ভবানী মুখোপাধ্যায়

পূর্বকথা—[জর্জ বার্ণার্ড শ' পনের বছর বয়সে একটি সাধারণ কর্মচারী হিসাবে জীবন-সংগ্রামে অবতীর্ণ হ'ন। তাঁর প্রথম জীবনের কাহিনী সেই সংগ্রামের কাহিনী। বার্ণার্ড শ'র জীবনের প্রথম চল্লিশ বছরের ইতিহাস অন্যত্র প্রকাশিত হয়েছে। চল্লিশোর্ধে বার্ণার্ড শ'র কাহিনী মাসিক বসুমতীতে প্রকাশিত হবে। এই কালেই শ' খ্যাতির সর্বোচ্চ শিখরে উঠেছিলেন।]

১৮৯৮, ১১শে জুন তারিখে শ' লিখেছেন—"আমার স্ত্রীর পক্ষে মনোরম মধুযামিনী, আমার পায়ের সেবা চলছিল, বেশ সেরে কিন্তু আমি এইবার পড়ে গিয়ে বাঁ হাতটা ভেঙেছি, ঠিক আছে।"

টফোলডে একটি বাসা নিয়ে মিসেস শ' জি, বি, এসের সারাবার চেষ্টা করছিলেন, বিয়ের পরই ওঁরা এখানে চলে লেন। সার্লোট শকে এই কাজে সাহায্য করছিলেন নার্স। কিন্তু এইভাবে পড়ে যাওয়ায় শ একেবারে কর্মণ্য হয়ে পড়লেন, এই সময় ভাগনার সম্পর্কে একটি বই লিখছিলেন, সেই কাজও বন্ধ রইলো। কিন্তু তিন সপ্তাহের ভিতর আবার কাজ সুরু করলেন এবং আগষ্ট মাসের মধ্যে বই শেষ হল। প্রকাশককে নির্দেশ দিলেন এমন ভাবে বইটা ছাপা এবং বাঁধাই হবে যে ধর্মগ্রন্থের মতো পকেটে রাখা যায়, নীরস গবেষণা গ্রন্থ নয়। এই গ্রন্থটি বার্ণার্ড শ'র বিশেষ প্রিয়, নাম The perfect Wagnerite। শ' এই গ্রন্থে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে ভাগনারও একজন সোস্তালিষ্ট ছিলেন।

পা ক্রমশঃ সেরে আসছিল, ডাক্তাররা প্রস্তাব করলেন সমুদ্রতীরে ভ্রমণের। সেপ্টেম্বর মাসে আইল অব ওয়াইটের এক হোটেলে গিয়ে উঠলেন স্বামি-স্ত্রী। এইখানেই বার্ণার্ড শ' তাঁর নতুন নাটক Caesar and Cleopatra রচনা সুরু করলেন।

পরকাল পরে ওঁরা আবার পিটফোলডে ফিরে এলেন, শ' এক পায়ে সাইকেল চড়ার চেষ্টা করতে গিয়ে আবার পা ভাঙলেন। শ' বলেছেন—"[illegible] অন্যান্যের বা দু'বার হাতভাঙার [illegible] প্রকাশ হতে

তাঁর আহারের ব্যবস্থা পরিবর্তনের জন্য বললেন। শ' নিরামিষ তিনি বললেন—death is better than Canibalism.

১৮৮১ জানুয়ারী মাস থেকে বার্ণার্ড শ' নিরামিষাশী। [illegible] শেলীর আদর্শে তিনি এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন, কারণ সেই কালে তাঁর ওপর শেলীর প্রভাব ছিল প্রচণ্ড। কিন্তু এ ছাড়া আরো একটি কারণ আছে, এই সময় মাসে একবার করে শ'র তীব্র মাথা ধরতো। শ' শুনেছিলেন নিরামিষ আহারে মাথা ধরা সারে। জবাই করা প্রাণীর প্রতি করুণাবশতঃ শ' এই ব্যবস্থা করেছিলেন তা নয়, তাঁর মতে জীবিত প্রাণীর দেহে মৃতদেহ কবরস্থ করা অনুচিত ও অশোভন। এ কথা অনুমান করা যায় যে হয়ত রাঁধার দোষে বাড়ির খাবার রুচিকর হত না, এবং সেইকালে লণ্ডনে অনেক নিরামিষ ভোজনালয় গড়ে উঠেছিল, অল্পমূল্যে সেখানে উত্তম আহার পাওয়া যেত।

১৮৮১'র মে মাসের শেষের দিকে বার্ণার্ড শ' স্মলপক্সে আক্রান্ত হন, এবং বসন্তরোগের জন্য প্রায় তিন সপ্তাহ ঘরে আটক থাকতে হয়। অসুখ সম্পর্কে শ কোথাও কিছু গোপন রাখেন নি, কিন্তু এই অসুখটি সম্পর্কে তিনি বিশেষ কিছু বলেন নি। তিনি বার বার এই কথাই বলতে চাইতেন যে মাংসাশী প্রাণীর চেয়ে তিনি স্বাস্থ্যবান, এবং তাদের চাইতে অনেক তাড়াতাড়ি [illegible] হাত থেকে মুক্তি পেয়ে থাকেন। এর কোনোটি কিন্তু [illegible] কিন্তু—টিকা না নেওয়ার কারণ হিসাবে এই স্মলপক্সের [illegible] আর কখনও তিনি এই রোগের কথা বলতেন না।

একটু সুস্থ হয়ে উঠে শ' [illegible] মামুন ওয়ালটারের কাছে [illegible]

যে ভোজন করেছিলেন, কিন্তু আবার অক্টোবর মাস ক পুরোপুরি নিরামিষাশী হলেন, এবং এই অভ্যাস থেকে চ্যুত হননি, নিরামিষ আহারের অনটন ঘটলে, অবশ্য কখনও কখনও মাছ খেতেন।

কিন্তু আশী বছর বয়সে যখন রক্তশূন্যতায় ভুগছিলেন বার্নার্ড শ', তখন তাঁকে লিভার ইনজেক্সন দিয়ে বাঁচানো হয়েছে।

শ' রসিকতা করে বলেছেন—"আমার উইলে আমার শবযাত্রা সম্পর্কে নির্দেশ আছে, সেই শবযাত্রায় শোকযাত্রীর গাড়ির ভিড় থাকবে না, থাকবে ষাঁড়, ভেড়া, শুকর, হাঁস-মুরগী এমন কি মাছের দল, তারা গলায় শাদা চাদর পরে আমার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করতে আসবে, আমি মৃত্যু বরণ করলেও তাদের স্বজাতিকে ভক্ষণ করিনি। 'নোয়াস আর্কের' ঘটনা ছাড়া এমন বিচিত্র শোভাযাত্রা আর কেউ কখনো দেখেনি।"

এই বছর নভেম্বর মাসেই ওঁরা হাইণ্ড-হেডে একটি নতুন বাড়িতে উঠে যান, বাড়িটির নাম ব্লেন্-কাথরা, এটি এখন একটি কলেজে পরিণত। শ লিখেছেন—"এই জায়গাটা পিটফোলডের চাইতে মনোরম, তাকে হারিয়ে দিয়েছে। এখানে এসে অবধি নতুন মানুষ হয়ে গেছি, এখানকার জলবাতাস এমন কি (কার কথা বলব?) সবাইকে নাট্যকার করে তুলবে।" সুতরাং তিনি মন দিয়ে **Caesar and Cleopatra** লিখতে লাগলেন।

শ'র বিবাহ প্রসঙ্গে নানা কথা এবং প্রশ্ন ওঠে। সার্লোট এবং র মধ্যে এমন গভীর সম্পর্ক থাকা সত্বেও উভয়ের বিবাহের কথা পাকা হতে এত দেরী হল কেন। শ'র জীবনীকারেরা দীর্ঘদিনের মেলামেশার ফলে পারস্পরিক প্রীতির সম্পর্ক এত সুদৃঢ় হয়েছে।

অনেকে আবার বলেন এর কারণ বহুবিধ, তবে এমন একজন গুণবতী মহিলাকে বিয়ে করলে লোকে বলতে পারে বার্ণাড শ' ভাগ্যান্বেষী, স্ত্রীর সম্পত্তিটাই তাঁর কাছে প্রধান আকর্ষণ, প্রেম নয়। এই কারণে সার্লোটকে 'নীল-নয়না আইরিশ ধনকুবের রমণী' প্রভৃতি বলার প্রকৃত অর্থ বার্ণাড শ'র আন্তরিক অস্বস্তি।

এই কালে অবশ্য প্রয়োজনাতিরিক্ত টাকা শ' উপার্জন করতেন, এবং প্রচার সভা প্রভৃতিতে বক্তৃতা দিয়ে সময় নষ্ট না করলে আরো অনেক অর্থ পেতেন, অনেক অবৈতনিক কর্মে শ'র সময় কাটতো। এই সময় থেকে শ' দু'চার জনকে কিছু কিছু সাহায্য করতেন, বয়সের সঙ্গে এই সাহায্যপ্রার্থীর সংখ্যা অনেক বেড়ে গিয়েছিল।

শ' নিজেও জানতেন সুসময় আসন্ন, তাঁর প্রতিভার মূল্য তিনি পাবেন, তবে হয়ত দেরী হবে। মানসিক দৃঢ়তা দিয়ে শ' নিজেকে বেঁধেছিলেন, সাফল্য তাঁর মাথা ঘুরিয়ে দেয়নি। একদা যে ভাবে অসাফল্যের ভার বহন করেছেন তেমনই নিরাসক্ত ভাবে সাফল্যের বোঝা কাঁধে তুলে নিয়েছেন।

শ'র খরচা ছিল যৎসামান্য, নিরামিষ ভোজনে দশ পেনস শিলিং দু'পেনস খরচা পড়ত। রাত্রে এক কাপ টি ডিম খেতেন। বন্ধুজনেরা তাঁকে নিমন্ত্রণ করে রুচি দেখে বিস্মিত হতেন। সকলের মনে হত শরীর দুর্বল হয়ে পড়ছে। শ'র নিজেরই সন্দেহ ছিল হয়ত লাংসটা খারাপ হয়েছে, তাই সকালে উঠে উচ্চৈঃস্বরে গলা সাধতেন, ধারণা, এই জাতীয় পরিশ্রমে লাংস ঠিক হয়ে যাবে। মাঝে মাঝে দীর্ঘপথ পায়ে হেঁটে বেড়াতেন, সঙ্গে থাকতেন উইলিয়াম আর্চার, গ্রাহাম ওয়ালাস, বা সিডনী ওলিভিয়ার। স্বাস্থ্যের উদ্দেশ্যে এই জাতীয় ভ্রমণ একেবারে অন্তিমকাল পর্যন্ত করেছেন, একেবারে অথর্ব না হয়ে পড়া পর্যন্ত।

দ্বিতীয় যুদ্ধের সময় শাদা কোটপরা জর্জ বার্ণার্ড শ' মোটর যাত্রীদের বিপন্ন করে তুলেছিলেন। শ' পায়ে হাঁটতে ভালোবাসতেন, বার বার পড়ে গেছেন এবং গুরুতর ভাবে আহত হয়েছেন, তবু এই অভ্যাস ত্যাগ করেন নি।

এই সমস্ত ব্যাপারে বার্ণার্ড শ'র খরচ ছিল যৎসামান্য, তাঁর ব্যয়-সাধ্য অভ্যাস মোটেই ছিল না, সার্লোটের সঙ্গে যখন শ'র পরিচয় হল তখন তাঁর হাতে প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থ। **The Devil's Disciple** শেষ করার পরে এলেন টেরীকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন শ'—"এখন থেকে একটু প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থ সঞ্চয়ের চেষ্টা করব, প্রয়োজন আছে বলে নয়, তবে বরাবরই আমি এতই দরিদ্র যে প্রায় দেউলিয়া ছিলাম না, একথা কিছুতেই বলা যায় না।"

সার্লোটের সঙ্গে পরিচয় কালে অর্থ সামর্থে সচ্ছল হলেও আর সব লেখকের মতই লেখকের ভাগ্য সর্বদাই পাঠক সম্প্রদায়ের রুচির উপর নির্ভরশীল, সুতরাং কিঞ্চিৎ অনিশ্চিত। পায়ের অসুখের জন্য দীর্ঘকাল অসুস্থ থাকায় বার্ণার্ড শ' প্রত আরো চিন্তিত হয়ে পড়লেন, অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সংশয় জাগলো মনে। শ'র সঞ্চয়ী প্রকৃতি, সাংবাদিকতা এবং আমেরিকান রঙ্গমঞ্চে নাটকের সাফল্যের ফলে এই কাল মোটামুটি সচ্ছল কেটেছে, নইলে তাঁকে এক বিপর্যয়ে পড়তে হত।

কিন্তু এই সব ছাড়াও বিবাহে বিলম্ব ঘটার অন্য ছিল। যৌন-সম্পর্ক বিষয়ে সার্লোটের মনে একটা ছিল। একসেল মনথের সঙ্গে অসফল প্রণয় এর আর কারণ হতে পারে। মাতৃত্ববিরোধী সার্লোটকে অনেকে বুঝেছেন, মনে করতেন তিনি বোধ হয় শিশুদের অপছন্দ করেন, কিন্তু এই ধারণা ভ্রান্ত। শ' সম্পর্কেও এই ভ্রান্ত ধারণা আছে, কিন্তু তাঁকে শিশুদের মধ্যে যাঁরা দেখেছেন তারাই জানতেন যে তিনি ছোটদের কত ভালো বাসতেন। পরিণত বয়সে শ' দুঃখ করতেন সন্তানহীনতার জন্য। বলেছেন, সার্লোটের সঙ্গে তাঁর চুক্তি ছিল বিবাহের ফলে সন্তান না হওয়া, কিন্তু এই বিষয়ে তাঁর কিঞ্চিৎ দৃঢ় হওয়া উচিত ছিল। সার্লোট অত্যন্ত দৃঢ়চেতা রমণী ছিলেন, অন্যথায় তিনি হয়ত বিবাহে রাজী হতেন না। বিবাহের ফলে যে রমণী যৌন-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় বিরোধী, স্বামীর পরকীয়া প্রীতিতে তাঁর কিঞ্চিৎ উদার হওয়া প্রয়োজন। সার্লোট কিন্তু সেই বিষয়ে অত্যন্ত কঠোর ছিলেন, স্বামীর এতটুকু উচ্ছৃঙ্খলতা তিনি সইতে পারতেন না। শ'কে যাঁরা অন্তরঙ্গ ভাবে জানতেন তাঁরা বলেন শুধু চিঠিপত্র লেখা ছাড়া শ'র এই বিষয়ে বিশেষ বাড়াবাড়ি ছিল না। মিসেস শ' বিশেষ করে প্যাট্রিক ক্যাম্বেলের সঙ্গে বার্ণার্ড শ'র ঘনিষ্ঠতা পছন্দ করতেন না। প্যাট্রিক ক্যাম্বেল এবং শ'র মধ্যে যে সব চিঠিপত্র বিনিময় ঘটেছিল তার কিছু উদাহরণ পরে দেওয়া যাবে।

শ' ছিলেন অতিশয় কোমল প্রকৃতির মানুষ। মহিলাদের প্রতি তাঁর ব্যবহার ছিল মধুর। নিজের মত বা ইচ্ছা তিনি জোর করে প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করতেন না। উভয়ের বিবাহে বিলম্বের এটি অন্যতম কারণ হতে পারে।

স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে অতিশয় মধুর সম্পর্ক ছিল। বন্ধুজনেরা এঁদের দাম্পত্য সম্পর্কের গভীরতায় অতিশয় আনন্দবোধ করতেন। শ' স্ত্রীর সম্পর্কে সচেতন, তুচ্ছতম প্রতিজ্ঞা পালনেও ছিল তাঁর অসীম আগ্রহ। সার্লোট একবার ম্যাকস বীরবোহমের সামনেই তাঁর আঁকা বার্ণার্ড শ'র ব্যঙ্গ চিত্র টুকরো টুকরো করে ছিঁড়েছিলেন। শ'র ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা এই ঘটনাটি সার্লোটের প্রেমের গভীরতার একটি দৃষ্টান্ত বলে মনে করেন। বার্ণার্ড শ'র কোনো রকম ব্যঙ্গচিত্র মিসেস শ' সহ্য করতে পারতেন না।

ফিটজরয় স্কোয়ারে অপরিচ্ছন্ন বাসায় বার্ণার্ড শ' যখন [illegible] পঙ্গু হয়ে পড়ে আছেন তখন সার্লোট ছুটে এসেছিলেন সেবার ভার নিতে। সেই সময় শ'কে হাইণ্ড হেড়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা না করলে হয়ত কোনো দিনই উভয়ের মধ্যে এই বিবাহ বন্ধন ঘটতো না।

ফ্রাঙ্ক হ্যারিসকে লিখিত এক পত্রে (১১৩০) শ' লিখেছিলেন—"চল্লিশ পার হওয়ার আগে আমার হাতে এমন টাকা ছিল না যে বিবাহ করলে নিছক অর্থের লোভে বিবাহ করছি না এই কথা মনে হত, আর সেই বয়সে (স্ত্রীর বয়সও চল্লিশ) আমার স্ত্রীর মনে যে সেই ক্ষুধা ছিল এই সন্দেহ করার কারণ নেই। আমাদের উভয়ের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলতা, প্রেমলীলা প্রভৃতির অবসান ঘটেছিল।"

১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে 'ব্রেন-ক্যাথারা' থেকে বার্ণার্ড শ' সর্বপ্রথম প্যাট্রিক-ক্যামবেলকে পত্র লিখেছিলেন। শ' লিখেছিলেন তাঁর শরীর ক্রমশঃ সেরে উঠছে,—তখনও উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা হয়নি। এই চিঠিতে শ' তাঁকে মিসেস প্যাট্রিক-ক্যামবেল বলেই সম্বোধন করেছিলেন।

দুই

শ'র পরাজয় ঘটেছিল মিসেস প্যাট্রিক ক্যামবেলের সংস্পর্শে। বার্ণার্ড শ' তাঁর নিজস্ব প্রভাব বিস্তারে সচেষ্ট হয়ে উঠেছিলেন, কিন্তু এই অভিনেত্রীর ইন্দ্রজাল স্পর্শে শ'র কৌশল ও ব্যক্তিত্ব প্রায় পরাভূত হয়েছিল।

প্রাথমিক সংযোগ ব্যবসা সূত্রে কিন্তু ক্রমশঃ তা নিবিড়তর হয়ে উঠল। এই সংযোগের ফলে বার্ণার্ড শ'র দাম্পত্য জীবনেও একটা প্রচণ্ড আলোড়ন এসেছিল। শ' লিখেছিলেন—"I am deeply, deeply wounded"—

উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা হওয়ার আগে অসংখ্য পত্র বিনিময় ঘটেছিল। সেই সব চিঠিপত্র মূলতঃ নূতন নাটকের প্রযোজনা সম্পর্কে, পত্রের মধ্যে দীর্ঘ বিরতিও ছিল।

Pygmalion—মিসেস ক্যামবেলের জন্যই রচিত হয়। 'পিগ্ম্যালিয়ন' লেখা শেষ হওয়ার পর এই নাটক সম্পর্কে মিসেস ক্যামবেলকে আগ্রহান্বিত করার উদ্দেশ্যে শ' কয়েকটি উচ্ছ্বাসপূর্ণ পত্র লেখেন। অভিনেত্রীদের নিজের নাটকে আগ্রহান্বিত করার জন্য শ' লিখছেন—"শুক্রবারের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ, স্বপ্নভরা শনি[illegible] জন্যও। জানতাম না আমার কিছু এখনও অবশিষ্ট [illegible] এখন আমি অনেক ভালো, আবার মাটির পৃথিবীতে ফিরে এ[illegible] আমার খোল-করতাল নিয়ে নেমে এসেছি। এ আমার ভী[illegible] এবং নীচতার পরিচায়ক হবে যদি না স্বীকার করি তুমি [illegible] রমণী, তোমার স্পর্শের ঐন্দ্রজালিক আবেশ আমার ও[illegible] বারো ঘণ্টার অধিককাল স্থায়ী হয়েছিল।"

এই রোমান্টিক অভিনয় কিন্তু নিছক ব্যবসাদারী। নাটক মঞ্চস্থ করতে হবে তাই অভিনেত্রীকে হাতে রাখা।

মিসেস ক্যামবেলও যে এই উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না তা নয়। শ' হয়ত বিবেক দংশনের প্রভাবে লিখেছিলেন—"আমার মত আইরিশ মিথ্যাবাদী এবং অভিনেতা সম্পর্কে সতর্ক থেকো, তোমার হৃদয়-রক্তে লেখনী পূর্ণ করে তোমার পবিত্র আবেগ ও অনুভূতি হয়ত মঞ্চে পরিবেশন করবো একদিন!"

মিসেস ক্যামবেল জবাবে লিখেছিলেন—'তুমি কি সত্যই মনে করো আমার প্রতি তোমার অনুরাগ বশতঃ আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলে? আমি জানতাম লিজাই তোমার লক্ষ্য (পিগ্ম্যালিয়ন নাটকের ফুলওয়ালী), তোমার এই মনোহর ব্যবসাদারী ভঙ্গীতে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম।"

এই অন্তরঙ্গতার সর্বশ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য এই যে, সূচনায় যা ছিল খেলা মাত্র তা একদা হৃদয় দাহণ সত্যে পরিণত হল। বণিকের মানদণ্ড যেমন শর্বরী শেষে রাজদণ্ডে পরিবর্তিত হয়েছিল, তেমনই কৌতুকবশে যে প্রেমাভিনয়ের সূত্রপাত তা অবশেষে [illegible] প্রেমের পর্যায়ে পৌছল।

শ' যেখানে যেতেন কেবল প্যাট্রিক ক্যামবেলের গল্প বলতেন, শ্রোতারা অতিষ্ঠ হয়ে উঠতো। শ'র ঘনিষ্ঠ বন্ধু সিডনী ওয়েব বুঝতে পারতেন না এই রমণীর ভেতর শ' কি পেয়েছেন, অন্য বন্ধুরাও বুঝতেন না। বার্ণার্ড শ'র এই মাত্রাতিরিক্ত প্রেমাবেগকে ওয়েব বলতেন, "a c[illegible] case of sexual senility." যৌনবিকার মাত্র।

মিসেস সার্লোট শ' ক্রমশঃই আতংকিত হয়ে উঠলেন। এদিকে মিসেস ক্যামবেল তাঁর প্রতি সার্লোটের উপেক্ষা লক্ষ্য করে তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করার জন্য সচেষ্ট হয়ে উঠলেন।

পরিকল্পনানুসারে না হলেও একদিন ঘটনাচক্রে উভয়ের দেখা হয়ে গেল। সার্লোট কিন্তু অত্যন্ত সৌজন্য সহকারে মিসেস ক্যাম্পবেলের সঙ্গে আলাপ করলেন।

শ' লিখেছেন—"সার্লোট শান্ত ভঙ্গীতে জানে আমাকে প্রতিহত করার ক্ষমতা কোনো নারীর নেই—স্ত্রীলোক সম্পর্কে তার তেমন আগ্রহ নেই—তোমাকে সে এখনও বোধকরি ধরতে পারেনি।"

এর পরের বছর শ' এবং মিসেস ক্যামবেলের [illegible] একটি টেলিফোন-আলোচনা সহসা সার্লোটের কানে যায়। [illegible] আলোচনার খণ্ডিত অংশ তাঁর মনে বিশেষ বেদনা সৃষ্টি করে।

মিসেস ক্যামবেলকে এই ঘটনার উল্লেখ করে শ' [illegible] "ভয়ংকর প্রতিক্রিয়া হয়েছে সার্লোটের মনে, [illegible]

রতে দেখলে আমার কষ্ট হয়। মরিয়া হয়ে শূন্যে হাত গুটিয়ে ভাবি আর মনে মনে প্রশ্ন করি একজনকে বলিদান না দিয়ে কি অপরকে সুখী করা যায় না ?"

এ বার্ণাড শ'র আত্ম-প্রবঞ্চনা নয়, তিনি মিসেস ক্যামবেলকে ভালোভাবেই জানতেন, সে যে কতখানি হিসাবী, কতদূর যে তার সীমা ত' তাঁর অজানা ছিলনা। মনে মনে শ' জানতেন মিসেস ক্যামবেল নিছক মেকি, লোভের বস্তু, সরল ভালোবাসা বা উদগ্র কামনার উপলক্ষ্য নয়।

এই বিচিত্র প্রেমলীলার যখন পূর্ণ জোয়ার তখন হঠাৎ একদিন মিসেস ক্যামবেল জর্জ-কর্ণওয়ালিস ওয়েষ্টকে বিয়ে করবেন স্থির করলেন। এই ঘটনার সবচেয়ে হাস্যকর অবস্থা হল যে বার্ণাড শ' এবং কর্ণওয়ালিস ওয়েষ্ট পরস্পরের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত হয়ে পড়লেন। দুজনের মধ্যে গভীর প্রীতির সম্পর্ক স্থাপিত হল।

শ' লিখলেন—"ষ্টেলা, (মিসেস ক্যাম্‌বেলের ডাক নাম) সুতরাং যদিও আমি জর্জকে ভালোবাসি (আমাদের উভয়ের সমান রুচি), আমি বলি সে ত' বয়সে তরুণ আমি প্রৌঢ়, সে বরং কিছুদিন অপেক্ষা করুক অন্তত আমি ক্লান্ত না হওয়া পর্যন্ত।"

বার্ণাড শ' এবং মিসেস প্যাট্রিক ক্যামবেল ডেনমার্ক হিলে ভগিনী লুসীর বাসায় মিলিত হতেন। লুসী এবং মিসেস প্যাটরিক ক্যামবেলের মধ্যে মনের মিল ছিল, তাই সহজেই দুজনের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠল। সার্লোট লুসীকে দেখতে পারতেন না, সুতরাং লুসী তাঁকে পছন্দ করতেন, শ' এবং মিসেস ক্যামবেলের এই প্রেমলীলায় হয়ত তাঁর জ্বালা নিবারিত হত। হয়ত আনন্দ পেতেন। সার্লোট হয়ত মনে করতেন শ' তাঁর রুগ্না ভগিনীকে দেখতে আসেন, আসলে কিন্তু মিসেস পার্ট্রিক ক্যামবেলই উপলক্ষ্য। কিন্তু এই প্রেমলীলার পরিণতিও আসন্ন হয়ে এসেছিল, শ'র মত রোমান্টিক মানুষের পক্ষে এমন উদ্দাম এবং হিসেবী স্ত্রীলোকের সঙ্গে তাল রাখতে পারা কঠিন।

স্যাণ্ডউইচের গিলডফোরড হোটেলে মিসেস ক্যামবেল উঠেছেন, বার্ণার্ড শ'র সেখানে হাজির হওয়ার বাসনা হল। কিন্তু এই রমণী শ'র প্রেমের অংশভাগিনী হওয়ার উপযুক্ত নন। তাঁর নজর নিজের সুখ সুবিধার দিকে।

স্যাণ্ডউইচে বার্ণার্ড শ'এর উপস্থিতিতে আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন মিসেস প্যাট্রিক ক্যামবেল, ভয় হল হয়ত আসন্ন বিবাহটা ভেঙে যায়, সত্বরে বার্ণার্ড শ'কে চিঠি লিখলেন মিসেস ক্যামবেল— 'দয়া করে লণ্ডনে ফিরে যাও, কিংবা যেখানে তোমার খুসী, এখানে থেকোনা, তুমি যদি না যাও আমিই যাব, আমি বড় ক্লান্ত, আমার অন্য কোথাও যাওয়া চলেনা। তোমাকে ঘৃণা করতে হবে এমন কর্ম যেন কোরোনা—ষ্টেলা।"

পরদিন প্রাতে আর একখানি চিঠি এল—ষ্টেলা পলাতক। সে লিখেছে—"বিদায়, আমি বড়ো ক্লান্ত,—তুমি আমার চেয়ে অনেক শক্ত এবং সমর্থ—ষ্টেলা"

এর প্রতিক্রিয়া অতিশয় তীব্র এবং তীক্ষ্ণ। উদ্দাম প্রেমলীলার পরিণতি। সেদিন বার্ণার্ড শ' যে চিঠি লিখলেন সে চিঠি প্যাট্রিক ক্যামবেলকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলার পক্ষে যথেষ্ট—

"তবে তাই হোক, যাও। একটি স্ত্রীলোককে হারানোর অর্থ পৃথিবীর অবসান নয়। সূর্য ওঠে, সাঁতার কাটতে ভালো লাগে, ভালো লাগে কাজ করতে, আমার আত্মার পক্ষে নিরালা সইবে। কিন্তু আমি অতিশয় ব্যথিত, আহত। আমাকে পরখ করে দেখলে যে আমাকে তোমার সইলো না, আমি তোমার মনে শান্তি এনে দিতে পারিনি, পারিনি স্বস্তি দিতে, কিংবা আনন্দ। আমাদের সখ্যতার কোথাও এতটুকু স্পষ্টতা নেই। আমি তোমার সঙ্গে একটু বেশী ভালো ব্যবহার করেছি। আমার হৃদয় ও মন তোমাকে সমর্পণ করেছি (যেমন উৎসর্গ করেছি পৃথিবীকে)। তোমাকে গড়ে তোলার চেষ্টা করেছি—আর তুমি তার বিনিময়ে পালিয়ে গেলে। তবে যাও—"

এই চিঠি পড়ে বোঝা যায়, শ' অতিশয় ক্ষিপ্ত হয়েছিলেন, সে চিঠির ভাষাও তেমনই তীব্র—তিনি লিখেছেন—"আমার আশা মেটেনি, তোমাকে কটুত্তম বাক্য প্রয়োগ করা হয়নি। হতভাগ্য রমণী, তুমি কে যে আমার অন্ত্র ছিন্নভিন্ন হবে? সাতান্ন বছর বয়সের মধ্যে কুড়ি বছর আমার কষ্টে কেটেছে, সাঁইত্রিশ বছর কাজ করেছি। তারপর দু'দণ্ড শান্তি পেয়েছিলাম। রোমান্সের দিকে প্রায় মন দিয়েছিলাম। পবিত্রতম বন্ধন ও গভীরতম মূল ছিন্ন করার বিপজ্জনক দায়িত্ব নিয়েছিলাম, চোরাবালিতে পা রেখে অন্ধকারে আলেয়ার পিছনে ছুটেছি, প্রাচীনতম মরীচিকার পিছনে ছুটেছে, বাসি ফুলের পাপড়িকে দু'হাতে গ্রহণ করেছি—"এ আমার স্বর্গ, এ আমার স্বর্গ'—"

এই চিঠিখানি সাহিত্য হিসাবেও অপূর্ব। শুধু অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা হল।

তৃতীয় দিবসেও বার্ণার্ড শ'র হৃদয়াবেগ শান্ত হয়নি। তিনি লিখছেন—"তুমি আঘাত করেছ, তাই তোমাকে আঘাত হানতে চাই। দুর্নাম ভাগিনী, নীচ, হৃদয়হীনা, চপলা, দুষ্টা রমণী। মিথ্যাভাষিণী, সত্যভঙ্গকারিণী, ছলনাময়ী নারী—"

শ'র এই তাচ্ছিল্যময় বক্রোক্তির পালটা জবাব দিলেন মিসেস প্যাট্রিক ক্যামবেল,—"অষ্টাদশ শতাব্দীর মনোবৃত্তির মানুষ তুমি, আমাকে তুমি হারিয়েছ কারণ আমাকে কখনও তুমি পাওনি, তুচ্ছ দীপাধার এবং অগ্নিশিখা ভিন্ন আমার কি আর আছে, তুমি তোমার উদ্দাম অহমিকার বাতাসে তা নির্বাপিত করতে চাও?—যদি তুমি অন্ধকারে পথ হারাও এই ভয়ে আমি আমার দীপশিখা জ্বালিয়ে রাখবো ?"

আগুন নিবিয়ে গিয়েছিল, পড়েছিল ভস্মাবশেষ, দীপশিখা আর জ্বালানো সম্ভব হয় না। আরো কয়েক বছর ধরে চিঠিপত্র চললো, কিন্তু সেই সব পত্রে উত্তাপ নেই, নাটক আর অভিনয়ের কথা।

শ'র নিদারুণ কশাঘাতে প্রেমের ম্লান দীপশিখা আবার হয়ত উজ্জ্বল হয়ে উঠতো, কিন্তু সেই বহ্নি স্পর্শ দিতে বার্ণার্ড শ'র আর আগ্রহ ছিল না। বার্ণার্ড শ'র খেলা শেষ,—তবু শ' কিঞ্চিৎ অভিনয় করেছেন শেষ পর্যন্ত—সার্লোটকে চিন্তিত, বিরক্ত এবং উত্যক্ত করেছেন।

মিসেস ক্যামবেলের দিন শেষ হয়ে এল, এই বয়স্কোজি প্রৌঢ়া রমণীকে কে আর অভিনয় করার জন্য আমন্ত্রণ করবে!

মিসেস ক্যামবেল কিঞ্চিৎ অর্থপ্রাপ্তির জন্ত বার্নার্ড শ'র পত্রাবলী প্রকাশের জন্তে উত্তোগী হলেন। শ' অবশ্ব মিসেস ক্যামবেল বিপদে পড়লেই অর্থ সাহায্য করতেন। কিন্তু এ বিপদ অন্ত রকম, অর্থ এবং প্রচার দুই চান মিসেস ক্যামবেল। শ' তাই জানালেন সার্লোটের জীবদ্দশায় এই পত্রাবলী প্রকাশ করা সঙ্গত হবে না, তবু মিসেস ক্যামবেল ছাড়বার পাত্রী নন।

কর্ণওয়ালিস-ওয়েষ্টের সঙ্গে বিবাহের অবসান ঘটলো। কর্মহীন হয়ে মিসেস ক্যামবেল, শ' এবং আরো অনেকের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলেন। হলিউডে ছুটলেন মিসেস ক্যামবেল, সেই মেকী আসরে মিসেস ক্যামবেলের কঙ্কালের নৃত্য দেখে কারো মনে আনন্দ জাগলো না।

হলিউড থেকে দেশে ফেরার পথে কাষ্টমস পথ রোধ করলো, মিসেস ক্যামবেলের কুকুর 'মুন বীম'কে দেশে আনার বাধা। মিসেস ক্যামবেল কনটিনেণ্টে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন এবং শ'র কাছে টাকার জন্ত আবেদন পাঠাতে লাগলেন। শ' একদিন লিখলেন—"তুমি যদি একটি বই লেখো—"যদিও আমি অপূর্ব অভিনেত্রী তবু আমাকে কোনো লেখক বা প্রযোজক তুবার গ্রহণ করবেন না—কেন?—তাহলে সেই বই বেশী বিক্রী হবে। আর তোমাকে এদেশে আনা? তার চেয়ে শয়তানকে বরং আনা ভালো। তুমি আমাকে এবং সবাইকে বিপদে ফেলবে। তুমি জানো না তোমার ঐ হতভাগা কুকুরটাকে আমি মনে মনে কতো আশীর্বাদ করেছি।"

১৯৩১-এর জুন মাসে শেষ চিঠিতে মিসেস ক্যামবেল লিখছেন—"দারিদ্র্য এবং আরামহীনতায় আমি অভ্যস্ত হয়ে উঠছি, দৈনন্দিন ছোটখাটো কাজের জন্ত দাসী নেই, তাও সইছে"—শ' কিন্তু অচল অটল। শেষ পত্রে আরো অনেক কথার সঙ্গে শ' লিখেছিলেন—"I am too old, too old, too old."

১৯৪০-এর এপ্রিল মাসে প্যারীতে পঁচাত্তর বছর বয়সে মিসেস ক্যামবেলের মৃত্যু ঘটে। শ' লিখেছেন—"মারা গেছে, সবাই স্বস্তি পেল, বিশেষ করে সে স্বয়ং, তার ইদানীংকার ছবি সুখী রমণীর ছবি নয়। বড় অভিনেত্রী ছিল না সে, তবে সে মোহিনী রমণী ছিল। সে ছিল দুর্দমনীয়। ওরিণথিয়ার চরিত্রটি (The Apple Cart) ওর নাটকীয় প্রতিরূপ। তার আত্মা শান্তি লাভ করুক।"

The Apple Cart নাটকের দ্বিতীয় দৃশ্যে কিং ম্যাগনাসকে ওরিণথিয়ার সঙ্গে কিঞ্চিৎ ধস্তাধস্তি করতে হয়েছে। এর পটভূমিতে বার্নার্ড শ'র জীবনের একটি ছোট্ট কাহিনী আছে। একদিন মিসেস ক্যামবেলের বাড়িতে সন্ধ্যা যাপন করছেন শ', বাড়ি ফেরার সময় হয়েছে, সার্লোটকে কথা দেওয়া আছে নির্দিষ্ট সময় ফিরতে হবে।

মিসেস ক্যামবেল এই ঘটনাটি জানতে পেরে শ'কে ওক করার জন্ত নানা ছল করে তাঁকে আটক রাখার চেষ্টা করলেন শেষে কিছুতেই আটকাতে না পেরে জড়িয়ে ধরলেন ধস্তাধস্তির ফলে উভয়েই মাটিতে পড়ে গেলেন, সে অবস্থায় দাসী দরজা খুলে এই দৃশ্য দেখে তাড়াতাড়ি পালিয়ে গেল।

শ' এই ঘটনাটি The Apple Cart-এ নাটকায়িত করেছেন।

বৈষ্ণবীয়

দুর্গাদাস সরকার

জানি, এ নয় লঘু তৃষ্ণা,
দুবেলা শুধু ভাবি দেহের নিয়ে দাবী
এখনো জেগে কেন কৃষ্ণা!

না হয় নেই হোক, তথাপি নেই শোক,
এ নয় বাণী তার বস্তুতঃ।
ত্রিলোকে বয়ে তার অশ্রু তো।

পূর্ব পশ্চিমে কতো না বার দিনে
আমার ডাক আসে উত্তরের,
কৃষ্ণা চঞ্চল দক্ষিণে।

নয়ন কালো কারো মেঘের বর্ণের
অঙ্গ সজ্জিত ভূষণে নানা,
মনের মত তবু যায় না জানা।

সহজে পায় যদি দুঃখ নেই;
যদি না কাছে পায় তখন হতাশায়
অন্ত জনে ডাকে সংশয়েই।

তারা কি জানতো না, কোথায় সান্ত্বনা?
শ্রেষ্ঠ ভাবে মনে সঙ্গদান,
অঙ্গ দিয়ে করে অঙ্গদান।

কৃষ্ণা নয় নিজে ত্রিগুণাতীত।
একা সে এক জনে বেসেছে ভালো মনে,
তাকেই পেলে সুখ অপরিমিত।

সামনে আছে যার স্মরণ পারাবার,—
বদল করে মালা কন্ঠ মনে,
সঙ্গে সেই থাকে সঙ্গোপনে।

কখনো যদি কাছে না যাই, 'আছে' 'আছে':
বলেও ঢাকে মুখ কৃষ্ণা।
প্রেম তো নয় মৃগতৃষ্ণা।

পরিমল গোস্বামী

শেষ পর্ব্ব

রেডিওতে সাপ্তাহিক সমালোচনার জন্ত চৌরঙ্গী অঞ্চলে প্রতি সপ্তাহে তিনটি ছবি দেখতে হত নিয়মিত। প্রতি মঙ্গলবার বেলা ১১টায় মেট্রোতে এবং বুধবার নিউ এম্পায়ারে ও লাইট হাউসে সকাল ৮টা থেকে পর পর। মেট্রোর জন্ত স্থায়ী পাস ছিল, অন্ত সিনেমা থেকে প্রতি সপ্তাহে ডাকে আসত। মেট্রোর কার্ডের বৈশিষ্ট্য—অ্যাডমিট টু, অর্থাৎ ব্যবস্থা ছিল দুজনের জন্ত। খুবই বিবেচনাসঙ্গত ব্যবস্থা। একজন সঙ্গী না হলে দেখতে ভাল লাগে না। আমার সঙ্গে অধিকাংশ সময় যেতেন 'চিত্রগুপ্ত' (মনোমোহন ঘোষ)। অনাদিকুমার দস্তিদারও যেতেন মাঝে মাঝে। নাটক ও বাংলা সিনেমা প্রতি সপ্তাহে নতুন হয় না, একটা আরম্ভ হলে ছ' মাস বা এক বছর। কাজেই ইংরেজী ছবি অনেক দেখতে হয়েছে, প্রায় পাঁচ বছর ধ'রে। যুদ্ধের জন্ত এ আলোচনা সাময়িক ভাবে বন্ধ থাকে, এবং তার পর যখন আরম্ভ হয়, তখন মাসে একবার মাত্র, এবং সেও সিনেমা ও থিয়েটার পৃথক ক'রে দেওয়া হয় এবং ইংরেজী ও বাংলা সিনেমাও পৃথক হয়। এই নবপর্যায়ে স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রমথনাথ বিশী ও পরে আমি যোগ দিই। তবে এবারে খুবই অনিয়মিত। স্থনীতিবাবু ও প্রমথনাথ দুজনেই এ বিষয়ে অধিকারী। স্থনীতিবাবু সর্বজাতীয় আর্টের ভক্ত, থিয়েটারেরও। রঙ্গমঞ্চপ্রিয় অনেককাল থেকেই, শিশিরকুমার ভাদুড়ির বন্ধু। প্রমথনাথ বিশী স্বয়ং নাট্যকার এবং ভাল অভিনেতা। থিয়েটারে গেলে নাম করতে পারতেন।

এই সময়ের কিছু আগে, অর্থাৎ ১৯৩৮—৩৯ সালে ক্যামেরার কাজে একটু বেশি মাত্রায় আকৃষ্ট হয়ে পড়ি। ১৯৩৬ সালেই এর আরম্ভ, আধুনিক একটি ক্যামেরা কেনার পর থেকে। নীরদচন্দ্র চৌধুরী আমার কয়েকটি ছবি "বাংলার শ্রী" এই নামে নূতন পত্রিকায় ছাপেন। সেগুলো অবশ্য তার বছর দশেক আগে তোলা। ছবিগুলি ছিল ধান চাষ সম্পর্কে। সেই সময় শম্ভু সাহার কয়েকখানি উৎকৃষ্ট ছবি এই কাগজে ছাপা হয়। ক্যামেরাকে চিত্রধর্মিতা ফোটাতে পারলে এদেশে তার কিছু মূল্য [illegible] আমাদের দেশে দুর্লভ হলেও বহু পূর্বে মাসিকপত্রে এর কিছু কিছু দৃষ্টান্ত আমি দেখেছি। কিন্তু ফোটোগ্রাফির আধুনিক পর্যায়ে নূতন পত্রিকায় নীরদ চৌধুরী আমাদের ছবি ছেপে এক নতুন যুগের সূচনা করলেন। তিনি পরের বছর অমল হোম সম্পাদিত মিউনিসিপ্যাল গেজেটের বার্ষিক সংখ্যা সম্পাদনা কালে আমার কয়েকখানা ছবি আর্ট প্লেটে ছাপেন। তারপর থেকে কয়েক বছর স্বাস্থ্য সংখ্যা ও বার্ষিক সংখ্যায় অমল হোম আমার অনেক ছবি ছাপেন। তাঁর পরিকল্পনায় পরে ছাপার বৈচিত্র্য এবং ছবির মর্যাদা এবং আমার উৎসাহ আরও বেড়েছিল। এই কাগজেই শম্ভু সাহার ছবি দেখে আমি তাঁর ভক্ত হয়েছিলাম। অধ্যাপক হিরণকুমার সান্যালেরও কয়েকখানি অতি সুন্দর ছবি দেখেছি মিউনিসিপ্যাল গেজেটে।

ছবি তোলা এ সময়ে একটা নেশার মতো পেয়ে বসেছিল। সঙ্গীও পেয়েছিলাম। নিউ থিয়েটার্সের প্রচার সচিব হেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ও আমি প্রতি ছুটিতে কলকাতার পথে পথে, নদীর ধারে ধারে, চিড়িয়াখানায়, শিবপুরের বাগানে, কলকাতার বাইরে মাঠে মাঠে ক্যামেরা নিয়ে ঘুরেছি। ছবির সংখ্যা হয়েছে কয়েক হাজার। ইতিমধ্যে নিখিলচন্দ্র দাসকে ক্যামেরায় উৎসাহী করে তুলেছিলাম। একবার হাসিয়ে দেওয়াতে তিনি তাঁর দামী ক্যামেরা ছুঁড়ে মারতে উদ্যত হয়েছিলেন। তখন বলেছিলাম এ বিষয়ে বক্স ক্যামেরা ভাল। পরপর অনেকগুলো ছুঁড়ে মারলেও অল্প টাকার উপর দিয়ে যায়।

মৌচাকের সম্পাদক সুধীরচন্দ্র সরকারের অনুরোধে এই সময় (১৯৩৭) ছোটদের উপযুক্ত একটি কি দু'টি প্রবন্ধ লিখি ফোটো তোলা বিষয়ে। একটু নতুন ধরণে লিখেছিলাম; এই সুধীর বাবুকে একদিন আমারই একটি ত্রুটির জন্ত শাস্তি পেতে হয়েছিল। একদিন বাড়ি থেকে বেরোতেই দেখি নিখিলচন্দ্র দাসের গাড়ি এসে থামল আমার পথ রোধ ক'রে। পাশে সুধীর বাবু উপবিষ্ট। নিখিল বাবুর মুখে কিছু দুশ্চিন্তার ছায়া। জিজ্ঞাসা ক'রে জানলাম অর্থের সন্ধানে বেরিয়েছেন। শুনে আমি শুধু বলেছিলাম চলন্তিকার প্রকাশক পাশে থাকতে অর্থচিন্তা কেন—সব অর্থ তো চলন্তিকাতেই পাবেন। এর ফলে সুধীর বাবুর কি অবস্থা ঘটেছিল তা বলা বাহুল্য মাত্র।

বিশ্বনাথ রায় সম্পাদিত 'জনসেবা' নামক সাপ্তাহিক কাগজের জন্য থেকে অধ্যাপক কবি বিভূতিভূষণ চৌধুরী আমার কাছ থেকে একটি ব্যঙ্গ রচনা নিয়ে ছাপেন ১৯৪৩ সালে। তখন যুদ্ধের তৃতীয় অঙ্কের শেষ দৃশ্য চলছে। 'ট্রামের সেই লোকটি,' 'বাঘের গলায় হাড়' প্রভৃতি গল্প জনসেবাতে প্রথম ছাপা হয়।

প্রবাসীতে ১৯৩৪-৩৫ থেকে প্রায় নিয়মিত লিখেছি। পুলিনবিহারী সেন এ সময়ে সহকারী সম্পাদক। ১৯৪০ সালে রবীন্দ্রনাথের তিনসঙ্গী প্রকাশিত হলে তিনি আমাকে এই বই সম্পর্কে একটি আলোচনা লিখতে বলেন। এই আলোচনাটি প্রবাসী (জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৮) তে ছাপা হয়। এ ভিন্ন আর দু'টি মাত্র প্রবন্ধ প্রবাসীতে লিখেছি, বাকী সবই ব্যঙ্গ গল্প। পুলিনবিহারী সেন সুজনতায় প্রসিদ্ধ, এ বিষয়ে তিনি অপরিবর্তনীয়। পত্রলেখক হিসেবে অক্লান্তকর্মা, তাঁর কয়েক শত চিঠি আমি জমা ক'রে রেখেছি।

যুগান্তরের কোন্ পুরো সংখ্যা থেকে প্রতি বৎসর লিখছি মনে নেই, ১৯৪০ থেকে সম্ভবত। লেখা আদায়ের ভার থাকত ভূষণচন্দ্র দাসের উপর। ভূষণচন্দ্র যুগান্তরের সাব-এডিটর (বর্তমানে সাময়িকী বিভাগের সহকারী সম্পাদক।) এ পর্যন্ত যুগান্তরের বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের পরে এই দ্বিতীয় ব্যক্তির সঙ্গে পরিচয় হল। তার পরে একদিন অপ্রত্যাশিত ভাবে এলেন আর্ট প্রেমিক সুকমলকান্তি ঘোষ, পিসি এল'এর সঙ্গে আমাদের বাড়ীতে, কিছু ফোটোগ্রাফ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে। এর কিছুদিন মধ্যেই প্রুফ দেখা উপলক্ষে যুগান্তরে গিয়ে বিজয়ভূষণ দাশগুপ্ত ও নন্দগোপাল সেনগুপ্তের সঙ্গে পরিচয় ঘটে।

যুদ্ধের মাঝামাঝি সময় থেকে পরিচয় কাগজে লিখছি। পরিচয়ের সঙ্গে পরিচয়ের মাধ্যম বিভূ মুখোপাধ্যায়। হিরণকুমার সান্যাল, গোপাল হালদার এঁরা পরিচয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত ছিলেন। বিভূ মুখোপাধ্যায়ই আমাকে প্রথমে পরিচয়ে লিখতে অনুরোধ করেন। এঁর ব্যবহার অতি মার্জিত এবং এবং মধুর। বহুবার এঁর সংস্পর্শে আসতে হয়েছে, কিন্তু চরিত্রমাধুর্যের কোনো সীমা খুঁজে পাইনি কখনো। চাঁপা রঙের জামা চাদর প'রে থাকতেন, এখন রং রক্ষা করছে শুধু চাদর। সেটি গৈরিক রঙের আর এক সংস্করণ। সন্ন্যাসের ভদ্র রূপ। এঁর সৌজন্য সৌজন্য-সপ্তাহে মাত্র সীমাবদ্ধ নয়। এমন নিরহঙ্কার সহৃদয় ব্যক্তি আধুনিক কালে খুব বেশি দেখা যায় না।

বসুমতীর সঙ্গে আমার সম্পর্ক সম্পূর্ণ আত্মিক। ১৯২৬ সালে প্রথম লিখেছি বসুমতীতে, এক বন্ধু সেটি আমার কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছিলেন। তারপর কবে থেকে যে আবার লিখতে সুরু করেছি তা মনে পড়ে না, কিন্তু কারো সঙ্গেই সাক্ষাৎ পরিচয় নেই। পরিচয় না থাকলেও দৈনিক ও মাসিক বসুমতী পেয়ে যাচ্ছি নিয়মিত —সে যে কবে থেকে তাও আর মনে আনতে পারি না। প্রাণতোষ ঘটককে চোখে দেখেছি দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে। তার আগে কিছু-দিনের জন্য বসুমতীর সঙ্গে আমার যোগাযোগ রক্ষা করেছে প্রসিদ্ধ কবি বিমলচন্দ্র ঘোষ। সে তখন মাসিক বসুমতীর সম্পাদনা বিভাগে কাজ করত।

১৯৪১ সালে ধর্মতলার খোবর্ণ লেনের লিপিকা প্রেস থেকে 'রূপ ও রীতি' নামক একখানা মাসিক পত্র প্রকাশিত হতে থাকে। সম্পাদক প্রমথ চৌধুরী। এ কাগজের একজন প্রধান উদ্যোক্তা বিনয়কৃষ্ণ দত্ত। ওখানে ছোটখাটো একটি আড্ডা বসত। ছোটখাটো মানে ঘরটা অত্যন্ত ছোট তাই। শিল্পী ভোলা চট্টোপাধ্যায় (ভি-সি), শচীন্দ্রলাল ঘোষ, বিনয়কৃষ্ণ দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, আমি এবং আরও অনেকে। ঐ একটুখানি জায়গাতেই শচীন্দ্রলাল ঘোষ মাঝে মাঝে মনের আনন্দে গান ধরতেন।

এই 'রূপ ও রীতি' কাগজে আমার কয়েকটি লেখা ছাপা হয়। তার মধ্যে একটি বেতার বক্তৃতা। এই লেখাটি সম্পর্কে দু'একটি কথা উল্লেখযোগ্য। বিষয়টি ছিল ইংরেজী থেকে বাংলায় অনুবাদ সমস্যা নিয়ে। যুদ্ধের সময় এমন অনেক নতুন ইংরেজী শব্দ (যুদ্ধ বিষয়ের) প্রতিদিন বাংলা অনুবাদের সময় দেখা দিচ্ছে যার প্রতিশব্দ নেই, অতএব তা ইংরেজীতেই রাখা ভাল এই ছিল আমার কথা। অর্থাৎ পরিচিত বাংলা শব্দে আধুনিক যুদ্ধজাহাজ ও বহু যুদ্ধাস্ত্রের পরিচয় দেওয়া যায় না, কেন না আমাদের দেশে এমন যুদ্ধ কখনো হয় নি। বলেছিলাম, "আমাদের দেশের প্রথম যুদ্ধ মহাভারতের যুদ্ধ, এবং শেষ যুদ্ধ পলাশীর যুদ্ধ। কিন্তু মহাভারতের যুদ্ধ দার্শনিক যুদ্ধ এবং পলাশীর যুদ্ধ এমন যা এই ১৯৪১ সালে ঘটলে লোকে টিকিট কিনে দেখত।"

আমার এই বক্তৃতার পরবর্তী বক্তৃতা ছিল সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের। তাঁরটিও ঐ একই সংখ্যা রূপ ও রীতিতে ছাপা হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন, "আধুনিক বাঙলার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আলোচনার উদ্দেশ্যে এই যে বক্তৃতামালা, এর প্রথম বক্তৃতায় পরিমল গোস্বামী বিদেশী শব্দের অনুবাদ নিয়ে বাঙালী লেখক আর সাধারণ বাঙালীকে যে ঝঞ্ঝাটে পড়তে হয় তার সুন্দর আলোচনা করেছিলেন। তাঁর বক্তব্যের সার কথা ছিল এই যে মুখের ভাষায় আমরা যে [বিদেশী] শব্দ ব্যবহার করি সেইটেই ভাষার সত্যকার শব্দ, লেখার ভাষায় ব্যবহারের জন্য পণ্ডিতেরা নানা রকম শব্দ [পরিভাষা] তৈরী করে দেন বটে কিন্তু সে সব শব্দ ছাপার অক্ষরেই বদ্ধ থাকে। সে সব শব্দ যতক্ষণ না লোকে সাধারণ কথাবার্তায় ব্যবহার করে,ততক্ষণ সে ধরণের শব্দের কোনো বিশেষ সার্থকতা নেই। তিনি একটি বিষয়ে বিশেষ জোর দিয়েই বলেছেন— আধুনিক জগতে মানুষের জীবনযাত্রা যে পথে চলছে, যে ভাবে নানা নোতুন নোতুন জিনিস বিজ্ঞান আবিষ্কার করে মানুষের সেবায় এনে দিচ্ছে, তাতে নিত্য নোতুন নোতুন শব্দ এই সব জিনিসের নাম হিসেবে ভাষায় আসছে।...

সুধীরচন্দ্র সরকারের কি অবস্থা ঘটেছিল তা বলা বাহুল্য

"ইউরোপ অ্যামেরিকা এই সব জিনিস বার করবে, এদের নাম ইউরোপ অ্যামেরিকা থেকেই আমাদের দেশে আসছে। অনেক সময় আমরা বাঙলা ভাষায় এই সব শব্দের একটা অনুবাদ করে নেবার চেষ্টা করি; কিন্তু সে অনুবাদ বহু স্থলে আবার ঠিক হয় না। বস্তুর নাম হলে বিদেশী নামটাই ব্যবহার করতে কারো বাধে না, ভাষায় সেই শব্দটাই প্রচলিত হয়ে দাঁড়ায়। তিনি কতকগুলি উদাহরণ দিয়েছেন, যেমন এরোপ্লেন, রেডিও, মোটরকার, ক্রুজার, ট্যাঙ্ক, মেশীনগান, ডেপথ চার্জ টর্পীডো।"

আমার বক্তব্যের এই সারাংশ-শেষে সুনীতি বাবু যে কথাটি বললেন তার মর্ম এই কথাগুলিতে পাওয়া যাবে—"একেবারে নোতুন দেখা দিয়েছে এমন কোনো জিনিসের নাম নিতে আমাদের তেমন বাধে না, বিশেষতঃ নামটা যদি সংক্ষিপ্ত আর ছোটো হয়; কিন্তু অনেক সময় একটা 'স্বদেশী মনোভাব' এসে কোনও ভাব, গুণ, শ্রেণী, ক্রিয়া ইত্যাদির বোধক বিদেশী শব্দকে অনুবাদ ক'রে নেবার প্রয়োজন হয়। অনেক সময় কথাবার্তার ভাষায় আমরা ব্যবহার না করলেও (আমরা অল্পবিস্তর সুবিধাবাদী কি না, বিশেষতঃ ভাষার ব্যাপারে) সে রকম অনুবাদ লেখার ভাষায় চলে আর কচিৎ সুপরিচিত হয়েও দাঁড়ায়—সাহিত্যে বেশী ব্যবহারের ফলে মুখের ভাষাতেও ক্রমে এগুলি চালু হয়ে যায়।

সুনীতি বাবুর মূল বক্তব্য এইটি। আমার বক্তব্যে যেটুকু ফাঁক ছিল সুনীতি বাবু তা পূরণ করলেন একটুখানি অ্যামেণ্ড ক'রে।

১৯৪০-এর কোনো একদিন রেডিওতে গিয়ে নৃপেন্দ্র মজুমদারের কাছে শুনি যুদ্ধের প্রচার উদ্দেশ্যে আধা সরকারী এক প্রতিষ্ঠান গড়া হচ্ছে, নাম পাবলিক রিলেশনস্ সাব-কমিটি, (পরে 'সাব' উঠে গিয়ে শুধু কমিটি), তাতে অনুবাদের কাজের জন্য তিনি আমার নাম সুপারিশ করেছেন।

এই প্রতিষ্ঠানে যুদ্ধান্ত কাল পর্যন্ত কাজ করেছি—এক বেলার কাজ। বহুবিধ টুকরো কাজ এক সঙ্গে এবং শহরের উপর বোমার আশঙ্কা ক্রমেই বাড়ছে।

ফেব্রুয়ারি ১৯৪১, ২২শে তারিখে স্টেশন ডাইরেকটর ভিক্টর পরাণজ্যোতি এক নিমন্ত্রণ পাঠালেন। গিয়ে দেখি লেখক বন্ধু অনেকেই এসেছেন। পরাণজ্যোতির বক্তব্য রেডিওতে একখানা উপন্যাস প্রচার করা হবে, তার এক একটি অধ্যায় এক এক জনে লিখবেন। প্রস্তাবটি ভাল। সবাই রাজি। কিন্তু বুদ্ধিতে বয়সে যিনি আমাদের অতিক্রম ক'রে গেছেন তিনি এ উপন্যাসের সবচেয়ে সহজ অধ্যায়টি লেখার ভার নিলেন। অর্থাৎ প্রথম অধ্যায়। প্রথম অধ্যায় তিনি আর কাউকে দিতে রাজি নন। ইনি হচ্ছেন হেমেন্দ্রকুমার রায়—আমাদের প্রিয়তম হেমেনদা। এ উপন্যাস যথাসময়ে প্রচার করা হয়েছিল এবং পনেরো জনে লেখা ব'লে এর নাম হয়েছিল পঞ্চদশী।

পঞ্চদশীর লেখকের নাম অধ্যায় পরম্পরা হিসেবে এই—(১) হেমেন্দ্রকুমার রায়, (২) সরোজকুমার রায়চৌধুরী, (৩) কেশবচন্দ্র গুপ্ত, (৪) উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, (৫) সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, (৬) প্রবোধকুমার সান্যাল, (৭) পরিমল গোস্বামী, (৮) প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, (৯) নরেন্দ্র (১০) শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, (১১) বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল) (১২) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, (১৩) সজনীকান্ত দাস, (১৪) তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, (১৫) নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত। অন্যান্য ব্যাপারে যেমন, এখানেও তেমনি আমি মধ্যপন্থী।

আমার অধ্যায়টি রেডিওতে পড়েছিলাম ২৩-৫-৪১ তারিখে। এ উপন্যাস কোনো এক প্রকাশক ছেপেছিলেন ঐ বছরেই।

এ সময়ে চারদিক ঢাকা নিয়ন্ত্রিত একটুখানি আলোর সাহায্যে পড়াশোনা। ব্ল্যাকআউটের কৃষ্ণপক্ষের রাতগুলোয় তবু তো খানিকটা নিশ্চিন্ত মনে হয় (যদিও ভুল ক'রে) কিন্তু চাঁদ দেখলে আতঙ্ক। এতকালের আদরের চাঁদ শত্রুপক্ষে যোগ দিয়েছিল ভেবে ভীষণ দুঃখ। মনে হয়েছিল, চাঁদের আলোয় শত্রুবিমান আক্রমণের লক্ষ্য সহজে চিনতে পারবে। কিন্তু তখন একটি খবরে জানা গেল—বিমানবাহিনী সাফল্যের সঙ্গে কোনো শহরের লক্ষ্যবস্তুর উপর বোমা ফেলে ফিরে আসার পর বাহিনীর নেতাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, "কি ক'রে শহর চিনতে পারলে?" তিনি তার জবাবে বলেছিলেন, "আকাশ থেকে দেখা গেল মস্ত বড় একটা এলাকা অস্বাভাবিক রকমের অন্ধকার, তখনই বুঝলাম এইটিই শহর।" এটি পড়ার পরে আতঙ্কিত হওয়ার জন্য আর শুক্লপক্ষের অপেক্ষা করিনি।

সাইরেনের কি বীভৎস পৈশাচিক আওয়াজ! ঐ আওয়াজের সঙ্গে বোমাপড়ার আওয়াজ মিলে শেষে এমন এক 'কনডিশনড্ রিফ্লেক্স'-এর উদ্ভব হল যে সাইরেন বাজলেই দম বন্ধ ক'রে অপেক্ষা করতাম কতক্ষণে মাথার উপর বোমা পড়বে। তারপর হঠাৎ 'অল ক্লিয়ার'—একটানা বাঁশি—আরামের নিশ্বাস!

বোমা পড়া আরম্ভ হলে শহরবাসীর কি বৈরাগ্য। দিগ্বিদিক জ্ঞানহারা হয়ে পালাচ্ছে সব। জমি বাড়িঘর আসবাবপত্র যে কোনো দামে ছেড়ে পালাচ্ছে।

২০শে ডিসেম্বর (১৯৪২) প্রথম বোমা পড়ল কলকাতায়। ২১ তারিখে আর একবার। ২২ তারিখে তৃতীয় আক্রমণ, ২৪ তারিখে চতুর্থ আক্রমণ। বৈরাগ্য আসবে না কেন মনে? বিধ্বস্ত রেঙ্গুন শহরের ছবি দেখছি, যুগুৎসুকারী জাপানী (এই রকমই অন্তত প্রচার করা হত) অমানুষিক অত্যাচার করছে সবার উপর (অন্যদেশের সৈন্যরা তো করুণার অবতার!—আর ভাবছি মানুষের জীবনের কি দাম? বহুকাল পরে কলকাতার সকল বয়সের সকল সম্প্রদায় ও ধর্মের লোকের মনে ঐ একই জিজ্ঞাসা, বৈরাগ্য ভিন্ন প্রাণ বাঁচে কিসে? একটি ঘটির মায়ায়, একটি বাটির মায়ায়, আবদ্ধ থেকে প্রাণ হারাবে? অতএব ঘটিবাটি বিক্রি ক'রে দিয়ে বেরিয়ে এসো পথে—খোলাপথের গান গাইতে গাইতে এগিয়ে চল (দিশাহারা হয়ে), শুধু ছুটে চল, ঘুস দিয়ে রেলের টিকিট কর, ঘুস দিয়ে গাড়িতে ওঠ, ঘুস দিয়ে প্রাণটা বাঁচাও, ঘুস দিতে দিতে ছুটে চল।

বৈরাগ্যই বটে, কিন্তু এটি ছিল নির্বোধের বৈরাগ্য, তাই এদের ত্যাগে যে বিরাট একটা ওজন কমে গেল, সে ওজন বহন করার জন্য সে দিন ডেস্পারেট ভোগীর দল এদের পায়ে পায়ে লেগে ছিল। তারা সস্তায় ধনী হয়ে গেল।

কলকাতার পথে পথে কঙ্কাল জমে উঠছে। কটা দিন সবাই

চরম উদাসীন। কারো কোনো দিকে খেয়াল নেই। ক্রমে পথে পথে শত শত মৃত ও মুমূর্ষু ডিঙিয়ে পথ চলছি, মন বিবাগী, দিগভ্রান্ত। জীবনের কি দাম। তরুণ ছেলেদের মুখেও হাসি মিলিয়ে গেছে।

এমনি এক দিনে ১২ নং ওয়াটারলু স্ট্রীটে (১৯৪২) বিপ্লবী সাধকশিল্পী ভোলা চট্টোপাধ্যায় (V. C.) এক প্রকাশনীর উদ্বোধন করলেন। এটিতে কোন ব্যবসাদারী চেহারা ছিল না, একটি বৈঠকখানা মাত্র, নাম সন্ত্বাগার। সন্ত্ব মানে সাধুই সম্ভবতঃ। ডক্টর কালিদাস নাগ উপস্থিত থেকে সবার কল্যাণ কামনা করলেন। এর প্রধান উদ্যোক্তা বিনয়কৃষ্ণ দত্ত। কিন্তু প্রকৃত সন্ত্ব বা সত্ত্ব বা সাধু মাত্র দুজন, ভোলা চট্টোপাধ্যায় ও বিনয়কৃষ্ণ দত্ত। বাদবাকী সবাই গৃহী-সন্ন্যাসী।

একটিমাত্র ঘর, কিন্তু ভিড় জমত মন্দ নয়। ভোলানাথ, গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য, বিনয়কৃষ্ণ, প্রতিশঙ্কর রায়, সুধাংশুপ্রকাশ চৌধুরী, বিমলচন্দ্র চক্রবর্তী, ত্রিদিবনাথ রায়, কিরণকুমার রায়, বিভাস রায়চৌধুরী, রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, অতুলানন্দ চক্রবর্তী, মোহিনীমোহন মুখোপাধ্যায়, বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, বিনয় চৌধুরী, কমলাকান্ত বিশ্বাস ও আরও অনেকে।

এখানে পর পর অনেকগুলি বই ছাপা হয়। সবই একরকম চেহারার—নাম শতাব্দী গ্রন্থমালা। অধ্যাপক মোহিনীমোহন মুখোপাধ্যায়ের ইনকাইলাম, রবীন্দ্রনাথ ঘোষের লোক-বাহুল্যের আতঙ্ক, অধ্যাপক বিভাস রায়চৌধুরীর নাট্য-সাহিত্যের ভূমিকা, বিনয় চৌধুরীর ঘর ও সংসার (ছোট গল্পের বই), সুধাংশুপ্রকাশ চৌধুরীর নব্য-বিজ্ঞান-কথা, নরেন্দু বসুর রস-সাহিত্য ও আমার হনুমানের বিচার, (কৌতুক-নাট্য, মার্চ ১৯৪৩)।

পরমাণু রহস্য এবং বিশ্বসৃষ্টির মূলকথা বোঝাবার উদ্দেশ্যেই নব্য-বিজ্ঞান-কথা বইখানি লেখা। কিন্তু এ লেখা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। গল্প বা রূপকথার ভঙ্গীতে লেখা। তিনটি অধ্যায়—"একটি অসম্ভব রূপকথা" "একটি আজগুবি নাটক" ও "বুদ্বুদ বিদারণ কাহিনী"। আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞানের মূল কথাগুলি এমন সুললিত গল্পের বা নাটকের ভঙ্গিতে অদ্যাবধি বাংলা ভাষায় লেখা হয়নি। নমুনা—

"গল্প শুরু হল: তোমরা, অর্থাৎ যারা হিন্দুশাস্ত্রের খবর রাখ, নিশ্চয়ই জান যে পুরাকালে বিশ্বামিত্র একবার বিশ্বসৃষ্টি করতে আরম্ভ করেন, কিন্তু আমার যতদূর মনে পড়ছে, সে কাজ তাঁর শেষ হয়নি
বিশ্বসৃষ্টির কাজ স্বয়ং বিশ্বস্রষ্টাও (মানে যদি তিনি থাকেন) বো
আজও শেষ করে উঠতে পারেননি, হয়তো কোনো দিনই এ
হবে না। আমার গল্পের বিষয় হচ্ছে কলির বিশ
তোমাদের বিশ্বামিত্র সৃষ্টি সুরু করেন রাগে, আমার রূপক
অনুরাগে, তবে অনুরাগটা অবশ্য ব্যক্তিক নয়, নিছক বৈ

এইভাবে কাহিনী শুরু। নায়ক বাদারফোর্ড
বই বাংলা ভাষায় এই প্রথম, এবং সম্ভবতঃ এই শে
পুনর্মুদ্রণ হয়নি কেন জানি না।

রবীন্দ্রনাথ ঘোষ সত্ত্বাগারের একটিমাত্র
"লোকবাহুল্যের আতঙ্ক" লেখেনি। তারও
ভিত্তিতে লেখা পপুলেশন বিষয়ক। তা
বাহুল্যের আতঙ্ক অমূলক। বর্তমান অং

হার আপনি কমে আসছে, নতুন করে সে চেষ্টা করা ভুল। কাজেই তাতে সমাজের, যে স্তরের সন্তান হওয়া বাঞ্ছনীয় তাদেরই সন্তান সংখ্যা কমবে, কিন্তু যাদের কমা উচিত তাদের কমবে না। ইউরোপের এই অভিজ্ঞতার কথা সে ব্যাখ্যা করেছে এ বইতে।

শতাব্দী গ্রন্থমালার বইগুলিতে একটি সাধারণ ভূমিকা থাকত, ভূমিকার স্বাক্ষরকারী তিন জন—প্রতিশঙ্কর রায়, সুধাংশুপ্রকাশ চৌধুরী ও বিনয়কৃষ্ণ দত্ত। প্রতিশঙ্কর বিজ্ঞান কলেজে গণিতের অধ্যাপক, সত্ত্বদত্তা ভিন্ন আর সবই তাঁর অঙ্কের হিসেবে মাপা। সব বিষয় precise, সম্ভবত জার্মানির প্রভাব।

ওয়াটারলু স্ট্রীটের দিনগুলিই কলকাতার চরম দুর্দশাগ্রস্ত দিন। তবু বাইরে যতটুকু বৈরাগ্য মনে জাগত, এখানে অনেক বন্ধু একত্র জুটে কিছুক্ষণ কাটালেই আবার মনের অবস্থা স্বাভাবিক হত। এখান থেকে দল বেঁধে বিকেলের দিকে খাদ্য অভিযানে বেরোতাম। খাদ্য বস্তু বড়ই দুর্লভ। খুঁজে খুঁজে কাছাকাছি একটা আড্ডা আবিষ্কার করেছিলাম, দোকানটি একটু অন্তরালে, প্রচুর ভীড়, কিন্তু তবু তো কিছু পাওয়া যেতো। পথে পথে তখন অনাহার-মৃত্যু আরম্ভ হয়ে গেছে। ক্যামেরা নিয়ে বেরোলে মূল্যবান ছবি হতে পারত এই সব মুমূর্ষুর। কিন্তু প্রবৃত্তি হল না। কোনো দিন একটি ছবিও তুলতে পারিনি।

কিছুদিনের মধ্যেই দৃশ্য পরিবর্তিত হল। তার মানে
যুদ্ধে আমরা সবাই হেরে গেলাম। ওয়াট
বিনয়কৃষ্ণ দত্তের নেতৃত্বে চলে এলাম
জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যাণ্ড পাবলি
সুরেশচন্দ্র দাস, বিনয়কৃষ্ণের
প্রচারে মন দেবেন, অতএব
এই সঙ্গে 'বাংলার শিক্ষ
(নামে নবী
১১৯ নম্বরে
স্থান সঙ্কুল
থেকে
অ

নিয়মিতদের মধ্যে জগদীশ গুপ্ত, সরোজকুমার রায়চৌধুরী, ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় (ভি-সি), গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য, নরনীকান্ত বিশ্বাস, কালীকিঙ্কর ঘোষ দস্তিদার, প্রভাতশঙ্কর রায়, সুধাংশুপ্রকাশ চৌধুরী, বিনয়কৃষ্ণ দত্ত, অপর্ণাপ্রসাদ সেনগুপ্ত, পরেশচন্দ্র দাসগুপ্ত, অশোক মজুমদার ইত্যাদি। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে এখানকার পরিচয় আরও একটু ঘনিষ্ঠ হল, তাঁর বই অনেকগুলো ছাপা হয়েছিল এখানে। খুব গম্ভীর এবং মৃদুভাষী, এবং কিছু ভাবপ্রবণও, কিন্তু তাঁর ছোট গল্পের মধ্যে যে স্নিগ্ধ কৌতুক হাস্যের স্রোত বয়ে যায়, তা তাঁর মধ্যে হঠাৎ খুঁজে পাওয়া যায় না। সম্পূর্ণ বর্ণচোরা। নরনীকান্ত বিশ্বাস সাহিত্য সমালোচনায় খ্যাত, দীর্ঘদেহ এবং এমন, যে আকাশে চোখ তুলে আলাপ করতে হয়। দৈর্ঘ্যে মণীশ ঘটকের সগোত্র।

এখানকার বৈঠক স্থায়ীভাবেই জমে ওঠবার কথা, কিন্তু ...পণ্ডের মতোই বাজারে কাগজের দুর্ভিক্ষ দেখা দিল এবং এক আশ্চর্য ঘটনা লক্ষ্য করলাম এই যে, যুদ্ধের দরুণ অন্নবস্ত্রের যত ...ভিক্ষ ঘটতে লাগল, সাধারণ লোকের বই পড়ার ঝোঁক ...ত গেল বেড়ে। শেষে হাতে তৈরি অতি নিকৃষ্ট কাগজে ...ই ছাপা ভিন্ন গতি রইল না। অবশ্য যাঁরা ব্ল্যাক মার্কেটে ...দায় রাজি ছিলেন না তাঁদের দুর্দশা হল বেশি। ... আমার 'ব্ল্যাক মার্কেট' নামক গল্পের বইখানাও ...জ ছাপতে হল। এই হাতে তৈরি কাগজের ... পাঠকের চেয়েও পোকায়। কিছুদিনের ... হয়ে গেল এই ভাবে। সরোজকুমারের ...পর পোকায় শ্রেষ্ঠ হাংগার পরিতৃপ্ত ...।

...ক জনের বারোটি গল্পের ...ম্পাদনা করেছিলাম ... ঘোষ, প্রবোধ ...নাথ বসু, ...পরিমল ...কা

যুদ্ধের অফিসের কাজ, এখানকার কাজ, উপরন্তু বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র আর এক ঘাটে নিয়ে পৌঁছে দিলেন আমাকে। একই সঙ্গে সাত ঘাটের জল খেলাম। অহীন্দ্র চৌধুরী তখন রঙমহলের নিয়মিত অভিনেতা, তাঁর ইচ্ছা মঞ্চ সংক্রান্ত একখানা কাগজ বার করা। বীরেন্দ্রকৃষ্ণের মতে আমিই এ বিষয়ে নির্ভরযোগ্য যুক্ত পুরুষ। ছিলাম রসায়ন মতে ট্রায়াড, এবারে হলাম টেট্রাড। একেবারে কার্বনধর্মী। বলছি শুধু, তবে আলো দিচ্ছি কি না সন্দেহ।

'রঙমহল সংবাদ' নামক পাক্ষিকপত্র প্রকাশিত হল। (প্রথম সংখ্যা ১লা আগষ্ট, ১৯৪৩)। তখন ঘোর যুদ্ধের কাল, দুর্ভিক্ষের কাল, (ভাত কাপড় এবং কাগজের), নতুন কাগজ প্রকাশে অনেক হাঙ্গামা, তাই ওটি হল শুধু থিয়েটারের দর্শকদের কাছে টিকিটের সঙ্গে একখানা করে বিনামূল্যে বিতরণ উদ্দেশ্যে। এ কাগজে অবশ্য রঙমহলের নাটকগুলিরই প্রচার ছিল মুখ্য, তার সঙ্গে দেশ বিদেশের মঞ্চসংবাদ থাকত, মাঝে মাঝে ছোট গল্পও। প্রাচীনকালের নাটক বিষয়ে অহীন্দ্রবাবু লিখতেন। আমি সন্ধ্যায় যেতাম সেখানে, অহীন্দ্র বাবুর সাজঘরে জমত আড্ডা। অনেকেই আসতেন। পুরণো অভিনেতা কুঞ্জলাল চক্রবর্তী, ক্ষেত্র মিত্র প্রভৃতিকে দেখেছি এখানে। প্রমথনাথ বিশীর 'ঘৃতং পিবেৎ' নাটকখানি 'সানি ভিলা' নামে এখানে খুব সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়। এই উপলক্ষে তিনি প্রতিদিন আসতেন এখানে। অন্যতম উদ্দেশ্য প্রতিদিনের প্রতিশ্রুত টাকা আদায় করা। থিয়েটার সম্ভবত সে প্রতিশ্রুতি বেশিদিন পালন করেনি।

মন্মথমোহন বসু, হেমেন্দ্র দাসগুপ্ত প্রায় আসতেন। একদিন একটি পরিচিত কণ্ঠস্বরে কিছু বিভ্রান্ত হয়েছিলাম। বাল্য কাল থেকে রেকর্ডের মধ্যে দিয়ে কুসুমকুমারীর কণ্ঠস্বরের সঙ্গে পরিচয়। পরে নৃপেন বোসের অংশীদাররূপে নাচ গান দেখা ছিল। বহু কাল পরে সেই কণ্ঠ কানের পাশে। চেয়ে দেখি এক বৃদ্ধা পাশে দাঁড়িয়ে, বিধবা, থানপরা, তোলচর্মা। পরে শুনলাম তিনিই সেই কুসুমকুমারী। কণ্ঠস্বরের পাখীটি এখনও ঠিক আছে, শুধু খাঁচাটি একেবারে জীর্ণ হয়ে পড়েছে। আরও শুনলাম এঁর এখন চ্যারিটির উপর নির্ভর। রঙমহলে নবরূপে প্রযোজিত বিজিয়া নাটক সম্পর্কে কুসুমকুমারীর একখানা চিঠি ছাপা হয়েছিল।

অহীন্দ্র বাবুর পরিবেশটি ভালই লেগেছিল, তাঁর থিয়েটার বিষয়ে ...ভিজ্ঞা ছিল, পড়াশোনাও করতেন। থিয়েটারে ভূমিকা তৈরি ... দেওয়ার কাজে সন্তোষ সিংহ ছিলেন পাকা ওস্তাদ। তিনি ... ভাবে খাটতেন। সন্তোষ বাবু সব রকম ভূমিকাতেই ...ত অভিনয় করতে পারতেন।

...সংবাদ ১ মাস পরে বন্ধ ক'রে দিতে হল। যাঁর টাকা ... বাবুর এই কাজটি ভাল চোখে দেখতেন না। তাঁর ...পাদান হতে পারে। অহীন্দ্র বাবুর একবার অসুখ ...লক নিজে ডাক্তার নিয়ে গেলেন, নিজে ফী দিলেন, ...ন্দ্র বাবুকে দিতে দিলেন না, জোর ক'রে নিজে ... বই আমি জানি। কিন্তু বিস্মিত হলাম যখন ... আরম্ভ করলেন "হাড় কেপ্পন মশাই, ওষুধের ... ভেজে চালাচ্ছেন।" ইত্যাদি।

...। খুবই কৌতুক বোধ করেছিলাম। তার

পর দীর্ঘ ১ মাস পরে হঠাৎ একদিন এ বৃত্তের উপরে যবনিকা টেনে দিলাম নিজ হাতে।

এর কয়েক মাস আগে গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের পুত্র সুধীরচন্দ্র এসে প্রস্তাব করল তারা কয়েক বন্ধু মিলে একখানা মাসিক পত্র বার করবে, তাতে আমার নাম সম্পাদকরূপে তাদের থার দিতে আমি রাজি আছি কি না। আমি বললাম নাম দিতে আপত্তি নেই, কিন্তু সে ক্ষেত্রে লেখা মনোনয়নের ভারও আমাকে নিতে হবে, নইলে অস্বস্তি বোধ করব।

তাই স্থির হল। মাসিকের নাম হল 'নূতন পত্র।' আমার নামের সঙ্গে সুধীরের নামও ছাপা হল সম্পাদকরূপে। যথারীতি ডিক্লারেশন নিয়ে এবং প্রায় ৩৬ পৃষ্ঠা বিজ্ঞাপন অঙ্গে ধারণ ক'রে ১১৪৩ সালে প্রথম যে সংখ্যাখানি প্রকাশিত হল সেখানি হল শারদীয় সংখ্যা। সে সংখ্যায় যাঁরা লিখলেন তাঁদের নাম—বিধুশেখর ভট্টাচার্য, ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ভাস্কর, গোপাল হালদার, ডাঃ যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী, ঊষা দেবী, (বর্তমানে ডক্টর) সন্ধ্যা ভাদুড়ী (বর্তমানে ডক্টর) চিত্রিতা গুপ্ত, সত্যেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, অমলেশ ত্রিপাঠী, জ্যোতিরিন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ডঃ সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, জ্ঞানেন্দ্রনাথ বাগচী, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রমথনাথ বিশী, পূর্ণেন্দুকুমার চট্টোপাধ্যায়, (বর্তমানে এম-আর-সি-পি), পঙ্কজকুমার রায়, (বর্তমানে কো অর্ডিনেটর, দিল্লী সেঃ ইঃ অফ এডুকেশন) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (পত্র)। সম্পাদকীয় লিখলাম আমি নিজ স্বাক্ষরে।

কিছু দিনের মধ্যেই এক ঘটনা ঘটল। যুদ্ধের অন্ধকার পথ ঘাট। তার মধ্যে অনেক পরিশ্রম ক'রে বাড়ি খুঁজে এক রাত্রে আমার কাছে এলেন কয়েক জন যুবক। তাঁদের বক্তব্য, ক্যালকাটা কমার্শাল ব্যাঙ্কের হেমেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় আমাকে অনুরোধ জানিয়েছেন তাঁর সঙ্গে অবশ্য দেখা করতে। 'নূতন পত্র' মাসিকে আমার লেখা সম্পাদকীয় পড়ে তাঁর ভাল লেগেছে, তিনি আমার সঙ্গে কিছু আলাপ করতে চান।

ব্যবস্থা হল এঁরা পরদিন এসে আমাকে ওয়াটারলু স্ট্রীটের যুদ্ধ প্রচার অফিস থেকে ডেকে নিয়ে যাবেন। যথাসময়ে হেমেন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গে দেখা হল। তিনি বললেন দৈনিক 'কৃষক' কাগজের সম্পাদনা ভার তিনি আমাকে দিতে চান। তিনি নূতন পত্রের সম্পাদকীয় পড়েছেন এবং তাঁর মনে হয়েছে দৈনিক কাগজের সম্পাদনা কাজ আমাকে দিয়ে ভাল হবে।

আমি তো এ প্রস্তাবে স্তম্ভিত। দৈনিক কাগজের সম্পাদনা করতে যে পরিমাণ বুদ্ধি দরকার তা আমার নেই, আমি সাপ্তাহিক বা মাসিক পত্রে অভ্যস্ত, দৈনিক কদাপি নয় আমি সে কথা বললাম। অর্থাৎ ভাল একটি চাকরি তিনি আমাকে দিতে কৃতসংকল্প, আর আমি তা অগ্রাহ্য ক'রে প্রাণপণে আমারই বিরুদ্ধে ব'লে চলেছি। নিজের অযোগ্যতা বিষয়ে এমন জোরের সঙ্গে বলা চাকরির ইতিহাসে এই হয় তো প্রথম। হেমেন্দ্রবাবু আর কি বলবেন, আমাকে ভেবে দেখতে বললেন। বেতনটি তখনকার পক্ষে আমার কাছে লোভনীয় ছিল অবশ্যই, কিন্তু ভাববার আর কিছু অবশিষ্ট ছিল না, আমি দৈনিক কাগজের সম্পাদনারূপ অভিশপ্ত একটি কাজের ভার যে নেব না, এ বিষয়ে তখনই মন স্থির ক'রে ফেলেছিলাম। ঘর থেকে বেরিয়ে আসতেই যাঁরা আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন, তাঁরা হতাশ ভাবে ব... "আপনি এ কি করলেন, নিয়ে নিন কাজটা।"

"নূতন পত্র" প্রকাশিত হতে লাগল। অগ্রহায়ণ ও ... সংখ্যাও যথাসময়ে আবির্ভূত হল, তারপর মাঘের জন্য আয়ো... করার পূর্ব মুহূর্তে খবর এলো অবিলম্বে কাগজ বন্ধ করতে হবে... প্রকাশ করা বে-আইনি হয়েছে। কাগজের পরিচালকেরা ভেবেছি... এখানে যথারীতি ডিক্লারেশন পাওয়াই যথেষ্ট, কিন্তু পরে জানা গেল তা নয়, দিল্লী থেকে অনুমতি আনতে হবে। কিন্তু তার আগে এ কাগজ বন্ধ ক'রে, তবে।

কিন্তু বন্ধ করাই হল, নতুন ক'রে দিল্লী গিয়ে দরবার করতে কেউ রাজি হল না।

কাগজখানার চেহারা ভালই হয়েছিল। প্রথম সংখ্যায় পরিচয় দিয়েছি, বাকী দু'খানারও দিই, সাময়িক পত্রের ইতিহাসে শিশুমৃত্যুর খতিয়ানে কাজে লাগতে পারে। পরবর্তী সংখ্যাদ্বয়ের লেখকলেখিকা, দ্বিতীয় সংখ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ আচার্য, বিনয় চৌধুরী, প্রভা সেন, বাণী রায়, গোপাল ভট্টাচার্য, কেশব গুপ্ত, ডঃ সুবোধ সেনগুপ্ত, হেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (বিজ্ঞান-লেখক), রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় (সঙ্কলন) সার সৈয়দ সুলতান আহমদ, পূর্ণেন্দুকুমার চট্টোপাধ্যায়, লুইজি পিরান্দেল্লো, অভিজিৎ বাগচী, ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পরিমল গোস্বামী। তৃতীয় সংখ্যায়— বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ভাস্কর, পরিমল গোস্বামী, সত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় সুধাংশুপ্রকাশ চৌধুরী, করালীকান্ত বিশ্বাস, ডঃ সুবোধ সেনগুপ্ত, সন্ধ্যা ভাদুড়ী, সরোজ... রায়চৌধুরী, হেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (বিজ্ঞান লেখক)।

১১৩৬ সালে নীরদচন্দ্র চৌধুরী সম্পাদনা করেছিলেন 'নূতন পত্রিকা'—তার আয়ু শেষ হয় পাঁচখানায়; ১১৪৩ সালে 'নূতন পত্র' মাত্র তিনখানাতেই শেষ হল।

ভোলা চট্টোপাধ্যায় বা ভি-সি'র কথা আগে উল্লেখ করেছি। এঁর চরিত্রবৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য। বিদ্রোহী শিল্পী ভি-সি। নিজের আদর্শের সঙ্গে জীবনকে এমন ভাবে মিলিয়ে দেওয়া এ যুগে বিরল।
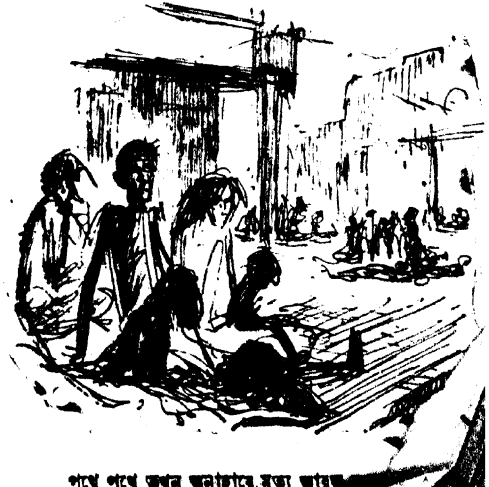
পথে পথে তখন অনাহারে মৃত্যু আর...

ছাব্বিশ-সাতাশ বছর আগে এঁর নেতৃত্বে আর্ট রেবেল সেণ্টারের প্রদর্শনী হয়। ভি-সি'র অনুগামী ছিলেন অবনী সেন, গোবর্ধন আশ, কালীকিঙ্কর ঘোষদস্তিদার, রবি বসু ইত্যাদি। ওয়েলিংটন স্কয়ারের ইয়র্ক ম্যানশনে সম্মিলিতভাবে এই প্রথম আধুনিক শিল্পের প্রদর্শনী। এর আগে কিউবিস্টিক রীতির শিল্পী গগনেন্দ্রনাথের একক প্রদর্শনী মাত্র হয়েছে।

বাংলাদেশের শিল্পের ইতিহাসে এসব কাহিনী লেখা হয়েছে কি না জানি না। এই সময়েই বর্তমান আর্ট অ্যাকাডেমির সূত্রপাত হয়। এবং এঁদের মধ্যে যাঁরা শুধু শিল্পে নয় জীবনদর্শনে বিদ্রোহী, তাঁরা পরে এ দল থেকেও বেরিয়ে আসেন। এই শেষোক্ত দলে ভি-সি, কালীকিঙ্কর ও রবি বসু। প্রথম দু'জনের সঙ্গে আমি ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত। ভি-সি'র মতো দৃঢ় মেরুদণ্ড-বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব, যা কোনো অন্যায়ের কাছে মাথা নত করে না, টাকার লোভ থেকে যা সম্পূর্ণ মুক্ত, এমন ব্যক্তিত্বের কথা আমার মনে বিস্ময় জাগায়। জনমত এবং জনগুণগ্রাহিতাকে, এবং টাকার মূল্যে শিল্পমূল্য বোধকে, ষোল আনা অগ্রাহ্য ক'রে নিজের সৃষ্টির আনন্দে ডুবে সমস্ত জীবন কাটিয়ে দেওয়ার দৃষ্টান্ত বিরল, সন্দেহ নেই। এ বিষয়ে আর এক শিল্পী—কালীকিঙ্কর ঘোষদস্তিদার—ভি-সির অনুজ হবার দাবী রাখে।

সাহিত্যের ক্ষেত্রে এক সহৃদয় বন্ধুর কথা আমি আনন্দের সঙ্গে স্মরণ করি। ইনি শিব এবং রামের সমন্বয় করেছেন নামে এবং ব্যবহারে। শিবরাম চক্রবর্তীর মতো গুণী কথাশিল্পী বাংলায় দ্বিতীয় নেই। ইনিও নিজ সৃষ্টির মধ্যে নিজের পুরস্কার খুঁজে পেয়েছেন। উদাসীন উদার হৃদয়, অন্যের ভাল খুঁজে বেড়ান এবং ভাল দেখেন। এবং সব চেয়ে বড় কথা, সকল ভালর গুণগান ক'রে বেড়ান। শিবরাম বড় ভাষাশিল্পী। প্রমথ চৌধুরীর মুখে এঁর প্রশংসা শুনেছি। সহৃদয় কৌতুকরসে মনটি সব সময় ভরা। এঁর লেখা আসলে বড়দের জন্যই, কিন্তু বড়রা যাঁরা হাসি পেলে নিজেকে ছোট বোধ করেন, তাঁরা শিবরামের হাস্যরস থেকে আত্মবঞ্চিত। কৌতুক, কৌতুকরূপেই একটা বড় সার্থকতা বহন করে, সৌর্দাপ ফুল গোলাপ ফুল রূপে। গোলাপ ফুলের পেটে যারা কাঁঠালের কোয়ার সন্ধান করে, তারা নিজেরাই নিজেদের শাস্তি দেয়।

সময় ছুটছে দ্রুত।

বাল্যকালে স্কুলে পড়তে খবরের কাগজে "স্থানীয় সংবাদ" লিখে লেখক-জীবন শুরু করেছিলাম, সাহিত্যের পথে স্থায়ী আসন দিলেন সজনীকান্ত, বহু পথ ঘুরে আবার সেই খবরের কাগজেই প্রবেশ করলাম। ১৩৫৫ সালে নিতান্তই দৈবযোগে শুনলাম, যুগান্তরের সাময়িকী সম্পাদক বিনয় ঘোষ যুগান্তর ছেড়ে দিয়েছেন। নিতান্তই দৈবযোগে প্রমথনাথ বিশীর সঙ্গে পরদিনই দেখা। প্রমথনাথ তখন যুগান্তরের সহকারী সম্পাদক। ১৩৫৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের শেষে কোনো একটা দিন প্রমথনাথ বিশী আমাকে যুগান্তরের দু'জন নিয়োগকর্তার সম্মুখে নিয়ে পৌঁছে দিলেন—তাঁরা (শ্রীশচীবিলাস রায়চৌধুরী ও শ্রীরতন দত্ত) আমাকে তখনই সহকারী সম্পাদকরূপে কাজে যোগ দেবার জন্য অনুমতি দিলেন। কাজ আরম্ভ হল ১লা মার্চ থেকে, যুগান্তর সাময়িকী বিভাগে। চতুর্দশ বর্ষ প্রায় পার হয়।

আজ আমার এ স্মৃতি ছবি আঁকতে আঁকতে যতবার ফিরে জীবন পথটি দেখতে চেষ্টা করেছি, ততবার সব ভাল লেগেছে যত মানুষের সঙ্গলাভ করেছি, জীবনে যা কিছু করেছি এবং করিনি সব সুন্দর মনে হয়। তবু সেই সব দিন থেকে সরে এসেছি, এ চিন্তা মনকে বেদনাতুর করে। নৌকোখানা যখন বর্ষার স্রোতে বন্দর ছেড়ে দ্রুত ভেসে চলেছে, তখন আর ফেরা চলে না সেখানে এ যেন রবীন্দ্রনাথের পোষ্টমাষ্টারের নৌকো। স্রোতের টান, পালের হাওয়ার টান, ইচ্ছার টানের চেয়ে অনেক বেশি প্রবল।

পরবর্তী দৃশ্যের দিকে দ্রুত এগিয়ে চলেছি। পিছনের দৃশ্য ক্রমে বর্তমানে এসে মিলিয়ে যাচ্ছে, অতএব কলম থামাবার সময় এলো।

বেশি কাছ থেকে দেখা জিনিসের ছবি "স্মৃতি" ছবি নয়। তা দূরে সরে গেলেই মধুর লাগে। সময়ের ব্যবধান ঘটাতে হয় একটু। মদিরার মতোই দীর্ঘ দিন মাটির নিচে রাখতে হয়,—"a long age in the deep-delved earth."

যিনি আমার এ স্মৃতিচিত্রণ অনুসরণ করেছেন তিনি অবশ্যই লক্ষ্য করেছেন, এ রচনা আমার জীবনী নয়, এটি একটা কালের একটা অংশের ছবি মাত্র। আরো লক্ষ্য করেছেন, এর মধ্যে আমার নিজস্ব ছবিটি একক ভাবে আদৌ উল্লেখযোগ্য নয়, স্থান, কাল ও মানুষের সঙ্গে মিলিয়ে তার দাম। সবার প্রতিফলিত আলোয় আমাকে যেটুকু দেখা যায়, তার বেশি কিছু নয়। (কৌশলে চাঁদের সমগোত্র হবার চেষ্টা করছি না তাই ব'লে।)

এই যুগ তুচ্ছকেও কিছু মূল্য দিয়ে থাকে, সেই বিশ্বাসে এই আত্মপ্রকাশ। অবশ্য এর মূল প্রেরণা প্রাণতোষ ঘটক। তার সঙ্গে এক অবর্ণনীয় প্রীতির সম্পর্কে আমি বাঁধা। তারই ইচ্ছায় আমার এই রচনা।

প্রতিফলিত আলোর কথাটা সত্য কথা। একটা আধুনিক ইংরেজী কবিতাও মনে পড়ছে। তার মধ্যে আমার এক সমধর্মীকে আবিষ্কার করেছি। বৃষ্টির ফলে পথের ধারে ধারে যে একটু একটু জল জমে থাকে, সেইটি হচ্ছে কবিতার বিষয়বস্তু, নাম Puddles. লেখক জে, রেডউড অ্যানডারসন। যাবতীয় আবর্জনা জমে এই জলের বুকে, গাছের ঝরা পাতা, খড়কুটো, দেশলাইয়ের কাঠি। এরাই সেই নোংরা জলের একমাত্র সঙ্গী। কিন্তু—

"...when the sun
shines from their eyes. Then's their poor attire
forgotten, and their lowly circumstance,
and I remember only
youth's irrepressible joy, the loveliness
inseparable from waters great and small,
whose power and gift from God is to reflect
the lights of heaven ;"...

[ক্রমশঃ।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের চিঠি

University College of Science

১৪।১২।২১

প্রিয় ভগিনী,

আমার হৃদয় এরূপ উদ্বেলিত হইয়াছে যে, আমি আমার মনের ভাব ভাষায় প্রকাশ করিতে পারিতেছি না। শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস বোমার মামলার সময় শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন, তাহা রাজনৈতিক মামলার ইতিহাসে বিশেষ বিখ্যাত হইয়া রহিয়াছে। সেই হইতে তিনি জনসাধারণের দৃষ্টি বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করিয়াছেন। তাঁহার অসীম বদান্যতা তাঁহার আন্তরিক স্বদেশপ্রীতি, তাঁহার উচ্চ আদর্শ ও দুর্ব্বলকে আশ্রয়দান বরাবরই আমাদের বিস্ময় ও ভক্তি উৎপাদন করিয়াছে। তাঁহার বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব যে বাঙলার ও ভারতের যুবকবৃন্দের হৃদয় অধিকার করিয়াছে, ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। রাজনীতি ক্ষেত্রে তাঁহার সহিত যাঁহাদের মত-বিরোধ আছে, তাঁহারাও তাঁহার অপূর্ব্ব স্বার্থত্যাগে বিস্মিত না হইয়া পারেন না। তাঁহার বর্ত্তমান পরীক্ষার সময় আমার মন তাঁহার জন্য ব্যাকুল হইয়া রহিয়াছে। আমি জনসাধারণ হইতে কতকটা বিচ্ছিন্ন আছি; সুতরাং আমার মনে হয়, আমি হয়ত তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য ভালরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছি না। কবি বলিয়াছেন—বৈজ্ঞানিকেরা পার্থিব গৌরবকেই অধিক ভালবাসিয়া থাকে। সারা জীবন আমি আমার প্রিয় বিষয়ে নিবিষ্ট থাকাতে হয়ত আমার অন্তর্দৃষ্টি কতকটা নষ্ট হইয়াছে। আমার মানসিক শক্তিও অনেকটা কমিয়া গিয়াছে।

প্রিয় ভগিনী, আমার উদ্দেশ্য ছিল, আমার প্রিয় আলোচ্য বিষয়ের মধ্য দিয়াই আমি আমার দেশের সেবা করিব। আমাদের উভয়ের উদ্দেশ্যই এক। ভগবান জানেন, আমার আর কোন উদ্দেশ্য নাই। আপনি বীরের মত হাসিমুখে সমস্ত বিপৎপাত সহ্য করিতেছেন, এবং আপনি বর্ত্তমান বঙ্গ দেশের নারীজাতির নিকট এমন এক আদর্শ উপস্থিত করিয়াছেন, যাহা রাজপুতদের সেই গৌরবের দিনের পর হইতে আজ পর্য্যন্ত আর কেহ প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। আমি সর্ব্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করি যে, আমাদের মাতৃভূমির ভাগ্যাকাশ যে ঘোর মেঘে আচ্ছন্ন হইয়াছে, তাহা শীঘ্রই দূরীভূত হইবে এবং আপনার স্বামীও আমাদের নিকট শীঘ্রই ফিরিয়া আসিবেন।

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়

[শ্রীপ্রসন্নকুমার রায় প্রণীত আচার্য্য-বাণী, ২য় খণ্ড থেকে উদ্ধৃত]

স্বামী বিবেকানন্দের চিঠি

১

ওঁ তৎসৎ

দার্জ্জিলিং
৬ই এপ্রিল, ১৮৯৭

মান্যবরাসু—

মহাশয়ার প্রেরিত 'ভারতী' পাইয়া বিশেষ অনুগৃহীত বোধ করিতেছি এবং যে উদ্দেশ্যে আমার ক্ষুদ্র জীবন ন্যস্ত হইয়াছে, তাহা যে ভবদীয়ার ন্যায় মহানুভাবাদের সাধুবাদ সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়াছে, তাহাতে আপনাকে ধন্য মনে করিতেছি।

এ জীবন-সংগ্রামে নবীন ভাবের সমুদ্‌ঘাতার উত্তেজক অতি বিরল, উৎসাহয়িত্রীর কথা ত দূরে থাকুক; বিশেষতঃ আমাদের হতভাগ্য দেশে। এজন্য বঙ্গ-বিদুষী নারীর সাধুবাদ সমগ্র ভার পুরুষের উচ্চকণ্ঠ ধন্যবাদাপেক্ষাও অধিক শ্লাঘ্য।

প্রভু করুন, যেন আপনার মত অনেক রমণী এদেশে জন্মগ্রহণ করেন ও স্বদেশের উন্নতিকল্পে জীবন উৎসর্গ করেন।

আপনার লিখিত 'ভারতী' পত্রিকায় মৎসম্বন্ধী প্রবন্ধ বিষয়ে আমার কিঞ্চিৎ মন্তব্য আছে; তাহা এই—

পাশ্চাত্য দেশে ধর্মপ্রচার ভারতের মঙ্গলের জন্যই করা হইয়াছে এবং হইবে। পাশ্চাত্যেরা সহায়তা না করিলে যে আমরা উঠিতে পারিব না, ইহা চির ধারণা। এদেশে এখনও গুণের আদর নাই, অর্থবল নাই এবং সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয় এই যে, কৃতকর্ম্মতা (Practicality) আদৌ নাই।

উদ্দেশ্য অনেক আছে, উপায় এদেশে নাই। আমাদের মস্তক আছে, হস্ত নাই। আমাদের বেদান্ত-মত আছে, কার্য্যে পরিণত করিবার ক্ষমতা নাই। আমাদের পুস্তকে মহা সাম্যবাদ আছে, আমাদের কার্য্যে মহা ভেদবুদ্ধি। মহা নিঃস্বার্থ নিষ্কাম কর্ম্ম ভারতেই প্রচারিত হইয়াছে, কিন্তু কার্য্যে আমরা অতি নির্দ্দয়, অতি হৃদয়হীন, নিজের মাংসপিণ্ড শরীর ছাড়া অন্য কিছুই ভাবিতে পারি না।

তথাপি উপস্থিত অবস্থার মধ্য দিয়াই কেবল কার্য্যে অগ্রসর হইতে পারা যায়, অন্য উপায় নাই, ভাল-মন্দ বিচারের শক্তি সকলের আছে, কিন্তু তিনিই বীর, যিনি এই সমস্ত ভ্রম-প্রমাদ ও দুঃখপূর্ণ সংসারের তরঙ্গে পশ্চাৎপদ না হইয়া এক হস্তে অশ্রুবারি মোচন করেন ও অপর অকম্পিত হস্তে উদ্ধারের পথ প্রদর্শন করেন। এ দিকে গতানুগতিক জড়পিণ্ডবৎ সমাজ, অন্য দিকে অস্থির ধৈর্য্য অগ্নিবর্ষণকারী সংস্কারক; কল্যাণের পথ এই দুইয়ের মধ্য জাপানে শুনিয়াছিলাম যে, সে-দেশের বালিকাদিগের বিশ্বাস

যদি কেউ এই হতশ্রী, বিগতভাগ্য, লুপ্তবুদ্ধি, পরপদবিদলিত, চিরবুভুক্ষিত, কলহশীল ও পরশ্রীকাতর ভারতবাসীকে প্রাণের সহিত ভালবাসে, তবে ভারত আবার জাগিবে। যবে শত শত মহাপ্রাণ নর-নারী সকল বিলাস ভোগসুখেচ্ছা বিসর্জ্জন করিয়া কায়মনোবাক্যে দারিদ্র্য ও মূর্খতার ঘনাবর্ত্তে ক্রমশঃ উত্তরোত্তর নিমজ্জনকারী কোটি কোটি স্বদেশীয় নর-নারীর কল্যাণ কামনা করিবে, তখন ভারত জাগিবে। আমার ন্যায় ক্ষুদ্র জীবনেও ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে, সদুদ্দেশ্যে, অকপটতা ও অনন্ত প্রেম বিশ্ব বিজয় করিতে সক্ষম। উক্ত গুণশালী একজন কোটি কোটি কপট ও নিষ্ঠুরের দুর্ব্বুদ্ধি নাশ করিতে সক্ষম।

আমার পুনর্ব্বার পাশ্চাত্যদেশ গমন অনিশ্চিত। যদি যাইও, তাহাও জানিবেন ভারতের জন্য—এদেশে লোকবল কোথায়? অর্থবল কোথায়? অনেক পাশ্চাত্য নর-নারী ভারতের কল্যাণের জন্য ভারতীয় ভাবে ভারতীয় ধর্ম্মের মধ্য দিয়া অতি নীচ চণ্ডালাদিরও সেবা করিতে প্রস্তুত আছেন। দেশে কয়জন? আর অর্থবল! আমাকে অভ্যর্থনা করিবার ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য কলিকাতাবাসীরা টিকিট বিক্রয় করিয়া লেকচার দেওয়াইলেন এবং তাহাতেও সঙ্কুলান না হওয়ায় ৩০০ টাকার এক বিল আমার নিকট প্রেরণ করেন! ইহাতে কাহারও দোষ দিতেছি না বা কুসমালোচনাও করিতেছি না, কিন্তু পাশ্চাত্য অর্থবল ও লোকবল না হইলে যে আমাদের কল্যাণ অসম্ভব, ইহারই পোষণ করিতেছি। ইতি শম্

চিরকৃতজ্ঞ ও সদা প্রভু সন্নিধানে ভগবৎ কল্যাণ-কামনাকারী

বিবেকানন্দ

[পত্রাবলী, ২য় সংস্করণ, ৮০নং পত্র স্বামী আত্মবোধানন্দজীর অনুমোদনক্রমে মুদ্রিত]।

স্বামীজী 'ভারতী' সম্পাদিকা সরলা দেবীকে এই চিঠিটি লেখেন। ইংলণ্ড ও আমেরিকাবাসীর চিত্ত জয় ক'রে স্বামীজী ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে দেশের দিকে রওনা হ'ন। তিনি দেশে ফিরে এলে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ২৮ ফেব্রুয়ারী রাজা রাধাকান্ত দেবের শোভাবাজারের বাড়ীতে এক বিরাট অভিনন্দন সভা অনুষ্ঠিত হয়। স্বামীজী এই চিঠিতে ঐ সভারই উল্লেখ করেছেন। এর পর আর একখানি চিঠিতে 'ভারতী' সম্পাদিকাকে তিনি জানান যে, তিনি ঐ টাকা দিতে অপারগ হওয়ায় উদ্যোক্তারা নিজেরাই সে খরচ মিটিয়ে দেন। স্বামীজী এ সময়ে দার্জিলিং গিয়েছিলেন স্বাস্থ্যোদ্ধারের আশায়। স্বামীজীর অন্যান্য চিঠির মত এই চিঠিতেও দেশবাসীর জন্যে তাঁর অকৃত্রিম ভালবাসার পরিচয় আছে।

২

১৮ এপ্রিল, ১৮৯৮

স্নেহাস্পদাসু,

জো, কর্মযোগ সব সময়ে কঠিন। আমার জন্য প্রার্থনা করো, যেন চিরদিনের জন্য আমার কাজ করা শেষ হয়ে যায়, আর আমার মনপ্রাণ যেন মায়ের সত্তায় নিঃশেষে মিলে যায়। তাঁর কাজ তিনিই জানেন।

লণ্ডনে পুনরায় এসে নিশ্চয়ই তুমি খুশী হয়েছ। পুরাতন বন্ধুদের সকলকে আমার কৃতজ্ঞতা এবং ভালবাসা দিও। আমি ভাল আছি,—মানসিক খুব ভালই আছি। শরীরের চেয়ে মনের শান্তিই বেশী বোধ করছি। জীবন-যুদ্ধে হার-জিত দুই-ই হল। এখন পুঁটলি-পোঁটলা বেঁধে বসে আছি পরম মুক্তিদাতার প্রতীক্ষায়। "শিব, শিব, পারে নিয়ে চল আমার তরী।"

যতই যা হোক, দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটীর তলায় রামকৃষ্ণদেবের অপূর্ব বাণী শুনতে শুনতে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যেত যে বালক আমি আজও সেই বালক ছাড়া আর কিছু নই। সেই বালক ভাবটাই হচ্ছে আমার সত্যিকার প্রকৃতি। কাজকর্ম, পরোপকার প্রভৃতি যা কিছু করেছি, তা সবই বাইরের জিনিষ। আজকাল আবার তাঁর কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছি—সেই আগেকার প্রাণ-মাতানো কণ্ঠস্বর। বাঁধন সব টুটে যাচ্ছে, মানুষের মায়া দূর হচ্ছে, কাজকর্ম আর ভাল লাগছে না, জীবনের সব চাকচিক্য শেষ হয়ে গেছে। এখন শুধু গুরু মহারাজের ডাক শুনতে পাচ্ছি, যাই প্রভু, যাই।

"প্রেতের পিণ্ডদান প্রেতের দল করুক। তুই এসব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে আমার সঙ্গে সঙ্গে চলে আয়।"—হে প্রেমাস্পদ, আমি আজ তোমার পথেই চলেছি।

হ্যাঁ, এবার ঠিক চলেছি। একেবারে নির্বাণের তীরে এসে দাঁড়িয়েছি। সময়ে সময়ে হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করি যেন সেই অনন্ত শান্তির সমুদ্র,—তার বুকে এতটুকু চাঞ্চল্য—এতটুকু ঢেউ নেই।

এই পৃথিবীতে যে জন্মেছিলুম, তাতে আমি খুশী। জীবনে যে এত দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করলুম, তাতেও খুশী। কাজ করতে করতে বড় বড় ভুল-ভ্রান্তি ঘটেছে, তাতেও খুশী। আবার এখন যে শান্তির রাজ্যে এগিয়ে চলেছি—তাতেও খুশী। জগতে কাউকে মায়ার বাঁধনে বেঁধে যাচ্ছি না—কারও বাঁধন নিয়েও যাচ্ছি না। দেহটা ধ্বংস হলে মুক্তি আসুক অথবা দেহ থাকতে থাকতেই মুক্তি পাই—যাই হোক না কেন, সেই পুরানো বিবেকানন্দ কিন্তু চলে গেছে, চিরদিনের জন্য চলে গেছে, আর কখনও ফিরবে না।

গুরু, পরিচালক, নেতা, আচার্য বিবেকানন্দ মারা গেছে—পড়ে আছে শুধু বালকস্বভাব, জীবনের সদাউৎসুক ছাত্র, সেবক বিবেকানন্দ।

তুমি বুঝতে পারছ কেন আর আমি * * বিষয়ে কোনও কথা বলতে চাই না। কোন কথা বলবার কি অধিকার আছে আমার? অনেক দিন হ'ল নেতৃত্ব ছেড়ে দিয়েছি। হুকুম করার অধিকার আর আমার নেই। * * * প্রভুর ইচ্ছাস্রোতে যখন সম্পূর্ণরূপে গা ভাসান দিয়ে থাকতুম, সেই দিনগুলি আমার জীবনের সবচেয়ে মধুময় সময় বলে মনে হয়। আবার আমি গা ভাসান দিয়েছি।

আকাশে সূর্যের খর আলো আর সামনে দিগন্তবিস্তৃত শ্যামলিমা। দিনের উত্তাপে চারিদিক নিস্তব্ধ, নিঝুম ধরিত্রী, আর আমি ভেসে চলেছি ধীরে ধীরে নদীর শীতল বুকে—নিজের বিন্দুমাত্রও ইচ্ছা না রেখে। হাত-পা নেড়ে সামান্যমাত্র আওয়াজ করার সাহস পর্যন্ত নেই, পাছে এই অপূর্ব নিস্তব্ধতা ভেঙে যায়। প্রাণের এই রকম শান্তিই জগৎটাকে মায়া বলে উড়িয়ে দেয়।

আগে আমার কর্ম-আয়োজনের মধ্যে জাগত মান-যশের উচ্চাশা, ভালবাসার ভিতর আসত ব্যক্তি-বিচার, ব্রহ্মচর্য সাধনার পিছনে থাকত ভয়, নেতৃত্বের মধ্যে প্রভুত্বস্পৃহা। এখন সে সব মরে যাচ্ছে, আর আমি ভেসে চলেছি। যাই মা, যাই। তোমার স্নেহময় বুকে করে যেখানে আমায় নিয়ে চলেছ সেই অশব্দ, অস্পর্শ, অজ্ঞাত, অপূর্ব

রাজ্যে কাজ করার সব শক্তি বিসর্জন দিয়ে আমি যাব শুধু দ্রষ্টা হিসাবে।

আহা, কি অসীম শান্তি! মনে হচ্ছে, চিন্তাগুলো পর্যন্ত যেন হৃদয়ের দূর অতিদূর গভীর তল থেকে অস্পষ্ট দূরাগত গুঞ্জনধ্বনির মত ভেসে আসছে। চারিদিকে শান্তি। মধুর—মধুর সে শান্তি। মানুষ ঘুমিয়ে পড়ার ঠিক আগে কয়েক মুহূর্ত যেমন বোধ করে—যখন সব জিনিষ দেখা যায় তবু মনে হয় যেন ছায়ার মত—যখন মানুষের মনে থাকে না ভয়, থাকে না কিছুর উপর টান, থাকে না কোন হৃদয়াবেগ। আমার অবস্থা আজ ঠিক সেই রকম। আমার মনে এখন জেগেছে সেই শান্তি—যে শান্তি মানুষ ছবি আর পুতুল দিয়ে সাজানো ঘরে একলা একলা দাঁড়িয়ে অনুভব করে। যাই প্রভু, যাই।……*

[* 'এপিসিল্‌স্‌' ৪র্থ ভাগ, থেকে উদ্ধৃত]

স্বামীজী ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে ১৮ই এপ্রিল তাঁর পাশ্চাত্ত্য দেশীয় শিষ্যা শ্রীমতী ম্যাক্‌লিঅডকে এই চিঠিখানি লেখেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের চিঠি

সাইরেন চেস্‌র—৪ঠা ডিসেম্বর, ১৮৮৪

আমার বিশ্বাস যে, যত দিন আমাদের দেশবাসীর ভাল আবাসগৃহে আরামে থাকিতে ইচ্ছা না হইবে, তত দিন আমাদের গার্হস্থ্য অবস্থার উন্নতি হইবে না। পরিচ্ছন্নতা, ও অন্ততঃ আয়সাধ্য ভাল অবস্থায় জীবন ধারণ করা আমাদের জাতির লক্ষ্য হওয়া উচিত। * * * আমাদিগের কৃষকের অবস্থার সঙ্গে এখানকার কৃষকের অবস্থা তুলনা করিয়া দেখিলে বুঝা যায়, আমাদের কৃষকেরা কি গরীব দুরবস্থাপন্ন। যে দিন যাহা পায়, প্রায় সেই দিনই তাহা ব্যয় করে, সঞ্চিত অর্থ নাই; আরামময় বাসস্থান নাই; তৃণাবৃত কুটিরে শতছিন্ন শয্যায়, শত গ্রন্থিময় বসনে, বহু সন্তানের পিতা, কৃষক দীনভাবে কোন প্রকারে জীবন যাপন করে। দুর্ভিক্ষকালে তাহারা (হতভাগ্য কৃষক!) সপুত্র-পরিবারে অনশনে প্রাণত্যাগ করে। ইহার কারণ কি? অন্যান্য কারণও আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু আমার ধ্রুব বিশ্বাস যে, বর্ত্তমানে সন্তোষই ইহার মূল। তাহার অবস্থা উত্তম হইতে পারে, ইহা তাহার ধারণা হয় না।

পূর্বপুরুষ-ব্যবহৃত ভূকর্ষী ব্যবহার না করিয়া নূতন প্রকার লাঙ্গল ব্যবহার করিলে যে ভূমি দ্বিগুণ ফলবতী হইতে পারে ইহা তাহাদিগের বিশ্বাস হয় না। গরীব থাকিলেই নিজ অবস্থায় সন্তুষ্ট, নব প্রথার উপকারিতায় অবিশ্বাসী, দুর্ভিক্ষ হইলে তাহারা বিধি নির্বন্ধের দোষ দেয়, নিজ ভাগ্যকে অভিশাপ দেয় ও স্বীয় ললাটে করাঘাত করে। আমি বলি, তাহাদিগের মনে সম্ভোগ-বাসনা দাও উন্নতির সোপান রচিত হইবে।

আমি যেন শুনিতেছি, পৃথিবীর ঘটনানভিজ্ঞ ভাবসর্ব্বস্ব (sentimental) কেহ এখানে হয়ত কবিত্বময়ী ভাষায় বলিতেছেন—"বিলাসের চিন্তা দূরে রাখ, সম্ভোগ-বাসনা শত যোজন অন্তরে চিরদিন অবস্থান করুক, এই সন্তোষই কৃষকদিগের জীবন, ইহাই তাহাদিগের সুখ-সম্পদ, ইহাই তাহাদিগের দুর্ভাগ্যের, ধৈর্য্যের ও সহিষ্ণুতার জননী। বিলাস তাহাদিগের মধ্যে আনিও না। ইহা তাহাদিগের জীবনকে দুঃখময় করিবে, পারিবারিক সুখে কালিমা নিক্ষেপ করিবে, ইহা মধু না আনিয়া তাহাদের জীবনে অসন্তোষের হলাহল ঢালিয়া দিবে।

এখানে কেহ বলিতে পারেন যে, যদি অসন্তোষই উন্নতির মূল হইল, অসন্তোষই পারিবারিক শৃঙ্খলার কারণ হইল, আর সেই অসন্তোষই ভবিষ্যতের উন্নতির সোপান হইয়া জীবনের সঙ্গী হইল তাহা হইলে সুখ কোথায় রহিল? অসন্তোষপ্রণোদিত কার্য্যের ফলসুখের একটি উপাদান। আমার আরও বিশ্বাস দুর্ভিক্ষ-সময় যে খাইতে পায় সে, যে খাইতে পায় না সেই অনাহারী, সপরিবারে মৃতপ্রায়, হতভাগ্য কৃষক অপেক্ষা অধিক সুখী; কারণ তাহার সম্মুখে ধূল্যবলুণ্ঠিত পুত্র-কন্যা কাঁদে না, প্রিয় ভার্য্যা সম্মুখে অনশনে প্রাণত্যাগ করে না। আর সুখই যদি মানবের একমাত্র লক্ষ্য হয় যদি আরও উন্নত অবস্থায় সুখ না থাকে, তবে মানবের আদিম অবস্থা হইতে সভ্যাবস্থা বাঞ্ছনীয় নহে বলিতে হইবে। মনুষ্য বর্ত্তমানে সন্তুষ্ট থাকিলে সভ্য হইত না, তাহা হইলে সুরম্য হর্ম্যরাজি ধরণীপৃষ্ঠ সুশোভিত করিত না, বাণিজ্যপোত নির্ম্মিত হইত না, রেলপথ বৈদ্যুতিক তার উদ্ভাবিত হইত না, ব্যোমযান আকাশে উড়িত না, তাহা হইলে সঙ্গীতের প্রাণালোভী ঝঙ্কার চিত্রের হৃদয়োন্মাদী মাধুর্য্য ভাস্কর নির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তির প্রস্তরগত কবিত্ব, কবিতায় তারাময়ী ভাষা সৃষ্ট হইত না, ও মানব জীবন-পথে কুসুম-বৃষ্টি করিত না। অসন্তোষ ইহাদিগের উৎপত্তি-স্থান। অসন্তোষই সভ্যতা-স্রোতস্বিনীর নির্ঝর।

[নবকৃষ্ণ ঘোষ প্রণীত 'দ্বিজেন্দ্রলাল' নামক গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত]

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের চিঠি

১

"দেখ, সেদিন রাজনারায়ণ বসু মহশয়কে দেখিয়া একটা কথা মনে পড়িল। তুমি জান, আমি বুড়ো মানুষকে ভালবাসি না।… কিন্তু বুড়ো কাহাকে বলি জান? রাজনারায়ণ বাবু, রামতনু লাহিড়ী মহাশয়কে আমি বুড়ো বলি না। কারণ আমার অভিধানে চুল পাকিলেই বুড়ো হয় না। যে মনে করে, আমি সব জানি, সংসারের উন্নতি যা হবার হয়ে গেছে, সেই বৃদ্ধ। যাহাদের হৃদয়ে নিত্য নূতন আশা, নূতন আকাঙ্খা জাগে না, সেই বৃদ্ধ। যা আছে, মন্দ হইলেও তাহাই থাকিবে, ইহাই যাহার বিশ্বাস, সেই বৃদ্ধ। বৃদ্ধ সে, যে যুবকের পবিত্র উৎসাহ-অগ্নি নিবাইতে চায়। চুল পাকিয়াছে বলিয়া কি রামতনু বাবু বৃদ্ধ? শুনিলাম, তিনি নাকি আবার 'বোধোদয়' পড়িতেছেন, কারণ তিনি বলেন, 'বোধোদয়ে' যাহা লেখা আছে, আমরা তাহাই করি না; বড় বই পড়ি কেন? পরলোকের দ্বারদেশে আগতপ্রায় এই সপ্ততিপর বৃদ্ধের কি অদ্ভুত ধর্ম্মপিপাসা! আর রাজনারায়ণ বাবুর যে পরিহাস-রসিকতা, হাসির ছটা দেখিলাম, তাঁহাকে বৃদ্ধ বলি কেমন করিয়া? বৃদ্ধ আমরা; পেঁচার মত মুখ ভার করিয়া বিজ্ঞতার ভাণ করি; যেন বিধাতার কাছে লেখাপড়া করিয়া দিয়াছি যে, আর হাসিব না। শিশুর হাসি আর সাধুর হাসি একই রকমের। উভয়েই জননীর মুখ দেখিতে পান।"…

[এই চিঠিটা শ্রীযুক্তা শান্তা দেবী প্রণীত "রামানন্দ চট্টো… ও অর্দ্ধ শতাব্দীর বাংলা" নামক গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত। ১… 'ধর্ম্মবন্ধু'তে চিঠিপত্রের স্তম্ভে রামানন্দ এই পত্রটি প্রকাশ…

২

প্রবাসী কার্য্যালয়, এলাহাবাদ
১১।১১।১১০১

সবিনয় নিবেদন,

আপনার প্রেরিত রচনাগুলি আদ্যোপান্ত পড়িয়াছি। সকলগুলিই প্রশংসনীয়। অবশ্য সকলগুলিকে একই কারণে বা একই রকমের প্রশংসা দেওয়া যায় না। 'বনলীলা' ছন্দের মধুর ঝঙ্কারে এবং কবিত্বে মনোজ্ঞ হইয়াছে। ছন্দের এত বাঁধুনীর মধ্যে এতটা কবিত্ব রাখা বিশেষ ক্ষমতা ও প্রতিভার পরিচায়ক। 'প্রেমলীলা'ও বেশ হইয়াছে। কিন্তু Petruchio ও Kate-এর মত Court-shipটা এত সংক্ষেপে সারিতে গিয়া আপনি আনন্দ ও সুহাসিনীকে কতকটা abruptly প্রেমে ফেলিয়াছেন। ক্রেতা একটা দর হাঁকিয়া কিম্বা লইব না বলিয়া দোকান হইতে দু' পা যাইতে না যাইতেই যে দোকানদার দর কমাইয়া দেয়, সে এখনও দোকানদারী শিখে নাই। সুহাসিনীকে প্রেমের ব্যবসায়ে কি এতটা অনভিজ্ঞ করা আপনার উদ্দেশ্য। অথবা হয়ত সে বেচারা মুখরা হইলেও নিতান্ত সরলা।

'মোতিয়া' বেশ হইয়াছে। সাহেব বাঁদরটাকে আর একটুকু নাচাইলে মন্দ হইত না।

ঋতু-সংহারের অনুবাদ মূলের সহিত মিলাইয়া দেখিবার সুযোগ পাই নাই, সে ক্ষমতাও নাই। কবিতা হিসাবে বেশ হইয়াছে। ইহা সত্য যে, সমুদয় রচনা delicate রুচির লোকের উপযোগী নয়। ঋতু-সংহার সে মোহ জন্মাইতে পারে না, যাহা সংস্কৃত মূলে আছে। ইহাও অনেক জায়গায় indelicate মনে হয়। ফ্রেম অনুসারে ছবি মানানসই বা বেমানান হয়। তেমনি উজ্জয়িনীর নায়ক-নায়িকার চিত্র উজ্জয়িনীর ফ্রেমে যেমন জোরালো হয়, বাংলার ফ্রেমে তেমনটি হয় না। আমার ধারণা, দুর্নীতি বা অশ্লীলতা কথায় হয় না, উদ্দেশ্যে হয়। দাম্পত্য প্রেমের চরম পরিণতি যাহাই হউক, মূলতঃ এবং প্রধানতঃ উহা শুধু অশরীরী ব্যাপার নয়:—দৈহিক আধ্যাত্মিকের অনির্ব্বচনীয় সংমিশ্রণ। যৌন আকর্ষণ ও অনুরাগের বর্ণনায় কেহ যদি দৈহিকের দিকে বেশি ঝোঁকেন, তাহা হইলেই তাঁহার রচনাকে অশ্লীল বলিতে পারি না; যদিও তাহাকে শ্রেষ্ঠ কবিতার আসন দিতেও পারি না। কিন্তু দৈহিক একেবারে বাদ দিলেও কেমন অস্বাভাবিক লাগে। তবে এ কথা মানি যে, দৈহিক আকর্ষণের বা সম্ভোগের চিত্র অপরিণত-বুদ্ধি পাঠক-পাঠিকার পক্ষে ভাল নয়। এই জন্য আমি পুস্তক-প্রকাশক হইলে আপনার বক্ষ্যমান সমুদয় রচনাই ছাপিতে পারিতাম। কিন্তু যাহা Promiscuously ছেলেমেয়ে বালক-বৃদ্ধ সকলের হাতে পড়ে এরূপ Publicationএ ছাপা কাহারও পক্ষে সঙ্গত বোধ করি না। যাহা হউক, আপনি বোধ হয় এসব ঝুটা Philosophy শুনিতে চান না। এখন কাজের কথা বলি।

...আমার বিবেচনায় গদ্য-পদ্য সবগুলি এক কেতাবে ছাপায় দোষ নাই, কারণ সবগুলিতেই পুষ্পধন্বার কীর্ত্তি বা প্রভাব বিদ্যমান আছে।

...আমি চাকরী করিয়া খাই, সাহিত্যচর্চ্চা করিবার সময় পাই না। নতুবা ইচ্ছা হয় যে আর কোনরূপে না পারি, আপনার 'বনলীলা' বা 'বংশী গোপাল' এবং অন্যান্য কবিদের কোন কোন কবিতার appreciation লিখিয়াও সাহিত্যসেবা করি। কিন্তু তাহার সময় কোথা? মণিহারী দোকান বা পাঁচ ফুলের সাজি সাজাইতে সাজাইতে বুঝি—বা আয়ু শেষ হয়। ইতি—

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

[শ্রীযুক্তা শান্তা দেবী প্রণীত 'রামানন্দ ও অর্দ্ধ শতাব্দীর বাংলা' নামক গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত]

শ্রীযুক্তা শান্তা দেবী এই চিঠির প্রসঙ্গে লিখেছেন—"বাংলা দেশের বাহির হইতে 'প্রবাসী'কে গড়িয়া তুলিতে এবং শক্তিশালী ও জনপ্রিয় করিতে সম্পাদককে অনেক বেগ পাইতে হইয়াছিল। দেবেন্দ্রনাথ সেন, যোগেশচন্দ্র রায়, বামনদাস বসু, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি প্রবাসী বাঙালীরা লেখার কার্য্যে তাঁহার সহায় ছিলেন। বাংলা দেশের লেখকদের নিকট এই সময় তিনি বেশী লেখা পাইতেন না। অনেকের ধারণা, নামজাদা লেখকের লেখা পাইলেই তিনি নির্ব্বিচারে ছাপিতেন এবং গল্প ও কবিতা বিষয়ে তিনি বিশেষজ্ঞ ছিলেন না। এই ধারণা যে কতখানি ভুল, তাহা যাঁহারা তাঁহার সহিত কাজ করিয়াছেন এবং যাঁহারা নিজেদের লেখা পাঠাইতেন তাঁহারাই জানেন ......বিজয়চন্দ্র মজুমদার তাঁহাকে কখনও কখনও মতামতের জন্যই রচনা পাঠাইতেন। তাঁহার গৃহে রক্ষিত রামানন্দের ৪২।৪৩ বৎসর পূর্ব্বেকার চিঠি উদ্ধৃত করিলে বুঝা যাইবে, তিনি কতটা সব দিক দেখিয়া বিচার করিতেন।"

দেশবন্ধুর চিঠি

ষ্টেপ্ এসাইড,
দার্জ্জিলিং
১৬।৬।২৫

কল্যাণবরেষু—

তুমি বোধ হয় জান, স্বরাজ্যদলকে আমি অনেক টাকা ধার দিয়ে এসেছি। কিন্তু সে টাকা আমাকে শোধ করবার এখন ও-দলের আর সাধ্য নাই। ফলে এই দাঁড়িয়েছে যে, আমার নিজ খরচের জন্য যা কিছু ছিল, প্রায় সবই স্বরাজ্যদলের জন্য দেওয়ায়, এখন আমি একেবারে কপর্দ্দকহীন; এবং এমনও অবস্থা হ'তে পারে যে, আমার শরীর সারবার পূর্ব্বেই আমাকে এ স্থান ছেড়ে কলকাতা আসতে হ'তে পারে। দুঃখ দেশের জন্য, কারণ ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে আমার সমস্ত শক্তি, শ্রম ও সাধনা দেশের পক্ষে নিয়োজিত করা একান্ত আবশ্যক। আমার মনে হয়, ১৯২৬ খৃষ্টাব্দই দেশের পক্ষে ভীষণ ভাগ্য-পরীক্ষার বৎসর। আমার শরীর এখনও সারে নাই। সামান্য উপকার হয়েছে সন্দেহ নাই, কিন্তু প্রতি সপ্তাহেই—সোমবার একবার ক'রে জ্বর হয়। কাল যে জ্বর হয়েছে, তা এখনও সারেনি, আমি রোগশয্যায় শায়িতাবস্থায়ই তোমার কাছে চিঠি লিখছি। মহাত্মা আজ সকালে জলপাইগুড়ি রওনা হয়ে গেছেন। ভরসা করি তোমরা সব ভাল আছ, আর কাজকর্ম্মও বেশ চলেছে।

আশীর্ব্বাদক
শ্রীচিত্তরঞ্জন দাস

[শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত প্রণীত "দেশবন্ধু-স্মৃতি" নামক গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত]

বাসন্তী দেবী

[দেশবন্ধু-পত্নী এবং দেশপ্রেমিকা মহিলা]

সেদিন দক্ষিণ-কলিকাতার এক ঐতিহ্যময় গৃহপ্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া প্রাতঃস্মরণীয় পরলোকগত এক মহামানবের উদ্দেশ্যে প্রথমে প্রণতি জানাইয়া গৃহকর্ত্রীর সাক্ষাৎপ্রার্থী হই। কিয়ৎক্ষণের মধ্যে দ্বিতলের সুসজ্জিত কক্ষে এক বর্ষীয়সী মাতৃসমা মহিলার সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। আগমনের কারণ নিবেদন করিতে তিনি বলিলেন, 'আমার জীবনী বলিতে কিছু নাই'। এই মহীয়সী নারী হলেন দেশবন্ধু-সহধর্মিণী—বর্তমান শতাব্দীর পূর্ব্বভাগের এক বিশিষ্টা জাতীয়তাবাদী মহিলা বাসন্তী দেবী।

১৮৮০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা সহরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পৈতৃক নিবাস ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণায়। পিতা ৺বরদানাথ হালদার—মাতা ৺হরিসুন্দরী দেবী। বরদানাথ ছিলেন আসামের বিজনী ষ্টেটের দেওয়ান। দশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত আসামের বিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাস করিয়া বাসন্তী দেবী কলিকাতা লরেটো কনভেণ্টে কিছুকাল পড়াশুনা করেন। ১৮৯৭ সালে সপ্তদশ বৎসর বয়ঃক্রমে উদীয়মান ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জন দাশের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। তাঁহাদের জ্যেষ্ঠা কন্যা বিশিষ্টা কীর্ত্তন-গায়িকা অপর্ণা দেবী ব্যারিষ্টার সুধীরচন্দ্র রায়ের স্ত্রী ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভূতপূর্ব্ব আইন-সচিব শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের জননী। কনিষ্ঠা কন্যা কল্যাণী দেবীর সহিত রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের দৌহিত্র ও কলিকাতা করপোরেশনের ভূতপূর্ব্ব Dy. C. E. O. শ্রীভাস্কর মুখার্জ্জির বিবাহ হয়। তাঁহাদের একমাত্র পুত্র চিররঞ্জন দাশ ১৯২৬ সালে পরলোক গমন করেন।

প্রাচুর্য্যের মধ্যে অবস্থান করা সত্ত্বেও দরিদ্রনারায়ণ সেবা ও স্বদেশপ্রীতির জন্য যখন চিত্তরঞ্জন স্বগৃহসহ সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়' মাথায় তুলিয়া দেশমাতৃকার মুক্তি সাধনের জন্য নিজেকে বিলাইয়া দেন, তখন বাসন্তী দেবীও বিনা দ্বিধায় হাসিমুখে স্বামীর অনুগামিনী হন। এই মহাপুরুষকে সেই সময় ভারতবাসী বরণ করে নিল "দেশবন্ধু" রূপে। ১৯২১ সালে কলিকাতায় আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ হয়। প্রথম দলে অন্যতম সত্যাগ্রহী ছিলেন পুত্র চিররঞ্জন—দ্বিতীয় দলের নেত্রী ছিলেন বাসন্তী দেবী স্বয়ং—তৃতীয় দলকে পরিচালনা করেন দেশবন্ধু। ৬ই ডিসেম্বর পুত্র ধৃত হইয়া বিচারে ছয় মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন—মাতাকে ৭ই ডিসেম্বর গ্রেপ্তার করিয়া প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ছাড়িয়া দেওয়া হয়—আর ১০ই ডিসেম্বর পিতা অভিযুক্ত হন। ১৯২৩ সালে তারকেশ্বর মন্দির পরিচালনায় গলদ দূরীকরণে যখন দেশবন্ধু সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ করেন, তখন বাসন্তী দেবী একমাত্র পুত্রকে প্রথম স্বেচ্ছাসেবকরূপে প্রেরণ করেন। ১৯২১ সালে গয়া কংগ্রেস অধিবেশনে যখন দেশবন্ধু স্বরাজ্য পার্টি গঠনের কথা ঘোষণা করেন, তখন বাসন্তী দেবী উহাতে উপস্থিত ছিলেন। রাজনৈতিক কার্য্যকলাপে বাঙলা প্রদেশে দেশবন্ধুর অন্তরঙ্গ সহকর্মী ছিলেন পরলোকগত বি, এন, শাসমল ও সুভাষচন্দ্র বসু। ১৯২২ সালে দেশবন্ধু সহ উক্ত দুই জননায়ককে যুগপৎ তাঁহাদের গৃহ হইতে পুলিশ কর্ত্তৃক গ্রেপ্তার আজও বাসন্তী দেবীর স্মরণে আছে। চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক সম্মেলনে সভানেত্রী হিসাবে তাঁহার ভাষণ অতুলনীয় হয়। ১৯২৩ সালে দেশবন্ধু কলিকাতা করপোরেশনের সর্ব্বপ্রথম মেয়র নির্ব্বাচিত হন এবং এর পর বৎসর পুনরায় উক্ত পদে তাঁহাকে বরণ করা হয়।

সেই সময় সুভাষচন্দ্রকে করপোরেশনের চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসার হিসাবে দেশবন্ধু মনোনীত করেন। ইহার কয়েক মাস পরে সুভাষচন্দ্র ধৃত হন এবং মান্দালয় জেলে প্রেরিত হন—সে কথাও বাসন্তী দেবী জানাইলেন। অতিরিক্ত পরিশ্রমের দরুণ চিত্তরঞ্জনের শরীর ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং দেশবন্ধুকে লইয়া বাসন্তী দেবী দার্জ্জিলিঙে গমন করেন। ১৯২৫ সালের ১৬ই জুন তিনি তথায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ভারতমাতার এত বড় ত্যাগী

বাসন্তী দেবী

সন্তানের আত্মবিসর্জনে শোকসন্তপ্ত বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনের নিভৃত প্রান্তর হতে কেঁদে উঠলেন :—

"এনেছিলে সাথে করে
মৃত্যুহীন প্রাণ,
মরণে তাহাই তুমি
করে গেলে দান"।

ইহার এক বৎসর পরে একমাত্র পুত্র চিত্তরঞ্জনকে চিরকালের মতন হারালেন বাসন্তী দেবী। অল্প সময়ের ব্যবধানে এত বড় দুইটি শোকাবহ ঘটনা তাঁহার হৃদয়ে খুবই আঘাত করে এবং ধীরে ধীরে নিজেকে ক্রমশঃ সাংসারিক কর্মপ্রবাহ হইতে বিচ্যুত করেন।

কবিগুরুর কথায় বাসন্তী দেবী বলেন যে, বাল্যকাল হইতে রবীন্দ্রনাথ ও ঠাকুর পরিবারের সহিত তাঁহাদের পরিচয় ছিল। ইহা ছাড়া ৺সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী সম্পর্কে তাঁহার ভগিনী হইতেন।

পারিবারিক কথায় তিনি জানালেন যে, তাঁহার কনিষ্ঠা ভগিনী মাধুরী দেবীর সহিত ব্যারিষ্টার চারুচন্দ্র দাশের বিবাহ হয়। ভ্রাতা সুরেন্দ্রনাথ হালদার মৃত। তাঁহার পাঁচ ননদিনীর মধ্যে কনিষ্ঠা বর্ত্তমানে জীবিতা আছেন। ৺উর্ম্মিলা দাশ বরাবর রাজনৈতিক আন্দোলনে নিজেকে জড়িত রাখিয়াছিলেন। ৺অমলা দাশ একজন সুগায়িকা ও সঙ্গীতশিল্পী ছিলেন। তাঁহার বিধবা পুত্রবধূ তাঁহার নিকট থাকেন। ব্যারিষ্টার ৺বি, সি, চ্যাটার্জি তাঁহার পিসতুত ভ্রাতা হইতেন। ব্যারিষ্টার শ্রী পি, আর দাশ তাঁহার দেবর হন।

পুরাতন ঘটনা ও দেশবন্ধু সম্বন্ধে কিছু বলিতে অনুরুদ্ধ হইলে বাসন্তী দেবী মন্তব্য করিলেন—"আশী বৎসর বয়স হতে চলল—স্মৃতির অতলে হারিয়ে গেছে বিগত জীবনের অনেক কথা।" তবু তিনি জানালেন, "১৯২১ সালে দেশবন্ধু সম্পূর্ণ ভাবে রাজনীতিক্ষেত্রে প্রবেশ করেন—অনুরোধ আসা সত্বেও তিনি আর কোন মামলা পরিচালনা করেন নাই—মতিলালজী, স্বরূপরাণী, জওহরলাল ও বিজয়লক্ষ্মীর সহিত আমাদের খুবই ঘনিষ্ঠতা ছিল—বোম্বাইতে দাঙ্গার পর গান্ধীজি অনশনব্রত গ্রহণ করিলে দেশবন্ধুর সহিত আমি তথায় তাঁহার সহিত দেখা করি—পুণা জেলে গান্ধীজির সহিত আমি নিজে দেখা করিয়াছিলাম—সেখানে যাওয়ার সময় কল্যাণ ষ্টেশনে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়—হাকিম আজমল খাঁ, বিঠলভাই প্যাটেল, ডাঃ আনসারী, মৌলানা আজাদ, চক্রবর্ত্তী রাজাগোপালচারী, বিপিন পাল, রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি জননায়কদের সহিত আমার বিশেষ পরিচয় হইয়াছিল—দিল্লীতে গান্ধীজির (একবার অনশনব্রত গ্রহণ করিলে) সহিত সাক্ষাতের জন্য মতিলালজী ও আমরা কুতুব মিনারের নিকট ডাকবাংলোয় একত্রে অবস্থান করিয়াছিলাম—দার্জ্জিলিঙে অসুস্থ দেশবন্ধুকে দেখিবার জন্য মহাত্মা গান্ধী সহ অনেক নেতা আসিতেন—সুভাষচন্দ্র আমাকে বরাবর নিজ জননীর মতন ভক্তি করিত, সরোজিনী নাইডু ও তাঁহার পিতা ৺অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং মাতার সহিত আমাদের খুবই ঘনিষ্ঠতা ছিল—তাছাড়া অঘোরনাথের পৈতৃকভূমি ছিল বিক্রমপুরে।"

দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর "বসুমতী সাহিত্য মন্দির" তাঁহার লিখিত প্রবন্ধসমূহ সংগ্রহ করিয়া পুস্তাকারে প্রকাশিত করিয়াছিলেন—সে কথাও বাসন্তী দেবী জানাইলেন।

চিত্তরঞ্জনের সহিত তিনি ভারতবর্ষের বহু স্থান পরিভ্রমণ করিয়াছেন এবং অসুস্থ কন্যাকে লইয়া তিনি ১৯১২ সালে ইংল্যাণ্ডে গমন করেন ও পর বৎসর ভারতে ফিরিয়া আসেন।

তিনি বলিলেন যে, দেশবন্ধু সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত যত পুস্তক বা প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে অধিকাংশই ঠিক মত লিখিত হয় নাই বলিয়া তাঁহার মনে হয়। তাঁহার কন্যা অপর্ণা দেবী লিখিত "মানুষ চিত্তরঞ্জন" পুস্তকে সঠিক তথ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে।

বর্ত্তমানে তিনি দেবার্চ্চনা ও পাঠাভ্যাসের মধ্যে নিজেকে বিলাইয়া রাখিয়াছেন। প্রত্যাবর্ত্তনের সময় আমার মনে হল যে স্বাধীন ভারতে বাসন্তী দেবীর প্রাপ্য সম্মান ও যথাযোগ্য মর্য্যাদা দিতে আমরা বোধ হয় ভুলিয়া গিয়াছি!

ডক্টর শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

[খ্যাতনামা সুপরিচিত আইনজ্ঞ ও গ্রন্থকার]

বহু বিচিত্রতর জীবনের সন্ধান মেলে আইনের দ্বারদেশে। কত সহস্র নর-নারীর মিছিল, ভিন্ন ভিন্ন তাদের জীবনযাত্রা, চিন্তাধারা, দৃষ্টিভঙ্গী। হাজার হাজার বক্তব্যে গমগম করছে বিচারপুরী। এরই সঙ্গে প্রতিনিয়ত বিদ্যমান আছে কয়েকজোড়া মাত্র সন্ধানী চোখ। শিল্পীর, স্রষ্টার, সাহিত্যকারের। এই বহুবিধ জীবনধারার সঙ্গে তাঁরা পরিচিত করান সাহিত্যপাঠকদের, এই হাজারো জীবনকে চিরকালের জন্য এঁরা প্রতিষ্ঠিত করে যান সাহিত্যপত্রে, এই অসংখ্য চরিত্রের সঙ্গে কল্পনার সংমিশ্রণে এঁরা সৃষ্টি করেন অভিনব সাহিত্য। আইন ও সাহিত্যের দরবারে যুগপৎ পদার্পণ ঘটেছে বহুজনের, সংখ্যায় নিরূপণ করা যায় না। সেই স্রষ্টা-সাহিত্যিকদের মধ্যে একজনের নাম উল্লেখ করছি প্রবীণ সাহিত্যকার ও আইনজ্ঞ ডক্টর শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের নাম।

ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত টাঙ্গাইলের পরলোকগত মহেশচন্দ্র সেনগুপ্তের পুত্র নরেশচন্দ্র জন্ম নিলেন বগুড়ায় ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের মে মাসের দ্বিতীয় দিনটিতে। মহেশচন্দ্র ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। কর্মব্যপদেশে বিভিন্ন স্থানে তাঁকে পরিভ্রমণ করতে হোত; সেই কারণে পুত্র নরেশচন্দ্রকে বিদ্যালাভ করতে হয়েছে একাধিক বিদ্যালয় থেকে। মুঙ্গের থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন নরেশচন্দ্র (১৮৯৭) তারপর প্রেসিডেন্সী কলেজে এসে ভর্তি হলেন, এখান থেকে দর্শনশাস্ত্র এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন যথাক্রমে ১৯০২ ও ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে।

তারপরেই এল ১৯০৫ সাল। বাঙালীর জাতীয় জীবন থেকে যার তাৎপর্য কোন দিনই মুছে যাবার নয়। ভারতবর্ষ সেদিন বাংলার কাছ থেকে করজোড়ে গ্রহণ করেছিল স্বাধীনতা-সংগ্রামের মন্ত্র। দেশজোড়া এক নতুন চেতনার আবেদন সেদিন স্পর্শ করেছিল প্রতিটি স্বাধীনতাকামী মানবের অন্তরজগৎ। এর আকর্ষণ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারলেন না নরেশচন্দ্র নিজেকে—তাঁর তারুণ্য, কায়মনোবাক্যে সাড়া দিল পাঁচ সালের আইনকে। সেই সময় পেশা হিসেবে ওকালতিকে গ্রহণ করার কোন বাসনাই নরেশচন্দ্রের ছিল না—নিজেকে তার আকর্ষণের কাছে কোন মতেই ধরা দেন নি তখনও পর্যন্ত। ১৯০৬ সালে "উকিল" শ্রেণীভুক্ত হলেন নরেশচন্দ্র। এম, এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন ১৯১১ সালে, পরের

বছর আইনশাস্ত্রে "ডক্টরেট" লাভ করলেন, ঠিক এই সময়ে কন্যার অকাল বিয়োগে আইন ব্যবসায়ে নরেশচন্দ্র বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েন। ১৯১৬ সালে সহকারী অধ্যক্ষরূপে যোগ দিলেন ঢাকার আইন কলেজে। জগন্নাথ হলের প্রোভোষ্ট এবং আইন শাস্ত্রের অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধানের আসন অলঙ্কৃত করেছেন নরেশচন্দ্র (১৯২০-২৪)। এর পর কলকাতায় ফিরে এসে নিয়মিত ভাবে আইন ব্যবসায় শুরু করলেন। আজও অক্লান্তকর্মী নরেশচন্দ্র কর্মের স্রোতেই নিজেকে ভাসিয়ে রেখেছেন। ঢাকা যাত্রার প্রাক্কালে কলকাতার আইন কলেজেও অধ্যাপনা করছেন নরেশচন্দ্র। ঢাকার থাকাকালীন অসহযোগ আন্দোলনের বহু কাজ এঁর দ্বারা সাধিত হয়েছে। সেখানকার কুটীরশিল্পের উন্নতি ও প্রসার কল্পে ইনি বহু পরিশ্রম ব্যয় করেছেন। ভূমিসংস্কার সম্বন্ধে এঁর অবদান অসামান্য। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্যের আসনও এঁর দ্বারা অলঙ্কৃত হয়েছে (১৯৩০—৩৫)। আন্তর্জাতিক প্রথমত আইন বিষয়ক মার্কিণ মুলুকে যে অধিবেশন বসে ১৯৫০ সালে ভারতবর্ষ থেকে নরেশচন্দ্র সেই অধিবেশনে যোগ দেন। ১৯৫০ সালে ঠাকুর আইনের অধ্যাপকরূপে নরেশচন্দ্রকে দেখা গেছে।

আইনজ্ঞ ছাড়াও যে পরিচয় নরেশচন্দ্রকে আবালবৃদ্ধ-বনিতার কাছে সমধিক জনপ্রিয় করে তুলেছে সে সম্বন্ধে কোন কিছুই এখনও বলা হয় না। এমন একটি সময় এসেছিল যে সময় নরেশচন্দ্রকে বাংলার সাহিত্য সমাজের নায়কের আসনে অধিষ্ঠিত থাকতে দেখা-গেছে। বাল্যকাল থেকে নরেশচন্দ্রের সাহিত্যসাধনার সূত্রপাত। ঢাকায় থাকাকালীন প্রথম গ্রন্থ প্রকাশিত হল। গ্রন্থের নাম আত্মসংস্কার। আজ পর্যন্ত ষাটখানি গ্রন্থ নরেশচন্দ্র রচনা করেছেন! এদের মধ্যে উল্টো ঢেউ, শাস্তি, কাঁটার ফুল, তরুণী ভার্য্যা, অভয়ের বিয়ে, শুভা, রবীন মাষ্টার, একা, সর্বহারা, আমি ছিলাম প্রভৃতি গ্রন্থগুলির নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। চলচ্চিত্রের মাধ্যমেও নরেশচন্দ্রের কয়েকটি কাহিনী চিত্রায়িত হয়ে দেখা দিয়েছে।

শ্রীসন্তোষকুমার বসু

[কলকাতার ভূতপূর্ব পৌরপ্রধান ও বিশিষ্ট দেশসেবী]

বহুজনের ধারণা যে, ধর্মাধিকরণকে কেন্দ্র করে যে সব আইনবিদগণকে দেখা যায় তাঁরা কেউই ন্যায়ের, সত্যের ও বিবেকের ধার দিয়েও চলেন না, এ কথা কয়েক জনের উপর প্রযোজ্য হলেও সকলের উপর কোন মতেই প্রযোজ্য নয়। আইন ব্যবসায়ীদের মধ্যে এখনও এমন বহুজন আছেন যাঁরা সত্য, শিব ও সুন্দরের পাদপদ্মে উৎসর্গ করে দিয়েছেন নিজেদের বিচার জ্ঞান ও বিবেক। অন্যায়ের প্রতিবাদে কণ্ঠ তাঁদের সর্বদাই মুখর, সর্বহারা শোষিতের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের সাহায্য করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন না তাঁরা। এমনই মানবদরদী, জনসেবী সত্যনিষ্ঠ আইনরথীদের মধ্যে শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করা যায় কলকাতার ভূতপূর্ব পৌরাধ্যক্ষ ও পূর্ব-পাকিস্তানের ভূতপূর্ব ভারতীয় রাষ্ট্র-প্রতিনিধি শ্রীসন্তোষকুমার বসু মহাশয়ের।

রাণাঘাটের একটি মধ্যবিত্ত পরিবারে তাঁর জন্ম হয় ১৮৯০ সালে। তাঁর পিতৃদেব স্বর্গীয় রাজচন্দ্র বসু স্থানীয় পৌরসভার সদস্য ছিলেন। অগ্রজ স্বর্গীয় সুশীলকুমার কিশোর বয়সেই গতায়ু হন; এর মধ্যেই জনসেবার জন্যে বহুজনের সম্ভ্রম আকর্ষণে ইনি হয়েছিলেন। বিখ্যাত ইনফ্লুয়েঞ্জা ট্যাবলেটের আবিষ্কর্তা পরলোকগত ডাঃ সুধীরকুমার বসুও ছিলেন এঁর অন্যতম অগ্রজ। সন্তোষকুমারের শৈশবকালে রাজচন্দ্রের মৃত্যু হয়, সেই থেকে জননী স্বর্গীয়া ত্রৈলোক্যতারিণী দেবীর যত্নে, পরিচালনায় ও আদর্শে সন্তোষকুমারের ভবিষ্যৎ জীবনের কর্মমুখর ইতিহাস গড়ে উঠতে থাকে।

১৯০৫ সালের আন্দোলনের অপরিহার্য হাতছানির আকর্ষণ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারলেন না সন্তোষকুমার নিজেকে। নিজেকে আহুতি দিলেন স্বদেশের মুক্তিযজ্ঞে। এই যজ্ঞে তৎকালীন ছাত্রসমাজের অবদান ছিল অসামান্য, তাদের যোগদান বহুলাংশে পুষ্ট করেছে এই আন্দোলনকে। ছাত্রদের সঙ্ঘবদ্ধ করার জন্যে একটি সংস্থা গঠন করলেন ছাত্র সন্তোষকুমার। সভাপতি হলেন রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ, অধ্যাপক জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তিনি নিজে হলেন যথাক্রমে সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদক, নাম দেওয়া হ'ল Students and young men's union. ১৯০৬ সালের কংগ্রেসের কলকাতার অধিবেশনে পৌরোহিত্য করলেন, মহামতি দাদাভাই নৌরজী, এঁর ব্যক্তিগত স্বেচ্ছাসেবকের কর্মভার গ্রহণ করেন সন্তোষকুমার।

১৯১২ সাল থেকে দু'বছরের জন্যে ইনি নাগপুরের স্কটিশ চার্চ পরিচালিত হিসলপ কলেজে ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপনা করেন। সেখানে "শনিবারের বৈঠক" নামে একটি সাংস্কৃতিক চক্রের প্রতিষ্ঠা করেন ও সাপ্তাহিক বক্তৃতামালার আয়োজন করেন। তাঁরা বক্তৃতার মধ্যে দিয়ে তৎকালীন মহারাষ্ট্র সমাজ প্রথম রবীন্দ্র সাহিত্যের আস্বাদ লাভ করবার সুযোগ পান।

১৯১৪ সালে কলকাতায় ফিরে এসে আইন ব্যবসায়ে লিপ্ত হন। নেতাজী সুভাষচন্দ্র, বিদ্রোহী কবি নজরুল, সূর্য সেন পরিচালিত চট্টগ্রামের বীর সন্তানদের স্বপক্ষে কয়েকটি মামলা ইনি পরিচালনা করেনী।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের নেতৃত্বে খিদিরপুরের প্রতিনিধি হিসেবে সদস্যরূপে ইনি কলকাতায় পৌর প্রতিষ্ঠানে যোগদান করেন (১৯২৪)। ১৯৩০ সালে সহ-পৌরপ্রধান এবং ১৯৩৩ সালে পৌর-প্রধানের সম্মান অর্পিত হয় সন্তোষ-কুমারের প্রতি। সদস্যদের মধ্যে পৌর-প্রধান নির্বাচন এঁর বেলাতেই প্রথম ঘটল, এঁর পূর্ববর্তীরা প্রত্যেকে অল্ডারম্যান থেকে মেয়র হয়েছেন, কাউন্সিলার থেকে

শ্রীসন্তোষকুমার বসু

মেয়র পদ লাভ ইনিই প্রথম করেন। ১৯৩৪ সালের বিহার ভূমিকম্পে এঁর সেবাকার্য চিরদিন মনে থাকবে। কেওড়াতলা মহাশ্মশানে দেশবন্ধুর অভ্রভেদী স্মৃতিমন্দিরের নির্মাণ কমিটির সম্পাদক ছিলেন সন্তোষকুমার। ১৯২৮ সালে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে সদস্য (কংগ্রেস) নির্বাচিত হন ও পরের বছরে আইন অমান্য আন্দোলনের প্রস্তুতিরূপে কংগ্রেসের নির্দেশে ঐ সদস্যপদ ত্যাগ করেন। ১৯৩৭ সালে সদস্য হলেন বঙ্গীয় বিধান সভার এবং নির্বাচিত হলেন কংগ্রেস পার্লামেন্টারী দলের সহকারী নেতা। নেতা ছিলেন স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র বসু। ১৯৪১ সালে বাঙলাদেশের কোয়ালিশান মন্ত্রিসভার অন্যতম সদস্যরূপে ইনি যোগ দেন, এখানে স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন, চিকিৎসা বিভাগ, জনস্বাস্থ্য, পরিবহন, অসামরিক দেশরক্ষা প্রভৃতি দপ্তরগুলি যথেষ্ট যোগ্যতার সঙ্গে পরিচালিত করেন। এ ছাড়াও মন্ত্রী হিসেবে জনসাধারণের স্বার্থ ও সুবিধার দিকে তাঁর আগ্রহ ছিল প্রবল। ১৯৪৩ সালে গভর্ণরের সঙ্গে মতদ্বৈধতার জন্যে মন্ত্রিসভার অন্যান্য সকলের সঙ্গে সন্তোষকুমারও পদত্যাগ করেন।

ভারতের স্বাধীনতালাভের পর ইনি ঢাকায় ভারতের রাষ্ট্র-প্রতিনিধির দায়িত্বভার গ্রহণ করেন (নভেম্বর ১৯৪৮) এখানে উভয় বঙ্গের মধ্যে সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক এবং প্রীতিপূর্ণ একটি মিলন সাধনের প্রচেষ্টায় ইনি বিশেষরূপে ব্রতী হন। ১৯৫০ সাল পর্যন্ত ইনি এই পদে সমাসীন ছিলেন।

কলকাতা হাইকোর্টের বার য়্যাসোসিয়েশান, পশ্চিমবঙ্গ আইন-ব্যবসায়ী সমিতি, পশ্চিমবঙ্গ স্বায়ত্ত-শাসন সমিতি তাঁকে একাধিক বার সভাপতি নির্বাচিত করে সম্মান জ্ঞাপন করে। খিদিরপুরের মাইকেল মধুসূদন লাইব্রেরীর তিনি এক জন স্তম্ভস্বরূপ। আজ ত্রিবিংশ বছর যাবৎ ঐ গ্রন্থাগারের সভাপতির আসনে ইনি সমাসীন আছেন পরম গৌরবের সঙ্গে।

১৯৫৭ সালে সংসদের একটি শূন্য আসনে কংগ্রেসপ্রার্থিরূপে নির্বাচিত হলেন এবং আবার এই এপ্রিল মাসে রাজ্যসভায় নির্বাচিত হয়েছেন ছ' বছরের জন্যে।

সন্তোষকুমারের কনিষ্ঠ পুত্র অরবিন্দ ইংল্যাণ্ডের ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় দর্শন ও ধর্মের অধ্যাপক, সেখানে প্রবন্ধকার রূপেও ইনি সমধিক প্রসিদ্ধি অর্জন করেছেন, এঁর পত্নী ডক্টর শ্রীমতী শোভা বসু, ডি, লিট কাশীধামের হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপিকা।

প্রার্থনা করি, অক্লান্ত কর্মী সন্তোষকুমারের সেবার আস্বাদ দেশ উত্তরোত্তর আরও গভীর ভাবে লাভ করুক।

রমা মজুমদার

[প্রথম মহিলা আই-এ-এস]

জাগ্রত নব-ভারত। জেগে উঠেছে তার আত্মা। কর্মের আহ্বানে সে আজ সুপ্তোত্থিত। জ্ঞান-বিজ্ঞানের মঙ্গলভাণ্ড হাতে নিয়ে দিক্ হতে দিগন্তরে তার পদ-বিক্ষেপ। এই অভিযানের যাত্রাপথে পিছিয়ে নেই বাংলা, পিছিয়ে নেই বাঙালী মহিলা। অতীত বাংলার পুনরাবৃত্তি। বীরাঙ্গনার দেশে, বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিভিন্ন ক্ষেত্রে মহিলা প্রতিভার [illegible] ঘটেছে। বয়সে যাঁরা তরুণী, কর্মে যাঁরা সুপ্রতিষ্ঠিত, প্রতিভায় যাঁরা উদ্দীপ্ত এবং অনাগত ভবিষ্যৎ যাঁদের জাগ্রত, সেই সব প্রতিভাময়ী বাঙালী মহিলাদের অন্যতমা হলেন প্রথম বাঙালী মহিলা আই, এ, এস, শ্রীযুক্তা রমা মজুমদার।

রাইটার্স বিল্ডিংসের সংরক্ষিত এলাকা। চারিদিকে স্তব্ধতা আর লালপাগড়ীর বিধি-নিষেধ। এরই গণ্ডী অতিক্রম করে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আণ্ডার সেক্রেটারীর সঙ্গে দেখা কোরতে এসেছি। বেশীক্ষণ বসতে হোল না—স্লিপ দেওয়ার মিনিট কয়েক বাদেই বেয়ারা ভেতরে নিয়ে গেল। সন্তর্পণে ঘরে ঢুকতেই সহাস্যমুখে যিনি অভ্যর্থনা জানালেন, তিনিই শ্রীযুক্তা রমা মজুমদার। জিজ্ঞাসা কোরলেন, আমার কাছে কী উদ্দেশ্যে? জানালাম, ভয় নেই, বাংলাদেশের মেয়েদের কাছে তাঁর মত একজন বাঙালী মেয়ের জীবনকথা তুলে ধরব আজকের এই নৈরাশ্যজনক মনোভাবের যুগে, তারা যাতে এগিয়ে চলার পথে সাহস পায় এই আশায় তাই এসেছি। বললেন—মুস্কিলে ফেললেন দেখছি। কতটুকু বা জীবন, কি-ই বা ঘটেছে, যা লোককে জানাবেন! বললাম, যতটুকুই জীবনসমুদ্রে পাড়ি দিন, আজকের দিনে মেয়েদের কাছে তাই-ই অনেকখানি। হার মেনে তিনি আরম্ভ কোরলেন :—

পিতা স্বর্গীয় ধীরেন্দ্রনাথ মজুমদার কার্য্যব্যপদেশে বছর ৩০।৩৫ আগে দিল্লীতে স্থায়িভাবে বাস সুরু করেন, নইলে আদি নিবাস পূর্ববাংলার সেই ঢাকা জেলা, যে জেলা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর পৈত্রিক ভূমি বলে দাবী করে। শ্রীযুক্তা মজুমদারের জন্ম দিল্লীতেই। বলা বাহুল্য, ছাত্রীজীবনে তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই সম্মানের সংগে সব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ১৯৫১ সালে I. A. S. পরীক্ষা দেন। বাংলার বাইরে মানুষ হলেও বাঙালীর মেয়ে বাংলাদেশের প্রতি অন্তরের সহজাত আকর্ষণ উপেক্ষা কোরতে পারেন নি, তাই বাংলাদেশেই তাঁর কর্মক্ষেত্র বেছে নিলেন। ১৯৫৫-৫৬ পর্য্যন্ত আলীপুরে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে ট্রেনিং নেন্। তারপর '৫৬ সালের সেপ্টেম্বর থেকে '৫৭ সালের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত দার্জ্জিলিংয়ে S. D. O. ছিলেন। ১৯৫৭ সালের ডিসেম্বরে তিনি রাইটার্স বিল্ডিংয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আণ্ডার সেক্রেটারী হিসাবে কার্য্যভার গ্রহণ করেন।

পারিবারিক কথা প্রসঙ্গে বললেন—পিতামাতার তিনি দ্বিতীয় সন্তান। বড় ভাই থাকেন বিশাখাপত্তনম, ছোট বোন ভেলোরে। মাকে নিয়ে তিনি এখানেই থাকেন।

শাসন বিভাগের জবরদস্ত কর্মী হলেও সাহিত্যপ্রীতি তাঁর অসাধারণ। সবগুলি পত্র-পত্রিকা সম্বন্ধে তিনি ওয়াকিবহাল। বাংলার বাইরে মানুষ হওয়ার জন্য বাংলা ভাষায় যেটুকু বেদখল ছিল, সামান্য দিনেই তা পুরোপুরি আদায় কোরছেন বিভিন্ন সাহিত্যিক ও কবিদের সাহিত্যসম্ভারের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিয়ে।

কিন্তু ছবির কথা উঠতেই লাজুক প্রকৃতির এই আই, এ, এস, অফিসার সবিনয়ে হাত জোড় কোরলেন। অর্থাৎ ওটি আর আমি পেয়ে উঠলাম না আনতে। যাক্, প্রার্থনা করি তাঁর কর্মমুখর জীবনের জয়গানে বাংলার আকাশ-বাতাস ধ্বনিত হয়ে উঠুক।

খেলনাপাতি —মীরাশ্রী ঘোষ

বিষ্ণুমূর্ত্তি
—হরজিৎ বিশ্বাস

কারুকার্য্য (বিষ্ণুপুর)
—তৃপ্তিশেখর রায়

তিন বন্ধু —আর্য্য বসু

লেক্ (জেনেভ্) —সুবোধ চট্টোপাধ্যায়

... এ মাসের প্রচ্ছদপট ...

[এই সংখ্যায় প্রচ্ছদে দক্ষিণেশ্বরস্থিত কালীমাতার মন্দিরের আলোকচিত্র মুদ্রিত হয়েছে। আলোকচিত্র বিমল সরকার কর্তৃক গৃহীত]

তিন বন্ধু

—অরুণকুমার দত্ত

মহারাণীর স্মৃতি

— অরুণ মুখোপাধ্যায়

বিদেশী নর্তকী

—দীপক বসাক

ঐ দেখো —গোবিন্দলাল দাস

যাত্রা

—আনন্দ মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

৺খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

১৯১২ সালে বক্তৃতা মধ্যে তদানীন্তন রাজপ্রতিনিধি লর্ড হার্ডিঞ্জ কবিকে Poet Laureate of Asia বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। প্রাইজ পাওয়ার দুই বৎসর পর বৃটিশ সরকারও কবিকে নাইট উপাধি দিলেন, যে উপাধি কবি ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে জালিয়ানওয়ালাবাগ নৃশংস হত্যালীলার পর বৃটিশ সরকারকে তৎকালীন রাজপ্রতিনিধি লর্ড চেমসফোর্ডের মাধ্যমে প্রত্যাখ্যান করেন ও সংবাদপত্রে ঘোষণা করেন যে অতঃপর কেহ যেন কবির নামের পূর্বে 'স্যার' যোগ না করেন। যদি কবিকে লিখিত কোনো পত্রাদিতে কেহ ঐরূপ স্যার উপাধি কবির নামের সহিত যোগ করেন তবে সে সব পত্র অপঠিত অবস্থায় প্রেরকের নিকট ফেরং যাইবে। আর চেমসফোর্ডকে খেতাব প্রত্যর্পণ করিয়া তাহার Letter patent-এর সহিত যে ঐতিহাসিক পত্র লেখেন তাহা নিম্নে দিলাম, যাহার ছত্রে ছত্রে ফুটিয়াছে পরাধীন দেশবাসীর জ্বালা, পরাধীনের অসহায়তা আর মনুষ্যত্ব অবমাননাকারী রক্ষক সরকারের ভক্ষকরূপের প্রতি ধিক্কার—

6 Dwarka Nath Tagore Lane
Calcutta.
18th May 1919

Your Excellency,

The enormity of the measures taken by Government in the Punjab for quelling some local disturbances has, with a rude shock, revealed to our minds the helplessness of our position as British subjects in India. The disproportionate severity of the punishments inflicted upon the unfortunate people and the methods of carrying them out, we are convinced, are without parallel in the history of civilised Governments, barring some conspicuous exceptions recent and remote. Considering that such treatment has been meted out to a population, disarmed and resourceless, by a power which has the most terribly efficient organisation for destruction of human lives, we must strongly assert that it can claim no political expediency, far less moral justification. The accounts of the insults and sufferings undergone by our brothers in the Punjab have trickled through the gagged silence, reaching every corner of India, and the universal agony of indignation roused in the hearts of our people has been ignored by our rulers,—possibly congratulating themselves for imparting what they imagine as salutary lessons. This callousness has been praised by most of the Anglo-Indians papers, which have in some cases gone to the brutal length of making fun of our sufferings, without receiving the least check from the same authority, relentlessly careful in smothering every cry of pain and expression of judgement from the organs representing the sufferers. Knowing that our appeals have been in vain and that the passion of vengeance is blinding the noble vision of statesmanship in our Government which could so easily afford to be magnanimous, as befitting its physical strength and moral tradition, the very least that I can do for my country is to take all consequences upon myself in giving voice to the protest of the millions of my countrymen surprised into a dumb anguish of terror. The time has come when badge of honour make our shame glaring in their incongruous context of humiliation, and I for my part wish to stand, shorn of all special distinctions, by the side of those of my countrymen who, for their so-called insignificance, are liable to suffer a degradation not fit for human beings. And these are the reasons which have painfully compelled me to ask your Excellency with due diference and regret to relieve me of my title of Knighthood which I had the honour to accept from His Majesty the King at the hands of your predecessor for wh

nobleness of heart I still entertain great admiration.

Yours faithfully
Rabindranath Tagore

এই উপাধিপদত্যাগ এবং তাহার কারণ সম্বলিত পত্রখানি সম্বন্ধে বৃটিশ পার্লামেন্টে মন্ত্রণা-গৃহে কোনো সভ্য প্রশ্ন উত্থাপিত করায় তৎকালীন ভারত-সচিব James Montague যে উত্তর প্রদান করেন তাহা Hansard's Parliamentary Debates এ প্রকাশিত হয়। জালিয়ানওয়ালাবাগের বারো বৎসর পরে হিজলীর ঘটনায় কবি কতদূর মর্মাহত হইয়াছিলেন তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। শাসক সম্প্রদায়ের নির্মম উদাসীনতা ও অমানুষিক আচরণ যে একরূপ রাজশক্তির স্বাভাবিক পরিণাম, ইহাই রবীন্দ্রনাথ দেশবাসীকে উপলব্ধি করিতে বলেন এবং সে কারণে অধিকতর সহিষ্ণু হইবার জন্য প্রস্তুত হইতে বলেন। কারণ, ইহাই নৈরাশ্যের স্থানে ভগবানের কৃপা ও আধ্যাত্মিক বল সঞ্চার করিবে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন সভায় সাহিত্যে ডাক্তার উপাধি গ্রহণ করিতে কবি উপস্থিত ছিলেন ও তাহার পর আরো দুই বার কবি উপস্থিত থাকিয়া দুইটি উপাধি গ্রহণ করেন। ১৯৩১ সালে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ তাঁহাদের উপাধি প্রদান সভায় সর্বভূমিতে অর্থাৎ নিখিল বিশ্বে যে কবির প্রতিভা পরিব্যাপ্ত সেই রবীন্দ্রনাথকে সম্মানসূচক 'কবি সার্বভৌম' উপাধিতে ভূষিত করেন এবং সংস্কৃতে কবির জ্ঞান যে কত গভীর ইহা তাহার স্বীকৃতি। এই সভায় প্রতিভাষণে কবি বলেন যে, বঙ্গভাষা সংস্কৃত-ভাষার দুহিতা। ইহার পর বৎসর ভারতের প্রাচীন শিক্ষা ও সংস্কৃতির অন্যতম পীঠস্থান বারাণসীর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন সভায় উপস্থিত থাকিয়া রবীন্দ্রনাথ ও বিখ্যাত আইনজ্ঞ ডাঃ স্যার তেজবাহাদুর সাপ্রু সম্মানাত্মক D. Let. বা ডক্টার অফ লেটার্স এবং জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র এবং আচার্য চন্দ্রশেখর ভেংকট রামন বিজ্ঞানে ডাক্তার উপাধি গ্রহণ করেন ও সমাবর্তন ভাষণ দেন রবীন্দ্রনাথ ও প্রফুল্লচন্দ্র। ১৯৩৩ সালে এশিয়াটিক-সোসাইটি কবিকে তাঁহাদের বিশিষ্ট বা অনারারি সভ্য করিয়া নিজেদের বহু দিনের গ্লানি ক্ষালন করেন ও পরে ভারতীয় অপর দুইটি বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা ও হায়দরাবাদ কবিকে In absentia (অনুপস্থিতিতে) উপাধি প্রদান করেন যেমন কবির তিরোধানের ঠিক এক বৎসর পূর্বে ১৯৪০-এর ৭ই অগাস্ট প্রদান করেন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়।

রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব

রবীন্দ্রনাথের অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্বের উল্লেখ এখানে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। যে সকল গুণে মানুষ মানুষকে আকৃষ্ট করে বিধাতা সে সকল গুণই রবীন্দ্রনাথকে মুক্তহস্তে দিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির স্বহস্ত-লিখিত পরিচয়-পত্র প্রিয়দর্শন কমনীয় মূর্তি সঙ্গে করিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, গুণের সহিত রূপের জন্যও সে পরিবার সমগ্র বাঙ্গালাদেশে খ্যাতাপন্ন। কিন্তু সে পরিবারেও কবি "গণ্য-সুন্দর সুন্দরের মাঝে।" রসরাজ অমৃতলাল জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে প্রেসিডেন্সি কলেজে পাঠদশায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে দেখিয়া গ্রীক আদর্শের পুরুষোচিত সৌন্দর্যের কথা তাঁহার মনে উদয় হইত। অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ অপেক্ষাও, সু-অবয়ব বিশিষ্ট, হাড় চওড়া, দীর্ঘচ্ছন্দ রবীন্দ্রনাথে, এই পুরুষোচিত সৌন্দর্য আরো একটু প্রস্ফুট ভাবে বিকশিত। তাঁহার চোখের দিব্যজ্যোতি অম্লান ও অমিততেজের পরিচায়ক। তাঁহার প্রতিভা কোনো দিন হীনপ্রভ হয় নাই। তাঁহার উজ্জ্বল গৌরবর্ণ দীর্ঘ দেহ, সৌষ্ঠবমণ্ডিত অবয়ব ও প্রতিভা-সমুজ্জ্বল বদন জনতার মধ্যেও লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। চক্ষু সহজে ফিরিতে চায় না, নয়ন ভরিয়া দেখিতে ইচ্ছা হয় এই শুভ্র শ্মশ্রুমণ্ডিত ঋষি-কবিকে। সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার লিখিয়াছিলেন—

স্বভাব না জানি যার,
আগে মুখ দেখি তার,
প্রকৃতি পটের পরে আকৃতি দর্পণ
গৃহ দেখে বোঝা যায় গৃহস্থ কেমন।

কিন্তু মনীষার আধার রবীন্দ্রনাথকে দেখিয়া তাঁহার অলোক-সামান্য লোকোত্তর প্রতিভা ও চিন্তানায়কতা বুঝা গেলেও তাঁহার সর্বতোমুখী মনের গতি ও কল্পনার ঐশ্বর্য অনুমান বা অনুধাবন করা সাধারণ নয়নের সাধ্য নহে। রবীন্দ্রনাথের বহিঃ-সৌন্দর্য তাঁহার অন্তরের সৌন্দর্যের সম্যক পরিচয়ের জন্য অপরের মনকে স্বতঃই ব্যগ্র করিয়া তুলিত। তাঁহার সহিত পরিচয়ের সৌভাগ্য যাঁহাদের হইয়াছে তাঁহারাই তাঁহার কথোপকথন ভঙ্গির অপূর্ব মনোহারিত্বে মুগ্ধ না হইয়া পারেন নাই। কথোপকথন কালে তাঁহার বদনে ভাবের বৈচিত্র্য, তাঁহার মধুর কণ্ঠস্বর, তাঁহার বাক্যে নানা রসের অবতারণা, কৌতুক-প্রিয়তা এবং তৎসহ স্বভাবসিদ্ধ ভদ্রতা ও সৌজন্যের সমাবেশে, সর্বগুণ হৃদয়ের একটা তরুণোচিত সরসতা শ্রোতার উপর অসামান্য প্রভাব বিস্তার করিত। তাঁহার কণ্ঠস্বরের ব্যাপকতা অনন্যসাধারণ। বৈচিত্র্য লইয়াই জীবনের প্রকাশ ও কবি ৮১ বছরের দীর্ঘ জীবন নানা বৈচিত্র্যপূর্ণ, সুতরাং বিশ্লেষণ করিয়া সেই বিরাট পুরুষের ব্যক্তিত্ব নির্দেশ করিতে যাওয়া আমাদের পক্ষে অসাধ্য। কিন্তু তাঁহার নয়নের ভঙ্গী ও ওষ্ঠের মৃদু হাসির অর্থ কেবল যাঁহারা তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশিবার সৌভাগ্য পাইয়াছেন তাঁহারাই বুঝিতে সক্ষম। ঈষৎ বিকচ নলিনীতুল্য নয়ন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন—"যোগীর মন সর্বদাই ঈশ্বরেতে থাকে সর্বদাই আত্মস্থ। চক্ষু ফ্যালফেলে, দেখলেই বোঝা যায় যেন পাখী ডিমে তা দিচ্ছে—সব মনটা সেই ডিমের দিকে, উপরে নাম মাত্র চেয়ে রয়েছে। কবির চক্ষু ফ্যালফেলে, উদাস, ভাববিহ্বল, আনন্দ বিস্ময়ের উপভোগে কতকটা অন্যমনস্ক।" ইহা সাধারণ কবির। অসাধারণ মানুষ রবীন্দ্রনাথের চক্ষু অন্যমনস্ক এবং একাগ্র দৃষ্টি আসন্নকে অতিক্রম করিয়া অবাস্তবের সন্ধানে যাইত, তাঁহার বাহ্যিক দৃষ্টিতে যাহার আভাস মাত্রও মিলিত না। কথোপকথন কালে তিনি নিজের মনোভাব যে ক্ষেত্রে অপরকে জানাইতে অনিচ্ছুক থাকিতেন, সে ক্ষেত্রে তিনি মৌনী থাকিতেন। কিন্তু যেমন আলোকচিত্রের সুগ্রাহী কাচখণ্ডের নিকট আলোকের কণামাত্রও নিজের অস্তিত্ব জানাইয়া যায়, সেইরূপ কবির অনন্যসাধারণ অনুভূতি চিরঅভ্যস্ত সংযমের আবরণ সত্ত্বেও প্রিয় হউক অপ্রিয় হউক তাঁহার চিত্তে কিঞ্চিন্মাত্র ভাববৈলক্ষণ্য আনিলে তাঁহার নয়নে বদনে তাহার সাক্ষ্য দিত। সাধারণের অলক্ষিত থাকিলেও, যে বুঝিত সেই জানিত।

কবিতারসমাধুর্য্যং কবির্বেত্তি ন তৎ কবিঃ।
ভবানীভ্রুকুটিভঙ্গীং ভবো বেত্তি না ভূধরঃ॥

ভাষাহীন নিষেধ, নিবারণ, অনুজ্ঞা, অভিযোগ, ক্ষোভ, অপ্রীতি তাঁহার নয়নকোণে ধরিতে কেবল অন্তরঙ্গরাই সক্ষম।

বাঙালীকে ধনে, মানে, জ্ঞানে, যশে, স্মরণে, বিজ্ঞানে, শিল্পে, সাহিত্যে উন্নত করিবার আকাঙ্ক্ষা রবীন্দ্রনাথ চিরদিন পোষণ করিতেন। বাঙালীকে চেনানো, বাঙলাদেশকে জানানো। একা রবীন্দ্রনাথ অসাধ্য সাধন করিয়াছেন। বাঙালী রবীন্দ্রনাথের পুস্তকাবলী আজ পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। তাঁহার কীর্ত্তি-কৌমুদীর বিস্তার, প্রাচীন কবির স্বস্তিবাচন সার্থক ভবিষ্যবাণী লইয়া আমাদের যুগের বরেণ্য সন্তানের মূর্তিমন্ত ললাটিকা—

কীর্ত্তিশ্চন্দ্রকরীন্দ্রকুন্দকুমুদক্ষীরোদনীরোপমা।
ত্রাসাদ্‌ যাতি দিগন্তরাণি ভবতো নাদ্যাপি বিশ্রাম্যতি॥

অর্থাৎ তোমার মুখমণ্ডলে দেবী সরস্বতী শুভ্রতার হ'ল আবির্ভাব। (তাই) দেখতে এসে চঞ্চলা লক্ষী তোমার গুণে হলেন আবদ্ধ। চন্দ্রকিরণ, কুন্দ, কুমুদ বা গজরাজ ঐরাবত এমন কি দুগ্ধ-সাগরের জলের মতো অমল ধবল তোমার কীর্তি, বাঁধা পড়ার ভয়ে, তোমার সান্নিধ্য হ'তে চললেন দূরে দূরান্তরে। অতিক্রান্ত হলেন সাগর, তবু আজো হ'ল না বিশ্রামের অবকাশ।

ইতালিতে, সুইডেনে, জার্মেনিতে, গ্রীসে, পারস্যে রবীন্দ্রনাথ রাজার অধিক সম্মান পাইয়াছেন। বাঙালী রবীন্দ্রনাথের পায়ে কিরীট-শোভিত মস্তক লুণ্ঠিত হইয়া প্রসাদ ভিক্ষা করিয়াছে। ইহা বাঙালীর গৌরব, বাঙলার গৌরব।

কিন্তু বাঙালী কবি নিজেকে বাঙালী বলিয়া গর্ব বোধ করিতেন যাহা তাঁহার দেশাত্মবোধক গানে ও নানা রচনায় মেলে। আর একটি ঘটনার উদাহরণও দিতেছি। একদা বিলাতযাত্রী রূপে কবি যখন জাহাজে যাইতেছিলেন, সেই জাহাজেরই অপর এক যাত্রী কবিকে অবাঙালী মনে করিয়া তাঁহার নিকট বাঙালীজাতি সম্বন্ধে ঘৃণাসূচক দু-একটি উক্তি করায় কবি তাহার উক্তি প্রত্যাহার করাইতে তাহাকে বাধ্য করেন ও বলেন—I have the honour to represent the Bengalee race which you hate most.

১৩২৮ বঙ্গাব্দের ১১ই ভাদ্র (১৯২১ খৃঃ) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে কবির ষষ্টিতম বর্ষপূর্তিতে দেশের লোক তাঁহার যে জন্মদিন সম্বর্ধনানুষ্ঠান করেন, সেই রবীন্দ্র-সম্বর্ধনা উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের প্রিয় শিষ্য, রবিমণ্ডলীভুক্ত বাঙলার প্রিয় কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (বোদাই) পঠিত স্বরচিত কবিতা 'নমস্কার' হইতে কয়েক পংক্তি পাঠক-পাঠিকাদের উপহার দিতেছি। যাহাতে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব, দেশপ্রেম, স্বজাতিপ্রীতি সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়—

ফটিক জলের তৃষ্ণা যে চাতক জাগাইল প্রাণে,
অমর করিল বঙ্গে মৃত্যুহারা মৃত্যুহরা তানে;
ছাতারে মুখর যুগে গাহিল যে চকোরের গান,
করিল যে, করা'ল যে, জনে জনে চন্দ্রসুধা পান;
ভাবের নিখরে যে বা বিথারিল রসের পাথার,—
নমস্কার! কবি নমস্কার!

প্রতিভা-প্রভায় যাঁর ছিন্ন-তমঃ অভিচার নিশি,
আবেদনে আস্থাহীন, 'আত্মশক্তি' মন্ত্র-দ্রষ্টা ঋষি
ভীরুতার চিরশত্রু, ভিক্ষুতার আজন্ম অরাতি,
শোণিত-নিষেক-পুষ্ট নৈষ্ঠুর্য্যের নিত্য পক্ষপাতী,
বঙ্গের মাথার মণি, ভারতের বৈজয়ন্ত হার,—
নমস্কার! তাঁরে নমস্কার!

রুদ্ধ-কণ্ঠ পাঞ্জাবের লাঞ্ছনার মৌনী-অমা রাতে
নির্ভয়ে দাঁড়াল একা বাণী যার পাঞ্চজন্য হাতে
ঘোষিল আত্মার জয় কামানের গর্জন ছাপায়ে
অতিচারী ফিরিঙ্গীর যাঁটা-পড়া কলিজা কাঁপিয়ে
তুচ্ছ করি রাজরোষ, উপরাজে দিল যে ধিক্কার,—
নমস্কার! তাঁরে নমস্কার!

স্বদেশে যে সর্বপূজ্য, বিদেশে যে রাজারও অধিক,
মুখরিত যার গানে সপ্তসিন্ধু আর দশদিক
বিশ্বকবি-ছত্রপতি, ছন্দরথী, নিত্য-বন্দনীয়,
বিত্তরে যে বিশ্বে বোধি, বিশ্ববোধিসত্ত্ব জগৎ প্রিয়,
নিত্য তারুণ্যের টীকা ভালে যার চিত্ত-চমৎকার,—
নমস্কার! তাঁরে নমস্কার!

চারি মহাদেশ যার ভক্ত, করে ভক্তি নিবেদন,
গুরু বলি শ্রদ্ধা সঁপে উদ্বোধিত আত্মা অগণন,
ভাবের ভুবনে যার চারি যুগে আসন অক্ষয়
যার দেহে মূর্তি ধরে ঋষিদের অমূর্ত অভয়,
অমৃতের সন্ধানী যে, ধ্যানী যে নির্দ্বন্দ্ব-সাধনার—
নমস্কার! নমস্কার! বারম্বার তাঁরে নমস্কার!

বিশ্ব-পথিক রবীন্দ্রনাথ যে প্রায় সারা বিশ্ব ভ্রমণ করিয়াছেন তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। প্রথম ভারতীয় যিনি ভারতের বাণী ও ধর্ম তথা হিন্দুধর্ম প্রচার করিতে বিশ্বভ্রমণ করেন, তিনি বিবেকানন্দ—যেমন সম্রাট অশোক ও হর্ষবর্ধনের সময়ে তাঁহারা বৌদ্ধধর্ম ও ভারতের সংযম, করুণা, মৈত্রী ও সংস্কৃতির বাণী প্রচারার্থে বিশ্বের নানা স্থানে প্রেরণ করেন প্রচারক। বিবেকানন্দের পর ভারতের সংস্কৃতির জীবন্ত প্রতীক রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভ্রমণে বাহির হন দেশের জ্ঞান মনীষার, সংস্কৃতির বাণী বিতরণার্থে আর তাঁহার বন্ধু জগদীশচন্দ্র বিশ্বভ্রমণে বাহির হন তাঁহার স্বদেশ ভারতকে বৃহত্তর বৈজ্ঞানিক জগতে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে। ইঁহার পর সংগীতশিল্পী দিলীপকুমার ও বিজ্ঞানাচার্য রামনও বিশ্বের নানা দেশ ভ্রমণ করিয়াছেন ও সদলে করিয়াছেন নৃত্যশিল্পী উদয়শংকর। উদয়শংকরের ও ডাঃ শ্রীকালিদাস নাগ, ডাঃ শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির পর পর অনেক ভারতবাসীই বিশ্বভ্রমণ করিতেছেন।

রবীন্দ্রনাথ যে যে দেশে ভ্রমণের আমন্ত্রণ পাইয়াছেন ও অল্প কয়েকটিতে যাইতে না পারায় বাকি যে সব দেশে ভ্রমণ করিয়াছেন ও তথাকার বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে বক্তৃতা দিয়াছেন সেই সব বিশ্ববিদ্যালয়গুলি হইল ভারতে কলিকাতা, ঢাকা, বারাণসী হিন্দু, হায়দরাবাদ, ওসমানিয়া, অন্ধ্র (আল্লাদি কৃষ্ণস্বামী বক্তা, ১৯৩৩), প্রভৃতি এবং বিদেশে অক্সফোর্ড (হিবার্ট বক্তা, ১৯২৭-৩০), বার্লিন

(১৯২১) মিউনিক (১৯২১) প্যারী, মিলান, ভিয়েন, জুৎরিক, ষ্টকহোম, অসলো, প্রাহা, কোপেনহেগেন, মাদ্রিদ, সোফিয়া, বুখারেষ্ট, বেলগ্রেড (১৯২৬) কায়রো, বুদাপেষ্ট, ড্রেসডেন, এ্যাথেন্স, আপসালা, আয়ারের ডার্লিংটন হল, ফ্র্যাংকফোর্ট (১৯৩১), ষ্ট্রাসবুর্গ (১৯২১) ফ্লোরেন্স (১৯২৬), ডিউবিন (১৯২৬), পিকিং (১৯২৪), ইলিনয় (১৯২১), টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয় (Fort Worth ১৯২২ আয়োয়া ষ্টেট ১৯১৭), শিকাগো (১৯১৩), ইয়েল (১৯১৬), হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় (Cambridge ১৯১০), মস্কো, ডোরপ্যাট, তেহেরাণ, প্রভৃতি এবং বিলাতের New Education Fellowship এর ১৯৩৫এ ভারতীয় কেন্দ্রে কবি সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। এই কেন্দ্র শান্তিনিকেতনে। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয় একজন বিদেশী রবীন্দ্রনাথকে সর্বপ্রথম তাঁহাদের রেক্টর পদ গ্রহণে আমন্ত্রণ করেন কিন্তু কবি শেষ জীবনে বিদেশে অবস্থিতি করিতে অনিচ্ছুক বিধায় উক্তপদ গ্রহণে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন।

কবি নানা সভায় ও অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করিয়াছেন। যাহাতে প্রমাণিত হইয়াছে যে তাঁহাকে সকলেই চায় ও তাঁহার সুচিন্তিত ভাষণ শুনিয়া নিজেদের জ্ঞানভাণ্ডারের সম্পদ বৃদ্ধি করিতে চায়। ইহার মধ্যে কয়েকটি বিশেষ বিশেষ সভা ও অনুষ্ঠানের তালিকা দিলাম :—

নিখিল ভারত দার্শনিক কংগ্রেস ১৯২৫, বঙ্গীয় প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্স, কলিকাতা ১৯১৭, রামমোহন শতবার্ষিকী ১৯৩৩, বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন, বারাণসী ১৯২৩, হিন্দী সাহিত্য সম্মেলন, ভরতপুর ১৯২৭, লখনউ সংগীত কন্‌ফারেন্স ১৯২৬ (কবি অতুলপ্রসাদ সেনের গৃহে অবস্থিতি), নিখিল ভারত ছাত্র কন্‌ফারেন্স, লাহোর ১৯৩৫, বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন, ভবানীপুর, কলিকাতা ১৯৩০ (অনুপস্থিত), প্রবর্তক সংঘ মন্দির প্রতিষ্ঠা, চন্দননগর ১৯২৮ (কবি যে সর্বসাধারণের সর্বশ্রেণীর সহিত একাত্ম ছিলেন এই উপলক্ষে তোলা ছবিতে তাহা দ্রষ্টব্য), বৃহত্তম ভারত পরিষদ, অভয় আশ্রম তৃতীয় বার্ষিকী ১৯২৬, হিজলী হত্যাকাণ্ড প্রতিবাদ সভা ১৯৩১, সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা প্রতিবাদ সভা, কলিকাতা টাউন হল ১৯৩৬ (কবি অসুস্থ অবস্থাতেও চিকিৎসক সমভিব্যাহারে উপস্থিত হইয়া সভাপতিত্ব করেন), ব্রাহ্মসমাজ শতবার্ষিকী ১৯২৪, গুজরাট সাহিত্য কনফারেন্স, আমেদাবাদ ১৯২০, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র সপ্ততিতম জয়ন্তী ১৯৩২। রবীন্দ্র জয়ন্তী।

১৯৩১ সালের যে মাসে রবীন্দ্রনাথের ৭০ বৎসর পূর্ণ হয়; সেই উপলক্ষে শান্তিনিকেতনে বিশ্বকবির জন্মোৎসবের প্রথম অনুষ্ঠান হয়। ভাদ্রমাসের কৃষ্ণা অষ্টমী তিথিতে জয়ন্তী যোগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হওয়ায় জন্মাষ্টমীকে 'শ্রীকৃষ্ণ জয়ন্তী' বলা হইত। জয়ন্তী যোগ ও অষ্টমী তিথি না পাইলেও জন্মতিথি উপলক্ষে বিশেষ মানবজের জন্মোৎসবের এই সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। সেই দৃষ্টান্তে এবার কবিগুরুর জন্মোৎসবের নাম দেওয়া হয় রবীন্দ্র জয়ন্তী। কলিকাতায় এই উৎসবকে 'রবীন্দ্র জয়ন্তী' বলিয়া প্রচার করা হয়। এই উৎসব উপলক্ষে কলিকাতা হইতে বহু রবীন্দ্র-ভক্তের শান্তিনিকেতনে সমাগম হয়। সেখানে প্রাতঃকালে আম্রকুঞ্জে যে অনুষ্ঠান হয় তাহাতে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী স্বরচিত কবিতায় কবিকে অভিনন্দিত করেন এবং অথর্ব বেদ হইতে সংগৃহীত মন্ত্রের দ্বারা কবি-আবাহন, কবিকে অর্ঘ্যদান ও কবির স্বস্তিবাচন হয় এবং মধ্যে মধ্যে কবির রচিত দু'চারিটি গান গীত হয়। চীনদেশের চারি জন ভদ্রলোক ও একজন মহিলা কবির জন্য উপহার আনিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে যিনি কবি তিনি স্বরচিত চীনভাষায় কবিতা সুর করিয়া পড়িয়া কবিকে উপহার দেন। বৃক্ষরোপণ ও প্রপা (জলসত্র) উৎসর্গ করিবার পরে রবীন্দ্রনাথ একটি বক্তৃতা করেন ও স্বরচিত নূতন কবিতা পাঠ করেন। 'আমাদের শান্তিনিকেতন' গানটি গাওয়া হয়, পরে জলযোগান্তে এই অনুষ্ঠান সমাধা হয়। এই উপলক্ষে কবির যে বাণী প্রচার হইয়াছে তাহা হইতে আমরা নিম্নে কিছু উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

"অস্বাভাবিক প্রতিযোগিতা ও শোষণসম্ভূত আমাদের এই বর্তমান দুঃখকষ্ট যাহাতে প্রশমিত করিতে পারা যায়, সেইরূপে জাতিসমূহকে পরস্পরের মিলনমূলক সহযোগিতায় জন্য সচেষ্ট হইতে হইবে। * * * ভাগ্যনিয়ন্ত্রণের বর্তমান সংগ্রামে ভারতকে বিস্মৃত হইলে চলিবে না। বিশ্বমানবের স্বাধীনতার সহিত ভারতবাসীর স্বাধীনতা চিরসম্বন্ধসূত্রে জড়িত। বিশ্বমানবের স্বাধীনতার অর্থ তাহাদের প্রত্যেকের অভ্যুদয়।"

এই উপলক্ষে বিশ্বভারতীর গ্রন্থাগারিক শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় একখানি পুস্তিকা "রবীন্দ্রবর্ষপঞ্জী" বা কবির জীবনের সত্তর বৎসরের প্রধান প্রধান ঘটনা ও অপরটি "রবীন্দ্রগ্রন্থপঞ্জী" যাহাতে কবির সকল গ্রন্থের কালানুক্রমিক তালিকা দেওয়া হয়, প্রকাশিত করিয়া উপস্থিত লোকদিগকে বিতরণ করেন। পরে ইহা বিক্রয়ের ব্যবস্থা হয়। এই পুস্তিকায় যে সকল ভুল আছে তাহা শ্রীযুক্ত প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ ১৩৩৯ সালের বৈশাখ ও আষাঢ় মাসের 'বিচিত্রা' পত্রিকায় দুইটি প্রবন্ধে সংশোধন করিয়াছেন। ঐ পুস্তিকা ও প্রবন্ধ হইতে কোনো সংবাদ ও তারিখ এই প্রবন্ধে গৃহীত হইয়াছে, তজ্জন্য আমরা প্রভাতকুমার ও প্রশান্তচন্দ্রের নিকট কৃতজ্ঞ। শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের সপ্ততিতম জয়ন্তী যখন অনুষ্ঠিত হয় তখন ঐ ২৫এ বৈশাখ তারিখেই কলিকাতা ও বাঙলার নানাস্থানে এবং বাঙলার বাহিরে ভারতের কয়েকটি প্রদেশের অনেক সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠানে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে কবির জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয় এবং বিভিন্ন দিক হইতে রবীন্দ্র সাহিত্যেরও কোথাও কোথাও তাঁহার জীবনের আলোচনা হয়। এই উপলক্ষে কলিকাতা বাগবাজারে নন্দী দত্ত লেনে 'রামকৃষ্ণ সংঘ' শ্যামবাজারে এ, ভি, স্কুল হলে একটি উৎসব সভার আয়োজন করেন। ১৩৩৮ সালের ২রা জ্যৈষ্ঠ আচার্য জগদীশচন্দ্র, রসায়নাচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, বিপিনচন্দ্র পাল, দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন, দেশগৌরব সুভাষচন্দ্র, জনপ্রিয় শ্যামাপ্রসাদ প্রমুখ কলিকাতার ৭৭ জন গণ্যমান্য ব্যক্তি সমগ্র দেশবাসীর পক্ষ হইতে কলিকাতায় কবির যথোচিত সম্বর্দ্ধনা এবং তাহার আনুষঙ্গিক উৎসব অনুষ্ঠানাদির ব্যবস্থা করিবার জন্য কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউটে পরামর্শের জন্য একটি সাধারণ জনসভা আহ্বান করেন। মহামহোপাধ্যায় ডাঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সভাপতির ভাষণে বলেন— বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে নবযুগের উদীয়মান শক্তিরূপে আশীর্বাদ বর্ষণ করিয়াছিলেন যাহা রবীন্দ্রনাথের উপর গভীর ফলপ্রসূ হইয়া বং

তাঁহার আবির্ভাব একটি যুগদৃশ্যের অবতারণা করিয়াছিল। শ্রীমান্ রবীন্দ্রনাথের খ্যাতি জগদ্ব্যাপী। আমি বয়সে কবির অপেক্ষা কয়েক বৎসরের বড়। রবীন্দ্রনাথ আজো ক্রমশঃ ঊর্দ্ধলোকে আরোহণ করিতেছেন। ৩০ বৎসরের মধ্যে তাঁহার খ্যাতি কেবল চীন হইতে পেরুতে বিস্তৃতিলাভ করে নাই, টেরাডেল ফুগো হইতে আলাস্কা এবং কামাস্কাটকা হইতে উত্তমাশা অন্তরীপ পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তিনি ঊর্দ্ধ হইতে ঊর্দ্ধলোকে আরোহণ করিয়া ঊর্দ্ধতমলোকে আরোহণ করিয়াছেন এবং সেই জগতের সমস্ত রহস্য কবির নিকট উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে।

সাহিত্য-জগতের এমন কোনো বিভাগই নাই যেখানে রবীন্দ্রনাথ প্রবেশ করেন নাই, কিন্তু গীতিকাব্য জগতে তিনি যে সাফল্য অর্জন করিয়াছেন তাহা অপরিমেয়। তাঁহার রচনাবলী জীবন্ত। তিনি প্রাচীন কবিদিগকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়াছেন। তাঁহার ব্যাকরণ জ্ঞান ও শব্দবিজ্ঞান আমাদের অধিকাংশকেই ছাড়াইয়া গিয়াছে। তিনি একাধারে বংশমর্যাদা, আশ্চর্য নিপুণতা এবং উচ্চশ্রেণীর মানবিক ক্ষমতা ও সৌন্দর্যের অধিকারী হইয়াছেন। যে জীবন তিনি বাছিয়া লইয়াছেন তাহা যেন প্রকৃতিই তাঁহাকে দান করিয়াছেন, এবং যে ব্রত তিনি গ্রহণ করিয়াছেন তাহা তিনি শৈশব হইতেই প্রকৃতির শিক্ষা ও সাহায্যের মধ্যে পাইয়াছেন। তিনি কেবল তাঁহার নিজের জন্যই খ্যাতি অর্জন করেন নাই, তাঁহার নিজ দেশ ও নিজ জাতির যশও তিনি অর্জন করিয়াছেন। হাজার বৎসর পূর্বে রাজশেখর আদর্শ কবির যে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহার প্রতি সর্বোৎকৃষ্ট পুরস্কার দেওয়া হইবে। (কাব্যমীমাংসা)।

রবীন্দ্রনাথ সেই আদর্শ-জীবন যাপন করিয়াছেন। তিনি তাহার পুরস্কার লাভ করিয়াছেন, সমস্ত জগৎ তাঁহাকে সম্মান করিয়াছে। বিশ্বের নানা দেশের নৃপতি ও রাষ্ট্রপতিবৃন্দ তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনা দিয়াছেন, ক্যানাডা ছাড়া তিনি যেখানেই গিয়াছেন, সেইখানেই জনমণ্ডলী তাঁহার কথা শুনিবার জন্য, তাঁহাকে সম্মান করিবার জন্য তাঁহাকে ঘিরিয়া ধরিয়াছে। ক্যানাডা সরকার ভারতকে পরাধীন বলিয়া অবজ্ঞা করায় জাহাজ হইতে তথাকার মাটিতে দেশপ্রেমিক কবি অবতরণ করেন নাই। বহুদূরের স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া তাঁহাকে পুরস্কার দিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার দেশবাসী তাঁহার জন্য কী করিয়াছেন? তাঁহারা ব্যগ্রভাবে কবির গ্রন্থাবলী পাঠ করিয়াছেন এবং তাঁহার গ্রন্থপাঠে যতদূর উপকার হইতে পারে তাহা লাভ করিয়াছেন; কিন্তু দেশবাসী সেই উপকারের কী প্রতিদান দিয়াছেন? আমরা যদি তাঁহার প্রতিভাপ্রসূত দানসমূহকে গ্রহণ ও উপলব্ধি করি, তাহাতেই তাঁহার প্রতি সর্বোৎকৃষ্ট পুরস্কার দেওয়া হইবে।

অতঃপর বিপিনচন্দ্র শ্রদ্ধাঞ্জলি দিলে সভার প্রস্তাবাদি আনয়ন করা হয়। সভার প্রথম প্রস্তাব :—কবি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বয়ঃক্রম সপ্ততিতম বর্ষ পূর্ণ হওয়ায় এই সভা তাঁহাকে সশ্রদ্ধ সম্ভাষণ ও সানন্দ অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছে। প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই প্রস্তাব উপস্থিত করেন ও তাঁহার বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন—এই উপলক্ষে লোকের স্মরণ রাখ উচিত যে, গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁহার শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনের ঘনিষ্ঠ সংযোগ। সুতরাং বিশ্বকবির সপ্ততিতম জন্ম বার্ষিকী উৎসবে এই দুইটি প্রতিষ্ঠানের প্রতি যাহাতে যোগ সমাদর করা হয় তাহা সকলেরই দেখা উচিত।

অতঃপর আচার্য স্যার জগদীশচন্দ্র বসুকে সভাপতি করি ১৯৩১ সালের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতা টাউন হলে রবীন্দ্রজয় ও প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। টাউন হলের সম্মুখ দিকে নবনির্মি কাউন্সিল ভবন পর্যন্ত রাজপথটি ঘিরিয়া ফেলিয়া মঞ্চ ও তোরণা নির্মিত হয়। এইখানে ও টাউন হলে সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠানা হয়। কলিকাতা পৌরসভার পক্ষে তদানীন্তন পৌরপাল ডা বিধানচন্দ্র রায়, বিশ্বভারতীর পক্ষে বিধুশেখর শাস্ত্রী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পক্ষে তদানীন্তন সভাপতি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র প্রভৃ এবং ভারতের ও বিশ্বের নানাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিবৃ কবিকে শ্রদ্ধাভিনন্দন জানাইলে কবি প্রতিভাষণে বলেন—বিপু জনসংঘের বাণী সংগমে আমি আজ স্তব্ধ। এখানে নানা কণ্ঠে নানা আহ্বান—এ যে আমারই উদ্দেশে রচিত, এ কথা আমার ম সম্যকরূপে গ্রহণ করিতে অক্ষম। সূর্যের আলোক বায়ুবিকী ধূলিরাশির মধ্য দিয়া ধরণীতে পরিব্যাপ্ত। কখনো বা (বাধাবিরোধের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত, কখনো বা সে বাধাহীন আকা সমুজ্জ্বল। আমার জীবনও বাধাবিরোধের প্রভূত নিষ্ঠুর দা হইতে বঞ্চিত হয় নাই। তাই আমার পক্ষে শুক্ল ও কৃ উভয় পক্ষের তিথিকেই প্রণাম করা সম্ভব হইল। দেশমাতা প্রাঙ্গণে গান গাহিয়াই আমার আজীবন কণ্ঠসাধনা। য মনে হইত উদাসীন তিনি, তখনো অলক্ষ্যে তিনি আম শ্রদ্ধাঞ্জলি, আমার সাধনা, আমার নৈবেদ্য গ্রহণ করিতেছিলেন * * * আজ আমার জীবন-সায়াহ্নে আমার দেশবাসীর নিকট হই তাঁহাদের প্রদত্ত সম্মান আমি সবিনয়ে গ্রহণ করিতেছি ও তাঁহাদে আমার সকৃতজ্ঞ চিত্তের শেষ নমস্কার জানাইয়া যাইতেছি। [ক্রমশ

"But in his present state of unspeakable barbarism, man is unable to distinguish his own spontaneous integrity from his mechanical lusts and aspirations. Hence there must still be laws and governments. But laws and governments henceforth, we see it clearly and we must not forget it, relate only to the material world : to property, the possession of property and the means of life, and to the material-mechanical nature of man."

—*D. H. Lawrence.*

মীর মশাররফ হোসেন

(১৮৪৮—১৯১১)

আশ্‌রাফ সিদ্দিকী

১

পূর্বপুরুষ

বাংলা সাহিত্যের একনিষ্ঠ সাধক মীর মশাররফ হোসেনের পূর্বপুরুষ সৈয়দ সাহুল্লা দীর্ঘকাল পূর্বে দিল্লী থেকে রওয়ানা হয়ে বাংলা দেশ ভ্রমণে আসেন। তাঁর বংশধরদের নিকট থেকে জানা যায়, বাগদাদ নগরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং শেষ মুঘল সম্রাটের তিনি ছিলেন প্রধান সেনাপতি অথবা Commander in Chief ফরিদপুর জেলার বর্তমান বালিয়াকান্দি ষ্টেশনের অনতিদূরে তিনি পদব্রজে হাঁটতে হাঁটতে উপস্থিত হন এবং পরিশেষে এই অঞ্চলেরই পদমদী গ্রামে তিনি স্থায়ী ভাবে বসবাস করতে থাকেন। সৈয়দ সাহুল্লার ভিটা উক্ত পদমদী গ্রামে অদ্যাপি বর্তমান আছে। সৈয়দ সাহুল্লার ছয় ছেলে জন্মগ্রহণ করে। বড় ছেলের নাম ছিল মীর উমর দরাজ। মীর পদবী সম্ভবতঃ তদানীন্তন কালের কোন মুসলিম অধিপতি দিয়ে থাকবেন। কোন মুসলিম নওয়াব অথবা সম্রাট মীর উমর দরাজের শক্তিমত্তা অথবা গুণপনার জন্য দিয়েছিল তা' অবশ্য জানা যায় না। সৈয়দ সাহুল্লা নিজ সন্তানদিগকে আরবী ও পারসী সাহিত্যে সুপণ্ডিত করে যান। পিতার মৃত্যুর পর উক্ত অঞ্চলে পারসী ও আরবী সাহিত্যে এবং ইসলাম ধর্মের বিধি ও বিধানে তাঁরা খুবই সম্মানীয় স্থানের অধিকারী ছিলেন। সৈয়দ সাহুল্লার বংশ-শাখা :—

সৈয়দ সাহুল্লা
|
মীর উমর দরাজ
|
মীর এব্‌রাহিম হোসেন
|
মীর মুয়াজ্জম হোসেন
|
মীর মশাররফ হোসেন, মীর মুহতেশাম হোসেন (Bar at Law), মীর মুকাররম হোসেন ও এক কন্যা।

২

জীবন ও সাহিত্য

সাহিত্যের সঙ্গে জীবনের যোগ থাকবেই। মীর সাহেবের জীবনের টুকরো অংশগুলির সঙ্গে তাঁর জীবনকে মিলিয়ে দেখতে হবে। পিতা মীর মুয়াজ্জম হোসেন বেশ অবস্থাপন্ন ও সম্ভ্রান্ত লোক ছিলেন। তিনি আরবী পারসী এবং ইংরেজীতেও কিছুটা দক্ষ ছিলেন। পুঁথি পড়া এবং পুঁথি সাহিত্য থেকে তাঁর রসাস্বাদনের খবরও পাওয়া যায়। 'বিষাদসিন্ধু'র ঐতিহাসিক পটভূমি মীর মশাররফ বাল্যেই হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন। ১১৫৪ অব্দে কুষ্টিয়ার লাহিনী পাড়ায় তাঁর জন্ম হয়। বাড়ীর নিকটেই কুমারখালী। সাহিত্য-শিল্প-সংগীত-নাটক প্রভৃতির তুমুল চর্চা চলছে তখন কুমারখালী গ্রামে (শ্রীযুক্ত জলধর সেনের 'কাঙাল হরিনাথ' দ্রষ্টব্য)। বালক মশাররফ তা' থেকে নানা রসাস্বাদন নিশ্চয়ই করেছিলেন এবং পরবর্তী সময়ে যুগপুরুষ কাঙাল হরিনাথের সঙ্গে যে তাঁর ঐকান্তিক যোগাযোগ সাধিত হয়েছিল সে খবরও জলধর বাবু স্পষ্ট ভাষায় লিখে গেছেন। এক দিকে মুসলমান ইতিহাস সম্বলিত পুঁথি সাহিত্য আরবী ফারসী গ্রন্থ প্রভৃতি অন্য দিকে সমৃদ্ধ হিন্দু সাহিত্য—এই দুইই তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে পেলেন। বাল্যে স্থানীয় জগমোহন নন্দীর পাঠশালাতেই তাঁর শিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছিল। জানতে পারা যায়, উক্ত জগমোহন নন্দী সংস্কৃত সাহিত্যে বিশেষ ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন ছিলেন, নাট্যকার ছিলেন ও নাটকে অভিনয়ও করতেন। এ হেন নাট্যকারের ছাত্রগণ যে কিছুটা নাট্যরস-অভিজ্ঞ হবেন—অন্ততঃ কাঁচা মনের উপর নাটকের মাদকতারস বিস্তারিত হ'বে—এটি ধরে নে'য়া যায়। পরবর্তী যুগে মীর সাহেবের 'বসন্তকুমারী' 'বেহুলা গীতাভিনয়', 'জমিদারদর্পণ' নাটকে সংস্কৃত পদ্ধতি অবলম্বন লক্ষ্যণীয়।

জগমোহন নন্দীর পাঠশালা থেকে পিতা মুয়াজ্জম হোসেন সাহেবের নির্দেশে অতঃপর বালক মশাররফ কৃষ্ণনগর স্কুলে ৫ম শ্রেণীতে ভর্তি হন। কুমারখালীতে স্কুল থাকতে তাঁকে কৃষ্ণনগর পাঠানো হ'ল এর কারণ এ-ও হ'তে পারে যে, গ্রামের যাত্রা পাঁচালী নাটুকেদের দলে মিশে না রসাতলে যান! কৃষ্ণনগর থেকে সঙ্গীদের সঙ্গে তিনি কলিকাতা যান এবং চেতলায় (কলিকাতা) নাদির হোসেন নামে পিতার এক বাল্যবন্ধুর বাসায় আতিথ্য গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন আলীপুরের আমিন। তাঁর একান্ত আগ্রহে তিনি অতঃপর কলিকাতাতেই পড়াশোনা করতে থাকেন। কিছুদিন পর নাদির হোসেন সাহেবের রূপবতী প্রথমা কন্যা লতিফুন্নেসার সঙ্গে তাঁর বিবাহ সম্বন্ধ ঠিক হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে শুভদৃষ্টির সময় দেখা গেল, বিবাহ হয়েছে নাদির হোসেন সাহেবের দ্বিতীয়া কন্যা আজিজুন্নেসার সঙ্গে। ১৮৬৫ অব্দের ১৯শে মে এই বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হয়। আজিজুন্নেসা কুরূপা ছিলেন—মুখরাও ছিলেন। পৃথিবী যে কত ছলনায় পূর্ণ তা মীর সাহেব সংসার প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই টের পেলেন। হয়তো লতিফুন্নেসার সঙ্গে বিবাহ হলে তাঁর জীবন অন্য দিকে প্রবাহিত হ'ত—বাংলা সাহিত্যও নানা দিকে লাভবান হ'ত। ইংরেজের নতুন সৃষ্ট শহর কলিকাতা—বাইরে এর নানা জৌলুস কিন্তু ভিতরে পাপের পঙ্কলীলা। 'আমার জীবনীতে' আছে এর কিছুদিন পরই তিনি এক এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেম বিবাহ করেছিলেন। একি শুধু জেদ বজায় রাখার জন্যই না জীবনে বিতৃষ্ণ হয়ে কে বলবে? পরবর্তী কালে নাটকীয় ভাবে বিবি কুলসুমের সঙ্গে তার বিবাহ হয় (সাহিত্য সাধক চরিতমালা—ব্রজেন বন্দ্যোপাধ্যায় দ্রষ্টব্য)—সুখের বিষয়, এ বিবাহ অত্যন্ত সুখের হয়—মীর সাহেব যেন আবার নতুন জীবন এবং নতুন উদ্যম ফিরে পেলেন—পূর্ণরূপে নিজেকে সাহিত্য সাধনায় নিয়োগ করলেন। 'বিবি কুলসুম' গ্রন্থের পত্রে পত্রে এর প্রমাণ মিলবে।

৩

রচনাবলী

ঊনবিংশ শতকের মুসলিম সাহিত্যিকগণ নয় শুধু বস্তুতঃ সমগ্র হিন্দু-মুসলিম সাহিত্যিকগণের মধ্যে মীর সাহেবের দান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। আলোচ্য সূত্রে তাঁর সাহিত্য-প্রতিভার

।রিমাণ করতে গিয়ে ব্রজেন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'সাহিত্যসাধক-রিতমালায়' শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করেছেন: "একদিকে বিদ্যাসাগরের যে স্থান—অন্য দিকে 'বিষাদসিন্ধু' প্রণেতা মীর মশার্‌রফ হোসেনের স্থান ঠিক অনুরূপ।—বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'সীতার বনবাস' বাংলাদেশের ঘরে ঘরে যেমন পঠিত হইয়াছিল 'বিষাদসিন্ধু' তেমনই আজ পর্য্যন্ত জাতীয় মহাকাব্যরূপে বাঙালী মুসলমানের ঘরে ঘরে পঠিত হয়। বাংলা সাহিত্যের অপূর্ব সম্পদ হিসাবে সকল সমাজেই এই গদ্যকাব্যখানির সমান আদর।—"

সম্ভবতঃ ব্রজেন বাবু মীর সাহেবের সবগুলি পুস্তক হাতের কাছে পাননি। যে কয়েকটি পেয়েছিলেন তাই নিয়েই বত্রিশ পৃষ্ঠার একটি আলোচনা-পুস্তক লিখে সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশ করেছেন। ব্রজেন বাবু সাহিত্যসাধকচরিতমালায় লেখকের ২৫টি পুস্তকের নাম দিয়েছেন। পুস্তকগুলি যথাক্রমে:

১। রত্নবতী (উপন্যাস)—১৮৬৯ অব্দ, ২। বসন্তকুমারী নাটক) ১৮৭৩ অব্দ, ৩। জমিদারদর্পণ (নাটক) ১৮৭৩; ৪। গোরাই ব্রীজ বা গৌরী সেতু (কবিতা, ১৮৭৩; ৫। এর উপায় কি (প্রহসন) ১৮৭৬; ৬। বিষাদসিন্ধু (ঐতিহাসিক উপন্যাস) তিন খণ্ড ১৮৮৫—১৮৯১; ৭। সঙ্গীতলহরী (গান) ১৮৮৭; ৮। গোজীবন (প্রবন্ধ) ১৮৮৮; ৯। বেহুলা গীতাভিনয়) ১৮৮৯; ১০। উদাসীন পথিকের মনের কথা উপন্যাস) ১৮৯০; ১১। গাজী মিয়ার বস্তানী (রস রচনা) ১৮৯৯; ১২। মৌলুদ শরীফ (গদ্যপদ্য) ১৩০৭ সাল; ১৩। মুসলমানের বাংলা শিক্ষা (১ম ভাগ ২য় ভাগ) ১৯০৩ ও ১৯০৮; ১৪। বিবি খোদেজার বিবাহ (কবিতা) ১৯০৫; ১৫। হজরত ওমরের ধর্মজীবন লাভ (কবিতা) ১৯০৫; ১৬। হজরত বেলালের জীবনী (কবিতা); ১৭। হজরত আমীর হামজার ধর্মজীবন লাভ (কবিতা) ১৯০৫; ১৮। মদিনার গৌরব (প্রবন্ধ) ১৯০৬; ১৯। মোস্লেম বীরত্ব (প্রবন্ধ) ১৯০৭; ২০। এসলামের জয় (প্রবন্ধ) ১৯০৮; ২১। আমার জীবনী (প্রবন্ধ) ১৯০৮-১০; ২২। বাজীমাত (কবিতা) ১৩১৫ সাল; ২৩। হজরত ইউসোফ (প্রবন্ধ) ১৩১৫ সাল; ২৪। খোদেবা ইছল ফেতর (কবিতা) ১৩১৬ সাল; ২৫। বিবি কুলসম (জীবনী) ১৩১৬ সাল।

এ ছাড়া ১৮৯৯ অব্দে প্রকাশিত গাজী মিয়ার বস্তানীর শেষ পৃষ্ঠায় বিজ্ঞাপন বিভাগে—১। ভাই ভাই এইত চাই, ২। ফাঁস কাগজ, ৩। একি, ৪। টালা অভিনয়, ৫। পঞ্চনারী, ৬। প্রেম পারিজাত, ৭। রাজিয়া খাতুন, ৮। তহমিনা (উপন্যাস), ৯। বাঁধা খাতা, ১০। নিয়তি কি অবনতি, মোট এই দশটি গ্রন্থের প্রকাশ সংবাদ আছে। টালা অভিনয় নাটকটি অধুনালুপ্ত 'হাফেজ' পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়েছিল। এ ছাড়া মাসিক নবনূর পত্রিকা ৩য় বর্ষ ১৩১২ সাল এবং ইসমাইল হোসেন সিরাজীর 'তারাবাঈ' উপন্যাসের বিজ্ঞাপন বিভাগে যথাক্রমে মীর সাহেবের 'গাজীমিয়ার গুলি' নামক আরও একটি গ্রন্থের প্রকাশ সংবাদ ও বিজ্ঞপ্তি এবং মূল্য দেওয়া আছে। লেখকের বংশধরদের নিকট 'হাউমুক জুলেখা' নামক একটি অপ্রকাশিত পুস্তকের সুবৃহৎ পাণ্ডুলিপি অদ্যাপি রক্ষিত আছে। তাহ'লে মীর সাহেবের রচিত পুস্তকের সংখ্যা ৩৭-৩৮এ গিয়ে দাঁড়ায়।

৪

মীর মশার্‌রফ হোসেন কাঙাল হরিনাথ ও যুগ-আন্দোলন

লাহিনীপাড়ার নিকটবর্তী কুমারখালীতেই গ্রামবার্তা সম্পাদক বিখ্যাত যুগপুরুষ হরিনাথ মজুমদার ওরফে কাঙাল হরিনাথ জন্মগ্রহণ করেন। মীর সাহেব তাঁর আত্মচরিত আমার জীবনীতে লিখেছেন—"গ্রামবার্তা সম্পাদক হরিনাথ মজুমদার মহাশয় আমাকে কনিষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় স্নেহ করিতেন। সপ্তাহে সপ্তাহে 'গ্রামবার্তায়' সংবাদ লিখিতাম···তিনি কাটিয়া-ছাঁটিয়া নিজ কাগজে প্রকাশ করিতেন···(আমার জীবনী ৩৩৬—৩৩৭), 'আমার জীবনী' পাঠে জানা যায়, তিনি 'সংবাদপ্রভাকরে'ও প্রবন্ধ লিখতেন এবং 'সংবাদ-প্রভাকরের' কুষ্টিয়ার সংবাদদাতা ছিলেন। কাজেই ধারণা করা যায়, দেশের তদানীন্তন সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন সম্বন্ধে তিনি বেশ ওয়াকেবহাল ছিলেন। ১৮৬৯ থেকে ১৮৭৩ অব্দের মধ্যেই তাঁর রত্নবতী (উপন্যাস) 'গৌরীসেতু' (কাব্য) 'বসন্তকুমারী' ও 'জমিদার-দর্পণ' (নাটক) প্রভৃতি গ্রন্থ প্রকাশ লাভ করে। ১৮৭৪ অব্দে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গ-দর্শন' বের হবার মাত্র দুই বৎসর পর থেকেই তিনি 'আজিজন নেহার' মাসিক পত্রিকাটি (মুসলিম সম্পাদিত প্রথম মাসিক) যোগ্যতার সঙ্গে সম্পাদনা করতে থাকেন। কাঙাল হরিনাথ মীর সাহেব থেকে ১৪ বৎসরের বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। দরিদ্রগত-প্রাণ কাঙাল কুমারখালিতে নৈশবিদ্যালয় পাঠাগার প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করে—নানা সাময়িক পত্র পত্রিকার পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা করে চারিদিকে একটি সুস্থ সাহিত্য আবহাওয়া সৃষ্টি করলেন—মীর সাহেব এ সুযোগ পরিপূর্ণ ভাবে গ্রহণ করতে পেলেন। মানসী পত্রিকায় কাঙাল হরিনাথের উপর শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চৌধুরী কবিতা লিখেছিলেন—

"যখন বঙ্গের গ্রামে দীন প্রজাগণ
উৎপীড়ন অত্যাচার নীরবে সহিত;
না জানিত রাজদ্বারে করিতে রোদন
নিজের অভাব নিজে বুঝিতে নারিত;
সে সময়ে হরিনাথ বীরের মতন
অনন্তসহায় ঘোর যুদ্ধে দাঁড়াইলা
জীবনের দীর্ঘকাল একাকী যুঝিলা
* * *
হরিনাথ গ্রামবার্ত্তা নিদর্শন তার।"

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দৌলতে ধীরে ধীরে 'বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল রাজদণ্ডরূপে।' শোষক ও শোষিত—জমিদার ও প্রজা এই দুই শ্রেণীর সৃষ্টি হ'ল দেশে। এক দিকে নীলকর সাহেবগণ অন্য দিকে জমিদার—তাদের অত্যাচারে সমগ্র পল্লী জর্জরিত হ'য়ে উঠল—চতুর্দিকে বিদ্রোহের বহ্নিশিখা জলে উঠল। দীনবন্ধু ১৮৬৮ অব্দে তাঁর 'নীলদর্পণ' নাটকে এর মর্মান্তিক চিত্র আঁকলেন। 'হিন্দু পেট্রিয়ট' 'সংবাদ প্রভাকর' প্রভৃতিতে এ সব বিদ্রোহের ঘটনা ও খবর যত্নের সঙ্গে প্রকাশিত হ'তে লাগল। হরিনাথের গ্রামবার্ত্তা (১ম প্রকাশ ১৮৭০ অব্দ) ও মীর সাহেব এবং অন্যান্য [illegible]

করতে শুরু করল। মীর মশাররফ হোসেনের 'জমিদারদর্পণ' নাটকের পটভূমি ইহাই। উৎসর্গপত্রে লেখক বলছেন :···"নিরপেক্ষ ভাবে আপন মুখ দর্পণে দেখিলে যেমন ভালোমন্দ বিচার করা যায় পরের মুখে তত ভালো হয় না। জমিদার-বংশে আমার জন্ম, সুতরাং জমিদারদিগের ছবি অঙ্কিত করিতে বিশেষ আয়াস আবশ্যক করে না। সেই বিবেচনায় জমিদারদর্পণ সম্মুখে ধারণ করিতেছি—যদি ইচ্ছা হয় মুখ দেখিয়া ভাল-মন্দ বিচার করিবেন।" "রাজপ্রতিনিধিরূপী মধ্যবর্তী সম" জমিদারগণ যে কি বস্তু তা' বোঝাতে গিয়ে সূত্রধার বলছে : "মফঃস্বলে একরূপ জানোয়ার আছে জানেন? শহরে তাদের কেউ চেনে না—আপন আপন বনে গিয়েই একেবারে বাঘ—এ জানোয়ারদের চারখানা পাও নাই, লেজ নাই—এরা খাসা পোষাক পরে দিব্বি সরু চেলের ভাত খায়—সাড়ে তিন হাত পুরু গদীতে বসে—খোসামুদে কুকুররাও গদীর আশে-পাশে লেজ গুড়িয়ে বসে থাকে—নাটকে যে নক্সাটি এঁকেছে তার কিছুই সাজানো নয়, অবিকল ছবি তুলেছে।"

এই সময়ের যে সাধারণ যুগচিন্তা তাহল, আমাদেরও ইতিহাস আছে—সংস্কৃতি আছে। রামমোহন রায় প্রভৃতির কথা—নতুন সভ্যতা ও বিজ্ঞানে ইংরেজ আমাদের উন্নত করবে। একদলের বাণী—আমরা এখন জেগেছি—ইংরেজ এ দেশ না। ছাড়লে দেশের উন্নতি নাই। অপর দলের বক্তব্য—ভারতের উন্নতি ইংরেজের সহায়তাতেই সম্ভব। তাই সুশাসক রিপণ সস্ত্রীক স্বদেশ যাত্রাকালে পোড়াদহ ফিকিরচাঁদের বাউলের দল দ্বারা তুমুল সম্বর্ধনা পাচ্ছেন—

"ভিক্টোরিয়া মাতা যখন জিজ্ঞাসিবে ব'ল তখন
(কেবল নাম রয়েছে সোনার ভারত সকল হারায়েছে।)
দুর্ভিক্ষ প্রতি বছরে অন্ন বিনা প্রজা মরে—
রাজরাজেশ্বরী হ'য়ে থাকুন মাতা ভিক্টোরিয়া
এ অত্যাচার দয়া করে করুন নিবারণ"।

(কাঙাল হরিনাথ দ্রষ্টব্য)

জমিদারদর্পণ নাটকেও নায়িকা বলছেন :

"কাতরে ডাকি মা তোরে শুন মা ভারতেশ্বরী।
অবিহিত অবিচারে আর বাঁচিনে মরি মরি।
থাক মা সাগর পারে কভু না হেরি তোমারে
রক্ষ মা প্রজা কিঙ্করে বিনয়ে মিনতি করি।"

লক্ষ্য করতে হবে—এই অনুরোধ পরবর্তী যুগে গিয়েই আদেশে পরিণত হচ্ছে—বাঙালী তার দারিদ্র্যের কারণ জানার জন্য ব্যগ্র—স্বাধীনতা আন্দোলনের সূত্রপাত। 'জমিদারদর্পণে' ইংরেজ জজ ম্যাজিষ্ট্রেট ডাক্তার প্রভৃতির যে পরিচয় ফুটে উঠেছে ১৮৭৫ অব্দে প্রকাশিত উপেন্দ্রনাথ দাস কৃত বিখ্যাত 'সুরেন্দ্রবিনোদিনী' নাটকে তারই পরিপূর্ণ রূপ দেখা গেল। (দ্রষ্টব্য আমাদের স্বদেশী আন্দোলনের পূর্বকথা যতীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত 'দেশ' ২রা ভাদ্র ১৩৬৩) নীলদর্পণ—জমিদারদর্পণ—সুরেন্দ্রবিনোদিনী এ যুগের চিত্তবিক্ষোভের দুরন্ত স্বাক্ষর। তাই দেখতে পাই 'জমিদারদর্পণ' পাঠ করে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রও বলতে বাধ্য হয়েছিলেন : "নীলকরদিগের সম্বন্ধে বিখ্যাত নীলদর্পণের যে উদ্দেশ্য সাধারণ জমিদার সম্বন্ধে ইহারও সেই উদ্দেশ্য। বঙ্গদর্শনের জন্মাবধি এই পত্র প্রজার হিতৈষী কিন্তু আমরা পাবনা জেলার প্রজাদিগের আচরণ শুনিয়া বিরক্ত ও বিষাদযুক্ত হইয়াছি। জ্বলন্ত অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দেওয়া নিষ্প্রয়োজনীয়। আমরা পরামর্শ দিই যে গ্রন্থকারের এ সময়ে এ গ্রন্থ বিক্রয় ও বিতরণ বন্ধ কর্ত্তব্য—নাটকখানি অনেকাংশে ভাল হইয়াছে, যেমন আদালতের চিত্রটি অতি পরিপাটি হইয়াছে। (বঙ্গদর্শন ভাদ্র ১২৮০ সাল); স্পষ্টই বুঝা যায় 'জমিদারদর্পণ' বঙ্কিমচন্দ্রকেও বিচলিত করেছে। ইংরেজ-সৃষ্ট এই নীলকর এবং জমিদারদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ অতঃপর সোজাসুজি মূল ইংরেজ শাসনকেই দংশন করতে থাকে। তাই কিছুদিনের মধ্যেই প্রয়োজনীয় হ'য়ে পড়ল Vernacular Act ইত্যাদি। মীর সাহেবের 'উদাসীন পথিকের মনের কথা' গ্রন্থের মধ্যেও এই নীল অত্যাচারের কাহিনীই দেখা যায়।—'সমালোচ্য পুস্তকখানি ঠিক উপন্যাস নহে। ইহা উপন্যাসাকারে নীল অত্যাচারের কাহিনী পূর্ণ।' (ভারতী—বৈশাখ ১২৯৮ রাজশাহী বরেন্দ্র মিউজিয়াম)।

হরিনাথ ও মীর মশাররফ এঁরা দুজনেই ছিলেন মনে-প্রাণে বাঙালী—ঈশ্বর গুপ্তের স্বাজাত্য বোধ যেন এঁদের অস্থিমজ্জায়—বাইরের সব বেলিয়াপণাকে ভুলে মনে-প্রাণে বাঙালী হ'তে হবে। তাই আমাদের সামাজিক এবং পারিবারিক জীবনের যেখানেই অসঙ্গতি দেখেছেন, জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা এবং বহু দর্শন জনিত প্রজ্ঞার আলোয় তা' নিরীক্ষণ করেছেন। প্রমাণ 'গাজী মিয়ার বস্তানী' (১৮৯৯); বিচ্ছিন্ন নথিতে গ্রন্থটি রচিত, কতকটা কমলাকান্তের দপ্তরের মত। বস্তানীর চরিত্রগুলির বর্ণনা নয় শুধু, নামগুলিও জমকালো : যথা—'লালআলু 'মোল্লা,' 'দাগাদারী,' 'ধিনতাধিনা,' ভেড়াকান্ত 'ধামাধরা' 'জয়ঢাক' 'ছিড়িয়া খাতুন' 'গুড়ুরাজ' 'পঞ্চকল্যাণী' 'যথা পয়সা'। স্থানগুলির নামও অবস্থান উপযোগী :—'অরাজকপুর' 'যমদ্বার' 'খামখেয়ালী গঞ্জ' 'নচ্ছারজেলা' 'নেংটি চোঙাগ্রাম' ইত্যাদি। 'বাজীমাত' নামক পদ্যময় কাব্যে (১৩১৫) যুগচিত্রটি আরও সুন্দর। লেখক আরম্ভেই মার্জনা ভিক্ষা করে নিচ্ছেন :

"গাঁজাখোর তাড়ীখোর মদখোর শত
চণ্ডুখোর নেশাখোর খোর আছে যত।
ডাক্তার উকিল আর চতুর মোক্তার।
লেখক কবির দল আর ব্যারিষ্টার।
নমি আমি পদপ্রান্তে কেহ চটিও না।
চটো না মৌলভী মুন্সী হাফেজ মৌলানা।
যদি মিথ্যা বলি তবে পাপ পরশিবে।
চৌদ্দ পুরুষের শ্রাদ্ধ কেহ না করিবে।

(বাজীমাত—৫ম পৃষ্ঠা)

লেখক সম্ভবতঃ দুঃখ করেই বলছেন :

"জীবন্ত মনের খেলা হয় দিনরাত
জুয়াকোর্টে হইতেছে কত কিস্তিমাত
* * *
তাহাদেরই এই ছবি নাম বাজীমাত ॥"

ম্যাটসিনী বলেছিলেন : Whenever you see corruption by your side and do not strive against it, you

there by betray your duty ; গোটে বলেছেন—প্রতিভার কাছে আমাদের প্রথম ও শেষ দাবী সত্য, প্রীতি—আশার কথা, মীর সাহেবের সাহিত্যে এর পরিচয় মিলবে। স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় এ সম্বন্ধে বলেছিলেন : "তিনি দৃঢ় মুষ্টিতে কশা ধারণ করিয়া যেখানে যাহার পৃষ্ঠে আঘাত করিয়াছেন সেখানেই যেন সপাসপ আঘাত ধ্বনি ফুটিয়া উঠিয়াছে ; কাতর ক্রন্দনের সঙ্গে রক্তধারা ছুটিয়া ছিটকাইয়া পড়িয়াছে। সে আঘাত কাহার পৃষ্ঠে বা পতিত হয় নাই।—পাঠক! হয়ত তুমি আর আমি আর তাহারা কেহই বাদ যায় নাই —বস্তানীর পল্লীচিত্র ইংরাজ রাজ্যের লজ্জার বিষয়। পড়িতে পড়িতে মনে হয় ইংরাজ রাজ্যের বাহিরে বিলাতী বার্ণিশ ভিতরে টিনের পাত, দেখিতে খুব জমকাল।"—

হিন্দু মুসলমানের মিলন সম্মিলিত শক্তির মিলনই আনবে শুভদিন—এই compromise-এর উদ্দেশ্যেই সম্ভবতঃ তিনি 'গো-জীবন' বইটি লিখেছিলেন এবং স্বীয় মুসলিম ভাইদের নিকট ওকালতি করেছিলেন গো-বধ বন্ধের জন্য। বলা বাহুল্য, এ নিয়ে তাকে স্বীয় সমাজের নিকট যথেষ্ট নাকাল হ'তে হয়েছিল। বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা ১১২৩ দ্রষ্টব্য); কিন্তু মীর সাহেব তাঁর উদার চিন্তাধারা থেকে বিচ্যুত হন নাই।

পল্লী এবং শহর এই উভয় জীবনেরই অভিজ্ঞতা ছিল তাঁর (প্রথম জীবনে কলিকাতা—অতঃপর কুষ্টিয়া—অতঃপর টাংগাইল-দেলদুয়ার—তারপর কুষ্টিয়া—আবার কলিকাতা এবং পরিশেষে পাদমদি) এ অভিজ্ঞতার প্রমাণ তাঁর সাহিত্যে অজস্র প্রবাদ বাক্যের সমারোহ—'বড়মানুষের ভালবাসা আর জবানী মোল্লার মুরগী পোষা'; 'উৎপাত করলে চিৎপাত হতে হয়'; 'পুরুষের দশদশা কখনও হাতী কখনও মশা' (গাজী মিয়ার বস্তানী); কু বাসনা মনে যার তার উপাসনা কি, মনে এক মুখে এক শুধু হরিবলে ফল কি'; 'সুখী বলে কোনজন—অধীনতাকালে বাঁধা যাদেরি জীবন'; 'যখন দেখে আটা আটি তখন কেঁদে ভিজায় মাটি' (জমিদারদর্পণ) ইত্যাদি।

৫

সাহিত্যিক মশাররফ হোসেন

মীর সাহেব ছিলেন খাঁটী সাহিত্যিক—সকল সাম্প্রদায়িকতার উর্দ্ধে। ঐতিহ্যের দিক থেকে হিন্দু ও মুসলিম কেউই কম নয়—পরস্পরকে না জানার জন্যই জাতীয় জীবনে এত কলঙ্করেখা।

পৃথিবীর সকল মানুষের নিকট মুসলিম ধর্ম্মের গৌরবময় অতীত ও ঐতিহ্য এবং ঘুমন্ত মুসলিমের কানে সেই মহান গৌরবশিখা উদ্দীপিত করবার জন্যই হয়ত তিনি 'হজরত ওমরের ধর্ম জীবন লাভ' 'হজরত আমীর হামজার ধর্ম জীবন লাভ' 'মদিনার গৌরব' 'মোসলেম বীরত্ব'. 'এসলামের জয়' 'বিষাদসিন্ধু' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। 'প্রদীপ' ১৩১৮ (জ্যৈষ্ঠ) লিখেছিল :—'তিনি একজন স্বধর্মনিষ্ঠ স্বদেশভক্ত অনুরক্ত মুসলমান সাহিত্য-সেবক—।

মীর মশাররফ হোসেনের দান শুধু বিরাট নয়—বিস্ময়কর। ঊনবিংশ শতকের তিমিরাচ্ছন্ন দুর্যোগের দিনে তিনিই মুসলিম ঐতিহ্যের বাণীকে শক্তিশালী ভাষায় রূপ দিয়েছিলেন। সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্পপূর্ণ আবহাওয়ায় তিনিই ধীর স্থির ভাবে মিলনের প্রদীপালোক নিয়ে অগ্রসর হয়েছিলেন। দুঃখের বিষয়, বিপরীত তরঙ্গ এসে সে প্রদীপকে ভাস্বর হতে দেয়নি।

ইংরেজী ১৯১১ অব্দের ১৯শে ডিসেম্বর বাংলা পৌষ, ১৩১৮ সালে লেখক তাঁর শেষ কর্ম্মস্থল পদমদী (ফরিদপুরে) প্রাণত্যাগ করেছেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ তাঁর একটি ফটো শ্রদ্ধার সঙ্গে পরিষদ গৃহে রক্ষা করছেন। তাঁর প্রকাশিত রচনাগুলি আজ বিস্মৃতির অন্ধকারে বিলুপ্তপ্রায়। এগুলি শীঘ্র উদ্ধার ও প্রকাশিত হওয়া কর্ত্তব্য।

মীর মশারফ হোসেনের ভাষা খাঁটি বিশুদ্ধ বাংলা ভাষা। কলিকাতাকে কেন্দ্র করে সংস্কৃতবহুল ও সংস্কৃতপন্থী যে সাধুভাষার প্রবর্তন হয়েছিল (ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে যার ভিত্তি—বিদ্যাসাগর-অক্ষয়-বঙ্কিমচন্দ্র যার পরিবৃদ্ধি) সাহিত্যিক হতে হলে তেমনি ভাষা লিখতে হবে—প্রচলিত সাহিত্য পত্রিকার style হৃদয়ঙ্গম করতে হবে—The fish can not deny the existance of water. মীর সাহেবও সেই ভাষাতেই সাহিত্য রচনা করে গেছেন। ১৩১৮ সালের ১৯শে ফাল্গুন চুঁচুড়া সাহিত্য সম্মেলনে শ্রীযুক্ত অক্ষয় সরকার মীর সাহেব সম্বন্ধে শ্রদ্ধার সঙ্গে বলেছিলেন : "মহরমের আখ্যান কাব্য 'বিষাদসিন্ধু' প্লাবনী করুণারসে টলমল আর সেই সিন্ধুর ভাষা বাঙালী হিন্দু লিখিতে পারিলে আপনাকে ধন্য মনে করিবে।" (বসুধা—ফাল্গুন-চৈত্র ১৩১৮ রমেন্দ্র মিউজিয়াম)।

বস্তুতঃ মীর মশাররফ সম্বন্ধে এ উক্তি যথার্থ। জাতীয় জীবনের নতুন পরিপ্রেক্ষিতে আজ মীর সাহেবকে নতুন দৃষ্টিতে আলোচনা করার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয়।

TIME AND YOU

Take time to work, it is the price of success.
Take time to think, it is the source of power.
Take time to play, it is the secret of youth.
Take time to read, it is the foundation of wisdom.
Take time to pray, it is the way to Heaven.
Take time to dream, it is the highway to the stars.
Take time to be friendly, it is the road to happiness.
Take time to laugh, it is the music of the soul.
Take time to look around, it is the short cut to unselfishness.

বাংলা কবিতার আধুনিক যুগ

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

১

আধুনিক বাংলা কবিতার বর্তমান বিস্তৃতি প্রসঙ্গে এ কথা মেনে নিতে বাধা নেই যে, বাংলা দেশের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অবস্থার নানা বিপর্যয়ের মধ্যেও বাংলা কবিতা ক্রমে ক্রমে একটি সুষ্ঠু পরিণতির পথে এগিয়ে যেতে পেরেছে এবং প্রায় ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর আগে অপেক্ষাকৃত তরুণ একদল কবির তারুণ্যজনোচিত বিদ্রোহের ফলে কাব্যকুঞ্জের যে অনিশ্চিত শাখাটি ভিন্ন পথে অগ্রসর হয়েছিল, তার অকালমৃত্যু সহসা সম্ভব বলে কেউ কেউ ভবিষ্যদ্বাণী করা সত্ত্বেও প্রকৃত প্রস্তাবে সে-শাখাই স্বতন্ত্র একটি ফলদায়িনী বৃক্ষের আকার লাভ করতে পেরেছে বলে আজকের দিনে অঙ্গীকার করে নিতে হয়। এই সাফল্য অবশ্যই অদ্যাবধি চূড়ান্ত স্বীকৃতিতে পরিণতি লাভ করে নি, হয়তো এখনো তার ক্রমবর্দ্ধমান অঙ্গ সুচারু বিন্যাসের অপেক্ষা রাখে এবং অঙ্কুর গাছে পরিণত হওয়ায় আধুনিক কাব্যের অকালমৃত্যুর প্রশ্ন অবান্তর বটে কিন্তু এখন পর্যন্ত সম্ভবত আরো আলো, বাতাস ও রসের আশ্রয় তার পক্ষে অনিবার্য।

অতএব স্বীকার করে নেয়া যেতে পারে যে, আধুনিক বাংলা কবিতা আজকের দিনে সর্বগুণসমন্বিত না হলেও অন্তত কোনো কোনো দিক থেকে উৎসাহব্যঞ্জক। এবং যখন এ কথা মনে পড়ে যে, পঁয়ত্রিশ কি ত্রিশ বছর আগে রবীন্দ্র-কাব্য ও রবীন্দ্র-কাব্যের প্রভাবপুষ্ট কবিতা ছাড়া স্বতন্ত্র কোনো কাব্যকলা ও কাব্য-বিন্যাসের বিষয় শুধু কল্পনামাত্র ছিল, তখন ইতিমধ্যেই বাংলা কবিতার যে প্রসার ও ব্যাপ্তি ঘটেছে, তা' সংবেদনশীল কাব্যপাঠকের মনে সাড়া না জাগিয়ে পারে না। অবশ্য, আধুনিক কবিতা শূন্য থেকে উদ্ভূত নয় এবং যেখান থেকে তার আরম্ভ তার আগেও একটি কাব্যধারা প্রবহমান। ফলে ত্রিশ বছর আগে, রবীন্দ্র কাব্যের প্রভাব এড়িয়ে নতুন কিছু করবার জন্যে যে তরুণ কবিগোষ্ঠী উদ্যোগী হয়েছিলেন তাঁরা যে রবীন্দ্র প্রভাবকে সর্বাংশে বর্জন করতে পেরেছিলেন এরূপ মনে করার সঙ্গত কারণ রয়েছে কি না সন্দেহ। রবীন্দ্রনাথ ও তরুণ কবিগোষ্ঠীর মাঝেও এমন কবির অভাব ছিল না যাঁরা মধ্যবর্তী পথের ভারসাম্য রক্ষা করেছেন এবং আধুনিক বাংলা কবিতার ধারাবাহিকতায় স্বাভাবিকতা বজায় রাখতে সাহায্য করেছেন। ফলে, রবীন্দ্রনাথের যাঁরা সাক্ষাৎ উত্তরসাধক তাঁরা ছাড়াও এমন কয়েক জন কবির সাক্ষাৎ লাভ সম্ভব আধুনিক বাংলা কাব্য আন্দোলনের সূচনাতেই যাঁদের নামোল্লেখ সঙ্গত ও স্বাভাবিক। আর যে-কারণেই সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, নজরুল ইসলাম ও মোহিতলাল মজুমদারের কাব্যকলা ও কাব্যরীতির আলোচনা প্রায় অপরিহার্য, রবীন্দ্র-কাব্যের প্রভাব প্রত্যক্ষ ভাবে স্বীকার করে নিয়েও তাঁদের কবিতা যে স্বকীয় স্বাতন্ত্র্যে সমুজ্জ্বল একথার উল্লেখ অনিবার্য।

প্রবহমান বাংলা কবিতায় সত্যেন্দ্রনাথ সঞ্চারিত করেছিলেন নানা ছন্দের দোলা, দিয়েছিলেন বাঙালীর সংসারের, বাংলা দেশের নানা টুকিটাকির খবর। কাব্য রচনার বিবিধ উপকরণ সংগ্রহের জন্যে তাঁকে দুর্গম দর্শনের শরণাপন্ন হতে হয়নি কি কোনো প্রাণান্তকর প্রয়াসের মুখোমুখী হতে হয়নি। তাঁর কাব্যের বিষয়বস্তু মহৎ কি অসামান্য কিছু ছিল না এবং গুরুগম্ভীর বিষয়কে কবিতায় উপস্থিত করার মতলব তাঁর কখনো ছিল কি না সন্দেহ। বাংলা দেশের, বাঙালী সংসারের সাধারণ পরিবেশের মধ্যেই কাব্য রচনার প্রচুর উপাদান তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন এবং তারই ফলে সম্ভব হয়েছিল 'পাল্কী চলে' 'দূরের পাল্লা' 'ইলশে গুঁড়ি' 'ছেলের দল' ইত্যাদি কবিতার সৃষ্টি। তা ছাড়া, সমসাময়িকতাকেও তিনি কাব্য থেকে দূরে সরিয়ে রাখার পক্ষপাতী নিশ্চয়ই ছিলেন না। কি রাষ্ট্রীয়, কি সামাজিক নানা ঘটনাও যে তাঁর কবি-প্রাণে সাড়া জাগিয়েছে তার প্রমাণ 'গান্ধিজী, 'নষ্ট কুণ্ঠ' 'জাতির পাঁতি' 'মেথর' ইত্যাদি কবিতায়ই রয়েছে। মোটের উপর, সত্যেন্দ্রনাথের কবিতাবলী পাঠান্তে এ সিদ্ধান্তই শোভন যে সুগভীর না হলেও সুভাষিত কবিতাগুচ্ছ সত্যেন্দ্রনাথ অজস্রই লিখেছেন এবং সামান্য বিষয় নিয়েও তিনি যে চিত্তহারী কবিতা লিখতে পেরেছেন তার মূলে রয়েছে তাঁর অপূর্ব ছন্দকুশলতা।

সত্যেন্দ্রনাথের পাশাপাশি যতীন্দ্রনাথ ও নজরুলকে অবশ্যই মনে হবে চড়া গলার কবি। সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায় জ্বালা নেই, যন্ত্রণা নেই, অতিবিপ্লবী ঘোষণা নেই, পক্ষান্তরে, শেষোক্ত দু'জন কবির কবিতায় শ্লেষ-ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের আধিক্য, সমাজ-চেতনার তীব্রতা। রবীন্দ্রকাব্যের নমনীয় গীতিময়তা ও রূপলাবণ্যের এবং সত্যেন্দ্রনাথের কবিতার ক্ষোভহীন স্নিগ্ধতার পরিপূরক হিসেবেই বোধ হয় সেকালের পাঠক যতীন্দ্রনাথ-নজরুলের উঁচুগলার সংস্কারমুক্ত বক্তব্যকে গ্রহণ করেছিল। বোধ হয় তখন থেকেই যতীন্দ্রনাথের শ্লেষ ও নজরুলের বিদ্রোহ অনিবার্য ভাবেই বাংলা কবিতায় পাঠককে আকর্ষণ করে এসেছে। 'চামেলী তুই বল্, কোথা থেকে নিয়ে এলি রূপের পরিমল।' সত্যেন্দ্রনাথের এই উক্তির পাশাপাশি যতীন্দ্রনাথের 'মনে কোরো ভাই মোরা চাষা নই,—চাষায় ব্যারিষ্টার!' কিংবা নজরুলের 'চির অবনত তুলিয়াছে আজ গগনে উচ্চ শির। 'বান্দা আজিকে বন্ধন ছেদি ভেঙেছে কারাপ্রাচীর।' বিশেষ তাৎপর্যময়। রবীন্দ্রকাব্যের মূল ধারার অনুসরণে তাঁর অনুগমনকারী কবিরা শান্ত, সমাহিত গীতিকাব্যের যে মসৃণ ধারা প্রবাহিত করে দিয়েছিলেন সেদিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে তাকাতে হ'লো সমস্যাকীর্ণ প্রতিবাদমুখর নতুন কবিতার দিকে। এই ধরণের কাব্য প্রতিবাদ ও বিদ্রোহের কাব্য, শ্লেষ-বিদ্রূপ ও উদ্দামতা-উত্তেজনাময় কাব্য—খুব নতুন কিছু বলেই হয়তো তদানীন্তন পাঠক-সমাজকে নিবিড় ভাবে আকর্ষণ করেছিল। কিন্তু খুব সম্ভব বিষয়বস্তুর নতুনত্বের জন্যেই শুধু নয়, অনুপ্রেরণাময় আন্তরিকতার জন্যেই সেকালে যতীন্দ্রনাথ-নজরুলের কবিতা সমাদর লাভ করেছিল।

২

সেকালের কাব্য-আন্দোলন এই পর্যায়ে এসেও স্থির হয়ে থাকতে পারেনি। সত্যেন্দ্রনাথ, যতীন্দ্রনাথ ও নজরুলের কবিতা

তরুণতর কবি-সম্প্রদায়ের প্রাণে সাড়া জাগিয়েছিল এই কারণেই যে, এঁদের কবিতাপাঠেই প্রথম হৃদয়ঙ্গম হ'লো যে রবীন্দ্র কাব্যধারার সর্বত্রগামী প্রভাবের মধ্যে থেকেও সমকালীন কাব্যে স্বাতন্ত্র্য ও স্বকীয় বিন্যাসের রূপ ও রীতি অব্যাহত রাখা সম্ভব। এঁরা রবীন্দ্রকাব্যে সুধা পান করেছিলেন, রবীন্দ্রকাব্যের আবহাওয়ায় এঁদের কবিপ্রাণ লালিত ও পরিপুষ্ট হয়েছিল বটে। কিন্তু তবু এঁদের কবিতায় সংযোজিত হ'লো নতুন সুর, মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার নতুন অভিব্যক্তি, নতুন জীবনাদর্শের প্রতিফলন।

সত্যেন্দ্রনাথ মেথরকে বন্ধু বলে সম্বোধন করলেন, যতীন্দ্রনাথ চাষাকে ভাই বলে কাছে টেনে নিলেন, আর সবচেয়ে অবাক করলেন নজরুল বারাঙ্গনাকে মাতৃসম্বোধন ক'রে। সত্যেন্দ্রনাথ জানালেন, মানুষের সঙ্গে মানুষের ভেদ নেই, 'কালো আর ধলো বাহিরে কেবল ভিতরে সকলি সমান রাঙা' তাঁর এই উক্তি অধুনা ইস্কুলপাঠ্য বইয়ের পাতায় সীমাবদ্ধ থাকলেও পঁয়ত্রিশ বছর আগে নতুন সমাজব্যবস্থার রূপক হিসেবে সহজেই অভিনন্দিত হয়েছিল। এদিকে যতীন্দ্রনাথ উপস্থিত করলেন দুঃখবাদ, সমকালীন কাব্যে প্রকৃতিবিলাসের যে আধিক্য ঘটেছিল তাকে সরাসরি বর্জন করে মানব-সমাজে যারা সামান্যজন অথচ যাদের পরিশ্রম ও কায়িক ক্লেশ সমগ্র সমাজ-ব্যবস্থার ভিত্তিমূল—তাদের অন্তর্লোকে স্থান দিলেন তাঁর কবিতায়। 'বজ্রে যে জনা মরে,' নবঘন শ্যাম শোভার তারিফ সে বংশে কে বা করে ?' এই জিজ্ঞাসা যতীন্দ্রনাথেরই। 'বন্ধু, বন্ধু, হে কবিবন্ধু, উপমার ফাঁস গুণি' 'আসল কথাটা চাপা দিতে ভাই কাব্যের জাল বুনি।' কবিতা যাঁদের কাছে বিলাসমাত্র যতীন্দ্রনাথের এই উক্তি তাঁদের সচকিত করে তুলেছিল। কিন্তু সমাজব্যবস্থার পরিবর্তনে দুঃখবাদের দিনলিপিই যথেষ্ট নয়, চাই বিদ্রোহ, চাই বিপ্লব। আর সে-কারণেই এলেন নজরুল তাঁর বিদ্রোহাত্মক বাণী নিয়ে। 'তোরা সব জয়ধ্বনি কর। ঐ নূতনের কেতন ওড়ে কাল-বোশেখীর ঝড়।' কিংবা 'বল বীর, চির উন্নত মম শির' এই ঘোষণা অপূর্ব ঝঙ্কার আনলো বাংলা কবিতায়। তাঁর, 'বিদ্রোহী' কবিতায় মূর্ত হয়ে উঠলো জীর্ণ সংস্কারের শৃঙ্খলভাঙার স্বপ্ন। বস্তুত, নজরুলের ঘোষণার পাশাপাশি সত্যেন্দ্রনাথ এমন কি যতীন্দ্রনাথের উক্তিকেও মনে হবে যথেষ্ট মৃদু, যথেষ্ট সুকোমল। 'আমি বিদ্রোহী ভৃগু, ভগবান বুকে এঁকে দিই পদচিহ্ন' কিংবা 'আমি খেয়ালী বিধির বক্ষ করিব ভিন্ন' এই উক্তি চলতি বাংলা কবিতার ভাবালুতা ও মৃদু গুঞ্জনধ্বনিকে স্তব্ধ করে আহ্বান জানালো অনমনীয় পৌরুষের, তারুণ্যের বিজয়-ঘোষণা ধ্বনিত হ'লো দিকে-দিকে।

কিন্তু বিষয়বস্তুতে নবত্ব এলেও আঙ্গিকের কলাকৌশলে তখন পর্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ রূপান্তর দৃষ্টিগোচর হয়নি। তাছাড়া, যতীন্দ্রনাথ নজরুলের কবিতায় উচ্ছ্বাসের আধিক্য সহজেই নজরে পড়ে। বেপরোয়া কথাবার্তা, অনেক সময় অব্যর্থরূপেই উচ্চারিত ; আচারলুপ্ত সমাজ ও সংসারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও প্রতিবাদের স্বর সঙ্গতরূপেই সার্থক। অথচ আঙ্গিকের দিক থেকে অনেক ছন্দেই অতিরিক্ত শিথিল ও তরল। এই শিথিলতা এই তরলতা তখনকার দিনের বাংলা কবিতার মজ্জাগত ব্যাপার। কিন্তু পরবর্তী কালের তরুণতর কবিগোষ্ঠী চাইলেন এই ভাবপ্রবণতা, এই উচ্ছ্বাসপ্রবণতাকে সরাসরি বর্জন করতে। বাংলা কবিতায় আনতে চাইলেন ভাবসংহতি, সতর্ক পদান্বয়, চিন্তাকল্পের সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণ। ফলে, প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতার রুক্ষ পৌরুষ, ঘন পদবিন্যাস ও সহজাত দার্ঢ্য প্রথম থেকেই প্রত্যয়ী কাব্য-পাঠককে আকর্ষণ করতে পেরেছিল।

অবশ্য প্রেমেন্দ্র মিত্র অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন মোহিতলাল মজুমদারের কাব্যপাঠে, মোহিতলালের কবিতার ভাবসংহতি ও অনমনীয় পৌরুষই তখন তরুণতর কবি-সম্প্রদায়ের মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। 'সত্য শুধু কামনাই মিথ্যা চির মরণ-পিপাসা' এই উক্তি কবি মোহিতলালেরই। শুধু বক্তব্যের দিক থেকে স্পর্ধিত ও সবল বলেই নয়, সুদৃঢ় গঠনকৌশল, সুসংবদ্ধ কবি-কল্পনা ও সংহত কারুকলার জন্যেই প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁর কবিতা কল্লোল যুগের তরুণতর কবিদের প্রাণে সাড়া জাগিয়েছিল। তাঁর কবিতায় যৌবন-বন্দনা নতুন সুস্পষ্ট রূপ গ্রহণ করেছিল, সুস্থ ও সবল মানুষের সম্ভোগক্ষমতা সার্থক কবি-কল্পনার মাধ্যমে যে কত বিচিত্রধর্মী হতে পারে, মোহিতলালের কবিতায়ই তখনকার দিনে তার প্রথম পরিচয় পাওয়া গেল। তাঁর 'বিস্মরণী' কাব্যগ্রন্থটি প্রধানত সে কারণেই মুগ্ধ তরুণতর কবিদের বিস্ময়বিমুগ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছিল। মোহিতলালের সনেট, তাঁর স্পেন্সরীয় স্তবকে রচিত দীর্ঘ কবিতা সার্থক কাব্য-সাধনার দৃষ্টান্তস্থল। এবং সত্যি বলতে কি, বাংলা কবিতার অতি লাবণ্যময় অতি-তারল্যের স্রোতে তাঁর সংস্কৃত-ঘেঁষা শব্দবহুল সার্থক উপমাখচিত স্তবকসজ্জা এখনকার দিনেও সংবেদনশীল পাঠকমনের বিমুগ্ধ দৃষ্টির অপেক্ষা রাখে। আর প্রধানতঃ সে-কারণেই কল্লোল যুগের শক্তিমান তরুণ কবি-সম্প্রদায় এক সময়ে মোহিতলালের কবিতায় তাঁদের বহু আকাঙ্ক্ষিত নতুনতর কাব্য-বিন্যাসের উপাদানসমূহ খুঁজে পেয়েছিলেন। কিন্তু মোহিতলালের এই প্রভাব আধুনিক বাংলা কবিতায় স্থায়ী হয়নি। কারণ, মোহিতলালের কবিতায় কোনো প্রগতিশীল ক্রমবিবর্তনের ধারা নেই। সম্ভবত সাহিত্য-বিচারে তিনি যে রক্ষণশীল মনোভাবের পরিচয় দিয়েছিলেন, শেষ পর্যন্ত সে মনোভাব তাঁর কবিতা রচনাকেও প্রভাবিত করেছিল।

৩

কল্লোলযুগের শুরু থেকে আধুনিক বাংলা কবিতার শুরু, একথা আধুনিক কালে স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু এই আরম্ভের আগেও যে আরম্ভ রয়েছে তা উপরে বিবৃত হয়েছে। কল্লোলযুগের তরুণ কবি-সম্প্রদায় কোনো বিশেষ এক ধরণের কাব্যাদর্শ ও কাব্যরীতির প্রবর্তন করবেন বলেই যে দল বেঁধেছিলেন এমন মনে করবার কারণ নেই। এবং যদিও প্রেমেন্দ্র মিত্র, জীবনানন্দ দাশ, বুদ্ধদেব বসু প্রমুখ কবিরা প্রায় একই সময়ে বাংলা দেশের কাব্যপাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন এবং যদিও ঐতিহাসিক অর্থে তাঁরা একই গোষ্ঠীর অন্তর্গত। তবু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, এঁদের কবিতার চারিত্রলক্ষণ সুস্পষ্টই পরস্পরের থেকে স্বতন্ত্র। প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'প্রথমা'র সমাজ সচেতন যে ঘোষণা স্পর্ধিতভাবেই উচ্চারিত, জীবনানন্দ দাশের 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র নির্জন নিঃসঙ্গ প্রকৃতিময়তা বা বুদ্ধদেব বসুর 'বন্দীর বন্দনা'র বন্দী প্রেমের তীব্র কাতরোক্তির সঙ্গে তার কোনো প্রত্যক্ষ যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া কঠিন। পরবর্তীকালেও আধুনিক কবিদের এই স্বাতন্ত্র্য অব্যাহত রয়েছে এবং অমিয় চক্রবর্তী

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত কি সমর সেনের কবিতায়ও বক্তব্য বিষয়, গঠন, উপাদান ও দ্যোতনার দিক থেকে পরস্পর সম্পর্কশূন্য চারিত্রলক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে। বিষ্ণু দে'র কবিতায় মানসগঠন ও আঙ্গিক সম্পর্কেও এই বক্তব্যই, তাঁর রচনার অনন্যতা অনস্বীকার্য।

গত তিরিশ বছরে আধুনিক বাংলা কবিতার অবয়ব উল্লেখযোগ্য ভাবেই বৃদ্ধি পেয়েছে, বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকের এরূপ বিস্তৃতিলাভ ঘটেছে যে, এখনকার দিনে সামান্য দু-চার কথায় আধুনিক বাংলা কবিতার বর্ণনার প্রচেষ্টা নিতান্তই হাস্যকর বলে বিবেচিত হবার আশঙ্কা রয়েছে। আধুনিক কাব্য আন্দোলন থেমে নেই; অপেক্ষাকৃত পুরাতন শক্তিমান কবিরা নিরন্তর লিখে চলেছেন; জীবনানন্দ দাশ এই সে দিন পর্যন্ত লিখে চলেছিলেন, দু'বছর আগে শোচনীয় মৃত্যু না ঘটলে তিনি হয়তো আরও বিস্ময়কর সৃজনী প্রতিভার পরিচয় দিতে পারিতেন। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে, অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় অদ্যাবধি নতুনতর সম্ভাবনার তোরণদ্বার উম্মোচিত হচ্ছে। বুদ্ধদেব বসুর কাব্যসাধনাও দিনে দিনে ক্রমশ বিচিত্রমুখী হয়ে উঠছে। প্রেমেন্দ্র মিত্র এঁদের তুলনায় কম লিখলেও মাঝে মাঝে নতুন কবিতা লিখে চমক লাগিয়ে দিচ্ছেন। এই কবিগোষ্ঠী অদ্যাবধি বিচিত্রভাবে সৃজনশীল বলেই আধুনিক বাংলা কবিতা দ্রুত সমৃদ্ধ হতে পেরেছে। এছাড়া অবশ্য পরবর্তীকালের নতুন নতুন কবিরাও রয়েছেন; তাঁদের মধ্যে যাঁরা পাঠকসমাজে স্বীকৃতিলাভে সক্ষম হয়েছেন তাঁদের সংখ্যাও নগণ্য নয়। কিন্তু তাঁদের রচনার মূল্য-বিচারের কাজ আরও দশ বছর পরবর্তী কালের সমালোচকের জন্যে অপেক্ষা করতে পারে বলে মেনে নিতে বাধা নেই।

আধুনিক কাব্য আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতাই উল্লেখযোগ্য আলোড়নের সূচনা করেছিল। তাঁর বাস্তবমুখী কবিতায় মাধুর্য ও অনমনীয় পৌরুষের সমন্বয় যেমন উল্লেখযোগ্য তেমনি সাধারণ মানুষের দুর্ভোগের জন্যে তাঁদের প্রতি সহানুভূতি এবং বিচিত্র ভৌগোলিক পরিবেশের মধ্যে নিয়ন্ত্রিত বহুদূরবর্তী মানবসমাজের সঙ্গে একাত্মতাবোধ তাঁর কবিতায় অভূতপূর্ব বৈচিত্র্য ও ব্যাপ্তি এনেছে। 'শুধু দুটি তীব্র তীক্ষ্ণ দুঃসাহসী ডানা, আকাশের মানে না সীমানা' কিংবা 'কোন সে পাহাড়ে কাটি সুড়ঙ্গ, কোথা অরণ্য উচ্ছেদ করি ভাই' এবং 'এই সব সূর্যকণা তিল তিল ক'রে ব'য়ে নিয়ে যেতে হবে কালের দিগন্তে?' এই সব পংক্তিতেই তাঁর কবিতার মূল বক্তব্য নিহিত রয়েছে। সাধারণ বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে সংহত কাব্যসৃষ্টির ঝোঁক এযুগে দেখা যায়। এ বিষয়েও প্রেমেন্দ্র মিত্র অগ্রণী। তাঁর 'নীল দিন', 'কাক ডাকে' ইত্যাদি কবিতা এদিক থেকে উল্লেখযোগ্য।

অন্য দিকে বুদ্ধদেব বসু পরিপূর্ণ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী কবি। এবং খুব সম্ভবত প্রেমের কবিতাই তাঁর সার্থকতম রচনা। যে-পাঠক মনে করেন কবিতা প্রধানত: কবির হৃদয়াবেগেরই বাহন 'বন্দীর বন্দনা' থেকে 'কঙ্কাবতী' পর্যন্ত সমগ্র কবিতাবলী পাঠে তিনি পরিতৃপ্ত হবেন এ প্রত্যাশা অন্যায় নয়। প্রকৃত প্রস্তাবে বুদ্ধদেব বসুর কবিতা অন্তরঙ্গতায় উদ্ভাসিত, স্পর্শকাতরতায় পরিপ্লুত। স্বভাবত যেমন হয়ে থাকে, বয়স ও অভিজ্ঞতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কবির প্রেম বিচিত্রগামী হয়েছে; নানা বাস্তব বিষয়বস্তু তার স্পর্শে সঞ্চারিত হয়েছে। মাঝে-মাঝে শেষের দিককার রচনায় (দময়ন্তী। দ্রৌপদীর শাড়ী। শীতের প্রার্থনা ও বসন্তের উত্তর।) এদিক-ওদিকে বাইরের সংসারের নানা বস্তুতে মন নিবদ্ধ হলেও অন্তর্নিহিত প্রেমের অনুরণন কখনোই একেবারে নিঃশেষিত হয়ে যায় নি। বলা বাহুল্য, শব্দ গ্রহণ, উপমা ও রূপকচয়নে এবং ভাববিন্যাসে বুদ্ধদেবের কবিতা অনবদ্য; যে-কোনো রুচির পাঠককে তা অভিভূত করবেই। প্রসঙ্গত একথা উল্লেখযোগ্য যে, অগ্রণী বাঙালী কবিদের মধ্যে বুদ্ধদেব বসুই সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের সর্বাপেক্ষা প্রত্যক্ষ উত্তরসাধক এবং তাঁর কবিতার অনবদ্য লিরিক সুর রবীন্দ্রকাব্যের অমৃতধারার উদ্বেল্যবশেই অন্তর্লীন।

৪

জীবনানন্দ দাশ, অমিয় চক্রবর্তী এবং সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও বিষ্ণু দে —এই চার জন কবি প্রকাশভঙ্গি ও আঙ্গিকের দিক থেকে বাংলা কবিতার সার্থক রূপান্তরই শুধু ঘটাননি, কাব্যের ক্ষেত্রকেও বহুবিস্তৃত করেছেন। সঙ্গে-সঙ্গে একথাও অবশ্য মনে পড়বে যে, সূচনাতেই একদা এঁদের অনেক কবিতাই দুর্বোধ্য বলে বিবেচিত হয়েছিল। সাধারণ কাব্যপাঠকের কাছে সুধীন্দ্রনাথের কবিতা অবশ্য আক্ষরিক অর্থেই দুর্বোধ্য। অর্থাৎ, তাঁর কবিতায় এমন সব বিচিত্র শব্দচয়ন নজরে পড়ে, যার অর্থ উদ্ধারের জন্যে শব্দকোষের শরণাপন্ন হতে হয়। এবং বিষ্ণু দের কবিতায়ও অনুরূপ শব্দ সমাবেশের নজির অনুপস্থিত নয়। প্রধানত: এই কারণেই অনেক পাঠক এই দুজন কবির নাম প্রায় একই সঙ্গে উচ্চারণ করেন। কিন্তু অমিয় চক্রবর্তী ও জীবনানন্দ দাশের পরবর্তীকালের কবিতায় যে দুর্বোধ্যতা লক্ষ্য করা যায় তা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির।

আধুনিক বাংলা কবিতার দুর্বোধ্যতা প্রসঙ্গে একথা অনেকেরই মনে পড়বে যে, কয়েক বছর আগে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে, টি. এস. এলিয়ট এবং এজরা পাউণ্ডের কবিতার প্রভাবে কোনো কোনো বাঙালী কবি বিশেষ ভাবে সম্মোহিত হয়েছিলেন। সুখের বিষয়, এই সম্মোহন দীর্ঘস্থায়ী হয়নি; দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ধাক্কায় কবিরা ফিরে এলেন নিজেদের স্বাভাবিক পারিপার্শ্বিকতায়। তাঁরা ফিরে তাকালেন স্বদেশের মাটির দিকে, প্রতিবেশী মানুষের দিকে। বিষ্ণু দে'র কাব্যপাঠেই এবং তাঁর কবিতার ক্রমবিবর্তনের ধারা লক্ষ্য করলেই এ সত্য হৃদয়ঙ্গম করা সহজ।

প্রসঙ্গত, কবিতার দুর্বোধ্যতা সম্পর্কে দু'-একটি কথা বলা যেতে পারে। এই দুর্বোধ্যতা নানা রকমের হতে পারে। চিন্তাবৃত্তির জটিলতা অনেক সময় এর জন্যে দায়ী, সেক্সপীয়রের শেষ বয়সের রচনায় তার প্রমাণ রয়েছে। সাঙ্কেতিকতা বা সিম্বলিজমের রূপও কাব্য জটিল হয়ে পড়ে যদি না তার চাবিকাঠি পাঠকের হাতে থাকে। বাংলা কবিতায় জীবনানন্দ দাশ থেকে অনুরূপ জটিলতার দৃষ্টান্ত দেওয়া সম্ভব। আবার অবাধ সঙ্গকরণ বা free association-এর ব্যবহারও কবিতাকে অস্পষ্ট ক'রে তুলতে পারে। কবি হয়তো তাঁর অবচেতন মনের পরস্পর বিচ্ছিন্ন এমন সব ভাবনাকে রূপদান করতে চান, যাকে অঙ্গীকার ক'রে নেওয়া পাঠকের পক্ষে

দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়। বিষ্ণু দে এবং অমিয় চক্রবর্তীর কবিতা দৃষ্টান্তস্থল। প্রথম ধরণের জটিলতা আয়ত্ত করতে হলে কবিতা বা কবিতার অংশ-বিশেষকে বার-বার পড়া দরকার। হয়তো অর্থ ভাষার মধ্যেই নিহিত রয়েছে, সুতরাং সে-ভাষাকে খুব নিবিষ্টচিত্তে অনুধাবন করা দরকার। কাব্যের জটিলতা যদি দ্বিতীয় রকমের হয় তাহলে সঙ্কেত বা সিম্বলের স্বরূপ সম্বন্ধে ধারণা থাকা চাই। তৃতীয় রকমের যে অস্পষ্টতা তা কিছুতেই দূর হওয়া সম্ভব নয় এই কারণে যে, সেরূপ স্থলে কবিতার উৎস কবির নিজের অবচেতন মন। তবে কবিবিশেষের মানসিক সংগঠন সম্পর্কে কিছুটা ধারণা থাকলে শেষোক্ত ধরণের জটিলতাকেও অনেকাংশে অতিক্রম ক'রে আসা হয়তো একেবারে অসম্ভব নয়।

জীবনানন্দ দাশ এককালে 'দুর্বোধ্য' কবিদের অন্যতম বিবেচিত হলেও সাম্প্রতিক কালে তাঁর শোচনীয় অকাল মৃত্যুর পর নানা আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে তাঁর কবিতা বিস্তৃত স্বীকৃতি লাভ করেছে। জীবনানন্দ নির্জন নিঃসঙ্গতার কবি, তাঁর কবিতা চিত্ররূপময় এরূপ ধারণাই প্রাধান্য পেয়েছে। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র প্রায় সব কবিতায়ই এ উক্তির সমর্থন মিলবে। কিন্তু 'সাতটি তারার তিমির'-এ জীবনানন্দ নাগরিক কবিও, যদিও নিঃসঙ্গ। নির্জন নিসর্গ নিকেতনে দীর্ঘকাল যাপন ক'রে তিনি অন্ততঃ কিছু কালের জন্যে ফিরে এসেছিলেন 'রক্তের পথে পৃথিবীর ধূলির ভিতরে।' এই সময়েই মহাজিজ্ঞাসার মাধ্যমে ব্যক্ত হয়েছিল তাঁর ইতিহাসচেতনা। এই ইতিহাসচেতনার গভীর প্রভাবেই তিনি শেষ পর্যন্ত আর আক্ষরিক অর্থে নির্জন কি নিঃসঙ্গ থাকেন নি ;—তখন তিনি বিশাল ইতিহাসচেতনার দ্বারা গভীর ভাবে আবদ্ধ। হাজার বছর ধরে যে-হৃদয় পৃথিবীর পথে সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে মালয় সাগরে ঘুরেছে, বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে বাস করেছে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন নগরজীবনে ফিরে এসেও, এ যুগের ব্যর্থতা, বেদনা, বিতৃষ্ণা ও রক্তক্ষয়ের মুখোমুখী হয়েও সে-হৃদয়ের অবলুপ্তি ঘটলো না। বরং গভীর ও বিশাল ইতিহাসচেতনায় লীন হয়েই সে-হৃদয় নতুন ক'রে আবিষ্কার করলো কালাতীত সত্যকে, সংশয়াতীত প্রত্যয়কে—যে-সত্য, যে প্রত্যয় যুগে-যুগে অতলস্পর্শ ইতিহাসবোধের মধ্যেই অঙ্কুরিত। তাই নতুন প্রত্যয়ের অঙ্গীকার জীবনানন্দের শেষের দিককার কবিতাবলীতে খুঁজে পাওয়া সম্ভব। এই প্রত্যয়ের বলেই যুগে-যুগে অতীত থেকে বর্তমানে, বর্তমান থেকে উন্মুখ ভবিষ্যতের দিকে, মানবাত্মার মহাপরিক্রমা সহজ হতে পেরেছে।

"এ যুগে কোথাও কোনো আলো—
কোনো কান্তিময় আলো।
চোখের সমুখে নেই যাত্রিকের,
নেই তো নিঃস্বত অন্ধকার।
রাত্রির মায়ের মতো"

কেন না, দেশে-দেশে মানুষ বিপন্ন, আহত, শোকে [ম্রি]য়মান। কিন্তু তবু ইতিহাসচেতনার সঞ্জীবিত গভীর প্রত্যয় 'নব [...]র মৃত্যুশঙ্কা রক্তশঙ্কা ভীতিশঙ্কা জয় করে' মানুষকে নিয়ে চলেছে [কো]নো সংশয়াতীত ইতিহাস-ভুবনে সেখানে মানব চেতনা নবীন প্রতিটি ব্যক্তির বাট বসন্তের তরে।' সঙ্গে সঙ্গে নিগূঢ় মন্ত্রের মতো উচ্চারিত হয়েছে জীবনানন্দের কবিতা। "সেই সব সুস্থিরিত উদ্বোধনে—'আছে আছে আছে' এই বোধির ভিতরে। চলেছে নক্ষত্র রাত্রি, সিন্ধু, রীতি, মানুষের বিভিন্ন হৃদয়, জয় অস্ত সূর্য, জয়, অলখ অরুণোদয় জয়।"

৫

কল্লোলের যুগ নয়, খুব সম্ভবত 'পরিচয়' পত্রিকার শুরুতেই সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে ও অমিয় চক্রবর্তী আধুনিক কালের কাব্য-পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। মেজাজ (temperament) দিক থেকে সুধীন্দ্রনাথ শুরু থেকেই প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর য়ুরোপীয় কবি-গোষ্ঠীর সগোত্র, সমসাময়িক সমাজের প্রচলিত রীতি নীতি, জীবনাদর্শ ও সংস্কার তাঁর মনে সাড়া জাগায়নি বলেই তিনি ঘোষণা করেছিলেন

'জীবনের সার কথা পিশাচের উপজীব্য হওয়া,
নির্বিকারে নির্বিবাদে সওয়া
শবের সংসর্গ আর শিবার সদ্ভাব।
মানসীর দিব্য আবির্ভাব,
সে শুধু সম্ভব স্বপ্নে, জাগরণে আমরা একাকী।'

অতিক্রান্ত শতাব্দীর পৈত্রিক বিধাতার কাছে কবি ফিরে চেয়েছেন অগ্রজের অটল বিশ্বাস। কিন্তু বিধাতার কাছ থেকে তিনি অনুপ্রেরণা পেয়েছেন এমন মনে করবার সঙ্গত কারণ নেই। রবীন্দ্রনাথ একদা কাব্যলক্ষ্মীকে অনুরোধ করেছিলেন তাঁকে সংসারের তীরে নিয়ে যেতে, কারণ ছিন্ন বাধা পলাতক বালকের মতো সারাদিন উদ্দেশ্যহীন বাঁশী বাজাতে তাঁর বিবেকে বেধেছিল। এই বিবেকী দ্বিধায় বিচলিত হয়েই সুধীন্দ্রনাথ বিধাতাকে স্মরণ করেছেন যাতে গতানুগতিক ও চিরাচরিত মূল্যবোধ ও সহজ সংস্কারে তাঁর আস্থা অবিচলিত থাকে। তাঁর প্রার্থনা :

অপ্রকট সত্তার জোরে
আমার অন্তিম যাত্রা অতিক্রমি সুমেরুর বাধা,
হয় যেন নন্দনে সমাধা,
যেখানে প্রতীক্ষা রত সুরসুন্দরীরা
সুকৃতির পুরস্কারে পাত্রে ঢেলে অমৃত মদিরা,
নীবিবন্ধ খুলে
শুয়ে আছে স্বপ্নাবিষ্ট কল্পতরুমূলে।

অথচ এই প্রার্থনাযুক্ত ঈষৎ শ্লেষের অনুরণন স্পষ্ট। কেন না সুধীন্দ্রনাথের মতো বিদগ্ধ কবির পক্ষে পূর্বপুরুষের মতো অগ্রজের অটল বিশ্বাসে নির্ভর করে থাকা সত্যিই আর সম্ভব নয়। নয় এই কারণেই যে আধুনিক য়ুরোপীয় সাহিত্য তিনি ব্যাপক ভাবেই পড়েছেন, ডান, এলিয়ট ও ফরাসী প্রতীকী কবিদের রচনার মাধ্যমে মানুষের আদর্শগত স্বপ্নভঙ্গের কাহিনীকে তিনি জেনেছেন। সুতরা[ং] তাঁর পক্ষে মিথ্যা আশ্বাসে ভর ক'রে থাকা সম্ভব হতে পারেনি। অথচ প্রখর বিবেকবান কবি বলেই তাঁর কবিতায় যন্ত্রণার ভাষা স্প[ষ্ট] রূপ নিয়েছে। তাঁর সংবেদনশীল মনে পরবর্তীকালেও বারংবা[র] বাইরের সংঘাতের ছায়া পড়েছে 'ক্রন্দসী'র কবিতাবলীতে অন্তর্দ্বন্দ্বে[র] মূল কারণ সামাজিক প্রতিকূল পটভূমি কিন্তু সংবর্তে সমকালী[ন] বিশ্বরাজনীতির ইদানীন্তন ঘটনা ঘটনও প্রভূত পরিমাণে ছায়াপা[ত] করেছে। কবির জিজ্ঞাসা :

'কে জবাব দেবে নিখিল সর্বনাশ
কোন অবরোহী পাতকের শাস্তিতে ?'

বিষ্ণু দে তার সমাজ-সচেতন কবিতায় গোড়ার দিকে সুধীন্দ্রনাথের মতোই সংশয়বাদী। সুধীন্দ্রনাথের মতো তাঁরাও মনন সাধনায় সমকালীন ইংরেজি ও য়ুরোপীয় সাহিত্যের প্রভাব বিস্তর। বর্তমান জগৎ নানা সমস্যায় ভারাক্রান্ত, সমসাময়িক পরিপ্রেক্ষা কাব্য সৃষ্টির অন্তরায়, জীবনে বৈচিত্র্য এবং সরসতা অনুপস্থিত—অতএব এ সবের প্রতিক্রিয়া কবিতায়ও থাকবেই এ রকম একটা যুক্তি, এক সময়ে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে, কোনো-কোনো কবিগোষ্ঠীর পক্ষ থেকে উপস্থিত করা হয়েছিল। এলিয়টের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত বিষ্ণু দের সে সময়কার কবিতাবলীতে তাই অনেক কাব্যপাঠক দুর্বোধ্য স্তবকের দৃষ্টান্ত খোঁজেন। কিন্তু একথা মানতেই হবে যে, 'চোরাবালি' থেকে শুরু করে 'পূর্বলেখ' 'সন্দীপের চর' 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার' পর্যন্ত দীর্ঘকালের রচনায় বিষ্ণু দের নিরবচ্ছিন্ন অগ্রগতি সুস্পষ্ট। গোড়ার দিকে শ্লেষ ও বিদ্রূপের আধিক্য তাঁর রচনায় জটিলতা আনলেও ক্রমশই নতুনতর বক্তব্যের পটভূমিকায়, নতুন জীবনাদর্শ-জনিত সুস্থ সমাজবোধের অনুপ্রেরণায় তাঁর কবিতা আশ্চর্য রকম উপভোগ্য হতে পেরেছে। সমাজসত্তা ও ব্যক্তিসত্তা এই কবির রচনায় সমন্বিত; মানবিক মূল্যের অঙ্গীকরণও সার্থক। তাঁর কবিতায় বিদেশী প্রতীক এক সময়ে প্রভাব বিস্তার করলেও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন ও পরবর্তী রচনায় দেশী প্রতীকের প্রয়োগে তাঁর শিল্পকলা প্রভূত পরিমাণেই সার্থক। এই দিক থেকে 'সন্দীপের চরে'র 'সমুদ্র স্বাধীন' এবং 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার'এর অন্তর্ভুক্ত 'বারোমাস্যা' কবিতাটি বহু উদ্ধৃতির অপেক্ষা রাখে। শব্দবিন্যাসে, সুদক্ষ কারিগরীতে বিষ্ণু দে আধুনিক অগ্রণী কবিদের মধ্যে বিশেষ আসনে আসীন একথা মনে রাখা দরকার।

অমিয় চক্রবর্তী চির ভ্রাম্যমান কবি। তাঁর পর্যটক মনে দেশ-বিদেশের স্মৃতি একাকার হয়ে রয়েছে। এদেশের গান্ধীবাদী আদর্শের সঙ্গেও তাঁর মনের মিল আবিষ্কারও সম্ভব। কবিজনোচিত মেজাজ ও মনোভাবের দিক থেকে আধুনিক বাঙালী কবিদের মধ্যে তিনিই বোধ হয় রবীন্দ্রনাথের সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সমকালীন তাঁর রচনায় বাংলা দেশের দুর্দশার ছবি বেদনার্দ্র গভীর তুলির অনবদ্য টানে রূপময় হয়েছিল।

'পাথরে মোড়ানো হৃদয় নগর।
জন্মে না কিছু অন্ন।
এখানে তোমরা আসবে কিসের জন্য ?'

এই উক্তি তীব্র, গভীর বেদনাসঞ্জাত। পরবর্তী কালে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ভ্রমণের ফলে কবিতার উপাদানের দিক থেকেই শুধু নয় কাব্যের পটভূমির বিস্তৃতির দিক থেকেও তাঁর ক্রমবর্দ্ধমান সাফল্য লক্ষ্যণীয়। বিদেশের নানা ছবি বার-বার ভিড় করেছে তাঁর কবিতায়। যেখানেই ভ্রাম্যমান, এই জটিল যুগের বিচিত্রতার প্রসঙ্গই বার-বার তাঁর গভীর চেতনায় হানা দিয়েছে। বোমাভাঙা যুগের বেদনায় তিনি ব্যথিত কিন্তু তার প্রকাশে কোনো উচ্ছ্বাস নেই, উত্তপ্ততা নেই। সংহত নমনীয়তায় তাঁর দৃষ্টি আশ্চর্যরূপে বিচরণশীল। 'পারাপার' ও পালাবদলের' অধিকাংশ কবিতায় একথার সমর্থন মিলবে। আশ্বাসে উজ্জ্বল, সততায় গভীর তাঁর কবিতায় নানা আশ্চর্য পংক্তির ফাঁকে-ফাঁকে হঠাৎ যেন কোনো অন্য জগতের আলো বিকীর্ণ হয়, কিছুক্ষণের জন্যে দেখা দিয়েই মিলিয়ে যায়। তখন মুহূর্তের জন্যে মনে হবে তিনি মিষ্টিক কবিদেরই অন্যতম; অতলস্পর্শ ভাবুকমনের গভীরতায় তাঁর মননসাধনার সূত্র সংযোজিত।

৬

আধুনিক বাংলা কবিতা পাঠকালে এ বস্তু লক্ষ্যণীয় যে, শব্দের ব্যবহার ও ভাষাগঠনে বাঙালী কবিগোষ্ঠীর অনেকেই নিছক স্বাতন্ত্র্যেরই পরিচয় দেননি, কাব্যচর্চায় সম্পূর্ণ নতুন সম্ভাবনার দ্বারও উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। অন্ততঃ জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে ও অমিয় চক্রবর্তী নিঃসন্দেহে শব্দসম্পদ বাড়িয়ে বাংলা কাব্যের শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়েছেন। একজন কৃতী কাব্যসমালোচকের মতে: Poetry may be intended to amuse, or to ridicule, or to persuade, or to produce an effect which we feel to be more valuable than amusement and different from instruction; but primarily poetry is an exploration of the possibilities of language. এই উক্তি মেনে নিলে বলতে বাধা থাকে না যে, উপরিউক্ত কবিরা এই দিক থেকে উল্লেখযোগ্য সাফল্য-অর্জন করেছেন। সুধীন্দ্রনাথ যেমন সংস্কৃত ও সংস্কৃতঘেঁষা নানা শব্দচয়নের মাধ্যমে তাঁর কবিতার ভাষায় সার্থক বিস্তৃতি ঘটিয়েছেন, "ছন্দে শৈথিল্যের প্রশ্রয় না দিয়ে, লঘু-গুরু, দেশী-বিদেশী, এমন কি পারিভাষিক, শব্দও আচরণীয় কি না, যে অনুসন্ধান" করেছেন অন্যদিকে তেমনি সাধারণ গ্রাম্য সংসারের প্রাত্যহিক জীবনে বহু ব্যবহৃত খাঁটি বাংলা শব্দের অনেক আশ্চর্য ও নিপুণ প্রয়োগে জীবনানন্দের কাব্যের পটভূমিও সমুজ্জ্বল। শুধু তাই নয়, বিদেশী শব্দের ব্যবহারও তাঁর কাব্যে সুপ্রচুর। বিষ্ণু দে ও অমিয় চক্রবর্তীর শব্দসম্ভারও আশ্চর্যরকম চমকপ্রদ। চমকপ্রদ এই কারণেই যে এঁরা প্রায়শ মামুলী ও প্রচলিত বহু ব্যবহৃত শব্দপ্রয়োগ শুধু বর্জনই করেন নি, নতুনতর শব্দপ্রয়োগে ভাববিন্যাসে স্বাতন্ত্র্য এনেছেন। যেখানে পুরাতন শব্দ ব্যবহৃত সেখানেও মামুলী অর্থে ব্যবহৃত না হয়ে তা' ইঙ্গিতে ইশারায় বক্তব্যকে অনন্যরূপে বিকীর্ণ করছে। ফলে, আধুনিক কাব্যে এসেছে নব-নব বিস্তৃতি, ব্যাপক ও গভীর অর্থময়তা এবং ব্যঞ্জনা।

ভাষাব্যবহার ও শব্দের বিচিত্র প্রয়োগের এই পরীক্ষায় তরুণতর কবিরাও কম উৎসুক নন। বস্তুত, খুব সাম্প্রতিককালের তরুণেরাও শব্দের ব্যবহার ও ভাষাগঠন সম্পর্কে অতিমাত্রায় সজাগ। ফলে, যে তরুণ কবি সবেমাত্র কবিতা লেখা শুরু করেছেন তাঁর কবিতায়ও অতি-তরল অতি-শিথিল পংক্তিবিন্যাস নজরে পড়বে কি না সন্দেহ। যদিও বক্তব্যের দিক থেকে সে-কবিতা যতোই অস্পষ্ট হোক না কেন। তবে খুব সাম্প্রতিক কবিতার দুর্বলতা এইখানে যে, তাদের সুর ও ঢঙ একই ধরণের, অনেক সময়ই একজনের থেকে অন্যজনার রচনা আলাদা করে চিহ্নিত করা শক্ত। এই দুর্বলতা অতিক্রম করতে পারলে বাংলা কবিতার আশঙ্কার কিছু থাকবে না।

মহারাজ নন্দকুমারের বিচার

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

পঞ্চানন ঘোষাল

এইরূপ এক সাংঘাতিক অপরাধের বিচার স্বর্ণের তুলাদণ্ডে করলে চলবে না। কারণ, এখানে ঐ দণ্ডের একটু উঁচু নীচুও আমরা উপেক্ষা করতে পারি না। এইরূপ ভাবে বিচার করলে দোষী-ব্যক্তিরা সহজেই মুক্তি পাবে। এইখানে আপনাদের লৌহ মানদণ্ডের সাহায্যে এই জঘন্য অপরাধের বিচার করতে হবে। আপনারা অতীব নিরপেক্ষতার সহিত বিচার করুন এই আসামী দোষী কিংবা নির্দ্দোষী। যদি আপনাদের মন বলে ঐ ব্যক্তি একান্তরূপেই দোষী, তা'হলে ফ্যাক্টের উপর বৃথা গুরুত্ব না দেওয়াই ভালো। ফরিয়াদীসহ সাক্ষীদের চরিত্র সম্বন্ধেও আপনাদের বিবেচনা করা উচিত হবে। তবে অপরাধটি সঙ্ঘটিত হওয়ার কত দিন পরে আসামীর সোপর্দ্দীকরণ হয় তাহাও অবশ্যই বিবেচ্য। এই উভয় ঘটনার মধ্যকার সময়ের ব্যবধান কতো তা আমি আপনাদের ইতিপূর্ব্বেই বলেছি। আসামীর পদমর্যাদা ও ধনদৌলত সম্বন্ধেও আপনারা বিবেচনা করবেন। এছাড়া আসামী এ অপরাধ সম্বন্ধে একটি স্বীকারোক্তিও করেছে। এখন আপনারা বিচার করুন, সত্যই আসামী কোনও স্বীকারোক্তি করেছে কি না, এবং তিনি যদি তা করে থাকেন তা'হলে তাঁর ঐ স্বীকারোক্তির মূল্যই বা কতটুকু? আপনাদের বিবেককে জিজ্ঞাসা করুন, আপনাদের কর্ত্তব্য কি? যদি আপনাদের মন বলে যে উনি নির্দ্দোষী তা'হলে আপনারা নিশ্চয়ই ওঁকে মুক্তি দেবেন। কিন্তু যদি আপনারা মনে-প্রাণে বুঝেন তিনি দোষী, তা'হলে আপনারা যেন কিছুতেই কর্ত্তব্যভ্রষ্ট না হন।

পনেরই জুন এই মামলার সাক্ষ্য সাবুত গ্রহণের কার্য্য শেষ হয়! ঐদিন জুরিগণকে সওয়াল বুঝানোর কাযও শেষ করা হয়েছিল। জুরিগণ মাত্র এক ঘণ্টা পরে ফিরে এসে রায় দেন যে, আসামী একান্তরূপেই দোষী। জুরিগণের রায়ে আসামীর প্রতি কোনও দয়া দেখানোর সুপারিশ না করাও তাৎপর্য্যপূর্ণ ছিল। জুরিগণ অভিমত জানানো মাত্র প্রধান বিচারপতি আর একটুখানিও বিলম্ব না করে মহারাজ নন্দকুমারের প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়েছিলেন।

ঐ সময় কলিকাতার য়ুরোপীয় এবং ভারতীয় নাগরিকদের কেহই একাকী বা যৌথভাবে তৎকালীন গভর্ণমেণ্টের নিকট মহারাজ নন্দকুমারের মৃত্যুদণ্ড মকুব করার জন্য কোনও আবেদন পেশ করেন নি। মহারাজের এটর্নী মিঃ ফেরার কলিকাতার য়ুরোপীয় নাগরিকদের এইরূপ এক আবেদন পেশ করার জন্য বারে বারে অনুরোধ করেছিলেন, কিন্তু তাতে স্বভাবতঃই তাঁরা কোনও সাড়া দেননি। অন্য দিকে ভারতীয় নাগরিকদের ধারণা হয়েছিল যে, এইরূপ কোনও আবেদন হেষ্টিংসের গভর্ণমেণ্টের নিকট পেশ করা নিরর্থক। সম্ভবতঃ এই জন্যই এইরূপ কোনও আবেদন নিবেদন সরকারে পাঠাতে তাঁরা সাহসী হননি। এ ছাড়া তৎকালীন কলিকাতার ইংরাজ-আশ্রয়ী বহু নাগরিকই ছিল স্বার্থপর, যো হুকুমের দল।

মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসীর হুকুম কলিকাতা শহরে প্রচার হওয়া মাত্র আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা নির্ব্বিশেষে শহরবাসিগণ শোকাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। সহানুভূতিশীল শহরবাসীদের ভবিষ্যৎ আচরণ সম্বন্ধেও নানারূপ গুজব রটতে থাকে, এমন কথাও উঠে যে মহারাজ বধ্যস্থলে এসে সমবেত জনতার নিকট একটা উত্তেজনাপূর্ণ ভাষণ দেবেন।

[এই সময় বহুবিষয়ে ভারতে প্রাচীনকালীন রীতি-নীতি প্রচলিত ছিল। এই সকল রীতি-নীতি অনুযায়ী ঐ সময় সর্ব্বসমক্ষে প্রকাশ্য এক স্থানে ফাঁসী দেওয়ার কার্য্য সমাধা করা হতো। নন্দকুমারের ফাঁসী এই কারণে এক প্রকাশ্য স্থানে সমাধা করা হয়েছিল কি? এ-ছাড়া জনসাধারণের নিকট মহারাজকে সর্ব্বসমক্ষে হেয় করারও এক ইচ্ছা কর্ত্তৃপক্ষের ছিল ব'লে মনে হয়।]

এই সকল সংবাদ শুনে কলিকাতার সেরিফ ম্যাকবেরী সাহেব ফাঁসীর পূর্ব্ব এবং পরদিন মহারাজ নন্দকুমারের সঙ্গে দেখা করে কর্ত্তৃপক্ষের নিকট তৎসম্পর্কে এক রিপোর্ট পেশ করেন। ঐ রিপোর্টের একটি বাঙলা তর্জ্জমা নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো।

৪ঠা আগষ্ট, শুক্রবার সন্ধ্যাকালে আমি মহারাজের সঙ্গে দেখা করি। আমি তাঁর কক্ষে প্রবেশ করা মাত্র তিনি দাঁড়িয়ে উঠে আমাকে অভিবাদন করেছিলেন। পরস্পর অভিবাদন গ্রহণান্তে আমরা উভয়ে ঐ কক্ষেই আসন পরিগ্রহণ করলাম। মহারাজ আমার সহিত অতীব স্বাভাবিকতার সহিত কথাবার্ত্তা বলেছিলেন। তাঁর আচরণের মধ্যে সকল সময়ই একটি নির্লিপ্ততার ভাব বিরাজ করছিল। তিনি এমন ভাবে আমার সঙ্গে কথা কইছিলেন, যেন ফাঁসীর হুকুম সম্বন্ধে তখনও পর্য্যন্ত তিনি অবহিত হতে পারেন নি! এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হলে তিনি বলেছিলেন, তিনি একজন প্রকৃত হিন্দু-বিধায় জীবন-মৃত্যু সম্বন্ধে দ্বিধাহীন। কর্ম্মধারা তিনি এই অন্যায় বিচার প্রহসন রোধ করার জন্য যথেষ্ট শ্রম করেছিলেন। কিন্তু এই সম্পর্কে তাঁর কোনও প্রচেষ্টাই ফলবতী হয়নি। সম্ভবতঃ

বৃহত্তর মঙ্গলের জন্য এবংবিধ আত্মবলিদানের প্রয়োজন হয়েছে। তিনি কথাবার্তার মধ্যে উদাত্ত কণ্ঠে আমাকে নিম্নোক্ত-রূপ এক প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন। ঐ প্রতিশ্রুতির যথাযথ অনুবাদ আমি নিম্নে উদ্ধৃত করলাম।

'আমি কর্ম্ম যখন করেছি, তখন এ জন্য আর আমি দায়ী নই। এই জন্য এরূপ অঘটন ঈশ্বরেরই অভিপ্রেত ব'লে আমি মনে করি, এই একই কারণে দেশবাসীকে এই বিচারের বিরুদ্ধে আমি উত্তেজিত করবো না। এছাড়া এ দেশে গণচিত্ত এখনও প্রস্তুত হয়নি। বহু দিনের উৎপীড়নে আজ তারা এমনি মৃতপ্রায় যে, তারা চেষ্টা করলেও আজ আর আমাকে রক্ষা করতে পারবে না। মিথ্যা মিথ্যা তাদের আমি বিপদে ফেলতেও চাই না। এই সম্পর্কে গভর্ণমেণ্ট নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। আমি একজন সদ্ ব্রাহ্মণ বিধায় মিথ্যা কথা আমি কোনও দিনই বলিনি। আজও আমি তা বলছি না।'

আমি মহারাজের সহিত আমার ব্যক্তিগত দোভাষীর সাহায্যে কথাবার্ত্তা কহিতেছিলাম। এই ব্যাপারে মহারাজের মনের শান্তি ব্যাহত করা আমার অভিপ্রেত ছিল না। আমি এই জন্য দোভাষীর মারফৎ তাঁকে বললাম, আমি আপনাকে আমার আন্তরিক সম্মান ও শুভেচ্ছা জানাতে এসেছি। 'আমি আমার পদ অনুযায়ী কেবল মাত্র আমার করণীয় কার্য্যই করতে এসেছি। ব্যক্তিগত ভাবে এই সব ব্যাপারে আমি কোন অংশই গ্রহণ করছি না। ঐ নিদারুণ ঘটনার দিন প্রয়োজন মত যথাসম্ভব আপনাকে আরেস দেবার জন্য আমার লোকজনদের আমি নির্দ্দেশ প্রদান করেছি। ঐ দিন প্রত্যূষে আপনার মনের প্রতিটি ইচ্ছাই আমি পূরণ করবো। আপনি আপনার নিজের পাল্কিতে নিজের ভৃত্যদের সমভিব্যাহারে বধ্যস্থানে যেতে পারবেন। এ-ছাড়া যদি কোনও বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে আপনি শেষ দেখা করতে চান তো তাদেরও আপনার নিকট থাকবার জন্য আমরা নির্দ্দেশ দিতে রাজি আছি। এঁরা আপনার নিকট এলে ভবিষ্যতে তাঁদের যে কোনও প্রকার অসুবিধাতে পড়তে হবে না, এ সম্বন্ধেও আমি আপনাকে নিশ্চয়তা দিতে পারি।' আমার এই সকল আশ্বাসবাণী ধীর ভাবে শুনে মহারাজ নন্দকুমার এ জন্য আমাকে ধন্যবাদ জানালেন, তার পর একটু নড়ে বসে আমাকে আশস্ত করে বললেন, 'আপনার শুভেচ্ছার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ! সুখের কথা, আপনার মত কয় জন ধার্ম্মিক ইংরাজও এদেশে এসেছেন। এই জন্য কোম্পানীর রাজত্ব এ দেশে বহুদিন কায়েম থাকবে। আশা করি, আমার ব্যক্তিগত কাযের জন্য আমার পরিবারবর্গের কোনও বিপদ হবে না। আপনি দয়া করে জেনারেল মনসন, কর্ণেল মনসন এবং মিঃ ফ্রানসিসকে আমার শুভেচ্ছা জানাতে ভুলবেন না। তাঁরা যেন আমার পুত্র রাজা গুরুদাসকে আমার শত্রুদের রোষ-বহ্নি থেকে রক্ষা করেন। রাজা গুরুদাসকে ব্রাহ্মণ সমাজ সহ সমগ্র হিন্দু সমাজের নেতারূপে তাঁদের সহায়তা করবার জন্য আমি ইতিপূর্ব্বেই নির্দ্দেশ দিয়াছি। এক্ষণে সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের অভিপ্রেত মাথা পেতে নিতে আমি নিজেকে প্রস্তুত করেছি'।

মহারাজ নন্দকুমারের মনোবল আমাকে সত্য সত্যই মুগ্ধ করেছিল। একটি ক্ষণের জন্য তাঁকে আমি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলতে শুনিনি। তাঁর গলার স্বর একটু মাত্রও অবিকৃত হতে আমি দেখলাম না। তাঁর এই অবিচলিত ভাবের জন্য একজন ইংরাজরূপে আমি অস্বস্তি অনুভব করছিলাম। এই জন্য আর একটুক্ষণও তাঁর কাছে আমি তিষ্ঠাতে পারিনি। আমি দ্রুত পদসঞ্চারে নীচে নেমে এসে জেলারের মুখে শুনলাম যে, আমার আগমনের পূর্ব্বে মহারাজের জামাতা রাধাকুমার এবং কয়জন বন্ধুবান্ধব তাঁর সঙ্গে দেখা করে গিয়েছে। ঐ সময় এই একই রূপ অবিচলিতের সহিত তিনি তাঁদের সহিত কথাবার্ত্তা বলেছেন। এর পর তাঁরা চলে গেলে প্রতিদিনের মত এইদিনও তিনি নিয়মিত হিসাব পত্র পরীক্ষা করেছেন। অবস্থা দৃষ্টে প্রতীত হচ্ছিল, কল্য যে তাঁর ফাঁসী হবে তা বুঝি তিনি জানেন না। এর পর একটি খাতাতে অনেকক্ষণ পর্যন্ত মহারাজ কিছু বিবরণও লিখে ফেলছিলেন। ইহা তাঁর মামলা সম্পর্কীয় কোনও বিবরণ কি না তা ঐ জেলার তখনও পর্য্যন্ত দেখেন নি। জেলারের কথায় আমার আশঙ্কা হলো, হয়তো পরদিন প্রত্যূষে ফাঁসীর পূর্ব্বেই তিনি আত্মহত্যার দ্বারা মৃত্যু বরণ করবেন। তবে এই আশঙ্কার বিশেষ কোনও হেতু ছিল না, কারণ মহারাজ আমাকে কথা দিয়েছিলেন যে এই ধর্ম্ম-বিরোধী কার্য্য তিনি কখনও করবেন না।

এর পর ৫ই যে আমাকে সাতটার সময় সংবাদ দেওয়া হলো যে, জেলেতে ফাঁসীর জন্য যা কিছু প্রস্তুতি তা সুসম্পন্ন করা হয়েছে। আমি এর পর রওনা হয়ে ঠিক সাড়ে সাতটায় জেলে এসে উপস্থিত হই। এই সময় বহু নিম্ন-শ্রেণীর নাগরিক ও তাঁর অনুগত প্রজাবৃন্দ ও ভৃত্যগণ তাঁর সঙ্গে শেষ দেখা করে আর্ত্তনাদ করতে করতে ফিরে যাচ্ছিল। এই মর্ম্মন্তুদ দৃশ্য আমাকে কিছুক্ষণের জন্য অভিভূত করে ফেলেছিল। আমার আগমন বার্ত্তা শুনা মাত্র মহারাজ নন্দকুমার নীচে নেমে প্রাঙ্গণে আমার সঙ্গে দেখা করলেন। এর পর আমরা উভয়ে জেলারের কক্ষে এসে উপবেশন করলাম। মহারাজকে এই সময়েও আমি কিছুমাত্র শঙ্কিত বা চিন্তিত দেখলাম না। তিনি পূর্ব্বের মতই হাসিমুখে আমাদের অভিবাদন জানিয়েছিলেন। এই সময় এক ব্যক্তিকে ঘড়ির কাঁটার দিকে লক্ষ্য করতে দেখে মহারাজ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন 'ওঃ, তাহলে সময় হয়েছে।' ঠিক আছে, আমি প্রস্তুত; এর পর নিকটে অপেক্ষমান তিনজন ব্রাহ্মণের প্রতি তিনি ফিরে তাকালেন। এই ব্রাহ্মণদের উপর তাঁর মৃতদেহ গ্রহণের ভার অর্পিত হয়েছিল। মহারাজ সাদরে এই ব্রাহ্মণদের আলিঙ্গন করে তাঁদের সংকার কার্য্য সম্বন্ধে উপদেশ দিচ্ছিলেন। এই ব্রাহ্মণত্রয় হতবিহ্বল ও শোকাতুর হয়ে উঠলেও মহারাজ নন্দকুমারকে এই সময় একটুমাত্রও অপ্রকৃতিস্থ হতে দেখা যায় নি!

[যে কয়েদখানাটিতে মহারাজ নন্দকুমারকে বিচারকালে আটক রাখা হয়েছিল উহার অবস্থান ছিল বর্ত্তমান লালবাজারে বা উহার নিকট এক স্থানে। তবে একটি পত্র হতে জানা যায় যে, লালবাজার হতে বহু পাল্কিযুক্ত এক প্রশেসন সহযোগে তাঁকে বধ্য স্থানে আনয়ন করা হয়েছিল। সাধারণতঃ বলা হয়ে থাকে যে, বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলের ভবনের একটি কক্ষে মহারাজ নন্দকুমারকে আটকে রাখা হয়েছিল। কিন্তু ঐ লালবাজার স্থানটি বর্ত্তমান কালীন লালবাজার ভবন কি না তাহা বিবেচ্য। আমার মতে বর্ত্তমান লালবাজারেরই এক স্থানে তাঁকে আটক রাখা হয়েছিল।]

এর পর আমরা ধীরে ধীরে জেলের গেটে এলে, মহারাজ তাঁ

নিজস্ব পাল্কিতে উঠে বসলেন। এই সময় ঐখানে একটি জনতাও জমা হয়েছিল। এই জনতাকে উদ্দেশ্য করে তিনি জানালেন যে, তাঁর অবর্ত্তমানে তাদের দেখাশুনার ভার তাঁর পুত্র রাজা গুরুদাসের উপর তিনি দিয়ে গেলেন। তাঁদের এই দেশে তাঁরা নির্ভয়ে বসবাস করতে পারবে।

তাঁর ভাষণে মহারাজা তাঁদের আরও জানালেন, প্রয়োজনবোধে রাজা গুরুদাস তাঁদের কল্যাণার্থে তাঁর মত মৃত্যুবরণ করতে কখনও কুণ্ঠিত হবেন না। এই কথা বলে তিনি পাল্কীবাহীদের নিজেই বধ্য-স্থানের দিকে রওনা হবার জন্য আদেশ প্রদান করলেন।

মহারাজের পাল্কীর পিছু পিছু আমি এবং আমার ডেপুটি সেরিফও নিজ নিজ পাল্কিতে বধ্যস্থলে এসে পৌঁছিলাম। বধ্যস্থলে সর্ব্বশ্রেণীর মানুষ সম্বলিত একটি বিরাট জনতা পূর্ব্ব হতেই অপেক্ষা করছিল, কিন্তু তারা কোনও প্রকার দাঙ্গাহাঙ্গামায় লিপ্ত হবার ইচ্ছা প্রকাশ না করেই সেখানে দাঁড়িয়েছিল। মহারাজ বধ্যমঞ্চের দিক মুখ করে পাল্কী থেকে নেমে সর্বপ্রথম জনতাকে কোনও প্রকারে উত্তেজিত না হ'তে নির্দেশ দিলেন।

মহারাজের এই আচরণে খুসী হয়ে আমি তাঁকে বললাম, তিনি যদি কোনও আত্মীয় বা বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে দেখা করতে চান তা'হলে আমি তাদের এখানে এখুনিই হাজির করতে পারি। প্রত্যুত্তরে মহারাজ নন্দকুমার এ জন্য হাসিমুখে আমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে উত্তর করলেন যে, এই বধ্যস্থান নিশ্চয়ই তাঁর আত্মীয়বর্গ ও বন্ধুদের সহিত দেখা করবার উপযুক্ত স্থান নয়। নিজের সামান্য তৃপ্তির জন্য অকারণে তিনি কাউকে ব্যথা প্রদান করতে ইচ্ছুক নন। তবে তাঁর শেষ ইচ্ছা এই যে, বধ্যমঞ্চে উঠে তিনি প্রার্থনারত হবেন। প্রার্থনার পরিশেষে তিনি হস্ত দ্বারা ইঙ্গিত করলে যেন তাঁকে বধ করা হয়। এই সময় আমি মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে মহারাজকে জানালাম যে, উহাতে অসুবিধা আছে; কারণ ঝুলিবার পূর্ব্বে তাঁর হস্তদ্বয় পিছনে এনে বেঁধে দেওয়া হবে। আমার এই ব্যাখ্যা শুনে মহারাজ প্রত্যুত্তরে বললেন, তাহলে আমি এই সম্পর্কে আমার পা দিয়ে ইসারা করবো। কারণ শেষবারের মত ঐ সময় আমি ঈশ্বরের নাম নেবো, এজন্য মুখে অন্য কথা বলা যাবে না। আমার পদসঞ্চালন জনিত ইঙ্গিত পাওয়া মাত্র আপনারা যেন আপনাদের যা কর্ত্তব্য পালন করেন।

এর পর নির্ভীক ভাবে ধীর পদবিক্ষেপে বধ্যমঞ্চে উঠতে উঠতে মহারাজ তাঁর মৃত দেহ গ্রহণের জন্য আনীত তিন জন ব্রাহ্মণকে দেখলেন, তাঁর মনে হচ্ছে তিনি যেন বস্ত্র পরিবর্ত্তনের জন্য পার্শ্বের কক্ষে গমন করছেন। এর পর মহারাজ আমাকে তাঁর এই অনুরোধ জানিয়ে বললেন যে, জনৈক ব্রাহ্মণ বা সৎ হিন্দু ভাই যেন তার মুখের বস্ত্রের ঠুলি পরিয়ে দেয় এবং তারাই যেন পিছন থেকে তাঁর হাত দুটো বেঁধে দেয়। মহারাজের মনোবল এমনই অটুট ছিল যে, এই করণীয় কার্য্যদ্বয় না করলেও চলতো। কিন্তু আইনের দাস আমি, তাই প্রতিটি কার্য্য আইনানুযায়ী করে যেতে আমি বাধ্য ছিলাম। যাহা হউক, এই কার্য্যদ্বয় তাঁর ইচ্ছামত জেলের একজন রাজপুত ব্রাহ্মণ সিপাহীর দ্বারাই আমি সমাধা করাই। মহারাজের মুখমণ্ডল বস্ত্রাবৃত হওয়ায় যতক্ষণ পর্যন্ত আমি স্থির ভাবে সেই দিকে চেয়েছিলাম কিন্তু ক্ষণিকের জন্য তার মুখে একটুমাত্রও উদ্বেগের চিহ্ন দেখতে পেলাম না। এর পরেরকার সকরুণ দৃশ্য আর না দেখতে পেরে আমার নিজস্ব পাল্কিতে এসে আমি শুয়ে পড়েছিলাম। ইতিমধ্যে মহারাজ নন্দকুমারও তাঁর প্রার্থনা পরিশেষে পূর্ব্বসিদ্ধান্ত অনুযায়ী পদ দ্বারা ইঙ্গিত দিয়েছিলেন এবং অকুস্থলে উপস্থিত ঘাতকও সেই ইঙ্গিত অনুযায়ী তাঁর পায়ের তলার তক্তাটি সরিয়ে নিয়ে তার দেহটি গলদেশের রশির সহিত নিম্নের কুয়ার মধ্যে নিক্ষেপ করেছিল। নির্দ্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হওয়ার পর তাঁর দেহটি উপরে উঠিয়ে এনে ঐ দেহটি তাঁর নিযুক্ত ব্রাহ্মণদের হস্তে অর্পিত হবার সময়ও আমি উপস্থিত ছিলাম। এই সময়ও তাঁর ঐ শান্তমুখে কোনও ভয়ের বা চিন্তার রেখা আমি দেখতে পাইনি। বস্তুতঃ পক্ষে এইরূপ এক নির্ভীক ব্যক্তির কথা আজও পর্য্যন্ত কোনও পুস্তকে আমি পড়িনি, কোনও বন্ধুবান্ধবের মুখে এইরূপ এক কাহিনী আমি কখনও শুনিও নি।'

তৎকালীন কলিকাতার শেরিফের লিখিত বিবরণ হতে আমরা উপরোক্ত তথ্যটুকুই শুধু জানিতে পারি। এই বিবরণটি তিনি মাদ্রাজস্থিত তাঁর জনৈক বন্ধুকে একটি পত্র লিখে জানিয়েছিলেন। কিন্তু এর পরবর্ত্তী ঘটনা আমরা নন্দকুমারের মহাপ্রয়াণের বার বৎসর পরে বৃটিশ পার্লামেণ্টে ইমপের ইমাপিচমেণ্টের সময় স্যার গিলবার্টের ভাষণ হইতে আমরা জানতে পারি। স্যার গিলবার্ট উদাত্ত ভাষায় বৃটিশ পার্লামেণ্টে সদস্যদের জানান যে, ঐ সময় সমবেত জনতা বিশ্বাস করতেই পারেনি যে সত্য সত্যই মহারাজ নন্দকুমারের মত একজন নিষ্পাপ মহাপুরুষকে ফাঁসী দেওয়া হবে! কিন্তু যখন তাঁদের চক্ষের সমুখে সত্যসত্যই তাঁদের প্রিয় মহারাজকে নৃশংসভাবে ঐরূপে হত্যা করা হলো, তখন তারা অনুশোচনায় অতিষ্ঠ হয়ে উঠে তারস্বরে আর্ত্তনাদ করতে করতে চতুর্দ্দিকে ছুটাছুটি করতে সুরু করে দিল। এদের মধ্যে বহু ধর্ম্মপ্রাণ মানুষ এই এই জঘন্য অত্যাচার সম্বলিত দৃশ্য দেখা জনিত পাপ ক্ষালনের জন্য নিকটবর্ত্তী গঙ্গার জলে অবতরণ করে কথঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্ত করেছিল। এই সময় ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ হতে দূরে থাকবার জন্য এই অপবিত্রীকৃত নগরী ছেড়ে মানুষ দলে দলে গ্রামাঞ্চলে চলে গিয়েছিল।

উপরোক্ত ঘটনা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষদর্শী স্যার গিলবার্ট এবং সেরিফ ম্যাকরী সাহেব যে বিবরণ দিয়েছেন তা সর্ব্বৈব সত্য ব'লে আমি মনে করি। বৃটিশ পার্লামেণ্টে ইম্পের ইম্পিচমেণ্টের চুয়াল্ল বৎসর পরে মেকলে সাহেব যে বিবরণ দিয়েছেন তার সবটা বরং বিশ্বাস করা যেতে পারে না। এই সম্বন্ধে ইম্পের পুত্র তার স্মারকলিপিতে তার পিতার দোষ ক্ষালন করবার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর মতে মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসীর সময় আশানুযায়ী জনসমাগম হয় নি। এই কারণস্বরূপ তিনি লিখেছেন যে, হয়তো তিনি শহরে খুব বেশী জনপ্রিয় ছিলেন না। তবে তিনি তাঁর ডাইরী বইতে একথাও স্বীকার করেছেন যে সম্ভবতঃ বহু নাগরিকগণ ধর্ম্মীয় প্রতিবন্ধকতার জন্য এ করুণ দৃশ্য দেখতে নারাজ ছিল। তাই তাদের অনেকেই ঐ বধ্যস্থলে উপস্থিত থাকার কথা চিন্তাও করেনি। তবে এ কথাও সত্য যে, বহু য়ুরোপীয় এই বিচারের পর প্রধান বিচারপতি ইমপেকে ধন্যবাদ দেবার জন্য সমবেত হয়েছিল। এঁদের মধ্যে কয়েকজন ভারতীয় কোয়াক আইনজীবী এবং স্বার্থান্ধ ব্যবসায়ীও ছিলেন। এঁরা প্রকাশ্য স্থানে টাঙিয়ে রাখবার

জন্ত তাঁর একটি প্রতিকৃতি আঁকতে দিতেও তাঁকে রাজী করেছিল। আমার যতদূর মনে পড়ে বর্ত্তমান টাউন হলে তাঁর একটি তৈলচিত্র কিছুকাল পূর্ব্বে আমি টাঙানো আছে দেখেছিলাম। কিন্তু এই কতিপয় স্বার্থান্ধ বো-হজুরের দলের মনোবৃত্তি হতে তৎকালীন কলিকাতার অসংখ্য নাগরিকদের মানসিক অবস্থার বিচার করা চলে না। এই অন্যায় বিচারের জন্ত কলিকাতার বহু য়ুরোপীয়ও যে অখুশী ছিলেন, তা'ও নিশ্চিতরূপে বলা যেতে পারে। এই সম্পর্কে ১৭৮১ সালে জুন মাসে মহামতি হিকির বাঙলা গেজেটে প্রকাশিত একটি কার্টুন কাহিনীর প্রকাশন হতে ইহা বুঝা যায়। ইহার নাম দেওয়া হয়েছিল 'এরা সকলেই অন্যায়ী'। ইহাতে প্রধান বিচারপতি সহ প্রত্যেক জজ মুখ্য-জুরী, অনাহু জুরী এবং তৎসহ গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেণ হেষ্টিংসকে গালি দেওয়া হয়েছিল। ইহাতে মহারাজ নন্দকুমারের আত্মাকে দিয়ে বহু প্রকৃত তথ্য প্রকাশ করা হয়েছিল। এই সম্পর্কে হিকি হেষ্টিংসকে প্রাণ্ড মোগল বলে উপহাসও করেছিলেন।

এক্ষণে নন্দকুমারের বিচারক চার জন জজের কলিকাতা বাসস্থান সম্বন্ধে আমি যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করবো। মিঃ জাসটিস হাইড এখন যেখানে টাউন হল অবস্থিত সেইখানের একটি বাড়ীতে বাস করতেন। জজ ল্যামষ্টায়ার সাহেব ফ্রি স্কুল ষ্ট্রীটের একটি বাটীতে অবস্থান করতেন। মিসেস কে-এর মতে জজ শ্যাব আর চেম্বার ভবানীপুরবাসী ছিলেন। প্রধান বিচারপতি ইলিজা ইমপে মিডিলটন রো'র রোমান ক্যাথলিক চর্চ্চের পিছনে বাস করতেন। এক্ষণে এই বাড়ীটি একটি কনভেন্টরূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এঁর বাটীর অনতিদূরের রাস্তাটি তাঁর পরবর্ত্তী এক প্রধান বিচারপতির নামানুসারে পরে পার্ক ষ্ট্রীট রাখা হয়েছে।

জজ লেম্যাসটায়ার ১৭৭৭ সালে নভেম্বর এবং জজ হাইড ১৭৯৬ সালে জুলাই মাসে মৃত্যুবরণ করেন। এঁদের উভয়কেই সাউথ পার্ক ষ্ট্রীট কবরখানায় সমাধিস্থ করা হয়েছে। জজ চেম্বারস ১৮০৩ সালে প্যারিসে মারা যান। জজ ইমপে ১৮০১ খৃষ্টাব্দে সাতাত্তর বৎসর বয়সে ইংলণ্ডে মারা যান। সেকলে ও নন্দকুমারের কল্যাণে এঁদের পরবর্ত্তীকালীন প্রধান বিচারপতিদের নাম কেহ না জানলেও ইমপের নাম আজ দেশে বিদেশে সকলেই জানে।

এক্ষণে মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসী কলিকাতার কোন স্থানে হয়েছিল, এই তথ্যটি জানবার জন্ত ভারতবাসী মাত্রেই আগ্রহ প্রকাশ করে থাকেন। কলকাতার এই নিদারুণ স্থানটির অবস্থান সম্বন্ধে আজ কোন জনশ্রুতিও শুনা যায় না। মাত্র কয়েক পুরুষের মধ্যে এইরূপ এক ঘটনার স্মৃতি ভুলে যাওয়াও সম্ভব নয়। আমার মতে মহারাজকে গঙ্গার নিকট এমন এক স্থানে ফাঁসী দেওয়া হয়, যেখানকার স্থানীয় বাসিন্দাদের তৎকালীন শাসকদের প্রয়োজনে অন্যত্র সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমি কয়েকটি তথ্য হতে অবগত হয়েছি যে, এক্ষণে যেখানে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল সৌধটি অবস্থিত সেইখানেই মহারাজ নন্দকুমারের জীবনাবসান ঘটেছিল। পরবর্ত্তীকালে ঐখানকার স্থানীয় অধিবাসীদের অন্যত্র সরিয়ে দেওয়ায় আজ আর কেহ ঐ স্থানটি দেখিয়ে দিতে পারে না। কেহ কেহ বলেন যে, কালীঘাটের ব্রিজের নিকট মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসী হয়েছিল, কিন্তু সাক্ষ্য-প্রমাণ থেকে আমি জেনেছি যে ইহা আদপেই সত্য নহে। বেভারেণ্ড লেলং এর বিবরণ অনুযায়ী কুলীবাজার এবং হেষ্টিংস ব্রিজের মধ্যবর্ত্তী গঙ্গার নিকটবর্ত্তী এক স্থানে নন্দকুমারের জন্ত বিশেষরূপে নির্ম্মিত এই বধ্যমঞ্চটি স্থাপিত হয়েছিল।

মহারাজ নন্দকুমারের বিচারক জজ ও জুরী এবং তাঁর ইংরাজ ফরিয়াদিদের নামে আজ কোলকাতায় বহু পার্ক ও পথ দেখা যায়, কিন্তু আমাদের তৎকালীন অহিংসবাদী নির্ভীক জননেতা মহারাজ নন্দকুমারের নামে কোনও প্রতিষ্ঠান আছে কি না তা আমি জানি না। বৃহত্তর ক্ষেত্রে জনকল্যাণের কল্যাণ করার অপরাধে একদিন জগতের একজন অন্যতম ধর্মগুরু ভগবান যিশু খৃষ্টকেও এমনি ভাবে বিচারের প্রহসনের পর হত্যা করা হয়েছিল। সেই তুলনায় এক ক্ষুদ্রতর ক্ষেত্রে জনগণের চেষ্টা করার জন্ত তথাকথিত অপরাধে অনুরূপ ভাবেতে মহারাজ নন্দকুমারকেও বিচার প্রহসনের সাহায্যে হত্যা করা হয়েছিল।

[মহারাজ নন্দকুমারের একজন বংশধরকে আমি জানি। ইনি হচ্ছেন ভট্টপল্লীবাসী জগন্নাথ রায়। কিছুকাল পূর্ব্বে ইনি কলিকাতা য়ুনিভার্সিটীর কণ্ট্রোলার আফিসের হেড্ ক্লার্ক ছিলেন।]

এই নির্লজ্জ বিচার যে কত দূর জঘন্য ছিল, তা মহামতি হিকি তাঁর বাংলা গেজেটে [XXXIX Oct. 1781] প্রকাশ করেছিলেন। এই হিকির একটি স্মৃতিরক্ষার আয়োজন এদেশে হওয়া উচিত ছিল। আমি এই সম্পর্কে হিকির অভিমতের কিছু অংশ নিয়ে উদ্ধৃত করে বর্ত্তমান প্রবন্ধ শেষ করলাম। পরে আমি মহারাজ নন্দকুমার নামক পৃথক এক গ্রন্থে এই সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করবো।

"সামান্ত মাত্র জ্ঞান-বুদ্ধি-সম্পন্ন সভ্যমনা মানুষই স্বীকার করবে যে ১৭৫৭ সালে কলোনেল ক্লাইভ পরিচালিত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী দ্বারা জুয়াচুরির উদ্দেশে জগতের এক জঘন্যতম জালিয়াতীর কার্য্য সমাধা করা হয়। 'ট্রিটি' আখ্যাধারী এই জাল দলিলটিতে এ্যাডমিরাল ওয়াটসনের সহি জাল করে ভারতীয় বণিক উমিচাঁদকে তাঁরা ২৫০,০০০ পাউণ্ড অর্থ ঠকাতে পেরেছিলেন। শুধু তাই নয় উমিচাঁদকে যে এই ভাবে ঠকানো হয়েছে তা বাহাদুরীর সহিত তাঁকে জানানো হয়। এবং কলোনেল ক্লাইভের এই নির্লজ্জ উক্তি শুনে উমিচাঁদ তার পরিচারকদের স্কন্ধ অবলম্বন করে জ্ঞানহারা হয়ে লুটিয়ে পড়েছিলেন। আমরা প্রথমে একজন স্থানীয় বাঙ্গালী প্রধানের সহিত জাল-জুয়াচুরি করে পরে আবার তার জন্ত গর্ব্ব অনুভব করেছি। যদিও ক্লাইভের সেই অপকার্য্যই পরে উমিচাঁদের মৃত্যুর কারণ হয়েছিল। এর কিছু পরেই আমরা সহসা ইংরাজী আইনসহ ইংরাজ বিচারকদের এদেশের লোকেদের বিচারের জন্ত পাঠিয়েছি। আর সব চেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ভারতীয়দের নিকট সম্পূর্ণ অজ্ঞাত এই ব্রিটিশ আইন আমরা 'রিট্রসপেকটিভ' এফেক্ট সহ নির্লজ্জ দাম্ভিকতার সহিত এদেশে চালু করতে একটু মাত্রও ইতস্তত করি নি! এই ভারতের পক্ষে সম্পূর্ণরূপে অচল এই নব-প্রতিষ্ঠিত আইনকে রিট্রসপেক্টিভ এফেক্ট দিয়ে উহার সাহায্যে আমরা ইংলণ্ডীয় আইন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ এক মহান ভারতীয়কে ফাঁসী দিয়েছি। এমন এক পূর্ব্বকৃত অপরাধের জন্ত যে অপরাধ আমরা নিজেরাই বারে বারে এদেশে সমাধা করতে একটু-মাত্রও ইতস্ততঃ করিনি। বাংলাদেশে যে অপরাধ করার জন্ত

ক্লাইভকে ইংলণ্ডে পি'র বা লাট করা হয়েছে, সেই একই অপরাধের অজুহাতে এদেশে আমরা মহারাজ নন্দকুমারের মত ব্যক্তিকেও ফাঁসী দিয়েছি।"

এই প্রবন্ধটির' পরিশেষে আমি আমার দেশবাসীর নিকট আবেদন জানাচ্ছি যে, তাঁরা যেন কলিকাতায় হিকির মত এক মহান ইংরাজের এবং মহারাজ নন্দকুমারের মত মহাপুরুষের উপযুক্ত স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করেন, এ সম্বন্ধে যদি সহরবাসী আমার সহিত একমত হন, তাহ'লেই আমি আমার শ্রম সার্থক হয়েছে ব'লে মনে করবো। আমি আমাদের পৌরপ্রতিষ্ঠানের প্রতিটি সদস্যকে এই বিশেষ জাতীয় কর্ত্তব্য সম্বন্ধে অবহিত হবার জন্য অনুরোধ করছি।

ভারতে বৃটিশ-অধিকারের বিরুদ্ধে এই হিকিই প্রথম প্রতিবাদ জানান। এ জন্য য়ুরোপীয় বাসিন্দারা তাঁকে বহু বার প্রহার ও অপমান করেন। এ জন্য তাঁকে বারে বারে জেলেও যেতে হয়েছে। পরে এদেশ হতে তাঁকে নির্বাসিত হয়ে যেতেও হয়েছিল।

সমাপ্ত

বাল্যস্মৃতি

শ্রীচন্দ্রমোহন বক্সী

বার্দ্ধক্যে উপনীত হইয়াছি। সম্মুখে অন্ধকার, পশ্চাতে জীবনব্যাপী ভ্রান্তি, পার্শ্বে শুধু অভিযোগ। কৈফিয়ৎ ভাগ্য, নির্ভর শুধু ভগবান। অস্থিরতার মধ্যে ভাসিয়া উঠে মধুর স্মৃতি। অনেক সাধু ও সজ্জনের সংস্পর্শে আসিয়াছি। কি ফল হইয়াছে?

সে আজ অনেক দিনের কথা। ইংরাজী ১৯০৭।৮ সাল হইবে, তখন রামপুরহাটে থাকিতাম। তারাপুরের মহাতীর্থ নিকটেই। তখন সেখানে মা'র মন্দির ছাড়া ঘর-বাড়ী বিশেষ কিছু ছিল না। মন্দিরের নিকটেই মহাশ্মশান। জঙ্গলও মৃতের দেহাবশিষ্টে পরিপূর্ণ। কুকুর, শৃগাল, শকুনির আবাসস্থল। এক প্রান্তে ক্ষুদ্র একটি কুটীর। তাহাই মহাপুরুষ শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার আবাসস্থল। কখনও শ্রীশ্রীতারাক্ষ্যাপার সহিত, কখনও অপর সঙ্গীর সহিত পদব্রজে যাইতাম। সারা দিন থাকিতাম, মা'র প্রসাদ পাইতাম, শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার কার্য্যকলাপ দেখিতাম, সন্ধ্যায় ফিরিতাম। ...প্রসাদ অমৃত সমান মনে হইত, মহাশ্মশান ভীতি উৎপাদন করিত, শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপাকে অবাক হইয়া দেখিতাম। বাবা সর্ব্বদাই অন্যমনস্ক থাকিতেন, অস্ফুটে কি সব বলিতেন এবং প্রায়ই ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া থাকিতেন। একদা মাতৃদেবীসহ গিয়াছিলাম। মা'কে পদধূলি দিতে দেন নাই। শুনিলাম, স্ত্রীলোকদের পাদস্পর্শ করিতে দেন না।

একবার আরামবাগ গিয়াছিলাম। রাত্রে আহারাদির পর ...মানে গোয়ানে উঠি এবং পরদিন বৈকালে আরামবাগ পৌঁছাই। ...কায় আসিয়া রূপনারায়ণের বক্ষে ষ্টীমারে চড়িয়া ফিরিয়াছিলাম। ...খ ষ্টীমার ঘূর্ণির মধ্যে পড়িয়াছিল এবং ডেকের উপর জল ...য়াছিল। যাত্রীদের আর্ত্ত চীৎকার বহু দিন মনে ছিল। মাতৃভূমির ... এখানেই প্রথম উপলব্ধি করি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ...তন ভাইস-চ্যান্সেলর শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ...আদের বাটীর পার্শ্বে থাকিতেন। তিনি তখন এণ্ট্রান্স পরীক্ষার ... প্রস্তুত হইতেছেন। তিনি মেধাবী ছাত্র ছিলেন এবং সর্ব্বদা ...শুনা করিতেন। জ্যেষ্ঠদের সহিত তাঁহার আলোচনা আগ্রহের ...ত শুনিতাম।

১৯১১।১২ সাল হইবে। তখন বাঁকুড়া জেলা-স্কুলে পড়ি। ...ক্ত মহেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় আমাদের গণিতের শিক্ষক ছিলেন। ...-রাত্র পড়াশুনা লইয়াই থাকিতেন এবং সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করিতেন। তিনি গম্ভীর প্রকৃতির ছিলেন, হাসি তাঁহার দেখি নাই, আমরা তাঁহাকে ভয় করিতাম। কঠিন আবরণের অন্তরালে তাঁহার যে পবিত্র জীবনধারা, গভীর পাণ্ডিত্য ও ছাত্রদের প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসা ছিল, তাহা পরিণত বয়সে বুঝিতেছি। তাঁহার ভাগিনেয়দের মধ্যে কনিষ্ঠের সহিত আমাদের ঘনিষ্ঠতা ছিল। জ্যেষ্ঠ কলিকাতা ইউনিভারসিটির বর্ত্তমান ভাইসচ্যান্সলর শ্রীযুক্ত নির্ম্মলকুমার সিদ্ধান্ত মহাশয় সর্ব্বদা পড়াশুনা করিতেন, আমরা তাঁহাকে ভয় করিতাম।

সদানন্দ শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার মিত্র এক্ষণে পণ্ডিচেরী আশ্রমে সাধনায় রত। সর্ব্বজীবে তাঁহার অসীম ভালবাসার অভিব্যক্তি বাল্যেই প্রকাশ পাইয়াছিল। একদা তিনি নেতাজীর সহিত পরিচিত হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া কোন্নগর হইতে ভবানীপুর আসি। সেদিন নেতাজীর কটক যাইবার কথা। পরিচিত হইয়া তাঁহারা আলোচনায় একেবারে তন্ময় হইয়া গেলেন। ট্রেণের কথা স্মরণ নাই ভাবিয়া স্মরণ করাইয়া দিলাম। তাহার পর তিনজনে একটি ফিটন গাড়ীতে ষ্টেশন রওনা হইলাম। ষ্টেশনে ফিটন পৌঁছামাত্র কটকের ট্রেণ ছাড়িয়া দিল। আমি অপ্রস্তুত হইলাম, কিন্তু উঁহারা নির্ব্বিকার রহিলেন। ঐ ফিটনেই আমি ও নেতাজী ভবানীপুর ফিরিলাম, শিশিরকুমার কোন্নগর ফিরিয়া গেলেন।

সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তখন ভবানীপুর পদ্মপুকুরের নিকট থাকিতেন। আমরা সন্ধ্যার সময় পদ্মপুকুরের পাড়ে বসিয়া গল্প-গুজব করিতাম। অঘোর বাবু ছাত্র দেখিলেই ডাকিয়া পড়াশুনা সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন। আমাদের পড়াশুনার কথা ভাল লাগিত না। আমরা পলাইবার চেষ্টা করিতাম। তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য আমাদের বিস্ময় উৎপাদন করিলেও কিছুদিন পর আমরা বৈকালে পদ্মপুকুর যাওয়াই বন্ধ করিয়া দিলাম।

১৯১৪-১৫ সাল হইবে। প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ি। বৈকালে পদ্মপুকুর অথবা উডবার্ণ পার্কে বসিয়া গল্পগুজব করি। একদিন নেতাজী বলিলেন, পরচর্চ্চা না করিয়া এই সময় কিছু স... আলোচনা করিলে ভাল হয় না? একটি লাইব্রেরী স্থাপন ক...

সেখানে শাস্ত্রাদি আলোচনার প্রস্তাব করিলেন। আমরা রাজী হইলাম। লাইব্রেরীর জন্ত একটি ঘরের প্রয়োজন। আমরা তখন রামময় দত্ত রোডে থাকিতাম। আমাদের বাটীর পার্শ্বে শিবু নাপিতের বাড়ী ছিল। শিবু একটি ঘর ভাড়া দিবে শুনিয়া নেতাজীকে বলিলাম। নেতাজী শিবুর সহিত দেখা করিলেন। নেতাজী তখন নামকরা ছেলে হইয়া গিয়াছেন শিবু তাঁহাকে ঘর ভাড়া দিতে ভয় পাইতে লাগিল। অনুসন্ধান করিয়া যখন জানিল আমাদের সহিত "স্বদেশীওয়ালাদের" কোন সম্পর্ক নাই, আমরা শুধু ধর্ম্ম আলোচনা করিব তখন মাসিক ৭৲ টাকা ভাড়ায় একটি ছোট ঘর আমাদের দিল। নেতাজী ৪।৫ ফুট উচ্চ একটি আলমারী ও খানকয়েক পুস্তক যোগাড় করিয়া আনিলেন। আমরা সেখানে বৈকালে সমবেত হইয়া পুস্তক পাঠ ও আলোচনা করিতাম। শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীঅরবিন্দের বহু পুস্তক ইতিপূর্ব্বেই নেতাজীর পড়া ছিল। আলোচনার প্রধান অংশ তিনিই গ্রহণ করিতেন। কখনও কখনও তাঁহার অন্যান্ত স্থানের বন্ধুদের এখানে লইয়া আসিতেন। কিছুদিন পর শুনিলাম, সি আই ডি মহাশয়গণ আমাদের অনুসরণ করিতেছেন। সভ্যগণের উপস্থিতি কমিতে লাগিল। ক্রমশঃ লাইব্রেরী উঠিয়া গেল।

তখন বোধ হয় দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে আমি পড়ি। একদিন কলেজে আসিয়া শুনিলাম, পূর্ব্বদিন সন্ধ্যায় মুসলমান পাড়ায় শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের বাটীতে যে বোমা বিস্ফোরণ হইয়াছে তাহার নিকটেই আমাদের সহপাঠী শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তকে আহত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে এবং তাঁহাকে মেডিকেল কলেজ-হাসপাতালে রাখা হইয়াছে। পূর্ব্বদিন ক্লাসে তিনি খুব চিন্তিত ছিলেন। সে কারণ কাহারও কাহারও সন্দেহ থাকিলেও অধিকাংশ সহপাঠীর বিশ্বাস ছিল তিনি নির্দোষ। তিনি অক্সফোর্ড মিশন হোষ্টেলে থাকিতেন। বন্ধুদের তাঁহার সংবাদ লওয়া উচিত বিবেচনা করিয়া নেতাজীসহ আমরা ১০।১২জন সহপাঠী তাঁহাকে দেখিতে গেলাম। হাসপাতালে গিয়া শুনিলাম তিনি পুলিশ পাহারায় আছেন এবং তাঁহার সহিত দেখা করিতে গেলে পুলিশের নিকট নাম, ধাম ও তাঁহার সহিত দর্শনপ্রার্থীর কি সম্পর্ক, ইত্যাদি লিখাইতে হইবে। আমরা পুলিশের কাছে নাম-ধাম লিখাইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলাম। আমাদের নিষেধ সত্ত্বেও নেতাজী নাম-ধাম লিখাইয়া তাঁহার সহিত দেখা করিয়া আসিলেন।

নগেন্দ্রের মোকদ্দমায় স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সুবিখ্যাত রায়, বাঙ্গালার লাট সাহেবের নিকট নগেন্দ্রের স্বীকারোক্তি, লাট সাহেবের তদ্বিষয় উল্লেখ এবং এই বিষয় লইয়া খবরের কাগজের আলোচনা ও ইঙ্গিত আজ সর্ব্বজনবিদিত। এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলা প্রয়োজন মনে করি। বাল্যকাল হইতেই নগেন্দ্রের পূর্ববঙ্গের প্রতি অনুরাগ ছিল এবং এ বিষয়ে তাঁহার সহিত আমাদের অনেক আলোচনা হইয়াছিল।

নেতাজী কলেজ কামাই করিয়া মধ্যে মধ্যে বেলুড় মঠ ও দক্ষিণেশ্বর যাইতেন। দু'-এক বার তাঁহার সহিত পদব্রজে বেলুড় মঠ গিয়াছিলাম। একবার কয়েক দিন যাবৎ নেতাজী কলেজ আসিলেন না। সংবাদ লইয়া জানিলাম কয়েক দিন বাটীও যান নাই। দক্ষিণেশ্বর গিয়া থাকিবেন অনুমান করিয়া আমরা কয়েক বন্ধু পদব্রজে দক্ষিণেশ্বর গেলাম। তখন দক্ষিণেশ্বর যাওয়ার যান-বাহনের সুবিধা ছিল না। গিয়া দেখিলাম, পঞ্চবটীর তলে বেদীর উপর নেতাজী শুইয়া আছেন। অনুসন্ধানে জানিলাম, পূর্ব্বদিন হইতে কিছু আহার করেন নাই। তখন নিকটে কোন দোকান ছিল না। দূর হইতে মিষ্টান্ন আনাইয়া তাঁহাকে খাওয়াইয়া ভবানীপুর লইয়া আসিলাম।

আমরা তখন ভবানীপুর মাধব চাটুয্যের গলিতে থাকি। একদিন সন্ধ্যার সময় নেতাজী উত্তেজিত ভাবে আসিয়া আমাকে জড়াইয়া ধরিলেন ও অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। বলিলেন, স্বদেশীরা বসন্ত চাটুয্যেকে শেষ করিয়া আজ একটা কাজের মত কাজ করিয়াছে। দেখা গেল পুলিশ নেতাজীর বাটী পর্য্যন্ত ঘেরাও করিয়াছে। তখন স্থির হইল, নেতাজীকে জিজ্ঞাসা করিলে বলিবেন আমাদের বাটীতে ছিলেন। তাহার পর নেতাজী বাটী রওনা হইলেন, আমি দূরে দাঁড়াইয়া রহিলাম। নেতাজীর সুন্দর মূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহাকে কেহ বাধা দিল না। তিনি নিশ্চিন্ত চলিয়া গেলেন।

কলেজে সেদিন ধর্ম্মঘট। ওটেন সাহেব ভারতবাসিগণকে অসভ্য বলিয়াছেন। প্রতিবাদকল্পে আমরা সেদিন ক্লাসে না গিয়া কলেজের সম্মুখে দলবদ্ধ হইয়া পদচারণা করিতেছি। এমন সময় দেখা গেল হাইকোর্টের প্রাক্তন চীফ জাষ্টিস শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ক্লাসে যাইতেছেন। নেতাজী প্রমুখ কয়েকজন সহপাঠী তাঁহাকে ক্লাসে যাইতে নিষেধ করিলেন। ক্লাসে না গেলে তাঁহার পিতা অসন্তুষ্ট হইবেন বলিয়া তিনি ক্লাসে গেলেন। আমরা সে সময়ে অসন্তুষ্ট হইলেও আজ তাঁহার কথার গুরুত্ব উপলব্ধি করিতেছি।

তখন তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ি। একদিন ক্লাসের পর দ্বিতল হইতে নামিতেছি, দেখিলাম সিঁড়ির সম্মুখে নেতাজী উত্তেজিত ভাবে পদচারণা করিতেছেন। শুনিলাম ওটেন সাহেব পুনরায় গালাগালি করিয়াছেন এবং সেদিন তাঁহাকে উপযুক্ত শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত হইতেছে। দেখিতে দেখিতে আরও কয়েক জন বন্ধু আসিয়া সেখানে সমবেত হইলেন। অল্পক্ষণ পর ওটেন সাহেব নীচে আসিয়া নোটিশ বোর্ড দেখিতে লাগিলেন। এমন সময় পশ্চাৎ হইতে জনৈক বন্ধু তাঁহাকে একটা মুষ্ট্যাঘাত করিলেন। ওটেন সাহেব ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া সকলের মুখ দেখিতে লাগিলেন। হঠাৎ সকলে "মার শালাকে" বলিয়া ঘুষি ও জুতার দ্বারা প্রহার করিতে লাগিলেন। ওটেন সাহেবও ঘুষি ও লাথি মারিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি পড়িয়া গেলেন। তখনও তিনি ঘুষি ও লাথি মারিতেছিলেন। গড়াইতে গড়াইতে তিনি সিঁড়ির নিকটস্থ কমন রুমের সম্মুখে আসিয়া পড়িলেন। এমন সময় উপর হইতে গিলক্রাইষ্ট সাহেব ও তাঁহার পশ্চাতে অপর সাহেব ও বাঙ্গালী প্রফেসরগণ ছুটিয়া নামিয়া আসিলেন। তখন আক্রমণকারিগণ প্রস্থান করিলেন। নেতাজী সর্ব্বশেষে প্রস্থান করায় তাঁহার সম্মুখে যাইবার রাস্তা ছিল না। তিনি সিঁড়ির পশ্চাৎ দিয়া লাইব্রেরীর দিকে চলিয়া যান। সাত-আট জন আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে ওটেন সাহেব প্রকৃত ইংরাজের মত লড়িয়াছিলেন, একথা আজ স্বীকার করিব।

নেতাজীর সামরিক শিক্ষার বুনিয়াদ কলিকাতা ইউনিভার্সিটি কোরেই নিহিত হইয়াছিল। তিনি ২ নং প্লেটুনে ছিলেন। তাঁহা

সৈনিকের বসন্ত হওয়ায় জন্য নেতাজী সহ ২নং প্লেটুনের কতকাংশকে কিছু দিন কোয়ারানটাইনে থাকিতে হইয়াছিল এবং ইহাতে তাঁহাদের উন্নতির অসুবিধা হইয়াছিল।

কোরে থাকা কালীন প্রত্যেক সৈনিককে সপ্তাহে দুই দিন আর্মি ডোজে কুইনাইন খাইতে হইত। নেতাজীর আপত্তি সত্ত্বেও তাঁহাকে একবার কুইনাইন খাওয়ান হয়। তাহাতে সর্বাঙ্গে কাল কাল চিহ্ন (Eruption) বাহির হয়। কম্বল গায়ে দিয়া সারাদিন রৌদ্রে শুইয়া থাকেন। সন্ধ্যার সময় চিহ্নগুলি মিলাইয়া যায়। তাহার পর তাঁহাকে আর কুইনাইন খাইতে হয় নাই।

আমাদের বরাবরই ধারণা ছিল, নেতাজী সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিবেন। বিলাত হইতে ফিরিবার পরই তাঁহার সহিত দেখা হয় ও চার-পাঁচ ঘণ্টা কথাবার্ত্তা হয়। তখনও তিনি দেশের কার্য্য করিবার কথাই বলেন, কি ভাবে দেশের কার্য্য করিবেন তখনও তাহা স্থির ছিল না। ইহার পর যখনই যাইতাম শুনিতাম দেশবন্ধু তাঁহাকে ডাকাইয়া লইয়া গিয়াছেন। কয়েক দিন পর শুনিলাম তিনি কংগ্রেসের কার্য্যে যোগ দিবেন।

লোকসভার সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র একই বৎসরে দুই জায়গা হইতে এফ-আর-সি-এস পাশ করার সংবাদে বড় আনন্দ হইল। তাঁহার ম্যালেরিয়াভীতির কথা মনে পড়িল। একবার তাঁহাকে বর্দ্ধমান যাইবার কথা বলিয়াছিলাম, ম্যালেরিয়ার ভয়ে তিনি কিছুতেই যাইতে রাজী হইলেন না। তাঁহার ছিন্ন কাগজের কারবার ও একত্রে পদব্রজে আলিপুর কোর্ট যাওয়ার কথাও মনে পড়িতেছে।

শ্রীযুক্ত সুখময় চট্টোপাধ্যায়ের কালোয়াতী গানের প্রীতি মনে পড়িতেছে। বৈকালে কিং স্কোয়ারে তাঁহার গলা সাধা চলিত। পার্শ্বের বাটীর সাহেব একদিন সাবধান করিয়া দেওয়া সত্ত্বেও গান বন্ধ হইল না। তখন একদিন সাহেব সদলবলে আসিয়া আমাদের আক্রমণ করিলেন। তাঁহারা আমাদের অপেক্ষা বলবান ও মুষ্টিযুদ্ধে নিপুণ ছিল। কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর আমাদিগকে রণে ভঙ্গ দিতে হইল। সৌভাগ্যের বিষয়, নিকটেই সি-আই-ডির হেড আপিস থাকা সত্ত্বেও সাহেবরা কোন অভিযোগ করেন নাই।

সুসাহিত্যিক কাজী আবদুল আদুদের উদার মতবাদ, সম্পাদক শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন বক্সীর অন্যায়ের প্রতিবাদে দৃঢ়তা, শ্রীযুক্ত নির্ম্মল চক্রবর্ত্তীর অফুরন্ত তর্কের জাল, শ্রীযুক্ত শৈলেশ চক্রবর্ত্তীর "বিবলিওগ্রাফি" (Bibliography) কত কথাই আজ মনে হইতেছে। কত আনন্দেই দিন কাটিয়াছে। কিন্তু আজ মনে শান্তি নাই কেন?

'তুঁহু বাঁশি বজায়সি'

শেফালী দাস-রক্ষিত

ব্যাকুল বাঁশরী রাধারে পাসরি
ডাকে কি মধুর তানে।
বিহ্বলা রাধা এই-মধু সাধা
কেমনে বাধে গো পরাণে।
হৃদয় উপাড়ি নিল কে যে কাড়ি
এমনে দহিছে তারে।
এ পিরীতি কথা এই মধুরতা
কেমনে বলিবে কারে।
'বিশাখা' সখীরে ডাকে বারে বারে
তবু নাহি বলা হয়।
হৃদয় উছাসি প্রেম-জলে ভাসি
এ কি মধু-সংশয়।
বল্লরী দেহ গ্রহণ করহ
বলে যেন উদাসি।
পরাণ স'পিতে কানুরে বরিতে
কদম্বতলে আসি।
প্রেমময়ী রাধা প্রেমডোরে বাঁধা
পিরীতি এ কি গো দায়।
শ্যামের লাগিয়া পরাণ বাঁধিয়া
কাটাবে কেমনে হায়।
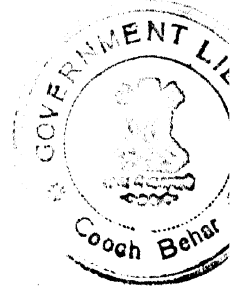
ডক্টর নবগোপাল দাস, আই, সি, এস

তিন

গায়ত্রীর সঙ্গে প্রদীপের পরিচয়ের একটা ইতিহাস আছে।

মিঃ সুপ্রকাশ কর যখন নদীয়ার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট তখন পল্লী-উন্নয়নের কাজে তিনি সপরিবারে গিয়েছিলেন কমলপুর গ্রামে। প্রদীপও সেখানে উপস্থিত ছিল কংগ্রেসের একজন সাধারণ কর্মী হিসাবে।

জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে সম্বর্দ্ধনা করবার জন্য বিরাট আয়োজন করা হয়েছিল। ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট এবং স্থানীয় কর্মচারিবৃন্দ উপস্থিত ত ছিলেনই, আর ছিল কমলপুর পল্লী-উন্নয়ন সমিতির সভ্যবৃন্দ এবং গ্রামরক্ষীর দল। তাছাড়া জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের সঙ্গে তাঁর স্ত্রীও আসছেন, এবং তিনি পুরস্কার বিতরণ করবেন, এই খবর ছড়িয়ে পড়েছিল কমলপুরের সীমানা অতিক্রম করে। ফলে প্রায় হাজারখানেক লোক সমবেত হয়েছিল স্কুলের খেলার মাঠে।

উদ্বোধন সঙ্গীত, সভাপতি নির্ব্বাচন এবং ইউনিয়ন বোর্ড প্রেসিডেণ্ট কর্ত্তৃক সাদর অভিনন্দনের পালা শেষ হবার পর মিঃ কর সুরু করলেন তাঁর ভাষণ। বলতে বলতে বেশ খানিকটা উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, তীব্র কণ্ঠে আক্রমণ করলেন কংগ্রেসী ভলাণ্টিয়ারদলের গুণ্ডামিকে এবং জানিয়ে দিলেন যে তিনি যত দিন জেলার অধিকর্তা আছেন তত দিন কিছুতেই বরদাস্ত করবেন না এই প্রকার অরাজকতা।

জনতার মধ্য থেকে কে একজন বলে উঠল, ওরে বাবা, এ যে শিমুলিয়ার ষাঁড়ের চেয়েও বেশী গর্জ্জন করছে দেখি!

মিঃ কর তাঁর ভাষণ বন্ধ করলেন। উচ্চকণ্ঠে বললেন, এই রাজদ্রোহী কথা কে বললে? বেরিয়ে এসো, সাহস যদি থাকে তাহলে সামনে এসে কথা ব'লো।

জনতা নীরব। ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট বললেন, স্যার, যা' হবার হয়ে গেছে, আর কোন গোলমাল হবে না। আপনি আপনার বক্তৃতাটা শেষ করে ফেলুন, তার পর মেমসাহেবকে পুরস্কারগুলো দিতে হবে যে।

মিঃ কর প্রেসিডেণ্টের অনুরোধ উপেক্ষা করে বেশ একটু তীব্র কণ্ঠেই বলে উঠলেন, যাদের একটুকু সাহস নেই তারা আবার দেশ স্বাধীন করবার জন্যে লাফালাফি করে। সরকারের উচিত এরকম রাজদ্রোহীদের প্রত্যেককে চাবকানো...

আর যাবে কোথায়? যে জনতা একটু আগেও নীরব ছিল তা' হয়ে উঠল বিক্ষুব্ধ, ঢেউ-এর মত এগিয়ে এল জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের মঞ্চের সামনে। চৌকিদার এবং পুলিশ যে কয়জন উপস্থিত ছিল তারা শশব্যস্তে ঘিরে দাঁড়াল হাকিমবাহাদুরকে।

মিঃ কর একটু ভড়কে গিয়েছিলেন বই কি। তাঁর সঙ্গে যদিও রিভলভার ছিল সেটা ব্যবহার করা যে আরো বড় মূর্খতার কাজ হবে, এই বুদ্ধিটুকু তাঁর লোপ পায়নি। তাছাড়া সঙ্গে আছে গায়ত্রী—এরকম পরিস্থিতির সঙ্গে এই তার প্রথম পরিচয়। থরথর ক'রে কাঁপছিল সে।

এমন সময় জনতার মাঝখান থেকে বেরিয়ে এল প্রদীপ। চৌকিদার পুলিশের নিষেধ উপেক্ষা করে সোজা সে এসে দাঁড়াল ম্যাজিষ্ট্রেটের মঞ্চের পুরোভাগে:—আপনারা কিছু ভাববেন না, সব শান্ত হয়ে যাবে—মৃদুকণ্ঠে এই দু'টি কথা ব'লে সে তাকাল জনতার দিকে। বলল, আপনারা মহাত্মাজীর অহিংসবাণী ভুলে যাবেন না, আজ আমাদের হাকিম যদি অন্যায় কোন কথা ব'লেও থাকেন তার প্রত্যুত্তর তাঁকে আক্রমণ করা নয়, জবাব দিতে হবে অন্য পদ্ধতিতে। তাছাড়া আপনারা দেখছেন না, এখানে একজন মহিলা বসে আছেন, আপনাদের উচিত তাঁর সামনে সংযত হয়ে থাকা, অভদ্রোচিত কোন ব্যবহার না করা।

গায়ত্রী অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখছিল ময়লা খদ্দরের ফতুয়া পরা শ্রীহীন এই ছেলেটিকে। কেমন যেন চেনা চেনা মনে হচ্ছে না? অস্ফুটকণ্ঠে তার মুখ দিয়ে বার হয়ে এল একটি মাত্র শব্দ—প্রদীপ?

কোলাহলের মধ্যে গায়ত্রীর মুখের কথা মিঃ কর শুনতে পেলেন না, প্রদীপও বোধ হয় না।

ধীরে ধীরে জনতা শান্ত হয়ে এল, যারা সম্মুখে এগিয়ে এসেছিল, তারা যথাস্থানে ফিরে গেল। প্রদীপও ভিড়ের মধ্যে কোথায় মিলিয়ে গেল।

মিঃ কর তাঁর বক্তৃতা আর শেষ করলেন না। কোনপ্রকারে পুরস্কার বিতরণ পর্ব্ব সমাপন করে সেদিনকার মত সভা ভঙ্গ হল।

ইন্‌স্‌পেক্‌শন বাংলোতে ফেরার পর গায়ত্রী তার স্বামীকে অনুরোধ জানাল, যে ছেলেটি অসম্মানের হাত থেকে তাদের বাঁচিয়েছে তার খোঁজ করতেই হবে। মিঃ কর প্রথমে রাজী হননি। কিন্তু গায়ত্রীর মিনতি-ব্যাকুল মুখখানার দিকে তাকিয়ে তিনি চৌকিদারকে পাঠালেন প্রদীপের সন্ধানে।

ঘণ্টাখানেক পরে চৌকিদারের সঙ্গে প্রদীপ এল। মিঃ কর এবং গায়ত্রী উভয়েই তাকে ডাকলেন বারান্দায়।

মিঃ করের প্রশ্নের উত্তরে বিনীত ভাবে সে জানাল যে কমলপুর তার জন্মভূমি নয়, সে থাকে কলকাতায়। বিশেষ কিছুই সে করে না, কলেজ ছাড়া অবধি। অন্যান্য প্রশ্নের উত্তরে বলল যে কংগ্রেসের একজন সাধারণ কর্মী সে। কমলপুরে এসেছে আজ হপ্তা দু'য়েক হ'ল, কংগ্রেসেরই কাজে।

মিঃ কর আগে থেকেই সন্দেহ করেছিলেন যে কংগ্রেসের সঙ্গে এই ছেলেটির সম্পর্ক আছে। প্রদীপের উত্তরে তিনি বেশ একটু গম্ভীর হয়ে রইলেন।

ওদিকে গায়ত্রী প্রদীপকে অজস্র ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে তাকে

ভয়ানক ভাবে অপ্রস্তুত এবং লজ্জিত করে তুলল। নমস্কারান্তে প্রদীপ কোনপ্রকারে সেখান থেকে ছুটে পালাল।

বেশী দূর সে এগোয়নি, হঠাৎ শুনতে পেল কে যেন তাকে ডাকছে।—বাবু, ও বাবু, একটু দাঁড়ান। তাকিয়ে দেখে সেই চৌকিদার। হাঁফাতে হাঁফাতে সে বলল, আপনাকে মেমসাহেব ডাকছেন।

—আমাকে ? কেন ? সবিস্ময়ে প্রদীপ প্রশ্ন করল।

—জানিনে, বাবু—মেমসাহেবের হুকুম আপনাকে নিয়ে যেতে হবে।

—হুকুম ? মেমসাহেবকে বলো, তাঁর হুকুম তামিল করবার সময় আমার নেই। প্রদীপ রুখে দাঁড়াল।

কাতরকণ্ঠে চৌকিদার বলল, আপনি একবারটি আসুন বাবু, নইলে আমার চাকুরী যাবে।

ম্যাজিষ্ট্রেট-গৃহিণীর এত প্রতাপ! প্রদীপ না হেসে পারল না। বলল, তোমার চাকুরী যায় এটা আমি চাই না। আচ্ছা, চলো।

মিঃ কর চলে গেছেন তাঁর সম্মানার্থে আয়োজিত এক ভোজন-সভায়। ইন্‌স্পেকশন বাংলোতে গায়ত্রী একা। অন্ধকারের মধ্যে প্রদীপ এসে দাঁড়াল সেখানে।

—আমাকে আপনি ডেকেছিলেন ? বেশ অসহিষ্ণু ভাবে প্রদীপ প্রশ্ন করল।

—ব'সো—আমাকে চিনতে পারছ না ? গায়ত্রী বলল।

চমকে উঠল প্রদীপ। কে এই মিসেস কর ? অন্ধকারে গায়ত্রীর মুখখানাও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না।

—আমি ভোলানাথ বাবুর মেয়ে গায়ত্রী, জ্যেঠামশায়, নিস্তারণ বাবু, কেমন আছেন ?

মুহূর্ত্তের মধ্যে সমস্ত কুহেলিকা গেল কেটে। এই সেই গায়ত্রী, যার সাহচর্যে সে কাটিয়েছে তার শৈশব এবং কৈশোরের সোনালি দিনগুলো। বয়সে সে প্রদীপের চেয়ে মাত্র বছরখানেকের বড়, কিন্তু ব্যবহার করেছে তার অভিভাবিকার মত। তার অত্যাচার এবং শাসন নীরবে সহ্য করেছে প্রদীপ।

—আমি কি করে জানব আই-সি-এস এর সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়েছে। স্কুল ছাড়বার পরে চলে এসেছি কলকাতায়, তার পর দশের, তোমার কোন খোঁজই করিনি।

—প্রয়োজন বোধ করোনি এই ত ?

—তা বলতে পার। সে যাক, আবার যে আমাকে ডাকলে, এর জন্ত তোমাকে জবাবদিহি করতে হবে না মিঃ করের কাছে ?

অসহিষ্ণু ভাবে গায়ত্রী জবাব দিল, সে ভাবনা তোমাকে ভাবতে হবে না প্রদীপ! আমি জিজ্ঞাসা করছি, এ পথে এলে কার বুদ্ধিতে ?

—ওঃ, আট বছর আগেকার কথা ভুলতে পারোনি বুঝি ? এখন আমি তোমার নাগালের বাইরে, গায়ত্রী—

—নাম ধরে ডাকতে লজ্জা করে না ? বয়সে আমি তোমার বড়, তাছাড়া আমার একটা মান-সম্মান আছে ত ? দিদি ব'লে ডেকো।

—তথাস্তু। তুমি যে এখন মিসেস কর সেটা ভুলে গিয়েছিলাম, অপরাধ নিয়ো না।

—তুমি ঠিক আগেরই মত অবুঝ এবং অবাধ্য রয়েছ দেখছি। গায়ত্রীদি' বলতে বুঝি সঙ্কোচ হয় ?

—সঙ্কোচ অসঙ্কোচের বালাই এখন আমার নেই। সেজন্যে লজ্জা তোমার কর্ত্তার প্রাণ রক্ষা করলাম নিজের সম্মান বিপন্ন ক'রে, তার পরিবর্ত্তে একটুকু কৃতজ্ঞতাও মিলল না।

কাতর কণ্ঠে গায়ত্রী বলল, ওঁর হয়ে আমি ত তোমাকে আমার কৃতজ্ঞতা জানিয়েছি, সেটা কি যথেষ্ট নয় ?

—না।···যাক সে কথা। এবার ব'লো কি জন্যে ডেকেছ ? আমার হাতে এতটুকু সময় নেই, তাছাড়া বড়লোক, বিশেষ করে আই-সি-এস, যাঁরা আমার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। প্রদীপ প্রস্থানোদ্যত হ'ল।

—আর একটু বসো। কত দিন পরে তোমার সঙ্গে দেখা, এই ভাবে যে দেখা হবে তা কে জানত ? দেখা যখন হয়েই গেল তখন তোমার নিজের খবরগুলো দিয়ে যাও অন্তত। গায়ত্রীর কথার মধ্যে বেজে উঠল একটা অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার সুর।

—শোন, দিদি, তোমার এবং আমার পথ সম্পূর্ণ বিভিন্ন। আমাদের মাঝখানে গড়ে উঠেছে দুর্লঙ্ঘ্য এক প্রাচীর, যা' অতিক্রম করা আমাদের উভয়ের পক্ষেই দুঃসাধ্য।

—এখান থেকে তুমি কোথায় যাবে ?

—জেনে কি লাভ হবে ? দেখছ ত' আমি তোমাকে কোন প্রশ্নই করছি না!

—সেটা তোমার মহত্ব নয়, সেটা হচ্ছে তোমার দম্ভ, তোমার গভীর ঔদাসীন্ত।

—হবে। সংক্ষেপে প্রদীপ জবাব দিল।

—নিজের কথা কিছুতেই বলবে না আমাকে ?

প্রদীপ খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বলল, যখন তুমি কিছুতেই ছাড়বে না, তাহলে বলছি।—শীগ্‌গিরই আমি যাচ্ছি যুদ্ধে, মহাত্মাজীর আহ্বানে।

—যুদ্ধে ? বল কি ? কোথায় যাচ্ছ ? বর্ম্মায় ?

—না, বর্ম্মায় যাবার সময় হয়নি এখনও। হেসে প্রদীপ বলল। আমি যাচ্ছি এই বাংলা দেশেরই অখ্যাত এক জায়গায়।

—এখানে আবার কিসের যুদ্ধ ? বিস্মিত ভাবে গায়ত্রী প্রশ্ন করল।

—এ যুদ্ধ হচ্ছে অন্যায়ের বিরুদ্ধে। তোমাদের বিরুদ্ধেও বলতে পার।

—তার মানে ?

—কথাটা বোধ হয় ঠিক হল না, তবে মিঃ কর আমাদের প্রতিপক্ষ ত বটেই!

—এবার বুঝতে পারছি। তোমরা হচ্ছ বিপ্লবী, আবার শুরু করতে চাও তোমাদের শক্তি পরীক্ষা। কিন্তু কি লাভ হবে ?

—লাভ লোকসানের চুলচেরা বিচার করে যুদ্ধ ঘোষণা করা যায় না, দিদি, অনেক সময় বিদ্রোহের নিশান তুলে ধরতে হয় নিজেদের সম্মান বাঁচাবার জন্তে। একটা কথা, মিঃ করকে বলো তাঁর বিচারশক্তি যেন তিনি হারিয়ে না ফেলেন, আজ কমলপুরে যা ঘটল তার পুনরাবৃত্তি যেন না হয় অদূর ভবিষ্যতে।

—কিন্তু তুমি কি এর মধ্যে নিজেকে না জড়ালে পারতে প্রদীপ ? এই কাজ করবার আরও কত লোক আছে। এতে কি নিতান্তই অপরিহার্য্য ?

—সে অহমিকা আমার নেই।

—তবে ?

—এর জবাব তুমি নিজেই জান। আজ আমার সময় নেই, চললাম।

—উনি শীগগিরই কলকাতায় বদলী হচ্ছেন, অর্ডারও এসে গেছে। আলিপুরে বাসা ঠিক হয়েছে, আমার সঙ্গে অবশ্য দেখা করো সেখানে।

—প্রতিশ্রুতি দিতে পারব না, দিদি। তবে ঠিকানাটা মনে রইল। প্রদীপ চলে গেল।

মেদিনীপুরে যাবার প্রাক্কালে প্রদীপের কেবলই মনে হচ্ছিল গায়ত্রীর কথা। মিঃ কর বদলী হয়ে এসেছেন কলকাতায়, স্বরাষ্ট্র দপ্তরের স্পেশাল অফিসাররূপে। প্রদীপ একবার তাঁর আলিপুরের বাংলোর পাশ দিয়ে ঘুরেও এসেছে, কিন্তু প্রবেশ করেনি।

সে স্থির করল গায়ত্রীকে একবার টেলিফোন করবে।

টেলিফোন ধরল গায়ত্রী নিজে।

—হ্যালো—

—আমি প্রদীপ কথা বলছি, গায়ত্রীদি'।

—প্রদীপ ? দিদিকে এত দিনে মনে পড়ল ?

—আমি কালই বেরিয়ে যাচ্ছি। তোমার সঙ্গে দেখা করা সম্ভব হবে না। কিছু মনে ক'রো না।

—কোথায় যাচ্ছ ? উৎকণ্ঠিত ভাবে গায়ত্রী প্রশ্ন করল।

—সেটা বলতে পারব না। যথাসময়ে জানতে পাবে।

—একবার আসবে না ?

—না, সময় নেই। টেলিফোনেই তোমাকে প্রণাম জানাচ্ছি, রাজার হোক্ দিদি ব'লে স্বীকার করেছি ত! প্রদীপের কথায় উপহাসের সুর বেজে উঠল যেন।

—ভগবানের কাছে প্রার্থনা করব সমস্ত বিপদ থেকে তিনি যেন তোমাকে রক্ষা করেন। গায়ত্রীর কণ্ঠস্বর যেন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল।

—চলি, দিদি।

টেলিফোনটার পাশে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইল গায়ত্রী। তার চেতনা হ'ল যখন অফিস থেকে ফিরলেন মিঃ কর।

—ও কি ? তুমি অন্ধকারে বসে রয়েছ যে ? মিঃ কর প্রশ্ন করলেন।

—কিছু না, শরীরটা ভাল বোধ করছি না। তোমার চা'টা আনতে বলছি বয়কে। পর্দা ঠেলে ভেতরে চলে গেল গায়ত্রী।

চার

মেদিনীপুরের পথে রওনা হ'বার আগে প্রদীপ আবার গেল ম্যাজিস্ট্রেট বাবুর কাছে, শেষ নির্দেশগুলো জেনে নিতে।

সুস্থ এবং একাগ্র মন নিয়েই যেতে পারবে আশা করেছিল। কিন্তু গোলমাল বাধাল সুমিত্রা।

সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে যাবে, এমন সময় পাশের ঘরের দরজা খুলে সুমিত্রা বাইরে এসে দাঁড়াল।

—আমাকে না ব'লেই চলে যাচ্ছ ?—সুমিত্রা অভিযোগ করল।

একটু লজ্জিত হয়ে প্রদীপ জবাব দিল, আজ বড্ড তাড়াতাড়ি আছে, সুমিত্রা। তোমার বাবার কাছে কতকগুলো উপদেশ নিতে গিয়ে দেরী হয়ে গেল—ভোরের ট্রেণেই মেদিনীপুরে ছুটতে হবে, কেন তা' ত তুমি জান।

—তাই ব'লে আমার সঙ্গে দুটো কথা বলবার সময়ও তোমার হয় না ? আমার বাবার মেয়ে আমি, তোমার কর্তব্যের পথে প্রতিবন্ধক আমি হ'ব না সেটা নিশ্চয়ই তুমি বোঝ। সুমিত্রার কণ্ঠে বেশ খানিকটা দম্ভ, আত্মপ্রত্যয়।

—তুমি তিলকে তাল ক'রে তুলছ। আচ্ছা, এসো, নীচে চলো, এখানে দাঁড়িয়ে তর্ক করার কোনই মানে হয় না।

সুমিত্রা এবং প্রদীপ একতলার একটা ছোট ঘরে, যেখানে অভ্যাগতরা এসে বসেন, ঢুকল।

প্রদীপ একটা চেয়ারে বসল, কিন্তু সুমিত্রা দাঁড়িয়ে রইল।

—দাঁড়িয়ে রইলে কেন? ব'সো না ? প্রদীপ অনুরোধ করল।

—বসলেই আবার তোমার মূল্যবান্ সময় নষ্ট হবে। তাছাড়া বিশেষ কোন বক্তব্যও নেই। শুধু তোমাকে একবার দেখতে চেয়েছিলাম।

প্রদীপ অত্যন্ত বিরক্তিবোধ করল। সে আর সব সহ্য করতে পারে, বরদাস্ত করতে পারে না এই প্রকার লুকোচুরি খেলা।

—আমাকে শুধু একবার দেখবার জন্যে তুমি আমাকে টেনে নিয়ে এলে এখানে ? সিঁড়িতে দেখাটা যথেষ্ট হয়নি বুঝি ?

সুমিত্রা আহত বোধ করল, কিন্তু সেটা গোপন করে শান্তমুখে বলল, আমি তোমাকে এখানে টেনে নিয়ে আসিনি প্রদীপ, তুমিই বললে সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলার কোন মানে হয় না।

কথাটা সত্য। প্রদীপ চুপ করে রইল। সুমিত্রাও নীরব। মিনিট পাঁচেক এইভাবে কাটবার পর প্রদীপ উঠে দাঁড়াল। বলল, আশা করি আমাকে দেখা তোমার সম্পূর্ণ হয়েছে এতক্ষণে। আমার অসংখ্য কাজ আছে, আর সময় নষ্ট করতে পারব না, চললাম।

সুমিত্রা দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। তার চোখমুখ লাল হয়ে উঠেছে, ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ছে, উদ্দীপ্ত যৌবনের হাওয়া দিয়ে সে যেন প্রদীপকে ঘিরে রাখতে চাচ্ছে।

বলল, আমি ঠিক বুঝতে পারিনে, প্রদীপ, মেয়েদের মধ্যে তুমি কি দেখতে চাও। আমার ধারণা ছিল তোমরা একদিকে যেমন চাও নারীর সৌন্দর্য্য এবং মাধুর্য্য, অন্যদিকে চাও তার তেজ, বুদ্ধি এবং জ্ঞান। তোমার মত লোকে শুধু শয্যাসঙ্গিনী চায় না, চায় সহধর্ম্মিণী, একক্রিয়াসঙ্গিনী।

—আমি কি চাই না চাই সে সব চুলচেরা বিচার করবার অবসর আমার নেই, সুমিত্রা। ছাড়ো, পথ ছাড়ো। বেশ একটু তিক্ত কণ্ঠেই প্রদীপ বলল।

সুমিত্রা সরে দাঁড়াল। লজ্জায়, অপমানে তার চোখের জলও যেন শুকিয়ে এল।

নির্দ্দিষ্ট কার্য্যক্ষেত্রে প্রদীপ পৌঁছে গেছে। তার সঙ্গে আছে জন দশ-বারো বাছাই করা কর্ম্মী। জ্যোতির্ম্ময় বাবু বলে দিয়েছেন, মহাত্মাজী শেষ বারের মত চেষ্টা করবেন বড়লাটের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে বোঝাতে যে দমননীতি অনুসরণ করে সরকার ভারতবর্ষের নর-নারীর সহায়তা পাবেন না। মহাত্মাজীর এই শেষ প্রয়াস যদি ব্যর্থ হয় তাহলে তিনি দেবেন সিগন্যাল, দেশব্যাপী অসহযোগের। এ বছরের অসহযোগ হবে আরও তীব্র, আরও ব্যাপক।

কিন্তু বড়লাটের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ মহাত্মাজীর মিলল না। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি কুইট ইণ্ডিয়া প্রস্তাব পাশ করার সঙ্গে সঙ্গেই বৃটিশ সরকার বার করলেন তাঁদের অস্ত্র, মহাত্মাজী প্রমুখ কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দকে ১৯৪২ সালের ৮ই আগষ্ট তারিখে করা হল গ্রেপ্তার।

মেদিনীপুরের অভ্যন্তরে দূর গণ্ডগ্রামে বসে প্রদীপ খবরগুলো শুনল কয়েক দিন বাদে লোকপরম্পরায়। আরও শুনল যে দেশের বিভিন্ন জায়গায় বিদ্রোহ সুরু হয়ে গেছে—বিহারে, উত্তরপ্রদেশের পূর্ব্বসীমান্তে, উড়িষ্যায়, মধ্যপ্রদেশের কোন কোন জায়গায়, সুদূর গুজরাটে।

জ্যোতির্ম্ময় বাবু প্রদীপকে বলেছিলেন যে যদি সাত দিনের মধ্যে বিপরীত কোন নির্দ্দেশ না পায় তাহলে সে যেন মহাত্মাজীর উপদেশ মত আন্দোলন সুরু করে তার নিজের এলাকায়। সেখানে তাকেই হ'তে হবে নেতা, তবে স্থানীয় কংগ্রেসের যাঁরা প্রতিনিধি তাঁদের নির্দ্দেশও যেন সে পালন করতে চেষ্টা করে সাধ্যমত।

প্রদীপের হাতে এসে পড়েছিল মহাত্মাজীর শেষ বাণীর এক কপি, কারারুদ্ধ হবার প্রাক্কালে দেশবাসীর কাছে তাঁর শেষ আবেদন। —সব সময় মনে রেখো তোমরা স্বাধীন, যদি স্বাধীনভাবে চলতে পার তাহলে কারো ক্ষমতা নেই তোমাদের পায়ে পরিয়ে দেয় পরাধীনতার শৃঙ্খল। অহিংস ভাবে আন্দোলন চালাও নির্ভয়ে, তোমাদের বিবেকের নির্দ্দেশ অনুযায়ী। জাতির সম্মানকে অক্ষুণ্ণ রেখো, তাতে যদি মৃত্যুকে বরণ করতে হয় সেও শ্রেয়ঃ।

প্রদীপ দেখল তার সহকর্ম্মীরা চঞ্চল হয়ে উঠেছে, অলস ভাবে ঘটনার গতির প্রতীক্ষায় বসে থাকতে তারা রাজী নয়। তাছাড়া চারদিক থেকে আসছে সত্যাগ্রহীদের সাফল্যের সংবাদ। কতদিন তারা চুপ করে বসে থাকবে?

সকলকে ডেকে প্রদীপ জানাল যে পরের দিন ভোরবেলায় সূর্য্য ওঠবার আগেই তারা রওনা হবে শিবগ্রামের দিকে। বৃটিশ সরকারের দাম্ভিকতার পরিচিতি, দেশের পরাধীনতার প্রতীক, শিবগ্রামের থানাই হবে তাদের লক্ষ্য।

প্রদীপ জানত এই জাতীয় অভিযানে সাফল্যলাভ করতে হলে তার পেছনে থাকা চাই সম্মিলিত জনবাহিনীর দৃঢ়তা। যথোপযুক্ত ব্যবস্থাও সে করেছিল। কিন্তু সেও অবাক হয়ে গেল যখন সে দেখল তার বাহিনীর মধ্যে রয়েছে অন্ততঃ একশত বালক-বালিকা এবং বেশ কয়েকজন বর্ষীয়সী মহিলা। তাদের মুখ আগ্রহোজ্জ্বল, নতুন প্রভাতের আশায় দীপ্যমান।

খোলামাঠের মাঝখান দিয়ে গান গাইতে গাইতে চলল এই সত্যাগ্রহীদল। তাদের সঙ্গে না আছে কোন অস্ত্র, না আছে অস্ত্রপ্রতিরোধকারী কোন আবরণ। আছে শুধু কংগ্রেসের পতাকা, আর আছে অপরিসীম নির্ভয়।

বেশীদূর তাদের এগোতে হ'ল না। দেখল, সম্মুখে সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে পুলিশের দল, রাইফল হাতে।

—খবরদার, আর এক পা'ও এগিয়ো না। এগিয়েছ ত গুলী করব। চীৎকার করে জানালেন পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট।

অগ্রগামী দল থমকে দাঁড়াল। মুহূর্ত্তের মধ্যে প্রদীপ স্থির করে নিল তার কর্ত্তব্য। মৃত্যুকে সে ভয় করে না, কিন্তু তার সঙ্গে আছে বালক-বালিকা, অশীতিপর বৃদ্ধা। বন্দুকের গুলীর আঘাত থেকে এদের বাঁচাতেই হবে।

সে একটু পিছু হঠে এল। উদ্দেশ্য, এদের সে অনুরোধ করবে ফিরে যেতে।

কিন্তু জনতা ভুল বুঝল। একজন চীৎকার করে বলে উঠল, পেছিয়ে এসো না, পেছিয়ে এসো না, আমরা ভয় পাই নি'। আরেকজন বলল, এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো—

দেখতে দেখতে শৃঙ্খলাবদ্ধ জনতা হয়ে উঠল উদ্দাম, বাঁধনছাড়া স্রোতের মত আছড়ে পড়ল সম্মুখে। প্রদীপ একবার শেষ চেষ্টা করল তাদের প্রতিরোধ করতে, কিন্তু দুর্ব্বার বন্যা তাকে ভাসিয়ে নিয়ে চলল এগিয়ে।

তারপর যা' অবশ্যম্ভাবী তা'ই ঘটল। প্রথমে পুলিশ করল গুলীবর্ষণ, সম্মুখের দু'-একজন গুলীর আঘাতে মাটিতে লুটিয়েও পড়ল, কিন্তু হাজার লোককে ঠেকানো জনকুড়ি পুলিশের পক্ষে দুঃসাধ্য—রাইফল থাকা সত্ত্বেও। জনতা অনায়াসে পুলিশের ব্যূহ ভেদ করে ছুটে চলল থানাঘরে, কয়েকজন ভেতরে গিয়ে টেনে আনল সব নথিপত্র, বাইরের উঠোনে সেগুলো স্তূপীকৃত ক'রে জ্বালাল আগুন। আরও কয়েকজন প্রস্তাব করল সমস্ত থানাটাকেই দাও পুড়িয়ে।

ততক্ষণে প্রদীপ থানাঘরে এসে পড়েছে। জনতা তখন খুবই উত্তেজিত, পুলিশের গুলীতে যে দু'জন পড়ে গিয়েছিল তাদের একজনের অবস্থা খুবই সঙ্গীন, বাঁচবে বলে ভরসা হয় না। প্রদীপ তাড়াতাড়ি তাদের পাঠিয়ে দিল নিরাপদ এক জায়গায়, স্বেচ্ছাসেবকদের তত্ত্বাবধানে।

তারপর সে চেষ্টা করল জনতাকে শান্ত করতে, কিন্তু তার প্রয়াস ব্যর্থ হ'ল। প্রতিশোধের ক্ষুধায় উন্মত্ত জনতা থানাঘরের চালায় আগুন লাগিয়ে দিল, আর কয়েকজন সমবেত কণ্ঠে সুরু করল ভাঙনের গান।

জনতার তাই এই রুদ্রমূর্ত্তি, এই সার্ব্বভৌম স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় প্রদীপ এর আগে কখনও পায়নি। নতুন এক উপলব্ধি তাকে কিছুক্ষণের জন্য স্তম্ভিত, চমৎকৃত করে রাখল।

কিন্তু বেশীক্ষণ নয়। সে বুঝতে পেরেছিল পুলিশ শীগগিরই ফিরে আসবে, একা নয়, মিলিটারি সৈন্য সঙ্গে নিয়ে, মেসিনগান সহ। দাঁড়িয়ে থেকে তাদের কাছে আত্মসমর্পণ করা হবে মূর্খতা, তাছাড়া এতগুলো প্রাণ নিয়ে খেলা করবার কোনই অধিকার নেই তার।

সে প্রস্তাব করল তারা চলে যাবে অন্যত্র, তারপর ছড়িয়ে পড়বে নানা জায়গায়, যাতে পুলিশ বা মিলিটারি তাদের সন্ধান না পায়।

থানাঘর ভস্মীভূত হবার পর জনতাও একটু শান্ত হয়েছিল, প্রদীপের উপদেশ গ্রহণ করতে তারা অস্বীকৃত হ'ল না।

ঘণ্টা দুই পরে পুলিশের সঙ্গে গুর্খা ব্যাটেলিয়ন যখন এসে পৌঁছল তখন চারিদিক নিশ্চুপ, যত দূর দেখা যায় জনমানবের চিহ্ন নেই, পড়ে আছে শুধু ভস্মের স্তূপ।

বলা বাহুল্য, সরকার ক্ষমা করলেন না। শিবগ্রামকে কেন্দ্র করে কুড়ি মাইলের মধ্যে যত বসতি ছিল সেখানে স্থাপন করা হ'ল মিলিটারী ইউনিট এবং তাদের হাতে দেওয়া হল সীমাহীন ক্ষমতা। তারপর যে অত্যাচার চলল তা' অকথ্য অবর্ণনীয়। প্রতিহিংসার লেলিহান জিহ্বার নগ্ন লোলুপতার কাহিনী বাইরের জনসাধারণের কাছে পৌঁছল অনেক দিন পরে, যখন মেদিনীপুরের উপর দিয়ে বয়ে গেছে প্রকৃতির তাণ্ডব ঝড়।

প্রদীপ তার ছত্রভঙ্গ হওয়া বাহিনীকে সমবেত করে নতুন এক অভিযানের আয়োজন করতে চেষ্টা করল, কিন্তু দেখল তা' একপ্রকার অসম্ভব। তার সহকর্মীদের অনেকেই পুলিশের কাছে ধরা পড়ে গিয়েছিল, সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় নেতৃবৃন্দও। রাজশক্তিকে এড়িয়ে মাস পাঁচেক পরে ছদ্মবেশে প্রদীপ চলে এল কলকাতায়।

পাঁচ

কলকাতায় পৌঁছে দেখল অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। কংগ্রেসের বিদ্রোহ দমন করবার পর বৃটিশ সরকার হয়ে উঠেছেন আরও অনম্র, আরও উদ্ধত। কংগ্রেসের নাম নিয়ে লোকে কোন কোন জায়গায় যে উচ্ছৃঙ্খলতার প্রকাশ দেখিয়েছিল তার অতিরঞ্জিত বর্ণনা প্রকাশিত হ'ল সরকারী দপ্তরখানা থেকে। ওদিকে কংগ্রেসের সমর্থকদের মধ্যেও অনেকে ভিড়লেন সরকারী দলে।

প্রদীপ আরও লক্ষ্য করল যে বামপন্থীদলগুলো নতুন এক জীবন লাভ করেছে। কংগ্রেসী নেতাদের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে তারা সরকারের সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলতে লাগল আগষ্ট সেপ্টেম্বরের গণ্ডগোলের জন্য সম্পূর্ণ দায়ী হচ্ছে কংগ্রেস।

চারিদিকে গোয়েন্দার ছড়াছড়ি, কাকে বিশ্বাস করবে এবং কাকে বিশ্বাস করবে না তা' নির্দ্ধারণ করা কঠিন। প্রদীপ বুঝেছিল গোয়েন্দা তার পেছনেও লেগেছে—তাকে সাবধানে গা ঢাকা দিয়ে থাকতে হবে বেশ কিছুদিন।

এক দোকান থেকে সে টেলিফোন্ করল গায়ত্রীকে। সংক্ষেপে জানাল তার সঙ্গে দেখা করা নিতান্ত প্রয়োজন। গায়ত্রী তাকে আসতে বলল অবিলম্বে, মিঃ কর অফিসে আছেন, বাড়ীতে ফিরতে বেশ দেরী হবে।

গায়ত্রী ঘরের জানালার কাছে তারই প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়েছিল। প্রদীপ আসতেই সে তাকে তার শোবার ঘরে নিয়ে গেল। চারদিক নিস্তব্ধ, টিফিনের পর বয় বেয়ারারা চলে গেছে তাদের নিজের নিজের কামরায়, প্রদীপের আগমন কারও নজরে পড়ল না।

—প্রদীপ ভাইটি, বড্ড রোগা হয়ে গেছ তুমি। সস্নেহে গায়ত্রী বলল।

—শরীরের কি অপরাধ, দিদি? এই কয় মাস যে ভাবে কেটেছে তাতে বেঁচে যে আছি, এই যথেষ্ট। কিন্তু সে সব কথা ব'লে সময় নষ্ট করতে চাইনে। তোমার কাছ থেকে কতকগুলো খবর হয়ত পাব, সেই আশায় এসেছি।

গায়ত্রী ক্ষুণ্ণ হবার ভাণ করল। বলল, অর্থাৎ এসেছ নিজের প্রয়োজনে? দিদির খোঁজ নিতে নয়।

—দিদির কাছে ভাইরা সব সময়ই আসে নিজের প্রয়োজনে। দিদিদেরই কর্ত্তব্য ভাইদের খবর নেওয়া।

—ওঃ, চমৎকার লজিক্ ত! তা' বল, তোমার কি কাজে আমি লাগতে পারি?

—তার আগে কিছু খেতে দাও, বড্ড খিদে পেয়েছে।

গায়ত্রী তাড়াতাড়ি প্লেট সাজিয়ে নিয়ে এল সন্দেশ এবং ফল। আর আনল রেফ্রিজারেটার থেকে শীতল পানীয়।

এক নিঃশ্বাসে খাবারগুলোর সদগতি ক'রে প্রদীপ বলল, আঃ, বেশ উপভোগ করা গেল! আই-সি-এস-এর গৃহিণীর সঙ্গে ভাব রাখায় লাভ আছে।

তার পর বলল, এবার আমার নিজের কথাটা বলছি। কিন্তু দেখো, মিঃ কর যেন কিছু জানতে না পারেন, কারণ আমি চাইনে তিনি আমার বা আমার বন্ধুদের গতিবিধির খবর পান। তা ছাড়া, আমি তোমার কাছে এসেছি এই খবর পেলে তোমার চারিদিকে তিনি বসাবেন কড়া পাহারা, যা ভেদ করে ভবিষ্যতে আমার পক্ষে আসা হবে সম্পূর্ণ অসম্ভব।

গায়ত্রী চুপ করে শুনল প্রদীপের কাহিনী। নতুন এক পৃথিবীর ছবি, যার সঙ্গে তার পরিচয় কত সামান্য। প্রদীপ কিন্তু পারিপার্শ্বিকের সম্মোহন কাটিয়ে উঠেছে, ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত সে দেখতে পাচ্ছে সম্পূর্ণ নির্ব্যক্তিক ভাবে। মন্ত্রমুগ্ধের মত গায়ত্রী শুনতে লাগল।

গল্প বলা শেষ হ'ল। ম্যান্টেলপিস্এর উপর স্থাপিত ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে প্রদীপ বলল, ওরে বাবা, চারটে বাজতে চলল। এবার ত তোমাদের চায়ের পালা, এখ্খুনি চাকর-বাকর এসে পড়বে। আমাকে পালাতে হবে।

গায়ত্রী বলল, ওরা পাঁচটার আগে আসে না, কারণ ওঁর ফিরতে ফিরতে ছ'টা সাড়ে ছ'টা হয়। সময় আছে, তোমার প্রশ্নগুলো এবার শুনি—

—এই দেখ, দিদি, তায় ভুলেই গিয়েছিলাম আসল উদ্দেশ্যের কথা, যে জন্যে তোমার কাছে আসা। বুঝতেই ত পারছ, আমার পক্ষে সব জায়গায় তখন যাতায়াত করা একটু মুস্কিল, তাই তোমার মাধ্যমে খবর নিতে হচ্ছে।

—বলো, কি খবর চাও।

—প্রথমত জ্যোতির্ম্ময় বাবুর খবর। তিনি কি বাইরে আছেন, না তিনিও সরকারের অতিথি?

—জ্যোতির্ম্ময় বাবু জেলে আছেন।

—এই সম্ভাবনাটাই আশা করেছিলাম। আর তাঁর মেয়ে সুমিত্রা?

—তাকেও ধরে নিয়ে গিয়েছিল, পরে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

—সরকারের বিশেষ অনুকম্পা ত'! যাক্, অটলবিহারী বাবুদের কি খবর? তাঁরা ভাল আছেন ত'।

—হ্যাঁ, তাঁরা ভালই আছেন, বন্দনাও। ব'লে গায়ত্রী একটু হাসল।

অটলবিহারীদের গায়ত্রী আগে থেকেই জানত। খানিকক্ষণ নীরব থেকে প্রদীপ বলল, আচ্ছা, দিদি, তুমি আমাকে একটা উপদেশ দাও দেখি! জ্যোতির্ময় বাবু বা অটলবিহারী বাবুর ওখানে আমার যাওয়া যুক্তিযুক্ত হবে কি?

—আমার উপদেশ যদি শুনতে চাও তাহ'লে বলব জ্যোতির্ময় বাবুর ওখানে তুমি আপাতত যেয়ো না, কারণ কংগ্রেসের সমস্ত নেতাদের বাড়ীর ওপর পুলিশের এখন কড়া নজর। তবে অটলবিহারী বাবুদের ওখানে তুমি যেতে পার, যদি তুমি মনে কর কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। তবু বলব, দিনে দুপুরে যেয়ো না।

—অটলবিহারী বাবুর ওখানে কে আমাকে পুলিশে লেলিয়ে দেবে? বন্দনা বা নবকিশোর নিশ্চয়ই নয়, আর অটলবিহারী বাবুকে এতটা নীচ আমি ভাবতে পারিনে, নিজেরই সঙ্কোচ হয়।

—আমি যাদের সংস্পর্শে এসেছি তাদের চরিত্রের নানা দিক্ দেখে মানুষের উপর বিশ্বাস আমি হারিয়ে ফেলেছি। আমার স্বামীকেও বাদ দিয়ে বলছি না। আমাকেও তুমি বিশ্বাস করো না।

—কি যে বলছ তুমি, দিদি! প্রদীপ বলল।

—এখন তুমি এসো, ভাই, বেয়ারাদের আসবার সময় হ'ল। একটা কথা, যদি তোমাকে কোন খবর দিতে হয় কোথায় তোমাকে পাব?

প্রদীপ একটু ভাবল, তারপর বলল, আপাতত অটলবিহারী বাবুর বাড়ীতেই টেলিফোন ক'রো, বন্দনাকে ডেকো, যা বলবার তাকেই ব'লো।

আলিপুরের বড় রাস্তায় এসে প্রদীপ ভাবতে লাগল এখন কি করা যায়। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসতে তখনও ঘণ্টা দুয়েক দেরী—অটলবিহারী বাবুদের বাড়ী এখন যাওয়া চলবে না।

অবশেষে সে ঢুকল ছোট একটা রেস্তঁরা ক্যাবিন-এ। চা' এবং ডিমের অমলেট সামনে নিয়ে হরেক রকমের লোক সেখানে বসে তুমুল তর্ক আলোচনা করছে। একটা টেবিলও খালি নেই, এদিকে ওদিকে দু'একটা সীট খালি আছে মাত্র। প্রদীপ তারই একটা অধিকার করে বসল, এবং অন্যান্য অতিথিদের অনুকরণ করে সেও অর্ডার দিল একপেয়ালা চা এবং ডবল ডিমের অমলেট।

গল্প করবার প্রয়াসে তারই টেবিলের অপর অতিথি বলল, এখানকার অমলেটটা কিন্তু খাসা মশায়, কি দিয়ে যে তৈরী করে বুঝতেই পারিনে—বাড়ীতে কতবার বলেছি, কিছুতেই এখানকার মত হয় না।

—আমি এই প্রথম এখানে এসেছি। প্রদীপ জবাব দিল।

—ওঃ, তাই নাকি? আপনি বুঝি এদিকে থাকেন না? আমিও অবশ্যি এই অঞ্চলের বাসিন্দা নই, আমার বাড়ী মেদিনীপুরে, তবে এদিকে প্রায়ই আমাকে যাতায়াত করতে হয়, সময় পেলেই এখানে ঢুকে পড়ি, অমলেট-এর লোভে।

বয় প্রদীপের চা' এবং অমলেট নিয়ে এল। ছোট চামচটার সাহায্যে অমলেটটা একটু ভেঙে মুখে ফেলে তার আস্বাদ গ্রহণ করে প্রদীপ বলল, সত্যি, ভারী চমৎকার তৈরী করেছে কিন্তু।

—কিছুদিন পরে আপনিও এখানকার নিয়মিত অতিথি হয়ে উঠবেন। লোকটা কিন্তু এই ক্যাবিন চালিয়েই একটা বাড়ী তৈরী করে ফেলেছে।

—বাড়ী? এত লাভ হয়? সবিস্ময়ে প্রদীপ প্রশ্ন করল।

বিচিত্র এক চক্ষুভঙ্গী করে সন্তোষ বলল, আরে মশায়, ক্যাবিনটা হচ্ছে বাইরের একটা আবরণ মাত্র। এর পেছনে আরও অনেক ব্যবসা চলে—আয় হচ্ছে সে সব ব্যবসাতে, চা আর অমলেট বিক্রি করে নয়।

এ আবার কি কথা? প্রদীপ বুঝতে পারল না, বিহ্বল ভাবে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল।

ফিসফিস করে সন্তোষ বলল, এখানে বড্ড চেঁচামেচি হচ্ছে, একটু শান্তিতে আলাপ করবার উপায় নেই। চা টা শেষ করে ফেলুন, বাইরে আসুন, বলছি আপনাকে।

প্রদীপ প্রথমে ভাবল পরচর্চ্চায় কাজ নেই, কি প্রয়োজন এই অপরিচিতের সঙ্গে বন্ধুত্ব করবার? তা'ছাড়া সে ফেরারী আসামী, একটু সন্তর্পণে তার চলাফেরা করা দরকার। কিন্তু হাতে এখনও অন্ততঃ দেড় ঘণ্টা সময় আছে, এই সময়টা কোন রকমে কাটাতে হবে ত। দোকানের বিল চুকিয়ে সন্তোষ এবং সে বাইরে চলে এল।

সন্তোষ বলল, আসুন, হাঁটা যাক। ঝিরঝির করে বেশ হাওয়া বইছে, রাস্তা ফাঁকা, হাঁটতে ভালই লাগবে। হ্যাঁ, আমার পরিচয় দেই, আমার নাম হচ্ছে সন্তোষ মুখোপাধ্যায়, এ-আর-পি-তে কাজ করি। এখন আমার অফ-ডিউটি, তাই ইউনিফর্ম্ম দেখছেন না। ভাল লাগে না সব সময় ধড়াচূড়ো পরে সং সেজে থাকতে। আপনার নাম?

প্রদীপ একটু ইতস্ততঃ করল। না, পরিচয় দেওয়া চলবে না, এ-আর-পি'র লোক, গোয়েন্দা কি না কে জানে? এর সঙ্গে না বেরুলেই বোধ হয় ভাল ছিল।

বলল, আমার নাম যতীন মজুমদার। বিশেষ কিছু করিনে, আমার এক খুড়োর কাপড়ের ব্যবসা আছে, দেখাশুনো করি।

হো হো করে হেসে উঠল সন্তোষ। বলল, দেখুন, আমার কাছে নাম এবং পরিচয় ভাঁড়াবার প্রয়োজন ছিল না আপনার। আপনি যে যতীন মজুমদার নন আমি হলফ করে বলতে পারি, আর কাপড়ের ব্যবসার সঙ্গে আপনার কোনই সংশ্রব নেই। ভয় পাবেন না, আমি পুলিশের টিকটিকি নই, তবে শার্লক হোমস এবং অ্যাগাথা ক্রিষ্টি পড়ে প্রাইভেট গোয়েন্দাগিরি একটু আধটু করে থাকি।

প্রদীপ অবাক! লোকটার দৃষ্টিশক্তিতে খুবই প্রখর বলতে হবে, কিন্তু কি করে সে বুঝল যে তার নাম যতীন মজুমদার নয়?

সন্তোষ বলে চলল, আপনার আসল নাম বলতে চান না, আমি জোর করব না, তবে আপনার জেনে রাখা ভাল যে আত্মগোপনের আর্টে আপনি এখনও ছেলেমানুষ।

তার পর বলল, আপাতত আপনাকে আমি যতীন বাবু ব'লেই ডাকব, কিন্তু ভুলে যাবেন না নিজের দেওয়া নামটা। ডাকলে সাড়া দেবেন যেন।

প্রদীপ একবার ভাবল পরিচয় গোপন না রেখে সত্যি কথাটা বলে ফেলে। কিন্তু তখনই তার মনে পড়ল সতর্কবাণী—আজকের পৃথিবীতে কাউকে বিশ্বাস করো না, প্রদীপ!

সন্তোষ বলতে লাগল, আমাদের ঐ ক্যাবিনের মালিকের কথা বলছি। ভদ্রলোকের আসল ব্যবসা হচ্ছে সন্ধ্যার অন্ধকারে। রাত্রিবেলা ওখানে আসে শাঁসালো খদ্দের, যাদের হাতে পয়সা আছে অজস্র, জীবনটাকে যারা উপভোগ করতে চায়। ওঁদের নিয়ে যান তাঁর ফ্ল্যাট-এ—সুবিধে আছে, ভদ্রলোক বিয়ে করেন নি, সেখানে আসে উদ্ভিন্নযৌবনা মেয়ে, যাদের পয়সার প্রয়োজন। দক্ষিণার এক-চতুর্থাংশ তিনি নেন, বাকীটা দেন তাদের যারা উপচার পরিবেশন করে। ইচ্ছে করলে অর্দ্ধেকটা বা তারও বেশী হয়ত নিতে পারতেন, কিন্তু ভদ্রলোকের দৃষ্টিশক্তি সুদূরপ্রসারী। তিনি জানেন যাদের নিয়ে কারবার তাদের খুসী রাখতে হবে, তারা যদি জানতে পায় যে তিনি তাদের প্রাপ্যের বেশীর ভাগটা আত্মসাৎ করছেন তাহলে হয়ত বিদ্রোহ করে বসবে। কাজেই লোভটা সম্বরণ করেন তিনি। ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার খুব ভাব আছে, আপনি যদি কোন দিন তাঁর ফ্ল্যাট-এ যেতে চান আমি ব্যবস্থা করে দিতে পারি অনায়াসে। কোন ভয় নেই, আমি কোন দালালি চাইব না—পরোপকার করেই আমার আনন্দ।

প্রদীপ শিউরে উঠল। এ কী বীভৎস খেলা চলেছে কলকাতার বুকে? মানুষ আজ নেমেছে অধঃপতনের এত নীচু সোপানে? লোকের দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে যারা ধনী, যারা শক্তিশালী, তারা করছে ব্যভিচার, লুণ্ঠন। প্রদীপের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসবার উপক্রম হ'ল।

সন্তোষ বলল, আপনার খুব শক লাগছে না? অনেকেরই লাগে, অন্ততঃ প্রথম প্রথম। কিন্তু বলুন ত, এতে শক্ পাবার কি আছে? স্বেচ্ছায় মেয়েরা আসছে, দু'পক্ষের কারোরই কোনপ্রকার বাধ্যবাধকতা নেই। তাছাড়া এ হচ্ছে ডিমাণ্ড আর সাপ্লাইএর কথা। ডিমাণ্ড যদি বাড়ে তাহ'লে সাপ্লাইকে বাড়তেই হবে। ও কি, কোন কথা বলছেন না যে?

—বলবার ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না।

—ওরে বাবা! আপনি দেখছি ভয়ানক পিউরিটান্! আচ্ছা, আপনাকেই একটা প্রশ্ন করি, আপনাদের বাংলা দেশেই কত মেয়েকে মা বাপের ইচ্ছায় আত্মসমর্পণ করতে হয়, অশীতিপর লোলচর্ম্ম বৃদ্ধের হাতে, মদ্যপায়ী পরনারীতে আসক্ত প্রৌঢ় বা যুবকের অঙ্কে। শুধু একটা বিয়ের অনুষ্ঠান হয়েছে বলেই সে সব হবে শোভন, সুরুচিসঙ্গত?

—আপনি কিসের সঙ্গে কিসের তুলনা করছেন, সন্তোষবাবু? তীব্রকণ্ঠে প্রদীপ বলল।

সন্তোষ বোধ হয় একটু লজ্জিত বোধ করল। বলল, দেখুন এটা হচ্ছে ডিগ্রীর কথা। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা নেই বলেই মেয়েরা দেহবিক্রয় করতে বাধ্য হয়—কখনও বা একজনের কাছে করে, কখনও বা একাধিকের কাছে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত তারা সেটা স্বেচ্ছায় করছে, আমাদের, বাইরের লোকেদের, মতপ্রকাশের কি প্রয়োজন?

—আপনার দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে আমার দৃষ্টিভঙ্গীর মিল কখনও হবে না, সন্তোষ বাবু। এসব কাহিনী আমি শুনতে চাইনে। আর কোন কথা যদি থাকে, বলুন।

হতাশার সুরে সন্তোষ বলল, আপনি যেরকম মরালিষ্ট তাতে আপনার সঙ্গে কথা কথা বলবার মত টপিক খুঁজে পাওয়াই মুস্কিল! হ্যাঁ, আমাদের ক্যাবিনের ভদ্রলোকটির আরও একটি ব্যবসা আছে, সেটা হচ্ছে কালোবাজারে খেলা করা।

—কালোবাজার?' সে আবার কি? প্রদীপ সবিস্ময়ে প্রশ্ন করল।

—নাঃ, আপনি নেহাতই ব্যাক্-নম্বর। কোথায় থাকেন আপনি? ব্ল্যাক মার্কেটে কখনও কোন জিনিষ কেনেন নি? কাপড়, চাল, ওষুধ?

না, প্রদীপের কোন প্রয়োজন হয়নি ব্ল্যাকমার্কেট থেকে কোন জিনিষ কেনবার। তবে, হ্যাঁ, সে মাঝে মাঝে সুমিত্রা এবং বন্দনার কথার ফাঁকে এই ধরণের একটা বাজারের কথা শুনেছে বই কি!

বলল, আমি সত্যি ব্যাক্নম্বর, সন্তোষ বাবু!

—তবে শুনুন। সরকার ত বলে দিয়েছে মাসে কয়েক সেরের বেশী চাল বা কয়েক গজের বেশী কাপড় পাব না, দাম বেঁধে দিয়েছে ওষুদের, কিন্তু তারা ভুলে গিয়েছে (অথবা ভুলে যাবার ভাণ কর্‌ছে) ছুটো জিনিষ। প্রথম, লোকের যা প্রয়োজন তার তুলনায় কন্‌ট্রোল থেকে জিনিষ দিচ্ছে খুবই সামান্য। তাই লোকে খুঁজছে অন্য কোথাও বাকীটা পাওয়া যায় কি না। যাদের পয়সা আছে তারা এর জন্য উপযুক্ত দাম দিতেও রাজী আছে! দ্বিতীয়, কন্‌ট্রোল যদি সাধুভাবে চলত তাহলে হয়ত প্রথম নম্বরের পরিস্থিতির সৃষ্টিই হত না। কিন্তু কন্‌ট্রোলে চলেছে ঘোরতর অরাজকতা, অসাধুতা, রীতিমত লুঠ। যারা অপেক্ষা করতে অসমর্থ বা অনিচ্ছুক তারা ছুটতে বাধ্য হচ্ছে কালোবাজারে। আমাদের ক্যাবিনের ভদ্রলোকের কাছে যান, যা' চাইবেন তিনি জোগাড় করে দেবেন, অবশ্য উপযুক্ত দর্শনী দিতে হবে।

—কিন্তু সরকার এ সব দেখে না? দুর্নীতির প্রশ্রয় দেয়?

—আপনিও পাগল! সরকারের এসব দেখবার সময় কোথায়? তারা ব্যস্ত কংগ্রেসী দলের লোকদের জেলে পুরতে। তাছাড়া দুর্নীতির প্রশ্রয় দেওয়াটাই যে তাদের একটা পলিসি, যাতে দেশের সবাই হয়ে ওঠে নীতিজ্ঞানরহিত। যারা সাধু নয় তারা কি স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করতে পারে কখনও? সরকারের এই বুদ্ধি আর কেউ বুঝুক আর নাই বুঝুক, এ-আর-পি'র সন্তোষ মুখুজ্যের বুঝতে দেরী হয় না।

প্রদীপকে মনে মনে স্বীকার করতেই হল সন্তোষের কথার মধ্যে সঙ্গতি আছে। অথচ সরকারের আচরণের এই দিকটা এতদিন তার চোখেই পড়েনি!

নিজেরই অজ্ঞাতে সন্তোষকে তার কেন যেন ভাল লাগল। কিন্তু লোকটা সুবিধের নয়, তাকে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত হবে না। প্রদীপ বলল, আমার কাজ আছে সন্তোষ বাবু, এখন যেতে হ'বে।

—আচ্ছা আসুন। পরিচয় যখন দিলেন না তখন ভবিষ্যতে কখন কি ভাবে দেখা হতে পারে তার ব্যবস্থাও করতে হবে আপনাকেই। তবে এ চায়ের ক্যাবিনে প্রায় প্রত্যেক বিকেল এবং কোন কোন সন্ধ্যায় আমাকে পাবেন। যদি আসেন দেখা হ'তে পারে।

প্রদীপ তাড়াতাড়ি হেঁটে চলল অটলবিহারী বাবুর বাড়ীর অভিমুখে। শুনল, সন্তোষ চেঁচিয়ে বলছে, আজকের মত নমস্কার যতীন বাবু। ও যতীন বাবু, শুনতে পাচ্ছেন ত?

প্রদীপের চোখ কান লাল হয়ে উঠল। [ক্রমশঃ

ভাবি এক, হয় আর

শ্রীদিলীপকুমার রায়

বারো

মোহনলাল অভিমানী বন্ধুর একটি হাত নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে বলে : আগে আমার কথাটা শেষ করতে দাও। দেখ, জীবনটাকে তোমার চেয়ে আমি খুব কম ক'রেও বছর দুই বেশি দেখেছি। তোমার বয়সে আমারও একটা খুব বড় রকম আদর্শবাদ ছিল।

কুঙ্কুম হেসে বলল : মোহনলাল, ধনীর সন্তান হয়েও সে আই-সি-এস পড়া ছেড়ে কৃষি শেখে—তার আদর্শবাদকেও কি 'ছিল'র কোঠায় ফেলতে হবে নাকি ?

মোহনলাল তাড়াতাড়ি বলে : আচ্ছা, আচ্ছা, আমার কথাটা শেষ করতে দাও। আমার বলার উদ্দেশ্য—যৌবনে পা দেবার মুখে তিন-চার বৎসরে মানুষের মন বড় কম পেকে ওঠে না। তাই এ তিন-চার বৎসরে আমার যে সব অভিজ্ঞতা হয়েছে, পল্লব হয়ত তা থেকে কিছু লাভ করতে পারে ভেবেই আমি—

পল্লব একটু ঝাঁঝালো সুরেই ব'লে বসে : তাই ব'লে ভাই, জীবন সম্বন্ধে পরের মুখে ঝাল খাওয়াই যে একমাত্র পন্থা, তা আমার মনে হয় না। তুমি এই তিন-চার বৎসরে যে ভাবে বদলেছ, অপরের ধারণাও যে ঠিক সেই ভাবেই বদলাবে, এমন তো না হ'তেও পারে ?

কুঙ্কুম চমকে পল্লবের দিকে তাকিয়ে বলে : পল্লব ! মোহনলাল যাই বলুক বন্ধু ভাবেই বলেছে—পরের মুখে ঝাল খাওয়াই তাকে এমন কথা সে বলতেই পারে না।

মোহনলাল তাড়াতাড়ি বলে : না, না পল্লব, আমি কিছু মনে করিনি—আরো এই জন্তে যে, তুমি সত্য কথাই বলেছ। প্রত্যেক মানুষেই জীবন তথা জগৎকে এমন একটা চোখে দেখে, ঠিক যে ভাবে আর কেউ দেখেনি। তাই পরের মুখে ঝাল খাওয়াটা যে বাঞ্ছনীয় নয়, সে বিষয়ে তোমার সঙ্গে আমার মতভেদ নেই। তবে আমি আমার 'সুপীরিয়র' অভিজ্ঞতা তোমার উপর চাপাতে চাইনি। আমি শুধু বলতে চেয়েছিলাম যে, প্রথম যৌবনে আমাদের মনটা একটু বেশি ঝোঁকালো থাকে ব'লে আমরা অনেক সময়েই ভাবি, আমরা অনেক কিছু পারব, যা আমাদের শক্তির বাইরে। আমি নিজে গত কয় বৎসরে কয়েক বার এই ভুল ক'রে বিপথকে নিজের পথ মনে ক'রে ভুলেছি ব'লেই তোমাকে নিতান্ত বন্ধুভাবে আমার এ অভিজ্ঞতাটি জানাতে চেয়েছিলাম।

পল্লব অনুতপ্ত কণ্ঠে বলল : কিছু মনে কোরো না ভাই, আমি তোমাকে ভুল বুঝেছিলাম।

সেদিন এ আলোচনা বহুক্ষণ চলল। কুঙ্কুমের প্রথম দিকে একটু দ্বিধা ছিল, কিন্তু পল্লবের কথা শুনতে শুনতে তার মনে পল্লবের উৎসাহের ছোঁয়াচ লাগল। সে মোহনলালের দিকে চেয়ে শেষে বলল : তুমি পল্লবকে সাবধান হ'তে বলছ ভালো ভেবেই এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আর একটা কথাও কি সাধারণ নীতি হিসেবে বলা যায় না, যে সর্বদা ভেবে চিন্তে হিসেব কিতেব ক'রে চলতে চলতে মানুষ হিসেবীই হয়ে ওঠে—বড় হয় না। সাবধান হওয়া মন্দ বলি না, কিন্তু সাবধানীই যে সব সময়ে জ্ঞানীর পদবী পায়, তাও তো বলা যায় না।

মোহনলাল চিন্তিতসুরে বলল : সেটাও সত্যি কথা। তবে কি জানো ভাই ! আমি সঙ্গীতকে কখনও ভালবাসায় সুযোগ বা শিক্ষা পাই নি। কাজেই হয়ত পল্লবের প্রস্তাবকে ঠিক যে ভাবে দেখা উচিত, সে ভাবে দেখতে পারছি না। ব'লে পল্লবের দিকে চেয়ে—হয়েছে কি, এ রকম ক্ষেত্রে অন্তরঙ্গ বন্ধুও ঠিক পথের খেইটি ধরিয়ে দিতে পারে না। তাছাড়া আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, পথ তুমি খুঁজে পাবেই পাবে—আর পাবে অন্তরের তাগিদেই, কারুর উপদেশে নয়। আমার কেবল একটি কথা মনে হয় যে অন্তরের ঠিক নির্দেশটি পেতে হ'লে ঝোঁকের বশে না চলাই ভালো।

তের

পল্লব যে নিজের গুণপণা, বুদ্ধি বা প্রতিভা সম্বন্ধে সচেতন ছিল, না তা নয়। কিন্তু ও যাকেই ভালোবাসত তার প্রভাব সহজেই বরণ করে নিত। ওর মন সহজেই দুলে উঠত আজ এ কথায়, কাল সে কথায়। কেম্ব্রিজে এসে নানা লোকের মুখে সঙ্গীত সম্বন্ধে নানা কথা শুনে ওর চিত্ত চঞ্চল হ'য়ে উঠেছিল একটু একটু ক'রে। পাখ মনের জয়ধ্বনি ওর মনের উচ্চাশার তারে বেজে উঠেছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও মোহনলালের কথায় ওর মনে ফের সংশয় দেখা দিল ; ও ঠিক করল যে হঠাৎ কিছু একটা করে বসবে না। র‍্যাংলার হবার চেষ্টা করবে। কিন্তু মুস্কিল হ'ল এই যে, ও যতই ক্লাশে গিয়ে অধ্যাপকের লেকচার শোনে ততই ওর মন বসে বেঁকে। আরো মুস্কিল হ'ল এই জন্তে যে, জীবিকার জন্তে ওর ভাবনা ছিল না, পিতৃদেবের জয় হোক। কেবল মুস্কিল এই যে, বাপের টাকায় ব'সে খেলেও আত্মসম্মান যাবে না, বিশেষ কুঙ্কুম যার বন্ধু তার কিছু একটা করা চাই, যা করার মত, যা করলে মান থাকে। অথচ সঙ্গীতকে পেশা করতে কেমন যেন তার ভয় করে। মামা কি বলবেন ? আত্মীয়-স্বজন কী বলবে ? দেশে ফিরে মিশবে কার সঙ্গে ? এই রকম হাজারো প্রশ্ন ওকে উদ্ভ্রান্ত করে তুলল। মোহনলাল তো মিথ্যে বলেনি।

মনের এই দারুণ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ও একদিন বিকেলে মিসেস নর্টনের ওখানে গিয়ে দরজায় ঘণ্টা বাজালো।

জন ছিল না, রিণা এসে দোর খুলেই লাফিয়ে উঠল, বলল অভিমানে : কত দিন আসেননি জানেন ? ন দিন।

পল্লব অভিমানের ভাণ করে : তুমিও তো আসতে পারতে ! আমি ঘরেই আছি নিশ্চয় জানতে আমার পিয়ানো শুনে। তবু কই আগের মতন তো আমার কাছে আসতে না চকলেট নিয়ে ?

রিণা তার লাল টুকটুকে ঠোঁট দু'খানি ফুলিয়ে বলল : আমি যেতাম না বৈ কি। 'মা'-ই ত আমাকে যেতে দিত না বলত—মিষ্টার বাকচির কত কাজ আছে।

পল্লব হেসে বলে, এবার যদি বলেন তো বোলো আমি আর যাই হই কেজো মানুষ নই।

রিণা পল্লবের হাত ধ'রে তাকে বসবার ঘরে একটা আরাম কেদারায় বসিয়ে তার কোলের ওপর ব'সে বলে : শুধু তাই ? মা বলে মিষ্টার বাকচি তোমার মতন দুষ্টু নন—তিনি পড়াশুনা করেন মিষ্টার বাকচি, বলুন ত, আমি কি দুষ্টু মেয়ে ?

পল্লব আদর করে বিণার গাল দুটি টিপে দিয়ে কৃত্রিম কোপে বলল : কে বলে ? আমি ত তোমার মতন লক্ষ্মী মেয়ে ত্রিভুবনে দেখতে পাই না।

মিসেস নর্টন চা নিয়ে ঘরে প্রবেশ করলেন। পল্লব প্রথম থেকেই তাঁকে দেখে মুগ্ধ হয়েছিল, তাই সময় পেলেই তাঁর কাছে একলা এসে ব'সে শুনত তাঁর কথা। দেশে কখনো তো কোনো ইংরাজ মহিলার নিকট সংস্পর্শে আসেনি, তাই ও আরো আকৃষ্ট হয়েছিল মিসেস নর্টনকে দেখে, তিনি শুধু সুন্দরী বলেই নন—তাঁর প্রতি ভাবভঙ্গিতে এমন একটা সহজ সুষমা ঝ'রে পড়ত যে তাঁর সান্নিধ্যে ও গভীর তৃপ্তি পেত। এ ছাড়া জনের কাছে ও সাগ্রহে শুনত এ সীমন্তিনীর নানা গুণাবলীর কথা। বলতে বলতে জনের মাতৃগর্বে মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠত। ওর সবচেয়ে ভালো লেগেছিল শুনে যে ধনী পিতার এক মাত্র কন্যা হওয়া সত্ত্বেও তিনি স্বামীর মৃত্যুর পরে আর বিবাহ করেন নি। ওর মনে পড়ত নিজের পিতার কথা, যিনি বলতেন, সত্যিকারের বিবাহ মানুষের একবারই হয়।

জন বলত সগর্বে যে তিন-চার জন বড় বড় লোক এসেছিলেন তাঁর পাণিপ্রার্থী হ'য়ে কিন্তু তাঁর এক উত্তর—পতিব্রতা কখনো দ্বিচারিণী হতে পারে না।

কিন্তু বিলাতী সমাজে ধনী সুন্দরী বিধবার 'না' বলাকে কেউ গ্রাহ্য করে না। তাই লণ্ডনে নানা পার্টি বল ডান্স প্রভৃতি উপলক্ষে অনেক অনুরাগীই মিসেস নর্টনকে নানা ভাবেই উদ্ব্যস্ত করে তুলত। যতই দিন যায় তাঁর প্রতি পূর্বোক্ত সম্প্রদায়ের নেকনজর ততই স্নেহ-সজল হয়ে উঠতে থাকে। শেষটা এমন হ'য়ে দাঁড়াল যে মিসেস নর্টনকে খানিকটা বাধ্য হয়েই লণ্ডনের সামাজিক জীবনের মায়া-মমতা ছেড়ে পুত্র-কন্যাকে নিয়ে কেম্ব্রিজে আশ্রয় নিতে হ'ল—যেন জন ও বিণাকে নিয়ে এক নতুন সংসার পাততে—নতুন ছাঁদ, যার প্রধান ঝোঁকটি ছিল অনুচ্ছল শান্তির।

মিসেস নর্টন স্বভাবতঃই উদারপন্থী ছিলেন। তাই তিনি পল্লবকে ভারতীয় ব'লে দূরে রাখবার চেষ্টা করতেন না। তাছাড়া তিনি চাইতেন যে জন ও বিণা বিদেশীদের সঙ্গে মিশে উদার হ'তে শেখে। এ ছাড়া তাঁর সদা-সংযত ব্যবহার, কমনীয় কান্তি, ভদ্র অথচ আন্তরিক আতিথেয়তা, কথাবার্তায় চিন্তাশীলতা ও সর্বোপরি মৃত স্বামীর প্রতি একান্ত নিষ্ঠার কাহিনী—সবই পল্লবকে মুগ্ধ করেছিল।

মিসেস নর্টনের মতন সুযোগ, সুবিধা—এমন কি শত প্রলোভন ও অনুরোধ সত্ত্বেও যে নারী পুনর্বিবাহ না ক'রে স্বামীর স্মৃতি-ধ্যান ক'রে জীবন কাটাতে কৃতসঙ্কল্প হয়, সে-ই বড় সতী, না জোর ক'রে যাদের আমরা ঘরে বন্ধ ক'রে অনাহারে শুকিয়ে দেবী ক'রে রাখি তারাই বড় সাধ্বী, এ প্রশ্ন পল্লবের মনে ক্রমেই বেশি ক'রে উদয় হ'ত। এ-সম্বন্ধে মোহনলালের একটি কথা তার প্রায়ই মনে হ'ত। বিধবা-বিবাহের বিপক্ষে সুক্ষমের দু'-একটি প্রবল মতামতের উত্তরে একদিন মোহনলাল বলেছিল যে, যে-দেশে লোকমত বিধবা বিবাহের স্বপক্ষে, সে দেশে বিধবার পক্ষে পুনর্বিবাহ না করাটাই অভাবনীয় বলেই আরো প্রশংসার্হ।

* * * *

বিণা যে একাই বেশ আসর সরগরম ক'রে রেখেছে দেখছি মিষ্টার বাকচি! আপনিও বোধ হয় বেশ থাকেন ছেলেপিলেদের সঙ্গে, না ?

পল্লব বলল : সব ছেলেপিলেদের সঙ্গে বেশ থাকি এমন কথা বললে সত্যের অপলাপ করা হবে।

কিন্তু আমার ত মনে হয়, আপনি ছোট ছেলেপিলেদের খুব ভালবাসেন।

বাসি বটে—কিন্তু সকলকে নয়। শিশু মাত্রকেই নির্বিশেষে ভালবাসতে পেরেছিলেন বোধ হয় এক যীশুখৃষ্ট। আমি ভালবাসি—সুন্দর ও মিশুকে ছেলেপিলেদের। কারণ আমার মনে হয় যে, সব শিশুর স্বভাব মিষ্ট হয় না, বা সকলের সঙ্গে ইচ্ছা করলেই ভাব করাও যায় না। তাছাড়া—তাছাড়া—

একটু থেমে পল্লব হঠাৎ একটা ছোট দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে ব'লে বসে : তাছাড়া সব শিশুর বাপ-মা সেটা পছন্দও করে না।

মিসেস নর্টন একটু আশ্চর্য হ'য়ে বললেন : সে কি মিষ্টার বাকচি! সন্তানকে আদর করলে কি কখনও কেউ অসন্তুষ্ট হ'তে পারে ?

পল্লব বলল : আমি এক সময়ে তাই ভাবতাম মিসেস নর্টন! ভিক্টর হিউগোর Les Miserables-এ একবার প'ড়েছিলাম যে, বাপ মা যতই কেন না কঠিন হোক, কেউ তাদের সন্তানকে সুন্দর বললে তার প্রতি তাদের হৃদয় আর্দ্র না হ'য়েই পারে-না—

বিণা হঠাৎ লাফিয়ে উঠে বলল : মা, ঐ আইরিণ ডাকছে। আমি একবার বাইরে যাই ?

মিসেস নর্টন বললেন : আচ্ছা যাও, কিন্তু যদি এক ফোঁটাও বৃষ্টি পড়ে, খেলা ছেড়ে তাহলে তক্ষুণি ফিরে আসতে হবে, মনে রেখো।

বিণা আচ্ছা বলেই বেরিয়ে গেল। মিসেস নর্টন পল্লবকে আর এক কাপ চা দিয়ে বললেন : হ্যাঁ তারপর ? কী বলতে যাচ্ছিলেন যেন ? বলেই থেমে—অবশ্য যদি বলতে বাধা না থাকে।

পল্লব বাধা দিয়ে বলল : না মিসেস নর্টন, আপনাকে বলবার আবার বাধা কি থাকতে পারে ?

এই 'আপনাকে' কথাটির ওপর সে সহসা একটু বেশি জোর দিয়ে ফেলাতে মিসেস নর্টন ঈষৎ রক্তিম হ'য়ে উঠেই তৎক্ষণাৎ জোর ক'রে সহজ সুরেই বললেন : তবে বলুন না। কিন্তু তার আগে আপনি আর চা বা কেক চান কি না বলুন।

পল্লব বলল : ধন্যবাদ। চা আর নয়—তবে আর একটু চিনি।

চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে পল্লব সুরু করে ওর কাহিনী। তখন বড় মনঃকষ্টেই ওর দিন কাটে—জলের মরুভূমিতে। ওর দুর্ভাগ্যক্রমে একজনও ভারতীয় আরোহী ছিল না। জাহাজের ইঙ্গ-ভারতীয়রা কেউই ওর ছায়া মাড়ায় না। এমন কি, জাহাজের টেবিলেও তার আশে-পাশের সাহেব-মেমরা তার সঙ্গে কথা কয় না। একজন মাত্র মোটা ও বেঁটে বড় সাহেব ছিলেন। তাঁর যেন জীবনের ব্রত ছিল—পল্লবকে সর্বদা বিলাতী আদব কায়দা ও ভদ্র ব্যবহার সম্বন্ধে অশ্রান্ত উপদেশ দেওয়া। এই নিঃসঙ্গ অবস্থায় হঠাৎ যেন বিধাতা দয়া করেই দু'টি ইংরাজ শিশুকে ওর বেদনা দূর করতে পাঠিয়ে দিলেন। এ দুটি ভাই-বোন

প্রায়ই ওর কোলে চ'ড়ে অনর্গল গল্প করে যেত। দেশে তাদের ক'টা চাকর আছে, কত খেলনা আছে, কয়টি কুকুর আছে, ইত্যাদি গুরুতর তথ্য পল্লবকে জ্ঞাপন করা ছিল তাদের নিত্যকর্ম। পল্লবও তাদের খুব গল্প বলত। ফলে তাদের সঙ্গে ওর খুব শীঘ্রই ভাব হয়ে গেল।

এমন সময়ে একদিন সকালে পল্লব তাদের ডাকতেই তারা বলে উঠল, আর ওর কাছে যাবে না। ব্যথিত হ'য়ে 'কেন' জিজ্ঞাসা করতে ছোট মেয়েটি বলল যে তাদের মা বলেছে যে, নেটিভের কাছে যেতে নেই। বলতে বলতে ব্যথায় পল্লবের অন্যমনস্ক চোখে দুই বিন্দু অশ্রু টলটল করতে লাগল। স্বভাবে উচ্ছ্বাসী তো!

মিসেস নর্টনের চোখও চিকচিক ক'রে ওঠে, তিনি মুখ ফিরিয়ে অস্ফুট স্বরে বললেন: তারা মানুষ নয় বোধ হয়?

পল্লব বিজেনীর কাছে অবধি কখনো এত মন খুলে কথা কয়নি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কুণ্ঠাও উঠল জেগে, বলল: দেখুন তো কোথা থেকে আমরা কী কথা এনে ফেলি! মরুক গে। আমি আজ আপনাকে একটা পরামর্শ জিজ্ঞাসা করতে এসেছি মিসেস নর্টন!

মিসেস নর্টন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললেন: বলুন। বলেই একটু হেসে—যদিও আমি যে ঠিক কী বিষয়ে আপনার পরামর্শদাত্রী হতে পারি ভেবে পাচ্ছি না।

পল্লব তার সঙ্গীতানুরাগ, বিলেতে সঙ্গীত শেখার ইচ্ছা, মোহনলালের উপদেশ সবই খুলে বলল।

মিসেস নর্টন ধীর ভাবে সব কথাগুলি শুনে বললেন: আমি আপনার দ্বিধা সঙ্কোচ বোধ হয় অনেকটা বুঝতে পারছি। কিন্তু এরূপ ক্ষেত্রে আমার আপনাকে পরামর্শ দিতে সাহস হয় না—আরো এই জন্যে যে, আমি আপনাদের দেশের ও সমাজের অবস্থা সম্বন্ধে কিছুই জানি না। তা আপনি এক কাজ করুন না কেন? আমার ভাই সাউথেণ্ড থাকেন। তিনি লণ্ডনের একটি ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর—খুব উচ্চশিক্ষিত লোক। তাঁর সঙ্গে আপনি আলাপ করুন না কেন? তিনি শুধু যে জগতের অনেক দেখেছেন শুনেছেন তাই নয়, সত্যিই একজন অসামান্য মানুষ—তাই সম্ভবত: আপনাকে ঠিক পরামর্শটি দিতে পারবেন। আপনি যদি তাঁর কাছে কিছু দিন থাকতে রাজি থাকেন তা'হলে আমি চিঠি লিখে তাঁর নিমন্ত্রণ আনিয়ে দিতে পারি।

পল্লব খুশি হ'য়ে বলল: ধন্যবাদ, সামনের তিন মাস ছুটিতে কোথায় যাব ভাবছিলাম—বেশ হবে। তাঁকে লিখে দিন।

চোদ্দ

পরদিনই সব বন্দোবস্ত হয়ে গেল—মিষ্টার টমাস তার করলেন: স্বাগতম্। মিসেস নর্টন রিণাকে নিয়ে পল্লবের সঙ্গে ষ্টেশনে গেলেন। তাকে ট্রেনে তুলে দেবার সময়ে রিণা বলল: মিষ্টার বাক্‌চি! সাউথেণ্ড থেকে ফেরবার সময়ে কিন্তু আমার জন্য একটা লাল ডল আনা চাই। নইলে আপনার সঙ্গে আড়ি।

পল্লব সভয়ে বলল: বাপ রে? তাহলে কি ডল না এনে পারি?

মিসেস নর্টন ব্যস্তসমস্ত হ'য়ে বললেন: না না, ডল টল কিছুই আনতে হবে না। রিণাকে কোন মতে কথা শোনাতে পারছি না, কী করি বলুন তো? বললে শোনে না। সকলকে বিরক্ত ক'রে মারে। ডল ওর ঢের আছে।

রিণা কাঁদ-কাঁদ স্বরে বলল: ছাই ডল—একটাও লাল ডল নেই। আইরিণের দাদা তাকে কেমন লাল টুকটুকে ডল কিনে এনে দিয়েছে। আর আমি লাল ডল চাইলেই যত দোষ! বা রে!

পল্লব তাকে কোলে তুলে নিয়ে বলল: ঠিক কথা রিণা! লাল ডল না হ'লে মান থাকে কখনো!

মিসেস নর্টন হেসে বললেন: আদর রেখে উঠুন এখন। রিণার ডলের সমস্যা নিষ্পত্তির জন্য গাড়ি দাঁড়াবে না।

পল্লব মিসেস নর্টনের সঙ্গে করপীড়ন ক'রে রিণাকে আদর ক'রে বলল: গুড বাই রিণা!

রিনা তার গলা জড়িয়ে ধরে বলল: গুড বাই মিষ্টার বাক্‌চি! না—না আইরিন বলেছিল 'অ-রিভোয়ার' বলতে হয়।' না মা?

মিসেস নর্টন হেসে বললেন: হ্যাঁ।

পল্লব ট্রেনের জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে রুমাল নাড়ে। মিসেস নর্টনও রুমাল ওড়ালেন। রিণা মহাব্যস্ত হ'য়ে তার ছোট্ট পকেটে হাত দিয়ে রুমাল খুঁজে না পেয়ে মহা উদ্বিগ্ন হ'য়ে মাকে জিজ্ঞাসা করল: মা, আমার রুমাল?

মিসেস নর্টন বললেন, রুমাল যাক—হাত তো আছে। ঐ দেখ, মিষ্টার বাক্‌চি তোমার দিকে চেয়ে কি বলছেন।

পল্লব হাসিমুখে বলে: লাল ডল কেমন? টকটকে লাল—

রুমালের শোক সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে সজোরে হাত নাড়তে নাড়তে রিণা বলল, হ্যাঁ, লাল ডল আর খুব বড় হয় যেন—

ধীরে ধীরে রিণার উদ্ভাসিত মুখ ও মিসেস নর্টনের স্নেহকোমা[ল] আনন সন্ধ্যার ম্লানিমায় অস্পষ্ট হয়ে আসে—দূরে ঐ কেবল মিসে[স] নর্টনের সাদা রুমাল—একটু পরে তাও দেখা যায় না। পল্লবের ম[ন] ভিজে ওঠে। দূর বিদেশে এই দুই শুভাকাঙ্ক্ষিণীর কথা ভাবতে জানলার কাছে ওর সীট ছিল, কামরায় আর কেউ নেই, ও একেবা[রে] একা। বসতে যেতেই দেখে—একটা কিসের প্যাকেট! এ কী কার প্যাকেট? খুলে দেখে, ও মা! ওর নিজের! চকলেট অ[া] বাদামে ভরা; ব্রেজিল নাট, সঙ্গে একটা ছবি কার্ড লেখা—Fro[m] Rina and Evelyn with love, godspeed!

ওর চোখে জল ভরে এল হঠাৎ। মনে প'ড়ে গেল ওর মা[মা] মামীমার কথা, যাঁরা দেশে ওকে স্নেহ দিয়ে এমনি করেই ঘি[রে] রেখেছিলেন—যখনই কোথাও ও বেড়াতে যেত, ওর মামীমা অজান্তে ঠিক এমনি ক'রেই ওর ব্যাগে রেখে দিতেন সন্দেশ ও আমসত্ব। মনে পড়ল, কোথায় যেন পড়েছিল এক বৈর[াগী] বলেছিল,—পালিয়ে যাব কোন চুলোয়? যেখানেই য[াই] মা-বোন। ওর তরুণ মনে উচ্ছ্বাসের বান ডেকে যায়, মনে প[ড়ে] ইংরাজ কবির কথা—A touch of nature makes t[he] whole world kin! কোথায় পল্লব—এ দেশে সাত স[মুদ্র] তের নদী পেরিয়ে—দূর-বিদেশে, বিভুঁয়ে, আর কোথায় মি[সেস] নর্টন ও রিণা কোথায় ওর সংস্কার, ভাষা, শিক্ষা-দীক্ষা—সর্বো[পরি] পরাধীনতার ব্যথা, আর কোথায় এরা—এমন আবহাওয়ায় মানুষ যার সঙ্গে ভারতবর্ষের আবহাওয়ার কোনো সম্বন্ধ নেই বলা চলে! অথচ দেশের ভাষার, আচারের, সংস্কারের দুস্তর ব্যব[ধান] আজ কোথায়? দুদিনে পর হ'য়ে গেল আপন—বিদেশিনীর চাক্ষুষ করল মাকে, বোনকে? মনে পড়ে গেল কবে পড়ে[ছিল]

ভাগবতে কোন ছেলেবেলায় : ঠাকুর বলছেন। যাকেই স্নেহ করো, তার কাছ থেকেই স্নেহ ফিরে পাও জেনো সে স্নেহের আদান-প্রদানের মাঝে আছি এক আমি, আর কেউ নয়। হঠাৎ সুদূর বিদেশে অনেক দিন বাদে ওর মনে উজিয়ে উঠল ঠাকুরের স্মৃতি। যাঁকে দৈনন্দিন হাজারো ব্যস্ততার চাপে পড়ে ও প্রায় ভুলেই গিয়েছিল। ট্রেনে হু হু ক'রে চলতে চলতে ওর স্নেহবুভুক্ষু হৃদয় গৌরবে, আনন্দে, তৃপ্তিতে, কৃতজ্ঞতায় ভ'রে উঠল। চোখের জলে ও ঠাকুরকে প্রণাম করল কপালে দুই হাত ঠেকিয়ে।

পনের

সাউথেণ্ড যাকে ইংরাজিতে বলে sea side resort, লণ্ডন থেকে ট্রেনে আসতে মাত্র এক ঘণ্টা লাগে ব'লে প্রতি সপ্তাহের শেষে বহু প্রমোদার্থী সেখানে ছুটে যান। মনোরম শহর। সুন্দর সুন্দর রাস্তা, বীথিকা, খোলা সবুজ মাঠ। পল্লবের কী যে ভালো লাগল মিষ্টার আর্চিবল্ড টমাসের বাড়িটি। প্রতি ঘর থেকেই সমুদ্র দেখা যায়, জানলা খুললেই চোখে আসে সমুদ্রের পরিচিত ভিজে গন্ধ। ওর মন উজিয়ে উঠল, মিসেস নর্টনকে চিঠি লিখে জানালো ধন্যবাদ।

গৃহের চেয়ে আরো ভালো লাগল গৃহকর্তাকে। তিনি রোজ সকালে বেরিয়ে যান কাজে—লণ্ডনের একটি বড় ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর, ছুটি খুবই কম। তার উপর সাউথেণ্ড থেকে লণ্ডনে রোজ ডেলি প্যাসেঞ্জারি। কাজেই তাঁর খাটুনি একটু বেশিই বৈ কি। তবু প্রত্যহ যখন তিনি সন্ধ্যাবেলা ফিরতেন, তাঁর মুখে ক্লান্তির চিহ্নও নেই, গতিভঙ্গি স্বচ্ছন্দ, মেজাজ শরীফ। প্রত্যহ সন্ধ্যায় সপরিবারে এক টেবিলে বসে পল্লবের সঙ্গে সানন্দে গল্প করতে করতে আহার করতেন। পল্লবের তাঁর সদা প্রফুল্ল ভাবটি বড় ভাল লাগত। মনে হ'ত, যারা দৈনন্দিন পরিশ্রমকে এ ভাবে গ্রহণ করতে পারে তারাই জীবন থেকে যথার্থ রসের খোরাক সঞ্চয় করে। নইলে আমরা অধিকাংশই ত বাঁচবার মতন বাঁচি না—দিনগত পাপক্ষয় করে যাই মাত্র।

পল্লব দেখত, মিষ্টার টমাস তাঁর ছেলেমেয়েদের নানা ছলে ভারি সুন্দর শিক্ষা দিতেন। তাদের সঙ্গে সর্বদাই এমন ভাবে মিশতেন যে তারা মনে করত যেন তিনি তাঁদেরই একজন। রবিবার বা অন্য কোনও ছুটির দিনে, তিনি প্রায়ই তাদের নিয়ে পল্লবের সঙ্গে গল্প করতে করতে অনেক দূরে অবাধে বেড়াতে যেতেন। অনেক সময় ছেলে-পিলেদের সঙ্গে অবাধে দৌড়াদৌড়িও করতেন। পল্লব প্রবীণ পিতাকে এ-ভাবে ছোট ছেলেমেয়েদের সঙ্গে যেন তাদেরি একজন হ'য়ে খেলা করতে দেখে প্রথমে একটু আশ্চর্য্য না হয়ে পারে নি।

মিষ্টার টমাস পল্লবকে একদিন বলেছিলেন যে, তিনি নানা জাতীয় অতিথিকে ডাক দেন শুধু নিজের তৃপ্তির জন্যেই নয়—ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্যও বটে। কারণ তিনি বলতেন—শিশুরা সহজেই জাতীয়তার গণ্ডি কাটাতে পারে। পল্লব তাঁর এই উদার মতামতের সঙ্গে মিসেস নর্টনের মতামতের একটা সাদৃশ্য পেত। শুধু রক্তেই নয়, স্বভাবেও ভাই-বোন বৈ কি!

মিষ্টার টমাসের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে পল্লব অল্প একটু মিশেই বুঝতে পারল যে সে ভুল করে নি। কারণ ও কখনো তাদের কথাবার্তায় আকারে ইঙ্গিতে এমন আভাস পায়নি যে ও বিদেশী, অতএব অবজ্ঞেয়। তাদের পিতার ফরাসী, রুশ, জর্মন, ইতালিয়ান প্রভৃতি নানা জাতীয় অতিথি বন্ধুর কথা বলতে বলতে তারা সরল উৎসাহে যেভাবে মুখর হয়ে উঠত, তাতে পল্লবের আদর্শবিলাসী মন গভীর তৃপ্তি পেত।

টমাস পরিবারের ছেলেমেয়েদের আর একটা স্বাভাবিক ব্যবহার তার বড় ভাল লাগত। তারা যখন বাগান থেকে ষ্ট্রবেরি, রাস্পবেরি পেয়ার প্রভৃতি বিলাতি ফল ওকে এনে দিত, তাদের কাউকে ও চকলেট লজেঞ্চুস কিনে দিলে সকলের মধ্যে ভাগ ক'রে নেবার সময় দাতাকেও ভাগ দিতে ভুলত না। কখনও হয়ত বা নিঃসঙ্কোচে সোজা ওর মুখেই লজেঞ্চুস পুরে দিত, যেন ও তাদেরই একজন।

মিষ্টার টমাসের বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি, কিন্তু যেমন অটুট স্বাস্থ্য তেমনি নিটোল প্রাণশক্তি। তিনি দুটো তিনটে বিদেশী ভাষা জানিতেন ও ভাল ভাল বিদেশী মাসিক নিয়মিত পড়তেন।

পল্লবের মাঝে মাঝে ভাবতে সত্যিই অবাক লাগত যে, ব্যাঙ্কের হাড়ভাঙা খাটুনি খেটেও তিনি কেমন করে নানা ভাষার মাসিক প্রভৃতি পড়বার সময় পেতেন। একদিন তাঁকে ও প্রশ্ন করেছিল। তাতে তিনি মৃদু হেসে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ রসিকতার সঙ্গে উত্তর দিয়েছিলেন—বাকচি, মানুষের জীবনটা যে কত লম্বা তা বুঝতে পারে কেবল তারা, যারা তার কাছ থেকে সবচেয়ে বেশি আদায় করে নিতে চায়। যারা কিছুই করে না, তারাই শুধু সময় নেই সময় নেই বলে হাম্বা হাম্বা ক'রে কোনো কিছুরই সময় পেয়ে ওঠে না। আমার একটি খুব ধনী লর্ড বন্ধু আছেন। তাঁকে কিছুই করতে হয় না, এক খরগোস শিকার ছাড়া। বাকি সময়টা কী করে কাটান কেউ জিজ্ঞাসা করলে তিনি নিঃসঙ্কোচেই জবাব দেন—হাই তুলে ও আড়মোড়া ছাড়তে ছাড়তে তিনি ঠাহর করতেই পারেন না যে এ ছাড়া জীবনে আর কিছু করা যেতে পারে।

পল্লব ক্রমে দেখলে যে, মিষ্টার টমাস যে শুধু য়ুরোপের খবর রাখেন তাই নয়, ভারতবর্ষ সম্বন্ধেও নিতান্ত কম জানেন না। সে একদিন তাঁর কাছে দেশভক্তির ঝোঁকে একটু অতিশয়োক্তি ক'রে ফেলে দারুণ অপ্রস্তুত হয়েছিল। ব্যাপারটা এই :

একদিন সন্ধ্যায় মিষ্টার টমাস ওকে কথায় কথায় প্রশ্ন করেন—হিন্দু সমাজতন্ত্রগণ কেমন ক'রে আশা করেন যে, যুবতী বিধবাকে বরাবর জোর করে দেবী দাঁড় করালেই তারা তাদের মানবী প্রবৃত্তিকে চিরকাল দমন ক'রে রাখতে পারবে? পল্লব উত্তরে সগর্বে বলে যে, সনাতন হিন্দু আদর্শে গড়ে ওঠার দরুণ ভারতীয়রা প্রায়ই য়ুরোপের চেয়ে ঢের বেশি সংযত ও জিতেন্দ্রিয়, কাজেই য়ুরোপ ও-সব বিষয়ে ভারতকে বুঝতে পারে না—ইত্যাদি।

এ কথা শুনে মিষ্টার টমাস আর কিছু না ব'লে একটা ভারতীয় সংবাদপত্র তাকে এনে দেন। তাতে লেখা ছিল যে বালিকা বধূর সহবাস-সম্মতির বয়স ১২ থেকে ১৪ বৎসর করবার প্রস্তাবে অধিকাংশ হিন্দু বক্তাই শুধু ঘোর আপত্তি করেই ক্ষান্ত হননি, একজন এমন গভীর আশঙ্কাও ব্যক্ত করেছেন যে, তা' হলে অধিকাংশ স্বামীকেই শ্রীঘর দর্শন করে আসতে হবে। পল্লব সেদিন লজ্জায় আর মাথা তুলতে পারে নি। এই তাদের সংযমী, সনাতনী হিন্দুর আভ্যন্তরীণ নৈতিক অবস্থা। সেই থেকে ও মিষ্টার টমাসের সঙ্গে একটু সাবধান হ'য়ে কথাবার্তা কইত।

প্রত্যহ সান্ধ্যভোজনের সময়ে পরিবারস্থ সকলকে নিয়ে মিষ্টার

ও মিসেস টমাস একত্রে গল্পালাপ করতে করতে ধীরে ধীরে আহার করতেন। তাঁরা এত ধীরে ধীরে খেতেন যে পল্লবের প্রথম প্রথম মনে হ'ত যেন তাঁদের সাথে খাওয়াটা উপলক্ষ মাত্র, আসল উদ্দেশ্য—গল্পালাপের রসভোগ।

সান্ধ্যভোজন সারা হলে ছেলেমেয়েরা পিতামাতাকে শুভরাত্রি জ্ঞাপন করে চুম্বন ক'রে রাতের জন্ত শয়নকক্ষে আশ্রয় নিত। এ প্রথাটিও পল্লবের ভারি ভাল লাগত। তার মনে হত যে, পিতামাতার প্রতি সন্তানের এ ভাবে নিত্য ভালবাসা-জ্ঞাপন হয়ত ক্রমে নিছক লৌকিক আচারে পরিণত হ'তে পারে, তা সত্ত্বেও সমাজে স্নেহপ্রীতি প্রকাশের এ-জাতীয় সামাজিক প্রথার দাম আছেই আছে।

ছেলেমেয়েরা শুতে গেলে পল্লব টমাস-দম্পতীর সঙ্গে ড্রয়িংরুমে এসে কফি পান করতে করতে বিশ্রম্ভালাপ করত। কখনো কখনো মিষ্টার টমাস ওর কাছে ভারতবর্ষের রকমারি তথ্য জানতে চাইতেন। পল্লব আশ্চর্য হয়ে ভাবত—প্রাণশক্তি বটে!

ষোলো

পল্লব মিষ্টার টমাসকে ওর জীবন-সমস্যার কথা রোজই বলবে ভাবে। কিন্তু কেমন একটা সংকোচ আসে। বলি-বলি করেও বলা হয় না।

সেদিন রবিবার, হঠাৎ মিষ্টার টমাস নিজেই কথা তুললেন, বললেন: ইভোলিনের চিঠি পেলাম। সে লিখেছে তোমার সম্বন্ধে আরো কথা। শেষে লিখেছে তোমার মন স্থির হচ্ছে না—তাই আমার কাছে পরামর্শ চাইতে এসেছ। কিন্তু কই, এ পর্যন্ত কিছুই তো বলোনি মুখ ফুটে?

পল্লব কুণ্ঠা দমন করে বলে: বলব বলব ভাবছিলাম কিন্তু:—

মিষ্টার টমাস স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললেন: কিন্তু কী? ইভোলিন যা লিখেছে তার পরে কিন্তুর স্থান কোথায়? সে লিখেছে তুমি ছেলেবেলা থেকেই সবচেয়ে ভালোবেসেছ গানকে আর মহাপুরুষের জীবন-চরিত। তুমি না কি চাও গানকেই পেশা করতে। কিন্তু ভরসা পাচ্ছ না। নির্ভরতার কারণটা ঠিক কি?

পল্লব একটু চুপ করে থেকে বলে, গান ভালোবাসি কিন্তু আমাদের দেশে গানকে আজ পর্যন্ত কোনো ভদ্র পরিবারের ছেলে পেশা করেনি।

মিষ্টার টমাস হেসে বললেন: ভাই, জাঁক ক'রে সুভদ্র অধ্যাপক বলতে চাও—পানে তোমার সহজ অনুরাগকে আমল না দিয়ে? বলেই গম্ভীর হয়ে—না এ ঠাট্টা নয়, গানে যার অনুরাগ সহজাত সে গায়ক হবে না তো হবে কে? ইভোলিন লিখেছে, তোমার শুধু যে কণ্ঠ অতি সুন্দর তাই নয়, তুমি নাকি ইতিমধ্যে আমাদের দেশের কয়েকটি কঠিন গানও চমৎকার গাইতে শিখে ফেলেছ। তোমার শিক্ষক নাকি বলেছেন—তোমার এমন প্রতিভা আছে যে, মন দিয়ে গান শিখলে এমন কি তুমি অপেরা গায়ক হ'তে পারো, অবশ্য খাটতে হবে সে জন্তে।

পল্লব খুশি হ'য়ে বলল: গানে আমার প্রতিভা আছে কি না বুঝতে পারি না। সহজ-পটুতা তো আর প্রতিভা নয়?

তা বটে, কিন্তু সহজ-পটুতাই হল প্রতিভার বনেদ। কিন্তু সে যাক—তুমি গানকে পেশা করতে ভয় পাচ্ছ বলেই কি র‍্যাংলার হতে চাচ্ছ? শোনো, তোমার স্বভাব ও মনের গতি আমি এ কয় দিনে কিছু লক্ষ্য করেছি। তোমার স্বধর্ম গণিত কি বিজ্ঞান নয়। তাই কেন মিথ্যে ওদিকে ঝুঁকেছ? বিশেষে যখন তুমি ঝুঁকতে পারো—যেদিকে ইচ্ছে করলেই তুমি আনন্দ পেতে পারো?

পল্লব একটু চুপ করে থেকে বলে, আমি ভাবছিলাম—মানে—আমার আত্মীয়-স্বজন চান আমি র‍্যাংলার হয়ে প্রফেসার হই ও অবসর সময়ে গানের চর্চা করি।

মিষ্টার টমাস হাসলেন: এ উপদেশে তোমার মন সায় দেয় কি?

পল্লব মুখ নিচু করে ভাবে, তারপর বলে: না, তবে—মানে—গণিতের প্রফেসর হ'য়েও তো আমি গান-বাজনার চর্চা রাখতে পারি?

সে সামান্য চর্চা। কোনো বিষয়ের প্রতি অনুরাগ যাদের প্রবল ও গভীর তারা সে সামান্য চর্চায় সার্থক হয় না। এটা আমি জানি ঠেকে শিখে, কারণ মোটা মাইনের নিরাপদ চাকরি ক'রে কিছু সুবিধে হ'লেও আমার জীবনের একটা মস্ত অপূর্ণতা থেকে গেছে।

পল্লব উৎসুক হ'য়ে জিজ্ঞাসা করে কি রকম? আমি তো দেখি, আপনি বেশ চমৎকার আছেন!

মিষ্টার টমাস একটি ছোট দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, জানো তো আমাদের মধ্যে একটা প্রবচন আছে, যা চক্‌চক্‌ করে তাই সোনা নয়! ছেলেবেলা থেকেই আমার পিয়ের লোটির মতন দেশে দেশে ঘুরে মানুষকে জানবার ও বোঝবার একটা গভীর তৃষ্ণা ছিল। তবে যাক সে কথা। আমি গায়ে পায়ে নিজের দৃষ্টান্ত দিলাম এই জন্তে যে, ঠেকে-শেখার চেয়ে দেখে শেখা ভালো। তাই তোমার কাছে বলা যে আমি ঠেকে শিখেছি এই কথাটি যে মানুষের জীবনের অন্তিম-লক্ষ্য কি, ঠিক করা কঠিন হ'লেও যে-কোনো দিকেই যাই না কেন, সার্থকতার আস্বাদ মিলতেই পারে না যদি আমাদের কোনো গভীর ক্ষুধাকে অপূর্ণ রেখে জীবনে সফল হতে যাই।

পল্লব খুশি হয়ে বলল: আমার পিতৃদেবও ঠিক এই কথাই বলতেন। তিনি ছিলেন সাহিত্যিক, কবি, সুরকার। কিন্তু চাকরিতে হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে তাঁর এত সময় ও শক্তি খরচ হ'য়ে যেত যে, সাহিত্য সৃষ্টির সময় বেশি পেতেন না। আমার মনে আছে—আমার ছেলেবেলায় বার বারই তিনি চেয়েছিলেন চাকরি ছেড়ে দিতে, পারেন নি কেবল এই ভয়ে, পাছে শেষে অর্থকষ্টে পড়তে হয়। বলেই যেচে বলে—আমাদের দেশে গানের বেলায় ঐ একই কথা। ভবিষ্যতে কি হবে বলা যায় না, কিন্তু আমাদের দেশে এখনো পর্যন্ত গান করে কেউ কেউ ভদ্রভাবে বাঁচতে পারে না। কেন না, গান শুনে টাকা দেবে এমন লোক আমাদের মধ্যে নেই বললেই হয়।

মিষ্টার টমাস ঘরের গৃহচুল্লীর আগুনের দিকে খানিক অন্যমনস্ক ভাবে চেয়ে রইলেন, তারপর বললেন: অবশ্য একথা বলাই বেশি যে, মানুষকে বেঁচে বর্তে থাকতে হলে খেতে-পরতে হবে আর খেতে-পরতে হ'লে টাকা চাই। কাজেই গান গেয়ে কি শিখিয়ে যদি অর্থাগম একেবারেই অসম্ভব হয় তাহলে গানের নেশাকে পেশা দাঁড় করানো চলে না। তবে একটা কথা আমার মনে হয় মানুষের জীবনে সব দেশেই শিল্পকলার প্রতিপত্তি হ'তে সময় লেগেছে। ধরো এক সময়ে ছিল যখন আমাদের দেশের বই লিখে জীবিকা উপার্জন করা প্রায় অসম্ভবের কোঠারই ছিল। যাঁরা অন্তরের তাগিদে না লিখে পারতেন না, তাঁরা হয় ছিলেন চাকরে না হয় ডাক্তার উকিল। কিন্তু ক্রমে ক্রমে সাহিত্য হ'য়ে উঠল তো একটি প্রধান পেশা। কেমন করে হল? ভালো বই পড়ুক

ইচ্ছা মানুষের একটি প্রধান ক্ষুধা বলেই না? মাইকেল এঞ্জেলোর জীবনী পড়লে দেখতে পাবে, তিনি যখন প্রথম বায়না ধরলেন শিল্পী হবার, তখন বাড়িতে সে কি হুলুস্থুল। মাইকেল এঞ্জেলোর অতি সুভদ্র পিতা হুঙ্কার ক'রে বললেন—কি! আমাদের, ভদ্র পরিবারে—সাক্ষাৎ আমার বংশধর—কি না শিল্পীর জীবন নেবে! শুধু হুঙ্কার নয়—প্রহার।

পল্লব উৎসাহিত হ'য়ে বলল: এ আমি জানতাম না। আমার বন্ধুদের আজই লিখে দেব।

তোমার বন্ধুদের? কেন? বলেই হেসে—তাঁরাও কি ইতালীয়ান পিতার মতন বলছেন না হে আমাদের অন্তরঙ্গ বন্ধু সুভদ্র বাকচিত্ত অভদ্র গায়ক হবে আর আমরা ঠায় বসে তার গান শুনব?

পল্লব অপ্রতিভ হ'য়ে বলল: না না, তা নয় মোটেই। তবে তারা দোমনা, বুঝে উঠতে পারে না বলে—য়ুরোপে সঙ্গীতের প্রতিষ্ঠা আছে, জনসাধারণ সাড়া দেয়, যেখানে আমাদের দেশে—

মিষ্টার টমাস বাধা দিয়ে হেসে বললেন: এ কি একটা কথা হ'ল, বাগচি? কোন্ দেশে কবে নতুন পথের পথিক পেয়েছে বাঁধা সড়ক? মার দেয়, মানুষ কখন? দেখতে দেখতে—শুনতে শুনতে—একটু ক'রে বুদ্ধি খুললে—তবে না? নতুন এক জোড়া জুতো পরতে পেলেও পা আপত্তি করে প্রথমটায়—পরতে পরতে তবে না পায়ের সঙ্গে পাদুকার মিতালি হয়। না, উপমা যে যুক্তি নয় আমি জানি। কিন্তু জীবনের সাক্ষ্য তো যুক্তিই বটে। তাই আমাদের দেশে হাল আমলে একটা মস্ত অভ্যুদয়ের দৃষ্টান্ত দিই। বার্ণার্ড শ-র লেখা পড়েছ নিশ্চয়ই?—আচ্ছা শেক্সপীর ও ইবসেনের পরে তাঁর মতন নাট্যকার জন্মায় নি একথা আজ সর্ববাদিসম্মত। আচ্ছা কিন্তু তিনিও কত দিন ধরে নাটকের পর নাটক লিখে গেছেন জানো? একেবারে নতুন ধরণের নাটক—তার উপর চাবুক মারেন নি তিনি কা'কে? আমার মনে আছে—প্রথম যখন শ-র নামডাক হয় আমরা কি রাগই করতাম! বলতাম—ওটা ভাঁড়, সং, ক্যাপা কত কি! কিন্তু আমার তো আজ শ-র পরে আর কারুর নাটকই মনে দাগ কাটে না—এক গলনওয়ার্দির দু-একটা নাটক ছাড়া। আজকের দিনে এমন সাহিত্যিক নেই যার উপর একেবারে নিরন্ন না হলেও দরিদ্র ছিলেনই বলব। এরকম আরো দৃষ্টান্ত দিতে পারি, কিন্তু ফেনিয়ে কি হবে? আমার বলবার কথা এই যে, যদি কারুর সত্যি প্রতিভা থাকে তবে সব সময়ে না হোক—প্রায়ই দেখতে পাবে তার সৃষ্টিকে লোকে প্রথম গ্রহণ করতে পারে নি। কিন্তু প্রতিভার ধর্মই এই যে, সে লোককে সমতা দিতে শেখায়, তৈরি করে নেয় গ্রহীতার কানকে মনকে প্রাণকে—ঠিক যেমন পটুয়া গড়ে নেয় মাটিকে।

পল্লব বিপন্ন কণ্ঠে বলে: আপনি কি বলছেন মিষ্টার টমাস? কোথায় বার্ণার্ড শ, আর কোথায় পল্লব বাগচি!

মিষ্টার টমাস হেসে ফেললেন: তোমার প্রশ্নটা বিনয়ীর মত হয়ে থাকতে পারে বাকচি! কিন্তু বুদ্ধিমানের মতন হয়নি। বিরাট পালোয়ান বিরাট হয় বহু সাধনার শেষে। কিন্তু যখন সে দশ বছরের বালক ছিল তখন কি সে ভাবতে পারত যে তার ছোট্ট দুর্বল দেহের মধ্যেই রয়েছে বিরাট পালোয়ানের সম্ভাবনা? আমি বলছি না—প্রতি দুর্বল শিশুই চেষ্টা করলে বিরাট পালোয়ান হ'তে পারে। কি প্রতি রিপোর্টার নাটক লিখতে লিখতে শ'র সমান নাট্যকার হতে পারে। আমি বলছি শুধু এই কথা, যে কোনো প্রতিভার অপরিণত অবস্থায় তরুণ চেহারা দেখে সব সময়ে জোর করে বলা যায় না—এ প্রতিভাই বটে। তবে এর উল্টো সাক্ষ্যও আছে, অনেক যুবকই দেখা যায়, যারা পরীক্ষায় সবাইকে হারিয়ে দেয়। লোকে ভাবে এ ছেলে সামান্যি নয়। কিন্তু পরে দেখা যায় যে তারা ভস করে ফুরিয়ে গেল—সোডার বোতলের গ্যাসের মতন। বলেই হঠাৎ—তুমি মহাপুরুষদের জীবন-চরিত পড়তে ভালোবাসো, ইভোলিন লিখেছে। এডিসনের জীবনী পড়েছ কি?

: না। তাঁর নাম শুনেছি অবশ্য, কে না শুনেছে? এ যুগে কোনো একটা মানুষ জগতের চেহারা এত বদলে দেয়নি, যেমন তিনি দিয়েছেন।

মিষ্টার টমাস যেমন মিট-মিট করে বললেন: আচ্ছা! কিন্তু জানো কি—এই বিরাট বৈজ্ঞানিক এডিসন ছেলেবেলায় ট্রেণে ট্রেণে খবরের কাগজ বিক্রি করে অন্নসংস্থান করতেন? তারপর তাঁর নিজের ঘরে নিতান্তই নিজের খেয়ালে এ তা নিয়ে টুকটাক করে নানা রকম এক্সপেরিমেণ্ট করতেন—কোনো কলেজেই ঢুকতেই পারেননি, কলেজি বিদ্যা শেখার তো দূরের কথা। আচ্ছা। যখন তিনি এই ভাবে শুধু নিজের অদম্য কৌতূহলকে চরিতার্থ করতে, এ ও তা নিয়ে আপন মনে পরীক্ষা করতেন তখন কি জানতেন তাঁকে যে পরে একদিন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকদের মধ্যে এভারেস্ট হয়ে ঘোষণা করবার অধিকারী হবেন? হে জগৎবাসী! দেখ একা আমি জগতের চেহারা যত বদলে দিয়েছি একশোটা বৈজ্ঞানিকও ততটা বদলে দিতে পারে কি? আরো কাছের দৃষ্টান্ত, দশ-পনের বৎসর আগেও আইনস্টাইনকে দেখে কেউ কি ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারত যে, তাঁর বৈজ্ঞানিক প্রতিভা নিউটনের সগোত্র?

পল্লব কি বলবে ভেবে না পেয়ে চুপ করে থেকে একটু পরে বলল: কিন্তু প্রতিভার একটা চিহ্ন তো এই যে, তার থাকে অটল আত্মবিশ্বাস।

কখনো কখনো থাকে বটে, কিন্তু সব সময়ে না। পেনি বলতেন, কোথায় বারিণের জোনাকি দ্যুতি। বলে একটু থেমে—এ নিয়ে আমি এক সময়ে খুব ভাবতাম, একে ওকে তাকে জিজ্ঞাসা করতাম—প্রতিভা কাকে বলে, কিসে তাকে চেনা যায়? কিন্তু পরে নানা প্রতিভাধরের জীবন-চরিত পড়তে পড়তে মনে হয়েছে যে শুধু এইটুকু মাত্র বলা যায় যে প্রতিভা যার থাকে সে চলে একটা অন্তরের তাগিদে—তাকে কোনো একটা দুর্নিবার শক্তি ঠেলা দেয়, ঘাড় ধরে খাটিয়ে নেয়—সে জন্যে এডিসন বলেছেন: Genius is one percent inspiration and ninety-nine percent perspiration. মাথার ঘাম পায়ে ফেলে খাটতে খাটতে সারা হওয়াতেই তার আনন্দ—বুঝলে?

পল্লব আপত্তি করে বলে: একথা কি সত্যি? সবাই কি দিন-রাত খাটলেই এডিশন কি শ' কি আইনষ্টাইন হতে পারে?

না। কিন্তু যারাই এডিশন কি শ' কি আইনষ্টাইন হয়েছে তাদেরই মাথায় ভূত চেপেছে। জানবে যে তাদের অব্যাহতি দেয়নি যত দিন না সে বলতে পেরেছে যা সে বলতে চায়, কি সৃষ্টি করেছে যা সে সৃষ্টি করতে চায়, বা আবিষ্কার করেছে যা সে খুঁজেছে অশ্রান্তভাবে

হাতড়ে হাতড়ে। তাই তোমার ক্ষেত্রে তোমার প্রতিভা আছে কি না, এ প্রশ্ন নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে যদি বিবেচনা করে দেখতে চাও তো দেখ, গানের দিকে তোমার এমন কোনো তাগিদ তুমি অন্তরে অনুভব করো কি না যে, তোমাকে কিছুতেই নিষ্কৃতি দিতে চায় না। যদি থাকে, তবে জেনো যে, এই নাছোড়বান্দা ভূতটি প্রতিভা হোন বা না হোন, তাঁর হুকুম মেনে চলা তোমার কর্তব্য, লোকে মাথা দিক বা না দিক।

পল্লব এ ধরণের কথা আগে কখনো শোনেনি, একটু ভেবে বলল: আপনার কথা শুনে একটু চমকে উঠেছি বৈ কি। কারণ যত দিন যাচ্ছে ততই গান আমাকে পেয়ে বসছে। মনে পড়ে, ছেলেবেলায় স্কুলের পড়াশুনোয় মন দিতে পারতাম না, নানা গানের সুর আমার মাথার মধ্যে ঘুরে বেড়াত বলে। এদেশে এসে ক্রমশ: যেন গান আমাকে আরো পেয়ে বসেছে। পরীক্ষায় ফার্স্ট ক্লাস পাওয়া এ-সব বই আর আমার মন টানে না তো? কিন্তু আমার ঐ এক মুশকিল—আত্মবিশ্বাস কম—সে জন্তে আমি খেতাব পেয়েছি 'সদা টলমান'। তাই ভয় হয়—যদি প্রতিভা আমার না থাকে গানে কি-ই বা সৃষ্টি করব?

মিষ্টার টমাস বললেন: তোমার গানের প্রতিভা আছে কি না, সে সম্বন্ধে রায় দেওয়ার অধিকারী আমি নই। তবে তোমার ভাবগতিক দেখে আমার একটা কথা প্রথম থেকেই মনে হয়েছে যে, তুমি গড়নে গড়পড়তা নও এবং স্বভাবে শিল্পীই বটে। তাই যদি কি, ষ্টার র‍্যাংলারও হও, তবে তাতে করে তোমার জীবনে সার্থকতা আসবে বলে আমার মনে হয় না। কিন্তু একটা কথা—তুমি কিসের দুঃখে প্রফেসর হতে যাচ্ছ বলো তো? ইভোলিন লিখেছে, তোমার বাবা যথেষ্ট টাকা রেখে গেছেন। তোমার নেই কোনো গলগ্রহ, মেধা তোমার আছে, সবার উপর আছে আশ্চর্য কণ্ঠ—যার মাধুর্যে আমরা সবাই মুগ্ধ হয়েছি তোমাদের গানের ক-খ না জেনেও। এ-হেন তুমি কেন গতানুগতিকতার পথেই চলতে চাইছ—কিসের নির্দেশে? বিশেষত: যখন মনে-প্রাণে তুমি আইডিয়ালিষ্ট—এ বিষয়ে আমার একটু সন্দেহ নেই।

না, না—

না না না, বাক্‌চি—হাঁ হাঁ। তোমার সঙ্গে আমার আলাপ মাত্র দু'দিনের বটে কিন্তু তা সত্ত্বেও একটা কথা আমার মনে হয়েছে প্রথম থেকেই, বলব?

বা:—আপনি!

তবে শোনো। কিছু মনে কোরো না কিন্তু, কারণ আমি বলছি সত্যিই বন্ধু ও শুভার্থী ভাবেই। আবার মনে হয় তোমার প্রতিভা আছে, কিন্তু আশৈশব সহজ পথে চলে এসে তোমার ইচ্ছার মেরুদণ্ড গড়ে ওঠেনি। কিন্তু এ ইচ্ছাশক্তিকে—Willকে গড়ে তোলা যায় সাধনা করে। তোমার সব আগে চাই সেই সাধনা, নইলে তোমার কোনো প্রতিভারই স্ফুরণ হবে না চিরদিন। তোমার ভাষায় সদাটলমান থেকে তুমি হেলায় হারাবে, যা তোমার নাগালের মধ্যেই ছিল। তা ছাড়া আর একটা কথা বলি: তুমি কেন ভাবছ জীবিকার কথা—যখন তোমার পিতৃদেব যা রেখে গেছেন, তা তোমার পক্ষে অপর্যাপ্ত? এমন ষ্টাট পেয়েছ যে, সে কেন নতুন পথের পথিক হতে ভয়ে অস্থির, লোকে সাড়া দেবে কি না দেবে ভেবে আকুল। তুমি তো ভাগ্যবান যুবক হে—বংশ, অর্থ, স্বাস্থ্য, রূপ, কণ্ঠ, বুদ্ধি, মধুর স্বভাব, স্নেহশীলতা কি নেই তোমার? এত মূলধন পেয়েও তোমার জীবনের ব্যবস্থায় দেউলে হবার ভয়?—বলে একটু থেমে—না, শোনো বাক্‌চি, তুমি আমার মতামত জানতেই এখানে এসেছ, তাই বলছি। আমার মনে হয়, তোমার মতন স্বভাব-আদর্শবাদী বেশি সাবধান হয়ে চললে হয়ত অনেক বিপদ ও ভয় হতে পারে, কিন্তু বড় প্রতিপত্তির বড় সার্থকতার আনন্দ থেকে বঞ্চিত হবেই হবে। অবশ্য একথা আমি বলছি না যে এ সংসারে থাকতে হলে বেপরোয়া হ'য়ে সব রকম সাবধানী যুক্তিকে নাকচ ক'রে প্রাণপণে ছুটলেই লক্ষ্যে পৌঁছনো যাবে। না খানিকটা শান্ত হয়ে সমঝে দেখতে হবেই—বাধার অনুপাতে শক্তি কতখানি? কিন্তু সব বলা হয়ে গেলেও একথার মার নেই জেনো যে, আমাদের প্রায় প্রত্যেকের মধ্যেই দুটি মানুষ থাকে—একটি সংসারী আর একটি স্বপনী, আর এই দুটির সামঞ্জস্য হ'লে তবেই আমরা গভীর তৃপ্তির স্বাদ পাই যার চলতি নাম fulfilment বলে একটু থেমে—এই সার্থকতার জন্তে যে সামঞ্জস্য, হার্মনি, আবশ্যক তার কিন্তু একটা সর্ত আছে, নৈলে সে ধরা দেয় না। সে সর্তটি এই যে ভয়ডর ও পরিণাম চিন্তা খানিকটা অন্তত বিসর্জন দিতেই হবে—to play safe মন্ত্র ছেড়ে to live dangerously এই মন্ত্র জপতে হবে। কথাটা একটু গালভরা মতন শোনাচ্ছে যাকে আমরা বলি full talping কিন্তু জীবনের সংঘর্ষ সময়ে বড় বড় কথাকে পাশ কাটিয়ে গেলে বড় পরিবর্তিত হয় না। বক্তৃতাটা দীর্ঘ হ'য়ে গেল, ক্ষমা কোরো। তবে আমার শেষ কথাটা এই to sum up এমন সময় জীবনে আসে যখন তাকে অঞ্চবই ডাক দেয় তখন ধ্রুবকে যে ছাড়তে পারে—to burn his boats তাকেই বলি মহৎ, যে পারে না তাকে বলি—গড়পড়তা সংসারী জীবমাত্র।

* * * *

পল্লব সেদিন রাতে আনন্দ যেন আর ধরে রাখতে পারে না! অকূল পাথারে দেখা পেল আলোকস্তম্ভের! সত্যিই তো এত শত আগুপাছুর কারণ কী—যখন ঘরে অন্ন আছে! মনে পড়ল কিছুদিন আগে কুঙ্কুম ওকে দেখিয়েছিল লেনিনের একটি প্রবন্ধ। তাতে লেনিন লিখেছিলেন যে, প্রতি বিপ্লবের প্রথম দিকে নেতা হতে হবে মধ্যবিত্তকেই—শ্রমিকেরা দলবদ্ধ হ'তে শিখবে প্রথমে এঁদের নায়কত্বেই। পরে ক্রমে ক্রমে আসবে তাদের নিজেদেরকে চালানোর ক্ষমতা। ওর হঠাৎ মনে হ'ল—ঠিক কথা, আমাকেও তাই এগুতে হবে গানকে পেশা করবার দিকে—যাতে ক'রে পরে আর সবাই ওদিকে আসতে পারে। আমার টাকা থাকার পরম সার্থকতা এইখানেই। তাছাড়া আর একটা কথাও ওর মনে হ'ল যে, যদি ওর প্রতিভা থাকে তবে ভয় কিসের? প্রতিভাই তো লোকের মত গ'ড়ে তোলে। রুচির মোড় ফিরিয়ে দেয়। আর প্রতিভা যদি না থাকে তবে প্রফেসর হয়ে ছেলে পড়িয়ে কি-ই বা এমন চতুর্বর্গ লাভ হবে? ওর মন গান গেয়ে ওঠে: to burn one's boats, to burn one's boats! ধন্ত মিস্টার টমাস—দিশারি।

ওর মন স্থির হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তিন তিনটি দীর্ঘ চিঠি লিখে ফেলল সব জানিয়ে—কুঙ্কুম, মোহনলাল আর মি নটনকে।

[ক্রমশ

(উপন্যাস)

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

২১

বাপ ফিরে পেয়েছে তার হারানো ছেলেকে। আনন্দে আত্মহারা দেবু চাটুজ্যে কি যে করবে—কি যে বলবে, কিছুই বুঝতে পারছে না। এই রকম যখন তার অবস্থা—তখন হন্তদন্ত হয়ে ছুটতে ছুটতে এসে হাজির হলো বুড়োশিব!

বাড়ীর দোরে রাস্তার ওপর দেবু চাটুজ্যের গাড়ীখানা দেখেই বুড়োশিব এই রকম একটা কিছু অনুমান করেছিল মনে মনে, কিন্তু সীতারাম যে তাকে একেবারে বাড়ীর দোতলায় নিয়ে গিয়ে তুলবে, আসবামাত্র সব-কিছু ফাঁস করে দেবে, অতটা সে ভাবতে পারেনি।

এত বড় আনন্দের সংবাদ—চেপেই বা সে রাখবে কেমন করে? আর সীতারাম সে রকম মানুষই নয়।

বুড়োশিব হো-হো করে হাসতে লাগলো দেবুর সুমুখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে।

দেবু জিজ্ঞাসা করলে, হাসছো যে অমন করে?

বুড়োশিব বললে, হাসবো না? একদিন আমি তোমার কাছে নিজে গিয়েছিলাম—সীতারাম নির্দ্দোষ, এই কথাটি তোমাকে বলবার জন্যে। তুমি বিশ্বাস করনি। সেদিন আমার চোখেও জল এসেছিল। ভগবান অলক্ষ্যে থেকে হেসেছিলেন। কাঁদ্ ব্যাটা, তোর এ কান্না একদিন কড়ায়-গণ্ডায় পুষিয়ে দেবো। আজ আমার সেই দিন এসেছে। তাই হাসছি।

দেবুও ম্লান একটু না হেসে থাকতে পারলে না।

বুড়োশিব বললে, কিন্তু ভাই, ভারি আফশোষ হচ্ছে। যা ভেবেছিলাম তা হ'লো না।

—কি ভেবেছিলে?

—ভেবেছিলাম, যার জন্যে এত কাণ্ড, সেই শুভকাজটি সমাধা ক'রে দেবো। চুপি-চুপি মালার সঙ্গে রঞ্জনের বিয়েটা সেরে দিয়ে তোমাকে ডেকে পাঠাবো—এই নাও, তোমার ছেলে নাও, এই নাও তোমার বৌ নাও।

দেবু বললে, দিলে না কেন?

সীতারামকে দেখিয়ে দিয়ে বুড়োশিব বললে, এই যে—ইনি। তোমাকে ডেকে এনে রঞ্জনকে তুলে দিলে তোমার হাতে!

দেবু বললে, আমাকে কেউ ডেকে আনেনি বুড়োশিব, আমি নিজে এসেছি মুখুজ্যের কাছে ক্ষমা চাইতে।

বুড়োশিব আবার হো-হো ক'রে হেসে উঠলো। সেই পবিত্র নির্ম্মল হাসি! বললে, ত্মাখো ত্মাখো—লীলাময়ের লীলা ত্মাখো অনুতপ্ত হয়ে তুমি যেমনি এলে তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে ভগবান অমনি প্রাণ খুলে আশীর্ব্বাদ করলেন তোমাকে। তোমা হারানো ছেলেকে দিলেন ফিরিয়ে!

বলতে বলতে বুড়োশিবের দু'চোখ বেয়ে দর-দর করে জল গড়িয়ে এলো। মুখে হাসি, চোখে জল!

দেবু অবাক হয়ে বুড়োশিবের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো বললে, এ আবার কি!

কাপড়ের খুঁটে চোখের জল মুছে বুড়োশিব বললে, এ কি নয়। আমার এরকম হয়।

ভগবানের নামে এ এক বিচিত্র অনুভূতি! সীতারাম খোল জানলার কাছে দাঁড়িয়েছিল, দেবু ডাকলে। বললে, শোনো বুড়োশিব ঠিকই বলেছে। আমি চললাম। রঞ্জন রইলো তোমা কাছে। মালার সঙ্গে তার বিয়ে দাও। আমি এসে ছেলে-বে নিয়ে যাব।

সীতারাম জিজ্ঞাসা করলে, তুমি বলছো এই কথা?

দেবু বললে, নিশ্চয়। এই যে এত কাণ্ড হলো—এ কিসে জন্যে? আমার ছিল টাকার দরকার। রাজাবাহাদুরের কা টাকা নিয়ে তার মেয়ের সঙ্গে ছেলের বিয়ে দেবার ব্যবস্থা যদি করতাম, তাহ'লে তো কিছুই হতো না। অথচ এমনি মজ টাকাও পেলাম না রাজাবাহাদুরের কাছ থেকে, এদিকে আমার হ'লো তা তো দেখতেই পাচ্ছ।

বুড়োশিব বললে, তবে যে শুনেছিলাম, রাজাবাহাদুরের কা থেকে তুমি অগ্রিম নিয়েছ?

—হ্যাঁ, অগ্রিম চেক্ একটা দিয়েছিল বটে। সেই চেক্ এক মাড়োয়ারীকে দিয়ে তার কাছ থেকে টাকা নিয়েছিলাম। শেষ পর্য্যন্ত চেকে টাকা পাওয়া গেল না। দেনাটা রয়ে গেল মাড়োয়ারীর কাছে।

আবার বুড়োশিব হেসে উঠলো। দেবু উঠে দাঁড়ালো। সীতারাম বললে, সত্যিই চললে ?

দেবু বললে, হ্যাঁ ভাই ! মনে মনে ভাবছিলাম—সুলতানপুরের লোকজনকে এক দিন খুব খাওয়াবো। ভালই হ'লো। ছেলের বিয়ের বৌ-ভাতটা হবে উপলক্ষ্য।

—আর আমি ? সীতারাম বললে, মেয়ের বিয়েটা কি আমি চুপি চুপি সেরে দেবো ?

দেবু বললে, দোষ কি ? রঞ্জন এসেছে—এখন যদি এই কথাটা জানাজানি হয়ে যায়, রঞ্জনকে দেখবার জন্যে লোক জড়ো হয়ে যাবে তোমার দরজায়। তার চেয়ে বিয়েটা তুমি সেরে দাও চুপি চুপি, আমি খুব ঘটা করে বাজনা বাজিয়ে বর-কনে নিয়ে যাব আমার বাড়ীতে।

বুড়োশিব বললে, তোমাকে এক দিন বলেছিলাম সীতারাম, আমি যা বলি তাই সত্যি হয়। এখন দেখছি, যা ভাবি তাও সত্যি ঘটে যায়।

চুপি চুপি ওদের বিয়েটা দেবো বলে আজ সকালেই আমি গিয়েছিলাম রাসু ভটচাজের বাড়ী। বিয়ের দিন ঠিক করেছিলাম কাল সন্ধ্যায়। তাহ'লে এই কথা রইলো দেবু, কাল সন্ধ্যেবেলা তুমি আসবে এখানে। বিয়ের সময় আর কেউ না থাকুক, তোমাকে থাকতেই হবে।

দেবু বললে, থাকবো।

পরের দিন বিয়ে। মালার সঙ্গে রঞ্জনের বিয়ে। যা তারা চেয়েছিল—তাই। কিন্তু নিতান্ত সঙ্গোপনে চুপি চুপি বিয়ে হবে, কেউ জানবে না, কেউ শুনবে না। জানবে শুধু দু'জন পুরোহিত আর একজন নাপিত।

সন্ধ্যার পরেই লগ্ন। দেবুর একজন কর্ম্মচারী এলো বিকেলবেলা প্রচুর জিনিসপত্র নিয়ে। দেবু পাঠিয়েছে। বিয়ের জন্য রঞ্জনের যা কিছু প্রয়োজন—সব। তার সঙ্গে দিয়েছে মালার খুব দামী একখানা শাড়ী, জামা, প্রসাধন-সামগ্রী আর দিয়েছে দেবুর মা'র গহনার বাক্সটি।

এই সব নিয়ে দেবু নিজেই আসতো, কিন্তু আসানসোল থেকে হঠাৎ একটা টেলিফোন্ পেয়ে তাঁকে চলে যেতে হয়েছে সেখানে। কর্ম্মচারীটি বললে, গাড়ী নিয়ে গেছেন। বলে গেছেন সোজা তিনি এইখানেই আসবেন। পুরুত আর নাপিতকে নিজে তিনি ডেকে বলে দিয়ে গেছেন। এ-কথা কাউকে তারা বলবে না।

এদিককার ব্যবস্থা সীতারামকে কিছুই করতে হয়নি। সে শুধু টাকা দিয়েই নিশ্চিন্ত। বুড়োশিব সবই করেছে।

কাঞ্চনের আজ আনন্দের সীমা নেই। রাত্রি প্রভাত হবার আগেই সে শয্যাত্যাগ করেছে। তারপর থেকে কি যে সে করবে কিছুই বুঝতে পারছে না।

মালা রান্নাঘরে ঢুকেছিল প্রতিদিনের মত মাকে সাহায্য করতে, কাঞ্চন তার হাতের কাজ কেড়ে নিয়ে বললে, বিয়ের কনেকে কাজ করতে নেই। সরে বোস্।

মালা হাসতে হাসতে বললে, বিয়ে তো সেই সন্ধ্যেবেলা মা, কাজ করলাম তো কি হ'লো ?

—না। উপোস করে কাজ করলে মুখখানি শুকিয়ে যাবে।

—তুমিও তো উপোস করেছো মা !

—আমার কিছু হবে না।

—আমারও কিছু হবে না। তুমি দেখে নিও। বিয়ে বলে আমার মনেই হচ্ছে না।

কাঞ্চন বললে, মনে হবে কেমন করে মা ! একটিমাত্র মেয়ের বিয়ে, ভেবেছিলাম কত কি করবো। তিন দিন ধরে সানাই বাজবে, নাচ-গান হবে, কত লোকজন আসবে বাড়ীতে, বর আসবে, বরযাত্রী আসবে, খাবে দাবে আনন্দ করবে।

কথাটা মালা তাকে শেষ করতে দিলে না। বললে, না মা, হৈ-চৈ গোলমাল হ'লো না, ভালই হলো। বাবার অনেক খরচ বেঁচে গেল। বেশ কেমন চুপি-চুপি এ আমার বেশ ভালই লাগছে।

—তবে যে বলছিস—বিয়ে-বিয়ে মনে হচ্ছে না ?

মালা ফিক্ ফিক্ ক'রে হাসতে লাগলো। সে আজ তার হাতে পেয়েছে আকাশের চাঁদ। তারও মনে আজ আনন্দের জোয়ার।

কাঞ্চন চুপ ক'রে রইলো। আড়চোখে দেখতে লাগলো মালাকে। ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে তাকে।

মালার সঙ্গী-সাথী নেই। মা-ই তার সঙ্গী, মা-ই তার সখী। হাসতে হাসতে মাকে জিজ্ঞাসা করলে, আচ্ছা মা, আজ তোমার জামাইকে কে সাজাবে ? কপালে চন্দনের ফোঁটা দিয়ে সাজিয়ে দিতে হবে তো ?

মা'ও একবার হাসলে মেয়ের দিকে তাকিয়ে। খানিক চুপ ক'রে থেকে বললে, জানি না।

—জানো না ?

মা চুপ ক'রে রইলো।

—না তুমি বল মা ?

—কি বলবো ?

—কে সাজিয়ে দেবে তোমার জামাইকে ?

কাঞ্চন খানিক চুপ ক'রে থেকে খানিক ভেবে বললে, আমি দেবো।

—হেট্ ! তোমার লজ্জা করবে।

কাঞ্চন বললে, লজ্জা করবে কেন ? মা দেয় না ছেলেকে সাজিয়ে ?

মালা বললে, আজ থেকে তুমি তাহ'লে ওর মা হ'লে ? তোমাকে মা বলে ডাকবে তো ?

কাঞ্চন বললে, নিশ্চয়ই ডাকবে। আমার ছেলে ছিল না—ছেলে পেলাম। রাজপুত্রের মতন ছেলে। মতন কেন ? রাজপুত্র তো !

মালা বললে, তোমার বুঝি খুব পছন্দ হয়েছে ওকে ?

—হবে না ?

—তাহ'লে ওকে তুমি ছেলের মতন ভাল বাসবে ?

—বাসরেই তো!

মালা বললে, হ্যাঁ, দেবো বাসতে! আমি বুঝি পর হয়ে যাব?

কাঞ্চন বললে, পাগলের মত কি যা-তা' বক্‌ছিস?

মালা বললে, আচ্ছা মা, আমি যদি পাগল হয়ে যাই, তুমি কি করবে?

কাঞ্চন এবার আর কিছুতেই জবাব দিলে না। কেন যে মালা আজ এমনি আবোল-তাবোল বকছে সে বুঝতে পেরেছে অনেকক্ষণ। ভালই লাগছে তার। তবু বললে, চুপ করবি?

মালা বললে, চুপ করেই তো রয়েছি।

কাঞ্চন বললে, যা এক ঘুম ঘুমিয়ে নিগে।

মালা বললে, কেন মা? ঘুমোবো কেন? আমাকে আজ রাত জাগতে হবে নাকি?

কাঞ্চন বললে, জানি না, যাঃ!

—যাব?

—হ্যাঁ যা।

মালা বললে, বেশ তবে যাই তোমার রাজপুত্তুর ছেলেকে খানিকটা জ্বালিয়ে আসি।

কাঞ্চন বললে, না যাসনি। আজ যেতে নেই। সেই শুভদৃষ্টির সময় দেখা হবে।

মালা ফিক্ করে হেসে ফেললে। বললে, আচ্ছা মা, শুভদৃষ্টির সময় আমি যদি হেসে ফেলি? কি হবে তাহ'লে? হাসতে নেই?

কাঞ্চন গম্ভীর হয়ে বললে, না।

মালা বললে, কেন মা? হাসলে কি হয়?

বুড়োশিব এসে দাঁড়ালো। কাঞ্চন বেঁচে গেল। বুড়োশিব বললে, মুখুজ্যে-গিন্নির আজ খুব কষ্ট হচ্ছে বুঝতে পারছি। এতগুলো লোকের রান্না—

কাঞ্চন বললে, এতগুলো কোথায়?

বুড়োশিব বললে, এ বেলায় না হয় কোনোরকমে চালিয়ে দিচ্ছেন দিন, ও-বেলায় কিন্তু হেঁসেলে ঢুকতে পাবেন না। আমি খুব ভাল এক জন লোক এনেছি। খুব বিশ্বাসী লোক।

কাঞ্চন বললে, লোক আবার আনতে গেলেন কেন? জানাজানি না হয়ে যায়—আমার শুধু সেই ভয়।

বুড়োশিব বললে, না, তা হবে না। আর হলোই বা। কাল সন্ধ্যেবেলা তো দেবু ওদের নিয়ে যাবে। যাক্, যে কথা বলতে এলাম শুনুন। কি কি রান্না হবে তার একটা ফর্দ্দ করবো আপনাকে জিজ্ঞাসা ক'রে।

বুড়োশিব কাগজ-পেন্সিল নিয়ে বসলো।

সন্ধ্যার আগে সবই প্রস্তুত হয়ে গেল। দোতলার বড় হল-ঘরে হবে বিয়ে। কাঞ্চন নিজেই আলপনা এঁকে মনের মত ক'রে সাজিয়েছে ঘরখানা।

সন্ধ্যার অন্ধকার নামতেই বড় বড় কয়েকটা পেট্রোমেক্স জ্বালানো হলো। পুরোহিত শালগ্রামশিলা এনে নান্দীমুখ সেরে ফেললেন।

দেবুর জন্য অপেক্ষা করছে সবাই। দেবু এলেই বিয়ে বসবে। অথচ দেবুর গাড়ীর এখনও দেখা নেই। সীতারাম চিন্তিত হয়ে উঠলো।

বুড়োশিব নীচে গিয়ে সদর দরজায় দাঁড়িয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে রইলো। আটটা পঁচিশে লগ্ন। দেবুর গাড়ী এসে যখন দাঁড়ালো, ঘড়িতে তখন আটটা কুড়ি।

সীতারাম জিজ্ঞাসা করলে, এত দেরি হলো যে?

দেবু বললে, ভেবেছিলে বুঝি এলো না?

বুড়োশিব বললে, না এলেও সেরে দিতাম।

সীতারাম হেসে উঠলো।

দেবু বললে, এস-ডি-ও ডেকে পাঠিয়েছিলেন। ভেবেছিলাম, রঞ্জনের খবরটা কাউকে এখন বলবো না। কিন্তু বলতে বাধ্য হলাম।

বুড়োশিব, সীতারাম—দু'জনেই জিজ্ঞাসা করলে, কেন?

দেবু বললে, একটা ইরাণী মেয়ে এস-ডি-ওর কাছে গিয়ে ভারি গোলমাল বাধিয়েছিল আজ। সে বলে কি না এই হত্যা রহস্যের সব কিছু সে জানে। সে বলেছে, যার মৃতদেহ আমাদের মুখুজ্যে পুকুরে পাওয়া গেছে, সেটা নাকি পানাগড়ের এক বাঙ্গালী ছোকরার মৃতদেহ, দেবু চাটুজ্যের ছেলে রঞ্জন সে নয়। তাদেরই দলের এক ছোকরা নাকি তাকে খুন করে ওইখানে পুঁতে দিয়ে ফেরার হয়েছে।

মেয়েটাকে পাগলী ভেবে এস-ডি-ও তাড়িয়ে দিয়েছেন।

এ ক্ষেত্রে আমার আর চুপ করে থাকা চললো না। এস-ডি-ও কে বলতে বাধ্য হলাম, রঞ্জন ফিরে এসেছে। ইরাণী মেয়েটাকে তাড়িয়ে দেওয়া আপনার উচিত হয়নি।

রঞ্জনের ফিরে আসার খবর পেয়ে এস-ডি-ও খুশী হলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি পুলিশ-সাহেবকে ডেকে পাঠালেন।

পুলিশ সাহেব আসতেই এস-ডি-ও বললেন, নিন মশাই, আপনার কাজ বাড়লো। দেবু বাবুর ছেলে বাড়ী ফিরেছে।

পুলিশ-সাহেব কি যেন ভাবছিলেন মাথা হেঁট করে। ইরাণী মেয়েটার কথা শুনে আশ্বস্ত হলেন। বললেন, ইরাণীদের দলটা বেশী দূর যায়নি। এ আমি বের করে ফেলবো।

বের করুন উনি! আমার দেরি হয়ে গেল। নমস্কার করে চলে এলাম।

বিয়ে চুকে গেল নির্বিঘ্নে।

মা কাছে বসে যত্ন করে খাওয়ালেন মেয়ে-জামাইকে। খাইয়ে বললেন, যা।

কোথায় বললেন যেতে?

রঞ্জন আগেই চলে গেছে তার জন্য নির্দিষ্ট শয়ন কক্ষে। এবার মালার পালা। মা ছাড়পত্র দিয়ে দিয়েছে।

কিন্তু মালার পা যেন আজ চলতে চাইছে না লজ্জায়। পরিহাস-চটুল সমবয়সী কোনও সখী কিংবা কোনও বোন যদি থাকতো তার, আজ সে তাকে টেনে নিয়ে যেতো বাসর শয্যায়। হাসিতে গল্পে গানে রাত্রি প্রভাত হয়ে যেতো।

কাল সে শ্বশুরবাড়ী চলে যাবে। কাজেই বিবাহের কোনও অনুষ্ঠান ফেলে রাখা হয়নি। কুশণ্ডিকা সেরে দেওয়া হয়েছে। সীঁথিতে

সিঁদুর উঠেছে। মালা স্বায়তঃ ধর্ম্মতঃ আইনতঃ আজ রঞ্জনের বিবাহিতা স্ত্রী।

এক পা এক পা করে মালা এগিয়ে যাচ্ছে রঞ্জনের ঘরের দিকে। জানলার কাছে থমকে থামলো। খোলা জানলার বাইরে দেখলে, আকাশে চাঁদ উঠেছে। লাল লাল ফুলে-ভরা কৃষ্ণচূড়া গাছের ওপর জ্যোৎস্নার আলো। স্নিগ্ধ সুন্দর হাওয়া এসে লাগছে তার মুখে, তার এলো চুলে, তার সারা দেহে।

মালার চোখে আজ সব কিছু ভাল লাগছে। মনে হচ্ছে যেন পৃথিবীর রং গেছে বদলে। অনুরাগে লাল হয়ে উঠেছে গাছের ফুল। চারি দিকে চলেছে যেন নব বসন্তের উৎসব। তার রক্তে জেগেছে শিহরণ, হৃদয়ে খেলেছে এক বিচিত্র অনুভূতি।

ইচ্ছে করছে—ছুটে গিয়ে আছাড় খেয়ে পড়ে রঞ্জনের বুকের ওপর। কিন্তু পারছে না। পা টলছে। মাতাল হয়ে গেছে মালা।

মাকে না জানিয়ে বাবাকে লুকিয়ে মুখুজ্যে পুকুরে যখন সে যেতো অভিসার যাত্রায়, তখন কিন্তু তার এত লজ্জা হতো না।

অথচ আজ সে ছাড়পত্র পেয়েছে রঞ্জনের কাছে যাবার আর আজকেই কি না তার যত লজ্জা যত সঙ্কোচ!

মালা হঠাৎ চমকে উঠে পেছন ফিরে চাইলে। দেখলে, রঞ্জন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছে।

—এখানে দাঁড়িয়ে কেন? এসো।

মালা আর রঞ্জন। দুটি নবীন জীবনের হলো সার্থক মিলন। প্রেমের দেবতা অলক্ষ্যে থেকে আশীর্ব্বাদ করলেন এই নবদম্পতিকে। যাদুমন্ত্রে যেন রূপান্তরিত হয়ে গেল এই পৃথিবী। সব যেন আনন্দময়, সব যেন মধুময়।

মনে হলো এ যেন তাদের নবজন্ম। রাত্রি প্রভাত হ'লো। আনন্দোজ্জ্বল জীবনের নব প্রভাত! ধূলার ধরণীতে নেমে এলো স্বর্গের সুষমা। সারাটা দিন কাটালো যেন নেশার ঘোরে।

সন্ধ্যার আগেই তাদের যাবার ব্যবস্থা। খবর পাঠিয়েছে দেবু তার কর্ম্মচারীকে দিয়ে। রাণীগঞ্জ থেকে ব্যাগপাইপ বাঁশী ঢোল ইত্যাদি নিয়ে একদল লোক এলো—গোরার বাজনা বাজাবার জন্যে। কারবাইড গ্যাসের বাতি এলো। আর সবার শেষে এলো প্রকাণ্ড একখানা মোটর গাড়ী ফুল দিয়ে সাজানো। সব এসে জড়ো হলো সীতারাম মুখুজ্যের দরজায়।

যে-রঞ্জনকে নিয়ে এত কাণ্ড, সেই রঞ্জন নাকি সশরীরে ফিরে এসেছে। এক কান দু'কান হ'তে হ'তে কথাটা সুলতানপুরের সবাই শুনে ফেললে।

তার ওপর আবার আর একটা গুজব। যে সীতারাম মুখুজ্যে রঞ্জনকে খুন করেছে বলে প্রায় মাসাবধি কাল হাজত-বাস করে এলো, তারই মেয়ে মালার সঙ্গে রঞ্জনের বিয়ে পর্য্যন্ত হয়ে গেছে কাল রাত্রে।

ছুটলো সব সীতারামের বাড়ীর দিকে। শোভাযাত্রা তখন সুরু হয়ে গেছে। সবার আগে চলেছে দেবু চাটুজ্যের প্রকাণ্ড গাড়ী। ভেতরে দুই বেয়াই বসে পাশাপাশি। সীতারাম মুখুজ্যে আর দেবু চাটুজ্যে। আর ড্রাইভারের পাশে বসে আছে বুড়োশিব।

বিরাট শোভাযাত্রা চলেছে—বাজনা বাজিয়ে। মাঝখানে ফুলে-ঢাকা কনভারটেব্‌ল্ ক্যাডিল্যাকের ওপর বর আর কনে। মালা আর রঞ্জন। সোনার মুকুট পরে রাজরাণীর মত পরমাসুন্দরী মালা বসে আছে স্বাস্থ্যবান সুন্দর রঞ্জনের পাশে।

সবাই অবাক হয়ে দেখলে রঞ্জনকে। বিস্ময়ের ওপর বিস্ময়। কয়লাকুঠির দেশ আজ চমকে উঠলো এই অভাবনীয় ব্যাপারে। রঞ্জনকে দেখা যেন তাদের শেষই হয় না। সত্যিই রঞ্জন তো, না আর কেউ? সঙ্কটা ভৈরবীর মন্দির হয়ে শোভাযাত্রা ফিরে এলো রুদ্রেশ্বর ভৈরবের মন্দির সমুখে।

গাড়ী থেকে নামলো সীতারাম, নামলো দেবু, নামলো বুড়োশিব। বর-কনেকে নামানো হ'লো।

মন্দির-চত্বরে গিয়ে রুদ্রেশ্বর মহাদেবকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করলে সকলে। তারপর পূজারীকে ডেকে দেবু তার হাতে একশো টাকার একটি নোট দিয়ে বললে, বাবার প্রণামী।

দেবু আজ মুক্তহস্ত।

গ্রাম পরিক্রমা শেষ করে শোভাযাত্রা গি... ...ালো দেবু চাটুজ্যের প্রাসাদোপম অট্টালিকার প্রবেশ-পথে।

বাড়ীর চারি দিকে আলো দেওয়া হয়েছে। ... ...ছে গাছে আলো জ্বলছে। পরমোৎসব রাত্রির আনন্দ যে... ...ক ছড়িয়ে পড়েছে।

পরের দিন সারা সুলতানপুরের নি... দেবু চাটুজ্যের বাড়ীতে। সারাদিন চললো খাওয়া আর খাওয়া। সুলতানপুরের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা, ব্রাহ্মণ-শূদ্র, ইতর-ভদ্র, কয়লাকুঠির কুলি-কামিন, দীন-দুঃখী—যে যেখানে ছিল, সকলেরই নিমন্ত্রণ।

সবাই বলতে লাগলো—এমন খাওয়া তারা কখনও খায়নি। দুহাত তুলে আশীর্ব্বাদ করে গেল নব দম্পতিকে।

পরাশর এলো পট্টবস্ত্র পরিধান করে। মাথার বড় বড় চুল চুড়ো করে বেঁধেছে মাথার ওপর, কপালে রক্তচন্দন আর সিঁদুরের ফোঁটা, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। মানিয়েছে চমৎকার!

পরাশরের সঙ্গে এসেছে মদন আর হারু। পরাশর বলেছিল, আমার খাতিরটা দেখবি একবার।

মদন আর হারু কিন্তু সে কথা বিশ্বাস করেনি। কারণ, তার অভ্রান্ত গণনা এক্ষেত্রে কেন জানি না ভুল হয়ে গেছে। রঞ্জন যে মরেনি, সে যে কোনো দিন ফিরে আসতে পারে—সে কথা সে বলতে পারেনি।

বলতে পারেনি সত্য, কিন্তু একটা ঘটনা এক দিন ঘটে গিয়েছিল দৈবাৎ। সে কথা এক দেবু চাটুজ্যে ছাড়া আর কেউ জানে না। আজ যে সেটা এমন ভাবে মিলে যাবে তা সে নিজেও ভাবতে পারেনি।

সেদিন সে গিয়েছিল কাছাকাছি একটা গ্রামে ধান-চুরির গণনা করতে, ফেরার পথে দেবু চাটুজ্যের সঙ্গে দেখা। তাকে দেখেই বোধ হয় দেবু চাটুজ্যের গাড়ীটা থামলো। দেবু বললে, কোথায় যাবে? পরাশর বললে, যাব না কোথাও। গিয়েছিলাম কমলপুর, ফিরছি। দেবু বললে, ওঠো গাড়ীতে। পরাশর গাড়ীতে উঠলো। দেবু জিজ্ঞাসা করলে, এই যে তুমি গণনা-টননা কর, এ-সব কি সত্যি? পরাশর বললে, সত্যি যদি না হতো, লোকজন আসতো না আমার কাছে। দেবু বললে, তাহ'লে কই বল তো দেখি, এই যে আমার মনের অশান্তি, এ-অশান্তি কি ঘুচবে না কোনো দিন?

পরাশর বলেছিল, দিন, দেখি আপনার হাতটা! দেবুর হাতের রেখার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলেছিল, আর ছ' মাস। ছ' মাসের ভেতর মনে যদি আপনি শান্তি না পান তো মারবেন আমার মাথায় পাঁচ জুতো।

পরাশর জানতো, শান্তি না পেলেও জুতো সে মারবে না।

দেবু বলেছিল, আর যদি শান্তি পাই, তাহ'লে?

পরাশর বলেছিল, আমাকে দশটা টাকা দেবেন।

তার বেশি চাইতে ভরসা হয়নি।

পরাশর কোথায় যেন শুনেছিল, মানুষের শোক—তা সে যত বড়ই হোক্, নিরানব্বই দিনের মধ্যে মানুষ তা ভুলতে আরম্ভ করে। সেই জন্তেই পরাশর দেবুকে বলেছিল, আর ছ' মাসের ভেতর আপনি শান্তি পাবেন। কারণ মুখুজ্যে-পুকুরে মৃতদেহটা পাওয়া গিয়েছিল তার এক ম' আগে।

দেবু জিজ্ঞাসা করেছিল, রঞ্জনকে কে মেরেছে, তুমি ?

ধা।

রাশরের বুক কাঁপছে। তাড়াতাড়ি গাড়ী থেকে পারলে বাঁচে। পরাশর বলেছিল, নাম-ধাম ঠিক বলতে ন ও মায়ের পুজো করে যদি গণনা করতে বসি, তাহ'লে অ জতে বলে দিতে পারি।

দেবু বলে স গণনা তোমাকে এক দিন করাবো।

তার পর অবশ্য সে গণনা করাবার প্রয়োজন তার হয়নি।

পরাশর সেদিন দেবুর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়ে প্রথমেই দেবুর কর্ম্মচারী সুধীরকে জিজ্ঞাসা করলে, বাবু কোথায়?

সুধীর বললে, ওই দিকে আছেন। বসুন আপনি। মদন, হারু, বোসো তোমরা।

পরাশর বললে, বাবুকে খবর দাও!

সুধীরের মুখে খবর পেয়েই দেবু এলো। পরাশরকে দেখেই বললে, তোমার কথাটা ঠিক ফলে গেছে পরাশর! দশটি টাকা তোমার পাওনা আছে। বলেই সুধীরকে ডেকে বললে, সুধীর, পরাশরকে পঞ্চাশটি টাকা দিয়ে দাও।

পরাশর গম্ভীর মুখে একবার মদনের দিকে, একবার হারুর দিকে তাকালে।

মদন জিজ্ঞাসা করলে, টাকা কিসের পরাশরদা'?

পরাশর বললে, গণনার।

হারু বললে, তুমি কি বলেছিলে, রঞ্জন মারা যায়নি, রঞ্জন ফিরে আসবে?

পরাশর এদিক-ওদিক একবার তাকিয়ে দেখলে, কথাটা কেউ শুনছে কি না। দেখলে কেউ শোনেনি। তখন বললে, বলেছিলাম।

পঞ্চাশটি টাকা কোঁচড়ে গুঁজে পরাশর খেতে বসলো। তার এক পাশে বসলো মদন, আর এক পাশে বসলো হারু।

দেবু সুধীরের ওপর ভার দিয়েছিল পরাশরকে ভাল করে খাওয়াতে।

সুধীর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খাওয়াচ্ছিল। কিন্তু সে কি খাওয়া!

পরাশরের খাওয়া দেখে মনে হলো, সে যেন কাঁসির খাওয়া খেয়ে নিচ্ছে।

পোলাও, মাছ, মাংস তিন-চার দফা হয়ে যাবার পর পঞ্চাশটি রসগোল্লা যখন অবলীলাক্রমে পার করে দিলে, মদন তখন একটু শঙ্কিত হয়ে উঠলো। দাদার কিছু হ'লে সামলাতে হবে তাকেই। চিমটি কেটে বললে, দাদা, থামো।

পরাশর শুধু বললে, হুঁ।

সুধীর একবার চট করে সেখান থেকে সরে গিয়ে দেবুকে বলেছিল, দেখবেন আসুন, পরাশরের খাওয়া দেখবেন।

দেবু মজা দেখবার জন্তেই হাসতে হাসতে এসে দাঁড়ালো পরাশরের কাছে।

কিন্তু খাওয়া দেখা তার আর হ'লো না।

মদন আর হারু তাকে তখন জোর করে তুলে দিয়েছে।

দেবু জিজ্ঞাসা করলে, ভাল করে খেয়েছ তো?

পরাশর বললে, খুব।

দেবু সুধীরকে ডেকে বললে, হাত ধোবার জল দাও, পান দাও।

এই বলে সে চলে যাচ্ছিল, কিন্তু দশ টাকা বলে যে পঞ্চাশ টাকা দিতে পারে তাকে সহজে ছাড়তে চাইলে না পরাশর। বললে, আমি জল-পান খাই, আপনি একবার আসবেন, একটা কথা বলবো আপনাকে।

একটা মিথ্যা যখন জয়লাভ করে, আর একটা মিথ্যা বলার প্রলোভন সম্বরণ করা পরাশরের মত মানুষের পক্ষে তখন শক্ত হয়ে ওঠে।

হাত ধুয়ে জল খেয়ে পান মুখে দিয়ে সুধীরের দেওয়া সিগারেটটি পরাশর সবে তখন ধরিয়েছে, এমন সময় দেবু এলো। জিজ্ঞাসা করলে, কি বলছিলে?

ভবিষ্যদ্বক্তা মহাপুরুষেরা কেমন করে বসে, কেমন করে কথা বলে কিছুই সে জানে না, তবু নিজেকে যথাসম্ভব সেই রকম করবার চেষ্টা করে। পরাশর বললে, আপনার হস্তরেখায় সেদিন দেখলাম, আপনার পুত্রের মৃত্যু নেই, কিন্তু কথাটা বলতে আমার সাহস হলো না। নইলে বলতে পারতাম—আপনার পুত্র ফিরে আসবে! কথাটা তাই ঘুরিয়ে বলেছিলাম—মনে আপনি শান্তি পাবেন।

দেবু বললে, ভাল, ভাল, তোমার গণনা সত্যিই ভালো। সেই জন্তেই তো তোমাকে আমি পুরস্কার দিলাম।

পরাশর বললে, আর একটা গণনার কথা আজ আপনাকে বলে যাই। কাল মায়ের পুজো শেষ করে আমি গণনা করতে বসলাম। দেখলাম—আপনাদের এই সুলতানপুরের মাটির দোষ কিনা জানি না। একটা-না-একটা হাঙ্গামা এখানে লেগেই থাকবে। এই আমি বলে গেলাম। মিলিয়ে দেখবেন।

অত্যধিক আহারের জন্তই বোধ করি পরাশরের আর বেশিক্ষণ বসে থাকা সম্ভব হলো না। উঠে দাঁড়িয়ে বললে, আসি তাহলে নমস্কার!

মদন ও হারুকে সঙ্গে নিয়ে পরাশর চলে গেল।

এই ভবিষ্যদ্বাণী সে কেন করে এলো তা সে জানে। রঞ্জন যখন ফিরে এলো তখন রঞ্জনের মৃতদেহ বলে মুখুজ্যে পুকুরে যেটা পাওয়া গেছে সেটা তাহলে কার? এই নিয়ে একটা হাঙ্গামা হৈচৈ হবেই পুলিশ সহজে ছাড়বে না। এই ভেবেই কথাটা সে বলে এসেছিল।

অদৃষ্ট বিধাতা বোধ করি তখন অলক্ষ্যে থেকে হেসেছিলেন।

দু'দিন যেতে না যেতেই বাধলো এক ভীষণ গোলমাল। সুলতানপুর আবার সরগরম হয়ে উঠলো।

পরাশরের জয় জয়কার!

কিন্তু যা ভেবে সে বলেছিল তা' হলো না—ঘটনাটা ঘটলো অন্য জায়গায়।

হঠাৎ দেখা গেল কলিয়ারীর সাইডিং লাইনের পাশে পরমাসুন্দরী একটি মেয়ের মৃতদেহ পড়ে আছে চিৎ হয়ে। মেয়েটা যুবতী—সাদা ধপধপে গায়ের রং। সাদা গায়ে লাল টকটকে রক্তের ছোপ। মাথাটা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দশ-বারো হাত দূরে গিয়ে পড়েছে। এত রক্তও ছিল মেয়েটার শরীরে! জায়গাটা লালে লাল!

দলে দলে লোকজন সব জড়ো হ'তে লাগলো। পুলিশ এলো, ভিড় সরিয়ে পাহারা দিতে লাগলো। পুলিশসাহেব এলেন। এস-ডি-ও এলেন তাঁর সঙ্গে।

এস-ডি-ও দেখেই চিনলেন—এ সেই ইরাণী মেয়েটা, যাকে তিনি তাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

পুলিশ-সাহেব তাকেই খুঁজছিলেন—মুখুজ্যে পুকুরের মৃতদেহের একটা হদিস পাবার জন্যে। কিন্তু ছি ছি, এ কি হলো? জীবন্ত পাওয়া গেল না তাকে।

মেয়েটা ট্রেণের চাকার তলায় মাথা দিয়ে আত্মহত্যা করেছে নিশ্চয়ই। কিন্তু কেন?

এস-ডি-ও বললেন, তাড়িয়ে দিলাম বলে?

পুলিশ সাহেব বললেন, না। প্রণয়ঘটিত ব্যাপার একটা আছে বোধ হয়।

এস-ডি-ও এসেছেন শুনে দেবু এলো, সীতারাম এলো। বুড়োশিব এসে দাঁড়ালো হাসতে হাসতে।

ওদিকে নববিবাহিত রঞ্জন এখানে আসবার জন্য জামা গায়ে দিচ্ছিল। মালা বললে, কোথায় যাচ্ছ?

রঞ্জন বললে, দেখে আসি।

মালা বললে, না। ইরাণী মেয়ে ও চুমকি। আমি ওকে চিনি। তুমি যেয়ো না ওখানে।

রঞ্জনের সমবয়সী সুধীর পেরিয়ে যাচ্ছিল সুমুখ দিয়ে। রঞ্জন ডাকলে, সুধীর, শোনো।

সুধীর কাছে এসে দাঁড়ালো। মালা তার মাথার কাপড়টা একটু তুলে দিলে।

রঞ্জন জিজ্ঞাসা করলে, গিয়েছিলে তুমি ওখানে? দেখে এলে মেয়েটাকে?

সুধীর বললে, ও আর কি দেখবো? মেয়েটা কাল সন্ধ্যেবেলা না হবে তো পাঁচ বার এসেছিল এখানে।

মালা চমকে উঠলো। বললে, এসেছিল?

সুধীর বললে, হ্যাঁ। রঞ্জনের সঙ্গে দেখা করতে চাইছিল। যত বলি দেখা হবে না, ও তত বলে, তুমি একবার বল তোমার দাদাবাবুকে চুমকি ডাকছে। শেষে একবার মিছেমিছি ঘরে ঢুকে ফিরে গিয়ে বললাম, দাদাবাবু বললে, দেখা করতে পারবো না। ওকে চলে যেতে বল। মেয়েটা কিছুতেই বিশ্বাস করতে চায় না। তারপর কি যেন ভাবলে, ভেবে বললে, তুমি একবার মালা দিদিমণিকে বল। আমি বললাম, তোমার মালা দিদিমণির সঙ্গে আমি কথা বলি না। আমি পারবো না বলতে। তখন ও আমার পা দুটো জড়িয়ে ধরতে এলো। কান্নাকাটি করতে লাগলো। তখন কি আর করবো, গুর্খা দারোয়ানটাকে ডেকে বললাম—একে রাস্তায় বের করে দে। যেতে চাইছিল না কিছুতেই। ওই ঝাউগাছটার তলায় বসে পড়লো। গুর্খা তখন ওর হাত ধরে চড় চড় করে টেনে নিয়ে চলে গেল। দয়া হলো মেয়েটার ওপর। বললাম, খাবে তো খেয়ে যেতে পারো। মেয়েটা কাঁদতে কাঁদতে বললে, না আমি খেতে আসিনি। এই বলে গুর্খার হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে নিজেই বেরিয়ে গেল।

রঞ্জন গুম হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনলে সব-কিছু।

মালা সুধীরের দিকে না তাকিয়েই বললে, আপনি যেন কারও কাছে বলবেন না এ-কথা।—এসো।

দু'জনেই ঘরে গিয়ে ঢুকলো।

মালার চোখের জল সুধীর দেখতে পেলে না, কিন্তু রঞ্জনের চোখে এড়ালো না। বললে, এ কি, ওই মেয়েটার জন্যে তুমি কাঁদছো?

চোখের জল মুছে মালা বললে, ওদের দলের সঙ্গে পথে পথে ঘুরে বেড়াতে ওর ভাল লাগতো না। হতভাগী ঘর বাঁধতে চেয়েছিল।

রঞ্জন বললে, না। ও চেয়েছিল ভালবাসতে।

মালা মুখ তুলে তাকালে রঞ্জনের দিকে। জিজ্ঞাসা করলে, কা'কে? তোমাকে?

কথাটার জবাব দেওয়া হলো না। হাসতে হাসতে বুড়োশিব এসে দাঁড়ালো। বললে, এসো তোমরা দু'জনেই এসো! পুলিশ-সাহেব আর এস-ডি-ও এসেছেন।

রঞ্জনের বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠলো। বললে, কেন, আমরা যাব কেন?

বুড়োশিব বললে, তোমার বাবা ওঁদের ডেকে আনলেন ছেলে-বৌকে দেখবেন বলে, ওঁরা এলেন বর-কনেকে আশীর্ব্বাদ করতে।

রঞ্জন বললে, চলুন যাচ্ছি।

বুড়োশিব বললে, বেশি দেরি কোরো না, ওঁদের তাড়াতাড়ি ফিরে যেতে হবে। আবার একটা মেয়ে কাটা পড়েছে ট্রেণের তলায়। যত ঝঞ্ঝাট কি আমাদের এইখানেই!

রঞ্জন বললে, আপনার পরাশর তো গণনা করে বলে দিয়েছে—আমাদের দেশে এমনি ঝঞ্ঝাট নাকি লেগেই থাকবে।

সমাপ্ত

"OBSCENITY is whatever happens to shock some elderly and ignorant magistrate."

—*Bertrand Russell.*

থার্মোফ্লাস্কের ইতিহাস

শ্রীহরপ্রসাদ ঘোষ
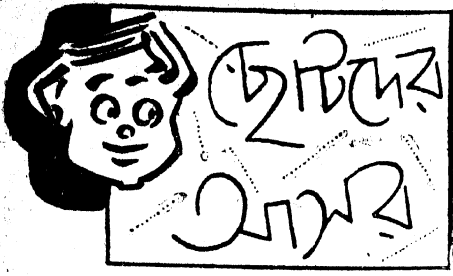
থার্মোফ্লাস্কে গরম জল গরম বা ঠাণ্ডা জল ঠাণ্ডা থাকে। এর একমাত্র কারণ থার্মোফ্লাস্কের ভেতর হ'তে তাপ বাইরে যেতে পারে না, কিম্বা বাইরে হতে তাপ ভেতরে আসতে পারে না। যদি বাইরে থেকে তাপ ভেতরে যেত তাহলে থার্মোফ্লাস্কের ভেতরে যে ঠাণ্ডা জিনিষ থাকত তার সঙ্গে বাইরের তাপ মিশে গিয়ে ভেতরের ঠাণ্ডা জিনিষটাকে গরম করে দিত। যদি থার্মোফ্লাস্কের ভেতর হ'তে তাপ বাইরে বেরিয়ে আসতে পারত, তাহলে থার্মোফ্লাস্কের ভেতরে যে গরম জিনিষ রাখা হ'ত, সে গরম জিনিষের তাপ থার্মোফ্লাস্কের বাইরে বার হয়ে এসে বাইরের অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা আবহাওয়ার সঙ্গে মিশে যেত এবং ভেতরের জিনিষটা স্বভাবতঃই ঠাণ্ডা হয়ে যেত। কিন্তু এই সব ব্যাপার ঘটে না বলেই থার্মোফ্লাস্কের এত কদর। এখন থার্মোফ্লাস্ক কি ভাবে তৈরী, সেটা জানবার ইচ্ছা তোমাদের খুব হ'চ্ছে, কি বল? থার্মোফ্লাস্ক কি ভাবে তৈরী সেকথা তোমাদের একটু পরে বলব। তার আগে কয়েকটা কথা তোমাদের জানতে হবে। সেগুলি হ'ল—এক হ'তে অন্য বস্তুতে কেমন ভাবে ও কি কি উপায়ে তাপের আদান-প্রদান হয়। এইগুলি জানতে পারলেই তোমরা বেশ ভাল ভাবেই বুঝতে পারবে, কেন থার্মোফ্লাস্কের ভেতরের গরম জিনিষ গরম অথবা ঠাণ্ডা জিনিষ ঠাণ্ডা থাকে।

তিনটে উপায়ে তাপের আদান-প্রদান হয়। পরিবহন, পরিচলন ও বিকিরণ। কেমন ভাবে হয় তাই শোনো এবার।

তাপের পরিবহন।

একটা লোহার রডের এক অংশ যদি আগুনের মধ্যে ঢুকিয়ে দাও আর অপর অংশ হাতে করে ধরে থাক, তাহ'লে দেখবে কিছুক্ষণ পরে লোহার রডটা একটু একটু করে গরম হয়ে গিয়ে শেষকালে এত বেশী গরম হ'য়ে যাবে যে, হাতে করে আর ধরে রাখা যাবে না। যদিও রডের অপর অংশটা—তোমার হাতে ধরা ছিল এবং আগুনের সঙ্গে এর কোনও সংস্রব ছিল না, তবুও এই দিকটা এত বেশী গরম হয়ে যাবে যে তুমি আর ধরে রাখতে পারবে না। একথা ঠিক যে, উনুনের আগুনের তাপই রডের এক দিক হ'তে অন্য দিকে এসে তোমার হাতে ছেঁকা দিয়েছে। কিন্তু কি করে উনুনের আগুনের তাপ রডের এক দিক হ'তে অন্যদিকে এসে তোমার হাতে ছেঁকা দিল, সে কারণটাই তোমরা জানতে চাও। নয় কি?

বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, প্রতিটি জিনিষ অসংখ্য 'অণু' দিয়ে তৈরী। নীরেট জিনিষের 'অণু'গুলি খুব ঘেঁষাঘেঁষি করে দল বেঁধে থাকে। এখন লোহার যে রডটা উনুনের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছিলে সে রডটাতে অসংখ্য 'অণু' আছে, এটা নিরেট পদার্থ বলে এর অণুগুলি পরস্পর খুব ঘেঁষাঘেঁষি করে দল বেঁধে থাকে। এখন রডটার যে অংশের অণুগুলি আগুনের মধ্যে ছিল তারা উত্তপ্ত হয়ে গিয়ে চট করে তাদের পাশের অণুগুলিতে খানিকটা তাপ দান করল। ফলে পাশের অণুগুলি উত্তপ্ত হ'য়ে উঠল। এরা আবার উত্তপ্ত হ'য়ে গিয়ে এদের পাশের অণুগুলিতে খানিকটা তাপ দান করল। এই ভাবে অণুগুলি ক্রমশঃ পর-পর গরম হ'তে হ'তে শেষ অবধি লোহার রডটার সমস্ত অণুগুলিই গরম হ'য়ে যাবে। সেই সঙ্গে আগুনের মধ্যে লোহার রডটার যে অংশ ঢুকান ছিল সে অংশ হ'তে তাপ পাশাপাশি এগোতে এগোতে রডের যে অংশ তোমার হাতের মধ্যে ছিল সে অংশ পর্য্যন্ত পৌছাবে। এই ভাবে এক দিক হ'তে অন্য দিকে তাপের ক্রম-সঞ্চালনকে তাপের 'পরিবহন' বলে। লোহা, সোনা, পেতল এই সব পদার্থে তাপের পরিবহন খুব বেশী হয়। কাঠ, সুতা, পশম এই সব পদার্থে তাপের পরিবহন এত কম পরিমাণে হয় যে, প্রায় হয় না বললেই চলে। বিদেশে গেলে উনুনের কাঠের এক দিকটা যখন দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে তখন অনায়াসে কাঠের অন্য দিকটা হাতে করে ধরে রাখতে তোমরা দেখেছ। এটা থেকে তোমরা সহজেই বুঝতে পারছ যে, কাঠের তাপ পরিবহন শক্তি খুবই কম। শুধু যে কঠিন পদার্থে তাপের পরিবহন হয় তা' নয়। তরল ও বায়বীয় পদার্থেও হয়। কিন্তু এ দুটো পদার্থের তাপের পরিবহন কঠিন পদার্থের তুলনায় অনেক কম। তোমরা হয়ত বলবে, এ দুটো পদার্থে তা হলে বেশী কি হয়? এ দুটো পদার্থে তাপের "পরিচলন" বেশী হয়। কি ভাবে হয়, তাই শোনো।

তাপের পরিচলন।

তোমাদের কোনও বন্ধু এলে চট করে কেটলিতে খানিকটা জল নিয়ে উনুনের আগুনে কেটলিটা বসিয়ে দাও। কেটলির জল কিছুক্ষণের মধ্যে গরম হ'য়ে টগবগ করে ফুটতে থাকে। আর তোমরা সেই গরম জলে চা-পাতা ফেলে দিয়ে তার সঙ্গে একটু চিনি, দুধ মিশিয়ে দিয়ে বেশ মেজাজে বন্ধু দীপ্তেন্দুকে গরম-চা খেতে দাও। সেই সঙ্গে নিজেও এক চুমুক খেয়ে দাও। বাদলার দিনে ত আর কথাই নেই।

গরম চা বেশ মজা করে পান করলে স্বীকার করছি। কিন্তু চা'এর জল কি করে গরম হ'ল তা' তোমরা মজা করে শোনো এবার। তোমরা হয়ত বলবে, কেন তাপের পরিবহনের জন্য। কারণ, তরল পদার্থেও 'অণু' ত যথেষ্ট পরিমাণে থাকে। জবাবটা আমাদের কানে ঠিক শোনালেও বৈজ্ঞানিকরা জবাবটা ঠিক বলে স্বীকার করবেন না। তাঁরা বলবেন যে, তরল ও বায়বীয় পদার্থের তাপের পরিবহন শক্তি এত কম যে হয় না বললেই চলে। এ দুটো পদার্থের হয় তাপের পরিচলন। অবশ্য তাপের পরিচলন ব্যাপারটা কি, সে-কথা তাঁরা আমাদের ভাল ভাবেই বুঝিয়ে দিয়েছেন। সে বিষয়ে তাঁদের তোমরা দোষ দিতে পার না। তোমরা আগেই জেনে রেখেছ যে, তরল ও বায়বীয় পদার্থের অণুগুলি নীরেট পদার্থের অণুগুলির মত ঘেঁষাঘেঁষি করে থাকে না। একটু ছড়িয়ে ছড়িয়ে ফাঁক ফাঁক হ'য়ে থাকে। আগুনের তাপ লোহার রডের একটা অণু হ'তে পাশের অণুতে এবং সেই

অণু হ'তে আবার তার পাশের অণুতে খুব সহজেই যেতে পারে। জলের অণুগুলি অর্থাৎ জলকণাগুলিতে সেরকম ভাবে যেতে পারে না। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে, তরল ও বায়বীয় পাদার্থে তাপের 'পরিবহন' না হ'য়ে 'পরিচলন' হয়। তাপের পরিচলন সম্বন্ধে তাঁরা কি বলেছেন সেটা তবে শোনো: পদার্থ যখনই খুব বেশী গরম হ'য়ে যায় তখনই হাল্কা হ'য়ে যায়। যত বেশী গরম হয় তত বেশী হাল্কা হয়। এটা পদার্থের স্বভাব। এখন কেটলীতে আগুনের সব চেয়ে কাছে যে জলটুকু আছে অর্থাৎ কেটলীর তলার জলটুকু সব চেয়ে আগে গরম হ'য়ে যাবে। আর গরম হ'য়ে গেলে হাল্কা হয়ে গিয়ে ওপরে উঠে যাবে। এখন এই জলটুকুর ছেড়ে আসা জায়গা ত খালি থাকতে পারে না? সেজন্য এই খালি জায়গায় ওপরের ঠাণ্ডা ও অপেক্ষাকৃত ভারী জল নেমে এসে জায়গা পূরণ করে থাকে। এখন এই জলটুকু আবার আগুনের কাছে এসে হাজির হয় বলে গরম হ'য়ে ওঠে এবং হাল্কা হ'য়ে গিয়ে ওপরে উঠে যায় এবং ওপরের অপেক্ষাকৃত ভারী ও ঠাণ্ডা জল নীচে নেমে এসে খালি জায়গা পূরণ করে। এই ভাবে কেটলীর জল ওঠা-নামা করেতে করতে সবটুকুই গরম হ'য়ে ফুটতে থাকে। এই ভাবে তাপের ওঠা-নামাকে অর্থাৎ তাপের সঞ্চালনকে বলা হয় 'তাপের পরিচলন।' এখানে জলের অণু (জলকণা) লোহার রডের অণুর মত তাপ পরিবহন না করে তাপ পরিচলন করল। অর্থাৎ তাপ এখানে লোহার রডের মত একটু একটু করে একটা অণু হ'তে আর একটা অণুতে পাশাপাশি না এসে জলের অণু (জলকণার) সঙ্গে মিশে গিয়ে যত পরিমাণ জলকণার সঙ্গে মিশল ঠিক তত পরিমাণ জলকণা উত্তপ্ত করে দিয়ে ওপরে পাঠিয়ে দিলে এবং ওপরে পাঠিয়ে দেবার পর ঠিক ততখানি পরিমাণ ওপরের ঠাণ্ডা ও অপেক্ষাকৃত ভারী জলকণা নীচে নামিয়ে এনে গরম করে দিলে। এই ভাবে তাপ এখানে অর্থাৎ জলের ব্যাপারে লোহার রডের মত পাশাপাশি না গিয়ে ওঠা-নামা করল।

বায়বীয় পদার্থে তাপের পরিবহন হয় না বললেই চলে। হয় পরিচলন। তেমনি কঠিন পদার্থে তাপের পরিচলন সম্ভব নয়। কেন না, পরিচলন ব্যাপারে তরল ও বায়বীয় পদার্থের অণুগুলি নীচ হতে ওপরে তাপ বয়ে নিয়ে যায়। কঠিন পদার্থের অণুগুলি এই ভাবে চলা-ফেরা করতে পারে না বলেই কঠিন পদার্থে তাপের পরিচলন সম্ভব নয়।

বায়বীয় পদার্থে তাপের পরিচলন কি উপায়ে হয়, শোনো এবার। সূর্য্যের উত্তাপে পৃথিবী খুব গরম হ'য়ে ওঠে। পৃথিবীতে মাটি, বালি, জল, পাথর প্রভৃতি হরেক রকম পদার্থ আছে। এখন সূর্য্যের তাপে এইগুলি গরম হ'য়ে উঠলেও সমান গরম হ'য়ে ওঠে না। পাথর বা বালি যে রকম গরম হ'য়ে ওঠে জল বা মাটি সেরকম গরম হ'য়ে ওঠে না। সুতরাং পাথর বা বালির কাছের বাতাস, জল বা মাটির কাছের বাতাস এর থেকে বেশী গরম হ'য়ে উঠবে। পাথর বা বালি উত্তপ্ত হয়ে গেলে এ সব পদার্থ হ'তে যে তাপ বার হ'বে সে তাপ এদের কাছের বাতাস গরম করে তুলবে। বাতাস গরম হ'য়ে গেলে ঠিক কেটলীর জলের মত হাল্কা হ'য়ে গিয়ে ওপরে উঠে যাবে আর ওপরের অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা ও ভারী বাতাস নেমে এসে খালি জায়গায় হাজির হবে। এই ভাবে বাতাস গরম হ'য়ে ওঠে। মাটি বা জল সূর্য্যের তাপে উত্তপ্ত হ'য়ে ওঠে, ঠিক কথা। কিন্তু পাথর বালির মত অত বেশী উত্তপ্ত হ'য়ে ওঠে না। সেজন্য মাটি বা জলের কাছের বাতাস একটু কম গরম হয়। পৃথিবী সূর্য্য হ'তে সারা দুপুর তাপ সংগ্রহ করে নিজে উত্তপ্ত হ'য়ে তাপের পরিচলন উপায়ে বাতাস গরম করে তোলে। কিন্তু সন্ধ্যাবেলা যখন সূর্য্য অস্ত যায় তখন কি হয়? সূর্য্য অস্ত যাবার পরেও কিছুক্ষণ পৃথিবীর মাটি, বালি প্রভৃতি গরম থাকে এবং যতক্ষণ গরম থাকে ততক্ষণ এদের কাছ থেকে যে তাপ বেরোয় তা' বাতাসকে তাপের পরিচলন উপায়ে উত্তপ্ত ও হাল্কা করে ওপরে তুলে দেয় এবং সেই খালি জায়গায় এসে হাজির হয় ওপরের অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা ও ভারী বাতাস। এখন পৃথিবী, সন্ধ্যা হয়ে যাওয়ার দরুণ সূর্য্যের তাপ আর না পাওয়ায় অপেক্ষাকৃত যে ঠাণ্ডা ও ভারী বাতাস এসে হাজির হ'ল, যে বাতাস আর উত্তপ্ত করে তুলতে পারবে না। সুতরাং ঠাণ্ডা যে বাতাস এসে হাজির হ'ল তা' ঠাণ্ডাই রয়ে গেল। তাহলেই বুঝতে পারছ সূর্য্য অস্ত যাবার পর বাতাস এত ঠাণ্ডা কেন হয়?

তাহলে তাপের পরিবহন ও পরিচলন কি, তা' তোমরা বুঝতে পারলে। এখন তাপের বিকিরণ কি শোনো।

কঠিন পদার্থে তাপের পরিবহন এবং তরল ও বায়বীয় পদার্থে তাপের পরিচলন ব্যাপারে পদার্থের অণুগুলি বিশেষ সাহায্য করে। লোহার রডের অণু এবং জল ও বাতাসের অণু অর্থাৎ জলকণা ও বায়বীয় কণা যদি না থাকত তাহলে লোহার রডে তাপের পরিবহন এবং কেটলীর জলের ও প্রকৃতির বাতাসের তাপের পরিচলন সম্ভব হ'ত না। এখন আমাদের এই বিরাট পৃথিবী সূর্য্য হ'তে যে তাপ পাচ্ছে তা' কিন্তু ঠিক পরিবহন উপায়ে হয় না। কেন না, সূর্য্যের সঙ্গে পৃথিবীর সংযোগকারী এমন কোনও 'সহায়ক' নেই যার জন্য পৃথিবী সূর্য্য হ'তে পরিবহন বা পরিচলন উপায়ে তাপ পেয়ে থাকে। তোমরা হয়ত বলবে যে, পৃথিবী ও সূর্য্যের সংযোগকারী 'সহায়ক' বাতাস (বায়ু) আছে। বৈজ্ঞানিকেরা এর জবাবে কি বলবেন জান? তাঁরা বলবেন—বাতাস পৃথিবী হ'তে ৩০০ মাইল উঁচু পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এর ওপরে শুধু বিরাট শূন্যতা। ৩০০ মাইল উঁচু পর্য্যন্ত না হয় সূর্য্য হ'তে পরিচলন উপায়ে পৃথিবী তাপ পেতে পারে কিন্তু পৃথিবী হ'তে সূর্য্য ৩০০ মাইল দূরে অবস্থিত নয়। প্রায় ৭ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত। সুতরাং ৩০০ মাইলের পর কি পদার্থ সূর্য্যের 'সহায়ক' হিসাবে কাজ করবে? যেখানে বিরাট শূন্যতা সেখানে কোনও পদার্থই সূর্য্যের 'সহায়ক' হিসাবে কাজ করতে পারবে না। তাহ'লে আমরা সূর্য্যের তাপ পেয়ে থাকি কি ভাবে? পেয়ে থাকি তাপের বিকিরণ দ্বারা। তাপের বিকিরণ কি, তা'ই শোনো এবার। একটা লম্প যদি তোমার ঘরের মাঝখানে রাখ সে-লম্প হতে যে তাপ বেরোবে, সেই বার-হওয়া তাপকে "তাপের বিকিরণ" বলে। তাপের পরিবহন পাশাপাশি হয়, তাপের পরিচলন উঁচু-নীচু ভাবে হয়; তাপের বিকিরণ সরল রেখায় হয়। লম্পটার সামনে যদি তুমি তোমার হাত রাখ তা'হলে লম্প হ'তে বিক্ষরিত তাপ তুমি তোমার হাতে অনুভব করবে। এই বিক্ষরিত তাপ যে সরল রেখায় গমন করে তা' তোমরা টের পাবে যদি লম্প ও তোমার হাতের মাঝখানে একটা 'পার্টিশন' রাখ। 'পার্টিশন' রাখলে

দেখবে যে, কোনও রকম তাপ আর তোমরা পাবে না। যদি বিকরিত তাপ সরল রেখায় না গিয়ে অন্য ভাবে যেত তাহলে তাপ পার্টিশনের গা বেয়ে উঠে তোমার হাতে লাগত। যদি লম্প ও তোমার হাতের মাঝখানে একটি কঠিন পদার্থ রাখা হ'ত তাহলে তোমার হাতে তাপ 'পরিবহন' উপায়ে আসত, অবশ্য পরিচলন করবার জন্য লম্প ও তোমার হাতের মাঝখানে যথেষ্ট বায়ু আছে কিন্তু পরিচালিত তাপ শুধু ওপর দিকে ওঠে, নীচের দিকে বা সরল রেখায় আসে না। সুতরাং লম্প হ'তে তাপ পরিচালিত হ'লে তোমার হাতে না লেগে তোমার হাতের ওপরের শরীরের যে-কোনও অংশে লাগত। সুতরাং তোমার হাতে লম্প হ'তে যে তাপ আসছে, তা বিকীরিত হয়ে আসছে।

তাহ'লে তাপের পরিবহন, পরিচলন ও বিকিরণ সম্বন্ধে তোমরা কিছু শুনলে। এখন থার্ম্মোফ্লাস্ক কি ভাবে তৈরী, তা বলবার আগে 'উত্তাপ' সম্বন্ধে তোমাদের কিছু বলব।

'উত্তাপ' এক প্রকার 'গতি' (motion) ছাড়া আর কিছুই নয়। কোনও পদার্থের অণুগুলি খুব বেশী জোরে চলাফেরা করলে যে দ্রুত-কম্পন (vibration) সৃষ্টি করে, সেটাই আমরা 'উত্তাপ' বলে অনুভব করি। তাহলে 'উত্তাপ' এক প্রকার 'গতি' বা 'কম্পন' মাত্র। এই 'উত্তাপ' যখন খুব বেড়ে যায়, তখন 'আলো'র সৃষ্টি হয়। তোমাদের যদি কেউ জিগ্যেস করেন—'আলো কি?' তোমরা চট করে উত্তর দিও যে, 'আলো' এক প্রকার 'গতি' বা 'কম্পন' মাত্র। আচ্ছা 'উত্তাপ' ও 'আলো' এ দুটোর তফাৎ কি, সেটা একটু বুঝিয়ে বলছি। ধরো, তোমার বন্ধুর একটা ফটো এনে সেটা একটা 'হাতুড়ি' দিয়ে পেরেক ঠুকে দেওয়ালের গায়ে টাঙ্গিয়ে দিলে। এখন তোমার হাতে যে হাতুড়ি আর পেরেক ছিল—দুটোই ঠাণ্ডা অবস্থায় ছিল। যেই তুমি হাতুড়ি দিয়ে দেওয়ালের গায়ে পেরেকটা পেটাতে শুরু করলে, অমনি তোমার বাহুর মাংসপেশীর 'গতি' (muscular motion) এক প্রকার 'অদৃশ্য-গতি'রূপে ঐ পেরেকের অণুগুলি বা moleculesএর ওপরে প্রেরিত হ'ল। বাহুর এই 'অদৃশ্য-গতি'কে আমরা 'উত্তাপ' বলি। তোমার বাহুর 'শক্তি'র জন্যই হাতুড়ির মুখের লৌহখণ্ডের (লোহার টুকরো) অণুগুলির সঙ্গে লোহার পেরেকের অণুগুলির ঘর্ষণ সৃষ্টি হ'ল। আর ঘর্ষণ সৃষ্টি হল বলেই লৌহখণ্ড ও পেরেকের অণুগুলির 'গতি' (motion) বেড়ে গেল এবং 'গতি' বেড়ে যাওয়ার ফলে 'কম্পন' বেড়ে গেল। যার ফলে 'উত্তাপ'এর সৃষ্টি হ'ল। তোমার 'বাহু-শক্তি' না থাকলে এই ব্যাপারটা ঘটত না বলে তোমার 'বাহু-শক্তি'কে বৈজ্ঞানিকেরা 'উত্তাপ' বলেন। তোমার 'বাহু-শক্তি' যখন খুব বেড়ে যাবে, তখন তুমি পেরেক ও হাতুড়ির মুখে অগ্নিকণা দেখতে পাবে। কারণ, পেরেক ও হাতুড়ির লৌহখণ্ডের অণুগুলির 'গতি' তখন ভীষণ রকম বেড়ে গিয়ে ভীষণ রকম 'কম্পন' সৃষ্টি করবে।

তাহলে 'উত্তাপ' এক প্রকার 'গতি' বা 'কম্পন' তোমরা জানতে পারলে। আরো জানতে পারলে 'গতি' বা 'কম্পন' যখন খুব বেড়ে যায়, তখন 'আলো'র উৎপত্তি হয়। দেখো, কারুর মাথায় লোহার ডাণ্ডা মেরে তা'র মাথা থেকে 'উত্তাপ' সৃষ্টি করে 'আলো'র উৎপত্তি দেখতে যেও না যেন।

কঠিন, তরল ও বায়বীয় পদার্থের ওপর 'উত্তাপে'র কি রকম প্রভাব, এইবার সে-কথা শোনো। ঠিকমত ধরতে গেলে নিরেট বা কঠিন (solid) বস্তু কিছুই নেই। সর্ব্বাপেক্ষা ঘন ধাতু সকল যেমন ধরো, লোহা বা প্ল্যাটিনাম বা ইস্পাত এদেরও অণুগুলি (molecules) পরস্পর স্পর্শ করে না। তোমরা যেমন একই ক্লাসে থেকে ভাল ছেলেদের সঙ্গে ধরা-ছোঁওয়া দিতে চাও না, সে রকম আর কি। এখন এই সব পদার্থের অণুগুলি পরস্পর স্পর্শ না করলেও পরমাণু বা অ্যাটম্ (atom)এর আকর্ষণ-শক্তির জন্য এরা কতকটা সংলগ্ন ভাবে থাকে। যেমন ক্লাসে শিক্ষক মহাশয়ের সুন্দর ভাবে পড়ানোর আকর্ষণ-শক্তিতে তোমরা অনেক সময়ে ইচ্ছা না থাকলেও বেঞ্চিগুলিতে পরস্পর সংলগ্ন ভাবে থাকো, অনেকটা সে রকম। এখন 'উত্তাপ' এক রকম 'কম্পন' সৃষ্টি করে এ সকল অণুগুলিকে ফাঁক ফাঁক করে দেয়। তোমাদের আগেই বলেছি যে, পরমাণুর আকর্ষণ-শক্তির জন্য অণুগুলি পরস্পর কতকটা সংলগ্ন ভাবে থাকে। যদি 'উত্তাপ' পরমাণুর আকর্ষণ-শক্তির চেয়ে বেশী হয় তাহলে অণুগুলি পরস্পরের গায়ে যেন ঢলে পড়ে। ঠিক যেমন ক্লাসে পড়ার সময় দারোয়ানের ঘন্টার আওয়াজ শুনে তোমরা হঠাৎ পরস্পরের গায়ে আনন্দে ঢলে পড়। অণুগুলির এই ঢলে-পড়া-অবস্থাকে আমরা পদার্থের তরল-অবস্থা বলি। 'উত্তাপ' যদি আরও বেড়ে যায় অর্থাৎ 'এ সকল অণুর' 'কম্পন' যদি পরমাণুর আকর্ষণ শক্তির চেয়ে আরও বেশী হয় তা হ'লে অণুগুলি পরস্পরের গায়ে ঢলে না পড়ে পরমাণুর আকর্ষণ-শক্তি হ'তে একেবারে 'বাঁধা গরু ছাড়া' পেয়ে গোছের হ'য়ে এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করতে থাকে। অণুগুলির ইতস্ততঃ ছোটাছুটি-করা অবস্থাকে আমরা পদার্থের বাষ্পীয়-অবস্থা (vapour) বলি। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, প্রকৃতপক্ষে নিরেট বস্তু নেই—'উত্তাপ' রূপ 'গতি'ই বস্তুকে তিনটে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় রাখে।

এইবার থার্ম্মোফ্লাস্ক কি ভাবে তৈরী, সেটা তোমাদের বলি। তোমরা লক্ষ্য করেছ যে, থার্ম্মোফ্লাস্কের ঢাকনাটা একটা ধাতুর তৈরী। এই ঢাকনার মধ্যে দু'টো স্তরবিশিষ্ট একটা কাচের পাত্র আছে। কাচের এই দু'টো স্তরের মাঝখানে যে বায়ু ছিল তা' পাম্প করে বার করে নেওয়া হয়েছে। বায়ু যে পাম্প করে বার করে নেওয়া হয়েছে তার প্রমাণ তোমরা পাবে। যদি লক্ষ্য করে দেখ, তাহ'লে দেখতে পাবে যে, থার্ম্মোফ্লাস্কের তলায় দুটো নলের মুখ আছে। এ দু'টো মুখ দিয়ে সমস্ত বায়ু পাম্প করে বার করে নিয়ে মুখ দু'টো বন্ধ করে দেওয়া হ'য়েছে। কারণ, বায়ু থাকলে থার্ম্মোফ্লাস্কের ভেতরে তাপের পরিচলন ঘটত। তোমরা এটাও দেখতে পাবে যে, থার্ম্মোফ্লাস্কের ভেতরের কাচ ও ধাতুর নির্ম্মিত ঢাকনা হ'তে শোলা কিংবা ফেল্টের ছিপি দিয়ে থার্ম্মোফ্লাস্কটা আলাদা করে রাখা হয়েছে। কারণ, শোলা বা ফেল্ট থাকলে তাপের পরিবহন সম্ভব নয়। এর পরে লক্ষ্য করবে, কাচের যে পাত্র আছে সে-পাত্রের উভয় দেওয়ালের ভেতর দিকটা পারা (পারদ) মাখিয়ে চক্চকে সাদা করে রাখা হয়েছে। যাতে তাপের বিকিরণ না হয়। তোমরা জেনে রাখ যে, 'কালো রং' এর তাপ বিকিরণ করবার কিংবা বিকীরিত তাপ গ্রহণ করবার ক্ষমতা সাদা রং এর থেকে বেশী। সেইজন্য গরম চা সাদা কাপে ঢালা হয়, যা'তে বেশীক্ষণ গরম থাকে। তাহলেই তোমরা বুঝতে পারছ, কেন থার্ম্মোফ্লাস্কের কাচের উভয় দেওয়ালে কালো বা

অন্য রং না মাখিয়ে কেন পারা মাখিয়ে সাদা চক্চকে রাখা হয়। সুতরাং থার্মোফ্লাস্কে তাপের পরিবহন, পরিচলন ও বিকিরণ যে কেন হয়, তার কারণ তোমরা বুঝতে পারলে আর সেই সঙ্গে গরম জল গরম বা ঠাণ্ডা জল ঠাণ্ডা কেন থাকে, তা'র কারণও জানলে। শুধু থার্মোফ্লাস্ক সঙ্গে নিয়ে পিক্‌নিকে যাওয়ার একটা শুভ দিন ঠিক করার কাজ তোমাদের এখন রইল। কি বল ?

ফাঁসীর মঞ্চে

শ্রীনরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

সহরের উপকণ্ঠে বেড়াতে বেরিয়েছে দুটি গ্রাম্য বালক। পথের ধারে ছিল বহুকালের পুরনো মন্দির। শিবমন্দিরের সামনে অসংখ্য নর-নারীর ভীড়। তাদের মধ্যে অনেকেই গলায় কাপড় দিয়ে লুটিয়ে পড়ছে পথের ধূলায়।

এক জন অপর জনকে জিজ্ঞেস করলো, আচ্ছা ললিত, ওখানে অত লোক কেন? আর অত লোক পথের ধারে অমন করে শুয়েই বা আছে কেন ?

ললিত বললে, এটি যে বুড়োশিবের মন্দির, খুব জাগ্রত ঠাকুর। এখানে ধরণা দিয়ে মানুষ যদি ভক্তি করে প্রার্থনা জানায় তবে ঠাকুরের কৃপায় অতি কঠিন ব্যাধির হাত থেকে নিস্তার পায়, কঠিন বিপদ থেকেও পায় মুক্তি।

তাই নাকি, তবে তো আমাকে ওখানে ধরণা দিতে হবে? বললে বালকটি।

ললিত বললে, কেন, তোমার আবার কোন রোগ হল যে ধরণা দিতে হবে ?

ছেলেটি বললে, আমি কোন ব্যাধির আরোগ্য কামনায় ধরণা দেবো না। আমি ধরণা দিয়ে এই আদেশ জানতে চাইব, শিবঠাকুরের কাছে যে কবে অত্যাচারী বৃটিশ-শাসকের হাত থেকে ভারতমাতার মুক্তি আসবে, কবে আমরা পরাধীনতা ব্যাধির হাত থেকে মুক্ত হয়ে, শ্বেতাঙ্গদের সাগরপারে বিতাড়িত করে নিজেরা দেশ শাসন করবো। কবে আসবে স্বাধীনতা, কবে আসবে শান্তি, বলতে বলতে বালকটি উত্তেজনায় কাঁপতে লাগলো।

এমন জলন্ত দেশপ্রেম কোন বালকের থাকতে পারে, তোমরা হয়তো জানতে চাইবে। বালকের নাম ক্ষুদিরাম বসু। মোটে আঠার বছর বয়সে মজঃফরপুরের জেলা-জজ অত্যাচারী কিংসফোর্ডকে হত্যা করতে গিয়ে দুই জন নির্দোষ মহিলাকে হত্যার অপরাধে ক্ষুদিরামের ফাঁসী হয়।

ফাঁসীর হুকুম দিয়ে বিচারক ক্ষুদিরামকে বললেন, তোমাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে, বুঝেছো বালক ?

ক্ষুদিরাম হাসিমুখে উত্তর দিল, মরবার জন্য আমি প্রস্তুত হয়েই আছি, তবে আমার একটা প্রার্থনা আছে।

বিচারক আদেশ দিলেন, বলো।

: আমি মরবার আগে এই সব লোকগুলোকে বোমা তৈরীর পদ্ধতিটা শিখিয়ে দিয়ে যাই—বালক হাসছে।

বিচারক চমকে ওঠেন, বাপ রে, কি সাংঘাতিক ছেলে! শীগ্‌গির একে হাজতে নিয়ে যাও। ক্ষুদিরামের ফাঁসী হলেও তার আদর্শ সহস্র কিশোর-কিশোরীকে মৃত্যুমন্ত্রে দীক্ষিত হবার সাহস জুগিয়েছিল।

যাদুরত্নাকর এ, সি, সরকার

খাওয়ার টেবিলে বসে অনেক বার আমাকে দেখাতে হয়েছে নানা ধরণের ম্যাজিক। কখনও বা কাপ- প্লেট-ডিস নিয়ে কখনও বা অভ্যাগতবৃন্দের কাছ থেকে চেয়ে নেওয়া কোনও জিনিষ নিয়ে আবার কখনও বা তাস-দড়ি-ঘড়ি-টাকা ইত্যাদি দিয়ে। খাওয়ার টেবিলে বসে সবচেয়ে বেশী খেলা আমি দেখিয়েছি লণ্ডনে থাকা কালে। আমি যে হোটেলে থাকতাম সে হোটেলের মালিক ছিলেন আমার বেশ অনুরক্ত। তাঁর চেনাশোনা কোনও লোক হোটেলে এলেই তিনি আমার সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে না দিয়ে ছাড়তেন না। সবচেয়ে বেশী লোকের ভীড় হত রাত্রিতে নৈশভোজনের সময়ে। হোটেলের মালিকের আদেশে প্রায়ই আমার জন্য খিচুড়ি, ডিমের কারী, আলুভাজা ইত্যাদি রান্না হত। মালিকের বন্ধুরাও বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে এই সব রান্না খেতে আসতেন। ভারতীয় খাদ্যের স্বাদ গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় যাদুবিদ্যার স্বাদও গ্রহণ করতে চাইতেন তাঁরা। তাঁদের দিক থেকে আসতো নানা অনুরোধ। এই কারণে সব সময়ে প্রস্তুত হয়েই আমি খাবার টেবিলে গিয়ে বসতাম। খেতে বসার আগেই খেলা প্রস্তুত করে রেখে দিতাম।

সেদিন রাত্রিতে হোটেলে ফিরে খাবার টেবিলের কাছে যেতেই দেখি, কয়েক জন ভদ্রলোক আর কয়েক জন মহিলা খেতে বসেছেন। হোটেলের মালিক আমার কানে কানে বললেন, "এঁরা এসেছেন ইতালী থেকে। এঁরা সবাই চিত্রতারকা।"—বুঝতে আমার বাকী রইলো না যে, এদের আহার শেষ হলেই মালিকের ভাবপ্রবণতা উচ্ছল হয়ে উঠবে। অর্থাৎ আমাকে ম্যাজিক দেখাতে হবে এদের কাছে হোটেলের মালিকের মান রাখবার জন্য। আমার জন্য নির্দ্দিষ্ট টেবিলে বসে টেবিল থেকে তুলে নিলাম একটি দাঁত-খোঁচানোর কাঠি, আর সেটাকে কাজে লাগিয়ে একটা ভাল খেলা প্রস্তুত করে রেখে খাওয়া আরম্ভ করলাম।

যা সন্দেহ করেছিলাম তাই হল, আমার খাওয়া সবে মাত্র শেষ হয়েছে এমন সময়ে হোটেলের মালিক তাঁর বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দকে নিয়ে এলেন আমার সামনে। পরিচয়ের পালা শেষ হবার পরেই এলো অনুরোধ, "মিঃ সরকার, আপনার কেরামতি একটু এঁদের দেখিয়ে দিন। এঁরা খুব উৎসুক আপনার যাদুর খেলা দু'-একটি দেখার

জন্যে।" বাধ্য হয়েই রাজী হতে হল। টেবিলের উপরে পড়ে থাকা 'লবণ-পাত্র'র দিকে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমি আমার দর্শকদের বললাম, "এই যে 'লবণ-পাত্র'টি দেখছেন এর ক্ষমতা অপরিসীম Gravity বা মাধ্যাকর্ষণ এর কিছুই করতে পারে না।" এই কথা বলে বাঁ হাতের আঙুলগুলোকে একত্র করে সেই আঙুলের তলা দিয়ে আমি স্পর্শ করলাম 'লবণ-পাত্রে'র মুখের দিকটা। হাতটা একটু তুলতে দেখা গেল যে সঙ্গে সঙ্গে 'লবণ-পাত্র'ও উঠছে উপরে। দেখে তো সবাই অবাক। এ কেমন করে সম্ভব হল?

আগেই বলেছি যে, দাঁত-খোঁচানোর কাঠি দিয়ে কৌশল করে রেখেছিলাম। কাঠে তৈরী tooth prick বা দাঁত-খোঁচানো কাঠি তো দেখেছ সকলেই। এই কাঠি একটি নিয়ে আমি সেটাকে বাঁ হাতের আংটির তলা দিয়ে এমন করে গুঁজে রেখেছিলাম যে তার সরু দিকটা নীচের দিকে; আঙুলের ডগায় শেষ প্রান্ত পর্য্যন্ত এসে থাকে। 'লবণ-পাত্র'র উপরে হাতের আঙুলের ডগা চেপে ধরতেই এই 'দাঁত খোঁচানোর কাঠি' পাত্রের ঢাকনার ফুটোর কোন একটির মধ্যে ঢুকে আটকে যায়। এর ফলে 'লবণ- পাত্র' ঝুলতে থাকে হাতের আঙুলগুলোর ডগায়।

সঙ্গে যে ছবি দিয়ে দিচ্ছি তা ভাল করে দেখলেই সব রহস্য জলের মতন পরিষ্কার হয়ে যাবে।

পাঁচ ভাই পাঁচ বোন

[রূপকথা]

শ্রীঅরুণাংশুবিকাশ সেনগুপ্ত

তারা ছিল পাঁচ বোন। ফুটফুটে পাঁচটি মেয়ে। তাদের ছিল মাথা-ভরতি মিশকালো পশমের মতন নরম কোঁকড়ান কোঁকড়ান চুল, পদ্মপলাশের মতো সুন্দর দু'চোখ, আপেলের মতো লাল টুকটুকে দুটো গাল, পাপড়ির মতন পাতলা দুটি ঠোঁট আর ছিল ঠিক গোলাপী তাদের গায়ের রঙ।

তারা ছিল ভালো মেয়ে। খু-ব ভালো। ঝগড়াঝাঁটি তো দূরের কথা, ভুলেও একটি খারাপ কথা কক্ষণো তারা বলতো না। সবাই তাদের ভালবাসতো। স-বা-ই।

খুব সকালে সূর্য-ঠাকুর যখন পূব-আকাশে দেখা দিতেন, তখন খিল খিল করে হেসে উঠত তারা। ফুরফুরে ঠাণ্ডা হাওয়া যখন মুখে এসে লাগতো, তখন তারা চীৎকার করে আনন্দে হাততালি দিত। সন্ধ্যার আকাশে যখন একটির পর একটি তারা ফুটে উঠত, তখন তাদের সমস্ত মুখ আনন্দে ঝলমল করে উঠত। এ ভাবেই একটির পর একটি দিন কেটে যেতো, গড়িয়ে যেতো একটি মাস, তারপর একদিন ফুরিয়ে যেতো পুরো একটি বছর।

এতো সুখের মধ্যেও দুঃখ তাদের ছিল। মাঝে মাঝে সে দুঃখটাই খুব বড় হয়ে তাদের বুকে এসে বাজত। সেদিন আর তারা খেলায় মেতে উঠত না, সেই মিষ্টি হাসিও আর তারা হাসতো না। মুখখানা শুকিয়ে এতোটুকুন হয়ে যেতো, চোখ দুটো ছলছল করে উঠত। শুধু তারা চুপ করে বসে বসে ভাবতো। তারা ভাবতো, সত্যিই তো, কেন, কেন আমাদের একটিও ভাই নেই। যতই তারা ভাবতো, ততই তাদের বুকগুলি হু-হু করে জ্বলে উঠত।

একদিন তারা ঠিক করলো, নাঃ, আর নয়, যে করেই হোক এর প্রতিকার তাদের করতেই হবে। ফুটফুটে পাঁচটি ভাই তাদের চাই-ই। ওরা পাঁচ বোনও শুনেছিল বটে, এখান হতে অনেক দূরে, অসংখ্য পাহাড়-পর্ব্বত ডিঙ্গিয়ে, কত বন-জঙ্গল ঝোঁপ-ঝাড় ছাড়িয়ে, শ-শ ক্রোশ পথ পার হয়ে গেলে তবে পড়ে মস্ত বড় এক পাহাড়। সেই পাহাড়েরই এক অন্ধকার ঘুটঘুটে গুহার মধ্যে থাকত থুরথুরে এক বুড়ি। ভীষণ কুচ্ছিত ছিল দেখতে সেই বুড়ি। আলকাতরার মতো ছিল তার গায়ের রঙ। চুলগুলি ছিল চুণের মতন ধবধবে সাদা। হাসতো ঠিক একটা বুনো শূয়োরের মতো ঘোঁৎ-ঘোঁৎ শব্দ করে। তার আবার একটা চোখ ছিল কাণা। কিন্তু রূপ না থাকলে হবে কি, গুণ তার ছিল। ইচ্ছে করলে অনেক কিছুই সে করতে পারতো। সবাই তাকে মান্যি করতো, ভয়ও করতো।

কিন্তু সেই থুরথুরে বুড়ির কাছে যাবার সমস্ত পথটাই ছিল ভয়ানক খারাপ। পৃথিবীর সমস্ত ঝড় বৃষ্টি যেন জমা ছিল সেইখানে। দিন নেই রাত নেই, শুধু ঝড় আর বৃষ্টি। সবসময় গোটা আকাশটা ঢাকা থাকতো কালো কুচকুচে মেঘে। বিদ্যুৎবেগে বইত কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া, ছুঁচের মতন বিঁধত বৃষ্টি আর প্রতিমুহূর্ত্তে অন্তর সমস্ত পৃথিবীতে কাঁপিয়ে পড়ত এক একটা ভয়ংকর বাজ। সূর্য কখনো দেখা দিত না সেইখানে। গাছপালা কিছুই জন্মাত না, যেদিকে তাকান হোক না কেন, চোখে শুধু পড়ত ফ্যাকাশে রঙের শেওলা আর শেওলা।

একদিন পাঁচ বোন ঠিক করলো, যে করেই হোক, ঐ বুড়ির কাছেই তারা যাবে। ওরা কল্পনায় মেতে উঠল, কল্পনার চোখে দেখতে লাগলো, যেন সেই বুড়ির কাছে তারা চলে গেছে। থুরথুরে বুড়ির পায়ে ধরে তারা বলছে আমাদের পাঁচটি ফুটফুটে ভাই দাও বুড়িমা, পাঁচটি ভাই দাও। আমরা একসঙ্গে খেলা করবো, একসঙ্গে ঘুরে বেড়াব, একসঙ্গে হাসবো। তোমার পায়ে ধরি বুড়িমা, দাও লক্ষীটি দাও। এর পরেই ওরা যেন দেখে, বুড়িমা সত্যিসত্যিই ফুটফুটে পাঁচটি ভাই তাদের তৈরী করে দিয়েছে। কতো রকমের খেলাই যে তারা দশ ভাই-বোনে মিলে করছে। আর তারা ভাবতে পারে না, এক অদ্ভুত আনন্দে চোখ দুটো বুঁজে ফেলে।

একদিন সত্যিসত্যিই পাঁচ বোন সেই অজানা দেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলো। দিন যায়, মাস যায়, বছরও যায়। পথ আর ফুরোয় না। কতো পাহাড়-পর্ব্বত, কতো বন-উপবন পার হয়ে তারা চলল। ক্লান্তিতে চোখ দুটো বুজে আসে, পা আর চলতে চায় না, ব্যথায় টনটন করে ওঠে দুটো হাঁটু, হাত দুটো যেন ছিঁড়ে পড়তে চায়। তবুও তারা এগিয়ে চলে। একদিন কিন্তু সত্যিই পথ শেষ হয়ে এলো। পাঁচ বোন সেই থুরথুরে বুড়ির দেশে গিয়ে পৌঁছুল। আস্তে আস্তে পাহাড়ের সেই অন্ধকার গুহার কাছে গিয়ে তারা দাঁড়াল, কচি মানুষের গন্ধ পেয়েই চেঁচিয়ে উঠল বুড়িটা। চীৎকার করে বলল, 'এখানে দাঁড়িয়ে কে রে, কে তোরা?' কি ভেবেই না সে বলল কথাটা। কি তার বলবার ছিরি!

'আমরা পাঁচ বোন',—চেঁচিয়ে বলল ওরা পাঁচ বোন। সেই কাণা চোখটাকে বুজে আরেকটা চোখ দিয়ে ভালো করে তাকিয়ে

তাকিয়ে দেখতে লাগল থুরথুরে বুড়ি। তারপর আবার সে ভুরু কুঁচকিয়ে বলে উঠল, 'তোরা কি চাস রে ছোট মেয়েরা!' এবার বুড়ির কাছে এগিয়ে গেলো পাঁচ বোন। তারপর তাদের সেই মিষ্টি গলায় বললো, 'আমরা ভাই চাই বুড়িমা, আমরা ভাই চাই। আমরা পাঁচ বোন, কিন্তু একটি ভাইও আমাদের নেই। তুমি আমাদের টুকটুকে পাঁচটি ভাই তৈরী করে দাও না বুড়িমা, তোমার পায়ে পড়ি, তুমি না করো না।'

থুরথুরে বুড়ি হেসে উঠল, তারপর খন খন করে বলল, 'বলি মেয়েরা, ভাই পাওয়া কী এতই সোজা, অনেক কিছু করতে হয় না, অনেক কিছু করতে হয়। বলি পারবি তোরা, বড় যে বড় গলায় ভাই চাইতে এসেছিস?'

পারবো, খুব পারবো, একসঙ্গে চীৎকার করে উঠল পাঁচ বোন। হা হা করে হেসে উঠল বুড়ি, তারপর বলল, 'ভাইয়ের জন্য যদি এতই দরদ, বলি পারবি আমি যা বলবো।'—'হ্যাঁ, হ্যাঁ,—'আবার একসঙ্গে চীৎকার করে উঠল পাঁচ বোন।—'তাহলে শোন মেয়েরা, থুরথুরে বুড়ি বলতে শুরু করে, 'এখান হতে সোজা হাঁটতে হাঁটতে এক পাহাড় পড়ে, ভীষণ খাড়া কিন্তু সেই পাহাড়। মাঝে মাঝে বিরাট বিরাট বরফের চাপ আর নদীর মতো বরফগলা জল সেই পাহাড়ের পথ দিয়ে নীচে নেমে আসে। তাছাড়া বিরাট বিরাট পাথর তো দিনরাতই পড়ছে টুকটাক করে। সেই পাথরের সঙ্গে ধাক্কা লাগলে তোরা যে কোথায় তলিয়ে যাবি ছোটমেয়েরা, হায় হায় রে, সে আর বলে! ফুলে ফুলে হাসতে থাকে থুরথুরে বুড়ি, যেন কত মজার কথাই না সে বলছে। তার মস্ত বড় লাল টকটকে জিভ দিয়ে শব্দ করতে করতে একবার কালো কুচকুচে ঝুলে-পড়া ঠোঁট দুটো চেটে নেয়। তারপর আবার বলা শুরু করে, 'সেই পাহাড় পেরিয়ে আরো সোজা উত্তর-পশ্চিমে হেঁটে গেলে তবে পাবি সেই গন্ধর বন! ক্রোশের পর ক্রোশ জুড়ে শুধু বন আর বন। সেই গোটা বনটাই হচ্ছে শুধু কাঁটার, বুঝলি মেয়েরা! দু'-একটা পাতাও যে মাঝে মাঝে পাবিনে তা নয়।' যদি শুধু কাঁটার বন শুনেই ভয় পেয়ে যায় ছোটমেয়েরা, তাই আশ্বাস দেয় থুরথুরে বুড়ি। সেই গন্ধর বনে আছে খু-ব সুন্দর একটা ফুল। খুব সুন্দর তার গন্ধ। পাপড়িগুলি তার লাল, ডাঁটাটার রং ঘন বেগুনে। অনেক করে খুঁজলে তবে তা পাবি। হ্যাঁ যদি সেই বনে গিয়ে সেই ফুল তোরা আনতে পারিস, তাহলে তোদের খু-ব সুন্দর দেখে পাঁচটা ভাই তৈরী করে দিতে পারি। কিন্তু মনে রাখিস, সেই কাঁটা যদি গায়ে ফোটে, তাহলে সমস্ত শরীর বিছের কামড়ের মতন জ্বলবে, আর সেই পাতা গায়ে লাগলে বিছুটি পাতার মতো চুলকোবে।'

পাঁচ বোন রাজি হয়ে যায়। থুরথুরে বুড়িকে প্রণাম করে তারা তক্ষুণি রওনা হোল সেই গন্ধর বনের সুন্দর ফুল আনতে। সেই পাহাড় ডিঙিয়ে কত পথ পার হয়ে একদিন তারা পৌঁছুলো সেই গন্ধর কাঁটার বনে। দিনের পর দিন খুঁজে বেড়ায় সেই ফুল। এদিকে খাঁ খাঁ রোদ্দুরে পিঠ পুড়ে যায়। বৃষ্টি বা ঝড় কিছুই হয় না সেখানে। হু হু করে শুকনো বাতাসের হলকা চোখে-মুখে এসে লাগে। ঘামে ভিজে চোখ দুটো জ্বালা করে। কাঁটায় কাঁটায় ফুলের মতন নরম শরীরগুলি ছিঁড়ে যায়। কিন্তু এতো করেও সেই ফুল তারা পায় না। একদিন কিন্তু সত্যি সত্যিই সে ফুল তারা পেল। ফুল পেয়ে আবার বহুদিন পর তাদের মুখ আনন্দে ঝলমল করে উঠল। ক্রোশের পর ক্রোশ পথ পার হয়ে, দেওয়ালের মত খাড়া সেই আকাশ-ছোঁয়া পাহাড়গুলি ডিঙিয়ে আবার তারা ফিরে চলল।

পথ শেষ হলে একদিন তারা গিয়ে হাজির হল থুরথুরে বুড়ির কাছে। পৌঁছেই এক বোন ছুটে গিয়ে ফুলটা দিল থুরথুরে বুড়ির হাতে। হাত বাড়িয়ে ফুলটা নিয়ে চোখের সামনে এনে খুব ভালো করে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখল কয়েক বার, জোর করে দু' তিনবার বোঁৎ বোঁৎ করে হাসলও সে। তারপরই পাঁচ বোনকে থ বানিয়ে সেই সুন্দর ফুলটাকে ফেলে দিল মাটিতে, পা দিয়ে মাড়িয়ে নষ্ট করে দিল সেই কতো কষ্টে আনা গন্ধর বনের ফুলকে। একটু কেসে খনখনে গলায় বলতে লাগল থুরথুরে বুড়ি, 'তা বলি ছোটমেয়েরা ফুল তোরা সত্যিই এনেছিস। আমি তোদের একটু পরীক্ষা করছিলাম, সত্যিই তোরা ভাই চাস কি না। কিন্তু তাই বলে কি ভাই এত সহজেই পাওয়া যায় রে মেয়েরা! অনেক কিছু করতে হয় না, অনেক কিছুই করতে হয়।' এবার প্রায় কেঁদে ফেলল পাঁচ বোন। গন্ধর বনের সেই কাঁটার বিষের জ্বালা এখনো কমেনি। তবুও পাঁচ বোন কাঁদ-কাঁদ গলায় বলল, 'লক্ষ্মী বুড়িমা, আমাদের ফুটফুটে পাঁচটি ভাই তৈরী করে দাও। তুমি যা বলবে, আমরা তাই করবো।'

এবার একটু নড়ে-চড়ে বসল থুরথুরে বুড়ি, তারপর জোর করে খকখক করে কয়েক বার কেশে নিয়ে আবার বলা শুরু করলো, 'শোন খুকীরা, আমি তোদের সত্যিই ভাই তৈরী করে দিতে পারি। যদি চাস তো এক্ষুণিই তা দিতে পারি। কিন্তু কথা হচ্ছে কি জানিস, তোরা যদি প্রত্যেকে তোদের শরীর থেকে কিছু মাংস আমায় কেটে নিতে দিস, তাহলে সেই মাংস দিয়ে তোদের পাঁচটা ফুটফুটে ভাই তৈরী করে দিতে পারি। কাটবার সময় কিন্তু একটুও কাঁদতে পারবি নে। এখন রাজি আছিস তো বল।'

পাঁচ বোন একটু চুপ করে থেকেই রাজি হয়ে যায়। 'তাই দাও মা।' শুকনো গলায় তারা বলে, যদিও তাদের চলচলে মুখগুলিতে ভাই পাবার এক অদ্ভুত আনন্দ ফুটে উঠে। এবার থুরথুরে বুড়ি সত্যি সত্যি কিন্তু একটা মস্ত বড় ধারাল চুরি নিয়ে সেই ফুলের মতন নরম পাঁচ বোনের শরীর থেকে মাংস কাটতে বসলো। উঃ, সে কি যন্ত্রণা, সেই দারুণ যন্ত্রণায় একবারে নীল হয়ে গেল তাদের শরীর। তবুও তারা একটুও কাঁদল না, ভুলে এক ফোঁটাও চোখের জল ফেলল না। তারা চুপ করে সব কিছু সয়ে গেল। এবার কিন্তু থুরথুরে বুড়ি সত্যিই সেই মাংস দিয়ে ফুটফুটে পাঁচটি ভাই তৈরী করে দিল।

ভাই পেয়ে সব কিছু দুঃখ তারা ভুলে গেল। এতো দিন পর তাদের সেই কত দিনের সাধই না মিটলো। থুরথুরে বুড়িকে বার বার প্রণাম করলো তারা। বুড়িমা কষ্ট দিয়েছে ঠিকই, কিন্তু ভাইও তো তারা পেয়েছে। ভাইদের নিয়ে ফিরে চলল তারা।

ফিরে এসেই নানারকম আমোদ আহ্লাদে মেতে উঠল পাঁচ ভাই আর পাঁচ বোন। হাসি আর গল্পে ভরিয়ে তুলল দিনগুলি। দিনগুলিকে কতো হাল্কাই না মনে হোল।

এভাবেই আবার বছরগুলি কাটে। কিন্তু এই সুখ বেশী দিন রইল না। স্বপ্নেও পাঁচ বোন যা কোন দিন ভাবেনি, শেষে একদিন তাই হোল। হঠাৎ একদিন ভায়েরা ঝগড়া শুরু করলো।

শুধু কি ঝগড়াই, হাতাহাতিও হতে লাগল প্রায়ই। একটা লাল ঝিনুক নিয়েই হয়তো মারামারি শুরু হয়ে গেল। এক ভাই বলে, এটা আমার, আরেক ভাই বলে, ওটা আমার। ওরা পাঁচ বোন কত যে বোঝায় ভাইদের, বলে, লক্ষ্মীটি, ঝগড়া করিসনে ভাই, কত ঝিনুক তোদের দেবো, কত হীরে, মুক্তো, পান্না, চুণিও তোদের দেবো। ঝগড়া কিন্তু কক্ষুখোনো করিস নে। আর তোরা আমাদের ভাই, আমরা কি দুষ্টু যে তোরা দুষ্টু হবি।' কিন্তু বোনেদের কোন কথাই কানে তোলে না ভায়েরা।

শেষে ভাইদের জ্বালায় অস্থির হয়ে উঠল পাঁচ বোন। একদিন তারা ঠিক করলো, নাঃ, আর দেরী করা ঠিক নয়, এর একটা বিহিত তাদের করতেই হবে। থুরথুরে বুড়ি থাকলে তার কাছেই না হয় আবার যাওয়া যেতো। কিন্তু সে আর এখন ওখানে নেই, কোথায় যে গেছে সে-ও কেউ জানে না। হঠাৎ পাঁচ বোনের মনে পড়ল পবনবুড়ির কথা। এখান হতে অনেক দূরে সোজা উত্তর-পূর্বে ক্রোশের পর ক্রোশ পথ পার হয়ে গেলে চোখে পড়ে ফুলে ঢাকা খুব সুন্দর এক পাহাড়। দূর থেকে সেই ফুলে-ঢাকা পাহাড়কে মনে হতো যেন কোন এক অপ্সরীদের দেশ। সেই পাহাড় থেকে আকাশকে আরো গাঢ় নীল দেখাত আর সেখানে সব সময়ে ভেসে আসতো চন্দন আর ফুলের মিষ্টি গন্ধ! সেই সুন্দর পাহাড়ের ওপরেই থাকতো এই পবনবুড়ি। তার দেখা পাওয়া ছিল ভয়ানক কঠিন ব্যাপার। কারোর সঙ্গেই দেখা করতো না সে। বাতাসের মতো তাকে দেখা যেতো না বলেই তার নাম ছিল পবনবুড়ি। থুরথুরে বুড়ির মতন দেখতে কুচ্ছিত ছিল না সে।

একদিন পাঁচবোন হাজির হোল পবনবুড়ির কাছে। কি মনে করে পবনবুড়ি দেখা করলো পাঁচ বোনের সঙ্গে, ডেকে এনে আদর করে বসালো তার কাছে। পাঁচ বোন সব কথা খুলে বলল তাকে। সব কথা শুনে ছি ছি করে উঠল পবনবুড়ি, বলল, 'ছে ছে, তোরা এত কষ্ট করে গিয়েছিলি কি না থুরথুরে বুড়ির কাছে। রাম রাম ওর কাছে আবার যায় নাকি কেউ। পাজির হদ্দ এই বুড়ি। ও একটা ডাইনী। কারোর ভালো করে না বুড়ি। আহা, তোদের পাঠিয়েছিল কিনা সেই গন্ধর কাঁটার বনে। শুধু শুধু তোদের এই রকম হয়রাণীটা করে কি লাভ হোল ওর।' পাঁচ বোনকে আরো কাছে টেনে নিয়ে আসে পবনবুড়ি, তারপর আবার বলে, 'আহা, তোদের শরীর থেকে মাংস কেটে তবে কিনা সেই মাংস দিয়ে ভাই তৈরী করে দিলে! ছুরি ধরতে হাত কি একটুও কাঁপল না রে। শরীরে মায়া দয়া বলে কি কিছুই নেই? আহা দেখ দিকি, যন্ত্রণায় সমস্ত শরীরটা কি রকম নীল হয়ে গেছে?'

পাঁচ বোনের গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল পবনবুড়ি। তারপর আবার বলল, 'ভাইরা তো দুষ্টু হবেই। থুরথুরে বুড়ি যখন তৈরী করে দিয়েছে, তখন দুষ্টু না হয়ে কি আর পারে। তবে তোরা একটা কাজ করতে পারিস, ছোটমেয়েরা।'

'কি, কি, বল বুড়িমা,' ওরা এক সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল।

পবনবুড়ি ঘাড় নাড়াতে থাকে, পরে বলে, 'কাজটা যে খুব সোজা তা নয়, সে হচ্ছে কী জানিস, তোরা দিন-রাত ভাইদের ঘিরে ঘিরে গান কর। সেই গানটাও তোদের শিখিয়ে দিচ্ছি, সে গানটা হচ্ছে এই,—

তোরা ভালো হ ভাই ভালো হ ঝগড়া তোরা করিস নে,
কতো কষ্টে তোদের পাওয়া সেটা যেন ভুলিস নে,
তোরা ভালো হ ভাই ভালো হ দুঃখ আর দিস নে।'

'শোন মেয়েরা'—পবনবুড়ি বলে, 'কিন্তু একটা কথা আছে। এই গান একবার শুরু করলে তা কিন্তু আর কোন দিন থামান চলবে না। পারবি ত মেয়েরা?'

'পারবো, খুব পারবো'—পবনবুড়িকে প্রণাম করে পাঁচ বোন চলে এলো। পবনবুড়ি ঠিক যা যা বলেছিল, ঠিক ঠিক তাই তারা করলো। পাঁচ ভাইকে ঘিরে ধরল পাঁচ বোন আর গাইতে শুরু করল সেই গান। দিন নেই রাত নেই, তারা শুধু গেয়ে চলে সেই গান।

রূপকথা কিন্তু এখানেই শেষ নয়। আরো আছে, তোমরা শুনে খুব অবাক হয়ে যাবে, সেদিন হতে আজ লক্ষ লক্ষ বছর পরও সেই গান গেয়ে চলেছে সেই পাঁচ বোন। এক মুহূর্তের জন্যও তারা বন্ধ করে না তাদের গান। এখন তোমরা বলতে পার এই পাঁচ বোন আর পাঁচ ভাই কারা? তোমরাও তাদের চেন বৈ কী, নিশ্চয়ই চেন। এই পাঁচ বোন হচ্ছে কে জান, তারা হচ্ছে পাঁচ মহাসমুদ্র আর পাঁচ ভাই হলো পাঁচ মহাদেশ। একদিন সমস্ত পৃথিবীটাই ছিল জলে জলময়। এই জলময় পৃথিবীতে কোথাও ছিল না শুকনো এক টুকরোও জমি। ক্রমে ক্রমে এই জলময় পৃথিবী থেকেই জেগে উঠল এক এক করে পাঁচ পাঁচটি মহাদেশ। ভাইদের তৈরী করতে গিয়ে নিজেদের শরীর থেকে মাংস কেটে দিতে হয়েছিল বলেই, সেই যন্ত্রণায় সমুদ্রের জল তাই আজো নীল। আর সমুদ্র ত তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছো। সমুদ্রের তীরে দাঁড়ালে তোমরা সমুদ্রের যে গর্জ্জন শোন, কখনো ভুলে যেও না, সে হচ্ছে সমুদ্রের গান। এই গান সে আজও পাঁচ মহাদেশকে শোনাচ্ছে :—

তোরা ভালো হ ভাই ভালো হ ঝগড়া তোরা করিসনে,
কতো কষ্টে তোদের পাওয়া সেটা যেন ভুলিসনে,
তোরা ভালো হ ভাই ভালো হ দুঃখ আর দিসনে।

চিচেন্‌ইট্‌জার মন্দির

শ্রীদেবব্রত ঘোষ

আমেরিকায় ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকদের আগমনের বহু পূর্ব্বে মধ্য-আমেরিকা, মেক্সিকো ও দক্ষিণ-আমেরিকায় পেরুতে উন্নত ধরণের সভ্যতা বিরাজ করতো। ইতিহাসে এই সভ্যতা 'মায়া-সভ্যতা' নামে পরিচিত। মায়া-সভ্যতার প্রভাবে মধ্য-আমেরিকার তিনটি বড় রাষ্ট্র মিলে 'মায়াপণ-সঙ্ঘ' নামে একটি যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থার সৃষ্টি করেছিল। তাদের সুনিয়ন্ত্রিত সরকার ও উন্নত ধরণের সাহিত্য ছিল। নগরে নগরে শিক্ষিত সমাজ ছিল। প্রস্তরকার্য্য, মৃৎপাত্র শিল্প, বয়নশিল্প, রঞ্জনশিল্প, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যে মায়া-সভ্যতার লোকেরা বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেছিল। নগরগুলিতে বড় বড় প্রাসাদ নির্মাণের প্রতিযোগিতা ছিল।

মায়াপণ-সঙ্ঘ দেড় শত বৎসরের বেশী স্থায়ী হয়। এই সভ্যতার যুগে পুরোহিতশ্রেণীর দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ ছিল। তাদের অত্যাচারে দেশবাসীদের দুঃখ-দুর্দ্দশার অন্ত ছিল না। ফলে কিছুদিনের মধ্যেই একটা সামাজিক বিপ্লব হয় ও এই সুযোগে বিদেশী আক্রমণকারীরা এসে অতর্কিতে তাদের দেশ আক্রমণ করে দখল করে নেয়। এই

বিদেশী আক্রমণকারীদের নাম আজটেক্স্। উক্সমল, লাধুয়া, মায়াপাণ, সাওমুলতুন ও ইউকাটান প্রভৃতি জনপদশালী রাষ্ট্রগুলি আজটেক্স্দের ফলেই ধ্বংস হয়।

প্রাচীন মায়া-সভ্যতার ইতিহাস পাঠ করে জানা যায় যে, সেকালে মায়াদের মাঝে নানারূপ কুসংস্কার প্রচলিত ছিল। তারা সর্ব্বদাই ড্রাগন জাতীয় এক ভয়ঙ্কর কাল্পনিক জীবের ভয়ে ভীত হয়ে থাকত। এই ভয়ঙ্কর জীবের সন্তুষ্টিবিধানের জন্য সমাজের প্রধান পুরোহিতরা প্রায়ই সুলক্ষণা, পবিত্র ও সুন্দরী কুমারীদের মণি-মুক্তা খচিত বহুমূল্য অলঙ্কারে সজ্জিত করে চিচেনইটজার মন্দির-প্রাঙ্গণের গভীর কূপে নিক্ষেপ করতেন। এই ভাবে কত-শত নিরীহ প্রাণ যে কুসংস্কারের কবলে পড়ে বলি হয়েছিল, তার ইয়ত্তা নেই।

চিচেনইট্জার মন্দির মেক্সিকোর ইউকাটান উপদ্বীপের অন্তর্গত মেরিডা-র জঙ্গলে অবস্থিত। প্রায় পাঁচশো বছর ধরে মেক্সিকোর জনসাধারণের মাঝে একটি কিম্বদন্তী প্রচলিত ছিল যে, চিচেনইটজার মন্দিরের নীচে নাকি প্রচুর ধনরত্ন লুকানো আছে। এই কিম্বদন্তীতে বিশ্বাস করে দেশ-বিদেশের বহু ধনলোভী যুগ-যুগ ধরে চিচেনইটজার মন্দিরের সন্ধানে এসে ইউকাটান্ উপদ্বীপের গভীর অরণ্যে বিষধর র‍্যাটেল সাপের কামড়ে প্রাণ হারিয়েছে। কিছুদিন পূর্ব্বে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের স্বনামধন্য প্রত্নতত্ত্ববিদ মিঃ এডওয়ার্ড থম্পসন্ এই বহুকথিত চিচেনইটজার মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করে মায়া-সভ্যতার ইতিহাসের এক বিস্মৃতপ্রায় অধ্যায়ের উপর আবার নতুন করে আলোকপাত করেছেন।

মিঃ থম্পসন্ যৌবনে ইউকাটান-এর মার্কিণ কন্সাল অফিসে সেক্রেটারীরূপে নিযুক্ত থাকা কালে সর্ব্বপ্রথম প্রাচীন মায়া-সভ্যতার ইতিহাসের প্রতি আকৃষ্ট হন। তিনি স্থানীয় জনসাধারণের কাছে চিচেনইটজার মন্দিরের প্রচুর ধনরত্নের গল্প শুনে এই বিষয়ে অনুসন্ধান শুরু করেন। মিঃ থম্পসন্ বিশপ ডিয়াগো ডি লাণ্ডার বিবরণী থেকে জানতে পারেন যে, প্রাচীন মায়া-সমাজের পুরোহিতরা দেশে অনাবৃষ্টি অথবা দুর্ভিক্ষ দেখা দিলেই দেবতার সন্তুষ্টি বিধানের জন্য সুন্দরী মায়া-কুমারীদের বহুমূল্য অলঙ্কারে ভূষিত করে চিচেনইটজার মন্দিরে এক রত্নময় বেদিকার উপর বলি দিতেন। এই রত্নময় বেদিকা "চাক্ মূল" নামে পরিচিত ছিল। বলি দেওয়ার পর প্রধান পুরোহিত কুমারীদের হৃৎপিণ্ডগুলি সোনার থালায় সাজিয়ে দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদন করতেন। এছাড়া মিঃ থম্পসন প্রাচীন মায়াদের সামাজিক রীতি-নীতি ও ধর্ম সম্বন্ধেও অনেক মূল্যবান তথ্য বিশপ লাণ্ডার বিবরণী থেকে সংগ্রহ করেন।

প্রায় দেড় বছর ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম করে মিঃ থম্পসন্ মেরিডার জঙ্গলে চিচেনইটজার মন্দিরের সন্ধান পান। পিরামিড-এর আকারে তৈরি এই মন্দিরটি পণ্ডিতগণের মতে স্থাপত্যশিল্পের ইতিহাসের এক অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে অনুসন্ধান করে তিনি হীরা, জহরত, মণি-মুক্তা, চুণী, পান্না ও সোনার গহনায় ভর্তি, চল্লিশটি পাথরের সিন্দুক আবিষ্কার করেন। এই প্রচুর ধনরত্নের সঙ্গে একমাত্র আরব্যোপন্যাসের কাল্পনিক ঐশ্বর্য্যেরই তুলনা করা চলে।

এর পর তিনি মন্দির-প্রাঙ্গণের বহুকথিত ও কুখ্যাত পবিত্র কূপের মধ্যে অনুসন্ধান কার্য্য শুরু করেন। গ্রীক-ডুবুরীদের সাহায্যে মিঃ থম্পসন্ কূপের তলদেশ থেকে অসংখ্য নারী-কঙ্কাল ও প্রায় তিরিশ মণ ওজনের হীরা, জহরত, মণি-মুক্তা খচিত জরোয়া গহনা উদ্ধার করেন। কিন্তু হঠাৎ এক দুর্ঘটনার ফলে কয়েকজন গ্রীক-ডুবুরীর মৃত্যু হওয়ায় এই অনুসন্ধান কার্য্য মাঝপথেই পরিত্যক্ত হয়। স্থানীয় কুসংস্কারাচ্ছন্ন জনসাধারণের বিশ্বাস, পবিত্র কূপের দেবতার শান্তিভঙ্গ করার অপরাধেই নাকি গ্রীক-ডুবুরীদের মৃত্যু হয়েছিল। তবে যতদূর মনে হয়, স্থানীয় জনসাধারণের এই কুসংস্কার মিঃ থম্পসনকেও প্রভাবিত করেছিল। আবার অনেকের মতে মিঃ থম্পসন্ প্রচুর ধনরত্ন হস্তগত করায় ইচ্ছে করেই এই অনুসন্ধান কার্য্য বন্ধ করে দেন। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের বোষ্টন সহরের পিবোডি সংগ্রহশালায় এই ধনরত্ন এখন রক্ষিত আছে।

সম্প্রতি আবার নতুন উদ্যমে চিচেন্ ইট্জার পবিত্র কূপের মধ্যে অনুসন্ধান কার্য্য শুরু হয়েছে। মেক্সিকোর কয়েক জন ধনী ব্যবসায়ী ও প্রত্নতত্ত্ববিদ এই অনুসন্ধানকারী দলে আছেন। তাঁদের মতে মিঃ থম্পসন্ চিচেন্ইট্জার অগাধ ধনরত্নের মাত্র সামান্যতম অংশ আবিষ্কার করতে সমর্থ হয়েছেন। কারণ—Experts claim that to day more than three million pounds worth of treasure still lies there. প্রমাণস্বরূপ তাঁরা ইতিমধ্যেই কয়েকটি হীরকখচিত সিংহাসন, দেবমূর্তি ও সোনার থালা প্রভৃতি উদ্ধার করেছেন বলে সংবাদ পাওয়া গেছে। যদি—The task will take months perhaps years, but the rewards gained may stagger the world.

পাখী

নমিতা সেনগুপ্তা

উচ্চ শাখে বসি পাখী, কাতরে কাহারে
কেন তুমি ডাকিতেছ এ তারস্বরে ?
বুঝি তুমি ছিলে কোনও বঙ্গ কুলবালা
শাশুড়ী স্বামীর জ্বালা সহিতে না পেরে বালা
সেই দুঃখে ত্যজ সেই শরীর তোমার
পাখী হয়ে করিতেছ সে দুঃখ প্রচার ?

অথবা সাধক তুমি বসি যোগাসনে
ডাকিছ করুণাময়ে সকরুণ তানে,
বুঝি কোনও দীননাথে পেয়েছিলে আঁখিপাতে
হারায়েছ বুঝি পুনঃ আঁখি পালটিতে
রোদন করিছ তাই কাতর ধ্বনিতে ?

এখনও তো হয়নি প্রভাত যামিনী
তুমি কেন ওরে পাখী, জেগেছ এখনি ?
সুষুপ্তিমগ্ন ধরা, সবাই চেতনাহারা
নিদ্রা নাই কেন পাখী নয়নে তোমার ?
মুখে শুধু 'চোখ গেল' ধ্বনি অনিবার ?

সিন্ধুপারে

শ্রীনীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত

তেরো

জীবনে অনেক দিন, অনেক ব্যাপারে মনে প্রচুর আনন্দ পেয়েছি কিন্তু সেই বসন্ত-পূর্ণিমার দিন সন্ধ্যেবেলা মনটা যে রকম উৎফুল্ল হয়ে হালকা হয়ে উঠেছিল—সে রকম আমার জীবনে খুব কমই হয়েছে বলে মনে হয়। আজ আর কোনও আড়াল নেই, মার্লিন দিয়েছে ধরা—ক্লাব থেকে হাসপাতালে ফিরে আসতে আসতে মনে হয়েছিল—আমি যেন সমস্ত জগৎটার উপর উড়ে বেড়াতে পারি, হঠাৎ যেন সে শক্তিটুকু পেয়েছি প্রাণে।

মাথার উপর আকাশে পূর্ণচন্দ্র, মাঠের পথ দিয়ে চলেছি—পাশে চলেছে মার্লিন। টম ও মক্‌টন অবশ্য সঙ্গেই ছিল—কিন্তু তাদের যেন কোনও অস্তিত্বই ছিল না আমার মনে। অতীতও ভাবিনি, ভবিষ্যৎও ভাবিনি—বর্ত্তমানের মহালগ্নের পুলকে একেবারে হয়ে উঠেছিলাম তন্ময়। পথে চলতে চলতে মার্লিন বারে বারে ফিরে ফিরে চেয়েছিল আমার দিকে—সেটুকু শুধু লক্ষ্য করা নয়, তার গভীর মর্ম্মটুকুও বুঝতে আমার দেরি হয়নি। যেন বলেছিল—তুমিই ত' সেই মানুষটি যাকে চিরদিন খুঁজে বেড়িয়েছি, তুমিই যে বিশেষ করে তৈরী হয়েছ আমারই জন্য, আমি যে তা প্রাণ দিয়ে বুঝেছি। চলতে চলতে এক ফাঁকে চুপি চুপি বলে, কাল যেন আসতে দেরী করো না। সে কথাটি কোনও দিনই ভুলিনি, আজও বাজে আমার মর্ম্মে মর্ম্মে।

হাসপাতালের সদর গেটের কাছে এসে বিদায় সম্ভাষণের জন্য একটু দাঁড়িয়ে মার্লিন সোজা চাইল আমার দিকে। বলল, কাল আবার দেখা হবে।

সঙ্গে সঙ্গে মক্‌টন বলল, অবশ্য যদি কাজের ক্ষতি না হয়। কাজের ক্ষতি করতে আমরা আপনাকে কখনও বলব না।

বললাম, না, কাল যাব।

কিন্তু হায় রে! তখন কি বুঝতে পেরেছিলাম চার-পাঁচ দিন ক্লাবে মোটে যাওয়াই হবে না? ব্যাপারটা বলি।

*　　*　　*　　*

হাসপাতালে এসেই সুনীলের একটি টেলিগ্রাম পেলাম। টেলিগ্রামে লেখা আছে: টেলিগ্রাম পাওয়া মাত্র চলে আসুন, পাল মৃত্যুশয্যায়। সে আপনাকে দেখতে চায়।

টেলিগ্রামটি হাতে করে খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে ভাবলাম—মন যে আমার এখন ডভিংটন ছেড়ে এক মুহূর্ত্তের জন্যও বাইরে যেতে রাজী নয়। তাই বোধ হয় প্রথমটা মনে হ'ল—আমি কেন যাব, এ ব্যাপারে আমারও কোন দায়িত্ব নেই। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে হ'ল, হাজার হলেও নীরেন আমার দেশের ছেলে, মৃত্যুশয্যায় আমাকে দেখতে চেয়েছে। সত্যি যদি মারা যায়—একবার না গেলে এর গ্লানিটুকু হয়ত চিরদিন থাকবে আমার মনে। মনকে দৃঢ় করে শেষ পর্য্যন্ত যাওয়াই ঠিক করলাম।

সোজা ডাঃ নায়ারের কাছে গেলাম। টেলিগ্রাম দেখিয়ে বললাম, আমার অন্ততঃ চার দিনের ছুটি চাই যে। ডাঃ নায়ারও তৎক্ষণাৎ আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে রেজিষ্ট্রারের কাছে গেলেন এবং তাঁকে আশ্বাস দিলেন যে, এই চার দিনের জন্য তাঁর নিজের কাজের উপর আমার সমস্ত কাজের ভার তিনিই নেবেন। এই নিয়ে রেজিষ্ট্রারের সঙ্গে কাজের বিষয়ে একটু আলোচনা করার পর ডাঃ নায়ারই টেলিফোন করলেন ডাঃ গ্রেহামকে। ডাঃ গ্রেহাম তখন হাসপাতালে রোগীদের কাজে ছিলেন। তিনিও সব শুনে আমার অনুপস্থিতিতে আমার কাজে ডাঃ নায়ারকে সাহায্য করতে সানন্দে রাজী হলেন। এদিক দিয়ে সব ব্যবস্থা হওয়ার পর রেজিষ্ট্রার মিঃ ব্লাঙ্ককে তাঁর বাড়ীতে টেলিফোন করে ছুটিটুকু মঞ্জুর করিয়ে দিলেন।

পরের দিনই সকালের ট্রেণে মার্চ থেকে রওয়ানা হয়ে বিকেলে লণ্ডনে এসে পৌছলাম। ষ্টেশন থেকে ট্যাক্সি করে সোজা গেলাম সুনীলদের ফ্ল্যাটে।

ফ্ল্যাটে গিয়ে দেখি—সুনীল বেরুবার জন্য তৈরী হচ্ছে। আমাকে দেখেই যেন বিশেষ উৎসাহিত হয়ে উঠল। বলল, এসে পড়েছেন? ভালই হয়েছে।

শুধালাম, নীরেনের খবর কি?

বলল, খবর মোটেই ভাল নয়। শেষ অবস্থা।

দুজনে গিয়ে বসলাম—বসবার ঘরটিতে।

সুনীল বলল, আপনি চা খেয়েছেন?

বললাম, না।

সুনীল দাঁড়াল, আপনার চা নিয়ে আসছি—বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল এবং অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই চা এবং একটি প্লেটে মাখন মাখিয়ে দুখানি ক্রাম্পেট নিয়ে এলো ঘরে। রাখল আমার পাশে এবং বসল পাশের একটি চেয়ারে। চা-এর সঙ্গে ক্রাম্পেট খেতে আমি যে ভালবাসি—সেটা সুনীল ভোলেনি দেখলাম।

চা খেতে খেতে শুধালাম, আপনি বেরিয়ে যাচ্ছিলেন?

বলল, হাঁ—হাসপাতালে নীরেনকে দেখতে। ও বেলা ত ১২টা পর্য্যন্ত ছিলাম—অক্সিজেন দেওয়া হচ্ছে।

শুধালাম, ডাক্তাররা বলে কি?

বলল, বলবে আর কি—কোনও আশা নেই।

শুধালাম, শেষ পর্য্যন্ত হল কি?

বলল, প্রথম বার পেটে যে অপারেশন হয়েছিল—সেটা টিউমার নয়—এখন শুনছি ক্যান্‌সার। এবারও ষ্টমাকে আবার ক্যান্‌সারের অপারেশন হয়েছে। কিন্তু আর বাঁচান যাবে না।

চুপ করে রইলাম।

স্নানের সময়
মনে
রাখবেন
একশ' বছরের
ঐতিহ্য,
বিশুদ্ধতা এবং
অপরিবর্ত্তিত
গুণগুলির জন্য
আজও সমাদৃত
লক্ষ্মীবিলাস
তৈল
এম. এল. বসু য়্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
লক্ষ্মীবিলাস হাউস, কলিকাতা-৯

সুনীল বলল, হয়ত এমনিই হত এই পরিণতি। কিন্তু শুনলাম,—অতিরিক্ত মদ খেয়ে জিনিষটাকে দ্রুত এগিয়ে দিয়েছে।

শুধালাম, জীবনটা কি সেই ভাবেই চলছিল ?

বলল, ঠিক নয়। আপনি এমিকে বলে চলে যাওয়ার পর এমি আর কিছু দিন আসত না। কিন্তু তাতে ফল হল উলটো।

শুধালাম, কি রকম ?

বলল, একলাই বোতলের পর বোতল শ্যাম্পেন কিনে এনে বাড়ীতেই দিন-রাত খেতে সুরু করল এবং সঙ্গে সঙ্গে অসহ্য পেটের যন্ত্রণা—পেটে বালিশ দিয়ে উপুড় হয়ে থাকত পড়ে।

বললাম, কি আশ্চর্য্য ! এরকম করে যদি আত্মহত্যা করে—কে আর কি করতে পারে ?

সুনীল বলল, শুনুন। কিছুতেই যখন ওকে নিরস্ত করা গেল না, তখন আমার মনে হল—এমি চলে যাওয়াতেই এতটা বাড়াবাড়ি হয়েছে—এমিকে ফিরিয়ে আনলে বোধ হয় একটু কাজ হবে। কেন জানি না মনে হল—সে থাকতে ত এতটা বাড়াবাড়ি ছিল না। সেই হয়ত রেখেছিল খানিকটা নিরস্ত করে। অন্ততঃ তাকে ফিরিয়ে আনলে ক্ষতি ত এর চেয়ে বেশী কিছু হবে না। একদিন বললামও সে কথা ওকে।

শুধালাম, তারপর ?

বলল আহা। ভাবলে আমার এখনও কষ্ট হয়। আমার কথাটা শুনেই শ্যাম্পেনের বোতলটা ছুড়ে ফেলে দিল এক পাশে—হাউ হাউ করে উঠল কেঁদে। আমার হাত দুটি ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলল—তা যদি পার, আমি আর মদ জীবনে ছোঁব না, কথা দিচ্ছি।

চুপ করে রইলাম—কি আর বলি। নীরেনের কান্নায় ভাঙা রুগ্ন মুখখানি কল্পনায় আমারও চোখের সামনে উঠল ভেসে, লাগল মনে একটা অভূতপূর্ব্ব দরদ তার প্রতি। আমিই ত এমির আসা বন্ধ করেছিলাম—আজ সে কথাটা কেন জানি না মনটাকে দিল পীড়া। খালি মনে হতে লাগল—এমির আসা বন্ধ না করলে নীরেন হয়ত আরও কিছু দিন বাঁচত। বাঁচার জন্য এমিকে ওর প্রয়োজন হয়েছিল, তাই হয়ত এমিকে অমন করে ধরেছিল আঁকড়ে। কিন্তু আমি ত অন্যায় বুঝে কিছু করিনি, ভালর জন্যই করেছিলাম—এই ভেবে মনকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করলাম। আজ জীবনের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে একটা কথা বারে বারে ভাবি—মানুষের ভাল-মন্দ বিচার করার অহঙ্কার মানুষকে দিয়ে তাঁর অপ্রতিহত সর্ব্বাঙ্গীন দৃষ্টির সামনে মানুষকে নিয়ে নিষ্ঠুর পরিহাস করার কি প্রয়োজন ছিল তাঁর ?

চা খাওয়া শেষ হলে উঠে দাঁড়িয়ে বললাম চলুন, আমিও আপনার সঙ্গে হাসপাতালে যাই। হাসপাতালটি শুনলাম—ডাডিংটন ছাড়িয়ে এজওয়ার রোডের প্রায় শেষের দিকে, মার্ব্বল আর্চের কাছাকাছি। বাসে যেতে যেতে বাকি কথাগুলি সুনীলের কাছে শুনলাম।

শুনেছিলাম—নীরেনের কাছ থেকে নীরেনের নোটবই-এ লেখা এমির ঠিকানাটা বার করে সুনীল এমির সঙ্গে দেখা করে এবং অনেক বুঝিয়ে এমিকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে আসে ফ্ল্যাটে।

শুধালাম, এমি থাকে কোথায় ?

বলল, ওয়াটারলু ব্রিজের কাছে একটি বোর্ডিং-হাউসে। তিনতলার উপর ছোট্ট একটি ঘর।

শুধালাম, এমি ফিরে আসাতে কি কিছু ফল হল ?

বলল, বোধ হয় কিছু দিন একটু হয়েছিল। চব্বিশ ঘণ্টা মদ খাওয়াটা বন্ধ করেছিল এমি। তবে দুজনে যতক্ষণ একসঙ্গে থাকত—চলত শ্যাম্পেন এবং সে অনেক রাত পর্য্যন্ত।

শুধালাম, এমি সেটুকু বন্ধ করার চেষ্টা করেনি কেন ?

বলল, সে কথা একদিন এমির সঙ্গে আমার হয়েছিল। এমিকে বলাতে সে এক অদ্ভুত কথা বলে বসল।

শুধালাম, কি বলেছিল এমি ?

বলল, কেমন এক রকম ভাবে আমার দিকে চেয়ে বলল—যেটুকু করেছি এই ঢের, এর বেশী আর নয়।

চুপ করে রইলাম। কিছুক্ষণ পরে শুধালাম, এমি হাসপাতালে নীরেনকে দেখতে যায় না ?

বলল, না—দেখিনি ত !

হাসপাতালে এলাম। সুন্দর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হাসপাতালটি। দোতলার একটি নিজস্ব ছোট ঘরে নীরেনকে রাখা হয়েছিল। দুজনে গেলাম সেই ঘরে। দেখলাম—বেশ একটি সুন্দরী নার্স নীরেনের বিছানার পাশে বসে নীরেনকে অক্সিজেন দিচ্ছে। নীরেন চিৎ হয়ে চোখ বুজে আছে শুয়ে। চাপাগলায় সুনীলের সঙ্গে নার্সটির কথা হলো এবং সুনীল আমাকে বলল, আর জ্ঞান নাই—আর বোধ হয় হবেও না।

চুপ করে বসে নীরেনের মুখের দিকে রইলাম চেয়ে। রোগজীর্ণ নীরেনের মুখখানির দিকে চেয়ে মনটা তার প্রতি করুণায় উঠল ভরে। বেচারা ! জীবনে কতই না সাধ-আহ্লাদ ছিল—কিছুই ত পেল না।

বাসে ফিরে আসতে আসতে সুনীল বলল, এই নার্সটিকে চব্বিশ ঘণ্টার জন্য বিশেষ ভাবে নিযুক্ত করা হয়েছে—নীরেনকে দেখবে বলে।

বললাম, নার্সটিকে ভাল বলেই মনে হল।

সুনীল বলল, দেখতেও বেশ। সেইটুকুই ছিল আমাদের পাল সাহেবের জীবনের শেষ সখ—অপূর্ণ রাখি কেন ?

শুধালাম, কি রকম ?

বলল, ঐ রোগের যন্ত্রণার মধ্যেও হাসপাতালে যেতে যেতে আমাকে বলেছিল—দেখো, আমার জন্য যে নার্সকে রাখবে, সে যেন দেখতে ভাল হয়।

* * * *

পরের দিন সকালে যত শীঘ্র সম্ভব ব্রেকফাষ্ট খেয়ে গেলাম হাসপাতালে নীরেনকে দেখতে। ব্রেকফাষ্ট-টেবিলে সুনীলকে একবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম—আছে ত ?

সুনীল বলল, হ্যাঁ। মারা গেলে আমাদের এখানে খবর আসত। সে ব্যবস্থা আছে।

হাসপাতালে গিয়ে নীরেনের ঘরের সামনে দাঁড়াতেই একজন—কালকের সে নার্সটি নয়—ছুটে এলো আমাদের কাছে এবং নার্স বলল, যাবেন না। এখন একটু জ্ঞান হয়েছে, এ অবস্থায় কোন উত্তেজনাই ভাল নয়।

সঙ্গে সঙ্গে চেয়ে দেখলাম, নীরেনের ঘরের দরজায় টাঙান পর্দার কটা কার্ড পিন দিয়ে আঁটা রয়েছে এবং তাতে বড় বড় অক্ষরে খা—দর্শনপ্রার্থীদের প্রবেশ নিষেধ।

নার্সটিকে শুধালাম, ডাক্তার কোথায়? তাঁর সঙ্গে একটু থা বলতে পারি কি?

নার্সটি আসুন বলে আমাকে একটা পাশের ঘরে নিয়ে গেল বং সেখানে দেখা হ'ল ডাক্তারের সঙ্গে। ডাক্তারটিকে নিজের রিচয় দিয়ে বললাম, আমি রোগীর বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধু। ডব্লিটন থেকে এসেছি শুধু একবার শেষ দেখা দেখবার জন্ত। সেটা কি কানও রকমেই সম্ভব হবে না?

ডাক্তারটি একটু ভেবে বললেন আচ্ছা, আমি একবার নিজে াগে দেখে আসি।

মিনিট চার-পাঁচ পরেই ফিরে এসে আমাকে ডাকলেন—আপনি াসুন কিন্তু মিনিট পাঁচ-এর বেশী থাকবেন না। আমিও আপনার সঙ্গে থাকব। সুনীলও সঙ্গে যাচ্ছিল কিন্তু তাকে বাধা দিয়ে লেন—আপনি না। সুনীল সেইখানেই চুপ করে রইল দাঁড়িয়ে।

ডাক্তারের সঙ্গে খুব সন্তর্পণে ঘরে ঢুকলাম। ডাক্তারটি আমাকে আড়াল করে ইসারায় ঘরের একটি কোণ দেখিয়ে দিলেন—যেন নীরেন আমাকে দেখতে না পায়। কালকের সেই নার্সটিকে দেখলাম—নীরেনের পাশে বসে আছে, দিচ্ছে অক্সিজেন। ডাক্তারটি নীরেনের কাছে এগিয়ে গিয়ে নীরেনের হাত ধরে নাড়ী দেখতে দেখতে হেসে বললেন, "ভালই ত আছেন। আপনার একটি ডাক্তার বন্ধু অনেক দূর থেকে আপনার অসুখের খবর পেয়ে ছুটে এসেছেন আপনাকে দেখতে—ভাগ্যবান লোক আপনি।

নীরেন যেমন চিৎ হয়ে শুয়েছিল তেমনিই রইল—চোখ দুটি আজ কিন্তু বোজা নয়। ডাক্তারটি ইসারায় আমাকে সামনে যেতে বললেন। নীরেনের পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম।

নীরেনের চোখ দুটি পড়ল আমার মুখের উপরে। লক্ষ্য করলাম—ঠোঁটের কোণে একটি ভাঙ্গা হাসির রেখাও যেন গেল খেলে। বুকের উপর হাত দুটি উঠল যেন একটু কেঁপে। দু'হাত দিয়ে ওর হাত দুটি হাতের মধ্যে ধরে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

দেখলাম—ঠোঁট দুটি একটু যেন কেঁপে কেঁপে উঠল। বুঝলাম—কি যেন একটা বলতে চায়। কিন্তু হায় রে। সে কথা ভাষায় বার করবার শক্তি ওর আর নাই—হারিয়ে ফেলেছে।

কেন জানি না, আমি বেশ জোরের সঙ্গে বললাম, নীরেন! তোমাকে আমি এতটুকুও ভুল বুঝিনি—তাই ত এলাম তোমার অসুখের খবর পেয়ে সুদূর ডব্লিটন থেকে ছুটে তোমাকে দেখতে।

চোখ দুটো বুজে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্য করলাম, চোখের কোণ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। ডাক্তারের ইসারায় আমি আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম।

* * * *

সুনীলের সঙ্গে নীরেনের আর দেখা হ'ল না। সেই দিনই বিকেল সাড়ে তিনটের সময় খবর এলো—নীরেন আর নাই।

যথারীতি ব্যবস্থার পর লণ্ডন ক্রিমেটোরিয়ামে (বৈদ্যুতিক সৎকারালয়) নীরেনের সৎকার শেষ করে বাড়ী ফিরে আসতে বাজল রাত আটটা। ক্রিমেটোরিয়ামে ভারত-প্রবাসী অনেক ছাত্রের সঙ্গেই দেখা হয়েছিল—তার মধ্যে সুরেশ ঘোষ একজন।

এদের মধ্যে দু'-এক জন ক্রিমেটোরিয়ামে যাওয়ার আগে হাসপাতালে এসেছিল ফুল নিয়ে। সুনীল অবশ্য অনেক ফুল কিনে নিয়ে এসে নীরেনের মৃতদেহ ফুল দিয়ে সুন্দর করে সাজিয়ে দিয়েছিল। সাজাবার পর একবার নীরেনকে শেষ দেখা দেখবার জন্ত এগিয়ে গিয়ে দেখি—ঠিক বুকের উপর একটি বিরাট ফুলের মালা সাজান রয়েছে এবং তৎসংলগ্ন একটি কার্ডে লেখা রয়েছে—E. J.। এ তোড়াটি কে কখন কি ভাবে নিয়ে এসেছিল—লক্ষ্য করিনি। পরে সুনীলকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। সুনীলও বলেছিল জানি না। বোধ হয় হাসপাতালে কেউ দিয়ে গিয়েছিল।

যাই হোক্, রাত আটটার পর ফ্ল্যাটে ফিরে এসে শরীর ও মনের তখন যা অবস্থা—খাওয়ার কথা আমরা কেউই ভাবিনি। সুনীল স্তব্ধ ভাবে ছিল—কোনও কথাই বলছিল না। ফ্ল্যাটে এসে কোনও রকমে কাপড়-চোপড় ছেড়ে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল। এবং সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল তার ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না।

আমিও সেই ঘরে চুপ করে খানিকক্ষণ বসে থেকে, সুনীলের কান্নার বেগ একটু রোধ হলে, বসবার ঘরে এসে কোনও রকমে একটা বিছানা পেতে সেই ঘরেই কাপড় ছেড়ে শুয়ে পড়লাম। আজ আর ও ঘরে নীরেনের খাটে শোবার ইচ্ছে হ'ল না।

* * * *

ভোরে ঘুমটা ঠিক ভেঙ্গেছিল কি না, মনে নেই, হঠাৎ যেন কানে এলো—টুং টাং পিয়ানোর শব্দ। ঘুমজড়িত চক্ষেই পিয়ানোর দিকে চেয়ে দেখেছিলাম—মনে আছে। এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘুমটা চমকে গেল একেবারে ভেঙ্গে—বন্ধ পিয়ানো, শূন্য পিয়ানোর সামনের আসনটি।

সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ মনে হল সেই দিন সকাল বেলার কথা—সেই নীরেনের ড্রেসিং গাউন গায় দিয়ে বসে টুং-টাং পিয়ানো বাজান, সেই তার বেসুরো গান—

তখন আমায় নাই বা মনে রাখলে
তারার পানে চেয়ে চেয়ে গো
নাই বা আমায় ডাকলে।

মনে পড়ে গেল—বেসুরো গান গাইবার জন্ত তাকে ধমক দিয়েছিলাম। ধমক খেয়ে সে শুধু হেসেছিল। বেচারা! নিশ্চয়ই বুঝেছিল শীঘ্রই তাকে জীবন থেকে বিদায় নিতে হবে—তাই বোধ হয় জীবনটার উপর কখনও সে রাগ করেনি, এতটুকু রাগ করেও জীবনটাকে মলিন করতে যেন লাগত তার প্রাণে, তাই সব কথায়ই হাসত হি-হি করে।

* * * *

বিকেল বেলা ফ্ল্যাটেই ছিলাম—বেরোই নি। আমি একলাই ছিলাম, কেন না সুনীল বেরিয়েছিল—ফ্ল্যাট তুলে দেওয়ার এবং নিজের থাকার ঘর ইত্যাদির ব্যবস্থা করতে। বাইরের ঘরেই একটা ড্রেসিং গাউন গায়ে দিয়ে চুপ করে বসেছিলাম। সুনীলের সঙ্গে কথা বলে ঠিক করেছিলাম—পরের দিন সকাল বেলা ডব্লিটনে যাব ফিরে। সে রাতটাও সুনীলকে একলা রেখে যেতে মন চায়নি।

চুপ করে জানালা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে বসে আছি—

বাইরে অঝোরে বৃষ্টি হচ্ছে। এত ঘন বর্ষা ইতিমধ্যে অনেক দিন দেখিনি। আগেই বলেছি, রাস্তার উপরেই জানালাটি। হঠাৎ চোখে পড়ল—একখানি মুখের পাশের দিকটি জানালার বাইরে কাচের সঙ্গে একটু কাৎ হয়ে যেন লেগে রয়েছে। বৃষ্টির ধারা কাচের উপর দিয়েও বয়ে যাচ্ছিল—তাই কাচটি হয়ে উঠেছিল দারুণ ঝাপসা। লক্ষ্য করলাম—মানুষের মুখ, এই পর্য্যন্ত, আর কিছুই বোঝা গেল না। ভাবলাম—এই দারুণ বৃষ্টিতে অবসন্ন হয়ে কেউ হয়ত মাথাটি কাচের উপর রেখে একটু আড়াল পাওয়ার চেষ্টা করছে। কিন্তু বাইরের সদর দরজায় কড়া নেড়ে ও ভিতরে ঢুকতে পারত। কিছুই ঠিক বুঝতে পারলাম না। মনে হল—যেই হোক, এই দারুণ বৃষ্টিতে লোকটিকে ভিতরে ডেকে এনে একটু আশ্রয় দেওয়া উচিত। উঠে গিয়ে সদর দরজাটি খুলে বাইরে মুখ বাড়ালাম।

দেখলাম—মানুষটি রমণী। সদর দরজার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়েছেন, তাই মুখখানি ঠিক দেখতে পাইনি। ডেকে বললাম, আপনি ওখানে দাঁড়িয়ে অমন করে ভিজছেন কেন? ভিতরে আসতে পারেন।

মেয়েটি মুখ ফেরাল। চমকে উঠলাম—এমি জনসন্। সর্ব্বাঙ্গ ভিজে সপসপ করছে। মাথার চুলগুলি ভিজে সোজা এলিয়ে পড়েছে—মুখে-কানে।

বললাম, এ কি এমি! ভিতরে এসো।

কোনও কথা না বলে ধীর পদক্ষেপে আমার সঙ্গে ভিতরে এলো।

বললাম, তুমি সাংঘাতিক ভিজে গিয়েছ দেখছি। চল বসবার ঘরে আগুনের কাছে।

বসবার ঘরে গেলাম। ভাগ্যিস আগুন জ্বালান ছিল। বছরের এ সময়টা সাধারণত আগুন জ্বালান হয় না, কিন্তু আজকের দিনটা খারাপ বলে সুনীল বেরুবার আগেই আমার জন্ত আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে গিয়েছিল।

বসবার ঘরে বসে বললাম দাঁড়াও, তোমার জন্ত একটু গরম চা নিয়ে আসি।

বলল, কোনও দরকার নাই বিক! যদি পার ত একটা শুকনো তোয়ালে আমাকে দাও।

শোবার ঘরে গিয়ে স্যুটকেসের ভিতর থেকে একটা পরিষ্কার তোয়ালে নিয়ে এসে এমিকে দিলাম। তোয়ালে দিয়ে যতদূর সম্ভব মাথা-মুখ পুঁছে ফেলে হাতের ব্যাগ থেকে ছোট একটি আয়না বার করে কতকটা নিল ঠিক করে। বসবার চেয়ারটি আগুনের কাছে টেনে নিয়ে গেল।

শুধালাম, তুমি ও রকম বাইরে দাঁড়িয়ে ভিজছিলে কেন?

বলল, ঝোঁকের মাথায় ছুটে চলে এসেছি। কিন্তু সদর দরজার কাছে এসে সোজা কড়া নেড়ে ঢুকতে চাইবার ভরসা হল না। তাই প্রথমটা জানালা দিয়ে দেখতে চেয়েছিলাম—তোমরা বাড়ী আছ কি না।

বললাম, বাইরে যে কি রকম বৃষ্টি হচ্ছে, সেটা খেয়াল ছিল না বুঝি?

বলল, হঠাৎ মনে হল তোমরা হয়ত আমাকে ঢুকতেই দেবে না। ভাবতেই মাথাটা যেন কি রকম গেল ঘুরে। তাই মাথাটা একটু কাৎ করে রেখেছিলাম জানালার উপরে।

বললাম, গায়ের কোটটা খুলে ফেল। আমি বরং সুনীলের ড্রেসিং গাউনটা এনে দিই, নৈলে ঠাণ্ডা লেগে যাবে।

বলল, না না দরকার নেই বিক! কিছু হবে না, শুকিয়ে যাচ্ছে।

চুপ করে রইলাম। এমির প্রতি মনোভাবে তখন আমার বিরাগ বিশেষ কিছুই ছিল না, তবে প্রসন্নতা যে ছিল এমন কথাও বলতে পারি না। মনে হল, এমিকে এখন খানিকটা গরম চা খাওয়াতে পারলে ভাল হয়। কিন্তু সুনীল বাড়ীতে নাই এবং চা করার অনেক হাঙ্গামা, সে সব আমার দ্বারা ঠিক হবে কি না সন্দেহ। অন্ততঃ এমির জন্ত সেটুকু হাঙ্গামা পোয়াবার ইচ্ছে আমার হ'ল না। তাই সে কথা আর তুলিনি।

একটু চুপ করে থেকে এমি বলল, তোমার সঙ্গে দেখা করার জন্তই এলাম বিক্!

শুধালাম, কেন?

বলল, তুমি একদিন আমাকে নরহন্ত্রী বলেছিলে। আজ আমি তোমার কাছে স্বীকার করতে এসেছি—আমি তাই।

কেন জানি না, এমির সঙ্গে এ ধরণের নাটকীয় কথা বলতে আমার মোটেই ভাল লাগল না। এবং নীরেনকে নিয়ে এমির সঙ্গে কোনও আলোচনা করারও প্রবৃত্তি হয়নি আমার। তাই চুপ করে রইলাম।

এমিও একটু চুপ করে থেকে মাথাটি নীচু করে আগুনের দিকে চেয়ে বলল, জান বিক্, আমি কুমারী নই—আমি বিবাহিতা।

একটু অবাক হ'লাম। শুধালাম, তুমি বিবাহিতা! কে তোমার স্বামী?

বলল তোমারই মতন একজন ভারতবাসী।

শুধালাম কি রকম? কোথায় সে?

বলল, জানি না। অনেক সন্ধান করেছি কোনও খবর পাইনি, আজ প্রায় ছয় বৎসর।

বললাম, সে কি!

সেই ভাবে আগুনের দিকে চেয়েই বলতে লাগল, আজ তোমার কাছ থেকে চিরবিদায় নিতে এসেছি বিক্! তাই তোমাকে আমার এই নগণ্য জীবনের ছোট্ট কাহিনীটি জানিয়ে যেতে চাই।

চুপ করে রইলাম। বলে যেতে লাগল: আমি তখন নিতান্ত ছেলেমানুষ—এই বছর ১৮ বয়স হবে। আমাদের গ্রামের অবস্থা ত তত ভাল নয়—সবে আমি গ্রাম ছেড়ে লণ্ডনে এসেছিলাম, আমার এক মাসীর বাড়ীতে থেকে চাকুরীর চেষ্টার জন্ত। লণ্ডনেই আলাপ হলো তার সঙ্গে। মাসী দু'-একটি ভাড়াটে অতিথি রাখতেন—সে ছিল তার একজন। একটু মেলামেশার পরেই তাকে যে কি রকম ভালবেসে ফেললাম বিক—তুমি ধারণাও করতে পারবে না। প্রাণ-মন দিয়ে যে এত বেশী ভালবাসা যায়—সে অভিজ্ঞতা যার হয়নি, সে বোঝে না।

শুধালাম, কে সে? কি তার নাম?

চোখ দুটি আগুনের উপর থেকে ফিরিয়ে একবার চাইল আমার দিকে। দেখলাম—চোখ দুটি সজল হয়ে উঠেছে। আবার চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বলল—নাম ছিল 'কুমার'। শুনেছিলাম

ারতবর্ষের পূর্ব্ব অঞ্চল থেকে সে এসেছিল। ক্রমে আমাদের প্রম হল নিবিড় থেকে নিবিড়তম। শেষ পর্য্যন্ত সে ামাকে চেয়ে বসল—আমার সর্ব্বস্ব নিয়ে হতে চেয়েছিল ধন্য।

একটু চুপ করে থেকে আবার বলে যেতে লাগল, কিন্তু আমি ছলাম পল্লীগ্রামের মেয়ে—বিবাহ না হলে সর্ব্বস্ব নিবেদন করা লে না—এই সংস্কার বদ্ধমূল ছিল আমার মনে। তাই, যদিও মস্ত প্রাণ-মন-দেহ দিয়ে আমিও তাকে চেয়েছিলাম তবুও কিছুতেই নজেকে বিলিয়ে দিতে পারিনি। শেষ পর্য্যন্ত লজ্জার মাথা খেয়ে নজেই বলেছিলাম—আমাকে বিবাহ কর না কেন?

একটু চুপ করে থেকে আবার বলে যেতে লাগল, কিন্তু দেখে অবাক হয়েছিলাম—এত ভালবাসে, কিন্তু কিছুতেই যেন বিবাহ রতে রাজী নয়। তখনও বুঝতে পারি নি, এখন বুঝি।

শুধালাম, কি?

বলল, সে নিশ্চয়ই বিবাহিত ছিল কিন্তু সে কথা আমার কাছে রেখেছিল গোপন। আমাকে বিবাহ না করার দিক দিয়ে কত থাই না বলেছিল—সব বাজে কথা, সব মিথ্যে কথা—

হঠাৎ যেন একটু উত্তেজিত হয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গেই নিজেকে সংযত করে নিয়ে বলল, যাই হোক, শেষ পর্য্যন্ত একদিন হঠাৎ বলে বসল—সে আমাকে বিবাহ করবে। আমি যেন হাতে স্বর্গ পেলাম বিক—সমস্ত প্রাণ-মন আনন্দে উঠল নেচে। তারপর অল্প কিছুদিনের মধ্যেই হয়ে গেল বিয়ে—আইন অনুসারে রেজিষ্ট্রি করে।

আবার একটু চুপ করে গেল। ততক্ষণে সত্যিই আমার একটা কৌতূহল হয়েছিল—বাকিটুকু শুনবার জন্য। শুধালাম, তারপর?

বলল, তারপর? তারপর প্রায় বছর খানেক কাটল—আমার জীবনের চরম মুহূর্ত্ত সেই সময়টা আর এ জীবনে কোনও দিনই আসবে না। মনে মনে একটা স্বপ্নরাজ্য তৈরী করে ফেলেছিলাম তাকে নিয়ে। বিবাহিত জীবনের ঘর-সংসারের মাধুর্য্যের কত ছবিই না দিন-রাত এঁকেছি; মনে মনে কল্পনার কত আকাশ-কুসুমই না রচনা করেছি—না আমি বড় বাজে কথা বলছি বিক, ক্ষমা করো।

বললাম, না না। আমার শুনতে ভালই লাগছে। বল।

বলল, ঠিক এই সময় হঠাৎ একদিন সে আমাকে ছেড়ে পালাল। কিছুদিন পাগলের মতন খুঁজেছি—আর খুঁজে পাইনি।

শুধালাম, ভারতবর্ষে তার ঠিকানায় চিঠি লিখেছিলে?

সোজা চাইল আমার মুখের দিকে। এমির চোখে ঠিক এত সহজ চাহনি বোধ হয় কোনও দিনই দেখিনি। চোখ দুটি সত্যই যেন সতের-আঠার বছরের সরলা বালিকার মতন হয়ে উঠল। হায় রে! এ চাহনি এমি আজ হারিয়ে ফেলেছে।

বলল, তার দেশের ঠিকানা ত সে কোনও দিনই আমাকে বলেনি। দেশ থেকে মাঝে মাঝে চিঠি অবশ্য আসত, দেশের ভাষায়—আমি ত তা জানি না। আমার কোনও কৌতূহলও ছিল না ও সব বিষয়ে। তাকে পেয়েছি—তাই নিয়েই ছিলাম আমি ভরপুর।

শুধালাম, কি করত সে এখানে?

বলল, একটা ইঞ্জিনীয়ারিং কারখানায় শিক্ষানবিশী করত। বিয়ের সময় বলেছিল—বছর খানেকের মধ্যে শিক্ষানবিশী শেষ হলে ভাল চাকুরী পাবে। কথা হয়েছিল—তখন দুজনে ছোট একটি পরিচ্ছন্ন ফ্ল্যাট নিয়ে সুন্দর করে সাজাব ঘর সংসার। দিন-রাত সেই কল্পনায় মশগুল হয়ে দিন কাটিয়েছি। ছোটখাট কত জিনিষ, যেটি চোখে ভাল লেগেছে, যেটি প্রয়োজনীয় বলে মনে হয়েছে, আমাদের শোবার ঘরে গুছিয়ে রেখেছিলাম, আমাদের সংসার হলে—

চুপ করে গেল। একদৃষ্টে চেয়ে রইল আগুনের দিকে। শুধালাম, সে কারখানায় খবর নাওনি?

কথা যেন কানেই গেল না। চুপ করে রইল বসে। আবার শুধালাম। বলল, হ্যাঁ, সে সব কত করেছি। তারা বলেছিল—তার শিক্ষানবীশ শেষ হওয়াতে সে চলে গিয়েছে। সেইখানেই খোঁজ করে তার একটা দেশের ঠিকানাও বার করেছিলাম—ঠিক কি না জানি না। অনেক চিঠি লিখেছি, কোনও জবাব পাইনি। হয়ত দেশে ফেরেই নি।

বললাম, সত্যিই বড় দুঃখের কথা।

এইবার আমার দিকে ফিরে চাইল—সোজা। এইবার দেখলাম—চোখ দুটি আবার যেন একটু জ্বলে উঠল। বলল, তার পর শুনবে? তার পর আমি বোধ হয় পাগল হয়ে গিয়েছিলাম। আমি এখনও পাগল—ঠিক সুস্থ স্বাভাবিক নই। নৈলে ইচ্ছে করে জেনে-শুনে নীরেনকে মৃত্যুর মুখে পৌঁছে দিতে পারি?

বললাম, থাক ও সব কথা।

বলল, না না—আমার বলা শেষ হয়নি। আমাকে বলতে দাও, বাধা দিও না। তার পর চারি দিকে আলোয় ঝলমল এই লণ্ডন সহরের বুকের উপর দিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছি নিজের বুকে একটা গভীর অন্ধকার নিয়ে। সব সময় সেই অন্তরের অন্ধকারের ভিতর থেকে উঠত একটা চাপা কান্নার ধ্বনি। ক্রমে সে কান্না গেল থেমে তার পর শুরু হল একটা জ্বালা। পথে-ঘাটে ভারতীয় দেখলে সে জ্বালা যেন দ্বিগুণ জ্বলে উঠত। ইচ্ছে করত—ওদের এক একটাকে ধরে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দি। পাগল না হলে কি এ রকম মনোভাব হয়? বল না বিক।

কি আর বলব—চুপ করেই রইলাম। বলে যেতে লাগল—ক্রমে একটির পর একটি ভারতীয়ের সঙ্গে গায়ে পড়ে নিজেই আলাপ করেছি—জ্বালিয়ে দেব বলে। কিন্তু কিছুদিন মেলামেশার পরে পেছিয়ে যেতাম, জ্বালাতে পারিনি—কেমন যেন একটা মায়া লাগ মনে। বিক! তুমিও তাই বেঁচে গেলে। এমন সময় এলো নীরে আমার জীবনে।

বললাম, নীরেনের কথা থাক এমি!

জোরের সঙ্গে বলল—না কখনো না। শুনতেই হ তোমাকে—এটেই আমার কথা। সেই কথা বলতেই ত এসেছি প্রথম দিন নীরেনকে দেখেই আমি চমকে উঠেছিলাম। মনে আ প্রথম যেদিন আমি এই ঘরে ঢুকি—তুমি আলাপ করিয়ে দি ওদের সঙ্গে আমার? প্রথমে ঘরে ঢুকেই নীরেনের মুখের পাশে দিকটা আমার চোখে পড়ে। চমকে মনে হল—এত একেবা সেই মুখ, সেই মঙ্গোলিয়ান ছাঁচে ঢালা মুখখানি। তার যতই নীরেনকে দেখতে লাগলাম ততই সেই লোকটির কথা ম হয়ে বুকের জ্বালা বেড়েই যেতে লাগল। আশ্চর্য্য! সেও ছিল

রকম ছোটখাট মানুষটি, ঐ রকম ধরণ-ধারণ, ঠিক ঐ রকম হাসি। ক্রমে মনটা নীরেনের প্রতি একটা রাগে ঘৃণায় উঠতে লাগল ভরে—অত মেশামেশি সত্ত্বেও এতটুকুও মমতা এল না প্রাণে। মনে হল—এত দিনে সময় হলো, ওকে জালিয়ে পুড়িয়ে দি, তাহলেই আমার মনের আগুন যাবে নিবে। পাব মুক্তি।

চুপ করে গেল। খানিকক্ষণ দুজনেই চুপ করে বসে আছি—বাইরে তখনও বৃষ্টি হচ্ছে, তবে বৃষ্টির বেগটা অনেকটা কম। মাঝে মাঝে বজ্রনিনাদের শব্দও এলো কানে। ভাবলাম—এইবার আমার একটা কথা বলা দরকার। কিন্তু কি বলব কিছুই ভেবে পেলাম না। হঠাৎ এমিই আবার কথা বলল। এবার গলাটা যেন বড্ড ভারি বলে মনে হল।

বলল, তারপরও তুমি সবই জান বিক! কিন্তু—একটু চুপ করে থেকে বলে যেতে লাগল, কিন্তু কৈ আজও আমার আগুনও নিবল না ত। আরও যেন বেশী জলছে। আমি এখন কি করি—কথা গলার মধ্যে জড়িয়ে গেল ভেঙ্গে। মুখখানি এলিয়ে পড়ল বুকের উপরে।

বললাম, এমি, শান্ত হও। সময়ে সব ঠিক হয়ে যাবে।

একটু পরে নিজেকে সামলে নিয়ে সোজা হয়ে উঠে বসল। চাইল আমার দিকে। বলল, আমি তোমাদের দেশের কি ক্ষতি করেছিলাম বল, যে একজনার পর একজন এসে আমাকে এই রকম জ্বালিয়ে পাগল করে দিয়ে গেল? সে আগুন ধরিয়ে দিয়ে পালাল—নীরেনকে পেয়ে সে আগুন নেবাতে গিয়ে আরও যেন জলে যাচ্ছি। নীরেনের ত স্ত্রী আছে—তার মৃত্যুর প্রায়শ্চিত্ত আমাকেই বা করতে হবে কেন? কেন, সে তার প্রাণ ঢেলে সর্ব্বস্ব দিয়ে আমার উপর অমন করে নির্ভর করেছিল?

বললাম, প্রায়শ্চিত্তের কথা কেন ভাবছ এমি? তার যে অসুখ হয়েছিল—মৃত্যু ছিল অনিবার্য্য।

বলল, জান বিক! বলেছি ত সে বেঁচে থাকতে তার ওপর এতটুকুও মমতা বোধ হয়নি কোনও দিন—খালি ঘৃণা, খালি রাগ। কিন্তু আজ সে আর নেই, অথচ আজ তার সেই রুগ্ন ম্লান হাসিমাখা মুখখানা মনে করে তারই জন্য—এ আমার কি হল বিক—হঠাৎ অঝোর কান্নায় নিজেরই কোলের উপর পড়ল ভেঙ্গে।

আমি এখন কি করি—ভেবে পেলাম না। এ দৃশ্যের অবসান হলে যেন আমি বাঁচি। সুনীলটাই বা ফিরে আসছে না কেন? চুপ করে বসে আছি—হঠাৎ মাথায় একটা বুদ্ধি এলো। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, এমি, তোমার এখন গরম কিছু খাওয়া দরকার। তুমি একটু বসো—আমি তোমার জন্য চা তৈরী করে নিয়ে আসি। বলে দ্বিতীয় কথার অপেক্ষা না করে চললাম ঘর ছেড়ে। এমি তখনও মাথা নীচু করে কাঁদছে—কিছু বলেনি।

প্রায় মিনিট কুড়ি-পঁচিশ লাগল—জল গরম করে চা' তৈরী করতে ইচ্ছে করেই বোধ হয় সময় একটু বেশীই নিলাম। ভেবেছিলাম—হয়ত এমি ইতিমধ্যে খানিকটা শান্ত হয়ে যাবে, সুনীলও হয়ত আসবে ফিরে।

চা নিয়ে যখন এসে ঘরে ঢুকলাম—দেখি এমি ঘরে নেই। একটু লক্ষ্য করেই বুঝলাম—এমি বাড়ী ছেড়ে চলে গিয়েছে।

বাইরের দিকে চেয়ে দেখলাম—আবার জোর বৃষ্টি হচ্ছে! ভাবলাম—এমি সত্যিই পাগল না কি?

[ক্রমশঃ।

বেলুন-ক্যামেরায় সূর্য্য

সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা সূর্য্যের এমন কতকগুলো আলোকচিত্র গ্রহণ করেছেন—যার সাহায্যে সূর্য্য সম্পর্কে বহু নূতন তথ্য জানতে পারা গেছে। এই কাজটি সম্ভবপর হয়েছে, বেলুনের সহিত সংলগ্ন একটি যন্ত্রযুক্ত টেলিস্কোপিক ক্যামেরায়। এই বেলুনটিকে ৮১ হাজার ফুট উচ্চে তুলে দেওয়া হয় এবং সেখানে থাকা অবস্থায় সংলগ্ন ক্যামেরাটিতে এসে সূর্য্যের প্রতিচ্ছবি আপনি ধরা পড়ে।

বেলুনের সাহায্য পেয়ে ক্যামেরা-যন্ত্রটি দুই ঘণ্টারও অধিক কাল উপরে ছিল। এই সময় মধ্যে ইহার মারফত ৮ হাজার আলোকচিত্র তোলা হয়। ইহার পূর্ব্বে এই ধরণের ছবি তোলা হয় ২৫ হাজার ফুট উপর থেকে।

আলোচ্য বেলুন-ক্যামেরায় যে সকল আলোকচিত্র তোলা হয়েছে, তাতে দেখা যায় যে, সূর্য্যের উপরিভাগটি অসংখ্য গ্যাসীয় পিণ্ডের একটি পুঞ্জ। এই পিণ্ডগুলোর এক-একটি দুই শত মাইল থেকে পাঁচ শত মাইল ব্যাসবিশিষ্ট। আসলে উহারা হচ্ছে জলন্ত হাইড্রোজেনের পিণ্ড। সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র পিণ্ডগুলো সবচেয়ে বেশী উত্তপ্ত—এই তাপ আনুমানিক ১২ হাজার ডিগ্রী ফারেনহিট। আকারে বৃহৎ পিণ্ডগুলো অপেক্ষাকৃত শীতল—উহাদেরও তাপমাত্রা ৯ হাজার ডিগ্রীর (ফারেনহিট) কম নহে।

এক মুঠো আকাশ

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

ধনঞ্জয় বৈরাগী

গৌরী যেদিন চিনুকে বলেছিল, কেষ্ট ফিরলে জানিয়ে দিতে সে ছবিতে কাজ করছে, সেই দিন থেকেই আর বেহালায় ফেরেনি। বিনোদের পার্কসার্কাসের বাড়ীতেই থেকে গেছে। এখানে ঠাকুর, চাকর, দারোয়ান কিছুরই অভাব নেই। নিজের হাতে কাঠি ভাঙ্গ কুটো করতে হয় না। গল্পের বই পড়া, রেডিও শোনা আর বিনোদের সঙ্গে বেড়াতে যাওয়া। এই নতুন জীবন তার বেশ ভাল লাগে। এর মধ্যে যথেষ্ট মাধুর্য্য আছে।

কত রকম বিনোদ জানে, কি ভাবে মেয়েদের সুন্দর দেখায়। নাহেবী দোকানে নিয়ে গিয়ে চুল কাঁপিয়ে ফুলিয়ে কি সুন্দর করে সাজিয়ে এনেছে। মোটা ভুরুকে সরু করিয়েছে, মুখে কত রকম রং মাখিয়েছে। আয়নায় নিজের চেহারা দেখে গৌরীর আশ্চর্য্য লাগে। সে যে, এত সুন্দরী, কোন দিন তা ভাবেনি।

বিনোদ বলে, হলদে শাড়ী আর কালো ব্লাউজ, এতে তোমায় সবচেয়ে বেশী মানায়।

মার্কেট থেকে পাড়-না-ওয়ালা কত রকম হলদে রং-এর শাড়ী এনে দিয়েছে। গৌরী পরতে গিয়ে বলে, দেখো লোকে না ভাবে হাবা হয়েছে। বিনোদ হো-হো করে হাসে।

গৌরী পার্কসার্কাসে আসা অবধি রোজই ভয় পেয়েছে কেষ্ট হয়তো যে কোন দিন এসে পড়বে কিন্তু সে আশঙ্কা যখন কেটে গেল, কেষ্ট এল না, গৌরী মনে মনে মুষড়ে পড়ে। সে ভেবেছিল কেষ্ট নিজে না এলেও চিনুকে অন্ততঃ পাঠাবে। কিন্তু চিনুও না আসাতে তার বিস্ময়ের সীমা থাকে না। তবে কি বিনোদের কথাই ঠিক যে গৌরী চলে যাওয়ায় কেষ্ট খুসীই হয়েছে? প্রথম প্রথম ভেবেছিল কেষ্ট বোধ হয় ফেরেনি কিন্তু দিন দুই আগে গাড়ী করে ষ্টুডিওতে যেতে কেষ্টকে ভিড়ের মধ্যে দেখতে পেয়ে সে ধারণাও বদলাতে বাধ্য হয়েছে।

এরই মধ্যে বেলারাণীর বাড়ীতে একদিন নেমন্তন্ন ছিলো। গৌরী আর বিনোদের। বিনোদ আগেই বেলারাণীর বাড়ী গিয়েছিল। গৌরী দোকান থেকে চুল ঠিক করে সেখানে এলো প্রায় ঘণ্টাখানেক বাদে। বেলারাণী বাইরের ঘরে বসেছিল। বলে, এসো গৌরী, এখানে বস।

—বিনোদ কোথায়?

—ওপরে আছে।

গৌরী বেলারাণীর পাশে বসে। বেলারাণী তারিফ করে বলে, খুব সুন্দর দেখাচ্ছে। ক'দিনে চেহারা ফিরিয়ে দিয়েছে বিনোদ।

গৌরী মুখ টিপে হাসে।

বেলারাণী ফুলদানীতে ফুল সাজাতে সাজাতে বলে, আমি তোমার চেয়ে অনেক বড়। আমি আর বিনোদ একবয়সী। আমাকে বেলাদি' বলেই ডেক। সারা দিন কি করো, যেদিন ষ্টুডিও থাকে না?

—কি আর করি। রেডিও শুনি কি গল্প করি।

—একটু পড়াশুনো ক'রো। অন্তত ইংরিজিটা। এ লাইনে খুব দরকার। চটপট কথা বলা চাই। বিনোদকে ব'লো একটা মাষ্টার রাখতে।

—গৌরী মাথা নিচু করে বলে, বলে দেখবো।

—ওকে বললেই রাখবে। আমার বেলা তো রেখেছিল।

—আপনি কি বলছেন বেলাদি'! আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

এবার বেলারাণীর বিস্ময়ের পালা, বলে, তুমি কি জান না আগে আমি বিনোদের সঙ্গে থাকতাম?

—আপনি?

—সে কি, বিনোদ তোমায় বলেনি বুঝি? ঠিক তুমি যেমন আজ আছ, আমিও একদিন ওর সঙ্গে ছিলাম, ঐ পার্কসার্কাসের বাড়ীতে। লোকটা ভাল। ওর টাকা আছে, হৃদয় আছে। নেই শুধু বুদ্ধি। ঐটে তোমার থাকা চাই। নিজের উপর দাঁড়াতে গেলে যা যা দরকার, সব এই বেলা করে নাও। পরে সুবিধে হবে।

—আপনি কত দিন ওখান থেকে চলে এসেছেন?

—বছর কয়েক। প্রথম প্রথম ও চেঁচামেচি করেছিল। তারপর যখন দেখলো আমি ছবিতে নাম করে ফেলেছি, তখন ও আর কিছু বলে না। এখানে আসে, যায়, দেখা করে।

—ও এখন কোথায় থাকে রাত্রে?

—বেশীর ভাগ নিজেদের বাড়ী। মাঝে মাঝে পার্কসার্কাসে।

—ও বিশেষ তোমায় জ্বালাতন করবে না। কারুর সঙ্গে মিশলেও বারণ করে না।

গৌরী বেলারাণীর সঙ্গে আর এ প্রসঙ্গ আলোচনা করতে চাইছিল না। জিজ্ঞেস করে।—বিনোদ এখন কি করছে ওপরে বেলাদি'।

—চলো, দেখিগে। ওপরে উঠতে উঠতে বেলারাণী একটা চোখ ছোট করে খাট গলায় জিজ্ঞেস করে, তোমার পিরীতের লোকটি কে?

গৌরী বুঝতে পারে না। মুখ তুলে তাকায়।

বেলারাণী হাসে, নেকা সেজ না। এ লাইনে আমি পেট থেকে পড়েই আছি। বিনোদকে নিয়ে তো আর পেট ভরবে না? আমার পিরীতের লোক আসতো রোজ রাত্রে। তাই বিনোদকে রোজ সকাল সকাল বাড়ীতে পাঠিয়ে দিতাম।

—যদি জানতে পারতো?

বেলারাণী গৌরীর হাতে চিমটি কাটে। পাগলী কোথাকার! বিনোদ যখন বাড়ী যেত ওর কোন হুঁস থাকতো নাকি! তাছাড়া

দরোয়ান চাকররা বকশিস পেত বলে, সময় বুঝে তাকে আমার ঘরে নিয়ে আসতো।

গৌরীর কৌতূহল হয়। তিনি কে?

—কেউ না। রাস্তার একটা লোক। আগে থিয়েটারের সিফটার ছিল। পরে আমি তাকে টাকা দিতাম। লোকটা ছিল সত্যিকারের পুরুষ মানুষ। কি সুন্দর স্বাস্থ্য!

—এখনও আসেন?

—না, মারা গেছেন। বলতে গিয়ে বেলারাণীর চোখে জল এসে পড়ে, তার মুখের আদলটা ছিল অনেকটা প্রভাত বাবুর মত।

দুজনে উপরে উঠে এসে দেখে, বিনোদ তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসে আছে। একেবারে মাতাল। গৌরী বিনোদকে আগে কখনও এত বেশী মত্ত অবস্থায় দেখেনি। জিজ্ঞেস করে, ও কি? এ রকম করে বসে আছ কেন?

বিনোদ জড়ান-গলায় বলে, আমি তো বেশী পান করিনি। মাথা আমার ঠিক আছে। দেখবে, আমি হেঁটে দেখিয়ে দেব। বলে বিনোদ উঠবার চেষ্টা করে। না পেরে আবার ফরাসে বসে পড়ে।

বেলারাণী গৌরীর খোঁপাটা নেড়ে দিয়ে বলে, যত চায় খেতে দিও। খবরদার নেশা ছাড়িও না। তাহ'লে তোমারও দিন ফুরবে।

বেলারাণী যে সব কথাই সত্যি বলেছে, তা বিনোদকে জিজ্ঞেস না করেও চাকরে বউ-এর কাছ থেকেও গৌরী সহজে জানতে পারে। সে বলে, আমার দেখতা আপনার আগে তিন জন। তবে বেলা দিদির মত কেউ নয়। কি টাকাই আমাদের দিয়েছে। এখনো বাড়ী গেলে ছবি দেখার পাশ দেয়। বিনোদের সম্বন্ধে বলে, এ বাবুর নতুন কিছুই নয়। ওঁর বাবা তাঁর বাবা তিন পুরুষে পয়সা হ'য়ে অবধি এই করছে। পাখী পোষে, পাখী উড়ে যায়, আবার পোষে।

কলকাতার প্রাণকেন্দ্র ক্লাইভ ষ্ট্রীট। এখন যার নাম হ'য়েছে—নেতাজী সুভাষ রোড। যেখানে সকাল ন'টা থেকে সন্ধ্যে ন'টা পর্য্যন্ত ভীড়ের অন্ত নেই। সেখানেই কালীর দলের বেশীর ভাগ লোকের দিন কাটে। কেউ বিক্রি করে চোরাই মাল। কেউ ডিসপোজালের জিনিষ। কেউ নতুন রকম খেলনা। যা প্রথম চোটে টাকায় একটা করে বিক্রি হয়ে পরে নেমে আসে জোড়া দু' আনায়, দু রাস্তার মোড়ের কাছে ব্যাঙ্কের বিরাট বাড়ীর তলায় পানওয়ালী ছাতা মাথায় করে পান বিক্রি করে। এলোচুলে গেঁট বাঁধা। কপালে সিঁদুরের টিপ। দু'-একটা ছোট পেঁটরা। তার পান সাজার সরঞ্জাম। এর সঙ্গে ভাব গাড়ীর ড্রাইভারদের। সারাদিন গাড়ী পার্ক করে রেখে তারাই বা কি করে! মাঝে মাঝে পানওয়ালীর সামনে উবু হয়ে বসে পান কিনে খায়। ঠাট্টা-তামাসা করে।

শ্যামল এসে পান সাজতে বলে। দু'পয়সার ভাল পান দাও।

পানওয়ালী পান সাজতে সাজতে মৃদু স্বরে জানায়, কাল এসেছিল। তোমার বাবার ঘণ্টাখানেক বাদে।

—শালা হয়রাণ করে মারছে।

—সাড়ে সাতশো টাকা চায়। বলছে তার কমে হবে না।

—সব ঠিক করে রাখবে। কোন গোলমাল হবে না। আমি আজ তোমার বাসায় দুশো টাকা নিয়ে যাব।

—পানওয়ালী চোখ না তুলেই বলে, ও পুরো টাকা আগে চায়।

শ্যামল গম্ভীর হয়ে যায়।—তাহলে অন্যদের জিজ্ঞেস করতে হবে।

—জিজ্ঞেস করে যদি মত হয়, তাহলে টাকা নিয়ে এস। আমি তো থাকবো।

শ্যামল পানওয়ালীর কাছ থেকে সোজা যায় রয়াল এক্সচেঞ্জের মোড়ে। জলিল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ষ্টীলের মাপবার গজ বিক্রি করছে। আড়াই টাকার মাল দেড় টাকায়।

শ্যামল সামনের দোকানে গিয়ে একটা সিগারেট ধরায়, সাড়ে সাতশো চাইছে।

জলিল চোখটা ছোট করে বলে, ঠিক আছে। আমি রাতের মধ্যে টাকা জোগাড় করে রাখবো।

জলিল অভ্যাস মত হাঁটতে সুরু করে, আড়াই টাকার মাল দেড় টাকায়। দু'-একজন এসে দেখে, তবে দাম না বলেই চলে যায়। সেদিকে জলিলের বড় খেয়াল নেই। বলে, দেবেন শালার মতলবটা কি, ঠিক বুঝতে পারছি না।

—কেন?

—কৈ এখনও তো এল না!

—আসবার কথা ছিল?

—তা না হলে আর দাঁড়িয়ে আছি কেন? সেই মেয়েটাকে নিয়ে আসবার কথা। রাজীব গাড়ী চালিয়ে নিয়ে আসবে।

—কোথায় যাবে? বউবাজারের গয়নার দোকানে?

—হ্যাঁ, মেয়েটা ওস্তাদ। ঠিক গুছিয়ে কাজ করবে। কিন্তু দেবেন শালাকে নিয়ে মুস্কিল! জেল খেটে খেটে মাথাটা মোটা হয়ে গেছে। কালী ভুল লোক ধরেছে। ওকে কি আর খাড়া করা যায়?

শ্যামল একথার কোনও উত্তর দেয় না। বলে ঠিক আছে আমি এখন বাড়ী চললাম। সন্ধ্যেবেলায় মঙ্গলার কাছে একসঙ্গে যাওয়া যাবে।

মঙ্গলা যে বাড়ীতে থাকে তা পুরনো হলেও পাকা দেওয়াল। মাথায় টালি-দেওয়া আড়াইখানা ঘর। তারই মধ্যে বেশ সাজিয়ে গুজিয়ে রাখে। বাড়ীতে তার চেহারা অন্য রকম। ভাল করে খোঁপা বেঁধে রঙীন শাড়ী পরে চোখের কোণে কাজল টানে। উত্তর-ক'লকাতার যে অঞ্চলে তার বাসা, সেখানে বেশীর ভাগ জানা-শোনা লোকেরই আনাগোণা, উটকো লোকের উপদ্রব বেশী নেই।

শ্যামল ও জলিল এল সন্ধ্যার ঝোঁকে। মঙ্গলা দরজা খুলে বসতে দেয়। জলিল সরাসরি কাজের কথা পাড়ে।

—অনেক টাকা দিলাম। দুটো চাবিই চাই। গাড়ীর আর গ্যারেজের।

—দেবে বলেছে।

—কবে?

—কাল এই সময় এস। রাতে গাড়ী সরিয়ে ফেল। কিন্তু আমার টাকা।

—কত চাও?

—আমি গরীব মানুষ। আড়াই শো।

—পাগল না কি? হাজার টাকা তো এইখানেই বেরিয়ে যাবে।

—আর তো কোন খরচ নেই। তোমরা যে কত হাজার টাকা পাবে!

—ধরা পড়লে যে কত বছর, সে হুঁস আছে? যাক গে, সব ঠিক মত হ'লে একশো দেড় শো টাকা পাইয়ে দেব।

—কাজের কথা এইখানেই শেষ হল। শুরু হল আমেজের কথা। মঙ্গলা দেবী পানীয় তিনটি গ্লাসে পরিবেশন করে। জলিল তারিফ করে বলে, বহুত আচ্ছা।

শ্যামল জলিলদের সঙ্গে থাকার পর থেকে মাঝে মাঝে নেশা করে। মাতাল সে হ'তে চায় না। কিন্তু রঙ্গীন ঘোরটা বেশ উপভোগ করে। একদিন হয়তো কেষ্টর কাছে লাঞ্ছিত হ'য়ে বিতৃষ্ণায় সে পান করতে সুরু করেছিল। কিন্তু এখন নিছক আনন্দের জন্যে পান করতে কুণ্ঠিত হয় না।

আজও মঙ্গলার অনুরোধে শ্যামল পান করলো। এত কড়া জিনিষ আগে সে খায়নি। তাই একটুতে নেশা ধরে যায়। বুঁদ হ'য়ে বসে বসে কত রকম ভাবে। মঙ্গলার দিকে বেশীক্ষণ তাকিয়ে থেকে তার মনে হয়, বেলারাণী বসে আছে। উঃ, কি পালিসকরা চকচকে চেহারা, কালো সিল্কের মত চুল। সঙ্গে সঙ্গে গৌরী চিনু অনেকের কথা তার মনে পড়ে। আশুদা', প্রভাত, মামার বাড়ী। শ্যামলের চোখে জল আসে। কেষ্টর কথা মনে হ'তেই তার চোখ জলে ওঠে। বিড়-বিড় করে বলে, তুমি খুব অন্যায় করেছ, খুব অন্যায়।

এ ভাবে কতক্ষণ কেটেছে শ্যামলের খেয়াল ছিল না। কার গরম নিঃশ্বাসে তার চেতনা ফিরে এল। অন্ধকার ঘরের মধ্যে মঙ্গলা তাকে নিবিড় আলিঙ্গনে বদ্ধ করেছে। শ্যামলের জীবনে এক নতুন অভিজ্ঞতা। সে উন্মুখ হ'য়ে ওঠে। মৃদু স্বরে জিজ্ঞেস করে, জলিল!

মঙ্গলা উত্তর দেয়, পাশের ঘরে শুয়ে আছে।

শ্যামল আর কথা বলে না। মঙ্গলার কাছে সম্পূর্ণরূপে ধরা দেয়। মঙ্গলা তার কানে কানে বলে, তুমি আমার কাছে এস, প্রায়ই এস, রোজ এস। তোমায় টাকা দিতে হবে না, কিছু দিতে হবে না, তুমি শুধু এস। যৌবনের প্রথম ধাপে পা দেওয়া শ্যামল কিছুতেই এ আমন্ত্রণকে অস্বীকার করতে পারে না।

চিনুর অক্লান্ত সেবায় কেষ্টর শরীর সুস্থ হয়ে উঠলেও ভাঙ্গা মন তার জোড়া লাগলো না। বেশীর ভাগ সময় গুম হ'য়ে বসে থাকে, আবল-তাবল ভাবে। চিনুকে সব সময় বলে, তুমি কেন এত খেটে মরছ চিনু, আমি তো ভাল আছি। চিনু হেসে উত্তর দেয়, কোথায় ভাল! আগের মত তো হননি।

—সে কি আর হবে?

—যত দিন না হবে, আমাকেও খাটতে হবে।

—পিনাকী কি ভাবছে বল তো?

—কি আবার!

—সারাদিনই তো তুমি আমার সেবা করছো।

চিনু হাসে, সেবা করাতে কোন দোষ নেই।

কেষ্ট আর কথা বলে না।

কেষ্ট নিজের বাড়ীতে ফিরে দিন দুই বেহালায় গেল না। বেশীর ভাগ সময় বাড়ীতে বসে থাকতো, তবে এরই মধ্যে একদিন আশুদা' খবর নিতে এসেছিলেন। কেষ্টর ক্লিষ্ট শীর্ণ মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ব্যাপার কি, কিশোরপুর থেকে ফিরে তো আর দেখা করলে না?

—জ্বর হ'য়েছিল।

—তাই নাকি? আমাকে জানাও নি কেন?

কেষ্ট ম্লান হেসে বলে, মিছিমিছি ব্যস্ত করিনি।

আশুদা' পাড়ার খবর দিয়ে গেলেন। পুজোর খরচপত্র সব মিটে গেছে। কোনও রকম গোলমাল হয়নি। এবারে যে পাড়ার পুজো সবচেয়ে সমারোহ করে হ'য়েছে সে বিষয়ে কারুর সন্দেহ নেই। প্রভাতরা সামনের সপ্তাহে ফিরছে। চিঠিতে জানিয়েছে, ওর ভাবী শ্বশুর অনেক ভাল। আর সব চিঠিতেই তো তোমার খবর করে।

—আমারও দরকার ওকে। এলেই আমায় জানাবেন।

প্রভাতের প্রসঙ্গে কেষ্টর মুখ গম্ভীর হয়ে যায়। আশুদা' বিস্মিত হন, কি হ'য়েছে বলতো? আজ-কাল তোমাদের দুজনের মধ্যে সদ্ভাব নেই না কি? দুজনেই দেখি দুজনের নাম শুনলে কেমন হয়ে যাও।

কেষ্ট সোজা উত্তর দেয়, প্রভাত আমাকে না জিজ্ঞেস করে একটা কাজ করেছে, আমি তার কৈফিয়ত চাই।

আশুদা' আর ও বিষয়ে বেশী কথা না বলে, দু'চারটে কথাবার্তার পর উঠে পড়েন।

প্রভাতের কথা মনে পড়লেই কেষ্টর কেমন যেন ঈর্ষা হয়। বেশ গুছিয়ে নিয়েছেন। ভাল চাকরী, শ্বশুরের বাড়ী-গাড়ী সবই তো ও পাবে। তার উপর অরুণা খাসা মেয়েটি।

শ্যামলটা হতভাগা। সেই যে চলে গেল আর একবার দেখা করে গেল না। কেষ্ট দু'-চারজনকে জিজ্ঞেস করে দেখেছে, কেউ জানে না শ্যামল এখন কোথায়। এক একবার ভাবে, খবর নিলেও হয় মদনের কাছে। সে হয় তো বলতে পারবে।

সেদিন সকালবেলা বাড়ী থেকে বেরিয়ে কেষ্ট ঘুরতে ঘুরতে মদনদের পাড়ায় আসে। বাড়ী না চিনলেও খুঁজতে হয় না। মোড়ের মাথায় আড্ডা-সংঘের জোর আসর বসেছিল, সেখানে খোঁজ করতেই তারা মদনের বাড়ী দেখিয়ে দিলে।

মদন নেড়ামাথায় নেমে এল। আর যাকেই হোক কেষ্টদা'কে সে মোটেই আশা করেনি। বৈঠকখানার দরজা খুলে বসতে দিয়ে জিজ্ঞেস করে, কি খবর কেষ্টদা'!

কেষ্ট গম্ভীর স্বরে প্রশ্ন করে, বাবা কবে গেলেন?

—এই ত মাসখানেক হবে।

—তোমার ওপর তো দাদা আছেন?

—হাঁ, এখন দুজনেই কাজ দেখছি। তিন পুরুষের গয়নার দোকান, সারাদিন ওখানেই বসি।

কেষ্ট তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে, মদন কত গম্ভীর হয়ে গেছে। সংসারের কতখানি চাপ সে সহসা উপলব্ধি করেছে। শ্যামলের বন্ধু মদন স্কুলপালানো বেহিসেবী ছেলে আর নেই। বাড়ীর ঐতিহ্য বজায় রেখে পুরো মাত্রায় হিসেবী হয়ে উঠেছে। কেষ্ট জিজ্ঞেস করে, শ্যামলের সংগে তোমার দেখা হয়?

—না তো, কেন?

—ওর কোন খবর পাচ্ছি না।
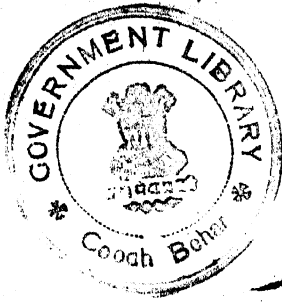
প্রত্যাবর্ত্তন

স্বচ্ছল একান্নবর্ত্তী পরিরার। বড়ভাই সংসারের কর্ত্তা। কিন্তু বিপত্তি সুরু হোল বড় লোকের মেয়ে সিপ্রা এ বাড়ীর ছোট ছেলে নিশিথের বৌ হয়ে আসার পর থেকেই। প্রেত্যেকদিন অশান্তি লেগেই আছে। একদিন চাকরের হাত থেকে ময়লা বলে চায়ের পেয়ালা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল সিপ্রা। আরেকদিন বড় বৌদি রান্না করতে করতে সিপ্রাকে কি একটা ফরমাস করেছিল। সিপ্রা যাচ্ছেতাই ভাবে অপমান করেছিলেন ওঁকে। "আমি কি আপনাদের বাড়ীর ঝি হয়ে এসেছি?" নিশিথের কানে সব কথাই পৌঁছত—কিন্তু অন্যভাবে। সিপ্রা আস্তে আস্তে নিশিথের মনটা দাদাবৌদির বিরুদ্ধে বিষিয়ে তুলল। ওকে বোঝাল ওদের ঠকিয়ে দাদাবৌদিরা নিজেরা সব গুছিয়ে নিচ্ছেন। নিশিথ প্রথম প্রথম বিশ্বাস করতনা। "যাঃ তা কি করে হবে? বড়বৌদি আমায় কোলে পিঠে করে নিজের ছেলের মত মানুষ করেছেন।" কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ওর মনেও সন্দেহের বিষ ঢুকলো। এক-

দিন সত্যাই দাদার সঙ্গে ঝগড়া করে বিষয় সম্পত্তি ভাগবাঁটোয়ারা করে আলাদা হয়ে গেল নিশিথ। সিপ্রার প্ররোচনায় নিশিথরা এসে উঠল সাহেবী পাড়ার এক বিরাট ফ্ল্যাটে। তারপর সুরু হোল এক অদ্ভুত জীবনযাত্রা। নিশিথ বলল "সিপ্রা এভাবে চললে দেউলিয়া হয়ে যাব।" সিপ্রা বলল "সে দায় তোমার। বিয়ে করার সময় মনে ছিলনা?" সিপ্রার জীবনযাত্রা অব্যাহত রইল। এরমধ্যেই ঘটল আর এক বিপর্যয়। নিশিথের কোম্পানী গেল লিকুইডেশনে। ফলে ওর কাজটা গেল। নিশিথ জানালনা সিপ্রাকে। দুহাতে বেপরোয়া টাকা ধার করতে লাগল। কিছুতেই হার মানবেনা ও। একদিন খুব জ্বর নিয়ে ফিরে এলো নিশিথ। সে জ্বর বেড়েই চলল। জ্বরের ঘোরে অচৈতন্য হয়ে রইল নিশিথ। সিপ্রা পড়ল অকূল সমুদ্রে। কি ভাবে চলবে এখন? দাদাবৌদির কথা ভাবতেই ও শিউরে উঠল। ওঁরা নিশ্চয়ই অপমান করে তাড়িয়ে দেবেন। কিন্তু ভেবে কোথাও কোন কূলকিনারা না পেয়ে ও দাদাকেই একটা চিঠি লিখল কিছু টাকা ধার চেয়ে আর সব কথা জানিয়ে। ৭ দিন অপেক্ষা করেও কোন উত্তর পেলনা। ও জানতো পাবেনা। মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল সিপ্রা। এতদিনকার কৃতকর্মের জন্যে আজ ওর অনুশোচনার শেষ নেই। হঠাৎ দরজার কড়া ঠকঠক করে উঠল। সিপ্রা কোন পাওনাদার ভেবেই দরজা খুলতে গিয়েছিল। কিন্তু দেখল দরজার সামনে দাদা আর বৌদি। দাদা শুধু জিজ্ঞেস করলেন "নিশি কোথায়?" তারপর জড়িয়ে ধরলেন অরুতপ্ত নিশিথকে। "দাদা! আঃ!" নিশিথ নিশ্চিন্ত আরামে চোখ বুঁজল। বৌদি বুকে তুলে নিলেন সিপ্রাকে —"আমার পাগলি মেয়ে!" সিপ্রার দুচোখ দিয়ে অঝোর ধারে জল গড়িয়ে পড়ছে।
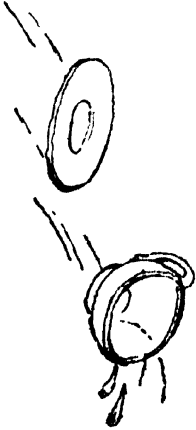
প্রায় ছমাস পর। নিশিথ মোড়ায় বসে আছে। সিপ্রা রান্না ঘরে। সিপ্রা বড় বৌদিকে বলল "আজ আমি চচ্চড়ি রান্না শিখব দিদি"— "আচ্ছা, একটু 'ডালডা' নিয়ে আয়তো ভাঁড়ার থেকে।" "ডালডা' তো নেই দিদি—বয়াম একেবারে খালি। একপোটাক আনিয়ে নেব?" "দূর পাগলি, 'ডালডা' বয়ামে কেন থাকবে, 'ডালডা' আছে 'ডালডার' টিনে আর 'ডালডা' তো একটু আনানো যায়না, পুরো টিনই আনতে হয়।" "কেন 'ডালডা' বুঝি খোলা পাওয়া যায়না?" "না, কখনও না। 'ডালডা' পাওয়া যায় একমাত্র শীলকরা টিনে। তাই তো 'ডালডা' সবসময় এত তাজা আর ভাল।" "কেন কাকীমা তো খোলা 'ডালডা' আনাতো।" "সেটা 'ডালডা' নয়রে পাগলি! 'ডালডা' খুব জনপ্রিয় বলে অনেক আজে বাজে জিনিষ ডালডার নামে কাটছে। 'ডালডা' পাওয়া যায় একমাত্র হলদে খেজুর গাছ মার্কা টিনে।" "তুমি 'ডালডা' কেন ব্যবহার কর দিদি? 'ডালডা' নাকি শরীরের পক্ষে ভাল নয়?" "কে বলেছে? 'ডালডায়' ভাল ঘিয়ের সমান ভিটামিন 'এ' যোগ করা হয়। ভিটামিন 'ডি' ও যোগ করা হয় এতে। তাই ডালডা স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত ভাল। এতে খরচও কত কম!"

নিশিথ প্রসন্ন মুখে ওদের কথা শুনে চলে। সিপ্রাকে ভুল বোঝার পালা এবার ওর শেষ হোল।

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড, বোম্বাই

DL. 3959-X16 BG

—সে কি, শ্যামল তো আপনার কাছেই ছিল।

—ছিল, তবে এখন নেই। কেষ্ট সংক্ষেপে বিজয়া দশমীর পরের দিনের কথা ব্যক্ত করে। মদন চিন্তিত হয়, তাইতো বসুন, আমি চুণীলালকে ডেকে আনি।

মদন অল্পক্ষণ পরেই চুণীলালকে ডেকে নিয়ে এল। চুণীলাল আক্ষেপ করে বলে, হতভাগাটা একেবারে গোল্লায় গেছে—

—আমি তো ভেবেছিলাম শ্যামল ফিরে আসবে।

—কালীর আড্ডায় গিয়ে পড়লে তাকে উদ্ধার করা শক্ত। দেবেনদা'ই পারলো না—

—দেবেনদা'র সঙ্গে দেখা—

—ক'দিন আগে হয়েছিল একটা গয়নার দোকানের সামনে। গাড়ীতে বসেছিলেন। আমি অবাক হয়ে গেলাম, যে লোকটা চিরকাল কাটা খদ্দরের পাঞ্জাবী পরে কাটিয়েছে তার পরনে ধোপদুরস্ত সৌখীন ধুতি-পাঞ্জাবী, মানুষ কত বদলে যায়! মদন চট করে জিজ্ঞেস করে, তোর সঙ্গে কথা হল?

—খুব অল্প। দোকান থেকে একটি মেয়ে এসে ওর গাড়ীতে উঠল, আমিও সরে পড়লাম। তাই'তো বলছি কালীর খপ্পরে পড়ে দেবেনদা' যদি পাল্টে যেতে পারেন, শ্যামল তো কিছুই নয়।

কেষ্ট চলে গেলে মদন আর চুণীলাল নন্দিতাদের বাড়ীর দিকে তাকিয়ে থাকে। ঘরামীরা ম্যেরাপ বাঁধছে, অঘ্রাণের দু'তারিখে নন্দিতার বিয়ে। পাকা দেখা হয়ে গেছে। মদন নিজের মনেই বলল, মধুদা'র মাথাটা খারাপ হয়ে যাবে।

—ভদ্রলোক বড় সেণ্টিমেণ্টাল।

—তা আর বলতে! এক দিনে কি চেহারাই হয়েছে। বললাম দিনকতক এখন ছুটি নিয়ে ঘুরে আসুন, তা কিছুতেই শুনবে না। বলে, বিয়ের দিনটা কাটিয়ে যা হয় করবে।

—মেয়েটা কি রকম এ ব্যাপারে সিরিয়াস্!

—ভগবান জানেন। তবে আমার মনে হয় বিয়ের আগে যেমন অনেক মেয়ের হয়, অল্প স্বল্প কষ্টিনষ্টি করে—

চুণীলাল দুঃখ প্রকাশ করে, বেচারী মধুদা!

কেষ্ট বেহালায় ফিরে নীচে না থেমে ওপরে উঠে যায় বাড়ীওয়ালার কাছে। মদনের পাড়া থেকে আসবার পথে ট্রামে বসে সিদ্ধান্ত করেছে ঘর সে ছেড়ে দেবে। এঘরের প্রয়োজন ফুরিয়েছে, মিছিমিছি পয়সা নষ্ট করে কি হবে। বাড়ীওয়ালার আপত্তি করার কিছু ছিল না। বলে, দেখবেন আপনি, জানাশোনা কোন লোকের যদি এরকম ঘরের দরকার থাকে। জানেন তো, অজেনা অচেনা লোককে আমি ভাড়া দিতে চাই না। কথায় আছে, অজ্ঞাত-কুলশীলস্য—

কেষ্ট থামিয়ে দেয়, খেয়াল রাখবো।

—এ মাসের ভাড়াটা তাহলে—

—এরই মধ্যে একদিন দিয়ে যাব, এখনও তো আমি যাই নাই।

ওপর থেকে নিচে নামতেই চিনুর সঙ্গে দেখা। বারান্দায় দাঁড়িয়ে সে ফেরিওয়ালার কাছে ফল কিনছিল। জিজ্ঞেস করে, কেষ্টদা' কখন এলেন?

—এই তো।

—ওপর থেকে?

—বাড়ীওয়ালাকে নোটিশ দিয়ে এলাম।

চিনু আর উৎসাহ প্রকাশ করে না। বলে, ও!

কেষ্ট ঘর খুলে ভেতরে ঢোকে। মনে পড়ে গৌরীর সংগে গিয়ে একটি একটি করে জিনিষ কিনে এই খেলাঘরের সংসার পেতেছিল। আসবাবের বাহুল্য না থাকলেও প্রয়োজনীয় সব কিছুই আছে।

নিজের অজ্ঞাতে কেষ্টর দীর্ঘশ্বাস পড়ে। মোড়ায় বসে পড়ে একটা সিগারেট ধরায়। হাত ধুয়ে আঁচলে মুছতে মুছতে চিনু ঘরের ভেতর ঢোকে। জিজ্ঞেস করে, কি খাবেন কেষ্টদা'?

কেষ্ট ম্লান হাসে, আমাকে দেখলেই তোমার খাওয়াতে ইচ্ছে করে কেন বলতো চিনু? আমি কি খুব বেশী খাই?

চিনু উত্তর দেয় না। বাক্সের ওপর থেকে কতকগুলো কাগজ মেঝেয় পড়ে গিয়েছিল, সেগুলো গুছিয়ে রাখে। কেষ্ট হঠাৎ বলে, এ জিনিষগুলোর কি করা যায়?

—বলুন।

—ভাবছি কাউকে দিয়ে দেব।

—বেশ তো।

একটু থেমে কেষ্ট আবার প্রশ্ন করে, তোমাদের কোন কাজে লাগবে না?

চিনু পরিষ্কার গলায় উত্তর দেয়, না। একটু পরে চিনু নিজে থেকেই জিজ্ঞেস করে, এ মাস থেকেই ঘর ছেড়ে দিচ্ছেন?

—হ্যাঁ।

—এখানে আবার কে আসবে কে জানে?

একথার উত্তর দেবার কিছু ছিল না, কেষ্ট চুপ করে বসে থাকে।

—এদিকের পালা উঠে গেলে আর কি এত দূর আসবেন?

—যদি কাজ পড়ে।

—বেশ ক'দিন একসঙ্গে থাকা গেল। জানতাম একদিন গৌরীকে নিয়ে এ বাসা ছেড়ে যাবেন। কিন্তু যেখানেই সংসার পাতুন, আমার একটা অধিকার থাকত। মাঝে মাঝে গিয়ে আপনাদের জ্বালাতন করতাম। তা আর হ'ল না—

—যা ভাবা যায় সব সময় তা হয় না।

চিনু মৃদুস্বরে বলে, তাই দেখছি।

—আমার নামে কোন চিঠি আসেনি?

—না।

—ওরা নিশ্চয় চটে গেছে। এসে অবধি একটাও চিঠি দিইনি।

—লিখবেন।

—তোমার কাছে পোষ্টকার্ড আছে?

চিনু হাসে, জানি আপনি নিজে চিঠি লেখেন না। আপনার মনে নেই বোধ হয়? আগের চিঠিটাও তো আমি লিখে দিয়েছিলাম।

—তাহলে এবারও দু' লাইন লিখে দাও।

চিনু পোষ্টকার্ড আর কলম নিয়ে আসে। যথারীতি ওপরে দুর্গা সহায় লিখে জিজ্ঞেস করে, শ্যামাকে লিখবেন তো?

—না, ওর স্বামীকে।

—বলুন।

কেষ্ট বলে যায়: প্রিয় ব্রজদুলাল, তোমাদের কাছ থেকে এসে

অবধি একটাও চিঠি দিই নি। কারণ আমার অসুখ করেছিল। এখন ভাল আছি। প্রায়ই তোমাদের সকলের কথা মনে পড়ে। মিঠু কিটু কেমন আছে। শ্যামা কেমন আছে সব কথা জানিও। কলকাতা বড় এক একঘেয়ে লাগছে, মনে শান্তি পাচ্ছি না। তোমার কথা ভুলিনি, তুমি যে বলেছিলে একজন ড্রিল-মাষ্টার দরকার, যদি কোন ভাল লোক পাই জানাব। আমার মত মুখ্যু-সুখ্যু মানুষ দিয়ে তো তোমার কাজ চলবে না, তাই ভাল লোকের সন্ধানে রইলাম। ভালবাসা নিও, ছোটদের আশীর্ব্বাদ জানিও। ইতি তোমাদের কেষ্ট।

চিঠি লেখা শেষ হতে চিনু বলে, খুব তো বাহাদুরী করে লিখলেন, যেন কিশোরপুরে ড্রিল-মাষ্টারী করবার জন্যে আপনার মন ছটফট করছে। সত্যি সত্যি ডাকলে যাবেন সেখানে কলকাতা ফেলে?

—কি জানি, এক একবার মনে হয় গেলেই ভাল। এখানে পড়ে থেকে আর কি হবে?

চিনু কোন কথা না বলেই উঠে পড়ে। কেষ্ট জিজ্ঞেস করে, কোথায় যাচ্ছ?

—রান্না চড়িয়ে দিই।

—আমিও উঠি চিনু!

—সে কি, আপনার জন্যেই তো রান্না করছি।

—না, না। আমি বাড়ী যাব।

—সেখানে তো কেউ বাড়া ভাত নিয়ে বসে থাকবে না। হোটেলের চাইতে এখানে খাওয়া ভাল। বলে চিনু ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। কেষ্ট কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থেকে জামা খুলে বিছানায় শুয়ে পড়ে।

গৌরী বিনোদের কাছে এসে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার সব রকম সুযোগ পেয়েছিল, পড়ার মাষ্টার, নাচের মাষ্টার, শাড়ী, গাড়ী, রূপসজ্জার নানারকম সরঞ্জাম কিছুরই অভাব ছিল না, কিন্তু চিনুর সঙ্গে দেখা করার আগ্রহ তার একটুকু কমেনি। মাঝে মাঝে হয়ত ভেবেছে, এর কি প্রয়োজন আছে? তবু তার মন কেষ্টর কথা জানার জন্যে কৌতূহলী হয়ে উঠেছে। এত দিনেও সে সাহস সঞ্চয় করে বেহালার বাসায় যেতে পারেনি। বিনোদ তাকে বলে, ও-সব কথা ভুলে যাও। কেষ্ট তোমার কে?

—কেউ না।

—তবে?

—তবে আর কি, এমনি জানতে ইচ্ছে করে, অনেক দিন এক-সঙ্গে ছিলাম তো।

—যেতে চাও আমি তোমায় নিয়ে যেতে পারি।

গৌরী এ প্রস্তাবে রাজী হতে পারে না। কেষ্টর মেজাজের সঙ্গে সে অপরিচিত নয়। হয়ত বিনোদকে অপমান করে বসবে, কি দরকার সে ঝামেলার মধ্যে গিয়ে? কিন্তু আশ্চর্য! আকস্মিক ভাবে চিনুর সঙ্গে গৌরীর দেখা হ'য়ে গেল এক থিয়েটারের রিহার্সালে। গৌরী গিয়েছিল বিনোদের সঙ্গে, বিনোদ সে ক্লাবের পেট্রন, চিনু এসেছিল টাকা নিয়ে অভিনয় করতে, দুজনের দেখা হতেই চিনু আড়ষ্ট হয়ে যায়, গৌরী সপ্রতিভ ভাবে এগিয়ে গিয়ে হেসে কথা বলে, কি খবর, কত দিন বাদে দেখা!

চিনু মুখ তুলে তাকায়, বলে, হ্যাঁ, প্রায় এক মাস হ'ল।

—এখানে পার্ট করছ বুঝি?

—হ্যাঁ।

গৌরী ভীড়ের মধ্যে থেকে চিনুকে টেনে এনে একান্তে বসে। জিজ্ঞেস করে, আমার কাছে আস না কেন?

—যেতে তো বলিসনি কখনও?

গৌরী হাসবার চেষ্টা করে, বলবার কি আছে, তোমাকেও নেমন্তন্ন করতে হবে নাকি?

—আশা করেছিলাম একটা খবর দেবে।

—পারিনি, এত রকম ঝামেলা। বাইরে থেকে ভাবতাম ফিল্ম লাইন খুব সোজা, উঃ বাবা, সকাল থেকে রাত্রি, খাটনির কি শেষ আছে?

চিনু একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে বলে, যাই বল, চেহারা তোমার অনেক ভাল হ'য়েছে।

গৌরী আত্মপ্রসাদ অনুভব করে বলে, সবাই তাই বলছে। একটু থেমে জিজ্ঞেস করে, তোমরা কেমন আছ?

—আমরা? ভালই।

—তবু?

চিনু অন্যমনস্ক ভাবে জিজ্ঞেস করে, তবু মানে?

—ঐ পিনাকী বাবু, তুমি—

—কেটে যাচ্ছে আর কি।

গৌরী ভেবেছিল চিনু নিজে থেকেই কেষ্টর কথা তুলবে। কিন্তু সে প্রসঙ্গ না ওঠায় সরাসরি প্রশ্ন করে, আর কেষ্টদা'? গৌরীর গলা কেঁপে ওঠে।

—বেশী দেখা হয় না।

—কেন? বেহালায় যায় না?

—বাড়ী ছেড়ে দিচ্ছেন এ মাস থেকে।

—তাই নাকি! জিনিষপত্র সব?

—বলছিলেন কোন দাতব্য প্রতিষ্ঠানে দিয়ে দেবেন।

—ও: ও! গৌরী চুপ করে যায়।

—শুনলাম, কলকাতায় আর থাকবেন না।

—কোথায় যাবেন?

—কলকাতার বাইরে কোন গ্রামে।

—হঠাৎ?

—বলছিলেন, কলকাতা আর ভাল লাগছে না।

এ বিষয় নিয়ে বেশী আলোচনা করতে গৌরীর ভয় হয়। কেন যে কেষ্ট কলকাতা ছেড়ে চলে যাচ্ছে, তা বুঝতে গৌরীর বাকী থাকে না। চিনু কিন্তু কোন কথাতে গৌরীকে একটুকু খোঁচা দেয় না। ষ্টুডিওতে কি রকম সে কাজ করছে, বাড়ীতে কি ভাবে দিন কাটা—একে একে সব কথা জিজ্ঞেস করে বিনোদের কথা পাড়ে বিনোদ বাবু লোক খুব ভাল না?

গৌরী উৎসাহিত হ'য়ে বলে, সত্যিই খুব ভাল। বাইরে থেকে ওকে কিছুই বোঝা যায় না।

গৌরী উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বিনোদের গুণ বর্ণনা করে। তার উদারতা তার ভালবাসা, অকৃত্রিম বন্ধুত্ব সব কিছু।

চিনু মন দিয়ে সব কথা শুনে হঠাৎ জিজ্ঞেস করে, কেষ্টদা' চেয়েও ভাল?

চিনুর এই একটি প্রশ্নে গৌরী হতবাক্ হ'য়ে যায়। কোনও উত্তর সে দিতে পারে না। যে মনকে সে এই ক'দিনে রাত্রে স্বপ্নে, জাগরণে, সব সময় বুঝিয়েছে। বিনোদ ভাল, কেষ্টদা'র চেয়ে অনেক ভাল, সেই মন চিনুর প্রশ্নের সামনে মৌনী হ'য়ে যায়। বিনোদ এসে গৌরীকে বাঁচায়। চিনুকে দেখে হেসে জিজ্ঞেস করে, কি খবর? গৌরী তো সারাক্ষণই তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায়। বিনোদ বরাবরই চিনুকে 'আপনি' বলে সম্বোধন করেছে। কিন্তু অনেক দিন পর আজকে দেখে 'তুমি' বলতে বাধে না।

সত্যি নাকি?

—বিশ্বাস না হয় ওকেই জিজ্ঞেস কর না।

—আমাদের ভাগ্য বলতে হবে।

বিনোদ কথাটা গায়ে মাখে না। দরাজ গলায় বলে, এস না একদিন ষ্টুডিওতে, গৌরী কেমন পার্ট করছে দেখবে।

—যাব।

রিহার্সাল সুরু করার জন্যে সকলের ডাক পড়ে। চিনু মাপ 'করবেন' বলে বলে বিনোদ ও গৌরীর কাছ থেকে চলে যায়।

এর মধ্যে আর কেষ্টর সংগে চিনুর দেখা হয়নি। দেখা হলে হয়তো গৌরীর কথা উঠতো, কিন্তু কেষ্ট আজ-কাল বেশীর ভাগই নিজের বাড়ীতে থাকে, খুব কম বার হয়। বেহালায় বেশী যেতে চায় না। পাছে চিনু তাকে নিয়ে অযথা ব্যস্ত হ'য়ে পড়ে। মনে মনে ভাবে, পিনাকী মুখে কিছু না বললেও নিশ্চয় অন্তরে বিরক্ত হয়। তবু এরই মধ্যে একদিন সে বেহালায় গিয়েছিল, কিন্তু চিনু বাড়ী ছিল না, ক'দিনই সন্ধ্যার সময় তাকে রিহার্সাল দিতে বাইরে যেতে হয়।

কেষ্ট চেষ্টা করে গৌরীর কথা আর না ভাবতে, তবু অনেক সময় তার কথা মনে পড়ে। এতে নিজের ওপর বিরক্তি বাড়ে আর কোন লাভ হয় না। ক'দিন আগে কোন এক সিনেমা পত্রিকায় নবাগতা গৌরী দেবীর ছবি সে দেখেছে। পয়সা দিয়ে এক কপি সংগ্রহ করেও এনেছিল, কিন্তু কয়েক ঘণ্টার বেশী সে বইখানা কাছে রাখেনি। এ ছবিতে ছিল না গৌরীর সেই সহজ সুন্দর মুখখানি। যা দেখে প্রথম দিন কেষ্টর মনে সহানুভূতির উদ্রেক হয়েছিল। যাকে নিয়ে ঘর বাঁধার স্বপ্ন তাকে পাগল করে দিয়েছিল, এ সেই গৌরী নয়। কেষ্ট বার বার ছবিখানা দেখেছে, তার লোল কটাক্ষ, অতি আধুনিক সাজ-পোষাক, ফাঁপানো মাথার চুল, কৃত্রিমতায় ভরা একখানা মুখ। রাগে সমস্ত শরীর তার কেঁপে উঠেছিল। নিমেষের মধ্যে ছবিখানা ছিঁড়ে কুটি কুটি করেও সে মনে শান্তি পায়নি। ছাদে গিয়ে ছবির টুকরোগুলো জড়ো করে একটা দেশলাই জ্বালিয়ে দেয়। একদৃষ্টে সেই দিকে তাকিয়ে থেকে কেষ্টর চোখে জল এসে পড়ে। গৌরীর ভাইকে শ্মশানে পোড়াতে গিয়েও তার মনে এতখানি অবসাদ আসেনি, যা আজ এল ছবির গৌরীকে অভিমানের চিতায় তুলতে।

আজ রোববার। প্রভাত কলকাতায় ফিরেই এসেছে আশুদা'র কাছে, পুরনো বন্ধু-বান্ধবের কাছে দেখা করতে। আশুদা' জড়িয়ে ধরে বললেন, তোমার শরীর অনেক ভাল হ'য়েছে প্রভাত! আগের মত প্রভাত হেসে পদ পূরণ করে দেয়, কাঠির উপর আলুর দম আর নেই। এই তো?

—কি সব খবর বল? অরুণা কেমন আছে? বিয়ে কবে?

প্রভাত ইচ্ছে করে কাসে, বিষম লাগিয়ে দিলেন যে! একসঙ্গে ক'টা প্রশ্নের উত্তর দেব?

—বেশ তো, একে একেই বল না।

অরুণা, অরুণার বাবা সবাই ভাল আছেন। অরুণার মা আমার মধ্যে রোজ নতুন নতুন গুণ দেখছেন। আমি নাকি বিদ্বান, বুদ্ধিমান, সৎচরিত্র, ধর্মভীরু—

—মানে স্কুলে মহাপুরুষদের জীবনী লিখতে ছেলেরা যে সব বিশেষণ ব্যবহার করেন, সেইগুলো তো? প্রভাত সায় দেয়, হুবহু ঠিক ধরেছেন।

আশুদা' প্রাণ খুলে হাসেন, এ নতুন কিছু নয় ভাই, শাশুড়ীর মুখে বরাবর ঐ সব শুনেছি, শুধু ওর কথামত মেয়েকে বাপের বাড়ী আসতে না দিলে বিশেষণগুলো কম ব্যবহার করতেন।

—অরুণার বাবা এখন অনেক ভাল, বিয়ের ব্যবস্থা বলতে গেলে সব উনি নিজেই করছেন।

—হাঁটতে-ফিরতে পারছেন?

—অল্পবিস্তর। ওঁর বন্ধুভাগ্য খুব ভাল। সবাই এসে সাহায্য করছে।

—বিয়েটা কবে?

—আট তারিখে।

—আটুই অঘ্রাণ, বল কি? এ ত এসে গেল, একেবারে নাকের গোড়ায়। খ্যাটের ব্যবস্থা ভাল হচ্ছে তো?

অনুষ্ঠানের ত্রুটি হবে না আশুদা'। আমার শ্বশুরের জিদ চেপে গেছে। উনি সুস্থ থাকলে যেভাবে মেয়ের বিয়ে হ'ত ঠিক সেই ভাবে ধূমধাম করে ব্যবস্থা করতে চান।

—এ ত খুব আনন্দের কথা, কি খাবে বল? আজ তুমি আমার গেষ্ট।

—শুধু চা।

—ঐ নেশাটি তোমার গেল না!

প্রভাত হেসে বলে, যাবেও না। কেষ্ট কোথায়?

—খবর পাঠিয়েছি, আসবে এখনি।

একটু থেমে আশুদা' জিজ্ঞেস করেন, তোমাদের কি হ'য়েছে বলতো?

—কেন?

কি জানি, তোমার কথা হ'লেই কেষ্ট কেমন গম্ভীর হয়ে যায়, তুমিও ওর কথা শুনলে কি যেন ভাব।

প্রভাত গম্ভীর ভাবে বলে, বিশেষ কিছু নয়। একটা কথা ওকে জিজ্ঞেস করার আছে।

—তোমার লেখাপত্তর চলছে কি রকম?

প্রভাত চায়ে চুমুক দিয়ে বলে, খুব বেশী লিখিনি আশুদা'! আগে পয়সার জন্যে বিস্তর লিখেছি, এখন সে দরকার নেই। মনে ইচ্ছে আছে দু'-একটা ভাল বই লেখার। অবশ্য যদি সময় আর সুযোগ পাই—
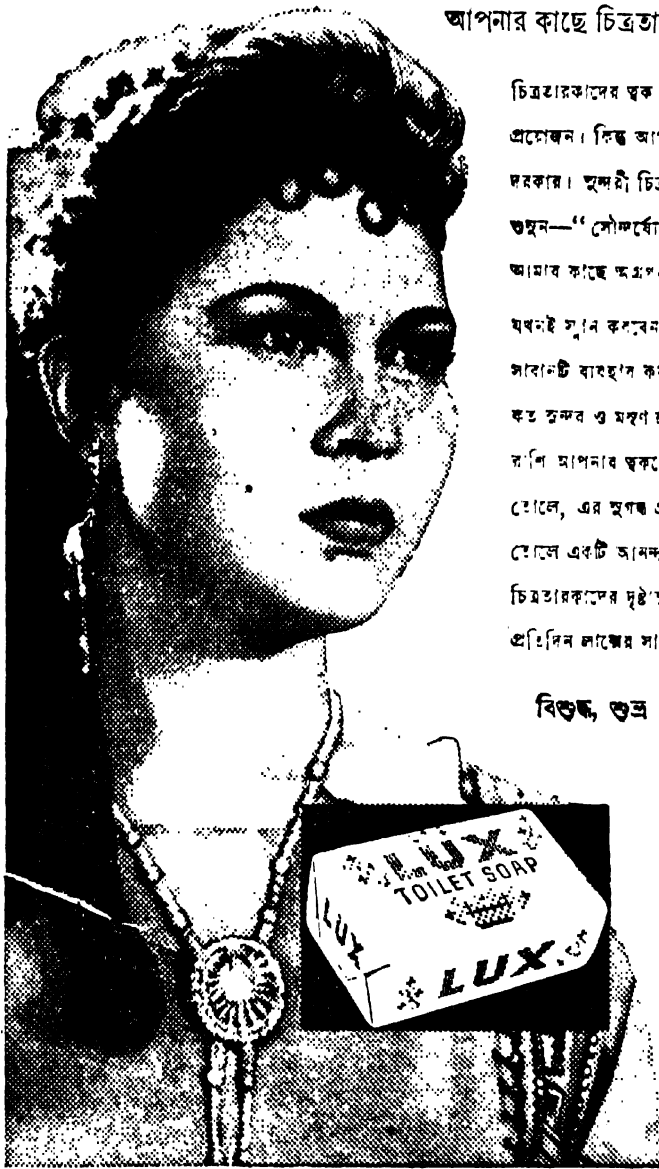
আপনার লাবণ্য

আপনার কাছে চিত্রতারকার লাবণ্যের মতই প্রিয়!

চিত্রতারকাদের ত্বক সর্বদাই মসৃণ ও সুন্দর রাখা অত্যন্ত প্রয়োজন। কিন্তু আপনার নিজের ত্বকেরও যত্ন নেওয়া দরকার। সুন্দরী চিত্রতারকা নিরূপা রায় কি বলেন শুনুন—"সৌন্দর্য্যের জন্যে লাক্স টয়লেট সাবান আমার কাছে অপরিহার্য্য।"

যখনই স্নান করবেন বা মুখ ধোবেন এই শুভ্র, বিশুদ্ধ সাবানটি ব্যবহার করুন—দেখবেন আপনার ত্বক কত সুন্দর ও মসৃণ হয়ে উঠেছে। এর সরের মত ফেনার রাশি আপনার ত্বককে পরিপূর্ণভাবে পরিষ্কার করে তোলে, এর সুগন্ধ প্রতি বারের স্নানকে করে তোলে একটি আনন্দময় অনুভূতি। সারা পৃথিবীর চিত্রতারকাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করুন—প্রতিদিন লাক্সের সাহায্যে আপনার ত্বকের যত্ন নিন।

বিশুদ্ধ, শুভ্র

লাক্স টয়লেট সাবান

LUX TOILET SOAP

LUX

চিত্রতারকাদের সৌন্দর্য্য সাবান

নিরূপা রায় মুক্তি ফিল্মের 'সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত' চিত্রের সুন্দরী তারকা

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড, কর্তৃক প্রস্তুত।

LTS. 361-X52 BG

এমন সময় কেষ্ট এসে পড়ে। আশুদা' চেঁচিয়ে বলেন, এস কেষ্ট, প্রভাতের তো বিয়ে লাগল।

কেষ্ট শুকনো হেসে বলে, ভালই তো।

প্রভাত প্রশ্ন করে, কি হয়েছে তোর কেষ্ট, এত শুকনো কেন?

—কিছু না।

—এখানে বস।

কেষ্ট বসেই আশুদা'কে উদ্দেশ্য করে বলে, আশুদা', কিছু যদি মনে না করেন প্রভাতের সঙ্গে দু'একটা দরকারী কথা সেরে নিই।

আশুদা' তাড়াতাড়ি উঠে পড়েন, নিশ্চয় নিশ্চয়! আমারও অনেক কাজ পড়ে রয়েছে, সেরে নিইগে।

আশুদা' উঠে যেতেই কেষ্ট কঠিন গলায় বলে, প্রভাত, তোর কাছ থেকে এ ব্যবহার আমি আশা করিনি।

প্রভাত মুখ তুলে তাকায়। কেষ্টকে তারই প্রশ্ন করার কথা, সেইজন্তেই তাকে এত দিন খুঁজেছে। হঠাৎ কেষ্টর কাছে এ অভিযোগে সে বিস্মিত হয়।

—গৌরীকে যদি তোমার ফিল্মে নামাবার ইচ্ছে ছিল, একবার আমাকে জিজ্ঞেস করাও তুমি দরকার মনে করলে না?

—আমি কিছুই বুঝতে পারছি না কেষ্ট, গৌরীকে আমি ফিল্মে নামাতে যাব কেন?

—তার মানে?

প্রভাত একে একে সব কথা বলে যায়, নাটকের রিহার্সালে চিনুর সংগে গৌরীকে দেখার পর কি ভাবে, কবে ষ্টুডিওতে দেখেছিল, তারপর বেলারাণীর বাড়ীতে গৌরীর সঙ্গে কথাবার্তা সব বর্ণনা করে বলে, আমি তো এতদিন তোরই উপর চটে ছিলাম। ভালবেসে বিয়ে করবি বলে আবার ফিল্মে কেন নামাতে গেলি। কেষ্ট নির্বাক-বিস্ময়ে প্রভাতের কথাগুলো শোনে। ধরা-গলায় বলে, আমার মাপ কর প্রভাত, আমি ভুল বুঝেছিলাম।

কেষ্ট হঠাৎ উঠে দাঁড়ায়। তার চোখ দুটো জলে ওঠে, দাঁতে দাঁত চেপে বলে, গৌরী যে এত বড় মিথ্যেবাদী তা জানতাম না।

আর কোন কথা না বলে কেষ্ট দ্রুত পায়ে চায়ের দোকান থেকে বেরিয়ে যায়। বিস্মিত প্রভাত আশুদা'র কাছে এসে নীচু গলায় জিজ্ঞেস করে, কেষ্টর কি হয়েছে আশুদা'?

আশুদা' ততোধিক গম্ভীর হয়ে বলেন, জানি না ভায়া, বোধ হয় মেয়েটা ওকে ছেড়ে পালিয়ে গেছে।

—গৌরী আর কেষ্টর কাছে থাকে না?

—সেই রকমই তো গুজব শুনছি।

প্রভাত অনন্ত কেবিন থেকে বেরিয়ে সোজা গেল বেলারাণীর বাড়ী। কেষ্ট ও গৌরী দু'জনকেই সে জানে। তাই তাদের মধ্যে যদি কোন রকম বিচ্ছেদ এসে থাকে তা জানার কৌতূহল স্বাভাবিক। এবং বেলারাণী যে সে সম্বন্ধে সব কথাই জানবে সে বিষয়েও তার কোনরকম সন্দেহ ছিল না।

প্রভাতকে দেখে বেলারাণী সত্যিই খুসী হয়। ওপরে ডেকে এনে সোফায় বসিয়ে গল্প করে, বাবা কি ছেলে, একটা চিঠি দিলে না?

প্রভাত ম্লান হাসে, চিঠি দিয়ে বিরক্ত করে কি লাভ?

—অত লাভ-লোকশান তোমায় কে দেখতে বলেছে, বললাম লিখতে, তা একটা কথাও যদি শোনে।

প্রভাত উত্তেজিত গলায় বলে, একটা দরকারী কথা তোমার কাছে জানতে এলাম।

কি বিষয়ে? ছবি কি উঠছে না উঠছে সব তো অরুণাকে লিখেছি।

তা নয়, আমি জানতে চাই গৌরীর কথা।

বেলারাণী হাসে, তোমাকেও গৌরীতে পেয়েছে নাকি? মেয়েটার বরাত ভাল।

—না, না, ওর বিষয়ে কি জান তুমি বল।

—বিশেষ কিছু জানি না, তবে ও এখন ছবিতে কাজ করছে, আর থাকে বিনোদের কাছে।

প্রভাত বিস্মিত হয়, বিনোদের কাছে!

—হ্যাঁ, পার্কসার্কাসে। কেন কি হ'য়েছে?

—না। আমি বরং উঠি।

—আশ্চর্য! আমায় বলবে না?

বলার কিছু নেই, আমার এক বন্ধু ওকে বস্তি থেকে এনে নিজের কাছে রেখেছিল, বিয়ে-থার ব্যবস্থা পাকাপাকি। হঠাৎ আজই শুনছি গৌরী সেখানে নেই। তাই ছুটে এলাম তোমার কাছে, যদি কোন হদিশ দিতে পার।

—এত কথা আমি কিছুই জানতাম না।

—ছেলেটা খুব শক্ পেয়েছে, প্রভাত উঠে পড়ে বলে, এস না একদিন, অরুণাকে সাহায্য করবে।

বেলারাণী হেসে বলে, আর তো বেশী দিন নেই, বেচারী অরুণা, ওর ওপর খুব চাপ পড়েছে নিশ্চয়, বরপক্ষ, কনেপক্ষ দুদিকের ব্যবস্থাই তো ওকে করতে হবে।

মামুলী কথাবার্তার পর প্রভাত বেলারাণীর বাড়ী থেকে বেরিয়ে আসে।

প্রভাত নিমন্ত্রণ করার অছিলায় গিয়েছিল বিনোদের বাড়ী পার্ক-সার্কাসে। বিনোদ সেখানে ছিল না। প্রভাত সরাসরি গৌরীর সংগে দেখা করে। গৌরী কি ভাবে অভ্যর্থনা করবে বুঝতে পারে না। যতদূর সম্ভব নিজেকে স্বাভাবিক করার চেষ্টা করে বলে, বসুন প্রভাত বাবু, বিনোদ এখন বাড়ী নেই। প্রভাত বসে পড়ে হাসবার চেষ্টা করে, বিয়ের নেমন্তন্ন করতে এলাম—

—তাই নাকি? বিয়ে কবে?

প্রভাত হাত বাড়িয়ে চিঠিটা এগিয়ে দেয় গৌরীর কাছে। গৌরী যতক্ষণ চিঠি পড়ে প্রভাত ভাল করে গৌরীকে নিরীক্ষণ করে। দেখে কতখানি তফাৎ। কেষ্টর সঙ্গে যে স্বভাবভীরু লাজুক মেয়েটিকে সে দেখেছিল, তার কিছুই আর বেঁচে নেই এই সুবেশা গৌরীর মধ্যে। ইচ্ছে করেই জিজ্ঞেস করে, আপনার চিঠিটা কোথায় দিয়ে যাব? এখানে না কেষ্টর কাছে?

প্রভাতের খোঁচাটুকু গৌরী গায়ে না মেখে বলে, কেন এইখানেই, যদি নেমন্তন্ন করার ইচ্ছে থাকে।

প্রভাত পকেট থেকে আরেকটা চিঠি বার করে তাতে নাম লিখে গৌরীর হাতে দেয়।

গৌরী নিজে থেকেই প্রশ্ন করে, আপনি কি জানতেন না আমি আজ-কাল এখানে থাকি?

—কি করে জানবো?

—কেষ্টদা' বলেনি?

—ওর তো বলে বেড়ানো স্বভাব নয় ?

গৌরী বেশী কথা বাড়াতে চায় না। প্রভাতের উপস্থিতি তার অসহ্য লাগে অথচ প্রভাত ওঠবার নাম করে না।

—ইুডিওর জীবন কেমন লাগছে ?

—ভালোই।

—এ লাইনে পয়সা আছে, তবে লেগে থাকতে হয়। আপনার কি ইচ্ছে, বরাবর থাকবেন, না দু'-দিনের জন্তে ?

—দেখি।

প্রভাত হাসে, মেয়েদের তো ঐ মুস্কিল, কিছুতেই লেগে থাকবে না। আজ এটা পছন্দ তো কাল ওটা—

গৌরী কথা ঘুরিয়ে নেয়, নতুন নাটক কিছু লিখছেন নাকি ?

—না, সময় পাইনি। তবে শীগগির লিখব।

—চিন্নুর সঙ্গে দেখা হয়েছে ?

—না।

—কেষ্টদা' ?

—হয়েছে। কেষ্টটা চিরকালই বোকা, একটু মুষড়ে পড়েছে।

—বোকা বলছেন কেন ?

প্রভাত অন্তমনস্ক ভাবে বলে, জীবনটাকে বড় বেশী সিরিয়াস্লী নিতে চায়, তাই এত দুর্ভোগ।

—আপনি নেন না বুঝি ?

—না। এসব ছেলেখেলা। নতুন শাড়ীর সখ যেমন আপনাদের মেটে না, তেমনি মেটে না আপনাদের নতুন জীবনের তেষ্টা।

গৌরী বিরক্ত হয়, বেলা অনেক হ'ল। এবার আমায় বাইরে যেতে হবে।

প্রভাত বাঁকা হাসি হেসে, উঠতে বলছেন, পরিষ্কার করে বললেই হয়, তাতে আমি কিছু মনে করি না। উঠে দাঁড়িয়ে চার দিক তাকিয়ে বলে, বেশ বাড়ী পেয়েছেন, কোথায় বেহালায় পাখীর বাসার মত একটা ছোট খুপ্‌রী, আর তার বদলে এই বিনোদের সুসজ্জিত বাড়ী।

গৌরী মুখ ঘুরিয়ে নেয়। প্রভাত হাত তুলে নমস্কার করে, এখন তো প্রায়ই দেখা হবে ইুডিওতে। চলি তবে। বিয়েতে নিশ্চয় আসবেন, আপনি আর বিনোদ দুজনেই।

গৌরী শুকনো গলায় বলে, চেষ্টা করব, কথা দিতে পারছি না।

সেখান থেকে বেরিয়ে প্রভাত গেল কেষ্টর বাড়ী। ভেবেছিল, এ সময় দেখা পাবে না, নেমন্তন্নের চিঠিখানা দিয়ে আসবে। কিন্তু কড়া নাড়তে কেষ্ট নিজে এসে দরজা খুলে দেয়। প্রভাতকে দেখে সাদরে অভ্যর্থনা করে, ভেতরে আয়।

—নেমন্তন্ন করতে এলাম।

কেষ্ট প্রভাতকে নিয়ে উপরে উঠতে উঠতে বলে, চিঠির আবার কি দরকার। তবু চিঠিখানা প্রভাতের হাত থেকে নিয়ে ভাল করে পড়ে বলে, বেশ লেখা হয়েছে, সাহিত্যিকের বিয়ে বোঝাই যাচ্ছে।

—তোকে কিন্তু আগে থেকে যেতে হবে, সব কিছু যোগাড়-যন্ত্র করা।

—যখন বলবি যাব।

—আজই চল না, বেশ হৈ-হৈ করা যাবে।

কেষ্ট মৃদুস্বরে বলে, আজ থাক, আর একদিন যাব।

—বাড়ীতে এরকম একলা একলা বসে আছিস কেন বল্‌তো ?

—এম্‌নি।

—এমনি না হাতী, আমি শুনেছি সব। ও-সব মেয়ের যাওয়াই ভাল। তুই বেঁচে গেছিস্।

—গৌরীকে তুই চিনিস না—

—অনেক গৌরী দেখেছি ভাই, চিনতে আর বাকী নেই। যত দিন বয়সের জোর থাকবে কেউ এদের ধরে রাখতে পারবে না।

কেষ্ট চুপ করে থেকে বলে, এক এক সময় মনে হয়, হয়ত সে অনুতপ্ত, ভয়ে আমার কাছে আসতে পারছে না। পাছে আমি রাগারাগি করি।

কেষ্ট যে গৌরীকে কতখানি ভালবাসে তা এই ক'টি কথায় প্রভাতের কাছে পরিষ্কার হয়ে যায়। বলে, আমি গৌরীর কাছে গিয়েছিলাম।

—কোথায় ?

—বিনোদের বাড়ী, পার্কসার্কাসে—

—দেখা হ'ল ?

—হ্যাঁ।

—কথা হ'ল

—হ্যাঁ।

—কি ?

—কত কথা। দেখলাম পুরোদস্তুর ফিল্‌ম এ্যাক্‌ট্রেস হবার চেষ্টা করছে। সে গৌরী নেই, মরেছে।

কেষ্টর চোখ দুটো আবার জ্বলে ওঠে, সত্যি প্রভাত তুই ঠিক বলেছিস। আমারও তাই বিশ্বাস গৌরী মরেছে। ক'দিন আগে আমি তাকে দাহ করেছি।

প্রভাত দেখে, কেষ্ট যেন কেমন আবল-তাবল বকছে, জোর করে তাকে গাড়ীতে নিয়ে যায়। চল্ আমার সঙ্গে। একলা তোকে কিছুতেই রেখে যেতে পারবো না।

কেষ্ট প্রভাতের কথামত অরুণাদের গাড়ীতে উঠল বটে কিন্তু কিছু দূর গিয়ে মোড়ের মাথায় জোর-জবরদস্তি করে নেমে পড়ে। মিনতিভরা গলায় বলে, আজকের দিনটা আমায় রেহাই দে প্রভাত! এ ক'দিনের মধ্যে নিশ্চয় যাব।

[ক্রমশঃ

"There have been many cases of people not in love getting married and getting on very well—without love but with understanding."

—*Mr. Nikita Chrushchev.*

অপরূপা

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

শ্রীদ্বারেশচন্দ্র শর্ম্মাচার্য্য

এরই মধ্যে নানা কথা উঠেছে।

সর্বেশ্বরের আশ্রমে যাতায়াতটা কেউ ভাল চোখে দেখেন নি। মণীশ যেন একটা অপরাধ করে বসেছে। জমিদার কৃষ্ণপ্রসাদও স্পষ্টই জানিয়েছেন,—তিনি বেঁচে থাকতে একটি ব্রাহ্মণের ছেলের জাতধর্ম যেতে দিতে কিছুতেই পারেন না তিনি।

মনে মনে জ্বলে উঠেন কৃষ্ণপ্রসাদ। ভাবেন,—কোন ধর্মই নেই লোকটার। ছিঃ ছিঃ। খৃষ্টান হলেও আপত্তি ছিল না। কোথাকার কে তার কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। তার উপর আবার রাজদ্রোহী। বকাটে শম্ভুনাথটা আবার উত্যক্ত করে তুলেছে। বাঁচা গিয়েছিল, চলে গিয়েছিল শহরে। মামার অন্ন ধ্বংস করছিল। এখন স্বদেশী ভূত চেপেছে ঘাড়ে। নিজের মা খেতে পায় না। বাবু এখন ঘরে ঘরে চরকা চালাবেন!

প্রসন্ন তর্করত্ন এক পাশে বসে গড়গড়ার নল টানছিলেন। জমিদারের খাস বেয়ারা দুলালচাঁদ দাঁড়িয়েছিল তর্করত্নের পাশে। কৃষ্ণপ্রসাদ বললেন,—সুলেমান রাজাই সর্বেশ্বর মাষ্টারদের প্রশ্রয় দিয়েছে পণ্ডিতজ্যোঠা! তাই ত' লোকটা মাথায় উঠে নাচছে। এত দিন পাহাড়ীদের নিয়েই ছিল। বেশ ছিল। এখন দেখছি—ভদ্রলোকের ছেলেদেরও মাথা খাবে।

তর্করত্ন বলে উঠেন,—দেখো বাবা কেষ্টপ্রসাদ! আমি আগেই বলেছিলাম, এখানে তোমার হাইস্কুল টাইস্কুল করে লাভ কি? ওই সর্বেশ্বর মাষ্টারই যত নষ্টের গোড়া। সুলেমান রাজা ত' ওই সর্বেশ্বরের বুদ্ধিতেই চলে। এখন বুঝলে ত'? যত সব ছোটলোকের মরণ আর কি? ইংরেজী বিদ্যা ঢুকেছে, আর জাতধর্ম্ম থাকবে না। ছোট বড় ভেদাভেদ আর রইল কই?

দুলালচাঁদ বললে,—উচিত কথাই কইছেন কর্তাঠাকুর! সবই একাকার অইয়া যাইব। খুরওয়ালা জুতো পইর‍্যা মা সরস্বতী আমাগোর অন্দরমহলে ঢুইকবেন আর কি? হুঁ!

তর্করত্ন বললেন,—ঠিক কথা বলেছ দুলালচাঁদ! ইরেজী বিদ্যা কি আর পাড়াগাঁয়ে সয়? সর্বমাষ্টারের সঙ্গে আবার শম্ভুনাথ যোগ দিয়েছে।

কৃষ্ণপ্রসাদ বললেন,—তাই ত' ভাবছি, কি করা যায়? সর্বেশ্বর ছেলেগুলোকে আবার বশ করেছে।

তর্করত্ন বললেন,—বেটা ম্লেচ্ছ! আকাট ম্লেচ্ছ! না হিন্দু, না মুসলমান। খৃষ্টানও নয়। শুনেছি ও যীশুর সঙ্গে এক আসনে বসিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে পূজো করে। মেরী আর দুর্গার মূর্তি রাখে পাশাপাশি। ঘোর কলি বাবা, ঘোর কলি! ঠাকুরদেবতারও জাত মারলে তোমার সর্বমাষ্টার!

দুলালচাঁদ তর্করত্নের গড়গড়ার কল্কেটার উপর ফুঁ দিতে দিতে বললে,—আগুইনটা নিভ্যা যাইছে কর্তাঠাকুর! জোর টান লাগান।

তর্করত্ন দু'একটা টান দিয়ে বললেন,—সব মাটি হয়ে গেল দুলাল! হরেকে কল্কেটা বদলে দিতে বল।

হরে ওরফে হরিরামকে দু'একবার ডেকে দুলালচাঁদ কল্কেটা পাল্টে দিতে বললে। তারপর হাতমুখ নেড়ে বলতে লাগল,—হুঁ কর্তা! হেই কথাই কইলছি। আমি এক দিন গেছলাম সর্ব মাষ্টারের আশ্রমে। নিজের চোখে দেইখ্যা আইছি—যত সব খিরিস্তানী কাণ্ড। সব এক কইর‍্যা দিছে কর্তা ঠাকুর। সব এক কইর‍্যা দিছে সর্বমাষ্টার। আমাগোর বাবা মহাদেবর ছবির সঙ্গে যীশুর ছবি বওয়াইছে একটা বেদীর উপর। হুঁ, এ আবার পূজা?

তর্করত্ন তাচ্ছিল্যের সুরে বলে উঠেন,—পূজো করে সর্বমাষ্টার! হেঃ-হেঃ-হেঃ।

গড়গড়ার নলে দু' তিনবার জোর টান দিয়ে ধুঁয়া ছাড়েন বৃদ্ধ প্রসন্ন তর্করত্ন। দুলালচাঁদ বলে,—হুঁ! যা কইলছেন কর্তাঠাকুর! এ আবার পূজা? কিচ্ছু নয়, সব ভেল্‌কি! সব ভেল্‌কি! চৌখ দুইটা বুঁইজ্যা চুপ কইর‍্যা বইস্যা থাকে সর্বমাষ্টার। তারপর পাহাড়ীদের কি যে আবোল-তাবোল বুঝায়, বুইঝ্যা উইঠতে পাইরলাম না। হুঁ! ধিঙ্গি মাইয়াটার আবার কি না চটক! হুঁ!

তর্করত্ন ব্যগ্র হয়ে জিজ্ঞেস করেন,—তারপর কি হয়?

দুলালচাঁদ বলে,—হুঁ! আমার মাথা আর মুণ্ডু কর্তাঠাকুর। মাইয়াটা পেরসাদ বিলি করে।

তর্করত্ন বিস্মিত হয়ে বলেন—প্রসাদ?

দুলালচাঁদ উত্তর দেয়,—অয় কর্তা ঠাকুর পেরসাদ!

উত্তেজিত কণ্ঠে তর্করত্ন বলে উঠেন,—প্রসাদ বিলি করে সর্বেশ্বর মাষ্টারের মেয়েটা। আর সবাই তা খায়?

দুলালচাঁদ বলে,—তবে আর কইলছি কি কর্তা ঠাকুর! পরসাদ বিলির সময় কাড়াকাড়ি লেগে যায়, সব ছোড়াদের মইধ্যে। সে কি ঢলাঢলি কর্তা ঠাকুর!

তর্করত্ন বলেন,—তা হলে ফাঁদ পেতেছে বল! কি সর্বনাশ! আমিও শুনেছি সব। জাতধর্ম্ম আর রইল না। আমাদের মহাদেব না কি যীশুখৃষ্টের স্তবস্তুতি করছেন ওঁর পূজার ঘরে।

কৃষ্ণপ্রসাদ গম্ভীর ভাবে বললেন,—তার যা খুশী করুক। তাতে ক্ষতি নেই পণ্ডিতজ্যোঠা! কিন্তু ভদ্রপাড়ায় হাত বাড়িয়েছে সর্বেশ্বর মাষ্টার। এ আমি হতে দিতে পারিনে।

তর্করত্ন বললেন,—কি বললে বাবা! যা খুশী করবে! আমাদের ঠাকুর দেবতারও জাত মারবে সর্ব মাষ্টার?

দুলালচাঁদ বললে,—মাইরবার আর বাকী কি আছে কর্তা ঠাকুর! মাইর‍্যা দিছে। আমাগোর ঠাকুরদেবতার জাত মাইর‍্যা

দিছে সর্বনাইটার! ইস্কুলের ছেলেগুলা ত এক-একটা আস্তা কালাপাড় অইছে। কামিনী খুড়ার পুলা ওই মণীশাটা ত রাইতদিন ওইখানে পইড়্যা আছে। হুঁ!

তর্করত্ন বলেন,—এর একটা বিহিত কর কেষ্টপ্রসাদ!

দুলালচাঁদ বলে,—যত সব খিরিস্তানী কাণ্ড! হুঁ!

তর্করত্ন বলেন,—চারপো কলির তিন পো হয়ে এসেছে বাবা কেষ্টপ্রসাদ! আগে তবু সামলে-সুমলে চলে যাচ্ছিল। এখন তোমার ওই স্বদেশী ভূত আর টিঁকতে দেবে না। বাকী একপো পূর্ণ হয় আর কি!

কৃষ্ণপ্রসাদ উত্তর দিলেন,—আমি একা আর কত দিক সামলাব বলুন। আমাদের নিজের ছেলেরাই কথা শুনে না। ওদিকে আবার মুসলমান রাজা রয়েছে। সে-ই যত নষ্টের গোড়া! গলি রাজা ত জেলে পচে মরছে। তবুও তাঁর আক্কেল হল না।

তর্করত্ন বললেন,—আমাদের ধর্ম্ম গেলে ওঁদের কি বাবা! ওঁদের ধর্ম্ম ত' আর যাবার নয়।

হঠাৎ কোথা থেকে শম্ভু এসে আলোচনায় বাধা জন্মাল। তাকে দেখে কৃষ্ণপ্রসাদের মুখের ভাব আরো গম্ভীর হয়ে উঠল। এই সেই শম্ভুনাথ। বেকার বকাটে শম্ভুনাথ স্বদেশী করে ঘুরে বেড়ায়। এই শম্ভুই এ-পাড়া ও-পাড়া ছেলেদের ক্ষেপিয়ে তুলে কি না সর্বনাশ ঘটিয়েছিল ক'মাস আগে। কৃষ্ণপ্রসাদ শম্ভুর কথাই ভাবছিলেন। তর্করত্নের কথাটা বোধ হয় শম্ভুর কানে গিয়েছিল; শম্ভু বললে,—কাদের ধর্ম্ম যাচ্ছে পণ্ডিতমশাই; আমাদের আবার ধর্ম্ম আছে না কি? পরাধীন যারা, তাদের আবার ধর্ম্ম কি?

দুলালচাঁদ বললে,—হুঁ! একটা কথার মত কথা কইছ শম্ভুভাই! আমাগোর আর ধর্ম্ম রইল কই? আংরেজী পড়া আর স্বদেশী ভূত আমাগোর ধর্ম্মর গলা টিইপ্যা মাইরছে।

শম্ভু সহাস্যে উত্তর দেয়,—তোমার গলাটাও ঠিক আছে দুলালদা'!

তারপর কৃষ্ণপ্রসাদের দিকে ফিরে শম্ভু বললে,—আপনাকে একটা কথা বলতে এসেছি জ্যেঠামশাই, আমরা সদর থেকে ঘরে ঘরে চরকা বিলি করছি। তাতে আপনার আপত্তি কেন বুঝতে পারি নে!

কৃষ্ণপ্রসাদ বললেন,—আপত্তি? আমার আপত্তি থাকবে কেন? তবে বুঝলে বাবা! রাজত্বটা ত' আমার নয়, যাদের রাজত্ব তারা যেটা সুনজরে দেখে না, সেটা করতে আমি দিই কি করে?

শম্ভু বললে,—তাদের কোন আপত্তি থাকতে পারে না জ্যেঠামশাই! আমরা চরকায় সূতা কাটব, সেই সুতোয় কাপড় তৈরী করে পরব। তাতে তাদের আপত্তি থাকবে কেন?

কৃষ্ণপ্রসাদ বিদ্রূপের সুরে বললেন,—কাট না যত পার সুতো। কিন্তু লোককে হুজুগে মাতিয়ে তুলছ কেন? বলি,—সবাই যদি সুতো কাটতে লেগে যায়, মাঠে লাঙ্গল দেবে কে? মা-মাসিরা যদি চরকা নিয়ে বসে থাকে, হেঁসেলে ঢুকবে কে বাবা? এই করে কি দেশের উন্নতি হবে?

শম্ভু উত্তর দেয়,—নিশ্চয়ই হবে। সব কাজই চলবে; শুধু অবসর সময়ে সুতো কাটবে। দেশ স্বাধীন হবে, নিজের পায়ে দাঁড়াব আমরা।

কৃষ্ণপ্রসাদ শম্ভুর হাবভাব ও কথাবার্ত্তা শুনে স্তম্ভিত হন। তাঁকে গ্রাম সম্পর্কে জ্যেঠামশাই বলে ডাকে শম্ভুনাথ। লেখাপড়াও বিশেষ কিছু করেনি সে। সেদিনের ছেলে শম্ভুনাথ যে হঠাৎ এমন নায়েক হয়ে উঠবে, কৃষ্ণপ্রসাদ তা স্বপ্নেও ভাবেন নি।

তবুও আজকালকার ছেলে। ইংরেজের গুলীর সামনে বুক উঁচিয়ে দাঁড়ায়। তাই একটু সাবধান হয়ে চলতে হয়। কৃষ্ণপ্রসাদ বললেন,—বেশ ত বাবা! তোমাদের যা খুশী কর। রাসু বামনী, পদ্মপিসী যে চিরকাল চরকায় সুতো কেটে আসছেন, কেউ ত' কোন আপত্তি করছে না?

শম্ভুনাথ বললে,—এখন সবাইকে সুতো কাটতে হবে। তাহলে নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখবে সবাই। ঘরে ভাত আছে, ঘরে কাপড় হবে। বিলাতী কাপড় অচল করে তুলব আমরা।

কৃষ্ণপ্রসাদ বললেন,—সে ত' চিরদিনই হয়ে আসছে বাবা! আমাদের যুগী, তাঁতি আর জোলারা ত আর মরে যায়নি। তারা কত কাপড় যোগাবে বল? সবাই এখন বাবু সাজতে চায়। দশ হাত চুয়াল্লিশ, পঞ্চাশ-বাহান্নতেও বাবুদের কুলোয় না। তারা আবার খদ্দর পরবে? দিক্ দেখি, সাহেবরা কাপড় বন্ধ করে! কি হবে ভেবেছ কি?

দুলালচাঁদ বললে,—হুঁ! হি কথা ভাইব্যা কথা কও শম্ভুভাই! দিক্ দেখি,—সায়েবরা কাপড় বন্ধ করে। সব একদিনে বেবস্ত্র অইয়া যাইব না?

কৃষ্ণপ্রসাদের মুখে ক্রূর হাসি ফুটে উঠল। তিনি বলতে লাগলেন,—দুদিনের সখ দুদিনেই মিটে যাবে বাবা! বেশ ছিলে শহরে। মামাদের ধরে করে চাকরী বাকরী বাগিয়ে নাওগে। তারা যা হোক একটা কিছু জুটিয়ে দিতে পারবে। ভদ্রলোকের ছেলে হয়ে এমন ফ্যা-ফ্যা করে ক'দিন ঘুরে বেড়াবে। তোমার মায়ের কথাটা ভেবে দেখেছ কি?

দুলালচাঁদ বললে,—সইত্যি কথা শম্ভুভাই! বেগার খাইট্যা পরাণটা দিলে। নিজর কিছুই কইরলা না।

তর্করত্ন এতক্ষণ চুপচাপ ছিলেন। শম্ভুকে তিনি ভয় করেই চলেন। কি জানি গোঁয়ার ছেলেটা আবার কি করে বসে। সেবার তাঁর গলা থেকে উড়ুনিটা কেড়ে নিয়ে গিয়ে ফাল ফাল করে ছিঁড়ে দিয়েছিল। আর বলেছিল,—ওটা বিলাতী কাপড় পণ্ডিত মশাই! মদন তাঁতিকে বলব একটা উড়ুনি আপনাকে বুনে দেবে। গুণ্ডার সর্দার ছেলেটা!

তর্করত্ন বললেন,—বাবা শম্ভু! তুমি ত সদ্বংশের ছেলে বাবা! রাতদিন হুজুগেই মেতে আছ। দীননাথদার ছেলে কি না! তোমার বাবা ত' পরের জন্যেই সব উড়িয়ে-পুড়িয়ে দিয়ে গেল। আর তুমি—।

শম্ভু বাধা দিয়ে বললে,—আমার জন্য আপনাকে ভাবতে হবে না পণ্ডিত মশাই! দেশ উদ্ধার হলে সবই হবে। আপনার বাড়িতেও একটা চরকা দিয়ে এসেছি।

তর্করত্ন যেন আঁতকে উঠলেন,—অ্যাঃ! বল কি? আমার বাড়িতে চরকা কাটবে কে?

শম্ভু বললে,—কেন, সন্ধ্যা কাটবে?

শম্ভুর কথায় তর্করত্নের যেন মুখ শুকিয়ে গেল। তিনি বললেন,—

সে কি আর পারবে বাবা? কে শিখিয়ে দেবে তাকে? হতভাগী মেয়েটা কপাল পুড়িয়ে এসে আমার ঘাড়ে চেপে বসেছে। কি আর করব? কাশী কিংবা নবদ্বীপে পাঠিয়ে দেবো মনে করছি। দীর্ঘ নিশ্বাস ফেললেন বৃদ্ধ প্রসন্ন তর্করত্ন।

শম্ভু বললে,—মেয়েটার জীবন ত' আপনি পুড়িয়ে দিয়েছেন পণ্ডিতমশাই! এখন কাঁদলে কি হবে? এগারো বছরের মেয়ের সঙ্গে একটা পঞ্চাশ বছর বয়সের মাতালকে জুটিয়ে দিলেন।

দুলালচাঁদ বললে, হঁ! অদ্দিষ্টের লিখন্ ভায়া! অদ্দিষ্টের লিখন! কুল রাইখতে অইলে বছর রাইখবা ক্যামনে?

শম্ভু বললে,—তারও ব্যবস্থা করব আমরা। সন্ধ্যা ভাল সুতো কাটতে পারবে। কাঞ্চনগড়ে তাকে ট্রেণিং দিয়ে কাজে লাগিয়ে দেবো।

তর্করত্ন মনে মনে প্রমাদ গুণলেন,—কি বলে ছোঁড়াটা! সর্বনাশ হবে। কুলে কালি পড়বে। এমনি ত' যুবতী বিধবা মেয়েকে সামলে রাখা দায়! তার উপর সন্ধ্যা রূপসী। শম্ভুর মত ছেলেরা যদি পিছু লাগে তাহলে সোনায় সোহাগা হবে।

তর্করত্ন বললেন,—না বাবা শম্ভু! কাজ কি এ সব ঝঞ্ঝাটে গিয়ে। বামুনের মেয়ে বিধবা একাদশী করবে; ঠাকুর-দেবতার নাম করবে। পরকালটা ত' আছে। আর তোমার দিদিমাকে ত' জানই।

শম্ভু সহাস্যে উত্তর দেয়,—জানি বইকি? তাঁকে বুঝিয়ে বলেছি। তিনি রাজী হয়েছেন।

তর্করত্ন বললেন,—রাজী হয়েছে সন্ধ্যার মা?

শম্ভু জবাব দেয়,—হ্যাঁ! এই ত' আমি সন্ধ্যাকে চরকা দিয়ে দু'দশ মিনিট সুতো-কাটা শিখিয়ে এসেছি। বেশ শিখে গেছে।

শম্ভুর কথায় তর্করত্ন মাথা চুলকাতে লাগলেন। দুলালচাঁদ বললে,—পাইরবো না ক্যানে কর্তা ঠাকুর! আমার দিদি-ঠাউকরাইন যে সাক্ষাৎ দুগগা-পিরতিমা।

তর্করত্ন চুপ করে আছেন। এগার বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল সন্ধ্যার। বিয়ের পর পাঁচ-সাত মাসের মধ্যেই বিধবা হয়ে ফিরে এসেছে। বয়স তার বাড়ছে; ষোল-সতের হবে। এ রকম মেয়েকে সামলে রাখা যে কি দায়, তা ঐ চ্যাংড়া ছোঁড়ারা কি বুঝবে? রাস্তায় ঘুরঘুর করছে ছেলেরা! এমন কি তেরো-চৌদ্দ বছর বয়সের ছেলেরা পর্য্যন্ত তর্করত্ন-গৃহিণীর কাছে রাস্তার পর্য্যায়ে পড়ে। তবু এ কেমন করে হল? গৃহিণী মত দিয়েছেন! তর্করত্ন আকাশ-পাতাল ভাবেন।

শম্ভু বললে,—ভাবছেন কি পণ্ডিতমশাই! ভালই হল; একটা কাজ নিয়ে থাকলে বরং ভালই হবে। লেখাপড়াও শিখবে; গাঁয়ে গাঁয়ে আমাদের সেণ্টার খোলা হবে। মেয়েদের জন্য মেয়ে টিচার দরকার। সন্ধ্যার মত মেয়ে একাজ পারবে?

তর্করত্ন বললেন,—গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে বেড়াবে সন্ধ্যা? মাষ্টারনী সাজবে? কি বলছ শম্ভু? আমার মেয়ে খৃষ্টান হবে?

শম্ভু বললে,—খৃষ্টান হতে যাবে কেন পণ্ডিতমশাই! দেশের কাজ করবে; দশের সেবা করবে। এ একটা মহৎ কাজ।

তর্করত্ন বললেন,—এ রকম কাজের ত' লোকের অভাব নেই শম্ভু! এ গরীব ব্রাহ্মণের বিধবা মেয়েকে নিয়ে টানাটানি কেন? সর্বনাশ হবে।

তর্করত্ন ভয়ে কিংবা রাগে কাঁপতে লাগলেন তা বুঝা গেল না। দুলালচাঁদ হাঁক দিলে,—ওরে হরে! কল্কে দিয়ে যা। তারপর দুলালচাঁদ বললে,—সইত্যি কথা শম্ভু ভাই। বেরাম্ভনের বিধবাকে নিয়ে টানাটানি কেন? শহর থনে খিরিস্তান মাগী-টাগী জোগাড় কইর‍্যা লও।

তর্করত্ন বললেন,—তাই কর বাবা! তাই কর!

কৃষ্ণপ্রসাদ বললেন,—দেখো শম্ভু। আমি তোমার মায়ের মুখের দিকে চেয়ে অনেক সহ্য করেছি। দীননাথদা'র কথাও আমার মনে আছে। তুমি ঘরের ছেলে; তোমার শত দোষও আমাদের মার্জনীয়। কিন্তু সব জিনিষেরই একটা সীমা আছে।

শম্ভুনাথ বললে,—আমি ত' এমন কোন কিছুই খারাপ কাজ করিনি। জ্যাঠামশাই।

কৃষ্ণপ্রসাদ বললেন,—খারাপ কাজ বলব কেন? কিন্তু যা করছ, তার পরিণাম ভেবেছ কি? স্কুলের ছেলেদের ক্ষেপিয়ে দিলে; তারপর দুটি কচি বাচ্চা প্রাণ দিল পুলিশের গুলীতে। এখন এসেছ ঘরের বউ-ঝিকে ক্ষেপিয়ে বের করবার মতলবে। এটা কি ভাল কাজ?

শম্ভু বললে,—কোন অন্যায় কাজ ত' নয় জ্যাঠামশাই! দেশের জন্য তারা প্রাণ বলি দিয়েছে। আমাদের মা-বোনেরা যেদিন দেশের জন্য রাস্তায় বের হবে সেদিন সত্যই স্বাধীনতা আসবে।

কৃষ্ণপ্রসাদের ক্রুর হাসি—হাঃ! হাঃ! হাঃ! বেশ! বেঁচে থাকলে দেখতে পাব বাবা! কিন্তু একটা কথা, তুমি এ গাঁয়ে এসব করতে পারবে না। কাঞ্চনগড়ে তোমার সর্বেশ্বর মাষ্টার আর সুলেমান রাজার এলাকায় যা খুশী করোগে। পারবে সুলেমান রাজার অন্দর মহলে গিয়ে চরকায় সুতো কাটা শিখাতে? পারবে?

শম্ভু বললে,—নিশ্চয়ই পারব। জানেন মাষ্টার সাহেব গণিরাজা জেলে আছেন।

কৃষ্ণপ্রসাদ বললেন,—জানি। ওঁদের অন্দরমহলে যেদিন চরকা চালাতে পারবে, সেদিন এখানে এসো শম্ভুনাথ। নিজের হাতে সুতো কাটব।

[ক্রমশঃ।

"If I heard that Mr. Khrushev had started praising my policies I should retire to a little room and consider where I had gone wrong."

—*Dr. Adenauer.*

তাজা ঝরঝরে ও সুন্দর হয়ে উঠুন
হিমালয় বোকের সাহায্যে
GOVERNMENT LI
Cooch Behar
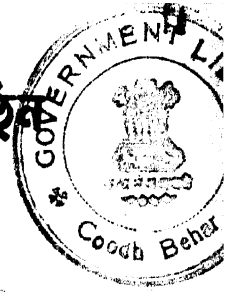
এই ঠাণ্ডা এবং স্নিগ্ধ স্নোটি
আপনাকে সুরভিত ও
সতেজ রাখবে।
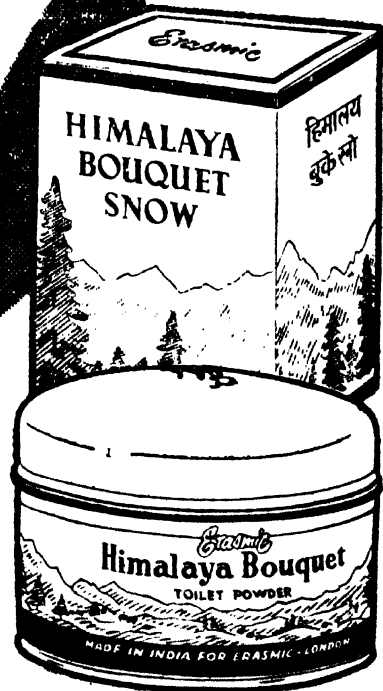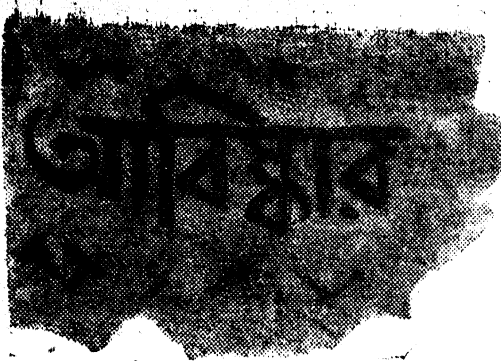
[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

ডক্টর এক্স

মেডিকেল কলেজে কমলের প্রথম বছরের চারটে টার্ম শেষ হয়েছে। এ্যানাটমির ডিসেকশন রুমে, দেওয়ালের ব্ল্যাকবোর্ডে আঁকা Brachial Plexus-এর ছবির তলায় নিজের টেবিলে বসে কমল নিবিষ্ট মনে ডিসেকশন করছিল। কয়েকজন ছাত্র কাছের সিংকের ধারে দাঁড়িয়ে সিগারেট খেতে খেতে কারণে অকারণে হাসাহাসি করছিল। দু'একদিনের মধ্যে কলেজ বন্ধ হবে তাই কাজে আর কারও বিশেষ উৎসাহ ছিল না।

একজন ছাত্র পাশের লেকচার থিয়েটারের দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকে খানিকক্ষণ এদিক ওদিক দেখে, কমলের কাছে এসে সে তার পিঠে হাত রাখল।

মুখ না তুলেই কমল বলল—এখন আমাকে ডিসটার্ব কোরো না ভাই, তাহলে এই ফাইন নার্ভ সব ট্রেস করতে পারব না।

ছেলেটি তাকে একটু ধাক্কা দিয়ে বলল—যাঃ, কলেজ বন্ধ হতে চলল কেউ কাজ করছে না ওঁরই যত কাজ পড়ল। এদিকে ফের। একটা সুখবর শোন!

এবার কমল হাতের ছুরিটা টেবিলে রেখে পেছন ফিরে জিজ্ঞাসা করল—সুখবর! কি সুখবর?

ছেলেটি উত্তর দিল—তুমি এ্যানাটমি একজামিনে ফার্স্ট হয়েছ।

—সত্যি? তুমি কি করে জানলে?

—নম্বর বেরিয়েছে। রেজিষ্ট্রারের অফিসে গিয়ে দেখে এলাম।

আর কিছু না বলে কমল আবার ছুরিটা হাতে তুলে নিল।

কিন্তু ছেলেটি তার হাত ধরে বলল—হয়েছে, খালি কাজ আর কাজ। ওসব এবার রাখ। আমাদের কবে খাওয়াচ্ছ বল। ছুটি তো হচ্ছে। আমরা কাশ্মীর যাচ্ছি। তোমার কি প্রোগ্রাম? চল না আমাদের সঙ্গে?

কমল উত্তর দিল—তুমি তো জান ভাই কোথাও বেড়াতে যাওয়ার মত অবস্থা আমার নয়। আমি ছুটি হলেই বাড়ী যাব। তবে বাড়ী যাবার আগে আমাকে একবার কানপুর যেতে হবে। আমার দাদা আজকাল ওখানে পোষ্টেড। আমাকে একবার যেতে লিখেছেন। আর খাওয়াবার কথা। ছুটির পর ফিরে এসেই তোমাদের খাওয়াব। চারটে বাজে। চল হষ্টেল যাই। আজ আর ডিসেকশন হবে না।

কানপুরে ক্যানাল রোড-এর উপর একটা বাড়ীর কাছে এসে যখন কমল এক্কা হতে নামল তখন বেলা পাঁচটা বেজেছে। বাড়ীর নিচের তলায় ডালের আড়তের লোকেরা রাস্তার ধারে পর্যন্ত ডাল ছড়িয়ে রেখেছে। বাড়ীর নম্বরটা পড়া যাচ্ছে না তবে বাড়ী চেনবার জন্য সমর তাকে ডালের আড়তের কথাটা লিখেছিল। ভাঙ্গা গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকে কমল একবার উপরে তাকিয়ে দেখল। একটা জানলা দিয়ে ওপরের ঘরের কিছুটা অংশ দেখা যায়। ঘরের মধ্যে দড়ির আলনায় সমরের র‍্যাপারটা ঝুলছে। ঠিক বাড়ীতেই সে এসেছে তাহলে।

ছড়ানি ডালের পাশ দিয়ে সন্তর্পণে পা ফেলে, জরাজীর্ণ সিঁড়ি দিয়ে কমল ওপরে উঠে দেখল সমরের ঘরের দরজা খোলা রয়েছে। সমর তাকে লিখেছিল, নিচের তলায় ডালের আড়তের লোকরা থাকে বলে তার দরজা সব সময় খোলা থাকে। তাই কমল যে কোনও সময়ে গেলেও তার কোন অসুবিধা হবেনা।

সমর অফিস হতে ফেরেনি। তার চাকরটাও আসেনি। এ কি ঘরে সমর থাকে!

ঘরের কোণে কোণে মাকড়সারা মনের আনন্দে জাল বুনেছে। ছাদের একটা কড়ি ভেঙ্গে পড়েছে বলে সেটা একটা বাঁশ দিয়ে ঠেকিয়ে রাখা হয়েছে। দেওয়ালে প্ল্যাষ্টারের চেয়ে ভাঙ্গা জায়গাই বোধ হয় বেশী। একটা ভাঙ্গা আলমারী, একটা টেবিল আর একটা ছেঁড়া দড়ির খাটিয়া ছাড়া ঘরে আর আসবাব নেই। পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখবার জন্যই বোধ হয় টেবিলের একটা পায়া ইঁট দিয়ে সোজা করে রাখা হয়েছে।

এই ঘরের সঙ্গে হষ্টেলের নিজের ঘরের তুলনা করে কমলের মন লজ্জায় সঙ্কুচিত হয়ে উঠল। মেডিকেল কলেজের নিরুদ্বেগ জীবনস্রোতে তাদের জন্য সমরের কৃচ্ছ্রসাধনের কথা কমল প্রায় ভুলে যেতে বসেছিল। আজকের এই নগ্ন দারিদ্র্যের রূপ সে কৃচ্ছ্রসাধনকে যেন চোখে আঙুল দিয়ে কমলকে দেখিয়ে দিল।

টেবিলের ওপরের একরাশ অঙ্ক আর ফিজিকস-এর বই-এর ওপর চায়ের ডিশ চাপা দেওয়া একটা কাগজের টুকরা কমল অন্যমনস্ক হয়ে তুলে নিল। আপনার লজ্জিত মনের পরিবর্তে এই কাগজকেই নিপীড়ন করে কমল নিজ উচ্ছ্বাসকে মুক্তি দিতে চাইল।

কিন্তু কাগজটা মুষ্টিবদ্ধ করবার আগে একবার তাতে চোখ বুলিয়ে কমল চমকে উঠল।

এ কি লিখেছে! এ কি লিখেছে সমর?

: কি বিশাল এই নক্ষত্রজগৎ! কতকোটি আলোকবর্ষ এর বিস্তার! এর তুলনায় মানুষের সুখ, দুঃখ, আশা আকাঙ্খার কথা কি অকিঞ্চিৎকর। আজ এই তারায় ভরা আকাশের তলায় দাঁড়িয়ে আমার মনে হচ্ছে, আমি যেন অতি ক্ষুদ্র, অতি তুচ্ছ। আমার যেন কোন মূল্যই আর নেই। নেই বলেই বোধহয় আমার জীবনের সর্বাধিক প্রিয়বস্তু বিশুদ্ধ জ্ঞানের চর্চাকে আমি এভাবে নষ্ট করতে পারছি। ফিজিক্স-এ কোন যুগান্তকারী আবিষ্কার করব এই আমার আশা ছিল। এর পথে অনেকদূর আমি এগিয়েও ছিলাম। আমি মাধ্যাকর্ষণ আর রিলেটিভিটি সম্বন্ধে এমন একটা তথ্য বার করেছিলাম যার সন্ধান Gauss, Reimann, Bolyaiiও পাননি। কিন্তু আজ বঝতে পারছি এতে কিছই হবেনা। আমার একবা

আবিষ্কার, ইনকামট্যাক্সের এই অন্ধকূপেই সমাধি হবে। এ নিয়তি, এ কারাগারের মধ্য হতে উদ্ধারের কোন উপায়ই আমার নেই।

লেখাটা পড়তে পড়তে কমলের মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। তাদের সংসারের জন্ত সময় অনেক ত্যাগ করেছে, এটা কমল জানত। কিন্তু সে ত্যাগের জন্ত সময়কে এত বড় মূল্য দিতে হয়েছে, এ কি তাদের সংসারে কেউ কল্পনাও করতে পেরেছিল ?

সময়ের ত্যাগের এই সত্যকে আবিষ্কার করে পৃথিবীর সব আনন্দ সমারোহ কমলের কাছে এক মুহূর্তে নিরর্থক হয়ে গেল।

পৃথিবীর ইতিহাসের খাতায়, আজকের দিনটির পাতা ছিঁড়ে ফেলে সব ভুলে যাবার জন্ত এক উদগ্র আকাঙ্খা সয়তানের মত কমলকে প্রলুব্ধ করতে লাগল। কিন্তু তার হাতের ছোট কাগজের টুকরাটিতে লেখা কয়টি লাইন সময়ের নিপীড়িত আত্মার ছবির মত তার সামনে দাঁড়িয়ে বলতে লাগল—

: ভুল কোরোনা, মহাপাপ কোরো না। সময়ের ওপর, সংসার, সমাজ যে অত্যাচার করেছে তার প্রায়শ্চিত্ত তুমি কর। সত্যকে অস্বীকার করতে যেও না। তাকে গ্রহণ কর। অনন্ত দুঃখের সমুদ্র আজ হতে তোমায় অতিক্রম করতে হবে, তার জন্ত প্রস্তুত হও।

হাতের কাগজের টুকরোটা চোখের সামনে তুলে ধরে কমল অবরুদ্ধস্বরে বলতে লাগল—না, না, এ আমি পারব না। এত ভার আমি কিছুতেই বইতে পারব না। তার চেয়ে—তার চেয়ে আমার মৃত্যুর দাম দিয়ে আমি সময়কে মুক্তি দেব।

বলতে বলতে সামনের বারান্দার কাঠের রেলিং-এর একটা ভাঙা জায়গার দিকে কমল মন্ত্রমুগ্ধের মত এগিয়ে গেল।

কিন্তু বারান্দায় পা দিয়ে তার মনে হল, শুধু সময়ের নয় পৃথিবীর সমস্ত অত্যাচারিত, উৎপীড়িত, বৈজ্ঞানিকের আত্মা যেন রেলিং-এর সেই ভাঙা জায়গাটার সামনে দাঁড়িয়ে তাকে বলছে,—নিবৃত্ত হও! ফিরে যাও। দেহ বিলুপ্তির অন্ধকারে আমাদের পথ দুর্গম না করে; ত্যাগ, সত্য, কর্মের অগ্নিতে আপনাকে দগ্ধ করে সেই শিখায় আমাদের পথ আলোকিত কর।

এক মুহূর্তের মৃত্যু দিয়ে নয়, জীবনব্যাপী মৃত্যুর মাঝে দাঁড়িয়ে আমাদের প্রতি অত্যাচারের প্রতিকার অন্বেষণ কর। প্রাণপণ চেষ্টায় নিজেকে সংযত করে কমল পায়ের কাছের ধুলা-বালির ওপর বসে পড়ল। আজ হতে মৃত্যুর ছায়ায় বাস করেও প্রতিনিয়ত তাকে মৃত্যুর হাত হতে বাঁচবার আকাঙ্খার সঙ্গে সংগ্রাম করতে হবে। সময়ের উপযুক্ত স্থানে, তার যথাযোগ্য মর্য্যাদায় তাকে প্রতিষ্ঠিত না করা পর্য্যন্ত, এই মরণাধিক যন্ত্রণা হতে সে আর কিছুতে মুক্তি পাবে না।

কলেজ-লাইব্রেরীর দোতলায় গোমতীর দিকের ছোট ব্যালকনিটায় কমল যখন এসে বসল তখন বেলা দুটো বেজেছে। সাধারণত: এই সময় লাইব্রেরীতে কেউ থাকে থাকে না, তা ছাড়া কলেজের ছুটির দিন নয় বলে লাইব্রেরী আজ একেবারে নির্জন।

কমলদের এ্যানাটমীর প্রফেসরের অসুখের জন্ত তারা প্রায় তিন ঘণ্টার লম্বা ছুটি পেয়েছে। মেডিকেল কলেজের ছাত্রদের পক্ষে এ রকম ছুটি একেবারেই দুর্লভ বলে তাদের ক্লাশের ছেলেরা দল বেঁধে বেড়াতে বেরিয়েছে। অন্ত সকলের সঙ্গে কমলও বেরিয়েছিল কিন্তু লাইব্রেরীর পাশ দিয়ে আসবার সময় নিজের রিসার্চের জন্ত বই পড়ার আকর্ষণ তাকে এখানে ঠেলে নিয়ে এল। যে রিসার্চ তাদের সর্বনাশের পথে নিয়ে যাচ্ছে নিজের প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্ত, তাকে কমল আজও আঁকড়ে ধরে আছে। শুধু তাই নয়, সময়ের দুর্ভাগ্যের কথা জানবার পর সে প্রতিজ্ঞা করেছে যে সময়ের ন্যায় অত্যাচারিত বৈজ্ঞানিক সমাজের উপর অন্যায়ের প্রতিকার দাবীর জন্ত এই রিসার্চের মধ্য দিয়েই সে প্রস্তুত হবে। আজ তার মত নগণ্য লোকের আবেদন কারও প্রাণে সাড়া জাগাবে না কিন্তু একদিন যখন সে রিসার্চ করে বড় হবে, খ্যাতি অর্জন করবে সেদিন তার কণ্ঠকে অস্বীকারের সাহস কারও হবে না। এই সংকল্পে প্রাণপ্রতিষ্ঠার জন্ত এক পা এক পা করে সে পিছন হতে সামনে এগিয়ে যাবে। কোন বাধাই আর তার পথ রুদ্ধ করতে পারবে না।

রিসার্চের জন্ত পড়াশুনা করতে লাইব্রেরীর এই নির্জন কোণে এসে বসলে, বই পড়তে পড়তে চোখ তুলে তাকিয়ে সামনের উন্মুক্ত প্রান্তরের প্রান্তে গোমতী ধারার শোভা দেখলে, কমলের মনে হয় যে শান্তি, যে নিশ্চিন্ততার সন্ধান সে চারি দিকে করছে, তারা যেন কখনও তাকে ছেড়ে যায়নি, তার যেন খুব কাছেই আছে, নিজের রিসার্চের মধ্য দিয়েই যেন কমল তাদের সন্ধান পাবে।

ভাদ্রের নির্মেঘ নীলার মত স্নিগ্ধ আকাশে, মদালস রমণীর মত রসভারাতুর অলসগমনা প্রকৃতিতে আজও কমল যেন সেই নিশ্চিন্ততার আভাস পাচ্ছে। পাশের পামগাছের ছায়া, সামনের টেবিলে

পেপারওয়েট চাপা দেওয়া একটা কাগজের ওপর এসে পড়েছে। সেদিকে তাকিয়ে, সমরের লেখা কাগজের টুকরোটা দেখা দিনের কথা আজ কমলের মনে পড়ল। সেদিনের পর ছয় মাস কেটে গেছে কিন্তু আজও কমলের সে দিনটা বড় কাছে মনে হচ্ছে। একটু চেষ্টা করলে পাশের পামগাছের পাতার মত সে দিনটা যেন সে স্পর্শ করতে পারে।

মধ্যের এই দীর্ঘ সময়ে সম্ভব অসম্ভব নানা উপায়ে কমল অর্থ উপার্জ্জনের চেষ্টা করেছে, যাতে সংসারের জন্য অর্থচিন্তার হাত হতে সে সমরকে অন্তত কিছুটাও রক্ষা করতে পারে। কিন্তু তার এই প্রাণান্ত চেষ্টাতেও কোন ফল হয়নি। পটে-আঁকা ছবির মত সে সব চেষ্টার কথা আজ এক এক করে তার মনে ভেসে উঠছে। পামগাছের ছায়া-ঘেরা এই কোণে বসে আজ গোমতী ব্রিজের নীচে শিবমন্দিরটার কাছে বটগাছতলার শীতল ছায়াচ্ছন্ন স্থানের কথা কমলের বড় বেশী করে মনে পড়ছে।

সন্ধ্যার অন্ধকারে, সেই ছায়ায় আপনাকে গোপন করে, সেখানে বসে বাঁশী বাজিয়ে, কত দিন কমল পথচারীদের কাছে অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করেছে। এ ভাবে অর্থ সংগ্রহের নিষ্ফলতার দিকের কথা সে সব দিন তার মনেই পড়েনি! সমরের জন্য একটা কিছু করতে হবে এই প্রেরণাই তাকে একাজের নিষ্ফলতা ও অপমানবোধের হাত হতে নিষ্কৃতি দিয়েছিল।

শুধু কি অর্থোপার্জ্জনই সেদিন তার লক্ষ্য ছিল?

তার যে মন আপন নিরুপায়তার গ্লানিতে অহোরাত্র হাহাকার করত, সুরের আনন্দস্রোতে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে আপনার অসীম লজ্জার স্পর্শ হতে সেও কি ক্ষণকালের জন্য নিস্তার পেতে চায়নি?

—বাবুজী বই এনেছি, এই বলে লাইব্রেরীর চাকর কমলের সামনে একরাশ বই রাখল।

চাকরের কথায় ও সামনের টেবিলে তার বই রাখার শব্দে কমল চমকে উঠল। এই বইগুলি হতে তাকে নোট নিতে হবে। ক্যানসারের ওপর এই বই কমল আজকাল বিশেষ করে পড়ছে।

চিকিৎসা-জগতের এই যে রহস্য যুগ যুগ ধরে মানুষের সব প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে আজও তার সংহার লীলা করছে, সে রহস্যকে জানবার চেষ্টাই কমল তার রিসার্চ্চের বিষয়বস্তু হিসাবে গ্রহণ করেছে।

চিকিৎসা-বিজ্ঞানে তার জ্ঞান এক সদ্যোজাত মানবশিশুর পৃথিবী সম্বন্ধে জ্ঞান অপেক্ষাও কম, কিন্তু যে উৎসাহ নিয়ে নবজাত শিশু তার চারিদিকের জীবনধারার রহস্য বুঝতে চেষ্টা করে, সেই কৌতূহল, সেই উৎসাহ নিয়ে, কমলও বিজ্ঞান-জগতের এই অদ্ভুত রহস্যের চারিদিকে ঘুরে বেড়াতে আরম্ভ করেছে। এ রহস্য-গৃহে প্রবেশের দ্বার একদিন তাকে আবিষ্কার করতেই হবে! সামনের খোলা বই-এর পাতা হাওয়ায় উলটে গিয়ে একটা সেল-এর ছবি বার হয়ে পড়ল।

সেল। চেতন জগতের মূলের এই ক্ষুদ্র বস্তুটি সাধারণ ভাবে বাড়তে বাড়তে হঠাৎ সমস্ত নিয়ম সংযমের বাইরে চলে গিয়ে কেন ক্যানসারের সৃষ্টি করে? হর্মোন? ভাইটামিন? হেরিডিটি? কি সেই জিনিষ যা সেলকে এভাবে উন্মত্তের মত বাড়তে প্রলুব্ধ করে?

চোখ বন্ধ করে সমস্ত চিন্তাশক্তিকে একাগ্র করে, কমল জিনিষটা ভাবতে চেষ্টা করল।

বাবুজী—বাবুজী!

বহু দূর হতে কমলকে কে যেন ডাকছে।

ষ্টিরয়েড হর্মোন। কোলেষ্টিরোল। মেথিলকোলানথ্রিন। এদের মধ্যেই কি ক্যানসার রহস্য সমাধানের ইঙ্গিত আছে?

আপনার মনে কমলকে কথা বলতে দেখে লাইব্রেরীর চাকর তাকে জিজ্ঞাসা করল—কি বলছেন বাবুজী?

কমল চোখ চেয়ে উত্তর দিল—কই তোমায় তো কিছু বলিনি? ক'টা বেজেছে জান?

—পাঁচটা প্রায় বাজে। লাইব্রেরী বন্ধ করব, তাই আপনাকে ডাকছিলাম।

—পাঁচটা বাজে? এতক্ষণ আমি এখানে বসে আছি?

—আপনি বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছিলেন বাবুজী!

—ঘুমিয়ে পড়েছিলাম? কি আশ্চর্য্য!

আমায় মনে হচ্ছে যেন এই বই, এরই কথা আমি ভাবছিলাম। যাক, এখানে তো আর পড়া হল না, এই বইটা আমায় ইস্যু করে দাও, হষ্টেলে নিয়ে গিয়ে পড়ব। বাকী বইগুলিও আলাদা করে রেখে দাও, কাল কিংবা তার পরদিন আমি আবার পড়তে আসব।

রাত দশটা বেজে গেছে। হষ্টেলের চাকর সকলের কাজ শেষ করে কমলের ঘরে এসে তাকে মশারি টাঙ্গাবার কথা জিজ্ঞাসা করল।

কোণে রাখা, ধূলায় বিবর্ণ মশারিটার দিকে তাকিয়ে কমল তাকে বলল—না, থাক। রোজ এই একই কথা চাকরকে বলতে হয়। রাত্রে সকলে শুয়ে পড়লে কমল নিজেই মশারি টাঙ্গায় আর ভোরে সবার ওঠবার আগে সে মশারি খুলে রাখে।

মশারির এক কোণে একটা বড় ফুটো হয়েছে, পয়সার অভাবে সেটাতে তালি দেওয়ান হয়নি বলে, এ গোপনতা।

চাকর চলে যাবার কিছুক্ষণ পরে ঘরের আলো নিবিয়ে কমল শুয়ে পড়ল। কাল সকালে তাকে তাড়াতাড়ি উঠতে হবে। সকাল সাতটার মধ্যে তাকে লক্ষ্ণৌ ইউনিভার্সিটির প্রফেসর সরকারের বাড়ী যেতে হবে। কমলের একটা চিঠির জবাবে তিনি তাকে ডেকে পাঠিয়েছেন।

দুদিন আগে কমল প্রফেসর সরকারকে সমরের রিসার্চ্চের কথা জানিয়ে একটা চিঠি লিখেছিল, তাঁর সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনার অনুমতি চেয়েছিল। সে চিঠির জবাবেই প্রফেসর সরকার তাঁর সঙ্গে কমলকে দেখা করতে বলেছেন।

ঘরটা বড় গরম মনে হচ্ছে। কিছুতে ঘুম আসছে না। বিছানা ছেড়ে উঠে মাথার কাছের জানলাটা কমল খুলে দিল। ঠাণ্ডা হাওয়ায় শরীর জুড়িয়ে যাচ্ছে। সমরের জন্য সত্যকার কিছু করতে পারার আনন্দে বাইরের তারায়-ভরা আকাশের মত তার মন পূর্ণ হয়ে উঠছে। সমরও হয়ত এখন জেগে আছে। Dirac Paradox-এর চিন্তা করে তারও হয়ত এখন বিনিদ্র রাত্রি কাটছে। সারাদিনের অসম্ভব কাজের পর, রিসার্চ্চের জন্য রাত্রের এই কয় ঘণ্টাই সমরের একান্ত নিজস্ব হয়ে থাকে। ছেঁড়া দড়ির খাটিয়ার ওপরের জীর্ণ শয্যার উষ্ণতা যখন তাকে মায়াবিনীর মত প্রলুব্ধ করে, বার বার চোখে জল দিয়েও যখন সে আর চোখ খুলে রাখতে পারেনা তখন হয়ত রাত্রি শেষ হয়ে আসে। পড়া ছেড়ে উঠে

দাঁড়িয়ে, বাইরের তারায়-ভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে সময় হয়ত তখন এমনি করেই আপনার দুঃখ ভুলতে চেষ্টা করে।

ঠাণ্ডা হাওয়ায় চোখের পাতা ভারী হয়ে কমলের কেমন ঘুম আসছে এমনি করে ঘুম এসে হয়ত তারও কষ্ট ভুলিয়ে দেয়।

জানলা খুলে রেখে, মশারির ফুটোয় তোয়ালে ঢাকা দিয়ে কমল শুয়ে পড়ল।

প্রফেসর সরকারের বাড়ী হতে বেরিয়ে কমল যখন রাস্তায় এসে দাঁড়াল, তখন দশটা বেজেছে।

এখান হতে হষ্টেল যেতে কমলের প্রায় আধ ঘণ্টা লাগবে। কোটের কলার উল্টে নিয়ে কমল হাঁটতে আরম্ভ করল।

থোবার্ণ কলেজের কাছে সারিবদ্ধ মোটরের একটির মধ্য হতে একটি মেয়েকে নামতে দেখে কমলের মনে হল, এই ধনীকন্যাকে কমল যদি কোন দিন কোন বিপদ হতে রক্ষা করে তাহলে বোধ হয় আর তার অভাব থাকে না।

রোমান্স নয়—মদিরতা নয়—সুখস্বপ্ন নয়—শুধু কিছু অর্থ। তার উপকারের বদলে যতটা অর্থ সমরের রিসার্চের জন্ম প্রয়োজন সেই অর্থ প্রার্থনা করলে কি মেয়েটি তাকে দেবে না? এ রকম ঘটনা কি সত্যকার জীবনে কিছুতেই ঘটতে পারে না?

বরফের মত ঠাণ্ডা হাওয়ার একটা ঝাপ্টা মুখে লাগতে কমলের দিবাস্বপ্ন শীতস্পর্শাতুর ফুলের মত সঙ্কুচিত হয়ে গেল। প্রচণ্ড শীতের এই রুক্ষ বায়ু তার মুখের চামড়া যেন চিরে দিতে লাগল। কোটের কাপড়ে মুখ ঢাকবার জন্ত পকেট হতে হাত বার করতে গিয়ে কমল দেখল, হাত দুটি আড়ষ্ট হয়ে উঠেছে। কোট পরে পর্য্যন্ত কমল হাত পকেট হতে বার করেনি।

ডাঃ সেনের একটা পুরান কোট নিজের মাপে কমল তৈরী করিয়েছে। আর সব ঠিক হলেও হাতটা ছোট হয়েছে, তাই কোট পরলে হাত সব সময়ে পকেটেই রাখতে হয়।

এই কোট আর একটা খাকী সুতির প্যাণ্ট পরে কমল প্রফেসর সরকারের বাড়ী গিয়েছিল। তাঁর সঙ্গে কথা বলার সময়ও কমল পকেট হতে হাত বার করেনি। কিন্তু তার অদ্ভুত পোষাক আর এ রকম অসামাজিক ব্যবহার দেখেও প্রফেসর সরকার তাকে অবজ্ঞা করেন নি। কমলের সঙ্গে তিনি অতি ভদ্র ব্যবহার করেছেন। সমরের রিসার্চের কথায় উৎসাহ দিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্ত সমরকে খবর দিতে বলেছেন।

এত দিনে হয়ত ঈশ্বর সদয় হয়েছেন। শীতের নগ্ন দীনতার পরে এবার হয়ত তাদের জীবনে বসন্তের পূর্ণতা আসবে। ছেঁড়া মশারির দৈন্ত ঢাকবার দিন হয়ত কমলের শেষ হতে চলেছে। ভাল করে তৈরী করান জামা-কাপড় পরে, কোটের পকেট হতে হাত সরিয়ে সকলের মত সে-ও হয়ত এবার সোজা হয়ে চলতে পারবে।

শীত কেটে গরম কাল এসে পড়েছে। হষ্টেলের বেশী ভাগ ছেলেই ছুটিতে বাড়ী গেছে। থার্ড আর ফোর্থ ইয়ারের কিছু ছাত্রকে

হাসপাতালে ডিউটির জন্ত থাকতে হয়েছে। এদের মধ্যে কমলও আছে।

হাসপাতালের কাজের পর মেস হতে খাওয়া সেরে কমল যখন হষ্টেলে এল তখন বেলা এগারটা বেজেছে।

চাকর রোজকার মত ঘর ধুয়ে দরজা জানলা বন্ধ করে গেছে। জানলা দরজার সবুজ কাচের মধ্য দিয়ে আসা ফিকে সবুজ আলোয় ঘরটা বড় স্নিগ্ধ মনে হচ্ছে। গানের সুরের মত সুন্দর এই পরিবেষ্টনে কমলের প্রথম যৌবনের আশা আকাঙ্ক্ষা যেন প্রাণ পেয়ে জীবন্ত হয়ে উঠছে।

তাদের সঙ্গে খেলা করতে, তাদের মধ্যে আপনাকে নিঃশেষে মিলিয়ে দেবার ইচ্ছায় কমলের সমস্ত সত্তা ব্যাকুল হয়ে উঠল।

কিন্তু সমরের জন্ত তার সংগ্রামের দুঃখময় স্মৃতির দংশন তাকে এটুকু সুখও আপনার করে নিতে দিল না।

প্রফেসর সরকার, সমরের সঙ্গে দেখা করে তার খুবই প্রশংসা করেছিলেন কিন্তু তিনি বহু চেষ্টা করেও তার রিসার্চের কোন সুবিধা করে দিতে পারেন নি। গত ছয় মাস ধরে উত্তর-ভারতের প্রায় সব বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে সমরের রিসার্চ সম্বন্ধে আলোচনা করে কমল এই একই ভাবে নিষ্ফল হয়েছে। ইন্‌কামট্যাক্সের চাকরী ছেড়ে সামান্ত ল্যাবরেটরী এ্যাসিস্‌ট্যান্‌টের কাজও সমর করতে প্রস্তুত ছিল কিন্তু তার সুযোগও সে পায়নি। অবজ্ঞা, উপহাস আর উপেক্ষা ছ'মাসে এই তারা সঞ্চয় করেছে! এসব কথা মনে হতেও এক অপরিসীম ক্লান্তি কমলকে আচ্ছন্ন করে তুলল।

কিন্তু সে আচ্ছন্নতার মধ্যেও তার মনে হল, বহুদূর হতে কে যেন তাকে বলছে—ওঠো, এখনও বিশ্রামের সময় তোমার হয়নি।

সেই নিষ্ঠুর অদৃশ্য কণ্ঠকে কমল মিনতি করতে লাগল,—একটু ঘুমাই, আমি যে আর পারছি না!

—পারতে তোমায় হবেই। ওঠ, ভেবে দেখ, সমরের জন্ত আর তুমি কি করতে পার।

—সবই তো করেছি, আর কোন উপায় যে আমি দেখতে পাচ্ছি না।

—ভেবে দেখ, খোঁজ, নিশ্চয়ই উপায় আছে।

—সমরের জন্ত কিছু করবার, কিছু দেবার আর কোন সম্বল আমার নেই!

—কিছু নেই? নিজের দেহটাও কি নেই? রকফেলার ইন্‌ষ্টিটিউটে হিউম্যান গিনিপিগ সম্বন্ধে কাল তোমাদের প্রফেসর যে লেক্‌চার দিয়েছিলেন তা কি ভুলে গেছ? রকফেলার ইন্‌ষ্টিটিউটে নিজের দেহদান করে তো তুমি সমরের রিসার্চের সুবিধা চেয়ে নিতে পার? ওঠ, এ সম্বন্ধে একটা চিঠি লেখ।

—তাই হবে। তাই করব।

অবচেতন মনের প্রদর্শিত এই সংকল্প স্থির করেও, শীতল শয্যার প্রশান্তিময় কোমল সুপ্তি হতে কমলের উঠতে ইচ্ছা করল না। সমস্ত শরীর ঠাণ্ডা সিমেণ্টের মেঝেকে জড়িয়ে থাকতে চাইল। তবু সেই অর্দ্ধজাগ্রত অবস্থায়, সরীসৃপের মত বুকে হেঁটে গিয়ে কমল জলের সোরাই রাখবার টুলটা ধরে উঠে দাঁড়াল।

চোখে-মুখে জল দিয়ে এ আচ্ছন্নতাকে দূরে সরিয়ে চিঠিটা সে এখনই লিখবে। যদি রকফেলার ইন্‌ষ্টিটিউট হিউম্যান গিনিপিগ হিসাবে তাকে গ্রহণ করে, তাহলে সমরের আর কোন অভাব থাকবে না।

বার বার চিঠি লিখে নষ্ট করে কমল যখন নিজের মনের মত করে চিঠিটা শেষ করল, তখন দ্বিপ্রহরকে পেছনে ফেলে দিন এগিয়ে গেছে। জুন মাসের অত্যুষ্ণ স্পর্শে তাপদগ্ধ পৃথিবী নির্জীব হয়ে পায়ের নীচে পড়ে আছে। চিঠিটা পোষ্ট করবার জন্ত হষ্টেল হতে বার হয়ে সেই উত্তপ্ত ধরিত্রীর স্পর্শে কমলের মনে হল, সৃষ্টির আদিতে সে যেন যাত্রারম্ভ করেছে; তার যাত্রা যেন কোন দিন শেষ হবে না। হষ্টেলের গেট পার হয়ে পোষ্ট অফিসের কাছে পৌঁছে, কমলের চোখের সামনে সব ঝাপ্‌সা হয়ে আসতে লাগল।

কাছের ঝাউগাছের পাশের ডাকবাক্সটা সবুজের ওপর লাল ছোপের মত মনে হতে লাগল।

আগুনের মত গরম সেই ডাকবাক্সের ওপর হাত বুলিয়ে চিঠি ফেলার কাটা জায়গাটা খুঁজতে খুঁজতে কমল আপনার মনেই বলতে আরম্ভ করল, আমি ভয় পাইনি। একটুও ভয় পাইনি।

চুপ···

কমলের মনে হল, চিঠি বাক্সে পড়ার শব্দটা বাক্সের গণ্ডী ছাড়িয়ে পাশের ঝাউগাছটার উপর দিয়ে আকাশের এক কোণে চলে যাচ্ছে। এত ধীরে যাচ্ছে শব্দটা যেন তার পেছনে দৌড়ে সেটাকে ফিরিয়ে আনা যায়। কমলের মনে হল লক্ষ লক্ষ কোটি যুগের, অনন্ত সময়ের সীমা পার না হওয়া পর্য্যন্ত তাকে যেন নিরন্তর শব্দটা শুনতে হবে।

সে শব্দের হাত হতে কমল যেন আর কোন দিন পরিত্রাণ পাবে না।

আশ্বিন মাস পড়েছে। রকফেলার ইন্‌ষ্টিটিউটে চিঠি লেখার সেই দিনের পর ছয় মাস গত হয়েছে। এক এক করে এই একশ আশী দিন উৎকণ্ঠা প্রতীক্ষায় কেটে গেছে কিন্তু কমলের চিঠির কোন জবাব আসেনি।

জীবনের এই দুর্ব্বহ ভারে পিষ্ট কমলের আজ-কাল আর কিছুই ভাল লাগে না। কেবলই কোথাও পালিয়ে যেতে ইচ্ছা করে। কিছুদিন নিশ্চিন্ত অবসর ভোগের জন্ত তার প্রাণ সর্ব্বদা উন্মুখ হয়ে থাকে। ক্যালেণ্ডারের পাতায় লাল কালিতে ছাপা ছুটির দিনের দিকে তাকিয়ে মনে পড়ল পূজা এসে গেছে। পূজার ছুটিতে পড়াশুনা করবার জন্ত তারা হষ্টেলেই থাকে বলে ছুটির কথা কারও মনে বিশেষ দাগ কাটে না। এবার আর কমল কিছুতেই হষ্টেলে থাকবে না ছুটির সময়। ছুটিতে বাড়ী গিয়ে অন্ততঃ কিছুদিনের জন্তও এই দুঃখের বোঝাকে সে নামিয়ে রাখবে।

পূজার ছুটির আর দশ দিন আছে। ছোট ছেলের মত কমল দেওয়ালে দশটা দাগ কাটল। এই শৃঙ্খলকে এক এক করে মোচন করে সে দেশকালের বন্দিত্ব হতে আপনাকে মুক্ত করবে।

একটা—তিনটা—সাতটা—নটা—দশটা।

আজ শেষ দাগটিকে, তার শেষ বন্ধনকে কমল ছিন্ন করেছে। আজ তার মুক্তি। আজ সে বাড়ী যাবে।

তার পরমপ্রিয় স্থান, বাড়ীর ছাদের উত্তর দিকের শেওলা-ধরা কোণটি কি আজও একই রকম আছে?

আম আর সজিনা গাছের ছায়ায় ঢাকা সেই রমণীয় স্থানে বসে বই পড়তে পড়তে জীবনের কত অমূল্য মুহূর্ত্ত সে কাটিয়েছে!

কত আশা! কত স্বপ্ন! কত কল্পনা! তাদের কি এখনও কমল সেখানে পাবে?

আমগাছতলায় ভোরের সূর্য্যের আলোয় দাঁড়িয়ে যে বুড়া ভিখারী তার নিজেরই মত পুরান সারঙ্গী বাজিয়ে গান করত সে কি তার সুরের মায়ায় আজও কমলকে আহ্বান করতে আসবে?

তরুণ সূর্য্যালোক-স্নাত নবীন প্রভাতকে যে অশিক্ষিত-পটু জরাকম্পিত কণ্ঠ আশোয়ারীর সুরে বন্দনা করত, কমলের মন সুখে ভরে তুলত যে কণ্ঠ কি আজও তাকে এই দুঃখের সমুদ্র উত্তীর্ণ করে করুণা, শান্তি, আশার রাজ্যে নিয়ে যেতে পারবে?

বৃষ্টি হয়ে গেল এক পশলা!

কাশফুলের মত মেঘ আকাশের কোণে মিলিয়ে যাচ্ছে। জানলার পাশে লাল ফুলে ঢাকা ক্রীপারের নীচে সবুজ ঘাসের ওপর, সত্ত অভিমানযুক্ত নারীর হাসি অশ্রুর মত জলের ফোঁটা চিক্‌চিক করছে।

প্রকৃতির এই আনন্দস্রোতে তার দুঃখ-বেদনাকে মিলিয়ে দেবার জন্ত সুন্দরী সত্তস্নাতা নবযৌবনা পৃথিবী তাকে ডাকছে।

মানুষের মনের যে বীণাটা সুখে-দুঃখে সমান ভাবে বাজে, কমলের মনের সেই বীণায় বাজছে মল্লারের সুর।

ট্রেণের সময় হয়ে এল। এবার তাকে জিনিষপত্র গোছাতে হবে।

ভোরবেলা কমলের ঘুম ভেঙ্গে গেল। কম্বলটা সরে গিয়ে শীত করছিল, সেটা ভাল করে গায়ে জড়িয়ে বাঙ্ক হতে নেমে কমল দরজার কাছে দাঁড়াল।

শেষরাত্রির কুয়াশার পর্দা সরিয়ে অস্তগামী চাঁদের আলো পৃথিবীর স্পর্শ পাবার আপ্রাণ চেষ্টা করছে।

ট্রেণ গঙ্গার ব্রিজের উপর উঠছে।

নিষ্ঠুর দৈত্যের মত তার আগমন-শব্দ যেন প্রকৃতির কোলের সুখস্বপ্নমগ্না পৃথিবীকে বিভীষিকা দেখাতে চাইছে। দূরে চড়ায় বাঁধা নৌকার আলোও যেন সে শব্দে কেঁপে উঠছে।

ব্রিজ পার হল ট্রেণ। এবার ষ্টেশন, তার পরই বাড়ী।

কমলের ঘরে এসে তাকে চুপ করে বসে থাকতে দেখে মীরা জিজ্ঞাসা করল—এমন করে বসে আছ কেন দাদা? পূজা দেখতে যাবে না?

কমল উত্তর দিল—এইবার যাব। তোরা কি কেউ আমার সঙ্গে যাবি?

—না দাদা, আমি আজ আর এখন যাব না। আজ রাত্রে থিয়েটার দেখব, তাই সব কাজ এখনই সেরে রাখতে হবে।

—তবে আমি যাই, আর দেরী করব না।

প্রায় প্রত্যেক বাড়ী হতে লোকে পূজা দেখতে গেছে। পাড়াটা তাই আশ্চর্য্য ভাবে নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে কুকুরের ডাক ছাড়া আর কোন শব্দ শোনা যাচ্ছে না।

জ্যোৎস্নালোক-স্নাত এই নীরবতার সমুদ্রে নিজের পদধ্বনিও কর্কশ মনে হতে কাঁকরের রাস্তা ছেড়ে কমল পাশের মাঠের শিশিরে ভেজা ঘাসের উপর দিয়ে চলতে আরম্ভ করল।

সবুজ গালিচার মত ঘাসের উপর সন্তর্পণে পা ফেলে চলতে চলতে কমলের মন যেন জলভারানত মেঘের মত এক অনির্ব্বচনীয় সুখে ভরে উঠল।

তার মনে হল, যে কোন বৃহৎ, যে কোন মহৎ কাজের জন্ত প্রয়োজন হলে সে যেন বর্ষণরিক্ত মেঘের মতই নিজেকে এখনই নিঃশেষ করতে পারে।

কিন্তু এই ইচ্ছাই কি সত্য? তার একমাত্র মহৎ কাজ সমরের উপকারের জন্ত সে কি বিনা দ্বিধায়, মরণাধিক যন্ত্রণা সহ্য করেও এখনই আত্মদান করতে পারে?

হৃদয়াবেগের চিরশত্রু বিবেকের এ প্রশ্নকে কমল সর্ব্বশক্তি দিয়ে নিজের মন হতে মুছে ফেলতে চেষ্টা করল।

বিবেকের সঙ্গে সংগ্রামে আজও তার ভয় হয়। কেবলই মনে হয়, তার আদর্শের মধ্যে বোধ হয় কোন ছলনা আছে। এই ভয়, এই সঙ্কোচ, এই দ্বিধা যেন সে ছলনারই প্রকাশ।

হৃদয়াবেগ দুর্ম্মূল্য বস্তু কিন্তু যখন তাকে বিচার করে গ্রহণ করতে হয় তখন তার অপেক্ষা দুর্ব্বহ ভার সংসারে বোধ হয় আর কোথাও থাকে না।

অন্তমনস্ক হয়ে চলতে চলতে কমল যখন পূজাবাড়ীতে পৌঁছাল তখন আরতি শেষ হয়েছে। লোকজন ফিরে যাচ্ছে। গেটের পাশের আমগাছতলায় সানাই-এর দল যেখানে বসেছিল সেখান হতে একজন কমলকে বলল—খোদা হাফিজ বাবুসাব!

কমল ফিরে দেখল, যে লোকটি সানাই-এর সঙ্গে নাকাড়া বাজায় সেই তাকে একথা বলছে।

বহু দিন হতে এদের সঙ্গে কমলের পরিচয়। প্রতি বছর পূজাতে এরাই সানাই বাজাতে আসে। মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হবার আগে প্রত্যেক পূজায় এদের সঙ্গে কমলের দেখা হত; অনেক সুর, বাঁশী বাজানর অনেক কৌশল কমল এদের কাছ হতে শিখেছে।

সামনের জবাগাছের বেড়ার মধ্য হতে পথ করে তাদের কাছে গিয়ে কমল বলল—খোদা হাফিজ, তুমি ভাল আছ তো মিঞা? কত দিন পরে তোমায় দেখলাম।

সামনের কাঠের আগুনে হাতের তামাকের কলকেটা ঝেড়ে ফেলে সে বলল—সব দুর্গামাইকী কৃপা। এত দিন পরে আপনার সঙ্গে দেখা হল, আপনার কি খাতির আমরা করব? কি শোনাব আপনাকে?

—কল্যাণ।

ঝরাপাতার উপর বিছান, ছেঁড়া সতরঞ্চির এক পাশে বসে সানাই-এর সুরসৃষ্টি শুনতে শুনতে কমলের মনে হল, তা সামনের কাঠের আগুনের ধোঁয়ায় ম্লান জ্যোৎস্না, কল্যাণ সুরে মোহাচ্ছন্ন তাদের হৃদয়, বৃক্ষপত্রের মর্ম্মর, প্রত্যেকে যেন আপনা বিশুদ্ধ সত্তাকে আবিষ্কার করে তারই আনন্দে এক অপার্থিব অজ্ঞা লোকের সৃষ্টি করেছে। আমগাছতলার এই ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে সে অরূপ লোকের বিস্তার; তার ব্যঞ্জনা, তার পরিণতি!

স্বপ্নমায়ার সেই ক্ষণসৃষ্টি জগৎ, লঘুপক্ষ বিহঙ্গের মত যে ক্ষণেক বিশ্রামান্তেই নিজের যাত্রাপথে উড়ে চলে যাবে।

ইন্দ্রনীলমণির দ্যুতির মত সুখ-দুঃখের অতীত এই যে অনুভূ যাকে অনুভব করা যায় মাত্র কিন্তু ধরা-ছোঁয়া যায় না, তা মায়ায় মুগ্ধ আবিষ্ট কমল নিজের অনন্ত দুঃখকে সেইক্ষণে অবহেলায় অতিক্রম করে গেল! [ক্রমশঃ

কর্ম্মবীর মনোমোহন পাঁড়ে

অজয়েন্দুনারায়ণ রায়

তিন

গৃহবিবাদ বিস্তার লাভ করলো। তার পর যা হওয়া উচিত তাই আরম্ভ হ'লো। পাঁড়ে মহাশয় পৈতৃক সম্পত্তি বিভাগ বণ্টন করতে বাধ্য হ'লেন। যৎসামান্য একটা অংশ ভাগে পেলেন তিনি। বুঝলেন, এই সম্পত্তিতে তাঁর চলবে না। ছেলেপুলে মানুষ করাও হয়ে উঠবে না। নিজের পথ দেখতে হবে তাঁকে। মনে প'ড়লো রাজধানীর কথা। সেখানে গিয়ে কোন ব্যবসা-বাণিজ্য দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করতে সক্ষম হ'তে পারবেন। বালক পুত্রের সে দিনের কথা শোনা থেকেই যে সঙ্কল্প স্থির ক'রেছিলেন, দৃঢ় হ'লো সে সঙ্কল্প। বাড়ীর ছেলেপুলে সহ স্ত্রীকে নিয়ে রওনা হ'লেন কলকাতা। গ্রামের বাড়ী এক রকম বন্ধ। এক জন ভৃত্যের উপর বাড়ীর সম্পূর্ণ ভার দিয়ে এলেন কলকাতা।

১২৮৬ সাল। মনোমোহনের বয়স তখন সাত আট বৎসর মাত্র। এসেই পাঁড়ে মহাশয় দেখা করলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সঙ্গে।

বিদ্যাসাগর মহাশয় পাঁড়ে মহাশয়কে সাদর সংবর্দ্ধনা জানিয়ে পাঁড়ে মহাশয়ের প্রস্তাব শুনেই আশ্বাস দিয়ে বললেন—তুমি পণ্ডিত মানুষ, আবার বিদ্যা আলোচনা আরম্ভ করো আর কোন রকম একটা ব্যবসায়ও আরম্ভ করো। আর তাতেই কিছু উপার্জ্জন ক'রে সংসার চালাও। আমি মদনমোহনকে নিয়ে একটা ছাপাখানা খুলে বই-এর ব্যবসা সুরু ক'রেচি বোধ হয় শুনেচ? বিদ্যালয়পাঠ্য বই লেখো। তোমার সুদিন সমাগত, চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। তোমার বড় ছেলেটিকে আমার ইস্কুলে ভর্ত্তি করে দাও। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আশ্বাসবাণীতে সব অবসাদ, ক্লান্তি, বিরক্তি দূর হ'লো বীরেশ্বর পাঁড়ে মহাশয়ের। হৃষ্টচিত্তে ফিরে এলেন বাসায়।

মনোমোহনকে ভর্ত্তি ক'রে দিলেন মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউশনে। আর পাঁড়ে মহাশয় একখানা কাপড়ের দোকান খুলে তাঁর ক্ষুদ্র বাসায় অবস্থান করতে লাগলেন।

দোকানের নাম রাখা হ'লো 'নববাস'। সেই ক্ষুদ্র বালকের সাথে পরামর্শ ক'রে সব কাজ করতে লাগলেন। এ যেন মাড়োয়ারী বালক! এই বয়স থেকেই দোকান চালাতে জানে। ঐ বালকই পরামর্শ দিলো—বাবা এক দরে আমাদের কাপড় বিক্রয় করতে হবে, এতে কেও না নেয় সে-ও ভাল। আমাদের কিন্তু এক দরই চালাতে হবে। তখন দেশে এক দরের প্রচলন ছিল না। দোকানদার এক দাম বলে, গ্রাহক কিছু কম দিতে চায়, শেষ পর্য্যন্ত ঘষা-মাজা ক'রে গ্রাহকরা দাম স্থির ক'রে সওদা করে। এই ছিল সে দিনের প্রথা। ক্রমশঃ জানাজানি আরম্ভ হ'লো। দু'-চার জন বলতে লাগলো পাঁড়ে ব্রাদার্সের 'নববাস'এ এক দরে কাপড় বিক্রী হয়। দেখেই আসা যাক্ না। যারা দেখতে আসে তাদের কেও কেও কেনেনও কিছু কিছু কাপড়। বলাবলি করে পরস্পরে, দামও ত বেশী নেন না এঁরা! ক্রমে সকলেই বুঝলো, এঁরা এক দামেই কাপড় বেচেন, তবে ঠকান না কারুকে! দর কষাকষি ক'রে কেনার চাইতে এঁদের দোকানেই কাপড় কেনা ভাল। কোন ঝকমারি নেই।

দোকান বেশ জমে উঠলো। বীরেশ্বর বাবু তখন তাঁর নাবালক ছেলের প্রশংসা করেন বন্ধু-বান্ধবদের কাছে। আরও প্রশংসা করেন এই জন্য যে, খরিদদারের সঙ্গে কোন ঝামেলা করতে হয় না, বেশ শান্তির মধ্যেই কাজ চলে যাচ্ছে। আর দরাদরি করাটা পণ্ডিত-ব্রাহ্মণের কাছে গ্লানিকরও কম না।

'নববাস' ভবনে সন্ধ্যা হ'লেই পণ্ডিতমণ্ডলীর সমাগম সুরু হ'ল। তখন আলোচনায় মত্ত থাকেন পণ্ডিত বীরেশ্বর পাঁড়ে। মনোমোহনের বয়স তখনও দশ পার হয়নি। বাবার অবসর সময়ে কাজ চালায় মনোমোহনই। বিদ্যাসাগর প্রভৃতি পণ্ডিতগণ সে কালে বলতে বাধ্য হয়েছিলেন—তোমাদের মনু এক জন বড় ব্যবসাদার হবে। ঐটুকু ছেলে কেমন ঠিক ঠিক দাম বলে! একটু যদি ভুল-ভ্রান্তি হয়। ও ছেলে লেখাপড়া তেমন না শিখলেও মানুষ হবে। এই ভাবে চললো কিছু কাল। দু'-এক বছর ক'রে বড় হ'তে লগেলো মনু।

দারিদ্র্যের পীড়নে চিরবাঞ্ছিত দুর্গাপূজা তুলে দিতে বাধ্য হ'লেন পাঁড়ে মহাশয়। বাবার দুঃখ দেখে দুঃখিত হ'লেন মনু। এক দিন বাবার কাছে প্রস্তাব করলেন—বাবা, একটা বইএর দোকান খুললে হয় না? তের-চৌদ্দ বছরের ছেলের কথায় কান দিলেন না বাবা। মনের দুঃখে দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম ক'রেই কাল কাটাতে লাগলেন।

এমন দিনও গিয়েছে, বেলা একটা দেড়টা; তিন জন অতিথি এসেচেন দেশ থেকে পাঁড়ে মশায়ের বাসাবাড়ীতে। জিজ্ঞেস করলেন পাঁড়ে মশায় স্ত্রীকে—কি হবে?

তিনি বললেন—তবে আবার কি! তোমার আমার না হয় এ বেলা ভাত খাওয়া হবে না। জলটল খেয়ে কাটিয়ে দিলেই চলবে। এখন রান্না করতে গেলে অসময় হ'য়ে যাবে।

পাঁড়ের মশায়ের খুসী ধরে না।

তখন মনোমোহন বললে—কেন না, ছেলেদের সবারই এক মুঠো ক'রে ভাত, কিছু কিছু তরকারি কাটলে না কেন? তারা বুঝতো বাড়ীতে মানুষ এসেচে। বাড়ীতে মানুষ এলে ফেরাতে নেই। এখন থেকেই এটা বোঝা উচিত।

ভারী খুসী হন মনুর কথা শুনে পাঁড়ে মহাশয়। এ যেন ছেলের মুখে প্রবীণের কথা!

এই সব কথা যদি কোন ক্রমে সাহিত্যিকদের আসরে উঠতো তখন একটা সমালোচনা চ'লতো মনুকে নিয়ে। ভূদেব বাবু ব'লতেন—আমি ত অনেক দিন থেকেই এই সব কথা লিখে আসচি। আমার লেখার, আমার কল্পনার, আমার আদর্শেরই একটা প্রকৃষ্ট মূর্ত্তি!

সায় দিতেন কেশব সেনও। মুখে বলতেন—মর্ণিং শোজ দি ডে (Morning shows the day)। ওর মুখে একটা ছটা দেখতে পাও না? ও এক জন হবেই।

পনর-ষোল বছর বয়স হ'য়েচে মনোমোহনের। বাবাকে বুঝিয়ে রাজি করালেন বই-এর দোকান খোলা। বাবার নামে দোকান খোলা হ'লেও ঐ ছেলে মনোমোহনই দেখাশোনা করতে লাগলেন। দোকানের নাম রাখা হ'লো 'পাঁড়ে ব্রাদার্স'। বাবার কাছে এমন টাকা নেই যে তাই দিয়ে বই কিনে এনে বিক্রী করতে পারেন। অগত্যা বাধ্য হ'লেন মনু বাবু, বড় বড়

দোকানদারদের কাছ থেকে ধারে পুস্তক আনতে। বিক্রী হ'লে হিসাব ক'রে ঠিক সময়ে দাম দিয়ে আসেন। এমনও না আছে, ঠিক সময়ে দাম দিতে না পারলে অবিক্রীত পুস্তকগুলি নিজের ব্যাগে ভ'রে নিয়ে যেতেন মহাজনদের কাছে। সৎলোক ব'লে বীরেশ্বর পাঁড়ে মহাশয়ের খ্যাতি ছিল। তার ছেলের এই রকম ব্যবহারে পুস্তক ব্যবসায়ীরা খুব খুসী হ'তেন। এমন বিশ্বাস অর্জন ক'রেছিলেন মনোমোহন যে, পুস্তক ব্যবসায়ীরা বলতেন—মনু যদি বুই নেয়, দশ হাজার টাকার বই দিতে পারি, তার মুখের একটা কথায়।

অতি সামান্ত কমিশনে বই বিক্রী করতেন মনু বাবু। সেই জন্ত গ্রাহকের ভীড় লেগেই থাকতো তাঁর দোকানে। তাঁর সাধুতা আর ব্যবসায়-বুদ্ধি দেখে বিখ্যাত পুস্তক বিক্রেতা গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় প্রচুর ধারে বহু বই দিতেন তাঁকে বিক্রী করবার জন্ত। মনোমোহন থিয়েটারের মনোমোহন বাবুও মনু বাবুকে অশেষ শ্রদ্ধা করতেন। গুণী হ'য়ে বসু মহাশয় গানও রচনা ক'রেছিলেন শোনা যায়।

ব্যবসায় পরিচালনাতেই বেশীর ভাগ সময় দিতে হওয়ায় এনট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'তে পারলেন না মনু বাবু। মা-বাবা দুঃখ ক'রে বললেন—অনেক ভরসা ক'রেছিলাম তোর উপর মনু! তুই পাশ করতে পারলি না ?

মনোমোহনও সঙ্গে সঙ্গেই বললেন—বাবা, পাশ করতে পারলাম না আমি ঠিকই, তবে আমার উপর ভরসা ছাড়বেন না। পড়া আমার মাথায় ঢোকে না বাবা! পড়ি, কিন্তু মন বসে না, কেবল ব্যবসার কথাই মাথায় খেলে যায়।

বাবার জেদে মনু বাবুকে আরও একবার এনট্রান্স পরীক্ষা দিতে হয়েছিল। সরস্বতীর কৃপা তাঁর উপর হ'লো না। অকৃতকার্য্য হ'লেন দ্বিতীয় বারও। বুঝলেন তিনি, মাতা সরস্বতীর কৃপা তিনি পাবেন না। তখন মন-প্রাণ দিয়ে লাগলেন লক্ষ্মীর আরাধনায়।

একটু বয়স হয়েছে তখন মনোমোহন পাঁড়ে মহাশয়ের। সে দিনে বেশী বয়সে বিবাহ, বাঙলা দেশে কচিৎ কেউ করতেন। এক-আধজন দেখে-শুনে যেতে লাগলেন মনু বাবুকে। সে সময়ের বিদ্বান পণ্ডিত হাইকোর্টের উকিল সারদাপ্রসন্ন রায় মহাশয়ের স্ত্রী শচীন্দ্রবালা দেবী মহাশয়া মনোমোহনকে দেখে খুব পছন্দ করলেন। মনে মনে স্থির করলেন, এ ছেলে পেলে বাঘডাঙা রাজবংশের একটি মেয়ের সঙ্গে এর বে' দিই। মনোমোহনকে তাঁর এত ভাল লেগেছে যে, তিনি বাঘডাঙায় তাঁর পিত্রালয়ে এসে প্রস্তাব উত্থাপন করলেন। বাঘডাঙা রাজবাটীর কন্তা তাঁর মাতা। রাজবাটীর কাছাকাছিই বাড়ী। তিনি তাঁর মাকে বললেন—একটি খুব ভাল পাত্র দেখে এলাম মা! ছেলে নিশ্চয়ই ভাল রকম উন্নতি করবে। তোমরা আমাদের বকুর সঙ্গে ওর বে দাও। বাঘডাঙার রাণী শুনে খুবই খুসী। তিনি তাঁর নিকট-আত্মীয় শ্রীশ বাবুকে ডেকে পাঠালেন দোহালিয়া থেকে। তিনি না কি ঐ অঞ্চলে পূর্ব্বেই সুখ্যাতি স্থাপন করাতে অনেকের সঙ্গেই তাঁর জানা-শোনাও আছে। তাঁকে পাত্র দেখতে যাওয়ায় অনুরোধ করায় তিনি রাজি হ'লেন।

শ্রীশ বাবু পাত্র দেখে এসে মত প্রকাশ ক'রে বললেন—ছেলেটি খুবই ভাল। স্বাস্থ্যও ভাল, দেখতে-শুনতেও মন্দ নয়। পাত্রের বাবা ত ও অঞ্চলের একজন খ্যাতনামা পণ্ডিত আর সজ্জন। তোমরা নিশ্চিন্ত হ'য়ে এ বিবাহ দিতে পার।

রাজা উপেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরী মহাশয়ের কন্তা শ্রীমতী জ্যোতিপ্রভা দেবীর সহিত মনোমোহন পাঁড়ে মহাশয়ের শুভ বিবাহ হ'য়ে গেল!

কয়েক জন ঝি-চাকর রাজকন্তার সঙ্গে এলো কন্তার শ্বশুরালয়। তাদের কিন্তু মন বসলো না দেখে শুনে। একে ত জামাই-এর তেমন গৌরবর্ণ নয়, পোষাক পরিচ্ছদও তেমন কিছু পরে না। খুঁটি ক'রে চুল ছাঁটা। জামাইয়ের আবার কয়েকটা ভাইও আছে। একা মালিক নয়। বিষয় সম্পত্তিও তেমন দেখায় মত কিছু নাই। এই সব দেখে-শুনে তারা ফিরে গিয়ে রাণীমাদের কাছে সব বললো। রাণীমারাও শুনে নৈরাশ্যের বেদনায় হাত-পা ছেড়ে দিয়ে পড়লেন বিছানায়। বললেন—শ্রীশ বাবুর কথায় তা হ'লে মেয়েটাকে গলা কেটে জলে ফেলে দিলাম। আমাদের জাতি তা হ'লে পড়লো এক হা-ভাতের ঘরে। এরই নাম অদৃষ্ট! পুঁটি হ'লো রাজরাণী। ভাবনার অন্ত নাই তাঁদের। কী আর করেন! বিবাহ ত উল্টাবার নয়। অগত্যা থাকতে হ'লো মনকে প্রবোধ দিয়ে আর ঐ বিধিলিপির দোহাই দিয়ে। তবু সে এক শোকাবহ ঘটনা সে দিনে রাজবাড়ীতে।

পুঁটি জ্যোতিপ্রভা দেবীর ছোট বোন। তাঁর বিবাহ হ'য়েছিল লালগোলার ছোট দেউড়িতে। ছোট দেউড়ির বাবুদের বাড়ীতে রাজোচিত সমারোহ। ঝি-চাকরের সংখ্যাও কম নয় আর সকলেরই পোষাক-পরিচ্ছদে আছে আভিজাত্যের ছাপ। তাই আপশোষটা হ'লো বেশী। এক বোন হ'লো রাজরাণী আর এক বোন হ'লো গৃহস্থ ঘরের গৃহিণী! এ কি কম দুঃখের কথা!

এ দিকে মনোমোহন বাবাকে ব'লে খুললেন তাঁতের কাপড়ের দোকান। বাপ বীরেশ্বর পাঁড়ে সাহিত্যচর্চ্চা নিয়েই থাকেন, আর কিছু তেমন দেখেনও না। সম্পূর্ণ ভারই এখন মনোমোহন পাঁড়ের উপর। দোকান চলতে লাগলো ছেলেরই উৎসাহে ও নিষ্ঠায়। তখন মনোমোহনের সারা মনে এসেছে অন্ত কোন ব্যবসায়ে ধন উপার্জ্জনের নেশা। প্রখর তাঁর ব্যবসায় বুদ্ধি। প্রথমেই বুঝে দেখলেন, নিজে না দেখে, না শিখে কোন বড় ব্যাপারে হাত দেওয়া ঠিক না। পড়তে আরম্ভ করলেন কনট্রাক্টরী। পরীক্ষা দিয়ে পাস ক'রে পেলেন লাইসেন্স। কিছু টাকা নিয়ে আরম্ভ করলেন কনট্রাক্টরী। এতে লাভ মন্দ নয়। তবে মনু বাবু তাঁর সহকর্ম্মীদের বলতেন—লোভের বশে বেশী লাভ করা চলবে না, নিজেকে বাঁচিয়ে ধর্ম্মরক্ষা ক'রে ক'রতে হবে কাজ, তার পর যা ভাগ্যে থাকে তাই লাভ হবে। এই নিয়ে প্রায়ই বাধতো তাঁর দলের লোকদের সাথে মনু বাবুর। তিনি ব'লতেন—বেশী হাঁ করলে আমার সাথে মিলবে না ভাই!

যাই হোক, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল অফিসের মস্ত বড় বাড়ী ভালভাবেই তৈরী ক'রে দেখিয়ে দিলেন বাঙালীর ছেলেও করতে পারে সুযোগ পেলে এমনতরো কাজ অনায়াসেই। বাড়ী দেখে সরকার থেকে আরম্ভ ক'রে সাধারণ লোকেও ভূয়সী প্রশংসা করতে লাগলেন পাঁড়ে মহাশয়ের।

পাঁড়ে মহাশয় দেখলেন, এ সব কাজে এতো চুরির সুযোগ আছে যা বলার নয়। এমন বহু সময় এসেচে যখন নিজেকে ধ'রে রাখা যায় না। তাঁর দলের লোকের কথা শুনলে আরও কয়েক সহস্র টাকা বেশী লাভ হ'তো। তাঁরা কেবলই বলেন মেটিরিয়াল কম দাও হে, গভর্ণমেণ্টকে বুঝিয়ে দিতে পারবে অক্লেশে। দু'এক হাজার বাজে খরচ ক'রে উপরওয়ালাদের সন্তুষ্ট করলেই চলবে। এ সব কাজ এই ভাবেই সবাই করে। বড় বড় কনট্রাক্টররা ফেঁপে ওঠে কেমন ক'রে, ব'লতে পারো?

একরোখা পাঁড়ে মহাশয় বললেন—না, না, তা হয় না। আমি ও সব নোংরামির মধ্যে যাবো না।

অন্য সকলে বলতে লাগলেন—এ কাজের যে নিয়মই এই। তুমি মত করো মন্নু, দেখিয়ে দেবো তোমাকে কত বেশী লাভ হয়।

প্রতিজ্ঞা ক'রে জানিয়ে দিলেন দৃঢ়চেতা মনোমোহন—আমি ভাই আর এ সব কাজে থাকবো না। আমার লাভের মোহ কেটে গেছে। এখন থেকে যা হয় তোমরাই করো। আমি আর তোমাদের ভিতর নেই।

বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন সকলেই ভেবেছিলেন এটা মন্নুর মুখের কথা মাত্র। এমন লাভজনক ব্যবসায় কি এক কথায় ছাড়তে পারে মনোমোহন?

বিস্ময়ে অবাক্ হ'লো সকলেই যখন তারা দেখলো, সত্যই সে টাকার মোহে বিচলিত হয় না, প্রতিজ্ঞা পালনে অসাধারণ তার দৃঢ়তা।

অনেক বাদানুবাদ চ'ললো, কিন্তু তাঁর এক কথা—যখন বুঝেচি এতে ছল-চাতুরী আছে, তখন এ ব্যবসায় আমি করবো না। বিবেক যাতে সায় দেয় না, তেমন কাজ আমায় দিয়ে হবে না।

হেমেন্দ্র মিত্র প্রভৃতি অনেক বন্ধু বহু চেষ্টা ক'রেও আর পেরে উঠলেন না মন্নু বাবুকে টলাতে।

মনোমোহন পাঁড়ে স্পষ্ট বললেন—টাকা উপার্জ্জনের জন্য আমি নিজেকে ছোট করবো না কোন দিন। যে ব্যবসায়ে টাকার জন্ম নিজেকে ভুলতে হয় সে ব্যবসায় আমার দ্বারা কোন দিন হবে না। ন্যায়ধর্ম্মকে জলাঞ্জলি দিয়ে টাকা রোজগার করতে আমি পারবো না।

তাঁর এই রকম আত্মপ্রত্যয়, এই রকম দৃঢ় মনোবল দেখে তখনকার দিনেও অনেকে অভিভূত হ'য়েছিলেন।

শেষে স্থির ক'রলেন তাঁর বন্ধুবান্ধবরা, ঐ ঠিকাদারী কাজ তাঁরাই চালিয়ে যাবেন, তিনি কিন্তু কাওকে কিছু ব'লতে পারবেন না।

তাঁদের এই প্রস্তাবে, হেসে মন্নু বাবু বললেন—আমি ও ব্যাপারে যখন আর থাকবোই না, তখন ব'লবো আর কি? যা ইচ্ছে তোমাদের করতে পারো। ন্যায়কে পদদলিত ক'রে অর্থার্জ্জনের অপচেষ্টা এক কথাতেই ত্যাগ করলেন তিনি।

তখন বাবার সাথে পরামর্শ ক'রে গেঞ্জির মেশিন আনা করালেন। বহু গেঞ্জি মোজা তৈয়ারী হ'তে লাগলো। সেই সব দ্রব্য বড় বড় দোকানে দোকানে দিয়ে এসে যা পেতে লাগলেন তাতে ভাল ভাবেই চলতে লাগলো সংসার। শঠতা নাই, কপটতা নাই, সঙ্গত মুনফা রেখেই বিক্রয় ক'রতে লাগলেন পাইকারদের কাছে তাঁর কারখানার গেঞ্জি-মোজা। মহাজনরাও সন্তুষ্টচিত্তেই নিতে লাগলেন তাঁর জিনিস। প্রতিষ্ঠাও হ'লো তাঁর কারখানার সুনামের।

তখন তাঁর বাবাকে মন্নু বাবু বললেন—আবার দুর্গামায়ের পুজো আনতে হবে বাবা! বৃদ্ধ পাঁড়ে মহাশয় পুত্রের এ প্রস্তাবে আনন্দে আত্মহারা হলেন।

তখন স্বদেশী আন্দোলনের ঢেউ সারা বাঙলা দেশকে ছেয়ে ফেলেচে। পিতা-পুত্রে পরামর্শ করলেন, দেশী কাপড়ের ব্যবসায় ক'রে কম দামে যৎসামান্য মুনফা রেখে চালু করতে হবে দেশী-কাপড়ের। এত কম মুনফায় সেদিন আর কেউ দিতে সক্ষম হননি দেশী-কাপড়। সুনাম ছড়িয়ে পড়লো কলকাতা সহরে।

আর একটা কঠোর প্রতিজ্ঞা করলেন—খদ্দর ছাড়া জীবনে কখন কিছু পরবো না, বিলিতী কোন জিনিস আমরা ব্যবহার করবো না। পিতা-পুত্র উভয়েই। সে প্রতিজ্ঞায় গভীরতা ছিল অপরিমেয়। উত্তরকালেও কেউ কখনো মনোমোহন পাঁড়ে মহাশয়কে বিদেশী বস্ত্রের পোষাক পরিচ্ছদ ব্যবহার করতে দেখেনি। তাঁর মুখের কথার দৃঢ়তা ছিল অনন্যসাধারণ। কথায় কাজে এতটুকু গরমিল ছিল না। যা বলবেন তা' তিনি অক্ষরে-অক্ষরে পালন করবেন এই ছিল তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। এতে যতো ক্ষতি হোক না কেন, সে দিকে দৃষ্টি দিতেন না। প্রায়ই বলতেন—কথার যার ঠিক থাকে না সে মানুষই নয়। আর একটা কথা প্রায়ই তাঁর মুখ থেকে শোনা যেত—নিজের কর্ত্তব্য কাজ ব'লে মন যাতে সায় দেবে, নিষ্ঠার সঙ্গে তা করবে। তাতে যত বাধাই আসুক, তাতে দৃক্‌পাত করবে না। এই যে আমি খদ্দর ধরেচি, হাজার লোক নিষেধ করলেও শুনবো না তাদের নিষেধ। আমি এটাকে গ্রহণ করেচি ধর্ম্ম ব'লে। খদ্দর ত্যাগে হবে একটা মস্ত বড় অধর্ম্ম।

তখনো মহাত্মা গান্ধীর যুগ আসে নি। দৃঢ়চেতা মনোমোহন বাবু নিজে উপলব্ধি করেছিলেন, আমাদের এই দরিদ্র দেশের লোকদের খদ্দর ব্যবহারকে ধর্ম্ম ব'লে গ্রহণ করা উচিত। আরও বুঝেছিলেন, বিলাসিতা পাপ, অধর্ম্ম। সেই জন্য সর্ব্বপ্রকার বিলাসোপকরণ ত্যাগ করতে তিনি হয়েছিলেন সক্ষম, অর্থের প্রাচুর্য্য সত্ত্বেও। সে দিনের বহু ধনাঢ্য অভিজাত ব্যক্তি ছিলেন তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু। তাঁদের বিলাসোপকরণ দেখলেও বিভ্রান্ত হননি তিনি কোনও দিন। তাঁর কাছে ও-সব ছিল অতি তুচ্ছ। গায়ে খদ্দরের মোটা জামা, পরিধানে খদ্দরের মোটা ধুতি, হাতে একখানা বাঁশের লাঠি, এই নিয়েই তিনি যে কোনও সভা-সমিতিতে হাজির হতেন। বহু লোকের বিস্মিত দৃষ্টি তাঁকে বিচলিত করতে পারে নি। এতে যে তাঁর সম্মান ক্ষুণ্ণ হবে সে চিন্তাও তাঁর মনে স্থান পায় নি কোন দিন। সম্মানের লাঘব হওয়া দূরে যাক্, এতে করেছিল তাঁকে অনন্য। এতে পেয়েছিলেন তিনি অসাধারণ শ্রদ্ধা সে দিনের দেশাত্ম-বোধ সম্পন্ন প্রত্যেকটি লোকের কাছে। তাঁর শেষ জীবনে আমরা তাঁর অনাড়ম্বর বেশ-ভূষা দেখে মুগ্ধ হতাম আর একটা আত্মপ্রসাদ অনুভব করতাম মনের গভীরে। আজও যেন প্রত্যক্ষ করছি তাঁর ভাব-গম্ভীর মাধুর্য্য-মণ্ডিত দেহশ্রী।
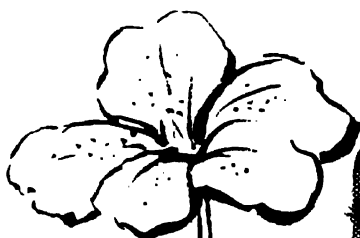
[ক্রমশঃ।

একমাত্র ক্যাডিলযুক্ত টয়লেট সাবান

P. 151-X 52 BG

রেক্সোনা প্রোপ্রাইটারী লিমিটেড এর পক্ষে হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড কর্তৃক ভারতে প্রস্তুত।

প্যার মিলঁ

গী ছ মোপাসাঁ

এক মাস ধরে আদিত্যদেব প্রান্তরে প্রান্তরে অগ্নি বিচ্ছুরিত করছেন। এই অগ্নিবর্ষণের ভেতরেই শুরু হয় কর্মমুখর জীবনের। যতদূর দৃষ্টি যায় প্রান্তরগুলোতে শুধু সবুজের সমারোহ। দিগন্তবিস্তৃত আকাশ সুনীল। নর্মানদের ছোট ছোট বাড়ীগুলোকে দূর থেকে মনে হয় যেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অরণ্য আর প্রক্ষিপ্ত পীচবৃক্ষগুলি যেন তাদের কটিবন্ধে রয়েছে আবদ্ধ। কীটদষ্ট দুয়ার খুললেই দেখা যায় প্রকাণ্ড উদ্যান গ্রামের কৃষকদেরই মত অস্থিচর্মসার প্রাচীন আপেলগাছগুলি ফুলে ছেয়ে গিয়েছে। ফুলের গন্ধ উন্মুক্ত আস্তাবল আর মুর্গীপূর্ণ আবর্জনাস্তূপের বিকট গন্ধের সাথে মিশে যাচ্ছে।

মধ্যাহ্ন। দরজার সম্মুখে পীচগাছের ছায়ায় বসে একটি পরিবার আহারে ব্যস্ত—বাবা, মা, চারটি ছেলে, দুটি পরিচারিকা আর তিনটি ভৃত্য। কেউ বিশেষ কথা বলছে না। সুপ খেতে খেতে ওরা আবিষ্কার করে যে ষ্টুয়ের পাত্রটি শুওরের চর্বি-মিশ্রিত আলুতে ভর্তি। মাঝে মাঝে একজন পরিচারিকা উঠে গিয়ে ভাঁড়ারঘর থেকে একটি পাত্রে করে মদ ভরে নিয়ে আসছে।

চল্লিশ বছরের একজন বলিষ্ঠ ভদ্রলোক বাড়ীর দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবছেন—একটি আঙুরগাছ জানালার তলা দিয়ে সাপের মত এঁকে-বেঁকে দেয়াল বরাবর চলে গিয়েছে।

গাছগুলিতে এবারে আগেই কুঁড়ি এসেছে—বোধ হয় অনেক ফলবে এবারে। ভদ্রলোকটি বললেন।

তাঁর স্ত্রী ফিরে তাকিয়ে দেখল নীরবে।—যেখানে প্যারকে গুলী ক'রে মারা হয়েছিল সেইখানেই আঙুর-গাছটিকে পোতা হয়েছে।

* * *

১৮৭০ সালের যুদ্ধের কথা। প্রুসিয়ানরা সমস্ত সহরটা দখল করেছে। জেনারেল ফে ড্যার্ব তাঁর উত্তর-বাহিনী নিয়ে প্রুসিয়ানদের সংগে লড়ছিলেন। একজন প্রুসিয়ান কর্মচারীকে তার দল-সমেত প্যার মিলঁ পীয়্যারের বাড়ীতে পাঠান হল। মিলঁ তাদের যথাসাধ্য অভ্যর্থনা করল। এক মাস ধরে জার্মাণদের একটি সেনাবাহিনী গ্রামের ভেতর পর্য্যবেক্ষণ করতে লাগল। ফরাসীরা ত্রিশ মাইল দূরে দাঁড়িয়ে। কিন্তু তবুও প্রতি রাত্রে কয়েক জন ক'রে জার্মাণ সংবাদ-সরবরাহকারী সৈনিক অদৃশ্য হয়ে যেতে লাগল।

সৈনিকদের গ্রামের ভেতর ঘুরে আসবার জন্ত পাঠান হত। যদি তারা দু'জন অথবা তিন জন করে একসঙ্গে বের হত তবে আর তারা ফিরে আসত না। পরদিন সকালে মাঠের ভেতর অথবা খানার ভেতর থেকে তাদের মৃতদেহগুলি বের করে নিয়ে আসা হত। তাদের ঘোড়াগুলিও তরবারির আঘাতে শিরশ্চ্যুত হয়ে রাস্তার উপর পড়ে থাকত। মনে হচ্ছিল, এই হত্যাকাণ্ডগুলি একই লোকের দ্বারা সম্পাদিত হচ্ছিল কিন্তু কেউ তাকে ধরতে পারছিল না।

সমস্ত সহরবাসীকে পীড়ন করা হল। সামান্ত কারণে কয়েক জন লোককে গুলী করে মারা হল। তাদের স্ত্রীদের বন্দী করা হল। ছেলেদের কাছ থেকে ভয় দেখিয়ে সত্য কথা বের করবার চেষ্টা করা হল। কিন্তু কোনই ফল হ'ল না।

একদিন সকালে মিলঁকে দেখতে পাওয়া গেল আস্তাবলের ভেতর পড়ে রয়েছে, মুখে গভীর ক্ষত। বাড়ী থেকে তিন কিলোমিটার দূরে দু'জন সংবাদ-সরবরাহকারী সৈনিককে দেখতে পাওয়া গেল পড়ে রয়েছে—আঘাতে উন্মুক্ত-জঠর তাদের। তাদের ভেতর একজনের হাতে তখনও রয়েছে রক্তাক্ত অস্ত্রটি। মিলঁ আঘাত পেয়েও বেঁচে গিয়েছে।

বাড়ীর সম্মুখে, খোলা জায়গায় বৃদ্ধ মিলঁকে ডেকে আনা হ'ল। ষাট বছর বয়স। কৃশ এবং ক্ষুদ্রকায় পাকানো শরীর। দীর্ঘ বাহু-যুগল কাঁকড়ার দাড়ার মত। চুলগুলো মলিন এবং পাখীর বুকের পালকের মত হাল্কা এবং বিরল কেশগুচ্ছের ভেতর দিয়ে মাথার সর্বত্র টাক দেখা যাচ্ছিল। বাদামী রঙের চামড়া ঘাড়ের কাছে কুঁচকে গিয়েছে। বড় বড় শিরাগুলিকে দেখা যাচ্ছিল চোয়ালের ভেতর দিয়ে কানের পাশে ফুটে উঠেছে। সহরের সবাই তাকে কৃপণ বলে জানে।

রান্নাঘর থেকে টেবিল বাইরে আনা হয়েছে। চারজন সৈনিকের মাঝখানে তাকে দাঁড় করান হল। তার সামনে বসে পাঁচ জন কর্মচারী এবং কর্ণেল সাহেব।

কর্ণেল ফরাসী ভাষায় বললেন: প্যার মিলঁ, যত দিন ধরে আমরা এখানে আছি শুধু তোমার প্রশংসাই শুনেছি। তুমি আমাদের প্রতি প্রসন্ন ছিলে এবং সর্বদা আমাদের যত্ন করতে কিন্তু আজ তোমার বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ আছে—সব খুলে বলতে হবে। বল, কি করে তুমি মুখে আঘাত পেয়েছ?

কোন জবাব দিল না সে।

কর্ণেল সাহেব বললেন—তোমার নীরবতাই অপরাধের সাক্ষ্য দিচ্ছে প্যার মিলঁ—তোমাকে জবাব দিতে হবে, শুনতে পাচ্ছ আজ সকালে ক্রশের কাছে দু'জন সৈনিককে মৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে, তুমি জান, কে তাদের হত্যা করেছে?

আমি। বৃদ্ধ পরিষ্কার জবাব দিল।

কর্ণেল সাহেব বিস্মিত এবং হতবাক হয়ে গেলেন মুহূর্তের জন্য-

কদৃষ্টে চেয়ে রইলেন বন্দীর দিকে। প্যার মিল নির্বিকার—মীন সরলতার ছাপ তার মুখে। মাটির দিকে তাকিয়ে—যেন বিধাতাকের সাথে কথা বলছে। একটি জিনিষ শুধু তার ভেতরের শান্তি প্রকাশ করে দিচ্ছে—সে বার বার ঢোক গিলছে যেন কণ্ঠরোধ হয়ে আসছে—বেশ পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল।

এই সরল মানুষটির পরিবার—অর্থাৎ পুত্র এবং পুত্রবধূ তাদের পশু-সন্তানসহ দশ-পা পেছনে বিমূঢ় ভাবে দাঁড়িয়েছিল।

কর্ণেল সাহেব বললেন—এক মাস ধরে রোজ সকালে আমাদের সংবাদ-সরবরাহকারী সৈনিকদের সহরের ভেতর মৃত অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায়, তুমি জান, কে তাদের খুন করে?

আমি।

—তুমি তাদের খুন করেছ?

—তাদের সবাইকে আমি খুন করেছি।

—তুমি একা?

—আমি একা।

—বল, কি করে খুন করলে?

এবার লোকটিকে যেন বিচলিত মনে হল। অনেকক্ষণ ধরে কথা বলতে হবে বলে বিরক্তির ভাব তার মুখে ফুটে উঠল। অস্পষ্ট জড়িতকণ্ঠে বলল—যেমন করে করবার করেছি।

কর্ণেল বললেন,—তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি, আমাকে সব খুলে বলতে হবে। কি করে তুমি শুরু করলে?

লোকটি পেছন ফিরে তার পরিবারের দিকে অপ্রসন্ন ভাবে তাকাল—ওরা সবাই তাকে লক্ষ্য করছিল। এক মুহূর্ত ইতস্ততঃ করে হঠাৎ বলতে শুরু করল—তোমরা যেদিন এলে পরদিন রাত দশটার সময় আমি ফিরে এলাম। তোমাদের পশুগুলোকে খাদ্য সরবরাহের জন্য তোমরা আমাকে কাজে বহাল করলে এবং বিনিময়ে পঞ্চাশ একু্য এবং ছুটো ভেড়া অতিরিক্ত দিতে রাজী হলে। কিন্তু হৃদয় চাইত অন্য জিনিষ।

একদিন দেখতে পেলাম, তোমাদের একজন অশ্বারোহী সৈনিক আমার ভাঁড়ারঘরের পেছনে ধূমপান করছে। ছোরাটা খুলে নিয়ে নিঃশব্দে তার পেছনে এলাম এবং এক আঘাতেই গমের শীষের মত মাথাটা কেটে ফেললাম—সে শুধু বলল—উঃ!—পুকুরের তলায় খুঁজে দেখতে পার একটা কয়লার বস্তার ভেতর তাকে দেখতে পাবে সঙ্গে একটা পাথরও আছে। একটা পরিকল্পনা মাথায় এল। আমি জুতো থেকে টুপী পর্য্যন্ত তার পোষাকটা খুলে নিয়ে গুহাবাসের ভেতর লুকিয়ে রাখলাম। বৃদ্ধ থামল। কর্মচারীরা পরস্পর পরস্পরের দিকে তাকাল।

• • • •

বৃদ্ধের শুধু একটি সঙ্কল্প—প্রুসিয়ানদের খুন কর। তাদের সে তীব্র ঘৃণা করে।

সে যখন খুসী নিজের ইচ্ছামত বাড়ী থেকে বের হতে পারত। বিজেতাদের প্রতি সে নম্র এবং প্রসন্নভাব দেখাত। বৃদ্ধ দেখতে পেল যে প্রত্যহ রাত্রে সংবাদ-সরবরাহকারী সৈনিকরা বেরিয়ে যায়। একদিন রাত্রে যে গ্রামে সৈনিকরা যাবে তার নাম জেনে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। সৈনিকদের সাথে মেলামেশার ফলে কয়েকটি জার্মাণশব্দ সে শিখেছিল—সেইটুকুই তার পক্ষে যথেষ্ট। বৃদ্ধ সৈনিকের পোষাকটা পরে নিল। মাঠের ভেতর উঁচু-নীচু জায়গায় বুকে হেঁটে লুকিয়ে লুকিয়ে এগোতে থাকে—বিনা অনুমতিতে অরণ্যে প্রবেশকারী শিকারীর মত উৎকর্ণ ঠিত—সামান্য শব্দটুকুও কান পেতে শোনে।

যখন মনে হল সময় হয়েছে, রাস্তার পাশে কাঁটার বনে লুকিয়ে রইল। সেখানে অপেক্ষা করতে লাগল। গভীর রাত—শক্ত রাস্তার ওপর ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনতে পাওয়া গেল—বৃদ্ধ মাটিতে কান পেতে শোনে নিশ্চিত হবার জন্য যে, একটি মাত্রই অশ্বারোহী এগিয়ে আসছে—তৈরি হয়ে নিল সে।

একজন অশ্বারোহী ছুটে আসছে জরুরী-বার্ত্তা নিয়ে। উৎকর্ণ—সজাগ দৃষ্টি। দশ-পা দূরে আসতেই প্যার মিল আর্তনাদ করতে করতে শরীরটাকে টেনে নিয়ে যেতে লাগল রাস্তার ওপর দিয়ে। জার্মাণভাষায় বলতে লাগল—সাহায্য কর, সাহায্য কর। অশ্বারোহী একজন জার্মাণ সৈনিককে পড়ে যেতে দেখে ঘোড়া থেকে নেমে পড়ল—কোন রকম সন্দেহ না করে আঘাতপ্রাপ্ত সৈনিককে যে ঝুঁকে দেখতে গিয়েছে অমনি মিল তার ছোরার দীর্ঘবাঁকা ফলাটা সৈনিকের পেটে ঢুকিয়ে দিল—সে পড়ে গিয়ে একটু ছটফট করেই স্থির হয়ে গেল—বৃদ্ধ এক অনির্বচনীয় আনন্দে উঠে পড়ল—নিজের খেয়ালে মৃতের গলাটা কেটে ফেলে একটা খানার ভেতর ফেলে দিল। প্রভুর জন্য অপেক্ষমান ঘোড়াটায় চেপে মাঠের ভেতর দিয়ে চলে গেল।

এক ঘণ্টা পর মিল দেখতে পেল, দু'জন জার্মাণ সৈনিক পাশাপাশি ঘোড়ায় চেপে বাড়ীতে ফিরছে। সাহায্য কর, সাহায্য কর। চীৎকার করতে করতে বৃদ্ধ সোজা তাদের দিকে এগিয়ে গেল। জার্মাণ সৈনিকের পোষাক দেখে ওরা কোনরকম সন্দেহ না করে বৃদ্ধকে তাদের কাছে এগোতে দিল—বৃদ্ধ গোলার মত ওদের ভেতর দিয়ে যাবার সময় ছোরা এবং রিভলবারের সাহায্যে দু'জনকেই খুন করল। তারপর সে জার্মাণ ঘোড়া দুটোকেও কেটে ফেলল। ধীরে ধীরে তার ভূগর্ভস্থিত গুপ্তাবাসে ফিরে এল এবং অন্ধকারের ভেতর একটা ঘোড়াকে লুকিয়ে রাখল। সামরিক পোষাক খুলে ফেলে তার সাধারণ গরীবের পোসাক পরে বিছানায় শুয়ে পড়ল এবং সকাল অবধি ঘুমোল।

চার দিন পর্য্যন্ত বের হল না। এই ঘটনার তদন্ত শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করল। পঞ্চম দিনে বের হয়ে একই কৌশলে আরও দু'জন সৈনিককে খুন করল। তার পর থেকে ক্রমাগত খুন করতে লাগল। প্রতি রাত্রে বৃদ্ধ শিকারের খোঁজে ঘুরে বেড়ায়। খুন করে মৃতদেহগুলিকে রাস্তার ওপর শুইয়ে রাখে, তারপর ভূগর্ভস্থ গুপ্তাবাসে ফিরে এসে ঘোড়া এবং সামরিক পোষাক লুকিয়ে রাখে।

মধ্যাহ্নে প্রসন্নমনে জল এবং যই নিয়ে আসে তার বাহনের জন্য। তাকে যেমন খাওয়ায় তেমনি তার কাছ থেকে কাজও আদায় করে।

যে দু'জনকে বৃদ্ধ আক্রমণ করেছিল, তাদের ভেতর একজন আগের দিন গুহার কাছে লুকিয়েছিল এবং বৃদ্ধ ফিরে আসতেই মুখে ছোরাঘাত করে। বৃদ্ধ গুহায় ফিরে এসে ঘোড়াটাকে লুকিয়ে রেখে তার সাধারণ পোষাক পরে—কিন্তু নিজের বাড়ীতে ফেরবার সময় দুর্বল বোধ করতে থাকে—কোন রকমে [illegible]

পৌঁছল কিন্তু বাড়ীতে পৌঁছতে পারল না। বৃদ্ধকে সেখানে দেখতে পাওয়া গেল খড়ের ওপর রক্তাক্ত শরীরে।

* * * *

কাহিনীটি শেষ করে হঠাৎ মাথা তুলে লোকটি গর্বভরে প্রুসিয়ান কর্মচারীদের দিকে তাকাল।

—তোমার আর কিছু বলবার নেই?

—না, আর কিছু না। হিসেব একদম ঠিক। আমি ঠিক ষোল জনকে খুন করেছি, বেশীও নয়, কমও নয়।

—তুমি জান যে তোমাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে?

—আমি তোমার করুণা প্রার্থনা করছি না।

—তুমি কি সৈনিক ছিলে?

—হ্যাঁ। আমার পিতাও প্রথম সম্রাটের সৈনিক ছিলেন এবং তোমরা তাকে খুন করেছ। আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র ফ্রাঁসোয়াকেও বিগত মাসে এভরোর কাছে তোমরা খুন করেছ। তোমাদের কাছে আমি ঋণী ছিলাম—সে ঋণ পরিশোধ করেছি। এখন আমরা মুক্ত।

কর্মচারীরা পরস্পর পরস্পরের দিকে তাকাল।

বৃদ্ধ বলে চলল—হ্যাঁ, আমার পিতা ও পুত্রের জন্য আমি মুক্ত। তোমাদের সঙ্গে ঝগড়া করতে চাইনে। তোমাদের আমি চিনি না এবং জানিও না, তোমরা কোত্থেকে এসেছ। তোমরা আমার বাড়ীতে যেন তোমাদেরই বাড়ীতে থেকে আমায় আদেশ করছ। যাক, আমি প্রতিশোধ নিয়েছি, এখন কোন অনুতাপ নেই।

বৃদ্ধ ঋজু দেহ সোজা করে দুই হাত আড়াআড়ি ভাবে রেখে বিনম্র নায়কের ভঙ্গীতে দাঁড়াল।

প্রুসিয়ানরা অনেকক্ষণ ধরে নিজেদের ভেতর কথা বলল। একজন ক্যাপ্টেন এই সরল মানুষটির পক্ষ সমর্থন করতে লাগল। সে-ও বিগত মাসে তার পুত্রকে হারিয়েছে।

কর্ণেল উঠে প্যার মিলঁর কাছে এগিয়ে গিয়ে নীচুগলায় বললেন—শোন বুড়ো, তোমাকে বাঁচাবার হয়ত একটা উপায় আছে, তা হচ্ছে—

কিন্তু সরল মানুষটি কিছুই শুনছিল না—দৃষ্টি তার বিজয়ী কর্মচারীর দিকে নিবদ্ধ—মাথার পাতলা চুলগুলো হাওয়ায় উড়ছিল—ভয়ঙ্কর মুখবিকৃতি করল সে—ক্ষত-বিক্ষত মুখটা সঙ্কুচিত করল, বুকটা ফুলিয়ে প্রুসিয়ান কর্মচারীর মুখে থুতু ছিটিয়ে দিল। প্রুসিয়ান কর্মচারীটি যেই হাত তুলেছে অমনি আবার সে থুতু দিল।

সমস্ত কর্মচারীরা হৈ-হৈ করে উঠল। এক মিনিটেরও কম সময়ের ভেতর নির্বিকার-চিত্ত বৃদ্ধকে দেয়ালের সাথে আটকে গুলীবিদ্ধ করা হল। বৃদ্ধ তার পুত্র, পুত্রবধূ এবং তাদের দুটি শিশুর দিকে তাকিয়ে হাসল—ওরা বিমূঢ় ভাবে দাঁড়িয়েছিল।

অনুবাদ: সুধীরকান্ত গুপ্ত

সংগ্রাম

সি, ডে, লুইস

উত্তাল সমুদ্র-তরঙ্গ
তাদের সূর্যকে আবৃত করেছে।
আর আমি জাহাজের ডেক থেকে
তাদের সাহস বজায় রাখতে গান গেয়ে চলেছি।

যেমন ঝড়ো মোরগ গান গায়,
বাতাসের বুক চিরে তাদের উত্তর
তারা বাতাসের দিকে ছুঁড়ে দেয়
এ যে নিঃশ্বাসের অবক্ষয়
অথবা, বসন্তের প্রশস্তি-গীতি
সে কথা তারা চিন্তাও করে না।

যেমন সমুদ্রগামী জাহাজ অগ্রসর হয়ে যায়,
সাহসের শেষ-রশ্মি পর্য্যন্ত
আগামী বন্দরের দিকে অগ্রসর হতে থাকে।

মেঘস্তরে, দূরদিগন্তে, সাংগীতিক শান্তি বিরাজিত,
সংগীতেই দুঃখের প্রগাঢ় প্রশান্তি,
গর্বেই তার শেষ আশ্রয় স্থল।

তবু আমি এখানেই বাস করি,
দুই বিরুদ্ধ শক্তির মাঝে আমার আবাস।

নিরপেক্ষতা আমাকে রক্ষা করে না
জীবন-সংগ্রাম আমাকে উজ্জীবিত করে না।

কোন কিছুই হয়তো বাঁচবে না;
নিরীহ পক্ষী শীঘ্রই নিহত হবে,
ব্যক্তিক তারকারাজি রক্তপ্রভাতে বিলীন হবে
সেইখানেই দুই পৃথিবী সংঘর্ষে মেতেছে!

জীবনের রক্তিম অগ্রগতি
দম্ভের জন্ম দেয়,
মানুষের রক্তের জন্যে তার নিয়তই চীৎকার
জীবন-সংগীত মুহূর্তেই পরিণত হয়
দুঃখের মৃত্যু সংগীতে!

তাহলে এবার নতুন আশা নিয়ে
এগিয়ে যাও,
কারণ যেখানে এত দিন আমরা গড়েছি সমাজ,
ভালোবেসেছি—তা আজ অরাজক,
কেবল প্রেতাত্মারাই দুই অগ্নির মধ্যে বাস করতে পারে।

অনুবাদক—মৃণালকান্তি মুখোপাধ্যায়

দিনন্দিন

গৌরী বিশ্বাস

রবিবারের সকাল। চৈতী আর গার্গী তেঁতুলের আচার হাতে চেয়ারে বসে পা দুলিয়ে চলেছে নিশ্চিন্ত ভঙ্গিতে। সেই সঙ্গে ওদের মধ্যে হাল-আমলের খ্যাতিমান এক জন চিত্রতারকার ঘরোয়া জীবন সংক্রান্ত মূল্যবান তথ্য সম্পর্কে বিতর্ক চলছিল। ও-দিকে কনিষ্ঠ মান্না আর পান্না পিতার সাময়িক অনুপস্থিতির সুযোগে মালবিকার বুকে-পিঠে ঝুলছে, পাশের ঘরে চন্দ্রা ঘণ্টাখানেক যাবৎ বিশ্বসংসার বিস্মৃত হয়ে কৃষ্ণাশীষের উদ্দেশ্যে পত্র-সাহিত্য রচনায় নিমগ্ন।

বাইরের ভেজানো গেটটা খুলে সাইকেল নিয়ে বাড়ী ঢুকলেন কিরণময়। দেয়ালের গায়ে সাইকেলটা হেলান দিয়ে রেখে, দু'হাত বোঝাই-করা জিনিষ-পত্র নিয়ে ঘরে এসে প্রবেশ করলেন!

সঙ্গে সঙ্গে স্প্রিং-দেওয়া দু'টো পুতুলের মতো সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে উঠল মান্না-পান্না। চৈতী আর গার্গীও ওদের গবেষণা আপাতত মুলতবী রেখে, চেহারায় একটা ক্ষিপ্র ভঙ্গি ফুটিয়ে এ-ঘর ও-ঘর জুড়ে অনাবশ্যক ঘোরাঘুরি আরম্ভ করে।

পাশের ঘরে ধ্যান ভঙ্গ হলো চন্দ্রারও এতক্ষণে। হাতের সবুজ প্যাড ও ঝর্ণাকলমটি বিছানার নীচে চাপা দিয়ে, এ ঘরে উঠে এলো সে-ও। পরিশ্রান্ত কিরণময়ের দিকে তাকিয়ে খুলে দিল ঘরের সিলিং ফ্যানটা।

কিরণময় চিরদিনই চটপটে, কর্ম্মঠ ও একটু ছটফটে স্বভাবের মানুষ। পুত্রকন্যারাও তাই সাধারণত পিতার উপস্থিতিতে নিজেদের যথাসম্ভব কর্মব্যস্ত প্রমাণিত করতেই তৎপর হয়ে ওঠে।

বিছানার ওপর হাতের সুদৃশ্য ব্যাগটা নামিয়ে রাখলেন কিরণময়,

উৎসুক চোখে তাকাল চন্দ্রা। ইতস্তত বিচরণ বন্ধ করে অনুসন্ধিৎসু চোখে এবার এগিয়ে এলো চৈতী, গার্গী। ব্যাগের মুখটা খুলতেই রকমারী ব্লাউজের ছিট ঝিকমিকিয়ে উঠলো ভেতর থেকে। মেয়েদের খুশীর উচ্ছ্বাস-ভরা মুখের দিকে পরিতৃপ্ত চোখে তাকালেন কিরণময়।

মান্না-পান্নার মনোযোগও যথাযোগ্য স্থানেই নিবদ্ধ দেখা গেল। অন্যান্য জিনিষের সঙ্গে আনা পায়রা দু'টো পর্য্যবেক্ষণ করছিল ওরা গোল গোল চোখে। ইতিপূর্ব্বেই দু'টো খরগোস এবং হাঁস, ছাগল ইত্যাদি মিলিয়ে ছোটখাটো একটি পশুশালা সংগঠন করেছে দু'ভাইতে মিলে।

মালবিকা বললে, যা তো গার্গী, এক গ্লাশ ঘোলের সরবৎ করে এনে দে উনিকে।

গার্গী প্রস্থানোদ্যত হলো। কিরণময় এরই মধ্যে বাইরে গিয়ে বারান্দার এ-মাথা ও-মাথা জুড়ে পায়চারী করতে আরম্ভ করেছিলেন। মালবিকার কথা শুনে আবার ঘরে এলেন এবং গলায় বার দুই কাশির মতো একটু আওয়াজ করে, মালবিকার প্রস্তাবিত ঘোলের সরবৎ বাতিল করে দিয়ে এক কাপ গরম চায়ের নির্দ্দেশ দিলেন গার্গীকে।

বিছানায় এসে দু'গালে হাত রেখে গুটিসুটি হয়ে বসলেন কিরণময়। একটু পরেই বললেন, বেশ একটু শীত-শীত করছে না? ফ্যানটা বরং বন্ধই করে দে চৈতী!

চৈতী ফ্যান বন্ধ করার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হচ্ছে দেখে মালবিকা বললেন, তুমি বরঞ্চ চাদরটা গায়ে জড়িয়ে বসো না? গরমে সর্দ্দি-গর্মি লেগে গেছে আমার। কথার সত্যতা প্রমাণার্থেই বোধ হয় উনি সঙ্গে সঙ্গে দু'-চারটে হাঁচিও দিয়ে ফেললেন।

ওদিকে পিতৃ অথবা মাতৃ-আজ্ঞা কোন্‌টি পালন করবে স্থির করতে না পেরে বিপন্ন মুখে দাঁড়িয়ে আছে চৈতী। চন্দ্রা উঠে গেল হাসিমুখে। ফ্যানের স্পীডটা কিছু কমিয়ে দিয়ে এসে বসল আবার। ওর মাঝামাঝি একটা রফা করার রকম দেখে হেসে ফেললেন দু'জনেই।

ইতিমধ্যে বাইরে দরজার কাছে সম্মিলিত কলকণ্ঠের একটা ঢেউ উঠলো। এবং পরক্ষণেই বিরাট একটি বাহিনী সঙ্গে নিয়ে বাড়ী ঢুকলো মেজ মেয়ে সাগরী। এলোমেলো ভঙ্গীতে শাড়ী পরা, আঁচলের একটি প্রান্ত কোমরে জড়ানো। উড়ন্ত একরাশ চূর্ণকুন্তল, কপালের ওপর জেগে-ওঠা বিন্দু বিন্দু স্বেদে বোঝা গেল ওর দৈনন্দিন কর্ত্তব্য-তালিকার কিছুটা অংশ সমাধা করে ফিরলো।

সাধারণত কিছু সংখ্যক অনুচর পরিবেষ্টিত অবস্থায়ই সাগরীকে দেখতে সবাই অভ্যস্ত। কাজেই কেউ বিস্মিত হলো না। বিশেষত 'ফ্লাড রিলিফের' জন্যে পাড়ার একটা 'চ্যারিটি শো' তোড়জোড় চলেছে ক'দিন থেকেই।

মান্না-পান্নাকে সাইকেলটা ঝাড়ামোছার কাজে নিয়োজিত করে এসেছিলেন কিরণময়, কিছুক্ষণ যাবৎ ওদের আর কোন সাড়া-শব্দ না পেয়ে বেরিয়ে এলেন। চৈতীকে সামনে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, মান্না-পান্না কোথায় রে?

ওরা ছাগল নিয়ে পেছনের মাঠে গেছে বাবা।

না ! এই বৈরাগী ছুটোকে নিয়ে আর পারা গেল না। ডেকে আন তো—কাজ আছে। বলে নিজেই পা বাড়ালেন।

তুমি বসো বাবা, আমি দেখছি। তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল চৈতী। মান্না-পান্নার নামোল্লেখ শুনে সংশয়াপন্ন চিত্তে বেরিয়ে এলেন মালবিকাও।

মান্না-পান্নার জীবজন্তু-প্রীতি বাড়ীতে সুবিদিত। কিন্তু কয়েক পা এগিয়ে দূর থেকেই মাঠের মধ্যে যে দৃশ্যটি চোখে পড়ল, তাতে সংকৃত না হয়ে পারলো না চৈতী। রোদ্দুরটা বেশ চড়ে গেছে। দরদরিয়ে ঘামছে মান্না-পান্না। কিন্তু সে-সব তুচ্ছ করে খুঁটিতে বাঁধা ছাগশিশুর মুখের সামনে এক গোছা কচি ঘাস ধরে দাঁড়িয়ে আছে মান্না। অপর পাশে দাঁড়িয়ে কনিষ্ঠ পান্না তালপাতার একটি পাখার সাহায্যে জোর হাতে হাওয়া করে চলেছে অবলা জীবটিকে। ওরই মধ্যে এক ফাঁকে আবার পাশের বালতিটা থেকে দু'আঁজলা জলও ছিটিয়ে দিল ও'টার গায়ে।

চৈতীকে দেখে উৎসাহিত হলো মান্না-পান্না। পান্না বলল, গরমে ভোম্বলী কি রকম ঘামছে দেখেছো সেজদি ?

কিন্তু ভোম্বলীর জন্যে বিশেষ উদ্বিগ্ন বলে বোধ হলো না চৈতীকে। ওদের দু'জনকে ধরে নিয়ে চললো ও বাড়ীর দিকে। চৈতীর হস্তধৃত অবস্থায়ই পান্না বাঁ হাতে খুঁটি থেকে ভোম্বলীকেও খুলে সঙ্গে নিয়ে চললো।

মান্না-পান্নাকে দ্রুতপদে এদিকে আসতে দেখে মালবিকার দিকে ফিরে তাকালেন কিরণময়। মালবিকার উদ্দেশ্যে অপরাধী পুত্রদ্বয় সম্বন্ধে কিছু বলতে যাচ্ছিলেন উনি। ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই ক্যাঁচ. করে একটা আওয়াজ হলো গেটে। এবং পেঙ্গুইন সিরিজের একগাদা বই হাতে স্মিতমুখে এসে ঢুকলো জ্যেষ্ঠপুত্র সোমনাথ।

প্রসন্ন মুখে কিরণময় ঘুরে দাঁড়ালেন সে দিকে. কি রে সোমা, এলি ?

মান্না-পান্না সম্বন্ধীয় বক্তব্য বিস্মৃত হয়ে উনি প্রসঙ্গান্তরে মনোনিবেশ করাতে, স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে এবার ভেতরের দিকে পা বাড়ালেন মালবিকা।

কিসের একটা গন্ধ ভেসে আসছে রান্নাঘরের দিক থেকে। ত্বরিত পায়ে সেই অভিমুখেই রওনা হলেন উনি।

নিত্যকর্ম্ম থেকে মা'কে একটু অবকাশ দেওয়ার ইচ্ছায় ছুটির এই দিনটায় রান্নাঘরের ভার সাগরী নিয়েছে আজ। কিন্তু খুব একটা বিশ্বাস নেই ওকে। সংসারের পরিচিত অর্দ্ধ-পরিচিত গণ্ডীর নানা মানুষের হাজারো সমস্যা ও চিন্তার সমাধান প্রচেষ্টায় নিয়ত জর্জ্জরিত হয়ে আছে মেয়ের ঐ একটা মগজ। ওর সর্ব্বকর্ম্মে যথেষ্ট সমর্থন ও আস্থা থাকলেও, রান্নার মতো তুচ্ছ ব্যাপারে যে খুব বেশীক্ষণ মন স্থির করে বসে থাকতে পারবে, এমন আস্থা পোষণ করেন না মালবিকা।

মালবিকার অনুমান অমূলক নয়। ডালের কড়াটা উনুনে চাপিয়ে দিয়ে সেই অবকাশে পেছনের ছোট ঘরটায় তখন একটা খাতা-পেন্সিল নিয়ে আঁকজোক করছিল সাগরী। নিয়মিত মাইনে দাখিলের অভাবে কাদের বুঝি নাম কাটা গেছে স্কুলের খাতা থেকে। এবং যথারীতি সেই ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দের শিক্ষকতার দায়িত্বটিও বিনা দক্ষিণায় গ্রহণ করেছে সাগরী কিছুদিন যাবৎ। ওদেরই একটা জটিল জিয়োমেট্রির এক্সট্রার সমাধানে নিমগ্ন ছিল ও।

মালবিকা রান্নাঘরে ঢুকে দেখলেন, কড়ায় বসানো ডালটা বেশ ধরে উঠেছে। উচ্চ কণ্ঠে উনি বার দুই ডাকলেন সাগরীকে।

চৈতী গার্গী ছিল কাছে-পিঠেই। এসে উপস্থিত হলো উদ্ভাসিত মুখে। এক পাশে এসে দাঁড়ালেন কিরণময়ও। তাঁর বিব্রত মুখ দেখে মনে হলো, উক্ত কর্ম্মের দায়িত্বটি সাগরীর নয়, ওঁর নিজেরই। মান্না-পান্নাকে প্রতিকূল পরিস্থিতিতে রক্ষা করতে মালবিকা যেমন সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করে থাকেন, তেমনি কিরণময়েরও কেমন একটা অলিখিত দায়িত্ব আছে কন্যাদের সম্বন্ধে।

মুখ তুলে তাকালেন মালবিকা, ভাখো, তোমার মেয়ের কাণ্ড।

আহা, ছেলেমানুষ তো ! তুমি আর ওকে কিছু বলো না গো এখন। হতেই তো পারে অমন ভুল এক-আধ দিন। ব্যাপারটাকে লঘু করার প্রয়াস পেলেন কিরণময়।

মালবিকা যে সত্যিই তেমন একটা কিছু বলবেন, তা নয়। কিন্তু মা'র ঐ শান্ত চোখ দু'টির গম্ভীর চাউনিটুকুই যথেষ্ট গুরুত্ব বহন করে পুত্রকন্যাদের কাছে। দূর থেকে পরিস্থিতি লক্ষ্য করছিল সাগরী। অকুস্থলে পিতাকে উপস্থিত হতে দেখে আশ্বস্ত চিত্তে এগিয়ে এলো সে-ও।

ওদিকে আর কালক্ষেপ না করে ঘরে ফিরে এসে বালিশের নীচে থেকে অর্দ্ধপঠিত গল্পের বইখানা আবার বের করে আনলো চৈতী। মাঝপথে হস্তান্তরিত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় বইটি রেখে গিয়েছিল সবার চোখের আড়ালে। কিন্তু নিভৃত একটি কোণ বেছে বইটায় মনোনিবেশ করতে না করতেই একটা লেপের ওয়াড় হাতে সে ঘরে দেখা দিল গার্গী।

এই যে সেজদি, মা বললেন, এ'টা চট করে একটু সেলাই দিয়ে জুড়ে দিতে।

গার্গীর কথায় নিঃসন্দেহে চটলো চৈতী। স্থির চোখে কয়েক মুহূর্ত্ত ওর দিকে চেয়ে থেকে বলল, কেন, ওটুকু সেলাইও কি তোরা কেউ পারিস নে ?

কিছু না বলে ওর হাতের কাছে ওয়াড়টা রেখে, ফিক্ করে একটু হেসে দ্রুত পদক্ষেপে ঘর পরিত্যাগ করলো গার্গী।

চৈতী জানে প্রতিবাদ নিষ্ফল। এবং সেজন্যে দায়ী সে নিজেই। কেন না, গেল বছরে সেলাইয়ে একটা ডিপ্লোমা অর্জ্জনের পর থেকেই চৈতীর এই দুর্দ্দৈব। সেই থেকে বাজারের থলে সেলাই থেকে আরম্ভ করে টেনিস র‍্যাকেট, মায় বন্দুকের খাপ তৈরী করা পর্য্যন্ত বাড়ীর যাবতীয় সেলাই অনিবার্য্য ভাবে এসে পড়েছে ওর ওপর।

সতৃষ্ণ চোখে অর্দ্ধসমাপ্ত বইটার দিকে একবার তাকিয়ে সেলাইয়ের মেশিনটা খুলে বসলো ও। মিনিট পাঁচেক বাদে মুখ তুলতেই দেখতে পেল, গজমাপক ফিতে ও খাকী কাপড়ের একটা টুকরো হাতে ও'কে লক্ষ্য করেই এগিয়ে আসছেন কিরণময়। স্মিতমুখে তাকাল চৈতী পিতার দিকে। অনুমান করলো, নূতন ধরণের কোন একটা সেলাইয়ের এক্সপিরিমেণ্টে অচিরেই নামতে হচ্ছে ওকে।

বিকেলের দিকে আয়নার সামনে বসে অন্যমনস্ক ভাবে চন্দ্র পাউডার পাফ.টা বুলোচ্ছিল মুখে। ওকে পিত্রালয়ে রেখে কয়েক দিনের জন্যে অফিসের কাজে কলকাতার বাইরে গেছে কুকাশীষ

লিখেছিল, আগামী শুক্র অথবা শনিবারের মধ্যেই ফিরবে। কে জানে, হয়ত এই শুক্রবারেই ফিরবে—

চৈতীর কণ্ঠস্বরে কল্পনাস্রোতে বাধা পড়ল ওর। মুখ ফিরিয়ে দেখলো, আয়নার জন্যে অপেক্ষমান চৈতী-গার্গী মিটিমিটি হাসছে দুষ্টুমি ভরা চোখে। হাসিমুখে চৈতীর সুদীর্ঘ চুলের গোছা ধরে টান্ দিল চন্দ্রা। বলল, আয় তোরা, কেমন ষ্টাইলে খোঁপা বেঁধে দেব, চৌখ্‌স!

বিচিত্র ছাঁদে দু' বোনের কবরী রচনা করতে বসে পড়ল চন্দ্রা।

শোবার ঘরে বসে গার্গীর স্বরচিত কাবিতাগুচ্ছের পাতা ওল্টাচ্ছিলেন মালবিকা। প্রসাধন সেরে সেখানে এসে দাঁড়াল চন্দ্রা আর চৈতী!—আমরা একটু ছাদে যাচ্ছি, মা!

মুখ তুলে স্নিগ্ধ চোখে একবার তাকালেন কন্যাদ্বয়ের দিকে, বললেন, আচ্ছা।

ওরা ছাদে উঠে গল্পে মশগুল হতে না হতেই সিঁড়িতে চটির শব্দ তুলে চঞ্চল পায়ে এসে দেখা দিল সাগরীও। বিকেলের দিকে বেরিয়েছিল একটা বিশেষ কাজে। ওর পরিচিত দুঃস্থ একটি মেয়ের জন্যে কিছুদিন থেকেই ভাল একটা টিউশানির খোঁজে ছিল। সেই ব্যবস্থাই করে ফিরলো আজ এইমাত্র। পরিতৃপ্তির উদ্দীপ্ত রেশটুকু তখনো ছড়িয়ে আছে ওর শ্যামল মুখশ্রীতে।

স্মিতমুখে বোনের দিকে ঘুরে দাঁড়াল চন্দ্রা, কি রে, কোথায় কোথায় ট্যুর করে এলি আজ?

ওদের কথার মধ্যেই বাড়ীর দরজায় একটা ট্যাক্সি দাঁড়ানোর আওয়াজ হলো। কৌতূহলী চোখে ওরা ছাদের কার্ণিসে ভর দিয়ে দৃষ্টিক্ষেপ করলো নীচের দিকে।

গার্গী তখনো নীচেই ছিল। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলো গেটের সামনে। হাওড়া থেকে নববিবাহিত মাসতুতো বোন ললিতাদি' আর জামাইবাবু এসেছেন। এক নজর দেখে নিয়েই বাইরে এগিয়ে যাবার পরিবর্ত্তে তাড়াতাড়ি আবার ভেতরে ছুটলো গার্গী।

মা মা, ললিতাদি' আর নূতন জামাইবাবু এসেছেন। একদমে কথা শেষ করলো ও।

এদিকে কবিতাগুচ্ছের পাতায় মনোনিবেশ করার খানিক বাদেই তন্দ্রার আবেশে না কাব্যের ভাবাবেশে ঠিক বোঝা গেল না, মালবিকার চোখ দু'টি বেশ জড়িয়ে এসেছিল। গার্গীর কথায় চোখ দু'টো টান করে তাকালেন এবার।

গার্গী ওর পূর্ব্বের কথাগুলো পুনরাবৃত্তি করে বেরিয়ে গেল দ্রুত পদক্ষেপে, ছাদ থেকে নীচে নেমে চৈতী আর সাগরী ততক্ষণে বাইরের ঘরে ওঁদের ঘিরে দাঁড়িয়েছে।

আর এদিকে পাশের ঘরে তখন গরমের দরুণ খানিক আগে খুলে-রাখা ব্লাউজটার অনুসন্ধান করছেন মালবিকা। বিছানার এক পাশ থেকে নির্দ্দিষ্ট ব্লাউজটি উদ্ধার করে গায়ের সেমিজটার ওপর চাপিয়ে এবার বাইরের ঘরে এসে দাঁড়ালেন উনিও।

সবাই মিলে প্রচুর হৈ-চৈ, গল্প-গুজবের পর, ঘণ্টা দেড়েক বাদে বিদায় নিয়ে চলে গেল ললিতা আর দেবেশ, সন্ধ্যা হয়ে এসেছে ততক্ষণে, ধূলো-কাদা মেখে খেলার মাঠ থেকে ফিরে এলো পান্না। খানিক বাদে মাউথ অর্গান হাতে বাড়ী ঢুকলো মান্নাও।

চৈতী, গার্গীর পরীক্ষার আর খুব বেশী দেরী নেই। ছুটির দিন বলে সারাদিন পড়াশুনো তেমন কিছুই হয়নি। তার ওপর এতক্ষণের মনোরম বৈঠকটির পর আপাতত বিক্ষিপ্ত মনটাও বসতে চাইছে না পাঠ্যপুস্তকে। নেহাৎ বিবেকের দংশন অসহ্য হওয়াতে বোধ হয় এতক্ষণে টেবিলের দু'পাশের চেয়ারে মুখোমুখি বই খুলে বসল দু'জনে।

সন্ধ্যা দিয়ে শাঁখ বাজিয়ে বাইরের খোলা হাওয়ায় এসে বসলেন মালবিকা কিছুক্ষণের জন্যে। কিরণময় এদিক সেদিক ঘুরছিলেন এবং সেই সঙ্গে অনেক কিছু করেও যাচ্ছিলেন। বসে বসে সাইকেলটা পাম্প করলেন মিনিট পাঁচেক। তারপর বারান্দার ঈষৎ ঝুলে-পড়া তারটা চোখে পড়তেই সেটি খুলে আবার যথাস্থানে সন্নিবেশিত করলেন। টবে বসানো ফুলগাছটার শুকনো পাতাগুলো ঝাড়লেন কিছুক্ষণ। অতঃপর বারান্দার ইলেকট্রিক প্লাগটি খুলে সেটার প্রতি মনোনিবেশ করতেই স্মিতমুখে ডাকলেন মালবিকা, অনেক হয়েছে, এবারে এসে স্থির হয়ে একটু বসো তো।

হাসির আভাস জেগে উঠল কিরণময়ের সৌম্যমুখে। ধীর পদে এসে মালবিকার পাশের চেয়ারখানায় বসে পড়লেন। মুগ্ধকণ্ঠের মৃদু হাসি আর গল্পে প্রশান্ত সন্ধ্যাটি প্রতিদিনকার মতোই আজো মর্ম্মরিত হয়ে উঠলো।

সবাইকে খাইয়ে দাইয়ে রাত্রিবেলাকার পাট চুকিয়ে হাত-পা ধুয়ে এ-ঘরে আসতে আসতে বেশ রাত হয়ে গেল মালবিকার।

ঘরে এসে টুকটাক কাজ সেরে ঠাকুরের আসনে প্রণাম করে উঠে দাঁড়ালেন উনি। ঠাকুরের গলায় গার্গীর ভোরবেলাকার গেঁথে দেওয়া কুঁড়ির মালা পাপড়ি খুলেছে। সৌরভটুকু সারা ঘর জুড়ে ছড়িয়ে আছে যেন আশীর্ব্বাদের মতো।

ধূপদানীতে আরো দু'টো ধূপকাঠি জ্বেলে দিলেন কিরণময়। শুভ্রকান্তি মহাদেবের সৌম্যমূর্ত্তি, বরাভয়দাত্রী কালিকার প্রসন্ন আয়ত চোখের দিকে চেয়ে নিবিড় এক প্রশান্তিতে ভরে ওঠে মনটা।

পাশের ঘরের পরদাটা হাওয়ায় দুলছে। বিছানার দু' প্রান্তে বসে নিজেদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ের বোঝাপড়ায় ব্যস্ত মান্না-পান্না। উভয়ের মধ্যে গভীর সৌহার্দ্দ থাকা সত্ত্বেও মালবিকার পাশে শোওয়ায় অধিকার নিয়ে প্রতিদিনকার মতো আজো যথারীতি মতানৈক্য দেখা দিয়েছে।

অদূরেই চৈতী আর গার্গী কোন্ কৌতুকময় স্মৃতির রোমন্থনে কে জানে, পরস্পরে হেসে কুটিকুটি হচ্ছে। সোমনাথ, চন্দ্রা আর সাগরীর স্বতঃস্ফূর্ত্ত হাসি গল্পের তরঙ্গ ছোট ছোট প্রতিধ্বনি তুলছে ঘরে।

প্রশান্ত হৃদয়ে পরিপূর্ণচিত্তে পুত্রকন্যাদের হাস্য-গুঞ্জন মুখরিত সে ঘরের দিকেই পা বাড়ালেন দু'জনে।

দেয়াল-ঘড়িতে ঢং ঢং শব্দে তখন দশটা বাজছে। মান-অভিমান হাসি-গল্প-গানে প্রতিনিয়ত আন্দোলিত দৈনন্দিন জীবনের গতিশীলতার মধ্যে দিয়ে একটি পরিক্রমা শেষে আরো অনেক অনেক আশা উজ্জ্বল দিনের প্রতিশ্রুতি রেখে এগিয়ে চললো রাতের পৃথিবী।

—

শ্রীবিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্য

ভারত বিখণ্ডিত হয়েছে। বিখণ্ডিত হয় নি ভারতবাসীর মন। এখন যা বলবো, যাঁর কথা বলবো—দিল্লীর পথে আজও তাঁকে সবাই দেখতে পাবেন। কাহিনী নয়, সত্য ঘটনা। ফ্রন্টিয়ারের দরিদ্র মুসলিম চাষীর ছেলে হাসু কবে যে আমাদের বাড়ীতে প্রথম এসেছিল সে কথা কারুরই মনে নেই। একদিন এলো, হাসু ছাড়া যখন বাড়ীর সব কাজই অচল। গ্রামের জমির হাল ছেড়ে সে শহরের গাড়ীর ষ্টীয়ারিং ধরেছে। গাড়ীরই শুধু নয়। এ বাড়ীর হালও হাসুর হাতে।

রাত তখন গভীর। পরীক্ষার পড়া তৈরী করছিলাম। হঠাৎ ঘরে একটা ছায়া পড়ল। হাসু ঘরে প্রবেশ করল। চোখে তার আতঙ্ক, মুখে বেদনার ছায়া—

বললাম কি রে, এত রাতে যে?

হাসু নিস্তব্ধ।

প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করলাম।

হাসু আমার চোখের দিকে তাকালো।

বললাম, কি হয়েছে? হাসু—

হাসু আমাদের নাম ধরেই ডাকত। বলল, তোমরা আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছ? আমি তোমাদের কি করেছি? দু'হাত দিয়ে মুখ ঢাকলো। তারপর হঠাৎ শিশুর মতন রুদ্ধ ক্রন্দনের বাঁধ ভেঙ্গে দিল।

এ ত বড় বিপদ!

বললাম কি রে হাসু? কি হ'ল তোর? এত রাতে এমন ভাবে কাঁদছিস? কে বলেছে তোকে তাড়াচ্ছি?

আমি নিজে শুনেছি। বাবুজী বলেছেন।

বললাম, পাগল কোথাকার! তুমি ভুল শুনেছো। যাও ঘুমোও গিয়ে। রাত অনেক হয়েছে।

চিন্তায় পড়লাম। কি করা যায় এ পাগলকে নিয়ে। কথাটা অবশ্য নেহাৎ মিথ্যা নয়। টাকার টানাটানিতে গাড়ীখানা বিক্রী করা হবে। গাড়ীর সাথে সাথে হাসুকেও নেবে বলে পাঁচশো টাকা কমেই রবিনারায়ণকে গাড়ীখানা দেওয়া হবে।

খবরটা তাহ'লে ওর কানেও গেছে। গাড়ী কেনার পুরো কেরামতি হাসুর। বাড়ীর ছেলেমেয়েরা বড় হওয়ার সাথে সাথে হাসুর বিশেষ তেমন আর কোন কাজ ছিল না। হাসু গাড়ী চালানো শিখল। তার বায়নাতেই নানা সখ কেটে গাড়ীখানা কেনা হয়। অনটনের দিনে আজ গাড়ী বিক্রী ছাড়া আমাদের আর কোন উপায়ই যে নেই। ফ্রন্টিয়ারের সরল চাষী হাসু তার কি বুঝবে?

দেখলাম লুকোচুরি খেলে লাভ নেই। বললাম, জানো তো হাসুভাই, আমরা বড় লোক নই। গাড়ী কোথ থেকে থাকবে? তারপর দেখছো তো আমরা এখন আরও গরীব হয়ে পড়ছি। এখন ভয়ানক টাকার দরকার—জানো তো—আমার পড়াশুনোতে কত খরচ। তুমিই না জোর এনে বলতে আমার চৌদ্দ দরজা পাশ করতেই হবে। এখনও তো তার দু' দরজা বাকী। তাছাড়া ভয় কি, আমরা কি চিরকালই এ অবস্থায় থাকবো নাকি?

হাসুর চোখ ছলছল করে উঠলো। বলল, ক' দরজা বাকী? দুই? 'এতদিন পড়ছো চৌদ্দ দরজা হ'ল না?' তারপর নিজে থেকেই বলল, বল আমার কসম, তুমি দিনরাত পড়াশুনো করবে। খেল দেখতে যাবে না। কনটপলেসে হাওয়া খেয়ে বখত নষ্ট করবে না।
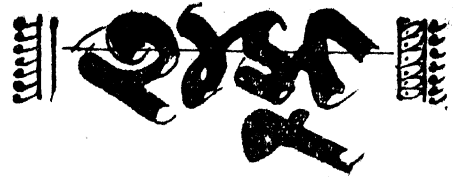
আমি মাথা ঝেঁকে বললাম হাঁা ভাই, প্রতিজ্ঞা করছি যাবো না।

তা হ'লে দু' সালের পড়া তোমার এক সালে খতম হবে তো?

বললাম, না ভাই, তা তো ইউনিভারসিটি মানবে না।

হাসু বুক বেঁধে বলল সে ভার আমার। মৌলবীটাকে আমি ম' নিয়ে নেবো।

আকাশ থেকে পড়লাম। বললাম, কোন্ মৌলবীকে রে?

—এ যে সেই বিলায়াত পাশ চশমা আঁটা—

বুঝলাম, ইংরিজী বিভাগের দত্ত সাহেবের কথা বলছে।

বললাম, একদিন বাড়ীতে দু'গজ কিকট দিয়েই তুমি এক বছর কমিয়ে নেবে। তা যে হয় না হাসু! এ যে কলেজের নিয়ম।

হাসু এবার নিরাশ হয়ে অন্য প্যাচ কষলো। সে বলল, তুমি দা'ভাই সাহেবকে বল না একবার যে হাসু ছাড়া আমাদের চলবে কেমন করে? আজকাল তোমরা সব বড় হয়ে গেছো, তাই কেউ আমাকে মানছো না।

বললাম, তুমি বুঝছো না। অন্য সময় হ'লে আমরা তোমার জন্যে লড়ে যেতুম। কিন্তু এখানে তুমি একশো পঁচিশ টাকা মাইনে পাবে। বিশিষ্ট সাহেবের গাড়ী চালাবে। ছুটির দিন বাড়ী আসবে।

হাসু বলল, সাহেবকে বললাম সাহেব কসুর মাপ। হাসুকে এক পাই হাত খরচা দিতে হবে না। সাম সুবো শুধু দু'খানা

শুকনো চপাতি। গাড়ী হাতছাড়া করো না। সাহেব বললেন, হাসু, মণি তো দু' বছর পরে বাড়ীর বাইরে কাজ করতে চলে যাবে। তুমি তো ওর বড়, তুমি যাচ্ছো—দু' বছর আগে। বাড়ী বসে বসে পঁচাত্তর টাকায় হাত খরচে তোমার কি হবে?

বাইরের কেউ হাসুকে মাইনে জিজ্ঞেস করলে হাসু তাকে খুন করতে যেত। মাইনে? মাইনে কেন রে? আমি কি চাকর? আমার হাতখরচ তোদের পাঁচ মাসের মাইনের সমান।

বললাম, ঠিকই তো হাসুভাই। তুমি টাকা কামাবে। আমরা পরম আনন্দে তোমার সাথে বেড়াতে যাবো। ছুটির দিন বাগান সামলাবো।

জানো দাভাই, আজ তোমরা সবাই আমাকে তাড়াচ্ছ। আমণি থাকলে একবার দেখে নিতাম কার হক আমাকে প্যাঁচা মুখো সাহেবের গাড়ী চালাতে তাড়িয়ে দেয়। কে চেয়েছিল গাড়ী চালানো শিখতে?

আঠারো বছর পূর্বে গতা মা'মণির শোকে হাসু ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না সুরু করে দিল।

দুই

আমি ইচ্ছে করেই পড়ার ঘরে বসেছিলাম। নমিতা এসে বলল, তোমাকে হাসুভাই ডাকছে। বাবা বাইরে চলে গেছেন।

হাসুর চারিদিক ঘিরে পাড়ার কলরব-মুখরিত শিশুর দল। হাসু আস্তে আস্তে বললো মণিভাই জানসে পড়ো। চৌদ্দ দরজা পাশ করা চাই। প্যাঁচামুখো সাহেবের মাথায় লাথি মেরে চাকরী ছেড়ে চলে আসবো। জানো তো চৌদ দরজা পাশ করে কত লোক হিন্দুস্থানের ওয়াজির বনেছে।

অনেক কষ্টে হাসু তথ্যখানি সংগ্রহ করেছে।

ভালো করে এদের যত্ন করো। সাহেবকে বেশী বাইরে যেতে দিও না। আমি নেই, তোমরা হুঁসিয়ারী থেকো।

সকলকে আলিঙ্গন করতে করতে হাসু ইচ্ছে করেই সন্ধ্যা করে ফেলল। চুপি চুপি বলল, গাড়ী বিক্রী হয়েছে খবরটা যেন আমরা চেপে যাই।

সকলে বললাম নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।

দিগগজকে কেউ বললাম না যে ক'দিন পরেই তো সকলে জানতে পারবে। সার্ভিসিঙ্-এর জন্য আর ক'মাস গাড়ী ফেলে রাখা যায়?

হাসু বলল, মণি ভাই, কলেজে সাইকেলে যাবে না। গাড়ীতে যাবে। আমি তোমাকে টিকিট কিনে দেবো। বাইরে বেশীক্ষণ থাকবে না। মনে থাকে যেন এখন বাড়ীতে তোমাকে দেখবার জন্য হাসু নেই। দরকার হলেই এক টুকরো কাগজে বই-এর নাম লিখে এই হাসুর কাছে পাঠিয়ে দিও। আমি কিনে আনবো। এখন আর ভয় কি? আমি তো চাকরী করতে যাচ্ছি। চৌদ দরজা পাশ করলে ঝাঁ করে সব ঝামেলা কেটে যাবে।

বললাম হাঁ ভাই! তুমি নতুন সাহেবের সাথে লড়াই টড়াই করো না। চাকরী করতে যাচ্ছো তো!

সাহেব বাড়ীতে নেই। আমি জানি কেন তিনি বাইরে গেছেন। বলেই মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে মাটিকে চুম্বন করে বললে, সাহেবকে আমার লাখ সেলাম।

তিন

মিশনারী কলেজে ষ্টাইপেণ্ড প্রার্থনা করলেই পাওয়া যায়। কিন্তু যেদিন টের পেলাম টাকাটা কেমব্রিজে ব্রাদার হুডের কামরা থেকে আসে, নাকে কানে খত দিলাম। ছিঃ আমার দুঃখিনী ভারত গরীব হতে পারে, ভিখারিণী তো নয়। কেমব্রিজের টাকায় পড়তে যাবে কোন দুঃখে? খবরটা জেনে অধ্যাপক দত্ত বললেন বেশ, চলো তবে পত্রিকার দপ্তরে। প্রথম তিন মাস মাইনে টাইনে নেই। পরে যা পাবে তাতে তোমার পড়ার খরচ উঠে আসবে।

ক্লান্ত পা দু'খানা আর চলে না। মনে মনে ভাবলাম, হাসু ভাই, রাত তিনটের সময় জনহীন তুষার-শীতল রাজপথে চলেছি তোমার চৌদ দরজা পাশ করার তাগিদে। তুমি দেখলে না একবার?

টেলিপ্যাথি জানি না—জানি না যখন বিশ্বাস করার প্রশ্নই ওঠে না। অনেক দিন পরে হাসুকে কেন মনে পড়লো বুঝলাম না। বাড়ীতে এসে শুনলাম হাসুভাই এসে অনেক রাগারাগি করেছে। এগারোটা অবধি বসে সে সাহেবের ওখানে ফিরে গেছে। এত দিন সিমলাতে গাড়ী চালাতে হয়েছিল। সে বাড়ীতে নেই বলে কি কাউকেই পরোয়া করতে হবে না। তেরো দরজায় উঠেছে বলে কি দু'খানা ডানা গজিয়েছে। রাত এগারোটা, আর মণি বাড়ীতে নেই।

শৈলেন বলল পাগলের নাচন যদি দেখতিস। যাবার সময়ে বলে গেছে কাল আবার আসবে। ডাক্তার সাহেব আবার তোর অসুখের ডায়াগনোসিস করে ভেবে-চিন্তে দৃঢ় প্রত্যয় করলেন, দা'ভাই নিশ্চয়ই দিল্ নিয়ে খেল্ সুরু করেছে। না হ'লে রাত সাড়ে এগারোটায়ও দেখা নেই?

গেলির পর গেলি প্রুফ পড়ে পড়ে চোখ দুটো দপ দপ করছিল। বললাম, সত্যি কথাই তো বলেছে। দিল্ নিয়েই তা খেল্ করছি। কত ব্যাটা পণ্ডিতকে বণ্ডিত করে দিচ্ছি জানো? কাল কখোন আসবে বলেছে কিছু? আটটা থেকে তো ডিউটি আবার।

শৈলেন বলল, ঠিক বিকেলে আসবে। আমি ওকে বলে দিয়েছি মণির দেখা বিকেলে খাবার সময়ে ছাড়া তো হবে না রে হাসু! বিকেলে ঠিক আসিস যেন।

অফিসে কাজের কথা কিছু বলে নি তো? যা উম্মাদ হয়তো অফিসে গিয়ে আঙ্গিনা জুড়ে নৃত্য শুরু করে দেবে।

বিকেলে আগে থেকেই তৈরী হয়েছিলাম। হাসুভাই ফিরে গেলে আর রক্ষে নেই।

কাগজের মোড়ায় কি একটা বেঁধে পকেট বোঝাই আখরোট বাদাম ভরে শ্রীমান হাসু হাজির হ'ল।

গম্ভীর ভাবে জিজ্ঞেস করল, মণিভাই, দিল তবিয়ত খুশ? বলি, চোখ দুটো বসে গেছে কেন?

শৈলেন বলল, না রে হাসু, ও রাত জাগে কি না তাই—

—রাত কেন জাগে? আমি না বলে গেছি রাত জাগবে না। আমি মানতে রাজী নই যে তুমি লায়েক হয়ে পড়েছো। তবুও আমার বলার হক্ আছে যে তুমি এখন থেকে হুঁসিয়ার থাকবে, দিল নিয়ে খবরদার খেলা করতে যাবে না। রাত জাগবে না। আজ তোমার জন্য একখানা বই নিয়ে এসেছি। আরও দেবো—অনেক দেবো বলেই হাতে করে যে কাগজের প্যাকেটটা এনেছিল সেটা খুলে অতি যত্নে একটার পর একটা ভাঁজ কভার

পেপার সরাতে বসলো। আমরা হাঁ করে হাস্নুর কাণ্ডটা উপভোগ করতে বসলাম।

মোটা একখানা বই বার করে পরিতৃপ্তির এক ঝলক হাসি হেসে হাস্নু বললে, হাঁ বাবা, আর চালাকীটি চলছে না। এ হাস্নু মিয়ার পাল্লায় পড়েছো। এই নাও পয়লা নম্বরের কেতাব। দুসরা, তিসরা কেতাব ঠিক দু'-একদিনেই পাবে। দাম-দস্তুর ঠিক করে এসেছি। সামনে মাসে টাকাটা পেয়ে কিনে আনবো।

আমার চক্ষু স্থির! বিলিতি এক রমণীর লেখা অতি মোটা উপন্যাস: ডিসপোজালের ছাপ। বললাম, হাস্নুভাই, কোথেকে কিন্‌লে, কত নিল?

হাস্নুভাই পাঁচটা আঙুল বিস্তৃত করে অতি পরিচিত কর্তার পোজ নিয়ে লেকচার সুরু করে দিল, হাস্নুমিয়াকে ঠকাবে?—দুনিয়াতে সে-মোল্লা এখনও জন্মায় নি। বললাম গিয়ে ইংরাজী কেতাব হ্যায়? ব্যাটা হাঁ করে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। ভাবলো আমি একটা আকাট গবেট। ইংরিজি দিয়ে কি করবো? বেতমিজ ব্যাটা আমার দিকে তাকিয়ে বলল, দেখছো কি তবে? সবই তো ইংরিজী কেতাব, দেখলাম সব চেয়ে মোটা বই একখানা নিশ্চয়ই চৌদ দরজার কেতাব। দশ টাকা দিয়ে কিনে ফেললাম ঝাঁ করে। দশ টাকাই চেয়েছিল। ব্যাটা হাঁ করে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। জানে না তো আমার মণিভাই তের দরজায় পড়ে।

আমি হাসব না কাঁদবো ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না। বল্‌লাম কোন্ দোকান থেকে কিনেছো?

ওর সাথে বই বদলাতে বেরিয়ে পড়লাম। দরকার নেই আজ ডিউটিতে গিয়ে। ক্রফ দেখতে দেখতে চোখ দুটো বেরিয়ে এলেও তারা আমায় এক রাতে দশটা টাকা দেবে না।

চার

সত্যি সত্যি একদিন 'চৌদ দরজা' পাশ করলাম। হাস্নু নৃত্য সুরু করেছে। পাঁচ আঙুল ছড়িয়ে বক্তৃতা সুরু করেছে—এই হাতে গড়া 'শিক্ত' চৌদ দরজা পাশ জড়ো করেছে। হাস্নু রাজ্যের লোককে নিমন্ত্রণ করে এনে জড়ো করেছে। তবু ভাগ্যিস ওর এখনও বাদশা থসে নি। জহরলাল তো 'চৌদ দরজা' পড়েই ওয়াজির বনেছে।

হাস্নুর উৎসাহ বেড়ে গেছে।

ষোল দরজাই যদি সব চেয়েও উঁচু হয় তবে মণিভাই সেটা খতম করেই কেন না কেন? দু' সালেরই তো মামলা। ছুম করে বলে বসল, খরচের পরোয়া নেই, আমি দেব।

এ বাড়ীর নাড়ী-নক্ষত্র ওর নখদর্পণে। তাই সর্বপ্রথম সমস্যাটার সমাধান করে করে নিশ্চিন্ত হয়ে হাত-পা গুটিয়ে খাটের উপর বসে বলল, মণিভাই, ষোল দরজার সেই বইখানা কিনে আনবো কাল।

আমার হৃৎকম্প সুরু হ'ল। আবার সেই বই? সে রাতে অনেক ভেবে চিন্তে বই ফেরত দিয়েছিলাম। হাস্নু বলেছিল বইটা ফেরত দেবে মণিভাই? তোমার কাজের নয়। আমাকে ঠকিয়েছে।

বলেছিলাম, আরে বল কি হাস্নুভাই তোমাকে ঠকাবে কে? বইখানা ষোলো দরজায় লাগে। দেখছো না কত মোটা?

ওর সরল হৃদয়ে আমি আঘাত দিতে চাই নি।

বললাম, না হাস্নুভাই, বইটই কিনতে যেও না। ষোল দরজায় কোন বই লাগবে না। সব লাইব্রেরী থেকে পড়তে হয়—

—রাত জেগে?

বললাম না ভাই, দিনেও পড়া যায়। আমি রাত জাগবো না।

একটা একটা করে দিন গুণছিলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের চাপরাশ মিললেই যেন আমার দুনিয়ার সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। জানি, রাজধানীর এ বিরাট চাকচিক্যের মাঝেও আর এক কোমল হৃদয় প্রতি প্রভাতে ক্যালেণ্ডারের পাতায় রোজ একটা করে ঢেরা কাটছে। হাস্নুর প্রতীক্ষার কাছে শবরীর কীর্তি বর্তিকা অতি নিষ্প্রভ ম্লান দ্যুতিমান।

দেখতে দেখতে একদিন ষোল দরজাই পাশ দিয়ে ফেললাম। একদিন আমি সত্যি সত্যিই এম, এ পাশ করলাম। হাস্নু এসে জুন মাসেই ইদের পরব জানাল। কি উৎসব! এবার তার মণিভাই ওয়াজির হবে।

জোড়া চারেক জুতোর সোল খুইয়ে যখন হতাশ ভাবে আকাশের দিকে তারকা গণনা ব্যতীত অন্য কোনও কাল যাপনের সন্ধান মিলল না তখন অধ্যাপক দত্ত এসে বললেন, মণি জার্ণালিসম করবে? প্রবন্ধ লিখতে পারবে? পত্রিকার জন্য প্রবন্ধ?

হাসি পেল।

বললাম লিখে কি হবে? সব লেখাই তো ফেরৎ এসেছে। যে ক'টা প্রকাশিত হয়েছে, সংসার প্রতিপালন আপাতত না হয় স্থগিতই রাখলাম, ডাক টিকিটের খরচটাও যে এখনও উঠলো না। দত্তকে এতদিন খবরটা বলিনি লজ্জায়।

হাস্নুর চিন্তাই সবচেয়ে বেশী। কি হল? সবাই কি খবর পায়নি, মণিভাই ষোল দরজা পাশ করেছে?

সেদিন ম্লান জ্যোৎস্নায় ছাদে বসেছিলাম। মনটা বোধ হয় উদাসই ছিল। ঠিক কিছুই ভাবছিলাম না। ভাবতে ইচ্ছে করছিল না। হঠাৎ পিছন থেকে পিঠে হাত দিয়ে দাঁড়ালো হাস্নু। বললাম, হাস্নুভাই, কাজে যাওনি?

ইনষ্টলমেণ্টে ওকে গাড়ী কিনে দেওয়া হয়েছিল—আজকাল ও ট্যাক্সি চালায়।

হাস্নু ফিস-ফিস করে আমার কানে কানে বলল, শোন মণিভাই, কাউকে বল না কিন্তু, যাত্রী পৌছুতে গিয়ে আজ হিন্দুস্থানের ওয়াজির ই, আজম-এর বাড়ী চিনে এসেছি। তোমাকে আমি কাল সেখানে নিয়ে যেতে চাই। তুমি যে ষোলো দরজা পাশ করেছো ওয়াজির ই-আজম সে খবর এখনও জানতে পেরেছে কি?

লক্ষ্মী কমলা!
আমার ভাইঝি কমলা স্কুলের ছুটিতে আমার এখানে আসার পর থেকেই বাড়ীর চেহারা যেন বদলে গেছে। আগে আমি সব সময়েই ব্যস্ত থাকতাম, কিছুই যেন হয়ে উঠতো না কিন্তু কমলার হাতের ছোঁয়ায় সমস্ত কাজ যেন মুহূর্ত্তের মধ্যে হয়ে যায়!
এই কাপড় ধোওয়ার ব্যাপারেই দেখুন না। কাপড় কাচার মধ্যে যে কোন বিশেষত্ব থাকতে পারে আমি তা জানতাম না তাই কমলা যখন আমায় বলল যে কাপড়কাচা সাবান হওয়া দরকার খাঁটী আমি বেশ অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। ও বলল, "খাঁটী সাবান হলে জামাকাপড় কাচা ভাল হয় কারণ খাঁটী সাবানে প্রচুর ফেণা হয়। সে ফেণায়

জামাকাপড়েরও ক্ষতি হয়না এবং হাতেরও কোন অনিষ্ট হয়না।" সে সানলাইট সাবান এনে আমায় দেখাল যে সানলাইটে কাচা জামাকাপড় কত পরিষ্কার হয়। সত্যি, একটু ঘষলেই ফেণা হয় কত। আমি যখন ওকে কাপড়কাচার জিনিষটা দিলাম, কমলা বলল—
"না, পিসীমা, সানলাইট দিয়ে কাচার সময় জামাকাপড় আছড়াতে হয়না। শুধু একটু সাবান ঘষে দাও প্রচুর ফেণা হবে এবং জামাকাপড় বিনা আছাড়েই পরিষ্কার হবে।"
সত্যিই কাচার পরে কাপড়জামা এত সাদা আর উজ্জ্বল হয়ে উঠল যে আমার যেন আর শুকোবার জন্যে তর সইছিল না; তখনই পরতে ইচ্ছে করছিল। কমলা সত্যিই চালাক মেয়ে! সে বলে যে সানলাইট দিয়ে কাচলে জামাকাপড় এত সাদা আর উজ্জ্বল হয় তার কারণ সানলাইটের প্রচুর ফেণা জামাকাপড়ের সুতোর ফাঁক থেকে সব ময়লা দূর করে দেয়।"
সবই তো বুঝলাম। কিন্তু বাড়ীটা চালাতে হয়তো আমাকেই। সেইজন্যে ওকে আমি আমার মনের কথাটা বলেই ফেললাম—"কিন্তু সানলাইটের দাম যে বড্ড বেশি।"
কমলা একগাল হেসে বলল—"পিসী, ওটা তোমার মিথ্যে ভয়!" আমি অবাক হয়ে গেলাম। তখন কমলা বলল: "একটা সানলাইট সাবানে একগাদা কাপড় কাচা যায়। সানলাইট দিয়ে জামাকাপড় কাচলে সত্যিই খরচ বাঁচে!" সানলাইট সাবান সম্বন্ধে আর একটি জিনিষ আমার খুব ভাল লাগে। সানলাইট দিয়ে কাচার পরে জামাকাপড়ের গন্ধটাই কেমন পরিষ্কার পরিষ্কার লাগে আর এর ফেণা হাতকে রাখে কোমল ও মসৃণ।
কমলা বাড়ীতে আসার পরেই আমি প্রথম জানলাম যে পরিবারের সমস্ত জামাকাপড় যেমন আমার স্বামীর সার্ট, পায়জামা, তোয়ালে, ন্যাপকিন, বিছানার চাদর, পর্দা, ছেলেমেয়েদের জামাকাপড়—এক কথায় আমার ছোটবড় সব জামাকাপড় কাচার জন্যে সানলাইটের থেকে ভাল সাবান আর কিছুই নেই। এটি যে শুধু জামাকাপড়কে সাদা ও উজ্জ্বল করে কাচে তাই নয়; সানলাইটের একটি সাবানেই এক গাদা জামাকাপড় কাচা যায়। এতে পয়সাও বাঁচে আর পরিষ্কার জামাকাপড়ও পরা হয়।
SUNLIGHT SOAP

নমিতা বসু-মজুমদার

সুরঙ্গমা আর পারবে না। অসহ্য লাগে বাড়ীর নিবিড় নীরবতা। নীরব-স্তব্ধতা যেন দিনে দিনে গ্রাস করতে আসছে। অক্টোপাসের মত চটচটে হাত নিয়ে সুরঙ্গমাকে আষ্টে-পৃষ্ঠে আঁকড়ে ধরে ধীরে ধীরে দম বন্ধ করে দিয়ে আয়ুটাকে হরণ করে নিতে চায়। কিন্তু, চাইলে কী হবে? তা হ'তে দিতে সুরঙ্গমা একটুও রাজী নন। বাঁচতে চান তিনি।

স্বামী অফিসে বার হয়ে যাবার সংগে সংগেই নিস্তরংগ নৈঃশব্দ বাড়ীটাকে নীরবে মুড়ে ধরতে থাকে। যেন দরজার পাশটিতেই অতি সংগোপনে আত্মগোপন করে অপেক্ষা করে থাকে। যে দরজা দিয়ে ত্রিদিবেশ বার হয়ে যান, যে দরজার কবাট ধরে দাঁড়িয়ে থাকেন সুরঙ্গমা, আর গলিটার খানিকটা বয়ে গিয়ে মিশে যাবার শেষ বাঁকটাতে পিছন ফিরে দেখেই বড় রাস্তায় মিলিয়ে যান ত্রিদিবেশ। ঠিক্ সেই সময়টায় সেই দরজা দিয়েই সুরঙ্গমারই বুকের পাশ ঘেঁষে ঢুকে পড়ে নীরবতা। বুকে একটা হিমশীতল কাঁপন লাগিয়ে দেয়।

কাঁপনটাকে বুকে বয়ে সুরঙ্গমার সমস্ত সংসারটাই ওলোট-পালোট হয়ে যায়।

এ-ঘর থেকে ও-ঘর করতে গিয়ে গা ছমছম্ করতে থাকে। বারান্দার রেলিং চেপে ধরে মনটা উদাস হয়ে থমকে থেমে যেতে চায়। অথচ সবুজ লনে ঘেরা হা-হা করা পোড়োবাড়ির বড় বড় দশ-বারো কামরাওয়ালা বাড়ী নয়। দুটি মানুষের উপযুক্ত ছোট দু'খানা ঘরের সংগে আরো ছোট একফালি বারান্দা লাগানো ছোট একটি ফ্ল্যাট। আশ্চর্য! তাও ফাঁকা লাগে সুরঙ্গমার!

দরজা দিয়ে এসে খানিক ক্ষণের জন্য চুপ করে বসে থাকা সুরঙ্গমার নিত্য-নিয়মিত কাজ।

সমুখের দরজা দিয়ে ঘরে আসা, এইটুকুতেই পায়ের শব্দ এ বেশী করে কানে আসে যে কানপাতা দায় হয়ে ওঠে। হৃদ্‌যন্ত্রে বৈকল্য ঘটলে রোগী যেমন নিজের বুকের উত্তাল-তরঙ্গ নিজে কানে শুনতে পায় আর পেয়ে হিম হয়ে উঠতে থাকে, তেমনি দশা তাঁর। ছোট দু'খানা ঘর এমন অস্বাভাবিক থমথমে যে, চলতে ফিরতে গেলে নিজের হালকা পায়ের শব্দেই দেহ-মন ওঠে শিউরে।

সে শব্দ শুনতে চান না সুরঙ্গমা। আবার বসে থেকে নেই রেহাই।

কোণে কোণে পর্যন্ত আপনাকে ব্যাপ্ত করে দেওয়া একাকী নিশ্চল-স্থাণু সুরঙ্গমার দশা দেখে অপলকে চেয়ে থাকে। হঠাৎ দেখতে পান, সেই তার অনিমিখে চেয়ে থাকায় থেকে থেকে কোণে উঠছে পিকপিকে একটা হাসি। অমনি উঠে পড়তে হয়। উঠে সেতারটা পেড়ে আনেন।

ওঠা, পাড়া, গেলাব খোলা, সেতারটাকে হাতের তলে কায়দা করে রপ্ত করে নেওয়া পর্যন্ত ছমছম্ করতে থাকে দেহ-মন। সাহস করে টুং-টাং শব্দ তুলতেই সাহস বেড়ে ওঠে। সেতার বেজে চলে দ্রুততালে। ধ্বনি দিয়ে সুরঙ্গমা ডুবিয়ে দিতে চান ধ্বনিহীনতাকে!

তবু হয় না। কিছুক্ষণের মত উদ্দাম হয়ে উঠে সুরঙ্গমা থেমে যান। বুঝতে পারেন, ফাঁক ভরিয়ে দিতে পারে এমন পাওনা তাঁর হয়নি। অপরিণত শিক্ষা। শিক্ষার দু'-চার ধাপ চলতে না চলতেই বিবাহ হয়ে গিয়েছিল।

তখন সেতার তুলে রেখে সেলাই পাড়েন। সেলাই ফেলে ডাক পাড়েন ঝিকে। ঝি এলে এটা-ওটা গল্প করতে করতে হাই উঠতে থাকে। কতই বা গল্প করবেন বাজে বাজে? সেলাই করবেন, লেস বুনবেন চৌকি, টেবিল সাজাতে? কত শুয়ে শুয়ে পড়বেন নাটক, নভেল? কত বাজাবেন আধ-শেখা সেতার? যে কাজে পুরো মন দেওয়া যায় না; সে কাজ কতক্ষণ করতে পারে মানুষ?

নিত্যদিনের মত চুপ করে বসেছিলেন সুরঙ্গমা। নিত্যদিনের মতই দরজা দিয়ে ঢুকে পড়েছে একাকীত্ব। হিমের ঝড় বইয়ে দিয়েছে।

এমন সময় খুট-খুট আওয়াজ উঠল সদর দরজাতে। এসেছেন পড়শিনী।

একটু-আধটু গল্প চলবার পর পড়শিনী বলে বসলেন,—দিদি, একটি দোসর নিবেন?

—দোসর? বিস্মিত হন সুরঙ্গমা।

—একেবারে একা থাকেন, কথা বলারও সাথী নাই। কত কথা বলবেন ঝিয়ের সাথে?

—আমি, আপনার কথা বুঝতে পারছিনে, ভাই!

—একটি মেয়ের কথা বলছি। মেয়েটির মা-বাপ নাই, খুড়ার ঘরে মানুষ। খুব সুন্দরী না হলেও কাম-কাজে দশখান হাত।

স্তম্ভিত হ'ন সুরঙ্গমা। যে যুগে মেয়ে হয়েও অবলীলাক্রমে এক মেয়ে আর এক মেয়েকে বলে বসত,—তা যখন নিজের পোড়া গর্ভে কিছু আনতে পারলে'না, তখন নিজেই উদ্‌যুগী হয়ে স্বামীর একটি বে' দাও না ভাই!

নিশ্চিত সে যুগে বাস করছেন না সুরঙ্গমা। কখনো যা না

করুন, এমন কথা শোনবার মত রুচি, প্রবৃত্তি তাঁর নেই। উত্তরোত্তর বিরক্তি বৃদ্ধি পেল। ঈষৎ রুষ্ট কণ্ঠে বললেন,—আমার আর কাজের লোকের দরকার তো নেই। দু'টো মানুষের কি-ই বা কাজ? এমনিতেই সময় কাটতে চায় না।

পড়শিনী বোধ করি কণ্ঠের রুষ্ট আভাসটাকে ধরতে পারলেন না। উৎসাহে বলে উঠলেন,—তাই কই, একটা দোসর নন। নয় বছরিয়া কুমারী কন্যা। তারে পালবেন দিদি!

নয় বছরের ছোট একটি মেয়ে। তাকেই পালন করা? অদ্ভুত ভাবে হতভম্ব হয়ে পড়লেন তিনি, অদ্ভুত আশ্চর্য এক ভাবে।

বুকের মধ্যে দ্রুততালে ধ্বক্ ধ্বক্ করে বেজে চলেছে অন্তরতম হৃদয়। পলকের মধ্যে গাল উঠল রাঙা হয়ে, চোখ জ্বলতে লাগল, কপালে বিন্দু বিন্দু মুক্তোর মত ঘাম জমে উঠল। মুষড়ে-পড়া অর্ধস্তিমিত সুরঙ্গমা মুহূর্তে সতেজ হয়ে উঠলেন। যেন দীর্ঘ দিনের রৌদ্রদগ্ধ শুকনো সবুজ লতাটিতে ঝরঝরিয়ে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল।

পড়শিনী বলে চলেছেন,—আপনাদের মেয়ে হবার যুগ্যিতা তার নেই, তা জানি। মা-হারা, বাপ-হারা মেয়ে, ধুড়াধুড়ির ঘরে মানুষ। তবে যখন নিজের করে নিবেন, নিজের মত শিখাইয়া পড়াইয়া পালবেন। তার পর তার ভাগ্য আর আপনার ভাগ্য!

এক পশলা বৃষ্টির জল এত দিন পরে পান করে সুরঙ্গমা যেন পিপাসায় আকুল হয়ে উঠলেন।

একটি ছোট মানুষের ভাগ্য জড়িয়ে যাবে তাঁর ভাগ্যের সংগে। জীবনের সংগে জীবন হয়ে যাবে গাঁথা। তাঁর বুকের সত্তার মধ্য দিয়ে জেগে উঠতে থাকবে আর একটি মানুষের সত্তা! তাঁর সাধ-আহ্লাদ, রুচি শিক্ষা-দীক্ষায়।

কি আশ্চর্য! কি অভূতপূর্ব আবিষ্কার! লোভে লোলুপ হয়ে উঠেছেন। চোখ-মুখ উঠেছে ঝকমকিয়ে। হঠাৎ কানে এলো একটা ভারী শব্দ। কে যেন ধপ্ করে পড়ে গেল মাটিতে। যে পড়ে গেল পড়েই রইল, তার পায়ের শব্দ আর বেজে উঠল না। একটা কান্না বেজে উঠল হতাশ কণ্ঠের। কে যেন অসহ্য যন্ত্রণায় গুমরোতে লাগল থেকে থেকে,—তবে আমার কি হবে? আমি যে বেশ আছি এখানে। তুমি জানো আর নাই জানো, কত বছর ধরে চুপি চুপি নিঃশব্দে এসে এই ঘরকে নিজের ঘর করে তুলেছি। সময় বুঝে বুকের মাঝে আঁকড়িয়ে ধরেছি। নিষ্পেষণে নিষ্পেষণে দম বন্ধ করে দিয়েছি তোমার। আর এখন কি হবে? আমার কি হবে? তাহলে এখন কি হ'বে আমার?

নিমেষের মধ্যে সুরঙ্গমা দেখতে পেলেন শোবার ঘরের মেঝেয় মুখ থুবড়িয়ে প'ড়ে দু'হাতের মধ্যে মুখ গুঁজে ফুলে ফুলে কেঁপে কেঁপে উঠছে নিবিড় নৈঃশব্দ। বুঝতে পেরেছে, বিদায় আসন্ন। সেই ন' বছরের মেয়েটা এই বাড়ীতে ঢুকে পড়লেই তাকে বাড়ীছাড়া হ'তে হ'বে। কলরোলে, হাসি-গল্পে, প্রাণমাতানো তরংগ দিয়ে সে বিদায় করবে নিষ্প্রাণ নিস্তরংগতাকে।

বুকের প্রবল আলোড়ন গলায় ঠেলে উঠল। সুরঙ্গমা তখনি বলে উঠতে চাইলেন,—পালব। পালব বৈ কি। নিশ্চয় পালন করব। এখনি নিয়ে আসুন তাকে, এখনি। আর একটুও দেরী নয়।

কিছু বললেন না। বুক বাঁধলেন। আস্তে সামলে নিলেন নিজেকে। নিয়ে, মৃদুকণ্ঠে বললেন,—আমার স্বামীকে জিগ্গেস করে দেখি!

ত্রিদিবেশ অফিস থেকে ফিরে সুরঙ্গমার প্রতি প্রথম দৃষ্টিপাতেই অবাক্ হয়ে গেলেন। চেয়ে রইলেন। চোখ আর ফেরাতে পারেন না।

—কি দেখছ? অত অবাক-চোখে?

—তোমাকে ভারী নতুন লাগছে।

—নতুন লাগছে! তাই নাকি? বলত কি নতুন কাজ করেছি।

—তাই ত খুঁজে দেখছিলুম, পেলুম না। তবে একটা জিনিস—ধরতে পেরেছি।

—কী ধরলে?

—সাজ করোনি, সাজ খসিয়েছ। আজ কাজল পরোনি চোখে।

—যাই বলো, ভালো লাগল না। আঁকতে গিয়ে রেখে দিলুম কাজল-শিশি। কাজল মানায় সেই মেয়ের চোখে যার কালো চোখের ছায়া চিন্তায় ঘেরা নয়, রহস্য দিয়ে ঘেরা।

—তাহলে এখন থেকে আমাকে ঠকতে হ'বে দেখছি। তোমার কাজলপরা চোখ আর দেখতে পাব না।

ত্রিদিবেশ একটু হেসেই গম্ভীর হলেন। গম্ভীর গলায় বললেন,—কেমন করে পাব আমরা সেই বয়েসটাকে, যার ছায়া চিন্তার ছায়া

নয়, বসন্তের ছায়া। সুরঙ্গমা, সে বয়েসকে আমরা বহু পিছনে ফেলে রেখে এসেছি। জীবনে পিছু ফিরে যাওয়া যায় না,—কিছুতেই নয়।—কিন্তু, তাকে ফিরিয়ে আনা যায় আরেক রকম করে।

অদ্ভুত ফিসুফিসে গলায় সুরঙ্গমা বলতে লাগলেন,—হাঁ, সত্যি আনা যায়। আর তার দিকে চেয়ে চেয়ে একই সংগে স্বাদ নেওয়া যায় নিজেদের অতীত জীবন থেকে সুরু করে বর্তমান জীবন, ভবিষ্যৎ জীবন, হওয়া জীবন, না-হওয়া-জীবন ; সমস্তর।

মুখ নিচু করে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ত্রিদিবেশ। বুঝতে পারলেন কী কথা বলতে চাইছেন সুরঙ্গমা। অথচ এমন সব কথা উত্থাপন করায় দুঃখ ছাড়া অন্য কিছু পাওনা নেই।

জীবনকে নিজেদের জীবন ছাড়াও অন্যের জীবনে বসিয়ে বসিয়ে সম্ভোগ করা যায়, তা তিনি জানেন। আর তার লোভ বোধ করি, সবচেয়ে সর্বনেশে লোভ। এবং সে লোভ যে ত্রিদিবেশের চেয়ে ঢের বেশী সুরঙ্গমার, একথা কে না জানে ?

লোভ যত, দুঃখও তত। পাওনা হয়নি বলে অন্তরের গভীরে সুরঙ্গমার ধিক্কারকেও তাঁর জানতে বাকি নেই।

মুখ তুললেন ভয়ে ভয়ে। ভেবেছিলেন, স্ত্রীর মুখে দেখতে পাবেন ঘনতর বেদনার ছায়া। অবাক চোখে চেয়ে রইলেন, তাঁর ঠোঁটের কোণে টেপাহাসি, কাজলহীন চোখের পাতায় ঝিলিমিলি লাগিয়ে কাঁপছে গোপন একটা রহস্য ; ভরন্ত পূর্ণদেহে স্নিগ্ধ একটি চাঞ্চল্যের হিল্লোল।

বোধ করি, এসে অবধি এই সুরঙ্গমাকেই দেখতে পাচ্ছেন বলে নতুন ঠেকছে চোখে।

স্বামীর গায়ের কোট খুলে নিয়ে স্ত্রী বাড়ীর পোষাক এগিয়ে দিলেন। ত্রিদিবেশ স্নান সেরে এলেন।

গুনগুনিয়ে গানের কলি ভাঁজতে ভাঁজতে সুরঙ্গমা চা-খাবার নিয়ে এলেন। ত্রিদিবেশ আর একবার চোখ তুলে দেখলেন নতুন মানুষটিকে।

গান সুরঙ্গমা গা'ন, তবে এখন নয়। চা-পর্ব চুকে গেলে ত্রিদিবেশ যখন আলস্যভরে একটা আরাম-কেদারায় আপনাকে নিমগ্ন করে দেন, তখন মাদুর পেতে বসে এস্রাজ বাজিয়ে দু-তিনটি গান স্বামীকে গেয়ে শোনান। অফিস থেকে ফিরে এলে যাতে হাতে অন্য কাজ না থাকে তাই রান্নার কাজ পূর্বে সেরে নিয়ে, চুল বেঁধে, গা ধুয়ে প্রস্তুত হয়ে থাকেন।

আজ চা-পর্ব শেষে মোড়া টেনে নিয়ে পাশে বসতে দেখে ত্রিদিবেশ বুঝতে পারলেন, নতুন সুরঙ্গমা নতুন কিছু করবেন। অথচ গানের লোভ তাঁর কম নয়। চোখ বুঁজে গান শুনতে শুনতে অফিসের ক্লান্তিটা নিঃশেষে ধুয়ে-মুছে যায় সুরের ধারায়। বলে উঠলেন,—আজ আমাকে তোমার গান শোনাবে না ?

—বাঃ। ঐ তো শুনলে গান। তোমার যে দেখি বড্ড বেশী লোভ !

—ওতো দু'কলি, পুরো নয়।

—দেখো, ভেবে দেখলুম, অমন করে মাদুর পেতে বসে এস্রাজ পেড়ে পুরো গান আর গাওয়া চলবে না।

—কেন ?

—বুঝতে পারছ না কেন, গলা কত ভার হয়ে গিয়েছে। সুরের আরোহ অবরোহে জোর লাগে। মীড়ের কাজ অবাধে ভেসে যায় না ডানা মেলে, গমকের কাজে গলা থরথরিয়ে কেঁদে মরে।

—কি করব তবে ? গান শুনব না ?

—কেন শুনবে না ? বেশ একটি হাল্‌কা কচি গলা, উঠতে নামতে চায়, একটুকু বাধা-বাঁধন নেই, অবলীলায় ভেসে বেড়াচ্ছে সুরেলা সুর—তারি গান শুনবে বসে। আমি তাকে শিখিয়ে দেব আমার যত গান।

আবার সেই কথা। ঘুরে ফিরে বারে বারে সেই একই কথায় এসে পড়ছে সুরঙ্গমা। বুকটা ভার হয়ে উঠল। ভার বুক নিয়েই ত্রিদিবেশ সুরঙ্গমার দিকে কটাক্ষে চাইলেন।

এখনো হাসি তার মুখে, ছায়া তার চোখে।

হঠাৎ বুকের কাছে ঘেঁষে এসে সুরঙ্গমা স্বামীকে বলে বসলেন, —একটি মেয়েকে মানুষ করবে ? নয় বছরের একটি মেয়ে।

—মেয়ে ! জীবনের সর্বাধিক বিস্ময়ে পৌঁছে বিস্ফারিত মূঢ় চোখে চেয়ে রইলেন ত্রিদিবেশ।

—হাঁ গো, মা নেই তার, বাপ নেই। আমাদের সমস্ত স্বত্ব বর্জন করে দিয়ে যাবে। নিজেদের মেয়ে বলেই তাকে নেব আমরা।

সুরঙ্গমা চোখ বুঁজে দু'হাতে স্বামীর গলা জড়িয়ে ধরে বুকে মুখ রাখলেন আর ত্রিদিবেশ তাঁর চুলে আঙুল বুলিয়ে চললেন নীরবে।

মেয়েটির আসবার দিন স্থির হয়ে গেল। রবিবারের সকাল বেলা। মাঝের দিনগুলো ভরে রইল মেয়েটির কথাতেই। স্বামি-স্ত্রীর অন্য আলাপন আর রইল না। নামপর্বই চুকতে চায় না।

ত্রিদিবেশ বললেন,—তার নাম হবে সুদর্শনা। বেশ মিল থাকবে তোমার সংগে।

—তা কি করে হবে ? শুনেছি যে দেখতে তত ফরসা নয়। ও-যে সুন্দরী মেয়ের নাম। না বাপু, সুদর্শনা নাম দিয়ে মেয়েকে ব্যঙ্গ করতে পারব না আমি।

—তবে কি নাম রাখবে, ঠিক করো। যাই রাখো, এমন নাম হওয়া চাই, যাতে করে তোমার মেয়ে বলে মনে হয়।

সুরঙ্গমা একটুখানি কি ভাবলেন। বললেন,—সুদক্ষিণা রাখলে মন্দ হয় না। মিলও থাকল, তাছাড়া—

—তা ছাড়া কি ?

—ও তো দাক্ষিণ্যের স্রোতেই পাওয়া। দক্ষিণা নামই ওর মানাবে ভালো।

—তাই হবে। নামটিও বেশ মিষ্টি। এদিকে আমিও ডাকতে পারব দখিণ পবন বলে।

—ওই তো, সব কিছুতেই বদ রুচি তোমার।

কৃত্রিম কোপে স্ত্রী কটাক্ষ বর্ষণ করলেন। স্বামী জবাব দিলেন মুখটেপা হাসি দিয়ে।

রাত্রে পাশাপাশি শুয়ে গল্প করতে করতে সবেই ত্রিদিবেশের চোখ ঘুমে জড়িয়ে এসেছে, এমন সময় মৃদু আকর্ষণ অনুভব করলেন।

—এই, শুনচ ?

—উঁ। ঘুমজড়ানো চোখে ত্রিদিবেশ জবাব দেন।

—উঁ, কি ? বলব না তবে।

এবার ত্রিদিবেশকে কথা কইতে হোলো। কী বলবে, বলো।

—বলব কী ছাই। চোখ না চাইলে বলব কা'কে ? ঘুমন্ত মানুষকে ?

সুরঙ্গমার কণ্ঠে অসম্ভব উষ্মা। অসম্ভব আগ্রহের ফলেই বোধ করি। ত্রিদিবেশ চোখ খুলে হাসতে লাগলেন।

—রাগ কোরো না। এই তো চোখ মেলেছি।

—একটা কথা মাথায় এসেছে।

—কি কথা ?

—সুদক্ষিণা নামটা পালটে দিলে হয় না ?

ও-হরি, এত রাত্রে এই কথা ? তাও আবার সদ্যহওয়া ঘুম ভাঙিয়ে দিয়ে। ত্রিদিবেশ ভেবেছিলেন, না জানি কি! বললেন, —কি রাখবে তবে ?

—কেন ? নামের কী অভাব আছে নাকি ? সুকীর্তি, সুযশা কত নাম আছে। আজকের দিনের মেয়েদের শুধু সুদর্শনা, সুদক্ষিণা, সুপ্রিয়া, সুজাতা হলেই চলবে না। কীর্তি চাই তাদের, যশও চাই!

—বেশ। তাই রাখো।

—তাই ভাবছি, কি রাখব। সুকীর্তি না সুযশা ?

ত্রিদিবেশ মুস্কিলে পড়লেন, বললেন,—তোমার যা ইচ্ছে। দু'টোই বেশ ভালো নাম।

—আর তোমার বুঝি কোনো ইচ্ছে নেই ?

সুরঙ্গমার স্বরে রোষের আভাস পেয়ে ত্রিদিবেশ বলে উঠলেন, —দেখ, নামরাখা বিষয়ে আমার চেয়ে তোমাকে ঢের বেশী জহুরী মনে করি।

—বেশ, বেশ। বেশ উন্নতি হয়েছে দেখছি! স্তুতি করতে শিখেছ। কিন্তু এর পর সাবধান! মেয়ের সামনে বেশী বেঁফাস কথা কইতে পারবে না।

বলেই হেসে বললেন,—সুকীর্তিই বেশী ভালো, কীর্তি বলে ডাকাও যাবে।

—খুব ভালো। বলে পাশ ফিরে কেবল চোখ বুঁজতে গিয়েছেন, মৃদু তাড়না লাভ করলেন সুরঙ্গমার হাতের। ঈষৎ ঠেলা দিয়ে রাগত স্বরে বললেন,—রাজ্যের ঘুম কি যত তোমার চোখেই এসে বাসা বেঁধেচে! কথাটা শেষ হ'তেই পেল না।

—সে কি কথা ? ঠিক্ হয়ে গেল যে সুকীর্তি নাম থাকবে। পৃথিবীতে কীর্তির দাম কত বড়, তা জানিনে বুঝি ?

—ছাই! সুরঙ্গমা ঠোঁট ওলটালেন। যশ নইলে আবার আজকের দিনের মানুষ ?

পরদিন। সময়টা অফিস-যাত্রার। ত্রিদিবেশের সাজ-সরঞ্জাম হয়ে গিয়েছে। সুরঙ্গমা দেখাশোনা দেখে দিচ্ছেন। একে একে তদারক করছেন হাতের বোতাম, টাইয়ের নট, জুতোর ফিতে, রুমাল, কলম ঘড়ি, টাকা-কড়ি সমস্তই। পকেটে কলম পরিয়ে দিতে দিতে ভারী চিন্তিতমনে বললেন,—আচ্ছা, সুকীর্তি সুযশা নিয়ে যখন এতই বাধচে, তখন না হয় নাই বা রাখলে ও নাম। পালটে দাও না কেন ?

অবাক্ ত্রিদিবেশ। বিব্রতও। যেন ত্রিদিবেশ নাম রেখেছেন, তাই বাধ:চে তাঁর ? যেন নামকরণ আর নাম বদলের ভার তাঁর হাতে ? কিন্তু, এমনতর কথা এখন সুরঙ্গমাকে বলাও যায় না। ঘড়ি পরতে পরতে বললেন,—তা হয়। বদলে কি নাম রাখবে ?

—এই ধরো, নন্দিনী।

এবার ত্রিদিবেশ সত্যিই খুঁতখুঁত করতে লাগলেন,—তোমার নামের সংগে একেবারেই মিল রইলো না।

—নাই-বা রইল। তোমার নামের সংগেও তো মিল থাকচে না। তাই বলে, তোমার মেয়ে হবে না নাকি ? ও কীর্তি নয়, যশ নয়, দক্ষিণা নয়, ভারী মিষ্টি ওর একটিমাত্র অর্থ—নন্দিনী অর্থাৎ মেয়ে। আমরা তো একটি মেয়েই চেয়েছি। নন্দি বলে ডাকতে পারব। কখনো সখনো নন্দা। আর তোমারো—

—আমারো কি ?

ঠোঁটে দাঁত চেপে ধরে সুরঙ্গমা অপরূপ হাসলেন,—সুবিধে হবে। ন—ন্দো বলে ডাকবে মোটা গলায়।

—হো-হো-হো-হো, হা-হা-হা-হা। হাসতে লাগলেন ত্রিদিবেশ। দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাবার মুখেই হাসতে লাগলেন প্রচুর পরিমাণে।

—এই—হাসছ কেন অমন করে ?

—হাসি পেল যে। একটা কথা মনে পড়ে গেল।

—কি কথা ?

—সুরঙ্গমা, বিয়ের পর প্রথম প্রথম দোকানে গেলে তুমি কিছুতেই শাড়ী পছন্দ করে উঠতে পারতে না। দেখতুম, দোকানের সব রঙের শাড়ীই তোমার ভারী পছন্দ। কাজেই একখানা দু'খানা নয় একরাশ কাপড় আনতে হ'ত কিনে।

—তার মানে ?

ঠোঁট কামড়ে ধরে রাগের ভঙ্গীতে সুরঙ্গমা প্রশ্ন করলেন।

—মানে, একটি মেয়েতে কুলোবে না তোমার, এক ডজন চাই।

কথাটা বলে ফেলেই পা বাড়িয়ে দিলেন।

গলির শেষ বাঁকটায় পিছন ফিরে দেখলেন, তখনো তেমনি দাঁড়িয়ে আছেন সুরঙ্গমা, তেমনি কবাট চেপে ধরে। হয়তো বা তেমনি অধর দংশন করে রোষের ভংগীতে!

এর পর বিকেলে এক সংগে বার হয়ে এক নতুন কাজ হোলো, ফ্রক কিনে বেড়ানো।

—কি মানাবে? দেখো তো। ভী গলা না চৌকো? কাচ বসানো ঝলমলে কাঠিওয়াড়ী না সিম্পল্ হনিকম?

গয়নার দোকানে গিয়ে বালার ডিজাইনও পছন্দ করে এলেন। মেয়ে এসে পৌঁছলেই মাপ চলে আসবে।

ফেরার পথে ট্রাম-বাসের আট, নয়, দশ বছরের মেয়ে দেখতে দেখতে স্বামি-স্ত্রীর আর ক্লান্তি নেই।

—কেমন দেখতে হবে, কে জানে?

—আমাদের মেয়েটির কথা বলছ? ত্রিদিবেশ হাসলেন।

—ঐ মেয়েটির চোখ দুটি ভারী সুন্দর, নয়? ঐ রকম হলে বেশ হয়।

—নাক নয়। নাক হবে ঐ মেয়েটির মত চিকণ-চোখা। থাঁদা নাকে মুখ নষ্ট।

—আর রঙ যদি ঐ কচি মেয়েটির মত হয়। ঐ যে বসেছিল শিমপাতার মত ঘন সবুজের ফ্রক পরে।

—কি করে হবে? তুমিই তো বলেছ, রঙ তেমন ফরসা নয়।

—তাও বটে। তা থাকগে, নাই-বা হোলো ফরসা রঙ। ডান ধারের মেয়েটিকে দেখেছিলে? কালো রঙেও চোখ-মুখ কি সুন্দর! আমার চোখ যেন জুড়িয়ে যাচ্ছিল। এমন মেয়ে পেলে আমি ফরসা রঙ, একটুও চাইনে।

—যা বলেছ। অমন চোখ-মুখ কালোরঙেই ভালো খোলে।

শনিবারের রাত। স্বামি-স্ত্রী উদ্‌গ্রীব হয়ে রইলেন। কথাবার্তা কিছুই হোলো না। থম্‌থম্ করতে লাগল দম্পতীর রাতের বিছানা। নীরবে জাল বুনতে লাগলেন মনে মনে।

আজ ছুটির দিন। রবিবার। জলযোগের আয়োজন স্বভাবতই একটু লোভনীয় হয়ে থাকে। আজ তার উপরেও একটু ঘটা করেছেন সুরঙ্গমা। রান্নাঘরে এসেছেন সাত-সকালে। আজ আসবে সে, সেই আসবে, আসবে তাঁদের নন্দিনী।

সুরঙ্গমার কান পেতে রাখা কানে সদর দরজার কড়া বেজে উঠতেই উনুন থেকে কড়াই নামিয়ে রেখে উঠে দাঁড়ালেন। উৎকর্ণ কানে বেজে উঠল দরজা খুলে দিয়ে স্বামীর আহ্বান করা। সংগে নিমেষের মধ্যে তাঁর শিরায় শিরায়, দেহের কোষে, তনুমনের অণু-অণুতে একটা পাক খেয়ে গেল। একটা তীব্রসুরের চরমে তুলে এনে কে যেন বেঁধে দিল সেতারকে। একটু ছোঁয়া লাগলেই বেজে উঠে ঝরঝরিয়ে ঝরে পড়বে সুতীব্র সেই সুর। শুধু একটুখানি ছোঁয়ার অপেক্ষা মাত্র।

সুরঙ্গমা অপেক্ষা করতে লাগলেন সেই মুহূর্তটির।

যে মুহূর্তটিতে একটি মা-হারা মেয়ে ছুটে এসে তাঁকে জড়িয়ে ধরে ডেকে উঠবে "মা" বলে। ডাকটির মধ্যেকার ভেঙেপড়া অবরুদ্ধ প্রাণের কান্নার স্রোত ঢেউ তুলিয়ে দেবে সুরঙ্গমার বুকের গভীরে মা ডাক শোনবার অবরুদ্ধ প্রাণের কান্নাসরোবরে।

চোখে আঁচল তুলে দিয়ে চোখ মুছে নিচ্ছিলেন, এমন সময় ত্রিদিবেশের আভাস পাওয়া গেল। ছায়ার মত এসে গম্ভীর গলায় ডেকে গেলেন,—সুরঙ্গমা, একবার বাইরের ঘরে এসো। ওঁদের মেয়েটিকে নিয়ে ওঁরা এসেছেন।

থমকিয়ে গেলেন। সেতারের বাঁধা পাকটা আচমকা ঢিলে হয়ে গেল এলিয়ে। অত গম্ভীর কেন স্বামীর কণ্ঠস্বর? এসেই চলে গেলেন ছায়ার মত। গেলেন বলেই দেখতে পেলেন না মুখভাব। শুধু কানে লেগে রইল একটি কথা ওঁদের মেয়ে। কেন, কেন নয় আমাদের মেয়ে?

হাত ধুয়ে মুছে সুরঙ্গমা বাহিরের ঘরে এলেন।

ভাবখানা চিন্তার ঘের লাগা, রহস্যের ঘেরাটুকু ঘা খেয়ে গেছে। অশ্রুজলে ধোওয়া চোখে একটা প্রশ্ন আছে থমকে।

অপরিচিত পুরুষকণ্ঠ কানে বেজে উঠল,—এইখানে সেবা দে।

মুহূর্তের জন্য মেয়েটির মুখে চোখ পড়ল। মুহূর্তের মধ্যেই নীল হয়ে গিয়ে চোখ বুজে গেল সুরঙ্গমার; তাঁর সেই অতিকাঙ্ক্ষার মুহূর্তটিতেই।

বসন্তের ভীষণ আক্রমণ তাকে শুধু রূপহীন করে দেয়নি; বীভৎস করে দিয়েছে। ভুরু ঝরে গিয়েছে; ঝরে গিয়েছে চোখের উপর নিচের পাতার সমস্ত কালো পাপড়ি; কালো ছায়াহীন পাণ্ডুর শাদা চোখে ভাবলেশহীন মৃতের দৃষ্টি। নাক গলাগলা, কান ক্ষয়ে যাওয়া, মাড়ি বার হয়ে পড়েছে দাঁতের। কি ভীষণ, কুশ্রীদর্শন! সেই মেয়ে কপালে, গালে, গলায়, হাতে-পায়ে অজস্র ক্ষতচিহ্ন নিয়ে ছেঁড়া কথুটুলে দাঁড়িয়ে আছে সুরঙ্গমার চোখের সমুখে। বুকের কাছে জড়ো করা, দুই হাতে তুলে ধরা ময়লা ছেঁড়া কাপড়ে বাঁধা ছোট একটা পুঁটুলি।—দে, সেবা দে।

আবার বেজে উঠল অপরিচিত পুরুষকণ্ঠ। সম্বিৎ পেয়ে সুরঙ্গমা চোখ মেলে চাইলেন।

তখনো বুকের কাছে জড়ো করা দু'হাতে তেমনি পুঁটুলি তুলে ধরা। হাত বাড়িয়ে পা ছুঁতে পারল না। মাথা নাবিয়ে দিল একেবারে পায়ের উপরে।

সুরঙ্গমা দু'হাতে তাকে তুলে ধরলেন। চোখ হোলো ঈষৎ ছলোছলো। আবেগে নয়, করুণায়। তুলে ধরলেন বটে, বুকে ধরতে পারলেন না। ধরলে বেসুর বাজত। মস্ত বড় ঝাঁকুনি খেয়ে এলিয়ে গিয়েছে সুরে-বাঁধা সেতারের সরু মোটা তার। মৃদুকণ্ঠে আহ্বান করলেন,—এসো। মৃদুকণ্ঠেও গাম্ভীর্যের ছোঁয়া লাগল। একটু আগেকার স্বামীর গম্ভীর গলার মতই লাগল নিজের গলা।

ওঁরা মেয়ে রেখে চলে গেলেন।

সেদিন স্বামি-স্ত্রী দু'জনেই হয়ে রইলেন হতভম্ব। ত্রিদিবেশ অফিসের ফাইল টেনে মুখ গুঁজড়ে ধরলেন। সুরঙ্গমা নাহক খানিকক্ষণ পড়ে থাকতে লাগলেন রান্নাঘরে আর মেয়েটা বসে বসে কুটি কুটি করে ছিঁড়তে লাগল পুঁটুলির ছেঁড়া কাপড়।

স্নানের কথা বলতে এসেও স্বামীর মুখের দিকে সুরঙ্গমা চুপ

তুলে ধরতে পারেন না। চোখোচোখি হ'তেই মুখ নামিয়ে নিচ্ছেন স্বামি-স্ত্রী। যেন কী ঘোরতর অপরাধে দু'জনে অপরাধী।

অথচ ত্রিদিবেশ বাড়ী থাকলে এমনতর গাম্ভীর্যের কথা স্বামি-স্ত্রী কল্পনাই করতে পারেন না। তখন সদর দরজায় সমুখ দিয়ে হিমশীতল শ্বাস ঝরিয়ে দিতে দিতে লোলুপ করুণ চোখে চেয়ে দেখে দেখে চলে যায় নীরবতা। সেদিন হাসি-গল্পে গানে, কাজকর্মে, পড়াশোনায় এমন কি পাশাপাশি নীরবে বসে থাকতেও মুখরতা এমন নীরন্ধ্র হয়ে থাকে যে নীরবতা প্রবেশপথের রন্ধ্রটুকু পর্যন্ত খুঁজে পায় না।

আজ মুখ নিচু করে কাজ করতে করতে রান্নাঘরেই সুরঙ্গমা শিউরে উঠলেন। বুক-পিঠের উপর দিয়ে শিরশির করে বয়ে গেল চিরপরিচিত হিমশীতলতার ঢেউ। স্তব্ধ হয়ে গেলেন। কি স্পর্দ্ধা! ত্রিদিবেশের উপস্থিতিকেও সমীহ না করে ঢুকে পড়েছে, যে সাহস এর আগে কোনো দিনও হয়নি। আর শুধু ঢুকে পড়া নয়, সুরঙ্গমার মুখের উপরে ঝুঁকে পড়ে বাঁকা হেসে ফিসফিসিয়ে উঠেছে,—কেমন? ঠিক হয়েছে তো? আরো মুক্তি চাই তোমার? আরো মুক্তি?

এই এক জ্বালা হয়েছে। খেতে, শুতে, উঠতে, বসতে স্বস্তি নেই। নিজেদের বিছানায় নিয়ে শোওয়া যায় না, মাথাভর্তি উকুন। একা ঠেলে দেওয়া যায় না বাহিরের ঘরে। কাজেই প্রথম রাত থেকেই—একটা আলাদা বিছানা পেতে দিচ্ছেন, নিজেদের বিছানা থেকে একটু দূরে। এমনি করেই দু'-চারদিন কাটল।

মেয়েটাকে দুজনেই সহ্য করে নিতে চান। সাধারণ ভাবে যতখানি সহ্য করা যায়, ততখানি। থেকে থেকে যুক্তির জালও পাতেন। যাই হোক্ না কেন, মানুষ তো। ওর মধ্যেও রয়েছে রক্ত-মাংসে গড়া ক্ষুধিত প্রাণ। কিন্তু, যুক্তির জালে কত বেঁধে রাখবেন হৃদয়কে? ফাঁক পেলেই সে বেরিয়ে পড়ে। বলে,—করুণা করতে বলো, করব, কর্তব্য করতে বলো, তাও করব, দোহাই তোমাদের, ভালোবাসতে বোলো না। তা পারব না।

যতবার করে ওর মুখের দিকে চান, তত বারই বুক শুকনো হয়ে ওঠে। দীর্ঘশ্বাস ঝরে পড়ে—এই আমাদের মেয়ে?

দ্বিতীয় দিনেই সুরঙ্গমা প্রশ্ন করেছিলেন,—বাঙলা লেখাপড়া কতদূর পড়েছো?

—কিছু না।

কিছু না? সে-কি! দ্বিতীয় ভাগ? প্রথম ভাগ? অ-আ ক-খ?

অসহ্য ক্ষোভে ফেটে পড়া গলায় সুরঙ্গমা প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে চলেছিলেন আর মেয়েটা বিস্ফারিত ভঙ্গীর চোখকে আরো বিস্ফারিত করে সুরঙ্গমার ক্ষোভাতুর মুখের দিকে চেয়ে কেবলি মাথা নেড়েছিল।

তৃতীয় সন্ধ্যায় বসেছিলেন গান গাওয়াতে। সা থেকে গলা চড়ল না রে, গা, মা, পায়। কথার মত আউড়ে গেল গানের কলি। তাও এত থেমে থেমে এত ভাঙা ভাঙা ভাবে আর এমন বিশ্রী রকমের ভুলে ভরা উচ্চারণ যে সুরঙ্গমা, ত্রিদিবেশ চমকে উঠে ত্রাস মোচন করলেন নীরবে।

এর পর থেকে কাজ হোলো মেয়েটাকে উঠে পড়ে পড়ানো। দুপুরবেলায় সুরঙ্গমা ডাকেন,—সরলা, বই নিয়ে এসো।

অত সাধের বাছা বাছা নাম সব মুখ ভার করে ফিরে গিয়েছে। নন্দিনী নয়, সুকীর্তি, সুযশা, সুদক্ষিণা নয়। রয়ে গেছে সেই ওর নিজের ঘর থেকে বয়ে আনা আটপৌরে সরলা নাম।

প্রথম ভাগ হাতে করে সরলা আসে। ছয় সাত দিনেও স্বরবর্ণ শেষ করতে পারেনি। চাড়ও নেই। দু'-চারবার স্বরে অ, স্বরে আ করে সেই যে হাই তুলতে থাকে, সে হাই থামে ঘুমিয়ে পড়লে। সেই যে ঘুমোয় ওঠে বিকেল পার করিয়ে দিয়ে। বেশ বোঝা যাচ্ছে, পড়াশোনার কাজে তার মন নেই!

পড়াশোনায় মন না থাকলে হবে কি, একটা কাজে ভারী মন সরলার। চেটে-পুটে আয়েস করে খায়। যেমন ভালবাসে খেতে, তেমনি খাবার সাধ। হয়তো আরো একটা সাধ আছে তার গোপন মনে। দু'টো ডাক ডাকবার জন্য ছটফট করে তার প্রাণটা! কিন্তু কি করে ডাকে, মা বলে, বাবা বলে? কিছু একটা করবার প্রয়োজনে সুরঙ্গমা আদেশ দেন,—সরলা তোর মেসোমশাইকে স্নানের কথা বলে আয় দেখি।

ত্রিদিবেশও বলেন,—তোমার মাসিমাকে আমার খাবারটা দিতে বলো তো, সরলা!

সারা সংসারের যোগসূত্রে কোথায় যেন একটা জট পাকিয়ে যাচ্ছে। আজও পড়াতে বসে ক্লান্ত বিরক্ত হয়ে উঠলেন সুরঙ্গমা।
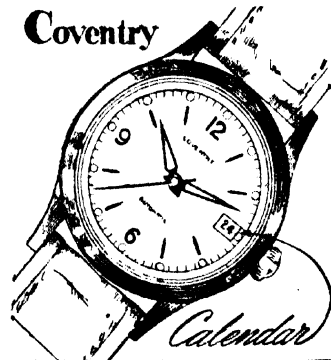
দু'চারবার পড়েই হাই তুলে সরলা পাশেই ঘুমে নেতিয়ে পড়ছে। অকস্মাৎ ধপ করে কি একটা ভারী জিনিষ পড়ে যাবার শব্দে চমকে উঠলেন। সংগে সংগে সর্বদেহের উপর দিয়ে বয়ে গেল হিমশীতল কাঁপন। দেখলেন তাঁর আর সরলার পাশেই মেঝের উপরে বসে পড়ে হাঁটুতে মুখ গুঁজে ধরে ফুলে ফুলে কেঁপে উঠছে নীরবতা। কি করছে? কাঁদছে? কেঁদে উঠেছে বিদায় আসন্ন ভেবে? যাই হোক, সরলা একটা কচি মেয়ে তো বটেই। ক্ষীণ প্রাণ হলেও, প্রাণ আছে তার। নিষ্প্রাণ, নিস্তরঙ্গ নয়। ভালো করে চোখ মেলে ধরে খুশি হ'বার পরিবর্তে হিম হয়ে গেলেন। কেঁপে কেঁপে কেঁদে ওঠা নয়; হেসে উঠছে। গলিত স্রোত বয়ে চলেছে তার হাসিতে কাঁপা-দেহে!

এই পরিহাস! এ-যে অসহ্য। সুরঙ্গমা উঠে দাঁড়ালেন।

সন্ধ্যাবেলায় স্বামীকে আড়ালে ডাকলেন,—দেখো, ওর মুখের দিকে যেন ভালো করে চাইতেই পারি না। যত চেষ্টাই করি, চেষ্টাটাই হয়, চাওয়া হয় না। মেয়েটাও টের পায় সে কথা।

—আমারো সেই দশা। ত্রিদিবেশেরও জবাব আসে।

—এর ফল ভালো হ'তে পারে না। না ওর পক্ষে, না আমাদের।

—সে তো ঠিক কথাই। ত্রিদিবেশ স্ত্রীকে সমর্থন করেন।

—তাহলে খবর পাঠাও না কেন ওর কাকাকে?

কথাটা ত্রিদিবেশের মনে ঘুরছিল, ফিরছিল। বলে উঠতে পারছিলেন না। এখন অত্যন্ত উৎসাহে বলে উঠলেন,—সেই ভালো! খুড়োমশাই আসুন। এসে তাঁদের মেয়ে তাঁরা নিয়ে যান।

খবর পেয়ে খুড়ো এলেন। এসেই হাত কচলাতে লাগলেন। মেয়েটার রূপগুণের কথা চেপে রেখে যে খুবই অন্যায় করা হয়েছে, বারংবার একথা বলবার সংগে সংগে একথাও বলতে লাগলেন, তবু জীবে দয়া আর শিবে দয়া একই, আর দয়ার মধ্যেও মহত্তী দয়া যে মানুষের প্রতি মানুষের দয়া, একথা কে না জানে? জানা কথাকে বার বার জানিয়ে শেষ পর্যন্ত বলতে লাগলেন,—নিজেদের মেয়ের মত করে না হোক্, পথ কুড়োনো মেয়ের মত ছেঁড়াখোঁড়া দিয়ে এঁটোকাঁটা খাইয়ে মানুষ করলেও, আমার আপত্তি নেই।

ত্রিদিবেশ গম্ভীর গলায় বললেন,—আমাদের আছে। আমরা আমাদের মেয়েকেই মানুষ করতে চেয়েছিলুম। জীবে দয়া করতে চাইনি। তবে একটা অন্যায় সরলার প্রতি হয়ে গিয়েছে। অপরাধের দায় আপনাদের বেশী হলেও আমরা একেবারে খারিজ হ'তে পারিনে। ওর বিয়ের সময় আসবেন। শ'চার-পাঁচ টাকা আমরা দেব ওর গহনা বলে। সরলার মাসিই দেবেন!

পুঁটুলিটাকে সুরঙ্গমা নিজের হাতে গুছিয়ে বেঁধে দিলেন। পুরোনো জামার সংগে পাট করে দিলেন নতুনগুলো। চিরুণী, তোয়ালে, বুরুশ সব যা সরলা ব্যবহার করেছে দিয়ে দিলেন। নতুন জামা পরে লুচি সন্দেশ খেয়ে সরলা উঠে দাঁড়াল।

ত্রিদিবেশ আর সুরঙ্গমা দুজনেই সদর দরজা পর্যন্ত এগিয়ে এলেন। যাবার মুখে দাঁড়িয়ে সরলা পুঁটুলিশুদ্ধ দুই হাত জড়ো করে বুকের উপরে ধরে ক্ষণিকের তরে দু'জনের মুখের দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে রইল। তারপরে চলে গেল। পিছন ফিরল না একবারও।

ঘরে ফিরে এসে ত্রিদিবেশ বিছানায় বসে আরামের একটা নিঃশ্বাস ছাড়তে গিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বসলেন। স্বামীর দিকে চেয়ে একটুকরো হাসতে গিয়ে অকারণে কেঁদে ফেললেন সুরঙ্গমা। ফেলেই বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ে বালিশে মুখ গুঁজে ধরলেন।

হু-হু করে কাঁদতে থাকা, মুখ গুঁজে ধরা সুরঙ্গমার মাথায় একটা হাত ফেলে রেখে ত্রিদিবেশ ভাবতে লাগলেন, মানুষের জীবনের হতাশাঘেরা দুঃখের করুণবেদনা কোন রন্ধ্রে লুকিয়ে থাকে, কেউ বলতে পারে না! রক্তমাংসে গড়া একটি মানুষকে তাঁরা ভালোবাসতে চেয়েছিলেন, আপন করে পেতে চেয়েছিলেন। পেয়েওছিলেন, অথচ ভালোবাসতে পারলেন না। তাতে আঘাত হান্‌ল আত্মজের সুনিবিড় সব মোহ-জড়ানো কল্পনা। তাকে বিদায় দিয়ে স্বস্তির শ্বাস ফেলবেন, ভেবেছিলেন। তাও হোল না। কান্নায় ভরে গেল বিদায়ের পরবর্তী ক্ষণ।

পরিধানের দিকে চেয়ে চোখ সজল হয়ে এলো। স্নানের আগে ধুতি-গেঞ্জি স্নানঘরে রেখে এসেছিল সরলা। কথা না বলে এক ফাঁকে কখন চুপ্‌টি ক'রে দোরগোড়ায় রেখে দিয়েছিল চটিজোড়া। তখনো কিছু জানত না সে।

ত্রিদিবেশই কি জানেন এর পরেকার কথা? সপ্তাহ না কাটতে আবার পড়শিনী এলেন।

—দিদির কাছে মুখ দেখাইতে লজ্জা করে।

—আপনার কি দোষ, ভাই?

—আমি কি জানি, ওদের মনে অত শয়তানী? তাই আমারে মেয়ে দেখালই না। এবার একটি ভালো মেয়ের সন্ধান পাইছি।

—না ভাই, আর নয়। বড্ড ঘা খেয়েছি।

—এবার আমি নিজের চোখে দেখে এসেছি। যেমন ফুটফুটে চেহারা, তেমনি টুকটুকে রঙ। বয়েসেও ভালো, আপনার পোষ মানবে। তিন বছরিয়া মেয়ে! মা মরেছে, বাপ আবার বিয়ায় বসতে চায়।

এবার স্বামি-স্ত্রী কোনো আশা করলেন না। কোনো কল্পনা, নামকরণের তর্ক, বাজার করা, কিছুই নয়। এমন কি, এ কথাও বলা থাকল যে পছন্দ না হ'লে তখনি ফেরৎ পাঠাবেন।

মেয়ে যে এলো, মেয়ের মত মেয়ে। নন্দিনী কেন, সুপ্রিয়া, সুদক্ষিণা তার নাম যাই দাও না কেন, নামের মুখে হাসি বেজে উঠবে।

রঙ নয় তো স্বর্ণরেণুর গুঁড়ো। চোখ নয় তো নীল পদ্মে বসেছে ভ্রমর। দুই ভুরু যেন ডানা মেলা প্রজাপতি, ছুটে চলেছে নাচের ছাঁদে। সেই মেয়ে লাল পদ্ম পাপড়ির ঠোঁটে সকাল বেলাকার সোনারঙা রোদ্দুরের ঝলমল হাসি ফুটিয়ে, রেশমী চুল দুলিয়ে বাপের কোল থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল সুরঙ্গমার কোলে। পড়েই দুহাতে আঁকড়ে ধরল।

সুরঙ্গমা তাকে সজোরে বুকে চেপে ধরলেন। এত জোরে ধরলেন যে তারি ঘায়ে বুকে একটা ব্যথা বেজে উঠল।

তারপর ছ'মাস কেটেছে। বাড়ীটার বদল হয়েছে অভূতপূর্ব। খিলখিল হাসি, দুড়দাড় শব্দ, নন্দি, মা, বাবা, ডাকে আশ্চর্য রকমের মুখর হয়ে থাকে।

আর সেই যে ছ'মাস আগেকার একটা সোনালী সকাল বেলায়

রেশমী চুল দুলিয়ে সোনার মত মেয়ে নন্দিনীকে সুরঙ্গমার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখে। একটা আকুল আর্তনাদ করে উঠে দরজার পাশ থেকে মুখ চেপে ধরে কান্না রোধ করতে করতে ছুটে গিয়েছিল নীরবতা, এতদিনের প্রিয় আবাস ছেড়ে যাবার অসহায় কান্না দূরে মেলানো গোঙানির মত লেগেছিল সুরঙ্গমার কানে ; তারপর আর এমুখো হয়নি! হয়তো সাহসই হয় না তার। এমন কি, নন্দিনীকে ঘুম পাড়াতে নিয়ে বুকের কাছটিতে ধরে যখন নন্দিনীর সংগে অঘোর ঘুমে তলিয়ে যান, নিশুতি হয়ে যায় বাড়ীটা, তখনো নয়। আর হিমশীতল বায়ে শিরশিরিয়ে উঠতে হয় না তাঁকে। না হলেও থেকে থেকে একটা ব্যথা বেজে ওঠে বুকে। ব্যথাটার সূত্রপাত নন্দিনীকে প্রথম বুকে চেপে ধরবার থেকেই।

নন্দিনী আধো গলায় ছড়া গায়, পড়া করে, সুরেলা গলায় গানের কলি গেয়ে ত্রিদিবেশ আর সুরঙ্গমার প্রাণে খুশির জোয়ার বইয়ে দেয়।

সেদিন এক, দুই, তিন তালের সংগে নাচের ইস্কুলে মায়ের হাত ধরে যাতায়াত করে যে নাচ শিখেছে, তারই দু'-চারটে ভংগী দেখিয়ে মুগ্ধ করে দিচ্ছিল বাবা-মাকে, এমন সময় মুখের হাসি বন্ধ করে সুরঙ্গমাকে বিছানায় উপুড় হয়ে পড়তে দেখে ত্রিদিবেশ ব্যস্ত হয়ে উঠলেন,—কি হোল, সুরঙ্গমা ?

—বুকে একটা ব্যথা করচে।

—ডাক্তার। অদ্ভুত ব্যস্ত হয়ে পড়লেন ত্রিদিবেশ।

—ডাক্তার কি হবে? ডাক্তারে কি করবে এই ব্যথার? চুপ করে একটু শুয়ে থাকলেই সেরে যাবে।

মুখের উপরে ঝুঁকে-পড়া ব্যাকুল-চোখের মেয়েকে আস্তে সরিয়ে বললেন,—নন্দা, এখন একটু বাবার কাছে থাকোতো মা! একটু শুতে দাও আমাকে।

আর একদিন বন্ধুর বাড়ী থেকে নিমন্ত্রণ এসেছে। তাঁদের মেয়ের জন্মতিথি! মেয়েকে এমন সাজালেন সুরঙ্গমা, যেন মুগ্ধ হয়ে যায় নিমন্ত্রণবাড়ীর সমস্ত লোকের চোখ। হয়তো বা একটু ঈর্ষার খোঁচাও বিঁধবে অনেক বাপ-মায়ের বুকে। দেখে দেখে যখন আর আশ মেটে না। ঝুঁকে পড়েছেন আলতো করে চুমো খাবেন মেয়ের কপালে, হঠাৎ সরে এলেন ভূতে পাওয়ার মত।

—ব্যাপার কি সুরঙ্গমা ? সেই ব্যথাটা নাকি ?

—হুঁ। চোখ বুজে জবাব দিয়েই বালিশ আঁকড়ে ধরলেন।

—ওদের না হয় একটা খবর পাঠিয়ে দিই যে আমরা—

—না না। একটু চুপ করে থাকলেই সেরে যাবে।

বড় দুশ্চিন্তায় পড়েছেন ত্রিদিবেশ। কি করে যে সুরঙ্গমা অমন একটা ব্যাধি বুকে বাধিয়ে বসলেন, তার হদিশ পাচ্ছেন না। থেকে থেকেই ব্যথাটা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে অথচ ডাক্তার দেখাবার কথা বললেই সুরঙ্গমা অসম্ভব চটে যান। ত্রিদিবেশের ভাবনা প্রবল রকমে বেড়ে উঠল দু'তিন দিন পরেকার এক রাত্রে।

মাঝরাত্তে সুরঙ্গমা ঘুম ভেঙে ধড়ফড়িয়ে উঠে বেবিকটের উপরে ঝুঁকে পড়তে নিতেই ত্রিদিবেশ আটকালেন,—এই তো এতক্ষণ বুকে করে রাখলে। শুইয়ে সবেই শুয়েছ। এখন একটু ঘুমোও দেখি। নাহলে যে অসুখ করবে।

—দেখি, নন্দি আছে কি না!

—এই দেখো। থাকবে না তো যাবে কোথায় ?

—কেউ যদি ওকে ঠেলে ফেলে দিয়ে সেই জায়গায় নিজে শুয়ে থাকে ?

—ক্ষেপেছ ? দরজা বন্ধ ঘরে কে আসবে শুনি ? ও, বুঝতে পেরেচি, তুমি স্বপ্ন দেখেছো।

—স্বপ্ন। তা হবেও বা।

একটুখানি চুপ করে থাকলেন সুরঙ্গমা। বললেন, কিন্তু, কি বিশ্রী স্বপ্ন!

—স্বপ্ন বিশ্রীই হয় সুরঙ্গমা। ঘুমোও এবার। একটু চোখ বুঁজতে চেষ্টা করো।

তবু সুরঙ্গমা একবার মেয়ের খাটে হাত বুলিয়ে নিলেন। মেয়ের কপালে, গালে হাত বুলিয়ে দিয়ে ভাবতে লাগলেন, কেন এমন হয়? কেন, একথা স্বামীকেও জানাতে পারছেন না। কেন জানাতে পারছেন না, হিমশীতল নীরবতার হাত থেকে রেহাই পেলেও পেতে পারছেন না উত্তাল-মুখর একটা ব্যথা থেকে।

কি করে জানাবেন ? কেমন করে জানাবেন যে তাঁর আর নন্দিনীর মাঝখানে থেকে থেকেই উপস্থিত হয় পরিচিত এক ছায়া। দুঃসহ সেই ছায়ামূর্তিকে ভাষায় রূপদান করবেন এত ভাষা তাঁর ভাণ্ডারে নেই। স্বপ্নেও নয়, জাগরণেও সেই ছায়া আসে। নন্দিনীর নাচের সময় তাকে আড়াল করে ধরে, তার বুকের উপরে ঝুঁকে পড়ে চুমো খেতে নিলে সে ছুটে এসে নিজের মুখ উঁচু করে তুলে ধরে।

আজ রাতে সেই ছায়া এসেছিল।

বলছিল,—আমার জায়গায় কেন শুইয়েছ ওকে? আমি শোব ওকে ঠেলে ফেলে দিয়ে।

আবার ধড়মড়িয়ে উঠলেন সুরঙ্গমা। কি দেখছেন তিনি? ত্রিদিবেশ তাঁকে জোর করে শুইয়ে দিলেন। দিয়ে আলতো করে বুকে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন ধীরে ধীরে। বুঝলেন ব্যথাটা আজ উত্তাল হয়েছে।

সুরঙ্গমা স্বামীর হাত বুকে চেপে ধরলেন সজোরে। ধরেও ত্রাণ পেলেন না। দেখতে পেলেন,—তাঁর আর নন্দিনীর মাঝখানে শুয়ে আছে পরিচিত সেই ছায়া। ভয় পেয়ে চোখ বুঁজলেন, সেখানেও দেখতে পেলেন সেই ছায়া। আবার চোখ খুললেন। খুলেও দেখতে পেলেন সেই দুঃসহ ছায়া!

পুঁটুলিশুদ্ধ জড়ো করা দু'হাত বুকের উপরে ধরে রেখে ফ্যাল্‌-ফ্যাল্‌ করে চেয়ে আছে শাদা নিনিমেষ নেত্রে।

"Bernard Shaw once considered me one of the five greatest living actors. The other four were the Marx Brothers." —*Sir Cedric Hardwicke.*

পক্ষধর মিশ্র

যে কোন দেশের উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্য লৌহশিল্পের গুরুত্বের কথা পাঠকদের নতুন করে বলবার কিছুই নেই। বর্তমান কালের বিজ্ঞান-সভ্যতার অগ্রগতির এক প্রধান উপাদান ইস্পাত। আমেরিকা, রাশিয়া, জার্ম্মাণী, ফ্রান্স এমন কি জাপানের সঙ্গেও লোহা ও ইস্পাত উৎপাদনের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের তুলনা করা যায় না। ভারতবর্ষকে নিজের প্রয়োজনের এক বৃহৎ অংশ লোহা ও ইস্পাত বিদেশ থেকে আমদানী করতে হয়। এমন কি, বৈদেশিক মুদ্রার এই চরম দুর্দিনে গত ১৯৫৭ সালে ভারতবর্ষ প্রায় ১৬ লক্ষ টন ইস্পাত বিদেশ থেকে আমদানী করতে বাধ্য হয়েছিল। কৃষি ও শিল্পের সর্ব্বক্ষেত্রেই ইস্পাতের প্রয়োজন অপরিসীম, আগামী কালে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কৃষির উন্নয়ন ও তার সঙ্গে শিল্পের প্রসার সাধনের জন্য ইস্পাত-শিল্পে ভারতের আত্মনির্ভরশীল হওয়া একান্ত প্রয়োজন। ভারত সরকার এই লক্ষ্য সামনে রেখে এগিয়ে চলেছেন, সর্ব্ব প্রকারে ইস্পাত-শিল্পের প্রসার ও উন্নতি সাধনের জন্য চেষ্টা করছেন। পরাধীন ভারতবর্ষে ইস্পাত উৎপাদনের প্রধান প্রতিষ্ঠান ছিল জামসেদপুরের টাটা আয়রণ অ্যাণ্ড ষ্টীল কোম্পানী এবং দেশকে লোহা ও ইস্পাত সরবরাহে টাটার সহযোগিতা করতো বার্ণপুরের ইণ্ডিয়ান আয়রণ অ্যাণ্ড ষ্টীল কোম্পানী ও ভদ্রাবতীর মহীশূর আয়রণ অ্যাণ্ড ষ্টীল কোম্পানী। দেশের শিল্পবিপ্লবের মহান প্রচেষ্টায় তাঁরা সকলেই তৎপর হয়ে উঠেছেন। জামসেদপুরের টাটা কোম্পানী এবং বার্ণপুরের ইণ্ডিয়ান আয়রণ কোম্পানী উভয়েই বিশ্বব্যাঙ্কের কাছ থেকে মোটা টাকা ধার নিয়ে তাঁদের কারখানার সম্প্রসারণ এবং তার সঙ্গে উৎপাদন বৃদ্ধির দিকে বিশেষ মনোযোগ দিয়েছেন। টাটা কোম্পানীর প্রধান লক্ষ্য, তাঁদের উৎপাদনের পরিমাণ ২০ লক্ষ টন করা, আশা করা যায়, বর্তমান পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সমাপ্তির আগেই তাঁরা তাঁদের এই প্রচেষ্টায় সাফল্য লাভ করে দেশের অগ্রগতির ক্ষেত্রে সহায়তা করতে পারবেন।

ইস্পাত উৎপাদনের ক্ষেত্রে এই সব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে চলবার জন্য ভারত সরকার স্বয়ং এগিয়ে এসেছেন। প্রতিষ্ঠিত হয়েছে হিন্দুস্থান ষ্টীল প্রাইভেট লিমিটেড,—এর মূলধন ৩০০ কোটি টাকা। রাউরকেল্লা, ভিলাই এবং দুর্গাপুরে তিনটি কারখানা স্থাপন করা হয়েছে এবং প্রারম্ভিক ভাবে প্রত্যেকটিতে ১০ লক্ষ টন করে ইস্পাত উৎপন্ন হবে। এই তিনটি কারখানা স্থাপনে ভারত সরকারকে সাহায্য করছে,—যথাক্রমে পশ্চিম জার্ম্মাণী, রাশিয়া এবং গ্রেট বৃটেন। আশা করা যায়, এই বছরের মধ্যেই রাউরকেল্লা ও ভিলাইতে কাজ সুরু হয়ে ভারতের ইস্পাত-শিল্পের ক্ষেত্রে এক নতুন যুগের সূচনা করবে।

* * * *

সুগন্ধি দ্রব্যের সৃষ্টিতে প্রকৃতির অবদান অসামান্য। পৃথিবীর বুকে সংখ্যাতীত শ্রেণীর উদ্ভিদের মাধ্যমে, প্রকৃতি সুগন্ধি দ্রব্যের সৃষ্টিকার্য্য চালিয়ে যাচ্ছে। বিশেষ শ্রেণীর ফুল ও উদ্ভিদের মধ্যেই প্রকৃতিসৃষ্ট সুরভি অবস্থান করে। কেবল উদ্ভিদ-জগত নয়, কোন কোন ক্ষেত্রে প্রকৃতির সুরভিসৃষ্টির কার্য্যে প্রাণিজগতও পেছিয়ে থাকে না। মানুষ সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতিজ সুগন্ধি দ্রব্যের উৎসগুলির মধ্যে থেকে সুরভি উৎপাদনের পদ্ধতি উদ্ভাবিত করেছে, এবং তারই সহায়তায় সে বহুবিধ সুগন্ধি দ্রব্য প্রস্তুত করছে। উদ্ভিদের সুগন্ধের কারণ তার সুগন্ধি তেল, এই সুগন্ধি তেলকেই পৃথক করে নিয়ে সুরভি শিল্পে ব্যবহার করা হয়। যে কোন সুগন্ধি ফুলের মধ্যে লুকিয়ে আছে এই সুগন্ধি তেল, একে বাইরে থেকে দেখা যায় না কিন্তু যখনই একটি ফুলের আঘ্রাণ আমরা গ্রহণ করি, তখনই ঘ্রাণের মধ্যে দিয়ে ফুলের মধ্যে অবস্থিত এই বস্তুটির সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে। এই সুগন্ধি তেলের সঙ্গে, সাধারণ তেল বা ঘি-এর প্রায় কোনই মিল নেই। সুগন্ধি তেল কাগজ অথবা কাপড়ের উপর তেলের দাগ ফেলে বটে, কিন্তু অন্যান্য তেল ঘি-এর দাগের মতো এই দাগ স্থায়ী নয়, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই এই তেল উঠে যায়, পেছনে কেবলমাত্র গন্ধের রেশ পড়ে থাকে। সহজে উপে-যাওয়া, সুগন্ধি তেলের একটি বিশেষ গুণ, তাই একে উদ্বায়ী তেলও বলা হয়। এই উদ্বায়ী তেলের সঙ্গে সঙ্গে গন্ধ-কণিকা বাতাসের মাধ্যমে আমাদের ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে উত্তেজিত করে বলেই আমরা সুগন্ধ অনুভব করি, অবশ্য কঠোর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে সব তেল ঘি-ই কিছু না কিছু পরিমাণে উদ্বায়ী কিন্তু তা বলে এই বিশেষ গুণের তুলনামূলক বিচারে সুগন্ধি তেলের ধারে কাছেও তারা আসতে পারে না। রাসায়নিক চরিত্র বিচারেও সুগন্ধি তেলকে,—তেল বা ঘিয়ের শ্রেণীতেই ফেলা যায় না, মিথ্যেই এদের নাম তেল দেওয়া হয়েছে।

বিশাল এই উদ্ভিদ ও প্রাণিজগতের মধ্যে ছড়িয়ে আছে প্রকৃতির সুগন্ধি দ্রব্যসমূহ। অবশ্য সর্বদিক বিচার করলে দেখা যায়, প্রকৃতির সুগন্ধি দ্রব্যসমূহের উৎপাদনে উদ্ভিদ-জগতের স্থান অনেক বেশী ব্যাপক। সুগন্ধি তেল গাছের ফুলের মধ্যেই শুধু পাওয়া যায় না, ক্ষেত্রবিশেষে তার ডালপালা, গুঁড়ি, শেকড়, ফল, পাতা ইত্যাদি সবকিছুর মধ্যেই ছড়িয়ে থাকে। তবে ফুলের পাপড়িই সবচেয়ে মূল্যবান, কারণ সাধারণ ভাবে দেখা যায়, এর মধ্যেই লুকিয়ে থাকে সবচেয়ে মূল্যবান সুগন্ধি তেল। গোলাপের অতুলনীয় সুগন্ধি তেলের উৎস হলো গোলাপ ফুলের পাপড়ি। দারুচিনির সুগন্ধি তেল থাকে গাছের পাতায় এবং ছালে, ওরিসের শেকড়ের মধ্যেই লুকিয়ে থাকে ভায়লেট ফুলের গন্ধসম্পন্ন সুরভি। সিসিলির বারগামট তেল অবস্থান করে ফলে আর লিমোনিনের (lemonene) উৎস হলো কমলালেবুর খোসা, একটা অতি সাধারণ প্রশ্ন এবার মনে জাগতে পারে, সুগন্ধি তেল প্রকৃতির বুকে কি কারণে সৃষ্টি হয়? উদ্ভিদ-জগতে এদের বিশেষ প্রয়োজনটা কি, যার জন্য স্রষ্টা এই সব অনবদ্য সুগন্ধের সৃষ্টি করেছেন? ফুলের সুগন্ধের প্রয়োজনটা সোজাসুজি দেখতে পাওয়া যায়,—গন্ধের দ্বারা সে আকর্ষণ করে পতঙ্গকে; পতঙ্গের দেহে এবং পাখায় লেগে এক ফুলের রেণু ছড়িয়ে পড়ে ফুলে ফুলে, প্রকৃতির সৃষ্টিকার্য্য অব্যাহত থাকে। এ ছাড়া আর যে সব সুগন্ধি তেল অবস্থান করে ফলে, পাতায় বা গাছের
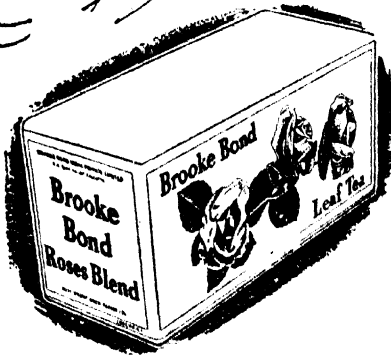
সবাই জানেন—
প্রতি প্যাকেট ব্রুক বণ্ড চায়ে অনেক বেশী কাপ ভালো চা তৈরী করা যায়
...আর বাগান থেকে সদ্যসদ্য সরবরাহ করা হয় ব'লে ব্রুক বণ্ড চা একেবারে তাজা থাকে
...আর লোকে রোজ সাড়ে পাঁচ কোটিরও বেশী কাপ ব্রুক বণ্ড চা খেয়ে থাকেন
Brooke Bond Roses Blend
Brooke Bond Leaf Tea
এই জন্যেই অন্য যে কোন মার্কা চায়ের চেয়ে ব্রুক বণ্ড চা বেশী লোকে খান !

শেকড়ে, সেই বিশেষ উদ্ভিদের জীবনীক্রিয়ার কোন না কোন দায়িত্ব নিশ্চয়ই তারা বহন করছে। এই আলোচনা কেবল উদ্ভিদতত্ত্ববিদেরাই করতে পারবেন। বিনা প্রয়োজনে মনে হয়, প্রকৃতির বুকে কোন কিছুর সৃষ্টিতেই বিধাতাঠাকুর হাত দেন না।

* * * *

বর্ত্তমানে পৃথিবীর সমস্ত অঞ্চলেই মনে হয় কোন না কোন সুগন্ধি-শিল্পের উদ্ভব হয়েছে। তবে গুরুত্বের দিক দিয়ে বিবেচনা করলে দেখা যায়, সুগন্ধি-শিল্পের ক্ষেত্রে সমগ্র পৃথিবীতে ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ড শীর্ষস্থান অধিকার করে আছে। দক্ষিণ-ফ্রান্সের একটি ছোট সহর গ্রাসে (Grasse) হলো এই শিল্পের প্রাণকেন্দ্র। সুরভি ব্যবসায়ীদের কাছে হিন্দুদের বারাণসীর মতোই এই অঞ্চল তীর্থস্থলস্বরূপ। এখানকার ফুলের চাষের প্রাচুর্য্য বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলের ঈর্ষ্যার উদ্রেক করে, কয়েক হাজার নিপুণ কর্ম্মীর অনলস কর্ম্মধারা সুগন্ধি শিল্পের ক্ষেত্রে গ্রাসের অতুলনীয় শ্রেষ্ঠত্ব বহুকাল ধরে অক্ষুণ্ণ রেখে আসছে। প্রাকৃতিক সুরভি উৎপাদনে গ্রাসের পর রিইউনিয়ন (Reunion) দ্বীপের নাম উল্লেখ করা যায়। হাজার স্কোয়ার মাইল বিস্তৃত এই দ্বীপটিতে ভেটিভারট (Vetivert), জিরানিয়াম (Geranium) প্রভৃতি সুগন্ধি তেল প্রচুর পরিমাণে উৎপাদিত হয়। এর পর উল্লেখ করা যায় জাঞ্জিবার, জাভা, ভারতের মহীশূর, ইতালীর দক্ষিণাঞ্চল এবং আমেরিকার মিসিগানের কথা। ভারতের মহীশূরে উৎপন্ন হয় চন্দনতেল, জাভা রপ্তানী করে সিট্রোনেলা আর পুদিনার গন্ধসম্পন্ন তেল উৎপন্ন হয় আমেরিকার মিসিগানে। গ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে ফরাসী দেশের কানে (Cannes), নিস (Nice), মনাকো (Monaco) প্রভৃতি অঞ্চলও সুগন্ধি-শিল্পের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য।

* * * *

একটু আগেই আলোচনা প্রসঙ্গে লিখেছিলাম, সুগন্ধি তেলসমূহ উদ্ভিদের জীবনী ক্রিয়ায় সহায়তা করে। সেই সহায়তা কি রকম, তা সামান্য আলোচনা করছি। ফুলের সুগন্ধ কেবল পতঙ্গকে আকর্ষণই করে না, যখন পতঙ্গ ঐ উদ্ভিদের শত্রু হয়ে দাঁড়ায় তখন কোন কোন ক্ষেত্রে উদ্ভিদের কোন বিশেষ গন্ধ পতঙ্গকে বিতাড়িতও করে। কোন সুগন্ধি তেল আহত উদ্ভিদের ঔষধের কাজ করে; দেহমধ্যে সংরক্ষিত খাদ্যরূপে বিরাজ করার দায়িত্বও অনেক ক্ষেত্রে ঐ সুগন্ধি তেলের উপর বর্ত্তায়। অনেকের মতে উদ্ভিদ-দেহের মধ্যে সুগন্ধি তেল জলের অবস্থিতির সমতা রক্ষা করে—এর ফলে উদ্ভিদ-দেহে জলের অপচয় রোধ হয়। সুগন্ধি তেল উদ্ভিদ-দেহে সর্ব্বক্ষেত্রেই নিজে সঞ্চিত খাদ্যরূপে থাকে না, কোন কোন সময়ে সঞ্চিত খাদ্যরূপে অবস্থিত অন্য কোন রসায়ন দ্রব্যকে পচে অথবা ভেঙ্গে নষ্ট হয়ে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করে। যাই হোক, সুগন্ধি তেল বিষয়ে যা বললাম, তার নিশ্চিত স্বীকৃতি এখন গবেষণার আশ্রয়ে শৈশবেই বিরাজ করছে।

* * * *

উদ্ভিদ-জগত থেকে যে সব সুগন্ধি দ্রব্য পাওয়া যায় তার একটি বিশেষ শ্রেণীর কথা এতক্ষণ আলোচনা করা হয় নি। এরা বিভিন্ন গাছের ক্ষরিত রস,—সুগন্ধি আঠাল দ্রব্য। ধুনা, রজন এবং বৃক্ষের আঠা জাতীয় এই দ্রব্যসকল বহু প্রাচীন কাল থেকেই উৎসব ও ধর্ম্মীয় অনুষ্ঠানাদিতে অত্যন্ত পবিত্র বস্তু বলে পরিগণিত। মির (myrrh), বালসাম (balsam), স্টোরাক্স (storax), ওলিবেনাম (olibanum) ইত্যাদি বহু প্রকার ধুনা জাতীয় পদার্থ সুরভিশিল্পে ব্যবহৃত হয়। সাধারণ ভাবে এই সব বস্তুগুলির মধ্যে পার্থক্য নির্দ্ধারণ করা খুবই কঠিন কাজ। গাছ থেকে এদের পৃথক করে নেওয়া অতি সহজ, গাছের গায়ে একটি ক্ষত করে রাখলেই এরা আপনি ক্ষরিত হতে থাকে। ধুনা জাতীয় বালসামের কথা প্রথমে আলোচনা করা যায়। প্রায় তিন চার রকমের বালসাম শিল্পক্ষেত্রে প্রস্তুত করা হয়। এই বস্তুটি জমাট রজনের মতো কঠিন নয় আবার গাছের আঠার মতো চটচটেও নয়। শক্ত-নরমের মাঝামাঝি একটা অবস্থায় বালসাম থাকে। বালসাম পেরু বা বালসাম টোলু উৎপাদনের প্রধান স্থান দক্ষিণ-আমেরিকা। বালসাম উৎপাদনকারী গাছের গায়ে ক্ষত সৃষ্টি করে তাতে মোটা কম্বল জাতীয় কাপড় বেঁধে রাখা হয়। কম্বলটি রসে ভিজে যায় এবং তারপর তাকে জলে সিদ্ধ করে বালসাম পৃথক করা হয়। বালসাম কোপাইবাও (copaiba) দক্ষিণ আমেরিকাজাত একটি দ্রব্য। বালসামের সমগোত্রীয় স্টোরাক্স পাওয়া যায় এসিয়া মাইনরে। স্টোরাক্স উৎপাদনকারী বিশেষ বৃক্ষের ছাল থেকে স্টোরাক্স গাছের ভিজে ছালকে চাপ দিলে একটি সৌরভযুক্ত তেল পাওয়া যায়, এই তেল জলের মধ্যে নিষ্ক্রান্ত স্টোরাক্সের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়। স্টোরাক্সের গন্ধ মনোরম ও শরীর মনের ক্লান্তি দূর করে। স্টোরাক্স, বালসাম বা কঠিন প্রকৃতির ধুনা বেনজয়িন এর গন্ধ ভেনিলার মতো।

বেনজয়িন (Benzoin) উৎপাদনের প্রধান অঞ্চল দক্ষিণ-পূর্ব্ব এসিয়া। বিনা কারণে আপনা থেকেই বেনজয়িন গাছে এই বস্তুটি উৎপন্ন হয় না। গাছের গা কেটে দিলে, বা আঘাত করে গাছের দেহে কোন ক্ষতের সৃষ্টি করলে গাছ বেনজয়িন উৎপন্ন করে আহত অঞ্চল দিয়ে বার করতে থাকে। উৎপাদনকারীরা সাধারণ ভাবে V এর আকারে গাছের গা কেটে রাখেন এবং তলায় গড়িয়ে পড়বার সময় বেনজয়িন সংগৃহীত হয়। মির, লাবডেনাম ইত্যাদি ধুনা জাতীয় পদার্থ উৎপাদিত হয় গাছের পাতা থেকে। এরা বেনজয়িন বা স্টোরাক্সের তুলনায় বেশ নরম জাতীয় ধুনা, সাধারণতঃ পাতার উপর আঁচড় কেটে, ছুরীর সহায়তায় এই বস্তুগুলি চেঁচে নেওয়া হয়। স্পেনে গাছের ডালপালা জল দিয়ে ফুটিয়ে এবং ফ্রান্সে জৈব দ্রবণের দ্বারা গাছের পাতা থেকে একে পৃথক করে নেওয়া হয়।

অতি প্রাচীনকাল থেকে ধুনা জাতীয় পদার্থ কি ভাবে ব্যবহৃত হয় তা আপনাদের জানা আছে। আগুনে দহন করলেই ধোঁয়ার মাধ্যমে এদের সুবাস চতুর্দ্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। এই সব চট্‌ চটে পদার্থকে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ব্যবহার করার যথেষ্ট চেষ্টা হয়েছে। বেনজিন বা অ্যালকোহলে ভিজিয়ে ধুনা বা রজন জাতীয় পদার্থের দ্রবণীয় অংশটিকে পৃথক করে নিয়ে, দ্রবণ আলাদা করে নিলে যে বস্তুটি পড়ে থাকে তাকে বলে রেজিনয়েড (rejinoid) এই কাজে গরম দ্রবণ ব্যবহার করে যে কাথ পাওয়া যায় তা সুগন্ধিশিল্পে নানা কাজে ব্যবহৃত হয়। ঠাণ্ডা পরিবেশে দ্রবণের সহায়তায় আরক জাতীয় যে রেজিনয়েড প্রস্তুত করা হয়, তার সামান্য অবস্থিতি উদ্বায়ী তেলের বাষ্পীভবনের বিলম্ব ঘটায়। সুগন্ধি শিল্পে তাই সুগন্ধি দ্রব্য সমূহের সত্বর বাষ্পীভবনের প্রতিবন্ধকরূপে নানা প্রকার সুতীব্র গন্ধযুক্ত রেজিনয়েড ব্যবহৃত হয়।

৫৪

জ্ঞানীদের ব্রহ্মজ্ঞান
ভক্তেরা চায়নাকো,
সেবাতেই তাদের আরাম ।
অসীম ঐশ্বর্য দেখে তাঁর
পাছে মনে ভয় ঢোকে,
ভালোবাসা পাছে কোমে যায়,
ভক্তেরা তাই
অনাদি অনন্তকে
রূপ দিয়ে ছোটো কোরে
সর্বদা কাছে পেতে চায়,
অসীমকে কাছে ডেকে
অসীমের গা-টা থেকে
মানুষের গন্ধটা চায় ।

৫৫

তা'বোলে কি এই তার মানে—
জ্ঞানীরা যেখানে যান,
ভক্তেরা যান্‌না সেখানে ?
নিশ্চয়ই যান্,
নিদারুণ প্রেমাভক্তিতে
ভক্তও পান সেই
জ্ঞানীদের একাকার জ্ঞান ।
তবে তাঁরা জ্ঞানীদের মোতো
বলেননা পৃথিবীটা ভুয়ো,
নিছক স্বপ্ন বোলে
উড়িয়ে জান্‌না কোনোদিনই,
উল্টে বলেন এই—
ছুনিয়ার সবেতেই
প্রকাশিত রোয়েছেন তিনি ।

সবেতেই সেই ভগবান,
একই অনেক হোয়ে
অসংখ্য নামে-রূপে
পৃথিবীতে লীলা কোরে যান ।

শ্রীমতীর প্রেমদৃষ্টিতে
শ্যাম ছাড়া কিছু নেই আর,
এমন কি মাঝে মাঝে
নিজেকেও বেমালুম
শ্যাম বোলে মনে হোতো তাঁর !

মহাভক্ত হনুমানজীও
বোলতেন জানি,—
মাঝে-মাঝে, সীতাপতি,
মনে হয় তুমিটাও আমি ।

বিবেকানন্দ স্তোত্র

সুমণি মিত্র

তার মানে এই—
জ্ঞানীরা যেখানে যান,
ভক্তও যান সেখানেই ।
ভক্তি-পথের শেষে
ভক্ত দাঁড়ান এসে
জ্ঞানীদের চরম জ্ঞানেই ।১

*   *   *

"যৎ কর্ম্মভির্যৎ তপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ ।
যোগেন দানধর্ম্মেণ শ্রেয়োভিরিতরৈরপি ॥
সর্ব্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেঽঞ্জসা ।
স্বর্গাপবর্গং মদ্ধাম কথঞ্চিদ্ যদি বাঞ্ছতি ॥" ২

---

১ । "ভক্তবৎসলঃ স্বয়মেব সর্ব্বেভ্যো মোক্ষবিঘ্নেভ্যো ভক্তিনিষ্ঠান্ সর্ব্বান্ পরিপালয়তি । সর্ব্বাভীষ্টান্ প্রযচ্ছতি মোক্ষং দাপয়তি ॥"

—ত্রিপাদ বিভূতি উপনিষদ্ (৮ম অধ্যায়)

ঠাকুরও তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিতে ঐ একই কথা বোলছেন,—"যিনি ব্রহ্মজ্ঞান চান, তিনি যদি ভক্তিপথ ধরেও যান তাহ'লেও ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করবেন । তার মানে নয় যে ভক্ত এক জায়গায় যাবে, আর জ্ঞানী বা কর্ম্মী আর এক জায়গায় যাবে । ভক্তবৎসল মনে কোরলেই ব্রহ্মজ্ঞান দিতে পারেন । ঈশ্বর যদি খুসী হন, তাহ'লে ভক্তিও দেন, জ্ঞানও দেন । কোলকাতায় যদি কেউ একবার এসে পড়তে পারে, তাহ'লে, গড়ের মাঠ, সুসাইটি সব দেখতে পাবে । কথাটা এই, এখন কোলকাতায় কেমন ক'রে আসি ।"

—কথামৃত ।

২ । "কর্মকাণ্ড ও তপস্যাচরণে, জ্ঞান ও বৈরাগ্যবলে, যোগ ও দানব্রতে কিংবা অন্যান্য মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানগুণে যা' যা' কিছু

৫৬

অথচ এ-রাস্তাটা সোজা,
শাস্ত্র বা সকলেই বলে।
দেহবোধ নিয়ে এই
কলিতে ভক্তিতেই
নির্ভয়ে পা বাড়ানো চলে। ৩

ষড়রিপু থাকুক না,
কেন ঘাবড়াও?
কান ধোরে রিপুদের
ঘোড়টা ঘুরিয়ে শুধু দাও।
কামনা কোরতে হোলে
বিষয়-বাসনা ফেলে
সচ্চিদানন্দকে চাও।

ক্রোধ যদি নাই যায়,
'ভক্তির তমঃ'৪ এনে
নিজেকে শুদ্ধ কোরে নাও,
বিশ্বাস দৃঢ় রেখে
তাঁর নামে মন থেকে
পাপবোধ ঝেড়ে ফেলে দাও।
ঈশ্বরলাভেতে যে
বাধার সৃষ্টি করে
সক্রোধে তাকে ধমকাও।

লোভ যদি নাই যায়,
ঈশ্বরে লোভ করো তবে।
মোহ যদি নাই যায়,
পুরোপুরি ঈশ্বরে
মোহগ্রস্ত হোতে হবে।
'আমি' ও 'আমার' বোধ
যদি নাই যায়,
ইষ্টকে ভাবো আপনার।
অহংশূন্য যদি হোতে নাই পারো,
ভাবো মনে—আমি শুধু তাঁর

যেমন শ্রীবিভীষণ
রাম ছাড়া কারো কাছে
মাথা নত করেনি আর।

৫৭

ভক্তি সহজ পথ
এই কারণেই।
এ পথের রহস্য এই—
মানবীয় বৃত্তি যা'
আছে আমাদের,
তারা কেউ হেয় নয়,
তবে
তাদের নিম্নগতি
উচ্চ ভাবের প্রতি
তোমায় ঘুরিয়ে দিতে হবে।

মানুষ যখন
কিছুর প্রাপ্তিতে
দুঃখেতে গালে হাত দ্যায়,
তখন বুঝতে হবে
দুঃখের বৃত্তিটা
নিম্নাভিমুখী হোতে চায়।
তবু এই দুঃখেরও আছে প্রয়োজন।
কেউ যদি খেদ করে এই কথা বোলে,—
'ঈশ্বর পেলুম না হায়!'
তবেই ও-বৃত্তিটা
ঊর্দ্ধাভিমুখী হোলো,
আত্মার চোখ খুলে যায়।

লটারীতে টাকা পেয়ে
কেউ যদি আনন্দে
ঘন-ঘন গোঁফে দ্যায় তা,
তখন বুঝতে হবে
আনন্দ-বৃত্তিটা
নিম্নাভিমুখী হোলো তার।
তা'বোলে ও-বৃত্তি কি
দিতে হবে ফেলে?
আনন্দ-বৃত্তির চরম সার্থকতা
ঈশ্বরে আনন্দ পেলে।

৫৮

অথচ তুমিই কিনা রাজা
যুগ-প্রবর্ত্তকরূপে এসে
আমাদের 'ভাগবত' ভক্তিশাস্ত্রকে
'অসচ্ছাস্ত্র' বোলে
অভিহিত কোরে গেল শেষে!

হোতে পারে, আমার ভক্ত একমাত্র মদীয় ভক্তিযোগ-বলেই সেই সমস্ত অনায়াসেই পেয়ে থাকেন। তিনি ইচ্ছে কোরলে, কি স্বর্গ, কি বৈকুণ্ঠ—এমন কি (জ্ঞানীদের) মুক্তি পর্যন্ত পেতে পারেন।"
শ্রীমদ্ভাগবত (একাদশ স্কন্ধ, বিংশ অধ্যায়, ৩২-৩৩)।

৩। "ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞৈস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চ্চয়ন্।
যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সংকীর্ত্ত্য কেশবম্॥"
—বিষ্ণুপুরাণ (৬৷২৷১৭)

৪। "...কি, আমি দুর্গানাম কোরেছি, উদ্ধার হবো না? আমার আবার পাপ কি? বন্ধন কি?" —শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

সদম্ভে বোলে গেলে কিনা,
বেদান্তের অদ্বিতীয়
নিরাকার ব্রহ্মতত্ত্ব থেকে
লোককে বিমুখ কোরে
ভাগবতকার
পত্তন কোরেছেন
চোখ-কানবিশিষ্ট
দেহধারী মানুষ-পূজার।৫

সবচেয়ে সেরা বিস্ময়,
তোমার মতানুযায়ী
'ভাগবত' হিন্দুর
প্রামাণিক শাস্ত্রই নয়!
অশুদ্ধ মন নিয়ে
'ভাগবত' পোড়ে,
দু'-চারটে কাহিনীর কদর্থ কোরে
তুমি কিনা কোরেছো প্রমাণ,
'ভাগবত' অশাস্ত্র,
বেদান্ত-বিরোধী পুরাণ!

* * *

কে বোলেছে 'ভাগবত'
বেদান্ত অনুগামী নয়?
বেদান্ত-তত্ত্বই
মূলসুর 'ভাগবতে,'
এ-ব্যাপারে নেই সংশয়।
বেদান্ত বোলতে কি রাজা
শঙ্করের 'অদ্বৈত'
কিংবা তাঁর 'মায়াবাদ'ই জানো?
বৈষ্ণবের 'লীলাবাদ,'
শুদ্ধা 'ভক্তিবাদ'
বেদান্ত-ভাষ্য—তা' মানো?

তুমি কি বোলতে চাও
স্বয়ং মহাপ্রভু
'কাষ্ঠ-লোষ্ট্র' চেয়েছেন?
কিংবা যা নশ্বর
'অবয়ব বিশিষ্ট'
তাকেই ব্রহ্ম ভেবেছেন?

'ভাগবতে' ভগবান
'কাষ্ঠ-লোষ্ট্র' নন,
সর্বব্যাপী ব্রহ্মই;
শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক
একটা উক্তিতেই
প্রমাণিত হবে সেইটেই।

* * *

"নচান্তর্ন বহির্যস্য ন পূর্বং নাপি চাপরম্।
পূর্বাপরং বহিশ্চান্তর্জগতো যো জগচ্চয়ঃ।"৬

* * *

তোমার যা শাস্ত্রজ্ঞান,
তাতে কি বোঝায় এটা
'অবয়ব বিশিষ্ট'
'পরিমিত' দেবতার ধ্যান?

৫৯

যুগের জনক হোয়ে
হে রামমোহন,
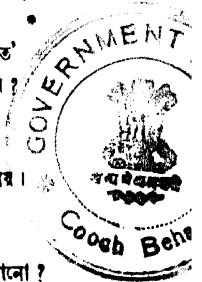
৫। আমাদের ভক্তি-শাস্ত্র শ্রীমদ্ভাগবত-এর সমালোচনা করতে গিয়ে রামমোহন বোলেছেন, "অদ্বিতীয়, ইন্দ্রিয়ের অগোচর, সর্বব্যাপী যে পরব্রহ্ম, তাঁহার তত্ত্ব হইতে লোক সকলকে বিমুখ করিবার নিমিত্তে ও পরিমিত ও মুখ নাসিকাদি অবয়ব বিশেষ্টের ভজনে প্রবর্ত করাইবার জন্য ভাগবদগৌরাঙ্গ পরায়ণেরা" চেষ্টা করেন। তাই রাজা শ্রীমদ্ভাগবতকে 'অসচ্ছাস্ত্র' বোলে নির্মমভাবে উপেক্ষা কোরেছেন, বৈষ্ণবদের তিনি 'কাষ্ঠ-লোষ্ট্রে'র উপাসক বোলে উপহাস কোরেছেন। ভাগবতকে তিনি বেদান্তের ভাষ্য বোলে স্বীকার করেননি। এ প্রসঙ্গে তিনি বোলেছেন,—"যুক্তির দ্বারাতেও সুব্যক্ত হইতেছে" যে শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ যে ননী চুরি, বস্ত্রহরণ এবং রাসলীলা কোরেছিলেন, "এই সকল সর্বলোকবিরুদ্ধ আচরণ" নিশ্চয়ই বেদান্তের ভাষ্য হোতে পারে না। কাজেই "বেদান্ত সূত্রের সহিত শ্রীভাগবতের সম্পর্ক মাত্র নাই।" দুঃখের বিষয়, নিদারুণ বৈষ্ণব-বিদ্বেষ নিয়ে রাজা ভাগবতের গোপীপ্রেমে খৃষ্টান পাদ্রীদের মতো লাম্পট্য এবং অশ্লীলতা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেলেন না। ভাগবতকে 'অসচ্ছাস্ত্র' বোলে অভিহিত কোরে, কৃষ্ণের লাম্পট্যকে পাঠকের "চিত্তমালিন্যের ও মন্দ সংস্কারের কারণ" নির্দেশ কোরে বিদেশী এবং স্বদেশী পণ্ডিত-সমাজকে রাজা বিপথে পরিচালিত কোরেছেন! এই ভ্রান্ত ধারণা শিক্ষিত-আহম্মকদের মস্তিষ্ক থেকে আজও সম্পূর্ণরূপে যায়নি। কিন্তু শুধু 'অসচ্ছাস্ত্র'ই নয়, সংশাস্ত্রের অসৎ ব্যাখ্যাও পাঠকের "চিত্তমালিন্যের মন্দ সংস্কারের কারণ হয়।"

এধারে বৈষ্ণবদের মধুরভাবের সাধনায় এবং কৃষ্ণের "এই সর্বলোকবিরুদ্ধ আচরণে" শিউরে উঠে যিনি বৈষ্ণবশাস্ত্রকে অশ্রদ্ধার সঙ্গে পরিহার করেন, তিনিই যখন ফের তন্ত্রোক্ত বামাচারের সমর্থন করেন, তখন তিনি আর একবার আরো মর্মান্তিক ভাবে আমাদের বিভ্রান্ত করেন। সবাই জানেন, রামমোহন তন্ত্রোক্ত বামাচারের সমর্থক এবং কোনো মুসলমান রমণীকে শক্তি হিসেবে গ্রহণ কোরে বহুকাল ধোরে তন্ত্রের বামাচার-সাধনায় লিপ্ত ছিলেন।

৬। "যাঁহার অন্তর নেই, বাহির নেই, পূর্ব নেই, পর নেই, যিনি স্বয়ং জগতের পূর্ব পর অন্তর বাহির, তথা আপনি জগতের স্বরূপ।"—শ্রীমদ্ভাগবত (১০।১।১২-১৩)।

কৃষ্ণের 'রাসলীলা,' 'বস্ত্রহরণ'—
এই সব কাহিনীর কদর্থ করা
তোমার কি হোয়েছে শোভন ?

*　　*　　*

'বস্ত্রহরণ' বৃথা নয় ;
'অষ্ট-পাশে' বাঁধা জীব,
পাশহীন হোলে তবে
এই জীবই সদাশিব হয় ।৭

'অষ্টপাশের' মানে কিনা—
লজ্জা, ভয়, জাতিবোধ,
কুলশীল, নিন্দা, শোক,
গোপনের ইচ্ছা ও ঘৃণা ।৮

এই বন্ধনগুলো যার
একে-একে খোসে যাবে,
অমনি দেখতে পাবে
শিব হোতে বাকী নেই তার ।

ঈশ্বর পেতে চায় যারা,
তাদের 'অষ্টপাশ'
তিনিই ঘুচিয়ে দিলে
জীবন্মুক্ত হয় তারা ।

এইবার গোপীদের আনো ।
তাদের সাতটা পাশ
খোসেছে, কেবল ঐ
'লজ্জা'টা যায়নি তখনো ।

একদিন তাই ভগবান
কালিন্দী-কূলে এসে
কৃপাবশে গোপীদের
ঐ 'পাশ' থেকে মুক্তি দান ।

কাত্যায়নীর পূজারিণী
বিবস্ত্রা গোপীদের
বস্ত্র হরণ কোরে
'লজ্জা'টা ঘোচালেন তিনি ।

তারপর যে-কথা শোনান,
সেটা কি ভোগের কথা
কিংবা অশ্লীলতা ?
দেখুন তো কি গন্ধ পান ?

*　　*　　*

"সঙ্কল্পো বিদিতঃ সাধ্ব্যো ভবতীনাং মদর্চ্চনং ।
ময়ানুমোদিতঃ সোঽসৌ সত্যো ভবিতুমর্হতি ।
নময্যাবেশিতধিয়াং কামঃ কামায় কল্পতে ।
ভর্জ্জিতাঃ কথিতা ধানাঃ প্রায়ো বীজায় নেশতে ।"৯

৬০

পরমপুরুষ চায় যারা
তারা সব গোপিনীই,
দ্বিতীয় পুরুষ নেই
দুনিয়ায় শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া ।

বাঁচে যারা তাঁরই উদ্দেশে,
একদিন এই ভাবে
বিবস্ত্র হোয়ে তবে
ঈশ্বর লাভ করে শেষে ।

*　　*　　*

তা'ছাড়াও গোপী কে জানেন ?
ষাট হাজার মহর্ষি
রামের আশীর্বাদে
গোপীরূপে মর্ত্যে এলেন ।১০

ব্রহ্মজ্ঞান যাঁরা পান,
জীবন্মুক্তিতেও
তাঁদের মেটে না ক্ষিদে,
লীলার রসাস্বাদ চান ।

তারপর ব্রহ্ম-কৃপায়
তাঁরাই আসেন ফের
নিষ্কাম গোপীরূপে
ব্রহ্মের মর্ত্য-লীলায় ।

[ক্রমশঃ ।

---

৭ । "পাশবদ্ধঃ স্মৃতো জীবঃ পাশমুক্তঃ সদাশিবঃ ।"
—কুলার্ণব তন্ত্র (৯) ।

৮ । "ঘৃণা লজ্জা ভয়ং শঙ্কা জুগুপ্সা চেতি পঞ্চমী ।
কুলং শীলং তথা জাতিরষ্টৌ পাশাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ।"
—কুলার্ণব তন্ত্র (১৩) ।

৯ । "হে সাধ্বীগণ ! আমাকে পতিরূপে প্রাপ্তিকামনায় তোমাদের যে এই কাত্যায়নীর অর্চ্চনাব্রত অনুষ্ঠিত হোয়েছে, তা' আমি জানি । তোমাদের বাসনা কখনই নিষ্ফল হবে না । দেখ, দগ্ধ বা পক্ক বীজ যেমন পুনরায় অঙ্কুরোৎপাদন করে না, সেইরূপ মদ্‌গতপ্রাণ ব্যক্তিদের বাসনাকে পুনর্বার ফলভোগ কোরতে হয় না ।"
—শ্রীমদ্‌ভাগবত (দশম স্কন্ধ, দ্বাবিংশ অধ্যায়, ১৯-২০)

১০ । "পুরা মহর্ষয়ঃ সর্ব্বে দণ্ডকারণ্যবাসিনঃ ।
দৃষ্ট্বা রামং হরিং তত্র ভোক্তুমৈচ্ছন্ সুবিগ্রহম্ ।
তে সর্ব্বে স্ত্রীত্বমাপন্নাঃ সমুদ্ভূতাশ্চ গোকুলে ।
হরিং সংপ্রাপ্য কামেন ততো মুক্তা ভবার্ণবাৎ ।"
—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (২।১৫৬) ।

এশীয় ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা

জাপানের রাজধানী টোকিওতে আসন্ন এশীয় ক্রীড়া-প্রতিযোগিতাকে কেন্দ্র করে সারা বিশ্বের, বিশেষ করে চ্যের ক্রীড়া মহলে উৎসাহ-উদ্দীপনা আশা-আকাঙ্ক্ষার অন্ত নেই। গামী ২৪শে মে থেকে ১লা জুন পর্য্যন্ত প্রাচ্যের এই সর্ববৃহৎ ড়ানুষ্ঠান হবে। এশিয়ার ২০টি দেশের প্রায় ১৫০০ প্রতিনিধি তন্মধ্যেই "সূর্য্যোদয়ের দেশে" উপস্থিত হয়েছেন। বয়সের সব করলে আলোচ্য প্রতিযোগিতা নবীনের দলেই থাকবে। ন না, এবার হচ্ছে মাত্র তৃতীয় বারের অনুষ্ঠান। ১৯৫১ সালে দিল্লীতে প্রথম এশীয় ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ৫৪ সালে ম্যানিলায় দ্বিতীয় বারের ক্রীড়ানুষ্ঠান হয়। এবার ক দিয়েছে জাপান—এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে বন্ধুত্ব, শান্তি, প্রীতি চিরস্থায়ী করার মহান্ উদ্দেশ্যে ব্রতী হয়ে। এশীয় ক্রীড়ার নুষ্ঠান কেন্দ্র কেবলমাত্র প্রতিযোগিতারই স্থান নয়, আন্তর্জ্জাতিক ধ্যতা স্থাপন এবং বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠাকল্পে এশিয়াবাসীর মিলন-াসর। এবারের প্রতিযোগিতায় আয়োজন করার পিছনে াপানবাসীর আন্তরিক উত্তম, পরিশ্রম এবং দৃঢ়সঙ্কল্পের কথাই থমে উল্লেখযোগ্য। তিন বছর ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম করে তাঁরা াদের মহৎ প্রয়াসকে সার্থক করে তুলেছেন। টোকিওর মেইজী ার্কে জাপানের জাতীয় ষ্টেডিয়ামই হবে আলোচ্য প্রতিযোগিতার প্রধান ক্রীড়াকেন্দ্র। ৭০,০০০ হাজার দর্শকের স্থান সঙ্কুলিত ই বিরাট এবং মনোরম ষ্টেডিয়ামের নির্ম্মাণকার্য্য মাত্র ৩০শে ার্চ্চ শেষ হয়েছে। এ ছাড়া বিভিন্ন প্রতিযোগিতার উপযোগী বিভিন্ন ক্রীড়াকেন্দ্র তো আছেই। গত দু'বারের তুলনায় এবারের এশীয় ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা আকার ও আয়োজনে অনেক বড়। তাই এবারের আকর্ষণ অনেকাংশে বেশী।

ভারতের দৃঢ় আশা

সাফল্যের দৃঢ় আশায় উদ্দীপ্ত হয়ে ভারত এবারের এশীয় ক্রীড়ায় যোগ দিচ্ছে। গত দু'বারের তুলনায় এবার ভারতের আরও অধিক সাফল্য সম্বন্ধে আশা করা নিশ্চয়ই নিরর্থক হবে না। নৈপুণ্যের বিচারে আন্তর্জ্জাতিক পর্য্যায়ে উন্নীত ভারতের কয়েক জন খ্যাতিমান ক্রীড়াবিদ এই উজ্জ্বল আশার সন্ধান দিতেছেন। এথলেটিকসে আশার প্রতীক সেনাদলের মিলখা সিংয়ের কথা সর্ব্বপ্রথমে বলতে হয়। ২০০ মিটার এবং ৪০০ মিটার দৌড়ে এই তরুণ সেনানীর নিশ্চিত সাফল্য এক রকম জোর করেই বলা যায়। ভারতীয় এথলিট দলের অধিনায়ক পরদুমন সিং সট্‌ পাট এবং ডিসকাস নিক্ষেপে বর্ত্তমান এশীয় রেকর্ডের অধিকারী। আশা করা যায় যে, এবার তিনি নূতন কীর্ত্তিতে তাঁর পূর্ব্বনৈপুণ্য ম্লান করে দিতে সক্ষম হবেন। ম্যারাথন দৌড়ে বাঙ্গালার প্রতিনিধি গুলজারা সিং কটকে ভারতের জাতীয় ক্রীড়া-প্রতিযোগিতায় এশীয় রেকর্ড ভঙ্গ করে বিস্ময়কর নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছিলেন। আশা করা যায়, আলোচ্য প্রতিযোগিতায় তিনি নতুন কৃতিত্বের স্বাক্ষর বহন করে সারা এশিয়ার সম্মান লাভ করবেন। উচ্চ লম্ফনে অজিত সিং বর্ত্তমান এশীয় রেকর্ডের অধিকারী। নিজের সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখতে তিনি নিশ্চয়ই সচেষ্ট থাকবেন। এ ছাড়া ১১০ মিটার হার্ডলসে শ্রীচাঁদরাম

দীর্ঘ লম্ফনে রামমেহের ডেকাথলনে সি, এন, মুখিয়া সম্বন্ধেও আশা করা যায়। ৪×৪০০ মিটার রীলে দৌড়ে ভারত জাপানের রেকর্ডকে ভাঙ্গতে পারবে বলে মনে হয়। মেয়েদের মধ্যে বর্শা নিক্ষেপ রাজস্থানের ই, জে, ডেভেন পোর্টের সাফল্য সম্বন্ধেও দৃঢ় আশা করা যায়। ৪×১০০ মিটার রীলে দৌড়ে ভারতীয় মহিলা দল এশীয় রেকর্ডের অধিকারী। তাঁদের এই কৃতিত্ব অক্ষুণ্ণ থাকবে বলে ধরে নেওয়া যায়।

১৯৫৬ সালে মেলবোর্ণে বিশ্ব অলিম্পিকের পর থেকে ভারতে এথলেটিকসের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। অভিজ্ঞ শিক্ষকের শিক্ষাধীনে থেকে ভারতীয় এথলিটগণ তাদের কৃতিত্ব এবং নৈপুণ্যের আরও উন্নতি ঘটিয়েছেন। সেই হিসেবে ভারতীয় দলের সাফল্য সম্বন্ধে আশা করা নিরর্থক হবে না বলে মনে হয়।

এবারের ক্রীড়াতালিকায় হকি খেলা প্রথম বার সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে। হকি খেলায় দিগ্বিজয়ী ভারত যে এশীয় প্রতিযোগিতায় প্রথমেই জয়ী হবে একথা নিশ্চিত। ফুটবলে প্রথম এশীয় প্রতিযোগিতায় ভারত জয়ী হইলেও দ্বিতীয় বারের প্রতিযোগিতায় পরাজিত হয়।

এবারের ভারতীয় ফুটবল দলের শক্তি সম্বন্ধে আশা করা যায়। অবশ্য প্রাচ্যের কয়েকটি দেশ ইতিমধ্যে তাদের খেলায় যথেষ্ট উন্নতি ঘটিয়েছে। সেই হিসেবে ভারতকে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বীতার সম্মুখীন হতে হবে। এবার ভলিবল প্রতিযোগিতাও প্রথম বার তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। এতেও ভারতের জয়লাভের সম্ভাবনা রয়েছে।

এশীয় ক্রীড়ায় জাপান গত দুবারের বিজয়ী। তাদের শ্রেষ্ঠত্ব অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য তারা নিশ্চয়ই সচেষ্ট থাকবে। ভারত হবে জাপানের নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বি। বিজয়ীর সম্মান লাভের জন্য ভারত ও জাপানের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে এশীয় ক্রীড়ার আকর্ষণীয় বিষয়।

এশীয় ক্রীড়া সার্থক হোক। শান্তি, ও মিলনের জয়গানে টোকিওর ক্রীড়াকেন্দ্র মুখরিত হোক, এই কামনা করি।

মোহনবাগানের লীগ ও বাইটন কাপ জয়

ফুটবল খেলায় মত হকি খেলাতেও মোহনবাগান ক্লাব প্রশংসনীয় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে। এই বৎসর প্রথম ডিভিসন হকি লীগ চ্যাম্পিয়ানশিপ লাভ করে তারা উপর্য্যুপরি চার বছর অপরাজিত থেকে এই সম্মান অর্জ্জনের অধিকারী হয়েছে। এইবার নিয়ে মোহনবাগান মোট সাত বার প্রথম ডিভিসন হকি লীগ বিজয়ী হয়। তার মধ্যে ছয় বারই তারা অপরাজিত থেকে লীগবিজয়ীর আখ্যা লাভ করে। এবার তারা লীগ জয়ের সঙ্গে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ হকি প্রতিযোগিতা বাইটন কাপ লাভ করে বিশেষ কৃতিত্বের

হন করে এনেছে। বাইটন কাপের ফাইন্যালে কিরকির ফ ইঞ্জিনীয়ার্স দলকে ১—০ গোলে পরাজিত করে াগান এই বৎসর বাইটন কাপ জয়ের অধিকারী হয়। ার নিয়ে মোহনবাগান দুবার বাইটন কাপ লাভ করলো। সালে বাঙ্গালোরের হিন্দুস্থান এয়ার ক্র্যাফট দলকে পরাজিত ারা প্রথম বার বাইটন কাপ জয় করেছিল। এবারের জয়ের জন্য মোহনবাগান দলকে মহঃ স্পোর্টিংয়ের প্রবল দ্বিতায় সম্মুখীন হতে হয়। লীগের নির্দিষ্ট খেলায় শক্তিশালী সমান পয়েন্ট অর্জন করে লীগ তালিকার শীর্ষদেশে যুগ্মভাবে করতে হয়। ফলে লীগ বিজয় নির্দ্ধারণকল্পে দুই দলকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামতে হয়। লীগ চ্যাম্পিয়ানশিপ মোহনবাগান ১—০ গোলে মহমেডান স্পোর্টিংকে পরাজিত জয়লাভের সম্মান অর্জ্জন করে। এই দুই দলের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট খেলাটি গোলশূন্য ভাবে শেষ হয়েছিল।

ফুটবল মরশুম

গত ১২ই মে থেকে কলকাতা ময়দানে প্রথম ডিভিসন ফুটবল লীগের খেলার সঙ্গে সঙ্গেই এবারের ফুটবল মরশুমের সূচনা হয়েছে। বাঙ্গালী জনজীবনে ফুটবল খেলার অবদান সুবিদিত।

ফুটবলকে কেন্দ্র করে বাঙ্গালীর মনে যে উন্মাদনার সৃষ্টি হয় তার পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। বাঙ্গালাদেশে ফুটবল খেলার নিয়ামক সংস্থা আই, এফ, এ এই বছর থেকে তিন বছর পর্য্যন্ত লীগে "উঠানামা" বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত করেছে। এর ফলে প্রতিযোগিতার আকর্ষণ অনেকখানি কমে গিয়েছে। তবে লীগবিজয়ের সম্মান লাভের জন্য খ্যাতনামা চারটি দল গত বারের লীগবিজয়ী মহমেডান স্পোর্টিং, ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব, মোহনবাগান ক্লাব এবং রাজস্থান ক্লাবের মধ্যে যথারীতি প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে বলে আশা করা যায়।

ঘুম ও শয্যা-ব্যবস্থা

মানুষের পক্ষে খাদ্যের ন্যায় ঘুমও অপরিহার্য্য। দেহ-কাঠামোকে সক্রিয় ও মজবুত রাখার জন্যই এইটি না হলে নয়। একটু ভাবলেই দেখা যাবে—জীবনের তিন ভাগের প্রায় এক ভাগই আমাদের কাটে বিছানায় অর্থাৎ ঘুমিয়ে। গড়পড়তা পরমায়ু ৬০ বছর ধরলে বুঝতে হবে—এর ভেতর নিদ্রায় কাটবে প্রায় ১৫টি বছর। আয়ু যদি বেশী হ'ল, ঘুমের মাত্রাও সেই অনুপাতে নিশ্চয়ই বেশী হবে।

ঘুমের জন্য যেখানে একটা দীর্ঘ সময় ছেড়ে দেওয়া চাই-ই, সেই অবস্থায় ঘুমটি যাতে নিশ্চিত আরামপ্রদ হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখা একটি প্রাথমিক কাজ। শয্যা-ব্যবস্থা ভালরকম অর্থাৎ পছন্দসই হওয়ার দাবী এইখানেই ওঠে। অনেককে দেখা যায়, ঘুমিয়ে সারা রাত্রির মধ্যে একবারও পাশ ফিরেন না, আবার অপর শ্রেণী হয়ত বার বার পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করে থাকেন। নিদ্রার মাঝখানে এক রাত্রিতে ৪০বার পাশ ফেরার কথাও শোনা যায়। তবে কার্য্যক্ষেত্রে এইটি কতটা সত্যি, বলা মুস্কিল।

মানুষের ঘুমের এখন আর একটি জরুরী বিষয়। কখনও হয়ত দেখা গেল, শোওয়া অবস্থায় বিছানার মাঝখানটা চেপে গেছে। এর ফলে মাথা ও পায়ের দিকটা থাকলো উঁচু হয়ে এবং মেরুদণ্ডের নিম্নাংশের গ্রন্থিগুলোতে হলো এক প্রকার যন্ত্রণা। এমন কি, এই থেকে পরবর্ত্তী জীবনে মারাত্মক কিছু হওয়াও বিচিত্র নয়। এই সব অবস্থায় চিকিৎসকের পরামর্শ নিতেই হবে এবং শয্যাব্যবস্থা সম্পর্কে হতে হবে যথেষ্ট সচেতন।

মাথার বালিশের প্রশ্নটি আসে এর পরই। কেউ কেউ শক্ত বালিশ পছন্দ করেন, কেউ বা নরম, কারও একখানি বালিশে মাথা রেখে শোবার অভ্যাস, কারও দুই। কেউ পাশ-বালিশ ছাড়াই স্বচ্ছন্দে ঘুমোতে পারেন, আবার কারো হয়ত এইটি না হলেই নয়। মোটের উপর ঘুমটি যাতে সকল দিক থেকে সুখের হয়, শয্যা-ব্যবস্থা সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই করতে হবে।
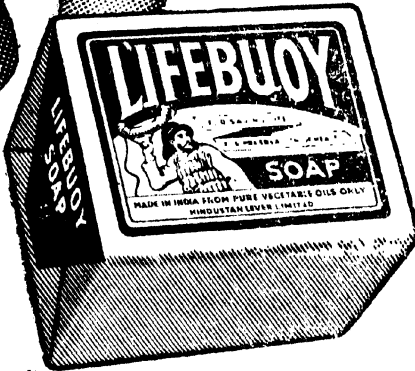
যাঁরা ভাল স্বাস্থ্য ভালবাসেন তাঁরা সবসময়
লাইফবয় দিয়ে স্নান করেন
LIFEBUOY
SOAP
LIFEBUOY SOAP
MADE IN INDIA FROM PURE VEGETABLE OILS ONLY
HINDUSTAN LEVER LIMITED
খেলাধূলোই বলুন বা কাজকর্ম্মই বলুন আমরা কখনই ধূলোময়লার থেকে নিরাপদ নয়। আর ময়লা বহন করে রোগের বীজাণু যা সবসময় আপনার স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। লাইফবয় সাবান এই বীজাণুগুলি ধুয়ে সাফ করে দেয় এবং আপনার স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখে।
প্রত্যেকদিন লাইফবয় সাবান দিয়ে স্নান করে আপনার স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখুন—এটি আপনাকে এত ঝরঝরে করে তোলে।

অঙ্গন ও প্রাঙ্গণ

বেশ সমারোহের সঙ্গেই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার শ্রাদ্ধশান্তি সম্পন্ন করলো অসীম। বৃষোৎসর্গ, রূপোর ষোড়শ, আত্মীয়-বন্ধু আমন্ত্রণ, ভূরিভোজন, ব্রাহ্মণপণ্ডিত বিদায়, কাঙালীভোজন,—কোনটি বাদ দেয়নি। মায়া দেবী গিয়েছিলেন অনিলকে নিয়ে—নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে। ফিরে এসে অনেক প্রশংসা করছিলেন সুদাম জননীর, পরদিন সন্ধ্যেবেলায় ড্রইংরুমে বসে।—আহা সাক্ষাৎ যেন লক্ষ্মীপ্রতিমা। অমন মা নাহলে কি অমন ছেলে জন্মায়? মুখের কথাগুলোই বা কি মিষ্টি! সন্তবিধবা, একটা ছেলে রইলো কোন সাতসাগর পারে; তবুও কত ধৈর্য্য!

মুখটি নিচু করে দেওরের হুকুম পালন করছে। আহা দেখলে যেন বুকটা কেমন করে গো! এখন ছেলেটা আবার ভালোয় ভালোয় ফিরলে বাঁচি! কাকাটিকে তো মোটেই সুবিধের লোক বলে মনে হয় না।

অনেক ঘাটের জল খেয়েছি বাবা, অনেক ঘুঘু চরিয়েছি, মানুষ শুঁকে শুঁকে হাড় পেকে গেলো।

—না! না! ওটা তোমার ভুল ধারণা মা! বললো অনিল। অসীম বেশ করিতকর্ম্মা ছেলে। মানুষও সে ভালোই।

—হ্যাঁ গো হ্যাঁ! ভালোর পরিচয় খুব দিয়েছে সে। সেই যে বলে না,—ডাইনীর করে পুত্তুর সমর্পণ। শ্যালে আগলায় ছাগল-ছানা। এও হয়েছে তাই।

হো-হো, করে হেসে উঠলো অনিল। এত কথাও তুমি জানো মা!

করবী পাশের সোফায় বসে উল বুনছিলো, অসন্তুষ্ট ভাবে বললো—যা হবার তা তো হবেই, তুমি রুখতে পেরেছো না, পারবে। অতই যদি মানুষ চিনেছিলে মা, তবে গোড়া থেকে তার প্রতিকার করোনি কেন? কেন নজর দাওনি তার দিকে?

—ওমা! শোন কথা। বিস্ময়ে গালে হাত দিলেন মায়া দেবী! এখন আমারই উপরই যত দোষ? এ যে দাঁড়ালো তাই! পেটের মেয়ে হয়ে তুই বললি এমন কথা? —বলে কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম! সন্নিসি কর্ত্তাটি যে খাল কেটে কুমীর পুরে দিয়ে গেলো বাড়ীতে, আর দোষ হল আমার? বলি আমায় মানে কে? তুমি, না তোমার ভাই—না বোনঝি?—ভালো করতে গেলাম সকলকারই—আর দোষ হল কি—না সেই আমারই!—যে যার খুসিমত পথ বেছে নিলে,—আমাকে কলা দেখিয়ে—

—আ, হা,—হা—অত রাগছো কেন মা? ব্যাপারটা হল কি? বললো অনিল, বরাভয় করমুদ্রা প্রদর্শন করে!

—ব্যাপারটা গড়িয়েছে কোথায়,—চোখ, কান যদি থাকতো তোমার তা হলে আর জিজ্ঞেস করতে হত না! যেই রক্ষক, সেই হল ভক্ষক! তোমার ভগিনী যে আমার ওপর টেক্কা দিয়ে ঐ অসীমকে দিয়ে গেলো মিতার ভার;—এবারে বুঝুক্ কত ধানে কত চাল! টেবিল বাজিয়ে চ্যালেঞ্জের ভঙ্গিতে জবাব দিলেন মায়া দেবী।

—মিথ্যে তাঁকে দোষ দিচ্ছো মা! মিতার ভার তিনি দিয়ে গেছেন তোমারই ওপর, অসীম বাবুকে কুটুম্ব হিসেবে যেটুকু বলবার সেইটুকুই বলেছেন,—তার নাম ভার দেওয়া নয়!—তোমার পেটের মেয়ে বলেই তোমার এ ত্রুটি আমার বুকে বড্ড বেজেছে মা,—আমাদের জন্তে তুমি যতটা ভেবেছো,—যতটা প্রাণ ঢেলেছো, মিতার জন্তে যদি তার একাংশ করতে তাহলে আজ এই শোচনীয় ব্যাপারটা ঘটতো না! শুধু নাচ, গান, লেখাপড়াই কি তার পাওনা ছিলো? তার জীবনের কি মহা-অভাব ছিলো, সে দিকে শুধু তুমি কেন, আমরা কেউই চেয়ে দেখিনি! যে যার স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম!

—যাক্ এখন আর করবার কিছু নেই মা! তবে আমাদের সান্ত্বনা এই যে—অদৃষ্টের গতিরোধ করতে কেউ পারে না। কাজে-কাজেই এ কথা আলোচনা করে আর লাভ নেই, যে যার অদৃষ্টের ফল ভোগ করবেই!

—কথাগুলো তেতো হলেও একেবারে মিথ্যে নয় রে রুবি! ওটা আমারও মাঝে মাঝে মনে হতো, যে মিতুটা যেন কেমন মনমরা হয়ে থাকে।

ওর মনের দিকে চাইবার মতো বোধ হয় সুদাম ছাড়া আর কেউ-ই ছিলো না, ছোটবেলা থেকে সে-ই ওর একমাত্র সঙ্গী ছিলো কি না!

তার পর থেকে সত্যিই ও যেন কেমন প্রাণহীন কলের পুতুলের মতই হয়ে গিয়েছিলো,—এ কথা সত্যি, খুবই সত্যি!—আমরা কেউ ওর এ দিকটায় নজর দিইনি—মাথার চুলগুলো হাতের মুঠোয় ধরে টানতে টানতে ম্লান মুখে বললো—অনিল।

সুদক্ষ অভিনেতার মতই দেখাচ্ছিলো তাকে। ফেটে পড়বার

আগে ধূমায়িত আগ্নেয়গিরির মত গুরুগম্ভীর মাতৃবদন দেখে চিন্তায় পড়লো করবী—কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বেরুলো বুঝি !—কিন্তু অদৃষ্টদেবতার খেয়ালে আগুনও জল হয়, আবার জলেও আগুন জ্বলে ওঠে। তাই—বেয়ারা এসে কার্ড দিলো একটা! কার্ডটায় চোখ বুলিয়ে লাফিয়ে উঠলো অনিল!

—মা! মহারাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ রাও এসেছেন, আমি যাচ্ছি ওঁদের হলে বসাইগে,—তুমিও এসো শীগগির! আর করি, মিতাকে নিয়ে তুই আয়!

অনিল ব্যস্ত ভাবে ছুটে বেরিয়ে গেলো ঘর থেকে। রাজা রাওকে সাদর অভ্যর্থনায় হলে বসালো অনিল। সঙ্গে এসেছে তাঁর পেয়ারের নাতনী পম্পিয়া রাও।

মায়া দেবী সত্বর বেশ পরিবর্ত্তন করে নীচে নেমে এলেন! যুক্ত করে মোলায়েম হাসি হেসে বললেন—কি সৌভাগ্য! কি মহাসৌভাগ্য আমাদের! আপনার পায়ের ধূলো পড়েছে এখানে!

—অনিল পরিচয় করিয়ে দিলো, ইনি আমার মা।

ওঃ! নমস্কার,—নমস্কার! তোমার মা, মানে দাঁড়াও, দাঁড়াও,—ইনি হলেন আমার স্বর্গীয় বন্ধুবর কুমার ইন্দ্রনাথের বৈবাহিকা। তা হলে তো সম্পর্কে আমারও বেয়ান হলেন—হা-হা, শব্দে হেসে বললেন রাজা রাও!

এ বাড়ীতে আমি আজ নতুন আসছি না বেয়ান ঠাকুরাণী! সোমনাথের বাবা ছিলেন আমার বিশিষ্ট বন্ধু। হঠাৎ সেদিন সুমিতার সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো, অনিরুদ্ধর বাড়ীতে। তাইতো আবার এতকাল পরে ছুটে আসতে হলো। শুনলুম অনিরুদ্ধর কাছে আমার মিতাদিদির ভারি অসুখ করেছিলো, আমার এই রাণীসাহেবা হুকুম করলেন চলো একবার দেখে আসি তোমার নতুন রাণীকে! তা ভাবলুম, নতুন রাণীর সঙ্গে মোলাকাত হবে আর আমার সেই যৌবনকালের ইন্দ্রপুরীটাও এই যাবার আগে একবার দেখে নেব।

—করবীর সঙ্গে মিতা এলো। গায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলো রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপকে ওরা দুজন।

সুমিতাকে বাহুবন্ধনে আকর্ষণ করে উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন, তিনি—এই যে আমার নতুন রাণীসাহেবা, কেমন আছে ভাই? বুড়োটাকে কৈ একবারও তো মনে কর না! এই দেখো বুড়ো নিজেই ছুটে এসেছে!

—তা বেয়ান ঠাকরুণ, আপনার লোকজনদের একবার পাঠিয়ে দিন তো আমার গাড়ীতে, সামান্য কিছু এনেছি আপনাদের জন্যে আর আমার নতুন রাণীর নজরানা কিছু।

—তুমি বোসো না, আমি দেখছি। অনিল গেলো বেয়ারাদের ডাকতে।

—শরীরটা ভালো ছিলো না দাদু! তাই যেতে পারিনি, মৃদুস্বরে বললো সুমিতা। আপনাকে রোজ মনে পড়ে।

পম্পিয়া এতক্ষণে মুখ খুললো। সেদিন যে কি চমৎকার আপনাকে মানিয়েছিল মিস ত্রিবেদী, অভিনয়ও তেমনি সুন্দর হয়েছিলো, রাজাবাহাদুরের শরীর খারাপ থাকায় দেখতে যেতে পারেন নি বলে সে-কি দুঃখ! আমি বললাম ঠিক আছে, ঐ বইটাই অভিনয় হবে আমাদের বাড়ীতে, তুমি একেবারে দুচোখ ভরে দেখবে, ষ্টেজের ওপর বসে, যেমন বিশ্বকবি নিজে বসতেন ষ্টেজের ওপর। আচ্ছা ইনি বোধ হয় করবী দেবী না? রতনলালের কাছে শুনেছি এঁর গল্প! খুব প্রশংসা করেন, রতনলালকে চিনতে পারছেন তো? ধনপতি ক্ষেত্রির ছোট ভাই?

করবী হাসে! বলে, হ্যাঁ দেখেছি তাঁকে ওখানে। তবে আলাপ-পরিচয় হয় নি! খুব সজ্জন পরিবার, আমার ভালোই লাগে।

—বেয়াই মশাই! এত কাল পরে যখন নতুন করে আলাপ-পরিচয় হলো, একটু মিষ্টিমুখ না করিয়ে ছাড়ছি নে! আমার হাতের তৈরী খাবার আশা করি আপনার ভালোই লাগবে! —দু'হাত কচলে বিনয়ে অবনত হয়ে বললেন, মায়া দেবী।

—তা বেয়ানের মান রাখতে হবে তো? মিথ্যে ওজর-আপত্তি নেই আমার! আহা এই সেই ইন্দ্রপুরী! এই ঘরে কি জমজমাট পার্টি গেছে; কে বলবে এই বাড়ীই সেই বাড়ী!

প্রকাণ্ড অয়েল পেণ্টিং ছবিগুলোর দিকে চেয়ে চেয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন রাজা রাও!

—দেখেছো রাণীসাহেবা, ঐ আমার বেষ্ট ফ্রেণ্ড কুমার ইন্দ্রনাথের ফটো, আর তার পাশে, ঐ শাল গায়ে, চুল-দাড়িওলা ফটো, ঠিক যেন আগেকার বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্রের মত দেখতে, ঐ হলেন মহারাজা রামনাথ ত্রিবেদী। তার পাশে ঐটি বোধ হয় সোমনাথের ফটো—না মিতাদিদি!

—লম্বা নিঃশ্বাস ছেড়ে জবাব দিলেন মায়া দেবী, আপনার অনুমান ঠিকই রাজাবাহাদুর! কার শাপ লেগে যে এমন রামরাজত্বি ছারখার হয়ে গেলো! সব কোথায় উড়ে-পুড়ে গেলো যেন! বাছা আমার এই যোয়ান বয়সে বিবাগী হলো, এ কি প্রাণে সয়? কি করবো বলুন, ঐ একরত্তি মেয়েটার মুখ চেয়ে বুক বেঁধে বাস করছি এই শ্মশানপুরীতে।

কান্নার ঢেউ লাগলো তাঁর কণ্ঠস্বরে! চোখ মুছলেন রুমালে!

দু'জন বেয়ারা আর রামভজন সিং বয়ে আনলো রাজারাও-এর আনা দ্রব্যগুলো। মস্ত টুকরী ভর্ত্তি ফল। অপর টুকরীতে বড় বড় সন্দেশের বাক্স; হাঁড়িভর্ত্তি রাজভোগ, সরভাজা, লেডিকেনি।

তার পর এলো, কেক্ দিয়ে গড়া ভারি ওজনের একটি কুমীর, প্ল্যাষ্টিকের ট্রেতে সাজানো! সবশেষে এলো ফুলের বাস্কেট!

বিস্ময় আর আনন্দের ধাক্কায় কোলাব্যাঙের মত চোখ দুটো জ্যাব-জ্যাব করছিলো মায়া দেবীর। লব্ধ বস্তুগুলোর ওপর লোলুপ দৃষ্টি বুলিয়ে বললেন, এ কি করেছেন রাজাবাহাদুর? একেবারে হাট বসিয়ে দিলেন যে ঘরে। এত খাবে কে? এইতো চারটি প্রাণী আমরা!

—অতি সামান্য। অতি সামান্য। লালকুঠিতে আনবার উপযুক্ত একেবারেই নয়। এবারে গরীব ব্রাহ্মণকে বিদায় দিন বেয়ান ঠাকরুণ!

—ওমা, কি যে বলেন। এই যে এখুনি আসছি রাজাসায়েব! ব্যস্ত হয়ে ভেতরে ছুটলেন মায়া দেবী। করবীও গেলো তাঁর পেছনে।

—পম্পিয়া সুমিতার চিবুকটি তুলে ধরে বলে—কি আছে ভাই তোমার বদনে, দেখি তো? কি দিয়ে পাগল করেছো দেশশুদ্ধ লোককে?

—আপনি বলা আর নয়, ভাই ; তুমি দিয়ে এবার থেকে আদান-প্রদান চলবে আমাদের, কেমন রাজি তো ?

লজ্জায় মুখ নিচু করে বলে সুমিতা—বেশ তো। কিন্তু দেশশুদ্ধ লোককে পাগল করার মত কোনো ঐশ্বর্য্য তো আমার নেই ভাই ! ওটা বাজে কথা।

—না, না, বাজে কথা নয় নয়রাণী, পাগল করেছো চাঁদ, সত্যিই আমায় পাগল করেছো, তা না হলে এই নড়বড়ে দেহটা নিয়ে কি মিছেই ছুটে এসেছি ? সুমিতাকে গভীর স্নেহে এক হাতে জড়িয়ে ধরে বললেন রাজা রাও।

জলতরঙ্গের মত হাসির ফোয়ারা উছলে উঠলো পম্পিয়ার কণ্ঠে। সোনালী জরির কাজকরা পাতলা ওড়নার প্রান্তটি হাতে করে, তুলে, ছপাৎ করে তার এক ঘা বসিয়ে দিলো রাজার গালে, তারপর সাপের মত এঁকে-বেঁকে হেসে গড়িয়ে বললো।

—শুকনো ছোবড়ায় মন ভরে নাকি ? কত শাঁসালো রসালো মাল ওর চার পাশে ঘুর ঘুর করছে যে—

—তাই নাকি ? তাই নাকি ? যথা ? চোখ পিট-পিট করলেন রাজাবাহাদুর।

—যথা ? অনিরুদ্ধ, অসীম, রতনলাল, আরো আরো কত, কে কত গুনবে রাজাসায়েব ? তোমার নূরজাহান বেগম সাহেবার রূপের আগুনে কত পতঙ্গ ঝাঁপ দেবার জন্যে একেবারে আকুলি-বিকুলি করছে যে—

স্থির দৃষ্টিতে পম্পিয়ার মুখের দিকে চেয়ে শুনছিলো সুমিতা ওর কথাগুলো,—ওর সীমাহীন বাচালতা দেখছিলো, অবাক চোখে !

—ভুল, মিথ্যে তোমার ধারণা পম্পিয়া ! অনিরুদ্ধকে আমি দাদা বলি, আর তিনিও আমায় ছোট বোনের মতই স্নেহ করেন। শান্ত উজ্জ্বল দুটি চোখ তুলে, দৃঢ় কণ্ঠে জবাব দিলো সুমিতা।

—সত্যি বলছো ? ওর হাত দুটো নিজের দুহাতে চেপে ধরে ওর চোখে চোখ মিলিয়ে বললো পম্পিয়া।

—যত অপরাধী আমি হই না কেন, ঐ মিথ্যাভাষণের অপরাধটি আমায় স্পর্শ করেনি, আমার কথায় বিশ্বাস করতে পারো ভাই !

—এক মুহূর্ত্তে যেন মন্ত্রবলে থেমে গেলো পম্পিয়ার সব বাচালতা। মৃদুস্বরে বললো—আমার সব জানা হয়ে গেছে ভাই ! অনিরুদ্ধকে অবিশ্বাস করে নিজেই কি কম যন্ত্রণা ভোগ করছি, আজ বড় শাস্তি দিলে তুমি আমাকে। আবার চোখ পিট-পিট করলেন রাজাবাহাদুর।

—শুধু আমারই কপাল পুড়লো রাণীসাহেবা, হায়, হায়, আমার একূল, ওকূল দুকূল গেলো যে। ঘর কাঁপিয়ে হা-হা, শব্দে হেসে উঠলেন তিনি।

অনিল ফিরে এলো রাজাবাহাদুরের লোকজনদের জলযোগ করিয়ে বখশিস দিয়ে।

—মায়া দেবী এলেন রূপোর থালায় রকমারী খাদ্যসম্ভার সাজিয়ে নিয়ে। তাঁর পেছনে করবীর হাতে আরেকখানি থালা।

টেবিলে থালাগুলো সাজিয়ে দিয়ে বিনীত অনুরোধ করলেন রাজাবাহাদুরকে—সামান্য আয়োজন—অনুগ্রহ করে চেখে দেখুন একটু ! পম্পাদিদি, তুমিও এগিয়ে বোসো তো ভাই ! খাবারগুলো সব আমার নিজের হাতে তৈরী।

বাবুর্চ্চি আর বয় এসে রূপোর কাঁটা, চামচ, আর সোনার বাঁট-লাগানো ছুরি সাজিয়ে দিলো টেবিলে। ওগুলো সর্ব্বদা ব্যবহার হয় না, বিশেষ ধরণের অতিথি বা নিমন্ত্রিতজনের জন্য বার করা হয় মাঝে-সাজে। বিচিত্র কারুকার্য্য খচিত রূপোর থালাবাটি, সোনার ডিস্-পেয়ালা নিওনলাইটে, ঝলমল করে ওঠে। খেতে বসে বিস্ময় প্রকাশ করলেন রাজা রাও !

—এর নাম সামান্য আয়োজন ? করেছেন কি ? এতটুকু সময়ের ভেতর এসব তৈরী করলেন কেমন করে ?

—সামান্য বৈ কি ! আপনার পাতে-দেবার মতো খাবার তৈরী করবার সময় পেলাম কোথায় রাজাবাহাদুর ? কতকগুলো আমাদের তৈরীই ছিলো আগে—এখন খালি মাংসর শেমিকাবাব, আর বিরিয়ানী পোলাউ, ডিমের ডেভিল, আর পুডিং এই তৈরী করে আনলাম, আপনার মুখে কেমন লাগবে জানি না···ঘাড় কাত করে বিনীত হাসি হেসে বললেন মায়া দেবী।

রান্নার তারিফ করে খেতে খেতে ছুরির বাঁটের দিকে নজর পড়তেই চমকে উঠলেন রাজা রাও ! চোখের কাছে তুলে ধরে ভালো করে দেখালেন, "ইন্দ্রনাথ" নামটি খোদাই করা ! সোনার ডিস্ লক্ষ্য করলেন ! ছুরি, কাঁটা, টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে, ইন্দ্রনাথের ফটোটার দিকে চেয়ে নিঃশব্দে বসে রইলেন তিনি ! সকলে অবাক হয়ে গিয়েছিলো তাঁর সহসা এই ভাবান্তর লক্ষ্য করে।

—দাদু ! কিছু খেলেন না কেন ? শুধালো সুমিতা !

মায়ের কাণ্ড তো ? ঠেসে ঝাল দিয়েছেন, আর না হয়, গরম মশলা দিয়ে একেবারে তেতো অখাদ্য করে রেখেছেন ! কত দিন বলেছি মাকে, যে ফারফোর গণি মিঞাকে দিনকতক রেখে, ঐ জংলী উড়েটাকে রান্না শেখাও মা,—কিছুতেই তা হয়ে উঠলো না ? মুসলমান ছাড়া কি ও সব মোগলাই রান্না কেউ জানে ? মহা অসহিষ্ণুভাবে হাত চিতিয়ে বললো অনিল !

দাঁতাতে রুমালে ঠোঁট চাপা দিয়ে খুঁক্‌খুঁক্ করে হাসলো পম্পিয়া।—

আর কত সহ্য করবেন মায়া দেবী ? রাগে তাঁর মুখখানা ফুলে উঠলো পাম-করা বেলুনের মত।—কি, এত বড় অপমান ? অর্ব্বাচীন কোথাকার ? সিনেমার নাটুকে তো ? বুদ্ধি আর কত হবে ? কিন্তু তাঁর নিজের ত বুদ্ধিভ্রম হয়নি এখনও ? এমন কোনোরকম বেছুট কথা তিনি মুখ দিয়ে কখনই বার হতে দেবেন না। মুহূর্ত্তের ভেতর মুখে তাঁর ফুটিয়ে তুললেন ক্ষমাসুন্দর হাসির আভা।

—বড্ড কি খারাপ লাগলো রাজাবাহাদুর ? একেবারে অখাদ্য হয়েছে বোধ হয় ? হাত জোড় করে শুধোলেন মায়া দেবী।

—অ্যাঁ কি বলছেন ? চমকে উঠলেন রাজা রাও ! তারপর হা-হা, শব্দে হেসে বললেন—অখাদ্য ! মোটেই না, চমৎকার হয়েছে, এমন রান্না বহুদিন খাইনি ! এই দেখুন না চেঁছেপুঁছে এমন করে খাবো যে আপনি লজ্জা পেয়ে যাবেন। খাওয়া থামিয়ে

ছিলাম, এই কথা তো? তার কারণ এই,—বোলে তিনি ছুরির সোনার বাঁটটি দেখিয়ে আবার আরম্ভ করলেন, এই ছুরিগুলো যে আমিই তৈরী করে এনেছিলাম। ছুরিখান' ছুঁয়েই যেন আমার সর্বাঙ্গ যেমন শিরশির করে উঠলো, চেনা, বড্ড চেনা, তারপর ভালো করে দেখলাম, খোদাইকরা নামটা এক পিঠে আর এক পিঠে লেখা ডিয়ারেষ্ট। মনটা যেন পাগলা ঘোড়ার মত ছুটে চলে গেলো সেই দিনগুলোতে। নীরব হলেন রাজা রাও। তাঁর আঁসফলের মত নিষ্প্রভ চোখ দুটি যেন বেদনায় ছলো-ছলো হয়ে উঠলো। বাঁ হাতে শাদা ফ্রেঞ্চকাট দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে বলতে লাগলেন—কুমার ইন্দ্রনাথের ভারি শখের একখানি ছবি ছিলো, ছবিটার নাম ছিলো লাইট হাউস। হলের চারি ধারে চোখ বুলিয়ে খুঁজলেন সে ছবিখানা।

—সেখানা বাবার লাইব্রেরি-ঘরে আছে, মৃদুকণ্ঠে বললো সুস্মিতা।

—ওঃ, আচ্ছা। বড় চমৎকার, বড় ভালো ছবিখানা। যাবার সময় আমাকে একবার দেখিও তো মিতাদিদি, বললেন রাজাবাহাদুর—হ্যাঁ যে কথা বলছিলাম, সেই ছবিটা দেখে একটা পাগলা সায়েব একেবারে ধরে বসলো মহারাজা রামনাথকে যে ছবিখানা তাঁকে দিতেই হবে।

রাজা দিতে চাইলেন কিন্তু বেঁকে বসলেন আমার বন্ধু। সে কি কাণ্ড বাড়ীতে! আমরাও সুযোগ পেয়ে পরিহাস করতে লাগলাম বন্ধুর সঙ্গে। হায়, হায়, তোমার পেয়ারের ছবিরাণী যে এবারে সায়েবের কাঁধে চেপে সাগরপাড়ি দিতে চলেছে বন্ধু!

বন্ধু তো ঘুষি পাকিয়ে পাকিয়ে উঠলো, তারপর এক বোতল শেরি, ঢক্ ঢক্ করে গলায় ঢেলে দিয়ে বললো—নেভার—প্রাণ দেব সেভি আচ্ছা, তবু ইজ্জৎ দেব না—ওটা ছবি নয়, ও আমার দিল্‌কা পেয়ারী ও আমার দৌলতকা ইমান্।

কিন্তু, রাজাবাহাদুর যে,—

—এক থাবা দিয়ে থামিয়ে দিলো বন্ধু আমার মুখ। চোখ পাকিয়ে বললো বাজি আও। ঝুটাবাত নেহি মাংতা।

জানিই তো ও ছবি রাখা যাবে না,—দোষ কি বাজি রাখার? বড় রকমের স্ফূর্তি করা যাবে—বলে ফেললাম, ঠিক আছে দশ হাজার টাকা রইলো বাজি।

—সাক্ষীও রাখা হল ক'জন বন্ধুবান্ধব আর এ বাড়ীর পালোয়ান সর্দারের এক বেটাকে, কি যেন তার নাম—ঠিক মনে পড়ছে না—কি যেন নাম তার? প্রকাণ্ড এক কালোলোমওলা ভাল্লুক শীকার করেছিলেন ইন্দ্রনাথ। তার ভেতরের হাড় মাংস

বার করে খড়-ভুসি দিয়ে সেটাকে সত্যিকারের জ্যান্ত ভাল্লুকের মত এক কোণে দাঁড় করানো ছিলো। তার আড়াল থেকে কালো চেক-কাটা কম্বলটি মুড়ি দিয়ে থপ থপ করে বেরিয়ে এলো রামভজন। আভূমি সেলাম ঠুকে বললো, সেদিনের সাক্ষী রামভজন সিং! চমকে উঠলেন রাজা রাও। আনন্দবিহ্বল চোখে ওর দিকে কয়েক মুহূর্ত্ত চেয়ে রইলেন রাজা রাও—পুত্রহারা মা যেমন করে দৃষ্টিপাত করেন, তাঁর হঠাৎ ফিরে পাওয়া পুত্রের দিকে। তারপর নিজের সম্মানিত আসন ত্যাগ করে উঠে গিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরলেন বুকে।

—আছো? তুমি আজও আছো রামভজন সিং?

—আছি রাজাবাহাদুর! আপনাকে দেখেই চিনেছি। চোখে ভালো দৃষ্টি নেই, তবুও ভুল হয়নি। আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখছি আপনাকে, শুনছি সেদিনের সব কথা, আর চোখের সামনে স্পষ্ট দেখছি যেন কুমার সায়েবকে—আজ সব গপ্পো কথা হয়ে গেছে রাজাবাহাদুর—সব হারিয়ে গেছে কেউ নেই সেদিনের সাক্ষী। শুধু—শুধু—আছে এই বুড়ো ভূতটা—হাউ হাউ করে কেঁদে ফেললো বুড়ো!

কাঁদছিলো সুস্মিতাও!—দর-দর করে গাল বেয়ে ঝরে পড়ছিলো তার চোখের জলের ধারা।

রুমালে চোখ মুছে নিজের জায়গায় এসে বসলো রাজা রাও—রামভজনকে বললেন বোসো,—আমার পাশে রামভজন! পাশে বসলো না বুড়ো, বসলো মেঝের কার্পেটের ওপর। ঘরশুদ্ধ সকলে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলো ব্যাপারখানা দেখে!

—রাত যে অনেক হল দাদু! সারারাত কি গল্পই করবে? খাবে না? বললো পম্পিয়া।

—এই যে দিদি, খাচ্ছি। বাকীটা তুমি শুনিয়ে দাও তো রামভজন! খেতে খেতে বললেন রাজা রাও!

—বলছি, রাজাবাহাদুর! আপনি আরাম করে খান। বললো রামভজন সিং।—তারপর রাজাবাহাদুর মানে আমাদের কর্ত্তাবাবু তো ঠিক ঐ রকমই তসবীর আনিয়ে দিলেন বিলেত থেকে তিন লক্ষ টাকা দাম দিয়ে—বাজি জিতলেন কুমার সাহাব, দশ হাজার টাকা।

খোকাবাবু অবিশ্যি বলেছিলেন টাকা তিনি নেবেন না, কিন্তু আপনি বলেছিলেন—তা হবে না, বাজির টাকা তোমাকে নিতেই হবে! তখন খোকাবাবু বললেন—তবে সোনা-রূপোর ডিস, ছুরি, কাঁটা, চামচ, আর খাবার পিয়ালা, এই সব ঐ টাকার তৈরী করো। সব বন্ধু মিলে একসঙ্গে বসে ফূর্ত্তি করা যাবে। তাই হলো। কাশ্মীর থেকে এলো সোনা রূপোর খানাখাবার ডিস—গ্রীস—ইটালি থেকে এলো কাঁটা, চামচ, ছুরি, আর প্যারিস থেকে এলো পিয়ালা, অংরাজিতে যাকে বলে ডিকেণ্টার! ঠিক বাত বলছি না রাজাসাহাব?

সব, সব তোমার মনে আছে তো রামভজন? আহা-হা-হা,—সে সব কি ভোলবার? বললেন রাজা রাও! সব জিনিষ যেদিন এসে গেলো, সেদিন কি জমজমাট মজলিশ হয়েছিলো আমাদের এই হল-ঘরে! তোমার মনে আছে সে সব?

—আছে বৈ কি রাজাসাহাব! কিছু ভুলিনি! মজলিশে বসে আপনাদের সে কি আফশোষ—লাহোরীবাঈ এসেছিলো, কিন্তু রাজাবাহাদুর তখন তো অক্ষেম হয়ে পড়েন নি—ও সব বাঈ-টাঈ সেদিন বাড়ীতে ঢোকা বারণ ছিলো। রাণীমার সর্ব্বজয়া ব্রত আর রাজাবাবুর সন্ন্যেস চলছে। বাড়ীতে আসছে সাধু-সন্ন্যেসী, অতিথ-ফকির, দান-ধ্যান চলছে! সে জন্তে এক মাস বাঈনাচ চলবে না! কিন্তু কুমার সাহাব তো ধরে বসলেন আজই—ঐ জিনিষগুলো ব্যবহার করতে হবে! কাজেই লাহোরীবাঈ ফিরে গেলো পানসো টাকা গুণে নিয়ে—আর আপনারা সোনা-রূপোয় খেয়েও আফশোষ করলেন—আমাকেও ডেকে নিয়েছিলেন কি না, পান, আতর, সরাব দেবার জন্তে—তাই বিলকুল সব নজরে পড়েছিলো আমার!

—রূপোর চামচে করে পুডিং খেতে খেতে হাঃ, হাঃ, হাঃ, হাঃ, শব্দে দরবারী হাসির ফোয়ারা ছুটিয়ে দিলেন রাজা রাও।

সে হাসিতে যোগদান করলো বুড়ো ভজন সিং! ভারি জব্দ হয়েছিলে তো দাদু, বলতে বলতে সোফায় হেসে লুটিয়ে পড়লো পম্পিয়া।

—মায়া দেবীও হাসলেন মুখে রুমাল চাপা দিয়ে। অনিল, করবী সকলেই হাসলো—হাসলো না শুধু এক জন। সুস্মিতা! তার হাসির উৎস বুঝি একেবারেই শুকিয়ে গেছে! [ক্রমশঃ।

বৌদ্ধ পঞ্চশীল

শ্রীআশা রায়

ভগবান বুদ্ধের বাণীর মূল কথা হইতেছে—শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা। তিনি যে যুগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সে যুগে দেশের প্রচলিত ধর্ম্ম স্তরের পর স্তরে অনেক কুসংস্কার ও অপসত্যের আবর্জ্জনায় আবৃত হইয়াছিল। তৎকালে ধর্ম্মাচরণ ছিল আনুষ্ঠানিক আড়ম্বরে দেবতাদিগের প্রীতি সম্পাদন, ইহকালে অভীষ্ট পূরণ ও পরকালে সুখ-কামনায় যাগ-যজ্ঞের দ্বারা পুণ্যার্জ্জন। ব্রাহ্মণ পুরোহিতগণই ছিলেন ঐ সকল ক্রিয়াকাণ্ডের অধিকারী, তাই স্বকীয় স্বার্থ ও প্রাধান্য রাখিতে দিতেন প্রতিযোগিতার উৎসাহ, যার ফলে মাসের পর মাস আকাশ-বাতাস আচ্ছন্ন থাকিত যজ্ঞধূমে, ধরাতল সিক্ত থাকিত শত শত মূক পশু-বলিদানের রক্তস্রোতে। যজ্ঞের বিপুল ব্যয় সঙ্কুলানের জন্য ধনিগণ শোষণ করিত সমাজের নিরীহ দরিদ্রশ্রেণীকে, তাহাদের ঠেলিয়া দিত দুঃখ-দুর্দ্দশার মুখে পুণ্যলাভের স্তোক বাক্যে।

অপর শ্রেণী সাধু-সন্ন্যাসিগণ আত্মনিগ্রহ ও কৃচ্ছ্রসাধনকেই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মাচরণ বলিয়া মনে করিত। প্রকৃত সত্যের পথ, মুক্তির পথ কী, তাহা বিচার পূর্ব্বক অনুধাবন করিত না।

মহাতাপস বুদ্ধ অপরিসীম ত্যাগ, কঠোর তপস্যা দ্বারা জীবের জন্ম, জরা, মরণ, দুঃখের হেতু অবহিত হইলেন এবং মানবের মুক্তির পথ আবিষ্কার করিলেন। মহামনীষী সূক্ষ্ম যুক্তি দ্বারা সকল শাস্ত্রের বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলেন, তাহাদের অন্তর্নিহিত প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটন করিলেন এবং জ্ঞান ও যুক্তি-সিদ্ধ মুক্তির পথ ঘোষণা করিলেন। বাস্তবিক হিন্দুধর্ম্মের যদি কোথাও পরিপূর্ণ বিকাশ হইয়া থাকে তবে তাহা বৌদ্ধধর্ম্মেই হইয়াছে। তাই স্বামী বিবেকানন্দ চিকাগো (Chicago religious conference) বক্তৃতায় উদাত্তকণ্ঠে

লিয়াছিলেন—Buddhism is the fulfilment of Hinduism—বৌদ্ধধর্ম্মে হিন্দুধর্ম্ম পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে।

মানবের জীবন-মরণ সুখ-দুঃখের দুর্জ্ঞেয় হেতু-পরম্পরার জটিল সমস্যার সকল সমাধান যদি কোথাও হইয়া থাকে, তাহা ভগবান বুদ্ধের নির্দ্দেশিত মার্গেই হইয়াছে। তাই এই ধর্ম্ম চরমোৎকর্ষতা প্রাপ্ত হইয়া এক সার্ব্বজনীন ধর্ম্মরূপে দেশ-দেশান্তরে বিস্তৃত হইয়াছিল। এই মহান্ ধর্ম্মের মাধ্যমে প্রাচ্য সমগ্র এশিয়াতে ও পাশ্চাত্ত্যে দেশ-দেশান্তরে মৈত্রীলাভ করার সুযোগ পাইয়া পরস্পরের ভাবধারার আদান-প্রদানে ভারতে এক নূতন সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল। ভারত জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, শিল্পে, শোভায় জগতে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল, সে যুগ ভারতের স্বর্ণযুগ।

বৌদ্ধধর্ম্মে শীল পালনের বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হয়। পুণ্য কামনায় আনুষ্ঠানিক যাগ-যজ্ঞের আড়ম্বর বা কৃচ্ছ্রব্রতের সেই কালে, সত্যদ্রষ্টা শ্রীবুদ্ধ প্রথমেই ঘোষণা করিলেন—বাহ্যিক অনুষ্ঠান ও আত্মনিগ্রহে পরমার্থকে জানা যায় না। যোগিশ্রেষ্ঠ লোকোত্তর সাধনা দ্বারা যে নিগূঢ় সত্য আবিষ্কার করিয়াছিলেন তাহা জগতের শাশ্বত সত্য। তাই শত শতাব্দী পরেও মহাজ্ঞানী শঙ্করাচার্য্য, যিনি সার্ব্বত্রিক বৌদ্ধধর্ম্মের অতলে অন্তর্হিত ও লুপ্তপ্রায় ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মকে পুনরুজ্জীবিত করিয়াছিলেন, তিনিও বুদ্ধের সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "যোগিনাম্ রাজচক্রবর্ত্তিন্।" তত্ত্বদ্রষ্টা বুদ্ধ বলিলেন—মনই ধর্ম্ম-সমূহের পূর্ব্বগামী, মনকে পূর্ব্বে জান, পূজা-অর্চ্চনার বাহ্যিক সমারোহে বা আচার-নিয়মের গোঁড়ামিতে মন পবিত্র হয় না, বহির্মুখী মনকে অন্তর্মুখী কর, সেখানেই সকল সত্যের সন্ধান পাইবে। এই আত্মদর্শন ও মনঃশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করার আহ্বান তৎকালীন চিন্তাধারার সম্মুখে বিস্ময় ও বিপ্লব সৃষ্টি করিল, মানবের ভাবজগতে ইহা এক কল্যাণদায়ী নব যুগের সঞ্চার। তিনি বলিলেন, মনকে পবিত্র কর, মনের কলুষতা চঞ্চলতার মূলে আছে তৃষ্ণা অর্থাৎ বাসনা, বাসনা দমনের উপায় মনঃসংযম, তাই তাঁহার ধর্ম্ম শাসনের প্রথম উপদেশ শীল পালন।

ধনী দরিদ্র, উচ্চ নীচ, স্ত্রী পুরুষ, সকল মানব দুঃখমুক্ত হউক, এই এক মাত্র ছিল বাসনাবিজয়ী বুদ্ধের বিশ্বজনীন বাসনা।

ব্যক্তিগত জীবনে এই শীলানুসরণ সমাজেরও বিবেক উদ্বুদ্ধ করিয়া মঙ্গলপ্রসূ হইবে, সর্ব্বদ্রষ্টার এই উদ্দেশ্যও আমরা দেখিতে পাই। কেবল সদ্গ্রন্থ বা ধর্ম্মপুস্তক পাঠে চিত্ত নির্ম্মল হয় না, চিত্তের মলিনতা দূর করিতে প্রয়োজন শীল পালনের।

"ন গঙ্গা যমুনা চাপি সরভূ বা সরস্সতী
নিন্নগা বাচিরবতী মহী চাপি মহানদী।
সক্কুনন্তি বিসোধেতুং তম্মলং ইধ পানিনং
বিসোধযন্তি সত্তানং যং বে সীলজলং মলং

গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী অচিরবতী প্রভৃতি মহানদীর জলও প্রাণীদের পাপমল ধৌত করিতে পারে না, বরং শীলাচরণরূপ জলই পাপমল ধৌত করিতে সক্ষম।

চিত্ত বিশুদ্ধ না হইলে মানসিক অনুশীলন (ধ্যান) করা ও চিত্তশক্তিকে জাগ্রত করা যায় না, চৈতসিক অভিনিবেশ ব্যতীত সমাধি ও প্রজ্ঞা লাভ হয় না।

"দুল্লভ মনুস্সত্তং" মনুষ্যজন্ম দুর্লভ, দুর্লভ এই জন্য যে মানুষ মনের অধিকারী। অন্যান্য জীবের স্বীয় মনের অস্তিত্ব উপলব্ধি নাই এবং মনোবৃত্তি যেটি যখন প্রবল হয়, সেই অনুযায়ী সে ক্রিয়া করে, শুভ অশুভ বিচারশক্তি নাই। একমাত্র মানুষের চিত্তবৃত্তির উপর আধিপত্য অর্থাৎ ইচ্ছানুরূপ চালনা ও নিরোধের ক্ষমতা আছে।

বৌদ্ধধর্ম্মের পঞ্চশীলের কথা বর্ত্তমানে অনেকেই শুনিয়াছেন, ইহা শুনিতে সহজ ও সাধারণ। আড়াই হাজার বৎসর ধরিয়া আমরা বিভিন্ন ধর্ম্মগ্রন্থে এই নীতির অনুবৃত্তি বা ইহারই রূপান্তরিত অনুকৃতি শুনিয়া আসিতেছি, তাই আজ ইহা মামুলী হিতকথা বলিয়া মনে হয়, কিন্তু ইহা সর্ব্বপ্রথম ভগবান বুদ্ধেরই শ্রীমুখ-নিঃসৃত। এই নীতি শুনিতে যত সহজ বাস্তবিক পালন তত সহজ নহে। এ প্রবন্ধ তৎ বিষয়ক পর্য্যালোচনার নগণ্য প্রয়াস মাত্র। বুদ্ধের কাল হইতে অদ্যাপিও জগতে সর্ব্বত্র ত্রিশরণ ও পঞ্চশীল একই পদ্ধতিতে পালি ভাষায় আবৃত্ত হয়।

প্রথম শীল

"পানাতিপাতা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিয়ামি।"

প্রাণিহত্যা, জীবহিংসা হইতে বিরত থাকিব—এই শিক্ষাপদ গ্রহণ করিতেছি। বুদ্ধ বলিয়াছেন, জীবন সকলেরই প্রিয়, সকল প্রাণীই মৃত্যুভয়ে সন্ত্রস্ত, সুতরাং নিজের সহিত তুলনা করিয়া কাহাকেও আঘাত বা হত্যা করিবে না। তিনি বুঝিয়াছিলেন, ক্রোধ, হিংসা, দ্বেষ, বৈরভাব, সংসারের সকল অশান্তির কারণ। তাই সকল জীবের প্রতি মৈত্রী ভাবনা করিতে নির্দ্দেশ দিয়াছেন যথা—

"উদ্ধং যাব ভবগ্গা চ অধো যাব অবীচিতো সমন্তা চক্কবালেসু সব্বে সত্তা সব্বে পানা অবেরা হোন্তু, অব্যাপজ্জা হোন্তু, অনীঘা হোন্তু, সুখী অত্তানং পরিহরন্তু, দুক্খা মুচ্চন্তু যথা লদ্ধ সম্পত্তিতো মা বিগচ্ছন্তু।"

ঊর্দ্ধদিকে ভবাগ্র অবধি, নিম্নদিকে অবীচি পর্য্যন্ত ও চক্রবালের চতুর্দ্দিকের সকল সত্ত্বগণ সকল প্রাণিগণ শত্রুহীন হউক, বিপদ-হীন হউক, রোগহীন হউক এবং সুখে বাস করুক, দুঃখ হইতে মুক্ত হউক এবং লব্ধ সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত না হউক। এইরূপ অভিলাষ ও চেতনা চিত্তে সদাজাগ্রত রাখার শিক্ষা তিনি দিয়া গিয়াছেন।

দ্বিতীয় শীল

"অদিন্নাদানা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি।"

অদত্তদান গ্রহণ (চৌর্য্যবৃত্তি) হইতে বিরত থাকিব—এই শিক্ষাপদ গ্রহণ করিতেছি।

অদত্তদান দান গ্রহণ করিব না, ইহার অর্থ কেবল চুরি করিব না তাহাই নহে, যাহা আমাকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া দেওয়া হইবে না তাহা গ্রহণ না করা। অপরের অসহায়তা, বিপদ, ভীতি অক্ষমতার সুযোগে উৎকোচ, সুদ, অতিরিক্ত মুনাফা ইত্যাদিতে অবৈধ সুবিধাদ্বারা অর্থ আদায়ও অদত্তদান গ্রহণের পর্য্যায়ে পড়ে, কারণ এ সকল স্বেচ্ছাকৃত দান নহে। অর্থসম্পদ—তৃষ্ণার শেষ নাই, পরিণামে এই তৃষ্ণা দুষ্টক্ষত শরীরকে গ্রাস করিয়া ধ্বংস করার ন্যায় মানবের মনুষ্যত্ব ধ্বংস করে।

তৃতীয় শীল

"কামেসু মিচ্ছাচারা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি।"

কামে ব্যভিচার হইতে বিরত থাকিব—এই শিক্ষাপদ গ্রহণ

করিতেছি। এখন দেশকাল-পাত্রভেদে অনুযায়ী ব্যভিচার কথার বিভিন্ন অর্থ হয়। একদেশে এককালে একরূপ সামাজিক নিয়ম ও নীতি প্রচলিত থাকে তাহার পরবর্তীকালে ভিন্নরূপ হয়। দেশ বিধায়ে এক স্বামী বহু স্ত্রী ও এক স্ত্রী বহু স্বামী গ্রহণ করিবার রীতি আছে, সুতরাং ইহা প্রশ্ন হইতে পারে, মানুষ কোনটি পালন করিবে?

প্রকৃতপক্ষে এই শীল পালনের উদ্দেশ্য ইহাই যে, যাহার জন্য মানুষের ছলনা কপটতা ও প্রতারণার আশ্রয় লইতে হয়, তাহা হইতে বিরত থাকা অর্থাৎ যে, যে সমাজের অন্তর্ভুক্ত, সেই সমাজের প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ না হইয়া পুরুষ ও নারীর অবৈধ মিলনই ব্যভিচার, ইহা হইতে বিরত থাকার বিধিপালন। অবৈধ কামাচার বহু অনর্থের কারণ।

চতুর্থ শীল

"মুসাবাদা বেরমনী সিক্‌খাপদং সমাদি যামি।"

মিথ্যাবাক্য হইতে বিরত থাকিব—এই শিক্ষাপদ গ্রহণ করিতেছি। স্বার্থ ও লোভের জন্য দোষ স্খালন ও প্রবঞ্চনার জন্য মিথ্যাবাক্য বলিয়া আমরা চিত্তকে কলুষিত করি। উদ্দেশ্যসাধন, অভীষ্ট পূরণের জন্য গোপনতা কপটতা ও ভণ্ডামির আশ্রয় লওয়াও মিথ্যাচার। এক মিথ্যা বহু মিথ্যার জনম, ইহার বিষক্রিয়া চিত্তকে বিষাক্ত করে।

পঞ্চম শীল

"সুরা-মেরযমজ্জ-পমাদট্ঠানা বেরমনী সিক্‌খাপদং সমাদি যামি।"

মাদকদ্রব্য ও উত্তেজক ওষধি সেবনের প্রমত্ততা হইতে বিরত থাকিব—এই শিক্ষাপদ গ্রহণ করিতেছি।

মত্ততা এবং বর্তমানে নানাবিধ ওষধি সেবনের (আফিং, কোকেন, ধুতুরা প্রভৃতি বিষাক্ত উত্তেজক দ্রব্যঘটিত Drug addict) বহু দৃষ্টান্ত চিকিৎসকগণ অবগত আছেন, এই কুঅভ্যাস অনেক কিছু বিপত্তি অনর্থ ও ধ্বংসের কারণ হয়। আমাদের জাতীয় জনক মহাত্মা গান্ধী মাদক বর্জনের জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। সুখের বিষয়, ভারত সরকার ইতিমধ্যে এ সম্বন্ধে উদ্যোগী হইয়াছেন।

এই শীল সমুদয়ের প্রত্যেকটি নাস্তিবাচক negative সংকল্পের মধ্যে ব্যর্থক অর্থ রহিয়াছে যেমন—প্রাণিহিংসা করিব না অর্থাৎ সর্বজীবের প্রতি এইরূপ মৈত্রীপূর্ণ ভাব জাগ্রত করিব যে মনে হিংসা আসিবেই না। অদত্তের দান গ্রহণ করিব না অর্থাৎ চিত্তকে এরূপ লোভশূন্য করিব যে পরদ্রব্য আকাঙ্ক্ষা আসিবে না ইত্যাদি।

এতদ্ব্যতীত মনস্তত্ত্বের দিক হইতে এই পঞ্চশীল সংকল্পের একটি তাৎপর্য্য এই যে, একক বা সমবেত ভাবে যখনই বুদ্ধ-বন্দনা হয় তখনই ত্রিশরণের সহিত প্রত্যেক বৌদ্ধ পঞ্চশীল আবৃত্তি করেন। এই দৈনন্দিন পুনরাবৃত্তি প্রতিজ্ঞা-বাক্যের প্রাণ সঞ্চার করে এবং তাহা অনুশীলনে প্রেরণা যোগায়।

এই শীল পালনের আর একটি লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে চিন্তাশীল মনীষী যে নীতি পালনের উপদেশ দিয়াছিলেন তাহার প্রয়োজনীয়তা অদ্যাপিও অপরিহার্য্য। ইহার নৈতিক শক্তি ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত জীবন উভয়কেই শান্তি ও কল্যাণের পথে চালিত করে। সে কারণ স্বাধীন ভারত বর্তমানে তার প্রাচীন ঐতিহ্যকে রাষ্ট্রনীতির "পঞ্চশীল" চুক্তিতে প্রবর্তন করিয়াছে।

ব্যক্তিগত ভাবে পঞ্চবিধ শীল পালনের বৈশিষ্ট্য এই যে, চিত্তের অসদ্‌বৃত্তি অর্থাৎ ষড়রিপুর প্রভাব ক্রমশঃ লুপ্ত হইয়া সদ্‌বৃত্তি সকল জাগরিত হয় এবং চিত্তের প্রশান্ত ভাব আনয়ন করে। এখন আমরা যদি আমাদের চিত্তের যথার্থ অধিকারী হই, তবে এ সকল পালন দুরূহ হয় না। কিন্তু যেখানে চিত্ত আমাদের বশবর্ত্তী নহে বরং নানা রিপুসমূহের বশবর্ত্তী, সেখানে ধ্যানের অনুশীলন অসম্ভব ও নিষ্ফল। চিত্তের স্থৈর্য্য ও প্রশান্তি লাভের অনুশীলন অর্থ চিত্তের মোহমুক্তি, চিত্ত যেখানে চঞ্চল ও নানাবৃত্তির দাস, সেখানে মুক্তি পাইবার প্রশ্নই উঠিতে পারে না। সুতরাং চিত্তকে বাসনাবিমুখ, বন্ধনমুক্ত করিতে মনঃসংযম অর্থাৎ শীলপালনের প্রয়োজন। "ধম্মচরণে পি ন ভবতি অসীলস" শীলহীনের ধর্ম্মাচরণ হয় না। তাই সমাধির মূল ও আদি কথাই শীল—এই জন্মমৃত্যুর কালচক্রের অবিরাম আবর্ত্তন হইতে মুক্ত হইবার জন্য, অভ্যাসের দ্বারা চিত্তকে সংস্কারমুক্ত ও সংহত করিলে তাহা মনঃশক্তির উপর ক্রমিক অভ্যাসের সংকল্প যোগায়। এই অভ্যাসই কালে চিত্তের তন্ময়তা আনে, তখন অতীন্দ্রিয় জ্ঞান ধীরে ধীরে প্রতিভাত হয়। এই জ্ঞান পরিশেষে অনাবিল শান্তি ও শাশ্বত সত্যের উপলব্ধি আনয়ন করে এবং প্রজ্ঞা ও নির্ব্বাণের পথে চালিত করে।

"সব্বে সত্তা সুখিতা হোন্ত"

বৈশাখে

শাকিলা

জাগে ঘন ঘন অশনি
আজি দিনান্ত ছায়ায়ে
আঁধারে ঢাকিল ধরণী
দিল ত্রিভুবন কাঁপায়ে।

অম্বর আর অবনী ভরিয়া
এ কী তাণ্ডব নৃত্য।
ঝঞ্ঝার ঘায়ে বৈশাখী বায়ে
ধূলায় ধূসর চিত্ত।

জাগে গর্জ্জন, নাহি বর্ষণ
কাঁপে বিহঙ্গ কুলায়ে,
আজি কী ঝঞ্ঝা দিয়েছে আমার
শূন্য হৃদয় দুলায়ে!

বাজে মৃদঙ্গ যেন সহস্র
দিগন্তে জাগে কোলাহল
জাগে ভৈরব শমন ভীষণ,
কণ্ঠেতে ধরি' হলাহল।

ভুজঙ্গ যার ভূষণ অঙ্গে
শ্মশান যাহার নিত্যবাস,
প্রেতাত্মা যার হ'ল কিঙ্কর
সদাই যাহার চিত্তহাস।

সেই কী জাগিল বৈশাখে আজ
ধ্বংসের লীলামূর্ত্তিতে?
ধরায় জাগাতে নবীন সৃষ্টি
সবুজে রাঙানো স্ফূর্ত্তিতে?

কিছুতে আর মন ভরে না
বাদল আসে ছেয়ে
দুষ্টু আমার মিষ্টি হল
কোলে লজেন্স পেয়ে॥
কোলে
লজেন্স ও টফি
Hb
প্রস্তুত কারক
কোলে বিস্কুট কোং প্রাইভেট লিঃ
কলিকাতা-১০
Kolay
CONFECTIONERY

শ্রীমতী বাসবী বসু

মাঝ-রাতে ঘুমটা ভেঙে যায় অজয়ের।

জলের তলায় ডুব দিলে মানুষ যেমন একটা অদৃশ্য-শক্তির তাগিদে ওপরে ভেসে ওঠে, ঠিক তেমনি একটা অনুভূতির তাড়নায় অজয়কে যেন গভীর সুষুপ্তির ভিতর থেকে জাগরণের ঘাটে তুলে দিয়ে যায়।

প্রথমটায় মনে হয় বুঝি বা স্বপ্ন। একটু চোখ চেয়ে থেকে ঘরের গাঢ় অন্ধকারটা যখন স্বচ্ছ হোয়ে আসে তখন বিস্মিত অজয় তাকিয়ে দেখে, তার পায়ের কাছে পড়ে ফুলে ফুলে কাঁদছে কণিকা।

এত রাত্রে এত কান্নার কোন সঙ্গত কারণ মনে আসে না অজয়ের। বিস্ময়ের আতিশয্যে প্রথমটায় কণিকাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করতেও ভুলে যায় সে। সান্ত্বনা দেবার কথা মনেই আসে না।

শুধু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে কণিকার কান্না। যেন কত দিনের অবরোধ পাষাণ আজ সরে গেছে। বিগলিত হিমকণা নামছে স্বতঃস্রোতা মুখর নির্ঝরিণীর মত।

অবাক হোয়ে যায় অজয় ডাক্তার। কোথায় এই বেদনার উৎস ঠিক করতে পারে না কিছুতেই। হৃদয়ের কোন গোপন গহ্বর থেকে এর জন্ম হোল তার কারণ অনুধাবনে সম্পূর্ণ অক্ষম সে।

বয়সে তরুণ হলেও ডাক্তার আর মনস্তত্ত্ববিদ বলে আজ অজয়ের নাম-ডাক ছড়িয়ে পড়েছে কস্তুরীগন্ধের মত। গুণগ্রাহীদের তাড়নায় মুহূর্ত অবকাশ নেই তার। সেজন্য গৃহ আর গৃহিণীর ওপর নজর হয়তো কিছুটা শিথিলই হয়ে থাকবে, তাই বলে এত বড় ফাঁকি?

মনস্তত্ত্ববিদ স্বামী হয়ে নিজের স্ত্রীর এ-হেন মনোবেদনার কোন সন্ধানই সে রাখে না!

বিবেক-দংশিত অজয় কণিকার কাঁধে হাত রাখে, বলে—কণা, কি হোয়েছে তোমার? এ কি করছো তুমি? ওঠো ওঠো লক্ষ্মীটি—

কণিকা মোটেই ওঠে না। মুখটা আরও গুঁজে দেয় অজয়ের পায়ের ভেতর। একটা গুমরানো কান্নার আওয়াজ ছাড়া আর কোন সাড়াই আসে না ওর কাছ থেকে।

কান্নায় ওর পিঠটা শুধু কুঁকড়ে কুঁকড়ে ফুলতে থাকে। এবার অজয় জোর করে একটু। পাখীর মত ক্ষীণকায়া কণিকাকে জোর করেই তুলে আনে নিজের বলিষ্ঠ বাহুর মাঝখানে। ওর মাথাটাকে বুকের কাছে টেনে রেখে বলে—এ তুমি কি করছো, কণা! কি হোয়েছে তোমার?

কণিকা তবুও ফোঁপায়, ভাঙাগলায় বলে—ক্ষমা করো, আমায় তুমি ক্ষমা করো। তুমি আমায় দয়া না করলে আর গতি নেই আমার। ওগো, আমি ভগবানকেও ভুলে গেছি।

আর শোনা যায় না, কান্নায় ভেসে যায় ওর কথা।

অজয় বলে, কেন এত ব্যাকুল হোচ্ছো তুমি? আমাকে বলো না, কি এমন হয়েছে?

বলবো বলবো, বলতেই হবে আমায়। এ অসহ্য বোঝা আমি আর বইতে পারি না। তুমি আমায় নিষ্কৃতি দাও। ছুটি দাও তোমার এই সংসার থেকে। অশোক আর অলক তোমারই রইলো আমি বিনা সর্তে দিয়ে গেলাম ওদের। জীবনে আর কোন দিন মায়ের দাবী নিয়ে দাঁড়াবো না ওদের সুমুখে। শুধু তুমি আমায় করুণা করো, ওগো আমায় ভিক্ষা দাও—আমায় ফিরিয়ে দাও।

আবার রুদ্ধ হোয়ে যায় ওর কথা। তবে কান্নায় নয়, মূর্চ্ছায়। কণিকা মূর্চ্ছা গেছে। শক্ত হোয়ে উঠেছে ওর পাতলা শরীরটা।

অজয় ওকে বিছানার ওপর শুইয়ে দেয়। বেড সুইচটা টিপে দেয় হাত বাড়িয়ে। নীল আলো ছুটে আসে কৃত্রিম জ্যোৎস্নার মত। টেবিলে-রাখা কুঁজো থেকে কাচের গ্লাসে জল আনে। কণিকার সারা অঙ্গে সিক্তধারা ছড়ায়। তার পর অন্যমনস্ক ভাবে নিজেও জল খায় খানিকটা।

সাবধানতার সাথে কণিকার ঠোঁটের ফাঁকে ঢেলে দেয় দশ ফোঁটা এ্যাড্রিনালিন। কিন্তু অন্য বারের মত স্মেলিংসল্টের শিশি খুঁজতে ছোটে না।

ধৈর্য্য সহকারে কণিকার মূর্চ্ছাভঙ্গের প্রতীক্ষায় থাকে। মূর্চ্ছিত কণিকার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ওর অসতর্ক মনে ফুটে ওঠে আর একটি রাতের ছবি। যে রাতের পরে কালের ধূলো যতই জমুক, তবু সে রাত কিছুতেই বিস্মৃতির অন্তরালে লুপ্ত হোয়ে যায় না।

সে রাত অজয়ের ফুলশয্যার। ফুলে ফুলে সেদিন বাস্তবের এই ঘরখানাই যেন কল্পনার ইন্দ্রলোকে রূপান্তরিত হোয়েছিল। সমাগত সমবয়সীদের আনন্দ-মেলায় অজয়ের প্রথম মিলনরাত্রির সুরের রেশ আজও মনের তারে লেগে আছে। ঘরের প্রত্যেক দেওয়ালে গোলাপের রিং আর প্রত্যেক কোণায় বড় বড় ফ্লাওয়ারে ভাসে রজনীগন্ধার গুচ্ছ।

এক মাত্র সন্তানের ফুলশয্যা বলে মা সাধ্যাতীত খরচ করে সাজিয়েছিলেন ঘরটাকে।

সারাদিনের পরিশ্রমে সজ্জাকরেরা অজয়ের শয্যায় যে বেলফুলের মশারিটা তৈরী করেছিল, তার মধ্যে লাল টুকটুকে কার্পেটে বসা কণিকাকে দেখে চিরদিনের অরসিক কাজপাগলা অজয় ডাক্তারও যেন একটু কাব্যরসসিক্ত হয়ে পড়েছিল।

মনে করতে আজও একটু হাসি ফোটে অজয়ের ঠোঁটের কোণায়।

মামাতো-পিসতুতো বোন আর বৌদিদের দুষ্টুমীভরা হাসি আর নষ্টামীভরা আড়িপাতার ইতিহাস আজও লেখা আছে মনের পাতায়।

আ
লো
ক
চি
ত্র

অবাক —হরি মিত্র

বুদ্‌বুদ রচনা —বিত্ত মুখোপাধ্যায়

মৎস্যজীবি —[illegible]পন দাস
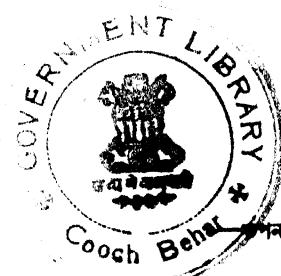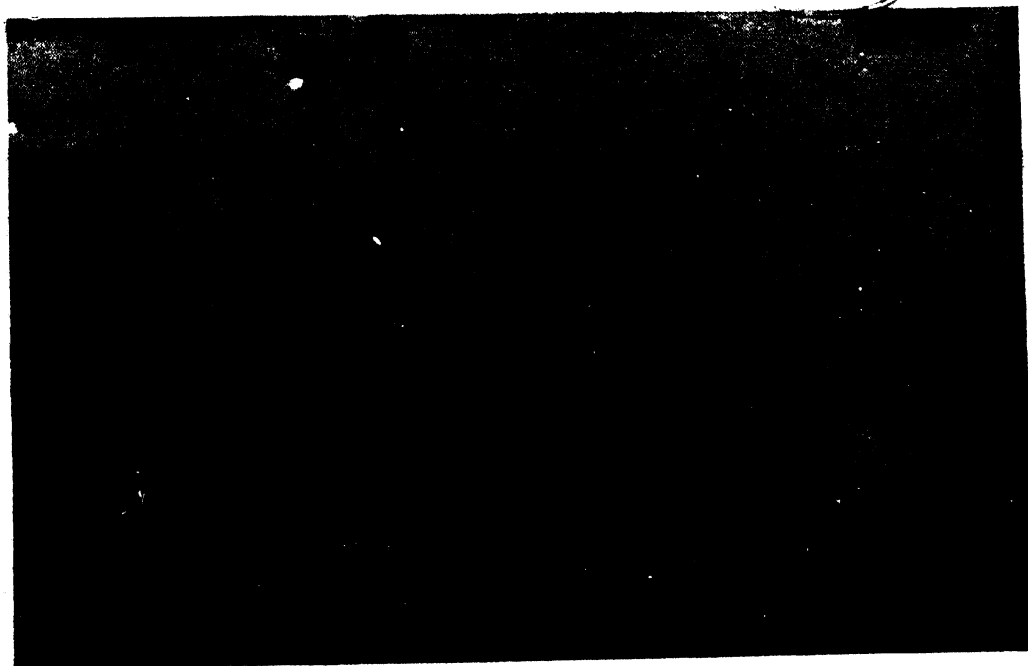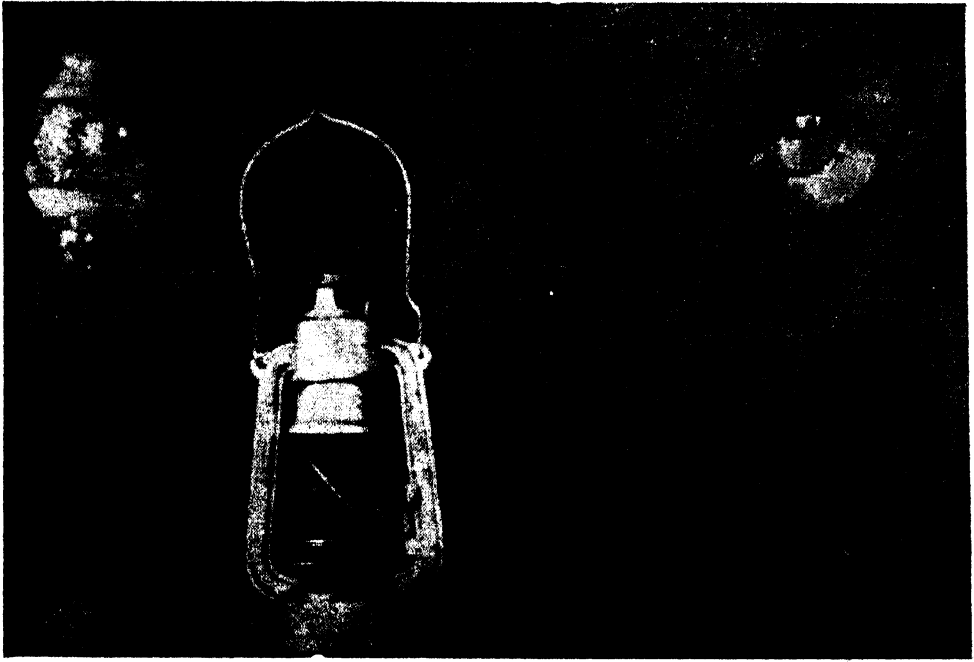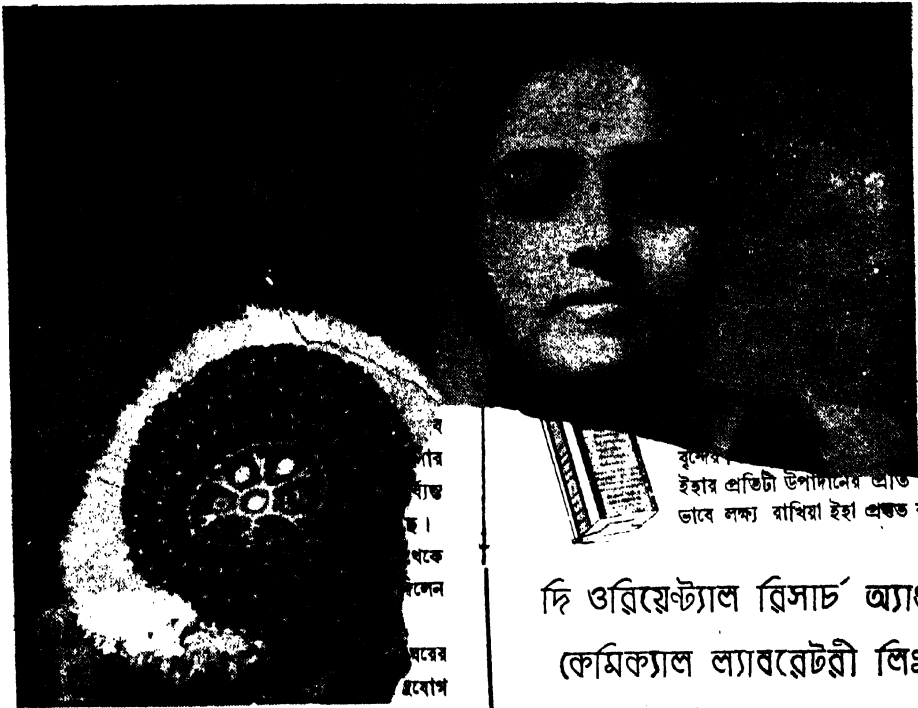
যেতে নাহি দিব

সুখেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়

আলোর অগ্রগতি —শ্যামলকুমার সরকার

দুই বন্ধু —কান্তি ভাই

শিলং লেক্
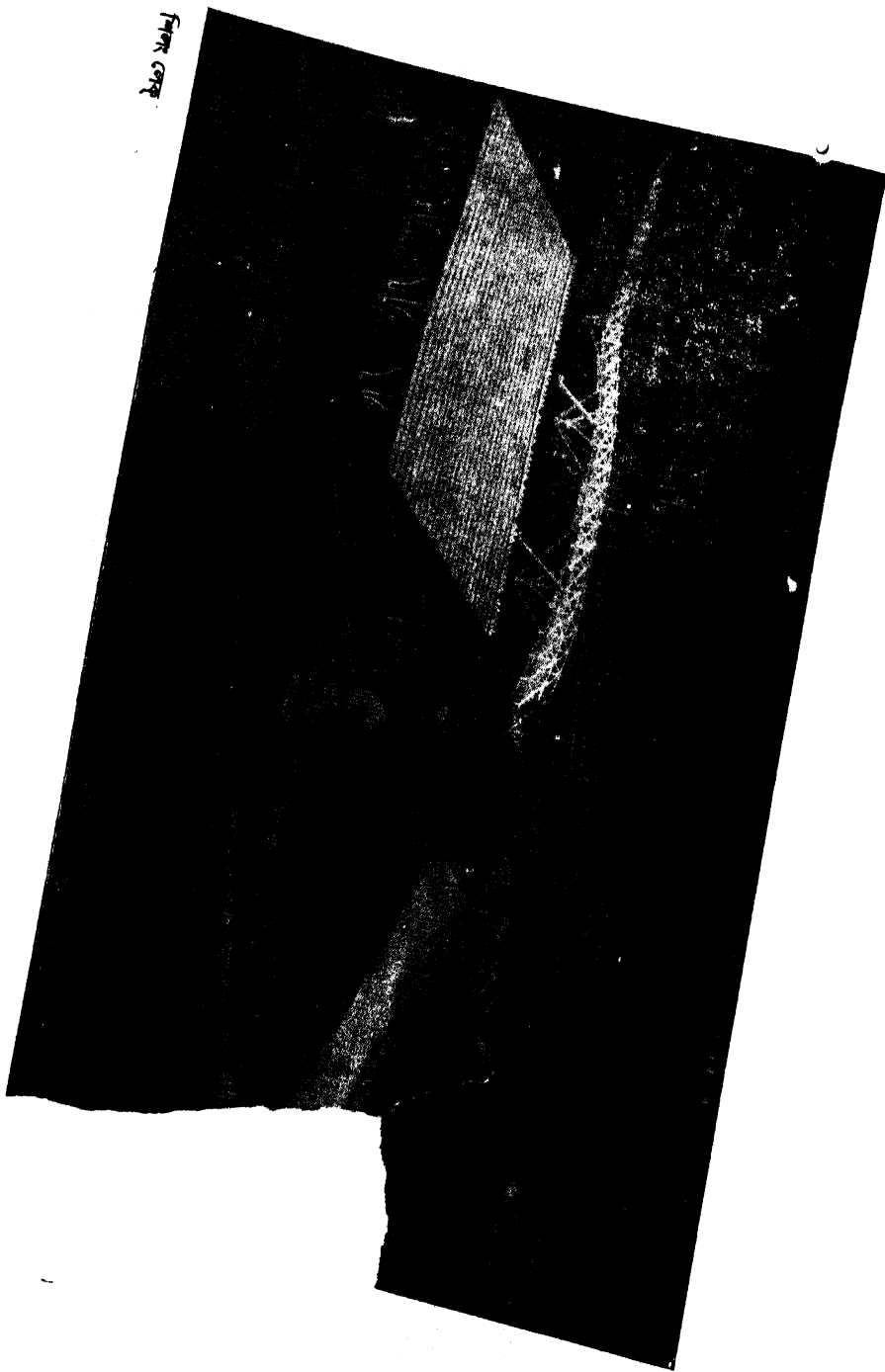
পাড়া-প্রতিবেশীদের বৌ-ঝিয়েরা, অন্য সময়ে যাঁরা অজয়কে দেখলে ভবিষ্যুক্ত ভদ্রলোক বলে মাথার কাপড় তুলে দিয়েছেন, দিনটিতে তাঁরাও যে কত নিকট-সম্পর্কীয়া হয়ে গিয়েছিলেন ভাবতেও আশ্চর্য্য লাগে!

নতুন কুটুম্ববাড়ীর থেকেও তরুণী পুরললনা কয়েক জন এসেছিলেন সেদিনের মিলন-উৎসবে।

তাঁদের বসার ভঙ্গিমাটুকু পর্য্যন্ত আজও স্পষ্ট মনে আছে অজয়ের। সেই লাল কাপড়পরা বউটি—সম্পর্কে কণিকার মামাতো দিদি হতেন বোধ হয়, কি চমৎকার গান করেছিলেন! অজয়ের পিসতুতো বোন অনুরাধাও গান করেছিলো অনেকগুলো। তার মধ্যে দু'-একটা গানের সুর আজও বোধ হয় অজয়ের স্মৃতিশক্তির বাইরে যায়নি।

সবশেষে কণিকাও গেয়েছিলো। ওর মধুকণ্ঠের প্রশংসায় মুখরিত হয়ে উঠেছিল ঘরের সকলে। ওদের সাথে সুর মিলিয়ে মুখে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা না করলেও তার সঙ্গে অজয়েরও অন্তরের পূর্ণ সমর্থন ছিল বৈ কী।

সব চেয়ে বেশী মনে পড়ে অজয়ের, কণিকার সেই জ্যেঠতুতো দিদিটিকে। কি মিষ্টি করে কথা বলতে জানেন ভদ্রমহিলা! সামান্য মামুলি রসিকতাগুলোকেও কত সুন্দর প্রয়োগ করতে জানেন। ওঁর কথা বলার ধরণে অজয় মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল।

তরুণ ডাক্তার সে। মুখে নববল্লভের সলজ্জ হাসিটুকু টেনে আনলেও মনে মনে স্ত্রী-আচার আর গতানুগতিক আচার-আচরণের ওপর বেশ একটু অবজ্ঞাই ছিল তার।

বার বারই সে তাই মাথা নেড়ে বলেছিলো—"উঁহু, যা বলবে তাই শুনতে আমি রাজী নই। আমায় বুঝিয়ে দাও কোনটা কেন করছি আমি। কি যুক্তি এগুলো করবার?

সকলে তাড়া দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছিল, বলেছিলো—করতে হয় তাই করছো। অত কেন কেন কর কেন বাপু?

কণিকার সেই দিদিটি কিন্তু কত সুন্দর করে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, এ-ও বুঝলে না ভাই? এই যে তুমি মঙ্গলী হাঁড়ির চালগুলো কণিকার সামনে ঢেলে দিলে আর কণিকা সেগুলো গুছিয়ে তুলে ভরে দিলো তোমার হাঁড়ি এর মানে—সারা জীবন তুমি এমনই করে রোজগারের টাকাগুলো ঢেলে দেবে কণিকার কাছে। আর কণিকা সেগুলো গুছিয়ে তুলে হাঁড়ি ভরে রাখবে তোমার ঘরে। আজকের এই সব কিছুই সারা জীবনের প্রথম মহড়া আর কি?

অজয়ের বেশ লেগেছিল যুক্তিটা। এমনি আরও কত ছোট ছোট করণীয় আচার। আজ অবশ্য আর খুঁটিয়ে সব মনে নেই অজয়ের। তবু নববধূর হাতের হলদে সুতো খোলার মৃদুস্পর্শটুকু থেকে নিয়ে এঁটো খাওয়ানোর দুষ্ট রসিকতা পর্য্যন্ত মিলিয়ে একটা মধুস্মৃতি আজও অন্তরের মণিকোটায় তোলা আছে।

হঠাৎ তাল কেটে গেল এক জায়গায়। পিসিমা কোথা থেকে কার যেন একটা ছোট বাচ্চাকে টেনে এনে বসিয়ে দিলেন কণিকার কোলে।

আরও একটা শুভকামনার মৌনগুঞ্জন ভেসে এলো ঘরের হাওয়ায়। সেটা কিন্তু নীরবই থেকে গেল, মুখর হবার আর সুযোগ পেল না।

ঘরের আলোটা যেন নিবে গেল বাতাসের দমকে। অদ্ভুত একটা কোলাহল উঠলো ঘরের মধ্যে। কণিকা মূর্চ্ছা গেছে।

ব্যস্ত হোয়ে মা এসে দাঁড়ালেন ঘরের মধ্যে। সকলকে স্নেহের তিরস্কারে শাসন করলেন ওকে এত ত্যক্ত করার জন্য। তারপর কণিকার জ্ঞান হোলে তাকে সযত্নে শুইয়ে দিলেন খাটের ওপর।

আর সে রাত্তের মত রুগীকে অজয় ডাক্তারের, জিম্মায় রেখে বিদায় নিলেন সকলে।

দশ বৎসর আগেকার কথা। অজয়ের মনে হয় যেন দশ মাস। এইতো সেদিন দুটি হাত থরথর করে কাঁপছিলো অজয়ের হাতের ভিতর।

দক্ষিণের জানলা দুটো খুলে দিয়েছিল অজয়। বৈশাখী ত্রয়োদশীর চন্দ্রিমা-চন্দনে স্নান করেছিল ওরা। কণিকার কানের কাছে মুখ নামিয়ে অজয় বার বার বলেছিল—আমায় তুমি ভয় পাচ্ছ কণা? ভয় কি? লক্ষীটি চোখ খোলো, কথা বলো। কণিকার সমস্ত শরীরটা ভীরু পাখীর মত কেঁপে কেঁপে উঠেছিল শুধু। কথা সে বলেনি।

তবু অজয়ের ভাল লেগেছিল। খুব ভাল লেগেছিল কণিকার এই লাজুকতা। অজয় মনে মনে সেদিন প্রতিজ্ঞা করেছিল 'দিনে দিনে হৃদয়ের গ্রন্থি তব খুলিব প্রেমের গৌরবে।'

এত দিনে আবার নতুন করে খটকা লাগে অজয়ের, সত্যি কি

তবে কণিকার হৃদয়ের সমস্ত গ্রন্থি খুলতে পারেনি অজয়? আরও কোন জটিলতর গ্রন্থি আছে কণিকার অন্তরের অন্তস্তলে?

কৈ, কোন দিন তো সে রকম কিছু মনে হয় নি অজয়ের। হতে পারে আত্মভোলা অন্যমনস্ক প্রকৃতির লোক সে; তাতে আবার সারাদিন ব্যস্ত থাকে কাজকর্মে, তাই বলে জীবনের মূলধনে এতবড় ঘাঁটতি?

না না কিছুতেই সম্ভব নয়। এ সব কি ভাবছে সে? তার সংসারে কণিকার কত বড় প্রতিষ্ঠা। সমস্তই তো কণিকার। সমস্ত কিছুতেই তো কণিকার করস্পর্শ মাখানো। অজয় তো সেই প্রথম দিনের মহড়া অনুযায়ী রোজগারের সমস্ত টাকা আজও বিনাদ্বিধায় কণিকার কাছে ঢেলে দেয়। কোন মাসে কম দিলাম, কোন মাসে বেশী দিলাম, তার হিসাবটুকু পর্য্যন্ত তলিয়ে দেখে না। তবে? কি সে এমন বোঝা যার ভারে কণিকা আজ নিষ্কৃতি চায়? নিজের হাতে-গড়া সংসার আর প্রাণ হতে প্রাণ দিয়ে গড়া দুটি শিশুর দাবী চিরদিনের মত ছাড়তে চায় কিসের বিনিময়ে?

যে দু'টি সন্তানের পিতৃত্বের গৌরব পেয়ে অজয় নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে করে—মনে মনে কৃতজ্ঞ হয় কণিকার কাছে তাদের মাতৃত্বের দাবী ছেড়ে পালাতে চায় কণিকা, একথা ভাবতেই অজয় বিস্ময়-বিমূঢ় হয়ে যায়।

সত্যিই ভাবনার কূল মেলে না। যে কণিকা এ বাড়ী ছেড়ে এক দিনের জন্য কখনও বাপের বাড়ী যেতে চায়নি, এমন কি বাপের বাড়ীর আত্মীয়-স্বজন ক্রমাগত আনাগোনা করুক তা পর্য্যন্ত পছন্দ করে নি, তার আজ একি পরিবর্তন? মা যত দিন বেঁচে ছিলেন কি খুশীই না হয়েছিলেন—কণিকার এই অনন্যচিত্তে সংসার করার জন্যে। তাঁর ধারণা ছিল মায়ের কষ্ট হবে বলেই কণিকা বাপের বাড়ী যেতে চায় না। অজয় একলা মানুষ, তার ঝামেলা হবে বলেই কণিকা রোজ রোজ কুটুম-কুটুম্বিতা পছন্দ করে না।

একমুখে তাঁর বৌমার সুবুদ্ধির প্রশংসা আর যেন ধরতো না। তবে সে আর ক'দিন? অশোক যখন পূর্ণগর্ভে তখনই তো সামান্য কয়েক দিন ভুগে মারা গেলেন মা। সেই অবধি কণিকাই তো সর্বময়ী।

চিরদিনই অত্যন্ত ধীর আর চাপা প্রকৃতির মেয়ে সে। সমস্ত দায়িত্ব নিয়ে অক্লান্ত সেবাযত্ন দিয়ে গড়ে তুলেছে অজয়ের সংসার। তবে? আজ কি এমন ঘটলো যা চিরদিনের নীরব কণিকাকে এমন মুখর করে তুললো?

আর ভাবতে পারে না অজয়। দু'হাতে নিজের মাথাটা চেপে ধরে। হঠাৎ স্বল্প আলোয় ওর নজর পড়ে কখন যেন চোখ মেলেছে কণিকা। মূর্চ্ছা ভেঙে ফ্যালফ্যালে দুটি চোখ মেলে একদৃষ্টে অজয়ের পানে তাকিয়ে আছে সে।

অজয়ের চোখে চোখ পড়তেই অজয়ের একটা হাত নিজের মুঠোর মধ্যে টেনে নেয়। তারপর মৃদু একটু ভর দিয়ে উঠে বসে বিছানার ওপর। অজয় তাড়াতাড়ি ওর পিঠে একটা বালিস দেয়। ওকে আরাম করে বসতে সাহায্য করে।

কণিকার আগেকার উত্তেজনা আর নেই। ধীর-গম্ভীর গলায় সে বলে—তোমায় আজ কয়েকটা কথা বলবো। কিন্তু এই আলোর মধ্যে তোমার চোখের দিকে তাকিয়ে বলবো, এত সাহস আমি আজও সঞ্চয় করে উঠতে পারিনি। আলোটা নিবিয়ে দাও।

অজয়ের একবার মুখে আসে—আজ থাক না কণিকা, বড় দুর্বল তুমি, বড় উত্তেজিত। কিন্তু যে কথা আর বলে না যে। ডাক্তারী শাস্ত্রের কতকগুলো উপদেশ আউড়ে কণিকাকে আজ বাধা দেওয়া যাবে না—সে কথা অজয় বেশ বুঝেছে।

বিনা বাক্যব্যয়ে তাই সে আলোটা নিবিয়ে দেয়। কণিকা ডুবে যায় অতীতের অন্ধকারে। আলোটা নিবোতে বলে ভালই করেছিল কণিকা। অন্ধকারের কালো পর্দাখানা দুজনের মধ্যে যেটুকু ব্যবধান সৃষ্টি করলো তাইতেই কিছুটা লজ্জার হাত থেকে বাঁচলো সে।

মরীয়া হয়েই অবশ্য সুরু করেছে। তবু তার অতীতের কালির ছিটেয় অজয়ের মুখে কতটা কালির প্রলেপ লাগলো সেটা আর স্পষ্ট করে দেখতে হলো না তাকে। অজয়ের মুখ গাঢ় থেকে গাঢ়তর কালো হয়ে মিশে রইলো রাতের কালোয়।

যে কথা কণিকা লুকিয়ে রেখেছে পাঁজরের তলায়—দীর্ঘ দশ বছর। অন্তরের সংঘাতে নিজে গুঁড়িয়ে গেছে, তবু মুখে এতটুকু রেখা ফুটতে দেয় নি কোন মতে।

আপনার দীনতার লজ্জায় অজয়ের সংসারে অনলস পরিশ্রম করেও যার অপরাধী মন কোন দিন এতটুকু স্বস্তি বা তৃপ্তি পায় নি—আজ সেই কথাই বলবে কণিকা।

অকপটে স্বীকার করে সমস্ত অন্তর্দ্বন্দ্বের শেষ করবে। তারপর এখানে থেকে চলে যাবে সে। সামাজিকতা আর দেশাচারের জের টানতে গিয়ে তার লতার প্রথম ফুলটি ধুলোয় ঝরে পড়ে গেছে, সেই পথের ধুলোতেই নেমে যাবে সে।

যেমন করেই হোক, ধুলো মুছে বুকে তুলে নেবে জীবনের সেই প্রথম পাওয়া ধনটিকে।

নিজের এই প্রতিষ্ঠার মধ্যে যে ওকে ধিক্কার দিচ্ছে অহর্নিশি তাকে বঞ্চিত করে নিজের এই অন্যায় সম্মান আর সহ্য হয় না কণিকার। এবার সে নিজেকে নামিয়ে তাকে তার প্রাপ্য সম্মান দেবেই।

অনেক—অনেক খেসারত সে জুগিয়েছে। রীতিমত মোটা অঙ্কের একটা মাসোহারা বরাদ্দ করেও সুতো বাঁধা পুতুলের মত নেচেছে নার্স নীরজার তর্জনীর ইঙ্গিতে।

চুরি? তা চুরিরই নামান্তর বই কি? অজয়কে না জানিয়ে অজয়ের রোজগারের টাকাগুলো মুঠো করে তুলে দিয়েছে অন্যের হাতে।

শুধু কি তাই? নিজের পাপকে চাপা দিতে কাঁড়ি কাঁড়ি ঘুস দিয়েছে সুবিধাবাদীদের। দেবতার মত স্বামীকে প্রতি পদক্ষেপে প্রতারণা করেছে দিনের পর দিন। তাই তো সে আজ নিজেকে সরিয়ে নিতে চায়। অশোক আর অলককে বিনাসর্ত্তে অজয়কে দিয়ে যেতে চায়। ওর জীবনের সাথে আর ওদের জড়িয়ে লাভই বা কি হবে? কে জানে বড়ো হয়ে ওরাই হয়তো কত নিষ্ঠুর রায় দেবে কণিকার অপরাধ বিচারে।

তাই সময় থাকতে সরে যেতে চায় কণিকা ওদের ছুনিয়া থেকে। তাছাড়া অজয়ের মত বাপ আছে ওদের, ওরা তো অসহায় নয়। কণিকাকে বাদ দিয়েও ওরা বাঁচবে। কিন্তু কণিকা যেখানে যেতে চায় সেখানে কণিকা ভিন্ন আর কেউ নেই।

নিজে পর্য্যাপ্ত সুখের মধ্যে থেকে কেমন করে সেই অসহায়কে ভুলে যাবে কণিকা। না না সে অসম্ভব। নিজের মনের সঙ্গে অহোরাত্র যুদ্ধ করে বড় ক্লান্ত সে।

তবু হয়তো এই ক্লান্ত তিক্ত জীবনের বোঝা টেনেই ওর দিন কাটতো। এই লুকোচুরির যাতায়াত—সমস্ত দিন রোদে রোদে ঘুরে একবারটি চোখের দেখা, এইতেই হয়তো সন্তুষ্ট থাকতো কণিকা।

কিন্তু যে নার্স নীরজার পায়ে ধরে একদিন আত্মজাকে হত্যার নিষ্ঠুর ষড়যন্ত্রের হাত থেকে বাঁচিয়েছিল কণিকা, মানুষ করার সমস্ত ব্যয়ভার নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে শুধু একটু আশ্রয়ের বিনিময়ে যার শত রকমের মনস্তুষ্টি সাধন করে এসেছে এত দিন—সেই নীরজাই হঠাৎ একদিন একটা মৌখিক সম্মতি পর্য্যন্ত না নিয়ে তার বোন বিরজাকে দান করে ফেললে কণিকার টুলিকে।

তারপর বোধ হয় গা-ঢাকা দেবার উদ্দেশ্যেই দেশে চলে গেলো রাত্রের গাড়ীতে।
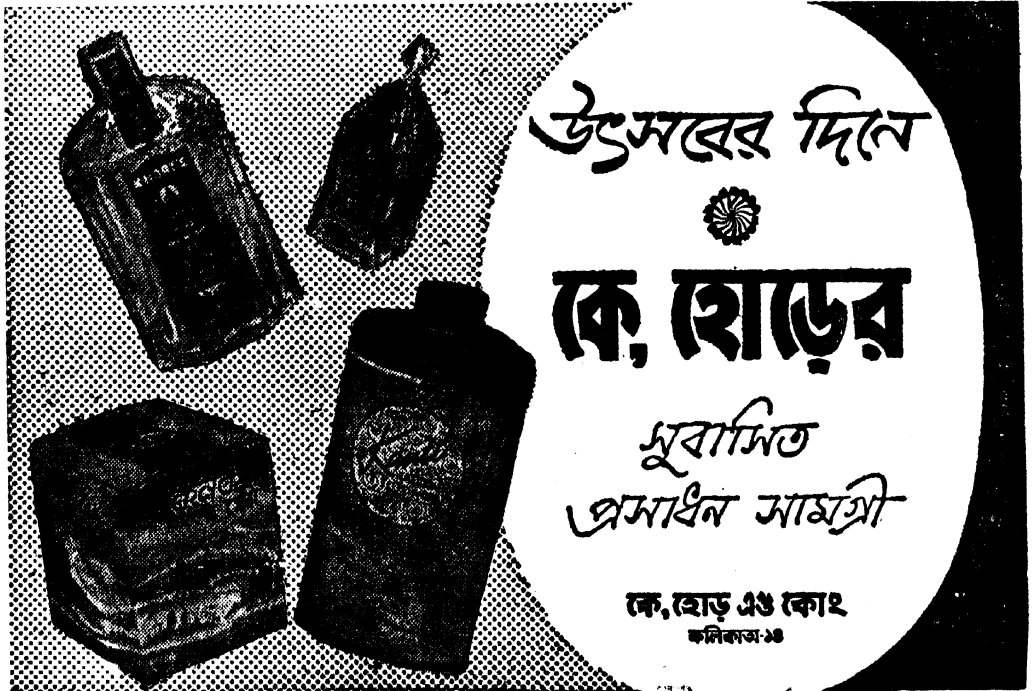
তার পরদিন ছুপুরে টুলির সখের লাল ফিতে আর ছু'-একটা পড়ার বই নিয়ে বহুদিনের গতানুগতিকে কণিকা যখন টালিগঞ্জের সেই নির্দিষ্ট ঘরটায় পৌঁছালো তখন শূন্য ঘরটা যেন হা-হা করে হেসে উঠলো পৈশাচিক বিদ্রূপে।

তারপর? নিরুপায় কণিকা মুখচেনা অচেনা প্রতিজনকে জিজ্ঞাসা করে—এই ঘরের বাসিন্দারা গেলো কোথায়?

কিছুতে সন্ধান মেলে না। অবশেষে দিন পনের ঘোরাঘুরির পর ওই বাড়ীরই অন্যতম বাসিন্দা বুড়ো ছুতোর মিস্ত্রি আহমেদের একটু দয়া হোল বোধ হয়। বলা বাহুল্য, কণিকার আর টুলির সত্যিকার সম্বন্ধটা সে জানতো না। তাই পান-বিড়ি রঞ্জিত বত্রিশপাটি দাঁত বার করে অতি সহজেই বললে—তুমি নীরজারে খুঁজতেছ দিদিঠাকরুণ? সে চলে গিয়েছে। ওই যে সোন্দর পানা মেয়েডারে লিয়ে থাকতো এতদিনে শোনলাম সেডা ওর লিজের মেয়ে লয়। ওর বোন বিরজা—দর্জিপাড়ায় কোন বস্তিতে থাকে—সেডা নচ্ছার বদমাইস একেবারে তারেই দিয়ে দিছে পুষ্যিডারে। তা লিবে না ক্যান? দিব্যি ডাগর পানা মাইয়া আর ছু'তিন সালে রোজগার করবে। ছুধের আশায় বকনার মত পেলছে। আর কি? হাঃ হাঃ নীরজা ইদিকে বুঁচকী বেঁধে সোজা শিয়ালদা। কয় আর থাকুম না। তুমি নিত্যি নিত্যি ঘোরাঘুরি করতে লেগেছ তাই কইলাম। বলি টাকা কড়ি কিছু আছে না কি পাওনা?

মাথা নেড়ে কোন মতে একটা না জানিয়েই আবার ছুটলো

কণিকা। দর্জিপাড়ার বস্তিতে অলি গলি হাতড়ে ফিরলো আরও দিন তিনেক। তবু শেষ পর্য্যন্ত খুঁজে বার করলো টুলিকে। রাস্তার কল থেকে জল আনতে এসেছিল টুলি। বালতিটা ফেলে দৌড়ে এলো কণিকাকে দেখে। ওর বুকের মধ্যে মুখটাকে লুকিয়ে ফোঁপাতে লাগলো শুধু। এগারো বছরের টুলি জীবনের বিভিন্ন পরিবেশে মুখ ফুটে বেদনা জানাতেও ভুলে গেছে।

খানিক পরে বেরিয়ে এলো একদল মেয়েমানুষ। তাদের আগে আগেই ছিল বিরজা। তাকে কণিকা আগে কখনও না দেখলেও বুঝে নিতে দেরী হয় না তার। কারণ নীরজার রোগাকাঠ চেহারার সাথে কোথায় যেন মিল আছে ওর বিশাল চেহারার।

মোটা শরীরে আর তায় চেয়েও মোটা গলায় কি বিশ্রী ধরণে কথা বললো সে—রাস্তায় দাঁড়িয়ে অত সোহাগ করতে লেগেছ কে গা তুমি? বলি চাও কি? তুকতাক কিছু জানা আছে না কি? তাই বশ করছো মেয়েটাকে?—কি বললে তোমার মেয়ে? তা আমরা বুঝি তোমার বাড়ী থেকে চুরি করে এনেছি? অন্য লোকের কাছে জমা ছিল? এ কি তোমার ক্যাশব্যাঙ্ক নাকি? সরে পড়ো—সরে পড়ো। ভালো কথায় বলছি পথ দেখো। এখানে সুবিধে হবে নি বুঝলে? ভালোয় ভালোয়—কি বললি আইন? মানে পুলিশ? তবে যা তাদের কাছেই যা। বুঝিয়ে বলগে যা ও তোর কি রকমের মেয়ে।

আরও অনেক কিছু বলেছিল—ভাষাগুলো সঠিক মনে নেই। ভাবতে গেলে শুধু দুটো রক্তচক্ষু আগুনের গোলার মত চোখ রাঙায় কণিকাকে।

টুলিকে ওরা হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গিয়েছিল।

নিরুপায় কণিকা ঝাঁপিয়ে পড়ে অজয়ের কোলের ওপর। এতদিনের সমস্ত লুকোচুরির কারাগার ভেঙে ভয়ের পাঁচিল টপকে লজ্জার বেড়া ডিঙিয়ে সম্পূর্ণ সমর্পণ করলো কণিকা। নিজের ওপর সমস্ত বিশ্বাস আজ ওর ধুলোয় মিশে গেছে। অভাগা সন্তানের ভবিষ্যৎ চিন্তায় সে আজ দিশাহারা।

কোন দিন যে মুখ ফুটে নিজের কোন ন্যায্য পাওনা চেয়ে নেয় নি। সে আজ একান্ত অসঙ্গত দাবী নিয়ে এসেছে অজয়ের কাছে।

তুমি ওকে উদ্ধার করে দাও। আমরা দু'জনে চলে যাবো তোমাদের কাছ থেকে। আর কোন দিন আসবো না। কিছু চাইবো না। ওগো যত অন্যায় সে তো আমার। তার তো কোন অপরাধ নেই। নির্দোষ একটা শিশুকে দয়া করো তুমি! সত্যি বলছি তুমি যদি ওকে না এনে দাও তবে আমি পাগল হোয়ে যাবো। অজয় শুধু নীরবে শোনে। রাতের আকাশ থেকে টুপটুপ করে দু'-একটি তারা খসে কৃষ্ণপক্ষের ক্ষীণবাঁকা চাঁদটা ডুবে যায় এক সময়। শুধু একা-একা নিশ্চল হোয়ে জ্বলতে থাকে শুকতারাটা। অজয়ের মনে হয় কালো রাত বড় দীর্ঘ। আকাশের গায়ে আলোর সাড়া আর কোন দিনই জাগবে না।

কণিকা নিজের ভাবনাতেই বিভোর। সে আর আজ খোঁজও রাখে না অজয়ের অন্তরে কি অশান্ত সমুদ্র পাড় ভেঙে গর্জন তুলে ছুটে আসছে। না পাষাণ-কঠিন প্রাণ অটল পর্বতের মত অসাড় হোয়ে গেলো একেবারে!

অজয়ের কালো রংয়ের মরিস গাড়ীটা যখন পুলিশ হেড কোয়ার্টারে পৌঁছালো তখন পাঁচটা বেজে গেছে। ইচ্ছা করেই অফিস আওয়ার্সের পর দেখা করার সময় ধার্য্য করেছিলো অজয়।

সাধারণ কেরাণীকুল বিদায় নিয়েছে। থানার সেই সরগরম ভাবটা আর নেই। প্রয়োজনীয় পাহারা আর পদস্থ অফিসারেরাই আছেন তাঁদের নির্দিষ্ট এলাকায়।

সি, আই, ডি ডিপার্টমেন্টের একজন চৌকিদারের মারফত নিজের নামলেখা কার্ডটা দেখাতে সহজেই অনুমতি মিললো ভিতরে যাবার। তারপর সেই চৌকিদারটির অনুগমন করে ওরা এসে পৌঁছালো তদন্তের ভারপ্রাপ্ত অফিসারটির কাছে।

ভদ্রলোক টেবিলের ধারে বসে একটা ফাইলের পাতা উল্টিয়ে যাচ্ছিলেন। ওদের দেখে বললেন—নমস্কার, বসুন। সুমুখের দুটো চেয়ারের পানে হাত বাড়িয়ে ইঙ্গিত করলেন তিনি।

প্রতি নমস্কার জানিয়ে বসলো অজয়। তারপর পিছন ফিরে কণিকার উদ্দেশ্যে বললে—বসো কণিকা!

বসলো কণিকা। সে যেন জড় চেতন নিষ্প্রাণ পুতুল। পরম নির্ভয়ে অজয়ের অনুগমন ছাড়া আর কিছু করার ক্ষমতা নেই তার। নিজের সমস্ত সত্তা সে হারিয়ে ফেলেছে।

সি, আই, ডি, ভদ্রলোক ওদের দুজনকেই দেখে নিলেন—ভাল করে। তার পর ধীরে-সুস্থে প্রশ্ন করলেন—আমি আপনাদের জন্যে কি করতে পারি বলুন?

অজয় আর কণিকার কাছ থেকে কোন উত্তর নেই। কি ভাবে সুরু করবে স্থির করতে পারছে না ওরা।

ভদ্রলোক বোধ হয় ওদের অবস্থাটা উপলব্ধি করেন, আশ্বাসের সুরে বলেন—নিশ্চয়ই কোন বিপদে পড়েই সাহায্যের জন্য আপনারা এখানে এসেছেন? বলুন, কি হয়েছে? কোন সংকোচ করবেন না। তাতে বিপদ আরও বাড়বার সম্ভাবনাই বেশী।

তবুও কণিকা মুখ খোলে না। বাধ্য হয়ে অজয়কেই গৌরচন্দ্রিকা সুরু করতে হয়। আবেদনের সুরে সে বলে—একটি মেয়েকে উদ্ধার করতে চাই আমরা। তারই সাহায্য চাইতে এসেছি।

পুলিশ ভদ্রলোক চোখ দুটোকে স্থির করে মেলে ধরেন অজয়ের মুখের উপর। তারপর প্রশ্ন করেন—তা মেয়েটি কার? আপনার?

—অত্যন্ত স্বাভাবিক প্রশ্ন। তবু অজয়ের কান দুটোয় কে যেন আবীর মাখিয়ে দেয়। কণিকার মাথাটাও ঝুলে আসে প্রায় বুকের কাছে।

অজয় নিজেকে সপ্রতিভ করার চেষ্টা করে। অল্প হেসে বলে—হ্যাঁ একরকম তাই। মানে মেয়েটি আমার স্ত্রীর।

শ্লেষ্মা-বিজড়িত গলাটা একটু পরিষ্কার করে নিয়ে একটু নড়ে-চড়ে বসেন ভদ্রলোক। তারপর প্রশ্ন করেন—উত্তরটা কিছু গোলমেলে বলে বোধ হচ্ছে ডাঃ মজুমদার! কর্তব্যের খাতিরে জিজ্ঞাসা করছি অপরাধ নেবেন না আশা করি। একথায় মানে কি? আপনার স্ত্রীর মেয়ে? আপনার নয়?

অজয় ডাক্তার। তার অভ্যেস আছে রকমারি গুরুতর পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়া। তবে তফাৎ এই যে, সে সব ক্ষেত্রে সমস্যাটা থাকে প্রাণ নিয়ে আর এ ক্ষেত্রে সমস্যা মান নিয়ে। সমস্ত অন্তর দিয়ে অনুভব করে অজয়, মান জিনিষটা প্রাণের চেয়ে কম দামী নয়।

তবু যথাসম্ভব সহজ হবার চেষ্টা করে অজয়। একটু থেমে সে বলে—ব্যাপারটা সহজ নয়।, বেশ কিছুটা গোলমেলেই। কিন্তু লুকোতে গেলে আরও গোলমাল হবার সম্ভাবনা, তাই যা সত্যি, তাই বলার চেষ্টা করেছি।

তদন্ত-অফিসারের গোঁফজোড়াটা এবার যেন নড়ে উঠলো। তার কারণ বার দুয়েক হাঁ করে তিনি মুখ বন্ধ করলেন। তারপর মাথার টাকটা ঠিক জায়গায় আছে কি না দেখে নিয়ে তিনি কোন মুখরোচক খাদ্য টুকে টুকে খাওয়ার মত প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে ব্যাপারটাকে ভাল করে জেনে নিলেন।

অজয়ও যথাসাধ্য উত্তর দিয়ে তাঁকে তত্ত্ব পরিবেশন করার চেষ্টা করলো কিন্তু তাঁর ক্ষুধা মেটাতে পারলো না। মোটামুটি খবর জানা হোয়ে গেলে তিনি অজয়কে পড়ে-ফেলা খবরের কাগজের মত দূরে সরিয়ে দিলেন। তারপর ড্রয়ার থেকে একটা জাবদা খাতা বার করে কলমটা বাগিয়ে ধরে চেয়ারটাকে একটু টেনে নিয়ে কণিকার মুখোমুখি হোয়ে বসলেন—না না, লজ্জা সংকোচ করলে চলবে না মিসেস মজুমদার! ডাক্তারের কাছে রোগের ইতিহাস লুকোনোও যেমন অপরাধ, আমাদের কাছে সত্য গোপন করাও ঠিক তেমনি অন্যায়।

কণিকা অত্যন্ত বিব্রত বোধ করে। নিরুপায় দৃষ্টিতে একবার অজয়ের পানে তাকায়। কতকটা বাধ্য হোয়ে থানায় এলেও ঠিক পুলিশী জেরার জন্য সে নিজেকে প্রস্তুত করতে পারে নি।

ওর অবস্থা দেখে অজয় ওকে সাহস দেয়—মনে ভরসা আনো। তোমার কাছ থেকে না শোনা পর্য্যন্ত কোন কাজই এগোবে না। যা সত্যি তাই বলবে। তুমি তো বুঝতেই পারছো দ্বিধা-সংকোচ করলে চলবে না।

তবু কণিকা মাথা নীচু করে বসে থাকে নীরবে। কিন্তু ঐটুকু মনোবিকার বা চক্ষুলজ্জাকে প্রশ্রয় দিতে গেলে পুলিশ হওয়া চলে না। কাজেই ভদ্রলোক আর চুপ করে থাকতে পারেন না। প্রশ্ন সুরু হোয়ে যায়। তার সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকে উত্তরের নোট নেওয়া।

আপনি তাহ'লে আপনার মেয়েকে দেখতে প্রায়ই যেতেন।

কণিকা মুখ তোলে। বোধ হয় মেয়ের কথা মনে করে একটু সাহস আনবারও চেষ্টা করে। মৃদু হলেও স্পষ্ট উত্তর দেয় সে।

হ্যাঁ, সপ্তাহে দু'-তিনবার আমি আমার মেয়েকে দেখতে টালিগঞ্জে যেতাম।

কখনও অন্যথা হোত না কি?

কোন কারণে আটকে পড়বার সম্ভাবনা থাকলে আগাম টাকা দিয়ে বলে-কয়ে আসতাম। দৈবাৎ আটকে পড়লে অন্তত একটা চিঠি দিয়েও জানাতাম আমার আটকে পড়ার কারণ।

ওরা কখনও আপনার বাড়ীতে চিঠি দিতো না?

না। আমার নিষেধ ছিল।

তাহলে আপনার মেয়ে আপনাকে চেনে? জেরার তপ্ত কড়াই জুড়োবার সুযোগ দিতে রাজী নন তদন্ত-অফিসার।

হ্যাঁ। সে আমাকে মা বলেই ডাকে। কণিকার স্পষ্ট উত্তরে অজয় পর্য্যন্ত বিস্মিত হয়।

যে সময় আপনার মেয়ে হয়, অনুমান কত বয়স ছিল আপনার?

উনিশ বছর।

আপনার এই মেয়ে হবার কথা ক'জন জানে?

আমার বাবা আর মা। অন্য সমস্ত আত্মীয়কে জানানো হয়েছিল, আমি আমার বড় মাসীমার বাড়ী পূর্ণিয়াতে বেড়াতে গিয়েছি। লোক জানাজানির ভয়ে, এই সময়ের মধ্যে আমার দিদিদের পর্য্যন্ত আনা হয়নি শ্বশুরবাড়ী থেকে।

কিছুকাল সব চুপচাপ।

তারপর আবার সুরু করেন ভদ্রলোক—মিসেস মজুমদার, আমি আপনাকে আরও একটি অপ্রিয় প্রশ্ন করতে বাধ্য হচ্ছি। হয়তো আপনিও বুঝতে পারছেন আমার প্রশ্নটা কি হতে পারে। জিজ্ঞাসা করতে আমারও সংকোচ আসছে। কিন্তু কি করবো?

আমাদের কর্ত্তব্য বড় কঠিন। সেখানে লজ্জা-সংকোচ-ভয় কিছুরই স্থান নেই। কিছু মনে করবেন না মিসেস মজুমদার, মেয়েটির বাবার নামটা আমাদের জানতে হবে। তাঁর একটা স্বীকারোক্তি পেলে কাজের বিশেষ সুবিধা হোত। মেয়েটি যে যথার্থ আপনার, পুলিশের কাছে সেটাও তো প্রমাণ-সাপেক্ষ।

প্রশ্ন শুনে স্তব্ধ হোয়ে বসে থাকে কণিকা। আবছায়া সন্ধ্যালোকে ওর মুখ দেখা যায় না।

অজয় ছটফট করে ওঠে। চেয়ার ছেড়ে উঠে সে সারা ঘরময় পায়চারী করে বেড়ায়। যে কথা স্পষ্ট করে জিজ্ঞাসা করতে তার নিজের ভদ্রতায় বেধেছে—বার বার মুখে এলেও যে কথা সে উচ্চারণ করতে পারেনি মুখ ফুটে একজন বাইরের ভদ্রলোকের সামনে, সেই প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছে কণিকাকে,—ভাবতেই উত্তেজনা বোধ করে সে।

তবুও অত্যন্ত স্থিরবুদ্ধি সে। বুঝে নিয়েছে কণিকার জেরার ব্যাপারে তার হস্তক্ষেপ করা চলবে না। পুলিশ এক্ষেত্রে তাকে স্বামীর মর্য্যাদা দেবে না হয়তো। সুতরাং সে নিজেকে সংবরণ করে রাখে। আরও দু'-চার বার পায়চারী করে এসে কণিকার চেয়ারের পিছনে দাঁড়ায়, বলে—টুনির কথা মনে করে নিজেকে শক্ত করো কণিকা! এতদিন পরে যদি তাকে স্বীকারই করলে তবে আর লুকোচুরির আশ্রয় নিয়ো না।

ধীরে ধীরে মুখ তোলে কণিকা।

মূর্চ্ছিতও হয় না, কেঁদেও ওঠে না আর। গভীর সমুদ্রের স্থির জলের মত স্থির হয়েছে ওর অন্তরের তুফান।

গম্ভীর গলায় সে বলে—মেয়েটির বাবার নাম শৈবাল সোম, সম্পর্কে তিনি আমার ছোট মেসোমশায় হন।

অজয় চমকে ওঠে। নিজের অজ্ঞাতেই প্রশ্ন করে ফেলে—কৈ, তাকে তো কখনও দেখি নি তোমাদের বাড়ীতে?

সম্মোহিত মানুষের মত ভাবলেশহীন কণ্ঠে কণিকা বলে যায়।—না। তুমি তাকে দেখবার সুযোগ পাও নি। কিন্তু এক সময় তিনি রোজই আসতেন আমাদের বাড়ীতে। আমার মা তাকে বড় ভালবাসতেন। মা-মরা ছোট বোনকে মানুষ করেছিলেন আমার মা। আমার ছোট মাসীমা তাঁর বিয়ের পরও বেশীর ভাগই আমাদের বাড়ীতে থাকতেন।

ছোট মেসোমশায় তখন ল' কলেজের পড়া শেষ করে বিলেত যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন।

একদিন দুপুরবেলায় তিনি হঠাৎ এলেন আমাদের বাড়ীতে, কিন্তু তখন কেউ ছিল না। ছোট মাসীমার জেদে পড়ে মা গিয়েছিলেন সিনেমায়। সামনে পরীক্ষা বলে আমি বাড়ীতে একা ছিলাম।

একটু চুপ করে থেকে আবার সুরু করে কণিকা—এ ঘটনা যখন প্রকাশ পেলো তখন তিন চার মাস কেটে গেছে। মা আর বাবার ভয়ে আর লজ্জায় কাটলো আরও দু'মাস! মা-বাবার ইচ্ছা ছিল এই অবাঞ্ছিত মাতৃত্বের দায় থেকে আমায় মুক্তি দিতে। কিন্তু অনেক দেরী হয়ে যাওয়ায় কোন ডাক্তারই রাজী হলেন না সে রকম ঝুঁকি নিতে। বাধ্য হোয়েই আমায় ওঁরা একটা নার্সিং হোমে রেখে দিলেন চার পাঁচ মাস।

একদিন সকাল বেলায় আমি স্বাভাবিক ভাবেই সুস্থ হলাম। তখনও কিন্তু ঘুণাক্ষরেও জানতে পারিনি আমার অভিভাবকরা আমার জন্যে আরও কত নিষ্ঠুর শাস্তি তৈরী করে রেখেছেন! বিকেলের দিকে আমি আমার সন্তানকে দেখতে চাইলাম, নার্স বললো—সে মারা গেছে।

মোটেই বিশ্বাস করতে পারিনি সে কথা। বললাম, হতেই পারে না, তার সুস্থ সবল কান্না আমি শুনেছি।

নার্স বললো—ঠিক মারা যায়নি এখনও। তবে যাতে যায় তার ব্যবস্থা হয়েছে। গলা টিপে বা অন্য কোন স্থূল প্রয়াসে মারলে পুলিশ হাঙ্গামার ভয় আছে। তাই তাকে স্লো-পয়জনে মারার ব্যবস্থা করা হয়েছে ডাক্তারের সহযোগিতায়। আমি কি আর না জানি সে কথা? তবে আর মায়া বাড়িয়ে লাভ কি?

আমি উঠে নার্সের পা দুটো জড়িয়ে ধরলাম। শত-সহস্র মিনতি করে ভিক্ষা চাইতে লাগলাম আমার সন্তানের জীবন। প্রথমে সে কিছুতেই রাজী নয়। তারপর যখন সে বুঝলো—চুপ করে আমি থাকবো না—আমার সন্তানকে বাঁচানোর জন্যে যতদূর যেতে হয় আমি যেতে প্রস্তুত। অথচ সে আমাকে বলে ফেলেছে সমস্ত কথা। তখন নিজের বিপদের কথা ভেবেই সে রাজী হোল।

সর্ত হোল খরচ সমস্ত আমার। সে শুধু পালন করবে। তাইতেই সেদিন তাঁকে কি করুণাময়ী বলেই যে মনে হয়েছিল!

সেই রাত্রেই একজন মেথরাণীর হাতে আমার গলার সোনার হারটা খুলে দিয়ে তারই সহায়তায় বাচ্চাটাকে পাঠালাম ঐ নার্স

নীরজার বাড়ী। নীরজাই ডাক্তার আর আমার অভিভাবককে জানালো বাচ্চাটা মারা গেছে। বলা বাহুল্য, সনাক্তের জন্ত কেউ আসেনি।

তারপর? তারপর একদিন আমি বাড়ী ফিরে এলাম। গত কিছুদিন থেকে—মানে ঐ বাচ্চাটা পেটে আসার পর থেকে আমার মা অত্যন্ত নির্দয় নীরস ব্যবহার করতেন আমার সঙ্গে। অহোরাত্র মৃত্যু কামনা করতেন আমার। কিন্তু তাঁদের অবস্থার কথা মনে করে আমার একদিনও রাগ হয়নি তাতে।

বাড়ী ফিরে আসার আর যদিও আমার মা খানিকটা সদয় ব্যবহার করতেন আমার সঙ্গে, তবুও আমার আর বাড়ীর কোন কিছুই ভাল লাগতো না। যাঁরা আমার সন্তানের প্রতি এত কঠিন হতে পারেন তাঁদের আমি আর কিছুতেই ভালবাসতে পারতাম না।

কলেজের বই কলম মায় হাতঘড়িটি পর্য্যন্ত বেচে টুলির খরচ দিলাম। মাকে লুকিয়ে কলেজ যাবার নাম করে গানের টিউশনী নিলাম ছটো।—সপ্তাহে চার দিন। বাকী সময় যেতাম টুলির কাছে।

অজয় প্রশ্ন করে—তোমার এই বাচ্ছা হবার কথা—তোমার ছোট মাসীমা বা ছোট মেসোমশায় জানতেন না?

একটু নীরব থেকে কণিকা বলে—বাচ্ছা ভূমিষ্ঠ হবার কথা জানতেন কি না বলতে পারি না, তবে সম্ভাবনার কথা আমার মা নিজে ছোট মাসীমাকে জানিয়েছিলেন। ছোট মাসীমা তাতে ভীষণ রেগে যান তারপর থেকে আর কোন দিন তিনি আসেন নি আমাদের বাড়ীতে—তাঁর স্বামীও নয়। তিনি অবশ্য তখন বিলেতে ব্যারিষ্টারী পড়বার জন্ত—

মাপ করবেন মিসেস মজুমদার, ব্যারিষ্টার শৈবাল সোম? মানে এখন যিনি হাইকোর্টে প্র্যাকটিশ করছেন?

হ্যাঁ, তিনিই। যেটুকু জানি এখন তাঁর খুব প্র্যাকটিশ। উত্তরে ভদ্রলোক শুধু টাকে হাত বুলোতে থাকেন, প্রায় স্বগতই বলেন—তাইতো! তাইতো! কেসটা সোম সাহেবের সাথে জড়িয়ে গেছে দেখছি।

অজয় এ লাইনের লোক নয়। সোম সাহেবকে সে চেনে না। তবু সি-আই-ডি অফিসারের চিন্তার পরিমাণ দেখে সে তাঁর খাতিরের কিছুটা অনুমান করতে পারে। পুলিশের চোখে কেসটার গুরুত্বই যেন বেড়ে যাচ্ছে সোম সাহেবের নামটা টেনে এনে।

একটু ভেবে নিয়ে অজয় বলে—মনে হচ্ছে আপনি চেনেন ব্যারিষ্টার সোমকে। তা চলুন না একবার আমাদের সঙ্গে। চেষ্টা করে দেখি একটা স্বীকারোক্তি পাওয়া যায় কি না?

প্রকাণ্ড একটা জিভ কাটলেন তদন্ত-অফিসার। ব্যস্তভাবে বললেন—আপনি কি পাগল হলেন মশায়? পুলিশ সঙ্গে করে যাবেন ব্যারিষ্টার সোমের কাছে? তাহলে তাঁর পক্ষে কখনও স্বীকারোক্তি দেওয়া সম্ভব? কত বড় একটা নামডাক? ধুলোয় মিলিয়ে দিতে এ বদনাম মাথায় তুলে নেবে এমন অর্বাচীন কে আছে? নেহাৎই যদি যেতে চান তবে নিজেরা প্রাইভেটলী দেখা করুন গিয়ে। মনুষ্যত্বের দোহাই দিয়ে যদি কাজ হয়। তবে আমার তো মনে হয় না। কবেকার যৌবনের একটা ঘটনা—যার কোন প্রমাণ নেই। না না অসম্ভব! একেবারেই কোন আশা নেই।

অজয় আর কথা বাড়ায় না। মামুলি দু'-একটা কথাবার্ত্তা বিনিময়ের পর বিদায় নেয় সেদিনের মত।

ভদ্রলোক দরজা পর্য্যন্ত এগিয়ে দেন। আশ্বাস দেন তাঁর যথাসাধ্য চেষ্টার ক্রটি হবে না। তবে ভরসা বিশেষ দেন না।

বহু দিনের ব্যাপার। বুঝলেন না? সাক্ষী-টাক্ষীরও সেরকম জুত নেই! ইঙ্গিতে আরও বলেন—যদিও আশা না করাই উচিত তবুও সোম সাহেবের একটা ষ্টেটমেণ্ট পেলে কেসটার চেহারাই আলাদা হয়ে যেতো। আদালতে ওঁর মুখের একটা কথারই অনেক দাম। কি আর করা যায়। তার দিকটাও তো ভেবে দেখতে হবে একবার!

বাড়ী ফিরে যে দু'-একজন রুগী নিচের চেম্বারে অপেক্ষা করছিল তাদের প্রয়োজন মিটিয়ে বিদায় দিলো অজয়! কম্পাউণ্ডারকে ছুটি দিলো সেদিনের মত। রামশরণ বেয়ারাকে নির্দ্দেশ দিলো তাকে যেন কেউ বিরক্ত না করে—সে দিকে দৃষ্টি রাখবার। তার পর আলোটা নিবিয়ে নিচের চেম্বারেই একটা ইজিচেয়ারে গা মেলে দিয়ে ভাবতে লাগলো তার আপাত কর্ত্তব্যের কথা।

সোম সাহেবের মত মস্ত মানী লোক না হলেও আত্মসম্মান বলে একটা জিনিস অজয়েরও আছে। উপযাচক হয়ে পুলিশের কাছে গিয়ে নিজের স্ত্রীর বিগত জীবনের কলঙ্ক প্রকাশ করেছে সে। এবার তাকে কোমর বেঁধেই নামতে হবে আসরে। অত্যন্ত নিজের আত্মীয়-স্বজনের চোখকান বাঁচিয়ে কতখানি সন্তর্পণে কাজ করতে হবে তাও একটা গবেষণার বিষয়। তা না হলে কাজ কিছু বা নাই হোক, ঢাকের বাদ্যিতেই আসর মাৎ হয়ে যাবে একেবারে।

সমস্ত বিবেক-বুদ্ধি নিয়ে অজয় ভাবনার সাগরে ডুব দেয়, সেখানে অকূল-পাথার—অন্ত নাই, অন্ত নাই!!

[ক্রমশঃ।

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

স্নুলেখা দাশগুপ্তা

ফিরে এলেন যতীন বাবু।
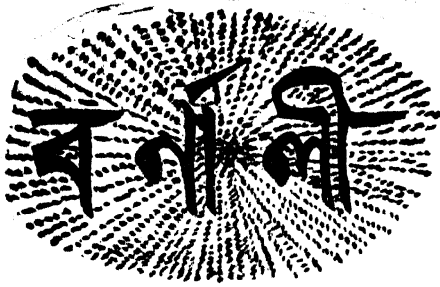
তার ট্যাক্সি থামার এবং উপরে উঠে আসবার শব্দে সেই প্রথম বাড়ীটার স্তব্ধ নিশ্চল মানুষগুলো যার যার জায়গায় একটু নড়ে চড়ে বসলো। পরস্পরের দিকে মুখ চাওয়া-চায়ি করলো।

কিন্তু যে টগবগে তেজী ভাবটা নিয়ে যতীন বাবু ছুটে গিয়েছিলেন, সে ভাবটায় কি কিছু মন্দা পড়েছে? কিছু কমজোর ঠেকছে কি তাঁকে? তাঁর হাঁটা, ঢোকা, বসায় যে খুশী উপচানো ভাবটা প্রকাশ পাবে ওরা ভেবেছিল—কই তা তো প্রকাশ পাচ্ছে না!

গায়ের চাদর, হাতের লাঠি আলনায় রেখে যতীন বাবু হাঁক দিলেন তামাকের জন্ত। তারপর ইজিচেয়ারে বসে খোঁজ করলেন ছোট পিসীর।

পিসীমা নির্বোধ নন। পিসী-ভাইঝির ঘটনার কিছুমাত্র উল্লেখ করলেন না। একটু দরকার ছিল তাই চলে গেছে—জানিয়ে ব্যস্ততা প্রকাশ করলেন ওখানে কি হলো তা জানবার জন্ত। এবং যতীন বাবুও হঠাৎ সোজা হয়ে বসে তাঁর মন্দা ভাবটায় উপর চাবুক কষলেন যেন—ট্যাক্সি থেকে মাত্র দরজায় নেবে দাঁড়িয়েছি—পড়তো পড় মেয়েটা পড়ে গেল কি না আবার একেবারে আমারই সামনে! দাঁত বের করে হাসতে হাসতে কাঁকে যেন সে বিদায় দিচ্ছে। আর লোকটা গাড়ী থেকে হাত বের করে নাড়ছে। গাড়ীটায় পেছনে লেখা রয়েছে দেখলাম ডাক্তার। উঃ, যত সব—

মৌরীর দুই জালাভরা চোখের সামনে দীর্ঘ সমুন্নত দেহ নিয়ে হাত বাড়িয়ে এসে দাঁড়ালো যে, সে কে? গায়ের সাদা মোটা চাদর তার লুটিয়ে পড়েছে মাটিতে। হাত বাড়িয়ে বলছে—এসো, আমার কাছে এসো। এ ডাক কি সেদিন বিপ্রদাস শুধু লাঞ্ছিত অপমানিত কুমুকে দেয় নি? কুমু কি শুধু উপলক্ষ্য মাত্র? এ ডাক কি নারীর প্রতি কোন মহাপুরুষের আহ্বান?

এই বিরক্ত কণ্ঠ কার? বিয়ে ভেঙ্গে দেওয়া নিয়ে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করছে। বলছে—এমন বিয়ে হচ্ছে না কতো। জয়দেব? তা বলুক। একটুও শ্রদ্ধা বাড়লো না সেজন্ত মৌরীর দাদার প্রতি। নিজে হলে ছোড়দা যা করেছে সেও তাই করতো। বড় বড় কথা এদের মুখের কথা—হৃদয়ের কথা নয়। সেটা ধরা পড়ে যখন বলা ছেড়ে করার মানুষটির ডাক আসে। তখন ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে ব্যর্থ বিদ্যা, ব্যর্থ শিক্ষা ঔদার্য্য দাক্ষিণ্য শূন্য অখণ্ড স্বার্থপরতা ভরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এক একটা মন। এখনও যাদের অন্তরের কথা—চরিত্র জিনিষটা শুধু মেয়েদের জন্ত। সতীত্বের মতো মেয়েদের বড় গুণ নেই। সেবা—তাও আর্ত্তজনে নয়? তাঁর আর তাঁর সংসারের সেবা ছাড়া নারীর অন্ত কিছু করণীয় নেই। তাঁর হাঁ আর নার সঙ্গে মাথা নেড়ে চলা ছাড়া কোন কর্ত্তব্য নেই। রূপ-যৌবনটাই নারীর একমাত্র শক্তি আর সম্বল। যৌন আকর্ষণটাই তার একমাত্র আকর্ষণ। নারীর একমাত্র মূল্য—সে পুরুষের স্পৃহার কতটা ইন্ধন যোগাতে পারবে—তার প্রবৃত্তিকে কতটা বেশী তৃপ্ত করতে পারবে। এই মনোবৃত্তির সঙ্গে বুদ্ধি ও প্রবৃত্তির যেটুকু পার্থক্য ঘটেছে সেটুকু প্রকৃতিগত নয় শুধু মাত্র পরিমাণগত। আজও যদি বৈজ্ঞানিক প্রমাণে সাব্যস্ত হয় মৃত্যুর পর আত্মা কিছুদিন এই পৃথিবীর বটগাছে, শেওড়া গাছে বাস করে তবে, পুরুষের ভাবনার জগতে আবার উঁকি দেবে স্ত্রীটিকে কি করে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া যায়।

ও ঘরের কথা এগিয়ে চলেছে। যতীন বাবু বলছেন—বাবা এখানে নেই। তিনি গেছেন পাকিস্থানে কিছু জমিজমা বিক্রির চেষ্টায়। দেখা হলো ছেলের সঙ্গে। মনে হলো গোপন করার কথাটা ছেলে একেবারেই জানতো না। আমার কথা শুনতে শুনতে কঠিন ভাঁজ জমে উঠতে লাগলো তার কপালে। হঠাৎ উঠে আসছি বলে চলে গেল ভিতরে। ফিরে এলো প্রায় তক্ষুণি। হাত জোড় করে বললো—বাবা-মার কাছে অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনা করছি। এ ছাড়া আর আমার কিছু বলবার নেই। যতীন বাবু গড়গড়ায় একটা টান দিয়ে বললেন—তোরা বার বার জিজ্ঞাসা করছিস কেবল, তুমি কি বললে, ওরা কি বললো। ওরা বলেনি—আমাকেও বলতে দেয়নি। গাড়ীতে বসে কত তৈরী হয়েছিলাম—মুখই খুলতে দিলে না ছেলেটা আমাকে। বলতে যেতেই তেমনি হাত জোড় করল আবার—আর থাক। আপনারও ভালো লাগবে না। আমাদেরও অসম্মানের বোঝা ভারী হবে। আমরা আপনাদের কাছে যারপর-নাই অপরাধী। মার্জনা চাইতেও আমার সঙ্কোচ বোধ হচ্ছে। তবু আশা করি, আপনারা আমাদের অপরাধ মার্জনা করবেন। একটা ছোট ছেলে এসে—যতীন বাবু বোধ হয় এতক্ষণ ভুলে গিয়েছিলেন। এবার পকেট থেকে বের করলেন একটা চৌকো লাল বাক্স। সেটা পিসীমার হাতে দিয়ে বললেন—বাক্সটা এনে আমার সামনের টেবিলে রেখে দিয়ে গেল। বুঝলাম আমাদের আশীর্বাদের গয়না। তুলে পকেটে ভরবো, তাও হাত উঠে না—ফেলে রেখে আসবো তা-ও হয় না—এমন একটা বিশ্রী অবস্থায় পড়লাম। হাতের নলটা গড়গড়ার গায়ে জড়িয়ে রেখে হাত দুটো মাথার উপর তুলে চুপ করে বসে রইলেন যতীন বাবু। তাঁকে দেখে স্পষ্ট বোঝা যেতে লাগলো, একটা অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ তাঁর ভেতর কাজ করছে। সেটা কি? অপরাধীর দুঃখ প্রকাশ ও মার্জনা ভিক্ষার মধ্যেও তিনি নিজেকেই কোথাও দিয়ে ছোট বোধ করে এসেছেন? না করে আসবার পর তাঁর মনে দ্বিধা জেগেছে যেটা করে এলেন সেটা ঠিক হলো কি না? না ভালো কাজ মন্দকাজের আনন্দ-পীড়ন তাদের কাছে ফাঁকি রাখে না বলে? ছোট সোয়ালোও উপবাসী পুত্রের শিয়রে বসে থাকা যায় অবসন্ন হাতে পদ্মরাগ মণি এসে নৃত্য করে। বলে, যদিও আজ নিদারুণ শীত। আমার পালক খসে পড়বার অবস্থা হয়েছে। তবু ভেতরে আমি বেশ গরম বোধ করছি বন্ধু!

যতীন বাবু একটা জোর গলাখাঁকারি দিয়ে যেন অস্বস্তিটাকে ঝেড়ে ফেলে উঠে দাঁড়ালেন। চাদরটা ফের তুলে নিয়ে ফেললেন কাঁধে। লাঠিটা তুলে নিলেন হাতে। রওনা হলেন ছোট বোনের বাড়ীর উদ্দেশ্যে। এসব মানবীয় দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলবার জন্য তাঁর কাছ থেকে একবার ঘুরে আসাই যথেষ্ট। ছোট বোনের চোখের সাধারণের প্রতি অবজ্ঞা ভাবের রশ্মিটাই যতীন বাবুর ভেতরে প্রবেশ করে তাঁর শক্তি যোগায়। সাধারণের সুখ-দুঃখ ব্যথা-বেদনা ছোট পিসীর কাছে একেবারে জলো। তাদের জীবনে ওজনদার কি আছে যে, তাদের সুখ-দুঃখের ব্যথা-বেদনার ওজন ভারী হবে। গাড়ী-বাড়ী-টাকা-জায়গা-পদমর্য্যাদা—আছে কিছু? নেই। তবে সুখ-দুঃখও নেই। সম্মানও না। ছোট বোনের এক-আধ ডোজেই যতীন বাবু চাঙ্গা হয়ে ফিরবেন ঘরে।

পিসীমাও নিরুত্তম বিরস মুখেই ছিলেন এতক্ষণ। ভাই-এর হাত থেকে গয়নার বাক্সটা নিয়েছিলেন নির্লিপ্ত ভাবে। দু-একটা কথা যা বলছিলেন তা-ও বিমর্ষ মুখে। ভাবটা, তোমরা বাপু তোমার ছোট পিসীকেই যদি এমন দাঁতে চিবুতে পারো তবে আমি করি কি! আমায় তো গিলে ফিলবে। পিসীমাও উঠলেন ভাই-এর সঙ্গে বোনের বাড়ী যাবার জন্য। হাঁ, ওখানে গিয়ে তাঁরা দুজনেই নিজেদের ফিরে পাবেন।

তাঁদের বেরিয়ে আসবার পরে মৌরী-অমিতা-মধু তিনজনেই বারান্দার রেলিং ছেড়ে ঘরে এসে ঢুকলো। তাঁরা চলে গেলে অমিতা বললো—আমিও ভাই তোমাদের দাদাকে নিয়ে একটু মা'র ওখান থেকে ঘুরে আসছি। বাচ্চাগুলোকে অমন হঠাৎ করে পাঠিয়ে দিলাম—তাতে যে পাকা মেয়ে ঝিণু, কি বলতে কি বলবে ঠিক আছে কিছু? মা ব্যস্ত হয়ে আছেন। আমরা যাবো আর আসবো। আয়নার কাছে দাঁড়িয়ে যে শাড়ীটি পরা ছিল সেটাই একটু গুছিয়ে পাছিয়ে নিতে নিতে বললো—মৌ, তুমি ভাই মনটা ঠাণ্ডা করে ফেলো। ওরা যখন শান্ত ভাবে নিয়েছে—বুঝেছে কত বড় অন্যায়টা করেছে, তখন আর কি। শাড়ী ঠিক করে চিরুণীটা নিয়ে সামনের রুক্ষ এলো চুলগুলো ফটপট হাতে পেছন দিকে ঠেলে দিতে দিতে বললো—আর ওদের মেয়ের যে রূপ! দেখবে আরো কত ভালো বিয়ে হয়ে যায়। অমন বিয়ে নিয়ে কত বিভ্রাট হয়—হয় কি তাতে। চিরুণীটা রেখে এবার ঘুরে দাঁড়ালো অমিতা—সম্বন্ধ পেলে আর যে দেরী করতে চায় না মানুষ এই জন্য। একটু হেসে বললো—এখন তোমার বিয়েটা ভালোয় ভালোয় হয়ে গেলে রক্ষা পাওয়া যায় ভাই!

—বিয়ে নিয়ে কত গোলমাল হয়, ভেঙ্গে যায়—হয় কি তাতে! তবে আমার বিয়েটা ভালোয় ভালোয় হয়ে যাওয়া নিয়ে এতো চিন্তার কি আছে?

—গোলমাল হয়ে গেলে আর কি করবে মানুষ? কিন্তু অযথা হোক, এ তো কেউ চায় না বা সাধ করে কেউ ভেঙ্গে দেয় না।

—আমারটা হলেও যথার্থ কারণে হবে এবং সাধ করে হবে না।

—সত্যি তুমি বিয়ে ভেঙ্গে দিবে তোমার?

—দিলে সত্যই দিতে হবে। মিথ্যা ভাঁওতা কি কখ আমি জানিনে।

—তোমাকে পাগল ভাববে সবাই।

বসে ছিল, হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে অমিতার হাত ধরে টেনে চেয়ারে বসালো মৌরী তাকে। বললো—দাঁড়াও। আর একটু পরে গেলে কিছু হবে না। কেন আমায় পাগল বলবে, সে কথায় জবাব দিয়ে যাও।

ঘাবড়ে গেল যেন সে। কথার টানে কোথায় নিয়ে ফেলবে তার ঠিক আছে কিছু? তারপর হয়ত কিছুই জবাব থাকবে না তার। বললো—ও বাবা, আমি তোমার কথার জবাব দিতে পারবো না।

—পারবে। আমি তীক্ষ্ণ জবাব, সাহিত্যিক জবাব, রাজনৈতিক রিটোর্ট—কিছুই চাচ্ছিনে। সোজা সরল কথায় তোমার মনের কথা বলো, কেন আমায় পাগল বলবে সবাই?

অমিতা বললো—একটি ভালো পাত্র পাওয়া—তাও আবার, সুদর্শন বাবুর মতো—এ শুধু ভাগ্যের দানে মিলেছে। চেষ্টায় মেলানো সম্ভব ছিল না আমাদের পক্ষে। ছেলেমানুষী খেয়ালে এ বিয়ে হতে না দিলে আমরা কপাল থাবড়াবো মন্দভাগ্য বলে। আর লোকে নিশ্চয়ই বলবে পাগল। তোমার কারণটা অপরের কাছে হাস্যকর অকারণ মনে হবে। সুদর্শন বাবুর সম্বন্ধে তো তুমি কিছু শোননি?

—মমতার সম্বন্ধে তোমরা কিছু শুনেছ? দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁটটাকে এক পাশে চেপে ধরে অমিতার দিকে তাকিয়ে রইল মৌরী।

—আমি বলছি তোর আগের প্রশ্ন থেকে সুরু করে। চেয়ারটা টেনে মঞ্জু এগিয়ে এলো।

—না তুই বলবিনে। তোর কথা আমি শুনতে চাচ্ছিনে তো? আমি চাচ্ছি বৌদির কথা শুনতে।

—আমার কথার অপরাধ?

—তোর কথা কথাই নয়—নয় ত শুধু কথাই। তুই না বলবি নিজের কথা—না বলবি মেয়েদের। শুধু আমার কথার গায়ে তীর বিঁধে বিঁধে তাদের ধরাশায়ী করে যুদ্ধ জয় করবি—এই তোর ইচ্ছে।

—তবে সেটা আমারও ইচ্ছে। আমি চললাম।

অমিতা চলে গেলে মৌরীর ঘরের ভেতর পায়চারী করার দিকে একটু সময় তাকিয়ে থেকে মঞ্জু বললো—যে ভাবে তুই দিদি, ঘরের মধ্যে পাক খাচ্ছিস, আমার মনে হয় তাতে তোর চিন্তার জট খুলছে তো না-ই, আরো বাঁধছে।

থামলো মৌরী। বললো—কাল আমি পুরী যাচ্ছি।

—কখন?

—যখন ট্রেন।

—আমায় ষ্টেশনে তুলে দিয়ে আসলেই হবে, না একেবারে হোটেল ঠিক করে, থেকে ফেরার সময় সঙ্গে করে ফিরতে হবে?

—কিছু করতে হবে না তোর। তুই টেরও পাবিনে।

এবার শিরদাঁড়া টান করলো মঞ্জু। বললো—দেখ দিদি, অমন হঠাৎ আবোল-তাবোল কিছু করে বসবিনে বলছি। তোকে কেউ পাঁজাকোলায় তুলে নিয়ে সাত পাক ঘোরাতে পারবে না। যা করবার এখানে থেকেই করতে পারবি। কলকাতা সহরে তুই অজানা পথ চলতে পারিস না—কাঁপুনি সুরু হয়ে যায়—তুই যাবি একা বাইরে! একা চলেছিস কোন দিন?

—চলিনি। কিন্তু কোন দিন চলতে হলে সেই কোন দিনটা তো একদিন আরম্ভ করতে হবে। সেই আরম্ভের দিনটাই আমার হবে কাল। কলেজ এক্সকার্সনে বহু গেছি। ব্যবস্থা করে নিতে পারবো।

—তুই এই বিয়ে হতে দিবিনে একেবারে স্থির করেই ফেলেছিস?

—হাঁ, স্থির করে ফেলেছি।

—গুরুত্বটা ভেবে দেখেছিস?

এবার একটু কি হাসলো মৌরী? বললো—নেই-ই গুরুত্ব কিছু, তো ভাববো কি।

—কিছু গুরুত্ব নেই?

মাথা নাড়ল মৌরী—না—একেবারেই না। গোড়াতে সেইটে ভাবতে গিয়ে কূল-কিনারা পাচ্ছিলাম না। অন্ধকার ঠেকছিল সব। এখন দেখছি না তো, খুব সহজ। বড় জোর ঘণ্টা আধা ঘণ্টার ব্যাপার। এই তো মিটে গেল একটা। কেউ কি দরিয়ায় ভেসে গেলো? না কারু বাড়ীঘর মাথায় ভেঙ্গে পড়ল? বৌদি বললে, অমন কত হয়—হয় কি তাতে? বাবা বিবেকের ছোট কাঁটাটা তুলে ফেলতে চলে গেছেন বোনের কাছে—এই জোর কদমে ফিরে এলেন বলে। কোথাও যখন কোন গুরুত্ব দেখতে পাচ্ছিনে তখন নিজেরটা বলে বেশী গুরুত্ব দেবো কেন?

রামু দু'কাপ ধোঁয়া-ওঠা চা এনে বসালো ওদের দু'বোনের সামনে। ওরা দেখেছে, অশান্ত দিনে রামু আশ্চর্য্য সেবাপরায়ণ। মৌরী যে চা খায়নি, সে যে কাপটা ঠেলে রেখে উঠে গেছে এ তার লক্ষ্য এড়ায়নি। দু'বোনের স্নেহভরা দৃষ্টি বকশিস নিয়ে হৃষ্টমনে বের হয়ে গেল রামু। মৌরীর এতক্ষণে মনে পড়লো আজ বিকেলে ও চা খায়নি। কাপটা হাতে নিয়ে চুমুক দিল সে। ভারি ভালো লাগলো চা'টা। জানালাটা দিয়ে বাইরের দিকে তাকালো সে। এক-আকাশ তারা জলজল করছে। কোথাও মেঘের চিহ্নটুকু নেই। দক্ষিণা বাতাস পথে নিমগাছটার সাক্ষাৎ পেয়ে আনন্দে তাকে কাঁপিয়ে ঝাঁপিয়ে প্রচুর ফুল ঝরাচ্ছে। কিন্তু ফুল কুড়োনো বেচারার সামর্থ্যের বাইরে। কিন্তু কি সে পারছে না তার জন্য মুখ কালো করছে না। যা পারে তাতেই তার আনন্দ। গন্ধটা নিয়ে এসে খুশীতে ছড়িয়ে পড়েছে ঘরে। চোখ বুজে বড় করে নিঃশ্বাস টানল মৌরী—যেন মধ্যাহ্নের পর এই প্রথম সে বাতাস গ্রহণ করল।

মঞ্জু চা খাচ্ছিল আর না খাবার অবসর কালটা হাতল ধরে কাপটাকে প্লেটের এদিক-ওদিক ঘোরাচ্ছিল। ভাবছিল সে। ওর স্বাচ্ছন্দ্য গতির চিন্তা এতো ঘোরপ্যাঁচেও একটু না জড়িয়ে পরিষ্কার ছিল। কিন্তু কোথায় যেন আটকে গেল মনে হচ্ছে। ঘটনাটা সম্বন্ধে ওর ধারণা ছিল এই—সেদিন যেমন ঐ ঘটনার ভেতর দিয়ে মৌরী সুদর্শনকে অনেক দূর পর্যন্ত দেখে নিয়েছিল সুদর্শনও মৌরীকে তাই নিয়েছিল। ডাক্তার সে। কারণ বুঝলে বিধান জানে নিজের হারানো মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে দিয়েছিল সে বলিষ্ঠ অহমিকায়। যোগ্য ব্যক্তির অহংকারে আকর্ষণ আছে। মানুষকে সে টানে। সেই টানের আবর্তে পড়ে গিয়েছিল মৌরীও। আর যখন মমতার বিয়ে ভেঙ্গে দেবার প্রতিবাদে কিছুতেই হতে পারে না বলে উঠে আসে, তখন ও জানে মৌরীর মনেরও অগোচর ছি

মমতায় মমতার সঙ্গে এক হয়ে জড়িয়ে যেতে পারে ও নিজে। কিন্তু ডাক্তার—ডাক্তার—ডাক্তার এই ডাক্তার শব্দটা গিয়ে চাবুকের মতো আঘাত করে করে মৌরীর মুখ যখন সাদা করে তুলছিল তখনই মধু বুঝছিল—নতুন জটিলতা সৃষ্টি হচ্ছে। তবু ভাবনার কিছু আছে মনে হয়নি। মনে হয়েছে মৌরীর এই উৎক্ষিপ্ত উত্তেজনা কিছু চোখের জল ফেলে আপনিই শান্ত হয়ে যাবে। বিশে আষাঢ়ের বাহ্যিক অনুষ্ঠান বাইরের জন্যই বাকী আছে। হৃদয়ের অনুষ্ঠানে মৌরী তা শেষ করে ফেলেছে। সুদর্শন এখন মৌরীর কাছে শুধু একজন পাত্র নয়, একজন ব্যক্তি নয়, একজন ডাক্তার নয়। কল্পনায় সুদর্শনের বলিষ্ঠ হাত দুটোর ভেতর আনন্দে বহু বার সে মুখ লুকিয়েছে। কাঁদতে হলেও সে এখন মুখ আড়াল করবার জন্য সে দুটো হাতই খুঁজবে। হাত থেকে কাপটা নামিয়ে রেখে মধু মৌরীর দিকে তাকালো—ছোড়দা' আর তোর দুটো বিয়ে কি এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে? দুটো বিয়ে ভাঙা কি সত্যি এক?

—নয় কেন?

—ছোড়দা' আর মমতা—দুজনের সঙ্গে না আছে পরিচয় না দেখেছে একজন আর একজনকে। অভিভাবকদের ঠিক করা বিয়ে—অভিভাবকরাই ভেঙে দিলেন। অসম্মানের প্রশ্ন বাদ দিলে আর কিছু থাকে না আর। তোদের সম্বন্ধটাও যদিও ওদেরই ঠিক করা কিন্তু তোরা দুজন—সুদর্শন বাবু আর তুই কি ছোড়দা আর মমতার জায়গায় আছিস? ওদের কাছে বিয়ে ভাঙাটা শুধু বিয়ে ভাঙা। তোদের কাছেও কি তাই হবে?

এক ঝলক রক্ত ছুটে এসে যেন আছড়ে পড়লো মৌরীর মুখটার উপর। কাপটার দিকে চোখ রেখে পর পর চুমুকে চা'টা খেয়ে নিয়ে উপুড় হয়ে কাপটাকে ঠেলে দিল টেবিলের নীচে। আর এই অবসরে শান্ত করলো বুকটাকে। তারপর মুখ তুলে বললো—বেশ, না হয় তার চাইতে কিছু বেশীই হলো।

মধু দেখছিল সবই। এতক্ষণে কৌতুকে চোখ চকচক করে উঠল ওর। বললো—কতটা?

—আমি কি শিশু? হাত ছাড়িয়ে 'এই এত্তো' আর হাত গুটিয়ে 'এই এইটুকু' করে পরিমাণ বোঝাবো।

হেসে উঠল মধু।—আচ্ছা তা না হয় তাই দেখানো গেলো। তবে এটা তুই স্বীকার করছিস যে, দুটো এক নয়। কেমন?

—তবু এক।

—তবু এক!

—হাঁ, তবু এক।

একটা এলোমেলো পাঞ্জাবী গায়ে চাপিয়ে হাতে ঘড়ি বাঁধতে বাঁধতে ঘরে এসে ঢুকলো বাসুদেব। ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে যেন আপন মনেই বললো সে—আটটা। যেতে—হাঁ, ঘণ্টাখানেক তো [illegible] পরেই। ন'টা হবে পৌঁছোতে। তা ভদ্রলোকের বাড়ী যাবার পক্ষে [illegible]া কিছু অসময় নয়। ঘড়ি থেকে মুখ তুলে বললো—সে [illegible] পথটা একটু বাতলে।

[illegible]ায় যাচ্ছ না বললে পথ বাতলে দেবো কি করে?

[illegible] —বাড়ী।

—বাঃ কি কাণ্ড! কাদের?

—আরে, বলছি তো মমতাদের।

—কখন বললে?

—ঐ তো বলেছি—বল বল, কি ভাবে যেতে হবে বল শীগ্‌গির করে।

এবার প্রশ্ন করলো মৌরী—ওখানে যাচ্ছ কেন?

—বিয়ে হবে এই বলতে।

—তুমি এখানেই বিয়ে করবে ঠিক করেছ?

—হাঁ।

—কেন, আমার জন্ত?

—তোর জন্ত আবার কি।

—তবে কিসের জন্ত তাই বলো। একটু আগেও তো মত ছিল না তোমার।

জবাবটা বাসুদেব দিল তুড়েসই মতোই। বললো, একটু আগে প্রস্তুত থাকতে হলে তারও একটু আগে ব্যাপারটা জানার প্রয়োজন হয়। তার পর খবরটা অপ্রত্যাশিত এবং আমাদের প্রচলিত সংস্কারে আঘাত করাও বটে—প্রথম ধাক্কায় বিমূঢ় হয়ে পড়াটা—অর্থাৎ কিংকর্তব্য ভাবটা নিশ্চয়ই দোষের নয়।

স্বীকার করলো মৌরী—বেশ।

উৎসাহ বেড়ে গেল বাসুদেবের—তার উপর গোপন করে মেয়ে গছিয়ে দেওয়া—আজ-কালও এই মনোবৃত্তির লোক থাকতে পারে ধারণাই ছিল না আমার। এরা তো ভয়ঙ্কর লোক! এরা পারে না কি। ওদের উচিত শাস্তি—

তাকিয়ে রইল মৌরী।

মঞ্জু বললো—আঃ ছোড়দা, যা বলতে এসেছিলে তাই বল না।

সামলে নিল বাসুদেব। রাশ টানল জিভের। ছিঃ ছিঃ কি মূর্খামী করেছে। তাড়াতাড়ি বললো—ঐ তো বলছিলাম; পরিষ্কার বলে নিলে কি দোষ ছিল?

আমি জোর করে বলতে পারি, প্রথম থেকে ব্যাপারটা বলে কয়ে নিলে আমার কিছুমাত্র আপত্তি হতো না!

আর তর্কে ঢুকলো না মৌরী। বললো—গোপন করা নিয়ে আর কথা বাড়িও না ছোড়দা, আমার ভালো লাগছে না। ওটা বুড়ো বাপ-মার কাণ্ড। আমরা অনায়াসে ক্ষমা-ঘেন্না করে দিতে পারি তাঁদের। ঠোঁটের কোণে একটা শ্লেষের ঝাঁজ ফেলে বললো—হয়তো আজকালকার ছেলেদের সম্বন্ধে আশাটা কিছু বেশী ছিল! ভেবেছিলেন, একবার চুপচাপের উপর অভিভাবকের দরজা উতরে গিয়ে পাত্রের দরজায় উপস্থিত হতে পারলে সব বিপদ কেটে যাবে। তখন অভিভাবক বিমুখ হলেও পাত্র ঠিক থাকবে। তাই হয়তো ছুটো বুড়োবুড়ি সব অসম্মান সব অশ্রদ্ধা মাথা পেতে নিতে রাজী হয়েছিল। উঠে দাঁড়ালো মৌরী। ওকে ক্লান্ত—অবসন্ন লাগছিল।

ঘড়িটা ব্যস্ত ভাবে দেখে নিয়ে বাসুদেব বললো—গেল প্রায় আধ ঘণ্টা এখানেই পার হয়ে। আর নয়। মঞ্জু তুইও চল না?

মঞ্জু মৌরীর মুখের দিকে তাকালো—বেশ তো যাই?

—না, আর আমি নাটকের অঙ্ক বাড়াতে রাজী নই। তুই কি মনে করিস এখন গেলেই ওরা ভাই-বোন অমনি রাজী হয়ে যাবে?

জবাব দিল বাসুদেব। কেন যাবে না? আমরা বলবো বাবার ব্যাপারটা আমাদের অজ্ঞাতে হয়েছে। এটা তো কিছু অসম্ভব নয়। তবেই তো মিটে গেলো। তোর ধারণায় বুড়ো বাপ মা না ভেবেছিলেন—তাই হলো। ওদেরও ভাই-বোনের রাজী হওয়ার পেছনে ছোট বোধ করার কিছু রইল না। আর এতেও যদি না হয় বাস্—আমাদেরও আর কিছু বলবার থাকবে না। আমরা দায়মুক্ত?

—'ভালোই তো' এই কথাটা না বলা পর্য্যন্ত তোমার কথা অসমাপ্ত থেকে যাবে। তাই ওটা আমিই বললাম। দেখো ছোড়দা, তোমার কথা তোমার ভাষা তোমার মুখ প্রতি মুহূর্তে বলছে তুমি কত ত্যক্ত ওদের ওপর। তাই তুমি যে কথা বলতে ওখানে যেতে চাচ্ছ, তা কত মিথ্যা ওরা না জানুক আমি তো জানি। অনর্থক কথা আমার আর ভালো লাগছে না। আসল কথাটা শোন—ওঁরা যে সব কথা বলছেন তাই যদি সত্য হয় তবে তোমার আমার কারু পক্ষেই এ বিয়ে মঙ্গলের হবে না। আর মঙ্গলেরই যদি না হলো, তবে না হওয়াই ভালো; আর না হওয়া যখন ভালো তখন হবে না। বড্ড গরম লাগছে স্নান করতে যাচ্ছি। ক্লান্ত পায়ে ঘামে ভেজা চুলগুলো হাতে জড়াতে জড়াতে চলে গেল মৌরী।

ছটফট করলো বাসুদেব সমস্ত রাত। উঠলো, বসলো, পায়চারী করলো। যদিও সে ভাবলো খুব চিন্তা করছে। কিন্তু তা নয়। চিন্তাশক্তি বিরল জিনিষ। মনটাকে অনিয়ন্ত্রিত দৌড়ঝাঁপ করিয়ে আর ছটফট করতে করতে মানুষ ভাবে চিন্তা করছে। তারপর এক সময় শ্রান্তিতে অবসাদে হাত-পা ছেড়ে দিয়ে বলে, আমি আর ভাবতে পারিনে যা হয় হোক। যা হওয়ার তাই হয়। স্রোতের মুখের কুটোর মতো ঘটনার টানে ভেসে চলে। বাসুদেবও যখন বিছানায় শুলো তখন ঐ ঘটনার টানে ভাসবার জন্তই যেন চিৎ হয়ে পড়লো।

একটা দুরু-দুরু বুক নিয়ে অমিতাও ঘুর-ঘুর করলো এঘর ওঘর সে-ঘর। বসে রইল জানালার কাছে। জয়দেব যতই বলুক এটা মৌরীর রাগের কথা—সে শান্তি পাচ্ছিল না। ওর মনে হচ্ছে—রাগের কথা নয় এ মৌরীর সংকল্পের কথা। যদিও অমিতা তার শাশুড়ীকে খুবই কম দেখেছে তবু মনে হতে লাগলো আজ যদি তিনি এসে একবার দাঁড়াতেন তবে বুঝি সব সুরাহা হয়ে যেত। একমাত্র মা'র কাছেই মেয়ে মাথা নত করতো।

রাত বেড়ে চলল। সমস্ত বাড়ীটা এতো নিঃসাড় যে, কোণের বসবার ঘরের ঘড়িটার টিকটিক শব্দ বুঝি কান পাতলে সব কটা ঘর থেকে শোনা যায়। আকাশে একটা এবড়ো-খেবড়ো মলিনমুখী চাঁদ। যেন তার নিতান্ত অনিচ্ছায় কেউ জোর করে টেনে হাজির করেছে। দক্ষিণা বাতাস তেমনি বয়ে আনছে নিমফুলের গন্ধ। অন্ধকার ঘরের দেয়ালে চাঁদের আলোর পরদায় দুলছে ছবির মতো ছায়া। দুজনেই বুঝছে কেউ ঘুমায়নি। ধীরে ধীরে মঞ্জু বললো—আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে, সুদর্শন বাবুর দুর্বলতা তুই বুঝতে পারছিস। তাই হঠাৎ সুযোগ এসে যাওয়ায় মজার খেলায় মেতেছিস। খেলাটা বড্ড বেশী খরচ-সাপেক্ষ আর মানুষগুলোর উপর জুলুমসাপেক্ষ হয়ে যাচ্ছে—এই যা। নইলে আমোদ ছিল।

একটু হাসল মৌরী। যদিও মঞ্জু অন্ধকারে তা দেখল না।

[ক্রমশঃ।

দামের তুলনায় সেরা

কাজেও অতুলনীয়

ন্যাশনাল-একোর দুটি চমৎকার মডেল!

রেডিও শোনায় আনন্দ উপভোগ করার জন্যে দুটি চমৎকার ন্যাশনাল-একো মডেল—দামের তুলনায় সেরা, কাজের দিক থেকেও অপূর্ব! এগুলো 'মনসুনাইজ্‌ড', আর প্রত্যেকটিতে এক বছরের গ্যারান্টি আছে। আপনার সবচেয়ে কাছাকাছি ন্যাশনাল-একো ডীলারের কাছে গেলেই বাজিয়ে শোনাবে।

মডেল ৭১৭ : সোনালি বর্ডার দেওয়া মেরুন রঙের প্লাষ্টিক কেবিনেট। মডেল ইউ ৭১৭—৫ ভাল্ব, ৩ ব্যাণ্ড ২৩০ ভল্টের জন্য, এসি/ডিসি। মডেল বি-৭১৭ : ৪ ভাল্ব, ৩ ব্যাণ্ড ড্রাই ব্যাটারীতে চলে।
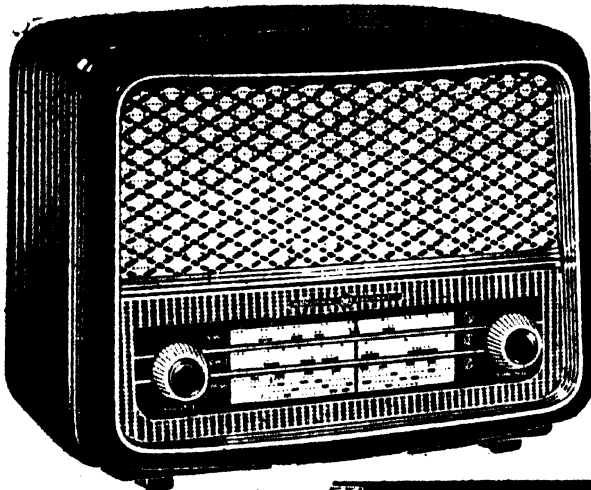
দাম ২৫০৲ টাকা

নেট দাম দেওয়া হ'ল ; এর ওপর স্থানীয় কর

মডেল ১৮৭ : ৬ ভাল্ব, ৮ ব্যাণ্ড, সুন্দর কাঠের কেবিনেট। মডেল এ-১৮৭ এসিতে চলে। মডেল ইউ-১৮৭ এসি বা ডিসির জন্যে। দাম ৪৭৫৲ টাকা

ন্যাশনাল-একো রেডিওই সেরা—এগুলো

জেনারেল রেডিও এণ্ড অ্যাপ্লায়েন্সেস প্রাইভেট লিমিটেড

৩ ম্যাডান ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১৩ ● অপেরা হাউস, বোম্বাই ৪ ● ১/১৮ মাউণ্ট রোড, মাদ্রাজ ● ৩৬/৭৯ সিলভার জুবিলী পার্ক রোড, বাঙ্গালোর ● বোর্দিল্লান কলোনী, চাঁদনী চক, দিল্লী।

অ্যাসবেষ্টস—বিভিন্ন ব্যবহার

ভূগর্ভে যে সকল মূল্যবান সম্পদের সন্ধান পাওয়া গেছে এদেরই একটি প্রধান অ্যাসবেষ্টস। ইহা অজৈব খনিজ পদার্থ কিন্তু তাই বলে স্বর্ণ, লৌহ; টিন, অ্যালুমিনিয়াম, নিকেল প্রভৃতি যেমন ধাতুদ্রব্য, এইটি সে পর্য্যায়ভুক্ত নয়। এর বিশেষ ধর্ম্ম বা বৈশিষ্ট্য—ইহা আগুনে পোড়ে না। বিজ্ঞানী মানুষ নিয়োজিত করে আসছে একে নানা কল্যাণ-কাজে। আজিকার দিনে এর মূল্য ও গুরুত্ব সত্যই অনস্বীকার্য্য।

বিশ্বের বহু অঞ্চলে মাটি খুঁড়ে এই অগ্নিনিরোধক খনিজ পদার্থটি (অ্যাসবেষ্টস) আবিষ্কৃত হয়েছে। তন্মধ্যে কানাডা, আফ্রিকা, হাঙ্গেরী, রুশিয়া, ইংল্যাণ্ড, স্কটল্যাণ্ড, নিউ সাউথ ওয়েলস, সাইপ্রাস প্রভৃতি কয়টি দেশের নাম বিশেষ ভাবে করা যায়। ঠিক কবে থেকে এর ব্যবহার চলে আসছে মানুষের রাজ্যে, সেইটি আজ অবশ্য ইতিহাসের সামগ্রী। কিন্তু এ যুগে এসে এমনি দাঁড়িয়ে গেছে—কতকগুলো অত্যাবশ্যক ক্ষেত্রে অ্যাসবেষ্টস না হলেই যেন নয়।

প্রথমেই বলা হলো, অ্যাসবেষ্টস একটি অজৈব খনিজ পদার্থ অর্থাৎ ভূগর্ভে নিহিত কোন প্রাণী বা উদ্ভিদের দেহাংশ থেকে ঠিক এর সৃষ্টি নয়। যতদূর জানা যায়, এক প্রকার কঠিন শিলা চূর্ণীকৃত হয়ে ক্রমে তন্তু বা সূতার আকার গ্রহণ করে এবং এই বিস্ময়কর খনিজ পদার্থই অ্যাসবেষ্টস এর ব্যবহারিক মূল্য অন্যান্য খনিজ পদার্থকে থেকে বেশী এবং এর বিশেষ কারণ—এই পদার্থটি অমনি দগ্ধ হয় না।

ইতিহাস পর্য্যালোচনা করলে দেখা যাবে—চৈনিক ও মিশরীয় সভ্যতার গোড়ার দিকেই অ্যাসবেষ্টসের ব্যবহার ছিল। সে সময় এই থেকে কাপড় তৈরী হ'ত, পাপোষ তৈরী হত এবং আরও কত কি। অপর দিকে তৎকালীন রোমানরা ইতালী ও সাইপ্রাস থেকে এই খনিজ পদার্থটি সংগ্রহ করে নেয় এবং এর সাহায্যে তৈরী করে শবাচ্ছাদন বস্ত্র, টেবিল ক্লথ ইত্যাদি। আগুনে পোড়ে না বলেই অ্যাসবেষ্টসকে তারা বলতো—'লিনাস ভিনাস' অর্থাৎ অক্ষয় বস্ত্র। রাজারাজড়াদের অনেককেই মরবার পর এই বস্ত্রাবৃত করে কবর দেওয়া হ'ত সেকালে, প্রাচীন মন্দিরগুলোতে যে প্রদীপ জ্বালানো হ'ত, তার পলতেগুলো থাকতো অ্যাসবেষ্টসে তৈরী। উক্ত প্রদীপের আলো সহসা নির্ব্বাপিত হত না বলে একে বলা হত—'অ্যাসবেষ্টা' বা অনির্ব্বাণ দীপশিখা।

গ্রীক পর্য্যটক পসানিয়াজ তাঁর বিবরণে একটি বিশেষ দীপাধারের উল্লেখ করেছেন। এই দীপাধারটিতে তেল ভর্ত্তি করা হ'ত বছরে মাত্র একবার। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় ছিল যে এইটি নির্ব্বাপিত হ'ত না কখনই। তার কারণ ছিল আরই কিছুই নয়। এখানেও প্রদীপের পলতেটি ছিল খনিজ তন্তু অ্যাসবেষ্টস নির্ম্মিত। এই ধরণের আরও একটি কাহিনী শুনতে পাওয়া যায়। প্রথম চার্লস তাঁর অতিথি অভ্যাগতদের চোখের উপর একটি টেবিল ক্লথ রেখে তাতে আগুন ধরিয়ে দেন। এই অবস্থায় বেশ কিছুটা সময় অতিবাহিত হয়ে গেল। সকলেই ভাবলেন—টেবিলক্লথটি পুড়ে ছাই হয়ে গেছে নিশ্চয়ই। কিন্তু আগুনের অভ্যন্তর থেকে যখন ঐটিকে বার করা হ'ল, তখন দেখা গেল বিস্ময়ের সঙ্গে—কোথায়ও এর ক্ষত নেই, অগ্নিদগ্ধ হওয়ার কোন চিহ্নই নেই।

চতুর্দ্দশ শতাব্দীর একটি ঐতিহাসিক বিবরণ। ইতালীয় পর্য্যটক মার্কোপলো আবিষ্কার করলেন অ্যাসবেষ্টস বিশাল তাতার সাম্রাজ্য থেকে। শুধু আবিষ্কারই নয়, সাইবেরিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে যেতে তিনি প্রচুর পরিমাণে এই খনিজ পদার্থটি সংগ্রহ করেন, এবং তারপর এক বিশেষ প্রক্রিয়ায় সেগুলো শুকিয়ে চূর্ণীকৃত করে নানা কাজে ব্যবহারের উপযোগী করে তোলেন। সেই দিনে কি পদ্ধতিতে তিনি এইটি করেছিলেন, আজ অবশ্য সেটি জানবার উপায় নেই হয়ত।

মার্কোপলোর পর অ্যাসবেষ্টসের ব্যবহার অবশ্য কিছুকালের জন্য উঠে যায়। এই মূল্যবান খনিজ পদার্থটি সম্পর্কে অনেকেই আর খোঁজখবর রাখত না, কিন্তু উদ্যোগী মানুষের কাছ থেকে লক্ষ্মী দীর্ঘদিন দূরে থাকতে পারে না, এইটি দেখা গেছে। আবার সন্ধান হয় ভূগর্ভে অ্যাসবেষ্টসের নানা ভাবে শুরু হয় এর ব্যবহার। এই সময় এর উপর মুদ্রণেরও চেষ্টা হয়—অবশ্য এইটির উদ্দেশ্য ছিল ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ দলিলপত্রকে স্থায়ী করে রাখা। কিন্তু কার্য্যতঃ দেখা গেল এতে সুবিধা হবার নয়। কারণ অ্যাসবেষ্টসে তৈরী পত্রটি আগুনে দগ্ধ না হলেও এর ওপরকার মুদ্রণের ছাপটা বিনষ্ট হয়ে পড়ে।

ইতালীয় পর্য্যটক মার্কোপলোর পর অ্যাসবেষ্টসের ক্ষেত্রে যে অন্ধকার যুগ দেখা দেয়, সেইটি বেশী দিন স্থায়ী হ'তে পারেনি—এই মাত্র বলা হলো। ১৬৭৬ খৃষ্টাব্দে একজন চৈনিক ব্যবসায়ী একটি বিস্ময়কর রুমাল প্রদর্শন করেন—এইটি ছিল 'লিনাস অ্যাসবেসটি' বা অ্যাসবেষ্টস তন্তু দিয়ে তৈরী। ভিয়েনার এক প্রদর্শনীতে ১৬৭১ খৃষ্টাব্দে একটি তোয়ালে দেখতে পাওয়া যায় যেটি ছিল তৃতীয় কার্ডিনালের এবং অ্যাসবেষ্টসেই সুনিপুণ ভাবে প্রস্তুত। ১৭০২ খৃষ্টাব্দের একটি রোমান সমাধিকেন্দ্র থেকে অ্যাসবেষ্টস তৈরী শবাচ্ছাদনের একখানি নমুনা পাওয়া যায়। পরে ঐটি ভেটিকানের পাঠমন্দিরে সযত্নে সংরক্ষণের ব্যবস্থা হয়।

পরবর্ত্তী সময়ে অ্যাসবেষ্টস আবিষ্কৃত হয় রুশিয়ার ইউরাল পর্ব্বতে প্রচুর। মস্কোতে পিটারের রাজত্বকালেই এই থেকে নানা মূল্যবান পণ্যসম্ভার উৎপাদন চলে। আজ সমগ্র বিশ্বে অ্যাসবেষ্টস শিল্প নিয়ে কাজ করবার প্রচুর অর্থ এসে থাকে এই উভয় মারফত। অ্যাসবেষ্টস কিন্তু নানা ধরণের হয়ে থাকে। ফরাসী ভাষায় একে বলা হয়—'পিয়েরি এ কটন' বা সূতীপাথর। বিজ্ঞানীরা এইটিকে অভিহিত করেছেন—ম্যাগনেসিয়াম সিলিকেট নামে। অ্যাসবেষ্টস দিয়ে আজ কত জিনিষ তৈরী হচ্ছে, তার ইয়ত্তা নেই।

বিকল বাহিনীর লোকদের মজবুত পোষাক-পরিচ্ছদ এই দিয়ে হয়ে থাকে, ষ্টীম পাইপ, বয়লার ইত্যাদিতেও এইটি ব্যবহার করা হয়। সিমেন্টের সঙ্গে মিশিয়ে অ্যাসবেষ্টস দ্বারা ঢেউ তোলা পাত তৈরী হয় এবং সেই দিয়ে ঘরের ছাউনি হচ্ছে। টালির ছাদ থেকেও অ্যাসবেষ্টসের ছাউনি অনেক ক্ষেত্রে পছন্দ করা হয়, এবং এর দুইটি কারণ—এক দিকে এতে খরচ কম, অপর দিকে এই ছাউনিতে আগুন ধরবার আশঙ্কা নেই। বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অ্যাসবেষ্টস যে মানুষের সুখ-সমৃদ্ধির আরও অনেক উপাদান যোগাবে, ইহা নিঃসন্দেহ।

কাজুবাদামের চাষ

খাদ্য হিসাবে কাজুবাদামের একটি স্থান নির্ণীত হয়েছে অন্য দেশের ন্যায় এই দেশেও। কেবিন, রেস্তোরাঁ, কফিহাউস প্রভৃতিতে এইটি অনেক ক্ষেত্রেই এখন সরবরাহ করা হয়। পর্য্যাপ্ত খাদ্যপ্রাণ বা 'ভিটামিন' আছে বলেই এর এতখানি মূল্য বা সমাদর।

ভারতে কাজুবাদামের চাষ পূর্ব্বের চেয়ে অবশ্য বেড়েছে। এইটি বেশী পরিমাণে উৎপাদিত হয়ে থাকে এখানকার উপকূলবর্ত্তী অঞ্চলগুলোকেই। এর ভিতর মাদ্রাজ আর অন্ধ্র রাজ্যের উপকূলবর্ত্তী জেলাসমূহে ইহা প্রচুর জন্মায়—পশ্চিমবঙ্গেও ক্রমে এর চাষ বাড়ছে। তবে দেশের সম্যক্ প্রয়োজন মেটাতে হলে এর চাষ বা ফলনের দিকে অধিকতর নজর না দিলে নয়।

উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হলে কি রকম মাটিতে এবং কি ধরণের জলবায়ুতে কাজুবাদাম গাছ জন্মায়—সেইটি প্রথমে জানা দরকার। দেখা গেছে, এদেশের সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী ঢালু পাহাড়ী জমিতে কাঁকরে বা বেলে মাটিতে এর চাষ ভাল হয়। কাজু গাছের বর্দ্ধন ও পুষ্টির জন্য মাটি খুব উর্ব্বর হ'তে হবে, এমন কোন কথা নেই। তবে এর জন্য বিশেষ যত্ন ও পরিচর্য্যার দরকার হয়। বহু অনাবাদী জমি যেখানে হয়ত অন্য ফসল ভাল জন্মায় না, সেখানে কাজুর চাষে সুফল ফলেছে, এমনও দেখা গেছে। তবে ফলন যে এদেশে খারাপ হয়, আবশ্যক যত্ন ও তত্ত্বাবধানের অভাবই এর জন্য প্রধানত দায়ী।

বীজ থেকে ও কলম থেকে দুই ভাবেই কাজুবাদামের গাছ করা যায়। তবে বীজ থেকে যে গাছ হয়, এর ফল ভাল হবে, এইটি নিশ্চয় করে বলা যায় না। বীজজাত গাছের ফল ধরাও সুরু হয় একটু দেরীতে। অপর দিকে কলমের গাছে ফল ধরে অনেকটা তাড়াতাড়ি। আবার এই ফল গুণের দিক থেকে যেমন হয় ভাল, সংখ্যার দিক থেকেও হয় যথেষ্ট বেশী। কাজু গাছের কলম অবশ্য নানা প্রক্রিয়ায় তৈরী করা যেতে পারে, তবে পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে—কাজুর ডালে কলম বিশেষ কার্য্যকরী।

গাছ থেকে কলম কেটে আনবার সময় খুব সাবধানতা দরকার। দেখতে হবে—যাতে এর শিকড় না ভেঙে যায় বা কোন রকমে কলমটিতে চোট না পড়ে। বর্ষাকালই হচ্ছে কলম রোপণের উপযুক্ত সময়—তবে বৎসরের অন্য সময়ও ইহা রোপণ করা চলে। গ্রীষ্মের দিনে যদি এইটি লাগাবার প্রয়োজন হয়, তা হ'লে জলসিঞ্চন করতে হবে মাঝে মাঝে—এইমাত্র নিয়ম। যে ক্ষেত্রে কাজুবাদাম একটি পুষ্টিকর খাদ্যরূপে স্বীকৃত হয়েছে, সেই অবস্থায় এর চাষাবাদ বৃদ্ধির দিকে জাতীয় সরকার দৃষ্টি দেবেন, এইটি স্বভাবতঃই আশা করা যায়।

লাক্ষা-কথা

শ্রীবরুণচন্দ্র মল্লিক

লাক্ষা শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ নির্দ্ধারণ করতে গিয়ে যথেষ্ট মতভেদ দেখা যায়। অনেকে বলেন, সংস্কৃতে পলাশ, কুল, কুসুম ইত্যাদি গাছগুলি 'লাক্ষাতরু' নামে পরিচিত। এ সব গাছে আশ্রয় গ্রহণ ক'রে লাক্ষাকীটেরা লালা নির্গত করে, আর এদের নিঃসৃত লালাই গাছের নামানুসারে লাক্ষা নামে অভিহিত হয়। আবার অনেকে এ মতবাদের বিপক্ষে মত পোষণ করেন। তাঁদের মতে, একটা লাক্ষাকীটের মাতৃকোষ থেকে লাখ্, লাখ্, সংখ্যক লাক্ষা শুককীট নির্গমন হয় এবং এদের নিঃসৃত লালা লক্ষ লক্ষ শব্দের অপভ্রংশে লাক্ষা নামে খ্যাত।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, ছারপোকা জাতীয় এক ধরণের অতি ক্ষুদ্র কীট নিঃসৃত লালার নামই লাক্ষা। এ ধরণের কীটের বৈজ্ঞানিক নাম 'লেসিফার লাক্কা, 'কোক্‌সিডি' নামক বংশোদ্ভূত। লাক্ষা বহু গুণ সম্পন্ন এক ধরণের প্রাকৃতিক 'রেজিন'। লাক্ষা শুককীট আয়তনে আধ মিলিমিটারের চেয়েও ছোট, দেখতে লাল রঙের। একটি পূর্ণপ্রাপ্ত মাতৃকোষ থেকে আনুমানিক দু'শত থেকে পাঁচ শ লাক্ষাশূকের জন্ম হয়, এর মধ্যে শতকরা তিরিশ ও সত্তর ভা যথাক্রমে পুরুষ ও স্ত্রী-কীট। পুরুষ কীটের জীবনকাল স্ত্রীকীটে তুলনায় অনেকাংশে কম, প্রায় অর্দ্ধেক বলা যায়। সেজন্য এদের দ্বা লাক্ষা উৎপাদন খুব কম পরিমাণে হয়। লাক্ষা শূককীট মাতৃকো থেকে নির্গমন হওয়ার অল্প সময়ের মধ্যেই নিজ নিজ বাসস্থা অন্বেষণে গাছের সঙ্গে সঙ্গে ডালে চলে-ফিরে বেড়ায়, যেসব শু কীটেরা বাসস্থান সংগ্রহ করতে অসমর্থ হয় তারা অচিরেই মা যায়। প্রকৃতির নিয়ম এমনই যে, স্ত্রী শুককীট গাছের ডা একবার বসে গেলে চলনশক্তি হারায় এবং দেহের মধ্যে ধারাবাহি ভাবে কতকগুলি পরিবর্ত্তন হ'তে দেখা যায়। আট থেকে সপ্তাহের মধ্যে পুরুষ কীট এদের কোষ থেকে বার হয়ে আসে স্ত্রীকীটের দিকে অগ্রসর হয় ও মিলন হয়। মিলনের কয়েক দি মধ্যেই পুরুষ কীটেরা মারা যায় এবং স্ত্রী কীটেরা গর্ভপ্রাপ্ত হ স্ত্রী-কীটেরা আয়তনে বৃদ্ধি পায় ও নিজেদের দেহের রসগ্রন্থি এ সময়ে সক্রিয় হয়ে ওঠে অর্থাৎ ক্রমাগতই গাঢ় লাল আ মত রস নির্গত করে। এ হেন রস বা লালা বাতাসের সং এসে কঠিন আবরণের সৃষ্টি করে আর এর মধ্যেই লাক্ষা-কী আত্মগোপন করে। এদের জীবন সত্যই বৈচিত্র্যময়। যে বৃক্ষকে কেন্দ্র করে লাক্ষা-ফসলের চাষ হয় সেগুলি লাক্ষা-কী আশ্রয়-বৃক্ষ নামে পরিচিত। জল-বায়ুর প্রকারভেদে আশ্রয়-বৃ তারতম্য দেখা যায়। ভারতবর্ষে বহু রকমের আশ্রয়-বৃক্ষ এর মধ্যে কুসুম, পলাশ, কুল, অড়হর, খয়ের ইত্যাদির নাম বি ভাবে উল্লেখযোগ্য।

লাক্ষা-কীটকে সাধারণতঃ দুটো শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে যথা—কুসমী ও রঙিনী। যে সব বীজলাক্ষা কেবল মাত্র নামক আশ্রয়-বৃক্ষের জন্য ব্যবহৃত হয় অর্থাৎ কুসমী ফসল পাওয়া

সেগুলি কুসমী লাক্ষা-কীট শ্রেণীভুক্ত এবং অন্যান্য আশ্রয়-বৃক্ষের জন্ত ব্যবহৃত লাক্ষা-কীট রঙ্গিণী নামে পরিচিত। কুসমী ও রঙ্গিণী জাতীয় লাক্ষাকীটের জীবনকাল যথাক্রমে ছয় ও আট মাস হওয়ায় বছরে মোট চারটি ফসল পাওয়া যায়। লাক্ষা উৎপন্ন মাসের হিন্দী নামানুসারে ফসলের নামকরণ প্রচলিত যেমন বৈশাখী কাতকী, আঘনী ও জেঠুই। প্রথমোক্ত ফসল দুটি রঙ্গিণী ও অপর দুটি কুসমী শ্রেণীভুক্ত। লাক্ষাবৃত ডালগুলি কাটা অবস্থায় ছড়িলাক্ষা নামে পরিচিত। বাজারে সাধারণতঃ দু'রকমের ছড়িলাক্ষা দেখা যায়, যথা অরি ও ফুঙ্কি। একটার ক্ষেত্রে লাক্ষাকীট জীবন্ত অবস্থায় বর্তমান থাকে কিন্তু শেষোক্তটির ক্ষেত্রে তা থাকে না। ভারতে ছড়িলাক্ষা উৎপাদনের পরিমাণ হচ্ছে কম-বেশী ১১,০০,০০০ মণ। পেষাই ছড়িলাক্ষা থেকে অপরিস্রুত অংশ ও রংযুক্ত করণের পর যা অবশিষ্ট থাকে তা দানালাক্ষা বা সাফাই লাক্ষা নামে পরিচিত। ভারতে দানালাক্ষা উৎপাদনের পরিমাণ প্রতি বৎসর গড়ে প্রায় ৩০,০০০টন বা ৮,১০,০০০মণ। অধিকাংশ দানালাক্ষা পাতগালা বা বটনগালা তৈরী করতে নিয়োজিত হয় অর্থাৎ পরিশোধন করা হয়। ভারতে লাক্ষা পরিশোধনের জন্ত ছোটবড় আনুমানিক ৪০০ কারখানা আছে। লাক্ষা, মরশুমী ফসল বলে এসব কারখানাগুলি বছরের সব সময় শ্রমিকদের কাজ দিতে পারে না। নিয়মিত ভাবে কাজ খুব কম কারখানাতেই হয়।

লাক্ষা বা গালা বহুবিধ শিল্পে ব্যবহৃত হয়, যেমন গ্রামোফোন রেকর্ড শিল্পে শতকরা ৩৫ ভাগ, বৈদ্যুতিক শিল্পে শতকরা ২০ ভাগ টুপিশিল্পে শতকরা ১০ ভাগ, পেন্ট ও বার্ণিশ শিল্পে শতকরা ১৫ ভাগ, সিলিং ওয়াকস শিল্পে শতকরা ৫ ভাগ, অলঙ্কার, কাঠের খেলনার রং, নখ পালিশ, শিরীষ কাগজ, তাস ইত্যাদি শিল্পে শতকরা ১৫ ভাগ।

বর্তমান ভারতের আর্থিক ক্ষেত্রে লাক্ষাশিল্পের গুরুত্ব কম নয়। কেবলমাত্র এ শিল্পের মাধ্যমে বছরে আনুমানিক এগারো কোটি টাকার মত বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়। শুনলে বিস্মিত হতে হয়, শতকরা লাক্ষা উৎপাদনের ৮ ভাগও আমাদের দেশে কোন শিল্পে ব্যবহৃত হয় না। অপর পক্ষে বলা যায় যে, এ শিল্পটি সম্পূর্ণরূপে বিদেশী বাজারের ওপর নির্ভরশীল। এ ব্যবসায়ের বর্তমান ধারায় ক্রমিক পরিবর্তন না হলে ভারতের লাক্ষাশিল্পের ভবিষ্যৎ উন্নতিমূলক হতে পারে না। বিদেশে কেবলমাত্র লাক্ষা বা গালা রপ্তানী না করে বিভিন্ন শিল্পের মাধ্যমে লাক্ষাজাত দ্রব্য রপ্তানী করতে পারলে আমাদের লাক্ষাশিল্পের অর্থনৈতিক কাঠামো আরো দৃঢ়তর হবে।

কবি-প্রণাম

হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

শতাব্দী ঘুমায় :
অবলুপ্ত সহস্র শতক
          দিনান্তের স্নিগ্ধ ছায়াতলে।
মহাকাল ভৈরবের পিঙ্গল জটায়
ঘুমায় শিথিল সূর্য :
লক্ষ শত পরিক্রমা—
উদয়-গিরির অরুণিমা
          মিশে যায় রক্তিম সন্ধ্যায়,
প্রদোষের অন্ধকারে :
          নামে যবনিকা।
স্মিতমুখে চায় অরুন্ধতী ;
সপ্তর্ষির কানাকানি
ভেসে আসে নিশীথ পবনে।
          বিমুগ্ধ-বিস্ময়ে
রাত্রিরে ঘিরিয়া
দিনের এ আসা-যাওয়া মহামহোৎসব :

শ্রান্তিহীন, ক্লান্তিহীন লক্ষ আবর্তন :
মুছে যায় বিস্মৃতির কোলে।
চৈত্র-সন্ধ্যা আসে বার বার,
ঝরে পড়ে আবির পলাশ
ধূসর ধূলায়, পৃথিবীর উত্তপ্ত পঞ্জরে।
জাগে কৃষ্ণচূড়া !
শালবনে লাগে রঙ—বৈশাখের খরসূর্যতাপে।
দিন আসে, দিন চলে যায়
          বৈশাখের আয়ু হয় শেষ।
বর্ষে বর্ষে শতাব্দী ফুরায়,
তবু জাগে মানুষের চিত্তলোকে চির অনিমেষ—
সূর্য ওঠা, সূর্য ডোবা : তুচ্ছ করি নিত্য আনাগোনা :
সোনার অক্ষরে লেখা বৈশাখের পঞ্চবিংশ দিন।
হে কবি, মানস-সূর্য।
          মানুষের তীর্থ হলো সেই মহাক্ষণ :
                    পুণ্য তব নাম।

সহস্র শতক মাঝে পুণ্যতিথি পঁচিশে বৈশাখ
শতাব্দীর রহিল প্রণাম।

সাহিত্য পরিচয়

১৩৬৪—১৩৬৫ সালের উল্লেখযোগ্য বই

✱ কবিতা ✱

বই	লেখক	প্রকাশক
অভয়ামঙ্গল ৭৲	আশুতোষ দাস সম্পাদিত	কলি: বিশ্ববিদ্যালয়
পরশুরামের কৃষ্ণমঙ্গল ১২৲	নলিনীনাথ দাশগুপ্ত সম্পাদিত	ঐ
শিবসংকীর্তন বা শিবায়ন ৮৲	যোগিলাল হালদার সম্পাদিত	ঐ
একা এবং কয়েকজন ২৲	সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়	সাহিত্য-প্রকাশক
দূরান্ত বাধা ১৲	অরুণাচল বসু	গ্রন্থ-জগৎ
নিশান্তিকা ৩৲	যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত	বাক্
নীলকণ্ঠ ১।•	রাম বসু	গ্রন্থ-জগৎ
রূপসী বাংলা ৩৲	জীবনানন্দ দাশ	সিগনেট
শোভিনী ২৲	সৌমিত্র সেনগুপ্ত	আনন্দ পাবলিশার্স
শ্রেষ্ঠ কবিতা ৫।•	কুমুদরঞ্জন মল্লিক	মিত্র ও ঘোষ
সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা ৪৲		নিউ এজ
পল্লী-পাঁচালী ৩৲	শান্তি পাল	রঞ্জন পাবলিশিং

✱ উপন্যাস ✱

বই	লেখক	প্রকাশক
অসিধারা ৩।•	নারায়ণ গঙ্গো:	বেঙ্গল পাবলিশার্স
উন্মোচন ৩৮•	আশাপূর্ণা দেবী	সরস্বতী গ্রন্থালয়
কলকাতার কাছেই ৫।•	গজেন্দ্রকুমার মিত্র	আই, এ, পি
গঙ্গা ৫।•	সমরেশ বসু	বেঙ্গল পাবলিশার্স
গৃহসন্ধানে ৪।•	প্রভাত বন্দ্যোপাধ্যায়	শান্তি লাইব্রেরি
চকমকি ৩।•	আনন্দ বাগচী	আর্ট ইউনিয়ন
চীনে লণ্ঠন ৩।•	লীলা মজুমদার	ত্রিবেণী
ছায়ামানবী ২।•	ভবানী মুখোপাধ্যায়	শ্রীবাণী বুক হাউস
জীবন-জাহ্নবী ৬।•	রামপদ মুখোপাধ্যায়	মিত্র ও ঘোষ
তিমির-বলয় (২য় খণ্ড) ৩।•	সরোজ রায়চৌধুরী	বিহার সাহিত্য ভবন
দুর্গতোরণ ৩৲	সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়	সাহিত্য জগৎ
দেওয়াল (২য় খণ্ড) ৬৲	বিমল কর	ডি, এম
দীপের নাম টিয়ারঙ ৩।•	রমাপদ চৌধুরী	আভেনির
নটী ৩।•	মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য	নিউ এজ
নিছক মানুষ ৪।•	গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য	সাহিত্য ভবন
পূর্ব পার্বতী ৮৲	প্রফুল্ল রায়	বেঙ্গল পাবলিশার্স
পঞ্চতপা ৬।•	আশুতোষ মুখোপাধ্যায়	মিত্র ও ঘোষ
বিচারপতি ৩৲	অনুরূপা দেবী	মিত্র ও ঘোষ
বিহঙ্গবিলাস ৩৲	প্রবোধবন্ধু অধিকারী	কথামালা
বৃষ্টি, বৃষ্টি ৫।•	মনোজ বসু	বেঙ্গল পাবলিশার্স
মধুবাংশু ৬।•	সুবোধকুমার চক্রবর্তী	এ, মুখার্জি
মাথুর ৬৲	বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়	বেঙ্গল পাবলিশার্স
মাধুকরী ৩।•	মন্মথনাথ ঘোষ	এসো: পাবলিশার্স
রত্ন ও শ্রীমতী (২য় খণ্ড) ৩৲	অন্নদাশঙ্কর রায়	ডি, এম
রাধা ৭৲	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	ত্রিবেণী
যৌবনভরা এ বসন্ত ৩৲	অমরেন্দ্র ঘোষ	ক্যালকাটা বুক ক্লাব
শুক্লপক্ষ ৩৲	নরেন্দ্রনাথ মিত্র	ডি, এম
শ্রেয়সী ৫৲	সুবোধ ঘোষ	ক্যালকাটা পাবলিশার্স
সংকট ৩।•	সতীনাথ ভাদুড়ী	বেঙ্গল পাবলিশার্স
সীমাস্বর্গ ২৮•	শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যো:	এসো: পাবলিশার্স
গঙ্গা ৫।•	সমরেশ বসু	বেঙ্গল পাবলিশার্স
দ্বিতীয় ডাকে ৩।•	বিক্রমাদিত্য	মিত্র ও ঘোষ
প্রাণগঙ্গা ৫৲	অবিনাশ সাহা	ভারতী লাইব্রেরী
কাজল গাঁয়ের কাহিনী ৫।•	শক্তিপদ রাজগুরু	গুরুদাস

✱ গল্পগ্রন্থ ✱

বই	লেখক	প্রকাশক
অনুগামিনী ৩৲	বনফুল	বেঙ্গল পাবলিশার্স
অন্তঃপুর ২।•	সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়	অভিজিৎ
অন্তরঙ্গ ৩৲	প্রফুল্ল রায়	এসোসিয়েটেড পাবলিশার্স
আনন্দীবাঈ ইত্যাদি গল্প ৩৲	পরশুরাম	এম, সি, সরকার
আরও বিচিত্র কাহিনী ৩৲	তুষারকান্তি ঘোষ	এম, সি, সরকার
নব নায়িকা ৩।•	আশুতোষ মুখো:	ভারতী লাইব্রেরী
একটি নীল আকাশ ২৲	প্রভাত দেবসরকার	নিও লীট
কখনো আসেনি ৩৲	রমাপদ চৌধুরী	ক্যালকাটা পাবলিশার্স
গল্পলোক ৪৲	সুবোধ ঘোষ	নিউ স্ক্রীপ্ট
গল্প-সংগ্রহ (১ম) ৪৲	মনোজ বসু	বেঙ্গল পাবলিশার্স
গল্প-সংগ্রহ ৫৲	সরলাবালা সরকার	আনন্দ পাবলিশার্স
গল্প-পঞ্চাশৎ ৪।•	বিভূতি মুখোপাধ্যায়	মিত্র ও ঘোষ
চিরদিনের কাহিনী ২।•	সুশীল জানা	ঈস্টার্ণ ট্রেডিং
চেনামুখ ৩৲	রূপদর্শী	রতিক
তৃষ্ণা ৩৲	সমরেশ বসু	ত্রিবেণী
পরমায়ু ৩ •	সন্তোষকুমার ঘোষ	ত্রিবেণী
পিঙ্গলার প্রেম ২।•	বিমল কর	আভেনির
ব্যঙ্গমা ব্যঙ্গমী ৫।•	পরিমল গোস্বামী সম্পাদিত	ইষ্টলাইট
ভাটিয়ালী ২।•	নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	কথামালা
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় গল্প সংগ্রহ ৪৲		ন্যাশনাল বুক এজেন্সি
মিশ্র রাগ ৩।•	নরেন্দ্রনাথ মিত্র	মিত্র ও ঘোষ
মুঠো মুঠো কুয়াশা ২।•	প্রাণতোষ ঘটক	ভারতী লাইব্রেরী
রূপ হলুদ ২৲	বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	আই, এ, পি
লঘুপাক ৬৲	বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়	মিত্রালয়

শাহের বায়ু ২।• আবুল কালাম সামসুদ্দীন ভারতী লাইব্রেরী
শ্রেষ্ঠ গল্প ৫৲ সুমথ ঘোষ মিত্র ও ঘোষ
সিঁড়ি ২।• নবেন্দু ঘোষ গ্রন্থ-জগৎ
স্বামী মানেই আসামী ২।• শিবরাম চক্রবর্তী রাইটার্স কর্ণার

* রম্যরচনা *

আজব নগরী ৩৲ শ্রীপান্থ প্রজ্ঞা
ধূপছায়া ৪৲ সৈয়দ মুজতবা আলী ত্রিবেণী
সপ্তপর্ণ ৩৲ পরিমল গোস্বামী মিত্র ও ঘোষ
ছুরে-করে-কম্‌বা নীলকণ্ঠ বেঙ্গল পাবলিসার্স

* নাটক *

একাঙ্ক নাটক সঙ্কলন ৫৲ গ্রন্থম
কবি ২৲ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মিত্র ও ঘোষ
জনরব ২৲ হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মিত্রালয়
বন্যা ২৲ অনিলবরণ দত্ত প্রান্তিক
মরার আগে মরব না ৮• চিত্ত চৌধুরী কলিকাতা পুস্তকালয়
মরা হাতি লাখ টাকা ১৲ মন্মথ রায় গুরুদাস
মৌচোর ২৮• সলিল সেন ইণ্ডিয়ানা
রুপোলী চাঁদ ২।• ধনঞ্জয় বৈরাগী আর্ট এণ্ড লেটার্স

* ভ্রমণ *

অনেক সাগর পেরিয়ে ৪৲ চিত্রিতা দেবী প্রজ্ঞা
কাশ্মীর ভ্রমণ ৩৲ বিমলচন্দ্র সিংহ অভিজিৎ
নতুন জাপান ৮৲ কালীপদ বিশ্বাস ওরিয়েণ্ট বুক কোং
বিদেশ বিভুঁই ৬৲ দক্ষিণারঞ্জন বসু বেঙ্গল পাবলিশার্স
মন্দিরময় ভারত ৫৲ অপূর্বরতন ভাদুড়ী এম, সি, সরকার
রূপময় ভারত ৪৲ খগেন্দ্রনাথ মিত্র ও রামেন্দ্র দেশমুখ্য শরৎ বুক হাউস
সোবিয়েতের দেশে দেশে ৬৲ মনোজ বসু বেঙ্গল পাবলিশার্স
স্বর্গ যদি কোথাও থাকে ৪৲ রূপদর্শী বেঙ্গল পাবলিশার্স
হিমাদ্রি ৩।• রাণী চন্দ বিশ্বভারতী
চীন থেকে ভারত ৩৲ রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য কলি: পুস্তকালয়

* সাহিত্য ও সংস্কৃতি *

অলঙ্কার পরিচয় ১।• সমীরেশ দাশগুপ্ত এস, রায় এণ্ড কোং
ঊনবিংশ শতাব্দীর কবিওয়ালা ও বাংলা সাহিত্য ৮৲ নিরঞ্জন চক্রবর্তী আই, এ, পি
কবিতার বিচিত্র কথা ৮৲ হরপ্রসাদ মিত্র কথামালা
কুলায় ও কালপুরুষ ৫।• সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সিগনেট
চিন্ময় বঙ্গ ৪৲ ক্ষিতিমোহন সেন আনন্দ পাবলিশার্স
প্রাকৃত সাহিত্য ।• মনোমোহন ঘোষ বিশ্বভারতী
প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কালক্রম ৫৲ সুখময় মুখো: ক্যালকাটা বুক ক্লাব
বক্তব্য ৫৲ ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বিদ্যোদয়
বাংলা গল্প-বিচিত্রা ৩।• নারায়ণ গঙ্গো: বেঙ্গল পাবলিশার্স
বাংলা নাটক ৩৲ দেবকুমার বসু গ্রন্থ-জগৎ
বাংলায় নবযুগ ৬৲ মোহিতলাল মজুমদার আই, এ, পি
বাংলার নব্য সংস্কৃতি ১।• যোগেশচন্দ্র বাগল বিশ্বভারতী
বাংলার বাউল ২৫৲ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ওরিয়েণ্ট বুক কোং
ব্যঞ্জনা ও কাব্য (২য় খণ্ড ২৲, ৩য় খণ্ড ২।•) হরিহর মিশ্র গ্রন্থ-জগৎ
রবীন্দ্র কাব্যালোক ৫৲ অমিতা মিত্র এ, মুখার্জী
রবীন্দ্রনাট্য-পরিক্রমা ৬৲ অশোক সেন এ, মুখার্জী
রবীন্দ্র-নাট্যসাহিত্যের ভূমিকা ৬৲ সাধনকুমার ভট্টাচার্য জিজ্ঞাসা
রবীন্দ্র-মানস ৩।• অরবিন্দ পোদ্দার ইণ্ডিয়ানা
লেখকের কথা ২।• মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নিউ এজ
শরৎ-সাহিত্যে মূলতত্ত্ব ১।• হুমায়ুন কবীর আই, এ, পি
সনেটের আলোকে মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ ৬৲ জগদীশ ভট্টাচার্য বেঙ্গল পাবলিশার্স
সাহিত্য ও সংস্কৃতি ৪৲ বিমলচন্দ্র সিংহ মিত্রালয়
সাহিত্য-জিজ্ঞাসা ৩।• সরলাবালা সরকার মিত্র ও ঘোষ
সাহিত্য পাঠের ভূমিকা ।• সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত বিশ্বভারতী

* জীবনী *

অবনীন্দ্র-চরিতম্‌ ৫৲ প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর আই, এ, পি
আমাদের শ্রীমা ২৲ সনাতন ভদ্র প্রবর্তক
কবিয়াল এণ্টনি ফিরিঙ্গি ৫৲ মদন বন্দ্যোপাধ্যায় সত্যব্রত লাইব্রেরি
নদীয়ার মহাজীবন ১৮• কৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রবর্তক
নামাচার্য শ্রীরামদাস ৩৲ সুশীলকুমার সেন বি. সি. সেন
বিদ্যাসাগর ৭৲ মণি বাগচী প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী
বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ (১ম খণ্ড ৩৲, ২য় খণ্ড ৭৲ বিনয় ঘোষ বেঙ্গল পাবলিশার্স
রবীন্দ্র-স্মৃতি ৩।• সৌরীন্দ্রমোহন মুখো: শিশির পাব্লিশিং
কথাশিল্পী ৫৲ সৌরীন্দ্রমোহন ঘোষ ভারতী লাইব্রেরী

* স্মৃতিকথা *

আমার কথা ১।• আলাউদ্দীন খাঁ (অনুলেখক শুভময় ঘোষ) গ্রন্থ-জগৎ
আমার দেখা বিপ্লব ও বিপ্লবী ২৮• মতিলাল রায় প্রবর্তক
ইংলণ্ডের ডায়েরি ৪৲ শিবনাথ শাস্ত্রী বেঙ্গল পাবলিশার্স
পুরাতনী ৫৲ ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী আই, এ, পি
বিগত দিন ৩।• উপেন্দ্রনাথ গঙ্গো: বেঙ্গল পাবলিশার্স

* রচনাবলী *

বিদ্যাসাগর-রচনাসম্ভার ৮৲ প্রমথনাথ বিশী সম্পাদিত মিত্র ও ঘোষ
ভূদেব-রচনাসম্ভার ৮৲ প্রমথনাথ বিশী সম্পাদিত মিত্র ও ঘোষ
রমেশ-রচনাসম্ভার ১০৲ প্রমথনাথ বিশী সম্পাদিত মিত্র ও ঘোষ
সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রচনাসংগ্রহ ৪৲ প্রকাশিকা

* ইতিহাস *

পেশোবাদিগের রাজ্যশাসন পদ্ধতি ৩৲ সুরেন্দ্রনাথ সেন এ, মুখার্জী
ভারতীয় মহাবিদ্রোহ ৮৲ প্রমোদ সেনগুপ্ত বিদ্যোদয়
স্বাধীনতার সংগ্রামে বাংলা ৫৲ নরহরি কবিরাজ ন্যাশনাল বুক এজেন্সি
বিজ্ঞানের ইতিহাস (২য় খণ্ড) ১২৲ সমরেন্দ্র সেন ইণ্ডিয়ান অ্যাসো: ফর দি কাল্টিভেশন অব সায়েন্স

* সংগীত *

সুরের গুরু রবীন্দ্রনাথ ২॥০	কালিদাস নাগ	বুক ব্যাঙ্ক
স্বরবিতান (খণ্ড ৫২ — ২॥০, ৫৪ — ৩৲, ৫৫ — ২॥০)	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	বিশ্বভারতী

* পত্রসাহিত্য *

চিঠিপত্র (৬ষ্ঠ খণ্ড) ৪৲	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	বিশ্বভারতী

* নানা নিবন্ধ *

আত্মার আলো ১৲	স্বামী উপানন্দ	প্রবর্তক
ভারত-জিজ্ঞাসা ৩৲	ত্রিপুরাশঙ্কর সেন	জিজ্ঞাসা
ইস্কুলের ইতিবৃত্ত	সুধীরচন্দ্র রায়	প্রবর্তক
ঋগ্বেদের দেবতা ও মানুষ ২॥০	মৈত্রেয়ী দেবী	এম. সি. সরকার
কুটিরশিল্প ও পরিকল্পনা ২॥০	অনাদিনাথ সিংহ	বেঙ্গল পাবলিশার্স
গ্রন্থাগার : কর্মী ও পাঠক ১৲	রাজকুমার মুখোপাধ্যায়	আই. এ. পি
গ্রহে উপগ্রহে ১॥০	বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়	গ্রন্থ-জগৎ
পরিবার পরিকল্পনা ১॥০	কল্যেন্দ্রকুমার পাল	বাসন্তী
পশ্চাৎপট ২॥০	ইন্দ্রমিত্র	ডি. এম
বাংলা দেশের গ্রন্থাগার (১ম খণ্ড) ৮৲	কৃষ্ণময় ভট্টাচার্য	গ্রন্থ-জগৎ
বিচিত্র বিবাহ ৩৲	অমিতাকুমারী বসু	সিগনেট
বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি ২৲	প্রিয়দারঞ্জন রায়	গ্রন্থ-জগৎ
মার্কসীয় অর্থনীতির ধারা ১॥০	পাঁচুগোপাল ভাদুড়ী	ন্যাশনাল
রবীন্দ্র-শিক্ষাদর্শন ৫৲	ভুজঙ্গভূষণ ভট্টাচার্য	বিদ্যোদয়
রূপচিন্তা ৩৲	সুবিমল বসু	সিগনেট
শিক্ষক ও শিক্ষার্থী ২৲	হুমায়ুন কবীর	বেঙ্গল পাবলিশার্স
শিশুর জীবন ও শিক্ষা ৪৸০	শ্রীনিবাস ভট্টাচার্য	আই. এ. পি
সমাজ ও ইতিহাস ৩॥০	সুশোভন সরকার	বাক্

* শিশু সাহিত্য *

এবংপুরের টিকটিকি ১৲	ইন্দ্রনীল চট্টো:	বেঙ্গল পাবলিশার্স
কবরী ১৸০	বনফুল	আই. এ. পি
গল্প আর গল্প ২৲	প্রেমেন্দ্র মিত্র	বিদ্যোদয়
গল্পময় ভারত ৪৲	সুনীল জানা	বিদ্যোদয়
গল্প লেখা হল না ১॥০	চারুচন্দ্র চক্রবর্তী	বেঙ্গল পাবলিশার্স
চিত্রে বুদ্ধ-জীবনকথা ১৲	শৈল চক্রবর্তী	বিদ্যোদয়
ছোটদের শ্রেষ্ঠগল্প ২৲	অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	অভ্যুদয়
ছোটদের শ্রেষ্ঠগল্প ২৲	প্রবোধকুমার সান্যাল	আনন্দ পাব্লিশার্স
ছোটদের শ্রেষ্ঠগল্প ২৲	প্রেমেন্দ্র মিত্র	অভ্যুদয়
দেশ-বিদেশের রূপকথা ২॥০	সুভাষ মুখো:	বেঙ্গল পাবলিশার্স
পুঁথি পুরাণের গল্প ২৲	যামিনীকান্ত সোম	বেঙ্গল পাবলিশার্স
সাইবেরিয়ার শেষ মানুষ	বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	বিদ্যোদয়
সোনার ময়ূর ২॥০	সুখলতা রাও	আই. এ. পি.
স্কুলের মেয়েরা ২৲	পরিমল গোস্বামী	গ্রন্থম্
হলদে পাখীর পালক ২৲	লীলা মজুমদার	আই. এ. পি
হেসে যাও ২৲	বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়	আই. এ. পি

* অনুবাদ *

অঙ্কুর গল্পগুচ্ছ ২৲	বি. বিশ্বনাথম্	গণ সাহিত্য ভবন
এত গান ছিল (মেরিয়ান অ্যাণ্ডারসন) ১৲	অ-কু-রা	চসন্তিকা
ওয়ার্ড নং ৬৲ (শেকভ) ২৲	মণি বসু	গ্রন্থ-জগৎ
কথাগুচ্ছ (পুশকিন) ৩৲		ইষ্টার্ণ ট্রেডিং
কাশতানকা (শেকভ) ১॥০		ন্যাশনাল বুক এজেন্সি
ক্যামিলি (ডুমা) ৩॥০	প্রফুল্লকুমার বসু	বুক এম্পোরিয়াম
ক্যাসানোভার স্মৃতিকথা ৫৸০	শান্তা বসু	আর্ট এ্যাণ্ড লেটার্স
চীনা প্রেমের গল্প ৪॥০	বীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	মিত্রালয়
ছাত্রদের প্রতি (মহাত্মা গান্ধী) ৪॥০		মিত্র ও ঘোষ
তৃষ্ণা (মঁাগ) ৩৲	কল্পনা রায়	আর্ট এণ্ড লেটার্স
প্রথম প্রেম (তুর্গেনেভ) ১॥০		ইষ্টার্ণ ট্রেডিং
বিদেশী গল্পগুচ্ছ ৩॥০	অমিয় চক্রবর্তী সম্পাদিত	অভ্যুদয়
ভীষণ প্রতিশোধ ও অন্যান্য গল্প (গোগোল) ২৲		ইষ্টার্ণ ট্রেডিং
রত্নদ্বীপ (ষ্টিভেনসন) ২॥০	হরিদাস ঘোষ	এ. মুখার্জী
রত্নবলয় (কুপরিন) ৫॥০		ন্যাশনাল বুক এজেন্সি
রুশদেশের উপকথা (তলস্তয়) ২॥০		ইষ্টার্ণ ট্রেডিং
সোনার চাবি (আলেক্সি তলস্তয়) ২৲		ন্যাশনাল বুক এজেন্সি
হিন্দু সাধনা (রাধাকৃষ্ণণ) ৩৲	স্বর্ণপ্রভা সেন	জিজ্ঞাসা

* অভিধান *

পরিভাষা কোষ ১০৲	সুপ্রকাশ রায়	বিদ্যোদয়

পূর্ব বাংলার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের তালিকা

ধরতরঙ্গ	আবুল কালাম শামসুদ্দীন	নওরোজ
নিষ্পত্তি	বেদুইন সামাদ	ঢাকা
প্রেম ও প্রয়োজন	সুনীলকুমার বসু	ইষ্টবেঙ্গল পাবলিশার্স
সহধর্মিণী	মোহাম্মদ শাহজাহান	ফেরদৌস পাব্লিঃ
স্ত্রী-ভাগ্য ভালো	কাজী আবুল হোসেন	লেখাঘর
চেনা মানুষের কথা	তাজাকলম	কোহিনুর
ত্রিস্রোতা	আবুল কালাম শামসুদ্দীন	নওরোজ
হপ্তম পঞ্চম	শওকত ওসমান	কোহিনুর
নয়াজগতের পথে	ইব্রাহিম খাঁ	মল্লিক ব্রাদার্স
পদ্মনদীর পলি মাটি	সৈয়দ আবদুস সুলতান	ময়মনসিংহ
ভাসানী যখন ইউরোপে	খন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস	ন্যাশনাল পাবলিকেশন
যুগস্রষ্টা নজরুল	মঈনুদ্দিন	অক্সফোর্ড ইউঃ লাইব্রেরী
বগুড়ার ইতিহাস	কে. এম. মিছের	অমুঃ অফিস, বগুড়া
মহাবিদ্রোহের কাহিনী	সত্যেন সেন	ঢাকা
মোমেনসাহীর লোকসাহিত্য	রওশন ইজদানী	বাঙলা একাডেমী
কনকচাঁপার কান্না	মোবারক হোসেন	সিটি পাবলিশার্স
ঘোড়ার ডিম	কাজী আবুল হোসেন	লেখাঘর
পুতুলের কান্না	নূরুল আলম	ঢাকা
বুদ্ধির ঢেঁকি	গোলাম রহমান	ইউনিটি বুক এজেন্সি
রূপকথার মায়াপুরী	আসাদ্দুক জোহনী	ঢাকা

লালন ফকিরের গান

[রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত (রবীন্দ্রনাথ-সংগৃহীত) বর্ণানুক্রমিক সুচী]

অ

অজান খবর না জানিলে কিশোরো ফকিরি
অন আদির আদি শ্রীকুষ্ট নিধি
অনেক ভাগ্যর ফলে সে চাঁদ
অন্তরে জার সদায়
অন্তিম কালের কালে ওকি হয় না জানি
অপারের কাণ্ডার নবিজি আমার
অবুঝ মনেরে তোমার হলোনা দিশে
অসার ভেবে সার দিন গেল আমার

আ

আকার নিরাকার সেই রববানা
আগে জাননা ওমুবায় বাজি হারিলে
আছে জার মনের মানুষ মনে
আছে দিন দুনিয়া অচিনক মানুষ একজনা
আছে ভাবের তালা সেই ঘরে
আছে মাএর ওতে জগতপীতা
আজ আমার অন্তোরে
আজ কোরেছে সাই ব্রেক্ষাণ্ডের উপর
আজব আএনা মহল মনিগোভিরে
আজবরং ফোকিরি সাদা সোহাগীনি সাই
আপন ঘরের খবর লেনা
আপন ছুরাতে আদম গঠিলে দয়াময়
আপনারে আপ্নী চিনিলে
আপনারে আপ্নি চেনা জদি যায়
আব হায়াতের নদি কোনখানে
আমাবস্যা দিনে চন্দ্র থাকেন জেয়ে
আমার মনের মানুশের সোনে
আমার মনেরে বুজাই কিশে
আমায় হয়নারে যে মনের মতো মন
আমারে কি রেকবেন গুরু চরণদাসি
আমি কি দোষ দিবো কারোরে
আয়গো যাই নবির দিনে
আয় হায়ালি অমাবস্তি না মেজে
আর কি গৌউর এসবে ফিরে
আর কি বোষবো এমন সাদ বাজারে
আর কি হবে এমন জনম বোষবো সাদুর মেলে
আলেক মাল দিয়েছে

উ

উদার কলিরে ভাই কলি আমি বলি
উপরে সে কাজ দেখরে ভাই

এ

এই মানুসে সেই মানুষ আছে
এক দিন পারের কথা ভাবলিনারে
এক ফুলে চায় রোজ ধরেচে
একবার চাঁদবদনে বলরে সাই
এ কি আএন নবি কয় জারি
এ কি আজগবি এক ফুল
এখন আর ভেবলে কি হবে
একবার জগন্নাথে দেখরে জেএ
এ দেশেতে এই শুক হোলো
এনে মহাজনের ধন
এ বড়ো আজব কুদরতি
এবার কি সাদনে সমনজালা জায়
এবার কে তোর মলেক চিন্‌লীনে আর
এমন দিন কি হবে রে
এমন মানব জনম আর কি হবে
এমন শুভার্গ আমার কবে হবে
এলাহি আলানিন আল্লা
এসোহে অপারের কাণ্ডারি

ঐ

ঐ এক অজান মানুষ ফিরচে দেশে

ও

ওকো তরিকাতে দাখিল না হলে
ও তোর ঠিকের ঘরে ভুল পড়েছে মন
ও দুটি সুরের ভেদবিচার জানা উচিত বটে
ও মন কে তোমারো জাবে সাতে
ও মন তিনপোড়ায় তো খাটি হোলেনা
ও মন দেখে শুনে ঘোর গেলনা
ওরে মন আমার
ও সে কুলের মর্ম জেন্তে হয়

ক

করি কেমনে শুদ্ধ সহজ প্রেমসাদন
কাজ কি আমার এ ছার দলে
কার ভাবে সাম মজে এলো গো
কারে আজ শুদাই সে কথা
কারে দিবো দোষ
কারে বলে অটলপ্রাপ্তী ভাবি তাই
কাল কাটালি কালের বশে

কি আজব কলেরশীক
কি করি কোন্ পথে জাই
কি করি ভেবে মরি মন মাঝি
কিবা রূপের ঝলক দিচ্চে দিদলে
কি রূপ সাদনের বলে অধর ধরা জাএ
কি সাধনে আমি পাই গো তারে
কি সাদনে পাইগো তারে
কিশে আর বোজাই মন তোরে
কি হবে আমারো গতি

কুদরতের সীমা কে জানে
কুলের বউ ছিলাম
কিত্তি কর্মারো খেল বুজতে পারে

কে কথা কওরে দেখা দেয়না
কে তাহারে চিন্তে পারে
কে পারে মকর-উল্লার মকর বুজিতে
কে বুজিতে পারে আমার সাইর কুদরতি
কে বোজে মন মওলার আলোকবাজি
কে বোজে শাইর লিলেখেলা

কোথা আছে রে সেই দিনদরোদি সাই
কোথা রইলে হে ও দয়াল কাণ্ডারি—২
কোনকুলে জাবি মনুবায়
কোন রসে কোন রতির খেলা
কোন রাগে সে মানুষ আছে
কোন শুকে সাই করেম খেলা এই ভবে
ক্রিষ্ট পর্দের কথা করোরে দিশে
ক্রিষ্ট বিনে তেষ্টা তেশী

খ

খাকি আদমের ভেদ সে ভেদ কি পশু বোজে
খেম অপরাদ ওহে দিননাথ

খেল খেল অপরাধ দাসের পানে এবার চাও
খেলচে মানুষ নিয়ে খিয়ে

গ

গুরু দেখায় গৌউর দেখি কি গুরু দেখি
গুরু দোহাই তোমার মনকে আমার
গুরুপদে নিষ্ঠা মন জার হবে
গুরু বস্তু চিনে লেনা
গুরু গুভাব দেও আমার মনে
গৌউর কি আইন আনিল নদীয়ায়
গৌউর প্রেম জথাই আমি বাপ দিএচি তায়
গোসাই আমার দিন কি যাবে এই হালে
গোসাইর ভাব জেহি ধারা

চ

চাতোক সভাব না হলে
চাঁদ আছে চান্দে ঘেরা
চাঁদ ধরা ফাঁদ জাননা মন
চাঁদ বলে চাঁদ কান্দে কেনে
চান্দে চান্দে চন্দ্রগ্রহণ হয়
চারটি চন্দ্র ভাবের ভুবনে
চিনবে তারে এমন আছে কোন ধনি
চিরকাল জল ছেচে
চিরোদিনে দুখেরো আনন্দে
চেএ দেখ্‌নারে মন দির্ষিনজরে

জ

জগত মকতিতে ভোলালে সাই
জদি কানার ফিকির জানা জাএ
জদি গৌউরচাঁদকে পাই
জদি সবায় কাজ্ঞ সিদ্ধি হয়
জা জা কানার ফিকির জেনতো জারে
জানরে মন সেই রাগের করোন
জানা চাই আমাবস্য থাকে চাঁদ কোথায়
জানি মন প্রেমের প্রিমি কাজে পেলে
জিব মলে জিব জাএ কোন সংসারে
জে আমায় পাঠালে এই ভাবনগরে
জেওনা অন্দাজি পন্তে মন রসনা
জে জন দেখেছে অটোল রুপের
জে জন পর্দ্দহিন সরবরে জাএ
জে জা ভাবে সেইরূপ সে হয়
জে জোন সাদকের মূল গোড়া
জেতে সাধ হএরে কাশী কর্ম্মকাশী বাজে গলায়
জে দিন ডিমু ভরে ভেসেছিলো সাই
জেনগে জাঁ গুরুর দ্বারে জ্ঞান উপাসনা
জেনগে মানুষের করোন কিসে হয়
জেনতে হয় আদম ছপির আদ্দিকথা
জেনবো এই পাপি হইতে
জে পন্তে সাই চলে ফেরে—২
জেপোরসে পরসে পরস সে পড়োসো চিনলেনা
জে সাধোন জোরে কেটে জায় কর্ম্মফাসি

ড

ডাকরে মন আমার
ডুবে দেখ দেখি মন কিরূপ নিলে ময়

ত

তিন দিনে তিন মরম জেনে
তুমি কার আজ কেবা তোমার—২
তোমার মতো দয়াল বন্ধু
তোরা কেও জাসনে ও পাগোলের কাছে
তোরা দেখনারে মন দির্ষ্ব নজরে

থ

থাকনা মন একান্তো হোএ

দ

দয়াল নিতাই কারো ফেলে জাবেনা
দাড়া কানাই একবার দেখি
দিনে দিনে হল আমার দিন আখেরি
দিনের ভাব জেদিন উদয় হবে
দিনের ভাব জেহি ধারা
দিনো রেতে থেকো সবরে বাহুসারি
দেখনা এবার আপনার ঘর ঠাউরিএ
দেখলাম এ সংসার ভোজবাজীর প্রকার—২
দেখলাম কি কুদরতিময়
দেখরে আমার রছুল যার কাণ্ডারি
দেখোরে দিনরোজনি কোথা হইতে হয়
দেলদরিয়ায় ডুবিলে

ধ

ধড়ে কোথায় মাক্কা মদিনে
ধরো চোর হাওয়ার ঘরে ফান্দ পেতে
ধরোরে অধর চান্দেরে
ধেনে জারে পাএনা মহামনি

ন

নজোর এক দিগ গেলে আর দিগে
অন্দোকার হয়
নদির তিরধারা
নবি না চিনে কি আল্লা পাবে
নবি না চিনলে কি সে খোদার ভেদ পায়
নবির অঙ্গে জগত পয়দা হয়
নবির আএন রোজা সার্দ্দ নাই
নরেকারে দু'জন মুরি ভেসেছে সদায়
নরেকারে ভেসেছেরে এক ফুল
না জানি কেমন রূপ সে
না জেনে করণকারণ কথায় কি হবে
না জেনে ঘরের খবর তাকাই আচমানে
নাম সাধন বিফল বয়জোক বিনে
না হোলে মন সহোপা কি ফল মেলে
নিচে পর্দ্দ চরকবানে জুগল মিলন

প

পড়বে দাএমি নামাজ এ দিন তোলো আখিরি
পড়ে ভুত মন আর হসনে মহুরায়
পাকি কখন উড়ে জাএ
পাগোল দেয়ানের মোন কি খোন দিএ পাই
পাপধর্ম জদি পূর্ব্বে লেখা জাএ
পারে সামাত্ত কে তারে দেখা
পার করো দয়াল আমার কেশে ধরে
পার করো হে দয়ালচাঁদ আমারে
পারে লোএ জাও আমায়
পারো নিরহেতু সাদনা করিতে
পোরগে নামাজ জেনে শুনে
প্রেমের সঙ্গী আছে তিন

ফ

ফকিরি করবি খেপা কোন রাগে
ফের পলো তোর ফিকিরিতে
ফেরের ছেড়ে করো ফকিরি

ব

বল কারে খুজিব খেপা দেশবিদেশে
বাকির কাগজ গেল হজুরে
বিদেশীরো প্রেম কেউ কোরোনা
বিশয় বিশে চঞ্চলা মন দিবো রজোনি
বিসমিল্লাতো আছেরে মাকাচোকা
বেদে কি তার মর্ম জানে

ভ

ভক্তের দ্বারে বান্দা আছে সাই
ভজো মুরশীদের কদম এইবেলা
ভজোনের নিগুড়কতা জাতে আছ
ভবে কে তাহারে চিন্তে পারে
ভাবের উদয় যে দিন হবে
ভুলনা মন তারো ভুলে
পুলবোনা ২ বলি, কাজের বেলা ঠিক থাকেনা।

ম

মদিনায় রছুল নামে কে এল ভাই
মন আএন মাফিক নিরিক দিতে ভাবো কি
মন আমার কি ছার গৌরব কোরবো ভবে
মন আমার কেউ না জেনে মজোনা
মন আমার তুই করি একি ইতোরপনা
মন কি এহাই ভাবো
মন কি তুই ভোড়্‌য়া কাঙাল জ্ঞান ছাড়া
মন চোরারে ধরবি জদি মন
মন তোর আপন বলতে কে আছে
মন রে আপ্তোতত্ত্বে না জানিলে
মনে না দেখলে নেহাজ কোরে
মনের ভাব বুঝে নবি মর্ম খুলেছে

মনের মানুষ খেলচে দিদলে
মনের মনে হোলোনা একদিন
মনের হোলো মতি মন্দ
মরসিদ জানায় যারে
মরসীদ বলো মনরে পাখি—২
মরশীদ বিনে কি ধন আর আছে—২
মস্নিরে কি আজব কারখানা
মলে ঈশ্বর প্রাপ্তো হবে কেন বলে
মলে গুরু প্রাপ্তো হবে সে তো
মানসের করোণ সে কিরে স্বাধারণ
মানুষ অবিশ্বাসে পাইনেরে
মানুষ ঝলক দিব নেহারে
মানুষ ধরো নিহাররে
মানুষ ভজলে সোনার মানুষ হবি
মায়েরে ভজিলে হয় সে বাপের ঠেকেনা
মুখের কথা কি কিশে চাঁদ ধরা জাএ
মুরশীদ মনি গোজিরে
মুরশীদের ঠাঁই জেনারে সে ভেদ বুজে
মুলের ঠিক না পেলে সাদন হয় কিশে
মেরা রাজের কথা শুদাবো কারে
মরে সাঁইর আজব নীলে খেলা

য

যেখানে সাঁইর বারামখানা
যে জানে কানায় কিকির
যে তাব গোপীর ভাবনা
যে রূপে সাই আছে সে মানুষে
যে সাধনজোরে কেটে জাএ কর্ম্মকাশী—২

র

রংমহলে সিদ কাটে সদায়
রাত পোয়ালে পাকিটে বলে দেরে থাই
রূপের ঘরে অটল রূপ বেহারে
রূপেরো তুলনা রূপে
রেকলে সাই কৃপজল করে
রোছুলকে চিনিলে খোদা চেনা জায়

শ

শুদ্ধ প্রেমরশীক বিনে
শুদ্ধ প্রেমরাগে সদায়
শুদ্ধ প্রেমের প্রিমি মানুষ
শুদ্ধ প্রেমরসের রশীক বেরে সাই
শুমজে করো ফকিরি মনরে
শে জারে বোজায় সেই বোজে

স

সকলি কপালে করে
সড়ো রশীক বিনে কেবা তারে চেনে
সদা এসে নিরাঞ্জন নিয়ে ভাপে
সবায় কি তার মর্ম জেন্তে পায়
সমাএ গেলেরে ও মন সাদন হবে না
সহরে সোলজনা বোমবেটে
সাই আমার কখন কখন খ্যালে কোন খেলা
সাইকে বোজে তোমার অপার নিলে
সাই দরবেষ যারা
সাইর নিলে দেখে লাগে চোমেত্তকার
সার্দ্ধ কিরে আমার সে রূপ চিনিস্তে
সামাগু কি তার মর্ম্ম জানা জাএ
সামাগু কি সে ধন পাবে
সেই অটল রূপের উপাসোনা
সে কথা কি কবার কথা
সে করণ সিদ্ধি করা সামাগু কি হয়—২
সে ভাব উদায় না হলে
সে ভাব সবায় কি জানে
সোনার মান গেলোরে ভাই
সোনার মানুষ ঝলক দেয় দিলে
সোনার মানুষ ভেষচে রসে

হ

হরি কান্দে হরি বোলে কেনে
হাএ কি কলের ঘরখানি বেন্দে
হাএ চিরদিন পুষলাম এক অচিন পাকি
হিরে লাল মতির দোকানে গেলেমা
হুজুরে কার হবেরে নিকাশ দেনা

রেকর্ড-পরিচয়

"হিজ্ মাষ্টার্স ভয়েস" ও "কলম্বিয়া" রেকর্ড কোম্পানি এবার বিশিষ্ট শিল্পীদের গাওয়া রবীন্দ্র-সংগীতের ছ'খানি রেকর্ড প্রকাশ করেছেন :—

হিজ মাষ্টার্স ভয়েস

N 82779—"সখী, আঁধারে একেলা ঘরে" ও "আজ জ্যোৎস্না রাতে"—গেয়েছেন কবিগুরুর স্নেহধন্যা শ্রীমতী কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়।

N 82780—রবীন্দ্র-গীতির অন্যতমা শ্রেষ্ঠ শিল্পী শ্রীমতী সুচিত্রা মিত্রের কণ্ঠে—"আমি যে গান গাই" ও "যদি প্রেম দিলে না প্রাণে।"

N 82781—"বহু যুগের ওপার হ'তে" ও "আজ নবীন মেঘের সুর লেগেছে"—প্রখ্যাত শিল্পী সুবীর সেনের গাওয়া ছ'খানি আকর্ষণীয় রবীন্দ্র-গীতি।

কলম্বিয়া

GE 24888—হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের ভাবগম্ভীর কণ্ঠের ছ'খানি রবীন্দ্র-সংগীত—"নিশীথে কী ক'য়ে গেল" ও "বিদায় করেছ যারে।"

GE 24889—"এসো আমার ঘরে" ও "ভাল যদি বাস সখী"—সুন্দর রূপে পরিবেশন করেছেন চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়।

GE 24890—সুললিত কণ্ঠে কুমারী বনানী ঘোষের গাওয়া ছ'খানি রবীন্দ্র-সংগীত—"অনেক কথা বলেছিলেম" ও "যায় দিন শ্রাবণ দিন যায়।"—

রাঢ়বঙ্গে ঝাঁপান গান

চন্দ্রকুমার

রাঢ়বঙ্গে প্রায় সর্বত্র ঝাঁপান গান প্রচলিত আছে। ঝাঁপান শ্রাবণের শুক্লা পঞ্চমী বা নাগপঞ্চমী তিথিতে গীত হয়। ঝাঁপান সাধারণত দেবী মনসারই স্তব গীতি। রাঢ়বঙ্গে নিম্নশ্রেণীর জনসাধারণ হাড়ি, মুচি, ডোম, বাগ্দী, কৈবর্ত ইত্যাদি সম্প্রদায়ের মধ্যে ঝাঁপান, বা মনসা উৎসবের প্রচলন দেখা যায়।

মনসা বেদোক্ত দেবী নন। তবে ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে মনসার উপাখ্যানে জানা যায়, মনসা দেবী অযোনিসম্ভূতা কশ্যপ মুনির মানসকন্যা।

"কশ্যপ মুনির মনে জন্ম তাঁর হয়
তাই ত মনসা তাঁরে সর্বজনে কয়।"

(ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ)

তিনি অকৃত যোনি। জরৎকারু ঋষির সঙ্গে তাঁহার বিবাহ লৌকিক, কেন না মনসা দেবীকে পরিত্যাগ করিবার কালে ব্রহ্মা মহেশ্বর প্রভৃতি দেবগণের উপদেশে জরৎকারু মনসার নাভিদেশ স্পর্শ করে গর্ভসঞ্চার করেন। এই যোনি সংসর্গহীন স্পর্শের ফলে পুত্র আস্তিকের জন্ম হয়। রাজা জনমেজয় তক্ষক কর্তৃক দষ্ট হয়ে পিতা পরীক্ষিতের মৃত্যুশোকে কাতর হয়ে নাগনিধন যজ্ঞ আরম্ভ করেন। পরিশেষে মনসা ও আস্তিকের প্রচেষ্টায় সর্পকুল ঐ নিধনযজ্ঞ হ'তে রক্ষা পায়। ইহাই মনসার উপাখ্যান। মনসা বিভিন্ন নামে বিভিন্ন

স্থানে পরিচিত। কোথাও তিনি কর্কোনাগ, (কর্কট নাগ) কোথাও তিনি বিষহরী।

"হরিতে পারেন তিনি বিষের হরণ,
বিষহরী নামে তাই ডাকে সর্বজন।"

(ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ)

অনেক স্থানে প্রতি পঞ্চমী তিথিতেই দেবী মনসার উদ্দেশ্যে পূজা দেওয়া হয়। অনেক গ্রামে অরন্ধন প্রভৃতি নানাবিধ অনুষ্ঠানের মধ্যে মনসা দেবীর উদ্দেশ্যে ব্রত উদ্‌যাপন করতে দেখা যায়।

শ্রাবণের শুক্লা পঞ্চমীতে লোকে দেবীর উদ্দেশ্যে পূজা দেয়। হাজার হাজার পাঁঠা বলি হয় দেবীর থানে (স্থানে) প্রায় সর্বত্র একটি মনসাসিজু কিংবা বটগাছের নীচে দেবীর পূজা হয়। কোন মন্দির নাই, নাই কোন দেবীর বিগ্রহ শুধু, আছে স্থানটুকু আর মাচাস্থা। হুগলী জেলার ইনছুড়া গ্রামের মনসাপূজা উপলক্ষে একটি বিরাট মেলার সমাবেশ হয়। পনের, বিশ মাইল দূর হ'তে এই মেলায় জনসমাবেশ হয়। নানাস্থানের নানা মানত থাকে। সাধারণের বিশ্বাস, দেবীর কৃপায় অপুত্রকের পুত্র হয়। রোগীর সারে রোগ। গৃহ সর্পহীন হয় এবং সর্পভয় দূর হয়। আর তাচ্ছিল্য করলে? চাঁদসদাগরের দুঃখের কথা মনে পড়ে ওদের।

ধর্মরাজ ঠাকুরের মত দেবী মনসার পূজা তথাকথিত ভদ্র সমাজে তাদৃশ প্রচলন নাই। সমাজের নিম্ন শ্রেণীর জনসাধারণ এই সব উৎসবে প্রচুর উৎসাহ ও শ্রদ্ধা দেখাইয়া থাকে। মনসাকে বৌদ্ধতন্ত্রের দেবী বলিয়া অনুমান করা অন্যায় নহে। পরে সম্ভবতঃ গুপ্তযুগে মনসাকে হিন্দুগণের দেবী বলে স্বীকার করা হয়েছে।

নাগপঞ্চমীর শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ ঝাঁপান গান। ঝাঁপান শব্দটি সম্ভবতঃ ঝাঁপি (চুবড়ী, কিম্বা পিটারী-হিন্দিশব্দ) শব্দ হইতে উৎপত্তি হয়েছে। সর্প-কুলকে বেদেরা ঝাঁপির মধ্যে সংরক্ষণ করে। ঝাঁপান গান প্রকারান্তরে মনসারই স্তব গান। এই সমস্ত গান ঐ অশিক্ষিত নিম্নশ্রেণীর লোকেরাই রচনা করে থাকে। এই সমস্ত রচনায় হয়ত ছন্দে গরমিল থাকে, আঞ্চলিক ভাষার উচ্চারণ বিকৃতিতে সাধু ভাষা হতে কিছুটা বিকৃত শোনায়, কিন্তু ভাবের গভীরতায় বেশ সমৃদ্ধ। তারা নিরক্ষর। কিন্তু রামায়ণ মহাভারত শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ ইত্যাদিতে জ্ঞান বেশ প্রখর।

নাগপঞ্চমীর দিন দেবীর নিকট বলি দেবার পাঁঠার মণ্ডু নিয়ে কাড়াকাড়ি করতে করতে ওরা এক আসুরিক মত্ততায় নেচে উঠে। ঢোল, কাঁসি প্রভৃতি বাদ্যের সঙ্গে মনসার স্তব-স্তুতি গাইতে থাকে, তখন আর চাষ আবাদ, সংসার-পুত্র পরিবার অভাব-অনটন কোন কিছুতেই তারা বাঁধা পড়ে থাকতে চায় না। মাত্র এই একটি দিনের জন্য সর্বস্ব বিসর্জন দিয়ে আনন্দিত চিত্তে দেবী মনসার স্তব গান করে।

"রাজা পরীক্ষিৎ কুকর্ম করিলে?
মুনির গলায় মরা সাপ কেন তুলে দিলে?
সর্পাঘাতে পরীক্ষিতের তনু হল হারা,
জনমেজয় কুমার হলেন জীয়ন্তে মরা,
জনমেজয় কুমার বলেন যতেক দেবগণ,
সবার সাক্ষাতে আমি করি নিবেদন।" ইত্যাদি

অন্য একটি গানে মনসার স্তবে বলা হয়েছে

"জয় জয় মা মনসা, জয় জয় বিষহরী,
আস্তিকমুনির জননী মা গো, দেবী নাগেশ্বরী।" ইত্যাদি

কাটোয়া মহকুমার বনকাপাসী গ্রামের জনৈক ঝাঁপান গায়কের নিকট সঙ্গীত দুইটি সংগৃহীত হয়েছে। ঝাঁপান রাঢ়বঙ্গের লোক-সঙ্গীতগুলির মধ্যে অন্যতম। বর্তমানে নানা অবস্থা বিপর্য্যয়ে এই সঙ্গীতগুলির মধ্যে রাঢ়বঙ্গের লোকসংস্কৃতির অনেক কথা, অনেক ইতিহাস প্রচ্ছন্ন রয়েছে। কালক্রমে এই সঙ্গীতগুলি হয়ত চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে ইতিহাসের 'মমি' হিসাবে সাক্ষ্য দেবে। এইগুলির সংরক্ষণের প্রয়োজন আছে। বর্তমান প্রবন্ধে আমি এই বিষয়ে অগ্রণী হতে দেশের যুব সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

আমার কথা (৪০)

শ্রীমতী কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রায় শান্তিনিকেতনের আলো, বাতাস, মাটি ও জলে লালিত-পালিত যে শিশু—বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের স্নেহচ্ছায়ায় বর্দ্ধিত যে কিশোরী—গুরুদেবের আশ্রমে শিক্ষা-দীক্ষা, ললিতকলা ও সঙ্গীত-সাধনা যে দুহিতার—উত্তরকালে সেই কন্যাকে আমরা পেয়েছি ত্রুটিহীন রবীন্দ্র-সঙ্গীতশিল্পী হিসাবে শ্রীমতী কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাধ্যমে। নামটিও কবিগুরুর দেওয়া—যেন রত্নহার।

আজ এই আত্মপরিচয় দেওয়ার যুগে কেহ যদি নিজের কথা বলতে সঙ্কুচিত হন—বিশেষতঃ যাঁর নাম সঙ্গীতজ্ঞ মহলে পরিচিত—

তবে বিস্ময়ের সীমা থাকে না। কথায় কথায় যা জানলুম তা লিপিবদ্ধ করছি পাঠক-পাঠিকার উদ্দেশ্যে :

আমি তো জন্ম থেকেই শান্তিনিকেতনে—দাদামশায়রা প্রথম থেকেই যুক্ত ছিলেন আশ্রমের সঙ্গে। দাদামশায় যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বড় ভাই রাজেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের (১৯০২—২৪) শিক্ষক ও ম্যানেজার ছিলেন। বাবা শ্রীসত্যচরণ মুখোপাধ্যায় এঁদের সঙ্গে যোগ দেন এবং ১৯২১ সন থেকে আজ পর্য্যন্ত বিশ্বভারতী গ্রন্থাগারের কর্মিরূপে রয়েছেন। মা ও বাবা বরাবর বেশ গান গাইতেন। সঙ্গীত পরিবেশে মানুষ হয়েছি—তাই জীবনের নিত্য-নৈমিত্তিকের সঙ্গে গান মিশে গেছে আমার মধ্যে। কিন্তু গানে হাতেখড়ি হয়েছে সুধাদি'র কাছে (শ্রীপ্রভাত মুখোপাধ্যায়ের স্ত্রী)। তিনিই ছোটদের নিয়ে নানা অনুষ্ঠান করতেন। পাঁচজনের সঙ্গে শিখেছি—পাঁচজনের মধ্যে মানুষ হয়েছি। তখন দূর থেকে দেখতাম গুরুদেবকে। কাছে যাওয়ার কথা মনেও আসত না—বুঝিনি তাঁর মহিমা তখন। হঠাৎ একদিন ভিন্নপরিবেশে গিয়ে পড়লাম তাঁর সামনে। এক বিকালে ঈশান কোণে কালো মেঘের ঘনঘটা দেখে মনে হল ঝড় আসবে, ছুটলাম 'উত্তরায়ণ'এর দিকে। আশে-পাশের গাছ থেকে যে আম পড়ছে টুপটাপ করে। আম কুড়াচ্ছি কোঁচড়ে। এল বৃষ্টি। 'শ্যামলী'র পাশে এসে দাঁড়ালাম ভয়ে ভয়ে মাথা বাঁচানর জন্ত। অন্ত পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন সেই দূরের মানুষ রবীন্দ্রনাথ—প্রকৃতির রূপে আত্মভোলা। হঠাৎ ডাকলেন, 'ভিতরে আয়।' তখন চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছি আর ভাবছি কখন পালাব। কেন বললেন কবিগুরু, 'কি যে, গানটান করিস না'? না বলি কি করে! গাইলাম ধীরেন্দ্রলাল রায়ের কাছে শেখা হিন্দী গান। সুর ছিল বেহাগ। খুব খুসী হলেন শুনে। সেই খুসীর আলোর ছোঁয়া লাগল আমার জীবনে। পিতৃদত্ত নাম 'অণিমা' শুনে বদলিয়ে দিলেন 'কণিকা'। সেই যে তাঁর স্নেহের কণিকা পেলাম, তাই আমায় পূর্ণ করে দিতে লাগল দিনে দিনে। এর পর সকল অনুষ্ঠানে আমায় বিশেষ ভাবে অভিনয় শেখাতে লাগলেন নিজে। বড়দের যখন গান শোনাতেন, আমারও ডাক পড়ত। মনে পড়ে প্রথম পাবলিক ষ্টেজে (ছায়া সিনেমা) আমার ১১।১২ বছর বয়সে 'বর্ষামঙ্গল' অভিনয়ে অংশগ্রহণ। গান গাইলাম 'ছায়া ঘনাইছে বনে বনে'। পাছে ভয় পাই—তাই কবিও গাইলেন আমার সঙ্গে। আশ্রমের বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিক পাশ ও সঙ্গীতভবন থেকে রবীন্দ্রসঙ্গীতে ডিপ্লোমা প্রাপ্তি প্রায় একসঙ্গেই হয়। ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী, ও দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শান্তিদেব ঘোষ, শৈলজারঞ্জন বাবু, অমিতা সেন, রমা কর ও সর্বোপরি গুরুদেব—এঁদের কাছে রবীন্দ্রসঙ্গীত শিখি। রাগসঙ্গীতে শিক্ষা পাই হেমেন্দ্রলাল রায়, ক্ষিতীশ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ভি, ভি, ওয়াজেলওয়ারের নিকট। গুরুদেবের নিকটে অভিনয় শিখি এবং 'তাসের দেশ', 'নটীর পূজা', 'মায়ার খেলা' ইত্যাদিতে তিনিই শিক্ষা দেন। ১৯৪৩ সালে সঙ্গীতভবনে সহ-শিক্ষিকা নিযুক্তা হই। উক্ত বৎসরই আকাশবাণীতে প্রথম গান গাই 'আমি রূপে তোমায় ভোলাব না' ও 'বন্ধু রহ রহ সাথে।' দু'টোই রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং আমায় শিখাইয়াছিলেন। আকাশবাণীর অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্ত দিল্লী, নাগপুর, পাটনা, শ্রীনগর, মাদ্রাজ প্রভৃতি সহরগুলিতে যেতে হয়েছে। যেখানেই গিয়াছি একথা মনে করেই তৃপ্তি পেয়েছি যে আমার সকল শিক্ষার গুরু, কবির গান শোনাতে চলেছি জীবনের পুণ্যব্রতরূপে। তাঁহার স্বামীর কথায় স্বাভাবিক লজ্জায় জানালেন, শ্রীবীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় শান্তিনিকেতনকে খুবই ভালবাসেন, প্রাণের তাগিদে কমার্স পড়া ছেড়ে এখান থেকে বাংলায় এম, এ দেন। শান্তিনিকেতনে সহ-গ্রন্থাগারিক হিসাবে রয়েছেন। মাঝে সরকারী বৃত্তি নিয়ে য়ুরোপ ও আমেরিকা ঘুরে আসেন। আমার সকল প্রচেষ্টায় ওঁর সাহায্য আছেই। আমাদের দু'জনায় লেখা 'রবীন্দ্র সঙ্গীতের ভূমিকা' পুস্তকটি বর্ত্তমান মাসে প্রকাশিত হইয়াছে। রবীন্দ্র সঙ্গীত সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে লেখার সঙ্কল্প আছে আমাদের। রবীন্দ্রনাথের কথায় পুনরায় বললেন, বড় হয়ে তাঁকে আরও নিবিড় সান্নিধ্যর মধ্যে পেতে না পেতেই তিনি চিরবিদায় নিলেন। এক এক সময় মনে হয়, আরও কিছুদিন আগে যদি পৃথিবীতে আসতুম, কত বেশী জানতুম, দেখতুম ও পেতুম তাঁর কাছ থেকে। তবু যা পেয়েছি—তার তুলনা নাই। তাঁরই সৃষ্ট আশ্রমে মানুষ হয়েছি আমি। জীবনের সকল সৌন্দর্য্যবোধ হয়েছে আমার এখানে। একে বাদ দিয়ে আমার জীবন কল্পনা করিতে পারি না। তাই আশ্রম-দেবতার কাছে প্রতিনিয়ত প্রার্থনা—যেন শেষ দিন পর্য্যন্ত এখানে থাকতে পারি। গুরুদেবের গান শোনাবার ও শেখাবার যতটুকু ভার পেয়েছি, তা আমার সৌভাগ্যদ্যোতক বলে মনে করি। এই দায়িত্ব যেন শেষ পর্য্যন্ত বইতে পারি, এই আমার একান্ত প্রার্থনা। "মাসিক বসুমতী"র তিনি একজন নিয়মিত পাঠিকা।

শ্রীমতী কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়
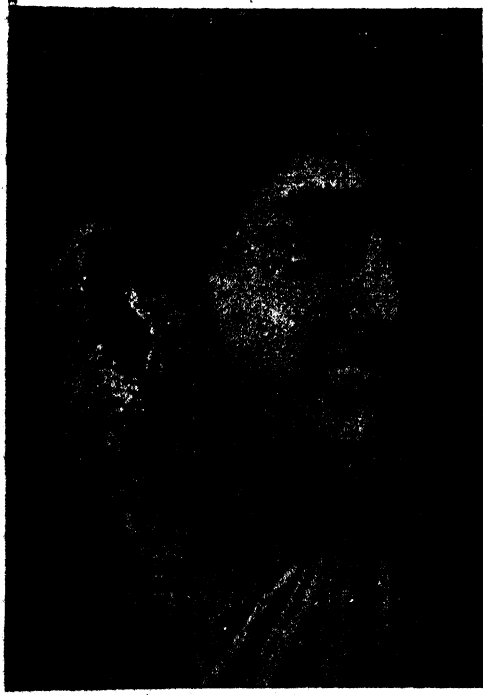
আটত্রিশ

মঞ্জরী সমুদ্রের ওপর গোপালপুরে চলে গেলো শ্যামচাঁদ গড়াইয়ের সঙ্গে। আর মঞ্জরীরই প্রাসাদের এক মহলে বেলারাণীর ঘরের মেঝেয় বসে পুরোনো জিনিষপত্তরের ধুলোর মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়লো দুলুবাবু। বেলারাণী একসময়ে আর তিষ্ঠতে না পেরে জিজ্ঞেস করে: কি সাতরাজার ধন মাণিক খুঁজছ ওই নোংরার মধ্যে শুনি? মাথা না তুলেই, তখনও জঞ্জাল ঘাঁটতে ঘাঁটতে দুলুবাবু জবাব দেয়: তোমাকে এক সময়ে কতকগুলো ছবি রাখতে দিয়েছিলাম মনে আছে?—হ্যাঁ, মঞ্জরীর তো? বেলারাণীর প্রশ্ন।—হ্যাঁ, মঞ্জরীর সেই ছবিগুলো কোথায়?—তা, বললেই হয় সেকথা,—আলমারীর চাবিগোছা হাতে নিয়ে পাশের ঘরে যায় বেলারাণী। যেতে যেতে মুখঝামটা দেয় দুলুবাবুকে: তোমার ধারণা ওগুলো ওই জঞ্জালের মধ্যে কোথাও আছে? কেন আমাকে জিজ্ঞেস করতে মনে বাধছিলো বুঝি? মরি নি তো এখনও, যতো সব আদিখ্যেতা!

সত্যিই মানে বাধছিলো দুলুবাবুর। মঞ্জরীবালার একমাত্র বাবু ছিলো যখন দুলুবাবু, তখনকার সেই মঞ্জরীবালার ছবি। উত্তেজক ছবি। মঞ্জরীর সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন দুলুবাবু একসময়ে ছবিগুলো এনে রেখে দিয়েছিলো বেলারাণীর জিম্মায়। কখনও কখনও বেলারাণী না থাকলে ছবিগুলো সামনে নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা স্মৃতির রোমন্থন করতো দুলালচাঁদ দত্ত। সে-ও আজ অনেক দিন হলো। দেখতো নিজের খেয়ালে; খুশীতে। একমাত্র সেণ্টিমেণ্টাল মূল্য ছাড়া সে ছবির দাম ছিলো না কানাকড়িও। কোনও দিন তা আর কোনও কাজে লাগবে, অলৌকিকতম কোনও স্বপ্নেও তার ছিলো না কোনও সম্ভাবনা। আজ সেই অসম্ভব সম্ভব হতে চলেছে। সম্ভাবনা বাস্তবের দরজায় এসে কড়া ধরে নাড়ছে দুলুবাবুর জীবনে। অগ্নিমূল্য আজ সেই মঞ্জরীবালার হেলায়-ফেলায় ফেলে রাখা ছবিগুলোর। মঞ্জরীবালা আর মঞ্জরীবালা নেই,—মঞ্জরী দেবী সে অনেক দিন। আর কয়েক দিন বাদেই হবে শ্রীমতী মঞ্জরী মিত্র। এবং শ্রীযুক্ত আলোক মিত্রের কাছে মঞ্জরীর দাম যতই হোক, মঞ্জরীবালার এই ছবিগুলোর দাম নিশ্চয়ই অনেক, অনেক বেশী হবে।

ছবিগুলোকে দুনিয়া থেকে মুছে দিতে হবে। দুলুবাবুর স্মৃতি থেকে। অগ্নিপরীক্ষায় সীতাকে উত্তীর্ণ করাতে রামচন্দ্রকে কম দাম দিতে হয়নি। মঞ্জরীর ছবিগুলোকে আগুনে দেবার জন্যে আলোক মিত্রই বা কম দাম দেবে কেন? আলোকের সঙ্গে মোটামুটি একটা পাকা কথা ইতোমধ্যে দুলুবাবু করেছে। দামও মোটামুটি ঠিক হয়েছে একটা। এখন ছবিগুলো নেগেটিভ শুদ্ধ আলোকের হাতে তুলে দিতে পারলেই দাঁও মিলে যায় হাতে হাতে। আজ ক'দিন ধরে আকাশ-পাতাল চুঁড়েও বেলারাণীর অনুপস্থিতিতে ছবিগুলোর কিনারা করতে পারেনি। আজ বেলারাণী বর্তমানেই জঞ্জালের মধ্যে শেষ চেষ্টা করছিলো দুলুবাবু। নিজে-নিজেই চেষ্টা করবার কারণ আর কিছুই নয় প্রস্তাবটা জানতে পারলে বেলারাণী রাজি না হতে পারে এমন একটা আশঙ্কা ছিলো দুলুবাবুর। বেলারাণী বোকা। বেলারাণী নিজের আখের নিজে খুইয়েছে। যে-ডালে বেলারাণী বসেছিলো সেই ডালে নিজের হাতে কোপ বসিয়েছে। না হলে মঞ্জরীবালা হতো না মঞ্জরী দেবী। বেলারাণী হতো, বেলা দেবী, হয়তো শ্রীমতী বেলারাণী দত্তও।

নীলকণ্ঠ

হয়তো ভাবতে-ভাবতে দুলুবাবুর খেয়াল থাকে না মঞ্জরীবালা মঞ্জরী দেবী না হয়ে উঠলে দুলালচাঁদ দত্তের সঙ্গে বেলারাণীর সম্বন্ধ হতো না ঘনিষ্ঠ কখনও। তার জন্যে দুলালচাঁদের কল্পনার ঘোড়াকে গর্দভ মনে করা ভুল হবে। পৃথিবীতে সব পুরুষই ছ্যাকরা গাড়ীর ঘোড়াকেই কল্পনার লাগাম লাগিয়ে পক্ষিরাজ বানাতে চেয়েছে চিরকাল। আর চিরকালই লাগাম ছিঁড়ে ঘোড়ার সঙ্গে ঘোড়সওয়ার মাটিতে গড়াগড়ি গেছে মুখ থুবড়ে মরবার জন্যে। তবুও বাসনার মৃত্যু হয় নি। আজও পুরুষ মানুষ দিগ্বিজয়ের স্বপ্নে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য। দুলুবাবু যাই হোক, পুরুষ মানুষ তো!

দুলুবাবু যত নির্বোধই হোক, বেলারাণী সম্বন্ধে তার আশঙ্কা যে অমূলক নয়, তার প্রমাণ হাতে হাতে পেতে দেরী হলো না একটুও। আলমারীর ডালার ফোকরে চাবি লাগিয়েও চাবি ঘোরালো না বেলারাণী। ফিরে এলো সে ঘরে, দুলুবাবু ছটফট করছে অধীর অপেক্ষায়, সেই ঘরে খালি হাতে।—ছবিগুলো কি দরকার বলো তো?

এমনই,—দুলুবাবু আড়মোড়া ভাঙবার অভিনয় করে ব্যাপারটা সহজ করতে।

উঁ-হুঁ,—এমনই নয়! বেলারাণী হাসে: এমনই হলে চেয়ে নিতে আমার কাছে, নিজে খুঁজে মরতে না—

আচ্ছা, আর কি জন্যে হতে পারে? দুলুবাবু মরীয়া।

সে কথা তো তোমার বলবার,—বেলারাণী আবার হাসে।

নিরুত্তর দুলুবাবুকে এবার বেলারাণী জবাব দেবার হাত থেকে অব্যাহতি দেয়, অত্যন্ত কঠোর অথচ অত্যন্ত শান্ত গলায় শুধু বলে: ছিঃ!

একটি ছিঃতে কুঁকড়ে এতটুকু হয়ে গেলো দুলালচাঁদ দত্ত। একটি সামান্য কথায়; একটি অসামান্য ভর্ৎসনা মাটিতে মিশিয়ে দিলো দুলুবাবুর বাসনার মানুষকে; চুপসে দিলো মুহূর্তে। বেলারাণী ওই ছিঃ ছাড়া তখনও একটি কথাও বলে নি। কিন্তু তারই মধ্যে ব'লে নিয়েছে সব। ব'লে নিয়েছে যে দুলালচাঁদ দত্তের মনের অন্তস্তল পর্যন্ত চিরে দেখে নিয়েছে বেলারাণী। মঞ্জরীবালার ছবিগুলো চড়া দামে আলোকের কাছে বেচবার কুৎসিততম প্রস্তাবের ওপর ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিলো দুলালচাঁদের মেয়েমানুষ বেলারাণী।

একটু সামলে নিয়ে নিজেকে বেলারাণী বললো: আমাদের দুজনেরই কোথাও ভুল হয়েছে দুলুবাবু! তুমি ভেবেছ আমি শুধুই বেশ্যা, আর আমি মনে করে এসেছি তুমি বুঝি পুরোপুরিই ভদ্রলোক। কিন্তু আজ দেখা যাচ্ছে তা নয়। আমাদের দুজনেরই ভুল হয়ে গেছে। যাক। আমি বেশ্যা না হলে এ প্রস্তাব তুমি আমার কাছে করতে সাহস করতে না। কিন্তু একটা কথা স্পষ্ট করেই তাহলে তোমাকে বলি দুলুবাবু! তোমাদের ভদ্রলোকের ভগবান বড় ভালো; বড় দয়ালু। তাঁর সব সয়। আমাদের বেশ্যাদের ভগবান অত দয়ালু নন। তিনি সব সন না। আর যার নুণ খাই, যার কাছে আশ্রয় পাই, তার গুণ না গাই তার সঙ্গে নেমকহারামী করলে আমাদের ভগবান সন না; কিছুতেই সন না।

দুলালচাঁদ এতক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছে। বেলারাণী থামা মাত্রই হাততালি দিতে দিতে দুলুবাবু বলে ওঠে; বাঃ বেলারাণী, বাঃ! কে বলে মঞ্জরীর চেয়ে তুমি কমতি যাও অভিনয়ে? এনকোর, এনকোর! আবার বল বেলারাণী, আবার শুনি।

বেলারাণী এবারে এগিয়ে এসে দুলুবাবুর হাতে একখানা খাম দেয়। দিয়ে বলে: একটু মজা করে দেখছিলাম তোমার মুখের চেহারা কেমন হয়। নাও, আর দগ্ধাবো না,—তোমার জিনিষ তুমি নাও।

খামখানা প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে ছিঁড়ে ফেলে দুলালচাঁদ। ছিঁড়ে ফেলতেই ভেতরের জিনিষ বেরিয়ে পড়ে। না। ছবি নয়। কয়েকখানা একশো টাকার নোট। একদম নোতুন। করকরে।

বেলারাণী হাঁ-হয়ে-যাওয়া দুলুবাবুকে ছুঁড়ে দেয় আরো কয়েকটা কথা: কই? এবারে হাততালি দিয়ে উঠলে না দুলালচাঁদ বাবু! থেমে গেলে কেন? বলো আমি মঞ্জরীর চেয়ে বড় অভিনেত্রী কি না? তুমি বলো,—আবার বলো,—আমি শুনি।

হতবাক হয়ে গেছে দুলুবাবু।

যাও, এখানে আর এসো না কোন দিন। ছবিগুলো বেচে টাকা চেয়েছিলে,—টাকা পেয়ে গেলে। ওর চেয়ে বেশী টাকা তোমাকে আলোক বাবু দিতো না। আর শুনে যাও, আমরা বেশ্যা—জন্ম থেকেই আমাদের জাত, ধর্ম, সমাজ গেছে। কিন্তু ওই একবারই গেছে। আর তোমরা ভদ্রলোক,—তাই তোমাদের জাত, ধর্ম, সমাজ একবারে যায় না,—বারে বারে যায়,—আমার কাছে হাত পেতে টাকা নিতে অনেক বার না হয়ে গেলোই! বাড়ী গিয়ে গঙ্গাজলে ধুয়ে নিও, দেখবে আর দাগ নেই। আর টাকা? বাজারে ভাঙাতে গিয়ে দেখো,—বেশ্যার আর ভদ্রলোকের টাকার একই দাম,—এক আধলাও কম নয় আমার দেওয়া টাকার দাম—

দরজা বন্ধ করে দেয় বেলারাণী দড়াম্ করে। দুলালচাঁদ চট্ করে খাম থেকে নোটগুলো বার করে গুণতে বসে। এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ—

যতখানি উল্লসিত হয়েছিলো দুলুবাবু, নোটগুলো হাতে পেয়ে ঠিক ততখানি চুপসে গেলো আলোক মিত্রের সামনে। আলোককে দুলুবাবু খোলাখুলি জানিয়ে দিতে বাধ্য হলো যে, বেলারাণী ছবিগুলো দিতে চাইছে না। আলোক একটু উত্তেজিত হয়ে বললো: বললেই পারতেন মশাই আরও টাকা চান,—এই প্যাঁচ কষার দরকার ছিলো না। সাফ-সাফ ঝেড়ে বলুন দেখি একবার,—ঠিক কত চান ছবিগুলোর জন্যে? দুলুবাবু এবারে ক্ষেপে গেলো; সবাইকে একরকম ভাবেন কেন বলুন দেখি মশাই! দামের জন্যে প্যাঁচ কষিনি; আপনার কাছে যে টাকা পাবার কথা সে টাকা পেয়ে গেছি, এই দেখুন বেলারাণীই দিয়েছে। ছবি সে ছাড়বে না—মঞ্জরীর ওই সব ছবি বেচলে নাকি নেমকহারামী করা হবে, বেলারাণীর মুখেই শুনতে পারেন গিয়ে, আমার কথা যদি বিশ্বাস না হয়।

বেলারাণীর কাছেই গেলো আলোক শেষ পর্যন্ত। হয় দুলুবাবু ধাপ্পা দিচ্ছে,—নয় বেলারাণী চোরের ওপর বাটপাড়ি করতে চায়। দেখা যাক কোনটা সত্যি। যেটাই সত্যি হোক আলোক ছবিগুলো চায়, যত দামই হোক সেই ছবির। বেলারাণীর কাছে গিয়ে কোন ভণিতা না করেই বললো: ছবিগুলো দিচ্ছ না কেন? কি চাও তুমি?

বেলারাণীর মুক্তোর মতো দাঁত হাসলো: কোন ছবি?

আলোক: ন্যাকামি রাখো,—মঞ্জরীর ছবিগুলো আমার চাই—

বেলা: বেশ তো। চাই তো, নিয়ে যান—

বেলারাণী ছবিগুলো এনে দিলো আলোকের হাতে।

আলোক: কত দিতে হবে?

বেলা: কি?

আলোক: টাকা? দাম?

পকেট থেকে নোটের তাড়া বার করলো আলোক। মুক্তোর মতো দাঁত এবার উচ্ছ্বসিত হাসিতে ঝলমলিয়ে উঠলো: ওগুলো রেখে দিন,—মঞ্জরীর বিয়েতে কিছু গড়িয়ে দেবেন, জিজ্ঞেস করলে বলবেন, তার গরীব বোনের উপহার।

যুদ্ধ করতে এসে নিরস্ত্র শত্রুকে হাসতে দেখলে মনের যে অবস্থা হয়, আলোকের মনের এখন সেই অবর্ণনীয় অবস্থা।

মুক্তোর দাঁতই আবার ঝিকমিকিয়ে উঠলো; যা ভেবেছিলেন, তা নয়। দোহাই আপনার আর ভাববেন না। না কি আবার নতুন করে ভাবনা সুরু হল? আমাদের জাতের কেউ টাকা নিলে তবু একরকম, টাকা না নিলে আপনাদের মতো লোকের বোধ হয় ভাবনা বাড়ে। বোধ হয়, বোধ হয় কেন, নিশ্চয়ই নতুন করে অঙ্ক কষতে সুরু করেন যে আবার আরও জটিল কোনও প্যাঁচে জড়িয়ে পড়তে যাচ্ছেন। আপনারা এত জানেন আর এটুকু জানেন না যে অঙ্ক ঠিক কষলে তার উত্তর মেলে কিন্তু জীবনের আঁক ঠিক কষলেও তার উত্তর অনেক সময় কেন কে জানে বেঠিক হয়ে যায়,—কিছুতেই মেলে না। যাক,—যেতে দিন ও-সব কথা। এবার আমার একটা কথার জবাব দেবেন? মঞ্জরীকে আপনি যদি

বিয়ে করে ঘরে তোলেন তাহলে, আপনি তো ছেলেমানুষ নন, জেনেশুনেই ভুলবেন সে কি এবং কে। এবং তাই জানতাম বলেই তো ভেবেছিলাম আপনি মরদ। ভেবেছিলাম আপনি সত্যি সত্যি ভালোবেসেছেন। কারণ, ভালোবাসা কোনও জাতকুল ঠিকুজি-কুষ্ঠী মেনে চলে না। কিন্তু এখন তো দেখছি আপনি মোহে পড়ে মঞ্জরীকে বিয়ে করতে চলেছেন। মোহে পড়ে মঞ্জরীকে বিয়ে করবার পর যত শক্ত ভিতের ওপরই বাড়ী খাড়া করুন, তাসের ঘরের মতো আপনাদের সংসার একদিন ধূলোয় লুটোপুটি খাবে। আগে নিজের মন ঠিক করুন, তারপর মন দেওয়া-নেওয়া করবেন। এত কথা কেন আজ বলছি মনে হতে পারে আপনার। বলছি এই জন্তে যে, আপনি লেখাপড়াজানা মানুষ হয়ে ভুলুবাবুর কাছে মঞ্জরীর গোপন ছবি আছে শুনে কিনতে যাচ্ছিলেন? আশ্চর্য! আপনার এত বুদ্ধি আর এটুকু মাথায় ঢোকে না যে ভুলুবাবু সারাজীবন এই ভয় দেখিয়ে টাকা নিতে পারে। ভুলুবাবু ছাড়াও এমন ছবি মঞ্জরীর অন্ত আরও অনেকের কাছে থাকতে পারে। থাকলোই বা! তাতে কি যায়-আসে,—আপনার ভালোবাসা যে খাঁটি তার প্রমাণ ছাড়া ও ছবিগুলোয় আর কিসের প্রমাণ থাকবে? সব জেনেও যে আপনি মঞ্জরীকে গ্রহণ করবেন, এইতেই তো আপনার জিত আলোক বাবু! মঞ্জরী যা মঞ্জরী তা-ই, এই বিশ্বাসে, এই গৌরবে যদি তাকে গ্রহণ করতে না পারেন, তাহলে সারা জীবন মঞ্জরীর নয়, মঞ্জরীর ছবিরই দাম দিয়ে যাবেন কেবল! তাই বলছি, মঞ্জরীকে গ্রহণ করবার আগে প্রস্তুত হন। হিসাব করে নিন, দাম বেশী কার, আসল মানুষটার না তার অবস্থা বিপর্যয়ের কয়েকখানা নোংরা ছবির?

মুক্তোর মতো সেই দাঁতের ঝিকিমিকি আর নেই! চোখের পাতা শুধু চিকচিক করছে এখন।

সমুদ্রের ওপর গোপালপুরেও ঝড় নেমেছে। উন্মত্ত ঢেউ তীরের ওপর আছড়ে পড়ে; ফিরে আবার উধাও হয়ে যায়। আবার আসে, অমিত উৎসাহে প্রচণ্ড আঘাত করে তীরকে। একেক সময়ে মনে হয়, সমুদ্রের ঢেউ যদি মুহূর্তের উন্মত্ততায় অস্বীকার করে নিজের সীমানাকে! যদি একবার যেখান থেকে ফিরে যাওয়ার কথা ঢেউগুলোর, সেখান থেকেই ফিরে না গিয়ে, এগিয়ে যায় আরেক পা। তারপর কি হবে, সেকথা তীরে দাঁড়িয়ে ভাবা যায় না। ভয় হয়। এই বিপুল জলরাশি যদি ভাসিয়ে নিয়ে যায় বিপুলা বসুন্ধরাকে! সমুদ্র তাই কোনও শোভা নয়। পাহাড় আর অরণ্যের রূপ আছে; কিন্তু সমুদ্র ভয়ঙ্কর, সমুদ্র অপরূপ!

ঝড় শুধু সমুদ্রের ওপরই নয়। সমুদ্রের ওপর গোপালপুরের হোটেল ডি-লাক্সের সব চেয়ে বড়ো দু'বিছানাওলা ঘরেও দুরন্ত ঝড় বইছে। গোপালপুরে পৌঁছেই দুর্দান্ত প্রতিহিংসায় দানবের মতো উন্মত্ত হয়ে উঠেছেন শ্যামচাঁদ। দু'-একদিনও নয়, দু'-এক ঘণ্টার মধ্যেই মঞ্জরী বুঝে নিয়েছে হাওয়া কোন দিকে বইছে। কিন্তু একটি টুঁ শব্দ করছে না মঞ্জরী। প্রতিবাদের ক্ষীণতম আওয়াজ মরে গেছে অজান্তে। শ্যামচাঁদ আর মঞ্জরী স্নান করতে গেছে সমুদ্রে। স্যুয়িং কষ্টুম পরা মঞ্জরীর ছবি উঠে গেছে মঞ্জরীর অজান্তে শ্যামচাঁদ নিয়োজিত লোকের ক্যামেরায়। সে ছবি চালান হয়ে গেছে কলকাতায় কাগজে। ছাপা হয়েছে প্রচ্ছদের ওপর। বিক্রী বেড়ে গেছে সাপ্তাহিকের, মাসিকের। কাগজ গিয়ে পৌঁছেচে আলোকের বাড়ী; সেখান থেকে আলোকের মায়ের হাতে।

কিন্তু শ্যামচাঁদ জানেন নি; সেইখানে পৌঁছেই হার হয়েছে তাঁর চক্রান্তের। আলোকের মা জিজ্ঞেস করেছেন আলোককে আচমকা: হ্যাঁ রে, মঞ্জু গোপালপুর গেছে? হ্যাঁ মা,—ছেলে জবাব দিয়েছে। কই আমায় বলিসনি তো তুই? আচ্ছা ছেলে যা হোক, ভাগ্যিস এই কাগজখানা হাতে এসে পড়েছিলো, ব্যাজ-আক্ষেপ জানান আলোকের মা।

কাগজখানা পড়েছিলো আলোকের মায়ের সামনে। প্রচ্ছদের ওপর মঞ্জরীর স্যুয়িং কষ্টুম পরা উত্তেজক ছবি। আলোক একটু অপ্রস্তুতবোধ করছিলো।

কিন্তু আলোকের মা মুহূর্তে মুছে দিলেন ছেলের সমস্ত সঙ্কোচ একটি কথায়: বাঃ,—মঞ্জুকে সাঁতারের পোষাকে চমৎকার মানায় তো! তা' মানাবে বই কি! স্বাস্থ্য কি মেয়ের? সপ্রশংস উচ্ছ্বাসে প্রগলভা মনে হয় প্রৌঢ়াকে। মঞ্জরীকে সত্যিই মনে ধরেছে আলোকের মায়ের।

কলকাতায় আলোক মিত্রের মা মনে মনে যত সদয়ই হোন মঞ্জুর ওপর,—কলকাতা থেকে অনেক দূরে সমুদ্রতটে শ্যামচাঁদ পড়াই কিন্তু দিনে দিনে নির্মম, নির্দয় হয়ে উঠতে থাকলেন মঞ্জরীর ওপর।

এখন আর মঞ্জরীর কোনও কারণ ছিলো না শ্যামচাঁদকে মেনে নেবার। এখন সে ফোঁস করে উঠলে শ্যামচাঁদকে থাবা গুটিয়ে নিতেই হোত। একদিন ছিলো যেদিন শ্যামচাঁদ ছিলো মঞ্জরীবালার অভিনেত্রী-জীবনে সাফল্যের সব চেয়ে বড় সোপান। তারপর সোপান থেকে সোপান অতিক্রম করে সাফল্যের এমন জায়গায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে মঞ্জরীবালা, সেখান থেকে শ্যামচাঁদ কেন টলিউডের কোনও হাতেরই আর তেমন জোর নেই যার ধাক্কায় এক ইঞ্চিও হটে আসতে হয় মঞ্জরীকে। মঞ্জরীকে যেদিন হাতে করে গড়ে পিটে মানুষ করে তুলছিলেন, সেদিন দু'জন লোক, শ্রীকৃষ্ণ দত্ত আর শ্যামচাঁদ গড়াই, কেউই ভাবেননি এত সহজেই তাদের পিগম্যালিয়ন প্রাণ পাবে আর তাদের নিজেদের প্রাণান্ত হবে তাকে বাগে রাখবার প্রচেষ্টায়। কিন্তু দেখতে না দেখতে, চোখের পলক দু'-চার বার পড়তে না পড়তেই মঞ্জরী বহু দূর এগিয়ে গেলো। যে পর্যন্ত পৌঁছনর শেষ সীমা বলে ধার্য করেছিলেন শ্রীকৃষ্ণ অথবা শ্যামচাঁদ মুহূর্তে সেই দুস্তর পথ অতিক্রম করে এগিয়ে গেলো আরও আরও অনেক দূর মঞ্জরীবালা। এত দূর এগুলো যে এখন তাকে মঞ্জরীবালা বলে উল্লেখ করতেও শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্যামচাঁদের এবং টলিউডের প্রায় সকলেরই দুবার ভাবতে হয়। অবশ্য ভাবনাতেই শেষ হয় সব দুর্ভাবনা! বলতে আর ভরসা হয় না কারুর।

সত্যিই তাই। মঞ্জরীর প্রয়োজন ছিলো না শ্যামচাঁদের সঙ্গে সমুদ্রের ওপর গোপালপুরে যাবার। অপ্রয়োজনীয় ছিলো শ্যামচাঁদের অসভ্যতা, শ্যামচাঁদের অত্যাচার, শ্যামচাঁদের তাকে সকলের চোখে হেয় করে তোলার হীন ষড়যন্ত্রকে সহ্য করবার। শ্যামচাঁদের চেয়ে মঞ্জরীর ছবির বাজারে দর অনেক বেশী। শ্যামচাঁদকে না হোলে ছবি হবে, মঞ্জরীকে না পেলেও; কিন্তু সে ছবি দেখতে ভেঙ্গে পড়বে না লোক। শ্যামচাঁদের বদলে আর কেউ পরিচালনা করলে সঙ্গীত একটা প্রশ্ন করবে না লোকে। কিন্তু মঞ্জরীর বদলে আর কেউ অবতীর্ণ হলে মঞ্জরীর যোগ্য ভূমিকায়, লোকে প্রশ্ন করেই ক্ষান্ত হবে না,—সে ছবি বার বার দেখবার বাসনাও রইবে ক্ষান্ত তাদের। তাই মঞ্জরীরই দর। তারই আদর সর্বত্র। সেই মঞ্জরীর নিশ্চয়ই কোনও প্রয়োজন ছিলো নিঃশব্দে হজম করবার নির্মম শ্যামচাঁদ গড়াইকে। আর কারুর বিচারে না থাক, মঞ্জরীর বিচারে, মঞ্জরীর হিসাবে নিশ্চয়ই প্রয়োজন ছিলো। আর মঞ্জরীর হিসাবে কখনও ভুল হয় না।

সত্যিই এখনও প্রয়োজন ছিলো শ্যামচাঁদকে মঞ্জরীর। অভিনেত্রী মঞ্জরীর নয়। মঞ্জরীর শুধু সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী হওয়াতে নেই শেষ সান্ত্বনা; যে মঞ্জরী সমাজের যারা নেত্রী তাদের সঙ্গে একাসনে বসার অধিকার না পাওয়া পর্যন্ত শান্ত না,—সেই মঞ্জরীর সাফল্যের, সার্থকতার সোপানের অনেক ধাবা অতিক্রম করতে এখনও বাকী। এবং সেখান থেকে হিসাবের এতটুকু এদিক-ওদিকে চিরকালের মতো অবলুপ্তি অতল অন্ধকারে অবশ্যম্ভাবী। তাই এত পা ফেলে-ফেলে এগুনো, এতো সাবধানতা, এতো হিসেব। শুধু অভিনেত্রী হয়েই সন্তুষ্ট থাকলে মঞ্জরীর এসবেরই কোনও দরকার ছিলো না। মঞ্জরী অভিনেত্রীদের নেত্রী স্থান নিয়েছিলো অনেক দিনই। গাড়ী, বাড়ী, শাড়ী, গয়না, কোনও কিছুরই প্রাচুর্যের কোনও অভাবের অথবা এতটুকু অপর্যাপ্ততার কোনও অতৃপ্তি ছিলো না কোথাও। আরও বাড়ী, আরও শাড়ী আরও গয়না, আরও খ্যাতি, আরও প্রতিষ্ঠা, আরও বড়ো অঙ্কের কণ্ট্রাক্ট, আরও বড় বহরের দিগ্বিজয় ছিলো নিশ্চিত অপেক্ষায়। কিন্তু মাত্র সেইটুকুই লক্ষ্য হলে শ্যামচাঁদ গড়াইকে সবটুকু রস শুষে নেওয়া আখের ছিবড়ের মতো ছুঁড়ে ফেলে দিতে দ্বিধান্বিত হতো না মঞ্জরী। কিন্তু অভিনেত্রীশ্রেষ্ঠ হওয়া ছিলো আসলে উপলক্ষ্য মাত্র। লক্ষ্য ছিলো অনেক সুদূর থেকে স্থির নিবদ্ধ অনেক তারার মধ্যে আরেকটি তারকা হওয়া নয়; শুকতারা হয়েও সে আশা ছিলো না মিটবার।

মায়ের পেট থেকে পৃথিবীতে পড়বার মুহূর্তে মঞ্জরীর যে কান্না আর পাঁচ জনের মতই শ্রুত হয়েছিলো, আসলে তা কান্না নয়, প্রতিবাদ। মায়ের পেট থেকেই সমাজের বিরুদ্ধে ঘৃণার আর প্রতিশোধের স্পৃহা হয়েছিলো সহজাত কবচকুণ্ডল। যে সমাজ তাকে জন্মমুহূর্তেই সমাজচ্যুত করেছে সেই সমাজকে তার সংস্কারচ্যুত করবার একটি মাত্র প্রতিজ্ঞা হয়েছে তার প্রাণধারণের নিঃশ্বাস। জ্বলে উঠেছে সে শিখার মতো। সেই শিখার মাটি থেকে উঠে আকাশের মুখ স্পর্শ না করা পর্যন্ত মৃত্যু নেই।

তাই শ্যামচাঁদ গড়াইয়ের সঙ্গে শেষ বোঝাপড়ার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিলো সে। শ্যামচাঁদকেই সে বাধ্য করবে ত্যাগ করার জন্যে। নিজে ছেড়ে যাবে না শ্যামচাঁদকে। তাই অনেক রাতে শ্যামচাঁদের শয্যায় আদর-উত্যক্ত মঞ্জরী প্রশ্ন করল শ্যামচাঁদকে। সেই চরম প্রশ্ন যার শেষ উত্তর মঞ্জরীর জানা। জিজ্ঞেস করলো শ্যামচাঁদকে। তুমি আমাকে বিয়ে করবে?

মুহূর্তে বাদশার নিদ্রা, আসলে, জড়িমা দূর হলো। বিদ্যুতস্পৃষ্ট শ্যামচাঁদ বিপুল বপু সমেত তড়াক করে উঠে বসলেন বিছানায়। তার পরে সজোরে লাথি মারলো মঞ্জরীকে। তার পর বললেন: তুমি ভুলে যেও না তুমি কি? তার পর অন্ধকারেই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলেন বারান্দায়।

অন্ধকার ঘরে মাটির ওপর মুখ থুবড়ে পড়া মঞ্জরী মাথা তুলছে। অন্ধকার ঘর; শ্যামচাঁদ নেই। মঞ্জরী মন্ত্র-মাথা তুলছে সাপ। লক লক করছে ছোবল দেওয়ার জন্যে উদ্যত সাপের জীব। মাথার মণি খসে পড়েছে। সাপ নয় মঞ্জরীই। ছোবল দেওয়ার জন্যে লক লক করছে না জিব, ঠোঁটের দুটো কোণ হাসছে অতি ক্রূর হাসি। মাথার মণি খসে পড়েনি; চোখের কোণে শুধু ঝিলিক দিচ্ছে বিদ্যুত অন্ধকার ঘরেও, তার আলোয় বড় বীভৎস দেখাচ্ছে এই মুহূর্তে মঞ্জরীবালাকে। [ক্রমশঃ।

"Laymen often think that going to law is a speculation. I have heard some of them say that horse racing has nothing to it."

—*Lord Chief Justice Goddard.*

যোগাযোগ

বাঙলা সাহিত্যে উপন্যাসের ক্ষেত্রে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের অমরত্ব যারা ঘোষণা করে চলেছে যোগাযোগ তাদের অন্যতম। আর এই যোগাযোগের মধ্যে দিয়েই পাঠক সাধারণের দরবারে পরিচিত হয়েছে মধুসূদন ঘোষালের মত বিশেষ ধরণের একটি 'টাইপ' চরিত্র। গভীর মনস্তত্বের সঙ্গে তীব্রতম এক মর্মানুভূতির স্বাদ পাওয়া যায় বহুজনবন্দিত এই গ্রন্থে। সুখের বিষয় ভারতের একজন সার্থকনামা পরিচালক শ্রীনীতীন বসুর পরিচালনায় 'যোগাযোগ' চিত্রায়িত হয়ে আনন্দ দিচ্ছে দর্শক সাধারণকে। যোগাযোগের কাহিনী সম্বন্ধে নতুন করে বলবার কিছুই নেই। কারণ রবীন্দ্রনাথের রচনা শিক্ষিত সমাজ-ভুক্ত কোন ব্যক্তি অপঠিত থেকে যেতে পারে না। অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন ভাবে গৃহীত হয়েছে এই ছবিটি। অনাবশ্যক ভারের বোঝা ছবিটির স্কন্ধে চড়ানো হয় নি, তাতে ছবিটির নিজস্বতা যথাসাধ্য রক্ষিত হয়েছে। এ কথাও বলে রাখি যে ছবি বলতে যাঁরা নিছক প্রমোদ রসের আধার বলে বুঝে থাকেন এবং ছবির মধ্যে কোন কিছু গভীরত্বকে উপলব্ধি করতে যাঁরা রাজী নন এ জাতীয় ছবি তাঁদের চিত্তজয়ে হয়তো সমর্থ হবে না কিন্তু এ কথা অনস্বীকার্য যে রসবোদ্ধাদের দরবারে যোগাযোগ তার যথোপযুক্ত স্বীকৃতি লাভে বঞ্চিত হবে না। পরিচালনায় আমরা যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় পেয়েছি মাঝে মাঝে হয় তো সন্দেহও জেগেছিল যে 'মাধবীর জন্য'র নীতীন বসু আর 'যোগাযোগ'এর নীতীন বসু একই ব্যক্তি কি না। সমস্ত ছবিটির মধ্যে সানন্দে লক্ষ্য করেছি যে কাহিনীতে উল্লেখিত সময়টুকু ছবির মধ্যে সম্পূর্ণরূপে ধরা দিয়েছে। চিত্রের অঙ্গসজ্জায় সেই সময়ের ছাপ রীতিমত ফুটে উঠেছে যা যোগাযোগের চিত্রায়ণের সাফল্যের জন্যে অনেকাংশে দায়ী।

নেপথ্য সঙ্গীতে হিজেন মুখোপাধ্যায় ও ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়ের গানগুলিও যথেষ্ট উপভোগ্য। অভিনয়াংশে কুমুদিনীর মত কঠিন চরিত্রটি সুন্দর ভাবে রূপায়িত করেছেন রীতা রায় (গাজীপুর প্রবাসী জগদ্বন্দ্যের স্বনামধন্য স্বর্গীয় রায়বাহাদুর গগনচন্দ্র রায়ের পৌত্রী)। এই নবাগতার ভবিষ্যতের উজ্জ্বল্য সম্বন্ধে আমরা আশা পোষণ করি। বসন্ত চৌধুরী, অসিতবরণ ও ভারতী দেবীর অভিনয়ও যথেষ্ট হৃদয়গ্রাহী। মঞ্জু দের অভিনয় এক কথায় অনবদ্য। তবে দুঃখের সঙ্গে উল্লেখ করছি মধুসূদনের চরিত্রে উৎপল দত্ত ব্যর্থ। 'হারানো সুর'-এ যে ব্যর্থতার ছাপ উৎপল দত্ত রেখে গিয়েছিলেন তাতে ছবির কিছু যায় আসে না। কারণ তাতে তিনি অভিনয় করেছিলেন অপ্রধান চরিত্রে, কিন্তু মধুসূদনের মত একটি প্রধান চরিত্রের যথোপযুক্ত রূপায়ণের উপর ছবির ভালমন্দ বহুলাংশে নির্ভর করে। মধুসূদন যথেষ্ট গম্ভীর এবং ব্যক্তিত্ববান পুরুষ ছিলেন ঠিকই কিন্তু গাম্ভীর্য আর ব্যক্তিত্বের অর্থ কি অযথা আস্ফালন এবং উল্লম্ফনমাত্র? এঁরা ছাড়া অন্যান্য ভূমিকায় অবতরণ করেছেন জহর গঙ্গোপাধ্যায়, অমর মল্লিক, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, অশোক সরকার, খগেন পাঠক ও সন্ধ্যা দেবী প্রভৃতি। পরিশেষে যোগাযোগের মত ছবি উপহার দেওয়ার জন্যে আমরা ধন্যবাদ জানাই "রিদম্" পত্রিকার সুযোগ্যা সম্পাদিকা শ্রীমতী আশা মুখোপাধ্যায়, যশস্বিনী অভিনেত্রী শ্রীমতী উষা খান এবং স্বনামধন্য শ্রীপি. এন. রায়কে। ছবিটির চিত্রধর ও সুরকার যথাক্রমে অনিল বন্দ্যোপাধ্যায় ও হরিপ্রসন্ন দাস।
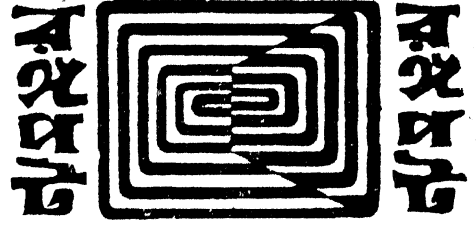
ডাক হরকরা

সাগরিকা ও শিল্পীর পর অগ্রগামী গোষ্ঠীর বর্তমান অবদান ডাকহরকরা। জমিদার গৃহের প্রাসাদশীর্ষ থেকে অগ্রগামীরা এবার নেমে এলেন বাঙলাদেশের শ্যামলশোভন শস্যভূমিতে। বলা বাহুল্য যে বাঙলাদেশের অন্দর-মহলের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অবর্ণনীয় রূপরাজি সুন্দরভাবে ধরা পড়েছে তাঁদের প্রতিভার স্বাক্ষর স্বরূপ ডাকহরকরা ছবিতে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৃজনীশক্তির কুশলতার স্বাক্ষরবাহী "ডাকহরকরা" ছবি একটি অতি সাধারণ নগণ্য ডাকহরকরাকে কেন্দ্র করে রচিত। সহজ সরল আত্মীয়তাপূর্ণ গ্রাম্য পরিবেশ। বাহুল্যবর্জিত স্বাভাবিক জীবনযাত্রা-এর মধ্যে দিয়েই কাহিনীর গতি। দীনু ডাকহরকরার ছেলে নিতাই একটি নারীর প্রতি আসক্ত তার উপর শ' পাঁচেক টাকার তার বিশেষ প্রয়োজন—পথিমধ্যে দীনুকেই সে এক দিন আক্রমণ করল কারণ দীনুর হাতেই ছিল মেলব্যাগ আর তাতে ছিল বহু টাকা—ছেলেকে চিনতে পারা সত্ত্বেও রীতিমত আহত না হওয়া পর্যন্ত সে টাকা দিল না ও পরে হাসপাতালে সে অকপটে স্বীকার করল যে তার পুত্র নিতাই-ই এ কাজ করেছে। এ দিকে সেই রাত থেকে নিতাই পলাতক, অনেককাল বাদে সংবাদ এল জাহাজে কর্মরত কালীন এক প্রাকৃতিক দুর্যোগের মুহূর্তে বহুজনকে নিশ্চিত মরণের হাত থেকে বাঁচিয়ে নিজের জীবন উৎসর্গ করে মরণকে জয় করে গেছে নিতাই। নিতায়ের ঔরসজাত পুত্রকে পরিত্যাগ করে তার প্রণয়িনী ততদিন অপরের সঙ্গে নিজের ভাগ্য মিলিয়ে দিয়েছে। সেই মাতৃপরিত্যক্ত শিশুকে—আপন পৌত্রকে আদর করে কোলে তুলে নেয় সর্বহারা দীনু—এইখানে গল্পের পরিসমাপ্তি। এক দীনুর চরিত্রটিকে কেন্দ্র করে সত্যানুরক্তি, কর্তব্যনিষ্ঠা বিবেকবোধ এবং অন্তরের অনমনীয় এক দৃঢ়তা যথেষ্ট পরিমাণে ফুটে উঠেছে। এই প্রাণস্পর্শী কাহিনীটির মধ্যে দিয়ে সঙ্গীতাংশ এবং নৃত্যাংশও বিশেষভাবে উপভোগ্য। পল্লী অঞ্চলে প্রচলিত বাঙলার খাঁটি নিজস্ব গানগুলির সংযোজন প্রশংসার্হ।

অভিনয়ে অপরিসীম দক্ষতা দেখিয়ে গেলেন কালী বন্দ্যোপাধ্যায়। বর্তমান বাঙলার এই অন্যতম অদ্বিতীয় চরিত্রাভিনেতার অভিনয় স্তব্ধ করে রাখে দর্শকসাধারণকে। জহর গঙ্গোপাধ্যায়, ধীরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, শোভা সেন, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় ও কমলা অধিকারীর অভিনয়ও অভিভূত করে তোলে। শোভা-সাবিত্রীর তো কথাই নেই। নবাগত অজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের অভিনয়ও পরিতৃপ্তিদানে সমর্থ হয়েছে। নিতাই চরিত্রটি সম্যকরূপ

পেয়েছে তাঁর অভিনয়ে। বাউলের ভূমিকায় দেখা যায় শান্তিদেব ঘোষকে। এ ছাড়াও রূপায়ণে আছেন গঙ্গাপদ বসু, মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়, গৌর শী, গোকুল মুখোপাধ্যায়, মনমোহন চট্টোপাধ্যায়, জহর রায়, মণি শ্রীমানী এবং মঞ্জুলা ভট্টাচার্য প্রভৃতি। আলোকচিত্রায়ণে এবং সুরযোজনায় প্রশংসনীয় নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন যথাক্রমে রামানন্দ সেনগুপ্ত ও সুধীন দাশগুপ্ত।

শ্রীশ্রীমা

পথভ্রষ্ট নর-সমাজকে সত্যিকারের পথের সন্ধান দিতে, অজ্ঞতা ও কুসংস্কারজাত আঁধারের অবসান করতে, অনুর্বর মনোভূমিতে অমৃতবারি সিঞ্চনার্থে পৃথিবীতে আবির্ভূত হলেন পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ—তাঁর সেই ত্রিকালবন্দিত অমৃতত্বকে পূর্ণতা দিতে কিছুকাল বাদেই আবির্ভূতা হলেন পরমাপ্রকৃতি শ্রীশ্রীসারদা দেবী। শিবের পাশে এসে দাঁড়ালেন দুর্গা, নারায়ণের পাশে লক্ষ্মী, রামকৃষ্ণের পাশে সারদা। বিশ্বমাতৃত্বের পুঞ্জীভূত সমষ্টির আবরণে মায়ের মহিমায় উজ্জ্বল প্রণম্যা মূর্তির পরিপূর্ণ বিকাশ। ঠাকুরের শক্তিরূপে বিশ্বের এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ঘরে ঘরে নরনারীকে মা উদ্বোধিত করে গেলেন নতুন চেতনায়, ক্ষমা, করুণা ও ত্যাগ জীবন্ত রূপ পেল মায়ের কল্যাণে।

মায়ের সর্বজনবন্দিত জীবনকাহিনী চিত্রাকারে দেখা দিয়েছে সুখ্যাত জীবনী-চিত্রকার কালীপ্রসাদ ঘোষের পরিচালনায়। যথোচিত ধৈর্য ও নিষ্ঠার ছাপ এঁকে গেলেন কালীপ্রসাদ ঘোষ এই চিত্রটি পরিচালনায়। এর আগে তাঁর পরিচালনাতেই পরিচালিত হয়েছে 'রাণী রাসমণি'র চিত্ররূপ এবং একাদিক্রমে প্রায় পাঁচ মাস কলকাতায় বিভিন্ন চিত্রগৃহে সগৌরবে প্রদর্শিত হয়েছে। কিন্তু রাসমণির পরিচালনাতেও যে সব দোষ ত্রুটি দেখা গিয়েছিল আনন্দের সঙ্গে লক্ষ্য করা যায় যে 'শ্রীশ্রীমা' পরিচালনায় সেই সব দোষ ত্রুটি বহুলাংশে অপসৃত হয়েছে। ছবিটিতে মায়ের পার্থিব জীবনের সমগ্র অংশটি দেখান হয়নি—অর্ধাংশমাত্র দেখানো হয়েছে অর্থাৎ ধরণীতে ঠাকুর যতদিন প্রকট ছিলেন ততদিন পর্যন্ত—সেই জন্যেই 'সারদা-রামকৃষ্ণ' বলে দর্শকগণকে এই স্বভাব সুলভ বিভ্রান্তির হাত থেকে রক্ষা করার জন্যে একটি উপ-নামকরণও করা হয়েছে।

মায়ের বিবাহের তোড়জোড় থেকে কাহিনী শুরু এবং ঠাকুরের লোকান্তর যাত্রার পরে বিশ্বমাতৃত্বের প্রতিমূর্তি মায়ের চরণে সন্তানদের ভক্তি প্রণতির মঞ্জুষা উজাড় করে দেওয়ায় কাহিনী শেষ। সারা ছবি জুড়ে আছে ঠাকুর ও মায়ের পরমপবিত্র দিব্য দাম্পত্যলীলা। নরেন্দ্রনাথের মুখ দিয়ে বলানো হচ্ছে যে, আমায় ছেড়ে দাও—আমার মা আছেন, বাবা আছেন—কিন্তু ঠাকুরের সান্নিধ্যে স্বামীজী যখন আসেন তখন বিশ্বনাথ দত্ত জীবিত ছিলেন কি? পুরুষ ও প্রকৃতি যে এক—তারা যে অভিন্ন এ তত্ত্ব চরিধন অভিনীত চরিত্রটির মুখ দিয়ে বলানো শুধু অনুচিতই নয় অন্যায় বলে মনে করা যায়। মর্ত্যজগতে মাকে কেন্দ্র করে আরও যে সব কাহিনী লিপিবদ্ধ হয়ে আছে তাদেরই মধ্যে থেকে আরও দুটি একটি কাহিনী চিত্রে সংযোজিত করলে ছবির মান এবং ঔজ্জ্বল্য আরও বৃদ্ধি পেত যেমন ঠাকুরের মতই মায়েরও মর্ত্যে আগমনের প্রারম্ভে তাঁর আগমনের সূচনাস্বরূপ তাঁর মাকে কেন্দ্র করে যে অলৌকিক ঘটনাটি ঘটেছিল কিংবা দেহরক্ষার ঠিক এক শ' বছর পরে গৃহহারা বাউলের বেশে বাঙলার বুকে নিজের পুনরাবির্ভাব সম্বন্ধে মাকে ঠাকুর যে ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছিলেন এবং সেই সঙ্গে মাকেও যে তাঁরই সঙ্গে আসতে হবে—এই বিষয়ে তাঁকে অবহিতা করে গিয়েছিলেন—এই ঘটনাগুলি ছবির শ্রীবৃদ্ধি-সাধন করতে পারত এ কথা অনস্বীকার্য।

ছবিটি বিশেষভাবে মনকে ধরে রাখে এবং যথেষ্ট পরিমাণে নৈপুণ্যও বহন করে। অনিল বাগচী পরিচালিত সঙ্গীতাংশ সুপরিচালিত। এই অসার, গুরুত্বহীন, নক্কারজনক ছবিগুলির মাঝখানে শ্রীশ্রীমার মত একখানি ছবির যথেষ্ট প্রয়োজন। সম্প্রদায়ের বক্তব্যহীন ছবির মত অঙ্গভঙ্গী দেখিয়ে বা গাছের ডাল ধরে কিংবা লেকের ধারে বসে কিছু বিলিতি কিছু হিন্দীসুরের অনুকরণে অর্থহীন গান পরিবেশন করে দর্শকের চোখ ধাঁধায় না—দর্শকচিত্তে শ্রীশ্রীমার মত ছবি রীতিমত একটি পবিত্রভাবের প্রভাব বিস্তার করে।

যাঁরা এখনও ছবিটি দেখেন নি—ভূমিকা-বণ্টনের প্রতি তাঁদের কৌতূহল স্বাভাবিক—তাঁদের কৌতূহল নিবারণার্থে শ্রীশ্রীমায়ের একটি সংক্ষিপ্ত ভূমিকালিপি লিপিবদ্ধ করছি—চন্দ্রমণি—সরযূবালা, ভৈরবী—ছায়া দেবী, রামেশ্বর—মোহন ঘোষাল মায়ের বাবা—পাহাড়ী সান্যাল, মায়ের মা—মলিনা দেবী, মায়ের কাকা—চন্দ্রশেখর দে, হৃদয়—জীবেন বসু, রামেশ্বরের স্ত্রী—ভারতী দেবী, লক্ষ্মীদিদি—সুদীপ্তা রায়, কালু—নীতীশ মুখোপাধ্যায়, তার স্ত্রী—রাণীবালা, স্বামীজী—নবকুমার, গিরিশচন্দ্র—জ্যোতির্ময়কুমার লাটু মহারাজ—সমরকুমার, বিদ্যাসাগর—পাহাড়ী সান্যাল, বঙ্কিমচন্দ্র—ভুবনু চৌধুরী, ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার—আদিত্য ঘোষ, গোলাপ মা—অপর্ণা দেবী, যোগীন মা—রাণী গাঙ্গুলী, পাগলিনী—প্রণতি ঘোষ।

অভিনয়ে অনন্যসাধারণ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে গেলেন অনুভা গুপ্তা ও গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। গুরুদাস বহু ছবিতে ঠাকুরের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন এবং বলতে বাধা নেই—এই ভূমিকায় তাঁর অভিনয় সহ্য করা যেত না—কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁর অভিনয় ব্যঙ্গে রূপায়িত হয়ে যেত কিন্তু শ্রীশ্রীমায় তাঁর অভিনয় সেগুলির তুলনায় বহুলাংশে উন্নত ও সমৃদ্ধ। নীতীশ মুখোপাধ্যায়, জীবেন বসু, সরযূবালা দেবী, প্রণতি ঘোষ, মায়ের কিশোরী মূর্তির রূপদাত্রী—লক্ষ্মী গঙ্গোপাধ্যায়ের অভিনয়ও অন্তর স্পর্শ করে। কথা হচ্ছে মাত্র দু'বার চোখের জল ফেলবার জন্যে পদ্মা দেবীকে কেন যে নামানো হ'ল বোঝা গেল না—যে চরিত্রে তাঁকে দেখা গেল সে চরিত্রটির নামও জানা গেল না। পূর্বোল্লেখিতেরা ও পূর্বোল্লেখিতারা ছাড়াও ভূমিকালিপিতে আছেন শিবকালী চট্টোপাধ্যায়, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, শ্রীপতি চৌধুরী, কার্তিক সরকার, হরিধন মুখোপাধ্যায়, বেচু সিংহ, বিশু বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তি ভট্টাচার্য, খগেন পাঠক, পান্নালাল ভট্টাচার্য, ভানু রায়, শ্রীমান্ বিজু, স্বাগতা চক্রবর্তী, মীরা রায়, অমিতা বসু, নিভাননী, রাজলক্ষ্মী, বেলারাণী, ইরা চক্রবর্তী, মায়ের বালিকা মূর্তির রূপদাত্রী মল্লিকা মল্লিক (খ্যাতনামা ব্যায়ামবীর কীর্তিনীয়া বিজয় মল্লিকের মেয়ে) প্রভৃতি।

প্রচার-পুস্তিকায় মাঝে মাঝে দু'একজন শিল্পীর নাম বাদ পড়ে যায় এবং যে সব শিল্পীদের প্রচারের মাধ্যমে তুলে ধরা হয় না—পুস্তিকাটিতে তাদের নামও বাদ যায় না—কিন্তু শ্রীশ্রীমার প্রচার-পুস্তিকাটিতে দেখলুম দু'একজন নয়—অল্পখ্যাত, সুখ্যাত এবং

এক কালের বিখ্যাত চিত্রনায়ক মিলিয়ে প্রায় তেরোজন শিল্পীর নাম বাদ পড়েছে। এ বিষয়ে পুস্তিকা-সম্পাদকের দৃষ্টি সবিনয়ে আকর্ষণ করি।

মঞ্চ-সংবাদ

ক'লকাতার রঙ্গমঞ্চগুলিতে নতুন নাটক উদ্বোধনের মরশুম চলছে। রঙমহল কর্তৃপক্ষ নীহাররঞ্জন গুপ্তের "মায়ামৃগ" বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের পরিচালনায় মঞ্চস্থ করেছেন। এই নাটকের উদ্বোধন হয় শুভ পয়লা বৈশাখ। অভিনয়াংশে আছেন—নীতীশ মুখোপাধ্যায়, রবীন মজুমদার, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, নবকুমার, বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়, কার্তিক সরকার, গোপাল মজুমদার, অজয় ভট্টাচার্য, হরিধন মুখোপাধ্যায়, জহর রায়, অজিত চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিম সোম, সুনীত মুখোপাধ্যায়, সরযূবালা দেবী, কেতকী দত্ত, গীতা সিং, কবিতা রায়, শীলা পাল, শুক্লা দাস, আশা দেবী প্রভৃতি শিল্পিবৃন্দ। সঙ্গীতাংশ পরিচালনা করছেন অনিল বাগচী।

শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্তের প্রথম ও দ্বিতীয় পর্ব অবলম্বনে রচিত নাটকখানি অসামান্য জনপ্রিয়তার সঙ্গে স্টার থিয়েটারে অভিনীত হচ্ছে। বর্তমানে কর্তৃপক্ষ শ্রীকান্তের তৃতীয় ও চতুর্থ পর্ব অবলম্বনে রচিত একটি নাটক মঞ্চস্থ করার সঙ্কল্প করেছেন। এর নাট্যরূপ দিয়েছেন প্রখ্যাত নাট্যকার শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত। সঙ্গীতাংশের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়। শিশির মল্লিক পরিচালিত এই নাটকখানিতে রূপায়ণের ভার গ্রহণ করেছেন জহর গঙ্গোপাধ্যায় নির্মলকুমার, অনুপকুমার, প্রেমাংশু বসু, প্রশান্তকুমার, কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, তুলসী চক্রবর্তী, শ্যাম লাহা, প্রীতি মজুমদার, শ্রীমান সুখেন, শিপ্রা মিত্র, গীতা দে, অপর্ণা দেবী, মিতা চট্টোপাধ্যায় ও বেলারাণী প্রভৃতি অভিনয়-শিল্পিগণ।

রঙ্গপট প্রসঙ্গে

যশস্বী সাহিত্যশিল্পী অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের লেখা 'ইন্দ্রাণী'র চিত্ররূপ দিচ্ছেন নীরেন লাহিড়ী। সুর দিচ্ছেন নচিকেতা ঘোষ। বিশু চক্রবর্তীর ক্যামেরায় দেখা যাবে ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ী সান্যাল, উত্তমকুমার, জীবেন বসু, চন্দ্রাবতী দেবী, সুচিত্রা সেন, তপতী ঘোষ, নমিতা সিংহ, অপর্ণা দেবী প্রভৃতিকে। • • • কার্তিক চট্টোপাধ্যায় পরিচালনা করছেন "জলজঙ্গল" ছবিটি। আলোকচিত্রের ভার পড়েছে অমূল্য মুখোপাধ্যায়ের উপর। চরিত্রায়ণের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন ছবি বিশ্বাস, বিকাশ রায়, উত্তমকুমার, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, মলিনা দেবী, সুচিত্রা সেন ইত্যাদি। • • • এম-কে-জি ইউনিটের পরিচালনায় গড়ে উঠেছে পৌরাণিক কাহিনী কর্ণের চিত্ররূপ। সুশ্বর ঘোষ ও অনিল বাগচী যথাক্রমে গ্রহণ করেছেন ক্যামেরা ও সঙ্গীতের ভার। রূপায়ণের ভার পড়েছে জহর গঙ্গোপাধ্যায়, কমল মিত্র, নীতীশ মুখোপাধ্যায়, বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মলিনা দেবী, পদ্মা দেবী, দীপ্তি রায় প্রভৃতি কুশলী শিল্পিবৃন্দের উপর। • • • অরূপ সরকার পরিচালিত "অপরাধ" এর চিত্রগ্রহণ সমাপ্তির পথে। এতে অভিনয় করতে দেখা যাবে ধীরাজ ভট্টাচার্য, বিকাশ রায়, রবীন মজুমদার, অনিল চট্টোপাধ্যায়, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, পদ্মা দেবী, তপতী ঘোষ প্রভৃতি অভিনয়শিল্পীদের। • • • "আত্মাহুতি" ছবিখানি গড়ে উঠছে ডি, কে, চট্টোপাধ্যায় ও রঞ্জিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের যুগ্ম পরিচালনায়। কাহিনীর উল্লেখিত চরিত্রগুলিকে রূপ দিতে দেখা যাবে যে সব শিল্পীদের তাঁদের মধ্যে বীরেন চট্টোপাধ্যায়, বীরেশ্বর সেন, জ্যোতির্ময়কুমার, তুলসী চক্রবর্তী, ছায়া দেবী, পদ্মা দেবী; দেবযানী ও শুক্লা সেনের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সোনালী সকাল

জয়ন্তী সেন

চোখে তার চোখ রাখি। আমাদের দু'জনের মন
দু'ধারা আলোর স্রোত এক নদী হয় মিলে-মিশে
আকাশের বাতায়নে মুখোমুখি প্রাণের আলাপে
এক বীণা-ঝঙ্কারের অনুভূতি অন্য বীণা-তারে
বেজে ওঠে মধু রবে—দু'জনের এ কি পরিচয়
সকালের মুগ্ধ নীল মুহূর্তের মিলন বাসরে।
আমি আর দিন আজ প্রাণে-মনে মিলেছি দু'জনে
বিস্ময়ের আভা চোখে চেয়ে থাকা আলোয়-আলোয়
অন্তহীন সমুদ্রের কলোচ্ছ্বাস অন্তরীক্ষ ভরে—
রেখেছি অস্থির চোখে মন মেলে পাখীর ডানায়।
রাত্রির নিঃসঙ্গ দেশ বহু দূরে ব্যবধান ঘন
মুছে গেছে দু'জনের ভালোলাগা নূতন দ্বীপের
অপরূপ ছায়াতটে। চোখে তার চোখ রেখে বলি
'তোমার আমার মন আজো হল সোনালী সকালে।'

উদয়ভানু

আলো প্রবেশের পথ নেই, বাতাসের গতিরোধ।

রুদ্ধকক্ষের দুয়োরে কান পাতলে এক মধুকণ্ঠীর কলহাস্য আর মিষ্টি মিষ্টি কথা শোনা যায়। হাসি আর কথায় যেন অনুরাগের সুর। কক্ষ মধ্যে না কি বৈচিত্র্য অনেক। বিলাসকক্ষ বা রঙমহালকে না কি হার মানায়, এমনই মনোহারী শোভা। ধবলপ্রস্তরের দেওয়ালের পাথরে পাথরে রত্নের লতাপাতা, রত্নের ফুল, রত্নের পাখী আর প্রজাপতি। কোথাও বা দর্পণ। কক্ষের ঊর্ধ্বে রূপার তারের চাঁদোয়া থেকে মতির ঝালর ঝুলছে। রত্নালঙ্কৃত পালঙ্কে জরির কামদার শয্যায় জরি-মখমলের বালিশ। বিবিধ ফুলদানিতে রাশি রাশি গন্ধফুল; পাত্রে পাত্রে আতর, গোলাপনির্য্যাস আর কেয়াসার। কক্ষতলে সুকোমল গালিচা বিছানো। এক কোণে এক উজ্জ্বল দীপালোক জ্বলছে। নক্ষত্রখচিত আকাশ যেন ঐ রূপাতারের চাঁদোয়া। আলোর আভায় ঝিকমিক করে।

পুষ্পরাশি কি খেলার সামগ্রী! ফুলখেলায় মত্ত যেন অবরোধবাসিনী। গোলাপের পাপড়ি দাঁতে কাটে আর ফেলে দেয়। ফুলের স্তবক ছোড়াছুড়ি করে আপন মনে। ফুলের আস্তরণে ঢাকা পড়ে বিছানা। পুষ্পরেণুর ছড়াছড়ি যেন।

—তোমার আর মুক্তি নাই। এক পরিহাসপ্রিয়ার মিষ্টকণ্ঠ কথা বলে কক্ষের অভ্যন্তরে। বলে,—এখন হ'তে আমার এই বুকে তুমি বন্দী হ'লে। খানিক থেমে আবার বলে,—কি, কথাটি মনে ধরলো না?

উত্তরদাতা যেন বাকহীন। নিশ্চুপ থাকেন তিনি। প্রশ্নকর্ত্রীর মুখখানি এক লক্ষ্যে দেখতে থাকেন। চোখের পলক পড়ে না কতক্ষণ।

দীপের আলো পড়েছে আনন্দকুমারীর হাসিভরা মুখে, উন্নত বুকে। চৌধুরাণী অর্দ্ধশায়িতা, দুই বাহুর পরে ঊর্দ্ধাঙ্গের, ভার রেখেছে। মিটি মিটি হাসির সঙ্গে আবার বললে,—মনে মনে আমাকে কি অভিশাপ দিতেছো? কথা কও না কেন?

পলকহীন চাউনি। চন্দ্রকান্ত যেন কিঞ্চিৎ বিষণ্ণ, বিমর্ষ। ক্ষণে ক্ষণে গাম্ভীর্য্য প্রকাশ পায় তাঁর মুখাকৃতিতে। পীড়াপীড়িতে তিনি বললেন,—অভিশাপ দেবো তেমন দৈবশক্তি আমার নাই। আশীর্ব্বাদ জানাই তুমি সুখী হও।

খিল খিল হাসি ধরলো আনন্দকুমারী। তার বুকের 'পরে কণ্ঠহার হাসির আবেগে নেচে নেচে উঠলো। হাসতে হাসতে বললে,—একা-একা কি সুখী হওয়া যায়? ভুলে যাও কেন আমি নারী। একা থাকায় এ জাতের কোন সুখ নাই, তাইতো তোমাকে চাই।

চন্দ্রকান্ত যেন দুঃখের হাসি হাসলেন। বললেন,—আমি যে মূর্তিমান দুর্ভাগ্য, সুখের আশা করি না। দীনদরিদ্র আমি সামর্থ্য নাই, সম্বল নাই।

—কিছু চাই না আমি। তোমাকে মাত্র চাই। সহসা হাসি থামিয়ে ফিস-ফিস কথা বললে চৌধুরাণী। একগুচ্ছ ফুল ছুঁড়লে চন্দ্রকান্তর প্রতি। বললে,—তুমি আমার থাকো। তোমার জন্য আমি কত কষ্ট পেয়েছি। লোকনিন্দা আর অপবাদকে তুচ্ছজ্ঞান করেছি।

—চৌধুরীমশাই কি তোমার এই খেয়াল বরদাস্ত করবেন চৌধুরাণী? আমার তো মনে হয় না তেমন। চন্দ্রকান্ত ধীরে ধীরে কথা বললেন। বললেন,—তিনি জানেন আমি একজন অতি দরিদ্র, চালচুলা নাই আমার। দুই বেলা দুই মুঠা অন্ন জোটে, তেমন একটা পাকাপাকি সংস্থান পর্য্যন্ত নাই।

হাসির জের টানলো আনন্দকুমারী। বললে,—চৌধুরীমশাইয়ের জন্য তোমার চিন্তার কারণ নাই। সে ভাবনা আমার। বাবামশাইকে আমি শান্ত করবো।

ফুলখেলা থামে না কিন্তু। কথা আর হাসির সঙ্গে সঙ্গে ফুলের স্তবক লোফালুফি করতে থাকে চৌধুরাণী। চন্দ্রকান্ত দেখলেন, আলো, ফুল আর কক্ষের সাজশয্যা যেন ম্লান হয়ে গেছে আনন্দকুমারীর রূপের ছটায়। তার দেহবল্লরীতে যৌবন টলমল করছে। মধুপূর্ণ মৌচাক যেন একটি।

—আমি কি তবে এই কক্ষে বন্দী থাকবো? তোমার তাই ইচ্ছা? কেমন যেন অসহায় কণ্ঠে বললেন চন্দ্রকান্ত।

আবার স-উত্তমে হাসি ধরে চৌধুরাণী। তার সেই স্বভাবসুলভ দেহদোলানো হাসি যেন থামতে চায় না সহজে। হাসতে হাসতে বললে,—হাঁ, তোমার আর মুক্তি নাই।

—লোকে যে নিন্দা রটাবে। ব্রাহ্মণ যেন ভয়ে ভয়ে বললেন।

চৌধুরাণী ঠোঁট উলটে বললে,—আমি নিন্দার তোয়াক্কা করি না। লোকে বলে বলুক। তুমি যদি একমত হও আমি সারা মান্দারণে ঢেঁড়া পিটাতে ব'লে দিই।

—তার কোন প্রয়োজন নাই। কথার শেষে তিক্ততা ফুটলো চন্দ্রকান্তর মুখে। কিছুক্ষণের নীরবতার পর বললেন,—আমার নাম কাটা যাবে ব্রাহ্মণ-তালিকা থেকে। কাজে-কর্ম্মে, শ্রাদ্ধ-শান্তিতে

কেউ আর ডাকবে না। পণ্ডিতবিদায় থেকে বঞ্চিত হবো আমি। সমাজ আমাকে পরিত্যাগ করবে।

পরিহাসের কৌতুকপূর্ণ হাসি হাসলো আনন্দকুমারী। বললে, —আমি তো তাই চাই। তোমার কথা শুনে খুশী হ'লাম আমি। পরম নিশ্চিন্ত হ'লাম। কথা বলতে বলতে চৌধুরাণী মতিবেলের একটি গোড়েমালা চন্দ্রকান্তর কণ্ঠে পরিয়ে দেয় সহসা। বলে, —এই মালাদানের মূল্য তুমি কি দিতে চাও না? কত মালা তোমাকে পরিয়েছি। আমার অন্তরের আশা-আকাঙ্খা কি ধূলিসাৎ করতে চাও?

কণ্ঠ থেকে মালা খুলে সেই মালা আনন্দকুমারীকে পরিয়ে দিলেন চন্দ্রকান্ত। বললেন,—আমি যদি অঙ্গীকার করি, তবুও কি তুমি মুক্তি দেবে না?

—অঙ্গীকার! সহাস্যে চৌধুরাণী বললে,—অঙ্গীকারের কোন মূল্য নাই আমার কাছে। তবুও শুনি কি অঙ্গীকার?

—আমি যদি আমরণ অকৃতদার থাকি, যদি পণ করি তোমাকে ভিন্ন অন্য কা'কেও ঠাঁই দেবো না আমার বক্ষমধ্যে? কথার শেষে চন্দ্রকান্ত সাগ্রহে উত্তরের প্রতীক্ষায় থাকেন।

কৃত্রিম গম্ভীর স্বরে আনন্দকুমারী বললে,—তাতে আমার সুখ কি! আমিতো আর আমরণ অনূঢ়া থাকতে পারি না। এত কাণ্ডের পর কে আমাকে গ্রহণ করবে তাই শুনি?

—তবে এখন উপায়? নিরুপায়ের মত কথা বলেন চন্দ্রকান্ত। বললেন,—তুমি এত নিষ্ঠুরা না হও। চৌধুরাণী, বিবেচনা কর আমার দুরবস্থার কথা।

আর নকল নয়। আসল গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে চৌধুরাণী বললে,— উপায় একটা আছে চন্দ্রকান্ত। বল, আমার অনুরোধ তুমি রক্ষা করবে? তাতে তোমারও মুক্তি হবে, তুমিও রেহাই পাবে এই অস্কুতকন্যার কবল থেকে।

—তোমার অনুরোধ রক্ষা হবে জানিও। চন্দ্রকান্ত দ্বিধাহীন মনে বললেন।

ব্যথাতুর অস্ফুট হাসির আভাস দেখা যায় আনন্দকুমারী লাল অধরপ্রান্তে। একটা গন্ধরাজ ফুলের পাপড়ি ছিঁড়তে ছিঁড়তে বললে,—আমাকে বিষ দাও তুমি। একটুকু সেঁকো বিষ দাও, খেয়ে সকল বালাই চুকিয়ে দিই।

এমন ধরণের কথা শুনতে হবে তেমন প্রত্যাশা করেননি চন্দ্রকান্ত। জিহ্বা দংশন করলেন নিজের। বললেন,—ছি, ছি, আত্মহত্যা করবে তুমি?

—হাঁ গো হাঁ। চোখ পাকিয়ে পাকিয়ে বললে আনন্দকুমারী। বললে,—মরণের আগে জানিয়ে যাবো বিষপানের কারণ।

শিউরে শিউরে উঠলেন চন্দ্রকান্ত। বললেন,—তবে তো আমারও মৃত্যু অনিবার্য্য।

মিষ্টহাসির সঙ্গে চৌধুরাণী বললে,—এসো আমরা দু'জনায় একত্রে মরি। ইহলোক ছেড়ে চ'লে যাই। পরলোকে আমাদের মিলন হবে। সেখানে লোকলজ্জা, সমাজ-ভয় থাকবে না।

চন্দ্রকান্ত আর কথা বলেন না। নতমুখে ব'সে থাকেন। চিন্তার রেখা ফুটেছে তাঁর প্রশস্ত কপালে। তিনি আনন্দকুমারীর বস্ত্রাঞ্চল পাকাতে থাকেন অন্যমনে।

আনন্দকুমারী আবার বললে সহাস্যে,—দেখো চন্দ্রকান্ত, আমি জানি তোমার হৃদয়মন্দিরে কার মূর্তি আসন পেয়েছে। আমি জানি, তুমি ঐ রাজকুমারী বিন্ধ্যবাসিনীকে—

—না না। সলজ্জায় অস্বীকার করলেন চন্দ্রকান্ত। বললেন,— তোমার ধারণা সত্য নয়।

—মিথ্যা হয়তো আমার জন্যই মিথ্যা জানবো। কথায় কথায় আনন্দকুমারীর কণ্ঠস্বর উগ্র হয়ে ওঠে যেন। চৌধুরাণী অধর কামড়ে ধরে নিজের। চিবিয়ে চিবিয়ে বললে,—তোমার আশাতে আমি ছাই দিয়েছি চন্দ্রকান্ত! তোমার সেই রূপের ডালি রাজকন্যেকে মান্দারণ থেকে বিদায় ক'রেছি। বিন্ধ্যবাসিনীকে আর তুমি দেখতে পাবে না।

একটি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন চন্দ্রকান্ত। বললেন,—তুমি অযথা অপবাদ দাও কেন? আমি কা'কেও চাহি না, কিছুই চাহি না।

—মিথ্যা কথাটা শুনাও কেন আর? চৌধুরাণী কেমন যেন কাঁপা-কাঁপা সুরে কথা বলছে। কেমন এক গোপন অভিমানের সুরে। বললে,—রাজকুমারী পরস্ত্রী, ভুলে যাও কেন?

অনেক কাল আগের দেখা, গভীর ঘুমের ঘোরে দেখা, এক সুখস্বপ্নের মত রাজকন্যা বিন্ধ্যবাসিনীর অনিন্দ্যসুন্দর মুখখানি চন্দ্রকান্তর মন-আকাশে ভেসে উঠলো। বিবেকের দংশনে যেন থেকে থেকে অধীর হয়ে ওঠেন তিনি। মানসিক অধঃপতন হয়েছে তাঁর। মিথ্যা বলেছেন একটা। বিন্ধ্যবাসিনীকে কত কাছে পেয়েছিলেন সেই গহন রাতে! রাজকুমারীর নধর নরম হাত দু'খানি নিজের হাতে ধ'রেছিলেন। বক্ষপাশে বেঁধেছিলেন তাঁকে। সেই স্পর্শসুখ হয়তো কখনও ভুলতে পারবেন না।

আকাশের চাঁদ আর তারা সাক্ষী আছে। রাতের আঁধার সাক্ষী আছে। চন্দ্রকান্তর স্মৃতি সাক্ষী আছে।

চন্দ্রকান্ত বললেন,—তুমিও কি তাই নও?

ঠোঁট বেঁকিয়ে কপালে জিজ্ঞাসার বিরক্তি-রেখা ফুটিয়ে চৌধুরাণী শুধোয়,—কথাটার অর্থটা কি, তাই শুনি?

—ম্যালেটের সঙ্গে তোমার মিলনের প্রসঙ্গটা ভুলে যাও কেন? ম্যালেট সত্যই তোমাকে ভালবাসে। চন্দ্রকান্ত ধীরে ধীরে কথা

বললেন। বললেন,—তাই বলি তুমিও আর কুমারী নাই। ম্যালেট তোমাকে—

মধ্যপথে কথা থেমে যায়। চৌধুরাণী চোখে-মুখে আঁচল চাপলো, লজ্জা না ক্ষোভে কে জানে! বললে,—ম্যালেটের নাম আমাকে শুনিও না। তোমার জন্ত আমি তার কবলে পড়েছি। আমি জানি, তুমি আমার হবে, তাই জীবন তুচ্ছ ক'রে পালিয়ে এসেছি সাহেবের বজরা থেকে।

—কাজটা ভাল কর' নাই। চন্দ্রকান্ত বললেন ইদিক সিদিক তাকিয়ে। বললেন,—ব্যাচারা ম্যালেট! তার জন্ত আমার দুঃখ হয়।

—আর আমার জন্ত দুঃখ হয় না? চৌধুরাণী কথা বলে করুণ কণ্ঠে। দুই চোখে অশ্রু টলমল করে। কথার শেষে আবার মুখ ঢাকে আঁচলে। বলে,—তুমি কি হৃদয়হীন! তুমি কি পাষাণ?

—হয়তো তাই। তোমার অনুমানই সত্য হয়তো বা। চন্দ্রকান্ত ঈষৎ হাসির সঙ্গে বললেন। বললেন,—দেখো চৌধুরাণী, তোমার যথার্থ মূল্য দিতে পারি, তোমাকে সমাদর করতে পারি তেমন সাধ্য আমার নাই। তাইতো সভয়ে পিছিয়ে আসি বারে বারে।

হঠাৎ পালঙ্ক ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো আনন্দকুমারী। রাগ আর ক্ষোভে জ্বলছে যেন সে। উগ্রসুন্দর মুখখানি ক্রোধ আর অভিমানে যেন রক্তবর্ণ ধারণ করেছে। চোখের দৃষ্টি স্থির হয়ে আছে। এত রাগের আগুন, তবুও মিহিসুরে বললে,—চন্দ্রকান্ত, মুক্তামালার কদরটা যে সে জানে না। আমি তোমাকে এখনই মুক্তি দিচ্ছি, তুমি এই গৃহ ত্যাগ কর'। ভুলে যেও আনন্দকুমারী নামে কেউ আছে এই পৃথিবীতে।

আশা করতে পারেন নি চন্দ্রকান্ত, এই ধরণের কথা শুনতে হবে। বিস্ময়-বিহ্বল চোখে তাকিয়ে থাকেন চৌধুরাণীর মুখপানে। বলেন,—আনন্দ, তোমার কথাই রক্ষা হোক। আমি যাই, তুমি থাকো। তুমি সুখী হও, এই প্রার্থনা আমার।

—তোমার প্রার্থনার কোন মূল্য দিই না আমি। সক্রোধে বললে চৌধুরাণী। ঘরের দুয়োরের অর্গল খুলতে খুলতে বললে,—পুরুষমানুষ এমনই স্বার্থপর আমি জানি। আমার আর সুখের প্রয়োজন নাই। আমি জানবো আমি একজন বিধবা। আমার স্বামীর মৃত্যু হয়েছে জানবো।

নির্ব্বাক চন্দ্রকান্ত। তিনিও শয্যা ত্যাগ করলেন। বললেন,—হাঁ চৌধুরাণী, আমি যাই। আমাকে যেতে দাও। আমার অনেক কাজ অসমাপ্ত আছে। চতুষ্পাঠীর জন্ত মন আমার আনচান করছে।

—আমারও অনেক কাজ আছে। এটা তোমারই একচেটিয়া নয়। কথা বলতে বলতে জলসিক্ত চোখে কক্ষের দ্বার মুক্ত করলো আনন্দকুমারী। বললে,—আমিও আমার গৃহে টোল-চতুষ্পাঠী স্থাপনা করবো। যা অর্থ লাগে লাগুক, ত্রিবেণী, মুড়াজোড় থেকে পণ্ডিতদের ডাকবো।

কেমন যেন হকচকিয়ে গেলেন চন্দ্রনাথ। তবুও নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন,—শুনে সুখী হ'লাম চৌধুরাণী! এই দীনদরিদ্র দেশে, এই অজ্ঞান অশিক্ষার দেশে তোমার মহতী চেষ্টা জয়যুক্ত হোক। কথা বলতে বলতে খানিক থেমে আবার বললেন,—তুমি জানবে আমি কখনও দারপরিগ্রহে সম্মত হব না। অবিবাহিত থেকেই দিন কাটিয়ে দেবো। তোমাকে কখনও বিস্মৃত হবো না।

—আমিও তাই থাকবো। আনন্দকুমারী ছলছল চোখে বললে। বললে,—তবে চেষ্টা করবো যাতে তোমার স্মৃতিটা মন থেকে মুছে যায়।

সামান্ত হাসি ফুটলো চন্দ্রকান্তর মুখে। বললেন,—তথাস্তু! তুমি সুখী হও, তাই আমি চাহি। অনুমতি দাও, আমি তবে বিদায় লই।

গলায় বস্ত্রাঞ্চল জড়িয়ে ভূমিতে মাথা ছুঁইয়ে প্রণাম করলো আনন্দকুমারী। শেষ প্রণাম, তাই হয়তো কিছু দীর্ঘস্থায়ী! মাথা তুলে বললে,—যদি কোন অপরাধ হয়ে থাকে ক্ষমার চোখে দেখো।

কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেলেন চন্দ্রকান্ত। কিয়দ্দূর যেতেই পিছু ডাক শুনলেন।

চৌধুরাণী কম্পিত ওষ্ঠে বললে,—একটা কথা বলি শোন'। বিদায়ী ব্রাহ্মণ পুনরায় কাছে আসতে বললে, রাজকুমারী বিন্ধ্যবাসিনীর প্রেম তোমার প্রতি অসীম। আমি তোমাদের পথের কাঁটা হ'তে চাই না। আমি তোমাকে পেলাম না, রাজকুমারী যেন পায়। তাতেই সান্ত্বনা।

—তিনি কোথায় গেছেন, কোথায় আছেন, কিছুই আমার জানা নাই। চন্দ্রকান্ত বললেন গম্ভীর স্বরে। বললেন,—কা'কেও আমি চাহি না আর। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো।

—বিন্ধ্যবাসিনী সুতানুটিতে গেছেন। তুমি সেথায় যাও, তাঁর সাক্ষাৎ পাবে। কথার শেষে আর এক মুহূর্ত থাকে না চৌধুরাণী। চোখে-মুখে আঁচল চেপে ছুট দেয় একটা। অন্দরের দিকেই চলে যেন উর্দ্ধশ্বাসে।

চন্দ্রকান্ত দেখলেন, আনন্দকুমারী এক দালানের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেল। কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে তিনিও চললেন বিপরীত দিকে। চৌধুরীমশাইয়ের প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে পথে নামলেন। চললেন হনহনিয়ে, চতুষ্পাঠীর পথে।

সন্ধ্যা নেমেছে তখন মাজারণের বুকে। আকাশে ক'টা জলজ্বলে তারা ফুটেছে। কালবৈশাখীর ঝড়ের বাতাস চলেছে এলোমেলো। পথের ধূলা উড়ছে গোধূলির মত। চোখ করকর করে, চন্দ্রকান্ত চোখ মুছলেন উত্তরীয়ে। তাঁর চোখ থেকে জলের ধারা নেমেছে। বিরহ বেদনায় চোখ দু'টি যেন জ্বলছে। কিন্তু উপায় নেই কিছু। চন্দ্রকান্তকে যেতেই হবে চতুষ্পাঠীতে। শিষ্যদল না কি তাঁরই পথ চেয়ে বসে আছে। দিন গুণছে।

বজরার কক্ষমধ্যে থেকে থেকে যেন কেঁপে কেঁপে ওঠেন জমিদার-নন্দিনী বিন্ধ্যবাসিনী। ক্ষিপ্র গতিতে বজরা উত্তর থেকে দক্ষিণ মুখে এগিয়ে চলেছে, ঢেউ ভেঙে ভেঙে। অনুকূল হাওয়া বইছে জোরালো বেগে, তাই পাল তুলে দেওয়া হয়েছে বজরার মাস্তুলে। পালের দড়িতে গাঙশালিকের ঝাঁক উড়ে এসে বসেছে। কিচমিচিয়ে ডাকাডাকি করছে।

লেঠেল জগমোহন ঘরে আসে। রাজকুমারীর কাছাকাছি এগিয়ে যায়। বলে,—রাজকুমারী, বিপদ এখনও কাটলো না।

—কেন জগমোহন? সভয়ে বললেন বিন্ধ্যবাসিনী।

দেহের পেশীগুলি যেন রাগের আধিক্যে স্ফীত হয়ে ওঠে মাঝে মাঝে। দাঁতে দাঁত চাপে সে। বললে,—যতক্ষণ সুতানুটিতে না যেতে পারছি ততক্ষণ ভয়-ভাবনা আছে। জমিদার কৃষ্ণরাম কি সহজে ছেড়ে দেবে মনে করেছো? কৃষ্ণরাম সে মানুষ নয়। জান থাকতে সে ছাড়বে না।

—তোমার অনুমান মিথ্যা নয় জগমোহন! ভয়ে ভয়ে রাজকন্যা বললেন। বললেন,—তাঁর স্বভাবটাই এমনি ধরণের। জেদের বশে সব করতে পারেন তিনি, আমি বেশ জানি।

—আমারও ঐ একই কথা রাজকন্যা! জগমোহন ফিসফিসিয়ে বললেন,—আমাদের জামাইটা একটা আস্ত গণ্ডমূর্খ। ভণ্ডামিই সার তার। বিচার-বিবেচনার কোন বালাই নেই। যা মন চায় করেন, কারও নিষেধ মানতে চান না।

—তার নাম মুখে আনাও মহাপাপ। কথার শেষে জগমোহন কক্ষ থেকে বেরিয়ে যায়।

বজরার ছাদ থেকে ডাক পড়েছে। কণ্ঠ সপ্তমে তুলে কাশীশঙ্কর ডাকলেন,—জগা! অ জগমোহন!

গুরু-গুরু মেঘ-ডাকার শব্দ শুনেছে যেন লেঠেল জগমোহন। বুক দুরু-দুরু করে তার। মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ে। সাড়া দেয় ভয়ে ভয়ে। বলে,—এই যে আমি হেথায় কুমারবাহাদুর!

—আয়, দেখবি আয়! কাশীশঙ্কর উদ্বিগ্ন স্বরে বললেন। যেন কিছু ব্যস্ততার সঙ্গে। বললেন,—জগমোহন, গতিক সুবিধার নয়।

কুমারবাহাদুরের হাতে একটা বিদেশী দূরবীণ। পেতলের লম্বমান নলাকার দূরবীণে বাম চোখ রেখেছেন। সাগ্রহে দেখছেন কি যেন।

অস্ত-রবির পাণ্ডু কিরণ এখনও পশ্চিম আসমানের শেষে। রূপালী রেখার আভাস। মধ্য-আকাশে শুক্লা নিশার প্রথম তারাদল দেখা দিয়েছে। লাজুক হাসি যেন সদ্য উদিতাদের মুখে মুখে। সন্ধ্যার আঁধার আজ যেন একান্তই পরাজয় বরণ করেছে।

বজরা থেকে তীরতরুসারি তাই হয়তো দূরবীণে ধরা পড়ে। জগমোহনের হাতে দূরবীণটা ধরিয়ে দিলেন কাশীশঙ্কর। কেমন যেন ব্যঙ্গের হাসি হেসে বললেন,—জমিদার কৃষ্ণরাম অশ্বারোহণে ধাবমান। পিছনে লোক-লস্কর। খানিক থেমে থাকলেন কুমারবাহাদুর। তাঁর নিজের দৃষ্টি সত্য না মিথ্যা যাচিয়ে নিতেই জগমোহনকে দেখতে সময় দিলেন। বললেন,—কি গো লেঠেল, ভুল দেখি নাই তো?

—নাঃ হুজুর, ঠিকই দেখেছেন।

দূরবীণ থেকে চোখ সরিয়ে কেমন যেন ঝাঁঝার সুরে জগমোহন বললে। আরও একবার সঠিক দেখতে দূরবীণে চোখ রাখলো। বললে,—এখন কর্তব্য কি তাই বলেন। রাত ঘনিয়ে আসছে ইয়াদ রাখবেন।

আবার একবার ব্যঙ্গের হাসি হাসলেন কাশীশঙ্কর। পাক দেওয়া ঘনকৃষ্ণ [illegible] গোঁফের ফাঁকে হাসির ইঙ্গিত ফুটলো। বললেন,—বজরাখান তীরে ভিড়াতে বল'। কর্তব্য একটি মাত্র আছে।

—কি কুমারবাহাদুর? বিস্ময়ের ঘোরে জগমোহনের চক্ষু স্থির হয়ে যায়। বলে,—বজরা তীরে ভিড়ালে আর রক্ষা নাই জানবেন। আমাগোর লোকবল তেমন নাই যে সামনাসামনি—

—জগমোহন! দৃপ্তকণ্ঠে গর্জে উঠলেন যেন কাশীশঙ্কর। নামটি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে বামপদ একবার ঠুকলেন। বজরার ছাদে যেন বজ্রপতন হয়। কুমারবাহাদুর সজোরে বললেন,—তুমি আমার শিক্ষাগুরু নহ। আমার হুকুম অমান্য করতো মৃত্যু অনিবার্য্য জানবে।

—ক্ষেমা করবেন হুজুর! লেঠেল জগমোহন জানু বাঁকিয়ে ব'সে পড়লো। ফরাসে দূরবীণ রেখে দিয়ে কুমারবাহাদুরের দুই পায়ে হাত আর মাথা ছোঁয়ালো। বললে,—আমি হুজুর রামের হাতে মরতে প্রস্তুত। আপনি সাজা দিন, মৃত্যুদণ্ড দিন, মাথা পেতে নেবো। তবে হুজুর, ঐ রাবণের হাতে মরতে চাই না তীরে বজরা ভিড়িয়ে।

—জগমোহন! আবার সেই সিংহসুলভ গর্জন ভাসলো মাঝ-গঙ্গায়। ক্ষণেকের মধ্যে কুমারবাহাদুরের মুখ রাঙিয়ে ওঠে। চোখ যেন রক্তবর্ণ হয়।

মৌনাচারিণী গঙ্গা, খরবেগে ব'য়ে চলেছে। ঢেউ নেই, গতি মাত্র। এখানে সেখানে নদীর বুকে চড়া দেখা দিয়েছে। শ্বেত-মরালের দল ছড়িয়ে আছে চড়ায়। বন্যার বোলে কূল ভেঙেছে কবে কে জানে। কাশফুলের ঝোপ মাথা তুলেছে চড়ায় আর তীরে। পুণ্যার্থীরা জলে নেমেছে গাহন সারতে। অশ্বত্থ আর বটের ছায়ায় মঠ-মন্দিরে দীপারতির আলো জ্বলেছে। রুদ্র আর রতির সাধনায় হোমকুণ্ড জ্বলছে কোথাও কোথাও! তীরতরুর ফাঁকে ফাঁকে শীর্ণ সোপানশ্রেণী দেখা যায়। কোথাও বা পিছল পদরেখা।

—সর্দারজী! কুমারবাহাদুর চীৎকার করলেন। বললেন,—বজরার গতি থামাও। হাল তুলে লও!

জগমোহন আবার মাথা নোয়ালো কাশীশঙ্করের পাদমূলে। বলে,—কুমারবাহাদুর, জিদ করবেন না। গড় করছি আমি। দোহাই আপনার!

বাম পায়ের আঘাতে জগমোহনকে এক ঠেলায় সরিয়ে দিলেন কাশীশঙ্কর। বজরার ছাদ থেকে দ্রুতগতিতে পাটাতনে নামলেন। মাঝিদের কাছে এগিয়ে সক্রোধে বললেন,—সর্দার, বজরা তীরে ভিড়াও! অন্যথা না হয়।

মাঝি-সর্দার পচাই মদ খেয়েছে কখন। নেশার উত্তেজনায় অকারণে হাসছে হো-হো শব্দে। হাসতে হাসতে বললে,—রাজামশাই, আপনি যখন হুকুম করেছেন।

গতি থেমে যায় বজরার। হাল চলে না আর। বজরা মোড় নেয় ধীরে। তীরের দিকে মুখ ফিরায়। তারপর আবার হাল চলতে থাকে এক সঙ্গে। সমান তালে।

অন্দরে যাবেন কাশীশঙ্কর, দুয়ারে দেখলেন রাজকুমারী বিন্ধ্যবাসিনী, পাষাণমূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছেন। বস্ত্র গুণ্ঠনের আড়ালে বিষাদভরা মুখখানিতে ভাদ্রের মেঘ নেমেছে যেন। চোখে জল টলমল করছে। হতাশায় ম্রিয়মাণ যেন তিনি।

সহোদরকে বললেন,—ভাই, তুমি এই পাষণ্ডের হাতে ধরা দিও না। মনে রাখিও তোমার গৃহ-সংসার আছে! স্ত্রী আর কন্যা আছে। রাজমাতা আছেন। কিছু একটা হয়তো তখন আর আমি মুখ দেখাতে পারবো না। তার আগে আমি যেন মরতে পারি।

—তুই এখনও একটা অবোধ-শিশু আছিস। সহাস্যে কাশীশঙ্কর বললেন। কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্রঘরে সিঁধোলেন।

বিন্ধ্যবাসিনী যেন অনড় অচল। তিনি স্থির দাঁড়িয়ে থাকেন। তাঁর আশাহত চোখে শূন্য দৃষ্টি ফুটেছে। মাঝে মাঝে ব্যর্থশ্বাস ফেলছেন একেকটি। লাল চুনীর মত রাঙা অধর যেন পাংশু হয়ে আছে। গোলাপ-গালের রঙ হারিয়েছে। নয়ন-কোণে কালিমা। রাজকুমারী শুনলেন, অস্ত্রঘরে ঝন ঝন শব্দ। শিউরে শিউরে উঠলেন বিন্ধ্যবাসিনী। অজানা ভবিষ্যৎ, কি হয় কে বলতে পারে। হয়তো রক্তপাত হবে, ভাবতেও শিহর লাগে বুকে। দেহ কেঁপে ওঠে থরথরিয়ে।

ম্লান সায়াহ্ন আজকের। কখন পূর্ণিমার ঢেউ ভেসেছে আসমানে। পূর্ণাকার চাঁদ উঠেছে কখন। আকাশ যেন সোনালী টিপ পরেছে কপালে। জমাট আঁধার নেই আজ! হোমকুণ্ডের ধূমায়মান অগ্নিশিখা অগ্নিপতাকার মত ঊর্দ্ধমুখে উড়ছে। শবভুক নিশাচরের পাল জলাজঙ্গলে বিচরণ করছে। শিয়াল, হায়না, খটাস, নেকড়ের দল আঁধার-গহ্বর থেকে বেরিয়ে পড়েছে। তান্ত্রিকের দল কাজে লেগেছে। গলায় নর-কপালের মালা ঝুলিয়ে রক্তশোষণের মন্ত্রগান গাইছে। অদূরেই শ্মশান। চিতা জ্বলছে কয়েকটি। নরমাংস দাহনের গন্ধ ভাসছে বাতাসে। চুল-পোড়ার গন্ধ। মানুষের কত সুখের দেহ-দেউল, জ্বলছে দাউ দাউ।

কাল-নিশীথিনী ঘনিয়ে আসছে। প্রলয়ের রাত্রি আসছে—রাজকুমারী ভাবতেও যেন ভয়ে জড়সড় হয়ে পড়েন। বিন্ধ্যবাসিনী দেখলেন, কাশীশঙ্কর যোদ্ধার সাজে সেজেছেন। হাতে, পায়ে আর বুকে লৌহসারের বর্ম এঁটেছেন। বাম দিকের কটি থেকে ঝুলছে খাপে-ভরা দীর্ঘ তরোয়াল। কোমরবন্ধনীতে একটি ভোজালী। হাতে একটা গাদা বন্দুক। মাথায় লোহার জালের শিরস্ত্রাণ। দেখলে এখন সহসা চেনা যায় না কুমারবাহাদুরকে। ক্রোধের আবেগে মধ্যে মধ্যে তরোয়ালের হাতলে হাত পড়ে। খাপ থেকে যেন মুক্ত করতে চান তরোয়াল। হাত নিশপিশ করে হননেচ্ছায়।

গঙ্গার পূর্ব্বতীরে বজরা অগ্রসর হ'তে থাকে। মাঝি-মাল্লাদের হাত চলে না যেন সন্ত্রাসে। কোথা থেকে এখনই বন্দুকের জ্বলন্ত বারুদ ছিটকে আসবে কেউ বলতে পারে না। বৃষ্টিপাতের মত রাশি রাশি বিষমাখা তীর উড়ে আসবে। কিন্তু কুমারবাহাদুর হুকুমজারী করেছেন, কে অমান্য করবে!

সরবে কাশীশঙ্কর বললেন,—সাদা নিশান উড়ানো হোক মাস্তুলে।

ক'জন সিপাই শ্বেতপতাকা তুলে দেয় মাস্তুলশীর্ষে। দুয়ারের কপাটের আড়ালে থেকে বিন্ধ্যবাসিনী ভয়ে ভয়ে লক্ষ্য করেন সকল কিছু। তিনি যেন নিতান্তই বিপন্না। দুরদৃষ্টের দোষে মুখ দেখাতেও যেন লজ্জা। দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপশালী সহোদর কাশীশঙ্কর, তবুও রাজকন্যা ভয়ে ভয়ে মুহূর্ত গুণতে থাকেন। কম্পিতকলেবর এখনই যেন মূর্চ্ছাগ্রস্ত হবে। বিন্ধ্যবাসিনীর দিকে সহাস্যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন কুমারবাহাদুর। বললেন,—বিন্ধ্য, আমি কৃষ্ণরায়ের প্রস্তাবেই সম্মত। দু'জনায় অসিযুদ্ধ হবে, দেখা যাক কে জয়ী হয়।

আশা-ভরসা লুপ্ত হয়ে যায় রাজকন্যার। ক্ষণে ক্ষণে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। বক্ষে কম্পন লাগে জ্বররোগিণীর মত। সহোদরের কথায় তিনি যেন চিন্তামুক্ত হতে পারেন না। আরও দুশ্চিন্তায় মন যেন আচ্ছন্ন হয়।

কুমারবাহাদুরের মুখে হাসির রেখা। প্রতিযোগিতায় নামতে হবে, তবু এতটুকু দ্বিধা নেই মনে। কাশীশঙ্কর অধীর আগ্রহে বজরার পাটাতনে পায়চারী করেন। ধৈর্য্য ধারণ করতে পারেন না যেন। বজরার ধীর গতি অসহ্য ঠেকে তাঁর।

আতশের রোশনাই আকাশে। একে একে কত তারা ফুটেছে। ভাসমান মেঘের অন্তরাল থেকে হঠাৎ আবার চাঁদ দেখা দিয়েছে। সূর্য্যের শেষ রূপালী রেখা সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়েছে কখন। আজ পূর্ণিমা, প্রকৃতির শোভা তাই ক্রমে ক্রমে বিকশিত হয়। চাঁদের আলোয় আজ প্রকৃতি উদ্ভাসিত।

বজরা তীরের কাছাকাছি যেতেই দূরাগত এক কণ্ঠসঙ্গীত ভেসে আসে। কাছাকাছি কোথাও আছে সরাইখানা। কে এক মাতাল মত্ত হয়ে গজলের সুর ধরেছে। খোশ-গানের আওয়াজ ভেসে আসছে। ভগ্নকণ্ঠের সুর।

কাল-নিশীথিনী ঘনায়মান—রাজকুমারী ভয়ে চোখ দুটিকে বন্ধ করলেন একবার। আতঙ্কের আতিশয্যে চোখে কিছু দেখা যায় না। দৃষ্টি চলে না। একরাশ কেশের বোঝা যেন আর বইতে পারেন না বিন্ধ্যবাসিনী। বিরক্তির সঙ্গে এলো খোঁপা জড়িয়ে নিলেন।

জগমোহন নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকে। তার কথা আর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তীরে বজরা ভিড়ালেন কুমারবাহাদুর। সে দরিদ্র, তাই হয়তো তার নিষেধ আবেদনে কর্ণপাত করলেন না কাশীশঙ্কর। মনে মনে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে জগমোহন, কিন্তু মুখে কিছু প্রকাশ করতে পারে না। মুখ ফুটে আর বলতে পারে না। প্রতিবাদ জানায় না আর।

তীরে কসাড়-বন। কাশফুলের জঙ্গলে ঢেউ খেলছে ফুরফুরে সান্ধ্য-বাতাসে। নৈশ-গঙ্গার জলে চাঁদের প্রতিবিম্ব ভাসছে। কসাড় বনের পাশেই আকাশস্পর্শী ঝাবলাগাছের সারি।

তীরে বজরা বাঁধা হয়। একমাত্র কাশীশঙ্কর ব্যতীত অন্যান্য

সকলের হৃৎপিণ্ডের ধুকধুকি যেন থেমে আছে ভয়ে আর উত্তেজনায়। কুমারবাহাদুর লক্ষ্য করলেন নক্ষত্রালোকে—বাবলা-বনের কোলে এক দল অশ্বারোহী। হাতে তাদের বর্শা আর ধনুক। কাশীশঙ্কর অনুমানে বুঝলেন, অশ্বারোহীরা প্রস্তুত হয়ে আছে। শুধু মাত্র হুকুমের অপেক্ষায় আছে তারা। হুকুম পেলেই বন্দুকের ঘোড়া দাগবে, বর্শা ছুঁড়বে। কুমারবাহাদুর বুঝলেন, আসল শত্রু বনান্তরালে লুক্কায়িত আছে।

কৃষ্ণরামের একজন অনুচর, লাফাতে লাফাতে নেমে আসে তীরভূমি থেকে, বজরার নিকটে। তারও হাতে একটি বন্দুক। কটিতে ছুরি। চোখের দৃষ্টিতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ।

কুমারবাহাদুর তাকে সাদর আহ্বান জানালেন। এক লাফে বজরা থেকে তীরে নামলেন। বললেন,—সুস্বাগতম্। সুস্বাগতম্।

অনুচর বললে,—যুদ্ধ না শান্তি ?

হেসে ফেললেন কাশীশঙ্কর। তাঁর বৃষস্কন্ধ হাসির তোড়ে নেচে উঠলো। হাসতে হাসতে বললেন,—যুদ্ধ! বিনা যুদ্ধে শান্তির আশা আমি করি না।

অনুচর বললে,—এখনও চিন্তা করেন, যুদ্ধে মহাশয়ের পরাস্ত হওয়ার সম্ভাবনাই অধিক। আবার হাসলেন কাশীশঙ্কর। বললেন, জমিদার কৃষ্ণরামকে জানাও, আমি মেষশাবক নহি। সে যেন প্রস্তুত হয়। তার কথায় আমি রাজী, প্রস্তাবে সম্মত। তাহাতে আমাতে অসিযুদ্ধ হোক, এই আমার কাম্য।

—তথাস্তু। কথার শেষে অনুচর খানিক থেমে বললে,—যুদ্ধস্থান কোথায় হবে, তাই শুনি ?

কাশীশঙ্কর বললেন,—এই গঙ্গাতীরে, বনাঞ্চলে। কথা বলতে বলতে তিনি কটিতে ঝুলানো তরবারি স্পর্শ করলেন। বললেন,—কৃষ্ণরামকে জানাও, বিলম্বে প্রয়োজন নাই।

অনুচর পিছু ফিরে ছুটলো বাবলা-বনের দিকে। পূর্ণিমার রাত, কিন্তু তীরভূমিতে আঁধার-গহ্বরের সৃষ্টি হয়েছে। খটাশ আর হায়না ছোটাছুটি করছে মানুষের ভয়ে। বসন্ত বিদায়গামী, তবুও কোকিলের ডাক শোনা যায়। পালায় পালায় ডাকাডাকি করছে কোকিল। একটি ডাকছে, অন্যটি সাড়া দিচ্ছে।

মূর্চ্ছা যাওয়ার মত দেহ যেন ট'লে ট'লে উঠছে। বিন্ধ্যবাসিনী রুদ্ধশ্বাসে শুনছেন ভেসে-আসা কথা। তিনি যেন এক দুঃস্বপ্ন দেখছেন।

কুমারবাহাদুর দেখলেন, হঠাৎ আলোর জৌলুস খেললো বাবলা-বনে। রামমশাল জ্বললো গোটা কয়েক। একটা আলোর রাজ্য সৃষ্টি হয় পলকের মধ্যে। কাশীশঙ্কর ধীরে ধীরে ঐ আলোর দিকে চললেন,—আর জগমোহন! জনা দশেক সিপাইকে সঙ্গে লয়ে আয়।

দাঁড়ী-মাঝিরা ঠক ঠক কাঁপছে মৃত্যুভয়ে। সর্দার-মাঝির পচাইয়ের নেশা ছুটে গেছে। সে-ও ভীত হ'য়ে উঠেছে।

রাজকুমারী দুর্গানাম জপ করেন। দুর্গতিনাশিনী দুর্গাকে স্মরণ করেন। বিপত্তারিণীকে ডাকেন আকুলচিত্তে। কিন্তু মনের একাগ্রতা বিনষ্ট হয়। কত কথা মনে আসে। কত সূত্রহীন চিন্তা খেলে মনে। চোখ ফেটে জল ঝরে।

বাবলাবনের কাছে যেতেই কুমারবাহাদুরের চোখে পড়লো কৃষ্ণরামকে। তিনিও সুসজ্জিত। কারণবারি পান করছেন তিনি, যুদ্ধের আগে হয়তো তৃষ্ণা নিবারণ করছেন। দেখে মনে মনে পুলকিত হ'লেন কাশীশঙ্কর। ভাবলেন, মদিরায় নেশায় কৃষ্ণরামের হাত চলবে না; তাক ফসকে যাবে। লক্ষ্যচ্যুত হবে তার উদ্যত কৃপাণ।

দৃষ্টি-বিনিময় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কুমারবাহাদুর সহাস্যে হাত এগিয়ে দিলেন কৃষ্ণরামের দিকে। যুদ্ধের আগে এই না কি নিয়ম করমর্দ্দন করতে হয় পরস্পরে। শুভেচ্ছাসূচক বাক্য বলাবলি করতে হয়।

করমর্দ্দনের শেষে কৃষ্ণরাম বিদ্রূপাত্মক হাসি হেসে বললেন,—কি হে কাশীশঙ্কর! তুমি আবার আমার বড়কুটুম্ব। সম্পর্কটা খুব মধুর। তোমায় সহ অসিখেলায় পৃথক এক আহ্লাদের কারণ আছে।

—আমিও ঠিক এই একই কথা বলি। কাশীশঙ্কর সহাস্যে বললেন। হাসি বিলীন হয়ে যায় ক্ষণেকের মধ্যে। বলেন,—যুদ্ধের সর্তটা ভুলিও না।

কৃষ্ণরাম মুখে পাত্র তুললেন। অবশিষ্টটুকু শেষ করলেন এক চুমুকে। মুখ বিকৃত করলেন বিস্বাদে। বললেন,—আমি বেজন্ম নই কাশীশঙ্কর! বাপ আর বাত আমার এক। বদল হয় না কথা।

—বহুৎ ধন্যবাদ! তবে এসো, খেলা শুরু হোক। কাশীশঙ্কর কথার শেষে কপালের ঘাম মুছলেন। বললেন,—তুমি কি প্রস্তুত

—হাঁ গো শালা হাঁ। আমি সদাই প্রস্তুত আছি। শ্লেষের হাসি হেসে কৃষ্ণরাম বলেন। বললেন,—তোমার ভগিনীটি কোথায় তাই শুনি ?

সর্ব্বজনের সমুখে শ্যালক আহ্বান শুনে ভীষণ অপমান বোধ করলেন কুমারবাহাদুর। বললেন,—বিন্ধ্যা আছে বজরামধ্যে। আমাকে পরাস্ত কর', অতঃপর বিন্ধ্যার নাম উচ্চারণ করিও।

রামমশালের আলোয় বাবলাবনে দিবালোকের বাহার যেন। দুই দলের লোক দুই দিকে ভাগাভাগি দাঁড়িয়ে আছে সাগ্রহে। কি ফল হয় কে জানে! কে কা'কে হারায় দেখা যাক। কারও নড়ন চড়ন নেই। কৃষ্ণরামের একেকটি তেজস্বী অশ্ব পা ঠুকছে মাটিতে। সওয়ার চাইছে হয়তো।

—অসিখেলার সর্তটা ভুলিও না কুমার কাশীশঙ্কর! জমিদার কৃষ্ণরাম তরোয়াল-খাপের ঝনন তুলে মিঠে হেসে বললেন। একটি চোখ ঈষৎ মুদিত করলেন পরিহাসের ভঙ্গিমায়। বললেন,—আর একবার সর্তটা খতায়ে ল'ও। সময় দিতেছি খানিক।

—প্রয়োজন নাই দয়া দাক্ষিণ্যের। কাশীশঙ্কর কপালে রেখা ফুটিয়ে বললেন। কাছেই ছিল জগমোহন। ঠিক প্রায় পাশেই ছিল। ইশারায় কাছে ডাকলেন তাকে কুমারবাহাদুর। কানে কানে বললেন,—বজরায় রাজকুমারী একা নাইতো ?

—না হুজুর! পাহারা আছে। আমার বিশ্বাসী লোক আছে ক'জন সিপাইও আছে। মাঝিরা আছে।

বক্ষ স্ফীত হয়ে উঠেছে কৃষ্ণরামের। যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য কি না কে জানে, ঘন ঘন শ্বাস টানছেন তিনি। মুষ্টি পাকিয়ে ধরছেন থেকে থেকে। কৃষ্ণরাম বললেন,—সর্তটা কি তা কি সঠিক জানা আছে রাজপুত্তুর ?

—অসি আঘাতে প্রথম যে জয়ী হবে সেই কি বিজেতা? কুমারবাহাদুর শুধোলেন।

—না। তা নয়। অসি-আঘাতে প্রথম যার মৃত্যু হবে সেই বিজেতারূপে গণ্য হবে। জমিদার কৃষ্ণরাম ভ্রূ বাঁকিয়ে 'বললেন, কয়েক মুহূর্ত থেমে আবার বললেন,—বন্দুকের একটা ফাঁকা আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে খেলারম্ভ হোক তবে ?

—হাঁ তাই হোক।

—যা সর্ত তাতে রাজী ?

—আলবৎ !

পরস্পরের বাক-বিনিময় শেষ হওয়ার পরক্ষণেই একটি বজ্রধ্বনি হয়। আকাশমুখে বারুদ দাগলো কে যেন।

মুখে হাসি ফুটিয়ে তরোয়াল চালালেন কাশীশঙ্কর। অস্ত্র প্রতিহত হয় কৃষ্ণরামের অস্ত্রে। একজনের অসির প্রতিবন্ধক হয়, অন্য জনের অসিচালনার ধাতব শব্দ ছুটলো ঝনঝনে। আঘাতের তীব্রতা অনুভূত হয় ঘন ঘন ঝনৎকারে।

অন্য যারা তারা দর্শকমাত্র। কেউ কা'কেও সাহায্য করবে না। মুখে কথা বলবে না। সকলের বুকে যেন শ্বাস আটকে আছে।

কৃষ্ণরাম ক্ষিপ্র অস্ত্র চালনার সঙ্গে সঙ্গে সম্মুখে এগিয়ে যেতে থাকেন আক্রমণের ভঙ্গীতে। কাশীশঙ্কর পিছু হটেন। তিনি মারমুখী নন যেন, শুধু মাত্র আঘাত ব্যাহত ক'রে চলেছেন। পিছু হ'টতে হ'টতেও মুখে হাসি কুমারবাহাদুরের। মৃদুমন্দ হাসছেন তিনি। একেক লাফে পিছনে হটছেন আর সামলে চলেছেন কৃষ্ণরামের আক্রমণ। অস্ত্রে-অস্ত্রে আঘাতের শব্দ যেন এক বিলম্ব তালের বাদ্য। বনের গভীরে যেন নর্তকী নেচে চলেছে বিলম্বিত সুরে।

মনে মনে হাসলেন, কাশীশঙ্কর। স্থির করলেন, অগ্রে ক্লান্ত হোক জমিদার কৃষ্ণরাম। অবিরাম অসিচালনার ক্লান্তি আসুক আগে। তাই আক্রমণের পরিবর্তে কেবল নিজেকে রক্ষা ক'রে চলেন সন্তর্পণে।

বিলম্বিত তাল দ্রুত হয়। কৃষ্ণরামের আক্রোশ উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হ'তে থাকে। এ-পাশে ও-পাশে ওপরে নীচে অসি চালিয়ে যান কৃষ্ণরাম। তাঁর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটতে থাকে। শ্বাসের গতিও যেন কিঞ্চিৎ দ্রুত।

সহসা মিথ্যা ভাণে ডান দিকে অসি চালিয়ে তৎক্ষণাৎ বাম দিক থেকে তীব্রবেগে হাত চালালেন কাশীশঙ্কর। তাঁর অব্যর্থ লক্ষ্যের দারুণ আঘাত লাগে কৃষ্ণরামের কণ্ঠ ও স্কন্ধের সংযোগে। কৃষ্ণরাম বিকট এক চিৎকার করেন হঠাৎ আঘাতে। তাঁর হাত অবশ হতে থাকে ক্ষণিকের মধ্যে। তবুও তিনি অসি চালনায় বিরত হন না। তাজা রক্তের ধারা নামে কৃষ্ণরামের বক্ষে আর পৃষ্ঠে। চোখের দৃষ্টিতে ফোটে ব্যথা-কাতরতা। জ্বালা-যন্ত্রণায় কপালে কুঞ্চন দেখা দেয়।

অবশ হাত বিশ্বাসঘাতকতা করে। কেমন যেন হাত ফসকে যায়। হাত ওঠে না ঠিক সময়ে।

কাশীশঙ্কর সুযোগ গ্রহণ করেন। তীক্ষ্ণধার তরোয়ালের অগ্রভাগ সজোরে বসিয়ে একটি ঠেলা মারলেন সেই সঙ্গে। কৃষ্ণরামের বুকে পিঠে অনর্গল রক্তপাতের সিক্তচিহ্ন। তিনি আবার এক আর্তনাদের সঙ্গে ধরাশায়ী হয়ে পড়লেন। হাতের অস্ত্র খসে পড়লো। কাশীশঙ্কর সেই বিদ্ধ তরবারি তখন আরও গভীরে চালিয়ে দিলেন।

কুমারবাহাদুরের পক্ষ জয়ধ্বনি তুললো জ্যোৎস্নাধবল আকাশ ফাটিয়ে।

তরবারি টেনে নিলেন কাশীশঙ্কর। খাপে ভরলেন। ঘন ঘন শ্বাস ফেলছেন তিনি। হাঁফ ধরছে যেন বুকে। কি এক আনন্দে তবু অট্টহাসি ধরলেন তিনি। বক্ষ নাচিয়ে নাচিয়ে হাসলেন আপন শক্তির গর্ববোধে।

সপ্তগ্রামের কুলীন-কুলতিলক স্বেচ্ছাচারী কৃষ্ণরামের চোখের দুই প্রান্তে বেদনাশ্রু। হীরার কুচির মত চিকচিক করে। একজন সহচর ভূমিতে লুণ্ঠিত কৃষ্ণরামের মাথা কোলে তুলে নেয়। অসহ্য জ্বালা ধরছে ক্ষতস্থানে। কাশীশঙ্করের অসিতে বিষ ছিল কি!

কৃষ্ণরামের অনুচরবর্গের হাতে হাতে অস্ত্র, কিন্তু তারা উপায়হীন। দলে দলে দ্বন্দ্বযুদ্ধের সর্ত স্থির হয়নি আগে।

হাসির শেষে শ্রান্তি মোচনের জন্য কিছুক্ষণ অচঞ্চল থাকেন। বুকভরা শ্বাস টানছেন তিনি। হাঁফ ধরছে বুকে। অস্ত্রচালনায় বিরতি হয়েছে, হাতের শিরা-উপশিরা থেকে থেকে কাঁপছে এখন। গর্ব্বের হাসি কুমারের মুখে।

রাম মশালের আলোয় ঝাবলাবনে যেন এক বিভীষিকার সৃষ্টি হয়েছে। কীট-পতঙ্গ ডাকছে। ঝসাড়বনে হায়না ওৎ পেতে আছে। মাংসের গন্ধ পেয়েছে দূর থেকে। নরমাংসের আস্বাদে জিহ্বা থেকে জল ঝরছে।

কৃষ্ণরাম কি যেন বলতে চাইছেন, অথচ কণ্ঠ সাড়া দেয় না। কষ্টকাতর চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছেন। কাকে যেন খোঁজাখুঁজি করছেন। কৃষ্ণরামের কম্পমান ওষ্ঠে গঙ্গাবারি দেওয়া হয়। জলপানের শক্তি নেই, জল গড়িয়ে পড়ে মুখ থেকে। ফুটো পড়লে শব্দ হয়, এমনই গম্ভীর স্তব্ধতা বিরাজ করে। সমবেত জনগন নিস্পন্দের মত দাঁড়িয়ে আছে।

হঠাৎ যেন ঘুমিয়ে পড়লেন কৃষ্ণরাম। মাথা নত হয়ে যায়। মুখের কষ্টচিহ্ন ধীরে ধীরে বিলীন হ'তে থাকে। শেষ শ্বাস ত্যাগ করলেন তিনি। কষ্টজ্বালার অবসান হয়। বাতাসে সাঁই সাঁই শব্দ ভাসছে। নাই নাই শব্দ যেন।

বহুক্ষণের নীরবতা। শোক পালনের মৌনপ্রকাশ। মুখে কথা নেই কারও।

কাশীশঙ্কর শব্দহীন পদক্ষেপে এগিয়ে চললেন। কৃষ্ণরামের পাশে দাঁড়িয়ে নতজানু হয়ে ব'সলেন। সামরিক রীতিতে সেলাম জানালেন। তার পর উঠেই পথ ধরলেন গঙ্গাতীরের। শীর্ণ এক সোপানশ্রেণীতে পদার্পণ করলেন। সিঁড়ি বেয়ে নেমে চললেন নীচে। তরতরিয়ে।

কে এক অবলা! শোকের প্রতিমূর্তি যেন! শুভ্রবস্ত্রধারিণী। কুমারবাহাদুরের সঙ্গে চোখাচোখি হ'তেই তিনি থমকে দাঁড়ালেন। —নীচে থেকে ওপরে উঠতে উঠতে। গুণ্ঠন ঈষৎ সরিয়ে কথা বললেন,—ভাই!

—কে ? বিন্ধ্যবাসিনী ? সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন কাশীশঙ্কর। ভরা-যৌবনের চাঁদ আকাশে। হাস্যময়ী পূর্ণিমার সোনা-রঙের ঢেউ ভাসছে দিকে দিকে। জ্যোৎস্নায় জোয়ারে মিশে গেছে গঙ্গা।

কুমারবাহাদুর স্পষ্ট দেখলেন রাজকুমারীর বিবাদ মুখ। বললেন,— বিন্ধ্য! তুমি কোথায় যাও এই বিপদের মাঝে?

—শুনেছি, তিনি আর নাই।

—হ্যাঁ, তা সত্য বটে। কৃষ্ণরামের মৃত্যু হয়েছে।

—তাই চলেছি আমি। ভাই, তুমি সুতানুটিতে ফিরে যাও। সেথায় যাওয়ায় আমার আর কাজ নাই।

—তুমি কোথায় যাবে?

—এক চিতায় জ্বলতে চলেছি। তাঁর সঙ্গে আমিও যাই। আমার তো কোন বালাই নাই। বিন্ধ্যবাসিনীর কণ্ঠস্বর বাষ্পরুদ্ধ। কেমন যেন করুণ। সিক্ত আঁখিপল্লব।

—আমি কি তবে পাতকী? তোমার মৃত্যুর কারণ কি আমাকে করতে চাও?

—না তা নয়। তুমি আমার জ্বালা জুড়ালে। কথা বলতে বলতে জ্যেষ্ঠকে প্রণাম করলেন বিন্ধ্যবাসিনী। কুমারের পাদস্পর্শ করলেন। বললেন,—আশীর্ব্বাদ কর, যেন সুখে যেতে পারি।

রাজকুমারীর কপাল স্পর্শ করলেন কাশীশঙ্কর। বললেন,— এই কি শেষ কথা? বৃথা মৃত্যু বরণ করবি?

—বৃথা নয় ভাই। একচিতায় যাই। আমাকে যেতে দাও। আমি তাঁর কাছে যাই। কথার শেষে আর থাকলেন না রাজকন্যা। অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিতে চললেন। চোখে জল, মুখে মনোবেদনার হাস্যরেখা। বিন্ধ্যবাসিনী কয়েক সোপান উঠে পিছু ফিরে বললেন,— ভাই, বিদায়।

সুতানুটিতে যখন কাশীশঙ্কর পৌঁছালেন, তখন ভোরের আলো ফুটেছে গঙ্গার তীরে। সিঁদুর-মেঘ ছড়িয়েছে আকাশপ্রান্তে। রাজপুরীতে কুমারবাহাদুরের সাক্ষাৎ পেয়ে হৈ-হৈ লাগে। ঘু ভেঙে যায় গৃহস্থের।

রাজবাহাদুর উঠে পড়েন। রাজমাতা ব্যস্ত হয়ে আসেন রাণীমায়েরাও দেখা দেন ঘুমভাঙা চোখে।

রাজমাতা বিলাসবাসিনী সাগ্রহে বললেন,—কাশী, আমার মেয়ে কৈ? সে কেমন আছে? তোমার সঙ্গে আসে নাই সে?

একসঙ্গে অনেক প্রশ্ন। কুমারবাহাদুর কাঁকে যেন খুঁজতে থাকেন চোখের সন্ধানে। দেখতে পেয়েছেন কি তাকে? হয়তে দেখেছেন। তিনি মহাশ্বেতা। রাজরাণী। দূরে এক দুয়ারে পাশে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে। মহাশ্বেতার মুখে কোন বিকা নেই।

ধৈর্য্য নেই রাজমাতার। তিনি আবার বললেন,—কি, কথ কও না কেন কুমারবাহাদুর?

হেসে ফেললেন কাশীশঙ্কর। তাঁর সেই স্বভাবসুলভ হাসি বললেন,—সব মিথ্যা জানো তোমরা। বিন্ধ্য তোমার পরম সুখে আছে। স্বামীর ঘর সে ত্যাগ করতে চাহে না। কৃষ্ণরামে কাছেই আছে। কথা বলতে বলতে মুখ থেকে হাসি অদৃশ্য হ কুমারের। বলেন,—বিন্ধ্যর এখন সুখের অন্ত নাই। কৃষ্ণরামে সঙ্গে একত্রে স্বর্গসুখে আছে।

কথার শেষে স্থান ত্যাগ করতে উঠলেন কাশীশঙ্কর। দুয়ারে কাছে এগিয়ে বললেন,—চল রাজরাণী, স্বগৃহে যাওয়া যাক।

আকাশে পৌর্ণমাসী চাঁদ। পূর্ণিমার সোনালী ঢেউ ভাসছে আসমানে। চন্দ্রালোকে কাশীশঙ্কর পথ চলেন। পেছনে রাজরাণী।

রাজমাতা বিলাসবাসিনী একটা স্বস্তির শ্বাস ফেললেন!

সমাপ্ত

বিদগ্ধ দুপুরের ক্লান্ত কান্না

জগন্ময় মিত্র

বিদগ্ধ দুপুরের ক্লান্ত কান্না
আর, অবাক শিরীষের ফিস-ফিস কথা কওয়া
হৃদয়ের মন্থর স্বপনের ক্লান্ত বিলাসে,
তুমি এলে, বেহাগ, ললিতের করুণ মূর্চ্ছনায়
কত কাছে, তবুও অতৃপ্ত আজও হৃদয়ের গোপন বিলাস।
তাই—
যাই লিখে,
বিদায়-গোধূলির চিড়খাওয়া সেতারের মসৃণ মীড়ে।
সুমনা,
আবার হারিয়ে যাবো বৃহৎ পৃথিবীর জনস্রোতে আর কলোচ্ছ্বাসে;
হয়ত' তখনও তুমি ফিরে ফিরে যাবে
বিদগ্ধ দুপুরের ক্লান্ত কান্নায়,
রেখে যাবে হৃদয়ের না-বলা বাণী আশাবরী সুরে
কিন্তু, আমি রবো দূরে—জনস্রোতে মিশে।

কংগ্রেসের সংস্কার

"কংগ্রেস যে ব্যাধিগ্রস্ত এবং তাহাকে চিকিৎসা করিয়া সুস্থ ও সবল করা প্রয়োজন, ইহা পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, কংগ্রেসের সভাপতি ধীবর মহাশয়—সকলেই স্বীকার করিতেছেন। পণ্ডিত জওহরলাল ত' পদত্যাগ পর্য্যন্ত করিতে চাহিয়াছিলেন। কংগ্রেসের অনেক রোগ। তাহার মধ্যে একটি বড় রোগ—প্রাদেশিকতা। ইহার ফলে কংগ্রেস ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। কংগ্রেসের পক্ষে যে রাষ্ট্রের ঐক্যসাধন চেষ্টা করা প্রয়োজন, তাহা পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুও স্বীকার করিয়াছেন। প্রাদেশিকতার প্রভাব কিরূপে লোককে রাষ্ট্রসচেতন না করিয়া বিভক্ত করিতেছে, তাহা পশ্চিমবঙ্গের দিকে চাহিলেই বুঝিতে পারা যায়। পশ্চিমবঙ্গের এক সীমায় বিহার, আর এক সীমায় আসাম-উড়িষ্যার কথা না বলিয়া আজ আমরা কেবল বিহারের ও আসামের কথাই বলিব। বিহার বহুকাল হইতে বাঙ্গালারই অংশ ছিল। যখন লর্ড কার্জ্জনের নীতির ফলে বঙ্গবিভাগ হইলে বাঙ্গালীর আন্দোলন ফলে বিভাগ রদ করিতে হয়, তখন বাঙ্গালীকে দুর্ব্বল করিবার জন্য ইংরেজ সরকার বিহার ও উড়িষ্যা লইয়া একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠিত করেন। তাহার পরে উড়িষ্যা স্বতন্ত্র হইয়াছে। ইংরেজ যখন বিহার ও উড়িষ্যাকে স্বতন্ত্র প্রদেশে পরিণত করেন, তখন তাঁহারা যে ইচ্ছা করিয়া বাঙ্গালার কতকাংশ বিহারকে দিয়াছিলেন, তাহা তৎকালীন বিহারী নেতারাও স্বীকার করিয়াছিলেন। তখন দীপনারায়ণ সিংহ, ফকরুদ্দীন, সচ্চিদানন্দ সিংহ ও পরমেশ্বরলাল এক বিবৃতিতে বলেন—বঙ্গ-ভাষাভাষী অঞ্চল বাঙ্গালার ও হিন্দীভাষাভাষী অঞ্চল বিহারের প্রাপ্য। সে হিসাবে (১) মহানন্দা নদীর পূর্ব্বে অবস্থিত পূর্ণিয়ার ও মালদহের অংশ বাঙ্গালায় যাইবে, অবশিষ্ট অংশ বিহারে থাকিবে। (২) সাঁওতাল পরগণার বাঙ্গালা-ভাষাভাষী অঞ্চল বাঙ্গালায় ও হিন্দী-ভাষাভাষী অঞ্চল বিহারে থাকিবে। (৩) সমগ্র মানভূম জিলা এবং সিংহভূমের ধলভূম পরগণা বাঙ্গালার হইবে। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে যখন এই বিবৃতি প্রচারিত হয়, তখন ভারতবর্ষ ইংরেজের অধীন। স্বতন্ত্র প্রদেশের অংশ হইয়াই বিহারী নেতারা বাঙ্গালীর সম্বন্ধে বিদ্বেষ-বিষ উদ্গারিত করিতে থাকেন।" —দৈনিক বসুমতী।

স্পুটনিক রহস্য

"রাশিয়ার তৃতীয় স্পুটনিক অর্থাৎ কৃত্রিম উপগ্রহই আকাশে উঠিয়াছে, পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তৃতীয় বলিয়াই প্রথম বিস্ময়ের চমক ইহাতে নাই। প্রায় সাত মাস পূর্ব্বে প্রথম স্পুটনিক যখন আকাশে উঠে তখন সারা পৃথিবীতে যে অভূতপূর্ব চাঞ্চল্য ? হইয়াছিল তাহা স্তিমিত হইয়াছে। বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়া গিয়াছে, তাহার স্থানে দেখা দিয়াছে মহাশূন্য অভিযানের ভবিষ্যৎ গতি-প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য নিয়া নানারূপ জল্পনা কল্পনা। রাশিয়ার মহাশূন্য অভিযানে অগ্রগতি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রকে উদ্বিগ্ন করিয়াছে। অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র আকারের কৃত্রিম উপগ্রহ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রও আকাশে পাঠাইতে পারিয়াছে। মহাশূন্যে অভিযানের প্রতিযোগিতায় দুই বৃহৎ রাষ্ট্রের মধ্যে কে কতখানি আগে বা পিছে রহিল তাহা বড় কথা নয়। চিন্তার বিষয় হইল মহাশূন্যে কৃত্রিম উপগ্রহ স্থাপনের উদ্দেশ্য নিয়া। আপাততঃ কৃত্রিম উপগ্রহ স্থাপন বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক গবেষণার অঙ্গ বলিয়া ধরিয়া নেওয়া হইয়াছে। কিন্তু যে বিপুল শক্তিশালী রকেটের সাহায্যে কৃত্রিম উপগ্রহকে মহাশূন্যে পাঠানো যায় সেই রকেটই আন্তর্মহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্রের চালকরূপে ব্যবহার করা যায়। তারপর কৃত্রিম উপগ্রহ স্থাপনের ব্যবস্থা আরও হইলে মহাশূন্য হইতেই নাকি পারমাণবিক অস্ত্র ছুড়িতে পারা যাইবে। কাজেই মহাশূন্য বিজয়ের বৈজ্ঞানিক সাফল্যের কেবল চমৎকার বোধ করিয়া থাকা হয়তো সম্ভব হইবে না। কথিত আছে যে, ম্যাক্সিম গর্কিকে এক জন চাষী বলিয়াছিল, 'আমরা আকাশে উড়িবার কলকৌশল আবিষ্কার করিতে পারিয়াছি, কিন্তু মাটিতে নির্বিঘ্নে জীবনযাত্রা ব্যবস্থার রহস্য আয়ত্ত করিতে পারি নাই।' এই উক্তির যথার্থতা কেবল রাশিয়ার তৃতীয় স্পুটনিককে লক্ষ্য করিয়াই স্মরণ করিতেছি না।"

—আনন্দবাজার পত্রিকা।

ঢালিয়া সাজো

"এক বৃহস্পতিবার কলিকাতার বিভিন্ন এলাকা হইতে রাজপথে পরিত্যক্ত চারটি সদ্যোজাত শিশু পাওয়া গিয়াছে। মাঝে মাঝে দুই একটি শিশু পাওয়ার ঘটনা খুব পুরাতন। কিন্তু এক তারিখে এক গণ্ডা শিশুপ্রাপ্তি একটা রেকর্ড, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ঘটনাটি কৌতুক করারও নয়, ইহা লইয়া সৌখীন কারুণ্য প্রকাশও অর্থহীন। আমাদের সমাজ-জীবনে তলায় তলায় আজ যে কত বড় ভাঙন ধরিয়াছে, নিম্নবিত্ত মানুষদের জীবনে সংস্কার ও সংস্থানের দ্বন্দ্ব যে কিরূপ প্রবল হইয়া উঠিতেছে, এ সব তাহারই প্রত্যক্ষ প্রমাণ। দেশজোড়া বেকার সমস্যার বিপাকে যুবকরা যথাবয়সে বিবাহের সুযোগ পায় না। দরিদ্র অভিভাবক পণ ও আনুষঙ্গিক ব্যয়ের দাপটে মেয়ের বিবাহ দিতে পারেন না। অথচ নানা কারণে নরনারীর মিশ্রণ সমাজে অবাধ হইয়াছে। এ ক্ষেত্রে অবশ্যম্ভাবী পরিণাম যখন দেখা দেয়, তখন মানের দায়েই মানুষ সদ্যোজাত শিশুকে জনসাধারণের করুণার মুখ চাহিয়া পথে ফেলিয়া পালায়। উদ্বাস্তু বেকার ও চালচুলাহীন মানুষদের দেশে এই

দিনের পর দিন হাঘরেদের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। পিতা-মাতার বৈধ সন্তানই যেখানে আপদস্বরূপ, সেখানে এই সব অন্ধকারের আগন্তুকদের আর স্থান কোথায়? এ সমস্যার সমাধান কোথায়? সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো আমূল ঢালিয়া সাজা ছাড়া এই মনুষ্য-জীবনের অপচয় কি কখনো বন্ধ হইবে?" —যুগান্তর।

বাস সার্ভিস না পানিসমেণ্ট?

"দেশ স্বাধীন হইবার পর ভারতের জনগণ দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া ভাবিয়াছিল, ইংরেজ অপসারণের পর এইবার দেশসেবা করিবার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেশবাসীর হাতে আসিল। ভুক্তভোগী দেশবাসী দুঃখ-দুর্দশার কথা কে অনুভব করিবে? কিন্তু দেশ স্বাধীন হইবার দশ বৎসর পরেও জনগণের কোন সমস্যার সমাধান হওয়া দূরের কথা প্রতিটি ক্ষেত্রেই উহা জটিল হইয়া উঠিয়াছে। একটা স্বাধীন ও উন্নত দেশের প্রাথমিক পরিচয় তাহার যানবাহন, বাসগৃহ ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার উৎকর্ষ। বর্তমানের পশ্চিম দেশ অর্থাৎ ইউরোপে বিশেষ করিয়া যানবাহনের দিক হইতে কত উন্নত হইয়াছে তাহা ভাবিলে ভারতবাসীকে হতবাক হইতে হইবে। স্বাভাবিক অবস্থায় সাধারণ যানবাহনে ভীড় হইয়াছে ইহা কেহ কল্পনাও করিতে পারে না। সর্বপ্রকার যানবাহনই যাত্রীদের সুখ-সুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখিতে সর্বদাই তৎপর। ঐ দেশে বাস সার্ভিস, ষ্টীমার সার্ভিস, ট্রেণ সার্ভিস নামকরণ বাস্তবিকই সার্থক। যানবাহন চালনার কথা এখানে উল্লেখ না করাই ভাল। ঘণ্টায় ৬০ মাইল বেগবান জার্মাণীর ট্রেণের দরজা জানালা বন্ধ থাকিলে বুঝিতে পারা যায় না যে ট্রেণটি চলিতেছে। আর আমাদের এই স্বাধীন ভারতে যাত্রীদের আরাম 'হারাম হায়।'"

—দামোদর (বর্দ্ধমান)।

নন্দলালের বিরাম-ক্ষেত্র

"দ্বিজু রায়ের নন্দলালের মত জহরলালও এক ভীষণ পণ করিয়া বসিয়াছিলেন যে, দেশের জন্ত তিনি প্রধানমন্ত্রিত্ব ত্যাগ করিবেন। চারিধারে সকলে বাহা-বাহা না করিলেও আহা-আহা করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। তখন তিনি ঘোষণা করিলেন—অন্ততঃ পাঁচ মাসের জন্ত গদী ছাড়িয়া তিনি দেশের উন্নতির চিন্তা একমনে করিবেন। সম্প্রতি সেই পাঁচ মাস দেখিতেছি পাঁচ সপ্তাহে দাঁড়াইয়াছে। এখন সমস্যা হইয়াছে—এই পাঁচ সপ্তাহই বা কোথায় কাটাইবেন? তিনি ঠিক করিয়াছিলেন, যাইবেন হিমালয়ের পাদদেশে কুলুতে। লেডী মাউণ্টব্যাটেন তাঁহাকে ভূমধ্যসাগরে সমুদ্র-বিহারে কাটাইবার নিমন্ত্রণ করিয়া দোটানায় ফেলিয়া দিয়াছেন! সত্যিই তো! মডার্ণ নন্দলালের তপস্যার যোগ্য স্থান কুলু উপত্যকার আপেল-কুঞ্জ অথবা ভূমধ্যসাগর-বক্ষে প্রমোদ-তরণী—তাহা বলা একটু কঠিন।"

—যুগবাণী (কলিকাতা)।

মূল্য বৃদ্ধি কেন?

"ধান-চাউলের উচ্চমূল্য রোধ হইতেছে না, যদিও সরকারী নিয়ন্ত্রিত মূল্য প্রচারিত হইয়াছে। বর্তমান গড়ধান্য ১৩ টাকায় নিয়ে পাওয়া যায় না। চাউল টাকা প্রতি /১৮/০— /১৮৫০ দর দাঁড়াইয়াছে। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাস, এখন হইতে যদি এইরূপ অবস্থা দাঁড়ায় তবে আগামী বর্ষার সময় চাষের দিনে লোকের কি অবস্থা দাঁড়াইবে তাহাই চিন্তার বিষয় হইয়াছে। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলি সরিষা, তৈল, ডাল, সুপারি, মসলা, চিনি প্রভৃতির দরও ক্রমেই বাড়িতেছে। মূল্যবৃদ্ধিতে লোকের জীবনধারণ সমস্যা ক্রমেই জটিল হইয়া পড়িতেছে।" —নীহার (কাঁথি)।

শোক-সংবাদ

অনুরূপা দেবী

পরম শ্রদ্ধেয়া সাহিত্যসম্রাজ্ঞী অনুরূপা দেবী গত ৬ই বৈশাখ ৭৬ বছর বয়েসে দেহান্তরিতা হয়েছেন। অর্ধশতাব্দীরও অধিককাল ইনি বাঙলা সাহিত্যকে সেবা করে গেছেন এবং দীর্ঘ দিনে বাঙলার উপন্যাস জগতকে যথেষ্ট পুষ্ট করে গেছেন! পুণ্যশ্লোক ভূদেব মুখোপাধ্যায় এঁর পিতামহ এবং বঙ্গীয় মঞ্চলোকের স্বনামধন্য পুরুষ নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এঁর মাতামহ। সাহিত্য সাধনা ছাড়াও সামাজিক উন্নয়নমূলক বহু প্রচেষ্টায় এঁর সংযোগ ছিল ঘনিষ্ঠ। ইনি প্রায় ত্রিশখানি গ্রন্থের রচয়িত্রী ছিলেন। এঁর স্বামী পরলোকগত পণ্ডিতপ্রবর শিখরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও কিছুকাল আগে পরাসু হয়েছেন। বসুমতী সাহিত্য মন্দির থেকে বিভিন্ন খণ্ডে এঁর গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হয়েছে।

অধ্যাপক উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য

বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী ও প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ অধ্যাপক উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য গত ৮ই বৈশাখ ৭২ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। ইনি প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার। এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পত্রিকা-সম্পাদক ছিলেন। হিষ্ট্রী য্যাণ্ড দি কালচার অফ দি ইণ্ডিয়ান পিপল (পাঁচ খণ্ডে) দর্শনের রূপ ও অভিব্যক্তি ভারত দর্শনসার চার শ' বছরের পাশ্চাত্ত্য দর্শন প্রভৃতি বহুজন সমাদৃত গ্রন্থগুলির ইনি রচয়িতা। পণ্ডিতসমাজ এঁর মৃত্যুতে বিশেষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলেন।

অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

চিত্রশিল্পী অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় গত ৩০এ বৈশাখ ৭৫ বছর বয়েসে লোকান্তর যাত্রা করেছেন। ইনি শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এঁর আঁকা শিল্পীর কন্যা, রাসলীলা, প্রেমলিপিকা প্রভৃতি চিত্রগুলি রসিকমহলে সম্বর্ধনা লাভ করে। "সোল অফ এ স্লেভ" নামক সে যুগের বিখ্যাত ছায়াচিত্রটি ইনিই পরিচালনা করেন।

সম্পাদক—শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

কলিকাতা, ১৬৬নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "বসুমতী রোটারী মেসিনে" শ্রীতারকনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

বিদেশী কুকুরপ্রীতি কেন ?

গত সংখ্যার মাসিক বসুমতীতে জনৈকা লীলা চট্টোপাধ্যায় 'বিদেশী কুকুরপ্রীতি কেন ?' পাঠ করিয়া সবিশেষ আশ্চর্য্য ও দুঃখিত হইয়াছেন দেখিয়া আমিও অত্যন্ত 'দুঃখ বোধ করিতেছি। আমি তাঁহার চিঠির আদ্যোপান্ত পড়িয়া কোন অর্থই আবিষ্কার করিতে পারিলাম না। যাহা হউক, আমার বক্তব্যকে তিনি অযথা যুক্তিহীনতার মধ্যে 'আক্রমণ' করিয়াছেন। আমি আবার বলিব, সমগ্র ভারতবর্ষে শিক্ষাদীক্ষার ক্ষেত্রে বাঙালীর একনায়কত্ব আজ লুপ্ত হইতে চলিয়াছে—যাহা অত্যন্ত ক্ষোভের কথা। অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ, সুভাষচন্দ্রের কৃতিত্ব আমি অস্বীকার করি নাই। বাঘা যতীন, সূর্য্য সেন ও প্রীতিলতার দেশপ্রীতিকেও আমি অসম্মান করি নাই। সুভাষচন্দ্রকে কোথায় অপমান করিলাম তাহাও বুঝিতে পারিলাম না। আইক ও ক্রুশ্চেভকে বিদেশী কুকুর বলিয়াছি, এই অভিযোগও সম্পূর্ণ মিথ্যা। লেনিন, লিঙ্কন, গান্ধীজী গুলীবিদ্ধ হওয়ায় অহঙ্কারের কোন কারণ থাকিতে পারে কেন, বুঝিলাম না। আমি আবার বলিতেছি, রুশদেশের ভারতপ্রীতি রুশদেশের নিরাপত্তার জন্যই, ভারতবর্ষকে রক্ষার নিমিত্ত আবশ্যই নহে। কাশ্মীরের জন্য রাশিয়ার ভেটো প্রয়োগ কাশ্মীর যাহাতে আক্রমণ কেন্দ্র না হইতে পারে তজ্জন্য, অন্য কারণ কিছুই নাই। কাশ্মীরে পাকিস্থানী শাসন প্রতিষ্ঠা হইলে রাশিয়ার বিপদের অন্ত থাকিবে না। আশা করি লীলা দেবী অস্বীকার করিবেন না। 'ভারত পেটের জন্য ভিক্ষার ঝুলি হাতে বাহির হইয়াছে' আমাদের নির্লজ্জ কংগ্রেসী নেতাদের নির্বুদ্ধিতায়: কংগ্রেসের উচ্চমহলের বিদেশী কুকুরপ্রীতি অত্যন্ত প্রকট। কমনওয়েলথভুক্তি ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। রাশিয়া ও আমেরিকা 'স্পুৎনিক' সাহায্যে মানুষের চিরজয় করিতে উদ্যোগী না হইয়া মারণাস্ত্র হিসাবে যে ব্যবহার করিবে, এ কথা আর অজানা নাই। তাই 'স্পুৎনিক' আমার কাছে একান্তই ঘৃণার বস্তু। এই কারণেই আমি পুনরায় বলি, ভারতীয় মহাগ্রন্থসমূহ রুশীয় শাসকদের মনোবিকার পরিবর্ত্তিত করিবে। আমেরিকার যুদ্ধপ্রীতিও প্রশমিত করিবে। লীলা দেবী সর্বশেষে চিরাচরিত প্রথায় মহাজনবাণী উদ্ধৃত করিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন। কবিগুরুর ভাষায় লিখিয়াছেন, 'পশ্চিম আজি খুলিয়াছে দ্বার' ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু ভারত যে আরও অনেক কাল আগে সিংহদ্বার উন্মুক্ত করিয়াছে লীলা দেবী কি তাহা জানেন না ? দেশের ঠাকুরকে ফেলিয়া যাহারা বিদেশী কুকুরদের মাথায় তুলিয়া মগজকে বিকৃত করিতে অভিলাষী তাহাদের দিন কবে অবসান হইবে, আমি সেই প্রতীক্ষায় আছি। এইরূপ বিকৃত মনের অধিকারীদেরও 'কুকুর' নামে ডাকিতে আমি পেছপাও হইব না। এবং ইহাদের ল্যাপ্‌ডগ কিম্বা বোর্জয় কুকুর নামকরণেই অভিহিত করিব। ইহারাই লেডী মাউন্টব্যাটেনের ও ষ্টালিনের ল্যাপ্‌ডগ। কিন্তু একমাত্র সান্ত্বনা, লেডীদের এবং ষ্টালিনদের ল্যাপডগের দিন ফুরাইয়া আসিতেছে, লীলাখেলার পালা শেষ হইয়া আসিতেছে।—শ্রীমতী মালা ঘোষচৌধুরী, রেঙ্গুণ।

পত্রিকা সমালোচনা

মাসিক বসুমতীর গত কার্ত্তিক সংখ্যার দিলীপ মালাকরের "সাহিত্যিক ও শিল্পী" সংক্ষিপ্ত হলেও একটি আকর্ষণীয় রচনা।
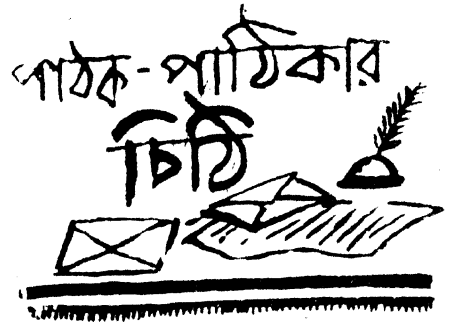
জগতবরেণ্য সাহিত্যিক ও কবিরা শুধু যে লেখা নিয়েই ছিলেন না, চিত্র ও শিল্প চর্চ্চাতেও যে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন লেখক এবিষয়ে আলোকপাত করে পাঠকদের কাছে নূতন একটি বিষয়ের উদ্‌ঘাটন করেছেন সেজন্য ধন্যবাদ। সম্পাদক হিসেবে এ ধরণের মৌলিক রচনা প্রকাশের জন্য আপনাকেও আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

উক্ত প্রবন্ধের একটি স্থানে লেখক কিঞ্চিৎ অতিশয়োক্তি করেছেন বলে আমার ধারণা। রচনার এক স্থানে লেখক লিখেছেন—"এইচ, জি, ওয়েলস, ডি, এইচ, লরেন্স, ও থ্যাকারে সাধারণ আর্টিষ্ট ছিলেন না। এঁদের আঁকা ছবিগুলোকে যে কোন উঁচুদরের বা পেশাদার চিত্রশিল্পীর আঁকা চিত্রের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। থ্যাকারের আঁকা ছবিগুলি একটু শ্লেষাত্মক।"

থ্যাকারে অসাধারণ আর্টিষ্ট ছিলেন বা উঁচুদরের পেশাদার চিত্রশিল্পীর চিত্রের সাথে থ্যাকারের তুলনা অতিশয়োক্তি বলেই মনে করি। কারণ, থ্যাকারে প্রথম জীবনে প্যারীতে শিল্পচর্চ্চা অধ্যয়ন করেও চিত্রবিদ্যাকে পুরোপুরি পেশা করতে সক্ষম হন নি। এবং শুধু চারুকলাই নয়—কার্টুন বিষয়েও থ্যাকারে বিশেষ ভাবে সচেষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু চিত্রবিদ্যায় তাঁকে কোনদিনই পেশাদার শিল্পীর সম্মান দেওয়া হয় নি। এ্যামেচার গোষ্ঠীভুক্তই তিনি ছিলেন। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে তিনি কার্টুন আঁকবার জন্যে "পাঞ্চ" পত্রিকায় যোগ দেন। কিন্তু কার্টুন আঁকবার ভার তার ওপর ছিল না—কার্টুন আঁকতেন জন লিচ্‌। তবে থ্যাকারে অজ্ঞ বা ব্যর্থ শিল্পী নন—এবিষয়ে আমি দিলীপ বাবুর সাথে একমত। শুধু শিল্পচর্চ্চাই নয়, আইন, সাংবাদিকতা, হিউমার ও সাহিত্যচর্চায়ও তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। ডিকেন্সের কয়েকটি উপন্যাসের চিত্রায়ণের জন্য থ্যাকারে উৎসাহী হয়ে সেকাজের ভার পাননি নিজের পরিপূর্ণ দক্ষতার অভাবে। Pear's এর ৬৪তম সংস্করণের এনসাইক্লোপিডিয়াতে থ্যাকারের আলোচনার কয়েকটি লাইন নীচে দিলাম—"His first ambition was to be an artist, he seriously proposed to be an illustrator of Dickens's works, but he never got much beyond the amateur stage in pictorial work, the drawings he made to illustrate some of his own novels being crude and inefficient."

এছাড়া Punch পত্রিকার "The Pagent of Punch I বিশেষ সংখ্যার মুখবন্ধে (পৃঃ ২৩) থ্যাকারেকে লেখকগোষ্ঠী তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। শিল্পী জন লিচ, রিচার্ড ওয়েল প্রভৃতি

সাথে তাঁকে পাংক্তেয় করা হয় নি। পরের পৃষ্ঠায় লাইনটি উদ্ধৃত করলাম। "Leech" and "Phiz," with Doyle, are the most notable Punch artists ; Thackeray, Douglas Jerrold, Percival Leigh and Horace (brother of Henry) Mayhew the outstanding writers."

থ্যাকারে চিত্রচর্চার প্রতি আসক্ত ছিলেন এবং উৎসাহের সাথে চিত্রচর্চাও করেন কিন্তু প্রথম শ্রেণীর শিল্পীর সঙ্গে থ্যাকারের তুলনা অচল। এদিক থেকে কিঞ্চিৎ আপত্তি থাকায় আপনাকে এই পত্রাঘাত। কমল সরকার ৫২।১৫, শশিভূষণ নিয়োগী গার্ডেন লেন।

গ্রাহক-গ্রাহিকা হইতে চাই

বর্ত্তমান বৎসরের বৈশাখ মাস হইতে গ্রাহিকা করিয়া লইয়া বাধিতা করিবেন। আশা করি এই মাসের মাসিক বসুমতী যথাসময়ে পাইব। (Miss) Anita Das, Nayatala, Patna.

Sending herewith Rs 15/- being my annual subscription for Masik Basumati—Anita Kar, Durgapur, Burdwan.

১৩৬৫ সালের বৈশাখ হইতে ৬ মাসের জন্ম ৭।৹ পাঠাইলাম। —Purnima Sarkar, Khamaria, Jubbulpur.

I am a regular subscriber of your Monthly magazine Masik Basumati. I am remitting the sum of Rs 15/- for the current Bengali year 1365. Please send me the same magazine from the month of Baisakh 1365 as before and oblige. —Sumitra Roy, Raniganj, Burdwan.

১৩৬৫ সালের মাসিক বসুমতীর (বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত) বার্ষিক চাঁদা ১৫৲ পাঠাইলাম। পত্রিকা পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। প্রিয়বালা গুপ্তা। লোদী রোড, নিউ দিল্লী।

I am sending the subscription for the Bengali year 1365 (from Baisakh to Chaitra).—Srikrishna Roy, Kamrup, Assam.

১৩৬৫ সালের বার্ষিক চাঁদা ১৫৲ টাকা পাঠাইলাম। নিয়মিত মাসিক বসুমতী পাঠাইবেন। Aparna Bhattacharjee, Khar, Bombay.

মাসিক বসুমতীর ছয় মাসের চাঁদা বাবদ ৭-৫০ পাঠাইলাম। নিয়মিত পত্রিকা পাইতে আশা রাখি।—Basanti Bhattacharjee, Sibsagar, Assam.

Please accept my annual subscription of your magazine for the year 1365 and continue to send the same regularly'—Sm. Promila Guha—Motihari, Behar.

আমার ষাণ্মাসিক চাঁদা (বৈশাখ—আশ্বিন) পাঠাইলা নিয়মিতভাবে বই পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। Sm. Nihari Bose, Gouhati, Assam.

I am herewith remitting Rs. 15/- for year subscription.—Sulekha Mitra, Jamshedpur.

১৩৬৫ সালের মাসিক বসুমতীর বাৎসরিক চাঁদা ১৫৲ টা পাঠাইলাম। পূর্ব্ববৎ নিয়মিত পত্রিকা পাঠাইলে বাধিত হই —Sm. Raj Lakshmi Kar, Darjeeling

দয়া করিয়া ১৩৬৫ বৈশাখ—আশ্বিন পর্য্যন্ত গ্রাহিকা কর লইবেন—শ্রীমতী চিন্ময়ী গুহ, মুঙ্গের বিহার।

১৩৬৫ সালের মাসিক বসুমতীর অগ্রিম মূল্য পাঠাইলা প্রাপ্তি সংবাদ দেবেন। Sm. Rama Chatterje Sundarchak, Burdwan.

Money sent being subscription for 1365 B. Kanamatsal, Burdwan.

আগামী বৎসরের চাঁদা ১৫৲ টাকা পাঠাইলাম। অনুগ্রহ কো নিয়মমত কাগজ পাঠাবেন। সুধাময়ী গুপ্তা, কংগ্রেসনগর, নাগপুর

মাসিক বসুমতীর বার্ষিক চাঁদা ১৫৲ টাকা পাঠাইলাম যথারীতি মাসিক বসুমতী পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। Sr Gouri Sen, Kazibazar, Cuttack,

১৩৬৫ সালের মাসিক বসুমতীর জন্ম বার্ষিক চাঁদা ১৫ পাঠাইলাম। অনুগ্রহপূর্ব্বক মাসিক বসুমতী পাঠাইয়া বাধি করিবেন।—নীলিমা মিত্র Hastings Road, Allahabad,

মাসিক বসুমতীর ষাণ্মাসিক চাঁদা (বৈশাখ হইতে আশ্বিন পর্য্যন্ত ৭।৹ টাকা পাঠাইলাম। অনুগ্রহ করিয়া মাসিক বসুমতী পাঠাই বাধিত করিবেন। বাসন্তী ঘোষাল, চুণার।

ছয় মাসের চাঁদা সডাক ৭'৫০ পাঠালাম। গ্রাহিকা হতে চাই গত চৈত্র সংখ্যা থেকে পত্রিকা পাঠালে বাধিত হব। অণিমা দ শিলিগুড়ি।

ছয় মাসের গ্রাহিকা হবার জন্ম ৭'৫০ পাঠাইলাম। বৈশা ৬'৫ হতে নিয়মিত মাসিক বসুমতী পাঠাবেন। মাসের মাঝামাঝি অতীব আগ্রহে মাসিক বসুমতীর জন্ম অপেক্ষা করে থাকি। কণিক দত্ত, সম্বলপুর।

বহুদিন যাবৎ স্থানীয় বিক্রেতাদের নিকট হইতে ক্রয় করিয় মাসিক বসুমতী পড়িতাম। উহাতে মাসিক বসুমতী পাওয়া অসুবিধা হওয়ায় আমি অত্র সহিত ১৫৲ পাঠাইয়া আপনাদে গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইতে চাই। ১৩৬৫ সালের বৈশাখ সংখ্যা হইতে মাসিক বসুমতী পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। মাধবীলতা দেবী রামঝোরা, জলপাইগুড়ি।

১৩৬৫ সালের (১২ মাসের জন্ম) বার্ষিক চাঁদা ১৫৲ টাক পাঠাইলাম। নিয়মিত মাসিক বসুমতী পাঠাইয়া বাধিত করিবেন Sm. Rama Rani Mittra, Delhi.

(অলরঙ্)

জ্যোৎস্নারাতে
—শ্রীশৈল চক্রবর্তী অঙ্কিত

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

মাসিক বসুমতী

৩৭শ বর্ষ—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৫] ॥ স্থাপিত ১৩২৯ ॥ [প্রথম খণ্ড, ২য় সংখ্যা

কথামৃত

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব। কেশব সেনের আসবার পর থেকে, তোদের মত 'ইয়ং বেঙ্গলের' (Young Bengal) দলই সব এখানে (আমার নিকটে) আসতে সুরু করেছে। আগে আগে এখানে কত যে সাধু সন্ত, ত্যাগী সন্ন্যাসী, বৈরাগী বাবাজি সব আসত যেতো, তা তোরা কি জানবি? রেল হবার পর থেকে তারা সব আর এদিকে আসে না। নইলে রেল হবার আগে যত সাধুরা সব গঙ্গার ধার দিয়ে 'হাটা পথ ধ'রে সাগরে চান (স্নান) করতে ও ৺জগন্নাথ দেখতে আসত। রাসমণির বাগানে ডেরা-ডাণ্ডা ফেলে অন্ততঃ দু'চার দিন থাকা, বিশ্রাম করা, তারা সকলে কোরতোই কোরতো। কেউ কেউ আবার কিছুকাল থেকেই যেত। কেন জানিস? সাধুরা 'দিশা-জঙ্গল' ও 'অন্ন-পানির' সুবিধা না দেখে কোথাও আড্ডা করে না। 'দিশা-জঙ্গল' কিনা—শৌচাদির সুবিধাজনক নিরেলা জায়গা। আর, 'অন্ন-পানি,' কিনা—ভিক্ষা। ভিক্ষায়েই তো সাধুদের শরীরধারণ—সে জন্য যেখানে সহজে ভিক্ষা পাওয়া যায়, তারই নিকটে সাধুরা 'আসন' অর্থাৎ থাকিবার স্থান ঠিক করে।

"আবার চলতে চলতে ক্লান্ত হ'য়ে পড়লে ভিক্ষার কষ্ট সহ্য ক'রেও বরং সাধুরা কোন স্থানে দু'-এক দিনের জন্য আড্ডা ক'রে থাকে, কিন্তু যেখানে জলের কষ্ট এবং 'দিশা-জঙ্গলের' কষ্ট বা শৌচাদি যাবার 'কায়াকং' (নির্জন) স্থান নেই, সেখানে কখনও থাকে না। ভাল ভাল সাধুরা ও সব (শৌচাদি) কাজ, যেখানে সকলে করে, যেখানে লোকের নজরে পড়তে হবে, সেখানে করে না। অনেক দূরে নিরেলা (নিরালয়) জায়গায় গোপনে সেরে আসে। সাধুদের কাছে একটা গল্প শুনেছিলাম—

"এক জন লোক ভাল ত্যাগী সাধু দেখবে ব'লে সন্ধান ক'রে ফিরছিল। তাকে এক জন ব'লে দিলে যে, যে সাধুকে লোকালয় ছাড়িয়ে অনেক দূরে গিয়ে শৌচাদি সারতে দেখবে, তাকেই জানবে ঠিক ঠিক ত্যাগী। সে ঐ কথাটি মনে রেখে লোকালয়ের বাহিরে সন্ধান করতে করতে এক দিন এক জন সাধুকে অপর সকলের চেয়ে অনেক অধিক দূরে গিয়ে ঐ সব কাজ সারতে দেখতে পেলে ও তার পেছনে পেছনে গিয়ে সে কেমন লোক তাই জানতে চেষ্টা করতে লাগলো। এখন, সে দেশের রাজার মেয়ে শুনেছিল যে ঠিক ঠিক যোগী পুরুষকে বিয়ে করতে পারলে সুপুত্তুর লাভ হয়; কারণ, শাস্ত্রে আছে, যোগীপুরুষদের ঔরসেই সাধুপুরুষেরা জন্মগ্রহণ করেন। রাজার মেয়ে তাই সাধুরা যেখানে আড্ডা করেছিল, সেখানে ম্লনের মত পতি

খুঁজতে এসে ঐ সাধুটিকেই পছন্দ করে, বাড়ী ফিরে গিয়ে তার বাপকে বল্লে যে, সে ঐ সাধুকে বিবাহ করবে। রাজা মেয়েটিকে বড় ভালবাসতো। মেয়ে জেদ করে ধরেছে, কাজেই রাজা সেই সাধুর কাছে এসে 'অর্দ্ধেক রাজত্ব দেব' ইত্যাদি ব'লে অনেক ক'রে বুঝালে যাতে সাধু রাজকন্তাকে বিবাহ করে। কিন্তু সাধু রাজার সে সব কথায় কিছুতেই ভুল্লো না। কাকেও কিছু না ব'লে রাতারাতি সে স্থান ছেড়ে পালিয়ে গেল! আগে যার কথা বলেছি, সেই লোকটি সাধুর ঐরূপ অদ্ভুত ত্যাগ দেখে বুঝলে যে, বাস্তবিকই সে একজন ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের দর্শন পেয়েছে ও তাঁর শরণাপন্ন হ'য়ে তাঁর মুখে উপদেশ পেয়ে তাঁর কৃপায় ঈশ্বর-ভক্তি লাভ ক'রে কৃতার্থ হোলো।

"রাসমণির বাগানে ভিক্ষার সুবিধা, মা গঙ্গার কৃপায় জলেরও অভাব নেই। আবার নিকটেই মনের মত 'দিশা-জঙ্গল' যাবার স্থান—কাজেই সাধুরা তখন এখানেই ডেরা কর্‌তো। আবার, কথা মুখে হাঁটে—এ সাধু ওকে বললে, সে, আর একজন এদিকে আসচে জেনে, তাকে বললে—এইরূপে রাসমণির বাগান যে সাগর ও জগন্নাথ দেখ্‌তে যাবার পথে একটি ডেরা করবার বেশ জায়গা, একথাটা সকল সাধুদের ভিতরেই তখন চাউর হ'য়ে গিয়েছিল।"

ঠাকুর আরও বলিতেন—"এক এক সময়ে, এক এক রকমের সাধুর ভিড় লেগে যেত। এক সময়ে সন্ন্যাসী পরমহংসই যত আসতে লাগল! পেট-বৈরাগীর দল নয়—সব ভাল ভাল লোক। (নিজের ঘর দেখাইয়া) ঘরে দিবা রাত্তির তাদের ভিড় লেগেই থাকত। আর দিবা রাত্তির ব্রহ্ম ও মায়ার স্বরূপ, অস্তি, ভাতি, প্রিয়, এই সব বেদান্তের কথাই চল্‌তো।

অস্তি, ভাতি, প্রিয়—ঠাকুর ঐ কথা কয়টি বলিয়াই আবার বুঝাইয়া দিতেন। বলিতেন—'সেটা কি জানিস্‌?—ব্রহ্মের স্বরূপ; বেদান্তে ঐ ভাবে বুঝান আছে যিনিই 'অস্তি'—কি না, ঠিক ঠিক বিদ্যমান আছেন—তিনিই 'ভাতি,' কি না—প্রকাশ পাচ্চেন। এখন 'প্রকাশটা' হচ্চে জ্ঞানের স্বভাব। যে জিনিষটার সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান হয়েছে সেটাই আমাদের কাছে প্রকাশিত রয়েছে। যেটার জ্ঞান নাই সে জিনিসটা আমাদের কাছে অপ্রকাশ রয়েছে। কেমন, না? তাই বেদান্ত বলে, যে জিনিষটার যখনি আমাদের অস্তিত্ব-বোধ হ'ল, তখনি অমনি সেই বোধের সঙ্গে সঙ্গে সেই জিনিষটা আমাদের কাছে দীপ্তিমান বা প্রকাশিত ব'লে বোধ হ'ল—অর্থাৎ তার জ্ঞান-স্বরূপের কথাটা আমাদের বোধ হ'ল। আর অমনি সেটা আমাদের প্রিয় ব'লে বোধ হ'ল—অর্থাৎ তার ভিতরের আনন্দস্বরূপ আমাদের মনে প্রিয় বুদ্ধির উদয় ক'রে সেটাকে ভালবাস্‌তে আমাদের আকর্ষণ করলে। এইরূপে যেখানেই আমাদের অস্তিত্ব জ্ঞান হচ্চে, সেখানেই আবার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপের জ্ঞান হচ্চে। সে জন্ত, যেটা 'অস্তি,' সেটাই 'ভাতি', ও 'প্রিয়'—যেটা 'ভাতি' সেটাই 'অস্তি' ও 'প্রিয়'—এবং যেটা 'প্রিয়' সেটাই 'অস্তি' ও 'ভাতি' ব'লে বোধ হচ্চে। কারণ, যে ব্রহ্মবস্তু হ'তে এই জগৎ ও জগতের প্রত্যেক বস্তু ও ব্যক্তির উদয় হয়েছে, তাঁর স্বরূপই হচ্চে 'অস্তি-ভাতি-প্রিয়' বা সৎ, চিৎ ও আনন্দ। সে জন্তই উত্তর গীতায় বলেছে—জ্ঞান হ'লে বুঝা যায়, যেখানে বা যে বস্তু বা ব্যক্তিতে তোমার মনকে টানছে, সেখানে বা সেই সেই বস্তু ও ব্যক্তির ভিতর পরমাত্মা রয়েছেন।—'যত্র যত্র মনো যাতি তত্র তত্র পরং পদং।' রূপরসেও তাঁর অংশ রয়েছে ব'লে লোকের মন সেদিকে ছুটে, এ কথা বেদেও আছে।"

"ঐ সব কথা নিয়ে তাহাদের ভিতর খুব তর্কবিচার লেগে যেত। (আমার) আবার তখন খুব পেটের অসুখ, আমাশয়। হাতের জল শুকাত না! ঘরের কোণে হুচু সরা পেতে রাখ্‌ত। সেই পেটের অসুখে ভুগ্‌চি, আর তাদের ঐ সব জ্ঞানবিচার শুন্‌চি। আর, যে কথাটার তারা কোন মীমাংসা করে উঠতে পার্‌চে না, (নিজের শরীর দেখাইয়া) ভিতর থেকে তার এমন এক একটা সহজ কথায় মীমাংসা মা তুলে দেখিয়ে দিচ্চে!—সেইটে তাদের বল্‌চি, আর তাদের সব ঝগড়া-বিবাদ মিটে যাচ্চে।"

ওঁ বাঙ মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা, মনো মে বাচি প্রতিষ্ঠিতম,
আবিরাবীর্ম এধি, বেদস্য ম আণীস্থঃ,
শ্রুতং মে মা প্রহাসীরনেনাধীতেনাহোরাত্রান্ সংদধামি,
ঋতং বদিষ্যামি, সত্যং বদিষ্যামি,
তন্মামবতু, তদ্বক্তারমবতু, অবতু মাম্,
অবতু বক্তারম্, অবতু বক্তারম্।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। —ঋগ্বেদ

আমার বাক্য মনে প্রতিষ্ঠিত হউক, আমার মন বাক্যে প্রতিষ্ঠিত হউক। হে স্বপ্রকাশ ঈশ্বর, আমার নিকট প্রকাশিত হও। (হে বাক্য ও মন, তোমরা) আমার নিকট বেদার্থ-আনয়নে সমর্থ হও। শ্রুত বিষয় যেন আমাকে ত্যাগ না করে। অধ্যয়নের দ্বারা আমি দিবারাত্র সংযোজিত করিব। আমি মানসিক সত্য বলিব, বাচনিক সত্য বলিব। ঈশ্বর আমায় রক্ষা করুন, আচার্যকে রক্ষা করুন, আমায় রক্ষা করুন, আচার্যকে রক্ষা করুন; আচার্যকে রক্ষা করুন। আমাদের উপর ত্রিধা শান্তি বর্ষিত হউক।

সাহিত্যে মরুভূমি

সুনীলকুমার নাগ

মরুভূমি শব্দটার তিন-চার রকম অর্থ হয়—যথা বৃক্ষলতাশূন্য জলহীন বালুকাময় ভূখণ্ড বা জনমানবশূন্য তৃণাচ্ছাদিত বিস্তীর্ণ প্রান্তর (বিশ্বকোষ, ১৪); বা শুধুই অনুর্বর ভূখণ্ড যেমন আমেরিকার প্রেয়ারীজ (Prairies) বা রুশিয়ার স্টেপিজ (Steppes)। বর্তমানে আমাদের এ আলোচনার বিষয়বস্তু সাধারণ অর্থে মরুভূমি বলতে যা বোঝায় অর্থাৎ খাস সাহারা, গোবি, থর, তাকলা মাকান প্রভৃতি।

ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ মরুভূমির উৎপত্তির প্রথম কারণ হিসেবে বলেন যে, চকমকি পাথর কালগ্রাসে চূর্ণ হ'তে বালুকায় রূপান্তরিত হয়। তারপর ধীরে ধীরে মরুভূমির সৃষ্টি হয়। আর দ্বিতীয় কারণ হ'লো এই যে, অনেক সময় মহাসমুদ্র ভূখণ্ডের মধ্যে বৃহৎ হ্রদ বা উপসাগর সৃষ্টি করে, এবং তারপর কালক্রমে সেই লবণাক্ত জলরাশি শুকিয়ে অনুর্বর বালুকাভূমির সূত্রপাত করে। বালুকণার তাপ সঞ্চালন শক্তি অনেক ধাতু অপেক্ষাও বেশী এবং কাঠের চাইতে প্রায় আটগুণ বেশী, কাজেই এই বালুকণার উপর বিষুবরেখার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সূর্য্যের সরাসরি দৃষ্টিপাত কি ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি করে, তা সহজেই অনুমেয়।

ভারতের মরুভূমি রাজপুতানায়। রাজপুতেরা শকবংশসম্ভূত। শকগণ প্রথমে সূর্য্যের উপাসনা করতেন কিন্তু পরে অথর্ব্বের প্রভাবাধীন হ'য়ে অগ্নিপূজকে রূপান্তরিত হন। কাজেই লীলাময়ী প্রকৃতির বিচিত্র ক্রীড়াভূমি বিরাট ভারতবর্ষের মধ্যে রাজপুতগণ সর্ব্বাপেক্ষা গরম জায়গাটা বেছে নেবেন, এইতো স্বাভাবিক। রাজপুতগণের একটি বৃহদংশ একেবারে খাস মরুভূমি না হলেও অন্ততঃ তার আশপাশের বাসিন্দা। আমাদের পুরাণাদিতে এ জায়গাটার নাম মরুদেশ বা মরুস্থলী বলে কথিত আছে—আজকের দিনে এর নাম 'থর,' আরাবল্লী পর্ব্বতের উত্তর-পশ্চিম কোণ থেকে আরম্ভ করে একেবারে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ পর্য্যন্ত এই মরুস্থলী বা 'থর।' ভট্ট কবিগণের অনেক রচনাতেই থরের নানা বর্ণনা আছে। থরের দক্ষিণে মাউন্ট আবু, এখানেই ব্রহ্মার মানসপুত্র বশিষ্ঠ অগ্নিযজ্ঞ করেছিলেন।

অনেক সময় মরুভূমির উপর দিয়ে এক রকম বিষাক্ত বাতাস প্রবাহিত হয়—সৃষ্টিকর্তার এমনই বিধান যে, মরুভূমির জাহাজ অর্থাৎ উটগুলি বহুদূর থেকেই এই বাতাসের ঘ্রাণ পায় এবং এই বিষাক্ত বাতাসের কবল থেকে রক্ষা পাবার জন্ত গুড়িগুড়ি দিয়ে বালির আড়ালে মাথা-লুকোয়। বলা বাহুল্য, মরু বিচরণে অভ্যস্ত সকলেই উটগুলির অকস্মাৎ ঐ ব্যবহার দেখে ব্যাপারটা বুঝতে পারে এবং তারাও বালির ঢিপির আড়ালে মুখ লুকোয়।

প্লিনি লিখে গেছেন যে, আফ্রিকার মরুভূমিতে অপদেবতারা মাঝে মাঝে মানুষের রূপ গ্রহণ করে মুহূর্ত্তের জন্ত দেখা দিয়েই আবার হাওয়ায় মিলিয়ে যায়। গোবি অঞ্চলে নাকি স্থানীয় অধিবাসীদের অনেকেই তাদের পিতামহ-প্রপিতামহের মুখ থেকে শুনেছে যে মরু-অধিষ্ঠাতা অপদেবতারা প্রায়ই মরুচারীদের উড়িয়ে আকাশে নিয়ে যায়।

আফগানদের ধারণা যে, এই অপদেবতারা অত্যন্ত নরমাংসপ্রিয়।

বিশ্ব সৃষ্টির মূলে যে অপার রহস্য লুকিয়ে আছে অসতর্ক মুহূর্ত্তে অনেকেরই কাছে হয়ত মনে হবে তার বেশীর ভাগই মানুষের জ্ঞান নৈপুণ্যের কাছে ধরা পড়েছে—কিন্তু বাস্তবিকই তা নয়। জ্ঞানের পরিধি বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ে অজ্ঞানতা সম্বন্ধে সচেতনতা। তাই বলতে হয়, সৃষ্টির রহস্য মাথায় থাকুক, ঐ রহস্যের যে সামান্ত অংশ আজকের দিনের মানুষের কাছে পরিস্ফুট হ'য়েছে হয়ত তার ফলেই আগামী দশ কি পনেরো বছর পর আজকের সাহারাকে আর চেনা যাবে না—এশিয়ার নব প্রাণবন্যায় 'গোবি', 'তাকলা মাকান' ও 'থর' প্লাবিত হ'য়ে শ্যামল সজ্জায় নতুন পৃথিবীর শোভা বর্দ্ধন করবে। 'নেফুদ', 'দাহানা', 'রাব অল খালি', লিবিয়া ও কালাহারির অনুন্নত মানব-সমাজ স্বদেশের রূপান্তরিত উর্বরা ভূমিতে নতুন ফসল ফলাবে, নতুন রক্তে পুষ্ট করবে দেহ-মন, নতুন স্ফূর্তির জোয়ার আসবে ওদের মনে। বিজ্ঞান যদি ঠিক পথে এগিয়ে চলে, যদি প্রকৃতই সর্বতোভাবে কল্যাণধর্মী হ'য়ে ওঠে, তা' হ'লে নিশ্চয়ই সেদিনের দেরী নেই যখন—"প্রান্তর ও জলশূন্য স্থান আমোদ করিবে, মরুভূমি উল্লসিত হইবে, গোলাপের ন্তায় উৎফুল্ল হইবে। সে পুষ্প্যাহুল্যে উৎফুল্ল হইবে আর আনন্দ ও গান সহকারে উল্লাস করিবে—"

The Holy Bible, Isaiali, 35—I&2

মরুভূমি মাত্রেরই ভূতাত্ত্বিক অবস্থা এক নয়—কোথাও ১৫ হাত খুঁড়লে বিশুদ্ধ পানীয় জল পাওয়া যায়, কোথায়ও বা পঞ্চাশ একশ' এমন কি দু'শ হাত খুঁড়লেও জলের স্পর্শ মিলবে না। আর কে জানে হয়ত তার ওপর একশ' পঞ্চাশ ফারেনহিট আবহাওয়া—কিন্তু এই অতি মারাত্মক পরিবেশ সৃষ্টি করেও প্রকৃতি দেবী তাঁর দুর্দান্ত সন্তান-সন্ততিদের ঘরকুনো করে ফেলতে পারেন নি—কারণ দেখা গেছে, এই রক্তশোষণকারী পরিবেশও বহু কৌতূহলী ব্যক্তির বিচিত্র সৌন্দর্য্য-পিপাসা নিবারণে সাহায্য করেছে—তাঁদেরই মধ্য থেকে অন্তত কয়েক জনের কথা এবার বলা যাক।

ভ্রমণকারী হিসেবে প্রথমেই ভেনিসের পোলোদের কথা বলতে

হয়। একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, অত্যাবধি যতো-ভ্রমণ বৃত্তান্ত প্রকাশিত হয়েছে মার্কো পোলোর ভ্রমণ বৃত্তান্ত তাদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ। খুব কম ভ্রমণ কাহিনীতেই দেশ, কাল, ব্যবসা-বাণিজ্য তথা জনগণের শিক্ষা, ধর্ম, সমাজ, সংস্কৃতি, আচার পদ্ধতি সম্বন্ধে এতো ব্যাপক মাল-মসলা পাওয়া যায়। তবে অন্য কোন বই অপেক্ষা মার্কো পোলোর বই-এর যে বিশেষ মর্যাদা বা আদর তার কারণ এই যে, তিনি সম্পূর্ণ নতুন একটি পরিবেশ সম্পর্কে তথ্য পরিবেশন করেছিলেন। তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্ত প্রকাশিত হবার আগে অনেকেরই কাছে এশিয়া একটা হেঁয়ালী, একটা 'মিষ্ট্রি' ছিলো মার্কো পোলোই প্রথম ইউরোপীয়, যিনি এই হেঁয়ালীর একটা যথাযথ ও হৃদয়গ্রাহী ব্যাখ্যা করলেন। মধ্য এশিয়ার অনেক কিছু সম্পর্কেই আজ বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগেও (অর্থাৎ মার্কো পোলোর ভ্রমণ বৃত্তান্ত প্রকাশিত হবার সাড়ে ছ'শ, বছর পরেও) ইতিহাস, ভূগোল, নৃতত্ত্ব, প্রভৃতি জ্ঞান-বিজ্ঞানের বহু সাধককেই মার্কো পোলোর বইয়ের সাহায্য নিতে হয়। জন ম্যাজফিল্ড মার্কো পোলো প্রসঙ্গে যথার্থই বলেছেন "It is only the wonderful traveller, who sees a wonder." মার্কো পোলো যে অসংখ্য wonder প্রত্যক্ষ করেছেন তার আলোচনা বর্তমান নিবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। শুধুমাত্র মরুভূমি প্রসঙ্গে তাঁর দু'-একটি অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করবো।

পূর্বে যে বিষাক্ত তপ্ত বাতাসের কথা বলা হয়েছে প্রথমেই তার একটি বিবরণ দেওয়া যাক। ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছিলো পারস্যের এক বালুকাময় প্রান্তরে। মার্কো বলেছেন—ছোট একটি রাজ্যের রাজা তাঁর অধীন অন্য একটি রাজ্যের নিকট হ'তে যথাসময়ে কর না পাওয়ার জন্য একদিন ক্ষিপ্ত হ'য়ে বলপ্রয়োগ পূর্বক কর আদায়ের জন্য ষোল শত অশ্বারোহী ও পাঁচ হাজার পদাতিকের একটি বাহিনী পাঠালেন। কিন্তু বিপথে যাবার জন্য—গন্তব্যস্থলে পৌঁছাবার পূর্বেই এই বাহিনীটি ঐ বিষাক্ত তপ্ত বাতাসের কবলে পড়ে যায়। বিষাক্ত বাতাস প্রবাহিত হ'য়ে যাবার পর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের জনসাধারণ এসে দেখল, একটিও সৈন্য বা অশ্ব জীবিত নেই। শুধু তাই নয়—ওদের সমস্ত শরীর এমন ভাবে পুড়ে গেছে যে অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি অনায়াসেই পৃথক করা যায়। কিন্তু এই অভিজ্ঞতার পরও মার্কো বা তাঁর পিতা ভীত হলেন না। এর পরও তাঁরা এগিয়ে যেতে লাগলেন। ছোটখাট বহু মরুভূমি তাদের অতিক্রম করতে হয়, কোথাও চার দিনের পথ, কোথাও চল্লিশ দিনের, কোথায়ও, বালির রং ঘন কালো, কোথায়ও বা স্বর্ণবর্ণ। দিনের পর দিন পিতা-পুত্র নির্ভয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন কুবলাই খাঁর দরবারে উপস্থিত হবার জন্য। অসংখ্য বর্বর উপজাতীয় ও তাতার-রাজ্যের মধ্য দিয়ে তাঁদের পথ করে নিতে হ'য়েছে—সে কি শুধুই সোনার লোভে? ধনদৌলতের কিছুটা লোভ অনেকের মত হয়ত তাদেরও ছিলো। কিন্তু সেইজন্যই প্রকৃতির সীমাহীন বৈচিত্র্যের প্রতি তাদের অগাধ আকর্ষণের কথাও অবশ্য স্বীকার্য। মার্কো এবং তাঁর পিতাই সম্ভবতঃ সভ্য পৃথিবীর প্রথম যাঁরা গোবির অফুরন্ত বালুকারাশির অবিশ্রান্ত ঝড় প্রত্যক্ষ করেন।

মরুভূমির সঙ্গে মরীচিকার সম্বন্ধ যেন প্রায় দেহের সঙ্গে মনের সম্বন্ধের মত। মার্কো এবং তাঁর পিতাও একাধিক বার এই মরীচিকার পেছনে ছুটেছিলেন কিন্তু পরিণামে রক্ষা পান।

এ যুগে ভূত, প্রেত বা অপদেবতায় খুব কম বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তি বিশ্বাস করে থাকেন। ব্যাপারটার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি যাই থাকু না কেন, মার্কো এবং তাঁর পিতাও মরুভূমির এই তথাকথি অপদেবতার ক্রিয়াকলাপ প্রত্যক্ষ করেন। এ ব্যাপারগুলো গো অঞ্চলের। কোন মরুযাত্রীই লম্বালম্বি ভাবে অর্থাৎ পূর্ব থেকে পশ্চি কখনো গোবি অতিক্রম করার চেষ্টা করেন নি। কারণ মার্কো তদানীন্তন কালের সকলেরই ধারণা ছিলো যে, অন্ততঃ এক বছরে চেষ্টা ভিন্ন এ কাজ সম্ভব নয়। এক বছরের খাদ্য এবং পানীয় জ সঙ্গে করে বহন করা সম্ভব নয় বলেই কেউ এ চেষ্টা কখনো করে নি। তবে আড়াআড়ি ভাবে গোবি অতিক্রম করতে মার্কোর মা মাসখানেক সময় লাগে। কোন মরুযাত্রী দলের কেউ যদি পেছনে পড়ে যায়, এমন কি দিনের বেলায়ও সে শুনতে পায় যেন তা পরিচিত কণ্ঠে নাম ধরে কেউ ডাকছে। বলা বাহুল্য যে, ঐ শ অনুসরণ করে কিছুদূর এগোবার পরই সে দিগ্‌ভ্রান্ত হ'য়ে পা এবং আতঙ্কে প্রাণত্যাগ করে। কখনো বা এমনও হয় যে একেবারে সরাসরি কোনও পরিচিত সঙ্গীর রূপ ধারণ ক অপদেবতার আবির্ভাব হয়। কখনো হয়ত দেখা যায়, একদ সুসজ্জিত সৈন্য আক্রমণ করতে আসছে। বলা বাহুল্য, এ দেখে কোন মরুযাত্রীর দল প্রাণভয়ে এদিক-ওদিক ছুটতে আরম্ভ ক এবং তার পর ঠিক পথ খুঁজে না পেয়ে মারা যায়। শুধু ধারা দিকটার কথাই বলা ঠিক নয়—অপদেবতাদের অনেকের নিশ্চয় সুকুমার শিল্পের প্রতিও ঝোঁক আছে। কারণ অনেক সময় আগুন ঝরা রোদে-ভরা নির্জন মরুভূমির মধ্যে মরুযাত্রীরা চমৎকার যন্ত্র সঙ্গীতের আওয়াজও শুনতে পায়।

স্যার রিচার্ড বার্টনের দীর্ঘ দিনের বাসনা ছিলো মুসলমানদের ধর্মস্থানগুলি দেখবার। মধ্য-আরবের অনেকটা জায়গা অনাবিষ্কৃত ছিলো, বার্টন মনে মনে ঠিক করলেন, এ জায়গাটাও দেখে আসতে হবে। কাজেই তিনি তাঁর পুণ্যযাত্রা সুরু করলেন ১৮৫৩ সালের ৪ঠা এপ্রিলের এক সুন্দর সকালে। সাউদাম্পটন থেকে তাঁর জাহাজ ছাড়ল আলেকজান্দ্রিয়ার উদ্দেশে। বার্টনের চিকিৎসাশাস্ত্রে কিছুটা অভিজ্ঞতা ছিল, তিনি ডাক্তার হিসেবে নিজের পরিচয় দিতে আরম্ভ করলেন, আলেকজান্দ্রিয়ায় এসে।

আলেকজান্দ্রিয়া থেকে হজের উদ্দেশে বার্টন আরো অনেক তীর্থযাত্রীর সঙ্গে জাহাজে রওনা হলেন।

ব্যাপারটা আশ্চর্য হবার মতো হলেও সত্যি যে, বার্টনের এ জাহাজে কম্পাস ছিল না বা এমন কি যাত্রা-পথের কোন চার্টও ছিল না। কাজেই সুয়েজ ধরে লোহিত সাগরে পড়ে জাহাজখানা আরবের উপকূল ভাগ ধরে এগোতে আরম্ভ করলো, উপকূল ভাগের দারুণ উত্তাপ আর প্রচণ্ড হাওয়ার মধ্যেও যে দশ-বারো দিন বার্টনের জাহাজ পথে-বিপথে ঘুরছিলো প্রত্যহই তিনি সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত প্রত্যক্ষ করতেন। মরু অঞ্চল রাতের দিকে ঠাণ্ডা হয়ে আসে যদিও কিন্তু চন্দ্রালোকে মরুপ্রান্তর বার্টনের ভালো লাগতো না, শেষে নির্দিষ্ট বন্দরে বার্টনের জাহাজ ভিড়লো, অন্য কয়েক জনের সঙ্গে বার্টন মদিনার পথে রওনা হলেন। সাত দিনের হাঁটা পথ। সঙ্গে বারোটি উটের পিঠে রসদ প্রভৃতি নিয়ে দারুণ উত্তাপের মধ্যে ধর্মমূলক গান গাইতে গাইতে যাত্রীরা এগোতে থাকে। এ মরুপথের

সর্বাপেক্ষা বিপদ দস্যুর দল। ওরা সাধারণতঃ দলবদ্ধভাবে যাত্রীদের আক্রমণ করে। বার্টনের ধারণা যে, এ অঞ্চলে চোর-ডাকাত-দস্যুরা যেভাবে অবাধে তাদের কাজ করে থাকে তাতে সরকারের সঙ্গে ওদের কিছু একটা যোগসাজস থাকাই সম্ভব। বার্টন যে সময়ের কথা বলছেন তখন এ অঞ্চল তুরস্কের অধীন ছিলো। তুর্কীরা আরবদের অনুকম্পার চোখে দেখত এবং এই দুই জাতির মধ্যে বিবাদেরও কখনই নিবৃত্তি হ'তো না। একদিনের কথা প্রসঙ্গে বার্টন বলেছেন যে, "তীর্থযাত্রীর গিরিপথ" ধরে এগোবার সময় অকস্মাৎ ওপরের পাহাড় থেকে গুলীবর্ষণ হতে আরম্ভ হলো—এরাও আত্মরক্ষার জন্ত প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলো এবং এই গিরিপথটুকু অতিক্রম করতেই তীর্থযাত্রীদের মধ্যে বারো জন প্রাণত্যাগ করলো দস্যুর হাতে। এই ভাবে এক সপ্তাহে মরুভূমির সঙ্কটপূর্ণ পথ অতিক্রম করে বার্টনের দল মদিনায় এসে পৌঁছল। মহম্মদ, আবু বকর ও ওমরের পুণ্য সমাধি স্থান দর্শন করবার পর বার্টন মক্কার পথে যাত্রা করলেন।

আবার দেড়শো ডিগ্রী ফারেনহিট, বালির ঝড়, মরা পাহাড়, নিষ্প্রাণ প্রান্তর। অতঃপর বার্টনের দল মক্কায় এসে পৌঁছলো। পুণ্যার্জনের জন্ত যাঁরা কষ্ট স্বীকার করেন তাঁদের কথা স্বতন্ত্র—তা' ছাড়া অন্তদের কথাও যদি ধরা যায়—যেমন বার্টন, তা হ'লেই বোঝা যাবে কেন মানুষ এতো কষ্ট করে এতো দুর্গম পথ অতিক্রম করে মক্কায় আসে। 'কাবা' দর্শনের পর বার্টনের মনে হ'লো যেন এত দিনের সমস্ত পরিশ্রম, ঝড়-ঝাপটার ক্লান্তি মুহূর্তে দেহ-মন থেকে মুছে গেল। বার্টন যেন নতুন করে নিজেকে ফিরে পেলেন, তাঁর ব্যক্তিত্বে নতুন এক অনির্বচনীয় পবিত্রতার স্ফুরণ অনুভব করলেন।

রিচার্ড বার্টনের ভ্রমণ বৃত্তান্ত A Pilgrimage to—At Madinah and Meccah ১৮৫৫ সালে প্রকাশিত হয়।

মরুভূমিগুলি নির্জন কিন্তু নিষ্প্রাণ নয়। বাস্তবিক পক্ষে অধিকাংশ মরুভূমিতেই প্রাণবহ্নি বিদ্যমান। যে নিয়মের অপার অনুগ্রহে শিশুর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে মায়ের বুকে সুধার স্রোত নেমে আসে, তাঁর নিয়ন্ত্রণের এমনই বাহাদুরী যে, মরুভূমির সাধারণ পোকামাকড় থেকে আরম্ভ করে সাপ, বকমাছি শামুক, সিংহ বা উট সকলেরই গায়ের রং এমন যে, তারা অনায়াসেই বালির সঙ্গে মিশে যেতে পারে শত্রুর হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্ত। তা ছাড়া প্রত্যেকের চোখের ও শ্বাস-প্রশ্বাসের যন্ত্রের পেশীগুলিও এমন যে, প্রবল বাতাস বা বালির ঝড়ের সময়ও ওরা বালির কবল থেকে নাক এবং চোখ রক্ষা করতে পারে। প্রত্যেক দেশেই অনেক জীব শীতকালে যেমন ঘুমিয়ে থাকে বা কোটরের আশ্রয়ে কাটায়, মরুভূমির অনেক প্রাণীও ঠিক তেমনি গ্রীষ্মকালে ঘুমিয়ে কাটায়।

সাহারাই নিঃসন্দেহে মরুভূমির রাজা—এ রাজা বিগতপ্রায় এক শতাব্দী যাবৎ ফরাসী ত্রিবর্ণ পতাকার ছায়ায় পাপক্ষয় করছে। পঁয়ত্রিশ লক্ষ বর্গমাইল এই যে বারগাটা যার আয়তন খাস ফ্রান্সের সতেরো গুণেরও বেশী—কি লাভ হয় ফরাসীদের এ জায়গাটা নিয়ে? সাহারার গর্ভে খনিজ দ্রব্যের কোন সন্ধান অদ্যাবধি পাওয়া যায়নি। শুধু খাস সাহারা কেন, আলজিরিয়া সহ সমগ্র আফ্রিকার সাম্রাজ্য থেকে ফ্রান্সের যে বৈষয়িক লাভ হয় পার্কার মুন তাঁর বিখ্যাত **Imperialism and world politics** গ্রন্থে পরিষ্কার ভাবে দেখিয়েছেন যে, এমন কি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র—যেখানে ফ্রান্সের কোনই ঔপনিবেশিক অধিকার নেই, তার সঙ্গে স্বাধীন ব্যবসা করেও ফ্রান্স ঢের ঢের বেশী লাভবান হয়। সাম্রাজ্যবাদের পরিপোষক মুষ্টিমেয় কয়েক জন বিকৃতমস্তিষ্কের ভুয়া গৌরববোধ ও মিথ্যা অহঙ্কার চরিতার্থ করবার জন্ত শুধু যে কালো আদমীর রক্তক্ষয় হচ্ছে, তাই নয়; নিরপরাধ ফরাসী তরুণদেরও সাম্রাজ্যবাদীর খেয়ালের জন্ত অকালে প্রাণ দিতে হয়। ইতিমধ্যে কাগজেই দেখলাম, আলজিরীয়দের বিদ্রোহ দমনের জন্ত গত কয়েক বছরে দু' হাজার ফরাসী সৈন্ত নিহত হয়েছে।

বছরের পর বছর ধরে পরীক্ষাকার্য্য চালাবার পর বিশেষজ্ঞগণের ধারণা যে, সাহারার তলদেশ থেকে মানুষের প্রয়োজনে লাগবার মত কোন বস্তু লাভেরই ক্ষীণতম সম্ভাবনাও নেই। সাহারা সত্যিই সাহারা! হায় সাহারা! কিন্তু মরুভূমি মাত্রেই সাহারা নয়, যেমন আমেরিকার নেভাদা বা আরবের নেফুদ, আমেরিকার মরুভূমি থেকে প্রতি বছর যে খনিজদ্রব্য আহরণ করা হয় তার মূল্য দেড়শ' কোটি টাকারও বেশী। আর নেফুদের বিস্তৃত মরুভূমিতে অর্থাৎ আরবের উত্তরাঞ্চল, প্যালেষ্টাইন, সিরিয়া, ইরাক ও পারস্যের কিয়দংশের পেট্রোল নিয়ে সাম্রাজ্যবাদী ও রাজনৈতিক কুচক্রীদের ঝামেলা তো সর্বক্ষণই লেগে আছে। তবে যে কোন মরুভূমির যা সাধারণ পণ্য অর্থাৎ লবণ, তা সাহারাতেও পাওয়া যায়, তাছাড়া সাহারার উত্তরাংশে খেজুরও প্রচুর ফলে; অতো খেজুর, তবুও ওদেশে কেউ পাজী হ'য়ে উঠছে'না কেন? হায় মহারাজ! তোমার অমন প্রশস্ত বক্ষোদেশ, হৃদয়টা যে শুকনো গোলাপের মতো দেখায়? কিছু একটা ঘটাও।

শক্তিমান ফরাসী ঔপন্যাসিক পিয়ের লোতির "দি ডেসার্ট" প্রকাশিত হয় ১৮৯৮ খৃঃ অব্দে। প্যারিসের কৃত্রিমতাপূ নাগরিক জীবনে বিরক্তিবোধ করে লোতি মরুভূমিতে চলে আসে প্রকৃতির একটি বৈশিষ্ট্য রূপ উপভোগ করবার জন্ত। সিনাই থেকে ক্যালভারি পর্যন্ত লোতি ভ্রমণ করেন। মরুভূমি সম্বন্ধে লোতি সর্বাপেক্ষা আকৃষ্ট হ'য়েছেন—এর দারুণ নিঃসঙ্গতায়। যে দিকে তাকাও, ফাঁকা, শুধু ফাঁকা, আরো ফাঁকা—শূন্যতা যেন গ্রা করতে আসছে। তার ওপর অদূরের দিগন্ত অবধি ঝুলে-পড়া আকাশটা যেন এখুনি পিষে মারতে উদ্যত হ'য়েছে। এই নিদারু শূন্যতা ক্রমশঃ অন্তরে একটা হতাশার ভাব সৃষ্টি করতে থাকে— মনে হয়, এ শূন্যতার কি আর শেষ হবে না? বেশী দিন এভাবে চলবার পর সভ্য জনবহুল নগর-বন্দরের অস্তিত্ব সম্বন্ধেই মনে একটা সন্দেহ দেখা দিতে থাকে—এমনই মারাত্মক প্রভাব এ শূন্যতার! মরুভূমিতে সূর্যাস্ত দেখে লোতি বলেছেন—"Oh the sunset this evening! Never have w seen so much gold poured out for us alon around our lonely camp." সমস্ত পরিধি সোনার রং ঢাকা পড়ল, এমন কি উটগুলি পর্য্যন্ত মনে হ'তে লাগল যেন সোনা তৈরী। দুপুর রাত্রে মরুভূমিতে তাঁবুর বাইরে একা বেরুলে মা হয়, আকাশের তারাগুলি যেন কত নিকটে, মনে হয় ওদের সা জীবজগতের যেন একটা অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। দারু নিঃসঙ্গতার ফলে যা কিছু দেখা যায় তার সবটুকুই আপনার ক নেবার জন্ত একটা অপ্রতিরোধ্য আকাঙ্ক্ষা হ'তে থাকে। সিনাইয়ে পর্বতমালায় পার্শ্ববর্তী জনহীন অঞ্চল দেখে লোতি বলেছে

"It is as empty now as the soul of the modern man, as empty as the sky above us." কত সম্রাট আর সাম্রাজ্য কালের কবলে হারিয়ে গিয়েছে কিন্তু এই নিঃসঙ্গতা একান্ত ভাবেই কালজয়ী।

লোতির মরুভ্রমণ কাহিনীতেও একটি চমৎকার মরীচিকা দেখবার বর্ণনা আছে। অকস্মাৎ দেখা গেলো, সারি সারি খেজুর গাছ, সুন্দর সাজানো বাগান। এমন কি, পথপ্রদর্শক অভিজ্ঞ বেদুইনরাও বললো, যা হ'ক এবার একটু জিরিয়ে নেওয়া যাবে। কেউ কেউ হয়ত উট থেকে নেমেও পড়েছে, এমনি সময় ভুলটা ধরা পড়ল। এদিকে সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘনিঃশ্বাসের চাপা আওয়াজ হতে থাকে।

লোতির ঠিক বিপরীতধর্মী পরিদর্শক হ'লেন ডেভিড লিভিংষ্টোন। লিভিংষ্টোনের "Missionary Travels and Researches in South Africa" প্রকাশিত হয় ১৮৫৭ খৃঃ অব্দে। লিভিংষ্টোনের বইখানায় যদিও একটি মরুভূমি 'পাড়ি' দেবার কথা বর্ণনা করা হয়েছে, কিন্তু তবু বলতে হয় যে, তিনি অন্য যে কোন মরু-পর্য্যটক অপেক্ষা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ। আফ্রিকার বেচুয়ানাল্যাণ্ডের কালাহারি মরুভূমি বহিরাগত হিসেবে ইনিই সর্বপ্রথম প্রত্যক্ষ করেন। কিন্তু ইনি মরুর বালুকারাশি, তার উত্তাপ, ঝড় প্রভৃতি সব কিছুর চাইতে বেশী আকৃষ্ট হয়েছেন মরুভূমির অধিবাসীদের দেখে। কালাহারি মরুভূমির প্রধান স্থায়ী অধিবাসী হচ্ছে বুশমেনরা। শত্রুর হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য বুশমেনরা ইচ্ছে করেই মরুভূমির একেবারে অভ্যন্তর ভাগে ঘাঁটি করে—যেখানে জলের লেশমাত্র নেই।

লিভিংষ্টোন বিশেষ করে খৃষ্টধর্ম প্রচারের জন্যই বেচুয়ানাল্যাণ্ডে যান। একজন বুশমেন এক দিন কথায় কথায় নিজের গুণপণার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলে যে, আজ গোটা পাঁচেক লোককে হত্যা করলাম। লিভিংষ্টোন চমকে উঠে প্রশ্ন করেন—তুমি এ কাজের জন্য ঈশ্বরের নিকট কি জবাব দেবে? লোকটি বললো—কেন, ঈশ্বর কি আমার চতুরতার জন্য তারিফ করবেন না?

লিভিংষ্টোনের মতে "Bechuanas appear as amongst the most Godless races of mortals known anywhere." কিন্তু মনে রাখবেন, গত শ'খানেক বছর ধরে যে সব সাদা চামড়ার সাহেবরা আফ্রিকায় নানা ভাবে এবং অবিশ্রান্ত ভাবে হত্যাকাণ্ড চালাচ্ছে, তারা সবাই অত্যন্ত ধর্মভীরু এবং কায়মনোবাক্যে ঈশ্বরের উপাসনা করে থাকেন। হায় ঈশ্বর!

কিঙলেক-এর "ইয়োথেন" ইংরাজী-সাহিত্যের একখানা শ্রেষ্ঠ ভ্রমণ-বৃত্তান্তমূলক বই। এ বইয়ে ইয়োরোপের পূর্ব-দক্ষিণ থেকে তুরস্ক, জর্ডান, প্যালেষ্টাইন ও মিশর প্রভৃতি নানা দেশের কথাই আছে। প্লেগ থেকে আরম্ভ করে বেদুইন মেয়েদের রূপ পর্য্যন্ত, অনেক কিছুই আছে এ বইয়ে। তবে তিনটি পরিচ্ছেদ আছে, বিশেষ করে মরু-পর্য্যটন সম্বন্ধে—The Desert, Cairo to Suez, Suez to Gaza. উটের উচ্চতা সম্বন্ধে কিঙলেক বলছেন যে, মরুভূমির এ জবরজীবটির পিঠে উঠবার সময় মেলাই কসরৎ করতে হয় তা' ঠিক কিন্তু এ জীবটির উচ্চতাই মরুযাত্রীর পক্ষে একটা আশীর্বাদস্বরূপ। জ্বলন্ত বালুকারাশির মধ্যেও উটের পিঠে উঠবার সঙ্গে সঙ্গে শরীরটা অনেকটা ঠাণ্ডা বোধ হয়। কারণ এখন শুধু ওপরের রোদের তাপটা লাগবে। বালির উত্তাপের কবল থেকে উটের উচ্চতার জন্য কিছুটা রেহাই পাওয়া যায়।

গাজা থেকে কাইরো আসবার পথে মরুভূমির মধ্যে দু'দিন চলবার পর শুধু বালি ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। শুধু বালি আর বালি, আরো বালি। কোথাও বালির সু-উচ্চ পাহাড় হ'য়ে আছে—এ পাহাড় হয়ত গতকাল ছিল না, আবার আগামী কালও থাকবে না। কাজেই মরুভূমির অভ্যন্তর ভাগে বাতাস কেমন সুরঙ্গগতিতে প্রবাহিত হয় বোঝা যায়। শুধু বালি দেখতে দেখতে এমন একঘেয়ে লাগে যে, বার বার আকাশের দিকে চোখ তুলতে হয়।

অতি প্রত্যূষে তাঁবু গুটিয়ে যাত্রা সুরু করবার কিছুক্ষণের মধ্যেই সমস্ত শরীর রেশমী কাপড়ে ঢেকে রাখতে হয়। কারণ একটু বেলা হতেই সূর্য্যের তাপ এত বেড়ে যায় ওপরের দিকে আর তাকানো যায় না। যাত্রীরা পরস্পরের সঙ্গে কোন প্রকার বাক্যালাপই করতে পারে না। শুধু একে অপরের গোঙানী শুনতে থাকে। মরুভূমিতে অস্তগামী সূর্য্যের বর্ণনায় কিঙলেক বলছেন···"look upon his face, for his power is veiled in his beauty, and the redness of flames has become the redness of roses." সকালে যে মেঘপুঞ্জ দারুণ উত্তাপের ফলে দূরে সরে গিয়েছিল, অস্তগামী সূর্য্যের কাছে তারাই আবার ফিরে আসছে—

"Comes blushing yet still comes on.
Comes burning with blushes,
Yet hastens and clings to his side."

মরুভ্রমণকারীর মনে যে হতাশার সৃষ্টি হয় তার কথা লোতির মত কিঙলেকও বলেছেন। যদিও কিন্তু লোতি কিঙলেকের মত চমৎকার করে বলতে পারেন নি। লোতির বিষাদ শুধুই বিষাদ কিন্তু কিঙলেকের বিষাদের মধ্যে প্রচুর প্রাণরস আস্বাদন করা যায়। যেমন একদিনের কথা ধরা যায়। চতুর্থ দিনে এক দিকে দারুণ উত্তাপ তার ওপর নির্জনতা, যাকে কিঙলেক বলছেন frightfully oppressive, কিঙলেক উটের পিঠেই তন্দ্রাচ্ছন্ন হ'য়ে পড়েন। এবং তারপর হঠাৎ তিনি তাঁর দেশের গির্জার ঘটাধ্বনি শুনে জেগে ওঠেন। পরে অবশ্য বুঝতে পারলেন দেশের জন্য, আত্মীয় পরিজনের জন্য, সভ্য সমাজের জন্য তাঁর অন্তরাত্মা কি পরিমাণ ব্যাকুল হ'য়ে উঠেছে।

মরু অঞ্চলে যে প্রচণ্ড শীত পড়ে তার কথা অনেক ভ্রমণকারীই বলেছেন, এখানে মাত্র একজনের কথাই বলবো। চার্লস মণ্টেগু ডাউটির Arabia Desert বইয়ে একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করে বলা হ'য়েছে যে, আরবের মরুভূমির যে অঞ্চলে সমতল—এমন কি ছোটখাট কোন পাহাড়ও দৃষ্ট হয় না, সেই অঞ্চলে শীত ঋতুতে বহু মরুযাত্রীই প্রচণ্ড শীত ও ঠাণ্ডা হাওয়ার ফলে প্রাণত্যাগ করেছে দেখা গেছে। শীতের রাত্রে এখানকার তাপ হিমাঙ্কের অনেক নীচে নেমে যায়। স্থানীয় অধিবাসীদের সাধারণ পোষাকে এই শীতকে কোন মতেই আটকাতে পারে না। তাই সাধারণ দুর্ঘটনা অর্থাৎ শীতের প্রকোপে দশ-বিশ জন প্রাণত্যাগ করলো, এ রকম ব্যাপার প্রায় প্রত্যেক শীতকালেই ঘটে থাকে।

একবার বহু মরুযাত্রীর একটি বড় দলও এই ভাবে প্রাণ হারিয়েছিল বলে ডাউটি উল্লেখ করেছেন।

গ্রীষ্মকালে মরুভূমিতে বালি রোদ আর নির্জনতা সম্বন্ধে অন্য সকলের সঙ্গে ডাউটিরও মতের মিল আছে। মরুভূমিতে সূর্য্যোদয় সম্বন্ধে ডাউটি একটি চমৎকার বর্ণনা করেছেন—"The desert day dawns not little by little, but it is noontide in an hour." তালুর ওপরটা মনে হয় এখুনি ফেটে চৌচির হ'য়ে যাবে। কান দুটো মনে হয় জ্বলছে। বালুরাশিতে ঠিকরে সূর্য্যের রশ্মিমালা চোখে লাগলে হঠাৎ ধাঁধা লেগে যায়। ছোট-খাটো পাহাড় বা দু'-একটা দেখা যায়, মনে হয় যেন এক একটি বিশুষ্ক কঙ্কাল। কখনো কখনো দু'-একটা মালিকহীন উট দূরে খাদ্যের অন্বেষণে চরে বেড়াচ্ছে চোখে পড়ে। কি খাবে ওরা? এর উত্তর ডাউটি দেননি, দিয়েছেন মার্ক টোয়েন—"They would eat a tombstone if they bite it." (Innocents Abrood). আর একজনের কথা বলেই বর্ত্তমানের আলোচনা শেষ করবো। এঁর নাম সেভেন হেডিন। হেডিন জাতিতে সুইডিশ। এঁর "Through Asia," এশিয়ার একাধিক মরুভূমির ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা প্রকাশিত হয় ১৮৯৮ খৃঃ অব্দে।

এক দিক থেকে হেডিনের বইখানা মরুভূমি সম্পর্কে সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা। কারণ হেডিনের মত আর কেউ-ই মরুভূমির নীরস নিষ্প্রাণ, নির্মম দিকগুলি সম্পর্কে এতটা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করেন নি। প্রায় এক মাস ধরে হেডিন মরুভূমির সঙ্গে রীতিমত সংগ্রাম করেছেন, এদিক থেকে ভাবলে বলতে হয়, অন্য সকলে মরুভূমি শুধুই দেখেছেন, দেখে বিস্মিত, চমৎকৃত, বা স্তম্ভিত হ'য়েছেন। কারো মনটা বিষাদে পূর্ণ হ'য়েছে কেউ বা মরুর কবল থেকে মুক্তির আশায় মনের অবচেতনে প্রতি মুহূর্ত্তে বিধাতার কাছে মিনতি জানিয়েছেন, কেউ বা প্রকৃতির এই বিশাল সর্বনাশী রূপের তুলনায় জীবজগৎ তথা মানুষের ক্ষুদ্রতা, সামান্যতা দেখে হতাশ হ'য়েছেন এবং যত শীঘ্র সম্ভব পশ্চাদপসরণের সুযোগ খুঁজেছেন। কথাটা হয়ত মার্কোর বেলায় খাটে না তা' ঠিক কিন্তু মার্কোর মরুভূমির অভিজ্ঞতা অনেকের থেকেই কম, হেডিনের তুলনায় কম ত বটেই।

তাই বলতে হয়, হেডিনই একমাত্র ব্যক্তি—যিনি মরুভূমি জয় করেছেন। ১৮৯৫ খৃঃ অব্দের ১০ই এপ্রিল হেডিন চার জন ভৃত্য নিয়ে মধ্য এশিয়ার 'তাকলা মাকান' মরুভূমি আড়া-আড়ি ভাবে অতিক্রম করতে আরম্ভ করেন। সঙ্গে তাঁর প্রায় দু' মাসের উপযুক্ত রসদ। আন্দাজ করে যে পরিমাণ জল নিলেন তাতে অন্ততঃ পঁচিশ দিন চলবার কথা, তা' ছাড়া ছিল আটটি উট, দুটি কুকুর, তিনটি ভেড়া এবং দশ-বারোটি মুরগী। হেডিনের মরুযাত্রার উদ্দেশ্য শুধুই তাকলা মাকানের রহস্যোদ্‌ঘাটন করা। হেডিন লিখেছেন যে, প্রথম পনেরো দিন পর্য্যন্ত কোথাও পঁচাশ ফুট কোথাও বা একশ' ফুট খুঁড়লেই চমৎকার পানীয় জল পাওয়া যেত কিন্তু তারপর থেকে আর জলের চিহ্ন মাত্র কোথাও পাওয়া যায় না, একটিও তৃণ নাই, শুধুই বালি। এ বালি কোথাও ঘন কৃষ্ণ, কোথাও ছাই রঙের। কোথাও ক্যাকাসে আর তারই ওপর মধ্যাহ্নের সূর্য্যালোকে প্রতি পলকে মৃত্যুর হাতছানি।

আরো দু'দিন পর সঙ্গে করে আনা পাত্রের জল পান করতে গিয়ে হেডিন দেখলেন, দুটো পাত্র একেবারে শুকনো, আর দুটোতে যেটুকু জল আছে, তাতে বড় জোর দিন দুই চলতে পারে। তাই হেডিন বন্দোবস্ত করলেন যে, এখন থেকে জল সবাই ফোঁটা ফোঁটা খাবে। পরদিন দেখা গেল ঘন মেঘ জমে উঠেছে। সবাই মিলে বৃষ্টির জল সংগ্রহ করবার জন্য সমস্ত পাত্র প্রস্তুত রাখলেন, কিন্তু কোথায় বৃষ্টি! প্রকৃতি দেবী একটি উচ্চাঙ্গের রসিকতার আয়োজন করলেন বোঝা গেল—মেঘটুকু দেখতে দেখতে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল।

আরো দু'দিন পর দু'টি ক্লান্ত উটকে মুক্তি দেওয়া হ'ল, বোঝার ভারও কমানো হল—নিতান্ত অপরিহার্য্য জিনিষগুলি সঙ্গে রেখে আর সবই হেডিন তাকলা মাকানের বুকে ফেলে রেখে এগিয়ে যেতে লাগলেন। অকস্মাৎ উঠলো প্রচণ্ড ঝড়—ঝড়ে হেডিন তাঁর সঙ্গিগণ সহ বালির তলায় পিষ্ট হ'তে হ'তে কোন মতে বেঁচে গেলেন—অদূরে দৃষ্টি পড়তে দেখলেন, একটা বালির পাহাড় প্রায় আড়াইশ' ফুট উঁচু—এটি ঝড়ের কীর্ত্তি!

এর পরদিন দেখা গেল, বিশ্বাস করে জলের পাত্রটি যাকে বহন করতে দেয়া হয়েছিল, সে এক ফাঁকে সবটুকু জল একাই খেয়ে ফেলেছে। দারুণ তৃষ্ণায় কাতর হয়ে হেডিন ষ্টোভ ধরাবার স্পিরিটটাই খেয়ে নিলেন। তার পরদিন একটি মুরগী কেটে তার তাজা রক্তটা খেয়ে নিলেন গলা ভেজাবার জন্য। সঙ্গের ভৃত্যরা একটা ভেড়া কেটে, তার রক্তটা একটা পাত্রে সংগ্রহ করলো পান করবার জন্য—কিন্তু কী দুর্গন্ধ! আর এতই ঘন যে গেলা যায় না। পথ-প্রদর্শকটি তৃষ্ণার জ্বালায় প্রায় উন্মাদ হয়ে উঠলো—মুঠো মুঠো বালি নিয়ে চুষে জল বার করবার চেষ্টা করতে লাগলো। প্রত্যেকের শরীর এত অবসন্ন হয়ে পড়লো যে, পরিধানের বস্ত্রটুকুও বোঝার ভারী মনে হতে লাগলো। কয়েক জন সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে চলতে আরম্ভ করলো। কিন্তু হেঁটে এগোবার আর কারোরই শক্তি নেই। তিনটি ভৃত্যের দেহ নিষ্প্রাণ হয়ে গেল। হেডিন কাসিম নামে একটি ভৃত্যকে নিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে লাগলেন। ৬ই মে হেডিন দেখলেন, পাশাপাশি বসে কথা বললেও আর একের কণ্ঠস্বর অপরের কানে যায় না—দু'জনেই এমন শক্তিহীন হয়ে পড়েছেন। এমন সময় কিছু দূরে নদীর মত জলাশয়ের একটা ঢালু জায়গা দেখা গেল। হামাগুড়ি দিয়ে হেডিন সেই ঢালুর মাঝখান অবধি গেলেন, যেটুকু হুঁস তখনো ছিল তার সাহায্যেই ভেবে-চিন্তে বুঝে নিলেন, এইটেই খোটান নদী। কিন্তু এ নদীর বুকখানা একেবারেই শুকনো। কাসিম অনেক পেছনে পড়ে আছে। হেডিন যেন স্পষ্টই অনুভব করতে লাগলেন, মৃত্যু কেমন তিলে তিলে এগিয়ে আসছে। নাড়ী পরীক্ষা করে দেখলেন, মিনিটে উনপঞ্চাশ বার মাত্র। অবর্ণনীয় ক্লান্তিতে হেডিন চোখ বুজবেন, এমন সময় দৃষ্টিপথে ভেসে উঠলো এক ঝাঁক বালিহাঁস। যেখান থেকে ওরা উড়লো, হেডিন অনুমানে সেই দিকে এগোতে লাগলেন। হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে এসে এখানে তিনি একটি জলাশয় পেলেন। অঞ্জলি ভরে অনেকটা জল পান করবার পর হেডিনের মনে হলো—"Life seemed more desirable and beautiful than ever." বলা বাহুল্য, এইটিই তাকলা মাকানের একটা সীমা। এর পর পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের লোকেরা এসে হেডিন ও কাসিমকে খাদ্য জুগিয়ে ও অন্যান্য সাহায্য দিয়ে সুস্থ করে তোলে।

ভারত থেকে তিব্বত

রায় বাহাদুর শরৎচন্দ্র দাস

[তিব্বত যেন রূপকথার বিচিত্র দেশ। হিমালয়ের চার পাশে যে কোন তুষারময় স্বপ্নপুরী। সমতল ভূমির মানুষের কাছে—অত্যুচ্চ গিরিশিখরবাসী তিব্বতীয়দের কথা জানার কৌতূহল বহুকাল থেকে জেগে রয়েছে। কৌতূহল আছে তিব্বতের প্রকৃতির মধ্যে, তার লতা-পাতা, ফল-ফুল, পুরুষ ও নারীর মধ্যে; কৌতূহল আছে তার পথ-ঘাট, ঘর-বাড়ী, নদ-নদী, আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতির মধ্যে। সবই নতুন। সেই নতুনকে জানার জন্তে যুগে যুগে পর্যটকগণ শত বাধা, শত বিপত্তি বরণ করেছেন। কিন্তু বাঙালীর জীবনে এই অভিযান নতুন হলেও বিস্ময়কর নয়। প্রাচীন কালে যেমন এঁদেরই পূর্বপুরুষ দুর্লঙ্ঘ গিরি, শত শত নিবিড় বনানী, শত শত উত্তাল তরঙ্গসঙ্কুল সমুদ্র অতিক্রম করে চীন, জাপান, শ্যাম, ব্রহ্ম, জাভা, সুমাত্রা প্রভৃতি দেশে গমন করেছিলেন; সেখানে ভারতের ধর্ম, জ্ঞান, সংস্কৃতি প্রচার করে বৃহত্তর ভারতের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন—তেমনি আবার তিব্বত-রাজের আমন্ত্রণে চিরতুষারাবৃত দুর্গম তিব্বত দেশে গমন করে রাজগুরুর পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন, এ কথা এ যুগের বাঙালী ভুললেও, ইতিহাস তা আজও ভোলেনি—আপন বক্ষে সযত্নে এই দুর্গম পথের যাত্রিগণের অপূর্ব সাহস, কীর্তি-কথা ধারণ করে রয়েছে। তা হলেও কয়েক শতাব্দী আগেও তিব্বত সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলুম। ইউরোপের লোকেরা বহু দিন পর্যন্ত তিব্বতে প্রবেশলাভ করতে পারেনি। এই তো সেদিন মাত্র তারা তিব্বতে প্রবেশলাভ করেছে—তাদের ভ্রমণ-কাহিনী আর বাঙালী পর্যটক শরৎচন্দ্র দাসের তিব্বত সম্বন্ধে বিবরণী থেকে আমরা আজকাল নিষিদ্ধ দেশ (Forbidden City) লাসা ও তিব্বত সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে পারি। শরৎচন্দ্র দাস (১৮৪৯-১৯১৭) বৃহত্তর এশিয়ায় ভ্রমণ করেছেন। তিনি সিকিমে (১৮৮৪), চীন দেশের পিকিংএ (১৮৮৫), তিব্বতে লাসা শহরে (১৮৭৯, ১৮৮১), জাপানে (১৯১৫) ভ্রমণ করেছেন। তাঁর অভিজ্ঞতাও প্রচুর। তাঁর তিব্বত সম্বন্ধে কয়েকখানি বই আছে—"Journey to Lassa and Central Tibet" (১৯০২), "Narrative of the Incidents of My Early Life" (১৯০৮), "Narrative of a Journey to Tashi-lhumpo in 1879", "Indian Pandits in the Land of Snow" (১৮৯৩) ইত্যাদি। এর মধ্যে ক্ষুদ্র পুস্তিকা "Narrative of the Incidents of My Early Life"এ তিব্বত ভ্রমণের প্রথম অভিজ্ঞতার কথা আছে—বেশ তথ্যপূর্ণ ও চিত্তাকর্ষক। পাঠকবর্গের কৌতূহল নিবারণার্থে সেখানির অনুবাদ এখানে প্রকাশ করা হল।—অনুবাদক]

প্রস্তুতি

স্যার আলফ্রেড ক্রফট, এম-এ, এল-এল-ডি, কে-সি-আই-ই তখন বাঙলার শিক্ষা-বিভাগের অধিকর্তা। বাঙলা গভর্ণমেন্টের কাছে তাঁর লেখা একখানা চিঠিতে নিয়োক্ত অংশটি উল্লিখিত দেখা যায়:—

"শরৎচন্দ্রের প্রথম যাত্রা (১) সুরু হয় ১৮৭৯ সালে। তিনি তাসি-লাম্পোতে গিয়েছিলেন। সেখানে তাসি লামার অতিথি হিসেবে তিনি প্রধান মন্ত্রীর বাড়ীতে ছ'মাস কাটিয়েছিলেন। ভারতে ফিরে আসার সময় তিনি অনেক বহুমূল্য সংস্কৃত ও তিব্বতী পুঁথি (২) সংগ্রহ করে নিয়ে আসেন। তিনি কাঞ্চনজঙ্ঘার উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম দেশসমূহে পরিভ্রমণ করেন। ঐ দেশগুলির বিবরণ তাঁর পূর্বে আর জানা যায় নি। (৩) আমি ভারতের সার্ভেয়ার জেনারেল মেজর জেনারেল জে. টি. ওয়াকার, আই-সি-এসকে শরৎচন্দ্রের ভ্রমণ, পর্যবেক্ষিত জিনিষ ও তথ্যগুলির বিষয় জানিয়েছিলুম। পর্যবেক্ষণ ও তথ্যের দিক থেকে তাঁর ভ্রমণ সাফল্যমণ্ডিত নিশ্চয়ই। বিচক্ষণতার সঙ্গে সেগুলি গৃহীত ও লিপিবদ্ধ হয়েছে। মানচিত্র প্রভৃতির জন্ত সেগুলির প্রয়োজন অপরিহার্য।" (সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার জেনারেল রিপোর্ট, ১৮৮১-৮২, পৃ: ১১৬)।

তিব্বতে আমার প্রথম যাত্রার বিবরণী "Narrative of a Journey to Tashi-lhumpo in 1879"তে আমার প্রাথমিক তথ্যগুলি সংযোজিত করে দিয়েছিলুম। স্যর আলফ্রেড ক্রফট তাতে মন্তব্য প্রকাশ করেছিলেন—

"এই বিবরণীর লেখক বাবু শরৎচন্দ্র দাস ১৮৭৪ সালে কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজের ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ছাত্র ছিলেন। বাঙলার লেফটেন্যাণ্ট গভর্ণর স্যর জন ক্যাম্বেলের অনুমত্যানুসারে দার্জিলিংএ এক তিব্বতীয় বোর্ডিং-স্কুল খোলা হয় এবং সেখানে তিনি (শরৎচন্দ্র) প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। বাবু শরৎচন্দ্র দাস তথায় তিব্বতীয় ভাষা অধ্যয়নে নিজেকে নিয়োজিত করেন। পর পর কয়েক বছর তিনি স্বাধীন সিকিমের মঠ এবং উক্ত স্থানের দর্শনীয় স্থানগুলি পরিভ্রমণ করেন। সেখানে তিনি সিকিমের রাজা, রাজমন্ত্রী এবং ক্ষমতাশালী ব্যক্তিদের সঙ্গে পরিচিত হন। লামা ইউজেন গিয়াৎসো নামে পেমা ইয়ং-ট্সে এক জন সন্ন্যাসী দার্জিলিংএর উক্ত বিদ্যালয়ের তিব্বতীয় শিক্ষক ছিলেন। উক্ত লামাকে পেমা ইয়ং-ট্সে মঠ থেকে তাসি-লাম্পো ও লামার প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত করা হয়। শরৎচন্দ্রের বহু আকাঙ্ক্ষিত

(১) এখানে বলা যেতে পারে যে, এই ভ্রমণ আমি নিজ ব্যয়ে এবং আমার সম্পূর্ণ ইচ্ছায় হয়েছে। গভর্ণমেন্ট এতে আমাকে এক কপর্দকও সাহায্য করেন নি। ডেপুটি ইন্সপেক্টর অব স্কুল হিসেবে আমার বেতন মাসিক ১৫০৲। আমি কেবলমাত্র একমাসের বেতন অগ্রিম হিসেবে সঙ্গে নিয়েছিলুম।

(২) আমি বইগুলি গভর্ণমেন্ট ভুটিয়া (তিব্বতীয়) বোর্ডিং স্কুলে দান করি।

(৩) সাং এবং সিকিম প্রদেশের মানচিত্র দেখুন।

তিব্বত ভ্রমণের ইচ্ছা বলবতী হয়। এই সুযোগে লামাকে তিনি অনুরোধ করেন সেখানে তাঁর ভ্রমণ সম্ভব কি না তা অনুসন্ধান করতে। তাঁর অনুরোধে লামা লাসায় পৌঁছে তাঁর ভ্রমণ সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই করতে পারেন নি; কিন্তু তাসি-লাম্পোতে তাসি লামার প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত শরৎচন্দ্র দাসকে প্রধান মঠের ছাত্র হিসেবে তাসি-লাম্পো পরিদর্শন করার আহ্বান-পত্র উক্ত লামার হাত দিয়ে পাঠান। তাঁর অভিরুচি অনুযায়ী পথ দিয়ে আসার সুবিধার জন্ত জং-পন্স (Jong-pons) অর্থাৎ জেলাশাসক ও কালেক্টরগণকে সহায়তা করার জন্ত আদেশপত্র দেন। আদেশ থাকে—(যে কোন লোকের প্রতি) মালপত্র সমেত তাঁকে তাঁর গন্তব্যপথে যাওয়ার জন্ত সাহায্য করতে হবে। তদনুযায়ী বাবু শরৎচন্দ্র দাস লামা ইউজেন গিয়াৎসো সমভিব্যাহারে ১৮৭৯ খৃঃ জুন মাসে তাসি-লাম্পো যাত্রা শুরু করেন। সঙ্গে নিয়েছিলেন কতকগুলি বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি (৪), উপহার দ্রব্য আর ক্যামেরা (৫)। পর্যটকগণ উক্ত রাজধানীতে তিন মাস অবস্থানের পর প্রায় এক বছর পরে দার্জিলিং-এ ফিরে আসেন। প্রধান মন্ত্রী তাঁদের খুব আতিথেয়তা জানান। (৬) এবং আগামী বছর তাসি-লাম্পোতে আসার জন্ত নিমন্ত্রণ করেন। কিন্তু ১৮৮০ খৃঃ সিকিমের মধ্যে গোলযোগ উপস্থিত হওয়ায় তাঁরা সেই নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে বিরত হন।"

১লা আগষ্ট ১৮৮১　　স্বাঃ এ, ডব্লু ক্রফট।

উল্লিখিত আমন্ত্রণলিপি ছাড়াও লামা ইউজেন গিয়াৎসো তাঁর সঙ্গে তিব্বতীয় লাম-ইগ অর্থাৎ ছাড়পত্র তাসি-লামার দরবার থেকে নিয়ে আসেন। যাকে বলা হয় গিয়াৎসান থম্পো (Gya-tshan thonpo, সংস্কৃত উচ্চধ্বজ), যাতে তিব্বত সিকিম-সীমান্ত থেকে প্রধান লামার রাজধানী তাসি-লাম্পো পর্যন্ত পথ ভ্রমণের অনুমতি দেওয়া ছিল। সেই অনুমতিপত্রে এরূপ লেখা ছিল—

ছাড়পত্র

"দারগিয়াস, গুর-মে এবং গাম-পা (খাম বা জং) এর প্রধান ব্যক্তি অধিবাসীদিগের প্রতি:—

(এই ছাত্রপত্র) সিকিম এম-জে (চিকিৎসক) এবং টংখাই ডন্-রা (শরৎচন্দ্র) এই দু'জনের পথে ভ্রমণের জন্ত ব্যবস্থা; তার সঙ্গে তিনটি চড়বার টাট্টু ঘোড়া, দশটি মালবাহী পশু এবং অপর প্রয়োজনীয় খাদ্য ও জ্বালানি ইত্যাদি; বিনা খরচে তাঁদের বিশ্রাম স্থান এবং তিব্বত রাজ্যে, রাজধানী টাং-লু (শীতল উপত্যকা) এবং সেখান থেকে লা-চেন হয়ে ফিরবার পথে সীমান্তের ওপর দিয়ে—একবার মাত্র—গমনে উভয় পথে কোথাও বিলম্ব বা আটক না করার আদেশ রইল।

তারিখ—তাসি-লাম্পো, প্রথম দিন,

বছরের অষ্টম মাস　　তাসি-লাম্পোর আদালতের
(সেপ্টেম্বর, ১৮৭৮)　　মোহরাঙ্কিত সীল

১৮৮১ সালের জুলাই মাসে আমি গভর্ণমেন্টের কাছে নিম্নোক্ত প্রস্তাবগুলি করি—

এ, এইচ, ক্রফট, এস্কোয়ার
ডিরেক্টর অফ ইনষ্ট্রাক্‌সন, বেঙ্গল

দার্জিলিং, ১২ই জুলাই ১৮৮১

মহাশয়,

আপনি অবগত আছেন যে, এক বিরাট এবং বিস্তৃত পর্বতীয় অঞ্চল সিকিং এবং ভারতের (কাশ্মীর) মধ্যে অবস্থিত। সমগ্র পশ্চিম চীনদেশের অংশ সমেত, দক্ষিণ মঙ্গোলীয় অনুর্বরা ভূমি, বিশাল গোবি মরুভূমির পূর্বাঞ্চল—যার সীমারেখায় আছে দক্ষিণ জুঙ্গারিয়া, পূর্বে খাম এবং তিব্বতে পূর্ব প্রদেশসমূহ, যেখানে গাঙ্গেয় উপদ্বীপসমূহ অবস্থিত। এ সমস্ত এখনও সভ্য সমাজে অনাবিষ্কৃত ও অজ্ঞাত দেশ। বহু প্রসিদ্ধ পর্যটক তাঁদের নিজ নিজ রাজ্য সরকারের সহায়তায় যেখানে তাঁদের রাজ্যের প্রভাব আছে সেই সব সন্নিহিত অনাবিষ্কৃত অঞ্চলসমূহে পর্যটন করার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু তাঁরা বিফল হয়েছিলেন যে কারণে সে কারণগুলি আমি ব্যক্ত করতে ইচ্ছা করি না। যদি তাঁরা এ বিষয়ে কৃতকার্য হতেন, তা হলে তাঁরা হয়তো এর উপরে লিখিত স্থানগুলিকে অভিযান শুরু করার চেষ্টা করতেন।

এই ২০০০ মাইল বিস্তৃত অঞ্চলগুলি ভ্রমণের যে কষ্ট যে স্থান প্রাকৃতিক বাধা ও বিপর্যয়ে পূর্ণ, যেখানে মানুষ এখনও প্রাকৃতিক বাধার চেয়েও শত্রুপক্ষীয় বলে গণ্য—ঐ সকল প্রসিদ্ধ পর্যটকের সেখানে প্রবেশ করার কথা ভাবতেও সাহস করেন নি। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল এবং ইহা ঠিকই যে, তাঁরা যে সব স্থান সহজগম্য সেই সব স্থানেই প্রথমে অভিযান শুরু করবেন। কিন্তু যখন তাঁরা দেখলেন সেখানে সফলতা লাভ করার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নেই তখন সেই সব রাজনৈতিক ও প্রাকৃতিক দুর্লঙ্ঘ্য বাধা অতিক্রম করা তাঁদের পক্ষে হয়ে দাঁড়ালো দুরাশা মাত্র। এমন কি সম্প্রতি ব্যারন রিক্টোফেন এবং কাউণ্ট সেচ্‌েচনি, যদিও তাঁরা পিকিং-এর রাজকীয় সমস্ত সুবিধা পেয়েছিলেন অনুগ্র

---

(৪) যাত্রার জন্ত প্রয়োজনীয় সাজ সরঞ্জাম—

(ক) একজন ভুটিয়া গাইড—জংরি (সিকিম) থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘার পাদদেশে অবস্থিত নেপাল-সীমান্তে কাং-লাচেন পর্যন্ত।

(খ) দু'জন সিকিম কুলি—দার্জিলিং থেকে জংরি।

(গ) একটি পকেট sextant যন্ত্র।

(ঘ) একটি পরকলাযুক্ত (prismatic) কম্পাস।

(ঙ) দুটি হিপসোমিটার (hypsometer)।

(চ) একটি দূরবীক্ষণ যন্ত্র (field glass)।

(৫) আমি সঙ্গে নিয়েছিলুম "Tassendiers' Manual of Photography"। প্রধান মন্ত্রী বইখানি তিব্বতী ভাষায় অনুবাদ করেন। আমি তাঁকে collodion film দিয়ে ছবি তোলার কৌশল শিখিয়েছিলুম।

(৬) ভারতে ফেরবার পথে প্রধান মন্ত্রী আমাকে তিব্বতীয় মুদ্রায় কিছু টাকা ধার দিয়েছিলেন, যা আমার ফেরার খরচের পক্ষে যথেষ্ট ছিল।

তাঁরা তাঁদের আরব্ধ কাজ শেষ না করে ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন।

২। পশ্চিম তিব্বত ভ্রমণে আমি সাফল্যলাভ করেছি। সেখানে আমি সৌভাগ্যক্রমে কয়েকজন অকৃত্রিম বন্ধুও পেয়েছি—তাঁদের মধ্যে আছেন দেশের প্রধান মন্ত্রী এবং জ্ঞানী ব্যক্তিরা। ঐ দেশকে আমি নিখুঁত ভাবে দেখেছি—যে দেশ এই উনিশ শতকেও অজানা, দুর্গম। অনেক ভেবে চিন্তে আমি মন স্থির করেছি—ঐ দেশে কি গুপ্তধন নিহিত আছে তা আমি আবিষ্কার করব। এই কাজ অত্যন্ত দুরূহ—এই কাজ সম্পন্ন করতে হয়তো আমাকে মৃত্যু বরণ করতে হবে। দেশের রাজনৈতিক, প্রাকৃতিক বাধা এত প্রচুর যা শুধু অনুভব করা যেতে পারে, প্রকাশ করা সম্ভব নয়। যার কথা ভাবলেও হৃদয় হিম হয়ে যায়। যদি কোন ভ্রমণকারী ঐ সব বাধাকে অতিক্রম করতে পারে—হাজার হাজার মাইলের বক্রপথ, অসংখ্য রক্তপিপাসু, নিষ্ঠুর অসভ্য বর্বর জাতি, যেখানে নিহত হলে কোন চিহ্নই আর পাওয়া যাবে না—সেই ভ্রমণকারীই হবে ধন্য। হাঁ, আমি সাইবেরিয়ার সাহসী গভর্ণর জেনারেল—জেনারেল প্রেজেভাল্‌সকির (Prejevalsky) মত, যিনি রাশিয়ান গভর্ণমেন্টের ইজ্জৎ পিঠে বহন করে বেরিয়েছিলেন—আমি যা করতে যাচ্ছি—তার অর্ধেকও নয়—বলতে ইচ্ছে করে "বিদায়, হে আমার স্বদেশ। বহু দিনের জন্য বিদায়, তোমাকে কি আবার আমি দেখতে পাবো? অথবা সেই সুদূর দেশ থেকে আর কখনও ফিরে আসবো না।" যদি আমি উপযুক্ত উৎসাহ পাই, তবে আমি আমার নিজ পরিকল্পনানুযায়ী কাজ করতে প্রস্তুত আছি।

আপনার জানা আছে যে, উল্লিখিত প্রসিদ্ধ পর্যটকগণ সরকার-সাহায্যপুষ্ট হয়ে বহু ব্যয় করেছেন, আমাপেক্ষা কম কষ্টকর দেশগুলি ভ্রমণ করতে। কিন্তু তাঁরা যা সাহায্য পেয়েছিলেন, আমি সে পরিমাণ সাহায্যলাভের প্রত্যাশী নই।

প্রকাশ্য ভাবে নিজেকে রক্ষা করতে আমি বৃটিশ গভর্ণমেন্টের ইজ্জৎ বহন করে নিয়ে যেতে চাই না—যেমন নিয়েছিলেন জেনারেল প্রেজেভ্যালসকি মঙ্গোলিয়ার সামান্যতম অংশ পরিভ্রমণ করতে জারের অনুসাহায্য; নিয়েছিলেন সশস্ত্র কসাক রক্ষীদলকে তাঁর যাযাবর লুন্ঠনকারী অশিষ্ট তুর্কী দস্যুদের হাতে আক্রমণ নিরাপত্তার জন্য অথবা পূর্ব গোবির অসংখ্য টাংগিয়াংদের কাছ থেকে বাঁচবার জন্যে। আমার ইচ্ছা যে, আমি অ্যাবে হিউ আর গ্যাবেটের মত ভ্রমণ করব। অনাবিষ্কৃত অঞ্চলে ভ্রমণের সময় দুঃখ-কষ্টের মধ্যে নিজেকে অভ্যস্ত রাখব। প্রকৃতির সঙ্গে আর তথাকার মানুষের সঙ্গে খাপ খাওয়াব। বৃহত্তম এশিয়ার ভাবাজ্ঞানের মাধ্যমে তিব্বতীয় ও পারিপার্শ্বিক অধিবাসীদের রীতি-নীতির খবর আমি জানি। আমি আশা করি, এগুলিই আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করবে। আমি মনে-প্রাণে অনুভব করি, আমি বিজয়-মুকুট পরে ফিরে আসবো।

৩। একজন অভিজ্ঞ ও বিশ্বস্ত পথপ্রদর্শক আমি পেয়েছি, যার নাম লামা সেরাব—যিনি ভুটিয়া স্কুলের বোজলীয় শিক্ষক। তিনি বলেছেন, আমার পরিকল্পনানুযায়ী ভ্রমণ সম্পূর্ণ করতে পূর্ণ দুই বছর লাগবে এবং ব্যয়ের সংখ্যা প্রচুর ও অনিশ্চিত, যার আনুমানিক হিসাব আগে থেকে বলা যেতে পারে না। তাঁর আনুমানিক হিসাব মত ব্যয় হতে পারে প্রায় ২০,০০০ টাকা(৭)। তিনি আমাকে তাসি-লাম্পো থেকে লাসা যাওয়ার বদলে পিকিং থেকে যাত্রা করতে পরামর্শ দিয়েছেন। লামা ইউজেন গিয়াৎসো, যিনি আমার সঙ্গে গত বারে ভ্রমণ করেছিলেন। এবারেও আমার সঙ্গী হতে রাজি হয়েছেন।

আমি আপনার কাছে আমার পরিকল্পনা পরিষ্কার ভাবে জানালুম ইহার গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আপনি অবহিত আছেন(৮)। ইতি—

আপনার বিশ্বস্ত
(স্বাঃ) শরৎচন্দ্র দাস

মিঃ ক্রফটের সুপারিশে বাঙলা গভর্ণমেন্ট ভারত গভর্ণমেন্টের অনুমত্যানুসারে ভৌগোলিক অনুসন্ধান সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে সমুদয় পরিকল্পনা মঞ্জুর করেন। তাঁরা আমার সঙ্গে নিম্নোক্ত চুক্তি করেন।

"বাবু শরৎচন্দ্র দাস, ডেপুটি ইন্সপেক্টর অফ স্কুলস তিব্বতের পথে অগ্রসর হবেন এই মর্মে নিম্নোক্ত সর্তগুলি মিঃ ককেরেল, মিঃ ক্রফট ও শরৎচন্দ্র দাস কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

১। এই মাসে (১৮৮১, সেপ্টেম্বর) তিনি তাসি-লাম্পোর যাত্রা করবেন। সেখান থেকে তিনি যাবেন লাসায়, হয় এই বছরে অথবা আগামী বসন্তে অথবা তাঁর নিরাপদ ভ্রমণের সুবিধানুযায়ী যে কোন সময়ে। লাসায় পৌঁছে তিনি সেখানকার ক্ষমতাশালী ব্যক্তিগণের সঙ্গে পরিচিত হবেন আর যত দূর সম্ভব অনুসন্ধিৎসা বর্জন করে চলবেন। তিনি একটি দিন-পঞ্জিকা রাখবেন তাতে প্রতি দিনের পথের স্থান ও ব্যক্তি সম্বন্ধে জ্ঞাতব্যগুলি লিখিত থাকবে। তিনি তিব্বতের ধর্ম, সাহিত্য, আর ইতিহাস সম্বন্ধে অনুসন্ধান করবেন, সে সম্বন্ধে পৃথক ভাবে তাঁকে উপদেশ দেওয়া হবে। তাঁর ব্যবহারের জন্য তিনি বই, পুঁথি এবং তাঁর প্রয়োজন মত দ্রব্যসামগ্রী কিনতে পারবেন। তাঁর উদ্দেশ্য সাধনের জন্য স্থানীয় লোকও নিয়োগ করতে পারবেন। যদি তিনি বিবেচনা করেন লাসা শহর অতিক্রম করেও এগিয়ে যেতে পারবেন। কিন্তু এমন কোন ভৌগোলিক অনুসন্ধান(৯) করবেন না যাতে অপর পক্ষের কোনও সন্দেহের উদ্রেক হতে পারে। তিনি দূরবর্তী কোন শহর বা মঠ দেখতে যেতে পারেন, সেখানকার

(৭) পি, এণ্ড ও, কোম্পানীর বোটে কলকাতা থেকে পিকিং যাওয়ার খরচ তৎকালে তিন জনের আনুমানিক ২০০০৲ টাকা। লামা সেরাব লাসা যাওয়ার সময় আমার সঙ্গী ছিলেন না।

(৮) এই পরিকল্পনার কিছু কাজ পণ্ডিত নয়ন সিংএর ভ্রাতুষ্পুত্র কৃষ্ণ সিং করেছিলেন। সার্ভে রিপোর্টে তিনি A. K. নামে পরিচিত।

(৯) আমার মূল প্রস্তাবিত বিষয় থেকে আমি একটুও সরিনি অর্থাৎ বিস্তৃত অজ্ঞাত দেশের অনুসন্ধান হতে। সেই মত আমি শাক্য থেকে জাং-রি-থামায় পর্যটন করে বেড়িয়েছি। ইয়াং-ডো হ্রদের দেশ অনুসন্ধান কার্য বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে করেছি। এটা এত নিখুঁত হয়েছিল যে পরবর্তী কালে কর্ণেল ইয়ংহাসব্যাণ্ডের নেতৃত্বে যে তিব্বতীয় মিশন গিয়েছিল তাঁরা এই স্থান আর পুনর্বার জরীপ করেননি। পূর্বাঞ্চলে যে জরীপের কাজের জন্য যে দল প্রেরণের প্রস্তাব হয়েছিল তাহাও ভারত গভর্ণমেন্ট কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়।

রাস্তা জরীপ করতে পারেন কিন্তু কোন মানচিত্র প্রস্তুত করতে পারবেন না। লাসা শহরে অবস্থানের কোনও নির্দিষ্ট সময় নির্ধারিত থাকছে না। কোন বিশেষ কারণ ব্যতীত তিনি সব সময় চেষ্টা করবেন যাতে বারো মাসের মধ্যে ফিরে আসতে পারেন। সব সময় ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে চেষ্টা করবেন। ভারতীয় শিক্ষা বিভাগকে ভ্রমণের রিপোর্ট ও চিঠিপত্র পাঠাবার নিরাপদ ব্যবস্থা করবেন।

২। তাঁর ব্যয় বাবদ তাঁকে ৫০০০৲ টাকা দেওয়া হবে। সেই টাকা তিব্বতে চলিত সোনা, মুক্তা, প্রবাল এবং অন্যান্য তিব্বতের প্রয়োজনীয় দ্রব্যে বিনিময় করে নিয়ে যাবেন, যাতে সেখানে খরচের পক্ষে অসুবিধা না হয়। এই টাকায় তিনি এবং তাঁর সঙ্গীদের ভ্রমণ সম্বন্ধে যাবতীয় ব্যয় হবে। তিনি তাঁর খরচের একটি হিসাব রাখবেন। এবং যখন ফিরবেন তখন যদি কিছু উদ্বৃত্ত থাকে তাহা হিসাব সমেত শিক্ষা বিভাগের হাতে দিবেন।(১০)

স্বাঃ—হোরেস ককেরেল
দার্জিলিং　　সেক্রেটারী, বাঙলা গভর্ণমেণ্ট
সেপ্টেম্বর ৪, ১৮৮১　　এ, ডবল্যু, ক্রফট
ডিরেক্টর অফ পাবলিক ইনস্ট্রাকশন
শরৎচন্দ্র দাস

ভারতে প্রত্যাগমনের জন্য ছাড়পত্র

গাগ-পা (Ngag-pa) কলেজের ভূতপূর্ব প্রেসিডেণ্ট মাতব্বর সেন-চেন-এর চিকিৎসক লামা ও পান-ডুবের(১১) নিজ নিজ দেশে ফিরে যাবার আবেদনে সর্বময় কর্তা এবং তাঁর দপ্তর এই ছাড়পত্র মঞ্জুর করেছেন। আমাদের এলাকায় দবগিয়াস, গুর-মে এবং গাম-পা'র পথে কোন প্রকার বাধা (যেমন, রাস্তার নামে আটক, তল্লাসী, সন্দেহ) দেওয়া হবে না। তাঁরা নিজেরা চ্যান্সেলারের সম্মুখে উপস্থিত হলে তাঁদের (১৮৮২, সেপ্টেম্বর) বর্ষের ১ম মাসের ৪র্থ দিবসে এই শীলমোহরযুক্ত ছাড়পত্র দেওয়া হল।

প্রথম অধ্যায়

১৭ই জুনের সকাল—সিকিমের ডুব-দি মঠ থেকে আমার জং-রির উদ্দেশ্যে যাত্রা করলুম। সকাল ১০টায় আমরা এমন এক স্থানে এসে পৌছুলুম যেখানে আমরা এক নতুন উদ্ভিদের সঙ্গে পরিচিত হলুম। পেছনে ফেলে এলুম নানা জাতীয় রোডোডেনড্রন গুচ্ছ, জুনিপার লতা আর ভূর্জবৃক্ষকে ফেলে; এলুম নিম্ন পথের ওক আর চেষ্টনাট ফলের গাছকে। জলৌকার দল অদৃশ্য হয়েছে। সামনে এক বিরাট ঢালু পথ—মন-লাপ্‌চা (১২) যাহা উচ্চতায় সমুদ্রতটরেখা হতে ১০০০০ থেকে ১২০০০ ফুট। চারদিকের দৃশ্য কি নয়নাভিরাম! লাল, গোলাপী, রোডোডেনড্রন-গুচ্ছের সারি। আর তার প্রাচুর্যতায় স্থপরিপূর্ণমান। উদ্ভিদ-বিজ্ঞানে আমার অজ্ঞতা আমাকে অনুতপ্ত করলে এখানকার বিচিত্র বীথিরাজি।

বাখিম জং-রির মধ্যপথে আমি বহু মাতব্বর বৃদ্ধ ভদ্রলোক ডাঃ ইংলিসের (Dr. Inglis) সহিত পরিচিত হলুম। তিনি দার্জিলিং থেকে জং-রি এসেছেন পর্বতীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করতে। আরও এগিয়ে যেতে চান, কিন্তু কুলিদের অবাধ্যতা, পথপ্রদর্শকের অদূরদর্শিতা আর খাদ্যসঙ্কটের উৎপত্তিতে এই তুষারপথে অগ্রসর হতে সক্ষম হননি। ডাঃ ইংলিসের অভিলাষ তিনি নিউজিল্যাণ্ডে তাঁর সম্পত্তির দায়িত্ব গ্রহণ করার আগে হিমালয় পরিভ্রমণ করবেন। একথা তিনি আমাকে প্রকাশ করেন। যদিও আমি তাঁর প্রয়োজন মত তাঁকে সাহায্য করতে পারিনি কিন্তু যতদূর সম্ভব আমি তা করেছি (১৩)। বিকাল ৫টায় আমরা জং-রিতে পৌছুলুম। এক চমরু-পালকের বাড়ীতে আমরা আশ্রয় নিলুম। বাড়ীর দেওয়ালটি পাথর দিয়ে পর পর সাজিয়ে তৈরী—এতে কোন মসলা ব্যবহার হয়নি। বাড়ীর ছাদ কুড়ুল দিয়ে কাটা দেবদারু গাছের তক্তা দিয়ে সাজিয়ে বসান হয়েছে চারপাশের পাথরের ওপর। এখানকার লোকেরা করাতের ব্যবহার জানে না, এমন কি লোহা বা পেরেকের কথাও তাদের স্বপ্নেরও অগোচর!

এখানকার উচ্চতা ১৩,१০০ ফুট। জল এখানে গরম হয় ১৮৭°তে এবং তাপ ৪২° F। জং-রির দৃশ্য দেখে আমি বিস্ময়ে হতবাক্ হয়েছি। প্রসিদ্ধ উদ্ভিদতত্ত্ববিদ্ ও হিমালয়-পরিব্রাজক স্যর জোসেফ হুকার জং-রি দেখতে এসেছিলেন আমার জন্মাবার ছয় মাস পূর্বে অর্থাৎ ১৮৪৯ খৃঃ। তিনি এই স্থানের এক মনোরম বর্ণনা দেন—

"তাঁবুর প্রবেশদ্বারে আমি বসে আছি। উৎসুক নেত্রে এখানকার প্রাকৃতিক আবহাওয়া লক্ষ্য করছি। স্থির দৃষ্টিতে আমি চন্দ্রোদয়ের আনন্দ উপভোগ করতে লাগলুম; হঠাৎ একখণ্ড অশ্বপুচ্ছবৎ মেঘ এসে চন্দ্রকিরণকে স্তিমিত করে আমার মনকে বিক্ষিপ্ত করে দিল। তার পরেই সূচিবিদ্ধবৎ শীতলতা আর গভীর নীরবতা আমার মর্মে মর্মে আঘাত হানছিল। জানুয়ারি মাসে আমার অগ্রসর হবার বিশেষ চেষ্টা ছিল না—কারণ আমার খাদ্যবস্তু অপ্রচুর ছিল, তার সঙ্গে জং-রির পথসমূহ তুষারপাতে রুদ্ধ হয়েছিল। বায়ু-প্রবাহের প্রতিটি গতি পরিবর্তন আমি আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করছিলুম। বায়ুমান যন্ত্রে ও তাপমান যন্ত্রের উঠা-নামা আর অদূরে মেঘপুঞ্জের গতিপথ আমার দৃষ্টিকে এড়িয়ে যেতে পারে নি। সন্ধ্যা ৭টায় হঠাৎ বায়ুর গতি পশ্চিম দিকে পরিবর্তিত হয়ে যায় আর বায়ুমান যন্ত্রের রেখা ওপর দিকে উঠতে

---

(১০) চার মাস ভ্রমণের পর ভারতে প্রত্যাবর্তন করে যে ৫০০০৲ টাকা আমার ভ্রমণের জন্য অগ্রিম দেওয়া হয়েছিল তার উদ্বৃত্ত ২০০০৲ টাকা আমি কণ্ট্রোলার জেনারেল অফ ইণ্ডিয়ার ট্রেজারিতে ফেরৎ দিই।

(১১) প্রধান মন্ত্রী সাধারণতঃ আমাকে পান-ডুব বলে ডাকতেন, (pan হচ্ছে pandit এর প্রথম অংশ, আর Dub হচ্ছে Dub-chan অর্থাৎ সিদ্ধির প্রথম অংশ) এই নামেতে ভারতীয় পণ্ডিতেরা তিব্বতে পরিচিত ছিলেন।

(১২) মন-লাইনা পর্বতের পাদদেশ। যা হিমালয়ের ছোট ছোট পাহাড়গুলি ছাড়িয়ে (mon) উঠেছে।

(১৩) দার্জিলিং-এ পৌছে ডাঃ ইংলিস শরৎচন্দ্রের তৎপরতা ও উপকরণের কথা এবং শরৎচন্দ্র যে তাঁকে বিশেষ সাহায্য করেছেন, তা আমাকে বলেন—এ, ডবল্যু, ক্রফট।

থাকে। ৮টার পর তাপমান আবার কমতে থাকে। বায়ুর গতি ঘুরে উত্তর-পূর্বমুখী হয়। কুয়াসা পরিষ্কার হয়ে গেল। বায়ুমান যন্ত্রে নির্দেশক সাধারণ অবস্থায় এসে গেল যদিও আকাশ তখনও মেঘাচ্ছন্ন; তাপ ছিল তখন ১৭০°। বাতাসের এলোমেলো ভাব কেটে গেল। আমিও বেশ প্রশান্ত মনে বিছানায় আশ্রয় গ্রহণ করলুম।

ঢালু পথগুলি দেখাচ্ছে বেশ পরিষ্কার আর স্পষ্ট। পুষ্প আর তরুবীথি দিয়ে সাজানো যেন ওপরের গিরিপথ। সামনে ভোজনরত চমরু-গাই-এর দল, ইতস্ততঃ পত্রপুষ্পে সুশোভিত বৃক্ষরাশি। নীচে উপত্যকায় রোডোডেনড্রন গুচ্ছ আর বিচিত্র রঙে পুষ্পিত চারা গাছ। সূর্যদেবের বিদায়কালীন রশ্মি তুষারধবল পর্বতচূড়া রক্তিমাভায় রাঙিয়ে দিয়েছে, রাঙিয়ে দিয়েছে তার পারিপার্শ্বিক পরিবেশকে। হিন্দু কবিরা বৃথাই এর বর্ণনা দিতে গেছেন—কারণ তাঁরা এ দৃশ্য বোধ হয় দেখেন নি আর দেখে থাকলেও এর সৌন্দর্যের বর্ণনা ভাষায় প্রকাশ করতে সক্ষম হন নি। আমার দক্ষিণে খা-বুর পাহাড়ের হিম-শিখর, বামে বরফে-ঢাকা উঁচু পাহাড়, সামনে কাঞ্চনজঙ্ঘা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে রয়েছে, পশ্চাতে রাথং নদী অবিরাম গর্জন নিয়ে দক্ষিণামুখী হয়ে ছুটে চলেছে। আঃ! আমাদের সারা দিনটা আজ বেশ কাটল।

তিব্বতের পথে প্রথম যাত্রা

১০ই জুন—আমাদের যাত্রা হল সুরু। সকাল ১০টায় জং-রি থেকে বেরুলুম। পূর্বাকাশে প্রিগ-চু উপত্যকা ঘন কুয়াসায় সমাচ্ছন্ন। রবিরশ্মির রেশ ক্ষণে ক্ষণে দেখা যায়। কুয়াসার অন্তরাল ভেদ করেও লামা আমাদের যাত্রাপথরেখার সন্ধান দিচ্ছিল। পর পর দু'রাত্রি আমি সেক্সট্যান্ট যন্ত্র দিয়ে নভোমণ্ডল পর্যবেক্ষণ করতে চেষ্টা করছিলুম, কিন্তু কুয়াসার জন্যে আকাশে একটি তারাও দেখা যায়নি। দিনে জুন মাসের সূর্য এত উঁচু মনে হল যে আমাদের পক্ষে মধ্যরেখার উচ্চতা গ্রহণ করা অসম্ভব হয়েছিল।

বেলা ১টায় আমরা কাঠের পোলের ওপর দিয়ে রাথং নদী পার হলুম। অসংখ্য রোডোডেনড্রন পুষ্পকুঞ্জের মধ্য দিয়ে পথ এগিয়ে চলেছে পশ্চিমে নেপাল-সীমান্ত প্রদেশে। আমরাও এগিয়ে চলেছি পথ দিয়ে। বেলা ৩টায় এসে পৌঁছুলুম ইয়াংপু ও কাং-লার পথের সংযোগ স্থলে। এই স্থান থেকে টংলু পর্বতশ্রেণীর ওপর সিংলি-লা, কেলুট, সাম-তুব-ছুক-এর দিকে এসে পথ প্রসারিত হয়ে গেছে। শুভ্র তুষারশৃঙ্গ কম্বর-টেঙ্ হতে উদ্ভূত চুংরু নদীর গতিপথ অনুসরণ করে আমরা এগিয়ে চললুম। আমরা একজন গাইড (paljor) জং-রি থেকে নিয়োগ করেছিলুম। সে একটা পাথর ছুঁড়ে অদূরে ভ্রমণরত লাল ঝুঁটিওয়ালা এক মুরগীকে নিহত করলে, কিন্তু মোরগটা ফসকে গেল।

আকাশে ঝড় দেখা দিল। সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি। আমরা তখন চৈ-গিয়াব-লা (মিউলস ব্যাক পাহাড়—১৪,৮০০ ফুট) পাহাড়ে। সেই বিরাট পাহাড়ের ওপর প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টির মাতনে আমরা ছুটতে ছুটতে এক গুহায় আশ্রয় নিলুম। আমাদের আগে আশ্রয় নিয়েছে আরও তিনজন তিব্বতীয়। আলাপে তারা বললে, দুরন্ত কাঁড়ীর নেপালী চৌকিদার সিংবীর আমাদের যাওয়ার পথে কোন বাধা দেবে না—কারণ এ সময় গিরিপথ খোলা আছে।

সংবাদটা শুভ বটে। ঠাণ্ডা বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে তুষার পড়া সুরু হল। সে এমন স্থান যেখানে নব অঙ্কুরিত সবুজ ঘাস আর ইতস্ততঃ ছড়ান স্পঞ্জতুল্য কোমল শৈবাল ছাড়া আর কোনও উদ্ভিদই দৃষ্টিগোচরে এল না। সে রাত্রে আমরা খুবই অস্বস্তিতে, কনকনে ঠাণ্ডা বাতাসে আর শিলাবৃষ্টির আঘাতে কাটালুম।

[ক্রমশঃ।

অনুবাদক—শ্রীশৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ

চরন্ বৈ মধু বিন্দতি চরন্ স্বাদুমুদুম্বরম্।
সূর্যস্য পশ্য শ্রেমাণং যো ন তন্দ্রয়তে চরন্।
চরৈবেতি। চরৈবেতি। —ঐতরেয় ব্রাহ্মণ

যে চলে সে মধুলাভ করে। চলাই হইতেছে অমৃতময় ফলের প্রাপ্তি। ঊর্দ্ধাকাশে চাহিয়া দেখ সূর্যের দীপ্ত শ্রেষ্ঠত্ব। চলিতে চলিতে সে কখনও থামে নাই, কখনও অবসাদগ্রস্ত হয় নাই। অতএব তুমি চল—আগে চল। অবিশ্রান্ত চল।

ক্লৈব্যং মা স্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ।

—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

হে পার্থ, কাপুরুষতা আশ্রয় করিও না, উহা তোমার উপযুক্ত নহে। হে শত্রুতাপন, হৃদয়ের তুচ্ছ দুর্বলতা পরিহার করিয়া যুদ্ধার্থ উত্থিত হও। [—গীতা]

পরিমল গোস্বামী

পুনশ্চ

স্মৃতিচিত্রণের শেষ কিস্তি পাঠিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে ছিলাম, কিন্তু বৈশাখ-সংখ্যা মাসিক বসুমতী এলে দেখা গেল লেখার শেষে "ক্রমশঃ" কথাটি জুড়ে দেওয়া হয়েছে। ছাপাখানা থেকে সম্ভবত মনে করা হয়েছে আমি ভুল ক'রে "ক্রমশঃ" লিখে দিইনি। জানি না কার ভুল। ভুল জীবনে অনেক করেছি, হয়তো এটিও তার মধ্যে একটি। আমি যে আমার লেখার শেষে "শেষ" কথাটি জুড়ে দিইনি তার একটা কৈফিয়ৎ আছে আমার মনে। আমার ধারণা শেষ কথাটি কোনো অবস্থাতেই বলা যায় না। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা এটি। তিনি দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে এ কথা ব'লে গেছেন: "শেষ নাহি যে শেষ কথাটি কে বলবে।" এবং ঐ একই কথা নানা ভাবে বলেছেন বার বার। তাই আমি আশা করেছিলাম, আমার সঙ্কোচ হলেও বসুমতী প্রেস আমার ভাবভঙ্গি লক্ষ্য ক'রে 'শেষ' কথাটি লেখার শেষে জুড়ে দেবেন। আশা করেছিলাম, তাঁরাই আমাকে থামিয়ে দেবেন। কিন্তু দিলেন না, উপরন্তু আদেশ এসেছে উপসংহার লিখতে। আমি বলেছিলাম আমার স্মৃতিকথা ফুরিয়েছে। তাঁরা বললেন জানি, কিন্তু আপনি লিখুন।

এর পর বুঝতে পেরেছি 'ক্রমশ' কথাটি আমারই জুড়ে দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু উপসংহার লিখব কি করে? "উপ" কথাটি আমার পছন্দ নয়। শুধু সংহার ভাল। কিন্তু নিজেরই মনে প্রশ্ন জাগে—কিসের? উত্তর মেলে না। সংহার কার্য বহু পূর্বেই সমাধা হয়ে গেছে, অতএব পুনঃসংহার আরম্ভ করতে হয়। তা করব না।

অতএব এর নাম দিলাম পুনশ্চ।

এ লেখা যে আমার জীবনী নয়, সে কথা আগেই বলেছি। আত্মজীবনী লেখার অনেক দায়িত্ব। জীবনে অনেক বড় কাজ করতে হবে আগে, এবং সেই সঙ্গে অতি অসৎ কাজও অনেক করা দরকার। এই দুই মিলিয়ে হয় উৎকৃষ্ট জীবনী। অন্তত শুনে আসছি তাই। আবার বড় কাজ অনেক করা হলে, তা বাদ দিয়ে, শুধু অসৎ কৃতকর্ম সমূহ একত্র ক'রেও জীবনী লেখা যায়, এবং তার নাম দেওয়া যায় কনফেশন। মনে রাখতে হবে কনফেশন লিখতে হলে অনেক মহৎ কাজের কৃতিত্ব থাকা চাই, নইলে কনফেশন দাঁড়াবে কিসের জোরে?

ডি কুইন্‌সির কনফেশনস অফ অ্যান ইংলিশ ওপিয়াম ঈটার অবশ্য ব্যতিক্রম। কেন না, তিনি এই কনফেশন লিখে তবে সাহিত্যখ্যাতি লাভ করেছিলেন। সেন্ট অগাস্টিন, রুসো, টলস্টয় এঁরা প্রকৃত কনফেশন লেখক। গান্ধীজিরও সত্য নিয়ে পরীক্ষা, কনফেশন।

কনফেশনস অফ এ সোভা ফীল্ড—লিখেছিলেন স্টিফেন লীকক। সেটি আগাগোড়াই কনফেশন, তবে কিসের তা অনুক্ত আছে, শুধু সমধর্মীরা সেটি ধরতে পারবে।

কনফেশনকে দাঁড় করাবার মতো মহৎ কাজ কিছু করি নি। তাই কনফেশন লেখা আমার পক্ষে অচিন্তনীয়।

অতএব এ দুটিই আমার পরিত্যাজ্য। অনেকের মতে জীবনী লিখতে গেলে নিরপেক্ষ জীবনী লেখা উচিত। মনে মনে বোধ হয় তাঁরা চান যে, কিছু স্ক্যাণ্ডাল প্রকাশ করা হোক। স্ক্যাণ্ডাল বা কলঙ্ক কথা শুনতে কার না ভাল লাগে? কিন্তু শুধু ভাল লাগে বলেই তা শোনাতে হবে কেন বুঝি না। মানুষ যে পশুও সে কথা নতুন ক'রে বলার দরকার আছে কি? সবাই যেখানে এক, সেখানে নীরব থাকাই উচিত। আর পশুত্বের প্রতি এতটা প্রকাণ্ড টান থাকা কি ভাল? তা ভিন্ন নিরপেক্ষতা কথাটির অর্থও স্পষ্ট নয়। আমরা যদি বহির্দৃষ্টিতে অথবা অন্তর্দৃষ্টিতে সমগ্র বাস্তব বা সত্যকে এক সঙ্গে দেখতে পেতাম, তা হলে সমগ্রের নিরপেক্ষ বর্ণনাও সম্ভব হত। কিন্তু আমরা যত চেঁচিয়েই বলি না কেন, একসঙ্গে সমগ্র দেখার যান্ত্রিক বা আত্মিক চোখ আমাদের নেই। পূর্ণ সত্য আমরা দেখি না, সেটি কি তা জানি না। অতএব নিরপেক্ষ সত্য নামক কোনো সত্য আমাদের ধরা ছোঁয়ার বাইরে। আর যদি সত্যিই তা ধরা যেত তা হলে জীবনের আর কোনো অর্থ থাকত না। মহাবস্তু প্রত্যেকটি পৃথক বস্তু-সত্তায় প্রকাশিত, মহা সত্যও প্রত্যেকটি ব্যক্তির আংশিক দেখা মিলিয়ে তবে সার্থক। এর বাইরে সত্য থাকতেও পারে, নাও পারে। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধ সত্যটি আমার খুব পছন্দ। আমাদের প্রত্যেকের আংশিক দেখার ভিতর দিয়েই সর্বসত্য দেখার চোখ তৃপ্ত হচ্ছে।

অতএব কিছু ঝ্যাপ্তাল প্রকাশ করলেই পূর্ণ সত্য প্রকট হল, এ আমার ধারণার বাইরে। আমি তাই ও পথে যাই নি।—অর্থাৎ জীবনী লেখার পথে।

আমি এঁকেছি স্মৃতি ছবি। অনেক বিচ্ছিন্ন টুকরোর ছবি। এবং এরই মধ্যে যতটা সম্ভব ঝ্যাপ্তাল প্রচার করেছি। যথেষ্ট ছায়া না থাকলে কি আর ছবি হয়?

পুরাতনকে মনে আনা বা Reminiscence সম্পর্কে আরিষ্টটল একটি উৎকৃষ্ট কথা বলেছেন। তাঁর মতে আমাদের এ জন্মের জ্ঞান সবই পূর্বজন্মের উপলব্ধ সত্যের স্মৃতি মাত্র।

খুবই বড় কথা। আমি এ কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি। তবে পূর্বজন্মটি দৈহিক নয়, মানসিক, বা চেতনাসঞ্জাত। জ্ঞান হবার পর থেকেই তো বুঝতে বুঝতে চলেছি এই জন্মান্তরের রহস্য। কত নতুন নতুন জন্ম পার হয়ে এলাম। এটি এই জন্মেরই ব্যাপার। "এই জনমে ঘটালে মোর জন্ম-জনমান্তর"—কত সত্য কথা। এর পর যখন আমার চেতনা আর থাকবে না, তখন আমার কাল ও আমি ভবিষ্যৎ কালের মধ্যে ছড়িয়ে থাকব। স্মৃতিচিত্রণের মধ্যে আংশিক আমি ও আমার কালকে রেখে গেলাম। এর কি দাম আমার কাছে উদ্‌ঘাটিত নয়। লিখতে ভাল লাগল এইখানেই এর আপাত সার্থকতা। পরে হয় তো এ সমস্তকে ছাপিয়ে এ থেকে কোনো একটি দিনের কোনো একটি ছবি আরও স্পষ্ট ফুটে উঠবে কারো কাছে।

সবই দেখা জিনিসের ছবি। আমার কালে আমি কি উপলব্ধি করেছি তা এতে নেই। পুনশ্চতে সেই কথাটাই বলতে চেষ্টা করব, যদিও বলবার ইচ্ছে ছিল না।

যে কালটা পার হয়ে এলাম—সেটি একটি বিরাট কাল। এই কালের মধ্যে একটি হ্যালির ধূমকেতু, একটি মাত্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও দুটি বিশ্বযুদ্ধ দেখেছি। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে কথার অস্ত্রে, গায়ে হাত তোলার পালা আসবে অল্পদিনের মধ্যেই। অতএব দ্বিতীয়বার হ্যালির ধূমকেতু ও দ্বিতীয় রবীন্দ্রনাথ দর্শন যদিও আমার পক্ষে অসম্ভব, তৃতীয়বারের বিশ্বযুদ্ধ দেখার সম্ভাবনাটা রয়ে গেল।

মানুষ যে আজও বেঁচে আছে সে কেবল প্রকৃতিদত্ত বেঁচে থাকার তাগিদে। কি বিরাট সম্পদ-অপব্যয়, কি ব্যাপক নরহত্যা এক একটা যুদ্ধে, তবু তো যুদ্ধ থামে না। মানুষ জীবন-যুদ্ধে ভেঙে পড়তে পড়তেও বাঁচার তাগিদে যেমন উঠে দাঁড়াতে চায়, তেমনি এক একটা যুদ্ধে ব্যাপক বিভীষিকা থেকে উঠে দাঁড়িয়েই আবার যুদ্ধ করতে চায়।

এই হল মানুষের চরিত্রের একটা বড় ঝ্যাপ্তালের দিক। এরই মধ্যে আবার শান্তিপ্রিয় মানুষ নামক ছোট একটা দল আছে, (মতান্তরে, এই দলটাই বড়) কিন্তু যুদ্ধ থামাবার ক্ষমতা তার নেই। এই দলের লোকেরা অবশ্য ভাল ভাল কথা বলতে পারেন, এবং যুদ্ধবিশ্বাসীরা তাঁদের কথায় খুব প্রশংসা করেন, অনেক সময় পুরস্কারও দেওয়া হয়, কিন্তু শান্তি সত্যিই যদি কেউ আনতে চান তবে তাঁকে বাধা দেওয়া হয়, আন্তর্জাতিক পুরস্কারদাতাদের পাল্লায় পড়ে ভারতবর্ষ এ কথা আজ হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছে।

যুদ্ধ বন্ধ বা বিষাক্ত অস্ত্র বন্ধের পক্ষে বারট্রাণ্ড রাসেল কতকাল ধ'রে ভাল ভাল কথা বলছেন, বারনার্ড শ' যুদ্ধবাজদের নিয়ে এত বিদ্রূপ করেছেন, এবং তার জন্য দু'জনে কি প্রশংসাই না পেয়েছেন, কিন্তু প্রশংসাকারীরা সেই সঙ্গে যুদ্ধ এবং যুদ্ধাস্ত্র তৈরিতে আরও বেশি মনোযোগ দিয়েছেন। যীশু খৃষ্ট নামক এক নিরীহ ভদ্রলোক ছিলেন অহিংসধর্মী। বহু বাধা বিপত্তি সহ্য করেও, কোটি কোটি লোক তাঁর ধর্মে দীক্ষিত হলেন কিন্তু তাঁরাই এখন সংঘবদ্ধ ভাবে হিংসার অস্ত্রে শাণ দিচ্ছেন। অন্যবিশ্বের সব দেশের অবস্থাই প্রায় এক, কারণ মানুষ সর্বত্রই এক। এই মানুষ কোনো দিন এক সঙ্গে শান্তি চাইবে না, কারণ শান্তি একটি মরীচিকা, যা শুধু চরম বিপদে পড়লেই মানুষ চায়।

কবি, দার্শনিক, বিজ্ঞানী, প্রচার করেন বটে মানুষ এই পৃথিবীতে অবশ্য একদিন স্বর্গ রচনা করবে, কিন্তু তা হওয়া অসম্ভব। যারা নিরীহ মানুষের মাথায় বোমা ফেলছে তারাও বিশ্বাস করে তারা পৃথিবীতে স্বর্গ নামিয়ে আনছে।

আমি এই মোহ থেকে মুক্ত আছি ব'লে মনে করি। মানুষ পৃথিবীতে কোনো দিন স্বর্গ রচনা করবে এ কথার মতো বিভ্রান্তিকর কথা আমার কাছে আর কিছু নেই। অবশ্য স্বর্গ মানে যদি আনন্দময় শান্তিময় একটি মধুর পরিবেশ হয়, তবে তা রচনা চলছে প্রতি মুহূর্তে। মানুষ গভীর দুঃখের মধ্যেও ক্ষণে ক্ষণে সে-স্বর্গের আভাস পায়। মানুষ কোনো অপ্রত্যাশিত মুহূর্তে হঠাৎ আনন্দে যখন নিজেকে হারিয়ে ফেলে তখন সেই হঠাৎ আনন্দের মুহূর্তে তার চেতনায় স্বর্গ নেমে আসে। এর বাইরে কোথাও স্বর্গ নেই।

একটানা অতি বিস্তীর্ণ স্বর্গসুখ নামক কোনো সুখ কোথাও নেই, এমন কি স্বর্গেও নেই! একটানা সুখ বা একটানা আলো বা অন্ধকার এর কোনোটাই বাস্তব নয়। সমস্ত মানুষের ইতিহাস পড়লেই জানা যাবে মানুষের সমাজ কোনো ব্যাপক কাল জুড়ে সুখে থাকে নি। কারণ এমন সুখই শাস্তি, তাই এমন সুখের অবস্থা এলে, তা থেকে মুক্ত হবার জন্যই সে সুখ-বিরোধী হতে বাধ্য।

রবীন্দ্রনাথ প্রথম যুদ্ধের বিভীষিকার মধ্যেও মানুষের সদ্‌বুদ্ধির জয়ে তাঁর অদম্য বিশ্বাস থেকে একটা বড় প্রশ্ন তুলেছিলেন—

"মানুষ চূর্ণিল যবে নিজ মর্ত্য সীমা
তখন দিবে না দেখা দেবতার অমর মহিমা?"

(১১১৫)

দেবতার মহিমা দেখা দিয়েছিল ঠিক, কিন্তু খুব বেশি দিনের জন্য নয়। কারণ কোনো ভালই বেশি দিন টিকতে পারে না। তাই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আভাসে তিনি অনেকটা মোহমুক্ত। তিনি মানুষ পশুকে বিদ্রূপ ক'রেও, শেষ পর্যন্ত বলেছেন—

দ্যূতচ্ছলে দানবের মূঢ় অপব্যয়
গ্রন্থিতে পারে না কভু ইতিবৃত্তে শাশ্বত অধ্যায়।

(১১৩৮)

কিন্তু শাশ্বত ইতিহাস গড়ায় মানুষের গরজ নেই, তাই এ অভিশাপ বর্ষণ বৃথা হল। মানুষ মর্ত্য সীমা বার বার চূর্ণ করেছে, কিন্তু তা স্বর্গ রচনার জন্য অবশ্যই নয়। আধুনিক কালে সেটি হয়েছে ভিন্ন মহাদেশে অস্ত্রনিক্ষেপের উদ্দেশ্যে।

স্বর্গ গড়বে ব'লে মানুষ কি আজ থেকে চেষ্টা করছে? সকল পৃথিবীর সকল কালের সকল চিন্তানায়ক ও মনীষী সমবেত ভাবে

তাঁদের শ্রেষ্ঠ যুক্তি এবং আন্তরিক প্রস্তাব দিয়ে এ চেষ্টা করেছেন, কিন্তু হাজার হাজার বছরের চেষ্টাতেও অদ্যাবধি পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ ন্যূনতম খাওয়া পরা এবং বাসস্থান পায়নি। বিজ্ঞানের উন্নতি হয়েছে, কিন্তু মানুষের দুর্দশা কমেনি। তবে আর স্বর্গরাজ্য গড়ার মিথ্যা কল্পনা কেন? কল্পনা মিথ্যা নয়, কারণ একটা আদর্শ না থাকলে মানুষের চক্ষুলজ্জা হয়, উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে এগিয়ে চলার জোর পাওয়া যায় না।

স্বর্গ গড়া কোনো দিনই হবে না মানুষ চিরদিন মানুষই থাকবে। ন্যূনতম খাওয়া পরা এবং বাসস্থান যদি স্বর্গ হয় তবে তার জন্য চেষ্টা চলতে থাকবে এবং চলাই উচিত। চেষ্টা করতে করতে এক একটা জাতি হয় তো এ স্বর্গ পেয়ে যেতেও পারে, কিন্তু সকল পৃথিবীর লোক একসঙ্গে কখনো পাবে না। পাবে না এরই জন্য যে সকল পৃথিবীর লোককে এক সঙ্গে এক মন্ত্রে দীক্ষিত করা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। এক দলের মতে খাওয়া যত সত্য আর এক দলের মতে খাওয়া তত মিথ্যা। অবশ্য মতের পক্ষান্তর ঘটতে দেরি হয় না।

তবু সবাইকে এক মতে দীক্ষিত করার চেষ্টা চলবে। পরমাণু বোমা সহায়। যার পরমাণুর ষ্টক-পাইল এবং অস্ত্রক্ষেপণ ক্ষমতা যত বেশি, তার গুরুগিরি করার সম্ভাবনাও তত বেশি। অবশ্য অল্প দিনের জন্য, তারপর দীক্ষিতেরা বিদ্রোহ করবে, গুরুমারা বিদ্যা শিখবে, এবং মারতে আরম্ভও করবে।

চক্রবৎ চলছে এবং চলবে। এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ যে কোনো ভালই বেশি দিন টিকলে তা আর ভাল থাকে না। যদি স্থায়ী ভাল কিছু করা হয়ে থাকে হবে তা হচ্ছে মোটামুটি ভাবে আইন মানাবার চেষ্টা এবং জেলখানার বাইরে অধিকাংশ লোককে ছেড়ে রেখেও সাধারণ জীবন চালিয়ে যাওয়া। অবশ্য পথের মোড়ে মোড়ে একটি ক'রে পুলিস এবং মাইলখানেক পর পর একটি ক'রে থানাও আছে।

আমি শহরের কথাই বলছি। এখানে এক জন ট্যাক্সি ড্রাইভার যাত্রীর ভুলে-ফেলে-যাওয়া ব্যাগ বা বাক্স, যাত্রীকে ফিরিয়ে দিলে আমরা উৎসব করি, একজন পুলিস তার কর্তব্য পালন করলে তাকে নিয়ে নাচি। মাঝে মাঝে এ রকম সততার দৃষ্টান্ত দু'-একটা মেলে। কিন্তু তা কারো নীতিশিক্ষার ফলে নয়, কারো পুরস্কারের লোভে নয়, কারো ভয়েও নয়। দু' চারটি মানুষ সংসারে আপনা থেকেই সৎ আছে। দশ বারো হাজার বছরের বা আরো বেশি কালব্যাপী সভ্যতার ইতিহাসে এটি খুব প্রশংসার বিষয় কি? স্বর্গরাজ্যের প্রতিশ্রুতি এতে কি খুব জোরালো শোনায়?

এমনি যখন অবস্থা, তখন কোন্ মতবাদ ভাল, তা নিয়ে তর্ক করা নিষ্ফল। আমি স্থায়ী স্বর্গ গড়ার দাপ্ত থেকে দূরে সরে আছি, তাই মতবাদ নিয়ে আমার ঝগড়া নেই। ঝগড়া নেই, কারণ ওতে লাভ নেই। তর্ক করা স্পোর্ট মাত্র, কাউকে বোঝাবার জন্য নয়, বোঝাতে হলে অস্ত্র চাই। যুক্তিশাস্ত্র শুধু পরীক্ষা পাসের কাজে লাগে। মানুষ সর্বত্র পরস্পর বিরোধী অভ্যাসের দাস। ঘরে বসে কথার সাহায্যে সে যুক্তি-শাস্ত্রের উপকারিতা দেখাতে পারে, কিন্তু কাজে নামলে নিজের যুক্তি নিজেরই কাছে অচল হয়। অনেক বিষয়ে মত না মিললেও তাই শোপেনহাউয়েরের সঙ্গে এ বিষয়ে আমি একমত। তিনি বলেছেন, কাউকে সমস্ত শক্তি দিয়ে কিছু বোঝাবার চেষ্টা কর, শেষ পর্যন্ত দেখবে সে বোঝেনি। লজিকের সাহায্যে কেউ কাউকে কখনো কিছু বোঝাতে পারেনি, এমন কি লজিশিয়ানরাও লজিক ব্যবহার করেন কিছু উপার্জনের জন্য।

সবই অবশ্য খানিকটা দূর পর্যন্ত চলে। মানুষের চরিত্রের অন্তর্নিহিত বর্বরতা, পুলিসের ভয়ে বা মৃত্যুভয়ে কিছু চেপে রাখা সম্ভব, যদিও সব ক্ষেত্রে পারা যায় না। এই দুটি ভয় না থাকলে লজিক বিক্রি হত না।

মানুষের চরিত্রের এ ব্যাপার মেনে নিতেই হবে। একে সর্বদা বাড়িয়ে দেখার দরকার নেই। এর বাইরে আমরা কি সেই আমাদের বড় পরিচয়। মাঝে মাঝে আমরা শিক্ষা সংস্কৃতির মুখোশ পরি, সেইটি আমাদের দুর্লভ পরিচয়। এই পরিচয়েই বৈচিত্র্য সৃষ্টি সম্ভব। পশু পরিচয়ে বৈচিত্র্য নেই, সব এক। সবারই চরিত্রের তাই ঐ দুর্লভ দিকটিই ভাল লাগে এবং তারই স্মৃতি আমি লিখেছি। সত্য নিয়ে আমার কোনো পরীক্ষা নেই, কারণ সত্য কথাটি আমার কাছে স্পষ্ট নয়।

আমি একাধিক বার বলেছি আমি মধ্যপন্থাশ্রয়ী। রাজপথ থেকে একটু দূরে আছি। একদা এক অপরিচিতা মহিলাকে একটি অটোগ্রাফ দিয়েছিলাম একটি ছড়া সহযোগে। সেইটি সামান্য একটু পরিবর্তিত আকারে এখানে উদ্ধৃত ক'রে আমার কথাটি শেষ করি। এতে আমার কথাটা সম্ভবতঃ স্পষ্টতর:

হীরে হ'লে অঙ্গ ঘিরে জ্বলত জ্যোতি,
হীরো হ'লেও হ'ত রে ভাই, কিছু গতি।
হীরেও নহি হীরোও নহি—ধুলায় পড়ি
আঁধার আলোর মাঝেতে যাই গড়াগড়ি।
অনেক ভেবে ধরেছি ভাই মধ্যপন্থা,
লজ্জা নেই যে গাত্রে বহি জীর্ণ কন্থা।

দেখেছি যে বড় হওয়ার অনেক ঠেলা,
তাই কুড়িয়ে বেড়াই সবার অবহেলা।
লক্ষ কোটি জলের ফোঁটায় গড়া সিন্ধু,
তারই মাঝে লুকিয়ে আছি একটি বিন্দু।
আড়াল থেকে এড়াতে চাই সবার নজর,
ভাগ্য নিয়ে করিনে ভাই গজর গজর।
ধন্য তবু পেলাম যা তার তুলনা নাই,
সান্ত্বনা এই বাড়া ভাতে পড়েনি ছাই।
জন্ম জন্ম জানি হেথাই আসব ফিরে,
ভাবি না তাই কি ঠকাটাই ঠকেছি রে।

সমাপ্ত

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে লিখিত বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্রের পত্রাবলী

C/o M/s. Henry S. King & Co.,
65, Cornhill E. C.,
London
23rd Jan. 1902.

বন্ধু,

ইতিমধ্যে তোমার দু'খানা চিঠি পাইয়াছি। আমিও আমার চিঠি ও lecture পাঠাইয়াছিলাম, পাইয়া থাকিবে। তোমার পত্রের জন্য সর্ব্বদা উৎসুক থাকি। তুমি যে আশ্রমের জন্য কার্য্য করিতেছে তাহা হইতে অনেক আশা করি। মানুষ গঠন করিতে যদি পার তাহা হইলে আমাদের অনেক দুর্গতি দূর হইবে। তবে তোমার লেখা সর্ব্বদা দেখিতে চাই। অনেক কাল তোমার স্বর শুনিতে পাই না। আমি বড় শ্রান্ত। গত তিন মাস যাবৎ একখানা পুস্তক লিখিতেছিলাম—মনে করি নাই এত বড় হইবে। ইহার জন্য অত্যন্ত পরিশ্রম করিতে হইতেছে। সেই সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেক অত্যাশ্চর্য্য আবিষ্ক্রিয়া হইতেছে। আমি কি করিয়া সে সব ভাষায় প্রকাশ করিব তাহা ভাবিয়া পাই না। আমার পুস্তকে প্রতি ছত্রে সম্পূর্ণ নূতন বিষয় থাকিবে। বিষয়ও বহুপ্রসারী হইয়া পড়িতেছে। আশা করিয়াছিলাম তুমি আসিবে। আমি একাকী বড় বিষণ্ণ থাকি। তুমি সর্ব্বদা পত্র লিখিও।

লোকেনের সুসংবাদ শুনিয়াছ, তাহার মুখে আর হাসি ধরে না। বিবাহ সম্বন্ধে তাহার বক্তৃতা তোমার স্মরণ আছে। এখন সে সব কথা উল্টাইয়া বলে আমরা তাহার ভাব বুঝিতে পারি নাই। তাহার সুব্যবস্থা দেখিয়া সুখী হইয়াছি।

আমার ছোট বন্ধুটিকে আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জানাইও। তোমার জামাতার সহিত একদিন দেখা হইয়াছিল, বেশ ভালো লাগিয়াছিল। আবার আসিতে বলিব। তোমার সহধর্ম্মিণীকে আমার সম্ভাষণ জানাইও।

তোমার
জগদীশ

C/o M/s. Henry S. King & Co.,
65, Cornhill E. C.,
12-2-1902.

বন্ধু,

অনেক কাল তোমার পত্রের জন্য অপেক্ষা করিয়া নিরাশ হইয়াছি। ভুলিয়া গিয়াছ কি? তা নয়, জানি। তুমি হয়তো মনে করিতে পার না যে, তোমাদের চিঠি পাইলে কত খুশী হই। এখানে কার্যভারে ক্লান্ত, তার পর আরও কত বাধা তাহা মনে করিতে পার না। কয়েক জন বিখ্যাতনামা Physiologists এর থিওরি বোধ হয় আর টেকে না, সুতরাং তাহারা বদ্ধপরিকর হইয়া বাধা দিবেন। কিন্তু তোমাকে নিশ্চয় বলিতেছি তাহাদের বালির বাঁধন টিকিবে না। তবে সময় চাই। আমার একখানা পুস্তক প্রায় শেষ হইয়াছে। আমার পূর্ব্ব-কার্য্য সম্বন্ধেও বৈজ্ঞানিক পত্রে বিশেষ প্রশংসা হইতেছে—সর্ব্বপ্রধান আমেরিকান Engineering কাগজে Leader এ—

A field of inquiry of most extra-ordinary interest has been opened by Dr. J. Chandra Bose ইত্যাদি তিন কলম।

এখন আরও যাহা যাহা নূতন পাইতেছি তাহাতে আমাকে নির্ব্বাক করিয়াছে। তাহা ভাষা দিয়া বর্ণনা করিতে পারি না।

অদৃশ্য মানবিক তরঙ্গের সংঘাত ও তজ্জনিত বিবিধ অদ্ভুত কাণ্ড সেই সংগ্রামের autographic ইতিহাস। আমি আর কি বলিব, আমি এ জীবনে কিছু শেষ করিতে পারিব না।

বন্ধু, আমি এতদিনে আমাদের জাতীয় মঙ্গল বুঝিতে পারিতেছি, স্বদেশীর আত্মম্ভরী ও বিদেশীর নিন্দুকের কথায় চক্ষে আবরণ পড়িয়াছিল। এখন তাহা ছিন্ন হইয়াছে—এখন উন্মুক্ত চক্ষে যাহা প্রকৃত তাহাই দেখিতেছি। অঙ্কুরিত বীজের উপর পাথর চাপা দিলে প্রস্তর চূর্ণীকৃত হয়। সত্য ও জ্ঞানকে কেহ পরাভব করিতে পারিবে না।

তুমি মানুষ প্রস্তুত কর। জীবনে সেই পুরাকালের লক্ষ্য অঙ্কিত করিয়া দাও। আমাকে যদি শত বার জন্মগ্রহণ করিতে হইত, তাহা হইলে প্রত্যেক বার হিন্দুস্থানে জন্মগ্রহণ করিতাম।

ভাল কথা, 'হিন্দুস্থান' গানটি চিরকাল থাকিবে।

সুরেন যে remittance পাঠাইয়াছে তাহা পাইয়াছি, কি করিব বলিও।

তোমার জামাতাকে আমার বেশ ভালো লাগিয়াছে। বিনয়ী ও বুদ্ধিমান। সর্ব্বদা আসিতে অনুরোধ করিয়াছি।

দেখ আমার ছোট বন্ধুটিকে আমি ফিরিয়া না আসা পর্য্যন্ত হস্তান্তর করিও না।

তোমার নূতন লেখা পড়িবার জন্য ব্যস্ত আছি। বঙ্গদর্শন পাই না। মাঝে মাঝে তোমার পত্র পুনঃপুনঃ পড়ি আর দু' একখানা কবিতার পুস্তক আছে তাহা পড়ি। কিন্তু যেগুলি সঙ্গে নাই তাহা পড়িবার জন্য সর্ব্বদা ইচ্ছা হয়।

সর্ব্বদা পত্র লিখিও।

তোমার
জগদীশ

1, Birch Grove, Acton
London W.
21st March, 1902 (?)

বন্ধু,

তোমার পত্র পাইয়া আমি মুহূর্তের জন্য এখানকার সংগ্রামক্ষেত্র হইতে তোমার শান্তিময় আশ্রমে উপস্থিত হইলাম। অনেক কালের জন্য গভীর শান্তিতে হৃদয় পূর্ণ হইল। আমার সমস্ত হৃদয় মন তোমাদের সহিত মিলিত হইবার জন্য আকুল। তুমি যাহা করিতেছ তাহাই শ্রেষ্ঠ। এ বিষয়ে আগামী বারে অনেক লিখিব। আজ আমার কর্ণে এখনও রণক্ষেত্রের দুন্দুভি বাজিতেছে, কারণ এই মাত্র আমি সংগ্রাম হইতে ফিরিয়া আসিয়াছি। তুমি আমার জয় সংবাদে সুখী হইবে।

তোমরা চিন্তিত হইবে বলিয়া আমি এখানকার সব কথা খুলিয়া লিখি নাই। ইয়োরোপের একজন প্রধান Physiologyতে অগ্রণী, Burden Sanderson এর নাম শুনিয়াছ। Sanderson এবং Waller এই দুই জন Physiologyর উচ্চ সিংহাসন অনেক কাল যাবৎ নির্বিবাদে অধিকার করিয়াছিলেন।

আমি Royal Societyতে যখন বক্তৃতা করি, তাহাকে দেখাই যে যদি নির্জীব ও জন্তুর responsiveness এর একই আধার হয় তাহা হইলে মধ্যবর্তী উদ্ভিদের responseও একই রকম হইবে। তাহাতে Burden Sanderson উঠিয়া বলিলেন, আমি উদ্ভিদ সম্বন্ধে সমস্ত জীবন অনুসন্ধান করিয়াছি, কেবল লজ্জাবতী লতা সাড়া দেয় কিন্তু that ordinary plants should give electrical response is simply impossible. It cannot be. আরও বলিলেন Prof. Bose has applied physiological terms in describing his physical effects on metals. Though his paper is printed yet we hope he will revise it and use physical terms and not use our physiological expressions in describing phenomena of dead matter.

তাহার উত্তরে আমি বলিয়াছিলাম Scientific terms কাহারও একচেটিয়া সম্পত্তি নহে, আর এই সব Phenomena 'এক', সুতরাং আমি একের মধ্যে বহুত্ব প্রচারের বিরোধী।

ফল হইল যে আমার সেই Paper প্রকাশ বন্ধ হইল। কয় জন Physiologists এর প্রাণপণ চেষ্টায় Conspiracy! Bravo of silence হইল। কারণ আমার এই থিয়োরী স্থির হইলে উচ্চ বৈজ্ঞানিকদের theory একেবারে চূর্ণ হইয়া যায়। তাঁহারা মনে করিলেন, আমার দেশে ফিরিয়া যাইবার সময় নিকটবর্তী; একবার আমি সমুদ্র পার হইলে বিপদ কাটিয়া যাইবে।

তখন তোমাদের উৎসাহে এখানে থাকা স্থির করিলাম। কিন্তু কি করিয়া আমার experiment প্রকাশ করিব তাহা স্থির করিতে পারিতেছিলাম না। এ বিষয়ে একেবারে নিরাশ হইয়াছিলাম। কারণ—Whom are we to believe Physiologists who have grown grey in working out their special subjects or a young physicist who comes all of a sudden to upset all our convictions? সাধারণের মত এইরূপ ছিল।

ইতিমধ্যে Linnean Societyর President Prof. Vines এর সহিত আমার দৈবক্রমে দেখা হয়। ইনি আধুনিক Vegetable Physiologist এর মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। Linnean Society, Biology সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রধান Society Prof. Vines একদিন Prof. Hornes (successor of Huxley at the Royal College of Science) কে সঙ্গে করিয়া আমার experiment দেখিতে আসেন। তাঁহারা এই সব দেখিয়া কিরূপ চমৎকৃত হইয়াছিলেন তাহা বলিতে পারি না। Prof. Hornes পুনঃ পুনঃ বলিতেছিলেন, I wish Huxley had been living now, he would have found the dream of his life fulfilled.

তাহার পর Vines, as President of Linnean Society আমাকে উক্ত সভায় বক্তৃতা করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করেন।

সমবেত Physiologist-Biologist প্রমুখ বৈজ্ঞানিকমণ্ডলী, তাহার মধ্যে তোমার বন্ধু একাকী এই প্রতিপক্ষকুলের সহিত সংগ্রামে নিযুক্ত। ১৫ মিনিটের মধ্যেই বুঝিতে পারিলাম যে রণে জয় হইয়াছে। Bravo! Bravo! ইত্যাদি অনেক উৎসাহবাক্য শুনিলাম। বক্তৃতার পর President তিনবার উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বিরুদ্ধে কাহারও কিছু বলিবার আছে কি? একেবারে নিরুত্তর। তাহার পর Prof. Hartog উঠিয়া বলিলেন যে, we have, nothing but admiration for this wonderful piece of works. Presidentও অনেক সাধুবাদ করিলেন।

সুতরাং এতদিন পর আমার এই প্রথম সংগ্রামে কৃতকার্য্য হইয়াছি। আরও এখন অনেক করিবার আছে। আমি কি করিব বুঝিতে পারি না। আমি একান্ত শ্রান্ত, এবং আমার সমস্ত মন এখন নির্জ্জনে যাইবার জন্য ব্যাকুল।

কিন্তু আমি যে অগ্নি জ্বালাইয়াছি তাহার ইন্ধন আরও অনেক দিন যোগাইতে হইবে।

তুমি মহারাজকে আমার এই সংবাদ জানাইও। তোমরা যদি এখানে থাকিবার উপায় না করিতে—তাহা হইলে আমাকে নিষ্ফল-প্রয়াস হইয়া ফিরিয়া আসিতে হইত।

বন্ধু আমার পরিপূর্ণ হৃদয়ের ভালবাসা প্রেরণ করিতেছি।

তোমাদের জগদীশ

তোমার জন্য John Chinaman পাঠাইতেছি। আমরা স্বর্ণ ফেলিয়া ইয়োরোপীয় ভস্ম লেপন করিতেছি।

Hotel Observatorie,
Paris

বন্ধু, ৪ঠা এপ্রিল ১৯০২

তুমি যাত্রাকালে তোমার ব্রাহ্মণীর গাঁটরী, বোঁচকা ইত্যাদির কথা লইয়া পরিহাস কর। আমার প্যারিস আগমনকালে যদি দুরবস্থা দেখিতে, নানাবিধ কমণ্ডলুর দল, কেহ হস্তে, কেহ পৃষ্ঠে লইয়া সমস্তক্ষণ নিশ্বাস রোধ করিয়া এই ১ ঘণ্টা কাটাইয়াছি। সহযাত্রীদের বহু গঞ্জনা সহ্য করিয়াছি।

এখানে ৪ স্থানে বক্তৃতার জন্য আহূত হইয়াছি। গত রাত্রে এক বড় বৈজ্ঞানিক সভায় dinnerএ Principal guest ছিলাম। সেখানে অনেক বড় বড় লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে। তাঁহারা আমার এই নূতন ব্যাপার দেখিবার জন্য উৎসুক।

কল পরে জানাইব। তোমার বন্ধুতা আমাকে সর্ব্বদা সজীব করে। সন্ধ্যার পর ক্লান্তি তোমার আশ্রমের কথা মনে করিয়া ভুলিয়া যাই। কবে আসিয়া তোমাদের সহিত মিলিত হইব তাহার জন্ত প্রতীক্ষা করিতেছি। তোমার জগদীশ

বন্ধু, পারিস, ৮ই এপ্রিল ১৯০২

সারাদিন ঝঞ্চাট, দু'দণ্ড তোমার সহিত আলাপ করিবার সময় পাই না। সন্ধ্যার পর বাহিরের আঁধারের সহিত অন্তরের আলো জলিয়া উঠে। তখন আমি জন্মভূমির কোলে স্থান পাই।

ছেলেবেলায় ইংরাজী শিক্ষার সহিত যে পাক পড়িয়াছিল একদিনে তাহা আস্তে আস্তে খুলিয়াছে এখন স্বপ্রকৃতিস্থ হইয়া সব দেখিতে পারিতেছি। পশ্চিমের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া সব দেখিতে পাইয়া অনেক মোহ দূর হইয়াছে। তবে, পরের দোষ দেখিয়া আমাদের কি লাভ? কি করিয়া আমরা বিলাসের পথ হইতে উদ্ধার পাইব।

সচরাচর শুনিতে পাই, হিন্দু স্বভাবতঃই সংসারবিমুখ জীবনের সংগ্রাম হইতে পলাতক। এ কথা কি ঠিক? হিন্দুরা কি সমস্ত জীবন শক্তি দিয়া অভীষ্টের অনুসন্ধান করে নাই? এত জ্ঞান আহরণ কি বিনা চেষ্টায় হইয়াছে? শঙ্করাচার্য্যের বিজয় যাত্রা কোন অংশে যুদ্ধযাত্রা অপেক্ষা কম? এরূপ শারীরিক ও মানসিক শক্তির চরম প্রয়োগ এ কালে কি দেখা যায়?

তবে হিন্দু চিরকাল আসক্তিহীন, "আমি" কেহই নই, "যিনি আমাকে চালাইতেছেন তিনিই সব।"

তিনি বিশ্বকর্ম্মারূপে আমাদের হৃদয়মন পরাস্ত করিয়াছেন। আবার সখারূপে অতি সন্নিকটে। যিনি আমাদিগকে প্রেমপাশে বাঁধিয়াছেন তাঁহার চরণে প্রতি মুহূর্তে আত্মবলি দিতে হৃদয় উৎসুক। সুখের দিনে কিছু জানাইতে পারি না। কিন্তু দুঃখের দিনে একই জানাইতে পারি। তিনি আমাদিগকে যেখানে রাখিয়াছেন, দাস সে স্থানেই থাকিবে, সমস্ত কলঙ্ক বহন করিবে, সমস্ত নিষ্ফলতার মধ্যে সমস্ত চেষ্টা নিবেদন করিবে। আমাদের শক্তিই বা কি, কিন্তু কোটি কোটি ক্ষুদ্র প্রবাল-পঞ্জরে মহাদেশ গঠিত হইয়াছে। এই তো আমাদের একমাত্র আশা। যে মৃত্তিকাতে আমাদের শরীর গঠিত হইয়াছে সেই জন্মভূমির জন্ত আমাদের দেহ-মন পর্য্যবসিত হয় ইহা ব্যতীত ত আর আমাদের করিবার কিছু নাই।

তোমার আশ্রমের কুমারগণ যেন আমাদের চিরন্তন এই নিরাসক্তি লইয়া জীবনে প্রবেশ করিতে পারে। সংসারে যাইয়া যেন এই ভাব লইয়া সমস্ত প্রাণ-মন দিয়া নিয়োজিত কার্য্য করিতে পারে। তারপর জীবনের সন্ধ্যায় পুনরায় আশ্রমে ফিরিয়া আসিবে।

লণ্ডন

আমি লণ্ডনে ফিরিয়া আসিয়াছি। আমার তিন জায়গায় বক্তৃতা ছিল, সকল স্থানেই বক্তৃতা সুসম্পন্ন হইয়াছে। সকলে অতিশয় আশ্চর্য্য হইয়াছেন, এবং আরও জানিবার আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। এত বড় বিষয়টা ২।৪ দিনে সম্পূর্ণরূপ প্রকাশ ও প্রচার করিবার আশা করি না। তবে Germany হইতে যাইবার জন্ত অনুরোধ আসিয়াছে।

তুমি মনে কর যে আমি সর্ব্বদাই কর্ম্মসাধনে উন্মুখ। তুমি যদি জানিতে যে প্রতি মুহূর্ত্তে আমাকে নিজের সহিত কত সংগ্রাম করিতে হয়। আমার মন সর্ব্বদা ছুটিয়া যাইতে চাহে, এই অবিরাম যুঝিয়া আমি ক্লান্ত হইয়াছি। স্বভাবের ক্রোড়ে, যেখানে সমস্ত নিস্তব্ধ, সমস্ত শান্তিময়, যেখানে মন ছুটিয়া যায়। তোমরা যদি নিরাশ্বাস হও তবে আমি একা যুঝিয়া কি করিব? আমি সম্মুখে বড় বিভীষিকা দেখিতেছি। আমেরিকানরা এদেশে আসিয়া সমস্ত বাণিজ্য manufacture ইত্যাদি কাড়িয়া লইতেছে। এ দেশের তাড়িত লোকের ধাক্কা আমাদের উপর পড়িবে। যদি একে একে উপায় পরহস্তগত হয়, তাহা হইলে নির্ম্মূল হইবার বেশী দেরী নাই। কি করিয়া পরমুখাপেক্ষী না হইয়া লোকে স্বাধীন উপায় অবলম্বন করিতে পারে তাহা ভাবিয়া দেখিও। জাপানের সমৃদ্ধি কেন বাড়িতেছে? আমি তো উক্ত দেশের অনেককে দেখিয়াছি। আমি তোমাকে নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি যে আমাদের দেশে অন্ত দেশের সহিত তুলনা করিলে তপস্বীর অভাব দেখা যাইবে না। আমাদের কি ভবিষ্যতে কিছুই আশা নাই? চিরকালই কি মাথা নোয়াইয়া থাকিতে হইবে? এককাল কথা ছিল যে ভারতে বিজ্ঞান অসম্ভব—এখন কথা হইবে দৈবাৎ এক-আধটা instance ধর্ত্তব্য নয়। এমন কি Prof. Ramsay আমাকে বলিলেন, Your case is an exception, one swallow does not make a summer.

অবশ্য ইচ্ছা করিলে এ সমস্ত ভুলিয়া থাকা যায়। একটা জীবন বই ত নয়, আর কত দিনই বা। এ সংসারের শেষ হইলে কি মায়া যায়? এই একটা স্থানবিশেষের জন্ত মমতা হয় তো মায়া যায়।

তোমাকে আর কি লিখিব?

তোমার জামাতাকে দেখিয়া সুখী হইয়াছি। তাহাতে মনুষ্যত্ব আছে, তাহার দ্বারা তুমি সুখী হইবে। এখানকার ইঙ্গ-বঙ্গের হাওয়া যাহাকে স্পর্শ করে নাই। তোমার জগদীশ

বন্ধু, লণ্ডন, ১লা মে, ১৯০২

তোমার পত্রের প্রতীক্ষা করিয়াছিলাম, আজ পাইয়া বড় সুখী হইলাম। তোমার নিকট কত বিষয় বলিবার আছে, কিন্তু পত্রে কথা পরিস্ফুট হয় না। উৎসাহ কিম্বা অবসাদের সময়ে তোমাকে দেখিতে ইচ্ছা করে। অধিকাংশ সময়েই ত অবসাদ, সুতরাং তোমার সান্নিধ্য অনুভব করিতে ইচ্ছা হয়। সেদিন তোমার কতকগুলি কবিতা পড়িতেছিলাম, সেই শিলাইদহের প্রান্তরে, ও নদী, সেই আকাশ ও বালুর চর আমার চক্ষের সম্মুখে ভাসিতেছে। বলিতে পার কি, এই হৃদয়ের আকর্ষণের অর্থ কি? তোমার কি মনে হয় যে এই পৃথিবীর ছায়ার অন্তরালে আত্মা আত্মার সহিত অভিন্ন হইয়া যায়?

তুমি তো এত দিন নির্জ্জনে সাধনা করিয়াছ, বলিতে পার কি, কি করিলে সুখ-দুঃখের অতীত হইতে পারা যায়? এক দিন ভারতে সুদিন আসিবেই, কিন্তু এ কথা সর্ব্বদা মনে থাকে না। ইহা যে সত্য, এ কথা আমার মনে মুদ্রিত করিয়া দাও। একটা আশা না থাকিলে আমার শক্তি চলিয়া যায়।

বন্ধু, ৮ই মে

তুমি আমার নিকট উপস্থিত হও। আমি কি কষ্টের ভিতর দিয়া যাইতেছি, তুমি জানিবে না। তোমরা নিরাশ হইবে এ কথা

মনে করিয়া আমি এখানে কিরূপ বাধা পাইতেছি, তাহা জানাই নাই। তুমি মনেও করিতে পার না। এই যে Royal Societyতে গত বৎসর যে মাসে Plant Response সম্বন্ধে লিখিয়াছিলাম, তাহা Waller ও Sanderson চক্রান্ত করিয়া Publication বন্ধ করিয়া দিলেন। আমার সেই আবিষ্কার চুরি করিয়া Waller গত নভেম্বর মাসে এক কাগজে বাহির করিয়াছেন। আমি এত দিন জানিতাম না। আমার Linnean Societyর Paper ছাপা হইবার কথা যখন Councilএ উঠে, তখন Wallerএর বন্ধুরা তথায় আমার Paper বন্ধ করিতে চেষ্টা করেন—এই বলিয়া যে Waller গত নভেম্বরে এ কথা Publish করিয়াছেন। Councilএর কথা Confidential, সুতরাং এসব চক্রান্ত আমি জানিতাম না। আর Royal Societyর Paper বাহিরে প্রচার হয় নাই; সুতরাং প্রমাণাভাবও বটে। ভাগ্যক্রমে আমার Royal Institutionএর Lectureএ এ কথা ছিল, এবং দৈবক্রমে Linnean Societyর Secretaryর কাছে আমার উক্ত কাগজ ছিল। অনেক ঝগড়ার পর শুনিতে পাইতেছি যে, আমার কাগজ ছাপা হইবে।

President আমাকে লিখিয়াছেন, "...there are many queer things you have yet to learn. But I am glad that you now have had fair play." তাঁহার নিকট আরও অনেক কথা শুনিলাম। সে সব কথা বলিয়া আর কি হইবে? Ideal ভাঙ্গিয়া গেলে আর কি থাকে? এতদিন এ দেশের বিজ্ঞানসভায় অনেক বিশ্বাস করিয়াছি তাহা দূর করিয়া লাভ কি? অধিক দিন থাকিতে পারিলে আমি একাই ব্যূহ ভেদ করিতাম। কিন্তু আমার মন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। আমি একবার ক'দিন আসিয়া ভারতের মৃত্তিকা স্পর্শ করিয়া জীবন পাইতে চাই। তাহার পর যদি পুনরায় আসিতে পারি তবে ভবিষ্যতের কথা আর ভাবিব না। তোমার জগদীশ

লণ্ডন

৩০এ মে, ১৯০২

বন্ধু,

এতকাল কেবল কর্মসংবাদ লিখিয়াছি। একদিনও মন খুলিয়া চিঠি লিখিতে সময় পাই নাই। আজ আর সব কথা ভুলিয়া তোমার গৃহে অতিথি হইলাম। এক এক সময় মনে হয় দূর হউক, দুঃখের কথা, মানুষের হৃদয় বলিয়া ত একটা জিনিষ আছে। সন্ধ্যার পর তোমার ঘরে যেন বসিয়াছি। আমার ক্রোড়ে আমার ছোট বন্ধুটি বসিয়া আছে, অদূরে বন্ধুজায়া, আর তুমি তোমার লেখা পড়িয়া শুনাইতেছ। আমি তোমার লেখাগুলি পড়িতেছিলাম, তোমার স্বর যেন শুনিতে পাইতেছি। তুমি যে কালিদাসের সময়ের কথা লিখিয়াছ, মনে হয় যেন পূর্বজন্মের কথা শুনিতেছি! সে সব দিনের কথা স্মরণ করিয়া মন কেমন পুলকে বিহ্বল হয়। এরূপ মধুর স্মৃতি, এরূপ উজ্জ্বল সরল প্রেম, এরূপ কল্যাণ, অন্য কোন জাতিতে কি কখনও ছিল? তোমার আর একটি কথা আমার নিকট বড়ই ভালো লাগিয়াছে—সে কথা কল্যাণী তুমি ঠিকই বলিয়াছ, এ কথার অর্থ অন্য ভাষায় প্রকাশ পায় না।

তুমি নগর হইতে দূরে যে আশ্রম স্থাপন করিয়াছ, সেখানে কবে আসিতে পারিব মনে মনে কল্পনা করিতেছি। তারপর তোমার কল্পনার সাহায্যে সেই অতীত সুখের দিন ফিরিয়া আসিবে। আমার নিকট এই বর্তমান ত একেবারে অলীক দুঃস্বপ্ন বলিয়া মনে হয়। কল্পনারাজ্যেই আমাদের প্রকৃত জীবন।

তোমার এই নূতন স্থান কিরূপ মনে করিতে পারি না। আমার স্মৃতি শিলাইদহে আবদ্ধ। সেখানে কি ফিরিয়া যাইবে না? অন্ততঃ আমার সঙ্গে একবার যাইবে। আর একবার এক তীর্থযাত্রা করিব।

তোমার 'চোখের বালি' বৈশাখ মাস পর্য্যন্ত দেখিয়াছি। বেশ লাগিয়াছে। ভয় ছিল তুমি যেরূপ অবস্থায় ফেলিয়াছ তাহাতে কি করিবে। কিন্তু সবই সুন্দর হইয়াছে।

আমার এখানকার কাজের সংবাদ ভালই। স্রোত বোধ হয় অনুকূলেই পরিবর্তন হইয়াছে। সেদিন Linnean Societyর বাৎসরিক অধিবেশনে আমার কার্য্য সম্বন্ধে বিশেষ প্রশংসা হইয়াছে। যদি অধিক দিন থাকিতে পারি তাহা হইলে সবই অনুকূল হইতে পারে বলিয়া মনে হয়। তবে জয়-পরাজয় জোয়ার-ভাঁটা। Germanyর Bonn Universityতে বক্তৃতা করিতে অনুরোধ আসিয়াছে। তোমাদের প্রতিনিধির উপর একটু সদয় হইও।

তোমাদের নিকট একটু উৎসাহ পাইবার জন্য মাঝে মাঝে যে অবসাদ আসে তাহার কথা লিখিয়াছিলাম, আর অমনি তুমি বলিয়া বসিলে সাঁতারের নৌকাডুবি কখনও হয় না। একবার সমুদ্রে পড়িলে বুঝা যাইত নৌকাডুবি হয় কি না। তুমি কি মনে কর আমি এক কেষ্ট-বিষ্টু হইয়াছি? গলায় পাথর বাঁধিয়া জলে ফেলিলে ভাসিয়া উঠিব? দোহাই, এরূপ কবি-কল্পনা হইতে আমাকে রক্ষা কর।

আগামী সপ্তাহে Photographic Societyতে বক্তৃতার জন্য অনুরুদ্ধ হইয়াছি। দৃষ্টি ও Photography সম্বন্ধে বলিতে হইবে। চক্ষে যে ছায়া পড়ে তাহা মিলাইয়া যায়, কেবল তাহার প্রতিধ্বনি সুপ্ত ও জাগরিত স্মৃতিরূপে থাকিয়া যায়। কিন্তু photoর ছবি একেবারে অপরিবর্তিতরূপে মুদ্রিত হইয়া যায়। কি করিয়া সেই আণবিক আড়ষ্টতা (molecular arrest) সাধিত হয় তাহার সম্বন্ধে অতি আশ্চর্য experimentএ সফলতা লাভ করিয়াছি। হঠাৎ মনে হইল তুমি আমার আবিষ্কার চুরি করিয়া ইতিপূর্ব্বে কবিতারূপে প্রচার করিয়াছ। সুরদাস যখন তাহার চক্ষু শলাকাবিদ্ধ করিতে যাইতেছিল তখন তাহার মনে হইল যে, চির অন্ধকারে পলকহীন স্মৃতি চিরমুদ্রিত থাকিবে। তোমার

জগদীশ

লণ্ডন, ৬ই জুন, ১৯০২

বন্ধু,

কেবল একটি সংবাদ জানাইবার জন্য কয় পংক্তি লিখিয়াছি। আজ এক বৎসর পূর্ব্বে রয়াল সোসাইটিতে Inorganic Response সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলাম। তাহা প্রকাশিত হয় নাই তাহা জান। ঠিক এক বৎসর পর আজ জানিলাম আমার জিৎ হইয়াছে। রয়াল সোসাইটি আমার সেই আবিষ্কার সম্পূর্ণাকারে অবিলম্বে প্রচার করিবেন।

তুমি এ সংবাদে সুখী হইবে মনে করিয়া আনন্দিত হইয়াছি।

তোমার জগদীশ

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

জ্ঞানাঞ্জন পাল

সালটা মনে নেই, ১৯২৮ কি '২৯ হবে, বোধ হয় পূজার মুখে। পূর্ববাংলার ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে ঢাকায় যাবার জন্ত আমন্ত্রণ পাঠালেন বন্ধুরা বিপিনচন্দ্র পালকে। এটা তাঁর মৃত্যুর তিন কি চার বছর আগে। শরীর ভাল নয়, অনেক দিন থেকেই ভাল নয়। তবু আমায় সঙ্গে নিয়ে ঢাকায় যাবেন ঠিক করলেন।

যাবার দিন সকালে এক আত্মীয় এলেন বেড়াতে। বয়সে আমার ছোট কিন্তু সম্পর্কে বড় দেখেই বললেন তাকে—'ঢাকায় যাবে আমার সঙ্গে?' যুবকটি—'ইচ্ছা ত হয়, তবে—' বিপিনচন্দ্র—'খরচের কথা? হয়ে যাবে তা। আমার শরীর এখন অনেকটা ভাল। জ্ঞানাঞ্জনকে সঙ্গে গাড়ীতে না নিলেও চলবে। তাতে তোমাদের তৃতীয় শ্রেণীর ছ' খানা টিকিট হয়ে যাবে।' খরচের ব্যবস্থা এভাবে হ'ল। যুবকটি সোৎসাহে আমাদের সঙ্গী হলেন। তিনজনে ঢাকা রওয়ানা হলুম রাত্রে। ভোর হবার আগেই গোয়ালন্দ ঘাটে পৌঁছিলাম। নারায়ণগঞ্জের ষ্টীমারে যখন উঠলুম তখনও সকাল হয়নি। ভোর হ'ল পদ্মার বুকে। সকালটা যে এত মধুর অন্ত কোথাও তা মনে হয় নি। কেন জানি না, পুরীর সমুদ্র-তটেও নয়, দার্জিলিংয়ে হোটেলের বারান্দায় দাঁড়িয়েও নয়। শোভা তাদের কম নয়, কিন্তু নিজেকে তেমন ভাবে অন্তত্র পাই না যেমন পাই পদ্মার বুকে। এর ঢেউ মনে যে তরঙ্গ তোলে অন্তত্র তা তোলে না। স্মৃতি এখনো মনকে ভোলায়। তবু ত আমার জন্ম কলিকাতায়, মানুষ আমি কলিকাতাতেই। বিপিনচন্দ্র রোজ সকালে লেখেন। জাহাজে সেদিনও হয় ত তার ব্যতিক্রম হয় নি—নিজের হাতেই লিখেছিলেন, আমি ত সঙ্গে থাকতে পারিনি। একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলাম তাঁকে—রোজ সকালে কি লেখা আপনি আসে? বলেছিলেন,—দিনে মনে যে ভাবটা জাগে রাত্রে সেটা নিয়ে শুতে যাই। পরের দিন সকালে সেই ভাবই লেখার প্রেরণা হয়ে দেখা দেয়। ভেবেছি, মনের ভাব কি ফুলের কুঁড়ির মত, রাত্রে নিভৃতে তা ফোটে, আর সকালে লেখনীতে তা প্রকাশ পায়! মনের বাগানও কি এমন করে সাজান যায় যে ভাবের কুঁড়ি নিত্য সেখানে ধরে, আর ফোটাবার তাগিদে কুঁড়ি যেমন আপনি ফোটে, এরও প্রকাশের তাগিদ তেমন ভিতর থেকেই জাগে। লেখক নই, এরাজ্যের কথা কিছু জানি না। লেখক নই বলেই বিস্ময়টা হয় বেশী। একটা জিনিষ দেখেছি, রোজ সকালে তিনি লিখতেন, নিজের প্রেরণাতেই লিখতেন। অন্তে যেমন বলেছেন, তেমন লেখা কখনো তিনি লিখেছেন বলে জানি না।

দুপুরের ঠিক পরে নারায়ণগঞ্জে ষ্টীমার এসে থামল। মনে হ'ল নারায়ণগঞ্জ আরও একটু দূরে হ'ল না কেন? এত তৃপ্তি পাই বাংলার নদীপথে বেড়াতে। এ পথে অনেক বার এসেছি বিপিনচন্দ্রেরই সঙ্গে। সমস্তটা নদীপথে পিতার সঙ্গে গিয়েছি—একবার কলিকাতা থেকে। এর রূপ কখনো পুরানো হয়নি। যে বাংলার সঙ্গে আমার পিতৃ-পিতামহের ও সেই সঙ্গে আমারও নাড়ীর যোগ তা, নদী-খাল-বিলের বাংলা; নদীর জল নরম তার মাটি, আর মাটির মত নরম তার মন।

আমরা পূর্ব-বাংলা ব্রাহ্মসমাজের অতিথি। শহরের মাঝখানে কিন্তু আমরা থাকব না, থাকব এক অধ্যাপকের গৃহে রমনায়। এই পরিবারের সঙ্গে বিপিনচন্দ্রের দু'পুরুষের পরিচয়। প্রথম যুগের ব্রাহ্মদের গোঁড়া হিন্দু সমাজ কেবল সমাজ থেকে বের করে দেননি, গৃহছাড়াও করেছিলেন। নিজেদের ঘরবাড়ীর স্বাচ্ছন্দ্য ছাড়া মা-বোনের নিবিড় স্নেহবন্ধনও এঁদের কাটাতে হয়েছিল। এর বেদনা যে কত গভীর তার ধারণা করাও এখন শক্ত। ফলে কিন্তু এই সব ব্রাহ্মেরা, যেখানেরই হোন না কেন, সব মিলে একটা বড় পরিবারের মত হয়ে পড়েছিলেন। দুঃখ পরস্পরে ভাগ করে নিতেন সমবেদনায় ও সাহায্যে। ঝগড়া যে মাঝে মাঝে হ'ত না তা নয়—কথাও বন্ধ হ'ত শুনেছি মধ্যে মধ্যে, যেমন হয় বড় হিন্দু পরিবারে। কিন্তু একটা ঘননিবিষ্টতা গড়ে উঠেছিল এঁদের সকলকে ঘিরে। বিপিনচন্দ্র গৃহহারাদেরই একজন ছিলেন। ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেওয়ায় অভিমানী পিতা দীর্ঘ চোদ্দ বছর কোনো সম্বন্ধ রাখেননি পুত্রের সঙ্গে। অধ্যাপক পতি ও পত্নী দু'জনেরই বাবা ছিলেন প্রথম যুগের ব্রাহ্মকর্মী। সেই সূত্রেই বিপিনচন্দ্রের ঘনিষ্ঠতা হয় এঁদের সঙ্গে। এই যুগের ব্রাহ্ম-পরিবারের কারোরই অবস্থা প্রথম দিকে ভাল ছিল না। এঁদের ছেলেমেয়েরা মানুষ হয়ে ফের যখন স্বাচ্ছন্দ্যের সংসার পাতলেন, তখন বড় আহ্লাদ হয় তাঁদের পিতৃবন্ধু কেউ যদি এসে অতিথি হন! এরকম আনন্দের চেহারাই এঁদের চোখে-মুখে দেখেছিলাম, বিপিনচন্দ্রকে যখন প্রণাম করে এঁরা বাড়ীর মধ্যে নিয়ে গেলেন।

এঁদের সরকারী বাড়ী। অনেকটা জমি, বড় বড় ঘর আর সামনে প্রকাণ্ড লম্বা বারান্দা। একধারের মাঝারি ঘর ছেড়ে দিয়েছেন বিপিনচন্দ্রের জন্ত—একেবারে সাজিয়ে—অতিথির যাতে কোনো অসুবিধা না হয়। কিন্তু অতিথিই দেখি এক অসুবিধায় ফেললেন এঁদের। বিপিনচন্দ্র ও সঙ্গে আমি—আতিথ্যের এই ব্যবস্থাই এঁরা সানন্দে করেছেন। কিন্তু এঁদের অপরিচিত আর একটি যুবক আমাদের সঙ্গে। এঁকে রাখেন কোথায়? আর ঘর নেই যে এঁকে ছেড়ে দেন। অসোয়াস্তির কথা বটে; বিপিনচন্দ্রের মনেই হয়নি যে দু'জনের জায়গায় তিন জন না বলে অতিথি হলে গৃহস্থের অসুবিধা হতে পারে। এঁরা যুবকটিকে শহরে সমাজের অতিথি-ভবনে রাখার প্রস্তাব করলেন। সমাজের আচার্যই এই নিমন্ত্রণ জানালেন আগ্রহের সুরে যুবকটিকে। বিপিনচন্দ্রের মন এতে সায় দিল না! ভুলে গেলেন তিনি যে এটা তাঁর বাড়ী নয়; ভুলে গেলেন, যাঁদের তিনি অতিথি, তাঁর প্রকৃতির সঙ্গে তাঁদের না-ও মিলতে পারে। অধ্যাপকটি বিলেত ফেরত, থাকেন কতকটা সাহেবী ধরণে। নির্দ্ধারিত ভাল আয়ে সংসার চলে, সমস্তটা বাঁধা নিয়মে। বিপিনচন্দ্র সাহেব ছিলেন শুনেছি বিলেত যাবার আগে। বিলেত গিয়ে তাঁর সাহেবিয়ানা কেটে যায় একেবারে। নির্দ্ধারিত আয় তাঁর সংসারে প্রায় কখনো ছিল না। বললেন,—অসুবিধা কেন হবে? তিন জনেই এক ঘরে শুতে পারি একটা ক্যাম্প-খাট বেশী দিয়ে দিলে; দিনে সেটা গোটান থাকবে। একখানা বেশী চেয়ার একটু ঘেঁষাঘেঁষি করে দিলে টেবিলে সকলের

খাওয়াও ত একসঙ্গে হ'তে পারবে। আর এঁদের সুবিধাই হবে বললেন এই যুবকটি সঙ্গে থাকলে। আমাকে ত ওঁর লেখা লিখতে হয় সারা সকাল। এই যুবকটি তখন তাঁর গরম জলটল যা দরকার, ভিতরে গিয়ে তা নিয়ে আসতে পারবেন। এঁদের একটি মাত্র মেয়ে, কলেজে পড়েন। এক অপরিচিত যুবক হঠাৎ অতিথি হলে এমনিতে সংকোচ হয়—মা-বাবার হয়, বড় মেয়েরও হয়। তার উপরে বিপিনচন্দ্র ব্যবস্থা দিলেন যুবকটি সর্বদা অন্দরে যাবেন আসবেন তাঁর ফরমাসে। এ ব্যবস্থায় স্বামি-স্ত্রী দু'জনেই পরে নিশ্চয় হেসেছিলেন। বুঝলেন, তাঁদের সম্মানিত অতিথিটি কেবল বয়সে বা জ্ঞানে বৃদ্ধ নন, শিশুর মত অবুঝও বটে কোনো কোনো বিষয়ে। অবশ্য বিপিনচন্দ্রের কথাই রহিল, বয়স্কের কাছে বালকের কথা যেমন থাকে। আমরা তিনজনেই এখানে অতিথি রয়ে গেলাম।

প্রথম দিনের পরেই কিন্তু এঁদের অসোয়াস্তি আর রহিল না। বিপিনচন্দ্রের প্রকৃতিতে একটা সহজ স্নেহপ্রবণতা ছিল, বাহিরের জনকেও তা স্পর্শ করত। এ ক্ষেত্রেও তাই হ'ল। যুবকটি এক বড় বংশের ছেলে, দেশের কাজে এঁরা বড়। ব্যবহারও এঁর অতি ভদ্র। এই অধ্যাপক-পরিবারের যা কিছু সংকোচ বা সাবধানতা তা বাহিরের ; সেটুকু পার হলেই মিষ্টি মিশুক, মজলিসী এঁদের মন।

ঢাকা শহরে আকর্ষণের কিছু পাইনি, পেয়েছি লোকের মনে বা জীবনে। স্বদেশী আন্দোলনকে ব্যর্থ করতে ইংরেজ দুটো পথ নেয়। এক, হিন্দু ও মুসলমানে ঝগড়া বাধানো ; দুই দেশসেবা যাদের প্রাণকে স্পর্শ করেছে, অত্যাচারে তাদের জর্জরিত করা। ঢাকা শহরেই মুসলিম লীগ স্থাপিত হয় ১৯০৬ সালে। ঐ বছরেই কংগ্রেসে নতুন জাতীয়তার আদর্শ স্থান পায়। লীগ যেন তার পাল্টা জবাব। ইংরেজ মুসলমানকেও লাগিয়ে দেয় হিন্দুর উপর অত্যাচার করতে। হিন্দু ও মুসলমানে মারামারি করলে বিপ্লবের আগুন যদি জলেই বা ওঠে, তা ইংরেজের দিকে ছড়িয়ে পড়বে না। ১৮৫৭ এর তুলনায় এই আগুনের তেজ হবে শতগুণ বেশী, ইংরেজ তা জানত। এটা বিপ্লবের রূপ নেবে, সাধারণ বিদ্রোহের নয়। শিক্ষিত হিন্দু-যুবচিত্তকে লোভে জয় করা যাবে না, নির্যাতনে চেপে মারার তাই এত চেষ্টা। এর বিরুদ্ধে দাঁড়াবার পথ দেখায় ঢাকা। দেশপ্রেমকে সংগঠিত করার জন্য প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয় ; নাম তার অনুশীলন সমিতি। যতটা শুনেছি বিপিনচন্দ্র প্রমুখের প্রেরণায়, পি, মিত্রের নেতৃত্বে ও পুলিন দাসের সংগঠনে এ গড়ে ওঠে শুধু ঢাকায় নয়, এ নামে ও অন্য নামে পূর্ববাংলার সর্বত্র। মুসলমান জনতাকে হিন্দুর বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা নিষ্ফল হয়। এটা কিন্তু এই সমিতির ছোট বা সাময়িক কাজ। আসল কাজ হ'ল দেশকে বীর্য্যে প্রতিষ্ঠিত করা। ভয় তাহলে মন থেকে চলে যাবে। ভয়ের কারণ সর্বত্র এক অবাস্তব বস্তু। অন্ধকারে দড়িকে সাপ মনে করে ভয় হয়। আলোতে সে ভুল ভেঙে গেলে ভয়ও দূর হয়। বেদান্ত বলেন, জ্ঞানে ভুলকে নিরস্ত করা ও ভয়কেও নিবারণ করা যায়। বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখ লেখায় ও বক্তৃতায় এই জ্ঞান দেশকে দেবার চেষ্টা করেন। বিদেশী প্রভুশক্তি এঁরা বলেন, মায়াতে আমাদের অসাড় করে রেখেছে। দেশাত্মবোধ জাগলে এই মায়া মন থেকে কেটে যাবে, আলোতে অন্ধকার যেমন যায়। কিন্তু দেশপ্রেমের সাধনে এ এক অঙ্গ মাত্র। দেশপ্রেমিক বীর্য্যে প্রতিষ্ঠিত হলে এ সাধন পূর্ণাঙ্গ হয়। সরলা দেবীর বীরাষ্টমীর মত অনুশীলন সমিতির আদর্শ হ'ল, এই বীর্য্যের সাধন করা। ঢাকায় এর জন্ম বা নবজন্ম। তাই ঢাকা দেশপ্রেমিকের এক পবিত্র তীর্থস্থান।

ইংরেজ প্রভুশক্তির সঙ্গে স্বদেশ-প্রেমের কয়েক বার লড়াই হয় স্বদেশী যুগে। বরিশালে বোধ হয় প্রথম হয় ১৯০৬ সালে। লাঠির ঘায়ে ইংরেজ প্রাদেশিক সম্মেলন ভাঙলেও স্বদেশীর ব্রত ভাঙতে পারেনি। স্বদেশীর আলোর শিখা আরও উজ্জ্বল হয় এর পরে। বস্তুতঃ, সমস্ত স্বদেশী যুগে এই লড়াই চলে বরিশালে অশ্বিনীকুমারের নেতৃত্বে। ইতিহাস বলবে স্বদেশীদেরই জয় হয়, ইংরেজের নয়। ঢাকাতেও এক ছোট পরাজয় হয় ইংরেজের এক দিন। ছোট লাট ফুলার জনশূন্য সম্বর্দ্ধনা পান শহরের, আর স্বদেশীর বাহক বিপিনচন্দ্র পান বিপুল অভ্যর্থনা প্রায় একই সময়ে। ধীরপন্থী নেতারা সভা করতে সেদিন ভয় পান, কেন না, রাগলে ইংরেজের জ্ঞান থাকে না, আর ইংরেজ রাজপ্রতিনিধির সেদিন রাগ বা ক্ষোভ কম হয়নি। কিন্তু বিশাল জনতা সমবেত হয় সভায় নদীর পারে বিকেলে, ভয় তাদের কেটে গেছে। বিপিনচন্দ্র বক্তৃতা দেন, বিষয়—দেশপ্রেম। প্রাচীনদের মুখে শুনেছি, সে-বক্তৃতার নাকি তুলনা হয় না। ভাবটা অবশ্য তাঁদেরই। বহুকাল পরে স্বদেশী যুগের এসব প্রসঙ্গ এক দিন উঠলে বিপিনচন্দ্র বলেন, সাধ্য কি তাঁর ঐ উদ্দীপনা জাগান। দেবতা তাঁর উপর ভর করেছিলেন, তাতেই তা সম্ভব হয়েছিল। অরবিন্দ, অশ্বিনীকুমার, বিপিনচন্দ্র স্বদেশী যুগে তাঁদের কাজকে এই চোখেই দেখতেন—তাঁরা যন্ত্র মাত্র, যন্ত্রী অন্য জন। ঢাকায় যে কয়বার এসেছি, এ সকল কথা মনে এসেছে, আর এই শহরের জনতাকে বা জনশক্তিকে প্রণাম জানিয়েছে।

ঢাকায় এবার ছিলাম বাড়ীতে ; আগে যে দু'বার এসেছিলাম ছিলাম নৌকায়। স্নানাদির ব্যবস্থা সবই নৌকায়, রান্নাও নৌকায় হ'ত। মেলায় সাধুদের যেমন সিধে আসে, চাল, ডাল, মাছ, তরকারী তেমন আসত কাঁচা। একবারের স্মৃতি আজও মন থেকে মুছে যায়নি। সে বারে আমাদের সঙ্গে আর একজন ছিলেন। নাম তাঁর রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। স্বদেশী যুগে ও তার আগে ব্রাহ্ম-সমাজে সুগায়ক বলে তাঁর খ্যাতি ছিল। আমি যখনকার কথা বলছি, তখন তিনি বৃদ্ধ। মাথায় সাদা চুল, সাদা দাড়িতে মুখখানা ঢাকা, ভাবে বিভোর হয়ে যখন গান করতেন, তখন প্রাচীন ঋষিদের ছবি মনে করিয়ে দিত। হাস্যরসিক সদানন্দ পুরুষ, অন্যকে আনন্দ দেবার ক্ষমতা প্রচুর। বিপিনচন্দ্র এবার এসেছিলেন বোধ হয় হরিসভার আমন্ত্রণে, ভক্তি-সাধন সম্বন্ধে কয়েকটি বক্তৃতা দিতে। রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বক্তৃতার আগে ও পরে গান করতেন। এ সময় তিনি পৌরাণিক কথকতাও করতেন। এক দিন এই উৎসবে তাঁর কথকতাও সম্ভব হয়েছিল। সংযমী মানুষ, একাদশী অমাবস্যায় উপোস করেন। নৌকায় একাদশীর দিন উপোস করা কিন্তু তাঁর হয়নি, উপোস করেন পরদিন। আমার অনেক অনুরোধে আমাদের সঙ্গেই দুপুরে খান। খেয়ে কিন্তু অনুতাপ করেন নি। রান্না করেছিলেন সেদিন বিপিনচন্দ্র নিজে। বিপিনচন্দ্র রাঁধতে ভালবাসতেন, বিশেষ করে নতুন নতুন রান্না।

নদীর পাড় দিয়ে শহরের দিকে একটা রাস্তা চলে গিয়েছে। নদীর পাড়ে একটা বাগানও আছে। কিন্তু শহরের দিকটা সুন্দর নয়, সুন্দর ওপারের গ্রামের দিকটা। শহরকে সুন্দর করতে হয়, এ বোধ আমাদের এখনও ভাল করে জেগেছে বলে জানি না। গ্রামের দিকটা প্রকৃতিই সুন্দর করে রাখে। ঠিক ওপারে শুভাঢ্যা গ্রাম। আচার্য প্রসন্নকুমার রায়ের জন্মভূমি। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ বলে এঁর খ্যাতি সারা বাংলায় একদিন ছড়িয়েছিল। রং সাদা নয় বলে প্রেসিডেন্সি কলেজের স্থায়ী অধ্যক্ষের পদ বোধ হয় পান নি। দুর্গামোহন দাসের প্রথমা কন্যা সরলা রায় সত্য সত্যই এঁর সহধর্মিণী ছিলেন। মেয়েদের শিক্ষায় এই মহিলার দান কম নয়। গোখলে বালিকা বিদ্যালয়ের ইনিই প্রতিষ্ঠাত্রী। এই শুভাঢ্যা গ্রামের একটি যুবকের সঙ্গে আমাদের বাড়ীর এমন এক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল যা সহোদর ভাই-বোনদের মধ্যেও দুর্লভ। নাম তাঁর অক্ষয়কুমার রায়। স্বদেশীর প্রথম উচ্ছ্বাসে তিনি বোধ হয় স্কুল থেকে বহিষ্কৃত হ'ন বা বেরিয়ে আসেন। এসে পড়েন একেবারে নবজাতীয়তার প্রবল স্রোতের মাঝখানে। এঁর বাবা বিপিনচন্দ্রের হাতে এঁকে সঁপে দেন। সেদিন থেকে তিনি আমাদের বাড়ীরই আর এক ছেলে হ'ন।

অক্ষয়কুমার বিপিনচন্দ্রকে যে শ্রদ্ধা করতেন, আমি তার তুলনা দেখিনি। গুরুজনের উপর স্বাভাবিক যে শ্রদ্ধা, তার সঙ্গে মিশে গিয়েছিল দেশের প্রতি গভীর ভালবাসা। তাঁর চোখে বিপিনচন্দ্র ত্যাগী দেশসেবকের মূর্তি ছিলেন। এঁর একটা কাহিনী জীবনে ভুলব না। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের "সন্ধ্যা" পত্রিকায় বিপিনচন্দ্র মধ্যে মধ্যে লেখেন। একদিন সকালে একটা লেখা লিখে তিনি অক্ষয়কুমারকে দেন উপাধ্যায় মহাশয়ের হাতে দিয়ে আসবার জন্য। লেখাটার সঙ্গে সাড়ে চার আনা পয়সাও দিয়ে দেন। আমরা থাকি তখন হাজরা পার্কের সামনে, কালীঘাট অঞ্চলে। "সন্ধ্যা" পত্রিকার আপিস উত্তর-কলিকাতায়, বোধ হয় শিবনারায়ণ দাসের গলিতে। প্রায় দু'ক্রোশ পথ। এই পথ হেঁটে এসে অক্ষয়কুমার উপাধ্যায় মহাশয়ের হাতে লেখা ও পয়সাটা দেন। পয়সাটা ছিল যাতায়াতের ট্রামভাড়া, বিপিনচন্দ্র বলতে ভুলে গিয়েছিলেন। সুতরাং হেঁটেই অক্ষয়কুমার এসেছিলেন। উপাধ্যায় মহাশয় প্রথমে বুঝতেই পারেন না, এই কয় আনা পয়সা কিসের। একটু পরে অক্ষয়কুমারকে জিজ্ঞাসা করলেন,—"তুমি কিসে এসেছ বল ত?" সংকোচে অক্ষয়কুমার উত্তর দিলেন, "হেঁটে"। হেসে উঠে উপাধ্যায় মহাশয় বললেন, "এ যে তোমারই ট্রামভাড়া। ট্রামেই ফিরে যাও।" নায়কের প্রতি এরকম শ্রদ্ধা ও দেশের কাজে এরকম নিষ্ঠা সে যুগেও দুর্লভ ছিল।

বিপিনচন্দ্র বাধ্য হয়ে ১৯০৮ সালে বিলেত চলে গেলে অক্ষয়কুমার রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনে সেবার কাজে যোগ দেন। শিক্ষকতায় নয়, কেন না পড়াশুনার সে সুবিধা ত তাঁর হয়নি। কিন্তু সেবায় তিনি ছাত্রদের প্রাণে যে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন শিক্ষকেরও তা দুর্লভ ছিল। রবীন্দ্রনাথের স্নেহ অক্ষয়কুমারকে দৃঢ় বন্ধনে বেঁধেছিল। শেষদিন পর্যন্ত শান্তিনিকেতনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিন্ন হয়নি। প্রথম জীবনে যে আকাঙ্ক্ষায় তিনি বিপিনচন্দ্রের কাছে এসে পড়েন, রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনে সেবার মধ্য দিয়ে যে আকাঙ্ক্ষা তিনি পরিতৃপ্ত করতে চেষ্টা করেন, তাই তাঁকে প্রৌঢ়ে মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনে সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে যোগ দিতে প্রেরণা দেয়। গান্ধীজি তাঁর সরলতা ও দেশপ্রেমে মুগ্ধ হয়ে লবণ আন্দোলনে তাঁকে তাঁর একজন অনুগামী শিষ্য করে নেন। ডাণ্ডি যাত্রায় তিনি গান্ধীজির সহযাত্রী ছিলেন। অক্ষয়কুমার গান্ধীজি, রবীন্দ্রনাথ ও বিপিনচন্দ্রকে সমান শ্রদ্ধা করতেন—যদিও এঁদের মত বা আদর্শ এক ছিল না। অক্ষয়কুমারের জীবন স্বদেশীর জাগরণের এক উৎকৃষ্ট ফল বলে আমার সর্বদা মনে হয়েছে। অক্ষয়কুমার কলিকাতায় কোনো কাজে এসে শান্তিনিকেতনে ফিরে গেলেই রবীন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করতেন,—"তোমার গুরুজির খবর কি?" বিপিনচন্দ্রও বলতেন, "তোমার গুরুদেবের সংবাদ কি?" দুই গুরু একই শিষ্যকে নিয়ে এভাবে হাস্য-পরিহাস করতেন। এই নির্লোভ যুবকটির মুক্ত জীবন সহজাত ছিল। তাই আচার্য্য নন্দলাল বসু, এণ্ডরুজ সাহেব প্রমুখের প্রীতি যেমন তিনি পেয়েছিলেন, তেমন পেয়েছিলেন আমাদের স্বতঃ-উৎসারিত শ্রদ্ধা।

অক্ষয়কুমার বিপিনচন্দ্রের সঙ্গে একবার ঢাকায় আসেন, থাকেন ক'দিন নৌকায় আমাদের সঙ্গে। একদিন একটা ছোট নৌকা করে আমায় শুভাঢ্যায় তাঁদের বাড়ীতে নিয়ে যান। পশ্চিম-বাংলা অঞ্চলে এখন যেমন সাইকেল-রিক্স, পূর্ব-বাংলায় তেমন ছোট নৌকা, কেন না জলপথই অনেক জায়গায় একমাত্র পথ। আমাকে নতুন কাপড় দিলেন তাঁরা। বিপিনচন্দ্রের জন্যও নতুন কাপড় পাঠিয়ে দিলেন। কোনো নিমন্ত্রণে এরকম মর্য্যাদা এর আগে বা পরে পাইনি।

যে অধ্যাপকের বাড়ীতে এবার আমরা অতিথি ছিলাম, তিনি একজন সাহিত্যরসিক ছিলেন। ধর্মালোচনায় তাঁর অনুরাগ দেখিনি, যদিও নিষ্ঠাবান ব্রাহ্ম ছিলেন তিনি। রাজনৈতিক আন্দোলনও তাঁকে বিশেষ স্পর্শ করেনি। ইংরেজী সাহিত্য তাঁর ভাল পড়া ছিল। আমার একেবারেই ছিল না। শুনতুম তাঁর কথা, আলোচনায় যোগ দিতে পারতুম না। সে সময় আমাদের মন বেশী চাইত যারা নিপীড়িত তাদের কথা জানতে ও বুঝতে। ইংরেজী তর্জমায় তাই রুসের সাহিত্য পড়তাম, সাহিত্য হিসাবে তা বড়, আর নির্যাতিত জীবনের ছবি তাতে ফুটে উঠেছে ব'লে। আমাদের দুঃখের সঙ্গে যে অনেক মেলে। এমন কি, আমেরিকার নিগ্রোদের দুঃখের কবিতা ও গানও যতটুকু পেতাম তাও পড়তাম। এগুলিকে Negro spirituals বলে। এই গানগুলি গেয়েই বুকার টি ওয়াশিংটন নিগ্রো বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য টাকা তোলেন। অধ্যাপক-বন্ধুটি সুগায়ক ছিলেন। রবীন্দ্র-সংগীত ও রবীন্দ্র-সাহিত্য তাঁর অতি প্রিয় ছিল। কিন্তু সব চেয়ে বেশী মনে আছে এঁর কাজি নজরুলের সম্বন্ধে গল্প। নজরুল বেশ কিছুদিন এঁদের বাড়ীতে অতিথি ছিলেন। আর গানে, কবিতায়, গল্পে মাতিয়ে রেখেছিলেন। অথচ নজরুল, বলতে পারি, প্রকৃতিতে বনের পাখী চিরকালই। অধ্যাপকটি তার উল্টা। কিন্তু মানুষের মনে মুক্তির পিপাসা প্রবল বুঝতে পারি যখন এঁদের দু'জনের সংগতের গল্প শুনি।

প্রথম যৌবনে বিপিনচন্দ্র প্রমুখাকিসের প্রেরণায় ব্রাহ্মসমাজে

এসে পড়েছিলেন, এ প্রশ্ন মনে হয়েছে। যতটা বুঝেছি, এসেছিলেন তাঁরা মুক্তির আকাঙ্ক্ষায়। ধর্মে ও সমাজে যে গ্লানি জমেছিল আগের কয়েক 'শ' বছরে, চৈতন্যদেবের আন্দোলনে তা অনেকটা ধুয়ে যায়। মানুষের মন নতুন মুক্তির স্বাদ পায়। আমাদের সাধারণ জীবনের নানা সম্বন্ধ যে নিত্য আনন্দের ভূমিতে পৌঁছিতে পারে, এ সম্ভাবনা জাগে। নতুন সাহিত্যে ও শিল্পে তা রূপ নেয়। নতুন সমাজ-চেতনাও জাগে, আগে যা হয়নি। কিন্তু সে ত' চারশো বছর আগের কথা। তার প্রভাব ক্ষীণ হয়ে গেছে অনেক দিন। আমাদের সাধারণের জীবনকে অজ্ঞতা ও অন্ধতায় ফের ঘিরেছে। এই দীর্ঘদিনের গ্লানি থেকে মুক্তি দরকার, এই প্রয়োজনের মুখেই ইংরেজ এ দেশে আসে। নিত্যমুক্তের স্বভাব নাকি মানুষের প্রাকৃতিক। কিন্তু সকলে এ সম্বন্ধে সজাগ নয়। মুক্তির আকাঙ্ক্ষা সকলের প্রাণে হয় ত' জাগে না। কিন্তু যাদের জাগে প্রবল বেগেই জাগে। বিপিনচন্দ্র প্রমুখ বোধ হয় মুক্তির আকাঙ্ক্ষা নিয়েই জন্মেছিলেন। ইংরেজ এ দেশে আসায় তা ফুটে ওঠবার অবসর পায়। এই মুক্তির আকাঙ্ক্ষাতেই তাঁরা ব্রাহ্মসমাজে এসে পড়েন।

দেশে কোন ওলট-পালোট হলে দু'ভাবে তার প্রতিক্রিয়া সাধারণতঃ দেখা দেয়। লোভী যারা, তারা লোভের নতুন রাস্তা পায়। ইংরেজ এদেশে আসায় আমাদের মধ্যেও কিছু লোক তাড়াতাড়ি ধনী হয়। কিন্তু এদের প্রভাব দ্রুত মিলিয়ে যায়। এর আর এক প্রতিক্রিয়া হয় আমাদের সভ্যতা ও সাধনার উপর। আমাদের সভ্যতা এত বড় আঘাত এর আগে পায়নি। আমাদের সভ্যতা ছোটও নয়, নতুনও নয়। এ যেমন বিরাট তেমন প্রাচীন। আত্মরক্ষার অস্ত্র এর অজানা নেই। সমাজপতিরা তা ইসলামের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেন মুসলমান এদেশে এলে। পণ্ডিতেরা একে 'কমঠ' ব্রত বলেছেন। এতে সমাজ তার নিজের মধ্যে সবটা গুটিয়ে নেয়, কূর্ম বা কচ্ছপ আক্রান্ত হ'লে যেমন করে। সমাজ এতে টিকে যায়, কিন্তু নতুন জীবনে ও তেজে সে আর প্রসারিত হবার অবকাশ পায় না। ইংরেজের বেলায় হয়ত তাই হ'ত যদি না ফরাসী বিপ্লবের সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার বাণী এখানেও এসে পৌঁছত প্রায় একই সময়ে। ফলে একটা অদ্ভুত জিনিষ এখানে ঘটল। দেশে এক নবজাগরণের সূচনা হ'ল পরাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে। এর প্রথম উচ্ছ্বাসে ডিরোজিওর শিষ্যরা আমাদের সভ্যতা ও সাধনার সবটাই অস্বীকার করলেন। প্রাচীন সভ্যতা তা হতে দেবে কেন? এর ফলে যে ক্ষতি হ'তে পারত তা কিন্তু হল না, এর ভালটুকুই আমরা পেলাম। তার কারণ রামমোহন রায়ের মনীষা ও কর্মচেষ্টা। রামমোহনের কর্মজীবন আরম্ভ হয় ১৮১৪ সালে কলিকাতায়। ডিরোজিওর শিষ্যেরা এগিয়ে আসেন ১৮৩০ এই রকম সময়ে। রামমোহন যে বীজ বপন করেন তার ফল ফলতে আরম্ভ করে তাঁর মৃত্যুর পরে। কিন্তু তাতে অসুবিধা হয় না।

আমাদের দেশের নবজাগরণ এক বিশিষ্ট রূপ নেয়। এর জন্ত প্রয়োজন হয় এমন এক পথের সন্ধান করা, যা দেশকে এগিয়েও দেবে, এবং আত্মস্বরূপেও প্রতিষ্ঠিত করবে। আত্মরক্ষার প্রয়োজনে মানুষ এবং সমাজও অনেক সময় নিজেকে সংকুচিত করে। আমাদের আত্মরক্ষা করতে হবে বটে কিন্তু সংকোচনের পথে নয়, সম্প্রসারণের পথে। নবজাগরণের পথেই আমাদের চলতে হবে, কিন্তু তা হবে নিজেদের স্বদেশী পথ। পৃথিবীতে প্রাচীন বড় সভ্যতা উঠেছে ও পড়েছে—ইতিহাসে তার কাহিনী আছে। প্রাচীনতাকে আঁকড়ে আছে দুনিয়া থেকে আলাদা হয়ে, তার দৃষ্টান্তও একেবারে বিরল নয়। কিন্তু প্রাচীন সভ্যতা নবজীবনে সঞ্জীবিত হয়ে উঠবে—এ কঠিন সাধনা! পৃথিবীর ইতিহাসে এরকম সার্থক চেষ্টা বেশী হয়নি। রামমোহন দেশকে এই কঠিন সাধনা করতেই আহ্বান জানালেন। পথও তার দেখিয়ে দিলেন। প্রথমে ব্রাহ্মসভা ও পরে ব্রাহ্মসমাজের অনুষ্ঠান তারই ফল।

এযুগের সব দেশের সাধনার মূল কথা হ'ল সাধারণ মানুষকে তার প্রাপ্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা। প্রাচীন বলে ভারত বা চীন এ দায়িত্ব থেকে মুক্তি পাবে না। এ যুগে বাংলা তিনটি স্পষ্ট ধারায় এই মানবতার সাধনা করতে চেষ্টা করেছে। তিনটির সঙ্গেই ব্রাহ্মসমাজের ঘনিষ্ঠ যোগ। একটি ধারা রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের, একটি ধারা রবীন্দ্রনাথের, ও তৃতীয়টি বিজয়কৃষ্ণ, গোস্বামী মহাশয়ের জীবনে ও সাধনায় বৈষ্ণব আদর্শ যা মূর্ত হয়েছে সেই ধারা। বিজয়কৃষ্ণের প্রেরণায় যাঁদের জীবন সার্থক হয়ে গড়ে বিপিনচন্দ্র তাঁদের একজন। এই শেষের ধারারই অন্যতম বাহক ও ব্যাখ্যাতাও তিনি। প্রথমটি প্রাচীনের সঙ্গে যুক্ত হয় বেদান্তের মধ্য দিয়ে, রবীন্দ্রনাথের যোগ উপনিষদের সঙ্গে প্রধানতঃ, বিপিনচন্দ্র যে প্রেরণা পান বিজয়কৃষ্ণের" কাছ থেকে, তা বৈষ্ণব আদর্শের নতুন রূপ, ব্রহ্মজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। এগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন তিনটি পৃথক মত বা আদর্শ নয়, একই আদর্শের ত্রিধারা।

এ যুগের চিন্তা ও কর্মের ইতিহাসের তলিয়ে আলোচনা এখনো হয়নি। ব্রাহ্ম সমাজেরও বাহিরের কথাই আমরা জানি। কিন্তু কেশবচন্দ্র যে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাতেই আদি সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বৃহত্তর আদর্শের ভিত্তিতে তাঁর ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ গড়ে তুলতে চেষ্টা করেন, আবার গণতন্ত্র আদর্শের প্রেরণাতেই যে কেশবচন্দ্রের ব্রাহ্মসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের প্রতিষ্ঠা হয়, এ সকল কথা জানতে বা বুঝতে চেষ্টা করি না। ছোট পয়ঃপ্রণালী যেমন নদীতে মিশতে চায়, নদী যেমন সমুদ্রে মিলিত হয়ে নিজের সার্থকতা অন্বেষণ করে, তেমন মুক্তির আকাঙ্ক্ষাতেই ব্রাহ্মসমাজে এই ক্রম-বিবর্তন। এর প্রভাব সে যুগে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সকলের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠার পরেও এর গতি থামে না, থামে অনেক পরে।

মানবতার সাধনার কথাই বিপিনচন্দ্র প্রচার করেন, ব্রাহ্ম-সমাজের উৎসবে যেমন, অন্ত কোনো হিন্দু প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেও তেমন। একই ভাব একই আদর্শ, ভারতের প্রাচীন সাধনা সঞ্জীবিত হওয়ার অমৃতময় কাহিনী। ১৯০৮ সালে জেলের মধ্যে বিপিনচন্দ্রের যে অনুভূতি হয়, অরবিন্দ তাকে জীবে ভগবদ্দর্শন বলে উত্তরপাড়ার বক্তৃতায় উল্লেখ করেন। এই অনুভূতির কথাই বিপিনচন্দ্রের "জেলের খাতা" বইয়ে আছে। এই বইয়ের প্রকাশভঙ্গী তাঁর অন্ত লেখা থেকে স্বতন্ত্র। যুক্তির পথে তিনি তাঁর মর্মকথা লেখেননি, লিখেছেন যেমনটি তিনি অনুভব করেছেন তেমনটি। এই ভাব বয়সের সঙ্গে আরও গাঢ় হয়। নব পর্যায় "বঙ্গদর্শনে" ও "নারায়ণে"

তিনি বৈষ্ণব ধর্ম ও সাধনা সম্বন্ধে যে বহু প্রবন্ধ লেখেন, তার সকলগুলিরও মূল লক্ষ্য মানবতার এই নতুন সাধনা। তাঁর ইংরেজী বই 'Bengal Vaishnavism'-এ এই আদর্শই বিবৃত ও ব্যাখ্যাত হয়েছে। এই বই তাঁর মৃত্যুর কিছু আগে লেখা, বাহির হয় মৃত্যুর পরে। মানবতার সাধনা ধর্মজীবনের ক্ষেত্রেই সীমিত হয়ে থাকতে পারে না। রাষ্ট্রজীবনেও তা ছড়িয়ে পড়তে চায়। এখানেও সেই একই কাহিনী, কেবল ভিন্ন রূপ। বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সংকীর্ণ ক্ষেত্র বিস্তৃত হয় ভারত-সভায়। ভারত-সভার আদর্শ দেশময় ছড়িয়ে পড়ে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠায়। কিন্তু লক্ষ্য এখনও ছোট—স্বায়ত্ত শাসনের স্তিমিত রূপ। স্বদেশী আন্দোলনেই স্বাধীনতা তার উজ্জ্বল রূপে চারিদিক উদ্ভাসিত করে আমাদের রাষ্ট্রীয় লক্ষ্যরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন, ভারত-সভা, কংগ্রেস ও স্বদেশীর নব-জাতীয়তা রাষ্ট্রীয়-জীবনে ক্রমে বৃহত্তর ক্ষেত্রে কেবল নয়, মহত্তর আদর্শেও আমাদের প্রতিষ্ঠিত করে।

আমাদের সমাজ-জীবনেও এই মুক্তির বাণী পৌঁছয় কিন্তু সাধারণের মধ্যে তেমন প্রসারতা বা গভীরতা লাভ করে না। এমন কি, চৈতন্যযুগেও যতটা হয়েছিল, বোধ হয় ততটাও নয়। চৈতন্য-যুগের জাগরণ সাধারণকে নিয়ে, সাধারণ থেকেই আরম্ভ হয়। কেবল বাংলায় নয়, ভারতের প্রায় সর্বত্র কাছাকাছি সময়ে সন্তদের জীবন ও বাণী তার প্রেরণা জোগায়। এই সকল সন্ত সাধারণের মধ্যেই জন্মেছিলেন বা সাধারণের মধ্যে তাঁদের সমস্ত জীবন ও কর্ম মিশিয়ে দিয়েছিলেন। এ যুগের বাংলার নবজাগরণ সাধারণের ততটা নয়, যতটা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের। তা সত্ত্বেও এর প্রেরণা জনগণের মধ্যে হয়ত ছড়িয়ে পড়তে পারত, যদি সাধারণের আর্থিক জীবন অমন ভাবে বিপর্য্যস্ত না হ'ত।

সমাজ-চেতনা জাগলে আর্থিক জীবনের কাঠামোও বদলে যায়। আর্থিক জীবনে কোনো মৌলিক পরিবর্তন ঘটলে সমাজ-জীবনেও তা প্রতিফলিত হয়। আমাদের দুঃখ হ'ল, অর্থনীতিক জীবনের আগের ভিত্তি নষ্ট হয়ে গেল, কিন্তু নতুন কিছু গড়ে উঠল না। অল্প একটু নাড়াচাড়ায় যে পরিবর্তন হ'ল, তারই ফলে এক নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণী বাংলায় এগিয়ে এলেন। এঁদের অনেকেরই জন্ম গ্রামে। নতুন শিক্ষার সুযোগ নিয়ে নবজাগরণকে এঁরাই পুষ্ট করেন। এ যুগের নব জীবনের যা কিছু শক্তি, তা এঁদেরই। কিন্তু এঁদের শক্তির উৎস ছিল ক্ষীণ। আরও তলা থেকে নতুন মানুষ আর এগিয়ে আসতে পারলেন না। ফলে ধারা গেল শুকিয়ে। আমি যে সময়ের কথা বলছি, সে সময়ে আর্থিক জীবনে আবার কিছু পরিবর্তনের একটা ক্ষীণ আশা দেখা দিয়েছিল। পাট চাষের লাভের অল্প অংশ চাষীরাও পেতে আরম্ভ করেন। পূর্ববঙ্গই পাট চাষের কেন্দ্র। চাষীরা বেশীর ভাগই আবার মুসলমান। লেখা-পড়া শেখার বা শেখানোর একটা নতুন আকাঙ্খা এঁদের মধ্যে জাগে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠায় এই আকাঙ্ক্ষা নতুন প্রেরণা পায়। বিপিনচন্দ্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় উৎসাহী ছিলেন। আমার যদি ভুল না হয়, এবারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের এক অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়ে তিনি বক্তৃতাও দেন।

এক দিকে পাট-চাষীদের আর্থিক অবস্থায় কিছু উন্নতির সম্ভাবনা যদি কতকটা স্থায়ী হয়, অন্য দিকে নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে একই বাংলা ভাষায় হিন্দু ও মুসলমান শিক্ষক ও ছাত্র যদি নতুন জ্ঞানার্জনে ব্যাপৃত থাকেন, তা'হলে দেশ যাঁরা গড়তে চান তাঁদের মনে আশা জাগে। এর সফলতা দু'দিকে দেখা দিতে পারে। এক, যাঁরা আগে আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনে এগিয়ে আসবার সুযোগ পাননি, তাঁদের একটা ছোট অংশও হয়ত শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হতে পারেন। দুই, আর্থিক জীবনেও এমন একটা স্থায়ী পরিবর্তনের সূচনা হ'তে পারে, যাতে কৃষি ও শিল্প দুই-ই উন্নতির পথে এগিয়ে যেতে পারে। আর এর ফলে যে নবজাগরণ তার অগ্রগতির পথে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছে স্বদেশীর ঠিক পরে, তার জয়যাত্রা আবার সুরু হ'তে পারে। এ আশা বড় আশা; দুঃখের দিনে আশা বড় হয়েই দেখা দেয়। কিন্তু এ আশা নির্মূলও হ'তে পারে যদি এক বড় ঝড়ে সব ওলট-পালট হয়ে যায়। সে রকম ঝড়ই আমাদের কপালে এলো, এসে সব বিপর্য্যস্ত করে দিল। আশা পরিণত হ'ল স্বপ্নে। প্রায় ত্রিশ বছরের আগে ঢাকা যাওয়ার স্মৃতিকথা দুঃখের কাহিনী হয়ে দাঁড়াল। এ দুঃখ যে কত বড়, তা বাঙ্গালী ছাড়া কেউ বুঝবে না।

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র মল্লিক

[কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি ও দেওয়ানী আইনজ্ঞ]

প্রতিভার বিকাশ অবশ্যম্ভাবী—ইহার সার্থকতা দেখা যায় কলিকাতা হাইকোর্টের আদিম বিভাগের বিশিষ্ট এ্যাডভোকেট শ্রীপ্রকাশচন্দ্র মল্লিক মহাশয়ের বিচারপতি পদে উন্নীত হওয়ায়। আত্মপ্রচারবিমুখ, নিরভিমানী, গম্ভীর প্রকৃতি, মধুর আলাপী ও আভিজাত্যদীপ্ত প্রকাশচন্দ্রের সহিত কিছুক্ষণের পরিচয়ে মুগ্ধ হয়ে যাই।

১৯০৪ সনের মার্চ মাসে শ্রী মল্লিক কলিকাতায় পৈতৃক-ভবনে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি হুগলী জেলার গুপ্তিপাড়ার বিশিষ্ট বৈদ্যবংশীয় সন্তান। পিতা ৺প্রিয়মাধব মল্লিক কয়েকটি বিদেশীয় ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর প্রতিনিধি হিসাবে সুপরিচিত ছিলেন। জ্যেঠামহাশয় ৺ইন্দুমাধব মল্লিক প্রখ্যাত "ইক মিক কুকার" (Ic-Mic-Cooker) এর আবিষ্কারক। পাটনা হাইকোর্টের স্বনামধন্য আইনবিশারদ ৺সুশীলমাধব মল্লিক তাঁহার কনিষ্ঠ পিতৃব্য ছিলেন। মাতামহ ৺মহেন্দ্রনাথ রায় সাবজজ ছিলেন।

১৯২০ সালে প্রকাশচন্দ্র সাউথ সুবারবণ স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সেন্টজেভিয়াস কলেজে আর্টস পড়িতে থাকেন। সেই সময়ে সারা ভারতে গান্ধীজি-প্রবর্তিত অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হয়। তখন পাঠরত ছাত্ররা দলে দলে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া আন্দোলনে যোগদান করিতে থাকে। বালক প্রকাশচন্দ্রও উহার ব্যতিক্রম ছিলেন না। দেশবন্ধুর নেতৃত্ব ও সুভাষচন্দ্র পরিচালিত বাঙলা প্রদেশের ছাত্র আন্দোলনে তিনি নিজেকে সম্পূর্ণ ভাবে বিলাইয়া দেন। তিনি তখন সুভাষচন্দ্রের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হন। আন্দোলন প্রত্যাহৃত হইলে ১৯২৩ সালে প্রকাশচন্দ্র বিদ্যাসাগর কলেজে দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে ভর্তি হইয়া পর বৎসর আই, এ, পরীক্ষায় ত্রয়োদশ স্থান অধিকার করেন। ১৯২৬ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে Economics অনার্সে বি, এ ও ১৯২৮ সালে উক্ত বিষয়ে এম, এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হইয়া স্বর্ণপদক লাভ করেন। ১৯২৯ সালে আইনের শেষ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে স্থান লাভ করেন। ইতিপূর্ব্বে আইনের প্রিলিমিনারী ও ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন। ১৯৩০ সালে তিনি কলিকাতা হাইকোর্টে Appellate বিভাগের অন্তর্ভুক্ত হন। ১৯৩২ সনে উহার আদিম বিভাগের এ্যাডভোকেটসীপ পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রথম হইয়া কয়েক বৎসরের মধ্যে নিজ দক্ষতায় উক্ত বিভাগে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হন। এই সময় তিনি ভারোশেসন সিটি ও বিদ্যাসাগর কলেজে অধ্যাপকরূপে কার্য্য করিতে থাকেন।

১৯২৫ সালের ১৬ই জুন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব পরীক্ষা-নিয়ামক রায়বাহাদুর নরেন্দ্রনাথ সেনের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী মনীষা দেবীর সহিত তিনি পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন।

১৯৫৪ সালে বিচারপতি শ্রীগোপেন্দ্রনাথ দাস অবসর গ্রহণ করিলে শ্রীমল্লিক কলিকাতা হাইকোর্টের অন্যতম বিচারক নিযুক্ত হন।

পাঠদশায় তিনি বিশ্ববিদ্যালয় পার্লামেন্টের সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন এবং অধ্যাপক সতীশ ঘোষ উহার তৎকালীন স্পীকার ছিলেন। খেলাধূলা অপেক্ষা পড়াশুনার প্রতি তাঁহার অধিকতর আগ্রহ ছিল। তিনি Y. M. C. A-র (ভবানীপুর) সম্পাদক ছিলেন এবং জি, এল, মেহতা, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মল্লিক প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা তথায় আমন্ত্রিত হইয়া বক্তৃতা দিতেন।

বিদ্যালয়-সহপাঠীদের মধ্যে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ বীরেন্দ্র গাঙ্গুলী, ভূতপূর্ব্ব ডেপুটী মেয়র শ্রীপূর্ণেন্দু বসু, কোল ডেভেলপমেন্ট করপোরেশনের অর্থবিষয়ক উপদেষ্টা শ্রীরমেন্দ্রনাথ বসু এবং কলেজ-সতীর্থদের মধ্যে মন্ত্রী শ্রীহুমায়ুন কবীর, কম্যুনিষ্ট নেতা শ্রীহীরেন্দ্র মুখার্জ্জি এম-পি ও সিভিলিয়ান শ্রীহিরণ্ময় ব্যানার্জ্জির নাম উল্লেখযোগ্য।

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র মল্লিক

আইনজীবী হিসাবে মামলা পরিচালনার সময় তিনি ডাঃ বিজন মুখার্জ্জি, শ্রীরূপেন্দ্র মিত্র, নাসিম আলি, মন্মথ মুখোপাধ্যায়, মিঃ বাক্‌লাণ্ড ও মিঃ প্যাংক্রিজের বিচার-পারদর্শিতায় মুগ্ধ হন।

জননী ৺চারুশীলা দেবী তাঁহার চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। কিন্তু স্নেহময়ী মাতার বিদ্যানুরাগ ও বিদ্বৎজনকে ভক্তি পুত্রকে বিদ্যাশিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করে। তজ্জন্য ১১২১ সালে কলেজ ত্যাগ করা সত্ত্বেও দুই বৎসর পরে তিনি পুনরায় পড়াশুনা আরম্ভ করেন। অগাধ মাতৃভক্তি ও আরাধ্যা মাতৃদেবীর অদৃশ্য আশীর্ব্বাদ যে তাঁহাকে যুগপৎ প্রভাবিত করিয়াছে—তাহা শ্রীমল্লিকের জীবনী পর্য্যালোচনা করিলে বুঝা যায়। আমার সঙ্গে তাঁহার গর্ভধারিণীর কথা বলিতে বলিতে প্রকাশচন্দ্র বিশেষ ভাবে অভিভূত হইয়া পড়েন। দেশের আইন সম্বন্ধে শ্রীমল্লিক মন্তব্য করেন যে, Simplification of Law হওয়া দরকার। সরকার প্রবর্ত্তিত Legal aid Society পত্তন সময়োচিত হইয়াছে বলিয়া তিনি মনে করেন। Law Commission মামলা পরিচালনা বাবদ প্রাথমিক ব্যয়বাহুল্য হ্রাস করার বিষয় বিবেচনা করিবেন, বলিয়া তিনি আশা করেন। কিন্তু বৃহৎ মামলায় বিবদমান পক্ষদ্বয় যে বিশিষ্ট আইনবিদদের নিযুক্ত করিয়া বর্দ্ধিত ব্যয় করিবেন, তাহাতে সরকার বা আইন-কমিশনের করণীয় কিছুই থাকিবে না বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন।

ডাঃ কৃপানাথ মিত্র

[ধাত্রীবিদ্যা বিশারদ ও মেডিকেল কলেজের ধাত্রীবিদ্যার অধ্যাপক]

ডাঃ কৃপানাথ মিত্র

আর্ত্ত মানবতার সেবায় আত্মনিয়োগ করে যাঁরা নিজেদের বিলিয়ে দিয়েছেন দেশের, সমাজের ও রাষ্ট্রের কল্যাণে, তাঁদের সংখ্যা পৃথিবীতে বিরল। এমনি একটি উৎসর্গীকৃত জীবন ডাঃ কৃপানাথ মিত্র। দেশের, সমাজের ও জনমানবের কল্যাণ সাধনই তাঁর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। অর্থ উপার্জ্জন যেমন জীবনে প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন দেশের, সমাজের ও রাষ্ট্রের কল্যাণ সাধন। তাই দেশের আর্ত্তমানবতার সেবা এবং রোগের নিরসন কল্পে গবেষণা করাই এই তরুণ পণ্ডিত চিকিৎসক তাঁর জীবনের ব্রত বলে গ্রহণ করেছেন। বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিক আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু, বিশিষ্ট সমাজসেবী রামতনু লাহিড়ী ছিলেন ডাঃ মিত্রের ঘনিষ্ঠ-আত্মীয়। আর্ত্তমানবতার সেবা ও সমাজের কল্যাণ সাধনের প্রেরণা পান ডাঃ কৃপানাথ এঁদের কাছ থেকেই উত্তরাধিকারসূত্রে। তাই আমরা দেখতে পাই ডাঃ মিত্রের জীবন ও ধারণা অন্যান্যদের চাইতে সম্পূর্ণ পৃথক।

ডাঃ মিত্রের স্ত্রীরোগ-বিশেষজ্ঞ ও ধাত্রীবিদ্যা বিশারদ হওয়ার পিছনে রহিয়াছে একটি করুণ ইতিহাস। বস্তুতঃ জীবনে ডাক্তারী ব্যবসায়ে লিপ্ত হওয়া কিম্বা চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করা তাঁর ইচ্ছা ছিল না। বরং এর বিরোধীই ছিলেন তিনি। কিন্তু জীবনে লোকে ভাবে এক, হয় অন্য রূপ। বাল্যকালে সন্তান প্রসবের সময় ডাঃ মিত্রের স্নেহময়ী মাতা মারা যান। এর পর থেকেই ডাঃ মিত্রের কিশোর মন এই চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রতি ধাবিত হয়। তাঁর পিতামহীর একান্ত ইচ্ছায় ডাঃ মিত্রকে চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হ'তে হয়। ডাঃ মিত্রের পূর্ব্বে তাঁর পরিবারের আর কেউ চিকিৎসা ব্যবসা অবলম্বন করেন নাই। মাতার মৃত্যুতে বালক কৃপানাথ গভীর শোকাভিভূত হয়ে পড়েন এবং ভবিষ্যৎ জীবনে তিনি স্ত্রীরোগ-বিশেষজ্ঞ এবং ধাত্রীবিদ্যাবিশারদ হওয়ার সঙ্কল্প গ্রহণ করেন, এই হলো তাঁর চিকিৎসা ব্যবসায়ে লিপ্ত হবার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

ছাত্রজীবনে ডাঃ মিত্র ছিলেন মেধাবী ছাত্র। মাত্র ৩১ বৎসর বয়সেই তিনি এম, ডি, এম, আর, সি, ও জি, এফ, আর, সি, এস ডিগ্রী লাভ করেন।

ডাঃ কৃপানাথের আদি নিবাস ছিল পূর্ব্ববঙ্গের ঢাকা জিলার বিক্রমপুরে, কিন্তু তাঁহাদের পরিবার প্রবাসী বাঙ্গালী হিসেবে পরিচিত। এই পরিবারের বসবাস বিহারের পাটনায়। পিতা স্বর্গতঃ অনন্তনাথ মিত্র পাটনাতেই বসবাস করতেন। পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল-কলেজেই ডাঃ মিত্রের প্রথম শিক্ষালাভ। তার পর উচ্চশিক্ষার্থে বিলাতে চলে যান। এডিনবরা ও অক্সফোর্ড বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন।

ইংরেজী ১১১৫ সালে বিহারের গিরিডিতে ডাঃ কৃপানাথ জন্মগ্রহণ করেন। ১১২১ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে পাটনা কলেজ থেকেই যথাক্রমে আই, এস-সি ও ১১৩৩ সালে বি, এস-সি পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। ১১৩১ সালে পাটনা মেডিকেল কলেজ থেকে এম, বি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং

চিকিৎসাবিদ্যায় গবেষণায় প্রবৃত্ত হন। ১৯৪৩ সালে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম, ডি ডিগ্রী লাভ করেন। তার পর স্ত্রীরোগ ও ধাত্রীবিদ্যায় উচ্চ শিক্ষালাভার্থে ইংলণ্ডে গমন করেন এবং লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হন। ১৯৪৫ সালে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম. আর. সি. ও. জি ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৪৬ সালে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এফ, আর, সি, এস হন। এই সময় তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত ধাত্রীবিদ্যার অধ্যাপক ডাঃ ময়ারের অধীনে শিক্ষালাভ ও গবেষণা করেন। দেশে এবং বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি কৃতী ও মেধাবী ছাত্র বলে বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন। ১৯৫৭ সালে ধাত্রীবিদ্যায় বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জনের জন্ত তিনি এফ, আর. সি, ও জি উপাধি লাভ করেন। তিনি বিভিন্ন মেডিকেল পত্র-পত্রিকায় বহু গবেষণা ও তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন এবং সেগুলো বিশেষ প্রশংসা লাভ করিয়াছে। ধাত্রীবিদ্যায় ডাঃ মিত্রের জ্ঞান ও পারদর্শিতা ভারতে ও ইউরোপের বহু স্থানে প্রশংসা লাভ করেছে। ডাঃ মিত্রের 'থিওরী' পাশ্চাত্য জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে ও বহু প্রখ্যাত জার্ণালে তা স্থান লাভ করেছে।

১৯৪৬ সালে তিনি ইউরোপ থেকে দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং চিকিৎসা ব্যবসায়ে লিপ্ত হন। ১৯৪৮ সালে তিনি লাক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে ধাত্রীবিদ্যার প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯৫০ সালে তিনি কলিকাতায় আসেন এবং কলিকাতা মেডিকেল কলেজের অনারারি ভিজিটিং সার্জ্জন হিসেবে যোগদান করেন। এ সময় তিনি ইডেন হাসপাতালের সহকারী সার্জ্জন ও অধ্যাপক ছিলেন। এই সময় ডাঃ মিত্রের বয়স মাত্র ৩২ বৎসর। ধাত্রী বিদ্যা বিশারদ ও স্ত্রীরোগ-বিশেষজ্ঞ হলেও এই বয়সই তখন তাঁর অধ্যাপকের পদ পাওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি করে। এজন্ত তিনি কলকাতা মেডিকেল কলেজ থেকে এ সময় সাময়িক ভাবে অবসর গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁর গবেষণা সমভাবেই চলতে থাকে। সাময়িক ভাবে কলকাতা মেডিকেল কলেজ থেকে অবসর নিলেও তিনি কলকাতার অন্ততম শ্রেষ্ঠ মাতৃসদন লোহিয়া হাসপাতালের সিনিওর সার্জ্জন হিসেবে যোগদান করেন। তিনি ধাত্রীবিদ্যার নূতন নূতন থিওরী আবিষ্কার করতে থাকেন। ১৯৫৫ সালে ডাঃ মিত্র পুনরায় ধাত্রীবিদ্যার অধ্যাপক হিসেবে কলকাতা মেডিকেল কলেজে যোগদান করেন। সেই থেকে অদ্যাবধি ইনি মেডিকেল কলেজের ধাত্রীবিদ্যার অধ্যাপক ও সার্জ্জন হিসেবে কাজ করে চলেছেন এবং মাঝে মাঝে তাঁর গবেষণার কাজও চলছে।

ডাঃ মিত্র গবেষণার কাজটাই বড় করে দেখে আসছেন। ধাত্রীবিদ্যায় নূতন নূতন বিষয়ের অবদান সম্পর্কে তিনি সর্ব্বদাই সচেতন এবং এ জন্তই তিনি কঠোর পরিশ্রম করে চলেছেন।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি নিরহঙ্কার, সদালাপী, বন্ধুবৎসল এবং দরিদ্রের বন্ধু। জীবনে অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ও গবেষণা এ কয়টি তাঁর অপরিহার্য্য অঙ্গ।

আমরা এই তরুণ পণ্ডিত চিকিৎসকের দীর্ঘায়ু কামনা করি। তিনি দীর্ঘ দিন বেঁচে থেকে দেশের, ও দশের আর্ত্তমানব-সমাজের কল্যাণ সাধন করুন।

শ্রীযুক্ত তারকনাথ ভট্টাচার্য্য

২৪ পরগণা জেলায় ভট্টপল্লীতে পণ্ডিতবংশে শ্রীযুক্ত তারকনাথ ভট্টাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ৺কৃষ্ণধন ভট্টাচার্য্য এবং মাতার নাম ৺নবকুমারী দেবী।

কৃষ্ণধন ভট্টাচার্য্য মহাশয় পুরুলিয়াতে কার্য্যব্যপদেশে বাস করিতেন। সেইখানে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে ১লা নভেম্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার যখন পাঁচ বৎসর বয়স সেই সময় ভাটপাড়ার নিজ বাড়ীতে ফিরিয়া আসেন এবং ভট্টপল্লীতেই মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ে পড়াশুনা আরম্ভ করেন। হুগলী কলেজিয়েট স্কুল হইতে ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মাসিক ১০ টাকা করিয়া বৃত্তি লাভ করেন।

নানা অসুবিধার মধ্য দিয়া ১৯২০ খৃষ্টাব্দে তিনি রিপণ কলেজ হইতে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। সেই সময় তাঁহার পিতৃদেব স্বর্গারোহণ করেন। এজন্ত তাঁহাকে পড়াশুনা ত্যাগ করিয়া চাকরীর চেষ্টা করিতে হয়। প্রতিযোগী পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া বঙ্গীয় সরকারের অর্থ বিভাগে করণিকের চাকরী গ্রহণ করেন। তাহার পর তাঁহার কার্য্যের যোগ্যতার জন্ত সরকার তাঁহাকে অর্থ বিভাগের ডেপুটি সেক্রেটারীর পদে উন্নীত করেন। ১৯৫৩ সালে মে মাসে Development Department-এ Financial Adviser-রূপে কার্য্যভার গ্রহণ করেন। এই সময় পশ্চিম-বাংলার উন্নতির জন্ত বহুপ্রকার চেষ্টা করিয়া সরকারের উদ্দেশ্য সাধনে সচেষ্ট হন। এই ব্যপদেশে তাঁহাকে বহু বার দিল্লী ও সিমলা প্রভৃতি স্থানে যাতায়াত করিতে হইয়াছে। বাজেট তৈয়ারীর ব্যাপারে তাঁহার মত দক্ষ লোক খুব কমই ছিলেন। ৬০ বৎসর বয়স হইলেও সরকার তাঁহাকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে আর্থিক উপদেষ্টা নিযুক্ত করিয়াছেন। এই বয়সেও তাঁহার কর্মদক্ষতা অসাধারণ!

শৈশবকাল হইতেই তাঁহার মধ্যে ধর্মপ্রাণতা বিদ্যমান। কথকতা, ভাগবত প্রভৃতি পাঠ হইলে তিনি সমস্ত কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া তাহা শুনিবার জন্ত উন্মুখ হইতেন। অনেক সময় যাত্রা শুনিতে যাইয়া সেখানেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। পিতা রাত্রিতে যাইয়া ছেলেকে লইয়া আসিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত তারকনাথ ভট্টাচার্য্য

সরকারের বড় চাকরী করিয়াও সাধু-সন্ন্যাসীর ন্যায় নির্লিপ্ত ভাবে জীবন যাপন করা প্রায়ই দেখা যায় না। ভট্টাচার্য্য

মহাশয়কে অন্ত সময় দেখিলে মনে হইবে না তিনি একজন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী। তাঁহাকে সাধারণ সাধু-সন্ন্যাসীর মতই মনে হয়। সংসারে থাকিয়াও সমস্ত কর্তব্য সমাপন করিয়াও নির্লিপ্ত ভাবে অবস্থানের তিনি এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। প্রায় ২০ বৎসর পূর্বে তিনি ভাটপাড়ায় 'সাধুআশ্রম' নামে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার উদ্দেশ্য সৎকথা আলোচনা ও জীবজগতের পারমার্থিক উন্নতি। বর্তমানে এই আশ্রমের ভক্তসংখ্যা প্রায় সহস্রাধিক। এই আশ্রমে প্রতি বৎসর পৌষ মাসে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের জন্মোৎসব উপলক্ষে ও বিশ্বকল্যাণের উদ্দেশ্যে বিরাট হোমযজ্ঞ সম্পন্ন করা হয়। তাহাতে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ও সাধু-সন্ন্যাসীকে নিমন্ত্রণ ও সম্বর্দ্ধনা করা হয়। ইহা ব্যতীত নিয়মিত ভাবে বিশ্বকল্যাণের জন্ত প্রতি মাসে শিবহোম ও নামযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। এই সাধুআশ্রম হইতে 'সাধু উপদেশ' তিন খণ্ড ও অন্তান্ত উপদেশাবলী প্রকাশিত হইয়াছে।

তাঁহার জীবনে বহু অলৌকিক ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে।

শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস

[গ্রন্থপ্রকাশক এবং সংবাদপত্রসেবী]

আত্মীয়-স্বজন ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রচুর বাধা দান সত্ত্বেও মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী-পরিবারের শিক্ষিত যুবকের সবেতন অধ্যাপনা বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া অনিশ্চিত আয়ের মুদ্রণ-শিল্পে আত্মনিয়োগ শ্রীসুরেশচন্দ্র দাসের দৃঢ়তার পরিচায়ক। একমাত্র অধ্যাপক ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব ভাইস-চ্যান্সেলার) শ্রীদাসের ছাত্রাবস্থায় নিজ গ্রন্থনিচয়ের প্রুফ দেখা ও নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করিবার সুযোগ দিয়া মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও গ্রন্থ-প্রকাশনার আকাঙ্খা অঙ্কুরিত করায় সাহায্য করেন বলিয়া তিনি মনে করেন।

শ্রীদাস ১১০৮ সালে ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণার রাজেরহাটী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কিছুদিন শান্তিনিকেতনে অবস্থানের পর বঙ্গবাসী কলেজিয়েট স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হন। সেখান হইতে ১১৩০ সালে বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতে সসম্মানে এম-এ পাশ করেন। ছাত্রজীবনে শ্রীদাস ডাঃ বিধুশেখর শাস্ত্রী, ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার ও অধ্যাপক (বর্ত্তমানে কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি) শ্রীফণিভূষণ চক্রবর্ত্তীর বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সক্ষম হন। ইহা ছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন অধ্যাপক জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, ডাঃ মেঘনাদ সাহা, শ্রীসত্যেন বসু প্রমুখ বৈজ্ঞানিকদের সহিত অল্পবিস্তর পরিচিত হইবার সুযোগ লাভ করেন।

শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস

এম-এ পরীক্ষার ফলাফল বাহির হইবার পরে, তিনি ঢাকা সলিমুল্লাহ কলেজে অধ্যাপক নিযুক্ত হন। কিছু দিনের মধ্যেই সরকারী শিক্ষা বিভাগে সুনিশ্চিত নিয়োগ পাওয়ার সংবাদ পাইয়া তিনি পূর্ব্বতন শিক্ষানিকেতন হইতে পদত্যাগ করেন কিন্তু শেষ মুহূর্ত্তে (তদানীন্তন শাসন কর্ত্তৃপক্ষের মুসলীম-প্রীতির ফলে) একজন মুসলমান অধ্যাপককে তৎপরিবর্ত্তে গ্রহণ করা হয়। পুনরায় সলিমুল্লাহ কলেজ হইতে আহ্বান আসা সত্ত্বেও চাকুরীতে বীতস্পৃহ সুরেশচন্দ্র তখন কলিকাতায় চলিয়া আসেন এবং ভ্রাতা অবিনাশচন্দ্র দাসের অর্থানুকূল্যে মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটে একটি ক্ষুদ্র ছাপাখানা চালু করিয়া বহু দিনের আন্তরিক আশা বাস্তবে রূপায়িত করার পথ খুঁজিয়া পান। এই সময় ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁহাকে নানারূপে সাহায্য করেন এবং ডাঃ সুশীলকুমার দে নিজস্ব কয়েকখানি গবেষণামূলক গ্রন্থ মুদ্রিত করান। উত্তরোত্তর কর্ম্মক্ষেত্র প্রসারিত হওয়ায় আসামের ভূতপূর্ব্ব কৃষি-ডিরেক্টর শ্রীযতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, ডক্টর দে'র স্ত্রী এবং শ্রীদাসের পরিচিত কয়েক জন অধ্যাপকের সক্রিয় সহায়তায় যৌথ কোম্পানীভুক্ত প্রেসটিকে ধর্ম্মতলায় 'জেনারেল প্রিণ্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স' নামে স্থানান্তরিত করেন।

এই স্থান হইতে শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাস 'নীলাঙ্গুরীয়', গল্প-গ্রন্থ 'বর্ষায়', 'বসন্তে', 'বরযাত্রী', ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার ও ডাঃ যদুনাথ সরকার সম্পাদিত 'History of Bengal', উহার বঙ্গানুবাদ 'বাংলা দেশের ইতিহাস', ডাঃ রাধাগোবিন্দ বসাক কৃত 'কৌটিল্যীয় অর্থশাস্ত্র', 'প্রাচীন ভারতে রাজ্য-শাসন পদ্ধতি', 'শাতবাহন নরপতি', 'গাথা সপ্তশতী', মোহিতলাল মজুমদারের 'আধুনিক বাংলা সাহিত্য', 'বিস্মরণী' প্রভৃতি বিশিষ্ট গ্রন্থসমূহ প্রকাশিত হয়। তন্মধ্যে কতকগুলি পুস্তক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত বাংলাদেশের বিশিষ্ট লেখকদের উপন্যাস, গল্পগ্রন্থ, অনুবাদ-সাহিত্য, শিশু-সাহিত্য ও প্রবন্ধ পুস্তক 'জেনারেল প্রিণ্টার্স' হইতে নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হইতেছে। প্রসঙ্গতঃ শ্রীদাস বলেন যে, পুস্তক-প্রকাশনার আয়োজনে তিনি যেমন একাধারে প্রদেশের মার্জ্জিত, রুচিবান ও প্রগতিশীল লেখকগোষ্ঠীর সহিত সংযুক্ত রহিয়াছেন, তেমন অন্তাধারে রুচিসম্পন্ন পাঠক-পাঠিকাদের চাহিদা অনুভব করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

বাংলাদেশের শিক্ষকমণ্ডলীর সাহচর্য্যে ১৩৪৭ সাল হইতে শ্রীদাস প্রদেশের শিক্ষা সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা 'বাংলার শিক্ষক' সম্পাদনা করিতেছেন।

পশ্চিম-বাংলার একমাত্র সান্ধ্য-দৈনিক 'ফ্রি-ল্যান্ড' ১১৫৪ সাল হইতে তাঁহার সম্পাদনায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

এতদ্ব্যতীত সুরেশচন্দ্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিভাগ, এসিয়াটিক সোসাইটী, বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদ, দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ মহামণ্ডল, ভারতীয় সংবাদপত্রসেবী-সঙ্ঘ প্রভৃতি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলির সহিত বহুদিন হইতে সংযুক্ত রহিয়াছেন।

১১২৮ সন হইতে নিয়মিত পাঠক হিসাবে শ্রীদাস জানান যে, বর্ত্তমানের উন্নত ও প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গীতে "মাসিক বসুমতী"র সম্পাদনা পাঠক-পাঠিকার নিকট যথেষ্ট আদৃত হইয়াছে। ব্যক্তিগত ভাবে তিনি উহার "সাহিত্য-পরিচয়" বিভাগটির উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

তিন

ভবানী মুখোপাধ্যায়

অভিনেত্রীদের সঙ্গে বার্ণার্ড শ'র কি ধরণের সম্পর্ক ছিল জানতে চেয়েছিলেন ফ্রাঙ্ক হ্যারিস। জবাবে শ' লিখলেন—

"তুমি ত' ভয়ানক লোক। অভিনেত্রীদের কাহিনী শুনতে চাও?—আমি যাঁদের দেখেছি মঞ্চের চাইতে মঞ্চের গণ্ডীর বাইরে তাঁরা আরো বড়ো। প্রকাশ্যে কিছু বলা অনুচিত, রঙ্গমঞ্চের আইনানুসারে মঞ্চের অন্তরালে যা ঘটে তা প্রকাশ নিষিদ্ধ।—ট্রির (বীয়রবোহম) মৃত্যুর পর তাঁর আত্মীয়বর্গ একটি স্মারক গ্রন্থ প্রকাশ করেন, আমিও একটি প্রবন্ধ লিখেছি, সেই প্রবন্ধে পর্দার আড়ালের কিছু তথ্য পরিবেশন করেছি।—ট্রি একবার আমার নিরামিষ ভোজন নিয়ে রহস্য করে মিসেস ক্যামবেলকে বলেছিলেন ওকে বীফস্টেক দিয়ে দেখা যাক কি হয়। এ কথায় স্টেলা বলেন—'দোহাই আপনার, অমন কর্ম করবেন না, এমনিই মানুষটি যথেষ্ট দুষ্ট, বীফস্টেক খাওয়া সুরু করলে লণ্ডন শহরের মেয়েদের নিরাপত্তা থাকবে না।' এই ঘটনাটি ছাপা হয়েছে, ছাপা যায়, কারণ এর সঙ্গে রঙ্গজগতের প্রত্যক্ষ যোগ নেই, আমরা কোনো কালে থিয়েটারে না এলেও এমনটি ঘটা সম্ভব।

নব্বই শতকে এলেন টেরীর সঙ্গে প্রায় আড়াইশো পত্র-বিনিময় ঘটেছে, প্রাচীনপন্থী যে কোনো মানুষের কাছে তা উন্মত্ত প্রেমপত্র মনে হবে, কিন্তু আমাদের উভয়ের বাসস্থানের ব্যবধান মাত্র এক শিলিং গাড়ি ভাড়া,—তবু কোনো দিন আমরা গোপনে মিলিত হইনি।—প্রথম যুদ্ধের আগে মিসেস ক্যামবেলের সঙ্গে এমনই ঘনিষ্ঠতা ঘটেছিল, The Apple Cart নাটকের ম্যাগনাস ও ওরিনথার মতো। আমি ছিলাম ম্যাগনাসের মত একনিষ্ঠ স্বামী, তার উক্তি 'Our strangely innocent relations' আমার ক্ষেত্রেও সত্য।"

বার্ণার্ড শ'র বন্ধুজনেরা কিন্তু অভিনেত্রীদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নিছক কামগন্ধহীন ছিল একথা বিশ্বাস করতেন না, 'strangely innocent'ও নয়। ম্যাগনাস ও ওরিনথার সংলাপের মধ্যে বার্ণার্ড শ'র জীবনের সংযোগ আছে, নাটকের প্রয়োজনে না হলেও নিজের প্রয়োজনে তাই নাট্যকার এই কথাগুলি লিপিবদ্ধ করেছেন, নীচের উদ্ধৃতিটুকু অর্থপূর্ণ—

"ম্যাগনাস। অসম্ভব প্রিয়তমে, জেসিমা প্রতীক্ষায় বসে থাকতে ভালোবাসে না।

ওরিনথা। তার কথা ভোলো, আমাকে ছেড়ে তুমি জেসিমার কাছে যেতে পারবে না।

(এমন জোরে ম্যাগনাসকে আকর্ষণ করল যে ম্যাগনাস পাশের আসনে পড়ে গেল।)

ম্যাগনাস। প্রিয়ে, আমাকে যে যেতেই হবে।

ওরিনথা। অন্ততঃ আজ নয়, শোনো ম্যাগনাস, তোমাকে দু'-একটা কথা বলার আছে।

ম্যাগনাস। কিছুই বলার নেই। উদ্দেশ্য আমার স্ত্রীকে বিরক্ত করা, তাই দেরী করিয়ে দিতে চাও। (উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা, ওরিনথা পুনরায় জোর করে বসিয়ে দেয়)—আমাকে যেতে দাও, করুণা করো।"

মিসেস প্যাট্রিক ক্যামবেল লিখেছেন—"বার্ণার্ড শ' যদিও আমার সঙ্গে এমন ভাবে কথা বলতেন যেন আমি ছাড়া আর কিছুই নেই; রাজনীতি আর সাহিত্য ছাড়া কোনো কিছুতে আগ্রহও ছিল না। কিন্তু নিজের পারিবারিক জীবনের স্থান ছিল সবার ওপর। পৃথিবী ধ্বংস হলেও সার্লোটকে দশ মিনিটের জন্য উৎকণ্ঠ প্রতীক্ষায় বসিয়ে রাখা চলবে না।"

The Apple Cart এর নিম্নোদ্ধৃত অংশে এই কথাটি আরো স্পষ্ট হবে—

"ম্যাগনাস। কিন্তু আমার স্ত্রী? আমার রাণী! জেসিমা বেচারীর কি হবে?

ওরিনথা। জলে ডুবিয়ে দাও। গুলী করো, কিংবা মোটর-চালককে বলো, সর্পিল পথে ছেড়ে দিয়ে আসুক। এই রমণী তোমাকে পরিহাসের বস্তু করে তুলেছে।

ম্যাগনাস। এসব আমি ভালোবাসিনে, লোকেও বলবে এ অতি অভব্যতা!

ওরিনথা। আহা! আমার কথা বুঝছো না, ডিভোর্স করো, তাকেই বরং সুযোগ দাও ডিভোর্স করার, এ ত সোজা! 'রণি' আমাকে এই ভাবেই বিয়ে করেছে। স্বাদ পালটানোর জন্য সবাই তাই করে।

ম্যাগনাস। জেসিমাহীন দিন আমার কল্পনাতীত।

ওরিনথা। আর সে থেকেই বা তোমার কি, তাও কেউ বুঝতে পারে না।"

হাইণ্ডহেডের 'ব্লেন-ক্যাথারা' নামক ভবনে ১৮৮৮-র নভেম্বর মাসে পিটফোলড থেকে শরীর সারানোর উদ্দেশ্যে গিয়েছিলেন বার্ণার্ড শ'। এসেই লিখেছিলেন—"একেবারে নতুন মানুষ হয়ে গেছি, এখানকার জল বাতাস, এমন কি—(কার কথা বলব?) সবাইকে নাট্যকার করে তুলবে।"

২রা ডিসেম্বর হেনরী আর্থার জোন্সকে লিখলেন—"এখন দেখা যাচ্ছে 'পা'টিকে অচল রাখার যে বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়েছিল—তার ফলে রোগী নিষ্ক্রিয়তার জন্য প্রায় মৃত্যুর মুখোমুখি

পৌঁছেছিল। গত সপ্তাহে বিশেষজ্ঞের কাছে গিয়ে বললাম, অবিলম্বে পায়ের হাড় এবং আক্রান্ত বুড়ো আঙুল কেটে বাদ দিয়ে দিন। দেখলাম একজন সার্জেনের পক্ষে তাঁর জ্ঞান প্রশংসনীয়, বিজ্ঞান ও শুভবোধের মধ্যস্থিত প্রকৃত সম্বন্ধ সম্পর্কে তিনি অবহিত। তিনি বললেন—তাঁর বুড়ো আঙুল হলে তিনি কিন্তু ভারমুক্ত হতেন না। তিনি বললেন স্পষ্টতঃ আমার স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়েছে, একেবারে ভেঙেপড়ার অবস্থা থেকে ক্রমশঃ সুস্থ হয়ে উঠছি, এবং কিঞ্চিৎ ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করলে হয়ত আর অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হবে না, খৃষ্টীয় বিজ্ঞানের বলেই সব সেরে যাবে, নয়ত অতি-তুচ্ছ ব্যাধি সামান্য অংশে সীমাবদ্ধ থাকবে। সুতরাং উপস্থিত প্রতীক্ষমান,—কিন্তু সখেদে জানাচ্ছি যে শারীরিক উন্নতির সমগ্র উৎসাহ আমি 'Caesar and Cleopatra' নাটকের চমকপ্রদ চতুর্থ অঙ্কে ব্যয়িত করেছি। ১৮৯৯-এর জানুয়ারী মাসের ৮ তারিখে লিখেছেন "ক্লিওপেট্রার ভূমিকা You Never Can Tell-এর Dolly-র ভূমিকার মতই চমৎকার।" এই চিঠিতেই তিনি জানিয়েছেন পা থেকে আবার পুঁয গড়াচ্ছে, আর এক টুকরো হাড় কেটে বাদ দিতে হবে।

ফরবেস রবার্টসন ও মিসেস প্যাট্রিক ক্যামবেলের দিকে লক্ষ্য রেখেই শ' এত উৎসাহ নিয়ে নাটকটি রচনা করলেন। এই বছরেই সর্বপ্রথম মিসেস ক্যামবেলকে চিঠি লিখেছিলেন। কিন্তু এই নাটকটি মঞ্চস্থ করা ব্যয়সাধ্য, তা ছাড়া বার্ণাড শ' তখনও পিনেরোর মত খ্যাতি অর্জন করেন নি। তাই ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে রচিত হলেও Caesar and Cleopatra ১৯০৭ এর আগে লণ্ডনে মঞ্চস্থ হয়নি। রবার্টসন এবং তাঁর সুন্দরী স্ত্রী গারট্রুড এলিয়েট মুখ্য ভূমিকায় অভিনয় করেন। এই নাটকটি সমালোচকদের মতে বার্ণাড শ'র নাটকাবলীর মধ্যে সর্বপ্রথম চমকপ্রদ রচনা।

এর আগে যে-সব নাটক রচনা করেছেন, সেই নাটকগুলির চরিত্রাবলীর আদর্শ অস্পষ্ট এবং আচ্ছন্ন। সেগুলির উদ্ভব পরিস্থিতি জনিত। পরিস্থিতি তাদের সৃষ্টি করেনি। কিন্তু এই নাটকের নায়ক একটা স্পষ্ট মনোবৃত্তির অধিকারী। আদর্শের তিনিই জনক, তাঁর খেয়াল মত সেই আদর্শের প্রয়োগ ও প্রক্ষেপ।

ঐতিহাসিক নাটকের বর্ণাঢ্য জৌলুশ থেকে মুক্ত করে শ' তাকে রূপায়িত করলেন পালিশহীন সাদা রঙে। এই কারণে 'Fictional Biography' তিনিই প্রবর্তক। এই জাতীয় জীবনীতে পাঠক সবিস্ময়ে আবিষ্কার করলো যে, মহাজনরা আসলে আমাদের মতো রক্তে-মাংসে গড়া মানুষ মাত্র। তবে বার্ণার্ড শ'র সব কিছুই অসাধারণ, সস্তার প্যাঁচ বা কৌশলের মোহে তিনি এই আঙ্গিক ব্যবহার করেন নি। পাদপীঠ থেকে 'বীরপুরুষ'কে মাটিতে নামিয়ে এনে দেখিয়েছেন পাথরের মূর্তি বা উপকথার চরিত্রের চেয়ে 'রক্ত-মাংসের মানুষ' অনেক বড়ো, অনেক মহৎ। শ' বলতে চেয়েছেন পাথরের মূর্তিদেরই মহৎ মানব বলা চলে না, আসলে তারা নির্বোধ চরিত্রের অতিরঞ্জন। বার্ণার্ড শ'র প্রতিপাদ্য প্রকৃত মহৎ চরিত্রের আকৃতি ও প্রকৃতি হয়ত তুচ্ছ এবং অতি সাধারণ হতে পারে, কিন্তু তার অসাধারণত্ব গভীর বাস্তবতায় নির্ভরশীল। বার্ণার্ড শ'র ঈজিপ্সীয় ও অষ্ট্রিয়ান নায়কদের চরিত্রে আছে মেলোড্রামার নায়কের অবাস্তবতা ও সম্ভ্রমবোধ।

শ'র ঐতিহাসিক নাটক তাই অন্তর্মুখী মেলোড্রামা। আবেগ-প্রধান, রোমাণ্টিক, গীতিবহুল বা বিরলগীতি নাটকের নাম মেলোড্রামা, বাংলায় নামকরণ করা হয়েছে মিলনান্তক।

সমালোচকরা বলেন Cæsar and Cleopatra এই জাতীয় মেলোড্রামা। তাঁর নায়ক কিন্তু এই জাতীয় নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাতে উদাসীন। আত্মপ্রতিষ্ঠায় সে নিরাসক্ত, প্রেমে বীতশ্রদ্ধ। এই পঞ্চাঙ্ক নাটকের নায়ক সেভিয়ান বাদী আর নায়িকা ক্লিওপেট্রা প্রতিবাদী। সীজর ছাত্র, ক্লিওপেট্রা ছাত্রী। যাঁরা শ'র Candida, The Devil's Disciple, and Captain Brassbound's Conversion প্রভৃতি পড়েছেন, তাঁদের কাছে এই ব্যাপার বিস্ময়কর নয়। ক্লিওপেট্রা মার্চব্যাঙ্কস, এনডারসন এবং ব্রাসবাউণ্ডের মত ধীরে ধীরে বিকশিত হলেও, শিশুর মত সুরু করলেও সীজারের প্রভাবে ক্লিওপেট্রা নারীত্বের পূর্ণ গরিমায় বিকশিত হয়ে ওঠে। তার শক্তি সীমাবদ্ধ, প্রকৃতিতে দুর্বল, এবং তার বিকাশের গতি নাট্যকারের মতে From a Kitten to Cat :—

এই নাটক সম্পর্কে বার্ণার্ড শ' তাঁর বন্ধু হেনকেথ পীয়রসনকে লিখেছেন—"এই জাতীয় নাটকই সেক্সপীয়ারের মতে ইতিহাস, ইতিবৃত্তমূলক নাটক। ইতিবৃত্ত অংশটুকু মমসেন থেকে আমি পুরোপুরি গ্রহণ করেছি। অন্য গ্রন্থও পড়েছি, প্লুটার্ক থেকে ওয়ার্ড-ফাউলার। প্লুটার্ক সীজারকে ঘৃণা করতেন। আমি যে ভাবে পরিবেশন করেছি মমসেন সীজারকে সেই ভাবেই রূপায়িত করেছেন। সীজারের মিশর গমন সংক্রান্ত ঘটনা বিশ্বাসীর মন নিয়ে মমসেন লিখেছেন, অন্য ঐতিহাসিকরা তা করেন নি। সেক্সপীয়র যে ভাবে প্লুটার্ক বা হলিনহেডকে আশ্রয় করেছেন, আমি ঠিক সেই ভাবেই মমসেনকে ধরেছি। সীজার হত্যা যে ইতিহাসের জঘন্যতম হত্যাকাণ্ড তা গ্যয়টের উক্তি থেকে অনুমান করি, আমার ধারণা তিনিও মমসেন—শ'র দৃষ্টিভংগীতেই সীজারকে বিচার করেছেন। যখন এই নাটক রচনা করেছি তখন আমার বয়স চুয়াল্লিশ বা তার কাছাকাছি, এখন মনে হয়, বিষয়ের গুরুত্ব অনুসারে সে বয়সটা কিঞ্চিৎ অপরিণত। তবে কাঁচা হাতের লেখা হলেও সাহিত্যকর্ম হিসাবে মন্দ হয়নি।"

স্পষ্ট করে শ' বলেছেন 'Three Plays for Puritans' নীতিবাগীশদের জন্য, কারণ নীতিগত ভিত্তি মেলোড্রামার বিরোধী, সুতরাং 'anti-erotic'। উইলিয়াম আর্চার অভিযোগ করেছেন, বার্ণার্ড শ' 'obsessed with sex' (যৌন-প্রভাবে আচ্ছন্ন) কথাটা একেবারে তুচ্ছ নয়। এই তিনটি নাটকেই 'ক্যানডিডা'র মতো একই প্রকৃতির 'Love interest,' বা প্রেম-কৌতূহল। কেন্দ্রীভূত এই নাটকাবলীর কেন্দ্রীভূত উপজীব্য। লেডী সিসিলি ব্রাসবাউণ্ডের প্রেমে পড়ো-পড়ো, জুডিথ ডিক ডজিয়নের প্রেমে আকুল আর সীজার ও ক্লিওপেট্রার কাহিনী আলেকজান্দ্রিয়ার সর্বত্র কানাকানি হচ্ছে। কিন্তু এই তিনটি নাটকেই কামদেবকে স্তম্ভিত করা হয়েছে। লেডী সিসিলি ঘণ্টার সাহায্যে পরিত্রাণ পেলেন, জুডিথের কামনা অপরিপূর্ণ রইলো, সে অবশ্য কোনো মতে নিষ্কৃতি

গেল, আর ক্লিওপেট্রা বোঝে সীজার প্রেমের গণ্ডীর অনেক উর্দ্ধে, প্রেমাতীত। যাই হোক বার্ণার্ড শ'র এই শেষোক্ত নাটকেই রোমান্টিক প্রেমের সকল পরিণতির একটা ইঙ্গিত আছে। মার্ক এন্টনি ষ্টেজে আবির্ভূত না হলেও নাটকের চার পাশেই বিচরণশীল, সীজারের মৃত্যুর সম্ভাবনাময় ভীষণ ভবিষ্যৎ, আর এন্টনির রোমান্স, নাটকটিকে সফল করেছে।

রুফিওর হাতে নেতৃত্ব দিয়ে, ক্লিওপেট্রাকে মিশরের রাণী হিসাবে রেখে সীজার যখন চলে গেলেন, তখন তিনি অনুভব করেছিলেন মৃত্যু তাঁর জন্ম প্রতীক্ষমান। সীজারের মুখ দিয়ে নাট্যকার বলেছেন—

"To the end of history murder shall breed murder, always in the name of right and honour and peace, until the Gods are tired of blood and create a race that can understand."

এই উপলব্ধিটুকুই নাটকের আভ্যন্তরীণ সংঘাতের চূড়ান্ত পরিণতি। গোড়ার দিকের দৃশ্যাবলীতে সীজার 'মিশ্র বীরপুরুষ' Sphinx-এর মতো 'part-brute, part-woman and part-God—' (অংশত: বর্বর, কিঞ্চিৎ স্ত্রী-সুলভ আবার কোথাও দেবতা), প্রয়োজনের খাতিরে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন সীজার। পাঠাগারে যখন অগ্নিদগ্ধ হল তখন সীজার যে ঔদাসীন্য দেখালেন, তাতে মনে হয়, ইতিহাসের প্রতি ইতিহাসস্রষ্টার নিদারুণ অবজ্ঞা। দ্বিতীয় অঙ্কে সীজার এবং থিওডেটসের মধ্যে আবেগময় কথোপকথনের মধ্যে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। দার্শনিক থিওডেটাস সম্রাট সীজারকে অনুরোধ করছেন আলেকজান্দ্রিয়ার পাঠাগারকে আগুনের হাত থেকে রক্ষা করুন। সীজার অনুরোধ রক্ষায় অসম্মত। থিওডেটাস তবু অনুনয় করছেন—অবনত হয়ে—"Caesar once in ten generations of men, the world gains an immortal book."

অবিচলিত সীজার উত্তরে বললেন—"If it did not flatter mankind, the common executioner would burn it."—

অনেক যুক্তিতে সাফল্য লাভ না করে বিরক্ত ও হতাশ থিওডেটাস বলেন—"What is burning there is the memory of mankind."

সীজার তেমনই নির্লিপ্ত অচঞ্চল কণ্ঠে জবাব দেন—"Shameful memory, let it burn".

থিওডেটাস বলেন—"Will you destroy the past?"

উত্তরে সীজার বললেন—"Ay, and Build the future with its ruins."

Man and Superman নাটকের জন টানার কিঞ্চিৎ আচ্ছন্ন প্রকৃতির। এই হয়তো তার স্বাভাবিক চরিত্র নয়, Life-forceএর প্রভাবেই সে স্তিমিত। তারই নির্দেশে কাজ করে যায়!

জুলিয়াস সীজারের একটা নিজস্ব উদ্দেশ্য আছে। পুরুষত্ব তার করায়ত্ত। তার উক্তিও তাই গর্বোদ্ধত।

সীজার সম্পর্কে এইচ, জি, ওয়েলসের ধারণা বিভিন্ন, তাঁর মতে 'Caesar had the megalomania of a common man.'

আর বার্ণার্ড শ'র সীজার বলেছেন—"I am he whose genius you are the symbol; part-brute, part-woman and part-God—nothing of man in we at all. Hare I guessed your sceret, Sphinx?

ওয়েলস যাই বলুন, বার্ণার্ড শ' মমসেনকে আশ্রয় করেছেন। আর মনে হয় সেক্সপীয়ারের Julius Caesar তাঁর মনে অসন্তোষ জাগিয়েছে, তাই শ' আপন মনের মাধুরী দিয়ে নিজের প্রতিচ্ছায়ার ইতিহাস ও কল্পনার খাদ মিশিয়ে সীজারের ছবি এঁকেছেন। শ' এক জায়গায় বিরক্ত হয়ে বলেছেন—"সেক্সপীয়ার মানব-চরিত্রের দুর্বলতা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন, কিন্তু সীজার জাতীয় মানুষের মানবিক শক্তির প্রাচুর্য সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান সীমাবদ্ধ।"

পরবর্তী জীবনে বার্ণার্ড শ' কিন্তু এ কথাও বলেছেন যে, 'greatest man that ever lived' এই নাটকে সেই চরিত্র রূপায়িত করার চেষ্টা করেছি একথা যদি বলে থাকি, তাহলে তা আমার পক্ষে নির্বোধের মত উক্তি হয়েছে।"

চেষ্টারটন বলেছেন শাদা-কালোর রেখাচিত্র হিসাবে জুলিয়াস সীজারের এমন প্রতিকৃতি আর হয়নি।

এই নাটকের প্রথম তিনটি অঙ্কে সীজার-চরিত্র ক্রমশ: বিকশিত হয়েছে আর ক্লিওপেট্রা ধীরে ধীরে প্রাণের ঐশ্বর্যে অধিকারিণী হয়েছেন। শেষ দুই অঙ্কে ক্লিওপেট্রা রীতিমত পরিণত চরিত্র, বাদী ও প্রতিবাদী মনের সংঘাত থেকে আপনাকে মুক্ত করার জন্ম সে সচেষ্ট হয়ে উঠেছে। দু'জন ঘাতককে ভাড়া করে নিজের প্রতিশোধ প্রবৃত্তির সমর্থনে ক্লিওপেট্রা বলে···"যদি দেখা যায় যে আলেকজান্দ্রিয়ার একজন মানুষও বলে যে আমি অন্যায় করেছি তাহলে আমার প্রাসাদদ্বারে আমারই ক্রীতদাস দ্বারা আমি ক্রুশ-বিদ্ধ হয়ে মরবো।"

উত্তরে সীজার বলেন—"তুমি অন্যায় করেছ, একথা বলার মানুষ যদি পৃথিবীতে খুঁজে পাওয়া যায়, তাহলে তাকে হয় আমার মত পৃথিবী জয় করতে হবে আর নয় ক্রুশবিদ্ধ হতে হবে।"

মেগালোম্যানিয়া সম্পর্কে প্রচলিত ধারণার উর্দ্ধে দুটি জিনিষ উঠতে পারে—প্রতিহত করার পক্ষে যে মানুষ অত্যন্ত শক্তিধর অথবা যে মানুষ অতি দুর্বল মনোবৃত্তির অধিকারী। হয় সর্বজয়ী শাসক নয় সাধক। যেমন সীজার এবং যীশুখৃষ্ট। সমালোচকদের মতে এই গ্রন্থ তাই এই কাল পর্যন্ত বার্ণার্ড শ'র পক্ষে প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা।

চার

১৮৯৯এর বসন্তকালে বার্ণার্ড শ'র পায়ের ক্ষতের চিকিৎসা বন্ধ করা হল। আশ্চর্য! ক্ষত ক্রমশ: সেরে উঠতে লাগল! এই বছরেই ওরা যে এলেন টেরীর উদ্দেশ্যে একটি নাটক রচনা সুরু করলেন।

এত দিন ধরে এলেন তাঁকে যে সব চিঠি লিখেছেন এবং মঞ্চে তাঁর অভিনয়াদি দেখে এলেনের এই চরিত্র চিত্রণ করেছিলেন

শ'। বন্ধু কেনেথ পীয়ারসনকে এই নাটক সম্পর্কে শ' লিখেছেন—

"Captain Brassbound's conversion আমার Blanco Posnet-এর মত ধর্মীয় বিষয়বস্তু. এলেন টেরীর জন্ত নাটকটি লিখেছিলাম। যখন এলেনের প্রথম দৌহিত্র জন্মাল তখন তিনি বলেছিলেন এখন আমি দিদিমা হলাম, কে আর আমার জন্ত নাটক লিখবে? আমি বলেছিলাম আমি লিখব। তারই ফলে Brassbound রচিত হয়েছিল।"

সেই কালে নাটকের কপিরাইট সম্পর্কে এক বিচিত্র আইন ছিল। নাট্যসত্ত্বের অধিকারী হতে হলে নাটকের অভিনয় হওয়া প্রয়োজন, সে অভিনয় রিহার্সেলহীন দ্রুতপঠনও হতে পারে, একজন মাত্র দর্শক যদি এক গিনি মূল্যের টিকিট কিনে সে অভিনয়ে উপস্থিত থাকেন, তাহলে নাটকের কপিরাইট বজায় থাকতো। এলেন আর্ভিংয়ের সঙ্গে আমেরিকা যাত্রার প্রাক্কালে লিভারপুলের এক রঙ্গমঞ্চে 'Captain Brassbound's conversion' কপিরাইট মর্যাদা দান করলেন। এই অভিনয়, রজনীতে এলেনের বিশ্বাস হল, এই নাটক অভিনয়যোগ্য, Drink Water এর ভূমিকাটি বিশেষ আনন্দদায়ক।

কিন্তু পরে আমেরিকা থেকে চিঠি লিখলেন যে, এখন এই বই করা সম্ভব নয়, মঞ্চ থেকে অবসর নেওয়ার আগে দু'-চারটি জনপ্রিয় নাটকে অভিনয় করে কিছু অর্থ সংগ্রহ করা চাই। যদি অথর্ব হয়ে পড়ি আমার নাবালক ছেলে-মেয়েরা আমার এই সামান্ত সঞ্চয় নিয়ে ছিনিমিনি খেলবে। দারিদ্র্যে আমার বড় ভয়—

বার্ণার্ড শ' সবচেয়ে বেশী ভয় করতেন দারিদ্র্য, এই বস্তুটির স্বাদ তাঁর অজানা নয়। তিনি বললেন—"বেশ Brassbound মঞ্চস্থ হবে না, প্রয়োজন উপস্থিত হলেই দেখি তুমি লাইসিয়াম থেকে আর আপনাকে মুক্ত রাখতে পারো না—অনেক স্বপ্ন বাতায়নপথে বিসর্জন দিয়েছি, আর এক-আধ বার অপমৃত্যুতে কি এসে যায়—"

কিন্তু দিন আগত ঐ, শ'র নাটক ক্রমশঃ বিদগ্ধজনের চিত্ত জয় করছিল। Captain Brassbound's Conversion এবং শ'র অন্তান্ত নাটক বিখ্যাত রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হতে লাগল। অচিরেই পৃথিবীর সর্বত্র নাট্যকার ও সাহিত্যসাধক হিসাবে জর্জ বার্ণাড শ'র স্বীকৃতি ও প্রতিষ্ঠা হল। তাঁর জীবদ্দশায় এই জনপ্রিয়তা ও খ্যাতি অম্লান হয়নি, আজও নয়।

John Bull's Other Island নাটকের অভিনয় দেখে আর্ল বালফুর (তখন মিঃ আর্থার বালফুর) এমনই অভিভূত হয়েছিলেন যে, সমসাময়িক রাজনীতিকদের তিনি এই নাটক দেখতে অনুরোধ করেন। এই নাটকের অভিনয় অজ্ঞাত এক দেশ সম্পর্কে নিজেদের জ্ঞান বৃদ্ধি করতে উপদেশ দেন। সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের জন্ত একটা বিশেষ অভিনয়ের ব্যবস্থা হল।

এত দিনে বার্ণাড শ'র কণ্ঠে বিজয়ীর জয়মাল্য।

আরও একটু মজার চমকপ্রদ ইতিহাস আছে এই নাটকের।

এই বছরের সাতই জুলাই নাটক লেখা শেষ হল, বার্ণাড শ' নাটকের নামকরণ করলেন—"The Witch of Atlas"। বার্ণার্ড শ' ব্যস্ত, কপিরাইট ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করতে হবে। সার্লেট ব্যস্ত, বার্ণার্ড শ'র হস্তাক্ষর উদ্ধার করে টাইপ করে নাটকটির কপি করতে হবে, এবং এই মাসের শেষের দিকে এলেন টেরীর হাতে নাটকটি পৌছাল।

পয়লা আগষ্ট বার্ণার্ড শ' নাটকটির নাম পরিবর্তন করে স্থির করলেন, কিঞ্চিৎ কুৎসিত হলেও "Captain Brassbound's Conversion" চমকপ্রদ হবে।

এলেনকে শ' জানালেন—"এ তোমার নাটক। আমার ক্ষমতায় যতটুকু সম্ভব তা করেছি।" তার পর জানিয়েছেন—"কিন্তু এই পর্যন্ত। আর নাটক নয়, শ'র দর্শন, রাজনীতি এবং সমাজনীতির জন্ত কিছু কাজ করার সময় এসেছে। প্রিয়তমে এলেন, সাধারণ নাট্যকারের চাইতে কিছু অতিরিক্ত হওয়া উচিত তোমার নাট্যকারের।"

তিন দিন পরে এলেন কিন্তু জানালেন, এ নাটক তাঁর উপযুক্ত নয়, লেডী সিসিলির পার্টটা বরং মিসেস প্যাট্রিক ক্যাম্বেলকে দেওয়া হোক।

অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হলেন বার্ণার্ড শ'। তিনি আশা করেছিলেন, এলেন টেরী এই ভূমিকাটি লুফে নেবেন—চমৎকার মানাবে। শ' বিরক্ত হয়ে জানালেন, "বোঝা যাচ্ছে আধুনিক রঙ্গমঞ্চ সম্পর্কে আমার কিছু করণীয় নেই, নতুন সমাজ গড়তে হবে, আমার কলম দিয়ে সমাজ দর্শক, অভিনেতা সবই সৃষ্টি করতে হবে।"

বিস্মিত এলেন জানালেন—"আমি ত' বুঝিনি তুমি লেডী সিসিলির চরিত্র আমার জন্তই তৈরী করেছ।"

আরো চটলেন বার্ণার্ড শ'। দীর্ঘ এক পত্র লিখলেন এলেন টেরীকে, "এই রমণী তুমি ছাড়া আর কে? কে এই নির্বোধ, আত্মসচেতন, তোমার মত গ্লামার বিহীন বালিকা অভিনেত্রী?"

এই চিঠির কঠোর ভাষায় দুঃখিত এলেনের চোখে জল এসেছে। তিনি আজ অসুস্থ। পরে তিনি জানিয়েছেন, আমার যে দাসীটি নাটকটি পাঠ করে শুনিয়েছিল সে বলেছিল, লেডী সিসিলি একটুকু আমার মত নয়, একদিন দরিদ্র-পল্লীতে বেড়ানোর সময় দাসীর চোখে এক বিচিত্র ভঙ্গী দেখলাম। ভাবলাম, মজার কিছু দেখেছে। পরের সপ্তাহে এক খোপদুরস্ত ভদ্র জনতার মধ্যেও আবার সেই দৃষ্টি দাসীর চোখে। প্রশ্ন করলাম ব্যাপার কি? দাসী অতিকষ্টে হাসি চেপে বলল—"মাফ করবেন, লেডী সিসিলি ঠিক আপনার মত!"

এলেন বার্ণার্ড শ'র অনুমতি চাইলেন নাটকটি আর্ভিংকে পড়ানোর জন্ত।

শ' জানতেন আর্ভিং কিছুতেই এই নাটক পছন্দ করবেন না। তবু এলেনকে খুসী করার জন্ত একটি দীর্ঘপত্রে রয়্যালটি, পার্সেন্টেজ প্রভৃতি লিখলেন। এলেন আর্ভিংকে অনেক অনুরোধ করলেন। কিন্তু আর্ভিং বললেন—"এ যেন কমিক অপেরা।"

এই সময়েও শ' অসুস্থ, কর্ণওয়ালে রোগশান্তির পর বিশ্রামরত। প্রতিদিন দু'বার স্নান করতেন। সাঁতার কাটতে অতিশয় ভালোবাসতেন শ', যেমন ভালোবাসতেন পায়ে হেঁটে বেড়াতে, শুধু সাঁতার কাটার জন্তই এই ধরণের ব্যায়াম তিনি নির্বাচন করছিলেন।

এলেন যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলেন আর্ভিংকে রাজী করানোর, একদিনে লেডী সিসিলির ভূমিকাটি তাঁর ভারি ভালো লেগেছে।

এ্যাফেল টাওয়ার (প্যারিস)

—সুধাংশু চক্রবর্ত্তী

আলোক চিত্র

ইটকশ্রেণী

—সুপ্রিয় সেনগুপ্ত

জ্ঞানান্বেষক —রথীন রায়
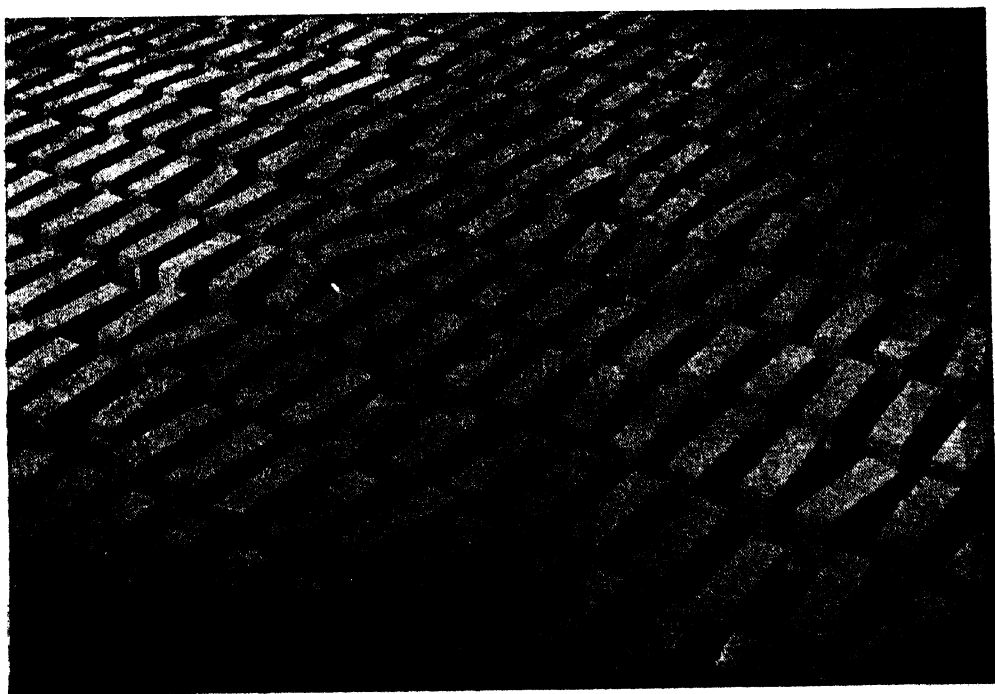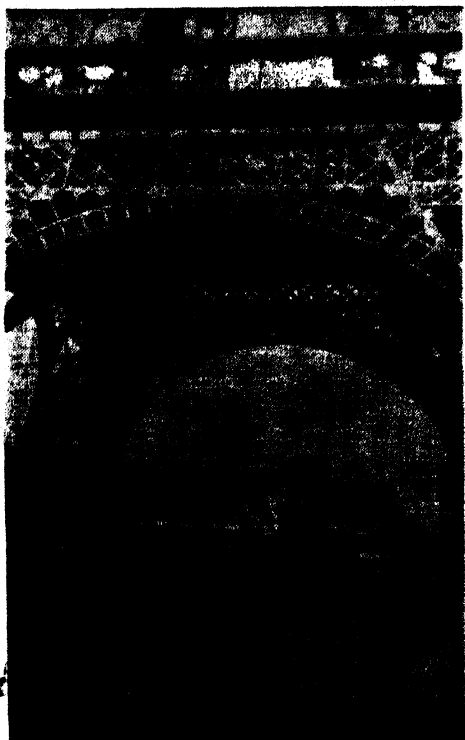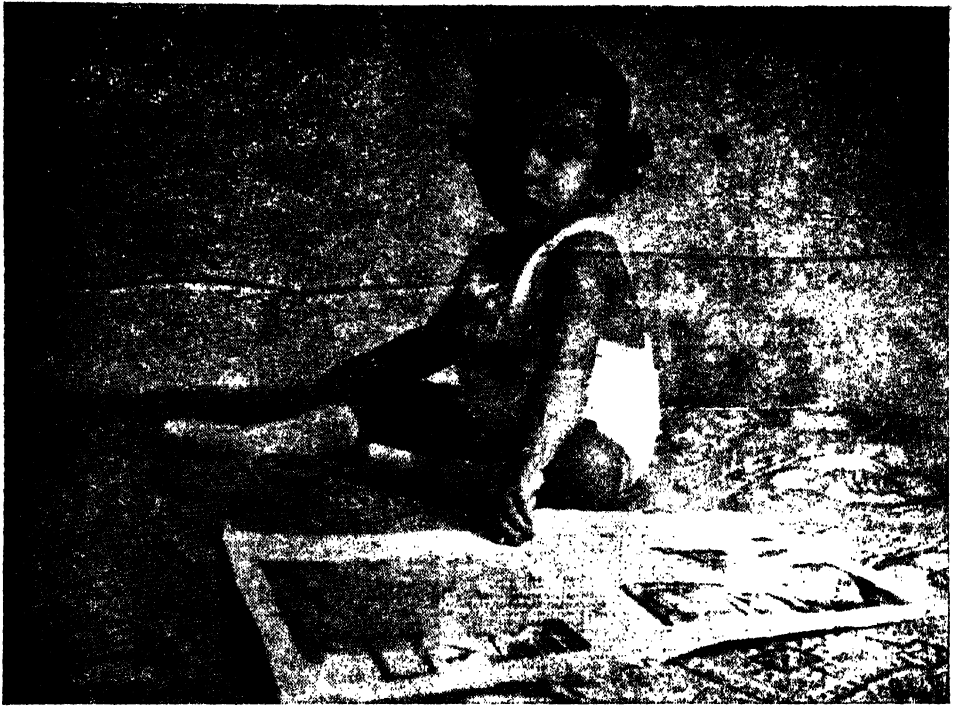
সাঁকো —তপনকান্তি দাস

উজবেকস্তান প্যাভিলিয়ন

মস্কো বিমান বন্দর

—রমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় গৃহীত

আজারবাইজান কন্যা

উজবেক সুন্দরী

ভবিষ্যৎ

—রতন দাশগুপ্ত

জে, বি, প্রিষ্ট্‌লে
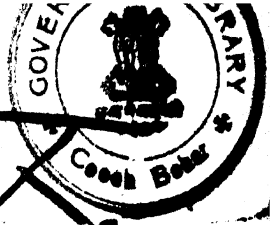
[পর্দা উঠলে দেখা যায়, নিস্তব্ধ মঞ্চের বুকে থম্‌থমে অন্ধকার। হঠাৎ শোনা যায় রিভলবারের শব্দ—ঈষৎ চাপা। তার পরই স্ত্রী-কণ্ঠের একটা মর্মান্তিক আর্তনাদ। মুহূর্তের নিস্তব্ধতা। তার পর একটানা ফোঁপানির শব্দ। অগ্নিকুণ্ডের পাশের সুইচ্ টিপে আলো জ্বেলে দিতে দিতে যেন ঈষৎ বিদ্রূপের সুরেই ফ্রেডা বলে, 'ব্যস্।' নিখুঁত একটি ড্রইংরুম ঝলমল করে ওঠে আলোয় আর সেখানে রয়েছে :

সুন্দরী ফ্রেডা, বছর তিরিশেক বয়সেও রয়ে গিয়েছে প্রাণচঞ্চল। কয়েক মুহূর্ত সে দাঁড়িয়ে থাকে অগ্নিকুণ্ডের পাশে।

অলওয়েন, ফ্রেডারই সমবয়সী। যেমন ধীর-স্থির, তেমনি তার মর্য্যাদাবোধ। অগ্নিকুণ্ডের পাশেই একখানা চেয়ারে সে বসে রয়েছে।

বেটিকে বলতে হবে খুবই সুন্দরী। আর বয়েসটাও তার খুবই কম। একটা সোফায় ঠেস দিয়ে সে বসে রয়েছে অলসভঙ্গীতে।

মিস মকারিজ, মহিলা-ঔপন্যাসিক। মাঝবয়েসী, চতুরা আর পোষাক-পরিচ্ছদও তদনুযায়ী। একখানা চেয়ার জাঁকিয়ে তিনি বসে রয়েছেন ঘরের মাঝখানে।

পরনে তাদের সবারই সান্ধ্য পোষাক। টেবিলের উপরকার যন্ত্রটা থেকে বোঝা যাচ্ছে সবাই তারা রেডিও শুনছিলেন আর অপেক্ষা করছিলেন পুরুষদের জন্য।

ফ্রেডা এগিয়ে যাচ্ছিল রেডিওটা বন্ধ করে দিতে। আর ঠিক তখুনি শোনা গেল ঘোষকের গতানুগতিক কণ্ঠস্বর : বৃটিশ ব্রডকাষ্টিং—এতক্ষণ আপনারা যে নাটকখানি শুনলেন, তার নাম হচ্ছে 'ঘুমন্ত কুকুর।' আটটি দৃশ্যে সমাপ্ত এই নাটকখানি লিখেছেন—মিঃ হামফ্রে চৌরাট্।]

প্রথম অঙ্ক

ফ্রেডা। (রেডিওটার দিকে যেতে যেতে) ও-রকম একটা কিছুই আশা করেছিলাম। তা, আপনার খুব খারাপ লাগেনি ত', মিস মকারিজ ?

মিস মকারিজ। না, না, মোটেই না।

বেটি। আমার কিন্তু এই সব রেডিও নাটক একটুও ভাল লাগে না—কেমন যেন ন্যাকামি বলে মনে হয়। তার চেয়ে নাচের বাজনাই ভাল ; আর গর্ডনের মতও ঠিক তাই।

ফ্রেডা। তা যা বলেছ ! জানেন মিস মকারিজ, আমার ভাই গর্ডন। একবার যদি রেডিও নিয়ে বসে—উঃ তাহলেই হয়েছে ! অনবরত নাচের বাজনার খোঁজে ডায়াল ঘুরিয়ে চলবে।

বেটি। তা সে যাই বলো, ঐ সব গুরুগম্ভীর বক্তৃতার চেয়ে, সে বরং অনেক ভালো। আমি ত ওরকম কিছু শুরু হলেই টুক করে সুইচটা বন্ধ করে দি।

মিস মকারিজ। নাটকখানার নাম দিলেন কি ?

অলওয়েন। 'ঘুমন্ত কুকুর।'

মিস মকারিজ। কেন, ঘুমন্ত কুকুর কেন ?

বেটি। মানে, তাকে ঘুম পাড়িয়ে রাখাই নিরাপদ।

ফ্রেডা। কা'কে ঘুম পাড়িয়ে রাখা ?

বেটি। কেন—সত্যকে ? শুনলে না কে বলছিল নাটকখানার চরিত্রগুলো সবাই নাকি প্রথমে মিথ্যে কথা বলছিলো।

মিস মকারিজ। ক'টা দৃশ্য যেন আমরা শুনতে পাইনি ?

অলওয়েন। বোধ হয় পাঁচটা।

মিস মকারিজ। ও, তাহলে হয়তো ঐ পাঁচটা দৃশ্য পর্য্যন্ত তারা মিথ্যে কথা বলছিলো, আর সেই জন্যই শেষে ওই লোকটা অমন রেগে গিয়েছিল, মানে আমি ঐ স্বামীটির কথা বলছি।

বেটি। স্বামী কোন জন ? নাকিসুরে কথা বলছিলো যে ?

মিস মকারিজ। (তাড়াতাড়ি) হ্যাঁ—যে শেষে গুলী করে আত্মহত্যা করলো। সত্যি কি করুণ !

ফ্রেডা। কিন্তু আমার ত ওদের সবাইকেই কেমন ন্যাকা-ন্যাকা মনে হচ্ছিল।

মিস মকারিজ। সেই জন্যই ত সবটা অত করুণ!

[এবার সবাই ওরা হেসে উঠল, আর ঠিক সেই সময়ই পাশের খাবার ঘর থেকে ভেসে এল পুরুষদের একটা দমকা হাসির শব্দ]

বেটি। ঐ শুনুন, ওদিকে কি চলছে।

মিস মকারিজ। কি আবার চলবে, নির্ঘাতই কোন অশ্লীল আলোচনা।

বেটি। না, হয়ত শুধুই পরচর্চ্চা। ওতে ওরা কত সময়ই না নষ্ট করে।

ফ্রেডা। তা আর বলতে! পরচর্চ্চা পেলে ওরা আর কিছুই চায় না।

মিস মকারিজ। সে কথা যদি বলত আমি ওটাকে খুব মন্দ বলি না। মানুষের সম্বন্ধে আগ্রহ আছে বলেই ওটা করে থাকে, নইলে স্বার্থপর লোক সাধারণত পরচর্চ্চা করে না। আমার বই-এর প্রকাশকেরা পরচর্চ্চা প্রিয় না হলেই আমার ভয় হয়।

বেটি। সে কথা হয়ত সত্যি। কিন্তু আমার আপত্তি শুধু ওদের ভণ্ডামিতে। পরচর্চ্চা করছো কর। তাই বলে তাকে কাজ বলে চালাবার চেষ্টাটা কেন?

ফ্রেডা। এখন ত ওদের আরও সুবিধে হয়ে গেল। তিন জনেই এক কোম্পানীর কর্ত্তা। যত আড্ডাই মারুক না কেন, সব কিছুকেই কাজ বলে চালিয়ে দেবে।

মিস মকারিজ। সে ত নিশ্চয়ই। এবার শুধু মিস অলওয়েন মিঃ ষ্ট্যান্টন্‌কে বিয়ে করে ফেললেই ষোল কলা পূর্ণ হয়।

অলওয়েন। কি সর্ব্বনাশ! আমি আবার মিঃ ষ্ট্যান্টন্‌কে বিয়ে করতে গেলাম কেন?

মিস মকারিজ। কথাটা কি আর আমি না ভেবেই বলেছি। দেখ না—তোমাদের ছ'জনের মধ্যে চার জনই দিব্যি কেমন জোড় বাঁধা। শুধু অলওয়েন আর ষ্ট্যান্টন্‌ই এখনও বেজোড়।

ফ্রেডা। কেমন অলওয়েন, শুনলে ত? বল এবার কি বলবে?

মিস মকারিজ। তোমাদের এই ছোট্ট সুখী পরিবেশের একজন হবার জন্য আমারই এক এক সময় ষ্ট্যান্টন্‌কে বিয়ে করে ফেলবার জন্য লোভ হয়।

ফ্রেডা। আমরা কি সবাই খুব সুখী?

মিস মকারিজ। তা আর বলতে!

ফ্রেডা। (মৃদু হাস্যে) ছোট্ট সুখী পরিবেশ, উঃ! কথাটা কি বিশ্রী!

মিস মকারিজ। কেন, বিশ্রী কেন? আমার ত ভারী চমৎকার মনে হয়।

ফ্রেডা। (রহস্যময় হাসি হেসে) হবেও বা!

মিস মকারিজ। তাছাড়া ঘরখানির ত কথাই নেই। কি মিষ্টি করেই তুমি সব গুছিয়েছ ফ্রেডা!

অলওয়েন। তা আর বলতে। আমার ত এলে পরে আর এখান থেকে বেরুতেই ইচ্ছে করে না। জানেন বোধ হয়, ওরা আমাকে এখানকার প্রেস থেকে শহরে বদলী করেছে? সে যাই হোক। আমি কিন্তু সুযোগ পেলেই এখানে এসে হাজির হই।

মিস মকারিজ। আচ্ছা ফ্রেডা, তোমায় দেওরের কথা ভেবে নিশ্চয়ই তোমরা খুব কষ্ট পাও? সে-ও ত শুনেছিলাম এইখানেই কোথায় থাকতো।

ফ্রেডা। (স্পষ্টই প্রসঙ্গটা তার মনোমত নয়) আপনি রবার্টের ভাই মার্টিনের কথা বলছেন?

মিস মকারিজ। হ্যাঁ—মার্টিন ক্যাপলান। আমি তখন আমেরিকায়, সেখান থেকেই মারাত্মক সংবাদটা শুনি।

[ওদের ঘিরে নেমে আসে কেমন যেন একটা নিস্তব্ধতা। বেটি ও অলওয়েন তাকায় ফ্রেডার দিকে—আর মিস মকারিজ তাকাতে থাকেন ওদের একজনের মুখের দিক থেকে আর একজনের মুখের দিকে।] ঐ যাঃ! প্রসঙ্গটা আমি নেহাৎ বোকার মতই উত্থাপন করে বসেছি। নাঃ, আমার দেখছি দিন দিনই মতিভ্রম হচ্ছে।

ফ্রেডা। না, না—সে কি কথা! তা কেন? তবে ব্যাপারটা খুবই দুঃখের কি না। অবশ্য এখন সবই সহ্য হয়ে গিয়েছে। গত জুনে—প্রায় বছর খানেকই হোলো—মার্টিন গুলী করে আত্মহত্যা করে। ও তখন ছিল ক্যালোস এণ্ডে। এখান থেকে মাইল বিশেক দূরে, সেখানে তার একটা বাংলো ছিল।

মিস মকারিজ। সত্যিই খুব দুঃখের। আমার সঙ্গে অবশ্য মার্টিনের সামান্য দু-এক দিনের পরিচয় ছিল। কিন্তু তাতেই ওকে ভাল লেগে গিয়েছিল। কি মজাটাই না করতে পারতো, তাছাড়া সুন্দরও ছিল, তাই না?

[ঘরে এসে ঢোকে ষ্ট্যান্টন্ ও গর্ডন। ষ্ট্যান্টনের বয়স প্রায় চল্লিশ, সপ্রতিভ আর ঈষৎ বিদ্রূপাত্মক ভাবভঙ্গী। গর্ডনের বয়েস পঁচিশের নিচে, সুন্দর মেয়েলি চেহারা, আর একটু চঞ্চল।]

অলওয়েন। হ্যাঁ, খুবই সুন্দর।

ষ্ট্যান্টন। (কৌতুকমিশ্রিত বিদ্রূপের সুরে) কে খুব সুন্দর?

ফ্রেডা। তুমি যে নও, সে ত বুঝতেই পারছো, ষ্ট্যান্টন!

ষ্ট্যানটন। আহা, সে না হয় না হলাম, তাই বলে শুনতে দোষ কি। কে সে ভাগ্যবান! কি, বলতে অসুবিধে আছে?

গর্ডন। (বেটির হাত হাতে নিয়ে) আলোচনাটা যে আমাকে নিয়ে, সে আমি না শুনেও বলতে পারি। আচ্ছা বেটি, তোমার যদি একটুও লজ্জা থাকে তুমি কেন ওদের সঙ্গে আমার সম্বন্ধে আলোচনা করতে যাও?

বেটি। (গর্ডনের হাত ধরে) খুব হয়েছে লক্ষ্মীটি, চেপে যাও। আড্ডা আর পুরোনো ব্রাণ্ডি মিলে তোমার অবস্থা যে কাহিল করে তুলেছে; সেটা তোমার মুখ দেখেই বুঝতে পারছি। এবার সত্যিই তোমাকে ব্যবসাদার বলে মনে হচ্ছে।

[ঘরে এসে ঢোকে রবার্ট। বয়েস তার পঁয়ত্রিশের নিচে। তার বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব সহজেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তার স্পষ্ট মতামত সব সময় মেনে নিতে না পারলেও তাকে ভাল লাগবে সকলেরই।]

রবার্ট। আজও দেরি হয়ে গেল, ফ্রেডা! সত্যি আমি দুঃখিত। কিন্তু সে জন্য তোমার ঐ হতভাগা কুকুরটাই দায়ী।

ফ্রেডা। কেন, সে আবার কি করলো?

রবার্ট। আর বল কেন? হঠাৎ এক সময় চেয়ে দেখি, দিব্যি বসে বসে সোনিয়া উইলিয়ামের উপন্যাসখানার পাণ্ডুলিপিটা চিবুচ্ছে। পাছে আবার অসুখে পড়ে তাই ছুটতে হ'ল কুকুরের ডাক্তারের

কাছে। এই যে—এ যে দেখছি মিস মকারিজ। লেখক-লেখিকাদের সম্বন্ধে আমাদের প্রকাশকদের মতামতটা শুনে ফেললেন ত?

মিস মকারিজ। তা, শুনলাম বৈ কি। তবে আমি কিন্তু এতক্ষণ ধরে এই ছোট্ট সুখী পরিবারটির প্রশংসাই করছিলাম।

রবার্ট। ও, তাহলে ত আপনাকে ধন্যবাদ দেওয়াই উচিত।

মিস মকারিজ। সত্যিই আপনারা সুখী।

রবার্ট। সে বিষয়ে আপনার সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত, মিস মকারিজ!

ষ্ট্যানটন। ওসব সুখী-টুখী কিছু নয়, মিস মকারিজ! আসলে আমাদের অনুভূতিগুলোই এসেছে ভোঁতা হয়ে, তাই মধ্যবিত্তর গতানুগতিকতাকেই আমরা সুখ বলে মেনে নিয়েছি।

রবার্ট। (কৌতুক, একটু যেন বেশী কৌতুকের সঙ্গেই) সে তুমি আমাদের বিষয়ে যাই কেন বলো না, ষ্ট্যানটন বেটির সম্বন্ধে কিন্তু এ কথা খাটে না। ও এখনও রয়ে গিয়েছে ঠিক আগের মতই চঞ্চল।

ষ্ট্যানটন। সে ত শুধু গর্ডন ওকে দরকার মত ঠেঙ্গানি দিতে শেখেনি বলে।

মিস মকারিজ। শুনলে ত, অলওয়েন! এই জন্যই বলেছিলাম যে, ষ্ট্যানটনের একটা ব্যবস্থা হওয়া দরকার। না হয়ত ও আরও বেশী সিনিক হয়ে পড়বে।

ষ্ট্যানটন। সে কথা অলওয়েনকে বলে কি হবে? ও এখন খাস লণ্ডনের বাসিন্দা। আমাদের মত মর্ত্ত্যের মানুষদের সঙ্গে ওর আর কিই বা সম্পর্ক!

অলওয়েন। বা রে! তা কেন? আমি ত দরকার মত হামেশাই এখানে আসি।

গর্ডন। হ্যাঁ, তবে সে আসা আমাকে কিংবা রবার্টকে দেখতে সেটা ঠিক—এই যাঃ, কি বলতে কি বলছি। (বেটি ও ফ্রেডার দিকে তাকিয়ে) না, না তোমরা যেন আবার ঈর্ষ্যান্বিত হয়ো না।

বেটি। (সহাস্যে) উঃ! ভাগ্যিস তুমি বললে, না হয়ত জ্বলে পুড়েই যেতাম ঈর্ষ্যায়।

গর্ডন। (রেডিওর ডায়াল ঘোরাতে ঘোরাতে) নাঃ। কি ভীষণ গোলমাল, কিছুই যদি শোনা যাচ্ছে।

ফ্রেডা। এই আবার শুরু হ'ল। আঃ গর্ডন, বন্ধ করে দাও। একটু আগেই আমরা রেডিও শুনেছি।

গর্ডন। কি শুনলে তোমরা?

ফ্রেডা। একখানা নাটকের শেষের দিকটা।

অলওয়েন। আর তার নাম হচ্ছে 'ঘুমন্ত কুকুর'।

ষ্ট্যানটন। সে আবার কি?

মিস মকারিজ। আমরাও তা ঠিক বুঝিনি। তবে, ব্যাপারটা শুরু হয়েছিল মিথ্যে কথা বলা নিয়ে, আর তার ফলে শেষ পর্যন্ত এক ভদ্রলোক আত্মহত্যা করলেন নিজেকে গুলী করে।

ষ্ট্যানটন। বি, বি, সি ত? ওদের দৌড় আর তার চেয়ে বেশী কি হবে।

অলওয়েন। (এতক্ষণ ধরে কি যেন ভেবে) এবার যেন ঐ নাটকখানার তাৎপর্য্য ধরে ফেলেছি বলে মনে হচ্ছে। আসলে 'ঘুমন্ত কুকুর' হচ্ছে সত্যেরই রূপক, আর ঐ স্বামী ভদ্রলোক জিদ ধরেছিলেন সেই সত্যকে জাগাতে অর্থাৎ জানতে।

ষ্ট্যানটন। তাই কি? হবেও বা। তবে সত্যের সঙ্গে ঘুমন্ত কুকুরের তুলনাটিকে কিন্তু বেশ চমৎকারই বলতে হবে।

মিস মকারিজ। (নিস্পৃহ ভাবে) তা সে যাই হোক। আমাদের দৈনন্দিন কথাবার্ত্তা ও আচার-ব্যবহারের অনেকখানিই যে মিথ্যে, একথাও আর অস্বীকার করা চলে না।

বেটি। (হঠাৎই খুকু-খুকু ভাবে) তাছাড়া উপায়ই বা কি? আমি ত দিন-রাতই বানিয়ে বানিয়ে কথা বলি।

গর্ডন। (রেডিওর ডায়াল ঘোরাতে ঘোরাতে) লক্ষ্মী মেয়ে! এতক্ষণে যা হোক একটা সত্যি কথা বললে!

বেটি। আর এই বানিয়ে কথা বলার জন্য দেখেছি লোকে আমাকে বেশী পছন্দ করে।

মিস মকারিজ। হয়ত তাই-ই। কিন্তু আমাদের আলোচ্য বিষয়টা আর একটু গুরুত্বপূর্ণ ছিল না?

রবার্ট। গুরুত্বপূর্ণ কি না জানি না। তবে আমার মতে সত্যটা সব সময়ই বাঞ্ছনীয়।

ষ্ট্যানটন। ওটা ঠিক ষাট মাইল বেগে মোড় ঘোরবার মতই বাঞ্ছনীয়।

ফ্রেডা। (কৌতুক ও রহস্যময়ীর ভঙ্গীতে) আর জীবনে মোড়েরও যখন কিছু কমতি নেই। কেমন, তাই না ষ্ট্যানটন?

ষ্ট্যানটন। (ফ্রেডা কিংবা উপস্থিত যে কোনও লোকেরই মহড়া নিতে সক্ষম) কমতি-বাড়তি অবশ্য কে কোন রাস্তা নেয় তার ওপরই নির্ভর করে। আচ্ছা—তুমিই বল না অলওয়েন। সত্য-অসত্যর মধ্যে কোনটা বাঞ্ছনীয়? তোমাকে ত ভীষণ বুদ্ধিমতী বলে মনে হচ্ছে।

অলওয়েন। (খুবই গম্ভীর ভাবে) এ ব্যাপারে তোমার সঙ্গে আমি একমত ষ্ট্যানটন! সব-কিছু সত্যি বলার মেলাই বিপদ। তার চেয়ে আমার মনে হয় ক্ষেত্র অনুসারে কিছুটা—

গর্ডন। (সোৎসাহে) আমিও তাই বলি। কিছুটা এদিক কিছুটা ওদিক।

ষ্ট্যানটন। আঃ গর্ডন, তুমি চুপ কর ত। হ্যাঁ অলওয়েন, কি বলছিলে তুমি?

অলওয়েন। (চিন্তিত ভাবে) মানে যথার্থ সত্য, অর্থাৎ কি না কোন কিছু বাদ না দিয়ে পরিপূর্ণ ভাবে কিছু প্রকাশ করার মধ্যে সত্যি কোন বিপদ থাকতে পারে না। কিন্তু সত্য বলতে আমরা সাধারণতঃ যা বুঝি তা হচ্ছে কতকগুলো ঘটনা। অথচ কার্য্য-কারণ বাদ দিলে সে ত' অর্দ্ধসত্য ছাড়া আর কিছুই না। আর আমার মতে এই অর্দ্ধসত্য হচ্ছে সবচেয়ে মারাত্মক।

গর্ডন। অথচ বিচারালয়ে এইগুলোর ওপরই জোর দেওয়া হয় সব চেয়ে বেশী। ঘণ্টার পর ঘণ্টা জেরা চলবে, '২৭শে নভেম্বর রাত্তে আপনি কোথায় ছিলেন?' না হয়ত 'এক কথায় বলুন, হ্যাঁ কিংবা না।'

মিস মকারিজ। (আলোচনাটা তার যেন ভালই লাগছে) তোমার যুক্তিটা আমি পুরোপুরি মেনে নিতে পারলাম না অলওয়েন! আমি বরং তুমি যাকে ঘটনা বা অর্দ্ধসত্য বলছ, তারই পক্ষপাতী।

রবার্ট। আমার মতটাও ঠিক তাই। ঘটনাটাই ত আসল।

ফ্রেডা। (রহস্যময়ীর ভঙ্গীতে) তুমি যে তাই বলবে, সে আমি আগেই জানতাম।

রবার্ট। তার মানে? তুমি কি বলতে চাইছ ফ্রেডা?

ফ্রেডা। (উদাস ভাবে) তেমন কিছুই না। কিন্তু এবার অন্য কিছু আলোচনা করলে হ'ত না? ধর—যেমন মজার কিছু। (মিস মকারিজের দিকে তাকিয়ে) আপনারা কেউ পানীয় কিছু নেবেন কি? কিংবা সিগারেট? (রবার্টের দিকে তাকিয়ে) দাও না ওদের সিগারেট।

রবার্ট। (টেবিল থেকে সিগারেট-কেস নিয়ে খুলে) এটাতে তো দেখছি একটাও নেই।

ফ্রেডা। এটায় নিশ্চয়ই আছে। (টেবিল থেকে আর একটা কেস তুলে নিয়ে মিস মকারিজের দিকে এগিয়ে দিয়ে) নিন মিস মকারিজ, অলওয়েন?

অলওয়েন। (কেসটার দিকে তাকিয়ে বিস্মিত কণ্ঠে) আরে, এই কেসটা ত দেখছি আমার পরিচিত। খুললেই দিব্যি একটা সুর বাজতে থাকে, তাই না? সুরটা আমার এখনও মনে আছে? (কেসটা খুলে মিস মকারিজকে একটা দিয়ে নিজে একটা নিয়ে নেয় আর কেসটায় বেজে চলে দিব্যি একটা সুর)।

রবার্ট। (বাজনাটা থামতে) সুন্দর, না?

ফ্রেডা। (কেসটা বন্ধ করে অলওয়েনের দিকে তাকিয়ে) বাঃ, এই কেস তুমি কি করে দেখবে? এটা ত আমি সবে আজই নামালাম। এটা ছিল (একটু থেমে) অন্য আর এক জনের।

অলওয়েন। মার্টিনের, তাই না? সেই আমাকে দেখিয়েছিল। (এক মুহূর্তের নিস্তব্ধতা, দু'জনেই দু'জনের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে।)

ফ্রেডা। (অবিশ্বাস ভরে) তুমি ভুল করছ, অলওয়েন! মার্টিন এই কেসটা তোমাকে দেখাতেই পারে না। তোমার সঙ্গে তার যখন শেষ দেখা হয়, সেই সময় এই কেসটা তার কাছে ছিলই না।

ষ্ট্যানটন। কিন্তু তুমিই বা জানলে কি করে ফ্রেডা, যে ওটা তখন তার কাছে ছিলই না।

ফ্রেডা। কি করে জানি সে কথা অবশ্য আলাদা। কিন্তু মার্টিন যে ওটা অলওয়েনকে দেখাতে পারে না, এ কথা ঠিক।

অলওয়েন। দেখাতে পারে না? (এক মুহূর্ত ফ্রেডার দিকে তাকিয়ে এবং পরমুহূর্তেই পরিবর্ত্তিত ভঙ্গীতে) হবেও বা, হয় ত আমিই ভুল করছি। কোথাও হয় ত ওই রকম একটা কেস দেখেছিলাম। তারপর মার্টিন এই জাতীয় জিনিষ পছন্দ করত বলে তার সাথেই সেটাকে গুলিয়ে ফেলেছি। (ফ্রেডা আস্তে আস্তে সরে আসে—তার জায়গায়।)

রবার্ট। মাফ ক'র অলওয়েন, আমার কিন্তু মনে হচ্ছে হঠাৎই যেন সত্যটাকে তুমি চেপে গেলে। ফ্রেডা যত জোর দিয়ে বলছে মার্টিন তোমাকে ওটা দেখাতেই পারে না, আমার মনে হচ্ছে তুমিও যেন ঠিক ততখানি নিশ্চিত ভাবেই জান যে, মার্টিনই তোমাকে ঐ কেসটা দেখিয়েছিল।

অলওয়েন। বেশ ত, তাই যদি হয়, তাতেই বা কি আসে-যায়।

গর্ডন। (তখনও রেডিওর ডায়াল ঘোরাতে ঘোরাতে) কিছুই না। আমি শুধু একটা নাচের বাজনা শুনতে পেলেই খুসী। কিন্তু মনে হচ্ছে এটা আর চলছে না।

রবার্ট। (বিরক্তির সঙ্গে) আঃ, গর্ডন! কেন আবার ওটাকে নিয়ে পরলে?

বেটি। (প্রশ্রয়ের ভঙ্গীতে) বা রে! আপনারা সবাই গর্ডনকে অত ধমকাচ্ছেন কেন?

রবার্ট। বেশ, তোমার গর্ডনকে তুমিই সামলাও। যা বলছিলাম (অলওয়েনের দিকে তাকিয়ে) হ্যাঁ অলওয়েন, না যায় আসে না কিছুই। তবে একটু আগে আমরা সব মিথ্যে বলা সম্বন্ধে আলোচনা করছিলাম কি না, সে দিক দিয়ে তোমার হঠাৎ এই সত্য চেপে যাওয়াটার মিল থাকছে কি?

মিস মকারিজ। (রহস্যভরে যেন মজাটা উপভোগ করার আগ্রহেই) আমিও ঠিক তাই ভাবছিলাম, একটুও মিল থাকছে না। না—ও-সব চাপাচাপি চলবে না অলওয়েন, এই সিগারেট কেস রহস্যের একটা হেস্তনেস্ত করতেই হবে।

ফ্রেডা। বা রে! এর মধ্যে আবার রহস্য কোথায় পেলেন? নেহাৎই একটা সামান্য ব্যাপার।

অলওয়েন। না ফ্রেডা, সামান্য ঠিক নয়। তবে আমি বলি সামান্যই হোক আর অসামান্যই হোক, তাতে কি আসে-যায়।

ফ্রেডা। তোমার কথা আমি বুঝতে পারছি না—অলওয়েন!

রবার্ট। আমিও ঠিক তাই। একটু আগেই বললে এটা তোমার আগের দেখা সিগারেট-কেস নয়। আবার এখন বলছ ব্যাপারটা সামান্য নয়, তোমার এই রহস্যের মানে কি, অলওয়েন? আমার এখনও বিশ্বাস, তুমি একটা কিছু চেপে যাচ্ছ। এই সিগারেট কেসটা—

ষ্ট্যানটন। (রহস্যচ্ছলে প্রসঙ্গটা চাপা দেবার উদ্দেশ্যে) আঃ! চুলোয় যাক সিগারেট-কেস!

বেটি। আপনি আসুন'ত মিঃ ষ্ট্যানটন, আমাদের শুনতে দিন—

মিস মকারিজ। কিন্তু ষ্ট্যানটন—

ষ্ট্যানটন। বাধা দেবার জন্য ক্ষমা চাইছি, কিন্তু আমি বলি কি যে সিগারেট কেস থেকে এমন বেসুরো সুর বাজে, তার আলোচনা না হয় বাদ দেওয়াই যাক্।

গর্ডন। (হঠাৎ তিক্তকণ্ঠে) নিশ্চয়ই! আর সেই সঙ্গে মার্টিনের আলোচনাও। সে আর এখন নেই, কিন্তু আমরা ত দিব্যি বেঁচে-বর্ত্তে রয়েছি।

রবার্ট। আঃ গর্ডন, তুমি চুপ কর ত?

গর্ডন। তা করছি, কিন্তু তোমরাও মার্টিনের মৃত আত্মাকে নিয়ে টানা-হ্যাঁচড়া কর না।

ফ্রেডা। করি না করি সে আমরা বুঝব, তোমার অত বিচলিত হবার কি?

গর্ডন। আহা, তোমার কথার ধরণ শুনলে মনে হয়, যেন মার্টিন তোমারই সম্পত্তি ছিল।

বেটি। মার্টিন কারুরই সম্পত্তি ছিল না, সে তার নিজেরই ছিল। কিন্তু তোমাদের মাথায় কিছু না থাকলেও তার মাথায় কিছু পদার্থ ছিল।

রবার্ট। (ক্রমশঃই বিস্মিত হয়ে) এ সব তুমি কি বলছ বেটি?

বেটি। (ঈষৎ উচ্চহাস্তে) বলছি আমার মুণ্ডু। আসল কথা, আপনাদের এই সব আলোচনায় আমার মাথা ধরবার উপক্রম হয়েছে।

রবার্ট। শুধুই কি তাই?

বেটি। তাই নয়ত আর কি? (রবার্টের প্রতি ভ্রূভঙ্গীসহ ঈষৎ হাস্ত)

রবার্ট। তাহলে এবার তুমিই বল ফ্রেডা!

ফ্রেডা। আঃ, সামান্ত ব্যাপার নিয়ে এতও তুমি ঘালাতে পার রবার্ট! সিগারেট-কেসটা নিয়ে এত বলাবলির কিই বা থাকতে পারে? মার্টিনের বাংলো থেকে অন্তান্ত জিনিষের সঙ্গে ওটাও আমাদের বাড়ী এসেছে। আর আজই শুধু ওটাকে আমি বার করে রেখেছি, কিন্তু মার্টিনের সঙ্গে অলওয়েনের শেষ দেখা হয়েছিল সেই শনিবার। মনে পড়ে? জুন মাসের প্রথম দিকে আমরা যেদিন সবাই মিলে তার ফ্যালোস এণ্ডের বাংলোয় গিয়েছিলাম।

গর্ডন। (চাপা উত্তেজনায়) উঃ! সে কি ভোলবার! দিনটা ছিল চমৎকার পরিষ্কার, রাতেও সে কি চাঁদের আলো। সেই আলোয় বাগানে বসে মার্টিন সেদিন আমাদের কত মজার গল্পই না বলেছিল। উঃ, সেই দিনটাই ছিল আমার জীবনের সেরা দিন! হায়—সে রকম দিন কি আর কোন দিন ফিরে আসবে! (আবেগে স্পষ্টই তার গলার স্বর কেঁপে গেল)।

রবার্ট। হ্যাঁ দিনটা সেদিন সুন্দরই ছিল। তা বলে সেটা যে তোমার জীবনে এত বড় একটা স্মরণীয় ঘটনা, তা কিছু তখন বুঝতে পারিনি।

ফ্রেডা। আমিও না। গর্ডনের আজ হ'ল কি? মার্টিনের সব-কিছুতে ও যেন বড় বেশী বাড়াবাড়ি করে ফেলছে।

বেটি। খুব সম্ভব রবার্টের ঐ পুরোনো ব্রাণ্ডি আর বড় বড় গ্লাশগুলোই সেজন্ত দায়ী। বস্তুটা সোজাসুজিই গিয়ে গর্ডনের মাথায় চেপে বসেছে।

গর্ডন। মাথায় ছাড়া আর কোথায় চাপলে তুমি খুসী হতে?

রবার্ট। (ফ্রেডার দিকে তাকিয়ে) তাহ'লে দেখা যাচ্ছে সেই শনিবার দিনই মার্টিনের সঙ্গে অলওয়েনের শেষ সাক্ষাৎ।

ফ্রেডা। হ্যাঁ, আর আমি জানি সেদিন পর্য্যন্ত এই কেসটা মার্টিনের কাছে ছিল না।

রবার্ট। না, থাকলে সে নিশ্চয়ই আমাদের ওটা দেখাত। (অলওয়েনের দিকে চেয়ে) তাহ'লে অলওয়েন, এবার কিন্তু তোমার পালা।

অলওয়েন। (কেমন যেন অনিশ্চিত হাসি হেসে) আমিও ত বলছি, এবার আমার পালা।

রবার্ট। (অসহিষ্ণু ভাবে) হ্যাঁ, তাই ত। বল এবার কি বলবে।

অলওয়েন। (সস্নেহে রবার্টের দিকে তাকিয়ে) আচ্ছা ছেলেমানুষ তুমি রবার্ট! আমার ভয় হচ্ছে বুঝি বা এখনও সাক্ষীর কাঠগড়ায় রয়েছি।

মিস মকারিজ। না, না—তা কেন? সে রকম হলে ত সব মজাটাই মাঠে মারা যাবে।

বেটি। তাছাড়া তুমিই বা ভুলে যাচ্ছ কেন অলওয়েন, সেই শনিবারই মার্টিনের সঙ্গে তোমার শেষ দেখা নয়। তার পরের রবিবারেও ত তুমি আর আমি মার্টিনকে কয়েকটা ছবি দেখাতে গিয়েছিলাম।

রবার্ট। হ্যাঁ, তা-ও ত বটে। আমরাই ত অলওয়েনকে পাঠিয়েছিলাম।

বেটি। অবশ্য সেদিনও আমরা ওই সিগারেট কেসটা দেখিনি।

ষ্ট্যান্টন। আরে, আমি ত এর আগে জীবনেও ওটা দেখিনি, আর পরেও কোন দিন দেখতে চাই না। বাপ রে বাপ! একটা সিগারেট কেস নিয়ে কি কাণ্ডটাই না চলছে এতক্ষণ ধরে।

ফ্রেডা। (বেটি ও অলওয়েনের দিকে তাকিয়ে) তা তোমাদের না দেখাই স্বাভাবিক। কারণ, তার পরের রবিবারেও ওটা মার্টিনের কাছে ছিল না।

ষ্ট্যান্টন। কিন্তু ফ্রেডা এই কেসটার সম্বন্ধে তুমিও যেন একটু বেশী খবর রাখ বলে মনে হচ্ছে?

গর্ডন। আমারও ঠিক সেই কথা। তুমিই বা ওটার বিষয়ে এত কিছু জানলে কি করে ফ্রেডা?

বেটি। (সোল্লাসে) আমি কিন্তু বলতে পারি কি করে জানলো। (ফ্রেডার দিকে তাকিয়ে) বলব? বলি? তুমিই ওটা মার্টিনকে দিয়েছিলে। (একসঙ্গে সবাইর দৃষ্টি গিয়ে পড়ল ফ্রেডার দিকে। ক্ষণিকের স্তব্ধতা।)

রবার্ট। (বিষন্ন-গম্ভীর স্বরে) সত্যিই তুমি দিয়েছিলে ফ্রেডা?

ফ্রেডা। (ধীরে ধীরে) হ্যাঁ। আমিই ওটা মার্টিনকে দিয়েছিলাম।

রবার্ট। আশ্চর্য্য! মানে মার্টিনকে দেবার কথা বলছি না। কেনই বা তুমি দেবে না? কিন্তু কথাটা একবারও তুমি আমায় বলনি ত? তাছাড়া কখনই বা দিলে—আর ওটা পেলেই বা কোথায়?

ফ্রেডা। (সম্পূর্ণ শান্ত ও স্বাভাবিক স্বরে) আশ্চর্য্যের এতে কিছুই নেই। সেই মারাত্মক শনিবারের আগের দিনের কথা নিশ্চয়ই তোমার মনে আছে; তুমি সেদিন লণ্ডনে থেকে গেলে, আর আমি চলে এলাম এখানে। পথে ক্যালথ্রপের দোকানে এই কেসটা দেখে বেশ মজার মনে হ'ল, তারপর দামটাও খুব সস্তা শুনে মার্টিনের জন্ত কিনে ফেললাম।

রবার্ট। তারপর ক্যালথ্রপই ওটা পাঠালো মার্টিনের ফ্যালোজ এণ্ডের বাংলোর ঠিকানায়। কাজেই ওটা সেই শেষ শনিবারের আগে পৌঁছতেই পারে না। কেমন, এই ত?

ফ্রেডা। হ্যাঁ।

রবার্ট। (স্বস্তির সঙ্গে) যাক্ এতক্ষণে তাহলে ব্যাপারটা পরিষ্কার হল।

গর্ডন। আমি কিন্তু ব্যাপারটাকে অত সহজ করে নিতে পারছি না ফ্রেডা! তুমি নিশ্চয়ই ভুলে যাওনি যে, সেই শনিবার দিন গোটা সকালটাই আমি মার্টিনের বাংলোয় ছিলাম।

রবার্ট। আচ্ছা! কিন্তু তাতে কি হ'ল?

গর্ডন। তাতে হ'ল এই যে, সেদিন ভোরে যখন চিঠিপত্র এলো তখন আমি সেখানেই উপস্থিত। সেদিনকার কোন কিছুই আমার ভোলবার নয়। আমার বেশ মনে আছে সেদিন মার্টিনের নামে কেবল জ্যাক ব্রুকফিল্ড থেকে একটা বইয়ের পার্শেল এসেছিল।

(কেসটা দেখিয়ে) এ রকম কোন কেস যে সেদিন যায়নি, এ আমি হলফ করেই বলতে পারি।

ফ্রেডা। (বিদ্রূপের সুরে) বেশ ত! তা না হয় সকলের ডাকে লাগিয়ে বিকেলের ডাকেই গিয়েছে। তাতেই বা এমন কি হয়েছে?

গর্ডন। হয়েছে এই যে, ফ্যালোজ এণ্ডের পোষ্ট অফিসে বিকেলের দিকে ডাক বিলির কোন ব্যবস্থাই নেই।

ফ্রেডা। নিশ্চয়ই আছে।

গর্ডন। নিশ্চয়ই নেই।

ফ্রেডা। (তীক্ষ্ণ কণ্ঠে) কে বললে তোমায় শুনি?

গর্ডন। মার্টিন নিজেই বলেছে। একদিন দেরীতে কাগজপত্র পেত বলে প্রায়ই সে গজ্‌গজ্‌ করতো। ওই কেসটা যে সেদিন ভোরে যায়নি সে ত আমি আগেই বলেছি আর বিকেলে ত যেতেই পারে না। সুতরাং তোমার ঐ দোকান থেকে পাঠানোর গল্প মোটেই আমি বিশ্বাস করতে পারলাম না, ফ্রেডা! আসলে তুমি নিজেই ওটা নিয়ে গিয়েছিলে কেমন, তাই না?

ফ্রেডা। (হঠাৎ ভীষণ রেগে) খুব হয়েছে! চুপ কর ত হাঁদারাম।

গর্ডন। তা এখন হাঁদারামই বল আর যাই বল, কথাটা ত তুমিই আমায় জোর করে বলালে। নাও এখন বল, গিয়েছিলে কি লাগিয়েছিলে।

রবার্ট। (অবিশ্বাস ভরে) গিয়েছিলে তুমি, ফ্রেডা?

ফ্রেডা। (নিজেকে দ্রুত সামলে) তুমি যখন নিতান্তই শুনবে বলে জিদ্‌ ধরেছ, তখন শোন—হ্যাঁ গিয়েছিলাম।

রবার্ট। (নিদারুণ বিস্ময়ে) ফ্রেডা!

গর্ডন। দেখলে ত আমি ঠিকই ধরেছি।

রবার্ট। (বিহ্বল ভাবে ফ্রেডার দিকে তাকিয়ে) তা হলে ত দেখা যাচ্ছে, তুমিই মার্টিনকে সকলের শেষে জীবিত দেখেছ।

ফ্রেডা। হ্যাঁ। বিকেলের চা ও রাতের খাবারের সময়ের মাঝখানে, তার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল।

রবার্ট। কিন্তু একথা ত আমাদের কাউকেই তুমি বলনি ফ্রেডা! এমন কি পুলিশকেও নয়।

ফ্রেডা। না, বলিনি। কারণ কারুরই তাতে কোন লাভ হ'ত না। মাঝখান থেকে আমায় শুধু সাক্ষীর কাঠগড়ায় গিয়ে দাঁড়াতে হ'ত। আর তার ফল ত গর্ডনকে দিয়ে চোখের সামনে দেখলাম।

গর্ডন। তা যা বলেছ! ব্যাটারা জেরায় জেরায় কি নাজেহালটাই না আমায় করলে!

ফ্রেডা। অবশ্য মার্টিনের তাতে কোন ক্ষতি হবার আশঙ্কা থাকলে সব কথাই আমাকে বলতে হ'ত বৈ কি। কিন্তু সে ত তখন ভাল-মন্দ সব কিছুরই বাইরে।

ষ্ট্যানটন। সে কথা তুমি ঠিকই বলেছ ফ্রেডা!

রবার্ট। হ্যাঁ, আমিও সেটা মানি। কিন্তু আমাকে—আমাকেও ত বলতে পারতে। হয়ত বলবে নানা বিভ্রাটের মধ্যে তখন আর বলে উঠতে পারিনি। কিন্তু পরে সব কিছু চুকে বুকে গেলেও বলতে পারতে। তা সে যাই হোক, এখন দেখা যাচ্ছে, মার্টিনের জীবিতাবস্থায় তুমিই তার সঙ্গে শেষ কথা বলেছ।

ফ্রেডা। (রহস্যভরে) সত্যিই তাই কি?

রবার্ট। (জিজ্ঞাসু ভাবে) তা নয়ত আবার কি?

ফ্রেডা। তাহলে অলওয়েনের কথার কি হবে?

রবার্ট। (বিভ্রান্ত ভাবে) অলওয়েনের কোন্‌ কথা? ও ঐ সিগারেট কেস সম্বন্ধে?

ফ্রেডা। হ্যাঁ, ঐ সিগারেট কেস সম্বন্ধেই। বিকেলের চায়ের সময়ের আগে ত আর ওটা মার্টিনের কাছে ছিল না। অথচ অলওয়েন বলছে, মার্টিনই ওটা তাকে দেখিয়েছিল।

বেটি। (যেন এসব কিছুই তার ভাল লাগছে না) কই, সে কথা আবার অলওয়েন কখন বলল? সে ত বলেছে হয়ত ও রকম কোন কেসই দেখে থাকবে। আর আমরাও তার সেই কথা বিশ্বাস করে নিচ্ছি, ব্যস চুকে গেল।

মিস্‌ মকারিজ। না, না—তা কি হয় বেটি!

বেটি। খুব হয়। কোন মানেই হয় না এই এক ব্যাপার নিয়ে ঘ্যানঘ্যানানির।

ষ্ট্যানটন। আমারও ঠিক সেই মত।

রবার্ট। আমার কিন্তু সে মত নয়।

বেটি। উঃ! কিন্তু আপনি—

রবার্ট। সত্যিই আমি দুঃখিত বেটি! তোমার এই সব ভাল না লাগবারই কথা। কারণ এর সঙ্গে কোন সম্পর্কই তোমার নেই। কিন্তু মার্টিন আমার ভাই—তার সম্বন্ধে সব কিছু জানবার অধিকার আমার আছে।

অলওয়েন। বেশ, তাই হবে রবার্ট! সবই তোমাকে জানান হবে, কিন্তু সে কি এখুনিই তুমি শুনতে চাও?

ফ্রেডা। এখুনিই অবশ্য দরকার নেই, যদিও আমার সময় সবাই তোমরা এখুনিরই পক্ষপাতী ছিলে। যাক্‌, আমার মনে হয়, তোমার বেলায় অন্ততঃ রবার্ট আর অতটা জিদ করবে না।

রবার্ট। তোমার এই কথার আমি কোন মানে বুঝছি না ফ্রেডা!

অলওয়েন। তা যে তুমি বুঝছ না, সে বিষয়ে আমি অন্তত নিশ্চিত।

ফ্রেডা। (বেশ কায়দায় পাবার ভঙ্গীতে) আর কথা না বাড়িয়ে এবার তুমি স্বীকার করেই ফেল না অলওয়েন যে, মার্টিনই এই কেসটা তোমায় দেখিয়েছিল। আর তার মানেই হচ্ছে সেদিন রাতে তুমি তার বাংলোয় গিয়েছিলে।

রবার্ট। (হতবুদ্ধি হয়ে) সে কি অলওয়েন! তুমিও সেখানে গিয়েছিলে! নাকি সবাই তোমরা পাগল হয়ে গেলে। প্রথমে ফ্রেডা, তারপর তুমি? অথচ দুজনের একজনও আমাদের কিছু জানালে না!

অলওয়েন। আমি দুঃখিত রবার্ট! জানান সম্ভব ছিল না বলেই জানাই নি।

রবার্ট। কিন্তু সেখানে তোমার কি কাজ ছিল?

অলওয়েন। একটা বিষয়ে আমি খুব দুশ্চিন্তায় পড়েছিলাম। মানে—এমন একটা কথা রটেছিল যাতে আমি অস্থির হয়ে আর থাকতে না পেরে মার্টিনের কাছেই গিয়েছিলাম, ব্যাপারটার সত্যাসত্য জানতে। বাইরে এক জায়গায় রাতের খাওয়াটা সেরে

আমি গিয়ে সেখানে পৌঁছলাম ন'টার কিছু আগে। তা ছাড়া এমনিতেই জায়গাটা খুব নির্জন। কাজেই যাওয়ার কিংবা আসার পথে কারুর সঙ্গেই আমার দেখা হয়নি। পুলিশ তদন্তের সময় ব্যাপারটা অবশ্য আমি চেপেই গেছি। কারণ, ফ্রেডার মত আমারও মনে হয়েছিল যে, এই কথা প্রকাশ করে কারুরই কোন লাভ নেই। ব্যস, এবার তোমার সব জানা হ'ল ত রবার্ট?

রবার্ট। কিন্তু তাহলে ত দেখা যাচ্ছে তোমার সঙ্গেই মার্টিনের শেষ দেখা হয়েছিল অলওয়েন? আর সেদিক দিয়ে সেই রাতের মারাত্মক ঘটনা সম্বন্ধে তোমার ত কিছু জানা থাকাই সম্ভব।

অলওয়েন। (ক্লান্ত ভাবে) সে সবই ত চুকে গেছে রবার্ট! এই আলোচনা আমরা না হয় আজ নাই করলাম। (পরিবর্ত্তিত ভঙ্গীতে) তা ছাড়া মিস মকারিজ রয়েছেন, উনি হয়ত এতে বিরক্তি বোধ করছেন।

মিস মকারিজ। (সাগ্রহে) না, না আমার বরং মজাই লাগছে।

অলওয়েন। তুমি কি বল ফ্রেডা, এই আলোচনার আর দরকার আছে? যেটুক যা ছিল, সবই ত বলা হয়ে গিয়েছে।

রবার্ট। কিন্তু অলওয়েন, মার্টিনের সঙ্গে তোমার দেখা করার ব্যাপারে, আমাদের কোম্পানীর কোন সম্রব ছিল কি? তুমি বলছিলে, কি একটা ব্যাপারে যে তুমি দুশ্চিন্তা ভোগ করছিলে?

অলওয়েন। উঃ রবার্ট! থাকই না এখন ওসব কথা।

রবার্ট। মাফ কর অলওয়েন, কিন্তু এটা আমার একান্তই জানা দরকার। কোম্পানীর সেই পাঁচশো পাউণ্ড হারিয়ে যাওয়ার সঙ্গে তোমার দুশ্চিন্তার কোন সংশ্রব ছিল কি?

গর্ডন। (বিচলিত স্বরে) উঃ, ভগবানের দিব্যি রবার্ট, সে টাকার প্রশ্ন আর এখন তুল না। মার্টিন ত চলেই গিয়েছে। কেন আবার তাকে নিয়ে টানাহ্যাঁচড়া করছ?

ফ্রেডা। তুমি শান্ত হওত গর্ডন, কি ছেলেমানুষীটাই না করছ! (মিস মকারিজের প্রতি) সত্যিই আমরা দুঃখিত!

গর্ডন। (অস্পষ্ট কণ্ঠে) সত্যি আমার ছেলেমানুষী হয়ে গিয়েছে। আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি মিস মকারিজ!

মিস মকারিজ। (উঠে দাঁড়িয়ে) না, না, সে কি? তাতে কি হয়েছে? আপনারা কিন্তু কিছু মনে করবেন না—এবার আবার আমার দেরী হয়ে যাচ্ছে।

ফ্রেডা। সে কি! এখনই চললেন? না, না, সে হতে পারে না।

রবার্ট। সত্যিই ত কি আর এমন রাত হয়েছে!

মিস মকারিজ। প্যাটারসনেরা বলেছিলেন আমার জন্য গাড়ী পাঠাবেন। পাঠিয়েছেন কি না বলতে পারেন?

রবার্ট। (দরজার দিকে এগোতে এগোতে) হ্যাঁ, আমরা খাবার ঘর থেকে বেরোবার সময়ই তাদের গাড়ী এসে গিয়েছে। ড্রাইভারকে বলেছি, অপেক্ষা করতে। একটু অপেক্ষা করুন, আমি এখনই ডেকে দিচ্ছি। (বেরিয়ে যেতে যেতে)

ফ্রেডা। (অপ্রতিভ ভঙ্গীতে) ও, তাহলে আপনাকে যেতেই হবে। (দরজার কাছে গিয়ে) আপনার স্কার্ফটা বোধ হয় আমার ঘরে ফেলে এসেছেন। আমি এখুনি এনে দিচ্ছি।

মিস মকারিজ। হ্যাঁ পরের গাড়ী আর কতক্ষণ আটকে রাখা যায়? তা ছাড়া যেতেও প্রায় আধ ঘণ্টা লাগবে। (ফ্রেডার করমর্দন করে) অনেক ধন্যবাদ। ভারী ভাল কাটলো সময়টা। (অলওয়েনের করমর্দন করে) সত্যি তোমাদের পরিবেশটি কি চমৎকার! (বেটি ও গর্ডনের করমর্দন করে) অনেক দিন পরে আবার সকলের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হল (ষ্ট্যান্টনের করমর্দন করে বাইরে যেতে যেতে দরজায় দাঁড়িয়ে) বাই—বাই—

সকলে। বাই—বাই।

ফ্রেডা। (বাইরে যেতে যেতে) শুনলাম আমেরিকায় আপনার চমৎকার কেটেছে।

(দুজনেই অদৃশ্য হ'ল। অলওয়েন তাকিয়ে রইল বইয়ের তাকগুলোর দিকে। বেটি উঠে পিয়ানোর ওপর রাখা সিগারেট কেসটার থেকে একটা সিগারেট তুলে নিল। আর ষ্ট্যান্টন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ঢেলে নেয় এক পাত্র পানীয়)

গর্ডন। উঃ, বাঁচা গেল!

বেটি। সে কথা আর বলতে! উঃ, কি মেয়েছেলে রে বাবা! ঠিক যেন জিওমেট্রির মাষ্টারনী!

ষ্ট্যানটন। ও তাই বল, সেই জন্যই বুঝি জিওমেট্রিতে বেটি এত পণ্ডিত। (গর্ডনের দিকে তাকিয়ে) তারপর গর্ডন, আর এক গ্লাস চলবে?

গর্ডন। না—ধন্যবাদ!

ষ্ট্যানটন। একটু অস্বাভাবিক—তাহলেও লেখিকা হিসেবে উনি একেবারে মন্দ নন।

গর্ডন। সে তুমি যাই বল ষ্ট্যানটন—আমি কিন্তু ওকে ভাল লেখিকা বলতে পারছি না।

বেটি। আর তাছাড়া মহিলাটি যে একজন বিশ্বনিন্দুক, এ আমি বাজি রেখেও বলতে পারি।

ষ্ট্যান্টন। তুমি ঠিকই বলেছ বেটি, সেদিক দিয়ে ওঁর বেশ দুর্নামই আছে। আজকের এই সিগারেট কেসের ব্যাপারটা দেখবে সপ্তাহখানেকের মধ্যেই গোটা লণ্ডনে ছড়িয়ে পড়েছে। এখুনি গিয়েই কোন না বলবেন প্যাটারসনদের! উঃ, বেচারার কি কষ্টটাই হচ্ছিল গল্পটা ছেড়ে উঠতে।

গর্ডন। আরও কিছু জানা যাবে বুঝলে হয়ত আজপেই উঠতেন না। কিন্তু যেটুকু জেনে গিয়েছেন তাই বা কম কি? (চুমকুড়ি কেটে) হয়ত কাল ভোরেই উঠে আমাদের নিয়ে ফেঁদে বসবেন মস্ত এক উপন্যাস।

বেটি। (বাহাদুরীর ভঙ্গীতে) সে উনি যত বড় লেখিকাই হন না কেন, অত সহজে কিছু আর আমার চরিত্র আঁকতে পারছেন না।

ষ্ট্যানটন। আর আমার চরিত্র? উনি হয়ত সব পাপের বোঝাই চাপিয়ে দেবেন আমার কাঁধে, কি বল বেটি?

বেটি। (চঞ্চল হাস্যে) যতটুকু শুনেছেন তাতে কত দূরই বা উনি এগোবেন? আর সত্যিই ত ফ্রেডার মার্টিনকে একটা সিগারেট কেস দেওয়া, আর অলওয়েনের তার সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার মধ্যে কি-ই বা এমন আপত্তির থাকতে পারে?

অলওয়েন। (নিস্পৃহ ভাবে তাকের বই দেখতে দেখতে) হ্যাঁ, কি আবার থাকবে।

বেটি। (অলওয়েনের দিকে তাকিয়ে) আরে! আমি ভুলেই গিয়েছিলাম যে তুমিও এখানে রয়েছ। আচ্ছা আমি কিন্তু এতক্ষণ কাউকেই কোন প্রশ্ন করিনি, এবার তোমাকে একটা প্রশ্ন করতে পারি?

অলওয়েন। ইচ্ছে হয় করো। কিন্তু জবাব যে দেব, এমন কথা দিতে পারছি না।

বেটি। তবে করেই দেখি। আচ্ছা অলওয়েন, মার্টিনকে তুমি ভালবাসতে?

অলওয়েন। (দৃঢ় ভাবে) মোটেই না।

বেটি। আমিও ঠিক তাই ভেবেছিলাম।

অলওয়েন। আরও সঠিক ভাবে বললে, আমি বরং তাকে অপছন্দই করতাম।

গর্ডন। উঃ, ওকথা আমি বিশ্বাসই করি না অলওয়েন! মার্টিনকে আবার কেউ ভাল না বেসে পারত নাকি? বলছি না তার কোন দোষই ছিল না। কিন্তু মার্টিন মার্টিনই, তাকে সবাইর ভালবাসতেই হবে।

বেটি। তার মানে সে ছিল তোমার উপাস্য দেবতা। জান অলওয়েন, গর্ডনও মনে মনে তাকে পুজোই করত। কেমন, তাই না? বল ত সত্যি করে!

ষ্ট্যানটন। কিছু আশ্চর্য্য নয়। লোককে আকৃষ্ট করবার অনেক গুণই মার্টিনের ছিল। তাছাড়া বুদ্ধিও ছিল প্রচুর। তার মৃত্যুতে আমাদের কোম্পানীর যে খুবই ক্ষতি হয়েছে এ কথা স্বীকার না করে উপায় নেই।

গর্ডন। আমারও ঠিক সেই মত।

বেটি। (সবিদ্রূপে) শুনি, কি ক্ষতি হয়েছে?

[অলওয়েনকে দেখা যায় একখানা বই তাকে সাজিয়ে রাখতে, রবার্ট ফিরে এসে টেবিলের দিকে গিয়ে এক গ্লাশ পানীয় ঢেলে নেয়, আর তারপরই ফ্রেডা এসে তুলে নেয় একটা সিগারেট।]

রবার্ট। এবার তাহলে ব্যাপারটার একটা মীমাংসা হয়ে যাক্।

অলওয়েন। দোহাই তোমার রবার্ট! যতদূর যা হয়েছে খুব হয়েছে, আর না।

রবার্ট। আমিও ক্ষমা চাইছি অলওয়েন! কিন্তু সত্য আমাকে জানতেই হবে। সমস্ত ব্যাপারটা আমার যেন কেমন অদ্ভুত মনে হচ্ছে। প্রথমে ফ্রেডা, তারপর তোমার, এই মার্টিনকে দেখতে যাওয়া, আর দুজনেরই সে কথা আমাদের কাছে গোপন রাখা, এটা আমার ভাল লাগেনি। তাহলে দেখতে পাচ্ছি আরও অনেক কিছুই তোমরা গোপন রাখতে পার। না, না এবার আর আমাদের কিছু গোপন রাখা উচিত নয়।

ফ্রেডা। আচ্ছা রবার্ট, তুমিই কি সব সময় সত্যি কথা বলতে পার?

রবার্ট। অন্তত বলবার চেষ্টা ত করি।

ষ্ট্যানটন। তুমি না হয় মহাত্মা রবার্ট, কিন্তু আমরা ত সাধারণ মর্ত্ত্যের মানুষ! আমাদের দুর্বলতাগুলো তো একটু ক্ষমা-ঘেন্নার সঙ্গে দেখা দরকার?

ফ্রেডা। (সকৌতুকে) কি দুর্বলতা ষ্ট্যানটন?

ষ্ট্যানটন। (কাঁধ ঝাঁকিয়ে) সে ত কতই আছে, যা হয় একটা ধরেই নেও না! এই যেমন বাজনাওলা সিগারেট কেস—

ফ্রেডা। (ইঙ্গিতপূর্ণ হাসি হেসে) কিংবা বাগান-বাড়ীর ওপর অত্যধিক ঝোঁক—

ষ্ট্যানটন। ইঙ্গিতটা কি মার্টিনের বাংলো সম্বন্ধে? কিন্তু আমি ত সেখানে খুব কমই গিয়েছি।

ফ্রেডা। তুমি বেশ জান ষ্ট্যানটন, ওটা আমি তোমার নিজের বাংলো সম্বন্ধেই বলেছি।

ষ্ট্যানটন। (স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে) তাহলে আমাকে স্বীকার করতেই হচ্ছে যে, রহস্যটা আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না!

রবার্ট। (বিপন্ন ভাবে) এই রে, এবার আবার তোমার পালা শুরু হ'ল নাকি ষ্ট্যানটন?

ষ্ট্যানটন। (উচ্চ হাস্যে) না, সে ভয় তুমি ক'র না।

রবার্ট। তবু রক্ষা! কিন্তু মার্টিনের এই ব্যাপারটার একটা ফয়সালা হওয়া দরকার। আর আমার ইচ্ছে, সেটা এখনি হোক।

গর্ডন। হায় ভগবান! এ যে দেখছি প্রায় পুলিশ-তদন্তের সামিল হয়ে দাঁড়াল।

রবার্ট। তা বলতে পার বটে। কিন্তু পুলিশ-তদন্তের সময় সব কিছু প্রকাশ না হওয়াতেই, এর দরকার হয়ে পড়েছে। হ্যাঁ অলওয়েন, মার্টিনের কাছে তোমার হঠাৎ ও-ভাবে যাবার কারণটা বোধ হয় এখন শুনতে পারি। কোম্পানীর হারানো টাকার সঙ্গে তার কোন সংস্রব ছিল কি?

অলওয়েন। হ্যাঁ, ছিল।

রবার্ট। তুমি কি ভেবেছিলে, মার্টিনই টাকাটা নিয়েছিল?

অলওয়েন। না—তবে, হয়ত অন্য কিছু।

রবার্ট। বলই না, কি ভেবেছিলে?

অলওয়েন। আমি ভেবেছিলাম, হয়ত আসল ব্যাপারটা তার জানা ছিল।

গর্ডন। (তিক্তকণ্ঠে) সে ত তোমরা ভাববেই!

বেটি। (হঠাৎ জরুরী তাড়া দিয়ে) গর্ডন, এবার আমি বাড়ী যাব।

গর্ডন। সে কি বেটি, এত সকাল সকাল!

বেটি। এখানে থাকলে নির্ঘাতই আমার মাথা ধরবে। (উঠে) চললাম—আমার ঘুম পেয়েছে।

গর্ডন। আরে দাঁড়াও, দাঁড়াও, আর একটু সবুর কর।

ষ্ট্যানটন। গর্ডন যদি থাকতে চায় তাহলে চল, না হয় আমিই তোমাকে পৌঁছে দিচ্ছি বেটি!

বেটি। না, গর্ডনও চলুক।

গর্ডন। আর একটু সবুর কর না।

বেটি। (হঠাৎ চিৎকার করে) আঃ, বলছি আমাকে বাড়ী নিয়ে চল।

রবার্ট। (চিন্তিত ভাবে) কি হ'ল তোমার, বেটি?

বেটি। না, এমনি। ভাল লাগছে না।

গর্ডন। আচ্ছা, আচ্ছা চল যাচ্ছি। (বেটির অনুসরণ করে)।

ষ্ট্যানটন। চল, আমিও তোমাদের সঙ্গে যাচ্ছি। (ফ্রেডাও উঠে দাঁড়ায়)।

রবার্ট। (এগিয়ে গিয়ে) শোন বেটি, আমাদের আলোচনায় যদি তুমি বিরক্ত হয়ে থাক তবে কিন্তু আমি ক্ষমা চাইছি। আমি জানি, এসবের সঙ্গে তোমার অন্তত কোন সম্পর্ক নেই।

বেটি। (রবার্টকে ঠেলে সরিয়ে দ্রুত দরজার দিকে যেতে যেতে) সামান্য একটা বিষয়কে কি জটিলই না করে তুলেছেন! (সজোরে দরজার শব্দ করে বেরিয়ে যায়)

গর্ডন। (দরজার কাছ থেকে) আচ্ছা—Good Night!

ষ্ট্যানটন। (দরজার কাছে গিয়ে) তাহলে আমিও চলি। এই নাবালক নাবালিকাকে পৌঁছে দিইগে।

অলওয়েন। (সবিদ্রূপে) সত্যিই তোমার দয়ার শরীর ষ্ট্যানটন!

ষ্ট্যানটন। (কঠোর মুখে হাসি টেনে) আচ্ছা তাহলে good night, (ওরা চলে গেলে অবশিষ্ট তিন জন অগ্নিকুণ্ডের ধারে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে।)

রবার্ট। এবার তাহলে তোমার মার্টিনের কাছে যাবার উদ্দেশ্যটা শোনা যাক অলওয়েন!

অলওয়েন। তার আগে বলত, সবাই আমরা সত্যি কথা বলছি কি না।

রবার্ট। আমার অন্তত চেষ্টার ত্রুটি নেই।

অলওয়েন। তুমি, ফ্রেডা?

ফ্রেডা। (হঠাৎ ফেটে পড়ে) হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। কত বার আর বলতে হবে?

রবার্ট। (অবাক হয়ে) কিন্তু তোমার বলবার ধরণটা একটু অদ্ভুত হয়ে গেল না?

ফ্রেডা। গেল নাকি? হবে। জানই ত মাঝে মাঝে ওরকম অদ্ভুত কিছুই আমি করে বসি।

অলওয়েন। ব্যাপারটা শুধু তোমার জন্যই এতদূর গড়ালো রবার্ট! তা সে যাই হোক, এবার কিন্তু তোমার পালা। আশা করি তুমিও সত্যি কথাই বলবে।

রবার্ট। হায় ভগবান! সে ত নিশ্চয়ই। কিন্তু আগে আমার প্রশ্নগুলোর জবাব দাও, তবে ত আমার পালা।

অলওয়েন। দিচ্ছি, কিন্তু তার আগে একটা জিনিষ জানতে চাই। অনেক দিন থেকে উৎকণ্ঠা ভোগ করলেও এ পর্যন্ত প্রশ্নটা তোমাকে আর করে উঠতে পারিনি। কিন্তু এখন ত আর কোন অসুবিধাই নেই, এইবার যা হোক নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে। আচ্ছা রবার্ট, কোম্পানীর ঐ টাকাটা কি তুমি নিয়েছিলে?

রবার্ট। কি বললে? টাকাটা আমি নিয়েছিলাম কি না?

অলওয়েন। হ্যাঁ, রবার্ট!

রবার্ট। নিশ্চয়ই না। তুমি কি পাগল হলে, অলওয়েন? আমি নেব কোম্পানীর টাকা? (অলওয়েনের মুখ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে প্রশান্ত হাসিতে) আর তাছাড়া টাকাটা যে মার্টিনই নিয়েছিল, সে ত তোমরা সবাই জান।

অলওয়েন। সত্যি আমি কি বোকা!

রবার্ট। তোমার কথা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না, অলওয়েন! টাকাটা মার্টিন নিয়েছে জেনেও কি করে তোমার অমন সন্দেহ হ'ল?

অলওয়েন। শুধু সন্দেহ করাই নয়, এই নিয়ে আমি কষ্টও কম পাইনি।

রবার্ট। কিন্তু কেন? কেন এমন সন্দেহ হ'ল? টাকা নেওয়ার ব্যাপারে আমি অবশ্য জোর দিচ্ছি না, ঘটনার চাপে অনেকেই অনেক কিছু করে। তাই বলে অন্যের ওপর সেই দোষ চাপান, বিশেষ করে মার্টিনের ওপর! আমার সম্বন্ধে তোমার এ রকম একটা ধারণা থাকতে পারে, এ যে আমার কল্পনারও অতীত, অলওয়েন! আমি তোমায় আমার বিশ্বস্ততম বন্ধুদেরই একজন বলে জানতাম।

ফ্রেডা। (স্থির সাহসের সঙ্গে) কিন্তু এ কথা কি তোমার একবারও মনে হয়নি রবার্ট যে, অলওয়েন শুধু তোমার বন্ধুই?

অলওয়েন। (অত্যন্ত বিচলিত ভাবে বাধা দিয়ে) না, না ফ্রেডা। তোমার দুটি পায়ে পড়ি।

ফ্রেডা। (শান্ত ভাবে অলওয়েনের বাহু জড়িয়ে) কেন, কি হয়েছে, অলওয়েন? কি এমন তাতে ক্ষতি হবে? হ্যাঁ রবার্ট, আমি বলছিলাম—নেহাৎ বোকা না হলে এত দিন তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারতে যে, অলওয়েন শুধু তোমার বন্ধুই নয়—

রবার্ট। (বাধা দিয়ে) ও কথা তোমার আমি মানি না ফ্রেডা, নিশ্চয়ই ও আমার বন্ধু।

ফ্রেডা। আমি বলছি তুমি ভুল করছ রবার্ট! বন্ধু ত বটেই, আর সেই সঙ্গে স্ত্রীলোক হিসেবেও অনেক দিন থেকেই ও তোমায় ভালবেসে এসেছে।

অলওয়েন। (অত্যন্ত কাতর হয়ে) ছিঃ, ছিঃ, এ তুমি কি করলে ফ্রেডা, এ তুমি কি করলে!

ফ্রেডা। কেন? কি হয়েছে তাতে! খুব ত সত্য সত্য করছিল। এখন বুঝুক সত্য জানার জালা!

রবার্ট। আমায় তুমি ক্ষমা কর অলওয়েন, সত্যিই আমি বোকা, বুঝতে পারিনি। আমি শুধু তোমায় বন্ধু বলেই মনে করে এসেছি।

অলওয়েন। ছিঃ ছিঃ, ফ্রেডা, কিন্তু তোমার অন্যায় হ'ল। এর পর যে লজ্জায় আমি মুখই দেখাতে পারব না।

ফ্রেডা। কিন্তু আগে বল কথাটা সত্যি কি না। তোমরা ত সবাই সত্য জানতেই চাইছিলে, আমি না হয় শুধু তারই একটু তোমাদের উপহার দিলাম। হ্যাঁ রবার্ট! এ শুধু আজ নয়, অনেক দিন থেকেই আমি জানতাম। স্ত্রীরা সহজেই বুঝতে পারে! মাঝে মাঝে তোমায় বলার ইচ্ছে যে হয়নি তা নয়; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত চেপে গিয়েছি। কিন্তু, এখন যখন জেনেই গেলে, তখন একে আর অবহেলা কর না। ভালবাসা কিছু তুচ্ছ বস্তু নয়। জীবনে এর একবার আবির্ভাব ঘটলে, পরিপূর্ণ ভাবে তাকে বরণ করে নেওয়াই উচিত।

অলওয়েন। (একদৃষ্টে ফ্রেডার মুখের দিকে তাকিয়ে) এবার কিন্তু আমিও একটা জিনিষ বুঝতে পারছি ফ্রেডা!

ফ্রেডা। কি বুঝতে পারছ?

অলওয়েন। তোমাকে—অবশ্য এ আমার অনেক আগেই বোঝা উচিত ছিল।

রবার্ট। তার মানে তুমি যদি আমার ও ফ্রেডার দাম্পত্য জীবনের কথা বলতে চাও অলওয়েন, তাহলে বলবো তুমি ঠিকই ধরেছ। ফ্রেডা কোন দিনই আমায় ভালবাসতে পারেনি। ফলে, আমাদের সম্পর্কটা মোটেই তেমন মধুর নয়। অবশ্য তাই বলে অন্য কাউকেও একথা আমি বলতে যাই নি।

ফ্রেডা। (প্রতিবাদের সুরে) আমিও যাইনি। তবে ওকথা কারুরই কাউকে বলতে হয় না—আপনা আপনিই সবাই জেনে যায়।

রবার্ট। কিন্তু এই যে অলওয়েন বলল, এইমাত্র সে তা জানতে পেরেছে?

অলওয়েন। (মৃদুস্বরে) না রবার্ট, সেকথা আমি বলিনি। আমি এখন যা জানলাম তা অন্য জিনিষ।

রবার্ট। ও তাই বুঝি? তাহলে তা কি?

অলওয়েন। (শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে) সে আমি বলতে চাই না।

ফ্রেডা। তোমাকে আর মহত্ব দেখাতে হবে না অলওয়েন! স্বচ্ছন্দেই তুমি বলতে পার। এখন আর কোন কিছুতেই কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি নেই।

অলওয়েন। (বিপন্ন ভাবে) ক্ষতিবৃদ্ধির কথা আমিও আর ভাবছি না ফ্রেডা! আমি এখন ভাবছি অন্য আর একটা জিনিষ। আর তা এমন জঘন্য, যা কি না কিছুতেই আমি বলতে পারব না।

ফ্রেডা। জঘন্য?

অলওয়েন। হ্যাঁ ফ্রেডা, খুবই জঘন্য। আমি জোড় হাতে অনুরোধ করছি তা বলবার জন্য আমায় চাপ দিও না।

ফ্রেডা। বেশ, কিন্তু ঐ টাকার সম্বন্ধে তোমাকে বলতেই হবে। তুমি স্বীকার করেছ তুমি ভেবেছিলে রবার্টই ওটা নিয়েছিল।

অলওয়েন। হ্যাঁ, সেই ধারণাই এত দিন আমার ছিল।

রবার্ট। তাহলে সে কথা এত দিন লুকিয়ে রাখবার মানে?

ফ্রেডা। মানে কি এখনও তোমায় বুঝিয়ে বলতে হবে রবার্ট, আশ্চর্য্য!

রবার্ট। অর্থাৎ তুমি বলতে চাইছ আমাকে বাঁচাবার জন্যই অলওয়েন এত দিন ব্যাপারটা চেপে গিয়েছে।

ফ্রেডা। এই দুরূহ ব্যাপারটা বোঝার জন্য নিশ্চয়ই তোমার একটা ডক্টরেট ডিগ্রি পাওয়া উচিত রবার্ট!

রবার্ট। সত্যিই আমি দুঃখিত অলওয়েন, অত্যন্ত দুঃখিত। প্রথমে কোম্পানীর টাকা নেওয়া—তারপর সেই অপরাধ নিজের ভাই-এর কাঁধে চাপিয়ে দেওয়া, ছিঃ ছিঃ—আমার সম্বন্ধে এই ধারণা নিয়ে কি করে তুমি চুপ করে রইলে এত দিন?

ফ্রেডা } কিছুই অসম্ভব নয়।
অলওয়েন } সেইজন্যই ত এত কষ্ট পাচ্ছিলাম।

ফ্রেডা। না থেমে বরঞ্চ আমি বলবো সেইটেই স্বাভাবিক। মেয়েরা যাকে ভালবাসে সমগ্র ভাবেই তাকে মেনে নেয়। এমন কি, তার জঘন্যতম অপরাধও ক্ষমার চোখে দেখে। কিংবা মনের কষ্ট মনেই চেপে রাখে। অন্তত অনেক মেয়েই তা করে।

রবার্ট। কিন্তু তোমাকে ত ওরকম কিছু করতে দেখি না ফ্রেডা?

ফ্রেডা। (শান্ত রহস্যপূর্ণ ভাবে) দেখ না? তার কারণ আমার অনেক কিছুই তুমি দেখতে পাও না। কিন্তু সে কথা যাক। আমার বক্তব্য হচ্ছে রবার্টকেই যখন তুমি সন্দেহ করেছিলে, অলওয়েন তখন নিশ্চয়ই জানতেন যে মার্টিন ও বিষয়ে সম্পূর্ণ নির্দোষ।

অলওয়েন। হ্যাঁ, মার্টিনের সঙ্গে দেখা করবার পর সে বিষয়েও আমি নিশ্চিত হয়েছিলাম।

ফ্রেডা। (সক্রোধে) কই একথাও তুমি কোন দিনই আমাদের জানি, অলওয়েন?

অলওয়েন। জানতাম এ প্রশ্ন ম করবেই। কিন্তু তখন আমার মনে হয়েছিল আমার বলা না বলায় মার্টিনেরও আর কোন কিছুই আসবে-যাবে না। সে ত তখন সমস্ত নিন্দে-প্রশংসারই বাইরে। তাছাড়া চেপে যাওয়া ছাড়া আমার যে আর কোন উপায়ই ছিল না, ফ্রেডা!

রবার্ট। সেও কি আমারই জন্য?

অলওয়েন। হ্যাঁ রবার্ট, তোমারই জন্য।

রবার্ট। কিন্তু এখন ত বুঝেছ, টাকাটা সেই নিয়েছিল।

অলওয়েন। না, সে কোন দিনই নেয়নি।

রবার্ট। কিন্তু সেই জন্যই ত সে আত্মহত্যা করলো, ধরা পড়বার লজ্জায়ই ত সে—

অলওয়েন। না রবার্ট, সেজন্য সে আত্মহত্যা করেনি। আমাকে বিশ্বাস কর, আমি বলছি ও টাকার সে বিন্দুবিসর্গও জানত না।

ফ্রেডা। (সাগ্রহে) তাই বল! আমি ত কল্পনাই করতে পারতাম না যে মার্টিনের মত লোক অমন কোন কাজ করতে পারে! তার স্বভাবই সে রকম ছিল না। তাকে খামখেয়ালী বলতে পার হয়ত বা কিছু কিছু নিষ্ঠুরতাও তার ছিল, কিন্তু তাই বলে কোন ছোট কাজ? না সে তার আসত না। আর তাছাড়া টাকা পয়সাকে ত সে আমলের মধ্যেই আনত না।

রবার্ট। কিন্তু তোমরা জান না, দেনার খরচের জন্য শেষের দিকটায় সে রীতিমত দেনায়ই জড়িয়ে পড়েছিল।

ফ্রেডা। হ্যাঁ, সেই জন্যই ত বলি সে কেন চুরি করতে যাবে? দরকার হলেই ত সে দেনা করত—আর সেটা করতে তার কোন সংকোচ ছিল না। বরঞ্চ তুমিই তার উল্টো, দেনার নাম শুনলেই তুমি আঁৎকে ওঠ।

অলওয়েন। হাঁ, সে কথা তুমি সত্যিই বলেছ, আর সেই জন্যই আমার মনে হয়েছে রবার্টই হয়ত—

রবার্ট। আশ্চর্য্য! দেনা করতে না চাইলেই চুরি করতে হবে? বরং আমার মতে টাকাকে খোলামকুচির মত যারা দেখে আর বেহিসেবী খরচ করে, চাপ পড়লে তারাই পরের টাকায় হাত দেয়।

অলওয়েন। হ্যাঁ, তখন তারা দেনা করে, কিন্তু চুরি করে না—অন্তত মার্টিনের স্বভাবের লোকেরা ত নয়ই।

রবার্ট। (একটু থেমে, চিন্তা করে) কিন্তু তাই বলে আমিই যে টাকাটা নিয়েছি, এ ধারণা তোমার কি করে হ'ল অলওয়েন?

অলওয়েন। কেন? কারণ মার্টিনই আমায় সে কথা বলেছিল, তার দৃঢ় ধারণা ছিল টাকাটা তুমি নিয়েছ।

রবার্ট। (হতবুদ্ধি হয়ে) মার্টিনই তোমায় বলেছিল?

অলওয়েন। হ্যাঁ, তার সঙ্গে আমার আলোচনার বিষয়ই ছিল তাই।

রবার্ট। (স্বগত) মার্টিনের ধারণা ছিল টাকাটা আমিই নিয়েছি। কিন্তু সে ত আমায় ভাল করেই জানত, তবু কেন তার অমন ধারণা হল?

তুমিও ত মার্টিনকে ভাল করেই জানতে, তবু কেন তাকে চোর বলে ভাবতে পারলে?

রবার্ট। হ্যাঁ, সে কথা বলতে পার বটে। কিন্তু আমার ভাবনার পেছনে বিশেষ কারণ ছিল। আমাকে একজন সেই কথাই বলেছিল, অবশ্য তাতেও আমি নিঃসন্দেহ ছিলাম না—সে হচ্ছে হল শুধু মার্টিনের আত্মহত্যার পরে।

অলওয়েন। (উত্তেজিত হয়ে) তুমি বলছ তোমাকে একজন বলেছিল? মার্টিনও ঠিক তাই বলেছিল। কি আশ্চর্য্য! তাকেও নাকি একজন বলেছিল চেকটা তুমিই নিয়েছ।

রবার্ট। কি সর্ব্বনাশ!

অলওয়েন। তুমি হয়ত কল্পনাও করতে পারছ না, কে তাকে একথা বলেছিল।

রবার্ট। এখন যেন মনে হচ্ছে তা-ও পারি।

ফ্রেডা। কে সে?

রবার্ট। (ভীষণ উত্তেজিত হয়ে) ষ্ট্যানটন, তাই না?

অলওয়েন। হ্যাঁ, ষ্ট্যানটনই।

রবার্ট। আর ঐ ষ্ট্যানটনই আমাকে বলেছিল মার্টিনই চেকটা নিয়েছে।

ফ্রেডা। } কি আশ্চর্য, কিন্তু সে কেন—
অলওয়েন। } কি সর্বনাশ, ষ্ট্যানটন!

রবার্ট। হ্যাঁ, প্রকারান্তরে সে তার প্রমাণও দিয়েছিলো। অবশ্য আমরা যাতে মার্টিনকে বাঁচাবার ব্যবস্থা করি, সে কথা সে বলেছিল।

অলওয়েন। কিন্তু তুমি বুঝতে পারছ না, রবার্ট! মার্টিনকেও সে ঠিক ঐ এক কথাই বলেছিলো। তার ধারণা ছিল, কেউ একথা জানতে পারবে না। নেহাৎ বিশ্বাসী মনে না করলে মার্টিন কি আমাকেই একথা বলতো?

রবার্ট। (দাঁতে দাঁত চেপে) ষ্ট্যানটন, ষ্ট্যানটন?

ফ্রেডা। (দৃঢ় স্বরে) তাহলে এখন দেখা যাচ্ছে ষ্ট্যানটনই ঐ চেকটা নিয়েছে।

অলওয়েন। তাই ত মনে হচ্ছে।

ফ্রেডা। (সরকারী উকিলের ভঙ্গিতে) ওতে আর মনে হওয়াহয়ির, কিছুই নেই অলওয়েন! নির্ঘাৎ এ তারই কাজ। আর সেটা চাপা দেবার জন্ত ইচ্ছে করেই সে রবার্ট ও মার্টিনকে পরস্পরের প্রতি সন্দিগ্ধ করে তুলেছিল। উঃ, কি ভীষণ শয়তানী!

রবার্ট। (চিন্তিত ভাবে) কিন্তু শুধু তাতেই ত আর প্রমাণ হয় না যে ষ্ট্যানটন নিজেই চেকটা চুরি করেছিল।

ফ্রেডা। এর পর আর প্রমাণের কি-ই বা বাকী থাকল?

রবার্ট। থাম, সমস্তটাই একবার বিচার-বিবেচনা করে দেখা যাক। (স্বগত) আচ্ছা, আমাদের পুরোনো কর্ম্মচারী মিঃ সন্টারের কিছু টাকার দরকার হওয়ায় আমাদেরই চেয়ারম্যান মিঃ হোয়াইট অর্থাৎ গর্ডনের বাবা তার নামে পাঁচশো পাউণ্ডের একখানা চেক কাটেন। কিন্তু সন্টার পরের দিন না আসাতে চেকখানা থেকে যায় তাঁর ড্রয়ারেই। তিন দিন পরে যখন মিঃ সন্টার এলেন, তখন কিন্তু আর চেকখানা খুঁজে পাওয়া গেল না। ব্যাঙ্কে খোঁজ নিয়ে জানা গেল, টাকাটা এর মধ্যেই তুলে নেওয়া হয়েছে। আমাদের বিশ্বাসী পুরোনো কর্ম্মচারী মিঃ ওয়াটসনকে বাদ দিলে, কেবলমাত্র ষ্ট্যানটন, মার্টিন অথবা আমার পক্ষেই সম্ভব চেকখানা সরানো। ব্যাঙ্কের কর্ম্মচারীরা কেউই আমাদের চেনে না। তারা শুধু জানাল, মার্টিন কিংবা আমার বয়েসী কেউ এসে টাকাটা তুলে নিয়েছে। সেই সঙ্গে তারা আর যা বর্ণনা দিলে তাতে সমস্ত সন্দেহটাই গিয়ে পড়লো মার্টিনের ওপর।

অলওয়েন। কিন্তু মিঃ হোয়াইট হার্ডস ত তোমাদের সকলকেই ব্যাঙ্কে নিয়ে যেতে পারতেন।

ফ্রেডা। না। বাবা তা করেন নি। তিনি ওদের সকলকেই ভীষণ ভালবাসতেন। ব্যাপারটায় তিনি মনে এত আঘাত পেলেন যে, অসুস্থই হয়ে পড়লেন।

রবার্ট। তা ছাড়া তিনি চাননি যে, এ বিষয়ে কারো কোন শাস্তি হোক। দোষ স্বীকার করে টাকাটা ফিরিয়ে দিলেই তিনি খুশী হতেন।

অলওয়েন। হ্যাঁ, আমাকেও তিনি তাই বলেছিলেন।

ফ্রেডা। আমাকেও। (রবার্টের দিকে তাকিয়ে) কিন্তু তোমার কেন, মার্টিনকেই দোষী মনে হয়েছিল রবার্ট?

রবার্ট। যতটুকু জানা গেল, তাতে সন্দেহটা মার্টিন ও আমার ওপরেই এসে পড়লো—অথচ আমি জানি, আমি নিইনি।

ফ্রেডা। (ধীরে ধীরে) আর ষ্ট্যানটন তোমাকে কি বলেছিলো?

রবার্ট। ষ্ট্যানটন বলেছিল, সে নাকি তোমার বাবার ঘর থেকে মার্টিনকেই বেরুতে দেখেছিল।

অলওয়েন। আর সেই ষ্ট্যানটনই মার্টিনকে বলেছিল, সে নাকি তোমাকেই মিঃ হোয়াইট হার্ডসের ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে দেখেছিল।

ফ্রেডা। এর পর আর কোন সন্দেহই থাকে না। ষ্ট্যানটনই নির্ঘাৎ চেকখানা সরিয়েছিল।

রবার্ট। সরাক, আর না সরাক, ষ্ট্যানটনকে এর কৈফিয়ত দিতে হবে। (দরজার দিকে এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে বাইরের এক কোণ থেকে রিসিভার তুলে নিয়ে) এখন বুঝতে পারছি কেন সে আমাদের আলোচনায় যোগ না দিয়ে কেটে পড়েছে। নিশ্চয়ই ও অনেক কিছুই চেপে রাখছে।

অলওয়েন। (বিষন্ন ভাবে) আমাদের সবাইকেই অনেক কিছু চেপে রাখতে হচ্ছে।

রবার্ট। তাহলে অন্ততঃ একবারের জন্তও আমাদের তা প্রকাশ করতে হবে। কিন্তু তার আগে ষ্ট্যানটনের কৈফিয়তটা শোনা দরকার। ক্যাণ্টারবারি ওয়ান—টু।

ফ্রেডা। কখন?

রবার্ট। এখনই।

ফ্রেডা। তুমি তাহলে ওদের সবাইকেই আসতে বলছ, রবার্ট!

রবার্ট। হ্যাঁ। (টেলিফোনে) হ্যালো—কে, গর্ডন? কি বলছ? ষ্ট্যানটনও আছে? বেশ তাহলে তোমাদের দু'জনেরই এখানে আসা দরকার। হ্যাঁ—হ্যাঁ, আরও অনেক কিছুই। কেউই আমরা বাদ পড়িনি। না, বেটিকে দরকার নেই, এর সঙ্গে ওর কোনই সম্পর্ক নেই। (ফ্রেডা ও অলওয়েনের পরস্পর দৃষ্টি-বিনিময়) ঠিক আছে। যত তাড়াতাড়ি পার। (রিসিভার রেখে দিয়ে, সদরের বাতির সুইচ খুলে দিয়ে, দরজা বন্ধ করে) এখনি ওরা এসে পড়ছে।

(পর্দা নেমে আসে)।

[ক্রমশঃ।

অনুবাদিকা—শ্রীমতী করবী গুপ্তা।

ডক্টর নবগোপাল দাস, আই, সি, এস

ছয়

অটলবিহারী বাবুর বাড়ীর সম্মুখে এসে প্রদীপ দেখল চার দিক অন্ধকার। অবশ্য এ-আর-পি'র সতর্কতা নিবন্ধন কোন বাড়ীর আলোই বাইরে থেকে দেখতে পাওয়া যায় না, কিন্তু অটলবিহারী বাবুর বাড়ী যেন একটু অসম্ভব রকম আলোক-বিবর্জিত এবং নিস্তব্ধ।

প্রদীপ খানিকক্ষণ ইতস্তত করল ভেতরে ঢুকবে কি না। কে জানে, এঁরা বাড়ী ছেড়ে অন্যত্র চলে গেছেন হয়ত! অথবা, সরকারী সিভিল ডিফেন্স-এর ঘাঁটি এখানে বসেনি ত?

নাঃ, অনুসন্ধান করে দেখাই যাক না কি ব্যাপার। প্রদীপ বারান্দার সামনে এসে বাইরের দরজার কড়া নাড়ল।

কোনই সাড়া-শব্দ নেই! প্রদীপ আবার কড়া নাড়ল, এবার একটু বেশী জোরে।

ভেতর থেকে কার গলা শোনা গেল। কে যেন প্রশ্ন করছে, কে?

—দরজাটা একবার খুলুন, জরুরী দরকার আছে। প্রদীপ অসহিষ্ণু ভাবে বলল।

অতি সন্তর্পণে দরজাটা একটু ফাঁক করে অটলবিহারী বাবু উঁকি মারলেন। আবার প্রশ্ন করলেন, আপনি, তুমি, কে?

—আমি প্রদীপ, কাকাবাবু!

—ওঃ, প্রদীপ? কোত্থেকে? এই অন্ধকারের মধ্যে এসেছ? অটলবিহারী বাবু এবার দরজাটা সম্পূর্ণ খুললেন এবং প্রদীপ তাঁকে আর কোন কথা বলবার অবসর না দিয়েই ভেতরে ঢুকে পড়ল।

দেখল, ঘর সত্যি সত্যি অন্ধকার। ওপাশের বারান্দায় অবশ্য মৃদু আলো জ্বলছে, কিন্তু তার রেখা রাস্তা পর্য্যন্ত পৌঁছয় না।

সম্মুখের দরজাটা বন্ধ করে অটলবিহারী প্রদীপের পেছনে পেছনে চলে এলেন। প্রদীপ ততক্ষণ বারান্দার মসৃণ মেঝের উপর বসে পড়েছে।

—আপনি এই সামান্য আলোয় কাজ করছেন, কাকাবাবু? চোখে কষ্ট হচ্ছে না?

—কষ্ট হলেই বা আর কি করব বল? এ-আর-পি'র যত কড়াকড়ি, কোন খুঁত খুঁজে পায় না, কোথা থেকে একটু আলো ঠিকরে বাইরে পড়েছে, অমনি কি ধমক! জাপানীরা নাকি আলো দেখে বোমা ফেলবে! যত সব ছেলেমানুষী কথা।

—বন্দনা নেই? প্রদীপ প্রশ্ন করল।

—বন্দনা? না, সে তার দিদিমার কাছে আছে, বেলুড়ে।

—কবে ফিরবে?

—সে ত ঠিক বলতে পারিনে, সবাই বলল কলকাতায় বোমা পড়তে পারে, তাই ওকে পাঠিয়ে দিলাম কলকাতার বাইরে। এখন দেখছি, কোন প্রয়োজন ছিল না।

—আর নবকিশোর?

—সে আমার কাছেই আছে। এখন বাড়ীতে নেই, কোথায় বেরিয়েছে। আজ-কাল তার দেখা পাওয়াই মুস্কিল, এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়ায়, কোন কোন দিন বাড়ীতে ফেরে রাত বারোটা একটায়। অন্ধকার রাতে এই ভাবে চলা-ফেরা করা আমার ভাল লাগে না।

—কিন্তু গাড়ী ত আছে তার?

—গাড়ী থাকলে কি হবে? চালায় সে নিজে। তুমি ত দেখছ, কি রকম অন্ধকার কলকাতার পথঘাট, তার ওপর গাড়ীর বাতিও অর্দ্ধেকটা কালো কাগজে ঢাকা। অথচ একটু হুঁসিয়ার হয়ে যে গাড়ী চালাবে, সেদিকে নবুর এতটুকু খেয়াল নেই। এই ত সেদিন কোন্ এক ভিখিরীর ছেলেকে চাপা দিয়েছিল, অনেক কষ্টে তার মাকে শ'খানেক টাকা দিয়ে আমি ব্যাপারটার নিষ্পত্তি করি।

তার পর একটু কাতর ভাবে অটলবিহারী বললেন, তোমার কথা সে খুব শোনে প্রদীপ! তুমি ওকে একটু বুঝিয়ে ব'লো এরকম বেপরোয়া হয়ে গাড়ী যেন না চালায়।

—আমার কথা কি সে এখন শুনবে? প্রদীপ হাসল। আচ্ছা, দেখা হ'লে বলব।

—তার পর, তোমার খবর কি? মেদিনীপুরে তোমরা ত খুব স্বাধীনতার নিশান ওড়ালে। তবু যদি শেষ পর্য্যন্ত যুঝবার মত সাহস এবং শক্তি তোমাদের থাকত!

প্রদীপ ক্ষণেকের জন্য দপ্ করে জ্বলে উঠল। তার পর নিজেকে সামলে নিল। বলল, আপনি ত ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন না, কাকাবাবু, সব কথা না জেনে এ রকম একটা অভিমত প্রকাশ করা কি উচিত হচ্ছে? আমরা ছিলুম নিরস্ত্র, তাছাড়া মহাত্মাজীর মত ধৈর্য্য এবং সাহস আমাদের আসবে কোত্থেকে? কাজেই আমরা যদি হঠে গিয়েও থাকি তার জন্যে লজ্জিত হ'বার কোন কারণ নেই।

—আমি সে কথা বলছি না। আমি বলছি যে উপলব্ধি এখন তোমার হয়েছে, সেটা অনেক আগেই হওয়া উচিত ছিল। আমরা যারা বয়সে প্রবীণ, তোমাদের চেয়ে বেশী অভিজ্ঞ, তোমাদের কি প্রথম থেকেই বলিনি যে বৃটিশ মিলিটারি শক্তির বিরুদ্ধে লড়তে যাওয়া ঘোরতর মূর্খতা? শুধু শুধু কতকগুলো লোক প্রাণ হারাল, আর কতকগুলো লোক জেলে গেল। এই যে, জ্যোতির্ময় বাবু, কি সার্থকতা হ'ল তাঁর কারাবরণে? মাঝখান থেকে তাঁর মেয়ে সুমিতার কি লাঞ্ছনা!

—আমি জ্যোতির্ম্ময় বাবু বা সুমিতার কথা জানিনে, তবে আমরা যারা অত্যন্ত নগণ্য—আমাদের কথা বলতে পারি। আমরা হেরেছি বটে, কিন্তু এ পরাজয় সাময়িক। আবার দিন আসবে, যখন আমরা যুদ্ধ করব, নতুন উদ্যমে, নতুন অস্ত্রসম্ভারে।

—বড় বড় কথা বলতে তোমরা খুব পারো, প্রদীপ! তবে তোমাদের দুর্ব্বলতায় দৈন্য কোথায় তা যদি সত্যি বুঝে থাক, তাহলে আমিও বলব তোমাদের এই ছেলেমানুষিটা মোটেই নিরর্থক হয়নি।

বাইরে আবার কে কড়া নাড়ল। অটলবিহারী একটু চঞ্চল হয়ে উঠলেন যেন।

প্রদীপ বলল, নবকিশোর এসেছে বোধ হয়। আমি দরজাটা খুলে দিয়ে আসি।

—না, না, তোমায় যেতে হবে না, আমিই দেখছি। বলে শশব্যস্তে অটলবিহারী এগিয়ে গেলেন।

প্রদীপ শুনতে পেল, অটলবিহারী বাবু ফিস্ ফিস করে আগন্তুকের সঙ্গে কি কথা বলছেন। কথোপকথনটা সম্পূর্ণ সে অনুধাবন করতে পারল না, তবে শুনল অটলবিহারী বাবু বার বারই বলছেন, একশ' টাকার কমে আমি কিছুতেই একবাক্স ইনজেকশন দিতে পারব না, মশায়! কত মাথার ঘাম পায়ে ফেলে জোগাড় করতে হয়েছে, জানেন? তাছাড়া সব সময় ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকতে হয়, কখন কে এসে খানাতল্লাসী সুরু করে।

আগন্তুক বলছিল, কিন্তু তাহ'লে আমার কমিশন যে কিছুই থাকবে না, বাঁড়ুয্যে মশায়!

অটলবিহারী জবাব দিলে, আমি তার কি জানি? আমার এক দাম, পছন্দ হয় নিন, না হয়, অন্যত্র দেখুন।

—অন্য জায়গায় যদি পাওয়া যেত তা হ'লে কি আপনার এতখানি খোসামোদ করতাম বাঁড়ুজ্যেমশাই? তবে, একটা কথা বলতে পারি, আমার মক্কেল বড্ড গরীব।

—তাহ'লে আপনার কমিশনটাই তাকে রেহাই দিন না কেন? আমার ঘাড় ভেঙ্গে মহানুভবতা না দেখালে বুঝি চলে না?

অটলবিহারী বাবু ভেতরে চলে এলেন। দেখলেন, প্রদীপ একই ভাবে বসে আছে। তুমি একটু অপেক্ষা কর, প্রদীপ, ব'লে তিনি ওপরে চলে গেলেন এবং একটু পরেই কাগজের ছোট একটা প্যাকেট হাতে ক'রে নীচে নেমে এলেন। আগন্তুকের সঙ্গে আরও দু' একটা কথা ব'লে তাকে বিদায় করে দিয়ে তিনি ফিরে এলেন প্রদীপের কাছে।

—ও কে কাকাবাবু, কেন এসেছিল? প্রদীপ প্রশ্ন করল।

—পাড়ারই এক ভদ্রলোক। একটা জিনিষ চাইতে এসেছিল। সংক্ষেপে অটলাবিহারী জবাব দিলেন।

প্রদীপ বুঝল প্রশ্নটা তিনি এড়িয়ে গেলেন।

অটলবিহারী হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, তুমি ফেরারী আসামী নও ত?

প্রদীপ হাসল। বলল, সে ত ঠিক জানিনে, অর্থাৎ আমার নামে কোন ওয়ারেন্ট বেরিয়েছে কি না। তবে, হ্যাঁ, কর্তারা আমাকে চিনতে পারলে বাইরে থাকতে দেবেন না এটা একরকম নিশ্চিত।

চিন্তান্বিত মুখে অটলবিহারী বললেন, তাহ'লে এ ভাবে ঘুরে বেড়ানো কি তোমার উচিত হচ্ছে? কখন কে দেখে ফেলে?

—সেই জন্যেই ত সন্ধ্যার অন্ধকারে এখানে এসেছি। এক আপনারা ছাড়া এখানে আমাকে চেনে কে? আশা করি, আপনি পুলিশ ডাকবেন না।

সোজাসুজি এই উক্তিতে অটলবিহারী বাবু বেশ একটু বিব্রত বোধ করলেন। তাড়াতাড়ি বললেন, আরে, ছিঃ, আমাদের কথা বলছিনে, বলছি এই যে আমার এখানে হরেক রকমের লোক আনা-গোনা করে, তাদের কেউ যদি হঠাৎ দেখে ফেলে।

—সে সম্ভাবনা খুবই কম। আমি এখানে আসব খুবই কচিৎ কদাচিৎ। আরও খুলে বলি, বন্দনা যখন এখানে নেই আমার আসবার প্রয়োজনই হবে না হয়ত!

অটলবিহারী খানিকক্ষণ গম্ভীর ভাবে বসে রইলেন। তার পর বললেন, কথাটা যখন তুমি নিজেই তুলেছ, আমিও খুলে বলি। তোমাকে আমরা স্নেহ করি, কিন্তু তার সুযোগ নিয়ে আমাদের বিপদের মধ্যে টেনে না আনলেই আমরা খুসী হ'ব। অর্থাৎ, আপাততঃ তুমি একটু দূরে থাকলে উভয় পক্ষেরই মঙ্গল।

—আপনারা খুসী হবেন একথাটার মানে? আপনারা কে কে?

—কেন? আমি, নবকিশোর, বন্দনা।

—বন্দনারও এই অভিমত? আমি বিশ্বাস করিনে।

—আমি তাকে খোলাখুলি একথা জিজ্ঞাসা করিনি বটে, তবে কোন্ মেয়ে চায় যে তার বাবা, তার ভাই বিপদের জালে জড়িয়ে পড়ে? তোমার কোন ভাই-বোন্ নেই ব'লে অন্যের দিকটা তুমি আদৌ দেখতে পাও না!

—আমি বেলুড়ে গিয়ে বন্দনার সঙ্গে এসম্বন্ধে মুখোমুখি কথা বলব।

—কেন একগুঁয়েমি করছ? মুখোমুখি প্রশ্ন করলে বন্দনা হয় ত অপ্রিয় সত্যটা বলতে পারবে না, তার সঙ্কোচ হবে। কিন্তু তাকে এই দ্বিধার মধ্যে ফেলা তোমার কি উচিত হবে, প্রদীপ? তাছাড়া অন্য কারণেও আমি চাই তুমি বন্দনার সঙ্গে একটু কম মেলামেশা কর।

—ঐটাই হচ্ছে আসল কারণ, কাকাবাবু! আপনার ভয়, বন্দনা আপনার উত্তরীয়ের আশ্রয় থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে এবং তার জন্যে প্রধানত দায়ী আমি। আপনি কিন্তু ভুল করছেন। বন্দনা যদি আজ নতুন চোখ দিয়ে পৃথিবীকে দেখতে সুরু করে থাকে, তাহ'লে তার পেছনে আছে যুগের হাওয়া, আমি নই।

অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে অটলবিহারী বললেন, যুগের হাওয়া না অন্য কিছু, সে আমি বুঝব। আমি তোমাকে শুধু বলছি, তুমি একটু দূরে দূরে থেকো। আমার এই সামান্য অনুরোধটাও যদি রাখতে না পার তাহ'লে আমাকে অন্য উপায়ের কথা ভাবতে হবে।

তাঁর এই শেষ কথার মধ্যে প্রচ্ছন্ন একটা ভয় প্রদর্শন।

প্রদীপ হেসে বলল, আপনার অনুরোধ পালন করতে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব, কাকাবাবু! কিন্তু বন্দনার সঙ্গে একবারটি দেখা করতেই হবে, তার দিদিমার ঠিকানাটা বলুন—

কঠিন হ'লেও অটলবিহারী কঠোর নন। তাছাড়া মাতাপিতা আত্মীয়-স্বজনবিহীন এই ছেলেটার জন্য তাঁর মন মাঝে মাঝে রসসিক্ত হয় বই কি!—বন্দনার দিদিমার ঠিকানাটা তিনি দিলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বললেন, একবারটি মাত্র, মনে থাকে যেন!

সাত

তার নিজের মেসে ফিরে যেতে প্রদীপের সাহস হ'ল না। অথচ সে এখন কোথায় যায়?

অটলবিহারী বাবুর বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসে উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে চলতে সুরু করল রাসবিহারী এভিন্যুর ফুটপাত ধরে। রাত যদিও তখন মাত্র আটটা, তবু পথচারীদের সংখ্যা কমে এসেছে, দোকানীরাও

তাদের দোকানপাট বন্ধ ক'রে ফেলছে। কারণ এই স্বল্পালোকিত রাতে ক্রেতার দল ঘরের বাইরে আসতে চায় না কিছুতেই।

হঠাৎ তার পাশে একটা মোটর গাড়ী এসে দাঁড়াল। হর্ণ শুনে সে তাকাল, দেখল নবকিশোর গাড়ী চালাচ্ছে, সে একা।

—এই যে প্রদীপদা'! তুমি কোত্থেকে? আমি অনেক দূর থেকে তোমাকে লক্ষ্য করছিলাম, প্রথমে বিশ্বাসই হয় নি যে তুমি! তারপর তোমার চলার ভঙ্গী দেখে সন্দেহ আর রইল না, ভাবলাম তোমাকে একটু সারপ্রাইজ করি। তা' যাচ্ছ কোথায়? যদি বল তোমাকে নামিয়ে দিতে পারি।—এক নিঃশ্বাসে নবকিশোর ব'লে গেল।

প্রদীপ জবাব দিল, তোমাদের ওখানেই গিয়েছিলাম, তোমার বাবার সঙ্গে দেখা হ'ল!

কৌতুক-চটুল চোখে নবকিশোর বলল, বন্দনা যে বেলুড়ে বন্দিনী, শুনেছ বোধ হয়?

—শুনেছি, তবে সে যে বন্দিনী, সেকথা ত শুনিনি!

—ওটা রূপক করে বললাম, প্রদীপদা'! বন্দিনী সে দিদিমার বাড়ীতে। বাবা বোধ হয় তোমার ভয়ে ওকে বেলুড়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন!

—ভয়? আমাকে ভয়? বিস্ময়াকুল সুরে প্রদীপ প্রশ্ন করল।

—ভয় মানুষের কখন কি ভাবে আসে কে বলতে পারে? বাবার ভয় নানাজাতীয়, তবে তার মধ্যে তোমার অংশটাও নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর নয়।

—কি যে বলছ তুমি, নবু! তিরস্কারের সুরে প্রদীপ বলল।

—রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলতে তোমার ভাল লাগছে প্রদীপদা'? আমার ত ভাল লাগছে না। যদি তোমার তেমন কোন তাড়া না থেকে থাকে তাহলে উঠে পড়ো না গাড়ীতে!

যাক্, খানিকক্ষণের জন্য অন্ততঃ বিশ্রাম মিলবে। দ্বিরুক্তি না করে প্রদীপ নবকিশোরের পাশে উঠে বসল। বিপুলবেগে ছুটল গাড়ী। প্রদীপ দেখল, অটলবিহারী বাবু এতটুকু অত্যুক্তি করেন নি। নবকিশোর গাড়ী চালায় সত্যি বেপরোয়া ভাবে।

—তারপর, কোথায় যাবে? নবকিশোর আবার প্রশ্ন করল।

—জানিনে, কারণ যাবার কোন জায়গা নেই।

—সে কি? তোমার সেই মেস কি উঠে গেছে?

—উঠে নিশ্চয়ই যায়নি, কিন্তু সেখানে যাওয়া চলবে না। তুমি ভুলে যাচ্ছ যে আমি মেদিনীপুর ফেরতা। আজই কলকাতায় এসেছি।

—ওঃ হোঃ, আমি বেমালুম ভুলে গিয়েছিলাম। অনেক গল্প শুনতে হবে তোমার কাছে। তোমরাই দেশের উপযুক্ত সন্তান, প্রদীপদা', আমরা কিছুই করতে পারলাম না। বলে সে সপ্রশংস-দৃষ্টিতে প্রদীপের দিকে তাকাল।

—আমরা কিছুই করতে পারিনি, নবু! হেরে এসেছি।

—হেরে এসেছ না ছাই! আমি ভেতরের অনেক খবর রাখি। দু'তিন সপ্তাহ তোমার বৃটিশসিংহকে ভয়াকুল করে তুলেছিলে তা আমরা এখানে বসেই শুনেছি।

—তুমি ভুল খবর শুনেছ। মেদিনীপুরে যাঁরা যথার্থ সাহসের পরিচয় দিয়েছেন তাঁদের দলে আমি ছিলাম না। আমি ছিলাম অন্য এক দলে, আমরা কিছুই করতে পারিনি। যাক্ সে কথ কিন্তু এতসব খবর তুমি পাও কোত্থেকে?

—ভয় নেই, প্রদীপদা', আমি পুলিশের টিকটিকি নই। আমা খবর জোগায় সম্পূর্ণ অন্য শ্রেণীর লোক। সে পরে বলব। কি এখন তুমি কি করবে? কোথায় যাবে? শোবে কোথায়?

—আজকের রাতের মত একটা ব্যবস্থা করে দিতে পার? প না হয় কোন বন্দোবস্ত করে নেব।

নবকিশোর খানিকক্ষণ ভাবল। তার পর বলল, ব্যবস্থা ত ক দিতে পারি অনায়াসে, কিন্তু তোমার সেখানে ভাল লাগবে না জায়গাটা বড্ড নোংরা।

—নোংরা জায়গায় থাকার খুব অভ্যেস আছে। একটা রা কোন কষ্ট হবে না।

—এ হচ্ছে অন্য রকমের নোংরা। তুমি বুঝবে না।

গাড়ী তখনও উদ্দাম বেগে চলেছে চৌরঙ্গীর মধ্য দিয়ে। এসপ্লেনে ক্রস করে চিত্তরঞ্জন এভিন্যুএ গাড়ী পড়ল।

—শোন, এক কাজ করা যাক। ওখানে এক হোটেলে ম্যানেজার আমার বন্ধু, একটা ঘর যদি খালি থাকে তাহ'লে সেখানে রাতটা কাটিয়ে দিতে পারবে। তাছাড়া তোমার খিদেও পেয়ে নিশ্চয়, খাওয়াও পাবে সেখানে।

—কিন্তু আমার কাছে খুবই সামান্য পয়সা আছে, নবু!

—সে ভাবনা আমার। তোমার কাছ থেকে কত স্নেহ পেয়েছি তার একটু প্রতিদান করবার সুযোগ আমাকে দাও।

ছেলেটা সত্যি পাগল! প্রদীপ আর কোন আপত্তি করল না গাড়ী এসে দাঁড়াল দ্বিতীয় শ্রেণীর একটা হোটেলের সামনে। প্রদীপকে গাড়িতে বসিয়ে রেখে নবকিশোর চলে গেল ভেতরে।

মিনিট দশেক পরে বেরিয়ে এসে বলল, সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে তোমার কপাল ভাল, একটি মাত্র ঘর খালি ছিল। আমি বলে যে তুমি এখানে দিন তিনেক থাকবে এবং যা বিল হবে আমার জ রেখে দেওয়া হবে। তুমি কিন্তু আবার পেমেন্ট করতে যেয়ো না।

—তিন দিনের জন্যে ঘর ভাড়া করলে কেন, নবু?

—তুমি বোঝ না, প্রদীপদা'। তুমি ত বললে কালকেই অ একটা ব্যবস্থা করে নেবে, কিন্তু যদি কোন ব্যবস্থা না হয়? হা একটু সময় রাখা ভাল। সত্যি সত্যি যদি তোমার প্রয়োজ না থাকে, যে কোন মুহূর্তে তুমি ম্যানেজারকে ব'লে ছেড়ে দিতে পার। ওঃ হো, তোমার সঙ্গে জিনিষপত্র কি ছিল না?

—ছোট একটা ব্যাগ ছিল, সেটা এক দোকানে রে বেরিয়েছিলাম।

—দোকান নিশ্চয়ই বন্ধ হয়ে গেছে এতক্ষণে?

—খুবই সম্ভব।

—একবার চেষ্টা ক'রে দেখব আমরা? গাড়ীতে আর কতটু সময়ই বা লাগবে?

—আবার গাড়ীতে করে ভবানীপুর পর্য্যন্ত যাবে? দোকান হরিশ মুখার্জ্জি রোড থেকে বেরিয়েছে।

—চলো না, দেখে আসি।

নবকিশোর সত্যি নাছোড়বান্দা। কোন কাজে সে ত্রুটি রাখে

চায় না। প্রদীপদা'র থাকবার এমন সুন্দর ব্যবস্থা হয়ে গেল, সেটা অসম্পূর্ণ হয়ে থাকবে জামা-কাপড়ের অভাবে?

প্রদীপের সৌভাগ্য দোকান এখনও বন্ধ হয়নি। দোকান থেকে ব্যাগটি আহরণ করে প্রদীপকে 'টাওয়ার হোটেল' এর ২৪ নং কামরায় বসিয়ে দিয়ে নবকিশোর বিদায় নিল।

পরের দিন প্রদীপ উপলব্ধি করল নবকিশোরের দূরদর্শিতার মূল্য। তাকে প্রথমে যেতে হবে বেলুড়ে, বন্দনার সঙ্গে দেখা করতেই হবে। নিজের মাথা গুঁজবার স্থানের সন্ধানে সে বেরুবে পরে, আজ যদি সম্ভব না হয়, তবে কাল। এই অবস্থায় আরও দু'রাত হোটেলে থাকতে পারে নিঃসঙ্কোচে, এই অনুভূতিটা আরামদায়ক বই কি!

বেলুড়ে বন্দনার দিদিমার বাড়ী খুঁজে বার করতে প্রদীপের বিশেষ বেগ পেতে হয়নি। শুনল বন্দনা বাড়ীতে নেই, সে গেছে মঠে। অপেক্ষা না ক'রে প্রদীপ হাঁটতে সুরু করল সোজা মঠের দিকে।

মঠের কাছাকাছি এসে বন্দনার সঙ্গে দেখা হ'য়ে গেল। অপ্রত্যাশিত ভাবে প্রদীপকে দেখে বন্দনা প্রায় নেচে উঠল।

—প্রদীপ তুমি ফিরে এসেছ? কবে? আমার ঠিকানা কোত্থেকে পেলে? না, এমনি বেলুড়ে বেড়াতে এসেছিলে? এক নিঃশ্বাসে প্রশ্নগুলো করল বন্দনা।

—ধীরে, বন্দনা, ধীরে। এতগুলো প্রশ্নের এক সঙ্গে জবাব দিই কি ক'রে বলত? আচ্ছা চলো, কোথাও বসা যাক।

বন্দনা প্রদীপকে নিয়ে এল গঙ্গার ধারে, ওপারে কলকাতা, অদূরে উইলিংটন ব্রিজে মেশিনগান এবং মিলিটারি সেপাইকে বেশ পরিষ্কার ভাবে দেখা যাচ্ছিল। তারা দু'জনে বসল।

—এবার তোমার প্রশ্নগুলোর জবাব দেবার চেষ্টা করি। আমি বেলুড়ে বেড়াতে আসেনি, এসেছি কাজে। কাজটা হচ্ছে তোমাকে কেন্দ্র ক'রে। ঠিকানা পেয়েছি কাকাবাবুর, তোমার বাবার, কাছ থেকে। মেদিনীপুর থেকে কলকাতায় ফিরেছি গত কাল। আরও কোন প্রশ্নের উত্তর বাকী রইল না ত?

—আমাকে কেন্দ্র করে তোমার আবার কি কাজ? আমার ত ধারণা, আমি তোমার কাজের পরিমণ্ডলের সম্পূর্ণ বাইরে!

—বলতে একটু ভুল হয়েছে। তোমাকে কেন্দ্র ক'রে নয়, তোমার সঙ্গে কাজ।

—ওঃ, তাই ব'লো।

—ভণিতা না ক'রে সোজাসুজিই ব'লে ফেলি। তোমার বাবা বললেন আমি নাকি বিপদের মধ্যে টেনে আনছি তোমাদের, কাজেই তিনি অনুরোধ জানিয়েছেন আমি যেন তোমাদের কাছ থেকে একটু দূরে থাকি।

—তার পর?

—তার পর আর কি? তুমি নিশ্চয়ই স্বীকার করবে যে তোমার বাবার মাথার ওপর বিপদ টেনে আনবার কোনই অধিকার নেই আমার।

—তুমি কি বলতে চাও, প্রদীপ? বন্দনা বেশ একটু তিক্ত কণ্ঠেই বলল।

—রাগ করো না, বন্দনা। আরও একটা কথা তোমার বাবা বলেছেন, তুমি নাকি আমার প্রভাবে এসে বিগড়ে যাচ্ছ, বাবার কথা আদৌ শুনছ না।

—এবার তোমার বক্তব্য শেষ হয়েছে ত?

—আপাতত—

—তাহ'লে আমার কথাটাও তোমাকে সংক্ষেপে জানিয়ে দিই। আমি বিগড়ে গেছি কি না জানি না, তবে এটা ঠিক যে আমার মনের অনেক পরিবর্ত্তন ঘটেছে। প্রসার হয়েছে বললেই বোধ হয় সুষ্ঠু হ'ত, কিন্তু নিজের সম্পর্কে এতখানি দম্ভ আমি প্রকাশ করতে চাইনা। আর, এর পরিবর্ত্তনের জন্ম দায়ী তোমরা কেউ নও, দায়ী আমি সম্পূর্ণ নিজে।

—কিন্তু তোমার বাবা সেটা বিশ্বাস করেন না।

—বিশ্বাস যদি না করেন, আমি নাচার।

—তুমি যা বললে সেটা কি সম্পূর্ণ সত্যি বন্দনা?

—দেখ, ব্যারিষ্টারি জেরার বিষয়বস্তু এটা নয়, এটা হচ্ছে অনুভূতির কথা। হয়ত আমার অজ্ঞাতে অবচেতন মনে এসে লেগেছে তোমার ব্যক্তিত্বের সংঘাত এবং তা অনেকখানি নিয়ন্ত্রণ করেছে আমার কর্ম্মপদ্ধতি, কিন্তু কারো দৃষ্টান্ত অনুকরণ বা অনুসরণ করবার সক্রিয় প্রয়াস আমি করিনি। তুমি হয়ত একথা শুনে দুঃখ পাচ্ছ, কিন্তু আমি যা অনুভব করছি তাই বললাম।

—দুঃখ পাব কেন? বরং সুখীই বোধ করছি। তোমার বাবার কথাবার্ত্তা শুনে নিজেকে অত্যন্ত অপরাধী মনে হয়েছিল, এখন অপরাধের বোঝাটা ঘাড় থেকে নামল।

—অপরাধের বোঝাটা এখনও নামেনি। বাবা যে বিপদের কথা বলেছেন সেটা আমার সম্বন্ধে নয়, তাঁর নিজের সম্বন্ধে, হয়ত আমার দাদার সম্বন্ধে।

—কিন্তু কি বিপদ তাঁর? তিনি ত সরকারের চাকুরী করেন না, আমার সঙ্গে তাঁর পরিচয় আছে সেটা জানতে পারলেই সরকার তাঁকে ধ'রে জেলে নিয়ে যাবেন না কি?

—তুমি ভেতরের সব খবর রাখনা। অনেক গোলমাল আছে, যার জন্যে বাবাকে আর দাদাকে সর্ব্বদা সামলে চলতে হয়। পুলিশকে তাঁরা ভয় করেন অন্য কারণে, তাই এমন কোন পরিস্থিতির সৃষ্টি হ'তে দিতে চান না যাতে পুলিশের সংস্পর্শে আসতে হয়।

—ঠিক না জানলেও খানিকটা অনুমান করতে পারছি। কিন্তু এর মধ্যে তোমার দাদার স্থান কোথায়? তার ভাবভঙ্গী দেখে ত মনে হ'লনা সে আমাকে এড়াতে চায়।

ব'লে সে বন্দনাকে জানাল নবকিশোরের তাকে গাড়ীতে তুলে নিয়ে গিয়ে হোটেলে প্রতিষ্ঠা করার কাহিনী।

—দাদা এখনও বাবার মত চালাক হয়ে ওঠেনি। তাছাড়া, সে তোমাকে সত্যি পছন্দ করে। তার আত্মবোধও বোধ হয় খানিকটা তৃপ্ত হয় যখন সে অনুভব করে দুঃস্থ বা বিপন্ন কাউকে সে সাহায্য করতে পেরেছে। কিন্তু সেও বদলে যাচ্ছে।

—তুমি এই কয়েক মাসের মধ্যে অনেক বেশী বুদ্ধিমতী হয়ে উঠেছ, বন্দনা। আমিও যেন তোমার নাগাল পাচ্ছি না!

—তাই নাকি?—বন্দনা হাসল।

—হাসির কথা নয়, সত্যি বলছি।—গভীরভাবে প্রদীপ বলল। —আমিও পরিচয় পাচ্ছি অনুন্নয়, রূঢ় এক পৃথিবীর। একজাজ

বিচরণ করছিলাম কল্পলোকের রাজ্যে, মাহাত্মাজীর বর্ণিত প্রাসাদ প্রাঙ্গণে। আমার দৃষ্টি ছিল একচক্ষু হরিণের মত।—সংসার যে কত জটিল, মানুষের মন যে কত দুর্ব্বোধ্য তা বুঝিনি' ততদিন।

—সেজন্য ক্ষোভ ক'রো না। তোমার মত সবুজ স্বচ্ছ মন ক'জনের আছে? এর সংস্পর্শে এসে আমরা যারা cynic হয়ে উঠেছি, আনন্দ পাই। এ যেন কৃত্রিম শীতলবায়ু দ্বারা ঠাণ্ডা করা ঘর থেকে বেরিয়ে প্রকৃতির দক্ষিণা বাতাস উপভোগ করা। তোমার চোখের মায়া-অঞ্জন যতদিন অক্ষুন্ন রাখতে পার থাকতে দাও।

—বড় বড় ফিলসফি ত অনেক শুনলাম। এখন আমার কি কর্ত্তব্য বল ত?

—তোমার কর্ত্তব্য? আমাকে বলে দিতে হবে? হাসালে তুমি।

—হাসির কথা নয়, বন্দনা! পলাতক আসামীর মত আমি আর কতদিন ঘুরে বেড়াব? তাছাড়া এই কর্ম্মহীন অলসতা আর সহ্য হচ্ছে না, একটা কিছু করা দরকার।

—অধীর হয়ো না। কর্ম্মব্যস্ত এই পৃথিবীতে তোমার উপযুক্ত কাজ মিলবেই।

—কিন্তু যতদিন কাজের সুযোগ না আসে ততদিন সময় কাটাই কি ক'রে বল ত?—আচ্ছা, তোমার সময় কাটছে কি ভাবে? এখানে ত তোমাকে তোমার বাবার সংসার দেখতে হয় না, তাছাড়া বন্ধুবান্ধবও বিশেষ কেউ আছে বলে ত মনে হয় না!

—প্রথমে আমারও কষ্ট হয়েছিল। তারপর দেখলাম মনের মধ্যে কষ্ট পোষণ করে রাখলে তার লাঘব ত হয়ই না, বরং বেড়ে ওঠে চতুর্গুণ। তাই আমি রোজ আসি মঠে, যাঁরা গৃহত্যাগী অথচ গৃহকে যাঁরা উপহাস করেন না তাঁদের কথা শুনি। লাইব্রেরী থেকে বই নিয়ে পড়ি, আর মাঝে মাঝে চুপ ক'রে বসে ভাবি।

—আমার উচিত তোমার সাহচর্য্যে আমার মনটাকে ডিসিপ্লিন্‌ড ক'রে নেওয়া। কিন্তু তুমি ত তা' হ'তে দেবে না!

তন্দ্রাজড়িত স্বরে বন্দনা বলল, বাধা আমার দিক থেকে নেই, প্রদীপ, বাধা হচ্ছে তোমার অবচেতন মনে। তুমি খুব ভালভাবেই জান তোমাকে কাছে পেলে আমি খুসী হই, তোমার সঙ্গে ঝগড়া করতেও আমার প্রাণে জাগে পুলকের শিহরণ। কিন্তু তোমার মন তখনও অন্তরখের চাকায় বাঁধা।

প্রদীপ বলল, অনেক দেরী হয়ে গেল, আজ আমি আসি।

—কলকাতায় ফিরে যাবার আদেশ বাবা কখন পাঠাবেন জানি না, তুমি কিন্তু বেলুড়ে আসতে এতটুকু সঙ্কোচ করো না।—আর থাকবার কোন ব্যবস্থা যদি করতে না পার তাহ'লে সোজা এখানে চলে এসো, এখানে একটা বন্দোবস্ত হয়ে যাবেই।

আট

সন্ধ্যার একটু আগেই প্রদীপ ফিরে এল কলকাতায়। হোটেলে না গিয়ে সে সোজা চলে গেল আলিপুরের সেই চা-এর ক্যাবিন-এ।

দেখল, সত্য-সত্যই সন্তোষ সেখানে আছে। আজও তার সামনের চেয়ারটা খালি ছিল, প্রদীপ সেখানেই বসল।

—এই যে যতীন বাবু, আসুন, আসুন। সন্তোষ বলল। তারপর কি খবর? চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই যে আপনার দেখা পাব এ আশা অবশ্য করিনি। সব খবর ভাল ত?

প্রদীপ জানাল তার খবর। আজ আর সে অমলেট্-এর অর্ডার দিল না, শুধু এক পেয়ালা চা নিল।

—ক্ষিদে নেই বুঝি?

—বিশেষ না। সংক্ষেপে প্রদীপ জবাব দিল।

—আপনাকে কেমন যেন মনমরা দেখাচ্ছে আজ! বান্ধবীর কাছ থেকে আঘাত পেয়েছেন বুঝি? সকৌতুকে সন্তোষ প্রশ্ন করল।

—সন্তোষ বাবু, আপনার কল্পনাশক্তি খুব প্রখর স্বীকার করছি, কিন্তু সব-সময় নিজের ক্ষমতার উপর এতখানি আস্থা-স্থাপন করবেন না।

—ওরে বাবা, আজ যে আপনি মারমুখো হয়ে এসেছেন! তবে, জানেন কি, সন্তোষ মুখুজ্যে ওতে এতটুকুও বিচলিত হয় না। মানুষ নিয়েই তার কারবার। মানুষকে সে ভালবাসে।

প্রদীপ কোন জবাব দিল না, নীরবে চা পান করতে লাগল।

তারপর হঠাৎ বলল, দেখুন সন্তোষ বাবু, আমার আসল পরিচয়টা আপনাকে দেওয়া দরকার।

চোখ টিপে সন্তোষ ইশারা করল, খবরদার, এখানে কিছু বলবেন না। চলুন, বাইরে চলুন।

বাইরে এসে বলল, এখন বলুন আপনার বক্তব্য।

—আমার নাম প্রদীপ গুহ, আমি কংগ্রেসের লোক, মেদিনীপুর থেকে এসেছি। এক নিঃশ্বাসে এই স্বীকারোক্তি করে প্রদীপ যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

—তা বেশ ত, প্রদীপ বাবু, এর মধ্যে লজ্জিত হবার কি আছে?

—লজ্জার কথা বলছি না, সন্তোষ বাবু! আপনাকে শুধু বলতে চাই যে আমার পেছনে পুলিশ আছে, আমার সঙ্গে ঘোরাফেরা করলে আপনার বিপদ হতে পারে।

তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতে সন্তোষ বলল, বিপদ হবে না, ছাই! সন্তোষ মুখুজ্যেকে আপনি এখনও চিনতে পারেন নি, এই শর্ম্মা বিপদকে ভয় করে না। তবে, হ্যাঁ, আপনার হয়ত মনে হতে পারে যে আমি আপনাকে ধরিয়ে দেব। একটা কথা বলছি, আপনার সঙ্গে আলাপ হওয়া অবধি আপনাকে বড্ড ভাল লেগেছে, আপনার বিশ্বাসের অমর্য্যাদা করব না।

—আপনার গতকালের উক্তিটা মনে পড়ছে, সন্তোষ বাবু, যে আমি একজন ব্যাক্‌নম্বর। আপনাদের জগতের সঙ্গে আমার একটু পরিচয় করিয়ে দিন না।

সন্দিগ্ধনেত্রে সন্তোষ প্রদীপের দিকে তাকাল। কিন্তু মুহূর্ত্তের জন্য। তারপর বলল, নাঃ, আপনাকে বিশ্বাস করতে পারি। আপনি গোয়েন্দা নন্।

এবার প্রদীপের হাসবার পালা। হায় রে, তাকেই গোয়েন্দা ব'লে সন্দেহ করে!

—কি দেখতে চান, বলুন। হাতেখড়ি করতে হলে নির্ব্বিচারে গুরুর কথা মানতে হয়, জানেন ত?

—জানি বই কি। গুরুর আদেশ শিরোধার্য্য করেই ত' মেদিনীপুরে গিয়েছিলাম। যথাসাধ্য চেষ্টা করব।

—কোথায় যাবেন? সেই ফ্ল্যাটে?

—মন্দ কি? প্রদীপ খুবই চেষ্টা করল তার স্বরের মধ্যে আগ্রহ এবং উৎসাহ ফুটিয়ে তুলতে।

—কিন্তু পয়সা খরচ করতে হবে যে! লোকটা পয়সা বড্ড চেনে, নগদ অন্ততঃ পঞ্চাশটি টাকা না দিলে কিছুতেই রাজী হবে না।

প্রদীপ একটু দমে গেল।—এত পয়সা ত আমার নেই, সন্তোষ বাবু! তাছাড়া আমি হতে চাই শুধু দর্শক, অংশগ্রহণে আমার কোনই প্রবৃত্তি নেই।

হো হো করে হেসে উঠল সন্তোষ।

—আপনি এখনও ছেলেমানুষ, প্রদীপ বাবু! ওখানে দর্শক আর নায়কের মধ্যে কোনও তফাৎ নেই, মুড়ি-মুড়কির সমান দর। তাছাড়া অনেকেই দর্শক ভাবে সুরু করেন কিন্তু সমাপ্তি হয় অন্ত ভাবে। রসময় আপনার এই সূক্ষ্ম পার্থক্যের রসগ্রহণ করতে পারবে না।

রসময় হচ্ছে চা'-এর ক্যাবিনের মালিকের নাম।

—এক কাজ করা যাক। আপনি যখন আমাকে গুরু ব'লে মেনে নিয়েছেন তখন প্রথম রাতের দক্ষিণাটা আমিই অ্যাডভান্স করছি। প্রথম বাধা কেটে গেলে পরবর্ত্তী দায়িত্ব কিন্তু নিতে হবে সম্পূর্ণ আপনাকেই!

সন্তোষ প্রদীপকে বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে ভেতরে চলে গেল। একটু পরে এসে বলল, সব ঠিক আছে। আরও ঘণ্টা দুই অপেক্ষা করতে হবে। আসুন, কোথাও খেয়ে নেওয়া যাক। আমি কিন্তু আপনাকে গন্তব্যস্থানে পৌঁছে দিয়েই খালাস, আজ রাতে আমার আবার ডিউটি আছে।

রাত আন্দাজ ন'টার সময় সন্তোষ এবং প্রদীপ মোমিনপুরগামী একটা বাস-এ উঠে বসল এবং মিনিট কুড়ি বাদে একটা ষ্টপ-এ নেমে পড়ল।

—এখান থেকে পাঁচ মিনিটের পথ। ফ্ল্যাটটা খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, আপনার পছন্দ হবে।

গ্যাসলাইটের স্তিমিত আলো অনুসরণ করে তারা দুজনে এসে দাঁড়াল দ্বিতল ছোট এক অট্টালিকার সামনে। নীচে রসময় দাঁড়িয়েছিল, তাদেরই প্রতীক্ষায়।

—রসময় বাবু, এই আমার বন্ধু। আপনি এঁকে ওপরে নিয়ে যান। আমাকে চলে যেতে হবে, ডিপোয় রিপোর্ট করবার সময় হ'ল।

রসময় বলল, আপনি আমার সঙ্গে আসুন, যতীন বাবু।

প্রদীপ বুঝল, সন্তোষ তার আসল পরিচয় গোপন করে গেছে রসময়ের কাছ থেকে। সে এখন যতীন মজুমদার, প্রদীপ গুহ নয়।

চাবি দিয়ে একটি ঘর খুলে রসময় প্রদীপকে বসতে বলল। —আপনি একটু অপেক্ষা করুন, এক্ষুণি আসছে।

প্রদীপ বসল। ঘরের এক কোণে টেবিল, গোটা দুই চেয়ার। টেবিলের উপর একটা ইলেক্‌ট্রিক ল্যাম্প। ওদিকে দেওয়ালের কাছ ঘেঁষে একটা ডিভ্যান্, তার ওপর গোটা দুই-তিন কুশন্। রসময়ের রুচি প্রশংসা করবার মত বটে!

প্রদীপের বুকটা ঢিপ ঢিপ করছিল। হঠাৎ খেয়ালের বশে এ কি করছে সে? যদিও সে জানে যে তার উদ্দেশ্য অসাধু নয়, তবু অভিজ্ঞতা অর্জ্জনের আর কোন পথ কি খোলা ছিল না?

সে চুপ করে তাকিয়ে রইল দেয়ালে টাঙান স্বামী বিবেকানন্দের ছবিটার দিকে।

দরজাটা সন্তর্পণে খুলে ঢুকল ষোল সতেরো বছরের একটি মেয়ে। পাতলা দোহারা চেহারা, গায়ের রংটা একটু ময়লা। সস্তা প্রসাধন সামগ্রীর সাহায্যে সে চেষ্টা করছে রংটাকে একটু উজ্জ্বল করে তুলতে, খানিকটা সফলও হয়েছে। যুঁই ফুলের মালায় খোপা জড়ানো। মুখে জোর করে টেনে আনা হাসি, তাকে বলা হয়েছে হাসতে হবে, তাই সে হাসছে।

প্রদীপ তড়াক করে লাফিয়ে উঠল চেয়ার থেকে। কি যে বলবে ভাষা খুঁজে পেল না সে। কি বলতে হয় ওদের? সন্তোষকে জিজ্ঞাসা করা বোধ হয় উচিত ছিল।

—আপনি উঠলেন যে? বসুন। মেয়েটি বলল।

প্রদীপ বসল তার উল্টোদিকে, দ্বিতীয় চেয়ারটিতে।

পাখা বন্ বন্ করে ঘুরছে, কিন্তু প্রদীপের সর্ব্বাঙ্গে ঘাম। অবশেষে সে প্রশ্ন করল, তোমার নাম কি?

—ছবি। মৃদুস্বরে মেয়েটি বলল।

—ছবি? দেশ কোথায়?

—বহরমপুরে।

—তোমার বয়স কত? প্রদীপ আবার প্রশ্ন করল।

—ঠিক জানিনে, ষোল সতেরো হবে—

—এখানে কেন এসেছ? প্রদীপ ভর্ৎসনার সুরে বলল।

ভয়াকুল চোখে ছবি প্রদীপের দিকে তাকাল। এ প্রশ্নের কি জবাব দেবে সে?

নির্ম্মম ভাবে প্রদীপ বলে চলল, কত দিন ধরে এ ব্যবসা চালাচ্ছ? কেন? পয়সার অভাব? হাসপাতালে নার্স্‌এর কাজ করতে পার না অথবা কোন বাড়ীতে ঝি-এর কাজ? লজ্জা করে না এই ভাবে রাতের পর রাত সম্পূর্ণ অপরিচিত পুরুষদের কাছে আসতে, তাদের কাছে তুলে ধরতে তোমার দেহের সম্ভার?

ছবির চোখ ছলছল করে উঠল। বলল, আপনার বুঝি আমাকে পছন্দ হচ্ছে না?

প্রদীপ আরও রেগে উঠল। তীব্রকণ্ঠে বলল, পছন্দ হচ্ছে খুবই, কিন্তু যখন মনে করি গতকাল এই প্রশ্ন করেছ আরেক জনকে এবং আগামীকাল করবে সম্পূর্ণ নতুন আর কাউকে, তখন আমার পছন্দ অপছন্দের মূল্য কোথায়, বুঝতে পারিনে।

ছবি কাতর কণ্ঠে বলল, সখ করে আমরা এ পথে আসিনি।

—নাঃ, সখ করে আসোনি। প্রদীপের কথায় তীব্র ব্যঙ্গ। তোমাদের জোর করে আনা হয়েছে, না?

—জোর করে নয়, তবে সখ করেও আসিনি। এসেছি নিতান্তই প্রাণের দায়ে। বলে ছবি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

প্রদীপ লজ্জিত বোধ করল। একটু নরম সুরে বলল, কান্নার কি আছে, ছবি? আমি তোমার বন্ধু, তোমাকে সাহায্য করতে এসেছি।

জিজ্ঞাসুনেত্রে ছবি তার দিকে তাকাল।

—বাড়ীতে তোমার কে আছে ?

—বাবা, তিনি পক্ষাঘাতে শয্যাশায়ী। দুটি ছোট ভাই, বিধবা দিদি, স্কুলে চাকুরী করেন।

—মা নেই ?

—মা অনেক দিন মারা গেছেন।

—হুঁ, তাই বুঝি রসময় বাবুর কাছে আত্মসমর্পণ করেছ ?

ছবি নীরব।

—দিদি কি জানেন এখানে কি হয় ?

ছবি তবু নীরব।

—প্রশ্নের জবাব দাও ছবি! প্রদীপ আদেশের সুরে বলল।

—ঠিক জানেন না বোধ হয়, তবে বোঝেন নিশ্চয়ই। ছবি এবার জবাব দিল।

—বাঃ, তাহ'লে ত বিবেকের কাছে কোনই জবাবদিহি করতে হয় না! প্রদীপের কণ্ঠে আবার স্নেহের সুর।

—আপনি কেন বার বার একই কথা বলছেন? আপনি কি বোঝেন না আমরা কত অসহায়? তার কথার মধ্যে আর্ত্তনাদের একটা প্রচ্ছন্ন সুর।

—শোন ছবি, যা হবার হয়ে গেছে। এখন তোমাকে এ পথ ছাড়তে হবে, আমি তোমাকে সাহায্য করব।

অবিশ্বাসের চোখে ছবি প্রদীপের দিকে তাকাল।

গম্ভীর ভাবে প্রদীপ বলতে লাগল, আমি তোমার কাছ থেকে আর কিছুই চাইনে, চাই শুধু এই প্রতিশ্রুতি যে রসময় বাবু বা তার লোক যদি ভবিষ্যতে তোমার কাছে আসে তুমি সোজা বলে দেবে তুমি আর এখানে আসতে পারবে না। বুঝেছ ?

—কিন্তু ওরা যে বাবার কাছে সব ফাঁস করে দেবে। ছবির চোখে-মুখে ভয়ের ছায়া।

—ওদের সে সাহস নেই। বলতে গেলে ওদের জড়াতে হবে নিজেদের। তোমার ভীরুতার সুযোগ নিয়ে ওরা তোমাকে খেলাচ্ছে, তুমি ওদের কথায় ঘাবড়ে যেয়ো না।

ছবি ঘাড় নাড়ল, কিন্তু প্রদীপের আশ্বাসবাণী তার চেতনার অন্তস্তলে পৌঁছল কি না বোঝা গেল না।

—তোমার ঠিকানাটা আমায় বল, আমি কালই সেখানে যেয়ে সব ব্যবস্থা করে আসব।

ছবির ঠিকানা প্রদীপ একটা কাগজের টুকরোয় লিখে নিল। তারপর বলল, এবার তোমার নিজের কথা ব'ল। আমি শুনতে রাজী আছি।

কি বলবে সে নিজের কথা? প্রদীপের প্রশ্নবাহিনীর উত্তরে যা' বলেছে তা' থেকেই কি প্রদীপ বাকীটুকু বুঝে নিতে পারেনি, পূরণ করতে পারেনি অসম্পূর্ণ পদগুলো?—কাহিনী অতি সাধারণ, অত্যন্ত চিরন্তন। এর মধ্যে না আছে নতুনত্ব, না আছে বৈচিত্র্য।

চুপ ক'রে মুখোমুখি হয়ে দু'জনে বসে রইল। ছবি প্রদীপের দিকে ভাল ক'রে তাকাবার সাহসও পেল না।

প্রায় এক ঘণ্টা পরে প্রদীপ যখন বেরিয়ে এল তখন সারাটা বাড়ী নিঝুম, আশে-পাশে জনমানবের চিহ্নও নেই। [ক্রমশঃ।

ডাক্তার খান সাহেব

শ্রীবৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য

সীমান্তের সূর্য তুমি, আকাশের কক্ষ হতে খসা
অম্লান আলোকে তব অপগত অজ্ঞান-তমসা।
তোমার একতা-মন্ত্রে দীক্ষা ল'য়ে হ'লো যে অমর
আত্ম-কলহ-মত্ত পথভ্রান্ত যত যাযাবর।
অফুরন্ত প্রাণ-রস তব। তাই তুমি যে হেলায়
জরারে ক'রেছ জয় তারুণ্যের দীপ্ত মহিমায়।
তোমা মাঝে নির্বাপিত ধর্ম প্রতি অন্ধ অনুরাগ
স্বরাজ-সংগ্রাম মাঝে ছিলে তুমি সতত সজাগ।
সহিষ্ণু উদার আর ত্যাগব্রতে নিবেদিত-প্রাণ
অহিংস-সাধক তুমি, সত্যাশ্রয়ী বরেণ্য পাঠান!
হিংস্র ঘৃণ্য বর্বরের ছুরিকার নির্মম আঘাতে
মৃত্যুঞ্জয়ী প্রাণলেখা রেখে গেলে মৃত্যুর পশ্চাতে।

ওপারের বন্ধু যত এপারের শোনো অনুনয়
রক্তমাঝে মুক্তিস্নানে হয় যেন চেতনা-উদয়।
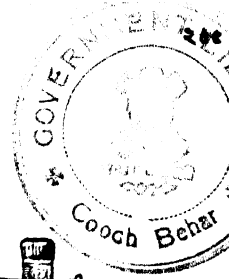
স্নানের সময়
মনে
রাখবেন
একশ' বছরের
ঐতিহ্য,
বিশুদ্ধতা এবং
অপরিবর্তিত
গুণগুলির জন্য
আজও সমাদৃত
লক্ষ্মীবিলাস
তৈল
এম. এল. বসু য়্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
লক্ষ্মীবিলাস হাউস, কলিকাতা-৯

চক্রপাণি

বন্ধুর ভূমি নেচে নেচে নেমে এল সমতলে। বার্মো, ফুসরো, আর্গাডা, তেলো, বোকারো, কোনার, তিলায়া—ছোটনাগপুর নেমে চলল বাংলার দিকে। খাদে খাদে বয়ে চলল দামোদর, বরাকর, তিলায়া, কোনার, হাজারিবাগ থেকে এলো কোনার, রাঁচী থেকে এলো বোকারো, এক হলো তারা বার্মোর কাছে—প্রবাহ এগিয়ে চলল দামোদরের দিকে, বরাকর এলো আরো উত্তর থেকে—হাজারিবাগ পেরিয়ে সাঁওতাল পরগণা পেরিয়ে মানভূমের ভেতর দিয়ে একেবারে বাংলার সীমানায় এসে মিলল দামোদরের সঙ্গে ডিসেরগড়ে। এ সব নিয়ে বিরাট দামোদর ভ্যালী—তার 'ক্যাচমেণ্ট এরিয়া' বা জল সংগ্রহ ক্ষেত্র গোটা ছোটনাগপুর, মানভূম, রাঁচী, পালামৌ আর সাঁওতাল পরগণা যেখানে শহর হয় নদী, খাদ, ডুঙ্গর আর মহীরুহ নিয়ে, যেখানে রাজত্ব করে বড় বড় অজগর, নেকড়ে আর চিতা আর মাঝে মাঝে একান্ত ব্যতিক্রমের মত কালো কালো ওঁরাও, সাঁওতাল আর কুর্মি।

অশান্তি নিয়ে এল এমন জায়গায় সমতলের মানুষ কয়লার সন্ধানে। গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ড-নর্মদার দক্ষিণে গণ্ডরাজাদের রাজ্যে শিলার গড়ন দেখে ভূতাত্ত্বিকেরা ঘোষণা করলেন গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ডের অস্তিত্ব—কোটি কোটি বছর আগেকার অখণ্ড ভূভাগ ভারত, আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া আর আমেরিকা মিলে। মাদাগাস্করের জীবাশ্ম চমৎকার ভাবে মিলে গেল দাক্ষিণাত্যের জীবাশ্মের সঙ্গে। প্রাণিবিদ্‌রা ঘোষণা করলেন—দক্ষিণ আফ্রিকা, দক্ষিণ ভারত আর দক্ষিণ আমেরিকার নিম্নশ্রেণীর মেরুদণ্ডী জীবের মধ্যে এমন অদ্ভুত মিল সুদূর অতীতে এ সব স্থলভাগের অখণ্ডতাই প্রমাণ করে। ভারতের ভূবিদ্যার যুগান্তরকারী আবিষ্কার গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ড—'ডিপ,' 'ষ্ট্রাটা,' 'ফল্ট,' 'ফোল্ড,' 'ষ্ট্রাইক,' 'টেকশ্চার নিয়ে এগিয়ে চলল রিসার্চ আর 'ফিল্ড-ওয়ার্ক'।

প্রথম যুগের গণ্ডোয়ানা যাকে বলা হল 'লোয়ার গণ্ডোয়ানা'—তার তিনটি স্তর—তালচের, দামুদা আর প্যাঞ্চেট। সবচেয়ে নীচে তালচের বড় বড় পাথরে ভর্তি—হাজারা, সিমলা, উড়িষ্যা, রাজপুতানা আর মধ্যপ্রদেশে তাদের স্তর বেরিয়ে এল মাটির ওপর। অতি শীতল হিমবাহের যুগে গ্লেসিয়ারের সঙ্গে ভেসে এসেছে পাথর আর নুড়ি, পলির মত তারা স্তরে স্তরে জমেছে; তৈরী হয়েছে তালচের সিরিজ—অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকাতেও এর প্রকাশ হয়েছে। এর পর এল দামুদা সিরিজ। গরম যুগের জল-হাওয়ায় সজীব হয়ে উঠল গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ড।

সারা দেশে বনমহোৎসব করলেন ব্রহ্মা। সবুজের সমারোহ পত্রে পুষ্পে সুশোভিত করলেন বিষ্ণু। আর সকল সৃষ্টির ধ্বংস করলেন মহেশ্বর তাঁর প্রলয় নাচনে—ভূকম্পনের প্রভাবে ধীরে ধীরে নেচে গেল গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ড সুনীল জলধির অতলান্তে! কোটি কোটি বছর ধরে স্তরে স্তরে জমে উঠল এর ওপর বিচিত্র সব শিলাস্তর, আর সে সবুজ বনরাজি তাপে ও চাপে দ্রবীভূত হয়ে উঠল ঘোর কৃষ্ণ অঙ্গারে!

বরাকরের যুগে চব্বিশ ফালি অঙ্গার স্তর জমেছে ঝরিয়া অঞ্চলের ভূতলে। একের পর এক 'স্যাণ্ডষ্টোন' আর 'শেল', 'শেল' আর কয়লা! তার পরের যুগের অঙ্গার রাণীগঞ্জ শ্রেণী সাতপুরা, ডিসেরগড়, চিনাকুড়ি আর সাংক্তোরিয়ায়—এসব মিলে প্রসিদ্ধ 'রাণীগঞ্জ ষ্টেজ', তার ওপর বিরাট শিলাস্তূপ—কয়লার নামগন্ধহীন শুধু 'স্যাণ্ডষ্টোন' আর লোহার 'শেল'—'লোয়ার গণ্ডোয়ানা'র 'পাঞ্চেট সিরিজ', এর মাথার মুকুট পঞ্চকূট পাহাড় যার চরণ ছুঁয়ে বয়ে গেছে দামোদর বরাকরের মোহানার একটু আগেই!

কয়লা আর লোহা, লোহা আর কয়লা—এ দুয়ে নিয়ে শিল্প। কয়লা দিল ঝরিয়া, লোহা দিল পাঞ্চেট, গজিয়ে উঠল শিল্প, পাহাড়ের ঢালে ঢালে বসল শহর—ভিনদেশ থেকে এল ভিনদেশীরা। ধরণীর বুক চিরে বেরোয় সোনা ঘোর কৃষ্ণ—ঘর্ঘর করে ঘোরে চাকা—নেমে যায় 'লিফট' সোজা শাফটের মধ্যে দিয়ে হাজার হাজার ফুট—ঢালু সুড়ঙ্গের ভেতর দিয়ে। টবের পর টব টেনে আনে মোটা তার—তারও চাকা ঘোরে মাটির ওপর!

লাইন বসেছে গ্র্যাণ্ডকর্ড, লাইন বসল বার্কাকানা লুপ। লাইন বসেছে, লাইন বসছে, ঘর্ঘর করে এগিয়ে যাচ্ছে ব্যালাষ্ট ট্রেন—অ্যাশ ব্যালাষ্ট ফেলে নতুন এমব্যাঙ্কমেণ্টের ওপর!

এরই মধ্যে মানবকুল—বিচিত্র তাদের ভাষা, বিচিত্রতর তাদের পরিচয়। এত দিন চলেছিল সংস্কার, এবার এসেছে বিপ্লব—বিপ্লব এনেছে ভারত সরকার। পাহাড়ের খাদে-খাদে বয়ে আসা খেয়ালী নদীগুলোকে সব তারা বাঁধবে—'ক্যাচমেণ্ট এরিয়া' থেকে ছুটে আসবে জল মানুষের তৈরী বাঁধের সামনের হাজার হাজার বর্গ-মাইল সরোবরের দিকে। সরোবর থেকে জল নিয়ে যাওয়া হবে নীচের, নল দিয়ে যেখানে বসেছে টার্বাইন—জল-বিদ্যুতের চাকা! হুহু করে ছুটে আসবে জলের তোড় চাকার পরিধি-ভরা নালি দিয়ে—যখন করে ঘুরবে 'টার্বাইনের 'শাফট' ঘোরাবে আর্মেচার শক্তিশালী চুম্বক দিয়ে ঘেরা 'ম্যাগনেটিক ফিল্ডে'—তৈরী হবে বিদ্যুৎ! আর্মেচার থেকে 'সুইচগীয়ার,' 'সুইচগীয়ার' থেকে 'পোল'—পোল থেকে কারখানা—পাহাড়ের বুকের বিদ্যুৎপ্রবাহ এগিয়ে চলবে সমতলের দিকে—রাঁচী, পাটনা, পুরুলিয়া টাটা, বার্ণপুর, আসানসোল, বর্দ্ধমান,

কলকাতা! দু'লক্ষ 'কিলোয়াট' বিদ্যুৎ আর দশ লক্ষ একর জমির জন্যে এগারো হাজার 'কিউসেক জল'—চমৎকার প্ল্যান হল 'ডি, ভি, সি,'র। উপনিবেশ বসল বার্কাকানা লুপের ধারে ধারে। গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ডে সুরু হ'ল প্রলয়! জমি তোলপাড় করে দিচ্ছে 'ক্যাটারপিলার', পাহাড় ফাটায় ডিনামাইট আর মাটি শক্ত করছে 'সিপ-ফুট-রোলার'!

জল হ'ল, বিদ্যুৎ হল, কারখানা খোলো এবার। বরাকরের দশ মাইল উত্তরে মেনলাইনের ওপর বিহারের সীমানা ষ্টেশন মিহিজাম। সেখান থেকে হেঁটে যাও পূর্ব্বে—পাঁচ মিনিট পরেই আবার আরম্ভ হ'ল বাংলাদেশ। নামেই বাংলা, আসলে ছোটনাগপুরের বিস্তার সেখানে। বিশেষজ্ঞরা নেমে পড়লেন! চমৎকার জায়গা কারখানার পক্ষে। কিসের কারখানা? রেলের ইঞ্জিন তৈরীর, নোটিশজারী হল আদিবাসীর ওপর, পত্তন হল চিত্তরঞ্জনের—জাপান বিহীন এশিয়ার প্রথম রেলের ইঞ্জিন তৈরীর কারখানা! ভগবান বিষ্ণুর কাছে আর্জ্জি পাঠাল ছোটনাগপুরের জন্তুজগৎ—তারা যে 'নিজবাসভূমে পরবাসী' হয়ে উঠেছে! কিন্তু বিষ্ণুর সবচেয়ে প্রিয় জীব মানুষ! ভগবান বিষ্ণুর সুখনিদ্রা ভাঙ্গল না!

ধানবাদে নামল একদল বৈজ্ঞানিক। ভূতাত্ত্বিকের স্বর্গ ঝরিয়া, ডিগওয়াডি, পাথরডিহি—পার হয়ে গেল তারা, হাজির হল সিনদ্রী! ব্যস! বসাও আর এক কারখানা। কৃষিপ্রধান দেশ ভারতবর্ষ। হাজার হাজার বছর ধরে উৎপীড়ন চলেছে জমির উপর। মানুষের খাবার জোগাতে জোগাতে নিঃশেষ হয়ে গেছে মাটির সমস্ত রস। গোবরের সার দেয় চাষীরা জমির মুখে এক ফোঁটা চরণামৃতের মত। তাতে আর কতটুকু উর্ব্বরতা বাড়ে! নাঃ, এমন উৎপীড়ন আর চলবে না। জমির রস আবার জমিতেই ফিরে আসবে—ভারত সরকার দেবে সার, অ্যামোনিয়াম সালফেট। কারখানা বসল সিনদ্রীতে 'সিনদ্রী ফার্টিলাইজার ওয়ার্কস'। তারও চাকা ঘোরে মাটির ওপর—'পুলির' ওপর দিয়ে বেল্ট টেনে আনে 'কোক' আর 'ক্যালসিয়াম সালফেট'।

* * * *

খচাং করে কেটে গেল 'কাপলিং'—হাজারিবাগ আলাদা হ'ল মোগলসরাই থেকে। ঘুম ভেঙ্গে গেল। ঘুমের ঘোরেই অনুমান করলাম, সাইডিং-এ রয়েছে আমাদের হাজারিবাগের বগি—গড়গড় করে বেরিয়ে যাচ্ছে মোগলসরাই প্যাসেঞ্জার।

ঘুমিয়ে পড়েছিলাম আবার। ঘুম ভাঙাল নিশীথ—ষ্টেশন এসে গেছে। কক্-কক্ করে ডেকে উঠল মোরগ প্ল্যাটফর্ম্মের সামনে উঁচু টিলা থেকে। সবে ফর্সা হয়েছে আকাশ। টিলার ওপর গোবর দিচ্ছে ঝুপরীর দেওয়ালে রেলপোর্টারের ঘরণী। হতাশ হলাম ষ্টেশনের রূপ দেখে। খবর দিল 'এডভান্স পার্টি'র দিলীপ। হ্যাঁ, এই সেই জায়গা যর কারখানায়, 'সেণ্ট্রিফুগাল মেশিনে' তৈরী হয় বড় বড় জলের পাইপ, যার ভারত-বিখ্যাত নাম 'স্পান পাইপ।' লাইন দিয়ে একটু এগিয়ে গেলেই কারখানার 'ফেন্সিং' আর এপার ওপার যাবার জন্যে রেললাইনের ওপর বিরাট সেতু। ফেন্সিং ঘেঁষে ছুটে যায় গ্র্যাণ্ডকর্ডের সব কটা ট্রেণ—বোম্বে মেল, দিল্লী মেল, ডুন এক্সপ্রেস। লাল লোহার হলকা ঘেরোয় বড় বড় 'ব্লাষ্টফার্ণেস' থেকে—মনে হয় কারখানার ভেতর দিয়েই ছুটে চলেছে রেলগাড়ী! এই কারখানারই ছাই-গাদায় বরাকর-মুখো গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোডের ধারে পর পর ছাউনি পড়েছে আমাদের।

পিছনে কারখানার লম্বা চিমনিগুলো দিন-রাত হুহু করে ধূম-উদ্গিরণ করে। তার সামনে ছাইগাদার ওপর লাইন দিয়ে ওয়াগান টেনে আনে ইঞ্জিন—ওয়াগান-ভর্ত্তি সমস্ত ছাই ওপর থেকে নীচের ঢালে পড়ে জমা হয়। তিন-চার শো ফুট নীচের এই পাদদেশ পশ্চিম দিকে ধীরে ধীরে নেমে এসে আবার উঁচু হয়ে গেছে। এই জায়গাটাই পরিষ্কার করে জঙ্গল কেটে সার্ভে-ক্যাম্প ফেলা হয়েছে ইন্জিনিয়ারিং কলেজের। চারটে লাইনে দশটা করে চল্লিশটা ছাত্রদের থাকবার তাঁবু। একেবারে পিছনে ইস্পাত-কোম্পানীর দৌলতে টিনে ঘেরা 'বাথরুম' আর 'ক্লোজেট'—কাছাকাছি 'ওয়াটার-মেন' থেকে জলের পাইপও টেনে আনল কোম্পানীর লোকেরা।

ফটকের সামনের রাস্তা জি, টি, রোড থেকে উঠে এসে ডান দিকে জঙ্গলের মধ্যে একেবারে নেমে গেছে; তারপর রেলের ওপর ওভারব্রিজ দিয়ে সোজা চলে ওপরে। কুলি-মজুর, ওঁরাও-সাঁওতাল হিন্দু-মুসলমান, বাঙালী-বিহারী, মাড়োয়ারী-উড়িয়া, এসবে মিলে সেখানে এক বিচিত্র জনতা, লোহা আর কয়লা নিয়ে তাদের জীবন!

ওপারে এক চক্কর দিয়ে লাইন পার হয়ে যখন এপারে পৌছুলাম, রাত হয়ে গেছে। ছবির মত সাজানো ছোট শহর কোম্পানীর বাংলো আর কোয়ার্টারে ভর্ত্তি। শহর পার হয়ে জি, টি, রোড।

মিশমিশে অন্ধকারের মাঝখানে উঁচু-নীচু ঢেউয়ের মত রাস্তা কোথায় যে কোন দিকে নিয়ে যায় কিছুই বোঝা যায় না। পাঁচশো বছরের পুরোনো শেরশাহী রাস্তার অনেক সংস্কার হয়েছে এযুগে, কিন্তু কার্পণ্য আছে বিজলীর। এ-হেন শিল্পস্থানেও পথের ধারে একটিও ষ্ট্রীট-লাইট চোখে পড়ে না। মাঝে মাঝে ঝুপরির ছেঁচা বাঁশের ফাঁক দিয়ে এক এক ছটা আলো নেমে এসেছে খাদে, নিশানা দেয় লোকালয়ের।

সঙ্গে ছিল রাও, রাঘবন, কায়ুম আর সরকার, পকেট থেকে সিগারেটের বাক্সটা বের করেই ফেলে দিল রাও। বলল—যাঃ, সিগারেট ত ফাঁক। কিছু অনুরোধ করার আগেই বলে দিলাম—আমি আর ঐ হোটেল রুচিরা অবধি হাঁটতে পারবো না। সামনের দোকানেই দেখ—সিগারেট না হয় বিড়ি ত পাবে!

অন্ধ্র জমিদারের ছেলে রাও। উত্তরে অভিমান করল সে—'ম্যাক্রোপোলো ছাড়া যে কিছুই খায় না, তার কাছে 'ক্যাপস্টন্'ও অপাংক্তেয়, বিড়ি ত দূরের কথা!' তবে বর্ত্তমানে অভাবে স্বভাব নষ্ট। খবর নেওয়া হল দোকানে। সিগারেট পাওয়া গেল। তার সামনের বেঞ্চিতে বসে একযোগে সুরু হল ধূমপান। তীব্র হেড লাইট জ্বালিয়ে সামনে দিয়ে ছুটে গেল ডি, ভি, সি,র ষ্টেশন ওয়াগন। হেড লাইটের চোখে পড়ল দোকানের কাছেই আমাদের রাস্তার সংযোগস্থলে একটা ছোট্ট ইটের ঘর—এদিকের দুটো জানালাই বন্ধ। গাড়ী চলে গেল। আবার সব অন্ধকার। সিগারেটের আগুন ছাড়া আমাদের কিছুই দেখা যায় না। হঠাৎ কায়ুম বলে উঠল—আরে তবলাকা আওয়াজ কাঁহাসে আতা? উৎকর্ণ হয়ে সবাই শুনলাম—সামনের ঐ ছোট্ট ইটের ঘরে তবলা সঙ্গতে হারমোনিয়ম বাজনা আর তার তালে তালে ঘুঙুর—ভেতরে নিশ্চয়ই

কোন টিমটিমে আলো জ্বলছে—ভেন্টিলেটারের ফাঁক দিয়ে আলোর এক পাতলা রশ্মি বেরিয়ে মিলিয়ে গেছে একশো ফুট নীচু খাদের অন্ধকারে। রাঘবন সবচেয়ে উৎসুক হয়ে উঠল, আরে চল্ চল্, লেট আস সী।

ঘরটা প্রদক্ষিণ করে হাল্কা ঢালাই কারখানার রাস্তায় উঠলাম। ঘরের এদিকের একটা জানলা আধ-খোলা। রাঘবন জানলার ফাঁক দিয়ে অনেকক্ষণ দেখল। তারপর আমাদের কাছে এসে এক রকম হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গেল সবাইকে।

ছোট একটা সতরঞ্চির একধারে বসে এক ওস্তাদজী হারমোনিয়ম্ বাজাচ্ছে, তার পাশে আর একজন ভয়ঙ্কর মাথা নেড়ে তবলা সঙ্গত করছে, আর সামনে ঘুঙুর পরে সমানে নেচে চলেছে দুই সুন্দরী। নাচের সঙ্গে সঙ্গে তাদের ঘাগরা গোল হয়ে ঘুরছে। অর্দ্ধাবৃত উর্দ্ধাঙ্গের ভাঁজে ভাঁজে তরঙ্গায়িত শুভ্রদেহ নারীর কমনীয় সৌন্দর্য্যের সকল আভাস দিচ্ছে। কতক্ষণ দাঁড়িয়েছি জানি না। হঠাৎ নাচতে নাচতে ছোটটি বসে পড়ল আর আমাদের জানলার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, মৈ নেই নাচুঙ্গী। বড়টি তার কথায় খিলখিল করে হেসে উঠল। বাজনা বন্ধ হয়ে গেল। আমরা ততক্ষণ জানলা ছেড়ে রাস্তার ওপর উঠে পড়েছি।

একটু এগুতে না এগুতেই সামনে থেকে কড়া টর্চের আলো পড়ল চোখে-মুখে। কাছে এসে সেলাম আলেকুম্ করল টর্চধারী আর বলল—বাবুজী অন্দর চলিয়ে, বাহারসে কেয়া দেখ রহে সে?

কেন জানি না, নিজের অজান্তেই চারজনে পকেটে হাত দিলাম। বাজনদার বলে উঠল—আরে সাব পকেটমে কেয়া দেখতে হে? ইস্ কো বাজার সমঝা? কার সমঝমে যে কি এসেছে, কেউই জানলুম না! শুধু বুঝলাম, ঐ ছোট ঘরটা আমাদের সকলকেই আকর্ষণ করছে আর তবলচি তখনও বলে চলেছে—একদিন দেখিয়ে, দোদিন দেখিয়ে, আচ্ছা লাগে ত বক্‌শিস দিজিয়ে। ফিরে তাকালাম কায়ুমের দিকে। জিজ্ঞেস করলাম—কি সাহেব, কটা বাজছে?

ন'টা বাজতে এখনও আধ ঘণ্টা। চল, পাঁচ মিনিট না হয় দেখেই আসি।

গলার স্বর একটু নামিয়ে বলল—'উই আর অলসো ফোর।' —আমরাও চার জন, ওরা করবে কি?

বলা বাহুল্য, বয়সের দিক থেকে আমাদের বেশীর ভাগ ছাত্রেরই তখনও 'ভোটিং রাইট' হয়নি এবং স্বাস্থ্যের গরিমায় কাশ্মীরী কায়ুম কাশ্মীরের মুখে-চুণ-কালি দিয়েছে আর তেলেগু রাও অন্ধ্রের মুখরক্ষা করেছে; বাকী আমরা দুই ভেতো বাঙালী শরীরের চেয়ে মন আর কর্ম্মের চেয়ে চিন্তা, এ দুটির দিকেই বেশী দৃষ্টি দিয়েছি।

সতরঞ্চির এক পাশে চাদর বিছিয়ে অতিথিদের বসবার জায়গা করলে তবলচি। হারমোনিয়ামে এক ঝঙ্কার দিয়ে বাজনদার হুকুম দিল—সুরু করো। বড়টি ঘুঙটের পট খুলে আদাব করলো। ছোটটি পা দুটি সামনে ছড়িয়ে হাত দুটি পিছনে রেখে নির্লিপ্ত ভাবে বসেই রইল। বড়টি কটাক্ষ হান্‌ল একবার তার ওপর। বাহুর আলগা বাজুবন্ধ শক্ত করে বাঁধল। উড়নীটা মখমলের কাঁচুলির ওপর দিয়ে সযত্নে ঘুরিয়ে নিল। নাচ সুরু হ'ল। ছোটটি আড়চোখে চেয়ে রইল আমাদের দিকে।

হারিকেনের শিখাটুকু উজ্জ্বল করে দিয়েছে কে! আলোর রশ্মি এসে পড়েছে ছোটটির চোখে-মুখে সর্ব্বাঙ্গে। উন্নত বক্ষের ওপর তার পাতলা আবরণী দিয়ে মুমুক্ষু যৌবনের আভাস—হঠাৎ আত্মচেতনা জাগল তার। সাদা উড়নী দিয়ে সমস্ত উর্দ্ধাঙ্গ ঢেকে ফেলল সুন্দরী।

রূপনগরীর পরী এসে যেন যাদু করেছে আমাদের! কতক্ষণ বসে আছি খেয়াল নেই। হঠাৎ ঘরে ঢুকল ইয়াসিন মিঞা—ক্যাম্পের সামনে যে ক্যান্টিন খোলা হয়েছে তার মালিক। আমাদের দেখে হতভম্ব হয়ে গেল ইয়াসিন। চোখের সামনে যেন ভূত দেখেছে সে। বাজিয়েদের দিকে তাকিয়ে চীৎকার করে উঠল—এ উল্লুকা বাচ্চা। বাজনদার বাজনা বন্ধ করে হাঁ করে তাকিয়ে রইল। বড় সুন্দরী কটাক্ষ হান্‌ল ইয়াসিনের ওপর, ছোট সুন্দরী হেসে গড়িয়ে পড়ল আর বলল—ইস্ কো কহতে হেঁ মিলটিরী? ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মত।

ছোট সুন্দরীর ঠাট্টায় রেগে উঠল ইয়াসিন। দূর থেকেও শুনতে পেলাম তার গর্জ্জন। খবর সে সত্যি ভুল পেয়েছিল। ইয়াসিন বলছে—মা কা দুধ পিতে হৈ এলোগ ইন্‌কো কহতা হৈ মিলটিরী? আজ রাতেই ডেরা ওঠাও এখান থেকে।

রেকনয়সেন্স সুরু হল পরের দিন—রেকনয়সেন্স বা সম্যক নিরীক্ষণ —সার্ভে আরম্ভ করার আগে চারিদিক ঘুরে দেখা। বোমা ফেলার আগে বোমারু বিমান শত্রুঘাঁটির ওপর আকাশ থেকে 'রেকনয়সেন্স' করে। রেল লাইন বসানোর আগে 'এডভান্স পার্টি' এগিয়ে চলে 'দুর্গমগিরি কান্তারমরু'র ওপর দিয়ে, তাও শুধু 'রেকনয়সেন্সে'র জন্যে। মাটির ওপর একটা করে খুঁটি পুঁতে রেখে যায় তারা—দরকার হলে খুঁটি বের করে তার ওপর সুতো দিয়ে লাইন টানবে ভবিষ্যতের দল।

এক বাংলোর বাগানে বেতের চেয়ারে বসে চা পান করছিলেন কোম্পানীর এক সাহেব। ছোট ছেলেটিকে টেবিলের ওপর বসিয়ে পট থেকে চা ঢেলে দিচ্ছিলেন মেমসাহেব। রাস্তাটার এক মস্ত বাঁক সেই বাংলোর সামনে। থিওডোলাইট-এর জন্যে খুঁটি পুঁতলাম সেই বাঁকে! ব্রেকফাষ্ট মিউজিক চলেছে পুরোদমে 'রেডিও সিলোন' থেকে—আর তার তালে তালে 'ফক্স-ট্রট' নেচে চলেছে সামনের ড্রইং-রুমে এক জোড়া তরুণ-তরুণী!

যতগুলো বাংলো ততগুলো রেডিও। ক'টা ভাষা জানেন আপনি? ভারতের সব অঞ্চলের অফিসার আছেন এখানে—আর ভারতের সব ক'টা ভাষা আছে এখানকার রেডিওগুলোতে, একদল কুঁচো ছেলে একটা মাঝারি গোছের বাংলো থেকে অনেকক্ষণ আমাদের দিকে তাকিয়ে ছিল। হাতছানি দিতেই তারা দৌড়িয়ে বেরিয়ে এলো!

খাবার জল চাইল রাও। দৌড়ে গিয়ে তিন খোকা তিন গ্লাস জল নিয়ে এল। জল দিয়েই সবচেয়ে ছোটটি বলে উঠল—তোমাদের হাতী ঘোড়া কোথায়? সার্কাস দেখাবে না?

নিশ্চয়ই দেখাব। তোমাদের আজ সকলের নেমন্তন্ন। ঠিক পাঁচটার সময় আমাদের তাঁবুতে হাজির হবে, কেমন?

কি মজা, কি মজা! আমরা সবাই যাব কিন্তু!

নিশ্চয়ই যাবে। টানাটানিতে রাখালের আঙুলগুলো ভেঙে পড়ার উপক্রম।

দু'দিন পরেই সুরু হল 'ট্রায়াঙ্গুলেশন'। খুঁটি পুঁতে ষ্টেশন করা হ'ল ক্লাব রোডে। টেলিস্কোপ ফোকাস করে এক লাইন থেকে আর এক লাইনের মধ্যে কোণ মাপছি, হঠাৎ টেলিস্কোপের মধ্যে ভেসে উঠল এক তরুণী—ববছাঁটা চুল, পরনে সাদা সিল্কের শাড়ী আর লাল চোলি—হন হন করে সে যেন টেলিস্কোপের মধ্যে দিয়েই হাঁটছে। টেলিস্কোপ এঁটে বৃত্তের ওপর কোণের মাপ দেখার জন্তে চোখ আর তুলিনি। আস্তে আস্তে সে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আমিও লেন্স ছেড়ে কোণটুকু লিখে নিলাম ফিল্ডবুকে; এমন সময় সম্বোধন এল—হ্যালো মিষ্টার! চেয়ে দেখি, দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মধ্যে দিয়ে সোজা চলে এসেছেন সুন্দরী আমার সামনে! চসমাটা চোখ থেকে নাকের ডগায় নামিয়ে ভাল ভাবে নিরীক্ষণ করলাম তরুণীকে। হ্যাটটা খুলে ফেললাম স্ত্রীজাতির সম্মানার্থে, বললাম হ্যালো মিস্, হোয়াট ক্যান আই ডু ফর ইউ?

নাথিং মাচ। তারপর একটু থেমে জিজ্ঞেস করল—ক্যান ইউ টেল মী হোয়্যার ইজ ছাট টল ফেয়ার ফেলো অফ ইওর গ্যাং? বলতে পারো, তোমাদের দলের সেই লম্বা ফর্সা ছেলেটা কোথায়?

আরে মিস, তুমি কার কথা বলছ? লম্বা ত অনেকেই আছে আমাদের মধ্যে, ফর্সাও আছে অনেকে। আর আমরা চুরিও করি না, ডাকাতিও করি না যা রেললাইনের 'গ্যাংম্যান'ও নই! সুতরাং অমন 'গ্যাং' 'গ্যাং' বলে অপমান করছ কেন?

দুঃখ প্রকাশ করল তরুণী। বলল—দুদিন আগে তোমাদের একটা দল রাস্তায় মাপটাপ করছিল। সে দলের একটা লম্বা ছেলের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে কানের ইয়ারিংটাই হারিয়ে ফেলেছি! কিবেণ নাম তার।

মনে পড়ে গেল কাপুরের কথা। রেকনয়সেন্সের দিনেই চেন নিয়ে বেরিয়েছিল তেরো নম্বর দলের নেতা মনোহরলাল কাপুর। মুখ নীচু করে 'লিঙ্ক' গোনার সময় মানুষের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে চমকে গিছল সে আর চীৎকার করে উঠেছিল, কানট ইউ সী? তারপর মুখ তুলে মানুষটিকে দেখে ভয়ঙ্কর আশ্চর্য্য হয়ে গিছল কাপুর—শাড়ীর আঁচল সামলে নিয়ে এক সুবেশা তরুণী হন হন করে গিয়ে ঢুকলো সামনের বাংলোতে—ফিরে একবার তাকালোও না 'চেনে'র ধারকটির দিকে।

একটু ভেবে জিজ্ঞেস করলাম—আর ইউ টকিং এবাউট কাপুর?

ইয়েস ইয়েস—ঐ নামেই ত বন্ধুরা তাকে ডাকছিল। সাফল্যের আনন্দে যেন উচ্ছল হয়ে উঠল তরুণী। তারপরই মিনতি করে জানতে চাইল—তার সঙ্গে কোথায় এখন দেখা হবে বল না?

ধ্যেৎ, আমি যে নামটা বললুম তার জন্তে একটা ধন্তবাদও নেই, উল্টে আবার প্রশ্ন? ধৈর্য্যের প্রায় শেষ সীমায় এসে জিজ্ঞেস করলুম—তোমার নামটা কি জানতে পারি?

নাম বলল, ডলি—উপাধি আহ্বলেসরায়া, কেউ কেউ উচ্চারণ করে 'আহ্বলেশ্বরী' বিশেষ করে তার হিন্দু বান্ধবীরা—ঈশ্বরী মার্কা নাম উচ্চারণ করতে নাকি তাদের ভারী ভালো লাগে! বলতে বলতে পার্সী-দুহিতার যেন খেয়াল হ'ল, নাম বলতে গিয়ে অনেক বাজে কথাই বলে ফেলেছে সে। সুতরাং সে প্রসঙ্গের ওপর হঠাৎ যবনিকা ফেলে আবার জিজ্ঞেস করল—কোথায় সে আছে বলো ত, ইয়ারিং-এর জন্তে কাল থেকে ভয়ঙ্কর খুঁজছি কাপুরকে।

বেশ, হারালে ইয়ারিং আর খুঁজছ কাপুরকে?

না মানে, আমতা আমতা করে জবাব দিল, মানে সে যদি ওটা পেয়ে থাকে।

প্লট-চার্ট দেখার ভণিতা করে উত্তর দিলাম—তোমাদের বাড়ীর কাছের রাস্তাগুলো দেখেছ? ঐ খানেই ত তাদের প্লট।

হেসে উঠল ডলি, বলল—কিন্তু আমার বাড়ী চিনলে কি করে?

উত্তর যেন মুখে লেগেই ছিল—বিকস ইউ আর এ ফেমাস ফিগার, এণ্ড কাপুর ইজ এ লীডার।

কৃত্রিম রাগ দেখাল সে। আর যাবার সময় বলে গেল, থ্যাঙ্ক ইউ।

চেয়ে রইলাম রাস্তায় যতক্ষণ ডলিকে দেখা যায়। তার পর—তার পর থিয়োডোলাইট খোলো, বাক্স লাগাও, ষ্ট্যাণ্ড নাও, ষ্টাফ নাও, এগিয়ে চল সাত জন—পার্টি নম্বর চোদ্দ, টুপিটা তখন হাতে ধরে আছি।

ইয়াসিনের ক্যান্টিনে আজ-কাল বিকেলে বসতে কেমন যেন লজ্জা লাগে। ছোট সুন্দরী এখনও যেন অবজ্ঞার হাসি হাসছে; বড় সুন্দরী, এখনও যেন চোখের সামনে রূপের সম্ভার সাজিয়ে নেচে চলেছে। হোগলা-ঘেরা ক্যান্টিনের সামনে বেঞ্চে বসে দূরে প্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের বাঁকের দিকে চেয়ে চেয়ে অলস ভঙ্গীতে এক কাপ চায়ে চুমুক দিচ্ছি। হালকা ঢালাই কারখানার এক শিফট শেষ হয়েছে। একদল মজুর সামনের রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে ক্যাম্পের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল। অনেকক্ষণ ধরে চেয়ে রইল ক্যাম্পের ভেতর। তার পর আমাদের কাছে এসে জিজ্ঞেস করল—বাবু, খেল কব সুরু হোগা? ইয়াসিন তেড়ে মারতে যায় আর কি। ভাগো হিঁয়াসে এ কেয়া বাজার হায়?

আশ্চর্য্য হয়ে তাকিয়ে রইল কুলির দল। চোস্ত উর্দুতে বুঝিয়ে দিল কায়ুম, এটা সার্কাসের তাঁবু নয়। তোমাদের এখানে লাইন বসবে, জলের কল হবে, ভাল ভাল থাকবার ঘর হবে। তাই মাপ করার জন্তে বাবুরা এসেছে কলকাত্তা থেকে।

কথা কি তারা শুনছে, তারা যেন স্বপ্ন দেখছে। মাথা নীচু করে আদাব করল একে একে। ছেঁড়া গেঞ্জি আর পায়জামা ঘামে আর 'গ্রীশস্তাণ্ডে' মিশে শরীরের সঙ্গে লেপটে গেছে। কয়লার খনির এক একটা যেন জোয়ান ভূত—তাগড়া শরীর নিয়ে তারা 'কিউপোলা'য় লোহা ফেলে যায় আর লোহার বালতি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ঢালায়ের ছাঁচে ঢেলে দেয়। তাদের জন্তে যে আর কোনো মানুষের দরদ থাকে, এ তারা স্বপ্নেও ভাবতে পারে না। ওপারের জঙ্গলে একের পর এক কালো ভূত সভ্যতার অভিশাপ বয়ে নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ঢং ঢং করে ঘণ্টা পড়ল সাতটায়, ড্রইং টেণ্টে কড়া আলো লাগানো হয়েছে। প্রথম 'প্রজেক্ট' 'ট্রায়াঙ্গুলেশন' শেষ। ছোট ছোট ত্রিভুজে ভাগ করে পনেরোটি দল শহর মেপেছে। তাদের পনেরোটি নক্সা একের পর এক পাশাপাশি জুড়ে দাও—গোটা শহর ধরা পড়বে মোটা পুরু হাতে তৈরী ড্রইং কাগজে কালো চীনে কালির রেখায়। চাপ দিয়েছেন প্রফেসর—দু'দিনের মধ্যেই নক্সা তৈরী করে ফেলতে হবে।

ড্রইং টেন্টের মাটি কেটে কুটে পরিষ্কার করে ঘেঁষ ফেলা হ'ল। তার ওপর ফাঁকে ফাঁকে দু'খানা তক্তা বসিয়ে দেওয়া হ'ল এক একটা লম্বা দু'পায়া ফ্রেমের ওপর—তৈরী হল ড্রইং টেবিল। চোখের ওপর দিয়ে দেওয়া হ'ল প্রত্যেক টেবিলে একটা করে একশো পাওয়ারের আলো—নাও নক্সা করে ফেলো।

পার্টি-লীডার তুষারদা' বলল—ওসব ক্যালকুলেশান আমার দ্বারা হবে না। আমি বড় জোর আঁকতে পারি। কিন্তু 'ট্র্যাভার্স-টেবিলটা' করে দিয়ে যাও।

আর 'ট্র্যাভার্স টেবিল'। খস খস করে চার্ট তৈরী করে বেমালুম আন্দাজে আঁকের পর আঁক বসিয়ে দিলাম, ও ত বড় টেবিল। কার আর চোখে ঘুম নেই যে ওটা আদ্যোপান্ত 'চেক' করে যাবে। সম্পূর্ণ টেবিলটা ছুঁড়ে দিলাম তুষারদা'র দিকে। তুষারদা' ত একেবারে হতভম্ব। বলল—বেমালুম গুল চালালে?

চালিয়েছি ত বেশ করেছি; তুমি ততক্ষণ খুঁজে বার করো আর আমরা বরাকর থেকে এক চক্কর দিয়ে আসি।

পুরোনো ছাত্র নতুন ছাত্রকে দেখে গাড়ী থামালো। লিফট পাওয়া গেল ডি, ভি, সি-র দৌলতে। বরাকর পার হয়ে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ঢুকল বিহারে চিরঘুণ্ডা ব্রিজের ওপর দিয়ে। বিহার আর উড়িষ্যা যখন এক ছিল তখনকার কালের রোড ব্রিজ এই চিরঘুণ্ডা ব্রিজ। দুই প্রদেশের সীমানা এর ওপারে এপারে দু'পারের প্রস্তরলিপির হুকুমনামা পড়লে মনে হয় যেন ডুরাণ্ড লাইনের ওপরেই এসে পড়েছি—এপারে ওপারে দু'দেশের শান্ত্রী বন্দুক ঘাড়ে খালি এদিক ওদিক করছে। ভাবখানা যেন, এই পাঠানের দেশে ঢুকেছ কি গেছ!

কালো পিচের রাস্তা দিয়ে নামতে লাগলাম ফেরার সময় বরাকরের দিকে। দিনান্তে কাজের শেষে জীপ আর লরীগুলো হু হু করে ছুটে চলেছে গ্যারেজের দিকে, বাংলার লোক বাংলায় ফিরছে, বিহারের লোক বিহারে। ব্রিজের নীচে দিয়ে বড় বড় ইস্পাতের পোষ্টের ওপর 'রোপওয়ে' টেনে চলেছে কয়লা আর বালির টাব বরাকরের এপার থেকে ওপারে। জমার খাতায় কয়লা দেনার খাতায় বালি। কয়লা কাটা হল, মাটির তলায় গর্ত্ত হল, সে গর্ত্ত ভর্ত্তি করা হল আবার বালি দিয়ে। ভর্ত্তি করার সময় যত রকম 'ঠেস' দেওয়া ছিল ওপরটাকে ধরে রাখার জন্তে সেগুলোও কেটে নেওয়া হল। আর 'অ্যাক্সিডেণ্ট' একজন মাইন সার্ভেয়ার বলেছিলেন, কয়লার খনির শতকরা নব্বই ভাগ অ্যাক্সিডেণ্ট হয় এই পিলার কাটার সময়।

অ্যাক্সিডেণ্ট এদিকেও হয়ে গেছে। পিছনে চেয়ে হঠাৎ খেয়াল হল, কাপুর আমাদের সঙ্গে নেই। নীচে নামার সিঁড়ি দিয়ে দু'জন নেমে গেল টর্চ্চ জ্বালিয়ে ব্রিজের তলায়—কে জানে, বরাকরের জলে ঝাঁপটাপ দিল কি না! আর আমরা দু'জন টর্চ্চ হাতে ব্রিজের ওপর উঠতে লাগলাম। পাশে যে পূর্ব্ব রেলপথের ব্রিজ আছে, তার দুটো 'স্প্যান' ও পেরুতে হল না। আমাদের সেতুরই ফুটপাথের কংক্রীটের ওপর টর্চ্চ ফেলতে চোখে এল কাপুরের চিরপ্রিয় ক্রেপ সু-এ আঁটা পদযুগল আর তার পাশেই সাদা এক জোড়া হাই হিল।

কাপুরকে এক গাঁট্টা দোব না চড় লাগাব, ঠিক করার আগেই হাই হিল ধারিণী বলে উঠল পরিষ্কার বাংলায়—আরে রায় না! আমি চমকে উঠলাম। এ দেখছি ডলি, আর এখানেই বা কি করে এল? সে প্রশ্নের জবাব ডলিই দিল। ওপারে 'চাক ফায়ারক্লে'র সহকারী ম্যানেজার ডলির পার্শ্ববর্ত্তিনীর জামাইবাবু। পার্শ্ববর্ত্তিনী ডলির বান্ধবী, সুমতি সেন। পাশাপাশি দুটো শপের ফোরম্যান ডলির বাবা আর সুমতির বাবা। ছোটবেলা থেকেই এক সঙ্গে মানুষ হয়েছে সুমতি আর ডলি। প্রথমে বাড়ীতে বসে বসে গুজরাটি আর বাংলা বর্ণপরিচয় শেষ করা হ'ল,—গুজরাটি ডলির মাতৃভাষা আর বাংলা সুমতির। তার পর মেম সাহেবের কাছে ইংরেজি, তারপরে শহরের গার্লস স্কুলে দু'বছর, পরিশেষে মিশনে ভর্ত্তি হল দুই বান্ধবী কলকাতায় এসে। ফার্ষ্ট ইয়ার সায়ান্স চলেছে এখন!

ডলির মুখে যেন ফোয়ারা এসেছে। ঠাট্টা করে বললাম—তা ত সবই বুঝলাম। কিন্তু তোমার বন্ধুর জামাইবাবুটিই বা কি রকম ভদ্রলোক! এই সন্ধ্যায় একলা ছেড়ে দিয়েছেন তোমাদের?

কথা শুনে ফোঁস করে উঠল—কেন আমরা কি কচি খুকী আছি এখনও?

আলবৎ। কলেজে-পড়া মেয়েদের চার ভাগের একভাগ 'মহিলা' হয়, আর বাকী তিন ভাগের দিখিদিক জ্ঞান লোপ পায়!

পার্শ্ববর্ত্তিনী হেসে উঠলো। বাক্যবাণ ছাড়বার জন্তে প্রস্তুত হচ্ছিল ডলি। কিন্তু তার হাত ধরে টান দিল সুমতি, বলল—চল, গাড়ী এতক্ষণ নিশ্চয় হর্ণ দিয়েছে। এই প্রথম কণ্ঠস্বর শুনলাম সুমতির। ব্রিজের রেলিঙের ওপর হাত রেখে সে শুধু একদৃষ্টে বরাকরের জলের দিকে চেয়ে ছিল। অন্ধকারে সে মানুষটির উপস্থিতির আভাসটুকুও যেন পাওয়া যায় না!

খট্‌খট্‌ করে চঞ্চল আওয়াজ এল হাই-হিলের। যাবার সময় উদ্‌গিরণ করে গেল ডলি—তোমার বন্ধুর মতলব ভালো নয়। তাকে বলো, সাত দিনের মধ্যেই আমার ইয়ারিং চাই।

কোনো কথারই উত্তর দিল না কাপুর। বললাম—এখানে আর দাঁড়িয়ে কি হবে? চল। অতি ধীর পদক্ষেপে আমরা ফিরে চললুম।

পাশে ইস্পাতের সেতুর ওপর দিয়ে 'কোল ফিল্ড এক্সপ্রেসে'র টর্পেডো ইঞ্জিন বুকের ওপর আলো জ্বালিয়ে ব্রিজ পার হচ্ছে। আর আমাদের রাস্তার ব্রিজে দোল খেতে খেতে ধীর গতিতে বেরিয়ে যাচ্ছে সুমতির জামাইবাবুর সাদা প্লিমাউথ। ওপাশের ইঞ্জিনের আলোয় স্পষ্ট দেখা গেল মানুষগুলোকে। হুবহু এক রকম পোষাক সুমতির আর ডলির—তফাৎ খালি মাথার চুলে, ডলির বব-ছাঁটা চুল পরিধানবিহীন আর সুমতির খোঁপায় বিচিত্র ফুলের সমারোহ! আমাদের দিকে চোখ পড়তেই সুমতি চোখ নামিয়ে নিল। আর ডলি একটা কাগজ পাকিয়ে ছুঁড়ে দিল আমাদের দিকে।

সমস্ত বাক্‌সংযম হারিয়ে ফেলল কাপুর আর বলে উঠল—কি শয়তান মেয়ে! চিরঘুণ্ডায় সিগারেট কিনতে গিয়ে তোদের পিছনে পড়ে গিছলাম; সিগারেট ধরিয়ে ব্রিজ পার হচ্ছি, এমন সময় এক টান পিছন থেকে। চেয়ে দেখি, শয়তান সশরীরে হাজির! বলে,—আমার জিনিষ ফেরৎ দাও। কত দিন তোমার পিছনে ঘুরছি। কিন্তু উপযুক্ত সুযোগ আর মেলে নি।

হাসি পেল কাপুরের কথা শুনে। বললাম—তোরই ত সব দোষ। প্রথম দিনে সত্যি কথাটা বলে দিলেই হ'ত।

চুপ করে রইল মনোহর।

একটু এগিয়েই চৌমাথার বোম্বে কাফে। কাফেতে এসে এক কোণে দু'জনে এক জোড়া আসন অধিকার করলাম। মুখ নীচু করে কপালে হাত দিয়ে বসল কাপুর। হাত দুটো ঠেলে কপাল থেকে সরিয়ে দিতেই কাপুর রেগে উঠল, বলল—ধ্যেৎ, ভালো লাগছে না!

কেন? কি হয়েছে তোমার? একটা মেয়ের জন্তে শেষ কালে পাগল হয়ে যাবি?

আই কেয়ার এ ষ্ট্র ফর হার। ওই বয়ং বেহায়ার মত আমার পেছনে ঘোরে।

খুব হয়েছে। এর কোন প্রমাণ দেখাতে পারিস?

খুব পারি। এই ত আজ সকালেই আরুলেসরায়ার বাংলোর ভেতর গিছলাম 'অফসেট' নিতে। দেখি, সামনের ঘরের পর্দা সরিয়ে আমাদের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে বেহায়া মেয়েটা—চোখ পড়তেই বেরিয়ে এসে বলল—পরের বাড়ীতে 'ট্রেসপাস' করলে কি হয় জান?

অকালপক্ব মেয়েটাকে এক চড়ই দিতাম। সংযত হয়ে বললাম—সে জ্ঞান তোমার কাছ থেকে নিতে হবে নাকি?

উত্তর দিল—তাই তো মনে হচ্ছে। বদমাইস, সাবকো বোলাও তো। গৃহকর্তা বেরিয়ে এলেন পোর্টিকোতে। পরনে একটা সাদা পায়জামা আর তার ওপর 'স্লিপিংগাউন'। তিনি বেরিয়ে এসেই বললেন—হ্যালো ডার্লিং, তুমি জেন্টলম্যানদের সঙ্গে এরকম ঝগড়া করছ কেন? জানো এরা সব বড় বড় ইঞ্জিনিয়ার হবে দু'-এক বছর বাদে?

ডলি ভেংচি কেটে বলল—ইঞ্জিনিয়ার না ছাই—রাস্তায় ফিতে মেপে কেউ ইঞ্জিনিয়ার হয়? বলেই সে দৌড়ে ঘরে ঢুকে পড়ল।

আরুলেসরায়া সাহেব আমাদের এক রকম টেনে নিয়ে ড্রইংরুমে বসালেন। চীৎকার করে বললেন—ডলি, চা নিয়ে এসো।

চা নিয়ে এল ডলি আর সুমতি। ডলিকে দেখিয়ে আরুলেসরায়া সাহেব বললেন—দিস ইজ মাই ওন্‌লি চাইল্ড—মিশনে পড়ে, ছুটি ত বাড়ী এসেছে। আর সুমতিকে দেখিয়ে বললেন—এ্যাণ্ড দিস ইজ দি টুইন সিষ্টার অফ ডলি। ভয়ঙ্কর চঞ্চল মেয়ে আমার ডলি, আর ঠিক উল্টো এই সুমতি। মাঝে মাঝে আশ্চর্য্য হয়ে যাই, এদের মধ্যে এত বন্ধুত্ব হ'ল কেমন করে!

সুমতি তখন অন্দরে চলে গেছে। ডলি দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিল। একেবারে চীৎকার করে উঠল—ও ড্যাডি, হোয়াই ডু ইউ ব্লেম মী অলওয়েজ? দিন-রাত খালি সুমতি আর সুমতি।

ডলির মা বেরিয়ে এলেন চীৎকার শুনে। এসেই বললেন, এই তোমাদের জেন্টলম্যানরা নাকি বাদের সাহায্য করার জন্তে কোম্পানী এত বড় নোটিশ পাঠিয়েছে বাড়ী-বাড়ী। আবার হাসি উঠল সারা ঘরে। ডলির মা কতকগুলো 'স্যাণ্ডউইচ' এগিয়ে দিলেন আমাদের দিকে। আর পাঁউরুটির ওপর জ্যাম লাগাতে লাগাতে বলে চললেন—জানো, আমাদের দারোয়ান যদি বেঁচে থাকত, ঠিক তোমাদের মত হত। চমকে উঠল ডলি। মাকে থামিয়ে বলে উঠল—চুপ করো মা! এদের কাছে দারোয়ান ভাইয়ের কথা বলে কি লাভ?

ডলির মাকে ভেতরে পাঠিয়ে দিলেন আরুলেসরায়া সাহেব। চোখ দুটো তারও ছলছল করে উঠল। আস্তে আস্তে বললেন—দারোয়ানের মৃত্যুর পর থেকেই মামির মাথাটা একটু খারাপ হয়ে গেছে।

প্লেন টেবিল, ফ্ল্যাগপোল, ট্র্যাণ্ড, টেপ—সব গুছিয়ে নিয়ে যখন উঠলাম, তখন বেলা একটা। গেটটা পার হয়ে পোর্টারের কাঁধে বাক্সগুলো চাপিয়ে দিচ্ছি, এমন সময় কতকগুলো 'অ্যারো' নিয়ে এসে সামনে ফেলে দিল ডলি; বলল—কি রকম ইঞ্জিনিয়ার তোমরা? জিনিষপত্রেরই ঠিক থাকে না! কিছু না বলে অ্যারোগুলো তুলে নিলাম। যাবার সময় কানের কাছে বলে গেল—ডোন্‌ট মাইণ্ড, ওগুলো আমি লুকিয়ে রেখেছিলাম।

কাপুর চুপ করল এখানে। একে একে সবাই উঠে পড়ল টেবিল থেকে। শুরু হয়ে এল কাফে। 'নিওন লাইট'গুলো মধুজাল বুনে তখনও জ্বলছে। কি যেন এঁকে চলেছে কাপুর একটা কাগজের ওপর। কিছু বলবার আগেই কাগজটা এগিয়ে দিয়ে বলল—দেখ ত সুমতির ইয়ারিংটা এই রকম কি না?

তা আমি কেমন করে জানবো?

কেন, দেখিস নি? একজোড়া দুল ছিল আজ সুমতির কানে।

কিন্তু সুমতির আর ডলির দুল এক হবে কেন?

নিশ্চয়ই হবে! মনটা বাদ দিয়ে ওদের সবই এক।

ধ্যেৎ, যত সব পাগলামি! রেগে বললাম—কে জানে?

[ক্রমশঃ ।

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

ধনঞ্জয় বৈরাগী

প্রথম প্রথম জলিলদের সঙ্গে থাকতে শ্যামলের অসুবিধা হলেও ক্রমে তা গা-সওয়া হয়ে যায়। জলিলরা সেই শ্রেণীর লোক। যাদের অনুভূতিশক্তি কম, শুধু ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে সুখ দুঃখ উপভোগ করে। যাদের মধ্যে নেই কোন কৃত্রিম বালাই, সব কিছুই বড় স্পষ্ট। লুকোচুরির মধ্যে যে আনন্দ আছে, তা তাদের অভিজ্ঞতার বাইরে। শ্যামল আর যাই হোক, এ ধরণের ছেলে ছিল না। তাই প্রথম প্রথম ভাল না লাগলেও মুখ বুজে কাটিয়ে দিত। কিন্তু এখন মনে হয়, এ মোটা জীবনটার মধ্যে কিছুই অস্বাভাবিক নয়।

জলিলরা মেয়ে দেখলে চোখ দিয়ে গিলে খায়। শ্যামলের মনে হত এ বড় অসভ্যতা। কিন্তু একদিনে সে নির্লজ্জ ভাবে তাকাতে শিখে গেছে। এর মধ্যে যে একটা আনন্দ আছে তা সে এর আগে বুঝতে পারতো না। অবশ্য মঙ্গলা এসে পড়ায় শ্যামল একদিনে খুব তাড়াতাড়ি বড় হ'য়ে উঠেছে। তাই প্রত্যেক দিন রাত্রে সে মঙ্গলার বাসায় যায়। সারা রাত কাটিয়ে ভোরবেলা জলিলদের কাছে ফিরে আসে।

জলিল টিটকিরি কাটে। মেয়েছেলে ছাড়া এক রাতও কাটাতে পারিস না! আচ্ছা ছেলে তুই। শ্যামল উত্তর না দিয়ে খাটিয়ার উপর শুয়ে পড়ে।

তোর বেহালার ছুঁড়িটা ভাল ছিল, তবু তাজা, মঙ্গলার মত বাজারের জিনিষ নয়।

শ্যামলের গৌরীর কথা মনে পড়লো। এক ঘরে কত রাত তারা শুয়েছে। কিন্তু কোন দিন তার দেহের প্রতি শ্যামলের নজর পড়েনি। এখন যদি এক রাত সে ঐ রকম ভাবে কাটাতে পারতো, একথা ভেবে শ্যামল দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে আড়মোড়া ভাঙ্গে।

সত্যি মঙ্গলা তাকে হাতে ধরে কৈশোর থেকে যৌবনে উপনীত করেছে। মঙ্গলা তাকে বলে, দুষ্ট লোকের সঙ্গে বেশী মিশো না। আমি খবর দিয়ে দেব, তুমি জলিলদের কাছে ঐটুকু বলেই টাকা আদায় করে নিও।

শ্যামল হেসে বলে তাতে কি হ'য়েছে। ওদের সঙ্গে ঘুরতে আমার বেশ ভাল লাগে। সেদিন যে তোমার কথামত আমরা গাড়ী নিয়ে পালালাম, তার মধ্যে কি আনন্দ।

মঙ্গলা ভয় পায়—যদি ধরা পড়তে?

—কে ধরবে? অত ভয় পেলে দুনিয়ায় থাকা চলে না। শ্যামল মঙ্গলাকে কাছে টেনে নিয়ে আদর করে বলে, কিছু ভয় নেই তোমার। রোজ রাত্রে দেখবে আমি ঠিক আসবো।

শ্যামলের সঙ্গে পুরোন বন্ধু-বান্ধবদের কারুরই দেখা হয় না। মদন আর চুনীলালের উপর যে আক্রোশ জমা হয়েছিল, তাও সে একরকম ভুলে গেছে বললেই হয়। প্রতিহিংসা নেবার কল্পনা আর নেই। এমন কি, বটুমামাকেও একলা পেলে সে হয়ত কিছু বলবে না, একমাত্র অভিমান তার কেষ্টদা'র ওপর। কেষ্টদা' যে তার প্রতি অন্যায় করেছে, একথা সে চেষ্টা করেও ভুলতে পারে না। কেষ্টদা'র কথা সে শুনতো। তাকে সে সত্যিই ভালবেসেছিল, অথচ সেই কেষ্টদা' বেইমানী করলে।

আগে দুঃখ পেলে মার কথা তার মনে পড়তো, হয়তো নীরবে চোখের জল ফেলতো কিন্তু মার সেই ছবিতে দেখা মুখখানা আর তার মনে পড়ে না। বাবা সম্বন্ধে অন্য কথা। শুধু ঐ বাবা শব্দটার সঙ্গেই সে পরিচিত। তার অন্তরের কোন স্পর্শই সে পায়নি। মামার বাড়ী থেকে চলে আসার আগে একদিন মামার সঙ্গে বটু-মামার টুকরো আলোচনায় সে শুনেছিল, তার বাবা মফঃস্বলে আবার বিয়ে করেছেন। সে কথা শশধর বাবু শ্যামলকে আর কোন দিন বলেননি। কিন্তু কলকাতায় তার আগে তিনি মাসে একবার করে আসতেন। ক্রমে তা তিন মাসে একবার হয়ে দাঁড়াল। শ্যামল এ নিয়ে মনে মনে যথেষ্ট ব্যথা পেয়েছে। কোন দিন মুখ ফুটে তা বলেনি। আজ শ্যামলের মনে হয় সে চলে আসায় সবাই হয়ত সুখী হয়েছে। বাবা নতুন সংসার নিয়ে ব্যস্ত। শ্যামলকে মন থেকে মুছে ফেলেছেন। মামার বাড়ীতে সে ছিল বাইরের ছেলে, এখন তারাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বেঁচেছে। সেই ফেলে-আসা দিনের কথা শ্যামল আর মোটেই ভাবতে চায় না। সবকিছুই তার দুঃস্বপ্নের মত মনে হয়।

কালী একদিন জিজ্ঞেস করেছিল, এখানে কি রকম লাগছে, তোর মন টিকবে? শ্যামল উৎসাহভরে বলে, নিশ্চয়।

সাবাস! কালী শ্যামলের পিঠ চাপড়ায়। এখন তুই আমার পায়ের কড়ে আঙুল। হবি বুড়ো আঙুল। পরে বাঁ পা, ডান পা। শেষে বাঁ হাত, ডান হাত। ব্যস! হাজার হাজার টাকা রোজগার।

শ্যামল কালীর পায়ে প্রণাম করে। ভাবে এ লোকটা খুব খাঁটি। এতটুকু ফাঁকি নেই এর মধ্যে, আজকের দিনে যারা কালীর হাত, পা, আঙুল, তাদের সকলের সঙ্গেই শ্যামল সুপরিচিত। একদিন সে তাদের মত হবে এতে আর আশ্চর্য্য কি?

এরই মধ্যে একদিন সন্ধ্যের মুখে ছোট ভাঙ্গা দু'দরজার গাড়ী চালিয়ে শ্যামল বালীগঞ্জ ষ্টেশনের কাছে গ্যারাজ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল রাসবিহারী এভিনিউ ধরে। গড়েহাটা বাজারের কাছে গাড়ী থামিয়ে পান, সিগারেট কিনতে নামে। নজরে পড়ে অনেকগুলি মেয়ে ট্রাম থেকে নেমে রাস্তা পার হচ্ছে। তাদের মধ্যে একজনকে সে চিনতে পারে, সে নন্দিতা।

নন্দিতা, রাস্তা পার হয়ে আলেয়ার সামনে দিয়ে আসছিল। শ্যামল ইতস্তত করে এগিয়ে যায়; নমস্কার করে বলে, চিনতে পারছেন?

শ্যামলকে দেখে নন্দিতা উৎফুল্ল হয়ে ওঠে, চার দিক তাকিয়ে নীচু গলায় বলে, শুনেছেন তো সব ? সামনের সপ্তাহে বিয়ে।

শ্যামল বলে, তাহলে মন্টুদা' ?

—আমি যে কি করব বুঝে উঠতে পারছি না। বাবা কিছুতেই রাজী হলেন না।

শ্যামল অন্যমনস্ক ভাবে বলে, মন্টুদা' কিন্তু পাগল হয়ে যাবে। ও আপনাকে—

—আমি বুঝতে পারছি, সব বুঝতে পারছি। এই তো দু'-একদিন মাত্র বাড়ী থেকে বেরুতে পেয়েছি বন্ধুদের নেমন্তন্ন করার জন্যে। মন্টুদা'কে একটা খবর পর্য্যন্ত দিতে পারি না। আমার সঙ্গে একবার দেখা করিয়ে দেবেন ?

নিশ্চয়।

কবে ?

আজই।

নন্দিতা খুসী হয়। ঘণ্টাখানেক আমার সময় আছে। তার মধ্যে হবে ?

কেন হবে না ? আমার সঙ্গে গাড়ী আছে। বালীগঞ্জ ষ্টেশনের কাছে একটা বাড়ীর কাছে আপনি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন, আমি মন্টুদা'কে নিয়ে আসি।

নন্দিতা ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করে, কেউ জানতে পারবে না তো ?

কোন ভয় নেই।

নন্দিতা শ্যামলের কথামত ওর ভাঙ্গা গাড়ীর পেছনের সিটে বসে। শ্যামল জোরে গাড়ী চালিয়ে বালীগঞ্জের গ্যারেজে নিয়ে আসে। বড় দরজা বাইরে থেকে বন্ধ ছিল। ধাক্কা দিয়ে খুলে নন্দিতাকে ভেতরে নিয়ে যায়। জলিল তখন একটা গাড়ী মেরামত করছে।

শ্যামল আলাপ করিয়ে দেয়, এ আমার এক বন্ধু। জলিলকে বলে, তুই দেখিস ওঁকে, এখানে রেখে যাচ্ছি।

নন্দিতা ব্যস্ত হ'য়ে প্রশ্ন করে, আপনি কতক্ষণে ফিরবেন ?

—আধ ঘণ্টাও লাগবে না। যাব আর আসবো।

জলিল তখন গাড়ীতে হাতুড়ী মেরে শব্দ করছে। নন্দিতাকে ঘরে খাটিয়ার উপর বসিয়ে শ্যামল সদর দরজা বন্ধ করে দ্রুত গাড়ী নিয়ে বেরিয়ে যায়। প্রায় ল্যান্সডাউন মার্কেট পর্য্যন্ত কোন দিকে না তাকিয়ে সে হু-হু শব্দে গাড়ী ছোটায়। এক-একবার ভাবে, মন্টুদা'কে যদি খুঁজে না পায়, নন্দিতা বড়ই নিরাশ হবে। মন্টুদা'র কথা মনে পড়তে তার মুখখানা চোখের সামনে ভেসে ওঠে। বড় নিরীহ ভদ্রলোক। নন্দিতার বিয়ে হ'য়ে গেলে মনে বড়ই কষ্ট পাবে। তার পরই মনে হয় যদি মদনের সঙ্গে দেখা হয়, সেই মদন, চুনীলাল, তাদের আড্ডাসংঘ বিতাড়িত শ্যামলকে কি ভাবে নেবে কে জানে। হয়ত পাঁচশো প্রশ্ন করবে। টিটকিরি কাটবে। ভাবতেই শ্যামলের গা গুলিয়ে ওঠে। এতদিনের যে পুঞ্জীভূত রাগ মদন ও চুনীলালের ওপর পোষা ছিল, তা আবার চাড়া দিয়ে ওঠে। হঠাৎ মনের মধ্যে বিপ্লব সুরু হয়। কেন সে মন্টুদা'র উপকার করবে ? কে এই নন্দিতা ? কে এই মন্টুদা' ? তার তো কেউ নয় ? মানুষের উপকার করা যদি ধর্ম্ম হয় তবে সে ধর্ম্ম তো কোন দিন তার প্রতি কেউ পালন করেনি ? দুনিয়ার সকলের কাছে সে শুধু কেবল অধর্ম্মের ভাগ পেয়ে থাকে। লাঞ্ছিত, অপমানিত হয়ে থাকে। তবে আজ হঠাৎ কেন সে উদার মহৎ হয়ে উঠবে ? সবাই ভাবে, শ্যামল আজ অধম নীচ—সে তাই হোক।

নন্দিতা ষোড়শী, চেহারায় তার যথেষ্ট আকর্ষণ আছে, আজ যখন তাকে সে হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়েছে, কেন তাকে উপভোগ করবে না ? চিরকাল যাদের উচ্ছিষ্ট পেয়ে জীবন কাটাতে হবে, তাদের কি প্রসাদ পাবার কোন অধিকার নেই ?

বিদ্রোহী শ্যামল গাড়ী ঘোরায়। জোরে, আরও জোরে ফিরতে থাকে। তার মন ছুটেছে তারই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্য—তেকোণ পার্কের কাছে এসে গাড়ীর চাকা কেটে গেল। শ্যামল বিরক্ত হ'য়ে নেমে চাকা বদলাতে থাকে। গাড়ীতে কোন যন্ত্রপাতি ছিল না। দোকান থেকে যন্ত্র এনে চাকা পাল্টে বেরুতে অনেক দেরী হ'য়ে যায়।

বালীগঞ্জের গ্যারেজে যখন এসে পৌঁছুল, বেশ রাত হ'য়ে গেছে। নিঝুম নিস্তব্ধ পাড়া, ধাক্কা দিয়ে দরজা খোলে। গাড়ী ভেতরে ঢুকিয়ে আবার দরজা বন্ধ করে দেয়, মনে মনে তৈরী করে নেয় কি ভাবে নন্দিতার সংগে কথা সুরু করবে। কেন মন্টুদা'র সঙ্গে দেখা হল না ? কোথায় গেছে, ইত্যাদি। বাইরের খাটিয়ায় জলিল উপুড় হ'য়ে শুয়ে রয়েছে, সারা দিন খেটে বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছে, ইচ্ছে করেই তাকে জাগায় না। দ্রুত পায়ে ভেতরের দিকে যায়, নিশ্চয় নন্দিতা সেখানে অধীর হ'য়ে বসে আছে। দরজা বন্ধ, ভেতর থেকে কোন রকম ভারী জিনিষ দিয়ে আটকান হ'য়েছে, বন্ধ করার খিল বা ছিটকিনি কিছুই তো নেই ? শ্যামল জোরে ধাক্কা দেয়, দরজা খোলার সংগে সংগে, টেবিল চেয়ার হুড়মুড় করে মাটিতে পড়ে। শ্যামল কিন্তু ভেতরে ঢুকতে পারে না ! অন্ধকার ঘরের মধ্যে স্পষ্ট দেখতে পায় কড়িকাঠের সংগে কাপড় বাঁধা। তাইতে নন্দিতার প্রাণহীন দেহটা ঝুলছে। কি বীভৎস ! কি ভয়ঙ্কর ! মুখে হাত চেপে শ্যামল চীৎকার করে ওঠে। ভয়ে ভয়ে, পেছু ফিরে বেরিয়ে আসে। ছুটে গিয়ে জলিলকে ডাকে, জলিল, সর্ব্বনাশ হ'য়েছে। ওঠ।

অনেক কষ্টে জলিল চোখ মেলে তাকায়, শ্যামল বোঝে, সে মাতাল।

শ্যামল ব্যস্ত হয়ে বলে, মেয়েটা গলায় দড়ি দিয়েছে। তুই জানিস কিছু ?

জলিল বেমালুম মাথা নাড়ে।

—এখন কি হবে ? শ্যামলের গলা কাঁপছে।

জলিল জড়ানো গলায় প্রশ্ন করে, একেবারে মরে গেছে ?

—আমি কাছে গিয়ে দেখিনি।

—তাহলে লাশটা ফেলে দিয়ে আসতে হবে।

শ্যামলের বুক ধড়ফড় করে—কোথায় ?

—যেখানে হোক, রাত হতেছে।

জলিল আবার শুয়ে পড়ে। একলা শ্যামলের ভয় লাগে, ঘরের দিকে তাকিয়ে চুপ করে সে জলিলের কাছে বসে থাকে, এতটুকু নড়বারও সাহস হয় না। মন্টুদা'র প্রেম সার্থক। নন্দিতা তার জন্যে আত্মহত্যা করে, এর মূল্য মন্টুদা' কি ভাবে দেবে, শ্যামল ভেবে পায় না।

লক্ষ্মী কমলা!
আমার ভাইঝি কমলা স্কুলের ছুটিতে আমার এখানে আসার পর থেকেই বাড়ীর চেহারা যেন বদলে গেছে। আগে আমি সব সময়েই ব্যস্ত থাকতাম, কিছুই যেন হয়ে উঠতো না কিন্তু কমলার হাতের ছোঁয়ায় সমস্ত কাজ যেন মূহুর্ত্তের মধ্যে হয়ে যায়!
এই কাপড় ধোওয়ার ব্যাপারেই দেখুন না। কাপড় কাচার মধ্যে যে কোন বিশেষত্ব থাকতে পারে আমি তা জানতাম না তাই কমলা যখন আমায় বলল যে কাপড়কাচা সাবান হওয়া দরকার খাঁটী আমি বেশ অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। ও বলল, "খাঁটী সাবান হলে জামাকাপড় কাচা ভাল হয় কারণ খাঁটী সাবানে প্রচুর ফেণা হয়। সে ফেণায়
S. 254 A-X52 BG

জামাকাপড়েরও ক্ষতি হয়না এবং হাতেরও কোন অনিষ্ট হয়না।" সে সানলাইট সাবান এনে আমায় দেখাল যে সানলাইটে কাচা জামাকাপড় কত পরিষ্কার হয়। সত্যি, একটু ঘষলেই ফেণা হয় কত। আমি যখন ওকে কাপড়কাচার জিনিষটা দিলাম, কমলা বলল—"না, পিসীমা, সানলাইট দিয়ে কাচার সময় জামাকাপড় আছড়াতে হয়না। শুধু একটু সাবান ঘষে দাও প্রচুর ফেণা হবে এবং জামাকাপড় বিনা আছাড়েই পরিষ্কার হবে।"
সত্যিই কাচার পরে কাপড়জামা এত সাদা আর উজ্জ্বল হয়ে উঠল যে আমার যেন আর শুকোবার জন্যে তর সইছিল না; তখনই পরতে ইচ্ছে করছিল। কমলা সত্যিই চালাক মেয়ে! সে বলে যে সানলাইট দিয়ে কাচলে জামাকাপড় এত সাদা আর উজ্জ্বল হয় তার কারণ সানলাইটের প্রচুর ফেণা জামাকাপড়ের সুতোর ফাঁক থেকে সব ময়লা দূর করে দেয়।"
সবই তো বুঝলাম। কিন্তু বাড়ীটা চালাতে হয়তো আমাকেই। সেইজন্যে ওকে আমি আমার মনের কথাটা বলেই ফেললাম—"কিন্তু সানলাইটের দাম যে বড্ড বেশি।" কমলা একগাল হেসে বলল—"পিসী, ওটা তোমার মিথ্যে ভয়!" আমি অবাক হয়ে গেলাম। তখন কমলা বলল: "একটা সানলাইট সাবানে একগাদা কাপড় কাচা যায়। সানলাইট দিয়ে জামাকাপড় কাচলে সত্যিই খরচ বাঁচে!" সানলাইট সাবান সম্বন্ধে আর একটি জিনিষ আমার খুব ভাল লাগে। সানলাইট দিয়ে কাচার পরে জামাকাপড়ের গন্ধটাই কেমন পরিষ্কার পরিষ্কার লাগে আর এর ফেণা হাতকে রাখে কোমল ও মসৃণ।
কমলা বাড়ীতে আসার পরেই আমি প্রথম জানলাম যে পরিবারের সমস্ত জামাকাপড় যেমন আমার স্বামীর সার্ট, পায়জামা, তোয়ালে, ন্যাপকিন, বিছানার চাদর, পর্দা, ছেলেমেয়েদের জামাকাপড়—এক কথায় আমার ছোটবড় সব জামাকাপড় কাচার জন্যে সানলাইটের থেকে ভাল সাবান আর কিছুই নেই। এটি যে শুধু জামাকাপড়কে সাদা ও উজ্জ্বল করে কাচে তাই নয়; সানলাইটের একটি সাবানেই এক গাদা জামাকাপড় কাচা যায়। এতে পয়সাও বাঁচে আর পরিষ্কার জামাকাপড়ও পরা হয়।
SUNLIGHT SOAP
S 284 B-X52 BG
হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড, বোম্বাই

অনেক রাত্রে নন্দিতার মৃতদেহটা কাপড়ে মুড়ে জলিল আর শ্যামল গাড়ীতে করে বেরিয়ে পড়ে। জলিল শুধু একবার বলেছিল, কোথা থেকে মেয়েটাকে জুটিয়েছিলি! কিছু বোঝে না। একদম আনকোরা নাকি? শ্যামলের এই প্রথম খেয়াল হয়, জলিলের মুখে, গলায় সব জায়গায় সে দেখেছে, নখ দিয়ে খামচান রক্তের দাগ। জলিলের দিকে তাকিয়ে সমস্ত শরীর তার ঘেন্নায় কুঁচকে ওঠে।

পরদিন খবরের কাগজে একটি কুমারী মেয়ের আত্মহত্যা বিবরণী বার হয়। গলায় ফাঁস লাগিয়ে তাইতে ভারী পাথর বেঁধে জলে ডুবে ছিল। কি ভাবে কেমন করে, কিছুরই হদিশ পাওয়া যায় নি। রাত্রে নন্দিতাকে ফিরতে না দেখে বাড়ীর লোক চার দিকে খুঁজতে বেরিয়েছিল। কাগজের খবর দেখে সনাক্ত করে এসেছে। মৃতা মেয়েটি আর কেউ নয়, নন্দিতা। বাড়ীতে কান্নার রোল উঠে। বিয়ে-বাড়ীতে আনন্দ এক নিমেষে নিবে গেল। বরপক্ষ কলকাতায় বাড়ী ভাড়া করে এসেছিল, রাতারাতি অন্ত জায়গায় বিয়ে ঠিক করে ফেলে। আত্মীয়েরা বললে, কি কেলেঙ্কারী, মরেও বাপ-মার মুখে কালি দিয়ে গেল। পাড়ার ছেলেরা সকলেই এই আকস্মিক ঘটনায় বেশ আঘাত পেয়েছে। আগের মত আড্ডাসংঘের পাথরে গিয়ে বসলেও হৈ-চৈ করে না।

চুনীলাল আক্ষেপ করে বলে, মেয়েটা সত্যিই 'জেনুইন' ছিল, আমি ভাবতাম বুঝি ইয়ার্কি করছে। মনের জোর না থাকলে কেউ আত্মহত্যা করতে পারে?

নন্দিতার মা'র চোখে অবিরল জলের ধারা। তাঁর দুঃখে কে সান্ত্বনা দেবে?

নন্দিতার বাবা নিজেকে অপরাধী মনে করেন, মন্টুর সঙ্গে বিয়ে দিলে এ অঘটন যে ঘটত না, সে বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ।

আর মন্টুদা', এক মুখ খোঁচা-খোঁচা দাড়ি, চোখ বসে গেছে, পাগলের মত ঘোলাটে চাউনি। ক্লান্ত স্বরে বলে, অশৌচ শেষ হলে তীর্থে চলে যাব।

মদনরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে, নন্দিতা মরে বেঁচে গেছে। মন্টুদা'র ট্র্যাজেডী চোখে দেখা যায় না।

মন্টুদা'র মত আরেক জনও অশান্তিতে দিন কাটিয়েছে, সে শ্যামল। সমাজ, সংসার, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন সবাইকে অগ্রাহ্য করতে পারলেও শ্যামল এখনও বিবেককে সম্পূর্ণ উড়িয়ে দিতে পারে নি। বিবেকের দংশনে বড় জ্বালা। সারা রাত সে ছটফট করেছে। ভোর থেকে মঙ্গলার কাছে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। কিছুতেই তাকে বাড়ী থেকে এক-পা বেরতে দেয় নি। সারাক্ষণ মদের বোতল আর গেলাস নিয়ে চোখ লাল করে বসে আছে।

মঙ্গলা ভয় পেয়ে বলে, কি করছ, মরে যাবে যে।

শ্যামল উত্তর না দিয়ে শুধু মাথা নাড়ে। ক'দিন এক-নাগাড়ে ঐ ভাবে বসে থাকে।

আড্ডায় ফিরতে না দেখে জলিল বুঝতে পেরেছিল, শ্যামল অনুশোচনায় আত্মগ্লানিতে কোথাও লুকিয়ে আছে। নিজে এসে মঙ্গলার বাসা থেকে শ্যামলকে টেনে বার করে নিয়ে যায়। বলে, ও কি করছিস? —

শ্যামল নেশার ঝোঁকে কেঁদে ফেলে, আমি পাপ করেছি।

—দূর শালা, তুই পাপ করলি কিসে, যা করলাম তা তো আমি।

—তোমার ভয় করে না?

—কিসের ভয়?

শ্যামল এক কথায় উত্তর দিতে পারে না। ভয় যে অনেক কিছুর। ইহকালের, পরকালের। ধর্মের, অধর্মের, পাপের, পুণ্যের। এত দিনের সংস্কারের বোঝা তার ঘাড়ের ওপর আজ চেপে বসেছে।

জলিল কিন্তু বেপরোয়া ভাবে বলে, ভয়? সে তো শুধু পুলিশের, আমি লাল পাগড়ীর তোয়াক্কা করি না। বলে জলিল হাতের বুড়ো আঙুল নাড়তে থাকে।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও শ্যামলকে জলিলের সংগে বেরিয়ে আসতে হয়। জলিল চাপাগলায় বলে, এখন কি আর নষ্ট করার সময় আছে? দেবেন শালা রাজী হয়েছে। কালীর হুকুম, এই সপ্তাহেই গয়না সরাতে হবে। খুব হুঁশিয়ার। তুই থাকবি আমার পাশে।

কেষ্ট যদিও প্রভাতকে কথা দিয়েছিল বিয়ের আয়োজন করতে তাদের বাড়ী যাবে কিন্তু এর মধ্যে একদিনও যেতে পারেনি। বার বার মনে হয়েছে তাদের আনন্দের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে না পেরে মিছিমিছি বিমর্ষ থেকে ছন্দপতন ঘটিয়ে লাভ কি?

প্রভাত ইতিমধ্যে দু'-একদিন লোকও পাঠিয়েছিল, কেষ্ট বাড়ী ছিল না বলে তাদের এড়িয়ে যেতে পেরেছে। এদিকে পুঁজি ফুরিয়ে আসছে। এক একবার মনে করে আবার আগের মত টাকা রোজগার করতে বার হবে। পরক্ষণেই ভাবে, তারই বা কি প্রয়োজন? একেবারে হাতে পয়সা না থাকলে তখন দেখা যাবে। ঠিক এই রকম যখন মনের অবস্থা, নিজের কর্তব্য যখন নিজেই ঠিক করতে পারছে না, সেই সময় ব্রজদুলালের কাছ থেকে একখানা দীর্ঘ চিঠি এসে পৌছল।

"প্রিয় কেষ্ট বাবু,

তোমার ছোট চিঠিটি যথাসময়ে পেয়েছি। পেয়েই উত্তর দিতে বসলাম। আমাদের কথা জানতে চেয়েছো, সকলেই ভাল আছি। মিঠু, কিটু আর শ্যামা সারাক্ষণই তোমার কথা বলে। আমাকে চিঠি লিখতে দেখে ছেলেরা বলছে লিখে দাও দাদু, যেন তাড়াতাড়ি চলে আসে। ওরা তোমায় সত্যিই ভালবাসে।

চিঠির এক জায়গায় লিখেছ, কলকাতা তোমায় ভাল লাগছে না। এ তো অত্যন্ত স্বাভাবিক কথা। আমি তো দু'দিনের জন্য সহরে গিয়ে তিষ্ঠতে পারি না। গ্রামের সহজ সুন্দর জীবনের স্বাদ পেলে আর কি সহরের শুকনো জীবন ভাল লাগে? সকলের চেয়ে বড় অভাব ওখানে প্রাণ নেই। এখানে অনুভব করি মানুষের মধ্যে আন্তরিকতা আছে। এইটাই এখানকার সবচেয়ে বড় সম্পদ। কলকাতায় নিজের মতলব ছাড়া স্বার্থ ছাড়া কেউ কারুর জন্যে কোন কাজ করে না। প্রত্যেকটি দিন সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত নিজেদের আত্মরক্ষা করে চলতে হয়, সব সময় ভয়, কে কোথায় ঠকিয়ে দেবে, কে কোথায় ন্যায্য পাওনা দেবে না। যারা জন্মেছে কলকাতায়, মানুষ হয়েছে কলকাতায়, মারা যাবে কলকাতায়, তাদের জন্যই ওই সহর, আমাদের জন্য নয়।

অতএব এখান থেকে ফিরে গিয়ে তোমার যে সহর ভাল লাগছে না তাতে আমি এতটুকু আশ্চর্য্য হইনি। কিন্তু দুঃখ পেয়েছি আর একটি কথায়।

তুমি লিখেছ, মনে কিছুতেই শান্তি পাচ্ছি না। এইটাই খুব বেশী ভাববার কথা। আমি তো মনে করি সুখ ও শান্তির সুধার স্বাদে যে জীবন ধন্য হতে পারেনি তার জীবন ধারণের কোন সার্থকতা নেই। মনে আছে বোধ হয়, তুমি আমায় বোঝাতে চেয়েছিলে এ জগতে বড় হবার একমাত্র পথ লোক ঠকিয়ে টাকা রোজগার করার। তোমার কথায় যুক্তির অভাব ছিল না। নিদর্শন দিয়ে দেখিয়েছিলে, আজকের দিনে অধিকাংশ পয়সাওয়ালা লোকেরাই অসৎ। বলেছিলে ডাক্তার রোগীকে ফাঁকি দিয়ে, উকিল মক্কেলকে ফাঁকি দিয়ে, মাষ্টার ছাত্রকে ফাঁকি দিয়ে ব্যবসাদার খদ্দেরকে ফাঁকি দিয়ে ব্যাংকে জমার অংক বাড়াচ্ছে। একথা অস্বীকার করার কিছু নেই, কিন্তু তাই বলে আমরাও সেই পথ ধরব কেন?

একবার ভাল করে ভেবে দেখ। সুখ ও শান্তি যদি জীবনের কাম্য হয়, তাহলে এই পয়সাওয়ালা লোকগুলো কি বা পেয়েছে? পেলে এ ভাবে নিজেদের মধ্যে খাওয়া-খাওয়ি করত না। আমি বলছি বিশ্বাস কর, এরা কেউ কাউকে বিশ্বাস করে না। স্বামী স্ত্রীকে নয়, ভাই ভাইকে নয়, বন্ধু বন্ধুকে নয়। এই যে অবিশ্বাস, সংশয়, সন্দেহ এর মধ্যে দিয়ে কি সুস্থ জীবন গড়ে উঠতে পারে?

এ নকল সভ্যতা বাঁচতে পারে না। ভিৎ যার দুর্ব্বল তা টিকে থাকবে কিসের জোরে? আমাদের চোখের সামনে আজ ভেজালে দেশটা ভরে গেল। তেল ঘি থেকে সুরু করে সাহিত্যে, শিল্পে, সামাজিক জীবনে। তুমি কি বলতে চাও, এই ভেজাল মেশানো সভ্যতা বেঁচে থাকবে? ঘুণধরা ইমারতের ভিত্তি আলগা হবে না? পড়বে, সব ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে। কোথাও কোন দিন মিথ্যের রাজ্য কায়েমি হয়নি, এখানেও হবে না। তার জন্যে যুদ্ধ করতে হবে তোমাকে আমাকে, শ্যামকে, সবাইকে। যারা এখনও এই ভেজালের নেশায় মশগুল হয়নি।

আমি তোমায় অনুরোধ করছি কেষ্ট, আর উদাসীন হয়ে থেকো না, ভাল ভাবে নিজেকে বিচার করে দেখো। সারা জীবনটাই কি আলেয়ার পেছনে ছুটবে? আজও কি সৃষ্টি করার সময় আসেনি? তুলে যাও ছোট ছোট স্বার্থের কথা, নিজেদের গণ্ডির কথা। তার বাইরেও একটা বিরাট জগৎ আছে, তার প্রয়োজনে তুমি সাড়া দেবে না?

ভেবে-চিন্তে উত্তর দিও। আমি তোমায় কিছু জোর করছি না। এখানকার স্কুলের ড্রিল মাষ্টারীর পদ খালি আছে। তোমাকে পেলে আমরা ধন্য মনে করব। ভালবাসা নিও।

ইতি গুণমুগ্ধ ব্রজদুলাল।"

কেষ্ট বার বার চিঠিখানা পড়ে, দেখে ব্রজদুলালের সংগে তার চিন্তার অনেক মিল আছে। দুজনেই একই কথা ভাবে কিন্তু পদ্ধতি আলাদা। কেষ্ট চায় ভাঙনের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিতে। ব্রজদুলাল ভাঙনের প্রতিরোধ করে রুখে দাঁড়াতে চায়। কেষ্টর মত তার মনে নৈরাশ্যবাদের ছায়াটুকু নেই। সে কর্ম্মে বিশ্বাসী, বিশ্বাস করে পাঁকে ফুল ফোটান যায়। নকল সভ্যতার পচধরা শিকড় উপড়ে ফেলে নতুন বীজ সে পুঁততে পারবে। তাই তো কেষ্টকে সে সাদরে আমন্ত্রণ জানিয়েছে।

সারা দিন ভেবেও কোন রকম সিদ্ধান্তে কেষ্ট পৌঁছতে পারে না। পাগলের মত এখানে-সেখানে ঘুরে বেড়ায়। পকেট থেকে চিঠিটা বার করে পড়ে আবার রেখে দেয়। সত্যিই তো, যে ভাবে সে গৌরী আর শ্যামলকে গড়ে তুলতে চেয়েছিল তারা তো সে পথের ইঙ্গিত বুঝতে পারে নি? কেষ্ট তো কোন দিন বিবেককে বিসর্জ্জন দিতে বলেনি কিন্তু এরা তো প্রথমে বিবেককেই বলি দিল! তাদের শিখিয়েছিল, যারা অন্যায় করে তাদের ঠকালে কোন দোষ হয় না। কিন্তু এরা যে ন্যায়-অন্যায়ের কোন ধারই ধারল না।

শ্যামল এখন কি করছে কে জানে! বিবেককে বলি দিলে মানুষ তো সব কিছুই করতে পারে। আর গৌরী? ভাবতেই কেষ্টর মাথা ঝিম-ঝিম করে ওঠে, সে এখন দেহটাকে মূলধন করেছে। নারীত্বের অবমাননা এর চেয়েও আর কি হতে পারে? কেষ্ট সিদ্ধান্ত করে, সে কিশোরপুর চলে যাবে। চিঠির উত্তর দেবার কথা ভাবতেই চিনুর কথা মনে পড়ল। বেহালায় গেলে সে এখুনি খুশী হয়ে লিখে দেবে।

বেহালার বাড়ীতে পৌঁছতেই বাইরের বারান্দায় চিনুর সঙ্গে দেখা। কেষ্টকে দেখে তার সারা মুখ হাসিতে ভরে যায়। বলে, কেষ্টদা', কত দিন বাদে এলেন?

—ব্যস্ত ছিলাম, বড় ব্যস্ত।

—চলুন, আমার ঘরে বসবেন চলুন।

—তোমার ঘরে? কেষ্ট ইতস্তত করে।

—তাতে কি হয়েছে, আপনার ঘর যে নোংরায় ভর্ত্তি।

—পিনাকী বাড়ী নেই?

—না। বলে আর কথা বলার সুযোগ না দিয়ে কেষ্টকে নিয়ে চিনু নিজের ঘরে ঢুকে যায়।

কেষ্ট এই প্রথম চিনুর ঘরে এল। ঘরটি আয়তনে ওরই ঘরের মত কিন্তু সুসজ্জিত। চিনুর রুচির প্রশংসা না করে পারা যায় না। ছোট দু'খানা চেয়ার, একটা টেবিল, সবুজ রঙের টেবিলঢাকা, বিছানা, আলনা সব কিছুই পরিপাটি করে রাখা। অগোছাল মোটেই নেই। কেষ্ট চেয়ারে বসে ব্রজদুলালের চিঠিটা চিনুর দিকে এগিয়ে দেয়। সমস্ত চিঠিটা পড়ে চিনু বুকভরা নিঃশ্বাস নিয়ে বলে, কি সুন্দর! যেমনি ভাষা, তেমনি ভাব!

কেষ্ট মৃদু স্বরে বলে, হাজার হোক ইস্কুল-মাষ্টার, ভালো তো লিখবেই।

—আপনি কি ঠিক করলেন?

—ভাবছি চলে যাব।

—সত্যি?

কেষ্ট চিনুর মুখের দিকে তাকায়, কেন, বিশ্বাস হচ্ছে না?

—কি জানি, চিনু দীর্ঘশ্বাস ফেলে, বসুন, আমি চায়ের জল চড়িয়ে দিই।

চিনুর ব্যবহারে কেষ্ট বিস্মিত হয়। ফিরে এলে জিজ্ঞেস করে, তুমি কি চাও না আমি যাই?

চিনু নিচের দিকে তাকিয়ে বলে, আমার চাওয়া না চাওয়ায় কি এসে-যায়?

কেষ্ট লক্ষ্য করে চিন্ময়র গলায় আজ অন্য কণ্ঠস্বর—একথা বলছ কেন?

—আপনাকে আমি কি বোঝাব? একজনের উপর রাগ হ'ল তো দেশ ছেড়ে চললেন। যেখানে বাস করতে আমার আপত্তি নেই, তবে দুঃখ হয় এই ভেবে যে, ভাল মনে আপনি যাচ্ছেন না, যাচ্ছেন বুক ভরা অভিমান নিয়ে—

—তুমি আমার জন্যে এত কথা ভাবো?

চিন্ময় ম্লান হাসে, ভাবি শুধু আজ থেকে নয়, যেদিন থেকে আপনাদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে সেদিন থেকে। আশ্চর্য লাগত এই দেখে, আপনি গৌরীকে কতখানি ভালবাসতেন অথচ সে তার কিছুই বুঝত না।

কেষ্টর কৌতূহল জাগে, তুমিই বা কি করে বুঝলে?

—আমি যে ঘর-পোড়া গরু।

—তার মানে?

—গৌরী আপনাকে আমার কথা বলেনি?

—না।

—আমার ইতিহাস অনেকটা আপনার মতই। বাবা, মা মারা যান আমার দশ বছর বয়েসে। ছিলাম দাদাদের সংসারে। চার দাদা, তিন দিদি, সাতটা সংসার। এক একজনের বাড়ী পালা করে থাকতাম। কোথাও সাত দিন, কোথাও এক মাস। কথায় বলে ভাগের মা গঙ্গা পায় না, আমি বলি ভাগের বোন বাঁচতে পারে না। মনে হত সকলেই আমাকে যেন অনুগ্রহ করছে। এই দুঃসময়ের মধ্যে পিনাকীর সঙ্গে আলাপ। আমার সেজদার বন্ধু, ভাল ফোটোগ্রাফার।

—তখন তোমার বয়স কত?

—পনের-ষোল বছর। পিনাকী আমার ছবি তুলে পত্রিকায় ছাপাত। ছ' বছর অনাদর অবহেলায় মানুষ হয়ে নিজেকে ভাগ্যবতী মনে হত। পিনাকীকে ভাল লাগত। বাড়ীতে এ নিয়ে কথা উঠল। মার পর্যন্ত খেলাম। পিনাকী লোভ দেখালে বিয়ে করছে, সংসার পাতবে। বিয়ের চেয়ে নিজের সংসার হবে এর প্রলোভন ছিল আমার কাছে বিরাট। একদিন ওর কথায় বেরিয়ে এলাম। আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে চিরকালের মত বিচ্ছেদ হয়ে গেল। পিনাকী আমায় এনে তুলল এইখানে। ছ'বছর এখানে রয়েছি।

—পিনাকী বিয়ে করবে না?

—না। গোড়ায় গোড়ায় বলত করবে, এখন জানিয়েছে সম্ভব হবে না।

—স্কাউণ্ড্রেল, তবে তোমায় বার করে এনেছিল কেন?

—বিনা পয়সার ছবি তোলার মডেল পাবে বলে। কত ছবি তুলেছে, রোজগার করছে, এখন আর একজনের পেছনে ঘোরে—

—মানে?

—চিত্রা। আমার চেয়েও ছোট, তার ছবি বেশী দামে বিক্রি হয়।

কেষ্ট থমথমে মুখে বলে, আমি পিনাকীর সঙ্গে কথা বলতে চাই।

—সে তো আর এখানে আসে না?

—সে কি!

—অনেক দিন হল। আপনি কিশোরপুর যাবার আগে থেকেই।

—তুমি একলা থাক, একথা তো আমায় বলনি?

—কি প্রয়োজন?

চিন্ময় কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ বলে, পিনাকী আমার সর্বনাশ করেছে। শুধু এক ব্যাপারে আমি কিছুতেই তাকে প্রশ্রয় দিইনি। যাতে না আমাদের কোন অবৈধ সন্তান হয় তার জন্যে প্রাণপণ যুদ্ধ করেছি। আমার জীবন তো গেছেই, কোন নিষ্পাপ শিশুকে এ দুর্ভোগের মধ্যে টেনে আনতে চাইনি।

কেষ্ট মাথা নেড়ে বলে, অথচ তুমি তো সংসার ভালবাস চিনু!

চিনুর গলা কান্নার ভরে আসে, প্রাণ দিয়ে ভালবাসি কেষ্টদা'। তারই আশায় একদিন বাড়ী থেকে ছুটে পালিয়ে এসেছি অথচ সব যেন কি রকম হয়ে গেল!

চিনু সামলাতে পারে না, মুখে আঁচল চাপা দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে উঠে যায়। কেষ্ট একলা বসে ভাবে, চিনু আজ তার সামনে নতুন সমস্যা নিয়ে এসে দাঁড়াল। এতদিনের মধ্যে তার কথা চিন্তা করার কোন প্রয়োজন কেষ্ট দেখেনি কিন্তু আজ মনে হল, চিনুও তো একা, নির্ভর করার মত কেউ তো তার নেই?

প্রভাতের বিয়ে নিয়ে সকলেই মেতে উঠেছে। অরুণার বাবার শরীর খারাপ হলেও মনের জোরে দাঁড়িয়ে উঠেছেন। একমাত্র মেয়ের বিয়ে, তিনি ঘটা করবেনই, কারুর নিষেধ শুনবেন না। বার বার প্রভাতকে বলছেন, খুব খেয়াল রেখো। সকলের যেন খাতির-যত্ন ঠিক মত হয়। কোন কষ্ট না পায়।

রমেশ বাবুর বন্ধুভাগ্য সত্যিই ভাল। একজন তাঁর বাড়ী ছেড়ে দিয়েছেন, সেখান থেকে অরুণার বিয়ে হবে। আত্মীয়-স্বজন অনেকে এসেছে। সকলের চেয়ে বড় কথা, রমেশ বাবুর সবিশেষ অনুরোধে প্রভাতের বাবা-মা দুজনেই কাশী থেকে ক'দিনের জন্য কলকাতায় এসেছেন। হৈ-হৈ আনন্দে পরিপূর্ণ বাড়ী।

প্রভাতের বন্ধুদেরও ব্যস্ততার শেষ নেই। অনন্ত কেবিনের 'আড্ডা' থেকে শুরু করে বেয়ারা পর্যন্ত সকলের বাঁধা হাজিরা। ভোম্বল, বিশু, মাণিক যারা সব সময়েই অনন্ত কেবিনে চায়ের পেয়ালা নিয়ে সময় কাটায়, তারা এখন প্রভাতের বাড়ীতেই আড্ডা গেড়ে বসেছে। ভোম্বল জিজ্ঞেস করে, কি ব্যাপার বলতো মাইরী, কেষ্টদা'র পাত্তা নেই!

বিশু বলে, সত্যি আশ্চর্য্য! প্রভাতদা' তো ওরই বন্ধু, আমরা সেই সুবাদে ঘর জাঁকিয়ে বসে আছি।

—কি যেন হয়েছে! বেশী কথাবার্তাও বলে না, দেখা হলে একটু হাসে।

ক'দিন থেকেই অরুণাদের বাড়ীতে সানাই বাজছে। এ রমেশ বাবুরই ব্যবস্থা। ওঁদের বিয়ের সময়ও নাকি এই রকম একটানা সানাই বেজেছিল। একদিন মদনও এসেছিল। একান্তে বসে আড্ডা'র সঙ্গে আলাপ করে, সানাই শুনলে আমার বড় মন খারাপ হয়ে যায় আড্ডা'—

—কেন?

—নন্দিতার কথা মনে পড়ে যায়।

—আহা বেচারী, আশুদা' সমবেদনা প্রকাশ করেন, বাবা-মা বোধ হয় খুব শোক পেয়েছেন ?

—ওঁদের অনেকগুলি ছেলেমেয়ে, হয়ত সামলে উঠবেন। কিন্তু মন্মদা'র জন্যে বেশী দুঃখ হয়, ও লোকটা বোধ হয় পাগল হয়ে যাবে।

—তোমরা কিছু করতে পারলে না ?

—আমরা আর কি করব ? তার জন্যে নন্দিতা মারা গেছে, এ কথা সে কি করে ভুলবে ? গান অত ভালবাসত, মুখে এখন একটি সুর নেই, চাকরী ছেড়ে দিয়েছে, কি যে করবে বঝতে পারছি না।

আশুদা' সত্যি মনে কষ্ট পা'ন।

এর মধ্যে বেলারাণী একদিন এসেছিল অরুণার কাছে, সুন্দর দেখতে একছড়া সোনার হার নিয়ে। অরুণা আপত্তি করে বলে, এ কি বেলাদি', এত খরচা করে মিছিমিছি ?

বেলারাণী থামিয়ে দেয়, তোমাকে আর গিন্নীর মত কথা বলতে হবে না। এস, পরিয়ে দিই।

বেলারাণী অরুণার গলায় এক রকম জোর করেই হারছড়া পরিয়ে দেয়। অরুণা ছুটে গিয়ে সবাইকে দেখিয়ে আসে।

সবার আগে প্রভাত এল কোমর বেঁধে ঝগড়া করতে, এ ভারী অন্যায় আপনার, আমার সঙ্গেও যদি লৌকিকতা করেন—

—আপনাকে তো কিছু দিইনি।

অরুণা খিল-খিল করে হেসে ওঠে, সত্যি বেলাদি', আপনার সঙ্গে কেউ কথায় পারবে না, ও তো ছেলেমানুষ।

অনেকক্ষণ ধরে তাদের হাসিঠাট্টা চলে। ওঠবার সময় বেলারাণী বলে, অরুণাকে নিয়ে দু'-একদিন মার্কেটে যাব কিন্তু—

অরুণা সোৎসাহে বলে, খুব ভাল হবে বেলাদি', আপনি আমায় দু'-একখানা শাড়ী বেছে দেবেন।

গাড়ীতে উঠতে উঠতে বেলারাণী প্রভাতকে জিজ্ঞেস করে, বিনোদ এসেছিল নাকি ?

—না।

—গৌরীকে নিয়েই বোধ হয় খুব ব্যস্ত ? আমার বাড়ীতেও অনেক দিন আসেনি।

—গৌরী কি রকম কাজ করছে ?

—শুনছি দুটো বই-এ আরও কন্ট্রাক্ট পেয়েছে।

—তবে তো ভালই বলতে হবে।

—মেয়েটার চেষ্টা আছে, তার ওপর বিনোদের টাকা, আর কি চাই। আজ চলি, পরশু অরুণাকে নিয়ে যাব।

কেষ্টকে সকলে গরুখোঁজা করে না পেলেও সে দু'দিন প্রভাতের বিয়েবাড়ীর সামনে থেকে ঘুরে গেছে। ভীড় দেখলেই এখন তার ভয় করে, কথা বলাটাই যেন সবচেয়ে বেশী জ্বালা। দূর থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে দেখেছে বিয়েবাড়ীর আলো, শুনেছে লোকজনের কোলাহল। সুমধুর সানাই-এর সুর। অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে নিঃশব্দে ফিরে গেছে।

ব্রজদুলালকে আজও চিঠির জবাব দেওয়া হয়নি। কিন্তু সে দেবে। প্রথম সুযোগেই লিখে জানাবে কলকাতার মোহ তার মন থেকে অনেকখানি কেটে গেছে। গৌরী, শ্যামল সবাইকে ভুলে যেতে চেয়েছে। কিছুদিন আগেও গৌরীর কথা মনে হলেই যে অস্বস্তি বোধ করত, এখন তা অনেকখানি কমে গেছে। কারণ, তার সম্বন্ধে আর কৌতূহলও নেই। শ্যামলের কথাও বড় একটা ভাবে না। ব্রজদুলালের ডাক তার কাছে অনেক বড়। অন্তত সে একবার চেষ্টা করবে তার সঙ্গে কাজ করতে। কিন্তু একজন, যার কথা সে এখন না ভেবে পারে না, সে হোল সহায়-সম্বলহীনা চিনু। কেষ্ট ভাবে, সেদিন যদি ও ভাবে চিনু তার অতীত জীবনের ইতিহাস কেষ্টর সামনে অকপটে খুলে না ধরতো তাহলে হয় ত কেষ্টর এখান থেকে চলে যাওয়া অনেকখানি সহজ হ'ত। আজ যেতে হলে তাকে পালিয়ে যেতে হবে। নয় ত চিনুর কোন রকম ব্যবস্থা করে তবে সে ছুটি পাবে। তাই সাহস সঞ্চয় করে সে আবার এল চিনুর সঙ্গে কথা বলতে।

চিনু বাড়ী ছিল না। কেষ্ট দরজা খুলে নিজের ঘরে বসে। ঝাড়াপোঁছার অভাবে ঘরটা নোংরা হয়েছে, তবে জিনিষপত্রগুলো এক ঠাঁই করে গোছান। নিশ্চয় চিনুর কীর্তি।

কেষ্টর মনে পড়ল বাড়ীভাড়াটা চুকিয়ে দেওয়া দরকার। উপরে গিয়ে বাড়ীওয়ালাকে ডেকে শেষ মাসের ভাড়া দিয়ে দেয়। বাড়ীওয়ালা ধন্যবাদ জানিয়ে বলে, আপনাদের নিয়ে নিশ্চিন্ত আরামে ছিলাম। এখন কে আবার আসবে! আপনি কাউকে পেলেন নাকি ?

কেষ্ট বলে, কই আর ?

—একসঙ্গে দু'খানা ঘরই খালি হয়ে গেল।

—আবার কোনটা ?

—চিনুও তো নোটিশ দিয়েছে।

—তাই নাকি! কেষ্ট বিস্মিত হয়।

—ওর পক্ষে একটু বেশী ভাড়াই হয়, তেমন তো রোজগার নেই। পিনাকী বাবু থাকতে উনিই দিতেন, এখন তো চিনুকেই সব চালাতে হয়। তিরিশ টাকা মাসে মাসে দেওয়া সোজা কথা নয়, কি বলেন?

কেষ্ট এই প্রথম জানল, পিনাকী চলে যাওয়ার পর থেকে এই ক'মাস চিনু বড় কষ্টে টাকা রোজগার করে নিজের সংসার চালাচ্ছে। আশ্চর্য্য মেয়ে! একদিনও তো এ-সব কথা বলেনি। কত দিন তাকে রান্না করে খাইয়েছে, প্রয়োজনীয় ছোটখাট জিনিষ হাতের কাছে এনে দিয়েছে। কেষ্ট যদি জানত চিনু নিজেই এ-সব জোগাচ্ছে, তাহলে কিছুতেই তাকে করতে দিত না। চিনুর প্রতি সহানুভূতিতে তার মন ভরে যায়। বাড়ীওয়ালার সঙ্গে বেশী কথা না বলে নিজের ঘরে গিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

চিনু ফিরল বেশ সন্ধ্যে করে। কেষ্টর ঘরে ঢুকে হাসিমুখে জিজ্ঞেস করে, কখন এলেন কেষ্টদা'?

—এই তো একটু আগে।

—আমার ফিরতে বড্ড দেরী হয়ে গেল, না? আমার ঘরে চলুন, নোংরার মধ্যে বসে থাকতে হবে না।

কেষ্ট কোন আপত্তি না করে চিনুর পেছন পেছন ওর ঘরে এসে ঢোকে। চিনু চেয়ার ঝেড়ে বসতে দেয়। জুতো-জোড়া খুলে ফেলে নিজেও আরেকটি চেয়ারে আরাম করে বসে। বলে, উঃ, বাঁচলাম। সেই কখন বেরিয়েছি।

কেষ্ট আজ তাকিয়ে তাকিয়ে চিনুকে দেখে, পরনে তার ছাপা শাড়ী, সেই রং-এর ব্লাউজ, চোখে-মুখে ক্লান্তি আর অবসাদের ছাপ সুস্পষ্ট। কিছুদিন থেকেই কেষ্ট লক্ষ্য করেছিল বটে, চিনুর চোখের তলায় কালি পড়েছে, কিন্তু তা যে ক্রমে এত গভীর হয়ে উঠেছে, সে খেয়াল করেনি। সহানুভূতিমাখা গলায় জিজ্ঞেস করে, বড় খাটনী পড়েছে, না?

কেষ্টর কাছ থেকে এতখানি মোলায়েম গলা চিনু আশা করেনি, মুখ তুলে ম্লান হেসে বলে, কি আর উপায় বলুন?

—তুমি যে এত দিন নিজে রোজগার করে সংসার চালাচ্ছ, তা আমায় বলনি কেন?

—দুঃখের কথা বেশী শুনিয়ে লাভ কি?

কেষ্ট দীর্ঘশ্বাস ফেলে, আমারই ভুল হয়েছে চিনু, নিজের দিকটাই এত বড় করে দেখেছিলাম। তোমার কথা ভাবার সময় পাই নি।

কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে কেষ্টই জিজ্ঞেস করে, আজ-কাল কি কর?

—বাঁধা-ধরা কাজ কিছু নেই, যখন যেটা পাই। কোন মাসে থিয়েটারে চান্স পাই, সে মাসটা শ্রেষ্ঠই চলে যায়। বাড়ী বসে থাকলে সেলাই-এর কাজ করে কিছু বিক্রি করি। দু'-এক ঘর চেনা লোক আছে, যারা দয়া করে মোটা সেলাই-এর কাজ আমাদের দেন। তাছাড়া দুটি ছোট ছেলে-মেয়েকে পড়াই।

—কত দিন এ রকম করছ?

—বেশ কিছু দিন। শেষের দিকে পিনাকী এখানে থাকলেও টাকা দিত না।

—এ ঘর ছেড়ে দেবে শুনছি?

—আপনাকে কে বললে?

—বাড়ীওয়ালা।

—হাঁ, ভাবছি কম ভাড়ার কোন ঘরে চলে যাব।

—ঘর পেয়েছো?

—হাঁ, টালিগঞ্জের কাছে। সতেরো টাকা ভাড়া।

—টালিগঞ্জের ঘরের সন্ধান আগে পাওনি বুঝি?

—মাস দুই হ'ল পেয়েছি।

—আগে যাওনি কেন?

চিনু চট করে কোন উত্তর দিতে পারে না, মাথা নীচু করে মৃদু স্বরে বলে, তাহলে তো আপনার সঙ্গে দেখা হ'ত না কেষ্টদা'?

এ কণ্ঠস্বর কেষ্টর অতি পরিচিত, এর মধ্যে উচ্ছাস নেই। ব্যাকুলতা নেই, নির্ভীক স্বীকারোক্তি, যা মেয়েরা কোন দিন প্রকাশ করতে পারে না। অন্য কারুর কাছে যাকে তারা প্রাণ দিয়ে ভালো না বাসে। কেষ্ট একদৃষ্টে চিনুর দিকে তাকিয়ে থেকে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে প্রকাশ করে।—তুমি কি এত দিন আমার জন্যেই এখানে ছিলে?

চিনুর সেই নির্ভীক উত্তর, আমার তো আর কেউ নেই কেষ্টদা'!

এ কথা যে সত্য, কতখানি সত্য, তা কেষ্টর চেয়ে বেশী আর কে জানে! এক সময় বলে, এর পরের কথা কিছু ভেবেছো চিনু, কি করবে, কি ভাবে চালাবে, একটা বাঁধা-ধরা রোজগার চাই তো।

—নিজের কথা আর ভাবতে পারি না কেষ্টদা', অনেক ভেবেছি। ভেবে ভেবে পাগল হয়ে গেছি, কিন্তু কি ফল হ'ল? ঘরবাঁধার স্বপ্নে ঘর ভেঙ্গে বেরিয়ে এলাম, কিন্তু স্বপ্নকে স্বপ্নই রয়ে গেল। নতুন করে আঘাত পাবার জন্যে আবার কি ভাববো বলুন? সান্ত্বনা দেবার কোন ভাষাই কেষ্ট খুঁজে পায় না।

চিনুই বলে, গৌরী আপনাকে ফেলে চলে গিয়ে যে অন্যায় করেছে তারই প্রায়শ্চিত্ত করার জন্যে এত দিন এখানে ছিলাম। যখন দেখলাম, কিশোরপুর যাওয়াই আপনি ঠিক করেছেন, বুঝলাম আমার কাজও ফুরিয়েছে। এখানকার তল্পি-তল্পা ওঠাই।

—না চিনু, তোমার কোন ব্যবস্থা করতে না পারলে আমার কিশোরপুর যাওয়া হবে না।

চিনু ব্যস্ত হয়ে বলে, না না, তা কেন হবে? আপনি চলে যান। ওরাই ওখানে আপনার অপেক্ষায় বসে আছেন। আমি ঠিক চালিয়ে নিতে পারবো।

—কি করে পারবে?

চিনু ম্লান হাসে, আপনাকে না বললে তো আজও জানতে পারতেন না।

যখন জানতে পেরেছি, আমার কর্ত্তব্য করে যাবো, কেষ্ট উঠে পড়ে, এখন আমি চলি।

চিনু দরজা পর্য্যন্ত এগিয়ে এসে বলে, কিছু খেয়ে যাবেন না?

—আজ থাক।

—কাল তো প্রভাত বাবুর বিয়ে, আপনি যাবেন না?

—বলতে পারছি না।

—আমাকে অনেক করে যেতে বলেছেন।

—যদি যাই তোমায় নিয়ে যাব।

কেষ্ট বেহালা থেকে সোজা বাড়ীতে ফিরে আসে। অন্ধকার ছাদে বসে চিনুর কথাগুলো ভাবতে থাকে। বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্যে জীবন কাটিয়ে চিনু তারই মত দুঃখ পেয়েছে। পিনাকী তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে বলেই কেষ্টর প্রতি গৌরীর এই ব্যবহারে সে এতখানি দুঃখ পেয়েছে। কেষ্ট মনে মনে গৌরীর সঙ্গে চিনুর তুলনা করে। চিনু সংসারে অভিজ্ঞা, গৌরীর কোন অভিজ্ঞতাই ছিল না। চিনু চায় সংসার, ছেলে-মেয়ে, গৌরী সে জায়গায় চায় যশ, প্রতিষ্ঠা। চিনু আনন্দ পায় স্বার্থত্যাগের মধ্যে। গৌরীর আনন্দ স্বার্থসিদ্ধিতে। চিনুর মধ্যে এমন কিছু আকর্ষণ আছে যা গৌরীর মধ্যে ছিল না, তা হোল নারীর স্বভাবসুলভ সহানুভূতি স্নেহ মমতা। মায়ের আসনে চিনুকে কল্পনা করা যায়, কিন্তু গৌরীকে করা যায় না। বন্ধু হিসেবে, সঙ্গী হিসেবে গৌরী হয়ত চিনুর চেয়ে ভাল, স্ত্রী হিসেবে নয়। চিন্তার খেই হারিয়ে ফেলে কেষ্ট ঘুমিয়ে পড়ে।

পরদিন সকালে কেষ্ট এল অনন্ত কেবিনে। ভেবেছিল, এতদিন বাদে আসায় সকলে তাকে নিয়ে খুব হৈ-চৈ করবে। কিন্তু পৌঁছে দেখে, সকলে ব্যস্ত। আশুদা', ভোতন, বিশু সবাই কাগজ নিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। কেষ্ট আজ সকাল থেকে এখনও কাগজ দেখেনি। কি এমন উত্তেজনাপূর্ণ খবর বেরিয়েছে জানবার তার কৌতূহল হয়। আশুদা'র কাছে আসতেই তিনি কেষ্টর পিঠের ওপর জোরে চাপড় মেরে বলেন, দেখেছ কাণ্ডটা, সবাই একসঙ্গে ধরা পড়েছে।

—কারা ?

—দেবেন ঘোষ, তার দলবল শুদ্ধু।

—কে দেবেন ঘোষ, পলিটিক্যাল লীডার ?

ভোতন চেঁচিয়ে বলে, পলিটিক্যাল লীডার না ঘণ্টা, ডাকাত! গয়নার দোকান লুঠ করতে গিয়ে ধরা পড়েছে।

—কই, দেখি কাগজ।

কেষ্টর হাতে কাগজ না দিয়ে ভোতন চিৎকার করে পড়তে সুরু করে, যার সারমর্ম এই দাঁড়ায়, দেবেন ঘোষ ও তার দলের তিরিশ জনকে পুলিশ কাল গ্রেপ্তার করে, কোন এক গয়নার দোকান লুঠ করার সময়। এই বিরাট সহরের বুকে এদের জাল পাতা ছিল। যা দিয়ে অনেক রকম কারবার চালাত। গাড়ী চুরি করা, ব্যাঙ্ক ভাঙ্গা প্রভৃতি এদের বহু কীর্তি। পুলিশ প্রায় ছ'মাস এদের পেছনে থেকে কাল গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়েছে।

বিশু চট করে বলে, এখন তাহলে একটা গাড়ী কেনা যাক। আর চুরি যাওয়ার ভয় নেই। ওর মন্তব্য শুনে অনেকেই হেসে ওঠে। কেষ্ট কিন্তু আর সেখানে বেশীক্ষণ বসে না। দেবেন ও কালীর নাম পড়েই তার শ্যামলের কথা মনে হয়েছিল। তাই ভাবে, মদনের সঙ্গে একবার দেখা করা দরকার।

আড্ডাসংঘেও ওই একই বিষয় আলোচনা হচ্ছে। মদন ও চুনীলাল দুজনের সঙ্গেই কেষ্টর দেখা হয়ে যায়। কেষ্টকে দেখে তারা এগিয়ে এসে বলে, সর্বনাশ হয়েছে কেষ্টদা', শ্যামল ধরা পড়েছে।

হতবুদ্ধি কেষ্ট ধীর গলায় জিজ্ঞেস করে, কি করে জানলে ?

চুনীলাল উত্তর দেয়, আমি খবর পেয়েছি।

—কাগজে একটা মেয়ের নাম দিয়েছে, সে কে ?

—আজ-কাল দেবেনদা'র সঙ্গে ঘুরত। ঐ সব ব্যাপারেই বোধ হয়। চুনীলাল নিজে থেকেই বলে, কালীর পাল্লায় পড়ে কি দুরবস্থাই হ'ল দেবেনদা'র। দেশের লোক এখন থু থু করছে! অথচ মানুষটা কতখানি খাঁটি, আমি তো জানি।

কেষ্টর এ সব কথা শোনার আর ধৈর্য্য ছিল না। একলা চলতে সুরু করে। শ্যামল আজ জেলে, যে শ্যামল ক'দিন আগেও তার কাছে ছিল। যাকে সে নিজের মত করে মানুষ করতে চেয়েছিল। কি ভয়ঙ্কর পরিণতি! যে সিনেমার সামনে প্রথম দিন শ্যামলের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, অন্যমনস্ক ভাবে কেষ্ট সেখানেই এসে দাঁড়ায়। কত কথা আজ মনে পড়ে। চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কেষ্ট দেখে, কত লোক এসে টিকিট নিয়ে যাচ্ছে। বারান্দায় উঠে ছবি দেখছে। বাইরের দেয়ালে কোন একটি অভিনেত্রীর যৌন আবেদনপূর্ণ আকৃতি আঁকা রয়েছে। কোন পথচারী পানের পিক লাগিয়ে দিয়েছে ছবির মুখে। কেষ্টর গা ঘিনঘিন করে উঠল। এমনি করেই একদিন হয়ত গৌরীর ছবি আঁকা থাকবে সিনেমা হাউসের দেয়ালে। বিরক্ত হয়ে কেষ্ট হন হন করে হাঁটতে সুরু করে।

কেষ্ট যখন বেহালার বাড়ীতে এসে পৌঁছল তখন বেলা দুপুর। চিনুর ঘরের দরজা ভেজানো ছিল। কেষ্ট টোকা মেরে কোন সাড়া পায় না। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে পড়ে। চিনু খাটের ওপর ঘুমিয়ে আছে। কেষ্ট একবার ভাবে এ সময় ঘরে ঢোকা উচিত হবে কি না। পরক্ষণেই স্থির করে, এখুনি চিনুকে তুলে তার মনের কথা ব্যক্ত করবে। শব্দ না করে কেষ্ট খাটের কাছে এগিয়ে যায়। ঘুমিয়ে পড়ায় চিনুর মুখের সেই ক্লান্তি অবসাদ অনেকখানি যেন কমে গেছে। স্নান করে খোলাচুল বালিশের ওপর ছড়িয়ে পরম শান্তিতে সে ঘুমিয়ে আছে। বড় স্নিগ্ধ, বড় পবিত্র সে মুখ। কেষ্টর মন মমতায় ভরে যায়। কপালে হাত দিয়ে ডাকে, চিনু ?

চিনু চমকে ধড়মড় করে উঠে বসে। কেষ্টর দিকে বড় বড় চোখে তাকায়। অপ্রস্তুত কেষ্ট হাসবার চেষ্টা করে, কি হয়েছে, অত চমকে উঠলে কেন ?

চিনু পা'টা গুটিয়ে নিয়ে তেমনি বিস্ময় ভরা চোখে বলে, আমি একটা স্বপ্ন দেখছিলাম, তাই চমকে উঠেছি।

—কি স্বপ্ন ?

—কোথায় যেন বেড়াতে গেছি। পাড়া-গাঁ। ট্রেণে করে, বাসে করে যেতে হল। মাটীর বাড়ী, সব অচেনা লোক। কা'কে যেন খুঁজছি, হঠাৎ আপনার সঙ্গে দেখা হ'ল।

চিনু তখনও যেন স্বপ্ন দেখছে, অধীর আগ্রহে কেষ্টর কথা শোনার জন্যে তার দিকে তাকিয়ে থাকে।

কেষ্ট ধীর স্বরে বলে, তুমি যে জায়গাটা স্বপ্নে দেখেছো, আমি জানি।

—কোথায় ?

—কিশোরপুর।

—কিশোরপুর! কি অদ্ভুত, আমি তো সেখানে কখনও যাইনি ?

—যাওনি, যাবে।

চিনু কেষ্টর কথা বুঝতে পারে না, মুখ তুলে তাকায়।

—ব্রজদুলালকে একটা চিঠি লিখব, কাগজ-কলম নিয়ে এস।

চিনু কথামত কাগজ-কলম সংগ্রহ করে এনে দেখে কেষ্ট তার খাটের ওপর চোখে হাত দিয়ে শুয়ে আছে। জিজ্ঞেস করে, লিখবেন না?

—আমি বলে যাচ্ছি, তুমি লিখে নাও।

"প্রিয় ব্রজদুলাল,

তোমার দীর্ঘ চিঠি আমার জীবনের অনেকখানি বদলে দিয়েছে। আমি স্থির করেছি তোমাদের স্কুলেই কাজ করব। যদি তোমার কোন কাজে লাগতে পারি, তাহলেই সুখী হব। তবে এবার আমি একলা যাচ্ছি না, স্থামাকে বোল, তার খুড়ীমাও আমার সঙ্গে যাবে।"

চিনু এই পর্য্যন্ত লিখেই কেষ্টর মুখের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চায়।

কেষ্ট কিন্তু চোখ বুজেই বলে যায়, "কয়েক দিন আমাদের সময় লাগবে। বিয়ে-থা, এধারকার বিলি-ব্যবস্থা সব কিছু সেরে পৌঁছতে এ মাসটা লেগে যাবে। সামনের মাসের পয়লা থেকে কাজে যোগ দিতে পারব। ছোটদের আমার আশীর্ব্বাদ জানিও। তুমি আমার ভালবাসা নিও। ইতি—কেষ্ট।"

চিঠি লেখা শেষ করে চিনু চুপ করে বসে থাকে। কেষ্ট তখনও চোখ বন্ধ করেই শুয়ে আছে। এক সময় গাঢ় স্বরে জিজ্ঞেস করে, তোমার কোন আপত্তি নেই তো চিনু?

চিনু উত্তর দিতে পারে না, চোখে জল ভরে আসে। কেষ্ট বলে যায়, নতুন জীবন। পাড়া গাঁ, কিন্তু সেখানে আন্তরিকতা আছে চিনু! ক'দিন থেকেই বুঝেছি সেখানে থাকলে শান্তি পাব, তুমি আমি দু'জনেই। ব্রজদুলাল বড় খাঁটি লোক। আর স্থামাকে তুমি চেনো না, সে আমাকে যেমনি ভালবাসে তোমাকেও সে তেমনি ভাবেই কাছে টেনে নেবে।

চিনুর কাছ থেকে কোন উত্তর না পেয়ে কেষ্ট চোখ খুলে তাকায়, চিনু চোখের জল মোছার কোন চেষ্টা করে না; অবিরল ধারায় তার বুক ভেসে যাচ্ছে। কোন রকমে গলা পরিষ্কার করে চিনু বলে, তুমি সুখী হবে তো কেষ্টদা'?

কেষ্ট সস্নেহে চিনুকে কাছে টেনে নেয়। বলে, তোমাকে আমি চিনতে পেরেছি চিনু, আমার মনে আর কোন সংশয় নেই।

কিন্তু তুমি তো আমার সব কথা জান না, সেগুলো পরিষ্কার করে বলে নিতে চাই। একবার না বলে ভুল করেছি।

চিনু বাধা দিয়ে বলে, আমি সব জানি কেষ্টদা', গৌরী রাগের মাথায় আমায় একদিন বলেছিল।

কেষ্ট বিস্ময়ের সুরে বলে, সব জেনেও তুমি আমায় ভাল বেসেছ। কেষ্ট চিনুকে আদর করে কোমল স্বরে বলে, তোমার স্পর্শে এসে আমার জীবন বদলে গেল। এখন বুঝেছি, অন্যায়ের প্রতিকার অন্যায় দিয়ে হয় না। ব্রজদুলালের কথাই সত্যি, আমাদের সবাইকে মানুষ তৈরী করতে হবে, সত্যিকারের মানুষ।

কতক্ষণ এ ভাবে কেটে গেছে, দু' জনেরই খেয়াল ছিল না। চিনু হঠাৎ জিজ্ঞেস করে, প্রভাত বাবুর বিয়ে আজ, যাবে না?

কেষ্ট উঠে বসে, যেতেই হবে। চটপট তৈরী হয়ে নাও চিনু!

দু'জনে কাপড় বদলে আধ ঘণ্টার মধ্যে বেরিয়ে পড়ে।

অরুণাদের বাড়ী আজ লোকে লোকারণ্য। আলোয়, বাজনায়, সাজসজ্জায় ঝলমল্ করছে। প্রভাতের দিকের সকলে, বিশেষ করে বন্ধু-বান্ধবরা বরযাত্রী হয়ে এসেও বাড়ীর ছেলের মত কাজ করছে। অতিথিসৎকারে সকলেই ব্যস্ত। গেটের মুখে আশুদা', গলায় চাদর দিয়ে সকলকে অভ্যর্থনা করছেন। রমেশ বাবু ভিতরের দালানে চেয়ার পেতে বসে হাসিমুখে পরিচিতদের সঙ্গে আলাপ করছেন। প্রভাতকে কিন্তু বরের আসনে কেউ বসিয়ে রাখতে পারছে না। পাঁচ দশ মিনিট বাদে বাদেই একবার করে পাক দিয়ে আসছে। দেখছে কোথাও কোন অসুবিধে হচ্ছে কি না। আশুদা' ভরসা দিয়ে বলেন, তুমি কেন ব্যস্ত হচ্ছ প্রভাত, আমরা তো সকলেই আছি।

—তবু না দেখলে চলে না। অরুণাদের দিকে কেউ দেখবার নেই, ওদের আত্মীয়দের আপনি তো চেনেন না?

—তোমার শ্বশুর খুব ভাল ব্যবস্থা করেছেন মানতেই হবে। ওঁনার বন্ধু-বান্ধবদের এতগুলো গাড়ী খাটছে, লোক আনছে, পৌঁছে দিয়ে আসছে। এ কি কম কথা?

—সেই জন্যেই তো ব্যস্ত হয়ে আছি, বড় অভিমানী লোক, অনুষ্ঠানের কোন ত্রুটি হলে দুঃখ পাবেন।

প্রভাত চলে গেলে, আশুদা' অন্যদের বলেন, এ রকম জামাই পাওয়া ভাগ্যের কথা।

বেলারাণী অনেকক্ষণ এসেছে, বলেই রেখেছিল কনে সাজানো হয়ে গেলে বাকি যেটুকু করবার নিজে হাতে করে দেবে। তাই আত্মীয়-স্বজনের সাজানো হয়ে গেলে অরুণাকে নিয়ে বেলারাণী পাশের ঘরে যায়। বিশেষ কিছু নয়, সামান্য একটু অদল-বদলের মধ্যে যে কতখানি পার্থক্য তা না দেখলে বোঝা যায় না। মাথার মুকুটটা ঠিক মত পরিয়ে তার সঙ্গে নিজের পছন্দকরা হাল্কা গোলাপী রং-এর ওড়না লাগিয়ে দেয়। অরুণার গাল টিপে দিয়ে বেলারাণী হেসে বলে, আয়নায় দেখ তো এবার কেমন দেখাচ্ছে?

অরুণার মুখে হাসি ধরে না। সোল্লাসে বলে, আপনি কি সুন্দর সাজাতে পারেন বেলাদি'! মাসীমা আমায় পাগোল করে মারছিলো, সাত বার চুলটা খুলেছেন আর বেঁধেছেন।

অরুণার মা উপহারের জিনিষপত্র কোথায় রাখা হবে, সম্প্রদানের সামগ্রী কি ভাবে সাজালে ভাল হবে, বাসরঘরে কোথায় কোথায় ফুল দেওয়া হবে, সব ব্যাপারেই বেলারাণীর পরামর্শ নিয়ে যাচ্ছেন। ক'দিনের মধ্যে মেয়েটি তাঁদের অত্যন্ত আপনার হয়ে উঠেছে।

কেষ্ট চিনুকে নিয়ে বিয়েবাড়ীতে ঢুকেই দেখে, সামনেই আশুদা' দাঁড়িয়ে। খুসী হয়ে চিনুকে বলে, আশুদা'কে প্রণাম কর, এই আমার সত্যিকারের দাদা।

চিনু কথামত প্রণাম করতেই আশুদা' ব্যস্ত হয়ে পড়েন, থাক মা, থাক। তোমার কথা কত শুনেছি, চোখের দেখাই বাকি ছিল—

কেষ্ট বুঝতে পারে আশুদা' চিনুকে গৌরী বলে ভুল করছেন। তাই পরিচয় করিয়ে বলে, এর নাম চিন্ময়ী, ডাকনাম চিনু।

—তুমি ভেতরে যাও মা, মেয়েরা সব আছেন।

চিনু অন্দর মহলে চলে যায়। আশুদা' জিজ্ঞেস করেন, মেয়েটি কে?

—শীগগিরি আমাদের বিয়ে হবে। তারপর চলে যাব কিশোরপুর, ওখানে একটা চাকরী নিয়েছি।

—কিসের চাকরী?

—ব্রজদুলালের স্কুলে।

আণ্ডদা' অভিমান ভরা গলায় বলেন, এত দিন আমায় বলনি কেন?

—আগে যে ঠিক ছিল না। এত দিন বড় অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কেটেছে। আজ আর মনের মধ্যে কোন সংশয় নেই আণ্ডদা'—

আর কোন কথা হয় না। ভোক্তনের দল কেষ্টকে দেখে টানতে টানতে ভেতরে নিয়ে যায়। সাঙ্গোপাঙ্গদের ডেকে বলে, কেষ্টদা' এসে গেছে, মাংসর বালতিটা ধরিয়ে দে।

কেষ্ট সোৎসাহে জামা খুলে, কাপড়ের ওপর গামছা জড়িয়ে পরিবেশন করতে লেগে যায়। কয়েক মিনিটের মধ্যে হৈ-হৈ আনন্দের মধ্যে মিশে গিয়ে কেষ্ট ভুলে যায় আজ এই প্রথম সে প্রভাতের বিয়েবাড়ীতে এল। নিমন্ত্রিতদের যত্ন করে সে খাওয়ায়। চিৎকার, চেঁচামিচিতে বাড়ী ভরিয়ে দেয়।

আণ্ডদা' এক অবসরে প্রভাতকে কেষ্টর খবর দিয়ে আসেন। কেষ্ট এসেছে শুনেই প্রভাত ছুটে ভেতরে চলে যায়। পরিবেশনরত কেষ্টকে ধমক দিয়ে বলে, এতক্ষণে আসার সময় হল, আমি ভাবলাম তুই আর আসবি না।

প্রাণখোলা হাসি হেসে কেষ্ট রসিকতা করে, বরকে এখন এখানে আসতে নেই, তার ওপর ঝগড়া তো করতেই নেই। এই যে, হাতে মাংসর বালতি দেখছিস? কেষ্ট বালতিটা প্রভাতের দিকে ছোঁড়ার ভঙ্গী করে। সকলেই হো-হো করে হাসে। প্রভাত কেষ্টকে একান্তে ডেকে নিয়ে যায়। বলে, আণ্ডদা'র কাছে সব শুনলাম। কি যে খুশী হয়েছি, তোকে কি করে বোঝাব!

—চিনুকে তো তুই জানিস?

—অনেক দিন থেকে। সত্যি বড় ভাল মেয়ে। চিরকাল দুঃখই পেয়েছে, তোর সঙ্গে ওর মিল হবে খুব ভাল। শুনলাম, তোরা কলকাতা ছেড়ে চলে যাবি?

—এ সহর আর ভাল লাগছে না প্রভাত, দেখি না ওখানে কিছু দিন থেকে। যদি একঘেয়ে লাগে, ফিরে আসব।

নির্ব্বিঘ্নে বিয়ের অনুষ্ঠান শেষ হয়। রমেশ বাবু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলেন, এতক্ষণে নিশ্চিন্ত হলাম। কোন রকম ত্রুটি হয়নি, তোমার বন্ধুরা খুব ভাল ম্যানেজ করেছে।

বাসরঘরে যাবার আগে প্রভাত বেলারাণীর সঙ্গে কেষ্টর আলাপ করিয়ে দেয়। চিনুর কথা বলতেও ভোলে না।

বেলারাণী বলে, আচ্ছা মেয়ে তো! এতক্ষণ আমার সঙ্গে রইল, একটা কথাও তো বলেনি!

প্রভাত ও আণ্ডদা'র কৃপায় পরিচিত মহলে কেষ্ট ও চিনুর বিয়ে জানতে কারুর বাকী থাকে না। সকলে এসে কেষ্টকে অভিনন্দন জানিয়ে যায়।

এক সময় কেষ্ট প্রভাতকে জিজ্ঞেস করে, বিনোদদের নেমন্তন্ন করিস্ নি?

—করেছিলাম, ওরা আসেনি। সকালে বেয়ারা দিয়ে চিঠি লিখে একটা উপহার পাঠিয়ে দিয়েছে।

—কেষ্ট দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, আজ দেখা হলে ভাল হত।

—যাবি ওদের ওখানে?

—না থাক। আমার সঙ্গে আর হয়ত দেখা হবে না। দেখা হলে তুই গৌরীকে বলিস, ওর ওপর আর আমার কোন অভিমান নেই। ও বড় হোক, ভাল হোক, এই আমি চাই।

প্রভাত এ বিষয়ে কেষ্টকে আর কথা বলতে দেয় না। বলে, বেশ রাত হ'ল, এখন চিনুকে নিয়ে বাড়ী যা।

বিয়েবাড়ীর গাড়ী করে কেষ্টরা বেহালায় ফেরে। ঘরে এসে চিনু প্রথম কথা বলে,. আজ বড় অদ্ভুত লাগছিল! সারাক্ষণ অরুণার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলাম, কি মিষ্টি দেখতে মেয়েটা!

—খুব ভাল মেয়ে। তোমার তো চেনা বিশেষ কেউ ছিল না?

—না। তাই বসে বসে কত কথা ভাবছিলাম। নিজের বাড়ীর কথা, দাদা-দিদিদের কথা। এমনি করে বাড়ীতেও বিয়ে হত। বাবা তখন বেঁচে। বলতেন, চিনুর বেলা সব চেয়ে ধূমধাম হবে—

কেষ্ট থামিয়ে দেয়। বলে, থাক ও সব পুরোন কথা। আজ আমি অনেক দিন বাদে আগের মত হৈ-হৈ করতে পেরেছি। মনের মধ্যে আর কোন ময়লা নেই, পরিষ্কার হয়ে গেছে। আমি কি ভাবছিলাম জানো?

—কি?

—তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়ে গেছে। একটু চুপ করে থেকে বলে, আগে ভাবতাম, বিয়ের অনুষ্ঠান বড় করে না হলে মনে তৃপ্তি পাব না। কিন্তু আজ বুঝেছি সে সব মিথ্যে। মনের মধ্যে তোমাকে আমি পেয়েছি।

চিনু কোন উত্তর দিতে পারে না। কেষ্টর কাঁধের ওপর আলতো করে হাত রাখে। কেষ্ট চিনুকে কাছে টেনে নেয়। জানলা দিয়ে দূরে তাকিয়ে দেখে, ফ্রেমে-বাঁধা এক টুকরো আকাশ। নির্ম্মল পবিত্র এক মুঠো আকাশ। দু'জনে সেই দিকে চেয়ে থাকে।

শেষ

"The best drug for the relief of pain is alcohol —and I don't mean anything pharmaceutical, but whisky!" —*Professor Charles Rob.*
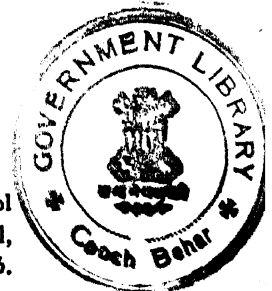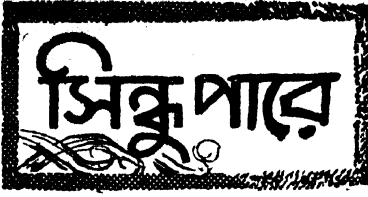
শ্রীনীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত

চোদ্দ

পরের দিন সকাল বেলা ট্রেনটি যখন লণ্ডনের আবহাওয়া ছাড়িয়ে খোলা মাঠের উপর দিয়ে ছুটে যাচ্ছিল, ট্রেনের জানালা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে লণ্ডনের সমস্ত ব্যাপারটা একটা দুঃস্বপ্নের মত মনে হতে লাগল। বৃষ্টি আর নাই—মাঝে মাঝে একটু একটু রোদের আমেজও দেখা যাচ্ছে, বাইরের উদার প্রকৃতির সবুজ প্রলেপে দুঃস্বপ্নের ঘোরটা মনের উপর থেকে ক্রমে যেন গেল কেটে। ভেসে উঠল মনের উপরে—মার্লিন। মনটা একটা নতুন পুলকে শিউরে উঠল জেগে। ট্রেনের চেয়ে আরও বেগে ছুটল মনটা সেই ডুডিংটনে, যেখানে রয়েছে—মার্লিন। মনে মনে হিসেব করে নিলাম—ডুডিংটন পৌঁছতে ৫টা বাজবে। ঠিক করে ফেললাম—হাসপাতালে একবার দেখা দিয়েই সোজা চলে যাব ক্লাবে।

ট্রেন ঠিকই চলেছে কিন্তু আমার মনটা হঠাৎ যেন একটা প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে গেল থেমে। তাই ত! আমিও ত ফুকানের মতন লীলা করেছি সুরু। আমি যে বিবাহিত, আমাদের এ প্রেমের যে কোনও পরিণতি নাই—মার্লিনও জানে না। ফুকানের মতন ইচ্ছে করে যে বলিনি—তা অবশ্য নয়। কিন্তু বলা ত হয়ে ওঠেনি, সুযোগই পাইনি বলবার—এবং সত্য কথা বলতে গেলে সে কথা মনেই হয়নি। তাই ত! ফিরে গিয়ে যত শীঘ্র সম্ভব কথাটি বলা উচিত মার্লিনকে। তারপর? চমকে উঠলাম। মার্লিন যদি—হঠাৎ যেন বাইরের প্রকৃতি অন্ধকারে কালো হয়ে গেল, আমার চোখের সামনে।

ডুডিংটনে এসে পৌঁছতে বেলা ৫টা বেজে গেল। হাসপাতালে এলাম—কিন্তু ক্লাবে যাওয়ার সে উৎসাহটি আর নাই, কখন যেন গেছে নিবে। প্রাণভরা ইচ্ছে—ছুটে গিয়ে একবার মার্লিনের মুখখানি দেখে আসি, কিন্তু মন এগোতে চায়নি। কিসের যেন একটা ভয়ে যাচ্ছিল পিছিয়ে। দেখা হলে, আর দেরী না করে অকপটে আমার জীবনের কথাটি মার্লিনকে জানিয়ে দেওয়া দরকার—এ শিক্ষা যে এমিলিয়া জনসন ভাল করেই দিয়ে গিয়েছিল আমাকে—সেটা ডুডিংটনে এসে যেন আরও উপলব্ধি করলাম।

দেখা হল ডাঃ নায়ারের সঙ্গে। তাঁকে বিস্তারিত নীরেনের মৃত্যুর খবর বললাম। তিনি শুনে খুবই দুঃখ করলেন। বললেন, সত্যিই বিদেশে আপনার লোক কেউ কাছে নাই—এ বড়ই দুঃখের কথা।

তারপর কথায় কথায় আমাকে বললেন—তুমি যে ক্লাবে এত প্রিয় হয়ে উঠেছ তা ত জানতাম না।

শুধালাম কি রকম?

বললেন, এই ত তিন-চার দিন তুমি নেই, ইতিমধ্যে দু'দিনই তোমার খবর নিতে লোক এসেছিল হাসপাতালে।

শুধালাম, কে কে নিতে এসেছিল খবর?

বললেন, নামটা যতদূর আমার মনে পড়ে, বলেছিল মঙ্কটন। আমি সন্ধ্যেবেলা একটু বাগানে বেড়াই কি না—আমাকে এসে তোমার কথা জিজ্ঞাসা করেছিল।

ইচ্ছা হল শুধাই,—মঙ্কটনের সঙ্গে আর কেউ ছিল কি না। কিন্তু ডাঃ নায়ারকে সোজা জিজ্ঞাসা করতে লজ্জা হল।

বললাম, ওঃ, মঙ্কটন! ও দলটা এই রাস্তা দিয়েই বাড়ী ফেরে। আমিও ওদের সঙ্গে ফিরি কি না।

একটু হেসে বললেন, তুমি যেদিন যাও সেই দিনই সন্ধ্যেবেলা এসেছিল। শুনে গেল তুমি হঠাৎ জরুরী কাজে লণ্ডনে গিয়েছ, ফিরতে তিন-চার দিন দেরী হবে। আবার কাল এসেছিল খবর নিতে—ফিরেছ কি না। খুব জমিয়েছ দেখছি ওদের সঙ্গে।

মঙ্কটন একলাই এসেছিল, না ওদের দলটিও ছিল সঙ্গে? আর না জিজ্ঞাসা করে পারলাম না।

বললেন, দল ত দেখিনি—তবে একটি মেয়ে ছিল সঙ্গে লক্ষ্য করেছি। মেয়েটি অবশ্য আমার ঠিক কাছে আসেনি—একটু দূরে ছিল দাঁড়িয়ে।

ওঃ বুঝেছি—মিস্ ফ্রেজারও ছিল সঙ্গে। কথাটা এমন সহজ ভাবে বললাম, যেন আমার মনের দিক দিয়ে, তাতে বিন্দুমাত্র আসে যায় না।

বললেন, হবে। আমার সঙ্গে পরিচয় হয়নি।

বললাম, জানেন, ঐ মেয়েটি এ বছরের গল্ফ ক্লাবের 'মে কুইন' হয়েছে।

ডাঃ নায়ার আস্তে বললেন, তা 'মে কুইন' হওয়ার মতন রূপ বটে!"

• • • •

'মে কুইন' হওয়ার মতন রূপ বটে—কথাটা যেন আমার কানে বাজতে লাগল। অবশ্য কথাটা নতুন কিছুই নয়—আমিও জানি। তবুও একটা মিষ্টি সুরের গান যদিও জানা, তবুও শুনতে যেমন লাগে ভাল—সেই রকম লাগল কানে। মনটা ঐ কথাটার ভিত্তিতে আরও যেন মার্লিনকে নিয়ে হয়ে উঠল ভরপুর।

পরের দিন বিকেলে ক্লাবে গেলাম। মনটাকে ইতিমধ্যে ঠিক করে নিয়েছিলাম—একটু সুযোগ পেলেই মার্লিনকে সরল ভাবে আমার গোপন মনের নিবিড় কথাটি নিবেদন করে আমাদের মিলনের বাধার দিকটাও দেব জানিয়ে। তারপর? তারপর মার্লিনের উপরই দেব ছেড়ে আমাদের জীবনের সমস্যার সিদ্ধান্তের ভার। সে যা করে—তাই নেবো মেনে।

বুলা! তুমি নিশ্চয়ই আমার উপর ভীষণ রাগ করছ। নিশ্চয়ই ভাবছ—এ কি রকম মনের দুর্বলতা, নিজের সমস্যা সমাধান করার শক্তি নিজের মনেই থাকা উচিত। সুধার মুখের দিকে চেয়ে তোমাদের কথা ভেবে আমার নিজেরই ঠিক করে ফেলা উচিত ছিল—না এ অবৈধ প্রেমকে প্রশ্রয় দেব না। কিন্তু বুলা! ভগবান আমাকে যা তৈরী করেছেন, আমি ত তাই। একটা আদর্শে মনটাকে ভেঙ্গে নতুন করে তৈরী করবার শক্তি ত আমার মধ্যে তিনি দেন নাই। মনের বেলুন একবার আকাশে উড়লে, তাকে ইচ্ছে করে কাটিয়ে মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়ার মধ্যে যে শক্তিটুকু দরকার, সেটা তোমার মেজদার মনে কোনও দিনই

সবাই জানেন—
দামের তুলনায় ব্রুক বণ্ড চায়ে অনেক বেশী কাপ ভালো চা পাবেন
...আর সীল করা প্যাকেটে পাওয়া যায় বলে ব্রুক বণ্ড চা নির্ভেজাল ও একেবারে খাঁটি থাকে
...আর হপ্তায় ২,১০,০০,০০০ প্যাকেট ব্রুক বণ্ড চা তৈরী হয়
এই জন্যেই অন্য যে কোন মার্কা চায়ের চেয়ে ব্রুক বণ্ড চা বেশী লোকে খান
Brooke Bond Tea

ছিল না এবং তা ছাড়া এর মধ্যে আরও একটা দিক আছে। সরল ভাবেই সেটা তোমাকে বলি। প্রেম জিনিষটা যে কি, সেটা মার্লিনকে পেয়ে আমার জীবনে এই প্রথম উপলব্ধি করেছিলাম। সুধার সঙ্গে অবশ্য বিবাহ হয়েছিল। কিন্তু বিবাহের পূর্ব্বে তাকে কখনও দেখিনি, জানিনি, চিনিনি। বিবাহের পরে নববধূর নব মাধুরীতে দিন কতক অবশ্য একটা নেশায় মশগুল হয়ে উঠেছিলাম—এটা স্বীকার করি। কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই সে নেশা গেল কেটে। তারপর থেকে সুধার প্রতি একটা সহানুভূতি, একটা দরদ বরাবরই অনুভব করেছি এবং আজ জীবনের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়েও বলতে পারি—আজও করি। আজ ভেবে দেখে মনে হয় সেটার কারণ—সুধার চরিত্রগত মাধুর্য্য। সেটুকু যদি তার চরিত্রে না থাকত, তাহলে সে বিবাহের অল্প কিছুদিনের মধ্যেই আমার প্রাণ থেকে যেত একেবারে মুছে। কিন্তু মার্লিনের কথা স্বতন্ত্র। এমি বলেছিল মন-প্রাণ দিয়ে যে এত বেশী ভালবাসা যায়—সে অভিজ্ঞতা যার হয়নি সে বোঝে না। মার্লিনকে পেয়ে সেটা আমি হাড়ে হাড়ে বুঝতে পেরেছিলাম। বুলা! তোমারও যে অভিজ্ঞতা হয়নি এমন নয়, তাই তুমিও ত জান। তাই সব দিক বিবেচনা করে তোমার মেজদাকে ক্ষমা করে নেওয়ার চেষ্টা করো।

ক্লাবের সদর গেটে ঢুকেই দেখি, চেরী গাছতলায় বসে আছে মার্লিন ও ডরথী। ডরথী আমাকে দেখেই তাড়াতাড়ি এগিয়ে এলো আমার কাছে, এসে বলল, ব্যাপার কি আপনার?

বললাম, ক'দিনের জন্ত হঠাৎ লণ্ডনে যেতে হয়েছিল।

বলল, তা বলা নাই, কওয়া নাই—মানুষ এই রকম ডুব দেয়?

বললাম, হঠাৎ টেলিগ্রাম পেয়ে—

কথা থামিয়ে দিয়ে বলল, কৈফিয়ৎ আমার কাছে নয়। যাকে দেবার তাকে গিয়ে দিন।

কথা বলতে বলতে চেরী গাছতলায় এলাম।

ডরথী বলল, আপনারা কথা বলুন—আমি একটু খেলিগে যাই।

শুধালাম, এতক্ষণ খেলছিলেন না কেন?

বলল, যা কাণ্ড করেছেন, খেলাধূলো মাথায় উঠে গেছে। বলে উত্তরের অপেক্ষা না করে ব্যাডমিণ্টন খেলার দিকে গেল চলে। বসলাম গিয়ে মার্লিনের পাশে। অনায়াসে একখানি হাত তুলে নিলাম হাতে—দ্বিধা করিনি।

মার্লিন চুপ করেই ছিল—এইবার কথা বলল—লণ্ডন থেকে এইবার কথা বলল, লণ্ডন থেকে কবে এলে?

কথার মধ্যে যে একটু অভিমানের সুর মেশান ছিল—সেটুকু আমার লক্ষ্য এড়ায়নি।

বললাম, কাল বিকেলে।

শুধাল, কখন এসে পৌঁছেছিলে?

বললাম, এই বেলা ৫টা আন্দাজ।

বললাম, না ঠিক তা নয়। তবে—

চুপ করে গেলাম। কাল ক্লাবে না আসার কারণের দিক দিয়ে ঠিক সত্য কথাটা এখনই কি রকম করে বলি?

বলল, হঠাৎ ও রকম চলে গেলে, একটা খবর দিয়ে ত গেলে পারতে।

বললাম, খবর কি করে দেব? সেদিন সন্ধ্যেবেলা বাড়ী ফিরেই টেলিগ্রাম পেলাম—এক বন্ধু মৃত্যুশয্যায়। পরের দিন সকাল বেলায়ই চলে যেতে হল।

বলল, তা ক্লাবে একটা চিঠি পাঠিয়েও ত যেতে পারতে।

বললাম, সেটা অবশ্য আমার মাথায় আসেনি।

চুপ করে গেল। হাতখানি হাতের মধ্যে একটু জোরে চেপে ধরে বললাম, মার্লিন! ওরকম ভাবে চলে যাওয়াতে তোমার রাগ বুঝি—না?

একটু হেসে চাইল আমার দিকে। বলল, রাগ করার অধিকারটি কি পেয়েছি আমি?

বললাম, পাওনি? নিজের মনকেই জিজ্ঞাসা করো।

কথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে শুধাল, তা বন্ধুটির খবর কি?

বললাম, মারা গেল।

এঁ্যা! বলে যেন একটু চমকে উঠল। তারপর বলল, আমি সত্যিই বড় দুঃখিত।

চুপ করে রইলাম! একটু পরে বেশ গম্ভীর ভাবে বললাম, মার্লিন! তোমার সঙ্গে আমার অত্যন্ত জরুরী কথা আছে।

বলল, বল।

বললাম, একটু সময় লাগবে—এবং তোমাকে খানিকক্ষণ নিরিবিলি পাওয়ার দরকার।

একটু হেসে বলল, কথার সারমর্ম্মটি না হয় এখনই বলে দাও—বিস্তারিত পরে হবে।

উচ্ছ্বসিত হয়ে বললাম, সারমর্ম্ম হচ্ছে—আমি তোমাকে ভালবাসি। এত ভালবাসি—

দু'টি আঙ্গুল দিয়ে আমার ঠোঁট দু'টি চেপে বলল, চুপ্! চুপ্! অত গোপন কথা কি এত জোরে বলে?

এমির কথার অনুকরণে বললাম, প্রাণ মন দিয়ে যে এত বেশী ভালবাসা যায়—

হঠাৎ টম পাশ দিয়ে ছুটে এল সামনে। মার্লিনকে বলল, আরে তুমি এখানে—আমি স্থষ্টি তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি।

মার্লিন শুধাল, কেন?

টমের এ সময় হঠাৎ এসে পড়াটা যে মার্লিনও ঠিক পছন্দ করেনি মার্লিনের 'কেন' প্রশ্নটার ধরণেই সেটা বুঝতে পারলাম।

টম বলল, দেখলাম ডরথী একলা খেলছে। তোমাকে কোথায়ও দেখি না—

মার্লিন বলল, তা কি হয়েছে? তোমার চোখে চোখে সব সময় আমাকে থাকতে হবে নাকি?

টম কথার কোনও উত্তর না দিয়ে এসে বসল আমাদের পাশে।

* * * *

সন্ধ্যেবেলা ক্লাব থেকে ফিরে যাওয়ার সময় মার্লিন চলল আমার পাশে পাশে—টম ও মক্কটন একটু এগিয়ে যাচ্ছিল। লক্ষ্য করলাম—টম দু'-একবার পেছিয়ে আমাদের পাশে এসে চলবার চেষ্টা করছিল, কিন্তু মক্কটন টমের বাহু ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল নিজের সঙ্গে।

মার্লিনকে বললাম, মক্কটন দেখছি আজ হঠাৎ বিশেষ উদার হয়ে উঠেছে।

মার্গিন খিল-খিল করে হেসে উঠল। বলল, তার একটু কারণ আছে।

শুধালাম, কি?

বলল, মন্টন জানে—তোমাকে আমার একটা কথা বলবার আছে।

একটু অবাক হলাম। হেসে শুধালাম, গোপন কথা নাকি?

হেসে বলল, না গো। তাহলে মন্টন অত উদার হত না।

শুধালাম, কথাটা কি?

বলল, পরশু দিন বিকেলে তুমি আমাদের বাড়ীতে যাবে। চা খাবে। আমার মা'র সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দেব।

উৎফুল্ল হয়ে বললাম, এ ত খুব ভাল কথা। কিন্তু তোমাদের বাড়ী যে আমি চিনি না।

বলল, সে ব্যবস্থা হবে। মন্টন কি টম এসে হাসপাতাল থেকে তোমাকে নিয়ে যাবে।

বললাম, তা এ কথাটা ত টম মন্টনের সামনেই হতে পারত।

আবার একটু চাপা রকমের হাসি হেসে উঠল। বলল, সেইখানে একটু চালাকি করেছি।

শুধালাম, কি?

বলল, মন্টনকে বলেছি—টমের সামনে এ কথাটি আমি তোমাকে বলতে চাই না। তাহলে আমাদের পাড়ার সবাই জেনে যেতেও পারে। এবং কেউ কেউ হয়ত আসবে তোমাকে দেখতে—সেটা তুমি পছন্দ না-ও করতে পার।

শুধালাম, তা এ চালাকিটুকু করার অর্থ?

সঙ্গে সঙ্গে বলল, তোমাকে একটু একলা পাব বলে।

কি দুষ্টু! বলে মার্গিনের পিঠের উপর দিয়ে আমার বাহুটি জড়িয়ে তাকে একটু কাছে টেনে নিলাম। আমরা চলছিলাম আস্তে আস্তে, ওদের থেকে খানিকটা পেছিয়ে পড়েছি। জগতটা তখন প্রায় ঢাকা পড়ে গেছে—সন্ধ্যার ঘন আবহাওয়ায়।

হঠাৎ মার্গিন বলল, শোন। আমরা কিন্তু বড় গরীব।

হেসে বললাম, আমাকে কি খুব বড়লোক ঠাওরালে নাকি? তবে হ্যাঁ—ইদানীং হয়েছি।

শুধাল, কি রকম?

বললাম, রাজরাণী পেয়ে।

• • • •

আমার কথাটা কিন্তু বলা হল না। পথে চলতে চলতে একটু ফুরসুৎ যে পাইনি—এমন নয়। কিন্তু বলি বলি করেও বলা হল না। সন্ধ্যার অন্ধকারে মাঠের পথে চলতে চলতে এমন একটা রঙিণ মায়ারাজ্য সৃষ্টি হয়ে উঠেছিল, আমাদের দুজনকে নিয়ে যে হঠাৎ তার মধ্যে একটা বোমা ফাটিয়ে সেই মায়ারাজ্যটাকে টুকরো টুকরো করে ভেঙে ফেলার মতন শক্তি ও সাহস আমার হল না—তাই বলতে পারিনি।

কিন্তু বলতে ত হবেই। হাসপাতালে ফিরে এসে ঘরে না গিয়ে বারান্দাতেই চুপ করে বসে রইলাম—খানিকক্ষণ। বলতে ত হবেই এবং সেটা মার্গিনের বাড়ীতে চা' খেতে যাওয়ার আগেই বলা উচিত। বাড়ীতে আমাকে চা' খেতে নিমন্ত্রণ করার তাৎপর্য্যটুকুও বুঝতে আমার দেরী হয়নি। মার সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দেবে। কেন? এ দেশের প্রথা অনুসারে ছেলে-মেয়ে পরস্পর পরস্পরকে ভালবেসে পছন্দ করার পর নিজ নিজ বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে বাপ-মার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়, সুযোগ দেয় বাপ-মাকে চিনবার, জানবার—যাতে করে বিবাহ-পণে আবদ্ধ হতে, বাপ-মার দিক দিয়ে অমতের কোনও কারণ না ঘটে। অবশ্য এ প্রথার যে ব্যতিক্রম ঘটে না তা নয় এবং বাপ-মার দিক দিয়ে অমতের কারণ ঘটলেও ছেলে-মেয়েরা যে সব সময় সেটাই মেনে নেয়, তাও নয়।

তবে সাধারণতঃ এইটেই চলতি প্রথা। মার্গিন পল্লীবাসিনী মেয়ে এবং এই চলতি প্রথা অনুসারেই নিজের মার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেওয়ার জন্ত যে আমাকে বাড়ীতে ডেকেছে—সেটুকু বুঝতে আমার দেরী হয়নি। নিজের মনোভাবের সঙ্গে নিজের মা'র পছন্দটিও মিলিয়ে নিতে চায়। পরন্তু ওদের বাড়ীতে যাওয়ার কথা। অতএব ভেবে ঠিক করে ফেললাম, কালই কোনও রকমে একটা ফুরসুৎ করে কথাটা মার্গিনকে জানিয়ে দিয়ে স্পষ্টই জিজ্ঞাসা করব—এ ক্ষেত্রে তার বাড়ীতে আমার আর যাওয়া উচিত কি না।

কিন্তু পরের দিন মার্গিনের সঙ্গে নিরিবিলি কথা বলার ফুরসুৎই হল না। সেদিন মার্গিনরা ক্লাবে এলো একটু দেরী করে। আমি ওদের জন্ত খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে যখন টেনিস খেলতে সুরু করেছি—চেয়ে দেখি মার্গিনরা ঢুকছে ক্লাবে। এসেই মহা উৎসাহে ওরা ব্যাডমিন্টন খেলায় গিয়ে যোগ দিল। ফেরার সময় পথে যেতে যেতে লক্ষ্য করলাম শুধু টমই নয়, মন্টনও মার্গিনকে আজ আর নিরিবিলি আমার সঙ্গে ছেড়ে দিতে নারাজ। একবার ভাবলাম জোর করে বলি—মার্গিন, তোমার সঙ্গে আমার একটু কথা আছে। কিন্তু ওদের ধরণ দেখে সেটুকু বলতে বাধল।

বাড়ীতে এসে ভেবে ঠিক করলাম—কাল আর মার্গিনের বাড়ী যাব না, যে আমাকে নিতে আসবে তার হাতে না যেতে পারার দরুণ ক্ষমা চেয়ে একখানি চিঠি লিখে পাঠিয়ে দেবো এবং তাতেই দেব বিস্তারিত সব জানিয়ে। অনেক রাত জেগে চিঠির একখানি খসড়াও করে রাখলাম। কি রকম মার্গিনকে আমি ভালবাসি—সে কথাটা চিঠির গোড়ায়ই লিখলাম যেন সমস্ত প্রাণ ঢেলে।

• • • •

পরের দিন সকাল বেলা ঘুম ভেঙেই মার্গিনের কথা মনে করে মনটা উঠল হু-হু করে। তাই ত! ঐ চিঠিখানায়ই যদি হয়ে যায় সব সমাপ্তি, তাহলে মার্গিনের মুখখানা আর জীবনে দেখতে পাব না? সব কথা মুখে বলে হাত দুটি ধরে চাইব বিদায়—সেই ত মধুর, তার মধ্যেও যে একটা নিবিড় আনন্দ আছে। বিদায় না-ও দিতে পারে—ভাবতে মনটা কেমন যেন একটা পুলকে উঠল শিউরে। ভাবলাম—যাব। ওদের বাড়ীতে নিশ্চয়ই ওকে পাব নিরিবিলি—মুখেই জানিয়ে দেব কথাটি। মুখে যদি বলতে বাধে—চিঠিখানা না হয় নিয়ে যাব পকেটে, তুলে দেব হাতে। বলব—আমার সামনেই পড়।

যাব ঠিক করে ফেলাতে, যাওয়ার স্বপক্ষে যুক্তির অভাব হ'ল না। ভাবলাম—বেচারা! বলেছিল—আমরা বড় গরীব, আমাকে চা' খাওয়াবার জন্ত না জানি কত ব্যবস্থাই করেছে, হয়ত সমস্ত দিনটাই খাটবে, আয়োজনটা সুন্দর করে তোলবার জন্ত। হঠাৎ

যদি আমি না যাই—দারুণ ব্যথা পাবে মনে। তার উপর যাবে চিঠি—ঐ চিঠি। না না, তা কিছুতেই হতে পারে না।

বিকেল চারটে বাজতে না বাজতে টম নয়, মক্কটন এলো হাসপাতালে আমাকে নিতে। প্রায় তৈরীই ছিলাম। চললাম—মক্কটনের সঙ্গে।

পথে যেতে যেতে মক্কটনের সঙ্গে কথাবার্তা হলো। শুধালাম, বাড়ীতে কে কে থাকে?

মক্কটন বলল, মার্লি ও তার মা—আর কেউ নয়।

শুধালাম, ওর বাবা? নেই বুঝি?

বলল, না। তিনি মারা গেছেন তিন-চার বছর হলো। তিনি ছিলেন উত্তরে ব্ল্যাকপুলে বিখ্যাত লোক—সলিসিটার। খুব প্রতিষ্ঠা ছিল তাঁর সেখানে—মেয়র হওয়ার কথা হচ্ছিল—হঠাৎ মারা গেলেন। বয়সও এমন কিছু বেশী হয়নি।

বললাম, বড়ই দুঃখের কথা!

বলল, ব্ল্যাকপুলের কাছে বিসফামে সমুদ্রের ধারে মস্ত বাড়ী ছিল ওদের, আর আজ গিয়ে দেখবেন—কি অবস্থায় এখন আছে।

বললাম, তা মানুষের ত চিরদিন সমান যায় না।

একটু চুপ করে থেকে বলল, তা অবশ্য ঠিক। তবে মার্লিনের কথা ভেবে বড় দুঃখ হয়। মা বাতে পঙ্গু—প্রায়ই চলতে পারেন না, কোনও রকমে লাঠি ভর করে একটু এদিক-ওদিক যান। রান্না-বান্না ইত্যাদি ঘরের সমস্ত কাজ করতে হয় মার্লিনকে। একটা ঝি অবশ্য আছে—সকাল বেলা খানিকক্ষণ এসে কিছু কাজ করে দিয়ে যায়। তাও মার্লিন বলছিল—তাকেও জবাব দেবে।

কথার মধ্যে মার্লিনের প্রতি মক্কটনের দরদটুকু স্পষ্টই উঠল ফুটে। কেন জানি না বললাম, তা সত্ত্বেও ও রোজ ক্লাবে আসে—বাহাদুরী দিতে হবে বৈ কি।

বলল, প্রথম প্রথম আসতে চাইত না। আমিই গিয়ে বুঝিয়ে মাঝে মাঝে একরকম জোর করে নিয়ে আসতাম এবং তাতে মায়েরও খুব সমর্থন অবশ্য ছিল। তবে ইদানীং দেখছি, ক্লাবে যাওয়ার ঝোঁকটা বেড়েছে। আমার যাওয়ার অপেক্ষায় উদ্‌গ্রীব হয়ে বসে থাকে।

শেষ কথাটার মধ্যে যে একটা আত্মপ্রসাদ ফুটে উঠেছিল—সেটা যে কেউ লক্ষ্য করতে পারে। কিন্তু ঐ একই কথায় আমার মনেও যে একটা আত্মপ্রসাদ জেগে উঠেছিল—সেটুকু খালি আমিই জানি। শুধালাম, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—যদি অবশ্য বলতে আপনার আপত্তি না থাকে—

শুধাল, কি?

বললাম, ব্ল্যাকপুল ত অনেক দূরে—উত্তরে। সে দেশ ছেড়ে ওঁরা এত দূরে লণ্ডেন-এ এসে বসবাস সুরু করলেন কেন?

বলল, বাপের ঐ রকম হঠাৎ মৃত্যুর পরে মা ওখানে থাকতে চান নি। দূরে কোথাও একান্তে নিরিবিলি ছোট একটি বাড়ী নিয়ে থাকার ইচ্ছে হয়েছিল তাঁর। মার্লিনের এক মাসী আছেন। উইসবিচে তাঁর স্বামীর মস্ত হোটেল—'হোয়াইট লায়ন।' ইংল্যাণ্ডে বিভিন্ন স্থানে তাঁদের হোটেল আছে—মস্ত বড়লোক তাঁরা। তিনিই লণ্ডেন-এর এই বাড়ীটা সস্তায় ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। বীসফামের বাড়ী এবং ওদিকে যা কিছু ছিল সব বেচে-কিনে মেয়েকে নিয়ে মা এইখানে এসে বসবাস করলেন সুরু।

শুধালাম, আপনার সঙ্গে বুঝি অনেক দিনের আলাপ?

বলল, ওদের এ অঞ্চলে আসার অল্প কিছু দিনের মধ্যেই।

তার পর একটু হেসে বলল, আমি ওদের বাড়ীর একজন বললেই হয়। মার্লির কথা ছেড়েই দিচ্ছি—ওর মা-ও আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন।

যদিও এ বিষয় আমার সন্দেহের লেশমাত্র ছিল না যে, মক্কটনের প্রতি মার্লিনের মনে প্রেমের ছায়া পর্য্যন্ত লাগেনি। তবুও মক্কটনের ধরণে ধারণে মাঝে মাঝে মনে যে একটা খটকা লাগত না এমন নয়, কেন মক্কটনকে মার্লিন এতটা প্রশ্রয় দেয়।

সোজা মক্কটনকে শুধালাম, আপনি ও মার্লিন বুঝি বিবাহ-পাশে আবদ্ধ?

হেসে মক্কটন বলল, না এখনও নয়। ঐ রকম মাকে ফেলে মার্লিন বিবাহ কি করে করে বলুন? তাই বিবাহের কথা মার্লিন এখন ভাবতেই পারে না।

মনের খটকা অবশ্য মিটল না। তবে এইটুকু বুঝলাম, মক্কটন বিবাহ-পাশে আবদ্ধ হতে চেয়েছিল, মর্লিন রাজি হয়নি।

ক্রমে আমরা ডডিংটনের জর্জ হোটেলের সামনে তিন রাস্তায় মোড়ের ক্লকটাওয়ারটা ছাড়িয়ে কেমব্রিজের রাস্তা ধরে চললাম। সামান্য একটু দূরে গিয়েই বড় রাস্তা ছেড়ে ঢুকলাম বাঁয়ে একটা সরু রাস্তায় এবং এসে পড়লাম একটা চার্চ্চের পাশে।

গ্রাম্য চার্চ্চটি দেখে মুগ্ধ হলাম। বড় বড় ওক, পাইন এবং বীচ গাছে ঢাকা একটি ছোট পুরাতন চার্চ্চ। রেলিং-ঘেরা প্রাঙ্গণটি অবশ্য বড় কিন্তু মানুষের হাতে, গাছ ও ফুলের বাহারে সাজান গোছান একেবারেই নয়, কেমন যেন এলোমেলো ইতস্তত বিক্ষিপ্ত গাছপালা ঝোপ-ঝাড়। তার মধ্যে লক্ষ্য করলাম প্রাঙ্গণে চারিদিকে ছড়ান রয়েছে বাঁধান মানুষের কবর। চুপচাপ নিরিবিলি স্থানটি নিজের পরিপূর্ণ শান্তিতে সমস্ত জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজেই যেন রয়েছে ভরপুর হয়ে।

চার্চ্চের পাশ দিয়ে একটি ছোট রাস্তা বেয়ে চলতে চলতে শুধালাম, এইটাই বুঝি আপনাদের চার্চ্চ? বড় সুন্দর জায়গাটি ত?

বলল, হ্যাঁ। আশে-পাশের তিন-চারটি গ্রাম নিয়ে এই চার্চ্চটি।

শুধালাম, আপনারা কি রোজ সন্ধ্যেবেলা এই পথ দিয়েই ফেরেন?

বলল, হ্যাঁ—এইটেই লণ্ডেনে যাওয়ার সোজা পথ।

বললাম, সন্ধ্যের পর এখান দিয়ে যেতে নিশ্চয়ই গা ছমছম করে—কি ভীষণ নিরিবিলি স্থানটি।

বলল, হ্যাঁ, মার্লিনের বোধ হয় একটু ভয়-ভয় করে। তাইত, আমি ওকে বাড়ী পৌঁছে না দিয়ে বাড়ী ফিরি না। মার্লিন অবশ্য সেটা মুখে মানে না। কিন্তু টম্‌টা এখান দিয়ে যেতে ভীষণ ভয় পায়। তখন মার্লিন ওকে নিয়ে কি মজাই না করে। অন্য দিন এখানে ত লোকজন বড় একটা থাকে না। কিন্তু রবিবার সকালে বেশ গুলজার হয়। আমিও আসি মাঝে মাঝে। মার্লিন বোধ হয় কোনও রবিবার বাদ দেয় না।

চার্চের পাশের পথটি ধরে এসে পড়লাম একটি খোলা মাঠে—চার্চের পিছনে এই মাঠটি। ছোট মাঠ—মাঠের উপর দিয়ে একটি ছোট বাঁধান পথ, সেই পথ ধরে মাঠ পেরিয়ে এসে উঠলাম লংডেনের সদর রাস্তায়।

লক্ষ্য করে দেখলাম—ঐ একটিই রাস্তা। প্রশস্ত মোটেই নয়। এই রাস্তার ধারে সারি সারি কয়েকটি ঠিক একই ধরণের বাড়ী। রাস্তার ধারেই বাড়ীগুলির ফটক এবং সবগুলিই ছোট ছোট কুটীর ধরণের। বাড়ীগুলির রংও একই ধরণের—লাল, এবং সবগুলিই ছোট হলেও দোতলা। মাথার উপরে দুভাঁজ করা লাল টালির ছাদ।

এই রাস্তা ধরে চলতে চলতে লক্ষ্য করলাম, দু-একটি বাড়ীর একতলায় ছোট ছোট দু-একটি দোকানও আছে, এবং তার একটিতে বাইরে লণ্ডনের দু'-তিনটি বিখ্যাত খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন টাঙান। বুঝলাম—এই দোকানে দৈনিক খবরের কাগজ পাওয়া যায়। একটা বাড়ীর একতলায় ছোট একটি ঘরের সামনে লেখা রয়েছে—দেখলাম—পোষ্ট অফিস।

এই রকম কয়েকটি বাড়ী ছাড়িয়ে এগিয়ে যেতেই লক্ষ্য করলাম, একটি বাড়ীর ফটকে মার্লিন দাঁড়িয়ে আছে। একদৃষ্টে চেয়ে আছে পথের দিকে। আমাদের দেখেই দ্রুতপদে এগিয়ে এলো আমাদের কাছে, দুহাত দিয়ে ধরল আমার দুটি হাত, সোজা চাইল আমার মুখের পানে—সেই প্রাণঢালা আকুল চাহনি, যা লক্ষ্য করেছিলাম বসন্ত পূর্ণিমার উৎসবে। মৃদু হেসে বলল, এত দেরী করলে কেন? চল ভিতরে তোমাকে মার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। মন্টন আমার পাশেই ছিল—সে কথা যেন ভুলেই গেল। একটি হাল্কা নীল রং-এর পোষাক ছিল পরিধানে—মার্লিনের দিকে চেয়ে আবার যেন নতুন করে মুগ্ধ হলাম।

ভিতরে ঢুকতে গিয়ে দেখি—এই ছোট বাড়ীটি ফটকের কাছ থেকে মাঝখান দিয়ে আবার দুভাগে বিভক্ত, তারই একভাগে মার্লিনরা থাকে, অপর ভাগে থাকে বোধ হয় অন্য লোক। বাড়ীতে ঢুকে দেখি—যেমন এ দেশে হয়—একটা সরু টানা বারান্দা মতন স্থান, তার মধ্য দিয়ে একটি ছোট কার্পেট ঢাকা সিঁড়ি উঠে গিয়েছে উপরে। এই বারান্দাটির বাঁ হাতে একটি ঘরে মার্লিন আমাকে নিয়ে গেল—ঘরটির আসবাবপত্র দেখে বুঝলাম—এইটেই খাবার এবং বসবার ঘর। ঘরটি বিশেষ বড় নয় কিন্তু আসবাবপত্রের সাজানোর রুচিতে মন মুগ্ধ হয়। মাঝখানে একটি গোল টেবিল এবং তার উপর একটি সুন্দর ফুলদানিতে ফুল সাজান রয়েছে এবং লক্ষ্য করলাম আপাততঃ চা-এর সরঞ্জামও গুছিয়ে সাজান। টেবিলটির চারি দিকে চারটি গদিআঁটা চেয়ার—বেশ দামী বলে মনে হয়। ঘরটিতে বড় বড় দুটি জানালা—সুন্দর সিল্কের পর্দা টাঙান এবং উপর থেকে ঝুলছে ছোট ছোট ফুলের গাছের অরকিড। এখন গ্রীষ্মকাল, তাই একটি জানালার কাচ খোলাই রয়েছে এবং পর্দাও দেওয়া হয়েছে সরিয়ে। আরও লক্ষ্য করলাম—একটি জানালার পাশে ভেলভেটের কাপড়ে মোড়া তিনটি কৌচ পারিপাটি করে রাখা, মাঝখানে ছোট একটি টেবিলে আর একটি ফুলদানি

এবং তাতেও ফুল রয়েছে সাজান। ঘরের এক প্রান্তে জানালার অপর দিকে একটি চক্চকে পালিশকরা কাঠের সাইডবোর্ড (খোলা তাকওয়ালা আলমারী বলা যেতে পারে) এবং তার উপরে কিছু কিছু কাচের বাসন নিখুঁত ভাবে গুছিয়ে রাখা হয়েছে। ঘরের মেঝেতে অবশ্য পুরু কার্পেট পাতা।

ঘরে নিয়ে গিয়ে মার্লিন তার মার সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিল—তিনি বসেছিলেন টেবিলের পাশে গদি-আঁটা একটি চেয়ারে। আলাপ করিয়ে দিয়ে মার্লিন বলল—মা বাতে প্রায় পঙ্গু, সহজে উঠতে-বসতে পারেন না।

মহিলাটিকে ভালই লাগল—বর্ষীয়সী ঈষৎ স্থূলাঙ্গী ভদ্রমহিলার মুখের দিকে চেয়ে মনে হল—এককালে সুন্দরী ছিলেন, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। তবে লক্ষ্য করলাম—মার্লিনের মতন কালো চুল বা কালো চোখ নয় এবং গায়ের বর্ণও মার্লিনের মতন উজ্জ্বল গোলাপী নয়। সাধারণ ফর্সা ইংরেজ মহিলাদের মতন সাদা।

মহিলাটি সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে আমাকে বললেন, তোমার কথা মার্লিনের কাছে এত শুনেছি যে মনে হচ্ছে, তোমাকে যেন কত কাল থেকে চিনি।

একটা জিনিষ বিশেষ করে লক্ষ্য করলাম—মহিলাটির মুখে হাসি নাই বললেই চলে, অসাধারণ বিষণ্ণ মুখভাব। তবে চোখ দুটির দিকে চেয়ে সহজেই মনে হল—কোনও কপটতা, ছলনা, চালাকি মহিলাটির মধ্যে নাই, সর্ব্বদাই সহজ সরল এবং উদার জীবনের দৃষ্টিভঙ্গি। এবং অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে আরও একটা জিনিষ লক্ষ্য করলাম—সেটুকুও এখানেই বলে রাখি—শুধু শরীরের দিক দিয়েই নয়, মনের দিক দিয়েও মহিলাটি সম্পূর্ণ ভাবে মার্লিনের উপর নির্ভর করেন এবং এই নির্ভরতাটুকু নিয়েই যেন আছেন বেঁচে। নিজস্ব কোনও ব্যক্তিত্ব তাঁর কিছু আছে বলে আমার একেবারেই মনে হয়নি।

মহিলাটির সঙ্গে দু-চারটে কথাবার্ত্তা হচ্ছে—মার্লিন ও মঙ্কটন আছে ঘরেই—হঠাৎ টম্ কোথায় ছিল জানি না, ছুটে এলো ঘরে এবং মার্লিনকে জিজ্ঞাসা করল—চা-এর জল চড়িয়ে দেবে কি না। মার্লিন ইশারায় কি একটা বলে দিল এবং টম তৎক্ষণাৎ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। একটু পরে মার্লিনও চলে গেল ঘর ছেড়ে।

মঙ্কটন আমাকে শুধাল, আপনি হাত ধোবেন—বাথরুমে নিয়ে যাব?

বাথরুমে যাওয়ার কোনও প্রয়োজন আছে কি না—এইটে ভদ্রভাবে জিজ্ঞাসা করবার এ দেশে এই পদ্ধতি এটা ইতিপূর্ব্বেই শিখেছিলাম।

বললাম, চলুন।

মঙ্কটন আমাকে উপরে নিয়ে গেল। এবং উপরে গিয়ে লক্ষ্য করলাম—নীচে বসবার ঘরের উপরেই সামনের দিকে শোবার ঘর, বোধ হয় মা ও মেয়ে শোয় এবং তার পিছনেই বাথরুম। উপর তলায় আর কিছু আছে বলে মনে হল না। বাথরুমে হাত-মুখ ধুয়ে নীচে নেমে এসে দেখলাম—কেক ইত্যাদি খাবার ইতিমধ্যে চা-এর টেবিলে সাজান হয়ে গেছে এবং মার্লিন, টম্, মঙ্কটন সকলেই চা-এর টেবিলে আছে বসে—যেন আমারই প্রতীক্ষায়। মার্লিনের মা অবশ্য আগে থেকেই বসেছিলেন। মার্লিন এবং তাঁর মার মধ্যে আমার জন্য একটি চেয়ার রয়েছে খালি।

চা খেতে খেতে অনেক কথাবার্ত্তা হলো। তার মধ্যে যেটুকু বিশেষ করে আজও মনে আছে সেইটুকু বলি। কথায় কথায় মার্লিনের মা বলেছিলেন, আমার ভারতীয়দের খুব ভাল লাগে। আমরা ব্ল্যাকপুলে থাকতে দুটি ভারতীয়ের সঙ্গে আমাদের বেশ আলাপ হয়েছিল। বড় নম্র তোমাদের স্বভাব, বড় কোমল তোমাদের মুখ।

মার্লিন বলল, কৈ মা, আমারও কিছু ত মনে পড়ে না।

মার্লিনের মা বললেন, তুমি যে তখন বড্ড ছেলেমানুষ ছিলে—তাই মনে নাই।

আমি বললাম, তা আপনাদের দেশের লোকের ভদ্রতাজ্ঞানও অসাধারণ—শিক্ষা করার মতন।

মঙ্কটন গর্ব্বভরে বলল, আপনাদের দেশের কথা বলতে পারি না কিন্তু আমাদের ইংল্যাণ্ডের ভদ্রতা ও সৌজন্য আপনি ইউরোপে আর কোথায়ও পাবেন না।

কেন জানি না, হঠাৎ মার্লিন প্রতিবাদ করে উঠল—বলল, তুমি ইউরোপের কি-ই বা জান? জন্মে ত ইংল্যাণ্ডের বাইরে পা দাওনি।

মঙ্কটনের মুখের উপর সোজা এ রকম প্রতিবাদ করতে আমি মার্লিনকে কখনও দেখিনি। অবাক হলাম।

মার্লিনের মা একটু হেসে—এই বোধ হয় প্রথম তাঁর মুখে হাসি লক্ষ্য করলাম—বললেন, মার্লিনের মনে কথাটা লেগেছে।

মার্লিনের কথার উত্তরে মঙ্কটন বলল, ইংল্যাণ্ডের বাইরে না গেলেও, যেটুকু জানি তাতে এ কথা জোর করে বলা যায়।

মার্লিন বলল, আমরা সব বিষয়ে সকলের চেয়ে বড়—ইংল্যাণ্ডের লোকের মনে এই যে একটা আত্মগৌরব—আমি কেমন যেন সইতে পারি না।

একটু হেসে মার্লিনকে বললাম, তা তুমিও ত ইংল্যাণ্ডেরই মেয়ে

মার্লিন বলল, আপাততঃ তাই বটে। কিন্তু আসলে আমি স্পেনবাসিনী।

অবাক হয়ে শুধালাম, কি রকম?

মার্লিনের মা বললেন, মার্লিনের পিতামহ স্পেনেরই লোক ছিলেন। তিনি স্পেন ছেড়ে এদেশে এসে বসবাস সুরু করলেন তখন মার্লিনের বাবার বয়স ষোল-সতের হবে। তাই স্পেনের রক্ত ওর শরীরে রয়েছে।

মঙ্কটন বোধ হয় মনে মনে একটু রেগে ছিল, বলল, সেটা কিছু বিশেষ গর্ব্বের বিষয় নয়। খাঁটি ইংল্যাণ্ডের রক্তের আভিজাত্য আলাদা।

মার্লিন যেন ফোঁস করে উঠল—বলল, এই আভিজাত্যের গর্ব্বেই তোমরা সকলের চেয়ে ছোট। তাই ত আমি তোমাদের কাছ থেকে নিজের স্বাতন্ত্র্যটুকু বজায় রাখতে চাই। মা, আমার ত মনে হয় এই ইংরেজী অনুকরণে ফ্রেজার নাম ছেড়ে দিয়ে আমাদের আদি নাম ফেরেজ আমাদের আবার নেওয়া উচিত।

কেন জানি না, মার্লিনের ইংল্যাণ্ডের প্রতি এই মনোভাবটা আমার ভালই লাগল। এর পিছনে যে একটি বিশেষ কারণও ছিল—সেটা অবশ্য টের পেয়েছিলাম, অনেক অনেক পরে।

মার্লিনের মা বললেন, তোর মামাবাড়ীর দিকটা একেবারে ভুলে গেলি?

মার্লিন বলল, ভুলিনি ত। সেইখানেই ত আমার গর্ব। আমি বিশেষ করে কোন দেশেরই নই, হতেও চাই না। আমি জগতের মেয়ে।

বুলা। কথাটা আজও আমার কানে বাজে। আজও মনে আছে মুগ্ধ হয়ে মার্লিনের মুখের দিকে চেয়েছিলাম। দেখেছিলাম, উজ্জ্বল গোলাপী মুখখানি একটু উত্তেজনার রক্তিমাভায় প্রভাত-সূর্য্যের মতন দীপ্ত হয়ে উঠেছিল।

• • • •

চা খাওয়ার পর্ব শেষ হল। মার্লিন চা-এর সরঞ্জাম গুছিয়ে নিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করার জন্ম ঘর থেকে গেল চলে। টমও উঠে হাতে হাতে মার্লিনকে সাহায্য করে, মার্লিনের সঙ্গেই বেরিয়ে গেল। মফটনও একটু গম্ভীর হয়ে বসে থেকে ঘর থেকে চলে গেল—বোধ হয় মার্লিনের কাজে মার্লিনকে সাহায্য করার জন্ম। আমি ও মার্লিনের মা বসে কথাবার্ত্তা বলতে লাগলাম।

কথায় কথায় মার্লিনের মা বলেছিলেন, মনে আছে—বা অভিমানী মেয়ে আমার, জীবনে সুখী হবে কি না কে জানে! আমি ত মা—আমি জানি ওর মূল্য সাধারণ মেয়েদের চেয়ে অনেক বেশী। ওর যথার্থ মূল্য দিয়ে, বুঝে জীবনে চলতে পারে—এমন লোক কি ওর অদৃষ্টে জুটবে?

ক্রমে মার্লিনরা ফিরে এলো। মফটন এসে বসল চেয়ারে। মার্লিন, পোষাকের উপর একটি সাদা এপ্রোণ জড়িয়ে পাশের সাইডবোর্ডের দিকে মুখ করে চা-এর বাসন পুঁছে সাজিয়ে রাখতে লাগল—টম পাশে দাঁড়িয়ে একটি একটি করে দিচ্ছিল এগিয়ে।

মার্লিনের মা কথায় কথায় আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, দেশে বাপ-মা বেঁচে আছেন?

বললাম, মা মারা গেছেন—বাবা এখনও বেঁচে।

বললেন, এতদূরে চলে এসেছ—তাঁর নিশ্চয়ই তোমার জন্ম খুব মন কেমন করে?

একটু হেসে বললাম, সেটা ত স্বাভাবিক।

শুধালেন, তোমার ভাই-বোন নেই?

বললাম, হ্যাঁ, এক ভাই এবং এক বোন আছেন।

শুধালেন, তারা বাপের কাছেই থাকে ত?

বললাম, হ্যাঁ।

এইবার মনে মনে একটু অস্বস্তি অনুভব করতে লাগলাম। স্ত্রীর কথা বলতে আমার আপত্তি ছিল না, কিন্তু এই ভাবে মার্লিনের মাকে প্রথম বলতে আমি চাই নি। মার্লিনকে একটু নিরিবিলি পেয়ে—হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, দেশে কে কে আছে?

আর ত না বলা চলে না।

একটু জোরের সঙ্গে বললাম, ভাই-এর স্ত্রী আছেন এবং আমারও স্ত্রী আছেন।

হঠাৎ মার্লিনের দিক থেকে একটা সজোর চমকে-ওঠা দীর্ঘশ্বাস শুনে সবাই মার্লিনের দিকে চাইলাম।

মা শুধালেন, কি হল মার্লি?

মার্লিন মুখ না ফিরিয়েই বলল, কিছু না মা! প্লেটটা হাত থেকে পড়ে যাচ্ছিল—সামলে নিয়েছি।

আমার মনটাও উঠল কেঁপে—এই কি সমাপ্তির দীর্ঘনিঃশ্বাস?

[ক্রমশঃ।

সন্ধ্যাবেলা

দ্বিজেন চৌধুরী

এখনো সন্ধ্যা আসে
দু'টি তারা আকাশে জ্বালানো
বাতাসে ছড়ানো মিঠে
নিরিবিলি বিশ্রামের ভ্রাণ।
ইছামতী ছলোছলো ঢেউয়ে
এখনো সামান্য আলো
ঝিম্ ঝিম্ ভাবেই বিভোর।
এমনি সন্ধ্যাবেলা
ভুলে গিয়ে জীবন-জগৎ
বসা যায় মধুমতী নদীর কিনারে,
দেখা যায় নির্জ্জন গ্রামের ঘাট
একান্ত একলা মনে।

নদীর ওপারে যদি তাকাই কখনো
ধীরে ধীরে জ্বলে ওঠে বাতি
গাছপালা ছায়ার আড়ালে
দু-'চারটে ছোট-বড় জোনাকির মত।
এ পারে মেয়েলি ফুঁয়ে শঙ্খ বেজে ওঠা
চমৎকার নিরালা সময়।
গ্রামের ওধার থেকে
টানা-টানা দরাজ গলায়
কাঁপা কণ্ঠে আজান শোনায়
ধার্মিক মৌলবী লোক!
গরু নিয়ে ঘরে-ফেরা গ্রামের রাখাল
মেঠো সুরে মেঠো গান গায়।

এ সব ভেবেই শুধু মনে হবে যেন
এই মাঠ মাটির দেশেই
সন্ধ্যা আসে এলোমেলো রূপকথা নিয়ে
মুছে দিয়ে সোণা যায়
ঝরঝরে হাসির প্রলেপে।

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

ডক্টর এক্স

আগষ্ট উনিশ শো বেয়াল্লিশ। ভারত-ইতিহাসের এই স্মরণীয় সময়ে, মহাত্মা গান্ধীর ছোট দু'টি কথা 'ভারত ছাড়', দেশব্যাপী অসন্তোষের বহ্নিতে যেন নূতন করে ইন্ধন দিয়েছে।

দেশের লোকের পুঞ্জীভূত বেদনা, ঘৃণা, অসহায়ত্বের ছবি যেন ঐন্দ্রজালিকের স্পর্শে বদলে গিয়েছে। ভারতের প্রতি দিকে ছড়িয়ে যাওয়া এই আন্দোলনের স্পর্শ মেডিকেল কলেজেও দোলা দিয়েছে।

নেতা নেই, পথনির্দ্দেশের কেউ নেই, তবু কি এক অজানা প্রেরণায়, কলেজের ছেলেরা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে গ্রামে গ্রামে গিয়ে বিপ্লবের বাণী ছড়িয়ে দিতে আরম্ভ করেছে।

গতানুগতিক জীবন, সময়ের কথা, নিজের ভবিষ্যৎ সব ভুলে অন্য ছেলেদের সঙ্গে কমলকেও এ সর্ব্বগ্রাসী আহবে ঝাঁপ দিতে হয়েছে।

যে বিপ্লব কেবলমাত্র শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, তাকে জনসাধারণের মধ্যে এরাই প্রসারিত করতে চেষ্টা করছে। শিক্ষিত সম্প্রদায় বিপ্লবের স্ফুলিঙ্গ—জনসাধারণ ইন্ধন। যুগে যুগে বিপ্লবের এই একই ছবি!

আগষ্ট মাস শেষ হতে চলেছে। একটি ছোট দলের সঙ্গে কমল হষ্টেলে ফিরছিল। যতদূর দৃষ্টি যায় সব নির্জ্জন। ছোট ছেলেদেরও আর কোথাও খেলা করতে দেখা যাচ্ছে না। দেশব্যাপী বিপ্লবের ছায়ায় তাদের শিশু-মনও যেন আতঙ্কে কুঁকড়ে গেছে।

পিপুল গাছের নীচে, মেয়েদের কলহাস্য-মুখরিত, রাখালের বাঁশীর সুরে প্লাবিত স্থান আজ নিস্তব্ধ, জনহীন!

মানব-মনের সহজ আনন্দ, উচ্ছ্বাসের মূল্যে, এমনি করেই বোধ হয় রক্তরাঙা বিপ্লবের দাম দিতে হয়।

জীর্ণ কুঁড়ের সামনে বসে চাষীরা তামাক খাচ্ছে। তাদের দেখলে মনে হয়, চরম দারিদ্র্যের মধ্যেও তারা যেন এক অদ্ভুত শান্তিতে বেঁচে আছে। কোন কিছুই এমন কি মৃত্যুভয়ও যেন তাদের এ নির্লিপ্ততায় দাগ কাটতে পারবে না!

কোটি কোটি নিপীড়িত মানুষের যা শেষ আশ্রয় সেই ভাগ্যকে আশ্রয় করে তারা যেন চিরদিনের মত নির্ব্বিকার হয়ে গেছে।

এদেরই উত্তেজিত করবার জন্য, স্বাধীনতা-সংগ্রামের অর্থ এদেরই বোঝাবার জন্য কমলরা এই কয় দিন গ্রামে ঘুরে বেড়িয়েছে। কিন্তু কি ফল তারা পেয়েছে?

কিছুক্ষণ আগেই একটা গ্রামে কয়েক জন লোক তাদের কথা বলাবলি করছিল।

একজন বলছিল—তোরাও যেমন, লড়াই করতে হবে না আরো কিছু। বাবুদের সখ হয়েছে, তাই আমাদের নিয়ে মজা করতে এসেছে। এত দিন আমরা কষ্ট পেয়েছি। আমাদের পেটে খাবার নেই, পরনে কাপড় নেই, কই, এ-সব দেখতে আসবার কথা তো বাবুদের একবারও মনে পড়েনি?

আর একজন উত্তর দিয়েছিল—ঠিক বলেছিস, জরু-বেটি সামলে রাখিস, বাবুদের মতলব ভাল বোঝা যাচ্ছে না।

এ-সব উক্তিতে কমলের মন ঘৃণায় জর্জ্জর হয়ে উঠলেও এর পেছনে যে নিষ্ঠুর সত্য ছিল, তাকে অস্বীকার করবার সাধ্য তার হয়নি। অন্য সকলের সঙ্গে নিঃশব্দে, বিনা প্রতিবাদে কমলকেও সেখান হতে চলে আসতে হয়েছিল।

বৃহৎ দুঃখের মুকুরে ক্ষুদ্র দুঃখকে প্রতিফলিত দেখলে তবেই তার যথার্থ রূপ বোঝা যায়। তাই আজকের এই গ্লানির পঙ্কে স্নান করে এত দিন পরে কমল আপনার দুঃখকে ঠিক ভাবে অনুভব করতে পারল।

এক স্বাধীন জাতি অন্য দেশ জয় করে, সেখানকার লোকের সমাজ-ব্যবস্থা, জীবনযাত্রা, সহজ বিশ্বাসকে সম্পূর্ণ নষ্ট করে তাকে এ ভাবে শোষণ করতে পারে! অন্যায়, অধর্ম্ম, নীচতা, হীনতায় তাকে এ ভাবে ভরে তুলতে পারে, স্বচক্ষে না দেখলে কমল কোন দিন বিশ্বাস করতে পারত না। তবু এই রূপই শেষ! এই সত্য বলে সে কিছুতেই মেনে নিতে পারল না। তার পায়ে চলার পথের প্রান্তে লোকজন, গাছপালা, কীট-পতঙ্গ, ক্ষুদ্র-বৃহৎ সকল কিছুকে উদ্দেশ্য করে সে বলতে লাগল—তোমরাই পল্লী, তোমরাই গ্রাম, তোমরাই দেশ। তোমাদের ঘিরে আজ যা আছে, তা মিথ্যা। এ মিথ্যার কাছে তোমরা কিছুতেই মাথা নত কোরো না। এ আবর্জ্জনার স্তূপকে দগ্ধ করে, যা ন্যায়, যা ধর্ম্ম, যা সুন্দর, আজকের বিপ্লব-বহ্নি এক দিন তাকে অগ্নিদগ্ধ স্বর্ণের মত নিশ্চয়ই প্রকাশ করবে। ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, কর্ম্মের পথে সেই শুভদিনকে তোমরা আহ্বান কর।

রেল-লাইনের পাশের পায়ে-চলার পথে কমলরা অনেকটা হেঁটেছে। এদিকের রেল-লাইনে এখনও পাহারা বসেনি, তাই কমলরা এ-পথে নির্ব্বিঘ্নে যাওয়া-আসা করতে পারছে। লাইনের ধারে টেলিগ্রাফ পোলের ইনসুলেটর রৌদ্রের আলোয় চক্ চক্ করছে। টেলিগ্রাফ লাইনের শেষে, ষ্টেশনের ছোট লাল ঘর বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ষ্টেশনের কাছের ক্যালভার্ট পার হয়ে নীচে নামলেই তারা হষ্টেলের পেছনে পৌঁছে যাবে।

কমলের পাশের ছেলেটি এ কয় মাইল পথ চলায় একটি কথাও বলেনি। সে-ও তারই মত মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে। পাশ করবার পর উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশা ছেড়ে সে এ সংগ্রামে এসেছে।

সে হয়ত ভাবছে যে, ক্ষণিকের উত্তেজনা তাকে আজ এ পথে টেনেছে। যাকে সে কিছুতেই নিজের মনে খাপ খাইয়ে নিতে পারছে না। যে উত্তেজনার নীচে চাপা যুগান্তরের সঞ্চিত গ্লানি সংশয়, ভয়—তাকে কেবলই পেছনে টানছে। সেই উত্তেজনা

ফুলের মত…
আপনার লাবণ্য রেক্সোনা
ব্যবহারে ফুটে উঠবে
Rexona
BLENDED WITH CADYL
রেক্সোনা সাবানে থাকে ক্যাডিল অর্থাৎ ত্বকের স্বাস্থ্যরক্ষাকারী কয়েকটি তেলের এক বিশেষ সংমিশ্রণ যা আপনার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যকে বিকশিত করে তোলে!
একমাত্র ক্যাডিলযুক্ত টয়লেট সাবান

কয় মুহূর্তই হয়ত ভবিষ্যতে তার জীবনযুদ্ধের সহস্র কুশ্রীতার মধ্যেও অম্লান ফুলের মত ফুটে থাকবে।

সে হয়ত ভাবছে, শুধু দেশের জন্ত, সংগ্রামের নয়, তার এ নীচতাকে জয় করার আপ্রাণ চেষ্টার মূল্যও সে হয়ত কোন দিন পাবে না কিন্তু তার এই চেষ্টার সত্যই চিরদিন তার নিজের কাছে, নিজেকে বড় করে রাখবে! এই পাওয়াই কি কম?

ষ্টেশনে একটি মিলিটারী ট্রেণ থেমেছে! মিলিটারী পুলিশের দৃষ্টি এড়িয়ে এক এক করে অতি সন্তর্পণে কমলরা ক্যালভার্ট পার হয়ে নীচে নামল।

নীচে একটি ছেলে দাঁড়িয়ে ছিল। কমলকে দেখে তার কাছে এসে সে বলল—সেন, আমি অনেকক্ষণ তোমার জন্ত এখানে ঘোরাঘুরি করছি। ইউনিভার্সিটিতে আজ পুলিশ ছেলেদের ওপর ব্যাটন আর গুলী চালিয়েছে। অনেকে আহত হয়েছে। তাদের দেখবার জন্ত এক্সট্রা ষ্টুডেণ্ট-এর প্রয়োজন হওয়ায় অনেক ছেলের সঙ্গে তোমার নামেও কলবুক এসেছিল। সকলে গেছে কিন্তু তুমি ছিলে না তাই আমরা মিথ্যা বলে কলবুক ফিরিয়ে দিয়েছি ছ'বার। এবার ফিরে গেলে তোমার নামে রিপোর্ট হবে। আমরা ধরা পড়ব, এত দিনের কাজ নষ্ট হবে। শীঘ্র চল তুমি। এখনও সময় আছে।

কোন কথা না বলে ছেলেটির সঙ্গে কমল হষ্টেলের দিকে দৌড়াতে আরম্ভ করল। হষ্টেলে যখন তারা পৌছাল তখনও তৃতীয় বার কলবুক আসেনি।

বিপ্লবের জীবন ক্ষণস্থায়ী। তাই অগাষ্ট বিপ্লবের দিনও সব বিপ্লবের মত একদিন শেষ হয়েছে। বর্ষচক্র, একবার আবর্ত্তিত হয়ে তার শেষ পদে পৌছেচে। ছাত্ররা পূর্ব্বেরই মত স্কুল কলেজে যাওয়া-আসা করছে। অগাষ্টের দিনের উত্তেজনার বাষ্পও আর কারো মধ্যে অবশিষ্ট নেই।

কলেজের বড় গেটের কাছে দাঁড়িয়ে কমল ছাত্রদের এক হাসপাতাল হতে অন্ত হাসপাতালে যাওয়া দেখছিল আর ভাবছিল, আজকের এই শান্ত নিরীহ ছেলের দলকে দেখলে কেউ বিশ্বাস করবে না যে একদিন এরাই রক্তরাঙ্গা বিপ্লবের পথে পা বাড়িয়েছিল।

কমলের মাথার উপর কয়েকটি পাতা ঝরে পড়ল। উপর দিকে তাকিয়ে সে দেখল, প্রায় নিষ্পত্র এই গাছের সবচেয়ে উঁচু ডালে একটা চিল এসে বসেছে। বর্ষবিদায়ের আর দেরী নেই, তাই নূতন সজ্জায় সজ্জিত হবার জন্য গাছের পুরান জীর্ণ পাতা এক এক করে ঝরে পড়ছে। পুরাতন বৎসরের বক্ষভেদ করে বার হওয়া স্থবির বৃদ্ধের দীর্ঘশ্বাসের মত উত্তপ্ত বায়ু, সেই পাতা পথের এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্তে সরিয়ে দিয়ে যেন মহাকালের পদক্ষেপের জন্ত পথ প্রস্তুত করছে। সমস্ত প্রকৃতিতে এক শ্মশান-বৈরাগ্যের ছায়া।

কমলের মনেও যেন এই নিষ্পৃহতার আভাস লাগছে। কিছুদিন আগে তাদের ফোর্থ ইয়ার ক্লাশ শেষ হয়েছে। এবার মেন্টাল হাসপাতালে কাজ করবার জন্ত তাদের আগ্রা যেতে হবে। আগ্রায় থাকবার সম্বন্ধে কয়েকটি বিষয় জানবার জন্ত কমল একজন পরিচিত লোকের কাছে গিয়েছিল। কথায় কথায় তিনি কমলকে বলেছিলেন, ইউনিভার্সিটির ম্যাথমেটিক্স ডিপার্টমেণ্টের একজন নূতন প্রফেসর এসেছেন, তাঁর সঙ্গে দেখা করলে হয়ত সমরের কিছু সুবিধা হতে পারে। তাঁরই কাছ হতে পরিচয়পত্র নিয়ে কমল সেই প্রফেসরের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে। সমরের রিসার্চের কিছু আভাস তাঁকে দিয়ে আসবে। আর দাঁড়ালে চলবে না। অবসাদ, নিষ্পৃহতা, দ্বিধা ত্যাগ করে বহুবারের মত আর একবার তাকে যেতে হবে—হয়ত—নিষ্ফলতারই দিকে! গত চার বছর এ ভাবেই কেটেছে কমলের। সমরের রিসার্চের কথা নিয়ে এ কয় বছরে সে কত জায়গায় গেল, কত রকম লোক দেখল!

কলেজের ক্লাশ কামাই করে, সে সব লোকের বাড়ী গিয়ে তাকে ভিক্ষুকের মত বসে থাকতে হয়েছে। তার উপযাচকতা অনেক সময় ভদ্রতার সীমা ছাড়িয়ে গেছে, তবু সে নিজেকে সম্বরণ করতে পারেনি। যাদের বাড়ী কমল গেছে, তাদের উপেক্ষা, অবহেলা, অপমান কমলের রক্তে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। সে অগ্নিকে শীতল করবার জন্ত, মনের প্রকৃতিস্থতা আনবার জন্ত বসবার চেয়ারে তাকে বারংবার মাথা ঠুকতে হয়েছে, তবু—তবু—সে ফিরে আসেনি।

চার বছর! দীর্ঘ এই সময় কমলের এক অধীর, উন্মত্ত আবেগের মধ্যে কেটেছে কিন্তু কোন অবহেলা, কোন অপমান, কোন কিছুই তাকে মাথা নত করে পরাজয় স্বীকার করাতে পারেনি। দুঃখ, কষ্ট, বিদ্রূপ, উপেক্ষা যত বেড়েছে ততই তার সঙ্কল্প দৃঢ় হতে দৃঢ়তর হয়েছে। তাই সম্ভাব্য নিষ্ফলতাকে সামনে রেখেও আজ সে এগিয়ে যেতে পারছে।

ছটা বেজে গেছে! আগ্রায় এবার ট্রেণ পৌছাবে। মেনটাল হাসপাতালে কাজ করবার জন্ত যত ছেলে হাসপাতালে যাচ্ছে, তাদের মধ্যে বেশীভাগই হোটেলে থাকবে। বাকী ছেলেদের কেউ থাকবে আত্মীয়ের বাড়ী, কেউ কোন পরিচিত লোকের আশ্রয় নেবে। এত ছেলের মধ্যে কেবল কমলেরই কোথাও থাকবার স্থান নেই। লক্ষ্ণৌতে অনেক চেষ্টা করে, অনেক সন্ধান নিয়েও কমল আগ্রায় কারও বাড়ীতে থাকবার জায়গার ব্যবস্থা করতে পারেনি। তবে তার চেষ্টার মধ্যে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় যে বস্তুর অভাব ছিল তা হচ্ছে অর্থ!

আগ্রায় দশ দিন থাকবার, খাবার খরচ ও রেলভাড়ার জন্ত কমল সত্তর টাকার বেশী জোগাড় করতে পারেনি।

নূতন বদলী হয়ে সমর আলিগড় গেছে, তাই সে এমাসে মাসিক খরচ ছাড়া কোন অতিরিক্ত অর্থ পাঠাতে পারেনি।

তাই আগ্রার খরচের জন্ত এক মাস সঞ্চয় করে কমল এই সত্তর টাকা মাত্র জোগাড় করেছে।

এ সঞ্চয়ের জন্ত কদর্য্যাহারের অন্তরালের কৃচ্ছসাধন দিয়ে তাকে বাইরের চাকচিক্যকে বজায় রাখতে হয়েছে। ধোপার খরচ বাঁচাবার জন্ত সে নিজের হাতে কাপড় কেচেছে। অসুস্থতার অজুহাতে আহার ব্যবস্থা সঙ্কীর্ণ করেছে। ক্ষুধার জালা যেদিন অপমানবোধকে ছাপিয়ে উঠেছে সেদিন কমল অযাচিত হয়ে কোন পরিচিত লোকের বাড়ী গিয়েছে। তাদের মুখ হতে খাবার নিমন্ত্রণের কথা শোনবার আশায় অনেক রাত্রি অবধি বসে থেকেছে।

এসব কথা ভাবতেও এক তীব্র বিবমিষায় তার শরীর অবসন্ন হয়ে উঠছে। পাশ হতে এক জন ছাত্র কমলকে ঠেলা দিয়ে

বললে—কি ভাবছ সেন? ট্রেণ তো অনেকক্ষণ প্ল্যাটফর্মে এসে দাঁড়িয়েছে, নামবে না?

অতিকষ্টে নিজেকে সংযত করে কমল উত্তর দিল—রাত্রি জেগে শরীরটা খারাপ লাগছিল। ও এখনই ঠিক হয়ে যাবে। এস নামি।

—কোন দিকে যাবে তুমি?

—ঠিক নেই।

—ঠিক নেই? তুমি কি এখনও কোন থাকবার জায়গা ঠিক করনি?

—না।

—তাহলে কি করবে? এখন তো কোন হোটেলে জায়গা পাবে না?

—একটা কিছু ঠিক করেই নেব। চল যাই।

আগ্রায় কমলের ক্লাশের আজ শেষ দিন। গত দশ দিন তাকে ধর্ম্মশালায় কাটাতে হয়েছে। এতে তার আগ্রায় থাকবার অসুবিধা মিটেছে কিন্তু নিজের দৈন্য গোপনের জন্য এ কয় দিন তাকে প্রায় চোরের মত আত্মগোপন করে থাকতে হয়েছে। আজ রাত্রে ট্রেণে চড়বার পর তার সব লজ্জা সব গোপনতার শেষ হবে।

বেলা দশটার সময় হাসপাতালে গিয়ে কমল তার নামে লক্ষ্ণৌ হতে রিডাইরেক্ট করা একটা চিঠি পেল।

লক্ষ্ণৌতে অঙ্কের যে প্রফেসরের সঙ্গে কমল কথা বলেছিল, এ চিঠি তাঁরই কাছ হতে এসেছে।

তিনি লিখেছেন, শীঘ্রই তাঁকে ইউরোপ যেতে হবে, তাই সমর যেন চিঠি পাবামাত্র একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করে। সমরের রিসার্চ সম্বন্ধে কমল তাঁকে যা বলেছিল তাই শুনে আর তার রিসার্চের সামারী পড়ে তিনি এ বিষয়ে সমরের সঙ্গে আলোচনা করবার জন্য উৎসুক হয়েছেন।

দেখা করবার একটা দিন ও সময় ঠিক করে দিয়ে তিনি জানিয়েছেন যে, ঐ সময়ে দেখা না করলে তাঁর সঙ্গে সমরের আর দেখা না-ও হতে পারে।

ভালই হল। আজই কমল আলিগড় যাবে। লক্ষ্ণৌ ফেরবার আগে সমরের সঙ্গে একবার তার দেখা করবার ইচ্ছা ছিল। এই সুযোগে দেখা করা, চিঠি দেওয়া দুই-ই হয়ে যাবে।

পকেট হতে ব্যাগ বার করে কমল দেখল, তাতে যে টাকা আছে সে টাকায় আগ্রা হতে আলিগড় বাসে যাওয়ার, আর আলিগড় হতে লক্ষ্ণৌ ট্রেণে ফেরবার খরচ কোনক্রমে হয়ে যাবে।

হাসপাতালের ক্লার্ককে জিজ্ঞাসা করে কমল জানল যে, আলিগড়ের বাস ছাড়বার আর এক ঘণ্টা মাত্র দেরী আছে।

কমল হিসাব করে দেখল যে, হাসপাতাল হতে ধর্ম্মশালায় ফিরে সেখানে তার সামান্য জিনিষপত্র গুছিয়ে নিয়ে বাসষ্ট্যাণ্ডে পৌঁছাতে প্রায় এক ঘণ্টাই লাগবে। ক্লার্ককে ছুটির জন্য বলে কমল তখনই ধর্ম্মশালার দিকে রওনা হল।

আগ্রা হতে হাতরাসে এসে যখন বাস থামল তখন বেলা প্রায় আড়াইটা বেজেছে। রাস্তে কিছু গোলমাল হওয়ায় পথে আলিগড়ে বাস ষ্ট্যাণ্ডে নেমে কমল ড্রাইভারকে সমরের বাড়ীর রাস্তার নাম বলে সেটা কোথায়, জিজ্ঞাসা করল।

পাশে এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়েছিলেন। কমলের কথা শুনে তিনি বললেন যে, তিনিও ঐ দিকেই যাবেন। কমল যদি তাঁর সঙ্গে যায়, তাহলে কমলকে তিনি ঠিক জায়গাতে নামিয়ে দেবেন।

তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে কমল তাঁর সঙ্গে টাঙ্গায় উঠল।

বিকাল হয়ে এসেছে, তবু রোদের তীব্রতা একটুও কমেনি। সমস্ত আলিগড় সহর যেন একটা ক্লান্ত পশুর মত থাবার মধ্যে মুখ লুকিয়ে ঝিমুচ্ছে। পথে লোক চলাচল প্রায় নেই। ছোট ছেলেরাও খেলা করতে রাস্তায় বের হয়নি।

সমরের বাড়ীর সামনে কমলকে নামিয়ে দিয়ে ভদ্রলোক চলে গেলেন। বাড়ীটা দোতলা। রাস্তার উপরের সিঁড়ি দিয়ে উঠে দরজা খুলতে গিয়ে কমল দেখল, দরজায় তালাবন্ধ।

সমর নিশ্চয়ই টুরে গেছে। ও টুরে না গেলে বাড়ীতে চাকর থাকত, দরজায় তালাবন্ধ থাকত না।

সর্ব্বনাশ হয়েছে! সমরের টুরে যাবার সম্ভাবনা তো একবারও তার মনে হয়নি? এরকম টুরে গেলে সমরের ফেরবার কোন ঠিক থাকে না। তার ফিরতে দু'-একদিন কিংবা পাঁচ-সাত দিনও হতে পারে, কিন্তু কমলের কাছে এ দুই-ই সমান। নিঃসহায়, নিঃসম্বল অবস্থায় এখানে সমরের অপেক্ষায় আর একদিনও বসে থাকা তার পক্ষে অসম্ভব। আজ রাত্রের ট্রেণে তাকে লক্ষ্ণৌ ফিরে যেতেই হবে। না হলে হয়ত ক্ষুধার তাড়নায় এখানে সে ভিক্ষা করতে বাধ্য হবে।

যে অসহ্য ক্ষুধার অগ্নি কমলকে এখন দগ্ধ করছে তাকে হয়ত কাল পর্য্যন্ত, লক্ষ্ণৌ পৌঁছান পর্য্যন্ত, কমল ঠেকিয়ে রাখতে পারবে। কিন্তু সমরের চিঠির এখন সে কি করবে? কি করে সমরের ঘরে সে চিঠি রেখে আসবে?

আজ যদি কমল সমরের ঘরে এ চিঠি রেখে আসতে না পারে তাহলে হয়ত তার এমন একটা ক্ষতি হবে যার জন্য তাদের চিরজীবন অনুতাপ করতে হবে।

সমরের সেই সম্ভাব্য ক্ষতির চিন্তায় কমলের মন ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হতে লাগল।

সাইকেলের সামনে ঝোলান ছোট টিনের সুটকেশে, সামান্য জিনিষপত্র নিয়ে সমর হয়ত এই রোদে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

দেরী হয়ে গেছে। বৃন্দাবনের কাছে অনেক লোক নেমে যাওয়ায় বাস খালি হয়ে গিয়েছিল। খালি গাড়ীতে আরাম করে বসে বাস-এর একঘেয়ে শব্দ শুনতে শুনতে কমলের ঘুম এসেছিল। এখন হাতরাস-হাতরাস আওয়াজে সে চমকে উঠল।

হাতরাস থেকে তাকে আলিগড়ের বাস ধরতে হবে। বাস এখনও আসেনি। বাসষ্ট্যাণ্ড একটি পুকুরের পাশে। গাড়ীর ঝাঁকানীতে কমলের শরীর আড়ষ্ট হয়ে উঠেছিল, তাই বাস হতে বার হয়ে সে পুকুরের পাশে এসে দাঁড়াল। পুকুরের জল কম, তাই ঘাটের ভাঙা সিঁড়ি অনেক নীচ পর্য্যন্ত দেখা যায়। বড় বড় গাছের ছায়া চারিদিক অন্ধকার করে রেখেছে।

একটা একটা করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে কমল ঘাটের শেষ ধাপে গিয়ে বসল। ঘাটে এখনও জনসমাগম হয়নি, তাই পুকুরের জল কাচের মত পরিষ্কার। এই জলে আপনার ছায়া দেখে কমলের

মনে হল, চারিদিকের আলো-আঁধারীর রাজ্য এ ছায়া যেন বিস্ময়কর ভাবে খাপ খেয়ে গেছে। জলের তলা হতে উপরের জগতের দিকে দৃষ্টিপাত করে এ ছায়া যেন আনন্দে হতচকিত, স্থির হয়ে আছে।

সেই আলো-ছায়ায় ঘেরা নিস্তব্ধ, নির্জ্জন স্থানে বসে থাকতে থাকতে কমলের মনে হল, পরম স্নেহে, সমাদরে, আহ্বান করে কেউ যেন তাকে বিবিধ বর্ণযুক্ত বুদ্বুদের মত সুন্দর এই অপূর্ব্ব ছায়াজগতের কেন্দ্রস্থলে নিয়ে এসেছে। মহাকালের প্রহরণও যেন আশা, আনন্দময় এই স্বপ্নজগৎকে ধ্বংস করতে এসে ব্যথায় স্তব্ধ হয়ে গেছে। মহাকাল অস্ত্র সংযত করেছে, তবু তার চরম আঘাতের প্রতীক্ষার উৎকণ্ঠায় এ জগৎ যেন অনন্তকাল কম্পিত হচ্ছে। সামান্ত শব্দে, বৃক্ষপত্রের মর্ম্মরে, সে কম্পন যেন এ জগতের অধিবাসীদের কাছে শেষ স্নেহ, শেষ আশার বাণী বহন করে আনছে। অনেক উপরে, বৃক্ষপত্রের মধ্য দিয়ে আসা সূর্য্যকিরণের প্রতি দৃষ্টিপাত করে কমলের মনে হল যে সৌন্দর্য্যমায়া তাকে মায়ের স্নেহে এ জগতের একজন করে নিয়েছে; তারই কৃষ্ণতার নয়নের স্নেহধারায় সে যেন সিঞ্চিত হচ্ছে।

সেই অনির্ব্বচনীয় স্নেহের স্পর্শে কমল যেন বর্ষাবারিস্নাতা তাপদগ্ধা ধরণীর মত সঞ্জীবিত হয়ে উঠল।

প্রথম বর্ষাদিনে বৃষ্টিতে স্নান করবার জন্ত ছোট ছেলে যেমন করে তার গাত্রবস্ত্র পরিত্যাগ করে, নিজের সমস্ত রুক্ষতা, মালিন্য, গ্লানি দূরে সরিয়ে কমল ঠিক তেমন করে এ আনন্দধারায় স্নান করতে লাগল।

মানুষের জীবনে এক একটা সময় বোধ হয় এমন করেই সামান্ত থেকে অসামান্ত হয়ে ওঠে।

ট্রাভেলিং এলাউন্স বাঁচাবার জন্ত এভাবে টুরে যাওয়াই তার অভ্যাস। এ কষ্ট সহ্য করে যে সামান্ত অর্থ সমর সঞ্চয় করে, তাও সে মাকে পাঠিয়ে দেয়। আজও এভাবে গ্রাম হতে গ্রামান্তরে যেতে যেতে সে হয়ত কমলের কথাই ভাবছে। কমলের চেষ্টা একদিন সফল হবেই। কমল একদিন তাকে এ নরক হতে নিশ্চয়ই উদ্ধার করবে, এই আশা হয়ত আজও তার মুমূর্ষু প্রতিভাকে বাঁচিয়ে রেখেছে! এ কথা মনে করে আর্ত্ত, কশাহত ভারবাহী পশুর মত কমল টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল।

রাস্তার অপর পারে জলের কলের দিকে চোখ পড়তে তার মনে পড়ল, তৃষ্ণায় তার তালু পর্য্যন্ত শুকিয়ে উঠেছে।

জল খেয়ে, কমল যখন আবার এদিকে এল তখন সে মন স্থির করেছে। চিঠিটা হাতে করে, দরজার পাশের রেণ পাইপে হেলান দিয়ে সে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

এই রেণপাইপ বেয়ে দোতলায় উঠে সে সমরের ঘরে চিঠি রেখে আসবে। কেবল চিঠিই কমল রাখবে না। সমরের ঘরে যদি দু-একটা টাকা পায় তাও সে নিয়ে আসবে। এ টাকায় আজ বহুদিন পরে সে পেটভরে সুখাদ্য খাবে। আশ্চর্য্য! ক্ষুধার জ্বালা এখনও সে ভোলেনি!

চিঠি রাখবার প্রেরণা ছাড়া আহারের প্রলোভনও কি তার এই দুঃসাহসিক কাজের একটা কারণ নয়? এ কাজ কি কমল নিজের আদর্শের জন্তই করতে যাচ্ছে? চিঠি সমরকে দেবার আর কোন উপায় কি সে করতে পারত না?

রেণপাইপটা জড়িয়ে ধরে কমলের মনে হল, এত দিনের সঞ্চিত যে জৈবিক প্রয়োজনকে সে অস্বীকার করতে চেয়েছিল, যে ক্ষুধাকে কমল আদর্শের আবরণে গোপন করতে চেয়েছিল, সে এখন যেন তারই পরাণ, আবরণমুক্ত হয়ে তার সামনে দাঁড়িয়ে বলছে—আমি আর তোমার দেওয়া আমার আদর্শের আবরণ দুই-ই সত্য। দুজনকেই স্বীকার করে নাও। এতে কোন লজ্জা, কোন পাপ নেই। ওঠ, ওপরে ওঠ।

মোহমুগ্ধের মত কমল পাইপ বেয়ে ওপরে উঠতে আরম্ভ করল। হাতের চামড়া ছিঁড়ে, গরম লোহার ছোঁয়ায় অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে। যতটা সে উঠেছে এখনও প্রায় ততটাই তাকে উঠতে হবে।

হাজার বছর পরে, এই পাইপ, এই বাড়ী, নিশ্চিহ্ন হয়ে হয়ত এখানে এক নূতন যুগের নূতন মানুষের সভ্যতা গড়ে উঠবে। সেই সভ্যতা, সেই সমাজ, তখনকার বৈজ্ঞানিকদের পেট ভরে দুবেলা খেতে দেবে। শান্তিতে আনন্দে তাদের মনের মত কাজ করতে দেবে।

কমলের আজকের এই উন্মত্ততার কথা সেদিন হয়ত কারও মনে থাকবে না কিন্তু সেদিনের পৃথিবী সর্ব্বকালের মহা বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে সমরের নাম স্মরণ করবে; এ যেন আজ কমল স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে।

দেশ কালের সীমা অতিক্রম করে সেই অনাগত দিন আজ যেন কমলের সুস্পষ্ট দৃষ্টির ক্ষেত্রে এসে দাঁড়িয়ে বলছে—তোমার যাত্রা শেষ হয়েছে।

ওঠ, একটু—আর একটু!

লক্ষ্ণৌ ষ্টেশন হতে কমল যখন হষ্টেলে নিজের ঘরে পৌঁছল, তখন ক্ষুধায়, ক্লান্তিতে তার শরীর ভেঙ্গে পড়তে চাইছে। জিনিষপত্র টাঙ্গা হতে নামিয়ে ঘরের দরজার কাছে রেখেই কমল তোয়ালে হাতে করে বাথরুমে চলে গেল। বহুক্ষণ ধরে স্নান করবার পর, মেসে গিয়ে এক পেয়ালা চা আর কিছু খাবার খেয়ে কমল যখন আবার ঘরে ফিরে এল, তখন তার শরীর অনেকটা সুস্থ হয়েছে। দরজার কাছে রাখা জিনিষপত্র সরাতে গিয়ে সেখানে পড়ে-থাকা একটা চিঠি এবারে তার নজরে পড়ল। চিঠিটা বোধ হয় সেই দিনই এসেছে, তাই হষ্টেলের ওয়ার্ডেন আর সেটা আগ্রায় রিডাইরেক্ট করেন নি।

চিঠিটা খুলে কমল দেখল, সেটা মিস সেন-এর কাছ হতে এসেছে।

তিনি লিখেছেন—চিত্রা লক্ষ্ণৌ যাচ্ছে। আগ্রা হতে ফিরেই ওর সঙ্গে দেখা কোরো।

চিত্রা তাদের পাশের বাড়ীর মেয়ে—বাল্যসঙ্গিনী। মিস সেন তাকে মেয়ের মত ভালবাসেন। লক্ষ্ণৌতে চিত্রার মামার বাড়ী। বছরে দু'-একবার চিত্রা এখানে বেড়াতে আসে। চিত্রা যখন লক্ষ্ণৌতে থাকে তখন কমলের দিন বড় আনন্দে কাটে।

জিনিষপত্র ঠিক করে রেখে জামা-কাপড় বদলে, চিত্রাদের বাড়ী যেতে কমলের একটু দেরী হয়ে গেল। চিত্রাদের বাড়ীর গেটে কমল যখন প্রবেশ করল তখন অন্ধকার হয়ে এসেছে। বাড়ীর

সামনের ছোট মাঠটা হতে ছেলের দল খেলা শেষ করে কোলাহল করতে করতে বাড়ী ফিরছে।

চিত্রা বাইরে লনে বসেছিল, কমলকে দেখে সে বলল—কমল, এত দেরী করে এলে কেন ভাই? দেখ, আমি এখানে এসে পর্য্যন্ত প্রত্যহ তোমার অপেক্ষায় এভাবে বসে থাকি। আগ্রা থেকে কবে ফিরলে? মাসীমার চিঠি পেয়েছ? এস ভেতরে, দেখ, মাসীমা তোমার জন্ত কত খাবার পাঠিয়েছেন। সব খাবার আমি মীরা আর মাসীমা তোমার জন্ত তৈরী করেছি। মেসে তো খেতে পাও না! ভাল কথা, আজ রাত্রে তুমি এখানে খেয়ে যেও।

কমল বলল: নিশ্চই খেয়ে যাব। হষ্টেলের অখাদ্য খেয়ে প্রাণ যাবার জোগাড় হয়েছে। তোমার কাছে খাবার নিমন্ত্রণ পেয়ে কি যে ভাল লাগছে, কি বলব! আর দেরীর কথা বলছ—দেরী করিনি তো? আগ্রা হতে ফিরে মা'র চিঠি পেয়েই তো এখানে চলে এসেছি। আগ্রা থেকে আজই তো ফিরলাম।

চিত্রা একটু দুষ্ট হাসি হেসে বলল—খুব ভাল কাজ করেছ। এস তোমাকে তোমার ভাল কাজের একটা সারপ্রাইজ দেব।

দুজনে ড্রয়িংরুমে ঢুকতে চিত্রা, কোণের অর্গানের কাছে বসা একটি মেয়েকে দেখিয়ে কমলকে বলল—দেখ তো, আমার এই বন্ধুকে চিনতে পার কি না?

কমলকে দেখে মেয়েটি উঠে দাঁড়িয়ে তাকে নমস্কার করে বলল—নমস্তে, মিষ্টার সেন! প্রতি-নমস্কার করে কমল ভাবতে লাগলো—কোথায় যেন সে এই মেয়েটিকে দেখেছে! ওর বাঁকা সীঁথি আর হাসি যেন বহুযুগের বিস্মৃত এক সুখস্বপ্ন স্মৃতির সীমানায় আসতে চেষ্টা করছে।

তার চিন্তার মধ্যে চিত্রা হেসে বললে—রমাকে চিনতে পারলে না?

ও যে রমলা খান্না। আমরা যখন স্কুলে পড়তাম ও আমাদের বাড়ীতে ব্যাডমিণ্টন খেলতে আসত, মনে নেই? আমরাই যে ওকে বাঙ্গালী সাজাবার জন্ত ওর নাম রমা রেখেছিলাম। তোমার কি কিছু মনে নেই?

এইবার কমলের মনে পড়েছে। অতীতের দিনগুলির ওপর থেকে বিস্মৃতির যবনিকা সরে গেছে। চিনতে পেরেছে কমল—বাল্যসঙ্গিনীকে।

একটু ইতস্তত করে কমল জিজ্ঞাসা করল—আপনি লক্ষ্ণৌতে থাকেন?

মেয়েটি উত্তর দিল—হ্যাঁ, আমি ইউনিভার্সিটিতে পড়ি।

—আশ্চর্য্য! আজ চার বছর আমি লক্ষ্ণৌতে আছি, আপনার সঙ্গে তো কখনও দেখা হয়নি?

—আমাদের বাড়ী এক দিন আসুন না? আমরা বার নম্বর ফৈজাবাদ রোডে থাকি।

—যাব এক দিন।

—ও রকম বললে চলবে না, খুব শীঘ্র আসতে হবে।

—তাড়াতাড়ি যেতে আমি বিশেষ চেষ্টা করব।

—ঘরে বড় গরম, আসুন বাইরে গিয়ে বসি।

—চলুন—আজ আমি মা'র হাতে তৈরী মিষ্টি আপনাকে খাইয়ে আপনার সঙ্গে নূতন করে পরিচয় করব।

চার দিন একটানা বৃষ্টির পর আজ জল থেমেছে। বর্ষার বর্ষণক্লান্ত আকাশ মেঘমুক্ত হয়েছে।

হষ্টেল হতে কলেজে যাওয়া আর ফিরে এসে হষ্টেলে চুপ করে বসে থাকা ছাড়া, এ কয় দিন কোন কাজ ছিল না। এই বিরক্তিকর নৈষ্কর্ম্যের পর তাই আজ কমল সন্ধ্যার সময়ের হাসপাতালের ক্লাশে না গিয়ে পায়ে হেঁটে বেড়াতে বার হল।

অন্যমনস্ক হয়ে চলতে চলতে সে যখন গোমতীর ব্রিজের এক কোণে তার প্রিয় বিশ্রামের স্থানে এসে পৌঁছাল, তখন সূর্য্যাস্ত হতে আর দেরী নেই।

আজ সমর তাকে চিঠিতে জানিয়েছে—ইউনিভার্সিটির যে প্রফেসরের সঙ্গে তার দেখা করাবার জন্ত কমল অত চেষ্টা করেছিল, সে চেষ্টা নিষ্ফল হয়েছে। টুর হতে ফিরে সমর যখন কমলের চিঠি পেয়েছিল, সে সময় তাদের কমিশনার আসায় সে কিছুতেই ছুটী পায়নি। নিরুপায় হয়ে সমর তার রিসার্চের একটা সামগ্রী লক্ষ্ণৌতে পাঠিয়ে দিয়েছিল। সেই সামগ্রী পড়ে, সমরের রিসার্চের বিষয়বস্তু প্রফেসরটি ভাল করে বুঝতেই পারেন নি। তিনি সমরকে জানিয়েছেন, সমরের রিসার্চ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু এত দুরূহ যে, এদেশের কোন প্রফেসরই যে তাকে এ বিষয়ে সাহায্য করতে পারবেন, এ তাঁর মনে হয় না।

এ বিষয়ে সাহায্য তাকে একজনই করতে পারেন, তিনি পৃথিবীখ্যাত বৈজ্ঞানিক, প্রফেসর ব্রেনষ্টিন। প্রফেসর ব্রেনষ্টিন-এর কাছে গিয়ে রিসার্চ করবার জন্ত তিনি উপদেশ দিয়েছেন। কিন্তু প্রফেসর ব্রেনষ্টিনের কাছে সমর কি করে যাবে? কোথা হতে সে আর্থিক সাহায্য পাবে? এ সব সম্বন্ধে তিনি কোন কথাই বলেন নি।

ব্রিজের তলায় তৃতীয় থামটার গায়ে ধাক্কা খেয়ে গোমতীর জল যেখানে ক্ষুব্ধ আক্রোশে ঘুরছিল সেখানে তাকিয়ে কমলের মনেও একটা কথা চক্রাকারে আবর্ত্তিত হতে লাগল—নিষ্ফলতা! নিষ্ফলতা! নিষ্ফলতা! কমলের চারি দিকেও নিষ্ফলতা ছাড়া যেন আর কিছুই নেই!

দূরে পিক্‌চার ও গ্যালারীর দিকটা অন্ধকারে অস্পষ্ট হয়ে আসছে। হষ্টেলে ফিরবার সময় হয়ে এল। কিন্তু হষ্টেলের কথা ভাবতেও আজ কমলের খারাপ লাগছে।

হষ্টেলের জনারণ্যের কোলাহল হতে কে তাকে উদ্ধার করবে? যে সঙ্গ, যে মমতা মানুষকে সব কষ্ট ভুলিয়ে দেয় সেই সঙ্গ, সেই মমতা আজ কার কাছে কমল পাবে? ক্লান্ত, অবসন্ন, নিরাশ মনের অন্ধকারে, পরিচিত অর্দ্ধপরিচিত, সকল নর-নারীর স্মৃতি অন্বেষণ করতে করতে একটি হাসিভরা উজ্জল মুখের ছবি সেখানে ভেসে উঠল। সে মুখ রমার।

রমার কথা মনে পড়ে কমলের ব্যথিত মন সান্ত্বনার প্রলেপে যেন সঞ্জীবিত হয়ে উঠল। কি জানি কেন কমলের মনে হল, রমাই যেন আজ তার শূন্য হৃদয়কে ভরে তুলবে। রমার সঙ্গে দেখা করবার জন্ত আজকের মত শুভদিন যেন আর তার জীবনে আসবে না। এক অদৃশ্য শক্তি যেন কমলকে গোমতীর ব্রিজ হতে নামিয়ে ফৈজাবাদ রোডের দিকে আকর্ষণ করে নিয়ে গেল।

কমল যখন বাড়ী খুঁজে বার করে রমাদের বাড়ী পৌঁছাল, তখন আটটা বাজতে আর বেশী দেরী নেই। কলিংবেল টিপতে একটি ছেলে ভিতর হতে এসে কমলকে জিজ্ঞাসা করল, তার কি দরকার।

কমল তাকে বলল, সে রমার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

ড্রয়িংরুমে আলো জেলে তাকে সেখানে বসিয়ে ছেলেটি রমাকে ডাকতে গেল।

একটু পরে রমা এসে তাকে বলল—নমস্কার, আপনি আমার কথা মনে রেখেছেন দেখছি! খুব তাড়াতাড়ি এসেছেন তো?

অবাক হয়ে রমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে কমল উত্তর দিল—আপনি এত সুন্দর বাংলা বলতে পারেন? সেদিন তো আমার সঙ্গে হিন্দীতে কথা বলেছিলেন।

—আস্তে আস্তে বলতে পারি। বাংলা আমার খুব ভাল লাগে। তাই সুবিধা হলেই বাংলায় কথা বলি। চিত্রার কাছ হতে অনেক বাংলা বই আমি পড়েছি।

—এত ভাল বাংলা আপনার মুখে শুনব, এ আমি আশাও করিনি।

—যাই হোক, আপনি আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে এসেছেন, এজন্ত আমি আপনার কি খাতির করব বলুন তো?

—তাহলে সাহস করে আমার প্রার্থনা আপনাকে জানাতে পারি?

—নিশ্চয়ই!

—আপনি আজ হতে আমার সঙ্গে বাংলাতেই কথা বলবেন। আপনার মুখে বাংলা শুনতে আমার ভারী ভাল লাগবে। মনে হবে দেবী সরস্বতী যেন বাংলা ভাষার জন্মদান করে তাকে পালন করছেন।

—ঠাট্টা করছেন নাকি?

—না না, ঠাট্টা নয়, এ আমার মনের কথা। যাক্, আমি আপনাদের বাড়ী এসে, আপনাদের অসুবিধা করে যে পাপ করেছি, তার কি প্রায়শ্চিত্ত করব, এবার আমায় জানান।

—আপনি রোজ বিকালে এখানে ব্যাডমিণ্টন খেলতে আসবেন। আমরা এখনও ব্যাডমিণ্টন খেলি—ছোটবেলায় যেমন খেলতাম।

—প্রায়শ্চিত্ত যদি এ রকম হয়, তাহলে কিন্তু আমি ভরসা করে আরও অপরাধ করব।

—আমরাও খুসী হব। একটু বসুন, আমি আজ আপনাকে মিষ্টি খাওয়াব। সেদিন আপনি আমায় খাইয়েছিলেন, আজ আমার পালা।

—ঐটি আমায় মাপ করতে হবে। আজ আমার শরীরটা বিশেষ ভাল নেই, তা ছাড়া আজ আবার নাইট ডিউটি আছে। আপনি যদি অনুমতি করেন, তাহলে এখন যাই।

—কাল তাহলে নিশ্চয়ই আসবেন।

—ঠিক আসব। [ক্রমশঃ।

ভাবি এক, হয় আর

শ্রীদিলীপকুমার রায়

সতেরো

শুনে আমি ভয় পেয়েছি ব'লেই আপনাকে লিখছি খুলে। হয়েছে কি, ও শুধু যে সুন্দরী তাই নয়—বিষম ঝোঁকালো মেয়ে। তাই আমার মনে হয় না যে থিয়েটারের জীবনে ও নিজেকে সামলে চলতে পারবে—যদিও একথা শুনে ও রেগে টং। তাই আরো ও পরামর্শ নিতে যাবে ওর 'আংকল'-এর কাছে ; কেন না ওর বিশ্বাস যে তিনি ওকে বাধা দেবেন না। দেখা যাক আর্চি কি বলে। আমি মনে করি ওর বিবাহ করাই ভালো, নিরাপদ ব'লেও বটে, থিয়েটারী জীবনের চেয়ে বাঞ্ছনীয় ব'লেও বটে, অন্ততঃ ওর মতন স্বভাবের মেয়ের পক্ষে। সংসারেও বাগ মানতে পারে, কিন্তু থিয়েটারের অসংযত আবর্তে ও যে কোথায় ভেসে যাবে ভাবতেও গা কাঁপে। হ্যাঁ, একটা কথা চুপি চুপি ব'লে রাখি ভূমিকায় :—ওর সম্বন্ধে আপনাকে আমি আজ যে সব কথা লিখতে যাচ্ছি ওকে ঘুণাক্ষরেও বলবেন না, বলবেন না, বলবেন না, কেমন ? আর ওর সঙ্গে একটু সন্তর্পণেই মিশবেন। কেন আপনাকে প্রথমেই এ ভাবে সাবধান ক'রে দিতে বাধ্য হচ্ছি—ওর সঙ্গে একটু মিশলেই বুঝতে পারবেন।

পাছে আমাকে ভুল বোঝেন ব'লে এই সঙ্গেই ব'লে রাখি ও মেয়ে খারাপ নয়। স্বভাব ওর ভালো—খোলা-মেলা, প্যাঁচ নেই কোথাও। এর বেশি এখন না-ই বললাম—বিশেষ যখন নিশ্চয় জানি যে আপনাকে ওর যদি একবার ভালো লেগে যায় (এবং লাগবেও, এ বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই) তাহ'লে ও গল্ গল্ ক'রে ব'লে ফেলবে আপনাকে এমন সব কথা যা মেয়েরা সহজে বলে না। বহুভাষিণী ও স্বভাবে, যা কিছু মনে আসবে ঢাকাঢুকি না দিয়ে ব'লে ফেলে তবে ওর শান্তি। যাক্ এবার শুনুন বলি—যা বলবার জন্যে এত শত ভণিতা।

আর্চির স্ত্রীর একটি বোন ছিল, সিলভিয়া। সে আজ বিশ বৎসর আগে এক ফরাসী লম্পট কাউণ্ট পিনোর সঙ্গে প্রেমে প'ড়ে গৃহত্যাগ করে। পারিসে ওদের বিবাহ হয়।

বিবাহ সুখের হয়নি। কারণ কাউণ্ট রূপের দিক দিয়ে অসামান্য হ'লেও গুণের কোঠায় প্রায় শূন্য বললেও অত্যুক্তি হবে না। ধনী ছিলেন এক সময়ে, কিন্তু আজ প্রায় নিঃস্ব বললেই হয়। জুয়া, মদ ও মোহিনী এই তিনে মিলে ওঁর সর্বনাশ করেছে।

সিল্‌ভিয়া বিবাহ করার ছয় মাসের মধ্যেই টের পায় স্বামীর কীর্তি-কলাপ। বৎসর ঘুরতে না ঘুরতে পারিসে ওদের বাড়ি বাঁধা পড়ে। মদ খেয়ে এসে সময়ে সময়ে স্ত্রীর গায়ে হাত তুলতেও ওর বাধত না। এই দারুণ পরিবেশে রিতার জন্ম—একবার ভাবুন ওর অবস্থা। রিতা জন্মাবার বছর খানেক পরেই সিলভিয়ার মন ভেঙ্গে যায়। শেষে না পেরে একদিন বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করে। তারপর থেকে এত দিন আর্চিই রিতাকে পারিসের একটি বোর্ডিং-এ রেখে মানুষ ক'রে এসেছে সমস্ত খরচা দিয়ে। সম্প্রতি আরো অনেক কাণ্ড ঘটে, সে সব চিঠিতে লিখতে ইচ্ছেও করে না, লেখা ভালোও নয়। আর্চির মুখেই শুনবেন সব। মোট কথা এই যে, দিন দশেক আগে রিতার সঙ্গে কাউণ্টের বচসা হয় ওর মার গহনা নিয়ে। গহনাগুলি সিলভিয়া মৃত্যুশয্যায় আর্চিবল্ডের হাতে দেয়। পারিসের এক ব্যাঙ্কে আর্চিবল্ড সেগুলি রিতার নামে গচ্ছিত রাখে—প্রায় বিশ বৎসর আগে। ও নিজে ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর ব'লে পারিসের ব্যাঙ্কের কর্তার সঙ্গে ওর খাতির ছিল। ও তাঁকে বলে যে গহনাগুলি রিতা সাবালিকা হ'লে যেন তার হাতে দেয়, আর কারুর হাতেই নয়।

দিন দশেক আগে, রিতা বাইশে পা দিতেই কাউণ্ট ওকে বলেন গহনাগুলি ব্যাঙ্ক থেকে খালাস ক'রে নিয়ে তাঁকে ধার দিতে—টাকার তাঁর বিশেষ দরকার—বাঁধা দিয়ে রাতারাতি কিছু টাকা না তুললেই নয়। শুনে রিতা তৎক্ষণাৎ আর্চিকে টেলিফোন করে—ট্রাঙ্ক কলে। আর্চি ওকে উপদেশ দেয়—কালবিলম্ব না ক'রে গহনাগুলি নিয়ে সোজা ইংলণ্ডে চ'লে আসতে। রিতা ভরসা পেয়ে কাউণ্টকে বলে যে গহনা ও দেবে না। রাগে আগুন হ'য়ে কাউণ্ট ওকে চাবুক দিয়ে মারেন। পরদিনই ও ব্যাঙ্ক থেকে গহনা নিয়ে উড়ে এসে রিচমণ্ডে নামে, সেখান থেকে সোজা আমার এখানে। এ কয় দিনে ও অনেকটা সুস্থ হয়েছে বটে, কিন্তু ওর গলায় ও পিঠে চাবুকের দাগ এখনো মেলায় নি। সে দেখলে শিউরে উঠতে হয়—এমনি দাগ !

বুঝতেই পারছেন সে-মেয়ের কি দুঃখ, যার বাপ এ-হেন পাষণ্ড। সংসারে দুঃখ আছে তো কতরকমেরই—কিন্তু বাপকে সন্তান যখন ঘৃণা করতে বাধ্য হয় তখন সে যে কি দুঃখ—কিন্তু যাক এ সব কথা। এ সব ব'লে ফলই বা কি বলুন ? এবার শেষ করি ওর এখনকার জল্পনা-কল্পনার কথা কিছু ব'লে।

বলেছি ও সুন্দরী। বুদ্ধিও তীক্ষ্ণ। কিন্তু ও শুধু যে দারুণ ঝোঁকালো তাই নয়, তার উপর বিষম রাগী ও জেদী। বোধ হয় বাপের কাছ থেকেই পাওয়া উত্তরাধিকার-সূত্রে। তাই ওকে আমি বলি এখানকার গার্টন কলেজে পড়তে। ওর মার গহনা বেচলে দু-তিন হাজার পাউণ্ড পাবে। কাজেই ওকে একেবারে নিঃস্বও বলা যায় না। তাছাড়া আর্চি ও আমি দুজনে মিলে ওর কেম্বিজে পড়ার সব খরচই বহন করতে রাজি আছি। তাই ওর আর্থিক তেমন কোনো সমস্যা নেই, আপাততঃ।

কিন্তু ও গর্বী মেয়ে—চায় না সাবালিকা হবার পরেও কারুর গলগ্রহ হ'য়ে থাকতে। ও চায় এখনি রাতারাতি রোজগার করতে। কিন্তু শুধু টাকাই নয়, ও চায় নাম। থিয়েটারে বড় অভিনেত্রী হবার ওর বড় সাধ। এই নিয়ে ওর সঙ্গে এ কয় দিনে আমার বহু তর্কাতর্কি হয়েছে, কিন্তু ও কিছুতেই বাগ মানবে না, ফিরে ফিরে বলবে একই কথা : আণ্টি ! তুমি সেকেলে মানুষ—কী বুঝবে নব্যাদের উচ্চাশার মর্ম ?

আমি হেসে ওকে বলি : নব্যা উচ্চাশা না বুঝতে পারি, কিন্তু সনাতন বিপদ কা'কে বলে জানি তো !

কিন্তু থাক্ এসব বাজে কথা। ও দু-চার দিনের মধ্যেই ওখানে গিয়ে হাজির হবে। আপনাকে শুধু একটা অনুরোধ রইল, ওকে ওর 'উচ্চাশায়' ভুলেও আস্কারা দেবেন না। কারণ থিয়েটারে গেলে ও ডুববেই ডুববে। আশা করি, আর্চি আমার এ-কথায় সায় দেবে।

হ্যাঁ, শেষে বলি, আপনার সম্বন্ধে ওর সঙ্গে কি ধরণের আলোচনা হ'ল আজই।

আপনার কথা অবশ্য ওকে আগেই বলা ছিল। রিনা তো এমন দিন যায় না, যেদিন আপনার কথা না তোলে। ওর—মানে রিতার—খুব পছন্দ হয়েছে আপনার ফটোগ্রাফের চেহারা। কেবল বলত: দেখতে সুশ্রী—কিন্তু বড্ড ছেলেমানুষ, না আণ্টি ?

আমি হেসে বললাম: তোমার চেয়েও ?

ওর গাল দুটি রাঙা হ'য়ে উঠল, বলল: ঈশ! আমি যে পরিবেশের মধ্যে গ'ড়ে উঠেছি—সে তুমি বুঝবে না আণ্টি! বলো ওর কথা।

বললাম—যা যা জানি। এমনি সময়ে আপনার চিঠি এসে হাজির—আজই সকালে। ওকে পড়ে শোনালাম। ও বলল: লেখার বাঁধুনি আছে, মানতেই হবে, কিন্তু বেজায় সেণ্টিমেণ্টাল! তা দুঃখের মুখ দেখে নি তো—জানবে কোত্থেকে—সংসার কি বস্তু ? তাছাড়া ভারতবর্ষ তো এখনো প্রিমিটিভ অবস্থায় আছে। সেখানকার মানুষ কি বুঝবে জীবনের জটিলতা ? যাই হোক ওর চিঠির সরলতা দেখে হাসি পেলেও মিষ্টি মিষ্টি ব'লেই মিষ্টি লাগে বৈকি;' ভাবুন কি সাংঘাতিক পাকা মেয়ে! অথচ বয়স মাত্র একুশ—আপনার তো তেইশ, না ? তবু এমন ঢঙে কথা বলবে যেন ও আপনার দিদিমা! যাই হোক এ কথার উত্তরে ওকে কিছু বললাম না, ওর সঙ্গে একটু সাবধানে কথা কইতে হয় তো! যে মগচটা মেয়ে সামলানো এক দায়! জানি না ওকে কেমন লাগবে। কেবল একটি কথা বলবই—ও স্বভাবে ঝোঁকালো তথা রোখালো হ'লেও আদৌ নীচ কি কুটীল নয়। সরলতা দেখে হাসলেও ওকে সরলই বলব। অন্তত চাপা মেয়ে একেবারেই নয়। কথায় কথায় নাচে-গায়-হাসে। চঞ্চলা বৈ কি, কিন্তু দুঃশীলা নয়।

যাই হোক, ও খুব খুসী শুনে যে, আপনি গানকেই জীবিকা করবেন ঠিক করেছেন। কেবল বলল, একটু ক্ষুব্ধ সুরেই বৈকি: সুবিচার বটে;—ওকে তোমরা বললে অনিশ্চিতকে বরণ করতে, শুধু আমার বেলাই যত না-না-না-না! ব'লে আমাকে শাসিয়ে: তবে দেখো আণ্টি, আংকলকে আমি রাজি করাবই করাব, আর তখন হবে তোমার সাজা, দু-জনে মিলে একজোটে দেব তোমাকে দুয়ো। Vous etes impossible. (তোমাকে নিয়ে পারা ভার।)

ওর কথা শুনে হাসব না কাঁদব ভেবে পাইনে। কিন্তু আজ আর নয়। ও গেছে এখানে কোন এক থিয়েটারের কর্তার সঙ্গে আলাপ করতে। এখনি এলো ব'লে। কি জানি কি হবে ওর! থিয়েটার থিয়েটার ক'রে অস্থির। বলে কি জানেন ? বলে: সংসারে সত্যিকার সুখ পেয়েছে তারাই যারা দিনের পর দিন হাজার হাজার মানুষকে আনন্দ বিতরণ করে, যেমন মেরি পিকফোর্ড বা সারা বানার্ড বা ইসাডোরা ডানকান্—সার্থক জীবন এদেরি। কাল সকালে ও বলছিল ধন্য ইসাডোরা, সুখী ইসাডোরা! আমি আর থাকতে পারলাম না, বললাম: কে ধন্য আর কে অধন্য এ নিয়ে হয়ত মতভেদ থাকতে পারে, কিন্তু সুখী বলতে যা বোঝায় ইসাডোরা তা ছিলেন না—তাঁর নিজেরি এজাহারে। শোনো তবে। ব'লে আমার সেল্ফ থেকে ইসাডোরার আত্মজীবনী টেনে নিয়ে ওকে প'ড়ে শোনালাম তাঁর খেদ:

আমি অনেক বড় শিল্পী ও আপ্তকাম বুদ্ধিমন্তের খবর রাখি, কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনো মানুষকে দেখি নি যাকে বলা যেতে পারে সুখী—যদিও সুখী ব'লে কেউ কেউ বেশ ঢাক-পেটান বটে। মুখের এই মুখোশের পিছনে থাকেই থাকে সেই একই অস্বস্তি, বেদনা। তাই সময়ে সময়ে আমার মনে হয়—হয়ত এ জগতে স্থায়ী সুখ ব'লে কোনো জিনিষ নেই, আছে কেবল ক্ষণায়ু আনন্দ।

ওর মুখ চা-খড়ির মতন সাদা হ'য়ে গেল! একটু চুপ ক'রে থেকে হঠাৎ দুহাতে মুখ ঢেকে ভেঙ্গে পড়ল চাপা কান্নায়। আমি ওকে সান্ত্বনা দিতে ওর পিঠে হাত রাখতে না রাখতে ও মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল, ওর ঘরে ঢুকে সশব্দে দোর দিয়ে চেঁচিয়ে বলল: আমাকে ডেকো না আণ্টি, আমি আজ কিছু খাব না।

আমি ওর ঘরের সামনে গিয়ে ওর দোরে টোকা মারতেই বলল ফের চেঁচিয়ে: সাউথেণ্ডে তার ক'রে দাও আমি কালই যাব আংকলের পরামর্শ নিতে। তিনি দরদী বুঝবেনই বুঝবেন। মেয়েরা কখনো মেয়েদের বন্ধু হয় না।

আপনার কাছে শেষ অনুরোধ—আপনি এ চিঠিটি আর্চিকে দেখাবেন। কারণ সে যদি আমার সঙ্গে সায় নাও দেয় তাহ'লে ও বুঝবেই বুঝবে কেন আমি রিতাকে থিয়েটারে যাওয়া থেকে ঠেকাতে চাই।

ভালো কথা, আপনার বন্ধু মিষ্টার সেন আমাকে একটি বড় সুন্দর চিঠি লিখেছেন। এ-ছুটিতে তিনি গেছেন বার্লিনে বেড়াতে। সেখান থেকে লিখেছেন: আমার এখানে আসার উদ্দেশ্য—এখানকার দুচার জন রাজনীতিকের সঙ্গে আলাপ করা আর এ আশ্চর্য জাতির গঠন নৈপুণ্যের পদ্ধতি সম্বন্ধে কিছু ভিতরকার খবর জোগাড় করা। এর বেশি তিনি লেখেন নি, যদিও তিনি জানেন যে আমিও চাই ভারতের স্বাধীনতা। সত্যি, আপনার এই বন্ধুটির দেশভক্তি ও ঐকান্তিকতা দেখলে আশ্চর্য না হ'য়ে পারা যায় না। মিষ্টার ঘোষ আমাকে কিছুদিন আগে একবার বলেছিলেন যে, বিলেতে এসে পর্য্যন্ত উনি—মানে মিষ্টার সেন—নাকি একটিও থিয়েটার কি সিনেমা দেখেন নি—প্রায় এক বৎসর হ'তে চলল। তরুণ বয়সেও আমোদ প্রমোদ না চেয়ে মনে প্রাণে শুধু দেশের মঙ্গল চিন্তা, এক ধ্যান, এক স্বপ্ন—কিসে দেশ স্বাধীন হবে—এ হেন দেশানুরাগের কথা ইতিহাসেও বেশি পড়েছি ব'লে মনে পড়ে না।

মিষ্টার ঘোষও মাসখানেক আগে একদিন কথায় কথায় আমাকে বলেছিলেন: কুকুমকে খানিকটা অমানুষই বলব—মানে, দেখতে মানুষ হ'লেও স্বভাবে বৈরাগী, তপস্বী।

আমাদের দেশেও আদর্শবাদী দেখা যায় বটে, কিন্তু দেশের জন্যে সব আমোদ প্রমোদ ছেড়ে সদাসর্বদা দেশের মঙ্গলচিন্তা করতে পারে এমন তরুণ তপস্বী অন্তত আমার তো চোখে পড়েনি। তাই আপনাকে রিতা উচ্ছ্বাসী বলে বলুক, আমি বলি সাধু, যেহেতু এহেন অসামান্য বন্ধুর প্রভাব আপনি সর্বান্তঃকরণে বরণ ক'রে নিয়েছেন। শ্রদ্ধা এযুগের যুগধর্ম নয়—একথা মেনে নিয়েই বলবই বলব যে, শ্রদ্ধা করবার

এই ঠাণ্ডা এবং স্নিগ্ধ স্নোটি আপনাকে সুরক্ষিত ও সতেজ রাখবে।

হিমালয় বোকে স্নো

HIMALAYA BOUQUET SNOW

হিমালয় বুকে স্নো

এই মোলায়েম সুগন্ধ পাউডারটি দিয়ে আপনার প্রসাধন সম্পূর্ণ করুন আর দেখুন আপনাকে দেখতে কত সুন্দর লাগছে।

হিমালয় বোকে টয়লেট পাউডার

Erasmic Himalaya Bouquet TOILET POWDER

MADE IN INDIA FOR ERASMIC LONDON

HBS. 14-X52 BG

এরাসমিক কোং লিঃ লণ্ডন এর পক্ষে হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড কর্তৃক ভারতে প্রস্তুত।

সহজ শক্তি যার আছে সেই ধন্য। কাল রিতা আমার মুখে এ কথা শুনে হেসে বলল: বলি নি আণ্টি, তুমি সেকেলে—ব্যাক্ নাম্বার? কারণ একেলেরা সবাই এক বাক্যে বলবে হিরো-ওয়র্শিপ হ'ল মিডীভাল—এযুগে মেকি টাকা—অচল।

আমি পাল্টে হেসে বললাম: যা কিছু একেলে তাই যদি খাঁটি সোনা হ'ত তাহ'লে তো বলতে হয় বলশেভিসমের ডগম্যাটিসমই ধন্য—যে বলে আমি যা বুঝেছি তাই ঠিক—যারা আমার মতে সায় দেন না তাদের লিকুইডেট করলে তবেই আসবে স্বর্গরাজ্য।

ও একটু কোণঠেশা হ'য়ে বলল: বলশেভিসম্ ভালো আমিও বলি না, কিন্তু তাই ব'লে মিষ্টার সেনের দেশ-দেশ ক'রে মেতে ওঠাকে আমি শ্রদ্ধা করতে পারি না। দেশের জন্যে সব আমোদ-প্রমোদকে ডিসমিশ করা—এর নাম তো পাগলামি—মনোম্যানিয়া! প্রকৃতির বিপক্ষে যাওয়ার ফল কখনোই শুভ হ'তে পারে না—ও হ'ল নিছক গোঁয়ারতুমি—ইত্যাদি।

সুতরাং বুঝছেন কি ধরণের ডাউনরাইট মেয়ে! সত্যি, ওর জন্যে বড় ভাবনা হয়। কারণ দোষ অনেক থাকলেও ওর তিনটি মস্ত গুণ আছে—সত্যনিষ্ঠা, সরলতা ও স্নেহ-প্রবণতা। তাই ওর আচরণে সময়ে সময়ে ক্ষুব্ধ হ'লেও ওকে ভালো না বেসেও পারি না।

দেখুন দেখি, কি মস্ত চিঠি হ'য়ে গেল! এ চিঠি প'ড়ে আর্চি কি বলে যদি একটু জানান তো খুব খুশী হই।

রিণা আপনার কথা অষ্ট-প্রহরই বলে। রিতার সঙ্গে ওর বাধেও মাঝে মাঝেই, রিতা ওকে কেবলই ক্যাপাবে আপনার ঠেশ দিয়ে কথা ব'লে। তারপর কথা-কাটাকাটি শুনতে ভারি মজা লাগে সময় সময়।

কিন্তু আজ আর নয়! মিষ্টার সেনের চিঠিরও আজই জবাব দিতে হবে, কারণ তিন চার দিন বাদে তিনি বার্লিন থেকে ম্যুনিক যাবেন লিখেছেন—জেনেরাল হিণ্ডেনবার্গের সঙ্গে আলাপ করার না কি সুযোগ হয়েছে। কি কাণ্ড! ছুটিতে সব ছেড়ে কি না এক অতিকায়, দুর্দ্ধর্ষ জেনেরালের পিছনে ধাওয়া করা! এ শুধু ওঁর পক্ষেই সম্ভব। ইতি—

আপনার শুভার্থিনী ইভেলিন নর্টন।"

আঠারো

পল্লবের রক্ত গরম হ'য়ে ওঠে। সেন্টিমেন্টাল—ছেলেমানুষ! কে? রিতা এমনই কি প্রবীণা শুনি? তাও যদি বয়সে দু বছরের ছোট না হ'ত! পল্লব সবচেয়ে আগুন হয়ে উঠল ওর কুস্কুমকে পাগল, মনোম্যানিয়াক বলার দরুণ। ভ্রূ কুঞ্চন করে নিজের মনেই বলল। এ দেশের বিলাসিনীরা কি বুঝবে পুণ্যভূমি ভারতের তরুণ তপস্বীর মর্ম। ঠিক করল—সুবিধে পেলেই রিতাকে সাফ শুনিয়ে দেবে বেশ দু কথা। যেমন কুকুর তেমনই তো হবে মুগুর। প্রথম দিকে রিতার সম্বন্ধে ওর মনে যেমন সহানুভূতি ঘনিয়ে এসেছিল শেষের দিকে ঠিক তেমনই বিমুখতা উঠল জেগে। অথচ সেই সঙ্গে একটা অনাম্না কৌতূহল—হয়ত তার চেয়েও কিছু বেশি—একটা অচিন প্রত্যাশা। সঙ্গে সঙ্গে একটু ভয় ভয়ও করে বৈ কি। কুস্কুম ওকে বার বারই বলত: আর যাই করো পল্লব, মনে রেখো এ দেশের আগুনের আঁচ আমাদের দেশের আগুনের চেয়েও বেশি, তাকে নিয়ে খেলা করতে যেয়ো না। মনে রেখো—তোমার কাছ থেকে শুধু তোমার বন্ধুরাই নয়—দেশও অনেক কিছু আশা করে। এদেশে এসেছি আমরা শিখতে—ফুর্ত্তি করতে নয়—দেখো না জাপানী ছাত্রদের নিষ্ঠা—এ বিষয়ে মোহনলালের সঙ্গে কুস্কুমের মতের মিল ছিল না, কারণ সে অবাধে বিদেশিনীদের সঙ্গে মিশত—যদিও সম্ভ্রম বজায় রেখে। বলত পল্লবকে প্রায়ই: কুস্কুম হ'ল স্বভাব-তপস্বী, ওর স্বধর্ম তোমার আমার পর ধর্ম, কাজেই ওর ধর্ম আমরা নিলে রাখতে পারব না কিছুতেই। পল্লবের মন এ কথায় সহজেই সায় দিত, অথচ আশ্চর্য এই যে অনিচ্ছাসত্ত্বেও কুস্কুমের কথা মেনে চলতেই বেশি ইচ্ছা হ'ত। দেখে শুনে মোহনলাল ওকে প্রায়ই ঠাট্টা ক'রে বলত। হিরো-ওয়র্শিপর! আজ রিতাও কিনা করল সেই কথারই প্রতিধ্বনি! ভাবতে ভাবতে ওর মন খারাপ হয়ে গেল।

হঠাৎ মনে পড়ল মোহনলালের চিঠির কথা। সাগ্রহে খাম ছিঁড়ে পড়া সুরু করল।

"ভাই পল্লব,

তোমার চিঠিতে জানলাম সব কথা। মিষ্টার টমাসের যুক্তিগুলি সত্যিই চমৎকার! তাই মনে হয়—গানকেই পেশা করবে স্থির করে তোমার ভুল হয় নি—তোমাকে সাবধানী হতে উপদেশ দিয়ে আমিই ভুল করেছিলাম। হয়েছে কি, আমি এ কয় বৎসরে অনেক কিছুই দেখে-শুনে একটু যেন উদ্ভ্রান্ত মতন হ'য়ে পড়েছি। কারণ আমি নিজের ক্ষেত্রে অনেক কিছু অভাবনীয় ক'রে টের পেয়েছি যে, আমরা নিজেদের যা ভাবি, আমরা ঠিক তা নই। কুস্কুমের কথা একটু আলাদা। ও ঠিক আমাদের কোঠায় পড়ে না। এমন কি, ওকে দেখে কখনো কখনো আমার এমনও মনে হয়েছে যে, ও হয়ত খানিকটা অতিমানবের কোঠায়ই পড়ে, কিম্বা তাদের অগ্রদূত। সময়ে সময়ে সত্যি বলছি, আমার কেমন যেন ভয় ভয় করে, ভাবি এ মানুষকে বন্ধু ব'লে দাবী করাটা হয়ত হঠকারিতার পর্যায়েই পড়ে যা! ও যেন এ-জগতে এসেছে একটা ব্রত উদ্‌যাপন করতে—মিশন নিয়ে। জানি না ও ঠিক কি বস্তু। কিন্তু তোমাকে চিনতে পারি, তাই হয়ত মনে হয় এত আপন। কুস্কুমের সঙ্গে যখন কথা কই, মনের তারগুলি কেমন যেন একটা উঁচু সুরে বাঁধা হ'য়ে যায় আপনা-আপনি। কিন্তু তার পরেই যে কে সেই—নেমে আসি নিজের ঘরোয়া নিচু সুরে। সময়ে সময়ে ভাবি আশ্চর্য হ'য়ে—কোন্‌টা আমার নিজের স্বরূপ? কুস্কুমের প্রভাবে প'ড়েই আমি আই-সি-এস ছেড়ে দিই, একথা সত্যি। কিন্তু ওর অনুকরণ ক'রে ওর সারূপ্য লাভ করার চেষ্টা দুরাশা। অগ্নিধর্মী মানুষ আর মৃত্তিকাধর্মী মানুষ, এ দুয়ের জাতই আলাদা নয় কি?

তোমাকে আমার দলে টেনে হয়ত ভুল করছি। হয়ত তুমি পারবে ওর সত্যিকার সতীর্থ না হোক, শিষ্য হ'তে। আমি পারব না, ভাবতে কষ্ট হয়। কারণ আমি স্বভাবে যাকে বলে রিয়ালিষ্ট—তোমাদের মতন আইডিয়ালিষ্ট তো নই ভাই। কিন্তু স্বভাব নিয়ে আক্ষেপ ক'রে ফল কি? যাই হোক, আমার সব কথায় সায় দিতে না পারলেও রাগ করো না—এই অনুরোধ রইল।

মিস্টার টমাসের কথা শুনে সত্যিই অনেক কিছু শিখেছি আমি। তোমার দৌলতে মিসেস নর্টনের সঙ্গে আলাপ ক'রেও কম লাভবান হইনি। তুমি সহজেই মানুষের স্নেহ আকর্ষণ করতে পারো—বেটা এমন কি কুসুমও পারে না। তোমার এ-গুণটি সম্বন্ধে কুসুমের সঙ্গে আমার নানা সময়ে নানা আলোচনাই হয়েছে। আমরা দু'জনেই তোমার সম্বন্ধে এ বিষয়ে একমত যে, তোমার স্বভাবের মধ্যে এমন একটা কিছু আছে, যার গুণে তুমি সহজেই নানা লোকের মনের অন্তঃপুরে ঢুকবার ছাড়পত্র পাও। কামনা করি—তোমার এ-গুণটি যেন দিনে দিনে বিকাশই লাভ করে।

তোমার একটা কথায় কেবল সঘনে আপত্তি করবই করব: তুমি কেন মিস্টার টমাসকে বললে যে, গানে তোমার প্রতিভা আছে কি না তুমি নিশ্চয় ক'রে জানো না? তোমার সঙ্গে যার একটুও আলাপ আছে, সেই এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ। দু' বৎসর বয়সেই তুমি তাল দিতে পারতে, পাঁচ বৎসর বয়সে গাইতে, আট বৎসর বয়সে তান দিতে, বার বৎসর বয়সে গ্রামোফোন থেকে বড় বড় গাইয়ের গান গলায় তুলতে। এ ছাড়া তোমার কণ্ঠ—আমরা প্রায়ই ঠাট্টা করে বলি: পল্লবের কণ্ঠে অলিকুল মিলেছে, কোকিলের মিষ্টতা প্লাস সিংহের হুঙ্কার। তোমার কেবল একটি মস্ত দোষ আছে—নিজের সম্বন্ধে বিশ্বাসের অভাব। মিষ্টার টমাস ঠিকই বলেছেন—তোমাকে এখন কিছুদিন উঠে প'ড়ে লাগতেই হবে ইচ্ছাশক্তির সাধনা করতে। না, তোমার সাঙ্গীতিক প্রতিভা সম্বন্ধে তোমার কয়েক জন শত্রুও আমাদের সঙ্গে একমত। কেবল তাঁরা বলেন—তুমি চিরদিনই থাকবে a volling stone that gathers no moss. এ কথা অপ্রমাণ করার দায় কিন্তু তোমারই। তুমি ভাই, গানে বড় হ'য়ে সঙ্গীতে অসাধ্য সাধন করো। তুমি একদিন বলেছিলে—তোমার যা টাকা আছে তাকে ভিত্তি ক'রে কলকাতায় সঙ্গীত আকাডেমি গ'ড়ে তুলবে। যদি তোলো, তবে আমি হব সে জমিদারির পাওা কৃষক। তুমি গাইবে গান, আমি যোগাব ধান। কুসুমকে একদিন একথা বলায় সে হেসে কাটিয়ে দিল।

ভালো কথা, কুসুম হঠাৎ বার্লিন চলে গেল—সোজা কেম্ব্রিজ থেকে। সেখান থেকে এক চিঠি লিখেছে কাল—ও দু-'চার দিনের মধ্যে ম্যুনিক যাচ্ছে—জেনেরাল হিণ্ডেনবার্গের সঙ্গে কি কথাবার্তা আছে। বাপ রে! ভাবো তো কাণ্ড—শাকচচ্চড়ি খেয়ে মানুষ যে বাঙালি সে কি না যায় হিণ্ডেনবার্গকে ইণ্টারভিউ করতে! তবে এও ও-ই পারে—যা ধরবে না করে তো ছাড়বে না! অতিমানব বলি কি ওকে সাধে?

তোমার চিঠিটা ওকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। তোমার সরল উচ্ছ্বাসে ও আনন্দ পাবেই পাবে। এই সরলতা যেন তুমি বজায় রেখে চলতে পারো ভাই! একটা কথা তোমাকে বলি অকপটে—আমি নিজেকে তোমার চেয়ে বিজ্ঞ মনে করি বটে অভিজ্ঞতার দিক দিয়ে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটুকু স্বীকার করবার মতন বিনয় আমার আছে যে, বিজ্ঞতার চেয়ে সরলতা বড়, সাবধানতার চেয়ে আদর্শবাদ। ইতি।

তোমার নিত্যশুভার্থী মোহনলাল।"

উনিশ

সেদিন রাতে মিষ্টার টমাস লণ্ডন থেকে ফিরে এলে পল্লব তাঁর হাতে মিসেস নর্টনের চিঠিটি দিল। মিসেস টমাস ও ছেলেমেয়েরা শুতে চ'লে গেলে লাইব্রেরী-ঘরে এসে বসে মিষ্টার টমাস চিঠিটা পড়ে একটু চুপ করে রইলেন। পরে বললেন: রিতা আমাকে পারিস থেকে টেলিফোন করেছিল যে, ইভেলিনের ওখানে ওর গহনাগুলি জিম্মা রেখেই আমার কাছে আসবে। বলে একটু থেমে: ইভেলিনের কাছে গিয়ে ও ভালোই করেছে, কারণ ঠিক এ সময়ে আমার ব্যাঙ্কের কাজের চাপ একটু বেশি পড়েছে, তাই আমি ওকে বেশি সময় দিতে পারতাম না। তাছাড়া ইভেলিন ওকে সত্যিই ভালোবাসে। আমার স্ত্রী ওর মাসি হলেও ইভেলিনই ওর মা। বলে ফের একটু থেমে আর এ সময়ে মেয়েরা চায় মাতৃস্নেহের মতন কিছু একটা আশ্রয়। আমরা হাজার হলেও পুরুষ মানুষ তো—স্নেহ করলেও প্রকাশ করতে বাধা পাই।

পল্লব বলল: কিন্তু আপনি তো ঠিক আর পাঁচ জনের মতন নন মিষ্টার টমাস! স্নেহশীল আপনি স্বভাবে। নৈলে কি স্ত্রীর বোনঝির জন্যে কেউ এত করে?

মিষ্টার টমাসের মুখে ফুটে উঠল বিষণ্ণ হাসি, বললেন: সিলভিয়াকে আমি নিজের বোনের চেয়ে একটুও কম ভালবাসিনি বাকচি, সত্যি বলছি। মানুষ সংসারে সম্পর্কটাই দেখে কিন্তু হৃদয় কেন যে কার দিকে ঝোঁকে সমাজ বা রক্তের সম্পর্ক তার কি জানে? ব'লে চুপ করে খানিক চেয়ে রইলেন গৃহচুল্লীর দিকে, পরে যেন
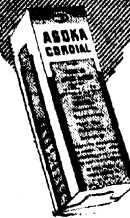
নিজের মনেই বললেন : আহা ! সে কি কষ্ট পেয়েই যে গেছে·· আর অমন মেয়ে—যেমন অপরূপ স্নেহে, পবিত্রতায় তেমনি অপরূপ দেখতে। ওকে দেখলে মনে হ'ত যেন ফুলের নির্যাস জমাট হ'য়ে মানুষের রূপ নিয়েছে।

পল্লব একটু চুপ ক'রে থেকে বলল মৃদুস্বরে : কিন্তু তিনি আত্মহত্যা করলেন কেন ? আপনার কাছে চ'লে এলেই তো পারতেন ?

মিষ্টার টমাস বললেন : সে-ও ঐ একই হৃদয়-রহস্য—কেন সিলভিয়া কাউন্টকে আঁকড়ে ধরে রইল—জেনে-শুনে যে সে লম্পট, নিষ্ঠুর, জুয়াড়ি, জালিয়াৎ—কার হৃদয় যে কখন কার দিকে ঝোঁকে কেউ কি জানে বাকচি ?

জালিয়াৎ ?

তবে শোনো বলি—যখন রিতা এল ব'লে। আমি না বললে হয়ত সেই বলবে, অথচ সে কতটুকুই বা জানে তার বাপের কীর্তি ? ব'লে একটু থেমে : সিলভিয়া কাউন্টের রূপমোহে পড়ে হঠাৎ পালিয়ে যায়—ওর মা'র কাছ থেকে পাওয়া গহনা আর বাপের কাছ থেকে পাওয়া হাজার তিনেক পাউণ্ড নিয়ে। তারপর সে অনেক কাণ্ড—একটু একটু ক'রেও টের পায় যে কাউন্ট দু'-তিনবার শুধু ঘুষ দিয়ে বেঁচে গেলেন, নৈলে যে হ'ত জেল—একবার একটি মেয়ের উপর অত্যাচার ক'রে, আর একবার এক বন্ধুর নাম সই জাল ক'রে। সে অনেক কাণ্ড, সব বলতে গেলে সারা রাতেও ফুরবে না। মোট কথা, সিলভিয়া বিয়ের বছরখানেকের মধ্যেই টের পায়—কাউন্টের কোনো গুণেই ঘাট নেই। আমাকে লেখে সব কথা। আমি ওকে বলি চ'লে আসতে, কিন্তু ও কিছুতেই কাউন্টকে ছেড়ে আসবার জোর পায় না—রিতা তখন সবে জন্মেছে। —এর প্রায় এক বৎসর পরে ও আমাকে লেখে যে আর সম্ভব নয় ও আত্মহত্যা করবে—কাউন্ট ব্যাঙ্কে ওর সব টাকা—প্রায় পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঙ্ক—ওর নাম সই জাল ক'রে বার ক'রে নিয়ে উধাও—আর ওর গহনার—যা ও অনেক কষ্টে লুকিয়ে রেখেছিল ব'লেই কাউন্ট হাতাতে পারেন নি।

আমি ভয় পেয়ে তৎক্ষণাৎ ছুটলাম পারিসে। ওর ভিলাতে পৌঁছতেই ডাক্তারের সঙ্গে দেখা। বললেন কোনো আশাই নেই। আমি যখন সিলভিয়ার শিয়রে গিয়ে দাঁড়ালাম তখন ওর ধনুষ্টঙ্কার হচ্ছে। অতি কষ্টে আমাকে বলল রিতাকে দেখতে আর বলল শেষে—রিতার গহনা—গহনা।

আমাকে ও চিঠিতে লিখেছিল গহনাগুলি কোথায় লুকিয়ে রেখেছে—ওর বাগানে কোন গাছের তলার মাটিতে পুঁতে। আমি ওর দেহান্তের সঙ্গে সঙ্গেই লুকিয়ে সেখান থেকে গহনার বাক্সটি নিয়ে জমা দিই রিতার নামে পারিসের এক ব্যাঙ্কে—যার ডিরেক্টর ছিলেন আমার বন্ধু। তাঁকে বলি, রিতা উনিশ বৎসর বাদে সাবালিকা হ'লে যেন এ-গহনার বাক্স তিনি তার হাতে দেন, আর কারুর হাতে নয়।

কাউন্ট সিলভিয়ার মৃত্যু সংবাদ পেয়েই আমার কাছে এসে দাবী করলেন ওর গহনা। আমি কোন উত্তর না দিয়ে আমার বাটলারকে তলব করে 'সোজা দোর দেখিয়ে দিলাম। কাউন্ট ভয় দেখিয়ে আমাকে চিঠি লিখলেন, বেনামিতে, যে দেবেন আমাকে সাজা। তার পরেই মহাপুরুষ ফের উধাও মন্টে কার্লোতে। আমি রিতাকে ভর্তি ক'রে দিলাম পারিসের এক বোর্ডিঙে। মহাপুরুষ লিখে পাঠালেন—তিনি এক পয়সাও দেবেন না মেয়ের জন্যে—যদি গহনা না ফেরৎ পান। আমি সে-চিঠির উত্তরে শুধু লিখলাম তথাস্তু, রিতার সব খরচ আমিই দেব। এই হল ওর কাহিনী সংক্ষেপে।

পল্লব একটু চুপ ক'রে থেকে বলল : রিতা জানে এ-সব কাহিনী ?

মিষ্টার টমাস ম্লান হাসলেন : এ কি আর চাপা থাকে ? বলে না—Murder will out ?—তবে দুঃখ এ নয় যে ও এ সব জানতে পেরেছে—দুঃখ এই যে, এর ফলে ও কেমন যেন একটু সিনিক মতন হ'য়ে পড়েছে। কিন্তু সেজন্যে ওকে দোষ দেবে কে ? আহা, বেচারা মেয়ে ! না জানল মার স্নেহ, না পারল বাপকে শ্রদ্ধা করতে। বলে একটু থেমে—তাই তো আরো ওর জন্যে আমাদের এত ভাবনা।

পল্লব কথা কইল না। ঘরের মধ্যে শুধু ঘড়ি করে টিক—টিক—টিক—

মিষ্টার টমাসই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করলেন : হ্যাঁ, ইভেলিন আমার মত জানতে চেয়েছে ওর থিয়েটারী জীবন নেওয়া সম্বন্ধে। তুমি লিখে দাও—আমিও পরে লিখব সময় পেলে—যে আমি তার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত।

কিন্তু ওর যদি মনে হয়, অভিনয়ই ওর লাইন—

ওকে নিরস্ত করতে হবে—যে ক'রে হোক। ব'লে একটু হেসে : কি জানো বাকচি ? All is not gold that glitters : থিয়েটারের জীবন বাইরে থেকে দেখতে উজ্জ্বল বটে, কিন্তু ভিতরে জমাট অন্ধকার। অবিশ্যি দু'-চারটে ব্যতিক্রম আছে—মানি। কিন্তু অধিকাংশ ভদ্রমেয়ের পক্ষেই রঙ্গমঞ্চের জীবন বর্জনীয় ব'লেই আমি মনে করি। না—শুধু নৈতিকতার যুক্তির দরুণই নয়—আমার আপত্তি আরো মূলগত। আমি দেখেছি, যারা দিনের পর দিন জীবিকার জন্যে অপরের চিত্তবিনোদন করতে বাধ্য হয়, তাদের মানসিক স্বাস্থ্যের দ্রুত অবনতি হয়। দিনের পর দিন হাজার হাজার দর্শকের মনোরঞ্জন করতে নাচ, গান, অভিনয়—এ কখনোই সুব্যবস্থা নয়, যদিও আমাদের সমাজের বহু শিল্পী ও গুণীকেই এই ভাবেই অন্নসংস্থান করতে হচ্ছে, সমাজের কোনো আমূল শোধন না হ'লে এ-ব্যবস্থাও বদলাতে পারে না। কাজেই এর বিরুদ্ধে আপত্তি করা নিষ্ফল। কিন্তু তবু ব্যক্তিগত দিক দিয়ে বলা চলে যে, যদি কোনো ভদ্রমেয়ে অন্য কোনো পথে জীবিকা উপার্জন করতে পারে কিম্বা বিবাহ ক'রে সংসার-ধর্মে মন বসাতে পারে—তবে তার পক্ষে রঙ্গমঞ্চের ছায়া মাড়ানোও আত্মহত্যার সামিল হবে—সব দিক দিয়েই। কেবল মুস্কিল এই বাকচি, যে, জেদের ভূত যখন ঘাড়ে চাপে তখন কুবুদ্ধিকেই মনে হয় সুবুদ্ধির পরাকাষ্ঠা। হ্যাঁ, তুমি ইভেলিনকে আরো একটু লিখে দিতে পারো যে, আমি প্রাণপণে চেষ্টা করব রিতাকে থিয়েটারী জীবন নেওয়া থেকে ঠেকাতে। এ ক্ষেত্রে আমি ইভেলিনের চেয়েও বেশি ভয় খাই—কারণ আমাদের দেশে সিনেমা থিয়েটার মিউসিক হল প্রভৃতির কর্মকর্তারা যে সুন্দরী নবাগতাদের 'পরে কি ভাবে চাপ দেন সে বিষয়ে আমি অনেক

ভিতরকার খবর জানি যা ইভেলিনের অজানা। কোনো ভালো পার্ট পেতে হ'লে তাদের রাজি হ'তে হয়—সব আগে থিয়েটারের কোনো কর্তার রক্ষিতা হ'তে। তাছাড়া রিতা শুধু সুন্দরী নয়, প্রাণশক্তি ওর অফুরন্ত—ওকে থিয়েটারের পাণ্ডারা তো লুফে নেবেন—আর তার মানে কি—তা তো বলেছি।

ঘরের মধ্যে খানিকক্ষণ নিশ্চুপ। পল্লব অস্বস্তি কাটাতে মোহনলালের চিঠির অবতারণা করল। মিষ্টার টমাস বললেন: নিশ্চয়, নিশ্চয়—এর আর কথা কি? তাঁকে লিখে দাও এক্ষুণি—চলে আসুন। তোমার বন্ধু কি আমাদেরও বন্ধু নন?

পল্লব আর্দ্র কণ্ঠে বলল: ধন্যবাদ মিষ্টার টমাস। মোহনলাল খুব মিশুক। তাছাড়া যেমন মিশুক তেম্নি উদার—আপনার সঙ্গে বনবে ভালো।

আর তোমার অন্য বন্ধুটি?—যার কথা ইভেলিন লিখেছেন—মিষ্টার সেন না?

পল্লব একটু কুণ্ঠিত সুরে বলে: তার সম্বন্ধে বেশি ভরসা দিতে বাধে। কারণ সে একটু—কি বলব—জানি না—তবে ঠিক সামাজিক মানুষ নয়। ভদ্র অবশ্য মনে-প্রাণে, কিন্তু লোক-লৌকিকতার খাতির একেবারেই রাখে না। কমনীয় হ'লেও নমনীয় নয়—আদৌ। যাকে ভালো লাগল তাকে মাথায় ক'রে রাখবে, স্নেহ দেবে উজাড় ক'রেই, কিন্তু যাকে ভালো লাগল না তার ছায়াও মাড়াবে না। তার এক লক্ষ্য—দেশের স্বাধীনতা। তাই—

মিষ্টার টমাস হেসে বললেন: ভরসা পাচ্ছ না? কিন্তু তা হ'লে আমাকে 'উদার' উপাধি দিলে কেমন ক'রে? যারা স্বভাবে স্বাধীন তারা কি যারা স্বাধীন হ'তে চায় তাদের প্রতি দরদী না হ'য়ে পারে? না না। তুমি অকুণ্ঠে লিখে দাও তোমার বন্ধুকে যে আমাদের মধ্যে বৃটিশ ইম্পিরিয়ালিষ্ট ব'লে যাঁরা নাম করেছেন তাঁদের দল পুষ্ট করি নি আমি কোনো দিনও। আর ঐ সঙ্গে লিখে দিও বিশেষ ক'রে যে তাঁর সঙ্গে আমি আলাপ করতে চাই সব আগে—যদি তিনি আমাদের এখানে দু-চার দিন কাটিয়ে যান তবে অত্যন্ত খুশি—

ক্রিং—ক্রিং—ক্রিং—

মিষ্টার টমাস চমকে উঠে বললেন: এত রাতে?

পল্লব উঠে দৌড়ে গিয়ে দোর খুলেই থমকে দাঁড়ায়। নির্মল আকাশে পূর্ণিমার চাঁদের আলোয় যা দেখল—কোন দিনই কি ভুলবে?

তরুণী সপ্রতিভ ভাবে হাত বাড়িয়ে বলল: ধন্যবাদ মিষ্টার বাকচি! আমি—রিতা পিনো। [ক্রমশঃ

একটি সনেট

(জন কীটস)

শহরে যে বহু দিন আবদ্ধ থাকে
তার কাছে ভালো লাগে নীলিম আকাশ—
ভালো লাগে পল্লীকে—তারই মধুরূপ
জাগায় হৃদয়ে তার নব-উল্লাস।

নদীর ঢেউ-এর মত তৃণ-শয্যায়
বসে যবে পাঠ করে পরম-পুলকে
প্রেমের কাব্য এক—তখন কি আহা
তার মত সুখী আর আছে এ ভূলোকে।

নগর-প্রাসাদে ফেরে ম্লান সন্ধ্যায়
দোয়েলের সুন্দর মধু-গান শুনে
চেয়ে চেয়ে শুধু চেয়ে সাদা মেঘ পানে
হৃদিতলে স্বপ্নের মায়াজাল বুনে।

'শিশিরের মত ঠিক কেন গেলো চলে
এত তাড়াতাড়ি দিন'—সখেদে সে বলে।

অনুবাদক—শ্রীমন্মথ দাশগুপ্ত
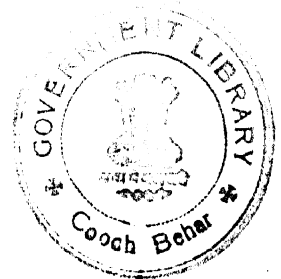
অপরূপা

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

শ্রীদ্বারেশচন্দ্র শর্ম্মাচার্য্য

অহিংস অসহযোগ! নূতন কথা, নূতন বাণী আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হচ্ছে। সঞ্জীবনী মন্ত্রে যেন উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল দেশটা। অভূতপূর্ব্ব সে দৃশ্য! গোলামীর শেকল কি তারা ছিঁড়তে পেরেছে? শত শত সুরথ আর নাজির প্রাণ দিয়েছে। হাজারে হাজারে তারা সব জেলে গিয়েছে। গোলামখানা কি ভেঙ্গে দিতে পেরেছে তারা? সাত সমুদ্র তের নদীর পারে ইংরেজের সিংহাসনে কি এর কোন কাঁপন লেগেছে?

সর্ব্বেশ্বর মাষ্টারের মনে কত প্রশ্ন জাগে। একে একে জেল থেকে ফিরছে সবাই। বেকারে বেকারে দেশ ভরে উঠেছে। কি আশ্চর্য্য! এত দিন কি এত লোক বেকার ছিল? তেত্রিশ কোটি ভারতবাসী আজ নিজেকে নিতান্ত অসহায়, নিতান্ত নিঃস্ব ভাবছে। কেন? কেন?—এরা কি সবাই গোলামী করত? না, না,—তা সত্যি নয়। গোলামীর মোহে আচ্ছন্ন ছিল এদের মন। নিজেদের নিঃস্ব অসহায় অবস্থার কথা এত দিন এরা ভাবতে পারে নি। অকর্ম্মাদের মধ্যে আজ জেগে উঠেছে কর্ম্মী মানুষ। এদের জন্ত কাজ চাই।

মিথ্যে নয়, মিথ্যে নয়। এত বড় সঞ্জীবন মন্ত্র যে দিতে পারে, তার কথা মিথ্যে হতে পারে না। দেশ স্বাধীন হয় নি বটে, কিন্তু স্বাধীন মানুষ জেগে উঠেছে। নিরস্ত্র সৈনিক তারা, বুক পেতে দেয় বন্দুকের গুলীর সামনে। মরবে তবু মারবে না। এরা এগিয়ে চলবে। এদের মধ্যে গোপন কিছুই নেই; এরা সত্যাশ্রয়ী সত্যাগ্রহী।

অহিংসমন্ত্র কাজ দিয়েছে। আপন মনে হেসে উঠেন সর্ব্বেশ্বর মাষ্টার। কর্ম্মী মানুষ জেগে উঠেছে; কাজ চাই কাজ। চরকায় সুতো কেটে আর খদ্দর বুনে কি কর্ম্মী মানুষ শান্ত থাকবে? তাদের অন্তরে যে হোমাগ্নি জ্বলে উঠেছে, এ হোমাগ্নির সমিধ জোগাবে কে?

'অহিংস-অসহযোগ'—বার বার কথাটা উচ্চারণ করেন সর্ব্বেশ্বর মাষ্টার। মনে পড়ে যায় পিছনে ফেলে-আসা দিনগুলি। একদিন তিনিও উন্মত্ত হয়েছিলেন। কিন্তু এ ভাবে নয়, এ মন্ত্রের গোপনতা নেই। কিন্তু সে মন্ত্র ছিল বড় গোপন। অহিংস নয় হিংসার নীতি ছিল তাতে; রক্তলোলুপ হয়ে উঠেছিল তাদের মন। নিজের হাত নিজে উলটে-পালটে দেখেন সর্ব্বেশ্বর মাষ্টার! এই হাতে, এই হাতেই কত গুলী ছুঁড়েছেন। নেতার আদেশে কর্ত্তব্যের খাতিরে দেশমাতৃকার স্বার্থে বিশ্বাসঘাতক সহকর্ম্মীকেও গুলী করতে হয়েছে! উঃ! কি ভয়াবহ, নির্ম্মম, নিষ্ঠুর সে কাজ! অথচ তা ব্যর্থ হয়ে গেল! কিন্তু এ নূতন মিছিল যে বন্ধ হবার নয়, ব্যর্থ হবার নয়!— দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছেন তিনি।

নূতন পরিবেশে, নূতন কাজে ব্রতী হয়েছিলেন তিনি। এই নূতন আন্দোলন আবার এক নূতন পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। মেতে উঠেছে সুজাতা। শুধু পাহাড়ীরা নয়, আশে-পাশের সকলেই তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। তাঁর আশ্রম আজ কর্ম্মমুখর হয়ে উঠেছে; যারা তাঁকে এড়িয়ে চলত; তাদের ছেলেমেয়েরাই তাঁর নেতৃত্ব মেনে নিয়েছে। মণীশ, অবিনাশ, সন্দীপ, নাজির ও শম্ভু আরো কত জন এসেছে। এক সুরথ গিয়েছে, তার বদলে এসেছে অনেকে! অভিভূত হয়ে পড়েন সর্ব্বেশ্বর। তাঁর জীবন যে বিচিত্র! কেউ তাঁর পরিচয় জানে না; নিজেই নিজের কথা ভুলে গেছেন সর্ব্বেশ্বর! স্মৃতি তাঁকে বিহ্বল করে তুলে। দূরে, বহু দূরে স্মৃতির যবনিকা ভেদ করে ছবির পর ছবি ভেসে উঠে।

তাঁর জীবনে পরিবর্ত্তন এনে দিয়েছে কে? আজ মনে পড়ে তাঁর বিপ্লবী মহেন্দ্র গুপ্তকে। আর মনে পড়ে আধপাগলা সাহেব রবার্টসনকে। হ্যাঁ, রবার্টসন! পাগল নয়, মহান্ আত্মা রবার্টসন! তাঁরই স্মৃতির আলেখ্য বহন করছে সুজাতা! আর, আর? নিজের বলতে যারা ছিল, তাদের কেউ কি বেঁচে নাই? তাদের যে কোন খোঁজই নেন নি সর্ব্বেশ্বর! নূতন জীবনে ভুলিয়ে রেখেছিল—রবার্টসন্ আর এক নারী,—লালিয়া।

কত কথা মনে পড়ে। অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছিলেন যুবক সর্ব্বেশ্বর। বি, এ, পরীক্ষা দিয়ে কলকাতা থেকে কি এক গোপন মন্ত্র নিয়ে পূর্ব্বাচলের দিকে যাত্রা করেছিলেন তিনি। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সে বিপ্লব যুগ। প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন সর্ব্বেশ্বর। দেশমাতৃকার নামে শপথ। আদেশ লঙ্ঘনে নিশ্চিত মৃত্যু। আবার আদেশ পালনেও মৃত্যুভয় আছে। তার উপর ধরা পড়লে আছে লাঞ্ছনা আর বর্ব্বরোচিত নির্য্যাতন।

ছদ্মবেশে, ছদ্মনামে কত ঘুরে বেড়িয়েছেন সর্ব্বেশ্বর। দিনের পর দিন পাহাড়ে জঙ্গলে কাটাতে হয়েছে। কোন দিন অন্ন জুটেছে, কোন দিন জুটে নাই। অনাহার, অনিদ্রা আর উৎকণ্ঠার মাঝে কেটে গেছে কত দিন। সশস্ত্র বিদ্রোহের আয়োজন চলেছিল দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত। যাঁদের সঙ্গে তিনি কাজ করতেন, তাঁদেরও সকলের পরিচয় জানতেন না সর্ব্বেশ্বর।

এরূপ গোপনীয়তা তিনি পছন্দ করতেন না। ভাল লাগত না এ রকম লুকোচুরি। তাঁর মনে হত, কেন লুকিয়ে থাকবেন তাঁরা? গ্রামের পর গ্রাম, শহরের পর শহর দখল করে যাবেন; কে বাধা দেবে? ক'টা সাহেব আছে এ দেশে? লুকিয়ে-চুরিয়ে বোমা ছুঁড়ে কি লাভ? বিদ্রোহী হয়ে উঠত তাঁর মন। তবু দলের কাজ, নেতার আদেশ তাঁকে নির্ব্বিচারে পালন করে যেতে হ'ত। ডিসিপ্লিন হ'ল আসল কথা।

কত পরীক্ষা দিতে হয়েছে সর্বেশ্বরকে। শুধু দুতিয়ালী করতে হয়েছে তিন বৎসর। নিজের ভবিষ্যৎ শিক্ষাদীক্ষার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের উপর যবনিকা ফেলে দিয়ে বনে-বাদাড়ে কাটিয়েছেন সর্বেশ্বর। মা-বাবা ছিলেন না, মামাই পড়াশোনার খরচ দিতেন। তাঁদেরও কোন খবর নেন নি সর্বেশ্বর। দেশমাতৃকার সেবাই তাঁর কাছে মহত্তর হয়ে উঠেছিল।

পাথারিয়া-পাহাড়ের দুর্গম অভ্যন্তরে ছিল পূর্বাচলের বিপ্লবীদের আড্ডা। না, না আড্ডা নয়, আশ্রম। বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠের কথা আজও মনে পড়ে সর্বেশ্বরের। সেই দুর্ভেদ্য অরণ্যের মধ্যে, গুহার মধ্যে কাটাতে হয়েছে অনেক দিন। দুর্গম অরণ্যের মধ্যে যে এত সুন্দর জায়গা থাকতে পারে, তা কোন দিন কেউ ভাবতেও পারে না। উঁচু পাহাড়ের গায়ের উপর হেলে পড়েছে আরেকটা পাহাড়; প্রকৃতির আচ্ছাদনীর মাঝখানে কালো পাথরের পাটাতনে বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে। এখানে যে জনমানব আছে বা থাকতে পারে, তার কাছে গেলেও কেউ বুঝতে পারে না।

পাথারিয়া-পাহাড়ের সেই দুর্গম অরণ্যেই সর্বেশ্বর অস্ত্রদীক্ষা পেয়েছিলেন। তাঁকে গুলী-ছোঁড়া শিখিয়েছিলেন মহেন্দ্র গুপ্ত। তাঁদের মহেন্দ্রদা'। সেই মহেন্দ্রদা'র পরিণাম চিন্তা করলেও এখনও গা শিউরে উঠে। অথচ মহেন্দ্রদা' নিজের পরিণাম নিজেই হাসিমুখে বরণ করে নিয়েছিলেন। নির্মম, নিষ্ঠুর মহেন্দ্রদা'র মধ্যেও যে হৃদয়বান্ মহাপুরুষ লুকিয়েছিলেন, তারও সন্ধান পেয়েছিলেন সর্বেশ্বর সেই শেষের দিনটিতে। সত্যই গুরুর উপযুক্ত যোগ্যতা ছিল তাঁর।

সেই নির্মম ভয়াবহ দিন। বিপ্লবী নেতারা ধরা পড়েছেন; কলকাতায় বিচার হচ্ছে। পাথারিয়ার জঙ্গলেও বসেছিল বিচার সভা। মহেন্দ্রদা'কে ঘিরে বসেছিল সর্বেশ্বরের মতই আটাশ জন যুবক। সকলেই সেদিন কিংকর্তব্যবিমূঢ়। তাদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে মহেন্দ্রদা'র কথার উপর।

মহেন্দ্রদা' বলেছিলেন,—আমি ভেবে দেখেছি বিজয়! এপথে আর কাজ হবে না। তোমরা ফিরে যাও সব। ভুলপথে চলে আর কোন লাভ নেই।

মহেন্দ্র গুপ্তের সঙ্গে তর্ক করেছিল বিজয় দত্ত। বিজয় উত্তর দিয়েছিল,—তাহলে কি করতে হবে আমাদের? আমরা দেশের কাছে বিশ্বাসঘাতক হব? আমাদের প্রতিজ্ঞা, আমাদের শপথ,—তার কি হবে?

মহেন্দ্রদা' বললেন,—কি আর হবে? দেশের সেবার কত পথ আছে। দেশের কুসংস্কার দূর কর, অজ্ঞ দেশবাসীদের মূর্খতা দূর করোগে।

বিজয় উত্তর দিলে,—আমাদের গায়ে যে ছাপ মারা আছে মহেন্দ্রদা'! আমরা কি পুলিশের হাতে ধরা দেবো?

মহেন্দ্রদা' শান্ত ভাবে বললেন,—না আমি তা বলছি না। ধরা দেবে কেন? সমাজসেবা ত মহৎ কাজ, তাতে কেউ বাধা দেবে না।

উত্তেজিত সুরে বিজয় উত্তর দিয়েছিল,—এ কি বলছেন মহেন্দ্রদা'! আপনি কি কিছুই জানেন না? আপনি আমাদের নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে চান? ফিরে যাবার উপায় কি আপনারা রেখেছেন?

প্রশান্ত হাসি ফুটে উঠে মহেন্দ্রদা'র মুখে। তিনি বললেন,—ওঃ! নিশ্চয়ই তার জন্ত আমরা দায়ী। অন্তের কথা জানি না। তার প্রায়শ্চিত্ত আমি নিজেই করব। কিন্তু ভেবে-চিন্তে কাজ করো বিজয়! আমার মনে হয়, এখনও ফিরে গেলে তেত্রিশ কোটি ভারতবাসীর মধ্যে সহজে মিশে যেতে পারবে তোমরা।

বিজয় বললে,—ভীরুর মত, কাপুরুষের মত আমাদের বেঁচে থাকতে বলছেন আপনি? না, না, এ হতে পারে না, মরতেই যখন হবে, তখন আমাদের শপথ আমরা ভাঙব না। নির্মূল করব ওদের। চা-বাগানে আমাদের কাজ আমরা শুরু করব। আমাদের অস্ত্র দিন মহেন্দ্রদা'!

মহেন্দ্রদা' তার উত্তরে বলেছিলেন—অস্ত্র? সে কখনও হতে পারে না বিজয়! চা-বাগানের দু'-চারটে সাহেবকে মেরে কি দেশ স্বাধীন হয়ে যাবে?

বিজয় বললে—সেই নির্দেশই এসেছিল আমাদের কাছে।

মহেন্দ্রদা' বললেন,—সে নির্দেশ আর কে দেবে বল? সবাই ত ধরা পড়ে গেছে। মস্ত বড় ভুল হয়ে গেছে বিজয়! এ সব কিশোর তরুণদের আর বিপথে চালাতে পারব না আমি।

বিজয় গর্জে উঠেছিল,—কি? কি বলছেন আপনি? এত দিন এ ধর্মজ্ঞান কোথায় ছিল আপনার? আমাদের সর্বনাশ করে বুঝি আপনি রেহাই পেতে চান? এ অবিচার আমরা মানব না মহেন্দ্রদা'! আপনার যা ইচ্ছা আপনি করুন। আমাদের কাজে আপনি বাধা দেবেন না।

মহেন্দ্রদা' বললেন,—বেশ, তাই হবে। কিন্তু আমার মনে হয়, এখানে থাকা আর নিরাপদ নয়। লুসাই পাহাড়ের পথে তোরা এখনই পালিয়ে যা।

বিজয় হুঙ্কার দিয়ে উঠল,—কেন? আমরা কি মরতে ভয় পাই মহেন্দ্রদা'?

উৎকণ্ঠার স্বরে মহেন্দ্রদা' বললেন,—না। তা-ও জানি বিজয়! কিন্তু মিছামিছি প্রাণ দিয়ে কি হবে? এখানকার সন্ধান পেয়েছে তারা।

উত্তেজিত বিজয় উত্তর দেয়,—এ আমি বিশ্বাস করি না মহেন্দ্রদা'! ছল-ছুতা ক'রে আপনি আমাদের তাড়িয়ে দিতে চান। এ আমি বুঝি।

মহেন্দ্রদা' হাসিমুখে বললেন,—বিশ্বাস করলি না? মনে রাখিস তোদের অনিষ্ট চিন্তা আমি কোন দিন করিনি, আর কোন দিন করবও না। আমার মনে হয়, পুলিশ বেড়াজাল পেতেছে। দক্ষিণের ওই পাথরকান্দির দিক দিয়ে তোরা লুসাই পাহাড়ের দিকে চলে যা। উত্তর, পশ্চিম কিংবা পূবদিকে গেলে বিপদ হবে।

বিজয় বললে,—আপনি দেখছি অন্তর্যামী হয়ে উঠেছেন মহেন্দ্রদা'! আশ্রম খুলে এখন থেকে গুরুগিরি করলেই আপনার কেটে যাবে। আমরা কিন্তু এ সব ভণ্ডামি করতে পারব না।

কথায় কথায় রাত অনেক হয়েছে। হঠাৎ সিটাং ছুটে এসে মহেন্দ্রদা'র কানে কানে কি বললে। মিশ্মি যুবক সিটাং।

খিকির আর হাজাংরাই সব খবর দেয়, তারাই আগলে রেখেছে এ পাহাড়ী আড্ডা।

মহেন্দ্রদা' বললেন,—তোরা পালা পুলিশ এসে পড়েছে ; সঙীন উঁচিয়ে আসছে গুর্খারা। এক্ষুণি পালা।

টর্চের আলো পড়তে লাগল পাহাড়ের গায়ে। বিজয় বললে, আমরা লড়াই করে মরব মহেন্দ্রদা'! গোলাঘর খুলে দিন ; রাইফেল নিয়ে আমরা দাঁড়াব।

তাই হবে ; তোরা পালা।—বলতে বলতে চক্ষের নিমেষে মহেন্দ্রদা' গোলাঘরে ঢুকলেন। তারপর সে কি ভীষণ আওয়াজ! গোলাঘরে আগুন দিয়েছেন মহেন্দ্রদা'। সঞ্চিত বোমা, বারুদের স্তূপে বিস্ফোরণ ঘটল ; আর মহেন্দ্রদা' তাঁর কথা রাখলেন। প্রায়শ্চিত্ত করলেন তিনি।

প্রায়শ্চিত্ত! প্রায়শ্চিত্ত! হতভম্বের মত আট-দশ জন যুবক দাঁড়িয়ে সে প্রায়শ্চিত্ত দেখতে পেল। বিজয় দত্ত বললে—বিশ্বাসঘাতক! দেশদ্রোহী!

এদিকে টর্চের তীব্র আলোক পড়ছে চারি দিক থেকে। একজন বলে উঠল,—সর্বনাশ বিজয়দা'! এখন কি হবে? মহেন্দ্রদা' ঠিকই বলেছিলেন।

বিজয় বললে,—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মিছামিছি মরতে পারব না। ছুটে চল সব ঐ দক্ষিণের পথে।

দিগ্বিদিক-জ্ঞানশূন্য হয়ে পালাল সব। জঙ্গলের পর জঙ্গল। উঁচু-নীচু পাহাড় ; ভীষণ সে পথ ; পা ফসকালে উপায় নেই। গুড়ুম-গুড়ুম আওয়াজ হচ্ছে পিছনের দিকে। ফিরে তাকালে সর্বনাশ! ভোরের দিকে অনেকটা নিশ্চিন্ত হল সবাই। কিন্তু এখন যাবে কোথায়? অনিশ্চিতের পথে যাত্রা শুরু হল।

মাঝে মাঝে পাহাড়ী বস্তী। কেউ কথা বুঝে না ; একসঙ্গে চললে বিপদ আছে। লোকে সন্দেহ করতে পারে। এক এক জন এক এক পথ ধরলে। সে বিদায়-দৃশ্য বড় করুণ! কেঁদে ফেলেছিল বিজয় দত্ত।

তারপর নিরুদ্দেশ যাত্রা। শ্রান্ত-ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন সর্বেশ্বর। পাহাড়ের উপর একটা গাছতলায় অচৈতন্য হয়ে পড়েছিলেন তিনি। কতক্ষণ, কতক্ষণ এরূপ ছিলেন তা বলতে পারেন না।

চোখ খুললেন সর্বেশ্বর। বিস্মিত হলেন তিনি। তাঁর চোখে-মুখে জলের ছাট দিচ্ছে এক সাহেব,—খাঁটি ইংরেজ! তবে কি পুলিশের হাতে পড়েছেন তিনি? কথা বলতে পারেন না ; সর্বাঙ্গে বেদনা ; হাত-পা নাড়তেও কষ্ট হচ্ছে। পিপাসায় বুক ফেটে যাচ্ছিল। অতি কষ্টে উচ্চারণ করলেন,—জল—জল ওয়াটার প্লিজ।

সাহেব ফ্লাস্ক খুলে জল ঢেলে দিলে সর্বেশ্বরের মুখে। শিকারীর বেশে সাহেব। পুলিশ নয় ; তবু বিশ্বাস নেই ওদের। শত্রুর জাত। নিশ্চয়ই ধরিয়ে দেবে।

সর্বেশ্বর ভাবেন ; ভয় কিসের? মহেন্দ্রদা' ত অভয়-মন্ত্র দিয়ে গেছেন। চোখের সামনে সে প্রায়শ্চিত্ত দেখেছেন সর্বেশ্বর। তাঁরও প্রায়শ্চিত্তের দরকার। নরহত্যা করেছেন তিনি। ডাকাতি করতে গিয়ে আত্মরক্ষায় জন্য গুলী ছুড়তে হয়েছে। না, না, সে ত সত্যিকার ডাকাতি নয়। দেশসেবার রসদ জোগাতে ডাকাতি করতে হয়েছে। যারা অন্যকে বঞ্চিত করে সঞ্চয় করেছে, তাদের ধন লুণ্ঠনে কিসের অপরাধ? অজস্র মজুরের রসে পুষ্ট হয়ে উঠেছে, বিদেশী মালিক। পাপ-পুণ্যের দোহাই দিয়ে, ধর্মের ভয় দেখিয়ে মানুষকে যারা ছোট করে রেখেছে, তাদের শাস্তি দিলে পাপ হয় না। এই শিক্ষাই পেয়েছেন সর্বেশ্বর। তবে এ সাহেবকে দেখে ভীত হবেন কেন তিনি? আকাশ-পাতাল ভাবেন সর্বেশ্বর।

সাহেবের মুখে মিষ্টি হাসি,—মাই গুড বয়! তুমি বড় ক্লান্ত! এখন কেমন বোধ করছ?

পরিষ্কার বাংলা বলছে সাহেব। আশ্চর্য্য হন সর্বেশ্বর। কিন্তু তাঁর প্রকৃত পরিচয় পেলে কি আর সাহেব রক্ষা করবে। নিশ্চয়ই তাঁকে ধরিয়ে দেবে।

সাহেব বললে,—পালিয়ে এসেছ? বহু দূর থেকে পাহাড়ের পথে পালিয়ে এসেছো! তুমি—তুমি নিশ্চয়ই স্বদেশী! ইউ আর এ প্যাট্রিয়ট, মাই গুড ফ্রেণ্ড!

সাহেবের কথা শুনে স্তম্ভিত হন যুবক সর্বেশ্বর। কি করে বুঝলে এ সাহেব? কি করে বুঝলে তিনি স্বদেশী সৈনিক? আর রক্ষে নেই। এবার ধরিয়ে দেবার পালা। সাহসে বুক বেঁধে সর্বেশ্বর বললেন,—হ্যাঁ। আমি মরতে ভয় করিনে সাহেব! তুমি আমায় ধরিয়ে দিতে পার।

হো-হো করে হেসে উঠল সাহেব। তার পর বললে,—মাই গুড ফ্রেণ্ড! আমাকে ভুল বুঝো না! আমি রাজার জাত বটে, কিন্তু রাজা নই। আমি তোমাদের শাসকও নই। আমি তোমাদের বন্ধু! আই এম রবার্টসন—এ ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া। এখন চল আমার সঙ্গে।

সাহেব হাসতে লাগল। তাজ্জব ব্যাপার! নিশ্চয়ই সর্বেশ্বরকে ছলনা করছে। যখন তার খপ্পরেই পড়ে গেছেন, তখন আর উপায়ই বা কি আছে! তিনি অতি কষ্টে বললেন,—আমার খুব কষ্ট হচ্ছে! আমি ত' হাঁটতে পারব না মিষ্টার রবার্টসন!

এগিয়ে আরো কাছে এসে হাঁটু গেড়ে সর্বেশ্বরের কাছে সাহেব বসে পড়ল। তার পর তাঁর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললে,—তোমার কোন ভয় নেই। আমার সঙ্গে থাকলে তুমি নিরাপদেই থাকবে। আই লাভ ইণ্ডিয়া!

তার পর সর্বেশ্বরকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিজের ঘাড়ের

উপর তুলে নিলে সেই রবার্টসন। একটা গাছে হেলান দিয়ে দাঁড় করিয়ে রেখেছিল তার বন্দুক। সেই বন্দুকটা হাতে নিলে; সর্বেশ্বর এলিয়ে পড়লেন তার কাঁধের উপর।

পাহাড়ের উঁচু-নীচু পথ ভেঙ্গে চলল রবার্টসন। পথ চলতে চলতে বকর-বকর করতে লাগল,—মাই গুড বয়! কি মার্ভেলাস্ আইডিয়া! দেশ স্বাধীন করবে তোমরা। নিশ্চয় পারবে; দু' দিন দেরী হতে পারে। ভয় নেই। এত বড় দেশটাকে তৈরী করতে দেরী হবে বৈ কি। কি সুন্দর এ দেশ! এই হিলি কাণ্ট্রি—সোনার দেশ। আমার দেশকে আমি ভালবাসি। কিন্তু এমন সুন্দর এ দেশ যে, একে ভাল না বেসে থাকতে পারছি না। তোমরাও খুব মহৎ! এমন সুন্দর দেশে যাদের জন্ম, তাদের অন্তর সুন্দর না হয়ে যায় না। তুমি থাকবে আমার কাছে; কোন ভয় নেই। তোমায় কাজ দেবো। নট টু বি স্লেভ। বাট ইউ উইল গেট চান্স টু সার্ভ ইওর কাণ্ট্রি। বুঝলে? আই অ্যাম রবার্টসন—ম্যানেজিং ডিরেক্টার অব সো ম্যানি টি গার্ডেনস্।

বকর বকর করছে রবার্টসন। মনে মনে ভাবেন সর্বেশ্বর,—লোকটা নিশ্চয়ই পাগল! এখন পাগলের হাত থেকে রেহাই পেলে হয়।

সাহেবের বাংলোয় এসে পৌঁছুলেন সর্বেশ্বর। সে কি যত্ন? সাত দিন বিশ্রাম নিলেন তিনি। হাঁটবার শক্তি ছিল না; তার উপর জ্বর। রবার্টসন সাহেব সর্বেশ্বরকে ভাল করে তুললে। ধীরে ধীরে তাঁর সন্দেহ দূর হতে লাগল।

সত্যই রবার্টসন এদেশকে ভালবাসে। হয়ত কিছু কিছু পাগলামি আছে তার মাঝে। কিন্তু এমন দরদী মানুষ জীবনে তিনি আর কখনও পাননি। আরো আশ্চর্য্য হলেন সর্বেশ্বর—বাঙালী মেয়ে লালিয়াকে দেখে। রাত-দিন সর্বেশ্বরের পরিচর্য্যা করেছে লালিয়া। লালিয়া সাহেবের কুড়ানো মেয়ে।

রবার্টসন বলে,—একেও তোমার মত কুড়িয়ে এনেছি সর্বেশ্বর! রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে ঘুরে বেড়াত; কোথায় বাড়ি, কোথায় ঘর—ঠিক বলতে পারে না। হিন্দু কি মুসলমান বুঝতে পারি না। পাগলী—বুঝলে Mad। এখন ভাল হয়ে গেছে। সুন্দর গান গায়, তোমাদের সেই বৈষ্ণবের গান। বড় সুন্দর গলা। অনেক দিন এদেশে আছি; মণিপুরীদের গানও আমার খুব ভাল লাগে। শুনবে ওর গান?—ও মাই গুড গার্ল! সেই গানটা—মরিব মরিব সখি!

হো-হো করে হেসে উঠে রবার্টসন! লালিয়া যে গান গায়, সর্বেশ্বর তা বুঝতে পারেন নি। সাহেব বললে,—তুমি এখানে আসার দিন থেকেই ও গান ছেড়ে দিয়েছে। বুঝলে সর্বেশ্বর! আই ওয়াণ্ট সন্-ইন্-লো!

সর্বেশ্বরের মুখেও হাসি ফুটে ওঠে। লালিয়ার ক'টা মুখও রাঙিয়ে ওঠে। তার চোখের ভাষায় করুণ আকুতি। যৌবনের পথে এগিয়ে চলেছে লালিয়া। মাঝে মাঝে মেম সাহেবও এসে যোগ দেয়; কিন্তু মেম সাহেব বললে ভুলই হবে। এ দেশেরই মেয়ে—পর্বতকন্যা পার্বতী! মিশনারী ইস্কুলে শিক্ষা পেয়েছে সে।

আমোদ-আহ্লাদে দিন কাটে; সাহেব বলে, তোমায় কাজ দিচ্ছি সর্বেশ্বর! স্কুল খুলে দিচ্ছি, তুমি ঐ পাহাড়ীদের আর কুলীদের মানুষ করে গড়ে তোল। তোমার সঙ্গে থাকবে লালিয়া—মাই গুড গার্ল!

সর্বেশ্বর রাজি হয়েছিলেন। কাজ শুরু করে দিয়েছিলেন সর্বেশ্বর। রবার্টসনের কাছেই তাঁর দীক্ষা নূতন মন্ত্রে; এদের মাঝেও মানুষ আছে সর্বেশ্বর। তোমার দেশকে জাগাতে হলে এদের জাগাতে হবে। তোমাদের দশভুজা দুর্গা যে পর্বতকন্যা ছিলেন, তা ডোণ্ট ফরগেট। বাট, মনে রেখো—আই ওয়াণ্ট এ সন্-ইন্-লো।

[ক্রমশঃ।

একটি কবিতা

কাকলী চট্টোপাধ্যায়

সময় প্রসন্ন ছিল না তখন বাতাস
কশ্চিৎ অনুকূল পালে, তবুও তো আশ্বাস
চেয়েছে অন্তর, নিষ্ঠুর মেঘের সমীপে
বার বার: হে আষাঢ়, যদিও এ দীপে
আলো জ্বলে নাই আজ, যদিও তৃষিত,
বুভুক্ষু অন্তর মোর, রাত্রি কণ্টকিত
অনিদ্রায়, তবুও ওদিকে অবিরাম
অকৃপণ ধারার দানে, পেয়েছে আরাম
কত শত জন; শুধু আমার মরুশুষ্ক জীবন
চেয়ে থাকে আষাঢ়-মেঘের দিকে; তবুও যখন
মোর 'পরে কৃপাধারা নামে আষাঢ়-শ্রাবণে
স্বপ্নজয়ী রাতে—গভীর আঁধারে: দুর্বল স্মরণে
সে কথা জেগে আছে—আজও রেখেছি অন্তরে,
আমার নতুন জীবন এল যে ফিরে গত আষাঢ়ে।

কর্ম্মবীর মনোমোহন পাঁড়ে

অজয়েন্দুনারায়ণ রায়

চার

বাঙলা তেরশো দশ-এগার সাল। নানা কাজের ফাঁকে আসতেন ঠিক সন্ধ্যার দিকে মহেন্দ্র মিত্র মহাশয়ের বাড়ীতে। তাঁর সহপাঠী বন্ধু ছিলেন মিত্র মহাশয়।

মহেন্দ্রবাবু ব'লতেন—এখানে বসে কি হবে, চল অমর দত্তর বাড়ী। সেখানে গিয়ে থিয়েটারের রিহার্সাল শুনে আসা যাক। যান দুই বন্ধু অমর দত্তর বাড়ী রিহার্সাল শুনতে। দত্তর সাথে মহেন্দ্রবাবুর ছিল প্রগাঢ় বন্ধুত্ব। মনুবাবুর সঙ্গে পরিচয় ক্রমে ঘনিষ্ঠ হ'য়ে পড়লো অমর দত্তর। ঘনিষ্ঠতা এত জমে গেল যে একদিনও রিহার্সালে না গিয়ে থাকতে পারতেন না মনুবাবু।

অমর দত্ত একদিন বললেন—মনুবাবু, আপনি যে দিন থেকে আমার এখানে আসছেন সেই দিন থেকেই আমাদের সকলেরই অভিনয় যেন ভাল হচ্ছে ব'লে অনুভব করছি আমি।

কারণ জিজ্ঞেস করায় বললেন, দত্ত মহাশয় আপনি খুব গম্ভীর প্রকৃতির লোক। অভিনেত্রীদের সঙ্গে সাধারণত সকলে করেন রঙ্গ রহস্য। কোন দিন দেখলুম না আপনার ভাবান্তর। সৌম্য গম্ভীর মানুষটি এলেই সকলেই সন্ত্রস্ত হ'য়ে পড়ে। চটুলতা, রঙ্গ রহস্য করবার সাহসই থাকে না কারও। মুখস্থ না করে আড়ষ্ট ভাবে কেউ অভিনয় করলে আপনি করেন তিরস্কার। সেইজন্ত আপনি চলে গেলে ওরা সব বলে কি জানেন?

পাঁড়ে মহাশয় গম্ভীর ভাবেই জিজ্ঞেস করলেন—কি বলে?

বলে, উনি মাষ্টার মশায়। আমিও ওদের বলি, পাবলিক ষ্টেজে নামতে হবে, টাকাও নিতে হবে দর্শকদের কাছ থেকে, মুখস্থ করবে না কেন? আপনি মনুবাবু দু'দিন না আসাতে, এবারকার বইটা ভাল হ'য়ে জমেনি।

হেসে বললেন মনুবাবু—মানুষের শরীর খারাপ থাকতে নেই? অসুস্থ হ'য়ে পড়ায় ক'দিন আসতে পারিনি। আমি ত সকলকে মাষ্টার-এর মতই বলি। তাঁরা কেউ কেউ হয়তো রাগ করেন। আর কেউ কেউ হয়তো অনধিকার চর্চাও ভাবেন।

অমরবাবু হেসে বললেন—ঐ ধরো মাষ্টারী আর কেউ করুক দিকি। হেসেই উড়িয়ে দেবে মেয়েরা, ঠাট্টা বিদ্রূপ করতে ছাড়বে না। মানুষ যাচাই করার শক্তি ওদের কম নয় মনুবাবু! ওরা সবাই বুঝে যে এ বড় কঠিন ঠাঁই।

হাসি-ঠাট্টায় রহস্যালাপে এই ভাবে কেটে যায় রাতের পর রাত। ক্রমশঃ এমন হ'লো মনুবাবু এক রাতও বাদ দেন না আসতে। জলঝড় হ'লেও আসবেনই তিনি। এ যেন চাকরে-বাবুর কর্ম্মস্থলে আসা। ধীর গম্ভীর মানুষটি দেখেন সব নিপুণ ভাবে। এক রকম মাষ্টার খেতাবই পেয়ে গেলেন তিনি গ্রীণরুমে।

এক দিন একটা অতি সামান্ত কথা নিয়ে বাধলো একজন প্রবীণ এ্যাকট্রেসের সাথে। অতি সামান্ত অতি তুচ্ছ ব্যাপার। মনুবাবু বললেন তারাসুন্দরীকে—তারা, ভাল এ্যাকট্রেস তুমি, তা হ'লেও নিজের পার্টটা ভালো ক'রেই তোমার মুখস্থ করা উচিত।

আহত হ'লেন তারাসুন্দরী। মন মেজাজও বোধ হয় সে দিন ভাল ছিল না তাঁর। ভাল ভাবে নিতে পারলেন না তিনি মনুবাবুর কথাটা। উত্তেজনা বশে হঠাৎ মুখ থেকে তাঁর বের হ'য়ে গেল—কে আপনাকে অধিকার দিয়েছে আমার সম্বন্ধে বলবার?

হারিয়ে ফেললেন মনুবাবু নিজেকে। সত্যই তাঁর কিছু বলার অধিকার আছে কি না বিবেচনা করবার ক্ষমতাও রইলো না তাঁর। অমন ধীর স্থির মানুষও উগ্রমূর্ত্তি হয়ে গলায় হাত দিয়ে বের করে দিলেন তারাসুন্দরীকে।

মুহূর্ত্তে যেন একটা দারুণ অঘটন ঘটে গেল। বিস্ময়ে স্তব্ধ গ্রীণরুমের সব ক'টি লোক!

মহেন্দ্রবাবু বললেন—এটা ভাল করলি না মনু! অনর্থক কি হাঙ্গামাটাই বাধালি!

তেজোদৃপ্ত কণ্ঠে বললেন মনুবাবু—ন্যায় কথা বলতে পাবো না? সামান্ত একটা নটী। সে কি না আমাকে অনধিকার দেখাতে আসে। নাই বা এলুম এ-কাজে।

কে থামায় তখন তাঁকে। থামবার ব্যক্তি তিনি ছিলেন না, তা ভাল ভাবেই জানা ছিল মহেন্দ্রবাবুর। চুপ করে গেলেন তিনি।

এখানেই কিন্তু যবনিকাপাত হ'লো না ব্যাপারটার। দেখতে দেখতে ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি যেন ধূমায়িত হ'য়ে উঠলো। সব ক'জন এ্যাকট্রেস এক হ'য়ে নালিশ জানালো মনোমোহন পাঁড়ের বিরুদ্ধে। তারা জানিয়ে দিল, পাঁড়ের মাষ্টারী আমরা সইবো না। আমরা আপনার থিয়েটারে চাকরী করবো না আর কোন দিন, পাঁড়ে মশায় যদি ঐধারা মাষ্টারী চালাতে আসেন। অত বড় অন্যায় করবেন উনি, আর আমরা স'য়ে যাবো ভাবছেন? উনি যদি দোষ স্বীকার না করেন, আমরা আপনার থিয়েটারে আসবো না, চাকরী আমরা সকলেই ছেড়ে দেবো বলে রাখছি।

মহা সমস্যা! অমর দত্ত মহেন্দ্র বাবুকে গোপনে বললেন—ব্যাপারটা কিছু বাড়াবাড়িই হয়ে গেছে, ওরা একযোগে চলে গেলে থিয়েটার চলবে কেমন করে? মনু যেন তারাসুন্দরীকে একটু বুঝিয়ে বলেন। তারাসুন্দরীকে একটু বললেই এ হাঙ্গামাটা চুকে যাবে।

মহেন্দ্রবাবু মনোমোহন পাঁড়েকে ভালভাবেই জানেন। তিনি ভাবলেন মনুবাবুকে একথা বলা মানেই, ভাগ্যে প্রহার লাভ। চিন্তিত হ'লেন তিনি। কি ক'রে এখন এ সমস্যার সমাধান হয় ভেবে স্থির করতে পারেন না তিনি। অগত্যা একদিন অমর দত্তকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন মনুবাবুর কাছে।

এ কথা সে কথার পর যেমন ঐ কথা বলা, মেজাজ বিগড়ে গেল মনুবাবুর। ক্রোধে আত্মহারা হয়ে বললেন—আচ্ছা, আপোষ করোগে তোমরা গলায় কাপড় দিয়ে; আজ থেকে তোমার থিয়েটারের সঙ্গে আমার আর কোন সম্বন্ধ রইলো না। তুমি থাকো তোমার ঐ সব এ্যাকট্রেস নিয়ে।

যেমন কথা তেমনি কাজ। ঝড়ের বেগে চলে গেলেন তাঁদের কাছ থেকে অন্দরমহলে।

সেদিন থেকে চিন্তা করতে লাগলেন কি করে থিয়েটারে অধিকার প্রতিষ্ঠা করা যায়। দুর্জ্জয় তাঁর সংকল্প। অধিকার প্রতিষ্ঠা করতেই হবে থিয়েটারে। দিবারাত্র ঐ চিন্তা। সুযোগও এসে গেল অতি শীঘ্রই।

টাকার অভাব অমর দত্তর। মহেন্দ্র বাবুর মারফৎ টাকা দিয়ে চললেন পাঁড়ে মহাশয়, অমর দত্তের প্রয়োজন মিটাতে। টাকার অঙ্ক ক্রমেই বেড়ে চললো। আরও টাকার দরকার।

মহেন্দ্রবাবু এসেছেন আবার এক দিন টাকার জন্ম। সেদিন মনোমোহন পাঁড়ে মহাশয় বললেন—অনেক টাকাই ত' দিলুম মহেন্দ্র, তবু অভাব মিটছে না তোমাদের। এখন একটা কাজ করো, আমাকে লীজ দাও, না হ'লে আর ভাই টাকা আমি এভাবে দিতে পারবো না। সব শুনে মহেন্দ্রবাবু এসে অমর দত্তকে তাঁর প্রস্তাব জানাতেই, সম্মত হলেন অমরবাবু।

নিরুপায় অমরবাবু সম্মত হলেন লীজ দিতে। মনোমোহন বাবুর সঙ্গে এসে অমর দত্ত লীজ দিতে স্বীকৃতি দিয়ে গেলেন। সর্ত্তাদি স্থির হয়ে গেল, লীজ-নামা লিখিত হ'লো উকিলের নির্দেশ মত। সন তেরশো এগারো সালে মনোমোহন পাঁড়ে মহাশয় অধিকার নিয়ে বসে গেলেন থিয়েটারে। ভাগ্যলক্ষ্মী প্রসন্ন হাস্তেই সে দিন মনোমোহনকে আশ্রয় করলেন।

এক বছর কেটে গেছে প্রায়। একদিন মনোমোহন পাঁড়ে মহাশয় থিয়েটারের রিহার্সাল রুমে এসে আদেশের সুরে বললেন—কি তারাসুন্দরী! এবার আমি এসেছি অধিকার নিয়েই, চিনতে পেরেছ ত?

শোনবামাত্র তারাসুন্দরীর চৈতন্ম ফিরে এসেছে। লজ্জায় অভিভূত হ'য়ে পাঁড়ে মহাশয়ের পদতলে লুটিয়ে পড়ে বললেন তারাসুন্দরী—অপরাধ হয়েছে আমার, আপনি আমায় মাফ করুন, আপনি আমার বাবা।

এত দিনের সঞ্চিত ক্রোধাগ্নিতে সিঞ্চিত হ'লো শান্তিবারি। পাঁড়ে মহাশয় তারাকে হাত ধরে উঠালেন কন্যাস্নেহে পিতার মত।

পাঁড়ে মহাশয় নিলেন থিয়েটারের পরিচালনার সম্পূর্ণ ভার।

এই সংবাদ পেয়ে ধর্মনিষ্ঠ পিতা বীরেশ্বর পাঁড়ে মহাশয় অভিভূত হ'য়ে পড়লেন। তাঁর বন্ধু পণ্ডিতমণ্ডলীও বিচলিত, চিন্তিত।

বীরেশ্বর পাঁড়ে মহাশয় পুত্রবধূ জ্যোতিপ্রভার সঙ্গে পরামর্শ করতে বসলেন। বললেন—বৌমা, আমার জ্ঞানবুদ্ধি লোপ পেতে বসেছে মা! বড় ভরসা করেছিলুম মনুর। সে থিয়েটারে মেতেছে। যত সব ভ্রষ্টা মেয়ে নিয়ে সর্ব্বদা সেখানে কারবার। কি যে হবে ভেবে ত কূল কিনারা করতে পাচ্ছি না মা!

বুদ্ধিমতী পুত্রবধূ শ্বশুরের হতাশ ভাব দেখে ধীর মৃদু কণ্ঠে বললেন—আপনি ভাববেন না বাবা! যা বলছেন সবই বুঝছি, কিন্তু অত বড় আপনার ছেলে, তাকে এ সব নিয়ে বেশী কিছু বলাও ত ভাল না বাবা।

ভাবনা তো তোমাদেরই জন্ম মা! খুব—খুব খারাপ সংসর্গ। ও থেকে অধঃপতনই হয় দেখে এসেছি। কস্মিনকালে কেউ উন্নতি করেছে দেখিনি ত মা!

তা জানি বাবা আমি। তবে আমার সঙ্গে এ নিয়ে তাঁর যা কথা হয়েছে, তাতে বুঝেছি বিপথে তিনি যাবেন না। বংশের ধারা, বংশের মর্য্যাদা তিনি নষ্ট হ'তে দেবেন না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন বাবা!

আশ্বস্ত হ'তে পারলেন না তবুও, জ্ঞানতপস্বী পাঁড়ে মহাশয় বুদ্ধিমতী পুত্রবধূর নিশ্চিন্ততা দেখেও। তিনি ভাবলেন—এও কি সম্ভব! তরুণ যুবক, শত শত চরিত্রহীনা যুবতীর সংসর্গে থাকতে হবে থিয়েটারে। মুনি-ঋষিরাও যার প্রভাব অতিক্রম করতে পারেন না, মানুষের-পক্ষে তাও কি সম্ভব? আমার পুত্র, আমার সমস্ত জীবনের ভরসা মনু, তার এ মতি হ'লো কেন? যা কারো পক্ষে সম্ভব হয়নি, কেমন ক'রে সেই অসম্ভব সম্ভব হবে? নৈরাশ্যে, দুশ্চিন্তায় মন ছেয়ে রইলো বৃদ্ধ পিতার। কিন্তু পুত্রবধূর কথায় পুত্রকে এ সম্পর্কে কিছু না ব'লে নিদারুণ মনোবেদনায় কাতর হ'য়ে রইলেন বৃদ্ধ সুপণ্ডিত বীরেশ্বর পাঁড়ে মহাশয়।

এ দিকে খুবই প্রশংসার সঙ্গেই চালাতে লাগলেন থিয়েটার মনুবাবু। যে সব দোষ স্বতঃই দেখতে পাওয়া যায়, এ সব ক্ষেত্রে সে সব দোষ থেকে মুক্ত হ'য়ে তিনি যেন একটা নূতন রেকর্ড স্থাপন করলেন থিয়েটার জগতে। থিয়েটারে যাওয়ার অর্থই যে পাপের পঙ্কিলতায় যাওয়া, আর সেই পঙ্কে ধীরে ধীরে নিমজ্জিত হওয়া এ ধারণা ভুলে যেতে লাগলেন সে দিনে একে একে অনেকেই। একটা মহান আদর্শের প্রতিষ্ঠা করলেন মনোমোহন পাঁড়ে মহাশয়।

যখন থিয়েটারে ভাল রকম অর্থাগম হ'তে লাগলো মনুবাবুর, তখন তিনি পরিবারবর্গের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্ম বাড়ীঘর দোরেই অর্জ্জিত অর্থ সমস্ত ব্যয় না ক'রে বিডন স্কোয়ারে সরস্বতী পূজা ক'রে বহু দরিদ্র নারায়ণের সেবা করতেন। সে দিনের সে পূজা, সে আয়োজন দেখে সকলেই ব'লতে বাধ্য হ'য়েছিলেন—মনোমোহন একজন প্রকৃত মানুষ, কেবল নিজের জন্মই তিনি অর্থার্জ্জন করেন না। ওঁর চেয়ে বড় লোক ত আছেন অনেক, ক'জন ওঁর মত জনসেবা ক'রতে পারে?

বৃদ্ধেরা ব'লতেন—কনক পাঁড়ের রক্ত আছে ওর ধমনীতে; হবে না কেন?

মনোমোহনও জানিয়ে দিতেন সকলকে, সত্যই কনক পাঁড়ের রক্ত র'য়েছে ওঁর ধমনীতে, কথায় নয়, কাজে—প্রতি পদক্ষেপে। জনসেবা ছিল তাঁর জীবনের ব্রত, সাধনা। কি সে আন্তরিক নিষ্ঠা! কি সে উদগ্র আগ্রহ! দেবী কমলা অকৃপণ হস্তে দিয়ে চলেছেন প্রচুর অর্থ তাঁর প্রিয় ভক্তকে।

পুত্রের কৃতিত্বে চরিত্র-গৌরবে পিতা মুগ্ধ। আশঙ্কার মেঘ অপসারিত হয়েছে মনের আকাশ থেকে। স্বধর্ম্মনিষ্ঠ বীরেশ্বর পাঁড়ের মনে এখন অনাবিল শান্তি।

পুণ্যতীর্থ কাশীধামে একটা বাড়ী ক'রে শেষ জীবনে কাশীবাস করবার ইচ্ছা বৃদ্ধ পাঁড়ে মহাশয়ের। পিতার মনের কথা জানতে পেরেই তাঁর পুত্র মনোমোহন আরম্ভ করে দিলেন কাশীতে বাড়ী নির্ম্মাণ। দেখতে দেখতে বাড়ীও হয়ে উঠলো।

বৃদ্ধ পাঁড়ে মহাশয় তখন কৃতী সন্তানকে বললেন—বাড়ী ত করালি, এখন তুই ঐ বাড়ীতে শিব প্রতিষ্ঠা করিয়ে আমার সাধ পূর্ণ কর বাবা!

অদ্যাপি চ'লে আসছে সেই বাড়ীতে বীরেশ্বর শিবলিঙ্গের পূজা নিয়মিত ভাবেই।

কাশীর বাড়ী নির্ম্মাণ, শিব প্রতিষ্ঠা শেষ হওয়ার কিছু দিন পরে বঙ্গভারতীর একনিষ্ঠ সেবক ধর্মপ্রাণ বৃদ্ধ বীরেশ্বর পাঁড়ে বুঝলেন, তাঁর শেষ সময় সমাগত। বড় ছেলেকে ডাকিয়ে বললেন—তুই মানুষ হ'তে চলেছিস। আমার শেষ ইচ্ছা পূর্ণ কর। পুণ্যক্ষেত্র কাশীধামে গঙ্গাতীরে আমার সব ক'টি আপন জনের সামনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে পারলে আমার জীবন সার্থক মনে করবো।

পিতার অন্তিম আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ রাখলেন না তাঁর সারা জীবনের ভরসাস্থল মনোমোহন। তখুনি স্থির করলেন সপরিবারে কাশী যাত্রা করতে হবে। সকলকে নিয়ে উপস্থিত হলেন কাশী ধামে নিজেদেরই বাড়ীতে। বৃদ্ধের আনন্দের সীমা নাই। কাশী-প্রবাসী বহু বাঙালীই নিত্য আসেন বৃদ্ধ পাঁড়ে মশায়ের খোঁজ খবর নিতে।

এক দিন মনোমোহন বাবু জিজ্ঞাসা করলেন পিতাকে—বাবা, আপনার আর কি পার্থিব আকাঙ্ক্ষা আছে বলুন ?

বৃদ্ধের মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো, আনন্দে হৃদয় উদ্বেল হ'য়ে উঠলো। অনিমিষ দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ পুত্রের মুখের দিকে চেয়ে থেকে বললেন—তুমি আমার কৃতী সন্তান, তোমাকে বলবার আমার আর কি আছে বাবা! নিজের চেষ্টায় উদ্যমে ধর্ম্মপথে থেকে টাকাকড়ি উপার্জ্জন করতে সক্ষম হ'য়েছ তুমি। তোমার ভাইরা ত তোমার মত উপার্জ্জনক্ষম হ'লো না, তাদের তুমি যেন দেখবে বাবা!

মনোমোহন বাবু তৎক্ষণাৎ বললেন—ও সব চিন্তা আপনি করবেন না বাবা! ভাইদেরকে বঞ্চিত করার ইচ্ছা আমার মোটেই নেই। আপনি নিশ্চিন্ত চিত্তে ইষ্টচিন্তা করুন। ভাইদের আমি কোন দিনই ফেলবো না।

আনন্দে বৃদ্ধের দুই চক্ষু সজল হ'য়ে উঠলো। একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন—খুব—খুব শান্তি পেলুম বাবা, খেয়া ঘাটে এসে দাঁড়িয়েছি, ডাক দিচ্ছে মাঝি, পেছনের দিকে চেয়ে উঠতে পারছিলুম না নৌকায়। আর পিছু দিকে চাইবার নাই। সারা জীবন তুই আমাকে দিয়ে এসেছিস শান্তি, দিয়ে এসেছিস অবসর। আশীর্ব্বাদ করি, তোর এই সুমতি যেন চিরদিন অটুট থাকে। বড় বৌমাও আমার সতীলক্ষ্মী, তোর যোগ্য সহধর্ম্মিণী। তার বুদ্ধি, তার জ্ঞান আমাকে মুগ্ধ ক'রেছে। সংসারের সকলকে আপনার নিজের মত দেখা কম শক্তির পরিচয় নয়। সেইজন্য আগে বংশ দেখে কাজ করা উচিত। দেবরদের নিজের ছেলের মতো দেখে আসছে আমার ঐ মা'টি! তোরা সুখী হ, দীর্ঘজীবী হ'। বৃদ্ধের দুই চোখে আনন্দাশ্রুর প্লাবন।

দিবারাত্রি ইষ্টচিন্তা করেন বৃদ্ধ। বীরেশ্বর শিবের, বিশ্বেশ্বরের, অন্নপূর্ণার চরণামৃত আনিয়ে প্রত্যহ পান করেন, ক্ষীণ হাত দুটি মস্তকে স্থাপন ক'রে প্রণাম নিবেদন করেন দেবতার চরণে। ভাগবত প্রসঙ্গ ছাড়া অন্য প্রসঙ্গ নেই। যাঁরা আসেন তাঁকে দেখতে কৃতাঞ্জলি হ'য়ে বলেন বিদায় দিন আমাকে আপনারা, জীর্ণ হয়েছে দেহ, জীর্ণ হ'য়েছে মন। চেয়ে আছি পরপারের দিকে। যাত্রাপথ যেন সুগম হয়, এই প্রার্থনা করুন।

তেরশো আঠার সালে হিন্দুর মহাতীর্থ মুক্তিপুরী বারাণসী ধামে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন পুত্র, পুত্রবধূ, পৌত্র প্রভৃতি স্বজনগণের সম্মুখে বৃদ্ধ বীরেশ্বর পাঁড়ে মহাশয় শান্ত সমাহিত চিত্তে।

পূতসলিলা জাহ্নবীতীরে পিতার শেষকৃত্য সম্পাদন ক'রে চিন্তা করতে লাগলেন মনোমোহন কেনই বা এলাম আমরা সংসারে, কি কাজই বা করাতে চান সেই বিশ্বস্রষ্টা ভগবান্ আমাদেরকে দিয়ে!

সেই দিনই মনে মনে সংকল্প করলেন মনোমোহন, আমার ধর্ম্মপ্রাণ পিতাকে চিরজীবী ক'রে রাখতে হবে এই পুণ্যতীর্থ কাশীধামে! কেমন ভাবে তা সম্ভব, কত অর্থেরই বা প্রয়োজন হবে আমার এই সঙ্কল্প সিদ্ধ ক'রতে? ভগবান কি সে দিন, সে অর্থ দেবেন আমাকে? চিন্তা, সর্ব্বদা চিন্তা। চিন্তা করতে করতেই ফিরে এলেন সপরিবারে নিজের কর্ম্মক্ষেত্র কলকাতায়।

১১১ গোয়াবাগান ষ্ট্রীটে—এখন মনোমোহন পাণ্ডে রোড, বাড়ী আরম্ভ ক'রে দিলেন। সেটা শেষ হ'লো। প্রকাণ্ড উঠান, চারিদিকে প্রাসাদোপম অট্টালিকা নির্ম্মিত হলো। শুভদিন দেখে সকলকে নিয়ে এলেন নিজের বাড়ীতে। কি বিপুল সমারোহে উৎসব সে দিন সেই বাড়ীতে! ইতর ভদ্র বহু লোকের সমাবেশ। আড়ম্বর, সর্ব্বত্র আড়ম্বর আর কল কোলাহল। পাঁড়ে মহাশয়ের কিন্তু সেই একই ভাব। সেই মোটা খদ্দরের হাতকাটা জামা আর একখানি ধুতি, তাও মোটা খদ্দরের। সম্পূর্ণ অনাড়ম্বর বেশ। আলাপ, আপ্যায়ন, তত্ত্বাবধান করে চলেছেন চারিদিকে।

উপরে নিচে সর্ব্বত্র সুবিস্তৃত কক্ষ। সেই প্রাসাদতুল্য বাড়ীতে এসে বাড়ীর ছেলেদেরকে বললেন—তোরা সব ঘর বারান্দা নিজে পরিষ্কার করবি। চাকরে করবে বলে ফেলে রাখবিনে কখনো। এ কাজ তোদের নিজের কাজ বলে মনে রাখবি। উপদেশ দিয়েই নিশ্চিন্ত ছিলেন না তিনি, এ সব কাজ ঠিক মত হচ্ছে কি না নিজে দেখতেন ঘুরে ফিরে; বৈশিষ্ট্য তাঁর এই সবেই।

পাঁড়ে মশায়ের কথা একটু জোর জোর ছিল। বাড়ীর সবাই তা জানতেন। ছোট ছেলেমেয়েদের যখন কিছু বলতেন তাঁর সেই গম্ভীর কণ্ঠস্বরের জন্য সেটা ঠিক আদেশের মতই মনে হতো। ছেলে-মেয়েরাও তাঁর অতি তুচ্ছতম কথাকেও আদেশ বলেই গ্রহণ করতো, এতটুকু বিরক্তি না দেখিয়ে।

তখন তাঁর ছেলে-মেয়েরা প্রায় সব ক'টিই হয়েছে। বড় ছেলে রত্নেশ্বরকে ডাকতেন বড় বাবু, মধ্যম ছেলে বিনয়কে মধ্যম বাবু, ছোট ছেলের বয়স তখন কম, বাবু আখ্যা পাবার যোগ্যই হয়নি। বাড়ী তখন গুলজার।

বাড়ীতে কেবল নিজেরাই বাস করবেন, এ পছন্দ হলো না মনোমোহন বাবুর। এত বড় বাড়ী করলাম কি কেবল নিজেদেরই সুখ-সুবিধার জন্য? এতে কি কেবল থাকবে আমারই ছেলে-মেয়েরা? সর্ব্বদা মনের মধ্যে এই আলোড়ন চলে। অস্বস্তি অনুভব করেন মনের মধ্যে। শেষ পর্য্যন্ত সমাধান হলো সমস্যার।

একদিন মনোমোহন বাবু ছেলেদেরকে, কর্ম্মচারীদেরকে, পাচক ভৃত্য সকলকে ডাক দিলেন। সকলে এসে দাঁড়ালেন সন্ত্রস্ত হয়ে সম্মুখে। তিনি বললেন—নিচেকার ঘরগুলো হবে ছাত্রাবাস। যে কোনও ছাত্র এলেই থাকবে, পড়াশুনো করবে নিচেকার ঘরগুলোতে। যেই আসুক যেন ফিরিয়ে দেওয়া না হয়। তাদের আহারের ব্যবস্থাও করতে হবে এখানেই। নিচেকার ঘরগুলোতে প্রতিষ্ঠিত হলো সেবাব্রত।

অবারিতদ্বার মনোমোহন পাঁড়ে মশায়ের ১১১, গোয়াবাগানের বাড়ীর। যে কেও কায়বা, চন্দনপুর প্রভৃতি গ্রাম থেকে কোন কাজেই হোক আর মামলা মোকর্দ্দমা করতেই হোক, কলকাতা আসুক না কেন, উঠবে এসে গোয়াবাগানে পাঁড়ে মশায়ের বাড়ীতেই। আবাহনও নাই বিসর্জ্জনও নাই। কেউ জিজ্ঞেস করবার নেই—কেন এসেছ, ক'দিন থাকবে।

যিনি যেখান থেকেই আসুন না কেন, একবার কেবল ঠাকুরকে জানিয়ে দিতে হবে মাত্র তাঁরা কয় জন এসেছেন।

রন্ধনগৃহের পাশের ঘরে কাঠের পিঁড়ে পাতাই রয়েছে। এসে বসে গেলেই হলো। ঠাকুর ভাত, ডাল, একটা তরকারী, মাছের ঝোল দিয়ে যাবে, আদেশের অপেক্ষা না রেখেই। পাঁড়ে মশায়ের এমনিধারা নির্দ্দেশ, খাওয়া শেষ হবার আগেই একজন ঝি এসে এক হাতা করে দুধ দিয়ে যাবে প্রত্যেকের পাতেই। তার পরই ঝির জিজ্ঞাসা গুড় দেবো? সম্মতি পেলেই খানিকটা গুড় দিয়ে যাবে ঝি।

মনোমোহন বাবু বলে রেখেছেন, খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে বাড়ীর ছেলেমেয়ে, মালিক, অভ্যাগত এদের মধ্যে কোন রকম পার্থক্য থাকবে না। বাইরে থেকে যাঁরাই আসুন না কেন, কেউ যেন বুঝতে না পারেন যে আহার্য্য দানের মধ্যে রয়েছে অনাদর, উপেক্ষা বা অশ্রদ্ধা। ছেলেদেরকে, নাতিদেরকে বলেও দিয়েছিলেন, বাইরের যাঁরা আসবেন তাঁদের সঙ্গে বসেই খাবে ঠিক একই রকম ভাবে। কোনও প্রভেদ যেন না থাকে। তাঁর আদেশ ছিল বাড়ীর সকলেরই কাছে, সম্রাটের আদেশের ন্যায় পালনীয়, আহার্য্যে পারিপাট্যের বাহুল্য ছিল না। কিন্তু প্রাচুর্য্য ছিল। রন্ধনেও ছিল না উপেক্ষা, বরং ছিল শ্রদ্ধা। সুতরাং অতৃপ্তি ঘটবার অবকাশ ছিল না। আর সকলেই জানতেন স্বয়ং বাবুর পাতেও ঠাকুর পরিবেশন করবে এই সব খাদ্যই। তাঁর উদারতা, মহাপ্রাণতা সকলকেই মুগ্ধ করতো।

কলকাতায় এই ধরণের জনসেবা কল্পনাও করা যায় না। আশ্চর্য্য! তিনি কিন্তু চালিয়ে এসেছিলেন এই ধরণের অন্নসত্র আজীবন। তাঁর সেই স্বতস্ফূর্ত্ত উৎসাহের ধারা আজও রুদ্ধ হয়ে যায়নি। ওঁদের বাড়ীতে দেখতে পাচ্ছি।

আগেকার দিনে পাঁড়ে মশায়ের জীবিত কালে দেখেছি, দু তিন জন ভাতরাঁধা ঠাকুরকে হিমসিম খেতে হয়েছে এক এক দিন কাজ শেষ করতে।

মনোমোহন বাবুর স্ত্রী যে, কোন উৎসবের দিনে সময়ে খেতে পেতেন না। নিমন্ত্রিত অনিমন্ত্রিত সকলের খাওয়া দাওয়া শেষ হলে তবে তিনি আহার করতেন। মনু বাবু বলতেন, এ রকম ভাবে অসময়ে খেলে তোমার শরীর যে খারাপ হবে। তুমি আমার সাথে খাবে বেলা এগারটার মধ্যে। নইলে শরীর টিকবে না তোমার।

তিনি শুনে হেসে বলতেন—তুমি যে সেবাব্রত লাগিয়েছ, সকলের খাওয়া শেষ না হ'লে আমি আগে কখন খেতে পারি? শরীর খারাপ হবে কেন? গৃহস্থের কর্ত্তব্য করলে কি কখনও শরীর খারাপ হয়?

মনে মনে খুবই আনন্দ হতো পাঁড়ে মশায়ের। ধরে নেবার একজন লোক হ'য়েছে ভেবে তাঁর আনন্দের সীমা থাকতো না।

পাঁড়ে মশায়ের পল্লী ভবনের প্রতিবেশী বা পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের দশ-পাঁচজন লোক আসার বিরাম নাই। অসন্তুষ্টি বা বিরক্তি নেই বাড়ীর লোকের।

নানা কাজের মধ্যে থেকেও মনোমোহন বাবু ঠাকুর চাকরদের, বাড়ীর ছেলেদের প্রায়ই বলতেন, দেশের যেন কেউ আমার বাড়ী থেকে অভুক্ত অবস্থায় ফিরে না যায়। তাঁর কাছে এই সেবা ছিল একটা পবিত্র ব্রত, অপরিহার্য্য-কর্ত্তব্য।

শেষ পর্য্যন্ত এমন হয়ে দাঁড়ালো, মনু বাবু সম্ভাষণ করবারও সময় পেতেন না অভ্যাগতদেরকে। যাঁরা আসতেন তাঁরাও ভাবতেন এটা তাঁদেরই বাড়ী। আসবো, খাবো দাবো, কাজকর্ম্ম করে চলে যাবো। ওঁর সাথে দেখা করার আবার কি প্রয়োজন?

সব চেয়ে আশ্চর্য্যের কথা! এমন অনেক দূর-আত্মীয় আসতেন ব্যবসার জিনিস পত্র কিনতে, তাঁদের ব্যবহার শুনলে আশ্চর্য্য হতে হয়। তাঁরা এসেছেন, দু-তিন দিন যথামত আহারাদিও করেছেন, শয্যা বালিশ ত বিছানাই রয়েছে, সুতরাং তাঁদের কোন অসুবিধাই ঘটেনি। দরকার মত ব্যবসার মালপত্র কিনেও এনেছেন, এখন সেগুলি বেঁধে-ছেঁদে নিয়ে যেতে হবে। মুস্কিলে পড়েছেন বাঁধবেন কিসে। সঙ্গে দু'-একখানা থলে কি চট আছে, তাতে সব বাঁধা হচ্ছে না। বিব্রত নিরুপায় ভদ্রলোক কি করেন? তাঁদেরই আরামের বিশ্রামের জন্য ফরাসের উপর যে সুবৃহৎ প্রশস্ত জাজিম বিছান রয়েছে, তারই খানিকটা অংশ ছিঁড়ে নিয়ে ব্যবসার মালপত্র বেঁধে ছেঁদে নিয়ে রওনা হবার জন্য প্রস্তুত হলেন। সেই সময়ে কেয়ার টেকার কোনও ভৃত্য যদি বলে—করছেন কি বাবু, অত বড় জাজিমখানা ছিঁড়ে নষ্ট করচেন?

উত্তর শুনলো ভৃত্য—নে নে তোর বড় বাবুকে বলিস, না হয় আর আসবো না। পয়সার মাল ফেলে গেলেই ত তোদের মজা। তা' আর বুঝি না বুঝি মনে করিস? স্তম্ভিত বিস্মিত ভৃত্য আর বাঙ্‌নিষ্পত্তি করতে পারে না।

বড় বাবু এ সব শুনে কিছুই বলতেন না। ভাবতেন, মানুষের চরমতম দৈন্যের, অধঃপতনের অবস্থা না এলে এ রকম করতে পারে না। সময় সময় শুনতে পাওয়া যেত একটা শুধু দীর্ঘশ্বাস।

এই যখন মনের অবস্থা মনোমোহন বাবুর, ঠিক সেই সময়েই ঐ ধারার লোকই যাবার সময় কাছে এসে দাঁড়িয়ে প্রণাম বা নমস্কার করলে প্রাণখোলা আশীর্ব্বাদ ক'রে বলতেন—মঙ্গল হোক। মুখে বিরক্তির একটুকু চিহ্ন নাই।

এ আশীর্ব্বাদ যিনি পেয়েছেন অথবা এ আশীর্ব্বাদ করতে যিনি দেখেছেন, বুঝেছেন কত বড়ো, কত উদার অন্তঃকরণ ছিল মনোমোহন পাঁড়ে মশায়ের।

তখন পূর্ণ উন্নতির অবস্থা মনোমোহন পাঁড়ের। কলকাতা সহরের নানা স্থানে প্রতি বছরই দুই-একখানা করে বাড়ী উঠছে। নিজের বাসভবন ১।১ গোয়াবাগানের সামনের সব বাড়ীগুলোই একে একে খরিদ করে নিলেন। যে জায়গাটা পতিত ছিল, সেখানে বাড়ী করিয়েও নিলেন। লক্ষ্মী যখন সুপ্রসন্না হন, সব দিক থেকেই পাওয়া যায় তাঁর কৃপা। যাকে বলে ধূলো মুঠো ধরলে সোনামুঠো হয়, এখন সেই রকম অবস্থা দাঁড়িয়েছে পাঁড়ে মশায়ের। স্ত্রী জ্যোতিপ্রভা দেবীকেও পেয়েছিলেন মনের মত। এই পুণ্যশীলা মহিলা প্রকৃতই ছিলেন স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গিনী। স্বামীর মতের বিরুদ্ধে কোনও দিন কেউ তাঁকে কোন একটা তুচ্ছতম কাজও করতে দেখেনি। যদি জানতে পারতেন সে কাজ তাঁর স্বামীকে দিয়ে করান একবারেই অসম্ভব। যত গুরুতরই হোক না কেন, তাঁর মনের বিরুদ্ধে সেটা, অসীম ধৈর্য্য আর সহিষ্ণুতার সঙ্গে জ্যোতিপ্রভা সংযত ক'রে রাখতেন তাঁর মনকে। স্বামীর মনে অণুমাত্র অশান্তি যাতে হবার সম্ভাবনা এমন কাজ জ্যোতি দেবীকে কেউ করতে

করতে দেখেনি। অনেকে বলতো ইনি এ যুগের মেয়ে নন, এ সেই ত্রেতা যুগের দ্বাপর যুগের মেয়ে। সত্যই তিনি ছিলেন আদর্শ মহিলা।

নসীরাম বাবু নামে একজন স্বজাতি পাঁড়ে মশায়ের বাড়ীতে থাকতেন। বাবু তাঁকে খুব স্নেহও করতেন। বাড়ীর সকলে এটা সহ্য করতে পারতো না। নসীরামের প্রতি বাবুর এই অসঙ্গত স্নেহাধিক্য সম্পর্কে নানা কথা বাড়ীর লোকে জ্যোতিপ্রভা দেবীকেও জানাতো প্রতিকারের ভরসায়। এই স্নেহাতিশয্য জ্যোতিপ্রভারও অনেক সময় ভাল লাগতো না।

একদিন সময় বুঝে রাত্রির বেলায় নসীরাম বাবুর বিরুদ্ধে অনেক কথাই বলতে লাগলেন জ্যোতিপ্রভা। শুনেই যান পাঁড়ে মশায়, কোন কথার প্রতিবাদ করেন না। সব শুনে অনেকেই মনে করলেন, এবার তাহলে একটা প্রতিকার নিশ্চয়ই বাবু করবেনই। প্রতীক্ষা করেই থাকে সকলে। পরিণতি কিছু দেখতে পায় না। আরও দু'-এক রাত্রি শুনেছেন পাঁড়ে মশায় নীরবেই নসীরামের বিরুদ্ধে।

একদিন অনেকের সামনেই পাঁড়ে মশায় বললেন, তোমরা নসীরামের বিরুদ্ধে অনেকে অনেক কথাই বলো বিনা প্রতিবাদে, সবই শুনে যাই। তোমরা যা বলো মিথ্যে নয় তা-ও জানি, তবু কেন আমি তাকে সহ্য করি জানো? নসীরাম আমার বাবার রোগের সময় যে ভাবে সেবা করেছে সে সেবা যেই দেখেছে ওর ছোটখাটো অনেক দোষই তাকে উপেক্ষা ক'রে যেতে হবে। এই কথা কয়টি ব'লেই মনু বাবু গম্ভীর হ'য়ে রইলেন।

সেই দিন থেকে তাঁর স্ত্রী জ্যোতিপ্রভা দেবী কোন দিন কোন সময়ের জন্ত নসীরাম বাবুর সম্পর্কে বিরুদ্ধ মনোভাব পোষণ করেননি।

তারপর পাঁড়ে মশায় নসীরাম বাবুকে মহাল দিয়েছেন আদায় করতে। সে তহবিল ভাঙলে ব'লেছেন, কি আর করা যাবে বলো, অতগুলো ছেলেপুলে, তাদেরকে খাওয়াতে হবে তো!

বাড়ীর লোক সকলে এক দিকে আর পাঁড়ে মশায় এক দিকে। একদিনও তিনি যার কাছ থেকে উপকার পেতেন, ভুলতে পারতেন না সে উপকার। এইখানেই আর দশ জনের সাথে তাঁর পার্থক্য। এইখানেই তাঁর চরিত্রে দেখা যেতো মানবতার পূর্ণ বিকাশ।

তারপর দেখা গেল নসীরাম বাবুর পাকা বাড়ী হ'লো পাঁড়ে মশায়ের দৌলতে। খাওয়া-পরার সংস্থানও ক'রে দিলেন।

এমন দিনও দেখা গেছে, পাঁড়ে মশায়কে যমরাজও ভয় ক'রেছেন।

নাতিদের মাতুল খুব বড় এক জন সাঁতুরে। এক দিন ঠাকুর বিসর্জ্জন উপলক্ষে পাঁড়ে মশায়ের দুই বড় নাতিকে নিয়ে গেল তাদের মাতুল পাঁড়ে মশায়ের অনুমতি নিয়ে। মনোমোহন বাবু বললেন—বেশ নিয়ে যেতে চাও, নিয়ে যাও, কিন্তু ফিরিয়ে এনে দিতে হবে আমার নাতি দুটিকে আমার কাছে।

সন্ধ্যা হয় হয়, এমন সময় খবর এলো পাঁড়েবাড়ীতে—ছেলে তিন জনকেই পাওয়া যাচ্ছে না। যা খবর পাওয়া গেল তাতে জানা গেল—বিসর্জ্জন দেখতে গিয়ে ওরা তিন জনেই নৌকা হ'তে গঙ্গার জলে প'ড়ে ডুবে গিয়েছে। এ খবর পেয়ে বাড়ীর লোক সকলে এমন মুহ্যমান হয়ে পড়লেন যে, কারও ঘটনাস্থলে যাবার সাহস হয় না। বাড়ীতে কান্নাকাটির পালা!
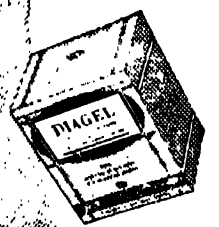
বেরিয়ে পড়লেন ঘরের ঘোড়ার গাড়ীতেই মনোমোহন পাঁড়ে মশায় খদ্দরের ফতুয়া গায়ে দিয়ে। হাতে বাঁশের মোটা লাঠি। সঙ্গে কয়েক জন লোকও নিলেন গাড়ীতেই। গঙ্গার ধারে গিয়ে বসলেন চেয়ারে। সককে হুকুম করলেন—দেখো প্রতি নৌকা তন্ন তন্ন ক'রে। ছেলেদেরকে তুলিয়ে আনতে পারলে প্রচুর পুরস্কার দেবো। খোঁজ প'ড়ে গেল। যারা খুঁজতে আরম্ভ ক'রেছে তাদেরই মধ্যে এক দল দেখতে পেল পাঁড়ে মশায়ের দুই নাতি ব্রজেশ্বর সোমেশ্বর একটা উল্টোন নৌকা ধ'রে কোনও রকমে প্রাণে বেঁচে রয়েছে। তাদের দুই ভাইকে এনে ফেলে দিল পাঁড়ে মশায়ের পায়ের তলায়। উচ্ছ্বসিত আনন্দে নাতিদেরকে কোলে তুলে নিলেন পাঁড়ে মশায়। তখন তাঁর মনে প'ড়লো তাদের মামার কথা। আবার খোঁজাখুঁজি আরম্ভ হ'লো। নিয়তির বিধান কে খণ্ডন করতে পারে? অনেক খোঁজাখুঁজির পর পাওয়া গেল তাঁকে মৃত অবস্থায়।

নাতি দু'টিকে নিয়ে বাড়ী ফিরে শুনতে পেলেন মনু বাবু তাঁর অভিভাবক স্থানীয়দের কাছে, বন্ধুবান্ধবদের কাছে—তোর কপাল বটে মনু! ঐটুকু ছেলেদেরকে বাঁচিয়ে আনলি! যমও তোকে ভয় করে, আজ বুঝলুম। এ কথা কেবল বন্ধু-বান্ধবরাই আর অভিভাবক স্থানীয়রাই বলেনি, এ কথা সে দিন শোনা যেতে লাগলো সকলেরই মুখে। [ক্রমশঃ।

পাগলিনী

ভাস্কর

আমহার্ট স্ট্রীটের পাশে একটি ছোট গলির মধ্যে বাস করেন পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। একটি অফিসে চাকরি করেন। আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছলই ছিল, সম্প্রতি একটু অস্বচ্ছলতা দেখা দিয়াছে। একটি কন্যা, তিনটি পুত্র। কন্যার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। জামাইয়ের অবস্থা বেশ ভাল।

বাড়ীটি গলির মধ্যে হইলেও বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। আসবাবপত্রের বাহুল্য না থাকিলেও বেশ রুচিসম্মতরূপেই সাজানো গুছানো। নীচের তলায় বসিবার ঘরে কয়েকখানি সোফা সেটি, কয়েকটি টিপয়। চারটি আলমারী নানা বিষয়ের বইতে ঠাসা। ছেলেমেয়েরা পড়াশুনা ভালবাসে। পুত্রদের কলেজের পড়াশুনা শেষ হইয়াছে। তাহাদের কলেজে পড়া বিভিন্ন বিষয়ের পুস্তক ছাড়াও সাধারণ সাহিত্য বিষয়ক বহু পুস্তক রহিয়াছে। অনেক সময়েই দেখা যায়, উহাদের মধ্যে কেহ না কেহ এই ঘরে বসিয়া একখানা বই লইয়া তন্ময় হইয়া আছে।

অরুণা স্কুলে বেশ ভাল ছাত্রী ছিল। পড়াশুনার প্রতি একটা আন্তরিক আগ্রহ ছিল। বিবাহের পরও তাহার সে অভ্যাস একেবারে লোপ পায় নাই। শ্বশুরবাড়ী যাইবার সময়ে বহু বই সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছে এবং সেখানেও মাঝে মাঝে একখানা একখানা করিয়া বহু পুস্তক কিনিয়াছে। তাহার শোবার ঘরের মধ্যে খুব ভাল পালিশ-করা দুইটি আলমারী বইতে ভরা। আত্মীয়-স্বজন এবং চেনা-শোনা কেহ কেহ উহার কাছে বই চাহিয়া লইয়া যায় পড়িবার জন্য। এজন্য অরুণাকে একখানা খাতাও করিতে হইয়াছে। কারণ, বই লইয়া ঠিক সময়মত ফেরত দিবার অভ্যাস অনেকেরই নাই। খাতায় লেখা না থাকিলে কে কবে কোন্ বই লইলেন এবং তাহা ফেরত আসিল কি না, ঠিক রাখা যায় না।

অরুণা সুন্দরী। রং ধবধবে ফর্সা না হইলেও বেশ ফর্সাই বলা যায়। বড় বড় চুল। মুখখানি নিখুঁত। ছোট কপালখানির নীচে দুটি সুন্দর ভ্রূ, যেন কালি দিয়ে আঁকা। টানা-টানা চোখ দুটি, চোখের তারা দুটি কালো। টিকলো নাক, সুন্দর দাঁতের পাটি। সমস্ত মুখখানিতে একটা অপূর্ব লক্ষ্মী-শ্রী। সুডৌল হাত দু'খানি। দুই হাতে চুড়ি, বালা, শাঁখা, হাতঘড়ি সুন্দর মানাইয়াছে।

শ্বশুরবাড়ী আসিয়া স্বামী, একটি ননদ, দুইটি দেওর, শ্বশুর ও শাশুড়ী, সকলের কাছেই স্নেহ পাইয়াছে, আদর পাইয়াছে, শ্রদ্ধা পাইয়াছে। অরুণার রূপে ও গুণে অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনেরাও মু হইয়াছে। সকলেই সমস্বরে বলিয়াছেন, এমন লক্ষ্মী বউ পাওয় বহু ভাগ্যের কথা।

স্বামী নরেশচন্দ্র একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের অংশীদার। সবল সুন্দর, স্বাস্থ্যবান দেহ। তাহাকে পাইয়া তাহার ভালবাসা পাইয় অরুণা কৃতার্থ হইয়াছে, মুগ্ধ হইয়াছে। অরুণা এক এক দিন ঠো ফুলাইয়া বলিয়াছে, তুমি এত ভালবাস আমাকে। বড্ড বেশি ভালবাস। এত ভালবাসা কপালে সইবে তো?

কি যে বল, অরুণা। তুমি আমার জীবনের কতখানি জুড়ে রয়েছ, তা তুমি বুঝতে পার না। তোমার কাছে থেকে, তোমা কথা শুনে, তোমার সেবা পেয়ে, তোমার একান্ত নির্ভর ভালবাস পেয়ে আমি ধন্য হয়ে গেছি। বহু ভাগ্য না থাকলে তোমার মত সাথী পাওয়া যায় না।

অত করে বলো না। আমার ভাগ্য দেখে সবাই হিংসে করে তা করুক গে। বাইরে থেকে তারা কতটুকুই বা জানে! যদি আমার সৌভাগ্য সবটুকু তারা জানতে পারতো, বুঝতে পারতো তাহলে হয়তো হিংসেয় মরেই যেত। যাকগে পরের কথা আমার খালি মনে হয়, এত সুখ সইলে হয়।

কেন ও সব ভাব। তোমার ওই লক্ষ্মীপ্রতিমার মত মুখে আমি কোন উদ্বেগের ছায়া দেখতে পারি নে। ওতে আমার কষ্ট হয়।

না, গো না, কোন উদ্বেগ আমার মনে নেই। তুমি এমনি করে আমাকে ভালবেস। আমি আর কিছুই চাইনে।

এই সব কথা বলিয়া অরুণা নরেশের বুকে মুখ লুকায়। নরে ধীরে ধীরে উহার চুলের গোছার মধ্যে আঙুল দিয়া মাথায় হা বুলাইতে থাকে।

২

সকালে উঠিয়া বাড়ীর সকলের চা ও খাবারের ব্যবস্থায় ম দেয় অরুণা। যেদিন যেরূপ ব্যবস্থা থাকে, তাহাই লইয়া শাশুড়ী ঠাকুরাণীকে জিজ্ঞাসা করিয়া কাহাকে কি দিবে, প্রভৃতি স্থির করিয়া লয়। শাশুড়ী মমতাময়ী, তাঁহার নাম সার্থ করিয়া তাঁহার মমতা দিয়া সংসারটিকে শান্তিতে ভরিয়া রাখিয়াছেন তিনি বলেন, আমি আর কি বলব, বৌমা! তুমিই সব গুছি গাছিয়ে করছ, আমার কিছু বলবার আর দরকার আছে কি যার যা দরকার, যার জন্য যে ব্যবস্থা করতে হবে, সবই তে তুমিই করছ।

প্রাতের আহারের পাট মিটিয়া গেলে অরুণা দেখিতে যা রান্নার কি ব্যবস্থা হইবে। ভাঁড়ার বাহির করিয়া দিয়া দৈনি বাজারের জিনিষপত্রের ব্যবস্থা করিয়া ঠাকুরকে নির্দেশ দিয় তরকারী যাহা কুটিতে হইবে, তাহার কিছু নিজে কুটিয়া এবং বাকিট ঝি বা ঠাকুরকে দিয়া কুটাইয়া রান্নার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করে। তা পর নিজের ঘরে আসিয়া একখানা বই লইয়া বসে, কখনে বা নরেশের সঙ্গে একটু হাস্যরসিকতা করে আবার কখনে একখানা খাতা খুলিয়া বসিয়া কবিতা লেখে। তেমন উচ্চস্তরে কবিতা নয়, কিন্তু সহজ ও সুখপাঠ্য সাধারণ ভাষায় লেখা সাধার সামাজিক ও দৈনন্দিন জীবনের নানা বিষয়ের কাব্যরূপ, পড়িতে বেশ ভাল লাগে। অবসর পাইলে নরেশকে পড়িয়া শুনায়, নরে

আনন্দিত হয়। বলে, আমার তো আর ও-সব কোন দিন হল না, হবেও না। তুমি লিখে পড়ে পড়ে আমাকে শুনিও। অনেকগুলো লেখা হলে বই বের করা যাবে।

বই, না ছাই। এই সব কি বইতে ছাপা যায়?

কেন যাবে না! অনেকগুলি কবিতা খুব ভাল হয়েছে।

তোমার কাছে ভাল হলেই কি ভাল হল?

বেশ, আমি যেন কিছুই বুঝি নে?

তাই কি আমি বলছি নাকি? আচ্ছা, অনেকগুলো লেখা হলে তার পর দেখা যাবে, ছাপা হবে কি না।

কিছুক্ষণ পরেই আসে স্নানাহারের সময়। অরুণা ব্যস্ত হয়ে ওঠে। তাড়াতাড়ি যায়, খাবার ঠিক করিয়া দেয়, পাতে নুণ লেবু দেওয়া হল কি না, একখানি মাছ আলাদা করিয়া নরেশের জন্ত ভাজা হইয়াছে কি না, প্রভৃতি সমস্ত খুঁটিনাটি দেখিয়া শুনিয়া ঠিকঠাক করিয়া দেয়। যতক্ষণ নরেশের খাওয়া না হয়, তাহার কাছে বসিয়া থাকে। খাওয়া শেষ হইলে তাহাকে পান আনিয়া দেয়। তাহার অফিসের কাপড়-চোপড় গুছাইয়া দিয়া একটু হাসে। নরেশ তাহাকে একটু আদর করিয়া অফিসে যাত্রা করে।

এর পরে শ্বশুর-শাশুড়ীর পালা। অতি সযত্নে তাঁহাদের সকল প্রকার ব্যবস্থা করিয়া নিজে দেওরদের সঙ্গে বসিয়া আহারাদি করে। কোন কোন দিন দেওরেরা তাড়াতাড়ি খাইয়া বাহির হইয়া গেলে অরুণা হয়তো তাহার শ্বশুর-শাশুড়ীর সঙ্গেই খায়। আবার কোন কোন দিন একাও বসিতে হয়।

এমনি করিয়া সে বৈকাল ও রাত্রের সাংসারিক কাজকর্মও অতি সুচারুরূপে ও দক্ষতার সঙ্গে সারিয়া ফেলে। এমনি করিয়া অরুণা ক্ষুদ্র পরিবারটিকে একান্ত আপন করিয়া ফেলিয়াছে। সকাল হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত সমস্ত কাজ সমস্ত প্রচেষ্টার সঙ্গে নিজেকে একান্ত ভাবে মিশাইয়া ফেলিয়াছে। নিজ পিতামাতার পরিবারে চিরদিন প্রতিপালিত হইয়াও বধূরা কেমন করিয়া অপর একটি পরিবারকে এত সত্বর আপন করিয়া ফেলে, এটা একটা রহস্য! বোধ হয় আমাদের দেশ ব্যতীত অন্ত কোন দেশে বা সমাজে এই ব্যাপার সম্ভব নয়। ভাসুর-দেবরেরা যখন নিজ নিজ পরিবার লইয়া বিব্রত হইয়া পড়িবে, প্রত্যেকের আয়ের সমতা থাকিবে না, তখন অবশ্য একত্র বাস করিয়া বিবিধ মনোমালিন্য বা অশান্তি ভোগ করা অপেক্ষা পৃথক বাস করাই কাম্য ও শ্রেয়ঃ, কিন্তু পিতা-মাতা ভ্রাতা-ভগিনী লইয়া যে ক্ষুদ্র পরিবার, তাহার মাধুর্য্য ও আদর্শ মানুষের সর্ব্বপ্রকার সামাজিক কল্যাণের শুধু সহায় নয়, ইহার পক্ষে একান্ত অপরিহার্য।

এমনি মাধুর্যের মধ্যেই দিন কাটিতেছিল অরুণার।

একদিন পরেশনাথ একখানি পত্র পাইয়া মর্মাহত হইলেন। তাঁহার সেজ ভগিনীপতির অকস্মাৎ মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার ভগিনী বিমলা কাঁদিয়া কাটিয়া পত্র লিখিয়াছেন, তিনি শ্বশুরবাড়ীতে আর একদিনও থাকিতে পারিবেন না। তাঁহার বয়স চল্লিশের কাছাকাছি হইলেও নিঃসন্তান। পরেশনাথ শোকাকুলা ভগিনীকে আদর করিয়াই তাঁহার কাছে আসিবার জন্ত লিখিয়া দিলেন।

প্রায় দুই মাস পরেই বিমলা বাক্স বিছানা এবং আরো কিছু জিনিষপত্র লইয়া দাদার কাছে উপস্থিত হইলেন। দুই-তিন দিন খুবই কান্নাকাটি করিলেন, কিন্তু সময়ে সবই সহিয়া যায়। ক্রমশঃ তিনি শোক ভুলিয়া পরেশের পরিবারের এক জন হইয়া নিশ্চিন্ত মনেই বাস করিতে লাগিলেন। কিছু দিন পরে তাঁহার এক দেবর তাঁহাকে লইতে আসিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি আর শ্বশুরালয়ে ফিরিয়া যাইতে সম্মত হন নাই। দেবরকে বলিয়া দিলেন, এখন তো দিনকতক এখানে থাকি, তার পর দেখা যাবে। এখানে দাদা বৌদিও আমাকে ছাড়বেন না।

অরুণার সহিত পিসিমার খুব ভাব হইয়া গিয়াছে। পিসিমা তাহাকে বলিয়াছেন, আমার আর সুখ-শান্তি কি বাছা? তোমাদের দেখেই আমার সুখ। তোমরা হয়তো ভাবছ, এ আবার একটা নূতন আপদ জুটলো।

অরুণা বলে, ও-সব কি বলছেন আপনি? আপনিও যা, মা-ও তাই।

হ্যাঁ, মা! আমি শুনেছি, তোমার মত লক্ষ্মী বউ নাকি আর হয় না।

কি যে সব বলেন আপনি?

তা, মা, আমার একটা পেট, একবেলা দুটো যা হয় হ'লেই হ'ল। আমি তোমাদের ঝঞ্ঝাট বাড়াতে চাই নে। যখন তোমাদের যা সুবিধে হয়—

আপনি অমন করে আমাকে বলবেন না। আপনাদের সেবা করাই তো আমার কাজ, আমার কর্ত্তব্য। যেটুকু পারব, করব বই কি।

হ্যাঁ, যা বলছিলাম। তোমরা যা ব্যবস্থা করেছ, তাই আমার কত ভাগ্যি। দুপুরে আলোচালের ভাতের সঙ্গে একটু ঘির জোগাড় করে দিও। আর একটু ভাতে-টাতে যেমন পেঁপে ভাতে বা কচু ভাতে। একটু মুগের ডাল, আর ধর গিয়ে একটু আলুপটলের দম, একটু ধোঁকার ডালনা—তা তোমাদের হেঁসেলে পাঁচ রকম রোজই হচ্ছে। খাওয়ার শেষে একটু চাটনি, একটু দই বা রাবড়ী—তোমাদের বাড়ীতে পাঁচ রকম তো এসেই থাকে। খাওয়ার শেষে একটা সন্দেশ বা লেডিকেনি, মানে, শুনেছি তোমাদের এপাড়ার খাবার নাকি খুব ভাল। নইলে, খাওয়া দাওয়ার লোভ আমার কোন দিনই নেই। আর রাত্রে কিছু খাওয়ার কোন দরকার নেই। তবে কি না, যে ক'দিন দেহটা আছে, মেরে তো ফেলতে পারি নে। হ্যাঁ, যা বলছিলাম, রাত্রে খানকতক ফুলকো লুচি, একটু আলু-কপির তরকারী, বেগুনভাজা খান দুই, আর একটু দই, মিষ্টি। একটা মর্ত্তমান কলা আর একটু দুধ হলে আর কিছু চাইনে। আমার আবার পাতলা দুধটা সয় না। দুধটা একটু মেরে দিও। লুচির সঙ্গে একটু ক্ষীর—ক্ষীর দুধই ভাল, কি বল? তা তোমাদের হাঙ্গামা কি বল? পাঁচ রকম তো তোমাদের দুবেলাই হচ্ছে।

অরুণা সব শুনিল। পিসিমার আহারের ফর্দ্দে প্রথমে একটু চমকাইয়া উঠিল। তারপর বলিল, আপনার যাতে কোন কষ্ট না হয়, আমি নিশ্চয়ই দেখব। এ আর আপনাকে বলতে হবে কেন? মাকেও বলব'খন।

না, না, বৌমা! এসব সামান্য খুঁটিনাটি নিয়ে আর বৌদিকে কিছু বলতে যেও না। উনি ভাববেন, আমি একটা রাক্কস। সত্যি বৌমা, খাবার লোভ আমার একেবারেই নেই। তবে কি না,

দেহটা ধারণ করতে হবে, তাই। আচ্ছা, আমি উঠি, দেখি বৌদি কি করছেন। আহা, কি লক্ষ্মী বৌমাটি আমার! যেন স্বর্গের প্রতিমে।

পিসিমার সামান্য একবেলা দু'টো হবিষ্যান্নের ফর্দ শুনিয়া অরুণা প্রমাদ গণিল। তথাপি একান্ত কর্ত্তব্যবোধে যথাসাধ্য পিসিমার আহারাদির ব্যবস্থা করিতে লাগিল। প্রায় প্রত্যহই তাঁহার খাইবার সময় তাঁহার পাশে বসিয়া খাওয়া দেখে। পিসিমা আদর করিয়া বলেন, যাও বউমা, একটু শোওগে,. আমার আর কিছু লাগবে না। তুমি কি আর কিছু বাকি রেখেছ? হ্যাঁ, ওই কলাটার খোসা ছাড়িয়ে ক্ষীরের বাটিতে ফেলে দিয়ে যাও। অরুণা দুধ-কলার ব্যবস্থা ঠিক করিয়া দিয়া উঠিয়া যায়।

এমনি করিয়া পিসিমার এ জীবন স্বচ্ছন্দ গতিতে চলিতে থাকে। স্বাস্থ্যের বেশ উন্নতি হইতেছে। পাড়ার অনেকগুলি বাড়ীর সঙ্গে আলাপ হইয়াছে। বৌদি মমতাময়ী পাড়া-বেড়ানো তেমন পছন্দ করেন না। অবসর সময়ে বই পড়েন। বই পড়িয়াই তাঁহার সমস্ত অবসর কাটিয়া যায়। বিমলার পাড়া না হইলে চলে না। পাড়ায় গিয়া পাড়ার গিন্নীদের সঙ্গে বৌদের সঙ্গে অবাধে আলাপ করেন। কথাও একটু বেশি বলেন ঘরের কথা পরের কথা লইয়া আলোচনাও কম করেন না। সেইজন্য পাড়ার লোকের কাছে বিমলা যেমন পপুলার হইয়া উঠিলেন, তেমনি একটু ভীতির কারণও হইলেন। যাহারা, চতুর তাহারা নিজের মনের কথা মনে রাখিয়া উহার নিকট হইতে অন্য পরিবারের কথা বাহির করিয়া লয়। যাহারা সরল তাহারা নিজেদের অজ্ঞাতসারে এমন অনেক কথা বলিয়া ফেলে, যাহা পাড়ায় রাষ্ট্র করা অনুচিত। পিসিমার কিন্তু কোনখানেই মুখ বন্ধ হয় না। পিসিমার ছেলে নেই, মেয়ে নেই, কোন ভেষ্টেড ইণ্টারেষ্ট (কায়েমী স্বার্থ) নেই, কাজেই তাঁহার কোন প্রকার আলোচনায় সমালোচনায় উৎসাহের অভাব নাই।

৩

মানুষের চরিত্র অতি জটিল! মনের মধ্যে কত প্রকার ভাব, কত প্রকার চিন্তা কত প্রকারে প্রকটিত হয়, তাহার ইয়ত্তা নাই। পিসিমাকে অরুণা শ্রদ্ধা করে, ভক্তি করে, প্রাণপণে সেবা করে। পিসিমার মুখেও অরুণার কত প্রশংসা। অথচ পিসিমার মনের অন্তস্তলে অরুণার প্রতি এক বিষম হিংসা, একটা বিষম ঈর্ষ্যার ভাব যে কেন অঙ্কুরিত হইল এবং কেন তাহা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, তাহা কে বলিতে পারিবে? কেন এমন হয়?

একদিন বিমলা মমতাময়ীকে একা পাইয়া তাহাকে বলিলেন, দেখ বৌদি, কোন কিছুরই বাড়াবাড়ি ভাল নয়।

কিসের বাড়াবাড়ি ঠাকুরঝি?

না বাপু, কি দরকার আমার তোমাদের কথায়? এক বেলা দুটো খাই, আপন মনে পড়ে থাকি।

কি হয়েছে, বলুন না? পাড়ার কোন নূতন খবর আছে বুঝি? কার কি বাড়াবাড়ি হ'ল।

পাড়ার কথা নয় বৌদি, ঘরের কথাই বলছি। পাড়ার কথায় কি কাজ আমার ?

ব্যাপারটা কি, বলুনই না ?

গলার স্বর নামাইয়া বিমলা বলিলেন, আমাদের বৌমার কথা বলছি।

বৌমার কথা! বৌমার কি কথা ?

মানে, অত রূপ ভাল না।

তার মানে ? আমাদের অমন লক্ষ্মীপ্রতিমা বৌ—

আমরা পাড়াগাঁয়ে মানুষ হলে কি হয়, আমাদেরও চোখ-কান আছে। বৌমাটির আর সব ভাল, কিন্তু—

কি বলছেন আপনি ?

আমি কি আর শুধু শুধু বলছি ?

আপনি কিছু কখনো দেখতে পেয়েছেন ?

অনেক দিন, অনেক বার। এত দিন কিছু বলিনি, ভাবলুম, পরের সংসারে এসে কাজ কি আমার ওসব কথায়। কিন্তু শেষটা থাকতে পারলাম না।

সত্যিই কিছু দেখেছেন আপনি ? আমার যে কিছুতেই বিশ্বাস হয় না।

নরেশ তো সারাদিন বাড়ীই থাকে না। অবসর পেলেই বৌমা হয় বইতে মুখ গুঁজে পড়ে থাকে—যত সব লক্ষ্মীছাড়া বই—আর এ-জানলায় ও-জানলায় গিয়ে পাড়ার যত সব—

দেখুন, ঠাকুরঝি, আপনি ওসব কথা বলবেন না আমাকে। বৌমার ওরকম কোন বদভ্যাস আছে, আমি বিশ্বাস করিনে।

তা হলে আমি আর কিছু বলব না। শেষে একটা অনর্থ না হয়, আমাদের বংশে একটা যাচ্ছেতাই ব্যাপার না ঘটে, দাদার মাথা না হেঁট হয়, তাই বলতে যাচ্ছিলাম। নইলে, আমার আর কি ?

সেদিন আর কোন কথা হইল না।

পরদিন বিমলা পাড়া বেড়াইতে গিয়া একটি কুৎসাপরায়ণা বধূকে কানে কানে অরুণা সম্পর্কে অনেক কথা বলিয়া বিশেষ করিয়া বারণ করিয়া দিয়া আসিলেন, তিনি যেন একথা কর্ণান্তর না করেন। তাঁহাকে বিশেষ স্নেহ করেন এবং তিনিও বিমলা পিসিকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করেন বলিয়াই শুধু তাঁহাকে একথা বলিলেন, নইলে ঘরের কথা কি কেহ পাড়ার লোকের কাছে বলে ?

বধূটি অবশ্য তাহার কর্তব্য পালন করিতে বিলম্ব করিল না। কয়েক দিনের মধ্যেই পাড়ার নিকটবর্তী বাড়ীগুলি অরুণার আলোচনায় মুখর হইয়া উঠিল, অবশ্য অতি নীরবে, অতি সন্তর্পণে।

আরো কয়েক দিন পরে পিসিমা মমতাময়ীকে বলিলেন, বৌদি, আমার আর এখানে থাকা হয় না।

কেন ?

পাড়ার লোকের কথায় তো আর কান পাতা যায় না। তুমি না হয় বাড়ীতে চুপ করে বসে থাক। আমি তা পারিনে। সবাই পিসিমা পিসিমা করে পাগল। কিন্তু যেখানে যখন যাব, সেখানেই বৌমার কথা শুনতে হবে। আমার কাজ নেই এখানে থেকে।

আজ মমতাময়ীকে বেশ একটু গম্ভীর দেখা গেল। পিসিমা আর কথা না বাড়াইয়া আস্তে আস্তে সরিয়া গেলেন।

সন্দেহ জিনিষটা বটগাছের বীজের মত। একটুকু বীজ, তাহা হইতেই ক্রমশ বিরাট একটা বটগাছ গজাইয়া উঠে। অরুণার প্রতি এই যে সন্দেহের বীজ উপ্ত হইল, তাহা ক্রমশ একটু একটু করিয়া বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। বিমলা দেবী অতি সযত্নে তাহাতে বারিসিঞ্চন করিয়া উহাকে সতেজ ও বর্দ্ধিষ্ণু করিয়া তুলিলেন। এ দিকে অরুণার প্রতি তাঁহার মমতার অন্ত নাই। রাত্রে অরুণা যখন ক্ষীর আর মর্তমান কলা লইয়া পিসিমার লুচির থালার পাশে বসিয়া থাকে, তাহাকে বলেন, বৌমা, আর কেন ? সারাদিন সবার জন্ম খেটে খুটে এখন আবার আমার পাশে এসে বসলে। যাও, ঘরে যাও, শোওগে। দেখ নরেশ কিছু চায় টায় কি না। যাও, লক্ষ্মী মা, আর আমার পাতের গোড়ায় বসে থেকো না। বরঞ্চ আর খান পাঁচ ছয় লুচি রেখে যাও পাতে, আর কিছু লাগবে না। আর দুটো সন্দেশ ওই ক্ষীরের সঙ্গে। হ্যাঁ, বাছা, আর কিছু লাগবে না। অরুণা তাঁহার কথা মত কাজ করিয়া একটু হাসিয়া, উঠিয়া নিজের ঘরে যায়।

পিসিমা অতি ধীরে অতি যত্নে অরুণার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়া চলিলেন। অরুণা বহু দিন কিছুই বুঝিতে পারে নাই। কিন্তু এখন যেন বাড়ীর লোকের বিশেষত মেয়েদের ব্যবহারের মধ্যে একটু পার্থক্য, একটু বিশেষত্ব লক্ষ্য করিতে আরম্ভ করিয়াছে। কথাবার্তার মধ্যে যেন সে আনন্দ, সে আন্তরিকতা নাই। কেহই যেন মন খুলিয়া কথা বলে না। অরুণা অবশ্য এ সব উপেক্ষা করিয়াই চলে। নিজের কর্তব্য করিয়া যায়, যথাসম্ভব হাসি-গল্পে যোগ দেয়, অবসর পাইলেই বই লইয়া বসে। কবিতার বই, কলেজের পাঠ্য দর্শনের বই, উপন্যাস ইত্যাদি।

একদিন রাত্রে নরেশের বিষন্ন গম্ভীর মুখ দেখিয়া অরুণা অত্যন্ত ভয় পাইয়া গেল। নরেশকে এমন কখনো সে দেখে নাই। তবে কি তাহার অফিসে কোন গুরুতর গোলযোগ হইয়াছে ? না শরীরে হঠাৎ কোন অসুখের উপসর্গ হইয়াছে ? সে কাছে গিয়া ধীরে ধীরে তাহার পিঠে হাত রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি হয়েছে তোমার ?

নরেশ আস্তে তাহার হাত সরাইয়া দিয়া বলিল, আমার মন ভাল নেই, বিরক্ত করো না। এই কথা বলিয়া নরেশ চুপ করিয়া বিছানার উপর বসিয়া রহিল। একটু পরে বলিল, কেন অমন করে বসে রইলে ? যাও, শুয়ে পড় গে। অরুণা ভীত ও উদ্বিগ্ন চিত্তে সরিয়া গেল। যতক্ষণ নরেশ বসিয়াছিল, ততক্ষণ সে-ও মুখ নীচু করিয়া বসিয়া রহিল। নরেশ যখন শুইয়া পড়িল, তখন অরুণাও শুইয়া পড়িল, কিন্তু তাহার চোখে ঘুম আসিল না। একটা অনিশ্চিত আশঙ্কায় তাহার বুক কাঁপিয়া উঠিতেছে। চোখ দিয়া জল কাটিয়া বাহির হইতেছে।

পর পর কয়েক দিন এমনি করিয়াই কাটিল। অরুণার মন ভয়ে ও উদ্বেগে ভরিয়া উঠিয়াছে। সমস্ত দিন তাহার যে কেমন করিয়া কাটে ভগবানই জানেন। সংসারের কর্তব্যগুলি কলের মত করিয়া যায়। প্রয়োজন মত হাসির অভিনয়ও করিতে হয়, কিন্তু তাহার মনের ভাব ক্রমশই তাহাকে গভীর ভাবে নিপীড়িত করিতে লাগিল। সে কেবলই ভাবে, এ কি হইল ? কেন এই ভাবান্তর সকলের মুখে ? শুধু পিসিমাই তাহাকে এখনও পূর্ব্বের মতই আদর করেন বরং একটু বেশি বেশিই করেন। হয়তো তাহার মনের দুঃখ বুঝিয়া তিনিই একা

সহানুভূতির স্বরে কথা বলেন। বলেন, আহা! বৌমার কি যে হ'ল! এমন হাসি মুখখানা একেবারে আঁধার! আহা! এমন লক্ষ্মী বৌমা!

এক দিন রাত্রে অরুণা যেন নরেশের উপেক্ষা আর সহিতে পারিতেছিল না। সে তাহার কাছে গিয়া ছলছল চোখে বলিল, কেন তুমি আমার সঙ্গে হেসে কথা বলছ না? কেন তুমি এমন গম্ভীর হয়ে থাক সব সময়? কি হয়েছে, বল না?

নরেশের মুখ দিয়া কোন কথা বাহির হয় না।

অরুণা বলে, তোমাকে আজ বলতে হবে, তোমার কি হয়েছে?

এরূপ বহুক্ষণ অনুরোধ ও পীড়াপীড়ির পর নরেশ বলিল, তোমার সঙ্গে আমার আর কোন সম্পর্ক নেই।

কি সর্বনাশ! এমন কথা তুমি মুখে আনতে পারলে? কেন? কি হয়েছে? কেন তুমি আমায় এমন কথা বলছ?

সেটা তোমার নিজেরই বোঝা উচিত।

আমি কিছুই বুঝতে পারছি নে।

আর ন্যাকা সেজো না।

তুমি ভয়ানক ভুল করেছ।

না, আমি ভুল করিনি।

তোমার ভুল এক দিন ভাঙবেই। সেই আশাতেই আমি এখানে থাকব। নইলে তোমার ওই সঠিক কথা শুনেও আমি আর এ বাড়ীতে থাকতুম না।

অরুণার চোখ ছলছল করিয়া ওঠে। নরেশ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে ঘরের বাহির হইয়া যায়।

নরেশ আর অরুণার দাম্পত্য-জীবনে যে ফাটল ধরিয়াছে, তাহা আর জোড়া লাগিল না। নরেশের সমস্ত উপেক্ষার উত্তরে অরুণা অসহায় ভাবে শুধু বলে, তোমার ভুল এক দিন ভাঙবে। আমাকে বিশ্বাস কর, তুমি অত্যন্ত ভুল করেছ।

৪

অরুণা মা হইবে। মা হওয়া নারীর অন্তরের কামনা। নানা প্রকার শারীরিক উপসর্গ সত্ত্বেও অরুণার মনে একটা গোপন আনন্দ ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু স্বামীর উপেক্ষায় সে আনন্দ উপভোগ করিতে পারিতেছে না। তাহার বিশ্বাস হইয়াছে, এইবার সে নিশ্চয়ই স্বামীর মন পাইবে। অন্তত সন্তানের স্নেহে সন্তানের মাতাকেও একটু স্নেহ করিবে।

অরুণা নরেশকে বলে, তোমার আনন্দ হচ্ছে না?

আমার কিছুই হচ্ছে না।

কেন? কেন তুমি এত উদাসীন হয়ে যাচ্ছ দিন-দিন?

নূতন করে আর প্রশ্ন করে লাভ কি?

অরুণা হতাশ হয়, কিন্তু আশা ছাড়ে না। এ কখনো হতে পারে। একটা সম্পূর্ণ মিথ্যা কখনো চিরদিন বেঁচে থাকতে পারে? তবে কেন শাস্ত্রে বলে, 'সত্যমেব জয়তে নানৃতম্'। সত্যের জয় নিশ্চয়ই হবে। মনে মনে ভগবানকে ডাকে। কত আকুল প্রার্থনা করে।

ক্রমশ দিন ঘনাইয়া আসে। প্রথম প্রসূতির মনে কত ভয়, কত উদ্বেগ! এদিকে বিমলার হীন এবং নৃশংস প্রচার ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। পরেশ প্রায় নির্বিকার। মমতাময়ী দুঃখে, বেদনায় প্রায় হতবাক্। বিমলার কিন্তু উৎসাহের অন্ত নাই। মমতাময়ীর সব নিষ্ক্রিয়তা তিনি নিজেই পূরণ করিয়া লইতেছেন। সংসারের কাজকর্মের তত্ত্বাবধান এখন প্রায় বিমলাই করেন।

যথাসময়ে একদিন সন্ধ্যার একটু পরে অরুণার ক্রোড়ে একটি ক্ষুদ্র নবজাতক পৃথিবীর আলোকে চক্ষু উন্মীলন করিল। ডাক্তার ও ধাত্রী ঘরের বাহিরে আসিয়া বলিলেন, দুজনেই বেশ ভাল আছে।

বিমলা জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হয়েছে, ডাক্তারবাবু?

ছেলে। সন্দেশ চাই কিন্তু।

ধাত্রীও হাসিয়া বলিল, আমি চাই সিল্কের শাড়ী।

ডাক্তার বলিয়া গেলেন, প্রসূতির অস্বাভাবিক রক্তপাত হইয়াছে। অত্যন্ত দুর্বল। কয়েক দিন খুব সাবধানে থাকতে হবে।

ডাক্তারের নির্দেশমত ঔষধ ও পথ্য খাইয়া অরুণা তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। ক্ষুদ্র শিশুটি কোলের কাছে ঘুমাইয়াছে।

অরুণা আশা করিয়াছিল, নরেশ নিশ্চয়ই আসিয়া দেখিয়া যাইবে। কিন্তু তাহার সে আশা পূর্ণ হইবার পূর্বেই ঔষধের প্রভাবে নিদ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল।

বিমলা যেন এ সব সহিতে পারিতেছিল না। অরুণা কেন সন্তানবতী হইবে? কেন সে সুখী হইবে? স্বামী সন্তানহীন বিমলার ক্রুর মন হিংস্র হইয়া উঠিয়াছে। এবার অরুণার সর্বনাশ করিবার জন্ত সে তাহার শেষ সাংঘাতিক অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইল। ক্রুর ফণিনী যে ফণা তুলিয়া দংশন করিতে উদ্যত হয়, তেমনি বিষাক্ত মনে বিষাক্ত জিহ্বা সঞ্চালন করিয়া অতি নিম্নস্বরে নরেশকে গিয়া বলিলেন, বাবা, ও ছেলে তোমার নয়। শুধু তাই নয়, কবে কোথায় কাহার সহিত অরুণা ঘনিষ্ঠ ব্যবহার করিয়াছিল, তাহাও বিবৃত করিতে নিরস্ত হইলেন না।

প্রায় বৎসরাধিক কালের মানসিক উদ্বেগ নরেশের মনটাকে অত্যন্ত বিপর্যস্ত করিয়া ফেলিয়াছিল। পিসিমার কথার উত্তর দিবার কোন প্রবৃত্তি তাহার ছিল না। তথাপি যেন আহত জীবের আর্তনাদের মতই সে ধীরে ধীরে বলিল, এখনই কি মুখের চেহারা বোঝা সম্ভব? আমার ছোট বোনটা যখন হ'ল, তখন সে কি বিশ্রী দেখাচ্ছিল। দু'-তিন মাস পরেই কেমন অপূর্ব শ্রী ফুটে উঠল, ঠিক মায়ের মত।

বিমলা বলিলেন, তা হতে পারে। কিন্তু আগের সব ব্যাপার তো আমার চোখে দেখা কি না। ও কখনো তোমার ছেলে নয়, আমি তোমাকে নিশ্চয় বলে দিচ্ছি।

নরেশের মাথায় আগুন জ্বলিয়া উঠিল। পিসিমা আস্তে আস্তে সরিয়া গেলেন। কিছুক্ষণ উন্মত্তের মত বিড়-বিড় করিয়া কি বলিল। তারপর গভীর রাত্রে অরুণার ঘরে গিয়া কাঁথা ও নেকড়ার মধ্যে শিশুটিকে জড়াইয়া লইয়া বাড়ীর বাহির হইয়া গেল। অত রাত্রে পথ-ঘাট প্রায় নির্জন। শ্রীহরি লেনের মোড়ের কাছে দেওয়ালের পাশে পুঁটুলিটি শোয়াইয়া রাখিয়া দ্রুতপদে বাড়ী ফিরিয়া আসিল। শিশুটি তখনও নিদ্রামগ্ন।

ঔষধের প্রভাবে অরুণার ঘুম ভাঙিতে একটু দেরি হইল। শেষ রাত্রিতে ঘুম ভাঙিতেই পাশে শিশুটিকে দেখিতে না পাইয়া ভীতত্রস্ত হইয়া উঠিয়া পড়িল এবং একান্ত দুর্বল শরীরটিকে কোন মতে-

হরবাবুর বিপত্তি

হরবাবু চেঞ্জে আসায় সবাই বেশ একটা হাসির খোরাক পেল। দুদিনের মধ্যেই তাঁকে চিনে ফেললো স্বাস্থ্যান্বেষীর দল। দিবারাত্রি গলায় একটা ঠাকুর্দার আমলের কম্ফটার, মাথায় একটা বাঁদর টুপী আর একটা তালি দেওয়া ওভারকোট যার আদি রং এবং বয়েস নিয়ে ছেলেছোকরাদের মধ্যে বাজী লড়ালড়ি সুরু হোল। আর কিপটের যাশু ভদ্রলোক। প্রায়ই তাঁকে বাজারে মাছওয়ালা, তরকারীওয়ালাদের সঙ্গে তারস্বরে ঝগড়া করতে দেখা যেতো। "মগের মুল্লুক পেয়েচো! ১২ আনা সের। তার থেকে আমার গলাটা কেটে নাওনা!" প্রায় আধঘন্টা ঝগড়াঝাঁটি, দরাদরি করে তিনি হয়তো কিনতেন একছটাক মাছ। লোকে ভাবতো লোকটা খায় কি? তিনটে ছেলেমেয়ে নিয়ে সংসার এইটুকু মাছে হবে কি?

যাই হোক, একে একে সবাইয়ের পরিচয় হোল ওঁর সাথে। ছোট জায়গা — সবাই এসেছে অল্প কয়েকদিনের জন্যে, পরিচয় না হয়ে উপায় কি? কিন্তু হৃদ্যতা বাড়লনা মোটেই। কারণ, পয়সার ব্যাপারে ওঁর হাতটানের কথাটা ছড়িয়ে পড়ল মুখে মুখে। তিনি প্রায়ই পয়সাকড়ি না দিয়ে পিকনিক, পার্টিতে হামলা করতে লাগলেন।

সেদিন সান্ধ্য মজলিসে জল্পনা কল্পনা সুরু হোল কি করে ভদ্রলোককে জব্দ করা যায়। বিনয়ের রাগ সবচেয়ে বেশি। সেদিন বাজারে মুদীর দোকানে কি একটা কিনছিলেন হরবাবু। বিনয় বলেছিল—"ওটা না কিনে—", খেঁকিয়ে উঠেছিলেন হরবাবু—"আমার জন্যে আপনার এত চিন্তা কেন মশাই?" বিনয় সেটা ভুলতে পারেনি। ও বলল—"লোকটা একটা আস্ত ক্রিমিন্যাল-যত সস্তায় আজেবাজে জিনিষ কেনার ফন্দী! একটা মোটা টাকার চোট বসিয়ে দেওয়া যায়না?" প্রায় রাত বারোটা পর্য্যন্ত জল্পনা কল্পনা চলল! তারপর হাসিমুখে সবাই উঠল। তারপরদিন হরবাবুর বাড়ীর সামনে এলো এক জটাজুটধারী সন্ন্যাসী। হরবাবুকে বলল—"কিছু টাকা কামাবার ইচ্ছে আছে? যা দেবে তার ডবল পাবে—একশো দিলে দু'শো, দুশো দিলে চারশো।" লোভে জ্বলজ্বল করে উঠলো হরবাবুর চোখ দুটি—"কিন্তু বাবা আমার সামনেই হবে তো?" "নিশ্চয়ই,

রাত তিনটের সময় টাকা নিয়ে বুড়ো বটতলায় এসো।” গেলেন হরবাবু একশো টাকা নিয়ে। সন্ন্যাসী কিছুক্ষণ তুকতাক করলেন তারপর হরবাবুকে বললেন—“চোখ বোঁজ।” তারপর হরবাবুর হাতে গুঁজে দিলেন দুটো একশো টাকার নোট। হরবাবু আহ্লাদে আটখানা। সন্ন্যাসী বললেন—“ইচ্ছে হলে আবার এসো।” হরবাবুর মাথায় তখন ভূত চেপে গেছে। পরদিন গেলেন তিনি ৫০০ টাকা নিয়ে। আবার সেই তুকতাক। আবার চোখ বোঁজা। আজ কিন্তু হরবাবু চোখ বুঁজে আছেন তো আছেনই। শেষে নিজে থেকেই চোখ খুললেন হরবাবু। সব ভোঁভা। সন্ন্যাসীর টিকিটিরও পাত্তা নেই। মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন হরবাবু—তারপর ডুকরে কেঁদে উঠলেন। কড়কড়ে পাঁচশো টাকা! তারপর তিনচারদিন সেই চির পরিচিত কম্ফটার আর ওভার কোটটি রাস্তায় দেখা গেলনা। শোনা গেল হরবাবুর শরীর খারাপ। ছুটির শেষ দিন। কালই সব ফিরবে যে যার কর্ম্মস্থলে। একটা বিরাট পার্টির আয়োজন হয়েছে। সবাই দল বেঁধে গেল হরবাবুকে নিয়ে আসতে। কিছুতেই আসবেননা তিনি, তারাও নাছোড়বান্দা। শেষে চাঁদা দিতে হবেনা শুনে আসতে রাজী হলেন। পার্টির আরম্ভেই বিনয় উঠে দাঁড়িয়ে নাটকীয় ভঙ্গীতে বলল—“আজকের এ পার্টিটি হরবাবুর সম্মানে—ওঁকে আমরা একটা প্রাইজ দেব।” তারপর হরবাবুর হাতে দিল একটা প্যাকেট। প্যাকেটটি খুলে হরবাবুর চক্ষুস্থির। ৩৯০ টাকার নোট, একটা দাড়ী, একটা পরচুলো সুন্দর করে সাজানো। আনন্দে হরবাবুর দুচোখে জল এসে গেল। বিনয় বলল—‘আপনার ১০ টাকা আমরা এই পার্টির জন্যে আজ খরচ করেছি। আর প্রথমবারে আপনাকে যে ১০০ টাকা দেওয়া হয়েছিল সেটা আমরা কেটে নিয়েছি।” “বেশ করেছো, বেশ করেছো।” হরবাবু আনন্দে আর কথা বলতে পারছেননা। বিনয় বলল—“হরবাবু, আপনার সঙ্গে এই আমাদের শেষ দেখা। আমি সবাইয়ের মুখপাত্র হয়ে আপনাকে দু একটি কথা বলব। সবসময়ে খাবার দাবারে পয়সা বাঁচাবেননা। তাতে আপনার নিজেরই ক্ষতি হবে। আপনি বাজারের সবচেয়ে নিকৃষ্ট জিনিষ সস্তায় কিনে ভাবেন খুব জিতে গেলেন। কিন্তু খুব ভুল ধারণা সেটা। আপনি বাজারের আজেবাজে খোলা বনস্পতি কিনবেননা। সেদিন বলতে গিয়ে তো আপনার কাছে ধমক খেয়েছিলাম।” এবার হরবাবু মুখ খুললেন—“আমি তো আজেবাজে বনস্পতি কিনিনা, আমি কিনি ‘ডালডা’। ‘ডালডায়’ ভিটামিন ‘এ’ আর ‘ডি’ আছে আর ‘ডালডা’ তো স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল।” বিনয় বলল—“হ্যাঁ, ‘ডালডা’ স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল কিন্তু খোলা অবস্থায় ‘ডালডা’ কখনও কিনতে পাওয়া যায়না। ‘ডালডা’ পাওয়া যায় একমাত্র হলদে শীলকরা টিনে যার ওপর খেজুর গাছের ছবি আছে। ‘ডালডা’ সম্বন্ধে এই কথাটি জানা থাকলেই আপনাকে আর ঠকতে হবেনা।” সেদিনকার পার্টিতে হরবাবুর বেশ ভালমত শিক্ষা হয়েছিল বৈকী।

টানিয়া লইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে নরেশের ঘরের দরজায় ধাক্কা দিতে লাগিল। নরেশ উঠিয়া দরজা খুলিতেই অরুণা ঘরে ঢুকিয়া নরেশের হাত জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, সর্বনাশ হয়েছে!

কি হ'ল?

খোকাকে কে নিয়ে গিয়েছে।

নরেশ দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, আমি নিয়ে গিয়েছি। মনে কর সে মরে গেছে। এতক্ষণ হয়তো সত্যিই মরে গেছে।

কি বলছ তুমি?

হ্যাঁ, ও আমার ছেলে নয়। তাই আমি তাকে ফেলে দিয়ে এসেছি।

অরুণা তাহার ক্ষীণদেহের সর্বশক্তি সংহত করিয়া গর্জন করিয়া উঠিল, কে বলেছে একথা?

উত্তেজিত নরেশ বলিয়া ফেলিল, পিসিমা বলেছেন। তিনি সব জানেন।

অরুণা পুনরায় চিৎকার করিয়া উঠিল, পিসিমা! পিসিমা! কি সাংঘাতিক কথা! দুধ-কলা দিয়ে এই সাপ পুষেছি এত দিন। তারই কথা শুনে তুমি এমন কাজ করলে? করতে পারলে? কোন হিংস্র পাষণ্ডও একাজ করতে পারতো না। কোথায় ফেলেছ, শীগগিরই খুঁজে নিয়ে এস, যাও শীগগির যাও। নিয়ে এস আমার খোকাকে, তোমার খোকাকে। কি সর্বনাশ তুমি করেছ, এখনও বুঝতে পারছ না? হা ভগবান্, তুমি এখনও চুপ করে দাঁড়িয়ে আছ?

নরেশের ক্রোধ মোটেই প্রশমিত হয় নাই। সে অরুণাকে একটা প্রচণ্ড ধাক্কা দিয়া বলিল, যাও এখান থেকে।

ধাক্কা সামলাইতে না পারিয়া অরুণা মেঝেয় পড়িয়া গেল। পড়িবার সময়ে দরজার কোণে লাগিয়া তাহার মাথায় একস্থান ভীষণবেগে রক্তপাত হইতে লাগিল। অরুণা সম্পূর্ণ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছে।

প্রায় প্রভাত হইয়া আসিয়াছে। ডাক্তার আসিয়া মাথায় ব্যাণ্ডেজ করিয়া দিয়া ঔষধাদি দিয়া গেলেন। অরুণা তখনও অচেতন। প্রায় একদিন সম্পূর্ণ অচেতন থাকিয়া অরুণার জ্ঞান ফিরিয়া আসিল। কিছু গরম দুধ খাওয়ানো হইল। বিছানায় ভাল করিয়া শোয়াইয়া অল্প পাখার বাতাসের ব্যবস্থা করিয়া নরেশ তাহার পাশে গিয়া বসিল।

নরেশ ভাবিতে লাগিল। অরুণার ফুলের মত মুখখানির দিকে যেন অনেক দিন পরে চাহিয়া দেখিল। এই দুই দিকের সাংঘাতিক ঘটনাবলীতে নরেশের মনটাও যেন অতিমাত্রায় আহত হইয়াছে। সে-ও একটু সান্ত্বনা চায়। পিসিমা ঘুরিয়া ফিরিয়া সহানুভূতির যে অভিনয় করিতেছেন, তাহাতে যেন তাহার মন সান্ত্বনা পাইতেছে না। যাহা হইবার তাহা তো হইয়াছে। এখন অরুণার সঙ্গে একটু আপোষ করা যায় না? সমস্ত জীবনটা সে বহিবে কিরূপে? এক বৎসরেরও বেশি সে অরুণার সঙ্গে ভাল ভাবে সরল ভাবে কথা বলে নাই। যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহা ভুলিয়া অরুণার সঙ্গে আবার স্বাভাবিক জীবন যাপন করা যায় না? জীবনে কত প্রকার কত ঝড়-ঝঞ্ঝা বহিয়া যায়, মানুষ তাহা কাটাইয়া উঠিয়া আবার নূতন আশা, নূতন উৎসাহ লইয়া নূতন জীবনের আস্বাদ পাইতে চায়। তাহারা এখনো জীবনের প্রারম্ভে। কেন পারিব না নূতন করিয়া জীবনটাকে স্বাভাবিক করিয়া লইতে?

অনেকক্ষণ পরে অরুণা চোখ খুলিল। নরেশ ডাক্তারের উপদেশ মত এক মাত্রা ঔষধ খাওয়াইয়া দিল। ঔষধ খাইয়া অরুণা আবার চুপ করিয়া রহিল। চোখ খোলা, কিন্তু দৃষ্টি নরেশের দিকে নয়। নরেশ ডাকিল, অরুণা!

অরুণা কোন উত্তর দিল না। তেমনি অন্য দিকে চাহিয়া রহিল।

নরেশ আবার একটু ঝুঁকিয়া পড়িয়া একটু আদর করিয়া বলিল, অরুণা, আমায় ক্ষমা কর। অরুণা তেমনি নির্বিকার ভাবে চাহিয়া রহিল। অনেকক্ষণ অনেক চেষ্টা করিয়াও নরেশ অরুণার নিকট হইতে কোন কথা বা কোন প্রকার সাড়া পাইল না। চোখ মেলিয়া চাহিয়া আছে। অথচ সে দৃষ্টির কোন অর্থ নাই। অর্থহীন চোখের দৃশ্য যে কি মর্মান্তিক, তাহা যে না দেখিয়াছে সে বুঝিবে না।

নরেশের বুঝিতে বাকি রহিল না, অরুণার মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটিয়াছে, অরুণার পাশে বসিয়াই যে কোঁচার খুঁট দিয়া চোখ মুছিল।

৫

অরুণা ঘরের কোণে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। খাইতে দিলে খায়, খাইতে না দিলে, চায় না। হাসেও না, কাঁদেও না। যে কোন এক দিকে চাহিয়া থাকে। মনে হয় যেন দেখিতেছে, কিন্তু কিছুই তাহার চোখে পড়ে না। আস্তে, জোরে, যে কোন ভাবে কথা বলিলে সে যে শুনিতেছে বা শুনিতেছে না, তাহা বোঝা যায় না।

বিমলা বলে, অমন হয়ে থাকে। কত দেখেছি আমি। ক'দিন পরে সব ঠিক হয়ে যাবে। পেটের ছেলে তো। শোক পেয়েছে, তাই অমন হয়েছে। তোমরা কিছু ভেবো না।

নরেশ কিন্তু না ভাবিয়া পারে না। ডাক্তার দেখায়, স্পেশালিষ্ট দেখায়, কিছুতেই কিছু হয় না। রক্তশূন্যতা ছাড়া অন্য কোন শারীরিক উপসর্গ নাই। কত ঔষধ খাওয়ান হইতেছে, কিছুতেই কোন ফল হইতেছে না।

একজন ডাক্তার বলিলেন, বোধ হয় ওঁর কোলে একটি ছোট শিশু এনে দিতে পারলে ফল হ'ত।

নরেশ বলিল, আচ্ছা দেখি চেষ্টা করে।

ডাক্তার বলিলেন, অনাথ-আশ্রমগুলোয় খোঁজ করুন। ছোট ছেলে থাকলে, কিছু টাকা দিলেই তারা দিয়ে দেবে। আপনাদের কাছে কোনো অযত্ন হবে না, ভালই থাকবে।

ডাক্তার চলিয়া গেলেন।

নরেশের মনে পড়ল, যেদিন সেই দুর্ঘটনা হয়, তার দু'-একদিন পরেই সংবাদপত্রে একটি সংবাদ বাহির হইয়াছিল, শ্রীহরি লেনের মোড়ে একটি পরিত্যক্ত শিশুকে পুলিশ শ্রীবিষ্ণু-অনাথআশ্রমে জমা দিয়াছে।

নরেশ মমতাময়ীকে সঙ্গে করিয়া শ্রীবিষ্ণু অনাথ-আশ্রমে উপস্থিত হইল, আশ্রমের কর্ত্রীকে তাহাদের উদ্দেশ্য জানাইলে, তিনি বলিলেন,

তার পাঁচটি ছোট ছেলে-মেয়ে আছে। দেখুন যদি আপনাদের পছন্দ হয়। প্রথমে যেটি দেখিলেন, সেটি অত্যন্ত কুৎসিত বলিয়া উঁহাদের মনঃপুত হইল না। তারপর আর একটি ছেলেকে আনিতেই মমতাময়ী বিস্ময়ে হতবাক হইয়া গেলেন। তাড়াতাড়ি ছেলেটিকে কোলের মধ্যে লইয়া বলিতে লাগিলেন, এ যে অবিকল তোর মত দেখতে। কি আশ্চর্য! কি সুন্দর মুখখানা! কি সুন্দর চোখ-নাক! আহা কোন অভাগী একে এখানে ফেলে গেছে?

কর্ত্রী বলিলেন, এখানে ফেলে গেলে তো হ'তো। ফেলে গিয়েছিল রাস্তার পাশে। পুলিশ কুড়িয়ে এনে এখানে দিয়ে যায়। ও যে বাঁচবে, সে আশা ছিল না। ভগবান ওকে বাঁচিয়েছেন। এখন দেখছি, ওর ভাগ্য ভাল। আপনাদের মত মা-বাবা পেলে ওর জন্ম সার্থক হবে।

নরেশ পাথর হইয়া গিয়াছে।

মমতাময়ী খোকাকে বার বার চুম্বন করিলেন। নরেশকে বলিলেন, উনি যা চান, ওঁকে দিয়ে একটা গাড়ী ডাক।

বাড়ী আসিয়া সকলকে ছেলেটিকে দেখাইলেন। সকলেই বলিতে লাগিল, কি আশ্চর্য! অবিকল নরেশ। সকলেই জানিত, জন্মের রাত্রিতেই ছেলেটি মারা যায় এবং প্রত্যূষে নরেশ তাহাকে শ্মশানে লইয়া গিয়াছে।

শুধু পিসিমার মুখখানি গম্ভীর হইয়া উঠিল। তিনি কোন কথাই বলিতে পারিলেন না।

শিশুটিকে লইয়া নরেশ অরুণার কোলে শোয়াইয়া দিল। কিন্তু অরুণার সেই নির্বিকার অস্বাভাবিক দৃষ্টি বা ভাবের কোন পরিবর্ত্তন হইল না। নরেশের চোখ ছল ছল করিয়া উঠিল। বলিল, অরুণা, এই যে আমাদের খোকা, একটু কোলে নাও, কতক্ষণ দুধ খায়নি, একটু দুধ খাওয়াও।

অরুণা ভিন্ন জগতে চলিয়া গিয়াছে।

অনেক দিন অনেক চেষ্টা করিয়াও যখন কিছু হইল না, তখন কেহ কেহ পরামর্শ দিলেন, অরুণাকে একটি উন্মাদ-আশ্রমে রাখিতে। হয়তো তাহাতে উপকার হইতে পারে। বিমলা বলিলেন, খোকা আমার কাছেই থাকবে।

নরেশ বলিল, আপনাকে আজই আপনার শ্বশুর-বাড়ীতে যেতে হবে। বিমলা চলিয়া গেলেন।

নরেশ অরুণাকে লইয়া উন্মাদ-আশ্রমে রাখিয়া আসিয়াছে। খোকাকে আদর করে, যত্ন করে, আর তার দুই গাল বহিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়ে। কেবলই মনে পড়ে অরুণার সেই মর্ম্মান্তিক আর্তনাদ, তোমার ভুল ভাঙবে। নিশ্চয়ই তোমার ভুল ভাঙবে।

উন্মাদ-আশ্রমে গেলেই দেখা যাবে, একটি অসামান্য রূপ-লাবণ্যবতী, স্বাস্থ্যবতী, লক্ষ্মীপ্রতিমা মাথায় সিঁদুরের টিপ পরিয়া অবিরত উল বুনিতেছে। মাঝে-মাঝে এদিকে-ওদিকে চোখ ফিরাইতেছে, কিন্তু কিছুই দেখিতেছে না।

স্পেনসার সুব্রত দত্ত

ফিস নেট, পিকাডিলীর উত্তর-পশ্চিমের কফি-বার। হঠাৎ নজরে আসে না, সদর রাস্তার ওপরে নয়, আদি সড়ক পেরিয়ে সিম্পসনের দোকানের পেছনের গলির মধ্যে ফিস নেট কফি-বার।

খরিদ্দারের সংখ্যা খুবই বেশী। পিকাডিলীর অধিকাংশ কফি-বারে, কফির সংগে স্যাণ্ডউইচ কিনতে হবে, তা না হ'লে দোকানদারের পোষায় না। সব খরিদ্দারের স্যাণ্ডউইচ কেনার ইচ্ছে থাকে না। তাই তারা অন্য বার খোঁজে যেখানে শুধু 'কফি' অথবা লিমন দেওয়া চা পাওয়া যায়। ফিস নেট মন বার।

জন মার্ফির এমন বার খোঁজার প্রয়োজন ছিল না। কারণ, প্রথমত সে লণ্ডনে থাকে না—থাকে উইণ্ডসরে। আর দ্বিতীয়ত তার সামর্থ্য প্রচুর। সব চেয়ে বড় কথা হোল—কফি-বার সাধারণের জন্য। জনের জন্য নয়। তবু জন আসে, ফিস নেটে। সপ্তাহে একদিন, আর তা'—গত তিন মাস যাবৎ। জন মার্ফি সেলস একজিকিউটিভ। অফিসের কাছে সপ্তাহে একদিন তাকে লণ্ডনে আসতে হয়। তার বাল্যবন্ধু আর্টিষ্ট ডেরেব গডফ্রে একদিন তাকে এখানে এনেছিল। সেই হোল সূত্রপাত।

ফিস নেটের সামনের দরজায় মানুষ-প্রমাণ এক মোমবাতি। সব সময়ে জ্বলছে। ভেতরের দেওয়ালে ওয়াল পেপারে আঁকা ছোট ছোট মাছ। দরজা দিয়ে ঢুকেই ডাইনে-বাঁয়ে চেয়ার পাতা, একটু দূরে কাউণ্টার—তার লাগাও ছোট ছোট উঁচু বসার টুল। জাহাজের মোটা কাছি ঝুলছে ওপরে বাঁশের দোলনা থেকে। দোলনার গা বেয়ে উঠেছে ইনডোর আইভি লতা। কাউণ্টারের ওপরে এসপ্রেসো কফির এ্যাপারাটাস। পেছনে ফ্রেস্কো। গভীর সমুদ্র—অনেক দূরে অস্পষ্ট লাইট-হাউসের গম্বুজ। আর বোধ হয় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত জেলেদের নৌকা। আইভি-লতার আড়ালে রেকর্ড প্লেয়ার বসান। গান হয়, কদাচিৎ। তার পাশের সরু সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে যাও—বেসমেণ্টে। মালিকের-লাউঞ্জ, বিশেষ বন্ধুদের জন্য।

বুধবার সন্ধ্যে। জেফি গাড়ীকে একটু দূরে পার্ক করে জন মার্ফি দ্রুত পায়ে এগিয়ে আসে। ফিস নেটে আজ বেশী খরিদ্দার নেই। কাউণ্টারের সামনে দাঁড়িয়ে একটু অপেক্ষা করে। তারপর দ্রুত পায়ে জন নীচে নেমে আসে।

এলসিপ্রে লাউঞ্জে ব'সে। এলসিপ্রে ফিস নেটের মালিক ডিক নীলসনের বাগদত্তা, ম্যানেজারও, নীলসন প্রতি বুধবারে

আলগা পায়ে এলসি উঠে আসে, তুমি বোলার পরে কেন আসনি দুষ্টু ছেলে? জনকে চুমু খেয়ে এলসি বলে—তুমি আমাকে ভালবাস কি না তা জানবার জন্য আমি আজ বোলার পরিনি।

জন বলে। তুমি আমাকে ভালবাস—না আমার বোলার হ্যাটকে?

—আমি জানি না জন! দেখছ না—নীলসনের সংগে আজ এক বছরের ওপর এনগেজড হয়ে আছি, অথচ বিয়ে করতে পারছি না! আবার তুমি এসেছ আমার জীবনে—

—কই তোমার জীবনে এলাম! তোমার জীবনে আমার ঠাঁই নেই। আছে এই বোলার হ্যাটের।

—থাক জন ওসব কথা। আমি তোমাকে ভালবাসি কিনা—তার প্রমাণ তুমি নিশ্চয় পেয়েছ, দেখ তোমারই জন্যে আমি আগুন নিয়ে খেলা করছি। নীলসন যদি জানতে পারে।

কি ক'রবে? এনগেজমেণ্ট চুকিয়ে দেবে? না—দুষ্টু, তোমার সংগে ও শেষ করতে পারে না। তোমাকে যে ভালবেসেছে সেই জানে তোমাকে হারান কত কঠিন। আমি জানি ব'লে আমার মন স্থির ক'রতে পারছি না, আর তা ছাড়া তুমি আজও আমাকে জানালে না যে তুমি আমাকে ভালবাস কি না!

—কি হবে তা জেনে জন! আমি তোমার কতটুকুই বা জানি। যদিও গত দু মাস যাবৎ আমরা ঘনিষ্ঠ হয়েছি। আমার যেন কেমন একটা অনুভূতি হয় যে তোমাকে এর বেশী জানতে চাওয়া মানে তোমাকে হারান। লেসলির কথা আমার মনে পড়ে। আমার প্রথম প্রেমিক, আমার সলিসিটর মনিব—যার অফিসে আমি ষ্টেনো ছিলাম। লেসলি বয়সে আমার বাবার মত, তার গলার স্বর, কথা বলার ধরণ—মাথার বোলার, সবই আমার বাবার মত, তাই প্রথম দিনই আমি আকৃষ্ট হই। লেসলি সংসারী, স্ত্রী-পুত্র-পরিবার সবই ছিল তার, তবু আমি আকৃষ্ট হলাম। ওর তা বুঝতে দেরী হয়নি। লেসলি খেলতে এসেছিল আর সে জানতো আমিও খেলতে এসেছি। কিন্তু আমি যে পরিবেশে মানুষ হয়েছি, সে পরিবেশ খেলা ঠিক জানে না। তোমরা হয়তো বলবে—আমার পরিবেশ ভিক্টোরিয়ান তাই ওকে যবে বেশী করে জানতে চাইলাম—তখন ওকে হারাতে হোল। তোমার সম্বন্ধেও আমার সেই ধারণা। তোমাকে বেশী জানতে চাওয়া মানে হারান। আর এই সময়টুকুর জন্য তোমার ওপর আমার যা আকর্ষণ তা আমার ভালবাসা নয়, আমার ভাললাগা।

—নীলসনকে কি তুমি ভালবাস? জন প্রশ্ন করে।

—না। সেটা আমার ভালবাসা নয়, আমার কৃতজ্ঞতা। নীলসনকে আমরা অনেক দিন থেকে জানি। আমি যখন ডনকাষ্টারে থাকতাম তখন ও মাঝে মাঝে আমাদের বাড়ীতে এসেছে। ইনটিরিয়র ডেকরেটর হিসেবে। ফাটকায় সর্বস্বান্ত হয়ে আমার বাবা যেদিন আত্মহত্যা করে, আমার সেদিনের কথা মনে আছে, সেই ঘোর দুর্দিনে নীলসন আমার যথেষ্ট করেছে যার জন্য আমি আজ দু'পায়ে দাঁড়িয়ে।

—আর তার জন্য কি তাকে বিয়ে করতে হবে? এই প্রেমহীন বিয়ে?

—কি করতে বলো আমাকে? তোমাকে বিয়ে করতে?

হবে না। আমি তা জানি আর তার জন্ত মোটেই দুঃখিত নই। ফিস নেটের ম্যানেজারের আর উইণ্ডসরের পোষ্ট একজিকিউটিভ এদের অনেক তফাৎ।

তুমি সুইটী এ যুগের নও। তোমার মধ্যে আজও ভিক্টোরিয়ান যুগের সংস্কার মেশান। আমি অবাক হয়ে যাই তুমি এতটা ক্লাস-কনসাস কেন? তোমার আর আমার মধ্যে এতটু পার্থক্য নেই। তুমি তা ভাল ক'রে জান।—জানো না? না। না আমার থেকে তোমার চোখ সরিয়ে নিও না। আমার দিকে তাকাও—তুমি তো জানো—যদি কেউ তোমাকে কিছু বলে তার থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নেওয়া রূঢ়তা।

এলসি তখন জনের প্রথম দিনের উক্তির কথা ভাবছিল, যা সে ডেরেককে ব'লেছিল—ছোট গলিতে এক কফি-বার। আবার তার নাম ফিস নেট। এ তো ফিস-বারের নাম হওয়া উচিত—যেখানে সাধারণ লোক আসবে। তোমরা so called intellectuals কি সব বিষয়ে বৈশিষ্ট্য জাহির করতে চাও আর ডেরেক তখন হেসেছিল।

ফিস-বার। হ্যাঁ জন মার্ফি একে ফিস-বারই মনে করে।

—সুইট,—বলো জন? আমার প্রশ্নের জবাব দিলে না তো? তুমি এড়িয়ে যেতে ভালবাস। আমার অনেক প্রশ্ন—যদি তোমার ভাল না লাগে—তুমি এড়িয়ে যাও। তাই না সুইটী?—

—না জন! আমি এড়াতে চাই না। আর তোমাকে দুঃখ দিয়ে নিজে দুঃখ পেতে চাই না। চলো—কোথাও বেড়িয়ে আসি।

—কিন্তু তোমার কাউন্টারের হিসেব কে দেখবে?—

—এতক্ষণ যে দেখছিল। আর সে ভাবনা আমার—তোমার নয়। চলো বাইরে যাই।

২

এলসির বয়স বাইশ বছর। জন অবশ্য বলে ওকে আঠারর বেশী দেখায় না। এলসি জানে এ মিথ্যে। তবু ও হাসে। এলসি বাবার একমাত্র মেয়ে। ইয়র্কসায়ারে ওদের ছোটখাট ফার্ম ছিল। সেটা ওর মায়ের খেয়াল। জেনী গ্রে অষ্ট্রেলিয়ার মেয়ে। লণ্ডনে হলিডে করতে এসে হেনরী গ্রের প্রেমে পড়ে। হেনরী গ্রে-ষ্টক ব্রোকার অথচ কাব্য-ধর্মী। অদ্ভুত মিল। জেনী গ্রে বোধ হয় ভাবুক, হেনরীর প্রেমে পড়ে।

এলসির প্রথম জীবন কাটে সম্পূর্ণ মায়ের অনুশাসনে। বাড়ীতে গভর্ণেস ছিল। জেনীর মনে ভিক্টোরিয়ান যুগের আভিজাত্যের যে কল্পনা ছিল—তার সে রূপ দিতে চেয়েছিল বাস্তব জীবনে। তাই সাধারণের শিক্ষার থেকে এলসির শিক্ষা বিভিন্ন হোল। এলসি কিন্তু তার মায়ের চেয়ে বাবাকে অনেক বেশী ভালবাসতো। আবছা আলো-আঁধারে মেশা শৈশবের এক ঘটনা সে ভুলতে পারে না। সে তার বাবার ছবি। যে বাবা প্রতিদিন সকালে টেলিগ্রাফ আর ফিনান্সিয়াল টাইমস হাতে নিয়ে অফিস যেত আর সন্ধ্যেবেলায় সুইনবার্ণ হাতে আগুনের ধারে বসে কখনো ধীর কখনো উদাত্ত কণ্ঠে আবৃত্তি করতো—

"But what thing dost thou now—Looking Godward to cry—

I am 1, Thou art thou, I am low—thou art high ?

I am thou whom thou seekest to find him—find thou but thyself, thou art I."

ঠিক মানে সে বুঝতো না। তবু ভাবতো—বাবা যেন কি একটা চায়। তার আভাস পেয়েছে—নাগাল পায় নি। বেচারা বাবা!

তবু এলসির কাছে এই উদাস-দৃষ্টি মেশান বাবার চেয়ে বেশী ভাল লাগতো—বোলার হ্যাট মাথায়—সাদা ষ্টিফ কলার আর রোল-করা ছাতা হাতে—বাবার ছবি। বোলার হ্যাটপরা বাবা। কাল কুচকুচে বোলার, বড় ভাল! এলসির বড় ইচ্ছে হ'তো একদিন মাথায় বোলার পরে, ওদের পাশের বাড়ীতে কেণ্টকী থেকে টেডিরা এসেছিল হলিডে করতে। কেণ্টকী থেকে যারা ইয়র্কসায়ারে হলিডে করতে আসে—তাদের অনেক পয়সা থাকা স্বাভাবিক। এজন্য জেনী গ্রে টেডিদের চা'য়ে ডেকেছিল। আর এলসি ওদের বাড়ীতে যেতে পারতো। টেডির সংগে এসেছিল—ওর নিগ্রেস আনি ম্যাগি। বুক ঠিক বোলারের মত—কাল কুচকুচে শক্ত, গোল।

ওর যখন সতের বছর বয়স তখন ওদের সংসারে মস্ত অঘটন ঘটে গেল। হেনরী গ্রের আত্মহত্যা। শুধু আত্মহত্যা নয়। জেনীকে হত্যা করে আত্মহত্যা। ঘুমোবার ওষুধ খেয়ে কার্বন মনক্সাইড পয়সনিং। পোষ্ট মর্টেম এ দেখা যায় জেনীকে যে পরিমাণ 'ডোস' দেওয়া হয়েছে—তাই প্রাণনাশের পক্ষে যথেষ্ট। ফাটকায় হেনরীর যথাসর্বস্ব বিকিয়ে গিয়েছিল। ফার্ম হাউসও বাঁধা পড়েছিল। তাই আত্মহত্যা ক'রে সে মুক্তি পেল। এলসি কিন্তু আজও বোঝে না যে বাবা মাকে কেন ঘুমের ওষুধ দিল। আর তাকে দিল না। হয়তো ও'কে দেবার সুযোগ অনেক কম ছিল। রাত্রে 'সাপারের' কফিতে মাকে ঘুমের ওষুধ দেওয়া খুবই সোজা—তাকে নয়। তাই বোধ হয় সে বেঁচে গেল।

নীলসন এলো তখন এগিয়ে। বাইশ বছরের ইনটিরিওর ডেকরেটার। ওদের বাড়ীর ডেকরেশান সম্বন্ধে মতামত প্রকাশের জন্ত সে একাধিক বার এসেছে—এবং হেনরী তাকে অত্যন্ত পছন্দ করতো। নীলসনের বাড়ী হেনরীর কাজিনের বাড়ীর লাগাও। ওদের মধ্যে যাতায়াতও ছিল, তাই হেনরীর ইচ্ছেয় জেনীকে দু'-একবার নীলসনকে চায়ে ডাকতে হয়েছে। জেনী অবশ্য তা কোন দিনই চায়নি।—কি না ইনটিরিওর ডেকরেটার। তবু যদি অক্সফোর্ড বা কেমব্রিজের আণ্ডার গ্রাজুয়েটও হোত।

গ্রেরা যে দিন আত্মহত্যা করে সেদিন জুনের প্রথম সপ্তাহের এক দিন। ওদের পর্টুগালে হলিডে করার আর ক'দিন মাত্র আছে। অনেক ভোরেই আলো এসে এলসির ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েছিল—ফার্মহাউসে মোরগরাও জানান দিচ্ছিল যে ভোর হয়েছে। একটু শিরশিরে ভাব ভোরের বাতাসে, কিন্তু কেন জানি না—এলসির সারা শরীরে যে কিসের শিরশিরানি অনুভব করেছিল। চাদরটা ভাল করে টেনে নিয়ে সে আবার শুয়ে পড়েছিল। ঘুম ভাঙলো ফার্মহাউসের পুরোনো লোক জিমির ডাকে। বেলা তখন সাড়ে নটা, ছুটির দিনও নয়, মঙ্গলবার। জিমের কাজ ছিল—

প্রতিদিন এই সময়ে টাটকা দুধের ক্রীম আর ডিম পৌঁছে দেওয়া গৃহকর্ত্রীর হাতে, যে অনেক আগেই উঠতো। কিচেনে জিনিষ রেখে জিম চলে যাচ্ছিল—কিন্তু কার্বন মনক্সাইড-এর গন্ধে সে থমকে দাঁড়াল। মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ন'টা, বাড়ীতে কেউ ওঠে নি। কর্তার গাড়ীও গ্যারাজে। জিমের ব্যাপারটা খুব ভাল লাগে নি। কিন্তু সে কি করতে পারে? বেডরুমে নক করার সাহস তার ছিল না। সে চলেই গিয়েছিল। আবার ফেরত এলো।

আধ ঘণ্টা বাদে, এবারে সে দেশলাই জ্বালিয়ে দেখলো কিচেনের কোনও গ্যাস লিক করছে কি না। কিন্তু কোন হদিশ পেল না। এলসিকে সে জন্মাতে দেখেছে—তাই সাহস করে এলসির ঘরে সে ধাক্কা দিলো।

খোলা জানলা দিয়ে এক মুঠো নরম রোদ এসে পড়েছিল এলসির শোবার ঘরে। ভোরের দিকে তার একবার ঘুম ভেঙেছিল, তাই এবারে হঠাৎ ঘুম ভাঙলো না। দু-একবার জিমের ডাকের পর সে এলো উঠে। পায়ের কাছেই ড্রেসিং গাউন আর বেড রুম স্লিপার। দরজা খুলেই জিমকে দেখে ও একটু অবাক হোল।

গুডমর্ণিং মিস গ্রে।—গুডমর্ণিং এলসি বলল। ক্রিম আর ডিম কিচেনে রেখে দাও।

জিম বললে, আমি সব রেখে দিয়েছি—বেশ ভাল। বড় বেলা হয়ে গেছে না? মা হয়তো রাগ করবে। আজ আবার আমার গ্রীক পড়ার দিন। হ্যাঁ মা, বুঝি আমার দরজায় নক করতে বলেছে?

মিস গ্রে! জিম আমতা আমতা করতে লাগলো।

কি হয়েছে? তুমি সকাল বেলায় অমন হাঁদার মত কেন দাঁড়িয়ে? কি বলবে?

মিস গ্রে তোমার বাবার গাড়ী গ্যারেজে রয়েছে।

তাতে আর কি! হয়তো গাড়ীর কিছু গণ্ডগোল হয়েছে।

তোমার মা কিচেনে নেই। তাকে সকাল থেকে দেখিনি।

মা হয়তো কাজে ব্যস্ত এদিক সেদিক কিন্তু কেন?

তোমার বাবার বোলার হ্যাট—হ্যাট র‍্যাকে।

বাবার বোলার হ্যাট র‍্যাকে? ঠিক দেখেছ? বাবা তাহলে অফিসে যায়নি, কেন? আমি তো কিছুই জানি না।

ওরা কেউ ঘুম থেকে ওঠেনি, আমি তাই তোমার দরজায় ধাক্কা দিয়েছি। তুমি দেখ ওদের দরজা নক করে।

কোন সাড়া পেল না—দরজা ধাক্কা দিয়ে এলসি। আস্তে জোরে অনেক বার। শেষে সে কেঁদে ফেলেছিল।

পরের ঘটনা খুবই সোজা। জিমের টেলিফোনে পুলিশ এলো। দরজা ভেঙে ঘরে ঢোকা হোল, গ্রে'রা তখন মৃত। হেনরীর স্বীকারোক্তি ছিল আর ছিল এলসির কাছে মার্জনা ভিক্ষা, জেনীর কোনও স্বীকারোক্তি ছিল না। তাই আদালতের অনুমান স্ত্রীকে হত্যা করে হেনরী আত্মহত্যা করেছে।

জবানবন্দী দিয়ে এলসি নিজের ঘরে আসে। খোলা জানলা দিয়ে ফার্ম হাউসের ভেড়াগুলোকে দেখা যাচ্ছিল। নির্বাক নীরব। একঘেয়ে এলসির মনে হোল সব একঘেয়ে, আগে এই ভেড়াগুলোকে সোনালী রোদে দেখে তার মনে হয়েছে কি শান্তিময় এই পরিবেশ। আজ তার মনে হোল—সব একঘেয়ে—মরবিড।

কিউজ্যারালের পরে বাড়ী ছাড়তে হোল, বাবার কাজিন থাকতো ডনকাষ্টারে, তার কাছে এলো, 'গ্রে'দের পরিচয়ের গণ্ডী বড় ছোট, এলসির মামার বাড়ীর সকলে থাকতো অষ্ট্রেলিয়ায় আর জেনীর স্বাবাবির জন্ত স্বস্ততাও হয়নি কারুর সংগে। যেনকাষ্ট ওর কাকা। নিঃসন্তান—টেকনিসিয়ান। তার আশ্রয়ে এলসি এলো—মাথা নীচু করে। স্থাবর অস্থাবর সব সম্পত্তি পেছনে রেখে, হেনরী গ্রের যথাসর্বস্ব দেনায় বিকিয়ে গিয়েছিল।

ডনকাষ্টারে চার্চ থেকে ফেরার পথে এক রবিবার ওর নীলসনের সংগে দেখা।—গুড-মর্ণিং মিস গ্রে—নীলসন বলেছিল। গুড-মর্ণিং কোন রকমে প্রত্যভিবাদন করে এলসি লজ্জায় মাথা নীচু করেছিল। তার অতীত নীলসনের অজানা নয়। তাই ডনকাষ্টারে সেই সাধারণ পরিবেশে এলসি যেন নিজেকে বড় ছোট মনে করেছিল। নীলসন স্বভাবতঃ স্বল্পভাষী, তবু সে এলসিকে বলে, যে তার দ্বারা যদি কোনও উপকার হয় সে সানন্দে তা করতে রাজি আছে।

আমি কারুর কাছে কোনও দাক্ষিণ্য চাই না মিঃ নীলসন, এলসি বলেছিল।

এ দাক্ষিণ্য নয় মিস গ্রে, এ আমার খৃষ্টীয়ান মনোবৃত্তি—নীলসন ব'লেছিল।

তারপর নীলসনের সহায়তায় এলসি সর্টহ্যাণ্ড আর টাইপরাইটিং শিখলো, আর ছ'মাসের মধ্যে লণ্ডনে সলিসিটর কার্মে ষ্টেনোর কাজ পেল। বয়স তখন তার আঠার। তার মনিব—লেসলি হার্পার। তার প্রথম প্রেমিকও। প্রথম প্রেম মুক্ত হতে না হতে শেষ হয়েছিল। লেসলী হার্পার এলসিকে ঠিক বুঝে উঠতে পারে নি। আঠার বছরের একটি মেয়ে তার চুয়াল্লিশ বছর বয়সের মালিকের সংগে প্রেম এক কারণেই করতে পারে—লেসলি জানতো। তার চাকরীর উন্নতির জন্ত। এ কিন্তু আলাদা।

বেবী, তোমার বয় ফ্রেণ্ড নেই? লেসলি তাকে প্রশ্ন করেছিল।

তুমিই কি আমার সব নও? এলসি বলেছিল—লেস, আমি তোমাকে চুমু খাই না, খাই একটা কালো কুচকুচে বোলার হ্যাটকে। যার থেকে নীলচে আভা ঠিকরে বেরোয়। সলিসিটর লেসলি—এ সব তার হিসেবের মধ্যে নেই। যবে সে বুঝলো—এলসি গ্রে সীয়েরিয়াস হয়েছে—তখন সে এক দিন এলসিকে বললে যে, তার কাজ বেশী হবার জন্ত সে অন্ত ষ্টেনো রাখবে, এলসি তার জুনিওরের কাজ করতে রাজি আছে কি না। অধ্যায় সেখানে শেষ করে—এলসি কাজে ইস্তফা দিল। তারপর কিছু দিন এ-দিক সে-দিকে কিছু কাজ করে এলসি এলো ম্যানেজারেস হয়ে—ফিস নেটের। নীলসনের নতুন ব্যবসায়। আর সে প্রায় সাড়ে তিন বছরের কথা।

৩

নীলসনকে বিয়ের তারিখ দেবার সময় হয়েছে। এক বছরের ওপর সে অপেক্ষা করছে। এলসির আজও সময় হোল না। জন মার্কির কথা নীলসন জানে কি জানে না—এলসির জানা নেই এলসি অবশ্য এক দিন ওদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল, ওর পুরনো অফিসের পরিচিত বন্ধু বলে।

শুধু নীলসনকে তারিখ দিতে হবে না, জনকেও দিতে হবে। জন ওর ফ্ল্যাট-এ আসতে চায়, এলসিকে পরিপূর্ণ ভাবে পেতে।

এলসি তারিখ দেয় নি, দেবে কি না জানে না। প্রবৃত্তিতে তার বাধছে। ভিক্টোরিয়ান সংস্কার মাখান প্রবৃত্তি, যে প্রবৃত্তি জেনী গ্রে তার মজ্জায়-মজ্জায় মিশিয়ে দিয়েছে।

ভাল লাগে না তার এই একঘেয়েমিতে ! সকাল-সন্ধ্যে ছোট ফিস নেটে কাটান, একঘেয়ে লোকের মুখ দেখা, রেকর্ড প্লেয়ারে এক গান শোনা ! এ জীবন কি এলসি গ্রের জন্য ? ইয়র্কশায়ারের খোলা মেলা আবহাওয়ার হেনরী গ্রের সুইনবার্ণ শোনা মেয়ে !

জেনী গ্রের ভিক্টোরিয়ান আভিজাত্য মাখান—সবারি শেখান মেয়ে ! মুক্তি চাই, এই একঘেয়েমি থেকে। সামনের শনিবার নীলসন 'ফিস-নেটে' আসবে না—এলসিও সেদিন ছুটি নেবে, দোকানের ক্যাসে কে বসে না বসে, তার ভাবনা সে ভাববে না।

কোথায় যাবে ? ছবি দেখতে ? না, আর্ট-গ্যালারীতে। ন্যাশনাল আর্ট গ্যালারীতে না গিয়ে কেন যে সে 'টেটে' গেল, সে নিজেই জানে না। ক্যাণ্ডিনস্কির এক্জিবিসন হচ্ছিল, মডার্ণ আর্ট সে পছন্দ করে না—নীলসন করে। তবু সে এগিয়ে এলো। বাঁ দিকের দু' নম্বর ঘরে ডেরেক গডফ্রের সংগে দেখা। ভ্যান গ'র 'সান-ফ্লাওয়ারের' সামনে সে দাঁড়িয়েছিল। এর আগে সে 'সান ফ্লাওয়ার' অরিজিন্যাল দেখেনি—ছোট কার্ডে দেখেছে, 'ফ্লাওয়ার-ভাসে' সূর্যমুখীর গুচ্ছ। তার কয়েকটা পাতা আলগা—কয়েকটা ম্লান। এত সজীব রঙের খেলা যে মনে হয়—এ ছবি, না বাস্তব ? বাস্তবতার চেয়ে বেশী এর রঙের নেশা। কি যেন আছে ঐ রং-এ, যা চোখে নেশা লাগিয়ে দেয়। ডেরেকের চোখে তার নেশা। এলসিরও।

একটু পরেই ডেরেক ওকে আবিষ্কার করলে। ডেরেক ফিস-নেটের পুরোনো খরিদ্দার। নিয়মিত অতিথি। আর তা ছাড়া আর্টের ব্যাপারে নীলসনের সংগে তার কিছুটা আলাপ আছে। অতএব, সে ফিস-নেটে খরিদ্দারের চেয়ে কিছু বেশী।

গুড আফটারনুন মিস গ্রে, আপনাকে এখানে আশা করিনি—ডেরেক বললে।

গুড আফটারনুন। প্রত্যভিবাদন জানিয়ে এলসি বললে, কেন, টেট কি শুধু আপনাদের জন্য। আর্ট না হয় আমরা বুঝি না। কিন্তু সুন্দর-অসুন্দর তো বুঝি !

না না, আমি তা বলছি না। মিঃ নীলসন বলেন যে, আপনি ক্লাসিকের ভক্ত। তাই ওকথা বলছিলাম। চলুন, নীচের রেস্তোরাঁয় কফি খেয়ে আসি।

রেস্তোরাঁয় কিছুক্ষণ গল্প হবার পর ডেরেক হঠাৎ একটা কথা বলে ফেলল। জন বলছিল, আপনি মিঃ নীলসনের সংগ চুকিয়ে দিচ্ছেন। এ কথা সত্যি ? ডেরেকের সংগে এলসির এমন কিছু অন্তরঙ্গতা হয়নি, যাতে সে তাকে এমন কথা জিগ্যেস করতে পারে—এলসি ভাবলো। আবার এ-ও মনে হোল—তার গল্প জন সকলকেই বলে বেড়ায়। আর সে বলা মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে।

আর কি বলেছে মিঃ মার্ফি আপনাকে ? এলসি উদ্গ্রীব হয়ে প্রশ্ন করল।

না, থাক মিস গ্রে ! সে কথায় কাজ নেই। আমার কিন্তু অন্য ধারণা ছিল আপনার ব্যাপারে। কারণ প্রথম দিন জন ফিস-নেটে এসে যা মন্তব্য করেছিল, আমার ধারণা আপনি তা শুনেছিলেন। তাই পরে আমি একটু অবাক হয়েছি। আজ মনে হচ্ছে, আপনি তা শোনেন নি, গানের শব্দ। রেকর্ড-প্লেয়ারে গান বাজছিল তখন—এপ্রিল-লাভ।

শুনেছিল এলসি সে-মন্তব্য। এই ফিস-নেটের angler-টি তো বেশ। ফিস-নেট মন্দ নয়—anglerও ভাল। কিন্তু ভাল মাছ কি এই করে আসে ? অনেক বড় মাছ আবার angler-কে জলে নিয়ে যায়, জান তো ? তবু এলসি ডেরেককে বললে, কই আমি তো কিছু শুনিনি ! কে বলেছিল মিঃ মার্ফি ! বলুন না ?

মাপ করবেন আমাকে। আমার অনধিকার-চর্চার জন্য মাপ চাইছি। থাক ও প্রসংগ। দু'জনে চুপ করে বসে রইলো অনেকক্ষণ। তার পর এলসি বললে, চলুন, ওঠা যাক এবার।

৪

বেডরুমের জানলায় পর্দা বিকেল বেলায় এলসি ফেলে দিয়েছে। আজ জন আসবে তার ফ্ল্যাটে। এ বুধবার নীলসন ডনকাষ্টারে যায়নি। তবু এলসি 'জনের' সংগে 'ডেট' বজায় রেখেছে। আজ জন আসবে—ষ্ট্রাইপড ট্রাউজার পরে, হাতে থাকবে রোল-করা সিল্কের কভারে ছাতা, গলায় ফল্‌স ষ্টিফ কলার আর বোলার হ্যাট মাথায়।

আজ সকাল থেকে এলসি ফিস-নেটে যায়নি। শরীর অসুস্থ নীলসনকে জানিয়েছে। আর জানিয়েছে, কেউ যেন তাকে ব্যস্ত না করে, কেউ নয়। সে একলা থাকতে চায়। বোলারের ইতিহাস আজ শেষ হবে। লেসলি হার্পার, জন মার্ফি, তোমাদের জাত আর এলসি গ্রের জাত—একই, আবার আলাদা। মিল তোমাদের সবারিতে, আর অমিল ব্যাংকের খাতায়, তোমাদের পাড়ায়। মে-ফেয়ার আর কিলবার্ণ ! নিউ আলিপুর আর রামরাজাতলা। জন মার্ফির জেফির এলসিকে বিলাস-সংগিনী করার জন্য প্রস্তুত। জীবন-সংগিনীর মর্যাদা দেবার জন্য নয়। এলসি, গ্রে বুধবারের সান্ধ্য-নর্মসহচরী। Evening cup of tea !

এলসির আপত্তি থাকার কোন কারণ থাকতো না, যদি সে তার অতীতকে অস্বীকার করতে পারতো। যদি সে ভুলতে পারতো সে হেনরী গ্রের মেয়ে, বোলার-পরা হেনরী গ্রে, ষ্টক-ব্রোকার হেনরী

গ্রে! যদি সে অস্বীকার করতো তার মায়ের অনুশাসন। না না, এলসি এই সাধারণ ছেলেদের সংগে কিছুতেই বেরোবে না। ওর আঠার বছর বয়সে আমি coming out 'বল' দেব, তখন অক্সফোর্ড বা কেমব্রিজের আণ্ডার-গ্রাজুয়েটদের সংগেও বেরোতে পারে। যাদের ভবিষ্যৎ আছে। এলসি কি করে তা ভোলে? যে সমাজের সে এক দিন ছিল, আজও সে তার স্বপ্ন দেখে। যদিও সে আজ, সে একলা সমাজ-ছাড়া। তবু এলসি বোলারের স্বপ্ন দেখে।

কিন্তু এই 'অবসেসন'-এর জন্য কি সে নিজেকে ক্ষমা করতে পারে? জন মার্কির পরিচয় সে পেয়েছে। অতি সাধারণ আত্ম-সচেতন জন, যে জানে তার জেফির গাড়ী আছে, যে জানে প্রতি বছর সে 'কন্টিনেন্টে' হলিডে করতে পারে, যে জানে অন্য শ্রেণীর সংগে তার অমিল অনেকখানি। ব্যাংক ব্যালান্সে, পোষাকে, জীবন-মানে। তার মধ্যে সাহিত্য নেই, রসবোধ নেই, তবু এলসি আকৃষ্ট হয়েছে। আর শুধু আকৃষ্ট হয়নি, নীলসনকে দিনের পর দিন বঞ্চনা করেছে। আজ তার চূড়ান্ত। জন আজ তার গোপন-কুঞ্জের অভিসারী!

যে জীবন কোন দিন মুকুলিত হবে না, তার কি প্রয়োজন আছে? হেনরী গ্রে পথ দেখিয়ে গেছে। কলা-পিয়াসী হেনরী। ব্যাঙ্কারের মেয়ে জেনী গ্রে জীবনে বিশ্বাসী ছিল। তার পূর্বপুরুষের রক্তে বেঁচে থাকার স্পৃহা। সেই রক্ত জেনীর। তাই হেনরীকে হত্যা করতে হোল জেনীকে ওভারডোস দিয়ে। জেনী—জীবনে বিশ্বাসী।

আজ এলসি কি তার রক্তে তার বাবার ডাক শুনেছে? বোধ হয় তাই। ঘুমের ওষুধ ঠিক আছে। কফির সংগে দু'জনের সে কতখানি ওষুধ মিশোবে, সে-ও তার ঠিক আছে। তার পর ওরা দুজনেই ঘুমোবে আর সে ঘুম আর ভাঙবে না।

কিলবার্ণ রোড যেখানে ল্যাডব্রুক রোডের সংগে মিশেছে, সেখানে বুধবার সন্ধ্যেবেলায় কালো রংএর জেফির থামলো। আবছা ষ্ট্রাইপড-ট্রাউজার পরা, নীলচে কালো বোলার মাথায় জন মার্কি নামলো। এদিকটাও কিছুটা ইষ্ট এণ্ড এর মত—অস্ফুট স্বরে মন্তব্য হোল, যাক্ গে।

জানলায় এলসি দাঁড়িয়ে, পর্দার আড়ালে। গাড়ীর আওয়াজ নেমে এলো নীচে। সে এসেছে। তার জীবন-রংগমঞ্চের নায়ক। দুজনে ওপরে এলো। ওপরে দুটো ঘর, বেড-রুম আর সিটিং-রুম। ঘরে হ্যাট-র‍্যাক নেই; মাথা থেকে বোলারটা খুলে টেবিলের ওপর রাখতে যাবার সময় এলসি বললে, খুলো না বোলার জন, দাঁড়াও তোমায় আমি দেখি। তোমার মনের নাগাল পাওয়া দায় সুইটী। কেন তুমি কি আমাকে দেখনি? এসো, কাছে এসো।

ধরা দিলে না এলসি। ধরা তো দিতেই হবে। আজ মধুযামিনী, মধু নেই, বিষের পাত্র পূর্ণ। গরল দেবে সে জনকে। নিজের মনে মনে সে হাসলো, তারপর জনকে বললে, আমার হাতে তৈরী করা কফি নিয়ে আসি ডারলিং, খাবে না?

উত্তরের অপেক্ষা না করেই এলসি চলে আসে কিচেনেতে।

ওষুধ মেশান হয়ে গেছে জনের পাত্রে। চিনি দিল মিশিয়ে তার নিজের পাত্রে তখনও দেওয়া হয়নি ট্যাবলেট, হঠাৎ ওর নজর গেল সামনের ছোট আর্সিতে। জনের ছায়া।

সে হাসছে, তোমাকে দেখতে এলাম সুইটী তোমার কাজের মাঝে, কিন্তু ও কি? তোমার কি শরীর খারাপ হয়েছে? তোমার কফি আমি করে দি, তোমাকে বড় ক্লান্ত দেখাচ্ছে। জন ওকে কফি করে দেয়। ওষুধ ছাড়া কফি। তারপর নিজের পাত্র হাতে নিয়ে এলসির সঙ্গে বেডরুমে আসে। না, সে দেখেনি।

ঘুম আসছে জনের, চোখের পাতা ভারি হয়ে। আমার যেন কি হয়েছে সুইটী, একটু ঘুমিয়ে নি, কেন জানি না ঘুম পাচ্ছে আমার, একটু ঘুমোই। ঘুমিয়ে পড়েছে জন, উঠে এসে এলসি ওর গলার টিককলার আলগা করে দেয়। ভ্রু দুটো কুঁচকে ওঠে তার, এইতো তার সুযোগ। এখন ট্যাবলেট দেওয়া এক কাপ কফি খেয়ে সে গ্যাসের মিটারের চাবিটা ঘুরিয়ে দিতে পারে। ঘরের দরজা জানলা সবই বন্ধ। কি করবে সে? হেনরী গ্রে কি পথ দেখিয়ে যায়নি?

ভাবছে এলসি, কিন্তু সে ভাবতে পারে না। কিন্তু কেন সে মরবে? কেন? কেন? তার জীবন তো আজও অপরিপূর্ণ। সে কি জেনী গ্রের মেয়ে না, যে জীবনে বিশ্বাসী? জেনীর রক্তে আদিম ঔপনিবেশিকের ধারা, যারা অজানাকে জানবে অষ্টাদশ শতাব্দীতে অষ্ট্রেলিয়ায় গেছে, কত বিপর্যয় অস্বীকার করে, রাত্রির তমসাকে ডুবিয়ে দিয়েছে যাদের বিশ্বাসের প্রত্যুষ-সূর্য।

আচ্ছা, নীলসন কেন বোলার হ্যাট পরে না? কর্ডরয়ের ট্রাউসার পরা ক্যাসুয়াল কন্টিনেন্টাল কার্ডিগান পরা তার ডিক নীলসন। সে কি পরবে না, যদি এলসি তাকে বলে? সে তো তাকে ভালবাসে। আর একথাও সে বলেছে, বেবী তোমার মন তুমি জানো না, আমি জানি, আমার ভালবাসা তোমার ভাল-মন্দ পেরিয়ে তোমার সব কিছুকে। যদি ভুল করে থাকে আমায় সুযোগ দিও শুধরে নেবার।

তাই হোক, নীলসন শুধু একবার বোলার হ্যাট পরুক তার জন্য। জনের খুলে-ফেলা বোলার, এলসি দেখুক তাকে দু'চোখ ভরে। শেষ স্বপ্নের অঞ্জন মুছে যায় তার চোখ থেকে তারপরে। সে জেনী গ্রের মেয়ে, তার নতুন জীবনের উপনিবেশের আজ গোড়াপত্তন হোক। সে-ও ঔপনিবেশিক। সে মরতে পারে না।

টেলিফোনের ডায়ালে এলসি হাত দেয়, তারপরে ফিস-নেটে টেলিফোন করে 'জেরাড •••১'।

There may be some things better than sex, and some things may be worse; but there is nothing exactly like it."

—*W. C. Fields*,

আপনার ত্বকও

চিত্রতারকাদের ত্বকের মতই সুন্দর হয়ে উঠতে পারে

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

শ্রীমতী বাসবী বসু

দরজা নাড়ার শব্দে উঠে অর্গল খুলে দেয় অজয়। কণিকা ঘরে ঢোকে—কি গো আজ আর খাবে না নাকি? মাথা ধরেছে বুঝি?

ক'টা বেজেছে? নিজের গলার ভারী আওয়াজে নিজেই চমকে ওঠে অজয়। পাছে কণিকা লক্ষ্য করে তাই তাড়াতাড়ি সহজ হবার অভিপ্রায়ে বলে—ছেলেরা কোথায়? তাদের খাওয়া হয়ে গেছে?

অনেকক্ষণ খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে তারা। রাত তো কম হয়নি, এগারোটা বেজে গেছে যে।

অজয় বলে—তাই নাকি? চলো খেতে যাই। তোমারও বোধ হয় খাওয়া হয়নি?

এ কথার উত্তর দেয় না কণিকা। কারণ, দিনে ওরা আগে পরে যেমনই হোক খায়, কিন্তু রাতের খাওয়া চিরকালই একসঙ্গে।

খেতে বসে অজয়ের কম খাওয়া নিয়ে কণিকা অভিযোগ করে। উদ্বেগ জানায় শরীরের জন্যে। তবুও কিন্তু ভাল করে খেতে পারে না অজয়—কণিকার আবেদন ওর মনের অন্দর মহল পর্য্যন্ত পৌঁছায় না।

খেয়ে উঠে কিছুক্ষণ মেডিক্যাল জার্ণালগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করে। আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানের কোন নবতত্ত্ব চিন্তাধারার সাথে পরিচিত হবার চেষ্টা করে অজয়। অথবা চলমান পৃথিবীর তত্ত্বসংগ্রহের সাথে সাথে ধূমপানের আয়াসটুকু উপভোগ করে—এটা তার চিরদিনের অভ্যাস।

আজ রাতটা একটু মাত্রাধিক্যই হয়েছে দেখেও ষ্টাডিরুমে গিয়ে ঢুকলো অজয়। পৃথিবীর কোন তথ্যে আজ তার মন রস পাবে না—একথা সে নিজে ভাল করেই জানে। তবুও পড়াশোনার অছিলাতে একটু একা থাকতে চায় সে।

কণিকাও কিছু বলে না আর। ওর অন্যমনস্কতা লক্ষ্য করেই সুমুখ থেকে' সরে যায় বোধ হয়। শোবার ঘরে অজয় যখন শুতে এলো রাত তখন সাড়ে বারোটা, কণিকা ঘুমিয়ে পড়েছে। নিশ্চিন্ত নিদ্রার ছন্দে ওঠানামা করছে ওর বুক। স্তিমিত আলোয় কণিকার বিষণ্ণ কালিঢালা মুখটাও যেন কিছুটা পরিষ্কার বলে মনে হয়।

একটু অবাক হয় অজয়। ঠিক এটা আশা করেনি সে। যে কথার আলোড়নে তার মত ধীর শান্ত মানুষকে অস্থির চঞ্চল করে তুলেছে সে কথার পর কণিকা কি করে এত নিশ্চিন্ত হোল!

মনস্তাত্বিক অজয় আবার মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ শুরু করে দেয়।

কণিকা যেন স্বস্তি পেয়েছে এ ঘটনা প্রকাশ পেয়ে। চব্বিশ ঘণ্টা লুকোচুরি করে করে হাঁফিয়ে উঠেছিল কণিকা। ধরা পড়ার ভয়ে অস্থির হয়ে পড়েছিল। দীর্ঘদিন পরে অজয়ের কাছে অপরাধ স্বীকার করে—শাস্তি গুরুতর হোতে পারে বুঝেও কিছুটা যেন শান্তি পেয়েছে সে।

তার দুঃসহ বোঝা বইবার একজন অংশীদার খুঁজে পেয়েছে। কণিকার মন বিশ্লেষণ করার পরে নিজের মনটাও বিশ্লেষণ করে দেখবার চেষ্টা করে অজয়। কণিকার জন্য কি জমা আছে সেখানে—ঘৃণা না মমতা? রাগ না ক্ষমা?

অজয়ের কালো রংয়ের মরিস গাড়ীটা পরদিন দেখা গেল নিউ আলিপুরের নতুন সড়কে।

গাড়ীতে বসে কণিকা তাকিয়ে দেখে নতুন গড়ে-ওঠা পল্লী। তার পর এক সময় বলে—এ দিকটাতে আমরা আগে কখনও আসি নি। না?

অজয় উত্তর দেয় না।

আরও বেশ খানিকটা এগিয়ে যায় গাড়ী হাঁকিয়ে। ধীরে সুস্থে বলে—তোমার আত্মীয়-স্বজনের নাম-ধাম তুমি নিজেই যদি মুখে না আনো তবে আর এ রাস্তায় আসবে কেন বলো?

চকিতে ঘাড় ফিরিয়ে অজয়ের ষ্টিয়ারিংশুদ্ধ হাতটা চেপে ধরে কণিকা—প্রশ্ন করে, কোথায় যাচ্ছি আমরা?

হাতটা ছাড়িয়ে অজয় উত্তর দেয়—ছেলেমানুষি করো না কণিকা। তোমার মাসীর বাড়ী যাচ্ছি আমরা। বুঝতে পারছো না?

উত্তেজনায় হাঁপায় কণিকা—আমি কিছুতেই যাবো না। তুমি ওদের ঠিকানা পেলে কি করে?

অজয় হাসে, বলে—অত বড় ব্যারিষ্টার। ঠিকানা যোগাড় করা আর কঠিন কি বলো? থানায় গেলে সহজেই পেতাম। আরও সহজেই পেলাম টেলিফোন গাইডে।

একটু চুপ করে থাকে কণিকা, তারপর মিনতি করে—আমি যাবো না। কিছুতেই যাবো না। বলতে পারো, কি বলবো আমি সেখানে গিয়ে? না না আমি পারবো না, কিছুতেই নয়। তোমার দুটি পায়ে পড়ি আমায় বাড়ী ফিরিয়ে নিয়ে চলো।

এবার অজয় ধমক লাগায়—কি বাজে বকছো, কণিকা? তোমাকে নিজের মুখে কিছুই বলতে হবে না। যা বলবার তা আমিই বলবো। কিন্তু তোমাকে আমার সঙ্গে যেতেই হবে। তা না হলে আমিই বা যাবো কি করে সেখানে? তুমি এত স্বার্থপর হয়ে গেছ কণিকা, আমার অবস্থাটা একবারও ভাবছো না?

কণিকা আর কিছু বলে না। বলার মত কি-ই বা আছে তার?

অজয়ের গাড়ী নিঃশব্দে এগিয়ে চলে নতুন পথে। সামনের মোড়টা বেঁকে যে নতুন মস্ত বড় গেটওয়ালা বাড়ীটা দেখা গেল, তার প্রস্তর-ফলক দেখে গাড়ীর গতিটা কম করে অজয়। নামবার

আভাস দেবা মাত্র জমকালো পোষাকপরা দ্বারোয়ান শশব্যস্তে এগিয়ে ইংগিতে জানায়—যাইয়ে যাইয়ে ভিতর চলা যাইয়ে। হাঁ হাঁ, লে যাইয়ে মোটরকার অন্দরমে।

নিঃসন্দেহে দ্বারোয়ানজী ওদের ব্যারিষ্টার সাহেবের নতুন মক্কেল ভেবে নিয়েছে। তাই সম্বর্দ্ধনাটা এক রকম ভালই হল বলতে হবে।

বিদায় সম্ভাষণটা গলা ধাক্কা না হয়, ভাবতে ভাবতে গাড়ীটাকে গেটের ভেতর ঢুকিয়ে দেয়।

লাল খোয়ায় পেটানো রাস্তা—দু'ধারে সবুজের আলপনা। তারি মাঝে মাঝে বড় ল্যাম্পপোষ্টে বলের মত গোল গোল আলো তিন স্তবকে সাজানো।

সুন্দর বাড়ীটি। অজয় মুগ্ধ হয়।

এত সুন্দর বাড়ী বোধ হয় কমই আছে কলকাতায়। প্রত্যেকটি জিনিসে মালিকের ঐশ্বর্য্য আর রুচির সম্মিলিত প্রকাশ।

মনে মনে তারিফ করতে বাধ্য হয় অজয়। বাড়ীর সামনেটায় গাড়ী থামতেই উর্দ্দিপরা বেয়ারা গাড়ীর দরজা খুলে ওদের নিয়ে গেল ভিতরে। যে ঘরটায় ওরা গিয়ে বসলো সেটা বোধ হয় ওয়েটিং রুম।

পুরু কার্পেটে দামী পর্দায় আর বহুমূল্য আসবাবে সাজানো। একটি ছোট হলঘর। অপেক্ষমান ব্যক্তিবৃন্দের মনোরঞ্জনের জন্য বহু রকমের পত্র-পত্রিকা স্তূপ করা আছে সেণ্টার টেবিলে। সেটাকে কেন্দ্র করে আরও চার-পাঁচটা বৃত্তাকারে সাজানো সোফা-কাউচের সমাবেশ। ছাইদানী আর ফুলদানীতে অলঙ্কৃত।

এধারে-ওধারে ছড়িয়ে যে ক'টি সম্ভ্রান্ত মূর্তি নজরে পড়লো তারাও এ-হেন দরবারের সভাসদ।

অজয় তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল আর ভাবছিল, কণিকার যে সত্যি সত্যি এত অভিজাত আত্মীয় আছেন তা নিজের চোখে না দেখলে হয়ত বিশ্বাসই করতো না অজয়।

বেয়ারা এসে কাগজ কলম রাখে—নাম-ধাম ইত্যাদি লিখে জানাতে হবে সোম সাহেবের কাছে। খাস বিলিতি কায়দায় ছাপানো কাগজ। অজয় তাতে পরিষ্কার বাংলায় লিখে দেয়—

'একান্ত ব্যক্তিগত কারণে দেখা করতে চাই। জনান্তিকে দেখা করলে সুখী হব। অপেক্ষা করতে রাজী আছি।

অজয় মজুমদার
শ্যামবাজার।'

সময়টা নিতান্ত মন্দ নয়। সন্ধ্যা সাতটা থেকে অপেক্ষা করতে করতে রাত স' নটায় অবকাশ মিললো সোম সাহেবের।

পরামর্শ-ভিক্ষু আর উপদেশ-কাঙাল অতিথিরা একে একে বিদায় নিলে অজয়ের ডাক এলো।

কনসল্টিং রুমে এসে অজয় অভিভূত হয়। মস্ত বড় একটা টেবিলের ওধারে পর্বতপ্রমাণ বইয়ের মধ্যে যে ভদ্রলোক ওদের স্বাগত জানালেন অজয় খানিকক্ষণ চেয়ে রইলো তাঁর দিকে।

বসার ভঙ্গিমাটুকুতে পর্য্যন্ত ব্যক্তিত্বের ব্যঞ্জনা। সামনে মাথার চুল একটু পাতলা হোয়ে এলেও রূপবান পুরুষ, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

নীরবে হাত তুলে নমস্কার জানায় অজয়, তারপর ভদ্রলোকের সামনের একটা চেয়ার টেনে বসে পড়ে অজয়। কণিকাও অবশ্য বসেছে পাশের চেয়ারটায়।

এতক্ষণ পর্য্যন্ত অজয় কণিকার সমস্ত দুর্বলতাকে প্রচণ্ড ফুৎকারে নিবিয়ে দিয়েছে কিন্তু ঠিক এই মুহূর্তে নিজেও অত্যন্ত দীনতা অনুভব করে মনে মনে। সমস্ত বক্তব্য হারিয়ে মৌন নত মুখে বসে থাকে।

তবে বেশীক্ষণ নয়। ব্যারিষ্টার সাহেবের সময়ের দাম বেশী। অত ধীরে-সুস্থে ভাষা সাজিয়ে বক্তব্য পেশ করবার সুযোগ দিতে তিনি রাজী নন।

ভদ্রতার চিনিমোড়া তাগাদা আসে তাঁর পক্ষ থেকে—এখন বোধ হয় আপনারা নিঃসংকোচে বলতে পারেন আপনাদের বক্তব্য। ঘরে-বাইরে যথেষ্ট নির্জন। আশা করি, অসুবিধার কোন কারণ নেই আর।

আজ্ঞে না ঠিক সে জন্য নয়—অজয় তবুও নিজেকে তৈরী করে নিতে পারেনি।

অল্প হেসে ব্যারিষ্টার বলেন, দেখুন, আমাদের কাজই এই। আমরা গোপন কথার লৌহসিন্দুক-বিশেষ! কেসটা যদি আমি না-ও নিই তবু আমার কাছে বললে সে কথা মাঠে-ঘাটে ছড়িয়ে যাবার ভয় আপনার নেই।

অজয় বোঝে ব্যারিষ্টার সোমও তাকে সাধারণ মক্কেল বলে ভেবে নিয়েছেন মনে মনে।

সেটাই স্বাভাবিক। কারণ অজয়কে তিনি জীবনে কখনও দেখেননি তাকে চেনার সম্ভবনাই নেই তাঁর। আর কণিকা বলে যে হাসি-খুশী-মাখা মেয়েটিকে তিনি চিনতেন এক সময়, আজকের এই শীর্ণ বিষাদ-ম্লান মহিলাটির সাথে তার কোনখানে মিল নেই।

অজয় প্রাণপণে নিজেকে শক্ত করার চেষ্টা করে। সমস্ত দুর্বলতাকে জয় করে স্পষ্ট স্বরে বলে, দেখুন ঠিক মামলায় পরামর্শ চাইতে আসিনি আমরা। একটা অনুরোধ নিয়ে এসেছি আপনার কাছে। এঁকে আপনি নিশ্চয় চিনতে পারবেন, তালতলার শশাঙ্ক বাবুর মেয়ে কণিকা, আমার স্ত্রী।

মিঃ সোম মুহূর্তের জন্য তাকাল কণিকার পানে। তার পর অজয়ের দিকে চেয়ে কৃত্রিম ব্যগ্রতা ফোটান কণ্ঠে, তাই না কি? শশাঙ্ক বাবুর জামাই তুমি? তা বেশ বেশ। বহুকাল দেখা-সাক্ষাৎ নেই, তাই আমি চিনতে পারিনি। আগে বলতে হয়। মিছিমিছি এতক্ষণ বাইরে বসে রইলে! মুখে আপ্যায়ন করলেও যে পাতলা মেঘটা ব্যারিষ্টারের মুখের উজ্জ্বলতাটুকুকে আড়াল করলো, অজয়ের নজরে সেটা এড়ায়নি।

তাতে কি হয়েছে? আমাদের কোন অসুবিধাই হয়নি।

তবু ভদ্রতা বজায় করার চেষ্টা করে ব্যারিষ্টার, তা যাক, এখন বল কি জন্যে এসেছো তোমরা আমার কাছে?

এত রাত্রে এখন ভুলে-যাওয়া আত্মীয়তার সূতো ধরে অজয় নির্ঘাত দর্শনীর টাকা কয়টা বাঁচাতে চায়, সে বিষয়ে সোম সাহেব নিঃসন্দেহ।

মিঃ সোম, সমস্ত ব্যাপারটা ঠিক গুছিয়ে সাজিয়ে বলতে আমি পারবো না। মাত্র কয়েক দিন আগে আমি জানতে পেরেছি আমার স্ত্রী কণিকার বিয়ের আগেকার একটি মেয়ে আছে।

ঘটনাচক্রে মেয়েটি আজ অত্যন্ত অসহায়। জঘন্য পরিবেশে অতি

কষ্টে দিন কাটাচ্ছে। আমি পুলিশের সাহায্য নিয়ে তাকে উদ্ধার করবার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু পুলিশের অভিমত মেয়েটির বাবা অর্থাৎ আপনার একটা লিখিত স্বীকারোক্তি না হলে কোন কাজই এগোবে না।

কারণ সেই বদ স্ত্রীলোকটা—বিরজা যার নাম, সে নিজের মেয়ে বলে দাবী করছে মেয়েটিকে। কণিকার একলার দাবীতে জোর পাচ্ছে না পুলিশ। তাই আমরা আপনার কাছে এলাম।

কি বলতে চাও তুমি? কতকগুলো বাজে কথা এত দিন পরে বাড়ী বয়ে এসে বলতে লজ্জা হোল না তোমার? নিজের স্ত্রীকে পর্য্যন্ত সঙ্গে করে এসে একটা অভদ্র কথা বলতে ভদ্রতায় বাধলো না তোমার? গেট আউট ইউ ননসেন্স আই সে গেট আউট। উত্তেজনায় সোম সাহেবের গলা মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। অঙ্গুলি সংকেতে অজয়কে তিনি বাইরের দরজা দেখিয়ে দেন।

অজয় কিন্তু একটুও উত্তেজিত হয় না। শান্ত কণ্ঠে বলে, আমিও ভেবেছিলাম আমার বক্তব্য শুনলে আপনি মেজাজ ঠিক রাখতে পারবেন না। তবুও বুঝে দেখুন, লজ্জা আপনার চেয়ে আমারই কি কম? কিন্তু উপায়ই বা কি? ভুল বা অন্যায় যা হোয়েছে তা তো হয়েছেই, একটা নিরপরাধ শিশুর ভবিষ্যৎ নষ্ট করলে তো অপরাধ লাঘব হবে না? তার চেয়ে শুধু নিজের কথাটি না ভেবে যদি তাকে একটু সুযোগ দেন—

থাক থাক, দয়া করে উপদেশটা বন্ধ করুন। বলাটা যতটা সোজা করাটা অতটা সোজা নয়। বুঝলেন? ভাবতে পারেন আমার সুনাম কতটা হাম্পার করবে এতে?—যান, সাধ্য থাকে আদালতে গিয়ে প্রমাণ করুন। আমার পক্ষে এতখানি বদান্যতা দেখানো সম্ভব নয়। যান, দয়া করে আপনারা যান এখান থেকে—চেষ্টা করেও নিজেকে সংবরণ করতে পারেন না সোম সাহেব।

তাঁর চীৎকারে দু'-তিন জন দারোয়ান বেয়ারা ছুটে আসে ঘরের ভিতর। সেই সঙ্গে একজোড়া ভেলভেটের চটি মৃদু শব্দ তুলে এগিয়ে আসে, তার পর নিঃশব্দে ডুবে যায় ঘরের কার্পেটে।

কি ব্যাপার? হয়েছে কি? এত উত্তেজিত কেন তুমি?

বলবো বলবো, পরে তোমাকে সব বলবো সবিতা! এখন এদের যেতে বলো তুমি। আমি একটু একা থাকতে চাই। দু' হাতে মাথাটা চেপে ধরে টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়েন ব্যারিষ্টার সোম।

ক্ষণকালের জন্য সেই দিকে অবাক হোয়ে তাকিয়ে থাকেন মিসেস সোম। তার পর ফিরে তাকান সমুখে আসীন দম্পতির পানে।

কিন্তু তিনিও ওদের চিনতে পারেননি। তার কারণ অজয়কে তিনিও কখনও দেখেননি, তবে কণিকাকে বোধ হয় তিনি চিনতে পারতেন কিন্তু তাঁকে সে সুযোগ দেয়নি কণিকা। বহুক্ষণ আগে থেকেই নিজের দুটো হাতের পাতায় মুখ লুকিয়ে বসেছিল কণিকা—আচ্ছন্নের মত।

কি ভাবে ওদের বিদায় করা যায়, বোধ করি সেই চিন্তাই করছিলেন মিসেস সোম। তবে তাঁর কিছু করবার আগেই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় অজয়, তারপর যাবার মুখে সোম সাহেবের উদ্দেশ্যে বলে যায়—আবার বলছি স্বীকার না করলেও আপনার নামটাকে সম্পূর্ণ বাঁচাতে আপনি পারবেন না। লালবাজারে সাত নম্বর কামরায় কেসটা ডাইরী হয়ে গেছে। সুতরাং আপনার নাম জড়িয়ে কেসটা আদালতে উঠবেই। কণিকার মা-বাবা সাক্ষ্য আর সে সময় আপনি নিয়মিত যেতেন ওদের বাড়ী, একথাট আদালতে প্রমাণ করা খুব বেশী কঠিন হবে না বোধ হয় আপনি স্বীকার করলে বরং অনেক সহজে মিটতো ব্যাপারটা। এখন যেটুকুও বা ঘোঁট হোত এ নিয়ে, দু'-চার বছর পরে তা আপনিই থিতিয়ে যেত। কিন্তু তাতে মেয়েটা উদ্ধার পেতো—মন্দলোকের চক্রান্ত থেকে নিষ্কৃতি পেত। একবার ভেবে দেখবেন—আইন অবশ্য আপনি আমার চেয়ে অনেক ভাল বোঝেন। আমি আর কি বোঝাবো? আচ্ছা তাহলে চলি আজ—

অতগুলো চাকর-দারোয়ান আর মিসেস সোমের গিলে-খাওয় দৃষ্টির সুমুখ দিয়ে কণিকার হাতটা চেপে ধরে বেরিয়ে যায় অজয়। এতক্ষণ পরে বাইরের বাতাসে ওরা সহজ নিঃশ্বাস নেয় বোধ হয়।

তারপর দু'টো দিন কেটে গেছে।

চৈত্রের শেষ। দিনে দিনে রুক্ষ থেকে রুক্ষতর হয়ে উঠছে প্রকৃতির শ্যামল সুষমা।

অল্প কাজ করেই ক্লান্তি নামে। সহজেই বীতরাগ আসে। তার ওপর এত-বড় নৈরাশ্যে অজয়ের মনটা একেবারেই ভেঙ্গে পড়েছে। বিষিয়ে গেছে সংসারের ওপর থেকে।

এই যে যারা শিক্ষিত মার্জিত অভিজাত বলে সকলের শ্রদ্ধা কিনে বসে আছে তাদের স্বরূপটা ভাবতে গেলে ওর আপাদমস্তক জ্বলে যায়।

ওরা মানুষ—দেবতা নয়, সেকথা অজয় জানে! অন্যায় না হয় করেছে কিন্তু অন্যায় করে ফেলে সেটাকে সর্বসমক্ষে স্বীকার করার সৎসাহসের অভাব তাকে বড় পীড়া দেয়।

ফাঁকি দিয়ে এই যে এরা জগতের সম্মানের শিখরে ইজারা নিয়ে বসে আছে, এর কতটুকু প্রাপ্য ওদের? ভাবতে ভাবতে অজয়ের মনটা তিক্ততায় ভরে যায়।

পুলিশের তরফ থেকেও আর বিশেষ কোন খবর নেই। মাত্র একদিন তারা তদন্তে গিয়েছিলো। একেবারে নিরাশ হয়েই ফিরে এসেছে। পয়সা দিয়ে কিনেছি বা অপরের কাছ থেকে এনেছি এ সমস্ত কাঁচা কথার ধার দিয়েও যায়নি বিরজা। একেবারে সদম্ভ ঘোষণায় জানিয়েছে—টুনি তার নিজের মেয়ে। কতকগুলো সমশ্রেণীর মেয়ে সাক্ষীও হাজির করে দিয়েছে পুলিশের সামনে। পুলিস তবুও শেষ চেষ্টা করে দেখেছিল—টুনিকে জেরা করে। ফল হয়নি। কারণ যদিও টুনির মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছিল টুনি মিথ্যা কথা বলছে তবুও তার জেরার উত্তরগুলো কণিকার বিপক্ষেই গেল। বোধ হয় অত্যাচারের ভয়েই স্বল্প কথার ভেতর দিয়ে টুনি প্রায় স্বীকার করেই নিলো যে বিরজাই টুনির মা।

একে তো নাবালকের কথার কোন মূল্যই নেই আদালতে। তাতে আবার বিরুদ্ধবাদীকে কেমন করে উদ্ধার করবে পুলিশ?

আর মুখের ভাব? মনের কথা? পুলিশের মোটা মোটা আইনের বইতে সে সম্বন্ধে তো কিছু লেখা নেই? কাজেই অকৃতকার্য্য পুলিশ অজয়কে কি ভরসা দিতে পারে?

সেদিন সবেমাত্র রুগী দেখা শেষ করে বাড়ী ফিরেছে অজয়, ঝনঝন শব্দে ডাক দিলো টেলিফোনটা। বিরক্ত হাতেই রিসিভারটা তুলে নিলো অজয়, বললে—ইয়েস ডাঃ মজুমদার স্পিকিং—

মন্দির-মূর্ত্তি (খাজুরাহ)

—দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

গোলঘর (পাটনা)

—সলিল গোস্বামী

ক্লান্তি

—সুবোধকুমার দ

ইমামবারা (হুগলী)
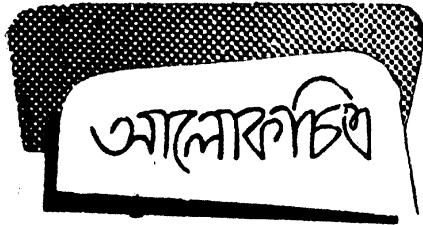
—অমিয়কুমার মুখোপাধ্যায়

তুষারাচ্ছন্ন কেদারনাথ

—পারিজাত বক্সী

পশু-পাখীর প্রদর্শনী
—মীরেন অধিকারী

আই, আই, টি (হিজলী) —এস, এম, হায়দার

রথ (দক্ষিণ-ভারত)

—মানবচন্দ্র মিত্র

যোধপুরী বেগমের কবর (সেকেন্দ্রা)

—শচীকুমার মিত্র
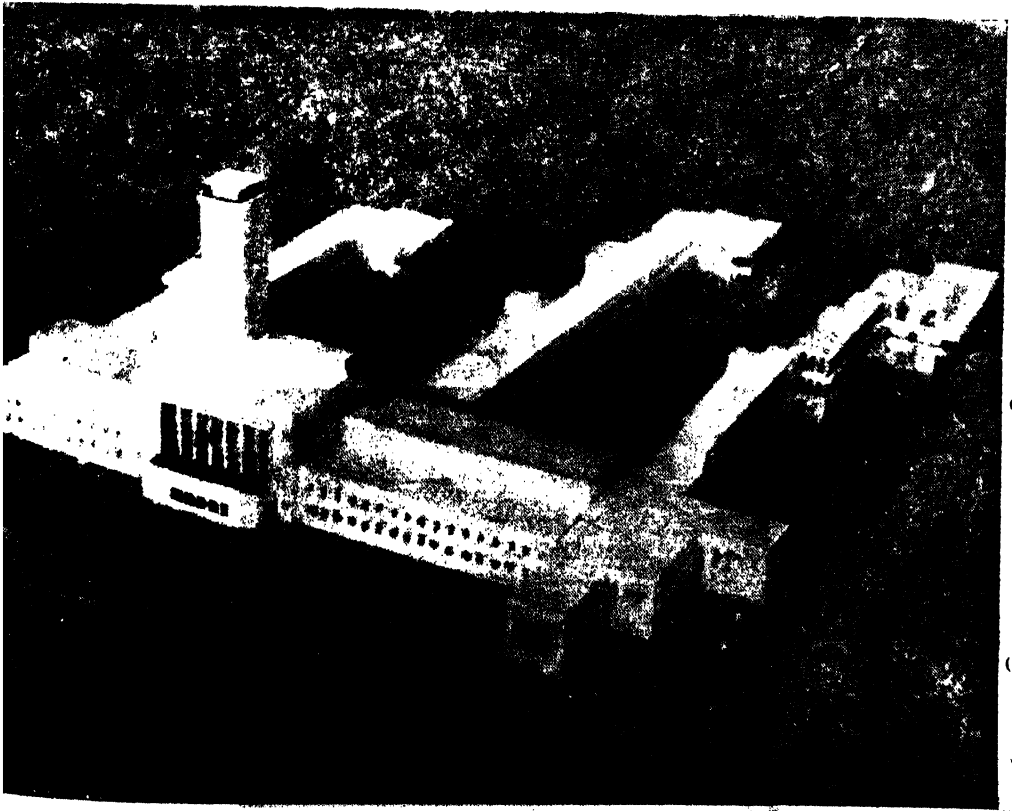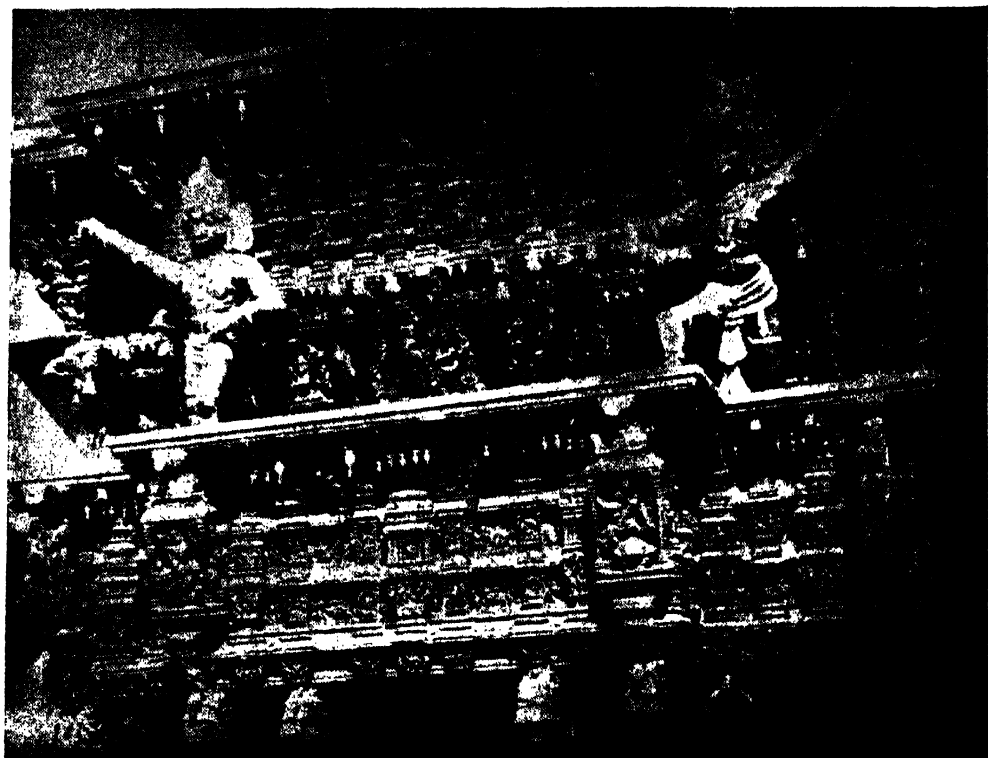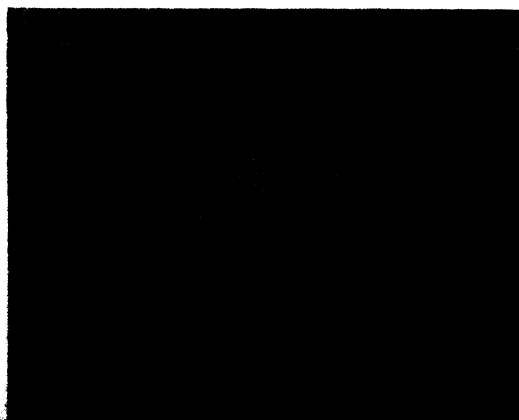
ওপার থেকে তার স্বরে ভেসে এলো—আমি লালবাজার থেকে বলছি—ডাঃ মজুমদার! নমস্কার! সত্যিই আপনাকে নমস্কার। আমরা মশাই পুলিশের লোক কত রকমের তাজ্জব ব্যাপার রোজই দেখছি। চোখ ক্ষয়ে গেল দুনিয়ার হালচাল দেখে দেখে। কিন্তু আপনি মশাই আমাদেরও ম্যাজিক দেখিয়ে ছেড়ে দিলেন? অ্যাঁ বাহাদুর লোক বটে!

কি হয়েছে? বলেন কি? এর থেকে বেশী আশ্চর্য্য আর কি হতে পারে?

নাঃ টেলিফোনে সব কথা বলাটা ভাল হচ্ছে না। সট করে একবার চলে আসুন না? নিজের চোখেই দেখতে পাবেন—যা কেউ কোন দিন ভাবে নি। আসছেন?

বেশ বেশ—

কণিকা আপত্তি করে। আবার যে এখন জামা গায়ে দিচ্ছো? জরুরী কেস? জানি না বাপু—এদিকে বেলা বারোটা বাজে।

অজয় ততক্ষণে গ্যারেজে।

থানায় পৌঁছে অজয় একছুটে চলে যায় তদন্ত অফিসারের কামরায়।

আনন্দে ডগমগ অফিসার ভদ্রলোক অজয়কে দেখেই বিস্তারিত ভাবে অজয়েরই দেখান ম্যাজিকের আখ্যান সুরু করে দেন—আর দেখছেন কি মশাই কেল্লা ফতে। যাকে বলে সিওর উইন।

অজয় ঠিকমত অনুধাবন করে উঠতে পারে না। বোকার মত প্রশ্ন করে—কিসের কথা বলছেন?

আরে বলছি আর কি? ব্যারিষ্টার সোম তাঁর ষ্টেটমেণ্ট দিয়ে গেছেন। এই দেখুন বিশ্বাস হচ্ছে না তো? তবে আর বলছি কি? তাজ্জব ব্যাপার মশাই, তাজ্জব ব্যাপার! আমাদের স্বপ্নেরও অতীত—নিজে এসেছিলেন থানায়।

গতকাল সন্ধ্যাবেলায়—তখন বোধ হয় সাড়ে সাতটা হবে আমি আর সামন্তদা' একটা পুরোন কেসের সাক্ষীর জবানবন্দীগুলো মেলাচ্ছিলাম। হঠাৎ চৌকিদার ঠাকুরদীন একটা আইভরি কার্ড এনে দেখালে আমায়। দেখি, সোম সায়েবের নাম লেখা কার্ড। নির্জনে সাক্ষাৎ চান এই কথাটুকু মেনসেন করা আছে কার্ডের তলায়। ভিতরে আনতে বললাম তাড়াতাড়ি। উনি এলেন—রুক্ষ শুকনো চেহারা—মনের ওপর দিয়ে ঝড় বয়ে গেছে তা সহজেই বোঝা যায়। অত্যন্ত সংকুচিত ভাবে আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, ডাঃ মজুমদারের কেসটা আমার কাছে পড়েছে কি না? আমার তদ্বিরেই তার তদন্ত হচ্ছে না কি ইত্যাদি। ওঁর কুণ্ঠা দেখে সামন্তদা'কেও সরিয়ে দিলাম ঘর থেকে। তারপর ধীরে ধীরে তাঁকে জানালাম ওঁর প্রশ্নের উত্তরগুলো।

সমস্ত শুনে তিনি আমার সামনে বসেই সই করলেন ষ্টেটমেণ্টে। বাড়ী থেকেই গুছিয়ে লিখে এনেছিলেন সমস্ত কিছু।

কাগজটা আমার হাতে দিয়ে বললেন—মিঃ বাসু, এ বিষয় নিয়ে বার বার কেউ আমায় বিরক্ত না করে, এই শুধু আমার অনুরোধ।

আমি বললুম—না না আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, এ বিষয়ের জন্ত আর কেউ আপনাকে জ্বালাতন করবে না। আপনি তো যথেষ্ট করেছেন। তবে এতটা যখন করলেন তখন আমাদের আর একটু সাহায্য করুন ব্যারিষ্টার সোম! আপনার ব্লাডের একটা শ্লাইড নেবার অনুমতি দিন দয়া করে। কারণ মেয়েটার ব্লাড কালচারে রিপোর্টটাই তো হবে সবচেয়ে বড় প্রমাণ। আপনাকে আর কি আইন বোঝাবো?

নীরবে বসে বর্মাচুরুট টানছিলেন ব্যারিষ্টার। তাইতেই মৌন সম্মতির লক্ষণ ধরে নিয়ে ডেকে আনলাম সামন্তদা'কে। আকার-ইঙ্গিত পেয়ে চটপট সে একটু রক্তের নমুনা রেখে দিলে।

চিন্তাগ্রস্ত ব্যারিষ্টার নিঃশব্দে বিদায় নিলেন। ওকে বিদায় দিয়ে উঠে এসে দাঁড়ালাম এই বারান্দায়। নিচেটা এখান থেকে পরিষ্কার দেখা যায়। দেখলাম, মাথা নীচু করে নেমে গেলেন ব্যারিষ্টার সোম। তারপর একটু আড়াল খুঁজে রাখা মস্ত একটা ক্যাডিলাকে ষ্টার্ট দিলেন। নিছক একা এসেছিলেন—একটা ড্রাইভার পর্য্যন্ত ছিল না সঙ্গে। যাই বলুন ডাঃ মজুমদার, ব্যারিষ্টার সোম যথেষ্ট মহত্ত্ব দেখিয়েছেন—আপনি কি বলেন?

নির্দিষ্ট উত্তরটা এড়িয়ে গিয়ে অজয় প্রশ্ন করে—আপনি যে বলেছিলেন ব্যারিষ্টার সোমের স্বীকারোক্তিটা পেলে কেসটার চেহারাই আলাদা হোয়ে যাবে, আশা করি সেকথা আপনার মনে আছে মিঃ বোস?

আছে বৈ কি ডাঃ মজুমদার! নিশ্চয় মনে আছে। তুধের [?] স্তোক আপনাকে আমি দিইনি মোটেই। ব্যারিষ্টারের ষ্টেটমেণ্ট যখন পেয়েছি বারো আনা সাকসেস হয়েই গেছে। এবার কণিকা দেবীর একটা ব্লাড টেষ্ট দস্তখত করা জবানবন্দী চাই। আমাদের ডকুমেণ্টারী ফাইলের জন্ত। বুঝলেন? ব্যস যতদূর মনে হয় এইতেই বিরজার কিস্তি মাৎ হয়ে যাবে।

অনেক দিন পরে কলকণ্ঠে আনন্দ ঘোষণা করে বাড়ী ফিরলো অজয়।

কণিকা, কণিকা, শীগগির নেমে এসো ভীষণ সুখবর আছে একটা, কোন সাড়া নেই। অজয় হাসে মনে মনে। নির্ঘাত চটেছে কণিকা। খাবার বেলায় বেরিয়ে যাওয়া কোনকালেই ওর পছন্দ নয়, তাতে আবার বড্ড দেরী হয়ে গেছে কথা কইতে কইতে। চারটে বাজে। ভাত খাবার সময়ও নেই আর। কণিকাও খায়নি হয়তো। রাগ করারই তো কথা।

বাধ্য হোয়েই ওপর তলায় উঠে আসে অজয়। কণিকাকে শোবার ঘরে না পেয়ে পাশের ঘর বারান্দা সর্বত্র খুঁজে বেড়ায় আর চেঁচায়—আরে গেলো কোথায় সব? কাজ না পড়লে কি ভাত ফেলে ছোটে কেউ? আচ্ছা অবুঝ বা হোক—

মিনিট তিনেক পরেই দেখা গেলো অজয়ের চীৎকারে ত্রস্ত কণিকা দ্রুতপায়ে ছাদের সিঁড়ি দিয়ে নামছে। মুখখানা তার বড্ড শুকনো। কে জানে হয়তো পড়ন্ত রোদে কি সারাদিনের উপবাসে হবে বা!

নিজের মদগর্বে মশগুল অজয় অসময়ে কণিকার ছাদে ওঠার কারণ অনুসন্ধানে মুহূর্তকাল সময়ও নষ্ট করে না। টান মেরে গা থেকে জামা গেঞ্জিগুলো খুলতে খুলতে প্রফুল্ল কণ্ঠে জানায়—জানো, ব্যারিষ্টার সোম নিজে এসে স্বীকারোক্তি পেশ করে গেছেন থানায়।

সত্যি বলছি—আরে আরে, হোল কি তোমার? শোনই না ব্যাপারটা, আরে—

কণিকা মন্থর পায়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেছে। অজয় ঠিক বুঝে উঠতে পারে না কণিকার মনের ভাবটা। সত্যের সামনে দাঁড়াতে কেন এত ভয় পায় কণিকা?

অজয় তো নিজের মন স্থির করেই ফেলেছে—নিজের জীবনে যত সংঘাতই আসুক একটা বাচ্চা মেয়েকে অতল তলে তলিয়ে যেতে সে কিছুতেই দেবে না। কণিকার ওপর টুলির যে দাবী নিজের জোর খাটিয়ে তার থেকে টুলিকে বঞ্চিত করে জিততে সে চায় না। তাতে তার জীবনে যত দুর্ভোগই আসুক।

তবু মনস্তত্ত্ববিদ অজয় অনেক সময় দিলো কণিকাকে ধাক্কা সামলাতে। সত্যিই তো অজয়ের কাছেই যে কথা চমকপ্রদ কণিকার মনে তো সে কথায় তুফান তুলবেই।

রাত্রে অজয় যখন শুতে এলো তখন রাত বড় মন্দ হয়নি। কণিকা অবশ্য জেগেই ছিল। অন্ধকারে জানলার ধারে বসেছিল একা। পাশের ঘরে ছেলে দুটো স্কুল থেকে ফিরে খেলার মাঠ আর তারপরে প্রাইভেট টিউটর ওদের ঘুমের বাড়ীর দোরগোড়া পর্য্যন্ত পৌঁছে দিয়ে যায়! বালিশে মাথাটি রাখার আগে পর্য্যন্ত অপেক্ষা কঠিন তাদের পক্ষে।

শোবার ঘরে ঢুকে নিস্তব্ধ ঘরটা অজয়ের বড় বেশী ফাঁকা বলে হয়। কণিকা অশোক আর অলক তিন জনেই আছে যে যার জায়গায় তবু আজকে অজয়ের মনে হয় ঘরটা বড় বেশী মৌন বড় বেশী গম্ভীর।

নিজের মনকেই প্রশ্ন করে অজয় কণিকার নীরবতাই কি এর কারণ? না তো তা কেমন করে হবে?

কণিকা তো কোন দিনই বাগ্মী নয়? চিরকালই সে শান্ত স্বল্পভাষিণী।

তবু আজ অজয়ের মন বলে, বড় বেশী নিথর নিস্তরঙ্গ হয়ে গেছে কণিকা। যেন পাষাণ-প্রতিমায় শুধু প্রাণের স্পন্দন মাত্র। ও যেন ওর চারিপাশে বিষাদে আর গাম্ভীর্যে একটা অদ্ভুত রহস্যময় আবরণ গড়ে তুলেছে। কি যে ও ভাবে সারাক্ষণ, অজয় তার কূল পায় না।

তবু আজ অত্যন্ত সচেতন অজয়। আজকের নবতম প্রসঙ্গের ধার দিয়েও সে যায় না। বরং সে বিষয়টিকে সযত্নে পরিহার করে অন্য পাঁচমিশেলী কথা বলে যায়, যাতে কণিকার মনটা কিছুটা অন্তত সহজ হতে পারে।

ওর মন কিন্তু প্রতীক্ষা করে থাকে কতক্ষণে কণিকা নিজে হতে ওই প্রসঙ্গ তুলবে। মন খুলে আশা-নিরাশার ভয় ভাবনার ভাগ দেবে অজয়কে।

মনস্তাত্ত্বিক অজয় নতুন করে সুযোগ পাবে কণিকার মন বিশ্লেষণের।

কিন্তু সমস্ত থিওরীই ফেলিওর। কণিকার তরফ থেকে কোন সাড়াই নেই। অবশ্য অজয়ের আহ্বানে খাটের ওপর অজয়ের কাছে এসেই বসেছে সে।

তবুও দুরন্ত ব্যবধান। অজয় নানা কথা বলে। কিন্তু সংসারের বিবিধ আলোচনায় দু'-একটা সমর্থনের মৌন সম্মতি বা স্বল্পতম উত্তর ছাড়া আর কিছুই আদায় করতে পারলো না কণিকার কাছ থেকে।

অথচ অজয়ের সমস্ত অন্তর জুড়ে ফুটছে ওই একটা কথাই। ওর প্রাণপ্রাচুর্য্যে ভরা মন টুলিকে উদ্ধার করার পুণ্য কার্য্য সম্পাদনের আনন্দে মেতে উঠেছে একেবারে। এক অসতর্ক মুহূর্ত্তে শতবার না বলার প্রতিজ্ঞা ভেসে যায়। কণিকাকে কাছে টেনে নিয়ে অজয় বলে ফেলে—কণা, চলো না আমরা নিজেরাই যাই পুলিশের সঙ্গে। উদ্ধার করে আনি টুলিকে। আমার তো মনে হয় তোমায় দেখলে টুলিও আর ভয় পেয়ে মিছে কথা বলবে না। কাজটা অনেক সহজ হয়ে যাবে।

এক হাতে খাটের বাজুটা চেপে ধরে কণিকা নীচের ঠোঁটটা কামড়ে ধরে দাঁত দিয়ে, মাথা নেড়ে আপত্তি জানায়—না।

কেন? কেন যাবে না? একবার তো একলাই গিয়েছিলে? তাতে কি হয়েছে? ক্ষতি কি? কা'কে লজ্জা? কিসের সংকোচ?

সারা রাত-জোড়া এই সমস্ত প্রশ্নের ওই একটি মাত্র উত্তর। কোন মতেই যখন তার নড়চড় হোল না, তখন নিরুপায় অজয় মনে মনে অবুঝ কণিকাকে গাল পাড়ে বৈ কি?

কণিকা যেন কেমন একরোখা জেদী হোয়ে গেছে, শত সাধ্য-সাধনাতেও একটি কথা কানে তোলে না।

আগে তবু অজয়ের সঙ্গে থানায় আর নিউ আলিপুরে গিয়েছিল কণিকা, এবার সে আর তাতেও রাজী হোল না। বাধ্য হোয়ে অজয়কেই মিছিমিছি কণিকাকে অসুস্থ বানিয়ে থানা থেকে লোক ডেকে এনে কণিকার ব্লাডগ্রাইড আর লিখিত জবানবন্দী জমা করিয়ে দিয়ে নিজেকে কৃতার্থজ্ঞান করতে হোল।

আর কণিকা? সে শুধু ভূতে-পাওয়া মানুষের মত ঘুরে বেড়ায় সারা বাড়ীটা। ছেলে দুটো যখন জেগে থাকে তখন নিঃশব্দে এসে ওদের কপালে চুমা খায়।

অজয়ের মাথায় বালিশটাকে ঠিক করে রাখার অছিলায় হাত বুলোয় দিনে একশ'বার।

আর? অজয়ের ছায়া দেখলে পালিয়ে বেড়ায় চোরের মত। অজয়কেও ভয় করতে সুরু করেছে। তার কারণ অজয়কে সে যে দায়িত্ব দিয়েছে অজয় তা নিখুঁত ভাবেই সম্পাদন করছে কিন্তু এর পর যখন অজয় ওকে সমস্ত পৃথিবীর সামনে দাঁড় করিয়ে দেবে আসামীর কাঠগড়ায় তখন সে কি অনুযোগ করবে? নিজে বিচারকের আসনে বসে সকলের সামনে অজয় যখন তাকে বলবে তুমি অপবিত্র, তুমি প্রতারক, তখন কি বলবে কণিকা? সে কি জানে না সেদিন একটি মানুষও তাকে সহানুভূতি দেবে না—সারা পৃথিবীর ঘৃণা মাথায় নিয়ে তাকে সরে যেতে হবে সকলের সুমুখ থেকে?

তাই একদিন যে সংসার নিজেই ছেড়ে যাবার জন্য উন্মুখ হোয়ে উঠেছিল কণিকা আজ তারই বন্ধন ঘোচাবার কথা ভাবতেও সে ভয় পায়। মেয়েমানুষের কাছে এই সম্মান এই মর্য্যাদার নামই তো প্রতিমায় প্রাণপ্রতিষ্ঠা। এটুকু হারালে আর কি থাকবে কণিকার?

এত দিনে সে বুঝতে পেরেছে মনটাকে দলিত দ্রাক্ষার মত নিঙড়েও বা পাওয়া যায় অনেক সময় তা সুধা নয়,—সুরা। তাতে মাদকতা আছে, শান্তি নেই। তাই বোধ হয় টুলিকে কাছে পাওয়ার সে দুর্বার আগ্রহে আর জোয়ার নেই—ভাঁটা পড়ে গেছে।

বিশেষ অজয়ের এই উদারতার পাশে নিজের দীনতা তার বড্ডো বাজে। অজয়ের ওই হাসিমুখ—ও যেন ছুরীর চেয়েও তীক্ষ্ণ। দিন-রাত কণিকাকে বিঁধছে।

এর চেয়ে অজয় যদি ওকে শাস্তি দিত, পীড়ন করতো অনেক সহজ হতো কণিকার মন। এতদিন ধরে শাস্তির জন্য পিঠ পেতে দাঁড়িয়ে থাকা সে-ও কি কম সাজা ?

কি করে এত সহজে গ্রহণ করলো অজয় ? তবে নিশ্চয় ওকে বিদায় করতে পারলে অজয় বাঁচে। সেটাই তো স্বাভাবিক ? সত্যিই তো কণিকার কাছ থেকে সে যা পেয়েছে তার তো গোড়াতেই ফাঁকি ? আজ যদি তাকে মৃতা বলেও জানায় অজয় আত্মীয়-স্বজনকে, তারপর একটা বিয়ে করে আনে তার ভেতরে অন্যায় কোথায় ?

একথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে তাকে বিদায় করে দেয় নি—এই তো যথেষ্ট। আর কি আশা করে কণিকা ?

নিজেকে শক্ত করার চেষ্টা করে কণিকা—এই তো সে চেয়েছিল টুলিকে নিয়ে সে চলে যাবে। তবে ? আর কেন এ দুর্বলতা ?

অবশ্য টুলিকে উদ্ধার করার জন্য কারুকেই আর বিশেষ কিছু করতে হোল না।

টুলি যে কণিকারই সন্তান, এ কথা টুলির রক্তেই লেখা ছিল।

তাতে পিতৃপরিচয়ও হাজির। সুতরাং বৈধ না হলেও জাতকের জন্মপত্রিকায় আর খুঁত নেই। পুলিশেরও দ্বিধা নেই উদ্ধার করতে।

প্রথম দিন শুধু টুলির একটু রক্ত নিয়েই চলে এলো পুলিশ। রক্ত পরীক্ষার ফলটা দেখেই মিঃ বোস একরকম জোর করেই নিয়ে এলেন টুলিকে। আদালতের অনুমতি পর্যন্ত অপেক্ষা করতে গেলে বেচারাকে আরও বেশ কয়েকটা দিন থাকতে হোত ওই নরককুণ্ডে।

তবে বিচারে প্রমাণ না হলে তো টুলি কণিকার কাছে যেতে পারে না ? তাই মিঃ বোস ঠিক করলেন, আপাততঃ একটা আশ্রমের হেপাজতে থাকবে টুলি।

অজয়ও খুশী হোল এ ব্যবস্থায়। কারণ টুলি ভীষণ মনমরা আর একগুঁয়ে হয়ে গেছে ওই বিশ্রী পরিবেশে থেকে। শত ডাকলেও কথা কয় না। চোখের চাউনিও যেন বন্য পশুর মত। আশা করা যায় আশ্রমের সুরীতিতে ওর ভালই হবে।

অজয় কিন্তু মনে মনে কঠিন প্রতিজ্ঞা করেছে কণিকাকে সে এখন আর কিছুতেই জানাবে না কোন কথা।

টুলির কথা শুনতে কণিকার আগ্রহ আর নেই সে কথা বুঝতে আর বাকী নেই অজয়ের।

আর বলবেই বা কখন, আজকাল কণিকা সারা দিনেও একবার আসে না অজয়ের সামনে। রাতে পাশের ঘরে শোয় ছেলেদের নিয়ে।

মিঃ বোস অবশ্য বলছিলেন, এ সময় টুলির পক্ষে কণিকার স্নেহ দরকার ছিল। টুলি জগতে কাউকেই আর বিশ্বাস করতে পারছে না। তাছাড়া অজয়কে সে চেনে না। কোথা থেকে কোথায় যাচ্ছে—সে কথা শুনলেও সে আর নির্ভর করতে পারছে না আমাদের কারুর ওপর।

অজয় বাধ্য হয়েই বলে দেয় কণিকা অত্যন্ত অসুস্থ। তার পক্ষে এখানে আসা অসম্ভব।

মিঃ বোস আর কিছু বলেন না। নীরবেই টুলির আশ্রমের ফর্মটা ফিলআপ করতে থাকেন।

বিরজার দাপাদাপি প্রথমটায় খুব বেশী মনে হলেও তার তারস্বর তারা থেকে উদারায় নামতে খুব বেশীক্ষণ সময় লাগে নি। সাধা গলা তো।

মুখে অবশ্য সে অনেক গমক গিটকিরী ছেড়েছিল, মুক্তকণ্ঠে বলেছিল—পুলিশের পূর্বপুরুষকে সে কিঞ্চিৎ সুশিক্ষা দেবেই। সহজে ছাড়ান দেবে না কারুকে। তার পেটের সোমথ মেয়েকে জোর করে টেনে নিয়ে যাওয়া—অ্যাঁ ?

কিন্তু দেখা গেল মুখে আঁশবটিতে কি মুড়ো খ্যাংরার ডগায় তার যতটা জোর অন্যান্য ক্ষেত্রে ঠিক অতটা নেই। তার সমগোত্রীয়ারা তাকে সহজেই বুঝিয়ে দিলে—একটা ছুঁড়ির জন্যে অত ঝামেলায় যাবার দরকার কি মাসি ? তাছাড়া ওটা কালকেউটের ছানা। কোনদিনই তোর পোষ মানতো না, ওই তো দুধের মেয়ে তার চক্করখানা দেখিস নি ?

বিরজা তবুও গজরাতে থাকে। হাজার হোক মুখের গ্রাস তো। একেবারে বাড়া ভাতে ছাই পড়েছে তার।

কিন্তু একেবারে দমিয়ে দিলেন মিঃ বোস। কথাটা অবশ্য বড্ডো বেআইনীই বললেন তিনি।

বিরজাকে একটু আড়ালে ডেকে জানিয়ে গেলেন—ইচ্ছা করলে তিনি এ কেসটাকে এমন ভাবে সাজিয়ে দিতে পারেন যে মেয়ে চুরীর দায়ে পড়ে যাবে ওরা। তারপর বিরজা আর নীরজা দুটি বোনে বছর সাতেক জোড়ে ঘানি টানার আর নড়ন-চড়ন নেই।

এ সব কি সব্বনেশে কথা বল দিকিনি গা—এর পর আর নালিশ পুলিশ করার ভরসা থাকে ? কাজেই অবলা মেয়েমানুষ বাধ্য হয়ে আদালত থানা ইত্যাদি যত সব্বনাশের ডিপো আছে সবের মাথায় খ্যাংরার বাড়ি বুলোয় মনে মনে। সুতরাং মুখে অত চেঁচামেচি করলেও কার্য্যকালে একটা নালিশও করে না বিরজা পুলিশের হামলার বিরুদ্ধে।

তবু বিচার একটা হোল বৈ কি। তবে সেটা সাজানো নাটকের মত। মামলা হিসাবে জমলো না। বাদী-প্রতিবাদীর লড়াই নেই। সাজানো সাক্ষীর ঝুড়ি-ঝুড়ি মিথ্যা কথা নেই—নেহাতই পানসে।

মিঃ বোস পাকা লোক—দুটি সাক্ষীতেই বাজীমাৎ করে দিলেন তিনি। অনায়াসে খুঁজে নিয়ে এলেন সেই ছুতোর মিস্ত্রিকে। যে টুলিকে নিয়ে নীরজার টালিগঞ্জের বাসায় থাকার সময় কণিকাকে দিনের পর দিন আনাগোণা করতে দেখেছে আর বিরজার কাছে টুলিকে পাচার করার প্রত্যক্ষদর্শী বলে নিজেকে দাবী করতে পারে।

আর একটু আয়াস-সাপেক্ষ হলেও টুলির জন্মস্থান সেই

নার্সিংহোমের তৎকালীন খাতা মিলিয়ে খুঁজে বার করে আনলেন সেই মেথরাণীর নাম-ঠিকানা; যে সদ্যোজাত টুলিকে পৌঁছে দিয়েছিল নীরজার বাসায়। মেথরাণীটা অবশ্য প্রথমটায় একেবারেই পাত্তা দিচ্ছিল না ওদের। অনেক অভয়বাণী শুনিয়ে তবে তার স্বীকারোক্তি পাওয়া গেল।

ব্যাপারটা যদি আরও দূর অবধি গড়াতো, তাহলে নিশ্চয় কণিকার বাবা-মার সাক্ষীর দরকার হোত। যে ডাক্তার শিশুহত্যার ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়েছিলেন তার নাকে দড়ি পরানোর অনেক ছুটোছুটি করতে হতো পুলিশদের—কিন্তু কিছুই হোল না সে রকম। অজয়ের অনুরোধে যত দূর সম্ভব চুপিসাড়েই কাজ করলেন মিঃ বোস।

তদন্ত কমিশনের সুপারিশে অতি সহজেই অনুমতিপত্র মঞ্জুর হয়ে গেল—টুলিকে উদ্ধার করবার।

তবে কণিকা আদালতে হাজির না হওয়ায় বেশ কিছুটা ঝামেলার সৃষ্টি হয়েছিল। অজয় নিজে মেডিক্যাল সার্টিফিকেট দাখিল করে তবে সে ঝামেলার দায় এড়ায়।

তবু নীরজার তরফ থেকে কোন বাধাই এলো না বলে জলের মত সহজ হোয়ে গেল এত বড় কাজটা।

তবু একটু বিজ্ঞের হাসি হেসে অন্য দিকে মুখ ফেরালেন মিঃ বোস। এত দিন ধরে অজয়ের আগ্রহের আতিশয্যে তাঁর আজীবন সঞ্চিত সংসারের অভিজ্ঞতার গর্বে আঘাত লেগেছিল। কিন্তু সমস্ত পর্ব সমাধা হবার পরও অজয় তখন বললে, আজ থাক। টুলিকে আমি দু'-চারদিন পরে এসে নিয়ে যাবো মিঃ বোস! তবে এখন কিছু জানাবারও দরকার নেই। ও যেমন আছে আশ্রমেই থাক।

নিজের অভিজ্ঞতার পরে আস্থা ফিরে এলো মিঃ বোসের। মুখে বললেন—বেশ তো, বেশ তো। সে যেদিন আপনার ইচ্ছা। আমাদের আর কোন আপত্তি নেই। মনে মনে বললেন হুঁ হুঁ বাবা, যতই মুখে উদারতা দেখাও বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে তোলাটা অতটা সোজা নয়। শেষ কালে পিছুতেই হবে—এ আমি জানতাম।

সেদিন পড়ন্ত বেলায় সকলের কাচা কাপড়গুলো কুঁচিয়ে যথাস্থানে তুলছিল কণিকা। আগে চিরকাল ছোটুয়া চাকরই এ কাজটা করতো—আজ-কাল ছোটুয়া ঘুম থেকে ওঠার আগেই কণিকা সেরে ফেলে কাজগুলো। কেন যে করে, তা সে নিজেই জানে না।

সারাদিন ঘুরে বেড়ায়, এটা-সেটা নাড়ে—আর ছোটখাটো কাজগুলো খুঁজে খুঁজে করে রাখে। প্রিয়জনের পরিচর্য্যার মিষ্টতাটুকু তাকে যেন জীবনের এক নতুন আস্বাদ এনে দেয়। ছেলেদের বইগুলো মলাট দিয়ে গুছিয়ে রাখে, অজয়ের কলমটায় কালি ভরে রাখে—এমনি যত সব কাজ কণিকার।

সবই করে কিন্তু তারই মাঝে ভোরবেলার সানাইয়ের মত একটা বিষণ্ণ রাগিণী ওর সারা অন্তর জুড়ে থাকে—আসন্ন বিদায়ের বেদনায়।

বেলা বোধ হয় চারটে হবে। অন্য দিন এমন সময় চাকরদের ঘুম ভাঙাতে কণিকাকে বেশ একটু সোরগোল তুলতে হয়। কিন্তু আজ জামাকাপড় গুছিয়ে এসে কণিকা দেখে ছোটুয়া বাইরের ঘরটাকে একেবারে পরিষ্কার ঝক্‌ঝকে করে তুলেছে। এমন কি, ফুলদানীতে টাটকা ফুল পর্য্যন্ত।

ছোটুয়ার এ-হেন সুবুদ্ধির কারণ অনুসন্ধান করার আগেই কণিকাকে অবাক করে দিয়ে অজয়ের খাস বেয়ারা রামশরণ বড় বড় চারটে খাবারের বাক্স নিয়ে ভাঁড়ারঘরের দিকে চলে গেল।

কণিকা ওর পিছু-পিছু ভাঁড়ারের দিকে এগিয়ে যায়, বলে কি ব্যাপার রামশরণ? এত খাবার কিসের?

উত্তর পাবার আগেই কণিকার নজরে পড়ে—ভাঁড়ারঘরের মেঝের উপর ঝকঝকে ডজন চারেক ধোয়া-মোছা কাচের গ্লাস আর কাপ-ডিস। পাউণ্ড দুয়েক ভাল চা, চিনি, দুধ আর এক বোতল অরেঞ্জ সিরাপ কখন যেন এসে হাজির হোয়েছে।

রামশরণ পুরানো লোক। তাতে অজয়ের পেয়ারের খানসামা বলে তার জাঁক আছে। সুযোগ পেলে সে কণিকাকেও সে কথা জানাতে ভোলে না। মেঝের জিনিষগুলোর দিকে কণিকার দৃষ্টি আকর্ষণ করে দু'হাত নেড়ে সে বললে—আমার কি নিশ্বেস ফেলার সময় আছে মা? বাবুর হুকুম, অনেক ভদ্দর লোক আসবেন; তাদের চা-জলখাবার চাই। দেখেন না, তিনি নিজিই সব পাঠিয়ে দেছেন।

আর কি জিজ্ঞাসা করবে কণিকা? তাকে বাদ দিয়েই যদি বাড়ীতে কোন উৎসবের আয়োজন হয়ে থাকে, তবে তার মধ্যে নাক গলাবার চেষ্টা করলে কি মান বাড়বে কণিকার?

আরও একটু পরেই ছেলেরা ফিরলো স্কুল থেকে। ওদের প্রশ্নে কণিকা বিব্রত বোধ করে।

ও মা! কে আসবে মা আজ? এত খাবার খাবে কে?

কণিকা যত বলে—আমি তো জানি না বাবা—ওরা তা মানবেও না, শুনবেও না।

নিশ্চয় তুমি জানো, বল না মা! কারা আসবে বাড়ীতে আজ?

কণিকার মন ভারী হয়ে ওঠে অপমানে আর অভিমানে। ধীরে ধীরে ছেলেদের ভুলিয়ে সরিয়ে আনে, কণিকা ওদের বরাদ্দ খাবার খেতে দেয়। ওরা চাইলেও অজয়ের আনা খাবার থেকে কোন খাবার তুলে দিতে পারে না কণিকা—হাত দিতে ওর প্রবৃত্তি হয় না কিছুতে।

ওদের খাবার দিয়ে জল গড়িয়ে দিয়ে মুখ তোলবার আগেই কে যেন কণিকার চোখ টিপে ধরে পিছন থেকে। কণিকা ঠকে যায়—বলতে পারে না হঠাৎ এমন চুড়িপরা হাত কার হতে পারে।

অনুরাধা হেসে ওঠে, বলে—বৌদি, সত্যি তুই আমাদের ভুলে গেছিস একেবারে। হয়ত দেখলেও আর চিনতে পারবি না।

ও মা, ঠাকুরঝি, তাই বল—বহুদিন পরে সমবয়সী ননদিনীর আগমনে সত্যিই একটু খুশী হয় কণিকা।

সেদিন দাদার সঙ্গে তুই গেলিনে কেন নিমন্ত্রণ করতে? সত্যি বড় অসুখ করেছিল না রে? বড্ডো রোগা হয়ে গেছিস তাই? একরাশ প্রশ্ন ফুলঝুরির মত ঝরে পড়ে।

কণিকা মৌন মুখে দাঁড়িয়ে থাকে। উত্তর দেবার চেষ্টাও করে না। উত্তর দেবার চেষ্টা করলেই যে গণ্ডগোল হবার সম্ভাবনা, সেটুকু বোঝবার মত বুদ্ধি তার আছে।

তাছাড়া চপ করে থাকা ভিন্ন উপায়ই বা কি? কিসের

নিমন্ত্রণ? কবেই বা অজয় করে এলো? কণিকা এর বিন্দু-বিসর্গও জানে না, এ'সব কথা কী প্রকাশ্যে বলা যায়?

অনুরাধা একা নয়, মিনিট পনেরর মধ্যে আরও তিন-চার গাড়ি-ভর্তি কুটুম হাজির। কণিকার নিস্তব্ধ বাড়ীটা সরগরম হয়ে উঠলো।

কাউকে বাদ দেয় নি অজয়। কণিকার বাপের বাড়ী থেকে দিদি-বৌদিরা সকলেই এসেছে।

ওদের প্রশ্নে আর অভিনন্দনের ঠেলায় কাঠ হয়ে উঠলো কণিকা। আবার একগাদা করে ফুল এনেছে সব।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে কুন্তলা বৌদি গলা ছাড়ে, ধন্যি ভাই! বিয়ের দশ বছর পরে এমন বিবাহ-বার্ষিকী করা কখনও দেখিনি আগে। যাই বলো ঠাকুরঝি, তোমরা ভাই আছ বেশ। ছেলেপুলে বেশী হয়নি, পাছে বুড়ো হয়ে যাও, বেশী মোটা হও বা পাছে খারাপ দেখায়—সত্যি হিংসে হয় তোমাদের দেখে। আমাদের তো কোলে কাঁকালে ট্যাঁ ট্যাঁ করছে না দিনরাত। এত সব করবো কখন।

বড়দি বললেন—তা তুই কেন এমন হয়ে আছিস রে কণি? একটা কাপড় পরা নেই? চুলটা পর্যন্ত বাঁধিস নি এখনও, ছেলে দুটোকেও একটু সাজাস নি? বড্ডো বুড়ো হয়ে গেছিস, না রে? আমরা না হয় ঘরের লোক, আর সেদিন অজয় পই-পই করে বলে একটু আগেও এসেছি। কিন্তু সাড়ে চারটে বেজে গেছে—সাড়ে পাঁচটায় না তোর টিপার্টি?

কণিকার মনে পড়েছে—আজ ১৭ই বৈশাখ। কণিকার বিয়ের তারিখ। নিজের মনের অশান্তিতে একেবারে খেয়াল ছিল না ওর। কণিকা হতভম্বের মত বলে—না, মানে আমি—

চল চল তোর সব মানে আমি বুঝেছি—বড়দির প্রচণ্ড ধমকে ওর কথার খেই হারিয়ে যায়। দশ বছর আগে আজকের তিথিতে যেমন করে সকলের হাতে নিজেকে সম্পূর্ণ ছেড়ে দিয়েছিল কণিকা আজ আবার তেমনি করে নিজেকে ছেড়ে দেয়।

ওর চুল খোঁপা হয়ে মাথায় ওঠে। আলমারী থেকে একটা পছন্দসই কাপড় বেরিয়ে এসে জড়িয়ে যায় ওর সর্বাঙ্গে।

অবশেষে সিঁদুর-আলতা পরিয়ে ওরা ওঁদের নিখুঁত কর্তব্য সমাপন করেন। কণিকার ওজর-আপত্তি সেখানে সমুদ্রে শিশিরের সমান।

সোয়া পাঁচটা আন্দাজ সিঁড়িতে অজয়ের জুতোর আওয়াজ শোনা যায়। বিয়েবাড়ীতে বর আসার মত সকলে ছুটে যায় তাকে অভ্যর্থনা জানাতে।

ওদের মিলিত কলরোলে বাড়ী মুখরিত হয়ে ওঠে। কণিকার মনে হয় ছুটে পালায় ঘর ছেড়ে। এই সাজসজ্জা এই আনন্দ-সম্ভারে তার ফাঁকির বিচার করবে অজয়। হয়তো আজই—আজই সকলের সামনে ওর স্বরূপ প্রকাশ করে দেবে।

হয়তো এই উদ্দেশ্যেই সকলকে ডেকে এনেছে অজয়। কণিকা উঠে দাঁড়ায়—পা দুটো ওর থরথর করে কাঁপছে। কিন্তু দরজার দিকে তাকিয়ে আবার বসে পড়ে সে—টুলি ঘরে ঢুকছে। নতুন জামা নতুন জুতো নতুন রিবণে কি সুন্দর দেখাচ্ছে টুলিকে। কণিকার ইচ্ছা করে ছুটে গিয়ে একবার ওকে জড়িয়ে ধরে।

কিন্তু তার আগেই ওর শ্রবণ বিদীর্ণ করে একটা সমবেত কণ্ঠের প্রশ্ন ওঠে—মেয়েটি কে? বেশ তো মেয়েটি—ইত্যাদি।

অজয় হাসে। বলে—ওর কথা বলবো বলেই আজকের এই আয়োজন। বসুন আপনারা। ওরে সরবৎ নিয়ে আয়—

সকলে বসলো। টুলি শুধু এদিক-ওদিক তাকায়, কা'কে যেন খুঁজছে সে।

জানলার ফাঁকে বসেছে কণিকা। মুখটাও আড়াল পড়েছে একটু। একঘর মেয়ের মধ্যে তাই টুলি ওকে খুঁজে পায় না।

অজয় বোঝে—ও অস্বস্তি অনুভব করছে বসতে। তাই ডাক দেয়—ওরে অলোক, ওরে অলক, তোদের দিদি এসেছে নিয়ে যা। খেলা করগে ওর সঙ্গে।

আদেশ পালনে দেরী হয় না। দিদি নামে নতুন খেলার সাথীটির প্রাপ্তি-সংবাদে ছুটে আসে অশোক আর অলক। দু'জনে টুলির দু'টো হাত ধরে টেনে নিয়ে চলে যায়।

ততক্ষণে রামশরণ টেবিলে অরেঞ্জ-স্কোয়াশ দিয়েছে। সকলের হাতে সরবতের গ্লাস। অজয়ের হাতেও রাঙা সরবত টলটল করছে। শুধু কণিকাই ছোঁয় নি—গলাটা কাগজের মত শুকিয়ে গেলেও না। অজয়ের হাসি আগুন জ্বালায় ওর মনে, কথাগুলো কানে গরম সীসে ঢেলে দেয় কি?

আজ আপনাদের সকলকে আমি ডেকে এনেছি আমার জীবনের একটা ঘটনার কথা বলবো বলে। যা আমার জীবনের একটা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। কিন্তু আপনারা কেউ জানেন না সে কথা—এমন কি কণিকাও এত দিন জানতো না।

ব্যাপারটার মধ্যে খানিকটা স্বেচ্ছাচারিতার দায় নিশ্চয় আছে। তবে এত দিন বাদে হঠাৎ যদি আপনারা আমার একটি মেয়েকে দেখেন তবে এমন অনেক কথা ভেবে নেবেন হয়তো বা সত্যি নয়।

তাই আপনাদের নিমন্ত্রণ করে আজ এখানে এনেছি নিজে, মুখে বললে অনেক অনর্থক গবেষণার ভার লাঘব করতে পারবো বলে।

ব্যাপারটা অবশ্য নেহাৎই মামুলি। আমি যখন কলেজে পড়তুম তখন একটি মেয়ের সাথে আমার আলাপ হয়। এবং ক্রমেই সে আলাপ গভীর হতে থাকে। মাস তিনেক পরে আমরা স্থির করি আমরা বিয়ে করবো। কিন্তু এ ধরণের বিয়েতে মা-পিসিমাদের মত পাবো না—এ আমি জানতাম। বিশেষ তখন সবেমাত্র আমার বাবা মারা গেছেন, তাই আমার এ ধরণের ইচ্ছাকে ওরা স্বেচ্ছাচারিতার চরম নিদর্শন বলে ধরে নেবেন, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ ছিল না।

তাই শেষ পর্যন্ত আমরা লুকিয়ে বিয়ে করলাম। ইচ্ছা ছিল, বিয়ের পর মাকে জানাবো। কিন্তু আজ নয় কাল করে করে বড্ডো দেরী হয়ে গেল মাকে জানাতে। মাত্র এক বছর বেঁচেছিল ললিতা। মাকে তার কাছে নিয়ে গেলাম যেদিন সে মারা যায়। মাত্র তের দিনের মেয়ে রেখে টাইফয়েডে মারা গেল সে। মা আর লোক জানাজানি করতে বারণ করলেন। বললেন—ফুরিয়েই যখন গেছে তখন যেতে দে।

মেয়েটা এত দিন পেড নার্সের জিম্মায় আর বোর্ডিংয়েই বড় হয়েছে কিন্তু কণিকা আর রাজী হচ্ছে না কিছুতেই।

ও তো এত দিন জানতো না। মা-ও জানাননি, বলতেন—কি জানি হয়তো দুঃখ পাবে, কি দরকার।

আমি যে হাসপাতালে এত দিন প্র্যাকটিস করতাম ওর

বোর্ডিংয়ের যাবতীয় চিঠিপত্র সেইখান থেকেই আনাগোণা করতো বরাবর। কিন্তু মাস দুয়েক আগে আমার সাময়িক অনুপস্থিতিতে কে যেন একটা চিঠি রিডাইরেক্ট করে দিয়েছে বাড়ীর ঠিকানায়, তাইতেই কণিকা জানতে পেরেছে।

ওর একান্ত জেদ মেয়েটাকে বাড়ীতে আনবার। শেষ পর্য্যন্ত তাই নিয়েও এলাম। তাই আজ আপনাদের ডেকেছি আমি। আমাদের বিবাহিত জীবনের নবজন্ম হোল, আপনারা আমাদের আশীর্বাদ করুন—করজোড়ে বক্তব্য শেষ করে অজয়।

ঘরশুদ্ধ মেয়ে-পুরুষ এতক্ষণ নিস্তব্ধ হয়ে বসে শোনে ওর কথা। কিন্তু সকলের সুমুখে স্বীকার করার সাহসের খাতিরেই হোক আর অজয়ের ব্যক্তিত্বের জোরেই হোক, কেউ কোন বাঁকা কথা বলার সুযোগ পেলো না। দু'-একজন শুধু হুম বলে তাদের মন্তব্যগুলোকে পেটের ভেতর পুরে ফেলেন। সময়ান্তরে বেরুবে নিশ্চয়।

শুধু কুন্তলা বৌদি তার জা অনীতার গা টিপে বললে, এততেও আবার বিবাহ-বার্ষিকী। আমরা হলে গঙ্গায় ডুবে মরতাম।

অনীতা বললে—ভাবটা দেখছেন—ভাঙ্গেন তবু মচকান না।

ওদের বিশেষ কিছু বলবার সুযোগ দিলো না অজয়। হাঁক-ডাক করে ভালো ভালো খাবার দিয়ে ভরিয়ে দিলো ওদের মুখগুলো। যদিও সে বেশ জানে এ মিষ্টি ওদের অন্তর স্পর্শ করবে না।

ভেতরটা ওদের আগ্নেয়গিরির মত ফুঁসছে। বেশী সময় পেলেই বিস্ফোরণ হবে—বেরিয়ে আসবে প্রচণ্ড লাভাস্রোত। হোক্—তাতে আপত্তি নেই অজয়ের। তবে বাড়ী গিয়ে এখানে নয়।

মিষ্টান্নের সাথে সাথে টুলিকে দিয়ে এক ঝাঁক পেন্নাম ঠুকিয়ে দিলো সে সকলের পায়ে।

কণিকা দাঁড়িয়ে রইলো নীরবে নতমুখে। সকলে কিন্তু তাকেই প্রশংসা করলে। যাবার সময় আকারে-ইঙ্গিতে বলে গেলো কণিকার মত মেয়ে দুর্লভ আজকের দিনে। অজয় অত্যন্ত ভাগ্যবান, তাই কণিকার মত স্ত্রী পেয়েছে।

কণিকার প্রতি এর চেয়ে বড় পরিহাস আর কি হতে পারে? এততেও শেষ নয়। বড়দি—যাঁকে কণিকা দেবীর মত শ্রদ্ধা করেছে, যার মুখের একটুকু প্রশংসাতে নিজেকে ধন্যজ্ঞান করেছে চিরকাল, সেই বড়দি আজ যাবার সময় কণিকাকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে বললেন—আমি সত্যি বড় খুশী হয়েছি রে কণি! সংসারে চলতে গিয়ে একটা ভুল আমরা প্রায়ই করি—নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থটাকে বিরাট করে দেখি, তার সেই স্বার্থের জন্যে দুনিয়ার সকলের সঙ্গে লড়াই করে মরি—ভাবি ভাবি বীরত্ব করলাম—বড্ডো জিতে গেলাম। কিন্তু আমরা মেয়েমানুষ—আমরাই যদি নিজেদের সমস্ত কোমলবৃত্তিগুলোকে রসাতলে পাঠিয়ে শুধু নিজেদের আত্মসর্বস্ব ইচ্ছাগুলোকেই চরিতার্থ করি, তবে সংসারে থাকে কি? তুই যে আজও মনটাকে বড় রেখেছিস সাধারণের চেয়ে—দেখে সত্যি আমার আজ বড় আনন্দ হোল।

না, না, না—কণিকার সমস্ত অন্তরাত্মা প্রতিবাদ করে। কি শুনছে কে? মানছে কে? কণিকার অত কথা? ওর আপত্তি বিনয় ভেবে ওরা আরও বিনীত হয়ে পড়ে।

তারপর এক সময় সন্ধ্যার অন্ধকারে কণিকাকে একা রে আনন্দ-কোলাহল-মুখরিত অভ্যাগতের দল নিচে নেমে যায় সেখানে দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে অজয় করজোড়ে নম্র শিষ্টাচার জানা সকলকে। সমাগত অতিথিদের প্রতি অভ্যর্থনা থেকে সুরু ক বিদায় সম্ভাষণ পর্য্যন্ত ওর ত্রুটিশূন্য আপ্যায়ন।

ওপরে শূন্য ঘরে শূন্য হৃদয়ে একা দাঁড়িয়েছিল কণিকা। যে ওর সর্বস্ব এইমাত্র লুঠ হোয়ে গেছে।

তবু একটা কথা মনে মনে অস্বীকার করতে কিছুতেই পারে ন কণিকা—সত্যের চেয়ে মিথ্যা যে মন্দ, একথা সে চিরদিনই জানে কিন্তু পৃথিবীর রূঢ় সত্যের চাইতে একটা মিথ্যা যে এত মধুর ত তো তার জানা ছিল না?

অন্ধকার কখন গাঢ় হয়েছে ঘরে-বাইরে। একান্ত অন্যমনস্ক হয়ে দাঁড়িয়েছিল কণিকা। অজয়ের করস্পর্শে যখন চেতন সম্বুদ্ধ হোল তখন কিন্তু স্পর্শকারীকে চিনতে দেরী হোল না কণিকার।

সমস্ত শরীরটা কেঁপে উঠলো। নতুন একটা জিজ্ঞাসা মনটাকে তোলপাড় করে দিলো একেবারে! কি বলবে সে? কি বলবার মত আছে তার? ধন্যবাদ! না কি গল্পের নায়িকার মত একটা প্রণাম ঠুকে দেবে অজয়ের পায়ে?

কিছুই বলতে পারে না কণিকা। কোন কথাই জোগায় না তার মুখে।

অন্ধকারেও তার মনের ভাবটা অজয়ের অগোচরে থাকে না কিন্তু সে আজ প্রতিজ্ঞা করেছে, কণিকাকে নীরব থাকতে দেবে না। হৃদয়ের ভাগ নেবার মন্ত্রপড়া অধিকারটুকু কোন মতেই ছাড়বে না আজ।

তাই কাঁধ থেকে হাতটা সরিয়ে নিয়ে অভিমানের সুরে সে বলে—কি, কথা বলবে না তো? তাহলে আমি চলে যাচ্ছি। বড় অভিনেতার মত দরজা পানে পা বাড়ায় অজয়। তারপর আবার ঘুরে দাঁড়ায়—কণিকা ওর জামার প্রান্তটা ধরেছে।

কণিকার ঠোঁট কাঁপে—গলা কাঁপে—তারপর এক সময় দু'চোখের কোল বেয়ে ঝরঝর করে নেমে আসে অজস্র বর্ষণ। বহু কষ্টে সে বলে—আমার জন্যে ঐ তুমি কেন করলে? তার অস্ফুট স্বর আর শোনা যায় না।

—অজয় আরো কাছে সরে আসে, তারপর কণিকার মাথায় একটি হাত রেখে গাঢ়স্বরে বলে—কেন মিছিমিছি মনটাকে ভারী করছো কণা? কে বললে তোমার জন্যে আমি এসব করলাম? তুমি কি জানো না, একটা মেয়ের আমার কত দিনের সাধ। মনে করো না কেন, ওই অসহায় মেয়েটিকে আমরা রাস্তা থেকে কুড়িয়ে এনেছি দুজনে।

শেষ

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

সুলেখা দাশগুপ্তা

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল মঞ্জু। তারপর তার পূর্বকথার রেশ ধরে বললো—ফাঁদে-পড়া ইঁদুরকেও শিকারী বেড়াল না খেলিয়ে স্পর্শ করে না যে বুদ্ধির তাড়নায়, এটা কিন্তু দিদি তোর সেই বুদ্ধির খেলা। তুই জানিস, তোর এই অসম্মানকর প্রত্যাখ্যানের জবাব দেবার জন্যও বটে, যাকে পাওয়া যত শক্ত হয়ে দাঁড়ায় তাকে পাওয়ার ঝোঁক তত তীব্র হয়—প্রেমের এই রীতির জন্যও বটে—ভদ্রলোক এর পর তোকে পাওয়ার জন্য একেবারে অশান্ত হয়ে উঠবেন। তাই তোর এই হাতে পাওয়ার খেলা।

সেবারও যেমন হেসেছিল, এবারও মৌরী তেমনি হাসল। কথার জবাব মানুষ অনেক সময় হাসিতে দেয়। কিন্তু অন্ধকার ঘরে যেখানে অন্য পক্ষ সেই হাসি দেখবে না, সেখানে তো হাসিতে জবাব হয় না। না, মৌরীর এই হাসি মঞ্জুর জন্য নয়। এটা মৌরীর মোহমুক্ত মনের বৈরাগ্যের হাসি।

কিন্তু মনের দেখার কাছে চোখের দেখা তো অতি স্থূল দেখা। মঞ্জুর অনুভূতির একটুও কষ্ট হলো না মৌরীর সেই অন্ধকারের হাসি দেখতে। বললো—হাসিটার ভেতর আর্টিষ্টিক সেন্সের পরিচয় আছে। সুদর্শন বাবু দেখলে আরো মুগ্ধ হবেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তোর এই যে ধারণা, তোর সব ভাবা শেষ হয়ে গেছে; এ অবধি বসে চিন্তা করবার কিছুমাত্র অবকাশ না পেয়েও কেবল আমাদের সঙ্গে তর্কবিতর্ক করতে করতেই তুই শেষ করে ফেলেছিস তোর ভাবার কাজ—এর মধ্যে মস্ত গলদ রয়ে গেছে। চিন্তার কাজ আর মনের কাজ একেবারেই এক নয়—তা যতই তারা অভিন্ন হোক। যুক্তিবুদ্ধি যখন মহা হৈ-হাঙ্গামা বাধিয়ে ছোটাছুটি, মাথা ঝাঁকাঝাঁকি করে অবশেষে বলে—বাস্ এই আমি স্থির করলাম। মন তখন গুটি-গুটি পায়ে এসে আসন নিয়ে বলে—এবার তবে আমি এলাম। বুঝলি?

—অবশ্যই।

—এই বোঝায় তখন কুলোয় না মানাম। ঝড়-থামা প্রকৃতির মত শান্ত স্নিগ্ধ নীরব সেই পরিবেশে মন তখন সুরু করে দেয় তার শিল্প কাজ। কত ছবি যে সে তখন আঁকে! যুক্তির দাপটে যারা ভয়ে লুকিয়েছিল প্রাণচাঞ্চল্য আরম্ভ হয় তখন তাদের মধ্যে। হৃদয় অক্লান্ত কল্পনায় যুগিয়ে চলে ছবি। রক্তের লাল কণিকা যোগায় রং, অনুভূতি ঢালে প্রাণ। যুক্তি ফিরে এসে দেখে তার পাঁচ শব্দের রংয়ের পাশে মনের আঁকা অসংখ্য রঙিন ছবির সম্ভার। ক্রুদ্ধ যুক্তি উঠে চোখ রাঙিয়ে—কি এগুলো? ভয়ে আর লজ্জায় সব উলটে পালটে ফেলে মন বলে—কোথায় কি? শুধু একটু খেলছিলাম। এখনও তোর ভেতরের ঝড় শেষ হয়নি। মনও তাই নিরুদ্দেশ। হৃদয় নিঃশব্দ। রক্ত স্তব্ধ। রাজপাট দখল করে ছোটাছুটি করছে গরম উত্তেজনা। সার যুক্তি যে কত অসার তা এখন তুই বুঝবিনে। জবাব আছে?

—আছে।

—দিবি নে?

—দেবো। তোর কথা যদি মেনেই নেই যে শান্ত হওয়া মাত্র আমার মন একেবারে সুদর্শনময় হয়ে উঠে তার দিকে ধাওয়া করবে, তবু আমি যে সঙ্কল্প করেছি তাতেই অবিচলিত থাকব। চাইলেই যেমন জীবনের বাসনাকে প্রশ্রয় দেওয়া যায় না, চায় বলেই মনের বাসনাকেও তেমনি প্রশ্রয় দেওয়া যায় না। তোর চিন্তা আর মন যেমন এক নয়, জীবন আর দুর্বলতাও তেমনি এক নয়। জীবনের হাল শুধু ভালো লাগার হাতে ছেড়ে দিলে তার হাল খুব ভালো হয় না। বলে কথার টানটা একেবারে টেনে নিয়ে গিয়ে বললো, কিন্তু তোকে আমার একটা অনুরোধ আছে মঞ্জু! মৌরীর গলায় আবেদন।

—কি?

—যদিও আমার প্রতিজ্ঞা ওদের কাছে আমি একেবারেই চুপ করে থাকব তা যত কাণ্ডই ওরা করুক। তবে তা পুরো সম্ভব হয়ত না-ও হতে পারে। তুই অযথা কথা বাড়াসনে। আমি তোকে কথা দিচ্ছি নাটকীয় কিছু করবো না। আর আমার মনে এখন কোন আর চাঞ্চল্যও নেই। মনস্থির করার সঙ্গে সঙ্গে মনও আমার শান্ত হয়ে গেছে।

—বৃথা কথা বাড়ানো—এই যখন বোঝা হয়ে যাচ্ছে তখন নিশ্চয়ই আমি আর তা বাড়াবো না। কিন্তু তুই ভাবছিস আমি বাড়ীর দিক তাকিয়ে এ সব কথা বলছি। আমার কথা নয় কিন্তু ভুল। আমার সত্যি ইচ্ছে নয় যে, তুই এই বিয়ে ভেঙ্গে দিস। সেবিকার কাজ অপাংক্তেয় হয়ে আছে—এ কাজটার প্রতি আমাদের দেশের বিতৃষ্ণা আর অবহেলার অশিক্ষার ওপর আঘাত দিতেই হবে—এবং তার জন্য যা করণীয় অর্থাৎ ছোড়দা'র বিয়েটা দেওয়া তা যদি করতে পারি তবেই সেটা হবে—সরকারী ভাষায় যাকে বলে—এই—গঠনমূলক কাজ। তোরটা তো হচ্ছে ভাঙ্গার কাজ।

মৌরী বললে—তোর কথার জবাবে বলতে হয়, স্বইচ্ছায় গঠনের কাজে হাত না দিলে—জোর করে টেনে আনলে তাতে গড়ে না আরো ভাঙ্গে। এবং তেমন কাজ করতে হলে নিজেরই করতে এগিয়ে যেতে হয়। অন্যের উপর চাপ দেওয়া চলে না। প্রথমতঃ হলো এই। দ্বিতীয়তঃ আমি সংস্কারক নই। আমি অন্যদের উদ্ধার করতে পারি তত শক্তি আমার নেই। শুধু চেষ্টা করতে পারি নিজেকে রক্ষা করতে—এই পর্যন্ত।

মঞ্জু হাল ছেড়ে দেওয়া একটা নিঃশ্বাস টেনে বললো, কাপড়ের জমীন তৈরীর মতো ভালোবাসার জমীন তৈরী হতেও বহু টানা-পড়েনের বুনন দরকার হয়। এটা বোধ হয় তোদের সেই জমীন তৈরীর কাজই চলছে—দেখা যাক্। পাশ ফিরল মঞ্জু। চেষ্টা করে একটু ঘুম আসে কি না।

ঘুম এলো না, ঘুমের চেষ্টাও মৌরী করল না। চোখ দুটো টিপে

বন্ধ করে রেখে ভাবতে লাগল শুধু কাল কথাটা শোনার পর বাবা-পিসিমারা যে লণ্ডভণ্ড কাণ্ডটা সুরু করবেন, সেই ঝড়টা সামলানোর এবং থামানোর উপায় কি।

কিন্তু ঝড় তো থামানো যায় না। তার শক্তি নিঃশেষ হয়ে ফুরিয়ে যেতে দিতে হয় বয়ে যাওয়ার মধ্য দিয়ে। আর গতির তীব্রতা বুঝে বাড়াতে হয় প্রতিরোধের দৃঢ়তা।—হাঁ, তাই করবে সে। তার পর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা। চার্চের ঘড়িতে শব্দ হলো দুটোর, তারপর আড়াইটের, তারপর তিনটের। মধ্য রাত্রির জন-মানবশূন্য রাস্তায় মাঝে মাঝে ছুটে বেরিয়ে যায় গাড়ী, শোনে তার শব্দ। পাশের বস্তির গলিতে ঠুং ঠুং শব্দ তুলে এসে থামে রিক্সা, কানে আসে জড়িত জিবের হিসাব মিটানো। কখনো জড়িত গলার গান মিলিয়ে যায় গলির শেষে। কোথাও একটা কুকুর ডেকে উঠলে চলতে থাকে নানা দিক থেকে তার উত্তর প্রত্যুত্তর। পাশের এ্যাংলো বাড়ীটার পশীর শিকল বাজানো লাফ-ঝাঁপ থামতে চায় না। সাহেবের মোটা গলায় ধমক খেয়ে কাতর কেঁউ কেঁউ শব্দ তুলতে তুলতে শেষে নীরব হয়। গীর্জার ঘড়ীতে বাজে চারটে। সাড়ে চারটে। ভেসে আসে আজানের আহ্বান শব্দ। উঠে বসে মৌরী। দরজা খুলে এসে দাঁড়ালো সে বারান্দায়। ভোরের বাতাসের যে মৃদু দোলায় ঝির-ঝির শির-শির শব্দ তুলে গাছের পাতাগুলো দুলছিল সেই ঠাণ্ডা বাতাসটা ওর উত্তপ্ত মুখ-চোখ-মাথার ওপর দিয়ে বয়ে বয়ে যেন ওকে শীতল করে দিতে লাগল। দু'-একটা পাখী এধার-ওধার থেকে দু'-একবার ডেকে উঠে আবার চুপ হয়ে গেল—এখনও ভোর হয়নি। আলো ফোটেনি। এ্যাংলো বাড়ীটার আলো জ্বলে উঠল। মোম বাতি জ্বেলে সুইচ টিপে ষ্টোভে বসালো চায়ের জল। ট্রেতে সাজাতে লাগলো চায়ের সরঞ্জাম—বিস্কিটের টিন—বাঁ হাতে নাইট গাউনের মাটিতে লুটানো ঝুলটা মুঠো করে ধরে। আমার বুকের বোতামগুলো পুরো খোলা। হাতের কাজের সঙ্গে দুলতে লাগল তার নরম নিটোল বুকের মসৃণ ত্বক্। ঘুম ভাঙ্গা ফোলা ফোলা চোখে এখনও তার বিছানার টান। হঠাৎ বারান্দার কোণ থেকে একটা অস্পষ্ট শব্দে সে দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে এসে ঘরে ঢুকল মৌরী। এ নিয়ে আজকের রাতে দুবার সে চোখ ফেরালো বাবার দিক থেকে। একবার যখন তিনি বারান্দা দিয়ে পাঞ্জাবীর হাতায় মুখ মুছতে মুছতে চলে গেলেন। দ্বিতীয় বার এই এখন।

সকাল বেলা উঠে মঞ্জু প্রথমেই উপস্থিত হলো গিয়ে রান্নাঘরে অমিতার খোঁজে। অমিতা চায়ের সাজ নিয়ে বসেছিল। মঞ্জুর ছায়াটা ঘরে পড়তে বেশ একটু চমকে মুখ তুলে তাকাল।

—কি ভাবছিলে গো এতো? হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করলে মঞ্জু।

ডান হাতটা বুকের ওপর রেখে অমিতা বললে, আমার তাই বুকটা কেবল ধড়াস্ ধড়াস্ করছে। ওরা যখন শুনবে বাড়ীতে, তখন যে কি দক্ষযজ্ঞ আরম্ভ হবে। আমার ইচ্ছে করছে পালাই এখান থেকে।

মাথা নাড়ল মঞ্জু। তা সেজন্ত আমাদের কিছুটা প্রস্তুত হয়ে থাকতেই হবে। আচ্ছা শোন। চা করবার ভারটা মামুর হাতে দিয়ে তুমি আমার সঙ্গে এসো তো?

—কোথায়?

—এসোই না। একবার শেষ চেষ্টা করে দেখা যাক্।

—কি ভাবে? কি করে? আগ্রহের প্রাবল্যে একেবারে চেয়ার ঠেলে প্রায় লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালো অমিতা।

—এসো আমার সঙ্গে বলছি।

মঞ্জুর পিছু-পিছু চললো অমিতা। বসবার ঘরে ঢুকে জিজ্ঞাসা করলে মঞ্জু—অর্গ্যানটা ঠিক আছে তো?

—হ্যাঁ।

—তবে আর কালবিলম্ব না করে বসে পড় ওটার কাছে।

—মানে! বলছ কি তুমি?

—বলছি গান গাইতে। হতভম্ব অমিতাকে হাত ধরে টেনে এনে মঞ্জুই বসিয়ে দিল অর্গ্যানের সামনের টুলটার ওপর। তার পর ঢাকনাটা খুলতে খুলতে বললে, সাপের ফণা নেমে আসে এমন মন্ত্রও নাকি আছে। মনের ফণা কাবু হয়, তেমন মন্ত্র কি কিছু নেই? রাতভোর ভেবেও কূল করতে পারছিলাম না। এইমাত্র পিসিমা তাঁর নিত্য-নৈমিত্তিকের গায়ত্রী স্তোত্রটির সুর টানতে টানতে বারান্দা পার হলেন। সেই সুরটা আমার ভেতরে গিয়ে যে কি আঘাত করতে লাগল—কি ভাবে ভেতরটাকে ভেঙ্গে-চুরে একশা করে দিতে লাগল—সে বৌদি আমি তোমাকে কথায় বোঝাতে পারবো না। বুঝলাম, মন্ত্র পেয়ে গেলাম। এমনি একটা অনির্বচনীয় ভাঙ্গ-চুরে ভেঙ্গে-চুরে ফেলা যায় কি না দিদির জেদটাকে—একবার তাই দেখা যাক। বাড়ীতে দক্ষযজ্ঞের ঝড় উঠবার আগে, আকাশে-বাতাসে একটা গানের তুফান তোল তো তুমি।

অর্গ্যানের খোলা ঢাকনাটার উপর হাত রেখে বসে রইল অমিতা। তার সব উৎসাহ নিবে গেছে। বললে, একেবারে ছেলেমানুষী কথা। লোকে শুনলে হাসবে। গান দিয়ে নাকি মন পাল্টাতে পারে কেউ।

হাতে-পায়ে একটা ভীষণ চঞ্চলতা প্রকাশ করলে মঞ্জু।—তোমাকে বোঝাতে পারছিনে ছাই আমার কথা। কি করে যে বোঝাই—আমি চাচ্ছি, ওর মনের সামনের যুক্তি-তর্ক জেদকে পেছনে ঠেলে দিয়ে ওর মনের পেছনের দুর্বলতাকে সামনে এগিয়ে আনতে। গায়ত্রী স্তোত্রের সুর আমার ভেতরে গিয়ে যে ভাবে আছড়ে পড়েছিল—তেমনি আছড়ে-পড়া সুরে ওর অন্ধ জেদটাকে ভেঙ্গে-চুরে দিতে।

নিরুত্তরে কিন্তু যেন কিছুটা হৃদয়ঙ্গম করতে পারছে, এই দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল অমিতা মঞ্জুর দিকে।

খুসীতে চক্ চক্ করে উঠল মঞ্জুর কালো চোখ। বললে—কিছুটা বুঝেছ? আচ্ছা, বাকীটাও পরিষ্কার করে দিচ্ছি—কথার সঙ্গে সুর জুড়ে দিলে, সে-মনকে নিয়ে কোথায় না উধাও হয়ে যেতে পারে? এই মনটাকেই উধাও করে দেওয়া যাক ওর। মনটাকে পিষ্ট করে হলেও তার উপর দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করা যায়, কিন্তু নিরুদ্দেশ মন নিয়ে কিছু করা যায় না। তার মতো অসহায় দুর্বল অবস্থা মানুষের আর হতে হয় না! পায়ের নীচে মাটি না থাকলে যেমন হয়, ঠিক তেমনি।

মুখ নিচু করে অর্গ্যানের রিডের উপর এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত একবার আঙুল টেনে গেল অমিতা—যেন গানের অন্বেষণে। তার পর অর্গ্যানে সুরের ঝংকার তুলে সে কণ্ঠ মিলালো তাতে—

আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার
পরাণ সখা বন্ধু হে আমার।

আকাশ কাঁদে হতাশ সম
নাই যে ঘুম নয়নে মম
দুয়ার খুলে হে প্রিয়তম
চাও যে বারে বার—

সমুদ্রের বিরাট ঢেউ আচমকা এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে উলটো-পালটা খাইয়ে যেমন চোরা টানে টেনে নিয়ে চলে গভীর সমুদ্র-পানে, মৌরীকেও যেন এই সুর আর কথা আছড়ে উলটো-পালটা খাইয়ে চোরা টানে টেনে নিয়ে চললো কোন্ গভীরে! নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসতে চাইল ওর—

বাহিরে কিছু দেখিতে নাহি পাই
তোমার পথ কোথায় ভাবি তাই—

ওর বোবা-মনের যেন হঠাৎ কণ্ঠ খুলে গেছে এবং আশ্চর্য্য হয়ে, স্তম্ভিত হয়ে, ও নিজের কথা নিজের কানে শুনছে। মন এই কথাগুলো যেন বহুক্ষণ ধরে বলতে চেষ্টা করছিল। কিন্তু সে বলা কথায় হবার জো ছিল না। তাই সে এই সুরকেই বুঝি খুঁজছিল। অমিতা একের পর এক রেডিওর রেকর্ড পাল্টানো গানের মতো চলন্ত নিরবচ্ছিন্ন গান গেয়ে। দু' হাতে চোখে হাত ঢাকা দিয়ে বসে রইল মৌরী। অন্তরার টান ওর অন্তরকে ভেঙ্গে-চুরে একাকার করে দিতে লাগল—

ব্যথা আমার কূল মানে না
বাধা মানে না
পরাণ আমার ঘুম জানে না
জাগা জানে না—

শ্রান্ত অমিতা গান থামিয়ে ঘুরে বসতেই মঞ্জুর কাঁচা গলায়—

তুমি কেমন করে গান কর হে গুণী—
আমি অবাক হয়ে শুনি কেবল শুনি—

শুনে—হেসে ফেললো সে। ফের ঘুরে বসে অর্গেনে ঝংকার তুলে গলা মিলালো সে—'সুরের আলোয় ভুবন ফেলে ছেয়ে'—অমিতার তৈরী গলার সঙ্গে মঞ্জুর কাঁচা গলার মিলিত সঙ্গীত আর দক্ষ হাতের বাজনা বাড়ীটার নিরানন্দ বিমর্ষ ভাবটাকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে, হাসি আনন্দ গান নিয়ে যেন দরজায় দরজায় ছুটাছুটি আরম্ভ করে দিল। অমিতার হাসিমুখ দেখলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়—বাড়ীতে এ জাতীয় একটা কিছুর দরকার ছিল এটা স্বীকার করে, সে মনে মনে মঞ্জুকে ভারি প্রশংসা করছে।

তখন চা নিয়ে এলে মঞ্জু অমিতাকে দেয়নি, এবার উঠে গিয়ে সে নিজের হাতে চা তৈরী করে আনল বৌদির জন্ম। রামুর হাতে মৌরীর জন্ত পাঠিয়ে দিয়ে বলে দিল, কোন কথা বলবি নে। শুধু চুপচাপ রেখে চলে আসবি।

রামু জানতে চাইল, জানবে কি করে দিদিমণি?

—আচ্ছা, শুধু বলবি চা। আর এসে বলে যাবি দিদিমণি কি করছে। রামু সংবাদ দিয়ে গেল, দিদিমণি চোখে হাত-চাপা দিয়ে শুয়ে আছে। সে চা ছাড়া আর একটা কথাও বলেনি।

অমিতা চায়ে চুমুক দিয়ে বললে, বাড়ীটা হাল্কা হয়েছে ঠিকই কিন্তু তোমার আসল উদ্দেশ্য কতটা সফল হবে, আমার সন্দেহ আছে। গানের প্রভাব যতই হোক, তা সাময়িক। সুর থেমে গেলে কথা বন্ধ হয়ে গেলে তার অনুরণনও থেমে যায়।

আশ্চর্য্য রামুর সহজাত বুদ্ধি! দৌড়ে এসে খবর দিল—বাবু কিন্তু বড় দিদিমণির ঘরে যাচ্ছেন।

বারান্দার যেখানে এসে মঞ্জু বাবাকে ধরলো, পেছন থেকে ডাক দিয়ে অনায়াসে তাঁকে থামাতে পারতো সে। কিন্তু কি বলবে? দিদির ঘরে এখন যেও না, কেন? ওর সঙ্গে এখন কথা বলো না কেন? অমিতা মঞ্জু দুজনে দাঁড়িয়ে রইল স্তব্ধ হয়ে।

উৎফুল্ল মুখে যতীন বাবু গিয়ে ঢুকলেন মেয়েদের ঘরে। বাড়ীর এই গানের হৈ-হল্লা তাকে ভারি নিশ্চিন্ত করেছে। কালকের ব্যাপারটা নিয়ে মেয়েদের সঙ্গে মনান্তর যে অনিবার্য, এ বিষয়ে সন্দেহ ছিল না তাঁর। মেয়েদের মতামত নিয়ে মাথা ঘামান না তিনি। শুধু চান বাধা আসার আগে আপনার কাজ শেষ করে ফেলতে। তার পর গণ্ডগোল করে সে সময়টা তিনি চুপ থাকবেন! এই হলো তাঁর পদ্ধতি। তার পর যা হয় হোক। এবারও তৈরী ছিলেন তিনি, কিছু হবেই। প্রথমটার তাই তিনি চমৎকৃতই হয়ে উঠেছিলেন গান শুনে। এমন শান্ত সমাপ্তি বা মেয়েদের এমন আত্মসমর্পণ তার মতের কাছে, এ তিনি আদপেই আশা করেন নি। কিন্তু বর্তমানে আপন ভাগ্যটাকে যতীন বাবুর এত বেশী প্রসন্ন মনে হচ্ছিল যে, এই ঘটনাটাকেও তিনি তাঁর সুপ্রসন্ন ভাগ্যের আনুকূল্য বলেই গ্রহণ করলেন। মেয়েদের সঙ্গে কথা বলা কমতে কমতে এমন একটা পর্যায়ে এসে তা আজ দাঁড়িয়েছে যে, কথা বলতে মেয়েদের ঘরে ঢুকতে তার অন্ত দিন অনভ্যস্ত ঠেকে। আজ সেই দূরত্বটা পর্যন্ত অন্তর্হিত

হয়ে গেল তার মন থেকে। একেবারে 'মা' সম্বোধন করে ফেললেন তিনি মৌরীকে। উঠে দাঁড়ালো মৌরী। ওর শরীরটা কি ভালো নেই? ভালোই আছে। বেশ বেশ, ভালো থাকলেই নিশ্চিন্ত। তবে একটু তৈরী হয়ে নিতে হচ্ছে ওদের। কেন? ছোট পিসী এই এলেন বলে, একটি মেয়ে দেখতে যেতে হবে যে। ওরা দেখে এসেছেন। শুধু মৌরীর পছন্দ হলেই হয়। ছোড়দা' যাচ্ছে তো? যেন বর্তে গেলেন যতীন বাবু মেয়ের কথায়। যেন কৃতার্থ হয়ে গেলেন বাসুদেবকে যেতে বলায়। হাঁ হাঁ, তুমি যখন বলছ মা, সে নিশ্চয়ই যাবে। মৌরীর মুখের কাঠিন্য নজরেও পড়লো না তাঁর। বাসু বাসু বলে ডাকতে ডাকতে বেরিয়ে গেলেন তিনি। কালো পেড়ে শান্তিপুরীর কোঁচানো কোঁচা লুটোচ্ছে মাটিতে। জমীনের পাতলা আবরণ ভেদ করে দেখা যাচ্ছে শরীরের টকটকে ফরসা রং। খালি গা, ভরাট শরীর। মঞ্জু তাকিয়ে রইল বাবার দিকে। বয়স কি কখনো কখনো পেছন দিকেও চলে!

মৌরী যাচ্ছে। মৌরী বলেছে সে মেয়ে দেখতে যাবে, আর বলেছে, তাকে যাবার কথা। তবে কি মৌরীর ক্ষেপামি ঠাণ্ডা হলো? একটা বিদ্রূপের রেখা খেলে গেল বাসুর ঠোঁটে। বিয়ে—যার বাড়া কাজ মেয়েরা আর কিছু জানে না; জানে ঐ একটা, যাকে ঐ অপেক্ষায় তারা দেবে বিয়ে ভেঙ্গে। তাতে অমন বিয়ে। বাসুদেব বারান্দা থেকে ঘরে ঢুকবার আগে যেন রুমাল দিয়ে হাসি টেনে মুছে তার পর ঘরে ঢুকল। গম্ভীর ভাবে বললো, কিন্তু স্পষ্ট বোঝা যেতে লাগল তার কষ্ট হচ্ছে গম্ভীর থাকতে—কি, আবার শেষে কোন ঝামেলা টামেলা বাধাবি না তো?

—না।

—বেশ লক্ষ্মী মেয়ের মতো গিয়ে বিয়ের পিড়িতে বসবি।

—তোমার তৈরী পাত্রীর মতো আমাদের হাতের কাছে এমন গণ্ডায় গণ্ডায় তৈরী পাত্র হাজির থাকে না। 'রেডিমেড' মিলবে মনে হয় না। যদি মেলে বসব।

পলকে কালো হয়ে উঠল বাসুদেবের মুখ। যে হাসিটাকে সে রুমালে মুছে পকেটে ভরে দিল—সেই হাসিটা যেন পকেট থেকে পালাবার পথ খুঁজতে লাগল। ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সে।

আয়নার কাছে বসে বাঁ হাতে গালের চামড়া টেনে টেনে ডান হাতে সেফটি রেজার চালাচ্ছিলেন যতীন বাবু তাঁর পাকা দাড়ির উপর। হাত চালনা থেমে গেল তাঁর বাসুদেবের কথায়। বিস্মিত ভাবে তাকালেন তিনি ছেলের দিকে। কি বলছে মৌরী, এ বিয়ে হবে না? একটা যখন ভেঙ্গেছে তখন আর একটাও ভাঙবে? মৌরীকে খুশী করতেই যখন মমতার সঙ্গে সম্বন্ধে রাজী হয়েছিলেন যতীন বাবু কোন অনুসন্ধান টনুসন্ধান না করে—তখন ভাঙবার আগেও তার মতটাই আগে নেওয়া উচিত ছিল। যদিও বাসুদেব নিজেও তার বিয়েটার চাইতে মৌরীর বিয়েটাকে বড় করে দেখছিল—এমন কি, সেই জন্য একটা দারুণ অপ্রবৃত্তির বিয়েতে পর্যন্ত সে রাজী হয়ে গিয়েছিল—সেটা ভুলে সে আক্রমণ করল যতীন বাবুকে।

বিশ্বাস করলেন না যতীন বাবু ছেলের কথা। এটার সঙ্গে ওটার যোগ কি? যোগসূত্রটা বাসুদেব বিকৃত মুখে দেখিয়ে দিলে বিমূঢ় ভাবে কিছুকাল তাকিয়ে রইলেন তিনি ছেলের দিকে। তারপর হাতের ক্ষুর নামিয়ে রেখে আদ্দেক কামানো ও সাবান-মাখা মুখেই উঠে গিয়ে প্রবেশ করলেন মেয়ের ঘরে। অবিশ্বাস্ত কণ্ঠে শুধোলেন—তুমি বলেছ, তুমি বিয়ে করবে না?

—হ্যাঁ। উঠে দাঁড়িয়ে স্পষ্ট জবাবে বললো মৌরী। শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন যতীন বাবু মেয়ের মুখের দিকে। বাসুদেবের বিয়ে নিয়ে মেয়েদের সঙ্গে একটা বিরোধের জন্য তিনি তৈরী ছিলেন কিন্তু ঘটনাটা যে কোন রকমেই মৌরীর বিয়ের সঙ্গে জড়িয়ে যেতে পারে, এ তাঁর কল্পনায়ও ছিল না। সুইচ টিপে ঘরের আলো নিবিয়ে দিলেও বুঝি এমন মুহূর্তে সব অন্ধকার হয়ে যায় না। যে ভাবে যতীন বাবুর চোখের আলো নিবে গেল। অন্ধকার ঘরে জিনিষ হাতড়াবার মতোই তিনি কথা হাতড়াতে লাগলেন—বিয়ে করবে না বলছ?

—হ্যাঁ।

ঘোলাটে দৃষ্টিতে আবারও সেই একই প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করলেন যতীন বাবু—তুমি বিয়ে করবে না বলছ?

মৌরীও তেমনি একই ভাবে জবাব দিল—হ্যাঁ।

রামু খুসীতে দৌড়ে এসে ঘরে ঢুকে নীচ থেকে ছুটে আসার ধাক্কায় হাঁ করে নিঃশ্বাস টানতে টানতে বললে, এই মস্ত মস্ত দুটো ট্রাক এসেছে বাবু—মেরাপ বাঁধার জিনিষ-পত্তর নিয়ে। মাল নামাচ্ছে তারা। আপনাকে ডাকছে। ঘরের সবার দিকে একটা আকর্ণবিস্তৃত হাসি দিয়ে তাকালো সে। যেন—আর কি। সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেল তো। মেরাপ বাঁধার জিনিষ নামছে—বিয়ের তবে আর বাকী কি?

টেবিলের একটা বই খাড়া করে শক্ত হাতে চেপে ধরল মৌরী—যদি এই মেরাপ বাঁধাবাঁধি আরম্ভ হয়—আমার কথা না শুনে, তবে আমি এক্ষুণি এ বাড়ী ছেড়ে চলে যাবো।

মঞ্জু বসে বসে নির্বিকার ভাবে খাতায় আঁকিবুকি করে চলছিল—তেমনি হাত চালাতে চালাতে ছোট্ট গলায় বললো—এই দিদি, তুই নাটকীয় কিছু করবিনে কথা দিয়েছিস?

যতীন বাবু এবার রাগে ফেটে পড়ে চেঁচিয়ে উঠলেন—এ কি ছেলেখেলা! বললেই হোল বিয়ে করবো না? ও সব উন্মাদের কথা রাখো। রামুর দিকে তাকিয়ে দাদাবাবুদের ডেকে মালপত্র ছাদে তুলবার নির্দেশ দিতেই মৌরী ব্যাগটা তুলে কাঁধে ঝুলালো।

ক্রোধোন্মত্ত যতীন বাবু দিশেহারার মতো এদিক ওদিক তাকাতে লাগলেন—কি, বাড়ী ছেড়ে চলে যাবে—এতো সাহস? তোমাকে—তোমাকে আমি তালাবন্ধ করে রাখবো। বিয়ে তোমাকে করতেই হবে।

হাসল মৌরী।

ঘরে এসে ঢুকলেন ছোট পিসী। বললেন, বুড়োধাড়ী মেয়েকে বিয়ে দেবে তুমি তালাবন্ধ করে? অমিতা প্রতিবেশীদের দিককার দরজা-জানালা বন্ধ করে দিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইল। মঞ্জু তেমনি এঁকে চলল খাতাভরে কুকুর বেড়াল মানুষ। কখনো বাবা-পিসীমাদের কথাগুলো চলল ছুটোছাটা লিখে। যেন অলস অবসর কাটাচ্ছে সে। ঘরে যা ঘটছে তার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই তার তাই সে শুনছে না—পিসীমাদের চিৎকার গাল-মন্দ অশ্লীল মুখক

—বাবার হল্লা আর বৃথা গর্জন। মৌরী দৃঢ়ভাবে তেমনি দাঁড়িয়ে। জানালাটা বাতাসে কিছুটা খুলে গেছে। এক টুকরো রোদ তার মুখের উপর যেন স্তম্ভিত হয়ে পড়ে আছে।

ঘরের ভেতর কি ঘটল, কে যে কি বললো, কার কথা যে কে শুনল, কিছুই বুঝল না অমিতা। শুধু শেষ কলাকলটা ধরল ছোট পিসীর কথায়। উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে বেরিয়ে এসে তিনি ভাইকে বললেন—টেলিগ্রাম দাও মেয়ে হঠাৎ মারা গেছে। কথায় বলে কুকুরের পেটে ঘি সয় না। এ বিয়ে সম্ভ হবে কি করে ওর! বারান্দা দিয়ে যেতে যেতে ডাকলেন ভাইকে—চল আমার সঙ্গে। আমি সামনে থেকে টেলিগ্রাম করিয়ে তবে যাবো। এ বিয়ে আমিই আর হতে দেবো না। ভাইকে একরকম টেনে নিয়ে চললেন তিনি। যে স্ত্রীকে চিরকাল অশান্তির আধার ভেবে এসেছেন—আজ জীবনের চরমতম অশান্ত ক্ষণে যতীন বাবুর মনে পড়তে লাগল কেবল তারই কথা। জীবনে যাকে বঞ্চনা ছাড়া কিছুই করেননি, আজ তাকে পেলে সর্বস্ব সমর্পণ করে তিনি পালাতেন—আর তবেই বুঝি সব দিক রক্ষা হতো।

মঞ্জু এবার হাতের কলম নামিয়ে আড়মোড়া ভেঙ্গে উঠে দাঁড়ালো। যাক দু'-দু'টো বিয়ে মিটল। যদিও হাঙ্গামা নেহাৎ কম হলো না, তবু যে অনেক হাঙ্গামা বাঁচলো তা-ও সত্যি।

মৌরী ব্যাগ খুলে তিন-তিনটা সারিডন একসঙ্গে মুখে পুরে দাঁতে চিবুতে চিবুতে কুঁজো থেকে জল গড়ালো। তারপর ঢকঢক করে পুরো এক গ্লাস জল খেলো।

মঞ্জু বললে—আর গোটাকয় বেশী মুখে পুরলে টেলিগ্রামটা কিন্তু সত্য করে দিতে পারিস দিদি!

দু'টো লাল ডগডগে চোখ তুলে মৌরী বললো—এতেও কুলোবে না। ছিঁড়ে যাচ্ছে মাথা। চিবুকের, কপালের বিন্দু বিন্দু ঘাম আঁচল তুলে মুছল মৌরী।

মঞ্জু বললো—পুবের জানালা দিয়ে এসে-পড়া সকালের কচি রোদটা এতক্ষণ তোর মুখের উপর তার মৃদু তপ্ত নিঃশ্বাস ফেলছিল। এবার ঘর থেকে পায় পায় বেরিয়ে গেল দক্ষিণের দরজা দিয়ে। হ্যাঁ, সন্ধ্যা নাগাদ পৌঁছে দেবে লক্ষ্ণৌর প্রাসাদে সব খবর। যক্ষ পাঠিয়েছিলেন তার বিরহবার্তা মেঘদূত মারফৎ। তোর ছিন্ন প্রেমবার্তা নিয়ে যাবে রৌদ্রদূত। যেমন খবর তার তেমনি দূত হওয়াই তো উচিত।

মৌরী মাথায় জল চাপিয়ে পাখাটা বাড়িয়ে শুয়ে পড়ল। মাছগুলো নিঃশব্দে সব শেষ করে মিনি মুখ পরিষ্কার করতে করতে মন্থর পায়ে বারান্দা দিয়ে হেঁটে ওদের ঘরের দিকেই আসতে লাগল। বেড়ালটার পুরো তৃপ্তির মন্থর চলনের সঙ্গে ছোট পিসীর হাঁটাটা কি আশ্চর্য্য রকম মিল—মঞ্জু তাকিয়ে রইল তার দিকে। মিনি গুটিসুটি মেরে টেবিলের নীচে শুয়ে পড়বার আগে একবার ওদের দুজনের দিকে তাকিয়ে মিউ মিউ করে ডেকে নিল। যেন দেখল আক্রমণের সম্ভাবনা আছে কি না। তারপর আরামে চোখ বুজল। মঞ্জু যেন একাগ্র মনে কি ভাবল বেশ কিছুটা সময়। তারপর অন্যমনস্ক ভাবে উঠে দাঁড়াতে কলমটা পড়ে গিয়ে যে শব্দ হলো, সেই শব্দে চোখ মেলল মৌরী।

মঞ্জু বললো—আচ্ছা, এবার তো বেশ মাথা উঁচু করে গিয়ে মমতাদের বাড়ীর দরজায় টুঁ মারা যায়—কি বলিস?

—তবে আমি মাথা উঁচু করা কাজই করলাম বল?

—অন্তত মাথা-পড়া কাজ করিসনি, সে তো নিশ্চয়ই। যাবো?

—বিয়ের ঐদিনটা পার হয়ে যাক, তারপর যাস।

—এখনও কোন সম্ভাবনা আছে নাকি?

—না। কিন্তু হাঙ্গামা এখনও অনেক আছে। সে সব মিটুক, তারপর।

—আচ্ছা। [ক্রমশঃ।

পড়ন্ত বিকেলে

বংশীধারী দাস

সূর্যাস্তের রঙে রাঙা মেঘের সিঁড়িতে
যাই-যাই ক'রে তবু দাঁড়ালো থমকিয়ে
ইচ্ছার কটিতে শেষ মৃদু ভর দিয়ে-
মৌন-ম্লান ফিরে-যাওয়া রোদের বিকেল।

আহা এ বিকেল বুঝি অন্তিম পিপাসা
ক্ষণিক জ্বালিয়ে দিয়ে মেঘের শিখরে
আপন অব্যক্ত গাঢ় বেদনার ভরে
ধীরে ধীরে ক্ষয়ে যাবে,

যদি যায়, এই
রোদটুকু যতক্ষণ সয় এ শরীরে
সে চায় নিবিড় ক'রে, চায় ফিরে ফিরে।
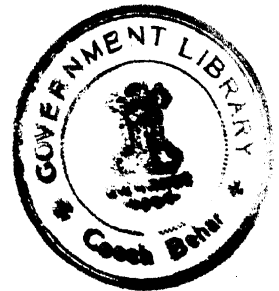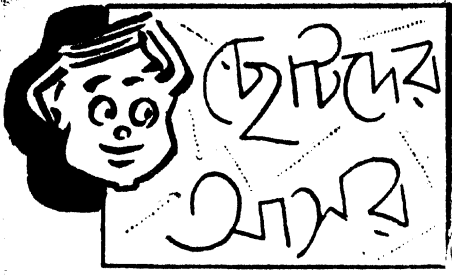
শান্তনুর পত্র

প্রিয় কিশোর,

তোমাকে অনেক দিন পরে লিখছি। তার কারণ অবশ্য এ নয় যে আমি সময় পাইনি। চিঠি লেখার সময় সব সময়ই পাওয়া যায়। কতটুকু সময়ই বা লাগে। আমি যে লিখিনি তার কারণ তুমি খুঁজে পাবে আমার চিঠিরই মধ্যে। আমি কিছুদিন আগে কালিম্পং-এ পোষ্টেড হয়ে এসেছি। চাকরি আমার মাত্র কয় মাসের, কিন্তু জানি না কেন, এখানে এসেই একটা ঘটনার পর আমার মনের মধ্যে খুবই একটা পরিবর্তন এসে যায়। পরিবর্তন হয়ত সাময়িক হ'তে পারে কিন্তু ভয়ানক যে একটা নাড়া খেয়েছি তাতে সন্দেহ নেই। তার থেকে নিজেকে সামলে তুলতে কত দিন লাগবে জানি না। তবে এটি আমার জীবনে একটি অবিস্মরণীয় চিহ্ন রেখে যাবে।

এখানে এসে কাজে যোগ দেবার কিছুদিন পরেই হঠাৎ একটা খবর আমার কানে আসে। সেটা হচ্ছে দুর্গম পাহাড়ে ওঠবার একটি দুর্ঘটনা। এক ভদ্রলোকের মৃতদেহ পাওয়া গেছে। পাহাড়ীরা এসে নিকটবর্তী থানায় খবর দেয়। পাহাড়ে এরকম দুর্ঘটনা এমন কিছু চমকপ্রদ নয়। আমার কানে আসাতে আমিও এমন কিছু লক্ষ্য করার বিশেষত্ব খুঁজে পাইনি এই ঘটনার মধ্যে। কিন্তু যে মুহূর্তে একখানা ছবির দিকে আমার চোখ পড়ল, সেই মুহূর্তেই আমার মাথা ঘুরে গেল। ছবিটা সেই ভদ্রলোকেরই ফটোগ্রাফ—তাঁর ঝুলির মধ্যে অনেক জিনিষের সঙ্গে এটাও নাকি পাওয়া গেছে।

আচ্ছা কিশোর, এবার নিশ্চয়ই তোমার মনে হচ্ছে যে, সেই লোকটির সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক ছিল। তাই না?

ছিল ত বটেই, তা না হলে তার কথা তোমাকে পত্রে লিখবো কেন? তোমারও যে সময়ের দাম আছে তা তো জানি। ভাল কথা, তোমার পরীক্ষার কথা লিখো। আর অন্যান্য খবর জানাবে—ললিতার কথাও লিখো। ইতি—শান্তনু।

কিশোরের পত্র

প্রিয় শান্তনু,

তোমার পত্র যথাসময়ে পেয়েছি। কিন্তু, প্রথম কথা হচ্ছে যে, তুমি কি একটা গল্পের সূচনা করতে চাও? না কি, তোমার নিজের কথাই লিখেছ? যেটুকু লিখেছ তাতে কেউই খুশি হ'তে পারে না। গাছে তুলে দিয়ে মই কেড়ে নেওয়ার মত। যদি জানাতেই হয় সবটা জানানোই উচিত ছিল। হ'তে পারে, তোমার হাতে সময় ছিল না কিন্তু আমাকে এরকম suspense এ রাখা কি তোমার কর্ত্তব্য?

Better none than little. জানত আমি অল্পে খুশি নই। তোমার মনের অবস্থা survey করার মত কোনও অবকাশই দাওনি আমাকে।

আমার কাঁধের ওপর অনেক ঝঞ্চাট না থাকলে হয়ত কোনও দিন প্রত্যূষে দেখতে আমি তোমার কোয়ার্টারে স্যুটকেস বগলে হাজির হয়েছি। কিন্তু তা যখন হচ্ছে না, তুমি অতি অবশ্য সমস্ত ঘটনা লিখে জানাবে। ভদ্রলোক কে, কি ভাবে তার মৃত্যু হয়েছে এবং সব চেয়ে বড় কথা, তোমার সঙ্গে তার কি সম্পর্ক ছিল।

তোমার পত্রের আশায় রইলুম। আমাদের এখানের খবর সবিশেষ পরে জানাবো। সংক্ষেপে জেনে রাখো, আমার সেকেণ্ড ইয়ারের টেষ্ট হয়ে গেছে—ভালই করেছি। বলা বাহুল্য, তোমার দীর্ঘ পত্র পড়ার জন্যে অনন্ত অবকাশ আছে হাতে। ইতি—কিশোর।

পাঁচ দিন পরে একখানা মোটা খাম এল কিশোরের নামে। খুলে সে দেখলো শান্তনুরই চিঠি। দীর্ঘ পত্র পড়ার জন্যে মনটা তৈরী করে নিয়ে সে একটা ইজিচেয়ারে এলিয়ে পড়লো। শান্তনু লিখেছে—

প্রিয় কিশোর,

তোমাকে suspense এ রাখা আমার উচিত হয়নি। তবে উপায় ছিল না। সব খুলে বলার মত সময় ছিল না হাতে, তা ছাড়া মনের অবস্থা যে খুবই চঞ্চল ছিল তা বোধ হয় বুঝতে পেরেছ।

যাই হোক, ঘটনাটা পরিষ্কার করার চেষ্টা করছি···তুমি ত জান, আমি Geological survey উপলক্ষে পাহাড়ে জায়গায় ঘুরি। এখানে আসা অবশ্য কাজের জন্যে নয়, নিছক বেড়াবার জন্যে।

গত ২৭শে এপ্রিল হঠাৎ ঐ দুর্ঘটনার সংবাদ পেলাম এবং তার পরই স্থানীয় পুলিশ কর্মচারীর মারফৎ ঐ ফটোখানি আমার নজরে পড়লো। ঐ ফটোখানির সঙ্গে আমার অনেকখানি পুরনো স্মৃতি জড়িয়ে ছিল। লোকটি আমাদের খুবই চেনা। অবশ্য তখন এত বৃদ্ধ হয়নি, তাহলেও মুখের কোনও পরিবর্ত্তন হয়নি। এই বারে আমার একটু পুরনো ইতিহাস বলছি।

ছোটবেলায় আমরা তিন ভাই-বোন মানুষ হই। আমিই ছিলুম বড়। আমার নীচে মিহির আর ছোট বোন মণিমালা। কলকাতার এক বিরাট না হলেও বড় বাড়ীতে ছিলাম। পুরনো বাড়ী, ভাঙ্গা ভাঙ্গা চেহারা। বাড়ীর মধ্যিখানে মস্ত এক উঠোন। বাড়ীতে থাকি আমরা তিন জন, বাবা আর এক পিসী। তা ছাড়া দু'-তিন জন দাস-দাসীও ছিল। আমাদের জন্যে একজন শিক্ষকও ছিলেন।

আমরা স্কুলে পড়তাম, বাড়ীতে এসে খেলা করতাম। নীচে উঠোনটি ছিল আমাদের বড় প্রিয়। যত রকম খেলা তারা

শ্রীশৈল চক্রবর্ত্তী

দরাজ বুকের ওপর। উঠোনের কোণে ছিল একটা কাঞ্চন ফুলের গাছ। তার ছায়াটি বড় মধুর লাগতো। ধুলোখেলার পীঠস্থান ছিল ওটি। খেলায় তন্ময় আমাদের পিঠের ওপর মাঝে মাঝে হাওয়ায় খসা কাঞ্চন ফুল ঝরে পড়তো।

উঠোনের আশে-পাশের বারান্দাগুলোয় ছিল বহু পায়রার বাস। তাদের কলরব সরগরম করে রাখতো বাড়ীটাকে। বকম্ বকম্ আওয়াজটা এখনও বেশ কানে বেজে ওঠে। আমরা তাদের অকারণ তাড়া দিয়ে মজা দেখতুম। ডানা ঝাপটানো আওয়াজটায় স্তব্ধ দুপুর যেন উচ্চকিত হয়ে উঠতো।

দালানের এক প্রান্তে ছিল এক সিঁড়ি। ভাঙ্গা-ভাঙ্গা ধাপ। সোজা উঠলে দোতলায় আর একটা বারান্দা। ডান দিক দিয়ে বারান্দা পেরিয়ে আমাদের থাকার ঘর। আমরা মানে, আমরা তিন জন। সিঁড়ি দিয়ে উঠে বাঁ দিকে যাবার উপায় নেই। সেখানে পার্টিশান দেওয়া, যার দরজা প্রায় সব সময়ই বন্ধ। বাবা থাকতেন সেই বন্ধের মহলে। কদাচিৎ খুলতো সেই দরজা এবং আমাদের ওপর কড়া নিষেধ ছিল ও-দিকে যাবার পথে। কত উঁকি-ঝুঁকি মেরেছি কিন্তু কিছুই দেখবার উপায় নেই। বারণের উঁচু দেয়াল আমাদের যেন বিদ্রূপ করতো।

হাঁ, বাবার সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা হতো, দিনের মধ্যে দু'-একবার। কিন্তু সন্ধ্যার পর আর তাঁকে দেখা যেত না। সব চেয়ে সহজ লাগতো তাঁকে খাবার সময় যেদিন আমরা একসঙ্গে খেতাম। হাসতেন, দু'-একটা গল্পও করতেন। কিন্তু মাঝে মাঝে হঠাৎ কেন যেন গম্ভীর হয়ে যেতেন!

এক দিন সন্ধ্যাবেলা আমরা খেলা-ধুলো সেরে হাত-পা ধুয়ে পড়তে বসার উপক্রম করছি, লাল্টুর মা এক বাটি ক'রে দুধ খাইয়ে গেল আমাদের। কেন জানি না, সেদিন সত্যিই পড়ার ইচ্ছেটা ছিল না। কিন্তু তিন জনেই বসেছি পড়তে। ঘড়িটা চলছে, টক্ টক্ টক্; যেন নাল-পরা একটা মস্ত ঘোড়া চলছে কদমে।

এমন সময় হঠাৎ সেই নিস্তব্ধ বাড়ীর সিঁড়িতে ভারী ভারী জুতোর আওয়াজ উঠলো। আমরা সচকিত হয়ে উঠলুম।

মশ মশ মশ।

শব্দটা সিঁড়ি দিয়ে উঠে আমাদের বারান্দার পাশ দিয়ে বাঁদিকের বারান্দার দিকে এগুলো। তার পরেই শোনা গেল দরজা খোলার শব্দ। সেই নিষিদ্ধ মহলের দরজা। পদশব্দ সেই দিকেই যেন মিলিয়ে গেল।

কে এলো?—বলে উঠলো মিহির। মণিও আমার দিকে তাকিয়ে থাকে বড় বড় চোখ ক'রে।

আলো জ্বালা হয়েছে—কাচের ঝাড়গুলিতে বাতি নেই। অনেকগুলিই ভেঙ্গে-চুরে গেছে। দেয়ালগিরিতে জ্বলছে কেরোসিনের আলো।

মণিমালা সবে ছ'বছরের। সে বিশেষ ভয় পেয়েছে মনে হলো না। সে বললে, মাখন ডাক্তার বাবু এলো।

দূর! দাবড়ি দিয়ে বললে মিহির—তার জুতোর আওয়াজ অত ভারী বুঝি? নিশ্চয়ই অন্য কেউ।

আমি বললুম, বোধ হয়, টেঁপু জ্যাঠা এসেছে। সেই যে একটা কি মামলার জন্তে আসে বাবার কাছে। তোরা এখন পড় দেখি।

'হিরোজ অফ হিষ্টোরি' বইখানা খুললাম আমিও। ওদের আদর্শ হতে হবে ত আমাকে। কিন্তু মনের ভাবটা কিছুতেই হিরোর মত হচ্ছে না।

যথারীতি পড়া ও তারপরে খাওয়া সেরে তিন জনই ঘুমিয়ে পড়লাম। গভীর রাত্রে ঘুমের মধ্যে মনে হলো, আবার যেন সেই পদশব্দ শুনছি।

দিনের বেলায় ওকথা আমরা বেমালুম ভুলে গেলুম। কিন্তু তিন দিন পরে আবার সেই শব্দ মশ-মশ-মশ। সেদিন সবাই ঘুমুচ্ছিল, আমিই ছিলুম জেগে। মনের মধ্যে অনেক কথা তোলপাড় করতে লাগলো। মণিকে পিসীমা এক ব্রহ্মদৈত্যের গল্প বলতেন মাঝে মাঝে। না ঘুমুলে না কি সেই ব্রহ্মদৈত্য আসে বাড়ীতে। আর যে ছেলে-মেয়ে ঘুমোয় না তার চোখ উপড়ে নেয়। মণি আড়ষ্ট হয়ে জিগ্যেস করেছিল: চোখ নিয়ে কি করে সে? পিসীমা বলেছিলেন: ব্রহ্মদৈত্য ঝুলিতে করে নিয়ে যায়। বাড়ীতে গিয়ে সে দেয় তার বাচ্চাদের। তারা সেগুলো দিয়ে মারবেল খেলে।

এ কথা বিশ্বাস করার বয়েস নয় আমার, আমি ক্লাস এইটে পড়ি। কিন্তু তবু যেন সেই ভয়াত্মক কল্পনা আমায় পেয়ে বসে। মনে মনে ব্রহ্মদৈত্যের ছবিই ওঠে ভেসে।

যাই হোক, একদিন সন্ধ্যায় নিরিবিলিতে পেলুম পিসীমাকে। মা অনেক দিন মারা গেছেন, তাই বিধবা পিসীমা আমাদের বাড়ীতে থাকেন, আমাদের মানুষ করেন। পিসীমাকে ধরে বসলুম, তোমাকে বলতেই হবে।

অনেক কাটাবার চেষ্টা ক'রে শেষে তিনি বললেন, কাউকে বলিসনি যেন, তোর বাবা জানতে পারলে ভীষণ রাগ করবে। রাত্রে একজন লোক আসে তোর বাবার কাছে। এ দেশী লোক নয় সে, নামটা কি যেন শ্রীবাস্তব, জব্বলপুরের ওদিকে বাড়ী।

কেন আসে সে ? ভয়ে ভয়ে জিগ্যেস করলুম আমি।

তা বাপু আমি জানি না। তার এক বিরাট ঝোলা দেখেছি কাঁধে ঝোলে। তাতে না কি যত রাজ্যের পাথর-নুড়ি বোঝাই। তা লোকটি খারাপ নয়। তোদের সঙ্গে যদি আলাপ হয় তাহ'লে দেখবি তাকে দেখে ভয় করে না।

অত রাত্রে আসে কেন ? কখনও দিনের বেলায় তাকে দেখিনি! বিস্মিত কণ্ঠে বলি আমি।

রাত্রেই ওদের দরকার যে। আমি কি আর অত-শত বুঝি ? তবে শুধু রাত্রেই সে আসে, কয়েক ঘণ্টা থাকে আবার চলে যায়। কোথায় যায় তাও জানি না।

আমি একদিন দেখবো তাকে। বললুম আমি।

না, খবরদার না। তোদের বলতে নিষেধ আছে। তোরা জানিস না, আহা, কত টাকাই যে নগেন (আমার বাবার নাম নগেন্দ্রকুমার) নষ্ট করলো ঐ লোকটার পাল্লায় পড়ে। কত বড় জমিদারের ছেলে তোরা। আজ কি-ই বা আছে! কেষ্টরামপুরের তালুক যখন ছিল—আমি ছোটবেলায় কত হাতীতে চড়েছি। কত দাস-দাসী, নায়েব-গোমস্তা, কত ঐশ্বর্য কত দাপট ছিল বাবার। এ বাড়ীটা বাবা কেনেন কলকাতায় কর্মচারীরা থাকবে বলে, আর মাঝে মাঝে আমরা এসে বেড়িয়ে যেতুম এখানে।

পিসীমা দীর্ঘনিঃশ্বাসের সঙ্গে পুরনো দিনের অনেক কথাই বলতে লাগলেন। আমার মন কিন্তু ঘুরে-ফিরে সেই রহস্যময় নৈশ আগন্তুকের পিঠে ঝোলানো ঝুলির মধ্যেই পড়ে ছিল।

আমার অন্যমনস্কতা পিসীমার চোখ এড়ায়নি। তিনি বললেন, আমার ভয় হয় শান্তু, নগেন যে কি নেশায় পাগল হয়ে আছে সে-ই জানে! কিন্তু কোনও দিকেই তার নজর নেই। শেষে যা আছে সবই বুঝি সে খোয়াবে।

কিছু বুঝতে পারছি না পিসীমা! তুমি পরিষ্কার করে বল। অধীর ভাবে বললুম আমি।

পিসীমা বলতে থাকেন, দেখ, তুই ছেলেমানুষ, তুই বুঝবি কি ? মামলার কথা কি বুঝিস তুই ? এক মামলায় পড়ে রোকের মাথায় আস্তে আস্তে একের পর এক সব তালুকগুলি বিকিয়ে গেল। ত তোর বাবার মাথা গেল গুলিয়ে। রাগে দুঃখে অপমানে মানু কি থাকে আর ? আর ঠিক সেই সময়ই এসে জুটলো ঐ শ্রীবাস্ত লোকটা ভাল কিন্তু ওর মন্ত্রণাটা, আমার মনে হয়, ভাল না। যে বাবার যখন হার হলো মামলায় তখন তার মুখে কেবলই শুনত একদিন আমি আবার সব উদ্ধার করবো। টাকা সংগ্রহের জ চেষ্টাই করেছিল সে। কোন দিকেই যখন কিছু হলো না তখন মুষড়ে পড়লো। ঘরের মধ্যে বন্ধ থাকে, কথা নেই, বার্ত্তা নেই—(কেমন। তারপর, জানি না কেমন করে এসে জুটলো ঐ শ্রীবাস্ত ও আসার পর থেকেই কিন্তু নগেনের উৎসাহ দেখলুম। একা ওদের গোপন কথা একটু শুনেছিলুম। নগেন বললে, সব সো ফলাবো আবার। সোনার রহস্যটুকু যদি জানতে পারি একবা তারপর থেকে ঐ লোকটির যাতায়াত। আমার মনে হয়, (সোনা তৈরী করার কোনও গোপন ফিকির আবিষ্কার করতে যাচ্ছে জানি না, আমার অত-শত খোঁজে দরকারই বা কি ? যাক, মিহির এসে পড়লো। তুই কিন্তু এসব কথা কারুর কাছে প্রক করবি না। তবে ঐ শ্রীবাস্তবের সঙ্গে যদি আলাপ হয়, তোরা তা পাথর-কাকু বলে ডাকিস। খুশি রাখাই ভাল। লোকটা হ মন্তর-তন্তর জানে।

পিসীমার কাছে সেই দিন অনেকখানি তথ্য জানতে পারলুম ব কিন্তু মনের মধ্যে আরও অনেক রহস্য জমা হয়ে উঠলো। বুঝতে পারছো, কিশোর, বারো-তেরো বছরের কিশোর মনে এই রহস্যে প্রভাব কতখানি ? নিজেকেই যেন কত প্রশ্ন করলুম, নিশাচর শ্রীবাস্তব লোকটা কে ? চোরের মত, ব্রহ্মদৈত্যের মত নিশীথ রাতে বা কেন আসে ? বাবার কাছে এটা এত গোপনীয়ই বা কেন তারপর, সোনা সত্যিই কি করা যায় ? Alchemy বলে এক শব্দ পড়েছিলাম। অভিধানে তার মানে দেখলুম। অনেক দি আগে মানুষ যে বিদ্যার সাহায্যে অন্য ধাতুকে সোনা করার চে করতো তাকেই অ্যালকেমি বলে। মনের মধ্যে কৌতূহল পর্বত প্রমাণ খাড়া হয়ে উঠলো।

তখনকার মনের অবস্থার কথা লিখে চিঠি দীর্ঘ করবো না শুধু এক দিনের ঘটনার কথা লিখছি।

রাত্রে মিহির আর মণিমালা ঘুমিয়ে পড়ার পরে অনেকক্ষ অবধি জেগে থাকতুম আমি।

একদিন ওরা ঘুমিয়ে পড়েছে আমি মশারি থেকে বেরি এসেছি। তখন রাত অনেক হবে, বোধ হয় দশটা। পিসী আমাদের পাশের ঘরে ঘুমুতেন। আস্তে আস্তে বেরিয়ে এলাম ঘ থেকে বারান্দায়। পার্টিশানের ছোট দরজাটার গায়ে হাত রেখেছি সামান্য চাপে সেটা খুলে গেল। আস্তে আস্তে ঢুকলুম প্রথ বাঁ দিকের ঘরটায়। পরে জেনেছিলুম, সেইটেই বাবা ল্যাবরেটরী। একটা মিটমিটে আলো, কেউ নেই ঘরে। আমা তখন দেখবার সময় নেই। একটা আলমারির পাশে একা বড় তাক, তার পাশে কোণের দিকে একটা পরদা ঝুলছে আমি নিরাপদ দেখে সেই পরদার আড়ালে ঢুকে দাঁড়ি রইলুম।

[ক্রমশঃ

সমাজসেবায় স্বামিজী

সতীকুমার নাগ

স্বামী বিবেকানন্দ বেলুড় মঠের কাজ শেষ করেছেন। এত কাজে তাঁর শরীর খারাপ হয়ে যায়।

ডাক্তার বললেন, আপনি কিছু দিন দার্জিলিং-এ থাকুন। সেখানে বিশ্রাম নিন। স্বামিজী তাতে বললেন, তা কি করে হয়? সবে মঠের কাজ শেষ করেছি। এখনও অনেক কাজ বাকী আছে।

শেষ পর্যন্ত গুরুভাইদের কথায় স্বামিজী দার্জিলিং-এ গেলেন। দার্জিলিং-এ তাঁর স্বাস্থ্য ভাল হয়ে আসছিল। এ সময় সংবাদ এল তাঁর কাছে। কলকাতায় প্লেগ লেগেছে। ভয়ে লোকজন পালাতে শুরু করেছে। মরার হিড়িকও পড়েছে।

স্বামিজী বললেন, আমাকে এখানে বসে থাকলে চলবে না। কলকাতায় যেতে হবে।

ডাক্তার বললেন, তা কি করে হয়? আপনাকে আরও কিছু দিন বিশ্রাম নিতে হবে যে।

বিশ্রাম! এই বলে স্বামিজী বললেন, আজ আমি অসহায়দের অবস্থা বুঝতে পারছি। আমার রোগের যন্ত্রণার চেয়ে ওদের যন্ত্রণায় বেশী কষ্ট পাচ্ছি।

স্বামিজী কারো কথা শুনলেন না। তিনি কলকাতায় এলেন।

কলকাতা শহরে তেমন লোকজন নাই। ভয়ে অনেকেই পালিয়েছে। আর যারা আছে, তারাও ভয়ে-ভয়ে দিন কাটায়। চারি দিকে আতঙ্ক ও ভয়ের ছায়া। এ-বাড়ী, ও-বাড়ী থেকে শোনা যায় কান্নাকাটি। এর উপর সরকার আইন জারী করেছেন—প্লেগ রেগুলেশন। বলতে গেলে, কলকাতায় আরেক দিকে অরাজকতা। এ সব দেখে স্বামিজীর দরদী মন দুঃখে ভরে উঠল।

জনসাধারণ প্লেগ রোগের বিষয়ে অজ্ঞ। এই রোগে তাদের কি করতে হবে, না করতে হবে, তা নিয়ে তিনি এক প্রচারপত্র লিখেন। এই প্রচারপত্রখানি হিন্দি ও বাংলা পত্রিকাতে ছাপতে দিলেন। স্বামিজী গুরুভাইদের নিয়ে সেবা-কাজ শুরু করেন।

এ কাজে অনেক টাকা লাগবে। কিন্তু কোথা থেকে এত টাকা যোগাড় হবে? এক জন গুরুভাই স্বামিজীকে জিজ্ঞেস করলেন।

হাজার হাজার লোক আমাদের চোখের উপর ভুগবে আর আমরা মঠে বাস করব? আমরা সাধু-সন্ন্যাসী মানুষ! যদি দরকার হয়, তবে ঐ মঠই বেচে দেব। আবার আমরা না হয় গাছতলায় বাসা বাঁধব। ভিক্ষা করে দিন চলবে। এদের সেবা করাই বড় ধর্ম। এতেই নারায়ণের পূজা করা হয়।

তিনি জনসাধারণের কাছে আবেদন জানালেন। তাঁর আবেদনে অনেকেই সাড়া দিলেন। টাকারও অভাব হল না। অনেক টাকা যোগাড় হল। সে টাকা দিয়েই কলকাতায় খুব বড় জমি ভাড়া নেওয়া হল। ঐ জমিতে প্লেগরোগীদের জন্য ঘর উঠল। স্বামিজী কর্মীদের প্রত্যেক পল্লীতে পাঠালেন। কর্মীরা বাড়ী বাড়ী গিয়ে খোঁজ নেন, কে প্লেগে ভুগছে, না ভুগছে। তাঁরা প্লেগরোগীদের কাঁধে করে নিয়ে আসছেন ঐ সকল ঘরে। সেখানেই তাদের সেবা-শুশ্রূষা হয়।

স্বামিজীর কাজের অন্ত নাই। তিনি নিজে রোগীদের দেখা-শোনার ভার নিয়েছেন। ঘুরে-ফিরে সবাইকে দেখেন। নিজের হাতে তাদের সেবা করেন।

আরেক দিকে কর্মীরা কাজে বেরিয়ে পড়েন। যে এলাকায় প্লেগ লাগে, সেখানেই কর্মীরা যান। সেখানকার আবর্জনা দূর করেন। প্লেগের প্রতিষেধক ওষুধ দিয়ে সে-স্থান পরিষ্কার করেন। এই ভাবে দিনের পর দিন স্বামিজীর সেবার কাজ চলে।

স্বামিজী সমাজসেবাকে স্থান দিয়েছেন—সবার উপরে।

তিনি সবাইকে ডেকে বলতেন, দেশের যারা অন্নহীন, তাদের অন্ন দাও। যারা নিরক্ষর, তাদের অক্ষর দান কর। ওদের সেবা করলেই ঈশ্বরের সেবা করা হয়।

স্বামিজী নিজে কাজ করে আমাদের দেখিয়েছেন—সেবা-ধর্ম কা'কে বলে, সমাজসেবা কি ভাবে করতে হয়।

অতীশ

শ্রীবারীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আজ থেকে হাজার বছর আগে। সে সময়ে আমাদের এই দেশের বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম সমস্ত এশিয়া মহাদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন মহাজ্ঞানী অতীশ। অতীশ ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের এক রাজার ছেলে। ছেলেবেলায় তাঁর নাম ছিল—চন্দ্রগর্ভ। চন্দ্রগর্ভ ভোগসুখ ত্যাগ করে জ্ঞানধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। বিভিন্ন জায়গায় শিক্ষালাভ করে প্রথমে তিনি ওদন্তপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে প্রবেশ করেন। সেখানকার অধ্যক্ষ শীলরক্ষিত তাঁকে 'দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান' উপাধি দেন।

অতীশ বৃদ্ধ হয়েছেন। তাঁর বয়স যখন সত্তর বৎসর, সেই সময়ে তাঁর কাছে তিব্বতরাজ দূত পাঠিয়েছিলেন। তিব্বত মহাচীনের এক বিরাট অংশ। সেখানকার রাজা ইয়োসি হোড যখন বুঝতে পারলেন, তাঁর দেশ ক্রমশঃ জ্ঞান ও ধর্মে পিছিয়ে পড়ছে তখন তিনি ঠিক করলেন, ভারতবর্ষ থেকে মহাজ্ঞানী অতীশকে নিয়ে এলে দেশের দুর্গতি মোচন হবে। দু'বার লোক পাঠিয়েও কোন ফল হল না, দ্বিতীয় বারে রাজা যে সোনা পাঠিয়েছিলেন অতীশ তা' ফিরিয়ে দেন। ইয়োসি ভুল বুঝলেন। তিনি ভাবলেন—অতীশ আরও সোনা চান। তাই তিনি সোনা সংগ্রহ করতে লাগলেন। এই সোনা সংগ্রহ করতে গিয়েই তিনি শত্রুরাজ্যে বন্দী হন। সেখানেই কারাগারে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পূর্ব্বে ইয়োসি তাঁর ভাইপোকে বলে যান—আমি জীবনে যা করতে পারলুম না, তোমার উপর তার ভার দিয়ে গেলাম। তুমি আচার্য্য অতীশকে বোলো, তিব্বতরাজ অর্থ দিয়ে নয়, জীবন দিয়ে আপনার আগমন কামনা করে গেছেন।

ইয়োসির মৃত্যুর পর তাঁর ভাইপো চ্যাংচুব, বিনয়ধর নামে একজন পণ্ডিতকে বিক্রমশীলায় অতীশের কাছে পাঠালেন। অতীশ এবার আর দূতকে ফিরিয়ে দিতে পারলেন না। সত্তর বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ পায়ে হেঁটে হিমালয়ের দুর্গম পথে জ্ঞান ও সত্য প্রচারের জন্যে বেরুলেন। হিমালয়ের ওপারে বৌদ্ধধর্মের নতুন সূর্য্য উদিত হল। সেদিন বাংলার অধিবাসীরা যা আশঙ্কা করেছিলেন তাই

ঘটলো। অতীশ তিব্বতে দেহত্যাগ করলেন। মহাচীনের মাটিতে তাঁর সমাধি আজও পথিকের বিস্ময় উৎপাদন করে। তিব্বতে ধর্ম ও সভ্যতার যে মধ্যাহ্ন-সূর্য্য আজ কিরণ বিকীর্ণ করছে তার সূচনা হয়েছিল অতীশের সাধনায়। হিমালয়ের শৈত্য, দুর্গম পথশ্রম মৃত্যুকে নিকটবর্ত্তী করে আনবে জেনেও দীপঙ্কর পশ্চাৎপদ হননি। জ্ঞান ও ধর্মে মহা অমৃত বিতরণ করবার জন্তে তিনি জীবন দান করে গেছেন। তিব্বতবাসীরা আজও তাঁর কথা স্মরণ করে মাথা নত করে।

বিক্রমশীলার সেদিনের সেই বিদায়কালীন দৃশ্যটি বড়ই করুণ! ছাত্র, অধ্যাপক সবাই অতীশের চার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। জ্যোতিষী বলছেন: এই বৃদ্ধ বয়সে তুহিন-শীতল হিমালয়ের পথে পদব্রজে তিব্বতে গেলে অচিরাৎ আপনার মৃত্যু হবে। আমরা আর আপনাকে ফিরে পাব না।—অতীশের সম্মুখে হতাশাব্যঞ্জক দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন তিব্বতের দূত বিনয়ধর। অতীশের মুখে মৃত্যুর করাল ছায়া। সহসা সেই অন্ধকার থেকে অতীশের মুখে দেখা দিল এক দিব্যজ্যোতি:। বিনয়ধর দেখতে পেলেন আশার আলোক—মৃত্যুঞ্জয়ী এক মহাবীর্য্য। সেই আলোক কালকে অতিক্রম করে আজও বিচ্ছুরিত হচ্ছে।

বিজ্ঞানীর গল্প

সুধাংশুকুমার ভট্টাচার্য্য

উনিশশো সতেরো সালের সাতুই নবেম্বর। সারা রুশিয়ার খেটে-খাওয়া মানুষের দল অত্যাচারী জার রাজার বিরুদ্ধে লেনিনের নেতৃত্বে একত্রিত হয়েছে। কোটি কোটি মানুষের উদ্ধত মুষ্টিতে জারের আসন টলমল—চার দিকে ভাঙনের লীলাখেলা চলেছে, পথে পথে মিছিল—এ বন্যাকে ঠেলে এগিয়ে আসা সম্ভব নয়।

এমন সময় মস্কো সহরের এক গবেষণাগারে অস্থির ভাবে পায়চারী করছেন এক বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী। ঠিক সাতটার সময়ে তাঁর সহকারী ছাত্রের আসার কথা অথচ ঘড়ির কাঁটা ক্রমশ: ঘুরতে ঘুরতে এগিয়ে চলে। মাঝে মাঝে বাইরে থেকে উন্মত্ত কোলাহল ভেসে আসে, কিন্তু বিজ্ঞানীর মনে তা কোন রেখাপাতই করে না। সহকারীর উপস্থিতির কথাই তিনি ভাবতে থাকেন। আটটা, ন'টা, দশটা, এগারোটাও বেজে যায় আস্তে আস্তে। ক্রুদ্ধ ভাবে বেরিয়ে আসে গবেষণাগার হ'তে বিজ্ঞানী। সহকারীর দেরীর জন্ত আজকের এমন অমূল্য দিনটাই মাটী হয়ে গেল!

কিন্তু দরজার বাইরে বেরিয়ে আসতেই দেখেন, সহকারী হন্তদন্ত হয়ে ছুটতে ছুটতে আসছে। বেশ একটু রাগতস্বরেই তাকে প্রশ্ন করেন বিজ্ঞানী—আজ এত দেরী কেন? উত্তরে ছাত্র জানায় বাইরের বিপ্লবের কথা। জনারণ্যের মধ্য দিয়ে কত কষ্টে তাকে পথ করে আসতে হয়েছে, তাই এত দেরী হয়ে গেল; এজন্ত অধ্যাপক যেন তাকে ক্ষমা করেন। বিজ্ঞানী ধীর ভাবে বললেন—কিন্তু গবেষণার যখন কাজ রয়েছে, বাইরের বিপ্লবে কি আসে-যায়?

এই বিজ্ঞানী হচ্ছেন রুশিয়ার বিখ্যাত নোবেল প্রাইজ প্রাপ্ত শারীরবিজ্ঞানী পাভলভ। আপন মনে গবেষণাগারে তিনি গবেষণা করে চলেছিলেন, বাইরের কোন কিছুই তাঁকে বাধা দিতে পারে নি। বিপ্লবকে তিনি গোড়া থেকেই সুনজরে দেখতে পারেন নি। রাশিয়ার এ নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থা তাঁকে কতখানি মর্যাদা দেবে, তা তিনি বুঝতে পারেন নি। কিন্তু বিপ্লবের পর লেনিনের অনুরো[ধে] খ্যাতনামা সাহিত্যিক গর্কী তাঁকে সোবিয়েতের পক্ষ থেকে প্রতিশ্রু[তি] দিয়ে এলেন সাহায্যের। দ্বিগুণ উৎসাহে আবার কাজ করতে লাগলেন বিজ্ঞানী।

এবার আরও পিছনে ফেরা যাক। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে রুশদেশে[র] এক সাধারণ মধ্যবিত্তের ঘরে পাভলভের জন্ম হয়। বিজ্ঞানে[র] দিকে ছেলেবেলা হতেই ছিল তাঁর আগ্রহ। পরিণত বয়সে মানুষে[র] পরিপাক ক্রিয়া সম্বন্ধে তিনি গবেষণা করতে আরম্ভ করেন। [এ] সময়ে এক আশ্চর্য ঘটনা তাঁর চোখে পড়ে। তাঁর গবেষণার বিষয়ব[স্তু] ছিল কতকগুলো কুকুর। তাদের সামনে খাবার রাখলে তাদে[র] জিভ দিয়ে লালা ঝরতে লাগল। এমন কি, ক্রমশ এমন হ'ল যে যে পাত্রে খাবার রাখা হ'ত সেটা দেখলে এবং যে খাবার দেয় তাকে দেখলেও লালা ঝরতে থাকে কুকুরদের। তারপর নানা রকম ক[রে] তিনি পরীক্ষা করতে সুরু করলেন। খাদ্যের সংগে খাদকের এই [যে] সম্বন্ধ, একে তিনি নাম দিলেন স্নায়বিক প্রতিক্রিয়া। এর দ্বার[া] তিনি প্রচার করলেন যে, শেখা জিনিষটা অভ্যাস তৈরী করা ছাড়া আর কিছুই নয়।

গবেষণা করছিলেন তিনি শারীর-বিজ্ঞানের একটা দুরূহ তত্ত্ব নিয়ে আর তা হ'তে মনোবিজ্ঞানের একটা সূত্র শেখার কাজে যা[র] প্রয়োজন সকলেই স্বীকার ক'রে নিয়েছেন। তারপরে আরও গবেষণা করে আবিষ্কার করলেন তিনি মানুষের পরিপাক শক্তির কারণ। সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ল তাঁর নাম আর সেই বছরেই তিনি শারীর-বিজ্ঞানে নোবেল প্রাইজ লাভ করলেন। সেটা হ'ল ১৯০৪ সালের কথা। ১৯৩৬ সালে এই বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানীর মৃত্যু হয় কিন্তু তার আগেই তিনি রাষ্ট্রের উন্নতি দেখে গিয়েছিলেন।

তিন আলসের গল্প

(বিদেশী গল্প অবলম্বনে)

শ্রীচিত্তরঞ্জন বিশ্বাস

অনেক দিন আগে সাত সমুদ্দুর তের নদীর পারে এক রাজা ছিলেন। তাঁর রাজত্বটাও বেশ বড় ছিল। যুবক বয়স থেকে সুরু করে বৃদ্ধাবস্থা পর্য্যন্ত বেশ ভাল ভাবে রাজত্ব চালালেন তিনি।

এ দিকে হয়েছে কি! রাজামশাইয়ের তিন ছেলে ছিল। ওরা তিন জন রাজকার্য্যের কিছু বুঝত না। লেখাপড়াও জানত না। এমন কি রকেও আড্ডা মারত না।

নিজের অবস্থা দেখে রাজামশাই ভাবলেন—আমার ত তিন কাল গিয়েছে। বাকী এক কাল। এর মধ্যে কবে যে মরবো—তার ত' ঠিক নেই।

সুতরাং তিনি গণ্ডমূর্খ ছেলে তিনটেকে ডেকে বললেন—দেখ বাবা সকল! আমি ত বুড়ো হয়ে পড়েছি। কবে যে মরবো তার ঠিক নেই। তাই ভেবেছি, মরবার আগেই তোমাদের হাতে রাজত্বটা সমর্পণ করে যাই। কিন্তু একটা সমস্যায় পড়েছি আমি। তোমাদের তিন জনকেই ত' আমি সমান ভালবাসি। তাই বলে ত' আর তিন জনে রাজত্ব চালাতে পারবে না? কারণ তাহলে মারামারি কাটাকাটি বাধতে পারে। তাই ঠিক করেছি, তোমাদের মধ্যে যে

সব চেয়ে বেশী আলসে—তাকেই রাজত্বি দেব। এখন বল দেখি কে কি রকম আলসে ?

রাজামশাইয়ের কথা শুনে ওরা তিন ভাই আগে বার চারেক লাফ দিয়ে নিল। তার পর বড় জন বলল—বাবা! আমিই সব চাইতে বেশী আলসে। কেন শুনুন। আমি যদি গভীর ভাবে নিদ্রামগ্ন থাকি এবং তখন যদি আমার চোখের ওপর ভারী কোন বস্তু পড়ে, তাহলে আমি জাগব না, ঠিক পূর্ব্বের মতই নিদ্রিত থাকব।

মেজ জন বলল—ও সব হবে-টবে না। এ রাজত্বি আমার। কারণ আমি যদি শীতের রাতে শরীর গরম রাখবার জন্তে কোন জলন্ত অগ্নিকুণ্ডের পাশে বসি এবং তখন যদি আমার কোন পা পুড়েও যায়, তথাপি আমি আমার চরম অলসতার দরুণ পূর্ব্বোক্ত অগ্নিকুণ্ডের পাশে অচল অটল ভাবে বসে থাকব।

মেজ জনের কথা শেষ হতেই ছোট জন বলে উঠল—দেখ বাবা! কোন গুল্‌তাপ্পি আমি মানব না। রাজত্বিটা আমায় দিতেই হবে। এবং এ আমি ছাড়া আর কেউ চালাতে পারবে না। কারণ, আমি এক গাছা দড়ি নিয়ে গলায় পেঁচিয়ে কোন বৃক্ষশাখায় যদি ঝুলতে থাকি এবং তখন যদি কেউ আমার নিশ্চিত মৃত্যুর কবল থেকে বাঁচাবার আশায় আমার হস্তে একখানা ছুরি দেয় দড়িটা কাটবার জন্তে, তাহলে আমি ঐ ছুরি নেব না। কারণ, আমি যেমন আলসের রাজা। তেমনি এ রাজ্যেরও।

তিন জনের মধ্যে ছোট ছেলের কথা শুনে রাজামশাই অত্যন্ত বিস্মিত হলেন এবং বললেন—তোমাদের মধ্যে ছোট জন রাজত্বিটা পাবার একমাত্র উপযুক্ত। সুতরাং আমার মৃত্যুর পর সে-ই রাজা হবে।

সাহিত্যিকের দুর্ভোগ

[অনিতা ব্রাইটসমিডের ফরাসী রচনা 'nez-gete'-এর অনুবাদ]

একশ' বছর আগে ফরাসীদেশে এক বিখ্যাত ঔপন্যাসিক বাস করতেন। বহুদিন থেকে তিনি শীতের সময় রাশিয়া বেড়িয়ে দেখতে চেয়েছিলেন। অবশেষে একদিন পিটার্সবার্গ অভিমুখে রওনা হলেন। বরফ পড়তে আরম্ভ করেছে এবং 'নেভা'র জল জমে গিয়েছে। স্লেজগাড়ী এবং অন্যান্য টানাগাড়ীগুলো বরফের ওপর দিয়ে ঘুরছে। ক্রমশঃ তাপমাত্রা ২০ ডিগ্রি থেকে হিমাঙ্কে নেমে এল—এমন কি তারও নীচে। সৌভাগ্যক্রমে ঔপন্যাসিকের গায়ে ভারী পোষাক ছিল। এই সময়ে ভাল করে গরম পোষাক না পরে কেউ বের হয় না।

একদিন সকালে লেখক তাঁর প্রথম অভিযানে বের হলেন। একটা ভারী কোট গায়ে দিলেন এবং মাথায় একটা লোমশ টুপী চাপালেন, তাতে কান দুটিও পড়ল ঢাকা। নাকের ডগাটা কিন্তু রইল অনাচ্ছাদিত। লেখক অবাক হয়ে গেলেন ফরাসী দেশে লোকে রাশিয়ার শীতের কথা এত বলেছে! এই নাকি শীত! এক মুহূর্ত বাদেই তিনি লক্ষ্য করলেন যে লোকেরা তাঁকে উৎকণ্ঠিত হয়ে লক্ষ্য করছে। একজন ভদ্রলোক তাঁর এসে চেঁচিয়ে বললেন—Noss! Noss! ঔপন্যাসিক একবর্ণও রুশভাষা জানতেন না, তাই তিনি অর্থটা কি হতে পারে ভেবে দেখবার জন্ত দাঁড়ালেন না। রাস্তার মোড়ে একজন এইকা-চালক তাঁর কাছে গিয়ে কানের কাছে চেঁচিয়ে উঠল—Noss! Noss! মাথা নেড়ে লেখক আবার পথ চলতে শুরু করলেন। সহসা জনতার ভেতর থেকে একজন তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বিনা বাক্যব্যয়ে বরফ দিয়ে নাকের ডগাটা ঘষতে শুরু করল। বিমূঢ় ঔপন্যাসিক এক প্রচণ্ড ঘুষি চালাতেই লোকটি দশ-পা দূরে ছিটকে পড়ে কাঁপতে লাগল। সৌভাগ্যক্রমেই হোক কি দুর্ভাগ্যক্রমেই হোক, দু'জন লোক লেখকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে পালা করে তাঁর নাকের ডগাটা বরফ দিয়ে ঘষতে শুরু করল। দু'জন বলিষ্ঠ লোকের হাত থেকে তিনি নিজেকে আর রক্ষা করতে পারলেন না, উপরন্তু যাকে ঘুষি মেরেছিলেন সে-ও আবার ফিরে এসে তার কাজ করতে লাগল—অর্থাৎ নাকের ডগা ঘষতে লাগল। হতভাগ্য সাহিত্যিক পরিত্রাহি চীৎকার শুরু করলেন, যদি কেউ এসে তাঁকে সাহায্য করে।

সহসা একজন পুলিশ-অফিসার এসে ফরাসী ভাষায় তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন যে ব্যাপার কি।

দেখছেন না, এই অভদ্র লোকগুলোর আচরণ? রেগে বললেন সাহিত্যিক।

আরে এই ত স্বাভাবিক নিয়ম! বিস্মিত হয়ে পুলিশ-অফিসারটি জবাব দিলেন।

হ্যাঁ, একজন হতভাগ্য বিদেশীকে বরফ দিয়ে মুখ ঘষে, নাক ডলাই মলাই করা স্বাভাবিক নিয়ম বটে!

অফিসারটি খিল-খিল করে হেসে উঠলেন—পরে বললেন—এই হতভাগ্য লোকগুলো যে আপনার কি অসীম উপকার করেছে তা আপনি বুঝতে পারলেন না। যদি তারা বরফ দিয়ে আপনার নাক না ঘষত, তাহলে কখন আপনার নাকটা জমে যেত!

হায় ভগবান! লেখক ডান হাত দিয়ে নাকে হাত বোলাতে থাকে।

এই সময়ে একজন পথচারী অফিসারকে বলল—সাবধান সার্জেন্ট! তোমার নাক কিন্তু জমে যাচ্ছে।

মনে করিয়ে দেবার জন্ত অফিসারটি তাকে ধন্তবাদ জানিয়ে নীচু হয়ে একমুঠো বরফ তুলে নিয়ে নিজের নাকে ঘষতে আরম্ভ করল।

লোকটি সাহায্য না করলে লেখকের নাকটি খোয়া যেত নিশ্চিত। অবশেষে আক্রমণকারীর উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে তার সদাচরণের জন্ত পুরস্কৃত করতে লেখক তৎক্ষণাৎ ছুটতে আরম্ভ করলেন লোকটিকে ধরবার জন্ত।

—কেউ তাকে অনুসরণ করছে দেখে হতভাগ্য লোকটি ছুটতে শুরু করল এবং নিশ্চয়ই জনতার ভেতর অদৃশ্য হয়ে যেত—যদি না লোকেরা তাকে চোর ভেবে ধরে ফেলত। লেখক তাকে ধরে কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ তার হাতে দশ রুবল গুঁজে দিলেন—সমস্ত ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল। লোকেরা ভুয়ো-চোরকে ছেড়ে দিল। লোকটি অভিভূত হয়ে লেখককে অজস্র ধন্তবাদ জানাল। লেখক হেসে উঠলেন এবং সংকল্প করলেন যে, ভবিষ্যতে তিনি নাকের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখবেন এবং রাশিয়ায় থাকাকালীন তিনি কখনও নাকের প্রতি দৃষ্টি হারাননি।

এই ঔপন্যাসিকই হলেন খ্যাতনামা আলেকজান্দার ডুমা।

অনুবাদক—সুধীরকান্তি গুপ্ত।

অঙ্গন ও প্রাঙ্গণ

দিন সাতেক পরে ক্লাবে, ককটেল পার্টিতে অসীমের আমন্ত্রণ পেয়ে এসেছে অনিল। কয়েক পাত্র গলায় ঢালবার পর একটু পৃথক ভাবে সরে বসেছিলো অসীম, অনিলকে নিয়ে।

—তোমাকে একটা কথা বলতে চাই অনিল, হাতের পাত্রটি নিঃশেষ করে টেবিলে রাখতে রাখতে বললো অসীম।

—বলে ফেলো, সোফায় মাথাটা হেলিয়ে দিয়ে জবাব দিলো অনিল।

—কথাটা মানে, আমার সঙ্গে সুমিতার বর্ত্তমান সম্বন্ধটা নিশ্চয়ই তোমার অজানা নয়, মানে বলতে চাইছি যে, ঐ সম্বন্ধটাই একেবারে পাকা করে ফেলতে চাই আমি।

—একটু ভাবলো অনিল। মনে পড়লো সুদামের কথা, মনটা কেমন চিন্-চিন্ করে উঠলো। কিন্তু মিতা যদি ধরা দিয়ে থাকে তবে সে কি করতে পারে? আর সত্যি কথা বলতে হলে এ ব্যাপারটা তার নিজের পক্ষেও শুভকর, মানে অসীম যদি মিতাকে বিয়ে করে, তবে তার পথ তো পরিষ্কার। শুকতারাকে পাবার পথে ঐ অসীমই ছিলো প্রধান অন্তরায়, এখন সে যদি সরে দাঁড়ায় মন্দ কি? সোজা হয়ে বসলো অনিল। রুমাল দিয়ে মুখটা ভালো করে মুছে গলাটা ঝেড়ে নিয়ে বললে—হ্যাঁ, ঘটনাস্রোতকে তো আর ফেরানো যায় না? অবশ্য সঠিক ব্যাপার তোমাদের আমার কিছু জানবার কথা নয়। তবে আমাকে কিছু জানাবার প্রয়োজন হয়ে থাকে, শুনতে আপত্তি নেই আমার।

বাতিঘর

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

বারি দেবী

একটা সিগারেট জ্বালালো অসীম, অনিলকে এগিয়ে দিলো একটা। বাঁ হাতে নিজের চুলগুলো মুঠোতে চেপে ধরে দু'-একটা টান দিলো। পেছনে মাথা হেলিয়ে উর্দ্ধদৃষ্টিতে মুখ দিয়ে ধোঁয়া ওড়ালো দু'-চার বার; তার পর সোজা হয়ে বসে বললো—যা বলছি শোনো, তারপর ভেবে-চিন্তে তোমার বক্তব্য বোলো। চলতি ঘটনার ফাঁসে মিতার আর আমার জীবন একসঙ্গে জড়িয়ে গেছে, সেটা ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় যে ভাবেই হোক হয়েছে। এখন ওকে বিয়ে করা ছাড়া উপায় দেখি না। কিন্তু সোমনাথ বাবুকে কথাটা জানাতে কেমন বাধো-বাধো ঠেকছে। কারণ আগে স্থির ছিলো সুদামের সঙ্গে, বুঝলে না? এ ক্ষেত্রে এ ভারটা, মানে তাঁকে সব খোলাখুলি ভাবে জানিয়ে তার পর একটা দিন স্থির করা, এই সব কাজের ভার আমি তোমাকেই দিতে চাইছি।

একটু হাসলো অনিল। বুকের ভেতরটা আবার কেমন খচ্-খচ্ করে উঠলো। বোধ হয় বিবেকের অদৃশ্য-ঘড়িতে ওয়ার্নিং বাজলো। কিন্তু কামনা, লোভ আর স্বার্থপরতার বজ্রমুষ্টি থামিয়ে দিলো বিবেকের আর্ত্তনাদের ক্ষীণ স্বরকে। চাপা একটা নিঃশ্বাসও বুঝি সন্তর্পণে ঝরে পড়লো—বেদনার না স্বস্তির, কে জানে? এলোমেলো চিন্তার হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যে আর এক পেগ শ্যাম্পেন ঢক্ ঢক্ করে পান করলো অনিল। এবারে মনটা বেশ হাল্কা লাগছে, বাজে সেণ্টিমেণ্টগুলো আর জটলা পাকাচ্ছে না।

ধীর, স্থির ভাবে একটা সিগারেট জ্বালিয়ে বললো সে—তোমার কথা বুঝতে পারছি, তবে মিতার এ ব্যাপারে সম্মতি আছে কি না, সেটাও তো জানা দরকার?

—হো-হো করে উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলো অসীম।

—তবে কি বুঝলে ব্রাদার! সেই যে সাত কাণ্ড রামায়ণ শোনবার পর একজন জিজ্ঞেস করেছিলো,—সীতে কার ভার্য্যা! বঁড়শীর টোপ না গিললে মাছকে কি ডাঙায় তোলা যায়? মানে আমি বলতে চাইছি যে, পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ প্রথমে না জাগলে কি একটা মানে···প্রেম, ভালোবাসা, ঐ নিরামিষ ভাবোচ্ছ্বাস নয়, একেবারে খাঁটি দৈহিক ব্যাপার ঘটতে পারে? এসব তো তুমিও বোঝো হে, যখন সিনেমা-টিনেমা করছো। তার পর শুকতারার আবির্ভাবও ঘটছে তোমার আকাশে। একটু বাঁকা চাউনি আর চাপা হাসির সঙ্গে বক্তব্য শেষ করলো অসীম।

—অলরাইট। সবই তো তাহলে তৈরী, খালি একটা সামাজিক সমর্থন আর ভোজের ব্যবস্থা এই তো? আর জামাইবাবুর মতামত এ স্থলে অবান্তর হলেও, বৈষয়িক ব্যাপারে প্রয়োজনীয়। ঠিক আছে, যোগাযোগগুলো আমার দ্বারাই হয়ে যাবে বলে মনে হয়।

খুট-খুট করে জুতোর হিলের শব্দতরঙ্গে ভেসে এলেন অলকাপুরীর মাসীমা—মিসেস বর্দ্ধণ। অর্থপূর্ণ দৃষ্টি তাঁর বিনিময় করলেন অসীমের চোখের সঙ্গে। তারপর সুগন্ধি রুমালে ঠোঁট মুছতে মুছতে বললেন—এই যে, অসীম, আর অনিল, দুজনেই উপস্থিত আছো, তা মিতা এলো না কেন? এখনও শরীর খারাপ চলছে নাকি? এত চতুর্দ্দিকে ঝামেলা, সময় করে যে মেয়েটাকে একবার দেখতে যাবো, তারও উপায় নেই। অসীমের পাশের চেয়ারটিতে বসলেন তিনি।

—মিতা ভালোই আছে মাসীমা, বললো অসীম, তাকে আঃ

ডাকিনি, কারণ এই বিয়ের কথাবার্ত্তাগুলো হবে আজ, সে লজ্জা পাবে, মানে বড্ড বেশী লাজুক প্রকৃতির কি না ?

—তাই নাকি, তাই নাকি, বেশ, বেশ, তা বিয়েটা হচ্ছে কার সঙ্গে ? কাকা না ভাইপো, বরমাল্যটা পড়বে কার গলায় হে ? চোরা চাউনি নিক্ষেপ করে অসীমের দিকে, হাসলেন মাসীমা।

—না সুদাম নয়, অসীমের সঙ্গেই মিতার বিয়ে হবে, যদিও আগে ঠিক ছিলো—সুদামের সঙ্গে কিন্তু এখন, মাথা চুলকে কথা থামিয়ে অসীমের দিকে চাইলো অনিল।

—বুঝেছি, অমন হয়েই থাকে। মানে—কবে ছোটবেলায় কার সঙ্গে কি কথা হয়েছিলো, সেইটাই সারাজীবন মেনে চলতে হবে, বাস্তবক্ষেত্রে এ নীতি একেবারেই অচল ; বুঝলে অনিল ? ও-সব সেকেলে মনোবৃত্তিগুলো জীবনের উন্নতির পথে ভারি ক্ষতিকর ! এই সব বাজে সেন্টিমেন্টগুলোকে পরিহার করিয়ে একেবারে খাঁটি বিজ্ঞানসম্মত আধুনিক ভাবধারায় ছেলেমেয়েদের মনগুলোকে বলিষ্ঠ করাই তো আমোদের অলকাপুরীর শিক্ষার বৈশিষ্ট্য। মনে হয় সে শিক্ষা কার্য্যকরী হয়েছে মিতার জীবনে। মনোমত জীবনসাথী নির্ব্বাচনের দৃষ্টিভঙ্গী লাভ করেছে সে।

—সগর্ব্বে নিজের অভিমত ব্যক্ত করলেন মাসীমা।—কৈ ! ঘোড়া, কিম্বা ভেড়া, কিছু একটা হাজির করো অসীম, গলাটা বড় শুকিয়ে উঠছে যে—হি, হি, হি, ও ককটেল, ককটেলগুলো কেমন যেন নিরামিষ গোছের, ওতে আমার মেজাজ শরিফ হয় না।

—একেবারে খাঁটি বেদবাক্য উচ্চারণ করেছেন মাসীমা। এমন উন্নত রুচিজ্ঞান আপনার ভেতরে আছে বোলেই না, নিত্য-নতুন অভিনব শিল্প ও শিল্পী সৃষ্টি করছেন। মাসীমার একখানা হাত নিজের হাতে টেনে নিয়ে চাপ দিতে দিতে বললো অসীম।

গেলাশের গায়ে ঠুন ঠুন করে চামচ বাজালেন মাসীমা। ছুটে এসে সেলাম বাজালো বয়। আবার ছুটে চলে গেলো ফরমায়েসী মাল আনবার জন্ম।

অন্তমনস্ক ভাবে নিজের চুলগুলো হাতের মুঠোয় চেপে ধরে টান দিচ্ছিলো অনিল। কপালের খাঁজে মানসিক দ্বন্দ্বের নিশানা।

ওর দিকে চেয়ে হাসলেন মাসীমা, চোখ মেলালেন অসীমের চোখের সঙ্গে।

সিগারেট ধরালো অসীম। হাসি-বিনিময় করলো মাসীমার সঙ্গে—তারপর বললো—শুকতারার খবর কি মাসীমা ? রতনলাল ফেক্ট্রির নতুন বইটাতে হিরোইনের পাট নিচ্ছে কে ?

—হিরোর পার্ট যাকে মানাবে তাকেই দেওয়া হবে। নির্ব্বাচনের ভার তো পড়েছে আমারই ওপর কি না! তা, ভেবে দেখিনি এখনও। নতুন কয়েকটি ছেলে এসেছে অলকাপুরীতে; অল্প সময়ের ভেতর বেশ তৈরী হয়েছে ওরা, তাই ভাবছি ওদেরো তো সুযোগ দিতে হবে?

—চমক ভাঙলো অনিলের, মাসীমার অব্যর্থ বাক্যবাণে। বিস্ময় আর কাতরতা ফুটে উঠলো—ওর দু'চোখের দৃষ্টিতে, সে দৃষ্টি স্থির হলো মাসীমার শিকারী বেড়ালের চোখের মত জলজলে চোখ দুটির ওপর।

দুজনে পড়লো দুজনার চোখের ভাষা।

ঠোঁট বেঁকিয়ে মুচকে মুচকে হাসলেন মাসীমা। ও হাসির অর্থ বোঝে অনিল। বছরখানেক হল এসেছে ছবির জগতে, সেখানে দেখছে, হরদমই দেখছে এরকম দামী দামী হাসি! কথার বদলে এই ধরণের হাসি দিয়েই অনেক কিছু বলা যায়।

নাঃ। নিজের উন্নতি চাওয়াটা অন্যায় নয়। তার ওপরে আছে শুকতারা, আর মিতারও তো কোনো ক্ষতি করা হচ্ছে না, মুলাম। তা সে ফিরে আসুক না, একটা ভালো মেয়ে দেখে ওর বিয়ে দেওয়া শক্ত কাজ নয়।

চট করে সব কিছু ভেবে মনটাকে ঝাঁকুনি দিয়ে প্রস্তুত করে নেয় অনিল।

বেয়ারা এলো মাসীমার ফরমায়েসী দ্রব্য নিয়ে। হোয়াইট হর্স, জনিওয়াকার আর হাউস অফ লর্ডস। বোতল তিনটি সাজিয়ে দিলো টেবিলে।

ফেনিল পাত্র দুটি এগিয়ে দিলেন মাসীমা অনিল আর অসীমের দিকে। তারপর বোতল তুলে নিজে ঢক-ঢক করে পান করলেন খানিকটা।

আঃ। এতক্ষণে খাঁটি মাল একটু গলায় পড়লো। মিটার ক্ষেত্রির পাল্লায় পড়ে আমার এই অভ্যেসটা বড় খারাপ হয়ে গেছে বুঝেছো অসীম, ও ককটেল বিয়ার, স্যাম্পেন, ওসব ভেজাল মালে গলা ভিজলেও মনটা ভেজে না; মানে মনটা যেন কেমন শুকনো বালির চরের মত খাঁ খাঁ করতে থাকে। কিন্তু মাত্তোর একটা ইটালিয়ান মাল ঢেলেছো কি অমনি সেখানে একেবারে যেন গঙ্গা-যমুনার ঢেউ কল কল করে ছুটে আসে। আনন্দের স্ফূর্ত্তির বন্যা বইয়ে ছাড়ে।

এলোপাথাড়ী বুকনীর মাঝে মাঝে গলা ভিজিয়ে নিচ্ছিলেন মাসীমা।

—মিতার বাবাকে আজই তাহলে সব লিখে দিচ্ছি মাসীমা, আর তাঁর তো করবার কিছুই নেই, সব ভারই তো আমাদের ওপর দিয়ে গেছেন। তবে আমাদের কর্ত্তব্য হিসেবে, শুধু একটা তাঁর মত নেওয়া দরকার, মানে বৈষয়িক ব্যাপারটা তো, এই সঙ্গেই নজর দিতে হবে, বুঝলেন কি না।

—হাঃ! হাঃ! হাঃ! হিঃ, হিঃ, হিঃ!

প্রমত্ত হাসির জোয়ারে ভাসতে ভাসতে হাউস অফ লর্ডস-এর বোতলটাকে বুকে জাপটে ধরে জবাব দিলেন মাসীমা।

—বুঝেছি ডারলিং বুঝেছি, একেবারে আগা থেকে গোড়া পর্য্যন্ত বুঝেছি।—ক্ষেত্রির বউ-এর বিয়ার আসন থেকে তোমায় নামায় কে? এই মাসীমা থাকতে? এই মাসীমার একটু নেক্ নজর, মানে এই তোমরা যাকে বলো অনুরাগ; তাই পাবার জন্যে ওই ধনপতি ক্ষেত্রি তো তার গোটা ষ্টেটটাই নজরানা দিতে প্রস্তুত, তুচ্ছ ব্যাপারগুলো ছেড়েই দাও, বুঝলে কি না হিঃ, হিঃ, হিঃ, হোঃ, হোঃ, হোঃ। হাসির ঢেউএ ঢেউএ, স্বপনপুরীতে ভেসে চললেন অলকাপুরীর মাসীমা। [ক্রমশঃ।

শ্রদ্ধেয়া অনুরূপা দেবী

প্রমীলা মিত্র

বাংলা ১৩৩৪ সালের মাঘ মাসের এক প্রভাতে মজঃফরপুরের সুপ্রসিদ্ধা সাহিত্যিকা শ্রীঅনুরূপা দেবী পোষ্টে একটি 'অটোগ্রাফস্'পেলেন—প্রমীলা মিত্র পাঠিয়েছেন তাঁকে অনুরোধ করে—এই খাতার পাতায় নিজে হাতে কিছু লিখে দিতে হবে। 'অটোগ্রাফস' প্রেরিকা কয় লাইন কবিতায় তাঁর অনুরোধ জানিয়েছেন—

'পরিচয়ের জানাজানি নাই বা হোল।
একটি ছোট বোনকে যদি বাসই ভালো,
তাহার লাগি হে শ্রদ্ধেয়া খাতার পাতে—
লিখেই দিয়ো একটি লাইন আপন হাতে।
বাঁধবো তারে স্মৃতির পাশে হৃদয়-কোণে
তৃপ্ত হবে সকল পরাণ সঙ্গোপনে।'

এক সপ্তাহের মধ্যেই পোষ্টে 'অটোগ্রাফস' ফিরে এলো। শ্রদ্ধেয়া অনুরূপা দেবী তাঁর এই অপরিচিতা ছোট বোনের খাতার পাতায় সুন্দর কবিতা লিখে পাঠালেন। গভীর আনন্দে ও বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে রইলাম,—নগণ্যা অপরিচিতার প্রতি তাঁর এই স্নেহ-ভাষণে। কবিতাটি এখানে উদ্ধৃত করলাম।

'পরিচয়ের জানাজানি নেই বা কিসে।
লিপির মাঝে প্রাণটি গেলো প্রাণে মিশে।
বোনটি যদি শ্রদ্ধা পাঠায় দিদিকে তার
দিদি তবে স্নেহ দিয়ে শুধবে সে ধার।
চিরদিনের নিয়ম এ যে চিরন্তনী
প্রেমের বাঁধে বেঁধে ফেলা হৃদয় মনই।
হবেনা তো তৃপ্ত হলেই সঙ্গোপনে।
তৃপ্তি কিছু পাঠিও আবার চিঠির সনে।'

প্রথিতযশা লেখিকার এই একান্ত আপন করে নেওয়ার গৌরবে সেদিন নিজেকে যথেষ্ট গৌরবান্বিত মনে করেছিলাম।

এই 'অটোগ্রাফসের' মাধ্যমে তারপর বহু দিন আমাদের মধ্যে কবিতায় পত্রালাপ চলেছিল। তখনকার দিনে এক দেশবরেণ্যা সাহিত্যিকার সহিত আমার মত এক অখ্যাতা তরুণীর পত্র-বিনিময় যেন আশাতীত সৌভাগ্যের বিষয়! আমরা কেউ কাকেও তখনও চোখে দেখিনি,—বয়সেরও যথেষ্ট ব্যবধান—তবু এক মনোরম মিলনের সৃষ্টি করেছিল আমাদের এই পত্র-বিনিময়।

তখনকার দিনে অনুরূপা দেবীর কয়েকটি খ্যাতনামা উপন্যাস—মন্ত্রশক্তি, মা, পোষ্যপুত্র, মহানিশা ইত্যাদি সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়ে প্রচুর প্রশংসা অর্জন করেছিল। তাঁর রঙ্গমঞ্চে

'মন্ত্রশক্তি' তখন অভিনীত হচ্ছিল—আমি দিদিদের সঙ্গে মন্ত্রশক্তি দেখতে ষ্টার থিয়েটারে গিয়েছিলাম।

ষ্টারের তখন দোতলায় দু'পাশে সবচেয়ে দামী আসন 'বক্স' ছিল। দু'দিকের কোণের যে দু'টি বক্স ছিল—তাতে সর্ব্বসাধারণের বসবার অধিকার ছিল না বলে জানতাম। থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষদের জন্য ঐ দু'খানি বক্স নির্দিষ্ট ছিল। মন্ত্রশক্তির অপূর্ব্ব অভিনয় আমাদের মুগ্ধ করেছিল। সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা ৺ইন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায় অম্বরের ভূমিকায় ও প্রখ্যাতা অভিনেত্রী ৺কৃষ্ণভামিনী বাণীর ভূমিকায় আশ্চর্য্য অভিনয়-নৈপুণ্য দেখিয়েছিলেন। নটসূর্য্য অহীন্দ্র চৌধুরীও মৃগাঙ্কর ভূমিকায় কৃতিত্বের সহিত অভিনয় করেছিলেন। আমার অকস্মাৎ দৃষ্টি পড়লো কোণের বক্সের দিকে—যাঁরা সেখানে আসন গ্রহণ করেছিলেন—তাঁদের মধ্যে একটি মহিলার বৈশিষ্ট্য আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। ছোড়দি'কে বললুম—ওঁকে যেন অনুরূপা দেবী বলে মনে হচ্ছে। উনি যে মজঃফরপুর থেকে তখন কলিকাতায় এসেছিলেন তা আমার জানা ছিল না। এর আগে ওঁর অল্প বয়সের ছবি কাগজে দেখে থাকলেও তখনকার চেহারায় তার কোন সাদৃশ্য পাইনি। তবু বার বার মন বলছিল উনিই আমার না দেখা অথচ অন্তরলোকের বহু পরিচিতা শ্রদ্ধেয়া অনুরূপা দেবী।

সামনে গিয়ে নিজের পরিচয় জানাবার প্রবল আগ্রহে আর সেই অঙ্কের বাকী দৃশ্যটুকুতেও মন বসছিল না। অঙ্ক শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কোণের বক্সের উদ্দেশ্যে ছুটলুম—এবং ঝি মারফৎ তাঁকে খবর পাঠালুম আমি দেখা করবার জন্য উৎসুক।

তিনি তখুনি এসে লবিতে দাঁড়ালেন, প্রণাম করে পরিচয় দিতে তিনি আনন্দের সঙ্গে সাদরে আমায় গ্রহণ করলেন! সেই রাত্রে শত শত দর্শকের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা-মুখরিত আলোকোজ্জ্বল প্রেক্ষাগৃহে তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাতের কথা আজ এখনও স্মৃতির মণিকোঠায় উজ্জ্বল হয়ে আছে।

চিঠিতে তাঁর যে স্নেহ, যে আশীর্ব্বাদ পেয়ে এসেছি, আজও তা হতে বঞ্চিত হলুম না! আমাদের মিলনের যেটুকু ফাঁক ছিল, তা আজ পূর্ণ হোল। পরের অঙ্ক আরম্ভ হতেই তাড়াতাড়ি নিজের আসনে ক্ষুণ্ণ মনে ফিরে আসতে হোল, কথা তো বেশী হোল না! সে রাত্রে এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দের আস্বাদ পেয়ে বাড়ী ফিরলুম।

দু'দিন পরে একখানা পোষ্টকার্ড পেলুম, আমার এই স্নেহপরায়ণা দিদির কাছ থেকে, লিখেছেন—

স্নেহাস্পদাসু,

আসার সময় আর একটি বার দেখার আশে,
কিছু সময় দাঁড়িয়েছিলাম সিঁড়ির পাশে
যা হোক্ যদি ইচ্ছা থাকে দেখা দেবার,
হবে দেখা কাল বিকালে এলে এবার!

শুভার্থিনী দিদি
অনুরূপা দেবী

তিনি তখন ২৬৮ নং লোয়ার সার্কুলার রোডে তাঁর দেওরের (যিনি স্বনামধন্য, মার্টিন কোম্পানীর রেলের প্রতিষ্ঠাতা স্যর রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের জামাতা, নাম ঠিক মনে নেই) বাড়ীতে অবস্থান করছিলেন।

আমি তাঁর কাছ থেকে এই দেখা করার আমন্ত্রণ পেয়ে সত্যই ভারী খুসী হলুম—সেদিন প্রেক্ষাগৃহে তাঁর সঙ্গে বেশীক্ষণ কথা হয়নি বলে বেশ একটু ক্ষুব্ধ হয়েছিলাম।

নির্দ্দিষ্ট সময়ে আমি লোয়ার সার্কুলার রোডে দিদির সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। সেখানে তাঁর সঙ্গে তো দেখা হোলই, তাঁর জা স্যর রাজেন্দ্রনাথের কন্যার সঙ্গেও আলাপ হোল। আমরা তখন একখানি হাতে-লেখা মাসিকপত্রিকা প্রকাশ করতাম, যার সম্পাদিকা আমিই ছিলাম। কথা প্রসঙ্গে আমাদের পত্রিকাখানির কথা উল্লেখ করাতে, তিনি যথেষ্ট আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন ও অজস্র উৎসাহও দিয়েছিলেন আমাদের এই সাহিত্য প্রেরণায়। পরে তিনি একটি কবিতাও আমাদের পত্রিকায় প্রকাশের জন্য পাঠিয়েছিলেন। শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় ও (যিনি অনুরূপা দেবীর মাসতুতো ভাই) সেই সময় আমাদের পত্রিকায় একটি কবিতা পাঠিয়ে আমাদের ধন্য করেছিলেন। সেদিন আন্তরিক প্রীতিপূর্ণ সমাদরে পরিতৃপ্ত মন নিয়ে বাড়ী ফিরলাম।

পত্রালাপ মাঝে মাঝে চলতো। ১৩৩৬ সাল বৈশাখ মাস। আমার পূজনীয় খুল্লতাত শ্বশুর মহাশয়ের (যিনি বাংলার প্রথম ঔপন্যাসিক ৺টেকচাঁদ ঠাকুরের পৌত্র,—শ্রীপান্নালাল মিত্র) মহাপ্রয়াণের পরদিন—শোকসন্তপ্ত বাড়ী আত্মীয়-স্বজনে পরিপূর্ণ। অপরাহ্ণে আমায় কে যেন এসে বললো, এক মহিলা আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। আমি গিয়ে দেখি দিদি (অনুরূপা দেবী) সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে। শশব্যস্তে এগিয়ে গেলাম,—তিনি যে আসবেন আমার বাড়ীতে, এ ধারণারও অতীত! এত সৌভাগ্য কল্পনা করতেও পারিনি! এই শোকবিষণ্ণ বাড়ীতে তাঁর যোগ্য সমাদর কী করে করবো—কী কথাই বা বলবো, মন ভারী হয়ে এলো!

তিনি এগিয়ে এলেন—আমার কাছে বিপদের কথা শুনে বললেন—আজ চলি—আর একদিন আসবো। কিছু বলতে পারলুম না—বিষণ্ণ মনে তাঁকে প্রণাম করে বিদায় দিলুম।

সারা রাত্রি কাঁটার মত কী বেদনা বুকে বিঁধে রইলো ঘুমাতে পারলুম না। দিদি এলেন এমন পরিবেশের মধ্যে, তাঁকে আনন্দ মনে অভ্যর্থনা করতে পারলুম না! এ সৌভাগ্য কী আর আসবে! পরদিন ক্ষমা চেয়ে চিঠি দিলুম। সে চিঠির উত্তর এলো—

"ক্ষমা চেয়েছ কেন বুঝতে পারলুম না—তোমার দিদি কী এতই ভাগ্যবতী যে কখনও তার আত্মীয় বিয়োগ হয়নি? সে সময় বাড়ীর কী অবস্থা হয় জানে না? অথবা তোমার দিদি এতই হৃদয়হীনা যে অপরের দুঃখ বোঝে না! আমি ওঁদের কাছে অপরিচিতা, নাহলে নিশ্চয়ই চলে আসতুম না, ওঁদের দুঃখের অংশ নিয়ে কাছে বসে আসতুম।"

আমার দিদির মতই মহীয়সী নারীই এমন কথা লিখতে পারে! চিঠিখানা মাথায় ঠেকালুম।

একবার তিনি আমায় তাঁর 'ত্রিবেণী' উপন্যাসের একটা সমালোচনা লিখতে বলেছিলেন,—সে সময় মাসিক বসুমতীতে 'ত্রিবেণী' ধারাবাহিকরূপে বার হোত।

তিনি শুধু লেখিকা নন—কবিও। তাঁর বহু কবিতায় চিঠি

আজও আমার কাছে আছে—সেগুলি আমার জীবনের এক অমূল্য সম্পদ।

মাঝে দীর্ঘদিন পত্রালাপ বন্ধ ছিল। তারপর হঠাৎ একদিন আমার নামে একখানি পোষ্টকার্ড পেলুম—উপরে সম্বোধনহীন ও তলায় স্বাক্ষরহীন।

"লক্ষ্মীরে আজ অলক্ষ্মীতে (?) করেছ কী বিসর্জ্জন?
ভাঙ্গা কুলায় বাস্ত দিয়ে আবর্জ্জনার আয়োজন।
মাথায় তুলে ঠেলে ফেলা তোমার প্রেমের বিষম ঠেলা
বর্ষমাসের হিসাব হারা তোমার যে এই বিস্মরণ,
ভাবতে পারো,—কোথায় কারো আকুল করে তুলছে মন।
"নিশ্চয় চিনতে পারবে না!"

এই চিঠি! হস্তাক্ষর দেখে ও এমন স্নেহপূর্ণ অনুযোগ দেখে বুঝতেই পারলুম—এ আমার দিদি ছাড়া আর কেউ নয়। 'লক্ষ্মী' কথাটি কোন সময় তাঁকে লেখা আমার কোন কবিতায় ব্যবহৃত হয়েছিল।

তৎক্ষণাৎ পত্রাঘাত—

"অনেক দিনের পরে দিদি পেলাম তোমার চিঠি এ কী!
কোন বাঁধনে পড়লে বাঁধা অবাক হয়ে তাই তো দেখি!
"লক্ষী দেবী চঞ্চলা"। যে এ কথাটা কাজেই বটে,
তোমার চিঠি প্রমাণ তাহার পেলাম যে আজ হাতে হাতে,
অচঞ্চলা তোমার স্নেহ আজকে সেটা বুঝছি ভালো,
তোমার লেখা কয়টি লাইন আমার মনে জ্বাললো আলো,
লক্ষ্মীরে কী ঠেলতে পারি তুলতে পারি তাও কী হয়!
তোমায় পাবার যোগ্যতা নেই—তাইতো এত সম্ভ্রম, ভয়!
তোমার ঘরে মহোৎসবে ফুলের মালায় গন্ধে গানে,
নিত্যি লোকের আনাগোণা তোমার খ্যাতি জগৎ জানে,
আমার ঘরের গোপন কোণে তারই কিছু আভাস আনে,
আনন্দেতে সম্ভ্রমেতে শ্রদ্ধা জানাই তোমার পানে,
মিথ্যে কিছুই হয়নি দিদি, পৌঁছেছে তা তোমার পায়ে,
আমার মনের ফুলের সুবাস পাবে তুমি উতল বায়ে।
তোমার বীণা গুঞ্জরিছে—শ্রবণে মোর সুধার ধারা,
তোমার বাণী কাজের ফাঁকে করে আমায় দিশাহারা,
ধন্য আমি, তৃপ্ত আমি, আমায় তোমার আছে মনে,
মন বুঝেছে ব্যাকুলতা—প্রণাম দিদি শ্রীচরণে।

১৫ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৪০

তার পর মাঝে মাঝে চিঠি চলছিল,—কিন্তু সেই বছরই মাঘ মাসে (১৩৪০) বিহারে প্রচণ্ড ভূমিকম্প হয়। এই দুর্ঘটনায় সমগ্র বিহার বিধ্বস্ত হয় ও শত-সহস্র লোক গৃহহীন, নিরাশ্রয় হয়, আরও কত শত প্রাণ যে বিনষ্ট হয়,—তার ইয়ত্তা নেই।

মজঃফরপুরও বাদ যায়নি। শ্রদ্ধেয়া অনুরূপা দেবীরও নিদারুণ ক্ষতি হয়, তাঁর গৃহ তো ধ্বংস হয়ই, তাঁর পৌত্রী (৺অমুজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা) এই দুর্ঘটনায় প্রাণ হারায়। সংবাদপত্র মারফৎ এই মর্মান্তিক দুঃসংবাদে স্তম্ভিত হয়ে গেলুম। তখন এই বিপর্য্যয় অবস্থার মধ্যে তাঁকে চিঠি লিখে খবর নেবারও উপায় নেই। এই দুঃখময় বিপদের দিনে তাঁর শোকে সহানুভূতি জানাবারও উপায় নেই। মন অত্যন্ত অশান্ত—বেদনায় পীড়িত।

দিন কয়েক অপেক্ষা করে দিদিকে একখানা চিঠি দিলুম। তিনি কোথায়-কী অবস্থার মধ্যে আছেন জানি না—তবু দিলুম যদি পান।

গভীর বিপদে মনেতে ব্যথা পাই
তখনি মনে হয় তোমার কাছে যাই,
নিঠুর দেবতার এ কী এ পরিহাস!
বোঝে না বোধহীনা হারায় বিশ্বাস
আমার কানে বাজে আর্ত্ত ক্রন্দন
শতেক গৃহহারা মাহারা ভাই-বোন
তুলেছে হাহাকার; হেথায় সুখনীড়ে
আমারও বুকে দিদি বেদনা আসে ঘিরে
আমি যে অকর্মা দূরেতে থাকি লাজে,
তোমার এ বিপদে দাঁড়াতে পারিনি যে,
কী দেব সান্ত্বনা—ভাষা যে নাহি তার
যে গেছে,—তারই তরে ঝরিছে আঁখিধার
কাগজে যাহা পাই—যেটুকু জনরব,
সেটুকুই জানি দিদি কেমন আছে সব?
আমি তো লিখিনিকো মনেতে আছে যাহা
গোপনে যা বেজেছে—গোপনে থাক তাহা,
ব্যাকুল হৃদয়ের ক্ষমো এ অপরাধ,
জানিতে উৎসুক সুস্থ সংবাদ
যদি বা সম্ভবে, তাহোলে দিও চিঠি
আমার বাতায়নে পিয়াসী আঁখি দিঠি
রহিল পথ পানে, তোমার লিপি অর্ঘে
তাহারে দিও প্রীতি স্নেহের সম্ভাষে।

২৪শে মাঘ ১৩৪০

চিঠি দিলুম। প্রতীক্ষা—আর প্রতীক্ষা, উত্তর আর আসে না। সে চিঠি তিনি পেয়েছিলেন কী না, উত্তর দেবার অবস্থা ছিল কী না,—কোন খবরই পাইনি। মনে দুর্ভাবনার মেঘ—কিছুতেই স্বস্তি পাইনে। কিছুদিন পরে খবর পেলুম আমার নিকটতম আত্মীয় ব্যারিষ্টার শ্রীশচীন্দ্রনাথ রুদ্রের নিকটে, এই দুর্ঘটনার পর তিনি মজঃফরপুর গেছলেন এবং রিলিফ কমিটির সঙ্গে থেকে দুর্গতদের জন্য বহু পরিশ্রম ও সাহায্য করেন, দিদিরা ভালো আছেন ও কলিকাতায় এসেছেন শুনে নিশ্চিন্ত হলুম,—দুর্ভাবনার মেঘ কাটলো।

কিছু দিন পরে খবর পেলুম, দিদি শ্যামবাজারে রামরতন বসু লেনে বাসা ভাড়া করে আছেন। আমি তখনি ছুটলাম—দীর্ঘ দিন পরে দেখা, প্রচণ্ড দুর্ঘটনার পরে। একে একে সবই শুনলাম, সেই ভয়াবহ দিনের মর্ম্মন্তুদ করুণ কাহিনী। তাঁকে সান্ত্বনা জানাতে গিয়ে নিজেই সান্ত্বনাহীন হয়ে বাড়ী ফিরলুম।

তার পর রামরতন বসু লেনের বাসায় আরও কয়েক বার গেছি। এখানেই তাঁর পুত্রবধূ (৺অমুজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী) ও কন্যা কল্পনা দেবীকে দেখেছি।

শ্যামবাজারে ফড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীটে 'বিচিত্রা' অফিসের পাশে পরে তিনি উঠে গেছলেন, কিন্তু সে-বাড়ীতে আমার আর যাওয়ার সুযোগ ঘটে ওঠেনি।

এর পর সংসারের নানা ঘাত-প্রতিঘাত ও ঘটনাচক্রে কলিকাতার বাইরে বহু দিন থাকতে বাধ্য হয়েছিলাম। দিদির জ্যেষ্ঠপুত্র অমুজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অকাল মৃত্যুর কথা সংবাদপত্রে পড়েছি। বাইরে ছিলাম, কিন্তু ঠিকানা না জানায় তাঁর এই গভীরতম শোকে সমবেদনা জানিয়ে একখানা চিঠিও দিতে পারিনি। কলিকাতায় এসে পরে তাঁর ঠিকানা জানবার অনেক চেষ্টা করেও পাইনি। দীর্ঘ দিন তাঁর সঙ্গে যোগসূত্র ছিল, কিন্তু শেষ কয়েক বৎসর তাঁর কোন খবর পাইনি। সুদীর্ঘ দিনের সঙ্গী স্বামী শ্রীশিখরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু-সাবাদ পেয়েছি। শেষ জীবনে দিদির এই দুর্ভাগ্যের জন্ত অনেক চোখের জল মুছেছি। 'মহিলা' নামে একখানা পত্রিকায় মাঝে দেখেছিলাম—সম্পাদিকা অনুরূপা দেবী। 'মহিলা' অফিসে তাঁর ঠিকানার জন্ত চিঠি লিখেও উত্তর পাইনি।

আমার স্বর্গগত পিতা পুলিনবিহারী নাগচৌধুরী বহু তীর্থ পরিভ্রমণ করেছিলেন। 'হিমালয় যাত্রা' ও 'নেপাল যাত্রা' নামে তাঁর দু'খানি বই মুদ্রিত হয়েছিল। আজ দুই বৎসর হোল তিনি পরলোক গমন করেছেন, তাঁর শেষ প্রয়াণের আগে তিনি প্রায়ই বলতেন—'কল্যাণীয়া অনুরূপাকে আমার দু'খানা বই পাঠিয়ে দাও।" আমি নিজে গিয়ে দিদিকে বই দেবো ভেবেছিলাম, কিন্তু ঠিকানা না জানায় পিতার শেষ ইচ্ছা পূর্ণ করতে পারিনি। আমারও বহু দিন পরে দিদির সঙ্গে দেখা করবার ইচ্ছা হয়েছিল, কিন্তু সে ইচ্ছাও আর পূর্ণ হোল না।

সংবাদপত্রে শ্রদ্ধেয়া দিদির মহাপ্রয়াণের খবরে অত্যন্ত দুঃখিত ও মর্ম্মাহত হলুম। অনেক পুরানো দিনের কথা আজ স্মৃতির পাতায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। 'অটোগ্রাফসে'র সেতু বয়ে তাঁর অত্যন্ত নিকটতম হয়েছিলাম, আজ তাঁর বিচ্ছেদে গভীর বেদনা অনুভব করছি। শুধু আমি নয়, সারা বাংলা দেশই তাঁর বিচ্ছেদে বিষণ্ণ, ম্রিয়মাণ। এই প্রতিভাময়ী মহীয়সী রমণীকে হারিয়ে বাংলা সাহিত্যের যে ক্ষতি হোল, তা অপূরণীয়। আজ শ্রদ্ধানত চিত্তে তাঁর অমর আত্মার উদ্দেশ্যে বার বার প্রণাম করছি।

স্মৃতি-বিস্মৃতি

উৎপলা সেন

সুখ-দুঃখের অনুভূতির বুনানি যে দুটি কাঠিতে আশ্রয় করে বেড়ে চলে, তা হল স্মৃতি ও বিস্মৃতি। তাই স্মৃতি এবং বিস্মৃতির হস্তক্ষেপ আমাদের তথা মানুষের প্রত্যেক কাজে এবং প্রত্যেক চিন্তায়। মাটির এ খেলাঘরে এই দুই তাল-বেতালের আবির্ভাব মেনে না নিলে আমাদের মরতে হবে, চিন্তা, অনুভূতি ও কর্মের বিশৃঙ্খল অভিশাপে। স্মৃতি-বিস্মৃতির নিবাস কিন্তু মনে। মন জিনিষটার একটু বিশ্লেষণ দরকার। কতকগুলি টুকরো টুকরো অনুভূতির সমষ্টি নিয়ে মন; এ কথা যদি আমাদের বাস্তব মন স্বীকার করে নিতে বলে, তবে সন্দেহ দেখা দেবে। আত্ম-সচেতনার উৎস কোথায়? আজকের 'আমি'র সঙ্গে বাল্যের 'আমি'র যোগ কোথায়? তাই মনকে আবার রহস্যাবৃত কোন ধরা-অধরা চরিত্রের 'আত্মা' নামে অভিহিত করার প্রচেষ্টা চলে। কিন্তু তারও পূর্ণ স্বীকৃতি নেই। তাই আত্মা কি শুধু নাম, না আর কিছু? উত্তর নাই, যেহেতু নেতি নেতি ভাবের প্রশ্রয় এখানে।

সত্য-মিথ্যা মিলিয়ে এই যে মন, এর কার্য্যকলাপ কিন্তু অসাধারণ—ক্ষমতা অসাধারণোত্তর স্মৃতি-বিস্মৃতিকে নিয়ে তার সংসারে প্রতি-উৎসব নিত্যই চলছে। আজ পেয়েছি বলে হাসিতে ভরে উঠেছে যে মুখ কাল সে পাওয়াকে স্মরণ করেই মুখ আরও উজ্জ্বল। পরিবর্ত্তনের প্রান্তে ভেসে যাওয়া জীবন-সায়রের অন্ত প্রান্তে এসেও সে মুখের হাসি অমর। কে তাকে বাঁচিয়ে রেখেছে? স্মৃতি। সুতোকে আশ্রয় করে যেমন হয় ফুলের মালা, তেমন স্মৃতির আলোক-সূত্র দিয়ে গাথা মানুষের জীবন। পূর্ব সুরের স্মৃতির সঙ্গে বর্ত্তমানের গাওয়া গানের সুর মিলিয়ে, গান ঠিক কি ভুল গাওয়া হয়েছে, আমরা বলি। জানা ঘটনা যখন মন থেকে তলিয়ে যায়, তাকে বলি বিস্মৃতি। বিরাট শোকাবহ ঘটনার শেষে যে চোখের জল নামল, তার সমস্ত অনুভূতিকে বিলয়ের নীরন্ধ্র কুঠুরিতে সরিয়ে নিয়ে গেল যে শক্তি তা বিস্মৃতি। এই ভাবে চলে স্মৃতি-বিস্মৃতির খেলা।

এই খেলারও বিভিন্ন দিক আছে—এক দিকে গভীরতা, অন্ত দিকে হাল্কা। কলেজের কার্ড হওয়া মেয়ে ক্লাসে হাসি ও সহানুভূতি জাগায় মঙ্গলবারের রুটিন সোমবারে মেনে। মজার খেলা কিন্তু কোন guarantee নেই শত অভ্যাস শত শৃঙ্খলা, হাজার অভিজ্ঞতা সব কিছুই ভেঙ্গে পড়তে পারে যদি এই দুটি বোন স্মৃতি-বিস্মৃতি আচম্বিতে এসে পড়ে কারুর কাজের প্রাঙ্গণে।

সাধারণতঃ হাত ধরাধরি করেই আসে এরা—খেলে দু' হাতে। স্মৃতির যেখানে শেষ, বিস্মৃতির সেখানে শুরু। একের মুঠি আলগা হলে অন্তে সেটা নেবার জন্ত অঞ্জলি পাতে। এক করে উন্মুক্ত, অন্ত করে অবলুপ্ত। এক বোন জাগায়, অন্ত বোন ঘুম পাড়ায়।

মানুষের রাগ কিন্তু বিস্মৃতিতে, অনুরাগ স্মৃতিতে। মনে মনে সর্বদাই চেষ্টা 'ভুলবো না'। তাই স্মারক, উৎসব, মর্মর মূর্তি, কবিতা, গান, তাজমহল। তাই আবার কানমলা, দণ্ডের মধ্যে শূল, মাইনে কাটা, শাস্তি, ভর্ৎসনা ও হুমকি। "ভুলে গিয়েছিলাম এর আবেদন তাই অতি দুর্বল, "দেখুন, আজও মনে করে সব কিছু মেনে চলি" এর বলিষ্ঠ ঘোষণার কাছে।

সব পড়ে মনে রেখেছে তার জন্ত শাস্তি এবং 'এ প্লাস বি হোল স্কোয়ারে'র ফরমূলা মনে রাখার অক্ষমতার জন্ত আমাদের কারো ভাগ্যে দুঃখ ঘটেছে বলে শুনিনি। বাস্তব জগতে তাই দেখি, স্মৃতির দামই বেশি—বিস্মৃতি যেন দুয়োরাণী।

বিস্মৃতির মূল্য বুঝবার লোকও বোধ হয় দুনিয়ায় কম। কারণ, যে বোঝে সে অনেক মূল্য দিয়েই বোঝে। পুত্রশোকাতুরা মাতার কান্না যদি চিরস্থায়ী হত, তবে বোধ হয় কান্না ছাড়া অন্ত কোন স্বরের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটত না। জীবনে যার এসেছে রিক্তের শূন্ততা, হাহাকারের বেদনা শুধু সেই জানে বিস্মৃতির শান্তি-প্রলেপের প্রয়োজনীয়তা। বিস্মৃতির কার্য্যকারিতা কত পরিচ্ছন্ন তা জানে কোন কর্তব্যরত সেই বিমানচালক কর্মে অংশ গ্রহণের প্রাক্কালে যে দেখে এসেছে কোন পারিবারিক বিপদের ছায়াপাত। স্মৃতি যেখানে ভারী, বিস্মৃতি সেখানে কাম্য। জীবনের পথকে সে করে সুগম। বিস্মৃতি যেখানে নির্মমতা, স্মৃতি সেখানে আনে সজীবতা, নব প্রেরণা। এমনি করেই এই দুইটি দুরন্ত শিশুর খেলা চলেছে, আমাদের মনে অনুদিন অনুক্ষণ।

সাগরপারে

প্রতিমা গুপ্ত

বিলেত সম্বন্ধে আমাদের মোহকে ব্যঙ্গ করে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় লিখেছিলেন 'বিলাত দেশটা মাটির, সেটা সোনারূপার নয়।' অনেক দিন আগের লেখা অথচ বর্ত্তমান কালেও এ ব্যঙ্গ অত্যন্ত সত্য। স্বাধীনতা আমাদের মোহ ঘোচাতে পারে নাই। ভারতীয়রা এখনও এদেশে আসার জন্ত উন্মুখ হয়ে আছেন। প্রতি বছর ছাত্রধারা বয়ে আসছে বিলাতের দিকে।

আমাদের দেশের ছেলে-মেয়েদের সাধারণ শিক্ষার জন্ত এদেশে আসার যে খুব প্রয়োজন আছে, তা মনে হয় না। ডাক্তারী, আইন ইঞ্জিনিয়ারীং ইত্যাদি· বিশেষ কয়েকটা পোষ্ট গ্রাজুয়েট কোর্স করার জন্ত এখনও এখানে আসার প্রয়োজন হয় কোনও কোনও সময়। এই পরিণত বয়সে ছেলে-মেয়ের মনের ও চরিত্রের দৃঢ়তা আসে ও ভাল মন্দ বিচারের ক্ষমতা হয়।

ভারতবর্ষে একটি মধ্যবিত্ত পরিবারে চার-পাঁচটি সন্তান থাকে। দেশে তাদের ভরণ-পোষণ ও উপযুক্ত শিক্ষা দিতে মা-বাপের কত অসুবিধা হয়, তা ছাড়া যখন মেধাবী ছাত্রকে তাঁরা বিদেশে পাঠান, না জানি কত কষ্ট তাঁদের ভোগ করতে হয়। এরকম সাধারণ পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে কারো যে বিশেষ কোনও লাভ হয়েছে, তা আমার মনে হয় না। আমি জানি, একটি সাধারণ পরিবারের পাঁচটি ছেলের মধ্যে একটিকে আইন পড়াতে কেম্বি জে পাঁচ বছর রাখতে হয়। তার জন্ত সেই পরিবারের সকলকে কতটা ত্যাগ করতে হয়েছে, তা লিখে জানান সম্ভব নয়। শুধু সামান্ত উদাহরণ দিচ্ছি যে, বাড়ীর বউ ও মেয়েদের মাঝে, ছোট সাড়ী ও গামছা দিয়ে লজ্জা ঢাকতে হয়েছে। অন্ত অভাবের কথা ত লিখলামই না। এতটা স্বার্থত্যাগ অবশ্য আজ-কাল কম।

সেই ছেলে সসম্মানে পাশ ক'রে দেশে ফিরে প্রচুর যশ ও অর্থ লাভ করেন ও পরিবারকে নানা ভাবে সাহায্য করেন। এই পরিবার আজ সুখী ও বর্দ্ধিষ্ণু।

কিন্তু সব ক্ষেত্রেই এরকম সাফল্য ও কৃতজ্ঞতা দেখা যায় না। একটি ছেলের এখানে থাকার ও পড়ার খরচা সাড়ে চারশ কি পাঁচশ' টাকা লাগে এক মাসে। প্রত্যেক বাপ-মা'র পক্ষে তা পাঠান সম্ভব হয় না ; সুতরাং বেশীর ভাগ ছাত্র-ছাত্রীকে পড়ার সঙ্গে, চাকুরী করতে হয়। যতটা সময় তারা পড়াশুনায় দিতে পারত, ততটা পারে না। এ ছাড়া আছে সংসারের যাবতীয় কাজ। বাইরে খেলে খরচ বেশী, সাময়িক অসুস্থতা আছে, আর আছে অনিশ্চিত আবহাওয়া। বাড়ীতে খাওয়া মানে নিজের রান্না, বাজার ও বাসন মাজা, তা ছাড়া কাপড় কাচা ইস্ত্রি করা বিছানা করা ও ঘর পরিষ্কার করাও আছে। দোকানে কাপড় কাচাতে অনেক খরচ। হঠাৎ এরকম অমানুষিক পরিশ্রমে, দিনের শেষে শরীরে আসে ক্লান্তি ও মনে আসে অবসাদ। অবসাদ কিছুটা সূর্য্য বিহীন দিনগুলির জন্ত ও শীতের জন্য। অতিরিক্ত পরিশ্রম ও মুখরোচক সুখাদ্যের অভাবে একটি অদ্ভুত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, যখন তারা পড়াশুনায় মন দিতে পারে না। আর একটি ক্ষতিকর অবস্থা হচ্ছে এখানকার নিঃসঙ্গতা ও স্নেহ, আদর-যত্নের অভাব। কত দিন মানুষ একা থাকতে পারে?

এই ভাবে থাকতে থাকতে শেষে নিরুপায় হয়ে অন্তদেশের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে অনেকে মিশতে আরম্ভ করে, যাদের সঙ্গ সুলভ। তারপর সুরু হয় তাদের জন্মদিনে, খৃষ্টমাসে, ও নানারকম পাল-পর্ব্বে উপহার দেওয়া, বাইরে খাওয়ান, সিনেমা ও থিয়েটারে নিয়ে যাওয়া। এই এখানকার নিয়ম। এতে প্রচুর খরচ। দেশের সঙ্গে এখানকার খরচের কোনও তুলনাই হয় না।

মনুষ যখন অর্থ ও বিবেকের সঙ্গে সংগ্রাম করে, তখনই আসে তার বিপদ। কোনও উপায়ে তাকে অর্থ সংগ্রহ করতে হবে। সে জানে, বাপ-মার কাছে আরো টাকা চাওয়া অসম্ভব। তাই তার বিবেক তাকে খোঁচা দেয়। এই অবস্থাতে সে কি ক'রে পড়াশুনায় মন দেয়?

রোগে আক্রান্ত হলে, নিজের ঘরে জল দেবারও তার কেউ নাই। কারো নজরে পড়লে, অবস্থা বুঝে হাসপাতালের ব্যাবস্থা হতে পারে। কিন্তু স্নেহময়ী মা, বোন এসে মাথায় হাত বুলিয়ে দেবে না ও পথ্য রেঁধে দেবে না।

এ দেশের লোকেরা অত্যন্ত চাপা, গম্ভীর প্রকৃতির। নিজের থেকে সহজে আলাপ করেন না। আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা প্রথমে বিদেশে এসে কিছু লাজুক থাকে, তাই মেলামেশায় বাধা। বেশ কিছুদিন একলা কাটাতে হয়। কলেজ ও স্কুলে ভর্ত্তি হবার সময় সেপ্টেম্বর মাসে, এই সময়ই বেশীর ভাগ ছাত্র এসে পৌঁছয়। শীতের মুখে, অন্ধকার ও মেঘাচ্ছন্ন আকাশের তলায় এই বিরাট সহরটিতে একলা এসে দাঁড়াল, এক ভয়াবহ ব্যাপার।

এই খরচের মধ্যে চালিয়ে, ভাল ভাবে থেকে, নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পাশ করে যদিই বা ছেলেরা দেশে ফেরে, তাতে তাদের লাভ কি? ফিরে গিয়ে তারা কি দেশে শিক্ষিত ছেলেমেয়ের চেয়ে বেশী মাইনা পায় না বেশী সম্মানজনক পদ পায়? পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট কোর্সের জন্ত হয়ত কোনও সময় তারা বেশী টাকা ও মান পেতে পারে, কিন্তু সাধারণ ডিগ্রির জন্ত এখানে আসার সার্থকতা কি? তবে বিদেশী ব্যবসায়ীরা যতক্ষণ আমাদের দেশে আছেন ততক্ষণ এ দেশী শিক্ষার মূল্য থাকবে। অবশ্য তার জন্ত চাই ভাল পৃষ্ঠপোষকতা।

এখানে দেখবার জানবার ও শেখবার অনেক জিনিস আছে কিন্তু সেগুলি ভবিষ্যতে নিজের সামর্থ্য, সুযোগ ও সুবিধানুযায়ী দেখে যাওয়া যায়, শিখে যাওয়া যায়। এ রকম জ্ঞানার্জ্জনের কোনও বাঁধা বয়স ত নাই।

সিনিয়র কেম্বিজ, ম্যাট্রিক, আই, এ পাশ করে ছেলেমেয়েরা যখন এখানে আসে তখন তারা বড় ছোট থাকে। এই দূর দেশে নির্ব্বান্ধব অবস্থায় থাকা তাদের পক্ষে কঠিন হয়।

দেশের ছেলেরা ভারতে থাকতে মেয়েদের সঙ্গে মেশবার বিশেষ সুযোগ পায় না। কিন্তু এখানে বিদ্যালয়ের বাইরেও অবাধ মেলা-মেশা। এই মেলামেশায় এক এক সময় মাত্রা ঠিক রাখা মুস্কিল। আমাদের কাছে যা দৃষ্টিকটু, এদের কাছে হয়ত তাই স্বাভাবিক।

বিদেশে বেশী দিন থাকার পর অনেক ছাত্রের আর দেশের কিছুই ভাল লাগে না। বাড়ী, ঘর, রাস্তা-ঘাট সবই মলিন মনে হয়, মেয়েদের সে রকম সপ্রতিভ ও সুন্দর মনে হয় না। তারা বোঝে না আমাদের মেয়েদের লাবণ্যময়ী কল্যাণী মূর্ত্তির কত মূল্য প্রাচ্যের সঙ্গে পাশ্চাত্যের কোনও তুলনাই হতে পারে না।

'লাইফবয় সাবান
দিয়ে এইবার চান্ করতে হবে'
- এটি সেই ঝরঝরে
তাজা ভাব এনে দেয়!
LIFEBUOY SOAP
LIFEBUOY
SOAP

বিজ্ঞানবার্ত্তা
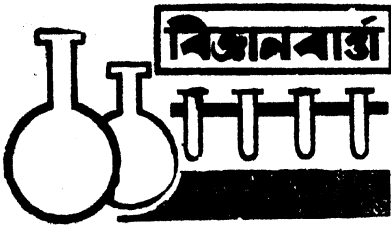
পক্ষধর মিশ্র

কেবল পরমাণু বোমাই মানুষের অশান্তির একমাত্র কারণ নয়, শান্তির কাজে পরমাণু শক্তির ব্যবহারও সময়-বিশেষে জনসাধারণের মানসিক সমস্যার কারণ হতে পারে। পাঠকেরা হয়তো অবাক হয়ে ভাববেন ও আবার কি রকম কথা? শান্তির কাজে, মানব-সভ্যতার অগ্রগতিকে সহায়তা করার জন্য ব্যবহৃত হয়ে পরমাণু শক্তি আবার কি রকম ভাবে মানসিক রোগের সৃষ্টি করতে পারে! মনোবিজ্ঞানীরা এই রকম আশঙ্কা পোষণ করেন এবং তাই কয়েক মাস আগে বিশ্ব-স্বাস্থ্য-সংস্থা জেনেভাতে এক বিরাট আলোচনা-চক্রের আয়োজন করেছিলেন। সেই আলোচনা-সভায় বিশ্বের বিশিষ্ট মনের চিকিৎসকেরা যোগদান করে শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য পরমাণু শক্তির ক্রমবর্দ্ধমান ব্যবহার মানুষের মানসিক জগতে কোন কঠিন সমস্যার উদ্ভব ঘটাবে কি না, তা নিয়ে আলোচনা করেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন ভিয়েনার অধ্যাপক হান্স হফ, (Prof. Hans Hoff)। পরমাণু শক্তির ব্যবহার যদি সত্যিই মানুষের মনোজগতে কোন বৈকল্য আনে, তা হলে সেই সমস্যার প্রকৃতি কি রকম হবে এবং তার নিরাময়ের জন্য কি ধরণের ব্যবস্থা ও সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার, অনতিবিলম্বে তা বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে নির্দ্ধারণ করা উচিত বলে অনেক বিজ্ঞানী দৃঢ় মত প্রকাশ করেন। বিশ্ব-স্বাস্থ্য-সংস্থার পরিচালক তাঁর ভাষণে জানান যে, শান্তির কাজে পরমাণু শক্তির ব্যবহার ঘটনাচক্রে যেমন মানুষের দৈহিক বৈকল্য ঘটাতে পারে, তেমন মানসিক কোন সমস্যার সৃষ্টি করাও তার পক্ষে অসম্ভব নয়। প্রথম শিল্প-বিপ্লব মানুষের মনে এক বিরাট আলোড়ন এনেছিলো, শান্তির কাছে পরমাণু শক্তির ব্যবহার সৃষ্টি করবে দ্বিতীয় শিল্প-বিপ্লবের; তাই মানব সভ্যতার মনোজগতে যাতে প্রথম বিপ্লবের সমস্যাবলীর পুনরাবৃত্তি না ঘটে, বিজ্ঞানীদের সে দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

সমস্যার উদ্ভবের আগেই তার পরিণাম ও নিরাময়ের জন্য বিশ্ব-স্বাস্থ্য-সংস্থা যে আলাপ-আলোচনা শুরু করেছেন, তাতে মনে হয়, মানুষের দৈহিক এবং মানসিক এই উভয় দিকেই বিজ্ঞানের ক্ষেত্র থেকে আসবে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি। আগামী পরমাণু শক্তির যুগে সে নির্ভয়ে মন ও স্বাস্থ্য নিয়ে পৃথিবীর সুখ ও শান্তি উপভোগ করতে পারবে।

* * * *

বৈকাল হ্রদের বুকে নতুন এক গভীর অঞ্চল আবিষ্কৃত হয়েছে। এই অঞ্চলের গভীরতা ১৯৪০ মিটার। সমস্ত পৃথিবীর মিষ্টি জলের হ্রদসমূহের মধ্যে বৈকালের গভীরতাই সর্ব্বাধিক, এবার নতুন করে সে তার নিজের রেকর্ড ভাঙলো। এতো দিন জানা ছিল বৈকাল হ্রদের গভীরতা ১৭৪১ মিটার। হ্রদের বুকে যে গর্তটি এই নতুন গভীরতার সন্ধান দিয়েছে, তা প্রায় ৩০ মাইল লম্বা এবং কোন কোন অঞ্চলে আধ মাইল থেকে স্থানবিশেষে মাত্র ১০০ গজেরও কম চওড়া।

* * * *

নানাপ্রকার সুগন্ধি রসায়ন দ্রব্য প্রয়োজন মতো মিশ্রিত ও অ্যালকোহলের সহায়তায় তরল করে মানুষ তার নিজের রুচি অনুযায়ী সৌরভ উৎপাদন করে। সুগন্ধি রসায়নের উৎস উদ্ভিদ-জগত অথবা প্রাণিজগত, আবার কেউ বা সৃষ্ট হয়েছে মানুষের নিজের গবেষণাগারে, এদের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট কোন কোন রসায়ন দ্রব্যের সহায়তায় বিশেষ একটি সুবাস সৃষ্টি করা হয়। প্রকৃতি থেকে প্রাপ্ত সুগন্ধি তেলের অনেকেরই রাসায়নিক উপাদান এক; কিন্তু স্ফুটাঙ্ক, ঘনত্ব ইত্যাদি নানাপ্রকার গুণাবলী পৃথক। এই পৃথক গুণাবলী বিচার করে সুগন্ধি রসায়ন দ্রব্যাদির মধ্যে পার্থক্য অনুধাবন করা যায়। কিন্তু সবচেয়ে বড় পার্থক্য বিরাজ করছে তাদের গন্ধের মধ্যে। অধিকাংশ সুগন্ধি তেলের গন্ধই প্রীতিকারক নয়, দ্রবণের সাহায্যে অত্যন্ত তরল করার পর তাদের সৌরভ মানুষের দেহ-মনকে আনন্দ দান করে।

সুগন্ধি-বিজ্ঞানীর গবেষণাগারে সর্ব্বপ্রকারের সুগন্ধি রসায়ন দ্রব্য এসে সমবেত হয়। এখানেই সুগন্ধি-বিজ্ঞানীর বিবেচনাসম্মত মিশ্রণের মাধ্যমে তারা নতুন সুবাসের উদ্ভব ঘটায়। বিজ্ঞানীর প্রধান কৃতিত্ব নতুনের সৃষ্টিতে, ব্যবসায়ীরা তারপর শিল্পগত উৎপাদন করে ঐ অনবদ্য সৌরভকে সাধারণের ব্যবহারের জন্য প্রচার করেন। সুগন্ধি-বিজ্ঞানী জানে, কোন সুবাস কিসের মাধ্যমে ব্যবহৃত হবে। সাবানের সৌরভের সঙ্গে পানীয় জলের সুগন্ধ অথবা রুমালের এসেন্সের তফাৎ অনেক, তাই প্রয়োজন অনুযায়ী তাকে নতুন সুরভি উৎপাদন করতে হবে। গবেষণার আধুনিক সাজসরঞ্জামে সুসজ্জিত, যে কোন প্রসাধন দ্রব্য বা সুগন্ধ অল্প পরিমাণে প্রস্তুত করার আয়োজন সেখানে আছে।

সুরভি উৎপাদনের চিত্রখানি কল্পনা করে দেখুন, বিরাট এক সুসজ্জিত কক্ষে নিখুঁত একটি ওজনদাঁড়ির সামনে বসে সুগন্ধি-বিজ্ঞানী তাঁর গবেষণা চালাচ্ছেন। এক এক করে পরীক্ষা করছেন নানাপ্রকার সুগন্ধি রসায়ন, কোনটির সঙ্গে কোন রসায়ন দ্রব্য মিশ্রিত হয়ে এক অভিনব সৌরভের উদ্ভব ঘটাবে। নাক এই বিশেষজ্ঞের একমাত্র হাতিয়ার, তার সহায়তায় সুগন্ধি রসায়নের গন্ধ নিপুণ ভাবে তিনি বিশ্লেষণ করছেন। পছন্দ হলেই নিখুঁত ঐ ওজনদাঁড়িতে পরিমাপ করে একটি রসায়ন দ্রব্যের সঙ্গে আর একটি রসায়ন দ্রব্য হচ্ছে মেশান। সুগন্ধি-বিজ্ঞানীর কাজ এই ভাবেই চলে এগিয়ে, একটির পর একটি করে রসায়ন দ্রব্য মিশ্রিত হয়ে পরিশেষে এক মিশ্র সৌরভের সৃষ্টি ঘটায়। বিজ্ঞানী সন্তুষ্ট না হওয়া পর্য্যন্ত এগিয়ে চলে কাজ, তাঁর সন্তোষের পর, ঐ সুরভি রসিকজনের সন্তোষ বিধানের জন্য শিল্পক্ষেত্রে প্রেরিত হবে। সৃষ্টি করার আগেই ঐ সুরভির কাঠামোর উপাদান কি হবে, তা মনের মধ্যে অভিজ্ঞতার সহায়তায় বিজ্ঞানী এঁকে নেন, তারপর অসাধারণ মেধা, ধৈর্য্য, ও অনুকরণ ক্ষমতার সাহায্যে সে বাস্তব রূপ পরিগ্রহণ করে

সুরভি বিজ্ঞানীর অসাধারণ অভিজ্ঞতা ও ঘ্রাণশক্তির মাধ্যমেই ঐ নতুন সৌরভের জন্ম হয়। ঐ সুরভির সুগন্ধের প্রধান উপাদান যে রসায়ন দ্রব্য, তাই দিয়ে সুরু হয় কাজ, সর্ব্বশেষে দেওয়া হয় কোন বিশেষ স্থিরীকারক বস্তু। স্থিরীকারক ঐ সুরভির মধ্যে যে কোন পরিবর্ত্তনের প্রতিবন্ধকতা করার ক্ষমতা দেয়। স্থিরীকারক সুরভির সত্বর বাষ্পীভবনের এক প্রধান প্রতিবন্ধক এবং সময়ের সঙ্গে ঐ সুরভির যে কোন পরিবর্ত্তনের পথে সে বাধা দেয়। স্থিরীকারকরূপে কি ধরণের সুরভি উৎপাদনক্ষেত্রে কোন সুগন্ধি রসায়ন কতো পরিমাণে ব্যবহার করা হয় তা সুগন্ধিবিজ্ঞানীরা তাঁদের অভিজ্ঞতা দিয়ে নির্দ্ধারণ করেন। সাধারণ ক্ষেত্রে নানা প্রকার প্রাণিজ সুগন্ধি রসায়ন দ্রব্যের আরক স্থিরীকারক হিসাবে ব্যবহার করা হয়। স্থিরীকারক সমূহের স্ফুটনাঙ্ক খুব বেশী এবং বাষ্পজ্ঞানের পরিমাণ অত্যন্ত কম হওয়ার জন্য সুরভিকে তারা দীর্ঘস্থায়ী করে। কুমারিন, ভেনিলিন, হেলিওট্রপিন ও নানা প্রকার ল্যাকটোন (lactones) জাতীয় পদার্থ প্রধানত: সুগন্ধের কারণ হিসাবে ব্যবহৃত হলেও তাদের স্থিরীকারক গুণাবলীও উল্লেখযোগ্য।

পরিশেষে সুগন্ধি-বিজ্ঞানী ঐ সুরভি অ্যালকোহলের সহায়তায় তরল করেন। একটি নির্দ্দিষ্ট ওজনের মিশ্রিত সুগন্ধি রসায়ন দ্রব্যে বিভিন্ন পরিমাণে অ্যালকোহল মিশিয়ে অভিজ্ঞতা ও প্রখর নাকের সহায়তায় নির্ণয় করা হয়, কতো পরিমাণে দ্রবণে ঐ তরল সুগন্ধ সাধারণ মানুষের কাছে সবচেয়ে প্রীতিকর হতে পারে। প্রয়োজন অনুসারে অ্যালকোহল ছাড়াও পেট্রোলিয়াম ইথার, বেনজিন ইত্যাদি নানাপ্রকার দ্রবণও ক্ষেত্রবিশেষে ব্যবহার করা হয়। সুরভি প্রস্তুত হলো, সুরভি-বিজ্ঞানী আবার নিখুঁত ভাবে ওজন করে নানা উপাদান মিশিয়ে ঐ সুবাসের পুনরাবৃত্তি ঘটালেন। বারে বারে পরীক্ষা করে ঐ বিশেষ সৌরভের সৃষ্টি বিষয়ে একেবারে নিঃসন্দেহ হওয়ার পর সুরভি ব্যবসায়ীরা শিল্পক্ষেত্রে তা প্রস্তুত করার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সুগন্ধি-বিজ্ঞানীরা সব সময়ে রসায়ন-বিজ্ঞানে পারদর্শী হন না, তাঁদের বিজ্ঞান প্রধানত: কাজ চালায় কেবলমাত্র ঘ্রাণের সহায়তায়, তবু অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তাঁদের জানা আছে, কোন কোন সুগন্ধি রসায়ন দ্রব্যের মধ্যে রাসায়নিক প্রক্রিয়া চলে। সুরভির উপাদানগুলির মধ্যে যাতে কোন রাসায়নিক প্রক্রিয়া না হয়, সেদিকে তাঁদের সতর্ক দৃষ্টি থাকে এবং সব সময়েই রাসায়নিক গুণাগুণ বিচার করে উপাদানগুলি মিশ্রিত করা হয়। স্থিরীকারক পদার্থটি সমস্ত উপাদানগুলিকে এক সূত্রে আবদ্ধ করে সুরভিকে একটি নির্দ্দিষ্ট চরিত্রের পদার্থে পরিণত করে। সৃষ্ট সুরভিটির সুগন্ধ একেবারে পৃথক, তার মধ্যে অবস্থিত উপাদানগুলির নিজস্ব পৃথক পৃথক গন্ধের রেশ তার মধ্যে পাওয়া যাবে না।

যে ধরণের তরল সুরভি বাজারে বিক্রয়ার্থ পাঠান হয়, তার একটির কাঠামো মোটামুটি আলোচনা করা যাক। প্রত্যেকটি সুরভি উৎপাদনের প্রতিষ্ঠান যে সব সুরভি প্রস্তুত করেন, তার মধ্যে ঐ প্রতিষ্ঠানের কিছু না কিছু নিজস্ব বিশেষত্বের ছোঁয়া থাকে। যদি কোন প্রতিষ্ঠানের সুরভি প্রস্তুত করার ফরমুলাও অন্য কারো হাতে এসে পড়ে, তাহলেও তিনি ঐ বিশেষ সুরভি হুবহু প্রস্তুত করতে পারবেন না। কারণ, ধরুন লেখা আছে, এতে বারগামটের সুগন্ধি তেল শতকরা ৫ ভাগ দেওয়া হবে। কিন্তু আপনি জানেন না, ঠিক কোন্ বারগামট তেল এখানে ব্যবহার করতে হবে। উৎপাদনের উৎস অনুযায়ী ঐ তেলের প্রকৃতিও কম-বেশী কিছু বদলায়, তাই এই বিশেষ সুগন্ধের রেশ সৃষ্টির কাজে কোন্ উপাদান ব্যবহার করা হবে, তার চাবি-কাঠিটি উৎপাদকের সিন্দুকে লুকোনো রয়েছে।

* * * * *

সুরভি উৎপাদনকারীদের সদাসর্ব্বদা কৃত্রিম অথবা ভেজাল সুগন্ধি দ্রব্যের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হয়। সুরভি প্রস্তুতকল্পে তাঁরা যে সব রসায়ন দ্রব্য ব্যবহার করেন, তা কৃত্রিম হলে উৎপাদিত সুরভির সৌরভ নির্দ্দিষ্ট মানে উন্নীত হতে পারে না। অবিশুদ্ধ সুগন্ধি রসায়ন বহুক্ষেত্রেই সুগন্ধি বিশেষজ্ঞরা তাঁদের প্রখর ঘ্রাণ শক্তির সহায়তায় নির্ণয় করতে পারেন। এ ছাড়াও ঊর্দ্ধপাতনের সহায়তাও কৃত্রিম বা ভেজালযুক্ত পদার্থ নির্ণয় করা যায়। বারগামট তেলের মধ্যে ভেজাল মিশ্রিত করলে তার স্ফুটনাঙ্ক এক থাকে না। ভেজাল হিসাবে অনেক সাধারণ তেল সুগন্ধি তেলের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হলে তা নির্ণয় করবার এক বিশেষ পদ্ধতি আছে। একটি সাদা কাগজের গায়ে এক কোঁটা তেল লাগিয়ে তাকে কোন গরম স্থানে কয়েক ঘণ্টা ফেলে রাখা হয়। সুগন্ধি তেলে যদি অন্য কোন সাধারণ তেল মেশান থাকে তাহলে কিছুক্ষণের মধ্যে সুগন্ধি তেল উপে যাওয়ার পর ভেজাল হিসাবে মিশ্রিত অন্য তেলটির একটি দাগ কাগজের গায়ে লেগে থাকবে। বহুক্ষেত্রেই ক্যাষ্টর অয়েল ব্যবহার করে সুগন্ধি তেলে ভেজাল মেশান হয়। অবস্থাবিশেষে অ্যালকোহল, মোম, প্যারাফিন প্রভৃতি বস্তুর ভেজাল হিসাবে ব্যবহার করার চেষ্টা চলে কিন্তু এই ভেজাল নির্ণয় করা কঠিন নয়। সংশ্লেষিত সুগন্ধি রসায়ন দ্রব্যের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে ভেজাল নির্ণয়ের জটিলতা গিয়েছে অনেক বেড়ে। বহু ক্ষেত্রেই প্রকৃতিজ কোন রসায়ন দ্রব্যের মূল্য সংশ্লেষিত ঐ একই বস্তুর চেয়ে অনেক বেশী। অপরাধকারীরা এই সুযোগ গ্রহণ করে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ভেজাল মেশাবার চেষ্টা করেন।
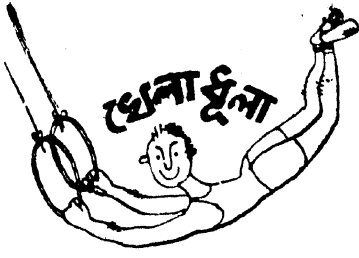
শরীরযন্ত্রটি সাময়িক ভাবে বিকল হয়ে পড়ায় গতবার খেলা-ধূলা সম্পর্কে আলোচনা সম্ভব হয়নি। তাই সাধ্যমত এবার আলোচনা করব।

ক'লকাতা মাঠে হকি লীগ শেষ হওয়ার পর ফুটবল মরশুম সুরু হয়ে গেছে।

একবার ফুটবল মরশুমে ওঠা-নামা না থাকায় খেলার মধ্যে ততটা উদ্দীপনা ও উৎসাহ দেখা যাবে না। খেলায় ওঠা-নামা ব্যবস্থা থাকলে খেলার মান কিছুটা উন্নত হওয়ার আসা দেখা যায়। কারণ ওঠা-নামার প্রশ্ন থাকায় প্রতিটি দলই চেষ্টা করে সাধ্যমত ভালো খেলার। কিন্তু এবারকার লীগ প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ান সিপ লাভ করার জন্য বড় দলগুলির প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে।

এবারকার প্রতিযোগিতায় সর্ব্বসমেত ১৫টি দল আছে। দলগত শক্তিতে এবার মহামেডান দল গত বারের তুলনায় কিছু দুর্ব্বল। আমেদ হোসেন এবার মহামেডান দল ত্যাগ করে মোহনবাগান দলে যোগ দিয়েছেন। তাছাড়া অন্যান্য সকল খেলোয়াড় মহামেডান দলে আছেন।

এবারে ইষ্টবেঙ্গল দল বেশ শক্তিহীন হয়ে পড়েছে। কারণ, ইষ্টবেঙ্গল দল ছেড়ে অনেক খেলোয়াড় অন্যান্য দলে চলে গেছে। তবে এবার ইষ্টবেঙ্গল দল বালী প্রতিভার সুযোগ সন্ধানী সেণ্টার ফরোয়ার্ড নীলেশ সরকারকে পেয়েছে। নীলেশ সরকারকে ঠিক মত খেলাতে পারলে ইষ্টবেঙ্গল দলের এবারকার পুরোভাগে গোল করার সমস্যা মিটবে বলে আশা করা যায়।

এবার মোহনবাগান দল অনেক খেলোয়াড় সংগ্রহ করেছে। একমাত্র গত বারের রাইট আউট পি খাঁ দল ছেড়ে উয়াড়ীতে যোগ দিয়েছেন। কেরালা থেকে রবীন্দ্রনাথ এসে যোগ দেওয়ায় মোহনবাগান দলের ব্যাক সমস্যার কিছু সমাধান হয়েছে বলা চলে।

রাজস্থান দলকে এবারে সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী দল হিসাবে মনে হয়। মাদ্রাজ, পাঞ্জাব, কেরালা থেকে বেশ কয়েক জন খেলোয়াড় আমদানী করেছে।

প্রধানতঃ এই কয়েকটি দলের মধ্যে চ্যাম্পিয়ান সিপের প্রতিদ্বন্দ্বিতা গত কয়েক বছর ধরে হয়ে আসছে এবং এবারে হবে আশা করা যাচ্ছে।

গত ১ই মে থেকে ক'লকাতা মাঠের ফুটবল লীগের খেলা শুরু হয়ে গেছে।

এশিয়ান গেম্‌সের সমাপ্তিও হয়ে গেছে। এবার ক'লকাতার ফুটবল জমে উঠবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

বালী প্রতিভা, এরিয়ান্স প্রমুখ দলগুলি তরুণ খেলোয়াড় সমন্বয়ে গঠিত। এবারকার লীগের সূচনায় এরা বেশ ভালই খেলছে বলা যায়। আগামী বারে ক'লকাতা মাঠের ফুটবল সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করব।

এশিয়ান গেম্‌স্

জাপানের রাজধানী টোকিওতে তৃতীয় এশিয়ান গেম্‌সের নয় দিন-ব্যাপী অনুষ্ঠান শেষ হয়ে গেছে। তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেবার চেষ্টা করব।

এশিয়ান গেম্‌সের উদ্দেশ্য এশিয়াবাসীদের মধ্যে প্রীতি ও সৌহার্দ্দ বজায় রাখা। বিশ্বের মধ্যে চলেছে ক্ষমতালাভের প্রচেষ্টা। একে অপরকে নাশ করে বড় হতে চাইছে। এই বিভেদের ফলে বিশ্বের নিশ্বাস আজ বিষাক্ত হয়ে উঠেছে। তাই আজকের এই এশিয়ান গেমসের অনুষ্ঠান প্রীতি ও মৈত্রীর বাণী বহন করে এনেছে।

প্রথম এশিয়ান গেম্‌স হয় দিল্লীতে এবং দ্বিতীয় এশিয়ান গেম্‌স অনুষ্ঠিত হয় ম্যানিলায়।

জাপানের রাজধানী টোকিওতে তৃতীয় এশিয়ান গেমসের অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন জাপ সম্রাট।

এবারকার এশিয়ান গেম্‌সে-এ দু'-একটি বিষয় ছাড়া প্রত্যেকটি বিষয়ে নতুন রেকর্ড সৃষ্টি হয়েছে। কুড়িটি দেশের দেড় সহস্রাধিক তরুণ-তরুণী মিলিত হয়েছিল এবারকার অনুষ্ঠানে।

প্রথম ও দ্বিতীয় এশিয়ান গেমসের মত এবারও জাপানের ক্রীড়াবিদরা সবচেয়ে বেশী স্বর্ণপদক রৌপ্যপদক ও ব্রোঞ্জপদক লাভ করেছে। অন্যান্য দেশের তুলনায় জাপানের পদকসংখ্যা এত বেশী যে, অন্য কোন দেশের সংগে তুলনা করা যায় না।

এবারকার ক্রীড়ানুষ্ঠানে ১৫টি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা ছিল। ভারত কেবলমাত্র ফুটবল, হকি, এ্যাথেলেটিক স্পোর্টস; ভলিবল ও ও মুষ্টিযুদ্ধে যোগদান করেছিল।

এবারকার প্রতিযোগিতায় ভারত লাভ করেছে ৫টি স্বর্ণপদক, ৪টি রৌপ্যপদক ও ৩টি ব্রোঞ্জপদক।

এবারের প্রতিযোগিতায় কোন্ দেশ কয়টি করে পদক লাভ করেছে, তা নিয়ে দেওয়া হল :—

	স্বর্ণ	রৌপ্য	ব্রোঞ্জ
জাপান	৬৭	৪১	৩০
ফিলিপাইন	৮	১৯	২১
দক্ষিণ কোরিয়া	৮	৭	১২
ইরাণ	৭	১৪	১১
চীন	৬	১১	১৭
পাকিস্তান	৬	১১	৯
ভারত	৫	৪	৩
ভিয়েৎনাম	২	০	৪
বার্মা	১	২	১
সিঙ্গাপুর	১	১	১
সিংহল	১	০	১
থাইল্যাণ্ড	০	১	৩
হংকং	০	১	১
ইন্দোনেশিয়া	০	০	৩
মালয়	০	০	৩
ইসরাইল	০	০	২
আফগানিস্থান	০	০	০
নেপাল	০	০	০
কম্বোডিয়া	০	০	০
উত্তর বোর্ণিও	০	০	০

উপরে ২০টি যোগদানকারী দেশের পদকের খতিয়ান দেখে সহজে বোঝা যায়, কোন্ দেশের যোগ্যতা কতখানি। এবারে যতখানি সম্ভব আলোচনা করব।

ভারত ফুটবলে এবার চতুর্থ স্থান অধিকার করেছে। ভারতীয় ফুটবলের মান দিন দিন নিম্নমুখী। ঠিকমত অনুশীলন না হলে ভারতীয় ফুটবলের মান যে কোন ক্রমে উন্নীত হবে না, এ বিষয়ে কোন মতানৈক্য নেই। শুধু অনুশীলন নয়, ভারতের খেলাধূলার মধ্যে যে রাজনীতি চলেছে তাতে ভারতের ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

হকিতে বিশ্ববিজয়ী ভারত এবার পাকিস্তানের সংগে ফাইন্যাল খেলায় ড্র করেও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে। হকিতে তার পূর্ব্বকার সুনাম নষ্ট করেছে। হকিতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করায় ভারতের প্রতি ক্রীড়ামোদী ব্যথিত হয়েছেন। এবার হকিতে যাঁরা কর্ম্মকর্তা নির্ব্বাচিত হয়েছিলেন তাঁরা ফ্যাইনাল খেলায় উপস্থিত না থেকে অন্য খেলা পরিচালনা করছিলেন। তবে এ কথা অনস্বীকার্য যে, ভারতের খেলার মান দিন দিন নিম্নমুখী।

ভলিবলে ভারত তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে। এ বারের ভলিবলে প্রথম স্থান পেয়েছে জাপান ও দ্বিতীয় স্থান লাভ করেছে ইরাণ।

পুরুষদের ট্রাক ও ফিল্ড ইভেন্টের কুড়িটি বিষয়ের মধ্যে একটিমাত্র বিষয়ে নতুন এশিয়ান রেকর্ড স্থাপন হয়নি। ১০০ মিটার দৌড়ে ভারতের কোন প্রতিনিধি ছিল না। এবারে ১০০ মিটার দৌড়ে স্বর্ণপদক লাভ করেছেন এশিয়ার ক্ষিপ্রতম দৌড়বীর পাকিস্থানের আব্দুল খালিক—সময় ১০'১ সেঃ।

ভারতের কৃতী দৌড়বীর মিলখা সিং এবারে ২০০ মিটার ও ৪০০ মিটার দৌড়ে স্বর্ণপদক লাভ করেছেন। তবে এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য যে, জাতীয় প্রতিযোগিতায় মিলখা সিং যে রেকর্ড করেছিলেন তা অতিক্রম করতে পারেন নি। মিলখা সিং (ভারত) ২১-৬ সেঃ। ৪০০ মিটার দৌড়ে ভারতের দলজিত সিং দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। কিন্তু দৌড় আরম্ভের সময় তিনি লাইন অতিক্রম করায় প্রতিযোগী হিসাবে বাতিল হন। মিলখা সিং (ভারত) ৪৬'৬ সেঃ।

৮০০ মিটার দৌড়ে জাপানের যোশিটাকা মুরয়া তার আগের রেকর্ডের চেয়ে এবারের রেকর্ড আরও উন্নত করেছেন। শুধু যোশিটাকা মুরয়া নন আরও ৬।৭ জন প্রতিযোগী পূর্ব্বকার রেকর্ড ভঙ্গ করেছেন। যোশিটাকা মুরয়া (জাপান) ১ মিঃ ৫২'৬ সেঃ।

১৫০০ মিটার দৌড়ে পূর্ব্বেকার রেকর্ড অপেক্ষা ১ সেকেণ্ড কম সময়ে ইরাণের খালিস মহম্মদ স্বর্ণপদক লাভ করেছেন। তাঁর সময় ৩ মিঃ ৪৭-৬ সেঃ

৩০০০ মিটার ষ্টিপল চেজ-এ পাকিস্থানের মুবারক শাহ পূর্ব্বকার এশিয়ান রেকর্ড অপেক্ষা ১৩ সেঃ কম সময়ে অতিক্রম করে নূতন এশিয়ান রেকর্ড স্থাপন করেছেন। মুবারক শাহ (পাকিস্থান) ৯ মিঃ ৩ সেঃ

৫০০০ মিটার দৌড়ে জাপানের ওজামু ইনো তার পূর্ব্ব রেকর্ড ভঙ্গ করে নতুন এশিয়ান রেকর্ড স্থাপন করেছেন। ওজামু ইনো (জাপান) ১৪ মিঃ ৩১-৪ সেঃ

১০০০০ মিটার দৌড়ে প্রথম ছয় জন প্রতিযোগী পূর্ব্বকার এশিয়ান রেকর্ড ভঙ্গ করেছেন। জাপানের টাকাশি বাবা স্বর্ণপদক লাভ করেছেন। সময় ৩০ মিঃ ৪৮-৫ সেঃ

১১০ মিটার হার্ডলে এবারে পাকিস্থানের প্রতিযোগী গোলাম রাজিক স্বর্ণপদক লাভ করেছেন। ম্যানিলায় ভারতের সারোয়াম সিং যে রেকর্ড প্রতিষ্ঠা করেন তদপেক্ষা ৩ সেঃ কম সময়ে গোলাম রাজিক ১১০ মিটার হার্ডলে স্বর্ণপদক লাভ করেন। গোলাম রাজিক (পাকিস্থান) ১৪-৪ সেঃ

৪০০ মিটার হার্ডল-এ জাতীয় চীনের সাই চে ফু নতুন এশিয়ান রেকর্ডের প্রতিষ্ঠা করেন। ইতিপূর্ব্বে ম্যানিলায় পাকিস্থানের কৃতী এ্যাথলীট মীর্জা খাঁ ৫৫-১ সেঃ ছিল জাপানের সাই চে ফু : ৫২-৪ সেঃ নতুন এশিয়ান রেকর্ড স্থাপন করেন।

৪—১০০ মিটার দৌড়ে প্রথম ও দ্বিতীয় এশিয়ান গেমসে জাপানের প্রতিযোগীরাই জয়লাভ করেছিল। কিন্তু এবারে ফিলিপাইনের প্রতিযোগীরা জাপানের কাছ থেকে এ সম্মান ছিনিয়ে নিয়েছে। ফিলিপাইন ও জাপানের শেষ প্রতিযোগী একই সময় পৌছান। কিন্তু 'ফটো ফিনিশে' ফিলিপাইন প্রথম স্থান অধিকার করেছে। জাপান দ্বিতীয় ও পাকিস্থান তৃতীয় স্থান লাভ করেছে।

ফিলিপাইন (আর ভিস্বা, আই গোমেজ, পি, সুবিদো ও ই বস্তিস্তা) সময় ৪১-৪ সেকেণ্ড।

৪—৪০০ মিটার রিলে রেসে ভারত দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেও পুরস্কার পায়নি। কারণ ভারতের প্রথম প্রতিযোগী বি, জোসেফ নিজের লাইন অতিক্রম লাঠি পরিবর্ত্তন করেন। সেইজন্য ভারতকে প্রতিযোগী থেকে বাতিল করে দেওয়া হয়। জাপান প্রথম স্থান অধিকার করে। সময় ৩ মিঃ ১৩-৯ সেঃ

এশিয়ান গেমসের পুরো তালিকা এবার দেওয়া সম্ভব হোল না। আগামী বারে দেওয়ার চেষ্টা করব।

এ মাসের প্রচ্ছদপট

এই সংখ্যার প্রচ্ছদে পোষাক-পরিচ্ছদের কাপড়ের নমুনা প্রকাশিত হয়েছে। জার্ম্মাণী দেশের ভিন্ন ভিন্ন পোষাকের বিভিন্ন নক্সা।
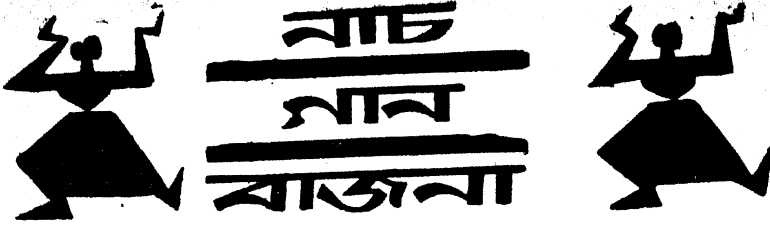
পূর্ব্ববাংলার গাজীর গান

নরেন্দ্র মণ্ডল

পূর্ব্ববাংলার এই সব অঞ্চলের গাজীর গানে গাজী ফকির ও কালু ফকিরের যেরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহাতে গাজীকে ভগবানেরই এক আংশিক অবতার ও কালুকে তাহারই সমশক্তিমান একজন সহকারীরূপে বর্ণনা করা হয়। গাজীর গান আরম্ভ হওয়ার আগে মূল গায়েন যে বন্দনা গায়—

> পেত্থমে বন্দনা করি গাজী পীরের পায়,
> যাহার লা'গে পয়দা হইলাম এই দুনিয়ায়।
> জীবের দুঃখ দেইখা খোদার আর সয়না তর,
> কলির শুরে জন্ম নিল গাজী পীর পয়গম্বর।
> তারপরে বন্দনা করি কালু ফকির ঠাই,
> এক ডালেতে দু'টি পক্ষী যেন যমজ ভাই।—ইত্যাদি।

আবার ফরিদপুর জেলার কোন কোন অঞ্চলের গাজীর গানে গাজীকে কোন এক নবাব বাদশার একমাত্র পুত্র হিসাবে বর্ণনা করা হয়। তরুণ যুবক গাজীর সংসারে বৈরাগ্য দেখা দেয়; এবং ফকিরী গ্রহণ করে সংসার ত্যাগ করে ভগবৎ প্রাপ্তির আশায়। খোদার প্রেমে পাগল গাজী ফকির একা চলেছে পাহাড়-পর্ব্বত, বন-জঙ্গল, নদীনালা অতিক্রম করে। পথের কোন বাধাই তাকে বাধা দিতে পারে না, আর মুখে শুধু এক কথা। 'কোথায় খোদাতালা'।

এখানে ঠিক গৃহত্যাগী গৌতম বুদ্ধ ও নীলাচলগামী গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর জীবনীর সঙ্গে মিল দেখা যায়।

ঘন বনের মধ্য দিয়ে গভীর রাত্রে চলেছে গাজী ফকির। বাঘ ভল্লুক হিংস্র পশুর দল শিকারের আশায় ওৎ পেতে আছে এখানে সেখানে। কোন দিকে খেয়াল নেই গাজীর। মুখে অবিরাম রসুল খোদাতালার নাম জপছে। এমন সময় এক বিরাটকায় বাঘ এসে হাঁ মেলে দাঁড়াল গাজীর সম্মুখে। প্রেমোন্মাদ গাজী ভাবল, এই বুঝি তার খোদা এসেছে। খোদা, খোদা, বলে সেই বাঘটাকেই জড়িয়ে ধরতে যায় গাজী। এখানেও এই কাহিনীটি পুরাণের ধ্রুব চরিত্রের কথা মনে করিয়ে দেয়। গাজী বাঘটিকে আলিঙ্গন করতেই দেখে, বাঘটি একটি কৃষ্ণকায় মনুষ্য মূর্ত্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে। এই লোকটিকেই কালু ফকির বলে বর্ণনা করা হয় গাজীর গানে। এবং এই কালু ফকিরই ভগবানের অংশস্বরূপ। গাজীর সাধনার পথে সহায়করূপে তার সঙ্গ নিল কালু। কোথাও বা কালু ফকিরকে ব্যাঘ্রদেবতা বলা হয়, কারণ বোধ হয় ব্যাঘ্ররূপেই তার প্রথম আবির্ভাব বলে।

গাজী সাধনায় সিদ্ধিলাভ করল। তখন দেশে দেশে খোদাতালার মহিমা প্রচার করে বেড়ানই তার ব্রত হল। দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা মেগে খায় গাজী আর কালু ফকির খোদার নাম-মহিমা শুনায়।

গাজী কালুর রূপ বর্ণনা পাওয়া যায় গাজীর গানে—

এক গৃহের সম্মুখে ভিক্ষার্থে উপস্থিত হয়েছে গাজী-কালু। গৃহের পরিচারিকা প্রথমে তাদের দেখতে পেয়ে গৃহকর্ত্রীকে গিয়ে সংবাদ দিচ্ছে—

মূল গায়েন কথক ঠাকুরের মত প্রথমে কথায় বলে, তারপর ধূয়ার আথর দিয়ে সুরে বলে—

দাসী বলছে—মা গো মা, তোমার দেউড়ীতে দুই ফকির এইসছে।

বিবি বলে—সে কেমন ফকির রে দাসী?

দাসী—বলে—মা গো, সে যে কিরূপ, আর কি কইলব।

দোহাররা ধূয়া ধরে—ওরে আমার গাজীচাঁদ, এবার তরাইও তুমি ভবনদীর পার।

মূল গায়েন আথর দেয়—

> একটি ফকির গৌরী বয়ন আর একটি ফকির কালো,
> দুই ফকিরের রূপে মা গো তোমার দেউড়ী করছে আলো।
> আসমানের চাঁদ সুরয যেন ভুঁয়েতে বসতি,—
> তোমার দেউড়ীতে মা জ্বাইলা দিছে হাজার চেরাক বাতি।

(প্রতি অক্ষরের শেষে ধূয়া ধরে দোহাররা)

তখন দাসীর মুখে খবর পেয়ে বিবি ছুটে এসে গাজী-কালুকে দেখতে পেয়ে বলে—

> কে আইল চাঁদ নবীন ফকীর, ঘর বা সে কোন স্থানে।
> কোন মায়ের কোল করছে খালি, এই কাঁচা বয়সে।

গাজী-গানের মধ্যে গাজীর চরিত্রে পাওয়া যায়—দয়া, মায়া, ত্যাগ ক্ষমা ইত্যাদি যাবতীয় মহৎগুণ বিশিষ্ট এক আদর্শ মানুষকে—

ধূয়া :—ও গাজী মালেক রে, তুমি এবার করুণা কর—

আথর :—গাজী গাজী বল রে ভাই, গাজীর নাম করগে সার।

> অনায়াসে তইরে যাবা ভবনদীর পার।
> গাজীর নামে হাজত কর, ধর দয়াল গাজীর পায়ে।
> গোহত্যা, ব্রহ্মহত্যার পাপ খণ্ডে যায়।

আবার দুষ্টের দমনেও গাজীর চরিত্রে দৃঢ়তা দেখা যায় :—

> সোনার গাজীর নামে রে ভাই যে করিবে হেলা।
> তার গলায় হবে গলগণ্ড, চোখদে' বাইরাবে দুই ঢ্যালা।

কালু ফকিরের চরিত্রে বিভিন্ন ভাবের সমাবেশ দেখা যায় কালু কখনও এক ভীষণ গোঁয়ার গোবিন্দ, কখনও সে একটি ভাঁড় কথায় কথায় ব্যঙ্গ রসিকতায় সবাইকে হাসিয়ে মারছে। আবা কখনও বৃদ্ধ, কখনও যুবা। ভিন্ন ভিন্ন পালায় কালু ফকিরে

ভিন্ন ভিন্ন সাজ পোষাকে অভিনয় করতে দেখা যায়। তবে এই সব ভাঁড়ামি বা গোয়ার্তুমীর আড়ালেও কালু ফকিরের মধ্যে যে একটি কোমল প্রাণ ঘুমিয়ে আছে, তা তার সব কাজের মধ্যেই প্রমাণিত হয়।

পূর্ববাংলার গ্রাম্য শ্রমজীবীদের মধ্যে গাজীর গান যে এত প্রিয়, তার অন্যতম কারণ বোধ হয় কালু ফকিরের বৈচিত্র্যময় চরিত্রের মধ্যে তাদের অনাবিল আনন্দ লাভ। সাধারণতঃ কালুকে ভাঁড়ের অভিনয়ই করতে হয়, তাই গাজীর গানের দলে বায়না দেওয়ার আগে তাদের কালু ফকির অভিনেতাটি কেমন, তা প্রথমেই যাচাই করে নেয় হাস্যকৌতুকপ্রিয় গ্রাম্য চাষীরা। কালু ফকিরের অভিনয় যে করে তাকে এতদঞ্চলের চলতি ভাষায় 'কাছাইয়া' বলা হয়। কথাটির সাধু ভাষা বোধ হয় হাস্যরসিক।

কালু ফকিরও অন্যায়ের প্রতিকারে, আর্ত্তের উদ্ধারে গাজী ফকিরেরই তুল্য। তবে তার ক্রিয়াটি এমন অদ্ভুত ভাবে সে সম্পন্ন করে, যাহাতে শ্রোতৃগণকে যুগপৎ আনন্দ ও শিক্ষা দুটোই দেওয়া হয়। যেমন :—

রহীম বাদশার পালায় গুলবিবি তার প্রৌঢ় স্বামী কাশেমালীর ঘর করে শান্তি পায় না মনে। তরুণ যুবক কালুকে দেখে মজল। কালুকে সাদী করবার জন্য জিদ ধরল গুলবিবি। তখন কালু তাকে উপযুক্ত শিক্ষা দেবার জন্য সাদী করতে রাজী হল। কিন্তু বিয়ের রাত্রে বাসর ঘরে গুলবিবি দেখে, সেই যুবক এক অশীতিপর বৃদ্ধে রূপান্তরিত হয়েছে।

গুলবিবি তখন কেঁদে কেঁদে বলছে :—

কি তথলাম কি হইল রে দিদি, আমার খাট কপালের দোষে,
কাইল তথলাম কাঁচা পোলা, আইজ বুড়া হইল কিসে!

তখন বৃদ্ধরূপী কালু উঠে বলে :—

তোর বুড়া ভাতার কাশেমালীর বোকৃষা দাঁতের বিষে।

কালু আরও বলে :—

কাচ্চাসোনা সুন্দার মাইয়া কাইল হইল তোর বিয়া,
আইজ আবার তুই নিকায় বসলি, ভাতার বিদায় দিয়া।

শ্রোতাদের সম্বোধন করে কালু তখন কথায় বলে :—

ক'নত কর্ত্তারা, এ মাগী কি মাইয়া মানুষ না মাছ কেউটার জাত?

শ্রোতারা কুলত্যাগিনী গুলবিবির এই শাস্তিতে আনন্দে হাততালি দিতে থাকে।

কালু তখন ক্রন্দনরতা গুলবিবিকে বলে :—

বুড়া ভাতার দেইখা ঘর ছাড়লি তুই ওরে কাঁচা ছেরি?
দুদিন বাদে তুইও হবি থুনথুনে এক বুড়ি।

উপস্থিত শ্রোতারা তখন—ক্ষণস্থায়ী যৌবনের মোহে অনিবার্য্য জরা-মৃত্যুকে ভুলে যাওয়া দেহকামীদের প্রতি এই সুস্পষ্ট উক্তিতে, কালু ফকিরের প্রতি শ্রদ্ধায় ভক্তিতে গদগদ হয়ে ওঠে।

যদিও গাজীর গানের মুখ্য নায়ক গাজী ফকির, তবুও শ্রোতাদের মধ্যে কালু ফকিরের প্রভাবই যেন স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

তবে গাজীই আসল কর্ত্তব্যকর্ত্তা। তার নামেই দোহাই পাড়ে সবাই। এমন কি কালু ফকির নিজেও। কারণ, গাজী ফকিরের নাম প্রচার করতেই ত সে অবতীর্ণ হয়েছে। যেমন :—এক ব্যক্তি গাজীর দরগায় সিন্নী দিতে অবহেলা করায় কালু তাকে অন্ধ করে দিল, তখন সে কালু ফকিরের কাছে গিয়ে কেঁদে পড়ল। কালু তার স্বভাবসুলভ ভাষায় তাকে বলছে :—

আমার কাছে ভ্যাদর ভ্যাদর করতিছিস ক্যান ঘ্যাটা,
আমি করব কি উপায়।
গাজীর নামের দোহাই দিয়ে ধরগে দয়াল গাজীর পায়।

এখানেও সেই গৌরাঙ্গদেবের নবদ্বীপ-লীলার কথা মনে পড়ে। নিতাইর মাথায় কলসীর কানা মেরে অনুতপ্ত জগাই মাধাই যখন নিতাইর পায়ে ধরে কাঁদছে, তখন নিতাই বললেন—

—'ধর নিমাইচাঁদের পায়ে।'—

গাজীর গানের এক একটি দলে সাধারণতঃ সাত-আট জন লোক থাকে। তার মধ্যে মূল গায়েন একজন। মূল গায়েন কথক ঠাকুরের মত কথায় গানে ধুয়ার আখর দিয়ে গান গায়। আর তার সঙ্গে ধুয়া ধরে তিন-চার জন দোহার। এই মূল গায়েনকে কখনও হতে হয় কথক, কখনও গাজী ফকির, আবার কোন কোন দলে দেখা যায় গায়েন নিজেই পরচুল ও শাড়ী পরে গানের ফাঁকে ফাঁকে নাচ দেখিয়ে শ্রোতাদের মনে বৈচিত্র্য এনে দেয়। কিন্তু অধিকাংশ দলেই নাচের জন্য অল্পবয়স্ক তিন-চারটি ছেলে থাকে। আর থাকে ঢোল অথবা খোল-করতাল ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র। আবার মূল গায়েনকে কোথাও কোথাও বয়াতি বলে থাকে। রাসযাত্রা কৃষ্ণযাত্রার মত ভিন্ন ভিন্ন পালা বা উপকথার মাধ্যমে গাজী ফকিরের মহত্ত্ব কীর্ত্তন করা হয় গাজীর গানে। যথা—রহীম বাদশার পালা মদন মালের পালা ইত্যাদি। প্রতিটি পালার

মধ্যেই গাজী ও কালু ফকিরের অলৌকিক ক্ষমতা, তাদের মহত্ত্ব ও খোদাতাল্লার নাম প্রচার করা হয়। তাছাড়া সমাজ-জীবনের কতকগুলি অতিপরিচিত আপনজনদেরও দেখতে পাওয়া যায় এই সব পালার বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে। যেমন :—

আব্দাল বাদশার পালায়,—আব্দাল বাদশা বনের মধ্যে বাঘের হাতে প্রাণ দিলে তার মা সাকিনা বিবি পুত্রশোকে বিলাপ করছে।

ধুয়া :—ও আমার কপালে বিধি এই কি ছিল।

আথর :—কোথায় গেলি আব্দাল আমার, ছেড়ে তোর দুখিনী মা।
ফিরে এইসে মা বলে ডাক, মোর তাপিত প্রাণ জুড়া।
মৎস্যে চেনে গহীন গাঙ্গা পঙ্খে চেনে ডাল।
মায়ে জানে পুতের ব্যথা, যেন বুকের শাল।
কোথায় যাব কি করিব আমি ভেবে নারে পাই।
মায়ের বুকে পুতের শোক জুড়াবার জাগা নাই।

এখানে অতিপরিচিত এক পুত্রহারা শোকাতুরা মায়ের কথা শুনে উপস্থিত শ্রোতাদের চোখ সজল হয়ে ওঠে। তাদের প্রত্যেকের জীবনে অন্তত কয়েকটি এমন মাকে তারা দেখেছে যে—

আবার রকীম বাদশার পালায় দেখি,—তরুণী স্ত্রী চুনাই বিবিকে রেখে তরুণ যুবক রকীম বাদশা গৃহত্যাগ করে ফকির হয়ে গেল পীর গাজীর সন্ধানে। আর স্বামিবিরহিণী অর্দ্ধোন্মত্তা চুনাই স্বামীর সন্ধানে একাকিনী দুর্গম পথে চলেছে।

একবার বরিশাল ও খুলনার দক্ষিণ সীমান্তাঞ্চলে একটি গাজীর গানের আসরে আমি যে ভাষায় মূল গায়েনকে চুনাই বিবির বিলাপোক্তি করতে শুনেছিলাম, এখানে হুবহু সেইটিই তুলে ধরছি—

গলায় বেশ আবেগ মিশিয়ে মূল গায়েন কথায় বলছে :—

—'নিদারুণ জঙ্গল। পাগলিনী চুনাইবিবি চলছে রকীম বাদশার তালাশে। যারে দ্যাখে তারেই জিগায়, তোমরা কি কেউ রকীম বাদশারে এই পথে যাইতে দ্যখছ?' কেউ কইতে পারে না রকীমের কথা।

তখন যাইতে যাইতে দ্যখে সেই নিদারুণ জঙ্গলের মধ্যে এট্টা বট বেরেক্কের গাছ। সেই না বট বেরেক্কের গাছে ছেল একখানা ঠাল। আর সেই না ঠালে বইসা ছেল এট্টা পাক্কী। সেই পাক্কীরে দেইখ্যা চুনাই বিবি কয়—'ওরে পাক্কী পাক্কীরে, এই না পথে রকীম বাদশা চইলা গ্যাছে, তুই ট্যারড়া পাইলি না?'

গ্রাম্য অসংস্কৃত ভাষায় হলেও মাঝে মাঝে এই গাজীর গানে সূক্ষ্ম কাব্যকলা ও মনস্তত্ত্বের কিছু কিছু আভাস মেলে। এখানেও দেখতে পাই সেই চির পুরাতন ছবির ছায়া। যেমন—রাবণ সীতাকে হরণ করে নিয়ে যাবার পর পঞ্চবটীর প্রতিটি লতাপাতার কাছে রামের ব্যর্থ জিজ্ঞাসা। অথবা ব্রজ ছেড়ে শ্যাম যখন মথুরায় চলে গেলেন, তখন শ্যামবিরহিণী শ্রীরাধিকার বিরহোচ্ছ্বাস—'বল রে মাধবী লতা, আমার শ্যাম বন্ধু গেল কোথা?' প্রিয়বিরহে প্রিয়ের সেই চিরন্তন আকুলোচ্ছ্বাস। চুনাই বিবি কেঁদে কেঁদে বলছে :—

(আথর) শোন শোন ও প্রাণনাথ বলি যে তোমারে।
কি দোষে ছাড়িলে তোমার চুনাই দাসীরে।
তোমরা যে সব পুরুষ জাতি, কঠিন তোমার মন।
বল, কি কইয়া বুঝাইয়া রাখি, আমার আগুইনা যৈবন।

শেষের আথরটি সেই—"এ ভরুর ভার সহিতে না পারি"—কথারই প্রতিধ্বনি নয় কি?

প্রতিটি পালার শেষেই গাজী-কালুর অলৌকিক ক্ষমতার পরিচ দেওয়া হয়, পূর্ব্বেই বলেছি। যেমন অন্ধ দৃষ্টি পেল, নির্ধন ধ পেল। কোন ধনী তার পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ ভিখারী হল কি ভাবে ভক্তের মনোবাঞ্ছাপূর্ণকারী গাজী-কালু দুষ্টের দমন আ শিষ্টের পালন করে চলেছে তারই বিবরণ।

যদিও এই লোকগীতিটির মধ্যে পৌরাণিক কাহিনীর ছা যথেষ্ট, তবুও পূর্ববাংলার গ্রাম্য শ্রমজীবীদের মনে এর একটি স্বতন্ত্র আবেদন আছে। আর যদিও এই গাজীর গান এক মুসলমান ফকিরকে কেন্দ্র করে, এবং এর অধিকাংশ পালাগান রচিত হয়েছে মুসলমান-সমাজকে কেন্দ্র করে, তবুও পূর্ব্ব-বাংলা হিন্দু ও মুসলমান গ্রাম্য চাষী ও অন্যান্য শ্রমজীবীরা জাতি-ধর্ম নির্ব্বিশেষে বহুকাল থেকে এই গাজীগানের মুগ্ধ শ্রোতা, এবং তাদে মনেও অসামান্য প্রভাব বিস্তার করে আছে এই গাজী পীর বিশেষতঃ চাষী সম্প্রদায়, গরু মহিষ ইত্যাদির উপর যাদের পেশ নির্ভর করে, আর নিকারী সম্প্রদায়, অর্থাৎ এক শ্রেণীর মৎস্যজীবী জলের উপর নৌকায়ই যাদের ঘর গৃহস্থালী, এই দুই সম্প্রদায়ে নিকট গাজী ফকির ভগবানের তুল্য পূজ্য। চাষীরা মনে করে গ মহিষ ইত্যাদির একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা গাজী পীর। কোন গরু মহিষে অসুখ হলে অথবা হারিয়ে গেলে তারা গাজীর দরগায় সিন্নী মান করে অথবা এক পালা গাজীর গান মানত করে। গাজীর গা এ বিষয়ে একটি আথর আছে—

'গাজীর নামে হাজত দেব গরু যদি বাঁচে—'

জল আর নৌকার দেবতা যে গাজী পীর, তার প্রমাণ অনে ভাটিয়ালী গানেও পাওয়া যায়। যেমন—

মাঝি রে—গাজী বদর বলে দাড় ক্যালাইও হেঁইও
আসে আসুক দেওয়া তুফান গাজী পীরের
দোহাই দিও মাঝিরে—ইত্যাদি

এ গানে সহজেই অনুমান করা যায় যে, মাঝি-মাল্লারাও গাজী পরম ভক্ত।

পূর্ব্ব-বাংলায় আর এক শ্রেণীর ভিখারী ফকির আছে, যাদের ব হয় গাজীর ফকির। গায়ে কালো রং-এর আলখাল্লা, গলায় তসবী হাতে একটি গাজীর আশা। একখানি লাঠির মাথায় গোলাকা একখানি পিতলের চাকতিতে দুটি চোখ, একটি মুখ আঁকা থা মাত্র। ইহাকেই গাজীর আশা বলে এ দেশে। সাধারণত অগ্রহায়ণ বা পৌষ মাসে, প্রত্যেক চাষীর বাড়ীতে যখন ধা মাড়াইয়ের মরশুম চলে, তখনই চাষীদের বাড়ী বাড়ী এ গাজীর ছড়া গান গেয়ে ভিক্ষা করে বেড়ায়। এরা অনেক পশ্চিমবঙ্গের মুস্কিল আসান গানের ফকিরদের মত। এদে ছড়াগানগুলো প্রায়ই চাষী-বৌদের উদ্দেশ্যে গাওয়া হয়। কো এক চাষী-বৌ গাজীর ফকিরকে ভিক্ষা না দেওয়ায় কির শাস্তি পেয়েছিল, এসেই তারা সেই ছড়াটি আগে বলবে। ছড়াটিএই-

হারে দোম্ দোম্ বলিয়া গাজী ছাড়িল জীগির।
নন্দ ঘোষের মায় বলে এই আইল ফকির।
নন্দ ঘোষের মায় বলে কালু ঘোষের ঝি।
বাড়ী আইল গাজীর ফকির ভিক্ষা দেব কি।
ভিক্ষা করতে আইছি আমি ভিক্ষা লইয়া ফিরি।
বাটায় করিয়া আন চাউল পয়সা কড়ি।

দধি দুগ্ধ থাকে যদি গাজীর থানে দেব।
সিন্নী দিয়া গাজীর নামে দোয়া কইরা যাব।
তখন, সুবুদ্ধি গোয়াইলার মাইয়ার কুবুদ্ধি জাগিল।
ছিয়ার উপর দৈ থুইয়া মিথ্যা কথা কইল।
ফকির বলে মিথ্যা কথা কইলি গাজীর থানে।
ইহার সাজা দিব আমি গোয়াইলার বাতানে।
ঘরে মইল গোয়ালিনী, আস্তালে মইল গাই।
হাইলা গরু মইল কত ল্যাকা জোকা নাই।
গোয়াইলা তখন কাইন্দা কাইটা গেল গাজীর কাছে।
গাজীর নামে হাজত দেব গরু যদি বাঁচে।
তখন, দোম দোম্ বলিয়া গাজী, পিঠে দিল বাড়ি।
সাত দিনের মরা গরু হাইটা ওঠল বাড়ী।

এ ছড়া শোনার পর কোন্ গৃহস্থ বৌ ভিক্ষা না দেবার সাহস রে?

চাষী-বৌ চুপড়ীতে ধান, বাটায় চাল সুপারী নিয়ে গাজীর াশার কাছে রাখে। আর জামবাটীতে ভরে দেয় কালো গাইর দুধ। দই দুধে গাজীর আশাকে স্নান করায় ফকির। ছোট ছোট ছেলে-য়েরা ঘিরে ধরে ফকিরকে আরও ছড়া শোনার জন্যে। ফকির ড়া গায়—পূর্ব্ব-বাংলার একান্নবর্ত্তী চাষী পরিবারগুলির মধ্যে গড়াটে বৌ'রা কি ভাবে ভাঙন লাগায় সংসারে তারই কথা—

শাশুড়ী উঠিয়া বলে মাইজা বৌলো মা,
গগনেতে অধিক বেলা দুয়ার খোলবা না।
এমনতর ঘরের বৌরা শুইয়া থাকে নাকি।
দুই চার দণ্ড বেলা হইল উঠান সুরতে বাকী।
মাইজা বৌ উইঠা বলে আমি সবার দাসী।
এত মানুষ থাকতে আমি উঠান ঘুরতে আসি।
শাশুড়ী কয় এ সংসারে লাগছে মরণ দশা।
মনে মনে তোমার বুঝি ভেন্ন হবার আশা।
ভেন্ন হবার আশায় থাকে ভেন্ন হইয়া যাও।
মোরে ছাইড়া তোমরা সবে দুধে ভাতে খাও।
খাইটা খুইটা মাইজা কর্ত্তা বাড়ী যখন আসে।
ঘরের মধ্যে মাইজা বৌ গাল ফুলাইয়া বসে।—ইত্যাদি।

আবার হিন্দু চাষীদের বাড়ীতে লক্ষ্মীর পাঁচালী নামক একটি ছড়াও নায় গাজীর ফকিররা। এই ছড়াটিতে গৃহস্থ বধূদের স্বভাবের বিশেষ বশেষ লক্ষণ ও দৈনন্দিন অভ্যাসগুলি তাদের ভবিষ্যৎ সংসার-জীবনে করূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবে অথবা ফলদায়ক হবে তারই কথা :—

দমদমাইয়া হাটে নারী চউখ পাকাইয়া চায়।
সেই নারী অভাগিনী আগে পতি খায়।
রাইন্ধা বাইড়া যেবা নারী পুত্রের আগে খায়।
তার ভরনা কলসীর জল তরাসে শুকায়।
আউলাইয়া মাথার ক্যাশ খোরে পাড়া পাড়া।
নিশ্চয় জানিবা তোমরা সুওত লক্ষ্মীছাড়া।
নাইয়া ধুইয়া যেবা নারী উল্টা বাঁধে ক্যাশ।
তার ঘাড়ে লাথি মাইরা লক্ষ্মী ছাড়ে দ্যাশ।
আর, নাইয়া ধুইয়া যেবা নারী মুখে দেয় পান।
লক্ষ্মী বলে সেই নারী লক্ষ্মীর সমান।

সতী নারীর পতি যেন পর্ব্বতেরি চূড়া।
অসতীর পতি যেন ভাঙ্গা নৌকার গুরা।
সকালবেলা গোবর ছড়া সন্ধ্যাবেলা বাতি।
লক্ষ্মী বলে সেই ঘরে আমার বসতি।—ইত্যাদি।

এখানে একটি কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য যে,—বাৎস্যায়নের 'কামসূত্র' বা মহাকবি ক্ষেমেন্দ্রের 'কলাবিলাস' থেকে সুরু করে আধুনিক কালের বহু নারী-মনস্তাত্ত্বিকগণ নারীচরিত্রের যে বিশেষ বিশেষ বহির্লক্ষণগুলির দ্বারা তাদের আন্ত-চরিত্রের বৈচিত্র্য প্রমাণিত করেছেন বহু গ্রন্থে, পল্লীগ্রামের অশিক্ষিত গাজীর ফকিরের মুখে শোনা উপরোক্ত ছড়াটিতে যে তার কয়েকটির সঙ্গে অদ্ভুত মিল আছে, একথা অস্বীকার করবার উপায় নাই।

বলা বাহুল্য, গাজীর ফকিরদের এই ছড়াগুলি পল্লীগ্রামের অশিক্ষিত চাষী-বৌদের সরল মনে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

রেকর্ড-পরিচয়

"হিজ মাষ্টার্স ভয়েস" ও "কলম্বিয়া" রেকর্ডে প্রকাশিত নতুন গানের সংক্ষিপ্ত পরিচয় :

হিজ মাষ্টার্স ভয়েস

N 82782—তালাত মামুদের সুরেলা কণ্ঠের দু'খানি আধুনিক গান—"এই রিম ঝিম ঝিম বরষা" ও "তোমারে পারিনি যে ভুলিতে।"

N 76065—মান্না দে'র গাওয়া "ডাকহরকরা" বাণীচিত্রের দু'খানি গান—"লাল পাগড়ী মাথে" ও "ওগো তোমার শেষ বিচারের আশায়।"

N 76066—গীতশ্রী কুমারী ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়ের গাওয়া "যোগাযোগ" বাণীচিত্রের দু'খানি গান—"পিয়া যব আওয়ব" ও "তুম্ সঙ্গ কাহে প্রীত।"

N 76067—"ডাকহরকরা" বাণীচিত্রের দু'খানি গান—"মন রে আমার হায়" ও "কাঁচের চুড়ির ছটা"—প্রথমটি মান্না দে ও দ্বিতীয়টি গেয়েছেন শ্রীমতী গীতা দত্ত।

কলম্বিয়া

GE 24891—আধুনিক দু'খানি গান "জীবন-নদীর দুই তীরে" ও "আমি কেন যে বিদায় ওগো নিয়েছি"—গেয়েছেন পান্নালাল ভট্টাচার্য।

GE 24892—কুমারী কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায়ের কণ্ঠে দু'খানি অতুলপ্রসাদী গান—"শ্রাবণ ঝুলাতে বাদল রাতে" ও "মেঘেরা দল বেঁধে যায়।"

GE 30375—গীতশ্রী কুমারী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া "নূপুর" বাণীচিত্রের দু'খানি গান—"আমি হার মেনেছি" ও "যত দূর যে মরণে আমি।"

GE 30376—"নূপুর" বাণীচিত্রের অন্য দু'খানি গান—"আলো-ছায়া ঘরা" ও "চুপি চুপি শোন"—গেয়েছেন যথাক্রমে গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ও শ্রীমতী প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়।

GE 30395 to GE 30398 রেকর্ডগুলিতে "বৃন্দাবন লীলা" বাণীচিত্রের গানগুলি ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, কুমারী আরতি মুখোপাধ্যায়, চিন্ময় লাহিড়ী, প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমতী মীরা বন্দ্যোপাধ্যায়, কুমারী ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়, পান্নালাল ভট্টাচার্য, এ, টি, কানন ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি মূল শিল্পীদের কণ্ঠে পরিবেশিত হয়েছে।

আমার কথা (৪১)

শ্রীমতী মীরা বন্দ্যোপাধ্যায়

মাতার ঐকান্তিক আগ্রহ ও পিতার সুনিপুণ শিক্ষাদান দশম বর্ষীয়া এক কন্যাকে মাত্র দ্বাদশ মাসের মধ্যে ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে স্থায়ী আসনে সুপ্রতিষ্ঠিতা করে ইহা একটি বিশেষ ঘটনা। কন্যার নাম হল সর্বজনপরিচিতা শ্রীমতী মীরা চট্টোপাধ্যায় (বর্ত্তমানে বন্দ্যোপাধ্যায়) এবং পিতা হলেন বিশিষ্ট সঙ্গীতবেত্তা শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়।

কয়েক দিন পূর্ব্বে এক সন্ধ্যায় শিল্পীর গৃহে যখন উপস্থিত হই, তখন মীরা দেবী দুইটি ছাত্রীকে শিক্ষাদানে ব্যস্ত ছিলেন। পিতার সাদর অভ্যর্থনা ও কিয়ৎক্ষণের মধ্যে সঙ্গীতজ্ঞার সহিত পরিচয়ের মাধ্যমে সংগ্রহ করলুম :

১৯৩২ সালের ২৮শে মার্চ্চ মীরাটে জন্মগ্রহণ করি। জ্যাঠামশায় প্রখ্যাত চিত্রাঙ্কনশিল্পী ও লেখক শ্রীপ্রমোদকুমার চ্যাটার্জ্জি। পিতা শ্রীরাইচাঁদ বড়ালের গৃহাগত পাঞ্জাবের পণ্ডিত হরিশচন্দ্র ঠালীর নিকট প্রথম, পরে ওস্তাদ বাদল খাঁ সাহেব ও শ্রীভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় এবং শেষে মহম্মদ দবীর খাঁ সাহেবের সঙ্গীত-শিষ্য হই। প্রেসিডেন্সী বালিকা বিদ্যালয় (বর্ত্তমানে কমলা চাটার্জ্জি বিদ্যালয়) আমি লেখাপড়া শিখি। বরাবর বাবা কয়েক জন ছাত্রছাত্রীকে গান শেখাতেন—আমি শ্রোতা হিসাবে উপস্থিত থাকতাম। ১৯৪১ সালের ডিসেম্বরে যখন দলে দলে লোক কলিকাতা ছেড়ে যায়, তখন বাবার সব কয়টি শিক্ষার্থীও অনুপস্থিত হতে থাকেন। সঙ্গীত-পাগল বাবা মুষড়ে পড়লেন খুবই। তখন আমার মা বললেন যে নিজের ছেলেমেয়েদের গান শেখান হোক। বড় মেয়ে আমি—তাই বাবা আমায় মনোনীত করে প্রাণঢালা দরদ দিয়ে তালিম দিতে সুরু করলেন। কেন জানি না—আমারও আগ্রহ বেড়ে গেল। এক বৎসর পরে (১৯৪২) 'অল বেঙ্গল মিউজিক কনফারেন্সে' যোগদান করি। বলতে লজ্জা হয়—কিন্তু ভূয়সী প্রশংসা পাই—শুধু দর্শকদের কাছ থেকে নয়—সেই স্থানে উপস্থিত ভারতবিখ্যাত শিল্পীদের নিকটও। হতভম্ব হলাম যখন তাঁরা আসন ছেড়ে এসে আমায় অভিনন্দন জানালেন।

শ্রীমতী মীরা বন্দ্যোপাধ্যায়

এর পর যতগুলি সঙ্গীত-সম্মেলন হল, সবগুলি থেকে এল আহ্বান—যোগদান করি প্রত্যেকটিতে — আর যেন 'প্রখ্যাতা' হয়ে উঠলুম রাতারাতি। ১৯৪৩ সালে কলিকাতা বেতার কেন্দ্রের আহ্বানে প্রথম আকাশবাণীতে গান করি। ১৯৪৪ সালে সঙ্গীত সম্মিলনী দিলেন 'গীতশ্রী' উপাধি। ১৯৪৫ সালে গাওয়েনীয়ার কোম্পানীর তত্বাবধানে দুইটি আধুনিক সঙ্গীত আমার কণ্ঠে রেকর্ড করা হয়। সেই বৎসর নভেম্বর মাসে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় সঙ্গীতাসরে যোগদান করি। ইতিমধ্যে ভারতের বিভিন্ন বেতারকেন্দ্রে প্রায় প্রতিটি প্রদেশের সঙ্গীতানুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করি।

১৯৪৮ সালের মার্চ্চে মাউন্টব্যাটেন-দম্পতিকে কলিকাতার শেরিফ এক সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। ক্যালকাটা ক্লাবের বিস্তৃত লনে অনুষ্ঠিত সভায় আমি মহাত্মা গান্ধী রচিত 'উঠো, জাগো মুসাফীর' হিন্দী ভজনটি গাই। প্রধান অতিথিদ্বয় আমায় অভিনন্দন জানিয়ে মন্তব্য করলেন যে, স্বয়ং গান্ধীজি লিখিত গানটি শুনে তাঁরা সাতিশয় সন্তুষ্ট হয়েছেন।

১৯৫০ সালের ডিসেম্বরে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত সঙ্গীতাসরে আমার গান শুনে ভারত ও পাকিস্তানখ্যাত অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী গোলাম আলী খাঁ সাহেব সেই রাত্রে ঘোষণা করেন যে, আমি তাঁর শিষ্যা হলুম এবং পরে যখনই তিনি কলিকাতায় আসেন, তখনই আমায় তিনি সঙ্গীত-শিক্ষা দেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে বাবার কাছে শিক্ষানবিশী করি।

১৯৫৩ সালে দিল্লী বেতার-কেন্দ্রের জাতীয় অনুষ্ঠানে প্রথম অংশ গ্রহণে চারি বার গান করি।

১৯৫৪ সালে ভারত সরকারের Cultural Delegation-এ অন্যতমা সদস্যা হিসাবে মনোনীত হই। উহার নেত্রী ছিলেন ডাঃ শ্রীমতী চন্দ্রশেখরম্—আর সদস্যদের মধ্যে রবীন্দ্রশঙ্কর, তারা চৌধুরী, জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ ও পণ্ডিত ভি. এন. পটবর্দ্ধনের নাম উল্লেখযোগ্য। আড়াই মাসব্যাপী রাশিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া ও পোল্যাণ্ড পরিভ্রমণ করি। সর্ব্বত্রই উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে অংশ গ্রহণ করি। পৃথিবীখ্যাত Bolshoi Stage-এ অগণিত শ্রোতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে ভারতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করি। অজস্র সম্বর্দ্ধনা ও অভ্যর্থনা পেয়েছি আমরা সর্ব্বত্র। বহু উপহার পেয়েছি—সযত্নে রেখেছি সেগুলো—বিদেশী বন্ধু-বান্ধবদের আন্তরিক প্রীতির নিদর্শন হিসাবে।

১৯৫৬ সালে প্রয়াগ সঙ্গীত সমিতি কর্ত্তৃক আয়োজিত 'সঙ্গীত-প্রভাকর' পরীক্ষায় নিখিল ভারতে আমি প্রথম স্থান অধিকার করায় স্বর্ণপদক লাভ করি।

১৯৫৭ সালে মীরা দেবী পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়েছেন আর একজন উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীত সাধক পাটনা নিবাসী শ্রীপ্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। উক্ত বৎসরে দিল্লী বেতার-কেন্দ্র পরিচালিত সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেন মীরা দেবীর ছাত্রী কুমারী লক্ষ্মী বসু।

বাঙ্গালী উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীতশিল্পীদের শ্রদ্ধা জানিয়ে তিনি বললেন যে, মধ্যে বাবা শিখেছেন ভীষ্মদেব বাবুর কাছে আর আমি স্নেহের পাত্রী হিসাবে মধ্যে মধ্যে তাল, লয় ও মাত্রার নির্দ্দেশ পেয়ে থাকি সঙ্গীতাচার্য্য তারাপদ চক্রবর্ত্তী ও সঙ্গীতজ্ঞ চিন্ময় লাহিড়ীর নিকট।

শ্রীমতী মীরা বন্দ্যোপাধ্যায় পেয়েছেন মায়ের কাছে প্রেরণা, পিতার কাছে শিক্ষা, আলাউদ্দীন খাঁ ও গোলাম আলী সাহেবের স্নেহ, সঙ্গীত-রসগ্রাহীদের অভ্যর্থনা এবং ভারতখ্যাত শিল্পীদের সহিত একই আসরে সঙ্গীত পরিবেশনা করেছেন।

বিদায়ের আগে শিল্পী দেখালেন, স্বদেশের ও বিদেশের স্মৃতিসমূহ —যা তাঁর এ্যালবামের মধ্যে ধরা পড়েছে চিত্র মারফৎ। রাত বেশী হওয়ায় পিতা ও কন্যার নিকট বিদায় নিয়ে উঠে পড়ি।
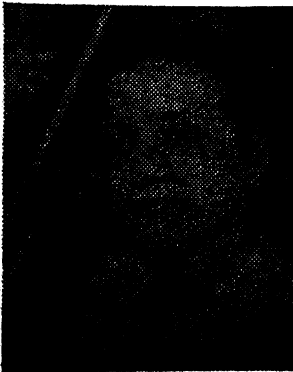
শো রুমের পুরাতন ঠিকানা ১২৪, ১২৪/১ বহুবাজার স্ট্রীট · কলিকাতা - ১২ কেবলমাত্র রবিবার খোলা থাকে

"প্রয়াসী"

বাড়ীর পিছনে গির্জার ঘড়িতে ঢং-ঢং করে চারটে বাজার শব্দ কানে এল। জানলায় বসে শরতের নীলাকাশে সাদা মেঘের ছুটোছুটি দেখতে দেখতে কখন যে দুপুরটা কেটে গেছে টেরও পাইনি। আজ আমার চারি দিকের পারিপার্শ্বিককে ভারি ভাল লাগছে—ভাল লাগছে ঐ নির্মল আকাশ, ভাল লাগছে আমার এই ছোট ঘরখানি, ভাল লাগছে অদূরে রাস্তায় ল্যাণ্ডমাষ্টারের সগর্ব হুঙ্কার, ভাল লাগছে ক্ষুদে হকারের মুহুর্মুহু চীৎকার। বহুদিন পরে আজ আমার মনটাই খুব ভাল আছে। সিনিয়ার নার্সের ট্রেনিং পাশ করেছি প্রায় দু'বছর হল। অথচ এখনও একটা ভাল কাজ জোটেনি। একটা ছোট নার্সারি স্কুলে স্বল্প মাইনের কাজ করছি। ছোট স্কুল—প্রয়োজন তার সামান্য। কোন শিশুর হঠাৎ অসুখ করলে বা কেউ পড়ে গেলে শুশ্রূষা করতে হয়। আর প্রতি মাসে তাদের মেডিক্যাল একজামিনেশনে সাহায্য করতে হয় ডাক্তারকে এইমাত্র। খাটুনি নেই যেমন, রোজগারও নেই তেমনি। শিক্ষার পালা সাঙ্গ করে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ছবি আঁকতে আঁকতে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের পর এমন আলস্য আর অর্থকষ্টের মধ্যে দিন কাটাতে বিরক্ত হয়ে উঠেছি, অবশ্য চেষ্টারও ত্রুটি করছিলাম না, কিন্তু এ যুগে ব্যাকিং-এর জোর না থাকলে বোধ করি ভগবান লাভও হয় না, তার আবার চাকরি। আজ-কালকার দিনে চাকরি লাভ কি ভগবান লাভের চেয়েও আয়াসসাধ্য নয়?

তবু 'বরাত আজি মোর কেমনে গেল খুলি'—জানি না। আজ শনিবার স্কুল বন্ধ। তবু বোর্ডিং-এর একটি অসুস্থ ছেলেকে ইনজেকসন দিতে যেতে হয়েছিল। সেখান থেকে একটা চিঠি পেলাম। না, যেখানে অ্যাপ্লাই করেছি সেখান থেকে নয় এবং ইনটারভিউ দিতেও নয়। এটা একেবারে কাজে যোগ দেবার জরুরী আদেশ।

আমি যখন ট্রেনিং পড়তাম, তখন এক প্রবীণ প্রফেসর ছিলেন—বড়লোকের ছেলে তিনি। টাকা তাঁর প্রচুর আছে,

আর আছে একটি দরদী মন। তিনি সম্প্রতি রিটায়ার করে একটি ছোট টি. বি. স্যানাটোরিয়াম করেছেন হিমালয়ের পাদদেশে ছোট একটা জায়গায়। সেখানেই কাজ করতে ডাক পড়েছে আমার। দক্ষিণা ভালই। গভর্ণমেন্ট সার্ভিস নয়, স্থায়িত্ব বা পেনসনের আশা নেই। বরং নবগঠিত প্রাইভেট স্যানাটোরিয়াম, যে কোন দিন বন্ধ হয়ে যাবার সম্ভাবনাই প্রবল। তবু আজ চিঠিটা পেয়ে মনে হল কি এক পরম রত্ন লাভ করলাম—টাকায় এর পরিমাপ করা যায় না। এখন তো অন্ততঃ ভাবতেও পারছি না এখানকার যে এই নতুন কাজের মাঝেও রোজ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখব খবরের কাগজের কর্মখালির বিজ্ঞাপন, এদিকে ওদিকে চোখ-কান খুলে রাখব যাতে আমার কোন উন্নতির সোপান দৃষ্টি এড়িয়ে না যায়। অবশ্য মহতেরা উপদেশ দিয়েছেন সব উন্নতিকেই অপর উচ্চতর উন্নতির সোপান মাত্র মনে করতে—সুতরাং আরও অনেক বড় আদর্শ আমার থাকা উচিত। তবু আমার এই শুভানুধ্যায়ী অধ্যাপকের সঙ্গে কোন দিন স্বার্থের খাতিরে বিশ্বাসঘাতকতা করে চলে আসব, আজ অন্ততঃ একথা ভাবতেও পারলাম না। আমার মনের সে নীচতা কি আমার নূতন প্রাপ্তির পথ পঙ্কিল করে দেবে না? কে জানে, সে সুযোগ এলে আর হয় তো এ সব বড় বড় কথা মনে পড়ার দুর্বুদ্ধিই হবে না।

এমনি কত কিছু ভাবতে ভাবতে বিকেল হয়ে এসেছে কখন।

এখন সম্বিৎ ফিরে পেয়ে তাড়াতাড়ি উঠে পড়লাম। আমার ইচ্ছা সপ্তাহখানেকের মধ্যেই রওনা হয়ে পড়ি। স্কুলের কাজ ছাড়ার ব্যবস্থা করতে হবে, প্রয়োজনীয় গোটা কয়েক জিনিস কিনতে হবে, ঘরের বাকী ভাড়াটা দিয়ে দিতে হবে, তারপরই কলকাতা ছাড়তে পারব। কলকাতায় আমার কোন আকর্ষণ নেই। কারণ আপনার বলতে কেউই প্রায় নেই আমার। শুধু একজনকে মনে পড়ছে নার্সারি স্কুল-বোর্ডিং-এর সুপারিনটেণ্ডেণ্ট আমায় খুব স্নেহ করেন। সবাই তাঁকে বড়মা বলে, আমিও বলি। তিনিই আমার আত্মীয় বন্ধু সব। তাঁর সঙ্গে কত দিন দেখা হবে না ভেবে মনটা যে খারাপ হয়ে গেল না তা নয়। তবু সব কিছু ঝেড়ে ফেলে দিলাম।

আমার নতুন চাকরীর কথা জানাবার তিনি ছাড়া আর বিশেষ কেউ নেই। তখনি চটপট তৈরী হয়ে নিয়ে ঘরটায় চাবি দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

গিয়ে দেখলাম, বড়মা তাঁর অফিসঘরের সামনের বারান্দায় বসে আছেন। আমায় সহাস্যে অভ্যর্থনা জানালেন। তারপর আমার সব কথা শুনে উৎসাহ দিলেন খুব, আবার আমি দূরে চলে যাব ভেবে চোখ তাঁর ছলছল করে এল। কেমন ভারি হয়ে উঠল আবহাওয়াটা। দুজনেই চুপ করে বসে রইলাম।

হঠাৎ বাইরের দিকে নজর পড়তে দেখলাম গেট দিয়ে ঢুকে এদিকে এগিয়ে আসছেন একজন ভদ্রলোক ও একটি মহিলা। ভদ্রলোক সাধারণ কিন্তু ভদ্রমহিলা সুন্দরী না হলেও সুশ্রী। আর সাজ-সজ্জায় বাহুল্য না থাক অপ্রাচুর্য্যও নেই। কাছে এগিয়ে আসতে দেখলাম তাঁর পরনের শাড়ীটি ভারি শৌখীন, গলায়, কানে দুটো মুক্তোর গয়না, মুখে প্রসাধনের বাহুল্যই আছে বলতে হবে।

ততক্ষণে ওঁরা এসে বারান্দায় উঠেছেন—ভদ্রলোক নমস্কার করে হাসিমুখে দাঁড়ালেন।

বড়মাও হেসে বললেন, এই যে রথীন বাবু, খবর ভাল? মেয়েকে দেখতে এলেন?

প্রত্যুত্তরে রথীন বাবু বললেন, আজ্ঞে হ্যাঁ। ভদ্রমহিলাকে দেখিয়ে বললেন, আমার স্ত্রী।

বড়মা একটু অবাক হলেন যেন। তারপর সামলে নিয়ে বললেন, আপনি তো একদিনও মেয়েকে দেখতে আসেন নি, না?

ভদ্রমহিলা মাথা নেড়ে একটু হাসলেন শুধু।

ভাল করে লক্ষ্য করে দেখলাম, তাঁর চোখের কোলের কালি পাউডার আর কাজলের প্রলেপেও ঢাকা পড়েনি, গলাবন্ধ জামার নীচেও কণ্ঠার হাড় বেশ প্রকট হয়ে উঠেছে, বব্ হেয়ারটাও যে শুধু ফ্যাসান নয়, চুলের স্বল্পতা ঢাকবার প্রয়াসমাত্র, এটাও আমার সন্ধানী দৃষ্টি এড়াতে পারল না। এক কথায় ভদ্রমহিলার চোখে-মুখে অস্বাস্থ্যের লক্ষণ কোন মতেই ঢাকা পড়ে নি। নিজের বিশ্লেষণী দৃষ্টির তারিফ করে মনে মনে আত্মপ্রসাদ অনুভব করছিলাম, তারই মধ্যে শুনলাম, বড়মা দরওয়ানজীকে বলছেন এঁদের মাঠের বেঞ্চে নিয়ে গিয়ে বসাতে আর উমাদিদিকে বলতে রীণাকে এঁদের কাছে পাঠিয়ে দিতে।

আমি মনে মনে একটা বড় ধাক্কা খেলাম। রীণা এই বোর্ডিংএর বছর পাঁচ-ছয়ের একটি মেয়ে—ভারি সুশ্রী আর চঞ্চল—সারা বোর্ডিংটা মাতিয়ে রাখে। ভারি ভাল লাগে মেয়েটাকে। অথচ তার মাকে দেখে কি বিশ্রী যে লাগল! রীণার মা এমন কেন?

ওঁরা চলে যেতে বড়মাকে কথাটা বললাম।

বড়মা বললেন, যা বলেছিস। রীণার মা-ই না কি রীণাকে ভর্ত্তি করতে এসেছিল—মাস আষ্টেক আগে। আমি দেখিনি, শুনেছিলাম না কি খুব চাল। তবে এতটা আবার আশা করিনি বাপু! রথীন বাবু তো প্রায়ই আসেন, ইনি তো এই প্রথম দেখতে এলেন মেয়েকে। স্বামী তো একটা ইস্কুল-মাষ্টার বৌ-এর সাজ দেখলে মনে হয়, কে না কে!

এমন সময় কয়েক জন লোক এলেন বড়মার কাছে কাজের কথা নিয়ে। গল্পে ছেদ পড়ায় বিরক্ত চিত্তে আমি বাগানের দিকে চোখ ফেরালাম আর দৃষ্টি গিয়ে পড়ল রীণার অপেক্ষমান পিতা-মাতার ওপর। একটুখানি ব্যবধানে দু'খানা বেঞ্চ—আমি দেখে অবাক হলাম, দু'জনে দুটো বেঞ্চের দুপ্রান্তে গিয়ে বসেছেন।

রীণা ছুটতে ছুটতে আসছে দেখলাম। মার দিকেই আসছিল, হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে কি ভাবল, তারপর বাপের কোলে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

একটু পরে আবার দেখলাম, তেমনি রথীন বাবুর কোলের কাছে দাঁড়িয়ে কোঁকড়া চুলে ভরা মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে গল্প করছে রীণা—আমি শুধু তার হাত-পা নাড়া দেখতে পাচ্ছি।

বড়মাও যে কথা শেষ করে এদিকে দেখছেন, টের পাইনি। হঠাৎ তিনি বললেন, আমি ভাবতুম রীণা মাকেই বুঝি বেশী ভালবাসে, জিগ্যেস করলে বলেও বোধ হয় তাই। প্রথম প্রথম মার জন্তে ভাবত। আজ কিন্তু একবারও মার কাছে গেল না দেখলি? আট-ন' মাস পরে দেখছে তো। কিন্তু ঠিক বুঝতে পারে কে ভালবাসে আর কে ভালবাসে না!

আবার কিছুক্ষণ গল্প করলাম বড়মার সঙ্গে। তারপর বড়মা ফোন ধরতে উঠে অফিসে গেলেন। আমি আবার মাঠের দিকে চেয়ে দেখলাম রীণার মা-বাবা চলে যাচ্ছেন এবার। রীণার মা মাটির দিকে চেয়ে দ্রুতপদে এগিয়ে আসছেন, একবারও পিছন ফিরে দেখছেন না। আর রথীন বাবু বার বার পিছন ফিরে ফিরে দূরে দণ্ডায়মান মেয়েকে দেখছেন আর বলছেন তাকে বড়মার কাছে চলে যেতে। রীণা দাঁড়িয়ে আছে চুপ করে। ওই বারান্দার সামনে একটা বড় গাছ, তার আড়ালে ওঁরা অদৃশ্য হয়ে গেলেন। এমন সময় রীণা হাত তুলে চেঁচিয়ে উঠল, মামণি টা টা!

মামণি যে প্রত্যুত্তরে কি করলেন দেখতে পেলাম না, কিন্তু যাই করে থাকুন, রীণা যে তাতেই কৃতার্থ বোধ করছে নিজেকে মনেই নেই। সে একগাল হাসল, তারপর লাফাতে লাফাতে ফিরে চলে গেল হোষ্টেল-বাড়ীতে।

একটু পরে রীণাকে নিয়ে এল উমা, ওদের টিচার।

ভীষণ কাঁদছে মেয়েটা, কেঁদে কেঁদে লাল হয়ে গেছে চোখ-মুখ, মায়ের জন্ত ভীষণ মন কেমন করছে ওর, ও না কি এখানে আর থাকবে না কিছুতেই। উমা সামলাতে না পেরে অবশেষে বড়মার কাছে নিয়ে এসেছে। বড়মা বাক্স থেকে লজেন্স বার করে রীণাকে কোলে করে ভোলাতে লাগলেন। সেদিকে তাকিয়ে বড়মার কথাটা আমার একেবারেই মিথ্যে মনে হল—সত্যই কি শিশুরা মানুষ চিনতে পারে?

আজ দুপুর থেকে মনটা আমার খুব খুসী ছিল, সন্ধ্যাবেলা ফেরার সময় ভারি খারাপ হয়ে গেল। বার বার আমার চোখের সামনে ভেসে উঠছে রীণার দুষ্টুমিভরা কচি মুখখানা আর তারই পাশে

দেখতে পাচ্ছি তার মায়ের প্রসাধনকর্কশ কঠিন মুখটা। ঘুরে-ফিরে আমার কেবলি মনে হচ্ছে এই আট মাসের মধ্যে প্রথম মেয়েকে দেখতে এসে একবার তাকে কাছে ডাকল না, এ কি রকম মা? তবে এসেছিল কেন? কর্ত্তব্য করতে? আমার মনে হল আজকালকার মেয়েরা মা হবার সম্পূর্ণ অনুপযুক্তা। আধুনিক মায়েরা সন্তানকে বোর্ডিংএ রেখে দিয়ে নির্ঝঞ্ঝাট হয়ে স্ফূর্ত্তি করে বেড়ায়। মনে পড়ে গেল ট্রেণিং নেবার সময় আমি একটি মেয়ের অসুখে নার্সিং করেছিলাম। সদ্যবিবাহিতা মেয়েটি মা হবার ঝামেলা এড়াতে নানারকম ওষুধ খেয়ে জটিল অসুখে অনেক দিন ভুগেছিল। সেদিন তার প্রতি আমি ভীষণ ঘৃণা বোধ করেছিলাম। কিন্তু আজ মনে হল এমন সন্তানের প্রতি অবহেলার চেয়ে সে বোধ করি ভালই করেছিল। অথচ আশ্চর্য্য, এই আধুনিক কালের মায়েদের মনের পরিবর্ত্তন হলেও সন্তান অনেক ক্ষেত্রেই আজও আগের মতই আছে। আজও তারা ধাত্রীর কোল থেকে মায়ের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়তে চায়, মায়ের জন্ত কেঁদে আকুল হয়।—সেণ্টিমেণ্টাল বলে আমার একটু অখ্যাতি আছে। অন্ত লোক হলে হয় তো কিছু ভাবত না, কিন্তু শুধু রীণার কথা ভেবে নয়, তার মত আধুনিক পিতামাতার সহস্র সন্তানের কথা ভেবে আমার দু' চোখ জলে ভরে এল।

দুর্ভাগ্য আমার! মাসখানেকের আগে যেতে পারলাম না। ফ্লু'র দাপটে বেশ কিছুদিনের জন্ত শয্যা নিতে হল। ডাঃ দত্তকে তার পাঠিয়েছিলাম দুঃসংবাদ জানিয়ে। প্রত্যুত্তরে তিনি সান্ত্বনা দিয়ে জানিয়েছেন—ঠিক আছে, আমি যেন সুস্থ হয়ে উঠে তবে যাই—তাড়া করবার দরকার নেই। নিশ্চিন্ত প্রফুল্লতায় তখন ঘর ছাড়বার আর দুর্বলতা ঘোচাবার জন্ত প্রতীক্ষা করেছি।

কর্মস্থলে পৌঁছে আমার মনের প্রফুল্লতা সবিস্ময় আনন্দে রূপান্তরিত হল। ছোট্ট ফাঁকা জায়গাটা—ষ্টেশন থেকেই দেখতে পেলাম পাহাড়ের প্রগাঢ় নীলিমা আকাশের ফিকে রং-এর ওপর অলস ছায়া ফেলে চুপ করে আছে। চারি দিকে বুনো ফুলের রাশি—অফুরন্ত অসীম।

অতি সহজেই স্যানাটোরিয়াম খুঁজে পেলাম। এই জায়গাটারই মত সুন্দর, ঝকঝকে তকতকে—ভারি ভাল লাগল।

ডাঃ দত্ত আমায় কলকণ্ঠে অভ্যর্থনা করলেন। কাজ বুঝে নিলাম। ছোট স্যানাটোরিয়াম। সে তুলনায় নার্স বেশী। প্রতি ঘরে চারটি সিট এবং তার জন্ত একজন করে নার্স। একটু ইতর-বিশেষ যে হয় না তা নয়, তবে মোটামুটি এটাই ব্যবস্থা।

মেল-ওয়ার্ডের একটি ঘরে প্রথম সপ্তাহে আমার নাইট-ডিউটি, আজ থেকেই কাজে লাগব। এখন প্রভাত—বেয়ারার সঙ্গে নার্স কোয়ার্টার্সের দিকে পা বাড়ালাম—বিশ্রাম করবার প্রচুর সময় পাওয়া যাবে।

আনন্দে ক'দিন কাটল। তবে নাইট-ডিউটি বলে রোগীদের সবার সঙ্গে এখনও আলাপ হয় নি। অধিকাংশ রোগীই ভাল আছে বেশ। তারা ঘুরে বেড়ায় এখানে-ওখানে, তাই প্রভাতের যে স্বল্প সময়টুকু থাকি তারি মধ্যে অনেকেরই মুখ চেনা হয়ে গেছে। রাত্রে প্রায় কারো সঙ্গেই দেখা হয় না। কারণ ডাঃ দত্তের কড়া হুকুম, আটটার পর সব রোগীকে শুয়ে পড়তে হবে। নিজে আটটার পর থেকে সাড়ে এগারোটা বারোটা অবধি আধ ঘণ্টা তিন কোয়ার্টার অন্তর অন্তর রাউণ্ড দেন। সুতরাং সুস্থতার সুযোগে কেউ যে লুকিয়ে জেগে থেকে অন্তায় করবে, সে সুবিধেও নেই।

সেদিন সকালে দিনের নার্সকে চার্জ বুঝিয়ে দিচ্ছি—বেয়ারা এসে জানাল ডাঃ দত্ত ডেকেছেন। অফিসে এসে দেখলাম, তিনি কাজে ডুবে আছেন। অপেক্ষা করতে করতে ভাবছিলাম, এই কাজ-পাগলা মানুষটার দাম কি দেশের লোক কেউ দেবে? এমন সময় খোলা ফাইলটা বন্ধ করে আর বন্ধ ফাইল একটা খুলতে খুলতে ডাঃ দত্ত বললেন, আচ্ছা তুমি মনীষা গাঙ্গুলীকে চেন?

আমি থতমত খেয়ে গেলাম। এ নামের কাউকে তো কই মনে পড়ছে না আমার! মনীষা গাঙ্গুলী এখানকার রোগী না নার্স নাকি এখানের সঙ্গে যার কোন সম্পর্কই নেই, সম্পূর্ণ অন্ত প্রসঙ্গ।

আসছেন ডাক্তার, কিছুই না বুঝতে পেরে শুধু বললাম, কৈ না তো স্যার!

ডাঃ দত্ত বললেন, সে এখানে মাসখানেক হল আবার এসেছে। গত বার বেশ সেরে ফিরে গেল। কিন্তু বাঙালী সাধারণ ঘরের মেয়ে নিজের ওপর এত বেশী অত্যাচার করে যে, আমার তো মনে হয়, এই মেয়েগুলোকে বাঁচাবার হলে সমাজ থেকে এই সাধারণ ঘরটাই তুলে দিতে হবে। না'হলে এদের বাঁচান প্র্যাকটিক্যালি ইমপসিবিল। মেয়েটা ছেলেমানুষ। কিন্তু এবার ওর মনটা এমন ভেঙ্গে গেছে যে কিছুতেই রিকভার করতে পারছে না। এই কয়েক মাস প্রথম যখন এসেছিল তখন কিন্তু এমন মোরোজ ছিল না। আমি বেশ ভয় পেয়ে যাচ্ছি, কারনা মেয়েটার স্বাস্থ্যের কোন উন্নতি হচ্ছে না!

চিন্তাক্লিষ্ট মুখে ডাক্তার চুপ করে বসে রইলেন। আমারই বা কি বলবার আছে?

একটু পরে আবার বললেন ডাঃ দত্ত, ও হ্যাঁ! যে জন্যে তোমায় ডেকেছি। ভারি মুশকিলে পড়েছি। ষ্টাফের অসুখ করেছে, বেশীর ভাগ সব ক'টাই আনাড়ী—সে রকম কাউকে পাচ্ছি না। অথচ আজ আমায় কয়েকটা কেস পরীক্ষা করতেই হবে। তুমি এখনি আমার সঙ্গে রাউণ্ডে যেতে পারবে?

জিজ্ঞাসু নেত্রে ডাঃ দত্ত আমার দিকে তাকালেন। রাত্রি জাগরণের ক্লান্তি তখন আমার শুভ্র শয্যার দিকে টানছিল। তা উত্তর দিতে আমার বেধে গেল।

পরক্ষণেই ডাক্তারের ধিক্কার ধ্বনিতে ঘর ভরে গেল। শেম শেম ইউ ইয়াং লেডি! এত ক্লান্তি তোমার? একদিন না ঘুমি পার না! আই ক্যান গো অন ওয়েকিং ফর ডেস টুগেদার—এ ইন দিস ওল্ড এজ।

লজ্জিত হলাম। তাড়াতাড়ি বললাম, না স্যার, কে বল পারব না?

মুহূর্ত্তে ডাঃ দত্ত খুসী হয়ে গেলেন। বললেন, এই চাই। এমন সব মেয়ে না হলে আমার তো চলবেই ন জানি তোমার কষ্ট হবে—কিন্তু ডোণ্ট কেয়ার ইট মাই গাল যাও, হাতে-মুখে জল দিয়ে ফ্রেস হয়ে এস।

দ্রুতপদে ঘর ছেড়ে চলে গেলাম।

রাউণ্ড দিতে গিয়ে সারা হাসপাতালটা

যাবে আমার আজ। ডাঃ দত্ত সব আগে মনীষা গাঙ্গুলীকে পরীক্ষা করতে চান। তাই আমরা প্রথমেই ফিমেল ওয়ার্ডের একটা ঘরে ঢুকলাম। সে ঘরের তিনটে বেড খালি। এটা ঠিক ডাঃ দত্তের রাউণ্ডে আসবার সময় নয়, সাধারণতঃ আরও বেলায় আসেন তিনি। তাই বাসিন্দারা প্রস্তুত নেই।

ডাঃ দত্ত সহাস্যে বললেন, বাঃ, এঁরা যে দেখছি দিব্যি হাওয়া খেতে বেরিয়েছেন!

চতুর্থ বেডের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন ডাক্তার। ট্রলি ঠেলে নিয়ে আমিও এগোলাম। একটি শীর্ণ মেয়ে শুয়ে আছে বিছানায় মিশিয়ে। চোখ দুটো বোজা, দক্ষিণ বাহুটি কপালের ওপর রাখা।

ডাঃ দত্ত মেয়েটির সেই কপালের ওপর রাখা হাতটিতে একটু হাত বুলিয়ে মৃদু কণ্ঠে ডাকলেন, মনীষা!

মনীষা ধীরে ধীরে চোখ মেলে তাকাল। তার সর্ব শরীরের মাঝে ডাগর শুধু তার দুটি চোখ। মুখভরা হাসি দিয়ে সে ডাঃ দত্তকে নিঃশব্দ অভ্যর্থনা জানাল।

ডাঃ দত্ত স্নেহার্দ্র কণ্ঠে বললেন, কেমন আছ মা আজ?

মনীষা দ্বিধা মাত্র না করে বলল, বেশ ভাল আছি।

আমার অবাধ্য দৃষ্টি তার শয্যায় বিলীয়মান দেহ থেকে দেওয়ালে টাঙ্গান টেম্পারেচার চার্টের ওপর গিয়ে পড়ল। গতকাল জ্বর উঠেছিল প্রায় ১০৪°, আর এই মাত্র ডাঃ দত্তের কাছে শুনে এলাম দিন দুই আগে রক্তবমি করেছে সে। ভাল থাকারই লক্ষণ বটে!

কিন্তু ডাঃ দত্ত সে কথায় অকুণ্ঠ সমর্থন জানালেন, থাকবে বই কি, থাকতেই হবে। এর পর দেখবে আরও ভাল আছ।

ছেলেমানুষের মত করে ভোলাচ্ছেন ডাঃ দত্ত। মনীষা ভুলছে কি না সেই জানে। কিন্তু আমার কোন সন্দেহ রইল না যে তার অবস্থা বেশ সঙ্কটজনক।

এবার ডাঃ দত্তআবার বললেন, সত্যি জান কল্পনা, এই মা'টি আমার কখনও বলে না আমার এই কষ্টটা হচ্ছে। অথচ যারা সুস্থ তাদের দেখ অভিযোগের আর অন্ত নেই। তাই তো আমার এই সদা ভাল থাকা মা'টিকে আমি এত ভালবাসি।

ওকে পরীক্ষা করবার জন্য প্রস্তুত হতে হতে ডাঃ দত্ত আবার বললেন, কি? চেন তুমি একে? কোন দিন তোমার নার্সারি স্কুলে একে দেখনি?

এতক্ষণের মধ্যে একবারও মনে হয়নি মনীষাকে আমি চিনি। প্রসাধনহীন বিশুষ্ক মুখখানা দেখে নিমেষের জন্যও মনে পড়েনি কোন দেখা মুখ। কিন্তু এখন মুহূর্তের মধ্যে মনীষাকে আমার মনে পড়ে গেল সে বীথার মা।

মনের মধ্যে আবার একটা ধাক্কা খেলাম। এখানে আসার আগেই হয়তো সে মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল, এ কথা ভেবে যে দুঃখিত হলাম না তা নয়। তবু এই রোগশয্যায় শায়িত মেয়েটিকে দেখেও আমি তাকে ঠিক মমতা করতে পারলাম না। নার্সারি স্কুলে তার যে রূপ দেখেছিলাম সে দৃশ্য আমার চোখের সামনে ভেসে উঠে আমার মনটাকে তেমনি বিষিয়ে রাখল। যন্ত্রের মত ডাক্তারের হাতে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি এগিয়ে দিতে দিতে পলকের জন্য তাঁর স্নেহপূর্ণ মুখের দিকে তাকিয়ে মনে মনে ভাবলাম, ভুল করছেন তিনি। যে মেয়ে নিজেকে বিকশিত করতে গিয়ে সন্তানকে অবহেলা করে তাকে কি আপন করা যায়? সুমিষ্ট ব্যবহার ও করে নিশ্চয়ই, শুধু নেক নজরে পড়ে সুযোগ সুবিধে পেতে, স্বার্থের খাতিরে।

ডে-ডিউটিতে কাজ করছি এখন। মনীষাকে দিনে সহস্র বার দেখি, ওষুধ খাওয়াই, ইনজেকশন দিই। কিন্তু কোন আন্তরিকতা নেই আমার সেবায়। ওকে আমি ঘৃণা করি বললেও অত্যুক্তি হয় না। ওর হাসি দেখলেও আমার রাগ ধরে।

ওকে এখন একটা আলাদা কেবিনে রাখা হয়েছে। দিবা-রাত্র খাটে শুয়ে থাকে সে, ওঠবার সামর্থ নেই। বড় জোর আধশোয়া হয়ে পাশের জানলা দিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখে। অহোরাত্র বিষণ্ণ, আপন চিন্তায় আপনই বিভোর।

প্রায় সুস্থ রোগিণীদের মজলিসে প্রায়ই মনীষার বিরুদ্ধ আলোচনা হয়—এধার-ওধার যেতে-আসতে শুনতে পাই। মুখে স্বীকার করি না বটে, মনে মনে বোধ করি আমিও যোগ দিই। ওরা যখন বলে, অসুখ তো আমাদেরও করেছে তাই বলে কি ওর মত মুখে চাবি দিয়ে আছি? আসল কথা, দেমাকেই গেলেন উনি! তখন অসুস্থতার মাপকাঠিতে প্রচুর প্রভেদ আছে জানা সত্ত্বেও আমি ঠিক ওদের দোষ দিতে পারি না।

সেদিন ডিউটিতে এসে নাইট নার্সকে দেখতে পেলাম না। বোধ হয় অফিসে গেছে। সে এলে চার্জ বুঝে নিতে হবে। পাশেই

মনীষার কেবিন। এখান থেকেই দেখা যায়—পর্দাটা উড়তেই দেখলাম মনীষা তার বিছানায় রোগজীর্ণ শরীরটাকে কুঁকড়ে ছোট করে ঘুমিয়ে পড়েছে। ভাল করে শুইয়ে দেবার জন্ত তাড়াতাড়ি কাছে গেলাম। তার মুখের চেহারা দেখে চমকে উঠলাম—এই এক রাত্রে ওর রোগটা যেন অনেক বেড়ে গেছে!

ওকে ভাল করে শুইয়ে বালিস ঠিক করে দিতে গিয়ে বালিসের তলা থেকে একটা প্যাড মাটিতে পড়ে গেল। কাজ শেষ করে সেটাকে মাটি থেকে তুলে নিতেই চোখে পড়ে গেল প্রথম পাতাটায় বীণাকে লেখা একটা চিঠি। তাকে দেওয়া হয় নি, তারিখ রয়েছে গত কালের।—নাইট-নার্স এখনও আসছে না—মনীষা ঘুমে অচেতন—নিশ্চয় অশেষ কষ্টের পর ইনজেকশনের কল্যাণ-হস্ত ওকে ঘুম পাড়িয়েছে। চিঠিটা টেবিলে রাখতে যাচ্ছিলাম—একটা জায়গায় চোখ পড়ে গেল। নিজের অজ্ঞাতসারেই চিঠিটা পড়ে ফেললাম।

"আমার পরম স্নেহের—

বীণা, তোমার সুন্দর চিঠি পেয়ে আমার খুব আনন্দ হল। তুমি খুব ভাল চিঠি লিখতে শিখেছ। এই দেখ, তোমার ইচ্ছে মত আলাদা খামে শুধু তোমায় চিঠি দিলাম। এবার থেকে বেড়াতে যাবার সময় আর তোমায় ফেলে যাব না। এবার তুমি দুঃখ কোর না। তোমার বাপী লিখেছেন, তোমায় নিয়ে আমার কাছে আসবেন। তুমি কিন্তু তোমার বাপীকে বুঝিয়ে বোলো এখানে তোমাদের আসতে নেই। তুমি তো জান আমার অসুখ করেছে, আর আমার কাছে তুমি এলে আমার অসুখ বেড়ে যাবে। বাপীকে সে কথা বলে এখানে আসতে বারণ করবে। আমি বেশ সেরে উঠেছি, শীগগিরই তোমাদের কাছে ফিরে যাব। তখন থেকে আর তোমায় বোর্ডিং-এ থাকতে হবে না, আমার কাছে থাকবে। তুমি ভাল মেয়ে হয়ে থেক। কেমন আছ? চিঠি দিও। এখানে যেন এস না। আমার প্রাণভরা স্নেহ ও ভালবাসা নিও। ইতি—

তোমার মা।"

চিঠিটা রেখে দিয়ে এক রকম ছুটে চলে এলাম ঘর থেকে। আমার মনে হল ঐ যে মেয়েটি সন্তানের অকল্যাণ আশঙ্কায় নিজেকে সব সুখ হতে বঞ্চিত করে রেখেছে, আমার নীচ ও ভ্রান্ত বিদ্বেষের নিঃশ্বাস ওকে মৃত্যুপথে আরও ঠেলে দিচ্ছে।

বাইরে বারান্দায় কয়েক জন মহিলা গল্প করছেন। আজও ওঁদের গল্পের বিষয়বস্তু হল মনীষা। বুঝলাম, ওঁরা মনীষার এই আকস্মিক অসুস্থতার কথা জানেন না। না হলে নারীর কোমল মন, আজ অন্ততঃ ওকে রেহাই দিত!

নতুন আবিষ্কারের আনন্দে ওঁদের চোখে-মুখে খুসীর বিদ্যুৎ খেলছে। মনীষা নাকি ওঁদের কাছে অধ্যাপক-পত্নী বলে পরিচয় দিয়েছিল, আর কোন সত্যবাদিনীর কাছ থেকে ওঁরা জেনেছেন যে, সে স্কুল-মাষ্টারের স্ত্রী। বিস্ময়, কৌতূহল আর বিদ্রূপের হাসিতে বাতাসটা ভারি হয়ে উঠেছে।

এক ভদ্রমহিলাকে বলতে শুনলাম, তা বাপু ওই বা কি করবে বল? অত পাউডার, লিপষ্টিক আর গয়নার সঙ্গে কি আর মাষ্টারের বৌ কথাটা মানায়? প্রথমে যেদিন এল তোমরা তো সেদিন দেখনি। সাজের কি ঘটা। এসেছিল তো রোগ নিয়ে হাসপাতালে। এই তো এখন হাড়ের রূপ বার হয়ে বেরুচ্ছে।

অপর একজন সায় দিলেন, ঘেন্নায় মরি মা! এই তো এসেছি, কেউ বলতে পারবে একটা সিঁদুর টিপ পরতে দেখেছে কোন দিন? হাসপাতাল বলে কথা!

অপরিসীম ঘৃণায় তাঁরা চোখ-মুখ কুঞ্চিত করলেন। আমি ভাল করে মহিলাদ্বয়ের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, তাঁদের মুখের বলীরেখা অস্তগামী প্রৌঢ়ত্বে বড় বেশী প্রকট করে তুলেছে যেন।

আজ প্রথম রাগে আমার সর্বাঙ্গ জ্বলে গেল। চীৎকার করে বলতে ইচ্ছে করল, কেন ওর সমালোচনা করবে তোমরা? ওর স্বল্পস্থায়ী জীবন ও যদি ওর সীমিত গণ্ডির মধ্যে ভোগ করে নিতে চায়, তাতে তোমাদের এত আপত্তি কিসের? সুস্থ মানুষ সাজলে দোষ নেই আর যাকে অসময়ে অনিচ্ছায় এই ধরণী থেকে বিদায় নিয়ে যেতে হবে সে একটু সাজলেই কি তোমাদের চোখে মস্ত অপরাধ করে ফেলল সে? স্কুলমাষ্টারকে সবাই মিলে নামিয়ে রেখেছ সমাজের নীচের তলায়—তাই ওরও তো ওপরে ওঠবার কোন সম্ভাবনা নেই। ও যদি শুধু কল্পনায় একটুখানি ঊর্ধ্বে একটু তৃপ্তি নিয়ে তোমাদের মাঝখান থেকে সরে যেত, কি ক্ষতি হত তোমাদের?

হঠাৎ সচেতন হয়ে ভাবলাম, ওদের সমালোচনার নিন্দে করতে গিয়ে আমিই ওদের সমালোচনা করছি। আর শুধু এদের কেন? এ রিক্ত মেয়েটির প্রতি আমিই বা কি মমতা দেখিয়েছি? বড় বড় কথা ভেবেছি, ও নাকি মাতৃত্বের অপমান করেছে, কিন্তু ওর সাজসজ্জার বিরুদ্ধেও আমার বলার কথা কি কম ছিল—এই এক মিনিট আগেও?

নিজের ওপর কিন্তু আমার রাগ হল না, এদের ওপর রাগটাও পড়ে গেল।

ভেবে দেখলাম এই তো স্বাভাবিক। অত্যাচারিত মজুররা যখন মিছিল করে বেরিয়ে স্বার্থান্বেষী মালিকের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে—চলবে না। চলবে না! তখন আমরা ছাদের পাঁচিল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে দেখি তাদের উড্ডীন লাল ঝাণ্ডা—অবশ্য নিজে যদি সেই মালিকটি না হই। বলি 'এইতো উচিত।' কাগজে কাগজে জানাই দরিদ্রের রক্তশোষণের প্রতিবাদ, মনুষ্যত্বের অবমাননার বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিয়ে ফিরি মঞ্চে মঞ্চে। আর ঘরে ঘরে সাধারণ মধ্যবিত্তরা যখন স্বল্প আয়ে কোন রকমে ভদ্রতা রক্ষা করে চলে তখন আমরা ভালমন্দ কিছুই বলি না। ওদের ঐ ধুকতে ধুকতে সম্মানের বোঝা বয়ে চলাটাই আমাদের চোখে স্বাভাবিক। কিন্তু তারা যদি সেই অন্নের মধ্য থেকে অল্প কিছু দিয়ে নিজেদের সাজায়, চারিদিকের চোখ ঝলসানো সাজসজ্জার উপকরণ থেকে একটু কিছু নিয়ে আপনার অতৃপ্ত কামনা মেটায়, অমনি আমাদের প্রশান্তি যায় ঘুচে। তবু ওরাও যেমন নীরবেই ওদের দারিদ্র্য বহন করে আমরাও তেমনি 'চলবে না' বলে মিছিল বার করি না। আমরা যে ভদ্রলোক, তাই ভদ্রতা রক্ষা করে চলি! কি দরকার আমাদের, কারো সাতে-পাঁচে থাকবার? শুধু ব্যঙ্গের হাসি হেসে, একে অপরকে চোখ ঠারি ভাবলে তার মুখের ওপর কিছু বলে তাকে আঘাত দেব, এমন নীচতা আমাদের নেই। উন্নত জগতের সভ্য মানুষ আমরা এটুকু পালিশ আর থাকবে না আমাদের?

ভারতে যন্ত্রপাতির উৎপাদন

বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে অগ্রগতির জন্ত যন্ত্রপাতি বা কলকব্জা অত্যাবশুক। এর সাহচর্য্য না পেয়ে কোন রাষ্ট্রের পক্ষেই শিল্পসমৃদ্ধ হওয়া সম্ভব নয়। আধুনিক ধরণের একটি শিল্প কারখানা খুলতে চাইলে, কোন একটি 'গঠন-পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করবার দাবী রাখলে প্রথমেই চাই উপযোগী যন্ত্রপাতি। স্বাধীন ও উন্নতিকামী ভারতের স্থান সেদিক থেকে কোথায়, নিশ্চয়ই ভেবে দেখবার।

যত কাল এ-দেশটির উপর পর-শাসন ছিল, তত দিন দেশের অভ্যন্তরে একান্ত দামী যন্ত্রপাতির উৎপাদনের ব্যবস্থা মোটেই ছিল না। সেদিন একটি কোন গুরুত্বপূর্ণ শিল্প কারখানা খুলতে গেলেই যন্ত্রপাতি বা কলকব্জার জন্ত বিদেশের দিকে তাকাতে হ'ত। স্বাধীনতা অর্জ্জিত হওয়ার পরও অংশু সেই নির্ভরতার সম্পূর্ণ অবসান ঘটেনি। তবে, এখানে কলকব্জা বা যন্ত্রপাতি নির্ম্মাণের জন্ত কারখানা স্থাপিত হয়েছে এবং উৎপাদনও বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে ক্রমেই।

একটি পরিসংখ্যান আলোচনা করে দেখা যায়—১৯৫১-৫২ সালে ভারতকে বাইরে থেকে প্রায় ৩ কোটি টাকার যন্ত্রপাতি আমদানী করতে হয়। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুমোদিত শিল্পায়নের জন্ত ১৯৫৫-৫৬ সালে যে যন্ত্রপাতি আমদানী হয়, এর মূল্য ছয় কোটি টাকার উপর। শিল্প ও অর্থনীতি বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন—দ্বিতীয় পরিকল্পনা শেষে এই দেশের সংগঠনে বছরে প্রায় ১৭ কোটি টাকার কলকব্জা বা যন্ত্রপাতি প্রয়োজন হবে।

ভারতের অভ্যন্তর থেকেই যন্ত্রপাতির 'উক্ত বিপুল চাহিদা মেটান সম্ভব হবে কি না, সে অবশ্ব একটি প্রশ্ন। কিন্তু জাতির পক্ষে, জাতীয় সরকারের পক্ষে এই বলে চুপ করে বসে থাকা সম্ভব নয়। বাঙ্গালোরে সরকারী উদ্যোগে হিন্দুস্থান মেশিন টুলস ফ্যাক্টরী নামে যে বিরাট কারখানাটি স্থাপিত হয়েছে, তাতে অবশ্ব প্রয়োজনীয় নানা ধরণের যন্ত্রপাতি উৎপাদনের চলেছে অব্যাহত 'চেষ্টা। এই ভাবে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কলকব্জা নির্ম্মাণের আরও কতকগুলো কারখানা স্থাপিত হলে আমদানী হ্রাস পাবে।

সুখের কথা, ভারতের রিং ফ্রেম, তাঁত ও কার্ডিং ইঞ্জিনের মোট চাহিদার বেশীর ভাগই এক্ষণে আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনায় মেটান সম্ভব হচ্ছে। কলকব্জা বা যন্ত্রপাতির (কার্ডিং ইঞ্জিন, ফ্রেম, রিলিং মেশিন, বাণ্ডলিং ও বেলিং প্রেস) উৎপাদন ক্রমে বাড়ছে—একটু আগেই তা বলা হল। সর্ব্বশেষ সরকারী হিসাব পর্য্যালোচনায় জানা গেছে—১৯৫৭ সালে ভারতে কার্ডিং ইঞ্জিন তৈরী হয়েছে প্রায় নয় শত। পূর্ব্ববর্ত্তী বছরে ১১ মাসে এই অত্যাবশুক যন্ত্রটি তৈরী হয়েছিল ৭২৬টি। অপর দিকে ১৯৫৭ সালের প্রথম ১১ মাসে ১৮৪১টি রিলিং মেশিন, ১২৫৫টি রিং ফ্রেম, ২৮২টি স্বয়ংক্রিয় তাঁত ও ৩০টি ড্রইং ফ্রেম উৎপাদিত হয়। আলোচ্য সময়ে পূর্ব্ববর্ত্তী বছরে এই কয়টি যন্ত্রের উৎপাদন ছিল যথাক্রমে ১৬১টি ও ২৪টি। এই হিসাব থেকে গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রপাতি উৎপাদনে ভারত কতখানি এগিয়ে যেতে পারছে, তার একটি ধারণা হয় সহজেই।

এদেশের শণ-শিল্প

ভারতে শণ-শিল্প একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প। দড়ি, বস্তা, জাল, সতরঞ্চ প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় জিনিস তৈরী হয় শণ দিয়ে। শণ-শিল্প এদেশে দ্রুত গড়ে উঠবার পথ খুঁজে পেয়েছে সে জন্তই।

ভারতের বহু অঞ্চলে পাটজাতীয় এই ছোট গাছটি (শণ) উৎপন্ন হয়। সাদা, সবুজ (গঞ্জাম) ও ডিউথুড়ী—এই তিন শ্রেণীর শণ এদেশে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে সাদা শ্রেণীর শণ পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা, বিহার ও উত্তর প্রদেশে জন্মে থাকে এবং মোট উৎপাদনের শতকরা প্রায় ৫৬ ভাগই এই শ্রেণীভুক্ত। সবুজ (গঞ্জাম) শ্রেণীর শণ উৎপন্ন হয় পাঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ, বোম্বাই, মহীশূর, উত্তর প্রদেশ ও উড়িষ্যায়। তৃতীয় শ্রেণীর (ডিউথুড়ী) শণ একমাত্র বোম্বাই-এ জন্মে থাকে এবং তাও সেখানকার রত্নগিরি জেলায়। ইহার উৎপাদন মোট উৎপাদনের তুলনায় নিতান্ত কম।

পাটের ন্তায় কাঁচা শণকেও বিভিন্ন বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে সাফাই করা হয় এবং তৎপরে শ্রেণী বিভাগ করে হাইড্রোলিক প্রেসের সহায়তায় সেগুলোকে প্যাক করার ব্যবস্থা আছে। বৎসরে ভারতে যে শণ উৎপন্ন হয়, তার পরিমাণ ১ লক্ষ ২০ হাজার টনেরও বেশী। ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা, ইটালী, ফ্রান্স প্রভৃতি বহু দেশে শণ ও শণজাত পণ্য রপ্তানী হয়ে থাকে। ফলতঃ এই থেকে ভারত বেশ কিছু পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জ্জন করে থাকে।

তালগুড় শিল্প ও পশ্চিমবঙ্গ

প্রকৃতি প্রদত্ত সম্পদ হিসাবে তালগাছের স্থান নিঃসন্দেহে প্রথম পর্য্যায়ে। এই গাছটি থেকে কত প্রয়োজনীয় জিনিষ আমরা পেয়ে আসছি। তন্মধ্যে তাল-রসের গুড় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বলতে কি, পশ্চিমবঙ্গে তালগুড় আজ সাধারণ ভোগ্যপণ্য মাত্র নয় ইহা একটি অন্ততম প্রধান শিল্পরূপেও গণ্য।

তালগুড়ের সহিত বাঙালীর রসনার পরিচয় যুগযুগান্ত কা[illegible] আগেকার। তবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এইটির চাষ আরম্ভ হয়ে[illegible] খুব বেশী দিন নয়। জাতীয় সরকার রাজ্যের শাসন ভার গ্রহ[illegible] করলে পর, সক্রিয় মনোযোগ নিবদ্ধ হতে থাকে এদিকটায় পশ্চিমবঙ্গে তালগুড়কে কেন্দ্র করে একটি যে শিল্প গড়ে উঠছে, এ[illegible] মূল ধাপটি সম্ভবতঃ এইখানেই।

সরকারী একটি হিসাব—ভারতে তাল ও খেজুরগাছ আ[illegible] মোটামুটি ৫ কোটি। এই থেকে ব্যবহার উপযোগী গুড় উৎপন্ন হ'[illegible] পারে প্রায় ৩ কোটি মণ বা ১১ লক্ষ টন কিন্তু সে ভাবে উৎপাদনে

উপযুক্ত প্রয়াস এখন পর্য্যন্ত নেওয়া হয় নি। অপর দিকে একমাত্র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যেই ৩২ লক্ষ তাল ও খেজুরগাছ আছে। এগুলোকে ভিত্তি করে প্রায় ১১ লক্ষ মণ (৭০ হাজার টন) গুড় উৎপাদন সম্ভবপর, সরকার এই দাবী রাখেন। কিন্তু কার্য্যত: এখানেও সে ভাবে উৎপাদনের পর্য্যাপ্ত চেষ্টা নেই, ফলে গুড় উৎপাদিত হয় মাত্র ৬০ হাজার টন। এই উৎপাদনও রাজ্যের চাহিদার তুলনায় নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। যতদূর হিসাব জানা গেছে—সারা পশ্চিমবঙ্গে বৎসরে গুড়ের প্রয়োজন প্রায় ৩ লক্ষ টন। সুতরাং অন্যান্য অঞ্চল থেকে বেশ কিছু পরিমাণ গুড় আমদানী না করলে নয়।

পশ্চিমবঙ্গে একমাত্র তালগুড় কি পরিমাণ উৎপন্ন হচ্ছে, এক্ষণে সেটি লক্ষ্য করা যাক। এই রাজ্যে যে তালগাছ আছে, তার মোট সংখ্যা হবে প্রায় ১৭ লক্ষ। এর সব কয়টি গাছই কিন্তু আবশ্যক উৎপাদনক্ষম নয়। গুড় উৎপাদনের জন্য রস সরবরাহ করে থাকে, এমন গাছের সংখ্যা অনধিক ২ লক্ষ মাত্র। আলোচ্য ব্যবস্থায় দেখা গেছে, ৬ হাজার টনের মত তালগুড় এখানে উৎপন্ন হয়। ব্যাপক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসৃত হলে উৎপাদিত গুড়ের পরিমাণ অবশ্য যথেষ্ট বৃদ্ধি পেতে পারে।

আমাদের দেশে তালরসের অনেকটা অপচয় বা অপব্যবহার হয় অথচ এই রস বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে খাঁটি গুড় বা চিনি তৈয়ারী করলে দেশের গুড়ের চাহিদা মিটানো সম্ভব। খাদ্য হিসাবেও তাল-গুড় শুধু উপাদেয়ই নয়, পুষ্টিকরও বটে। এই থেকে আমরা ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, ভিটামিন্ 'এ' (খাদ্যপ্রাণ 'ক') প্রভৃতি পেতে পারি। তালগুড়কে কেন্দ্র করে যদি একটি স্থায়ী ও মজবুত শিল্প গড়ে তোলা যায়, তাহলে নানা দিক থেকেই উপকারের সম্ভাবনা। এই শিল্পে বহু লোকের কর্মসংস্থান হতে পারে এবং আশানুরূপ আর্থিক উন্নয়নও সম্ভবপর, এটি সহজেই অনুমেয়। সরকার এরূপ দাবী রাখছেন—১৫টি মাত্র তালগাছ থেকে এক মরশুমে (চৈত্র, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ) খরচ বাদে আয় হতে পারে ৩ শত টাকা। সরকারী উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় প্রায় দেড় শতটি তালগুড় শিল্পের শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। অল্প ব্যয়ে কি ভাবে উৎকৃষ্ট তালগুড় উৎপন্ন হতে পারে, সে দিকেও তারা পরীক্ষা চালিয়েছেন। পল্লীঅঞ্চলের অধিবাসীদের সজীব দৃষ্টি থাকলে এবং সরকারী সহায়তা ও উদ্যম অব্যাহত থাকলে পশ্চিমবঙ্গে তালগুড় শিল্পের উন্নতি নিশ্চিত, এটুকু বলা যায়।

দু'টি কবিতা

শ্রীরমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

রুশীয়া

"যা পেয়েছি, তা রেখেছি মনের খাঁচায় ধরি,
'লালের দেশে'র দিনগুলি যে ভুলতে নাহি পারি।
তাদের প্রীতির মূল্য দেবার সাধ্য আমার নাই,
তাদের প্রেমের পরশ পেয়ে ধন্য আমি ভাই!
'লোহার-যবনিকা'র পারে আছে কোমল প্রাণ,
কে বলে গো 'লাল-রুশীয়া!' তবে সবুজ কাহার নাম?"

তাসিয়ানা

নাম যে তোমার 'তাসিয়ানা', রাশিয়ানা তুমি,
প্রীতির ছোঁয়া দিয়ে তুমি ভরেছো দিনগুলি।
মস্কো নদীর ধারের স্মৃতি, জাগে বারে বারে,
ক্রীমস্কী সাঁকোয় সন্ধ্যা এসে যবনিকা টানে।
বিদায়-বেলা এই কথাটি বলে যেতে চাই,
থাকি আমি যে দেশেতেই, ভুলো নাকো ভাই।
ধরার যুবা মিলেছিলো লালের পারাবারে,
আবার দেখা হবে, এবার পীত-সাগরের তীরে।

বক্তব্য

গত দেড় বছরের মধ্যে ধূর্জটিপ্রসাদের তিনখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, উপন্যাস 'অন্তঃশীলা' ও 'একদা বিখ্যাত,' 'আমরা ও তাঁহারা'র নূতন সংস্করণ এবং জার্ণাল-ধর্মী 'মনে এলো।' সম্প্রতি প্রকাশিত হল 'বক্তব্য', যা গত পঁচিশ বছরের মধ্যে লেখা নানা চিন্তাশ্রয়ী প্রবন্ধের একটি মূল্যবান এবং সুমুদ্রিত, সুদৃশ্য সংকলন। এটি বিশেষ আনন্দের কারণ—শুধু প্রবন্ধ-সাহিত্যে গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন বলে নয়, একজন বিদগ্ধ ও চিন্তাশীল লেখকের প্রতি পাঠক সমাজের দায়িত্ব-বোধের স্বীকৃতি হিসাবেও।

বইখানিকে দুটি স্তবকে ভাগ করা হয়েছে। একটি সমাজ অপরটি সংস্কৃতি-চিন্তা। সংস্কৃতির মধ্যে আবার দুটি ভাগ করা যেতে পারে। একটি রবীন্দ্র সম্পর্কিত, অপরটি সাহিত্য-সংক্রান্ত বিচিত্র আলোচনা। বইটির অন্তিম প্রবন্ধ হল 'নতুন ও পুরাতন।' এটা খুব সঙ্গত হয়েছে, কারণ নতুন ও পুরাতনের প্রকৃত দ্বন্দ্বটি ফুটিয়ে তুলে ধূর্জটিপ্রসাদ চমৎকার শেষ করেছেন তাঁর প্রিয় পরিচিত ভঙ্গীতে। বক্তব্য শেষ হল বটে কিন্তু রেশ রয়ে গেল রসিকচিত্তে।

নব্য সমাজ-দর্শনের ভূমিকা, নব্য সমাজ-দর্শনের প্রতিজ্ঞা, মার্ক্সবাদ ও মনুষ্যধর্ম এবং অতঃ কিম্—সমাজ বিষয়ক এই চারটি প্রবন্ধে লেখক তার তীক্ষ্ণ মননের আলোকে সমাজ ও মানুষের মতবাদ সম্পর্কে সার কথাগুলি উদ্ধার করেছেন, উদ্ভাসিতও করেছেন। আদর্শ সমাজ গঠনের চেষ্টায় বিশ্বের নানা মানুষের পরিকল্পনা ও মতবাদ এবং সেগুলির সার্থকতার পরিমাপ করে তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেচেন যে, ভারতীয় সমাজে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ নয়, 'পার্সোন্যালিজম' অর্থাৎ পুরুষতত্ত্বের ভিতর দিয়েই মানুষের প্রগতি আসতে পারে। ব্যক্তি বা 'ইনডিভিজুয়েল' আর পুরুষ বা 'পার্সন'-এর মধ্যে তফাৎ হল এই যে, ব্যক্তি আত্মকেন্দ্রিক। আর সমাজের সঙ্গে সম্পর্কিত যে ব্যক্তি অর্থাৎ যার মধ্যে 'সেন্স-অব-কম্যুনিটি' রয়েছে, সেই হল পুরুষ। ভারতীয় সমাজ যতই ভেঙ্গে পড়ুক না কেন, সেটি এখনও অসংলগ্ন ব্যক্তিকণার জঞ্জাল হয়নি। তার সমাজ-রীতিতে, তার দৃষ্টিভঙ্গীতে এখনও একটি মানব-প্রত্যয়ের আভাস মেলে, যেটি ব্যক্তিত্বের চেয়ে পুরুষতত্ত্বেরই অনুকূল। সমাজ বিশ্লেষণের ফলে এই ধরণের আশাবাদী প্রতিপাদ্য প্রত্যেক সচেতন পাঠককেই সচকিত করে তুলবে।

ইতিহাস বিষয়ক তিনটি প্রবন্ধই বিশেষ মূল্যবান। সামাজিক জীবনের স্থিতি, প্রগতি ও অবনতির ব্যাখ্যা হওয়া উচিত বৈজ্ঞানিক উপায়ে। অর্থাৎ মানুষ তার সমবেত চাহিদা ও চেষ্টার ফলে যে উপায়ে বহিঃপ্রকৃতিকে জয় করেছে বা জয় করতে চেষ্টা করেছে, তারই ইতিহাসের সাহায্যে। ইতিহাসরীতির এই সূত্র ধরেই প্রবন্ধকার পর পর তিনটি প্রবন্ধে দৃষ্টান্ত সহকারে আলোচনা করেছেন। ব্যক্তিগত সম্পত্তিজ্ঞান, উৎপাদনের ওপর একাধিপত্য এবং স্বার্থবুদ্ধি কমলে বিরোধের ক্ষেত্র সংকীর্ণ হবে। সেই সঙ্গে শ্রেণীও ব্যাপক হবে, সমাজের মধ্যে প্রসারিত হবে। তখন শ্রেণী-বিরোধের ভীষণতা থাকবে না। বিরোধ থাকবেই, কারণ বাধার মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাওয়াই বিশ্বচরাচরের নিয়ম। বিরোধের অবসানে বিশ্ব ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। অবশ্য, এ বিষয়ে সন্দেহ রয়ে গিয়েছে। যাই হোক, শ্রেণীবিভাগ তুলে দেবার কাজে সচেতন ভাবে এই বিশ্বশক্তিকে নিয়োজিত করাই ঐতিহাসিকের একমাত্র সামাজিক কর্তব্য। সমাজ-বিষয়ক এই প্রবন্ধগুলি পড়লে মনে হয়, ধূর্জটিপ্রসাদ যতটা সিদ্ধান্ত করেন, ততটা প্রয়োগ করেন না। অবশ্য এইটাই তাঁর চিন্তার স্বভাব।

সংস্কৃতি-চিন্তার প্রথমেই রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত আটটি প্রবন্ধ রয়েছে। রবীন্দ্রনাথের মতন মহাপুরুষের সঙ্গে অন্য দেশের মহাপুরুষের তুলনা থেকে প্রবন্ধকার তাঁর পাঠকবর্গকে নিরস্ত হতে বলেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, রবীন্দ্র সৃষ্টির প্রত্যেক নতুন অধ্যায়ের পূর্বেকার ইতিহাস হচ্ছে এই: যেই একটি রূপ ছাঁচ হয়ে উঠছে, আদিম জীবনশক্তির ভাণ্ডার থেকে তখনই নতুন রূপের প্রেরণা আসছে। অনবরত জীবনের কাছ থেকে শক্তি-আহরণই রবীন্দ্র সৃষ্টিপদ্ধতির মৌলিক বন্ধন। রবীন্দ্রনাথের ভাণ্ডার ছিল দু'টি। সামাজিক ক্ষেত্রে জনগণ, অর্থাৎ গ্রামের জনগণের জীবনধারা। আর আদর্শের ক্ষেত্রে, সনাতন ভারতীয় আধ্যাত্মিকতা। এই ভাবে প্রবন্ধকার রবীন্দ্র সৃষ্টির অতি উজ্জ্বল সূত্রটি নিপুণ ভাবে ধরিয়ে দিয়েছেন। 'রবীন্দ্র সমালোচনার পদ্ধতি' প্রবন্ধটিতে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে একদা যে অ-সাহিত্যিক সমালোচনা গড়ে উঠেছিল এবং এখনও উঠছে, সে সম্বন্ধে ধূর্জটিপ্রসাদ পাঠকদের খুব ভালো ভাবে সচেতন করে দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের কাব্যসঙ্গীত ও নাটকের ক্ষেত্রেও যে দুর্বল সমালোচনা দেখা যায়, তার প্রতিও লেখকের সজাগ দৃষ্টি এড়ায় নি। সমগ্রতাবোধের অভাবেই প্রবন্ধকারকে ভাবিয়ে তুলেছে। এই সমগ্রতাবোধ নিয়েই রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলারও আলোচনা করতে হবে। আবার রবীন্দ্র সঙ্গীতের আলোচনায় কথা ও সুরের প্রয়োজনীয়তা এবং ঐ সমগ্রভাবে রবীন্দ্র সঙ্গীতের ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা যে ভাবে ধূর্জটিপ্রসাদ বিশ্লেষণ করেছেন, তাতে শুধু সঙ্গীতরসিক মাত্রেই আনন্দিত হবেন। এ ছাড়া রবীন্দ্রনাথের জন্ম উৎসব উপলক্ষে দেশময় যে উচ্ছ্বাসের অদ্ভুত স্রোত বইছে, তার বিরুদ্ধে লেখকের আক্ষেপ প্রত্যেক বুদ্ধিমান বাঙালীরই আক্ষেপ। 'রবীন্দ্রনাথ আমাদের কাছে ভক্তিই পেয়ে গেলেন, শ্রদ্ধা পেলেন না'—এই উক্তি চার দফা ঘটনা আর যুক্তি দিয়ে তিনি যে ক্ষোভাত্মক সিদ্ধান্তে এনেছেন

তা মারাত্মক রকমের সত্য। এর পরে 'কবির নির্দেশ' নামক একটি দামী প্রবন্ধ। কবির প্রতি মৌখিক ভক্তিপরায়ণ পাঠক-সমাজ ও দেশবাসীর কাছে লেখকের মূল বক্তব্য হল—বাঙালীকে বাঁচতে হলে রবীন্দ্রনাথের পথে চলাই ভালো। এবং সে পথ কতদূর সৃষ্টিমূলক এবং জাতীয় উন্নতির প্রকৃত সহায়, কবির সত্যিকারের ইতিহাস-চেতনা এবং গঠন-প্রচেষ্টা থেকেই লেখক সে সত্য প্রমাণিত করেছেন। 'রবীন্দ্রনাথের রাজনীতি ও সমাজনীতি' প্রবন্ধে রাজনৈতিক রবীন্দ্রনাথকে ভারতীয় সমাজের পটভূমিতে রেখে দেখার মৌলিক চেষ্টা করেছেন ধূর্জটিপ্রসাদ। পরাধীন নিরন্ন রোগক্লিষ্ট ভিক্ষাজীবীর শ্রেণী যদি ভারতীয় সমাজবহির্ভূত না হয়, যদি তাদের প্রাণবান না করা পর্যন্ত ধর্মসাধনা অপূর্ণ থাকে, যদি তাদের মধ্যে মনুষ্যত্ববোধ জাগানো পলিটিক্‌সের প্রাণবস্তু হয়, তা হলে রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই পলিটিক্যন। জীবনের সমগ্রতা সাধনাই কবির ধর্ম এবং তার মধ্যেই তাঁর ইতিহাস-বোধ, সমাজ-চেতনা ও রাজনীতি-জ্ঞান।

পরবর্তী ভাগে সাহিত্যে বিশ্ববোধ এবং প্রগতিবোধ সম্বন্ধে দুটি চমৎকার প্রবন্ধ রয়েছে। স্বল্পায়তন প্রবন্ধ, কিন্তু তথ্য ও যুক্তির সুমিত মিশ্রণে বিন্দুতে সিন্ধু। 'বর্তমান সাহিত্যের মূল কথা' প্রবন্ধটি বক্তব্যের দিক থেকে বোধ হয় সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। বাঙলা সাহিত্য রবীন্দ্রযুগ ও রবীন্দ্রোত্তর যুগের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য, 'বর্তমান' কথাটির দ্যোতনা, সাহিত্য-সৃষ্টির স্মৃতিকেন্দ্র, ভাব ও অনুষঙ্গ প্রভৃতি মূল কথাগুলি ধূর্জটিপ্রসাদ যে সহজ অথচ গভীর করে বুঝিয়েছেন, তার জন্য বুদ্ধিমান পাঠক তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। আবার 'গদ্য কবিতা' প্রবন্ধে গদ্য কবিতা বিচারের মূল মানদণ্ডটিকে প্রবন্ধকার যে রকম স্পষ্ট করে বুঝিয়েছেন, তাতে প্রমাণ হয়, সাহিত্যে যুক্তিনিষ্ঠ বিচারের প্রতি তাঁর রুচি এবং অধীত অধিকার। তবে এই সব প্রবন্ধের মধ্যে 'আষাঢ়ে' রচনাটি শিল্পকর্ম হিসেবে আশ্চর্য সৃষ্টি। পাঠককে কখন যে আষাঢ়ের রসঘনতা থেকে দীপ্ত রৌদ্রে নিয়ে এসে তিনি বাঙালীর জীবন বুদ্ধি ও ভাবচর্চার আলোচনার আসর জমিয়ে তোলেন, তা টেরই পাওয়া যায় না। আলোচনার শেষে একটি বাক্যেই প্রবন্ধকার তাঁর প্রতিপাদ্যকে ব্যক্ত করেছেন: আমরা কবিতাই লিখি না, কবিতাও লিখি। 'সঙ্গীত-সমালোচনা' প্রবন্ধে বাঙলার গীতিকার ও গায়কদের আলোচনা করে ধূর্জটিপ্রসাদ আদর্শ সঙ্গীত-সমালোচকের পরিচয় দিয়েছেন। গীতিরূপ এবং গায়ন-পদ্ধতির নতুন নতুন রূপসৃষ্টিকে যিনি আনন্দে বরণ করে নিতে পারেন, তিনিই যথার্থ সমালোচক। তাঁর পক্ষে ওস্তাদ বা স্পেশ্যালিস্ট হবার প্রয়োজন নেই। সংস্কৃতি বিষয়ক প্রবন্ধগুলির মধ্যে 'অথ কাব্য-জিজ্ঞাসা' লেখাটি শুধু সব চেয়ে দীর্ঘ নয়, বোধ হয় সব চেয়ে সারবান। তেইশ বছর আগেকার এ রচনাটিতে সাহিত্য ও সমাজ সম্পর্কে ধূর্জটিপ্রসাদ যে অগ্রগামী চিন্তার পরিচয় দিয়েছিলেন, বর্তমান সময়ের পরিবেশও তা অম্লান। সাহিত্যে যে সমাজ-সত্তাকে আমরা প্রতিষ্ঠিত করতে চাই, সে সম্বন্ধে ঐতিহাসিক চেতনার প্রয়োজন। আর যে সেই সমাজ গড়বে, সেই বড় সাহিত্য সৃষ্টির সহায়তা করবে। 'অথ কাব্যজিজ্ঞাসা'র এই হল মৌলিক বক্তব্য এবং খাঁটি প্রগতির উক্তি। 'নতুন ও পুরাতন' প্রবন্ধটিতে সবুজ পত্রের যুগ ও পরবর্তী যুগের বৈশিষ্ট্য আলোচনার শেষে লেখক যেন বিদায় নিয়েছেন আমাদের কাছ থেকে। এক মুহূর্তে চোখের সামনে ভেসে উঠেছে চল্লিশ বছর আগেকার বাঙালী অধ্যাপক ও ছাত্রের জীবন-সংযোগ, স্পেশ্যালাইজেশন নয়—টোটাল বা পুরো মানুষ হয়ে ওঠার সাধনা, মনীষিজন সঙ্গমের সৌভাগ্য, রসগ্রাহী সাহিত্যচর্চা এবং বুদ্ধিবৃত্তির সানন্দ অনুশীলন।

'বক্তব্য' বইখানির এই হল মোটামুটি পরিচয়। প্রাবন্ধিক ধূর্জটিপ্রসাদের নানামুখী প্রতিভা বা ব্যক্তিত্ব প্রকাশের পূর্ণাঙ্গ পরিচিত নয়। তার জন্য স্বতন্ত্র গ্রন্থের প্রয়োজন এবং সে গ্রন্থ রচনার সময় এসে গেছে। তিনি যে একজন মস্ত 'ইনটেলেকচুয়াল' এই কথাই শুনে এসেছি। কিন্তু তাঁর অনন্ত সাহিত্যকর্মের ও সাহিত্য-ভাবনার যোগ্য বিচার ও শ্রদ্ধাশীল আলোচনার সময় কি আজও হয়নি? মনীষী স্বীকৃতির অপেক্ষা করেন না, এ কথা ঠিক। কিন্তু যে সমাজ ও সাহিত্যবোধে পুষ্ট একটি মানস বিশিষ্ট দান করে গেল চিন্তার ক্ষেত্রে, সে-ই সমাজ ও সাহিত্যের প্রতি পাঠক-সমালোচকদেরও একটা নৈতিক দায়িত্ব থাকা উচিত। এ বইখানি সম্বন্ধে শুধু এইটুকু বলতে চাই যে, এর বক্তব্যে কোথাও অব্যক্তি নেই। প্রতিটি বচন ও বাচন সুব্যক্ত, বিভিন্ন প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে অভিব্যক্ত। সে সব প্রবন্ধ 'পরিচয়' ইত্যাদি সাহিত্য-পত্রিকায় তুঙ্গ যুগের রচনা। কিন্তু ধূর্জটিপ্রসাদ চিন্তার স্বচ্ছতা, বলিষ্ঠতা—অর্থাৎ যা নিয়ে তিনি ধূর্জটিপ্রসাদ—সেই স্বচ্ছতা ও বলিষ্ঠতা এখনও সাহিত্যিকদের ও চিন্তাশীল পাঠকের কাছে অনুকরণীয়। তাঁর আশঙ্কিত সমস্যা এখনও আমাদের কাছে আশঙ্কিত। তাঁর দিগদর্শন এখনও আমাদের পক্ষে দিগদর্শন। 'বক্তব্য' গ্রন্থের পাতায় বিচিত্র নতুন চিন্তার স্বাদ। প্রত্যেকটি পরিমিত বাক্যে পরিচ্ছন্ন চিন্তার দ্যুতি। প্রত্যেকটি প্রবন্ধের পাকড় ও মুখবন্ধ, রচনার বাঁধুনি, উচ্ছ্বাসবর্জনের যুক্তি আর রসিকতার দীপ্তি যেমনি অনায়াস, তেমনি সজীব। চিন্তার আলোড়নে এবং মননশীল প্রকাশে মত ও ধারণার শুদ্ধ রূপটি প্রকাশিত। এ সব প্রবন্ধ পরিণত, রসোপেত। বার বার পড়তে হয়, তবেই ডালিমের দানার মতন চিবিয়ে তাদের রস গ্রহণ সম্পূর্ণ হয়।

আর একটি কথা। সবুজ পত্রের গোষ্ঠীভুক্ত এবং প্রমথ চৌধুরীর শিষ্য হলেও, ধূর্জটিপ্রসাদ তাঁর মননে ও ভাবণে বীরবলের সগোত্র নন। সাদৃশ্যটুকু আপাত চিন্তার গভীরতায়, যুক্তিমার্গের অকুণ্ঠ আশ্রয়ে, ঋজু রচনার অন্তর্নিষ্ঠ তাগিদে আর সিদ্ধান্তের সুস্পষ্টতায়, ধূর্জটিপ্রসাদ তাঁরই অধ্যাপক রামেন্দ্রসুন্দরের সমধর্মী। অর্থাৎ সত্যসন্ধানী প্রকৃত ব্রাহ্মণ এবং অভিজাত ব্রাহ্মণ। বিদ্যোদয় লাইব্রেরী, ৭২ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা—৯। মূল্য পাঁচ টাকা।

উল্লেখযোগ্য সাম্প্রতিক বই

রাধা

অষ্টাদশ শতাব্দী এক-চতুর্থাংশ তখন সবে অতিক্রম করে এসেছে। বাঙলায় তখন নবাবী আমল। মসনদে সমাসীন সুজাউদ্দীন। বাঙলাদেশের পথে-প্রান্তরে তখন শান্তি ও সমৃদ্ধির বিজয়-বৈজয়ন্তী, নর-নারীর মন তখন কানায় কানায় ভরে আছে প্রাচুর্যে। ইলামবাজার সেদিন একটি বর্ধিষ্ণু অঞ্চল। বৈষ্ণব

সন্ন্যাসীদের জেষ্ঠা-নৈষ্ঠীদের মিলনতীর্থ। কৃষ্ণদাসী আর মোহিনী মা আর মেয়ে সেই সঙ্গে মাধবানন্দকে কেন্দ্র করে এই উপন্যাসের আখ্যায়িকা রচনা করেছেন বর্তমান বাঙলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। যে যুগের ঘটনা নিয়ে এই কাহিনী গঠিত—সেই যুগের পূর্ণাঙ্গচিত্র লেখক এখানে তুলে ধরেছেন তাঁর গ্রন্থে। উপন্যাস এবং ইতিহাসকে সমান গতিতে পরিচালিত করে নিয়ে গেছেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। ভাষার স্বতঃস্ফূর্ততায় এবং বর্ণনার রসপূর্ণ মাধুর্যে উপন্যাসটি বিশেষ রমণীয় হয়ে উঠেছে। প্রকাশক—ত্রিবেণী প্রকাশন, ১০ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট। দাম—সাত টাকা মাত্র।

দ্বন্দ্বমধুর

বাঙলা সাহিত্যের আঙিনায় সৈয়দ মুজতবা আলী এবং রঞ্জনের পদচিহ্ন বিশেষ ভাবে প্রকটমান। গতানুগতিকতার মুখে কুঠারাঘাত করে যুগের নবীনত্বানুসারী এক বলিষ্ঠ চেতনা নিয়ে এই দুই শক্তিধর সাহিত্যস্রষ্টার আবির্ভাব। এঁদের সাহিত্যকে কেন্দ্র করে যে দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায় বাঙালীর মানসলোকে তার প্রভাব অনামান্য। শ্রীকানাইলাল সরকার বর্তমানে যুগ্মভাবে এঁদের একখানি গল্পগ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। "দ্বন্দ্বমধুর" শীর্ষক এই গ্রন্থে গল্পগুলি সজীবতায় ও শ্রেষ্ঠত্বে ভরপুর। প্রতিটি গল্প লেখকদের সর্বজনস্বীকৃত পাণ্ডিত্যের ছাপ বহন করে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠেছে। জেণ্টলম্যান এবং ইংরেজী রসিকতা গল্প দু'টি বিশেষ ভাবে পঠিতব্য। মণি গল্পের মধ্যে দিয়ে লেখকের মনীষার মধ্যে দিয়েও পরম মোহনীয় একটি দরদভরা মনের সন্ধান পাওয়া যায়। প্রকাশক—ত্রিবেণী প্রকাশন, ১০ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট। দাম—তিন টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা মাত্র।

জীবন-জাহ্নবী

দীর্ঘকাল ধরে অপরিসীম সেবার দ্বারা যাঁরা বাঙলা সাহিত্যকে পুষ্ট করে এসেছেন, তাঁদের মধ্যে অনায়াসে করা যায় রামপদ মুখোপাধ্যায়ের নাম। তাঁর সাম্প্রতিকতম গ্রন্থ "জীবন-জাহ্নবী"। স্বপ্ন, সংঘাত, সৃষ্টি এই নিয়েই গঠিত জীবন। এরাই জীবনকে পরিচালিত করছে তার গন্তব্যের অভিমুখে অর্থাৎ পূর্ণতার সাগরসঙ্গমে। শুধু আজকের দিনের বললে ভুল হয়, সুদূর অতীতে যে জীবন আমরা ফেলে এসেছি অতীতের যে সব জীবন আজ ইতিহাস হয়ে বেঁচে আছে, তারাও এই স্বপ্ন-সংঘাত আর সৃষ্টিতে পুষ্ট। এই তিনের মধ্যেই জীবনের পরিচয় পূর্ণতা ও বিকাশ। কয়েকটি চরিত্রকে কেন্দ্র করে এই সত্যই এখানে উদ্‌ঘাটিত করেছেন লেখক রামপদ মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক—মিত্র ও ঘোষ, ১০ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট। দাম—সাড়ে ছ' টাকা মাত্র।

আজকের পশ্চিম

পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ মহাশয় শুধু রাজনীতির ক্ষেত্রে নয়, পাণ্ডিত্যের দরবারেও একজন সুপরিচিত স্বনামধন্য পুরুষ। কিছুকাল আগে তিনি পশ্চিম পরিভ্রমণ করেছেন ও যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন তাই লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন উপরোক্ত গ্রন্থে কন্যা শ্রীমতী সাধনা বিশ্বাসের সহযোগিতায়। বর্তমান কালে বিশেষ করে দু'টি মহাযুদ্ধের ধাক্কা খেয়ে সংখ্যাতীত সমস্যায় নিজেকে জড়িয়ে রেখে পশ্চিম কি ভাবে এগিয়ে যাবে—কেমন ভাবে তার শিক্ষা দীক্ষা জীবনধারণের প্রণালী রূপলাভ করছে সে বিষয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র অঙ্কন করেছেন ডাঃ ঘোষ। এই গ্রন্থে ব্রিটেন, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, পশ্চিম-জার্মাণী, হল্যাণ্ড, সুইজারল্যাণ্ড, ফ্রান্স, ডেনমার্ক, সুইডেন ও ফিনল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশগুলি সম্বন্ধে আলোচনা স্থানলাভ করেছে। কয়েকটি আলোকচিত্রের সংযোজন এই গ্রন্থের শোভাবর্ধন করেছে। অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রে এই গ্রন্থপাঠে উপকৃত হবেন, এ বিশ্বাস আমরা রাখি। প্রকাশক, এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানী, ১৩ মহাত্মা গান্ধী রোড। দাম চার টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা মাত্র।

দ্বীপের নাম টিয়ারঙ

একটি দ্বীপের নাম টিয়ারঙ। সেই টিয়ারঙকে কেন্দ্র করে আনন্দ-বেদনা, ঘাত-প্রতিঘাতের সংযোজনায় উপন্যাস রূপ দিয়েছেন নবীনকালের যশস্বী কথাশিল্পী রমাপদ চৌধুরী। মানুষের জীবনের উত্থান-পতন কামনা-বাসনার সঙ্গে একটি দ্বীপের সংযোগ কতখানি বা তার সঙ্গে সাদৃশ্য কোথায়, এই পটভূমিকায় লেখনীর মাধ্যমে একটি অপূর্বচিত্র অঙ্কনে সমর্থ হয়েছেন রমাপদ চৌধুরী। বন্ধন থেকে মানুষ চায় মুক্তি, মুক্তি থেকে ফিরে যেতে চায় বন্ধনে, মানুষের আত্মা এই আদিম অতৃপ্তির চিরন্তন ধারক ও বাহক। বিশাল সমুদ্রের মাঝে একটি দ্বীপ, সেই দ্বীপের স্বতন্ত্র কাহিনী স্বতন্ত্র ইতিহাস ঠিক তেমনই মানুষের জীবনে মুক্তির সীমাহীন সমুদ্রের মাঝখানে যেন দেখা যায় বন্ধনের মত ক্ষুদ্র একটি দ্বীপ। তার চিন্তাধারা তার মনের কথা, তার না বলা বাণী সবই যেন স্বাতন্ত্র্যের পরিচায়ক। জীবন-দর্শনরূপী মুকুরের সাহায্যে মানুষের জীবনের সঙ্গে সমুদ্র ও দ্বীপের নিবিড় যোগাযোগের যে চিত্র প্রতিফলিত হচ্ছে, নিখুঁতভাবে রমাপদ চৌধুরীর লেখনীর দ্বারা সেই সত্যই সাহিত্যক্ষেত্রে চিত্রিত হয়েছে। রমাপদ চৌধুরীর বর্ণনাভঙ্গী ঘটনাবিন্যাস চরিত্র সৃষ্টি প্রশংসনীয়। দ্বীপের নাম টিয়ারঙ সুবোদ্ধা পাঠক-সমাজে একটি রসঘন পুলকানুভূতির সঞ্চার করবে। প্রকাশক আভেনীর ২৩৮-বি, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ ১১। দাম—তিন টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা মাত্র।

বর্ষাবিজয়

বাণী রায়ের কবিখ্যাতি বহুজনের কাছে সুবিদিত, এ কথা কারোরই অবিদিত নয়। কিন্তু কেবলমাত্র কবিতার ক্ষেত্রেই তাঁর উপস্থিতি নয়, গল্প-উপন্যাসের ক্ষেত্রেও তাঁর অবাধ এবং স্বচ্ছন্দ গতিবিধি। বর্ষাবিজয় তাঁর কতকগুলি ছোট গল্পের সংকলন। গল্পগুলি বিশেষ ভাবে সুপাঠ্য, চিত্ত আকর্ষণ করার যোগ্যতা রাখে এবং কাহিনী-বৈচিত্র্যে ও বিন্যাসের কল্যাণে সমুজ্জ্বল। বর্ষাবিজয় একটি মহতী মৃত্যু, হে মহানগরী, বড় মিস্ত্রীর ছোট মেয়ে পারুল

প্রভৃতি গল্পগুলি বিশেষ ভাবে উপভোগ্য এবং যুগোপযোগী বলিষ্ঠ বক্তব্য বহন করে। প্রকাশক—মিত্র ও ঘোষ, ১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম তিন টাকা মাত্র।

মধ্যরাতের তারা

স্বনামধন্যা লেখিকা প্রতিভা বসুর নবতম উপন্যাস মধ্যরাতের তারা। একটি পুরুষ ও দু'টি মেয়েকে কেন্দ্র করে গল্প। আলো আর অন্ধকার যে সমান ভাবে তাল রেখে জীবনের সঙ্গে চলছে, সেই দিকে লেখিকা এই উপন্যাসের মাধ্যমে আলোকপাত করেছেন আর এই আলো-আঁধারির মধ্যে যে বিরাট জীবন-জিজ্ঞাসা একটি বিশাল স্থান অধিকার করে আছে আর তার প্রশ্নের যথাযথ উত্তর সন্ধানে মানব সমাজ দিশা হারিয়ে ফেলছে; সেদিকেও যথেষ্ট ইঙ্গিতের আভাস পাওয়া যায় এই গ্রন্থে। শ্রীসুবোধ দাশগুপ্তের আঁকা প্রচ্ছদ চিত্রটিও যথেষ্ট তাৎপর্য্য বহন করে। প্রকাশক—এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম তিন টাকা পঁচিশ নয়া পয়সা মাত্র।

দিল্লীর ডাকে

বহু বাঙালীর বাসে মুখর-গুঞ্জনে ভরে আছে রাজধানী দিল্লী। বলতে গেলে, বাঙালীদের নিয়ে দিল্লীতে একটি পৃথক সমাজই গড়ে উঠেছে। এই দিল্লীবাসী বাঙালীদের কেন্দ্র করে সুখ্যাত সাহিত্য-শিল্পী বিক্রমাদিত্যের "দিল্লীর ডাকে" রচনা। রমেন, সুনীল, মাধবী, অমল বাবু, সুজাতা, সুবিনয়, মিসেস লাহা প্রভৃতি চরিত্রগুলির মাধ্যমে দিল্লীর বাঙালী-সমাজকে লেখক পরিচিত করে তুলেছেন বাঙলার পাঠক-সমাজের সঙ্গে। প্রথমোক্ত সমাজের ভাবধারা, চালচলন, আচার-ব্যবহার যথাযথ ফুটিয়ে তুলতে লেখক দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। সুনীল ও মাধবী চরিত্র দুটির সুরূপায়ণের জন্য লেখক ধন্যবাদ দাবী করতে পারেন। কাহিনীর মধ্যে মধ্যে ইতিহাসের পুলক স্পর্শ উপন্যাসটিকে উপভোগ্য করে তুলতে বহুল পরিমাণে সহায়তা করেছে। প্রকাশক—মিত্র ও ঘোষ, ১০ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট। দাম—সাড়ে তিন টাকা মাত্র।

পঙ্কজা

পঙ্কজা উপন্যাসে এক ভিখারিণী কন্যার বিচিত্র জীবনধারার কাহিনী সুনিপুণ ভাবে চিত্রিত হয়েছে। রাস্তার ভিক্ষাজীবী কয়েকটি কিশোর-কিশোরীর চরিত্র এত জীবন্ত যে লেখকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আর অনন্যসাধারণ দৃষ্টিভঙ্গীর কথা পর পর স্মরণ করিয়ে দেয়। নীচের তলার মানুষের প্রেম আর প্রাণের বিশালতায় তার শুদ্ধি এ উপন্যাসের সাহিত্য-সম্পদ। প্রতিষ্ঠিত ঔপন্যাসিক স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এ উপন্যাসখানি পাঠক-সমাজে আদৃত হবে বলে আশা করি। প্রকাশক সাহিত্য জগৎ। কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা।

হ-রে-ক-র-ক-ম-বা

মাসিক বসুমতীতে ইতঃপূর্বে ধারাবাহিক প্রকাশিত চিত্র ও বিচিত্র ও বর্তমানে প্রকাশমান অন্ত ও প্রত্যহ-র রচয়িতা নীলকণ্ঠের নতুন বই: হ-রে-ক-র-ক-ম-বা পয়লা বৈশাখ প্রকাশিত হয়েছে। বিস্ময়কর ভঙ্গিমায় বিরচিত অপ্রিয় সত্য নীলকণ্ঠের সাহিত্য-সৃষ্টির প্রথম ও প্রধান পরিচয়। এই পরিচয়ের মহিমাই নীলকণ্ঠকে একটি বিশিষ্ট কণ্ঠস্বর এবং একটি বিচিত্র ব্যক্তিত্ব দান করেছে। তাঁর রচনার মধ্যে দিয়ে একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বাদের সৃষ্টি সাহিত্যে হয়েছে অভিনন্দিত। হ-রে-ক-র-ক-ম-বা'-য় বুদ্ধির দীপ্তির হৃদয়হারী সহানুভূতির সজীবতার সোনায় সোহাগা যোগ করেছে। কোথাও উত্তেজক, কোথাও উজ্জ্বল, কোথাও প্রাণবন্ত পরিমণ্ডল রচনায় উদ্দীপ্ত। তাঁর প্রথম গ্রন্থ চিত্র ও বিচিত্র-র চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশের অপেক্ষায়। তাঁর অন্যান্য প্রকাশিত পুস্তকের নাম—তারা তিন জন, বসন্ত কেবিন, ননীগোপালের বিয়ে; জীবনরঙ্গ। হ-রে-ক-র-ক-ম-বা'য় তাঁর সাম্প্রতিকতম প্রকাশ। দাম: আড়াই টাকা! প্রকাশক: বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলিকাতা বারো।

ত্রিধারা

বর্তমান কালে নবীন সাহিত্যিকদের মধ্যে সমরেশ বসুর নাম সবিশেষ পরিচিত। সমরেশ বসুর "ত্রিধারা" উপন্যাসটিও তাঁর পাঠক-পাঠিকার কাছে অপরিচিত নয়। স্রোতের মত জীবনও বয়ে চলেছে! হাজার-হাজার ঘটনা কাহিনী স্মৃতির আকারে থেকে যাচ্ছে জীবন-নদীর উভয় তীরে। বর্তমান সমাজকে কেন্দ্র করে তার ত্রিবিধ গতিকে অবলম্বন করে উপন্যাসটি রচিত। অসংখ্য ধারার মধ্যে থেকে বিশেষ ধরণের তিনটি ধারাকে অবলম্বন করে এই উপন্যাসের সম্প্রসারণ। লেখকের ভাষার জড়তা কিন্তু এখনো মুক্ত হয়নি। সমরেশ বাবু যে চরিত্রগুলির অবতারণ করেছেন, সেগুলির প্রত্যেকটিই স্বকীয়তা এবং স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী। চরিত্রগুলি যথেষ্ট পরিমাণ তাৎপর্য বহন করে। প্রকাশক—ক্যালকাটা পাবলিশার্স, ১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম আট টাকা মাত্র।

যে আঁধার আলোর অধিক

খ্যাতিমান কবি বুদ্ধদেব বসুর আধুনিকতম কাব্যগ্রন্থ। লখাই চণ্ডাই নামের অভ্যন্তরে বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়ার যে সম্ভাবনা ছিল, বুদ্ধদেব বসু তার বিপরীত রূপই প্রদর্শন করেছেন এই গ্রন্থের কবিতাগুলির মধ্যে। ছোট বড়ো পঞ্চান্নটি কবিতার মধ্যে অধিকাংশই আনন্দবর্দ্ধক ও কাব্যরসলালিত্যে ভরা। নতুন দেখায় ও নতুন করে দেখানোর ক্ষমতায় কবি শক্তিধর। যুক্তির ফাঁকনিতে ফাঁকা আর অনুভূতির গভীরে ডুব দেওয়া কবিতাগুলির মধ্যেও জটিলতা পাঠকের দুর্গতি সৃষ্টির কারণ হয় নি। শিল্পী সৌরেন সেনের আঁকা রঙীন প্রচ্ছদপটটি বিচিত্র ও অদ্ভুত। চিত্রিত বিষয়ের মধ্যে পারমাটোজা না প্রোটো প্লাজম, ডিম্বাণু না ভ্রূণ তা একমাত্র জীববিজ্ঞাবিশারদরাই বলতে পারবেন। এস, সি, সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২ হইতে প্রকাশিত। মূল্য ২।০
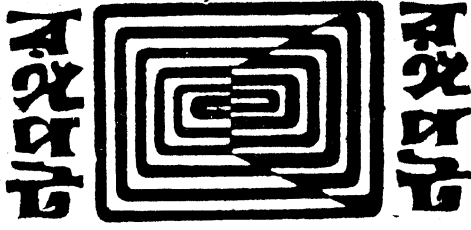
কালামাটি

বিগত পাঁচ বছরের মধ্যে বাঙলা ছায়াছবিতে আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের গল্প ও উপন্যাসের রূপায়ণ—যেন এক আশ্চর্য্যকর ঘটনা! এ যাবৎ বাঙলা ছবির রেওয়াজ ছিল সেকেলে মামুলী কাহিনীকে যেন তেন প্রকারেণ দর্শকচক্ষে হাজির করা। কয়েক জন বাঙালী পরিচালক এখনও এই পন্থাই অনুসরণ করছেন। ফলে তাঁরা প্রতিভার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও রুচিশীলদের কাছে আর কলকে পাচ্ছেন না। আবার দেখা যাচ্ছে, দ্বিতীয় শ্রেণীর পরিচালকদের হাতে এযুগের গল্প ও উপন্যাস বেশ ভাল ভাবেই উৎরে যাচ্ছে। বলতে বাধা নেই, এই সব ছবি বক্স অফিসকেও মাৎ করছে। ছবি হিট হচ্ছে। সম্প্রতি মুক্তিপ্রাপ্ত বাঙলা ছবি 'কালামাটি' আমাদের চিত্রশিল্পের এক অভিনব সংযোজন। সুদক্ষ সাহিত্যিক রমাপদ চৌধুরীর 'বিবিকরজ' নামক বিখ্যাত গল্পের পটভূমিকায় পরিচালক তপন সিংহ 'কালামাটি' ছবিখানি সৃষ্টি করেছেন। কয়লাখনির কুলীদের এক সমস্যা, তাদের শিশু-সন্তানের দল। মা আর বাবা কাজে চলে যায়, শিশুরা কোথায় থাকবে তার কোন স্থিরতা নেই। অথচ পদে পদে বিপদের সম্ভাবনা খনি-অঞ্চলের প্রত্যেকটি কেন্দ্রে। খনির মালিক বেবী-ক্রেশ বা শিশুরক্ষণকেন্দ্র স্থাপিত করলেন, কিন্তু কুলীর দল সেদিকে দৃক্‌পাত করতে চায় না। বেবী-ক্রেশ যেন তাদের কাছে এক বিস্ময়। এ-হেন পরিস্থিতিতে শিশুরক্ষার ভার নিয়ে চাকরী করলে অনুপমা—যার স্বামী পঙ্গু এবং একমাত্র কন্যা 'মনু' যার একমাত্র আকর্ষণ এই পৃথিবীতে। খনির ওয়েলফেয়ার অফিসার জ্যোতির্ময়ের কুনজর পড়লো অনুপমার প্রতি। কিন্তু কোন সাড়া মিললো না বিপরীত পক্ষ থেকে। এই অপমানের প্রতিহিংসায় জ্যোতির্ময় আর প্রেমিক থাকলো না, ভীষণ এক জন্তুর রূপ ধারণ করলো। ষড়যন্ত্র পাকালো নানা উপায়ে। ওদিকে দাম্পত্য জীবনে অসুখী অ্যাসিষ্টাণ্ট ম্যানেজার অনুপমার পোড়াভাগ্য সত্ত্বেও তাকে সুখী দেখে তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়। পরিচারিকা মরিয়মও অনুপমাকে শ্রদ্ধা করে। ফুরসৎ পেলেই নাগরের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করে। অনুপমার মেয়ে মনুর সঙ্গী-সাথী বলতে ইঞ্জিনিয়ার মুখার্জ্জী ছাড়া কেউ নেই। মরিয়মের প্রেম কুলীবস্তীতে খুনোখুনি বাধিয়ে তোলে। 'কালামাটি' নানা ঘাত-প্রতিঘাতের এক বেদনাকরুণ ছবি। বাঙলার 'কালোমাটি' কয়লার কালিমায় কত যে সুখ দুঃখ ব্যথা বেদনা হাসি আর অশ্রু লুকিয়ে আছে 'কালামাটি' না দেখলে জানা যাবে না। কিছুকাল পূর্ব্বে 'হাউ গ্রীন ওয়াজ মাই ভ্যালী' কলকাতায় প্রদর্শিত হয়। 'কালামাটি'র আলোকচিত্রে এই ছবিখানির চিত্র-প্রভাব স্থানে স্থানে বেশ নজরে পড়লো। অভিনয়ে প্রথমেই সাধোবাদ করতে হয় অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়ের। 'পঞ্চতপা'র সমগোত্রীয় বলেও অনুপমার চরিত্র দর্শকমনে আসন পেয়েছে। অনুপকুমার, অসিতবরণ, জহর রায়, ভানু বন্দ্যো, জীবেন বসু নিজ নিজ সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। ইঞ্জিনিয়ার মুখার্জ্জীর অভিনয় বেশ সহজ এবং স্বাভাবিক। 'কালামাটি'র চিত্ররূপদানে পরিচালক তপন সিংহ যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখালেন আবার। ছবির সঙ্গীত পরিচালনা গতানুগতিকতার ধারে কাছে যায়নি। পণ্ডিত রবিশঙ্করকে এজন্য ধন্যবাদ জানাই।

অযান্ত্রিক

সর্ব্বাধুনিক বাঙলা সাহিত্যের জনক সুবোধ ঘোষের 'অযান্ত্রিক' গল্পটি বাঙলা গল্প-সাহিত্যের একটি মূল্যবান সম্পদ বলা যায়। পাত্র-পাত্রী নায়ক-নায়িকা প্রায় সকল গল্পেই থাকে, কিন্তু মানব জীবন ছাড়া আরও এমন অনেক কিছু আছে—যাদের জীবন আছে কিন্তু তারা মানুষের মত বুদ্ধির জোরে স্বয়ং চালিত নয়। যেমন মোটর গাড়ী। বিজ্ঞানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবদান মোটর—যার অশ্বশক্তিতে চলছে কত শত বিরাট বিরাট কল-কারখানা, জলসেচ, ইত্যাদি। এই মোটরযান 'জগদ্দল' অযান্ত্রিক ছবিখানির আসল অভিনেতা। 'জগদ্দল' বুড়িয়ে গেছে বয়সের প্রাচুর্য্যে, লোলচর্ম্ম বৃদ্ধের মত নড়বড়ে তার আকৃতি। যখন তখন এটা সেটা যন্ত্র বিকল হয়ে পড়ে। চলতে চলতে থেমে যায়। আবার থেমে গেলেও হঠাৎ দৌড়তে শুরু করে। কিন্তু যে চালায় জগদ্দলকে, সেই বিমল থেকে থেকে বিব্রত হয়ে উঠলেও সত্যি সত্যিই অন্তর থেকে ভালবাসে বুড়ো জগদ্দলকে। ছোটনাগপুরের একটি ছোট সহরের পটভূমিতে অযান্ত্রিক কাহিনীর রচনা। পরিচালক ঋত্বিক ঘটক বিভিন্ন প্রতীকের মাধ্যমে ছবিখানির আদ্যোপান্ত গড়ে তুলেছেন। পরিচালকের দৃষ্টিকোণ, শিল্পনৈপুণ্য প্রশংসনীয়। বিমলের চরিত্রে কালী বন্দ্যোপাধ্যায় অসামান্য ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। অন্যান্য ভূমিকায় কাজল চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমান দীপক, কেষ্ট মুখোপাধ্যায়, তুলসী চক্রবর্ত্তী, গঙ্গাপদ বসু, সীতা মুখোপাধ্যায়ের অভিনয় উল্লেখযোগ্য। চিত্র এবং সঙ্গীত পরিচালনায় যথাক্রমে দীনেন গুপ্ত এবং ওস্তাদ আলী আকবর খাঁ দর্শকচিত্তকে জয় করবে সন্দেহ নেই।

বিশ্বরূপা

গত ৮ই জুন বিশ্বরূপা রঙ্গমঞ্চের তৃতীয় বার্ষিক প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে মহাসমারোহে এক উৎসবের আয়োজন করা হয়। এই উৎসবে বিভিন্ন বৈদেশিক দূতাবাসের প্রধানগণ মঞ্চের উপর উপবিষ্ট ছিলেন। অনুষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ সম্মানিত আসনসমূহ অলঙ্কৃত করেন নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নির্মলকুমার সিদ্ধান্ত, শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য প্রমুখ সুধিবৃন্দ। এই উৎসবে মাননীয় অতিথিগণের পদার্পণ উপলক্ষে তাঁদের সম্মানার্থে পরবর্ত্তী বৃহস্পতিবার ছুটি ঘোষণা করা হয় অর্থাৎ ঐ দিন সাধারণ অভিনয় বন্ধ রাখা হয়। বিশ্বরূপার কর্ণধারদ্বয় শ্রীদক্ষিণেশ্বর সরকার ও তাঁর অনুজ শ্রীরাসবিহারী সরকার সমাগত অতিথিবৃন্দের আদর আপ্যায়নের প্রতি যথোচিত যত্নবান ছিলেন।

রঙ্গপট প্রসঙ্গে

ভারতের প্রতিটি প্রাণীর চিরবন্দিত মহাকাব্য রামায়ণের অংশবিশেষ চিত্রায়িত হচ্ছে প্রফুল্ল চক্রবর্তীর পরিচালনায়। আলোক চিত্রায়ণের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন রমেন পাল। ইতিহাসবন্দিত রামায়ণিক চরিত্রগুলি রূপায়ণের ভার গ্রহণ করেছেন নীতীশ মুখোপাধ্যায় অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, অসীমকুমার, জহর রায়, গৌর শী, পদ্মা দেবী, সুপ্রিয়া চৌধুরী দেবযানী প্রভৃতি শিল্পীরা। * * শিশু সাহিত্যের পাঠক-পাঠিকাদের কাছে বাণভট্টের লেখা "লালুভুলু" কাহিনীর নাম অজানা নয়। এই কাহিনীর চিত্রায়িত হচ্ছে অগ্রদূতের পরিচালনায় এবং উল্লেখিত চরিত্রগুলি রূপ পাচ্ছে শ্রীমান সুখেন ও পরেশ ঘোষ তৎসহ অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, শিশির বটব্যাল শোভা সেন, কাজল চট্টোপাধ্যায়, কমলা মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির অভিনয়ে। * * বোম্বাইয়ের ছবির বাজারে বাঙলার বিজয় পতাকা দৃপ্ত গৌরবে সকলের সামনে তুলে ধরেছেন অশোককুমার (কুমুদলাল গঙ্গোপাধ্যায়)। সুদীর্ঘকাল ধরে অপ্রতিহত সম্মানের সঙ্গে সারা ভারতের চিত্রামোদীদের আনন্দের খোরাক জুগিয়ে চলেছেন সাতচল্লিশ বছর বয়স্ক এই বাঙালী শিল্পীটি। বাঙলা ছবির বাজারেও ইনি আগন্তুক নন। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সুর সংযোজিত "ছুটি" ছবিটিতে তাঁকে অভিনয় করতে দেখা যাবে। ঐ ছবিতে অশোককুমার ছাড়াও পাহাড়ী সান্যাল অনুপকুমার, শোভা সেন, সুমিত্রা দেবী, অনীতা গুহ প্রভৃতিকেও দেখা যাবে উপরোক্ত ছবিতে অভিনয় করতে। * * সুরেন্দ্ররঞ্জন সরকার পরিচালিত রোমাঞ্চ ছবিটির মাধ্যমে অভিনয় দেখতে পাওয়া যাবে নীতীশ মুখোপাধ্যায়, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, আশীষকুমার, নবকুমার, শিশির মিত্র, সবিতা বসু, অপর্ণা দেবী প্রভৃতি শিল্পীদের। * * সাহিত্যিকা বাণী রায়ের 'কৈফিয়ৎ' কাহিনীর চিত্ররূপ দিচ্ছেন চিত্র-পরিচালক অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়। এতে অভিনয়ের জন্যে নির্বাচিত হয়েছেন জহর গঙ্গোপাধ্যায়, রবীন মজুমদার, দীপক মুখোপাধ্যায়, সন্ধ্যা বন্দ্যোপাধ্যায়, রণজিৎ দে, প্রণতি ঘোষ, বাসবী নন্দী, সুব্রতা সেন প্রভৃতি।

হয়তো পাবো

মায়া মুখোপাধ্যায়

একটা অচেনা সুরের মত
সম্পূর্ণ উপলব্ধি না হয়েও তুমি মধুর !
আমার জীবনে তুমি রহস্যময়ী প্রশ্ন,
তবু মনে হয় পাবো এ প্রতীক্ষার উত্তর।
একদিন হারাবে তার রঙীনতা ;
তবু সে রাঙিয়ে যাবে অবুঝ মনকে,
যে জানে কোন দিনই পাবে না তোমাকে।
তোমাকে দেখব সুদূর থেকে
ঘুমন্ত নদীর বুকে দূরগামী নৌকোর মত,—
যার পালের ভিজে বাতাসে
ভিজবে না কোন দিনই শুকনো মনের পাতা ;
কাঁপবে না কোন দিনই অবশ দেহের স্নায়ু !
তবু এ চেয়ে থাকা হয়তো হবে না ভুল ;
অতীন্দ্রিয় অনুভূতির লোকে হয়তো পাবো তোমাকে
হাজার বছরের পরের কোনো এক আশ্চর্য্য সন্ধ্যায়।
হাজার বছরের অ-ধারা রূপকে
অপরূপ করবো সেদিন মনের অলকায়।
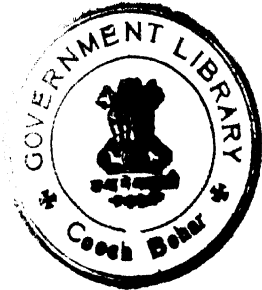
বাঙ্গালা আবার সবার মাঝে যোগ্য আসন পাবে

"পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদে রাজ্যে প্রধান-সচিব বলিয়াছেন—'আমার বিশেষ আশা আছে, নিন্দুকরা যাহাই কেন বলুন না— এই যে পশ্চিমবঙ্গ যাহার সহিত আমার ভবিষ্যৎ জড়িত—ইহা উন্নতির পথেই অগ্রসর হইবে এবং ভারতের রাজ্যসমূহের মধ্যে তাহার যোগ্য আসন গ্রহণ করিবে।' আমরা কেবল যে প্রধান-সচিব মহাশয়ের এই উক্তির পুনরুক্তি করিতেছি তাহাই নহে—তাঁহার উক্তির জন্ত তাঁহাকে অভিনন্দিতও করিতেছি। সময় সময় তাঁহাদিগের সহিত আমাদিগের মতভেদ হইয়াছে এবং তাহা অনিবার্য্য। কিন্তু আমাদিগের এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই যে, তিনি তাঁহার ব্যক্তিগত স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া রাজ্যের কোন কাজ করেন নাই। কোন রাজ্যকে সমুন্নত ও সমাদৃত করিলে প্রধান-সচিবের তাহাতে যে গৌরব, সে গৌরব অর্জনের স্পৃহা ব্যক্তিগত হইলেও নিন্দনীয় নহে।"

—দৈনিক বসুমতী।

নৃশংস হত্যা

"কম্যুনিষ্ট বিচার-ব্যবস্থায় নিষ্ঠুর প্রহসন এখন আর কাহারও অজানা নাই। ষ্টালিনের উত্তরাধিকারী ও শিষ্যরাই সেই নৃশংস হত্যালীলার অগণিত গোপন কাহিনী প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। আবার তাঁহারাই এক নূতন রক্তাক্ত ইতিহাস রচনা সুরু করিয়াছেন ষ্ট্যালিনী পদ্ধতিতে। যে অবস্থায় যে ভাবে হাঙ্গেরীর ভূতপূর্ব্ব প্রধানমন্ত্রী ইমরে নেগী ও তাঁহার তিনজন সহচরকে হত্যা করা হইয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ পড়িলে শিহরিয়া উঠিতে হয়, মানবধর্মের এই চরম লাঞ্ছনা ও অপমানে অপরিসীম ক্ষোভ ও ঘৃণার উদ্রেক হবে। আদালতে রীতিমত বিচারে অপরাধী প্রতিপন্ন হইলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রাণদণ্ড হয়। কিন্তু ইমরে নেগী ও তাঁহার সহচর তিন জনকে সভ্য জগতের রীতিসম্মত পদ্ধতিতে গ্রেপ্তার করা হয় নাই, বিচার করা হয় নাই। তাঁহাদিগকে সুপরিকল্পিত ভাবে হত্যা করা হইয়াছে; সুবিচার দূরের কথা, তাঁহাদের বিচারই হয় নাই। তথাকথিত "গণ-আদালতে" গোপনে তাঁহাদের বিচার হইয়াছে বলিয়া মস্কো হইতে যে খবর প্রচারিত হইয়াছে, তাহা অন্ধ কম্যুনিষ্ট সমর্থকেরা ছাড়া কেহই বিশ্বাস করিবেন না। পূর্বাপর সমস্ত ঘটনা স্মরণ করিলে স্পষ্টই দেখা যাইবে, ইমরে নেগী ও তাঁহার সহচর তিন জনকে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া জল্লাদের হাতে সমর্পণ করা হইয়াছে।"

—আনন্দবাজার পত্রিকা।

দস্যু দমন চাই

"পশ্চিমবঙ্গের পূর্বসীমান্ত হইতে আর একটি হামলার খবর আসিয়াছে। মাত্র কয়েক দিন পূর্বে—নদীয়া-মুর্শিদাবাদ সীমান্তে অবস্থিত এক চরে প্রচুর ধান জন্মিয়াছিল। সুতরাং নদীর ওপার হইতে এই শস্যপূর্ণ চরটি পাকিস্তানীদের প্রলুব্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। এক দিন প্রায় দুই শত পাকিস্তানী কৃষক দশখানি নৌকায় চড়িয়া এবং প্রায় কুড়িজন সশস্ত্র পাকিস্তানী পুলিশসহ আলোচ্য চর হইতে জোর করিয়া ধান কাটিয়া লইবার জন্ম দ্রুত আসিতে থাকে। ইতিমধ্যে খবর পাইয়া চরের নিকটস্থ ভারতীয় সীমান্তে অবস্থিত কয়েকটি গ্রাম হইতে প্রায় পাঁচ শত ভারতীয় মুসলমান (যাহারা ঐ চরে কৃষিকার্য করে) আক্রমণকারীদিগকে বাধা দিবার জন্ম চরে সমবেত হয়। অধিকন্তু, নিকটবর্ত্তী সীমান্তরক্ষী ভারতীয় পুলিশও আগাইয়া আসে। ইহা দেখিয়া পাকিস্তানী দস্যুরা ব্যর্থমনোরথ হইয়া অবিলম্বে পলায়ন করে। একটি কারণে এই ঘটনাটি বিশেষ লক্ষ্য করার মত। কারণ, সীমান্তে যাহা অহরহ ঘটিয়া থাকে তাহা এইরূপ—পাকিস্তানীরা ছোট কিম্বা বড় দলে সমবেত হইয়া আমাদের সীমান্তের কোন ধানক্ষেতে কিম্বা গ্রামের উপর হামলা করিল এবং স্বচ্ছন্দে নিজেদের ইচ্ছামত জিনিষপত্র লুঠতরাজ করিয়া, সেই সঙ্গে কতকগুলি গরু-মহিষ এবং দু-একটা মানুষও লইয়া হে-রে-রে-রে করিতে করিতে চলিয়া গেল। গ্রামবাসীরা কিম্বা সীমান্তরক্ষী বলিয়া কথিত পুলিশ যে যাহার ঘরে বসিয়া থাকিল। দিন কয়েক পরে খবরের কাগজে খবরটা ছাপা হইল। আলোচ্য ক্ষেত্রে পাকিস্তানীরা যে জুলিয়াস সিজারের মত 'আসিলাম, দেখিলাম, জয় করিলাম' নাটকের অভিনয় করিতে পারে নাই, ইহা খুবই ভরসার কথা। পশ্চিমবঙ্গের পূর্বসীমান্তের অন্ত সকল স্থানের অধিবাসীরা এবং সীমান্ত পুলিশ যদি এই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করে, তবে পাকিস্তানীদের দস্যুবৃত্তি আপনা হইতেই কমিয়া আসিবে।"

—যুগান্তর।

বিধান সভার আরাম

"বাহিরে প্রচণ্ড গরম, তাই বিধান সভার সভ্যেরা শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত সভাকক্ষে ঘণ্টাখানেক আগে হইতে আসিয়া হানা দেন এবং সহজে নড়িতে চান না। কিন্তু সময় কাটে কি করিয়া? কিরূপে তাঁহারা সময় কাটান তাহা দেখিতে গেলাম। দেখিলাম, স্পীকার মহাশয় হাতের উপর মাথা রাখিয়া আসনে বসিয়াই দিবানিদ্রা উপভোগ করিতেছেন। মন্ত্রীদের ভিতর কবির লড়াই সুরু হইয়া গিয়াছে, একজন কবিতা লিখিয়া আর একজনকে পাঠাইতেছেন এবং তিনি কবিতায় তার জবাব লিখিয়া ফেরৎ দিতেছেন। মহিলা সভ্য সোয়েটার বুনিতেছেন। বিরোধী দলের প্রথম সারির নেতারা হেমদা'র দপ্তর হইতে তাম্বুল সংগ্রহ করিয়া আয়েস করিয়া চিবাইতেছেন এবং ফাঁকে ফাঁকে নাক ডাকাইয়া লইতেছেন। উভয়

পক্ষের ইতরজনেরা অর্থাৎ পিছনের বেঞ্চের উপবেশকেরা ছোট ছোট দলে বদ্ধ হইয়া রসালো আলোচনা জুড়িয়া দিয়াছেন। সিনেমা হইতে ধর্মঘট পর্য্যন্ত কিছুই বাকি নাই। যে হতভাগ্যের যখন বক্তৃতার পালা আসিতেছে সে বেচারী মাইকের সামনে দাঁড়াইয়া তারস্বরে চীৎকার করিতেছে, শুনিতেছে শুধু টেপ রেকর্ডার।"—যুগবাণী।

প্রচার বিভাগের প্রতি

"কুটিরশিল্প-প্রচারে সরকার যে সকল সহায়তা করিতেছেন, জনসাধারণ তাহা ভাল ভাবে জানিতেই পারিতেছে না। এ বিষয়ে প্রচার বিভাগের খুবই ক্রটি। অবিলম্বে মফঃস্বলের সংবাদপত্রগুলিতে ইহার বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশের ব্যবস্থা করা উচিত। কলিকাতার দৈনিকে খবর দিলে কাজ সারা হয় সত্য, কিন্তু কাজ করিতে হইলে মফঃস্বলের পানেই দৃষ্টি দিতে হইবে।"

—পল্লীবাসী কালনা।

মাছের ভেজাল

"করিমগঞ্জ বাজারে এখন ওজনদরে মাছ বিক্রয় হইতেছে। মূল্য নিয়ন্ত্রণের কোন উপায় না থাকায় ওজনের মাছও অত্যধিক মূল্য দিয়াই ক্রেতারা ক্রয় করেন। আজকাল আবার বাজারে পচা মাছেরই আধিক্য। পৌরস্বাস্থ্য বিভাগ পচা মাছ সম্বন্ধে যথোচিত ব্যবস্থা করিলে জনসাধারণ উপকৃত হইবে।—শ্রীহট্টের এক সংবাদে প্রকাশ, মাছের ভিতর নাকি কীটও পাওয়া যাইতেছে এবং একত্র অনেকে মাছ খাওয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন। করিমগঞ্জবাসীও এই বিষয়ে অবহিত হউন।" —যুগশক্তি (করিমগঞ্জ)।

বিচারকের অভাব

"বর্দ্ধমান আদালতে ফৌজদারী মামলা বিচারের জন্ত পাঁচ জন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন, কিন্তু কিছু দিন যাবৎ উহা কমিতে কমিতে মাত্র একটিতে দাঁড়াইয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা কর্ম্মঠ হাকিম শ্রীপি, নস্করকে ২৬শে মে হঠাৎ বদলী করা হইয়াছে। শ্রীডি, পি, ঘোষাল ছুটিতে আছেন। ফলে ভাল মানুষ হাকিম শ্রীবি, কে, ব্যানার্জী সবে ধন নীলমণি হইয়া যাবতীয় ফৌজদারী মামলার চাপে অস্থির হইয়া পড়িয়াছেন। জনসাধারণের হয়রাণীর অন্ত নাই। আমরা জিজ্ঞাসা করি, এই দারুণ বেকারীর যুগে হাকিমের এত দুর্ভিক্ষ কেন? সরকার কি ক্রমে ক্রমে বিচার উঠাইয়া দিবার পরিকল্পনা করিয়াছেন? কংগ্রেসী শাসনে দেশ রামরাজত্বে পরিণত হইতে চলিয়াছে, ইহা কি তাহারই নিদর্শন?" —দামোদর।

বাঙালীর স্থান নেই

"পশ্চিমবঙ্গের দুর্গাপুরে বাঙ্গালীদের কাজ জুটিতেছে না বলিয়া অভিযোগ আমরা ইতিপূর্ব্বেও শুনিয়াছি। দুর্গাপুর বাঙ্গালীর বেকার সমস্তা সমাধানের সহায়তা করিবে বলিয়া গোড়ার দিকে শুনিতে পাওয়া গিয়াছিল। বিধান সভায় বিরোধী দলের নেতা শ্রীজ্যোতি বসু অভিযোগ করিয়াছেন যে, দুর্গাপুরে শতকরা ৮১ জনই অবাঙ্গালী নিযুক্ত হইতেছে। সরকার কংগ্রেসী দল হয়ত বলিতে পারেন যে ইহাও বামপন্থী চক্রান্ত। বামপন্থী দল বাঙ্গালী যুবকদের চাকুরী লইতে অনুপ্রাণিত করিতেছে না। কলিকাতার দমকল চাকুরীর ইতিবৃত্তের পরও এরূপ কথা কংগ্রেসের মুখে প্রকাশ পাইলেও আমরা বিস্মিত হইব। স্বর্গ হইতে মর্ত্ত্য বহু দূর। স্বর্গরাজ্যের অধিবাসিগণ এত খবর রাখেন না।" —ত্রিস্রোতা (জলপাইগুড়ি)

শিবপুরে মধুচক্র

"পশ্চিমবঙ্গে বোটানিক্যাল গার্ডেনে যে পাকিস্থানী 'মধুচক্র' আছে, যাহা ভারতের বিরুদ্ধে একটি গভীর ষড়যন্ত্রের আড্ডা বলিয়া সন্দেহ করা হইতেছে, তাহার সম্পর্কে দ্বিতীয় দফায় একটি বিবরণ গত ৩-৬-৫৮ তারিখে আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। আনন্দের কথা এই যে, ডাঃ রায় স্বয়ং উদ্যোগী হইয়া তদন্ত করাইতেছেন। কিন্তু তদন্তকারী অফিসার যে আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে তদন্তের ফলে, উক্ত মধুচক্র ভাঙ্গিবে কিনা সন্দেহ হইতেছে। বহু উচ্চপদস্থ হিন্দু রাজকর্ম্মচারীও উহার সহিত জড়িত আছেন। ইহাপেক্ষা লজ্জা ও ঘৃণার বিষয় আর কি হইতে পারে? আশা করি, ডাঃ রায় এখনই মধুচক্রের আড্ডাধারীকে অন্ততঃ সাসপেণ্ড করিবেন এবং কঠোর হস্তে চক্রটি ভাঙ্গিয়া দিয়া দুষ্কৃতকারীদের শাস্তি দিবেন। ইহা না করিলে একদিন পূর্ব্বভারতে অকস্মাৎ বিপদ আসিতে পারে।" —মেদিনীপুর হিতৈষী।

ভীড় ঠেকাও

রাষ্ট্রসংঘের পরিসংখ্যান হইতে দেখিতেছি, বিশ্বের লোকসংখ্যা প্রতি ঘণ্টায় ৫,৪০০ এবং বৎসরে ৪ কোটি ৭০ লক্ষ করিয়া বৃদ্ধি পাইতেছে এবং বর্ত্তমান শতাব্দী শেষ হওয়ার পূর্ব্বে এই জনসংখ্যা বর্ত্তমান লোকসংখ্যা অর্থাৎ ২৭৩ কোটি ৭০ লক্ষের দ্বিগুণ হইবে। ৩১ মে রাষ্ট্রসংঘের ১৯৫৭ সালের জন্ম পরিসংখ্যান ইয়ার-বুকে এই তথ্য লিপিবদ্ধ হইয়াছে যে ২০ বৎসরে লোকসংখ্যা প্রায় এক-চতুর্থাংশ বৃদ্ধি পাইয়াছে। বর্ত্তমানে প্রতি এক হাজারে জন্মের হার হইতেছে ৩৫, মৃত্যুর হার ১৮। লোকসংখ্যায় এশিয়া অগ্রগামী এবং প্রতি বৎসর এশিয়ার জনসংখ্যা ২ কোটি ৪০ লক্ষ বৃদ্ধি পাইতেছে। নানাবিধ দুর্ঘটনায় অথবা সংঘর্ষে বা রোগে মানুষের মৃত্যুর হার যতই ভয়াবহরূপে বাড়িয়া চলুক, দেখা যাইতেছে জন্মহার প্রায় তাহার দ্বিগুণ সংখ্যায় ক্ষতিপূরণ করিয়েছে। এরূপ ক্ষেত্রে বর্ত্তমানের বেকার সমস্যা শিক্ষা-সমস্যা প্রভৃতি নানাবিধ সমস্যার সমাধান কল্পে "অধিক খাদ্য ফলাও" "অধিক কর্ম্মসংস্থানের ব্যবস্থা" ইত্যাদি যত পরিকল্পনাই রূপায়িত হোক না কেন, "জন্মনিয়ন্ত্রণ" ব্যতীত সমস্যা-বর্জ্জিত অবস্থার সম্ভাবনা সম্ভব নহে।"

—আসানসোল হিতৈষী।

দেনা-পাওনা

"দেশ স্বাধীন ও ত্রিপুরার ভারতভুক্তির পর হইতে এই পর্য্যন্ত চাকুরী ব্যপদেশে, ত্রিপুরার বাহির হইতে বহুলোক এখানে আসিয়াছেন এবং গিয়াছেন। কিন্তু আজ যদি তাঁহাদের এখানকার দেনা-পাওনার হিসাবটা বিচার করিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, চাকুরী বা সেবার (?) মাধ্যমে তাঁহারা ত্রিপুরাকে যাহা দিয়াছেন, তাহার তুলনায় অনেক বেশী তাঁহারা বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা ও প্রমোশন ইত্যাদি দ্বারা লইয়া গিয়াছেন। বস্তুতঃ এই রাজ্যটা হইয়া পড়িয়াছে যেন বহিরাগতদের প্রমোশনের একটা

প্লাটফরম। ছোট, বড় যে কোন কর্ম্মচারী বাহির হইতে এখানে আসেন কিছুদিন চাকুরী করার পর তাহারা এক একটি প্রমোশন লইয়া এখান হইতে চলিয়া যান ; কিন্তু চাকুরীর মাধ্যমে যে কাজের বিনিময়ে তাহারা সেই প্রমোশন পান, তাহার কথা না তোলাই ভাল। প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, কোন কাজ না করিয়া বা কার্য্যে কোন কৃতিত্ব না দর্শাইয়াই কি তবে সংশ্লিষ্ট কর্ম্মচারিগণ প্রমোশন লাভ করেন ? কিন্তু এই প্রশ্নের জবাবে জিজ্ঞাসা করা যায় যে, তাঁহাদের কর্ম্মতৎপরতা বা কৃতিত্বের বিচার কে করিবে ? কাগজে-পত্রে বা সরকারী তথ্যাদিতে তাঁহাদের কর্ম্মদক্ষতার একটা বিবরণ লিপিবদ্ধ হয় বটে এবং সম্ভবতঃ উহারই ভিত্তিতে তাহাদের প্রমোশন হইয়া থাকে। কিন্তু সেই বিবরণের সত্যতা যাচাই করা হয় কি? অথবা এমনও হইতে পারে যে, সভ্য জগতের বহির্ভূত এই ত্রিপুরা রাজ্যে বহিরাগতদের কয়েকটা বৎসর অবস্থান করাও একটা কৃতিত্বের পরিচায়ক এবং তন্মূলেই তাঁহাদের প্রমোশনও হইয়া থাকে।"

—সমাচার (ত্রিপুরা)

শোক-সংবাদ

আচার্য স্যার যদুনাথ সরকার

ভারতীয় ইতিহাসের প্রখিতযশা গবেষক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব উপাচার্য এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রাক্তন সভাপতি আচার্য স্যার যদুনাথ সরকার গত ৫ই জ্যৈষ্ঠ আকস্মিক ভাবে ৮৮ বছর বয়েসে পরলোকগত হয়েছেন। এশিয়াটিক সোসাইটির সম্মানিত সদস্যের এবং বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্যের আসনও এঁর দ্বারা অলঙ্কৃত। ঐতিহাসিক গবেষণার ক্ষেত্রে যদুনাথ এক অনাস্বাদিতপূর্ব যুগান্তর এনেছেন। ভারতে মোগল সাম্রাজ্য এবং শিবাজী সম্পর্কে এঁর মৌলিক গবেষণা ও বহু অবলুপ্ত তথ্যের উদ্ধারসাধন এক জাতীয় গর্বের বস্তু। প্রথম জীবনে ইনি ইংরাজীভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপকরূপে কর্মজীবন সুরু করেন। ঢাকা ও পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় এঁকে সম্মানাত্মক "ডি-লিট" উপাধিতে ভূষিত করেন। ঐতিহাসিক প্রাচীন লিখনসমূহের রস আহরণার্থে বহু ভাষাও ইনি আয়ত্তে আনেন। যদুনাথের তিরোধানে বাঙলা দেশের এক দিকপাল বর্ষীয়ান মনীষীর অভাব ঘটল।

শশিভূষণ দে

বিখ্যাত দাতা ও সমাজহিতৈষী রায়বাহাদুর শশিভূষণ দে গত ৭ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার দেহত্যাগ করেছেন ৯১ বছর বয়েসে। সমাজ-সেবার ক্ষেত্রে এঁর নাম চিরদিন স্মরণীয় হয়ে থাকবে। জীবনে অসংখ্য দুঃখীর দুঃখমোচন কল্পে বহু লক্ষ টাকা ইনি ব্যয় করেছেন। এ ছাড়াও বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠান এঁর অর্থে পরিপুষ্ট হয়ে দেশের ও দশের উপকার সাধন করে চলেছে।

রবীন্দ্রচন্দ্র দেব

কলকাতার বর্তমানকালের জীবিত জ্যেষ্ঠ য্যাটর্নী ও ইনকরপোরেটেড ল' সোসাইটির সভাপতি রবীন্দ্রচন্দ্র দেব ৯ই জ্যৈষ্ঠ ৭৩ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। ১৯০৫ সালের স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে ইনি ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত ছিলেন এবং দীর্ঘ দিন ধরে অপরিসীম দক্ষতার সঙ্গে আইন ব্যবসায়ে যুক্ত ছিলেন। ইনি ঠনঠনিয়ার বিখ্যাত দেববংশে জন্মগ্রহণ করেন।

ডাঃ তাপসকুমার বসু

বাঙলার প্রখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ তাপসকুমার বসু শুক্রবার ৩০শে জ্যৈষ্ঠ মাত্র ৫০ বছর বয়সে আকস্মিক ভাবে লোকান্তরিত হয়েছেন। জীবনের অর্ধাংশব্যাপী চিকিৎসা কর্মে লিপ্ত থেকে ইনি প্রভূত যশের অধিকারী হন। আর-জি-কর মেডিক্যাল কলেজের ইনি সহকারী তত্ত্বাবধায়ক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট গ্রাজুয়েট কলেজ অফ মেডিসিনের অন্যতম প্রবক্তা ছিলেন। ডাঃ বসুর এই আকস্মিক এবং অকাল-তিরোধান বাঙলার চিকিৎসাক্ষেত্রে বিপুল ক্ষতি সাধন করিল।

চণ্ডীপ্রসাদ ঘোষ

খড়দহ ঘোষ-পরিবারের ৺শশিভূষণ ঘোষের তৃতীয় পুত্র চণ্ডীপ্রসাদ ঘোষ ১২ই চৈত্র স্বগৃহে ৭৩ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। প্রথম মহাযুদ্ধে তিনি ইউরোপ আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করেন। ১৯১৫ সালে রাজা পঞ্চম জর্জ্জ কর্ত্তৃক আমন্ত্রিত দ্বাদশ জন ভারতীয় সামরিক অফিসারদের

মধ্যে অন্যতম হিসাবে চণ্ডীপ্রসাদ বাকিংহামে রাজপ্রাসাদে কিছুকাল অবস্থান করেন। মৃত্যুকালে তিনি বিধবা স্ত্রী, তিন ভ্রাতা, তিন পুত্র, তিন কন্যা, দুই জামাতা ও নাতি-নাতিনী রাখিয়া গিয়াছেন। ইংল্যাণ্ডে শিক্ষাপ্রাপ্ত অন্যতম প্রথম ভারতীয় ডাক্তার ৺ভোলানাথ বসু তাঁহার মাতামহ ছিলেন।

সম্পাদক—শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক
কলিকাতা, ১৬৬নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "বসুমতী রোটারী মেসিনে" শ্রীতারকনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

"বিদেশী কুকুরপ্রীতি কেন?"
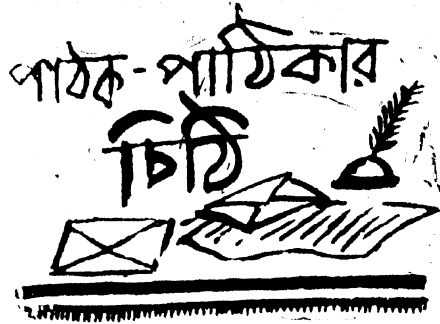
মাসিক বসুমতীর গত ফাল্গুন, চৈত্র ও বৈশাখ সংখ্যাগুলির "পাঠক-পাঠিকার চিঠি" কোরামে উপরোক্ত শিরোনামায় দুই ভগিনী শ্রীমতী মালা ঘোষচৌধুরী ও লীলা চট্টোপাধ্যায়ের পারস্পরিক বাক্য-বিনিময়ের মাধ্যমে যথেষ্ট উত্তপ্ত আবহাওয়া এবং উত্তেজনা প্রকাশ পেয়েছে। অথচ মেয়ে হিসেবেই বলছি, তাঁদের এরকম উষ্ণতা প্রকাশ করার কোন কারণ ছিল না। আজকের আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির রাজনৈতিক কোলাহল নিয়ে তাঁরা সেই কোলাহলেরই পুনরাবৃত্তি করেছেন, তাই সে সম্বন্ধে মন্তব্য করতে এবং বক্তব্য পেশে বিরত রইলাম। তার কারণ একাধিক এবং প্রধান হল যে তাতে হয়ত এ কোলাহল কোন্দলে দাঁড়াবে। সেই জন্তে শুধুমাত্র ভারত প্রসংগে দু'টি অভিযোগের উত্তর দেব ভারতের মেয়ে হিসেবে; সমালোচনার ভয়ে নয়, সমালোচনাটা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নয় বলে। ভগিনীদের বলে রাখা ভালো যে'কোন রাজনৈতিক দলের সভ্যা আমি নই। এ কথা বলছি এই কারণে যে তাঁরা আমাকে হয়ত অহেতুক সন্দেহ পোষণে অবিচার করতে পারেন।

প্রথম কথা, ভারত পেটের জন্তে ঝুলি হাতে বেরিয়েছে এ কথা সূর্যের মত সত্য, কিন্তু সে ঝুলি ভিক্ষার নয়। তার কারণ হল ভিক্ষা যে করতে আসে সে গরিব সন্দেহ নেই, কিন্তু কোন দিন বড়লোক হয়ে সে সেই ভিক্ষা ফিরিয়ে দেবে বলে আসে না এবং যে দেয় সে-ও ফিরে পাবে বলে ভিক্ষা দেয় না কোন দিন। বর্তমান প্রসংগে ভারতকে কি সেই ভিখারী স্তরে ফেলা যাবে, বরং এর বিপরীতটাই নয় কি? মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা, সোভিয়েট রাশিয়া, জাপান, জার্মাণী প্রভৃতি শিল্পোন্নত দেশসমূহ ভারতকে অর্থনৈতিক সাহায্য দিচ্ছে সে কি তারা ফিরে পাবে না বলে? ঋণ দেওয়ার পূর্বে উন্নতদেশগুলি অনুন্নতদেশ সমূহের অর্থনৈতিক কাঠামো—তার পোটেন্‌শলটি অর্থাৎ সাধ্য মিলিয়ে খুব বিবেচনা করে যে দেশ অদূর ভবিষ্যতে তার ঋণ শোধ করতে পারবে কি না। তারপর চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর হয়। ভারতের ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম অবশ্যই হয় না।

অনুন্নত দেশকে উন্নত করার জন্তে ভারত আজ সাংগঠনিক কাজে নেমেছে। সেজন্তেই পাঁচশালা পরিকল্পনা, এত আয়োজন, এত কৃচ্ছ্রসাধন। কলম্বো প্ল্যানের বাইরে এবং উপরের দেশগুলি ছাড়াও ভারত আজ সাহায্য নিচ্ছে নরওয়ে, সুইটজারল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, অষ্ট্রিয়া, ফ্রান্স, রুমানিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া, যুগোস্লাভিয়া প্রভৃতির কাছ থেকে শুধু অর্থকরী নয় কারিগরীও। এ ছাড়াও আছে I. B. R. D. এবং World Bank। এ শুধু আজকের ভারতের পেটপুরণের জন্তে নয়, আগামীকালের ভারতবাসীর উন্নতজীবনের জন্তে। দেশকে উন্নত করতে হলে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা যে কত দ্রুত ফল দেয় সোবিয়েট য়ুনিয়ন তা বিশ্বকে দেখিয়ে দিয়েছে। এর আগে যে পরিকল্পনার কথা অন্তান্ত দেশে অজানা ছিল তা নয়, সোবিয়েটই প্রথম তার বিস্তৃততাকে রূপ দেয়। আর একথা সকলের জানা, আশা করি, যে কমিউনিষ্ট জগতের বাইরে অকমিউনিষ্ট ভারত প্রথম পাঁচশালা পরিকল্পনায় নিজেকে নিয়োগ করে। এবং এই পরিকল্পনার সুষ্ঠু প্রয়োগ করতে হলে external এবং internal resources-এর প্রয়োজন ভারতে এই দুই resources-এর মধ্যে বিরাট ফাঁক (gaps আছে যা ঐ দুই ক্ষেত্র থেকেই তুলতে হবে। এটা প্রত্যেক গরীব দেশেরই resources-এর অভাবের প্রতিবিম্ব—যার জন্তে দেশের অভ্যন্তর থেকে পরিকল্পনার রূপ দেওয়ার খুব বেশি টাকা তোলা যায় না এবং ক্যাপিটাল ফরমেশনের জন্তে বিদেশী সাহায্য প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। তাই এ কাজ শুধু কংগ্রেস পার্টি কেন, শাসনভার যে কোন পার্টির হাতে এলেই তারা এ কাজ করতে বাধ্য থাকত, না হলে বোঝা যেত দেশের কল্যাণ তারা চায় না। তাই শ্রীমতী মালা ঘোষচৌধুরী কংগ্রেসী শাসনকর্তাদের নির্লজ্জ কেন বলেছেন বুঝতে পারলাম না। নির্লজ্জের যে সংজ্ঞা আমার জানা আছে তাতে এর অর্থ পরিষ্কার হল না, শ্রীমতী ঘোষচৌধুরী পরিষ্কার করবেন কি?

শ্রীমতী ঘোষচৌধুরী আন্তর্জাতিক রাজনীতি নিয়ে যেখানে মাথা ঘামান—অন্ততঃ চেষ্টা করেন সেখানে আশা করি ভারতের এবং বহির্ভারতের ইকনমিক জার্ণাল ও অন্তান্ত পত্রিকা পড়ে থাকেন। সেই আশাতেই তাঁকে বলি যে ভারতের এই বৈদেশিক সাহায্য ব্যাপারে দেশের এবং বিদেশের বিশেষ করে ইংল্যাণ্ডের দৈনিকগুলোর অধিকাংশ (যেমন ডেলি এক্সপ্রেস, ডেলি মেল, ডেলি টেলিগ্রাফ প্রভৃতি) ভারতের বিরুদ্ধে যে প্রচারকার্য্য করে সে সেই সাবেকী সাম্রাজ্যবাদী গাত্রদাহ। প্রভাবশালী পত্রিকা অবজারভার নিরপেক্ষ দৃষ্টি নিয়ে কাশ্মীর-সমস্যার আলোচনা করে থাকে এবং ভারত-প্রসংগে লিখে থাকে যে ভারতের টাকার প্রয়োজন কারণ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সাফল্যমণ্ডিত করতে সে পঞ্চপরিকল্পনা যাতে ১৯৬১ সালে জীবনযাত্রার মান শতকরা ১৫ ভাগ বৃদ্ধি পায় এর বিনিময়ে ভারতবাসীরা সবরকম ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত

...র জন্যে যে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি কর বসিয়েছে এবং ...মন কি গান্ধীজী যার পরম বিরোধী ছিলেন সেই লবণকর তারা ...সিয়েছে। তবে এ-ও ঠিক, ভারত টাকা ভিক্ষা চাইছে না। ...রত সমুদয়তা চান না, সহযোগিতা চায়; বৃটেনকে চায় Partner রূপে, Patron রূপে নয়। ভারতের সাফল্য মানে ...শিয়ায় গণতন্ত্রের সাফল্য, আগামীকালের পৃথিবীকে নতুন পথ ...বং নতুন আশার আলো দেখাবে ভারত।

দ্বিতীয় কথা, শ্রীমতী মালা ঘোষচৌধুরী অভিযোগ করেছেন: ...ংগ্রেসের উচ্চমহলের বিদেশী কুকুরপ্রীতি অত্যন্ত প্রকট। ...মনওয়েলথভুক্তি ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

আমার মনে হয় শ্রীমতী ঘোষচৌধুরীর বিদেশীদের কুকুর সম্বোধনে ...লীনতায় বাধা উচিত ছিল প্রথমেই। বাংলাভাষায় কি অন্য ...ব্দের অভাব ছিল, না বিদেশীদের প্রতি প্রীতি জিনিষটা কি সত্যিই ...র্হ? তাহলে বিশ্বভ্রাতৃত্ব, বিশ্ব ফেডারেশন প্রভৃতির যে স্বপ্ন ...দেখা হয় এবং যার প্রাথমিক রূপ পেয়েছে রাষ্ট্রসংঘ—সে সব তো ...নিন্দনীয়। আর কংগ্রেসের উচ্চমহলের যে কথা তিনি আবিষ্কার ...রেছেন সেটা যদি সত্যিই থাকে তবে তার খানিকটা দেশের জন্যে ...বং বাকিটা বিশ্বশান্তির খাতিরে। কিন্তু ভারতের অপর দুই প্রধান রাজনৈতিক দল যে দলীয় স্বার্থের জন্যে বিদেশীদের সংগে যোগাযোগ রেখেছে এ সংবাদ কি তাঁর অজানা?

ভারতের কমনওয়েলথভুক্তি "বিদেশী কুকুরপ্রীতির" দৃষ্টান্ত আদপেই নয়। কমনওয়েলথের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে দেশে বিদেশে অনেক আলোচনা তর্ক হয়ে গেছে। এই ঠাণ্ডা অনুষ্ঠানসর্বস্ব সম্মেলনের অর্থ জিজ্ঞাসা করা হয়েছে। কিন্তু কমনওয়েলথ অব নেশনস আজ কমনওয়েলথ ক্লাব নাম নিতে চলেছে একটা আন্তর্জাতিক সংস্থা হিসাবে। সামরিক আঁতাত এটা নয়, বন্ধুত্বের এবং প্রীতির সম্মেলন এটা। এখানে নেই কোন বাধ্যবাধকতা, আইনের কড়াকড়ি। এর সদস্যসংখ্যাও বেড়ে চলেছে, ঘানা যোগ দিয়েছে এবং আরও অনেকেই যোগ দেবে বলে আশা করা যাচ্ছে। সকল ধর্ম বর্ণ কর্মের এ এক বিচিত্র সম্মেলন। তাই ভীষণ কনজারভেটিব মন ইংল্যাণ্ডে মাথা তুলেছে; সাদার সংগে তামাটে আর কালোর মিলন—সে যে বড় ভীষণ। সাদার তলায় কালো থাকতে পারে, কিন্তু তামাটেগুলোর (অর্থাৎ ভারত, সিংহল, পাকিস্তান এবং মালয়) সংগে বেড়ানো, তাদের আদেশ উপদেশ শোনা—সে যে অতি ভয়ংকর! কিন্তু কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া এর চরম বিরোধিতা করেছে। ভারতের বিদেশী কুকুরপ্রীতি সত্যিই যদি প্রকট হয় তাহলে গত ১৯৫৬ সালে সুয়েজ ক্রাইসিসের সময় Head of the Commonwealth, ইংল্যাণ্ডকে ভারত কি তীব্র নিন্দা করে নি? হাঙ্গেরীর ব্যাপারে সোবিয়েটকে নিন্দা করে নি, মধ্যপ্রাচ্যের জটিলতাবৃদ্ধির জন্যে যুক্তরাষ্ট্রকে নিন্দা করে নি? কমনওয়েলথ প্রসংগ যখন এসেছে তখন ভারতের পররাষ্ট্রনীতির কথা অনিবার্য ভাবে এসে পড়ে। ভারতের পররাষ্ট্রনীতি কি বিদেশীদের মতানুসারে চলে অথবা বিদেশীদের মন যুগিয়ে চলে। ...র দৃষ্টান্ত যদি অভিযোগে স্পষ্ট উল্লেখ থাকত আলোচনার সুবিধে ...ত তাহলে। ভারত কমনওয়েলথে যেমন আছে তেমন সে কমিউনিষ্ট অকমিউনিষ্ট রাষ্ট্রসমূহের সংগে পঞ্চশীলে জড়িত। কমনওয়েলথ একটা যৌথ পরিবারের মত, কখন ভাঙবে কেউ বলতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ মেনন তো ঘোষণা করেছেন: পারস্পরিক স্বার্থ ও সাহায্য নিয়ে এ বেঁচে আছে। আপাততঃ ভারত গভর্ণমেন্টের এ সংঘ ছেড়ে দেওয়ার সম্ভাবনা নেই। তবে বনিবনা না হলে এবং স্বার্থে আঘাত লাগলেই আমরা অবশ্যই ছেড়ে দেব।

বৈপ্লবিক বুলি অনেকেই আউড়ে থাকেন, শুনতেও সেগুলো খারাপ লাগে না। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে কমনওয়েলথকে যাঁরা বিচার করেন একটা ধীর বিপ্লবের সুর তাঁরা এতে পান বৈ কি। শান্তির জন্যে আণবিক শক্তির ব্যবহারে কমনওয়েলথের বৈজ্ঞানিকরা যে মিলিত হচ্ছেন সেটা কি তার অসাফল্য, আর ভারতের কংগ্রেস পার্টির কমনওয়েলথ ঘেঁসা-নীতি একান্তই বর্জনীয় এবং স্বাদেশিকতার পরিচয়?

কিছুকাল আগে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী ভারত সফর করে গেছেন। লণ্ডনের এক সভায় তিনি বক্তৃতা প্রসংগে বলেছেন: "In India he had seen something of the practical significance of the Five year Plan, which was so important not only to India itself but also to the Commonwealth as a whole. Britain has already done a great deal to help India and would continue to give all the help it could within its means. * * *We have given our help in full measure under the Colombo Plan. One of the great obstacles facing the Asian Commonwealth Countries was the shortage of technologists and scientists. For this reason, the U. K. had concentrated its main effort under the Plan on providing technical assistance to the Asian partners in the Commonwealth." মিঃ ম্যাকমিলানের এ কথা শোনার পরও কি বলা যাবে যে কমনওয়েলথভুক্তি আমাদের কংগ্রেসের উচ্চমহলের বিদেশী কুকুরপ্রীতির প্রকৃষ্ট উদাহরণ?—শ্রীঅনীতা হাজরা বোঁড়শো, পোঃ—সড্যা, বর্ধমান।

পত্রিকা সমালোচনা

১৩৬৫ সালের বৈশাখ সংখ্যা মাসিক 'বসুমতী'তে প্রকাশিত 'মুরারি ঘোষ' মহাশয়ের প্রবন্ধ এক দুই তিন সম্বন্ধে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। শ্রীযুক্ত ঘোষ এক স্থলে লিখিয়াছেন: 'মহাক্ষৌণী হোল ১-এর পেছনে ৫৩টা শূন্য $-১০^{৫৩}$. আবার অপর এক স্থলে লিখিয়াছেন: 'অসংখ্যেয় হোল আমাদের জ্ঞাত সবচেয়ে বড় সংখ্যা: $১০^{১৪০}$, দশ এর পেছনে একশো চল্লিশটা শূন্য।" কিন্তু তাহা কি করিয়া সম্ভব। ১০-এর পেছনে একশো চল্লিশটা শূন্য অর্থাৎ ১-এর পেছনে একশো একচল্লিশটা শূন্য। অতএব অসংখ্যেয় $১০^{১৪১}$, হয় না। কাজেই উদ্ধৃতিটা হইবে এক এর পেছনে একশো চল্লিশটা শূন্য বা দশ এর পেছনে একশো উনচল্লিশটা। গাণিতিক পরিসংখ্যানে একটা শূন্যের সহায্যে মান বহুল পরিমাণে কমিয়া বা বাড়িয়া যায়। শ্রীশ্যামাপ্রসাদ চটরাজ। বাঁকুড়া।

গ্রাহক-গ্রাহিকা হইতে চাই

আমার নতুন বছরের (১৩৬৫) মাসিক বসুমতীর চাঁদা ৭।০ পাঠাইলাম।—Tripti Basu, Nayagaon, Model Houses, Lucknow.

Sending herewith Rs. 7·50 nP. as half-yearly subscription for Monthly Basumati. Please continue my membership for another 6 months. Mrs. Kanak Maitra, M. A., Kamala Club—Kanpur.

৬ মাসের মাসিক বসুমতীর মূল্য হিসাবে ৭·৫০ পাঠাইলাম। বৈশাখ '৬৫ হইতে নিয়মিত মাসিক বসুমতী পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।—শ্রীমতী মাধবিকা চট্টোপাধ্যায়, পুরী।

বাণ্মাসিক চাঁদা ৭·৫০ পাঠাইলাম।—Anjali Roy Chowdhury, Cuttack.

মাসিক বসুমতী এক বছরের মূল্য বাবদ ১৫৲ পাঠাইলাম। অনুগ্রহ করিয়া বৈশাখ সংখ্যা শীঘ্র পাঠাইয়া দিবেন।—Aparna Trivedi, Churchgate, Reclamation, Bombay.

মাসিক বসুমতীর চাঁদা বাবদ ৭।০ পাঠাইলাম। শীঘ্রই পত্রিকা পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।—Hasi Guha, Panagarh.

মাসিক বসুমতীর বাণ্মাসিক চাঁদা (বৈশাখ—আশ্বিন ১৩৬৫) পাঠাইলাম। মাসিক বসুমতী নিয়মিত পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। বাঙালীদের জন্ত মাসিক বসুমতীর অবদান বিশেষ করিয়া উল্লেখযোগ্য। দিনে দিনে ইহার শ্রীবৃদ্ধি হউক, এই প্রার্থনা।—Sm. Aradhana Ghose, Patna.

Herewith Rs. 15/- as subscription for the continuance of Masik Basumati.—Mrs. Himani Banerjee, Kali Bari Road—Jhansi.

মাসিক বসুমতীর বাৎসরিক মূল্য পাঠাইলাম। অবিলম্বে বৈশাখ সংখ্যা পাঠাইবেন।—Parul Das Gupta, Dhanbad.

বাৎসরিক ১৫৲ টাকা চাঁদা পাঠাইলাম। অনুগ্রহ করিয়া বৈশাখ সংখ্যা হইতে মাসিক বসুমতী পাঠাইবেন।—Sm. Nita Chakravorty, Bhandara, C. P.

বৈশাখ মাস হইতে ছয় মাসের গ্রাহক মূল্য ৭।০ পাঠাইলাম নিয়মিত মাসিক বসুমতী পাঠাইবেন। Sm. Bela Dasgupta Lodhi Road, New Delhi.

Please acknowledge receipt of Rs. 15/- being the subscription of Masik Basumati from Baisakh to Chaitra 1365 B. S.—Miss Swapna Sanyal Malda.

মাসিক বসুমতীর বার্ষিক টাকা পাঠাইলাম। টাকা পাঠাইতে দেরী হইয়া যাওয়ার জন্ত দুঃখিত। Amita Sanyal, Alipurduer Junction, Assam.

১৩৬৫ সালের জন্ত মাসিক বসুমতীর বাণ্মাসিক চাঁদা ৭·৫ পাঠাইলাম। বৈশাখ সংখ্যা হইতে নিয়মিত পত্রিকা পাঠাইবেন Sm. Sudhamoyee Debi, Katihar, Purnea.

A sum of Rs. 15·00 as advance subscription of Monthly Basumati for 1363 B. S. is remitted herewith. Please send the copies early and regularly.—Abdul Alim, Burdwan.

ছয় মাসের চাঁদা পাঠাইলাম। আমাদের প্রিয় মাসিক বসুমতী নিয়মিত বৈশাখ সংখ্যা হইতে পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। সু... নাগা পাহাড়ের এক কোণায় মাসিক বসুমতীর জন্ত আগ্রহে আছি Basanti Roy, Tuensang, Naga, Hills.

Rs. 7·50 is sent herewith towards annual subscription of Monthly Basumati for the current year. Please send Monthly Basumati from Baisakh last balance Rs. 7·50 will be send to you in time.—Sm. Saraswati Debi, Baripur—Puri Orissa.

স্থানান্তরে থাকার দরুণ মাসিক বসুমতীর বর্তমান সালের চাঁদা পাঠাইতে কিছু বিলম্ব হইল। উপস্থিত ছয় মাসের চাঁদা পাঠাইলাম বৈশাখ (১৩৬৫) সংখ্যা হইতে নিয়মিত পাঠাইবেন। Sm. Kanaklata Devi, Barharwa. (S. P.)

—প্যাবলো পিকাশো অঙ্কিত

শিল্পী ও মডেল

সুন্দরী ও ক্লাউন

শিল্পী ও মডেল

সুন্দরীর ভক্ত
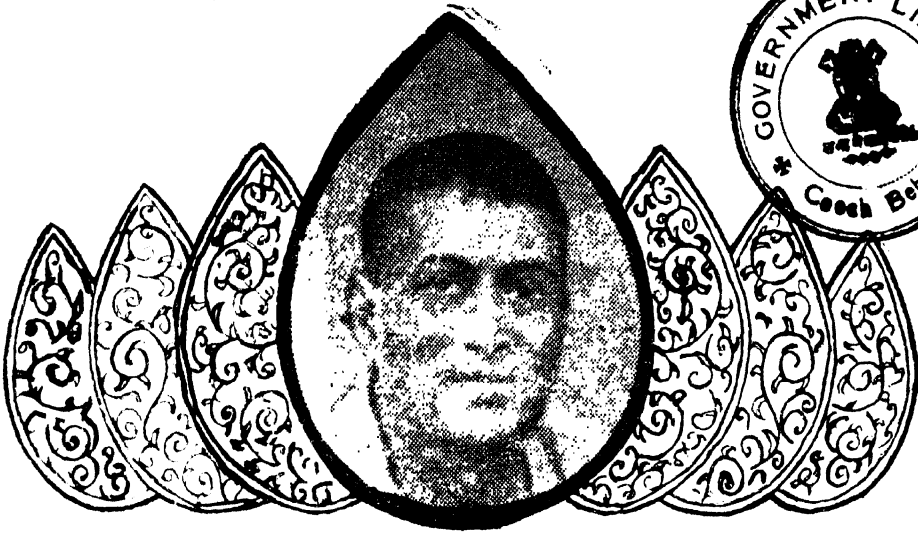
মাসিক বসুমতী

৩৭শ বর্ষ—আষাঢ়, ১৩৬৫] ॥ স্থাপিত ১৩২৯ ॥ [প্রথম খণ্ড, ৩য় সংখ্যা

কথামৃত

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। "আচ্ছা, এ কি বল্ দেখি? মা কালীকে ...খ্‌তে যাব মনে করেছি তো একেবারে সিধে মা কালীর মন্দিরে ...তে হবে। এদিক্ ওদিক্ ঘুরে বা রাধাগোবিন্দের মন্দিরে উঠে ... প্রণাম ক'রে যাব, তা হবে না। কে যেন পা টেনে, সিধে মা ...লীর মন্দিরে নিয়ে যায়—একটু এদিক্ ওদিক বেঁক্‌তে দেয় না। ... কালীকে দেখার পর, যেথায় ইচ্ছা যেতে পারি—এ কেন বল্ ...খি?" আমরা মুখে বলিতাম, 'কি জানি মশাই'; আবার মনে ...ন ভাবিতাম, 'এও কি হয়? ইচ্ছা করিলেই আগে রাধাগোবিন্দকে ...ণাম করিয়া যাইতে পারেন। মা কালীকে দেখ্‌বার ইচ্ছাটা ...ী হয় ব'লেই বোধ হয়, অন্যরূপ ইচ্ছা হয় না' ইত্যাদি; কিন্তু ...সব কথা সহসা ভাঙ্গিয়া বলিতেও পারিতাম না। ঠাকুরই আবার ...ন কখন ঐ বিষয়ের উত্তরে বলিতেন—'কি জানিস? যখন যেটা ...ন হয়, ক'র্‌বো, সেটা তখনই করতে হবে—এতটুকু দেরী সয় ...!' কে জানে তখন, একনিষ্ঠ মনের এই প্রকার গতি ও চেষ্টাদি ... ঠাকুরের মনটার অন্তঃস্তর অবধি সমস্তটা, বহুকাল ধরিয়া ...নিষ্ঠ হইয়া একেবারে একভাবে তরঙ্গায়িত হইয়া উঠে—উহাতে ... ভাবকে আশ্রয় করিয়া বিপরীত তরঙ্গরাজি আর উঠেই না।

আবার কখন কখন বলিতেন—'দেখ, নির্ব্বিকল্প অবস্থায় উঠ্‌লে তখন ত আর আমি তুমি, দেখা শুনা, বলা কহা কিছুই থাকে না; সেখান থেকে দুই তিন ধাপ নেমে এসেও এতটা ঝোঁক থাকে যে, তখনও বহু লোকের সঙ্গে বা বহু জিনিস নিয়ে ব্যবহার চলে না। তখন যদি খেতে বসি আর পঞ্চাশ রকম তরকারী সাজিয়ে দেয়, তবু হাত সে সকলের দিকে যায় না; এক জায়গা থেকেই মুখে উঠ্‌বে! এমন সব অবস্থা হয়! তখন ভাত ডাল তরকারী পায়েস সব একত্রে মিশিয়ে নিয়ে খেতে হয়!' আমরা এই সমরস অবস্থার দুই তিন ধাপ নীচের কথা শুনিয়াই অবাক্ হইয়া থাকিতাম। 'আবার এমন একটা অবস্থা হয়, তখন কাউকে ছুঁতে পারি না। (ভক্তদের সকলকে দেখাইয়া) এদের কেউ ছুঁলে যন্ত্রণায় চীৎকার ক'রে উঠি।' আমাদের ভিতর কেইবা তখন এ কথার মর্ম্ম বুঝে যে, শুদ্ধসত্ত্ব গুণটা তখন ঠাকুরের মনে এতটা বেশী হয় যে, এতটুকু অশুদ্ধতার স্পর্শ সহ্য করিতে পারেন না! 'তাবে আবার একটা অবস্থা হয়, তখন খালি (শ্রীযুত বাবুরাম মহারাজকে দেখাইয়া) ওকে ছুঁতে পারি; ও যদি তখন ধরে ত কষ্ট হয় না। ও খাইয়ে দিলে তবে খেতে পারি।'

জ্ঞানযোগ

শ্রীঅরবিন্দ

যোগের উদ্দেশ্য কি ?

আধ্যাত্মিক সাধনার মানেই হবে এমন কাউকে বা এমন কিছুকে জানবার চেষ্টা, যিনি বা যে বস্তু একেবারে পরাৎপর ও চিরন্তন ও অশেষ, যা আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোনো পার্থিব শক্তির তালিকার মধ্যে নয়, যদিও তিনি বা সেই মূলবস্তু সকল কিছুরই আদি উৎস ও জন্মদাতা, কিন্তু যার দিকে সাধারণ মানুষের মন আদৌ দৃষ্টিপাত করে না। জ্ঞানীয় সাধনা এমন এক বিশেষ জ্ঞানের অবস্থাতে গিয়ে পৌঁছতে চায় যা, আমরা চলিত কথায় যাকে জ্ঞান বলি সে জিনিস নয়। এই বিশেষ জ্ঞান যখন আসবে তখন তা হবে স্বতঃস্ফূর্ত এবং নিত্যস্থায়ী এবং অশেষ, সে হবে এমন এক বিশিষ্ট রকমের চেতনা যা সাধারণ মানুষের বস্তুচেতনা ও ভাবচেতনার থেকে অতিরিক্ত কিছু, এবং তার দ্বারা আমরা ঐ পরাৎপর ও চিরন্তন ও শেষের সঙ্গে একাত্ম হয়ে তার প্রত্যক্ষ স্পর্শানুভব করতে বা তার মধ্যে প্রবেশ করতে বা তাকে সম্পূর্ণরূপে জানতে পারবো। কিন্তু যেহেতু মানুষ হলো মনোময় প্রাণী, সেই হেতু তাকে তার মনের যন্ত্রাদির সাহায্য নিয়েই এই জ্ঞান-সাধনার কাজ প্রথম শুরু করতে হবে; কিন্তু তার পরে তাকে মনের সীমা ছাড়িয়ে গিয়ে অতীন্দ্রিয় ও অতিমানস শক্তির সাহায্য নিতে হবে, কারণ এখানে আমরা এমন জিনিসকে জানতে চাইছি যা নিজেই অতীন্দ্রিয় ও অতিমানসিক, যা আমাদের মন ও ইন্দ্রিয়ের অগোচর, যদিও মন এবং ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়েই আমরা তার প্রথম আভাসটি বা প্রথম প্রতিবিম্বটি ধরে নিতে পারবো।

প্রাচীন পদ্ধতিগুলির মধ্যে অন্যান্য বিষয়ে নানা মতভেদ থাকলেও, এ বিষয়ে সকলেই একমত যে, সেই চিরন্তন ও চরম সদ্‌বস্তু কেবল এক বিশুদ্ধ ও বিশ্বাতীত পরাৎপর অবস্থাতে অথবা পূর্ণ অনস্তিত্বের অবস্থাতেই অবস্থান করতে পারে। এখানকার বিশ্বগত যে অবস্থাকে আমরা অস্তিত্ব বলে থাকি তা হলো নিতান্ত অজ্ঞানের অবস্থা। কেউ যদি ব্যক্তিগত ভাবে তার সর্বোত্তম পরিণতিতে গিয়েও পৌঁছতে পারে, তথাপি তাও থাকবে সেই পরিপূর্ণ অজ্ঞানেরই অবস্থা। সুতরাং প্রকৃত সত্যান্বেষী হয়ে সত্যকে জানতে চাইলে যা কিছু ব্যক্তিগত, যা কিছু বিশ্বগত, সমস্তই ছেড়ে আসতে হবে। যিনি অনাদি অচল পরাৎপর পরমাত্মা, অথবা যা চরমের চরম অনন্ত শূন্যতা, তাই যখন একমাত্র মূল সত্য, তখন তাই হবে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের একমাত্র লক্ষ্য। পার্থিব চেতনার অতীত যে চেতনাকে ও যে জ্ঞানকে আমরা আয়ত্ত করতে চাইবো, তা আমাদের নিয়ে যাবে এক নির্বাণের অবস্থাতে, যাতে অহংজ্ঞানটুকু একেবারে লোপ পেয়ে যাবে, মন-প্রাণ-দেহগত সকল রকমের তৎপরতাই সেখানে স্তব্ধ হয়ে যাবে, অনুপম এক জ্ঞানদীপ্ত আত্মসমাহিত অনির্বচনীয় ও নির্ব্যক্তিক প্রশান্তির মধ্যে পরম বিশুদ্ধ এক আনন্দের অবস্থাতে গিয়ে আমরা উপনীত হবো।

সেই অবস্থাতে গিয়ে পৌঁছবার উপায় ধ্যানযোগ বা নিদিধ্যাসন, সকল বস্তু ও সকল বিষয়ের চিন্তা ত্যাগ ক'রে অনন্যচিত্ত একাগ্রতায় নিবিষ্ট হয়ে থাকা, একমাত্র লক্ষ্যের মধ্যে মনকে সম্পূর্ণ নিমগ্ন করে দেওয়া। কেবল এর প্রথম দিকেই আরো কিছু তৎপরতা থাকা চাই, সাধকের নিজেকে বিশুদ্ধ ক'রে আনবার জন্য, তার ব্যক্তিগত প্রকৃতিকে নৈতিক বিশুদ্ধির দ্বারা সেই জ্ঞানের উপযুক্ত আধারে পরিণত করবার জন্য। হিন্দু সাধকের পক্ষে সে প্রক্রিয়াগুলি হবে শাস্ত্রসম্মতভাবে জপ-তপাদির অনুষ্ঠান এবং দৈনন্দিন জীবনকে নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে নিখুঁতভাবে পরিচালিত করা, কিংবা বৌদ্ধ সাধকের পক্ষে হবে নির্দিষ্ট অষ্টমার্গ অনুসরণ করতে অভ্যস্ত হয়ে চরম অনুকম্পার কাজে নিযুক্ত হওয়া, যাতে পরের সেবাতে অহংভাব সম্পূর্ণ নির্মূল হয়ে যায়। কঠোর ও রীতিমত বিশুদ্ধ জ্ঞানযোগের কিন্তু নিয়ম এই যে, সকল রকমের ক্রিয়াকেই শেষ পর্যন্ত পরিত্যাগ করে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় স্থিরতার অবস্থায় গিয়ে পৌঁছতে হবে। তাতে বলে যে, কর্ম তোমাকে মুক্তির জন্য প্রস্তুত করে দেবে মাত্র, কিন্তু তার দ্বারা প্রকৃত মুক্তি মিলবে না। উচ্চতর সিদ্ধির শিখরে যদি উঠে যেতে চাও তাহলে কর্মে লিপ্ত থাকা তার পক্ষে অনুকূল নয়, বরং আধ্যাত্মিক লক্ষ্যে উপনীত হতে ওর দ্বারা তুরপনেয় বাধা জন্মাতে পারে। তুরীয় অবস্থা কর্মের সম্পূর্ণ বিপরীত, কাজেই কর্মে নিযুক্ত থেকে সে অবস্থাতে যাওয়া যাবে না। এমন কি ভক্তি, প্রেম, পূজা আরাধনা, এগুলিও কেবল অপরিণত আত্মার পক্ষে, উপায়গুলি উত্তম হলেও তা কেবল অন্ধ ও অজ্ঞান অবস্থার বেলাতেই উত্তম। কারণ এমন কিছুর কাছে আমরা তা নিবেদন করে থাকি যা আমাদের চেয়ে বৃহত্তর ও মহত্তর ও স্বতন্ত্র; কিন্তু চরম জ্ঞানের ক্ষেত্রে সেখানে তাতে আমাতে এমন কিছু ভেদাভেদই থাকবে না, সেখানে সবই এক আত্মা বা একই শূন্যতা, সেখানে পূজা ভক্তি প্রেম নিবেদন করবারও কেউ নেই আর সে নিবেদন গ্রহণ করবারও কেউ নেই। আছে কেবল এক একাত্মবোধের বা শূন্যতাবোধের চেতনা, কাজেই সকল রকমের চিন্তাক্রিয়া পর্যন্ত তখন থেমে যাবে, আর এই চিন্তাস্তব্ধতা তোমার সমগ্র প্রকৃতির মধ্যেও পরিপূর্ণ এক স্তব্ধতা ও স্থিরতা এনে দেবে। থাকবে মাত্র পূর্ণ তাদাত্ম্য কিংবা শাশ্বত শূন্যতার অনুভূতি।

বিশুদ্ধ জ্ঞানযোগ প্রথমে বুদ্ধির পথেই পরিচালিত হয়, যদিও পরে তা বুদ্ধি ও তার ক্রিয়াকে ছাড়িয়ে যায়। রূপাত্মকভাবে আমরা যেমন অস্তিত্ব নিয়ে রয়েছি, জ্ঞানযোগের সাধক তার আপন চিন্তার সাহায্যে তার থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে নেয়। হৃদয়কে সে অস্বীকার করে, জীবন ও ইন্দ্রিয়াদি থেকে পৃথক হয়ে দাঁড়ায়, দেহ থেকেও সে পৃথক সর্বপ্রকারে আপনাকে বিমুক্ত ক'রে নিয়ে তবেই সে চরম সিদ্ধিতে গিয়ে পৌঁছতে পারবে। এ যুক্তির মধ্যে এক অন্তর্নিহিত সত্যও রয়েছে, কারণ ওর দ্বারা একপ্রকারের সত্য অনুভূতিতে গিয়েই উত্তীর্ণ হওয়া যায়। পরমাত্মার এক চরম স্থিরতার নিষ্কর্ম ভাব রয়েছে, যা চির অবিচল ও অপরিবর্তনীয়, যা সকল কিছু অভিব্যক্তি ও তৎপরতার উর্ধ্বে কেবল নিশ্চল সাক্ষীরূপে বিরাজ করছে। আর আমাদেরও মনস্তাত্ত্বিক গঠনের মধ্যে যে ভাবনা বা ভাব নামক জিনিসটি থাকে, তাও এক হিসাবে এই নিশ্চল সত্তার অনেকটা কাছাকাছি—অন্ততপক্ষে এই হিসাবে যে, সচেতন সর্বজ্ঞাতা যেমন সকল তৎপরতা থেকে তফাতে থেকে সব কিছুকেই দেখছেন, আমাদের মনের এই অংশটিও সেরূপ করতে পারে।

আমাদের মধ্যে যে হৃদয়বৃত্তি এবং ইচ্ছাশক্তি এবং অন্যান্য রকমের শক্তি রয়েছে, তার প্রকৃতিই হলো ক্রিয়াশীল হওয়া, কারণ ক্রিয়াতেই সেগুলির সার্থকতা—যদিও সাফল্য মাত্রেই সে ক্রিয়া থেমে গিয়ে স্থিরতা এসে পড়ে, কিংবা সে ক্রিয়া নিত্য বিফল ও ব্যর্থ হতে থাকলে তাতেও বিপরীত ভাবে অবসাদের স্থিরতা এসে পড়ে। ভাবনাশক্তিও তেমনি এক রকমের ক্রিয়াশীল শক্তি, কিন্তু তার বিশেষত্ব এই যে, ইচ্ছামাত্রেই এ শক্তি তার ক্রিয়া বন্ধ ক'রে স্থির হয়ে যেতে পারে। আমাদের সকল ক্রিয়ার উপরে যে অন্তরস্থ একটি নিশ্চল ও নিষ্ক্রিয় সাক্ষীসত্তা বিরাজ করছে, এই ভাবনাশক্তি আপন জ্ঞানদীপ্ত বোধের দ্বারা তাকেই স্থির ভাবে অনুভব করতে থেকে পরিতৃপ্ত ও শান্ত হতে পারে, আর সেই নিশ্চল আত্মার সাক্ষাৎকার পেলে তখন অনুভব করে যে সত্যের সাধনাতে তার সিদ্ধিলাভ হলো, কাজেই নিজেও তখন সে সকল ক্রিয়া ছেড়ে স্থির হয়ে ঐরূপ নিশ্চল অবস্থাতে বিরাজ করে। এমনি প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য থাকার দরুণ আমাদের ভাবনাশক্তি সর্বদা ক্রিয়াব্যস্ত কর্মী হওয়ার বদলে বরং নিরপেক্ষ দর্শক ও নির্লিপ্ত বিচারক হয়ে ক্রিয়াবর্জিত থাকাটাই বেশী পছন্দ করে। এই কারণে সহজেই সে একটা আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক প্রশান্তি এবং নিস্পৃহ নির্লিপ্ততার মধ্যে নিজেকে এনে ফেলতে পারে। আর যেহেতু মানুষ মাত্রেই মনোময় প্রাণী, তাই ভাবনার মধ্যে প্রবেশ করাই তার আপন অজ্ঞানতাকে ও তার আবিলতাকে এড়িয়ে যাবার পক্ষে চিরদিনই এক ফলপ্রদ ও স্বাভাবিক উপায়। এই ভাবনার আশ্রয় নিলে তার দ্বারা তুমি আত্মসংযত হতে পারো, স্থির ভাবে ধ্যান করতে পারো, কোনো কিছু অনুধাবন করতে পারো, শ্রবণ মনন, নিদিধ্যাসনের দ্বারা মনকে তার লক্ষ্যের মধ্যে তন্ময় ভাবে নিযুক্ত করতে পারো। সেই কারণেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, এই ভাবনা জিনিসটিকে সর্বোপরিস্থ করে রাখতে পারলে তাই হবে সিদ্ধিলাভের পক্ষে এক অপরিহার্য সহায় স্বরূপ। একেই আমাদের যাত্রাপথের অগ্রণী ক'রে নিয়ে ওর সাহায্যেই আমরা সাধনাতে অগ্রসর হতে পারি, কিংবা অন্ততপক্ষে ভিতরকার মন্দিরে প্রবেশের পক্ষে শেষের দরজা বলে ওকে ধরে নিতে পারি।

আসলে কিন্তু ভাবনা হলো মাত্র পথনির্দেশ করবার অগ্রদূত ; সে কেবল আমাদের পথ দেখাতেই পারে, কিন্তু সে কোনো কাজে লাগাতে পারে না, জোর ক'রে হুকুম করতে পারে না। তা যে পারে সে হলো ইচ্ছাশক্তি। এই ইচ্ছাশক্তিই আমাদের চালাবার মালিক, অভিযান যাত্রার নায়ক, যজ্ঞের প্রথম নিয়ন্তা ও হোতা। এই ইচ্ছাশক্তি মানে হৃদয়ে জেগে ওঠা কোনো কামনা নয়, কিংবা মনে জেগে ওঠা কোনো খেয়াল কিংবা দাবি নয়, যদিও সেগুলিকেও আমরা সাধারণত আমাদের ইচ্ছাই বলে থাকি। কিন্তু ইচ্ছাশক্তি হলো আমাদের এবং সকল সত্তারই অতি গভীর ও প্রবলতম এক নিগূঢ় চেতনশক্তি, যাকে বলবো তপস্, তেজস্, নিষ্ঠা, শ্রদ্ধা। এই শক্তিই আমাদের গতিবিধিকে নিরূপিত করে, আর আমাদের বুদ্ধি ও হৃদয়বৃত্তি কতকটা অন্ধ অনুগত ভৃত্য হয়ে যন্ত্রের মতো একেই অনুসরণ করে।

অন্তরস্থ যে অন্তরাত্মা বাইরের সকল বস্তু ও সকল ব্যাপার থেকে তফাৎ হয়ে চুপ ক'রে বসে আছে, অথচ যে রয়েছে আমাদের অস্তিত্বকে বিধৃত ক'রে, সে হলো স্বয়ং পরমাত্মা থেকেই খসে আসা এক আচ্ছন্ন অংশ মাত্র ; তার অস্তিত্ব স্বতন্ত্র ও স্বয়ংসর্বস্ব নয়। সকল অস্তিত্বের মূলে আছেন সেই শাশ্বত পরমাত্মা। যদিও তিনি সকল ক্রিয়ার উর্ধ্বেও কোনো কিছুর মধ্যেই আবদ্ধ নন, তবু তিনিই হলেন সকল ক্রিয়ার উদ্ভোক্তা ও ভর্তা, তিনিই সব কিছু অনুমোদন করছেন, তাঁর শক্তিতেই সব কিছু ঘটছে। সকল রকম কাজ সেই পরম সত্তা থেকেই জন্মাচ্ছে ও নিরূপিত হচ্ছে ; বলতে গেলে ঘটনা মাত্রই তাঁরই ঘটানো, বিকাশ মাত্রই তাঁরই চেতনাশক্তির বিকাশ ; সেখানে আত্মার বিরোধী কিছু নেই বা আত্মা ছাড়া অন্য কারো শক্তি নেই। সকল কর্মের মধ্যে সেই পরমাত্মারই চেতন ইচ্ছা বা শক্তি প্রকাশ পাচ্ছে, তাইই অনন্ত প্রকারে নিজেকে অভিব্যক্ত করছে। সেই পরম ইচ্ছা বা পরম শক্তি অজ্ঞান নয়, তার আত্মজ্ঞানের সঙ্গে এই সকল অভিব্যক্তির ভিতরকার জ্ঞান একেবারে অভেদ ও অনন্য। অতএব, আমাদের মধ্যেও যে নিগূঢ় এবং আসল ইচ্ছাশক্তি রয়েছে, শ্রদ্ধা ও তেজ নিয়ে যে অদম্য অধ্যাত্মশক্তি আমাদের প্রকৃতির মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে, তাও হলো সেই পরমেচ্ছারই অংশ মাত্র, তাঁরই নিজস্ব যন্ত্র মাত্র। সেই ইচ্ছার সঙ্গে এই ইচ্ছার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে, সেই এর প্রবর্তক ও আলোকদাতা। এ কথা যদি একবার আমরা চেতনার মধ্যে জানতে পারি এবং উপলব্ধির মধ্যে ধরে রাখতে পারি, তাহলেই জ্ঞান এসে যাবে যে আমরা সেই পরাৎপর ব্রহ্মের কতখানি নিকটতম। কিন্তু কেবল ভাবনাশক্তির ক্রিয়া সেই নিগূঢ় নৈকট্যের বোধটি এনে দিতে পারবে না। অথচ সেই ইচ্ছাকে নিজের মধ্যে ও অনন্ত বিশ্বের মধ্যে একই বলে জানতে পারা এবং শেষ পর্যন্ত তারই চূড়ান্ত সাফল্যে গিয়ে পৌছনো, এই হবে জীবনের ও যোগের পথের সন্ধানীদের সর্বশ্রেষ্ঠ লক্ষ্য এবং প্রকৃত জ্ঞানযোগের ও কর্মযোগেরও চূড়ান্ত।

মনের প্রকৃতির মধ্যে ভাবনাশক্তি তার সর্বোত্তম বা সর্বোচ্চ অংশও নয়। আর সত্য সম্বন্ধে একমাত্র সুগভীর নির্দেশকও নয়। সুতরাং পরম জ্ঞানলাভের পক্ষে একেই উপযুক্ত উপায় ভেবে কেবল এরই উপর নির্ভর ক'রে শেষ পর্যন্ত সন্তুষ্ট থাকা ঠিক নয়। কেবল কতকদূর পর্যন্তই একে আশ্রয় ক'রে চলা যেতে পারে, একেই তখন হৃদয়ের ও জীবনের ও সত্তার অন্যান্য অংশের উপদেষ্টা ক'রে নিতে হয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আসল প্রয়োজনটি এর দ্বারা সম্পূর্ণ মেটেনা ; ভাবনার দ্বারা তার নিজেরই চরম চরিতার্থতা মিলতে পারে, কিন্তু এটাও দেখা দরকার যে ওর সাহায্যে সত্তার অন্যান্য অংশের দিকেও চরিতার্থতা মিলছে কি না। কেবল বিবিক্ত ভাবনার দ্বারাই কাজ চলে যেতে পারতো, যদি বিশ্বসৃষ্টির শেষ উদ্দেশ্য এমন হতো যে, মনই যন্ত্রস্বরূপ হয়ে আমাদের সকলকে ভ্রান্ত ধারণাদির মধ্যে দাবিয়ে রেখে অজ্ঞানের গণ্ডীর মধ্যে কাজ করাতে থাকবে, আবার মনই তার থেকে মুক্তি দেবার ও আলো দেবার যন্ত্রস্বরূপ হয়ে অভ্রান্ত ধারণাদি এনে দিয়ে জ্ঞানের সর্বোচ্চ শিখরে আমাদের উঠিয়ে নিয়ে যাবে। কিন্তু সম্ভবত এই জগৎসৃষ্টির উদ্দেশ্য এমন অর্থহীন ও অসঙ্গত নয়, তার উদ্দেশ্য আরো ব্যাপক এবং জটিল। পরমাত্মার প্রগতির ঝোঁক ঐটুকু নীরস ও লঘু পরিণামের মধ্যে

সীমাবদ্ধ নয়, সেই অনন্তের লক্ষ্যসীমার উচ্চতা ওর চেয়ে আরো অনেক গুণে অনন্ত। অবশ্য আগেকার যুগের যুক্তি অনুসারে ওতে শেষ পর্যন্ত আমাদের ফাঁকা শূন্যের নেতিবাদে অথবা তেমনি ফাঁকা ধরণের ইতিবাদে নিয়ে গিয়ে পৌঁছে দেবে; কারণ ফাঁকা জিনিসের সাধনা শেষ পর্যন্ত ফাঁকার চূড়ান্তেই নিয়ে যায়, তার বিবিক্তসার এই দুই রকমেই হতে পারে। কিন্তু মানুষের অক্ষম মনের সংকীর্ণতাকে ও পঙ্গু যুক্তিকে ছাড়িয়ে তার যে বাস্তবাম্বেষী বোধশক্তি অনন্তের সুস্পষ্ট অনুভূতি লাভের জন্য আরো বিপুলতর সৌভাগ্যের প্রত্যাশা করে, সেই শক্তির দ্বারাই মিলতে পারে তার মানবোত্তর দিব্যজ্ঞানের সন্ধান। কেবল তো ভাবনাশক্তি টুকুই নয়, হৃদয়বৃত্তি এবং ইচ্ছাশক্তি এবং দেহ প্রাণ পর্যন্ত সমস্তই সেই অনন্ত দিব্যসত্তার বিভিন্ন অংশ, এগুলিরও কিছু বিশেষ তাৎপর্য আছে। এরও মধ্যে এমন শক্তি আছে যার দ্বারা আত্মা তার পূর্ণ আত্মজ্ঞানে ফিরে যেতে পারে কিংবা তাকে ফিরে পেতে পারে। অতএব পরমাত্মার ইচ্ছা এই হওয়াই সম্ভব যে,—আমাদের সমগ্র সত্তাই দিব্য পরিণতি লাভ করবে, প্রগতির উদ্ধতা ভিতরের গভীরতম প্রদেশকে পর্যন্ত আলোকিত করবে, অতি-চেতনার স্পর্শে নিম্নতর নিশ্চেতনাও দিব্যভাবে প্রদীপ্ত হবে।

আগেকার জ্ঞানযোগের নিয়ম এই ছিল যে, ক্রমে ক্রমে দেহকে, প্রাণকে, সমস্ত ইন্দ্রিয়াদিকে নিত্য বিমুখতার দ্বারা প্রত্যাখ্যান করতে হবে, ও এমন কি ভাবনাকে পর্যন্ত বর্জন ক'রে, হয় নীরব আত্মার মধ্যে কিংবা অখণ্ড নির্বাণের মধ্যে কিংবা অজ্ঞেয় ব্রহ্মের মধ্যে বিলীন হতে হবে। কিন্তু এখনকার পূর্ণ জ্ঞানযোগে এই কথা বলে যে, সর্ব দিক দিয়েই আমাদের পূর্ণ আত্মপরিণতি হওয়া চাই, কেবল যা বর্জন করতে হবে তা আমাদের নিজেদেরই অচেতনা, অজ্ঞানতা, এবং তারই যত কিছু ক্রিয়াচাঞ্চল্য। আপনসত্তার মধ্যে যে মিথ্যা পরিচয়টি অহং রূপে সর্বদা উঁকি মারছে, তাকেই আগে পরিত্যাগ করো; তবেই তোমার যা সত্য স্বরূপ তা অভিব্যক্ত হবে। প্রাণের মধ্যে যে মিথ্যা পরিচয়টি জৈব কামনা ও অভ্যাসগত দেহবিলাস রূপে দখল নিয়ে রয়েছে, তাকেই আগে ঘোচাও; তবেই তোমার জীবন সত্য হয়ে তার মাঝে দিব্য শক্তি ও অসীমের আনন্দ প্রস্ফুটিত হবে। ইন্দ্রিয়াদির মধ্যে যে মিথ্যা পরিচয়টি স্থুল উপভোগের দাস হয়ে থেকে কেবল তার দোটানা অনুভব নিয়ে টানা পোড়েন করছে, তাকেই আগে নির্মূল করো; তবেই দেখবে যে তোমার মধ্যেই এমন বৃহত্তর অনুভূতির স্থান রয়েছে, যার উন্মীলনে তুমি সকল কিছুর মাঝেই দিব্যের সন্ধান পেতে থাকবে এবং নিজেও দিব্যভাবে তাতে সাড়া দিতে থাকবে। হৃদয়ের মধ্যে যে মিথ্যা পরিচয়টি তার দুই দুই ভাবের আবিল আবেগ সমূহের ও কামনা-বাসনার তাড়না নিয়ে নিত্য প্রকাশ পাচ্ছে, তাকেই আগে বর্জন করো; তবেই তোমার ভিতরকার গভীর হৃদয়টি খুলে গিয়ে সকল জীবের প্রতি তা দিব্য প্রেমে পরিপূর্ণ হবে, এবং অনন্তের দিকে অনন্ত আবেগ নিয়ে তার কাছ থেকে সমুচিত সাড়া পেতে উন্মুখ হয়ে উঠবে। ভাবনাবৃত্তির যে মিথ্যা পরিচয়টি তার উদ্ধত ও সবজান্তা মতামতের বোঁচকা বেঁধে তাই দিয়ে এক অপরিণত মানসিক প্রতিস্থিতি গড়ে রেখেছে আর কয়েকটি সংকীর্ণ বিষয়ে লিপ্ত থেকে তাই নিয়ে একচেটিয়া কারবার ক'রে যাচ্ছে, তাকেই আগে চূর্ণ করো; তবেই দেখবে ওর পিছনে রয়েছে জ্ঞানের কত বৃহত্তর সম্ভাবনা, যার দ্বারা ভগবানের প্রকৃত সত্য সম্বন্ধে এবং আত্মা ও প্রকৃতি ও বিশ্ব সম্বন্ধে তোমার পুরোপুরি দৃষ্টি খুলে যাবে। তবেই সব দিয়ে হতে পারবে তোমার পূর্ণ আত্মপরিণতি,—এক দিক দিয়ে হবে হৃদয়ানুভূতির চূড়ান্ত, তার প্রেম ও ভক্তি ও নিবেদন ও আনন্দ-বোধের চরিতার্থতার দ্বারা; এক দিক দিয়ে হবে ইন্দ্রিয়ানুভূতির চূড়ান্ত, সব কিছুর মধ্যেই সেগুলি দেখতে থাকবে এক দিব্য সৌন্দর্য ও সর্বসুন্দর অপরূপকে; এক দিক দিয়ে হবে প্রাণ-সাফল্যের চূড়ান্ত, তোমার প্রাণের দিব্যশক্তি ও অপূর্ব কর্মকুশলতার ভিতর দিয়ে তার দক্ষতা ও সম্পূর্ণতার ভিতর দিয়ে; এক দিক দিয়ে হবে ভাবনার সর্বসীমা অতিক্রমের চূড়ান্ত, সত্যকে এবং আলোককে এবং দিব্যজ্ঞানকে পাবার পিপাসা তার মিটে যাবে। আমাদের নিজস্ব প্রকৃতির মধ্যেই রয়েছে এই সব অপূর্ব জিনিস, এ গুলিকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে যে অন্য কিছুর সন্ধানে ছুটতে হবে তা নয়, এরাই আপন আপন অন্ধকারকে অতিক্রম ক'রে পৌঁছবে এক চরম বস্তুতে, এবং সেখানেই অনন্ত প্রকারে তার আপন চরিতার্থতা ঘটবে, সেখানে যে সর্বাঙ্গীন সঙ্গতি মিলবে তার কোনো মাপজোপ নেই।

প্রাচীন জ্ঞানযোগের প্রণালীতে যে মনের ভাবনার সাহায্যে সব কিছুকে বর্জন করে নিজেকে তার ভিতর থেকে সরিয়ে নিতে উপদেশ দেওয়া হয়েছে, তার পিছনে রয়েছে অবশ্য এক সর্বজয়ী আধ্যাত্মিক অনুভূতির ঐতিহ্য। যারাই মনের সকল ক্রিয়ার গণ্ডীকে অতিক্রম করে দিগন্তহীন আভ্যন্তরীণ রাজ্যে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছে, তারাই এক বাক্যে ঘোষণা করেছে, সেখানকার যে সুগভীর ও সুস্পষ্ট ও নিঃসন্দেহ অনুভূতি, সেই হলো মুক্তির পরমানুভূতি, তার যে চেতনা নিজেদের মধ্যে লাভ করা যায় তা বিশ্ব ও বিশ্বের সকল বস্তুর, সকল লক্ষ্যের, সকল লাভের, সকল ঘটনার অতীত। সে অবস্থা হলো অতি প্রশান্ত, অস্পর্শিত, উদ্বেগশূন্য, অটল, অসীম। সে মুক্তি মানুষকে এমন উচ্চ অবস্থায় নিয়ে যায়, তা ধারণাতীত ও বর্ণনাতীত,—নিজেদের ব্যক্তিত্বকে সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে আমরা তার মধ্যে প্রবেশ ক'রে এক সর্বাতিক্রমী শাশ্বত সাক্ষী-পুরুষের উপস্থিতি গোচর করতে থাকি, এক সীমাতীত ও কালাতীত অনন্ত আমাদের সকল অস্তিত্বকে নস্যাৎ করে মহিমান্বিত শূন্যতার উপর থেকে দেখিয়ে দেয় যে সেই জিনিসই হলো একমাত্র প্রকৃত বাস্তব। কাজেকাজেই তোমার অধ্যাত্মলিপ্সু মন যদি একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে এই প্রকারে আপন অস্তিত্বকে অস্বীকার করতে থাকে, তাহলে শেষ পর্যন্ত এই চূড়ান্ত পরিণতিতে গিয়ে তুমি পৌঁছবে। মুক্তির জন্য সাধনাতে এই বর্জনের অংশটার ভিতর দিয়ে যতক্ষণ অতিক্রম করা না যাচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত মনের প্রভাব ও তার ক্রিয়াজাল থেকে সম্পূর্ণ কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয় না,—এ সকল উক্তি সত্য হলেও, সেই মুক্তির অনুভূতি যতই অপূর্ব ও চমৎকার হোক তবু সেখানেই যে থেমে যেতে হবে এমন কোনো কথা নেই। মনের ধারণার অতীত এক অসাধারণ অনুভূতি বলেই মন ওতে একান্ত অভিভূত হয়ে থাকে। কিন্তু যতই হোক তবু এ নেতিবাচক অনুভূতিরই চরম, এর পরেও রয়েছে এক অনন্ত মহাচেতনার সুতীব্র সুস্পষ্ট জ্যোতি। সে হলো এক অসীম জ্ঞানরাজ্য, এক পরাৎপর প্রত্যক্ষ ইতিবাচক বস্তুর উপস্থিতি। তাকেই পাওয়া চাই।

আধ্যাত্মিক জ্ঞানের চরম লক্ষ্য ভগবান, যিনি অন্তহীন, পরাৎপর, একমেবাদ্বিতীয়। তার সঙ্গে আমাদের ব্যক্তি-সত্তার ও বিশ্ব-সত্তার অচ্ছেদ্য সম্পর্ক, অথচ এই ব্যক্তিগত ও বিশ্বগত সম্পর্ককে অনেকখানি ছাপিয়েও তার অস্তিত্ব। বিশ্ব ও ব্যক্তিকে আমরা যতটুকু দেখি, সেগুলি ততটুকুই মাত্র নয়, আমাদের মন ও ইন্দ্রিয়াদি তার সম্বন্ধে যা কিছু পরিচয় জেনেছে সে হলো অজ্ঞানের জানা। যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের এই সব যন্ত্র অতি-মানসিক ও অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের দ্বারা আলোকিত না হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত এরা আংশিক ও ভুল জিনিসই দেখতে থাকবে, খণ্ডিত ও বিকৃত পরিচয়ের রূপই গড়তে থাকবে। তত্রাচ, বিশ্বকে ও ব্যক্তিকে এখন যেমন দেখছি তার মধ্যেও সত্য রয়েছে, এই রূপের ভিতর থেকেও জানা যায় যে ওর অন্তরালে সত্যের প্রকৃত স্বরূপ কেমন। তা জানা যায় প্রথমত আমাদের মনের ও ইন্দ্রিয়াদির সাধারণ ধারণাগুলির ক্রমিক সংশোধনের দ্বারা; সে ধারণা প্রথমে জন্মায় অজ্ঞান ইন্দ্রিয় মন ও সংকীর্ণ স্থূল বুদ্ধি থেকে, আর তার ক্রমিক সংশোধন হতে থাকে উচ্চ থেকে উচ্চতর বুদ্ধির বিকাশে; এই হলো মানুষের জ্ঞান ও বিজ্ঞানের প্রণালী। কিন্তু একেও উত্তীর্ণ ক'রে অন্য এক রকমের জ্ঞান রয়েছে, যাকে বলা যায় সত্য চেতনা, তা যখন আসে তখন বুদ্ধি বৃত্তিকে ছাপিয়ে এমন এক আলোর সামনে আমাদের চোখ খুলে দেয়, যেখান থেকে বুদ্ধির আলোটুকু সামান্য মাত্রই প্রতিফলিত হয়ে আসছিল। সেই আসল আলোর সামনে উপস্থিত হলে তখন নিছক যুক্তি বুদ্ধির মাপজোপ ও যত কিছু মনের রূপ গড়ার কাজ সমস্তই ঘুচে যায়, কিংবা তা এক অন্তর্দৃষ্টিতে রূপান্তরিত হয়, এবং তার থেকে আসে আধ্যাত্মিক অনুভূতির সুস্পষ্ট বাস্তবতা। এই অন্তর্দৃষ্টি নিজেকে এবং বিশ্বকে বাদ দিয়ে কেবল শাশ্বত ব্রহ্মের দিকেও নিবদ্ধ হতে পারে, কিন্তু সে দৃষ্টি আবার সেই শাশ্বত ভূমি থেকে এই সব অস্তিত্বের দিকেও চেয়ে দেখতে পারে। তা যখন সম্ভব হয়, তখনই আমরা বুঝতে পারি যে এগুলিও সত্য, ইন্দ্রিয়-মনের যে অজ্ঞানতা ও জীবনের যে অসারতা এতকাল দেখে আসছি, তাও মহাচেতনার অহেতুক খামখেয়ালি বা অনর্থক ভ্রান্তিবিলাস নয়। ইচ্ছা করেই এমনি এক রুক্ষ ভূমির পরিকল্পনা করা হয়েছিল, যেখানে অনন্তাংশ আত্মা এসে ক্রমে ক্রমে আত্মবিকাশ করতে পারবে, এমনই এক জড় ভিত্তি যেখানে এসে বিশ্বসৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সে ক্রমশ আত্মোন্মীলন ও আত্মনিরূপণ করতে পারবে। এ কথা সত্য যে সাধারণ ভাবে দেখলে এখানে যা কিছু হতে দেখা যাচ্ছে তার কোনো তাৎপর্য মেলে না, এবং প্রত্যেকটি জিনিসের আলাদা আলাদা অর্থ খুঁজতে গেলে সব কিছুকে মিথ্যা মায়া ও প্রহেলিকা বলেই বোধ হতে থাকে; কিন্তু সব কিছুরই চরম অর্থ রয়েছে এক চরম জায়গাতে গিয়ে, পরাৎপরের পরম শক্তিক্রিয়াই সব কিছুকে তার আপেক্ষিক মূল্য দিচ্ছে মূল সত্যের অনুপাতে। পূর্ণ ও গভীরতম আত্মজ্ঞান ও বিশ্বজ্ঞান উপস্থিত হলে তখন তারই ভিত্তিতে সেই সর্বমীমাংসাকারী ও সর্বসমন্বয়কারী অর্থ টি সম্বন্ধে প্রকৃত অনুভূতি আমাদের আসবে।

ব্যক্তি সম্বন্ধে বলতে গেলে সেই পরাৎপরই আমাদের প্রত্যেকের আত্মার সর্বোচ্চতম মূল কাণ্ড, অর্থাৎ মূলত: আমরাও তাই ছাড়া অন্য কিছু নয়, বিভিন্ন প্রকৃতি নিয়েও সেই একেরই আমরা অভিব্যক্তি, সুতরাং প্রকৃত আত্মজ্ঞানে পৌঁছতে যে-ব্যক্তি আধ্যাত্মিক জ্ঞানযোগের সাধনা করবে, তাকে সকল বস্তুর আপাতদৃষ্ট পরিচয়গুলিকে অস্বীকার করতে হবে, যেমন আগেকার যোগেও করা হতো। সে ব্যক্তিকে নিজের থেকে আবিষ্কার করতে হবে যে, এই স্থূল দেহটাই আমাদের আমি নয়, এ হলো আমাদের অস্তিত্বের জন্য একটা বাহ্য ভিত্তিস্বরূপ মাত্র; এ হলো অসীমের একটা সীমায়িত রূপায়ণ। স্থূল জিনিসকেই জগতের একমাত্র বাস্তব বলে জ্ঞান করা, শরীরের মধ্যে যে মস্তিষ্ক ও স্নায়ুতন্ত্রী ও জীবকোষ ও অণুগুলি দেখা যাচ্ছে, তাকেই আমাদের সবটুকু সত্য বলে মনে করা, আর সে জ্ঞান অসম্পূর্ণ হলেও তাই বাস্তবজ্ঞানের মূল ভিত্তি বলে বিবেচনা করা, একেই বলা যায় মায়া। সেই মায়াতেই আমরা অর্ধদৃষ্টকে পূর্ণদৃষ্ট বলে ধরে নিই, অন্ধকার তলদেশকে বা ছায়ামাত্রকে প্রকৃত আলো দেখা বলে ভুল করি, শূন্য মাত্র দেখে তাকেই পূর্ণ বলে ঘোষণা করি। বস্তুবাদে দৃষ্ট-বস্তু মাত্রকেই স্বয়ং দৃষ্টিশক্তি বলে ভুল করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যে আসল জিনিস নিত্য ব্যক্ত হচ্ছে ও নিজেকে ব্যক্ত করতে চাইছে, এই সৃষ্টি হলো তারই অভিব্যক্তির এক উপায়। সকল স্থূল বস্তু এবং আমাদের দেহ ও তার মস্তিষ্ক স্নায়ু কোষ প্রভৃতি সবই হলো এমন এক প্রাণশক্তির ক্রিয়া প্রকাশের বিভিন্ন ক্ষেত্র, যে শক্তি তার ক্রিয়ার দ্বারা সে যোগ বজায় রেখে চলেছে। নিত্য যে সব বাস্তব স্পন্দন ঘটছে সেগুলি তারই অঙ্কপাত মাত্র, এরই ভিতর দিয়ে আত্মা অনন্তের কতকগুলি সত্যকে অনুভব করছে এবং বস্তুর আকারে রূপ নিয়ে তাকে সার্থক করছে। এ হলো যেন ভাষা দিয়ে কিছু ব্যক্ত করার মতো, ছবি এঁকে বা লিখে কিছু প্রকাশ করার মতো, প্রতীক দিয়ে আসলকে জানাবার মতো, কিন্তু গভীরতর দৃষ্টিতে দেখলে মূল জিনিস তাই নয়।

আমাদের জীবনও আমাদের আত্মা নয়। জীবন একটা শক্তি মাত্র যা দেহ মস্তিষ্ক স্নায়ু প্রভৃতির ভিতর দিয়ে ক্রিয়া করছে; তাও এ শক্তি অনন্তের পুরা শক্তি নয়। প্রাণশক্তিই হলো আসল শক্তি, সেই শক্তিই স্থূল বস্তুকে আশ্রয় ক'রে তাকে যন্ত্ররূপে চালিত করছে, সেই শক্তিই সব কিছুর উৎস ও সব কথার শেষ কথা— জীবনবাদের এই সংকীর্ণ ও অব্যবস্থিত গোঁড়ামি, এতেই ভ্রান্তি এসে পড়ে, আধা মীমাংসাকে পুরো বলে ধরে নেওয়া হয়, যেমন সমুদ্রের তটের কাছে দাঁড়িয়ে তার তরঙ্গভঙ্গী দেখে লোকে মনে করে যে মহাসমুদ্রের বুকের সমস্ত জলটাই বুঝি এমনি। জীবনবাদের যুক্তি যদিও একেবারে ভিত্তিহীন নয়, কিন্তু দোষ এই যে, তাতে বাহ্য অভিব্যক্তিকেই আসল জিনিস বলে ধরে নেওয়া হয়। কিন্তু সেই প্রাণশক্তিও আসছে এক মহাচেতনা থেকে, যা রয়েছে ওকে ছাপিয়ে ওর চেয়ে আরো অনেক অনেক বেশী। সেই চেতনাই এব কিছু অনুভব করছে আর ক্রিয়া করছে, কিন্তু এ কথাটি আমরা কিছুতেই বুঝতে পারব না, যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের বর্তমান মনের গণ্ডী ছাড়িয়ে এর চেয়ে আরো উচ্চতর অবস্থাতে গিয়ে পৌঁছতে না পারছি। মনকে আমরা প্রাণের জিনিস বলেই ভেবে থাকি, কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে মন হলো প্রাণের পরের আর এক ধাপ, যদিও তা শেষ ধাপ নয়, ওর পরের আরো কিছু গোপন জিনিস ব্যক্ত হতে বাকি আছে; মন কখনো প্রাণের অভিব্যক্তি নয়, প্রাণও যার নিম্নস্তর অভিব্যক্তি মনও তারই উচ্চতর অভিব্যক্তি।

আর যাকে বলি আমাদের মন, যা দিয়ে ভাবা ও বোঝার কাজ করি, তাও আত্মা নয়। তাও সেই আসল জিনিস নয়, তার গোড়াও নয়, শেষও নয়; অনন্ত থেকে ঠিক্‌রে আসা একটু অর্ধ-আলোর ঝিকিমিকি মাত্র। মনের দ্বারাই সব কিছু গড়া হচ্ছে, মনের মধ্যেই সব কিছু আকার নিচ্ছে, আদর্শবাদের এ সূক্ষ্ম ধারণাটিও ভুল, এতেও আধা-সত্যকে পুরো বলে ধরে নেওয়া হয়,—চাঁদের ধার করা আলো দেখে তাকে স্বয়ং সূর্য বলে মনে করার মতো। এ আদর্শবাদ সত্তার মূল কথায় গিয়ে পৌঁছতে পারে না, তাকে স্পর্শও করতে পারে না, যেখানে গিয়ে পৌঁছয় সে হলো প্রকৃতির এক নিম্নতর স্বরূপ। বস্তুত মন হলো এমন এক চেতনাময় অস্তিত্বের বাহ্য ও অস্পষ্ট উপচ্ছায়া যা মনের দ্বারাই সীমাটানা নয়, তাকেও অনেক ছাড়িয়ে রয়েছে।

আগেকার জ্ঞানযোগে তাই এই সব কিছুকে বাদ দিয়ে এমন এক বিশুদ্ধ চেতনাময় অস্তিত্বের উপলব্ধিতে গিয়ে পৌঁছনো হতো, যা পরিপূর্ণ আত্মপরিজ্ঞাত, আত্মানন্দে নিমগ্ন, যা মন-প্রাণ-দেহের সাপেক্ষ নয়, আর সেই উপলব্ধিতেই সরাসরি জানা যেতো যে, এই জিনিসই হলো আত্মন্, এই হলো আমাদের অস্তিত্বের মূল ও তার প্রকৃত স্বরূপ। এতে যদিও মূল সত্যে পৌঁছনো হতো বটে, কিন্তু এত তাড়াতাড়ি মাঝের সব কিছুকে ডিঙিয়ে যাওয়া হতো, যাতে একটা ভুল করা হতো—ধরে নেওয়া হতো যে আমাদের এই চিন্তক মন আর সেই পরাৎপরের মাঝামাঝি আর কিছুই কিছু নয়, বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ। তাই পরমাত্মা এর মাঝখানে যে এত জাজ্জ্বল্যমান ...াট সৃষ্টির রাজ্য বিছিয়ে রেখেছেন, তার দিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র না ক'রে চোখ বুজে সমাধিতে মগ্ন হওয়াই ছিল জ্ঞানে পৌঁছবার প্রকৃষ্ট উপায়। হয়তো সে উদ্দেশ্য তাতে সিদ্ধও হতো, কিন্তু তার পরে সেই অনন্তের মধ্যে পৌঁছে সেখানেই ঘুমিয়ে পড়া ছাড়া আর কিছু হতো না। কিংবা যদি কেউ জেগেও রইল, তবু তার আত্মবিলোপী মন সেই সর্বোচ্চ অনুভূতিটি নিয়েই মেতে রইল, সে সিদ্ধি অনন্তের অনন্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে নয়, পরাৎপরের সমগ্রের মধ্যে নয়। মন তার সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক মননের দ্বারা কেবল নিষ্কল ব্রহ্মকেই জানতে পারে, তার মানসপটে প্রতিফলিত সচ্চিদানন্দকেই অনুভব করে। কিন্তু চোখ বুজে ব্রহ্মের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে তার সর্বোচ্চ ও সমগ্র সত্যকে জানা যায় না, আর পূর্ণ আত্মজ্ঞানও তাতে মেলে না; তার জন্য মনের গণ্ডী ছাড়িয়ে ধৈর্যের সঙ্গে আরো পা বাড়াতে থেকে শেষ পর্যন্ত সত্যচেতনাতে গিয়ে পৌঁছতে হবে, তবেই অনন্তকে সব দিক দিয়ে জানা যাবে এবং দেখা যাবে এবং তার নাগাল পাওয়া যাবে, তাকে মিলতে পারবে তার অসীম ঐশ্বর্যের পরিপূর্ণতায়। আর তখনই আমাদের প্রকৃত আত্মাকেও আবিষ্কার করবো, যা কেবল স্থাণুবৎ নিশ্চল নিষ্ক্রিয় শুদ্ধ আত্মন্ নয়, তাই হলো জাগ্রত জীবন্ত আত্মা, তার ক্রিয়া ব্যক্তিরও মধ্যে এবং বিশ্বেরও মধ্যে এবং বিশ্বকেও ছাপিয়ে। এই আত্মাকে মনের বিবিক্ত ভাবের দ্বারা প্রকাশ করা যায় না; মহাপুরুষ ঋষিরা এবং অপূর্ব শক্তিশালী আগমবাদীরা তাঁদের অনুপ্রেরণা থেকে সহস্র রকমের বর্ণনা দিয়েও তার অনন্ত ঐশ্বর্যকে পূর্ণভাবে ব্যক্ত করতে পারেন নি।

বিশ্বের দিক থেকেই তাকে ব্রহ্ম বলা হয়েছে। সেই অদ্বিতীয় ব্রহ্মই বিশ্বের—সকল রূপের ও সকল শক্তির ও সকল ভাবের ভৌতিক, আধ্যাত্মিক ও চেতনাময় সার সত্তা, তাই হলো বিশ্বের সকল কিছুর জন্মদাতা ও ভর্তা ও নিয়ন্তা। সেই বিশ্বগত ও বিশ্বাতীত পরমাত্মা। বিশ্বকে শেষ পর্যন্ত আমরা যত নাম দিয়েই ব্যাখ্যা করি—যেমন শক্তি ও জড়, নাম ও রূপ, পুরুষ ও প্রকৃতি, কোনো কিছুর দ্বারাই তাকে ও তার প্রকৃতিকে পুরোপুরি বোঝানো যায় না। মন-প্রাণ-দেহের উপাধিমুক্ত সেই একই পরমাত্মা থেকে বিভিন্ন প্রকার দেহ-প্রাণ-মন ও চৈত্যসত্তার আকৃতি নিয়ে আমরাও তারই লীলাকে যেমন বিচিত্র করছি, বিশ্বও তেমনি সেই নিরুপাধিক পরমাত্মা থেকে বিশ্বআত্মা ও বিশ্বপ্রকৃতির বিভিন্ন প্রকার উপাধি নিয়ে তাঁরই লীলাকে বিচিত্র করছে। অথচ নিজে তিনি এর কোনোটাই নন, ভাব কিংবা নাম কিংবা রূপের কোনো উপাধিই তাঁর নেই, এমন কি, মৌলিক পুরুষ-প্রকৃতির ভেদও সেখানে নেই। যে পরম আত্মা ও পরম অস্তিত্ব থেকে এত বিচিত্র জগৎব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হয়েছে, সে অনন্ত আত্মা এবং অনন্ত সত্তা। কেবল প্রকৃতিভেদে আমাদের মধ্যে বিভিন্ন ব্যক্তিত্ব, যাকে বলা যেতে পারে একই পরাৎপরের বিভিন্ন অংশবিভূতি। সুতরাং আপন আত্মাকে যে আবিষ্কার করবে সে এ কথাও জানবে যে, তার স্বাভাবিক ব্যক্তিত্বটুকু প্রকৃতপক্ষে তার নিজের কিছুই নয়, একই বিশ্বসত্তা প্রকৃতির সম্পর্কে ও অন্যান্য ব্যক্তিদের সম্পর্কে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন আকার নিয়েছে মাত্র, নতুবা উপর থেকে দেখলে তা একই সত্তার প্রাণপ্রতিষ্ঠিত হচ বাহ্য কণাংশ।

সেই চূড়ান্ত অস্তিত্বকে ব্যক্তিও বলা যায় না, বিশ্বও বলা যায়না। যার আধ্যাত্মিক জ্ঞান আসবে, সে তাকে এই দুইরকম শক্তির কোনটাই ভাববেনা, এগুলিকে ছাড়িয়ে সে ভাববে পরাৎপরকে। সে জানবে যে তা এমন কিছু যার নাম দেওয়া যায়না, যাকে মনের দ্বারা ধরা যায়না, তা শুধুই তাই, নিরুপাধিক ও নিরপেক্ষ। আগেকার জ্ঞানযোগে তাই ব্যক্তি ও বিশ্ব দুইকেই বাদ দিয়ে রেখেছে। তাতে যাকে খুঁজতে বলে তিনি নিরাকার, সকল সম্বন্ধ ও বর্ণনাতীত, তিনি এও নন, তাও নন, নেতি নেতি। অথচ বলা হচ্ছে যে তিনি এক, অদ্বিতীয়, অনন্ত, এবং অনির্বচনীয় রূপে একাধারে তিনি সৎ ও চিৎ ও আনন্দ। আর যদিও মনের দ্বারা তাঁকে জানা যায় না, তবু কিন্তু আমাদের এই ব্যক্তিসত্তার ভিতর দিয়ে এবং বিশ্বজোড়া নাম রূপের ভিতর দিয়ে সেই পরম ব্রহ্মের নাগাল পাওয়া যায়, আর যখন সেই ভাবে তাঁকে উপলব্ধি করি তখন নিজেদের চেতনাতে এও উপলব্ধি করি যে আমাদের ভিতরকার যে মূল সত্তা, সে তাঁরই স্বরূপ। তাই সেই পরম ব্রহ্ম সম্বন্ধে ভাবনা ধারণা করতে গেলে প্রথমে পূর্বোক্ত প্রকারের কৌশল অবলম্বন করতে বাধ্য হতে হয়। নেতিবাদের সাহায্য নেওয়া সেখানে অপরিহার্য হয়ে পড়ে, নিজের মধ্যে যে সব পূর্বধারণা ও সংকীর্ণ অভিজ্ঞতার বোঝা জমা হয়ে আছে সেগুলিকে ঝেঁটিয়ে দূর ক'রে দেবার জন্য; তখন অনিশ্চিত ও অনির্দিষ্টের ভিতর দিয়েই সেই অনন্তের দিকে অভিযান শুরু করতে বাধ্য হতে হয়। মানুষের মন আবদ্ধ হয়ে রয়েছে তার যত কিছু ধারণা দিয়ে গড়া প্রাচীরবেষ্টিত এক কারাগারের মধ্যে, নিজের কাজগুলি চালাবার জন্য এটা তার দরকার হয়, কিন্তু জড় প্রাণ মন ও আত্মা সম্বন্ধে যে সকল ধারণার কোনোটাই খাঁটি সত্য নয়। মনশ্চক্ষে

আমরা তাই দেখতে থাকি, কিন্তু তার সামনে বিস্তৃত সেই আলো-আঁধারি পার হয়ে যদি একবার অতিমানস জ্ঞানের বিস্তীর্ণ প্রান্তরে উপনীত হতে পারি, তখন আর ঐ সকল কৌশলের কিছুই প্রয়োজন থাকবে না। অতিমানসের আলো তখন তোমাকে সেই অনন্ত ব্রহ্ম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ এক আলাদা রকমের ইতিবাচক অকস্ত ও জীবন্ত প্রত্যক্ষ অনুভূতি পাইয়ে দেবে। কারণ ব্রহ্ম যদিও ব্যক্তি বা নির্ব্যক্তিকের অতীত, তথাপি সে দুই রকমই, এক দিকে নির্ব্যক্তিকও বটে আবার অন্যদিকে এক চরম ব্যক্তিও বটে। যদিও সে সকল রকম সংখ্যা গণনার অতীত, তথাপি সে এক হয়ে বিশ্বের মাঝে অসংখ্য রকমে বহু। যদিও তার গুণের কোনো সীমা নেই, তথাপি সে নির্গুণ শূন্য মাত্র নয়, অসংখ্য রকমের গুণ রয়েছে তার মধ্যে। ব্যক্তি-আত্মাও তিনি, সমষ্টি-আত্মাও তিনি, সকল সমষ্টির অধিকও তিনি; তিনিই নিরাকার ব্রহ্ম, আবার তিনিই সাকার বিশ্ব। তিনি বিশ্বগত ও বিশ্বাতীত, তিনিই পরম পুরুষ ও পরমা শক্তি, চির অজাত থেকেও তিনি নিত্য জাতক, অসীম হয়েও অসংখ্য প্রকারে সসীম। তিনি বহুরূপী এক, জটিলরূপী সরলতা, কঠিনরূপী সহজ, নিস্তব্ধরূপী বাণী, নির্ব্যক্তিকরূপী ব্যক্তি, অনন্তরূপী প্রহেলিকা। উচ্চতর চেতনার কাছে অতীব স্বচ্ছ, কিন্তু নিম্নতর চেতনার কাছে চোখ ধাঁধানো তীব্র জ্যোতির আড়ালে নিজেকে আবৃত রেখে চির অদর্শনীয় ও দৃষ্টি দুর্ভেদ্য। মাত্রা হিসাবী মনের কাছে এই সকল বৈপরীত্য এতই পরস্পর-বিরোধী যে, ওর মধ্যে কোনো সামঞ্জস্য করাই সম্ভব হয় না, কিন্তু অতিমানসের সত্যচেতনা এলে তার অবাধ দৃষ্টি ও অনুভূতির কাছে সব রকমের বৈপরীত্যই এত সহজে মিলে যায় যে সেখানে বিরোধের কল্পনা করতে যাওয়াও অকল্পনীয় অপরাধের সামিল হয়ে পড়ে। মাত্রা হিসাবের ও পার্থক্য-বুদ্ধির দেয়াল তখন ভেঙে ধূলিসাৎ হয়ে গেছে, সরল সুন্দর সত্যটি স্বচ্ছ ভাবে দেখা দিয়ে সব কিছুর মধ্যেই একটা সঙ্গতি ও ঐক্যের উজ্জ্বল আলো জ্বেলে দিয়েছে। মাত্রা বুঝে ও পার্থক্য বুঝে কাজ করা ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তখনও চলছে, কিন্তু আত্মভ্রান্ত চিত্তের যে আড়াল করা কারা-প্রাচীর ছিল তা আর নেই।

ব্রহ্ম সম্বন্ধে এই নব চেতনা এবং ব্যক্তি ও বিশ্ব সম্বন্ধে তার যা অনুচিত প্রতিক্রিয়া, তাই হবে শাশ্বত জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা! মন সেই চেতনাকে নিয়ে নানা পথে পরিচালিত করতে পারে, নানা দার্শনিক তত্ত্বের সৃষ্টি করতে পারে, ওর কোনো একটি দিকে বেশী ঝোঁক দিয়ে তাকে কমিয়ে বাড়িয়ে নতুন কিছু আকার দিতে পারে, তার থেকে সত্যকে ও ভ্রান্তিকে পৃথক পৃথক ক'রে দেখাতে পারে। কিন্তু মানুষের মনের বুদ্ধিগত বৈষম্য ও অপূর্ণতা যেমন ভাবাই বলুক, চরম কথা হলো এই যে, ভাবনা ও অনুভূতির চূড়ান্ত হলো ঐখানেই, ঐখানে গিয়েই পৌঁছতে হবে। জ্ঞানযোগের একমাত্র লক্ষ্য সেই শাশ্বত সদ্‌বস্তু, সেই পরম ব্রহ্ম, সেই পরাৎপর, যিনি সবার মধ্যে থেকে সবার উপরে বিরাজ করছেন, যিনি ব্যক্তিতে ও বিশ্বে থেকেও গোপন হয়ে আছেন।

জ্ঞানের চূড়ান্তে গিয়ে পৌঁছলে যে পার্থিব অস্তিত্বকে উড়িয়ে দিতে হবে এমন কোনো কথা নেই। কারণ যে ব্রহ্মের মধ্যে আমরা নিজেদের মিলিয়ে দেবো, যে পরাৎপরের মধ্যে তলিয়ে যাবো, তার মধ্যে আমাদের একান্ত কাম্য পূর্ণচেতনাই রয়েছে আর সেই চেতনা দিয়ে নিজেই তিনি সর্বক্ষণ এই পৃথিবীতে এবং সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তাঁর সৃষ্টির নিত্যলীলা ঘটিয়ে চলেছেন। আর এ কথা মনে করাও ভুল হবে যে, জ্ঞানযোগের সাধনান্তে সিদ্ধিলাভ করলেই আমাদের পার্থিব অস্তিত্বের কাজ শেষ হয়ে গেল, অতঃপর আর কিছুই করবার রইল না। কারণ ওর দ্বারা আমরা আভ্যন্তরীণ স্থিরতা এনে ব্যক্তিগত আত্মোপলব্ধি পেলাম মাত্র; ওর পরের কাজ আরো বাকি রইল। মুক্তির নীরবতার মধ্যে ডুবতে পারলেও সেখানেই থেমে যাওয়া চলবেনা, তখন স্বয়ং ব্রহ্মের আত্মপরিণতির ক্রিয়াতে যোগ দিতে হবে, তিনি ব্যক্তির মধ্যে যে দিব্যের অভিব্যক্তি ঘটালেন তার প্রত্যক্ষ নিদর্শন জগৎকে দেখিয়ে তদনুযায়ী কর্ম করতে হবে—যে কর্ম সম্পাদন করতে মহাপুরুষেরা সিদ্ধিলাভের পরেও এখানে অবস্থান করেন। যতদিন আমরা আমি-চেতনার মধ্যে আটক থাকি আর মনের দীপটুকু জ্বেলে অন্ধকারের মধ্যেই হাতড়াতে থাকি, ততদিন পর্যন্ত কোনো আত্মপরিণতির কাজ সার্থকভাবে হতে পারেনা। সেই সংকীর্ণ বর্তমান চেতনা কেবল প্রকৃতির ক্ষেত্র মাত্র, তার সাহায্যে পূর্ণতা মেলেনা; কারণ তার দ্বারা যতটুকু আলো ফোটে তা অহংমিশ্রিত অবিদ্যা ও ভ্রান্তির প্রভাবে অন্ধকারেই মিলিয়ে যায়। দিব্য অভিব্যক্তি নিয়ে ব্রহ্মের যে প্রকৃত আত্মপরিণতি ঘটবে তা কেবল ব্রহ্মচেতনার ভিত্তিতেই সম্ভব হতে পারে। সুতরাং জীবন্মুক্ত আত্মা জীবনকে স্বীকার ক'রে নিলে তার দ্বারাই সে কাজ সফল হবে।

সেই হলো পূর্ণ জ্ঞান। ওতে আমরা জানবো যে সর্বত্র ও সর্ব অবস্থায় আমরা যা কিছু দেখছি সমস্ত একই জিনিস, যা কিছু অনুভব করছি তা একই সত্তা, কোথাও কোনো ফাঁক নেই। মন-যন্ত্রটিই কেবল তার চিন্তার ও আস্পৃহা জাগাবার সাময়িক সুবিধার জন্য আপোষে কতকগুলি কৃত্রিম ভাগাভাগি ক'রে নেয়, শাশ্বতের এক অংশের সঙ্গে অন্য অংশের অমিল রচনা করে। মুক্ত আত্মা যে হয় সে ঐ অজ্ঞান মনের ধারার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই কাজ করতে থাকে, বরং সর্বকৃৎ হয়ে সে তখন আরো বেশী কাজ করতে পারে, কারণ যা কিছু সে করে তা সত্যজ্ঞান ও বৃহত্তর চিৎশক্তি নিয়ে। কিন্তু ভিতরে সে ঐক্যের ভাব থেকে কিংবা পূর্ণচেতনা ও সর্বোচ্চ জ্ঞান থেকে কিছুমাত্র বিচ্যুত হয় না। কারণ সে নিশ্চিত জানে যে পরমাত্মা অগোচর হয়ে থাকলেও এই জগতেরই মধ্যে বিরাজ করছেন, আর তিনি যেমন চূড়ান্ত নির্বাণের মধ্যে অনির্বচনীয়রূপে আত্মবিলোপ ক'রে থাকতে পারেন, তেমনি আবার অনির্বচনীয় রূপে এই বস্তুজগতের মধ্যেও থাকতে পারেন।

অনুবাদক :—পশুপতি ভট্টাচার্য্য

"Where there is marriage without love, there will be love without marriage."

—Benjamin Franklin.

শ্রীঅরবিন্দের আদর্শ ও সাধনা

শ্রীরামেশ্বর সাউ

"অমৃতং তু বিদ্যা"

The earliest formula of Wisdom promises to be its last—God, Light, Freedom, Immortality. —*The Life Divine*, *Ch. I*

সৃষ্টির আদিম মানুষ যাহা চাহিয়াছিল, আজিকার মানুষ তাহা চাহে না ; আজিকার মানুষ যাহা চাহে, ভবিষ্যতের মানুষ তাহা চাহিবে না। যুগের পরিবর্ত্তনের সহিত মানুষের চাহিদার পরিবর্ত্তন চলিয়াছে বিচিত্র গতিতে। যুগে যুগে বিভিন্ন ব্যক্তিপুরুষকে কেন্দ্র করিয়া বিভিন্ন যুগাদর্শ মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। ঋষি মধুচ্ছন্দা কি চাহিয়াছিলেন, তাহার পর মনু কি চাহিলেন। বুদ্ধ কি চাহিয়াছিলেন, তাহার পর শঙ্কর কি চাহিলেন। মহাপ্রভু কি শিখাইয়াছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ কোন্ আদর্শ আনিলেন !—যুগপুরুষদের যুগের প্রয়োজনে বিচিত্র শিক্ষা, বিচিত্র বাণী, বিচিত্র আদর্শ ! তাঁহাদের আদর্শের এই ধ্বস্তাধ্বস্তির মধ্যে সাধারণ মানুষ কখনও নিষ্পিষ্ট হইয়াছে, কখনও একটিমাত্র কাষ্ঠখণ্ডকে আশ্রয় করিয়া ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ তরঙ্গিণী অতিক্রম করিয়াছে। অথচ মানুষের যে ক্রন্দন তাহা আজিও থামিল না—তাহার চাহিদাকে আজিও কেহ পূর্ণ করিতে পারিল না ! শুধু সাময়িক ভাবে তৃষ্ণার নিবৃত্তি হইয়াছে দেখিতে পাই। কারণ তাহার সেই চাহিদাকে সে সর্ব্বত্র প্রকট করিয়া ধরিতে পারে নাই, তাহার মূল চাহিদাকে সকলে ঠিক ঠিক বুঝিতেও পারে নাই।১

তাহার সকল চাহিদার অন্তরে এই যে সুপ্ত গুপ্ত চাহিদা—যাহার পূর্ত্তি হইলে সব চাহিদার পূর্ত্তি এবং জীবনের পূর্ণতা,—সেই চাহিদা কি ? সে চাহিদা অমৃতের চাহিদা, অমরত্ব লাভের এষণা—

"মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে, মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।" এই অমৃত এষণার মূলে দুইটি মূল সত্তা রহিয়াছে, প্রথমতঃ আমি আমাকে ভালবাসি ; তাই আমাকে আমি নষ্ট করিয়া দিতে, ধ্বংস করিয়া দিতে, নিশ্চিহ্ন করিয়া দিতে চাই না। আমি যে পরের সেবা, দেশের সেবা বা ঈশ্বরের সেবায় নিজেকে বিলাইয়া দিতে চাই, তাহার কারণ আমি আমাকে নিভাইয়া ফেলিতে চাই না ; তাহার কারণ আমি চাই আমাকে বিস্তৃত করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতে, প্রাকৃত জীবনের সীমাকে ছাড়াইয়া এক বিস্তৃততর পরিধির মধ্যে নিজের মহত্তর সত্তাকে উপলব্ধি করিতে ! আমি চাই—চারিদিকে আমার শিকড় ছড়াইয়া আমার রস-সঞ্চয়কে বাড়াইয়া আমি বড় হইয়া উঠিব, বিরাট হইয়া উঠিব (মনে রাখিতে হইবে অহং হইতে মুক্তি—এই বড় হওয়ার প্রধান লক্ষণ)। দ্বিতীয়তঃ, আমি আমার বাঁচার আধারকেও বড় করিয়া অমর করিয়া রাখিব। আমি যে মৃত্যু কামনা করি, তাহার কারণ, আমার আধারের প্রতি—আমার দেহ-প্রাণ মনের প্রতি—আমার বিদ্বেষ আছে, তা নয় ; তাহার কারণ আমার অন্তরাত্মার, আমার চৈত্যপুরুষের বিবর্ত্তনের সঙ্গে তাহার যোগসূত্রটি কাটিয়া গিয়াছে, আমার অন্তরপুরুষের সাথে সে আর পা মিলাইয়া চলিতে পারে না।

আধ্যাত্মিক সাধক-যোগী-ভক্তের কথা ছাড়িয়া দিলে জড়বাদীর পার্থিব জীবন কামনার পশ্চাতেও একই চাহিদা নিহিত দেখিতে পাই। জড়বাদীর সাময়িক ভোগজনিত যে তৃপ্তি তাহাতে সাময়িক আত্মবিস্মৃতি ঘটে, সীমা ও মৃত্যুচেতনা সাময়িক ভাবে লোপ পায়। সীমা ও মৃত্যুকে অতিক্রম করার এই ব্যর্থ প্রয়াস জড়বাদীকে লুব্ধ করিয়াছে—যদিও সে-সম্বন্ধে তিনি সচেতন নন। পিতামহেরা একেই লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন :—

বিদ্যাং চাবিদ্যাং চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে ॥

অবশ্য ইহার মধ্যে কোন সত্য বা সার্থকতা নাই, এমন নয়—

A riddle of opposites is made his field :
Freedom he asks but needs to live in bonds,
He has need of darkness to percieve some light,
And need of grief to feel a little bliss ;
He has need of death to find a greater life.
—*Sri Aurobindo*, *Sabitri*, *P. 381.*

তথাপি পার্থিব জীবনের এই সীমা জড়বাদীকে মুক্তি দিতে পারে নাই, তাঁহাকে আরও শক্ত করিয়া বাঁধিয়াই ধরিয়াছে।

১। তুলনা করুন—

Assailed on earth and unassured of heaven,
Descended here unhappy and sublime,
A link between the demigod and the beast,
He knows not his own greatness nor his aim ;
He has forgotten why he has come and whence ;
His spirit and his members are at war,
His heights break off too low to reach the skies,
His mass is buried in the animal mire."
—*Sri Aurobindo*, *Savitri*, *Book III*, *Cant IV.*

জড়বাদীর এই যে সাময়িক আত্মবিস্মৃতি, ইহাতে চেতনার অবনতিই সাধিত হয়, এক নিদ্রিত তামসিকতার গর্ভে এই যে আত্মলয়, ইহাতে সচেতন আত্মতৃপ্তি নাই। কারণ, আত্মমুক্তি নাই। অপর দিকে আধ্যাত্মিক মুক্তির মধ্য দিয়া সীমা ও মৃত্যুকে জয় করার প্রয়াসে আছে সচেতন মুক্তি—শক্তি ও জ্যোতির উপলব্ধি। সেখানে মৃত্যুতে সব কিছু কালো হইয়া যায় নাই; জীবন ও জ্যোতির প্রবল প্রবাহে সবকিছু উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। আচার্য্য শঙ্কর এই দুই প্রকার আত্মবিস্মৃতির মধ্যে যে পার্থক্য, তাহা সুন্দর ভাবে দেখাইয়াছেন—

আত্মতত্ত্বং ন জানাতি সুপ্তৌ যদি তদা কথা।
আত্মধীরেব বিস্তেতি বাচ্যং ন দ্বৈত বিস্মৃতিঃ॥

—পঞ্চদশী, তৃপ্তি-দীপ, ৭।১৮৫

—"আত্মতত্ত্বজ্ঞানকেই আত্মবিদ্যা বলা উচিত; দ্বৈতবিস্মরণকে তাহা বলা চলে না; তাহাই যদি বলা যাইত, তাহা হইলে তো সুষুপ্তি অবস্থাকেও জ্ঞানের অবস্থা বলা যাইত, কারণ সুষুপ্তিতে দ্বৈতজ্ঞানের অভাব ঘটে। কিন্তু জ্ঞান অভাব নহে, ভাব।"

আমরা বলিতেছিলাম মানুষের চাহিদা অমৃত, অমরত্ব, এবং তাহা সকলের মধ্যেই একভাবে-না-একভাবে আছে। এই অমরত্বকে পাইতে চাই। শ্রীঅরবিন্দের পূর্ব্বে চেতনার অমরত্ব লাভ করিয়াছিলেন অনেকেই। কিন্তু সে-অমরত্ব একান্ত ভাবে চেতনারই। আধ্যাত্মিক চেতনা ছাড়া—বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় কোষ ছাড়া—মানুষের আত্মপ্রকাশের রহিয়াছে যে আরও তিনটি যন্ত্র—মনোময় কোষ, প্রাণময় কোষ ও অন্নময় কোষ—ইহাদের অমরত্ব শ্রীঅরবিন্দের পূর্ব্বে কেহ দাবী করেন নাই। (কারণ ইহাদের অমরত্বের জন্য ইহাদের রূপান্তরের প্রয়োজন এবং তাহার সাধনা পূর্ণযোগের সাধনা—শ্রীঅরবিন্দের অতিমানসিক যোগের সাধনা; এই সাধনার সময় তখনও হয় নাই। বর্ত্তমানে হইয়াছে বিবর্ত্তনের ক্রমবিকাশের ফলেই, এ কথা শ্রীঅরবিন্দ স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছিলেন।) তাই চেতনার যখন মুক্তি হইয়াছে, তখন অনেকেই পার্থিব জীবনকে পিষিয়া শুষিয়া নিশ্চিহ্ন করিয়া পলাইয়া গিয়াছেন সবকিছুর অতীত তুরীয় লোকে। সমস্ত প্রাচীন যোগই যে পরলোকসর্ব্বস্ব, তাহার একটি মূল কারণও ইহাই। পার্থিব আধারের এই তিনটি অংশকে অমরত্ব দান করার পথ দেখাইলেন শ্রীঅরবিন্দ। শ্রীঅরবিন্দের নিজের ভাষায়—

"The ascent of man from the physical to the supramental must open out the possibility of a corresponding ascent in the grades of substance to that ideal or causal body which is proper to our supramental being, and the conquest of the lower principles by supermind and its liberation of them into a divine life and a divine mentality must render possible a conquest of our physical limitations by the power and principle of supramental substance. And this means the evolution not only of an untramelled consciousness, a mind and sense not shut up in the walls of the physical ego or limited to the poor basis of knowledge given by the physical organs of sense, but a life-power liberated more and more from its mortal limitations, a physical life fit for a divine inhabitant and,—in the sense not of attachment or of restriction to our present corporeal frame but an exceeding of the law of the physical body,—the conquest of death, an earthly immortality."—*The Life Divine, Vol. I Ch. XXVI.*

শ্রীঅরবিন্দ এই সহজ কথাটা প্রথমেই বলিয়াছেন—"To be perpetually reborn is the condition of material immortality."—(*The Synthesis of Yoga, Ch. I.*) এই সাধনা যে দিব্যজীবনের সাধনা, তাহার পরিণতি অমরত্ব।

শ্রীঅরবিন্দের এই দিব্যজীবনের সাধনা ও আদর্শ আলোচনা করিতে গিয়া একটি কথা প্রথমেই বলিয়া রাখা প্রয়োজন—এই যোগমার্গের সাধক প্রাচীন যোগপন্থাগুলির সবকিছুকে যেমন চরম লক্ষ্য বলিয়া আঁকড়াইয়া ধরেন নাই, তেমনি তাহাদের অন্তর্নিহিত সত্যটুকুও অস্বীকার করেন নাই।

প্রাচীন যোগপন্থাগুলির প্রত্যেকটিকে দেখি তাহারা প্রত্যেকে মানব-সত্তার এক-একটি অংশকে আশ্রয় করিয়া চলিয়াছে। মানব-সত্তার আছে যে পাঁচটি অংশ—অন্নময় কোষ, প্রাণময় কোষ, মনোময় কোষ, বিজ্ঞানময় কোষ ও আনন্দময় কোষ—তাহাদের প্রত্যেকটির কর্ম্মধারা স্বতন্ত্র, সার্থকতাও স্বতন্ত্র; তবু তাহারা পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন নয়। এক-একটি যোগমার্গ মানবসত্তার এই এক-একটি অংশকে আশ্রয় করিয়াছে বলিয়া তাহাদের ফলও আংশিক। মানুষের—পূর্ণ অখণ্ড মানুষের—সামগ্রিক সাধনা তাহাদের কাহারও নাই। হঠযোগের ক্রিয়া সীমাবদ্ধ অন্নময় ও প্রাণময় কোষে।

শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ

হঠযোগী আনিতে চাহিয়াছেন, দেহের ও প্রাণের উপর সজ্ঞান নিয়ন্ত্রণ। দেহের প্রতিটি অংশ—অন্তর ও বাহ্য,—প্রতিটি কোষকে সক্রিয় সুন্দর সুঠাম করিয়া গড়িয়া তুলিতে তাঁহার ক্রিয়া অব্যর্থ। দেহের নাড়ীগুলিকে শুদ্ধ করিয়া শোধিত করিয়া তাহাদের সীমায়িত প্রাণের গণ্ডি ভাঙ্গিয়া প্রকৃতির বিপুল প্রাণ-স্রোতের সহিত নিজেকে যুক্ত করিয়া দিয়াছেন হঠযোগী। তাহার জন্ম তাঁহার দুইটি মূল উপায় রহিয়াছে—আসন ও প্রাণায়াম, আনুষঙ্গিক রহিয়াছে নেতি, ধৌতি প্রভৃতি বহু গুহ্য ক্রিয়া ও প্রক্রিয়া। আয়ুর সাধারণ সীমাকে হঠযোগী অতিক্রম করিয়াছেন অবলীলাক্রমে। "শতবর্ষ জীবিত থাকা তাঁহার পক্ষে অতি তুচ্ছ কথা। দেড় শত বৎসর বয়স হইয়া গেলেও দেখিবে, তিনি পূর্ণ যুবা ও সতেজ রহিয়াছেন, তাঁহার একটি কেশও শুভ্র হয় নাই।" (২) তাঁহার দেহ ও প্রাণ অপূর্ব্ব শক্তিতে পূর্ণ, বিচিত্র বিভূতিতে ঐশ্বর্য্যবান। কিন্তু তাঁহার অমৃতের পিপাসার নিবৃত্তি হইল কৈ? —'অমৃতত্বস্য নাশাস্তি বিত্তেন'—এই ঐশ্বর্য্যে তিনিও হাঁপাইয়া উঠিয়া অমৃতের জন্ম ব্যাকুল হইয়া উঠেন। অবশ্য ঐশ্বর্য্যের প্রাচুর্য্য দিব্যজীবনের পক্ষে বিঘ্নকর, আমরা এমন কথা বলি না। আমরা বলি—এর পরেও আছে—এহো বাহ্য। অতএব ততঃ কিম্?—হঠযোগীর দীর্ঘজীবন আয়ুর সাধারণ সীমাকে অতিক্রম করিয়াছে, কিন্তু মৃত্যুকে সম্পূর্ণরূপে জয় করিতে পারে নাই। প্রকৃতির এই প্রাণস্রোত এক দিন তাঁহার আধার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবেই। সেদিন অমৃত এবং অমরত্বের এই মস্ত অভাব বড় শক্ত করিয়া বাজিবে।

দেহ ও প্রাণের পর মন। এই মনকে আশ্রয় করিয়াছে রাজযোগ। প্রথমতঃ মনকে শান্ত শুদ্ধ সংযত করিতে রাজযোগ অবলম্বন করিয়াছে অহিংসা, সত্য, অস্তেয় প্রভৃতি যম এবং আন্তর ও বাহ্য শৌচ। মনের উপর প্রাণের ও দেহের যে প্রভাব এবং তজ্জনিত যে নিম্নমুখী আকর্ষণ তাহার হস্ত হইতে মুক্তি পাইবার জন্ম রাজযোগী প্রাণায়াম ও আসনকে আমল দিয়াছেন, কিন্তু ঐ প্রয়োজনের অতিরিক্ত তাহাদের সেখানে প্রবেশাধিকার নাই। প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান এই ভাবে ধাপের পর ধাপ অগ্রসর হইয়া আসিয়া 'তদেবার্থমাত্রনির্ভাসংস্বরূপশূন্যমিব সমাধি'র মধ্যে লীন হইয়া গেলেই রাজযোগের সার্থকতা। ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব হইতে মুক্তি দিয়া রাজযোগ বৃহত্তর আত্মচেতনার আস্বাদ আনিয়া দেয়। রাজযোগের এই অবদান অনস্বীকার্য্য। তথাপি একথা বলিতেই হয়, হঠযোগী যেমন ঐশ্বর্য্যকে ধরিয়া অমৃতকে ভুলিয়াছেন, রাজযোগী তেমনি অমৃতকে পাইয়া ঐশ্বর্য্য হইতে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইয়াছেন। অপূর্ণতা তাই উভয়ের মধ্যেই রহিয়াছে।

অথচ রাজযোগীর এই সংকীর্ণ জীবনবোধ চিরকালই ছিল না। এই আত্মমুক্তির পর রাজযোগী তাঁহার যোগৈশ্বর্য্যে তাঁহার যোগশক্তিতে পার্থিব জীবনকে, পারিপার্শ্বিককে, পৃথিবীকে শোধিত নিয়ন্ত্রিত করিয়া অমৃতের আধারে গঠিত করিবার সাধনা করিতেন। তাই 'স্বারাজ্যসিদ্ধি'র পর 'সাম্রাজ্যসিদ্ধি'র বিধান ছিল। রাজযোগীর এই দুই প্রকার সিদ্ধি স্বীকার করিয়া লইয়াও দিব্য জীবনের সাধক বলিয়াছেন, রাজযোগ মূলতঃ পরলোকসর্ব্বস্ব। কারণ জীবনের ধর্ম্মকে তিনি পূর্ণ করিয়া স্বীকার করেন নাই, ইহজীবনের অমরত্ব তিনি দাবী করেন নাই। তাই তুরীয় ভূমি তাঁহার নিকট সর্ব্বোচ্চ আদর্শ, রাজযোগী দেহ-প্রাণ-মনকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন, কিন্তু অমরত্বের আধারে রূপান্তরিত করিতে পারেন নাই।

হঠযোগ-রাজযোগ ধরিয়াছে আধারকে। বলিয়াছে, মানুষের অজ্ঞানতার আবরণ রহিয়াছে তাহার প্রাণে, মনে, দেহে। আধারকে তাই শোধিত কর, অজ্ঞানতার আবরণ আপনি খসিয়া যাইবে, চিৎসত্তা তখন ফুটিয়া উঠিবে নিজস্ব স্বরূপ লইয়া। মার্গত্রয়ী কিন্তু হাত দিয়াছে মানবসত্তার মূলে। বলিয়াছে, তুমি তৎস্বরূপ—'তত্ত্বমসি'। তোমার এত দেহ-মন-প্রাণের কসরতের দরকার কি? তোমার মূলে দেখ,—তোমার অন্তরাত্মায় কোন্ প্রেরণা খেলিতেছে—জ্ঞান, প্রেম না কর্ম্ম? যাহাই খেলুক, সে তো তাঁহারই প্রকাশিত হইবার এষণা। তাহা যদি বিকৃত হইয়া থাকে তবে তাহাকে স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত কর, বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিলে তাহাকে মূল উৎসের সহিত যুক্ত করিয়া দাও। তাহার অবিচ্ছিন্ন প্রবাহই তোমাকে ধুইয়া মুছিয়া শুদ্ধ বুদ্ধ অপাপবিদ্ধরূপে প্রতিষ্ঠিত করিবে। মার্গত্রয়ীর—জ্ঞান-কর্ম্ম-ভক্তিযোগের সাধনা, এই দিক দিয়া বিচার করিলে অত্যন্ত খাঁটি ও আন্তরিক সাধনা বলিতে পারি।

জ্ঞানযোগী বলিয়াছেন, জানিবার প্রেরণা মানুষের সত্য প্রেরণা। কিন্তু কি জানিতে হইবে তাহাকে? জানিতে হইবে নিজেকে—'আত্মানং বিদ্ধি।' কারণ, জ্ঞানযোগীর মতে আত্মতত্ত্বই পরমতত্ত্ব। গীতা বলিয়াছেন—

> অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্।
> এতজ্‌জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোঽন্যথা।—১৩/১১

আত্মা ও পরমাত্মার অভেদজ্ঞান, জগতের সর্ব্বত্র পরমাত্মার অবস্থিতিজ্ঞান এই তো সম্যক্ জ্ঞান—'ইত্যেব নিশ্চয়ঃ স্ফারঃ সম্যক্ জ্ঞানং বিদুর্বুধাঃ।' এই জ্ঞান হইলে আর বন্ধন থাকে না, মোহ থাকে না, কারণ তখন ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই নাই। জ্ঞানাবতার শঙ্কর তাঁহার 'মণিরত্নমালা'-গ্রন্থে আরও সহজ করিয়া আরও স্পষ্ট করিয়া এই কথাটাই ঘুরাইয়া বলিয়াছেন—'বোধো হি কো?—যস্তু বিমুক্তিহেতুঃ।' মোক্ষৈকসাধনস্বরূপ এই যে জ্ঞান, ইহার সাধনা কি? জ্ঞানযোগী বলিয়াছেন, সাধনা করিতে চাও?—সূচনা করো, দেখ নিত্য কি, সত্য কি, মিথ্যা কি। চাই এই 'নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকঃ'। কিন্তু সে বিবেক আসিবে কোথা হইতে? তোমার বাসনা-কামনা ঐহিক পারত্রিক সুখের প্রতি সমস্ত আকর্ষণ ত্যাগ কর, তোমাকে হইতে হইবে নিরাসক্ত প্রশান্ত। ইহারই নাম 'ইহামুত্রার্থফলবিরাগঃ'। এ ছাড়া চাই ষটসম্পত্তি—শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, শ্রদ্ধা ও সমাধান। আর সর্ব্বোপরি তোমার আন্তরিকতা। তুমি সত্যই অজ্ঞানতা হইতে, বন্ধন ও সীমা হইতে মুক্তি চাও কি?—'মুমুক্ষুত্ব নাম মোক্ষোঽস্তিতীব্রেচ্ছাবত্ত্বম্'। তারপর তুমি জ্ঞানযোগের অধিকারী হইবে। তখন তোমার সাধনা হইবে 'শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন'—শুনিবে সত্যের কথা, চিন্তা করিবে সত্যের স্বরূপ এবং বুঝিতে চেষ্টা করিবে গুরুবাক্য।

জ্ঞানযোগীর মহৎ লাভ সচ্চিদানন্দ। দেহ-প্রাণ-মনকে তিনি

২। স্বামী বিবেকানন্দ, "রাজযোগ।"

শুদ্ধ করিতে ততটা ব্যগ্র নন, যতটা ব্যগ্র তিনি তাহাদের ত্যাগ করিয়া তুরীয়ে উঠিয়া যাইবার জন্ত। জগৎ তাঁহার নিকট মায়া, প্রপঞ্চ, স্বপ্ন। সত্যের নির্গুণ রূপই তিনি দেখিয়াছেন, তাহার প্রকাশের প্রতি তিনি উদাসীন। শ্রীঅরবিন্দের যোগের সাধক তাই বলিয়াছেন,—"জ্ঞানযোগীর ভুল এইখানে, তিনি নিজের অস্মিতার মধ্যে ব্রহ্মকে প্রকট দেখিতেছেন, একান্ত ভাবে সেখানেই ব্রহ্মকে উপলব্ধি করিতেছেন। কিন্তু নিজের সত্তাকে জগতের কেন্দ্ররূপে না দেখিয়া, জগতের অন্যান্য বস্তুকে নিজের চৈতন্যের ছায়া বা মায়াখেলারূপে না গ্রহণ করিয়া যদি অপরের সত্তার মধ্যেও আমরা ব্রহ্মকে উপলব্ধি করিতে পারি, প্রত্যেক ব্যষ্টিগত চৈতন্যের মধ্যে একই ব্রহ্মের পূর্ণস্থিতি সাক্ষাৎ করি, তবে জগতের বাহিরে নয়, জগতের ভিতরেও ব্রহ্মকে পাইব। সকল দ্বৈতের মধ্যে অদ্বৈতের উপলব্ধির দ্বারা বুঝিব জগৎ ও ব্রহ্মের মধ্যে মায়াবাদী কল্পিত সে ব্যবধান নাই।" (—নলিনীকান্ত গুপ্ত, "পূর্ণযোগ") শ্রীঅরবিন্দ একটি চিঠিতে এ প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন—

"I do not agree with the view that the world is an illusion, 'mithya.' The Brahman is here as well as in the supracosmic Absolute. The thing to be overcome is the Ignorance which makes us blind and prevents us from realizing Brahman in the world as well as beyond it and the true nature of existence."

বস্তুতঃ, পরম সত্যের পূর্ণ স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া জীবনের ধর্ম ও কর্ম, তাহার পুষ্পিত বিকাশকে মহনীয় মোহনীয় মাধুর্য্যময় করিয়া তোলাতেই দিব্যজীবনের পূর্ণতা, তাহাই হইল দিব্যজীবনের পূর্ণযোগ—"মানুষ যখন তাহার অন্তঃস্থ ব্রহ্মের এই পরম প্রশান্তির এবং নির্গুণ ভাবের সন্ধান পায় এবং তাহার দিব্য আনন্দ ও সমতা হইতেই অক্ষয় কর্মধারা অবাধ গতিতে প্রবাহিত হইতে থাকে, তখনই তাহার মধ্যে পূর্ণতা আসে। যাঁহার মধ্যে এই শান্তির প্রতিষ্ঠা হইয়া গিয়াছে, তাঁহার নীরবতার মধ্যেই বিশ্বলীলার শক্তিসমূহের অক্ষয় প্রস্রবণ দেখা যায়।"

"Man, too, becomes perfect only when he has found within himself that absolute calm and passivity of the Brahman and supports by it with the same divine tolerance and the same divine bliss a free and inexhaustible activity. Those who have thus possessed the calm within, can perceive always welling out from its silence a perennial supply of energies that work in the universe."—*The Life Divine Vol I, Ch. IV.*

কর্মযোগী জীবনের প্রকাশ সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করেন নাই। মনের যেমন ধর্মজিজ্ঞাসা, প্রাণের ধর্ম তেমনি শক্তি—কর্মৈষণা। প্রাণ তুরীয়ের নীরবতায় সর্ব্বদা স্থির থাকিতে পারে না। বিশ্বের লীলায় তাহার প্রকাশ সিসৃক্ষারূপে। কর্মের প্রেরণা সৃষ্টির মূল হইতে—'কর্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি' (গীতা)। কর্ম না করিয়া মানুষ ক্ষণকালও থাকিতে পারে না, প্রকৃতির ইহাই নিয়ম। জীবন ধারণ করাও যে একটা কর্ম।—

ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ।

কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ।—গীতা, ৩।৫

তবে মানুষের অধিকার আছে শুধু কর্মে, কর্মফলে নয়—'কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচ ন'। কর্মযোগী তাহার জন্ত বিধান করিয়াছেন—তুমি যাহা কিছু কর—আহার, যজ্ঞ, দান, তপস্যা—সব শ্রীভগবানের উদ্দেশে উৎসর্গ কর—

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।

যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্।—গীতা, ৯।২৭

এই ভাবে আসক্তির বন্ধন ক্রমশঃ খসিয়া যাইবে, জীব পরব্রহ্মে লীন হইয়া যাইবে, পৃথিবীর বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া সে তাহার নিজস্ব ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হইবে—'অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ।'

এ যাবৎ যত কর্মযোগী সাধক আসিয়াছেন, তাঁহাদের মূল লক্ষ্য ব্রহ্মনির্ব্বাণ। কেহ কেহ জীবন্মুক্ত হইয়া কর্ম করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু তাহার পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য স্থাপনের জন্ত নয়, এই মায়াপ্রপঞ্চ হইতে জীবকুলকে সরাইয়া লইবার প্রেরণায়। শ্রীঅরবিন্দের কর্মযোগের সহিত প্রাচীন কর্মযোগের পার্থক্য এইখানেই। শ্রীঅরবিন্দ কর্মযোগের মুক্তিকে স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু সে মুক্তি জীবন্মুক্তি এই অর্থে নয় যে, জীবিতকালে পৃথিবী হইতে সকলকে পরলোকে সরাইয়া লইয়া যাইবার জন্ত কর্ম, বরং পৃথিবীতেই যথেচ্ছকাল জীবিত থাকিয়া এখানেই শাশ্বত স্বর্গলোক রচনা করা। দিব্য জীবনের সাধক শুধু মুক্তিকেই কামনা করেন না, তাঁহার লক্ষ্য ভগবানের দিব্যলীলাকে পৃথিবীতেই মূর্ত্ত করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়া ধরা এবং অমৃতের সঙ্গে সঙ্গে অমরত্ব লাভ করা। শ্রীঅরবিন্দ তাঁহার কর্মযোগের তিনটি স্তর দেখাইয়াছেন। প্রথমাবস্থায় পৃথক কর্ত্তৃত্ববোধ যখন থাকে তখন সাধক ভগবানের উদ্দেশ্যে কর্ম করিয়া চলেন। ক্রমে দ্বিতীয় স্তরে যখন উঠিয়া আসেন, তখন বুঝিতে পারেন তিনি মা মহাশক্তির দিব্যলীলার যন্ত্র মাত্র, মহাশক্তি সাধকের আধারকে অবলম্বন করিয়া নিজেরই কর্ম করিয়া থাকেন। "একদিন আসবে যখন ক্রমেই তোমার এ অনুভব বৃদ্ধি পাবে যে তুমি যন্ত্র, কর্মী নও।" ক্রমে মহাশক্তি যতই সাধককে অধিকার করিয়া চলেন সাধক ততই বুঝিতে পারেন, মা ভগবতী কেবল প্রেরণা দেন না, পথ দেখাইয়াই চলেন না, পরন্তু সাধকের প্রতি কর্ম প্রবর্ত্তন ও উদ্‌যাপন তিনিই করেন। এই সিদ্ধির শেষ অবস্থা শ্রীঅরবিন্দের নিজেরই অনবদ্য ভাষায়—

"The last stage of this perfection will come when you are completely identified with the Divine Mother and feel yourself to be no longer another and separate being, instrument servant or worker but truly a child and eternal portion of her consciousness and force. Always she will be in you and you in her...."

—("*The Mother*". *pp*, 32-33)

ভক্তিযোগের সাধনা হৃদয়কে লইয়া। মানুষ যেমন কর্ম করিতে চায়, জানিতে চায়, তেমনি তাহার সমস্ত প্রেরণার সঙ্গে

থাকে ভালবাসার প্রেরণা। কারণ, সে নিজেই রসস্বরূপ, বিবেকানন্দ এত দূর বলিয়াছেন যে, মানুষের আত্মা প্রেমস্বরূপ নয়, সে প্রেমই। মানুষ তাই চায় রসকে জীবনে প্রকাশ করিতে, ভোগ করিতে। তাহার জন্ত "নানা সম্বন্ধের বন্ধনে আপনাকে জড়াইয়া মানুষ এই জগতে—নানা ভালবাসার পাত্রে আপনার হৃদয়ধারা ঢালিয়া দিতেছে। পুত্রের প্রতি, বন্ধুর প্রতি প্রণয়ী বা প্রণয়িনীর প্রতি এইরূপ ভালবাসার লীলাসম্বন্ধ সে পাতিয়াছে। ভক্তিযোগ বলিতেছেন, ভগবানকেও এইরূপ যে কোন ভাবে তুমি পাইতে পার। তিনি একটা অদ্ভুত বা অনধিগম্য পদার্থ কিছু নহেন। তিনিই 'পিতেব পুত্রস্য সখ্যেব সখ্যুঃ প্রিয়ঃ প্রিয়ায়াঃ'। শান্ত, দাস্য সাখ্য, বাৎসল্য ও মধুর প্রেমের রসের পঞ্চধা ভাব। এই সকল ভাবই হৃদয়ে রাখ এবং যে ভাবেই তুমি ভগবৎপূর্ণ থাক না কেন, মানুষের দিক হইতে ফিরাইয়া কেবল তাহাকে ভগবানের চারি দিকে ফুটাইয়া তোল। (৩) ভক্তবীর হনুমান, অর্জ্জুন, যশোদা দেবী, শ্রীরাধা এইরূপ এক এক ভাবের মধ্য দিয়া ভগবানকে পাইয়াছিলেন। (৪) ভক্তিযোগের অভাব এই যে, তিনি জগৎকে কতকাংশে স্বীকার করিলেও নিজেকে ঠিক স্বীকার করিতে পারেন না। তিনি প্রেমরসের ভাবালুতায় ক্রমশঃ নিষ্ক্রিয় (passive) হইয়া যান; জগতের বিবর্ত্তনে তাঁহারও যে একটি সক্রিয় (active) ভূমিকা থাকিতে পারে, এবং তাহা যে ক্ষুদ্র অহং-প্রণোদিত নয়, বরং দিব্যশক্তির প্রেরণায় জাত, সে সত্য তিনি ত্যাগ করিয়া 'গোলোকে' চলিয়া যাইবার জন্যই উৎসুক হইয়া উঠেন। নলিনীকান্ত গুপ্ত বলিয়াছেন—"ভক্তিমার্গ আরও বলিতেছে মানুষের যে রূপতৃষা, ভোগবাসনা, ইন্দ্রিয় পরিচালিত জীবন তাহার মধ্যে ভগবানেরই ভোগেচ্ছা লুক্কায়িত, তাঁহারই আনন্দ স্ফুরিত। তাই এ সকলকে ছাড়িয়া দিয়া নয়, কিন্তু ইহাদিগকে ভগবানের মধ্যে শুদ্ধ ও পরিপূর্ণ করিয়া লইয়াই দিব্যজীবন পাওয়া যাইতে পারে।"

এ যাবৎ যে যোগমার্গগুলির আলোচনা করা গেল, একটু গভীর ভাবে চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে তাহাদের মূল প্রতিষ্ঠা জ্ঞানে, তাহাদের সাধনার অবলম্বন পুরুষ। তাই সামান্য ইতর-বিশেষ হইলেও বৈদান্তিকের সেই নির্লিপ্ততা সেই নির্ব্বাণমুখীনতা সব কিছুর মধ্যে কেমন যেন ফুটিয়া উঠিয়াছে। এ সব বৈদান্তিক যোগমার্গ ছাড়া ভারতে আর এক প্রকার সাধন-পদ্ধতি প্রচলিত আছে—তান্ত্রিক যোগ। সাধক এখানে পুরুষকে ছাড়িয়া প্রকৃতিকে ধরিয়াছেন, তাঁহার সাধনার মূলে তাই জ্ঞান নয়, শক্তি। তান্ত্রিকের সাধনা ত্যাগ নয়, ভোগ। তাই দেখি তন্ত্রে নানা প্রকার ব্যভিচারের উল্লেখ, পঞ্চ 'ম'কারের সাধনা। ভোগের মধ্য দিয়া ক্রমান্বয়ে পশুভাব হইতে বীরভাব ও পরে দেবভাবে উঠিয়া আসাই তান্ত্রিকের সাধনক্রম। কিন্তু বৈদান্তিক যেমন পুরুষকে ধরিয়া জ্ঞানপন্থী গেরুয়াধারী সন্ন্যাসীর জন্ম দিয়াছেন, তান্ত্রিকও তেমনি প্রকৃতিকে একান্ত করিয়া ধরিয়া ভৈরব-ভৈরবী সাজাইয়াছেন। ফলতঃ, জীবনের যে পূর্ণ সুসমঞ্জস রূপ তাহা কাহারও সাধনার লক্ষ্য হয় নাই। দিব্যজীবনের সাধক এই পূর্ণতা এই সামঞ্জস্যই কামনা করেন। তাই পুরুষ ও প্রকৃতিকে সমান অধিকার দিয়া তিনি বলিয়াছেন, তাহারা একই সত্যের এপিঠ-ওপিঠ। বস্তুতঃ, একটিকে ছাড়িয়া অপরটি পূর্ণ হইতে পারে না। অগ্নি হইতে তাহার দাহিকা-শক্তিকে যেমন পৃথক করা যায় না, ব্রহ্ম হইতে শক্তিকেও তেমনি বিচ্ছিন্ন করা যায় না। শাস্ত্রকার এই কথাটাই আরও সুন্দর করিয়া, একটু কাব্য করিয়াই যেন বলিয়াছেন—

> কটুত্বং চৈব শীতত্বং মৃদুত্বঞ্চ যথা জলে।
> প্রকৃতিঃ পুরুষস্তদ্বদভিন্নং প্রতিভাতি মে।
>
> —গোরক্ষ-সংহিতা, ৫/১১

প্রকৃতির আধার যে দেহ তাহার উপর জোর দিয়া ভাগবতকার আরও দৃঢ় কণ্ঠে বলিয়াছেন—

> নারায়ণস্ত্বং ন হি সর্ব্বদেহিনামাত্মাস্যধীশাখিললোকসাক্ষী।
> নারায়ণোঽঙ্গং নরভূজলায়নাত্তচ্চাপি সত্যং ন তবৈব মায়া।
>
> ১০/১৪/১৪

দিব্যজীবনের সাধক তাই পুরুষ ও প্রকৃতিকে সমানাধিকার দিয়া বলিয়াছেন, তাহারা উপনিষদের সেই দুই বিহঙ্গের মত একই শাখায় বসিয়া সমসুরে গান করুক—'দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া।'

দিব্যজীবনের সাধনায় পরা ও অপরা প্রকৃতির সজ্ঞান বোধ থাকা দরকার। সাধক জাগ্রত জীবন্ত ভাবে এক দিকে যেমন পরাপ্রকৃতির—দিব্যজননীর—হাতে অখণ্ডভাবে নিজেকে তুলিয়া ধরেন, অপর দিকে তেমনি জ্ঞান-প্রেম-কর্ম্মের মধ্য দিয়া অন্তরের দিব্য চৈতন্যসত্তাকে (psychic being) জাগ্রত করিয়া সম্মুখে আনিয়া ধরেন। অন্তরে ভগবানকে আনিয়া প্রতিষ্ঠিত করেন, তখন সেই দিব্যশক্তিই নিজের প্রকৃতি অনুযায়ী সাধকের প্রকৃতিকে রূপান্তরিত করেন। এই দিক দিয়া, এই যোগের সাধক ও সাধ্য দুই-ই ভগবান। সত্তার সমগ্র অংশে এক অখণ্ড শান্তি নামাইয়া আনা এবং বিপুল কর্ম্মের মধ্যেও অন্তরের বিশ্রামকে অটুট রাখা ইহাই এই যোগসাধনার ভিত্তি। অন্তরের 'আমি, সত্তা এই ভাবে দেহ-প্রাণ-মনের অতমাশ্রিত বিক্ষোভ হইতে, নিম্নপ্রকৃতির বন্ধ হইতে মুক্ত হইয়া স্ব-স্ব রূপে ফুটিয়া উঠে।

সাধক এইখানে রাজযোগের মূল সত্যকে স্বীকার করিয়া নিজের দেহের উপরে—সহস্রারে মাথার উপরের এক কেন্দ্র তুলিয়া ধরেন এই কেন্দ্র উপরের মূল সত্যের—সচ্চিদানন্দের সহিত যুক্ত এবং এ কেন্দ্র হইতে হইতে বিধাতা 'তপস'কে আশ্রয় করিয়া সক্রিয় হই বিশ্বলীলায় নিজেকে প্রকাশ করিয়া ধরেন। শ্রীঅরবিন্দ ইহারই ন

৩। বৈষ্ণব কবি বড় সহজ করিয়া কথাটা বলিয়াছেন—

> কাম প্রেম দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ।
> লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপে বিলক্ষণ।
> আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে কহি কাম।
> কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম।
>
> *　　*　　*
>
> দাস্য সাখ্য বাৎসল্য আর যে শৃঙ্গার।
> চারিভাবে চতুর্ব্বিধ ভক্তই আধার।
>
> *　　*　　*
>
> কৃষ্ণময়ী কৃষ্ণ যাঁর ভিতরে-বাহিরে।
> যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে।
>
> —কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী, চৈতন্যচরিতামৃত, আদিলীলা।

৪। শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত গুপ্ত, "পূর্ণযোগ" পৃঃ ২৫-২৬।

দিয়াছেন—অতিমানস বা Super mind। আমাদের শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন—বিজ্ঞানময় লোক। এই কেন্দ্রে উঠিয়া সাধক আত্মসত্তার উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব স্থাপন করেন, তাঁহার আধারের ত্রুটি, অপূর্ণতা ও তমোকেন্দ্রগুলির উপর ক্রিয়া করিয়া তাহাকে রূপান্তরিত করেন মহাশক্তির দিব্যলীলার উপযোগী যন্ত্র। মহাশক্তির জ্যোতি ও শক্তিতে তাঁহার প্রতি অঙ্গ ভরিয়া উঠে। বিবর্তনের ধারায় স্বেচ্ছাক্রমে আধারকে রূপান্তরিত করিয়া তিনি অন্তরাত্মার অগ্রগতির সহিত সমপদে আগাইয়া যাইতে পারেন। দেহান্তর গ্রহণ তখন অপরিহার্য্য নয়। বস্তুতঃ, মহাশক্তির লীলাই তাঁহার সাধনার আত্মপ্রকাশ করে। সাধকের স্থূল দেহও চিন্ময় হইয়া উঠে—এইখানেই পূর্ণযোগের পূর্ণসিদ্ধি—অমরত্ব এই যোগের পরিণতি। এই সাধনা ব্যতীত জগতে স্বর্গলোক স্থাপনের স্বপ্ন বৃথা। কারণ মানুষ যত দিন অপূর্ণ থাকিবে তাহার সৃষ্ট জগৎও তত দিন অপূর্ণ থাকিয়া যাইবে, তাহাকে লইয়া যুগযুগান্তরের কবি ও ঋষির স্বপ্ন স্বর্গলোক রচনা করা যাইবে না—

"The perfected human world cannot be created by or composed of men who themselves are imperfect."—*The Life Divine*.

এই যোগের সাধক তাঁহার সাধনায় যতই অগ্রসর হইয়া যান, ততই দেখিতে পান, এ যোগ অন্য সমস্ত যোগের মত নয়। ইহার সিদ্ধি যেমন পূর্ণাঙ্গ, ইহার সাধনা তেমনি দুরূহ। অথচ পতনে-উত্থানে মা মহাশক্তি তাঁহার স্নেহাঞ্চল বাড়াইয়া সাধককে সর্ব্বদা বক্ষে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। এই দিক দিয়া এই যোগের মত নিরাপদ নিশ্চিত পথও আর দেখি না। সাধক ক্রমে পূর্ণতা ও অমরত্বের পথে অগ্রসর হইয়া পূর্ণসিদ্ধি লাভ করেন। দিব্যজীবনের এই সাধনার পথেই আসিবে স্বর্গ—যুগ-যুগান্তরের মানুষের অমৃতস্পৃহা পূর্ণ হইবে, দুঃখ ও মৃত্যুকে জয় করিয়া প্রকৃতি আসিয়া দাঁড়াইবে অমরত্বের পথে, আগাইয়া যাইবে আত্মার নির্দ্দেশে—

"Annulling the decree of death and pain
Erasing the formulas of the Ignorance....,
Nature shall draw back from mortality
And Spirit's fires shall guide the earth's blind force."

—*Savitri*.

এই প্রবন্ধ রচনায় জন্য নিম্নোদ্ধৃত গ্রন্থগুলির উপর সবিশেষ নির্ভর করিতে হইয়াছে—

1. *On Yoga* (*The Synthesis of Yoga—Sri Aurobindo*.
2. *The Life Divine, Vol, I.*
3. পূর্ণযোগ—শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত
4. চেতনার অবতরণ—শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

এক ফালি বারান্দা

শ্রীনীলিমা ভট্টাচার্য্য

এক ফালি বারান্দা—
বিডন ষ্ট্রীট যেখানে কাট্ করে গেছে
কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের বুকের পাঁজর ঘেঁষে
সেখানেই ছিল সে।

বারান্দা হতে পরিষ্কার দেখা যেতো
হেদুয়া—আজাদ-হিন্দ-বাগ
যার সংস্কৃত নাম।
যারই জল, এক দিন কোন কবির
প্রাণে জাগিয়েছিল নিছকই এক
—অশান্ত যৌন চঞ্চলতা।

সেই বারান্দা হতেই—
প্রথম সম্ভাষণ জানালো সে
তার কাজল-কালো চোখের কোণে
ভীরুতা আর লজ্জায় পরশ ছিল লেগে।
চলন্ত বাসের থেকে নেমে
দাঁড়িয়েছিলাম পথের এক পাশে
তার নির্দেশ মত।

এল না সে—
শুধু সেদিন নয়, অনেক অনেক দিন
অনেক অনেক বার গিয়েছি সেখানে।
আসেনি সে কোন দিনই নেমে
বোবা লোকের মুখের কথার মত
আভাস দিয়েই তার সকল কথা
গেছে থেমে। রহস্যময়ী ঐ
এক ফালি বারান্দা জানাতে
পারেনি তার সেই নিছক
খেলার ইতিহাস।

হয়তো ভুল করেই—
সেদিন সে ডেকেছিল যারে
বার বার সে এসেছে, তার
সেই না-বলা কথা শুনেছে—
কিন্তু সেদিনের সেই একটুখানি ভুলে
যে ডাক সে দিয়ে গেছে ঐ
এক ফালি বারান্দা হতে।
আজও মনের তারে সে ডাক
শত সুর ধরি ঝংকৃত হয়ে ওঠে—
মাঝে মাঝে
অবসর কালে।

বঙ্গাব্দার সহিত শকাব্দার খেদপূর্ব্বক কথোপকথন

[ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত সংবাদপ্রভাকর হইতে পুনর্মুদ্রিত]

(১১ জ্যৈষ্ঠ, ১২৫৫, ইং ২৩ মে, ১৮৪৮, শকাব্দ ১৭৭০)

শকাব্দা। হে ভাই বঙ্গাব্দ, ভাল আছ তো ? আশীর্ব্বাদ করি, বহুদিন যাবৎ সাক্ষাৎ হয় নাই। আমি শালিবাহন রাজা কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়া আপনার বাহুবল এবং গুণের প্রভাবে শ্রীমন্মহারাজাধিরাজ বিক্রমাদিত্য বাহাদুরের প্রণীত সম্বৎকে পরাজয় করিয়াছি। এই ক্ষণে প্রায় কেহই কালের সংখ্যা নিরূপণকালে তাঁহাকে স্মরণ করেন না, সাধু ব্যক্তিমাত্রেই প্রথমে আমার সমাদর করিয়া থাকেন। আমার জন্মের বিষয়ে মানবেরা দুই প্রকার উক্তি করেন, অর্থাৎ কেহ ২ কহেন, শালিবাহন রাজার প্রাসাদে আমার জন্ম হয় এবং কেহ ২ কহিয়া থাকেন যে, শক নামক ভূপতি আমার জনক ছিলেন। সে যাহাই হউক, যিনি যেরূপ বলুন, তাহাতে হানি বিরহ, কিন্তু আমি বাপের ব্যাটা বটে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। সম্বৎ আমার ভয়ে জনসমাজ পরিত্যাগপূর্ব্বক অতি গোপন ভাবে তীর্থবাসী সন্ন্যাসীর ন্যায় ছদ্মবেশে কাশী প্রভৃতি তীর্থস্থানে ভ্রমণানন্তর তত্রস্থ পণ্ডিতগণের আশ্রয় লইয়াছেন। এদেশে আর আসিতে পান না, কেবল অস্মদ্দেশের গঞ্জিকাপ্রিয় পঞ্জিকাকারি ভিক্ষুকেরা তাঁহার একখানি প্রতিমূর্ত্তি লইয়া বৎসরান্তে একবার খেলা করিয়া থাকে। ভাই হে, যেটের কোলে আমার বয়স ১৭৭০ বৎসর হইল, এই দীর্ঘকাল পরম সুখে কালের রাজ্য সম্ভোগ করিতেছি। কোন বিষয়ে কখনই কাহারো নিকট পরাভব হই নাই, কেহই আমার সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারে নাই। শুদ্ধ তুমি একমাত্র আমার প্রতিযোগি ছিলে, ফলতঃ তোমার জন্ম এবং শ্রীবৃদ্ধির জন্য আমি দুঃখিত হই নাই বরং সুখানুভব করিয়াছি। কারণ, তোমার জন্মদাতা যিনি, তিনি অতি মহাত্মা ব্যক্তি, যদিও তাঁহার কিছু ঠিকানা নাই, অর্থাৎ কেহই নিশ্চিতরূপে কহিতে পারেন না যে, তুমি কাহার দ্বারা জন্মলাভ করিয়াছ। তথাচ এমত স্বীকার করিতে হইবেক যে, তোমার পিতা স্বাধীন ছিলেন, নচেৎ তোমার এতদ্রূপ উন্নতির কোন সম্ভাবনাই ছিল না। অধুনা এই বঙ্গদেশে আমার অপেক্ষা বরং তোমার সম্ভ্রম বৃদ্ধি হইয়াছে। যেহেতু আমাকে শুদ্ধ পণ্ডিতেরাই আহ্বান করেন, তোমাকে হাড়ি, শুড়ি, যুগি, জোলা, কলু, কেওরা ও দোকানি, পসারি, মুদি, বকালি প্রভৃতি সকলেই পূজা করিয়া থাকেন। আমি ভাটপাড়ার ঠাকুর-বংশের ন্যায় অশূদ্রপ্রতিগ্রাহী হইয়াছি, ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্যকে সুবিদ করিতে পারি না। তুমি খড়দহবাসী নিত্যানন্দবংশীয় গোস্বামী মহাশয়দিগের ন্যায় ছত্রিশ বর্ণ উদ্ধার করতঃ বিশ্বধন্য হইয়াছ। যথা—

"*　　　*　　　*　　　*

তথাপি আমার প্রভু নিত্যানন্দ রায়।"

ভ্রাতা হে, ধন্য ২, না হবে কেন, বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইয়াছ, তোমার বয়স ১২৫৫ বৎসর হইল, ইহাতে ক্রমশই শ্রীবৃদ্ধি দেখিতেছি, ভাল ২ হউক, হউক, তোমার শৌর্য্য, বীর্য্য বুদ্ধির প্রাখর্য্য ও তাৎপর্য্য এবং আশ্চর্য্য কার্য্য সকল দৃষ্টি করত মহা তুষ্টি প্রাপ্ত হইয়া পরিপূর্ণ প্রেম ভরে স্নেহের সহিত তোমাকে ভ্রাতৃরূপে সম্বোধন করিয়াছি, এবং বহুকাল পর্য্যন্ত উভয় ভ্রাতায় ঐক্যরূপে মনের সুখে কালের কার্য্য নিরূপণ করিতেছি। ভাই হে, এতদিন কোন ভাবনা ছিল না, সংপ্রতি কি সর্ব্বনাশ দেখিতেছি, এ আবার কি উৎপাত? কোথা হইতে একটা পুনুকে শত্রু আসিয়া আমাদিগের অব্দ শব্দকে কলঙ্কি করিতেছে, যথা, 'দানিশাব্দ,' 'মানশাব্দ', 'আব্দুলরাজাব্দ,' 'ধব্দুসরাজাব্দ' ইত্যাদি আধুনিক অব্দ সকল কি ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল, ইহারা আমাদিগের দুই ভ্রাতার সম্পদসূচক পদ লইয়া বিপদ ঘটাইবার উদ্যোগ করিতেছে, অতএব ভাই, এই ক্ষণে কি উপায় করা যায় বল দেখি?

বঙ্গাব্দা। দাদা মহাশয়, প্রণাম হই, আশীর্ব্বাদ করুন, আপনার শ্রীচরণাশীর্ব্বাদে এ সেবকের সমস্ত মঙ্গল বিশেষ। আমার উন্নতি ও মান সম্ভ্রম যে কিছু সকলি আপনার অনুগ্রহ জন্য স্বীকার করিতে হইবেক, আমি বঙ্গদেশের রাজা কর্ত্তৃক জন্মগ্রহণ করিয়াছি, এজন্য লোকে আমাকে বৎসররূপ কাল গণনায় সাল বলিয়া উল্লেখ করে, বঙ্গদেশীয় কোন স্বাধীনরাজা, যিনি হউন, আমার পিতা হয়েন, তিনি একজনই হইবেন দুইজনের কথা কেহই কহিবেন না, কিন্তু জন্মবিষয়ে আপনার অধিক কুলগৌরব ও পুণ্য প্রতিষ্ঠা স্বীকার করিতে হইবেক, কেন না মানবমণ্ডলী ভিন্ন ২ রূপে আপনার পিতৃত্রয় বলিয়া ঘোষণা করিয়া থাকেন, যথা, শালিবাহন, শকাদিত্য এবং শক। সে যাহা হউক, দাদা ঠাকুর, আপনার কোন ভাবনা নাই বরং আমি ভীত হইতে পারি, কারণ জ্যোতিষের সহিত ঐক্য করিয়া মহাশয়ের উৎপত্তি হইয়াছে, সুতরাং ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা প্রাণান্তেও আপানাকে পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না। ফলতঃ শত্রুকে ক্ষুদ্র জ্ঞান করা উচিত হয় না, আধুনিক চারি অব্দার দুই অব্দা এইক্ষণে কিঞ্চিৎ প্রবল হইয়া চলিতেছে, ইহার একজনের কর্ত্তা, "মাকুজঙ্গ"; আর একজনের কর্ত্তা, "কাঁকুজঙ্গ" প্রথমের সম্পদ টানাবাড়ি, দ্বিতীয়ের সম্পদ মানাদাড়ি, এই দাড়ি বাড়ি এক হইয়া আমাদের উপর আড়ি তুলিবার ইচ্ছা করিয়াছেন, এইক্ষণে মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন; হামলোক অব্ছে ছোড়েঙ্গা নেই, বেশ করিয়া দেখেঙ্গা, লড়েঙ্গা ও সবকো হাড় তোড়েঙ্গা, জান জাঙ্গা, তবু সহজে ভাগেঙ্গা নেই। আপনি ভয় করিবেন না, প্রাচীন হইয়াছেন, কেবল জপ করুন, আমি একা বাহাদুর, টেক্কা হইয়া এক ধাক্কা মারিয়া শত্রুদিগ্যে অক্কা পাঠাইব, উহারদিগের দুধে নাড়ী, কচি বয়স, ঐ সমস্ত ক্ষুদে অব্দ আমার ভয়ঙ্কর শব্দ শুনিয়া স্তব্ধ ও জব্দ হইয়া পলায়ন করিবে, তাহাতেই আমারদিগের জয় লব্ধ হইবেক, অতএব ভয় নাই, ভয় নাই।

শকাব্দা। ভাই হে, তবে, তবে, কোন ভয় নাইতো, আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, এজন্য শঙ্কা করি, তোমার কল্যাণে জয় হইলেই ভাল, আমি কুলক্ষণদৃষ্টে মনে ২ চিন্তা করিয়াছিলাম যে, ক্ষত্রি বংশীয় দেবাপি মহীপাল যেরূপ স্বীয় অনুজ শান্তনুকে রাজ্য সমর্পণ পূর্ব্বক বনে গমন করিয়াছিলেন, আমি সেইরূপ এই দুঃসময়ে তোমাকে রাজ্য প্রদান পূর্ব্বক বনবাসে যাত্রা করিব, সংপ্রতি তোমার সাহসে কিঞ্চিৎ সাহস পাইলাম, হে ভ্রাতঃ, তুমি যদিও মদীয় পিতার তনজ নহ, কিন্তু ধর্ম্মতো আমার অনুজ হইয়াছ, অতএব হে অনুজ, উক্ত দনুজদিগকে দমন করিয়া মনুজ মণ্ডলে সুখ্যাতি সমূহ সংগ্রহ করহ।

বঙ্গাব্দা। দাদাঠাকুর, আমিতো প্রতিজ্ঞা করিয়াছি শরীর

দখে নিরস্ত হইব না, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের বোকা রাজারা যেমন প্রজাদিগের "রিবলিউসনে" ভীত হইয়া পলায়ন করাতে তত্তৎস্থানে "রিববলিকন্ গবর্ণমেণ্ট" অর্থাৎ প্রজাপ্রভুত্ব রাজ্য হইয়াছে, আমরা কি তেমন করিতে দিব ? কখনই না, "বিনাযুদ্ধে ন কেশবঃ" আমরা ইংরাজের মুলুকে থাকি, সুতরাং সাহেবি চাল চালিয়া নড়াই করিব। ফায়ের, ফায়ের। শকাব্দা। ভাই উহারা স্বাধীন নহে, তবে কি বিবেচনায় অব্দ প্রকাশে সাহসি হইল ?

বঙ্গাব্দা। দাদাঠাকুর, উহারদিগের কথা কহিবেন না, লজ্জা থাকিলে তো বিবেচনা থাকে। যিনি 'মাকুজঙ্গ' তিনি শূদ্রজাতির বিংশতি রাত্রি অশৌচ ব্যবস্থা বাহির করিয়াছেন, সুতরাং যে ব্যক্তি ধর্ম্মশাস্ত্রের মর্ম্মভেদ করে, সে ব্যক্তি জগতে হাস্যাস্পদের আস্পাদ হইয়াও নামজারির নিমিত্ত সকল কার্য্যই করিতে পারেন ; পরন্তু "কাঁকুজঙ্গ" কায়স্থ হইয়া ক্ষত্রি নামে সূত্রধর হওনের অভিপ্রায়ে প্রায় ক্ষিপ্ত হইয়াছেন, তাঁহার মিত্র, মিত্র চর্ম্মজীবির মর্ম্মক্রমে কর্ম্ম ও শর্ম্মফলে বর্ম্ম ধর্ম্মপ্রাপ্ত হইয়াছেন, এবং বায়জী ঐ পৈতের কল্যাণে মানন করিয়া দাড়ি ধরিয়াছেন, অতএব তাঁহারদিগের অসাধ্য কি আছে ? এখন এই অবধি থাকুক, ইহারদিগের আর আর গুণের কথা পরে কহিব।

নাম ধরে মাকুজঙ্গ নবরঙ্গ ক্রিয়া।
দিবসে সাঁতার পাড়ে উজবনে গিয়া।
কাটি মুটি দক্ষি টানা ভক্তি টানা থুমো।
মাকুযন্ত্রে পূজা করে চাই বাবাজী ধুমো।
আঁকু বাঁকু কাঁকু মাকু মাক্ক মাকু ঝুমো।
এটা ওটা নড় বড়েটা শ্রীগোবিন্দায় নমো।
দেখিয়া কালের গুণ হইলাম স্তব্ধ।
কহে ভেক ভেক করি, করি করি জব্দ।
জাহির করেছে নাম, ভাল দানী শাব্দ।
আমলো মা, হাবা-ভাঁতি কোথা পেলি অব্দ।
মিত্র তব মিত্র ভাল মহীপাল রায়।
যার উপন্যাসে তুমি নিত্য পড় সায়।
ব্রাহ্মণ আনিয়া কত নব বিধি নয়ে।
রেখেছ সুন্দর দাড়ী সূত্রধর হোয়ে।
হও হও ক্ষত্রি হও তাহে নাহি দ্বেষ।
আন্দুলাব্দ কোথা পেলে জিজ্ঞাসি বিশেষ।
সরস্বতী থানে বুঝি এসেছিল ভেসে।
হঠাৎ পেয়েছ তাই আপনার দেশে।
প্রজাদের অধিপতি ভূপাল যে হয়।
তার পক্ষে শাল কভু অসম্ভব নয়।
আপনার অভিনব অপরূপ অব্দ।
হয় কি না হয় এর শাস্ত্রযোগে লব্ধ।
সত্য করে বল সব ভিক্ষা এই চাই।
দোহাই দোহাই রাজা দাড়ির দোহাই।

মন্তব্য :—১৯৫৭ খৃষ্টাব্দের ২২শে মার্চ্চ হইতে ভারত গভর্ণমেণ্টের আদেশে 'শকাব্দা'র পুনঃ প্রচলন হইয়াছে। এবং সংবাদপত্রসমূহে ইংরাজী ও প্রাদেশিক তারিখের সহিত শকাব্দাও মুদ্রিত হইতেছে।

বাঙ্গলাদেশে সংবাদপত্রে পূর্ব্বে ইংরাজী তারিখের সহিত শকাব্দার তারিখ লিখিত হইত। লোকপ্রসিদ্ধি আছে যে 'সংবাদ-প্রভাকর' সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বাঙ্গলাদেশে বঙ্গাব্দে তারিখ লিখিবার প্রচলন করেন। "পুরাতন বৎসরের গমন ও নূতন বৎসরের আগমন উপলক্ষে প্রতি বৎসর চৈত্রমাসের চরম রাত্রে" তিনি মহাসাড়ম্বরে নববর্ষের উৎসব করিতেন। ঠিক কোন সময় হইতে তিনি এই প্রথার প্রবর্ত্তন করেন, তাহা নিশ্চিতরূপে বলিতে না পারিলেও, উদ্ধৃত প্রবন্ধটি হইতে জানিতে পারি যে তিনিই এই প্রথার প্রবর্ত্তনকারী।

বঙ্গাব্দে তারিখ লিখিবার পদ্ধতি বাঙ্গলাদেশের জনসাধারণ গ্রহণ করিলেও শিক্ষিত সমাজ কিন্তু শকাব্দায় তারিখ লিখিতেন। তৎকালীন শিক্ষিত সমাজের মুখপত্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত 'তত্ত্ব-বোধিনী' পত্রিকার একটি সংখ্যায় নিম্নোক্ত তারিখ মুদ্রিতআছে :—

১৫৪ সংখ্যা—জ্যৈষ্ঠ ১৭৭৮ শক ২রা জ্যৈষ্ঠ বুধবার সম্বৎ—১৯১৩, কলি গতাব্দ ৪৯৫৭।

ইহা লক্ষ্যণীয় যে, ইহাতে সম্বৎ, কলি গতাব্দের উল্লেখ থাকিলেও বঙ্গাব্দের কোন উল্লেখ নাই।

আলোচ্য প্রবন্ধটিতে দানিশাব্দ, মানসাব্দ, আন্দুলরাজাব্দ প্রভৃতি তৎকালীন বাঙ্গলাদেশে প্রচলিত বিভিন্ন অব্দের উল্লেখ রহিয়াছে। এই অব্দগুলির সহিত বাঙ্গলার সামাজিক ইতিহাস ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত এবং ইহাদের প্রবর্ত্তনকারীদের সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা হইলে, বহু নূতন তথ্যের উদ্‌ঘাটন হইবে।

'আন্দুলরাজাব্দ'এর সহিত আন্দুলরাজবংশের ইতিহাস ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে উলুবেড়িয়া হইতে প্রকাশিত কিশোরীমোহন গঙ্গোপাধ্যায় লিখিত "The History of the Andulraj" নামক পুস্তিকা হইতে জানিতে পারি যে লর্ড ক্লাইভের সহায়তাকারী দেওয়ান রামচরণ রায় আন্দুল রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। লর্ড ক্লাইভের সুপারিশ অনুযায়ী দিল্লীশ্বর শাহ আলম রামচরণের পুত্র রামলোচন রায়কে 'রাজা' উপাধি প্রদান করেন। এবং আনুমানিক ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে 'আন্দুল রাজাব্দ' প্রবর্ত্তন করেন। রামলোচনের পুত্র কাশীনাথ এবং পৌত্র রাজনারায়ণ রায়। এই রাজনারায়ণ রায় অত্যন্ত প্রতাপশালী জমিদার ছিলেন, উপবীত গ্রহণ করিয়া ক্ষত্রিয়ের ন্যায় আচরণ করিতেন, 'আন্দুল রাজাব্দ' প্রচারে সচেষ্ট ছিলেন এবং বহুলাংশে সফলকামও হইয়াছিলেন। আলোচ্য প্রবন্ধে তিনিই হইতেছেন বিদ্রূপের প্রধান লক্ষ্য।

'আন্দুলরাজাব্দ' কেবলমাত্র আন্দুল-রাজ সরকারের কাগজ পত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল না, সংবাদপত্রেও মুদ্রিত হইত। ডাক্তার নরেন্দ্রনাথ লাহা সম্পাদিত The Indian Historical Quarterly, Vol. II, (1956) পত্রে আচার্য্য সুশীলকুমার দে. Some old Books and Periodicals in the British Museum নামক সুদীর্ঘ প্রবন্ধে 'সম্বাদ ভাস্কর' এর আলোচনা প্রসঙ্গে এক সংখ্যা সম্বাদ ভাস্কর এর উল্লেখ করিয়াছেন। এই সংখ্যাটিতে তারিখ এইরূপ ভাবে মুদ্রিত হইয়াছে।

"৭৫ সংখ্যা ২০ বালম, ইং ১৮৫৮ সাল ২ আক্টোবর, দানীশাব্দা ১০৮ আন্দুলরাজাব্দা ৯১, বাঙ্গলা ১২৬৫ সাল ১৭ আশ্বিন শনিবার (মূল্য মাসে ১৲ টাকা আগামি ৮৲ টাকা) এই স্থলে লক্ষ্যণীয় যে সম্বাদ ভাস্করে ইংরাজী ও বাঙ্গলা তারিখের সহিত উদ্ধৃত প্রবন্ধোল্লেখিত, দানীশাব্দ ও আন্দুলরাজাব্দও মুদ্রিত হইয়াছে, কিন্তু শকাব্দার কোন উল্লেখ নাই। এই আন্দুলরাজাব্দের সহিত সংবাদপত্র সম্পাদকের

চরম নিগ্রহের একটি করুণ কাহিনীও বিজড়িত আছে। সুপ্রসিদ্ধ গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের পূর্ব্বে শ্রীনাথ রায় 'সম্বাদ ভাস্করে'র সম্পাদক ছিলেন। রাজা রাজনারায়ণ রায় এই পত্রের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন এবং সেই জন্য আন্দুলরাজাব্দ এই পত্রে মুদ্রিত হইত। শ্রীনাথ রায় তাঁহার পত্রে রাজা রাজনারায়ণের কোন কোন অপকীর্ত্তির কথা প্রকাশ করিলে রাজা রাজনারায়ণ ক্ষিপ্ত হইয়া স্বীয় অনুচর দ্বারা শ্রীনাথকে গোপনে কলিকাতা হইতে আন্দুলে হরণ করিয়া লইয়া যান। এবং তাঁহার প্রতি অমানুষিক অত্যাচার করেন। ঋষি রাজনারায়ণ এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন। এরূপ সম্পাদক হরণ ব্যাপার বঙ্গদেশে, এমন কি বোধ হয় জগতে কখনও ঘটে নাই। আর এই সম্পর্কে আচার্য্য সুশীলকুমার দে তাঁহার পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধে লিখিয়াছেন।

The first editor Srinath Roy was assaulted by the servants of the Raja of Andul, a cruel tyrinical landlord, some of his misdoings had been exposed in the paper. A criminal suit was brought against the Raja who was fined Rs 1000/- Gaurisankar also seems to have come into conflict with the same Raja. From the fact that the Andul Raj Era is used to date the paper (as we see above) it would appear that it was probably in some way patronised by the Andul Raj. The above assault occured in January 13, 1840 and it was reported in the Englishman April 15, 1840. Srinath incurred heavy injuries as parts of his body were burnt by red hot iron.

উদ্ধৃত প্রবন্ধে কায়স্থ হইয়া ক্ষত্রিয়ের ন্যায় উপবীত ধারণের জন্য কটাক্ষ করা হইয়াছে। কায়স্থ জাতি ক্ষত্রিয় কি না, এই প্রসঙ্গের আলোচনার সূত্রপাত হয় সুদূর ১৮২৮।২৯ খৃষ্টাব্দে, বারাণসী হইতে শ্রীধর মিশ্র নাম জনৈক ব্যক্তি সমাচারচন্দ্রিকায় প্রশ্ন করেন যে কায়স্থ জাতি কাহার সন্তান। ইহারা শূদ্র কি না এবং ইঁহাদের উৎপত্তি কোথায়। সমাচারচন্দ্রিকায় এই প্রশ্নের কোন উত্তর প্রকাশ না হওয়াতে তৎকালীন অন্য আর একখানি সাপ্তাহিক পত্র 'বঙ্গদূত' সম্পাদক ভোলানাথ সেন তাহার পত্রে পুনরায় উপরোক্ত প্রশ্নগুলি উত্থাপন করেন। এই প্রশ্নগুলির উত্তরে সিমলা নিবাসী জনৈক তারিণীচরণ মিত্র, 'কায়স্থ বর্ণা ন ভবন্তি শূদ্রা' এই শ্লোক উল্লেখ করিয়া বলেন যে ইহারা চিত্রগুপ্তের সন্তান, ইঁহাদের অশৌচবিধি দেশ বিশেষে ১০।১২ দিন ; ১৫।৩০ দিন কদাচ নহে। ইহার পর আন্দুলের অন্যতম জমিদার জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিক ১৭৬৩ শকে (ইং ১৮৪১ খৃ:) "কায়স্থহিতার্ণব" প্রকাশ করিয়া পূর্ব্বোক্ত মত সমর্থন করেন। ১৭৬৬ শকে (ইং ১৮৪১ খৃ:) রাজনারায়ণ মিত্র "কায়স্থ কৌস্তুভ" প্রকাশ করেন। স্বর্গতঃ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার "বাংলা সাময়িক সাহিত্যে" কায়স্থ কৌস্তুভের বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন, "এই সাময়িক পত্রে কায়স্থ উৎপত্তির বিবরণ, কায়স্থ জাতি যে ক্ষত্রিয় বর্ণ, তদ্বিষয়ে শাস্ত্রোক্ত বচন, প্রভৃতি আছে। ইহার প্রথম সংখ্যা ১৭ জুলাই, ১৮৪৪, দ্বিতীয় সংখ্যা ১১ মার্চ্চ ১৮৪৫ এবং তৃতীয় সংখ্যা ৫ মে ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই তৃতীয় সংখ্যাটি প্রকাশের অব্যবহিত পরে (১৭ দিন) আলোচ্য প্রবন্ধটি সংবাদ প্রভাকরে প্রকাশিত হয়। সন ১২৮২ সালের চৈত্র মাসে প্রকাশিত এই পুস্তকের আর একটি সংস্করণে "কায়স্থ কৌস্তুভ" অর্থাৎ বৈকুণ্ঠবাসী মহাত্মা রাজনারায়ণ মিত্র কর্ত্তৃক কায়স্থ কৌস্তুভ সংখ্যাত্রয়ের সার সংগ্রহ যাহাতে আন্দুলাধিপতি স্বর্গগত রাজা রাজনারায়ণ রায় বাহাদুর বহু বন্ধুগণের ব্যবস্থায় ক্ষত্রিয় প্রমাণ করিয়া আপন কুমারকে উপবীত ধারণ করান, সেই সকল প্রমাণ এবং স্বাধীন ও রাজোপাধিধারী প্রাচীন শ্রীমন্ত কীর্তিবন্ত যশোবন্ত কায়স্থদিগের নামের তালিকা প্রকাশ করা হইয়াছে।

ভারতবর্ষে কোন সময় হইতে অব্দ গণনা প্রথা আরম্ভ হইয়াছে এবং কত প্রকার অব্দ প্রচলিত আছে তাহার কোন প্রামাণ্য ইতিহাস পাওয়া যায় না। এই সম্পর্কে প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত "বিশ্বকোষ" বলেন, "অতি প্রাচীনকালে আমাদের ভারতবর্ষেও অব্দ লিখিয়া রাখার সুপ্রথা ছিল না। কিন্তু যুধিষ্ঠিরের সময় হইতে প্রকৃত অব্দ রাখিবার প্রথা প্রচলিত হইয়া আছে। যুধিষ্ঠিরের রাজত্বকাল হইতে যে অব্দ প্রচলিত হয় তাহার নাম যুধিষ্ঠিরাব্দ। কলির গতাব্দও অনেকস্থলে লিখিত আছে ; শ্বেতবরাহ কল্পাব্দ কলির গতাব্দ, সম্বৎ, শকাব্দ, সন, ফসলী, বিলায়তি, হিজরী, মগী এবং খৃষ্টাব্দ প্রভৃতি অনেক প্রকার অব্দ বাঙ্গালা পঞ্জিকায় লিখিত থাকে। কিন্তু বাঙ্গালা কাজে ইংরাজী অব্দ এবং সাল অধিক প্রচলিত হইয়াছে। কেবল সংস্কৃত কাজে সম্বৎ ও শকের চলন দেখা যায়। মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের সময় হইতে বৈষ্ণবগণ "চৈতন্যাব্দ" গণনা করিয়া থাকেন। কোন পঞ্জিকা মধ্যে "রাজেন্দ্রঅব্দ" ও লিখিত থাকে। ইহা কৃষ্ণচন্দ্র রাজার সময় হইতে গণিত হয়। (অব্দ: পৃ: ৪২৮। ৪৩০)। বঙ্গাব্দ সম্বন্ধে 'বিশ্বকোষ' বলেন, "গৌড়াধিপ সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহ দেশীয় প্রচলিত সৌর মাসের সহিত সামঞ্জস্য রাখিবার জন্য চান্দ্র হিজরী সনকে সৌর বাঙ্গালা সনে পরিণত করেন। ৯০৩ হিজরী বা ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে সুলতান হোসেন শাহের রাজ্যারম্ভ এবং ঐ বৎসর বা কিছু পরে বাঙ্গালা সন আরম্ভ ধরা যায়, (সম্বৎসর: পৃ: ১৮)। বিশ্বকোষ আরও বলেন, "হিন্দুরা পূর্ব্বে ১লা অগ্রহায়ণ হইতে নববর্ষ গণনা করিত, এখন ১লা বৈশাখ হইতে গণনা করেন" নওরোজ:—পৃ: ৪৭৪।

প্রবন্ধে বর্ণিত 'মানসাব্দ', 'দানীসাব্দ' প্রভৃতি সম্বন্ধে বহু চেষ্টা করিয়াও কোন তথ্য সংগ্রহ করিতে পারি নাই। কোন সুধী মনীষী করিলে, বাঙ্গলার সামাজিক ইতিহাসে রচনায় বিশেষ সাহায্য করা হইবে বলিয়া মনে হয়।

আলোচ্য প্রবন্ধটির শীর্ষদেশে 'বন্ধু হইতে প্রাপ্ত' মুদ্রিত হইলেও ইহা ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত লিখিত বলিয়া অনুমিত হয়। এইরূপ বিদ্রূপাত্মক রচনায় ঈশ্বরচন্দ্র বিশেষ পারদর্শী এবং বাঙ্গলা-ভাষায় তাঁহার ন্যায় Saterist কেহ নাই। ঈশ্বরচন্দ্রের ব্যঙ্গ-কবিতার সহিত সকলের অল্পবিস্তর পরিচয় আছে কিন্তু তাঁহার বিদ্রূপাত্মক গদ্য রচনার সহিত তেমন পরিচয় নাই। বিদ্রূপাত্মক গদ্য রচনার নিদর্শন হিসাবেও প্রবন্ধটির সাহিত্যে গুরুত্ব আছে।

['বিশ্বকোষ' গ্রন্থগুলি দেখিবার সুযোগ দেওয়ার জন্য শ্রদ্ধেয় শ্রীযুত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়কে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।]

সঙ্কলন—শ্রীশম্ভুনাথ প্রামাণিক।

শ্রীফণিভূষণ চক্রবর্ত্তী

[কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ও বিশিষ্ট জ্ঞানতপস্বী]

স্বভাবমধুর, সৌজন্যপরায়ণ, সদালাপী, গুণগ্রাহী, পরদুঃখকাতর ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পশ্চিমবঙ্গের সর্ব্বোচ্চ ধর্ম্মাধিকরণের প্রধান যে বেশ কিছুক্ষণ সাক্ষাৎপ্রার্থীকে বিভিন্ন বিষয় আলোচনার মাধ্যমে মুগ্ধ করিতে সক্ষম—বিচারপতি শ্রীফণিভূষণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের স্বগৃহে বাহুল্যবর্জ্জিত মনোরম পাঠকক্ষে বসিয়া উহা উপলব্ধি করিলাম। অষ্টপ্রহরের মধ্যে মাত্র চারি ঘণ্টা গভীর সুপ্তি এবং অবশিষ্টাংশ কর্ম্মে ও পঠনে আত্মনিমজ্জন—এই চিরকুমার, কল্যাণকামী ও দৃঢ়চেতা মনীষীর বৈশিষ্ট্য।

ঢাকা জিলার নারায়ণগঞ্জ মহকুমাস্থ জয়মঙ্গল গ্রামের পৈতৃক ভবনে ৺শ্যামাচরণ ও ৺বিনোদবাসিনী দেবীর প্রথম সন্তান ফণিভূষণ ১৮৯৮ সালের ১২ই অক্টোবর ভূমিষ্ঠ হন। বিগত শতাব্দীর একজন বিশিষ্ট সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত হিসাবে তাঁহার পিতামহ ৺গঙ্গারাম সার্ব্বভৌম সর্ব্বজনপরিচিত ছিলেন। ৺তারকচন্দ্র চক্রবর্ত্তী তাঁহার মাতামহ হইতেন। দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত ইংরাজীতে সুপণ্ডিত পিতার নিকট শিক্ষা গ্রহণান্তে ১৯১১ সালে তিনি ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীতে (বর্ত্তমানে Class VIII) ভর্ত্তি হইয়া তথা হইতে দ্বিতীয় স্থানাধিকারিরূপে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯১৬ সালে কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে আই, এ, এবং ১৯১৬ সালে উহার ছাত্র হিসাবে ইংরাজী সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীর অনার্স সহ গ্রাজুয়েট হন। সেই সময় কলেজ পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁহার লিখিত কয়েকটি প্রবন্ধ দুই বৎসর পূর্ব্বে (১৯৫৬) জেনারেল প্রিন্টার্সের শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস "Morning Blossoms" নামক পুস্তকে গ্রথিত করেন। ১৯২০ সালে শ্রীচক্রবর্ত্তী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ইংরাজী সাহিত্যে এম, এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে চতুর্থ স্থান অধিকার করেন। পঠদ্দশায় ৺জয়গোপাল ব্যানার্জি, ডাঃ ব্রজেন্দ্র শীল, ৺প্রফুল্ল ঘোষ, শ্রীঅরবিন্দাগ্রজ ৺মনোমোহন ঘোষ, ডাঃ আদিত্য মুখোপাধ্যায়, মিঃ জেমস্, মিঃ হোম্, মিঃ ষ্টিফেন, ডাঃ শ্রীকুমার ব্যানার্জ্জি প্রভৃতি কৃতী শিক্ষাবিদদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন। এম, এ পরীক্ষার অব্যবহিত পরে অধ্যক্ষ শ্রীজানকীনাথ শাস্ত্রীর আহ্বানে তিনি কয়েক মাস রিপণ কলেজে অধ্যাপনা করেন এবং কিছুদিন পরে আইনের প্রাথমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯২২ সালে অধ্যক্ষ সত্যেন্দ্র ভদ্রের উদ্যোগে তিনি ঢাকা জগন্নাথ কলেজে ইংরাজী লেকচারার পদ গ্রহণ করিয়া ১৯২৬ সাল পর্য্যন্ত তথায় অবস্থান করেন। ইতিমধ্যে ১৯২৪ সালে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের শেষ পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হন। তাঁহার সহপাঠীদের মধ্যে ভারতের প্রধান নির্ব্বাচন-কমিশনার শ্রীসুকুমার সেন, বিশ্বখাদ্য-সংস্থার ডিরেক্টর জেনারেল শ্রীবিনয়রঞ্জন সেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব উপাধ্যক্ষ মামুদ হাসান ও বিশিষ্ট লেখক শ্রীমণীন্দ্রলাল বসুর নাম উল্লেখযোগ্য। শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র ও বিশিষ্ট গ্রন্থ-প্রকাশক শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস তাঁহার অন্যতম ছাত্রদ্বয়।

মেধাবী ছাত্র, সুযোগ্য অধ্যাপক ও ইংরাজী সাহিত্য এবং ভাষাভিজ্ঞ হওয়ায় রাষ্ট্রগুরু-জামাতা শ্রীযোগেশ চৌধুরী নিজ পরিচালিত Calcutta Weekly Notes-এর সম্পূর্ণ ভার ১৯২৭ সালে ফণিভূষণের উপর ন্যস্ত করেন। তজ্জন্য তাঁহাকে ঢাকা হইতে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয়। দীর্ঘ অষ্টাদশ বৎসর উক্ত 'সাপ্তাহিক' তাঁহার সুযোগ্য সম্পাদনায়, সুলিখিত প্রবন্ধ পরিবেশনায় এবং পাঠকদের পত্রোত্তরে সর্ব্বভারতে উচ্চ-প্রশংসিত

শ্রীফণিভূষণ চক্রবর্ত্তী

হয়। প্রসঙ্গত শ্রীচক্রবর্ত্তী বলেন যে, উক্ত কার্য্যের জন্ম যৎসামান্ত পারিশ্রমিক পাইলেও উহা সম্পাদনায় একাধারে যেমন তাঁহার জ্ঞানভাণ্ডার বৃদ্ধি পায়, অন্তাধারে তেমন পরবর্ত্তীকালে আইনজগতে তাঁহার সুপ্রতিষ্ঠায় প্রভূত সাহায্য হয়।

আইনজীবী ফণিভূষণ বহু বিশিষ্ট মামলা পরিচালনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে ভাওয়াল সন্ন্যাসী ও বিজনীরাজ এষ্টেট মামলাদ্বয় নিজ পেশায় তাঁহাকে এক স্থায়ী আসন দান করে। কিছুকাল মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার তাঁহাকে ইনকামট্যাক্স মামলায় সরকারী পরামর্শদাতারূপে নিয়োগ করেন।

১৯৪৫ সালের এপ্রিল মাসে আকস্মিক ভাবে তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের অন্যতম বিচারপতির পদ গ্রহণ করেন। ইহার ছয় মাস পূর্ব্বে তৎকালীন প্রধান বিচারপতি স্যার হ্যারল্ড ডার্বিশায়ার কথাপ্রসঙ্গে শ্রী চক্রবর্ত্তীকে বিচারপতিপদে নিয়োগের কথা বলিয়াছিলেন। ১৯৪৯ সালে ফেডারেল কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি শ্রী বরদাচারীর সভাপতিত্বে গঠিত আয়কর তদন্ত কমিশনের তিনি অন্যতম সদস্য নির্ব্বাচিত হন। সেই সময় সর্ব্বভারত পরিভ্রমণকালে সমস্ত প্রদেশের বিশিষ্ট আইনজীবীদের পারদর্শিতা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতালাভের সুযোগ পাইয়া শ্রীচক্রবর্ত্তী কলিকাতা 'বারের' আইনজ্ঞদের দক্ষতায় নিঃসংশয় হন। ১৯৫২ সালের ১৯শে মে তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের Acting প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হন এবং ১৩ই জুন উক্ত পদে তাঁহাকে স্থায়ী ভাবে নিয়োগ-পত্র দেওয়া হয়।

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ডক্টর হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের হঠাৎ পরলোক গমনে শ্রীচক্রবর্ত্তী ১৯৫৬ সালের ৮ই আগষ্ট অস্থায়ী রাজ্যপালপদ গ্রহণ করেন। উক্ত বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে চ্যান্সেলাররূপে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন উৎসবে তাঁহার অলিখিত পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা শিক্ষাবিদ ও ছাত্রমহলে যথেষ্ট চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। সেই সময় জেল পরিদর্শন কালে কয়েদীদের উদ্দেশ্যে তিনি একটি সুন্দর ভাষণ দিয়াছিলেন। রাজ্যপাল হিসাবে তিনি প্রথম কয়েক দিন তাঁহার অশ্বিনী দত্ত রোডস্থ বাসগৃহ হইতে কর্ম্ম সম্পাদনা করিয়াছিলেন, তজ্জন্য উক্ত গৃহে কয়েক দিন 'Governor's Flag' উড্ডীয়মান থাকে।

কর্ম্মনিষ্ঠার পুরস্কারস্বরূপ ১৯৫৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে সুপ্রীম কোর্টে তাঁহাকে অন্যতম বিচারপতি পদে নিয়োগ করা স্থিরীকৃত হয়। উক্ত পদের কার্য্যকাল পাঁচ বৎসর দীর্ঘতর হওয়া সত্ত্বেও প্রধান বিচারপতি থাকা শ্রেয়ঃ মনে করিয়া তিনি উহা গ্রহণে অক্ষম হন। বর্ত্তমান বৎসরের অক্টোবর মাসে বর্দ্ধিত বয়ঃপূর্ত্তির জন্য তিনি প্রধান বিচারপতিপদ হইতে অবসর গ্রহণ করিতেছেন।

১৯২৫ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঢাকায় আগমন করিলে ফণিভূষণ কবিগুরু প্রদত্ত ভাষণগুলি অনুলেখন করিতেন। তজ্জন্য পরবর্ত্তীকালে শ্রীচক্রবর্ত্তীর সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পায়। রবীন্দ্রনাথের সাজসজ্জা ও মৌখিক কবিতাচয়নের কথা তিনি উল্লেখ করেন। বর্ত্তমানকালে ছাত্রছাত্রীরা রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্বন্ধে যথেষ্ট উদাসীন—সে কথা তিনি জানাইলেন।

শিক্ষানুরাগী পিতা তৎকালীন প্রকাশিত সমস্ত সংবাদপত্র সাময়িকপত্র ও বিবিধ গ্রন্থাদি আহরণ করিয়া জয়মঙ্গল গ্রামের স্বগৃহে একটি গ্রন্থাগার সৃষ্টি করেন। তজ্জন্য তাঁহার পুত্রত্রয় বাল্যকাল হইতে পাঠে আগ্রহান্বিত হন। শ্রীচক্রবর্ত্তী বলেন যে সেই সময় ৺দীনেন্দ্রকুমার রায় 'ভারতী' পত্রিকায় নিয়মিত গল্পের মাধ্যমে সুষ্ঠু পল্লীচিত্র অঙ্কন করিতেন। 'প্রদীপ' ও 'প্রবাসী' পত্রিকাদ্বয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখিত কবিতা, প্রবন্ধ ও উপন্যাসসমূহ পা[ঠ] করিয়া তিনি আনন্দ পাইতেন। 'ভারতী'তে প্রকাশিত 'চিরকুমা[র] সভা' ও পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত 'চিরকুমার সভা'র মধ্যে য[ে] পার্থক্য আছে—তাহাও তিনি উল্লেখ করেন। মতবিরোধের ক[া]ডাঃ যদুনাথ সরকার শান্তিনিকেতন হইতে অধ্যাপকের পদত্যা[গ] প্রসঙ্গে যে পত্র লিখেন, তাহা 'প্রবাসী'তে তিনি পাঠ করিয়াছিলেন ৺রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় যে রবীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনা[থ] প্রমুখ কাব্য ও চিত্র-শিল্পীদের সহিত আমাদের পরিচয় করাই[য়া] দিয়াছেন, তাহা চিরস্মরণীয় বলিয়া তিনি মনে করেন। ছাত্রজীবনে ৺চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত 'চয়নিকা' এক খণ্ড পুরস্কার পাইয়া তাঁহার নিকট রবীন্দ্র-কাব্যপুরীর সিংহদ্বার খুলিয়া যায়। তাই একান্ত আগ্রহে সমগ্র রবীন্দ্র-কাব্য তিনি কণ্ঠস্থ করিয়াছেন। কারণ, এইরূপ না করিলে সুসাহিত্যের সহিত অসমাপ্ত পরিচিতি ঘটে বলিয়া তিনি মনে করেন।

আইনে পশার সম্বন্ধে তিনি মন্তব্য করেন যে, প্রারম্ভিক কালে প্রথম কিছু দিন যদি আইনজীবীরা অল্প মামলা গ্রহণ করিয়া প্রচু[র] অভিনিবেশ সহকারে উহাতে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করেন তবে তাঁহাদের ভবিষ্যৎ সমুজ্জল হয়। আর সেই সঙ্গে আইন-বিষয়ক বিবিধ গ্রন্থ নিয়মিত পাঠ করা প্রয়োজন। তিনি স্ব[য়ং] কোন বিশিষ্ট আইনবিদের সহকারী ছিলেন না বা কোন সহকারী গ্রহণ করিতেন না। একক সাধনাই মানসিক গঠনের অনুকূল বলিয়া তিনি সর্ব্বদা মনে করেন। তবে কেহ তাঁহার নিকট আসিলে তিনি সর্ব্বসময় তাঁহাকে সাহায্য করিতেন।

আইন সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তরে ফণিভূষণ বলেন যে, এখনকার ভারতীয় আইন British Jurisprudence এর উপর ভিত্তি করিয়া রচিত। কলা, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে ভারতের কিছু মৌলিক অবদান রহিয়াছে কিন্তু আইনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য মৌলিকত্ব দেখা যায় না। তজ্জন্য আমাদের আইনজগতকে আরও সুগঠিত, উন্নত ও সুষ্ঠু করিবার জন্য কয়েক জন বিলাতী Law-Lordকে আমাদের সুপ্রীম কোর্টে রাখা চলিতে পারে।

নিতান্ত অপরিহার্য্য না হইলে বৈকাল পাঁচ ঘটিকার মধ্যে তিনি আদালত-প্রাঙ্গণ ত্যাগ করেন। কারণ, হাইকোর্ট-কর্ম্মিবৃন্দ ও পুলিশ প্রহরীরা তাঁহার জন্য দপ্তরে অনর্থক অপেক্ষা করিবে, ইহা তিনি পছন্দ করেন না।

নিজ গ্রামের কথায় আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে জানালেন প্রধান বিচারপতি যে, যেখানে শিশু প্রথম নিঃশ্বাস গ্রহণ করেছে, যেখানে বালক মাটি নিয়ে করে খেলা—যেখানে কিশোর চঞ্চলতায় অস্থির হয়ে উঠেছে—যেখানে যুবক প্রতি বার কর্ম্মকেন্দ্র ছাড়িয়া ছুটিয়া গিয়াছে—আজ পরিণত বয়সে সে স্থানে তাঁহার প্রবেশ নিষেধ। পিতা গড়েছিলেন যে শান্তিনিকেতন—তিনি করেছিলেন যে কুটির আরও উন্নত—দেশ বিভাগের জন্য সেই নীড় আজ পরিত্যক্ত। আ[জ] সেই সাথে সেখানে রেখে এসেছেন চিরকালের রতন বাল্যস্মৃ[তি]

কৈশোরস্বপ্ন, যৌবনলীলা আর বৃদ্ধবয়সের সান্ত্বনা। তাই আজ এতদূরে বসিয়া তিনি মনে মনে আঁকেন সেই ক্ষুদ্র, বৃক্ষ-পরিবেষ্টিত, পবন-আন্দোলিত ছোট পাহাড়ঘেরা স্বগ্রামের ছবি আর শ্বেত-প্রস্তরের ফলকে পাঁচটি কথায় লেখা রয়েছে 'জয়মঙ্গল' তাঁহার কলিকাতা-গৃহের প্রবেশদ্বারে।

বিচারপতি হিসাবে হয়ত তিনি বজ্র-কঠোর কিন্তু আলাপে জানতে পারি কোমল হৃদয় ব্যক্তিটিকে। অবসর গ্রহণের পর পুস্তক পাঠ আর সাহিত্য আলোচনা তাঁহার জীবনসঙ্গী হইবে। আমার মনে হয় যে, তাঁহার সুপ্ত সাহিত্য-প্রতিভার যথোচিত বিকাশের জন্য আমাদের তৎপর হইতে হইবে।

কিছুদিন পূর্ব্বে প্রধান বিচারপতিকে নীরবে শ্রদ্ধা জানাইয়া জনৈক হাইকোর্ট বিচারপতি আমায় জানিয়েছিলেন, "তাঁহার অবসর গ্রহণের পর আমাদের বিচারালয়ে যে বিরাট শূন্যতা আসিবে—তাহা কত দিনে আবার পূর্ণরূপ পাইবে—ইহা আমার ধারণাতীত।" বিরাট প্রতিভাধর প্রধান বিচারপতি চক্রবর্ত্তী মহাশয় সম্বন্ধে ইহাপেক্ষা আর বিশেষ কি নিবেদন করা যাইতে পারে?

ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

[চিন্তাশীল ও মনস্বী লেখক, সাহিত্য ও সঙ্গীত-সমালোচক]

ধূর্জ্জটিপ্রসাদের জন্ম ১৮৯৪ সালের ৫ই অক্টোবর, ৺দুর্গাসপ্তমীর দিনে। জন্মস্থান চাতরা, শ্রীরামপুর। প্রথম জীবন কেটেছে বারাসতে, যেখানে তাঁর পিতা ৺ভূপতিনাথ মুখোপাধ্যায় ছিলেন লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল। পিতামহ কালিদাস মুখোপাধ্যায় ছিলেন সেকালের নামকরা ছাত্র, সিনিয়র-জুনিয়র স্কলার। প্রথম হুগলি ব্রাঞ্চ স্কুলের হেডমাষ্টার, পরে হুগলি কলেজের অধ্যাপক ছিলেন তিনি। ধূর্জ্জটিপ্রসাদের মাতামহ হলেন হালিসহরের হেমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়,—হুগলি ফৌজদারী আদালতের তদানীন্তন সেরা উকীল। ইনিও হুগলি কলেজের কৃতী ছাত্র, কলিকাতা বিশ্ববিত্তালয় থেকে দ্বিতীয় বৎসরের দর্শনশাস্ত্রে এম, এ। দাতা হিসেবে তাঁর প্রসিদ্ধ ছিল। এই হল ধূর্জ্জটিপ্রসাদের বংশ-পরিচয়। শ্রীরামপুরে তাঁর জন্ম হলেও আদিনিবাস হচ্ছে ভাটপাড়া-কাঁঠালপাড়ার নিকটবর্ত্তী নারায়ণপুর গ্রামে। অতএব পারিবারিক শিক্ষা-দীক্ষা এবং সংস্কৃতির ঐতিহ্য তাঁকে যে প্রভাবিত করেছে, এটা বিচিত্র নয়। তাঁর সঙ্গীতরুচিও পিতামাতার কাছ থেকেই পাওয়া। বিশেষ করে তাঁর মাতা এলোকেশী দেবী ছিলেন সুগায়িকা। এই পারিবারিক আবহাওয়ার কথা তিনি 'মনে এলো'য় এবং 'বক্তব্য' বইটির কোন কোন প্রবন্ধে বলেছেন।

কৈশোর থেকেই ধূর্জ্জটিপ্রসাদের একটি অসাধারণ গুণ দেখা যায়। সেটি হচ্ছে বন্ধুপ্রীতি এবং বন্ধুগোষ্ঠী তৈরি করার ক্ষমতা। স্কুলজীবনে তাঁর প্রথম বন্ধু হলেন স্বনামখ্যাত বৈজ্ঞানিক সত্যেন বসু। পরবর্ত্তী জীবনে তাঁর আলাপী স্বভাবের গুণে বন্ধুসংখ্যা হল অগণিত। ধূর্জ্জটিপ্রসাদ সেন্ট জেভিয়ার্স এবং প্রধানতঃ রিপণ কলেজেরই ছাত্র। সে সময়ে রিপণ কলেজে বাংলার নাম-করা মনীষীদের সমাগম হয়েছিল। সুপণ্ডিত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, রামেন্দ্রসুন্দর, জানকী ভট্টাচার্য, ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনবিহারী গুপ্ত প্রভৃতি সেকালের দিক্‌পাল অধ্যাপকদের ধর্মতত্ত্ব, দর্শন, বিজ্ঞান ও সাহিত্য বিষয়ক আলোচনা তরুণ ধূর্জ্জটিপ্রসাদকে মুগ্ধ করেছিল। এই সময়ে আর একজন চরিত্রবান স্বদেশপ্রেমিক অধ্যাপকের সংস্পর্শে তিনি যথেষ্ট লাভবান হন। ইনি সিটি কলেজের গণিতের অধ্যাপক সতীশ চট্টোপাধ্যায়। 'বক্তব্য' বইখানিতে এক জায়গায় ধূর্জ্জটিপ্রসাদ সে-কথা স্বীকার করে লিখেছেন: 'আমার জীবনে আমার পিতার ও সতীশ বাবুর আদর্শবাদের ছাপ সুস্পষ্ট।'

এর পরে ধূর্জ্জটিপ্রসাদ আর একটি গোষ্ঠীর সংস্পর্শে আসেন যার শিরোমণি ছিলেন প্রমথ চৌধুরী। ১৯১৩ সালে রাঁচিতে যে আলাপের সূত্রপাত, তা ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে 'সবুজপত্র' ও 'বিচিত্রা'র মাধ্যমে। রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত প্রভৃতি মনস্বী ব্যক্তিদের সঙ্গলাভ ও সাহিত্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পকলাচর্চার অবকাশ ঘটে, তাঁর জীবনে বহু গুণিজনের সংস্পর্শে।

ধূর্জ্জটিপ্রসাদের ছাত্রজীবন বেশ বিচিত্র। সাহিত্য ও বিজ্ঞান, দুটি বিষয়েই ছিল তাঁর সমান আকর্ষণ। আই, এস-সি পাশ করে বি, এ-তে নিলেন ইংরেজি অনার্স এবং তার সঙ্গে কেমিষ্ট্রি ও অঙ্ক। এম-এ পাশ করেন প্রথমে ইতিহাস নিয়ে, পরে অর্থনীতিতে। তাঁর কর্মজীবন শুরু হয় বঙ্গবাসী কলেজে অধ্যাপনায়। তার পর লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিত্তালয়ে ১৯২২ সালে যোগদান করেন এবং দীর্ঘ তেত্রিশ বছর সেখানে অধ্যাপনা করেন। তাঁরই উৎসাহে সমাজ-বিজ্ঞান বিভাগের উন্নতি হয় এবং পরে তিনি অর্থনীতি ও সমাজ-বিজ্ঞানের প্রধান অধ্যাপক হন। উত্তরপ্রদেশের নবীন ছাত্র-সমাজ ধূর্জ্জটিপ্রসাদের কাছে সমাজতত্ত্বের গবেষণায় এবং সমাজতত্ত্বের চর্চায় যথেষ্ট প্রেরণা লাভ করেছে। সুপণ্ডিত চিন্তাশীল ও বিদগ্ধ ব্যক্তিত্বের জন্য এবং সঙ্গীত-রসগ্রাহী মজলিশী গুণের জন্য ধূর্জ্জটিপ্রসাদ শুধু প্রবাসী বাঙালী সমাজে নয়, অ-বাঙালীর কাছেও সমাদৃত।

ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

১৯৫৫ সালে ধূর্জটি বাবু লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর গ্রহণ করেন এবং আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি বিভাগের অধ্যক্ষ হিসেবে যোগদান করেন। আলিগড়ে থাকতেই তিনি অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েন। সুইজারল্যাণ্ডে গিয়ে চিকিৎসা করিয়ে আসার পর এখন তিনি অনেকটা সুস্থ। আলিগড়ই এখনও তাঁর কর্মক্ষেত্র।

ধূর্জটিপ্রসাদের রচনা নানা জাতীয়। ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় তাঁর একাধিক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। ইংরেজি বইয়ের মধ্যে Personality, Basic Concepts of Sociology, Modern Indian Culture, Tagore—a study, Indian Music, The Problems of Indian youth, On Indian History প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য এবং এদের মধ্যে কয়েকটি বিদেশে সমাদৃত হয়েছে। তাঁর পরিণত বয়সের রচনাগুলি 'Diversities' নাম দিয়ে প্রকাশিত হচ্ছে।

বাংলা ভাষায় তাঁহার সাহিত্য কর্মও কিছু কম নয়। 'সবুজ পত্রে' প্রকাশিত 'দাদার ডায়েরি' এবং 'ডিমোক্রেসি,' 'ধরতাই বুলি' ও 'ঘরে বাইরে'র আলোচনা সুধিজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক প্রশংসিতও হয়েছিল। 'চিন্তয়সি' নামে প্রবন্ধ-সমষ্টি আর 'আমরা ও তাঁহারা,'—যেটি বিষয় ও প্রকাশভঙ্গীর দিক থেকে মৌলিক সাহিত্য সৃষ্টি বলে স্বীকৃত হয়েছে। 'রিয়ালিষ্ট' হ'ল তাঁর ছোট গল্পের বই, এখানেও গল্পকার হিসেবে ধূর্জটি বাবু নিজস্ব কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। উপন্যাসের ক্ষেত্রেও তিনি একটি নতুন দিক খুলে দিয়েছেন। সমাজচেতনা ও ব্যক্তিচেতনার দ্বন্দ্ব এবং মনোবিশ্লেষণের মাধ্যমে তাঁর 'অন্তঃশিলা, 'আবর্ত' ও 'মোহানা'—এই উপন্যাসত্রয় যে একটি অভাবিত সাহিত্য গতির সূচনা করে দিয়েছে, এ কথা বর্তমানের গুণজ্ঞ সমালোচকরা স্বীকার করেছেন।

বাংলা দেশে এবং প্রবাসে ধূর্জটিপ্রসাদ সঙ্গীতজ্ঞ এবং প্রবীণ সমঝদার হিসেবে সুখ্যাত। ১৯১০ থেকে ১৯৪০ সালের মধ্যে ভারতের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতশিল্পীদের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ সংস্পর্শ ঘটেছে এবং উল্লেখযোগ্য সঙ্গীত-সম্মেলনগুলিতে তিনি উপস্থিত থেকেছেন। নিপুণ আলোচনা ও রসসাহিত্যের জন্ত নবীন সঙ্গীতশিল্পীদের কাছে তিনি সৌহার্দ্য লাভ করেছেন। সঙ্গীতের ওপর তাঁর ছুটি বাংলা বই 'কথা ও সুর' এবং 'সুর ও সঙ্গতি' আজও অপ্রতিদ্বন্দ্বী। শেষোক্ত গ্রন্থে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ধূর্জটিপ্রসাদের সঙ্গে যুগ্ম-গ্রন্থকার। এ সম্মান অনন্ত।

১৯৪০ সালে তিনি বছর তিনেকের জন্ত যুক্তপ্রদেশের কংগ্রেসী সরকারে ডিরেক্টর অব পাবলিক ইনফরমেশন এবং প্রেস অ্যাডভাইসর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এ ছাড়া ১৯৫১ থেকে ১৯৫৫ সালের মধ্যে তিনি বহু বার বিদেশে গিয়েছেন এবং প্রতিনিধিমূলক সম্মেলনে যোগদান করেছেন। কলম্বো ও বানডুং কনফারেন্সে, মস্কোতে অর্থনীতিক সম্মেলনে তিনি উপস্থিত ছিলেন আর আন্তর্জাতিক হেগ, বিদ্যাপীঠেও অভ্যাগত অধ্যাপক হিসেবে কাজ করেছিলেন।

তিনি উঁচুদরের বক্তা, ইংরেজি ও বাংলা ছুই ভাষাতেই। কিন্তু তাঁর বক্তৃতায় আওয়াজ নেই। লেখার মতন কথাতেও তাঁর শুদ্ধি ও ভারসাম্য, তীক্ষ্ণতা এবং বলিষ্ঠতা।

ধূর্জটিপ্রসাদ বিবাহ করেন এলাহাবাদ-প্রবাসী প্রবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা ছায়া দেবীকে। ধূর্জটি বাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিমলাপ্রসাদ সুখ্যাত সাহিত্যিক ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক।

ডাঃ শ্রীমতী সরলা ঘোষ

[সুপ্রসিদ্ধা মহিলা-চিকিৎসক—স্ত্রীরোগ-বিশেষজ্ঞ]

আজকের দিনেও, স্বাধীন দেশের সরকার যখন দরাজ হাতে মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের জন্ত বৃত্তি দিচ্ছেন, ছেলে বা মেয়েকে নিজের জলপানির ভরসায় ডাক্তারী পড়তে বড় একটা শোনা যায় না। কিন্তু এই সাহসে ভর করেই মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন নিতান্ত নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরের একটি মেয়ে, আজকের দিনের স্বনামধন্যা ডাক্তার শ্রীমতী সরলা ঘোষ।

ইংরাজী ১৯০৪ সালের ১৯শে এপ্রিল আসাম প্রদেশের এক চা-বাগানে পিতামাতার পঞ্চম সন্তান শ্রীযুক্তা ঘোষের জন্ম হয়। পিতা স্বর্গীয় ডাঃ অন্নদাপ্রসাদ ঘোষ সেখানকার ডাক্তার ছিলেন। এঁদের আদিনিবাস ছিল অবশ্য ২৪ পরগণা জেলার মগরাহাট গ্রামে। কিন্তু আসামের শিবসাগরে এঁরা স্থায়ী বসতি স্থাপন করেছিলেন। ছোটবেলা থেকেই পিতার ডাক্তারী বৃত্তি কন্যার মনে ডাক্তার হওয়ার প্রেরণা দিয়েছিল। সাধারণত দেখা যায়, কোন কৃতী মানুষের জীবনে তাকে আরও বড় হতে পিতামাতার প্রভাব অথবা পারিবারিক পরিবেশ অনেকখানি সাহায্য করেছে। শ্রীযুক্তা ঘোষের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। পারিবারিক পরিবেশ অবশ্য তাঁর বিরূপই ছিল। আসামের চা-বাগানের ছেলেমেয়েদের পড়বার জন্ত কোন স্কুল না থাকায় তাঁর বড় বোনকে ৮।৯ বছর বয়সে বোর্ডিংয়ে পাঠান হয়, তাই তাঁর ঠাকুমা ছেলের উপরে রাগ করে বাড়ী ছেড়ে চলে যান। মা কৈশোরেই মারা যান, তাই পিতা অন্নদাপ্রসাদের প্রভাব ও আদর্শই বালিকা সরলার মনে চিরকালের জন্ত মুদ্রিত হয়ে যায়। আদর্শবাদী অন্নদাপ্রসাদ অত্যন্ত উদার ও স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। ওখানে কোন স্কুল না থাকায় তিনি নিজের পুত্রকন্যাদের সংগে চা-বাগানের অন্য শিশুদেরও পড়াতেন। কার্য্য ব্যপদেশে দেশত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন সত্যি। কিন্তু জন্মভূমির উপরে টান ছিল অসীম। ছিয়াশী বৎসর বয়সে বৃদ্ধ অন্নদাপ্রসাদ আসাম থেকে কোলকাতায় সরলা দেবীর গৃহে আসেন জন্মভূমি দর্শন করার জন্ত। ওঁদের বাড়ী মগরাহাট ষ্টেশনে নেমেও বেশ কিছু দূর যেতে হয়। ডাঃ ঘোষ তাই তাঁকে মোটরে যেতে বললে তিনি রাজী হলেন না। বললেন, তোরা বিলাসিতা শিখেছিস। আমার দেশে যাব আমি পায়ে হেঁটে। তাই এক আত্মীয়ের সংগে ট্রেণে করে যেয়ে পায়ে হেঁটে তাঁর গ্রামে পৌঁছেছিলেন।

দেশের ধূলি মাথায় নিয়ে বৃদ্ধ মেয়ের কাতর অনুরোধ উপেক্ষা করে আসামে চলে যান নিজের বাড়িতে শেষ সময় কাটাবেন বলে। আর হোলও তাই। আসামে ফেরার এক সপ্তাহের মধ্যে তিনি মারা গেলেন। এই পিতার আদর্শে অনুপ্রাণিত সরলা দেবী ছোটবেলা থেকেই ডাক্তারী পড়বার জন্ত প্রস্তুত হয়েছিলেন। খুব ছোটবেলায় তিনি ঢাকা বোর্ডিংয়ে চলে যান পড়ার জন্ত, এখানে তাঁর সহপাঠিনী

ছিলেন পশ্চিমবংগ সরকারের সোস্তাল-এডুকেশনের চিফ ইন্সপেক্‌ট্রেস ফর উইমেন শ্রীযুক্তা মনোরমা বসু। সেখান থেকেই তিনি ১১২৩ সালে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় নবম স্থান অধিকার করেন। এই পরীক্ষার ঠিক আগেই তাঁর মাতৃবিয়োগ ঘটে। প্রবেশিকা পরীক্ষায় চারটি লেটার ও জলপানি পেয়ে তিনি কোলকাতায় বেথুন কলেজে পড়তে এলেন। ১১২৫ খৃষ্টাব্দে তিনি মেয়েদের মধ্যে প্রথম হয়ে, বেথুন থেকে আই-এস-সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হলেন। ফাদার লাফোঁ স্কলারশিপ, প্রতিভা দেবী স্কলারশিপ এবং জেনারেল এফিসিয়েন্সির জন্ত স্কলারশিপ পেলেন।

এই চল্লিশ টাকা সম্বল করে মেডিক্যাল কলেজে ডাক্তারী পড়তে ঢুকলেন। তখনকার দিনের ডাক্তারী পড়ার খরচ আজকের তুলনায় কম হলেও অন্ত পড়ার তুলনায় ব্যয়বহুল ও সময়সাপেক্ষ ছিল। কিন্তু ডাঃ ঘোষ সেদিকে বিন্দুমাত্র চিন্তা না করে নিজের পড়ার খরচ ত চালাতে লাগলেনই, উপরন্তু ছোট ছোট ভাইবোনদেরও এই সময় থেকে কিছু কিছু সাহায্য কোরতে লাগলেন। ডাক্তারী পড়ার ছ'বছর ছিল তাঁর সাধনার সময়। পাশ তাঁকে কোরতেই হবে। বাড়ীর অবস্থা ত ভাল নয় যে আবার তাকে কেউ পড়াবে। কথা প্রসংগে বললেন—আজকালকার ছেলেদের পড়ায় সে নিষ্ঠা আমি দেখতে পাই না। পড়ার চেয়ে ওরা রেডিও, সিনেমা ভাল বোঝে। ডাক্তারী পড়ার এই ছ'বছরে আমার বেশ মনে আছে আমি দু'দিন মাত্র সিনেমা দেখতে গিয়েছিলাম—একদিন বাজি ধরে, আর একদিন কি কারণে যেন মনটা ভীষণ খারাপ হয়েছিল, তাই আমার দুই বন্ধু ধরে নিয়ে গিয়েছিল সিনেমা দেখতে। ১১৩১ সালে আমি M. B. পাশ করি। ইচ্ছা ছিল গায়নোকলজিষ্ট হওয়ার, তা' আর হোল না। সেই থেকেই বলদেও দাস হাসপাতালের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট হয়ে আছি।

১১৩৮ সালে গেলেন বিলেতে। আয়ার্ল্যাণ্ডের Post Graduate Training নিয়ে D. G. O. & L. M. F. হয়ে এলেন।

বিলেত থেকে ফিরে আসার পর তাঁর বিয়ে হয় প্রখ্যাত চিকিৎসক আর, জি, কর হাসপাতালের চেষ্ট ফিজিসিয়ান ডাঃ প্রশান্তকুমার ঘোষের সংগে। ঘোষ-দম্পতির কোন সন্তান হয়নি। কিন্তু বাড়ী দেখলে বোঝার উপায় নেই. বহু আত্মীয়-বন্ধু, পুত্র-কন্তায় তাঁদের বাড়ী সরগরম। তিনি এক এক করে সবাইকে শিক্ষার সুযোগ দিচ্ছেন। বললেন—কাউকে সম্পত্তি দিয়ে বড় লোক করে যাব না, কিন্তু লেখা-পড়ার ব্যাপারে আমার যতটুকু সামর্থ্য সাহায্য করে যাব, যদি তারা মানুষ হয়। এ বিষয়ে তাঁর স্বামীর ঔদার্য্য ও মহানুভবতার কথা উল্লেখ করে বললেন—তিনি এত ভাল যে মুখে বললে বোধ করি ছোট হয়ে যাবেন।

১১৫৪ সালে ঘোষ-দম্পতিরা বিলেতে গিয়েছিলেন এক চিকিৎসক সম্মেলনে যোগ দিতে এবং সারা ইউরোপ পরিভ্রমণ করে এসেছিলেন। এবার একটু প্রাচ্যের দিকে যাওয়ার ইচ্ছা হয়েছে।

বর্তমানে ডাঃ সরলা ঘোষ নিখিল ভারত নারী-সম্মেলনের সক্রিয় সদস্যা। তিনি চিলড্রেনস হোম (৮এ বেথুন রো) ও ওয়ার্কিং গার্লস হোষ্টেল-এর সম্পাদিকা এবং ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল সেকসানের সভানেত্রী। সোস্তাল ওয়েলফেয়ার বোর্ডের অধীনে
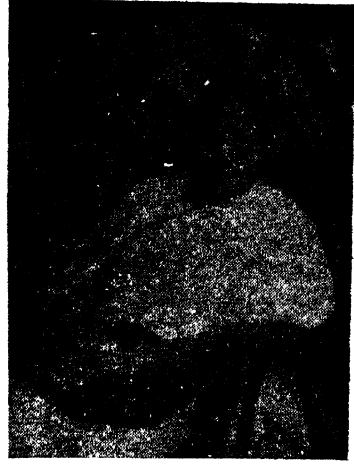
শ্রীমতী সরলা ঘোষ

হাওড়া প্রজেক্ট ইমপ্লিমেণ্ট কমিটির চেয়ারম্যান। এমনি বাংলা দেশের কত-শত সমাজ-কল্যাণমূলক কাজে তাঁর নীরব হস্তের স্পর্শ রয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। তবু শিক্ষার্থীদের সাহায্য দানের ব্যাপারে তাঁর আগ্রহ ও দান অনেক বেশী।

নিতান্ত নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে হয়ে তিনি যে ভাবে নিজের চেষ্টায় কৃতিত্বের সর্বোচ্চ শিখরে উঠেছেন, তা আজকালকার সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীরই অনুকরণযোগ্য।

শুধু মাত্র মহিলা-চিকিৎসক হিসাবে নয়—সমাজসেবায়ও তাঁর নাম বিংশ শতাব্দীর অলিখিত ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ বসু

[বাংলার প্রবীণতম যুব-সংগঠক, স্কাউট আন্দোলনের অগ্রদীপ এবং বিশিষ্ট আইনজ্ঞ]

যুব আন্দোলনের একজন প্রবীণ ও বিশিষ্ট পুরুষ হিসাবে তিনি সর্বজনবরেণ্য, বয়স্কাউট আন্দোলন থেকে আরম্ভ করে বাংলার অধিকাংশ যুব-সংগঠনের সঙ্গে তাঁর যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যায়। সমাজ-জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত প্রত্যেকের জীবনেই আছে কোন একজন আদর্শ-পুরুষের সাহচর্য ও অনুপ্রেরণা। এইরূপ উৎসাহ ও প্রেরণাদাতার মূর্ত প্রতীক হলেন, বর্তমান বাংলার প্রবীণতম ক্রীড়ামোদী ও প্রখ্যাতনামা যুব-সংগঠনকারী কর্মযোগী স্বনামধন্ত শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ বসু। তাঁর সংস্পর্শে এসে কত ছেলের জীবনের গতি পরিবর্তিত হয়ে সাফল্যের পথে এগিয়ে গিয়েছে, তার ইয়ত্তা নাই।

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ২৩শে ডিসেম্বর, এই কলকাতারই পটলডাঙায় এক শিক্ষিত ও সংস্কৃতিসম্পন্ন জমিদার পরিবারে নৃপেন্দ্রনাথের জন্ম হয়। বর্তমানে কলকাতা-নিবাসী হলেও এই বসু-পরিবারের আদি নিবাস হুগলী জেলার পানিশাহলা গ্রামে।

নৃপেন্দ্রনাথের যখন মাত্র ১১ বছর বয়স, তখন তাঁর পিতৃদেব প্রতাপচন্দ্র বসু পরলোক গমন করেন। নৃপেন্দ্রনাথের জীবনের সমস্ত কিছুর প্রেরণার উৎস ছিলেন, তাঁর পরমারাধ্যতমা জননী শ্রীকৃষ্ণপ্রসেবিনী দেবী। তিনি ছিলেন শোভাবাজার রাজবাটীর, রাজা হরেন্দ্রকৃষ্ণ দেবের কন্যা।

নৃপেন্দ্রনাথের পড়াশুনা আরম্ভ হয় হেয়ার স্কুলে। সেই সময় হেয়ার স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী রায় শ্রীরস.য় মিত্র বাহাদুর। নৃপেন্দ্রনাথের জীবনে এই মহান শিক্ষকের প্রভাব কম নয়। এই স্কুল থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে এনট্রান্স পাশ করবার পর নৃপেন্দ্রনাথ প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হলেন। এখানে তিনি অধ্যাপকরূপে পান বীণাপাণির শ্রেষ্ঠ পুজারীদ্বয়—আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুকে। প্রেসিডেন্সী কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ পি, কে, রায়ের প্রিয় ছাত্র ছিলেন নৃপেন্দ্রনাথ। এই প্রেসিডেন্সী কলেজেই তিনি পরিচিত হন ভারতের বর্তমান রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের সঙ্গে। উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্য নৃপেন্দ্রনাথ ১৯০৮ সালে ইংলণ্ড যাত্রা করেন। ইংলণ্ডে তিনি কেম্‌ব্রিজের ডাউনিং কলেজে ও লণ্ডনের লিঙ্কন্‌স্ ইনে ভর্তি হলেন এবং নিজ অধ্যবসায় বলে কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক উপাধি প্রাপ্ত হয়ে ব্যারিষ্টারী পাশ করলেন। ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু, প্রসিদ্ধ জননেতা শরৎচন্দ্র বসু, প্রাক্তন আইন-সচিব শ্রীচারুচন্দ্র বিশ্বাস, স্যার সত্যেন রায়, শ্রীজীবনকৃষ্ণ মিত্র, প্রসিদ্ধ আইনবিদ্‌ ডাঃ রাধাবিনোদ পাল, অধ্যাপক হরিদাস ভট্টাচার্য, শ্রীমণীন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল, শ্রীডি, ড্রাইভার প্রভৃতি নৃপেন্দ্রনাথের সতীর্থ। ইংলণ্ডে দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হয়। কেম্‌ব্রিজের ইণ্ডিয়ান মজলিসের তিনি ছিলেন ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক। আমাদের প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু এই মজলিসের সভ্য ছিলেন। ভারতে ফিরে কলকাতা বারে যোগদান করলেন ১৯১২ সালে, তাঁর ভগিনীপতি সার চারুচন্দ্র ঘোষের জুনিয়ার হিসাবে তাঁর

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ বসু

জীবনের শুরু, পরবর্তীকালে তিনি সার বি, এল, মিত্রের সহকারী ব্যারিষ্টার হয়েও কাজ করেছেন।

উত্তরকালে যিনি ভারতীয় ক্রীড়াজগতে এক বিশিষ্ট পুরুষ বলিয়া পরিগণিত হবেন তাঁর সূচনা ১৯১৬ সালে। সর্বশ্রী জে, এম ঘোষ (বাংলার স্কাউট আন্দোলনের পুরোধা), এস গোস্বামী, সতীশ মিত্র, ডাঃ এস, কে, মল্লিক প্রভৃতি তদানীন্তন স্কাউট নেতৃবৃন্দ নৃপেন্দ্রনাথকে স্কাউট আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে আহ্বান জানালেন, তাঁদের অনুরোধে নৃপেন্দ্রনাথ ব্যারিষ্টার হিজেন্দ্রনাথ বসুর সহকারী হিসাবে স্কাউট আন্দোলনে যোগদান করলেন। সেই সময়ে ভারতে স্কাউট আন্দোলনের প্রথম অবস্থা, কিন্তু লণ্ডনের কেন্দ্রীয় বয়স্কাউট সংস্থা ভারতস্থ স্কাউট আন্দোলনের স্বপক্ষে ছিলেন না। নৃপেন্দ্রনাথের সবিশেষ চেষ্টায় লণ্ডনস্থ সংঘের নীতি পরিবর্তিত হল—তাঁরা ভারতীয় বয়স্কাউট আন্দোলনকে সমর্থন করলেন। তাঁর পরবর্তী কাজ হয় কলিকাতা বয়স্কাউট এসোসিয়েশনের সম্পাদক ও উত্তর কলিকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজিয়েট স্কুলের স্কাউটমাষ্টারের কার্য্যভার গ্রহণ। তাঁর সুপরিচালনায় স্বল্পকালের মধ্যেই কলিকাতা সংঘ বাংলাদেশের বৃহত্তম এসোসিয়েসনরূপে পরিগণিত হয়। নৃপেন্দ্রনাথ পরিচালিত স্কটিশ গ্রুপ ছিল কলিকাতা এসোসিয়েসনের গৌরব। তদানীন্তন স্কটিশ গ্রুপের কাব ও স্কাউটদের অনেকেই আজ সমাজ জীবনে সুপরিচিত। শ্রীপ্রভাসচন্দ্র দে—প্রাক্তন ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে। ডাঃ অমর দেব আই-এম-এস, শ্রীসরোজ কাঞ্জিলাল—প্রাক্তন জেনারেল ম্যানেজার টেলিফোন শ্রীসমর চট্টোপাধ্যায়—ডেপুটি ডিরেক্টর পোষ্ট অ্যাণ্ড টেলিগ্রাফ, বিচারপতি পি, বি, মুখার্জ্জী, প্রখ্যাত মুষ্টিযোদ্ধা রবীন সরকার (বর্তমানে ইংলণ্ড প্রবাসী) নৃপেন্দ্রনাথের স্কটিশ গ্রুপের কাব ও স্কাউট।

সার আলফ্রেড পিকফোর্ড ও কর্ণেল জে, এস, উইলসন পরিচালিত উডব্যাজ শিক্ষাশিবিরে নৃপেন্দ্রনাথ যোগদান করেন। পরবর্তীকালে কর্ণেল উইলসন গিলওয়েল পার্কের ক্যাম্পচীফ, আন্তর্জাতিক বয়স্কাউট সংস্থার ডিরেক্টর ও প্রেসিডেন্টরূপে কাজ করেছিলেন। ভারতীয়দের মধ্যে নৃপেন্দ্রনাথই প্রথমে আন্তর্জাতিক বয়স্কাউট সংস্থার বিশেষ সম্মান উডব্যাজ পান। আন্তর্জাতিক স্কাউটিং শিক্ষাকেন্দ্র ইংলণ্ডের গিলওয়েল পার্কে বিশেষ শিক্ষালাভ করার পর ডেপুটি ক্যাম্প চীফ পদে নিয়োগ করা প্রথা ছিল। কিন্তু আন্তর্জাতিক বয়স্কাউট সংস্থা নৃপেন্দ্রনাথের কর্মদক্ষতার জন্য এই প্রথার ব্যতিক্রম করিয়া তাঁকে বাংলার ডেপুটি ক্যাম্প চীফ পদে নিযুক্ত করলেন। নৃপেন্দ্রনাথ প্রথম ভারতীয় ডেপুটি ক্যাম্প চীফ, বাংলাদেশের স্কাউটারদের শিক্ষাদানের জন্য ভারপ্রাপ্ত হয়েও আসামের তদানীন্তন গভর্ণর সার জন কারের অনুরোধে তিনি শিলিংএ প্রথম স্কাউট মাষ্টার শিবির পরিচালনা করেন।

১৯২১ সালে স্কাউটিং প্রতিষ্ঠাতা লর্ড বেডেন পাওয়েলের ভারত পরিদর্শনের পর ভারতীয় বয়স্কাউট সংঘ ইংলণ্ডের কেন্দ্রীয় কার্য্যালয় কর্তৃক অনুমোদিত হইলে সার আলফ্রেড পিকফোর্ড ও কর্ণেল জে, এস, উইলসন প্রমুখ স্কাউট নেতৃবৃন্দের আহ্বানে নৃপেন্দ্রনাথ নবগঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক বয়স্কাউট সংঘের সম্পাদকের কার্য্যভার গ্রহণ করলেন। তাঁর আপ্রাণ-চেষ্টায় ও অক্লান্ত পরিশ্রমে বাংলার প্রতিটি জেলায় স্কাউটিং প্রসার লাভ করল।

বর্তমান কালের বাংলার স্কাউটিং-এর স্রষ্টা নৃপেন্দ্রনাথ, দেশের ছেলেরা যাতে সুস্থ-সবল সু-নাগরিক হয় তার জন্ত তিনি সমস্ত বাংলাদেশ পরিভ্রমণ করে দেশবাসীকে হৃদয়ঙ্গম করান যে, স্কাউটিং-এর প্রতিষ্ঠাতা বিদেশী হলেও এর শিক্ষা-প্রণালীর সঙ্গে ভারতের আদর্শ ও প্রাচীন শিক্ষা-প্রণালীর মিল আছে, নৃপেন্দ্রনাথের এইরূপ প্রচেষ্টার ফলে স্কাউটিংএর প্রসারও জনপ্রিয় হইল, নিরলস কর্মী নৃপেন্দ্রনাথকে এর জন্ত অনেক বাধা-বিঘ্ন ও শারীরিক ক্লেশ সহ্য করিতে হইয়াছিল। বাংলাদেশে প্রথম সাফল্যমণ্ডিত জাম্বুরী (Jamboree) তাঁহার পরিচালন শক্তির প্রকাশ।

লর্ড সিংহ, বর্দ্ধমানের মহারাজা, কর্মবীর সার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সার বি, এল, মিত্র, শ্রী এস, আর, দাশ প্রমুখ বাংলার সুসন্তানগণ এই "মানুষ গড়ার" কাজে সর্বসময়েই নৃপেন্দ্রনাথকে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করতেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন তাঁকে বলতেন "Carry on Bhose. I see wonderful possibilities in it for the good of our country."

কলকাতার অনতিদূরে যশোর রোডের উপর গঙ্গানগরে বাংলার স্কাউট অফিসারদের জন্ত একটি স্থায়ী শিক্ষাশিবির স্থাপন করে নৃপেন্দ্রনাথ বাংলার স্কাউটিং এর এক বিরাট অভাব মোচন করলেন, আন্তর্জাতিক স্কাউটিং শিক্ষাকেন্দ্র গিলওয়েল পার্কের অনুরূপে নির্মিত এই শিবির নৃপেন্দ্রনাথকে চিরস্মরণীয় করে রাখবে। স্কাউটিং এর বিপুল প্রসারের জন্ত তিনি বাংলাভাষায় স্কাউটিং সম্বন্ধীয় পুস্তক প্রণয়ন করলেন। তাঁর রচিত পুস্তকাবলী আজও বাংলার স্কাউটারদের নিকট অতীব প্রয়োজনীয়। বাংলার যুবসমাজের উন্নতিকল্পে তাঁর কার্য্যাবলীর জন্ত তদানীন্তন বৃটিশ সরকার তাঁকে O.B.E. খেতাব দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু নিরলস, নিঃস্বার্থপরায়ণ নৃপেন্দ্রনাথ প্রকৃত কর্মযোগীর ন্তায় সরকার প্রদত্ত এই খেতাব গ্রহণে অসম্মতি জ্ঞাপন করেছিলেন।

১৯৩৫ সালের প্রথম ভাগ, বঙ্গীয় প্রাদেশিক সংঘের সম্পাদক হিসাবে নৃপেন্দ্রনাথের কর্মনৈপুণ্য ও সংগঠনশক্তি সর্বজনবিদিত। তদানীন্তন ভাইসরয় লর্ড উইলিংডনের ইচ্ছা যে, তিনি নূতন দিল্লীতে অবস্থিত নিখিল ভারত বয়স্কাউট সংঘের পরিচালন ভার গ্রহণ করেন। দীর্ঘ পরিশ্রমে গঠিত বঙ্গীয় বয়স্কাউট সংঘ, নৃপেন্দ্রনাথের নিকট ইহা স্বজন পরিত্যাগের তুল্য। তার উপর পারিবারিক প্রয়োজনে তাঁর বাংলার বাহিরে থাকা সম্ভব ছিল না। অবশেষে স্তার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও সার জ্যোৎস্না ঘোষালের পরামর্শে নৃপেন্দ্রনাথ কলকাতায় ভারতীয় বয়স্কাউট সংঘের কার্য্যভার গ্রহণ করতে রাজী হলেন। লর্ড উইলিংডন ও তদানীন্তন চীফ স্কাউট কমিশনার সার এরিক মিয়েভিল ইহা অনুমোদন করলেন। বাংলার স্কাউটগণ আনন্দাশ্রু নয়নে বাংলার স্কাউটিংএর স্রষ্টা—বাংলার স্কাউটপিতা নৃপেন্দ্রনাথকে এক সম্বর্দ্ধনা সভায় তাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানালো, তদানীন্তন বঙ্গীয় বয়স্কাউট সংঘের প্রাদেশিক কাউন্সিল তাঁকে বাংলার স্কাউটদের নিকট চিরস্মরণীয় করে রাখবার জন্ত তৎপ্রতিষ্ঠিত গঙ্গানগরের স্কাউট শিবিরের নামকরণ করলেন, "নৃপেন পার্ক"।

নিখিল ভারত বয়স্কাউট সংঘের সাধারণ সম্পাদকের কার্য্যভার গ্রহণ করেই নৃপেন্দ্রনাথ সমগ্র ভারতে স্কাউটিং প্রসারে ব্রতী হলেন, সে সময় অবিভক্ত ভারতের সঙ্গে ব্রহ্মদেশ ও সিংহল সংযুক্ত ছিল, তাঁর কর্মদক্ষতায় ভারতের প্রত্যেক প্রদেশ ও রাজ্যে স্কাউটিং বিস্তৃত হল। তাঁর অভূতপূর্ব সংগঠন শক্তির পরিচয়ে লর্ড উইলিংডন ইংলণ্ডের কেন্দ্রীয় কার্য্যালয়ের নিকট নৃপেন্দ্রনাথকে স্কাউটিংজগতের সর্ব্বোচ্চ সম্মান "সিলভার উলফ"এ ভূষিত করবার ইচ্ছা জানালেন, নৃপেন্দ্রনাথ কেন্দ্রীয় বয়স্কাউট সংস্থার নিকট সুপরিচিত ছিলেন, স্কাউটিং সম্বন্ধে নৃপেন্দ্রনাথের মতামতকে তাঁরা শ্রদ্ধা করতেন। স্কাউট জগতের সর্বোচ্চ সম্মানে ভূষিত করবার কথায় তাঁরা সানন্দে তাঁদের সম্মতি জ্ঞাপন করলেন, সিমলাতে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে লর্ড উইলিংডন নৃপেন্দ্রনাথকে "সিলভার উলফ" প্রদান করলেন।

১৯৩৭ সাল। নৃপেন্দ্রনাথের প্রচেষ্টায় ঐ বছরের ফেব্রুয়ারী মাসে দিল্লীতে সর্বপ্রথম সর্বভারতীয় 'জাম্বুরী' অনুষ্ঠিত হল। এই 'জাম্বুরী' তাঁর যোগ্যতার চরম প্রকাশ, স্কাউটিং প্রতিষ্ঠাতা লর্ড বেডেন পাওয়েল ও লেডী বেডেন পাওয়েল এই জাম্বুরীতে উপস্থিত ছিলেন। নৃপেন্দ্রনাথ পরিকল্পিত 'জাম্বুরী'র সাফল্যের জন্ত স্কাউটিং স্রষ্টা লর্ড বেডেন পাওয়েল স্বয়ং নৃপেন্দ্রনাথকে অভিনন্দিত করে তাঁর প্রশংসা করেছিলেন। সর্বভারতীয় জাম্বুরীর সাফল্য ভারতীয় বয়স্কাউট সংঘের দৃঢ়ীকরণে সহায়তা করিল, দেশের ছেলেরা বয়স্কাউট সংঘের মাধ্যমে সুস্থ-সবল ও চরিত্রবাণ নাগরিক হইয়া নিঃস্বার্থ ভাবে দেশ ও দশের সেবায় ব্রতী হউক, তাঁর এই প্রচেষ্টা সাফল্যলাভ করিল, দীর্ঘকাল বয়স্কাউট সংঘের অগ্রগতিতে সাহায্য করিয়া ১৯৩৭ সালের শেষভাগে নৃপেন্দ্রনাথ বয়স্কাউট সংঘ হইতে অবসর গ্রহণ করলেন।

নৃপেন্দ্রনাথের জীবন স্কাউটিংএ উৎসর্গিত-প্রাণ, ১৯৪০ সালে তিনি দক্ষিণ কলকাতা বয়স্কাউট এসোসিয়েসনের পরিচালনভার গ্রহণ করলেন। ১৯৫০ সাল পর্য্যন্ত তিনি দক্ষিণ কলিকাতায় জিলা স্কাউট কমিশনার ছিলেন। তাঁর সুপরিচালনা বলে দক্ষিণ কলিকাতা বয়স্কাউট সংঘ আজ পশ্চিম বাংলার শ্রেষ্ঠ সংঘ বলিয়া পরিগণিত।

নৃপেন্দ্রনাথের ভূতপূর্ব স্কাউটদের মধ্যে অনেকেই বর্তমানে কৃতী, গণ্যমান্ত ও যশস্বী হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—ভারত সরকারের শিক্ষাবিভাগের ডাঃ মনোমোহন দাস, শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ, ভারতীয় বিমানবাহিনীর সর্বাধিনায়ক এয়ার মার্শাল সুব্রত মুখোপাধ্যায়, ডাঃ কনক সর্বাধিকারী। ভারত স্কাউটস ও গাইডসের বর্তমান ন্তাশনাল সেক্রেটারী শ্রীসরোজ ঘোষ। ইহারা আজও পরম শ্রদ্ধার সহিত নৃপেন্দ্রনাথের শিক্ষার কথা উল্লেখ করেন।

তাঁর কর্মতৎপরতা কেবল বয়স্কাউট সংঘের মাঝেই সীমাবদ্ধ ছিল না, ক্যালকাটা সুইমিং ও স্পোর্টস এসোসিয়েসনের তিনি ছিলেন সম্পাদক। বেঙ্গল অলিম্পিক এসোসিয়েসনের যুগ্ম সম্পাদক হিসাবেও তিনি কাজ করেছেন। তাঁরই প্রচেষ্টায় শ্রীনলিন মালিক প্রথম ভারতীয় প্রতিনিধিরূপে যোগদান করেন। বাংলাদেশের প্রত্যেক সুইমিং ক্লাবের মধ্যে সংযোগ সাধনের জন্ত নৃপেন্দ্রনাথ বেঙ্গল এমেচার সুইমিং এসোসিয়েসন ও ইণ্ডিয়ান সুইমিং ফেডারেশন গঠন করেছেন। তাঁর মতে প্রত্যেক ক্রীড়া প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব পরিচালনা সমিতি

থাকা উচিত—একটি বিশেষ গোষ্ঠীর মধ্যে সমস্ত ক্রীড়া প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্ব থাকা অনুচিত। ইণ্ডিয়ান সুইমিং ফেডারেশনের সম্পাদকরূপে নৃপেন্দ্রনাথ অল বেঙ্গল সুইমিং চাম্পিয়ানসিপ প্রতিযোগিতার সংগঠন করেন। তাঁর সম্পাদক থাকাকালীন বাংলাদেশ সাঁতারে ভারতের শ্রেষ্ঠ প্রদেশ বলিয়া সুনাম অর্জন করে। বাগবাজার জিমনাসিয়ামের সভাপতি তিনি ১৯৩২ সাল থেকে। তাঁর প্রচেষ্টায় বাগবাজার জিমনাসিয়ামের নিজস্ব খেলার মাঠ ও ক্লাবরুমের জন্য কলকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট হতে ৮০ হাজার টাকায় ১০ কাঠা জমি কেনা সম্ভবপর হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানের কার্য্যকলাপে প্রীত হয়ে স্বর্গীয় রাজ্যপাল ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় ক্লাব তহবিলে ১০০ টাকা দান করেছিলেন। এই বাগবাজার জিমনাসিয়াম থেকেই নৃপেন্দ্রনাথের উদ্যোগে গঠিত হয় বেঙ্গল ভলিবল এসোসিয়েসন ও বঙ্গীয় অপেশাদার ভারোত্তোলন সমিতি। ১৯৫৬ সাল পর্য্যন্ত তিনি ওয়েটলিফটিং ফেডারেশনের সম্পাদকরূপে কাজ করেছেন। তাঁরই প্রচেষ্টায় ১৯৩৬ সালে বার্লিন অলিম্পিকে ভারতবর্ষ প্রতিনিধিত্ব করে। বর্তমানে প্রবর্ত্তিত এশিয়ান গেমস পরিকল্পনার বহুপূর্বে নৃপেন্দ্রনাথ প্রবর্ত্তন করেছিলেন এশিয়োত্তর দেশসমূহের মধ্যে প্রতিযোগিতা, তাঁর উদ্যোগে ভারত-সিংহল ও ভারত-ব্রহ্ম ভারোত্তোলন প্রতিযোগিত অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৪৮ সাল পর্য্যন্ত নৃপেন্দ্রনাথ সেন্ট্রাল সুইমিং ক্লাবের সভাপতি ছিলেন। কর্ণওয়ালিশ স্কোয়ারে এই ক্লাবের প্যাভিলিয়ান নির্মাণেও ছিল তাঁর প্রচেষ্টা।

কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত তিনি ছিলেন শিশু রংমহলের সভাপতি। তাঁর প্রাক্তন স্কাউট শ্রীসমর চট্টোপাধ্যায় এই শিশু রংমহলের প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক। আজও তিনি শিশু রংমহলের পরম প্রিয় 'দাদু'। নৃপেন্দ্রনাথের সুদক্ষ পরিচালনায় শিশু রংমহল আজ ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিশুসংগঠনরূপে সঙ্গীত-নাটক একাদেমী কর্তৃক অনুমোদিত।

নিম্নোক্ত প্রতিষ্ঠান সমূহের সহিত তিনি আজও জড়িত আছেন। অ্যামেচার রেষ্টলিং এসোসিয়েসনের সভাপতি। ভারতীয় ভারোত্তলন সমিতি ও নর্থ ক্লাবের তিনি সহকারী সভাপতি। এ ছাড়াও আর, জি, কর মেডিকেল কলেজ ও হসপিটাল ও বিদ্যাসাগর কলেজ—এই দুইটি প্রতিষ্ঠানের গভর্নিংবডির সদস্য। সাউথ সুবারবন মেন স্কুলের কার্য্যকরী সমিতির সদস্য ও কলিকাতা চ্যারিটেবল সোসাইটির সদস্য।

কলকাতা হাইকোর্টের বারকাউন্সিলের সভ্য ছিলেন নৃপেন্দ্রনাথ ১৯৫৫ সাল পর্য্যন্ত। ধর্মজীবনে তিনি শ্রীশ্রীহংসদেব মহারাজ অবধূত-এর শিষ্য। মহামহোপাধ্যায় দুর্গাচরণ সাংখ্যতীর্থ এবং স্বামী বিশুদ্ধানন্দ গিরির (বিপ্লবী হৃষিকেশ কাঞ্জিলাল) পদপ্রান্তে বসে নৃপেন্দ্রনাথ নিয়েছেন উপনিষদের পাঠ। কাশী বিশ্বনাথ হিন্দু মহামণ্ডল এক মানপত্র দিয়েছেন তাঁর হিন্দু উত্তরাধিকার বিলের বিপক্ষে জনমত সংগ্রহ করার জন্য।

"Our athletes were suffering a great deal from internal squabbles." বলেছেন আমাদের প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহেরু। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযুক্ত থেকে একথা নৃপেন্দ্রনাথ অনুভব করেছেন বহুপূর্বে। তাঁর মতে দলাদলিতে সংঘের উদ্দেশ্য সফল হয় না। বর্তমানে যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলা এসেছে তারা ফাঁকিবাজ হয়েছে, গুরুজনদের মানে না, ইত্যাদি শুনে নৃপেন্দ্রনাথ বলেন যে ছেলেদের কাছে আজ চাক্ষুষ আদর্শের অভাবের জন্যই তাদের এই অবস্থা, উপদেশের চেয়ে নিজের দৃষ্টান্ত অধিক কার্য্যকরী। বড়দের মধ্যে দলাদলি ও দেশে অসাধুতার বিস্তারের জন্যই যুব-সম্প্রদায়ের এই অবস্থা!

ভারতের প্রবীণ ক্রীড়ামোদী আজ সত্তরের কোঠা পেরিয়ে গেছেন। এখনও যুবকদের আহ্বান তিনি এড়াতে পারেন না। যুবকদের নিকট নৃপেন্দ্রনাথ হয়ে যান তাদেরই একজন।

MARX SAID IT

"Will the giant Russian State ever halt in its march towards world power? Even if she wished to do so, conditions would prevent it. The natural borders of Russia run from Danzig, or even Stettin, down to Trieste, and it is inevitable that the Russian leaders should do their utmost to swell out until they have reached this border. Russia has only one opponent: the explosive power of democratic ideas and the inborn urge of the human race in the direction of freedom."—*Karl Marx, in The New York Tribune, April 12, 1853.*
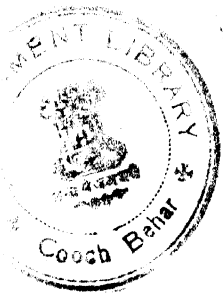
ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অত্যাচার

[পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর]

শ্রীখগেন্দ্রনাথ বসু

যশোহর-খুলনার লবণ প্রস্তুতের ইতিহাস

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন খুলনা মহকুমা বা জেলায় পরিণত হয় নাই। বর্ত্তমান খুলনা শহরের পূর্ব্ব-দক্ষিণে প্রবাহিত রূপসা নদী। ইহার পূর্ব্বতীরে রেনী সাহেবের কুঠীর ধ্বংসাবশেষ এখনও বিদ্যমান। রেনী সাহেব বৃটিশ সরকারের সৈন্ত বিভাগে একজন সাধারণ সৈনিক ছিলেন। কোন গুরুতর অপরাধের জন্ত তাঁহাকে পলায়ন করিয়া আসিতে হয়, কোন্ সূত্রে কাহার সাহায্যে তিনি এখানে আসিয়া প্রতিপত্তি স্থাপন করেন, তাহার বিস্তৃত বিবরণ এখানে নিষ্প্রয়োজন। তাঁহার কুঠী হইতে দুই মাইল ব্যবধানে শ্রীরামপুর গ্রামে শিবনাথ ঘোষ নামে একজন দুর্দ্দান্ত প্রতাপশালী জমিদার ছিলেন। রেনী সাহেব তাঁহার অনেক জমি জোর করিয়া দখল করিয়া লয়েন এবং ক্রমে খ্যাতনামা নীলকর ও জমিদার হইয়া উঠেন। তখন বৃটিশের আইন ও শৃঙ্খলা সুষ্ঠুভাবে গড়িয়া উঠে নাই, ফলতঃ অনেক জমিদার ও জমিদারীর ইতিহাস এইরূপই ছিল। রেনী সাহেবের সহিত শিবনাথের আজীবন বিবাদের ইহাই মূল কারণ। এই বিবাদ প্রসিদ্ধ প্রবাদে পরিণত হইয়াছে। এইরূপ শুনা যায়, রেনী সাহেব জীবিত থাকিতেই শিবনাথের মৃত্যু হইলে, একটি লোক প্রচুর পুরস্কারের আশায় এই সংবাদ রেনী সাহেবের কাছে লইয়া গেলে, তিনি তাহাকে বেত্রাঘাত করিয়া বলিয়াছিলেন—ইহাই তোমার উপযুক্ত পুরস্কার। আমার সমযোদ্ধা শিবনাথ আজ আমাকে ফেলিয়া চলিয়া গেল, আমি আর কাহারও সঙ্গে বিবাদ করিব না। এইরূপ আরও প্রকাশ, রেনী সাহেব শিবনাথের শবানুগমনও করিয়াছিলেন, রেনী সাহেবের জমিদারী পরে নড়াইলের বাবুরা কিনিয়া লয়েন।

যাহা হউক, এই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ বিবাদের জন্ত বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে উভয়ের বাসস্থানের মধ্যে নয়াবাদ থানা প্রতিষ্ঠা করিতে হয়। সুন্দরবনের জঙ্গল কাটিয়া নূতন আবাদ করিতে হইয়াছিল বলিয়া ইহাকে নয়াবাদ বলিত। (১)

১৮৪২ খৃষ্টাব্দে নয়াবাদ খুলনা মহকুমায় এবং পরে উহাই খুলনা জেলায় পরিণত হয় ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে। ইহার পূর্ব্বে খুলনা, যশোহর জেলার অন্তর্গত এবং কতকাংশ ২৪ পরগণার মধ্যে ছিল।

১৭৮১ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নীমক বিভাগ খোলেন, এবং জমিদারগণকে তাঁহাদের জমিদারী মধ্যে লবণ প্রস্তুতের অধিকার হইতে বঞ্চিত করেন। ক্ষতিপূরণ স্বরূপ তাঁহাদিগকে একটি নির্দিষ্ট মালিকানা দেওয়া হইত। ইহা ভিন্ন জমিদারগণ লবণ প্রস্তুতে কোম্পানীকে সাহায্য করিবেন বলিয়া উৎপন্ন লবণের পরিমাণ অনুসারে তাহাদিগকে মাসোহারা দেওয়া হয়। লবণ প্রস্তুতের জমিকে নিমক-খালাড়ী বলিত। ১৭১৪ খৃষ্টাব্দে কোম্পানী বাৎসরিক জমা ধার্য্য করিয়া জমিদারগণের নিকট হইতে সমস্ত খালাড়ী বন্দোবস্ত করিয়া লয়েন।(২) ১৮৬১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত লবণ প্রস্তুতের একচেটিয়া ব্যবসায় গবর্ণমেণ্টের হাতে ছিল; এই সময়ে গবর্ণমেণ্ট এই অধিকার ত্যাগ করেন, অতঃপর যাহারা ব্যক্তিগত ভাবে লবণ প্রস্তুত করিত, তাহাদিগকে নির্দ্ধারিত শুল্ক দিতে হইত, স্যার সি, সি, বিডন, কে, সি এস, আই, যখন বঙ্গের ছোট লাট, তখন এই একচেটিয়া ব্যবসায় উঠিয়া যায়।(৩)

বঙ্গদেশে লবণ ব্যবসায় সম্পূর্ণ বাঙ্গালীর হাতেই ছিল, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী উহা হস্তান্তরিত করিয়া লয়েন। নীলকুঠির স্তায় কুঠি স্থাপন করিয়া লবণ প্রস্তুতকারকদের উপর অমানুষিক অত্যাচার করা হয়, ইহার কিঞ্চিৎ আভাস পূর্ব প্রবন্ধে দেওয়া হইয়াছে। তৎকালে যশোহরের অন্তর্গত খুলনায় রায়-মঙ্গল, শিবপুর, রামপুর, জামিরা এবং মালই প্রভৃতি স্থলে লবণ প্রস্তুত হইত। বঙ্গদেশের মধ্যে যশোহরেই অর্থাৎ এই সকল কেন্দ্রে সর্বাপেক্ষা অধিক লবণ প্রস্তুত হইত। (৪)

রায়মঙ্গল পশর এদের মুখে, স্যার ড্যানিয়েল হ্যামিলটনের Rural Reconstruction Institute যেখানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেই গোসাবা নামক স্থানের পূর্ব্বদিকে অবস্থিত ছিল, তৎকালে ইহা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর স্থান ছিল, প্রতি বৎসর বহু লোক সেখানে গিয়া মারা পড়িত। রায়মঙ্গলের পরিমাণ ফল ছিল ২০ হাজার ২৩০ একর বা ৩১ বর্গ শিবপুর রামপুরের সদর ষ্টেশন ছিল মাইল। রাজস্ব ৭৫৮ পাউণ্ড ২ শিলিং, সদর ষ্টেশন সাতক্ষীরা, তখন ২৪ পরগণার অন্তর্গত ছিল (৫) খুলনাতেই।

এই দুই পরগণা পশর ও রায়মঙ্গল এদের মধ্যবর্ত্তী স্থানে, সমুদ্রের নিকটে অবস্থিত ছিল, ইহা মহারাজ প্রতাপাদিত্যের রাজ্যভুক্ত, কাড়াপাড়া জমিদার-বংশের আদিপুরুষ, পরমানন্দ বসু রাজা বসন্ত রায়ের ভগিনী ভবানী দেবীকে বিবাহ কালে যৌতুক স্বরূপ প্রাপ্ত হন, ইহার পরিমাণ ফল ৩ হাজার তিন শত একর বা ৫'০১ বর্গমাইল, ইহা দুই ভাগে বিভক্ত ছিল, ইহার রাজস্ব ১২২ পাউণ্ড ১৮ শিলিং। (৬)

জামিরা খুলনার অতি সন্নিকটেই অবস্থিত ছিল, ইহার পরিমাণ

১। ৺সতীশচন্দ্র মিত্রের যশোহর-খুলনার ইতিহাস, ২য় খণ্ড, ৭১২ পৃষ্ঠা।

২। Hunter's Statistical Report of Midnapore Vol III, p. 150.

৩। Buckland's Bengal under Leut. Governors p. p 286-87.

৪। of the extent of manufacture of salt making, Jessore stands first—Westland's report of the Distict of Jessore,

৫। Statistical Account of Jessore by W. W. Hunter B. A., L. L. D. Vol II. p, 326.

৬। Statistical Account of Jessore by W. W. Hunter B. A., L L. D. Vol II, para 90.

ফল ৬ হাজার ৪ শত ২০ একর বা ১০'০৩ বর্গ-মাইল, ইহা সতেরটি ভাগে বিভক্ত, রাজস্ব ১৩০১ পাউণ্ড ১২ শিলিং, লোকসংখ্যা ২ হাজার ২ শত ২০। (৭)

মালই বর্ত্তমান সাতক্ষীরা-বাবুদের অধীনে আছে, ইহার পরিমাণ ফল ৮২ হাজার ৪০ একর বা ১২৮'১১ বর্গ-মাইল, ইহা ৩৭ ভাগে বিভক্ত ছিল, রাজস্ব ১২ হাজার ৮ শত ২৭ পাউণ্ড ১৬ শিলিং লোকসংখ্যা ১৭ হাজার ১ শত ৩০, সদর ষ্টেশন খুলনা। (৮)

যশোহর 'নিমক বিভাগ' ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বৎসরেই জিলার শাসন ভার ইংরেজ কর্ত্তৃক পূর্ণভাবে গৃহীত হয়। মিঃ হেঙ্কেল ইহার প্রথম কালেকটার।

খুলনার যে সকল স্থানে লবণ প্রস্তুত হইত তাহার মধ্যে রায়মঙ্গল বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে। গোকুল ঘোষাল, আত্মারাম দত্ত, গোকুল মিত্র প্রভৃতি ভদ্রমহোদয়গণ এখানকার এজেন্সী লইয়াছিলেন। গোকুল ঘোষাল বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা ভেরেনষ্টেটের দেওয়ান হইয়া প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করেন, ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। ভূ-কৈলাস রাজ-বংশের প্রতিষ্ঠাতা মহারাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল গোকুলের ভ্রাতুষ্পুত্র।

গোকুল মিত্রের আদি নিবাস বালী। ইঁহার পিতার নাম সীতারাম মিত্র, গোকুল মিত্র কলিকাতা বাগবাজারের একজন স্বনামখ্যাত ব্যক্তি। কোম্পানীর নিমক মহালে চাকরী করিয়া গোকুল ধনী, উপরন্তু তিনি একজন অতি ক্রিয়ান্বিত ব্যক্তি ছিলেন, বারো মাসে তেরো পার্ব্বণে তাঁহার বাড়ী সর্ব্বদাই মুখরিত থাকিত। গোকুলের প্রাসাদতুল্য বাড়ী চিৎপুর রোডে এখনও বর্ত্তমান এবং এখনও প্রতি বৎসর কোজাগরী প্রতিপদে সে বাটীতে মহা-সমারোহে অন্নকূট মহোৎসব হইয়া থাকে। গোকুল মিত্রের গলি নামে কলিকাতার একটি রাস্তা আছে।

যাহা হউক, এই সকল ব্যক্তির আবির্ভাবকাল বিচার করিলে, আমরা দেখিতে পাই, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে নিজ হাতে লবণের একচেটিয়া ব্যবসায় গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে ইঁহারা লবণ প্রস্তুতের এজেন্সী লইয়াছিলেন, এবং বাঙ্গলার লবণ ব্যবসায় সম্পূর্ণরূপে বাঙ্গালীর হাতেই ছিল, বহরমপুরের সেন বংশের প্রতিষ্ঠাতাগণ, শোভাবাজারের রাজবাড়ীর অধিবাসিগণ এবং হাটখোলার দত্তগণ সময়ে সময়ে লবণ প্রস্তুতের এজেন্সী লইয়া যথেষ্ট ধনসম্পদশালী হইয়াছিলেন। কাড়াপাড়ার রায়চৌধুরী জমিদার গাভ বসু বংশীয় বঙ্গজ কায়স্থ। এই জমিদার বংশের আদিপুরুষ ভবানী পরমানন্দ (৯), বঙ্গজের আদি অলঙ্কার বসুর পুত্র লক্ষণ হইতে ১৪শ পর্য্যায়। মহারাজ বল্লালসেনের সময়ে ঘোষ ও গুহবংশে ৫ম পুরুষ এবং বসু ও মিত্র বংশে ৭ম পুরুষ সমান

৭। Idem, para 44.

৮। Idem, para 56.

(৯) ভবানী পরমানন্দের প্রকৃত নাম—পরমানন্দ বসু, তিনি রাজা বসন্ত রায়ের ভগিনী ভবানী দেবীকে বিবাহ করেন, হাবলী প্রভৃতি পরগণী জমিদারী পাইয়া তাঁহার রায় উপাধি হয়। ঘটক-কারিকায় তাঁহার নামের সঙ্গে রাজকুমারী ভবানীর নাম যুক্ত হইয়া তিনি ভবানী পরমানন্দ নামে আখ্যাত হন। ৺সতীশচন্দ্র মিত্রের "যশোহর-খুলনার ইতিহাস" ২য় খণ্ড, ৬৫০ পৃষ্ঠা।

মর্য্যাদা ও সমান কুলীন স্থিরীকৃত হওয়ায় বসু ও মিত্র বংশে—দুই পুরুষ বাদ পর্য্যায় গণনা করা হয়। (১০)

এই বংশের প্রসিদ্ধ সাধক মুনিরাম রায়ের পৌত্র গোবিন্দচন্দ্র রায় বিংশ পর্য্যায়ভুক্ত। তিনি গোবিন্দগঞ্জ রহিমাবাদ হাটের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন, তাঁহার পুত্র তিলকচন্দ্র, কালীপ্রসাদ রায়ও এই জমিদার বংশীয়, কিন্তু ১৭শ পর্য্যায় হইতে ধারা ভিন্ন হইয়াছে। ঐ পর্য্যায়ে রাজেন্দ্রর ধারায় গোবিন্দ ও তিলক এবং রামেশ্বরের ধারায় ২১শ পর্য্যায়ে কালীপ্রসাদ। কালীপ্রসাদের পৌত্র অবসরপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার রায় সাহেব নিকুঞ্জবিহারী রায় কিছুদিন পূর্ব্বে পরলোকগত হইয়াছেন।

যাহা হউক, গোবিন্দচন্দ্র, তিলকচন্দ্র, কালীপ্রসাদ রায় রাখান-গাছির নাগচৌধুরীগণ এবং নপাড়া গ্রামের শিবনাথ ঘোষ শিবপুর রামপুরের এজেন্সী লইয়াছিলেন। গোবিন্দচন্দ্র রায় এবং শিবনাথ ঘোষ রাখানগাছির নাগচৌধুরীগণের সহিত একত্রে সন ১২৫১ সালের ১০ই চৈত্র (১৮৪৫ খৃঃ ২২শে মার্চ্চ) জেলা ২৪ পরগণার এজেন্ট সাহেবকে যে 'একরার'নামা লিখিয়া দেন, তাহাতে জুলুম এবং পীড়নের পথ বেশ পরিষ্কার হইয়াই দেখা দিয়াছে, সেই পুরাতন দলিলখানি আমাদের হস্তগত হইয়াছে, উহার বহুস্থান ছিন্ন ও কীটদষ্ট, পাঠোদ্ধার করিয়া এখানে কতকাংশ প্রকাশ করা সম্ভব হইলেও, বাহুল্যভয়ে তাহা হইতে বিরত থাকিলাম।

বাদশাহ ২য় আলমগীরের রাজত্বের ৪র্থ বর্ষে ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দের ২৩শে ডিসেম্বর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ২৪ পরগণা জমিদারী প্রাপ্ত হন। ইহার মধ্যে হাতিয়াগড়ের নিকটে লবণ মহাল নামে খ্যাত মলঙ্গী মহাল একটি পরগণা ছিল। এইক্ষণে তাহার অস্তিত্ব নাই। তাহাতে দেওয়াম দুর্লভরাম, রাজা রাজবল্লভ, রাজা গঙ্গাবেহারী প্রভৃতি মহোদয়গণের দস্তখত আছে। উক্ত মলঙ্গী মহালে সুন্দরবনস্থ ভাগীরথীর পূর্ব্বপারে লবণ প্রস্তুতের কারখানা ছিল।

মিষ্টার হেঙ্কেল (Mr. Tilman Henkell) যশোহরের প্রথম কালেক্টর, জেলা জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট এবং কালেক্টর এই তিন বিভাগের কার্য্যই তাঁহাকে করিতে হইত, কিন্তু নিমক বিভাগের সহিত তাঁহার কোন সম্বন্ধ ছিল না। এই বিভাগের এলেকা ছিল,—জেলার দক্ষিণাংশে সুন্দরবন অঞ্চল, মিঃ ইউয়ার্ট (Ewart) নামক এক সাহেবের উপর ইহার কর্ত্তৃত্ব অর্পিত ছিল, তাঁহার তিন জন সহকারী, বহু নিম্নতন কর্মচারী এবং ক্ষুদ্র একটি সৈন্যদল ছিল। তখন রায়মঙ্গল এজেন্সীর হেড-কোয়ার্টার খুলনায়। মিঃ ইউয়ার্ট তাঁহার দলবলসহ খুলনাতে অবস্থিতি করিতেন। জেলার আদালত

(১০) শ্রীযুত ভূপতি রায়চৌধুরী বঙ্গজ কায়স্থ বসু বংশলতায় দেখাইয়াছেন:—দশরথের দুই পুত্র—অলঙ্কার (বঙ্গজ) এবং কৃষ্ণ (দক্ষিণ রাঢ়ীয়)। অলঙ্কারের পুত্র লক্ষণ হইতে পর্য্যায় ধরিয়াছেন, লক্ষণের পুত্র অভয়াচরণ, তৎপুত্র ত্রিলোচন, তৎপুত্র হংসরাম। কিন্তু আমরা যে দক্ষিণরাঢ়ীয় বংশলতা সংগ্রহ করিয়াছি, তাহাতে আছে—দশরথের পুত্র শ্রীকৃষ্ণ, তৎপুত্র ভবনাথ, তৎপুত্র হংসরাম (দশরথ হইতে ৪ পর্য্যায়), হংসরামের ৩ পুত্র—শুক্তিরাম, মুক্তিরাম ও অলঙ্কার; শুক্তি বাগণ্ডা সমাজ, মুক্তি মাহীনগর এবং অলঙ্কার বঙ্গজ সমাজের আদিপুরুষ।

প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বেই নিমক মহালের কর্মচারিগণ এখানে তাঁহাদের আড্ডা স্থাপন করিয়াছিলেন, যাহারা লবণ জাল দিয়া প্রস্তুত করিত, তাহাদের নাম ছিল মাহিন্দার, কিন্তু তাহাদের উপরে মলঙ্গী নামক এক মধ্যশ্রেণীর লোক থাকিত। L. S. S. O'Mally তাঁহার বেঙ্গল ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে উল্লেখ করিয়াছেন—মাহিন্দারগণ দাদন লইতে অস্বীকার করিলে তাহাদিগকে পীড়ন করা হইত। নীল চাষে নীলকর সাহেবদের অত্যাচার কি মর্মান্তিক ছিল তাহা ৺দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণে' দর্পণের ন্যায়ই প্রতিভাত হইয়াছে, লবণ প্রস্তুতে মাহিন্দারদিগের উপর অত্যাচার ইহা অপেক্ষা বেশী অথবা কিছু কম ছিল, তাহা এখন হিসাব করিয়া বলা কঠিন। মাহিন্দারদিগকে কার্য্যে প্রবৃত্ত করাইবার এবং দাদনের টাকা ওয়াশীল করিবার ক্ষমতা মলঙ্গিদের উপর দেওয়া হইত। বলা বাহুল্য, মলঙ্গিগণ অতি নিষ্ঠুরতার সহিতই এই ক্ষমতার অপব্যবহার করিত।(১১) ৪৲ টাকা দাদন দিয়া ২০৲ টাকা আদায় করিতে যত প্রকারের পীড়নযন্ত্র তাহাদের হাতে ছিল তাহা সমস্তই প্রয়োগ করিত, মিঃ হেঙ্কেল যশোহরের কলেক্টর হইয়া আসিলে, মাহিন্দারগণ তাহাদিগকে এই নিষ্ঠুর পীড়ন হইতে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহার নিকট আবেদন করে। গবর্ণমেণ্টের সল্ট এজেণ্ট এই বিভাগে বিচারকের হস্তক্ষেপে যথেষ্ট আক্রোশ প্রকাশ করেন, ফলে বিচারকের পিয়ন এবং কর্মচারীদের মধ্যে রীতিমত কলহ বাধিয়া উঠে।

নিমক বিভাগের এই সকল অত্যাচার দূরীকরণার্থ ইহার সংস্কারের জন্য মিঃ হেঙ্কেল ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে কয়েকটি প্রস্তাব গবর্ণর বাহাদুরের দপ্তরে পেশ করেন, তিনি নিজে সল্ট এজেণ্টের কর্তৃত্ব লইতে ইচ্ছুক হইলেন। লর্ড কর্ণওয়ালিস তখন গবর্ণর জেনেরাল। তিনি মিঃ হেঙ্কেলের প্রস্তাবে সম্মত হন এবং অন্ততঃ রায়মঙ্গল বিভাগের জন্য মিঃ হেঙ্কেলকে সল্ট এজেণ্টের কার্য্যভার গ্রহণ করিতে আদেশ দেন, মিঃ ইউয়ার্ট বাখরগঞ্জে বদলী হইলেন। অবশেষে ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে মিঃ হেঙ্কেলের প্রস্তাব সমূহ গৃহীত হইয়া আইনজারি হইল। এতদিনে মাহিন্দারগণের দুঃখের নিশা অবসান হইল, কারণ এইক্ষণ হইতে তাহাদের উপর কোন বাধ্যবাধকতা থাকিল না,—লবণ প্রস্তুত কার্য্যে যোগ দেওয়া মাহিন্দারগণের ইচ্ছাধীন হইল (১২); এবং সল্ট এজেণ্ট তাহাদের পীড়ক না হইয়া রক্ষক হইলেন।

মিঃ হেঙ্কেল অতি দয়াশীল সদাশয় কলেক্টর ছিলেন, তাঁহার আন্তরিক চেষ্টায় যখন লবণ প্রস্তুতের উৎপীড়ন ও অত্যাচার উঠিয়া গেল, তখন তাঁহার জনপ্রিয়তা এতদূর বর্দ্ধিত হইল যে, "এইরূপ প্রবাদ—প্রজাগণ তাঁহার মূর্ত্তি গড়াইয়া পূজা করিত (১৩)। সাতক্ষীরা মহকুমার হেঙ্কেলগঞ্জ বা (অপভ্রংশে) হিঙ্গুলগঞ্জ নামক স্থান এখনও সেই দেবতুল্য মহাশয় ব্যক্তির স্মৃতি বহন করিতেছে (১৪)।

বঙ্গদেশের প্রায় সর্বত্রই এই প্রকারের জুলুম ও অত্যাচার হইত, ভারতের অনেক স্থানেই ইহার পুনরভিনয় চলিত, কিন্তু মাদ্রাজের অবস্থা কতকটা ভিন্ন বলিয়া মনে হয়। এখানেও সরকারের একচেটিয়া ব্যবসায় ছিল, কিন্তু মাহিন্দারদিগকে লবণ প্রস্তুতে বাধ্য করা হইত না। কর্মচারিগণ তাঁহাদের সতর্ক পরিদর্শন দ্বারা সামান্য হস্তক্ষেপে অধিক লভ্যাংশ পাইতেন, সাধারণ কৃষক শ্রেণীর লোকেই লবণ প্রস্তুত করিত, ইহা তাহাদের পৈতৃক ব্যবসায় বলিয়া এবং ইহার ব্যবসায়ে লভ্যাংশ পাইত বলিয়া তাহাদের আর্থিক অবস্থা উন্নত ছিল। তাহাদিগকে কোন প্রকার দাদন দেওয়া হইত না, কিন্তু তাহাদের পারিশ্রমিকের একটা নির্দিষ্ট হার ছিল। সরকারের লবণের গোলায় লবণ পৌঁছাইয়া দিলে, তাহারা এই পারিশ্রমিক পাইত। পারিশ্রমিকের নাম ছিল 'কুদিভরম্'; উহার হার ছিল—৮২⅖ পাউণ্ডের প্রতি মণ /০ এক আনা ৬ পাই। তদারকী এবং অন্যান্য খরচ ধরিয়া প্রতি মণে মোট ব্যয় পড়িত ৶০ তিন আনা ৪ পাই, মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্ট ক্রেতাদের নিকট হইতে প্রতি মণ ২।০ টাকা দাবী করিতেন। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত এই নিয়ম চলিয়াছে (১৫)।

১৮৬২।৬৩ খৃষ্টাব্দে স্যার সি, সি, বীডন, কে, সি, এস, আই যখন বঙ্গের ছোটলাট, তখন লবণের একচেটিয়া ব্যবসায় পরিত্যক্ত হয়, বাঙ্গালী লবণ-কর দিয়া আবার কিছুদিন পর্য্যন্ত লবণ প্রস্তুতের ব্যবসায় চালাইয়াছিল, কিন্তু বিলাতী লবণের প্রতিযোগিতায় তাহারা বেশী দিন টিকিয়া থাকিতে পারে নাই। সরকার বাহাদুরও আইন করিয়া লবণের কারবার নিষিদ্ধ করিয়া দেন, এই দিন হইতে বাঙ্গালীর সুখ-সৌভাগ্যও অনেকাংশে খর্ব্ব হয়।

১১। These powers, the Malangis cruelly abused, and gross oppressions were perpetrated by the salt officials—Bengal District Gazetteer (Khulna).

১২। মিঃ হেঙ্কেল ভার গ্রহণ করিয়াই প্রচার করিয়া দিলেন যে—(ক) কয়েকটি মাত্র নির্দিষ্ট স্থানে মাহিন্দার লইবার জন্য দাদন দেওয়া হইবে, (খ) কাহাকেও ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করিয়া দাদন দেওয়া হইবে না, (গ) এক বৎসরের দাদনের জন্য পর বৎসর দায়ী হইতে হইবে না। গবর্ণমেণ্ট হইতে উহার সঙ্গে আর একটি দফা সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হইল যে, (ঘ) যদি দেখা যায়, প্রজারা স্বেচ্ছায় লবণের কারবারে কার্য্য করিতে চাহে না, তাহা হইলে এই ব্যবসায় বন্ধ করা হইবে,—যশোহর খুলনার ইতিহাস, ২য় খণ্ড ৬১১ পৃঃ।

১৩। "কৃতজ্ঞ প্রজারা তাহাদের প্রাণের আনুরক্তি দেখাইবার জন্য প্রত্যেক গৃহে তাঁহার মৃন্ময় মূর্ত্তি গড়িয়া দেবতার মত পূজা করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, এ কথাটি পরে সংবাদরূপে সেকালের একখানি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় (২৪।৪।১৭৮৮)"—কলিকাতা সেকালের ও একালের, ৬৭২ পৃঃ।

১৪। সুন্দরবনের সঙ্গে মহামতি হেঙ্কেলের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল, ঐতিহাসিক সতীশ বাবু এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"আজ, যে সুন্দরবন গবর্ণমেণ্টের একটি প্রধান আয়ের সম্পত্তি, হেঙ্কেলের প্রাথমিক চেষ্টা উহার ভিত্তিস্বরূপ। নিজে কোন অতিরিক্ত বেতন ত লইতেনই না—পরন্তু সময়ে সময়ে নিজের তহবিল হইতে অর্থ দিয়া আবাদকারী তালুকদারদিগকে সাহায্য করিতেন।" যশোহর খুলনার ইতিহাস, ২য় খণ্ড, ৬১৩ পৃঃ।

১৫। Imperial Gazetteer of India, Vol II, P. 453.

মহাতীর্থ

শ্রীমতী শান্তি সেন

আজকের দিনে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ও শ্রীশ্রীমা সারদামণি দেবীর নাম জানে না এমন লোক অল্পই আছেন। শ্রীঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করি, যাঁরা তাঁকে এখনও জানেন নি, তাঁরা যেন তাঁকে জানবার সৌভাগ্য লাভ করেন।

কলকাতার অতি নিকটেই শ্রীঠাকুর ও শ্রীমায়ের জন্মস্থান আজ মহাতীর্থে পরিণত হয়েছে। কত দূর দেশ থেকে কত বিদেশী ভক্তরা সেখানে যাচ্ছেন। সুদূর আমেরিকা ও ইউরোপ থেকেও ভক্ত-সমাগম হয়ে থাকে। আর আমরা কলকাতায় বাস করেও সেখানে যাবার সুযোগ সুবিধা করে উঠতে পারি না।

আমার বহুদিনের আকাঙ্খা ছিল মনে যে, যদি কোনও দিন সুযোগ হয় তবে একবার কামারপুকুর (শ্রীঠাকুরের জন্মস্থান) জয়রামবাটী (শ্রীমায়ের জন্মস্থান) দর্শন করব। কিন্তু দিনের পর দিন যায়, বছরের পর বছর যায়, সুবিধা আর হয়ে ওঠে না। বয়স বেড়ে উঠল, দেহ অসুস্থ হয়ে পড়তে লাগল, তবুও মনে আমার আশা জেগেই রইল যে একদিন না একদিন সে মহাতীর্থ দর্শন আমার হবেই। আমি সাধিকা নই, জপধ্যান করবার সময়ও পাইনা, সাধারণ ভাবে সংসার নিয়েই দিন কাটাই, তবুও মনে-প্রাণে এই অনুভূতি আমার আছে যে তাঁর কৃপায় আমি বঞ্চিত হইনি। আমি অকৃতী অধম হলেও তিনি কম করে কিছু আমাকে দেননি।

কিছুকাল ধরে আমাকে কলকাতার বাইরে বাস করতে হচ্ছে। হঠাৎ আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি ও কলকাতায় চলে আসি চিকিৎসার জন্য। যখন এসে পৌঁছলাম, তখন ইনভ্যালিড চেয়ারে করে ষ্টেশন থেকে নিয়ে আসতে হোলো আমাকে, পায়ে বাত হয়ে আমার এমন পঙ্গু অবস্থা হয়েছিল। এক মাস চিকিৎসার পরে মোটামুটি সুস্থ হয়ে উঠে অল্প অল্প চলা-ফেরা করতে আরম্ভ করলাম।

ইতিমধ্যে নতুন বছর এসে পড়ল। আমার অনেক দিনের অভ্যাস প্রতি বছর ১লা বৈশাখ খুব ভোরে উঠে বেলুড়ে গিয়ে ঠাকুর দর্শন করে প্রণাম করে এসে তবে অন্য কাজ করা। এ বছরও ১লা বৈশাখ বেলুড়ে গেলাম। আমার সঙ্গে আমার মা ছিলেন। বেলুড়ে পৌঁছে ঠাকুর-প্রণাম করে অন্যান্য মন্দির সব দর্শন করে ফিরছি, এমন সময় আমার মায়ের পরিচিত একজন মহারাজের সঙ্গে দেখা হোলো। মা তাঁর সঙ্গে কথায় কথায় হঠাৎ বললেন: আপনি যে আমাকে কামারপুকুর ও জয়রামবাটী দেখাবেন বলেছিলেন তা ত আজও দেখালেন না। বুড়ো হয়েছি, রোগেও সর্ব্বদা ভুগছি, আর আমার দেখা হবে না যদি তাড়াতাড়ি দেখে না আসি।

মহারাজ বললেন: বেশ ত আপনি যদি যেতে চান তবে ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

তিনি আর একজন মহারাজের নাম করে বলে দিলেন যে, তাঁকে ধরলে আমাদের যাবার সব রকম ব্যবস্থা তিনি সহজেই করে দিতে পারেন। এই কথা শুনে আমরা তাঁর কাছে গেলাম। তিনি প্রথমে আপত্তি করলেন যে ভয়ানক গরম, তাছাড়া আমরা দুজনেই অসুস্থ, এখন গেলে আমাদের খুব কষ্ট হবে। কিন্তু আমাদের ব্যাকুলতা দেখে শেষ পর্য্যন্ত তিনি রাজী হয়ে সব ব্যবস্থা করে দিলেন। ঠিক হ'ল ৪ঠা বৈশাখ শেষ রাত্রিতে আমরা রওনা হব। নতুন যে মোটর রোড হয়েছে, গাড়ী নিয়ে সেই রাস্তায় আমরা যাব। সঙ্গে একজন লোকও দেবেন বললেন, যিনি অনেক বার ঐ জায়গায় গিয়েছেন। একখানা চিঠিও দিয়ে দিলেন আমাদের পরিচয় দিয়ে ওখানকার অধ্যক্ষ মহারাজার নামে, যাতে আমাদের কোনও রকম অসুবিধা না হয়।

সব ঠিক করে ত চলে এলাম। এখন ভাবনা হ'ল, বাড়ীর লোকেদের যদি মত না হয়। আমি বাতের রুগী, বিশেষ করে পায়েই আমার বাত, আমার মা-ও রুগ্ন, বয়সের সঙ্গে আরও শরীর অসুস্থ হয়েছে এখন। কিন্তু ঠাকুরের যখন কৃপা হয় তখন কোনও বাধাই আসে না। নিজেদের মনে এটুকু জোর এল যে যখন পরম করুণাময় সব যোগাযোগ করে দিলেন তখন এবার মহাতীর্থ দর্শন আমাদের হবেই। একেবারে যাবার আগের দিন বাড়ীতে জানালাম যে পরদিন ভোরবেলা আমরা যাব। দু' একজন একটু আপত্তি জানাল এই বলে যে, আমাদের দুজনেরই এত শরীর খারাপ, এ অবস্থায় মোটরে প্রায় ৮০ মাইল রাস্তা যাওয়া আমাদের ঠিক হবে না। কিন্তু আমাদের মনের ভাব তখন এমন হোলো যে মূককে যিনি বাচাল করেন, পঙ্গু যাঁর ইচ্ছায় গিরি লঙ্ঘন করে, তাঁর কৃপায় আমরাও এই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে যেতে পারব নিরাপদে। অসীম করুণাময় ঠাকুর ত দেখছেন যে কি আগ্রহভরে আমরা দুই অসুস্থ ও অশক্ত মাতা কন্যা তাঁর জন্মভূমি দর্শন ইচ্ছায় পথে বার হতে চলেছি। তিনি সর্ব্বদা আমাদের সঙ্গে থেকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবেন।

বৃহস্পতিবার ৪ঠা বৈশাখ ১৩৬৫ সাল আমার জীবনে এক পরম স্মরণীয় দিন। শেষ রাত্রিতে ঠিক চারটার সময় আমি এবং আমার মা, আমরা দুজনে ঠাকুরের নাম স্মরণ করে রওনা হ'লাম, সেই বহু-আকাঙ্খিত তীর্থস্থানের উদ্দেশে। সঙ্গে রইল দারোয়ান এবং মহারাজ যে লোকটিকে দেবেন বলেছিলেন তিনি। তা ছাড়া ড্রাইভার ত আছেই। যে ভদ্রলোক সঙ্গে গেলেন তিনি এই নতুন রাস্তায় কখনও যাননি। তাছাড়াও তিনি অত্যন্ত নিরীহ শান্ত প্রকৃতির মানুষ। পথের সঙ্গী হিসাবে খুব নির্ভরযোগ্য নন। কাজেই শুধুমাত্র ঠাকুরের ভরসাই একমাত্র ভরসা রইল আমাদের।

বেলুড়ের মহারাজ পথের বিবরণ খুব চমৎকার করে লিখে দিয়েছিলেন। মোটামুটি পথের বর্ণনা আমি একটু লিখছি, যদি কারও সুবিধা হয় সেই জন্য। হাওড়া হয়ে শেওড়াফুলী পর্য্যন্ত গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড দিয়ে যেতে হয়। তারপর তারকেশ্বরের রাস্তায় পড়ে চাপাডাঙ্গা বলে এক জায়গায় গিয়ে সেখান থেকে মুণ্ডেশ্বরী নদী পার হতে হয়। মুণ্ডেশ্বরী নদীতে ষ্টীল বোট আছে। গাড়ী শুদ্ধ অপর পারে পৌঁছে দেয়। তবে অপর পারে খুব খাড়া পাড় দিয়ে গাড়ী উঠাতে হয়। সেখানে খুব সাবধানে গাড়ী তুলে নিতে হয়। মুণ্ডেশ্বরী থেকে আরামবাগ প্রায় ১০ মাইল হবে। আরামবাগ থেকে কামারপুকুরের দূরত্বও প্রায় ঐরকমই। রাস্তা বেশ ভালই পেলাম সব জায়গায়, তবে আরামবাগের কাছে খানিকটা কাঁচা রাস্তা আছে, সেটুকু ভাল নয়। তাছাড়া কামারপুকুরে পৌঁছবার প্রায় এক মাইল আগে থেকে কাঁচা রাস্তা ও এই পথটুকু

খুবই খারাপ হয়ে রয়েছে, সর্ব্বদা গরুর গাড়ী ও লরী চলাচল করে। মাঝখানটা উটের পিঠের মতন উঁচু হয়ে দু'পাশে নীচু হয়ে গেছে। ফলে গাড়ী অতি সাবধানে চালাতে হয়, না হলে তলায় লাগবার সম্ভাবনা। আমাদের গাড়ীর সাইলেন্সার-এর সঙ্গে রাস্তার উঁচু দিকটা লেগে এমন শব্দ হ'ল যে ড্রাইভার বলে, ভেঙ্গে গেল বোধ হয়। যাহোক্ আস্তে আস্তে চালিয়ে ঠাকুরের দয়ায় আমরা নিরাপদেই এসে পৌঁছলাম।

একটু দূর থেকে শ্রীমন্দিরের চূড়া দেখতে পেয়েছিলাম। নেমেই ধূলাপায়েই মন্দিরে গেলাম ঠাকুর দর্শন করতে। বহুদিনের সাধ পূর্ণ হ'ল এতদিনে। ঠাকুরের কৃপার পরিচয় যেন আবার নতুন করে অনুভব করলাম। কবে মনের গহনে যে আমার মুকুল অঙ্কুরিত হয়েছিল আজ তাঁর দয়ায় সে মুকুল পূর্ণ প্রস্ফুটিত হয়ে উঠল। এক অনাস্বাদিতপূর্ব্ব আনন্দে মন ভরে উঠল।

ওখানকার অধ্যক্ষ মহারাজ বললেন, ঘরে গিয়ে সব জিনিষপত্র রেখে, একটু বিশ্রাম করে চা খেয়ে নিয়ে, সব ঘুরে দেখতে। ওঁদের যে গেষ্ট-হাউস আছে সেখানে গেলাম। মন্দিরের খুবই কাছে গেষ্ট-হাউস। সুন্দর একখানি ঘর পেলাম। পাশেই স্নানের ঘর ইত্যাদি আছে। কোনও অসুবিধা নাই। জিনিষপত্র রেখেই আমরা বেরিয়ে পড়লাম।

শ্রীমন্দিরের পাশেই গৃহদেবতা ৺রঘুবীরের মন্দির। ৺রঘুবীর দর্শন করলাম। শ্রীঠাকুরের কুলদেবতা ইনি।

ঠাকুর যে ঘরে থাকতেন সেই ঘরখানি সেই ভাবেই রাখা হয়েছে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সুন্দর একখানি মাটির ঘর উপরে খড়ের ছাউনি দেওয়া। ঘরের মাঝে একখানি খাটের উপরে ঠাকুরের প্রতিকৃতি। তাছাড়া মাটির দেয়ালের চারি পাশ ঘিরে তাঁর সব সন্ন্যাসী-শিষ্যদের ছবি রয়েছে। শ্রীমার ছবিও আছে। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম। মনে হয় না যে ঘরখানি অব্যবহৃত। তাঁর দেহ-সৌরভ যেন এখনও এ ঘরের মধ্যে বিরাজ করছে।

ঠাকুরের ঘরের পর পাশাপাশি আরও দুখানা ঘর আছে। শুনলাম ঐ-সব ঘরে ঠাকুরের ভাইরা থাকতেন। এখন অন্যান্য কাজে ব্যবহার করা হয়। একজন বয়স্কা স্ত্রীলোক তকতকে করে মাটির দাওয়া লেপছিলেন। তিনি বললেন যে, প্রায় ১৫ বছর ধরে তিনি শ্রী মায়ের সেবা করেছেন।

জিজ্ঞাসা করলাম : আপনার কে আছে এখন এখানে ?

উত্তরে বললেন ঠাকুরঘর দেখিয়ে : আমার বাবা আছেন, মা আছেন, আবার কে থাকবে।

এই ভক্তিপূর্ণ সরল উত্তর শুনে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। এমন ভক্তি বিশ্বাস যদি তাঁর উপর রাখতে পারা যায় তবে জীবনে কামনার আর কিছু থাকে না।

এবার আমরা গেলাম ঠাকুরের ভিক্ষামাতা ধনী কামারণীর বাড়ী দেখতে। সেখানেও ছোট একটি মন্দিরের মতন করে রাখা হয়েছে। ধনীর একখানি প্রতিকৃতি (কল্পিত বলেই শুনলাম) আছে, ঠাকুরকে কোলে নিয়ে বসে আছেন। মা যশোদা যেন সস্নেহে নন্দদুলাল কোলে বসে আছেন এমন সুন্দর পবিত্র ভাব ছবিখানিতে। মনে হতে লাগল কি সুকৃতি এই কামারকন্যার ছিল যার ফলে জন্মমাত্র স্বয়ং গদাধরকে স্পর্শ করবার সৌভাগ্য ইনি লাভ করেছিলেন। বার বার সেই পুণ্যবতীর উদ্দেশে প্রণাম জানালাম।

কাছাকাছি লাহা বাবুদের বাড়ী, পাইনদের বাড়ী দেখলাম। সবই এখন ভগ্ন অবস্থায় রয়েছে। বেলা প্রায় ১০টার সময় মোটামুটি সব দেখে নিজেদের ঘরে ফিরে এলাম। একটু বিশ্রাম করে আমরা 'হালদার পুকুরে' স্নান করতে গেলাম। যে পুকুর একদিন শ্রী ঠাকুর ও শ্রী মার অঙ্গ পরশে পবিত্র হয়েছে, সেই পুকুরে স্নান করা অনেক পুণ্যের ফলে ঘটে। ঠাকুরের অসীম দয়ায় আমাদের এ সৌভাগ্য হ'ল। জলে নেমে স্নান করতে করতে 'শ্রীমা সারদা দেবী' বইখানিতে যে অলৌকিক ঘটনার কথা আছে সেই ঘটনার কথা মনে পড়ল। ঘটনাটি এখানে উল্লেখ না করে পারলাম না।

তের বৎসর বয়সে শ্রী মা যখন কামারপুকুরে ছিলেন, তখনকার একটি অলৌকিক ব্যাপার ভক্তগণ তাঁহার শ্রীমুখে এইরূপ শুনিয়াছিলেন। পার্শ্বের গ্রাম্যপথ ও গৃহগুলি অতিক্রম করিয়া সুবৃহৎ হালদার পুকুরে স্নান করিতে যাইতে তাঁহার ভয় হইত। খিড়কির দরজা দিয়া বাহির হইয়া আসিয়া ভাবিতেছেন, নূতন বউ, একলা কি করে নাইতে যাব ? ভাবিতে ভাবিতে দেখেন, আটটি মেয়ে আসিল। শ্রী মাও অমনি রাস্তায় নামিয়া পড়িলেন। মেয়েদের চারিজন তাঁহার আগে, চারিজন তাঁহার পিছনে হইয়া তাঁহাকে লইয়া হালদার পুকুরের ঘাটে চলিল। মা স্নান করিলেন, তাহারাও করিল। পরে আবার সেই ভাবে বাড়ী পর্য্যন্ত আসিল। মা যত দিন সেখানে ছিলেন প্রতিদিন ঐরূপ হইত। অনেক দিন তাঁহার মনে হইয়াছে মেয়েগুলি কারা—স্নানের সময় রোজই আসে ? কিন্তু তিনি কিছুই বুঝিতে পারেন নাই। তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসাও করেন নাই।

স্নান শেষ করে উঠে এলাম। মনে হতে লাগল না জানি কত জন্মের পুণ্যফলে এ তীর্থসলিলে অবগাহন স্নান করবার সৌভাগ্য লাভ করলাম।

খানিকক্ষণ পরে প্রসাদ নিতে গেলাম। ঠাকুরের ও ৺রঘুবীরের দুজনেরই অন্নভোগের প্রসাদ পেলাম। উপকরণের বৈশিষ্ট্য কিছুই নেই, তবু যেন মনে হতে লাগল কি অমৃতই খেলাম!

দুপুর বেলা প্রচণ্ড রোদের তেজে কোথাও যেতে পারলাম না। একটু বেলা পড়লে আমরা 'জয়রামবাটী' রওনা হ'লাম।

জয়রামবাটী কামারপুকুর থেকে প্রায় চার মাইল হবে। কাঁচা রাস্তা, আমোদর নদের কাছে সামান্য একটু জলা জায়গাও পার হতে হয়। তবে জল অল্পই থাকাতে গাড়ী নিয়ে যেতে কোনও অসুবিধা হোলো না। একেবারে শ্রীমা'র মন্দিরের সামনেই গাড়ী থামল। আমরা নেমে শ্রীমাকে দর্শন করে ভিতরে গিয়ে একটু বসলাম। ওখানকার অধ্যক্ষ মহারাজ বললেন, রাত্রিতে শ্রীমা'র প্রসাদ নিয়ে যেতে। কিন্তু রাস্তা ভাল নয় বলে আমরা তাড়াতাড়ি একটু মিষ্টিপ্রসাদ নিয়ে উঠে পড়লাম। মহারাজ সঙ্গে একজন ব্রহ্মচারীকে দিলেন মোটামুটি দর্শনীয় যা আছে সব আমাদের দেখিয়ে দেবার জন্য।

মন্দির-সংলগ্ন একটি ছোট ঘরে শ্রীমা'র ব্যবহৃত বিছানা ও বাসনপত্র সব আছে। প্রথমে সেই সব দেখলাম। তারপর গেলাম

শ্রীমা তাঁর ভাইয়ের বাড়ীতে যে ঘরে থাকতেন সেই ঘর দেখতে। শুনলাম, সেই ঘর ঠিক সেই ভাবেই রাখা হয়েছে। ছোট্ট ঘর, শ্রীমা'র একখানি বড় ছবি রয়েছে। সুন্দর পরিচ্ছন্ন করে গুছিয়ে রাখা আছে ঘরখানি।

এবারে গেলাম শ্রীমার নিজের বাড়ীতে, সে বাড়ী স্বামী সারদানন্দ ও মাষ্টার মহাশয় করে দিয়েছিলেন। এ বাড়ীখানিও মাটির, তবে বেশ বড়। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঘরগুলি। ভক্তরা সব যে ঘরে থাকতেন, যেখানে বসে শ্রীমা তরকারী কুটতেন, সব ঘুরে ঘুরে দেখলাম। তবে সময় কম বলে একটু তাড়াতাড়ি করতে হচ্ছিল। সবশেষে গেলাম সিংহবাহিনীর মন্দির দেখতে। শ্রীমার জীবনীতে অনেক পড়েছি এই জাগ্রতা দেবীর কথা। এই সিংহবাহিনীর মাটি শ্রীমা সর্ব্বদা সঙ্গে রাখতেন। কারও কোন রোগ হলে এই মাটি তাকে ওষুধের মতন সেবন করতে বলতেন এমন বিশ্বাস ছিল তাঁর এই দেবীর প্রতি। নিজেও প্রতিদিন এই মাটি একটু করে গ্রহণ করতেন।

শ্রীমা'র ভক্তি-বিশ্বাস-পূত সেই সিংহবাহিনীর দর্শন যে কোনও দিন পাব তা কল্পনার অতীত ছিল। ৺দেবীকে প্রণাম করে আমরাও ৺দেবীর মন্দিরের পবিত্র মৃত্তিকা কিছু সংগ্রহ করে আনলাম।

সন্ধ্যা হয়ে এল, আমাদের ফিরে যেতে হবে এবার। ফিরবার পথে বাঁড়ুয্যে পুকুর বা তালপুকুর বলে একটি পুকুর দেখে এলাম। শুনলাম, শ্রীমা এই পুকুরে প্রায় প্রতিদিন স্নান করতে আসতেন। সেই পবিত্র জল স্পর্শ করে ধন্য হলাম। শ্রীমাকে ও তাঁর জন্মস্থানকে প্রণাম জানিয়ে আবার কামারপুকুরে ফিরে এলাম।

শ্রীঠাকুরের সন্ধ্যারতির সময় হয়ে এসেছিল। মন্দিরে আরতির ঘণ্টা বেজে উঠল। তাড়াতাড়ি করে আরতি দেখতে গেলাম। কি সুন্দর সে আরতি! পল্লীগ্রামের শান্ত সন্ধ্যায়, নির্জ্জন পরিবেশে সে এক অপূর্ব্ব অনুভূতি হোলো যেন তাঁর আবির্ভাব দেখতে পাচ্ছি। দীপালোকে উদ্ভাসিত সেই অপরূপ রূপের যেন তুলনা নেই। আমাদের এমন চঞ্চল মনও স্থির হয়ে রইল।

আরতির শেষে খানিকক্ষণ ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ হোলো। পাঠ শেষ হলে আমরা নিজেদের ঘরে ফিরে এলাম। আমার মা বলতে লাগলেন, জীবনে অনেক তীর্থ দর্শন করেছি, কন্যাকুমারী, রামেশ্বর থেকে আরম্ভ করে, কাশী, গয়া, মথুরা, বৃন্দাবন, হরিদ্বার ইত্যাদি বহু তীর্থ ঘুরে এসেছি কিন্তু আজ যে আনন্দ পেলাম এ অনির্ব্বচনীয়, যেন কল্পনাতীত!

আমারও মনে হতে লাগল, জীবনে ত কম কিছুই পাইনি, মানুষে যা কামনা করে তাঁর দয়ায় সে সবই ত পেয়েছি, তবুও আজ তিনি যা দিলেন এ আনন্দ পাবার সৌভাগ্য যে কখনও হতে পারে তা কখনও ভাবতেও পারিনি। মনে হতে লাগল 'পরশ যারে যায় না করা, সকল দেহে দিলেন ধরা,' এ বুঝি তাই? না জন্মান্তরের কোন পুণ্যফলে কৃপা লাভ করলাম?

রাত্রি হয়ে গেল। প্রসাদ পাবার ডাক এল। প্রসাদ নিয়ে ঘরে ফিরে এলাম। পরদিন খুব ভোরেই আবার যাত্রা শুরু করতে হবে। সেজন্য তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়লাম।

রাত তিনটার সময় উঠে পড়লাম। একেবারে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হয়ে নিয়ে মঙ্গল আরতি দেখতে গেলাম। রাত চারটার সময় মঙ্গল আরতি হয়। সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য! মন্দিরের সামনে নাটমন্দিরের বাইরের সিঁড়িতে আমরা বসলাম। ঠিক সামনেই শ্রীঠাকুরের মন্দিরের বন্ধ দরজা। রাত চারটার সময় মধুর গম্ভীর শঙ্খধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরের দরজা খুলে গেল। শুধু কর্পূরের আরতি হোলো অল্প একটু সময় নিয়ে। কিন্তু এই অল্পক্ষণটি চিরজীবনের মতন মনে গাঁথা হয়ে রইল। মাথার উপরে তারাভরা অনন্ত আকাশ, সামনে স্নিগ্ধ মৃদু আলোতে ঠাকুরের আরতি হচ্ছে। মনে হতে লাগল 'তাঁরে আরতি করে চন্দ্র তপন, দেব মানব বন্দে চরণ'। এ আরতি যেন মানুষ করছে না, যেন বিশ্ব-প্রকৃতি এক হয়ে তাঁর আরতি করছে। সেই শ্রীমূর্ত্তির দিকে অনিমেষ চোখে চেয়ে বসে রইলাম।

আরতির শেষে ব্রহ্মচারীরা গীতা পাঠ করলেন। আমরা ঠাকুর প্রণাম করে ঘরে ফিরে গিয়ে সব গুছিয়ে গাড়ীতে তুলে দিয়ে মহারাজের সঙ্গে দেখা করে বিদায় নিতে এলাম। অত ভোরেও আমাদের চা না খাইয়ে আসতে দিলেন না। আতিথ্যের কোনও ত্রুটি থাকতে দেবেন না।

প্রায় ছয়টার সময় কামারপুকুর থেকে রওনা হলাম। এই একটা দিন যে কেমন করে কেটে গেল কিছু বুঝলাম না! এখন যেন বাস্তব জগতে ফিরে এলাম। একবার মনে একটু সংশয় এল যে রাস্তা ত তেমন ভাল নয়, যদি গাড়ী কোনও রকম বিকল হয় তবে আমরা দুই মা-মেয়ে কি করে এই দীর্ঘ পথ ফিরে যাব? কিন্তু তখনি মনে জোর এল যে যিনি দয়া করে এনেছেন তিনিই নিরাপদে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন। আর সত্যিই পথে কোনও অঘটনই ঘটল না। আমরা ঠিক চার ঘণ্টার মধ্যে কলকাতায় নিজেদের বাড়ী পৌঁছে গেলাম।

মহাতীর্থ দর্শন করে এলাম। আর কোনও তীর্থ দর্শন না হলেও কোনও ক্ষোভ থাকবে না। জীবনে-মরণে যেন ওই শ্রীচরণে স্থান পাই, এই শুধু একমাত্র প্রার্থনা। অভয় পদে শরণ নিয়েছি, শরণ পেয়েছিও, আর কিছুরই ভয় নেই। এবার শেষ কথাটি বলি।

'যা পেয়েছি ভাগ্য বলে মানি,
পেয়েছি ত তব পরশখানি,
আছ তুমি এই জানি ত মনে,
যাব ধরি সেই ভরসার তরী'।

"I can't understand why the Russians are so unfriendly· Two drinks of vodka and I like everybody"

—*Sabrina.*

শিল্পে শিক্ষা শিক্ষায় শিল্প

শ্রীগোবর্দ্ধন আশ

চারুচিত্র শিল্পে শিক্ষার বিস্তার অর্থ : চারুচিত্র শিল্পের ক্ষেত্রে আদর্শকে কর্ম্মময় জীবন গতি ছন্দে রূপ বর্ণনায় প্রতিফলিত করতে হলে, সকল গোঁড়ামি ও দাস মনোবৃত্তির কবলমুক্ত সাবলীল, সহজ সুন্দর ও সার্ব্বজনীন সৌরভযুক্ত পরিবেশ সৃজনায় গবেষণামূলক চিন্তা ও কার্য্য পরিচালনা করতে যে শক্তি, বিদ্যা ও নিষ্ঠাবুদ্ধি প্রয়োজন তাহা অর্জ্জন করতে শিক্ষা করা। এ শিক্ষা ব্যতীত চারুচিত্র শিল্প রচনা আদর্শ স্থাপন করতে পারে না, পরন্তু সৌরভহীন পুষ্পের মত অনাদৃত হয়ে থাকে।

প্রকৃতির রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে যে মর্ম্মস্পর্শী চেতনা, ধৈর্য্য ও সাহস থাকা দরকার তাহা আবাদী শিক্ষা ব্যতীত লাভ করা অসম্ভব।

বিশ্বের দরবারে চারুচিত্র শিল্পের ক্ষেত্রে জাগ্রত ভারত অন্তর্বহির সাম্য বিশ্বজনীন অবদানে অগ্রদূত প্রমাণ করতে গবেষণা-মূলক শিক্ষা বিস্তার প্রয়োজন। ইহা বাস্তবিক আমাদের দেশে একান্ত অভাব। দেশের শিল্পীরা প্রায় দলীয় ধারা নিয়ে চিত্র শিল্প রচনায় অভ্যস্ত, কিন্তু যুগের দাবী, এ সীমাবদ্ধ ধারাকে শাশ্বত বলে মেনে নেবে না। অতীত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যত সমন্বিত ধারায় সুগভীরে প্রবেশ করবার দুর্ব্বার আকাঙ্ক্ষা পূরণে বীর পদক্ষেপে দুর্গম পথকে সুগম করে আদর্শ প্রতিষ্ঠা করবেই। এই অনন্ত-প্রসারী অভিযান বিশ্বের যত গ্লানি যত অপমান বিধৌত করে বিশ্বজনগণ মনোরাজ্যে সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্ প্রতিষ্ঠা করবে। ইহাই জীবনের প্রকাশ এবং আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টা। সাম্যকে বাস্তবে রূপায়িত করতে শিক্ষা করা। রূপে শব্দ যোজনা করা! রূপে শব্দ যোজনা = দর্শনে শ্রবণ, (যোগ সাধন)। আবাদী শিক্ষা দ্বারা চারু চিত্র শিল্পে রচনায় মর্ম্মস্পর্শী ভাব তরঙ্গ লীলায়িত হয়ে জাতির জীবনধারায় আদর্শ দর্শনের আধ্যাত্মিক চরিত্র সুদৃঢ় করবে। রূপে শব্দ যোজনা করাই চারু চিত্র শিল্পে শিক্ষার বিস্তার।

শিক্ষায় চারুচিত্র শিল্পের রসবোধ বিস্তার অর্থ : শিক্ষার ক্ষেত্রে, মহাকালবৈরী তমসাবৃত অজ্ঞান অন্ধকারে অবিদ্যানাশী জ্ঞানাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করে আদর্শকে কর্ম্মময় জীবনদীপ শিখায় রূপায়িত করতে চারুচিত্র শিল্পে শ্রদ্ধার অর্ঘস্বরূপ সুনির্ম্মল রসসম্ভার পূর্ণ রচনা বোধ যাহা জড়মুক্ত সার্ব্বভৌম ভাব ও ভাষার সূক্ষ্ম অনুভূতির উৎস তাহা অনুশীলন করা। জীবনের মূল তত্ত্ব সমূহে যে সমস্ত রচনা কৌশল আছে তাহার সহিত সম্যক পরিচিত হতে চিত্র শিল্পের জড়মুক্ত যে স্বভাব তাহা আয়ত্বে আনতে না পারলে বাস্তব জীবনে সৌন্দর্য্য বিকাশে আদর্শ প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। আমাদের দেশে শিক্ষার ক্ষেত্রে চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ বহুগুণে গুণী হয়েও সম্যক চারুচিত্র শিল্প রসে বঞ্চিত আছেন। সে কারণে উচ্চ শিক্ষার ব্যয়বহুল সমূহ ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও শিক্ষা আদর্শের সৌরভ বিতরণে অনন্ত-প্রসারী হয়ে জাতিকে প্রাণবন্ত করতে পারছে না।

উদ্দেশ্য সার্থক করতে হলে চারুচিত্র শিল্প ধারায় যে রসপূর্ণ সমষ্টি বোধ ও সাম্যবোধ বর্ত্তমান, বিশ্বপ্রকৃতিরাজিতে ত্রিকাল সমন্বিত প্রশান্ত মূর্ত্তিতে বিরাজমান, শিক্ষার ক্ষেত্রে তাহার প্রবর্ত্তন একান্ত প্রয়োজন। এই অনন্ত-প্রসারী শিক্ষা সকল দুঃখদৈন্যের কলঙ্ক মোচনে বিশ্বজনগণ জীবন-প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করে সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্ আদর্শ প্রতিষ্ঠা করবে। ইহাই যুগের দাবী ও আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টা। শব্দকে রূপায়িত করা বা শব্দে রূপ যোজনা করা। শব্দে রূপ যোজনা = শ্রবণে দর্শন, (যোগ সাধন)। চারুচিত্র শিল্পের রসবোধ, অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যত ত্রিকাল সমন্বিত শিক্ষাকে অন্তর্ম্মুখী করে জাতির মেরুদণ্ড আধ্যাত্মিক চরিত্র সুদৃঢ় করবে। রূপে শব্দ যোজনা করাই শিক্ষায় চারুচিত্র শিল্পের রসবোধ বিস্তার।

অভিজ্ঞান তত্ত্ব সমূহ :—

রূপে শব্দ যোজনা = দর্শনে শ্রবণ। রূপ, রস, গন্ধ (দর্শন, শ্রবণ, মনন)—প্রেমাস্পর্শন।

শব্দে রূপ যোজনা = শ্রবণে দর্শন। শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ (শ্রবণ, দর্শন মনন) প্রেমাকর্ষণ।

রূপে শব্দ যোজনা : শব্দে রূপ যোজনা = (কম্পন, আকর্ষণ) আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধন, যোগসাধন দ্বারা জড়ে চৈতন্য উদয়।

রূপে শব্দ যোজনা = রূপের বিলাস, (শিল্পের মধ্যে শিল্পীর বিলাস)।

শব্দে রূপ যোজনা = বিলাসের রূপ, (শিল্পীর মধ্যে শিল্পের (বিলাস)।

সঙ্কল্প = রূপ—বোধব্য : বিকল্প = শব্দ,—বোধ, সঙ্কল্প বিকল্পাত্মক মন, এই মনের উৎকর্ষ সাধনই যোগ সাধন ; যোগ সাধন দ্বারা মনের নিরুদ্ধ অবস্থাই সমাধি।

সঙ্কল্প ও বিকল্পের ঐক্য সাধন,—বোধ ও বোধব্য একাকার হয়ে যোগ বিয়োগান্তের ঊর্দ্ধে নির্ব্বিকল্প সমাধিই ব্রহ্মলাভ, শাশ্বত শান্তি লাভ। জড়শূন্য সূক্ষ্মাতীত সূক্ষ্ম ওঁ (ব্রহ্মবিদ্যা)—

অতীত গৌরব ও সর্ব্ববিধ আদিম কুসংস্কারাত্মক পদ্ধতি, গঠন-প্রণালী এবং জাতিগত বর্ণনালঙ্কার-বিধান,—চারুচিত্র শিল্প ও শিক্ষার ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ অবদানে বহু শতাব্দী দেশ সেবা দ্বারা কর্ম্মবহুল বর্ত্তমানকে আমাদের সম্মুখে বহন করে এনেছে। তাহা ভাল মন্দ যাহাই হউক, আমরা প্রভূত পরিমাণে ঋণী এবং মহান অবদানসমূহ অবশ্যই স্মৃতিসৌধে সংরক্ষিত ও সম্মানিত হবে। কিন্তু যুগের দাবী,—চারুচিত্র শিল্প ও শিক্ষার ক্ষেত্রে ত্যাগনিষ্ঠ হৃদয়বত্তার দ্বারা মুক্ত গতিশীল জীবন্ত সত্য সার্ব্বভৌম ভাববন্যায় আধ্যাত্ম পরিবর্ত্তনে আন্তর্জাতিক শান্তি বিধান সুদৃঢ় হউক।

বর্ত্তমান কুজ্‌ঝটিকাপূর্ণ আবহাওয়ায় উত্তাল তরঙ্গময়ী সমুদ্রের বক্ষে জাহাজের যাত্রিগণ উৎকণ্ঠায় জীবনের দিন-পঞ্জিকা হাতে নিয়ে, কর্ণধার-পরিচালকবর্গের অনুকম্পায় গন্তব্যস্থান নির্দ্দেশের অপেক্ষায় পাটাতনের উপর দণ্ডায়মান। এ হেন দুর্দ্দিনে আবেদন,—হে কর্ণধার ভেলাখানির ত্রুটি বিচ্যুতি চূড়ান্ত পরীক্ষা করা হোক,—পারাবারে প্রস্তুত আছে কি না?

মানব সমাজে তমসাচ্ছন্ন অবস্থায় জ্যোতি আবিষ্কৃত হয়েছিল,— আমরা জীবজগতে শ্রেষ্ঠ। আমরা আমাদের চিন্তা কার্য্যে পরিণত করিতে পারি। বর্ত্তমান জগৎ বিদ্যুৎগতির মত প্রগতিশীল। প্রগতির স্রোতের টান বিশ্বজনগণের দায়িত্ব বহন করতে পারে নাই। অসংস্কৃত জনসাধারণ জাতীয় সরকার কর্ত্তৃক অদূর ভবিষ্যতে তাদের সর্ব্ববিধ উন্নত বিধি ব্যবস্থার আশায় অপেক্ষমান। তারা দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থার বিষয় কিছুই জানে না। তাদের জীবনযাত্রা

প্রণালী ও প্রার্থিত বিষয়-বস্তুর আকার যোগাটে। ইহাকে জীবনের সুসাম্য অবস্থা বলা চলে না, ইহা সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খল অবস্থা। অদূর ভবিষ্যতে ধ্বংসাবলীর পুনরাবৃত্তি হওয়ার হাত থেকে সুরক্ষিত ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য আমরা অবশ্যই যত্নবান হব। কেন না সেই ঝড়ের লক্ষণ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। অতীতের ধ্বংসাবশেষের উপর বর্ত্তমান প্রতিষ্ঠিত এবং বর্ত্তমানের কার্য্যাবলী যদি অতীত অসংস্কৃত ধারায় পরিচালিত হতে থাকে তবে অগ্রগতির পথ অচিরাৎ রুদ্ধ হবে। জগতের ইতিহাস জনগণ সমক্ষে অতীত কার্য্যাবলী সত্যের সাক্ষীস্বরূপ উপযুক্ত সমালোচনামূলক উদাহরণ পরিবেশন করে।

স্বাধীনতার দশম বার্ষিক অতিবাহিত হল কিন্তু জনসমাজ অসুস্থ, অশান্ত আবহাওয়ায় পরিপূর্ণ। এমতাবস্থায়, শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নততর ও সুপ্রশস্ত ধারা, "চারুচিত্র শিল্পে শিক্ষার বিস্তার এবং শিক্ষায় চারুচিত্র শিল্পের রসবোধ বিস্তার", গবেষণামূলক প্রচেষ্টার দ্বারা সমগ্র রাষ্ট্রের বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরিক মামুলী বিধি-বিধানসমূহের অমূল পরিবর্ত্তন একান্ত প্রয়োজন। যে প্রচেষ্টার দ্বারা জনসাধারণ নৈতিকচরিত্র গঠন মার্জ্জিত রুচিবোধ এবং সূক্ষ্ম অনুভূতি লাভ করে সৌন্দর্য্যের উপাসনায় ব্রতী হয়ে বহুবিধ জটিল সমস্যা নিজেরাই সমাধান করবে।

স্বাধীন রাষ্ট্রে আত্মসহায় সঙ্ঘ বা মানুষ-তৈরী কারখানা প্রতিষ্ঠা একান্ত প্রয়োজন, সেখানে জনসাধারণ জীবন-প্রণালীর বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরিক বিষয় সমূহ যে বৈজ্ঞানিক পন্থার উপর স্থাপিত, তাহা শিক্ষা করবার সুযোগ পাবে।

ভারতের সুরুচিসম্পন্ন যুবকদল তাদের জাগ্রত চৈতন্য দ্বারা জাতির মেরুদণ্ড আধ্যাত্মিক চরিত্র সুদৃঢ় করবে।

আমাদের মহান কর্ত্তব্য,—দেশের অবস্থা বৈগুণ্যের সহিত যুদ্ধ করা, শরীর ও মনকে সর্ব্বতো ভাবে খাঁটি করা। চারুচিত্র শিল্প, চিত্ত স্বাধীনতা লাভের একটি প্রকৃষ্ট মাধ্যম,—এই চিত্র শিল্প যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠা করে সমগ্র দেশের জনগণের শারীরিক ও মানসিক দুঃখ, দৈন্য ঘুচাতে ও আগত বংশধরগণের কল্যাণে নির্দ্দোষ সারবস্তু বিষয়বস্তু সমূহের গবেষণা করা! প্রকৃতি সহায়তায় কঠোর পরিশ্রমের দ্বারা সমগ্র দেশব্যাপী সর্ব্বজন সমক্ষে শিল্পীর গঠনমূলক রুচিবোধের উৎস ও শিষ্টাচারের আবহাওয়া সৃষ্টি করা।

ক্রমবিকাশের পথে "সত্য" সর্ব্বশক্তি, সংহতির মূল ভিত্তিভূমি এবং বীর্য্যবত্তার পূর্ণ ভাষা। শুধু কথায় নয়, কার্য্যক্ষেত্রে,—স্বাধীন রাষ্ট্রে মানবতার মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য ত্যাগশক্তির দ্বারা অন্যায়, অবিচার ও সর্ব্ববিধ জটিল সমস্যা বিলুপ্ত করে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা পালন করতে আমরা ন্যায়ত বাধ্য। মনুষ্যসমাজে সর্ব্ববিধ ভাব, ভাষা, কার্য্য ও আবেগপূর্ণ তত্ত্ব এবং স্বাভাবিক উদ্দীপনায় জাতীয়তা বোধের প্রকাশ থাকা চাই। প্রতিভা পৃথিবীর সমগ্র দেশের সম্পদ। শ্রেষ্ঠ সম্পদের অধিকারী শক্তিশালী ভারতে অসম্ভব বলে কিছুই নাই। অন্যান্য স্বাধীন রাষ্ট্রের সহিত শিক্ষা সংস্কৃতির আদান প্রদান দেশের কুসংস্কাররূপ সংক্রামক ব্যাধি সমূহ দূরীকরণে ও দেশের সৌভাগ্য প্রতিষ্ঠায় প্রভূত সাহায্য করে।

প্রবল ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন সমাজসেবীদের অগ্রগতির পথে সকল বাধা অপসারিত হতে বাধ্য। বিশ্বের বিপর্য্যয়ে আমাদের যাত্রা ভঙ্গ করা সঙ্গত নয়, পরন্তু মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে সর্ব্বতো ভাবে আমাদের জীবন উৎসর্গ করবার জন্য প্রস্তুত রাখাই সমীচীন।

আমরা স্বাধীন ভারতের অধিবাসী,—ধ্বংসের তাণ্ডবলীলা রূপ সংক্রামকব্যাধি প্রতিরোধের জন্য সমাজের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক মলিনতা দূরীকরণের ইহাই উপযুক্ত সময়।

আত্মসহায় সঙ্ঘ,—সুদৃঢ় সংহতির দ্বারা আন্তর্জাতিক শান্তিবিধান প্রতিষ্ঠায় দেশবাসীর শারীরিক, মানসিক (বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক) ক্ষয়িষ্ণু প্রণালী জড়তামুক্ত করে সঞ্জীবিত করবার উদ্দেশ্যে আত্মসহায় সঙ্ঘ বা মানুষ-তৈরী কারখানায় যোগদানে মার্জ্জিত রুচিবোধ, শিষ্টাচার ও বৈজ্ঞানিক পন্থা শিক্ষালাভের জন্য একটি নির্দ্দিষ্ট বিধিবদ্ধ প্রস্তাব দেশের জনগণ সমক্ষে বিঘোষিত করবেন। ক্রমবিকাশের পথে শারীরিক ও মানসিক সংবিধানে সমতা থাকা চাই।

বস্তুজগতে জনগণ জীবন রক্ষার্থে অভাব পূরণের আশায় বিপাকে অজ্ঞাতে মৃত্যুমুখে ধাবিত হচ্ছে (প্রাণ রাখতে প্রাণান্ত হচ্ছে)।—

সঙ্ঘের উপদেষ্টামণ্ডলী দেশের জনগণকে আত্মনির্ভরতা এবং অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে দৃঢ়তার সহিত দণ্ডায়মান হতে শিক্ষালাভের জন্য সঙ্ঘে যোগদানের আহ্বান জানাবেন ও উপদেশ দিবেন।

সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ আমরা,—জননীজন্মভূমি হতে সর্ব্ববিধ সুযোগ সুবিধা ও প্রেরণা এবং মনুষ্যোচিত শক্তি, জ্ঞান, বিবেকবুদ্ধি, চৈতন্য লাভ করে থাকি।

জগতে, সত্য, অকপটতা ও সুচিন্তার দ্বারা সক্রিয় স্বাধীনতা লাভই মনুষ্য সমাজের শ্রেষ্ঠ দাবী।

জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠাই বর্ত্তমান সমস্যা। বিশ্বসঙ্কটের মূলে,—শান্তিময় আবহাওয়া সৃষ্টি এবং বিশ্বব্যাপী পরম্পরায় সার্ব্বভৌমিক ভাব, ভাষা, শিক্ষা, সংস্কৃতি স্বাধীনভাবে আদান প্রদানে বিরাট বাধা অপসারণের প্রচেষ্টা ব্যতীত আর কিছুই নয়, এবং ইহা নিশ্চিত সম্ভব, যেহেতু আমরা বিশ্ববাসী একই আকাশতলে একই পৃথ্বীর মাটিতে অবস্থিত।

যে সমস্ত মহামনীষী জগতের অকল্যাণ দূরীভূত করে কল্যাণময় শুভ পথ আবিষ্কারে আত্মোৎসর্গ করে গেছেন, মনুষ্য সমাজ নিশ্চয়ই সেই প্রদর্শিত আলোকময় পথের পথচারী হয়ে জীবজগতে বর্ত্তমান দুর্গতি দূরীকরণে সর্ব্বান্তকরণে যত্নবান হবে এবং শান্তিময় আবহাওয়া প্রতিষ্ঠার দ্বারা মানবজাতির স্বাধীনতা স্তম্ভ সুদৃঢ় করে মহাকল্যাণ সাধন করবে। ইহা মাত্র পটভূমিকা প্রস্তুতি, যে পটভূমিকায় আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন মহান ব্যক্তিগণ দুর্দ্দমনীয় ইচ্ছাশক্তি ও উত্তম সহকারে আবির্ভূত হয়ে ঐকান্তিক ত্যাগনিষ্ঠা ও শাশ্বত সৌন্দর্য্য প্রীতির উপাদানে সকল দুঃখ দুর্গতি দূরীভূত করে বিশ্বভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করবে।

আমরা আশা করতে পারি অদূর ভবিষ্যতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের জনগণ নব আবিষ্কৃত শান্তিরাজ্যের অধিবাসী হয়ে সত্যনিষ্ঠা পালনে বিশ্বশান্তি জয়যুক্ত করবে।
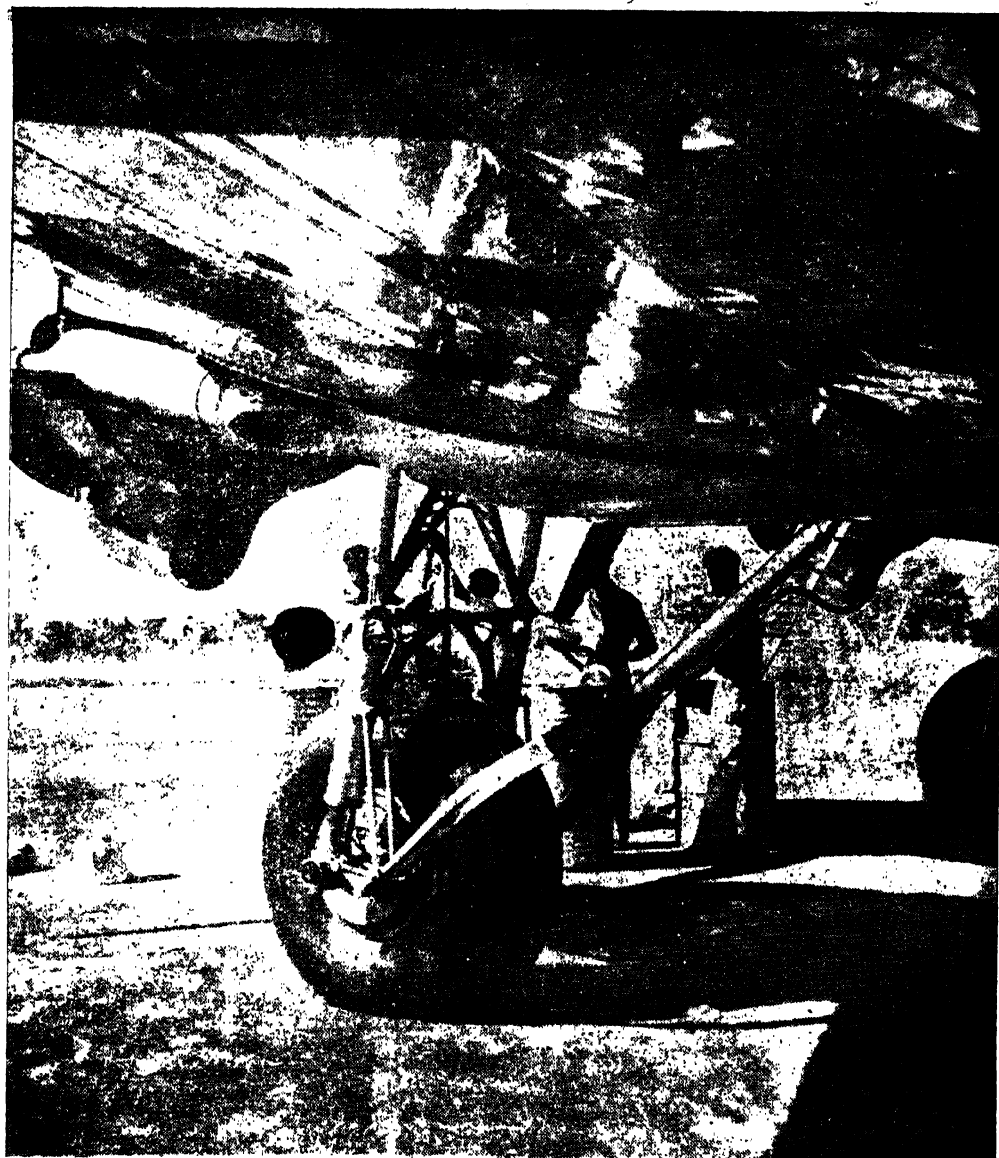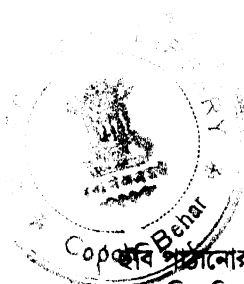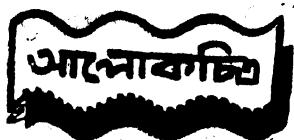
যন্ত্রদানব —পি, সাহানা

[ছবি পাঠানোর সময়ে ছবির পেছনে নাম ধাম ও ছবির বিষয়বস্তু লিখতে যেন ভুলবেন না]

সিকান্দ্রা (আগ্রা) —নির্মলচন্দ্র মিত্র

তুমি কি আমি ?

—গোবিন্দলাল দাস

দীঘা (মেদিনীপুর)

—জয়ন্ত নাগ

জেলেনী —অমল সেনগুপ্ত
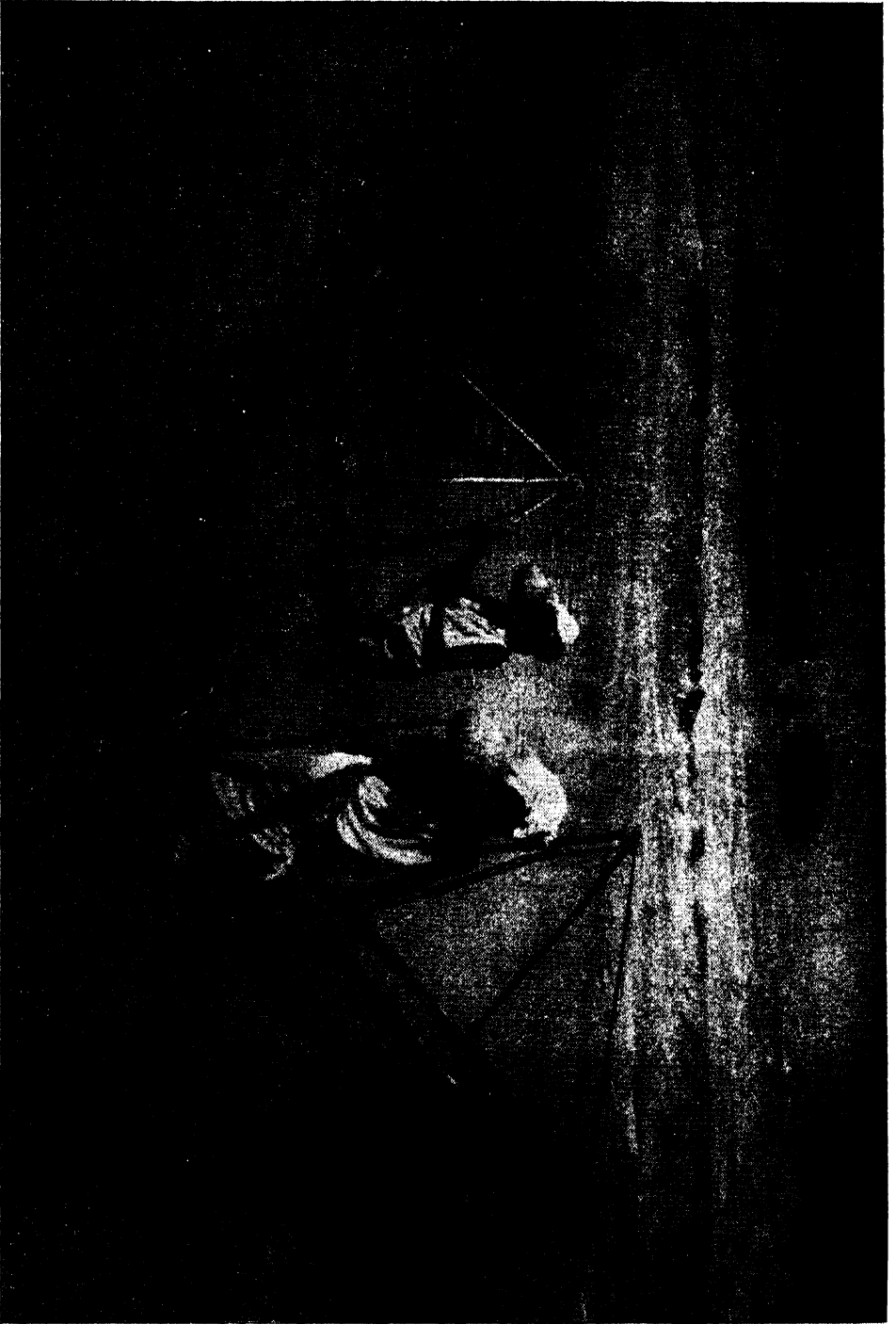
রবীন্দ্রায়ণ

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

৺খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
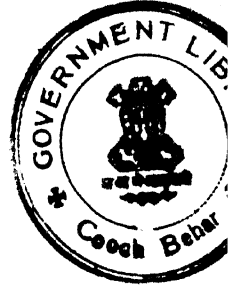
চন্দননগর লালবাগানস্থ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত গোবর্ধন কাব্য-ব্যাকরণস্মৃতিসাংখ্যবেদান্ততর্কতীর্থ কবির উক্ত সংস্কৃত ভাষণের যে বঙ্গানুবাদ করিয়া আমায় ঋণী করিয়াছেন তাহা দিতেছি—

হে উক্ততীর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিগণ,

আমি এই ভারতবর্ষের জনৈক কবি। সেই ভারতীয় কবি আমাকে, সম্মানিত করিয়া আপনাদের প্রাচীন বিদ্যাভূমি নিশ্চয়ই আমার মানবধর্মস্বরূপ মহৎ বেদকে আবিষ্কার করিতে চেষ্টা করিতেছে, যাহার প্রয়োজন বর্তমানে অত্যন্ত গভীর এবং অনতিক্রমণীয় হইয়াছে। এই মানবধর্মবিশিষ্ট আমার অবিনশ্বর প্রতীকের ন্যায় আপনাদের প্রদত্ত এই বাচিক প্রতিপত্তি প্রাপ্ত হইয়া আমার গর্বে চিত্ত স্ফীত হইতেছে। এই শান্তিনিকেতনে আমি আপনাদিগকে সালিঙ্গন আহ্বান করিতেছি কারণ আপনারা এই অমূল্য উপঢৌকন আমার ও আমার দেশের নিমিত্ত আনয়ন করিয়াছেন। ইহা চিরকাল আমাদের হৃদয়ে বিদ্যমান থাকিবে এবং তাহা আমাদের সাধারণ সংস্কৃতি লাভের হেতু হইবে, ইহা আপনারা অবগত হউন। যে সময়ে মানবের আতঙ্ক বৃদ্ধি হয় ও গুণ সকল তিরোহিত হইয়া থাকে এবং নিরঙ্কুশভাবে অশিষ্টাচার বর্ধিত হয় ও ভোগবিষয়ে পশুজনোচিত স্পৃহা হয় বিজ্ঞানের দ্বারা সমুপচিত এই সেই সময় উপস্থিত হইয়াছে। এতাদৃশ সময়ে বিশ্বব্যাপী সম্মেলনের কারণ কবিত্ব শক্তি বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। তাহা হইলেও কাল নিরন্তর তর্জন করিয়া সংযত হইতেছে, কিন্তু আমরা যে এই সকলকে অতিক্রম করিয়া জীবিত থাকিব এবং জ্ঞাত হইব যে আর্যধর্ম পরমার্থ লাভের জন্য নিত্যই বর্ধিত হইতেছে সেই আমাদিগের এই প্রতীতি অবশ্যই স্বীকার করা কর্তব্য যে ইহা কোনো অনাগত সময়ের মঙ্গলের হেতু। এই নিমিত্তই উক্ততীর্থ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত এই উপাধি আমি গ্রহণ করিতেছি। আমি ইহাকে সুপ্রতিষ্ঠিত দেখিতে নিশ্চয়ই জীবিত থাকিব না। সেই মঙ্গলকর দিন সকলের সম্মেলনের জন্য এই বন্ধুত্ব-সূচক সম্মানকে অভিনন্দিত করিতেছি। ইতি শিব, শান্তিনিকেতন, ২৩এ শ্রাবণ ১৩৪৭।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথ চিরদিনই উচ্চশিক্ষা বিস্তারের পক্ষপাতী ছিলেন, তাহাও যেমন উৎসব দ্বারা সমর্থিত হইল, তেমনি বিশ্বভারতীর দাবী পৃথিবীর একটি প্রাচীন বিদ্যাপীঠের দ্বারা এই উৎসবের সহযোগিতায় স্বীকৃত হইল। শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের পরীক্ষা পারস্পরের মধ্যে গ্রাহ্য ও বিনিময়ের ব্যবস্থা হইয়াছে। প্রাচীন সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা ও অনুষ্ঠানটির গাম্ভীর্য বর্ধন মানসে ঋগ্বেদের নিম্নে প্রদত্ত দুইটি মন্ত্রে, মণ্ডপে বুধমণ্ডলী সমবেত হইবার পর সভার উদ্বোধন করা হয়। বৈদিক উচ্চারণে ও স্বরভঙ্গীতে উহা ছাত্র-ছাত্রীমণ্ডলীর দ্বারা সমস্বরে গীত হয়—

স্বস্তি পন্থামনু চরেম সূর্যাচন্দ্রমসাবিব।
পুনর্দদতাঘ্নতা জানতা সং গমেমহি॥

ঋগ্—৫।৫১।১৫

অর্থাৎ, সূর্য ও চন্দ্রের ন্যায় আমরা যেন নিত্যই মঙ্গলকর মার্গে পরিচালিত হই। এবং দাতা অহিংসক ও বিজ্ঞ ব্যক্তির সহিত সততই মিলিত হই।

যে দেবানাং যজ্ঞিয়া যজ্ঞিয়ানাং মনোর্যজত্রা অমৃতা ঋতজ্ঞাঃ।
তে নো রাসন্তামুরুগায়মদ্য যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ॥

ঋগ্—৭।৩৫।১৫

অর্থাৎ যাঁহারা অমর নির্ভীক ও ধার্মিক এবং দেবলোকের ও পার্থিব লোকের দ্বারা পূজনীয় ও সম্মানিত, তাঁহারা অধুনা আমাদিগকে মহৎ পথ প্রদর্শন করুন। এবং সেই সকল ব্যক্তি তাঁহাদের সদিচ্ছা দ্বারা আমাদিগকে পালন করুন।

তৎপরে প্রতিনিধিদের সাদর আহ্বান করা হয় কবির নিম্নলিখিত গানে এবং তাহার ইংরাজি অনুবাদ শুনাইয়া তাঁহাদের গোচরে আনা হয় যে-গানটি বসু বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠায় পূর্বে গীত হইয়াছিল—

বিশ্ববিদ্যাতীর্থপ্রাঙ্গণ করো মহোজ্জ্বল আজ হে
বরপুত্র সংঘ বিরাজ হে।
ঘন তিমির রাত্রির চির প্রতীক্ষা
পূর্ণ করো, লহ জ্যোতির্দীক্ষা,
যাত্রী দল সব সাজ হে,
দিব্য বীণা বাজ হে,
এসো কর্মী, এসো জ্ঞানী,
এসো জনকল্যাণধ্যানী,
এসো তাপসরাজ হে।
এসো হে ধীশক্তি-সম্পদ মুক্তবন্ধ সমাজ হে।

তাহার পর উক্ততীর্থ (Oxford) বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তার প্রতিনিধিরূপে হেণ্ডার্সন ও ডাঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন্ সভাপতি সমীপে কবিকে উপস্থিত করেন ও তথাকার রচিত ল্যাটিন ভাষায় অভিনন্দন পাঠ করেন ও তাহার ইংরাজি তর্জমাও পঠিত হয়। কলিকাতা বেতার প্রতিষ্ঠান সভামণ্ডপে বিশেষ যন্ত্র সমাবেশ করিয়া সমস্ত বিশ্ববাসীর ঘরে ঘরে অনুষ্ঠানের প্রত্যেক কথাটি গানটি broadcast করিয়া পৌঁছাইবার ব্যবস্থা করেন। সে হিসাবে ইহা একটি

বিশ্বব্যাপী উৎসবে পরিণত হয়। বিদেশী ভাষায় হইলেও বাঙলার ভাই বোনদের সে বক্তৃতার কিছু মর্ম দিলাম—

"You have before you India's most distinguished son, in whose family no more perfect illustration can be found of that verse of Horace :

Fortes creantut fortibus et honis

A noble line gives proof of noble sires.

The fourth brother who is present before you now has by his life, his genius and his character augmented so greatly the fame of his house that, did his piety and modesty not forbid, none would have a better right to say in Scipio's famous phrase

Virtutes generis mieis moribus accumulavi.

My life has crowned the virtues of my line.

There before you is the poet and writer Myrionous (myriad-minded), the musician famous in his art, the philosopher proved both in word and deed, the fervent upholder of learning and sound doctrine, the ardent defender of public liberties, one who by the sanctity of his life and character has won for himself the praise of all mankind. With the unanimous approval of the Vice-Chancellor, the Doctors and the Masters of the University, I present to you a man—Mousikotaton Rabindranath Tagore, praemio Nobeliano iam insignitum (already a Nobel prizeman and dear to all the Muses) in order that he may receive the laurel wreath of Oxford also, and be admitted to the Degree of Doctor of Literature, honoris causa."

তখন সভাপতি রবীন্দ্রনাথকে সম্বোধন করেন—

Vir venerabilis et doctissime,

Musarum Sacerdos dilectissime,

Venerable and learned Sir,

Most beloved priest of the muses

I admit you to the Degree of Doctor of Literature এই উক্তিতে তাঁহাকে অভ্যর্থনা ও সমাদর করিয়া স্বশ্রেণীভুক্ত করিলেন। কবি তাঁহার সংস্কৃত ভাষণ দিলে ও তাহার ইংরাজি অনুবাদ পঠিত হইলে Sir Frederick Maurice Gwyer ইংরাজি বক্তৃতা করেন। পরিশেষে অথর্ববেদের ১১।১।১৪ মন্ত্রগুলি সমস্বরে গীত হয়। অতিথি দের আপ্যায়নের জন্ত বিশ্বভারতী ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

বিলাতীয় অভিনন্দনে কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ ঐতিহাসিক সত্য হিসাবে ঠিক হয় নাই। তাঁহারা বলেন—His grand father was one of the first of his countrymen to visit the distant land of Britain এবং তাঁহার সম্বন্ধে অর্থাৎ কবির সম্বন্ধে "fourth brother" (quartus) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সর্ব প্রথম এক বাঙালী ভদ্রলোক বিলাত গমন করেন। তাহাকে চাকুরী লইয়া মাঝি মাল্লাদের তথায় গমন ধর্তব্য নহে। ইহার পর বন্দ্যোপাধ্যায় বংশীয় যুগপুরুষ রামমোহন রায় পুত্র ও ভৃত্যবর্গ সমভিব্যাহারে ১৮৩০ খৃঃ বিলাত গমন করেন। তৎপরে দ্বারকানাথ ঠাকুর ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে বিলাত যান। ইংরাজেরা ও তৎকালীন ইংরাজি শিক্ষাভিমানী বাঙালীরা দায়িত্বহীন উক্তি বক্তৃতার আস্ফালনে ব্যবহার করিয়া আত্মশ্লাঘা বোধ করিতেন। তাহার ফলে আমরা দেখি শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগলের 'মুক্তির সন্ধানে ভারত' পুস্তকে রামমোহন সম্বন্ধে কয়েকটি ভুল তথ্য।

আর একটি ভুল উল্লেখ করা হইয়াছে স্বর্ণকুমারী দেবীকে প্রথম মহিলা ঔপন্যাসিক বলিয়া। সেই সেকালে দক্ষিণ আমেরিকার যেমন দ্বারকানাথ ঠাকুরের বাণিজ্যিক যোগ ছিল, সেইরূপ সেকালের প্রথম বাঙালী মহিলা ঔপন্যাসিক ১৮৭২ সালে প্রকাশিত "সফল স্বপ্ন" উপন্যাসের রচয়িত্রী মোক্ষদা দেবী, যিনি বিখ্যাত ব্যারিষ্টার ও প্রথম কংগ্রেস সভাপতি উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের (W. C. Bonerjee) ভগিনী। আর প্রথম মহিলা লেখিকা ১৮৬৩ সালে প্রকাশিত "তারাবতী" পুস্তকের রচয়িত্রী সাহিত্য সম্রাজ্ঞী স্বর্ণকুমারী দেবীরই ঠাকুরমাদের একজন শিবসুন্দরী দেবী মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের মাতা। রচনা কাল তাহারও পূর্বে সুতরাং বঙ্কিমের 'দুর্গেশনন্দিনীর' সমসাময়িক একপ্রকার বলা যায়।

ডক্টার অব সিভিল ল-এর গাউন (জোব্বা) পরিহিত Gwyer মাথায় slate cap পরিয়া সকলকে আহ্বান করিলে রবীন্দ্রনাথের আসনের সম্মুখে (মঞ্চোপরি) সকলে আসিয়া একে একে কবিকে অভিবাদন করেন। অতঃপর Gwyer বলেন—

And have not Santiniketan and my own University this is common, that each bases its education upon recognition of and respect for human personality ? Do they not both attribute pre-eminence to the virtue of tolerance, since none can claim respect for his own personality unless he is willing to respect that of others ? There indeed are the foundation of true democracy, and its success has been and will always be, in proportion as those who live under it are conscious of its spiritual and intellectual elements.

আর বর্তমান দ্বিতীয় বিশ্বসমরের তাৎপর্য বলিতে বলিয়াছেন : We are witnessing an attempt to assassinate reason, to proscribe tolerance, and to crush the human spirit beneath a monstrous materialism. যাহা আক্রমণকারীর উদ্দেশ্য। Is not the clamant need of our day hard intellectual effect and the habit

of independent judgement, courage to face realities, and not to deny the existence of problems we are too indolent to solve; reverence for the spirit of an ancient culture, without servility to the past or attempts to reverse the evolutionary process ?

Such I believe to be the principles which inspire your teaching in this place, and such are those of my own University. May the love of true learning be even cherished in their place ; and may there ever be granted to all their children 'hope still to find, strength still to climb the spheres.' I deem it a privilege to have taken part in this memorable ceremony in which the University whose representative I am, has, in honouring you, done honour to itself.

এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানাত্মক উপাধি বিদেশীকে দিবার জন্ম দূর বিদেশে অভিযান তাহার সনাতন রীতির ব্যতিক্রম যেজন্ম এই উপলক্ষে ষ্টেটস্‌ম্যান পত্রিকা শিরোনামা ছাপেন Oxford comes at Santiniketan এবং কবি সার্বভৌম রবীন্দ্রনাথই উপলক্ষ হইয়া দুর্গত বাঙলা দেশের ভাগ্যে এ উপাধি গ্রহণ করেন যে দেশের দুঃখে দারিদ্রে কবি লিখিয়াছেন—অন্নহারা গৃহহারা চায় উর্দ্ধপানে, ডাকে ভগবানে। গাম্ভারও বলিতে বাধ্য হন—

It is my earnest prayer that though, those bonds which have been forged today between an ancient foundation and a new, there may pass and repass a vital current in which the spiritual force of the West and East may mingle and, if God will, draw strength from one another.

ইহাই কবির দীর্ঘপোষিত কামনা ও তাহারই বাহ্যিক রূপ বিশ্বভারতী রচনা। সুতরাং এক্ষেত্রে তাহারই সাফল্য দেখিয়া অন্তরের সহিত শ্রীভগবানকে ধন্যবাদ জানাই। প্রাচীন সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধার জন্যই বিভিন্ন ভাষায় রচিত বহু গ্রন্থ বিশ্বভারতী গ্রন্থাগারে স্থান পাইয়াছে। বহু সহস্র চৈনিক গ্রন্থ সংগ্রহ হওয়ায় একটি 'চীনা-ভবন' প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। সেইরূপ জৈনদর্শন এবং চারণ প্রভৃতি প্রাচীন কবিদের ভাষণ ও তুলসীদাস, কবীর, দাদু প্রভৃতি ধর্মাত্মাগণের উপদেশাবলী চর্চার জন্য একটি 'হিন্দী-ভবন' স্বতন্ত্র উত্থিত হইয়াছে এবং সকল স্থানেই অধ্যয়নরত গবেষণাকারী ছাত্রমণ্ডলী আছে, তাহাতে পুরাকালের নালন্দা বা তক্ষশীলার ছাত্র-পীঠের আভাষ পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং কবীরের শতাধিক দোঁহা ও গান ইংরাজি ভাষায় ভাষান্তরিত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন ম্যাক্‌মিলান কোম্পানীর সাহায্যে।

বিলাতি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ বক্তা এই বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকেও সম্মানিত ব্যক্তির পূর্বপুরুষদের গুণকীর্তন দ্বারা আরম্ভ করিয়াছেন বক্তৃতা। সাধারণ ইংরাজ ব্যক্তিমাহাত্ম্যে এতটা মগ্ন যে তাঁহারা টেনিসনের সেই স্মরণীয় ছত্র অনুসরণ করিয়া বলেন—Too proud to care whence I oame. (Lady Clare Vere de Vere). অধ্যাপকমণ্ডলী বিখ্যাত রোমীয় কবি Horace-এর ল্যাটিন ভাষায় রচিত একটি পংক্তি ব্যবহার করিতে পশ্চাৎপদ নয় যাহার অর্থ "অভিজাত পূর্বপুরুষের প্রমাণ বংশধরগণের গুণাবলীতে, আর তাহাতেই বিস্তারিত বংশ সম্ভ্রান্ত বলিয়া প্রখ্যাত হয়।" রবীন্দ্রনাথের উল্লেখ করিতে আর একটি প্রাচীন Latin উক্তি দিয়াছেন যাহা রোমের দিগ্বিজয়ী সেনাপতি জ্যেষ্ঠ Scipioর উক্তি—ইতিহাসে এবং রোমীয়দের ধারণায় জুপিটার সিজার অপেক্ষাও সিপিও মহাযোদ্ধা ও বীর। তাঁহারই কোনো বক্তৃতা হইতে উক্তভীর্থের পণ্ডিতেরা একটি বচন উদ্ধার করিয়া বলেন যে ধর্মপ্রাণতায়, বিনয়ে ও লজ্জায় যদি রবীন্দ্রনাথকে নিষেধ না করিত তাহা হইলে পূর্ণ অধিকারে সিপিওর বাক্যের প্রতিধ্বনি তাঁহার মুখেই শোভা পাইত। তাঁহার প্রতিভা বলে তিনি তাঁহার সদ্‌বংশের ও তাঁহার গৃহের যশ এতটা বৃদ্ধি করিয়াছেন যে তাঁহার অপেক্ষা আর কাহারও ঐরূপ উক্তি করার অধিক যোগ্যতা নাই।" কবির বিশেষত্ব বুঝাইতে যে দুটি বিশেষণ গ্রীক্ ভাষায় প্রয়োগ করা হইয়াছে— myrionous ও mousikotaton, তাহার প্রথমটির অর্থ—অযুতমনা কবি ; দ্বিতীয়টির—কলালক্ষীদের প্রিয়তম পাত্র। গ্রীক শব্দ 'মিরিয়ুস' অর্থে দশ সহস্র অর্থাৎ প্রতিভা বহুমুখী এবং 'মুসা' অর্থে কলাদাত্রী, যে শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে মৌসিকে টেক্‌নে বা মিউজিক বা সংগীত-কৌশল। আমাদের যেমন অষ্ট বসু, নব গ্রহ, ছয় রাগ, ছত্রিশ রাগিণী, তেমনি গ্রীক্ পুরাণানুযায়ী নয়টি মুসা ইংরাজি মিউজেস্ (muses) আছেন যাঁহারা ভাষা, ধ্বনি ও কাব্যের বিভিন্ন বিভাগের অধিষ্ঠাত্রী। গ্রীক দেবী Nemesis বা নিয়তিও কবিকে কৃপা করিয়াছেন। ঐ দেবীর জগৎ নিয়ন্ত্রণে ও বিধানে যে মহাবোধ জীবকে ঘটনা মধ্যে সতত চালনা করে, সে সম্বন্ধে চেতনাও রবীন্দ্র-সাহিত্যে প্রতিফলিত। নীতিজ্ঞান (ethical ideas) সংমিশ্রণে কবি তাহা পাঠকবর্গকে উপহার দিয়াছেন। তাই তাঁহার অনেক গল্পের ও নাটকের পরিসমাপ্তিতে যে কারুণ্য ফুটিয়াছে তাহা সাধারণের সহজবোধ্য না হইলেও মহিমায় ও সূক্ষ্ম কারুকার্যে গ্রীক ট্র্যাজেডির কাছাকাছি যায়। তাঁহার 'দেবতার গ্রাস', 'গান্ধারীর আবেদন', 'কর্ণ-কুন্তির কথোপকথন', 'বিচারক', 'মাসী', 'কর্মফল' (গল্প), ঋষ্যশৃঙ্গের নিকট মোহিনীগণের খেদ প্রভৃতি ভালো করিয়া দেখিলে এই কার্য-পরম্পরা বুঝা যায়। আমাদের দেশে পুরাণে এতগুলি বিভাগীয় দেবীর সৃষ্টি না করিয়া

শশধরকরবর্ণা শুভ্রভা তুম্বহস্তা
জয়তী জিতসমস্তা ভারতী বেণুহস্তা

বলিয়া কালিদাস যাঁহার বর্ণনা করিয়াছেন, সেই

স্তুদিতট নমিতাঙ্গী সম্নিষণা সিতাব্জে
সকল বিভব সিদ্ধৈর্পাতু বাগদেবতা নঃ—

কে স্মরণ করিয়া তাঁহাকেই "বাণী বিদ্যাদায়িনী নমামি ত্বং" উচ্চারণে প্রণাম করিলেই যাবতীয় বিভব, মনস্বিতা ও কবিত্ব শক্তির সমাবেশ হইয়া থাকে। সুতরাং বাঙালী কবি রবীন্দ্রনাথকে মুসিকোটাটোন্ বা মিউজে সেকায়ডোটা বলিলে মানবীয় বিকাশের এই নয়টি বিভাগেই যে তিনি বরপ্রাপ্ত এবং তাঁহার নব ধারায়

উৎসারিত বহুমুখী প্রতিভা ও পারগতা অল্প পরিসরে জ্ঞাপন করা যায়, উক্তভীর্থ-পণ্ডিতেরা বুঝাইয়াছেন। জীবনপ্রান্তে এই যশের উত্তুঙ্গশিখরে তিনি বসিয়া বিদেশাগত জয়দাতাদের সাদর আহ্বানের সাথে অসংকোচেই স্পষ্ট জানাইয়া দিলেন যে, যদি তাঁহাদের সেদিনকার কার্য তাঁহার নিজের দেশের এবং দেশবাসীর ও আরাধ্য সংস্কৃতির প্রতি 'সপ্রণয়-সংকেত' বা সৌহার্দ্যের জন্য হস্তপ্রসারণ (gestute) হয়, তবেই তাঁহাদের প্রদত্ত মাল্য তিনি স্বচ্ছন্দচিত্তে গ্রহণ করিতে পারেন। ইহারই অন্যথায় এই সহৃদয়তার অভাব তাঁহাকে রাজদত্ত 'নাইট' উপাধি ঘৃণায় একদিন প্রত্যর্পণ করিতে প্রণোদিত করিয়াছিল। দেশবাসীর গৌরবের জন্য এ ত্যাগের কথা পূর্বেই বলিয়াছি। বর্তমান ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য সুধিবৃন্দ ও বুধমণ্ডলী যে তাঁহার অনুভূতির ও বাক্যের বা বিত্তায় সাফল্যরূপ বিভূতির যথার্থতা অঙ্গীকার করিয়া তাঁহার মনুষ্যত্বকে মর্যাদা অর্পণ করিলেন, সভাধিনায়ক স্যার মরিসের অভিভাষণে তাহা প্রমাণিত হইল।

জাতীয়তা ও সংস্কৃতি রক্ষার জন্য পূর্বপুরুষের কার্যকলাপ ও বাণীর প্রতি শ্রদ্ধা সমর্পণ কর্তব্য, যাহা শ্রীঅরবিন্দের নির্দেশিত তৃতীয় পন্থা, তাহা কবিও কার্যত স্বীকার করিয়াছেন ও শেষ বয়সে ঐতিহাসিক চেতনার প্রতি যথেষ্ট জোর দিয়াছেন। তাঁহার একাশীতিতম বর্ষ প্রবেশে শেষ জন্মদিনে শান্তিনিকেতনে যাহা বলেন তাহা ১৩৪৮এর জ্যৈষ্ঠের প্রবাসীতে আমরা প্রবন্ধাকারে 'সভ্যতার সংকট' নামে পাই। ইহা ১৯৪১এ অর্থাৎ ঐ বৎসরেই crisis in civilization ইংরাজি প্রবন্ধে অনূদিত হইয়া বিশ্বের সকল জাতির গোচরে আসে। তাহার উপসংহারে এই sage and seerএর বাণী যাহা উচ্চারিত হয় তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি—

মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষা করব। মনুষ্যত্বের অন্তহীন প্রতিকারহীন পরাভবকে চরম ব'লে বিশ্বাস করাকে আমি অপরাধ মনে করি। এই কথা আজ ব'লে যাব প্রবল প্রতাপশালীরও ক্ষমতা মদমত্ততা আত্মম্ভরিতা যে নিরাপদ নয়, তারই প্রমাণ হবার দিন আজ সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে, নিশ্চিত এ সত্য প্রমাণিত হবে যে

অধর্মে নৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রানি পশ্যতি।
ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি।
ঐ মহামানব আসে
এল মহাজন্মের লগ্ন।
আজি অমারাত্রি দুর্গতোরণ যত
ধূলিতলে হয়ে গেল ভগ্ন।
উদয় শিখরে জাগে মাভৈঃ মাভৈঃ রব
নবজীবনের আশ্বাসে।
জয় জয় জয়রে মানব অভ্যুদয়
মন্দ্রি' উঠিল মহাকাশে।
(সভ্যতার সংকট)

উদয়ন,
শান্তিনিকেতন
১ বৈশাখ ১৩৪৮

এই স্বীকারোক্তিতে তাঁহার মহত্ব, কালোপযোগী প্রয়োজনীয়তা-বোধ, মনের অগ্রগতি এবং অদমনীয় প্রতীতি প্রকাশ পাইয়াছে যাহা প্রণিধানযোগ্য। যখন তাঁহার সমসাময়িক ও অনুবর্তিগণ পাশ্চাত্যের ধারায় মুগ্ধ, শিক্ষাগর্বে জাতীয়তাপরিপন্থী জীবনের লক্ষ্য ও ভোগ্য বস্তুর মূল্য নিরূপণে আত্মতৃপ্ত ধনী সম্প্রদায়ের মনোভাব বা বুরজোঁয়া সম্ভ্রমবোধে উগ্র, তখন তাহাদের মধ্যে দাঁড়াইয়া সতেজ ও এমন সরল ভাবে পন্থার বিষয় ব্যক্ত করায় শুধুই ইয়োরোপের সভ্যতা দেউলিয়া হইয়া যাওয়ার ঘোষণা নহে, দেশের উচ্চশিক্ষিতগণের জীবনেতিহাসের ও বিকৃত দৃষ্টি ভঙ্গীতে বর্ধিত হওয়ার নিদারুণ অসারতা ও নৈতিক ও চারিত্রিক বলের শোচনীয় দৈন্যতাও জ্ঞাপিত করিতেছে। এই মর্মকথার মূল্য আজ কেহ সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিবে না কিন্তু ভবিষ্যতে যদি নব দর্শন, নব প্রণালীতে সমাজগঠন ও চিন্তার বিষয় করিয়া মানবীয় কর্মের নব মূল্য নিরূপিত হয়, তখন হয়তো সাধারণ মানব শুধু মনুষ্যসমাজের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া নিজের দাবী বুঝিয়া লইতে ও নির্বিবাদে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে। তখন নব সংস্কৃতির জন্ম হইবে, যাহাতে মানুষ প্রেমে ও ত্যাগে সুন্দর হইবে, বিপন্নের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করিয়া ধন্য জ্ঞান করিবে। ইহা রবীন্দ্রনাথের চিরপরিচিত Idealism বা আদর্শবাদ, অদমিত অবস্থায় মন্দের মধ্যে ভালোর অনুসন্ধান ও ভবিষ্যতের প্রতি 'আশা ভরা আনন্দ' দৃষ্টি নিক্ষেপের সৎপরামর্শ। যে আশ্বাসবাণীতে (optimistic tone) জাতিকে উদ্দীপিত করিবে, তিনি আমরণ ব্রতস্বরূপ পালন করিয়া বলিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার যৌবনে রচিত 'এবার ফিরাও মোরে' বার্ধক্যে অধিকতর জোরের সহিত মন্ত্রস্বরূপ উচ্চারিত হইল। [আগামী সংখ্যায় সমাপ্য]

স্নানের সময়
মনে
রাখবেন
একশ' বছরের
ঐতিহ্য,
বিশুদ্ধতা এবং
অপরিবর্ত্তিত
গুণগুলির জন্য
আজও সমাদৃত
লক্ষ্মীবিলাস
তৈল
এম. এল. বসু য়্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
লক্ষ্মীবিলাস হাউস, কলিকাতা-৯

ডক্টর নবগোপাল দাস, আই, সি, এস

নয়

হোটেলে ফিরতে ফিরতে অনেক রাত হয়ে গেল। ফলে পরের দিন প্রদীপের ঘুম ভাঙল বেশ দেরীতে—আটটায়ও পরে।

প্রথমেই তার মনে পড়ল হোটেলে মাত্র আর একটি রাত তার মেয়াদ, কাল বিকেলের মধ্যেই তাকে চলে যেতে হবে। অবশ্য ম্যানেজারকে বললে হয়ত সে আরও দু'-এক দিন থাকতে পারে, কিন্তু নবকিশোর কি ভাববে? যে প্রদীপ তিন দিনের ভাড়া গ্রহণ করতে ইতস্তত করেছিল সে আজ নির্লজ্জের মত নবকিশোরকে বলবে যে হোটেলে তার আরও কয়েক দিন থাকা দরকার? তা ছাড়া নবকিশোরের যে কোন পাত্তাই নেই। প্রদীপ খুব আশা করেছিল যে নবকিশোর অন্তত টেলিফোনে তার খোঁজ নেবে, কিন্তু ম্যানেজার তাকে বলেছেন তার জন্তে কোনই মেসেজ আসেনি'।

ঘাড়ের উপর একটা প্রকাণ্ড দায়িত্ব নিয়েছে সে, ছবির একটা ব্যবস্থা করবেই। রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে বোধ হয় একটা মাদকতা আছে, তা' এনে দেয় আবেগের ঢেউ, তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে বাজায় স্বপ্নের সঙ্গীত। কিন্তু দিনের রূঢ় আলোয় সে মন্দির রূপায়িত হয় ভগ্নাংশের ভগ্নস্তূপে, কল্পনাবিলাসী মন হয়ে ওঠে আহত, ক্লিষ্ট। ছবির দায়িত্ব গ্রহণ করবার কি প্রয়োজন ছিল তার? মুখে বলা সহজ, কাজে পর্য্যবসিত করা কত কঠিন। তার নিজেরই চালচুলো নেই, হাতে একটি পয়সা নেই, আর সে কি না জোগাবে ছবির পাথেয়?

না, লজ্জার মাথা খেয়ে নবকিশোরের কাছে হাত পাততেই হবে। উপায় নেই।

ম্যানেজারের অফিসে বসে সে নবকিশোরকে টেলিফোন করল।

—আমি প্রদীপ কথা বলছি।

—প্রদীপ দা'? কি খবর? কোন অসুবিধে হচ্ছে না ত?

—কিছু না, নবু। তবে আমাকে বোধ হয় আরও দিন দু'য়েক থাকতে হবে। নানা কাজে জড়িয়ে পড়েছি। ঘরের ব্যবস্থা এখনও করে নিতে পারিনি।

—তা বেশ ত', তুমি ম্যানেজারকে বলে রেখো। আমি পোটা দশেকের সময় ওখানে যাব, সব ঠিক করে দেব। তুমি থাকবে ত?

—থাকব। তোমার সঙ্গে আর একটা বিষয়েও আলোচনা দরকার। হাতে একটু সময় নিয়ে এসো।

নবকিশোর যথাসময়ে এসে হাজির হল।

প্রদীপের ঘরে ঢুকেই বলল, ম্যানেজারকে আমি ব'লে দিয়েছি যে তুমি যতদিন খুশী এখানে থাকবে, বিলটা হপ্তায় হপ্তায় আমার কাছে সে পাঠাবে।

কৃতজ্ঞ ভাবে প্রদীপ নবকিশোরের দিকে তাকাল। বলল, তোমার ঋণ অপরিশোধ্য, নবু—

—কি যে বল তুমি, প্রদীপদা'! তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতে নবকিশোর বলল। তারপর, কি একটা কথা বলবে বলেছিলে না?

—আমি একটি দুঃস্থ, বিপন্ন মেয়ের ভার নিয়েছি, নবু!

—তুমি? একটি মেয়ের ভার নিয়েছ? সবিস্ময়ে নবকিশোর প্রশ্ন করল। এ যে রীতিমত রোম্যান্স ব'লে মনে হচ্ছে প্রদীপদা'।

—রোম্যান্সই বটে, তবে তুমি যে জাতীয় রোম্যান্স কল্পনা করছ তা নয়। এই মেয়েটির জীবনে নেমে এসেছে গাঢ় অন্ধকার, তার তপ্ত অশ্রুনীরে শুনতে পেয়েছি অভিশপ্ত করুণ ঝঙ্কার।

সংক্ষেপে সে ছবির কাহিনী বলল।

নবকিশোর খানিকক্ষণের জন্ত গম্ভীর হয়ে রইল। তারপর বলল, কি ব্যবস্থা তুমি করতে চাও?

—সেটাই ত' ভাববার বিষয় এবং তোমাকে ডেকেছি সে সম্বন্ধে পরামর্শ করতে। বুঝতেই ত পারছ ওকে বাঁচাতে হলে এক্ষুণি প্রয়োজন টাকার, তারপর ওর একটা চাকুরী বা লেখাপড়ার ব্যবস্থা করে দিতে হবে।

—তোমার এত মাথা ব্যথা কেন প্রদীপদা'? কলকাতার বুকে ও রকম কত মেয়ে আছে, তুমি কি তাদের সবাকার গার্ডিয়ান্ এঞ্জেল হবে নাকি?

—যেখানে যত অন্যায় হচ্ছে সবটার প্রতিকার করব এ রকম দুরাশা রাখিনে। কিন্তু যে অন্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় হয়েছে তার বিধান যে করা দরকার। তাছাড়া আমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছি।

—তুমি সংসারকে এখনও চেন না প্রদীপদা'। তুমি কি মনে কর তোমার এই মেয়েটি এক কথায় তার রচিত পথ ছেড়ে চলে আসবে? আজ তুমি না হয় টাকা দিলে, হয়ত তার চাকুরী বা লেখাপড়ার ব্যবস্থাও করে দিলে, কিন্তু তার স্বভাবের গতির মোড় সে ফেরাতে পারবে কি?

—কেন পারবে না? বেশ একটু জোরের সঙ্গেই প্রদীপ বলল। বয়স তার খুবই অল্প, মন এখনও কোমল। তাছাড়া নিতান্ত অভাবের তাড়নায় সে এ পথে নেমেছে।

—এ গল্প ওদের সবাই করে থাকে।

—না, না, এ আমি কিছুতেই মানব না। তুমি আজকাল বড্ড cynic হয়ে গেছ, নবু! সংসারের নির্মম আঘাতে চারদিকে যে মর্ম্মভেদী ক্রন্দন উঠছে তাকি তুমি শুনতে পাও না একটুকু?

নবকিশোর দেখল প্রদীপের সঙ্গে তর্ক করা বৃথা। বলল, বেশ, তোমার হয়ে আমিই এই কাজের ভার নিলাম। আমাকে ঠিকানাটা দাও, আমিই সব ব্যবস্থা করে দেব।

—সত্যি ছবির সব ব্যবস্থা করবে তুমি? তুমি মহান, তুমি প্রাণবন্ত, নবু!—গভীর কৃতজ্ঞতায় প্রদীপের স্বর রুদ্ধ হয়ে এল।

—আমি তোমাকে পরে জানাব কি করলাম।

যাক্‌, কঠিন একটা সমস্যার হাত থেকে রেহাই পাওয়া গেল। এবার গায়ত্রীর সঙ্গে দেখা করে আসা যেতে পারে।

তার নির্দ্দিষ্ট সময়ে, অর্থাৎ বেলা আড়াইটার পরে, সে আবার ছুটল আলিপুরে। গায়ত্রীকে সে আগেই টেলিফোন ক'রে সাবধান ক'রে রেখেছিল যে ঐ সময়ে সে আসবে।

দেখল, গায়ত্রী একাই আছে, কিন্তু তার মুখ অত্যন্ত চিন্তাকুল, ভয়াতুর।

—কি হয়েছে দিদি?

—খবর বড্ড খারাপ, প্রদীপ। উনি একটু আগে এসেছিলেন, বলে গেলেন দিল্লী থেকে তার এসেছে, মহাত্মাজী নাকি সরকারকে নোটিশ দিয়েছেন ১০ই ফেব্রুয়ারী থেকে অনশন সুরু করবেন, একদিন দু'দিনের জন্যে নয়, পুরো তিন হপ্তা! আজকেই সান্ধ্য কাগজে দেখতে পাবে খবর।

এ কি অসম্ভব কথা! এই বয়সে তিন সপ্তাহব্যাপী অনশন—এ যে মৃত্যুকে ডেকে আনা!

—কি হবে প্রদীপ ভাই?

—আমিও বুঝতে পারছিনে দিদি। মহাত্মাজী কেন এই সংকল্প করলেন? মিঃ কর কিছু বললেন কি?

—সংক্ষেপে যা বললেন তার চুম্বক এই: গান্ধীজি নাকি বড়লাটের কাছে চিঠি লিখেছিলেন তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করবার ইচ্ছে জানিয়ে, উদ্দেশ্য তাঁকে বলা যে সরকার যে কুৎসা রটাচ্ছে তাঁর এবং কংগ্রেসের নামে, সেটা তিনি খণ্ডন করবেন অকাট্য প্রমাণের সাহায্যে। বড়লাট তাতে রাজী হন নি। গান্ধীজি তার উত্তরে জানিয়েছেন যে তিনি সত্যাগ্রহী, আলোচনার পথ যখন রুদ্ধ করে দেওয়া হ'ল তখন সত্যকে উপলব্ধি করবেন অনশনের কৃচ্ছ্রসাধনায়। সমস্ত প্রাদেশিক সরকারের কাছে নির্দ্দেশ এসেছে, তারা যেন সতর্ক হয়ে থাকে, এবার সুরুতেই সব গোলমাল নির্ম্মম ভাবে বন্ধ করে দেওয়া হবে। শীগগিরই ১৪৪ ধারাও জারি হবে কলকাতার বিশিষ্ট বিশিষ্ট এলাকায়।

—মহাত্মাজী ঠিকই সংকল্প করেছেন দিদি। এছাড়া আর কোন পথ খোলা ছিল না। যার এতটুকু সম্মানবোধ আছে সে নির্ব্বিচারে মেনে নিতে পারে না সরকারের মিথ্যাভাষণ, বিদ্রূপ—

—কিন্তু তিনি না দেবতা? এযে অভিমান প্রকাশ করা হচ্ছে প্রদীপ। কার সঙ্গে অভিমান?

—তিনি দেবতা নন দিদি, তিনি ও রক্তমাংসের মানুষ। তবে আমাদের বিচার বুদ্ধির অনেক ওপরে তিনি। ক্ষুদ্র, নগণ্য আমরা, সাধারণের মাপকাঠিতে তাঁর কার্য্যপদ্ধতি বিচার করা আমাদের শোভা পায় না।

—ঐখানেই তোমরা ভুল কর। কাউকে একবার শীর্ষ স্থানে তুললে তাঁর ব্যবহারের মধ্যে কোন ত্রুটি, কোন অসঙ্গতি দেখতে পাওনা, দেখলেও চোখ বুজে থাক। দেশের স্বাধীনতা যারা কামনা করে তাদের প্রথম প্রয়োজন মনের স্বাধীনতা অর্জ্জন করা।

—অস্বীকার করিনে, কিন্তু দেশের জীবনে এমন সব সঙ্কট মুহূর্ত্ত আসে যখন মনের স্বাধীনতাকেও দিতে হয় দ্বিতীয় স্থান। নেতৃত্বকে মানতে হয়, বন্ধনকে গ্রহণ করে নিতে হয়।

—কিন্তু গান্ধীজি আজ ছ'মাসেরও বেশী কারাগারে বন্দী, বাইরের জগতের সঙ্গে কোনই যোগাযোগ নেই তাঁর। দেশ আজ কি চায় তা' কি করে বুঝবেন তিনি? তাছাড়া তিনি কি এটা উপলব্ধি করেন না যে আজ তাঁর মৃত্যু হলে দেশ হয়ে যাবে কর্ণধারহীন?

—আবার তোমাকে বলছি, দিদি, সাধারণের মাপকাঠিতে ওঁকে বিচার করবার মত দুঃসাহস আমাদের যেন না হয়। আর আমি এও বলছি যে মনে মনে উনি বিশ্বাস করেন যে এই অনশনও কাটিয়ে উঠবেন। তাঁর কাজ যে এখনও অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে।

—তাই যেন হয় প্রদীপ। আমরা যারা দূর থেকে তাঁর কথা শুনেছি, তাঁর লেখা পড়েছি, কিন্তু চোখে দেখবার সৌভাগ্য হয়নি, কতটুকু বুঝতে পারি তাঁকে?

তার পর বলল, এসব কথা এখন থাক। তোমার খবর ব'ল।

—আমার খবর বিশেষ নেই, তবে বন্দনা কলকাতা থেকে বেলুড়ে চলে গেছে।

—তুমি বেলুড়ে ঘুরে এসেছ নিশ্চয়? গায়ত্রীর স্বরে কৌতুক।

—হ্যাঁ, গতকাল গিয়েছিলাম। তোমাকে বলতে এসেছি যে অটলবিহারী বাবুদের ওখানে টেলিফোন করলে বন্দনাকে পাবে না।

—সে ত দেখতেই পাচ্ছি। তুমি এখন আছ কোথায়?

—আপাততঃ টাওয়ার হোটেলে।

—টাওয়ার হোটেলে? তুমি? টাকা পেলে কোত্থেকে?

—আমার অদৃষ্ট ভাল, দিদি। সেদিন অটলবিহারী বাবুর ওখান থেকে বেরিয়ে ভাবছিলাম কোথায় যাই, এমন সময় তাঁর ছেলে নবকিশোর তার প্রকাণ্ড মোটর গাড়ী নিয়ে আমার পাশে এসে দাঁড়াল। আমার চেয়ে বছর দুয়েকের ছোট। এককালে আমার পরম ভক্ত ছিল, এখনও প্রদীপদা' বলতে অজ্ঞান। সেই আমার বন্দোবস্ত করে দিয়েছে টাওয়ার হোটেলে।

—বিলটা বুঝি সে পেমেন্ট করছে?

লজ্জিত ভাবে প্রদীপ জবাব দিল, হ্যাঁ।

—আমার ভাল লাগছে না, প্রদীপ। আমি জানি তুমি বলবে তোমারও ভাল লাগছে না, কিন্তু উপায়ান্তর ছিল না। আমি ভাবছি অন্য কথা। আমি এ-জাতীয় লোকদের চিনি, এরা একটা পয়সাও খরচ করবে না যদি তার প্রতিদানে কিছু না পায়।

প্রতিবাদের সুরে প্রদীপ বলল, তুমি নবকিশোরের প্রতি অবিচার করছ, দিদি। ওর কোনই অভিসন্ধি নেই—নেহাৎ যোগাযোগ হয়ে গেল, তাই আমি টাওয়ার হোটেলে এলাম তা ছাড়া আমার মত পথের ভিখিরির কাছ থেকে কি প্রতিদান সে আশা করতে পারে?

—সেটা এখন বলা কঠিন, তবে তোমাকে বলছি, তুমি সাবধানে থেকো।

প্রদীপ একবার ভাবল গায়ত্রীর কাছে সে ছবির কথাও বলে, কিন্তু নবকিশোরের প্রতি দিদি বিশেষ প্রসন্ন নয়, কাজেই ছবির কাহিনী আর বলা হ'ল না।

গায়ত্রী বলল, শোন প্রদীপ, এই হোটেলে ত তোমার চিরকাল থাকা চলবে না। যতদূর মনে হচ্ছে, থাকবার কোন জায়গাই তোমার ঠিক হয়নি। তোমার দিদি যদি একটা ব্যবস্থা করে দেয় তোমার আপত্তি আছে?

আপত্তি? কিছুমাত্র না। সে বেঁচে যায় যদি কেউ তার

তার গ্রহণ করে। কিন্তু দিদির বা মিঃ করের এতে বিপদ হবে না ত ?

প্রদীপকে নিরুত্তর দেখে গায়ত্রী বুঝল কোথায় প্রদীপের বাধছে। বলল, তুমি ভেবো না, ওঁকে বাঁচিয়েই আমি তোমার ব্যবস্থা করতে চেষ্টা করব।

তারপর একটু হেসে বলল, তুমি সেদিন বলেছিলে আই-সি-এস-এর গিন্নীর সঙ্গে ভাব রাখায় লাভ আছে—এবার তার পরিচয় পাবে।

দশ

আলিপুর থেকে বেরিয়ে প্রদীপ সোজা এল কালীঘাট ট্রাম ডিপোর কাছে। দেখল, লোকে লোকারণ্য। ব্যাপার কি ? না, মহাত্মাজীর অনশন সুরু করবার বিজ্ঞপ্তিসহ খবরের কাগজের সান্ধ্য সংস্করণ বেরিয়েছে এবং লোকে তা কিনছে, পড়ছে আর আলোচনা করছে। একটু বাদেই পুলিশের একটা গাড়ী চলে গেল ট্রাম ডিপোর পাশ দিয়ে, মাইক্রোফোনে চেঁচিয়ে বলে গেল, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল অঞ্চলে আজ থেকে ১৪৪ ধারা জারী হ'ল, একসঙ্গে পাঁচজন বা তার বেশী যদি জনপথে মিলিত হয় তাহলে সেটা বে-আইনী হবে এবং সরকার প্রতিকারমূলক যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পশ্চাৎপদ হবে না।

গায়ত্রী যা' যা' বলেছিল ঠিক তা'ই ঘটছে। স্বরাষ্ট্র বিভাগের বড় অফিসারের গৃহিণী ত !

জনতা অবশ্য পুলিশের সতর্কবাণী শুনেছে বলে মনে হ'ল না। কোনপ্রকার ভ্রূক্ষেপ না করে লোকে প্রবৃত্ত রইল তাদের আলোচনায়, প্রকাশ করতে লাগল তাদের মতামত। একটা বিষয়ে সবাই হ'ল একমত: এবার গান্ধীজির মৃত্যু হলে বৃটেনের ললাটে অঙ্কিত হবে দুরপনেয় কলঙ্ক। হাজার স্বাধীনতা দিলেও তা ঘুচবে না।

এইসব কথাবার্তা শুনে প্রদীপ ক্লান্ত ও বিরক্ত বোধ করছিল। মহাত্মাজীর জীবনের স্বকীয় কোন মূল্য কি নেই এদের চোখে ? এদের তুলাদণ্ড হ'ল শুধু বৃটিশশক্তির ভাঙন ?

কোথায় সে যাবে এখন ? কোনখানে গিয়ে দু'দণ্ড কথা বলতে পারে এমন জায়গার সংখ্যা কত কম। গায়ত্রীর কাছে সে যায় অতি সন্তর্পণে, মিঃ কর যখন থাকেন না সেই সময়টুকুর মধ্যে। আর সেখানে গিয়েও কি সে শান্তি পায় ? দিদি তাকে স্নেহ করে সত্য, কিন্তু সেই স্নেহ সে অকুণ্ঠিত চিত্তে গ্রহণ করতে পারে না। আর বন্দনা ? বন্দনার সাহচর্য্য তাকে হয়ত খানিকটা আনন্দ, খানিকটা মুক্তি দিতে পারত, কিন্তু সে যে রয়েছে বহু দূরে। ইচ্ছে করলেই ত' আর বেলুড়ে চলে যাওয়া যায় না। তাছাড়া, বন্দনার আর তার সম্পর্কটা যে কোন্ পর্য্যায়ের তা' এখনও সে ভাল করে জানেনা, জানবার চেষ্টা ও করে না !

বড় একা সে। কেন সে নিজেকে ডুবিয়ে দিতে পারে না এই বিশাল পৃথিবীতে ? নবকিশোর, সন্তোষ, অটলবিহারী, এমনকি জ্যোতির্ম্ময়বাবুও বোধ হয় তার মত এমন একা নয়। কেন তার এই একাকিত্ব ? নিজেকে অনন্যসাধারণ মনে করবার মত ধৃষ্টতা তার নেই, তবে এটুকু উপলব্ধি করে যে কারো সঙ্গে তার খাপ খায় না। এই যে বিরাট জনতা, এর মধ্যেও ত সে মিশে যেতে পারছে না। মেদিনীপুরে যখন সে বিদ্রোহী বাহিনীর নেতারূপে গিয়েছিল তখনও কি সে নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দিতে পেরেছিল বিপ্লবের সমগ্রতার মধ্যে ?

দোষটা সম্পূর্ণ তারই।—শৈশব থেকে সে বেড়ে উঠেছে অসীম একাকিত্বের মধ্যে। মা-বাবা বা আত্মীয়ের স্নেহ হয়ত একাকিত্বের এই শৃঙ্খল ভেঙে দিতে পারত, কিন্তু জ্ঞান হ'বার পর অবধি ওপর থেকে বর্ষণোন্মুখ কোন স্নেহই সে পায়নি'।—তারপর সে যখন কংগ্রেসের কাজে নামল সেও কি এই একাকিত্বের হাত থেকে ক্ষণিক মুক্তিলাভের আশায়ই নয় ?—না, কংগ্রেসের যথার্থ কর্ম্মী হিসেবে অভিহিত হবার সম্পূর্ণ অযোগ্য সে।

সাথীত্ব, সাহচর্য্য দু'একজন তাকে দিতে চেয়েছে, বন্দনা ছাড়াও—যথা, সুমিত্রা। কিন্তু সেখানেও সে দুরন্ত পলাতক।···সুমিত্রাকে তার ভাল লাগে না, তার মনের খোরাক দিতে সুমিত্রা সম্পূর্ণ অক্ষম।

তার চেয়ে এক কাজ করা যাক। ছবির ওখানেই যাওয়া যাক্—নবকিশোর কি ব্যবস্থা করল তা' ছবির মুখ থেকেই শোনা যাক্।

ছবিদের খোলার ঘর খুঁজে বার করতে তার বেশ খানিকটা সময় লাগল। রীতিমত বাস্তুহারাদের কলোনি, যদি ও সেখানে শুধু বাস্তুহারারাই থাকেনা, থাকে তারাও যাদের জীবনের অর্গল শিথিল হয়ে এসেছে।—কি অসম্ভব দারিদ্র্যের মধ্যে থাকে এরা, নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। অথচ, এরাও মানুষ !

ছবিদের ঘর খুঁজে পাওয়া গেল, কিন্তু সেখানে কেউ নেই, প্রকাণ্ড একটা তালা ঝুলছে দরজায়।

পাশের ঘরের দাওয়ায় এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক বসে হুঁকো টানছিলেন। প্রদীপ তার কাছে গিয়ে প্রশ্ন করল, এরা গেলেন কোথায় ?

বৃদ্ধ সন্দেহের চোখে তার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, আপনি কে ? কি প্রয়োজন আপনার ?

—আমি এদের পরিচিত। বিদেশ থেকে এসেছি।

—বন্ধুর অভাব এদের নেই দেখছি। তা আপনি একটু দেরী ক'রে এসেছেন। এরা দেশে চলে গেছে।

—দেশে ? কখন ? প্রদীপ সবিস্ময়ে প্রশ্ন করল।

—আজই, এই কয়েক ঘণ্টা আগে। বড় গাড়ী হাঁকিয়ে জমিদার বাবু এসেছিলেন, মশায়, ফিসফিস ক'রে কি সব কথা বললেন, তারপর সবাইকে গাড়ীতে' তুলে নিয়ে চলে গেলেন, মালপত্র সমেত। ঘরের মধ্যে বোধ হয় পড়ে আছে একটা চৌকী আর খানকয়েক বাসন। আমার কাছে চাবিটা দিয়ে বলল যে ফিরে না-আসা পর্য্যন্ত আমি যেন একটু নজর রাখি। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কোথায় যাচ্ছ ? বলল, দেশে, বহরমপুরে। জিজ্ঞাসা করলাম, হঠাৎ ? বলল, বিপদের খবর পেয়েছি, চলে যেতে হচ্ছে। জিজ্ঞাসা করলাম, ক'দিন বাদে ফিরবে ? বলল, জানিনে, দেশ থেকে

চিঠি লিখে জানাব। আমার জিনিষটা মোটেই ভাল লাগল না। কিন্তু আমি বলবার কে ? তাছাড়া জমিদার বাবু যেভাবে এদের আগলে রেখেছিলেন তাতে শান্ত ভাবে কথা বলবার সময় পেলাম কোথায়। যাক্ গে, মশায়, পরের ভাবনা ভেবে ঘুম নষ্ট করায় আমার কি প্রয়োজন ? চলে গেছে, ভালই হয়েছে। যদি ফিরে না আসে তাহলে আমি ওখানেই গিয়ে থাকব। এখানে ত তিলার্দ্ধ জায়গা নেই, একটু পা ছড়িয়ে বসতে পারব।

প্রদীপ বুঝতে পারল নবকিশোর এসে ছবি এবং তার পরিবারের সকলকে অন্যত্র নিয়ে গেছে, কিন্তু তাকে একবারও না জানিয়ে এসব করবার প্রয়োজন ছিল কি ? ওরা বহরমপুরেই গিয়েছে কি না তা'ই বা কে জানে ?

এখানে অপেক্ষা করে আর কোন লাভ নেই। চিন্তাকুলচিত্তে প্রদীপ ফিরল টাওয়ার হোটেলে।

হোটেলে ফিরে শুনল, নবকিশোর এসেছিল। তাকে না পেয়ে চলে গেছে, বলে গেছে পরের দিন বেলা দশটার সময় আসবে, প্রদীপ যেন হোটেলেই থাকে।

প্রদীপ চেষ্টা করল নবকিশোরকে টেলিফোনে পেতে, কিন্তু অটলবিহারী বাবু জানালেন যে নবকিশোর সেই যে সকাল ন'টায় বেরিয়ে গেছে তারপর বাড়ী ফেরেনি। কখন সে ফিরবে বলতে পারেন না, তবে রাত এগারোটার আগে নয়।

সারাটা রাত কাটল দুর্ভাবনায়। পরের দিন যথাসময়ে নবকিশোর এসে হাজির। বলল, কাল সন্ধ্যার একটু পরে তোমার কাছে এসেছিলাম, তুমি ছিলে না, তাই চলে গেলাম।

—ছবিদের কি ব্যবস্থা করেছ তুমি ?—প্রদীপ প্রশ্ন করল।

—সেই কথাই ত তোমাকে বলতে এলাম। ভেবে চিন্তে দেখলাম, ওদের এখানে রাখাটা সঙ্গত হবে না, কলকাতায় নানা রকমের প্রলোভন, তা ছাড়া রসময়ের লোক হয়ত পেছু নিতে পারে। তাই ওদের তুলে দিলাম ওদের বাড়ীর ট্রেণে। সঙ্গে একশ' টাকাও দিয়ে দিয়েছি এবং বলেছি, সামনের মাসে আবার টাকা পাঠাব, যত দিন না ছবির একটা ভাল ব্যবস্থা করতে পারি।

—ছবি ওদের সঙ্গে যায়নি ?

—নিশ্চয় গেছে ! তুমি আমাকে কি মনে কর প্রদীপদা' ? অভিভাবকহীনা একটি মেয়ের দায়িত্ব কি আমি নিতে পারি ? লোকনিন্দার ভয়ও ত আছে—আমার কথা বলছি না, ছবির কথাই বলছি।

—কিন্তু এ ব্যবস্থা কেমন ধারা হ'ল, নবু ?

—এ সাময়িক ব্যবস্থা, প্রদীপদা'। আমি ছবির নার্সিং ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করছি, তবে জানই ত, সময় লাগবে। ব্যবস্থা হয়ে গেলেই ছবিকে চলে আসতে বলব। এখানে থাকবার ওর কোনই অসুবিধে হবে না, নার্সদের হষ্টেলে অনায়াসে থাকতে পারবে। তা ছাড়া সরকার অনেক স্কলারশিপ দিচ্ছে, ছবি যাতে তার একটা পায়, সে চেষ্টাও করছি।

—তুমি ওদের বহরমপুরের ঠিকানা লিখে নিয়েছ ত ?

—নিয়েছি বই কি ! ঠিকানা না নিলে পরের মাসে টাকা পাঠাব কোথায় ?

তার পর পকেট থেকে একটা কাগজ বার করে সে প্রদীপের হাতে দিল। বলল, ছবি তোমার কাছে এই চিঠিটা দিয়েছে।

প্রদীপ কাগজের ভাঁজ খুলল। কাঁচা মেয়েলি হাতে লেখা :

"শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার নাম জানি না, তবে নবকিশোর বাবুর কাছে আপনার কথা কিছু কিছু শুনলাম। আপনি যে দয়াপরবশ হয়ে ওঁকে আমাদের কাছে পাঠিয়েছেন, সেজন্য আমি চিরঋণী হয়ে রইলাম আপনার কাছে। এখন দেশে যাচ্ছি, নবকিশোর বাবু বললেন, আমার ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা হলে খবর দেবেন, তখন কলকাতায় ফিরে আসব। আশা করি, তখন আবার দেখা হবে।

প্রণতা—ছবি"

না, সে ভুল বুঝেছিল নবকিশোরকে। ভালই ব্যবস্থা করেছে নবকিশোর। সত্যি, ছবির এখন কিছু দিন বাইরে থাকা উচিত—কলকাতার এই বিষাক্ত হাওয়ার পরিবর্তে সে উপভোগ করুক খোলা মাঠের শীতল, নির্মল বাতাস। তার শরীর এবং মন হয়ে উঠুক স্বচ্ছ, স্নিগ্ধ, মুছে যাক্ সব ক্লেদ, মালিন্য।

—তুমি যথার্থ মানুষের কাজ করেছ, নবু ! গাঢ় ভাবে প্রদীপ বলল।

—কি যে তুমি বল, প্রদীপদা' ! নবকিশোর জবাব দিল।

তার পর বলল, ছবি মেয়েটা কিন্তু সত্যি ভাল, প্রদীপদা'।

এগারো

তিন সপ্তাহ পরের কথা। দেশবাসী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বেঁচেছে। অনশনের অনুশাসন মহাত্মাজী কেটে উঠেছেন নিজের মনের জোরে। তাঁর এই অনশন নিরর্থক হয়নি কোন দিক থেকেই। একজিকিউটিভ কাউন্সিলের তিন তিন জন ভারতীয় সভ্য পদত্যাগ করেছেন সরকারের নীতির প্রতিবাদস্বরূপ। লিন্‌লিথগোর বিরাগ বা অনুরোধ কিছুই তাঁদের বিচলিত করতে পারেনি। আর সুপ্ত ভারতে নতুন একটা সাড়া জেগেছে, যা' সীমাবদ্ধ হয়ে থাকেনি শুধু কংগ্রেসীদলের মধ্যে। কংগ্রেসের বাইরে যাঁরা আছেন তাঁরাও অনুভব করেছেন সরকারের হৃদয়হীন নীতির প্রহার।

শেষ মুহূর্তে লিন্‌লিথগোর ব্যঙ্গোক্তির প্রতিক্রিয়া জেগেছে প্রত্যেকটি মানুষের মনে। "আপনার অনশন হচ্ছে পলিটিক্যাল ব্ল্যাক মেল—মৃত্যুকে বরণ করে ভবিষ্যত ঐতিহাসিকের নির্মম বিচার এড়াবার চেষ্টা করছেন আপনি"—কত হৃদয়হীন, কত কঠোর হ'লে গান্ধীজির মত লোকের সম্বন্ধে এই অভিসন্ধি আরোপ করা সম্ভব !

বারবার প্রদীপ পড়ছিল খবরের কাগজের স্তম্ভে বিশেষ সংবাদদাতার পত্র : "আজ ৩রা মার্চ্চ ১-৩৪ মিনিটে মহাত্মাজী অনশন ভঙ্গ করেছেন। সে যে কি পবিত্র মুহূর্ত্ত তা' যাঁরা উপস্থিত ছিলেন না তাঁদের পক্ষে হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন। প্রথমে মহাত্মাজীকে পড়ে শোনান হ'ল গীতা, কোরাণ এবং বাইবেল থেকে কয়েকটি বিশিষ্ট পংক্তি। তারপর নিমীলিত চোখে তিনি প্রার্থনা করলেন। তারপর তাঁর সহধর্মিণী শ্রীমতী কস্তুরবা তাঁর হাতে এনে দিলেন ছ' আউন্স কমলালেবুর রস—একটি কাঁচের আধারে। কুড়ি মিনিট

ধরে মহাত্মাজী সেটা পান করলেন। তার আগে, দুর্ব্বলকণ্ঠে, তিনি ধন্যবাদ জানালেন তাঁর চিকিৎসকদের, যাঁরা এই তিন সপ্তাহ ধরে করেছেন তাঁর পরিচর্য্যা।—'মৃত্যুর মুখ থেকে যে আমি ফিরে এসেছি তার পেছনে আছে আপনাদের স্নেহ এবং প্রীতি। তবে এটাও আমার মনে হয় যে আপনাদের শক্তির চেয়েও বড় কোন এক অদৃশ্য শক্তি আমাকে ঘিরে ছিল অনুক্ষণ। হয়ত আমাকে দিয়ে দেশের প্রয়োজন এখনও ফুরিয়ে যায়নি। নইলে কেন আমি আবার ফিরে এলাম আপনাদের মাঝখানে?'—তারপর সরোজিনী দেবী ঢুকলেন ঘরে, অভ্যাগত প্রত্যেককে দিলেন কমলালেবুর রস।"

সহজ, স্বচ্ছ বর্ণনা। কিন্তু এর পেছনে আছে কত গভীর অনুভূতি! পড়তে পড়তে প্রদীপের চোখ সজল হয়ে উঠল।

সপ্তাহান্তে প্রদীপ টাওয়ার হোটেল ছেড়ে দিয়েছিল। গায়ত্রী তার থাকবার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল তারই এক আত্মীয়ের বাসায়, বরানগরে। সেখানে কেউ তার সঠিক পরিচয় জানতে চায় নি', সে গায়ত্রীর এক জন আশ্রিত এই পরিচয়ই ছিল যথেষ্ট। তবে প্রদীপের আত্মসম্মানে যাতে আঘাত না লাগে সেজন্য গায়ত্রীই বলে দিয়েছিল যে খাওয়া এবং আশ্রয়ের বিনিময়ে সে যেন দিনে দু'ঘণ্টা করে নটবর বাবুর ছেলে দুটিকে পড়ায়। অলস জীবনে এই একটা কাজ পেয়ে প্রদীপও বেঁচে গিয়েছিল।

এর মধ্যে অটলবিহারীদের ওখানে বা বেলুড়ে সে যায় নি'। প্রধান কারণ, মহাত্মাজীর অনশনের মধ্যে তার অবসরই হয় নি' নিজের সুখ-দুঃখের কথা ভাবতে। নবকিশোর, সন্তোষ বা সুমিত্রার সঙ্গেও তার দেখা হয়নি'।

যোগাযোগ ছিল শুধু গায়ত্রীর সঙ্গে। সপ্তাহে একদিন করে সে আলিপুরে যেত, তার নির্দ্দিষ্ট সময়টিতে। ঘণ্টা দুই কথা বলে আবার ফিরে যেত বরানগরে।

মহাত্মাজীর অনশনের অধ্যায় শেষ হয়ে গেছে, এবার প্রদীপ স্থির করল তার বন্ধু এবং পরিচিতদের খোঁজ করবে। ওদিকে গায়ত্রীও তাকে জানিয়ে দিয়েছে যে সরকারের ধরপাকড় নীতি একটু শিথিল হয়েছে, যতদূর সে জানে প্রদীপের বিরুদ্ধে সরকারের অভিযোগ চাপা পড়ে গেছে বিস্মৃতির গর্ভে। কাজেই সে এখন খানিকটা সহজ ভাবে চলা ফেরা করতে পারে।

গায়ত্রীর ওখান থেকেই সে টেলিফোন করল অটলবিহারী বাবুর বাড়ীতে। টেলিফোন ধরল বন্দনা।

—ও কি, তুমি ফিরে এসেছ? প্রদীপ প্রশ্ন করল।

—হ্যাঁ, হপ্তাখানেক হয়ে গেল। তুমি ত আর বেলুড়ে এলে না, তাই ভাবলাম আমিই কলকাতায় যাই, যদি তোমার দর্শন মেলে। কিন্তু কোথায় তুমি আছ কেউ বলতে পারল না। একমাত্র দাদা বলল তুমি বরানগরে না কোথায় আছ, তবে তোমার ঠিকানা সে জানে না।

—নবকিশোর ভাল আছে ত?

—খুব ভাল আছে। বন্দনা জবাব দিল। আর আমিও ভাল আছি, তোমার প্রশ্ন করবার আগেই বলে দিলাম।

—এই আবার আমাকে একটা খোঁচা দিলে!

—বাঃ রে, এর মধ্যে খোঁচা কোথায়? টেলিফোনে তুমি শুনছ আমার স্বর, আর কুশল প্রশ্ন করছ আরেকজনের। ভাবলাম, তোমার বোধ হয় সঙ্কোচ হচ্ছে, তাই আমার খবরটা আগে থেকেই জানিয়ে দিলাম।

—বেলুড় থেকে তুমি বেশ মুখরা হয়ে ফিরেছ দেখছি!

—কথা বললেও দোষ? বেশ, আর কথা বলব না। টেলিফোন রেখে দিচ্ছি।

—আমি তোমার ওখানে যাব, বন্দনা?

—স্বচ্ছন্দে, যখন তোমার অভিরুচি। আমি ত সব সময় বাড়ীতেই আছি!

—আজই যাব, বিকেলের দিকে, কেমন?

গায়ত্রী প্রশ্ন করল, বন্দনা ফিরে এসেছে বুঝি?

প্রদীপ ঘাড় নেড়ে জবাব দিল, হ্যাঁ।

তিন সপ্তাহ পরে বন্দনার সঙ্গে প্রদীপের এই প্রথম দেখা। অবাক্ হয়ে গেল তাকে দেখে। এই কয়দিনে বন্দনা রীতিমত সুরূপা হয়ে ফিরে এসেছে, তার চোখে মুখে উজ্জ্বল লালিত্য, গালে এসেছে যৌবনের লালিমা। প্রসাধনের দিকেও যেন তার নজর পড়েছে আগের চেয়ে একটু বেশী।

প্রদীপ বলল, তুমি ভারী সুন্দর হয়ে এসেছ, কিন্তু—

বন্দনার কান এবং গাল লাল হয়ে উঠল। তারপর একটু হেসে বললে, গায়ে মাংস বসেছে এই ত? তা' শরীরের অপরাধ কি? কাজকর্ম্ম ছিল না, শুধু খাও দাও ঘুমোও। তার উপর দিদিমার সস্নেহ অত্যাচার এবং গঙ্গার হাওয়া। সুখী হচ্ছি একটা জিনিষ লক্ষ্য করে যে আমার শরীরের উন্নতি অবনতির দিকে তোমার নজর পড়েছে।

বন্দনার কথাবার্ত্তায় পরিহাসের সুর।

—তোমার সঙ্গে কথায় পারা যায় না, বন্দনা।

—ঐ দেখ, আবার ঝগড়া সুরু করলে! তোমার খবর বলত এখন?

—প্রথমে ক্ষমা চাইছি বেলুড়ে যেতে পারিনি বলে। মহাত্মাজীর অনশন নিয়ে আমরা সবাই ছিলাম অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত, এই তিন হপ্তা কোথাও যাইনি।

—আমি আন্দাজ করতে পেরেছিলাম। বন্দনা বলল।

—তবে হ্যাঁ, তোমার কাছে চিঠি লিখতে পারতাম হয়ত। কিন্তু চিঠি লেখাটা আমার একেবারেই আসে না, শিখে নিতে হবে।

—অজস্র ধন্যবাদ। আমার কাছে চিঠি লিখবার জন্যে নতুন ক'রে এই বিদ্যা আয়ত্ত করবার প্রয়োজন নেই। আচ্ছা, বরানগরে তোমার থাকবার ব্যবস্থা কে করে দিল?

প্রদীপ খুলে বলল সব কথা।

—গায়ত্রীদি' ত খুব ভাল লোক দেখছি। আমাকে তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে হবে।

—তুমি যাবে, বন্দনা? উনি খুব খুসী হবেন। তোমার কথা ওঁকে বলেছি। উৎফুল্ল-স্বরে প্রদীপ বলল।

সন্দিগ্ধ ভাবে বন্দনা প্রশ্ন করল, আমার কথা ওঁকে বলেছ? কি বলেছ?

—তোমার নিন্দে করিনি', বরং প্রশংসাই করেছি।

—কি রকম প্রশংসা, শুনি ?

—সে কি দু'-এক কথায় বলা যায় ?

—ওরে বাবা, আমার এত প্রশংসা করেছ যে ভাষায় প্রকাশ করতে পারছ না। তোমাকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাব কি না ভাবছি।

—ঠাট্টা নয়, বন্দনা, সত্যি বলছি গায়ত্রীদি' জানেন তোমার আমার সম্পর্কের খানিকটা।

—খানিকটা ? তবু ভাল। কিন্তু আমি নিজেই জানিনে তোমার আমার সম্পর্কটা কি। তাই জানতে ইচ্ছে হয় তুমি কি বলেছ।

বিশদ ভাবে বন্দনার কথা গায়ত্রীর কাছে প্রদীপ সত্যি বলেনি। কিন্তু গায়ত্রী তার হাবভাব থেকে বুঝে নিয়েছিল যে যদি কাউকে ভালবেসে থাকে তাহ'লে সে হচ্ছে একমাত্র বন্দনা। আর বন্দনা যে প্রদীপকে ভালবাসে, গভীরভাবে ভালবাসে, এ বিষয়ে গায়ত্রীর কোনই সন্দেহ ছিল না।

প্রদীপ জবাব দিল, বড্ড কঠিন প্রশ্ন করলে তুমি। গায়ত্রীদি'র কাছে চল, ওঁর কাছেই শুনবে কি বলেছি।

স্থির হ'ল গায়ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ ক'রে এক দিন বন্দনাকে নিয়ে যাবে প্রদীপ।

একটু পরে অটলবিহারী বাবু এলেন। বললেন, এই যে প্রদীপ, ভাল আছ ত ?

—বন্দনা এসেছে খবর পেয়ে দেখা করতে এলাম।

—বেশ, বেশ। তা তুমি এখন থাক কোথায় ? নবু বলছিল বরানগরে কোথায় নাকি টুইশনি করছ, তারাই তোমাকে খেতে এবং থাকতে দেয়। তা' নেহাৎ মন্দ নয়, চুপ চাপ বসে থাকার চেয়ে ভাল। গান্ধীজি ত বেঁচে উঠলেন, এখন কি করবেন তিনি ?

সবিনয়ে প্রদীপ বলল যে তার মত নগণ্য লোকের পক্ষে এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া কঠিন।

—কেন যে তিনি নিজের জেদ ধরে বসে রয়েছেন! বড়লাট বার বার করে বলছেন, একবারটি ব'লো যে আগষ্ট সেপ্টেম্বরের গোলমালের জন্য দায়ী তোমার কুইট ইণ্ডিয়া আন্দোলন, কিন্তু এমন একগুঁয়ে তিনি যে কিছুতেই স্বীকার করবেন না। সমস্ত পৃথিবী বলছে দায়িত্ব সম্পূর্ণ কংগ্রেসের, অথচ উনি বলছেন, না, এর জন্য দায়ী বৃটিশ সরকার। এর চেয়ে হাস্যকর আর কিছু হ'তে পারে ?

প্রদীপ কোন কথা বলল না। পূর্ব্ব অভিজ্ঞতা থেকে সে বুঝেছিল যে অটলবিহারী বাবুর সঙ্গে তর্ক করা বৃথা, নিজের অভিমত সম্পর্কে তিনি সত্যি সত্যি অটল।

অটলবিহারীবাবু বলে চললেন, আর দেখ ত', এদিকে কি ব্যাপার হচ্ছে! কংগ্রেসী নেতাদের অনুপস্থিতির সুযোগে যত সব ভুঁইফোড় পার্টি তৈরী হচ্ছে রাতারাতি। এই বাংলা দেশের কথাই ভাবনা, আজ এখানে যে অরাজকতা চলেছে একি সম্ভবপর হ'ত যদি সরকারের সঙ্গে কংগ্রেস সহযোগিতা করত ?

তারপর হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, ভেতরের খবর রাখ ?

—কোন্ খবরের কথা বলছেন ?

—কোন খবরের কথা আর বলব ? দুর্ভিক্ষের খবর। ফাল্গুন মাস চলছে, ফসলের অবস্থা খুবই খারাপ। যা হয়েছে তা'ও কোথায় যেন উবে যাচ্ছে। আমি নিশ্চিত জানি এবার দুর্ভিক্ষ লাগবে বাংলা দেশে। তোমরা, কংগ্রেসের যারা কর্মী, তোমাদের উচিত এর একটা বিহিত করা।

অটলবিহারীবাবুর যুক্তি অকাট্য। কংগ্রেসের যাঁরা নেতৃস্থানীয় তাঁরা পড়ে রইলেন জেলে, অথচ বিহিত করতে হবে তাঁদেরই, সরকারকে নয়। কিন্তু প্রদীপ সত্যই চিন্তিত বোধ করল। যদি এরকম কিছু হবার সম্ভাবনা থেকে থাকে তার প্রতিবিধান করা দরকার বই কি। সে স্থির করল গায়ত্রীর সঙ্গে এ সম্বন্ধে আলোচনা করবে।

বারো

গায়ত্রীর ওখানে গিয়ে দেখে যেন এক মহোৎসবের আয়োজন চলেছে। বয় বেয়ারারা ছুটোছুটি করছে, বাংলোর বিশাল লন্‌এ অন্ততঃ দশ বারোখানা টেবিল পাতা হয়েছে, তার ওপর সাজান হচ্ছে সুদৃশ্য প্লেট, চায়ের পেয়ালা-পিরিচ, আর রকমারী খাদ্যসামগ্রী। গায়ত্রী বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হুকুম দিচ্ছে—ফুলদানিগুলোতে মৌসুমি ফুল সাজান হয়নি কেন ? প্রত্যেক টেবিলে কাগজের ন্যাপ্‌কিন্ রাখতে হবে, ভুল যেন না হয়। আইসক্রীমের ব্যবস্থা ঠিক আছে ত ?

—এই যে, প্রদীপ, আজ ভাই তোমার সঙ্গে গল্প করতে পারব না। সাড়ে তিনটা বাজল, ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই উনি এসে পড়বেন, আর পাঁচটা থেকে অভ্যাগতেরা আসতে সুরু করবেন।

—ব্যাপার কি দিদি !

—টি-পার্টি হবে, কলকাতায় আসার পর অবধি কত জায়গায় খেয়ে বেড়িয়েছি, তার প্রতিদান দিতে হবে ত'! উনি আবার ককটেল পার্টি পছন্দ করেন না, তাই টি-পার্টির আয়োজন করা হয়েছে। ককটেল না রাখার ত্রুটিটা অন্যদিক দিয়ে পুরিয়ে দিতে হবে কি না।

বেয়ারা বোধ হয় ভুল করে একটা টেবিলে খুব সাধারণ ফুলদানি রাখছিল। গায়ত্রী হাঁ হাঁ করে উঠল। বলল, কতবার তোমাকে বলেছি আবদুল, ওটা হচ্ছে বিশিষ্ট এবং সম্মানিত অতিথিদের টেবিল। ওখানে আমাদের ড্রইংরুমের রূপোর ফুলদানিটা রাখো, আর নার্সারি থেকে গোলাপী আর হলুদ ডালিয়াগুলো দিয়ে গেছে, তা' সবই যাবে ঐ টেবিলে। প্লেট পেয়ালা পিরিচ, কাঁটাচামচ সবই যেন আমাদের সেই স্পেশ্যাল সেট থেকে দেওয়া হয়।

তারপর একটু লজ্জিত ভাবে প্রদীপের দিকে তাকিয়ে বলল, চিফ সেক্রেটারী আসবেন কি না, তাই একটু বিশিষ্ট আয়োজন করতে হচ্ছে।

গায়ত্রীর এই রূপ এর আগে কখনও প্রদীপের চোখে পড়েনি'। সে বুঝতে পারল গায়ত্রী যে পরিমণ্ডলে চলাফেরা করে সেখানে দুর্ভিক্ষ কেন, যে কোন অভাবও যেন দুঃস্বপ্ন।

তবু প্রদীপ কথাটা উত্থাপন না ক'রে পারল না। বলল, আমি শুনে এলাম দিদি, বাংলা দেশে নাকি দুর্ভিক্ষ আসছে।

তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতে গায়ত্রী জবাব দিল, যতসব আজগুবি খবর। আজকালকার দিনে দুর্ভিক্ষ কখনও হ'তে পারে ? বাংলা দেশে অজন্মা যদি হয়ে থাকে, অন্য জায়গা থেকে চাল আসবে। চালের জন্য ত আমাদের বিদেশ থেকে আমদানীর ওপর নির্ভর করতে হয় না। তবে, হ্যাঁ, যুদ্ধের জন্যে জিনিষপত্রের দাম বেড়েছে এবং বাড়ছে তা' ত আমরা সবাই দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু একে দুর্ভিক্ষ বলা চলে না।

তা বটে। সাধারণের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় জিনিষ চালের দাম দুগুণ-তিনগুণ বেড়েছে, আরও বাড়বে, একে দুর্ভিক্ষের সংজ্ঞায় ফেলা শুধু অনুচিত নয়, অত্যন্ত অশোভন। এ হচ্ছে দুর্মূল্য, ডিম্যাণ্ড আর সাপ্লাইএর পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া! সন্তোষও যেন এইজাতীয় কি একটা কথা বলেছিল না, ছবির কথা বলতে গিয়ে ?

বলল, আজ তোমায় বিরক্ত করবনা, দিদি। চললাম।

—কোন কাজের কথা ছিল কি ?

—না, এমনি এসেছিলাম।

—বরানগরে তোমার কোন অসুবিধে হচ্ছে না ত ?

—কিছুমাত্র না। তুমি যে এই ব্যবস্থাটা করে দিয়েছ সেজন্য তোমার কাছে চিরকৃতজ্ঞ হয়ে আছি।

—কি আর করেছি ? আচ্ছা, এসো।

প্রদীপ চলে যাচ্ছিল, গায়ত্রী হঠাৎ তাকে ডাকল। বলল, একটু কিছু খেয়ে যাবে না ? সবই প্রায় তৈরী হয়ে গেছে।

প্রদীপ হেসে বলল, আজ থাক দিদি। তাছাড়া তোমার বেয়ারারা মোটেই খুসী হবে না যদি এই নানা ঝামেলার মধ্যে আমার জন্য আলাদা ক'রে প্লেট সাজাতে হয় এখন।

অটলবিহারীবাবুর কথাগুলো তার মনের শক্তি অপহরণ করে নিয়েছিল। সে কেবলই ভাবছিল দেশের এই পরিস্থিতির সঠিক আভাস কার কাছ থেকে পাওয়া যায়। জ্যোতির্ময় বাবু এখনও জেলে, গায়ত্রীদি' বা মিঃ কর ত দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা কল্পনাই করতে পারেন না, নবকিশোরকে এ প্রশ্ন করার কোনই অর্থ হয় না।

বরানগরে ফেরবার পথে বাস-এ তার হাতে এসে পড়ল এক হ্যাণ্ডবিল। সরকারী ইস্তাহার। বাংলা সরকার লক্ষ্য করছেন যে কিছুদিন ধরে একশ্রেণীর লোক রটিয়ে বেড়াচ্ছে যে দেশে চাল নেই, দুর্ভিক্ষ অবশ্যম্ভাবী। বাংলা দেশে এবার ফসল কিছু কম হয়েছে সরকার অস্বীকার করেন না, কিন্তু ঘাটতি পূরণ করবার জন্যে সরকার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা তৈরী করে রেখেছেন, প্রয়োজন হলেই তা' অবলম্বন করা হবে। তাছাড়া সারা ভারতের ষ্ট্যাটিসটিক্স খতিয়ে দেখা গেছে যে অন্যান্য বছরের তুলনায় এ বছরে ধান বা গম এতটুকু কম হয়নি। কাজেই যারা মিথ্যা অথবা আজগুবি রটনা করছে তাদের সতর্ক করে দেওয়া হচ্ছে যে সরকার তাদের বিরুদ্ধে আইনসম্মত উপায় অবলম্বন করতে বাধ্য হবেন।

ষ্ট্যাটিসটিক্স ? ঘাটতিপূরণ করবার জন্যে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা ? তাহ'লে অটলবিহারীবাবু কি জেগে দুঃস্বপ্ন দেখছেন ?

প্রদীপ স্থির করল সুমিত্রার কাছে যাবে, তার সঙ্গে বিষয়টা আলোচনা করবে।

সুমিত্রা বোধ হয় একরকম আশাই ছেড়ে দিয়েছিল যে প্রদীপ

আসবে। তাই সে সত্যি অত্যন্ত পুলকিত হ'য়ে উঠল প্রদীপের আগমনে। স্থির করল, অভিমানসূচক কোন ব্যবহার সে করবে না। স্নেহ যেখানে নেই সেখানে অভিমানপ্রকাশ রুদ্ধ দুয়ারে বিফল আঘাত করা মাত্র। মেদিনীপুরে যাবার প্রাক্কালে প্রদীপের ব্যবহার সে ভোলেনি।

খুব শান্ত ভাবে প্রদীপকে সে অভ্যর্থনা করল।

—অনেক আগেই আমার আসা উচিত ছিল, সুমিত্রা। কিন্তু নিজেকে নিয়ে এত ব্যস্ত ছিলাম যে অপরের চিন্তা করবার অবসরই হয় নি'।

এর উত্তরে সুমিত্রা হয়ত অনেক কিছুই বলতে পারত, কিন্তু সে শুধু বলল, তাতে আর কি হয়েছে? আমারও উচিত ছিল তোমার খবর নেওয়া, আমিও কর্ত্তব্য অবহেলা করেছি।

—না, না, তুমি হচ্ছ একা, মেয়ে। তাছাড়া আমার চালচুলোর কোন স্থিরতা নেই, আমার খবর নেবে কি ক'রে?

—ওসব কথা থাক্। এবার তোমার কথা বল।

—আমি? আমি বেশ ভালই আছি। মেদিনীপুর থেকে এসেছি আজ মাস তিনেক হতে চলল। প্রথমটায় গা'ঢাকা দিয়েছিলাম, এখন দিবালোকে এবং প্রকাশ্যস্থানে একটু-আধটু বার হতে সুরু করেছি।—আচ্ছা, তোমার বাবার খবর পাও ত?

ম্লান মুখে সুমিত্রা জবাব দিল, হ্যাঁ, পাই, আজকাল মাসে একখানা ক'রে চিঠি লিখবার এবং পাবার অনুমতি পেয়েছি। এই ত পরশুদিন তাঁর চিঠি পেয়েছি, মোটের উপর ভালই আছেন লিখেছেন।

—কোন্ জেলে আছেন তিনি?

—সেটা জানবার উপায় নেই, কারণ কর্তৃপক্ষ সে খবরটা সেন্সর করেন। তবে যতদূর শুনেছি, তিনি আছেন দমদম সেন্ট্রাল জেলে।

—তার মানে বাইরের কারোর সঙ্গে দেখা করা নিষিদ্ধ?

—একরকম তাই বইকি!

—তুমি একাই বাড়ী দেখাশুনো করছ?

—সহায়ক কোথায় পাব? তবে নবকিশোর বাবু, বন্দনার দাদা, মাঝে মাঝে আসেন, খবর নেন।

বন্দনার নাম উল্লেখে প্রদীপ যেন একটু চঞ্চল হয়ে উঠল।

—আমি যদি কোন বিষয়ে তোমাকে সাহায্য করতে পারি জানিয়ো। আমি আছি বরানগরে।—সুমিত্রাকে প্রদীপ তার ঠিকানাটা বলল।

—আমি জানি, নবকিশোর বাবুর কাছে শুনেছি।—ঠিকানাটা অবশ্য বলতে পারেন নি', তবে তুমি যে বরানগরে আছ সে কথা বলেছেন।

প্রদীপ একটু অপ্রস্তুত বোধ করল।

সুমিত্রা প্রশ্ন করল, মহাত্মাজীর অনশনের আরম্ভে তুমিও অনশন করেছিলে ত প্রদীপ?

লজ্জিত ভাবে প্রদীপ জবাব দিল, না ত!

—আমি করেছিলাম। মনে হল, এটুকুও যদি না করি তবে মিথ্যাই আমরা তাঁকে করি শ্রদ্ধা, নিজেদের পরিচয় দেই সত্যাগ্রহী বলে। সুমিত্রার কথায় একটা তীক্ষ্ণ তিরস্কারের সুর প্রচ্ছন্ন।

আবার প্রশ্ন করল, তুমি কি আজকাল কংগ্রেস ছেড়ে দিয়েছ নাকি?

—না, কেন?

—এমনি জিজ্ঞাসা করছি।

—কংগ্রেস ছেড়ে দেবার কোনই প্রশ্ন ওঠে না। আমরা যারা বাইরে আছি, আমাদের সমস্যা আরও জটিল। কি করব আমরা? কে পথ দেখাবে? তাছাড়া কিছু করবার সুযোগ কোথায়?

আত্মসমর্থনে এই কথাগুলো প্রদীপ বলল বটে, কিন্তু নিজেরই কাছে সেগুলো অত্যন্ত প্রাণহীন, নিঃসাড় বলে মনে হল।

—সুযোগ যথেষ্ট আছে প্রদীপ। দেশে দুর্ভিক্ষ আসছে শোননি? তোমরা কেন জনমত গড়ে তোল না যাতে সরকার বাধ্য হন উপযুক্ত সতর্ক ব্যবস্থা অবলম্বন করবে? তাছাড়া, তোমাদের উচিত দেশদ্রোহী ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে বিরাট ক্যাম্পেন চালানো।

—কিন্তু তুমি ঠিক জান দুর্ভিক্ষ আসছে?

—হাসালে তুমি। তোমার মত বুদ্ধিমান লোকের কাছ থেকে এই প্রশ্ন আশা করিনি।

আবার একটা তিরস্কার। প্রদীপ নীরবে হজম করল।

—কল্পনা বিলাস ছেড়ে বাস্তবের রাজ্যে ফিরে এসো প্রদীপ। কংগ্রেসকে বিশ্বাস করতে শেখো, কংগ্রেস মিথ্যে কথা বলে না।

—এর মধ্যে কংগ্রেস এল কোথায়?

—এর মধ্যে কংগ্রেস এল কোথায়? বেশ একটু তীব্র ভাবেই সুমিত্রা বলল। কংগ্রেসের শীর্ষস্থানে যাঁরা তাঁদের মুখ হয়ত বন্ধ করে দিয়েছেন সরকার, কিন্তু জনসাধারণ কি বলছে? জনসাধারণই এখন আমাদের কংগ্রেস।

তারপর একটু ধীরে সুমিত্রা বলল, তুমি যখন মেদিনীপুরে যাও তখন আমি আশা করেছিলাম তুমি জয়ী হবে। জয়ী না হতে পারলেও পরাজয়ের কলঙ্কতিলক নিয়ে কলকাতায় ফিরবে না। আমি দুঃখিত হয়েছি বইকি!

—আমিও দুঃখিত সুমিত্রা।

—যাক্ এসব আলোচনা করে কোন লাভ নেই। আমার অনুরোধ শুধু এই যে বাবার কাছে যে দীক্ষা তুমি নিয়েছ তার অমর্য্যাদা করো না। আপ্রাণ চেষ্টা করো কংগ্রেসের আদর্শকে বাঁচিয়ে রাখতে।

[ক্রমশঃ।

"Criticism is something you can avoid by saying nothing, doing nothing and being nothing."

—Earl Keith.

শ্রীনীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত

পনেরো

তাই বটে—সমাপ্তির দীর্ঘ নিঃশ্বাস বলে মনে মনে আর কোনও সন্দেহই রইল না, যখন দিনের পর দিন কেটে যেতে লাগল, মার্লিনের সঙ্গে আমার আর দেখা হলো না। পর পর পুরো এক সপ্তাহ রোজই ক্লাবে গেলাম—মার্লিন এলো না। মক্কটনকে দু তিন দিন পরে একদিন স্পষ্টই শুধালাম, মার্লিন ক্লাবে আসছে না কেন ?

মক্কটন বলেছিল, শরীরটা তার ভাল যাচ্ছে না।

আবার জিজ্ঞাসা করলাম, শরীরে কি বিশেষ কিছু অসুখ করেছে ?—বলেছিল, না, তেমন কিছু নয়। বলে—ক্লান্ত লাগে, তাই আসে না।

ভাবলাম—আমি ত ডাক্তার, বলি—একদিন গিয়ে দেখে আসব। কিন্তু কথাটা বলতে বাধল। মার্লিনের বাড়ী যাওয়ার অধিকার কি আর আছে আমার ?

ক্রমে এটুকুও আমার লক্ষ্য এড়াল না যে মক্কটনের আমার প্রতি ব্যবহারে সৌজন্য পূর্ব্বের চেয়ে বেড়েছে বই কমেনি, যদিও মার্লিনের বিষয় কোন আলোচনা আমার সঙ্গে করতে সে যেন আর রাজী নয়। তাই মার্লিনের বিষয় আর কোনও কথা আমিও তাকে জিজ্ঞাসা করিনি। কিন্তু ডরথীর ব্যবহারে সত্যই অবাক হলাম। কি অপরাধ আমি ডরথীর কাছে করেছিলাম জানি না, কিন্তু ডরথীর ব্যবহারে শুধু সহৃদয়তাই নয়, সৌজন্যের অভাবও ক্রমে স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠতে লাগল। সেধে কোনও কথা ত সে আমার সঙ্গে বলেই না, আমিও কোন কথা বললে নেহাৎ কোনও রকমে তার একটা উত্তর দিয়ে, আমাকে যেন এড়িয়ে যায়। অনেক ভেবে দেখেও এর কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ আমি খুঁজে পাইনি। তার বন্ধু আর ক্লাবে আসে না, তাই কি সে করেছিল আমাকেই অপরাধী ? কিন্তু থাক সে কথা।

যাই হোক, এইভাবে দিনের পর দিন রোজই ক্লাবে যাই এক প্রাণ আশা নিয়ে, রোজই ফিরে আসি দারুণ হতাশায় প্রাণটা শুকিয়ে—মার্লিনকে দেখা ত দূরের কথা, মার্লিনের কোন খবরও কাছে পাই না। টমটারই বা কি হল ? সেও ত আর আসে না ক্লাবে।

এইভাবে দিন সাত-আট কাটার পর একদিন ক্লাবে গিয়ে দেখি ডরথী, মক্কটন ও কলিন্‌স্ চেরী গাছ তলায় গম্ভীর হয়ে আছে বসে, নিজেদের মধ্যে দু'-একটি কথাবার্ত্তা বলছে। ওদের ধরণ দেখে সোজা ওদের কাছে এগিয়ে যেতে গোড়ায় একটু বাধল। কিন্তু চোখোচোখি হয়ে গেছে, না যাওয়াটা ত ঠিক ভদ্রতা হবে না এই ভেবে আমি ওদের কাছে এগিয়ে গিয়ে শুভসন্ধ্যা জানিয়ে দাঁড়ালাম। মক্কটন ও কলিন্‌স্ আমার অভিবাদনের উত্তরে শুভসন্ধ্যা জানিয়ে চুপ করে গেল, কিন্তু ডরথী কোনও উত্তরই দিল না। এ অবস্থায় আর ওদের কাছে থাকা চলে না—টেনিস খেলার দিকে চলে যাব ভাবছি—এমন সময় বৃদ্ধ টাউনসেণ্ড এলেন সেখানে, আমার একটি বাহু সস্নেহে নিজের বাহুতে নিলেন জড়িয়ে। ওদের দিকে চেয়ে বললেন, একি শুনছি—আমাদের মে কুইন নাকি ক্লাব ছেড়ে দিল ?

কথাটা শুনে আমার মনটাও উঠল কেঁপে।

মক্কটন বলল, হ্যাঁ—চিঠি পাঠিয়েছে।

টাউনসেণ্ড বললেন, না, তা হতে পারে না। আমরা সবাই মিলে গিয়ে জোর করে তাকে নিয়ে আসব ক্লাবে।

ডরথী বলল, কোনও ফল হবে না দাদু। কি রকম একগুঁয়ে মেয়ে জানেন না ত'! কাল আমরা সবাই গিয়ে অনেক বুঝিয়ে ছিলাম।

টাউনসেণ্ড নিজের বাহু দিয়ে আমার বাহুটি ঈষৎ একটু চেপে বললেন, চল ডক্। তোমাতে আমাতে আজ যাওয়া যাক্। আমরা গিয়ে বললে হয়ত কাজ হবে।

ডরথী একটু ঝাঁঝের সঙ্গে বলল, বৃথা কেন সময় নষ্ট করবেন ? তাতে ফল আরও খারাপ হবে।

মক্কটন বলল, ফল হবার হলে আমরা গিয়ে বলাতেই হত।

* * * *

বুলা! ইতিমধ্যে আমার মনের অবস্থাও ক্রমে নিদারুণ হয়ে উঠল। সেই সময়টা কয়েকটা দিন আমি যে কি ভীষণ মনঃকষ্টে কাটিয়েছিলাম—ভাবলে এখনও শিউরে উঠি। ভোর হতে না হতে যেন চমকে যেত ঘুম ভেঙ্গে এবং তারপর মনটা একটা কিসের চাপে এত ভারি হয়ে উঠত যে, শুয়ে শুয়ে তাকে যেন আর বইতে পারা যেত না। তারপর সমস্ত দিনই যন্ত্রচালিত পুতুলের মতন দিনের সব কাজই যেতাম করে কিন্তু তার পিছনে মন ছিল না। সে আপন ভাবে কোথায় যেন থাকত পড়ে এলিয়ে।

যেদিন শুনলাম—মার্লিন ক্লাব ছেড়ে দিয়েছে—সেদিন সমস্ত রাত ঘুমোতে পারিনি, আজও মনে আছে। অন্ধকার হয়ে একটা কালো যবনিকা যেন পড়ে গেল আমার জীবনের চারি দিকে, খালি থেকে থেকে হাঁফিয়ে উঠছিলাম। বোধ হয় মনের কোণে একটা ক্ষীণ আশা ছিল—আবার মার্লিনের সঙ্গে দেখা হবে ক্লাবে। সেই ক্ষীণ আশার আলোটুকু নিভে যেতেই কি সমস্ত মন প্রাণ ভরে উঠল একটা গভীর অন্ধকারে ? শেষরাত্রে ঠিক করে ফেললাম—শুধু ক্লাব নয়, ডভিংটনের হাসপাতালও আমি ছেড়ে দেব, চলে যাব লণ্ডনে। ডভিংটনের হাসপাতালে তখনও আমার প্রায় দু'মাসের কাজ বাকি। মনে মনে বললাম—ওগো আমার প্রিয়তম। তুমি কেন আমার জন্ত তোমার জীবনের সমস্ত আনন্দ থেকে নিজেকে নেবে গুটিয়ে। আমিই যাব চলে তোমার জীবনের পথ ছেড়ে—দূরে অনেক দূরে কথাগুলি বারে বারে বলে মনটা যেন একটু বা হালকা হল।

* * * *

পরের দিন সকালেই ডাঃ নায়ারকে বললাম। তিনি শুনে যেন স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। বললেন, সে কি কথা হাসপাতাল ছেড়ে চলে যাবে কি রকম ?

বললাম, ডড্‌ডিংটন আমার আর ভাল লাগছে না।

ডাঃ নায়ার খানিকক্ষণ একদৃষ্টে আমার মুখের দিকে রইলেন চেয়ে। তারপর বললেন, ছেলেমানুষী করো না। এই হাসপাতালে অন্তত ছ'টা মাস পুরো করে দিয়ে যাও। ছ'মাস পুরো হতে আর মাস দুইও নেই। হঠাৎ এ হাসপাতাল ছেড়ে দিলে শীঘ্র আর কোনও হাসপাতাল নাও পেতে পার।

বললাম, লণ্ডনে গিয়ে মাসখানেক অপেক্ষা করলেই আর একটা হাসপাতাল পেয়ে যাব।

বললেন, সন্দেহ! আর তাছাড়া এ রকম হাসপাতাল যে পাবে না—এ আমি জোর করে বলতে পারি। আমি অনেক দেখেছি—ভারতবাসীর পক্ষে এ রকম হাসপাতাল পাওয়া কঠিন। যাই হোক, তাতেও ত খানিকটা সময় বৃথা নষ্ট হলো।

বললাম, মাসখানেকে আর বেশী কি এসে যায়?

বললেন, অনেক এসে যায়। এ দেশে বৃথা সময় নষ্ট করার পক্ষপাতী আমি একেবারেই নই। বিশেষতঃ—ডাঃ নায়ার একটু চুপ করে গেলেন। তারপর বললেন, কিছু মনে করো না—তোমার যে রকম উড়ু উড়ু মনোভাব দেখছি—তাতে এখন আমার মনে হচ্ছে তুমি যত শীঘ্র পরীক্ষা পাশ করে দেশে ফিরে যাও—ততই ভাল।

বললাম, তাহলে আমিও বাঁচি।

বললেন, তবে। এই সময় এই হাসপাতাল ছাড়লে যদি হাসপাতাল পেতে দেরী হয়, পরীক্ষাটা দিতেও হয়ত অনেক পেছিয়ে যাবে—সেটা ভেবে দেখেছ?

ডাঃ নায়ারের কথার মধ্যে যুক্তি অবশ্য অকাট্য—কাজেই কোনও উত্তর দেওয়া চলে না। চুপ করে রইলাম। একটু পরে ডাঃ নায়ার আবার বলে যেতে লাগলেন, তোমার মেধা এবং কাজে তোমার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি শুধু আমি নয়, হাসপাতালের কর্তৃপক্ষও লক্ষ্য করেছেন। সেদিন আমার সঙ্গে কথা হচ্ছিল—এ ছ'মাস গেলে তোমাকে তাঁরা আরও ছ'মাস রাখতে রাজী। তাই আমি ভাবছিলাম—এক বছর হাসপাতালের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে, ডিপ্লোমা পরীক্ষা নয়, তোমার মতন ছেলের সোজা M. R. C. P. পরীক্ষা দেওয়া উচিত। তোমাকে বলব বলব ভাবছিলাম—এ কথা। কিন্তু আজ তুমি যে মনোভাব দেখালে—সত্য কথা বলতে গেলে আমি অত্যন্ত হতাশ হয়েছি।

ডাঃ নায়ারের এই মৃদু তিরস্কারে লজ্জিত হলাম। শুধালাম, M. R. C. P. পরীক্ষা পাশ করার যোগ্যতা আমার কি আছে?

বললেন, নিশ্চয়ই আছে। তোমার চেয়ে অনেক কম মেধাবী ছাত্র M. R. C. P. পরীক্ষা অনায়াসে পাশ করে গেছে—আমি জানি, তবে একটু মনস্থির করে কাজে লেগে থাকতে হবে।

আশ্চর্য্য মানুষের মন! M. R. C. P. কথাটার মধ্যে কি যাদু ছিল জানিনা, হঠাৎ যেন আমার অসাড় অবশ মনে একটা ক্ষীণ উৎসাহের সাড়া পেলাম। শুধু তাই নয়—দিনটা ছিল সুন্দর, বাইরে সূর্য্যের আলো ঝলমল করছিল—তার দিকে চেয়ে মনে হল কাল রাত্রের সেই অসহনীয় মনের বেদনাটা আজ কতকটা যেন সহনীয় হয়ে উঠেছে। সঙ্গে সঙ্গে টের পেলাম, ইতিমধ্যে কখন জানিনা, আমার অন্ধকার মনের গহন তলে আবার একটা আশার ক্ষীণ আলো উঠেছে জ্বলে—মার্লিন ত আমার খুব কাছেই আছে, এই ডড্‌ডিংটনেই। ডড্‌ডিংটনে থাকলে কোনও দিন না কোনও দিন তার সঙ্গে দেখা হবেই। সব কেটে দিয়ে দূরে যদি চলে যাই—না না আজ যেন আর তা ভাবতেই পারছিলাম না।

ডাঃ নায়ারকে বললাম, আপনার কথাগুলি খুবই ঠিক। দেখি ভেবে।

* * * *

কিন্তু দিনের পর দিন কেটে যেতে লাগল—কৈ দেখা হল না ত। ক্লাবে অবশ্য আমি আর যাইনি, কেন না ক্লাবে যাওয়ার আর কোনও উৎসাহ মনের মধ্যে ত পাইই নি বরং ক্লাবের ঐ আবহাওয়ায় যাব ভাবতে মনে কেমন যেন একটা বেদনা অনুভব করতাম—মার্লিন নাই ও আবহাওয়া আমি আর সইব কেমন করে। মার্লিন যে ক্লাবে যায় না সে খবরটুকুও আমার অগোচরে ছিল না, কেন না সন্ধ্যেবেলা বাগানে বেড়াতে বেড়াতে প্রায়ই লক্ষ্য করে দেখতাম—মক্‌টন একলাই ক্লাব থেকে যাচ্ছে ফিরে। অবশ্য মক্‌টনকে ডেকে আমি কোনও কথা বলিনি এবং মক্‌টনও কোনও দিন আমার দিকে তাকিয়ে এগিয়ে আসেনি।

এইভাবে দেখতে দেখতে একমাসের উপর কেটে গেল—এ হাসপাতালে আমার কাজ শেষ হতে আর বোধ হয় দিন দশ-বারো বাকি। বুলা! ইতিমধ্যে আমার মনের অবস্থাটা কি রকম দাঁড়িয়েছিল, মার্লিন আমার মন থেকে একেবারে সরে গিয়েছিল কিনা—হয়ত জানবার তোমার একটু কৌতূহল হচ্ছে। শুধু এইটুকু বলে রাখি—মার্লিনের বিরহটা কতকটা অবশ্য সয়ে গিয়েছিল, সময়ে সবই যায়। কিন্তু সে সময়টা আমার মনের বেলুনটি শুধু যে মাটিতেই চুপসে পড়েছিল তা নয়, একটা যেন ভারি পাথর চাপা পড়ে গিয়েছিল—যে পাথরটি সরাবার শক্তি জগতে একমাত্র ছিল মার্লিনের, আর কারও নয়। তাই উঠতে বসতে শুতে সব সময়ই একটা ভার বয়ে বেড়াতাম জীবনে—ক্রমেই যেন ক্লান্ত হয়ে পড়ছিলাম।

এই সময় ডাঃ নায়ারকে একদিন বললাম, দেখুন M. R. C. P. পরীক্ষা আমার দ্বারা দেওয়া হবে না। এ ক'টা দিন এই হাসপাতালে কাটিয়ে আমি লণ্ডনে ফিরে গিয়ে একটা ডিপ্লোমা পরীক্ষা দেওয়ার জন্য তৈরী হব।

ডাঃ নায়ার শুধু বললেন, বেশ।

বললাম, এ দেশে আর আমার মন টিকছে না।

ডাঃ নায়ার শুধালেন, তুমি আর টেনিস খেলতে যাও না কেন?

বললাম, ক্লাবে ওদের সঙ্গ আমার আর ভাল লাগে না। আমাদের মতন কালো লোকদের ওদের কাছ থেকে একটু দূরে থাকাই উচিত।

বললেন, কেন? তোমার সঙ্গে ত ওদের খুব ভাব জমে উঠেছিল।

চন্দ্রনাথের কথার অনুকরণে বললাম, না—দেখলাম, তেলে-জলে ঠিক মিশ খায় না।

ডাঃ নায়ার বললেন, একেবারে মিশে যাওয়ার চেষ্টা করার দরকারই বা কি। নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে চললে এদের সঙ্গে ভালই চলে।

কি আর বলব। চুপ করে গেলাম।

হাসপাতাল ছাড়ার আর মাত্র সাত দিন বাকি। ইতিমধ্যে দু'-তিন দিন আগে হাসপাতালের কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে অনুরোধ এসেছিল—আরও ছ'মাস কাজ করবার জন্ত। যদিও চিঠিতে এখনও উত্তর দিই নাই, কিন্তু মুখে জানিয়ে দিয়েছিলাম—আরও ছ' মাস আমার পক্ষে থাকা সম্ভব হবে না। লণ্ডনে যাওয়ার জন্ত আমার মনটা সত্যিই আকুল হয়ে উঠেছিল—কোনও দিকে আর কোনও আকর্ষণ খুঁজে পাচ্ছিলাম না ডভিংটনে।

শুধু একটি কাজ বাকি—ভাবতেও মনটা শিউরে উঠত—মার্লিনের বাড়ী গিয়ে তার মার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসতে হবে। ভদ্রতার দিক দিয়ে সেটুকু করা নিশ্চয়ই উচিত—হঠাৎ চার-পাঁচ দিন আগে এই কথাটি মাথায় এসেছিল। কিন্তু গত দু'তিন দিন ধরে রোজই সকালে ঠিক করতাম—বিকেলেই যাব। কিন্তু কেন জানিনা বিকেল এলেই আবার যাওয়াটা পিছিয়ে দিতাম পরের দিনের জন্ত। এইভাবে চলছিল দিনগুলো।

এই সময় একদিন সন্ধ্যার পরে—আমি আমার ঘরে বসে বই পড়ছিলাম এমন সময় কে যেন আমার দরজায় এসে মৃদু করাঘাত করল।

বললাম, ভিতরে আসুন।

হাসপাতালেরই একটি নার্স ঢুকল ঘরে। এ নার্সটি সাধারণত ডাঃ গ্রেহামের কাজেই সাহায্য করে তাই আমার সঙ্গে মুখ চেনা ছাড়া বিশেষ কোনও পরিচয় ছিল না।

শুধালাম, কি খবর নার্স?

বলল, ডাক্তার। আমাদের হাতের ২৭নং বেডের রোগিণী একবার আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছে।

শুধালাম, কেন? ডাঃ গ্রেহাম নাই?

বলল, তিনি আছেন। তবে রোগিণীটির ইচ্ছে—আপনি গিয়ে একবার তাকে দেখুন।

বললাম, সে কি করে হবে—ডাঃ গ্রেহামের অনুমতি ছাড়া—

বলল, রোগিণীটির অবস্থা বিশেষ ভাল নয়। তাই ডাঃ গ্রেহামকে আমি বলাতে—তাঁর আপত্তি নাই।

শুধালাম, কি অসুখ?

বলল, রিউমেটিক ফিভার। হার্টের অবস্থাও তত ভাল নয়। তাই আমরা একটু ভয় পাচ্ছি।

শুধালাম, শরীরে জ্বরের উত্তাপ কত?

বলল, পরশু পর্য্যন্ত ১০১।১০২ ছিল; পরশু থেকে বেড়েছে—১০৩।১০৪ হচ্ছে।

ঘরে বসে বসে একখানা বই পড়ছিলাম—সন্ধ্যেটা আমার হাতে কোনও কাজ ছিল না। আবার সেজে গুজে কাজে যেতে ইচ্ছে হল না। বললাম, আচ্ছা, কাল সকালবেলা আমি গিয়ে একবার দেখে আসব।

নার্সটি বলল, কিন্তু আজ একবার গিয়ে দেখে এলে ভাল হয়।

শুধালাম, আজই কেন?

বলল, বলেছি ত—হার্টের অবস্থা তত ভাল নয়। আজ সকাল থেকে হঠাৎ বারে বারে আপনার কথা বলছে। তাই ডাক্তার গ্রেহাম বললেন, যদি আপনার অসুবিধা না হয় আজই একবার গিয়ে দেখতে। মনটা শান্ত হোক। এ অবস্থায় কোনও উত্তেজনা ত ভাল নয়।

শুধালাম, এসেছে কতদিন?

বলল, তা আজ দশ-বার দিন হ'ল।

শুধালাম, তা হঠাৎ আমাকে দেখবার জন্ত ব্যস্ত হ'ল কেন?

একটু হেসে বলল, আপনার সুনাম যে এ অঞ্চলে সকলেই প্রায় শুনেছে—তাই বোধ হয়—

কথাটা শুনে মনে মনে নিশ্চয়ই খুসী হয়েছিলাম। কথাটা অবশ্য আমারও ঠিক অবিদিত ছিল না। এই হাসপাতালে রোগীরা প্রায়ই আমার হাতে আসার জন্ত ব্যগ্র হয়ে উঠত—এটা ইতিপূর্ব্বেও যে লক্ষ্য করিনি, এমন নয়।

বললাম, আচ্ছা যাও—আমি একটু পরে যাচ্ছি।

একটু পরে গেলাম হাসপাতালে—ডাঃ গ্রেহামের ওয়ার্ডে। দরজার কাছে নার্সটির সঙ্গে দেখা হলো। একটু দূরে রোগিণীর শয্যাটি দেখিয়ে দিয়ে বলল—এখন বোধ হয় একটু ঘুমুচ্ছে। আপনি গিয়ে দেখুন। প্রয়োজন হলে আমাকে ডাকবেন।

শুধালাম, জ্বরের উত্তাপ কতক্ষণ আগে নেওয়া হয়েছে?

বলল, আপনার ওখান থেকে ফিরে এসে আবার নিয়েছি। এখন উত্তাপ—১০৩°৮।

গেলাম রোগিণীর শয্যার পাশে—একটি সাদা চাদরে গলা পর্য্যন্ত ঢাকা—মুখখানি ঈষৎ কাত হয়ে পড়ে আছে বালিশের উপরে চোখ দুটি বোজা। রোগিণীর মুখের দিকে চেয়ে চমকে উঠলাম—মার্লিন!

বুলা। তোমার কাছে অস্বীকার করব না—বুকের মধ্যে ঢেউ খেলিয়ে চোখে আমার জল এলো। কোনও রকমে সামলে নিলাম।

একটা ছোট বসবার টুল টেনে নিয়ে বসলাম শয্যার পাশে। অতি সন্তর্পণে আমার হাতটি রাখলাম চাদর ঢাকা হাতখানির উপরে, চেয়ে রইলাম মুখের পানে।

কতক্ষণ এই ভাবে একদৃষ্টে মুখখানির দিকে চেয়ে বসেছিলাম সঠিক মনে নাই। হঠাৎ চাইল চোখ, দৃষ্টি এসে পড়ল আমার মুখের উপরে, খানিকক্ষণ একদৃষ্টে রইল চেয়ে। প্রাণখানা যেন শুকিয়ে গেছে তাই মনে হল শুষ্ক প্রাণের শীর্ণ অনুভূতি দুটো চোখের মধ্যে কিসের সংঘাতে জানি না একবার মাত্র দুটি অগ্নিশিখার মতন উঠল জ্বলে। তার পরই চোখ দুটি আবার গেল বুজে।

লক্ষ্য করলাম, ধারে ধারে অশ্রু ধারা গড়িয়ে পড়তে লাগল গাল দুটি বেয়ে।

* * * *

পরের দিন সকালবেলা বেশ সকাল সকালই কাজে গিয়ে প্রথমেই দেখা করলাম ডাঃ গ্রেহামের সঙ্গে তাঁর ওয়ার্ডে।

আগের দিন রাত্রে মার্লিনের সঙ্গে কোনও কথাই হয়নি। আমি চুপ করেই বসেছিলাম একটু পরেই মার্লিন আবার অঘোরে ঘুমিয়ে পড়ল, জ্বরের ঘোরে। ঘরের চারি দিকেই রোগিণী, নার্সরা রয়েছে বেশিক্ষণ বসে থাকা চলে না। খানিকক্ষণ পরে উঠে চলে যেতেই হ'ল। যাওয়ার সময় নার্সটিকে বলে গেলাম, জ্বরের উত্তাপ যদি আরও বাড়ে আমাকে খবর দিয়ো যত রাত্রিই হোক। জ্বর কমাবার প্রক্রিয়া সম্বন্ধেও নার্সকে দু একটা উপদেশ দিয়ে গেলাম। নার্সটি হঠাৎ আমার এতটা আগ্রহ দেখে বোধ হয় একটু অবাক হয়ে চাইল আমার মুখের দিকে।

অনেক রাত পর্যন্ত জেগে ঘরে বসেছিলাম, রাত্রে অবশ্য নার্স আর কোনও খবর দেয়নি।

সকালবেলা ডাঃ গ্রেহামের সঙ্গে দেখা হতেই তিনি হেসে বললেন, আপনার রোগিণী আজ কিন্তু একটু ভাল।

আমার রোগিণী কথাটা বুকে গিয়ে বাজল। মুখে শুধালাম, এখন জ্বরের উত্তাপ কত?

বললেন, আজ সকাল বেলায় দেখেছি জ্বরটা একটু নেমেছে ১০১ মাত্র। গত তিন-চার দিনের মধ্যে কোনও দিন এরকম হয়নি।

ইদানীং একটা বিশ্বাস আমার মনে গড়ে উঠেছিল—মানুষের শরীরের ব্যাধি বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই মনের প্রতিক্রিয়া। এ বিষয়ে চিন্তাশীল বৈজ্ঞানিক ডাক্তারদের দু' একটা প্রবন্ধও ইতিমধ্যে পড়েছিলাম। মার্লিনের বেলায় তারই কি আর একটা উদাহরণ পাওয়া গেল?

মুখে শুধালাম, হার্টের অবস্থা কি রকম ডাক্তার?

ডাঃ গ্রেহাম বললেন, সেইখানেই ত ভয় পাই। এ ব্যাধি থেকে যদি সেরেও ওঠে, হার্টটি বোধহয় জন্মের মতন জখম হয়ে রইল। আপনিও দেখবেন।

কথাটা যে সত্য এ বিষয় আমার মনে বিশেষ কোনও সন্দেহ হয়নি। রিউম্যাটিক ফিভারের বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই শেষ পর্যন্ত ঐ ফলই দাঁড়ায়। মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেল—বলাই বাহুল্য।

মুখে বললাম, না—আমি আর হার্ট দেখতে চাই না।

ডাঃ গ্রেহাম শুধালেন, রোগিণীটি বুঝি আপনার বিশেষ পরিচিত?

বললাম, হ্যাঁ। খুব ঘনিষ্ঠ ভাবেই আমি চিনি। ক্লাবে এক দলেই ছিলাম। তাছাড়া ওঁর বাড়ীতেও গিয়েছি—ওঁর মার সঙ্গেও আমার আলাপ আছে।

বললেন, প্রথম যখন এসেছিল—অবস্থা তখন থেকেই ঠিক ভাল নয়। অসুখটা কয়েক দিন আগে থেকেই হয়েছিল—হাসপাতালে আসতে দেরী করেছে। তাই আসামাত্র আমি আত্মীয়-স্বজন বন্ধু বান্ধবদের হাসপাতালে দেখতে আসা একেবারে বন্ধ করে দিয়েছিলাম। বোঝেন ত এ হার্টে কোনও উত্তেজনাই ঠিক নয়।

শুধালাম, তাহলে ওঁর মা কোনও খবর পাচ্ছেন না?

বললেন, খবর রোজই নিচ্ছে—তবে টেলিফোনে।

শুধালাম, কে টেলিফোন করে? ওর মা ত বাতে পঙ্গু—তিনি যে টেলিফোনে আসতে পারেন বলে মনে হয় না।

বললেন, কে তা ত জানি না—তবে পুরুষের গলা।

বুঝলাম—মঙ্কটন, কিংবা টমও হতে পারে। হয়ত মা টমকে দিয়ে টেলিফোনে খবর নেওয়ান। ঠিক বুঝতে পারলাম না।

ডাঃ গ্রেহাম আবার বললেন, কৈ—আপনার সঙ্গে যে এত পরিচিত, সে কথা ত আমার পরে কিছুই বলেনি। যখন জ্বরটা

বাড়ল—অবস্থা আরও খারাপ হলো—তখন বলল। নৈলে আমি আগেই আপনাকে খবর দিতাম। আপনি যে এই হাসপাতালেই আছেন—জানতেন না বুঝি?

বললাম, হ্যাঁ। তবে বোধ হয় আমাকে অযথা জ্বালাতন করতে চাননি। আর কিইবা বলি।

ডাঃ গ্রেহাম বললেন, যান একবার দেখে আসুন।

বললাম, এখন নয়। আগে আমি নিজের কাজগুলো সেরে আসি, তারপর নিশ্চয়ই দেখে যাব।

* * * *

মার্লিনের কাছে যখন গেলাম—তখন বেশ বেলা হয়েছে—এগারোটা বোধ হয় বেজে গিয়েছিল। মার্লিনের কাছে এগিয়ে গিয়ে বসে বললাম, আর কি এইবার ত ভাল হয়ে গেলে।

চুপ করেই রইল—কোনও কথা বলল না।

শুধালাম, মার্লিন। তুমি হাসপাতালে এসেই আমাকে খবর পাঠাওনি কেন?

হঠাৎ যেন একটু উত্তেজিত হয়ে উঠল—বলল, তুমি আমার কে—যে এসেই তোমাকে খবর পাঠাব?

কথাগুলি বলেই চোখ বুজে মাথাটি অন্যদিকে ঈষৎ ঘুরিয়ে চুপ করে রইল শুয়ে। আমিও চুপ করে রইলাম, তবে মার্লিনের একখানি হাত তুলে নিলাম হাতের মধ্যে।

মার্লিনের হাতখানি একটু চেপে বললাম, মার্লিন! মার্লিন! উত্তেজিত হয়োনা, আবার অসুখ বাড়বে।

একটু পরেই মুখটি ঘুরিয়ে সোজা চাইল আমার মুখের পানে—সজল চোখের কাতর বিষণ্ণ চাহনি। বলল, আমি ভেবেছিলাম—অসুখ যখন খুব বাড়ল, সমস্ত শরীরে কি যে তার যন্ত্রণা—আমার মনে হয়েছিল—আর বাঁচব না। তাই তোমাকে খবর দিতে বলেছিলাম।

বললাম, ঠিকই ত' করেছিলে। তাইত অসুখটা কমল।

দুজনেই আবার একটু চুপ করে রইলাম। আর কোনও কথা বলল না। সেইভাবেই রইল চুপ করে শুয়ে—হাতখানি রইল আমার হাতের মধ্যেই। পাছে উত্তেজনা বাড়ে—এই ভয়ে আমিও তখন আর কিছু বলিনি।

* * * *

রাত্রে ডিনার খাওয়ার পরে মার্লিনের কাছে গেলাম। রোগিণীরা প্রায় সকলেই ঘুমিয়ে পড়েছে—চুপচাপ নিস্তব্ধ ঘরখানি। ঘরের উজ্জ্বল আলোগুলি নিভিয়ে দেওয়া হয়েছে—একটি ম্লান আলো জ্বলছে ঘরের এক কোণে। জ্বরের উত্তাপ সকালের চেয়ে এমন বেশী কিছু বাড়েনি—এ খবর অবশ্য আমি আগেই পেয়েছিলাম।

অতি সন্তর্পণে গেলাম, মার্লিনের শয্যার পাশে—হয়ত মার্লিনও ঘুমিয়ে পড়েছে এতক্ষণে। কিন্তু গিয়ে দেখি মার্লিন চুপ করে শুয়ে আছে, চোখ দুটি খোলা।

চাপা গলায় শুধালাম, তুমি এখনও ঘুমোও নি?

বলল, ঘুম আসছে না।

বললাম, এইবার ঘুমোও। আমি পাশে বসে আছি।

সমস্ত বুক ছাপিয়ে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়ল—মুখে কিছু বলল না। হাতখানি নিজেই রাখল আমার হাতের উপরে। চোখ দুটি গেল বুজে।

পরের দিন সকাল বেলা ডাঃ গ্রেহামের সঙ্গে দেখা করতেই তিনি হেসে বললেন, শুনে সুখী হবেন—আজকের অবস্থা আরও ভাল। জ্বর একশ'রও নীচে নেমে গেছে।

শুধালাম, এমনি সাধারণ অবস্থা কি রকম?

বললেন, ভাল। রোগিণী আজ সকাল বেলা হেসে নার্সের সঙ্গে দু' একটি রসিকতাও করেছে—এরকম এ ক'দিনের মধ্যে একদিনও হয়নি।

নিজের হাতের কাজকর্ম সেরে মার্লিনের কাছে যখন গেলাম তখন একটু বেলাই হয়েছে, ঘরে ঢুকেই দেখি—মার্লিন চোখ মেলে শুয়ে আছে, চেয়ে আছে দরজার দিকে। কাছে গিয়ে বসতেই শুধাল, আসতে তোমার এত বেলা হল?

বললাম, হাতের কাজগুলো সেরে নিশ্চিন্ত হয়ে এলাম।

শুধাল, থাকবে কতক্ষণ?

বললাম, থাকতে ত' ইচ্ছে করে সমস্ত দিন তোমার কাছে। কিন্তু একঘর রোগিণী, বুঝতে ত পার, বেশীক্ষণ থাকাটা ভাল দেখাবে না।

চুপ করে রইল। একটু পরে আমি বললাম, মার্লিন! আমার একটা কথা রাখবে?

বলল, বল।

বললাম, আর নিজের মনের সঙ্গে লড়াই করোনা। তাতে অসুখ বেড়েই যাবে। মনটাকে শান্ত রাখার চেষ্টা করো।

মার্লিন আরও খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। পরে ধীরে ধীরে বলল সত্যি! দেখলাম—তুমি নইলে আমি কিছুতেই বাঁচব না। কিন্তু—

বললাম, এর মধ্যে কিন্তু কিছু নেই মার্লিন।

শুধাল, কোথায় গিয়ে দাঁড়াব দু'জনে শেষটা?

সঙ্গে সঙ্গে মাথায় জবাব এলো, দু'জনার পাশাপাশি।

আবার একটু চুপ করে রইল।

তারপর বলল, তুমি আমাকে ছেড়ে চলে যাবে না ত?

কথাগুলি এমন কাতর ভাবে বলল, যে আমার বুকটা প্রচণ্ড আবেগে যেন উঠল দুলে। আশে পাশে যে অন্যান্য লোক রয়েছে সে কথা যেন ভুলেই গেলাম। হাতখানি তুলে নিয়ে নিজের গালের উপর রেখে বললাম, মার্লিন-লীনা তোমাকে কতখানি ভালবাসি তুমি জান না।

মুখের কোণে ঈষৎ একটু হাসির রেখা গেল খেলে। বলল, লীনা—লীনা বেশ নামটি ত।

বললাম, আমি তোমাকে লীনা বলেই ডাকব।

ঠোঁটের কোণে ঈষৎ হাসির রেখা তখনও রয়েছে। বলল, আমিও মনে মনে তোমার একটা নাম ঠিক করে রেখেছিলাম।

শুধালাম, বল।

বলল, একবার মাত্র ত তোমার নামটা শুনেছিলাম—সঠিক মনে নাই। তবে তখনই সেটিকে ভাঙ্গিয়ে স্প্যানিশ ধরণে একটা নাম ভেবে রেখেছিলাম।

শুধালাম, কি সেটা?

আবার চোখে ফিরে এলো সেই প্রাণঢালা চাহনি। শুষ্ক প্রাণে কি আবার এলো জোয়ার? সেইভাবে আমার মুখের দিকে একটু চেয়ে নিজের ঠোঁট দুটিতে যেন একটু আদর মাখিয়ে বলল, বিকো!

সেইদিনই দুপুরের পর ডাঃ নায়ারের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে বললাম, আমি ঠিক করে ফেলেছি—M.R.C.P. পরীক্ষাই দেব। আরও ছ'মাস এই হাসপাতালেই থাকতে চাই।

ডাঃ নায়ার একটু যেন অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকালেন। পরে বললেন, তাহলে তুমি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আজই দেখা করে বলো।

বললাম, আমি একবার না বলেছি—আবার গিয়ে বলতে লজ্জা করে। আপনি যদি আমার হয়ে—

একটু ভেবে বললেন, আচ্ছা। আমিই কথা বলব।

ডাঃ গ্রেহামের সঙ্গে কথা বলে সেইদিন বিকেলেই গেলাম মার্লিনদের বাড়ী, মার্লিনের মার সঙ্গে দেখা করতে। সকাল বেলায়ই মার্লিন আমাকে বিশেষ করে অনুরোধ জানিয়েছিল সেই দিন বিকেলেই আমি নিজে যেন গিয়ে ওর মার সঙ্গে দেখা করি। বলেছিল জানি না, মা কি ভাবে আছেন। একেই ত ঐ শরীর তার উপর আমার জন্ম ভেবে ভেবে—

বলেছিলাম, টেলিফোনে রোজই খবর নেওয়া হচ্ছে।

বলেছিল, মা খবর ত নেওয়াচ্ছেন হয় ফিল না হয় টমকে দিয়ে। তাদের ঠিক অবস্থাটা বোঝবার বুদ্ধি কি আছে?

শুধিয়েছিলাম, তা কি বলব তোমার মাকে?

বলেছিল, বলো মার্লিন এবার ভাল হয়ে উঠল আর ভয়ের কিছু নেই।

একটু দুষ্টুমি বুদ্ধি মাথায় এলো, শুধালাম কথাটা ঠিক ত?

একটু হেসে বলেছিল, সেটা তুমিই ত জান।

মার্লিনদের বাড়ী গিয়ে যখন পৌছলাম তখন যদিও অপরাহ্ন চলে গেছে, কিন্তু অন্ধকার হতে অনেক দেরী। দরজায় কড়া নাড়তেই একটি মেয়ে এসে দরজা দিল খুলে। মেয়েটিকে দেখে একটু অবাক হলাম এ মেয়েটি কে?

মেয়েটিকে দেখে মনে হল মার্লিনেরই বয়সী কিংবা হয়ত কিছু বড় হবে। বেশ মোটা মোটা গোলগাল চেহারা বড় বড় ভাসা-ভাসা চোখে সব সময়ই যেন একটা হাসি রয়েছে লেগে যেন জীবনটাকে দেখে সে খালি আমোদেই উপভোগ করে। মেয়েটিও একটু যেন অবাক হয়ে চেয়ে রইল আমার মুখের পানে। বললাম, মিসেস ফ্রেজারের সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই।

মেয়েটি শুধাল, কি বলব?

বললাম, বলুন ডভিংটন হাসপাতাল থেকে ডাঃ চৌধুরী এসেছে দেখা করতে।

ডভিংটন হাসপাতালের নাম শুনেই বোধ হয় মেয়েটি বলল, ভিতরে আসুন।

ভিতরে গিয়ে সেই সিঁড়ির সামনে সেই বারান্দাটিতে দাঁড়ালাম মেয়েটি চলে গেল পাশের ঘরে। একটু পরেই ফিরে এসে বলল, আসুন ভিতরে।

ভিতরে গিয়ে দেখি মার্লিনের মা ঘরের কোণে একটি কৌচে বসে আছেন। আমাকে দেখেই দু' হাত বাড়িয়ে দিলেন এবং আমি কাছে যেতেই দু' হাত দিয়ে ধরলেন আমার হাত দু'টি। বসালেন নিজের কাছে। বললেন, তোমাকে দেখে বড্ড খুশী হয়েছি।

বললাম, মার্লিন-ই আমাকে পাঠাল আপনার কাছে তার বিস্তারিত খবর দেওয়ার জন্ম।

শুধালেন, কেমন আছে মেয়েটা—বাঁচবে ত?

বললাম, এখন ভালই আছে বিপদটা কেটে গেছে বলেই মনে হয়।

কথাটা শুনে মার্লিনের মা একটা গভীর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে মাথাটি নীচু করে চুপ করে রইলেন।

ইতিমধ্যে টম্ কখন যে ঘরে ঢুকে ঘরের এক কোণে চুপ করে দাঁড়িয়ে আমার কথা শুনছিল টের পাইনি। হঠাৎ একটা চাপা কান্নার আওয়াজে মুখ ফিরিয়ে দেখি টম পাশের আলমারিটির উপর মাথাটি রেখে কাঁদছে। আমার চাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঘর থেকে ছুটে গেল বেরিয়ে।

অবাক হয়ে মার্লিনের মাকে শুধালাম, টমের কি হল?

মার্লিনের মা চাইলেন আমার দিকে দেখলাম তাঁরও চোখ দুটি সজল; মৃদু হেসে বললেন, বেচারা। মার্লি হাসপাতালে যাওয়ার পর থেকে প্রায় পাগলের মতন হয়ে আছে। ক্রমে যখন খবর এলো অবস্থা খুবই খারাপ—খাওয়া দাওয়া দিল একেবারে ছেড়ে। আজ তোমার মুখে বিপদটা কেটে গেছে শুনে নিজেকে বোধ হয় আর সামলাতে পারল না।

সেই মেয়েটি এতক্ষণ ঘরেই ছিল, বসেছিল খাওয়ার টেবিলের একটি চেয়ারে। মার্লিনের মা তার দিকে চেয়ে বললেন, বারবারা ডককে একটু চা করে দাও সু-খবর নিয়ে নিজেই এসেছেন কষ্ট করে আমাদের বাড়ীতে।

মুখে বললাম, না, না আবার চা কেন।

মার্লিনের মা বললেন, তোমাকে কিছু না খাইয়ে বিদায় দিলে মার্লি কি রক্ষে রাখবে।

ইতিমধ্যে মেয়েটি উঠে দাঁড়িয়েছিল। আমি মেয়েটির দিকে তাকাতেই মার্লিনের মা বললেন, ও বারবারার সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দেওয়া হয়নি। বারবারা মার্টিন আমার বোনের মেয়ে। উইসবীচে বাপ-মার কাছে থাকে। আমি এই অবস্থায় আছি শুনে ওর মা ওকে পাঠিয়ে দিয়েছেন আমাকে দেখা শোনা করার জন্ম।

উঠে দাঁড়িয়ে বারবারার সঙ্গে করমর্দন করে শুধালাম, কেমন আছেন?

বারবারাও সঙ্গে সঙ্গে শুধাল, কেমন আছেন? আমাদের পরিচয় হ'ল।

বারবারা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে মার্লিনের মা বললেন, ওরা পাঁচ বোন। কোনটির বিয়ে হয়নি। বারবারা মার্লির সমবয়সী বলে মাঝে মাঝে এসে আমার কাছে থাকার ওর অভ্যাস আছে। মেয়েটি বড় ভাল।

বললাম, হ্যাঁ দেখেই মনে হয়।

একটু চুপ করে থেকে মার্লির মা শুধালেন, মার্লির অসুখটা আবার বাড়বে না ত?

বললাম, আশা ত করি না। তবে অসুখটা বড় পাজী অসুখ। আপনাকে সরলভাবেই বলি—এর পর মার্লিকে বিশেষ সাবধানে থাকতে হবে। এ অসুখে বেঁচে উঠলেও হার্টটি বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই জখম হয়ে যায়। কাজেই কোনও রকম উত্তেজনা বা মানসিক

"আচ্ছা, আমরা নিমুকে শাস্তি দেব আর তোমাকে একটা নতুন ফ্রক এনে দেব।"

"আমার জন্যে নয় মাসী, আমার পুতুলের জন্যে।"

সুশীলা মুন্নিকে, নিমুকে আর পুতুলটি নিয়ে তার বাড়ী চলে গেল আমিও বাড়ীর কাজকর্ম্ম সুরু করে দিলাম। বিকেল প্রায় ৪ টার সময় মুন্নি তার পুতুলটা নিয়ে নাচতে নাচতে ফিরে এলো। আমি উঠোন থেকে চিৎকার করে সুশীলাকে বললাম আমার সঙ্গে চা খেতে।

যখন সুশীলা এলো আমি ওকে বললাম "ডলের জন্যে তোমার নতুন ফ্রক কেনার কি দরকার ছিল?"

"না বোন, এটা নতুন নয়। সেই একই ফ্রক এটা। আমি শুধু কেচে ইস্ত্রী করে দিয়েছি।" "কেচে দিয়েছ? কিন্তু এটি এত পরিষ্কার ও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।"

সুশীলা একচুমুক চা খেয়ে বলল—"তার কারন আমি ওটা কেচেছি সানলাইট দিয়ে। আমার অন্যান্য জামাকাপড় কাচার ছিল তাই ভাবলাম মুন্নির ডলের ফ্রকটাও এই সঙ্গে কেচে দিই।"

আমি ব্যাপারটা আর একটু তলিয়ে দেখা মনস্থ করলাম। "তুমি তখন কতগুলি জামাকাপড় কেচেছিলে? আমাকে কি তুমি বোকা ঠাউরেছ? আমি একবারও তোমার বাড়ী থেকে জামাকাপড় আছড়ানোর কোন আওয়াজ পাইনি।"

সুশীলা বলল, "আচ্ছা, চা খেয়ে আমার সঙ্গে চল, আমি তোমায় এক মজা দেখাবো।"

সুশীলা বেশ ধীরেসুস্থে চা খেল, আর আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি মুচকি হাসছিল। আমার মনের অবস্থা কিন্তু অন্যরকম। আমি একচুমুকে চা শেষ করে ফেললাম।

আমি ওর বাড়ী গিয়ে দেখলাম একগাদা ইস্ত্রীকরা জামাকাপড় রাখা রয়েছে। আমার একবার গুনে দেখার ইচ্ছে হোল কিন্তু সেগুলি এত পরিষ্কার যে আমার ভয় হোল শুধু ছোঁয়াতেই সেগুলি ময়লা হয়ে যাবে। সুশীলা আমাকে বলল যে ও সব জামাকাপড়ই সানলাইটে কেচেছে। ওই গাদার মধ্যে ছিল—বিছানার চাদর, তোয়ালে, পর্দ্দা, পায়জামা, সার্ট, ধুতী, ফ্রক আরও নানাধরনের জামাকাপড়। আমি মনে মনে ভাবলাম বাবা: এতগুলো জামাকাপড় কাচতে কত সময় আর কতখানি সাবান না জানি লেগেছে। সুশীলা আমায় বুঝিয়ে দিল—"এতগুলি জামাকাপড় কাচতে খরচ অতি সামান্যই হয়েছে—পরিশ্রমও হয়েছে অত্যন্ত কম। একটি সানলাইট সাবানে ছোটবড় মিলিয়ে ৪০-৫০টী জামা কাপড় স্বচ্ছন্দে কাচা যায়।"

আমি তক্ষুনি সানলাইটে জামাকাপড় কেচে পরীক্ষা করে দেখা স্থির করলাম। সত্যিই, সুশীলা যা বলেছিল তার প্রতিটি কথা অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেল। একটু ঘষলেই সানলাইটে প্রচুর ফেণা হয়—আর সে ফেণা জামাকাপড়ের সুতোর ফাঁক থেকে ময়লা বের করে দেয়। জামাকাপড় বিনা আছাড়েই হয়ে ওঠে পরিষ্কার ও উজ্জ্বল।

আর একটি কথা, সানলাইটের গন্ধও ভাল—সানলাইটে কাচা জামাকাপড়ের গন্ধটাও কেমন পরিষ্কার পরিষ্কার লাগে। এর ফেণা হাতকে মসৃণ ও কোমল রাখে। এর থেকে বেশি আর কিছু কি চাওয়ার থাকতে পারে?

S. 2588-X52 BG

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড, কর্ত্তৃক প্রস্তুত।

আঘাত মার্লি যাতে জীবনে বাঁচিয়ে চলে—সেইটুকুর প্রতি আপনার লক্ষ্য রাখা দরকার।

কথাটা শুনে একটু চুপ করে রইলেন। তার পর রুমালে চোখ মুছে বললেন, আমি আর কতদিনই বা বাঁচব। তারপর? কে ওকে—আমাদের অদৃষ্ট যে কত খারাপ জান না, জান না।

তার পর শুধালেন, মার্লিকে বলেছ ও কথা?

বললাম, না এখনও বলিনি। তবে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলে—একদিন সাবধান করে দেব। এখন কিছু বলার দরকার নেই।

বললেন, অবশ্য স্বভাবতঃই ও খুব শান্ত মেয়ে। উত্তেজিত খুব কমই হয় এবং রাগলেও সহজে টের পাওয়া যায় না।

একটু ভরসা দিয়ে বললাম, তবে বয়স ত কম। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে হয়ত হার্টও ঠিক হয়ে যাবে।

চা ও কেক নিয়ে বারবারা ও টম্ ঘরে ঢুকল। কিছুক্ষণ পরে বিদায় নিলাম।

বিদায় নেওয়ার সময় মার্লিনের মা আবার আমার দুটি হাত ধরে সস্নেহে বললেন তুমি আসাতে খুব খুশী হয়েছি। আবার এসো—যখন খুশী। মার্লি তোমাকে কি ভালবাসে জান না—নিজের মায়ের পেটের ভাইকেও লোক বোধ হয় এত ভালবাসে না।

* * * *

হাসপাতালে গিয়ে সোজা গেলাম—মার্লিনের কাছে। তার বাড়ীর খবর বিস্তারিত তাকে বললাম। বারবারা মার কাছে এসে আছে শুনে অনেকটা যেন নিশ্চিন্ত হল। কথাবার্ত্তা খুব বেশী কিছু হলো না, তবে পাশে বসেছিলাম অনেকক্ষণ।

খাওয়া দাওয়া সেরে রাত্রে আমার ঘরে এসে দেখি—আমার টেবিলে একখানি নীল রং-এর চিঠি চাপা দেওয়া হয়েছে। চিঠিখানি হাতে করেই দেখলাম—সুধার চিঠি।

মোটামুটি সুধা লিখেছে যতশীঘ্র সম্ভব আমি যেন যাই ফিরে, সে আর একলা থাকতে কিছুতেই পারছে না। বরুণের বিষয়ও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অনেক কথা লিখেছে—কি রকম দুষ্টু হয়েছে সে ইত্যাদি—

তখনই সুধাকে চিঠি লিখতে বসলাম। বেশ বড় করে গুছিয়ে একখানা চিঠি লিখলাম। মোটের উপর এই কথাটাই বিশেষ করে বুঝিয়ে দিলাম—আমি M. R. C. P. পরীক্ষা দেওয়ার জন্য তৈরী হচ্ছি, বিশেষ কঠিন পরীক্ষা, কাজেই আমাকে আরও বছর দেড়েক থাকতেই হবে। অত বড় সম্মান নিয়ে দেশে ফিরলে সে গৌরব দেশে সুধারই যে হবে সবচেয়ে বড় ইত্যাদি ইত্যাদি—

চিঠিখানি শেষ করে একটা হালকা মন নিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লাম—সঙ্গে সঙ্গে সব কথা তলিয়ে গিয়ে মনটা ভরে উঠল মার্লিনকে নিয়ে, সে কথা সরল ভাবেই তোমার কাছে স্বীকার করি বুলা। মার্লিন আবার এলো ফিরে আমার জীবনে। কিন্তু মানুষের মনের বিচিত্র গতির কূল কিনারা মানুষ কোনও দিনই পায় না—শুয়ে অবশ্য কিছুক্ষণের মধ্যেই কথাটা হাড়ে হাড়ে টের পেলাম।

ইতিমধ্যে কখন যে আমার মনের কোন অজানা কোণে মেঘ ঘনিয়ে উঠেছিল—কিছুই ত টের পাইনি। শুয়ে, অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই বুঝতে পারলাম, ক্রমে মেঘ সমস্ত মনখানা দিয়েছে ছেয়ে, কেন এই মেঘ এলো—কিছুক্ষণ কোনও কারণ খুঁজে পেলাম না।

তুমি আমাকে ছেড়ে চলে যাবে না ত?—মার্লিনের এই কথাটি হঠাৎ চমকে ওঠা বিদ্যুতের মতন ভেসে উঠল মনে। তাই ত? একদিন ত যেতেই হবে দেশে ফিরে—তখন? একটা গভীর হতাশার অন্ধকারে মেঘ যেন আরও উঠল ঘনিয়ে। মনটাকে নানা দিক দিয়ে নানা যুক্তির হাওয়ায় মেঘ কাটিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতে লাগলাম—কিন্তু ফল কিছুই হলো না। ভাবলাম—দেশে ফিরে গিয়ে M. R. C. P.-র টাকার অভাব হবে না—প্রত্যেক বছরে না হয় এ দেশে মার্লিনকে যাব দেখে। কিংবা টাকার দিকটা একটু সচ্ছল হলে এসে মার্লিনকে নিয়ে যাব আমার দেশে—আমাদের দুজনার জীবন ধারা লোক চক্ষুর অন্তরালে মিশে পাহাড় ঘেরা গভীর বনভূমির মধ্যে একটা ঝর্ণার মতন কুলকুল শব্দে যাবে বয়ে নিজেরই পরিপূর্ণ আনন্দে। কিন্তু কৈ—মন ত কিছুতেই কোনও কথা মেনে নিতে রাজী হল না—মেঘ কেটে গেল না ত? শেষ পর্য্যন্ত—এখনও ত দেড় বছর বাকি দেখা যাবে পরে—এই ভেবে মনটাকে চাপা দেওয়ার চেষ্টা করলাম। চাপা দিতে পেরেছিলাম কিনা মনে নাই। তবে একটা হাল্কা মন নিয়ে শুয়েছিলাম, একটা ভারি মন নিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম—মনে আছে।

পরের দিন সকালবেলা ঘুম ভেঙ্গেই মনটা কিন্তু আবার উৎফুল্ল হাল্কা মনে হল পাশেই ত রয়েছে মার্লিন। কাল রাত্রের কথাগুলি যে ভুলে গিয়েছিলাম—তাও না। একে একে সবই পড়ল মনে। কিন্তু আশ্চর্য্য। আজ আর মনে মেঘ নেই আলোয় ঝলমল করছে। একদিন নয় দুদিন নয়, এক মাসও নয়—দেড় বছর এখনও বাকি। দেড় বছর মানে—প্রায় পাঁচশ পঞ্চাশ দিন।

পরম উৎসাহে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লাম।

* * * *

সকালের কাজকর্ম্ম সেরে মার্লিনের কাছে খানিকক্ষণ বসে যখন নিজের ঘরে ফিরে যাচ্ছি—ডাঃ নায়ারের সঙ্গে দেখা হলো। তিনি আমার সঙ্গে দেখা করার জন্যই আমার ঘরের দিকে যাচ্ছিলেন। আমাকে দেখে হেসে বললেন, তোমার বিষয় কথা বলে এলাম। ওঁরা খুশী মনেই রাজী হয়েছেন। মিঃ ব্লাক এখনও আছেন। তুমি নিজে গিয়ে একবার তাঁকে কৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানিয়ে এসো।

বললাম, তার আগে আপনাকে কৃতজ্ঞ ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। কি বললেন ওদের?

বললেন, বললাম—আমার পরামর্শে তুমি শেষ পর্য্যন্ত M.R.C.P. পরীক্ষা দেওয়াই ঠিক করেছ তাই এই হাসপাতালেই আরও ছ'মাস থাকতে চাও।

বললাম, সত্যি আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ রইলাম।

* * * *

আরও প্রায় সাত আটদিন পরে মার্লিন সুস্থ হয়ে উঠল—এলো তার বাড়ী ফিরে যাওয়ার দিনটি। আগের দিন সন্ধ্যেবেলা মার্লিন আমাকে বলেছিল বিকো, তুমি কিন্তু আমাকে বাড়ী পৌঁছে দেবে।

বললাম, নিশ্চয়। সে কথা আর বলতে—

বলল, আর কেউ নয় কিন্তু—

বললাম, ওরা যদি তোমাকে নিতে আসে?

শুধাল, ওদের কি কোনও খবর দেওয়া হয়েছে?

বললাম, না—গত দু'দিন ত কেউ টেলিফোন করেনি। শেষ আমার সঙ্গে মকটনের টেলিফোনে যা কথা হয়েছিল—তুমি ভালই আছ দুই চার দিনের মধ্যেই ফিরে যাবে আশা করি—এই পর্য্যন্ত।

বলল, তবে ঠিক আছে।

বললাম, তুমি ফিরে যাচ্ছ, তোমার মাকে ত একটা খবর দেওয়া উচিত।

বলল, না মা, মাকে একেবারে অবাক করে দেব।

বলতে ভুলে গিয়েছি ডাঃ গ্রেহাম টেলিফোনে মার্লিনের বিষয় খবরাখবরের ভার আমার উপরই দিয়েছিলেন। তাই মার্লিনের বিষয় কেউ খবর জানতে চাইলে, আমাকেই ডেকে দেওয়া হত।

মার্লিন শুধাল, ওরা দেখতে আসতে চায়নি?

বললাম, হ্যাঁ, কিন্তু আমি তেমন আস্কারা দিইনি।

মুখে একটু মৃদু হাসি খেলে গেল। শুধাল, কেন?

হেসে বললাম, ডাক্তারদের রোগীকে সব কথা বলতে নেই।

বলল, তুমি দুষ্টু।

* * * *

পরের দিন বেলা পাঁচটা আন্দাজ মার্লিনকে নিয়ে যাওয়ার কথা—বেলা বারোটা আন্দাজই টেলিফোন এলো। মকটনের টেলিফোন। মার্লিন ভাল আছে শুনে শুধাল, আজ সে একবার দেখা করতে আসতে চায়—কোনও বাধা আছে কি না?

কি আর বলি! সত্য কথা বললে—মকটন, টম্ ওরাই আসবে নিতে, আমি সঙ্গে গেলেও হয়ে থাকব গৌণ। মার্লিনও ত তা চায় না। তাই বোধ হয় বলে ফেললাম, আজকের দিনটা যাক—না হয় কাল পরশু আসবেন।

পাঁচটার সময় মার্লিনকে বাড়ী নিয়ে যাওয়ার জন্য তৈরী হলাম। ট্যাক্সি এসে দাঁড়িয়েছে দরজায়। ডডিংটনে ট্যাক্সি পাওয়া যায় না—তাই সকালবেলা আমিই মার্চ্চে টেলিফোন করে ট্যাক্সির বন্দোবস্ত করেছিলাম। বুঝা! শুনলে হয়ত একটু অবাক হবে—যদিও এদেশের অনেকেরই মোটর গাড়ী আছে তবুও ভাড়া করার মতন গাড়ী এদেশের গ্রাম্য-অঞ্চলে সহজে পাওয়া যায় না। মার্চ্চেও মাত্র একখানি ছোট অষ্টিন গাড়ী ভাড়া খাটে—তাও আগে থেকে বন্দোবস্ত করতে হয়।

মার্লিনকে নিয়ে উঠলাম গাড়ীতে—চলল গাড়ী। গাড়ী চলার সঙ্গে সঙ্গে মার্লিন মাথাটি এলিয়ে রাখলো আমার বাঁ কাঁধের উপর—আমার বাঁ দিকেই সে বসেছিল। ক্রমে মাথাটি আর একটু নেমে আশ্রয় নিল আমার বুকের উপরে—চোখ দুটি গেল বুজে। আমি বাঁ হাত দিয়ে মার্লিনকে জড়িয়ে বসে রইলাম—দু একবার আমার মুখটি রেখেছিলাম নীচু করে মার্লিনের মাথার উপরে। ডাকলাম লীনা!

ছোট একটু জবাব এল, উঃ!

বললাম, মকটন যে টেলিফোন করেছিল।

কোনও উত্তর দিল না—চোখ বুজে সেই ভাবেই রইল। মকটনের সঙ্গে টেলিফোনে কথাবার্ত্তার বিষয় বললাম। শুনে আস্তে শুধু বলল, বেশ করেছ।

বললাম, কিন্তু যখন টের পাবে—আজই তোমায় নিয়ে ফিরে যাচ্ছি।

শুধু বলল, পায়—পাবে।

আমিই বললাম, তখন না হয় একটা কৈফিয়ৎ দিয়ে দিলেই হবে। বললেই হবে—হঠাৎ ঠিক হল। কি বল?

কোনও জবাব পেলাম না। ঠিক সেইভাবে রইল চোখ বুজে। আরও দু'একটা কথা বলে জবাব না পেয়ে মুখের দিকে চেয়ে ভাবলাম—ঘুমিয়ে পড়ল নাকি?

বুঝা! আমার বুকে এলিয়ে পড়া রোগজীর্ণ মলিন মুখখানির দিকে চেয়ে ক্রমে একটা অভূতপূর্ব্ব মায়া, কেমন যেন একটা করুণাভরা দরদ সমস্ত প্রাণভরে অনুভব করলাম—ঐ মুখখানির প্রতি।

মনে হল—আমিই ত সারা জগতের মধ্যে সেই মানুষটি যার বুকে সে আজ নিয়েছে আশ্রয়—একটা পরম নিশ্চিন্ত বিশ্রাম।

[ক্রমশঃ

অসুখ সারে না

পৃথ্বীশ সরকার

এ পৃথিবীতে যাদের একান্ত সুখী মনে হয়
তাদের অসুখ আছে, তাদেরও কিছু কিছু ভয়
মনে মনে কাজ করে চিন্তাকে এলো-মেলো করে
তাদেরও মনে হয়—অসুস্থ দেহ যেন জ্বরে।

তাদেরও মনে হয়—পৃথিবীর হোল কি হঠাৎ,
পাখায় বাতাস নেই, ভীষণ গুমোট এই রাত—
অথবা গরম দিন, রদ্দুরে জ্বালা ধরে প্রাণে—
'আবহাওয়া ভালো নয়'—ভেবে নেয় এর বুঝি মানে।

কোলকাতা কেউ কেউ ছেড়ে পাহাড়ের কোন দেশে
দারজিলিং অথবা কোন সমুদ্র পারে এসে
হৃদয় জুড়াতে চায়। সেরে যায় হয় তো অসুখ
কিছুদিন ভরে যায় শান্তিতে সকলের বুক।

সময় ফুরিয়ে গেলে যখন কোলকাতায় ফেরে
মনে হয় তারা সুখী অসুখ গিয়েছে বুঝি সেরে
আত্মীয়-স্বজনেরা এবং বন্ধুরাও বলে
'শরীর হোয়েছে বেশ এ'কদিন প্রবাসের ফলে।'

হয় তো শরীর সারে, তবুও অসুখ কিছু থাকে
হৃদয়ের 'পরে তার মৃদু যন্ত্রণা ছেয়ে রাখে
আর না জানা অসুখে বিষণ্ণ যদিও হৃদয়—
তবু কিছু কিছু লোক আছে যারা সুখী মনে হয়।

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

ডক্টর এক্স
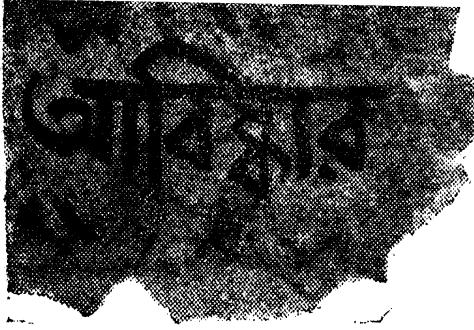
বর্ষা সন্ধ্যার সেই দিনের পর চার মাস কেটে গেছে। হষ্টেলে, নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে কমল চারিদিক পরিষ্কার করছিল।

কমলের নিমন্ত্রণে আজ রমা হষ্টেলে কমলের ঘর দেখতে আসতে রাজী হয়েছে, তাই কমলের এ উৎসাহ! সন্ধ্যাবেলা কমল রমাকে ও তার ভাইকে সঙ্গে করে নিয়ে আসবে; এই কথা আছে! বিকাল হয়ে এসেছে তাই কমল তাড়াতাড়ি করছে।

টেবিলের বই আর আলনার জামা-কাপড় ঠিক করে রেখে, দেয়াল-আলমারীটার ভেতর পরিষ্কার করতে গিয়ে কমল সমরের লেখা বহু পুরাতন একটা চিঠি পেল।

চিঠিটা হাতে নিয়ে কমলের মনে পড়ল, গত চার মাস সে সমরের কথা একেবারে চিন্তা করেনি। রমার সাহচর্য্যের সুখে মগ্ন কমল, তার জীবনের সবচেয়ে বড় পবিত্র দায়িত্বকে নিষ্ঠুরভাবে অবহেলা করেছে!

এই নগ্ন সত্যকে সামনে দেখে কমলের সব উৎসাহ তাকে নিঃশেষে ত্যাগ করে গেল। খোলা জানলা দিয়ে নিচের রাস্তার দিকে কমল একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। ঐ পথেই আজ রমার চরণচিহ্ন পড়বার কথা। ঐ পথ দিয়েই গত চার মাস কমল প্রত্যহ রমাদের বাড়ী গেছে।

সেখানে কত শান্তি! কত নিশ্চিন্ততা! কমলের অপেক্ষা করেছে। গত কয়মাসের স্মৃতি চলচ্চিত্রের মত কমলের মনে ভেসে উঠতে লাগল।

—আজ আপনাকে হারাব। এত দেরী করলেন যে?

—একটা ক্লাশ ছিল, তাই ছুটি হতে দেরী হল।

—আমরা এলাহাবাদে মিউজিক কনফারেন্স-এ যাচ্ছি, কিছুদিন হয়ত আর আপনার সঙ্গে দেখা হবে না। হাসছেন যে আমার কথা শুনে!

—হয়ত দেখা হতেও পারে।

—আপনিও যাবেন? টিকিট কিনেছেন?

—টিকিট আমার লাগবে না। আমি ওখানে বাঁশী বাজাব, একটা পাশ পাব। —

বলেননি? অথচ ফাঁকি দিয়ে আমার গান শুনে নিয়েছেন।

—সব কথা কি বলতে আছে?

—আপনাকে এই অপরাধের শাস্তি নিতে হবে।

—আপনাদের কাছে শাস্তি নেব এ আর বড় কথা কি।

—আজ আপনাকে এখানে খেতে হবে, আর রাত্রে আমি আপনার কাছে বাঁশী শুনব।

—অনেক রাত্রি হল খেতে, আপনার অসুবিধা হল।

—অসুবিধা কেন হবে হষ্টেলে তো এর চেয়েও বেশী রাত্রে খাই।

—রান্না কেমন লাগল?

—খুব ভাল।

—চলুন ড্রয়িংরুমে যাই।

—ড্রয়িংরুমের চেয়ে বাইরে বাগানে বসলে ভাল হয় না?

—তাই চলুন তবে।

—আসুন, এই গাছটার নীচে বসি, জায়গাটা বেশ ভাল। আপনার কি শীত লাগছে? আমার চাদরটা নিন ভাল করে গায়ে জড়িয়ে বসুন।

—সে কি? না-না—

—না বলবেন না। আমার কিছু অসুবিধা হবে না। বাঁশী বাজাবার সময় আমি এমনিই গায়ে চাদর রাখি না। অস্বস্তি লাগে আমার। এই ঠিক হয়েছে। এবার বাজাই তাহলে?

—চমৎকার বাজান আপনি। এত সময় কেটে গেল কিছু বুঝতেই পারলাম না।

—কি বাজালাম বলুন তো?

—আড়ানা মনে হল যেন।

—না, এটা নায়কী কানাড়া—আড়ানার সঙ্গে খুই সামান্যই তফাৎ আছে।

—আরও একটা কিছু বাজান মিষ্টার সেন, আমার বড় ভাল লাগছে শুনতে।

হাসি গানে আনন্দে কত সন্ধ্যা কত রাত্রি এ ভাবে কমলের কেটেছে! এক নারীর সঙ্গ এত আনন্দ এত সুখ তাকে কেন দিল?

কেন এই চার মাস কমল ক্লাশের লেক্‌চারে মন দিতে পারত না, একলাইনও নোট লিখত না? কেন সে কেবলই ভাবত কখন পাঁচটা বাজবে—কখন ক্লাশ শেষ করে সে রমাদের বাড়ী যাবে? কেন তার মন শুধু এই কথা ভেবে ভরে উঠত যে পাঁচটা বাজবার আশায় হয়ত একজন তারই মত উৎকণ্ঠ প্রতীক্ষায় ঘর-বার করছে?

বর্ষণ মুখর কত সন্ধ্যায় কমল একজনের পাশে চুপ করে বসে থেকেছে বার বার চেষ্টা করেও একটা কথা সে বলতে পারেনি তবু কেন সেই নিস্তব্ধতায়ও তার হৃদয় আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠেছে?

সরোদের চড়া সুরে বাঁধা তারের ঝংকারের মত কেন সামান্য সুখে তার মন ভরে উঠেছে সামান্য ঈর্ষ্যায় তার চোখে জল এসেছে?

লজ্জা, সঙ্কোচ, আনন্দ ঈর্ষ্যা সুখের রংএ এই যে ছবি গত কয় মাসে কমলের মনে একটু একটু করে সম্পূর্ণ হয়েছে তার দিকে তাকিয়ে কমলের চোখ জলে ভরে এল।

অমূল্য এই চিত্র আজ তাকে স্বহস্তে নষ্ট করতে হবে, না হলে এর সর্বনাশা মোহ থেকে সে কিছুতেই নিজেকে মুক্ত করতে পারবে না।

চার বছর আগে কমল নিজের রূপরসগন্ধপূর্ণ জীবনকে একদিন স্বহস্তে ধ্বংসের পথে ঠেলে দিয়েছিল। আজ আবার তারই পুনরাবৃত্তি হবে। সেদিন কমল নষ্ট করেছিল তার ভবিষ্যত—তার আশা আজ তাকে নষ্ট করতে হবে তার ভালবাসা।

কমল যখন রমাদের বাড়ী পৌঁছাল তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। তাকে দেখে রমা কলরব করে উঠল আসুন আসুন কতক্ষণ থেকে আপনার জন্য আমরা বসে আছি। এখন আপনার সঙ্গে গিয়ে আর কি দেখব?

ব্যথিত স্বরে কমল উত্তর দিল আপনার সঙ্গে দু' একটা কথা আছে এই পাশের ঘরে একটু আসবেন?

—খুব প্রয়োজনীয় কথা?

—হ্যাঁ।

—কি হয়েছে মিষ্টার সেন, আপনি আজ এত গম্ভীর কেন?

একটু চুপ করে থেকে কমল বলল আচ্ছা, আমার ব্যবহারে, আপনাদের আতিথ্য কি কোন দিন ক্ষুণ্ণ হয়েছে? আমি কি কোন দিন, কোন প্রকারে আপনার অমর্য্যাদা করেছি?

—না কোন দিন না। আপনার মত বন্ধু আমরা কখনও পাইনি।

—আপনি আমায় যা সম্মান দিলেন, আমি তার যোগ্য নই। আমি নিজের উপর বিশ্বাস হারিয়েছি। এখানে আসা আর আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। আপনি বুদ্ধিমতী আমার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখুন হয়ত বুঝতে পারবেন কেন একথা বলেছি।

—বুঝতে পেরেছি মিষ্টার সেন আমার বড় কষ্ট হচ্ছে। আমি—

—না আর কোন কথা নয় এবার আমি যাই।

প্রায়ান্ধকার ঘর হতে বার হয়ে তারা দু'জনে শীত সন্ধ্যার জ্যোৎস্নালোকে ভরা বারান্দায় এসে দাঁড়াল।

জ্যোৎস্নাস্নাত পথের উপর সামনের বাড়ীর ছায়া, বেত্রাহত বন্দীর মত পড়ে আছে।

গলির মোড়ের বড় গাছটা প্রহরীর মত তাকে দেখছে।

যে রসধারা পৃথিবী প্লাবিত করছে তার একবিন্দুও সে যেন এই মুমূর্ষু বন্দীকে গ্রহণ করতে দেবে না।

ঈষৎ শীত বাতাসে রমার চূর্ণালকগুচ্ছ তার মুখের উপর এসে পড়েছে শ্বেতপদ্মের মত সুকুমার কোমল সেই মুখের দিকে তাকিয়ে কমলের মনে হল, এতক্ষণ যা ঘটে গেল, গত চার মাস যা ঘটেছে তা যেন তার নিরবচ্ছিন্ন দুঃখময় জীবন রাত্রের এক সুখ স্বপ্ন মাত্র।

স্বপ্ন ঘোরাচ্ছন্নের মত সামনে এক পা বাড়াতে কমলের মনে হল সামনের থামে হেলান-দেওয়া অমর ভাস্কর গঠিত মর্মর মূর্ত্তির মত নারীর আর তার মধ্যে অতি সূক্ষ্ম কঠিন এক প্রাচীর যেন সেই মাত্র গড়ে উঠেছে। তীক্ষ্ণ তরবারির সূক্ষ্মাগ্রের কাঠিন্যের মত তাকে অতিক্রম করবার সাধ্য কমলের নেই।

রাত্রি গভীর হয়ে এসেছে। উদ্দেশ্যহীন উন্মত্ত এক আবেগে কমল অনেকক্ষণ পথ চলেছে আর সে চলতে পারছে না।

সর্বকালের সুখ দুঃখ হাসি কান্নার সাক্ষী, জনহীন সেই ধূলায় কমল আবিষ্টের মত বসে পড়ল।

রাস্তার আলো নিভে গেছে। দু পাশে গাছের ফাঁকে ফাঁকে জ্যোৎস্না এসে পড়েছে। আলো আঁধারীর মায়া-ঘেরা শান্ত নিস্তব্ধ রাত্রি অতন্দ্র চোখ মেলে সেই নির্ব্বাক দুঃখের মর্মান্তিক অভিনয় দেখতে লাগল।

শীত যাই যাই করছে। আকাশে বাতাসে নববসন্তের আগমন ধ্বনির চঞ্চলতা। দুই মাস হয়ে গেল কমল রমাকে ছেড়ে এসেছে।

অতি মধুর, সুন্দর কোন পরিবেশকে নির্মম ভাবে ধ্বংস করে আসার এক বেদনাদায়ক স্মৃতি যেন এ দুই মাস কমলকে বিকারগ্রস্তের মত ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে।

আতপ্ত বসন্তবায়ুর যে স্পর্শে পৃথিবীর জড়তা দূর হয়েছে সেই স্পর্শ কমলের আচ্ছন্নতাও যেন একদিন জোর করে ভেঙ্গে দিল।

সদ্যমোহনিদ্রোত্থিত রোগীর মত, কমল তার চারি দিকে চেয়ে দেখতে লাগল। তার ঘরের ক্ষুদ্র পরিধির মাঝেও মহাকালকে কে যেন ভরে দিয়েছে। অসীমতার ছায়ায় কমল যেন আর কোন দিন নিজের ব্যক্তিত্বকে খুঁজে পাবে না। যে আবেগ, যে উত্তেজনা তাকে এতদিন চালিয়ে নিয়ে এসেছে, সে আবেগ, অনন্ত মহাসাগরের মাঝে বুদ্বুদের মত যেন নিঃশেষে কোথায় মিলিয়ে গেছে।

সামনের টেবিলের স্তূপাকার বইগুলির দিকে তাকিয়ে কমলের আসন্ন পরীক্ষার কথা মনে পড়ল।

বইগুলি দেখতেও তার ভয় করছে। পরীক্ষায় সে এবার কোনক্রমেই পাশ করতে পারবে না।

কিন্তু পাশ করতে না পারলে কি হবে? কে তাকে আর ছয় মাস পড়ার খরচ দেবে?

সময়ের কি হবে? সে যে তার পাশ করার ওপরই নির্ভর করে আছে। আর সব মিথ্যা হয়ে, কমলের মুহূর্ত্তের দুর্বলতাই কি তার জীবনে সত্য হয়ে থাকবে?

খোলা জানলা দিয়ে আসা হাওয়ায় একটা কাগজের টুকরো টেবিলের উপর হতে কমলের পায়ের কাছে এসে পড়ল।

ফাইনাল ইয়ার ষ্টুডেন্টরা সকলেই সেটা কিছুদিন আগে পেয়েছিল। কাগজটা মিলিটারী মেডিকেল স্কলারশিপের জন্য দরখাস্তের ফর্ম্ম। সেটা দেখে আশায় আনন্দে কমলের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ঈশ্বর পথনির্দেশ করেছেন। এ স্কলারশিপ নিয়েই তাকে আজকের সমস্যার সমাধান করতে হবে।

একটা প্যাথলজিকাল পোষ্টমর্টেম দেখে কমল যখন হষ্টেলে ফিরল তখন বেলা একটা বেজেছে। আজ আর খাবার সময় হবে না।

এখনই ক্লিনিকাল সার্জ্জারীর ক্লাশে যেতে হবে।

নোটবুক বদলে নেবার জন্য নিজের ঘরের দরজা খুলতে কমল মেঝেয় পড়ে থাকা দুটা চিঠি পেল।

মিলিটারী স্কলারশিপ নেবার আগে সময় আর মিসেস সেনের সম্মতি চেয়ে কমল চিঠি লিখেছিল, সে চিঠিরই বোধ হয় জবাব এসেছে।

চিঠি দুটি এ্যাপ্রণের পকেটে ভরে; খাতা নিয়ে কমল ক্লাশে

চলে গেল। লেকচার থিয়েটরে গিয়ে যখন কমল পৌছাল তখনও প্রফেসর আসেননি। লেকচার থিয়েটার আণ্ডার-গ্র্যাজুয়েট এবং পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট ষ্টুডেণ্টে প্রায় ভরে এসেছে।

সার্জ্জারীর এই প্রফেসর চমৎকার লেকচার দেন তাই বাইরে থেকে পর্য্যন্ত লোক তাঁর লেকচার শুনতে আসে।

হাউস সার্জ্জনকে জিজ্ঞাসা করে কমল জানল, চারটি কেস দেখান হবে।

কিডনী টিউমার—ক্যানসার ব্রেষ্ট—অষ্টিয়োজেনিক সারকোমা আর ক্যানসার প্রষ্টেট।

চারটে কেসই কমলের দেখা। তাই সামনের বেঞ্চে জায়গা নেবার চেষ্টা না করে কমল পেছনের বেঞ্চে গিয়ে বসল।

প্রফেসর এলেন তখনই। সমস্ত ক্লাশ নিস্তব্ধ হয়ে গেল। হাউস সার্জ্জন ফাইনাল ইয়ার ষ্টুডেণ্টদের এ্যাটেনডান্‌স নিতে আরম্ভ করল। কমলের রোল নম্বর তিন। এ্যাটেনডান্‌স দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে কমল পকেট হতে চিঠি দুটা বার করে পড়তে আরম্ভ করল।

প্রথমে সমরের চিঠিটা সে পড়ল।

সমর তাকে মিলিটারীতে যেতে বারণ করেনি। শুধু একটু বিবেচনা করে কাজ করতে লিখেছে কারণ তার মতে কমলের ভবিষ্যত শুভাশুভের প্রশ্ন এখানে জড়িত।

সমরের কাছে এরকম চিঠিই কমল আশা করেছিল। কোন দিন সে কমলের কোন কাজেই বাধা দেয়নি।

মিসেস সেন লিখেছেন: কমল, তুমি কেন যুদ্ধে যেতে চাইছ তা আমি জানি না, কিন্তু আমি জানি আমি কেন তোমায় একাজে অনুমতি দিচ্ছি।

তুমি আপনা হতে না লিখলে, এরকম একটা কিছু করবার জন্ত অনুরোধ করে হয়ত আমাকেই তোমায় চিঠি লিখতে হত।

তুমি যেদিন মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হয়েছিলে সেদিন এ সংসারের দুরবস্থার কথা সমরকে জানিয়ে, তোমাদের জন্ত তাকে চাকরী করতে আমি বাধ্য করেছিলাম। হয়ত এতে তার ক্ষতি হয়েছে, কিন্তু সেদিন এ ছাড়া আর কোন কিছু করবার আমার উপায় ছিল না। তবু, আজও আমার সে কাজের কোন ফলই আমি পাইনি। সেদিনকার দুরবস্থা আজ রিক্ততার সীমায় এসে পৌছেছে। আজ আমার এমন সম্বল নেই যা দিয়ে আমি আমার মেয়ের চিকিৎসা করাই। তোমায় কিছুদিন আগে আমি মীরার অসুখের কথা লিখেছিলাম। তখন এর গুরুত্ব বোঝা যায়নি। মীরা কিছুদিন হতে চোখে কম দেখছিল। চোখের ডাক্তারকে দেখানতে তিনি বলেছেন বেরিবেরিতে ওর চোখ খারাপ হয়েছে। ইন্‌জেকশন না নিলে আর ভাল করে চিকিৎসা না করালে ও অন্ধ হয়ে যেতে পারে। ওকে প্রায় চল্লিশটা ইনজেকশান নিতে হবে।

এতদিন মীরার হাতের বালা বিক্রি করে আমি ওর চিকিৎসার খরচ চালিয়েছি, এখন সে অর্থও শেষ হয়েছে। তাই আর কোন উপায় না দেখে একহাতে চোখের জল মুছে অন্ত হাতে আমি তোমায় এ চিঠি লিখছি। তুমি টাকা পাঠালে তবে মীরার ইন্‌জেকশনের ওষুধ কেনা হবে। মা হয়ে, কেবল অর্থের জন্ত, নিজের সুবিধার জন্ত ছেলেকে যুদ্ধে পাঠাচ্ছি আজ এ কথাই সকলে বুঝবে, কিন্তু আমি জানি তুমি আমায় ভুল বুঝবে না। আশীর্ব্বাদ করি কোন দুঃখই কোন দিন তোমাকে যেন নীচ না করে। আজ আমার চিঠি পড়ে তোমার হৃদয় যেমন বিচলিত হবে, ভবিষ্যতে সকলের দুঃখেই তোমার হৃদয় যেন সে ভাবেই ব্যথিত হয়। ব্যথিত মানবাত্মার কল্যাণে তুমি যেন আপনাকে উৎসর্গ করতে পার।

চারজন আগেই বণ্ডে সই করেছিল। মার চিঠি পেয়ে কমলও সই করল।

আশ্চর্য্য মানুষের মন। বণ্ডে সই করতে করতে কমলের তিন বছর আগের একটি দিনের কথা মনে পড়ল। সেদিন সমরের রিসার্চ্চ পেপারের কয়েকটি কপি করাবার প্রয়োজন হয়েছিল। পেপার টাইপ করাবার জন্ত অর্থ সংগ্রহের চেষ্টায় সেদিন কমলকে লক্ষ্ণৌ-এর পথে পথে ঘুরতে হয়েছিল।

দশ টাকার দরকার ছিল, কিন্তু দশ পয়সা তখন তার পকেটে ছিল না।

সারাদিন চেষ্টা করেও অর্থসংগ্রহ করতে না পেরে কমল তার কাছে রাখা, ডাঃ সেন-এর স্মৃতিচিহ্ন, তাঁর সোনার পকেট-ঘড়ির ডালা খুলে বিক্রি করেছিল। সেই অর্থে সমরের রিসার্চ্চ পেপার ছাপান হয়েছিল। ঘড়িটা আজও তার কাছে আছে—আজও সেটা ঠিক করান হয়নি। অনেক টাকা আজ কমল পেয়েছে—এত টাকা সে একসঙ্গে কখনও দেখেনি! দেখেনি বলেই বোধহয় ভাঙ্গা ঘড়িটার মত জীবনের সেই নিরাভরণ দরিদ্র দিনের কথা আজ তার মনে পড়ছে।

কমলের জীবনে এবার হয়ত আভরণ আসবে কিন্তু ডাঃ সেনের ঘড়িটা আর সে কোন দিন সারাবে না।

ঐ ভাঙ্গা ঘড়ি, কমলের জীবনসংগ্রামের বহু সাক্ষীর মধ্যে একটি হয়ে চিরদিন তার সামনে থাকবে।

কমলের সই হয়ে যাবার পর অন্ত কয়েক জন ছেলে বণ্ডে সই করল। তাদের কথায়, কমল তাদের সঙ্গে কার্লটন হোটেলে লাঞ্চ খেতে আর বিলিয়ার্ড খেলতে গেল।

লাঞ্চ খাওয়ার পর বিলিয়ার্ড রুমে এসে বসে কমল চুপ করে অন্তদের খেলা দেখতে লাগল। অনেকক্ষণ খেলা হল। কেউ খেলল, কেউ খেলা দেখল কিন্তু কমল একই ভাবে বসে রইল। মার্কারের উপদেশ—বিলিয়ার্ড বলের শব্দ—ছেলেদের উত্তেজনা, হাস্য পরিহাস সবই যেন কমলের কাছে অর্থহীন মনে হতে লাগল।

তার জীবন যেন নিস্তরঙ্গ হ্রদের মত শান্ত হয়ে এসেছে!

এক অদৃশ্য শক্তি, বিলিয়ার্ডের চেন ক্যাননের মত তাকে যেন কেবলই এক থেকে অন্য দুঃখে নিয়ে যাচ্ছে।

অর্থ, সম্পদ, দুঃখ, শোক, আশা, আনন্দ, সবেরই যেন আজ তার কাছে একমূল্য!

যে আবেগ, যে উত্তেজনার আশায় সে এখানে এসেছিল তাও তো সে পেলনা! এ বিলাস, এ প্রাচুর্য্যের মাঝে এমন কিছুই তো তার মনে দাগ কাটল না, যা ক্ষণকালের জন্তও অন্তত তাকে এ দুঃখের সাগর হতে উদ্ধার করতে পারে! খেলা শেষ হয়ে এসেছে।

কমলের এক বন্ধু খানিকটা বিয়ারের অর্ডার দিয়ে এসে কমলের পাশে বসল। বিয়ার এলে সে এমন ভাবে তা পান করতে লাগল যেন এটা তার কাছে নিত্যকার ব্যাপার।
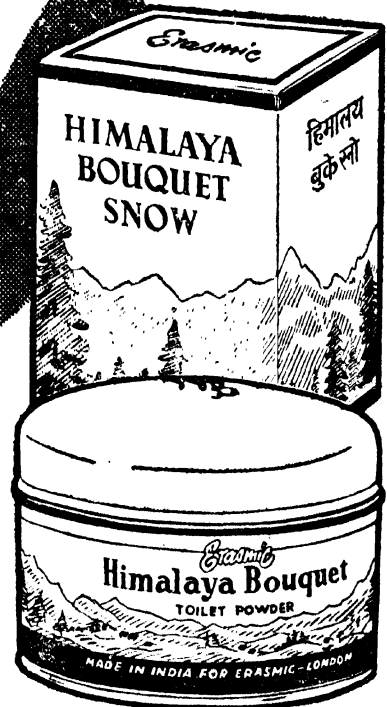
বিদায় থেয়ে সে কমলের কাছে স্ত্রীঘটিত ব্যাপারের এমন এক প্রস্তাব করল যা ভাষায় ব্যক্ত করা যায়না!

সে কথা শুনে কমল বিদ্যুত্তাহতের মত চমকে উঠল! এ জন্তই কি সে এখানে এসেছিল? এ পথ দিয়েই কি সে তার প্রার্থিত আবেগ উত্তেজনা পেতে চেয়েছিল?

অতর্কিত আঘাতে মুহ্যমান চোখের সামনে যেমন করে সব মিলিয়ে যায় তেমন করেই অত্যুজ্জ্বল আলোয় ভরা বিলিয়ার্ড রুমের সাজসজ্জা, লোকজন সমস্ত কমলের সামনে হতে মিলিয়ে গেল।

তার সেই অস্পষ্ট দৃষ্টির ক্ষেত্রে একটু একটু করে মিসেস সেনের চিন্তাক্লিষ্ট, বিষণ্ণ মুখের ছবি ভেসে উঠল।

সে মুখের নীরব অভিযোগের সঙ্গে কমলের হৃদয়ে অন্তস্তল হতে যে নিরবচ্ছিন্ন ধিক্কার উঠতে লাগল তার তাড়নায় কমল দু'হাতে মুখ ঢেকে টলতে টলতে ঘর হতে বার হয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়াল।

মিসেস সেন হয়ত এখন তার টাকার আশায় ঘর বার করছেন। তার পাঠান টাকা পেলে তবে তিনি মীরার জন্ত ওষুধ কিনতে পারবেন।

এখনই কমল তার কাছে যা কিছু আছে সব মিসেস সেনকে পাঠিয়ে দেবে।

দ্বিপ্রহরের উজ্জ্বল সূর্য্যালোক ধরণী প্লাবিত করছে। মুখ হতে হাত সরিয়ে সেদিকে দেখে কমলের মনের গ্লানি, মালিন্ত যেন নিঃশেষে দূর হয়ে গেল।

কঠিন, স্বচ্ছ এবং আলোকেরই মত তার মন আজ সংশয়মুক্ত হয়েছে!

এই প্রথম অনেক নীচে নেমেছিল বলে, তার আদর্শের উচ্চতার সম্পূর্ণ যথার্থ ধারণা কমল করতে পেরেছে!

কোন দিন কোন ছলেই ভুল পথে আর তার পা পড়বে না।

কমলের ফাইনাল ইয়ার পরীক্ষার আর দেরী নেই। মিলিটারী স্কলারশিপের চেষ্টায় ঘোরাঘুরি করে তার অনেক সময় নষ্ট হয়েছিল তাই প্রথম চেষ্টায় সে পাশ করতে পারেনি। এই দ্বিতীয় বার পরীক্ষায় পাশ করবার জন্ত কমল দিন রাত পরিশ্রম করছে। নষ্ট করবার মত একটু সময় তার হাতে নেই।

মিডওয়াইফারীর ক্লাশ শেষ করে সন্ধ্যা বেলা হষ্টেলে ফিরে কমল দেখল, একজন লোক তার অপেক্ষায় তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

কমলকে দরজা খুলে ঘরে ঢুকতে দেখে সে জিজ্ঞাসা করল—আপনার নামই কি কমলবাবু?

কমল উত্তর দিল—হ্যাঁ, আপনার কিছু দরকার আছে?

লোকটি বলল—আমি প্রফেসর এম, গুপ্তর কাছ হতে আসছি, তিনি আপনাকে এই চিঠিটা দিয়েছেন।

কমলকে চিঠি দিয়ে লোকটি চলে গেল।

ঘরে ঢুকে এ্যাপ্রণ্ আর বই টেবিলের উপর রেখে চিঠিটা খুলে কমল দেখল তাতে প্রফেসর গুপ্ত লিখেছেন, কমল যেন তাঁর বাড়ী গিয়ে, তাঁর মেয়েকে দেখে আসে। মেয়েটির সঙ্গে সমরের বিবাহের সম্বন্ধ হচ্ছে। কমলের মার চিঠি পেয়ে তিনি কমলকে নিমন্ত্রণ করছেন। যে কোন দিন বিকালে তাঁর ক্লে স্কোয়ারের বাড়ীতে গেলে কমলের সঙ্গে তাঁর দেখা হবে।

চিঠিটা পড়ে কমল অবাক হয়ে গেল।

বিবাহ করে কাউকে বাড়ী এনে বোঝা বাড়াবার মত অবস্থা তো তাদের নয়?

তবে কেন এ বিবাহের কথা উঠেছে?

এর নিশ্চয় কোন গুরুতর কারণ আছে।

কি সে কারণ, মেয়ে দেখবার আগে একথা এলাহাবাদ হতে কমলকে জেনে আসতে হবে!

পরদিন সকালের ট্রেণে কমলকে অকস্মাৎ বাড়ী আসতে দেখে মিসেস সেন জিজ্ঞাসা করলেন—কমল তুই হঠাৎ চলে এলি যেন? তোর একজামিনের তো আর বেশী দেরী নেই? গতবার তুই পাশ করতে পারিস নি এবারে পাশ করে ডাক্তার যে তোকে হতেই হবে। এ রকম করে সময় নষ্ট করলে কি করে পাশ করবি?

হাতের ব্যাগটা দালানে নামিয়ে রেখে কমল বলল—ওকথা থাক্ মা, আমার একটা প্রশ্নের জবাব দাও। লক্ষ্ণৌ-এর প্রফেসর গুপ্তর মেয়ের সঙ্গে কি তুমি সমরের বিয়ের সম্বন্ধ করছ?

—হ্যাঁ।

—কেন একাজ করছ, মা?

—টাকার জন্ত।

—টাকার জন্ত তুমি সমরের বিয়ে দেবে?

—হ্যাঁ দেব। মীরা বড় হয়েছে তার বিয়ে দিতে হবে। সে দেখতে সুন্দর নয় সেজন্ত তার বিয়েতে টাকার দরকার। সমরের বিয়ে দিয়ে টাকা না নিলে মীরার বিয়ের খরচ কোথা হতে আসবে?

—এ তুমি কি করেছ মা, এতে সমরের কি ক্ষতি হবে তা কি তুমি জান?

—জানতে চাই না আমি। মীরার বিয়ের চিন্তার চেয়ে এ জানার প্রয়োজন আমার কাছে বেশী নয়। আমি সমরকে এ কথা বলেছি। সে তো এতে আপত্তি করেনি। তোর এতে আপত্তি করবার কি আছে?

—আমার আপত্তির কি আছে? শোন মা, অর্থের প্রয়োজন ছাড়া সমরের সম্বন্ধে আর কিছু জানবার প্রয়োজন কোন দিন তুমি বোধ করনি, কারণ চির দিন তুমি এই জেনে এসেছ যে তোমার কোন কাজে সমর কোনক্রমেই বাধা দেবে না। এ জানার সুযোগ নিয়ে শুধু তুমি নয় অনেকে অনেক রকম অত্যাচার ওর ওপর করেছে, কিন্তু এবারে এর শেষ করতে হবে। সমরের উপর আর কোন অত্যাচারে আমি বাধা দেব। মীরার জন্তই যদি তোমার সমরকে এ ভাবে নষ্ট করবার প্রয়োজন হয়, তাহলে তারও উপায় আছে। সমরের পরিবর্ত্তে, মীরার বিয়ের জন্ত তুমি আমায় সামনে রাখ। তোমার এ ব্যবস্থা আমি মাথা পেতে নেব। এতে আমার ক্ষতির পরিমাণ হয়ত সীমা ছাড়িয়ে যাবে কিন্তু সমরের জন্ত সে ক্ষতির কোন প্রতিবাদ আমি কখনও করব না। এই শেষ বার আমি তোমায় বলছি মা, আমার সামনে সমরকে তুমি কিছুতেই নষ্ট করতে পারবে না—সমরকে নষ্ট করবার অধিকার তোমার নেই!

—আমি সমরকে নষ্ট করছি! তার ওপর আমার কোন অধিকার নেই! আমার ছেলে হয়ে, আমার সামনে দাঁড়িয়ে একথা তুই বলতে পারছিস ?

—তোমার ছেলে বলেই তো, একথা আমি বলতে পারছি। সমর যদি সাধারণ কেউ হত তাহলে ওর উপর অধিকার তোমার নিশ্চয়ই থাকত—কিন্তু ও যে কত বড়, ওর ওপর কত কি নির্ভর করছে, তার কল্পনাও তুমি করতে পারবে না—তাই পুত্রত্বের দাবী মাত্র নিয়ে ওর মত ছেলের ওপর কোন অন্যায় অধিকার স্থাপন আজ তুমি করতে পার না! সমরের মত ছেলের উপর অধিকার জোর করে আদায় করা যায় না মা, সে অধিকার অর্জন করতে হয়। সে চেষ্টা তুমি তো একদিনও করনি? মা, তোমার কথায় আমি প্রাণ দিতে পারি কিন্তু তোমার কোন কাজে সমরের উপর আঘাত পড়লে আমি তোমার বিরুদ্ধে দাঁড়াতেও দ্বিধা করব না। আজ হয়ত তুমি আমার কথায় মর্ম্মান্তিক আঘাত পাবে—কিন্তু যেদিন তুমি নিজের উত্তেজনা, ক্রোধ, দুঃখের উর্দ্ধে দাঁড়িয়ে আমার এই কথাকে বিচার করতে পারবে, সেদিন বুঝবে এ সত্য জানার প্রয়োজন তোমার জীবনে ছিল। অনেক ভুল, অনেক মিথ্যা অনেক অন্যায়ের হাত হতে ঐ সত্য তোমাকে রক্ষা করেছে।

অনেক খুঁজে অনেক জিজ্ঞাসা করে কমল যখন ক্লে স্কোয়ারে প্রফেসর গুপ্তর বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়াল তখন রাত্রি প্রায় সাতটা বেজেছে। লাল রং-এর বাংলো ধরণের বাড়ীর গেটে, প্রফেসর গুপ্তর নেম প্লেটের উপর পাশের রক্তকরবী গাছের ফুলে ভরা ডাল এসে পড়েছে।

গেট হতে লাল সুরকীর রাস্তা যেখানে পোর্টিকোতে মিশেছে সেখানে একটি উলসলে গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে।

বাড়ীর ভেতরে সুমিষ্ট স্ত্রীকণ্ঠে কেউ গান গাইছে—পথে সেই সুর ভেসে আসছে।

করবীর ডাল সরিয়ে নেম প্লেটটি একবার ভাল করে দেখে নিয়ে কমল গেট খুলে ভিতরে ঢুকল।

তাকে দেখে সামনের লন হতে একটি গ্রেট ডেন কুকুর গম্ভীর গলায় ডেকে উঠল।

যিনি গান গাইছিলেন, কুকুরের ডাক শুনে গান বন্ধ করে তিনি বললেন—রামলাল, দেখ তো বাইরে বোধহয় কোন লোক এসেছেন। তাঁর কথা শুনে ঝাড়ন কাঁধে একজন নেপালী চাকর বেরিয়ে আসতে কমল তাকে বলল—আমি মেডিকেল কলেজ থেকে প্রফেসর গুপ্তর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি, তিনি আমায় ডেকে পাঠিয়েছিলেন।

লনে পাতা বেতের চেয়ারে কমলকে বসিয়ে চাকরটি ভেতরে খবর দিতে গেল। একটু অপেক্ষা করবার পর, ইভনিং ড্রেস পরা একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক লনে এসে কমলকে বললেন—এই যে তুমি এসেছ। দু'দিন তোমার অপেক্ষায় থেকে আজ এখনি আমি বাইরে যাচ্ছিলাম। ভালই হল তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

কমল উত্তর দিল—আপনার চিঠি পেয়ে আমি মার সঙ্গে দেখা করতে এলাহাবাদ গিয়েছিলাম। তাই আপনার কাছে আসতে দেরি হল। আপনি আমায় ক্ষমা করবেন।

প্রফেসর গুপ্ত বললেন—আরে তাতে কি হয়েছে—মার কাছে সব জেনে এসে তুমি তো ভালই করেছ। বস, একটু চা খাও—আমি আমার মেয়েকে ডাকছি ওকে দেখ—মাকে সব জানিও।

তাঁকে বাধা দিয়ে কমল বলল—না, না, আপনাকে যে কথা বলতে এসেছি তা না বলে আপনার আতিথ্য গ্রহণ করা অথবা আপনার মেয়েকে দেখা কোনটাই আমার পক্ষে ঠিক হবে না। আপনি এজন্য দুঃখ করবেন না।

একটু বিস্মিত ভাবেই প্রফেসর গুপ্ত জিজ্ঞাসা করলেন—কি কথা তুমি আমায় বলতে চাও ?

কমল উত্তর দিল—আপনি আমার দাদার সঙ্গে আপনার মেয়ের বিয়ে দেবেন না। আমার দাদা আপনার মেয়ের যোগ্য নয়। ওঁর সঙ্গে বিয়ে হলে আপনার মেয়ে কিছুতেই সুখী হবেন না।

—সে কী, আমি যে শুনেছি তোমার দাদা খুব ভাল ছেলে ?

—আপনি ঠিকই শুনেছেন। আর ঐটিই এ বিবাহের সব চেয়ে বড় বাধা। আমার দাদা ফিজিক্সএ অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি রিসার্চ করছে। এই রিসার্চের সঙ্গে ওর জীবন মরণ সমস্যা জড়িত। রিসার্চের জন্য সে ইনকাম ট্যাক্সের এই লোভনীয় চাকরী ছেড়ে দিতে চেষ্টা করছে। রিসার্চের সুবিধার জন্য সে যে কোন ছোট কাজ, এমন কি সামান্য ল্যাবরেটরী এ্যাসিসটান্টেরও কাজ করতে প্রস্তুত আছে। এই দেখুন চাকরীর জন্য তার লেখা একটা দরখাস্তের কপি আমি আপনাকে দেখাতে এনেছি। ইনকাম ট্যাক্স

অফিসরের এই চাকরী ছেড়ে দিতে প্রস্তুত হয়ে সে একটি অখ্যাত ইনটারমিডিয়েট কলেজে কাজের জন্য দরখাস্ত করেছে। যার ভবিষ্যতের স্থিরতা নেই। মানুষের কাম্য খ্যাতি প্রতিপত্তি সম্পদের আশা ছেড়ে দিয়ে দারিদ্র্যকে যে এ ভাবে বরণ করে নিতে পারে, তাকে আপনি নিজ কন্যা সম্প্রদান করতে পারবেন? ভাল করে আপনি চিন্তা করুন। আপনার অনুমতি নিয়ে আমি বিদায় নিচ্ছি।

কমলের কথায় প্রফেসর গুপ্ত সমরের সঙ্গে নিজের মেয়ের বিবাহ দিতে সাহস পাননি। বিবাহ সম্বন্ধ তিনি ভেঙ্গে দিয়েছিলেন। এর পর যত জায়গা হতে সমরের বিবাহ সম্বন্ধ এসেছে প্রত্যেকটি কমল ঠিক এ ভাবেই নষ্ট করেছে।

বার বার বিবাহ সম্বন্ধ কমল নষ্ট করেছে আর ভেবেছে, পরের বার যার কাছে সে যাবে তিনি হয়ত সমরের যথার্থ মূল্য, তার রিসার্চের কথা বুঝতে পারবেন—তাদের সংগ্রামে উৎসাহ দেবেন। তাঁর গৃহেই হয়ত সেই কন্যা থাকবেন যিনি কেবল সমরকেই ভাল বাসবেন তার সম্পদ, সম্ভ্রমকে নয়।

তাঁরই কাছে, বিনা দ্বিধায় সমরের প্রতি তার কঠিন কর্তব্য ভারের অংশ দিয়ে কমল একটু বিশ্রাম নিতে পারবে। তাঁরই স্নেহাঞ্চলছায়ায় আপনাকে সমর্পণ করে, তাঁরই উৎসাহে, কমলও নিজের রিসার্চে মন দিতে পারবে। কিন্তু এতদিনেও তার আশা সফল হয়নি।

সময় এ ভাবে কেটেছে। সংসারের অবস্থা একটু একটু করে অসহ্য হয়ে উঠেছে। অর্থাভাবে, অবিবাহিতা কন্যার চিন্তায় মিসেস সেন রোগাক্রান্তা হয়েছেন। যিনি জীবনে কাকেও একটা রূঢ় কথা বলেন নি, তিনি অকারণে আপনার কন্যাকে ভর্ৎসনা করেছেন। খাবার থালার এক কোণে একটু তরকারীর স্পর্শ দেওয়া অন্ন মীরাকে এগিয়ে দিতে দিতে তিনি বলেছেন—এতলোক মরে তুই মরিস না কেন? তুই মর আমি নিশ্চিন্ত হই।

এর পর, মা ও মেয়ে পরস্পর পরস্পরকে লুকিয়ে কেঁদেছেন আর বলেছেন—ঈশ্বর আমাকে তুমি নাও, আর আমি পারি না।

মীরার সজল দৃষ্টি মিসেস সেন-এর রোগজীর্ণ মুখে অসহায়তার ছায়া কমলকে উত্তপ্ত লৌহশলাকার মত বিদ্ধ করেছে তবু কমল আপনাকে বিচলিত হতে দেয়নি।

যেদিন তার পিতার মৃত্যু হয়েছিল সেদিন ক্রন্দনরতা ভগিনীকে কাছে টেনে কমল সান্ত্বনা দিতে পেরেছিল। কিন্তু এখন তার সহস্রগুণ দুঃখের দিনে কমল তার কাছে গিয়ে একটা সান্ত্বনার কথাও উচ্চারণ করতে পারেনি!

অনন্ত দুঃখ কমল এ ভাবে সহ্য করেছে তবু যে বিবাহে সকলেই সুখী হত সে বিবাহ সে কিছুতেই ঘটতে দেয়নি। কারণ সমরের বৈজ্ঞানিক প্রতিভার মৃত্যু বিনিময়ে তাকে সে বিবাহের মূল্য দিতে হত।

[ক্রমশঃ।

আমার গাঁয়ের মাটি

অজিতেন্দ্র সিংহ

আমার গাঁয়ের এ পথ দিয়ে
একটুখানি গেলে,
বনফুলের বাস ছড়ানো
পুকুর পারে এলে
এদিক-ওদিক গাঁয়ের মাটির ছোট ঘর,
মাটির মানুষ থাকে ভুলে আপন পর।

এ গাঁ হতে ও গাঁ ছুঁয়ে
সোনা ধানের মাঠ,
ছায়াঘেরা ছবির মতন
গাঁয়ের ঘাট-বাট
আমার গাঁয়ের মাটি দিয়ে গড়া,
গাঁ'টি আমার সুখ-দুঃখে ভরা।

মাটির অন্ন মাটির জলে বাড়া
আমার দেহ-মনে,
মাটি মায়ের গোপন হাত বোলানো
গভীর যতনে।

আমার গাঁয়ের মাটির দেনা
শুধব কেমন করে
এই গাঁয়েতে জন্ম যখন
এই গাঁয়েতেই মরে।

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

চক্রপাণি

কে জানে! মঁসিঁয়ে লাভাঁই যে অতবড় ইনজিনিয়ার হবেন তাই বা কে জানত! মাতৃভূমি ফ্রান্স ছেড়ে ব্রেজিলে বাসা বেঁধেছিলেন মঁসিয়ে, রাজধানী রিওডি জেনিরোতে তখন বিরাট পরিকল্পনা চলেছে জল সরবরাহের, হাজার হাজার মাইল পাইপ লাইন বসবে সারা দেশের মাটিতে—ফিল্টার হাউস থেকে বয়ে নিয়ে যাবে বিশুদ্ধ পরিশ্রুত জল প্রত্যেক নাগরিকের রন্ধনশালায় আর স্নানাগারে। কিন্তু অত পাইপ কোথায়? গ্রীনস্যাণ্ডের ছাঁচে ঢেলে এত তাড়াতাড়ি অত মজবুত পাইপ তৈরী করা অসম্ভব। আর 'ভর্টিক্যাল কাষ্টিং' করে পাইপ তৈরী করার কারখানা ব্রেজিলেও আছে; কিন্তু তাতে খরচও বেশী, সময় লাগেও প্রচুর। পাইপের সমান গর্ত্ত করা হল মাটিতে। তার মধ্যে বসিয়ে দেওয়া হল আর একটা গোলপাইপ—যাকে বলে 'মোল্ড' বা ছাঁচ, তার ভিতরে পরিয়ে দেওয়া হল 'কোর' ঠিক মাঝখানে। 'মোল্ড' আর 'কোর' এর মধ্যে চারিদিকে রইল সমান একটু ফাঁক যেটা হচ্ছে পাইপের 'থিকনেস' বা স্থুলত্ব। তার মধ্যে ঢেলে দেওয়া হল গরম লোহা আর ওপরে পেটাই করা হল বালি। আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা হয়ে গেল লোহা! ভেতরের সমস্ত গ্যাস বেরিয়ে গেল বালিতে তৈরী করা ছোট ছোট নালির মধ্যে দিয়ে। এইবার বালি সরিয়ে ফেল, কোরটিকে আটা দিয়ে তুলে ফেল, আর ক্রেণ দিয়ে টেনে বের করে নাও সন্ত-ছাঁচা সি, আই, পাইপ।

কারখানায় 'ভার্টিক্যাল কাষ্টিং' এ তাই দেখছিলাম। তবে এখানে 'মোল্ডকে' মাটির তলায় পুঁততে হয় না। মেঝেতে আছে ঘোরানো 'টার্ণটেবল' তার ওপর বসানো আছে 'মোল্ড' আর কোর—আর লোহা ঢালা হচ্ছে দোতলা থেকে মোল্ডের ওপর দিয়ে। বুঝিয়ে চলেছেন দেশাই সাহেব—ফোরম্যান এ কারখানার।

স্পান পাইপ শপে যাবার আগে দেশাই সাহেব নিয়ে গেলেন তাঁর অফিসে। দশজনের ব্যাচ আমাদের। বেয়ারা চা দিয়ে গেল সকলকে। দেশাই সাহেব বলে চললেন—লাভাঁ সাহেবও ড্রিঙ্ক করে চলেছেন একরকম ভবে সে চা নয় মদ। ড্রিঙ্ক করছেন আর ভাবছেন। সবে তিনি এক গোল কেসিং তৈরী করেছেন আর সেটাকে মোটর দিয়ে মেসিনের ওপর চালিয়েছেন দাঁত বসানো র‍্যাকের মাধ্যমে। এইবার শুধু নল দিয়ে তার ভেতর লোহা ঢেলে দেওয়া আর একটা নির্দ্ধারিত গতিবেগে কেসিংটাকে ঘোরানো। কাজেতে এসেছেন সন্ধ্যে বেলায়। পেগের পর পেগ ঢেলে যাচ্ছেন গলায় আর আঁক কষে যাচ্ছেন একখণ্ড সাদা কাগজে। হঠাৎ কাকের ওয়েট্রেসকে জড়িয়ে ধরলেন লাফিয়ে উঠে আর আর্কিমিডিসের মত চীৎকার করে উঠলেন—ইউরেকা! ইউরেকা!

১৯১৪ সালের ঘটনা এটা। এর দশ বছর পরে ষ্ট্যাণ্টন কোম্পানী বিরাট কারখানা খুলল লাভাঁর প্রণালীতে পাইপ তৈরী করার, তরল লোহার কয়েক সেকেণ্ডের অবিশ্রান্ত স্পিনিঙে এর উৎপত্তি। তাই এই 'স্পিনিং'-এর জন্যে পাইপের নাম হল স্পান পাইপ। কম লোহার এত মজবুত পাইপ এর আগে কখনও হয়নি।

আটইঞ্চির ছাঁচ রয়েছে তখন মেশিনে। হাতে গ্লাভস-পরা মেকানিক সাঁড়াশী দিয়ে সন্ত-ঢালা লাল পাইপ বের করে দিচ্ছে মেশিন থেকে চেনের ওপর। অতি ধীর গতিতে ঘুরে চলেছে চেন—সঙ্গে সঙ্গে পাইপও এগিয়ে চলেছে 'নর্মালাইজিং ফার্ণেস'-এর মধ্যে দিয়ে। বিভিন্ন তাপাঙ্কে আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা হচ্ছে পাইপগুলো। চেনের একেবারে শেষপ্রান্তে পাইপের দুমুখ বন্ধ করে জল ভরে প্রেসার দেওয়া হচ্ছে—হাইড্রলিক টেষ্ট। কাষ্টিং খারাপ হলে পাইপ এইখানেই ফেটে যায়—ভাল হলে তার ওপর ছাপ পড়ে আই, এস, ডির, ইনস্পেক্টার অফ সাপ্লাই এণ্ড ডিসপোজালের। পাইপ-ভর্ত্তি ওয়াগান ছুটে চলে জনপদের দিকে—সভ্য জগতের প্রতিটি নাগরিকের দাবী—বাঁচবার জন্যে চাই আলো, বাতাস, আর বিশুদ্ধ পানীয় জল।

সবশেষে সোরাবজী আকাল সয়ারার ঘরে নিয়ে এলেন আমাদের দেশাই সাহেব। সোরাবজী সাহেব করমর্দ্দন করলেন সকলের সঙ্গে।

ডু ইউ স্মোক? এক প্যাকেট সিগারেট এগিয়ে দিলেন সোরাবজী সাহেব।

নো, থ্যাঙ্ক ইউ। মিথ্যে কথা বললাম সকলেই।

দ্যাটস গুড। তারপর শহরের কাজ ত তোমাদের শেষ হয়ে গেছে। এখন কোথায় যাবে?

গোটা প্রোগ্রামের ফিরিস্তি দিলাম—এরপর হবে কণ্টুর—তারপর রিভার সার্ভে, সবশেষে রেলওয়ে প্রজেক্ট। কেন্দুয়া আর বরাকরে অজস্র খাদ এক উচ্চতার জায়গাগুলোকে পেন্সিল দিয়ে যোগ করতে হবে প্লেটের ওপর—তৈরী হবে এক একটা কণ্টুর সমুদ্রতল থেকে আটশো, ন'শো, হাজার ফুট উঁচু। কণ্টুর শেষ করে বরাকর নদী মাপবার প্রোগ্রাম।

এক এক কাপ কফি দিয়ে গেল বেয়ারা। সোরাবজী জিজ্ঞেস করলেন—কাপুর কোথায়? তাকে ত দেখছি না।

উত্তর দিলাম নেকস্‌ট ব্যাচে আসবে কাপুর।

হঠাৎ ছেদ পড়ল কথায়। চাপরাসীর সঙ্গে টিফিন কেরিয়ার

নিয়ে ঘরে ঢুকল ডলি। অ্যাণ্টি রুমে খাবার রেখেই বেরিয়ে এল ঝগড়া করতে। ড্যাডি, এরা কি এখানেও সার্ভে করতে এসেছে? গম্ভীর ভাবে প্রশ্ন করল সে।

হো হো করে হেসে উঠলেন সোরাবজী। হাসতে হাসতেই বলে উঠলেন—আচ্ছা মা, এদের ওপর এত রাগ কেন তোমার? চমৎকার এক ইংরিজি উদ্ধৃতি শুনিয়ে বললেন—জানো, বিরাগ থেকেই অনুরাগ আসে।

হিমালয়ের মত গম্ভীর দেশাই সাহেব পর্য্যন্ত হেসে উঠলেন। লজ্জায় আর অপমানে লাল হয়ে উঠল ডলি।

লাল হয়ে উঠল কল্যাণেশ্বরীর আকাশও। ওপারে মাইথন, এ-পারে কল্যাণেশ্বরী। বেড়াতে বেড়াতে অনেকদূর এসে পড়েছি। পাহাড়ের কোলে লাল সূর্য্য ঢলে পড়ল। দৈত্যের মত অন্ধকার এসে ছেয়ে ফেলল সারা জগৎ।

পা চালিয়ে চললাম ফেরার পথে। সারা দেহ ছমছম করছে। পথচারীর ওপর হামলা এ অঞ্চলের নিত্যকার ব্যাপার—সপ্তাহে একটা করে মৃতদেহ পুলিশ পোষ্টমর্টমের জন্যে পাঠায় আসানসোল। মাঝে মাঝে হেডলাইট জ্বালিয়ে হু হু করে লরী ছুটে যায়। হিচ হাইকিং-এর কোনো প্রচলন নেই আমাদের দেশে। চিৎকার ও হাত দেখানো সত্ত্বেও কোন লরী দাঁড়াল না।

হাঁটতে হাঁটতে হোঁচট খেয়ে পড়ল রাঘবন। গোঙানি শোনা গেল রাস্তার ওপর থেকে। টর্চ্চও সঙ্গে নেই। রাও দেশলাই জ্বালাল। রাস্তায় প্রায় মাঝখানে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে এক ছ' ফুট লম্বা লোক—পরনে একটা ছেঁড়া ফুলপ্যাণ্ট কালো গেঞ্জী—দেশী মদের ফেনায় মুখ দিয়ে লালা ঝরছে রাস্তার ওপর—পাশে একটা কাৎ হয়ে পড়ে আছে কেরোসিনের বোতল— পানীয়ের শেষ তলানিটুকু তখনও বোতল থেকে ঝরছে।

লোকটা এখুনি গাড়ীর তলায় মরবে—রাও বলল—চল্ ওটাকে ঠেলে সরিয়ে দিই রাস্তার ধারে।

বিড় বিড় করে বকতে বকতে উঠে বসল লোকটা রাস্তার ওপর, বুকের তলায় চকচক করে উঠল চকচকে এক ছুরি। হেঁচকা মেরে শরীরটাকে খাড়া করবার চেষ্টা করল সে, কিন্তু দাঁড়াতে পারল না—ধপাস করে আবার পড়ে গেল রাস্তার ওপর, নিঃশ্বাসের ঘন ঘন আওয়াজ শোনা গেল রাস্তার আরেক ধার থেকে।

রাওকে বললাম, দেশলাইটা আবার জ্বালো, ও দেবদাস আর এখন উঠছে না।

দেশলাই আবার জ্বলল। কিন্তু এ কে! একেবারে আদিম নারী! কালো শরীরের ওপর থেকে সস্তা ফুলকাটা শাড়ী নেমে এসে পিচ-ঢালা রাস্তার ওপর গড়িয়ে পড়েছে! মুখের লালা আর পথের ধূলা এক হয়ে মুখে চোখে লেগে আছে আঠার মত। কাপড়ের খানিকটা খুঁট ধরে গড়াগড়ি করছে এক কুশাঙ্গী—তার চারি দিকে ছড়ানো রয়েছে ভাঙা মাটির ভাঁড় —বিড় বিড় করে অশ্লীল ভাষায় সম্ভাষণ সুরু করল সে। দেশলাই কাঠি নিভে গেল। ঝড়ের মত পা চালিয়ে এগিয়ে চললাম আমরা। গরীব দেশে যন্ত্রের আশীর্ব্বাদ—কামনা আর বাসনা হয়েছে শত গুণ, সামর্থ্য হয়েছে শতাংশ।

বেশীদূর এগুতে হ'ল না—ভয়ঙ্কর আর্ত্তনাদ শোনা গেল পেছনে। ঘ্যাঁচ করে দাঁড়িয়ে গেল এক লরী। এখানে দাঁড়াবারও প্রয়োজন ছিল না, আলোও নেই, পুলিশও নেই। আসানসোলে শুধু পোষ্টমর্টমের সংখ্যা বাড়ল একটা। খানিকটা আগেই তিনটে বাঁশের তেপায়ার তলায় ঝুলছে এক মস্ত ডে-লাইট! তার চার পাশে জমে আছে এক বিরাট জনতা।

মাঝখানে ঘাগরা ঘুরিয়ে উড়নী উড়িয়ে নাচছে কারা? উল্টো দিক থেকে দৌড়ে আসছিল একদল নাচ দেখবার জন্যে। ধাক্কাই লেগে গেল আমাদের সঙ্গে। টেনে তুললাম একজনকে, জিজ্ঞেস করলাম—কেয়া হোতা হ্যায় হঁয়া?

কোলিয়ারী কা শালগিরা। কোম্পানী নাচ দেখাতা হ্যায় হাম্ লোগ্ কো? ঝড়ের মত বলে চলেছে সে, দাঁড়াবার সময় নেই, শেষ কথা বলল—আপ্ ভি চলিয়ে না। চল।

খাড়াই-উৎরাই পেরিয়ে ছোট্ট এক উপত্যকার ওপর পৌঁছুলাম—দু' দিন আগেই কণ্টুর মেপে গেছি তার আশে পাশে। তেপায়ার ওপর ডে-লাইট হাওয়ায় ভয়ঙ্কর দুলছে। মাঝখানে খালি নাচবার জায়গাটাতেই সতরঞ্চ বিছোনো—আশেপাশে রুক্ষ ভূমিরূপের ওপর ছোট-বড় মেয়ে-পুরুষের ভয়ঙ্কর ভিড়। আস্তে আস্তে ভিড় ঠেলে সামনে যখন এলাম, কয়েক জন পশ্চিমা সসম্ভ্রমে কয়েকটা চেয়ার ছেড়ে দিল। ভাবল, কলিয়ারীর বাবুদের কেউ হবে হয়ত।

ঠুম্‌রীর বিস্তার চলেছে তখন—তবলা বন্ধ করে তবলচি বসে আছে। আর নাচিয়ে মাঝখানে বসে উড়নীর এক প্রান্ত এক হাতে বিস্তার করে মূল গায়েনের সঙ্গে সুর মিলিয়ে ঠুম্‌রীর রেশ টেনে চলেছে। বিস্তার শেষ হ'ল। তালে তালে উঠে পড়ল নর্ত্তকী। পাতলা উড়নীর মধ্যে দিয়ে খোঁপার চারদিকে সাদা সাদা ফুল, মাঝখানে সোনার প্রজাপতি আর গলায় এক ছড়া ঝলমলে হার চক্ চক্ করে উঠল। নর্ত্তকী নাচতে নাচতে মুখ ফেরাল আমাদের দিকে।

ঘুংঘটের ফাঁকে বাঁকা হাসি নিয়ে চেনা লোককে সেলাম করল সুন্দরী, প্রসারিত উড়নী জড়িয়ে নিল বুকের ওপর। বড় সুন্দরী নেচে চলেছে কলিয়ারীর প্রতিষ্ঠা-উৎসবে। কিন্তু ছোট সুন্দরী কোথায়?

হঠাৎ জনতার মধ্যে গুঞ্জন শোনা গেল, কলিয়ারীর সাহেব আসছেন। হাফপ্যাণ্ট-পরা সাহেব সাদা সিল্কের হাফ সার্ট পরে হাফ টাইমে এলেন মাঠে। আমাদের কয়েকটা চেয়ার পরেই একটা গদি-আঁটা চেয়ার ছিল, লক্ষ্য করিনি। গদিতে বসলেন সাহেব। ফাঁক ফাঁক পাতলা তক্তা দিয়ে তৈরী কাঠের বাক্সে লেবেল-আঁটা বোতল নিয়ে পিছু পিছু এল এক কুলি আর ইয়াসিন। ছোট্ট তাঁবু থেকে শোনা গেল ঝনক্ ঝনক্ ঝনক্—নূপুরের তালে তালে আসরের দিকে এগিয়ে আসছে আর এক নারীমূর্ত্তি! কে এ? ছোট সুন্দরী? চমকে উঠলাম রূপমতীর রূপ দেখে। আসরের ঠিক মাঝখানটিতে এসে পা দুটি পিছনে মুড়ে ঘুংঘট টেনে বসে পড়ল ছোট সুন্দরী। লাল ঘাগ্‌রা, লাল চেলী, লাল উড়নী, ঠোঁটে লাল, গালে লাল, চোখে সুরমা, সর্ব্বাঙ্গে সোনা—কয়লার খনিতে যেন উর্ব্বশী।

স্বপ্নাবিষ্টের মত কতক্ষণ বসেছিলাম, খেয়াল নেই। হঠাৎ হৈ-হৈ করে কলগুঞ্জন উঠল। ছোট সুন্দরী নাচতে নাচতে বসে পড়েছে আমাদের চেয়ারের সামনে। কোথেকে ছুটে এল

ইয়াসিন। হুকুম দিল, কেয়া হুয়া? কিছুতেই উঠল না ছোটসুন্দরী। সাহেব উঠে পড়লেন চেয়ার ছেড়ে, ইয়াসিন চলল তার পিছু পিছু। সঙ্গে একরকম হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে চলল রূপমতীকে। জনতা একদম ক্ষেপে উঠল। তেপায়ার ওপর থেকে ডে-লাইট ছিঁড়ে পড়ে গেল নীচে। কলিয়ারীর গার্ডরা ছুটে এল হাতিয়ার নিয়ে। আসর খালি হয়ে গেল মুহূর্তের মধ্যে। কলিয়ারীর এক চৌকিদার এসে জিজ্ঞেস করল—কাঁহা যায়েঙ্গে। গন্তব্য শুনে সে এগিয়ে এল আমাদের সঙ্গে।

অন্ধকারে রাস্তায় চলতে চলতে জিজ্ঞেস করলাম—এরা কারা দারোয়ানজী?

কিসকো বাত কহতে হেঁ?

এই যে যারা নাচছিল তারা?

দারোয়ান বলে চলল বিরাট ইতিহাস।

হামিদা, মতিয়া, মেহবুবা, ফুলজান—এসব কলিয়ারী অঞ্চলের খানদানী নাচনেওয়ালী। তারমধ্যে বেঁচে আছে শুধু ফুলজান—ঐ হচ্ছে বড় সুন্দরী। হামিদা যখন নাচত ফুলজান তখন ঘুরত তার আশে পাশে আর আঁচল পেতে পেতে নেচে নেচে সেলামী আদায় করত দর্শকদের কাছ থেকে। আজ হামিদাও নেই, মতিয়াও নেই আর মেহবুবা ত একপেট মদ খেয়ে নাচতে নাচতে পড়েই গেল সেদিন। বমি করতে করতে হার্টফেল করল মেহবুবা, রূপের পসরায় ভর্ত্তি ছিল তার দেহের দোকান—ঠিক তেমনি ভাবেই বিদায় নিল দুসহন পৃথিবীর বুক থেকে। মেহবুবাও গেল, কলিয়ারীর নাচও গেল! পুরো ছমাস বাদে নিয়ে এল ইয়াসিন ফুলজানকে। ফুলজানের প্রথম নাচ এ অঞ্চলে—বিনা পয়সায় হাজির হল সে। কিন্তু নাচই কি সব! যারা মেহবুবাকে দেখেছে নতুন নাচনেওয়ালীর সুরৎ দেখে তাদের পিয়াস মিটল না। এমন সময় কোত্থেকে নিয়ে এল ফুলজান লখিয়াকে। ছোট কিশোরী লখিয়া—সলজ্জ যৌবনের প্রথম ছোঁয়া লেগেছে সর্বাঙ্গে। ফুলজান নাচে, লখিয়াও নাচে। ফুলজান নাচে জীবনের পেশায়, লখিয়া নাচে যৌবনের নেশায়! কলিয়ারীতে আবার এল জীবন, কুলিমজুরের কোন উৎসব হলেই ফুলজান আর লখিয়া! দেমাক বাড়ল ফুলজানের। এখন আর কুলিমজুরের কথায় নাচতে আসে না সে। বলে—কুলি লোগকে বাতসে নেহি যায়েঙ্গী। সাব লোগ কুছ বোলা?

সাহেব লোগের দূত যায়। জিজ্ঞেস করে লখিয়া ভাল আছে? উসকি তবিয়ৎ ঠিক রহে ত নাচ হোগা। এতেও দেমাক কমে না ফুলজানের। পানের রসে ঠোঁট লাল করে লখিয়া হাসে আর ফুলজান রেগে ওঠে। বলে জোয়ানী মেরী ভি হ্যায়। তেরা সাব নেহি জানতা? কাঁচুলীর দু পাশের শাড়ী গুটিয়ে বুকের মাঝখানে বাঁধে ফুলজান। হঠাৎ পায়ের ঘুঙুর খুলে ফেলে লখিয়া, উড়নী ছুঁড়ে ফেলে দেয় বুকের ওপর থেকে আর আয়নার সামনে বসে চীৎকার করে ওঠে মৈ বাইজী নেহী হুঁ। তেরা সাবকো বোলদে মৈ নেহি নাচুঙ্গী। ফুলজান কথা দেয় শেষ পর্য্যন্ত।

রোমাঞ্চ আসছে দারোয়ানের কথায়। বলে কি লখিয়া নাচ তাহ'লে তার পেশা নয়? বে-ফাঁস প্রশ্ন করলাম দারোয়ানকে, সর্দ্দারজী লখিয়া কি সত্যি বাইজী নয়?

এ কথার সঠিক জবাব দেয়নি দারোয়ান, শুধু বলেছিল কে জানে বাবু।

তাঁবুতে যখন ফিরলাম তখনও কাপুর জেগে আছে, পকেট থেকে ছোট একটা লাল বাক্স বের করল কাপুর, বাক্স খুলে চোখের সামনে এগিয়ে দিল এক জোড়া কর্ণাভরণ।

শেষ পর্যন্ত দোকান থেকে কিনে আনলি। আমার কথা শুনে রেগে উঠল কাপুর।

বলল, বয়ে গেছে, আমি কিনতে যাব কেন? কিনে দিয়েছে আমার দিদি।

দিদি? তিনি আবার কোথায় থাকেন?

বার্ণপুরে।
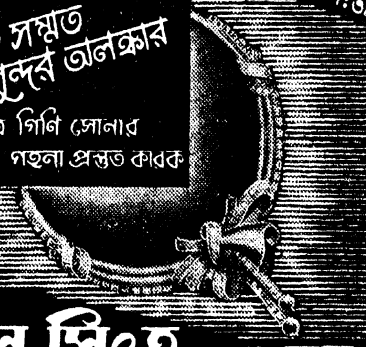
বার্ণপুরে?

হ্যাঁ, সেখানকার ওয়েলফেয়ার অফিসার আমার দিদি, এম, এ পাশ করে পুরো দু'বছর ওয়েলফেয়ার কোর্স পড়েছে কলকাতায়। তার পর রীতিমত ইণ্টারভিউ দিয়ে চাকরী পেয়েছে বার্ণপুরে—কাপুর বলে চলল—আজ বিকেলেই গিয়েছিলাম দিদির কাছে, কথায় কথায় সে বলে ফেলল, সোরাবজী সাহেবের কথা, বছরখানেক আগে এখানে কাজে এসেছিল দিদি, সেই সময় পরিচয় হয় সোরাবজী সাহেব আর তার স্ত্রীর সঙ্গে—দিদি জিজ্ঞেস করল ওদের সঙ্গে আলাপ হয়নি? যদি না হয় ত আমার নাম করে আলাপ করবি। আর ওদের একটা চমৎকার মেয়ে আছে—কি যেন নাম—

আমিই তাকে আর বছর আমার এক জানা কনভেন্টে ভর্ত্তি করে দিয়ে এলাম।

আমার আর সহ্য হল না। বলে ফেললাম—চমৎকার না হাতী, ঐ ডলির কথা বলছ ত?

দিদি চমকে উঠল, জিজ্ঞেস করল—কি ব্যাপার?

গোড়া থেকে শেষ অবধি সব শুনল দিদি। তারপর হুকুম করল—চল।

গাড়ী করে আসানসোল পৌঁছুতে বেশীক্ষণ লাগল না। একটা জুয়েলারীতে এসে টেনে বের করল আমাকে দিদি, সেলসম্যান এক ডজন ডিজাইন সামনে ছড়িয়ে দিল, দিদি বলল—এর মধ্যে কোনটা ডলির, পছন্দ কর, পকেট থেকে কাফেতে আঁকা সেই কাগজটা বের করলাম। মিলিয়ে দেখে পছন্দ করলাম একটা, দিদি হেসে উঠল এক চোট।

প্যান্টের পকেটে সেই দুলের বাক্সটা পুরে দিল দিদি, আর বলল—ডলির হারানো দুলের সঙ্গে যদি না মেলে তাকে বলে দিস—শকুন্তলা কাপুর তোমায় উপহার পাঠিয়েছে আমার হাত দিয়ে; আমি তার ভাই কি না।

রাত দুটোর ঘণ্টা বাজাল দারোয়ান। রাও গেছে চাকে তার আত্মীয়ের বাড়ী। তার খাটে শুয়ে বক্‌বক্ করে চলল কাপুর, না, বাকী রাতটুকুও ঘুমুতে দেবে না দেখছি। পাশ ফিরে শোবার চেষ্টা করতেই কাপুর ঘাড় ধরে এপাশে ফিরিয়ে দিল আর বলল—জানিস, আজ সকালে নওজোতের নিমন্ত্রণ করেছে আমাদের সোরাবজী সাহেব।

নওজোত? সে আবার কি?

নওজোত জানিস না? হিন্দুদের যেমন পৈতে, পার্শীদের তেমনি নওজোত। বিরাট যজ্ঞ করে অগ্নি সাক্ষী রেখে যজ্ঞোপবীত পরানো হয় নবজাত শিশুকে। সোরাবজী সাহেবের ভাই দারায়াস সাহেব বোখারোয় থাকেন—তারই ছেলের নওজোত।

কবে?

নওজোত হবে পরশু সকালে—আমাদের নেমন্তন্ন সন্ধ্যের সময়।

বেশ ত নেমন্তন্ন করেছে তোকে তুই যাবি। আমাদের কি?

পকেট থেকে এক কার্ড বের করে চোখের সামনে তুলে ধরলে কাপুর। বলল—এই ত্যাখ।

মামুলী নিমন্ত্রণপত্র মিঃ এণ্ড মিসেস্‌এর মিসেস্‌টুকু কেটে কালো কালিতে লেখা আছে—কাপুর এণ্ড হিজ ফ্রেণ্ডস।

হেসে উঠলাম হো হো করে। ফ্রেণ্ডস ত আশিজন। কাকে নিয়ে যাবে কাপুর।

সামনের খাটেই ঘুমুচ্ছিল গ্যাসোলিন অর্থাৎ বিনোদ পাল। হাসির চোটে ঘুম ভেঙ্গে গেল তার। ঘুম ভাঙতেই মশারীর দড়ি ছিঁড়ে বাইরে বেরিয়ে এল সে, আর বেমালুম এক চড় কষিয়ে দিল কাপুরকে। আসন্ন কুরুক্ষেত্রের আশঙ্কায় শয্যা ত্যাগ করলাম। কিন্তু মীমাংসা করে দিল গ্যাসোলিন নিজেই। ঢক্ ঢক্ করে কুঁজো থেকে এক গ্লাস জল খেয়ে এসেই মনোহরের কাছে গিয়ে জোড় হাত করে বলল—কাপুর সাব মুঝে মাপ কীজিয়ে।

হো-হো করে হেসে উঠল কাপুর। এইবার গ্যাসোলিনের পালা। গায়ের চাদর জড়িয়ে খাটিয়ার ওপর জোর করে বসল সে আর বলল—ওঃ মোহাব্বৎ একেই বলে বটে। আজ সকালে সেই পার্শী মেয়েটা কি করেছে জানিস?

বেঁগুনিয়ায় কাছে কন্টুর টানছি ক্লিনোমিটার নিয়ে। এমন সময় কলার-তোলা হাফ সার্ট আর স্ল্যাক্‌স পরে সাইকেলে করে এসে হাজির হল মেয়েটা, একেবারে প্লেন টেবিলের সামনে। সাইকেল থেকে তড়াক্ করে নেবেই প্রফেসর সেনের মত জিজ্ঞেস করল—হোয়াট ইজ ইওর পার্টি নাম্বার?

ক্রোধে সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে গেল। লেভেল থেকে চোখ না তুলেই বললাম—হোয়াট ইজ ইওর বিজনেস হিয়ার?

তেমনি উদ্ধত ভাবে জবাব দিল—নাথিং। গলার স্বর নামিয়ে বলল—তোমাদের তেরো নম্বর পার্টি কোথায়? গোটা লোয়ার কুলটি খুঁজছি আমি।

করুণা হল কথা শুনে। বললাম—বেশ করছ। তেরো নম্বর পার্টি এখন পিক্‌নিক করছে সালানপুরের রাস্তায়—তাদের রেলওয়ে প্রজেক্ট আরম্ভ হয়ে গেছে।

হতাশ হয়ে গেল মেয়েটা। ফেরার জন্যে উঠে পড়ল সাইকেলে। এবার আমিই ডাকলাম—শোনো।

কাছে আসতেই বললাম—কাপুরকে চাই?

গম্ভীর হয়ে গেল সে। অপরাধীর মত আম্‌তা আম্‌তা করে বলল—কাপুর আবার কে?

তবে আর তেরো নম্বর পার্টির সঙ্গে কি দরকার তোমার?

এইবার হেসে ফেলল তরুণী, হাঁ করে আমার মুখের দিকে তাকাল। বললাম—কাপুর আজ ফিল্ডে বেরোয় নি। ক্যাম্পে তার মেস-ডিউটি। কথা শেষ হতে না হতেই কচি খুকীর মত আবদার করে উঠল সে—কিন্তু ক্যাম্পে যাব কি করে?

কেন? যেমন করে সাইকেল চালিয়ে এখানে এসেছ।

হঠাৎ লজ্জা পেয়ে গেল সে। বলল—রাস্তায় সাইকেল চালানো এক আর ছেলেদের ক্যাম্পে যাওয়া আর এক—কে কি মনে করবে?

কি বলে পার্শী মেয়েটি। জিজ্ঞেস করলাম—কে কি মনে করবে তাতে তোমার কি?

মুখ নীচু করে উত্তর দিল—যতই হোক আমরা মেয়ে—তোমাদের মত কি হতে পারি? আরেকটু থেমেই বলল—আমি আর সাইকেলে চাপব না। দয়া করে এটা আমার বাড়ীতে পৌঁছে দেবে?

ঠিকানা আর নম্বর নিয়ে বললাম—দোব, কিন্তু তুমি এতটা হেঁটে যাবে?

হ্যাঁ, ঐ সামনেই আমাদের বাবুর্চ্চি রহমতের বাড়ী। ওর বাড়ীতে এ সব খুলে ওর বিবির শাড়ী পরে আমি রাস্তায় বেরুব। এ পোষাকে ভারী লজ্জা লাগছে আমার।

ফ্ল্যাগম্যানকে ডাকলাম ইশারায়। বললাম—যাঃ, মেমসাহেবকে এগিয়ে দিয়ে আয়। ক্ষুদ্র একটা নমস্কার আর ধন্যবাদ জানিয়ে ডলি চলে গেল!

ঘুমিয়ে পড়েছে মনোহর। কতটা যে শুনেছে জানি না। তার প্রশান্ত মুখের দিকে তাকিয়ে আরেকটা মুখ আমার মনে পড়ল—ববছাটা চুল, সিল্কের শাড়ী, সিল্কের চেলি আর বয়কের

বড় সাদা পায়ে তার চেয়েও সাদা একজোড়া হাইহিল—বলতে পার, তোমাদের দলের সেই লম্বা ফর্সা ছেলেটা কোথায়? কি যেন নাম তার—বন্ধুরা ডাকছিল তাকে।

রামধনুর সাতটা রং—কিন্তু এ আলোকসজ্জার রং সাতটা না হলেও সত্তরটা বটে। গেটের দু'ধারে শুভকর্মের প্রতীক কলাগাছ আর ঘটের উপর আম্রপত্রশোভিত সবুজ 'নারিয়ল'! কুঁচোনো ধুতি আর সাদা পাঞ্জাবী পরে গেটের সামনে দাঁড়িয়েছিল এক স্বাস্থ্যোজ্জ্বল যুবক। কাছে আসতেই গলার স্বর আর মুখ দেখে স্পষ্ট বোঝা গেল—সে পুরুষ এখনও তরুণই বটে, তাকে যুবক বলাই যায় না! সে-ই আমাদের অভ্যর্থনা করল পরিষ্কার বাংলায়—আসুন, আসুন, এত দেরী কেন? সোরাবজী সাহেব বাগানে সাজানো টেবিল আর চেয়ারের মাঝখানে ঘুরে ঘুরে অতিথি-সৎকার করছিলেন। আমাদের টেবিলের কাছে এসেই বললেন—হ্যালো বয়েজ, তোমাদের কি সময়জ্ঞান একটুও নেই! আমাদের ত প্রোগ্রাম একেবারে শেষ।

অপ্রস্তুত হয়ে গেলাম। কাপুর আর আমি দু'জনেই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। হো হো করে হেসে উঠলেন সোরাবজী সাহেব আর সেই সুপুরুষ তরুণকে উদ্দেশ করে বললেন—গো, টেক দেম ইন্‌সাইড।

বাগান থেকে ড্রইংরুম—মুখ নীচু করে চলল কাপুর, আর কোঁচার কাপড় পকেটে গুঁজে দিয়ে চলল তরুণ—সলজ্জ চাহনি তার চোখে আর অদ্ভুত সারল্য তার মুখে। নাম জানবার আগেই নেহাৎ অভদ্রের মত প্রশ্ন করলাম—কোন সালে জন্ম আপনার? আচম্‌কা প্রশ্নে চম্‌কে গেল সে। তার পরেই জবাব দিল—উনিশশো তেত্রিশ।

উনিশশো তেত্রিশ আর এটা উনিশশো বাহান্ন—তার মানে এখনও টীন-এজার!

লজ্জা পেয়ে গেল সে। কথা পালটিয়ে জিজ্ঞেস করলাম—আচ্ছা, আমরা আসার আগে কি অনুষ্ঠান হয়েছে আপনাদের?

অনুষ্ঠান না ছাই! ডলির বান্ধবীরা এসেছিল কয়েক জন কনভেণ্ট থেকে। তারাই দল বেঁধে বাঁদর-নাচ দেখিয়েছে খানিকটা! ব্যস! পাশের ঘর থেকেই চীৎকার করে উঠল ডলি—নন্‌সেন্স। তারপর পর্দা ঠেলে ঢুকে এল ঘরে আর বলে উঠল—বাঁদর নাচ? হোয়াট ডু ইউ নো এবাউট ডান্সিং? লাজুক ছেলেটিও লাফিয়ে উঠল সোফা থেকে। আর পাঞ্জাবীর হাতা গোটাতে গোটাতে চেঁচিয়ে উঠল—বাঁদর-নাচ নয় ত কি? কতকগুলো শুধু গাল ভরা নাম—ওয়ালজ, ফকস্‌-ট্রট, রাম্বা! নাচ না ছাই! নাচতে পারিস ভারত-নাট্যম, নাচতে পারিস কথাকলি! নেহাৎ 'কাগড়া' গুলো দেশে আছে বলেই যত সব অনাসৃষ্টি!

আর দেখে কে! ঘুষোঘুষি লেগে গেল মুহূর্ত্তের মধ্যে! ডলির নাইলনের শাড়ী আর ছেলেটির সাদা সিল্কের পাঞ্জাবী যায় যায়! ডলিকে ছাড়িয়ে নিল কাপুর। হু হু করে কেঁদে ফেলল ডলি। আর আস্তে আস্তে বলে চলল—চিরকাল আমাদের 'কাগড়া' বলে এসেছে গুজরাটীরা, ভাষা এক হলেও আমাদের সঙ্গে ওরা মেশে না; সব সময় দূরে এড়িয়ে চলে, আর আমাদের দেখিয়ে ঠাট্টা করে চীৎকার করে—'কাকে কি না খায়!' চোখের জল আর থামে না ডলির।

মুখ নীচু করে বসে আছে ছেলেটি। ঘরে ঢুকলেন সোরাবজী সাহেবের স্ত্রী এক মুখ হাসি নিয়ে। ডলির কান্না দেখে ফিরে তাকালেন তরুণটির দিকে। আর হো-হো করে হেসে উঠে বললেন—আবার ঝগড়া করেছিস অরুণ! তারপর শাড়ীর আঁচল দিয়ে চোখ মুছিয়ে দিলেন ডলির আর আমাদের জিজ্ঞেস করলেন—নিশ্চয়ই ডলিকে 'কাগড়া' বলেছে অরুণ—ইজ্‌ন্ট্‌ ইট? মাকে সরিয়ে দিয়ে ডলি এবার উঠে দাঁড়াল আর দুম দুম করে পা ফেলে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

অরুণ মাপ চাইল আমাদের কাছ থেকে। বলল—ডলির তেজ আমার কোন দিন সহ্য হয় না। কম করে তিন বছরের বড় আমি ওর চেয়ে—তবু আমাকে ও দাদা বলে না কখনও।

চা নিয়ে এল সুমতি। জামা কাপড় ছেড়ে ফিটফাট হয়ে বসল অরুণ। সুমতি চা দিয়ে ছোট্ট এক নমস্কার করল আমাদের। অরুণ বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

আমিই জিজ্ঞেস করলাম সুমতিকে—আচ্ছা সোরাবজী সাহেবের ত ছেলে নেই কেউ। অরুণ কি দারাযাস সাহেবের ছেলে?

না, ও হচ্ছে দেশাই সাহেবের ছেলে। সামনের বাংলোটাই ত ওদের।

কি করে অরুণ?

মাইনিং পড়ছে ধানবাদে। উইক্‌-এণ্ডে বাড়ী এসেছে।

একটা কথা অনেকক্ষণ ধরে মনে হচ্ছিল। বলেই ফেললাম। দেশাই সাহেবের ছেলে যখন, অরুণ নিশ্চয়ই গুজরাটি। কিন্তু ওর হাবভাব চালচলন, বেশভূষা সবই ত বাঙালীদের মত। এরকম কেন?

চুপ করে রইল সুমতি। খাবারের প্লেট নিয়ে ঘরে ঢুকল ডলি। এইবার হাসতে হাসতে বলল—চলে গেছে ত অরুণ। আমি জানি ও চলে যাবে। তারপর একটু থেমে আমাদের উদ্দেশ করে বলল—অরুণ গুজরাটি জানো ত। তা সত্ত্বেও মাছ-মাংস না হলে এক বেলাও ওর চলে না। আবার ওই আমাকে মাংস খাওয়ার জন্যে 'কাগড়া' বলে।

এক এক প্লেট খাবার এগিয়ে দিয়ে সামনের সোফায় বসে পড়ল ডলি। সুমতি দাঁড়িয়েই রইল। রণরঙ্গিণী মূর্ত্তি ধরে এই একটু আগেই যে মেয়ে কুরুক্ষেত্র বানিয়ে তুলেছিল ছোট্ট ঘরটিকে তার সঙ্গে এ ডলির যেন কোন মিল নেই। সুমতিকে ডেকে বলল—যা না সুমতি, অরুণকে ডেকে নিয়ে আয় না।

সুমতির বয়ে গেছে। তোমার সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে তুমিই যাও, আমার বয়ে গেছে।

আরে বাবা, ঝগড়া করাই বা কেন আর ভাব করাই বা কেন। মারামারি না করলেই হত। ও তোমার সঙ্গে ঠাট্টা করল, তুমিও ঠাট্টা করলেই পার্‌তে!

আমার কথা শুনে গম্ভীর হয়ে গেল ডলি। ওর সঙ্গে ঠাট্টা করা কি যে সে কথা! ডলি বলে উঠল, তোমরা তা বুঝবে না! অরুণের সঙ্গে কথায় পেরে ওঠা আমাদের কাজ নয়। স্কুলের রেকর্ড-মার্ক পাওয়া ছেলে অরুণ! ওর বাংলার খাতা দেখে হেডমাষ্টার

বলেছিলেন—আর জন্মে নিশ্চয়ই তুই বাঙালী ছিলি অরুণ। অরুণ উত্তর দিয়েছিল, আর জন্মে কেন, এজন্মেও ত আছি। বাংলা দেশে জন্মেছি, বাংলার হাওয়ায় মানুষ হয়েছি আর বাংলার ভাষা আমার মাতৃভাষা হবে না?

পৃথিবীর সমস্ত বিস্ময় যেন একাকার করে ভেসে উঠেছে অরুণ দেশাই। সেই ছোট্ট লাজুক ছেলেটি এত কথা জানে। আমি ছাড়া আরেকটি বাঙালী ছিল ঘরের মধ্যে, তার দিকে চাইলাম। আস্তে আস্তে পর্দা সরিয়ে অন্দর মহলে ঢুকে গেল সুমতি।

আরব সাগরের ঠাণ্ডা হাওয়া সারাদিন বয়ে আসে বালুচরের ওপর দিয়ে, পাশ দিয়ে বয়ে যায় তাপ্তী নদী তারই উপকূলে ছোট্ট এক বন্দরে গ্রীক, আরব, পর্তুগীজ, ইংরেজ অদূর অতীতে সওদাগরী নৌকো বেয়ে আসত; নাম তার সুরাট। আধুনিক বোম্বায়ের তখন জন্মই হয়নি। এই সুরাটেরই পাঁচ মাইল দক্ষিণে পৈতৃক বাড়ী দেশাই সাহেবের।

লোক আছে গাঁয়ে, কিন্তু খাদ্য নেই মোটে। সারা গুজরাট শুক্‌নো দেশ, শুধু তাপ্তী নদীর জলধারায় কিঞ্চিৎ উর্ব্বরা ছিল এ অঞ্চল। তাই লোকসংখ্যার চাপও ছিল তাপ্তী নদীর দুধারে। অবিশ্রান্ত কর্ষণের ফলে জমির উর্ব্বরতাও গেল কমে। সেবারে অনাবৃষ্টির সময় তাপ্তী নদীর জলও প্রায় শুকিয়ে গেল, দুর্ভিক্ষ এল সারা গাঁয়ে। প্যাটেলরা গ্রাম ছেড়ে চলে গেল আফ্রিকা। ক্ষেতের কাজ করত কনবীরা, মিস্ত্রীর কাজ করত করীয়াররা—তারাও চলে গেল সিঙ্গাপুর। দেশাই সাহেবের বাবা চলে এলেন অজানা দেশ বাংলায়। বার্কাকানা লুপ লাইন বসছে তখন ডেহরী অনশোন আর গোমোর মাঝখানে। সেখানে আর্থওয়ার্কের কন্ট্রাক্টর হলেন মোহনভাই দেশাই। গোটা বার্কাকানা লুপে এমন জায়গা নেই যেখানে না পায়ে হেঁটে গেছেন মোহনভাই। সেই মোহনভাই হঠাৎ একদিন দশ লাখ টাকার কাজ পেয়েও ছেড়ে দিলেন। টেণ্ডার খোলার পরের দিনই ডি, ই, এনকে জানিয়ে দিলেন তিনি আর ঠিকাদারী করবেন না। কণ্ট্রাকটরস লিষ্ট থেকে নাম কাটিয়ে নিলেন মোহনভাই আর বরাকরের বাড়ীতে বসে হাঁক দিলেন তার একমাত্র ছেলেকে—জয়ন্তীলাল। বাড়ীর পায়রাগুলোকে চাল আর ছোলা খাওয়াতে খাওয়াতে চম্‌কে উঠলেন এনট্রান্স পরীক্ষার্থী জয়ন্তীলাল। পিতার কণ্ঠস্বর ত এত গম্ভীর কখনও হয় না। ষোলো বছরের তরুণ জয়ন্তীলাল শঙ্কাকুল চিত্তে হাজির হলেন পিতার সামনে, চোখে চশমা লাগিয়ে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করলেন মোহনভাই তার একমাত্র পুত্রকে, তারপর গম্ভীর ভাবে বলে গেলেন—শোনো জয়ন্তীলাল, লেখাপড়ায় আর ফাঁকি দেওয়া চলবে না—আমি ঠিকাদারী ছেড়ে দিয়েছি। মাথায় বাজ পড়ল জয়ন্তীলালের—নির্ভাবনায় পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করার জন্তে দিন গুণছিলেন তিনি। এর সাতদিন আগেই 'সাগাই' হয়ে গেছে তার ঝরিয়ার ছগনভায়ের দুহিতার সঙ্গে। সাতখানা কলিয়ারীর মালিক ছগনভাই—অনেক ভেবে 'খানদান' পেয়েছিলেন তিনি মোহনভায়ের ঘরে। সাগায়ের দিন হাত

জোড় করে বলেছিলেন মোহনভাইকে—বেয়াই আসছে বছরেই ঘরের লক্ষ্মীকে ঘরে তুলে নিয়ে যাও। একথার জবাব দেননি মোহনভাই।

এক পেট রোটি, শাক, খিচরী আর ছাস খেয়ে সন্ধ্যে বেলায় বাড়ীর কড়ি থেকে ঝোলানো দোলনায় দোল খান জয়ন্তীলাল আর স্বপ্ন দেখেন ময়ূরপঙ্খী শাড়ী নেমেছে সোনার কাঁকণের ওপর; সোনার হাত ধরে আছে দোলনার লাল দড়ি, পাটে বসেছে তার পাটরাণী। আচ্ছা কত বড় হবে সে। মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়—বা ভারী উমর কেটলী? মা তার বয়স কত? মা হেসে ওঠেন—কার বয়স রে জয়ন্তী? লজ্জায় মুখ লুকিয়ে ফেলেন জয়ন্তীলাল।

এসব কথা বলতে বলতে দেশাই কাকা হো হো করে হাসেন আর কাকী আমাদের বকুনি লাগান—যা ডলি ভেতরে যা! এখনও এখানে বসে আছিস?

দেশাই কাকা বলে যান—ভাগ্যিস ঠিকাদার হইনি। তা'হলে তোমাদের সঙ্গে আলাপও হতনা, আর এমন গল্পও জমত না।

ওদিকে অরুণের জন্যে হঠাৎ উতলা হয়ে পড়েন কাকী। আজ যে শনিবার। অরুণ নিশ্চয়ই এতক্ষণ বাড়ী ফিরেছে।

ওঃ জানো রায়—ডলি এবার আমাকে সম্বোধন করে বলল—অরুণের জন্যে কাকী এত ভাবে যে শনিবার অরুণের আসতে যদি আধ ঘণ্টা দেরী হয়, মনে হয় কাকী হার্টফেলই করবে। এই ত কালকেই অরুণ এসেছে রাত এগারোটায়। আমি আর সুমতি সারাটা রাত বসে কাকীর কাছে। খট খট করে জুতোর শব্দ করতে করতে এল অরুণ—রাগে যেন গড় গড় করছে। কি হয়েছে বাপু? কিছুই হয় নাই, শুধু রাত হবার দোষটুকু ঢাকবার জন্যে এত কারসাজি। তা এত অকৃতজ্ঞ ছেলেটা, আমরা যে এতক্ষণ কাকীকে শান্ত রেখেছি, তার জন্যে একটাও ধন্যবাদ দিল না। উলটে সুমতিকে বলে উঠল—নিজের বাড়ী নেই? এখানে কি হচ্ছে এত রাতে? সুমতিটা একেবারে ভালোমানুষ কি না। আমি হলে শিক্ষা দিয়ে দিতাম অরুণকে।

বিলক্ষণ! একথা একেবারে সত্যি। আচ্ছা, ডলি ড্যাডিকে একবার খবর দাও। আমরা গুড নাইট জানাবো।

ও মা, ড্যাডি এখন এখানে কোথায়। ড্যাডি ত ক্লাবে।

রাত ত অনেক হ'ল। তিনি ফিরবেন না?

না। তার ফেরার কোনও ঠিক নেই। কখনও বারোটায়, কখনও দুটোয়, কোনও কোনও রাত ফেরেনই না—ক্লাবে রাত কাটিয়ে সেখান থেকেই চলে যান অফিস।

কেন? ক্লাবে আছে কি?

সবই আছে। গেমস, ড্যান্স, বার, আর শনিবার সারা রাত ধরে 'স্যাটারডে বল'। জানো রায়, এবারে নাচের সময় কি হয়েছিল, মনসুন বলের সময় মাইকে হঠাৎ এনাউন্স করল 'ট্যাপ্ ড্যান্স'—এ নাচে মিনিটে মিনিটে বদল করতে হয় পার্টনার। সবে খানিকটা নেচেছি মেশিনশপের মিঃ চ্যাটার্জীর সঙ্গে, এমন সময় কোত্থেকে হপ্ করে এল অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান রোড্রিগ্স—মদের গন্ধ বেরুচ্ছে তার সারা শরীর দিয়ে—এত জোরে আমার কোমর ধরেছিল যে, মনে হচ্ছিল আমার হাড়গুলোই বুঝি গুঁড়িয়ে যাবে। আর সেই নাচের সময়ই ঠোঁটের কাছে ঠোঁট নিয়ে এসে বলল—ডার্ল আই লাভ এ কিস? পার্সীদের বড় বড় ফিয়েস্তায় গেছি কলকাতায়, সেখানে বারেও সার্ভ করেছি, কার্ণিভালেও নেচেছি, কিন্তু এত অসভ্য পার্টনার কোথাও দেখিনি। সঙ্গে সঙ্গে ট্রেপিং পিছিয়ে বদলে নিলাম পার্টনার। নাচ যখন শেষ হয়ে এসেছে, নতুন পার্টনারের মুখের দিকে তাকালাম, চমকে গেলাম পার্টনারকে দেখে—ও মা, এ যে আমার ড্যাডি। একমুখ হেসে ফেললেন ড্যাডি। বাড়ীতে এসে মাকে বললেন—বাঃ, ডলি ত চমৎকার নাচে! আমাকে ডেকে বললেন—এ নাচ ত চমৎকার শিখেছ, স্লো ওয়ালজ শেখো এবার। লজ্জায় ড্যাডিকে মুখ দেখাইনি দশ দিন।

নির্বাক শ্রোতার মত বসে থেকে থেকে অস্থির হয়ে উঠল কাপুর। বলল—রাত দশটা বাজে, যাবি ত চল, আমি চলে যাচ্ছি।

টিপ্পনী করে উঠল ডলি—কেন, ক্যাম্পে আছে কে—যাবার এত তাড়া?

রেগে উঠল কাপুর—আমি ত ওর সঙ্গে কথা কই নি, বলেই রাগে গড়গড় করতে করতে পোর্টিকোতে বেরিয়ে গেল।

হি হি করে হাসতে লাগল ডলি।

তোমার বন্ধুকে রাগানো ভারী সহজ! প্রথম যেদিন ইয়ারিং-এর কথা বলেছিলাম, এত রেগে গিয়েছিল বন্ধুটি যে আমি মেয়ে না হলে হয়ত মেরেই ফেলত!

সবই যখন জান, তখন বেচারীকে মিছিমিছি রাগিয়ে কি আনন্দ পাও তুমি?

আরে তাও জান না বুঝি, কাপুর যে শকুন্তলাদি'র ভাই।

শকুন্তলাদি' আবার কে?

কেন কাপুর কিছু বলে নি! বার্ণপুরে ওয়েলফেয়ার অফিসার মিস শকুন্তলা কাপুর তোমাদের মনোহরের সহোদর বোন। সেই ত আমাকে কনভেণ্ট ভর্তি করে দিয়েছে। আমার নাচের হাতেখড়িও তার কাছে। কলকাতায় নিয়ে যাবার আগের রাতে ঐ যে গ্রামোফোন দেখছ তাতে পুরোনো কয়েকটা ড্যান্স মিউজিক লাগিয়ে আমায় নাচ শিখিয়েছিল শকুন্তলাদি'। তোমরা যেদিন লরী বোঝাই হয়ে এখানে প্রথম এলে, সেই দিনই শকুন্তলাদি'র চিঠি পেলাম—আমার ভাই মনোহরও সার্ভে ক্যাম্পে যাচ্ছে তোমাদের ওখানে। তাকে খুঁজে বের করে বোলো—শকুন্তলাদি'র ছোট বোন আমি, আর সেই সঙ্গে তোমারও। তা আমি প্রথম দিনই চেহারা দেখে চিনে ফেলেছি কাপুরকে! কিন্তু এমনি স্বভাব তোমার বন্ধুর যে এতটুকুও ঠাট্টা বোঝে না—ঠাট্টা করলেই রেগে যায় আর সেই যে কবে ইয়ারিং হারানোর কথা বলেছি সেই ভেবে গম্ভীর হয়ে থাকে সব সময়। রাস্তায় দেখা হলেও কথা বলে না।

ডলির কথা শুনে হেসে ফেললাম। গম্ভীর হয়ে গেল ডলি। বলল—তুমি হাসছ! আমার কিন্তু ভারী খারাপ লাগছে। মিথ্যে কথা বলেছি কাপুরকে, মিথ্যে কথা বলেছি তোমাদের সবাইকে। তুমি কাপুরকে বলো ও যেন এ কথা শকুন্তলাদি'কে কখখনো না বলে।

চোখ দুটো ছলছল করে উঠল ডলির। রাত এগারোটার ঘণ্টা বাজল ঘড়িতে। মোরারজী সাহেব তখনও ফেরেননি। ডলিকে বিদায় জানিয়ে বেরিয়ে এলাম। কাপুর একাই ক্যাম্পে ফিরে গেছে। [ক্রমশঃ।

জে, বি, প্রিষ্টলে

দ্বিতীয় অঙ্ক

(রবার্ট, ফ্রেডা ও অলওয়েনকে দেখা যাচ্ছে প্রথম অঙ্কের শেষ দৃশ্যের মতই আপন আপন জায়গায়)

রবার্ট। ওরা এখুনি আসছে।

ফ্রেডা। সবাই ?

রবার্ট। হ্যাঁ, শুধু বেটি বাদে, সে এখন ঘুমোতে যাচ্ছে।

অলওয়েন। (ঈষৎ বিদ্রূপের সুরে) খুকুমণিটির বুদ্ধি আছে !

রবার্ট। তোমার বলার ধরণটা একটু কেমন কেমন শোনাল না অলওয়েন ? যেন বেটিও চালাকি করে কিছু এড়িয়ে যাচ্ছে ? বেটির যে এ সবের সঙ্গে কোন সংশ্রব নেই তা ত তুমি ভাল করেই জান।

অলওয়েন। জানি কি ?

রবার্ট। (বিপন্ন ভাবে) জাননা'ত কি ?

ফ্রেডা। (চাপা বিদ্রূপের সুরে) বেচারা রবার্ট ! দেখ একবার ওর অবস্থাটা। সত্যি কত সহজেই না আমরা ধরা দিয়ে বসি। কি করে যে আমাদের কোন কিছু গোপন থাকে সেইটেই বরং আশ্চর্য্য।

রবার্ট। ওসব হেঁয়ালীর কোন মানেই আমি বুঝি না। তবে অলওয়েন, তোমার কিন্তু উচিত হয়নি বেটির সম্বন্ধে ওই ধরণের ইঙ্গিত করা। তুমি বেশই জান যে, সে এসবের বাইরে।

অলওয়েন। সে ত বটেই, তার মত সাদা মনের ছেলেমানুষকে এই সমস্ত নোংরামোর মধ্যে না আনাই উচিত।

রবার্ট। তা আমাদের থেকে সে ছোট ত' বটেই। তাছাড়া এখনও ভীষণ ভাবপ্রবণ। দেখলে না—যাবার সময় কি কাণ্ডটাই করে গেল। এ রকম আবহাওয়া সে সহ্যই করতে পারে না।

অলওয়েন। কিন্তু সে হয়ত অন্ত কোন—

রবার্ট। বেশ বোঝা যাচ্ছে তুমি তাকে অপছন্দ কর অলওয়েন, কিন্তু কেন ? সে ত' তোমাকে খুব প্রশংসার চক্ষেই দেখে।

অলওয়েন। (বিদ্রূপ বর্জিত সারল্যের সাথে) তা সে যে চক্ষেই আমায় দেখুক না কেন রবার্ট। আমি কিন্তু তার চেহারাটা ছাড়া আর কোন কিছুরই বিশেষ প্রশংসা করি না। আবার খুব যে একটা অপছন্দ করি তাও নয়। তবে তোমরা তাকে যতটা ক্ষমার চোখে দেখ, ঠিক ততটা ক্ষমার চোখেও দেখতে পারি না।

রবার্ট। (ক্রুদ্ধস্বরে) সে কি কথা অলওয়েন, এমন কি অন্যায় সে করেছে যাতে তাকে ক্ষমার চোখে দেখা না দেখার প্রশ্ন উঠতে পারে ?—না অলওয়েন আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, তোমার নেহাতই অবান্তর কথা হয়ে যাচ্ছে।

ফ্রেডা। (স্বকীয় ভঙ্গীতে) সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই, রবার্ট। তবে কি না আজ প্রথম থেকেই ঠিক হয়েছে অবান্তর কথা বলা। আপাতত কিন্তু একটা প্রশ্ন খুবই জরুরী হয়ে দেখা দিয়েছে। একজন লোককে এই রাত্রে টেনে আনা হচ্ছে সে যে একজন মিথ্যাবাদী জোচ্চোর, চাইকি চোরও সেই কথা শোনাতে। গৃহস্বামী হিসেবে সেক্ষেত্রে তার খাবার জন্য আর কিছু না হোক কয়েকখানা স্যাণ্ডউইচের ব্যবস্থাও ত তোমার করা উচিত।

রবার্ট। ভারি দায় পড়েছে আমার তাকে স্যাণ্ডউইচ খাওয়াবার।

ফ্রেডা। (বিদ্রূপের সুরে) ও, তাহলে তোমার কথা হচ্ছে অসাধুকে স্যাণ্ডউইচ দেওয়া হবে না। কেমন এই ত ? উঃ কি গম্ভীরই তোমরা হতে পার। এসময় থাকত মার্টিন, দেখতে কি মজাটাই না সে করত। বানিয়ে বানিয়েই হয়ত বলে যেত নিজের অনেক পাপের কথা। দোহাই তোমাদের, অন্তত চেষ্টা করেই দেখ না আর একটু হাল্কা হবার—অন্তত কিছুক্ষণের জন্যও।

রবার্ট। (গম্ভীর ভাবে) তোমার মত হাল্কা হতে পারছি না বলে সত্যই আমি দুঃখিত ফ্রেডা।

ফ্রেডা। কথাটা কিন্তু আমি বলেছিলাম নেহাৎ গৃহস্বামিনীর দায়িত্বের খাতিরেই। অতিথি এলে মিষ্টি কথা আর স্যাণ্ডউইচ

পরিবেশনই ত রীতি। (বাইরে ঘণ্টা বাজার শব্দ) ঐ দেখ বলতে বলতেই ওরা এসে গেল। তোমারই কিন্তু নিজেরই গিয়ে ওদের নিয়ে আসা উচিত, রবার্ট।

[রবার্ট বেরিয়ে যেতেই ঘরের হাওয়া হঠাৎ বদলে যায়। দ্রুত এবং ফিস ফিস শব্দে আলাপ চলে অলওয়েন আর ফ্রেডার মধ্যে]।

অলওয়েন। কবে তুমি জানলে, ফ্রেডা?

ফ্রেডা। সে অনেক দিন—প্রায় বছর দেড়েক আগে। অনেক সময় মনে হয়েছে, কথাটা তোমায় বলেই ফেলি।

অলওয়েন। কি বলতে?

ফ্রেডা। কে জানে কি বলতাম? হয়ত বোকার মতই কিছু, কিংবা হয়ত সহানুভূতিসূচক। (অলওয়েনের দুই হাত নিজের হাতে নিয়ে)

অলওয়েন। তোমার ব্যাপারটা কিন্তু আজই আমার নজরে এলো, ফ্রেডা। আর যতই ভাবছি ততই অবাক লাগছে এই সহজ জিনিষটা আগে কেন বুঝতে পারিনি!

ফ্রেডা। অবাক আমিও কম হইনি, অলওয়েন।

অলওয়েন। কিন্তু এ ত পাগলামিরই সামিল। কেমন, তাই নয় কি ফ্রেডা?

ফ্রেডা। সেকথা আর বলতে। কিন্তু এমনি মজা, এ পাগলামি ক্রমশঃ বেড়েই চলে। সে যাই হোক, এখন ত আর কিছুতেই কিছু এসে যাচ্ছে না। এ বরং একদিক দিয়ে ভালই হ'ল।

অলওয়েন। তা হয়ত হ'ল, কিন্তু আশঙ্কাও কিছু কম রইল না। এ যেন ঠিক ব্রেকহীন গাড়ীতে চড়বার মতই অনিশ্চিত।

ফ্রেডা। বিশেষ করে পথে যখন বাঁকেরও অন্ত নেই।

[বাইরে পুরুষ কণ্ঠস্বর, ঘরে এসে প্রথমেই ঢোকে ষ্ট্যানটন]

ষ্ট্যানটন। (ঘরে ঢুকতে ঢুকতে) আমি ত বুঝতেই পারছি না, এত জরুরীর কি হ'ল? ক্ষমা কর ফ্রেডা। আবার তোমায় বিরক্ত করতে এলাম। কিন্তু সেজন্য রবার্টই দায়ী।

ফ্রেডা। (গম্ভীর হয়ে) রবার্ট ঠিকই করেছে।

গর্ডন। (সোজা গিয়ে সোফায় গা এলিয়ে) তা সে ঠিক করুক আর বেঠিকই করুক, খানিকটা নূতনত্ব যে হল, তাতে ত আর সন্দেহ নেই! এবার শোনা যাক্, ব্যাপারটা কি?

রবার্ট। ব্যাপারটা প্রধানতঃ অফিসের সেই টাকাটা নিয়ে।

গর্ডন। (দারুণ বিরক্তিতে) উঃ, ঠিক যা ভয় করেছিলাম তাই। আবারও সেই টাকা! মার্টিনকে নিয়ে এই টানাপোড়েন কি না করলেই নয় রবার্ট?

রবার্ট। একটু ধৈর্য্য ধর গর্ডন, আমি বলছি মার্টিন মোটেই সে চেকটা নেয়নি।

গর্ডন। (উত্তেজনায় লাফিয়ে উঠে) কি, মার্টিন নেয়নি? ঠিক বলছ'ত?

ফ্রেডা। হ্যাঁ, একেবারে ঠিক।

গর্ডন। আমি জানতাম, এ কখনও হতেই পারেনা। মার্টিনের স্বভাবই তা নয়।

ষ্ট্যানটন। (ফ্রেডা ও রবার্টের দিকে তাকিয়ে) সত্যিই তোমাদের তাই ধারণা নাকি? তাহলে আর কে নিল? আর মার্টিনই বা কেন আত্মহত্যা করলো?

রবার্ট। (দৃঢ়কণ্ঠে) তা অবশ্য আমরা জানিনা ষ্ট্যানটন, কিন্তু আশা করছি তুমিই আমাদের তা বলবে।

ষ্ট্যানটন। (সহাস্যে) এ তোমার কেমন রসিকতা রবার্ট?

রবার্ট। মোটেই রসিকতা নয় ষ্ট্যানটন। শুধুমাত্র রসিকতার জন্য কেউ কাউকে এই রাত্রে টেনে আনে? এবার বল ত, তুমি আমায় বলেছিলে কি না যে মার্টিনই চেকটা নিয়েছে। অন্তত তুমি সে বিষয়ে প্রায় নিশ্চিত?

ষ্ট্যানটন। নিশ্চয়ই বলেছিলাম। আর সেই সঙ্গে তার কারণও। সমস্ত ঘটনা থেকে সেই ধারণাই আমার হয়েছিল। তারপর শেষে যা ঘটলো তাতে ত কোন সন্দেহেরই অবকাশ রইলো না।

রবার্ট। তাই কি?

ষ্ট্যানটন। তা নয়ত কি?

ফ্রেডা। তবে মার্টিনকে কেন তুমি বলেছিলে যে, রবার্টই (হঠাৎ আবেগের সুরে) চেকটা সরিয়েছে?

ষ্ট্যানটন। (চমকে) এ তোমার কেমন ঠাট্টা ফ্রেডা? আমি কেন মার্টিনকে সেকথা বলতে যাব?

ফ্রেডা। কেন বলতে যাবে সেইটাই ত আমরা জানতে চাইছি ষ্ট্যানটন।

ষ্ট্যানটন। না, একথা আমি তাকে বলিনি।

অলওয়েন। (শান্তকণ্ঠে) হ্যাঁ ষ্ট্যানটন, তুমিই তাকে একথা বলেছিলে।

ষ্ট্যানটন। (হতাশ ভাবে) সেকি অলওয়েন, তুমিও তাই বলছ?

অলওয়েন। হ্যাঁ ষ্ট্যানটন আমাকেও সেই কথাই বলতে হচ্ছে। কারণ তুমিই মার্টিনকে ঐ মিথ্যে কথাটা বলেছিলে। আর তার ফলে আমায় যে কি ভীষণ কষ্ট পেতে হয়েছে, তা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না।

ষ্ট্যানটন। বিশ্বাস কর, তোমাকে কষ্ট দেবার কোন ইচ্ছেই আমার ছিলনা। আমি কি করে বুঝবো তুমি গিয়ে মার্টিনের সঙ্গে দেখা করবে, আর সেও তোমাকে সব বলে দেবে।

অলওয়েন। সে তুমি কোন অভিপ্রায়ে কি করেছ তা আমার জানার কথা নয়, কিন্তু কাজটা যে তোমার অত্যন্ত জঘন্য হয়েছে সে ত স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে। এরপর অন্তত আমার সঙ্গে তোমার আর কোন সম্পর্কই থাকতে পারেনা, ষ্ট্যানটন।

ষ্ট্যানটন। আমায় ক্ষমা কর অলওয়েন। এতবড় শাস্তি তুমি আমায় দিওনা। এর চেয়ে পৃথিবীর আর সকলের সম্পর্ক ত্যাগ করাও যে আমার কাছে অনেক সহজ।

[করুণ চোখে সে তাকিয়ে থাকে অলওয়েনের মুখের দিকে। কিন্তু তার কাছ থেকে কোন সাড়াই আসেনা]

ফ্রেডা। (তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের সুরে) ও, তাহলে দেখছি অলওয়েন ছাড়া আমরা কেউই তোমার কাছে কিছুই নই!

রবার্ট। অনেকই মিথ্যে কথা বলেছ ষ্ট্যানটন—আর মিথ্যের মাত্রা না বাড়িয়ে এবার স্পষ্ট করে বলত, আমাকে আর মার্টিনকে ওভাবে খেলানর পেছনে, তোমার উদ্দেশ্যটা কি ছিল?

ফ্রেডা। কি আবার উদ্দেশ্য থাকবে? আসলে ঐ চেকটা আত্মসাৎ করাই ছিল ওর উদ্দেশ্য!

গর্ডন। (আবেগ-আবেশে) কি সর্বনাশ। ষ্ট্যানটন! তুমিই তাহলে চেকটা নিয়েছিলে?

ষ্ট্যানটন। হ্যাঁ—নিয়েছিলাম।

গর্ডন। (উত্তেজিত ভাবে ষ্ট্যানটনের দিকে ছুটে গিয়ে) তাহলে আমি বল'ব, তুমি একটি আস্ত শয়তান! ও টাকার কথা আমি ধরছিই না। আসল কথা হচ্ছে মার্টিনের ঘাড়ে দোষ চাপান। তোমার জন্যই সবার ধারণা হয়েছিল মার্টিনই চেকটা নিয়েছে!

ষ্ট্যানটন। (গর্ডনকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে) আঃ—ছেলেমানুষী করনা।

গর্ডন। (গর্ডন পুনরায় ঘুষি বাগিয়ে যেতে)

রবার্ট। গর্ডন! এই গর্ডন!

ষ্ট্যানটন। ওসব ঘুষি টুসি রাখ গর্ডন। (সকলের দিকে তাকিয়ে) আশা করি তোমরা কেউই চাও না এখানে একটা মারামারি হোক।

গর্ডন। বদমাস কোথাকার। মার্টিনের ওপর দোষ চাপিয়ে—

ষ্ট্যানটন। আ মলো যা! আমি কেন মার্টিনের ওপর দোষ চাপাতে যাব? আর মার্টিনও কিছু এমন নাবালক ছিল না যে, আমি চাপাতে চাইলেই সে তা মেনে নেবে। আসলে ব্যাপারটা একটু মনে করেই দেখ না সবাই। টাকাটা নিয়ে যখন হৈ চৈ চলছে, ঠিক সেই সময়েই মার্টিন আত্মহত্যা করলো। ফলে, সবাই তোমরা ধরে নিলে যে সেই টাকাটা চুরি করেছিল। আমার দোষের মধ্যে হয়েছে তোমাদের সেই চিন্তায় আমি বাধা দিইনি, এই ত? কিন্তু সে যখন চলেই গেল, তখন তোমরা তার সম্বন্ধে কি ভাবলে না ভাবলে, তাতে তার কিই বা এসে যায়।

রবার্ট। কিন্তু এ ছাড়া অন্য ভাবেও তুমি আমার কিংবা মার্টিনের ওপর দোষ চাপাতে চেষ্টা করেছ।

ফ্রেডা। হ্যাঁ। আর সেইজন্যই ব্যাপারটা এমন জঘন্য হয়ে উঠেছে।

ষ্ট্যানটন। না, মোটেই না। আমার কাজের জন্য আর কেউ শাস্তি ভোগ করুক, এ আমি কোন সময়েই চাইনি। আমি শুধু চেয়েছিলাম, আর কয়েকটা দিনের সময় পেতে। হঠাৎই জরুরী একটা প্রয়োজনে চেকটা আমি নিতে বাধ্য হই। তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে, ও ক'টা টাকার ব্যবস্থা করা আমার পক্ষে কিছুই কঠিন হত না। শুধু সল্টারকে বুঝিয়ে বললেই সব চুকে বুকে যেত। কিন্তু পরের দিন সল্টার না আসাতেই সব গেল গোলমাল হয়ে।

রবার্ট। কিন্তু চেকটা ত তুমি নিজেও ভাঙ্গাও নি?

ষ্ট্যানটন। না—তা ভাঙাই নি। সেই দিনই আমার একজন বিশ্বাসী লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। সে তখন ঐ ব্যাঙ্কেই যাচ্ছিল। কাজেই চেকটা আমি তাকেই দিলাম। এখন সেই লোকটার চেহারা ও বয়েস যে অনেকটা রবার্ট আর মার্টিনের মত, সেটা নিছকই দৈব ঘটনা! আমায় বিশ্বাস কর, এছাড়া আর কোন গভীর ষড়যন্ত্রই এর ভেতরে ছিল না। তারপর যা কিছু ঘটেছে, সবই ঘটনাচক্রে।

রবার্ট। কিন্তু একথা তুমি আগে বললেই পারতে?

ষ্ট্যানটন। তা কেন আমি বলতে যাব?

ফ্রেডা। কেন—তাও যদি তোমায় বলে দিতে হয় ষ্ট্যানটন, তাহলে আর কোন বক্তব্যই আমাদের নেই। কিন্তু মনে রেখ, ভদ্রতা ও রুচি বলেও একটা ব্যাপার আছে।

ষ্ট্যানটন। (এতক্ষণে খানিকটা স্বাভাবিক হয়ে) আছে নাকি? হবেও বা। কিন্তু অতটা রুচিবাগীশ হবার আগে ভুলে যেওনা ফ্রেডা সব কিছুরই একটা পরিণতি আছে। আমাকে দিয়ে যেটা শুরু করেছ, হয়ত বা সম্পূর্ণ অন্য আর একজনের ওপরই গিয়ে সেটা পড়তে পারে।

রবার্ট। হয়ত তাই। কিন্তু তাই বলে এ ব্যাপারে তোমার আচরণটা ত কিছু আর অত সহজে উড়িয়ে দেওয়া চলে না।

ষ্ট্যানটন। একটু ভেবে দেখলে না চলবারও কিছু নেই। মার্টিনের মৃত্যুতে সব কিছুই গেল চাপা পড়ে। সকলেরই ভাবখানা এই যে এটা যখন মার্টিনেরই কাজ তখন আর কিইবা হবে তা নিয়ে আলোচনা করে। পাঁচশো পাউণ্ডই খুব বড় কথা নয়। সব স্বীকার করে টাকাটা ফিরিয়ে দিতে পারলে, আমিই খুশী হতাম সব থেকে বেশী। কিন্তু মিঃ হোয়াইট হাউস তোমাদের ক্ষমা করলেও আমায় কি ক্ষমা করতে পারতেন? তোমরা ত' তারই শ্রেণীর লোক, কিন্তু আমি যে নেহাতই গরীবের ছেলে। তাছাড়া মার্টিনের আত্মহত্যার ব্যাপারটাই বা তাহলে কি দাঁড়াত?

ফ্রেডা। কি আবার দাঁড়াত? আমরা বুঝতাম সে নির্দোষ।

ষ্ট্যানটন। হ্যাঁ, তা হয়ত বুঝতে। কিন্তু তার আত্মহত্যার কারণটা কি সাব্যস্ত হত? সে কিছু আর রসিকতা করবার জন্য আত্মহত্যা করেনি!

ফ্রেডা। (অত্যন্ত আহত হয়ে) উঃ, কি সাংঘাতিক! (অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে)

গর্ডন। (উত্তেজিত হয়ে ষ্ট্যানটনের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে) খবরদার ষ্ট্যানটন।

রবার্ট। অলওয়েন। একসঙ্গে { মৃত ব্যক্তির সম্বন্ধে ও-ভাবে কথা না বলাই উচিত ষ্ট্যানটন।

ষ্ট্যানটন। কেন উচিত নয় শুনি? তোমরাই সত্য সত্য বলে লাফাচ্ছিলে। শোন এবার কত সত্য শুনতে চাও? আমার কিছু গরজ পড়েছিল না এ-ভাবে এসে সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়াবার। আর একবার যখন আমাকে দাঁড়াতেই হয়েছে তখন যতদূর যা জানি, সবই আমি বলবো। মার্টিন আত্মহত্যা করেছিল, এ তোমরা নিশ্চয়ই অস্বীকার করবে না। আর টাকাটা যে সে চুরি করেনি, এও তোমরা জানলে—এখন বলত তাহ'লে কেন সে আত্মহত্যা করেছিল? এবার বুঝতে পারছ, এই সখের সত্যপ্রীতি তোমাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছে!

ফ্রেডা। কোথায় আবার নিয়ে যাবে? তোমার ভাবখানা দেখে মনে হচ্ছে, তুমি যেন আমাদের চেয়েও মার্টিন সম্বন্ধে অনেক বেশী খোঁজ রাখতে!

ষ্ট্যানটন। রাখতাম কি না রাখতাম সে অন্য কথা। তবে সে যা করেছিল তার নিশ্চয়ই একটা সঙ্গত কারণ ছিল—আর সে কারণ যদি টাকা না হয় তাহ'লে নিশ্চয়ই তা অন্য কিছু?

রবার্ট। (চিন্তিত ভাবে) হয়ত বা টাকাটা আমি নিয়েছি ভেবেই সে তা করেছিল।

ষ্ট্যানটন। (বিদ্রূপের ভঙ্গীতে) 'হয়ত বার' জায়গায় 'হয়ত নাও'ত হতে পারে! তুমি যদি মনে করে থাক, তুমি চুরি করেছ ভেবেই সে আত্মহত্যা করেছিল, তাহলে আমি বলবো তোমার ভাইকে তুমি আদপেই চিনতে না। কারণ, আমি তোমার নাম করাতে সে ত হেসেই খুন! তোমার চুরি করাটা তার কাছে মনে হয়েছিল, মস্ত একটা মজার ব্যাপার।

অলওয়েন। হ্যাঁ, সে কথা খুবই সত্যি। ওতে তার কিছুই আসত যেত না।

রবার্ট। শোন ষ্ট্যানটন—সত্যিই কি তুমি জান, মার্টিন কেন আত্মহত্যা করেছিল?

ষ্ট্যানটন। না, সে আমি কি করে জানবো?

ফ্রেডা। (উত্তাপের সঙ্গে) তোমার কথা শুনে ত মনে হয়—সবই তুমি জান।

ষ্ট্যানটন। আমি শুধু কিছুটা অনুমানই করতে পারি।

ফ্রেডা। (তীক্ষ্ণ কণ্ঠে) তার মানে?

ষ্ট্যানটন। তার মানে, আমার ধারণা শেষের দিকটায় সে নিজেকে বড় বেশী জড়িয়ে ফেলেছিল।

রবার্ট। আমারও যেন তাই।

ষ্ট্যানটন। অবশ্য সেজন্য আমি তার দোষ দিই না।

ফ্রেডা। (উত্তেজনায় ফেটে পড়ে) দোষ দাও না। কি আস্পর্দ্ধা। তুমি তাকে দোষ দেবার কে হে? তুমি ত তার নাম উচ্চারণ করবার যোগ্যও নও। নিজের অপকর্মের বোঝা তার ঘাড়ে চাপিয়ে, সকলের মন তার ওপর বিষিয়ে তুলেও কি তোমার শান্তি নেই? এবার যখন তার নির্দোষিতা প্রমাণ হয়ে গেল, তখনও তুমি চাইছ তার চরিত্র সম্বন্ধে এটা ওটা ইঙ্গিত করতে। নির্লজ্জ আর কাকে বলে।

রবার্ট। একথা অবশ্য খুবই সত্যি। এখন আর তোমার কিছু না বলাই উচিত ষ্ট্যানটন।

ষ্ট্যানটন। (তিক্ত কণ্ঠে) এই উচিত বোধটা তোমার আরও আগে হলেই ভাল হ'ত রবার্ট। সত্য যদি না সহ্যই করতে পারবে, তাহলে তা নিয়ে এত বাড়াবাড়ি করতে না যাওয়াই কি তোমার উচিত ছিল না?

রবার্ট। সে যাই হোক। অন্তত মার্টিনের দুর্নামটা ত আমি দূর করতে পেরেছি।

ষ্ট্যানটন। পারনি তুমি কিছুই রবার্ট। মাঝ থেকে জটিলতাই আরও বাড়িয়ে তুলেছ। বল, এখন কি জানতে চাও? সব কিছুর জন্যই এখন আমি প্রস্তুত।

ফ্রেডা। (ফেটে পড়ে) প্রথমেই আমরা জানতে চাই যে স্বেচ্ছায় তুমি এখান থেকে যাবে কি না?

রবার্ট। আঃ, তুমি থাম ফ্রেডা। হ্যাঁ ষ্ট্যানটন, এর পরও কি তুমি আমাদের কোম্পানীতে থাকা সঙ্গত মনে কর?

ষ্ট্যানটন। সে আমি এখনও কিছু ঠিক করিনি। তা ছাড়া থাকা না থাকায় এখন খুব একটা আমার কিছু যায় আসেও না।

রবার্ট। এক বছর আগেও কিন্তু খুব আসত যেত, ষ্ট্যানটন।

ষ্ট্যানটন। হ্যাঁ। কিন্তু আমরা কথা বলছি এক বছর পরে। এখন আমি চলে গেলে, আমার চেয়ে তোমাদের কোম্পানীরই ক্ষতি হবে বেশী।

রবার্ট। এর পর আর কি কথা থাকতে পারে? তবে এই প্রসঙ্গে আর একটা কথাও বলতে চাই। আমার মনে হয় মার্টিনকে তুমি বরাবরই ঘৃণা করতে।

ষ্ট্যানটন। হ্যাঁ করতাম, তার কারণ হোয়াইট হাউস পরিবারের বাপ, ছেলে ও মেয়েরমত আমারও তার প্রেমে পড়বার কোন কারণ ছিল না। (মুহূর্তের স্তব্ধতা)।

রবার্ট। (দৃঢ়কণ্ঠে থেমে থেমে) তোমার এ কথার কোন গুরু অর্থ আছে কি? না থাকে ত কথাটা ফিরিয়ে নাও। নাহলে তোমায় এর কৈফিয়ৎ দিতে হবে।

ষ্ট্যানটন। (বেপরোয়া ভঙ্গীতে) ফিরিয়ে আমি কিছুই নিচ্ছিনা।

অলওয়েন। (দুজনের মধ্যে দাঁড়িয়ে) ষ্ট্যানটন, রবার্ট, এবার তোমরা থাম। অনেক কিছুই বলা হয়েছে, আর একে বাড়িয়ে তুলো না!

ষ্ট্যানটন। (অলওয়েনের দিকে ঘুরে) সত্যিই আমি দুঃখিত অলওয়েন! কিন্তু এর সব দোষই আমার নয়।

রবার্ট। (অবিচলিত স্বরে) আমি তোমার কৈফিয়তের অপেক্ষা করছি ষ্ট্যানটন।

ফ্রেডা। দেখছ না ইঙ্গিতটা ওর আমার সম্বন্ধেই।

রবার্ট। তাই কি ষ্ট্যানটন?

ষ্ট্যানটন। তা আমি ওকে বাদ দিয়েও কিছু বলিনি।

রবার্ট। ষ্ট্যানটন, হুঁশিয়ার হয়ে কথা বল!

ষ্ট্যানটন। হুঁশিয়ার হবার সময় চলে গেছে রবার্ট! আমার প্রতি ফ্রেডার অন্ধ বিদ্বেষের কারণটাই একটু ভেবে দেখ না। তাহলে দেখবে কারণ একটাই। ও জানে আমার কাছে ওর সব রহস্য ধরা পড়ে গেছে। আর সে রহস্য হচ্ছে—মার্টিনের সঙ্গে ওর অবৈধ প্রেম!

[ফ্রেডা আর্তনাদ করে ওঠে। রবার্ট স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে ফ্রেডার দিকে। তারপর তাকায় ষ্ট্যানটনের দিকে, তারপর আবার ফ্রেডার দিকে]

রবার্ট। (ফ্রেডার পেছনে দাঁড়িয়ে) এ কথা কি সত্যি ফ্রেডা? বলো, চুপ করে রইলে কেন? যা তুমি বলবে তাই আমি বিশ্বাস করবো। এখনও যে ওটাকে আমি লাথি মেরে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিইনি সে শুধু তোমার উত্তরের অপেক্ষায়।

ষ্ট্যানটন। মিথ্যেই তুমি ব্যাপারটাকে নাটকীয় করে তুলছো রবার্ট। এই বিষয়ে নিশ্চিত না হলে, কখনই আমি ওকথা বলতে যেতাম না। ওর স্বীকার কিংবা অস্বীকারে কিছুই আমার যায় আসে না। আর লাথি মারার কষ্ট তোমাকে করতে হবে না—দরকার মত আপনিই আমি চলে যাব। অনেক কষ্টই তোমাদের দিলাম,—ধন্যবাদ।

রবার্ট। ফ্রেডা এ কথা কি সত্যি?

ফ্রেডা। (হতাশায় ভেঙ্গে পড়ে) হ্যাঁ।

রবার্ট। (যেন ওরা দুজন ছাড়া আর কেউ সেখানে নেই) কত দিন থেকে?

ফ্রেডা। বরাবরই।

রবার্ট। কবে থেকে শুরু হয়েছিল?

ফ্রেডা। অনেকদিন থেকে।

রবার্ট। আমাদের বিয়েরও আগে?

ফ্রেডা। হ্যাঁ। ভেবেছিলাম বিয়ের পর সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু তা না হয়ে বরঞ্চ উল্টোটাই হ'ল।

রবার্ট। আমায় ত বললেই পারতে, কেন বলনি?

ফ্রেডা। বলতে যে চাইনি তা নয়। অনেক বারই চেষ্টা করেছি তোমায় বলতে। মনে মনে ঠিকও করতাম কি ভাবে শুরু করবো, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত আর বলে উঠতে পারিনি।

রবার্ট। বললেই ভাল করতে ফ্রেডা, বললেই ভাল করতে। অবশ্য আমার নিজেরও এটা বোঝা উচিত ছিল। এখন কিন্তু সবই পরিষ্কার হয়ে গেল। চাই কি কখন, এর সূত্রপাত তাও এখন আমি বলে দিতে পারি। হ্যাঁ ঠিক, আমরা যখন সেই গ্রীষ্মে টিন্‌টাগেলে গিয়েছিলাম তখনই। কেমন, তাই না?

ফ্রেডা। হ্যাঁ তাই। আঃ কি চমৎকারই না ছিল সেই গ্রীষ্মটা আর কোন দিনই তেমনটা হ'ল না।

রবার্ট। মার্টিন চলে গেল। আর তুমি বললে আর ক'টা দিন হাচিনসনদের বাড়ীতেই থেকে যাবে। তখনই তোমরা—

ফ্রেডা। হ্যাঁ। সেই ক'টা দিনই আমরা পরস্পরকে খুব কাছে পেয়েছিলাম। সত্যি কথা বলতে কি ঐ ক'টা দিনই আমার মার্টিনের সঙ্গে থাকবার সৌভাগ্য হয়েছিল। সে স্মৃতি আমার কোন দিনই ভোলবার নয়। যদিও মার্টিনের কাছে তার কোনই মূল্য ছিল না।

রবার্ট। সে কি! মার্টিন কি তোমায় ভালবাসত না?

ফ্রেডা। (বিষণ্ণতায় ভেঙ্গে পড়ে) না। সত্যিকারের ভাল সে কোন দিনই আমায় বাসেনি। তাহলেও সবই খুব সহজ হয়ে যেত। সে ভালবাসত না বলেই ত তোমায় বিয়ে করলাম। ভাবলাম তাতে হয়ত আমি সুস্থ হয়ে উঠব। কিন্তু ফল হ'ল ঠিক উল্টো। উঃ! দিনের পর দিন কি নরক যন্ত্রণাই না আমায় ভোগ করতে হয়েছে।

রবার্ট। কিন্তু মার্টিনও আমায় বললে পারত। সে ত জানত আমি কি অসুখী।

ফ্রেডা। না তা পারেনি। কারণ তোমায় সে খুব ভয় করতো।

রবার্ট। অসম্ভব! ভয় বলে কোন বস্তুই তারা জানা ছিল না। আর আমায় ভয় করবার ত কোন কথাই ওঠেনা।

ফ্রেডা। ওটা তোমার ভুল ধারণা। মনে মনে তোমার সম্বন্ধে তার অদ্ভুত একটা ভয় ছিল।

অলওয়েন। (মৃদুস্বরে) হ্যাঁ রবার্ট। ফ্রেডা ঠিকই বলেছে। আমিও তাই জানতাম।

গর্ডন। মার্টিন বলতো, রাগলে তোমার নাকি কাণ্ডজ্ঞান থাকেনা।

রবার্ট। অদ্ভুত! মার্টিন সম্বন্ধে একথাও আমার জানা ছিল না। তাহলে এইজন্যই কি (ফ্রেডার দিকে তাকিয়ে) তোমার কি মনে হয় ফ্রেডা, এইজন্যই কি সে—

ফ্রেডা। না, না, তা নিশ্চয়ই নয়। এসবে তার কিছুই যেত আসত না। (ভেঙ্গে পড়ে ফোঁপাতে ফোঁপাতে) উঃ, মার্টিন! মার্টিন!

অলওয়েন। (ফ্রেডার কাছে গিয়ে মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে) অমন করনা ফ্রেডা, শান্ত হও।

ষ্ট্যানটন। দেখলে রবার্ট, সত্য জানতে যাওয়ার পরিণতি!

রবার্ট। সেজন্য আমি মোটেই দুঃখিত নই ষ্ট্যানটন সবকিছু প্রকাশ হয়ে যাওয়ায়, আমি বরং খুসীই হয়েছি। আমার দুঃখ কেবল যে কেন এসব আগে প্রকাশ হ'লনা।

ষ্ট্যানটন। হলে কি এমন লাভ হত?

রবার্ট। প্রথমত মিথ্যের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যেত। দ্বিতীয়তঃ সমস্যাটার সমাধানের দিক দিয়েও হয়ত কিছু করা যেত। অন্তত আমি ওদের পথের অন্তরায় হয়ে থাকতাম না।

ষ্ট্যানটন। (বিদ্রূপের সুরে) তুমি আবার কবে অন্তরায় ছিলে?

গর্ডন। (ক্রমশঃ এসবে বিচলিত হয়ে) না, তুমি কেন অন্তরায় হতে যাবে রবার্ট? অন্তরায় ছিল মার্টিন নিজেই। ফ্রেডাই ত বললো যে সে ওকে ভালবাসত না। আর আমাকেও সে তাই বলেছিল।

রবার্ট। (অবিশ্বাসভরে গর্ডনের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে) তোমাকে বলেছিল?

গর্ডন। হ্যাঁ।

রবার্ট। (উদভ্রান্ত ভাবে) কিন্তু তুমি ত ফ্রেডার ভাই।

ফ্রেডা। (অলওয়েনকে ঠেলে দিয়ে) কি বা'জে মিথ্যে কথা বলছো গর্ডন।

গর্ডন। (রেগে) আমি কেন মিথ্যে বলতে যাব? মার্টিনই আমায় বলেছিল। সব কিছুই যে সে আমায় বলতো।

ফ্রেডা। কখনও না। সে বরং তোমার ছ্যাংলামিতে উত্যক্তই হয়ে উঠেছিল।

গর্ডন। কখনও না।

ফ্রেডা। নিশ্চয়ই। সে নিজেই আমাকে বলেছিল। হ্যাঁ, শনিবার দিন রাতে আমি যখন তাকে সিগারেট কেসটা দিতে যাই ঠিক তখনই সে বলেছিল। আগের দিন রাতে নাকি হাজারো চেষ্টা করেও তোমায় বাড়ী পাঠাতে পারেনি। সারা রাত ধরে কি জ্বালাতনটাই না তুমি তাকে জ্বালিয়েছিলে।

গর্ডন। ফ্রেডা, আমি বেশ জানি, এ সবই তোমার মনগড়া কথা। মার্টিন বেশ ভাল করেই জানতো আমি তাকে কত ভালবাসতাম। আর সে নিজেই কি আমায় কম ভালবাসত?

ফ্রেডা। কখনই না, এ হতে পারে না।

গর্ডন। তুমি ভালই জান, এ তোমার হিংসের কথা।

ফ্রেডা। মোটেই না। আমার বয়েই গেছে তোমায় হিংসে করতে।

গর্ডন। না আবার। চিরদিনই তুমি আমায় হিংসে ক[illegible] এলে।

ফ্রেডা। (ফেটে পড়ে) মিথ্যেবাদী।

গর্ডন। বেশ জান মোটেই মিথ্যে নয়।

ফ্রেডা। একশোবার মিথ্যে। কতবার সে আমার কা[illegible] বিরক্তি প্রকাশ করেছে। তোমার পাগলামোতে সে অস্থির হ[illegible] উঠেছিল। এই আজই কি তুমি কম পাগলামি করছো? মার্টি[illegible]

নাম উঠতে না উঠতেই তুমি ক্ষেপে উঠছ। লজ্জা থাকলে তুমি আর আমার সঙ্গে লাগতে আসতে না। (দু'হাতে মাথা চেপে মুখ ফেরায়)

রবার্ট। (বিভ্রান্ত ভাবে) ফ্রেডা, তোমরা কি পাগল হয়ে গেলে?

গর্ডন। (রবার্টের দিকে তাকিয়ে ভাঙ্গা গলায়) এ সবই ফ্রেডার হিংসের কথা, স্রেফ হিংসে। মার্টিন যদি আমায় ভালই না বাসবে তাহলে কি রোজ আমায় তার বাংলোয় থাকার জন্ত পীড়াপীড়ি করত? (ফ্রেডাকে) তোমাকেই বরং সে দেখতে পারত না। মেয়েদের তার ভাল লাগত না। কতবার সে অনুরোধ করেছে। আমি যেন তোমায় বলি তাকে আর না জ্বালাতে।

ফ্রেডা। (উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে) উঃ, থাম বলছি!

গর্ডন। তুমিও তাহলে আমার সঙ্গে লাগতে এস না।

অলওয়েন। (গর্ডনকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে চাপা স্বরে) চুপ, চুপ। দোহাই, দুজনেই তোমরা চুপ কর।

ষ্ট্যানটন। (চাপা বিদ্রূপের স্বরে) যাক না, বেরিয়েই যাক না। একবার যখন শুরু হয়েছে তখন বেরিয়ে যাওয়াই ভাল।

ফ্রেডা। মিথ্যে, মিথ্যে, মিথ্যে। আমি এর এক বর্ণও বিশ্বাস করি না। মার্টিন কখনই এত নিষ্ঠুর হতে পারে না।

গর্ডন। না, পারে না আবার? (ফ্রেডার কাছে এগিয়ে এসে) কেন। যেদিন সিগারেট কেস দিতে গিয়েছিলে, সেদিনের কথাই ভেবে দেখ না। কি বলেছিল সে?

ফ্রেডা। যাই বলুক না কেন, তাতে তোমার কি?

রবার্ট। (কর্কশকণ্ঠে) আঃ থাম তোমরা। এ কেচ্ছা আর আমার সহ্য হচ্ছে না। দু'জনেরই তোমাদের মাথা খারাপ হয়েছে।

গর্ডন। মোটেই মাথা খারাপ হয়নি। যে কোনও লোকের মতই আমি সুস্থ।

রবার্ট। বেশ, দয়া করে তার একটুও অন্তত পরিচয় দাও। তুমি কিছু এখন আর ছেলেমানুষ নও। আমরা সবাই জানি মার্টিন তোমার বন্ধু ছিল।

গর্ডন। (ফেটে পড়ে) বন্ধু? বন্ধু কি বলছ, সেই ছিল আমার সব কিছু! সে ছাড়া আর আমার কোন কিছুতেই কিছু এসে যেত না। উঃ, মাঝে মাঝে সে আমায় কি কষ্টটাই দিত। মাঝে মাঝে চেষ্টাও করেছি তাকে ঘৃণা করতে। কিন্তু তা কি কখনও সম্ভব! তাকে ঘৃণা করা ত আমার নিজেকে ঘৃণা করারই সামিল। কিন্তু মেয়েদের ওপর কোন ঝোঁকই তার ছিল না। মাঝে মাঝে যে তাদের ও না খেলাত এমন নয়। কিন্তু সে শুধু খেলানই। মার্টিন আমায় সব কথাই বলত, কিছু বাদ দিত না! কারণ আমায়ই সে শুধু ভালবাসত। সে চলে গেছে এখন আর কোন কিছুতেই আমার ক্ষতিবৃদ্ধি নেই। সবই আমি খুলে বললাম, যা কিছু তোমরা ভেবে নিতে পার। (চারিদিকের লজ্জিত স্তব্ধতার মধ্যে সেই শুধু চেয়ে থাকে বেপরোয়া ভঙ্গীতে)

রবার্ট। তাহলে বেটির অবস্থা কি দাঁড়াচ্ছে?

গর্ডন। (বিরক্ত হয়ে) কেন, তার আবার কি হ'ল?

রবার্ট। এই যা সব বললে, তার পর তার কথাটাই ত ভাবা দরকার।

গর্ডন। সেজন্ত তোমার চিন্তার কিছু নেই। তার ভাবনা সে নিজেই ভাবতে পারে।

রবার্ট। সেটা সে পারে না বলেই ত আমাদের ভাবা দরকার।

গর্ডন। পারে কি না পারে, সে তোমার থেকে আমিই ভাল জানি।

ফ্রেডা। (ঝাঁজের সঙ্গে) হ্যাঁ, তুমি সবই জান!

গর্ডন। আমার কথা ত' তোমার ভাল লাগবেই না। বিশেষ করে যখন জানলে যে, তোমার চেয়ে মার্টিন আমাকেই বেশী ভালবাসত।

ফ্রেডা। ও-কথা তোমার আমি বিশ্বাসই করি না।

অলওয়েন। (বাধা দিয়ে) আঃ, তোমরা থাম ত! এটা তোমরা বুঝছ না কেন যে, মার্টিন তোমাদের দু'জনকে নিয়েই মজা করত।

গর্ডন। (প্রতিবাদের স্বরে) মোটেই না, তার স্বভাবই তেমন ছিল না।

ষ্ট্যানটন। না, তা থাকবে কেন? তার স্বভাব ছিল গঙ্গাজলে ধোওয়া তুলসীটির মত।

ফ্রেডা। (তপ্তকণ্ঠে) সে না থাকতে পারে, কিন্তু তাই বলে সে নিজের চুরি অন্তের ঘাড়ে চাপাতে যায়নি।

ষ্ট্যানটন। সে ত সবার বিরুদ্ধেই কিছু না কিছু বলা যায়। কিন্তু আমি বলি কি, এই কাদা ছোড়াছুড়ি এবার থামালে হ'ত না?

অলওয়েন। এ বিষয়ে আমিও তোমার সঙ্গে একমত ষ্ট্যানটন। এখন শুধু ফ্রেডা আর গর্ডন মেনে নিলেই হয়। মার্টিন যে দুশ্চরিত্র ও নিষ্ঠুর প্রকৃতির ছিল, সে ত পরিষ্কারই বোঝা গেল। আর তাকে আমি অপছন্দও করতাম সেই জন্তই।

রবার্ট। অপছন্দ করতে?

অলওয়েন। হ্যাঁ রবার্ট, আমি দুঃখিত। কিন্তু মার্টিনকে আমার ভাল লাগত না। আমি বরং তাকে ঘৃণাই করতাম।

ষ্ট্যানটন। আমি কিন্তু তা জানতাম। আর আমার ধারণা তুমি ঠিকই করতে। একথা আমায় বলতেই হচ্ছে অলওয়েন, যে তোমার অনেক কিছুই খুব ঠিক।

অলওয়েন। না, সে দাবী আমি করি না।

ষ্ট্যানটন। দাবী তুমি কর আর নাই কর, তোমার বিচার বুদ্ধির ওপর আমার অন্তত খুব বিশ্বাস।

রবার্ট। সে যদি বল ত—আমারও ঠিক তাই।

অলওয়েন। না, না। এ তোমাদের অতিশয়োক্তি।

ষ্ট্যানটন। আর এও সত্যি যে আজকের ব্যাপারে একমাত্র তুমিই রয়ে গেলে সব কিছু ধরা ছোঁওয়ার বাইরে।

অলওয়েন। (ঈষৎ বিব্রত ও বিচলিত ভাবে) না—তাও সত্যি নয়।

গর্ডন। তা কি করে হবে? আলোচনাটা উঠলোই ত অলওয়েনের ঐ সিগারেট-কেসটা দেখা না দেখা নিয়ে।

ষ্ট্যানটন। এ আর এমন কি, এ ত আমি প্রথম থেকেই জানি।

অলওয়েন। কোনটা তুমি প্রথম থেকেই জানতে?

ষ্ট্যানটন। শনিবার দিন তোমার মার্টিনের ওখানে যাওয়ার ব্যাপারটা?

অলওয়েন। (বিচলিত ভাবে) তুমি জানতে?

ষ্ট্যানটন। হ্যাঁ।

অলওয়েন। কিন্তু কি করে? আমি ত ঠিক বুঝতে পারছি না—

ষ্ট্যানটন। সেদিন আমি ঐখানেই ছিলাম। আমার বাংলোটা রাস্তার মোড়ের গ্যারাজটারই ঠিক পাশে, সে কথাটা ভুলে যাচ্ছ কেন। তুমি ত ওখান থেকেই সেদিন পেট্রোল নিয়েছিলে।

অলওয়েন। (স্মরণ হওয়ার ভঙ্গিতে) হ্যাঁ, তাইত।

ষ্ট্যানটন। তুমি চলে যেতে ওখানকার লোকজনেরা বলাবলি করছিল তুমি নাকি ফ্যালোজ এণ্ডের দিকেই যাবে।

অলওয়েন। (স্থির দৃষ্টিতে ষ্ট্যানটনের দিকে তাকিয়ে) তাহলে তুমি প্রথম থেকেই এ কথা জানতে?

ষ্ট্যানটন। হ্যাঁ, প্রথম থেকেই।

রবার্ট। (তিক্তকণ্ঠে) আর তোমার মতে হয়ত সেকথা কেন এতক্ষণ গোপন রাখলে এ প্রশ্ন করাও আমাদের অন্যায়!

ষ্ট্যানটন। কেন, একথা আবার কেন? সাক্ষীও আজ আমি কম দিই নি।

গর্ডন। কিন্তু আমার চেয়ে বেশী সাক্ষী কাউকেই তোমাদের দিতে হয় নি। মার্টিনের সংগে আমারই শেষ দেখা হয়েছে ধরে নিয়ে, তদন্তের সময় কি নাজেহালটাই না আমায় করা হ'ল। এখন দেখছি আমার পরে শুধু ফ্রেডাই নয়—অলওয়েনেরও মার্টিনের সঙ্গে দেখা হয়েছিল।

ষ্ট্যানটন। ওসব বাজে কথা রাখ।

গর্ডন। বাজে কথা, এর কোনটা বাজে কথা হ'ল? (জানলার দিকে অপসৃয়মান অলওয়েনের দিকে মাথা হেলিয়ে) সত্যি কথা বলতে কি এখনও আমাদের অনেক কিছু বাকী আছে জানবার। এই যেমন অলওয়েনের কথাই ধরা যাক। ওর সেদিন কি দরকার ছিল সেখানে যাবার?

রবার্ট। সে ত অলওয়েন আগেই বলেছে। ও গিয়েছিল মার্টিনের সঙ্গে আমাদের অফিসের সেই টাকাটার বিষয়ে কথা বলতে।

গর্ডন। কিন্তু সেটুকুই কি সব?

ষ্ট্যানটন। তার মানে?

ফ্রেডা। তার মানে, গর্ডন হয়ত বলতে চাইছে, অলওয়েনের সব কথা এখনও আমাদের শোনা হয়নি। ওর কাছ থেকে আমরা শুধু জেনেছি যে মার্টিনের সঙ্গে টাকাটা সম্বন্ধে ওর কথা হয়েছিল। আর তার মতে রবার্টই টাকাটা নিয়েছিল।

গর্ডন। হ্যাঁ, তাইত। অলওয়েন সেখানে কতক্ষণ ছিল কিংবা মার্টিন ওকে আর কিছু বলেছিল কি না, কিছুই ত আমরা জানি না। (অলওয়েনের দিকে চেয়ে) আমার মতে অলওয়েনের উচিত আরও কিছু আমাদের বলা।

ষ্ট্যানটন। বেশ, সে কথা ওভাবে না বলে, ভাল করে বললেই হয়।

[অলওয়েন জানলার কাছে গিয়ে পাটি সরিয়েই হঠাৎ চীৎকার করে ওঠে।]

রবার্ট। } কি ব্যাপার অলওয়েন, কি হ'ল?
ষ্ট্যানটন। }

[রবার্ট জানলাটার কাছে গিয়ে বাইরে তাকায়। ফ্রেডাও উঠে যায় জানলার কাছে]।

রবার্ট। (বাইরে তাকাতে তাকাতে) না, কেউ ত নেই?

অলওয়েন। না, পর্দাটা সরাতেই পালিয়েছে। কিন্তু আমি শপথ করে বলতে পারি কেউ একজন ওখানে কান পেতে ছিল।

ষ্ট্যানটন। (বসে পড়ে গম্ভীর কণ্ঠে) তা রাতটা আজ কান পেতে থাকবার মতই বটে।

রবার্ট। না অলওয়েন, অসম্ভব। তা ছাড়া কাউকেই ত দেখলাম না।

গর্ডন। ভগবানকে সেজন্য ধন্যবাদ।

[ওরা আবার যে যার জায়গায় ফিরে আসছে, এমন সময় হঠাৎই বাইরে বেজে ওঠে ঘণ্টার শব্দ। সবাই দাঁড়িয়ে বিস্মিত ও বিরক্তির ভঙ্গীতে তাকাতে থাকে পরস্পরের দিকে]

রবার্ট। এই অসময়ে আবার কে এল?

ফ্রেডা। সে আমি কি করে বলবো? যাওনা গিয়ে দেখে এস।

রবার্ট। হ্যাঁ যাচ্ছি। কিন্তু আমি চাই না এই সময় কেউ এসে আমাদের আলোচনায় বাধা দিক।

ফ্রেডা। চাও না চাও, আগে ত দেখে এস কে এল।

[বাইরে আবার শোনা যায় ঘণ্টার শব্দ। রবার্ট বেরিয়ে যায়। ঘরের কেউই কোন কথা না বলে অপেক্ষা করতে থাকে চিন্তিত ভাবে। তার পর বাইরে শোনা যায় রবার্ট ও বেটির কণ্ঠস্বর]

রবার্ট। (বাইরে) কিন্তু আমি বলছি তোমার সম্বন্ধে কোন কথাই আমাদের হয়নি।

বেটি। (বাইরে) আপনি যাই কেন বলুন না, আমি জানি তা না হয়েই পারে না। আর সেই জন্যই ত আমার আসতে হ'ল।

রবার্ট। কি আশ্চর্য। আমি বলছি তবু তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না। (রবার্ট দরজা খুলে ধরতে বেটি এগিয়ে এসে ঘরে ঢোকে]

বেটি। (দরজার মুখ থেকে) কেমন তোমরা সবাই আমায় নিয়েই আলোচনা করছ ত? (সবাইর মুখের দিকে তাকিয়ে) জানতাম। তাই'ত ঘুমোতে গিয়েও ঘুম আসল না। উঠে চলে আসতে হ'ল।

ফ্রেডা। (শান্ত কণ্ঠে) এ তোমার একেবারেই ভুল ধারণা বেটি, সত্যি বলতে কি, একমাত্র তোমার বিষয়েই আমরা কোন আলোচনা করিনি।

বেটি। (গর্ডন, ষ্ট্যানটন ও রবার্টের দিকে তাকিয়ে) সত্যি?

রবার্ট। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।

অলওয়েন। একটু আগে ঐ জানলাটার পাশে তুমিই তবে আড়ি পেতেছিলে কেমন, তাই না?

বেটি। (বিভ্রান্ত ভাবে) না, আড়ি পাতিনি। আমি শুধু উঁকি মেরে তোমাদের ভাব-ভঙ্গী দেখছিলাম। তোমরা সবাই আমায় নিয়ে আলোচনা করছ ভেবে কিছুতেই ঘুম এল না। শেষে নিরুপায় হয়ে তিন তিনটে ঘুমের ট্যাবলেটই খেয়ে ফেললুম। কিন্তু তাতেও যদি ঘুম আসে! অগত্যা চলেই এলাম। কিন্তু

এখন দেখছি ট্যাবলেটগুলোতে আমার বেশ নেশা হয়েছে। কি বলতে কি বলছি কিছুই ঠিক নেই। তোমরা যেন কিছু মনে ক'র না। (সোফায় শরীর এলিয়ে দিয়ে চোখ বোজে)।

রবার্ট। (এগিয়ে গিয়ে বেটির পাশ ঘেঁষে) সত্যি খুব দুঃখিত বেটি! এই সব কিছুর জন্তই আমি দায়ী। তোমার কিছু দরকার নেই ত? (বেটি মাথা নাড়ে) ঠিক বলছ? (বেটি আবার মাথা নাড়ে) তুমি নিশ্চিন্ত থাক তোমার বিষয়ে কোন কথাই আমাদের হয় নি। আমরা বরং এ সব অপ্রিয় ব্যাপার থেকে তোমায় বাইরে রাখতেই চেয়েছি।

ফ্রেডা। (শ্লেষের সহিত) যে পরিবারকে নিয়ে এত কেলেঙ্কারী, সেই পরিবারেই যখন ওর বিয়ে হয়েছে, তখন আর কি করে ওকে তার বাইরে রাখবে রবার্ট?

রবার্ট। (ক্রুদ্ধস্বরে) আঃ, তুমি থাম ফ্রেডা!

ফ্রেডা। কেন, কি এমন অন্যায় বলেছি আমি যে, আমায় থামতে হবে? উঃ, রবার্ট এততেও যদি তোমার পরিবর্তন হ'ল!

রবার্ট। আজকের কথাবার্তার পরেও আমার কোন কিছুতে তোমার কিছু এসে যায় কি, ফ্রেডা?

ফ্রেডা। তা হয়ত যায় না। কিন্তু সুরুচি বলেও একটা ব্যাপার আছে।

রবার্ট। থেকে থাকলে, কিছুটা অন্তত তার পরিচয় দাও।

গর্ডন। উঃ, এবার তোমরা থামবে কি?

বেটি। কিন্তু তখন তোমাদের আলোচনাটা চলছিল যেন কি নিয়ে?

গর্ডন। শুরু ত হয়েছিল কোম্পানীর সেই টাকাটা নিয়ে।

বেটি। মার্টিনই তাহলে সেটা নিয়েছিল?

গর্ডন। মার্টিন কেন নিতে যাবে? নিয়েছে ঐ ষ্ট্যানটন, ও নিজেই তা স্বীকার করেছে।

[এক মুহূর্ত বেটি হয়ে ওঠে সচকিত। আপনা হতেই তার মুখ থেকে বেরিয়ে আসে একটা আর্তস্বর]

বেটি। কি বললে, ষ্ট্যানটন নিয়েছে? ও স্বীকার করেছে? অসম্ভব, কখনও না!

ষ্ট্যানটন। (সবিদ্রূপে) অসম্ভব বলেই মনে হয়, না বেটি? কিন্তু তবুও সম্ভব! তোমার দৃষ্টিতে কতটাই না আমি নেবে গেলাম। কিন্তু কি করা যাবে? আজ যে আমাদের সত্য বলারই পালা। কাজেই স্বীকার করতে হ'ল টাকাটা আমিই নিয়েছি। কথাটা খুবই মারাত্মক শোনাচ্ছে, কি বল বেটি?

[ষ্ট্যানটন তাকায় বেটির দিকে, কিন্তু যেন কেমন অস্বস্তির সঙ্গে এড়াতে চায় সেই দৃষ্টি। রবার্ট তাকাতে থাকে তাদের একজনের দিক থেকে আর একজনের দিকে]।

রবার্ট। তোমার ও কথার অর্থ কি ষ্ট্যানটন?

ষ্ট্যানটন। অর্থ আমি যা বললাম ঠিক তাই।

রবার্ট। কিন্তু বেটির সঙ্গে তোমার ঐ ধরণের কথা বলবার মানেটা কি?

ষ্ট্যানটন। হয়ত আমি বোঝাতে চেয়েছি ও ব্যাপারে বেটির অন্তত অতটা আশ্চর্য হবার কারণ নেই। বিশেষ করে আমায় যখন ও তেমন একটা ভালমানুষ বলেও জানে না।

রবার্ট। (থেমে থেমে) কথাটা এখনও পরিষ্কার বুঝলাম না, ষ্ট্যানটন।

ফ্রেডা। সে তুমি কোনদিনই বুঝবে না রবার্ট।

রবার্ট। (দ্রুত ফ্রেডার দিকে ঘুরে) কিন্তু তুমি বুঝেছ কি?

ফ্রেডা। (মিষ্টি হেসে) বুঝেছি বলেই ত মনে হচ্ছে।

বেটি। কিন্তু টাকাটা যদি মার্টিন না নিয়ে থাকে তবে কেন সে আত্মহত্যা করতে গেল?

গর্ডন। সেইটেই ত আমরা এখন জানতে চাইছি। যতদূর যা জানা গেল, তাতে দেখা যাচ্ছে অলওয়েনের সঙ্গেই তার শেষ দেখা। আর তখন সে অলওয়েনকে বলেছিল টাকাটা সে নেয়নি।

অলওয়েন। তাছাড়া তার ধারণা হয়েছিল রবার্টই টাকাটা নিয়েছে।

রবার্ট। আর আমার মনে হয় ঠিক এইজন্তই সে আত্মহত্যা করেছিল। অন্ত যা কিছুই সে বলে থাকনা কেন, সবই তার ধাপ্পা। আসলে মার্টিন কোন দিনই চাইত না, আমার সম্বন্ধে তার দুর্বলতা অন্ত কেউ ধরে ফেলে।

গর্ডন। হ্যাঁ, আমারও মনে হয় তাই।

রবার্ট। অন্তের কাছে সে আমায় যত ঠাট্টাই করুক না কেন, আসলে তার সব শ্রদ্ধা ও নির্ভরতাই ছিল আমার ওপর। চারদিকের অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তার মধ্যে আমাকেই সে মনে করতো একমাত্র আশ্রয়স্থল। সেই বিশ্বাসেই যখন আঘাত লাগল তখন আর বাঁচবার কোন আগ্রহই তার রইল না।
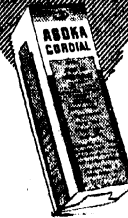
অলওয়েন। আমার কিন্তু তা মনে হয় না, রবার্ট।

ষ্ট্যানটন। আমারও না।

রবার্ট। কিন্তু তোমাদের কারুর পক্ষেই ত আর তাকে আমার থেকে বেশী জানা সম্ভব ছিল না। কাজেই ও নিয়ে আর আলোচনা করে কি হবে? নানারকম ব্যাপারেই সে দুশ্চিন্তা ভোগ করছিল। তারপর যখন সে শুনল আমিই চেকটা চুরি করেছি, তখন আর তার কোন আশাই রইল না! বুঝলে অলওয়েন, তোমাকে জানতে না দিলেও সে হয়ত এই চিন্তায়ই অস্থির হয়ে উঠেছিল। উঃ, কি বোকামিই আমি করেছি।

গর্ডন। সেকি, তুমি আবার কি বোকামি করলে?

রবার্ট। হ্যাঁ, বোকামি নয়ত কি? আমার উচিত ছিল তখনই মার্টিনকে গিয়ে ষ্ট্যানটনের কথাটা বলে দেওয়া।

গর্ডন। তবে ত দেখা যাচ্ছে ষ্ট্যানটনই আসলে তার মৃত্যুর কারণ!

ফ্রেডা। তা আর বলতে!

ষ্ট্যানটন। কি যা তা বলছ?

ফ্রেডা। মোটেই যা তা বলা হচ্ছে না। এখনও বুঝতে পারছ না তুমি কি করেছ?

ষ্ট্যানটন। না। কারণ রবার্টের ঐ ব্যাখ্যা আমি আদপেই বিশ্বাস করি না।

গর্ডন। তা কেন বিশ্বাস করবে? তাতে যে তোমারই অসুবিধে!

ষ্ট্যানটন। কথাগুলো একটু ভেবেই বল না ছাই; মার্টিনের আত্মহত্যার পেছনে অন্য কিছুও ত থাকতে পারে।

রবার্ট। না, আর কিছুই থাকতে পারে না। আমার বোকামী আর তোমার বিশ্বাসঘাতকতাই মার্টিনকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছে। বুঝলে ষ্ট্যানটন?

বেটি। (কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে) উঃ।

রবার্ট। আমি দুঃখিত, অত্যন্ত দুঃখিত বেটি। কিন্তু এর একটা ফয়সালা হওয়া দরকার।

ষ্ট্যানটন। কোন কিছু ফয়সালা করবার মত মানসিক অবস্থা, তোমাদের কারুরই আজ আছে কি?

রবার্ট। শোন ষ্ট্যানটন—

ষ্ট্যানটন। শোনবার মত কিছুই তুমি বলছ না রবার্ট।

গর্ডন। তোমাকে এর কৈফিয়ৎ দিতে হবে।

রবার্ট। মার্টিনকে ঐ মিথ্যে কথা বলার জন্ত, কোন দিনই তোমায় আমি ক্ষমা করতে পারব না ষ্ট্যানটন।

ষ্ট্যানটন। তুমি ভুল করছ রবার্ট—

গর্ডন। (ষ্ট্যানটনকে আঘাত করার উদ্দেশ্যে কাছে গিয়ে) নিশ্চয়ই না। মিথ্যেবাদী কোথাকার!

ষ্ট্যানটন। (গর্ডনকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে) আঃ, আমাকে ঘাঁটিও না বলছি, গর্ডন।

গর্ডন। (ষ্ট্যানটনের দিকে আবার চীৎকার করে ছুটে গিয়ে) তোমার জন্তই মার্টিন আত্মহত্যা করেছিল!

অলওয়েন। (উঠে দাঁড়িয়ে, পরিষ্কার কণ্ঠে) এবারে আমাকে একটু বলতে দাও, গর্ডন। (ফিরে দাঁড়িয়ে সবাই তাকায় তার দিকে) আমি বলছি, মার্টিন আত্মহত্যা করেনি। [ক্রমশঃ।

অনুবাদিকা—শ্রীমতী করবী গুপ্তা।

টুথ-ব্রাশ ব্যবহার-বিধি

রোজ সকালে ঘুম থেকে উঠে ভাল করে দাঁত মাজতে হবে—এইটি সাধারণ স্বাস্থ্যবিধি। নানা জিনিস দিয়ে দাঁত মাজবার ব্যবস্থা চলতি আছে। নানা ধরণের দাঁতনের স্থলে আজকাল বহু ক্ষেত্রে টুথ-ব্রাশ ব্যবহার করা হয়। অবশ্য এই সঙ্গে ভাল মাজন (পাউডার বা পেষ্ট) চাই। টুথ-ব্রাশ ব্যবহার মোটেই খারাপ বা অস্বাস্থ্যকর ব্যবস্থা নয়। তবে এই দিয়ে দাঁত মাজবার সময় কোন্ পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে, সেটি একটি জানবার কথা।

বিশেষজ্ঞদের নির্দ্দেশিত বিধি—উৎকৃষ্ট মাজন (পাউডার কিংবা পেষ্ট) সহযোগে দাঁতগুলো নিয়মিত ব্রাশ করতে হবে—এই কাজের সময় একটি দাঁতও যেন অবজ্ঞাত বা অবহেলিত না হয়। উপরের চোয়ালের দাঁতগুলো উপর থেকে নীচে এবং নীচের চোয়ালের বেলায় নীচ থেকে উপরে ব্রাশ চালাতে হবে। এই নিয়মের ব্যতিক্রম করে ব্রাশ ব্যবহার কখনই শ্রেয়ঃ নয়। আবার দাঁতের শুধু উপরের দিকটা বা অগ্রভাগ ব্রাশ করলেই হবে না—ব্রাশ চালাতে হবে সযত্নে তলার দিকেও অর্থাৎ সমগ্র অংশে। সম্মুখের দাঁত কয়টির তলার দিকে নজর দেওয়ার প্রয়োজন আবার বেশী। কেন না, এই দাঁতগুলোতেই সাধারণতঃ ময়লা (পাথুরি) আটকে থাকে। শুধু উপর বা নীচের দাঁতই নয়, দাঁতের মাড়িগুলোতেও যথারীতি ব্রাশ ব্যবহার সমীচীন।

অপরূপা

শ্রীদ্বারেশচন্দ্র শর্ম্মাচার্য্য
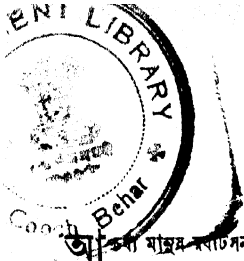
আশ্চর্য্য মানুষ রবার্টসন সাহেব।

রবার্টসন সর্বেশ্বরের জীবনে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করেছে। অজ্ঞাতবাসে কাটে সর্বেশ্বরের জীবন। অতীতকে তিনি ভুলে গেলেন। ভুলিয়ে দিয়েছে লালিয়া আর ওই পাহাড়ী মানুষগুলি, লুসাই, মিকির, কাছাড়ী কত জাতির কত বিচিত্র মানুষ। তাদের সঙ্গে আছে চা বাগানের কুলী-কামীন। আদিবাসী তারা; মহুয়া বন-ঘেরা বিচিত্র সাঁওতাল-পরগণায় তাদের দেশ। তাদের সে সুন্দর দেশের গল্প শোনেন সর্বেশ্বর। তারাও ভুলে গেছে তাদের দেশের হদিস; কোন দিকে পুবে কি পশ্চিমে তাও ঠিক বলতে পারে না।

আর লালিয়া? সর্বেশ্বরের কর্ম্মসঙ্গিনী লালিয়া; পাহাড়ী ছেলে-মেয়েদের নিয়ে উল্লাসে মত্ত থাকে। রবার্টসন সাহেবের পাঠশালার কাজ চলে; দুপুরে ছেলে-মেয়েদের মেলা। পুরুষ আর নারী সবাই কাজে বেরিয়ে যায়। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা আসে পাঠশালায়। কচি-বাচ্চাদের পর্য্যন্ত রেখে যায় তারা। ছোট ছোট খাটিয়ায় বিছানা পাতা রয়েছে; কেউ বা দোলনায় দোল খাচ্ছে। বিচিত্র এই পাঠশালা।

মিসেস রবার্টসনও যোগ দেন দুপুর বেলা। শ্লেট পেন্‌সিল আর বর্ণপরিচয়ের বই আসে সহর থেকে। বিচিত্র খেয়াল রবার্টসনের। কুলী-কামীনরা কাজের ফাঁকে ফাঁকে এসে দেখে যায়। তারাও পায় নূতন জীবনের আস্বাদ।

বিপ্লবী জীবনে নূতন বিপ্লব! তেত্রিশ কোটি ভারতবাসীর মাঝে কত কোটি যে লুকিয়ে আছে, এই পাহাড়ে-জঙ্গলে। মহেন্দ্রদা'র কথা মনে পড়ে যায়, সর্বেশ্বরের মনে উদ্দীপনা জাগে। এদের জাগিয়ে তুলতে হবে; এরাও মানুষ। এদের জাগাতে হবে; এরা সবাই জাগলে দেশের স্বাধীনতা আটকে থাকবে না। এরাই হবে তার রক্ষক। এদেরই বঞ্চিত করে মহাপাপ করেছিল আর্য্যেরা—দস্যুর মত এদের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে এদের যা-কিছু ছিল সবই কেড়ে নিয়েছিল। তবু এরা স্বাধীনতা দেয় নি, মাথা নত করেনি এরা। বনে-জঙ্গলে আশ্রয় নিয়ে বনের মানুষই হয়ে গেছে। স্বাধীনতার মন্ত্র এদের কাছেই শিখতে হবে।

রবার্টসন সাহেব এ কথাই বলে; বিপ্লবী মহেন্দ্রদা'র কথার প্রতিধ্বনি করে রবার্টসন সাহেব, খাঁটি ইংরেজের বাচ্চা। রবার্টসন বলে, বুঝলে সর্বেশ্বর এদের বাঁচিয়ে তুলতে হবে। আমরাও বর্ব্বর ছিলাম, দস্যু ছিলাম; তুমি ইতিহাস পড়নি? ইংলণ্ডের ইতিহাস? জানো, ইংরেজ কারা?

হো-হো করে হেসে ওঠে রবার্টসন। তারপর বলে, রোমানরা এসেই আমাদের চোখ ফুটিয়ে দিলে। আমরা কিন্তু পালিয়ে যাইনি। এরা আর্য্য-দস্যুদের ভয়ে পালিয়েছিল। কিন্তু সময় এসেছে, এবার এরা প্রতিশোধ নেবে। সাবধান হতে হবে।

সাহেবের কথা হেঁয়ালির মতই ঠেকে। সর্বেশ্বর বুঝতে পারেন না, কেন এই পাহাড়ীরা প্রতিশোধ নেবে? শান্ত নিরীহ এরা! নাগা আর লুসাইরা হিংস্র প্রকৃতির হলেও সাধারণ মানুষের সঙ্গে তারা ভাল ব্যবহারই করে। এদের না ঘাঁটালে কারো কোন অনিষ্ট করে না। এদের পল্লীতে ঘুরে ঘুরে দেখেছেন সর্বেশ্বর। বিপ্লবী জীবনের তাঁর বিচিত্র অভিজ্ঞতা আছে।

রবার্টসন সাহেব বলে,—বুঝলে না সর্বেশ্বর! আই থিঙ্ক ইউ হ্যাভ নট আণ্ডারষ্টাণ্ড। এরা জাগছে সর্বেশ্বর। তুমি আমি না জাগালেও এরা জাগছে। এদের জাগিয়ে তুলছে, আমারই দেশের মিশনারীরা। অকালে এদের ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিচ্ছে।

সর্বেশ্বর বলেন,—তাঁরা ভাল কাজই করছেন সাহেব। তাদের শিক্ষা দিয়ে দীক্ষা দিয়ে মানুষ করে তুলছেন।

সর্বেশ্বরের কথা শুনে হো-হো করে হেসে উঠল রবার্টসন। তারপর বললে আর তোমাদের সর্বনাশ করছে ব্রাদার! ভারতবর্ষের সর্বনাশ করছে। এরা তোমাদের পর হয়ে উঠছে, তোমাদের দেশের লোকই তোমাদের শত্রু হয়ে উঠছে।

সর্বেশ্বর বললেন,—তোমার কথা আমি বুঝতে পারছিনে সাহেব। মিশনারীরা ভাল শিক্ষাই দিচ্ছেন এদের। এরাও কেমন সভ্যভব্য হয়ে উঠছে।

রবার্টসন বললে,—তা ঠিক। কিন্তু তুমি জানো না। তাঁরা এদের শিখায় এই হিন্দু মুসলমান এই সমতলের লোকেরা তোমাদের শত্রু। এরাই তোমাদের বনে জঙ্গলে তাড়িয়ে দিয়েছে। এই সব শহর, সুন্দর ঘরবাড়ি এসব তোমাদেরই ছিল; সব এরা কেড়ে নিয়েছে। আজ তোমরা নুন পাও না, আগুন পাও না, কাপড় পাও না। সবই এরা ভোগ করছে। হাজার হাজার বছর ধরে তোমাদের ঠকিয়ে আসছে এরা। তাই তোমাদের দিকে ফিরেও তাকায় না।

বিস্ময়বিমূঢ় সর্বেশ্বর রবার্টসন্ সাহেবের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন। রবার্টসন বলে যায়,—মিশনারীরা তোমাদের অনিষ্ট করছে সর্বেশ্বর। তারাই এদের বন্ধু সেজে এদের খৃষ্টান করে তুলছে।

সর্বেশ্বর বলে ওঠেন,—খৃষ্টান যদি এরা হয়ে যায়, তাতে ক্ষতি কি?

রবার্টসন বলে,—কোন ক্ষতি নাই। কিন্তু এদের মনে এদেশের প্রতি বিদ্বেষ জেগে উঠছে সর্বেশ্বর। এটা হতে দেওয়া যায় না। এমন সুন্দর এ দেশ, এদেশের ধর্ম্মই আলাদা। তোমরা মূর্ত্তিপুজা কর সর্বেশ্বর! আমার দেশের লোক ভাবে তোমরা পুতুল পুজা কর। আমার কিন্তু তা মনে হয় না;—এদেশের গাছ পাথর, আকাশ বাতাস জুড়ে আছে নানা রূপে নানা দেবতা। এখানে সত্যি ঈশ্বর নানা রূপ ধরে আপনি ধরা দিয়েছেন

তোমাদের মূর্তিপূজো মিথ্যে নয় সর্বেশ্বর। বহু বিচিত্র এ দেশে বহুরূপে ঈশ্বরের প্রকাশ, তা আমি অস্বীকার করতে পারিনে।

সর্বেশ্বর রবার্টসন সাহেবের কথাবার্তায় মুগ্ধ হন। তিনি বুঝলেন, মহাজ্ঞানী এই রবার্টসন। সত্যই এদেশকে সে ভালবাসে; এদেশের সংস্কৃতিকে এদেশের আত্মাকে জেনে নিয়েছে রবার্টসন। রবার্টসন বলে—আধ পাগলা এক সাধু এসেছিল সর্বেশ্বর। সে-ই আমার চোখ খুলে দিয়ে গেছে। এ জগৎটাই মহামায়ার খেলা। তুমি, আমি, যদু, মধু সবই মহামায়ার সন্তান। আবার আমাদের সকলের মাঝেই তিনি আছেন। জগৎটা মিথ্যা নয় সর্বেশ্বর, মায়া নয় কিছুই। তোমার আমার মা, সেই মহামায়ারই মায়া। তিনিই মা হয়ে আমাদের লালন পালন করেছেন, ভাই, বোন, বন্ধু, স্ত্রী, পুত্র কিংবা কন্যা সবার মাঝেই তিনি আছেন। এই সমস্ত পৃথিবী, আকাশ-বাতাসে তিনি; তা না হলে আমরা বেঁচে থাকতে পারতেম না। ডু ইউ আণ্ডারষ্ট্যাণ্ড সর্বেশ্বর?

ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত সর্বেশ্বর চমকে ওঠেন সাহেবের কথা শুনে। তাঁর নিজের দেশকে এমন করে একজন বিদেশী জেনেছে; অথচ নিজেরা অবহেলা করেছেন এদেশের সংস্কৃতিকে এদেশের সনাতন ধারাকে। লজ্জারক্ত হয়ে উঠে সর্বেশ্বরের মুখ।

সেদিন থেকে সর্বেশ্বর হয়ে উঠলেন নূতন মানুষ। নিজের দেশের সত্যিকার পরিচয়ে মন দিলেন সর্বেশ্বর। রবার্টসনের পাঠাগারে ইংরেজী, বাংলা আর সংস্কৃত বইয়ের অভাব ছিল না। নূতন করে দেশের ইতিহাস পাঠ করলেন সর্বেশ্বর। রবার্টসনই বুঝালে অগস্ত্য যাত্রার কাহিনী আর পূর্বাচলে কপিলমুনির জন্ম যাত্রার কথা। কাছাড়ের জঙ্গলে ভুবন আর সিদ্ধেশ্বরে কপিলমুনির সিদ্ধাশ্রম তার সাক্ষ্য দিচ্ছে। মানুষকে মানুষ ক'রে গড়ে তুলতে হবে। শিব আর শক্তিকে একাসনে বসাতে হবে।

পাঠশালায় কাজ চলে, সকাল সন্ধ্যায় প্রার্থনা সভায় যে অপূর্ব প্রার্থনা মন্ত্র; মঙ্গলময়, মঙ্গল কর, মঙ্গলময় হে। তার পর আনন্দ মঠের সেই বন্দেমাতরম্ গান।

উল্লাসে নেচে উঠে হাত তালি দিত রবার্টসন সাহেব। মিসেস রবার্টসনও সে প্রার্থনায় যোগ দিতেন। লালিয়া হাত জোড় করে এক পাশে দাঁড়িয়ে থাকত।

পরিচ্ছন্ন হয়ে উঠল পাহাড়ীদের জীবন। লুসাই কিশোর কিশোরীরা যোগ দিল এ পাঠশালায়। মিশনারীদের টনক নড়ল; কিন্তু রবার্টসনের অদম্য উৎসাহ কেউ নেভাতে পারল না। শহর থেকে মাঝে মাঝে সাহেবরা রবার্টসনের এ বিচিত্র পাঠশালা দেখতে আসত। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট লয়েড সাহেব রবার্টসনের বন্ধু ছিলেন; তিনি এলে দু'চারদিন এখানে থাকতেন। তিনি সর্বেশ্বরকে উৎসাহিত করতেন।

রবার্টসন বলতেন,—দেখো লয়েড! আমি তো ধর্মপ্রচার করতে আসিনি। আমি এসেছি আমার কাজে। যাদের নিয়ে কাজ করছি, তাদের যদি কিছু উপকার হয়, তা কি আমি করব না? তার পর উচ্চহাস্যে বলতেন, এ লেবার মে বি দি প্রাইম মিনিষ্টার অব গ্রেট্ ব্রিটেন ওয়ান ডে! ইজ ইট নট ট্রু? সেই লেবার নিয়েই

আমার কাজ। এদের বাঁচিয়ে না রাখলে আমাদের চলবে কি করে?

লয়েড সাহেব হেসে হেসে মাথা নাড়তেন। তিনি যখন আসতেন তখন পাহাড়ীদের জন্ত বিস্তর কম্বল ও কাপড় নিয়ে আসতেন। মিসেস রবার্টসন আর লালিয়া পাহাড়ীদের তা বিলি করত। এরকমই সর্ব্বেশ্বরের দিন কাটছিল।

রবার্টসন মিসেস রবার্টসনের নাম দিয়েছিলেন মিসেস পার্ব্বতী। পার্ব্বতীর এক মেয়ে হ'ল। সাহেব নাম রাখলেন সুজাতা। তিনি বললেন,—বুঝলে সর্ব্বেশ্বর সুজাতা। তোমাদের লর্ড বুদ্ধকে সুজাতা পায়েস খাইয়ে দিল। এ মেয়ের হাতে পায়েস খেয়ে আমিও সংসার ছেড়ে পালাব।

এমনি উল্লাসে ও স্বচ্ছন্দে দিন কাটে। লালিয়ার মাঝে এক অপরূপ পরিবর্ত্তন লাভ করেন সর্ব্বেশ্বর। লালিয়া সবার মাঝে থেকেও যেন একা। আনমনে গান গায়, কখনও বা তার চোখে জল ঝরে; কখনও বা আপন মনে হাসে! সাহেব সত্যই বলেছে—এ যে কি জাতের মেয়ে চেনা কঠিন; চোখ দুটো কটা-কটা! চুলেও আছে পিঙ্গল-আভা। কাপড় পরায়ও আছে যাযাবর ধরণ। লালিয়া গান গায়—

বনের চিড়িয়া কাঁদে মনের খাঁচায়
মনের মানুষ তারে কেন গো কাঁদায়।
সে যে জানে না, জানে না মনের কথা
মনের কথা যত গোপন ব্যথা—
বনের চিড়িয়া কেন ভুলিল মায়ায়!

এমনি কত গানে, কত উচ্ছ্বাস ঝরে পড়ে। সর্ব্বেশ্বর ভাবতেন নিঃসঙ্গ জীবন পাগলী লালিয়া; হয়ত বা নিজের অতীত জীবনকে স্মরণ করে। পাহাড়ী ছেলেমেয়েদের নিয়ে বেশ থাকে লালিয়া। সন্ধ্যায়ই তার ভাবান্তর দেখা যায়। উদ্ভিন্ন-যৌবনা লালিয়া। তার মূর্ত্তি ধীরে ধীরে বিপ্লবী যুবক সর্ব্বেশ্বরের অন্তরে আলোড়ন জাগায়। তবু দৃঢ়-সংযমী সর্ব্বেশ্বর; বিপ্লবীদলে তাঁর কঠোর শিক্ষা। সাবধান হয়ে চলেন সর্ব্বেশ্বর। কিন্তু রবার্টসনের সেই রসিকতা এখনও যায়নি; মাঝে মাঝে লালিয়ার দিকে তাকিয়ে রবার্টসন বলে উঠে,—আই ওয়াণ্ট এ সন-ইন-ল সর্ব্বেশ্বর! এখন নিশ্চয়ই তোমার মত হবে।

সর্ব্বেশ্বর উত্তর দিতে পারেন না। নিজের বংশমর্য্যাদা, নিজের অতীত তাঁকে সচেতন করে তুলে। তবে কি তাঁর অতীতের সঙ্গে ভবিষ্যতের কোন যোগসূত্রই থাকবে না? লালিয়াকে বিবাহ করতে হবে? কি পরিচয় আছে লালিয়ার?

সাহেব যেন সর্ব্বেশ্বরের মনের কথা বুঝতে পারে। সে বলে, কি ভাবছ সর্ব্বেশ্বর? তোমার বংশের কথা, তোমার জাতের কথা?

সর্ব্বেশ্বর ভাবেন, সাহেবটা কি সর্ব্বজ্ঞ? মনের কথা কি এ জানতে পারে?

সাহেব বলে,—নেভার মাইণ্ড মাই বয়! লালিয়া নারী লালিয়া মানুষেরই মেয়ে। তার অতীত নেই। সবই ভুলে গেছে; তুমিও তোমার অতীত ভুলে যাও। আর তোমার অতীতের সঙ্গে তোমার কি কোন সম্পর্ক আছে সর্ব্বেশ্বর। ইউ আর এ গ্র্যাজুয়েট অফ দি ইউনিভার্সিটি। সে পরিচয় দিয়ে কি আর তোমার সমাজে দাঁড়াতে পারবে। না, কখনই পারবে না। তাহলে এত ভয় কেন? ডু ইউ লভ লালিয়া।

সর্ব্বেশ্বর মাথা নত করেন। রবার্টসন সাহেব হো-হো করে হেসে ওঠে তাহলে তার ব্যবস্থা করব আমি। আই শ্যাল বি ইওর ফাদার-ইন-ল। খাঁটি হিন্দুমতে বিবাহ? অল রাইট।

এমন করেই দিন কাটে। রবার্টসন সাহেব লালিয়ার বিবাহ দেবে। কিন্তু একটা দুঃসংবাদে সবই বিপর্য্যস্ত হতে বসল। সর্ব্বত্রই উৎকণ্ঠার ছায়া। লুসাইরা বিদ্রোহী হয়েছে; তারা যে কোন মুহূর্ত্তে আক্রমণ করতে পারে। ইংরেজ কিংবা বাঙ্গালী কারো নিস্তার নেই। কুড়াং নদীর বাঁকে সুন্দরচক চা বাগান তারা হঠাৎ সেদিন লুঠ করে গেছে; সাহেব আর বাবুদের নির্ব্বিচারে হত্যা করে গেছে তারা।

রবার্টসন সাহেব বললে—কেন তারা আমাদের মারবে? কক্ষনো তা হতে পারে না। আই লভ দীজ মেন। আই লভ দীস কাণ্ট্রি। এরা এত বর্ব্বর নয়; নিশ্চয়ই এর কোন কারণ আছে। কেউ তাদের ক্ষেপিয়ে দিয়েছে।

রবার্টসন নিকটবর্ত্তী লুসাইদের ডেকে জিজ্ঞাসা করলে,—সত্যি তোমরা আমাদের হত্যা করবে? কেন? কি করেছি আমরা?

এ সকল লুসাই কোন উত্তর দিতে পারে না। সত্যই এরা কিছু জানে না। মিরাঙ এদের মধ্যে একটু দুর্দ্দান্ত যুবক। সে বললে, —ভয় নেই সাহেব। আমরা আছি, আমরা তোদের রক্ষা করব। তবে কি জানিস; তোদের এই স্কুল আর এই কারবার পাহাড়ী সর্দ্দারদের সহ্য হচ্ছে না। তারা বলছে তোরা সব বিগড়ে দিচ্ছিস।

এক বুড়ো সর্দ্দার বললে—ফাদার ডেভিড রাগ করেছে সাহেব? কেউ আর ক্রুশ নিয়ে যীশুর ভজনা করতে চায় না। ফাদার বলে গেছে যীশু রাগ করেছেন, তার শাস্তি তুই পাবি।

আর একজন বললে—হাঁ সাহেব, তুই বুঝবি নি। স্বদেশী বাঙালী সব পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরছে। তারাই সবাইকে তাতিয়ে দিয়েছে। সাহেবদের মেরে নির্ম্মূল করলে এদেশ মোদেরই হয়ে যাবে, একথা বলছে।

রবার্টসন এদের কথা শুনে হেসে উঠলেন। সাহেব মেরে নির্ম্মূল করবে? বেশ, বেশ! কি বল সর্ব্বেশ্বর! তোমার সেই বিপ্লবী বন্ধুরা নিশ্চয়ই! কুছ পরোয়া নেই। আই এম রবার্টসন, এ ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া! আমার রক্ত দিলে যদি এ দেশ স্বাধীন হয়, আমি এক্ষুনি দিতে রাজী আছি। হো-হো করে হেসে উঠে রবার্টসন।

সর্ব্বেশ্বরের মনে সংশয় জাগে। দু'বছর আগেকার সেই বিদায়ের দিনের কথা মনে পড়ে। নিশ্চয়ই বিজয় দত্ত তার দলবল নিয়ে আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। তা হলে কি পুরাতন বিপ্লবী দল আবার সারা ভারতে বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে দিয়েছে। বিচ্ছিন্ন তিনি। কোন খবরই তিনি রাখেন না। কোন খবরই থাকে না কাগজ-পত্রে। সংবাদপত্র ত তিনি রোজই পড়েন।

রবার্টসন সাহেব মিলিটারীর সাহায্য নিতে রাজী হলেন না। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট লয়েড সাহেব নিজে থেকে একদল আর্মড পুলিশ পাঠালেন। রবার্টসন বললেন,—না, না, আমার সাহায্য চাইনে। তারা আমায় মারবে না।

এদিকে দিন স্থির করেছেন সাহেব। লালিয়ার বিবাহ। কন্যা সম্প্রদান করবেন তিনি। সর্ব্বেশ্বরকে বললেন, ঠিক থেকো

সর্বেশ্বর! পুরোত লাগবে না; বৈদিক মন্ত্র জানি আমি। অগ্নি সাক্ষী ক'রে সম্প্রদান করব।

সন্ধ্যা হ'লেই আতঙ্কে কুলী-বস্তীগুলি নিঝুম হয়ে যায়। বাঙালী বাবুদের কেউ কেউ স্ত্রীপুত্রপরিবারকে দূরে শহরে পাঠিয়ে দিয়েছেন। লুসাইরা ক্ষেপে উঠেছে; কখন যে আক্রমণ করে তার ঠিক ঠিকানা নেই। রবার্টসনের পাঠশালার কাজ ঠিকই চলে। সর্বেশ্বর কাজ করে যান; তবু মাঝে মাঝে শিউরে উঠেন। বিপ্লবীদলের স্বরূপ জানেন তিনি। বিজয় দত্তের জিঘাংসার মূর্তি তাঁর মনের কোণে উঁকি-ঝুঁকি মারে।

লালিয়ার লজ্জারুণ মূর্তি আবার সর্বেশ্বরকে অনুপ্রেরণা দেয়। স্বীকার করেছে লালিয়া; স্বীকার করেছেন সর্বেশ্বর। তাঁরা জীবনপথে উভয়েই একই পথের যাত্রী। মানবতার ধর্মে তাঁরা দীক্ষা নিয়েছেন,—মানবতা তাঁদের ধর্ম। রবার্টসনই দিয়েছেন সে দীক্ষা।

কুলী-বস্তী নিঝুম হ'লেও রবার্টসনের বাংলো আজ আনন্দমুখর। কুলীরমণীরা শাঁখ বাজাচ্ছে। মিসেস রবার্টসন যোগ দিয়েছেন তাদের সঙ্গে। রবার্টসন গরদের যোড় পরেছেন। দেবদারু আর চন্দন কাঠে জ্বলছে হোমের আগুন; এমন সময় হল্লা উঠল। লুসাইরা চা-বাগান আক্রমণ করেছে। হৈ-হৈ রৈ-রৈ বীভৎস আওয়াজ! আকুল কণ্ঠে চীৎকার করছে কুলী-কামীনরা। আর চীৎকার করছে—আশে-পাশের শান্ত পাহাড়ী লুসাই, কাছারী আর মিকিরীরা। বন্দুক পিস্তলেরও আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। কুলী-বস্তীতে আগুন ধরিয়েছে তারা। চায়ের কারখানায়ও আগুন দিয়েছে; গুদাম-ঘরের আগুন আকাশ ছুঁয়ে ফেলেছে।

থরহরি কাঁপছে লালিয়া। মিসেস রবার্টসন ছুটে এসে লালিয়াকে বললেন,—সুজাতাকে ধরো। আমি আসি। হাতে বন্দুক নিয়ে ছুটে চলল মিসেস রবার্টসন—পার্বতী।

বন্দুক নিয়ে ছুটে চললেন মিষ্টার রবার্টসন! গরদের যোড় রয়েছে তাঁর পরনে। কন্যা সম্প্রদান করা হয় নি। রবার্টসন বললেন,—অপেক্ষা কর সর্বেশ্বর; তোমাদের এখান থেকে বের হতে নেই। আমি আসছি।

গুড়ুম্ গুড়ুম্ গুম্—অসংখ্য আওয়াজ ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে আর্মড পুলিশ। মশাল আর বল্লম হাতে অসংখ্য লুসাই। মার-মার চীৎকার তাদের মুখে। তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছেন মিসেস রবার্টসন; বন্দুকের গুলী ফুরিয়ে গেছে। তবু এগিয়ে চলেছেন তিনি। ওদের ভাষায় ওদের কি যে বলছেন বুঝাই যায় না। পড়ে গেলেন মিসেস রবার্টসন।

ছুটে গেলেন রবার্টসন সাহেব। তাঁরও বন্দুকের গুলী নেই। বুক দিয়ে রক্ত পড়ছে; জড়িয়ে ধরলেন মিসেস রবার্টসনকে—আঃ, মাই ডার্লিং পার্বতী! পারলে না, পারলে না। দুর্গার মত অসুর বধ করতে পারলে না!

কথা সরছে না রবার্টসনের মুখে। পুলিশ এগিয়ে এসে তাঁদের ঘিরে রেখেছে। সর্বেশ্বর আর লালিয়া এসে দাঁড়ালেন তাঁদের কাছে। লালিয়ার হাত ধরে অতি কষ্টে সর্বেশ্বরের হাতে তুলে দিলেন রবার্টসন। মিসেস রবার্টসনের মৃত্যুর ছায়া ঘনিয়ে এলেও মশালের আলোয় দেখা গেল তাঁর মুখেও তৃপ্তির হাসি।

শেষ নিঃশ্বাস ফেললেন রবার্টসন সাহেব। শেষ নিঃশ্বাস ফেললেন মিসেস রবার্টসন। সর্বেশ্বরের মনে হ'ল—সত্যই ভারতবর্ষ তার এক পরম বন্ধুকে হারাল। এখনও তাঁর কানে মাঝে মাঝে যেন ঝঙ্কার দিয়ে উঠে—আই এম্ রবার্টসন,—এ ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া!

সমাপ্ত

অসুখে

ক্রন্দসী ধর

ঘুল ঘুলিরই ফাঁক দিয়ে ওই এক চিল্‌তে আলো,
মাগো, আমার আজ সকালে লাগছে কি যে ভালো!
বাইরে এখন কচি রোদে ডাকছে ক'টা বুলবুলি,
সারা উঠোন গন্ধে মাতায় স্বর্ণ-চাঁপা ফুলগুলি;
আতাগাছের জানলা ধ'রে ময়না-ছানার বায়না,
নীল আকাশকে ডাক দিয়ে কয়: আমার কাছে আয় না।
সোনার আলোর মিষ্টি ভোরে খুশীর আলো মাঠে-ঘাটে,
নীল-নীল-নীল অগাধ নীলে পাখ-পাখালি সাঁতার কাটে।

কোথায় আমার ক্লাস-পালানো মন রাঙানো ছন্দ
একলা শুয়ে ছোট্ট ঘরে, জানলা-কপাট বন্ধ;
মিষ্টি-রোদের নরম আলো হাতছানি দেয় আয় রে,
ঘরের চাবি খুলে আমায় কে নিবি আজ বাইরে।
মাগো, আমার একলা শুয়ে লাগছে না আর ভালো;
এক চিলতে আলো আমার সমস্ত মন ভরালো।

কলম্বার মনোমোহন পাঁড়ে

অজয়েন্দুনারায়ণ রায়

৫

বড় বড় অভিনেতা—যেমন নাট্যাচার্য্য গিরিশচন্দ্র ঘোষ, সুবিখ্যাত অভিনেতা অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী প্রভৃতির সঙ্গে নিতান্ত আপনার জনের মত ব্যবহার করতেন পাঁড়ে মশায়। তাঁরা বুঝবারই অবকাশ পেতেন না যে, তাঁদের দলের মালিক মনোমোহন পাঁড়ে।

যখন হাজার হাজার টাকা উপায় হ'তে লাগলো ঐসব অভিনেতাদের দ্বারা, তখন তাঁদের সুখ-সুবিধার দিকে সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখতেন পাঁড়ে মশায়।

এক দিন পাঁড়ে মশায় বললেন নাট্যাচার্য্য গিরিশচন্দ্রকে—আপনার সামনে বলবার অধিকার নেই আমার, তবুও একটা কথা বলতে হচ্ছে আমাকে; গভর্ণমেণ্টের বেঁধে-দেওয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ের অধিক সময় প্লে করা উচিত কি না একটু ভেবে দেখবেন।

এ কথার উত্তরে গিরিশ বাবু বললেন—আমরা ত তার জন্য ফাইন দিয়ে আসছি।

পাঁড়ে মশায়ের প্রকৃত রূপ দেখা গেল এই উত্তরে। তিনি দৃপ্ত ভাষায় বললেন—এটা কি আইনকে ফাঁকি দেওয়ার জন্য করা হচ্ছে না? এই আইনের মধ্যে যে সত্য রয়েছে, আমরা কি সেটাকে উপেক্ষা করছি না? জনসাধারণের স্বাস্থ্যহানি প্রতিরোধ করবার যে মঙ্গল উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে এই আইনে, তা ত পালন করা হচ্ছে না আমাদের।

তখন হেসে নাট্যাচার্য্য বললেন—আপনার নীতিজ্ঞানের পরিচয় পেয়ে খুসী হলুম। তিনি পাঁড়ে মশায়ের নীতিজ্ঞানের ভূয়সী প্রশংসা করতেন আর তাঁর সাথে এই সব বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করেও খুব খুসী হ'তেন। সব চেয়ে খুসী হ'তেন সত্যের প্রতি মনোমোহন বাবুর প্রগাঢ় দৃঢ়তা দেখে।

তার পর পরিচয় স্থাপন করলেন পাঁড়ে মশায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ নাট্যকার ডি, এল, রায়ের সঙ্গে। তিনিই প্রথম প্রস্তাব করলেন, তাঁর নাটকগুলি থিয়েটারে চালাবার জন্য। টাকা-পয়সা নিয়ে প্রথমে কিছু কথাবার্ত্তা হলো। পাঁড়ে মশায়ের এমনি লগ্ন, প্রথম পরিচয় হ'তেই ডি, এল, রায় মশায় আকৃষ্ট হ'য়ে পড়লেন। তাঁর যে নাট্যকার হিসাবে সারা বাঙলা-জোড়া নাম, তার মূলে পাঁড়ে মশায়েরও কিছুটা করণীয় ছিল। রায় মশায় নিজের মুখেই একথা বহুবার বলেছেন।

তখন পাঁড়ে মশায় দুর্গা পূজায় প্রচুর ধূমধাম করতেন। থিয়েটারের বড় বড় অভিনেতারাও নিমন্ত্রিত হ'তেন সেদিনে। দুর্গাদাস, অহীন্দ্র চৌধুরী প্রভৃতির মত অনেককেই নিমন্ত্রণ করেছেন দুপুর বেলায়। অপেক্ষা ক'রে বসে রয়েছেন, তিনটে বেজে গেল, কারও দেখা নেই; পাঁড়ে মশায় উঠে গেলেন মনঃক্ষুণ্ণ হ'য়ে।

সন্ধ্যায় আরতির পর পাঁড়ে মশায় বসে রয়েছেন মন্দিরে। এমন সময় সেদিনের বড় বড় কয়েক জন অভিনেতা এসে হাজির। তাঁরা চান প্রসাদ দর্শন করতে। তৎক্ষণাৎ পাঁড়ে মশায় অসঙ্কোচেই বলে বসলেন—রাত্রের দিকে ত আমার তেমন কোনও প্রসাদের বন্দোবস্ত নেই। এই কথা শোনার পর ওঁদের মধ্যে কাউকে কাউকে বলতে শোনা গেল—তখনই বলেছিলুম দিজেনের তখন, সে কথা তো শুনলে না।

একবার পাঁড়ে মশায় স্ত্রীকে নিয়ে পশ্চিম যাচ্ছেন বেড়াতে। এমন সময় সেকেণ্ড ক্লাসের কামরায় কয়েকজন অভিনেত্রী এসে প্রবেশ করলেন। সেই কামরাতেই ছিলেন পাঁড়ে মশায় সস্ত্রীক। যৌবন-মদমত্তা অভিনেত্রীদের কলগুঞ্জনে ও হাস্যে কামরা পূর্ণ হ'য়ে উঠলো। তাদের চটুল চাহনিতে কামরার বাহিরে প্ল্যাটফর্ম্মে বহু যুবক মুগ্ধ নেত্রে তাদের দিকে লালসা মদির দৃষ্টিক্ষেপ করতে লাগলো। পাঁড়ে মশায় গম্ভীর হয়ে বসে রয়েছেন। ট্রেণ ছেড়ে দেওয়ার পর তাদের লক্ষ্য হলো পাঁড়ে মশায়ের দিকে। কোথায় গেল তাদের কল হাস্য। কোথায় গেল চটুল চপলতা। সকলেই এককালে চমকে উঠে আসন ছেড়ে পাঁড়ে মশায়ের পায়ের ধূলো মাথায় নিতে লাগলো। তিনিও সকলকে স্নেহের স্পর্শ দান করে উদাত্ত স্বরে ব'ললেন কল্যাণ হোক। সে স্বরে মুগ্ধ হয়ে একে একে সকলে আসন নিলো। এখন যেন কামরায় পরিবেশ সৃষ্টি হলো ছাত্র ও শিক্ষকের। একটা ষ্টেশন পার হয়ে অন্য ষ্টেশনে ট্রেণ থামতেই তারা সকলেই নেমে গিয়ে উঠলো একটা ইণ্টারের কামরায়। সেকেণ্ড ক্লাস না কি আর ছিল না। এক খানা ছিল যদিও, সেখানি কতকগুলি সাহেব-মেমে ভরতি।

পাঁড়ে মশায়ের সঙ্গে আধ ঘণ্টা তিন কোয়ার্টার অভিনেত্রীদেরকে যাঁরা থাকতে দেখেছেন, তাঁরাই বুঝতে পেরেছেন কি সম্পর্ক ছিল পাঁড়ে মশায়ের সঙ্গে অভিনেত্রীদের। সে অসাধারণ গাম্ভীর্য্য খাঁচা ছাড়া করতো প্রাণচাঞ্চল্যকে অভিনেত্রীদের।

তখন কলকাতায় একটা হৈ চৈ প'ড়ে গেছে চাণক্যের নতুন ধরণের অভিনয় দেখে। এ রকম অভিনয় এর আগে কেউ দেখেনি, কল্পনাও করেনি। পাঁড়ে মশায়কে অনেকেই ধরলো। তারা বললো, চলুন একদিন ষ্টারে, দেখে আসবেন চাণক্য। অনেক বলা কওয়ার পর রাজি হলেন যেতে। তাঁর মনোমোহন থিয়েটারেও ঐ একই বই অভিনীত হচ্ছে ডি, এল, রায়ের চন্দ্রগুপ্ত। পাঁড়ে মশায় ষ্টারে যেতেই ব্যস্ত হয়ে পড়লেন ষ্টারের কর্ত্তৃপক্ষরা। কোথায় তাঁকে বসাবেন ঠিক পান না তাঁরা। তাঁদের আপ্যায়নে, সম্মান প্রদর্শনে পাঁড়ে মশায় মুগ্ধ হ'লেন, অভিনয়ও দেখলেন কৌতূহলের সঙ্গেই। সব বুঝেও নিলেন। ফিরে এসে তাঁর থিয়েটারের ড্রেসারকে বললেন তুমি এতগুলো পোষাক আনালে কেন এত টাকা খরচ করে। ঐ ত দেখে এলুম হাত পা খোলা সাধারণ পোষাক পরিহিত অভিনেতাদেরকে। দর্শকরাও এখন এই চাচ্ছে। অভিনেত্রীদেরও দেখলুম বুকে একটু ক'রে কাচুলি মাত্র! যুগের সাথে তুমি মানিয়ে চলতে পারো না। ঐ সব শলমা চুমকি জড়িদার জাঁকাল পোষাক পরিচ্ছদ কিনবার আগে যুগের হাওয়ার দিকে চেয়ে দেখবে। কি চায় দর্শকরা ভাল ক'রে বুঝে নিতে হবে।

কয়েকখানা বই-এ প্রভূত টাকা পেতে লাগলেন মনু বাবু। যেমন সাজাহান, দুর্গাদাস, বঙ্গেবর্গী, মোগল পাঠান, সিরাজউদ্দৌলা প্রভৃতি।

থিয়েটার ঘরের উপরে পাঁড়ে মশায়ের নিজস্ব একটি কামরায় নিত্য একটা আলোচনা সভা বসতো। সে সভায় প্রায়ই উপস্থিত থাকতেন অমৃতলাল বসু, যামিনীভূষণ রায়, ডাক্তার যতীন্দ্র মৈত্র। ডাঃ নরেন্দ্র বসু, বিনোদ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির মত লোক। সর্ব্বদা হাস্য কোলাহলে মুখর হ'য়ে থাকত সেই কামরাখানি!

ঐ গৃহে বসেই বন্ধু বান্ধবদের কিসে উন্নতি হবে সে বিষয়ে নানা কথাবার্ত্তা হ'তো। চক্ষু চিকিৎসক যতীন বাবুর প্রসার প্রতিপত্তি কি ভাবে হবে সে বিষয়েও তাঁর চেষ্টার ত্রুটি ছিল না।

মনু বাবুকে প্রায়ই বলতে শোনা যেত—আমি ভাই ভোগ বিলাসের জন্ম অর্থ উপার্জ্জন করিনা। আমি বুঝি আমি অর্থের রক্ষক মাত্র। আমি তার খাজাঞ্চি। আমার হাত দিয়ে তিনি কিছু করিয়ে নিতে চান। এ কথা বলবার সময় তাঁর চক্ষু হ'তো বাষ্পাকুল, ভাষা হ'তো ভাব কম্পিত। ভগবান গ্রহণ করেন মানুষের হৃদয়ের ভাব। মনোমোহনের হৃদয় ছিল নির্ম্মল স্বচ্ছ। কখনও তিনি মিথ্যার বা ছলনার আশ্রয় নিতে জানতেন না। যদি কেউ কখনও ছলনার আশ্রয় নিতেন তাঁকে তিনি দুচক্ষে দেখতে পারতেন না। সেই জন্ম সময় সময় তাঁকে হ'তে হতো দুর্মুখ। এ সময় কেউ তাঁকে থামাতে পারতো না। আবার পরক্ষণেই তিনি সাধারণ মানুষ, যেন কিছুই হয়নি।

পাঁড়ে মশায়ের দাবা খেলার বেশ সখ ছিল, খেলাও মন্দ জানতেন না। এই খেলার ধূম পড়তো, যখন তাঁর বড় শ্যালক মানব রাজা বাসডাঙা রাজবাড়ী থেকে কলকাতা আসতেন। তখন দিন নেই রাত নেই দুজনে খেলায় মত্ত। থিয়েটারে তাঁর নিজস্ব কামরাতেও কেউ করছেন আলোচনা, কয়েকজনে মিলে তাস পিটছেন আর মনু বাবু বসেছেন দাবা নিয়ে একদল প্রতিপক্ষকে নিয়ে। তখন তাঁর বাহ্যজ্ঞান থাকতো না।

যদি কখনও তাঁর স্ত্রী জ্যোতিপ্রভা দেবী বলতেন—ছেলেদের দিকে একটু নজর দাও, ওরা যে লেখাপড়া শিখবে না মোটেই, মানুষ হবে কি ক'রে?

তিনি ভার হ'য়ে শুনে বলতেন—আমার বাবা এতবড় পণ্ডিত, আমাকে শিক্ষা দিতে পেরেছেন? তিনি কি চেষ্টার কসুর ক'রেছেন ব'লতে চাও? আর কিছু বলতে হ'লো না বুদ্ধিমতী স্ত্রীকে। তিনি বুঝে নিলেন, মানুষ নিজের স্বভাবেই ভাল মন্দ শিক্ষা দীক্ষা সব ক'রে নেবে। অপরের চেষ্টা বা উপদেশ দেওয়া নিরর্থক। সেই দিন থেকে তিনি স্বামীর কথা শুনে ও প্রসঙ্গে আর মোটেই উচ্চবাচ্য করতেন না।

সাধারণের সাথে যেন কোন জায়গায় বিরাট একটা ব্যবধান ছিল মনোমোহনবাবুর। কারণ তিনি চুপ করে সহ্য ক'রে ব'সে থাকবার লোক ছিলেন না। যে কাজ সাধারণে উপেক্ষা করে আর সে সম্বন্ধে কিছু ব'লতেও চায় না, তেমন কাজও তিনি চুপ করে উপেক্ষা করতেন না। সে সম্পর্কে মন্তব্য প্রকাশ করতেন অকুতোভয়ে। তিনি বলতেন এটা তিনি পেয়েছেন পাঁড়ে বংশের ধারা রূপে।

আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ছিলেন তাঁর স্বজাতি আত্মীয়ও বটে। সারা বাঙলার একজন খ্যাতনামা সুপণ্ডিতও। ত্রিবেদী মশায় মনোমোহনবাবুর এক নিকটতম আত্মীয়ের সহিত তাঁর কন্যার বিবাহ দিয়েছিলেন বলে তাঁকে অনেক কথা শুনিয়ে দেন স্বজাতীয়দের এক সভায়। কেন তিনি এ কাজ করলেন একজন পণ্ডিত হ'য়ে? ত্রিবেদী মশায়কে স্বীকার করতে হয়েছিল মেয়েছেলের কথায় তিনি যখন অন্যায় করেছেন তখন মনুবাবু তাঁকে বলবেন না কেন? আমার বড় দাদার বিয়ের আসরে আমার বাবাকেও অনেক কথা শুনিয়ে দিয়েছিলেন। সম্পর্কে তিনি ছিলেন বাবার ভগিনীপতি। এই সব নানা কারণে মনুবাবুকে অনেকে রূক্ষ ভাষী বলতেন। কিন্তু আমরা ভালরূপেই জেনেছি তিনি ছিলেন অতিমাত্রায় স্পষ্ট ভাষী ন্যায়বাদী। দুর্ব্বল চিত্ত যারা তারাই তাঁর ঐ গুণকে গুণ ব'লে গ্রহণ করতে পারতো না।

বাগডাঙার এক কবিরাজ ছিলেন মনোমোহনবাবুর প্রিয় বন্ধু। তাঁর নাম উল্লেখ করবো না। একদিন কথায় কথায় তিনি বললেন—কতকগুলো এমন ধারা কাজ তোমরা করো যা নিতান্তই নিরর্থক, যাতে কোনও ফলই হয় না।

মনোমোহনবাবু রুক্ষ স্বরে প্রশ্ন করলেন, কি কাজ তুমি বলতে চাও কবিরাজ?

কবিরাজ বললেন—অনেক কাজই আছে। এই একটাই ধরো না—দুর্গো পুজো, কি ফল হবে এতে? বলিদানের সময় এই যে তোমরা সব ভক্তি ভরে দাঁড়াও আর "মা" বলে আকাশ কাঁপান চীৎকার করো মা কি খুশী হন এতে?

পুজার প্রতি অসীম ভক্তি পুরুষানুক্রমে চ'লে আসচে পাঁড়ে বাড়ীতে। বিরুদ্ধ কথা শুনে মেজাজ বিগড়ে গেল পাঁড়ে মশায়ের। রুষ্ট ভাব দেখেও কবিরাজ মশায় নিরস্ত হ'তে চান না। তিনি বললে—ও সব পুজোটুজো তুলিয়ে দাও; তার চেয়ে বরং ঐ টাকায় কাঙালী বিদেয় করো যাতে একটা কাজের মতো কাজ হবে।

তখন চরমতম ক্রোধে ফেটে প'ড়েছেন পাঁড়ে মশায়। কর্কশ স্বরে বললেন—কাঙালী বিদায় কি কম দেখছো কবিরাজ? মায়ের পুজা তোলার এ কেমন ধারা কথা তোমার! যখন পুজার মন্ত্র শুনি, কেমন ধারা ভাব হয় বলো দেখি। বলিদানের সময় মাকে ডাকতে গেলে কেমন ভাব হয় তা' তুমি জানো না কবিরাজ।

কবিরাজও নিরস্ত হবার পাত্র নন। তিনি বললেন—হাঁ হাঁ ও আমার ঢের দেখা আছে। ভাব হয় না ছাই হয়! ও-সব কিছু না, ও একটা চিরাচরিত কুসংস্কার।

মনোমোহন বাবু আর নিজেকে সংবরণ করতে পারলেন না। পরম বন্ধু কবিরাজ মশায়কে গলায় হাত দিয়ে বের করে দিলেন বাড়ী থেকে। সেই সময় ছাড়াতে গিয়েও অনেককে অপমানিত হ'তে হ'য়েছিল।

কিছুক্ষণ পরেই নবমীর বলিদানের সময় সমাগত। তখুনি ডাক পড়লো পাঁড়ে মশায়কে। তিনি গিয়ে দাঁড়ালেন সজল চক্ষে কৃতাঞ্জলি হয়ে। দুই-একটা বলিদানের পরই সহসা ঢাকের বাজনা চুপ হয়ে গেল। বলিদানে ব্যাঘাত ঘটেছে। বাড়ীতে কান্নাকাটি! কর্ম্মকার স্তম্ভিত নিরুত্তর। পুরোহিত মাথায় হাত দিয়ে বসে রয়েছেন।

মনোমোহন পাঁড়ে মশায় জোর গলায় বললেন—শাক্তের বাড়ীতেই ব্যাঘাত ঘটে, এত কাঁদাকাটা কেন! তখুনি তিনি বের হয়ে গেলেন ঠাকুর বাড়ী থেকে। দেখেন দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন কবিরাজজি। তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধ'রে বার কয়েক তাঁর মুখে চুমো খেলেন। অশ্রুস্বরে বললেন—তুই আমাকে ক্ষমা কর ভাই। আমার এতদূর করা ভাল হয়নি। রাগের মাথায় ভুল করেছি, তুই আমাকে ক্ষমা কর।

এর পর আবার তাঁদের দুজনের বন্ধুত্ব গভীরতর হয়েছিল।

আবার দুজনের সময় নাই অসময় নাই দাবা খেলা চলতে লাগলো। কবিরাজজির কয়লার ব্যবসায় কখনো টাকার অভাবে বন্ধ হয়নি।

কোনও কাজে কর্মে সব কুটুম্বের সঙ্গে ব'সে খাওয়ার নিয়ম ছিল না আমাদের বাড়ীর কারো। এ নিয়ম পুরুষানুক্রমে চলে আসছিল। কুটুম্বরাই দিতেন এ সম্মান আমাদেরকে। আমাদের চোখে এটা অসদৃশ লাগতো ব'লে আমরা ঐ প্রথা ভাঙবার চেষ্টা করলেও আমাদের আত্মীয় স্বজন কুটুম্বরাই ভাঙতে দিতেন না। তাঁরা আলাদা করে বিশেষ স্থানে আমাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করতেন। ভায়া আর কয়েকজন আত্মীয়কে নিয়ে গেছেন কায়রা গ্রামে আমাদের ভাগিনেয়ীর বিবাহে। সে বিবাহ হচ্ছে ঐ পাঁড়ে মশায়ের বাড়ীতেই। পাঁড়ে মশায় বললেন—ঐ ধারা আর করবে না। সব কুটুম্বের সঙ্গে বসে খাও। আলাদা হ'য়ে খাওয়া ভাল না। ভায়ার মত চিরকালই ঐ ধারা। তিনি সম্মতি দিলেন পাঁড়ে মশায়ের প্রস্তাবে। কিন্তু পাঁড়ে মশায়ও পেরে উঠলেন না অনেকের চাপে। অগত্যা তিনি আলাদা ক'রে অন্তস্থানেই খাওয়ানর ব্যবস্থা করলেন, কিন্তু অনেক তিরস্কারই শুনতে হয়েছিল আহারের পরে পাঁড়ে মশায়ের কাছ থেকে। সেদিনে যদিও কিছু দাগ লেগেছিল মনে, কিন্তু আজ বুঝছি কতখানি দূরদর্শিতা ছিল তাঁর! যার কোন দাম নেই তাই আঁকড়ে ব'সে থাকা যে কত বড় মূর্খতা, পাঁড়ে মশায় তা বুঝেছিলেন আর আমরাও আজ তা' মর্মে মর্মে বুঝছি।

তারপর মনোমোহনের মনে পড়লো পিতার শেষ কথা। ভাইদের একটা ব্যবস্থা করতে হবে। সকল ভাইকে ডেকে বললেন—তোরা থেকে সকলে পরামর্শ করে একটা ব্যবস্থা কর। তোরা যা বলবি আমি মেনে নেব। তোরা জানিস যা কিছু আমার আছে, পৈতৃক তেমন কিছুই নয়। আর বাবা থাকতে যা করেছিলাম তাও তেমন-কিছু নয়। বাবার মৃত্যুর পরই বেশীর ভাগ করা। এই সব বিবেচনা ক'রে তোরা সঙ্গতমত ব্যবস্থা কর। তোদেরকে ফাঁকি আমি দিতে চাইনে। তোদের যাতে স্বচ্ছন্দে চলে তাই আমার করবার ইচ্ছা। যাতে আমাদের ভাইদের মধ্যে একটা অশান্তি না ঘটে তাই কর।

দাদার কথায় ভাইরা কতকটা সম্মত হলেন বটে, কিন্তু বাঙালী চরিত্রের বৈশিষ্ট্য যাবে কোথায়! পাঁচজনে ভায়াদেরকে দিলেন দুর্বুদ্ধি, সৃষ্টি হলো বিরোধের। এখন মামলাও বাধতে বিলম্ব হল না।

বড় ভাই কিন্তু অটল অচল। বিচলিত হলেন না তিনি। স্থির সঙ্কল্প করলেন এ মামলা মিটুতেই হবে। ওদের ত দোষ নেই। পাঁচ জনে ওদের মাথা খারাপ করে দিয়েছে। কতখানি সহিষ্ণুতা, কতখানি ধৈর্য্য ছিল তাঁর চরিত্রে ভাবলেও অবাক হতে হয়। তাঁর প্রয়াস নিষ্ফল হ'লো না। অবশেষে ভায়ারা দাদার প্রস্তাবেই সম্মত হলেন। স্থির হলো প্রত্যেক ভাইকে একখানা করে বাড়ী দিতে হবে আর পঞ্চাশ টাকা করে মাসিক হাত খরচ দিতে হবে। ঐ সর্ত্তে লেখাপড়া হ'লো, ভাইরা প্রত্যেকে পেলেন একখানা করে বাড়ী। মাসিক হাত খরচা এখনো নিয়মিত ভাবেই পেয়ে আসছেন ট্রাষ্টির হাত থেকে।

বাড়ীর ছেলেমেয়েদের উপরও দৃষ্টি ছিল প্রখর পাঁড়ে মশায়ের। নিজেদের থিয়েটার বলে যেদিন খুসী যেতে পাবে না কেউ। বিশেষ কোন ধর্ম্মমূলক কি চরিত্র গঠনে সহায়ক নাটক অভিনীত হ'লে অনুমতি মিলতো থিয়েটারে যাবার। তাঁর আদেশ প্রতিপালিত হ'তো সম্রাটের আদেশের মত।

বাড়ীর সব মেয়েদেরকে শিক্ষা দিতেন হালুইকর এনে নানা রকম খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুতি। মেয়েরা খাবার প্রস্তুত করলে বন্ধুবান্ধবদেরকে খাওয়াতেন সেই সব খাদ্যদ্রব্য। ভদ্রলোকরা কি বলবেন তা' শুনবার জন্ত কি সে ব্যগ্রতা! সে এক আনন্দের পরিবেশ!

পাঁড়ে মশায় প্রতিদিন বসতেন নাতি-নাতনীদেরকে নিয়ে বৈকালে জলখাবার সময়। তাঁর সেই বাঁশের লাঠিখানি হাতেই থাকতো। কখন কখন সেই যষ্টি উত্তোলন ক'রে ভয়ও দেখাতেন তাদের। খাবার প্রচুর পরিমাণেই থাকতো। কোন ছেলের কি মেয়ের কম পড়বার ভয় থাকতো না। তবুও ছেলের স্বভাব ত! কেউ মাথা চাড়া দিলেই কিংবা আবদার করলেই তাঁর হাতের সেই লাঠি দেখতে পেত। খুব আনন্দে মহাপুরুষের সাহচর্য্যে দিনগুলো কেটে যেত বাড়ীর ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের। সে দিনের সেই মধুর পরিবেশের কথা মনে হ'লে আজও আনন্দে বুক ভরে ওঠে।

তাঁর সব চেয়ে প্রিয় খাদ্য ছিল কাঁঠালের বীচি। এ কোনও তরকারীতে না থাকলে তাঁর মন পছন্দ হ'তো না। বিদেশে গেলেও পার্শেলে যেত কাঁঠালবীচি। বীচি পুড়িয়ে মুড়ির সঙ্গে খেতেও তিনি ভালবাসতেন। তাঁর খাদ্য ছিল অনাড়ম্বর কিন্তু বিশুদ্ধ ও পুষ্টিকর।

আনন্দ কোলাহলের পর আহারের শেষে এক গ্লাস জল খেয়ে প্রাণখোলা তাঁর আঃ! উচ্চারণ শুনলে সবাই বুঝতে পারতো পাঁড়ে মশায়ের মেজাজ আজ বেশ ভাল আছে। তাঁর ঐ প্রাণ খোলা আঃ! উচ্চারণ যেতো হেদোর ধার অবধি।

৬

ছেলে যেমন ভাল লেখা পড়া শিখলে গুরুজনদের আশীর্ব্বাদ পায়—তোমার সোনার দোয়াত কলম হোক, মনোমোহন পাঁড়েকে ও তাঁর পিতৃপুরুষ আশীর্ব্বাদ করে থাকবেন—তোমার দুয়ারে যেন হাতী বাঁধা পড়ে। সে আশীর্ব্বাদও যেন ফলে গেল হাতে হাতে। একটা বিরাট সম্পত্তি—চৌবট্টি মৌজা যুক্ত একটা পরগণা তাঁর হাতে এসে গেল। খোরসেদপুর পরগণা। তখন রাজা ব'লে সকলে মনে করতে লাগলো পাঁড়ে মশায়কে। এই অভ্যুদয়েও তিনি ছিলেন অবিচলিত। সে দিনেও তাঁর পায়ে সেই তালতলার চটি, গায়ে খদ্দরের ফতুয়া, হাতে সেই চিরপরিচিত বাঁশের লাঠি। বৈভবে তাঁর মনে চাঞ্চল্য আসেনি একদিনও। এমন কি তিনি বলেছিলেন তাঁর ভাই ভূধর পাঁড়েকে—বলবে বড় বাবুকে যেন উতলা না হয় হাতীতে চড়ে। এ বড় বাবু তাঁর বড় ছেলে রত্নেশ্বর পাঁড়ে। তাঁরই ওপর তত্ত্বাবধানের ভার দিয়েছিলেন নতুন নেওয়া সম্পত্তির। ঐ সম্পত্তি নেওয়ার পর তাঁর এক আত্মীয়ের সাথে বিরাট মামলা হয়। সেই মামলায় জয়লাভ ক'রে যখন দখল নিতে যাবেন হাতীতে চড়ে তখনি এ কথা ব'লে পাঠিয়েছিলেন মনোমোহন বাবু তাঁর বড় ছেলেকে।
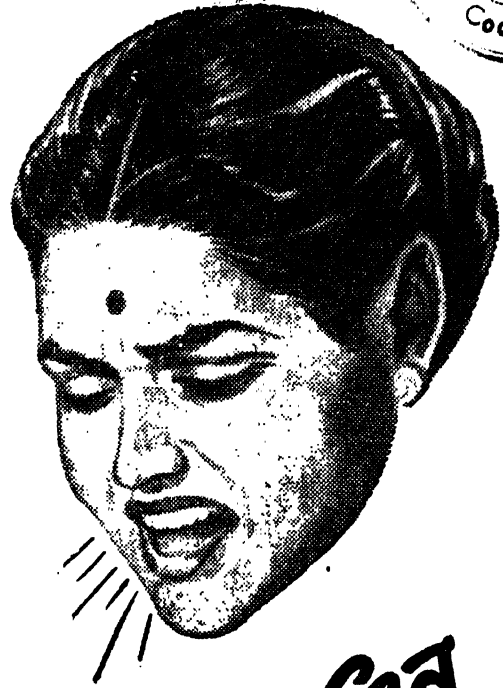
স্ত্রীলোক কখনও পাঁড়ে মশায়কে বশে আনতে পারে নি। লক্ষ

কাশির মূলকারণ দূর করুন
SIROLIN
'ROCHE'
for COUGHS COLDS and all irritable and inflamed conditions of the Chest and Respiratory Tract
সিরোলিন খান
নিরাপদ পারিবারিক ওষুধ
সিরোলিন কেবল যে কাশি 'থামিয়ে দেয়' তা নয়— কাশির মূলকারণ দুষ্ট-জীবাণুগুলিকেও ধ্বংস করে।
একমাত্র ডিস্ট্রিবিউটার্স :— ভলটাস লিমিটেড

লক্ষ টাকা হাতে এলেও তিনি কখনো বিচলিত হননি। বীডন ষ্ট্রীটে সারি বন্দী বাড়ী করেও গর্ব্ববোধ করেননি আর সেদিকে এমনভাবে কোনদিন দৃষ্টিপাতও করেন নি যাতে অপরের মনে হতে পারে গৌরব বোধ করছেন পাঁড়ে মশায় তাঁর কৃতিত্ব দেখে। বরং সেখানে শিব প্রতিষ্ঠা করে গেছেন এবং চিরদিন যাতে সুশৃঙ্খল সেবা পূজা চলে তারও ব্যবস্থা করে গেছেন।

কলকাতায় তখন প্লেগের প্রাদুর্ভাব। যে যেখানে আছে কলকাতা ছাড়তে চায়। মনোমোহন বাবুর আত্মীয় স্বজন, অনুগত আশ্রিত বাড়ীতে যারা ছিল কোলের শিশুটিকে পর্য্যন্ত নিয়ে রওনা হলেন নতুন কেনা কাছারী বাড়ী। সেখানে পৌঁছে সকলেই মহা খুশী। এ যেন মনোমোহনের জন্ত কেউ একখানি সাজান বাগান রচনা করে রেখেছে।

বিরাট কাছারী বাড়ী। তার পাশেই আম কাঁঠালের বিশাল বাগান। মৎস্যপূর্ণ সুবিস্তীর্ণ পুষ্করিণী। সম্মুখে হাজার হাজার বিঘা খাস জমি। এ দেখে কে খুশী না হবে? বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাস, বাতাস উঠলেই আম কুড়াবার ধুম প'ড়ে যেতো। এ যেন কি এক অনাবিল আনন্দের পরিবেশ। সকলকে নিয়ে এক সাথে মাখামাখি ক'রেই তাঁর আনন্দ।

মনোমোহন বাবুর পত্নী জ্যোতিপ্রভা দেবী আমার বাবার মামাত বোন। সেই জন্ত তাঁকে পিসীমা ব'লে ডাকি। এক দিন তাঁকে বললাম—হাঁ পিসীমা, পিসেমশায় সম্বন্ধে কিছু জানেন যদি বলুন।

তিনি বললেন—তোরা তোদের পিসে মশায় থাকতে ত এমন আসতিস না। আমি বাবা সব ভুলে গেছি। তিনিই ছিলেন আমার সব। কোন তীর্থে যেতে হ'লে আমাকে না নিয়ে যেতেন না। একবার আমার অসুখ হ'লো, তীর্থে যাবার সব ঠিক, দিন ক্ষণ হয়ে গেছে। জিনিসপত্র সব গোছগাছ করা হয়েছে। তিনি আমাকে নিয়ে যেতে পারলেন না ব'লে যাওয়া স্থগিত রাখলেন! বললেন—তোমাদের সঙ্গ ছেড়ে তীর্থে গিয়ে কি সুখ পাবো? আমি সঙ্গে থাকলেই পেতেন শান্তি। এই গোয়াবাগানের বাড়ীখানা যার দাম তিন চার লাখ টাকা ত বটেই আমার নামে লেখাপড়া করে দিয়ে গেছেন। বলে গেছেন আমার বংশের ছেলেরাই যাতে পায় সেই জন্ত তোমাকে দেওয়া। আর একটা সম্পত্তি যেটাকে আমাদের ভাত ঘর বললেই চলে সেটাও আমাকে দিয়ে গেছেন। ঐ এক কথাই বলে গেলেন।

আমি বললাম— পিসীমা, ও সব বিষয়ের কথা রাখুন, তিনি কেমন মানুষ ছিলেন, কি করতেন সেই সব কথা বলুন।

তখন আরম্ভ করলেন বলতে—তোমার পিসে মশায় ছিলেন এক কথার মানুষ। একটা কথা বলি তা হলেই বুঝতে পারবে। এক দিন—তখনো মোটর হয় নি। খুব চিন্তিত হয়ে বসে আছেন। খাবার আগে ঘোড়ার গাড়ী নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। ফিরে এসে খাওয়া দাওয়া সারলেন। খুব চিন্তিত। জিজ্ঞেস করতে সাহস পেলুম না মুখ দেখে। দুপুরে একটু ঘুমিয়ে উঠেই আবার বের হলেন গাড়ী নিয়ে। এবার ফিরে এসে নিজেই বললেন—কি মুস্কিল খামখা হায়রান হ'য়ে ঘুরে আসছি, কাজ কিছুই হ'চ্ছে না। মুখ খুব-ভার। রাত্রে থিয়েটার হ'তে এসে কোথাও তিনি বের হতেন না। ব্যতিক্রম দেখলাম সেদিন। খাওয়া-দাওয়ার পর বের হ'য়ে গেলেন। রাত তখন বারটা। উৎকণ্ঠিত হ'য়ে জেগে রয়েছি। ফিরে এলেন, খুসী ধরেনা। নিজেই বললেন—কি হায়রানটাই হতে হ'য়েছে আজ! এক বন্ধুর কাছে কিছু ধার নিয়েছিলুম, তাঁকে দেবার কথা ছিল আজ। সকাল থেকে ভদ্র লোকের দেখাই পাইনা। এতক্ষণে দেখা পেলুম। জিজ্ঞেস করলুম, কি বললেন ভদ্রলোক? তখন বললেন—তাঁর কথা শুনবে তবে! বললেন—তুমি ত আচ্ছা ভদ্রলোক! শুনলুম গোটা দিন চষেচ আমার বাড়ী! এই রাত দুপুরে কোন ভদ্র লোক টাকা দিতে আসে? আমি বললুম—আজ দিতে না পারলে যে কথার ঠিক থাকতো না! শুনে তিনি হেসে বললেন—ধন্ত তুমি মনু!

আর এক দিনের কথা বলি, শোন। সে দিন চিঠি এসেচে বাঁসডাঙ্গার রাজবাড়ী থেকে, রত্নেশ্বর বাঁসডাঙা থেকে আসবে আজই। জিজ্ঞেস করলেন—বড় বাবু নিজের হাতে লিখেচে? আমি বললুম, হাঁ। তখন তিনি বললেন না ভেবেই—ওর ভিতর বাঁসডাঙার রক্ত রয়েচে। দেখ এখন ক'দিন গাড়ী ঘুরে আসে ষ্টেশন থেকে। যা বলতেন কর্ত্তা একটাও মিথ্যা হ'তোনা। ওঁকে জিজ্ঞেস করলে বলতেন—আমি যে মিথ্যা বলিনা কখনো। যারা মিথ্যা বলে তাদের কথাই মিথ্যা হয়; মিথ্যা যে বলেনা তার কথা মিথ্যা হবে কেন?

আমি বললাম—তা সত্যি পিসীমা, মিথ্যা যিনি বলেন না, তিনি যা বলেন সত্যই হয়। তাই ত আগের দিনে মুনি-ঋষিরা বর দিলেও ফলতো আবার অভিশাপ দিলেও ফলতো। আর কি জানেন বলুন পিসীমা।

তিনি আবার বলতে লাগলেন—অনেক বড় লোক কর্ত্তাকে অষ্টাঙ্গের জন্ত কিছু দেবেন বলে দিতেন না। তখন তাঁর রাগ দেখতুম! শুনিয়ে দিতেন হাজার নাম-করা বড়লোক হ'লেও। সকলের সামনেই বলতেন—এই সব মহাপ্রভুদের চিনে রাখবেন, এঁরা কথার ঠিক রাখেন না। খুব সোজা লোক ছিলেন নিজে। একবার কথার বেঠিক দেখলে হাড়ে চটে যেতেন তার উপর। সাধারণ সংসারী লোকের মত ঢেকে চেপে কথা বলতে জানতেন না, সেইজন্ত অনেক লোক তাঁকে ভাল বলতেন না। তিনি মোটেই সংসারী মানুষ ছিলেন না। তিনি বলতেন—দেশের অনেক শিক্ষিত লোক এমন, এখনও বিলিতি জিনিষ ব্যবহার করতে তাদের ঘৃণা হয় না। তারা কি মানুষ! আমার বড় ছেলেকে বিলিতি জিনিষের মোহ ছাড়িয়েছি। ওর মামাদেরকে বিলিতির মোহ কাটিয়ে উঠিয়েছি। একটু থেমে আবার বলতে লাগলেন—মায়ের অসুখ শুনে বাপের বাড়ী বাঁসডাঙা গেলুম। মাকে দেখে এলুম। অবস্থা দেখে ভাল লাগলো না। বুঝলুম এ যাত্রা মা উঠবেন না, তবে এখুনি যে কিছু ভয় আছে তাও বুঝলুম না। সেই সময় জেমোর বাড়ীতে তোমাদেরও দেখে এসেছিলুম। ওখান থেকে কলকাতা ফিরে এসে ওঁকে সব কথা খুলে বলতেই উনি খুব ব্যস্ত হ'য়ে পড়লেন। বললেন—তুমি করেছ কি! তাঁকে নিয়ে এলে না কেন? এখুনি মাকে আনা করাও। তাঁকে আমি কাশীবাস করাব শেষ কালে। শুনে মনটা খুসীতে ভরে উঠলো। আমিই বরং লজ্জায় কিছু বলতে পারিনি। তাঁর কথা শুনে খুব

লজ্জা পেলুম। জিজ্ঞেস করলুম—কে থাকবে ওঁর কাছে কাশীতে? তিনি শুনেই বললেন, কেন তাঁর দুই ছেলে আছে, যোগ্য নাতি রয়েছে। তাঁর আবার লোকের ভাবনা! তখুনি মায়ের কাশীবাসের সব ব্যবস্থা ঠিক করতে লাগলেন। শেষকালে মা যত দিন বেঁচে ছিলেন একজন বামনী আর ছেলেদের মধ্যে এক জনকে না হয় নাতিকে রেখেছিলেন মায়ের কাছে সেবার জন্ম। সকল কাজেই তাঁর কর্ত্তব্যজ্ঞান টনটনে দেখতুম। কর্ত্তব্যের একটু ত্রুটি দেখলে ছেলে হোক, নাতি হোক, দেখতে পারতেন না। আমার এক মেয়ের মেয়ে শ্বশুরবাড়ীতে নাম পেতো না। তাঁর রাগ কর্ত্তো! বলতেন ও মেয়ে শাশুড়ীর মুখে মুখ দেয়! ওর কখনো অভাব ঘুচবে না, আমি ব'লে রাখলুম। আশ্চর্য্য! কখনো দু চোখে দেখতে পারতেন না ঐ নাতনীকে।

সব শুনে বুঝলাম কর্ত্তব্যের প্রতি তাঁর ছিল কি সুগভীর নিষ্ঠা! অন্যায় করলে অতি বড় আপনার জনকেও ক্ষমা করতেন না। আনন্দের মধ্যেই দিন কাটতে লাগলো।

সব সময় সব দিন সমানে যায় না। আনন্দের মধ্যেও বিষাদের ছায়াপাত হলো।

বড় মেয়ে ইন্দুবালা দেবীর শেষ কন্যা-সন্তান হওয়ার পর শরীর অসুস্থ হ'য়ে পড়লো। অসুখ সারতেই চায় না। মনু বাবু ব্যস্ত হ'য়ে তাঁর বন্ধু খ্যাতনামা স্ত্রী-চিকিৎসক বামনদাস বাবুকে ডাকালেন। তিনি দেখে বললেন—এ সূতিকা। সাবধানে নিয়ম মত ঔষধ-পথ্য ব্যবহার করা দরকার। বিশেষ চিন্তিত হ'য়ে আরও কয়েক জনকে ডাকালেন। সকলেই বামনদাস বাবুকে সমর্থন করায় পাঁড়ে মশায় বুঝলেন সূতিকাই বটে। অনেক চিকিৎসককে দেখালেন, কিন্তু রোগের উপশম হয় না। অবশেষে প্রাণসমা কন্যাকে বিসর্জ্জন দিতে হ'লো। এই কন্যার শোকে তিনি মুহ্যমান হ'য়ে পড়লেন। কালে শোকের প্রশমন হয়। পাঁড়ে মশায়েরও শোক একটু প্রশমিত হ'তেই তিনি অন্য এক মানুষ হ'য়ে ফুটে উঠলেন।

তিনি বুঝলেন দুনিয়া কিছুই না, সব অসার অলীক। যা ক'রে যাবো নিজে শুধু তাই থাকবে। এই নিদারুণ দুঃখের সময় তাঁর মধ্যম ভাই তাঁকে নানা ভাবে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন। তিনিও প্রাণতুল্য ভালবাসতেন তাঁর মধ্যম-ভ্রাতাকে। সেই বারই বোঝা গেল তাঁদের ভ্রাতৃপ্রেমের গভীরতা। পরস্পর পরস্পরকে বুকে জড়িয়ে ধ'রে কি সে মর্ম্মভেদ ক্রন্দন!

কাজ-কর্ম্ম সেরে মনু বাবু এসে বসতেন নিচেকার বেঞ্চিতে। সেইখানে বসেই তেলমাখা পর্ব্ব সারতেন। কোন কোন দিন বাজারের হিসাব এনে শোনাতেন সেই সময়েই সরকার। কি তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি! পায়চারি করতে করতে ধরে ফেলতেন যেটা অন্যায়। জিজ্ঞেস করতেন—এ খরচটা কেন? তখন মাথা চুলকিয়ে অপ্রতিভ হ'য়ে নিরুত্তর থাকতেন সরকার। তখুনি তিনি নিজেই বলতেন বড় বাবু না মধ্যম বাবু কে বলেছেন এ খরচ করতে? তার উত্তর পেলেই তিনি খুশী, সরকারকে অপরাধী ক'রে রাখতেন না।

ঐ অতো কড়া লোকের ছাতি এত নরম বলার না। গরুর রাখাল জগন্নাথ, ডাক নাম জগা। তাকেও ডেকে সস্নেহে জিজ্ঞেস করতেন—ভাল আছিস ত জগা? এক দিন জগার অসুখে তাঁর ব্যস্ততা দেখেছিলুম। এমন কি বেশী জ্বরের সময় দেখেছি তিনি নিজে জগার মাথায় জল দিচ্ছেন। আইস-ব্যাগ চেপে ধ'রে রয়েছেন। ঘৃণার চোখ তাঁর ছিল না। ছোট-বড় চাকর-চাকরাণী সকলকেই তিনি ভালবাসতেন।

একদিন পিসীমাকে জিজ্ঞেস করলাম—হাঁ পিসীমা, আপনি কি রকম দৈন্য দশা দেখেছেন এ বাড়ীতে এসে? ভার হয়ে পিসীমা বললেন—তা আবার দেখিনি! কতো ভগবানে ভক্তি আমার শ্বশুরের! টাকার অভাবে পুজো করতে পারতেন না মা দুর্গার। কি দুঃখ তখন তাঁর! তোমার পিসে বাবারও তখন বেশী বয়স না, উপায়ও করতে পারতেন না। বাড়ীতে লোক এসেছে, খেতে দিতে হবে; কি বেগই না পেতে হ'তো। যত দারিদ্র্যই হোক, বাড়ী থেকে অভুক্ত কাউকে যেতে দিতেন না শ্বশুর মশায়। নিজেরা উপবাসী থেকেও অভ্যাগতকে খাইয়েছেন, সবই ত দেখেছি বাবা! অমন দিন যেন অতি বড় শত্রুরও না হয়। শ্বশুরের একখানা বই গবর্ণমেণ্ট নিলেন ছেলেদেরকে পড়াবার জন্য। সে কি খুশী আমার শ্বশুরের। তখন আট দশ হাজার টাকা পেতেন ছেলেদের পড়ার জন্য বই চললে।

তখন আমার বড় ছেলে রত্নেশ্বর হয় বাঘডাঙায়। ওর জন্মের খবর যে দিন এলো সেই দিনই গবর্ণমেণ্ট বই নিয়েছেন ছেলেদেরকে পড়াবার জন্য। সেই জন্য ছেলের নাম রাখলেন রত্নেশ্বর। আর মুখেও বলেছেন এ ছেলের কখন অভাব হবে না—ও আমার রতন। তার পর থেকেই আমাদের অভাব দূর হ'তে লাগলো। শ্বশুর মশায় আবার পুজো আনলেন। তাঁর মুখে হাসি দেখা গেল। আমরাও ভাবলুম সব দুঃখ এইবার আমাদের ঘুচে গেল।

সব কাজই তাঁর পিতার নামে করবার ইচ্ছা ছিল। প্রায়ই বলতেন তিনিই আমার সব। তাঁরই আশীর্ব্বাদে আমি বেঁচে রয়েছি। এই যে ধন-ঐশ্বর্য্য দেখছো সব কিছুর মূলেই আমার পিতা।

একটা দাতব্য চিকিৎসালয় ক'রে আমার পল্লীভবনের দরিদ্র প্রতিবেশীদের রোগে ঔষধ পাবার ব্যবস্থা করতে হবে, এ কথা প্রায়ই বলতেন। আর একটা খুব বড় পুষ্করিণী কাটিয়ে প্রতিবেশীদের জলাভাব দূর করতে হবে। সে ইচ্ছা পূরণ করেছিলেন প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা খরচ ক'রে। এ সবই হ'য়েছিল আমার শ্বশুরবাড়ীর দেশ কায়বাতে। যশোর জেলার সদরে অনেক টাকা খরচ ক'রে আমার শ্বশুরের নামে একটা টোল স্থাপন করেন। বছর বছর অনেক টাকা খরচ করতেন, এখনও সে টোল চলছে।

সব চেয়ে একটা বড় কাজের প্রেরণা এলো তাঁর মনে। তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু কবিরাজ যামিনীভূষণের অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ কলেজ ও হাসপাতালের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে চিন্তা করতে লাগলেন দিবা-রাত্র। যাট হাজার টাকা দিয়েও চিন্তার বিরাম নাই। প্রত্যেক মিটিংয়েই তালতলার চটি পায়ে, খদ্দরের ফতুয়া গায়ে, আর হাতে বাঁশের লাঠি নিয়ে চীৎকার ক'রে রূঢ় স্বরে বলতেন—আপনারা যে মিটিং করছেন, এতে কাজের মত কাজ কি হচ্ছে? এখন মিটিং ছেড়ে কাজে বেরী হ'তে হবে। সে কথা অনেকেরই ভাল লাগতো না। তাঁরা বলতেন—আইন অনুসারে ত সব করতে হবে। রেজোলিউশন না হ'লে ত খামখেয়ালীর উপর কিছু করা চলে না। তখন রুখে উঠে বলতেন, রেখে দেন আপনাদের রেজোলিউশন। শীতে কষ্ট পাচ্ছে রোগী, আর এখন বসে মিটিং করা! এই কথা ব'লে দেখতে দেখতে

ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেলেন পাঁড়ে মশায়। ভিক্ষার ঝুলি হাতে নিয়ে ঘুরলেন বড় বড় লোকের দ্বারে দ্বারে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সকলে দেখতে পেলেন প্রতিষ্ঠানে এসে পড়েছে বহু সংখ্যক লেপ কাঁথা আর মণ দরুণে তূলো।

এক দিন ত যামিনী বাবুর সঙ্গে লাঠালাঠি হয় আর কি! হয়নি কেবল প্রগাঢ় বন্ধুত্বের জন্যই। সেদিন কাপড় নিয়ে বাধলো। রোগীদের পরবার মত কাপড় নেই। অনেক সময় রোগীদের কাপড় ছাড়িয়ে কাচান চলতো না। মনোমোহন বাবু বিচলিত হলেন। শেষ পর্য্যন্ত স্থির হ'লো মনু বাবুকেই পাঠান হোক কাপড়ের ব্যবস্থা করতে। তিনিও বের হ'লেন কাপড় সংগ্রহ করতে। কি সে ব্যাকুলতা! দ্বারে দ্বারে ঘুরে কাপড় যোগাড় করতে লাগলেন রোগীদের জন্ম। কোথাও কোথাও হতমান হ'য়ে ফিরে আসতে হয়। আবার কোথাও যা পাবেন আশা করে যান তা পান না। তবু বিরক্তি নাই, নৈরাশ্য নাই। কোন রকমে কিছু কাপড় যোগাড় হ'লো শেষ পর্য্যন্ত। নিজের পরমায়ু ক্ষয় ক'রে, নিজের বুকের রক্ত দিয়ে গ'ড়ে তুলেছিলেন অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ কলেজ আর হাসপাতাল বন্ধুবর কবিরাজ যামিনী বাবুর সঙ্গে। এর প্রতি ইটে জড়িত রয়েছে মনোমোহনের দরদ, বলতেন যামিনী বাবু।

কিছু দিন থেকে প্রস্তাব চলছিল ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট মনোমোহন থিয়েটার কিনে নিয়ে ঘর ভেঙে রাস্তা করতে হবে। অনেক বন্ধু বললেন মনু বাবুকে, করপোরেশনে ট্যাক্স বেশী দেবার ব্যবস্থা ক'রে নে, তা হলে দাম বেশী পাবি। সে সব ছোট কথায় কান দিলেন না মনু বাবু। তিনি জোর গলায় বললেন, আমার যা পাওনা তা ঠিক করে রেখেছেন ভগবান। অবশেষে এক দিন ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট একোয়ার করে নিলেন থিয়েটারের বাড়ী-ঘর, দামও প্রচুর টাকা পেলেন। সেই টাকাতে কিনলেন লেসলির বাড়ী। সেই বহু টাকায় খরিদা প্রকাণ্ড বাড়ী ট্রাষ্টির সম্পত্তি করে গেলেন। সেই বাড়ীর উপর যত সব সৎকার্য্যের টাকা পাবে বলে ট্রাষ্টির দলিল করে গেছেন। ভাইদের মাসোহারার চার্জ্জও থাকলো ঐ বাড়ীর উপরেই। অষ্টাঙ্গের বার্ষিক পাঁচ হাজার টাকা করে যা দেবার কথা বলেছিলেন তারও চার্জ দিয়ে গেলেন ঐ বাড়ীর উপরেই।

ক্রমশঃ শরীর খারাপের দিকে যাচ্ছিল মনোমোহন বাবুর। ডাক্তাররা পরীক্ষা ক'রে বললেন—সুগারও হয়েচে, হার্টেরও একটু দোষ আছে। তখুনি তাঁর মনে পড়লো কাশীধামের কথা। পিতার নশ্বর দেহ সেখানে রেখে এসেছেন! সেখানকার প্রতি ধূলিকণার সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ জড়িত রয়েছে। কর্ত্তব্যও অবশিষ্ট রয়েছে। এ আর ফেলে রাখা চলবে না। মনে পড়া মাত্র আরম্ভ করলেন এক বৃহৎ ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ, নাম দিলেন বীরেশ্বর ধর্ম্মশালা। আজও হাজার হাজার লোক যাচ্ছে ঐ পণ্ডিত বীরেশ্বরের নাম উল্লেখ ক'রে কাশীধামে ঐ ধর্ম্মশালায় থাকবার জন্ম। সুযোগ্য পুত্রের এ এক বিরাট সুমহৎ কীর্ত্তি। শুনা যায়, এই ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ করতে পাঁড়ে মশায়ের সে দিনে দুই লক্ষ টাকা ব্যয় হ'য়েছিল। পাঁড়ে মশায় ঘর-প্রতি ভাড়াও স্থির ক'রে গেছেন। অন্ততক তাঁরই ব্যবস্থা চ'লে আসছে। তিনি বুঝেছিলেন, এই ধর্ম্মশালাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে হবে। এর ঝুঁকি ছেলেদের উপর চাপালে কালে তারা চালাতে পারবে না। সামান্যতম ভাড়া দিতে গায়ে লাগবে না কোন ভদ্রলোকেরই। এ ভাড়া দিতে বিরক্ত হলেন না কেউ, বরং তাঁরা আনন্দ পান, সামান্য ভাড়া দিয়ে নিজস্ব অধিকার নিয়ে বাস করতে পান ব'লে।

এই ধর্ম্মশালা প্রতিষ্ঠার সময় আমরা নিমন্ত্রিত হয়েছিলাম। গিয়ে বিস্ময়াভিভূত হ'য়ে দেখেছিলাম বাঙালীর একটা বিরাট কীর্ত্তি কাশীধামে প্রতিষ্ঠিত হ'তে চলেছে। বহু গণ্যমান্য বরেণ্য অতিথিকে নিয়ে গেছেন কলকাতা হ'তে। অত বড় ধর্ম্মশালা মনোমোহন বাবুর বন্ধুবান্ধবেই পূর্ণ। বাড়ীর ছেলেপুলে বৌ-কন্যাও উপস্থিত। আমাদের দুই ভাইএর কাঁধে হাত রেখে উপর তলা থেকে নিচে পর্য্যন্ত সব খুঁটিনাটি করে দেখালেন। তারপর প্রশ্ন করলেন—তোমরা কোথায় উঠেছ? ভায়া বিজয়েন্দুনারায়ণ বললেন—আপনারই ব্রাঞ্চ ধর্ম্মশালায় লালগোলা-রাজবাড়ীতে।

শুনে তিনি ভারী খুসী। বুঝতে পারলাম এ খুসীর ভাব, সকলকে এ কথা বলছেন শুনে। তার পর তাঁর স্বভাবসিদ্ধ জোর গলায় বললেন—তোমরা কিন্তু দু'বেলা খাবার সময় আসবে এখানে। তোমরা না এলে আমরা খেতে বসবো না। অত বড় মানুষ কথার একটু নড়চড় দেখতাম না কখনো। তাঁর বড় ছেলে রত্নেশ্বর পাঁড়ে। আমাদের রতনদাদা, বলতেন, ভাই, আসতে না পার ত খবর দিতে ভুলো না যেন। তা না হ'লে আমাদের সকলকে বসে থাকতে হবে অপেক্ষা করে, আর সে বসে থাকা বড় সোজা কথাও নয়। হাইকোর্টের জজ স্যার মন্মথনাথের মত লোককেও বসে থাকতে হবে অপেক্ষা করে। একসঙ্গে বড় বারান্দায় বসে এক সাথে খাওয়া। তিনিও বসে লক্ষ্য রাখতেন, কোন্ জায়গায় কি পড়ছে, না পড়ছে আহার্য্য দ্রব্য।

উৎসব শেষ হ'লো। আমরা বাড়ী আসবার সময় কাতর হ'য়ে দাঁড়ালাম তাঁর সামনে। তিনি বললেন—বুঝেছি, তোমরা দু' ভাই কন্যাদায়ে পড়েছ। আচ্ছা তোমরা এখন যাও, তোমাদের মায়ের সাথে কথা হবে। চিন্তা করবে না। নিশ্চিন্ত হয়েই যাও, এমন কথাও বললেন। আমরা নিশ্চিন্ত হয়েই বাড়ী ফিরলাম।

তার পর তিনি আর শুভ কাজ করবার সময় পাননি। তাঁর ছেলে রত্নেশ্বর পাঁড়েকে বলে গিয়ে থাকবেন মনে হয়। কারণ, রতনদাদা উপযাচক হয়ে আমাদের বাড়ী গিয়ে তাঁর দুই ভ্রাতুষ্পুত্রের জন্য আমাদের দুই ভাইএর দুই কন্যাকে প্রার্থনা করেছিলেন। এক কথাতেই সব স্থির হয়ে গেল।

মহা সমারোহে ধর্ম্মশালা প্রতিষ্ঠার পর ফিরে এলেন পাঁড়ে মশায় কলকাতায় গোয়াবাগানের বাড়ীতে। আবার মুখরিত হ'লো আনন্দ-কোলাহলে কলকাতার বাড়ী। অতিথি-সজ্জনে বাড়ী পূর্ণ হ'লো। আমরাও তখন একবার শেষবারের মত এসে উপস্থিত হলাম কন্যাদায়ের কথা জানাতে। বাড়ীতে তিনি আছেন, সে কি বিরাট ব্যক্তিত্ব! যেন একটা বাঘ বসে রয়েছেন। কোন আত্মীয়-স্বজন আমাদেরকে তাঁর সামনে যেতে দিতে রাজি নন। কি জানি কি বলে বসবেন। যাই হোক, কারও কথায় কর্ণপাত না ক'রে শঙ্কিতচিত্তেই উপস্থিত হলাম পাঁড়ে মশায়ের কাছে। আমাদেরকে দেখেই বললেন—হোটেলে থাকো কেন তোমরা? তৎক্ষণাৎ আমরা বললাম—অপরাধ হয়েছে। এই একটা কথা শুনেই খুসী হলেন, বুঝতে পারলাম। তখন বললেন—তোমরা এখানে খেয়ে

যাবে কাল। আমরা সেদিন তাঁর অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারিনি। এসে দেখি প্রচুর আয়োজন। এক সাথে বসেই আহার করলেন। অনুরোধ করে খাওয়ালেন আমাদেরকে এটা-ওটা। তার পর নিজেই বললেন—বলেছি ত, তোমাদের মায়ের সাথে আলোচনা করে তোমাদের দু' ভাইএর দুই কন্যার একটা ব্যবস্থা করবো। দেখলাম, ঠিকই মনে রয়েছে তাঁর সেই কাশীধামে দেওয়া কথা।

শ্রীমান নির্ম্মলচন্দ্র রায়—আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দরের দৌহিত্র। বিবাহ করেছেন পাঁড়ে মশায়ের এক দৌহিত্রীকে। খুবই ভালবাসেন নাত-জামাইকে। নির্ম্মল দমদমে বাড়ী করার ইচ্ছা করেছে। এ ইচ্ছার কথা জানতে পেরে পাঁড়ে মশায়ের স্ত্রী বললেন—তুমি নিজে কিছু করো না। তোমার দাদুর সঙ্গে পরামর্শ করে বাড়ী করবে। তখুনি নির্ম্মল ছুটলো দাদুর খোঁজে। যেখানেই যান, সন্ধান পান না দাদুর। যামিনী বাবুর বাড়ী, যতীন মৈত্রের বাড়ী ঘুরেও সাক্ষাৎ পান না। অগত্যা রওনা হলেন গণেশ বাবু এটর্নির বাড়ী। গিয়ে দেখেন, বাড়ীর এক উপেক্ষিত কক্ষে বসে রয়েছেন পাঁড়ে মশায়। তেমন বিছানাপত্র নাই, ছেলেদের লেখাপড়া করবার ঘর। বাবুরা তখন অফিসে। নির্ম্মল এসে প্রণাম ক'রে সব কথা বললেন। তিনি শুনে সেই অবস্থাতেই একটা পেন্সিল দিয়ে বাড়ীর একটা নক্সা করে দিয়ে বললেন, আমার উপর ভার দাও দাদু! আমি সব ভার নিলুম। আশ্চর্য্য হয়ে যেতে হয় শুনলে। খাওয়া দাওয়া সেরে এগারটার পর নিত্য উপস্থিত হতেন দমদম। বাড়ী তৈয়ারী পর্য্যবেক্ষণ করতেন। তখন সম্ভবমত খরচ দিয়ে নির্ম্মল অনুপস্থিত থাকতেন সেখানে। বন্ধু-বান্ধবদের বাড়ী ঘুরে ঠিক দশটায় বাড়ী ফিরে আহারাদি ক'রে নিত্য দমদম যাওয়া চাই-ই।

পাঁড়ে মশায়ের প্রিয় স্থান ছিল কার্শিয়ং। সেখানে যখন যেতেন সাথে নিয়ে যেতেন কাঁটালবীচি। কার্শিয়ং গিয়েও বড় বড় লোকের কাছে ভিক্ষা চাইতেন অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ কলেজের জন্য। কখন কেউ কিছু থিয়েটারের জন্য চাইলে হাসতেন।

দু'-এক বছরও যায়নি, সে বার পূজার সময় তিনি খুবই অসুস্থ হ'য়ে পড়েছেন। এমন কি সে বার পূজার সময় দরিদ্র-নারায়ণের সেবা বন্ধ রেখেছেন ছেলেরা। শুনতে পেয়েই বললেন—এ তোমরা করছ কি? আমি বলছি তোমাদেরকে পূজার সময় কোন লোক বাড়ী এসে আহারপ্রার্থী হলে যেন অভুক্ত ফিরে না যায়। মায়ের প্রসাদ দিতেই হবে প্রার্থীমাত্রকেই। চণ্ডীমণ্ডপে তাঁর উদাত্ত স্বরে মাতৃনাম উচ্চারণ সে বার কেউ শুনতে পেলো না। নিজে অসুস্থ, তবু বার বার জিজ্ঞেস করেন ডাক্তার যতীন্দ্র মৈত্র কেমন আছেন? তোরা কেউ গিয়ে আমার নাম করে খোঁজ নিয়ে আয়। তাঁর ঐ চরমতম সঙ্কট সময়েও তাঁর বন্ধুপ্রীতি দেখে সকলেই মুগ্ধ হতেন। মৈত্র মহাশয়ের মৃত্যু সংবাদ তাঁকে দেওয়া হয়নি। একে একে বড় বড় ডাক্তারেরা তাঁর অবস্থা দেখে জবাব দিতে লাগলেন। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় মশায়ও রোগীকে দেখে বললেন—ভরসা নেই আর। রোগশয্যায় শয়ান অবস্থাতেও তাঁর চিরবাঞ্ছিত দুর্গাপূজার কথা সব শুনতেন। পূজার পর জিজ্ঞেস করতেন কে খেল না খেল। দরিদ্রনারায়ণ সেবা চলছে ত, এ খবরও নিতেন। হাত তুলে সজল চোখে মায়ের উদ্দেশে প্রণাম করেন! পুণ্য ত্রয়োদশী তিথি, যাত্রার শুভ সময় দেখে পাঁড়ে মশায় যাত্রা করা স্থির করলেন। দলে দলে বন্ধুবান্ধব এসে দেখে যান তাঁদের প্রিয় বন্ধুকে। বাড়ীতে লোক আসা-যাওয়ার বিশ্রাম নেই। লোক সমাগমের এত আধিক্য ঘটতে লাগলো যে, আত্মীয়-স্বজনকে অগত্যা ডাক্তারের দোহাই দিয়ে লোক সমাগমও বন্ধ করতে হলো।

বহু ভদ্রলোক বলতে লাগলেন—যামিনী বাবুর মৃত্যুর পর যিনি অষ্টাঙ্গের সমস্ত ভার মাথায় তুলে নিয়েছিলেন, তিনিও আজ যেতে বসেছেন। কেউ বা বলেন, কি মহাকীর্ত্তি কাশীধামে বাবার নামে করে গেছেন পাঁড়ে মহাশয়!

তাঁর আদর্শ চরিত্রের কথা, মহানুভবতার কথা শত মুখে বলেও শেষ করা যায় না। শত-সহস্র ভ্রষ্টচরিত্রা যুবতী নারীর সংস্পর্শে এসেও নিজের চরিত্র অক্ষুণ্ণ রেখেছেন এক পাঁড়ে মশায়ই। এ দিক দিয়ে তিনি সমগ্র পৃথিবীতে আদর্শ বীর পুরুষ। তাঁর শেষ দিনে চারি দিকে হাহাকার উঠলো।

লয়েডস ব্যাঙ্কে মনোমোহন বাবুর ও যামিনী বাবুর বহু টাকা খোওয়া যাওয়াতে যামিনী কবিরাজ মশায় অধীর হয়ে বুক চাপড়াতে লাগলে পাঁড়ে মশায় তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন, ওর জন্য অধীর হচ্ছো কেন? ও তো আমাদেরই উপার্জ্জিত।

কলিয়ারীতে লক্ষ লক্ষ টাকা নষ্ট হয়েছে। একটু বিচলিত হতে দেখা যায়নি পাঁড়ে মশাইকে। তাঁর তিরোধান শত শত সাধুর তিরোধান। কামিনী-কাঞ্চনে অনাসক্ত মহাপুরুষ যাবার সময়ও বলে গেছেন, জীব আসে আপন কর্মফল নিয়ে। কর্মফল শেষ হলেই চলে যায় ইহলোক থেকে অন্য লোকে।

এমন চরিত্রবান, স্থির, ধীর, গম্ভীর মানুষ, বহু ধনের অধিকারী হয়েও অনাসক্ত উদাসীন মানুষ ত আর চোখে পড়লো না!

তুমি নাই, কিন্তু কীর্ত্তিদেহে তুমি জীবিত রয়েছ। তোমার মৃত্যু নাই। তোমাকে প্রণাম করি শ্রদ্ধাপূর্ণ চিত্তে।

সমাপ্ত

"There are three intolerable things in life—cold coffee, luke-warm champagne and over-excited women." —*Orson Welles.*

"If you tell the truth you needn't remember anything." —*Mark Twain.*
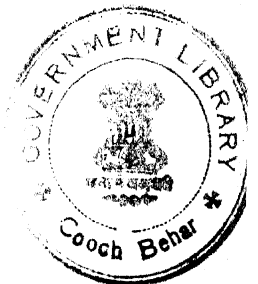
ভারত থেকে তিব্বত

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

রায় বাহাদুর শরৎচন্দ্র দাস

২০এ জুন—কুয়াশাহীন আকাশ। আনন্দোচ্ছল প্রভাতালোকের সঙ্গে সঙ্গে আমরা যাত্রা সুরু করলুম। নবীন তৃণদল। সবুজ উপত্যকার ওপরে যেন মখমল বিছান। আমাদের পদক্ষেপ পড়ল তার ওপর। এগিয়ে চললুম দু'পাশের বরফে-ঢাকা পাহাড়শ্রেণীর মাঝে সমতল চারণভূমির ওপর দিয়ে। দুপুর গড়িয়ে এল। সুদৃশ্য চারণভূমি আর স্বচ্ছ জলবাহী চু-কর পাং জং-এর ধারে পৌছান গেল। সামনেই প্রবহমান রাথং নদীর উৎস। এখানে চারণভূমি নেই, আছে কেবল ইতস্তত: ছড়ান তুষারনদীর আঘাতে ক্ষত প্রস্তর আর স্তূপ। তার ওপর দিয়েই আমাদের যেতে হবে—যেতে হবে আরও সিকি ক্রোশ। জলে-ভাঙ্গা পাথরের খাঁজে খাঁজে গিরিমূষিকের বাস। তাদের স্বাধীন গতিপথে আমরা বাধা সৃষ্টি করলুম তাদের বন্দী করার চেষ্টা করায়। এ রকম করে আমরা কালো পাহাড়ে পৌছুলুম। তার চূড়া ১৮,৩০০ ফুট উঁচু—আমরা তখন ১৬,০০০ ফুটে। মাথার ওপর প্রচণ্ড রোদ্দুর। রোদ্দুর থেকে মাথা বাঁচাবার আর তুষারের চোখ ঝলসান আলো থেকে রক্ষা পাবার জন্যে আমরা একটু কুয়াশার প্রত্যাশা করছিলুম। একেই বলে রোদ্দুর, রুদ্র তার তেজ। অসহ্য, তার প্রখরতা যেন দ্বিগুণ অনুভব করতে লাগলুম। লামা আর আমি নীল চশমায় চোখ আবৃত করলুম। আর কুলিরা? গাইডরা? তারা চোখের নীচে যে হাড় আছে—যাকে হনু বলা হয়, তাতে কালো রঙ মাখিয়ে দিলে তুষারের ঔজ্জ্বল্য থেকে চোখকে বাঁচাবার জন্যে। কোমল লোমের তৈরী আমার কোটটা পড়লুম। কিছু দূর যাবার পর রৌদ্রের তেজ এত অসহ্য মনে হল যে, সেটা ছুড়ে একটা কুলির ঘাড়ে চাপিয়ে দিলুম।

আমাদের গাইড আগে আগে যাচ্ছে আর আমি তাকে অনুসরণ করে চলেছি। সে আমাকে মাঝে মাঝে সাবধানে এগিয়ে আসতে বললে—কারণ একটি মাত্র ভুল পদক্ষেপ আমাকে তুষার-নদীর ফাটলের মধ্যে উদ্দাম গতিতে নিক্ষেপ করতে পারে। এ কি হঠাৎ বিদ্যুৎ গর্জনের মত ভীষণ আওয়াজ! দেখি ডান ও বাঁ উভয় দিকে ১০০ গজের মধ্যেই পাহাড়ের গা থেকে খসে পড়েছে বরফের স্তূপ। যদিও আমরা বেশ দূরে আছি কিন্তু আওয়াজের ভীষণতা আমাদের আতঙ্ক এনে দিলে। বরফের ওপর দিয়ে প্রায় এক মাইল হাঁটবার পর আবার আমরা শুষ্ক ভূমির ওপর এসে পৌছুলুম। এখানে পাহাড়ের স্তূপের ওপর দেখা গেল কতকগুলি ফ্ল্যাগ (নিশান)। গাইড আমাদের দেখিয়ে বললে—এইটে নেপাল আর সিকিমের সীমারেখা। চলার মাঝে এইখানেই কিছুক্ষণ বিশ্রাম করা গেল। আবার তুষার ভূমি, এটাও পার হতে হল, লম্বায় প্রায় এক মাইল। প্রথমটি যেমন সমতল ছিল এটা তেমনি অসমতল। চলতে চলতে ঢালু পথ পাওয়া গেল, নীচে নেমেই চলেছি, তাপের মাত্রা উঠতে লাগল, বরফও গলতে থাকল। অর্ধতরলীকৃত বরফ একটা সবুজ পয়ঃনালীতে পড়তে লাগল। এখান থেকেই ভাংগা-চু নদী বেরিয়েছে। আমার গাইড বললে ভাংগা-চু নদী একটা ধ্বংসমূলক নির্ঝরিণী। এর জল হঠাৎ বেড়ে ওঠে, পারাপারের সেতুগুলো ধ্বংস হয়ে যায় আর পথিকের প্রাণ নিয়ে হয় টানাটানি। এই জলস্ফীতির কারণ হঠাৎ বরফ গলতে থাকে আর সেই গলা বরফ খরবেগে নালায় এসে পড়ে ধ্বংসের কাজে লেগে যায়। দুর্বার নদী বলে নেপালী আর ভুটিয়ারা তার পুজো করে, তার অশান্ত রূপকে শান্ত করার জন্য।

সামনে পাহাড়ের সারি। তে-গিয়াব-লা হতে উদ্ভূত হয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘা উত্তর প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছে। তুষাররেখার শেষ সীমানায় কালো নঙ্গিমা। সিকিমের মধ্য দিয়ে প্রবহমান রাথং নদী থেকে পশ্চিম নেপালের বড় বড় নদী তাম্বুর, কোশী প্রভৃতি পৃথক্ হয়ে গেছে।

আবার একটা ঢালু পথে এসে পড়েছি। সেখানকার তাপ ৩০ ডিগ্রি থেকে ওঠা-নামা করছে। গাইড আমাকে নিরাপদে নামতে সাহায্য করলে। আমাদের কুলীগুলো পিঠে করে বোঝা নিয়েই বরফের ওপর সোজা গড়িয়ে গড়িয়ে যাচ্ছিল, বরফের ভাঙ্গা একটা পাথরে ধাক্কা লেগে একটা কুলী থেঁতলে গেল। এই ঢালু পথের নীচেই নিয়াং-গা-চু নদীর উৎস দেখা গেল। এখান থেকে নদীটি তাম্বুর নদীতে গিয়ে মিশেছে।

এবার রঙ বদলালো। কাংলা-নাঙ্গামার ধারের পাহাড়গুলি আর ধ্বসা পাহাড়গুলি সবই লাল। সিকিমের বেশীর ভাগ পাহাড় বালুময় ও চূণময় অথবা স্ফটিক প্রস্তরময়। এ রকম ভাবে পাঁচ মাইল চলার পর আমরা এমন এক জায়গায় এসে পৌছুলুম যেখানকার উদ্ভিদরাজি দেখে মন আমাদের সততই খুশীতে ভরে উঠল। এই জায়গাটার নাম ফুরপা-করপু অর্থাৎ সাদা গুহা। নদীর কিনারা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে পরিশ্রান্ত পথিক ক্ষণিক বিশ্রামের জন্য পায় অনেক পাথরের ফাটল। প্রধানতঃ ফাটলগুলি অধিকার করে থাকে দুপুরের রৌদ্রতপ্ত চমরু-পালকেরা—বেশ আরামেই বিশ্রাম করার জায়গা। ফুর-পা-করপু থেকে আরও নীচে তাঙ্গা-কোংমাতে এলুম। কি অপূর্ব দৃশ্য! সে দৃশ্যের স্নিগ্ধতায় যেন আমাদের মনে সারা অঙ্গে সজীবতা এনে দিল। বাঁ দিকে অনেকগুলি ঝর্ণা, একটার গায় আর একটা নেমে আসছে পাহাড়ের কোল থেকে। এ দৃশ্য সত্যই মনোরম। আরও ওপাশে টুংগা-কোংমা উপত্যকায় ছড়িয়ে আছে অনেক রোডোডেনড্রন তৃণ-বীথি, আর হরেক রকমের তরুরাজি। শৈবাল—প্রচুর শৈবাল। নাং-গা-শাল নামে এক আরামদায়ক তরুবীথির তলায় আমরা বিশ্রাম করতে লাগলুম। এখান থেকে যতদূর দেখা যায়—দেবদারু প্রভৃতি বড় বড় গাছের সারি আর তার মাঝে জুনিপার আর রোডোডেনড্রনগুচ্ছ। এই ত বিশ্রামের উপযুক্ত স্থান আর আমরাও অত্যন্ত ক্লান্ত। গোধূলি লগ্নে আমরা নিকটস্থ গুহায় নিজেদের এলিয়ে দিলুম। রোগে পড়লেন ইউজেন গিয়াৎসো তাঁর বহুদিনের পিত্তজ ব্যাধিতে। এগিয়ে এল গাইডরা ক্ষুন্নিবৃত্তির কার্যে। আরামে চা পান করা গেল—তার পর এল ভাত। ক্ষুধা, তৃষ্ণা ক্লান্তি সবই একসঙ্গে অপনোদন হল। রাতটা কাটানো গেল এখানেই—কিন্তু সকালেও লামার রোগের উপশম না হওয়ায় তাঁকে এক মাত্রা ওষুধ দিলুম—কিছুটা উপশমও হলো—তার জন্যে এখানে আজ আর এক দিনের জন্য বিশ্রাম—

২২এ জুন—উত্তর-পূর্ব মুখে যাত্রা। একটা কাঠের পোল দিয়ে

ঙ্যাং-গার শাখানদী ইয়ুহং তুষারনদী পেরোলুম। সেই কাঠের পোলটা তৈরী জুনিপার ও অন্যান্য কাঠ দিয়ে। পোলটা ৩০ ফুট লম্বা আর ৬ ফুট চওড়া। আমাদের দক্ষিণে এক নির্জন মঠ দেচন রোলফা দেখলুম। আর তারপরে সোচুং লা পাহাড়ের দিকে এগোতে লাগলুম। পাহাড়ের ধারে আছে একটা ছোট হ্রদ, অনেকগুলি নদীর সংযোগকারী, তাই একে বলা হয় চুনজেরমা। এ পাহাড়টা খাড়াই প্রায় ২৫০০ ফুট। আমরা চূড়ায় যখন পৌঁছুলুম তখন ভরা দুপুর। সেখানে দুটো ছোট ছোট হ্রদ আছে, তাদের পরিধি ৫০০ ফুটেরও বেশী নয়। ইয়ামা-তারি তুষারনদী থেকে ইয়ামা-তারি-চু নদী নেমে এসেছে। সেখানে চারটি গিরিশ্রেণী আছে তাও আমরা পার হলুম। এই চারটি গিরি হচ্ছে মিরজেন-লা, পাংগো-লা, সেনোন-লা ও টামা-লা। মিরজেন-লা ও টামা-লা অত্যন্ত খাড়াই, তাদের উচ্চতা ১৪৮০০ থেকে ১৫০০০ ফুট। এখানের তাপমান আমি দেখিনি। কিন্তু তার চূড়ায় ও ঢালু পথে যে সব উদ্ভিদ আছে তা দেখে তাপমানের যে পরিবর্তন হয়েছে তা বেশ বোঝা গেল। একটা পুরানো তুষার-প্রস্তরস্তূপ পেরিয়ে সন্ধ্যা ৬টায় আমরা এক সুদৃশ্য গ্রাম কাবা-চন-গিওনসায় (যেটা শীতপ্রধান গ্রাম) উপস্থিত হলুম। এটা ১১,৩৭৮ ফুট উচ্চে। এই গ্রামটি একটি সুন্দর নদীর ধারে ততোধিক সুন্দর এক উপত্যকায় অবস্থিত। খাড়াই ও এবড়ো-খেবড়ো পাহাড়ে, দেবদারু, রোডোডেনড্রন, জুনিপার আর নতশাখ উইলো গাছের ঘন জঙ্গলে ঘেরা এই সুমনোরম ছোট্ট গ্রামটিতে আমরা পদার্পণ করলুম। আমাদের গাইড এই গ্রামের এক ধনী শেরপা (নেপাল ভুটিয়া) চাষীর সঙ্গে লামার পরিচয় করিয়ে দিলে। সে আমাদের তার বাড়ীতে সাদরে আহ্বান করে নিয়ে গেল। লামার টুপি আর পোষাকে তারা আমাকে বিশেষতঃ ভারতীয় চেহারা দেখে নেপালের পা-বু (নেপালী) (১৪) লামা মনে করল।

আমার পরিচয় বা জাত জানার বদলে সেই অতিথিপরায়ণ চাষী আমাকে এক বিনত অভিবাদন জানালে। সে অতি সম্ভ্রমের সঙ্গে সম্মান দেখিয়ে চমরুলোমের তৈরী এক কুশনে বসবার জন্য আমাদের অনুরোধ করল। অন্যান্য লোকেরা আমাকে দেখবার জন্য এল কিন্তু আমার নাম বা পরিচয় জিজ্ঞাসা করার সাহস তাদের হয় নি। আমি বেশ অস্বস্তি বোধ করতে লাগলুম। ইউজেন গিয়াৎ-সো সেই সব লোকদের মনের কথা বুঝতে পেরে তাড়াতাড়ি আমাকে তাদের শুনিয়ে ডাকলে—"পালবু লামা"। অর্থাৎ বাবু লামার পরিবর্তে।

২৩এ জুন—গ্যাংসাতে আমরা তাসি-কয়ডিং-মঠ দেখতে গেলুম। কাংচন নদীর দক্ষিণধারে একটা সেতু দিয়ে উভয় গ্রামের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। সেখানে মঠেতে ৮০ জন সন্ন্যাসী বাস করেন। ১২ জনের অধিক সন্ন্যাসিনী আছেন তাঁরা সাধারণতঃ গ্রামেই বাস করেন। এই মঠ সিকিম ও পূর্ব নেপালের মধ্যে সূক্ষ্ম কারুকার্যময় ও সমৃদ্ধিশালী। এই মঠে কা-গ্যুর (বৌদ্ধশাস্ত্র) এবং টাং-গ্যুর (শাস্ত্র ও ধর্মগ্রন্থ) গ্রন্থের সম্পূর্ণ সংগ্রহ আছে। লামারা সাধারণ লোকের মত ঝোলান চুলের গুচ্ছ রাখে। প্রাচীন ভারতীয় বৌদ্ধদের মত কানে ইয়ারিং পড়ে। তারা নিজেদের নিয়ামা-পা সগ-চেন-পা অর্থাৎ লাল টুপীধারী সম্প্রদায়ভুক্ত লোক বলে পরিচয় দেয়। মহান বৌদ্ধ লামা একদিন এই পথে সিকিমে গিয়ে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন ও স্থাপন করেন এই গ্যাংসা মঠ। পেম-ইয়ং-ৎসে ও কাংমা-চন-গ্যাংসার লামারা একই সম্প্রদায়ের লোক। তাদের ধর্মবিধি ও অনুষ্ঠানবিধি অভিন্ন। গত বৎসরে গ্যাংসায় প্রধান লামা পেম-ইয়ং-ৎসে মঠ দেখতে এখানকার লোকেদের আতিথেয়তায় মুগ্ধ হন আর আমরা ঠিক এই সময়েই এ বছরে এখানে আসায় আমাদের তারা খুব জমকালো অভ্যর্থনা করে। ইউজেন গিয়া-ৎসো ও আমি উভয় মঠের অধিষ্ঠাতা দেবতার উদ্দেশ্যে একটি করে টাকা দক্ষিণা দিই। সন্ধ্যায় আমরা প্রধান লামার গৃহে নিমন্ত্রিত হই। তিনি আমাদের মুর্ওয়ামদ ও উষ্ণ মাখন মিশ্রিত চা দ্বারা অভ্যর্থনা করেন। প্রচুর পরিমাণে সিদ্ধ আলু আমাদের খেতে দেওয়া হল। বহুদিন পরে এই প্রথম আমরা আলু, মূলো আর শালগম দেখলুম। প্রধান লামা আমাদের সামনে এক বক্তৃতা দিলেন, উপদেশ দিলেন বুদ্ধের প্রতি, তাঁর ধর্মের প্রতি যেন আমরা অটুট বিশ্বাস রাখতে পারি। আমরা এখানে বিদেশী এবং হিমালয় ভ্রমণে অনভিজ্ঞ অথচ আগ্রহশীল বলে ইউজেন গিয়াৎ-সো তাঁর সান্নিধ্যে সাহায্য প্রার্থনা করে। তিনিও যথাসাধ্য আমাদের সাহায্য করবেন বলে স্বীকার করলেন। আমরা তাঁকে ধন্যবাদ দিলুম। আমাদের এই কথাবার্তার মধ্যে আমি তিব্বতীয় ও নেপালী দুই ভাষায় কথা কয়েছি। তিনিও আমাকে পালবু লামা মনে করেছেন। তাঁদের কাছে আমার নাম বা বাড়ীর কথা বলার প্রয়োজন হয় নি। আমিও জানানো মনে করিনি। তারা আমাকে তাদের খুসীমত যে দেশীয়ই মনে ভাবুন না কেন, তাতে আমার কোন আপত্তি নেই।

২৪এ জুন—এ দিন সকালে সমস্ত গ্রামবাসীরা আমাদের নিমন্ত্রণ করলে। ব্যবস্থা ছিল, ভেড়ার মাংস আর প্রচুর আলুর। আর ছিল ভ্রমণকারীর উপযুক্ত বড় বড় মগে মুর্ওয়া মদ। আমরা চক্রাকারে বসেছি—সামনে একটা টেবিল। তার ওপর বাঁশের খোলে বা চোঙায় ভর্তি মদ। মাঝখানে বড় একটা পাত্রে পূর্ণ মদ। আমরা প্রায় ২ ফুট লম্বা নলখাগড়া মুখে দিয়ে সেই পাত্র থেকে মদ্য পান করতে লাগলুম। তার পরই মজলিসি কথা সুরু হল। আমি বেশ মর্যাদাপূর্ণ ভাবে তাদের মাঝে বসেছি। আমার পায়ের নীচে দামী চীনদেশের তৈরী কম্বল। বেশী কথাবার্তা আমি এড়িয়ে চলেছি। মাঝে মাঝে আমাকে তারা যে প্রশ্ন করছিল—সংক্ষেপে তার উত্তর দিচ্ছিলুম। ইউজেন গিয়া-ৎসো আমার হয়ে বেশীর ভাগই জবাব দিচ্ছিল। তারা আমার প্রতি যে সম্মানসূচক বাক্য "লা-লা-সো, থগ-জে-ছে" (অসীম দয়ালু, সম্মানিত মহাশয়) উচ্চারণ করছিল—

১৪। নেপালে কাঠমুণ্ডু থেকে ৮০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে পাল-পা নামে এক বৃহৎ বৌদ্ধ মঠ আছে (৭ম-১১শ শতাব্দী)। তিব্বতীয়েরা এখানে জ্ঞানচর্চ্চা করে, সেই জন্য নেপালীকে তারা পাল-পো বলে। নেপালীরা তিব্বতকে বাল-পো বলে, এদের পশমের জন্য। 'বাল' শব্দে নেপালী ও ভারতীয় উভয়েই পশম বা চুল বোঝায়। নেপালীরা যাদের দাড়ী আছে তারাও ঐ নামে উল্লিখিত হয়। নেপালও বাল-পো' নামে অভিহিত হয়—যাকে সাধারণ ভাষায় বলে পা-বু।

তাতে আমি খুব আনন্দ উপভোগ করছিলুম। একটা বিষয়ে আশ্চর্য হলুম যখন শেরপা লোকেরা আমাদের খাওয়ার সময়ে একটা করে চপমা উপহার দিলে। এমন কি, আমাদের বন্ধুরা যখন দু'-তিন বোতল মুর্ওয়া মদ শেষ করেও কোন রকম বেচাল হল না, তখন আরও বিস্মিত হলুম। মদ সকলেই খেয়েছিল। খুব জোরাল আলোচনা চলছিল—প্রত্যেকেই চীৎকার করে নিজ নিজ কথা বলছিল—কথা যা বলছিল তা কেউ-ই শুনছিল না—সকলেই তাদের প্রতিবেশীদের কাছে বক্তৃতা করতে ব্যস্ত। দু'টোর সময় সেই সোরগোলপূর্ণ আলোচনা থামল।

এবার প্রস্থানের পালা। ক্রমে ত্রিশ থেকে তিন জনে দাঁড়ালো আর সেই তিন জনেই হলুম আমরা অভ্যাগত। আমাদের মাস্তবর আপ্যায়নকারী লামা তিনখানি থালায় ভাত আর সুরভিত মাংস নিয়ে এল। আমি তা থেকে অতি অল্পই গ্রহণ করলুম, বাকীটা আমাদের ভৃত্য ও গাইডদের জন্যে পাঠিয়ে দিলুম। আমরা প্রত্যেকে লামাকে ১৲ টাকা করে উপহার দিয়ে আমাদের স্বস্থানে ফিরলুম। ফিরলুম বটে, আবার আমন্ত্রিত হলুম সেখানকার চিত্রকর আর মূর্তি-শিল্পী খেপার বাড়ীতে—তখন বেলা সাড়ে তিনটা। খাবার অবস্থা ছিল না, খেলুম না কিছুই, কিন্তু ফেরবার সময় পূর্ববৎ প্রত্যেকেই খেপাকে ১৲ টাকা করে উপহার দিয়ে এলুম।

২৫এ জুন—প্রভাতে আমরা গ্যাংসা মঠের কম্ব-চান ২য় লামা ওমজের(১৫) গৃহে নিমন্ত্রিত হলুম। সেখানেও আমরা যথারীতি ১৲ টাকা করে দক্ষিণা দিয়ে আসি। তিব্বতপথের পথিক আমরা। তাই গ্রামবাসীরা আমাদের যাত্রার নিরাপত্তার জন্যে এক কমিটি গঠন করলে। সেই কমিটি গ্যাংসা মঠের একজন পার-চুং তা-পা (সন্ন্যাসী), যে গ্রামবাসীদের মধ্যে বেশ বলিষ্ঠ ও প্রভাবশালী, তাকে আমাদের যাত্রাপথের গাইড নিযুক্ত করলে। তারা নতুন কুলি নিয়োগ করলে—পুরোনো দিনের মত পুরোনো কুলিরা বিদায় নিলে। গ্যাংসা মঠের ধারে যে নদীটি কাং-চে-চু (কাং-চেন নদী) কাঞ্চনজঙ্ঘার তুষারনদী থেকে প্রবাহিত হয়ে আসছে। কিন্তু এখানকার লোকেরা নদীটিকে বলে টাম্বুরের প্রধান বাহিকা।

সকাল সাতটায় আমরা কাং-চেন নদীর পথ ধরে চললুম। পথটা সরল হওয়ায় চলার আনন্দও উপভোগ করতে লাগলুম। সকালটাও বেশ উজ্জ্বল মনে হল। শুধু কি তাই, পার হলুম খেম-শিংএর (রোডোডেনড্রন পুষ্প) কুঞ্জের ভেতর দিয়ে, পার হলুম শৈবাল-শোভিত জুনিপারের ঝোপের মধ্যে দিয়ে ক্লান্ত পদক্ষেপে, অবশেষে এক পাহাড়ের তলদেশে পৌছুলুম তখন বেলা দুইটা। দূর থেকে এই পাহাড়টা তুষারে আবৃত মনে হয়েছিল কিন্তু কাছে এসে আমাদের ভুল ভাঙল। একটা নির্ঝরিণীর গতিপথ বিভিন্নমুখী হয়ে পড়েছে। যার ফলে পাহাড়ের চূড়াটি ঢালু হয়ে একটা সাদা পাহাড় ও বালির প্রান্তরে এসে পড়েছে। আমাদের দক্ষিণে বিস্তৃত তুষারনদী অতুলনীয় জন্নু।

আমি ইতস্তত অনুসন্ধান করছিলুম কোন জীবাশ্ম বা জীবের প্রস্তরীভূত কোন ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায় কি না। কিন্তু সময়ের অভাবে অনুসন্ধান করা ঘটে উঠল না—কারণ আমার সঙ্গীরা আমাকে পেছনে রেখেই চলতে সুরু করল। বেলা ৪টার সময় কাঠের পোলের ওপর দিয়ে নদী পার হয়ে কাম্ব-বেন (ইয়ার-স বা গ্রীষ্মকালীন আবাস, ১৪,৬০০ ফুট, ফুটনাম্ব ১৮৭০) গ্রামে পৌছলুম। গ্রামের প্রবেশপথেই দেখা গেল একটা বার্লির কল যেটা চলছে নদীর জল-প্রবাহে। তারপরে একটা লম্বা মেনডং অর্থাৎ চিত্রিত বা ক্ষোদিত প্রস্তরস্তূপ। এই সুন্দর উপত্যকার চারধারেই বার্লির ক্ষেত। প্রত্যেক জমিটিই পাথরের বাঁধ দিয়ে ঘেরা—তার আলের উচ্চতা তিন-চার ফুট। কতক কতক আবার কাঠের বেড়া। গ্যংসা ও কম্বা-চানের (ইয়ার-স) বাড়ীগুলি কাঠের তৈরী, তাদের প্রান্তদেশ ত্রিকোণাকার আর ছাদগুলিও লম্বা কাঠের। এই সব ছাদের বর্গাগুলো কোন পেরেক বা দড়ি দিয়ে আটকান নয়—বড় বড় পাথরের দেওয়ালের ওপর পর পর সাজানো। ঘরের অভ্যন্তর অস্বস্তিকর নয়—কিন্তু জানালাগুলি খুবই ছোট, ঘরগুলিও অন্ধকার, যে হেতু বাসিন্দারা বেশীর ভাগ বাড়ীর বাইরে থাকে। যখন ঘরে ঢোকে তখন সব সময়ে ঘরের ভেতরে আলো জ্বালিয়ে রাখে—তাতে তাদের বিশেষ অসুবিধা হয় না। গ্যংসা ও কম্বা-চানের অধিবাসীদের কাং-চেন পাহাড়ের অধিষ্ঠাতা দেবতার উদ্দেশ্যে পুজোর এক অনুষ্ঠান দেখলুম। এই অনুষ্ঠানটির প্রধান অঙ্গ—নানা রকম খেলার অনুষ্ঠান, তীর ধনুকের কসরৎ, বন্দুক চালনা ইত্যাদি—তাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, পর্বতের অধিষ্ঠাতা দেবতা এই খেলার অনুষ্ঠানে সন্তুষ্ট হন। গ্যংসার তরুণেরা পরস্পরের সঙ্গে খেলার প্রতিযোগিতা করে। বয়স্কদের প্রিয় খেলা লোহার চাক্তি ছোড়া, পেছন ফিরে পদচালনা করা আর তীরছোঁড়া। এই ধর্মীয় অনুষ্ঠানের দর্শক হিসেবে আমরাও অংশ গ্রহণ করলুম। এই খেলার দৃশ্য আমাদের ওলিম্পিক খেলার কথা মনে করিয়ে দিলে। একজন সংবৌদ্ধের মত আমরাও ভারতীয় ওলিম্পিক কাং-চেনের প্রতি আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণাম জানালুম। দুপুর বেলায় ইয়ং-মা থেকে এক সংবাদবাহী সীমান্ত অফিসারের এক চিঠি বহন করে নিয়ে এল। উক্ত অফিসার কাং-পা-চানের পথে যাত্রা করেছেন—চিঠিতে জানিয়েছেন—চমরু গাই, ভেড়া প্রভৃতি পশু নিয়ে বণিকদের কাথাং-লাম্বোর বন্ধ সংকীর্ণ গিরিপথের মধ্যে দিয়ে তিব্বতে প্রবেশ করা নিষিদ্ধ হয়েছে। যদিও তিব্বত গভর্ণমেন্টের কাংলা-চেন মো গিরিপথ মুক্ত গিরিপথ তবুও পশুদের রোগের বিস্তার লাভ করার ফলে তার মধ্যে দিয়ে প্রবেশ বন্ধ। আমাদের কাম্ব-চান ও গ্যংসার বন্ধু প্রধান লামা গোপন ভাবে এই সংবাদ আমাদের জানালে এবং খুব ভোরেই অফিসারের আগমনের পূর্বে আমাদের যাত্রার জন্য অনুরোধ করলে।

২৬এ জুন—উষার আলো দেখার আগেই আমরা বেরিয়ে পড়ে প্রবহমান কাং-চেন চু নদীর বামদিক দিয়ে উঠতে লাগলুম। পথটি সরল, সহজ। ওঠা গেল বেশ। আমাদের দক্ষিণ দিকে কাং-চেন তুষারনদী বয়ে যাচ্ছে, যার সামুদেশ ঘুরে আমরা প্রান্তে পৌছুলুম। বাম দিকে উঠেছে হিমাবৃত গিরিশ্রেণী সেটা কাং-পা-চানের দীর্ঘ বিস্তৃতি। কাং-লা কান (১৬) থেকে তিন

১৫। মন্দিরের প্রধান পুরোহিত 'ওঁম' অতীন্দ্রিয় শব্দের দ্বারা প্রার্থনা আরম্ভ করেন।—'ওমজে'কে ভূড়সাদস্ত বলে।

১৬। কম্বা-চানের গ্রাম্য উচ্চারণ "কাং-পা-চান"।

মাইল দূরবর্তী এক নির্ঝরিণী। যে নির্ঝরিণী পাণ্ড-হাংরির দক্ষিণ ঢালুপথের কাছে আগে দেখে এসেছি, তার তুলনায় এটি অনেক সুন্দর, অনেক কমনীয়। এর জল এখানে খুব পবিত্র বলে গণ্য আর এর নাম খান জুম চু (১৭) অথবা ডাকিনী ঝর্ণা নামে কথিত। এর পবিত্র জলে স্নান করে গেছেন আট জন ভারতীয় সাধু যাঁদের তিব্বতীয় নাম রিগ-জিন-গ্যে (অষ্ট বিদ্যাধর), আর বৌদ্ধদের ব্যাসমুনি বিখ্যাত ত্সাং-সুং-গ্যাপা। এঁদের স্পর্শে হিমালয়ের মধ্যে এটি সর্বাপেক্ষা পবিত্র নদী বলে কথিত। এই ঝর্ণা অভঙ্গ অবস্থায় পাহাড়ের চূড়া থেকে পড়ছে। দ্রুতগতি নিম্নাবতরণ করে সম্মুখের পাহাড়ের ওপর দিয়ে অব্যাহত গতিতে বয়ে চলেছে। এর ফেনিল জলোচ্ছ্বাস নীচের পাহাড়ের অন্ধকারকে উজ্জ্বল করে দিচ্ছে। যেখান দিয়ে আমরা পার হলুম ঠিক তার ওপর দিয়েই ঝর্ণা যেন নিজেকে উজাড় করে নেমে আসছে। এই ঝর্ণার বিস্তার ১৮ ফুট আর যেখান থেকে নেমে আসছে তার উচ্চতা সোজাসুজি ভাবে প্রায় ১০০ ফুট। সু-উচ্চ পাহাড়ের চূড়া, পাহাড়ের চূড়া থেকে ঝরে পড়া ঝর্ণা, এলোমেলো ভাবে ছড়ান পাহাড়গুলির মাঝখান থেকে পথ কেটে বয়ে আসা, চারদিকের মনোরম সু-গম্ভীর দৃশ্য—এ সবগুলো নিয়ে হিমালয়ের মহান রূপ ও বিরাট পরিবেশ দেখে আমাদের নয়ন সার্থক করলুম।

উপত্যকার পর উপত্যকা আমরা পেরোতে লাগলুম। যার সুষম সৌন্দর্য পারিপার্শ্বিক পর্বতগুলির মহান ভাবের বিপরীত। যতদূর দৃষ্টি চলে তরুবীথির লেশমাত্র নেই—শুধু দেখা যায় অনুচ্চ গুল্মরাশি, ঢালুপথ ঘিরে ফুটে আছে বিভিন্ন বর্ণালি পুষ্পদল। মধ্যাহ্নে আমরা রামথং-এ(১৮) চমরুগাইদের এক আস্তানায় বসে আহার সমাধা করলুম।

উত্তর দিক ধরে যাত্রা সুরু করে এক বিস্তৃত পশুচারণের মাঠে এসে পৌঁছুলুম লম্বায় যেটা ৩ মাইল ও চওড়ায় ২ মাইল। সেখানে চমরু গাই-এর অস্থি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। কাম্বা-চানের অধিবাসীরা আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে এখানে তাদের পশুগুলিকে চরাতে আনে। এই মালভূমির চারপাশে উঁচু পাহাড়ের চূড়া। আর দক্ষিণ ও পূর্বে থামে-চু তুষার নদী প্রবহমান। এর ধার দিয়ে আমরা এগুতে লাগলুম। এই নদী কাং-চেন-চু নদী থেকে আসছে। অপর একটি নদী ১ মাইল ধরে পূর্ব থেকে প্রবাহিত হচ্ছে অন্তঃসলিলা রূপে, তার পরে ক্রমে প্রকাশমান হয়েছে পেম-চং-কি ডেমিরু(১১) বিপরীত দিকে যেখানে তিব্বতীয়দের রিনপকি গুরু পদ্মসম্ভব স্বর্গের চাবিটি লুকিয়ে রেখেছেন। আমাদের বামে পশ্চিমে যেখানে ঐশ্বর্যশালিনী তুষারবাহিনী জয়সাং অথবা জনসাং নদী। গতি তার মন্থর—বহন করে নিয়ে আসছে শুভ্র অনচ্ছ কর্দমময়, জলসঙ্ঘর্ষে ক্ষয়প্রাপ্ত মৃন্ময় বস্তু। আমাদের এই গুহার নিকটেই মেন-চু উষ্ণ কুণ্ড। পবিত্র এর জল, কারণ একদিন লালটুপি সম্প্রদায়ের নেতা পেমগুরু তিব্বতে যাবার পথে এই কুণ্ডের জলে অবগাহন করেছিলেন। সেই থেকে কুণ্ডে জমায়েত হল পুণ্যার্থীরা—কাম্বা-চান অধিবাসীরা। কুণ্ডের উভয় পার্শ্বে পাথর জমে আছে, জলে ক্ষয়ে যাওয়া পাথরের টুকরো আর কাঁকরের অবিচ্ছিন্ন রেখাতট। সুযোগ পায়নি সেখানে কোনও উদ্ভিদ জন্মাবার। পাথর পড়ে আছে সারি সারি যেন ছোটখাট গিরিশ্রেণীর মত। কতক পৃথক্ পৃথক্ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ভাবে ছড়ান—এই বিচ্ছিন্নতা, এই বিভক্ততা সৃষ্টি হয়েছে গলিত তুষারের অসরল পথ-রেখায়। ৫টার সময় আমরা জয়গু-গুহা নামক স্থানে পাথরের ফাটলে বসে বিশ্রাম করলুম। ফাটলটি ৬ ফুট লম্বা ৪ ফুট চওড়া, ৫ ফুট উঁচু। এই ফাটলের অধিবাসী মানুষ নয়, একটা পাহাড়ে শৃগাল, যাদের এখানে বলে ওয়ানমা বা ওয়া। এদের লোম খুব দামী। আমাদের গাইড বললে কস্তুরী ছাগ, নাও, হিমালয় হরিণের গতায়াত আছে এখানে। শেষোক্তটি অর্থাৎ হরিণগুলি পর্বতের অধিষ্ঠাতৃ দেবতার কাছে উৎসর্গীকৃত। এগুলিকে শিকারভোগ্য করা চলে না—অপরগুলি চলে। জঙ্গু-গে প্রায় ১৪,৮০০ ফুট সমুদ্রতটরেখা থেকে উঁচু, স্ফুটনাঙ্ক ১৭৮°। এ সময়ে তাপমাত্রা ৩০°। আমরা চা খেয়ে আর মটর খেয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি করলুম, কারণ ভাত রাঁধার জ্বালানি কাঠ জুটল না। রাত্রে হিম-পাতের সঙ্গে সঙ্গে কনকনে ঠাণ্ডা অনুভব করলুম। ইউজেন গিয়াৎ-সো ও আমি সেই গিরিশৃগালের গুহায় কোন রকমে গা এলিয়ে দিলুম। কুলিরা ওয়াটারপ্রুফ আর ছাতা ঢাকা দিয়ে খোলা মাঠেই শুয়ে পড়ল। অসমতল পাথরের ওপর শোয়া। দারুণ পৃষ্ঠব্যথার যন্ত্রণা আমাকে ঘুম থেকে ঠেলে তুলে দিলে। দেখি উষার প্রথম আলো গিরিকন্দরের ফাঁকে ঢুকে পড়েছে।

[ক্রমশঃ।

অনুবাদক—শ্রীশৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ

১৭। ডগলাস ফ্রেশফিল্ড সাহেব এখানে ১৮৯৯ সালে এসেছিলেন, তিনি এই স্থানের বর্ণনা নিম্নোক্ত ভাবে দিয়েছেন—এই দৃশ্যাংশের পরিবর্তন হতে লাগল। উপত্যকায় চরম ঔজ্জ্বল্য আর নেই। এর কারণ হয় বরফ খুব নীচুতে পৌঁছুতে পারেনি, অথবা পাহাড়ের ধারে পুরানো আকৃতিকে মুছে ফেলছে জলকল্লোলধারের মধ্যবর্তী অবনমিত স্থানের তুরঙ্গ আর পর্বতের পাদদেশে ক্রমনিম্ন আঘাতপ্রাপ্ত প্রস্তরখণ্ড সমূহের অস্তিত্ব। আমাদের পথ উত্তরে ঢালু পথের দিকে নেমেছে। সেখানে গাছের অনুপস্থিতি নিতান্তই চক্ষুপীড়াদায়ক। আমাদের সামনে এক সুন্দর ঝর্ণা। কাঞ্চনজঙ্ঘায় জলপ্রপাত খুব বিরল। সেই জন্য ১৮৭৯ সালে চন্দ্র দাসের ভ্রমণে এই জলপ্রপাতের দৃশ্যের অত্যধিক প্রশংসা দেখা গেছে। তিনি এটাকে গ্রীষ্মের প্রাক্কালে দেখেছিলেন তখন নিঃসন্দেহে এর আকৃতি আরও প্রবল ছিল।—Round Kang-Chen Junga.

(১৮) রামথং নামটিতে আমার বিস্ময় জেগেছিল! পারচুং আমাকে বললে—রাং-এর উচ্চারণ হ্রাম। হ্রাম মানে ভোঁদড় বা জলবিড়াল। আর থং মানে স্থান রামথং হচ্ছে জলবিড়ালের বিচরণ স্থান। এখানে ভোঁদড়গুলির চামড়া খুবই সুন্দর। মিঃ ডগলাস ফ্রেশফিল্ড কাঞ্চনজঙ্ঘার তুষারনদী দক্ষিণে রেখে পাং-পেরমা থেকে উত্তরমুখী রামথং-এ এসেছিলেন।

১১। এই স্থানটিকে বলা হয় লো-নাগ-থং। ইহার বক্রস্থানে চি-ৎসি-চু ছোট নদী বয়ে আসছে। আমাদের পথের উত্তরে বিখ্যাত পেমা-থং-কি-ৎসরি অর্থাৎ নে-পেমা-থং-এর বাইরের দেওয়াল এই নে পেমাথং হচ্ছে কাঞ্চনের উদ্যান যেখানে দেবতারা আর মুনিরা বাস করেন। এই স্থান পেরিয়ে গেলে লোনাক তুষারনদী
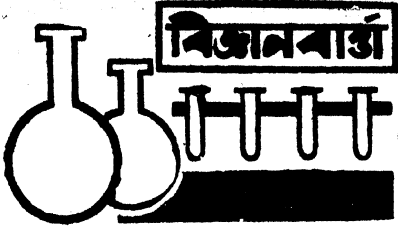
পক্ষধর মিশ্র

ভারতবর্ষের বুকে চতুর্দ্দিকে ছড়িয়ে আছে অজস্র রকমের প্রাকৃতিক সম্পদ, যার বিনিময়ে আমরা বিদেশীমুদ্রা অর্জ্জন করতে পারি। ভারত সরকার এক এক করে এই সব সম্পদ দেশের ও জাতির কাজে লাগবার চেষ্টা করছেন। কিছু দিন হলো তাঁরা সুগন্ধি তেলের উৎপাদন এবং তার ব্যবহার ও রপ্তানীর দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছেন। ভারতের বিশাল ভূখণ্ড থেকে অজস্র রকমের উদ্ভিজ্জ পদার্থ উৎপাদন করা সম্ভব যা সুগন্ধ ও প্রসাধন শিল্পের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষকে এই বিষয়ে কেবল স্বাবলম্বীই করে তুলবে তা নয়, বিদেশের সুগন্ধ দ্রব্যের বাজারে তার প্রাধান্ত প্রসারিত করতে পারবে। ভারত সরকার তাই বিশেষজ্ঞ এবং বিজ্ঞানীদের সহায়তা গ্রহণ করে একটি কমিটি গঠন করেছেন এবং এদের পরামর্শ নিয়ে প্রকৃতিজ ও তৎসঙ্গে সংশ্লেষিত সুগন্ধ রসায়ন উৎপাদনের উন্নতির দিকে মনোযোগ দেওয়া হয়েছে। শুনে আপনারা খুশী হবেন যে, আমেরিকার সুগন্ধ ব্যবসায়ীরা ভারত থেকে সুগন্ধ তেল কিনতে বিশেষ উৎসাহী। নিউ ইয়র্কের মেসার্স এল, এ, চেম্পন (M/s. L. A. Champon) অ্যাণ্ড কোং ভারতবর্ষ থেকে লেমন-(Lemongras) তেল, পামারোজা (Palmarosa) তেল এবং চন্দন তেল প্রচুর পরিমাণে কিনবার জন্ত আলোচনা সুরু করেছেন। পামারোজা তৈল ক্রয়ের ব্যাপারেই এই কোম্পানীর আগ্রহ সবচেয়ে বেশী। ভারত সরকারের উপদেষ্টামণ্ডলীর সভাপতি হলেন টাটা কোম্পানীর ডিরেক্টার শ্রীনারিয়েলওয়ালা (Sri Narielwala। এঁরা ভারতের বিভিন্ন স্থানে আলোচনাচক্রের আয়োজন করে কি ভাবে এই শিল্প বিষয়ে ভারতকে সমৃদ্ধতর করা যায়, তা নির্দ্ধারণ করতে সচেষ্ট হয়েছেন।

* * * *

এইবার প্রাণিজ সুগন্ধি রসায়ন বিষয়ে সামান্ত কিছু আলোচনা করবো, পাঠকেরা অবাক হয়ে চিন্তা করতে পারেন প্রাণিজ দ্রব্যের কথা চিন্তা করাই কঠিন,—সাধারণ ভাবে যে সব প্রাণিজ দ্রব্যের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ ঘটে, তাতে ঠিক কোন রকম সুগন্ধ আছে এ কথা কোন ক্রমেই বলা চলে না। বরঞ্চ অনেক ক্ষেত্রেই তা অত্যন্ত দুর্গন্ধ সম্পন্ন হয়।

সুগন্ধ রসায়ন দ্রব্য বলতে আমরা সেই সব বস্তুকেই অন্তর্ভুক্ত করছি যা সুরভি শিল্পে ব্যবহৃত হয়। এমন অনেক সুগন্ধি রসায়ন আছে একক ভাবে যার গন্ধ অত্যন্ত আপত্তিজনক কিন্তু অন্তান্ত উপাদানের সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায় সুরভির মধ্যে এর চরিত্র সম্পূর্ণ পৃথক। বহুপ্রকার আপত্তিকর গন্ধযুক্ত রসায়ন দ্রব্য পরিমিত পরিমাণে সুরভির মধ্যে উপস্থিত থেকে, ঐ সুগন্ধি দ্রব্যের মনোহরণের ক্ষমতা শতগুণে বাড়িয়ে দেয়। এ ছাড়া কোন কোন রসায়ন দ্রব্য তাদের সত্বর বাষ্পীভবনের প্রতিবন্ধকরূপে অথবা সুরভির অন্ত কোন বিশেষ চরিত্রের উন্নতি কল্পে ব্যবহৃত হয়।

অত্যন্ত ভালো শ্রেণীর সুরভির সত্বর বাষ্পীভবনের প্রতিবন্ধকরূপে প্রাণিজ সুগন্ধি রসায়ন সমূহের ব্যবহার খুবই বেশী। উদ্ভিদজগত থেকে আমরা অজস্র রকমের সুগন্ধি রসায়ন পাই, কিন্তু তার তুলনায় প্রাণিজ জগতের অবদান খুবই কম। মোটামুটি যে কয়েকটি প্রধান প্রাণিজ রসায়ন সুরভি উৎপাদনের জন্ত ব্যবহৃত হয় তাদের গন্ধকে কিছুতেই আনন্দদায়ক বলা চলে না। সাধারণতঃ এই সব রসায়ন দ্রব্যের ঘ্রাণ অত্যন্ত তীব্র হয় এবং তা দ্রবণের সহায়তায় উপযুক্ত ভাবে তরল করা সত্বেও সবক্ষেত্রে সহনযোগ্য হয় না।

প্রাচীন কালে ভারতবর্ষ এবং চীনের অভিজাতমহলে মৃগনাভির অসাধারণ কদর ছিল। দশম বা একাদশ শতাব্দীতে ইউরোপের পুঁথিপত্তরে দেখা যায়, সুরভি উৎপাদনকল্পে তৎকালে যথেষ্ট পরিমাণে মৃগনাভি ব্যবহার করা হোত। আধুনিক কালে যে কয়টি প্রাণিজ সুগন্ধি রসায়ন দ্রব্য প্রধানতঃ সুরভি শিল্পে ব্যবহৃত হয়, তাদের সংখ্যা খুব বেশী নয়।

সুগন্ধি দ্রব্য হিসাবে মৃগনাভি বা কস্তুরীর খ্যাতি প্রায় রূপকথার পর্য্যায়ে উন্নীত হয়েছে। ছোট বেলাতেই গল্পের মধ্যে দিয়ে রাজা-রাজড়ার দরবারে এই বস্তুটির অতুলনীয় সমাদরের কথা শুনে স্বভাবতঃ আমাদের ধারণা জন্মায় যে মৃগনাভির মতো সুরভি পৃথিবীতে বিরল। সত্যি কথা বলতে কি, সমস্ত প্রাণিজ সুগন্ধি রসায়ন দ্রব্যের মধ্যে একমাত্র কস্তুরীর গন্ধই সবচেয়ে প্রীতিকর এবং এর সুগন্ধ এতোই তীব্র যে কণিকা মাত্র কস্তুরী এক অঞ্চলের বাতাসকে সুগন্ধে ভরপুর করে রাখতে পারে। কস্তুরীমৃগ, কস্তুরী উৎপাদনের উৎস। এই হরিণগুলো দেখতে ছোট ছাগলের মতো, উচ্চতায় দেড় ফুটের চেয়ে খুব বেশী বড় হয় না। এদের বাসস্থান তিব্বতে এবং হিমালয়ের অন্তান্ত উচ্চ পর্ব্বতসমূহে। মৃগনাভি কেবলমাত্র পুরুষ জাতীয় কস্তুরীমৃগের দেহে সৃষ্টি হয় এবং এই বস্তুটি তাদের জননেন্দ্রিয়ের পাশে একটি থলিতে সঞ্চিত হয়। দু'বছরের কমবয়স্ক পুরুষ কস্তুরী-মৃগের দেহের মধ্যস্থ থলিতে মৃগনাভি পাওয়া যায় না। মৃগনাভির পরিবর্ত্তে সেখানে দুধের মতো একপ্রকার বস্তু থাকে যার সঙ্গে মৃগনাভির সুগন্ধের কোন সামঞ্জস্য নেই। মৃগনাভির আকার হয় অনেকটা আধখানা আখরোটের মতো, আয়তনও সামান্ত কিন্তু কোন কোন বিশেষ ক্ষেত্রে এক আউন্স বা দেড় আউন্স পরিমাণও পাওয়া যায়। হরিণের বয়স এবং ঋতুর সঙ্গে সঙ্গে মৃগনাভির গুণাগুণ নির্ভর করে। বসন্তকালে আহরিত মৃগনাভি তৈলাক্ত ও কোমল, রঙ লালচে বাদামী আর গন্ধ অত্যন্ত তীব্র।

হরিণকে হত্যা করে মৃগনাভি আহরণ করা হয়। কিন্তু বর্ত্তমান কালে কস্তুরীমৃগের সংখ্যা এতো কমে গেছে যে, এই জাতীয় প্রাণীর পৃথিবী থেকে বিলুপ্তির আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। এশিয়ার অনেক অঞ্চলে কস্তুরীমৃগ হত্যা করা বে-আইনী ঘোষণা করা সত্বেও এই আশঙ্কা দূরীভূত হয়েছে বলে মনে হয় না। এদের দেহের একটি বিশেষ ছিদ্র দিয়ে মৃগনাভি হয়তো আহরণ করা সম্ভব। বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে কস্তুরী আহরণের জন্ত এই পদ্ধতি প্রচলন শুরু হলে অকারণে কস্তুরীমৃগ হত্যা বন্ধ হয়ে যাবে বলে আশা করা যায়। কস্তুরীমৃগ হত্যা করার পদ্ধতির মধ্যে একটু বেশ নতুনত্ব আছে। এরা উঁচু

পাহাড়ে বাস করে, ছুটতে পারে খুব জোরে, তাই এদের শীকার করা রীতিমতো কঠিন কাজ। এদের শিকার করার জন্য শীকারীরা এক কৌশলের আশ্রয় নেন। সুরের মূর্চ্ছনার প্রতি এই প্রাণীর আকর্ষণ প্রগাঢ়, তাই শিকারীরা বাঁশি বাজিয়ে এদের আকর্ষণ করেন। সুরমুগ্ধ অবোধ প্রাণীরা মোহিত হয়ে সাক্ষাৎ মৃত্যুর দিকে নির্ভয়ে এগিয়ে এসে প্রাণদান করে। চীনদেশীয় মৃগনাভি, সাইবেরিয়ার মৃগনাভি এবং আসাম অথবা বাংলার মৃগনাভি সাধারণতঃ এই চার নামে বাজারে মৃগনাভি পাওয়া যায়। এর মধ্যে বাংলার এবং বোম্বাইয়ের মৃগনাভি খুবই দুষ্প্রাপ্য, সব চেয়ে বেশী পাওয়া যায় চীন দেশীয় কস্তুরী, এই বস্তুটির বাজারের নাম "মাস্ক টনকুইন" (musk tonquin), গুণাগুণ বিচার করলে দেখা যায়, উত্তম সুরভির বাষ্পীভবনের প্রতিবন্ধকরূপে এর তুলনা নেই।

* * * *

মৃগনাভির পর নাম করা যায় অ্যামবারগ্রিসের (ambergris) সুরভি ব্যবসায়ীদের কাছে এই প্রাণিজ রসায়ন দ্রব্যের আদর খুব বেশী। এটি প্রাণিদেহের একটি নিঃস্রাবণ সৃষ্টি হয়, বিশেষ শ্রেণীর তিমি মাছের দেহ থেকে ঐ বিশেষ শ্রেণীর তিমি মাছের পাকস্থলীতে অথবা সমুদ্রের মধ্যে ভাসমান অবস্থায় অ্যামবারগ্রিস পাওয়া যায়। অ্যামবারগ্রিসের সৃষ্টি নিয়ে তর্ক-বিতর্কের অন্ত নেই, অনেকেরই মতে কেবলমাত্র ঐ জাতীয় পুরুষ তিমির মধ্যে এই বস্তুটির সৃষ্টি হতে পারে। মৎস্যশীকারীরা স্কুইড (squid) দিয়ে টোপ ফেলেন, স্কুইড তিমির এক অতি প্রিয় খাদ্যবস্তু, তাই ঐ স্কুইড যায় তিমির পেটে। স্কুইডের ঠোঁট হজম না হয়ে পেটের মধ্যে বাস করে তিমিকে জ্বালাতন করে এবং তখনই তিমি একটি বস্তুর নিঃস্রাবণ ঘটায়। এই বস্তুটি তিমি মাছ দেহ থেকে নিষ্ক্রান্ত করতে পারে। নিষ্ক্রান্ত বস্তুটি ভাসতে থাকে সমুদ্রে, যতই সে পুরোনো হয় আর সূর্য্যের উত্তাপ পায় ততই তার মূল্য বাড়ে। যে অ্যামবারগ্রিস বহু বৎসর সমুদ্রে ভেসে বেড়াবার পর আবিষ্কৃত হয়, তার কদর খুবই বেশী।

অ্যামবারগ্রিসের দাম অসাধারণ, পাওয়াও যায় বিরাট ডেলার আকারে। শোনা যায়, একবার প্রায় সাড়ে চার মণ ওজনের একটি বিরাট অ্যামবারগ্রিসের তাল পাওয়া গিয়েছিল। বস্তুটির রঙ সাদাটে খয়েরি, প্রকৃতি তৈলাক্ত। গন্ধ মোটেই প্রীতিকারক নয়, কিন্তু অ্যালকোহল পরিমাণ মতো তরল করলে সহনযোগ্য হয়। এর গন্ধ অত্যন্ত স্থায়ী, তাই সুবাসের স্থায়িত্ব বাড়াবার জন্য বহু প্রকার সুরভিতে সুগন্ধি ব্যবসায়ীরা পরিমিত পরিমাণে অ্যামবারগ্রিস ব্যবহার করেন। অন্যান্য সব প্রাণিজ সুগন্ধি রসায়নের মতো সুরভির বাষ্পীভবনের প্রতিবন্ধকরূপেও অ্যামবারগ্রিসের যথেষ্ট সুনাম আছে। মূল্য অত্যন্ত বেশী হওয়ায়, পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ করার জন্য যথেষ্ট পরিমাণে অ্যামবারগ্রিস পাওয়া না যাওয়ায়, এর সুগন্ধের কারণ এখনও নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি।

ক্যাষ্টোর (Castor) আর এক প্রকার প্রাণিজ রসায়ন দ্রব্য। পাওয়া যায় লোমসমন্বিত দন্তুর বীবরের (beaver) দেহ থেকে। এই বস্তুটি স্ত্রী-পুরুষ উভয় বীবরের পেটের মধ্যে ক্ষুদ্র থলিতে অবস্থান করে। বীবরকে হত্যা করে এই থলি সংগ্রহ করতে হয়। এই প্রাণী কানাডা এবং রাশিয়াতে পাওয়া যায়। এর লোম অত্যন্ত মূল্যবান, তাই প্রধানতঃ লোম সংগ্রহের জন্য এই প্রাণীকে ধরা হয়, ক্যাষ্টর বীবরজাত গৌণ উৎপন্ন দ্রব্য। ক্যাষ্টরের তীব্র গন্ধ ও স্বাদ অত্যন্ত অপ্রীতিকর, অন্যান্য প্রাণিজ রসায়ন দ্রব্যের মতোই তরল করে একে মোটামুটি সহনীয় করা যায় এবং বাষ্পীভবনের প্রতিবন্ধকরূপেই প্রধানত সুরভি প্রস্তুতকারকেরা ব্যবহার করেন। এর রঙ কালচে এবং সুরভির রঙ পরিবর্ত্তনে এই বস্তুটি সহায়তা করে বলে, সুরভিশিল্পে অত্যন্ত বিবেচনার সঙ্গে এই বস্তুটি ব্যবহার করতে হয়। পরীক্ষা এবং বিশ্লেষণ করে এর মধ্যে বেনজাইল অ্যালকোহল, এল-বোরনিয়ল (L-Borneol) ইত্যাদি সুগন্ধি রসায়ন দ্রব্য পাওয়া গিয়েছে।

* * * *

গন্ধগোকুলার দেহজাত প্রাণিজ সুগন্ধি রসায়ন, সুরভি শিল্পে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। গন্ধগোকুলা বাংলাদেশ, বার্ম্মা, সিংহল, ফরমোজা, মালয় ইত্যাদি এশিয়ার বহু অঞ্চলে এবং আফ্রিকার আবিসিনিয়াতে প্রচুর পরিমাণে বিচরণ করে। আবিসিনিয়াতে ব্যবসায়ীরা রীতিমতো গন্ধগোকুলা (civat cat) পালন করে, এই মূল্যবান সুগন্ধি রসায়ন দ্রব্যটি উৎপাদন করেন। গন্ধগোকুলা বিড়াল চরিত্রের ভোঁদড় জাতীয় প্রাণী ; জননেন্দ্রিয়ের কাছে একটি থলিতে এর দেহজাত সুগন্ধি রসায়ন দ্রব্য সঞ্চিত থাকে। পুরুষ এবং স্ত্রী এই উভয় শ্রেণীর গন্ধগোকুলাই এই রসায়ন দ্রব্য উৎপাদন করে। গন্ধগোকুলার দেহজাত সুগন্ধি রসায়ন দ্রব্য আহরণের পন্থা বিশেষ অভিনব। এই প্রাণীটিকে একটি খাঁচায় উল্টে রেখে দিয়ে নানা ভাবে উত্তেজিত এবং বিরক্ত করা হয় এবং তার ফলে ক্রুদ্ধ প্রাণীটি এই রসায়ন দ্রব্যটি বার করে দেয়। মনে হয়, আক্রান্ত হলে ভীত প্রাণীটি এই রসায়ন দ্রব্যটিকে বার করে এবং এর আপত্তিকর গন্ধ বহু ক্ষেত্রে আক্রমণকারীকে দূরে সরিয়ে দেয়। গন্ধগোকুলার দেহজাত গন্ধের প্রধান উপাদান কোন কোন স্কেটোল (skatole), এবং এর গন্ধের প্রধান কারণ সিভেটোন (civetone) নামক রসায়ন দ্রব্য। উভয় রসায়ন দ্রব্যই সংশ্লেষণের দ্বারা প্রস্তুত করা সম্ভব হয়েছে। অন্য প্রাণিজ রসায়ন দ্রব্যগুলির মতো, সুরভির বাষ্পীভবনের প্রতিবন্ধকরূপে এবং তাকে দীর্ঘস্থায়ী করবার জন্য এই বস্তুটি ব্যবহার করা হয়। বস্তুটির রঙ ফিকে হলদে, বাতাসের সংস্পর্শে এসে ক্রমেই ঘোর বর্ণ ধারণ করে। দেহজাত গন্ধ নিষ্ক্রান্ত হওয়ার পর গন্ধগোকুলাকে কাঁচা মাংস খাইয়ে পালন করা হয়, কিছু দিনের মধ্যেই তার দেহমধ্যে সুগন্ধি রসায়ন দ্রব্য সঞ্চিত হয়ে আবার আহরণযোগ্য হয়ে পড়ে। আর এক প্রকার গন্ধগোকুলার কথা এতক্ষণ আলোচনা করা হয়নি, এদের বলা হয় কস্তুরী ইঁদুর (musk rat)। এদের বাসস্থান উত্তর আমেরিকার জলাভূমিতে, আকারে বড় হলেও ইঁদুরের মতো ; তাই নাম হয়েছে কস্তুরী ইঁদুর। কেবলমাত্র বসন্তকালে এদের দেহের একটি অংশে গন্ধ পাওয়া যায়। সুগন্ধি রসায়ন দ্রব্য সমন্বিত দেহস্থ থলিগুলি সংগ্রহ করবার জন্য এই শ্রেণীর গন্ধগোকুলাকে হত্যা করতে হয়।

প্রায় আধ ঘণ্টা পরে টং-টং করে এগারোটা বাজলো। ঐ ঘরটায় পাশেই বাবার শোবার ঘর। হাঁচি-কাশি বন্ধ করে দাঁড়িয়ে থাকা যে কি কষ্টকর, তা বোধ হয় বুঝতেই পারছো? যদি আজ শ্রীবাস্তব না আসে তাহ'লে অলক্ষিত ভাবে পালাবো কি করে এই কথা ভাবছি, এমন সময় সেই পদশব্দ। সেই পরিচিত মশ মশ মশ। পার্টিশানের কাঠে কাঠে মৃদু কয়েকটি টোকা। একটু পরেই সেই ঘরে, যে ঘরে আমি আছি, দু'টি মূর্ত্তি ঢুকলো। একটি বাবার আর পিছনেরটি একজন অপরিচিতের। পিঠে একটি শক্ত ব্যাগের ঝুলি। ঝুলিটা মেঝেয় নামিয়ে রেখে ও বসলো একটা টুলে। বাবা বসেছেন একটা চেয়ারে। আলোটা বাড়িয়ে দিলেন তিনি। এতক্ষণে আগন্তুকের মুখটা আমার চোখে পড়লো। মোটা একজোড়া ভুরু, ছাঁটা গোঁফ, ছাঁটা দাড়ি, মাথায় কাঁচা-পাকা এক রাশ চুল। খাঁকি রংয়ের একটা জীর্ণ কোট গায়ে আর পরনে পাজামা। পায়ে একটা বিরাট জুতো, জুতোটা দেখে তার পদশব্দের ওজনটা মনে মনে খতিয়ে নিলুম।

পরদাটা একটু একটু ফাঁক করে দেখছিলুম। বেশি দেখার লোভ হওয়া যে খারাপ তা জানতুম; কেন না, সামান্য শব্দ হলেই মুস্কিল। সামান্য পরদা-নড়া দু'জোড়া চোখের দৃষ্টি নাড়াবে না। তাই যেটুকু দিয়ে দেখা যায় সেই ফাঁকটুকু দিয়েই দেখতে লাগলুম। আগন্তুকের মুখখানা ভাল করে দেখলুম, নাকটা মোটা, একটা কাটা দাগ আছে বিশ্রী রকম। চাউনিটাও কী তীক্ষ্ণ, দেখলে ভয় লাগে।

দু'জনে কথাবার্ত্তা শুরু হলো। তারপর আগন্তুক তার ঝুলি খুলে বার করলো একরাশি পাথর। লাল সাদা কালো হরেক

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

শ্রীশৈল চক্রবর্ত্তী

রকমের। বাবা আগ্রহ করে সেগুলি হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলেন। তাদের অনেক আলোচনাও হতে লাগলো, আমি সে সব কিছুই বুঝলুম না। তারপর একটা চুল্লী জ্বালানো হলো। তাতে একটা লোহার কড়াই-এ কি সমস্ত ঢেলে দেওয়া হলো। আগুনের তাপে সেগুলো গলে গেল। একটা নীলাভ ধোঁওয়ায় ঘরটা ভরে গেল।

এমনি সময় শ্রীবাস্তব কিসের একটা নাম করলো। বুঝলুম সেটা কোনও মসলা বা উপকরণ হবে। বাবা বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, সেটা আছে ঐ তাকে। নিয়ে এসো ত পেড়ে।' শ্রীবাস্তব এগিয়ে আমার দিকেই এলো ঠিক পরদার কাছে। আমি আর তখন নিজেকে স্থির রাখতে পারলুম না। পরদা সরাতেই চমকে উঠে 'কে'? ব'লে বিরাট এক চীৎকার দিল সে।

বাবাও ছুটে এলেন কেমন এক পৈশাচিক বিহ্বলতায়। আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলুম। তার পরে কি হয়েছিল আমার আর জানা নেই। তবে বাবা যে আমাকে, পাঁজাকোলা করে শূন্যে তুলে ধরেছিলেন ও অজস্র ভর্ৎসনা করছিলেন, হয়ত বা আগুনেই ফেলে দিতেন আমাকে, তা একটু একটু টের পেয়েছিলুম। শ্রীবাস্তব তাঁকে শান্ত করারই চেষ্টা করছিলেন।

জ্ঞান হলো, আমি তখন আমার ঘরে খাটে শুয়ে আছি। মাথায় বেদনা, ভয়ানক জ্বর। এই জ্বর কিছুতেই ছাড়ছিল না। মাঝে মাঝে উত্তেজনার ঘোরে ভুল বকতুম ও নানা রকম দুঃস্বপ্ন দেখতুম।

তার পরে অবশ্য রোগ ছাড়লো, সেরে উঠলুম। কিন্তু শরীরটা সারলো না। দুর্বল অবস্থায় শুয়ে থাকতুম বিছানায়। একদিন পিসীমা বললেন, 'শানু, তোর পাথর-কাকু এসেছেন।'

চোখ চেয়ে দেখলুম সেই মূর্ত্তিকে। সে দিনের সেই লোক কিন্তু ভয়াবহ নয়। আমার বিছানার পাশে একটা টুল নিয়ে বসলো সে।

'ভালো আছ?' জিগ্যেস করলো আমায়।

'হ্যাঁ', বললুম আমি।

'তোমার অসুখের সময় আমি আরও এসেছিলুম। অবশ্য তোমার তখন জ্ঞান ছিল না।'

আমি পিসীমাকে বললুম, 'মিহির আর মণিকে ডেকে দাও না।' একা ঐ লোকটির সামনে আমার যেন অস্বস্তি লাগছিল। ওরা এসে আমার কাছেই বসলো।

মিহির বললে 'আপনিই পাথর-কাকু? যার কথা পিসীমা বলেছিল?'

হাসতে হাসতে লোকটি বললো 'হ্যাঁ গো, আমাকে তাই বলেই তোমরা ডেকো। আমার ঝুলি দেখছো ত? ওতে কেবল পাথর আর পাথর। তবে আমি একজন মানুষ, আমি পাথরের মূর্ত্তি-টুর্ত্তি নই—হে হে হে। আমায় পাথর-কাকুই বলো তোমরা।'

কিছুক্ষণ কেটে গেল। বিকালের আলো মুছে গেল। দাসী এসে দেয়ালগিরিটা জ্বেলে দিয়ে গেল।

মিহিরই আবার কথা কইল। 'আচ্ছা, পাথর দিয়ে কি করেন আপনি?'

'কি করি?' হাসতে হাসতে পাথর-কাকু বললেন, 'আম পাড়ি, জাম পাড়ি, তোমরা যেমন ঢিল ছোঁড় আর কি! কি বিশ্বাস হচ্ছে না? আচ্ছা, একদিন ঝুলি খুলে দেখাবো তোমাদের। এইবার ত তোমাদের সঙ্গে ভাব হয়ে গেল। তোমার নাম মণি না?'

মণি ঘাড় নেড়ে জানালো হ্যাঁ। পাথর-কাকু তার গাল ধরে আদর করে বললেন, 'কি সুন্দর টুলটুলে মুখ, আর কি সুন্দর চুলগুলি! বড় লক্ষ্মী মেয়ে।'

'আর তুমি হচ্ছ মিহির, কেমন তাই না?'

মিহির বললে, 'হ্যাঁ'।

'আচ্ছা আজ আমি যাই, আর একদিন আসবো। সেদিন তোমাদের গল্প বলবো—কেমন?' এই বলে পাথর-কাকু কাঁধে ঝোলার স্ট্র্যাপটা ঠিক করে নিয়ে উঠলেন।

আর একদিনের ঘটনা বলছি। তখন আমি বেশ সেরে উঠেছি। সে-ও সন্ধ্যাবেলা। আমরা পড়তে বসেছি।

'পাথর-কাকু পাথর দিয়ে কি করে ভাই মেজদা?' বলে ওঠে মণি।

আমি ধমক দিই। তোর অত খবরে দরকার নেই, এখন শ্লেটটা বার কর দেখি?

মণি তার প্রাইমার, ড্রয়িং বুক, আর সব কিছু নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলো, শ্লেটটা শুধু ছুঁলো না। মিহিরকে কয়েকটা অঙ্ক কষতে দিয়ে আমি সিন্ধুসভ্যতার পাতা ওল্টাচ্ছি, এমন সময় আমাদের ঘরের দরজাটা একটু ফাঁক হয়ে গেল।

ভীতিবিহ্বল চোখে আমরা সবাই তাকালুম। পাথর-কাকুর ঝুঁকে-পড়া মাথাটা দরজার ফাঁক দিয়ে বলে উঠলো 'ভয় নেই, আমি চোর নই, ভূত নই আর ভিস্তিওলাও নই।'

হাসতে হাসতে ঢুকলেন পাথর-কাকু।

'শুনলুম আজ তোমাদের মাষ্টার আসবেন না। আমিও ওপরে গিয়ে দেখি নগেন বাবু নেই। তাই, ভাবলুম কি আর করি, তোমাদের সঙ্গে দেখা করে যাই।'

আমি বলে উঠলুম, 'বেশ হয়েছে, তাহলে আজ গল্প হবে। আপনি যে বলেছিলেন সেদিন।'

পিঠের ঝোলাটা নামিয়ে বসলেন পাথর-কাকু।

'এই ঝোলায় আমি মনুকে ধরে নিয়ে যাব, কি বল?' বলেই তিনি হো-হো করে হাসতে থাকেন।

'আচ্ছা, এইবার এই ছেলেধরা ঝোলাটা খুলছি।' এই বলে পাথর-কাকু ঝুলি খুলে বার করলেন কয়েকটা পাথর।

'এই দেখ কত রকমের পাথর। তোমরা মনে করছো পাথরের আবার রকমারি কি। কিন্তু, তা নয়। হাজার রকমের পাথর আছে পৃথিবীতে। তাদের চেহারাও যেমন রকমারি, রংও রকমারি, গুণও রকমারি। এই দেখ স্যাণ্ড ষ্টোন,—লাল চেহারা, খসখসে গা। আগে কত মন্দির ও মূর্ত্তি তৈরী হতো এই পাথরে—কিন্তু ক্ষয়ে ক্ষয়ে যায়। আবার দেখ, এইটা কালো ব্ল্যাক ষ্টোন, বড় পাথর। কষ্টিপাথরও বলে একে। এইবার দেখ, সাদা ধব্‌ধব্ করছে, কি সুন্দর পাথর এটা। এটাকে বলে মার্বল। শ্বেতপাথর—কী সুন্দর মূর্ত্তি তৈরী হয় এ দিয়ে। আবার তাজমহলও তৈরী এ দিয়ে। এই দেখ গ্র্যানাইট, এটা ফ্লোরস্পার।'

'এই এতো পাথর দিয়ে আপনি কি করেন?' বলে উঠলো মিহির।

'আমি?' পাথর-কাকু বললেন, 'তাহলে বলি শোন। পাথর নিয়েই আমার কাজ। সারা জীবন এই নিয়েই কাটিয়েছি। এই পাথরেরই গল্প তোমাদের বলবো আজ। সে কিন্তু হিমালয়ের গল্প, দুর্গম অরণ্যের গল্প, হিমের রাজ্যের গল্প—ভালো লাগবে ত?'

আমরা তিন জনই একবাক্যে বলে উঠলুম 'হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ—'

'আর চিঠি দীর্ঘ করতে পারছি না, কিশোর! আজ এইখানেই শেষ করি। শুধু এই কথাটা বলে রাখি যে, যেমন আমাদের সেই ছোটবেলার পাথর-কাকুর সম্বন্ধে তোমার কিছু ধারণা হলো আমারও ধারণা তার চেয়ে খুব বেশী নয়। তার মুখের গল্পটা আমরা শুনেছিলুম এবং সেই গল্পের সঙ্গে তার জীবনও যে জড়িয়ে পড়বে তা কে জানতো? তাকে প্রথমে ভয়াবহ বলেই জেনেছিলুম কিন্তু তারপর তাকে ভয়ের পরিবর্তে ভক্তিই করতুম।

'বোধ হয় বুঝতে পেরেছো, এই পাথর-কাকুরই ফটো বেরিয়েছে সেদিন সেই মৃত ব্যক্তির ঝুলি থেকে। আমার পক্ষে অনুমান করা শক্ত হয়নি, যে পাহাড়ে-ঘোরা স্বভাবের সেই সরল প্রকৃতি বৃদ্ধ কোন্ দুরারোহ পর্বতে আরোহণ করতে গিয়ে পড়ে যান। আশা করি তোমরা কুশলে আছ। ইতি শান্তনু।'

কিশোর হষ্টেলে বসে বসে পড়লো এই পত্র। তারপর প্যাড আর কলম নিয়ে লিখতে লাগলো।

'ভাই শান্তনু,

তোমার দীর্ঘ পত্র পেয়ে খুব আনন্দ পেলুম। কিন্তু অনেক প্রশ্ন ভিড় করে আসছে মনের মধ্যে। ইচ্ছে হচ্ছে তোমার সামনে গিয়ে জিগ্যেস করি।

'তোমার পাথর-কাকুকে বেশ রহস্যময় লাগলো। কিসের নেশায় তিনি পাহাড়ে-পর্বতে বেড়াতেন তা ঠিক বুঝলুম না। তুমি বরাবরই একটু Sentimental তাই তোমার মনে ছোটবেলার ঘটনাটি অত্যন্ত প্রভাব বিস্তার করেছে। আজও তা তোমার মন থেকে মুছে যায় নি।

'কিন্তু পাথর-কাকুর গল্পটা না শুনলে আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। সেইটার ভূমিকা ক'রে তুমি চিঠি শেষ করলে এতে যে কোনও লোকই খুশি হ'তে পারে না। আমি ত নয়ই। আমার মনে হয়, সেই গল্পের মধ্যে হয়ত আমি প্রশ্নের উত্তর পাব। এর পরের চিঠিতে আমি কিন্তু ঐ গল্পের প্রতীক্ষা করবো। বিজ্ঞানের ছাত্র হিসাবে আমার এ বিষয়ে আগ্রহও কম নয়। ললিতাকেও তোমার পত্র দেখিয়েছি। সে-ও ঠিক আমার মত অধীর আগ্রহে বসে আছে পাথর-কাকুর আরব্ধ গল্প শোনার জন্যে। এইখানেই শেষ কচ্ছি। ইতি কিশোর।'

কয়েক দিন কেটে গেল। তারপর একদিন এসে পড়লো শান্তনুর পত্র।

'ভাই কিশোর,

তুমি আমাকে যতই সেণ্টিমেণ্টাল বলো না কেন, সব মানুষই তাই। তাছাড়া সমস্ত কাহিনীটা তোমার এখনও জানা হয়নি, তার আগেই তুমি তোমার রায় দিয়ে আমার ওপর অবিচার করেছ।

'পাথর-কাকুর গল্প যতটা মনে আছে বলতে চেষ্টা করবো। তবে এটা লিখতে আমার পুরো দশটি দিন সময় লেগেছে। সেদিন সেই প্রায়ান্ধকার ঘরে আমরা ক্ষুদ্র তিনটি শ্রোতা অবাক হয়ে শুনেছিলাম সেই গল্প।'

পাথর-কাকু বলতে আরম্ভ করলেন :—

'হিমালয়ের দুর্গম জঙ্গলে জনমানবহীন প্রদেশে একটা অপূর্ব ঝরণা ছিল। তার নাম সোনালি ঝরণা। অনেক দিন আগের কথা বলছি, তখন তোমাদের রেলগাড়ী হয়নি মোটরগাড়ীও হয়নি।

'আচ্ছা সেই ঝরণা কিন্তু যে-সে ঝরণার মত নয়। সেখানে গেলে নাকি লোক আর ফিরত না।'

'কি হোত ?'

'তোমরা যেমন অবাক হয়ে যাচ্ছ, লোকেও তেমনি অবাক হয়ে যেত। অনেকে বলতো, ঐ জঙ্গল থেকে নেমে আসে মস্ত বড় বড় বুনো শুয়োর আর নয়তো বিষাক্ত অজগর। তাদের নিশ্বাসে অসাড় হয়ে যেত মানুষ।

'কিন্তু ঝরণাটা ছিল নাকি অপূর্ব সুন্দর! অমন ঝরণা পৃথিবীতে কেউ দেখেনি। আগেও ছিল না, পরেও হয়নি! সোনালি ঝরণা—ঝরণা দিয়ে সোনা ঝরে পড়তো। বড় মজার কথা। কিন্তু ভেবে দেখ, শুধু সুন্দরের টানে মানুষ যে সেখানে যেত, তা নয়।

'মানুষ যেত সোনার লোভে। ঝরণার জলে যে স্বর্ণরেণু মিশে থাকতো তাই বালির মত স্তরে স্তরে জমে উঠতো নীচে আশেপাশে। সোনার ওপর মানুষের চিরকালের লোভ, তাই একা বা দলবল নিয়ে যখনই সে গেছে সেই সংগ্রহ করতে তখনই মৃত্যু নেমে এসেছে। ঝরণার সোনালি মায়ায় মুগ্ধ হয়ে প্রাণ দিয়েছে।'

মিহির বলে উঠলো—'সত্যি, সোনা পাওয়া যায় সেথা ?'

পাথর-কাকু বললেন, 'হ্যাঁ, তাই ত শুনেছি। শুনেছি, এক এক অগম্য গুহা থেকে ঐ সোনালি ধারা নেমে আসছে। সেই গুহায় এমন পাথর আছে যা নাকি সব জিনিসকে সোনা করে দেয়। কিন্তু দুর্লভ সেই পাথর—সেই পরশ-পাথর পৃথিবীতে একান্ত দুর্লভ।'

'সত্যিই কি এমন পাথর আছে পাথর-কাকু ?' আমি জিগ্যেস করে উঠলুম।

'আছে বলেই ত শুনেছি। কত পাথর ঘাঁটলুম, কত হাজার হাজার পাথরের নুড়ি নমুনা সংগ্রহ করেছি, কিন্তু পাইনি এখনও। প্রথমে আমারও বিশ্বাস হয়নি, কিন্তু পৃথিবীতে অনেক আশ্চর্য জিনিসও ত আছে। এমন পাথর আছে যার গা থেকে ঘামের মত জল ঝরে। নীরস তপ্ত রৌদ্রের মধ্যেও। কত গাছ থেকে শুকনো দিনে বৃষ্টি ঝরে। কত পাথর অন্ধকারে হীরের মত জ্বলে!'

'এদের নিয়েই ত আমার সময় কেটে যায়। নতুন কোনও রকম পেলেই আমি সংগ্রহ করি। কত রংয়ের কত রকম চেহারার পাথর যে কুড়িয়েছি তার আর শেষ নেই। এক রকম পাথর পেয়েছিলাম, তার গায়ে সবুজ আভা—বহুদিন পরে সে গেল কাল হয়ে। এ-সব তোমরা বড় হয়ে জানতে পারবে। তবে আমার মত যেন পাগল হয়ে যেও না। কেন বলবো ?'

'আমি তখন একটা সরকারী কাজ করি, ভূতত্ত্ববিদের কাজ। কোনখানে পৃথিবীর কোন স্তরে কি রকম মাটি, কি রকম পাথরের টুকরো পাওয়া যায়, এই খোঁজ নিয়ে ফিরি। কোনও পাথরের layerএর মধ্যে লক্ষ বছর পুরোনো দিনের হারানো জীবজন্তুর কঙ্কালও পাওয়া যায়।'

'পাহাড়, পর্বত চষে বেড়ানো আমার নিয়মিত কাজ। হিমালয়ের কত জায়গায় গেছি, বিন্ধ্য পাহাড়ে, আরাবল্লীতে, নাগপুরের পার্বত্য অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছি। তারপর অনেক দিন হলো চাকরি ছেড়েছি কিন্তু পাথরকে ছাড়তে পারিনি। তার সাক্ষ্য দিচ্ছে আমার এই ঝোলা।'

মণি বলে উঠলো, 'গল্প বলবে না ?'

'ও, হ্যাঁ···সেই সোনালি ঝরণার কথা। লোকে বলতো সে দৃশ্য দেখলে চোখ ঝলসে যায়। সোনার আলোয় জ্বল-জ্বল করতো সারা পাহাড়—আশে-পাশের সারা বনস্থলী। দিনের বেলা সূর্যকিরণ ঠিকরে পড়তো লক্ষ লক্ষ সোনালি শিখার মত। কিন্তু সে অনেক দিন আগে।'

কেরোসিনের আলো জ্বলছে ঘরে। ঘরের মধ্যে যতখানি আলো তার চেয়ে অন্ধকার জমা হয়েছে বেশি। পাথর-কাকুর গালে ও সাদা চুলের এক দিকে আলো পড়েছে, অন্যদিকটা রহস্যময় অন্ধকার। চোখের গভীরতার মধ্যে থেকে চোখ দুটো চক-চক করছে। আর একদৃষ্টিতে অপলক তাকিয়ে আছি তার দিকে।

পাথর-কাকু বলতে থাকেন। 'পাহাড় অঞ্চলে অনেকের কাছে শুনেছি আমি সেই সোনালি ঝরণার কথা। আমি কত বার সেই গোপনগুহার সন্ধানে ছুটেছি, যে গুহায় সেই দুর্লভ পাথর স্তরে স্তরে জমাট হয়ে আছে। কিন্তু পাইনি তার খোঁজ। সে কথা থাক। তার আগে তোমাদের একটা গল্প বলি। কত বেজেছে ? নগেনদা'র সঙ্গে দেখা না ক'রে আজ ওঠা চলবে না। বসতেই হবে। তা ছাড়া, তোমাদের মত শ্রোতা পেলে গল্প বলতে আমার খুব ভাল লাগে। কেন জানো ? গল্পকে বিশ্বাস না করলে গল্প জমে না—তার প্রাণ শুকিয়ে যায়। তোমরা গল্পকে বিশ্বাস করো। তাই মরা গল্প আর মরা হাড়, একই জিনিষ।' [ক্রমশঃ

তুষার-মানব

শ্রীদেবব্রত ঘোষ

হিমালয় চির রহস্যের আলয়। তাই হিমালয়ের গহন গিরি অঞ্চলে অতিকায় তুষার-মানব (Abominable Snowman) যা ইয়েতি-রহস্যের আজও কোন সমাধান হল না। প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে বিদেশী পর্বতারোহণকারীদের কাছ থেকে ইয়েতি সম্বন্ধে বহু চাঞ্চল্যকর সংবাদ পাওয়া গেছে। কিন্তু রহস্যের কোন সমাধান হয়নি বরং উত্তরোত্তর তা আরো ঘনীভূত হয়েছে।

১৯২৫ খৃষ্টাব্দে গ্রীক অনুসন্ধানকারী মিঃ এ, এন, টোম্বাজী জেমু গিরিবর্ত্মে একটি ইয়েতি দেখেছিলেন বলে শোনা যায়। তারপর ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে দু'জন নরউইজান অভিযাত্রী মিঃ থরবার্গ ও মিঃ ফ্রোস্টিস উত্তর-নেপালের জেমু গিরিবর্ত্মে বরফের উপর ইয়েতির পায়ের ছাপ লক্ষ্য করে অনুসরণ করার সময় হঠাৎ একটি ইয়েতি কর্তৃক আক্রান্ত হয়েছিলেন। তাঁদের মতে—ইয়েতি মনুষ্যাকৃতি ভীষণ-দর্শন প্রাণী, তার সারা দেহ পিঙ্গল বর্ণের লোমে ঢাকা।

এই ঘটনার প্রায় ছয় বৎসর পরে ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনের "ডেলি মেল" পত্রিকার মুখ্য বৈদেশিক সংবাদদাতা মিঃ রাল্ফ ইজার্ড-এর নেতৃত্বে সর্বপ্রথম একটি অনুসন্ধানকারী দল সরকারী ভাবে ইয়েতির সন্ধানে হিমালয় অঞ্চলে পরিভ্রমণ করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, মিঃ ইজার্ড এই অভিযানে কোন ইয়েতির দেখা পাননি

তবে তিনি ইয়েতিদের সম্বন্ধে বহু মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করে এনেছিলেন। তাঁর মতে—ইয়েতি মনুষ্যাকৃতি দ্বিপদবিশিষ্ট প্রাণী এবং দেখতে ভালুক, বানর অথবা লেঙ্গুরের মত নয়। এরা আট থেকে একুশ হাজার ফুট উচুঁতে পাহাড়ের গায়ে বাস করে।

তারপর ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস রাজ্যের কোটিপতি তৈল ব্যবসায়ী মিঃ টম স্লিক্-এর নেতৃত্বে অপর একটি অনুসন্ধানকারী দল হিমালয়ের বরুণ উপত্যকায় পরিভ্রমণ করেন। কারণ, শেরপাদের মতে বরুণ উপত্যকার আশে-পাশেই নাকি ইয়েতিদের প্রধানতঃ দেখা যায়। অথচ দুর্ভাগ্যের বিষয়, মিঃ স্লিক্ বহু চেষ্টা করেও কোন ইয়েতির দেখা অথবা সন্ধান পান নি।

যাই হোক, স্থানীয় বিশ্বাসভাজন শেরপাদের কাছে খোঁজ-খবর ও জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা গেছে—ইয়েতি মনুষ্যাকৃতি দ্বিপদবিশিষ্ট প্রাণী। কাঁচা মাংস ও ফলমূল এদের প্রধান খাদ্য। ইয়েতিরা গুহাবাসী এবং আগুন দেখে অন্যান্য জীবজন্তুর মতই ভীষণ ভয় পায়। এরা লোকালয় থেকে বহু দূরে হিমালয়ের গভীর অরণ্য অঞ্চলে বাস করে। তবে মাঝে মাঝে খাদ্যদ্রব্যের সন্ধানে লোকালয়ে এসে হানা দেয়। ইয়েতিরা মানুষের মত হাঁটতে এবং দৌড়তে পারে। আবার প্রয়োজন হলে হনুমানের মত চার-হাত-পায়ে ভর দিয়েও হাঁটতে পারে।

তুষার-শার্দুল শেরপা তেনজিং নোরগে ইয়েতির অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন। তাঁর মতে হিমালয়ের যেমন অসংখ্য চূড়া আছে, তেমনি হিমালয়ের গহন অরণ্যে ইয়েতি আছে।

কিছুদিন পূর্বে হিমালয়ের লাংটাং পর্বতমালার পাদদেশে অবস্থিত টার্কে গ্রামের অধিবাসী শেরপা ফুরপা ইয়েতি সম্বন্ধে এক চাঞ্চল্যকর সংবাদ পরিবেশন করেছেন। টার্কে গ্রামের অন্যান্য অধিবাসী ও শেরপারাও ফুরপার কথা সত্য বলে সমর্থন করেছে। কারণ, তারাও নাকি অনেকেই ফুরপা কথিত ইয়েতিটিকে বরফের উপর দিয়ে দৌড়ে পালাতে দেখেছিল।

ফুরপার বিবরণ—সেদিন সকালবেলা থেকেই আকাশের অবস্থা বড় খারাপ ছিল। শন্ শন্ শব্দে ঝড়ো হাওয়ার সাথে আকাশ থেকে অবিরাম ঝুপ ঝুপ করে পাখীর নরম পালকের মত বরফ পড়ছিল। বেলা দশটা নাগাদ আকাশের অবস্থা একটু পরিষ্কার হলে গ্রামের শেষ প্রান্তে আমার জল-চাকী-তে (water mill) গেলাম গতরাত্রের পেষা আটা সংগ্রহ করতে। প্রতিদিন সন্ধ্যায় চাক্কী-তে গম দিয়ে দরজায় তালা বন্ধ করা আমার নিত্যকার অভ্যাস। কিন্তু সেদিন ভারী অবাক হলাম, যখন দেখলাম দরজা খোলা।

আমার স্পষ্ট মনে আছে, গত সন্ধ্যায়ও আমি নিজের হাতে দরজা বন্ধ করেছি। তারপর তালা লাগিয়েছি। প্রথমে ভাবলাম, হয়ত আমার উঠতে দেরী দেখে বাড়ী থেকে অপর কেউ এসেছে আটা নিয়ে যেতে। কিন্তু তাই বা কেমন করে সম্ভব? বাড়ীতে আমরা মাত্র দু'জন প্রাণী। আমি ও আমার স্ত্রী। আর আমার স্ত্রী আজ প্রায় এক মাস ধরে কঠিন অসুখে শয্যাশায়ী। তারপর ভাবলাম, হয়ত আমাদের গ্রামের কোন ফিকিরবাজ লোক আটা চুরি করতে এসেছে। তাই লোকটিকে হাতে-নাতে ধরবার জন্তে খুব সন্তর্পণে কাঠের দেওয়ালের ফাঁক দিয়ে আমি ঘরের মধ্যে একবার উঁকি মেরে দেখার চেষ্টা করলাম। কিন্তু যা' দেখলাম, তাতে আমার সারা শরীর আতঙ্কে শিউরে উঠল।

প্রায় দশ-এগারো ফুট উঁচু এক বিশালকায় মনুষ্যাকৃতি প্রাণী ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। তার হাত দু'খানি হাঁটু পর্য্যন্ত ঝুলে পড়েছে। প্রকাণ্ড থাবা। নখগুলি ভালুকের নখের মত ধারাল ও বাঁকানো। সারা দেহ পিঙ্গল বর্ণের লোমে ঢাকা। মুখমণ্ডল চ্যাপ্টা। কতকটা বানরের মত। প্রচুর রেখাবলয়িত ও নির্লোম। অমিত শক্তিশালী এই জানোয়ারটি প্রায় বিশ জন বলিষ্ঠ পুরুষের শারীরিক শক্তিকে প্রতিহত করার ক্ষমতা রাখে। মাঝে মাঝে ঝুঁকে পড়ে সে দু'হাতে আটা তুলে গোগ্রাসে খাচ্ছিল। আরো লক্ষ্য করলাম, জানোয়ারটি যখন আটা খাচ্ছিল তখন সে মনের আনন্দে বুনো শূয়োরের মত নাক দিয়ে অদ্ভুত এক ধরণের ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ করছিল ও সারা গায়ে আটা মাখছিল। আমি ইতিপূর্ব্বে গ্রাম্য-বৃদ্ধদের কাছে ইয়েতি সম্বন্ধে অনেক গল্প শুনেছিলাম। তাই চুপি চুপি পিছু হঠে এসে চিৎকার করতে করতে গ্রামের দিকে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে শুরু করলাম। আমার চিৎকার শুনে আমাদের গ্রামের শেরপারা সকলেই সাহায্যের জন্য ছুটে এল। ইতিমধ্যে মানুষের সাড়া পেয়ে ইয়েতিটি মুহূর্তের মধ্যে লম্বা লম্বা পা ফেলে দৌড়ে পার্শ্ববর্তী উপত্যকার মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। আমাকে সাহায্য করার জন্তে সেদিন যে সকল শেরপারা জমায়েত হয়েছিল, তাদের মধ্যে অনেকেই উক্ত ইয়েতিটিকে বরফের উপর দিয়ে দৌড়ে পালাতে দেখেছিল।

মাকালু বিজয়ী ফরাসী অভিযাত্রী দলের সদস্যবৃন্দ বরুণ উপত্যকায় বরফের উপর ইয়েতির পায়ের ছাপ দেখেছেন। এই পায়ের ছাপগুলি প্রায় কুড়ি ইঞ্চি লম্বা। ফরাসী অভিযাত্রী দলের অন্যতম সদস্য গুইডো ম্যাগ্নোন-এর মতে—ইয়েতি বনমানুষের চেয়ে অপেক্ষাকৃত উন্নত ধরণের প্রাণী। দৈহিক উচ্চতায় প্রায় দশ-বারো ফুট। সারা দেহ পিঙ্গলবর্ণের লোমে ঢাকা। শারীরিক শক্তিতে পনেরো জন বলিষ্ঠ নওজোয়ানের সমকক্ষ। মাকালুর পাদদেশে সম্বুয়ার জঙ্গলে এদের মাঝে মাঝে দেখা যায়। গভীর জঙ্গলে গাছপালার ঘন আবরণে ইয়েতিরা লুকিয়ে থাকতে ভালোবাসে। তাই সচরাচর এরা শেরপাদের নজরে পড়ে না। সম্বুয়া মাকালুর পথে শেষ গ্রাম। এখানকার নৈসর্গিক দৃশ্য বড় নয়নাভিরাম!

এভারেষ্ট-বিজয়ী অভিযাত্রী দলের নেতা স্যার জন হাণ্ট বলেন—আমি ইয়েতির অস্তিত্বে বিশ্বাস করি। আমি বরফের উপর তাদের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পায়ের ছাপ দেখেছি। গভীর রাত্রে ইয়েতির চিৎকার শুনেছি। এ ছাড়া স্থানীয় বিশ্বাসভাজন শেরপা ও বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের কাছেও এ বিষয়ে অনেক গল্প শুনেছি। আর সত্যিই ত ইয়েতির অস্তিত্বে বিশ্বাস না করবার কি কারণ থাকতে পারে?

১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে সুইস অভিযাত্রী দলের নেতা মিঃ রেমণ্ড ল্যামবার্ট-এর নেতৃত্বে বিশ্ববিখ্যাত বেলজিয়ান নৃতত্ত্ববিদ্ মিঃ এম, জুলে ডেষ্ট্রি হিমালয়ের গণেশ হিমল অঞ্চলে পরিভ্রমণ করেন। ফিরে এসে তিনি সাংবাদিকদের নিকট বলেন—ইয়েতি মানুষ ও বনমানুষের মাঝামাঝি এক শ্রেণীর প্রাণী। বর্মার গভীর অরণ্যে ও পাহাড়-পর্ব্বতে আমি ইয়েতিদের পায়ের ছাপ দেখেছি। এরা

পথের নিশানা ঠিক রাখার জন্যে রাস্তার পাশে বড় বড় পাথরের চাই সাজিয়ে রাখে।

খুব বেশী দিনের কথা নয়। কয়েক বৎসর আগে সিকিম-এর জালাপ গিরিবর্ত্মের নিকট চুম্বিংথাম-এর ভারতীয় ডাক ও তার বিভাগের এগারো জন কর্মচারী একটি মনুষ্যাকৃতি হিংস্র প্রাণীর কবলে পড়ে অত্যন্ত শোচনীয় ভাবে প্রাণ হারিয়েছিল। পরে এই হিংস্র প্রাণীটিকে কয়েক জন ইংরাজ সৈনিক গুলী করে হত্যা করেছিল এবং সিকিম-এর তদানীন্তন পলিটিক্যাল অফিসার স্যার চার্লস বেল মৃতদেহটি গ্যাংটক-এ নিয়ে এসেছিলেন। স্যার চার্লস বেল তাঁর ডায়েরীতে লিখেছেন—স্থানীয় জনসাধারণ ও শেরপারা প্রাণীটিকে "ইয়েতি" বলে সনাক্ত করেছিল।

এ ছাড়া মিঃ স্লুৎথেস ও মিঃ ষ্টোনার-এর বিবরণ থেকে জানা যায়—এভারেষ্ট-এর পাদদেশে অবস্থিত পাঙ্গবোচে বৌদ্ধমঠে একটি ইয়েতির মাথার খুলি সযত্নে রক্ষিত আছে। হিমালয় আরোহণকারী বিভিন্ন দেশের অভিযাত্রীরা এই খুলিটি দেখেছেন এবং পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করে খুলিটি ইয়েতির বলে রায় দিয়েছেন। এ সম্বন্ধে একটি চমৎকার গল্পও প্রচলিত আছে—প্রায় একশো বছর আগেকার কথা। সাঙ্গদোবদে তখন পাঙ্গবোচে বৌদ্ধমঠের প্রধান পুরোহিত। তিনি ছিলেন মুক্তপুরুষ মহানুভব। ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও ক্ষুধা-তৃষ্ণার প্রতি তাঁর বিশেষ নজর ছিল না। এ জন্যে মাঝে মাঝে তিনি সময়মত আহার্য্য সংগ্রহ করতে পারতেন না। ভগবান তথাগতের অসীম করুণা এক দিন তিনি দেখলেন, একটি মনুষ্যাকৃতি প্রাণী অর্থাৎ ইয়েতি কিছু ফল-মূল এনে তাঁর সামনে রেখে গেল। পরদিনও ঠিক অনুরূপ ঘটনা ঘটল। এই ভাবে প্রতিদিন পুরোহিতকে ফল-মূল যোগান ইয়েতিটির নিয়মিত অভ্যাসে পরিণত হল। অবশেষে বৃদ্ধবয়সে এক দিন তাকে মন্দিরের সামনে মৃত অবস্থায় দেখা গেল। তখন সাঙ্গদোবদে তাঁর শিষ্যদের এই "মহান হৃদয় ও পরোপকারী" ইয়েতির মাথার খুলি পবিত্র বস্তুর নিদর্শন হিসাবে পাঙ্গবোচে বৌদ্ধ মঠের অভ্যন্তরে সযত্নে রক্ষা করতে আদেশ দিলেন। এখনো এই খুলিটি প্রতি বৎসর স্থানীয় শেরপা সম্প্রদায় কর্তৃক ভক্তিভরে পুজিত হয়।

শেরপারা জীবন ধারণের জন্য সর্ব্বদা কঠিন পরিশ্রম করে। এরা সাহসী, বীর, সুস্থ ও সবল। প্রকৃতির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে লড়াই করবার অসাধারণ শক্তি এদের মজ্জাগত। পশুপালন ও অল্পবিস্তর চাষবাস শেরপাদের জীবিকা অর্জনের প্রধান অবলম্বন। চাষবাসের দ্বারা আলু, ভুট্টা, যব, গম, বাজরা প্রভৃতি উৎপন্ন করে।

আগেই বলেছি, খাদ্যদ্রব্যের সন্ধানে ইয়েতিরা মাঝে মাঝে লোকালয়ে এসে হানা দেয়। তাই ইয়েতিদের দলবদ্ধ আক্রমণ প্রতিহত করার জন্যে শেরপারা গ্রামের প্রত্যন্ত দেশে বড় বড় জালায় বিষমিশ্রিত মদ রেখে দিয়ে আসে। রাত্রে ইয়েতিরা খাবার লোভে এই মদ পান করে এবং দলে দলে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অনেকের মতে এই ধরণের "পাইকারী হত্যা" বা Mass killing এর ফলেই নাকি আজ-কাল ইয়েতির সংখ্যা এত কমে গেছে।

ইয়েতিদের মধ্যে বহু বিবাহ ও মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা প্রচলিত। স্ত্রী-ইয়েতি বা মী-তে (তুষার-মানবী) গোপির প্রধান। পূজ্যপাদ শ্রীদালাই লামা কর্তৃক নিযুক্ত কাঠমাণ্ডুস্থিত বৌদ্ধমঠের প্রধান পুরোহিত সুপণ্ডিত লামা শ্রীপূর্ণ বজ্র বলেন—পূর্ণিমা রাত্রে ইয়েতিরা সমতল ভূমিতে জমায়েত হয়। সেখানে তারা শারীরিক শক্তিমত্তা প্রদর্শন করে। প্রায় দু' মণ আড়াই মণ ওজনের বড় বড় পাথরের চাঁই ইয়েতিরা অবলীলাক্রমে ¼ কিলোমিটার (২৭৫ ফুট) দূরে নিক্ষেপ করতে পারে।

বিখ্যাত ইয়েতি-বিশেষজ্ঞ শ্রীগণেশ বজ্র কিছুদিন পূর্ব্বে হিমালয় অঞ্চলে ব্যাপক অনুসন্ধান করে বহু ইয়েতি-গুহা আবিষ্কার করেছেন। ফিরে এসে এক সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেছেন—বিদেশীদের পক্ষে স্থানীয় শেরপাদের সাহায্য ব্যতীত ইয়েতির দেখা পাওয়া একেবারেই অসম্ভব। অথচ কুসংস্কারাচ্ছন্ন শেরপারাও এ বিষয়ে বিদেশীদের সাহায্য করতে রাজী নয়। কারণ, শেরপাদের বিশ্বাস, ইয়েতিদের ক্ষতি সাধন করলে তাদের 'প্রিয়জন-বিয়োগ' অবশ্যম্ভাবী। স্থানীয় শেরপা ও বৌদ্ধপুরোহিত সম্প্রদায় ইয়েতিদের প্রতি বিদেশী অভিযাত্রীদের প্রতিকূল মনোভাবের জন্য তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। সে কারণ নেপাল সরকার সম্প্রতি এক বিশেষ আইনের সাহায্যে ইয়েতি হত্যা বা বন্দী করা নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। তবে ছবি তোলা নিষিদ্ধ নয়। এই ধরণের নানা বাধা-বিরুদ্ধতা ও 'প্রতিবন্ধকতার' জন্য মনে হয়, অদূর ভবিষ্যতেও ইয়েতি-রহস্যের আশু সমাধানের আশা খুবই কম।

রাক্ষসী-রাণী

শ্রীভূতনাথ চট্টোপাধ্যায়

এক যে ছিল রাজা। তার ছিল এক রাণী। রাণী ছিল ভারী চমৎকার দেখতে। হলে কি হবে, রাণী ছিল এক নারী-বেশধারী রাক্ষসী। দিনে সে থাকতো রাণীর মতো। কথা কইতো, হাসতো-খেতো, সবই কাজ করতো সংসারের। রাতে বারোটা বাজবার পরই সে হয়ে যেত এক বীভৎস চেহারার রাক্ষসী।

রাজার বাড়ীর ঘড়িফটকে যখন রাত বারোটা বাজতো অমনি রাণী ধীরে ধীরে রাক্ষসীতে পরিণত হোয়ে যেতো। রাণী তখন বিছানা থেকে উঠে বাইরে চলে যেতো চরা করতে। মানে রাজপুরীর বাইরে চলে গিয়ে তার সামনে গরু মানুষ যা কিছু পেতো তাই ধরে পেটে পুরে দিতো। আবার ভোর হবার সংগে সংগে মোরগগুলো যখন ডেকে উঠতো তখন আবার সে রাণীর মতো বিছানায় এসে চুপি-চুপি শুয়ে পড়তো। রাজা কিছুই টের পেতেন না বা রাজপুরীর আর আর লোকেরাও।

এক দিন হলো কি! রাণী রাক্ষসী হোয়ে বেরিয়েছে—রাজার সভাকবি কি কারণে যে ঘরের জানালায় বসেছিলো—দেখলো, রাণী রাজার ঘর ছেড়ে বেরিয়ে চলেছে এক ভীষণ রাক্ষসীর বেশ ধারণ করে। ভারী অবাক হলো সভাকবি। সে-ও কৌতূহলী হোয়ে রাণীর পিছন পিছন চলতে সুরু করলো, সে কি করে তাই দেখতে!

রাক্ষসী-রাণী চলতে চলতে সামনে পেলো রাজার এক জন অনুচরকে। ধরলো তাকে জাপটে এবং সংগে সংগে ভেঙে ফেললো তার ঘাড়টা। এক নিমেষেই অতো বড় লোকটাকে খেয়ে হাত-মুখ ধুয়ে রাণী ভোর হবার আগেই ফিরে এলো রাজার বাড়ীতে।

তখন মোরগ ডাকতে সুরু করেছে। সভাকবি দেখে রাক্ষসী

আবার চমৎকার রাণীতে পরিণত হয়েছে। কবি তাই না দেখে তো অবাক্‌। দেখে-শুনে তার তো চোখ দু'টো ছানাবড়া।

পরদিন রাজার সেই অনুচরটির খোঁজ পড়লো। রাজসভায়, এমন কি রাজপুরীতে তাকে পাওয়া গেল না। কবি জানে তাকে পাওয়া যাবে—সে রাণীর পেটে গিয়ে হজম হোয়ে গেছে, রাণী রাক্ষসী হোয়ে তার হাড়গুলো অবধি খেয়ে ফেলেছে।

রাজা বললেন, "কোথায় সে—তাকে খুঁজে বার করতেই হবে এবং যে তাকে খুঁজে বার করতে পারবে আমি তাকে পাঁচ হাজার মোহর বক্‌শিস দেবো।"

সভাকবি তখন কিছু বললো না। কারণ সে জানে, তার এ ভয়াবহ কথা রাজা কেন, কেউই আমল দেবে না। সুতরাং পাঁচ হাজার মোহরের লোভ মনের মাঝে পুষে রেখে কোনো রকমে সে সেদিন চুপ করে রইল। আরো ভাল ভাবে দেখা দরকার। তা না হলে মিছে কথা হোলে রাজার আদেশে তাকে ফাঁসীকাঠে ঝুলতে হবে। সুতরাং চেপে যাওয়াই ভালো। তবে ভাল করে দেখবে সে। ছাড়বে না সহজে।

সেদিন রাত যখন দুপুর হোল, চারি দিক নিঝুম হোল, সভাকবি তো তৈরী হয়েই ছিল। রাণী রাক্ষসী সেজে বেরুলো। কবিও তার ঘর থেকে বেরুলো, চললো রাণী-রাক্ষসীর পিছন পিছন। আজ রাক্ষসী-রাণী খাবার মতো কোনো মানুষ বা জানোয়ার পেলো না কোথাও। ভীষণ রেগে উঠলো রাণী-রাক্ষসী খাবার না পেয়ে। বনে পাহাড়ে অনেক সময় কাটিয়ে ইতি-উতি করে খুঁজতে লাগল সে তার খাবার—সারা বন তোলপাড় করে ফেললো রাক্ষসী-রাণী। কোথাও কিছু পেল না সেদিন। নিজের হাতখানাই কামড়াতে লাগলো রাক্ষসী। কবির তো ভয়ে বুক টিপ টিপ করতে লাগলো। এই বার বুঝি তার পালা! রাক্ষসী ভীষণ রেগে গিয়ে এদিক ওদিক তাকাতে লাগলো, যদি কিছু পাওয়া যায় এই আশায়। আর "হাঁউ-মাঁউ-খাঁউ-খাঁউ" করে গরজাতে লাগলো।

"মানুষ কোথাও কাছে আছে বলেই মনে হয়।"

রাণী-রাক্ষসীর কথা শুনে কবির তো শরীর ভয়ে একেবারে কাঠ হোয়ে এলো। দারুণ এই শীতে তার কপালে ঘাম ঝরতে লাগলো। সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গাছের পিছনে ঠক্‌ ঠক্‌ করে কাঁপতে শুরু করেছে তখন।

হায়! আজকের জন্তেই ছিল বোধ হয় কবি! কেন সে এলো রাক্ষসী-রাণীকে অনুসরণ করে পাঁচ হাজার মোহরের লোভে? মনের মাঝে এ কথাটাই তার বার বার উঁকি মারতে লাগলো।

যাই হোক্‌, রাক্ষসী-রাণী এবার ফেরার পথে পা বাড়ালো। কারণ ওদিকে ভোর হয়ে আসছে। কবিও লুকিয়ে লুকিয়ে বাড়ী ফিরলো। বরাত ভাল কবির। তাই রাক্ষসীর হাত থেকে আজ কোনো রকমে বেঁচে গেছে।

পরদিন রাজা রাজসভায় বসেছেন। মনটা বড় খারাপ। ভাল একজন অনুচর হারানোর দুঃখ আর কি!

তোমাদের মাঝে কেউ তার সংবাদ পেয়েছো, বলতে পারো?

চারি দিকে নীরবতা। কেউ কোনো কথা বলতে পারছে না। নগর-কোটাল চারি দিকে লোক পাঠিয়েছে তাকে খুঁজে বার করতে।

"লোক পাঠানো হয়েছে মহারাজ! কোনো সংবাদ পাওয়া যায় নাই।"

"কেন?"

নগর-কোটাল চুপ। কেন'র কোনো জবাব দিতে সে পারলো না। কি করেই বা পারবে সে! সে তো খুঁজেই চলেছে। না যদি পাওয়া যায় তবে কি তার দোষ? সভা একেবারে চুপ—রাজা রেগে একেবারে টং! সেরা অনুচর তার আজ হারিয়ে গেছে। দুঃখে রাগ হলো রাজার। এমন সময় সভয়ে কবি উঠে দাঁড়ালো। সে রাজার পাশেই আসনে চুপ করে বসেছিল। এখন রাগের হেতু বুঝে এবং নিজের সুযোগ যাতে না হাতছাড়া হয়, তারই সুবিধা বুঝে রাজাকে বললো, "মহারাজ, একটা কথা বলবো?"

"বলো।"

"সভয়ে বলবো, না অভয়ে বলবো?"

"অভয়ে বলো।"

"আমি জানি আপনার সেই অনুচরের সংবাদ।"

"কোথায় সে? বলো কবি।"

"রাণী তাকে খেয়ে ফেলেছে।"

রাজসভায় সকলে অবাক্‌। রাণী একটা গোটা লোককে ধরে খেয়ে ফেললো! সে কেমন ভাবে হবে রে বাবা? কবির কথা কেউ বুঝে উঠতে পারলো না।

"সাবধান কবি! এখনো বলছি সাবধান! তোমাকে আমি ফাঁস কাঠে ঝোলাবো, যদি তোমার কথা মিছে হয়!"

"মহারাজ, তাই করবেন। আমার আরো কথা বলবার আছে—বলতে দিন হুজুর!"

"বলো।"

সভাকবি যা দেখেছিল দুদিন ধরে তা রাজাকে সবই খুলে বললো। রাণী কেমন করে রাক্ষসী হোয়ে মাংস গরু-ভেড়া যা পায় তাই ধরে ধরে খায়। কবি তা নিজের চোখে দেখেছে একদিন নয়—দুই দিন। রাজা হুংকার দিয়ে উঠলেন।

এই, কে আছিস? একে গারদঘরে পুরে রাখ। যদি কথা ওর মিছে না হয়, তবে তোমাকে পাঁচ হাজার মোহর দেওয়া হবে উপহার হিসাবে। আর যদি মিছে হয় তা হলে—

"আমার ফাঁসী হবে—তাতে আমি রাজী আছি মহারাজ! রাজপুরীর ভালর জন্তে এবং আপনার ভালর জন্তে একথা আমি জানালাম। রাণীই আপনার রাজপুরীতে দুঃখ ও শোকের সাগর বইয়ে দেবে, সে একজন রাক্ষসী। রাত দুপুরে সে তার আসল রূপ ধারণ করে—সাবধান মহারাজ—আপনিও সাবধান!

সভাকবিকে এর পর লোহার গারদে পোরা হলো। রাজসভা অবাক্‌। রাণী তাদের রাক্ষসী। সে কি রে বাবা! তবে তো এদেশে বাস করা আর সুবিধাজনক হবে না? সবাই যে যার মীমাংসা করে নিল মনে মনে। রাজা তাদের মনোভাব বুঝতে পারলেন। তিনি তাদের ডেকে বললেন: কারণ তারা যখন যে যেদিকে পারছে ছুটে পালাতে শুরু করেছে।

তোমরা কেউ পালিও না। আমি নিজেই রাণীর বিচার করবো—তাকে আমি মেরে তোমাদের ভয় দূর করবো।

সেই দিনই রাত দুপুরে রাজা না ঘুমিয়ে কপট ঘুমের ভাণ করে

পড়ে রইলো। রাত যখন বারোটা বাজলো রাজপুরীর ঘড়িঘটকে, রাণীর চেহারা দেখতে দেখতে বিরাট এক রাক্ষসীতে পরিণত হোলো। সে চেহারা দেখে রাজা ভড়কে গেল। সারা শরীরে তার কাঁটা দিয়ে উঠলো।

রাক্ষসী-রাণী এবার চরা করতে বাইরে চললো রাজবাড়ী ছেড়ে। রাজাও চললো তার সংগে সংগে তলোয়ারখানাকে তার কোমরে গুঁজে নিয়ে। দেশের লোকের ভালোর জন্যে আজ তিনি নিজে রাণীর বিচার করবেন। আর দেরি নয়—এই বার—এখুনিই!

রাণী-রাক্ষসীকে আজ আর বেশী দূর যেতে হোল না। রাজবাড়ীর দেউড়ীতে রাজার পোষা হাতী বাঁধা ছিল। রাণী-রাক্ষসী সেই হাতীটাকেই ধরে খেতে সুরু করে দিল। রাজা অবাক! চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে রাক্ষসী হাতীটাকে খেয়ে ফেললো! এক টুকরা হাড়ও তার পড়ে রইলো না!

ওদিকে মোরগ ডাকলো। ভোর হোয়ে গেছে। রাক্ষসী রাণীতে পরিণত হতে সুরু করেছে। আধখানা তখন সবে রাণী হয়েছে—রাজা আর সবুর করলেন না—তলোয়ারখানা তার দু' টুকরা করে ফেললো রাক্ষসী-রাণীকে। আর রাণী হবার অবসর দিলেন না তিনি, রাজপুরীর ভালোর জন্যে, মংগলের জন্যে রাণীকেও ছেড়ে দিলেন না রাজা।

সভাকবিকে পরদিন সকলের সামনে নিয়ে এসে পাঁচ হাজার সোনার মোহর উপহার দেওয়া হোলো। তার জন্যেই রাজা এবং এই দেশের সব লোক রাক্ষসী-রাণীর কবল থেকে ছাড়া পেলে! রাজা তার কথায় ও কাজে খুবই খুসী হোয়েছেন!

রাজার এইরূপ সংকাজে ও সুবিবেচনায় রাজপুরীতে জয় জয়কার পড়ে গেল।

"জয় মহারাজের জয়!"

রাজা নিজেও খুব খুশী হয়েছেন। দেশের লোকেদের এই ভয়াবহ বীভৎস রাক্ষসী-রাণীর হাত থেকে বাঁচাতে পেরেছেন বলে, তিনি সদাশয় এবং সুবিচারক রাজা। দেশের লোক তাঁকেই তো চায়!

আসল রাজকুমারী

হ্যান্স ক্রিশ্চিয়ান অ্যাণ্ডারসন

এক রাজ্যের রাজকুমার তার বাবাকে বলল—বাবা, আমি আসল রাজকুমারী বিয়ে করবো।

বাবা বললেন—আচ্ছা।

রাজকুমারী হ'লেই কিন্তু হবে না। আসল রাজকুমারী চাই কিন্তু। এই বলেই রাজকুমার তার পক্ষিরাজ ঘোড়া নিয়ে বেরিয়ে পড়লো আসল রাজকুমারীর খোঁজে। এ-দেশ থেকে ও-দেশ।

রাজা বললেন—তুমি দুঃখ করো না। আমি দেশ-বিদেশে দূত পাঠাচ্ছি। তারা খুঁজে নিয়ে আসবে তোমার জন্যে আসল রাজকুমারী। কিছু ভাবনা করো না।

রাজকুমারীর দূতরা বেরিয়ে পড়লো এক একটি পক্ষিরাজ ঘোড়া নিয়ে, আসল খোঁজে। এ-দেশ থেকে ও-দেশ। আর ও-দেশ থেকে সে-দেশ।

কিন্তু তাদেরও ঠিক রাজকুমারের মতো অবস্থা হোল। রাজকুমারী তো তারা পায়। কিন্তু কে যে আসল আর কে যে নকল—তা শুধু বুঝতে পারে না। তারাও রাজপ্রাসাদে ফিরে এলো।

হঠাৎ সেদিন বিকেলে অসম্ভব ঝড়-জল হোল। মুষলধারে বৃষ্টি, কড়-কড়-কড় করে মেঘ ডাকছে, মেঘের ডাক শুনে মনে হয় যেন বাঘ ডাকছে। চারি দিক পিচের মতো কালো অন্ধকার, কিছু ঠাহর হয় না, এতো কালো।

এই জল-ঝড়ের ভেতর রাজা শুনতে পেলেন দরজায় আওয়াজ। টক্-টক্-টক্। শব্দ শুনে রাজা গেলেন দরজা খুলতে।

রাজা দরজা খুলেই দেখলেন—বাইরে দাঁড়িয়ে অপরূপ সুন্দরী এক মেয়ে। বৃষ্টিতে ভিজছে। মেয়েটি এতো ভিজেছে যে তার জামা একেবারে গায়ের সঙ্গে সেঁটে গেছে। তার সেই সাঁটা জামার ভেতর দিয়ে তার রং ফুটে বেরুচ্ছে।

রাজা জিজ্ঞেস করলেন—'কে তুমি? কি তোমার পরিচয়?'

মেয়েটি আস্তে আস্তে উত্তর দিল—'আমি সেই আসল রাজকুমারী, যাকে আপনারা খুঁজছেন।'

এর ভেতর রাণী এসে হাজির। রাণী বললে—'এসো বাছা, ঘরে এসো। তুমি একদম ভিজে গেছ। জামা দিচ্ছি। ছেড়ে নাও।'

মেয়েটি পা টিপে টিপে ঘরে ঢুকলো। তারপর জামা ছাড়তে পাশের ঘরে গেল।

এদিকে রাণী শোবার ঘরে গিয়ে একটা পালঙ্কে ছোট ছোট তিনটে মটরদানা বিছানার গদির তলায় রেখে দিলেন। তারপর চাপা দিলেন গদির ওপর গদি। কুড়িটি গদি। গদিগুলো কিন্তু আমাদের মতো শিমূল তুলোর গদি নয়। পালঙ্কের গদি। একটা দুটো নয়। কু—ড়ি—টি। এসব কাজ কিন্তু রাণী নিঃশব্দে করলেন। কে-উ জানে না। জানেন শুধু রাণী।

মেয়েটি খেয়ে দেয়ে রাতে শুতে এলো সেই বিছানায়। কুড়িটি গদি দেওয়া পালঙ্কের বিছানায়। রাণী তাকে শুভরাত্রি জানিয়ে বিদায় নিলেন। মেয়েটি সেই পালঙ্কে শুয়ে আছে।

তার পরদিন কাক ডাকলো। ভোর হোল। রাণী এলেন। সুপ্রভাত জানিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—'বাছা, রাতে ঘুম হয়েছে তো?' মেয়েটি বলল—'না মোটেই নয়। সারাটা রাত যে কি ভাবে কাটিয়েছি তা' শুধু ভগবানই জানেন! সারাটা রাতই চোখের দু'টো পাতা পর্য্যন্ত এক করতে পারি নি।'

রাণী বললেন—'কেন, কি হয়েছিল?'

মেয়েটি বললে—'কি জানি, কি হয়েছিল!' বিছানায় শুতে না শুতেই সারাটা গায়ে কি যেন সুঁচের মত বিঁধছিল। দেখুন না, কেমন কালসিটে পড়ে গেছে।' রাণী শুধু বললেন—'হুঁ।' আর মনে মনে বললেন—এই হচ্ছে আসল রাজকুমারী; যার এতো সূক্ষ্ম অনুভূতি; একটা নয়, দু'টো নয়। কু—ড়ি—টি পালঙ্কের গদির ভেতর থেকে ছোট ছোট তি—ন—টে মটরদানার অস্তিত্ব উপলব্ধি করতে পারে; সে কি কখনোও আসল রাজকুমারী না হয়ে পারে?

রাণী রাজাকে বললেন সব কথা। ঠিক হোল বিয়ে। তারপর বাদ্যি বাজলো। কাড়া বাজলো।

বিয়ে হ'য়ে গেল রাজকুমারের সঙ্গে সে—ই মেয়েটির।

এখনও বোধ হয় সেই তিনটে মটরদানা কৌতূহলের দেরাজে বন্দী হয়ে আছে, যদি না হারিয়ে গিয়ে থাকে। আচ্ছা, তোমাদের কি মনে হয় বল তো? মেয়েটি আসল না নকল?

অনুবাদক—দেবাশীষ চট্টোপাধ্যায়।

'লাইফবয় সাবান
দিয়ে এইবার চান্ করতে হবে'
- এটি সেই ঝরঝরে
তাজা ভাব এনে দেয়!
LIFEBUOY
SOAP
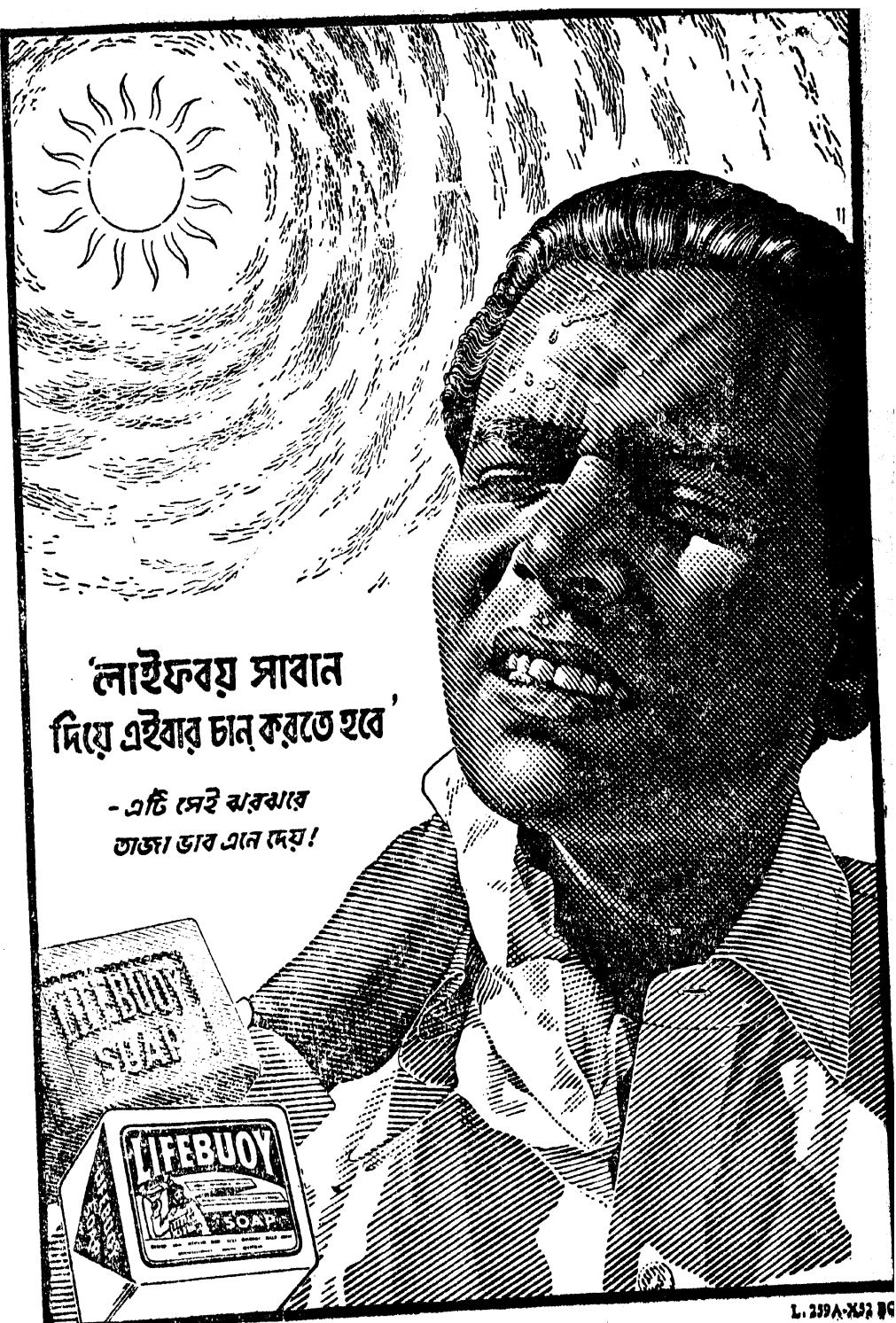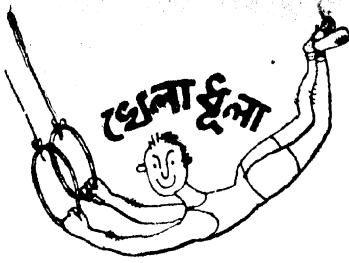
গতবারের এশিয়ান গেমসের পূর্ণ ফলাফল দেওয়া সম্ভব হয়নি। সে ঘাটতি এবারে পূরণ করে দিয়ে অন্যান্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করব।

গতবার এশিয়ান গেমসের দৌড় পর্ব্বটুকুর সংবাদ ছিল।

উঁচু লাফ—উঁচুলাফে সিংহলের এন, এথীরবীরসিংহম পূর্ব্ব রেকর্ডকে ভঙ্গ করে এবারে স্বর্ণপদকের অধিকারী হয়েছেন। এন এথীরবীরসিংহম (সিংহল) উচ্চতা ৬-৭$\frac{3}{8}$ ইঞ্চি। এ বিষয়ে ভারতের এশিয়ান গেমসের রেকর্ডের অধিকারী অজিত সিং টোকিও থেকে শূন্য হাতে ফিরে এসেছেন।

দীর্ঘ লাফ—কোরিয়ার তরুণ এ্যাথলীট সু ইয়ং জু নতুন রেকর্ড করে প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। সু ইয়ং জু—২৪ ফুট ১০ ইঞ্চি।

হপ ষ্টেপ জাম্প—এবারে নতুন রেকর্ডের অধিকারী হয়েছেন ভারতের মহীন্দর সিং। এ বিষয়ে উল্লেখ করা যেতে পারে, মহীন্দর সিং মেলবোর্ণ অলিম্পিকে পঞ্চম স্থান অধিকার করেছিলেন। মহীন্দর সিং, ৫১ ফু ২$\frac{3}{4}$ ইঞ্চি।

পোল ভল্ট—পর পর তিন বার এশিয়ান গেমসের পোল ভল্টের স্বর্ণপদক জাপানের কাছ থেকে কেউ ছিনিয়ে নিতে পারে নি। এবারে নতুন রেকর্ড করেন জাপানের নোরিয়াকু থাসুদা। ১৩ ফু: ১$\frac{1}{2}$ ইঞ্চি।

বর্শা নিক্ষেপ—পর পর দুবার পাকিস্থানের মহম্মদ নওয়াজ বর্শা ছোড়ায় স্বর্ণপদক লাভ করেছেন। তিনি তাঁর আগের রেকর্ড অপেক্ষা ১৭ ফুট উন্নত করেছেন। মহম্মদ নওয়াজ (পাকিস্থান) ২২৭ ফু ৮$\frac{1}{2}$ ইঞ্চি।

ডিসকাস নিক্ষেপ—ডিসকাস নিক্ষেপে অনেকেই আশা করেছিলেন, ভারতের পরদুমন সিং-এর উপর। কিন্তু ভারতের অন্যতম প্রতিনিধি বলাকার সিং পরদুমন সিং-এর এশিয়ান রেকর্ড ভেঙ্গে স্বর্ণপদক লাভ করেছেন। পরদুমন সিং তৃতীয় স্থান লাভ করেছেন। বলাকার সিং—১৫৬ ফু: ৪$\frac{1}{2}$ ইঞ্চি।

লোহার বল নিক্ষেপ—লোহার বল ছোড়ায় ভারতের পরদুমন সিং স্বর্ণপদক লাভ করেছেন। এবারের প্রতিযোগিতায় তিনি যতদূর বল ছুড়েছেন ইতিপূর্ব্বে আর এতখানি কখনও ছোড়েননি। পরদুমন সিং (ভারত) ৪৯ ফু: ৪ ইঞ্চি (নতুন এশিয়ান রেকর্ড)।

হাতুড়ী ছোড়া—পাকিস্থানের মহম্মদ ইকবাল হাতুড়ী ছোড়ায় এশিয়ান রেকর্ড ভঙ্গ করেছেন। মহম্মদ ইকবাল (পাকিস্থান) ২০০ ফুট $\frac{1}{2}$ ইঞ্চি।

ম্যারাথন দৌড়—ম্যারাথন দৌড়ে স্বর্ণপদক লাভ করেছেন কোরিয়ার লী চ্যাং হুন। ইনি এশিয়ান গেমসের রেকর্ডের অধিকারী ছোটা সিং-এর রেকর্ড ভঙ্গ করেছেন। ম্যারাথন দৌড়ে অনেকেই আশা করেছিলেন গুলজারা সিং-এর উপর। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ গুলজারা পথিমধ্যে পড়ে যাওয়ায় ওঠার সময় পুলিশ তাহাকে সাহায্য করে। সেইজন্য প্রতিযোগিতা থেকে তাকে নাকচ করে দেওয়া হয়েছে।

ডেকাথলন—সর্ব্ববিষয়ে সমান কৃতিসম্পন্ন এ্যাথলীট হিসাবে ডেকাথলন বিজয়ী হওয়া সত্যই বিশেষ সম্মানজনক। এবারকার প্রতিযোগিতায় এ সম্মান লাভ করেছেন জাপানের কৃতী এ্যাথলীট ইয়াং ৭১০১ পয়েণ্ট লাভ করে।

মহিলাদের এ্যাথলেটিক

মহিলাদের এ্যাথলেটিকসে ভারত কোন স্বর্ণপদক পায়নি। ১০০ মিটার দৌড়ে ভি সুজা রৌপ্যপদক ও ৪০০ মিটার রিলে দৌড়ে ভারতীয় দল ব্রোঞ্জপদক ও বর্শাছোড়ায় এলিজাবেথ ডেভেনপোর্ট রৌপ্যপদক লাভ করেছেন।

১০০ মিটার—এবারকার ১০০ মিটার দৌড়ে ফিলিপাইনের ইনোসেনসিয়া মোস্কিস স্বর্ণপদক লাভ করেছেন। সময় ১২.৫ সে: ২০০ মিটার দৌড়ে জাপানের যুকো কোবায়াসি (জাপান) স্বর্ণপদক লাভ করেছেন। সময় ২৫-১ সে: (নতুন রেকর্ড) তবে এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য ভারতের ষ্টিপি ডি: সুজা হিটে পূর্ব্ব রেকর্ড ২৪ সে: ভঙ্গ করে ২৫-৮ সে: দূরত্ব অতিক্রম করেন।

৮০ মিটার—৮০ মিটার হার্ডলে জাপানের মিচকি ইয়ামাটো ছাড়া আর কেউ বিজয়িনী হবার গৌরব অর্জ্জন করেননি। সময় ১১.৬ সে:।

৪ × ১০০ মিটার রিলে রেসে স্বর্ণপদকের অধিকারিণী হয়েছেন জাপানের মহিলারা ৪৮-৬ সে:।

উঁচু লাফ—জাপানের প্রতিযোগিনী এমিকো কামিয়া ১.৫৮ লাফিয়ে স্বর্ণপদকের অধিকারিণী হয়েছেন।

দীর্ঘ লাফ—ফিলিপাইনের ডি ভোদানা স্বর্ণপদক লাভ করেছেন।

বর্শা নিক্ষেপ—বর্শা নিক্ষেপে জাপানের মেয়ে স্বর্ণপদক লাভ করেছেন ৪৭.১৫ মিটার নিক্ষেপ করে। ইনি হচ্ছেন,—সিদাঃ ডিসকাস নিক্ষেপে হিরাকো উসিদা (জাপান)—দূরত্ব ১৩৭ ফুট ৫$\frac{1}{2}$ ইঞ্চি। লোহার বল নিক্ষেপে সেইকো ও বোনাই (জাপান) দূরত্ব ১৩.২৬ মিটার।

মহিলা এ্যাথেলেটিকসে জাপানের মেয়েদের জয়-জয়কার। ডিসকাস ছোড়া ও দীর্ঘ লাফ ছাড়া মহিলাদের এ্যাথেলেটিকসের সর্ব্ব বিষয়ে নতুন রেকর্ড সৃষ্টি হয়েছে।

সাঁতার, ডাইভিং ও ওয়াটার পোলো খেলায় জাপানের নিরঙ্কুশ প্রাধান্য। কেবল মাত্র ৪ × ১০০ মিটার রিলে রেসে মহিলা বিভাগের স্বর্ণপদকটি ফিলিপাইন দল ছিনিয়ে নিয়েছে। এ বিষয়ে জাপানই প্রথম হয়েছিল কিন্তু চেঞ্জ ওভারের সময় আইন ঘটিত ত্রুটি থাকায় জাপানকে প্রতিযোগিতা থেকে বাদ দেওয়ায় ফিলিপাইন স্বর্ণ পদক লাভ করেছে। জাপান সাঁতারে ২৫টি স্বর্ণপদক লাভ করেছে। সাঁতারের ২৬টি বিষয়ের মধ্যে ১৭টি বিষয়ে নতুন রেকর্ড স্থাপন হয়েছে। স্প্রিং বোর্ড ডাইভিং-এ মেয়েদের মধ্যে জাপানের কে সুখানি ও ছেলেদের মধ্যে জুতাকো বাবা স্বর্ণপদক লাভ করেছেন।

টেনিস—এবারই সর্ব্বপ্রথম টেনিস খেলা এশিয়ান গেমসে

অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কিন্তু ভারত থেকে টেনিসে কোন প্রতিনিধি পাঠান হয়নি। ফিলিপাইনের ডেভিস-কাপ খেলোয়াড় রেমণ্ড ভেরো স্বর্ণপদক লাভ করেছেন।

সিঙ্গলস ফাইন্যাল—রেমণ্ড ভেরো (ফিলিপাইন) ৬—৪, ১—৭, ৪—৬ ও ৭—৫ গেমে ফেলিসিসমো এ্যামোনজ (ফিলিপাইন) পরাজিত করেছেন।

ডাবলস ফাইন্যাল—রেমণ্ড ভেরো ও এফ এ্যম্পন (ফিলিপাইন) ৬—১, ৪—৬ ও ৭—৫ সেটে জুয়ান জোসে ও মিগেল ডাঙ্গোকে (ফিলিপাইন) পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিঙ্গলস—সাইবিকা কামো (জাপান) ৬—১ ও ৬—২ গেমে ডি এ্যামানকে (ফিলিপাইন) পরাজিত করেন।

মহিলাদের ডাবলস—সাইবিকা কামো ও রেইকো মিয়াগী (জাপান) ৬—২, ৬—২ গেমে ডি এ্যাম্পন ও প্যাট্রিসিয়া ইয়াগেয়োকে (ফিলিপাইন) পরাজিত করেন।

মিক্সড ডাবলস—এম শিবাটা ও রেইকো মিয়াগী (জাপান) ৩—৬, ৭—৫ ও ৬-৪ গেমে এম ডাঙ্গো ও প্যাট্রিয়া ইয়াগোয়োকে (ফিলিপাইন) পরাজিত করেন।

টেবিল টেনিস—টেনিসের মত টেবিল টেনিসও এবারকার এশিয়ান গেমসে সর্বপ্রথম অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বিশ্ব টেবিল টেনিসের প্রাধান্যকারী জাপানের খেলোয়াড়দের পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে।

পুরুষদের সিঙ্গলস—লী পে চীন (চীন) ২১-১৪, ২১-১৮ ও ২১-১৮ পয়েন্টে কিমুকি মনোদাকে (জাপান) পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিঙ্গলস—তায়াকো নাম্বা (জাপান) ২১-১৬, ২১-১২ ও ২১-১৭ পয়েন্টে কাজুকো ইয়মায়জলিকে (জাপান) পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস—ম্যায় ভ্যান হয়া ও তান কানা ডুকো (ইন্দোনেশিয়া) ১১-২৩, ২১-১৭, ২১-১৯ ও ২১-১৬ পয়েন্টে লী কোন তিন ও মো ইং চেনকে (চীন) পরাজিত করেন।

মহিলাদের ডাবলস—যুজি ইগুনি ও কাজুকো ইয়ামাইজুমি (জাপান) ২১-১৩, ২১-১২ ও ২১-৮ পয়েন্টে বাগুইও ওং এবং কুনকে (হংকং) পরাজিত করেন।

মিক্সড ডাবলস—ইচিরো ওগিমুরা ও ফুজি ইচুগুি (জাপান) ২১-১৪, ১৪-২১, ২১-১২, ১৩-২১ ও ২৪-২২ পয়েন্টে তোশিয়াকী তানাকা ও কাজুকো ইয়ামাইজুমিকে (জাপান) পরাজিত করেন।

বাস্কেট বলে ফিলিপাইনের একাধিপত্য। এশিয়ান গেমসে পর পর তিন বারই ফিলিপাইন স্বর্ণপদক লাভ করল। ফিলিপাইনের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া কোন দেশের পক্ষে সম্ভব হোল না। বাস্কেট বলে ফিলিপাইন প্রথম চীন দ্বিতীয় ও জাপান তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে। লীগ প্রথায় এ খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

ভারোত্তোলনের ২২টি বিষয়ে নতুন এশিয়ান রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ বিষয়ে ইরাণের প্রতিযোগীরা বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

মুষ্টিযুদ্ধের ১৩টি স্বর্ণপদকের মধ্যে জাপান ছুটি, কোরিয়া ছুটি এবং বর্মা ও চীন একটি করে স্বর্ণপদক লাভ করেছে। মুষ্টিযুদ্ধে ভারতের তিন জন প্রতিনিধি ছিল। তার মধ্যে লাইট-ওয়েটে সুন্দর রাও লাভ করেছেন ব্রোঞ্জপদক ও মিডল ওয়েটে হরি সিং রৌপ্যপদক লাভ করেছেন। হরি সিং সম্বন্ধে বিচারকের সিদ্ধান্তে কিছু গোলমাল হয়েছিল। মুষ্টিযুদ্ধ-বিশারদদের মতে হরি সিংএর স্বর্ণপদক পাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু বিচারকের পক্ষপাতিত্বে হরি সিং স্বর্ণপদকের পরিবর্তে রৌপ্যপদক লাভ করলেন।

ব্যাডমিণ্টন

ব্যাডমিণ্টনে মালয়ের আধিপত্যের অবসান হয়েছে। ইন্দোনেশিয়া ব্যাডমিণ্টনের নতুন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান।

সম্প্রতি সিঙ্গাপুরে টমাস কাপের চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডের খেলায় ন'বছরের বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ান মালয়কে ৬—৩ খেলায় পরাজিত করে ইন্দোনেশিয়া এ গৌরব অর্জ্জন করল।

'টমাস কাপ' ১৯৪৮ সালে ব্যাডমিণ্টন খেলার বিশ্ববিজয়ীর পুরস্কার হিসাবে ঘোষণা করার পর থেকেই এত দিন মালয়ের ঘরে ছিল। এবার সে সম্মান ইন্দোনেশিয়া ছিনিয়ে নিল। টমাস কাপের খেলা এবং টেনিসে ডেভিস কাপের খেলার প্রথা একই ভাবে পরিচালিত। আগামী বারের খেলায় ইন্দোনেশিয়াকে একমাত্র ফাইন্যাল ছাড়া আর কোন খেলায় অংশ গ্রহণ করতে হবে না। আঞ্চলিক প্রথায় খেলার পর যে দেশ বিজয়ী হয় সেই দেশকে টমাস কাপ উদ্ধার করার জন্য আগের বারের বিজয়ীর সংগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয়।

চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডের খেলার ফলাফল

সিঙ্গলস—ফেরি সোনভিল (ইন্দোনেশিয়া) ১৫—১১ ও ১৭—৪ পয়েন্টে এ ডি চুংকে (মালয়) পরাজিত করেন। তান জো হক (ইন্দোনেশিয়া) ১৮-১৫ ও ১৫-৪ পয়েন্টে তে-কিউ-সানকে (মালয়) পরাজিত করেন। ফেরি সোনভিল (ইন্দোনেশিয়া) ১৩ ১৫, ১৫-১৩ ও ১৮-১৭ পয়েন্টে তে কিউ সানকে (মালয়) পরাজিত করেন। তান জো হক (ইন্দোনেশিয়া) ১৫-১১ ও ১৫-৬ পয়েন্টে এ ডি চুংকে (মালয়) পরাজিত করেন। এ ডি ইউসুফ (ইন্দোনেশিয়া) ৬-১৫, ১৫-১০ ও ১৫-৮ পয়েন্টে আবদুল্লা পিরুজকে (মালয়) পরাজিত করেন।

ডাবলস—তনি কিং গোয়ান ও গু কিম বী (ইন্দোনেশিয়া) ১৫-৭ ও ১৫-৫ পয়েন্টে জনি হে ও লিম সে হুপকে (মালয়) পরাজিত করেন। এ ডি চুং ও ওই টেক হক (মালয়) ১৮-১৫ ও ১৫-৫ পয়েন্টে ফেরি সোনেভিল ও তান জো হককে (ইন্দোনেশিয়া) পরাজিত করেন। এ, ডি, চুং ও ওই টেক হক (মালয়) ১৬-১৫ ১৫-৯ ও ১৫-১০ পয়েন্টে গু কিন বী ও তান কিং গোয়ানকে (ইন্দোনেশিয়া) পরাজিত করেন। জনি হে ও লিম সে তুপ (মালয়) ১৫-১ ও ১৫-১ পয়েন্টে ফেরি সোনেভিল ও তান জো হককে (ইন্দোনেশিয়া) পরাজিত করেন।

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

সুলেখা দাশগুপ্তা

মৌরী চোখ বন্ধ করে দেয়ালের দিকে পাশ ফিরে শুয়ে রইলো। মঞ্জু বেরিয়ে এলো ঘর থেকে। কে কোথায় খোঁজ করে দেখা যাক। নীচের গেটে নামানো জিনিষপত্র—বাঁশ-সামীয়ানা-চেয়ার ইত্যাদি ফের তোলা হচ্ছে লরীতে। কুলীরা ভারবাহী। নামাতে বললে নামায়। তুলতে বললে তোলে। তবু বোঝা তুলতে তুলতে তারা বিস্মিত দৃষ্টিতে এক একবার তাকাচ্ছিল ওপর দিকে। পেন্সিল হাতে কর্মচারী গোছের লোকটি তার পাশে দাঁড়িয়ে বিড়ি টেনে চলা লোকটিকে—বোধ হয় লরীর ড্রাইভার হবে—যেন বিজ্ঞের মতো বলে চলেছিল কত কি। হয়তো এ তো বাঁধাই হয়নি। বাঁধাছাঁদা—ডেকোরেশন শেষ করার পরও যে কত বিয়ে হয় না—সব ভেঙ্গে ফেলতে হয়—হয়তো এমনি বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথাই শোনাচ্ছিল। বাড়ীর আশ-পাশের বারান্দা বা জানালাও একেবারে খালি ছিল না। এদিক-সেদিক কৌতূহলী মুখ ছিল। ওকে দেখে চোখের দৃষ্টিটাকে কেউ দিল অন্যমনস্ক করে। কেউ ঝুঁকে এমন ভাব করলো যেন, কাউকে ডাকছে বা খুঁজছে। কেউ গিয়ে ঢুকল ভেতরে। ইউরোপীয়ান মহিলাটি নিদারুণ শব্দ তুলে কাঁটা দিয়ে ডিম ফেটতে ফেটতে গিয়ে ঢুকল রান্নাঘরে। মঞ্জুও কারুর দিকে চোখ পড়তে না দিয়ে, পার হয়ে গেল বারান্দা। বারান্দার শেষ মাথায় নীচের দিকে তাকিয়ে শুকনো মুখে দাঁড়িয়েছিল রামু। ওকে দেখে মঞ্জু বলে উঠল—তুই এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছিস আর মাছ-তরকারী সব খেয়ে এলো তো বেড়াল।

—থাক্ গে।

—থাক্ গে! খাবো কি আমরা?

—কে খাবে আজ?

—উপোস থাকবো আমরা?

—ডাল তো আছে। তার পর করুণ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলো সে—দিদিমণির বিয়ে সত্যি ভেঙ্গে গেল?

ছোট পিসী যদি অমন মারা যাওয়ার কথা লিখবার কথা বলে না যেতেন, তবে মঞ্জু নিশ্চয়ই বলত—'হবে।' কিন্তু এখন আর সে আশা রাখা চলে না। বললো—দেখা যাক। কিন্তু শুধু ডাল-ভাত খাওয়া চলবে না রামু! আলু, কুমড়ো যা হোক কিছু ভাজাভুজি কর গিয়ে। মন খারাপ করিসনে। তোর কাজকর্ম আদ্দির পাঞ্জাবী আর পাজামা পরার ব্যবস্থা আমি করে দেবো—যা।

—আমি চাই না ওসব পরতে। বলে রামু চলে গেল। মঞ্জু উঁকি দিল বসবার ঘরে। কেউ নেই। গেল কোথায় সব! ছোট পিসী কি তার তোড়ে ভাসিয়ে নিয়ে বেরিয়ে গেছেন নাকি সবাইকে!

অমিতাকে পাওয়া গেল তার ঘরে। দুটো জলে-ভেজা ফুলো ফুলো চোখ নিয়ে চুপ করে বসেছিল গালে হাত দিয়ে। ইস্! কেঁদে কেঁদে চোখ-মুখ ফুলিয়ে বসে আছ!

দুটো কাঁপা-কাঁপা ঠোঁটে ভাঙ্গা গলায় অমিতা বললো—থামলে কেন? এর পর তোমার দাদার মতো বলো, তোমার বিয়ে তো ভাঙ্গেনি।

মাথা নাড়ল মঞ্জু—না, তেমন কথা আমি কখনই বলব না। তোমার না ভাঙুক তোমার ননদের ভেঙ্গেছে। তুমি অবশ্যই কাঁদতে পারো।

অমিতা ফের ভিজে-ওঠা চোখ দুটো আঁচল দিয়ে মুছে নিয়ে বললে—আমার এতো খারাপ লাগছে—একটু থামল সে। তারপর বললো, একটু সম্ভাবনার আশা যে মনে রাখবো, ছোট পিসী তা-ও হতে দিলেন না। মারা যাবার কথা লিখবার কি দরকার ছিল? জানো, বাবাও ও-কথাটায় আপত্তি জানাতে গিয়েছিলেন। কিন্তু ভগিনীর উগ্রমূর্তির দিকে তাকিয়ে তাঁর মুখের কথা মুখেই রয়ে গেল। ছোট পিসীর নিজের মুখ স্বামীর কাছে এবং স্বামীর মুখ সুদর্শনের বাবার কাছে যাতে রক্ষা হয় ছোট পিসী এখন নিজেই তা দেখবে এবং করবে এই তার কথা। বড়কে ঘর থেকে ডেকে নিয়ে গেছেন, আর্জেন্ট টেলিগ্রাম করতে হবে। ছোটকে নিয়ে গেছেন, সবাই মিলে বসে আজই সব জায়গায় চিঠি ছাড়তে হবে, অনিবার্য কারণে বিয়ে স্থগিত রইল বলে। জানো, ছোট ছেলের হাতের মিষ্টি রাস্তায় পড়ে গেলে সে যেমন জায়গাটা ছেড়ে যেতে যেতে কেবলি পেছন ফিরে তাকায়—বাবা ঠিক তেমনি ভাবে যেতে যেতে কেবল তোমাদের ঘরের দিকে তাকাচ্ছিলেন। আমার এমন কষ্ট হচ্ছিল তাঁর দিকে চেয়ে। আবার চোখে জলের আভাস দেখা দিল অমিতার। যাই বলো, মৌরী এ কাজটা একটু ভালো করল না—একটুও না। একদিন ও নিজেই বুঝবে কিন্তু লাভ কি তাতে?

মঞ্জু বললো—যাই বলো, এবার কিন্তু ছোট পিসীর একটা ধন্যবাদ প্রাপ্য আমাদের কাছে। মাথায় একটা পর্বত-প্রমাণ বোঝা বোধ করছিলাম—কেবল ভাবছিলাম, কি করে কি করি। সব দায়িত্ব যে ছোট পিসী নিলেন সে কি কম বাঁচা? সত্যি মঞ্জু অসম্ভব হাল্কা বোধ করতে লাগলো। যাক্, এ নিয়ে আর ভাবতে হবে না।

ভাবতে হলোও না। নামানো মাল তোলা হলো, রওনা হওয়া মাল পথ থেকে ফেরত গেল। আত্মীয়-স্বজন বন্ধু পড়শীরা সবাই ঠিক সময়ে চিঠি পেলো, বিয়ের দিন পিছিয়ে যাওয়ার। এখন আত্মীয় মহলে এই থাক। তারপর বলা যাবে এ বিয়ে ভেঙ্গে গেছে লক্ষ্ণৌ থেকে সুদর্শনের বাবার টেলিগ্রাম পর্যন্ত হাতে এসে গেল সংবাদ শুনে মর্মাহত হবার। আর কি,—গয়নাপত্র শাড়ী-কাপড় তাও তিনি শীগগিরই ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন তাঁর মাসশাশুড়ীর মেয়ের বিয়ের জন্য কিনে নিয়ে। হাঁ—কপালের ঘাম মুছতে পারে ছোট পিসী—নিশ্চয়ই পারেন আত্মপ্রসাদ বোধ করতে। অসুস্থ লিখলে আবার সুস্থ হবার প্রশ্ন আসতো না। তারপর তিনি মেয়েমানুষ

...নি কি সুদর্শনের মনোভাবটা কিছু বুঝতে পারেন না? সে ...সে উপস্থিত হতো না—। তারপর মানমর্যাদা কিছু অবশিষ্ট ...াকত কি?

৬

সুদর্শনের বাবার মর্মাহত হবার সংবাদ নিয়ে তাঁর আর্জেন্ট টেলিগ্রামখানা সাদাটে মুখে টেবিলের উপর পড়ে ছিল। অমিতাই হয়তো ওটা রেখে গিয়েছিল ওদের ঘরে। মঞ্জু সেটা খুলে আর একবার মনোযোগ দিয়ে পড়ল; তারপর ফের সেটাকে কাগজচাপা দিয়ে চেপে রাখতে বললো—ছোট পিসীর বুদ্ধিটা খেটে গেছে—আর যাবেই বা না কেন? এই খবর মিথ্যা হতে পারে এ কল্পনা করাও অসম্ভব। ড্রেসিং টেবিল থেকে মাথার তেলের শিশিটা তুলে নিয়ে চুলের গোড়ায় আঙুল চালিয়ে তেল দিতে দিতে ঘরের এদিক ওদিক হাঁটতে হাঁটতে মঞ্জু বললো—ইস্, আমি যদি মুহূর্তের জন্যও একবার দিব্যদৃষ্টি লাভ করতাম!

—তবে কি হতো? অমিতার সেলাই-এর কাজটায় ফুল তুলছিল মৌরী। দাঁতে সুতো কাটতে কাটতে জিজ্ঞাসা করলো।

—সুদর্শন বাবু কি করছেন একবার দেখতাম। জীবনে এমন প্রচণ্ড ভাবে কাউকে একটি বার দেখে আসবার বাসনা আর কোন দিন জাগবে কি না জানিনে। আলোর দিকে মুখ করে মৌরী ছুঁচে সুতো পরাচ্ছিল—তেলহাতেই ওর চিবুকটা নিজের দিকে টেনে ধরে মঞ্জু বললো—আচ্ছা, সত্যি করে বল, তোর ইচ্ছে করছে না?

মঞ্জুর হাতটা সরিয়ে দিয়ে আঁচলে মুখের তেলটা মুছতে মুছতে মৌরী বললো—কলেজে যাওয়া বন্ধ করে বাড়ীময় ঘুর-ঘুর করছিস আর কেবল কথা বলছিস? এতো কথা বলতেও পারিস? তোর কথা শুনতে শুনতে আমার মনে হয় আমিই যেন কত বলছি।

—ঘরে ঘরে সব গুম্ হয়ে বসে আছে; কি করবো শুনি? আমি ওভাবে থাকতে পারিনে। থাকাটাও দেখতে পারিনে। কিন্তু আমার কথা শুনে তোর মনে হয়, কত কথা যেন তুই-ই বলছিস আর ক্লান্ত লাগে—তাই না?

—হাঁ। ফের সেলাইটা তুলে নিল মৌরী হাতে।

—কাউকে বেশী খেতে দেখলে তোর মনে হয়, তোর খাওয়া হয়ে গেল। কাউকে বেশী কথা বলতে শুনলে, মনে হয় তুই-ই কথা বলেছিস—ক্লান্তি বোধ করিস। চার দিকে দেখে তোর বিয়েতে অরুচি এসে গেছে। দুদিন বাদে বলবি যা দেখছি চাইনে বাবা, ছেলেমেয়ে হওয়াও জীবনের সব স্বাদে যদি তোর এই ভাবে বিতৃষ্ণা এসে যায়—তবে উপায়টা কি তোকে নিয়ে? অমিতাকে বারান্দা দিয়ে যেতে দেখে এগিয়ে গেল মঞ্জু দরজার দিকে—বৌদি, তোমাকে বললাম না স্নান করে তৈরী হয়ে নিতে? একটু তোমার মার ওখানে যাবো। বেচারী মিত্রা নিশ্চয়ই ভাবছে ওদের ভালো সী'র বিয়ে বুঝি হয়েই গেল ওদের বাদ দিয়ে।—সন্ধ্যার সময়? বেশ তাই যাওয়া যাবে। স্নান সেরে ভিজে চুল চেয়ারের উল্টো পিঠে ছড়িয়ে দিয়ে ফের এসে বসল মঞ্জু মৌরীর মুখোমুখী। তুই সুদর্শন বাবুর উপর দস্তুর মতো অবিচার করলি দিদি! আচ্ছা, দেনাপাওনার জীবানন্দ চরিত্রটি তো তোর কাছে আকর্ষণীয় চরিত্র?

সেলাই এর দিকে দৃষ্টি রেখেই জবাব দিল মৌরী—হাঁ।

—কিন্তু কেন? যার চরিত্র বলতে কিছু নেই। যার মুহূর্ত কাটে না মদ আর মেয়েমানুষ ছাড়া। গৃহস্থ-বধূর সম্ভ্রম নষ্ট করাটা যার কাছে কিছুই নয়—যে মুখ বিকৃতি করে বলে, ভালো না লাগলে মেয়েদের আমি চাকর-দারোয়ানকে দিয়ে দি—যার ভেতর কোন মনুষ্যত্ব নেই—

সেলাই থেকে মুখ তুলল মৌরী—গোটা বইটায় যতগুলো চরিত্র আছে তার ভেতর সত্যিকারের মানুষ কে?

নীরবে মঞ্জু তাকিয়ে রইল মৌরীর দিকে।

মৌরী হাতের সেলাইটা পাশে রেখে দিয়ে বললো—গোটা বইটার নিষ্ঠাবান চরিত্রবান লোকগুলোর মনুষ্যত্ব যোগ করলেও কি ঐ চরিত্রহীন লোকটির মনুষ্যত্বের সঙ্গে তুলনা হয়, না পাশে এসে তারা দাঁড়াতে পারে?

অবাক কণ্ঠে মঞ্জু বললো—গৃহস্থ-বধূদের করুণ কান্না পর্যন্ত যার হৃদয় স্পর্শ করত না—

—পশু বলি হওয়ার সময় যে কান্না কাঁদে, সে কান্না কি আমাদের হৃদয় স্পর্শ করে? এ-ও ঠিক সেই জাতীয়। কিছু মানুষ আছে, যারা মনুষ্যত্ব নিয়ে না দাঁড়ানো পর্যন্ত সবাইকে মানুষ বলে গণ্য করে না। যে মেয়ের রুখে দাঁড়ানোর ভেতর সত্যিকারের মানুষের দেখা মিলল, সেখানেই থমকালো সে—থামলো সে। তারপর থেকে একটি মেয়ের মনুষ্যত্বের প্রতি যে স্বীকৃতি যে সম্মান যে শ্রদ্ধা সে দিয়ে গেল, তা দিতে পারার মতো শক্তি ক'জনার আছে?

—জীবনের প্রৌঢ়ত্বে এসে সেই মেয়েটির দেখা না মিললে, সমস্ত জীবনেও হয়তো তার এই মনুষ্যত্বের দেখা মিলত না।

—তা হলে লেখকও তাকে নায়ক করে গল্প লিখতে বসতেন না। যেদিন তার মনুষ্যত্বের দেখা মিলল গল্পের সুরুও সেদিন থেকেই হলো—তার আগে নয়।

—বেশ, মনুষ্যত্বটাই যদি মনুষ্য-চরিত্রের সব চাইতে মূল্যবান কথা হয়—তুই তো সুদর্শন বাবুর সেটা না থাকার কোন পরিচয় পাসনি?

—বিশ্বকর্মা নাকি তাঁর বাঁ পা ঝাড়া দিয়েই বেশীর ভাগ মানুষ সৃষ্টি করেন। কিন্তু মানুষ যখন সাহিত্য সৃষ্টি করতে বসে তখন

সৃষ্টি করে তার সমস্ত অন্তর দিয়ে। তাই মানুষের সৃষ্টির কাছে বিশ্বকর্মার বেশীর ভাগ সময়েই হার হয়, সাহিত্যিকের সৃষ্ট চরিত্রের কাছে বিশ্বকর্মার সৃষ্ট চরিত্র দাঁড়াতে পারে না। তাই জীবানন্দের মতো চরিত্রহীনের অন্ত নেই, কিন্তু তার মতো মনুষ্যত্ব খুঁজে পাওয়া কঠিন।

পরের দিন সকালবেলা খবরের কাগজ পড়া শেষ করে আড়-মোড়া ভেঙ্গে উঠে দাঁড়ালো মঞ্জু। বললো—তুই তো চন্দ্রসূর্যের মুখ দেখা বন্ধ করেছিস বলব না, কারণ সন্ধ্যা থেকে রাত পর্যন্ত ছাদে চাঁদই তোর সঙ্গী। কিন্তু সূর্যি ঠাকুরের সঙ্গে তো একেবারে আড়ি দিয়েই বসে আছিস। দিব্য ঝকঝকে চকচকে একটি রোদ উঠেছে। একটু বেরিয়ে পড়ি আমি।

—তোর বেরুনো ঠেকে কিসে? রোদ উঠলে দিব্য রোদ উঠেছে! মেঘ করলে—উঃ কি অপূর্ব মেঘ করেছে! বৃষ্টি নামলে তো কথাই নেই—আঃ ভিজতে কি আরাম। তা কোথায় বেরুবি—কলেজে?

মঞ্জু ততক্ষণে কাপড়ের আলমারীর দু'পাট খুলে দাঁড়িয়ে শাড়ী দেখতে দেখতে বলছে—লাল চলবে না। সবুজ চলবে না। বেগুনী—উঁহু। মেরুন ত অসম্ভব—অসম্ভব। নীল—বলেই থেমে হেসে ফেলে বললো, বলতেই কেমন মানুষটাকে মনে পড়ে গেল! গায়ের রংটা কি অসুবিধায়ই না ফেলেছে! খুসীমত টেনে খুলে শাড়ী-জামা পরবো তার পর্য্যন্ত উপায় নেই। সাদার উপর হলুদ-লাল-সবুজ রং ছিটানো মতো একটা হাওয়াই জর্জেটের শাড়ী খুলে পরতে পরতে বললো—তুই ঠিকই বলেছিস দিদি—বিশ্বকর্মার চাইতে সাহিত্যিক অনেক বেশী দরদী। তারা নায়িকাদের রং রূপ দিতে কৃপণতা করেন না। পদ্মফুলের মতো রং, গোলাপের পাবড়ির মতো ঠোঁট, চাঁপার কলির মতো আঙুল—

বাধা দিল মৌরী। বললো—যাচ্ছিস কোথায় তুই? গ্র্যাণ্ডে?

আঁচলটা কাঁধে তুলে দিতে দিতে মৌরীর দিকে তাকালো মঞ্জু—ভাবছিস কি দিদি তুই?

—ভাবছি না ভয় করছি!

ড্রেসিং টেবিলের কাছে গিয়ে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে মঞ্জু বললো—কবি বলেছেন কি জানিস? বলেছেন—

সবারে বাসবে ভালো
নইলে মনের কালো ঘুচবে না রে।
যাহা তোর আছে ভালো
ফুলের মতো দে সবারে।

—তবে গ্র্যাণ্ডেই যাচ্ছিস তুই? দেখ মঞ্জু, আমি বলছি লোকটি ভালো নয়।

মঞ্জু তেমনি ভাবে জবাব দিল—

যারে তুই ভাবিস ফণী
তারও মাথায় আছে মণি।

আর কথা বলল না মৌরী। গম্ভীর হয়ে বসে রইল।

মঞ্জু শাড়ী-জামা পরে, চটি পায়ে দিয়ে, কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে মৌরীর গম্ভীর মুখের কাছে গিয়ে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে বললো—

ভালোবাসি ভালোবাসি
এই সুরে কাছে দূরে জলে-স্থলে
বাজে কেবল আমার বাঁশী—হাসি।

হালকা হাওয়ার মতো ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। কিন্তু প্রায় তক্ষুণি আবার ফিরে এসে ঘরে মুখ বাড়িয়ে বলে গেল—মমতাদের বাড়ি যাচ্ছি।

মাছ-তরকারী কেটে রান্নার ব্যবস্থা দিয়ে দাটাকে কাজ করে রেখে সেখানেই জল-চৌকিটার উপর চুপ করে বসেছিল অমিতা। জুতোর শব্দে বেরিয়ে এলো—তুমিও বেরুচ্ছ না কি?

—আমিও বেরুচ্ছি নাকি মানে? বাড়ীর আর সবাই কি বাইরে নাকি?

—তাই তো! বাবা পিসীমা সেদিন থেকে এক রকম ও বাড়ীই। আজ এই মাত্র চিঠি দিয়ে দুভাইকেও ছোট পিসী ডেকে নিয়ে গেছেন। তারা খাবেও ওখানে বলে দিয়েছেন।

—কি ভাগ্য দাদাদের—ছোট পিসীর কাছে নেমন্তন্ন! কিন্তু একবার খোঁজ নিয়ে দেখো তো চুপি চুপি—কাল ওবাড়ীতে কোন ডিনার পার্টি ছিল কি না—কিছু বাড়তি খাবার রয়ে গেছে কি না এবং ছোট পিসীর ফ্রিজটা নষ্ট কি না।

হাসল অমিতা। বললো—বোধ হয় তাই। কিন্তু আজ আমিও এ বাড়ীতে টিকতে পারবো না কিছুতেই।

—কেন আজ কি?

—বাঃ আজ বিশে আষাঢ় নয়?

—ওঃ!

—হাঁ, আমার ভারি খারাপ লাগছে। সামান্য রান্না দিয়েছি। খেয়ে নিয়ে এসো, আমরাও বেরিয়ে পড়ি। ঘুরে-বেড়িয়ে ছবি দেখে সেই রাতে ফিরবো—কেমন?

না করতে পারলো না মঞ্জু। বললো, বেশ। একটার ভেতরই ফিরবো আমি। তার পর বেরিয়ে পড়া যাবে।

—মৌরী যদি না যেতে চায়?

—সে ভার আমার।

—তুমি যাচ্ছ কোথায়?

—মমতাদের বাড়ী।

—হঠাৎ?

—হঠাৎ নয়। বাবার যাওয়ার সময় থেকেই ভাবছিলাম যাওয়ার কথা।

—কেন?

—মমতাকে এই কথা বলতে যে, তোমার দাদা আমার বাবার কাছে ক্ষমা চেয়েছেন। কিন্তু ওটা উল্টো ক্ষমা চাওয়া হয়েছে। ক্ষমা চাইবো আমরা। আর সেটা চাইতেই আজ আমি এসেছি।

—যদি মমতা বাড়ী না থাকে?

—তার দাদাকে বলবো।

[ক্রমশঃ।

"A woman's idea of keeping a secret is to refuse to tell who told it to her." —Earl Wilson,

বাতিঘর

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

বারি দেবী

শীত গেছে। এসেছে নব বসন্ত। হঠাৎ যেন কেমন ভালোলাগা ভাব সকলের মনে দোলা দিয়ে গেছে। নবপল্লবে সেজেছে অরণ্য-শিশুরা—এবার ওদের ফুল ফোটানো, মধু ঝরানোর লগন এলো। লুব্ধ ভ্রমর আর প্রজাপতির দল মাঝে মাঝে তারই সন্ধানে ফিরছে। দেরী! আর কত দেরী? দেরী সইছে না অসীমেরও।

—আর যে দেরী সইছে না মিতা! একটা দিন-ক্ষণ দেখে বাইরের লোকাচারটা শেষ করে ফেলা যাক, কি বলো? তোমাকে পাবার জন্তে তাহলে নিত্যি এই ক্লাবে আর হোটেলে ছুটোছুটি করতে হয় না। ক্লাবে বসে সুমিতার একখানি হাত নিজের হাতে জড়িয়ে নিয়ে বলছিলো অসীম।

—কি করতে চাইছো? শুষ্ককণ্ঠে শুধোয় সুমিতা।

উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলো অসীম। ওর চিবুকটি দু' আঙুলে টিপে ধরে বললো—বি-য়ে গো! সমাজকে সাক্ষী রেখে, তোমাকে আমার একেবারে একচেটিয়া সম্পত্তি করতে চাইছি।

—বি-য়ে? অস্ফুট দু'টি অক্ষর বেরিয়ে এলো সুমিতার দু' ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে।

—অবাক হয়ে যাচ্ছ নাকি কথাটা শুনে? হ্যাঁ গো হ্যাঁ! বিয়ে, তোমাকে। এই মাসেই ও-হাঙ্গামা চুকিয়ে ফেলতে চাই। তোমার বাবাকে জানিয়েছে অনিল, তাঁর জবাবের অপেক্ষা চলছে।

—বাবাকে জানাবার আগে, একবার আমাকে জিজ্ঞাসা করনি কেন? না জানি, তিনি কি মনে করছেন আমাকে। ম্লানমুখে বললো সুমিতা।

—তাই নাকি? তা তো ভেবে দেখিনি আগে? মানে, আমি বলতে চাইছি যে, তোমার সঙ্গে এখন আমার দেহ-মন নিয়ে যে কারবার চলছে, তার স্বাভাবিক পরিণতি হচ্ছে ঐ বিয়ে। এ তো জানা কথাই যে, সেটা আর অন্য পুরুষের সঙ্গে ঘটতে পারে না, সেই জন্তেই তোমাকে জানাবার আর প্রয়োজন মনে করিনি। বিদ্রূপশাণিত কণ্ঠে জবাব দিলো অসীম।

—এত দিনের ঘটনাগুলো সব জড়ো হয়ে তালগোল পাকিয়ে একটা কিম্ভূতকিমাকার ভূতের মূর্ত্তি ধরে এসে যে দাঁড়ালো সুমিতার চোখের সামনে, অক্টোপাশের মত কিলবিলে সরু সরু হাতগুলো বাড়িয়ে ওকে জড়িয়ে ধরতে আসছে—হি-হি, করে হাসছে দু' পাটি শাদা দাঁত, কঙ্কালের হাসির মতো! সভয়ে চোখ বন্ধ করলো সুমিতা।

—কি হলো, আবার শরীর খারাপ না কি? ওর কাঁধ দুটো দু'হাতে চেপে ধরে মৃদু ঝাঁকুনি দিলো অসীম!

অ্যাঁ! কৈ, না তো! যেন স্বপ্নাচ্ছন্ন ভাবে জবাব দিলো সুমিতা। ভূত তো নয়, সামনে বসে অসীম! কেমন ভয়-ভয় চোখে ওর মুখের দিকে চেয়ে রইলো সুমিতা।

—হোলো কি? অমন অবাক চোখে কি দেখছো? ঝাঁঝালো গলায় বললো অসীম—ভাবছো বাবা কি মনে করবেন? তোমার সম্বন্ধে কিছু মনে করার কি অধিকার আছে তাঁর? তিনি তো তোমাকে কতকগুলো স্বার্থান্বেষীর হাতের পুতুল করে দিয়ে তাঁর নিজের কর্ত্তব্য শেষ করেছিলেন। আমি যদি না আসতাম তোমার জীবনে, তাহলে আজ তোমার অবস্থাটা কি দাঁড়াতো জানো? স্রেফ ঐ দিদিমার হাতে তৈরী জড় পুত্তলিকা। তোমাকে দাবিয়ে রেখে উনি চেয়েছিলেন নিজের স্বার্থসিদ্ধি করতে, মাঝপথে আমি এসে, বিঘ্ন ঘটালাম। কি ছিলে তুমি? আর আজ কি হয়েছো? ভেবে দেখো তো? সেই জড়তার নাগপাশ থেকে তোমাকে আমি মুক্তি দিয়েছি।

আজ তুমি লাভ করেছো স্বাধীন সাবলীল জীবনধারা, বিদগ্ধ সমাজের তুমি মুকুটমণি। তোমার নাম সবার মুখে মুখে ফিরছে, বলো মিতা, সে কার জন্তে? তোমার এই যশ-গৌরবের মূলে আছে কার প্রাণান্ত অধ্যবসায়?

অত ভাবতে শেখেনি সুমিতা। তার দুর্ব্বল ভীরু মন স্বীকার করে, হাঁ মানছি সব কৃতিত্বই তোমার অসীম! সে কথা অস্বীকার করবার শক্তি আমার নেই। কিন্তু মনটা আবার কেঁদে কেঁদে বলে,—কিন্তু এর কি প্রয়োজন ছিলো বলতে পারো? একান্ত নিঃসহায়, নিরীহ কুরঙ্গিণীকে নানা প্রকার চমকদার প্রলোভনে ভুলিয়ে, প্রাণান্তকারী ফাঁদে ফেলবার? আজ বিদগ্ধ সমাজের বিদ্যুৎশিখা হয়ে কি লাভ হলো তার?

আগে যে হৃদয় ছিলো অমৃতরসে টলোমলো, আজ সেখানে শুধু আছে হলাহল! আজকের জীবনে আছে তার প্রচুর মাদকতা, নেই শান্তির স্নিগ্ধতা। জ্বালা, শুধু জ্বালা, শুধু অতৃপ্তি আর বিবেকের তীব্র দংশন।

মনটা আবার হেসে বলে,—উন্নতি? খ্যাতি? যশ! স্বাধীন, সাবলীল জীবন? উঃ দস্যু! তুমি কি বলছো? ওগুলো

তোমার শাণিত অস্ত্র। ঐ অস্ত্রাঘাতে তুমি তাড়িয়েছো আমার আত্মার আত্মীয়কে! তার সুখের ঘরে জ্বালিয়েছো আগুন, তারপর করেছো সেথায় অনধিকার প্রবেশ। এই তো তোমার আসল রূপ? আমি বুঝি, সব বুঝি, কিন্তু কিছু করতে পারি না, সর্ব্বনাশা বন্যার স্রোতের টানে যেমন করে শক্তিমান হাতীও ভেসে যায়, আমি তেমনি ভেসে চলেছি, তোমার ছলনার স্রোতে!

আর ভাবতে পারে না সুমিতা। দুহাতে মুখ ঢেকে বললো—একটু গঙ্গার ধারে আমাকে নিয়ে চলো অসীম! এত আলো, এত গোলমাল আমি সইতে পারছি না, বড্ড মাথা ধরেছে।

—মুচকি হাসি হেসে উঠে দাঁড়িয়ে বললো অসীম, বেশ তো চলো!

আত্মপ্রসাদের ফেনিল রসধারায় যেন অন্তরটা ওর সিক্ত হয়ে উঠেছে। হ্যাঁ এই তো চেয়েছিলো সে,—ছলে, বলে, কৌশলে সিদ্ধিলাভ তাকে করতেই হবে। ওর পৌরুষত্বের কাছে, সর্ব্বগ্রাসী কামনার কাছে যে কোনো নারীকে আত্মসমর্পণ করতে হবে! পরাজয়ের গ্লানি ওকে স্পর্শ করতেই পারে না।

করুণা? না, সুমিতার করুণ কাতর মুখখানি দেখলে ওর প্রতি এক বিন্দুও করুণা জাগে না! অন্যায়? ও-সব দুর্ব্বল ভীতু মানুষের কথা!

—সুমিতার একখানি হাত নিজের বজ্রমুষ্টিতে বেঁধে নিয়ে দর্পিত চরণে এগিয়ে চললো অসীম—পায়ের সঙ্গে তাল রেখে মনও বলছিলো তার—আমার এই উদ্ধত চলার পথে যে কোনো বাধা আসুক না কেন, তাকে এমনি করে ভেঙে গুঁড়িয়ে, পিষে ধুলোয় মিশিয়ে দেব।

—গঙ্গার ধারে কয়েক পাক গাড়ী ঘোরবার পর, ঠাণ্ডা জোলো হাওয়ার ঝাপটা লেগে সুমিতার ওপরের জ্বালা কিছুটা কমলেও, মনের গহনে ধিকি-ধিকি দাবাগ্নি যেন ওকে দহন করতে লাগলো।

বিয়ে! সুদামকে নয়,—অসীমের গলায় দিতে হবে বরমাল্য? এ কেমন করে সম্ভব হল? তার লোহার বাসরঘরে কোন অদৃশ্য কারীগর রেখেছিলো ক্ষুদ্র ছিদ্রপথ? সেই পথে প্রবেশ করলো কালনাগ! এর নামই বুঝি নিয়তির পরিহাস!

চিন্তার অকূল সাগরের উত্তাল তরঙ্গে ভেসে চলেছে সুমিতার মন। এর চারি ধারে যেন ঘনিয়ে এসেছে প্রলয় অন্ধকার! কাজল-কালো ফেনিল বিক্ষুব্ধ তরঙ্গমালা যেন ওকে গ্রাস করতে আসছে! চোখের সামনে ওর ভেসে উঠলো বাতিঘর ছবিখানির দৃশ্যপট!

—কি হল? মাথাধরা এখনও ছাড়লো না? বাড়ী ফিরবে নাকি? বললো অসীম।

—অ্যাঁ! বাড়ী? হ্যাঁ তাই চলো।

পরম ক্লান্তিভারে অবসন্ন দেহটাকে সিটে এলিয়ে দিতে গিয়ে শিউরে উঠলো সুমিতা। ওর এলায়িত দেহখানি অসীমের বলিষ্ঠ বাহু-বন্ধনে আবদ্ধ।

বাড়ী ফিরে লাইব্রেরীঘরে কম্বলের আসনে পিতাকে উপবিষ্ট দেখে রীতিমত চমকে উঠেছিলো সুমিতা। যেন কোনো চৌর্য্য অপরাধে ধরা পড়েছে সে।

নতমুখে সঙ্কোচভরে গ্রহণ করলো পিতার পদধূলি। তারপর মৃদু কণ্ঠে বললো—আপনার আসবার কথা কিছু জানতে পারিনি তো বাবা! এখন থাকবেন তো?—যাই আপনার জলখাবার নিয়ে আসি।

পিতার সাধন-উজ্জ্বল সাহচর্য্য যেন সইতে পারছে না সে, তাই পালাতে চায়।

জলদগম্ভীর স্বরে জবাব দিলেন সোমনাথ—না, আমার খাদ্যের প্রয়োজন নেই মিতা, তুমি বসো।

অগত্যা বসতে হল সুমিতাকে। কোন অজানা আশঙ্কায় বুকটা ওর তোলপাড় করতে থাকে, নিশ্বাস যেন রুদ্ধ হয়ে আসে।

পূর্ব্বের মতই গম্ভীর কণ্ঠে বললেন সোমনাথ—সুদামের পরিবর্ত্তে অসীমের সঙ্গে তোমার বিবাহের প্রস্তাব পেয়ে জানতে এসেছি আমি, এ বিয়েতে তোমার সম্মতি আছে কি?

বিবর্ণ মুখে কাতর চোখ দুটি মেলে সোমনাথের মুখের দিকে চেয়ে রইলো সুমিতা। প্রাণপণ শক্তিতে কি কথা যেন ব্যক্ত করতে চাইছিলো, কিন্তু গলা দিয়ে ক্ষীণ স্বরটুকুও বার হলো না, শুধু ঠোঁট দুটি থর-থর করে কেঁপে উঠলো।

—কয়েক মিনিট ওর দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থাকবার পর আবার বললেন সোমনাথ—বুঝেছি, অবিদ্যার ধ্বংসাত্মক মোহপথ পরিহার কর মিতা! মনকে করো অন্তর্মুখীন, প্রাণের ডাক শোনো, দেখো সেখান থেকে কি নির্দ্দেশ পাও।

—বাবা! বাবা! আর্ত্তকণ্ঠে কেঁদে উঠলো সুমিতা। দুহাতে মুখ ঢেকে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগলো।

ধীর পায়ে ঘরে প্রবেশ করলো করবী। বসলো সুমিতার পাশে। সস্নেহে ওর পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললো,—ও মা! কত দিন বাদে বাবার সঙ্গে দেখা হলো, কথাবার্ত্তা কইবি না শুধু কেঁদেই ভাসিয়ে দিবি? তারপর সোমনাথের দিকে চেয়ে মৃদু হেসে বললো—আমার অপরাধ নেবেন না জামাইবাবু! মিতা পারবে না আপনার কথার জবাব দিতে।

জবাবটা আমিই দিচ্ছি। অসীম বাবুর সঙ্গে মিতার বিয়ে হওয়া একান্ত প্রয়োজন, এবং তা যত শীঘ্র হয়, সম্পন্ন করাই হবে সঙ্গত কাজ। এর বেশী কিছু আপনাকে বলার প্রয়োজন বোধ করি হবে না।

কয়েক মিনিট মুদিত নেত্রে স্থির হয়ে বসে রইলেন সোমনাথ। তারপর গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—বুঝলাম। প্রারব্ধ কর্ম্মের প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন হয়েছে। এবং মিতাকে জীবন দিয়ে তা করতে হবে। বিধিলিপি অখণ্ডনীয়।

আচ্ছা, ডাকো তোমার মা আর অনিলকে, আমি ওঁদের ওপর কার্য্যনির্ব্বাহের ভার দিয়ে আজই শেষ রাত্রে হরিদ্বার রওনা হবো। কন্যার দিকে সস্নেহ দৃষ্টিপাত করে ওকে নিজের কাছে টেনে নিলেন। তারপর মাথায় হাত রেখে বললেন—স্থির হও মা! কর্ম্মফলকে ধীর স্থির চিত্তে গ্রহণ করো। কয়েকটি মহাজন বাক্য বলছি, স্মরণ রেখো।

—সুখে, দুঃখে, সর্ব্বদা কায়মনোবাক্যে ভগবৎ শরণাগতিই মানব-জীবনের শ্রেষ্ঠগতি। সৎ ও অসৎ উভয় কর্ম্মের ফলই জীবকে ভোগ করতে হয়, তথাপি অনন্যচিত্তে যে জীব তাঁর শরণাপন্ন হয়, তিনি তাঁকে মহাদুঃখ, মহাভয় হতে পরিত্রাণ করেন।

—আমাদের জীবন-মহানদী ছুটে চলেছে, সেই পরমানন্দ সাগরে মিলিত হবার জন্ত। যত দিন সেই মহা মিলনলগ্নটি উপস্থিত না হচ্ছে, তত কাল কত উত্থান, পতন, আলো, আঁধার, প্রলয়, ঝঞ্চা, পার হয়ে আমাদের যেতে হবে। তারপর যখন মিলিত হবো আমরা সেই পরমাত্মার সাথে, তখনই হবে চলার শেষ। লাভ করবো সেই অখণ্ড আনন্দময় সত্তাকে। এ গভীর তত্ত্ব এত অল্পসময়ে বোঝাবার নয়; শুধু এইটুকু মনে রেখো—কোনো অবস্থাতেই ধৈর্য্য হারিও না। ঈশ্বরকে বিস্মরণ হোয়ো না, আর সুখ, বা দুঃখ কোনোটাকেই সত্য জ্ঞান কোরো না।

আগুন যেমন জঞ্জালরাশিকে ভস্মীভূত করে নিজে নিবে যায়, তেমনি ঐ সুখ-দুঃখের, ক্রিয়াও সাময়িক মানবের ওপর কার্য্যকরী হয়। কর্ম্মরাশিকে ভস্মীভূত করে সে-ও নিবে যায়। যতটা পারো কৃত্রিমতা বর্জ্জন করে পরমসত্যকে গ্রহণ করবার চেষ্টা কোরো।

অন্তরের নির্দ্দেশই ভগবৎ নির্দ্দেশ। তার বিরুদ্ধাচরণ কোরে, আপাতমনোহর কর্ম্মের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিলে দুঃখভোগ অবশ্যম্ভাবী।

নীরব হলেন সোমনাথ। এতগুলি কথা একসঙ্গে সুমিতাকে আর কখনও বলেননি তিনি। আজ পিতার পূতস্পর্শে, আর স্নেহপূর্ণ সাধুবাক্যে সুমিতার অন্তরটা যেন এক অনির্ব্বচনীয় অপূর্ব্ব ভাবরসে সিক্ত হয়ে উঠলো। শান্ত হল মনের দাহজ্বালা।

সে পিতার পা দুখানি, দুহাতে জড়িয়ে ধরে নিজের মাথাটি তার ওপর রেখে ব্যাকুলকণ্ঠে বললো, বাবা! এ-সব কথা আমাকে আগে শোনাননি কেন?

সময় না হলে কিছুই করবার উপায় নেই মা! তোমার জীবনে যখন যেটির প্রয়োজন হবে তখন তা আপনি আসবে। তার আগেও পাবে না; পরেও না।

আজ আমাকে আপনি বলে দিন বাবা, আমি কি করবো? আপনি যা আদেশ করবেন, আমি তাই পালন করবো। কাতরস্বরে বললো সুমিতা।

আমরা শত চেষ্টাতেও সেই সর্ব্বনিয়ন্তার নির্দ্দিষ্ট জীবনছক থেকে এক চুলও এদিক-ওদিক যেতে পারবো না, মিতু মা! সর্ব্বান্তঃকরণ দিয়ে তাঁর বিধান মেনে নাও, এতেই মঙ্গল হবে। সে-মঙ্গল মাত্র এক জন্মের ক্ষুদ্র জীবনের জন্ত নয়, আমাদের অনন্ত জীবনের মহামঙ্গল আসে দুঃখের ছদ্মবেশ ধারণ করে। আগুনে পুড়িয়ে সমস্ত খাদ ময়লা মুক্ত করে যেমন মিশ্রিত সোনাকে খাঁটি সোনা করে নেওয়া হয়, তেমনি দুঃখের আগুনে দহন না হলে আমাদের আত্মাও নির্ম্মল আর বিশুদ্ধ হন না। তাই সাধু মহাপুরুষরা বলেছেন, দুঃখ আমাদের পরম বন্ধু।

—বুঝলাম বাবা, আর মনে আমার কোনো দ্বিধা নেই। আপনি আমায় আশীর্ব্বাদ করুন।

গভীর স্নেহে কন্তার মাথাটি নিজের বুকে টেনে নিলেন সোমনাথ। পিতা-পুত্রীর এই অপূর্ব্ব মিলনক্ষণে ঘরে প্রবেশ করলো অনিল। নির্ব্বাক হয়ে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলো কয়েক মিনিট। মনের কোণে যেন অনুশোচনার কাঁটাটা খচ্ খচ্ করে উঠছিলো।

—এসো অনিল, তোমার সঙ্গে কথা আছে—ওকে ডাকলেন সোমনাথ। সঙ্কোচভরে অনিল এসে বসলো ওঁর পাশে। খানিকটা নীরবে চিন্তা করে বললেন সোমনাথ—তোমার চিঠির জবাব দিতে এলাম।

শুভদিন দেখে সুমিতাকে তুমি অসীমের হাতে সম্প্রদান কোরো। বিবাহের যৌতুক এবং অন্যান্ত খরচার জন্তে তোমার নামে পঞ্চাশ হাজার টাকার চেক্ দিয়ে গেলাম, আরো দু' মাস পরে ফিরে এসে আমি সম্পত্তির চরম ব্যবস্থা করে যাবো। পঞ্চাশ হাজার আরো দিলাম, বর-পণ দেবার জন্ত।

মায়া দেবী দরজার পাশে দাঁড়িয়ে শুনছিলেন সব কথা। মহা ব্যস্ত ভাবে ঘরে এসে বললেন—এটা কি ভালো হল বাবা? জন্মকাল থেকে সুদামের সঙ্গে মিতা বাক্‌দত্তা। তাকে হঠাৎ কেন বাতিল করা হচ্ছে? কিছুই তো বুঝতে পারছি না?

—সব ব্যাপারটাই তুমি বুঝতে চেও না মা! বুঝতে পারবে না। কবে ছোটবেলায়, কি কথা দেওয়া হয়েছিলো, তার জন্তে চিরদিনের ভবিষ্যৎটা নষ্ট করা বুদ্ধিমানের কাজ নয় মা!

ঘটনাচক্রের পরিবর্ত্তনে,—অবস্থার পরিবর্ত্তন হবেই, আর তাকে মেনেও নিতে হবে। বিষণ্ণ কণ্ঠে বললো অনিল।

—অত শত বুঝেও আমার কাজ নেই—ক্ষুণ্ণস্বরে বললেন মায়া দেবী। আমি তো এখন হয়েছি তোমাদের সংসারের আপদ বালাই।—বাবা সোমনাথ, আমার ওপর সব ভারই দিয়ে গিয়েছিলে; কিন্তু বলতে বাধ্য হচ্ছি,—সে ভার নেবার শক্তি আমার আর নেই। এখন স্ব-স্ব, স্বাধীন,—আমায় মানে কে? এই মিতার বিয়েটা হলেই আমি এবার দূরে কোথাও চলে যাবো, একথা তোমায় জানিয়ে রাখছি বাবা!

—তাই হবে মা! মিটি মিটি হেসে বললো করবী, আমি এবারে বিদেশে কাজ নেব, তখন তোমাকে নিয়ে যাবো,—ক'টা দিন সবুর করো।

—পোড়া কপাল আমার! রাগে জ্বলতে জ্বলতে জবাব দিলেন মায়া দেবী,—চিরকাল উনি আইবুড়ো ধবড়ী হয়ে চাকরী করবেন, আর আমাকে খেতে হবে সেই রোজগারের ভাত? কেন দু'মুঠো ছাই আর একটা চুলো কি আমার কোথাও জুটবে না?

—পাত্তোর যে জুটলো না মা, সেটা কি আমার দোষ? বলুন তো জামাইবাবু? চপল হাসির সঙ্গে বললো করবী।

—অনিত্য দাম্পত্য সুখে বঞ্চিতা হলেও, মনে হয় তুমি অতি-মানস লোকের ভূমানন্দ কিছুটা লাভ করেছো; তাই নেই কোনো ক্ষোভ।

সেই ধ্রুব সত্য, অখণ্ড আনন্দময় সত্তাকে অন্বেষণ করো, আমাদের ক্ষণিক, ক্ষুদ্র জীবনের পরম প্রাপ্তি, চরম শান্তি, এর মাঝেই শুধু আছে, আর সবই মহাভ্রান্তি, মহামিথ্যা! সুগভীর কণ্ঠে বললেন সোমনাথ।

—হেঁট হয়ে সোমনাথের দুটি পায়ের ওপর মাথা ছুঁইয়ে প্রণাম করলো করবী। দুহাতে তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় দিতে দিতে বললো,—আপনার আশীর্ব্বাদে, আমার ছদ্মবেশটা টেনে খুলে ফেলতে পেরেছি জামাইবাবু! একদিন ছিলো আমার মনের অফুরন্ত চাহিদা, কামনার আগুনে ইন্ধন জুগিয়েছি অনেক, কিন্তু তাতে শুধু জ্বালাই বেড়েছে, শান্তি বা তৃপ্তি একটুও মেলেনি!

একদিন এক অমূল্য বস্তুর সন্ধান পেলাম। ঠাকুরঘরে চৌকিতে ধূলোর আবরণের মাঝে ছিলো সেই অপূর্ব্ব মহাবস্তুটি, সেটি হচ্ছে মিতাকে দেওয়া আপনার শ্রীমদ্‌ভাগবত। কি অমৃত ছিলো তার মধ্যে জানি না জামাইবাবু, শুধু এইটুকু জানি, আমার মনের সকল প্রশ্নের জবাব যেন পেলাম ওরই মধ্যে। আর পেলাম কি নিবিড় শান্তি, আত্মশক্তি, আর সত্যের প্রতি নিষ্ঠা!

মুগ্ধচিত্তে সুমিতা শুনছিলো করবীর কথাগুলো। মনটা তার অব্যক্ত বেদনায় গুমরে গুমরে বলছিলো,—তুই তো পিতৃদত্ত অমূল্য সম্পদ অবহেলায় ধূলোর ওপর ফেলেছিলি, যার ভাগ্যে ছিলো, সেই খুঁজে পেলো তার মাঝে অন্তরের মহাসম্পদটি! দুর্ভাগিনী তুই, তাই মূল্য বুঝিসনি তার!

কন্যার অন্তরের ব্যর্থ হাহাকার বুঝি অনুভব করলেন সোমনাথ। গভীর স্নেহে ওর মাথাটি নিজের বুকে টেনে নিয়ে ধীরস্বরে বললেন—প্রারব্ধ কর্ম্মফলকে শান্ত চিত্তে গ্রহণ করো মিতু মা। আমাদের ভালো-মন্দ সুখ-দুঃখ, এ সবের পেছনে আছে তাঁর এক মহান্ উদ্দেশ্য। অনন্ত মঙ্গলময় তিনি, যা করেন, সবই আমাদের মঙ্গলের জন্য, এই বিশ্বাস রেখো, তা হলে সকল অবস্থাতেই স্থির থাকতে পারবে।

চোখ দুটো বড় বড় করে মহাবিস্ময় নিয়ে দেখছিলেন মায়া দেবী জামাতাকে আর কন্যাকে। শুনছিলেন, নতুন ধরণের ওদের কথাবার্ত্তাগুলো।

অনিলের মনটাও যেন কেমন উদাস হয়ে উঠেছিলো, করুণ স্বরে বললো সে—আপনাকে যেন আজ কেমন নতুন নতুন ঠেকছে জামাইবাবু! আর করবীটাও অনেক ভালো ভালো কথা শিখে ফেলেছে দেখছি! শুধু আমিই রইলাম অন্ধকারে পড়ে। আপনার কথাগুলো যখন শুনছিলাম তখন মনে হচ্ছিলো সব ছেড়ে ছুড়ে আপনার সঙ্গ নিতে পারলে সত্যিকারের শান্তি অবশ্যই পাওয়া যায়। একটা লম্বা নিঃশ্বাস ফেলে থামলো অনিল।

ওর দিকে চেয়ে স্মিতহাস্যের সঙ্গে বললেন সোমনাথ—আগে মনকে প্রস্তুত করো, শুদ্ধ করো, আমার সঙ্গ নেবার প্রয়োজন নেই, তখন তোমার সঙ্গ নেবার জন্যে অনেকে ব্যাকুল হবে। করবীর মাথার ওপর একখানি হাত রাখলেন সোমনাথ। ভাবগম্ভীর কণ্ঠে বললেন—এগিয়ে যাও, আরো মহারত্নের সন্ধান পাবে।

[ক্রমশঃ।

কবি ঈশ্বর গুপ্ত

বাসনা গোস্বামী

ঈশ্বর গুপ্তকে আমরা কেবলমাত্র ব্যঙ্গরসিক কবি বলেই জানি। পণ্ডিতমহলে তাঁকে "বলা হয় সাংবাদিক কবি—অর্থাৎ নিছক সাময়িকতাকে অবলম্বন করে কাব্য রচনা করাই নাকি ছিল তাঁর পেশা ও নেশা। কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের কাব্যজগতে প্রবেশ করে একটু অভিনিবিষ্ট হলেই দেখতে পাওয়া যায় যে, তিনি ব্যঙ্গরসিক ও সাংবাদিক কবি ছিলেন সত্য, কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা তিনি ছিলেন জীবনরসিক। জীবনকে তিনি আপন অভিজ্ঞতার গণ্ডীতে দেখেছিলেন, তারপর অতি সাদামাঠা ভাবে আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর এই প্রকাশের মধ্যে সারল্য থাকলেও এক দিকে যেমন তাঁর গভীর জীবনবোধের পরিচয় প্রকাশিত হয়েছে, অন্য দিকে তাঁর কবিকল্পনার প্রাচুর্য ও উর্বরতার সন্ধান মেলে।

কাব্য বা সাহিত্যের মূল কথা হ'ল এই যে: তা হ'ল, জীবনের বিশ্লেষণ অর্থাৎ সাহিত্য হ'ল জীবনের বাঙ্ময় রূপায়ণ। সৌন্দর্যদৃষ্টিতে দেখা এই জীবনের বিচিত্র সুষমায় সে সাত রঙা বর্ণালী কবি বা সাহিত্যিক আমাদের কাছে ধরে দেন, তার মধ্যে একান্ত ভাবে থাকে কবির সৌন্দর্যচেতনা এবং সাধকের ধ্যানদৃষ্টির যুগপৎ সম্মেলন। এই বিশুদ্ধ সৌন্দর্যবোধ যখন আমরা মানুষের মধ্যে আরোপ করি বা অনুভব করি, তখনই তার নাম হয় প্রেম। নিছক সৌন্দর্যচেতনা না হয়ে জীবনকে যে কবি ভালবাসেন, মানুষের প্রতি যে কবি সহমর্মিতা পোষণ করেন—তাঁর কাব্যেই একসঙ্গে জীবনের প্রকাশের মধ্যেই সৌন্দর্যচেতনার বিমিশ্র প্রকাশ হয়ে থাকে। ঈশ্বর গুপ্তের কাব্যে আমরা এই ধারার প্রকাশ লক্ষ্য করি। তাঁর জীবন গঠিত হয়েছিল স্নেহমায়াহীন এক নিদারুণ পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে। স্নেহের কোন বাঁধনই তাঁর জীবনের ভিত্তিমূলে জলসিঞ্চন করে তাঁকে লালিত করেনি। এর ফলে, জগত ও জীবনের প্রতি তিনি নির্মম হয়ে উঠেছিলেন; কিন্তু সেই শুষ্ক কঠোর নদী-রেখার তলদেশে যে ফল্গুস্রোতের প্রবাহ বয়ে যাচ্ছিল, একটু লক্ষ্য করলেই তা আমাদের চোখ এড়ায় না। একটি কবিতায় তিনি বলেছেন—

"ধরে মানুষের দেহ মানুষে করিয়া স্নেহ,
মিছা কাল করিলাম বই।
স্বরূপে মানুষ কই এমন মানুষ কই,
আমি ত মানুষ নিজে নই।"

প্রথম ছত্রটিতে মানুষের প্রতি তীব্র ঘৃণা ও বিতৃষ্ণা প্রকাশ পাচ্ছে, কিন্তু পরবর্তী ছত্রে এসে সেই বিতৃষ্ণার স্তরে নিজেকে স্থাপিত করে তাদের জীবনের ভাগ্যকে নিজের বলে গ্রহণ করেছেন। এই আপাত বৈষম্যমূলক উক্তির ভিতর দিয়ে তাঁর জীবন-প্রীতিই প্রকাশ পাচ্ছে।

ঈশ্বর গুপ্তকে আমরা সাধারণতঃ প্রতিক্রিয়াশীল কবি বলে মনে করি। কিন্তু তাঁর মধ্যেও সে প্রগতিশীল মনোবৃত্তি, সমাজকে মানুষকে উন্নতির পথে নিয়ে যাওয়ার চিন্তা ছিল, কৌলিন্য-প্রথা সম্পর্কে তাঁর উক্তিগুলি পড়লে আমরা বুঝতে পারি। তিনি বলেছেন:

"মিছা কেন কুল নিয়া করা আঁটাআঁটি।
এ যে কুল কুল নয় সার মাত্র আঁটি।"

তাঁর মতে কুলের মূল্য কানা কড়িও নয়; যে জিনিষের আসল সম্মান বা মূল্য—তা হোল মনুষ্যত্ব।

তৎকালীন সমাজে শাশুড়ী কর্তৃক বধূ-জীবনের উপর উৎপীড়নের মর্মান্তিক দুঃখের প্রতি ঈশ্বর গুপ্ত কাতর সমবেদনা জানিয়েছেন:—

"বধূর রন্ধনে যদি যায় তাহা এঁকে।
শাশুড়ী ননদ কত কথা কয় বেঁকে।"

আর তাহার ফলে,

"বধূর মধুর খনি মুখ শতদল।
সলিলে ভাসিয়া যায় চক্ষু ছল ছল।"

এই চিত্রের মধ্যে এক দিকে আছে বধূ-জীবনের উৎপীড়নের ট্রাজেডি, আর এক দিকে আছে সেই উৎপীড়নের প্রতি কবির বেদনামণ্ডিত দীর্ঘশ্বাস।

"পৌষড়ার গীত" কবিতায় কবির ব্যক্তি-জীবনের নিদারুণ ট্রাজেডির মর্মান্তিকতা প্রকাশিত। বাঙালীর জাতীয় সমারোহ এই পৌষ-পার্বণে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবহীন কবির কোথায় নিমন্ত্রণ হয়নি, কিন্তু দুর্দমনীয় লোভের পাচক-রস অনবরত ক্ষরিত হচ্ছে। অবশেষে কবি এই অভিনব পন্থা কল্পনা করে সান্ত্বনা পাচ্ছেন:—

"নিমন্ত্রণে যাচ্ছে যারা,
আমার হয়ে খাবে তারা,
মনকে আমি প্রবোধ দেবো,
হাত বুলিয়ে তাদের পেটে।"

পেটুক কবির অবস্থা বিপর্যয়ের করুণ পটভূমিকায় এক করুণ মহিমা লাভ করেছে। বিদ্যুৎ-চমকের এক চরম মুহূর্তে জীবনের এক করুণ রসোজ্জ্বলতার দিক উদ্ভাসিত হয়ে উঠল আমাদের সামনে, আর তার আলোকে আমরা কবি-মনের সমস্তটা একবার দেখে নিলাম। দেখলাম: জীবনের প্রতি সমবেদনা ও সহমর্মিতায় ব্যথা-কাতর কবির স্বপ্নমাখা চোখের তারায় দুই বিন্দু অশ্রু।

আজকের দিনের মাপকাঠিতে হয়ত ঈশ্বর গুপ্তের কাব্যকে আমরা নস্যাৎ করে দিতে পারি, কিন্তু তখনকার যুগ-জীবন ও কাব্যধারার মাপকাঠিতে বিচার করলে আমরা অনায়াসেই তাঁকে জীবন-রসিক আখ্যা দিতে পারি। দ্রষ্টা ও স্রষ্টার হর-গৌরী মিলন—জীবনকে দেখা ও তাকে যথার্থ শৈল্পিক রূপ দেওয়া হয়ত অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব হয়নি, কিন্তু এ বিষয়ে তাঁর মৌলিক প্রচেষ্টা আমরা লক্ষ্য করি। এখানেই গুপ্ত কবির কৃতিত্ব।

ইংলণ্ডে বৃদ্ধদের বসতি

বাণী দাশগুপ্তা

ইংলণ্ডের সামাজিক কাঠামো এমন যে, একটি পরিবার গঠিত হয় স্বামী, স্ত্রী ও সন্তান নিয়ে। তাতে বৃদ্ধ বাপ, মা এদের ঠিক যেন স্থান নেই। এই সমাজে সন্তান বড় হয়, জীবিকা অর্জ্জনের পথ নিজেই খুঁজে নেয় এবং বিয়ের বন্দোবস্ত নিজেই করে। ছেলে বা মেয়ে বিয়ের পর আর বাপ-মায়ের সঙ্গে থাকে না—নিজ নিজ নীড় গড়ে তোলে অন্যত্র।

কিন্তু এর মধ্যে এক বিরাট সমস্যা এসে যায়। বৃদ্ধ বাবা মা যায় কোথায় এবং তাদের রক্ষণাবেক্ষণ করেই বা কে? যত বৃদ্ধ হ'তে থাকে মানুষ তত চায় অবলম্বন, তত চায় নির্ভরযোগ্য স্থান। বার্দ্ধক্যের সাথে সাথে বাড়ে মানুষের ভীতি—অজানার ভীতি (fear of probability) হারানর ভীতি, অন্যের অধীনস্থ হওয়ার ভীতি, বার্দ্ধক্যের জরাগ্রস্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিঃসঙ্গতা অনুভূত হয়। একাকীত্ব বার্দ্ধক্যে অসহ্য হয়ে ওঠে, তাই চায় সে সকলের সঙ্গে কথা বলতে।

এই সামাজিক কাঠামোর জন্যই এই দেশে বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের পেনসনের বন্দোবস্ত সরকার করেছেন। বৃদ্ধাদের ৬০ বৎসরের পরে ও বৃদ্ধদের ৬৫ বৎসর পরে পেনসন দেওয়া হয়। সপ্তাহে ১পাঃ ৪শিঃ ৩পেঃ পেনসন দেওয়া হয়। কিন্তু পেনসন পেলেও তাদের তত্ত্বাবধান করে কে? এই বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের জন্য খোলা হ'য়েছে বহু রেসিডেনসিয়াল হোম। এই হোমগুলো কাউন্টি কাউন্সিলের অধীনে এই হোমগুলোর বাড়ীর বন্দোবস্ত করে। Local Authority হোমের বাড়ীগুলো এমন ভাবে তৈরী করা হয় যাতে বৃদ্ধাদের কোন অসুবিধা হয় না। এখানে (wash basin) মুখ ধোয়ার বেশিন বেশ নীচু করা হয়, যাতে বার্দ্ধক্যে নুয়ে-পড়া বৃদ্ধও নিজেই মুখ ধুতে পারেন। জানালাগুলো বেশ নীচু করা হয় যাতে ক'রে এরা অনায়াসে বাইরের জগৎ দেখতে পারেন। এদের বিছানা খুবই নরম করা হয় যাতে অস্থি-চর্ম্মসার বৃদ্ধরও শারীরিক অসুবিধা না হয়। এই হোমগুলোর ক্রমোন্নতি হচ্ছে দিনে দিনে। এই সব বৃদ্ধদের সময় কাটাবার জন্য নানা ধরণের Club করা হ'য়েছে—নানা ধরণের খেলার বন্দোবস্ত করা হ'য়েছে যাতে শারীরিক শক্তি প্রয়োগের দরকার হয় না। এখানে বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতাও হয়। বড়দিনে ভোজ ও নাচের (Ball) প্রোগ্রামও করা হয়। এক কথায় এদের নিঃসঙ্গতা একাকীত্ব দূর করার জন্য "হোম" কর্তৃপক্ষ নানা আয়োজন করেন।

এদের দেখাশুনার ভার যে সব নার্সদের উপর, তাদের বিশেষ শিক্ষা নিতে হয়েছে লণ্ডন ও এডিনবরা শিক্ষাকেন্দ্রে। এই নার্সদের বৃদ্ধদের মনস্তত্ত্ব রোগ, ব্যবহার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞান থাকা দরকার। অসীম ধৈর্য্যের সঙ্গে বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের সেবা এদের ক'রতে হয়।

বৃদ্ধবয়সে নানা রোগে মানুষ নিজ্জীব হয়ে আসে, তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে বাতে পঙ্গু হওয়া। তা ছাড়া পায়ে ব্যথা কোমরে ব্যথা ঘুম না হওয়া ইত্যাদি অসুখে কাতর অল্পবিস্তর সব বৃদ্ধরাই হ'য়ে থাকেন। এ ছাড়া কোন কঠিন রোগে আক্রান্ত হ'লে তাদের Chariatric Hospital-এ পাঠান হয় রোগমুক্তির জন্য। সকল বৃদ্ধদের ভর্তি করা হয় না এখানে। তার কারণ সামান্য রোগে ভুগছে এমন রোগীতে হাসপাতাল ভর্তি হ'য়ে গেলে কঠিন রোগগ্রস্তরা জায়গা পায় না। এ জন্য সামান্য রোগে রেসিডেনসিয়াল হোম থেকে (Half way Home) হাফ ওয়ে-হোম-এ এনে রাখা হয় এবং সেখানকার ডাক্তার যদি Chariatric হাসপাতালে পাঠান উচিত মনে করেন তবেই সেখানে ভর্তি হয়। এই Chariatric হাসপাতালের খুব নাম আছে, খুব দক্ষতার সঙ্গে কাজ করা হয় এখানে.দেখা গিয়েছে,রুগী বিশ বৎসর পেরালিসিসে ভুগে এসে এখানে নানাপ্রকার "রশ্মি" প্রয়োগের পর আবার সে উঠেছে,—চ'লছে।

সম্প্রতি ন্যাশনাল এডভাইসরি কমিটি গবেষণা ক'রছে কি প্রকারে বৃদ্ধদের কাজে লাগান যায়। অনেক সময় দেখা যায়, ৬৫ বৎসর বয়স হ'লেও বহু লোক কর্ম্মঠ থাকে ও কাজ করবার মত মনের ও দেহের শক্তি থাকে এবং তাদের এত দিনের অভিজ্ঞতায় কাজ বেশ সুষ্ঠু ভাবে অগ্রসর হয়। এসব ক্ষেত্রে বয়সের বাঁধাধরা নিয়মে যদি তাদের কাজ হ'তে অবসর গ্রহণ কর'তে হয়, তাতে দেশেরও ক্ষতি হয় বৃদ্ধদেরও ক্ষতি হয়। এখন ইংলণ্ডে ভাল খাওয়া থাকার জন্য, স্বাস্থ্যকর বাসস্থানের জন্য ডাক্তারের সময় মত সাহায্য পাওয়ার দরুণ বৃদ্ধদের মধ্যে মৃত্যুহার কমে গিয়েছে। ন্যাশনাল এডভাইসরি কমিটি চেষ্টা করছে কর্ম্মঠ সক্ষম বৃদ্ধদের কাজে বহাল রাখতে, তাতে দেশের ও দশের উন্নতি হবে।

ভারতবর্ষে এই ধরণের "হোম" বা আশ্রম স্থাপনের বিশেষ দরকার ছিল না। কারণ, সামাজিক কাঠামো এই ধরণের, তাতে সংসারেই বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের স্থান আছে। আমাদের দেশের যৌথ পরিবারে, বৃদ্ধ অশক্ত পঙ্গু বেকার প্রত্যেকেরই স্থান আছে। কিন্তু আজ-কালকার অর্থসঙ্কটের দিনে জিনিযপত্রের দুর্মূল্যের জন্য আজ আর যৌথ পরিবার বাঁচতে পারে না। সব বন্ধন যেন শিথিল হয়ে এসেছে ধীরে ধীরে। তা ছাড়া ভারত বিভক্ত হওয়া সত্ত্বেও বহু ঘর গেছে ভেঙ্গে—বহু বৃদ্ধ সন্তান হারিয়ে এসেছে ভারতে। কিন্তু আজ তারা কার দ্বারে ভিক্ষা চাইবে? কার দয়ার প্রত্যাশী হবে? তাই আজ মনে হয়, যদি আমাদের দেশেও অন্তত দু-চারটি আশ্রম বা হোম থাকতো তবে অনেকের এ দুর্গতি ভোগ করতে হ'ত না। আমাদের দেশে বহু বিত্তশালী ব্যক্তি খুলেছেন ধর্ম্মশালা, অনাথ আশ্রম, হাসপাতাল—তেমনি যদি দু-চারটি আশ্রম বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের জন্য খোলা হয় তবে তাঁরা বহু দুর্গতি হ'তে নিষ্কৃতি পান।

ছন্দপতন

গীতা চক্রবর্ত্তী

তোমার মাঝে পেলাম খুঁজে আমার পরিচয়,
আমার ভুবন তাইতো আছে এমন মধুময়—

কার মাঝে পরিচয় পেয়ে তোমার জীবন মধুময় হয়ে উঠল, জানতে পারি কি সেই ভাগ্যবানটি কে?—বলতে বলতে হাসতে হাসতে ঘরে ঢোকে সমীর।

আচ্ছা দাদাভাই, কত দিন তুমি আমার পেছনে এরকম লাগবে বলো তো?

যত দিন না তুমি একটি সুন্দর টুকটুকে বৌদির ব্যবস্থা করে দিচ্ছ।

তোমার বৌ এনে আমার লাভ?

—লাভ এই যে, তুই যে এখন আমার টেবিল গুছিয়ে দিস, চা করে দিস আর মাধবের সময় না হলে জুতোটা পরিষ্কার করিস, গেঞ্জিটা কেচে দিস, তা তখন তোর সেই বৌদিটি করবে।

সুপ্রিয়া খানিকক্ষণ থেমে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে—হায় রে, তোমার কপালে দেখছি বিয়ে নেই।

অবাক-বিস্ময়ে সমীর বলে, কেন রে, কি হলো?

গম্ভীর ভাবে বলে সুপ্রিয়া—কারণ কি জান? তোমার বৌ-এর কপালে অনেক দুঃখ আছে। সে বেচারী আসবে হয়তো কত আশা নিয়ে আর তুমি কিনা প্ল্যান করে রেখেছো তাকে খাটাবে বলে। না বাপু তা হবে না, আর আমিই বা আমার কাজ কেন বৌদিকে দিতে যাবো? তারপর দুষ্টুমীর ভঙ্গীতে বলে, আচ্ছা দাদাভাই, সত্যি কথা বল তো এখনও কি বৌদি মনোনীত করনি? সত্যি বলছি বিশ্বাস করো আমি কাউকে বলব না, উপরন্তু পারি ত ঘটক বিদেয় তেমন পেলে মা-বাবাকে বলে কয়ে সব ব্যবস্থাও করে দিতে পারি।

কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে হাত দুটো পিছনে রেখে বলে সমীর, ওহে ভগিনী, তোমার ঘটক বিদেয়ও ঠিক মতো পাবে আর তোমার কথায় বিশ্বাসও করছি, কিন্তু, হায় রে দুঃখের বিষয় হল এই যে, তোমার বৌদি এবং আমার মানসী এখনও যে গোকুলে বর্দ্ধমান।

দাদার বলার ভঙ্গি দেখে সুপ্রিয়া হাততালি দিয়ে হো-হো করে হেসে ওঠে বলে, এ তুমি গঙ্গাজলে নেমেও যদি বলো আমি বিশ্বাস করবো না। এম-এ'তে তোমরা কো এডুকেশন ক্লাশ করছ আর মানসী মনোনীত করোনি, এ আমি বিশ্বাস করি না।

সমীর সুপ্রিয়ার চুলের গোছাটা টেনে ধরে বলে, আচ্ছা 'সু' তুই এত পাকা হলি কোথেকে বল?

তোর থেকে সমীর—বলতে বলতে ঘরে ঢোকেন মা।

সমীর বলে,—দেখো মা 'সু' বলছে আমি নাকি 'সু'র বৌদি অর্থাৎ তোমার বৌমা ঠিক করেছি। এই বলে মায়ের গলা জড়িয়ে ছেলেমানুষের মতো মায়ের মুখের কাছে মুখ নিয়ে বলে,—আচ্ছা মা, তোমার বিশ্বাস হয়?

মা বলেন, যত সব পাগলামী কথা! তার পর হেসে বলেন, যেদিন শুনবো যে তুই তোর মনোমত একটা বিয়ে করে এনেছিস, সেই দিনই জানবি আমি নেই।

সুপ্রিয়া বলে, মা ওমনি বিশ্বাস করে নিল।

মার মনে গর্ব্ব ছেলে এম, এ পাশ, বয়স আর কত বছর বাইশ, দেখতে সুন্দর কিন্তু এখনও যেন কচি খোকাটি। মা, বাবা, বোন এই যেন সব। বোনটি ত প্রাণ। মায়ের কাছে কিছু গুপ্ত থাকে না। মা ভাবেন ওকে বিয়ে দিয়ে একটি সুন্দর ছোট বৌ ঘরে আনবেন। কিন্তু বড় ভয়। আজকালকার ছেলেমেয়েরা একটু বড় হলেই বড় ভয়ে কাটাতে হয়। তাই তিনি সমীরকে কোন টিউশানি করতে দেন না। তার পর সমীরের দিকে ফিরে বলেন, সমু, তুই কি আজ বেরোবি?

সমীর বলে, হ্যাঁ মা, আমার বন্ধু দেবব্রত আসে, ওকে ত তুমি চেন ওর মার অসুখ, ও বাড়ী গেছে। ওর টিউশনিটা আমায় করতে হবে।

তা কেন? মা বলেন, ও মা তুই জানিস না আজ জয়পুর থেকে ওরা সুপ্রিয়াকে দেখতে আসবে। সুপ্রিয়া তোকে বলেনি বুঝি? এ দিকে তো দেখি সব খবর দাদাকে না জানালে প্রাণ যায়।

সমীর বলে, আচ্ছা মা, নিজের বিয়ের কথা কেউ বলতে পারে? আর এ কি মা, সবেমাত্র 'সু'র বয়স ষোল, এবার আবার ম্যাট্রিকের বছর, তুমি এরই মধ্যে চাও এর বিয়ে দিতে? আমার কি ইচ্ছে জান? বোন আমার শিক্ষিত হবে, মনোমত পারি ত একজন বিলেত ফেরতের সঙ্গে সম্বন্ধ করবো। জান ওর কত কল্পনা কত আশা। আর কোথাকার কোন মোটা কালো, বেঁটে, ভুঁড়িওয়ালাকে জামাই না করলে তোমার মন কিছুতেই উঠবে না।

মা বলেন—রায়পুরের জমিদার আর তাছাড়া হলোই বা একটু মোটা বেটাছেলে, স্বাস্থ্য থাকা ভালো। আর বয়সই বা এমন কি। বছর ত্রিশ। সে এমন কিছুই নয়। আর আমি কত দিনই বা বাঁচবো। সুপ্রিয়ার বিয়ে দিয়ে তোর একটা বিয়ে দিয়ে আমরা বুড়োবুড়ি কাশী গিয়ে বাকী দিন ক'টা কাটিয়ে দেবো। আমাদের আর কি?

মায়ের কথার অনুকরণ করে সমীর বলে, হ্যাঁ আমাদের আর কি? ছেলেমেয়েকে বিয়ে দিয়ে নাতী-নাতনীর দিদিমা ঠাকুমা হলেই চরম পাওয়া শেষ হয়ে গেল। ছিঃ মা, বিংশ শতাব্দীর মা হয়ে তুমি কি করে এমন কথা বলো?

মা রেগে বলেন, হ্যাঁ, ঘাট হয়েছে, তোমাদের সঙ্গে কথা বলতে আসা যেমন পাপ, তেমনি ছেলে-মেয়ে।

সমীর এসে মাকে জড়িয়ে ধরে হেসে বলে, ও মা, তুমি জান না? A bird of the same feather flock together.

মা রেগে বলেন, ওই সব ইংরিজিগুলো ঐ তোমার বাবা আর বোনের কাছে করো। যাক, তারা যখন আজ আসবে বলেছে তখন একটু দয়া করে আমার মুখ হাসিয়ো না, তারপর যা ইচ্ছে হয় তাই করো। বলে গজ গজ করতে করতে চলে আসেন সুনীতি দেবী। এসে সব রাগ ঝাড়েন স্বামীর উপর, বলেন, কারুর তো কোন চিন্তা নেই, আমারই হয়েছে যত মরণ!

নরেন বাবু গড়গড়াটা পাশে রেখে বলেন, কি গো, হলো কি? সুনীতি দেবী ঝঙ্কার দিয়ে বলে ওঠেন, হবে আবার কি, হয়েছে আমার শ্রাদ্ধ। এবার লোক খাওয়ার বন্দোবস্ত করো। ছেলের গো—বোন এখন ছোট, এখন বিয়ে দেবে না।

হাঃ হাঃ করে হেসে বলেন, ও মা এই কথা! আমি বলি বুঝি কি? আর সত্যি কথাই ত সুপ্রিয়ার কি এমন বয়স। আমি বলি আর কিছু দিন যাক্—

কথা শেষ না হতেই সুনীতি দেবী বলে ওঠেন—হাঁ তা বই কি, তার পর চোখ বুজলে ঐ ছেলে দেবে বোনের বিয়ে? এ আমার ভরসা হয় না। ছেলের উপর আমার বিশ্বাস আছে। কিন্তু ও ত আর চিরকাল এমনই থাকবে না বিয়ে-থা করবে। তখন কেমন বউ আসবে কে জানে—

বউ যেমনই আসুক না কেন, ছেলে তোমার সমীরই থাকবে, অন্য কেউ থাকবে না—বলতে বলতে ঘরে ঢুকে বাবাকে দেখে লজ্জায় পালিয়ে যায় সমীর। কারণ মায়ের কাছে যতই তম্বী দেখাক না, বাবার কাছে তারা বড়ই মুখচোরা।

মা বলেন, যাক—আজ যে ওরা আসবে, দেখো আজকের দিনটা যা হোক করে মানটা রেখো।

সুপ্রিয়া এসে সমীরকে বলে, আচ্ছা দাদাভাই, মায়ের পেছনে এমন লাগলে কেন বলো ত? কি ভয়ানক রেগে গেছে মা।

ভেংচে ওঠে সমীর বলে, ওঃ তোমার বুঝি ওই ভুঁড়িওয়ালাটার গলায় মালা দেওয়ার ইচ্ছে? যার জন্য চুরি সেই বলে চোর।

রাত্রি প্রায় আটটা। সুপ্রিয়া পড়ছে। তুমি বসন্তের কোকিল, কোকিল বেশ লোক। যখন ফুল ফোটে, দক্ষিণ বাতাস বহে, এ সংসার সুখের স্পর্শে শিহরিয়া উঠে, তখন তুমি আসিয়া রসিকতা আরম্ভ কর, আর যখন দারুণ শীতে জীবলোকে থরহরি কম্প লাগে, তখন কোথায় থাক বাপু? যখন শ্রাবণের ধারায় আমার চালাঘরে নদী বহে, যখন বৃষ্টির চোটে কাক, চিল ভিজিয়া গোময় হয়, তখন তোমার মাজা-মাজা কালো-কালো দুলালী ধরণের শরীরখানি কোথায় থাকে? তুমি বসন্তের কোকিল, শীত-বর্ষার কেউ নও।

হ্যাঁ গো, আমি শীতেরও বর্ষারও। যখন ডাক পাঠাবে তখনই পাবে। আমার জন্য ধরণীকে নব সাজে সজ্জিত হতে হবে না, আবার সব কিছু ছেড়ে বিবাগী হতেও হবে না।

ও মা দেবুদা', আমি ভাবি সাহিত্যিকটি কে?

হাসতে হাসতে ঘরে ঢোকে দেবব্রত। বলে, আচ্ছা সুপ্রিয়া, তোমাদের বাড়ীতে নাকি আজ গণ্ডগোল হয়ে গেছে?

অবাক হয়ে যায় সুপ্রিয়া। বলে, গণ্ডগোল, সে কি?

গম্ভীর ভাবে দেবু বলে, হ্যাঁ রায়পুর থেকে নাকি কারা এসেছিলেন?

ও মা, এই নাকি গণ্ডগোল, বাবা, কি কথা বলার ছিরি!

যা হোক শেষে কি হলো? সুপ্রিয়া লজ্জায় চুপ করে থাকে; দেবু জিজ্ঞাসা করে 'সামু' কোথায়, দাদাভাই, মার ঘরে। দাঁড়াও ডেকে দিচ্ছি। এই বলে দেবুদা'র সামনে থেকে পালায়।

সমীর আসতে দেবু জানতে পারে যে তার অমতই এই সম্বন্ধ ভাঙ্গার প্রধান কারণ।

শুনে দেবু বলে, সত্যিই তো কি আর এমন বয়স সুপ্রিয়ার?

সমর্থন পেয়ে উৎসাহিত হয়ে উঠে সমীর। বলে, দেখিস 'সু' ভাল করে পড়াশুনো করুক, ওর জন্য আমি বিলেত ফেরৎ ছেলে আনবো। তার তাছাড়া 'সু' তো আমাদের দেখতেও সুন্দর আর ওর এমন গলা—

দেবু বলে,—থাম থাম বোনের প্রশংসায় যে একেবারে পঞ্চমুখ!

সুপ্রিয়া এসে দাঁড়াতেই সমীর তাকে কাছে টেনে নিয়ে বলে, কি রে, সম্বন্ধ ভেঙ্গে যাওয়ায় খুব দুঃখ হয়েছে? তারপর দেবব্রতকে হেসে বলে 'জানিস্ 'সু'র কিন্তু ওই ভুঁড়িওয়ালা জমিদারটাকে খুব পছন্দ হয়েছিল।

সুপ্রিয়া হেসে বলে, যাঃ, জান দাদাভাই, ভদ্রলোকের গোঁফ দেখে আমার কি হাসি পেয়েছিল, আমি কিছুতেই তাকাতে পারছিলাম না।

দেবব্রত গম্ভীর ভাবে বলে, না না অত হাসি নয়, তোমার কপালে ঐ তাহলে গোঁফ আছে। এই কথা শুনে তিন জনে হো-হো করে হেসে ওঠে।

সুপ্রিয়া আজ-কাল আই-এ পড়ে। সমীরের বিয়ে হয়ে গেল বিখ্যাত ধনী পরিমল রায়ের কন্যা রুমার সঙ্গে।

ফুলসজ্জার দিন সারাদিন সুপ্রিয়াকে দেখা যায় না। কারণ, অতিথিদের অভ্যর্থনার ভার তার উপর। বাবা বলেছেন, মা সুপ্রিয়া তুমি আর দেবব্রত অতিথিদের অভ্যর্থনা করবে। তাই আর বৌদিমণির কাছে তার আসা হয়নি। কিন্তু মনটা বড় ছটফট করছিলো। কি অপূর্ব্বই লাগছিল সেদিন বৌদিকে। সুপ্রিয়ার মাসতুত বোন বন্দনাই বৌদিকে সাজিয়েছিলো। চারিদিকে লোকজন পরিবেষ্টিতা নূতন বৌ বসেছিল, পেছন থেকে চোখ টিপে ধরে সুপ্রিয়া। তার পরেই চোখ ছেড়ে দিয়ে অভিমানে মুখ ফুলিয়ে বলে, কই একবারও ত ডেকে পাঠাওনি, আমি ভাবছিলাম কখন ডাকবে। রুমাও আস্তে আস্তে বলে, আমিও ত ভাবছিলাম কখন তুমি আসবে।

এমন সময় দেবব্রতর গলা শোনা যায়। 'সুপ্রিয়া, তোমার বন্ধুরা এসেছে—

যাই দেবুদা'! ত্রস্ত পদে বেরিয়ে যায় সুপ্রিয়া।

রাত্রে অতিথি সব চলে যাওয়ার পরে সুপ্রিয়া গিয়ে দাদার ঘরে ঢোকে। বলে, বৌদিমণি, দাদাভাইয়ের একটা প্ল্যান তোমায় জানিয়ে দিচ্ছি।

তারপর দুষ্টুমীর ভঙ্গিতে বলে, দাদা বলেছে যে তোমায় দিয়ে আমার কাজ করাবে। সমীর হাসিমুখে আদরের বোনটির দিকে চেয়ে থাকে।

মা ডাকেন—সুপ্রিয়া বেরিয়ে আয়, কত রাত হয়েছে, বৌমার ঘুম পেয়েছে। সুপ্রিয়া বৌদির দিকে তাকিয়ে কি ইসারা করে এসে অপেক্ষমান মাসতুত, পিসতুত বোন, বৌদির সঙ্গে এক সঙ্গে হেসে ওঠে।

তারপর মার গলার অনুকরণ করে বলে, বৌমা, রাত করো না, লক্ষ্মীমেয়ের মতো ঘুমিয়ে পড়। তারপর আবার হাসির হুল্লোড়। ভেতর থেকে সমীর বলে, দাঁড়া পাকা মেয়ে, যাচ্ছি।

সুপ্রিয়া বলে, আমি জানি তুমি এখন আসবে না। তারপর মায়ের ধমকে পালিয়ে যায়।

সমীর রুমাকে বলে, জান রুমা, 'সু' আমার অত্যন্ত আদরের, আমার ইচ্ছে তোমারও যেন তাই হয়।

অভিমানে ভরে ওঠে রুমার বুক, ওঃ, ফুলশয্যার দিন রাত্রে এই বুঝি প্রথম কথা? রুমা বলে, চেষ্টা করবো তোমার কথা রাখতে। তারপর পাশ ফিরে শুয়ে পড়ে। সমীর বুঝতে পারে না রুমার এতে রাগের কি হলো।

রুমা দেখে এ-বাড়িতে সুপ্রিয়ার প্রাধান্য। সুপ্রিয়া বি-এ পড়ে। এর মধ্যে ওদের বাবা মারা গেছেন।

এই, এই দিদি ত ছুঁয়ে! ও বৌমা, আমি রয়েছি ঠাকুরঘরে, মাধব দিল তেলের ভাঁড়টা ছুঁয়ে এ বাসি কাপড়ে। কখন এসেছে, তোমায় কখন তুলে রাখতে বলেছি। রুমা বলে, ছোড়দি ভাই ত আছে। মা বলেন সে কি, ও যে পড়া করছে।

রুমা ভাবে, ওঃ সে পড়া করছে আর রুমার কোন কাজ নেই?

সমীর বলে টাইটা বাঁধতে বাঁধতে, মা 'সু' আজ কলেজ থেকে দেবুর বাড়ী যাবে আমার সঙ্গে। ওর বোনের আজ জন্মদিন। তুমি কি কোথাও যাবে? কারণ আজ বাড়ী ফিরতে দেরী হবে।

মা বলেন—ও মা বৌমা যাবে না?

সমীর বলে, রুমা গেলে তোমার অসুবিধা হবে না?

মা হেসে বলেন—সে কি রে, আমার আগে তোরা কোথাও যাসনি।

সমীর বলে, ঠিক আছে তাহলে রুমাকে তৈরী থাকতে বলো।

অফিস থেকে এসে সমীর এবং সুপ্রিয়ার অনেক অনুরোধেও রুমা গেল না। বলল, তার মাথা ধরেছে।

তারা যখন দেবব্রতদের বাড়ী গেল তখন দেবব্রত বললো, কি রে সমীর, বৌ নিয়ে এলি না কেন? সুন্দরী বলে না কি?

দেবব্রতের মা বললেন, কি বাবা, আমরা গরীব মানুষ ঠিকমতো আদর অভ্যর্থনা করতে পারব না তাই?

সমীর বলে, কি যে বলেন মাসিমা। না না, রুমার শরীরটা বিশেষ ভাল নয়।

দুই ভাই-বোনের মনটা যেন ভারাক্রান্ত হয়ে থাকে। বাড়ীতে এসে সুপ্রিয়া বলে, আচ্ছা বৌদিমণি তুমি গেলে না, ওরা কত কথা বললেন।

রুমা বলে, কেন আমি না গেলেই বা তোমাদের কি?

সুপ্রিয়া কি রকম উত্তর শুনে একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে। তারপর বলে, না সেজন্য বলছি না। ওরা খুব আশা করেছিলো যে তুমি যাবে। এই বলে নিজের ঘরে চলে যায়। কিন্তু মনটা যেন কেমন করে।

সমীর বলে, রুমা আজ আমাদের কথাটা শুনলে ভাল করতে, তাহলে আজ আমাদের এত কথা শুনতে হতো না।

রুমা ক্রুদ্ধ হয়ে বলে, কেন? তোমরা ভাই-বোনই ত গিয়েছিলে, আর লোকের প্রয়োজন কি?

বিদ্রূপের ভঙ্গিতে সমীর বলে, ওঃ, এই কিন্তু রুমা একটা কথা জেনো। 'সু'র অনেক দিন আগেই বিয়ে হয়ে যেত। কিন্তু একমাত্র আমার জন্যেই হয়নি। আর তার সঙ্গে আমার যে স্নেহের আকর্ষণ তা তোমার বোঝার বাইরে। আর তোমায় জানিয়ে দিচ্ছি, ওকে আঘাত দিয়ে তুমি কোন কথা বলো না। এ বাড়ীতে তোমার যে অধিকার সে অধিকার 'সু'র উপরেও নয়, নীচেও নয়। দুজনের দু রকম অধিকার। আশা করি এবার সেটা বুঝবে।

ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে রুমা। সে-ও একমাত্র বোন আর তারও ভাই আছে। কিন্তু এমন আদিখ্যেতা ত সে কোন দিন দেখেনি।

তাই বলে, ভাই-বোন যথেষ্ট দেখেছি কিন্তু তোমাদের মতো বাড়াবাড়ি কেউ দেখেনি।

সমীর কোন কথা না বাড়িয়ে সুপ্রিয়াকে এসে বলে, রাগ করিস না 'সু'!

সুপ্রিয়া বলে, আমি ত কিছু মনে করিনি দাদা! তুমি বৌদিকে কিছু বলো না।

সুনীতি দেবীর একদিন পরপারে যাবার ডাক এলো। যাবার সময় বার বার করে তিনি রুমাকে বললেন, বৌমা, তোমার হাতে দিয়ে গেলাম। ওর বড় অভিমান মা, একটু বুঝো। রুমা মনে ভাবে তার হাতে সুপ্রিয়াকে না দিয়ে বরঞ্চ তাকেই সুপ্রিয়ার হাতে দিয়ে গেলে হোত।

তারপর কেটে গেছে অনেক দিন। আজ-কাল বৌদিরই প্রাধান্য। কেমন কেমন কথা বলে। সমীরও যেন একটু দূরে সরে গেছে।

সুনীতি দেবী একদিন সমীরকে বলেছিলেন যে, দেবব্রত তো ভাল ছেলে; এম, এ পাশ, কলকাতায় তিনখানা বাড়ী আছে, ওর সঙ্গে সুপ্রিয়ার বিয়ে দিলে কেমন হয়? কিন্তু কথাটা আর বেশী এগোয়নি। মায়ের মৃত্যুর কিছুদিন পর সমীর রুমাকে জিজ্ঞাসা করে, আচ্ছা রুমা, দেবুর সঙ্গে 'সু'র বিয়ে হলে কেমন হয়?

রুমা বলে, কেমন হয় মানে কি? বিয়ে ত প্রায় হয়েই গিয়েছে বলতে পারো।

সমীর অবাক হয়ে বলে, তার মানে?

রুমা বলে, দেবব্রত বাবু যে কেন এ বাড়ীতে আসে, এ কি আর বোঝো না?

সমীর গম্ভীরভাবে বলে 'হুঁ'।

একদিন সকালে সুপ্রিয়া খেয়ে-দেয়ে কলেজে যাবে, এমন সময় সমীর ডাকে, 'সুপ্রিয়া', চমকে ওঠে সুপ্রিয়া। দাদাভাই আজ তাকে ডাকলো সুপ্রিয়া। 'সু' সুপ্রিয়াতে পরিণত হলো। তবুও হেসে বলে, কি বলছো দাদাভাই!

সমীর গম্ভীর ভাবে বলে, শোন সুপ্রিয়া, এ সমস্ত কি শুনছি?

অবাক হয়ে সুপ্রিয়া বলে, কি শুনছো ভালো করে বলো, নইলে বুঝবো কি করে।

সমীর বলে, বেশ বুঝতে পারবে একটু চিন্তা করো। এই বলে বেরিয়ে যায়, বলে এসো কলেজ যাবে।

সুপ্রিয়া বলে, না দাদাভাই, তুমি যাও আমি আজ কলেজে যাব না।

তারপর কাপড় ছেড়ে এসে নিজের ঘরে খাটের উপর শুয়ে পড়ে সুপ্রিয়া, দাদাভাই তার দাদাভাই, তার থেকে দূরে সরে গেছে সে, বেশ বুঝতে পেরেছিল, কিন্তু এতদূরে? আর আজ সে কি না তাকে সন্দেহ করছে। থাকতে পারে না সুপ্রিয়া। বুকটা কেমন করে ওঠে। মা-বাবার শোক ভুলেছিল একমাত্র দাদার স্নেহে, আজ সেই দাদা এতদূরে, তার হাতের বাইরে। দাদাভাই তাকে ডাকে সুপ্রিয়া বলে। মা, মা গো, আমি আর পারছি না। এমন সময় কার স্পর্শে চমকে ওঠে সুপ্রিয়া। তাকিয়ে দেখে দেবব্রত। অবাক হয়ে বলে দেবুদা, তুমি?

তার মাথার চুলের মধ্যে অঙ্গুলি চালনা করতে করতে দেবব্রত বলে, হ্যাঁ, 'সু'।

অবাক হয়ে যায় সুপ্রিয়া। দেবুদা' তাকে কোন দিন 'সু' বলে ডাকে না। বলে, তুমি এলে কেন দেবু দা!

দেবব্রত বলে, বোনের দুঃখের সময় ভাই আসবে না তো কে আসবে বোন?

এই 'বোন' আর 'সু' ডাকের জন্যই ত তৃষিত সুপ্রিয়ার মন। সে আর থাকতে পারে না, কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে।

দেবব্রত বলে, আমি সবই বুঝতে পারি বোন।

হঠাৎ ঘরে ঢোকে সমীর, সঙ্গে রুমা। সমীর বলে, দেবব্রত বিয়েটা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করলে পারতে, এটা ভদ্রলোকের বাড়ী, এত অধঃপাতে গেছ?

দেবব্রত একটু হেসে বলে, খুব অধঃপাতে গেছি বলে মনে হয় না। কারণ তাহলে তুই এত ভদ্রতা করে দেবব্রত বলতিস্ না। আর শোন একটা কথা বলছি, আমার বোন ছন্দার বিয়ে হয়ে গেছে তা ত জানিস, মায়ের বড় কষ্ট আমি আজই 'সু'কে নিয়ে যাচ্ছি। যা

বোন তাড়াতাড়ি গুছিয়ে নে, আর যদি ইচ্ছে না হয় নিস না। তোর এই গরীব ভাই অন্ততঃ তোর কাপড় ক'খানা দিতে পারবে। শোন সমীর, তোর 'সু' তোর কাছে আজকাল 'সুপ্রিয়া' হয়েছে। আর তাই আমার সুপ্রিয়া আজ আমার কাছে 'সু' হয়েছে। নিয়ে যাচ্ছি, ওর বি-এ পরীক্ষাটা হয়ে গেলে একটা ভালছেলের সঙ্গেই বিয়ে দিয়ে দেবো, হয় তো তোর মত বিলাত ফেরতের সঙ্গে পারবো না। তবে হাত-পা বেঁধে বোনকে জলে ফেলবো না। তারপর সুপ্রিয়ার দিকে হেসে বলে, 'সু' বিশ্বাস করিস ত? তারপর বুঝলি সমীর, কার্ড পাঠাবো যাস, বৌদি আপনিও কিন্তু যাবেন তখনি কিন্তু 'সু'র প্রাধান্য থাকবে না। কারণ আমি হবো কন্যাকর্ত্তা, আমার প্রাধান্যই থাকবে। সুতরাং আপনার বোধ হয় বিশেষ অসুবিধা হবে না।

সমীর এতক্ষণ বিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে ছিল। এখন সুপ্রিয়াকে আর দেবব্রতকে গাড়ীতে উঠতে দেখে ছুটে গিয়ে বলে 'সু'—'সু' তুই চলে যাচ্ছিস। তোর দাদাভাইকে ছেড়ে তুই থাকতে পারবি 'সু'। ছেলেমানুষের মতো কেঁদে ফেলে সমীর।

সুপ্রিয়া আর থাকতে পারে না—বলে, দাদাভাই, যে ছন্দের পতন হয়েছে আবার জোড়া দিতে গেলে বড় বেসুরো ঠেকবে। আর তা ছাড়া ছন্দা চলে গেছে। তোমার স্নেহে বর্দ্ধিত হয়েছি, এবার দেবুদার স্নেহটাও একটু পরখ করি। তারপর কান্নামিশ্রিত হাসিতে বলে, তা ছাড়া ছন্দা চলে গেছে, তোমার তো বৌদিমণি আছে, দেবুদা'র তো আর কেউ নেই। তাই যাই ছুদিন, দেবুদার কাছে যাই। সমীর বুঝতে পারে যে মুখে যতই বলুক না কেন, অভিমানী 'সু' দাদার এই অবহেলা সহ্য করতে পারবে না।

তারপর গাড়ীটা বেরিয়ে যেতেই কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে সমীর,—'সু' 'সু' রে—

'সু' ছাড়া বাড়ী সমীর ভাবতে পারে না। যেদিকে দেখে, সেদিকেই 'সু'র হাসি-হাসি মুখ মনে পড়ে। কেবলি যেন মনে হয়, 'তোমার বৌ এনে আমার লাভ?' এমন সময় পাশে দেখে রুমা কখন রেডিও খুলে দিয়েছে। এতক্ষণ গান হচ্ছিল, সে খেয়াল করেনি, হঠাৎ শেষ লাইন কানে গেল—

'হাসি দিয়ে যার শুরু হয় তার শেষ হয় আঁখিধারে।'

হাসনাহানা

সুলতা সেনগুপ্ত

তোমার বাগানে হাসনাহানার কুঁড়ি
আমাদের মাঝে এনে দিতে পারে সখ্য
এনে দিতে পারে অপরিচিতের আলাপের অবকাশ
মিলনের উপলক্ষ।

শিষ্টতা আর সামাজিক বন্ধনে
অহঙ্কারের যে বাধায় আছি ক্ষুব্ধ
দখিণার এই ছোঁয়া না-ছোঁয়ার খেলা
একটি নিমেষে করে দেবে অবলুপ্ত।
কি বা এসে যাবে তাতে
কঠিন আগল এঁটেছি কঠিন হাতে,
এ ফুল-গন্ধে ভাঙনের সুর শুনি—
মন নিপীড়নে যতই হই না দক্ষ।

এ শুধু আমার মানসিক আলোচনা
সত্যের সাথে অকারণ বঞ্চনা
হ'তে পারে, তবে হবে না এমন কিছু
তোমার আমার মাথা যাতে হয় নীচু,
মদির গন্ধে যতই মাধুরী থাকে
উতলা যতই করুক শয়ন-কক্ষ।

চিরকেলে ফুল চিরকাল ফুটে থাকে
কে রাখে নজীর পাগল করেছে কা'কে
লোভনীয় নয়, শোভনীয় যাহা তাই আমাদের হোক
আমরা বিষয়ী লোক।

তাই ভালো, করি রুদ্ধ এ বাতায়ন
হাসনাহানারা লীলায়িত হয়ে জ্বালাবে কতক্ষণ?
যা খুশি করুক, ফুটুক-ঝরুক ওরা কৃষ্ণ-শুক্লপক্ষ
ভ্রষ্ট হবে না সামান্য এই ডাকে—কেহ কারো স্থির লক্ষ্য।

ভবানী মুখোপাধ্যায়

পাঁচ

প্রকাশক ফিসার আনউইন বার্ণার্ড শ'র গ্রন্থ প্রকাশে উৎসাহ প্রকাশ করেছিলেন, প্রায়ই তাঁকে অনুরোধ জানাতেন। শ' কিন্তু বলতেন The Star পত্রিকায় প্রকাশিত সঙ্গীত সম্পর্কিত আলোচনা গ্রন্থাকারে প্রকাশ করুন, কিংবা Lamb's Tales from Shakespeare এর মত Tales from Ibsen প্রকাশ করা যেতে পারে। শেষোক্ত গ্রন্থ অন্য প্রকাশক ছাপার জন্য উদ্‌গ্রীব। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে বার্ণার্ড শ' প্রকাশককে একখানি চিঠিতে লিখলেন।

"—আমি ইবসেন সংক্রান্ত প্রবন্ধ রচনায় হাত দিয়েছি গত সোমবার চোদ্দ ঘণ্টা এই প্রবন্ধের জন্য খেটেছি। সম্পূর্ণ হলে এর মোট শব্দসংখ্যা হবে ২৫,০০০। স্কট (আর একজন প্রকাশক) অতিশয় আগ্রহান্বিত হয়ে আছেন, এইমাত্র একটি পোষ্টকার্ডে জানিয়েছেন আগামী কাল ওঁর প্রস্তাব নিয়ে দেখা করতে আসবেন। আমার মনে হয় ইবসেনের জন্য উনি যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করেছেন সেই বিচারে এই গ্রন্থ আপনার চাইতে তাঁর কাছে অনেক মূল্যবান হবে। আমার ত' মনে হয় এর ওপর আপনার তেমন বিশেষ আগ্রহ নেই। যদি থাকে পত্র পাঠ মাত্র ৫,০০০ পাউণ্ডের চেক পাঠাবেন, ৬৬⅔% রয়্যালটি হিসাবে একটা চুক্তিপত্র পাঠাবেন, এই রয়্যালটি অবশ্য ষোলোখানি কপির ওপর প্রযোজ্য নয়—জি, বি, এস।

এই প্রবন্ধটিই বার্ণার্ড শ'র বিখ্যাত আলোচনা গ্রন্থ The Quintessence of Ibsenism। প্রথমতঃ ফেবিয়ান সোসাইটিতে বক্তৃতা দেওয়ার উদ্দেশ্যেই এই প্রবন্ধ রচিত হয়। সেণ্ট জেমস রেস্তোরাঁয় তিনি বিশাল জনতার সামনে ১৮ই জুলাই ১৮৯০ তারিখে এই দীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করেন। শ্রোতাদের মনে এই প্রবন্ধ গভীর রেখাপাত করেছিল, এই প্রবন্ধ পরিমার্জিত হয়ে ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়, সেই বছরই আমেরিকায় আর একটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ইবসেনের মৃত্যুর পর ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে আরো তথ্যপূর্ণ হয়ে নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

চেষ্টারটন বলেন—"এই চমৎকার গ্রন্থটিকে অনেকে বলেন The Quintessence of Shaw। সে যাই হোক, আসলে এই গ্রন্থ সুনীতি সম্পর্কে শ' মতবাদের সারমর্ম এবং ইবসেনের সাহিত্যকর্মের প্রচারণা।"

শ'র শৈশব কেটেছে উদার খৃষ্ট-নীতির আওতায়, তাকে বরং অত্যন্ত লঘু খৃষ্ট-নীতি বলা চলে। বার্ণার্ড শ'র পিতৃদেব বাইবেল পাঠ করে হেসে গড়িয়ে পড়তেন। বলতেন মিথ্যার ঝুলি।

খৃষ্ট-নীতির প্রতি এই তরল আগ্রহের ফলে বার্ণার্ড শ' স্বাধীন ভাবে নিজস্ব ধারণায় লালিত হয়েছেন। সেই ভিক্টোরীয় যুগের ধারণার ভিত্তি অবিশ্বাস। ঈশ্বরহীন মুক্তি-ফৌজে বার্ণার্ড শ' বিশ্বাসী হলেন। ধর্ম যেখানে নেতিবাচক সেখানে ধর্মকে উপেক্ষা করাটাই সক্রিয় নীতি। এই সূত্রে একথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, বার্ণার্ড শ'র প্রথমতম মুদ্রিত রচনা ধর্ম-প্রচারক স্যাঙ্কি এবং মুডির বিরুদ্ধে লিখিত। প্রথম জীবনের উপন্যাসাবলীর মধ্যে নাস্তিক পরিবেশই প্রধান। তাঁর পঞ্চম উপন্যাসেই যা কিছু উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা গেছে, সেখানে প্রচার করা হয়েছে সমাজবাদী নীতি। সোস্যালিজম বা সমাজবাদী নীতি বার্ণার্ড শ' জীবনের তৃতীয় অধ্যায়। শুধু তৃতীয় নয় এই হয়ত শেষ অধ্যায়।

অনেকের মতে রাজনৈতিক মতবাদে বার্ণার্ড শ'র বিশ্বাস ক্রমশঃ হ্রাস পেয়েছিল, তার পরিবর্তে Life force নামক নতুন জীবনাদর্শ স্থান পেয়েছিল! বার্ণার্ড শ'র জীবনের এই চতুর্থ অধ্যায়। তবে বার্ণার্ড শ' কোন দিনই সোস্যালিজমের প্রতি শ্রদ্ধা হারাননি, রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে হয়ত বিশ্বাস কিছু হ্রাস পেয়েছিল।

বার্ণার্ড শ'র কর্ম তাই তাঁর রাজনীতিক বিশ্বাসের সঙ্গে সহাবস্থান নীতি মেনে নিয়েছে। বার্ণার্ড শ'র তিনটি প্রধানতম প্রবন্ধ পুস্তকে তাঁর মতবাদ লিপিবদ্ধ রয়েছে—"The Quintessence of Ibsenism," "The Sanity of Art" এবং "The Perfect Wagnerite".

এই তিনখানি গ্রন্থই নব্বুই দশকে রচিত। তত দিনে বার্ণার্ড শ' সোস্যালিষ্ট হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত। তাঁর রাজনৈতিক মতবাদই ধর্ম বিশ্বাসে রূপান্তরিত হয়েছিল—একটি অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপিতে বার্ণার্ড শ'র এই মনোভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়।

"—সংক্ষেপে এই কথা বলা যায়, সোস্যালিজমকে আমাদের ধর্ম হিসাবে গ্রহণ করতে হবে।" (G. B. S. His life and works—A. Henderson).

প্রফেসর আর্কিবাল্ড হেনডারসনের মতে এই গ্রন্থ Shaws' masterpiece in the field of literary criticism।

ইবসেন সম্পর্কে কোনো ইংরাজী লেখক ইতিপূর্বে এমন বিস্তারিত আলোচনা করেন নি।

বার্ণার্ড শ' প্রথম জীবনে সোস্যালিষ্ট এবং পরে কম্যুনিষ্ট মতবাদে বিশ্বাসী হন, মৃত্যুকাল পর্যন্ত সেই বিশ্বাস থেকে তিনি বিচ্যুত হননি। ইবসেন কিন্তু Individualist বা স্বাতন্ত্র্যবাদী।

সবাই জানেন—
প্রতি প্যাকেট ব্রুক বণ্ড চায়ে অনেক বেশী কাপ ভালো চা তৈরী করা যায়
...আর বাগান থেকে সদ্যসদ্য সরবরাহ করা হয় ব'লে ব্রুক বণ্ড চা একেবারে তাজা থাকে
...আর লোকে রোজ সাড়ে পাঁচ কোটিরও বেশী কাপ ব্রুক বণ্ড চা খেয়ে থাকেন
Brooke Bond Roses Blend
Brooke Bond Leaf Tea
এই জন্যেই অন্য যে কোন মার্কা চায়ের চেয়ে ব্রুক বণ্ড চা বেশী লোকে খান !
ব্রুক বণ্ড ইণ্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড
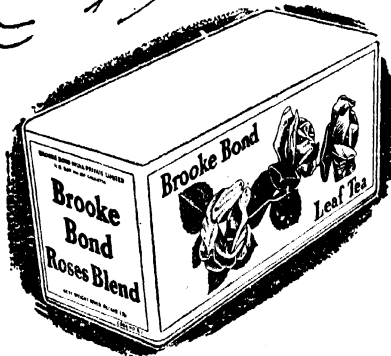
নিজস্ব বিশ্বাস সম্পর্কে ইবসেনের মনে এতটুকু সংশয় ছিল না। বার্ণার্ড শ'র বন্ধু উইলিয়াম আর্চার ইবসেনের সমগ্র গ্রন্থাবলী ইংরাজীতে অনুবাদ করেন। ইবসেনের Ghosts নামক গ্রন্থের ইংরাজী সংস্করণের ভূমিকায় ইবসেন রচিত (জানুয়ারী ১৮৮২) একখানি পত্র আর্চার উদ্ধৃত করেছেন। এই চিঠির মধ্যে ইবসেনের মতবাদের পরিচয় পাওয়া যায়—

"I, of course foresaw that my new play would call forth a howl from the camp of the stagnationists; and for this I care no more than for the barking of a pack of chained dogs—I myself responsible for what I write, I and no one else. I can not possibly embarras any party, for to no party I do belong." (আমার নতুন নাটক স্থিতিশীল সমাজের কাছ থেকে ধিক্কার লাভ করবে এ আমি জানতাম, কিন্তু তাদের আমি শৃঙ্খলাবদ্ধ কুকুরের চীৎকার হিসাবে গ্রহণ করব, আমি যা লিখি তার জন্য আমিই দায়ী, আর কেউ নয়। কোনো দলকে আমি বিব্রত করতে পারি না, কারণ আমি কোনো দলের নই)—এই উক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদীর উক্তি।

শ' এবং ইবসেনের মধ্যে মৌল প্রভেদও আছে। বার্ণার্ড শ' নারীর অধিকার সম্পর্কে সচেতন এবং সমর্থক, ইবসেনও নারী সমাজের ত্রাণকর্তা হিসাবে স্বীকৃত, তবে তাদের রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কে তিনি উদাসীন।

এই ছোট বইখানি রচিত হওয়ার পর প্রায় ষাট বছর কেটে গেছে, ইবসেন এখন ক্লাসিকের পর্যায়ে পৌছেছেন, তবু এই গ্রন্থের মূল্য আজও অপরিবর্তিত। যাঁরা বার্ণার্ড শ'র মুখে এই গ্রন্থের সারাংশ সেন্ট জেমস রেস্তোরাঁয় শুনেছিলেন তাঁরা বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়েছিলেন। বার্ণার্ড শ' সম্পর্কে এতদিন পর্যন্ত তাঁর পরিচিত মহলে যে ধারণা ছিল সেদিন সেই ধারণা পরিবর্তিত হয়—সকলে তাঁর মুখে ব্যঙ্গ এবং শ্লেষই শুনতে অভ্যস্ত ছিলেন, কিন্তু এই দিন থেকে বার্ণার্ড শ'র নতুনভাবে স্বীকৃতি লাভ হল।

এলেন টেরীকে একখানি চিঠিতে বার্ণার্ড শ' লিখেছিলেন—

"কয়েক বছর আগে সার্লোট অন্তরে আঘাত পেয়েছিলেন, তাই নিয়েই আকুল ছিল (মেয়েটি অত্যন্ত ভাবপ্রবণ) তার পর পড়ল The Quintessence of Ibsenism," তার বিশ্বাস এই তার ধর্মগ্রন্থ, এর ভিতরেই সে পেয়েছে মোক্ষ, মুক্তি, স্বাধীনতা, আত্মসম্মান ইত্যাদি। তারপর স্বয়ং গ্রন্থকারের দেখা পেয়েছে, সেই ব্যক্তিটি পত্রলেখক হিসাবে যে সহনীয় তা তোমার অজানা নেই।"

এই সার্লোট অবশেষে বার্ণার্ড শ'কে স্বামিত্বে বরণ করলেন।

সার্লোটের আত্মীয় পরিজন কিন্তু এই বিবাহ সুনজরে দেখেন নি। সার্লোটের বোন এমনই বিরক্ত হলেন যে আত্মীয়তার সম্পর্ক প্রায় ছিন্ন হল। মিসেস মেরী ষ্টুয়ার্ট চোলমণ্ডেলীর স্বামী সেনা-বিভাগের পদস্থ কর্মী। মিসেস চোলমণ্ডেলী বার্ণার্ড শ'কে একজন সোস্যালিষ্ট হিসাবেই জানতেন। তখন সাধারণতঃ ধারণা ছিল সোস্যালিষ্টরা ভদ্রলোকই নয়, তাই মিসেস চোলমণ্ডেলী ভেবেছিলেন সার্লোট কোনো ভাগ্যান্বেষীর পাল্লায় পড়েছে।

দুই বোনের মধ্যে এই বিভেদ একদিন কিন্তু আশ্চর্য ভাবে মিটে গেল। সার্লোট জানতেন, আলাপাচারে বার্ণার্ড শ' কি রকম চমৎকার! একদিন এক নিমন্ত্রণসভায় স্বামি-স্ত্রীতে যোগ দিলেন। সেইখানে মিসেস চোলমণ্ডেলীও নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন।

সার্লোট কৌশলে বার্ণার্ড শ' এবং মিসেস চোলমণ্ডেলীকে একা রেখে উঠে গেলেন। উভয়ের মধ্যে পরিচয় পর্যন্ত হল না। সার্লোট ফিরে এসে দেখেন দুজনের আলোচনা বেশ জমে উঠেছে।

মিসেস চোলমণ্ডেলী এই নব পরিচিত ব্যক্তিটিকে পেয়ে অত্যন্ত খুসী হয়েছেন বোঝা গেল, অবশ্য পরিচয় হওয়ার পর হয়ত ততটা খুসী হতে পারেন নি। কিন্তু উভয়ের মধ্যে সেই ভোজসভায় যে প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল তা কোনোদিন অম্লান হয়নি। এই মহিলাই বার্ণার্ড শ'কে অনুরোধ করেছিলেন সোস্যালিজম সম্পর্কে যে মেয়েদের কোনো জ্ঞান নেই তাঁদের জন্য সহজবোধ্য সোস্যালিজম লিখতে। The Intelligent Woman's Guide to Socialism and Capitalism গ্রন্থটি বার্ণার্ড শ' এই আত্মীয়কে উৎসর্গ করেছিলেন।

বার্ণার্ড শ'র নিজস্ব বলতে ছিলেন জননী লুসিণ্ডা এলিজাবেথ আর বোন লুসী। বিবাহের পর দেখা গেল সার্লোট তাঁদের প্রতি অপ্রসন্ন। এর একটি সম্ভাব্য কারণ বার্ণার্ড শ'র লণ্ডনের প্রথম ন' বছরের ব্যর্থতার ইতিহাস সার্লোট তাঁর কাছে শুনেছিলেন আর ফিটজরয় স্কোয়ারের অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে আহত, অসুস্থ বার্ণার্ড শ'কে দেখে সার্লোটের মনে নিদারুণ আঘাত লেগেছিল। এর পর বার্ণার্ড শ'র জননী বা ভগিনীকে সার্লোট সুনজরে দেখতে পারেন নি।

বিবাহের পরই দশ নম্বর এডেলফী টেরাসে উঠে এসেছিলেন শ'-দম্পতি। সার্লোট সুগৃহিণী ছিলেন। সংসার পরিচালনার কৌশল তাঁর আয়ত্ত থাকায়, বার্ণার্ড শ' এত দিনে পারিবারিক জীবনে একটা স্বচ্ছন্দ নিরাপত্তা উপভোগ করলেন।

লুসী রীতিমত ঈর্ষ্যা করতেন সার্লোটকে। তাঁর চিঠিপত্রে তার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়। বার্ণার্ড শ' যদিচ কর্তব্য হিসাবে তাঁর বোনটিকে প্রতিপালন করতেন, বোনের প্রতি তাঁর তেমন প্রীতি ছিল না।

লুসীর মৃত্যুর পর বার্ণার্ড শ' লিখেছিলেন—ওদের দুজনের মধ্যে সম্পর্ক তেমন মধুর ছিল না। সার্লোট আমার পরিজনবর্গকে ভয় করতো, অপছন্দ করতো, আমিও এজন্য তাকে জোর করিনি।

বিবাহের পর আর্চার, গ্রাহাম ওয়ালাস, ওলিভিয়ার প্রভৃতি বার্ণার্ড শ'র ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের সঙ্গে সংযোগও শিথিল হয়ে এসেছিল। বয়সের সঙ্গে মানুষের রুচির পরিবর্তন ঘটে, অবিবাহিত জীবনের উদ্দামতা ম্লান হয়ে আসে, বিবাহিত জীবনের আকৃতি বিভিন্ন, তাই বন্ধুজনের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়া বিচিত্র নয়।

চেষ্টারটন বলেছেন—"His enemies have accused Shaw of being anti-domestic, a shaker of the roof-tree, But in this sense Shaw may be called almost madly domestic—"

জীবনে ও সাহিত্যে বার্ণার্ড শ' তাই আদর্শ গৃহী, ঘর ছাড়া বৈরাগীর জীবন তাঁর আদর্শ নয়।

ছয়

আমাদের শরৎচন্দ্র সম্পর্কে একটা মজার গল্প প্রচলিত আছে। একজন তাঁর দেউলটির বাড়ি গিয়ে প্রশ্ন করেন—এখানে ম্যালেরিয়া কি রকম? মৃত্যুহার কত?

শরৎচন্দ্র সে প্রশ্নের সোজা জবাব না দিয়ে তাঁর বৃদ্ধ ভগিনীপতিকে দেখিয়ে বললেন—অতসব জানি না, তবে উনি বলেন এতখানি বয়স হল, বাইরে বসে যে নিশ্চিন্ত মনে তামাক টানবো সে উপায় নেই।

অর্থাৎ তাঁর চেয়েও বয়স্ক লোক গ্রামে আছে। সুতরাং মৃত্যুহার অনুমেয়।

বার্ণাড শ নানা ঠিকানায় থেকেছেন তারপর এক দিন—Ayotএর এক গির্জ্জা-প্রাঙ্গণে একটি সমাধি-ফলকে দেখলেন—"Jane Eversley (1815-1895)—Her time was short."

বার্ণার্ড শ' ভাবলেন যে অঞ্চলের মানুষ আশীবছরের পর মৃত্যুকেও অল্পজীবীর মৃত্যু বলে মনে করে, সেই দেশের আবহাওয়া নিশ্চয়ই চমৎকার, সুতরাং এইখানেই থাকা যাক।

Ayot-St. Lawrence-এ বাসা বাঁধলেন বার্ণার্ড শ, এবং জীবনের বাকী দিনগুলি সেইখানেই কাটালেন।

শহর থেকে দূরে থেকে নিরালায় সাহিত্য সাধনা করা যায় এমন একটি জায়গা শ'-দম্পতি কিছুকাল ধরে খুঁজছিলেন। হাসেলমেয়ারে প্রথম দিকে কিছুদিন থেকে হাইণ্ডহেডে গেলেন এবং সেখানে রইলেন। সেখান থেকে কর্ণওয়াল আবার ফিরে এলেন হাসেল মেয়ারে তারপর গিল্ডহেডের সেন্ট ক্যাথেরিনে, তারপর মে বেরীনল, পরে ওয়েলউনে এবং সর্বশেষে এ্যয়ট সেন্ট লরেন্স।

প্রথমে এই বাড়িটা ভাড়া নেওয়া হয়েছিল একটা উপযুক্ত বাড়ি সুবিধামত খুজে নেওয়ার জন্ম। কিন্তু ক্রমাগত বাড়ি বদল করে বোধ করি ওঁরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন, তাই এই বাড়িতেই রয়ে গেলেন। এই বাড়ির নামকরণ করা হল 'Shaw's Corner.'

বাড়ির আসবাবপত্র পছন্দ করে কিনলেন সার্লো'ট, বার্ণাড শ এ সব বিষয়ে নিস্পৃহ। প্রথমটা এই বাড়ি ভাড়া নেওয়া হয়েছিল. প্রথম মহাযুদ্ধের পর বাড়িওয়ালা জানালেন বাড়ি বিক্রী করা হবে, হয় উঠে চলে যান, নয় বাড়িটা কিনে নিন। বাড়িটা শেষ পর্যন্ত ওঁরা কিনে নিলেন। বার্ণার্ড শ'র অন্তরের মানুষ সংসারানুরাগী গৃহী।

বার্ণাড শ'র জীবনের সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি আজীবন কাজের মধ্যে ডুবে ছিলেন। এমন অসাধারণ কর্মক্ষমতা কদাচিৎ চোখে পড়ে। ১৯০০ শতকের গোড়ার দিকে রাস্তাঘাট, আলোর বন্দোবস্ত, জল নিকাশের ব্যবস্থা, ট্যাক্স, বসন্ত রোগের মহামারী নিবারণকল্পে আয়োজন প্রভৃতি বিভিন্ন ধরণের কাজে ব্যস্ত ছিলেন, তাছাড়া ফ্রি ট্রেড, বুয়র ওয়ার সম্পর্কে প্রবন্ধ রচনাও করেছেন, আর এই কালেই সকালের দিকে লিখেছেন Man and Superman—এই নাটকেও বার্ণার্ড শ' তাঁর অর্থ নৈতিক মতবাদ প্রচ্ছন্নভাবে প্রকাশ করেছেন।

বার্ণার্ড শ' কখনও আগে থেকে একটা প্লট ঠিক করে নিয়ে লিখতে বসতেন না। মোটামুটি একটা আইডিয়া ভিত্তি করে লিখতে বসতেন, তারপর প্রেরণা বশে লিখে যেতেন। আগের পাতায় কি লিখেছেন সেটুকুও উলটিয়ে দেখতেন না।

যাঁরা শান্ত দর্শনের নিভৃত অন্তরালে কালযাপন করতে ভালোবাসেন তাঁদের কিন্তু বার্ণার্ড শ'র নব্বুই দশকে রচিত প্রবন্ধের বইগুলি ছাড়া আর কিছু পড়া উচিত নয়। Man and Superman ১৯০১-এ এবং Back to Methuselah ১৯২১এ রচিত। বার্ণার্ড শ' এতদিন যাকে বলেছেন, "a passion of which we can give no account whatever." তারই অবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করেছেন। যাঁদের এই রচনা ভাল লাগে তাদের পক্ষে The Perfect Wagnerite না পড়ে Man and Superman-এর Don Juan in Hell পড়া ভালো।

বার্ণার্ড শ'র এই নাটকটিতে প্রথানুসারে রঙ্গমঞ্চের প্রয়োজনীয় তথ্যের উল্লেখ নেই, সুদীর্ঘ তৃতীয় অঙ্কটি Don Juan in Hell নামে খ্যাত। বার্ণার্ড শ'র মতে—"a careful attempt to write a new book of Genesis for the Bible of the Evolutionists."

নাট্য-সমালোচক এ, বি, ওয়েকলি একদিন বার্ণার্ড শ' যৌন সম্পর্কিত গোঁড়ামি নিয়ে রসিকতা করছিলেন, রহস্য করে বললেন—শ', ডন জুয়ান নিয়ে একটি নাটক লেখ, বেশ হবে।

তৎক্ষণাৎ বার্ণার্ড শ'র মনে পড়ল ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে লেখা Don Giovanni Explains নামক প্রবন্ধটি। এই প্রবন্ধে শ' লিখেছিলেন যে, ডন এমনই অধ্যাত্মরসে আপ্লুত ছিলেন যে, তাঁর পক্ষে নর্মলীলায় মত্ত থাকা সম্ভব নয়, তিনি বরং কামোন্মাদ রমণীদের কাছ থেকে পালিয়ে বেড়িয়েছেন। সব উপেক্ষিত রমণীরাই তাঁর দুর্নাম রটিয়েছে।

Man and Superman-এর Don Juan এই জাতীয় প্রাণী। সাম্প্রতিক কিংবদন্তী উপেক্ষা করে শ' মধ্যযুগীয় মতবাদ গ্রহণ করেছেন। এই হল শ'র প্রথম রসিকতা।

শ'র দ্বিতীয় রসিকতা—Hell বা নরক। তাঁর বিশ্বাস, অধিকাংশ মানুষ নিঃসন্দেহে 'নরক' ভালোবাসে, বার্ণার্ড শ'র মতে পৃথিবীরই অপর নাম নরক। যে জগৎ আধুনিক মানুষের আত্মিক আবাস বার্ণার্ড শ'র মতে তারই নাম নরক।

ডন জুয়ান সম্পর্কিত বার্ণার্ড শ'র এই সরস কল্পনার ফলে উচ্চতর মানবতার স্বপক্ষে তিনি কিছু বলতে পেরেছেন। আর নরক সম্পর্কিত কল্পনায় বার্ণার্ড শ'র হাতে গড়া শয়তানদের পুনর্বাসনের একটা ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ডন জুয়ানের প্রতিবাদী অথচ চরিত্র হিসাবে পরিপূরক একটি নারীচরিত্র সৃষ্টি করা হয়েছে, নারী সমাজের তিনি প্রতিনিধি। আর পুরুষ সমাজের প্রতিনিধিত্ব করার জন্ম মেয়ের বাপের চরিত্র যথেষ্ট। শয়তানের যুক্তিজালে সে বিচ্ছিন্ন।

এরা তিনজনে মিলে পৃথিবীর অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করে, শয়তান এবং জুয়ান দুজনেই পৃথিবীর নিন্দা করে। শয়তান প্রস্তাব করে যে জগতে মানুষের ধারণা তারা বাস করছে সেই জগতের পরিবর্তে যে জগতে তারা যেতে চায় সেখানে পাঠানো হোক,

পরিবর্তনের খাতিরে, আর ডন জুয়ান এক তৃতীয় ভুবনের খবর দেয়, তার নাম স্বর্গরাজ্য, বাস্তবের বাসভূমি।

অর্ধ-তৃপ্ত কামনা বাসনার কাছে যা কিছু প্রস্তাব রাখা উচিত শয়তান তাই বলে, জুয়ান সব প্রত্যাখ্যান করে, কঠোর প্রচেষ্টার প্রয়োজন। কিসের প্রচেষ্টা? মানুষ যাকে বলে প্রগতি বার্ণার্ড শ'র মত জুয়ানও তাকে উপহাস করে। তবু শ'র মতই জুয়ান একজাতীয় প্রগতিতে বিশ্বাসী, সে প্রগতির গতি অতি ধীর—সে অতি মানবিক বিবর্তন। ভবিষ্যতের গর্ভে লালিত Superman নবজন্মের আশায় গর্ভ যন্ত্রণায় আকুল।

জুয়ান বলে অতিবিস্ময়কর দেহযন্ত্র হল মানুষের মস্তিষ্ক, যেখানে বিচিত্র চিন্তাধারার জন্মভূমি—এই সৃষ্টির জন্য দায়ী Life force। মানুষের মস্তিষ্কে ভাবধারার উৎপত্তি, জীবনের চেয়ে তা বড়ো, জীবনের এক নূতনতর অতিরিক্ত আকৃতি। মানুষ সাধারণত কাপুরুষ, কিন্তু মাথায় একটা কিছু ভাব প্রবেশ করিয়ে দিলে সেই হয়ে উঠবে বীরপুরুষ। উচ্চতর ক্ষেত্রে এর মূল্য আরো বেশী, মনীষীরা এর সাহায্যে জীবনকে গভীর ভাবে উপলব্ধি করেন, নিয়ন্ত্রণ করেন।

বার্ণার্ড শ'র মতে ঈশ্বর প্রয়োজনসিদ্ধি করেন তাঁর ত্রুটি আর পরীক্ষার মাধ্যমে। যে ঈশ্বর চার্চ অব ইংলণ্ড পরিকল্পিত তিনি দেহহীন নিরাকার, ধীশক্তিহীন কামনা-ভাবনা-বাসনাহীন। ঈশ্বর সৃষ্টিশীল প্রয়োজন মাত্র (God is a creative purpose) —তাঁর সেই প্রয়োজনের খাতিরে সকল মানব-শিশুই একটা এক্সপেরিমেন্ট মাত্র। এই পারপাস বা প্রয়োজন ওরফে লাইফ ফোর্স (জীবনী-শক্তি) ওরফে এভল্যুশানারী এপেটাইট (বিবর্তনী বুভুক্ষা) ওরফে গড্—(ঈশ্বর) এত নাম তাঁর এত রূপ, তিনি কিন্তু ভীষণ ভুল করে থাকেন, আর তাঁর সেই সব ভ্রম সংশোধন করতে হয় মানুষকে।

এর ফলে পাপের উদ্ভব, অশুভের উদ্ভব, ঈশ্বর সেই সমস্যার সমাধান করেন না।

Man and superman নাটকে জর্জ বার্ণার্ড শ' এই সব কথাই বলেছেন। বার্ণার্ড শ'র প্রকৃতি বিদ্রোহী স্কুলের ছাত্রের মতো। যখন নায়ক জ্যাক ট্যানার নায়িকা ভায়োলেট হোয়াইটফিল্ডের সামনে এগিয়ে এসে তাকে অভিনন্দিত করে, বলে, জায়া হওয়ার পূর্বেই তুমি জননী হলে, আমার অভিনন্দন নাও। এই বাণী শোনার পর তরুণ সমাজ নাট্যকার জর্জ বার্ণার্ড শ'কে বরণ করলেন, তাদের হৃদয়ে শ'র জন্ম স্থায়ী আসন পাতা হল। ভায়োলেটের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন লীলা ম্যাককারথি। মেয়েটি শ'র এত ভক্ত হয়েছিল যে আহারেও বার্ণার্ড শ'কে অনুকরণ করত।

বিগত ষাট বছরে ইংরাজী নাট্য সাহিত্যে যত নাটক লিখিত তার তিনটি শ্রেষ্ঠতমের অন্যতম Man and Superman আর দুটি হল The Importance of Belng Earnest (অস্কার ওয়াইলড) এবং The Circle (সমরসেট মম)। এই একখানি মাত্র নাটক শ' তাঁর বন্ধুর নামে উৎসর্গ করেছেন, সেই বন্ধুটির নাম এ, বি ওয়েকলি, যিনি এই নাটক রচনায় শ'কে উদ্বুদ্ধ করেন।

প্রকাশান্তে নাটকটি পাঠানো হল প্রকাশক জন মারেকে, তিনি পুরাতন প্রকাশক, এই নাটক পড়ে লিখলেন—

"আমি প্রাচীনপন্থী, হয়ত কিঞ্চিৎ সেকেলে! এই নাটকের বক্তব্য এবং প্রতিপাদ্য বিষয় প্রতিষ্ঠিত মতবাদকে আহত, উত্তেজিত ও ক্ষুব্ধ করবে, অতএব আমি এই নাটক প্রকাশে অসমর্থ।"

এই চিঠি পেয়ে বার্ণার্ড শ' আহত হলেন।

এর পরই শ' ঠিক করলেন অতঃপর নিজেই নিজের বই প্রকাশ করবেন, এই সময় তাঁর আর্থিক অবস্থা অনেক স্বচ্ছল। শ' লিখেছেন, "I took matters into my own hands, and, like Herbert Spencer and Ruskin, manufactured my books myself, and induced Constables to take me on Commission"

নাটকটির আকৃতি এমন দীর্ঘ যে, নাট্য প্রযোজকদের কাছে নাটকটি তেমন লোভনীয় মনে হল না, তৃতীয় অঙ্ক অভিনয় করতেই একঘন্টা লাগে। বার্ণার্ড শ' অবস্থাটা অনুভব করে স্থির করলেন তৃতীয় অঙ্ক বাদ দিয়ে অভিনয় করলেও নাটকের ক্ষতি হবেনা। শুধু তৃতীয় অঙ্কটি বাদ দিয়ে যেমন এই নাটক অভিনীত হয়েছে তেমনই শুধুমাত্র তৃতীয় অঙ্কের দার্শনিক তত্ত্বেরও অভিনয় হয়েছে।

Man and Superman বার্ণার্ড শ'র সাফল্যজনক বিবাহের সুফল। দীর্ঘ ৪২ বৎসর দুঃখ দুর্দশায় দিন কাটানোর পর বার্ণার্ড শ' এই সর্বপ্রথম নিশ্চিন্ত নিরাপদ আশ্রয় পেয়েছেন, তাছাড়া বার্ণার্ড শ' ধনী মহিলার ঘরজামাই নন, রীতিমত উপার্জনশীল খ্যাতিমান সাহিত্যকার, এ তাঁর আত্মতুষ্টির অন্যতম কারণ।

ষ্টেজ সোসাইটি ২১শে মে ১৯০৫ Man and Superman মঞ্চস্থ করলেন। জ্যাক ট্যানারের ভূমিকায় নামলেন গ্রানভিল বার্কার। তিনি তরুণ বার্ণার্ড শ'র মত রূপসজ্জাগ্রহণ করলেন।

দুদিন পরে কোর্ট থিয়েটারে এই নাটক মঞ্চস্থ হল। এই কোর্ট থিয়েটার বার্ণার্ড শ'র জীবনের আর একটি পথচিহ্ন। এই রঙ্গমঞ্চে জর্জ বার্ণার্ড শ' নাটক, অভিনেতা-অভিনেত্রী, দর্শক সবকিছুই স্বহস্তে নিজের মনের মতো হয়ে সৃষ্টি করলেন।

নাট্যকার বার্ণার্ড শ' এত দিনে সসম্মানে প্রতিষ্ঠিত হলেন।

[ক্রমশঃ।

"Cheerfulness and content are great beautifiers, and famous preservers of youthful looks."

—Charles Dickens.

ফোয়ারা (রাশিয়া)

—রমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

দূরদর্শী

—নীলু পাল

টম্‌টম্‌ —পি, সাহানা

সাহিত্য পরিচয়

হঠাৎ কাগজের দুষ্প্রাপ্যতা

সম্প্রতি কলকাতা তথা পশ্চিম-বাঙলায় কাগজের দুষ্প্রাপ্যতা দেখা দিয়েছে অত্যন্ত প্রকটরূপে। পাঠক-পাঠিকা হয়তো জানেন না এই দুঃসংবাদ। কেন না, প্রকাশকরা কেউ এখনও একটি কথাও ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করেন নি কিম্বা প্রতিবাদ জানিয়ে একটা কিছু প্রতিবিধানের ব্যবস্থাও করলেন না 'বঙ্গীয় প্রকাশক সমিতি।' অথচ এখন থেকেই প্রকাশকদের মুখ বিষণ্ন হয়ে পড়েছে। ভবিষ্যতে পাততাড়ি গোটাতে হবে কি না কিছু জানা যাচ্ছে না। বই ছাপার কাগজ সত্যিই বাজারে অগ্নিমূল্য হয়ে উঠেছে। বহু রকমের কাগজ আর পাওয়া যাচ্ছে না। অধিকন্তু বিদেশ থেকে অনেক প্রকারের কাগজের আমদানী ভারত সরকার ইতিমধ্যে বন্ধ করে দিয়েছেন। কারণ, বিদেশী আর্ট-পেপারও "ন্যাশনেবল গুডস"-এর পর্য্যায়ে ফেলা হয়েছে। প্রকাশকদের জন্ত ধার্য্য কাগজের মধ্যে স্কুল ও কলেজ পাঠ্য-পুস্তকের ব্যবস্থাই বেশী, বাকী সাহিত্য-বিষয়ক বই—যার সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য। এখানে প্রশ্ন করলে অন্যায় হবে না, ভারত-সরকার হিন্দী-প্রচার বাবদ কি পরিমাণ কাগজ ধার্য্য করেছেন?

দেশের চাহিদা ও পাঠক-পাঠিকার দাবীকে উপেক্ষা ক'রে ভারত-সরকার ন্যায় না অন্যায় করেছেন, সে বিচারের দায়িত্ব আমাদের বাঙলা দেশের পাঠক-পাঠিকার। আপাততঃ সাহিত্যের আঙিনায় যে দুর্যোগ ঘনিয়ে এলো তাকে রোধ করতে না পারলে বাঙলা-সাহিত্যের ভবিষ্যৎ যে অন্ধকার—তা আর ভাষায় প্রকাশ করতে হবে না। আমাদের অনুরোধ, প্রকাশক ব্যবসায়ী সমিতি এই বিষয়ে যেন নীরব না থাকেন। এ ব্যবস্থা অমান্য করাই উচিত।

উল্লেখযোগ্য সাম্প্রতিক বই

গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন—২য়

অশীতি-উর্দ্ধ জ্ঞানতপস্বী ডক্টর রাধাগোবিন্দ নাথের বহু শ্রমের স্বাক্ষরবাহী গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনের দ্বিতীয় খণ্ডটি প্রকাশিত হয়েছে। জ্ঞানের জ্যোতির্ময় লোকে যাঁরা উপনীত হতে চান এই গ্রন্থপাঠে তাঁরা প্রভূত সাহায্য লাভ করবেন। গৌড়বঙ্গে যে বৈষ্ণবদর্শন একদা জন্মগ্রহণ করে মানবজীবনে সুবিপুল প্রভাব বিস্তার করেছিল এবং যার ধারা আজও বহমান, সেই সম্বন্ধে বহু মূল্যবান তত্ত্বে এই গ্রন্থটি পরিপূর্ণ। ব্রহ্মতত্ত্ব, তার সম্বন্ধে প্রস্থানত্রয় ও অন্যান্য আচার্যগণ আর জীবতত্ত্ব সম্বন্ধে এই গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে। বিদ্বজ্জনমহলে এই গ্রন্থটি উপযুক্ত সমাদর লাভ করুক কামনা করি। প্রাচ্যবাণী মন্দির, ৩ ফেডারেশান স্ট্রীট, দাম—পনেরো টাকা মাত্র।

জলপায়রা

বাঙলা কবিতার ক্ষেত্রে প্রেমেন্দ্র মিত্রের আসন যেমন অটল, তেমনই গল্পের ক্ষেত্রেও তাঁর দক্ষতা অনন্যসাধারণ, এ কথাও অনস্বীকার্য। বাঙলা ছোটগল্পের ক্ষেত্রে প্রেমেন্দ্র মিত্র এক নতুন চিন্তাধারার পরিচয় দিয়েছেন তাঁর আবির্ভাবের প্রথম লগ্ন থেকেই। জীবনের নিগূঢ় সত্যকে এক নতুন কোণ থেকে প্রত্যক্ষ করেছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। পাঠক-পাঠিকার মধ্যে আলোড়ন এনেছেন তাঁর অভিনব গল্প বলার চাতুর্যে। বর্তমানে তাঁর উপরোক্ত গ্রন্থটির গল্পগুলিও স্ব স্ব মহিমায় ভাস্বর, লালিত্যে ভরপুর, বলিষ্ঠ বক্তব্যের স্বাক্ষরে প্রস্ফুটিত। চিরদিনের ইতিহাস, এক অমানুষিক আত্মহত্যা তেলেনাপোতা আবিষ্কার, পটভূমিকা প্রভৃতি গল্পগুলি বিশেষভাবে পঠিতব্য, প্রচ্ছদশিল্প অঙ্কনে শক্তির পরিচয় দিয়েছেন য্যালফা বিটা। ত্রিবেণী প্রকাশন, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট। দাম—চার টাকা মাত্র।

জীবনের ঝরাপাতা

বাঙলা-দেশের সংস্কৃতির নব রূপায়ণে ঠাকুর পরিবারের দান বিশ্ববন্দিত। এই পরিবারের দৌহিত্রী পূজনীয়া সরলা দেবী চৌধুরাণীর আত্মস্মৃতি উপরোক্ত নামে প্রকাশিত হয়েছে। সরলা দেবী জন্মেছেন মাতুলালয়ে এবং ঠাকুরবাড়ীকে কেন্দ্র করে দেশের উপর দিয়ে যখন প্রতিভার মিছিল চলছিল, সরলা দেবী গড়ে উঠেছেন সেই সব আলোকোজ্জ্বল দিনে। সেই অমৃত-আদর্শে ভরিয়ে তুলেছেন নিজেকে, পুণ্যশ্লোক মাতামহ রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ দেশবরেণ্য মাতুলবর্গ ও ভ্রাতৃবর্গকে করেছেন প্রত্যক্ষ। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীর বহু তথ্য, বহু অজানা কাহিনী পরিবেশিত হয়েছে এতে। বহু আকর্ষণীয় উপাদানে গ্রন্থটি ভরপুর। পিছন দিকে ব্যক্তি-পরিচিতিতে অবশ্য যোগেশ বাগল কিছু ভুল তথ্য পরিবেশন করেছেন।—সাহিত্য সংসদ, ৩২।এ, আপার সারকুলার রোড। দাম—চার টাকা মাত্র।

গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান

গ্রন্থাগার একটি সমন্বয়ের ক্ষেত্রবিশেষ। কত শতাব্দী যে এখানে পাশাপাশি বিরাজ করছে, তার সীমা নেই। এখানে ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, দর্শন, সকলেই পরস্পরের বন্ধু। কারো সঙ্গে কারো বিচ্ছেদ নেই। কিন্তু এই গ্রন্থাগার পরিচালন পদ্ধতি রীতিমত বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন হয়। গ্রন্থাগার সম্বন্ধে খুঁটিনাটি তথ্য এখানে পরিবেশিত হয়েছে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার পরিচালন পদ্ধতি ও বিখ্যাত গ্রন্থাগার আন্দোলন সমূহের ইতিবৃত্তও গ্রন্থটিকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে। একটি গ্রন্থাগারের পক্ষে কি কি প্রয়োজন কিংবা কি ভাবে একটি গ্রন্থাগার চালানো হয়, এ বিষয়ে কৌতূহলী ব্যক্তিমাত্রেই এই গ্রন্থপাঠে উপকৃত হবেন। এই গ্রন্থটির

আমরা বহুল প্রচার কামনা করি।—লেখক শ্রীসুবোধকুমার মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-গ্রন্থাগারিক)। ডি, এম, লাইব্রেরী, ৪২, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট। দাম—দশ টাকা মাত্র।

ক্যাসানোভার স্মৃতিকথা

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফ্রান্সের আকাশ-বাতাস আলোড়িত করে তুলেছেন ক্যাসানোভা। সমগ্র অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে ক্যাসানোভার অনুরূপ আর একটি চরিত্র শুধু ফ্রান্স কেন, সারা জগতে খুব কম দেখা গেছে। কবি, শিল্পী, প্রেমিক, যোদ্ধা, সুপুরুষ, বীর, নির্ভীক প্রভৃতি এতগুলি গুণের সংমিশ্রণ ঘটেছিল এক ক্যাসানোভার মধ্যে। ক্যাসানোভা প্রকৃতপক্ষে ছিলেন সত্যিকারের জীবনের উপাসক। জীবন শব্দের নিগূঢ় অর্থ হয়তো তিনিই সম্যক উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বলেই বৈচিত্র্যের বন্যাধারা বয়ে গিয়েছিল তাঁর জীবনকে কেন্দ্র করে। তার আত্মস্মৃতির অনুবাদ দীর্ঘদিন ধরে মাসিক বসুমতীতে প্রকাশিত হয়েছিল। বর্তমানে তা গ্রন্থরূপ লাভ করেছে। অনুবাদিকা শ্রীমতী শান্তা বসুর অনুবাদ অভিনন্দনযোগ্য, তাঁর রচনা-ভঙ্গী মনোরম এবং অনুবাদ মাঝে মাঝে এত জীবন্ত হয়ে উঠেছে যে মনে হয় ক্যাসানোভারই মূল রচনা পড়া হচ্ছে। মূল রচনার মূল সুরটি শ্রীমতী শান্তা বসুর রচনায় কোথাও ব্যাহত হয়নি। আর্ট য়্যাণ্ড লেটার্স পাবলিশার্স, জবাকুসুম হাউস ৩৪ চিত্তরঞ্জন য়্যাভিনিউ। দাম—পাঁচ টাকা পঁচাত্তর নয়া পয়সা মাত্র।

বিজ্ঞানের ইতিহাস—২য়

বিশেষ জ্ঞানের সংক্ষেপিত নামই বিজ্ঞান। আর এই বিশেষ জ্ঞানের জন্মভূমিই ভারতবর্ষ। রোমক সাম্রাজ্যের পতনকে কেন্দ্র করে ইয়োরোপীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যখন অজন্মা দেখা দিয়ে সারা দেশে বিস্তার করল অন্ধকার, ভারতকে কেন্দ্র করে সারা এশিয়া ঠিক সেই সময়ে জ্ঞানের আলোয় উদ্ভাসিত। অবশ্য পাশ্চাত্য দেশে এই বিশেষ জ্ঞান পূর্বে ছিল না, একথা বলা যায় না—তবে তার অবলুপ্তির পর নব জন্মলাভ সম্ভবপর হয়েছে ভারতীয় বিজ্ঞানের কল্যাণে। সারা পৃথিবীতে বিজ্ঞানের আজ অসীম প্রভাব। বিশ্বের ভাগ্য এমন কি ধ্বংস ও সৃষ্টি পর্যন্ত আজ নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে বিজ্ঞানের ইশারায়। সুতরাং এর আবিষ্কার ও চিন্তাধারায় বিবর্তনের প্রামাণিক ইতিহাস আজ সকলেরই আদরের বস্তু। উপরোক্ত গ্রন্থটিতে ভারতীয় বিজ্ঞান-বেদোত্তর যুগ, আর বিজ্ঞান, ইয়োরোপীয় বিদ্যোৎসাহিতার পুনর্জন্ম, রেনেসাঁ আধুনিক বিজ্ঞানের আবির্ভাব সম্বন্ধে আলোকপাত করা হয়েছে। ইণ্ডিয়ান য়্যাসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশান অফ সায়েন্স যাদবপুর। দাম—বারো টাকা মাত্র।

স্কুলের মেয়েরা

একটি বালিকা বিদ্যালয় ও তার কয়েকটি ছাত্রীকে কেন্দ্র করে স্বনামধন্য সাহিত্যিক পরিমল গোস্বামীর উপরোক্ত গ্রন্থটি রচিত। একটি বালিকা বিদ্যালয়ের যে জীবনধারা সকলের সামনে দিয়ে বয়ে চলেছে তেমনই সকলের অজান্তে পাশাপাশিই অনুরূপ আর একটি জীবনধারা বয়ে চলেছে। এই জীবনধারার মধ্যে দিয়ে পড়াশুনা, আলোচনা, জ্ঞান-বিজ্ঞান-ইতিহাস-ভূগোল তাবা সাহিত্য বহমান নয়, এর মধ্যে দিয়ে প্রমূর্ত হয়ে উঠছে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, রেষারেষি, ঈর্ষ্যা-কলহ। বিদ্যালয়ের বিদ্যার্থিনী ছাড়াও ছাত্রীচরিত্রের আর একটি দিক দিয়ে পরিমল বাবু সেই দিকে আলোকপাত করেছেন। মাধবী, চপলা, কমলা প্রভৃতি চরিত্রগুলির সাহায্যে একটি বক্তব্য বিশেষভাবে প্রস্ফুটিত হয়েছে অর্থাৎ সাধারণ অনুমান থেকে যে চিন্তা-ধারণার সৃষ্টি—সেই শেষ নয়! তার পরেও আরো আছে। গ্রন্থটি ছাত্রী-সমাজের আনন্দ দিতে সক্ষম হবে বলে বিশ্বাস করি। রেখাচিত্রে গ্রন্থটিকে অনুপম সৌন্দর্য্যদান করেছেন প্রখ্যাত শিল্পী কালীকিঙ্কর ঘোষ দস্তিদার।—পত্রিকা সিণ্ডিকেট, পত্রিকা ভবন আনন্দ চ্যাটার্জী লেন। দাম—ছ' টাকা মাত্র।

ওরা কাজ করে

পৃথিবী আজ ভরে আছে দু'দল লোকে। সভ্যে আর অসভ্যে। এক দল চাকচিক্যে, ঔজ্জ্বল্যে ও পাণ্ডিত্যের ও রুচির নানাবিধ প্রলেপে নিজেদের ভরিয়ে রাখে আর এক দল নিঃসংশয়তার হাতে, উন্মুক্ততার হাতে, অসীমের হাতে নিজেদের অর্পণ করে আনন্দে ভরপুর। উপরোক্ত গ্রন্থের বর্ষীয়ান সাহিত্যিক পৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য শেষোক্তদের দিকেই আলোকপাত করেছেন। পৃথ্বীশচন্দ্রের চোখের সামনে ধরা পড়ে গিয়েছে দু'দলের লাভ-লোকসানের জমা-খরচের হিসেব-নিকেশ। পৃথ্বীশ বাবু অনুভব করেছেন যে অসভ্য, অশিক্ষিত হলেও পৃথিবীর অণু-পরমাণুতে যে বিধিদত্ত আনন্দের পুলকস্পর্শ ছড়িয়ে আছে, সেই অমৃত স্পর্শের আস্বাদন এই দ্বিতীয় দলের দ্বারাই হয়েছে। আর সেই স্পর্শের প্রভাবেই জীবন-মৃত্যুর উপরে যে অনন্ত জীবন বিরাজমান সেই অন্তহীন জীবনের অধিকারী এরা হতে পেরেছে। পৃথ্বীশচন্দ্রের এই গ্রন্থ পাঠে সাহিত্যরসিক মাত্রেই তৃপ্ত হবেন আশা করি। দেবশ্রী সাহিত্য সমিধ, ১১-এ তারক প্রামাণিক রোড। দাম—পাঁচ টাকা মাত্র।

কলিতীর্থ কালীঘাট

সব লেখকই যেমন সাহিত্যিক নন, তেমনই সব লেখাই সাহিত্য নয়। তবু এমন লেখারও সন্ধান পাওয়া যায়, যা সাহিত্য না হলেও পড়তে অসুবিধে হয় না। এমন বহু খাদ্য আছে যাদের নিজস্বতা বা নিজস্ব উপকারিতা কিছু না থাকলেও পঞ্চাশ ব্যঞ্জনের সঙ্গে ভূরি ভোজনের ক্ষেত্রে অনায়াসে চলে যায়। অবধূতের কলিতীর্থ কালীঘাট পড়ে এই কথায় বিশেষ করে মনে জেগে ওঠে। ভারতবাসীর কাছে কালীঘাট তীর্থবিশেষ। বহু পুণ্যার্থী নরনারীর জয়নাদে কালীঘাটের আঙিনা মুখর। সেই মহাতীর্থের পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া চরিত্রের সাহায্যে অবধূত এখানে ফোটাতে চেষ্টা করেছেন। কয়েকটি অসঙ্গতির স্বাক্ষরবাহী এই গ্রন্থটির মাধ্যমে অবধূতের সে প্রচেষ্টা কতখানি সফল হয়েছে তা বিচার করবেন রসজ্ঞ ও সুবোদ্ধা পাঠক-সমাজ। কংসারি হালদারের জীবনের শেষ পরিণতি রুচিবান পাঠকসমাজে কি ভাবে গৃহীত হবে বলতে পারি না। প্রচ্ছদচিত্র অঙ্কন করেছেন সুখ্যাত শিল্পী রণেন আয়নদত্ত। ত্রিবেণী প্রকাশন, ১০ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট। দাম—চার টাকা মাত্র।

সোহাগপুরা

ইতিহাসের দরবারে বাঙলা দেশের সাহিত্য ও কাব্য চিরঋণী। ইতিহাসের উপাদানে দিনের পর দিন ধরে নানা ভাবে বাংলা সাহিত্য নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে পুষ্ট করে তুলেছে। বঙ্কিমচন্দ্র থেকে শুরু করে বহু লেখক ইতিহাসকে আশ্রয় করে অভিনব সাহিত্য-সৃষ্টির চমৎকারিত্ব প্রদর্শন করেছেন। উপরোক্ত উপন্যাসটিও ঐতিহাসিক পটভূমিকায় রচিত। মোগল সাম্রাজ্যের পরবর্তী অধ্যায়গুলিকে কেন্দ্র করে এর কাহিনী রচিত। এই উপন্যাসপাঠে ইতিহাস ও সাহিত্যপ্রিয় ব্যক্তিমাত্রেই আনন্দলাভ করবেন। উপন্যাসের বর্ণনাভঙ্গী মনোরম, ভাষা উজ্জ্বল এবং সুখ্যাত সাহিত্যিক গজেন্দ্রকুমার মিত্রের লেখা এই উপন্যাসটিতে একটি পরম আন্তরিকতার আভাস পাওয়া যায়।—শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট। দাম—চার টাকা মাত্র।

অন্তঃপুর

বাঙলা সাহিত্যের দরবারে সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের নাম কারো অপরিচিত নয়। বাঙলা সাহিত্যে একদা সুধীরঞ্জন আলোড়ন এনেছিলেন বিস্ময় সৃষ্টি করে। সুধীরঞ্জনের উপরোক্ত গল্পগ্রন্থটি তাঁর প্রতিভার অন্যতম অপূর্ব স্বাক্ষরবাহী। মোট ন'টি গল্প এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। শেষোক্তটির নামেই গ্রন্থের নামকরণ। বাইরের চাকচিক্য যে কতখানি মূল্যহীন, সেই বিষয়ে লেখকের ইঙ্গিত সুপরিস্ফুট। অন্তরের সৌন্দর্য উপেক্ষা করে অধিকন্তু তাকে অস্বীকার করে মানুষ মোহাচ্ছন্নের মত আজ ছুটে চলেছে বাহ্যিক জৌলুষের উদ্দেশে এবং তার ফলে সে নিজের সঙ্গে সব কিছুই কখন যে হারিয়ে ফেলছে তা নিজেই বুঝতে পারে না। অন্তঃপুরের মধ্যে দিয়ে এই তত্ত্বই যেন ভেসে আসছে। বিভূতি সেনগুপ্তের প্রচ্ছদপট অঙ্কনও প্রশংসার দাবী রাখে। অভিজিৎ প্রকাশনী, ৭২।১ কলেজ ষ্ট্রীট। দাম—আড়াই টাকা মাত্র।

অন্তরতমা

নবীন সাহিত্যসেবীদের মধ্যে আজ যাঁরা জনপ্রিয়তায় বিভূষিত, বারীন্দ্রনাথ দাশ তাঁদের অন্যতম। এগারোখানি ছোট গল্পের সংকলন "অন্তরতমা" বইটিতে তাঁর লেখনীর সজীবতাই ঘোষিত হয়। প্রত্যেকটি গল্প বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। লেখকের দরদী মন ও সুমিষ্ট লেখনীর সাহায্যে গল্পগুলি পরম উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। লেখকের স্বকীয়তা, বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গী এবং সাবলীল বক্তব্য অভিনন্দনযোগ্য। প্রচ্ছদচিত্র এঁকেছেন দীপক দত্ত। বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট। দাম দু'টাকা পঁচাত্তর নয়া পয়সা মাত্র।

অবাধ্য শিশু ও শিক্ষাসমস্যা

আগামী কালের আশা ভরসা নির্ভরস্থল যারা, আজ তাদের অনেকেই শিশু। আজকে যে সকলের স্নেহের পাত্র, কাল সেই হবে সকলের নির্ভর ও শ্রদ্ধাপূর্ণ আস্থার আধার। শিশুদের উপর আমাদের আশা অন্তহীন। তাদের মানসক্ষেত্র যাতে সদাসর্বদা উর্বর ও প্রশস্ত থাকে সে দিকে আমাদের বিশেষ ভাবে দৃষ্টি রাখা উচিত। শিশুরা অবাধ্য হয় এবং আজকে সেই অবাধ্যতাই রীতিমত সমস্যার সৃষ্টি করেছে। কিন্তু এই অবাধ্যতা কোথা থেকে জন্ম নেয়, কেমন ভাবে হয় তার বিকাশ, কি ভাবে হয় তার পরিণতি, এ বিষয়ে আমরা অনেকেই উদাসীন। এই সম্বন্ধে এবং এই সমস্যার সমাধান সম্বন্ধেও শিশুমন-বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক বিভুরঞ্জন গুহ উপরোক্ত গ্রন্থে আলোকপাত করেছেন। তাঁর সুনিপুণ ও যুক্তিপূর্ণ আলোচনা প্রত্যেকটি অভিভাবককে আকৃষ্ট করবে আশা করি। এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখেছেন দেশবরেণ্য মনস্তাত্ত্বিক সুহৃৎচন্দ্র মিত্র। সরস্বতী লাইব্রেরী, ৩২ আপার সার্কুলার রোড। দাম—তিন টাকা মাত্র।

রাজা ইডিপাস

পৃথিবীর প্রাচীন সভ্যতার অন্যতম জন্মদাতা গ্রীস। সারা পৃথিবীর অধিকাংশ অন্ধকার ঘরগুলিতে ভারত প্রমুখ যে ক'টি দেশ জাগরণের মঙ্গলশঙ্খ বাজিয়েছিল, গ্রীস তাদের অন্যতম। গ্রীসের বীরেরা, যোদ্ধারা, দার্শনিক পণ্ডিতরা, সুধিবৃন্দ বহু শতাব্দীর ওপার থেকেও স্মরণের মঞ্জুষায় আজো অমর। যাদের মাধ্যমে গ্রীক সভ্যতা বিকাশ পেল, রূপ পেল, চেতনা পেল—নাটক তাদের মধ্যে অন্যতম। আর বিচ্ছেদই হল গ্রীক নাটকের প্রধান পরিণতি বা উপজীব্য। গ্রীসের বরণীয় নাট্যকার সোফোক্লিসের "রাজা ইডিপাস" নামক বিখ্যাত নাটকটি অনুবাদ করেছেন সাধনকুমার ভট্টাচার্য। বাঙলার সাহিত্যামোদী বিশেষতঃ নাট্যামোদীদের কাছে গ্রীকনাট্য সাহিত্যের পরিচয় এতে গাঢ় হবে আশা রাখি। "প্রতিভা", ২২ হ্যারিসন রোড। দাম—দু' টাকা পঁচিশ নয়া পয়সা মাত্র।

Primitive women used to dress in the furs of the animals their men killed for food. Now, devoted husbands plot and plan and toil to buy the things their ancestors tossed to their women with hardly a thought.

And what do men do in our time, once they snatch a little leisure ? They go hunting and fishing, often at enormous expense, after travelling perhaps hundreds of miles. Primitive men, on the other hand, just did it, and then, with the cave well stocked, took their ease

Perhaps our ancestors are laughing at us ?

—J. B. Priestley.

সাবধান!

আপনার সর্দি বিপজ্জনক হ'তে পারে !

গুরুতর রোগে আক্রান্ত হওয়ার পূর্বে—এই উত্তম বিশেষ কার্য্যকরী মলমটি দিয়ে সর্দির যন্ত্রণা দূর করুন!

সর্দির জ্বালা যন্ত্রণা যখন এত সহজে দূর করা যায় তখন সর্দিতে কেন ভুগবেন! শোবার সময় বুকে পিঠে ও গলায় ভিকস ভেপোরাব মালিশ করুন… আর সর্দি যেখানে যন্ত্রণা দিচ্ছে, ঠিক সেখানেই আপনি বোধ করবেন বেশ আরাম। ভিকস ভেপোরাব দ্রুত অনবরত আপনার সর্দির জ্বালা যন্ত্রণা দূর করে… আর সকাল থেকে উঠেই আপনি আবার আগের মতই সুস্থ বোধ করবেন। পরিবারের সকলের পক্ষে উপকারী।

ইহা দু'ভাবে সর্দি উপশম করে !

১ ইহা শ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে কাজ করে— ভিকস ভেপোরাব থেকে যে শক্তিশালী ঔষধের বাষ্প বেরোয় তা আপনি শ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করে গলায় ও নাকে সর্দির যন্ত্রণা দূর করতে পারেন।

২ ইহা ত্বকের ভিতর দিয়ে কাজ করে— ভিকস ভেপোরাব মালিশ করা মাত্রই ইহা ত্বকের ভিতর দিয়ে প্রবেশ করে, আপনার বুকের সর্দির ব্যথা দূর করে।

বুকে, পিঠে ও গলায় মালিশ করুন !

"Vicks VapoRub" is a Trad

এখনই ভিকস ভেপোরাব ব্যবহার করুন ঃ

নূতন **ছোট ট্রায়াল সাইজ টিন—মাত্র ৪০ নঃ পঃ ও তদুপরি ট্যাক্স।**

327-B

ধূমপানের পাইপ

মানুষের সমাজে ধূমপানের রীতি বা রেওয়াজ চলে আসছে স্মরণাতীত কাল থেকেই। তামাক, বিড়ি, সিগারেট, সিগার প্রভৃতির ব্যবহার আধুনিক যুগেও চলতি এবং সে ব্যাপক আকারে। তামাকু সেবনের পাইপ বা নলের রূপান্তর ঘটে আসছে কি ভাবে, আদিযুগে এইটি কি থেকে তৈরী হ'ত, এসকল অবশ্য আজও নিবিড় গবেষণার ব্যাপার।

ইতিহাস পর্য্যালোচনায় জানতে পারা যায়, আদিম যুগের মানুষ রকমারী জিনিস থেকে তৈরী করে নিতো ধূমপানের উপযোগী পাইপ বা নল। এস্কিমোরা তামাকু সেবনের খোল বা কল্কের জন্যে সিন্ধুঘোটকের (ওয়ালরাস) দাঁত, প্রস্তরখণ্ড ও ক্ষেত্রবিশেষে উইলো গাছের পল্লব ব্যবহার করতো। চীনা কুলি এবং ভারতীয় ও শ্যামদেশীয় কৃষকদের ভেতর ফাঁপা বেত বা বাঁশের পাইপের ব্যবহার ছিল। পারস্যের মেষপালকরা ভোজশেষে পরিত্যক্ত মেষশাবকের জানুসন্ধি দ্বারা পাইপ তৈরী করে ব্যবহার করতো বলেও জানা যায়। লণ্ডনের ভিক্টোরিয়া ও আলবার্ট মিউজিয়ামে একটি অপূর্ব্ব ধরণের পাইপ রক্ষিত আছে। ধূমপানের যন্ত্র হিসাবে উহা অতীত দিনে একটি ক্ষুদ্র শিশুর উরুদেশের অস্থি দিয়ে তৈরী হয়। এই পাইপটির গায়ের কৃষ্ণাভ বাদামী রঙ দেখলেই অনুমিত হবে যে, দীর্ঘকাল উহা স্বচ্ছন্দে ব্যবহৃত হয়েছে। হরিণের শিঙ, উটপাখীর হাড়, তিমির অস্থি, হাতীর দাঁত, লৌহ, পিতল, এলুমিনিয়ম, চীনামাটি প্রভৃতি বহু জিনিস নিয়ে পাইপ তৈরী করার তথ্য জানতে পারা যায়।

প্রসঙ্গতঃ, 'ব্রায়ার' পাইপ নামে পরিচিত একটি বিশেষ ধরণের পাইপের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ধূমপান বা তামাকু সেবনের এই যন্ত্রটি কিন্তু ব্রায়ার গাছের কাঠ থেকে ঠিক তৈরী হয় না। এ তৈরীর জন্যে ব্যবহৃত হয় এক জাতীয় শ্বেতবর্ণ বুনো গাছের (এরিকা আরবোরিয়া) শিকড়। এই গাছগুলো বহুল পরিমাণে জন্মে থাকে উত্তর আফ্রিকা ও করসিকায়। একটি চমৎকার ঘটনাকে কেন্দ্র করে এই পাইপের ব্যবহার চলতি হয় এক সময়ে। নেপোলিয়ানের জন্মস্থল সন্দর্শনের জন্ম কত ফরাসী করসিকায় গিয়ে থাকেন। এর ভেতর এমন একজন গিয়েছিলেন—কাঠের জিনিসপত্র তৈরী করা ছিল যাঁর পেশা। সেণ্ট ক্লডবাসী এই লোকটি পথিমধ্যে আপনার সখের পাইপখানা হারিয়ে ফেলেন। করসিকায় একজন ছুতার মিস্ত্রীকে এই দ্বীপে যে শক্ত কাঠ রয়েছে, তাই দিয়ে একটি পাইপ নির্ম্মাণ করে দেবার অনুরোধ জানালেন তিনি। যথাসময়ে পাইপটি তাঁর হস্তে অর্পিত হলে জানা গেল—এইটি স্থানীয় 'ব্রায়ার' গাছের শিকড় দিয়ে সযত্নে তৈরী। ফরাসী সফরকারী আনন্দে আটখানা হয়ে গেলেন, তাঁর হারানো পাইপের স্মৃতি তখন মন থেকে মুছে গেছে। ফ্রান্সে ফিরে এসে ঐ বুনো গাছের শিকড় সংগ্রহ করে তিনি নতুন ধরণের বহু পাইপ তৈরী করলেন। লক্ষ্য করবার যে, উক্ত লোকটির বাসভূমি সেণ্ট ক্লডই আজ বিশ্বে 'ব্রায়ার' পাইপের সর্ব্বপ্রধান কেন্দ্র।

এক্ষেত্রে আর একটি কথা বা বলতে হয়—তামাকের অন্যান্য সাধারণ পাইপ অপেক্ষা 'ব্রায়ার' পাইপের দাম বেশ বেশী। স্থায়িত্ব ও কার্য্যকারিতার দিক থেকেই 'ব্রায়ার' পাইপের অধিক মূল্য নির্দ্ধারিত হয়েছে, এরূপ মনে করা অনুচিত হবে না। অবশ্য নতুন ও নরম শিকড় দিয়ে যে 'ব্রায়ার' পাইপ তৈরী করা হয়, তার দাম তুলনায় পুরানো শিকড়ের তৈরী পাইপের চেয়ে কম।

ধূমপানের পাইপ বা নল ক্রমেই উন্নত ধরণের করে তুলবার জন্যে নানা গবেষণা ও আবিষ্কার চলেছে। এ বিষয়ে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রই অপরাপর দেশের চেয়ে অনেকখানি তৎপর। সেখানে সর্ব্বাধুনিক যে পাইপ চালু হয়েছে—আগুন ধরান, সাফাই করা প্রভৃতি সকল দিক থেকে উহা স্বয়ংক্রিয়। লণ্ডনের একজন পাইপ নির্ম্মাতা মোটরচালকদের ব্যবহারের জন্যে একটি বিশেষ ধরণের পাইপ আবিষ্কার করেছেন। এই পাইপটি মোটর গাড়ীর ড্যাশ-বোর্ডে আটকে রাখা চলে এবং একটি রাবার টিউবের সহায়তায় অনায়াসেই চলতি পথে ধূমপানের আরাম উপভোগ করা যায়।

চীনামাটি ছাড়াও অপর কতক ধরণের মাটি দিয়ে তৈরী করা পাইপ বা নলের ব্যবহার চালু আছে বহু দেশে। পশ্চিমী রাজ্যগুলোতে নারীদের মধ্যে এই পাইপের ব্যবহার বিস্তর দেখতে পাওয়া যায়। স্কটল্যাণ্ড, আয়ারল্যাণ্ড ও হল্যাণ্ড—এই কয়টি দেশের নাম এ প্রসঙ্গে বিশেষ ভাবে করা চলে। এ সকল জায়গায় কৃষক রমণীরা মৃত্তিকা নির্ম্মিত পাইপ ব্যবহারে খুবই অভ্যস্ত এবং এইটি তাদের নিকট বিশেষ প্রিয়ও বটে। ইংল্যাণ্ডে প্রথম যে নারীটি ধূমপানের জন্য পাইপ ব্যবহার করে, খুব সম্ভব তার নাম ছিল ম্যারী ফ্রিথ ওরফে মল্লি কাটপার্স। ১৫৮৪ খৃষ্টাব্দে লণ্ডন সহরেই এই নারীর জন্ম হয়েছিল বলে জানা যায়। মোটের উপর, সুদূর অতীতে যে পাইপ ব্যবহারের সূত্রপাত হয়, কালক্রমে তাহাই নানা রূপ নিয়ে সর্ব্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। বলতে কি, চাহিদা বৃদ্ধির দরুণ আজিকার বিশ্বে এইটি নিঃসন্দেহ হয়ে দাঁড়িয়েছে একটি প্রকাণ্ড অর্থকরী শিল্প।

পশ্চিমবঙ্গে রেয়ার চাষ

রেয়া বা 'রেমি' গাছের চাষ এদেশে এখন পর্য্যন্ত তেমন নেই, কিন্তু অর্থনৈতিক দিক থেকে এর যে গুরুত্ব রয়েছে, সেইটি অনস্বীকার্য্য। রেয়া হতে লম্বা আঁশযুক্ত এক প্রকার তুলা উৎপাদিত হয় এবং সেই তুলা থেকে তৈরী হয় উৎকৃষ্ট ধরণের সূতা। এই সূতার সাহায্যে অনায়াসেই উন্নত ধরণের কাপড়, জেলেদের জাল প্রভৃতি উৎপাদন করা যায়। পরীক্ষা ও গবেষণায় দেখা গেছে—রেশম অপেক্ষাও এইটি অনেক শক্ত, এবং টেঁকসই। সাধারণ তুলাজাত বস্ত্রের চেয়েও রেয়াজাত বস্ত্রের স্থায়িত্বকাল বহুল পরিমাণে বেশী বলে দাবী করা হয়।

পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি ও কুচবিহার জেলার কোন কোন অঞ্চলে রেয়ার চাষ ছিল। এখনও যে একেবারে নেই, তা নয়; তবে এই চাষ আজ বলতে গেলে বিলুপ্তির পথে। এর জন্ত অবশ্য নানা অবস্থা ও ব্যবস্থাই দায়ী। এই গাছটির নাম সব জায়গায় কিন্তু একরূপ নয়। জলপাইগুড়ি এলাকায় এর রেয়া বা 'রিয়া' নামে পরিচিতি। অপর দিকে কুচবিহারে এর চলতি নাম কুস্কুরা। রেয়া বা 'রেমি'র অপর একটি নাম চীনাঘাস।

এই রাজ্যে কি ভাবে রেয়া চাষের প্রসার হতে পারে এবং এ থেকে বস্ত্র বয়ন উপযোগী তুলা উৎপাদন করা যায়, এ সম্পর্কে সরকারী পর্য্যায়ে গবেষণা করা হচ্ছে বহু দিন। জাপান ও নিউজিল্যাণ্ডে রেয়ার প্রচলন তুলনায় অনেক বেশী। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয় জাপান থেকে রেয়া আমদানীর ব্যবস্থা করেন এবং প্রথমে ব্যারাকপুরে ও পরে জলপাইগুড়ির কোন কোন ক্ষেত্রে এর চাষের পরীক্ষা চালান হয়। পশ্চিমবঙ্গে উৎপন্ন রেয়া থেকে এরই ভেতর সাফল্যের সঙ্গে তুলাও সংগ্রহ করা হয়েছে। এরূপ জানা গেছে—রাজ্য সরকার পশ্চিমবঙ্গে লম্বা আঁশযুক্ত রেয়ার চাষ বৃদ্ধির একটি কার্য্যকরী পরিকল্পনা নিয়েছেন। এই পরিকল্পনা অনুসারে আসছে বছরে একমাত্র জলপাইগুড়িতেই এই গাছের চাষ করা হবে মোটামুটি এক হাজার একর জমিতে। চলতি বছরেও অন্ততঃ এক শত একর জমিতে রেয়া বা 'রেমি' চাষের ব্যবস্থা হয়েছে বলে কর্তৃপক্ষ দাবী রাখছেন।

দেশের বস্ত্রের বিপুল চাহিদা মেটাবার জন্য পরিপূরক ব্যবস্থা হিসাবে রেয়ার চাষ বৃদ্ধি করা অত্যাবশ্যক। অবশ্য এর জন্য সরকারী সাহায্য ও তত্ত্বাবধান পর্য্যাপ্ত থাকা চাই। মাঝে মাঝে রেয়া বা 'রেমি'জাত বস্ত্রাদির প্রদর্শনীর ব্যবস্থা এবং রেয়া চাষের বিধি-ব্যবস্থা ও উপযোগিতা সম্পর্কে প্রচার-পুস্তিকা বিলি হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়।

সুপারী উৎপাদনে ভারত

ভারতীয় গৃহে সুপারী একটি নিত্য ব্যবহার্য্য পণ্যের অন্তর্ভুক্ত। দৃশ্যতঃ পাণের সঙ্গেই এর বহুল ব্যবহার বটে, কিন্তু তা ছাড়াও অন্য নানা ভাবে ও নানা কাজে এইটি ব্যবহৃত হয়। খাওয়ার পর বা অমনি চলতি পথে সুপারী চিবাইতে অভ্যস্ত, এমন লোকের সংখ্যা এদেশে বেশ প্রচুর। তার পর পূজা-পার্বণ ও সামাজিক উৎসব অনুষ্ঠানাদিতে সুপারী না হলেই নয়। এরকম নানা কারণে সুপারী ঠিক একটি সাধারণ অপ্রয়োজনীয় পণ্যের পর্য্যায়ে পড়ে না, উহা সত্যি একটি মূল্যবান ও অপরিহার্য্য সামগ্রীরূপে গণ্য।

ভারতে সুপারীর চাহিদা যে বিপুল পরিমাণ, তাহা কোন হিসাব বা পরিসংখ্যানের অপেক্ষা রাখে না। অথচ সেদিন অবধি এদেশে এর চাষের সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা ছিল না বললেই চলে। ফলে ভারতের সুপারীর ব্যাপারে বৈদেশিক আমদানীর উপর নির্ভর করতে হচ্ছে প্রায় বরাবরই। রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জ্জিত হবার পর এদিকে জাতীয় সরকারের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছে, সন্দেহ নেই। কিন্তু এখন অবধি পরনির্ভরতার অবসান ঘটেনি, সেইটি দুঃখের হলেও স্বীকার করতে হবে।

একটি সরকারী হিসাব থেকে জানতে পারা যায় যে; ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বর্ত্তমানে মোটামুটি ২ লক্ষ ৬০ হাজার একর জমিতে সুপারীর চাষাবাদ হয়। এই থেকে বাৎসরিক সুপারী উৎপাদনের পরিমাণ হচ্ছে ২২ লক্ষ মণের কিছু বেশী। এ প্রসঙ্গে একটা বিষয় অবশ্য লক্ষ্য করবার—ভারতীয় মাটিতে সুপারীর ফলন মালয় প্রভৃতি দেশের সুপারী গাছের ফলন অপেক্ষা কম হয়ে থাকে। বলা হয় যে, এর প্রধান কারণ প্রাকৃতিক অবস্থা ও আবহাওয়া। আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে সুপারী চাষের যথেষ্ট অনুকূল প্রাকৃতিক অবস্থা বিদ্যমান। সেজন্ত সেখানে এর চাষ যাতে সম্প্রসারিত হয়, সরকার সেদিকে কিছুটা নজর দিয়েছেন।

সুপারী চাষের উন্নতি এবং উৎপাদন বৃদ্ধির জন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের খাদ্য ও কৃষি-মন্ত্রণালয়ের কয়েকটি উত্তম ও পরিকল্পনার কথা জানতে পারা যায়। উন্নততর পদ্ধতিতে চাষ, জল সেচের'ব্যবস্থা, নূতন সুপারী বাগান সৃষ্টি, কীটাদি ধ্বংসের ব্যবস্থা এ সকলই সরকারী পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত। সরকার দাবী করেন যে, উক্ত কর্ম্মসূচী ঠিক ভাবে অনুসৃত হ'লে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা শেষে ভারতে সুপারীর উৎপাদন বেড়ে যাবে অন্ততঃ শতকরা ২৫ ভাগ।

দেশে সুপারীর ফলন বৃদ্ধির জন্ত কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৫৫ সালে দক্ষিণ কানাড়ায় একটি কেন্দ্রীয় সুপারী গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করেছেন। বর্ত্তমানে মাদ্রাজ, কেরল ও মহীশূরে তিনটি আঞ্চলিক গবেষণা কেন্দ্র আছে এবং পর পর দেশের অভ্যন্তরে আরও কয়েকটি গবেষণা কেন্দ্র স্থাপিত হবে, অন্ততঃ সরকার এরূপ পরিকল্পনা রাখছেন। নতুন বাগান সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ভারতের কেন্দ্রীয় সুপারী কমিটি আসাম ও পশ্চিমবঙ্গে সুপারীর চারা তৈরী করবার ব্যবস্থা করেছেন কতকগুলো নির্দিষ্ট জায়গায়। আসাম, পশ্চিমবঙ্গ, মাদ্রাজ, বোম্বাই, মহীশূর—এ কয়টি স্থলে বছরে অন্যূন ৫০ হাজার সুপারীর চারা বিলি করা হচ্ছে—এইটিও একটি সরকারী পরিসংখ্যান।

পূর্ব্বেই বলা হলো, বর্ত্তমান ব্যবস্থাধীনে ভারতে বছরে সুপারী উৎপাদিত হয় ২২ লক্ষাধিক মণ। এ দ্বারা দেশের সম্পূর্ণ চাহিদা মিটে না এবং সেজন্ত বছরে প্রায় ১০ লক্ষ মণ সুপারী আমদানী করতে হয় ভারতকে বিদেশ থেকে। মালয়, সিঙ্গাপুর ও সিংহল—এই অঞ্চলগুলো থেকেই উক্ত সুপারী রপ্তানী হয়ে আসে।

সুপারী গাছ ও সুপারী নানা ভাবে মানুষের উপকারে নিয়োজিত হয়ে আসছে। বলতে গেলে, সুপারী গাছের সামান্ত অংশও অপ্রয়োজনীয় বলে ফেলে দেওয়া হয় না। অপর দিকে নানা অত্যাবশ্যক ব্যাপারে বিশেষ ভাবে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কালি প্রস্তুত করতে সুপারী অপরিহার্য্য। বিদেশ থেকে সুপারী আমদানী করতে যেয়ে ভারতকে এখনও বছরে কমপক্ষে ৩।৪ কোটি টাকা দিতে হয়। সরকারী উত্তম ও সহযোগিতা অব্যাহত থাকলে এবং সুপারী চাষের গুরুত্ব সম্পর্কে জনগণ ক্রমেই অধিক সচেতন হয়ে উঠলে অন্ততঃ এ টাকাটা বাঁচবে এবং সুপারীশিল্পও ভারতের একটি প্রধান শিল্পের মর্য্যাদা পাবে।

বিবেকানন্দ স্তোত্রে

সুমণি মিত্র

৬৪

"Ah,
That most marvellous
Passage of his life,
The most difficult to understand,
And which
None aught to attempt to understand
Until
He has become perfectly chaste and pure,
That most
Marvellous expansion of love
Allegorised
And expressed
In that beautiful play at Brindaban,
Which
None can understand
But he
Who has become mad with love
Drunk deep
Of the cup of love !

Who can understand
The throes of the love of the Gopies—
The very ideal of love,
Love
That wants nothing,
Love
That even does not care for heaven,
Love
That does not care
For anything in this world,
Or the world to come ?"[১]

*　　　*　　　*

নাস্ত্যেব তাস্মংস্তত্‌ সুখসুখিত্বম্‌ ।[২]

*　　　*　　　*

"গোপীগণের প্রেম রূঢ় মহাভাব নাম ।
বিশুদ্ধ নির্ম্মল প্রেম কভু নহে কাম ॥

*　　　*　　　*

'প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাম্‌ ।
ইত্যুদ্ধবাদয়োঽপ্যেতং বাঞ্ছন্তি ভগবৎপ্রিয়াঃ ।'[৩]

*　　　*　　　*

কাম প্রেম দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ ।
লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপে বিলক্ষণ ॥
আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি বাঞ্ছা তারে বলি কাম ।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম ॥
কামের তাৎপর্য নিজ সম্ভোগ কেবল ।
কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্য হয় প্রেম মহাবল ॥
লোকধর্ম্ম বেদধর্ম্ম দেহধর্ম্ম কর্ম্ম ।
লজ্জা ধৈর্য্য দেহসুখ আত্মসুখ মর্ম্ম ॥
দুস্ত্যজ আর্য্যপথ নিজ পরিজন ।
স্বজনে করয়ে যত তাড়ন ভর্ৎসন ॥

১। "তাঁর জীবনের সেই সর্বোত্তম অধ্যায়ের কথা মনে পোড়ছে, যা অতি দুর্বোধ্য। যতোক্ষণ পর্যন্ত কেউ পূর্ণ ব্রহ্মচারী এবং পবিত্র না হোচ্ছে, ততোক্ষণ পর্যন্ত তার বৃন্দাবনলীলা বোঝবার চেষ্টা করা উচিত নয়। সেই গোপীপ্রেমের চূড়ান্ত বিকাশ—যা' সেই বৃন্দাবনের মধুর লীলায় রূপকভাবে বর্ণিত হোয়েছে, প্রেম-মদিরা পানে যে একেবারে প্রেমোন্মত্ত হোয়েছে, সে ছাড়া আর কেউ তা' বুঝতে সক্ষম নয়। কে সেই গোপীদের বিরহযন্ত্রণার ভাব বুঝবে, যে-প্রেম প্রেমের চরম আদর্শস্বরূপ, যে-প্রেম আর কিছুই চায় না, যে-প্রেম স্বর্গ পর্যন্তও কামনা করে না, ইহলোক বা পরলোকের কোনো বস্তুই আকাঙ্ক্ষা করে না ?"—*Sages of India (Complete works, Vol III, Page* 257).

২। "দৈহিক ভালোবাসায় প্রেমিকা প্রেমিকের সুখে আনন্দ অনুভব করে না।"—ভক্তিসূত্র, দেবর্ষি নারদ (২৪)

এই সূত্রে দেবর্ষি নারদ বোলতে চাইছেন যে, দৈহিক প্রেমে প্রেমিকা আত্মসুখের জন্যেই প্রেমিককে ভালোবাসে, প্রেমিকের আনন্দে আনন্দলাভ করবার জন্যে নয়। জাগতিক ভালোবাসার পাত্র হোলো মানুষ, কিন্তু গোপিনীরা ভালোবেসেছিলেন স্বয়ং ভগবানকে এবং ভগবান-বুদ্ধিতেই ভগবানকে ভালোবেসেছিলেন, মানুষ-বুদ্ধিতে নয়। এই কারণেই তাঁদের প্রেমে ইন্দ্রিয়চর্চার কোনো স্থান ছিলো না। আত্মসুখের জন্য তাঁরা কৃষ্ণকে ভালোবাসেননি, কৃষ্ণের সুখের জন্যই কৃষ্ণকে ভালোবেসেছিলেন। তাঁদের যা' কিছু ছিলো—দেহ, মন, বুদ্ধি, সৌন্দর্য, যৌবন, এমন কি নিজেদের জীবন পর্যন্তও শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে তাঁরা নিবেদন কোরেছিলেন। তাঁদের বিশ্বাস—তাতে তাঁদের প্রেমাস্পদ আনন্দলাভ কোরবেন। তাঁদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য—সর্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণের আনন্দ বর্ধন করা। আর কাম ও প্রেমের পার্থক্যই হোলো এইখানে। একটাতে প্রেমিকা আত্মসুখের জন্যে প্রেমিককে ভালোবাসে, আর একটাতে প্রেমিকা প্রেমিকের সুখার্থে সর্বস্ব নিবেদন কোরে আনন্দ পায়।

৩। 'গোপিনীদের পবিত্র প্রেমই 'কাম' এই আখ্যায় প্রসিদ্ধিলাভ কোরেছে। এইজন্যে ভগবানের প্রিয় উদ্ধব প্রভৃতি মহাত্মারাও ঐ প্রেম কামনা করেন।' —ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

সর্ব্বত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন।
কৃষ্ণসুখ হেতু করে প্রেমের সেবন॥
ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণ দৃঢ় অনুরাগ।
স্বচ্ছ ধৌত বস্ত্রে যৈছে নাহি কোন দাগ॥
অতএব কামপ্রেমে বহুত অন্তর।
কাম অন্ধতম প্রেম নির্ম্মল ভাস্বর॥
অতএব গোপীগণে নাহি কামগন্ধ।
কৃষ্ণসুখ লাগি মাত্র কৃষ্ণে সে সম্বন্ধ॥

* * *

'যত্তে সুজাতচরণাম্বুরুহং স্তনেষু,
ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধীমহি কর্কশেষু।
তেনাটবীমটসি তদ্ ব্যথতে ন কিং স্বিৎ,
কূর্পাদিভির্ভ্রমতি ধীর্ভবদায়ুষাং নঃ॥' ৪

*

আত্মসুখ-দুঃখে গোপীর নাহিক বিচার।
কৃষ্ণসুখ হেতু চেষ্টা মনো-ব্যবহার॥
কৃষ্ণ বিনা আর সব করি পরিত্যাগ।
কৃষ্ণসুখ হেতু করে শুদ্ধ অনুরাগ॥

* * *

'এবং মদর্থোজ্ঝিতলোকবেদ
স্বানাং হি বো ময্যনুবৃত্তয়েঽবলাঃ।
ময়া পরোক্ষং ভজতা তিরোহিতং,
মাসূয়িতুমার্হথ তৎ প্রিয়ং প্রিয়াঃ॥' ৫

* * *

কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা এক আছে পূর্ব্ব হৈতে।
যে যৈছে ভজে কৃষ্ণে তারে ভজে তৈছে॥

* * *

'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥' ৬

* * *

৪। 'গোপিনীরা বোল্লেন, হে প্রিয়! তোমার যে কোমল চরণকমল আমরা আমাদের কঠিন স্তনের ওপর সভয়ে ধীরে ধীরে ধারণ কোরি, সেই চরণকমল দ্বারা তুমি এখন বনভ্রমণ কোরছো; তোমার সেই পাদপদ্ম কি উপলখণ্ডের দ্বারা ব্যথিত হোচ্ছেনা? নিশ্চয়ই হোচ্ছে—এই ভেবে আমাদের মন অত্যন্ত কাতর হোচ্ছে, কেননা তুমিই আমাদের জীবনস্বরূপ।"
—শ্রীমদ্ভাগবত (১০ম স্কন্ধ, ৩১ অধ্যায়, ১১ শ্লোক)।

৫। 'শ্রীভগবান বোলেছিলেন, হে গোপীগণ! তোমরা আমার জন্যে লোকধর্ম, বেদধর্ম, ও আত্মীয়স্বজন বিসর্জন কোরেছো সত্য, তবুও আমার প্রতি তোমাদের অনুবৃত্তির আধিক্য হবে বোলে অর্থাৎ সমস্ত চিন্তা ভুলে নিরন্তর আমাকেই তোমরা চিন্তা কোরবে বোলে আমি অন্তর্দ্ধান কোরেছিলাম; অথচ তোমরা আমায় দেখতে না পাও, এইরূপে আমি তোমাদেরই ভজনা কোরছিলাম। অতএব হে প্রিয়াগণ! প্রিয়জনের প্রতি দোষারোপ করা তোমাদের উচিত নয়।' —শ্রীমদ্ভাগবত (১০ম স্কন্ধ, ৩২ অধ্যায়, ২০ শ্লোক)

৬। 'যারা যে ভাবেই আমাকে আরাধনা করে, তাদের প্রতি আমি ঠিক সেইভাবেই অনুগ্রহ প্রদর্শন কোরি। হে পার্থ, সকলেই আমার প্রদর্শিত পথের অনুগামী।' —শ্রীমদ্ভগবত গীতা (৪।১১)।

সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হৈল গোপীর ভজনে।
তাহাতে প্রমাণ কৃষ্ণ শ্রীমুখবচনে॥

* * *

'ন পারয়েঽহং নিরবদ্য সংযুজাং,
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মাভজন্ দুর্জ্জরগেহশৃঙ্খলাঃ,
সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা॥' ৭

* * *

তবে যে দেখিয়ে গোপীর নিজ দেহে প্রীত।
সেহো তো কৃষ্ণের লাগি জানিহ নিশ্চিত॥
এই দেহ কৈল আমি কৃষ্ণে সমর্পণ।
তাঁর ধন তাঁর এই সম্ভোগসাধন॥
এ দেহ দর্শন স্পর্শে কৃষ্ণসন্তোষণ।
এই লাগি করেন দেহের মার্জ্জন ভূষণ॥ ৮

* * *

'নিজাঙ্গমপি যা গোপ্যো মমেতি সমুপাসতে।
তাভ্যঃ পরং ন মে পার্থ নিগূঢ়প্রেমভাজনম্॥' ৯

* * *

"This is the
Highest idea to picture.
The highest thing
We can get out of him
Is 'Gopijanaballabha',
The Beloved of the Gopis
Of Brindavan.

When that madness
Comes in your brain,
When you understand
The blessed Gopis,
Then you will understand
What love is.

When the whole world will vanish,
When all other considerations
Will have died out,
When
You become pure-hearted
With no other aim,

৭। 'শ্রীকৃষ্ণ বোলেছিলেন, হে সুন্দরীগণ! তোমাদের সঙ্গে আমার প্রেমসংযোগ নির্মল, আমি দেবতাদের পরমায়ু পেলেও তোমাদের প্রত্যুপকার কোরতে পারবো না; কারণ দুশ্ছেদ্য গৃহশৃঙ্খল ছেদন কোরে তোমরা আমাকে ভজনা কোরেছো। আমি তোমাদের ঋণপরিশোধ কোরতে সমর্থ নই; অতএব তোমাদের নিজেদের সাধুব্যবহার দ্বারাই তোমাদের সাধুব্যবহারের বিনিময় হোলো অর্থাৎ আমি প্রত্যুপকার কোরে অ-ঋণী হোতে পারলাম না, তোমাদের শীলতার দ্বারাই তোমরা সন্তুষ্ট হও।'
—শ্রীমদ্ভাগবত (১০ম স্কন্ধ, ৩২ অধ্যায়, ২২ শ্লোক)।

৮। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, আদিলীলা।

৯। শ্রীকৃষ্ণ বোলেছিলেন, 'হে অর্জুন! যেসব গোপিকারা নিজেদের দেহকেও আমার ভোগ্য বোলে যত্ন করেন, তাঁরা ছাড়া আমার প্রেমপাত্র অন্য কেউই নেই।'—গোপীপ্রেমামৃত (৩৪)

Not even
The search after truth,
Then and then alone
Will come to you
The madness of that love,
The strength
And the power of that infinite love,
Which the Gopis had,
That love for love's sake." ১০

৬৫

"আর এক অদ্ভুত গোপীভাবের স্বভাব।
বুদ্ধির গোচর নহে যাহার প্রভাব॥
গোপীগণ করেন যবে কৃষ্ণদরশন।
সুখ-বাঞ্ছা নাহি সুখ হয় কোটিগুণ॥
গোপিকাদর্শনে কৃষ্ণের যে আনন্দ হয়।
তাহা হৈতে কোটিগুণ গোপী আস্বাদয়॥
তাঁ সবার নাহি নিজ সুখ অনুরোধ।
তথাপি বাড়য়ে সুখ পড়িল বিরোধ॥
এ বিরোধের একমাত্র দেখি সমাধান।
গোপিকার সুখ কৃষ্ণসুখে পর্য্যবসান॥
গোপিকা-দর্শনে কৃষ্ণের বাড়ে প্রফুল্লতা।
সে মাধুর্য্য বাড়ে যার নাহিক সমতা॥
'আমার দর্শনে কৃষ্ণ পাইল এত সুখ।'
এত সুখে গোপীর প্রফুল্ল অঙ্গ মুখ॥
গোপীশোভা দেখি কৃষ্ণের শোভা বাড়ে যত।
কৃষ্ণ-শোভা দেখি গোপীর শোভা বাড়ে তত॥
এইমত পরস্পর পড়ে হুড়াহুড়ি।
পরস্পর বাড়ে কেহ মুখ নাহি মুড়ি॥
কিন্তু কৃষ্ণের সুখ হয় গোপী-রূপগুণে।
তাঁর সুখে সুখ বৃদ্ধি হয় গোপীগণে॥
অতএব সেই সুখে কৃষ্ণসুখ পোষে।
এই হেতু গোপী-প্রেমে নাহি কামদোষে॥ ১১

*　　*　　*

'উপেত্য পথি সুন্দরীততিভিরাভিরভ্যর্চ্চিতং
স্মিতাঙ্কুরকরম্বিতৈর্নটদপাঙ্গভঙ্গীশতৈঃ।
স্তনস্তবকসঞ্চরন্নয়নচঞ্চরীকাঞ্চলং
ব্রজে বিজয়িনং ভজে বিপিনদেশতঃ কেশবম্।" ১২

৬৬

স্বামিজী যথার্থ বোলেছেন,
অশুদ্ধ আত্মারা
কি বুঝবে গোপীদের প্রেম ?
যে-প্রেম কামনাহীন,
না-পাওয়ার নেই যাতে ক্ষোভ,
স্বর্গ বা মুক্তির
এমনকি নেই যাতে লোভ,
সে-প্রেম হৃদয়-হ্রদে
বাসনার বুদ্বুদ নিয়ে,
কামনা-মাজন মনে
কোনোদিন বোঝা সম্ভব ?

*　　*　　*

"Aye,
Forget first
The love for gold,
Name and fame
And
This little trumpery world of ours.
Then, only then,
You will understand
The love of the Gopis,
Too holy
To be attempted
Without giving up everything,
Too sacred
To be understood
Until
The soul has become
Perfectly pure.

People
With ideas of sex,
And of money,
And of fame,
Bubbling up
Every minute in the heart,
Daring to criticise
And
Understand the love of the Gopis!
That is the very essence
Of the Krishna Incarnation." ১৩ [ক্রমশঃ।

১০। "এই হোচ্ছে শ্রেষ্ঠতম আদর্শ। আমরা 'গোপীজনবল্লভ', বৃন্দাবনের সেই রাখালরাজার চেয়ে আর কোনো উচ্চতর আদর্শ পাই না। যখোন তোমাদের মস্তিষ্কে এই প্রেমোন্মত্ততা আসবে, যখোন তোমরা মহা ভাগ্যবতী গোপীদের ভাব বুঝবে, তখোনই তোমরা জানতে পারবে—প্রেম কি বস্তু। সমগ্র জগৎ যখোন তোমাদের দৃষ্টিপথ থেকে অন্তর্হিত হবে, যখোন তোমাদের হৃদয়ে অন্য কোনো কামনা থাকবে না, যখোন তোমাদের সম্পূর্ণ চিত্তশুদ্ধি হবে, কোনো দিকে কোনো লক্ষ্য থাকবে না, এমন কি যখোন তোমাদের সত্যানুসন্ধানের স্পৃহা পর্যন্তও থাকবে না, তখোনই তোমাদের হৃদয়ে সেই প্রেমোন্মত্ততার আবির্ভাব হবে, তখোনই বুঝবে—গোপীদের নিষ্কাম, অহেতুক, সেই অসীম প্রেমের শক্তিটা কি।' —*Sages of India* (*Complete works, Vol III, Page* 260).

১১। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, আদিলীলা।

১২। 'যিনি বন থেকে ফেরবার সময়ে স্মিতশোভিত নটনশীলকটাক্ষভঙ্গীশত দ্বারা ব্রজসুন্দরী কর্তৃক পথিমধ্যে সংকৃত হোচ্ছেন এবং গোপিকাদের স্তনস্তবকে যাঁর ভ্রমরবৎ নেত্রপ্রান্ত পরিভ্রমণ কোরছে, আমি সেই হরিকে ভজনা কোরি।'—শ্রীরূপগোস্বামী।

১৩। "প্রথমে এই কাঞ্চনের মোহ, নাম-যশের মোহ, এই ক্ষুদ্র মিথ্যা সংসারের প্রতি আসক্তি ছাড়ো দেখি। তখোনই—কেবলমাত্র তখোনই তোমরা বুঝতে পারবে—গোপীপ্রেম কাকে বলে। গোপীপ্রেম এত বিশুদ্ধ জিনিস যে সর্বত্যাগী না হোলে বোঝবার চেষ্টা করাই উচিত নয়। যতোদিন পর্যন্ত আত্মা সম্পূর্ণভাবে পবিত্র না হোচ্ছে, ততোদিন গোপীপ্রেম বোঝার চেষ্টা করাই বৃথা। প্রতি মুহূর্তে যাদের হৃদয়ে কামকাঞ্চনলিপ্সার বুদ্বুদ উঠছে, তারাই আবার কিনা গোপীপ্রেম বুঝতে এবং তার সমালোচনা কোরতে যায়! শ্রীকৃষ্ণঅবতারের মুখ্য উদ্দেশ্যই যে এই গোপীপ্রেম শিক্ষা।"—*Sages of India* (*Complete works, Vol III, Page* 259).
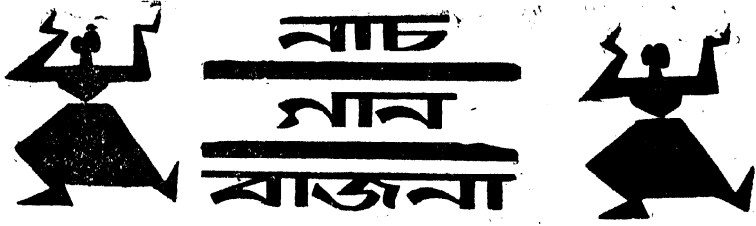
ছড়া ও পাঁচালী গানে কবি দাশরথী রায়

মহাকবি ৺দাশরথী রায় ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত কাটোয়ার সন্নিহিত বাঁদমড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম ৺দেবীপ্রসাদ রায়। ইঁহারা রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ। দাশরথী রায় বাল্যকাল হইতে পাটুলির নিকটবর্ত্তী পীলা নামক গ্রামে নিজ মাতুলালয়ে অবস্থান করিতেন। তিনি বাঙ্গলা ও যৎকিঞ্চিৎ ইংরাজী শিক্ষা করিয়া মাতুলের সহায়তায় সাকাইয়ের নীলকুঠিতে সামান্ত কেরাণীগিরি কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ঐ সময়ে তিনি সেই পীলা গ্রামে অক্ষয় কাটানী অকাবাই নাম্নী নৃত্যগীত-ব্যবসায়িনীর প্রণয়াসক্ত হন এবং তিনি এই "অকাবাই"এর ওস্তাদ কবির দলের গীত রচনা করিয়া দিতেন। কোন প্রতিদ্বন্দী কবি দল কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইবার পর তিনি স্বয়ং ছড়া ও গীত রচনা করিয়া দশজন বয়স্যের সহিত সখের এক পাঁচালীর দল গঠন করেন। পরে সেই দলই তাঁহার জীবিকা, সৌভাগ্য ও সুনামের কারণ হইয়া উঠে। তাঁহার সঙ্গীতপ্রিয়তা ও অসাধারণ কাব্য-প্রতিভার জন্ত তিনি স্মরণীয় হইয়া আছেন। তিনি বহু পালা ও গান রচনা করেন। তাঁহার নবপ্রথায় রচিত পাঁচালীর বহু বিষয়বস্তু, কাহিনী ও গানে সমৃদ্ধ। তাঁহার পালার মধ্যে কালীয় দমন, গোপীগণের বস্ত্রহরণ, মানভঞ্জন, কলঙ্কভঞ্জন, গোষ্ঠ লীলা, রাবণ বধ, দক্ষযজ্ঞ, শিব-বিবাহ, প্রহ্লাদ চরিত্র, মহিষাসুর বধ, রামবিবাহ, তরণীসেন বধ, লক্ষ্মণের শক্তি শেল প্রভৃতি সমধিক প্রসিদ্ধ। ইহা ব্যতীত, তাঁহার রচিত বহু পাঁচালীর সন্ধান পাওয়া যায়।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ৫৩ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার কোন পুত্রসন্তান ছিল না। একটিমাত্র কন্তা ও পত্নী প্রসন্নময়ী দেবীকে রাখিয়া তিনি পরলোকগমন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা তিনকড়ি রায় এবং তারপর তাঁহার দুই ভ্রাতুষ্পুত্র কিছুকাল পাঁচালীর দল রাখিয়াছিলেন; এখন কেহই জীবিত নাই।

তাঁহার ছড়া ও গীতে কবিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। এক সময়ে এই পাঁচালী পল্লীগ্রামের দ্বারে দ্বারে প্রতিধ্বনিত হইত এবং দাশরথী রায়ের দু'একটি গান জানিত না এমন লোক বাংলা দেশে দেখা যাইত না। এই সঙ্গীতগুলির সুর রামপ্রসাদের গানের ন্তায় সহজ সরল। সুতরাং সাধারণ লোকের পক্ষেও ইহা গাওয়া সহজ। ইনি আমাদের দেশের প্রথম সমাজ-চেতন কবি। তাঁহার পাঁচালীতে সেকালের লোকমানস সুপ্রতিফলিত। জনগণের আশা, নিরাশা, সুখ, দুঃখ প্রভৃতিকে তিনি বাণীরূপ দিয়াছেন। দেবতাকে মানুষ বানাইয়া ছাড়িয়াছেন। পাঁচালী বাঙ্গলার জনগণের সাহিত্য রূপে পরিচিত। লৌকিক কাহিনী লইয়া পাঁচালী গান রচনা করিয়া যে তিনি সাহসের পরিচয় দিয়াছেন, তার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁহার প্রেমমণি, নীলভ্রমর ও প্রেমচাঁদ প্রভৃতি পালা গানে। যদিও জনগণের আবেদনে তাঁর রচনায় শ্লেষ ও বিদ্রূপ ও অশ্লীল ইঙ্গিতের প্রশ্রয় দিতে হইয়াছিল, তবুও সাহিত্য-ক্ষেত্রে ইঁহার যে মূল্য আছে, তাহা সর্বজনস্বীকৃত।

কবি দাশরথী রায়ের ছড়া ও পাঁচালী সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন, "যিনি বাংলা ভাষায় সম্যকরূপে বুৎপন্ন হইতে বাসনা করেন, তিনি যত্নপূর্ব্বক আদ্যোপান্ত দাশুরায়ের পাঁচালী পাঠ করুন।"

অক্ষয়কুমার সরকার বলিয়াছেন,—"যাঁহারা দাশরথীকে কবি বলিতে চাহেন না, তাঁহারা হয় কাব্যের রসাস্বাদনে অক্ষম নচেৎ দাশরথীর রচনা সম্বন্ধে অজ্ঞ।"

নবদ্বীপের বিখ্যাত পণ্ডিত রাখালদাস ন্তায়রত্ন বলিয়াছেন; "আমি ত সামান্ত ব্যক্তি, নবদ্বীপের তৎকালীন জগন্মান্ত প্রাচীন যত অধ্যাপক ছিলেন, সকলেই দাশরথীর গুণে তদ্গত ও মুগ্ধ ছিলেন, সাক্ষাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলা বিষয়ে অনেক ব্যক্তিই সামান্ত মানবের ন্তায় নায়ক নায়িকার ভাবের বর্ণনা করিয়া কৃতার্থমন্য হইয়াছেন, কিন্তু প্রতি রচনায় শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ ব্রহ্মভাব মিশ্রিত অপূর্ব বর্ণনার দ্বারা দাশরথী রায় ভক্তি-প্রীতি রসে ভাবুক মাত্রকেই মোহিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।"

দাশরথী রায়ের রচিত পালা গান পরিণত বয়সেও রবীন্দ্রনাথের স্মরণপটে উদিত হইত। কিশোরীমোহন চট্টোপাধ্যায় কিছুদিন পাঁচালীর দলে ছিলেন। তাঁহার নিকটেই কবি প্রথম দাশুরায়ের পাঁচালীগান শ্রবণ করেন। কবি তাঁহার মনের ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন তাঁহার (কবির) কবিতার ছন্দে।

কিশোরী চাটুয্যে হটাৎ জুটত সন্ধ্যা হ'লে,
বাঁ হাতে তার থেলো হুঁকো চাদর কাঁধে ঝোলে।
দ্রুত লয়ে আউড়ে যেত লব কুশের ছড়া,
থাকত আমার খাতা লেখা, পড়ে থাকত পড়া।
মনে মনে ইচ্ছা হ'ত যদিই কোন ছলে,
ভরতি হওয়া সহজ হ'ত এই পাঁচালীর দলে।
ভাবনা মাথায় চাপত নাকো ক্লাসে ওঠার দায়ে,
গান শুনিয়ে চলে যেতুম নতুন নতুন গাঁয়ে।

পাঁচালীর নূতন নূতন গানে প্লাবিত হইয়াছিল এই বাংলা দেশ। কবিগুরু তার প্রভাব এড়াতে পারেন নাই, তাই তিনি দাশরথী রায়ের নিকট অনুপ্রাস ও যমক বহুল গান তাঁহার জীবন-স্মৃতিতে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন,—

"ভাব শ্রীকান্ত নরকান্তকারীরে,
নিতান্ত কৃতান্ত ভয়ান্ত হবে ভবে,
ভাবিলে ভাবনা যত ভ্রূভঙ্গে হরেরে।

করাল তরঙ্গে ভ্রূভঙ্গে ত্রিভঙ্গে যেথা ভাবে।
মন। কিমর্থে এ মর্ত্তে কি তত্ত্বে এলি,
সদা কুকীর্ত্তি দুর্বৃত্তি করিলি—কি হবে রে।
উচিৎ এ নহে, দাশরথিরে ডুবাবে।
কর প্রায়শ্চিত্ত, যে চিত্ত, সে নিত্য পদ ভেবে।

দাশরথী রায়ের রচনায় বিভিন্ন অর্থে একই শব্দের প্রয়োগ ও অনুপ্রাস বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তখনকার অধিকাংশ কবির ন্যায় দাশু রায়ের গানের মধ্যে ভক্তিভাবের প্রাবল্যও ছিল—

ত্রাণ করহে শঙ্কর।
আশুতোষ নাম গুণে গুণধাম,
হর মম দুঃখ হর হর।
বিপদ কাণ্ডারী প্রভু ত্রিপুরারী
বিখ্যাত গুণ ত্রিপুর। ইত্যাদি—
(ভৈরবী একতালা)

* * *

তারিণী তাপহারিণী মা।
তার তারা প্রদানে পদ-তরণী
তপন তনয় তাপে তাপিত তনয় তনু
ত্রাস নাশ তারা ত্রিবিধ পাপবারিণী। ইত্যাদি
(মল্লার, কাওয়ালী)

* * *

ত্রাণ কর তারা ত্রিনয়নী।
হে ভবানী ভবরাণী ভব ভয়বারিণী
ভয়ঙ্কর ভীমে, ভূভারহারিণী
ত্রিভুবনতারিণী, ত্রিগুণধারিণী,
ত্রিজন সৃজনকারিণী। ইত্যাদি
(ইমন্ কাওয়ালী)

রামপ্রসাদের ন্যায় তিনি শ্যামা-সঙ্গীতও রচনা করিয়াছিলেন। সেগুলির ভক্তিরসাত্মক ভাব ও রচনা-নৈপুণ্য লক্ষ্য করিবার বিষয়:—

লম্বিত গলে মুণ্ডমাল, দম্ভিতা ধনী মুখ করাল
স্তম্ভিত পদে মহাকাল, কম্পিতা ভয়ে মেদিনী।
দিগ্বসনী চন্দ্রভাল, আলুলয়ে পড়ে কেশ জাল।
শোভিত অসি করে কৃপাণ প্রখরা শিখর নন্দিনী।
চারিদিকে যত দিক্‌পাল
ভৈরবী শিবে তাল বেতাল,
একি অপরূপ রূপ বিশাল কালী কলুষখণ্ডিনী।
(বসন্ত)

দাশু রায়ের এইরূপ শব্দ-ঝঙ্কার ও ছন্দ পারিপাট্য কবি ভারতচন্দ্রেরই অনুসৃতি। এই শ্রেণীর শ্যামা-সঙ্গীতগুলি সম্বন্ধে দীনেশচন্দ্র বলেন—

"দাশুর পাঁচালী সম্বন্ধে আমরা যেরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিনা কেন, তাঁহার রচিত শ্যামা সঙ্গীতগুলির প্রাণ-খুলিয়া প্রশংসা করিব। এখানে বাক্য চপল অসার আমোদপ্রিয় শব্দকুশল দাশু সহসা ধর্ম্মগম্ভীর গুরুত্বদ্বারা স্বীয় গানগুলিতে এক আশ্চর্য্য বৈরাগ্য ও ভক্তিপূত কাতরতা ঢালিয়া দিয়াছেন।"

ও মোর পামর মন এখন বল কালী
কোথোনা যে মন আর আজি কালি।
অঙ্গেতে লিখিয়া কালি
কর কালী নামাবলি
না লিখিয়া কালী
কেন বিষয়-কালি মাখালি। ইত্যাদি
(সুরট, কাওয়ালী)

উমাসঙ্গীত অর্থাৎ আগমনী ও বিজয়ার গানেও দাশু রায়ের কৃতিত্ব বড় কম নহে। শ্বশুর-গৃহ হইতে প্রত্যাগতা কন্যা উমা দুই কাঁখে দুইটি শিশু লইয়া মাতৃ সংসারে প্রবেশ করার চিত্রটি সুপরিস্ফুট হইয়াছে তাঁহার রচিত সংগীতে,—

গা তোল গা তোল, বাঁধ মা কুন্তল,
ঐ এল পাষাণী তোর ঈশানী।
লয়ে যুগল শিশু কোলে, মা কই মা কই বলে,
ডাকিছে মা তোর শশধর-বদনী। (সিন্ধু)

দাশরথী রায়ের আগমনী বিষয়ে পাঁচালীর ছড়া যেমন বর্ণবিন্যাসে তেমনই অনুপ্রাস ও যমকে সমৃদ্ধ;—

(ছড়া)
রূপে ভুবন আলো ক'রে বিবিধ আয়ুধ করে
মণিময় আভরণ অঙ্গে;
চলিল সুরবন্দিনী তপ্ত সুবর্ণ বরণী,
সুহাস্য বদনী রঙ্গে-ভঙ্গে।
গিরিবাসিনী যত মেয়ে গৃহকার্য্য তেয়াগিয়ে,
পথ চেয়ে আছে পথ মাঝে।

মায়ের আগমন অমনি,   হেরিল যত রমণী
শঙ্কর রমণী, রণ সাজে ॥
পুলকে প্রফুল্ল কায়   দ্রুত গিয়ে মেনকায়
অমনি রমণীগণ বলে।
ওগো গা তোল রাজমহিষী   ঐ এল তোর উমাশশী,
পেলে দুর্গা দুর্গানাম ফলে ॥

গিরিরাজ কোন উপায় না দেখিয়া বিপদতারিণী দুর্গার স্মরণ লইলেন ;—

(ছড়া)

তুমি দুর্গে, দেহ দুর্গে, দুঃখী দীনে মুক্তি
দয়াময়ী দুর্গে তুমি দেব দেব উক্তি ।
দুবারাধ্যা দশ বিদ্যা দনুজ দলনী
দশকরা, দর্পহরা দিগম্বর রাণী ।

(গান)

উমা শৈল-রাজমহিষী কান্দিস্‌নে গো আর
তোমার দুঃখহরা উমা এলেন ঐ।
সে নাই তোর মেয়ে তারা, সিংহপৃষ্ঠে দশকরা
রূপে দশদিক আলো করিছেন ব্রহ্মময়ী।
(মুলতান—যৎ)

কবির রচনায় বৈচিত্র্যও লক্ষ্য করা যায়। তিনি ব্যঙ্গে ঢঙ্গে হিন্দি ভাষাতেও কতিপয় সংগীত রচনা করিয়া গিয়াছেন,—

"মেরে নাম মজনু ফকীর, মোকাম মেরি মটীয়ারী,
ঝট ভিখ দে মুঝে। এৎনে কাহেকো দেক্‌দারী
(খট-পোস্তাতাল)

সমসাময়িক ঘটনা অবলম্বনে বিধবা-বিবাহ প্রভৃতি সামাজিক ঘটনা প্রসঙ্গে তিনি বিধবা-বিবাহ প্রচলনকে আক্রমণ করিয়া পাঁচালী গান রচনা করিয়াছেন এবং প্রবর্তক স্বয়ং বিদ্যাসাগরকেও আক্রমণ হইতে অব্যহতি দেন নাই।

বিবাহ করিতে দিদি ! আছে বিধবাদের বিধি,
মরুক দেশের পোড়া-কপালে, সকলে,
কথা ছাপিয়ে রাখে হ'য়ে বাদী ।
আমাদিগকে দিতে নাগর
(এলেন) গুণের সাগর বিদ্যাসাগর,
বিধবা পার করতে তরী, গুণ ধরেছেন গুণনিধি ।

শ্রীকৃষ্ণ বিরহের পর কৃষ্ণপ্রিয়ার মিলন শীর্ষক পালায় কৃষ্ণশূন্য গোকুলের বর্ণনা প্রসঙ্গে, ছড়ায় তাঁহার অপূর্ব রচনা-নৈপুণ্যের প্রচুর নিদর্শন দেখা যায়। উৎকৃষ্ট রচনার মধ্যে ইহা অন্যতম বলা যাইতে পারে।

বিষয়শূন্য নরবর, বারিশূন্য সরোবর, বস্ত্রশূন্য বেশ।
দেবী শূন্য মণ্ডপ, কৃষ্ণ শূন্য পাণ্ডব, গঙ্গা শূন্য দেশ ।
জল শূন্য ঘট, শিব শূন্য মঠ, ব্যয় শূন্য কাণ্ড,
নাড়ী শূন্য দেহ, নারী শূন্য গৃহ, কর্পূর শূন্য ভাণ্ড ।
শিকল শূন্য তালা, ভজন শূন্য মালা, দৃষ্টি শূন্য নয়ন,
তুমি শূন্য রাজার রাজ্য, বিদ্যা শূন্য ভট্টাচার্য্য,
নিদ্রা শূন্য শয়ন। ইত্যাদি—

তাঁহার রচিত শিব-বিবাহ পালার অন্তর্গত নারদ মহামুনির বীণাযন্ত্রে বিষ্ণু গুণগান বিষয়ে ছড়ায় একই প্রকার শব্দের বহুল প্রয়োগ তাঁহার অনবদ্য সৃষ্টির নিদর্শন,—

হয়ে মত্ত, পরমার্থ তত্ত্ব, শিক্ষা দেন মানসে।
মন ভ্রান্ত, দিন ত অন্ত, ক্ষান্ত হওনারে কলুষে ॥
বলবন্ত সে কৃতান্ত করিব শান্ত কিরূপে আমি,
রাধাকান্ত চরণপ্রান্ত ধরিয়া ধ্যান ত করনা তুমি।
তোর ধ্যান তো দেখে একান্ত, কাঁপিছে প্রাণত শমন ভয়ে।
জ্ঞানবন্ত বলে হে মন্ত্র শুননা অন্তরে মন দিয়ে।
ভাব চিত্তে, কেন কুবৃত্তে, এ দেহ মিথ্যার কুপাত্র,
হবে জীর্ণ, ছিন্ন ভিন্ন, চিহ্ন রবে না মাত্র।

শ্রীরামের স্তুতি ব্যঞ্জক এই গানে নানাবিধ বাক্যবিন্যাস এবং রচনা-কৌশলের অপূর্ব সমাবেশের পরিচয় পাওয়া যায়।

গান (ঝিঁঝিট তাল যৎ)

দুস্তর ভব কাণ্ডারি দুর্জ্জন দমন কারি
দুর্ব্বলের বল তুমি দুর্ব্বাদলশ্যাম।
দশ জন্মার্জ্জিত দশবিধ পাপনাশ,
মানস দাশরথি রেখেছে শ্রীরামনাম মোক্ষধাম॥

দুর্গাস্তুতি ব্যঞ্জক একটি ভাবসমৃদ্ধ গানেও কবি-প্রতিভার পরিচয় প্রদান করে,—

রাজন ভাজন কিম্বা অভাজন,
কে তব অপ্রিয় কেবা প্রিয়জন,
কি সুজন দীন জন, কি দুর্জ্জন
স্বজন তোমারি সবে।
যা কর মা শমন এলো শীঘ্রগতি।
দেয় যদি মা গতি
গতিকে দেখে দুর্গতি
তবে দাশরথির গতি
অসঙ্গতি দুর্গতি সদাই রবে ॥

গঙ্গা ও ভগবতীর কোন্দল বিষয়ক পালায় শিব দুর্গাকে দক্ষ রাজার যজ্ঞে যাইতে নিষেধ করিয়া দুর্গাকে বলিতেছেন, "তুমি যজ্ঞে গেলে আমাকে অপমানিত হইতে হইবে, কারণ আমি অনিমন্ত্রিত।" গানে শিব দুর্গাকে বলিতেছেন তুমি অভিমান ছাড়।

(গান—সুরট যৎ)

তোমায় দেবাদিদেব বাখানে,
দেবাদির বিদ্যমানে
দানবে মানবে মানে,
তব মানে মানী।
তুমি না মানিলে তারা
সে মান হইবে হারা
তুমি শক্তি মম শক্তি
হে শক্তি-রূপিণী।

তৎকালীন শ্রোতারা কবিতায় বা গানে শব্দের নানা অর্থ প্রয়োগ, যমক ও অনুপ্রাস বিশেষ সমাদর করিতেন। দাশরথী রায়ের আগমনী গানে এই শ্রেণীর কৌশল ও সৌন্দর্য্য বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়।—

গান (ললিত—ঝিঁঝিট)

নন্দি ! গিরিনন্দিনী ত্রিনয়নের নয়নতারা।
তারা হারা হ'য়ে আছিরে, হয়ে আছিরে তারাহারা।
যে দিন তিন দিন ব'লে গেছেরে সেই দিন তারা।
সেই দিনে তখনি আমি দেখেছিরে দিনে তারা,
তারা শোকে বহিছে তারায় তারাকারা ধারা।
ব'সে যোগাসনে সেই তারারূপে,
যারা আছেরে তারা স'পে
ওরে নন্দি, তারা কি ধন জেনেছে তারা
তোরা কি এতকাল মিথ্যা কালঘোরে কাল হরিলি
জ্ঞান হ'য়েরে জ্ঞান চক্ষে মোর তারারে না হেরিলি
জলাভাবে আকুল, সিন্ধুকূলে থেকে তোরা।

কবি দাশরথী রায়ের অপূর্ব শব্দবিন্যাস, এই শব্দের বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ, অনুপ্রাস, যমক প্রভৃতি সাহিত্য ও কাব্যজগতে এক অপূর্ব সৃষ্টি। বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের মন্তব্য হইতেও তাঁহার কবি-প্রতিভার বিষয় সম্যক উপলব্ধি করা যায়। এই প্রতিভাবান কবির সাহিত্য ও কাব্যের বহুল আলোচনা আবশ্যক এবং আনুষ্ঠানিক ভাবে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিয়া কবিকে স্মরণীয় করাও দেশবাসীর কর্তব্য। —শ্রীকালীপদ লাহিড়ী।

রেকর্ড-পরিচয়

এইচ-এম্-ভি ও কলম্বিয়া রেকর্ডে প্রকাশিত নতুন গানের সংক্ষিপ্ত পরিচয় :—

হিজ মাষ্টার্স ভয়েস

এন ৮২৭৮২—বহুকাল পরে যশস্বী শিল্পী তালাত মামুদের কণ্ঠে দু'খানি চমৎকার বাংলা আধুনিক গান।

এন ৮২৭৮৩—দু'খানি আধুনিক গান সুন্দর রূপে পরিবেশন করেছেন তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

এন ৮২৭৮৪—কীর্তনকলানিধি রথীন ঘোষের পরিচালনায় গীতশ্রী কুমারী ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়ের গাওয়া দু'খানি ভাবমধুর কীর্তন গান।

এন ৮২৭৮৫—নিজের সুরে গাওয়া জনপ্রিয় শিল্পী মান্না দে'র কণ্ঠে দু'খানি অপূর্ব আধুনিক গান।

এন ৮২৭৮৬—বম্বের প্রখ্যাত প্লে-ব্যাক শিল্পী শ্রীমতী আশা ভোঁসলের গাওয়া দু'খানি আধুনিক গান। শিল্পীর মধুক্ষরা কণ্ঠে এই প্রথম বাংলা গান।

এন ৭৬০৬৯ এবং এন ৭৬০৭০ রেকর্ড দু'খানিতে "ভানু পেল লটারী" বাণীচিত্রের তিনখানি গান গেয়েছেন মূল শিল্পীরা।

কলম্বিয়া

জী ঈ ২৪৮৯১—পান্নালাল ভট্টাচার্যের কণ্ঠে মধুর দু'খানি আধুনিক গান।

জী ঈ ২৪৮১২—দু'খানি অতুলপ্রসাদী গানের সুন্দরতম পরিবেশন করেছেন কুমারী রুকা চট্টোপাধ্যায়।

জী ঈ ২৪৮১৩—দু'খানি সুন্দর আধুনিক গানকে ভাব ও সুরের মাধুর্যে পরিবেশন করেছেন শিল্পী ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য।

জী ঈ ২৪৮১৪—শ্রীমতী প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধুর কণ্ঠের দু'খানি শ্যামাসংগীত।

জী ঈ ২৪৮১৫—দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে দু'খানি সুন্দরতম আধুনিক গান।

জী ঈ ২৪৮১৬—দু'খানি মধুর আধুনিক গান—গেয়েছেন কুমারী ইলা চক্রবর্তী। গান দু'খানি সত্যই চিত্তজয়ী।

আমার কথা (৪২)

শ্রীসতীনাথ মুখোপাধ্যায়

সন্ধ্যাদীপে আলোকিত, ধূপের সৌরভে আমোদিত এবং কালীমাতা, দেবী বীণাপাণি ও ধ্যানমগ্ন ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের পট-মূর্ত্তি বিরাজিত ক্ষুদ্র অথচ মনোরম প্রকোষ্ঠে সেদিন এক বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পীর সরল আলাপে মুগ্ধ হয়েছিলাম। তাঁহার রচিত সুরের ইন্দ্রজাল তাঁহার ধ্বনিত মধুর সঙ্গীত তাঁহার কণ্ঠে অপূর্ব মূর্চ্ছনা আর তাঁহারই সৃষ্টি আধুনিক ও উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের একত্র সংমিশ্রণ স্রোত। মনে এক গভীর রেখাপাত করে। ইনিই হলেন বহু জনপ্রিয় শ্রীসতীনাথ মুখোপাধ্যায়। কথায় কথায় তিনি ব্যক্ত করলেন।

"১৯৪৭-৪৮ সালে মাত্র ২৩ বৎসর বয়সে বোম্বাই-এর শ্রীরামচন্দ্র পাল মহাশয়ের সহকারী সঙ্গীত পরিচালক রূপে 'জিপসী মেয়ে'

শ্রীসতীনাথ মুখোপাধ্যায়

'যুগদেবতা' 'পথ হারায় কাহিনী', 'অপবাদ', 'মর্য্যাদা', 'ক্যায়সে ভূলু' ইত্যাদি সাতটি ছবিতে নেপথ্য গায়ক হিসাবেও গান করি। কিন্তু ১৯৫০ সালে রমলা অভিনীত 'অনুরাগ' ছবিতে সঙ্গীত পরিচালক হই। তখন আমার পরিচয় সুরকার সতীনাথ। হঠাৎ মনে হল যে, আমি ত গায়ক। নির্ম্মীয়মাণ কয়েকটি ছবিতে সঙ্গীত পরিচালনার চুক্তি বাতিল করে দিলাম সঙ্গে সঙ্গে। রেকর্ড ও ফিল্ম প্রতিষ্ঠানগুলিতে এবার হাজির হলাম, নিজকণ্ঠে গান গাইবার আবেদন নিয়ে। তাঁরা জানালেন যে, আমি সুরস্রষ্টা—কণ্ঠশিল্পী নই। মনে এল দারুণ অভিমান! অন্যের দেওয়া সুরে মাত্র ১৭ বৎসর বয়সে ১৯৪৩ সালে (প্রবেশিকা পরীক্ষার পর) প্রথম গ্রামোফোন রেকর্ড করাই। তার পর ১৯৪৬ ও ১৯৪৮ সালে। কিন্তু এ কি—আজ আমি গায়ক নই! পূর্ণ এক বৎসর অর্থাৎ ১৯৫১ সালে কেবল কণ্ঠ-সাধনায় মগ্ন হলাম। ১৯৫২ সালে নিজের দেওয়া সুরে 'আজ তুমি নেই বলে' ও 'পাষাণের বুকে লিখ না আমার নাম' রেকর্ড করাই। রাতারাতি যেন 'প্রখ্যাত' হয়ে উঠি! তখন পর পর 'না যেও না', 'রাত জাগা মোর', 'বিদায় নিও না হায়', 'বালুকা বেলায়', 'জীবনে যদি দীপ', 'এখনও আকাশে চাঁদ', 'যেদিন জীবনে তুমি', 'গাগরী ভরণে যায়', 'বনের পাখি গায়', 'বোঝ না কেন', 'তোমারে ভুলিতে ওগো', 'আমার এ গানে', 'তোমার প্রথম গান', 'কোথা তুমি ঘনশ্যাম', 'ওগো শ্যাম মিনতি তোমায়' আমার গাওয়া গানগুলি প্রচুর সমাদর পেল শ্রোতাদের কাছে। খুব খুসী হলুম যে, 'সুরকার সতীনাথ' পুনরায় 'কণ্ঠশিল্পী' হিসাবে স্থান পেয়েছে। আবার আমার দেওয়া সুরে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, উৎপলা সেন, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য্য, লতা মুঙ্গেশকর, শ্যামল মিত্র, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, পান্নালাল ভট্টাচার্য্য, সুপ্রীতি ঘোষ, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির গানের রেকর্ড করা হইয়াছে। আমার অন্যতম প্রিয় ছাত্র দীপক মৈত্রের মৃত্যুর পর প্রকাশিত তাহার কণ্ঠে ধ্বনিত 'এ ত শুধু গান' ও 'কত কথা হল বলা' রেকর্ডটিতে আমিই সুর সংযোজনা করেছিলাম।

১৯২৫ সালে কলিকাতায় আমি জন্মগ্রহণ করি। আদি নিবাস হুগলী জেলার চুঁচুড়ায়। বাবা শ্রীতারকদাস মুখোপাধ্যায়। ৬।৭ বৎসর বয়স হইতে কখনও খালি গলায় কখনও বা হারমোনিয়াম সহযোগে গান গাইতাম। নয় বৎসরে চুঁচুড়ার ৺প্রবোধ ঘোষাল মহাশয়ের নিকট নিয়মিত গান শিখিতে থাকি। বাবার মামার বাড়ী লক্ষ্ণৌ শহরে প্রায়শঃ যাইতাম। সেখানে গৃহে গানের চর্চ্চা হইত আর আমিও উহাতে যোগদান করিতাম। ১৯০২ সালে চুঁচুড়া বিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষা, ১৯৪৪ সালে স্কলারসীপ সহ আই, এ, এবং ১৯৪৬ সালে হুগলী মহসীন কলেজ হইতে বি, এ পাশ করি। সঙ্গীত চর্চ্চায় অসুবিধা হইবে বিধায় এম, এ পড়ি নাই। ১৯৪০-৪৭ সাল পর্য্যন্ত কলিকাতার শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের সঙ্গীতশিষ্য ছিলাম এবং ১৯৪৮ সাল হইতে শ্রী চিন্ময় লাহিড়ী আমার সঙ্গীত-গুরু। এখনও প্রতি বুধবার সকালে তাঁহার নিকট শিক্ষা গ্রহণ করিয়া থাকি।

এই পর্য্যন্ত কলিকাতায় অনুষ্ঠিত বিভিন্ন সঙ্গীত সম্মেলনে যোগদান করিয়াছি। আকাশবাণীর অধিকাংশ কেন্দ্র হইতে বাঙ্গলা ও হিন্দী সঙ্গীত পরিবেশন করিয়াছি। গত দুই বৎসরে পূর্ব্ব-পাকিস্থানের বড় বড় সহরগুলিতে অনুষ্ঠিত সঙ্গীত সম্মেলনে যোগদান করি। বর্ত্তমান বৎসরের শেষভাগে পশ্চিম-পাকিস্থানের সঙ্গীতাসরে যোগদান করিবার আমন্ত্রণ আসিয়াছে।

'হরিলক্ষ্মী' ছায়া ছবিতে আমি সঙ্গীত পরিচালক ছিলাম। বর্ত্তমানে নির্ম্মীয়মাণ 'পুরীর মন্দির,' 'প্রবেশ নিষেধ,' 'স্বর্গমর্ত্ত্য,' 'শ্রীরাধা' ছবিগুলিতে আমি নেপথ্য-গায়ক হিসাবে কাজ করিতেছি। 'অগ্নিপরীক্ষা'-তে 'জীবন নদীর জোয়ার ভাটা' এবং 'রাণী রাসমণি'-তে 'আর কবে দেখা দিবি মা' আমারই কণ্ঠে ধ্বনিত এবং শ্রোতৃমহলে খুবই সমাদৃত হয়।

১৯৪৭ হইতে ১৯৫১ সাল পর্য্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের এ্যাকাউণ্টাণ্ট জেনারেল দপ্তরে অডিটার হিসাবে কার্য্য করিয়াছিলাম। তখন সঙ্গীতের সহিত খুবই জড়িত থাকি। একদিন দপ্তরে যাইতে পারি নাই—তজ্জন্য দরখাস্তে লিখিলাম যে আমি অসুস্থ। মিথ্যা কথা লেখার জন্য মনোবেদনা পাই। কিছুদিন পরে এ, জি,-কে সত্যকথা জানাইয়া পদত্যাগপত্র পেশ করি। তাহাতে লিখি যে সঙ্গীত-শিল্পী হিসাবে মিথ্যাকথা বলা বা লেখা পাপকার্য্য বলিয়া মনে করি। তদানীন্তন এ, জি, আমার পদত্যাগপত্র গ্রহণ করিয়া আমায় লেখেন যে—সঙ্গীতশিল্পী হিসাবে দিন দিন আমি উন্নতির শিখরে আরোহণ করি ইহাই তাঁহার কাম্য। তাঁহার পত্র আমার মনে রেখাপাত করে।"

সতীনাথ উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতকে এমনভাবে পরিবেশন করিয়া থাকেন যে তাহা শ্রোতাদের কণ্ঠেও গুঞ্জরিত হয়। তাঁহার নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত কয়েকজন শিল্পী শ্রোতৃমহলে বেশ সুনাম করিয়াছেন।

হিন্দী ভাষাভাষী প্রদেশগুলিতে শ্রীমুখোপাধ্যায় "সত্যনাথ" অথবা "সতীনাথ" নামেই সমধিক পরিচিত। আনন্দের কথা যে, হিন্দী শ্রোতাদের নিকট তিনি অন্যতম প্রিয় গায়ক। সঙ্গীতজ্ঞ সতীনাথের বিশেষত্ব যে, তিনি এই পর্য্যন্ত যতগুলি সঙ্গীত পরিবেশনা করিয়াছেন, সমুদায় সর্ব্বস্তরের রসগ্রাহীদের পরিপূর্ণভাবে মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছে।

পত্রিকা হিসাবে "মাসিক বসুমতী" সম্বন্ধে তাঁহার উচ্চ ধারণা হইয়াছে।

"One of the evils of democracy is that you have to endure the man you elected whether you like him or not."

—Will Rogers.

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে লেখা বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্রের পত্রাবলী

লণ্ডন

বন্ধু, ২১এ জুন ১৯০২

তোমার আহ্বান আমাকে দেশের দিকে টানিতেছে। শীঘ্রই তোমাদের সহিত দেখা করিব, এই মনে করিয়া মন উৎসাহে পূর্ণ হইতেছে।

তুমি যাহার সূত্রপাত করিতেছ তাহাই আমাদের প্রধান কল্যাণ। আমাদের সাম্রাজ্য বাহিরে নহে, অন্তরে। পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ ইহার অর্থ বুঝিতে অনেক সময় লাগে। নিরাশার কথা শুনিয়া বল ভাঙিয়া যায়, কিন্তু তোমার নিকট উৎসাহের কথা শুনিয়া বড়ই আশান্বিত হইয়াছি। ভারতের কল্যাণ আমাদের হাতে, আমাদের জীবন দিয়া আমাদের আশা, আমাদের সুখ দুঃখ আমরাই বহন করিব। মিথ্যা চাকচিক্যে যেন আমরা ভুলিয়া না যাই। যাহা প্রকৃত, যাহা কল্যাণকর তাহাই যেন আমাদের চিরসহচর হয়। বিদেশে যাহা উন্নতি বলে তাহার ভিতর দেখিয়াছি। আমরা যেন কখনও মিথ্যা কথায় না ভুলি—পুণ্যই আমাদের প্রধান লক্ষ্য। অন্তরে কিম্বা বাহিরে প্রতারণার দ্বারা আমরা কখনও প্রকৃত ইষ্টলাভ করিব না।

আমি একবার মনে করিতেছি যে শীঘ্রই দেশে আসিব। আবার মনে হইতেছে, আর কয় মাস থাকিয়া আমার মত প্রচার করিয়া ফিরিব। এতদিন সংগ্রামে বিক্ষুব্ধ ছিলাম। তুমি শুনিয়া সুখী হইবে সর্ব্বত্রই জয় সংবাদ। তোমার নিকট তিনখানা পুস্তিকা পাঠাই। তারিখ দেখিলে বুঝিবে ইহা এক বৎসর পূর্ব্বে পঠিত হয়, এক বৎসর পরে গৃহীত হইল। জড়ের স্পন্দন সম্বন্ধে গত বৎসরের ঘটনা জান। পুনরায় এ বৎসর রয়্যাল সোসাইটিতে আসিয়াছিলাম। এবার অনেক তর্কের পর আমার মতেরই জয় হইয়াছে। R. Society সত্বরই তাহা প্রচার করিবেন। Linn. Society উদ্ভিদ সম্বন্ধে আমার আবিষ্কার প্রকাশ করিবেন। ইতিমধ্যে Royal Photographic Society হইতে আহুত হইয়া Photography সম্বন্ধে আমার নূতন মত বিষয়ে বক্তৃতা করি, তাহাতে অনেকে নূতন তত্ত্বে বিস্মিত ও পুলকিত হইয়াছেন। President বলিয়াছেন, It will produce a revolution about our idea of photography আমি সম্প্রতি বিনা আলোকে ছবি তুলিতে সমর্থ হইয়াছি। বন্ধু, আমি এইবার নূতন নূতন তত্ত্বের সন্ধান পাইয়া বিহ্বল হইয়াছি। ইহার অন্ত কোথায়? মানুষের মন যে আর ধারণা করিতে পারে না।

তোমার জগদীশ

২

১৮ই জুলাই ১৯০২

বন্ধু,

সোমবার দিন তোমার পত্রের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। পাইয়া সুখী হইয়াছি!

তুমি লিখিয়াছ যে, আমরা ক্রমাগত এই সংসারের পাকে ঘুরিতেছি এ কথা ঠিক। মাঝে মাঝে এই আবর্ত্ত হইতে উদ্ধার পাইয়া প্রকৃতের সন্ধান পাই। রৌদ্র ও মেঘের ছায়া ক্রমাগত আমাদের হৃদয়পটে একে অন্যের অনুধাবন করিতেছে।

ইহার মধ্যে থাকিয়াই যাহা করিবার করিতে হইবে।

অনেক অকাজ লইয়া কখনও কখনও প্রকৃত কার্য্যের অনুসন্ধান পাইব।

সৌভাগ্যক্রমে আমাদের জাতীয় জীবনে পুরাতন কাল হইতে যে এক ছাপ পড়িয়াছে তাহা কখনও মুছিয়া যাইবে না। তাহা হইতে আমরা প্রকৃত ও অপ্রকৃতের ভেদ বুঝিতে পারিব। সহস্র অজানার মধ্যেও আমাদের মন চিরন্তনের দিকে উন্মুখ থাকিবে।

সেই চিরন্তন সত্য ভারতের প্রতি গহন ও গিরিগহ্বর হইতে আমাদিগকে আহ্বান করিতেছে। কথার জাল ও অকর্ম্মের জাল আমাদিগকে চিরকাল বাঁধিয়া রাখিতে পারিবে না। দুইদিন পরে অকৃতার্থতার জন্য আমরা বিমর্ষ হইব না।

তবে একটা সামঞ্জস্যের আবশ্যক। তোমাকে যিনি গান গাইবার জন্য পাঠাইয়াছেন তুমি তাঁহারই জন্য গান গাইবে। ইহাই তোমার মন্ত্র। এই অস্ফুট ভাষাতেই তুমি জীবন স্ফুটিত করিবে। আমাদের যাহার যা কিছু শক্তি আছে তাহাই যেন নিয়োজিত করিতে পারি। আমাদের সমস্ত শক্তি অতি ক্ষুদ্র। কিন্তু যাহা কিছু আছে তাহাই যেন পূজার জন্য দিতে পারি।

কিন্তু বলা ও কার্য্যের আড়ম্বরে যেন আমরা প্রকৃত ভুলিয়া না যাই। এইজন্যই তুমি যে আশ্রম করিয়াছ তাহার দিকে আমার মন আকৃষ্ট হইয়াছে। মাঝে মাঝে সেখানে যাইয়া প্রকৃতিস্থ হইয়া আসিব। কেবল বাহির লইয়া থাকিবার বিড়ম্বনা এদেশে দেখিতেছি। বাহির ও অন্তরের সামঞ্জস্য কি করিলে হয় তাহা আমাকে জানাইও।

আমার পুস্তকের শেষ প্রুফ লইয়া ব্যস্ত আছি। আর ৩।৪ সপ্তাহে পুস্তক মুদ্রিত হইবে। প্রুফ দেখিবার সময় গত দুই বৎসরের দারুণ সংগ্রামের কথা মনে হইয়া একান্ত ক্লিষ্ট হই। আমার এই

দীর্ঘ যন্ত্রণার ফল যেন তোমাদের গ্রহণীয় হয়। মনে করিয়াছিলাম উৎসর্গপত্রে লিখি—

To my countrymen
Who will yet claim
The intellectual heritage
Of their ancestors.

কিন্তু বন্ধু এমন কথা বলিতেও লজ্জিত হইতে হয়। তোমরা আমার হৃদয়ের কামনা বুঝিয়া লইও।

এই সঙ্গে ক্ষুদ্র দুইখানা পুস্তিকা পাঠাই।

আরও দু' একটি নূতন বিষয়ের সন্ধান পাইয়াছি, কিন্তু অনিশ্চিততার মধ্যে মনের দৃষ্টি যেন চলিয়া গিয়াছে। তোমার

জগদীশ

৩

লণ্ডন
৫ই সেপ্টেম্বর ১৯০২

বন্ধু,

অনেক দিন পরে তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। এতকাল চিঠি না পাইয়া চিন্তিত ছিলাম। তোমার অসুখ সারিয়াছে শুনিয়া আশ্বস্ত হইলাম।

কবি চিরযৌবন লইয়া জন্মগ্রহণ করেন, সুতরাং জরা তোমাকে স্পর্শ করিবে না।

তোমার সহিত কত বিষয়ে বলিবার আছে, তাহা অনেক দিনেও ফুরাইবে না। তোমার গৃহে আমার জন্য একটুকু স্থান রাখিও। বাহিরের কোলাহল, মিথ্যা বাদ-বিসংবাদ হইতে পলায়ন করিয়া তোমার সহিত প্রকৃতের অন্বেষণ করিব।

এ কয় মাস জার্ম্মেণীর বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ। তথায় যাইতে হইলে আর এক বৎসর ছুটি লইতে হয়। ইণ্ডিয়া অফিসে সে বিষয়ে বড় উৎসাহ পাইলাম না। অনুগ্রহ ভিক্ষা করিতেও রুচি হইল না। একবার ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় দীর্ঘ প্রবাসের জন্য বাহির হইব, এই আশা করিতেছি। অন্য কারণেও ইহা শ্রেয়ঃ। কারণ, এখানে যে বাধা পাইয়াছিলাম, এখানে থাকিয়াই তাহা ভঙ্গ করিব। আমার প্রতিযোগীদের সম্মুখীন হইয়া তাহাদিগকে পরাস্ত করিতে না পারিলে আমি শান্তি পাইতাম না। তুমি শুনিয়া সুখী হইবে যে, এতদিনের বিরুদ্ধ গতি অনুকূল হইয়াছে। সেদিন Nature-এর leading article-এ লিখিত ছিল—The Eastern mind coming fresh and untrammelled to the work as taught us etc. Royal Society এখন আমার দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। British Association হইতে সসম্মানে আহূত হইয়াছি। Botanical Section-এর President লিখিয়াছেন—

"আমি Plant Physiology সম্বন্ধে যে পুস্তক লিখিয়াছি, তাহার অপূর্ণতা দ্বিতীয় সংস্করণে আপনার আবিষ্ক্রিয়ার দীর্ঘ বিবরণ দিয়া পূরণ করিব।"

নূতন বিষয়ে অভ্যস্ত হইতে কতকটা সময় লাগে, সুতরাং সম্মুখের বৎসরে তাহা অভ্যস্ত হইলে আরও নূতন তথ্য প্রচারের সহায়তা হইবে। নতুবা অনেকগুলি নূতন বিষয়ে একবার গ্রহণ করিতে মানসিক জড়তা বাধা দেয়।

এই চিঠি পাইবার পশ্চাতে তোমাদের মধ্যে আমাকে দেখিতে পাইবে। ১১এ সেপ্টেম্বর রওনা হইব। কলিকাতা ৫ই কি ৬ই অক্টোবর পৌঁছিব। বোম্বাই হইতে তোমাকে telegraph করিব। তোমার সহিত যেন অগোপে দেখা হয়।

দুই বৎসরের পর তোমাদের সহিত দেখা হইবে। তোমাদের শুভ ইচ্ছা আমাকে সর্ব্বদা সঞ্জীবিত রাখিয়াছে। তোমাদের শুভ ইচ্ছা যদি কিয়ৎপরিমাণে পূরণ করিয়া থাকি, তাহা হইলে সুখী হইব।

তোমার

জগদীশ

অনেকগুলি নূতন কবিতা ও গল্প ফরমাইস রহিল। আমার ক্ষুদ্র বন্ধুটিকে ক্রোড়ে লইয়া সুখী হইব।

৪

লণ্ডন
১১এ সেপ্টেম্বর ১৯০২

বন্ধু,

মনে করিয়াছিলাম এ সপ্তাহে দেশে রওয়ানা হইব। আমার সহধর্ম্মিণীর হঠাৎ অসুখের জন্য তাহা হইল না। আগামী সপ্তাহের মধ্যে তিনি আরাম হইবেন, এরূপ আশা করিতেছি। আমরা ১১ই অক্টোবর কলিকাতা পৌঁছিব। তোমার, জগদীশ।

৫

দমদম
১লা জানুয়ারী ১৯০৩

বন্ধু,

তুমি সেদিন আমাকে তাড়াতাড়ি পাঠাইয়া দিলে, আর আমার ষ্টেশানে পুরা ১। ঘণ্টা বসিয়া থাকিতে হইয়াছিল। ১১টার সময় বাড়ী পৌঁছি। এখানে আসিয়া বুঝিতেছি আরও কয়দিন থাকিলে ভালো হইত।

এ কয়দিন যেরূপ মনের ও শারীরিক শান্তিতে ছিলাম তাহা সর্ব্বদাই মনে হইতেছে।

তোমার স্কুলের কথা সর্ব্বদাই ভাবিতেছি। যতই ভাবি ততই ভবিষ্যতে ইহা হইতে যে একজাতীয় মহাবিদ্যালয় উৎপন্ন হইবে তাহার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস হইতেছে। এ সম্বন্ধে অনেক কথা আছে, আসিলে হইবে।

তবে একটা বিষয় শীঘ্রই করিতে হইবে। এইটি সহজসাধ্য—পরে বৃহৎ আকারে হইবে কিন্তু বর্ত্তমান সুবিধা ছাড়িয়া দিতে নাই।

নবদ্বীপ তো সতীশ যাইবে। কিন্তু চীন ও জাপান হইতে পুঁথির কাপি সংগ্রহ অতি সত্বরই করিতে হইবে।

একজনকে চীন ভাষায় দিগ্‌গজ করা এখনও সময় সাপেক্ষ। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে কতকগুলি preliminary কাজ করিলে এ সম্বন্ধে একটা নূতন উৎসাহ হইবে। তাহার বলে কঠিনগুলি সহজ হইবে।

আমার plan এই—

এখন একজন একটি সংস্কৃত ও ইংরেজীবিদ ছাত্র সন্ধান করিয়া ৬ মাস Asiatic societyতে বুদ্ধধর্ম সম্বন্ধে Tibet এর mss, ও অন্যান্য লিপি যাহা আছে তাহা অভ্যস্ত করিতে হইবে। তারপর তোমার Mr. Horyকে সঙ্গে করিয়া তিনি চীন দেশের ও জাপানের নানা বিহারে বাঙ্গলা ও দেবনাগরী পুঁথির কাপি করিবেন।

এ সম্বন্ধে হোমির মত করাইতে হইবে। তাঁহার খবর আমাদিগকে দিতে হইবে। এরূপ মহৎ কার্য্যে হোমির সহানুভূতি পাইতে পার। আর জাপান ও চীন দেশের খ্যাতনামা লোকের সহিত আলাপের সুবিধা এখন হইতেই করিতে হইবে।

এই প্রথম exploration হইতে অনেক তথ্য বাহির হইবে, তাহার পর আরও systematic রূপে অনুসন্ধান করিতে হইবে। কোন কোন দিকে অনুসন্ধান কার্য্যকর হইবে এই preliminary কাজ হইতে তাহার সন্ধান পাওয়া যাইবে।

এ বিষয়ে আরও অনেক কথা আছে, তোমার সহিত শীঘ্রই যেন দেখা হয়।

কবিরত্নের পরীক্ষা লইয়া হয়তো তুমি ব্যস্ত আছ। আমার ভূতপূর্ব্ব ছাত্রদিগকে তুমি চেলা করিয়া লইও। তোমার

জগদীশ

পুঃ—আজ এ কাগজে এক সংবাদ দেখিয়া চক্ষুস্থির। আমার একটি পুচ্ছ সংযোগ হইয়াছে। এরূপ অনুগ্রহের কারণ বুঝিতে পারিলাম না।

৬

কলিকাতা

১৬, ৩, ১৯০৩

বন্ধু,

তুমি হাজারিবাগ পৌঁছিয়াছ কি না জানি না। চিঠি পাইয়াই উত্তর দিও।

নূতন নলটা করিতে দেরী হইল। নিজ বাসভূমে আমি এখন পরবাসী, আমার মিস্ত্রী এখন অন্যের হাতে, একটু তাহার সাহায্যের প্রয়োজন ছিল, এ জন্যেই দেরী হইল। আমি Parcel Post কাল পাঠাইব। আশা করি নির্ব্বিঘ্নে পৌঁছিবে। রেণুকার খবর সর্ব্বদা জানাইও। যতদূর সম্ভব বাহিরে গাছতলায় উন্মুক্ত বাতাসে থাকিবার বন্দোবস্ত করিও।

তোমার জন্য আমার মন ব্যাকুল থাকিবে। আমার পৃথিবীর পরিধি অতি ক্ষুদ্র। এই কয় বৎসরে তোমাকে অতি নিকটে পাইয়াছি। তোমার ও আমার সুখ দুঃখ যেন জড়িত হইয়া আছে। বাধা ও প্রতিকূল অবস্থাতেই যাহা প্রকৃত তাহা জানিয়াছি, তাহা না হইলে এ জীবন একেবারে নিষ্ফল হইত।

তোমার কার্য্য যে ফলবান হইবে তাহার ঘূণাক্ষরে সন্দেহ নাই। এ উপলক্ষে আমরাও দু একটি প্রকৃত মানুষের সন্ধান পাইব।

তোমার কিছু লেখা থাকিলে পাঠাইও। আমি এত লোকের মধ্যেও যেন একাকী। হাজারিবাগ আসিতে পারিলে কত সুখী হইতাম, বলিতে পারি না—হয় আসিব। দেখ, আমার এই মিথ্যা গোলমালে আর থাকিতে ইচ্ছা করে না। তোমার

জগদীশ

৭

Presidency College

১৭।৩।১৯০৩

বন্ধু,

আজ ওজোনের কল ডাকে পাঠাই। এক দিকে যে দু'টি তার দেখিতেছ তাহার সঙ্গে রুমকফ কয়েল লাগাইও। মুখ দিয়া আস্তে আস্তে বাতাস দিতে হইবে। অথবা এক নাসিকারন্ধ্র বন্ধ করিয়া অন্য দ্বারা শ্বাস টানিতে হইবে। ইহাতে ওজোন অধিক পরিমাণে হইবে।

তোমার ওখানে থাকিতে মন ব্যস্ত। আমার যেন মন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এখানকার ছোটখাটো রাষ্ট্রীয় গোলমাল তোমাকে স্পর্শ করে না। আমিও দূরে সব ভুলিয়া থাকিতে চেষ্টা করি, কিন্তু একেবারে বধির হইয়া থাকিতে পারি না। আর যে কাজ পাইয়া ভুলিতে চাই তাহাও পাই না।

সর্ব্বদা চিঠি লিখিও। আমাকে পরীক্ষায় চৌকিদারী করিতে হইতেছে।

তোমার

জগদীশ

পার্শেলটা সাবধানে খুলিও। টিনের মুখ এক দিকে কাটিয়া লইও। অধিক আঘাত করিলে ভিতরের কাচ ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে।

৮

বন্ধু, ১৯এ মার্চ্চ, ১৯০৩

তোমার পোষ্টকার্ডে তোমার অসুখের কথা শুনিলাম। এখন মনে হইতেছে, তুমি বোলপুরে থাকিলে দেখিতে আসিতাম। আমি এখনও নিষ্কাম ধর্ম লাভ করিতে পারি নাই। সুতরাং তোমার অসুখের কথা শুনিলে মন বিচলিত হয়। আর যখন আমার গণ্ডী এরূপ ক্ষুদ্র তখন ইহার মধ্যে কোনও আঘাত লাগিলে সাড়াটা অধিক রকম হয়। তোমার সহিত নৈকট্য যত বাড়িতে লাগিল, যেন মনে হইতেছিল কাজটা ভাল হইতেছে না। সে যাহা হউক, এখন অনুশোচনা করিয়া লাভ নাই তুমি শীঘ্র ভাল হও, শীঘ্র নিকটে সুস্থ শরীর লইয়া আইস।

রেণুকার খবর সর্ব্বদা জানাইও। এখন যেরূপ চিকিৎসা শাস্ত্রের উন্নতি হইতেছে তাহাতে এরূপ পীড়ার আরোগ্যও সহজসাধ্য মনে হয়।

শরৎ দাস মহাশয় এত করিয়াও যদি প্রভুর মন না পান, তবে একান্ত দুরদৃষ্ট বলিতে হইবে। দেখিতেছি দেবতার আরাধনা সহজ মনুষ্যের আরাধনাই সাধ্যাতীত। আজ Landholders সভাতে কি এক informal meeting হইবে, বুঝিতে পারিলাম না কি হইবে। তবে, mysteriously কেহ বলিলেন যে এদেশে বিজ্ঞান চর্চ্চার কি আগার প্রতিষ্ঠিত হইবার উদ্যোগ হইতেছে, নাটোর পাঁচ লক্ষ টাকা দিবেন ইত্যাদি। ভিন্ন ভিন্ন কলেজের অধ্যক্ষ (সুরেন্দ্রবাবু ইত্যাদি) আজ উপস্থিত থাকিবেন এবং এজন্য আলোচনা হইবে। আমি এজন্য কোন পত্র পাই নাই, তবে বঙ্গবাসী কলেজের গিরিশবাবু আমাকে যাইতে অনুরোধ করিলেন।

ব্যাপারটা কি বুঝিতে পারিতেছি না। অন্ততঃ আমার উপস্থিতি এরূপ অবস্থায় না থাকাই বোধ হয় ভালো। দশজনের রাষ্ট্রীয় আন্দোলন দ্বারা কিরূপ ফল হইবে তাহাও জানি না।

এই Easter উপলক্ষে বোধ হয় কয়দিন ছুটি আছে। তখন তোমার সহিত দেখা করিতে ইচ্ছুক। হয় কিনা জানি না—আমার মন আর এখানে নাই।

রাম না হইতেই রামায়ণ—তোমার বধূঠাকুরাণী এখন হইতে ব্রহ্ম-বিদ্যালয়ের নিকট কুটির নির্ম্মাণ করিতে উৎসুক।

বিধাতার রাজ্যে একটা সামঞ্জস্য আছে, আমরা বড় বড় জিনিষ ধরিতে যাই, আর চিরকালের জন্য শান্তি হারাই। আর গৃহলক্ষ্মীরা অতি ক্ষুদ্র পুতুল লইয়া চিরকাল মহা পরিতোষে জীবন যাপন করেন। ভালই।

এ বার হুকুম হইয়াছে যে, খোকার পায়ে যদি কোন কাঁটা ফুটিবার ঘা থাকে, তবে তাহার স্কুল যাওয়া বন্ধ।

তোমার
জগদীশ

৯

২৫এ মার্চ্চ ১৯০৩

বন্ধু,

তোমার জ্বরের কোন উপশম হইতেছে না শুনিয়া উদ্বিগ্ন হইলাম। তুমি কখনও পীড়া তাচ্ছিল্য করিও না। তোমার কাজকর্ম্ম এখন থাকুক, কেবল যত পার বিশ্রাম কর, আর যাহাতে শীঘ্র ভালো হও তাহা কর।

সেই বাটারীর জন্য

Sulphuric acid	1	part
Water	5	parts

mix with

powdered bichromate of potash as much as it will dissolve.

আমার বক্তৃতা শুক্রবার দিন সন্ধ্যা ৭টার সময়। তুমি থাকিলে যে কত সুখী হইতাম বলিতে পারি না। আর সব যেন অপরিচিত, অপ্রকৃত। শীঘ্র খবর দিও।

তোমার
জগদীশ

১০

93 Upper Circular Road.
১০ই আগষ্ট ১৯০৩

বন্ধু,

অনেককাল যাবৎ তোমার পত্র পাই না। মোহিত বাবুর নিকট শুনিলাম রেণুকা একটু ভালো আছেন। কিন্তু তোমার জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত আছি, তোমার মাঝে অসুখ হইয়াছিল শুনিলাম। কেমন থাক একখানা post card দিয়া জানাইও।

স্বামী উপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত আলাপ করিয়া বড় সুখী হইয়াছি। কেম্ব্রিজে বৃহৎ কার্য্যের সূচনা করিয়াছেন। এই উপলক্ষে যে আমাদের দর্শন শাস্ত্র বিদেশীর নিকট পরিচিত হইবে ইহা আমি বড় মঙ্গলকর ঘটনা বলিয়া মনে করি। পরশু দিন উপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত আলাপাদি করিবার জন্য আমি বন্ধুবর্গকে নিমন্ত্রণ করিয়াছি।

কিন্তু বিলাতে উপযুক্ত অধ্যাপক পাঠান আবশ্যক এই জন্য ব্রজেন্দ্র শীল মহাশয়ই সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত, তাহার সন্দেহ নাই। তবে তাঁহাকে কেবল দু'একটি বিষয়ে আবদ্ধ থাকিতে হইল। সাধারণের বুদ্ধিগম্য রকমে বক্তৃতা দিতে হইবে। তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। তাঁহাকে এ বিষয়ে বলিয়াছি এবং তিনি এ বিষয়ে সম্মত আছেন।

ব্রজেন্দ্র বাবুর এ সম্বন্ধে বহু কথা সংগৃহীত আছে। তাঁহার দ্বারাই এ কার্য্য প্রকৃষ্টরূপে সাধিত হইবে মনে হয়।

তবে কুচবিহারের নিকট এ বিষয়ে বলিতে হইবে যে তিনি পূর্ব্বে যে রূপ ব্রজেন্দ্র বাবুকে deputation পাঠাইয়াছিলেন এবারও তাঁহাকে সেইরূপ অনুগ্রহ করিতে হইবে। এ বিষয়ে তুমি লিখিলেই হইবে। আমি এ জন্য তোমাকে telegraph করিয়াছি।

আমার মনে হয় বিবিধ বাধা সত্ত্বেও আমাদের কার্য্যশক্তি একেবারে আবদ্ধ থাকিবে না।

স্কুলের খবর এখন ভালো। হেডমাষ্টারের প্রশংসা শুনিতেছি। তোমার চিঠির জন্য অপেক্ষা করিতেছি।

তোমার
জগদীশ

১১

৯৩ আপার সার্কুলার রোড
১৮ই আগষ্ট, ১৯০৩

বন্ধু,

তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। তুমি যে নানা দুশ্চিন্তার মধ্যে আছ, ইহা মনে করিয়া বড় কষ্ট হয়। তোমার নিজের শরীর যে ভালো নয়, তাহা তুমি না লিখিলেও বুঝিতে পারি।

আমি এখানে দু'-একটি অন্য বিষয়ের কার্য্যে সহায়তা করিতেছিলাম, তাহার মধ্যে বিলাতে হিন্দু দর্শনের অধ্যাপনা। ব্রজেন্দ্র বাবুর জন্য এখানে অনেকে আমাকে ধরিয়াছিলেন এবং তোমাকে telegraph করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করেন। তাহাতে তোমার নিকট telegraph যায়। এখানে কোন কাজে ১০ জনের একমত নাই। তবুও যতদূর পারিয়াছি, এজন্য চেষ্টা করিয়াছি।

কিন্তু তোমাকে বলিতে কি, আমার দশ কাজে যাইতে কোন অভিরুচি নাই। তোমার সহিত শুভক্ষণে দেখা হইয়াছিল, কেবল তোমার সহিত মন খুলিয়া কথা বলিতে পারি। আর তোমার সঙ্গেই কাজ করিয়া সুখী। নতুবা এত বড় বড় কথার গোলমালে মন অবসন্ন হইয়া যায়। একজনকে চেনা ও সম্পূর্ণ একা মনে করি। তুমি কবে আসিবে, তাহারই জন্য অপেক্ষা করিতেছি।

আমি একটা খুব বড় তথ্যের অনুসন্ধান লইয়া ব্যস্ত আছি, কিন্তু তুমি কাছে নাই বলিয়া কার্য্যে অবসাদ জন্মে। আরও নানা রকমে বাধা পাইতেছি। সে-সব কথা এখন থাকুক।

তুমি যে পুরীর জায়গা আমাকে দিতে চাহিয়াছ, তুমি কি মনে কর, আমার কোন স্থানের উপর কোনমাত্র টান আছে? কেবল এক সময়ে মনে করিয়াছিলাম যে, দু'জনে একটি কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া মাঝে মাঝে যাইয়া থাকিব। তোমারই জায়গা থাকুক, তুমি যদি এরূপ নিরাসক্ত হও, আর তুমি যদি পুরীতে সঙ্গী না হও, আমার পক্ষে ওরূপ নির্জ্জনবাস অসহ্য হইবে। মন নানা কারণে একেবারে নিস্তেজ হইয়া যায়, একটু জীবন্ত ভাব আসিলে ভালই। নতুবা সবই অলীক মনে হয়। মীরাকে আমি ও তোমার বন্ধুজায়া কাল দেখিতে গিয়াছিলাম, তাহাকে আগামী রবিবার দিন আনাইব। তুমি দু'-চারি পংক্তি সর্ব্বদা লিখিও।

তোমার
জগদীশ

কিরণকুমার রায়

পিতৃদত্ত নামটা মুছে গিয়ে কখন যে সবাই আমাকে 'বড় মিয়া' বলে ডাকতে শুরু করেছে, তা আমি জানি না ; হয়তো কেউই জানে না। বছর সাতেক আগেও কর্তা আমার নাম ধরে ডাকতেন। আরো কেউ কেউ ডাকতো। যেমন বুড়ো বাহাদুর সিং। বাহাদুর সিং দারোয়ান হয়ে আসে যে বছর, তার পরের বছর আমি আসি বেয়ারা হয়ে। বাহাদুর সিং আমাকে নাম ধরে ডাকতেন। বুড়ো অথর্ব হয়ে চোখে ছানি পড়ার পর তার জায়গায় নওজোয়ান নতুন লোক এসেছে। আমার নাতির সমান বয়স তার। বুড়ো বলে আমাকে সে খাতির করে। ডাকে চাচা। কর্তাও আর নাম ধরে ডাকেন না, ম্যানেজার বাবুও নয়। খদ্দের যাঁরা আসেন, তাঁরা তো নয়ই। সবাই ডাকেন বড়ো মিয়া। এখন এ নামটাই আমার পরিচয়, এ ডাকটাই আমাকে আহ্বান।

তবু আমার একটা নাম ছিল। যেমন আপনাদের সবার আছে। বাপ-মায়ের আদর করে রাখা নাম। আমার নাম সিরাজ আলি। কলকাতায় একদা যাঁরা খুব কাপ্তেন লোক ছিলেন, তাঁরা সবাই আমাকে এ নামেই ডাকতেন। বোসপাড়ার হরিসাধন দত্ত, হালসীবাগানের মিত্রসাহেব কি ভবানীপুরের বড় তরফের চৌধুরী। তাঁরা সকলেই গত হয়েছেন। সেই কলকাতাও আর নেই। আমার নামও তখন সবাই ভুলেছেন। কেবল ভোলেনি—

হ্যাঁ, কেবল ভোলে নি মিস ডোরা ডেসান। কয় দিন আগে ডোরা ডেসানের সঙ্গে দেখা হলো ইলিয়ট রোডে। অকালে বুড়ি হয়ে গেছে ডোরা ডেসান। চুলগুলো পাতলা হয়ে গেছে, কিছু বুঝি রেশমের মতো সাদাও হয়েছে। গায়ের চামড়া শিথিল হয়ে দুমড়ে গেছে। চোখেও নাকি ভালো দেখতে পায় না। তবু আমাকে দেখেই চিনতে পারলো। চিনতে পেরেই হাসলো, বললে, সিরাজ, তুমি যে একেবারে বুডঢা হয়ে গেলে,—

না। ডোরা ডেসানের কথা থাকুক। আমার কথাই বলি। আমি সিরাজ আলি, পার্ক স্ট্রীটের নামজাদা মদের দোকানের বেয়ারা। তেষট্টি বছর বয়স হলো। এই কলকাতায়ই পঞ্চাশ বছর ধরে বাস। আমার নাম আজ সবাই ভুলেছে। সকলেই ডাকে বড়ো মিয়া। এমন কি বাচ্চা মাতিয়া পর্যন্ত। ক'দিন আগে শুনছিলাম তার আম্মাকে বলছে নাতিটা, বড় মিয়া আর ক'দিন—

না। আর বেশি দিন নয়। আল্লার ডাক এসে পৌঁছেচে। অনেক দিন এ দুনিয়ায় কাটলো। এবার মায়া কাটাতে হবে। সেই শেষের দিনটিরও আর দেরি নেই।

হ্যাঁ, তার আগেই আমার কথা আপনাকে বলতে চাই। আমি জানি না, কি আমি বলবো। কিন্তু কিছু একটা বলার জন্ত আমার মনের মধ্যে আকুলি-বিকুলি আমি অনুভব করি। একটা তীক্ষ্ণ বেদনার মতো সর্ব্বক্ষণ তা জ্বলতে থাকে। অথচ ঠিক বুঝতে পারি না, আমার কথাটা ঠিকঠাক কি। কেমন।

বাবুসাহেব, লেখাপড়া শেখার রেওয়াজ ছিল না আমাদের পরিবারে। আমারও হয়নি। ত্রিপুরা জেলার একটা গণ্ডগ্রামে এক বিঘৎ মাটি আমার পৈত্রিক সম্পত্তি ছিল। চাষ করতো বাবা, আর বছরে আট মাস পরের বাড়িতে মুনিষ খাটতো। সেকালের কথা এখন স্বপ্নের মতো মনে হয়। দেড় টাকায় এক মণ চাল, দু' পয়সা সের দুধ, দশ পয়সায় নতুন খুবসুরৎ লুঙি। তবু, তখনো বছর ভরে আমরা খেতে পেতাম না। ঈদ মহরমে পেতাম না নতুন কাপড়। জীবনে সুখের মুখ দেখতাম না।

তাই এগারো বছর বয়সে শহর কুমিল্লায় গেলাম চাকরি করতে। মুন্সীবাড়ির নোকর। সেখান থেকে চাটগাঁ, চাটগাঁ থেকে নারায়ণগঞ্জ। তার পর খাস কলকাতায়।

সে সব কথা নাই বা শুনলেন। শুধু দুঃখের কথা, শুধু চোখের জলে-ভরা দীর্ঘশ্বাসের কাহিনী। কলকাতায় এসে রাজাবাজারে একটা হোটেলে চাকরি পেলাম। যারা খেতে আসতো তাদের খাবার দেওয়া, প্লেট-গেলাস ধোয়া-মোছা, ফাইফরমাস খাটা। সেই যে বয়ের চাকরি, তাতেই আটকে গেলাম। অবশ্য রাজাবাজারে নয়, নানা জায়গায় নানা রেস্তোরাঁ হোটেলে। পার্ক স্ট্রীটের এই মদের 'বারে' আছি পঁচিশ বছর। বয়স হু হু করে বেড়ে গেছে, শরীরের যন্ত্রপাতিতে ভাঙন লেগেছে, চুল সব সাদা হয়ে গেছে। তাতে আফশোস নেই। বাবুসাহেব, আফশোস ছিল না যদি—

না, না। এ আমার ঠিক মনের কথা নয় বাবুসাহেব! যা চাই শুধু তাই পাবো, জীবনটা এমন সহজ সুন্দর হবে, এ যে সম্ভব নয় বাবুসাহেব! অনেক দেখলাম। অনেক বিচিত্র দুঃখ, অনেক অদ্ভুত কান্না। মদের দোকানে বেয়ারাগিরি করে জীবনটাকে আমি আলাদা চোখে দেখেছি। তাই এ আমি ভাবি না, জীবনটা আমার ইচ্ছার মতো হয়েই চেহারা নেবে। আমি তো জানি, এ হয় না, কারোর জীবনেই হয় না।

বাবুসাহেব, আমার ছেলেকে আপনি দেখেন নি। দেখলে চিনতে পারতেন না। ফট ফট ইংরাজি বলে। অনেক কাল ধরে সাহেব-মেমদের মদ সার্ভ করে ইংরাজি উচ্চারণের ধরণটা আমি জানি। আমি বুঝতাম, আমার ছেলের ইংরাজি কথাবার্তাগুলো একেবারে খাঁটি সাহেবের বাচ্চার মতো। একে আমি আল্লার দয়া বলে মেনে নিয়েছিলাম। কিন্তু তাতেই আমার কাল হলো।

চাষার ছেলে আমি, মদের দোকানের বেয়ারা। অজ গাঁ থেকে এসে পড়েছি একেবারে খাস কলকাতার সাহেবপাড়ায়। আমার

মাথাটা একটু ঘুরে যাবে, তাতে আশ্চর্য কি ? কিন্তু বাবুসাহেব, মাথাটা আমার একটু নয়, একেবারেই ঘুরে গেল।

ছেলে যে বিপণ স্ট্রীটের কয়টা চ্যাংড়া ট্যাঁশফিরিঙ্গি বাচ্চার সঙ্গে মিশে ছেঁড়া প্যান্ট-কোট পরে কয়টা ইংরাজি বুলি শিখেছে, তা আমি মানতে চাইতাম না। ভাবতাম, হলামই বা আমি বেয়ারা, আমার ছেলে কেন ভদ্দরলোক হবে না ? বছরের পর বছর সারা রাত ভরে কলকাতার এই বেপাড়ায় ভদ্দরলোকদের যে নোংরা ইতরামি দেখেছি, তাতেও আমার শিক্ষা হয় নি। আমি ভেবেছিলাম এক একজন ভদ্দরলোক আসমানের একটি তারা। আমার ছেলেও কেন এমনি একটি জলজলন্ত তারা হবে না ?

ছেলেকে আমি ইস্কুলে ভর্তি করে দিলাম। সাহেবী ইস্কুলে। ভদ্দরলোকদের রাজা সাহেবদের দিকেই আমার নজর ছিল। সাহেবদের নকল করতে পারলেই তো ভদ্দরলোক হওয়া যাবে।

আমি আরো খুশি হলাম, ইস্কুলের পরীক্ষায় বার বার জলপানি পেতে লাগলো আমার ছেলে। বরাবর ফার্স্ট কি সেকেণ্ড হতে লাগলো ক্লাশে। মাষ্টারমশায়রা খুব প্রশংসা করতেন। এক দিন পাদ্রী হেডমাষ্টার আমাকে ডেকে বলেছিলেন, তোমার ছেলে একটি রত্ন।

বাবুসাহেব, কখনো কখনো, কতকগুলো কথা একেবারে মনের মধ্যে গিয়ে বিঁধে থাকে। আমার ছেলে যে একটি রত্ন, তাতে আমার সন্দেহ ছিল না। পাদ্রী সাহেবের কথাটা তাই আমার বুকের মধ্যে বাসা বেঁধে রইলো। ছেলের দিকে তাকিয়ে আমার আর তৃপ্তি মিটতো না। ছেলের কথা ভেবে ভেবে মনে মনে আশার সৌধ বানাতাম। ভাবতাম জজ-ম্যাজিস্ট্রেট একদিন সে হবেই। হুজুর বলে ডাকবে সবাই, পথে-ঘাটে দেখা হলে লোকে সেলাম করবে। তার বাড়িতে আমার মতো বেয়ারা থাকবে কয়েক জোড়া। ভাবতেই গর্বে আমার বুক ভরে যেত।

একটু বেশি বয়সে লেখাপড়া সুরু করেছিল বলে ম্যাট্রিক পাশ করার সময় সে পুরোপুরি সাবালক হয়ে গিয়েছিল। আমাদের পরিবারে নিয়ম ছিল, সাবালক হবার আগেই ছেলের বিয়ে দিতে হবে। আমার বাকি ছেলেদের বিয়ে দিয়েছিলাম যথাসময়ে। তারা কেউ লেখাপড়া ভালো শেখে নি। একজন একটা লোহার কারখানার মিস্ত্রি, আরেকজন পাকসাকাসে একটা বিড়ি সিগারেটের দোকান দিয়েছে। তাদের প্রতি আমার কোন আশা ছিল না, খেয়ে-পরে বেঁচে-বর্তে থাকলেই আমি সুখী। কিন্তু এ ছেলেকে আমি বিয়ে দিতে রাজী হলাম না।

আমার স্ত্রী ছেলের বিয়ের জন্ত হুলুস্থুলু বাধিয়ে দিয়েছিল।—কি কেলেঙ্কারি, সাবালক হয়ে গেল ছেলে, তবু বিয়ের নাম করে না !—স্ত্রী প্রথম প্রথম অনুযোগ করতো। তারপর কান্নাকাটি সুরু করে দিল। কিন্তু আমার আশা তো অনেক দূর। আমি কঠিন হয়ে রইলাম।

বিয়ে করলেই নতুন বিবি নিয়ে যৌবনের নেশায় মত্ত হবে ছেলে, লেখাপড়ায় মন বসবে না। বৌয়ের মতো লেখাপড়ার এমন শত্রু আর নেই। কথাটা কেউ আমাকে বলে দেয় নি, সহজবুদ্ধিতেই বুঝেছিলাম। আর মেয়েমানুষের নেশা মানুষকে যে কতখানি ক্ষতি করে, মদের দোকানে এতদিন ধরে বেয়ারাগিরি করেও আমি যদি না বুঝি, কে বুঝবে বলুন ?

ছেলের বিয়ের কোন ব্যবস্থাই আমি করলাম না। অনেক প্রস্তাব এসেছিল, আমি বাতিল করে দিলাম একদফেই। ছেলের মা কান্নাকাটি করে যখন বুঝলো কিছু হবে না, আমার মন টলবে না, খাওয়াদাওয়াই ছেড়ে দিল। ছেলের মেজাজটাও যে ভাল রইলো না, বুঝতে আমার কষ্ট হলো না।

আমি হাসলাম মনে মনে। যার জন্ত চুরি করি সেই বলে চোর। যার ভালোর জন্ত আমার চেষ্টা, সে নিজে সন্তুষ্ট নয়। কিন্তু কি করা যাবে, শুভ আর কল্যাণের পথে চলা যে কত কষ্টের, তা তো এ দুনিয়ায় রোজই দেখতে পাই।

বাবুসাহেব, আমার কথা শুনে হাসবেন না। ভাববেন না, বক্তৃতা দিচ্ছি, কি উপদেশ দিচ্ছি পাদ্রীদের মতো। এ অনেক জ্বালা পাওয়া, বেদনা পাওয়ার কথা। আমার ছেলেকে আমি শুধু ভালোবাসতাম না, তাকে মানুষের মতো মানুষ করে তুলবো, এই ছিল আমার আকাঙ্খা। কিন্তু বাবুসাহেব—

থাকুক, সেকথা পরে হবে। ছেলেকে ভর্তি করে দিলাম কলেজে। প্রতিবেশী আত্মীয়-স্বজন সবাই হাসলো, সবাই বিদ্রূপ করলো। বললে, সিরাজ আলির বেটা লাট হবে বলে কলেজে যাচ্ছে।

লাট তো সাহেবরা হয়। অনেক দিন আগেকার কথা বলছি। সাহেবরা ছাড়া তখন লাট হতে পারতো না কেউ। কিন্তু আমার ছেলে জজ্-ম্যাজিস্ট্রেট কেন হতে পারবে না ? কারোর মন খুলে আমার এই আশার কথাটা বলতাম না। কিন্তু এই কথাটাই আমি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতাম।

কলেজে ভর্তি করে দিলাম ছেলেকে। সাহেবদের কলেজে। কলেজের এক প্রফেসার রোজ আসতেন মদের দোকানে, আমাকে খাতির করতেন। তাঁকে দিয়ে কলেজের ভর্তির ব্যাপারটা চোকাতে পারলাম সহজেই। কিন্তু গোলমাল হলো ছেলের নাম নিয়ে।

ছেলের নাম ছিল মহম্মদ আলি। নামটা সাদাসিধে। নামের আগে একটা সৈয়দ বসিয়ে দিল ছেলে। সৈয়দ মহম্মদ আলি। নামটা সুন্দর হলো তা আমি অস্বীকার করি না। আভিজাত্যের রঙও লাগলো, বনেদিয়ানার ঢঙ। কিন্তু তবু আমার মনে খচখচ করতে লাগলো। কি আশ্চর্য দেখুন, আমি অনেক দূরের স্বপ্ন মনে মনে পুষে রেখেছিলাম, তবুও ছেলের এই আভিজাত্যের মোহটা ভালো লাগলো না। মনে হলো, মোহটা একদিন খুব একটা ভয়ঙ্কর বিপদের মধ্যে তার জীবনটাকে জড়িয়ে নেবে।

আগেই বলেছি, ছেলের বয়সটা একটু বেশী হয়ে গিয়েছিল। ও যখন কলেজে ভর্তি হলো, তখন তার একুশ বছর পূর্ণ হয়ে গেছে। পুরোপুরি নওজোয়ান। মুখে চাপ-চাপ গোঁফদাড়ি। দেহে যৌবনের তেজ।

একদিন সে এসেছিল কি একটা কাজে আমাদের মদের দোকানে। তখন সন্ধ্যা গাঢ় হয়ে নেমেছে। দোকানে অসম্ভব ভিড়। কয়েকটা নিত্য-আসা ফিরিঙ্গি মেয়ে কয়েকটা টেবিলে জাঁকিয়ে বসেছে।

সে এসে আমার সঙ্গে কয়েকটা পারিবারিক কাজের কথা বলে আবার তক্ষুণি চলে গেল।

একটা চেয়ারে বসেছিল ডোরা। ডোরা ডেসান। তখন তার তেজী বয়স, ভরপুর যৌবন। সে ফিক করে একটু হাসলো, তারপর আমাকে ডেকে জিগ্যেস করলো, ও কে সিরাজ আলি?

বললাম, আমার বেটা। কথাটা বলতে গিয়ে একটা গর্বের রেশ জেগেছিল আমার মনে। সুন্দর নওজোয়ান ভদ্রগোছের একটি ছেলে, কিন্তু ডোরা ডেসানকে বলতে পারা গেল না, কি আশ্চর্য সম্ভাবনাময় তার ভবিষ্যৎ!

ডোরা জিগ্যেস করলো, কি নাম তোমার ছেলের?

সৈয়দ মহম্মদ আলি।

আবার একটু হাসলো ডোরা ডেসান।

তার চোখে একটা চকিত বিদ্যুৎ ঝলসে গেল। একটা বিষধর সাপের মতো যেন একটু ক্ষণের জন্য ফণা তুলে। কিন্তু সে বিদ্যুতের মানে আমি বুঝতে পারিনি তখন।

সে আবার জিগ্যেস করেছিল, কি করে তোমার ছেলে?

কলেজে পড়ে।

তাই নাকি? বিস্মিত হয়েছিল ডোরা ডেসান। বলেছিল, আমার কাছে একদিন পাঠিয়ে দিও তোমার ছেলেকে সিরাজ আলি, তাকে একটা প্রাইভেট টুইশনি দেব।

এক-আধটা টুইশনি পেলে আর্থিক দিক থেকে সুবিধা হয়। বেয়ারাগিরি করে সংসার চালানোর উপর ছেলেকে কলেজে পড়ানো যে কত কষ্টকর, তা তো বলার দরকার হয় না বাবুসাহেব!

পরদিন সকালেই পাঠিয়ে দিলাম ছেলেকে। তখন আমার বাসা ছিল রিপণ লেনে আর ডোরা ডেসান থাকতো ম্যাকলিয়ড স্ট্রীটে। ফিরে এসে খানিকক্ষণ গম্ভীর হয়ে রইলো মহম্মদ আলি। ডেকে জিগ্যেস করলাম, কি রে, কি হলো, পেলি টুইসনি?

পেয়েছি। কিন্তু—

একটু উদ্বিগ্ন হয়ে জিগ্যেস করলাম, কিন্তু আর কি?

কিন্তু বড় খারাপ।

কি খারাপ?

মেয়েগুলো!

নিশ্চিন্ত হলাম। মেয়েগুলো যে খারাপ, আমার থেকে বেশি আর কে জানে! ছেলের দিকে তাকিয়ে রইলাম খুশি মনে। মেয়েমানুষ পুরুষকে খুব সহজেই বিভ্রান্ত করতে পারে। তার ওপর ওই মেয়েগুলো। যারা সন্ধ্যা থেকে রাত পর্যন্ত শিকার ধরে বেড়ায় আমার ছেলে যে ওই মেয়েগুলোকে ঘৃণা করতে শিখেছে, তাতে বড় সুখী হলাম। তৃপ্ত হলাম। কিন্তু আমার খুশি বাইরে জানাতে দিলাম না। জিগ্যেস করলাম, কত মাইনে দেবে?

কুড়ি টাকা।

আমি একেবারে আকাশ থেকে পড়লাম। বাবুসাহেব, যে কালের কথা বলছি, তখন এক মণ চালের দাম আড়াই টাকা। ছেলে-মেয়ে-বৌ নিয়ে অনেক লোকই দিব্যি সুখে সংসার চালায় কুড়ি টাকায়।

কা'কে পড়াতে হবে?

মিস ডোরা ডেসানের দিদি মিসেস ক্রিস্টিনা স্টিভেনশনকে। হিন্দী পড়াতে হবে সপ্তাহে তিন দিন। কোথায় একটা ভালো চাকরি নাকি পাবেন, হিন্দী না জানলে চাকরিটা জুটবে না।

একটা কথা আগে বলতে ভুলেছি, আমার ছেলে আরবি, উর্দু আর হিন্দী খুব ভালো করে শিখেছিল। আমি ভাবতাম, ইংরাজি ভাষারই শুধু দাম, আরবি-হিন্দী-উর্দুর নয়। হিন্দী পড়িয়েও মাসে কুড়ি টাকা রোজগার হয়, শুনে আমি অবাক হলাম।

ছেলের কাছে আগে শুনলাম, মিসেস ক্রিস্টিনার স্বামী মারা গেছেন কয়েক বছর আগে। বছর পনেরো বয়সের একটা মেয়ে আছে তার। সওদাগরি অফিসে টাইপিস্টের চাকরি করেন। এখন তদ্বির-তদারক করছেন ভালো একটা চাকরির। হিন্দী জানা থাকলে নাকি পেয়ে যেতে পারেন।

শুনে আমার ভালো লাগলো। যাকে পড়াতে হবে, তিনি প্রবীণা মেমসাহেব। সংসারে ঘা খেয়েছেন তিনি, জীবন দিয়ে স্নেহ করার মতো সন্তান আছে তাঁর। বাজে ফাজিল ফক্কড়িতে সময় দেবার মতো নিশ্চয়ই তাঁর প্রবৃত্তি নেই।

মাসের পয়লা থেকেই নিয়মিত পড়াতে যেতে লাগলো মহম্মদ আলি। আমিই জোরজার করে পাঠালাম। কামাই গাফলতি করতে পই পই বারণ করে দিলাম। কুড়ি টাকা রোজগার করতে পারলে তার পড়ার খরচ তো উঠবেই, সংসারেও একটু হাসির মুখ ফুটবে।

মহম্মদ আলি আমার অন্য ছেলেদের মতো নয়। সে ভদ্রলোকদের মতো দেখতে, কথাবার্তায়ও চৌকস। ছেলেবয়স থেকেই সে একটু বিলাসী। লুঙ্গি পরতে ভালো লাগতো না তার। বাড়িতে পরতো পাজামা, বাইরে বেরোবার সময় সার্ট-পেন্ট। আমি হাসতাম মনে

মনে। ভাবতাম ভবিষ্যৎ যার যেমন কাটবে, ছেলেবেলা থেকেই বুঝি তেমনি রুচি দেন আল্লা।

একদিন একটা কাচের ছোট শিশি পেলাম মহম্মদ আলির পড়ার টেবিলে। মিষ্টি গন্ধমাখা তেলের মতো কি একটা জিনিস আছে তাতে। মহম্মদ আলি বললো, সেণ্ট। কাপড়ে লাগালে নাকি গন্ধ বেরোয়। চুলের সুগন্ধ তেলও দেখলাম একদিন। ক্রমশঃই নজরে পড়তে লাগলো, দিনে দিনে যেন সৌখীন হয়ে যাচ্ছে মহম্মদ আলি। বাবুগিরির দিকে বেশি নজর দিয়েছে।

ভাবলাম কলেজে পড়ছে সে। কত বড় লোকের ছেলের সঙ্গে উঠা-বসা করতে হয়, সমান তালে চলতে হয় সাহেব সুবার সঙ্গে, পোষাকে সেণ্ট না মাখলে, ভালো করে টেরি কেটে চুল না আঁচড়ালে, ইস্ত্রিকরা জামা কাপড় না পরলে, ইজ্জৎ থাকবে কেন? তাই সাধ্যের বাইরে বিলাসিতা করছে দেখেও আমি দেখতে চাইতাম না। কিছু বলতাম না মহম্মদ আলিকে।

কিছুদিন যেতে না যেতেই একটা ফিস-ফিস গুঞ্জন কানে আসতো, কিন্তু স্পষ্ট কথাটা শুনতে পেতাম না, বুঝতেও পারতাম না। আমি কাছে গেলেই গুঞ্জনটা থেমে যেত। কানাকানিটা স্তব্ধ হয়ে থাকতো। শুধু পরচর্চারত লোকগুলো বিদ্রূপের হাসি নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে থাকতো।

একদিন ডোরা ডেসান বললে, সিরাজ আলি, তোমার ছেলেকে সামলাও। বলেই হাসলো। হাসলো তার সঙ্গের আরো ক'টা মেয়ে।

উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কেন?

ভীমরতি হয়েছে।

আমি কিছু বললাম না। চলে এলাম। এতদিন খাতির করেছি ডোরা ডেসানকে। লুকিয়ে চুরিয়ে গেলাসে ভরে দিয়েছি খাঁটি মদের পেগ। খদ্দের জুটিয়ে দিয়েছি। তার জন্যই তো ছেলে পেয়েছে এমন একটা চাকরি। কিন্তু আজ তার দিকে তাকিয়ে আমার রাগ হতে লাগলো। মহম্মদ আলিকে নিয়ে বিদ্রূপ করার অধিকার তাকে কে দিয়েছে?

আমি জানতাম না অনেক কিছুই। জানতাম না, অধিকার মহম্মদ আলিই দিয়েছে। দিয়েছে অসংযত আচরণে।

বাবুসাহেব, বুঝতে পারছি, একটা সন্দেহ আপনার মনে জাগছে বুঝি—

হায় রে, আমি বুঝেও বুঝতে পারিনি। একদিন মহম্মদ আলি বললো, কলেজ আমি ছেড়ে দেব।

কেন? আকাশ থেকে পড়লাম আমি।

একটা চাকরি পেয়েছি। মাইনে পঁয়ষট্টি টাকা।

হঠাৎ আমার রাগ হলো। পঁয়ষট্টি টাকা পরিমাণ হিসাবে অনেক। তবু আমি যে তিলে তিলে উচ্চাশাকে পোষণ করে রেখেছি, জজ-ম্যাজিষ্ট্রেটের স্বপ্ন বুনছি। অনেক সম্মান, অনেক টাকা, অনেক
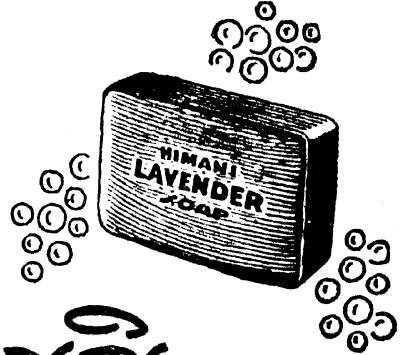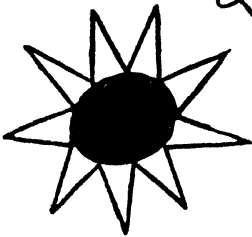
প্রতাপ-প্রতিপত্তি। কলেজ ছেড়ে দিয়ে হোক পঁয়ষট্টি টাকা, তবু এখনই চাকরি করতে বেরোলে আমার প্রতিদিনের স্বপ্ন যে চৌচির হয়ে ভেঙে যাবে।

বললাম, কলেজ ছাড়তে পারবে না। চাকরির মাথায় লাথি মারি।

মহম্মদ আলি একবার বিদ্রোহের ভঙ্গী করে তাকালো আমার দিকে। কিন্তু আমার চোখে রাগের আগুন দেখে কিছু বলল না। মাথা নিচু করে চলে গেল।

কিছুদিন পরে আবার একদিন ডোরাই আমাকে জানালে, সিরাজ আলি, তোমার ছেলে যে বড্ড বেড়ে গেছে। বুড়ি হয়ে গেছে ক্রিষ্টিনা, মেয়ের বয়স হলো বিয়ে দেবার মতো, তার সঙ্গে হৈ হৈ করে বেড়াচ্ছে মহম্মদ আলি। ওদের দু'জনের জন্য পাড়ায় যে আর কান পাতা যায় না।

এবার আর হাসি নেই ডোরা ডেসানের মুখে। বললে, শুনলাম, সে নাকি কলেজ ছেড়ে দিয়ে কোথায় এক চাকরিতে ঢুকেছে। বিয়ে করবে ক্রিষ্টিনাকে। ক্রিষ্টিনার রুচিকেও বলিহারী! পুরুষ পেলো না এংলো-ইণ্ডিয়ান সমাজে?

ঘৃণা আর রাগের আভাস দেখা গেল ডোরার মুখে।

ক'জন প্রতিবেশীও আমাকে সাবধান করে দিল। বারের আরো কয়টা মেয়ে বিচ্ছিরি সব কথা শোনালো।

বাবুসাহেব, আপনার ছেলে আছে কি না জানি না। জানলে বুঝতেন, ছেলেকে যতখানি ভালোবাসা যায়, নিজের প্রতিও অতো ভালোবাসা হয় না। আর যে ছেলে সব দিকে রত্ন, আশার মণি, তার প্রতি যে কত টান ভালোবাসা হয়, কেমন করে বোঝাবো আপনাকে?

মহম্মদ আলিকে আমি ভালোবাসতাম সব থেকে বেশি। আমার নিজের থেকেও। আর তার সম্পর্কে আমার আশার অন্ত ছিল না।

ডোরা ডেসান আর মেয়েগুলির কথাবার্তা শুনে আমার বুকের মধ্যে একটা আগুন দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠেছিল। প্রতিবেশী সহকর্মীদের কথা শুনে তাই হয়ে গিয়েছিল দাবানল। আমার মনের জগতে সব-কিছু পুড়িয়ে ছারখার করে দিচ্ছিল।

শরীর খারাপ বলে সেদিন আমি তাড়াতাড়ি চলে এসেছিলাম দোকান থেকে। তখন রাত্রির মাত্র প্রথম প্রহর।

দূর থেকে একটা চিৎকার শুনছিলাম। কটু কোলাহল। ভর্ৎসনা, কান্না, কলরব। বাড়ির উঠোনেই গোলমালটা জমজমাট। বহু লোকের ভিড়। মেয়ে-পুরুষ। লোকগুলি তামাশা দেখছে, হাসছে, মজা লুঠছে। আমার স্ত্রী দাওয়ায় বসে লুটিয়ে লুটিয়ে কাঁদছে।

কি ব্যাপার? বুকের মধ্যে দড়াম করে বাজলো একটা ভয়। কি হলো আমার বাড়িতে! ভীরুপায়ে চোরের মতো ভিড়ের পাশে এসে দাঁড়ালাম।

মহম্মদ আলি প্রচণ্ড মাতাল হয়ে মাটিতে লুটোচ্ছে। পায়ের কাছে একরাশ বমি। কতকগুলো মাছি ভন-ভন করছে। আর ডোরা ডেসানের দিদি মিসেস ক্রিষ্টিনা ষ্টিভেনসন খোলামেলা পোষাকে মাটিতে শুয়ে গোঙাচ্ছে।

মাথাটা আমার রাগে জ্বলে গেল। কোত্থেকে একটা মস্ত বাঁশের টুকরা এনে গায়ের সমস্ত জোর দিয়ে মহম্মদ আলির মাথায় বাড়ি মারলাম। ভয়-সন্ত্রস্ত জন্তুর মতো একবার দুটো চোখ মেলে আমার দিকে তাকালো মহম্মদ আলি। তারপর লুটিয়ে পড়লো মাটিতে। আমার স্ত্রী কাঁদতে কাঁদতে ছুটে এলো। কতকগুলো লোক আমাকে ধরে রাখলো। বড় ছেলের বৌ আর্ত-কান্না আরম্ভ করে দিল গলা ফাটিয়ে।

আমি চুপচাপ চলে এলাম আমার ঘরে। দরজা বন্ধ করে মাটিতে উবু হয়ে ভাঙা-গলায় ডাকতে লাগলাম, আল্লা ইয়া আল্লা, এ তুমি আমার কি করলে!

পরের দিন থেকে আর খোঁজ পাওয়া গেল না মহম্মদ আলির। সে একবারে নিখোঁজ হয়ে গেল। ক্রিষ্টিনা ষ্টিভেনসন কিন্তু রইলো নিজের ঘরেই। তার কেলেঙ্কারিটাও লোকে ভুলে গেল ক'দিন পরে।

কেবল আমার কপালই ভাঙলো। যে সন্তানটিকে সব চেয়ে বেশি মমতা দিয়ে আশার স্বপ্ন বুনে বুনে মানুষ করছিলাম, সে হারিয়ে গেল একেবারে!

বাবুসাহেব, মদের দোকানে রোজ কত কাণ্ড দেখি। কত সংসার তছনছ হওয়ার কত করুণ-কাহিনী। মানুষের মর্মন্তুদ দীর্ঘনিঃশ্বাস। আমার কাছে এখন কিছুই বিচিত্র মনে হয় না। পুরুষ আর মেয়ে যদি এক সঙ্গে কখনো নিবিড় ভাবে মেলে, তাহ'লে তাতে আগুন একটা জ্বলবেই।

সে আগুন কারোর কারোর ঘরে সুখের আলো ছড়ায়। শান্তির দীপালোক জ্বালায়। আবার সে আগুন কখনো কারোর ঘরবাড়ি পুড়িয়ে ছারখার করে দেয়।

বাবুসাহেব, আমার ভাগ্যে দীপালোক জ্বললো না। দাবানল সব পুড়িয়ে ছাই করে দিল। তবু যদি থাকতো আমার ছেলেটা। নাই বা হলো জজ-ম্যাজিষ্ট্রেট, নাই বা হলো হুজুর-হাকিম। তবু যদি থাকতো আমার ঘরে, যদি তার মুখ দেখতে পেতাম, তাহ'লে ক্ষমা চেয়ে নিতাম তার কাছে। যাক গে—

বাবুসাহেব আদাব! আপনাদের জীবনে যেন মঙ্গলের আলো জ্বলে, তাহ'লেই আমি খুশি হবো।

এ মাসের প্রচ্ছদপট

[এই সংখ্যার প্রচ্ছদে শিলঙে 'ডন বস্কো' গীর্জার ঠিক বিপরীত দিকের একটি পার্কে রক্ষিত যীশুখ্রীষ্টের এই মূর্ত্তি আছে। আলোকচিত্র রথীন রায় গৃহীত।]

সোমেন্দ্রনাথ রায়

একরাশ নরম ফুলের মত স্বামীর কোলের ওপরে মুখ গুঁজে পড়েছিল মিনু।

ঘরের জিনিষপত্র অগোছালো হয়ে গেছে। ছিঁড়েছে বিছানার চাদর আর একখানা শাড়ি। চেয়ারটা পড়ে আছে একপাশে মুখ থুবড়ে! টেবিলের বইখাতা এলোমেলো। দামী ফাউন্টেন পেনটা গড়াচ্ছে মাটিতে। ঘরের চারি দিকে তাকাতে তাকাতে থাবা দিয়ে মুখ আর মাথা পরিষ্কার করছিল ফুলটুসী। বাদামী, কালো আর সাদা, তিন রঙে অপরূপ কাবুলি বেড়াল।

কথা না বলে স্ত্রীর পিঠে হাত বোলাচ্ছিল শোভেন। জুৎসই কোন সান্ত্বনা-বাক্য মনে আসছে না। আবদার আর কান্নায় মেশা ঘড়-ঘড় ধ্বনি শোনা যাচ্ছিল মিনুর কণ্ঠ থেকে। মৃদু হেসে স্ত্রীর গালে ছোট একটা চিমটি দিয়ে শোভেন বলল, ফুলো বেড়াল।

সঙ্গে সঙ্গে ছিটকে উঠে পড়ল মিনু। ক্রুদ্ধ কটাক্ষে স্বামীর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, কি বললে?

হেসে তার চিবুকে হাত দিয়ে শোভেন বলল, ফুলটুসী হল তোমার হুলো বেড়াল। আর তুমি হচ্ছ আমার ফুলো বেড়াল।

ঝটকা দিয়ে স্বামীর হাত সরিয়ে দিল মিনু। উঠে দাঁড়িয়ে ঘরের চারি দিক দেখল একবার। তার পর ধাঁই করে লাথি মারল ফুলটুসীর গায়ে।

ম্যাও-ঘরর, শব্দ করে ছিটকে গেল বেড়ালটা। হঠাৎ এই অনাদরের কারণ বুঝতে না পেরে বিস্মিত হয়ে গেল বোধ করি। দুম দুম করে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল মিনু।

স্ত্রীর ছেলেমানুষিতে বিরক্ত হয় না শোভেন। তিন বছরের বিবাহিত জীবনে মিনুর আদ্যন্ত চেনা হয়ে গেছে তার। মৃদু হেসে আবার খবরের কাগজটা তুলে ধরল চোখের সামনে। কিন্তু পড়বে কি? কেবল স্মৃতির পটে ভেসে ওঠে একটু আগের ঘটনাগুলো।

শ্রীরামপুরের এই কটন মিলে স্পিনিং মাষ্টারের চাকরি নিয়ে এসেছে শোভেন আজ মাস ছয়েক হল। প্রথম দিকে কোয়ার্টার পায়নি। মাসখানেক হতে চলল, এই দোতলা বাংলোর নিচের অংশ পেয়েছে থাকবার জন্ত। দোতলায় থাকে মালিকের ভাইপো হীরাচাঁদ।

প্রাইভেট লিমিটেড ফার্ম। মালিক বাবু জয়রাম দাস আগরওয়ালার আরও একটা কটন মিল আছে আমেদাবাদে। সেখানে দেখাশুনো করেন বড় ভাই হরিকিষণ দাস। এখানে ম্যানেজিং ডাইরেক্টর বাবু জয়রাম দাস। তবে কাজকর্ম বেশীর ভাগ দেখাশুনো করে বাবু হরিকিষণ দাসের ছেলে হীরাচাঁদ। চৌকস ছোকরা। ম্যাঞ্চেষ্টারে দু'বছর ছিল। আলাপে ব্যবহারে টের পাওয়া যায় না মাড়োয়ারী ঐতিহ্য। ইংরেজি আর বাংলা, দুটো ভাষাই রপ্ত। চেহারাতেও সুপুরুষ। ভাল টেনিস খেলোয়াড়। শনিবার একটা বাজবার আগেই অফিস ছেড়ে বুইক গাড়ি হাঁকিয়ে ছোটে কলকাতায়, রেসের মাঠে। ফেরে কোন দিন রাত বারটায়। কোন দিন রবিবার সকালে। প্রত্যহ মিক্সট ব্রিড এ্যালসেসিয়ান কুকুরের চেন ধরে দাঁতে পাইপ কামড়ে বেড়াতে যায় গঙ্গার ধারে। চোস্ত সিল্কের স্যুটের বাহার দেখে হাঁ করে থাকে মাঝি-মাল্লা, কুলি-কামিনেরা। ঠোঁটের চটুল শিষ শুনে জড়সড় হয়ে ঘোমটা টেনে দেয় বাঙালী মেয়েরা।

শোভেনকে খাতির করে হীরাচাঁদ। শুধু কাজের লোক বলেই নয়। লেবার ট্যাক্‌ল্ করার কায়দা জানে শোভেন। তাছাড়া ওরা প্রায় একবয়সী।

আগে স্পিনিং মাষ্টারের কোয়ার্টার ছিল কম্পাউণ্ডের পুব দিকে। ওয়েল ফেয়ার অফিসার, চিফ ইলেক্‌ট্রিসিয়ান প্রভৃতি আর সব সাব-অর্ডিনেট অফিসারদের কোয়ার্টারের লাগোয়া সারি সারি একতলা ব্লকগুলোর একটা। শোভেনের আগে যে ভদ্রলোক ছিলেন স্পিনিং মাষ্টার, তিনি আমেদাবাদ মিলে চলে যাবার আগে মালিককে ধরে নিজের কোয়ার্টারে বসিয়ে গেছেন ভাইকে। একটা

সেকসানের ফিটার-ইন-চার্জ তাঁর ভাই। এই ব্লকে কোয়ার্টার পাবার যোগ্যতা নেই। তবে ধরাধরিতে কি না হয়?

শোভেন বাঙালী। কাজেই তার থাকার ব্যবস্থা হচ্ছে হবে করতে করতে কত দিন যে কেটে যেত, বলা যায় না! হীরাচাঁদই শেষ পর্য্যন্ত নিজের বাংলোর নিচের অংশ ছেড়ে দিল তাকে। প্রায় গঙ্গার ধারে। প্রকাণ্ড কম্পাউণ্ড। খোলা-মেলা পরিবেশ। আলো-বাতাসের অবাধ অধিকার। দোতলাটাই ছেড়ে দিতে চেয়েছিল হীরাচাঁদ। কিন্তু বিলেত ফেরৎ মালিককে বঞ্চিত করে এমন সুন্দর বাংলোর দোতলাটা আর নিতে চায়নি শোভেন। একতলার অংশই যথেষ্ট। মিনু প্রথম দিন পা দিয়েই তো নাচতে শুরু করে দিয়েছিল খুশীতে।

গঙ্গার হাওয়া এসে উড়িয়ে নিয়ে যেতে চায় জানলা দরজার পর্দা। ঝকঝকে শাদা কংক্রিটের দেওয়ালে বিকেলে রাঙা আলপনা আঁকা হয়ে যায় সূর্য্যের আলোয়। রাতে ঘাসবিছানো কম্পাউণ্ডে নামে চাঁদের আলোর জোয়ার। স্নান সারা মেয়ের অগোছালো চুলের রাশির মত গেটের ওপরে মাধবীলতার স্তবকে স্তবকে ফুটে ওঠে রঙিন পুষ্পসম্ভার। এত ঐশ্বর্য কোথায় রাখবে ভেবে দিশেহারা হয়ে গিয়েছিল মিনু গোড়ার দিকে।

কিন্তু তারপরেই সংকোচে সন্ত্রস্ত হয়ে গিয়েছিল সে। শোভেন জানে না সব কথা। কিছু কিছু বোঝে। তবে তার শিক্ষিত উদার মনে আমল পায় না অসুস্থ আশঙ্কা।

প্রথমে প্রতিবাদ জানিয়েছিল ফুলটুসী।

পিঠটা ধনুকের মত বাঁকিয়ে লোম ফুলিয়ে গজরাচ্ছিল সে দরজার পর্দার পাশ থেকে। ফ্যাঁস-ফ্যাঁস আওয়াজ শুনে ছুটে এসেছিল মিনু হাতের কাজ ফেলে।

বাড়িতে ঢুকতে প্রথমেই খানিকটা ঘেরা বারান্দার মত জায়গা। এক পাশ দিয়ে উঠে গেছে দোতলার সিঁড়ি। অন্য ধার দিয়ে গলির মত একটুখানি পথ পেরিয়ে এদের অংশে আসতে হয়। ও পাশে মোটর গ্যারেজ থাকায় এমন সুন্দর বাড়িটির ঢোকার অংশ এত অসুন্দর হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাছাড়া বাড়ী তৈরী করার সময়ে দেশওয়ালী রীতিই বোধ করি প্রাধান্য পেয়েছিল বাবু জয়রাম দাসের মাথায়। ভেবে পায়নি মিনতি, যে বাড়ীর ঘর-দুয়োর এমন ছিমছাম, পরিচ্ছন্ন, তার প্রবেশপথ এমন ঘিঞ্জি অন্ধকার করে তৈরী করায় মানুষ কোন্ আক্কেলে!

ফুলটুসীর ক্রুদ্ধ গর্জনে চকিত হয়ে ছুটে এসে মিনু দেখল, হীরাচাঁদের ছোকরা চাকর বাবুলাল ওর কুকুর জিমের চেন ধরে হাসছে দাঁত বার করে। আস্ফালন করছে দো-আঁশলা এ্যালসেসিয়ান সামনের দুই পা তুলে। আর কাবুলি ফুলটুসী মাঝে মাঝে ক্রুদ্ধ ফ্যাঁস-ফ্যাঁস গর্জন করে জানিয়ে দিচ্ছে, অত সহজে তোমার বেয়াদবি মেনে নিতে রাজি নই।

বাবুলালকে ধমক দিয়েছিল মিনতি, কুকুর নিয়ে দাঁড়িয়ে আছ কেন এখানে? সরিয়ে নিয়ে যাও।

হি হি করে হেসে উঠেছিল বাবুলাল। সিঁড়ি দিয়ে নামছিল হীরাচাঁদ। সে অপাঙ্গে তাকিয়ে দেখেছিল মিনুর দিকে। আলাপ জমেছিল যদিও, তবু ত্রিভুবনে ও লোকটির সঙ্গ স্পৃহনীয় নয়। তাই সরে গিয়েছিল মিনু। কোলে তুলে নিয়েছিল ফুলটুসীকে।

সন্ধ্যাবেলা দুজনে সবে চায়ের কাপে মুখ তুলেছে, দরজার বাইরে থেকে সাড়া দিল হীরাচাঁদ।—একটা কথা ছিল মুখার্জি!

এসো, এসো, তাকে সাদর আহ্বান জানিয়েছিল শোভেন। আর এক কাপ চা তৈরী করে আন দেখি চট করে—স্ত্রীকে নির্দেশ দিয়েছিল সে। তার পর, কি ব্যাপার? জিজ্ঞাসা করেছিল হীরাচাঁদকে।

একটা কথা ছিল. চেয়ারে বসতে বসতে জবাব দিয়েছিল হীরাচাঁদ। তোমার সঙ্গে নয়, মিসেস মুখার্জির সঙ্গে। শুনে থমকে দাঁড়িয়েছিল মিনু।

সকাল বেলা জিম আপনার বিল্লীকে অপমান করেছিল, তাই তার হয়ে ক্ষমা চাইতে এলাম।

ভ্রূ কুঁচকে ওই লোকটার কথা শুনে চলে গিয়েছিল মিনু রান্নাঘরে। ওর গায়ে-পড়া স্বভাব দেখে গা জ্বলে গেল তার। নেহাৎ মালিকের ভাইপো, না হলে এ রসিকতার জবাব দিত সে ভাল করে।

সেই হল প্রথম, আর আজ সকালে এই দ্বিতীয় উৎপাত।

বাজার সেরে এসে রবিবার সকালে দ্বিতীয় বার চা নিয়ে খবরের কাগজ পড়তে শুরু করেছে সবে শোভেন। মিনু রান্নাঘরে ব্যস্ত। কুকুরের ডাক আর বেড়ালের ফ্যাঁচ্ ফ্যাঁচ্ আওয়াজ কানে যেতেই রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল সে। এবারে আর মুখে মুখে নয়, হাতে হাতে। রোষ-বিকৃত মুখের সব দাঁত বেরিয়ে পড়েছে। থাবার নখগুলো উদ্যত। সে এক ভীষণ চেহারা ফুলটুসীর। জিম যেন মজা দেখবার জন্য এগিয়ে যাচ্ছে এক একবার। হঠাৎ এক লাফে জিমের চোখে-মুখে ক্রুদ্ধ থাবার আঁচড় বসিয়ে ঘরে ঢুকলো ফুলটুসী। অপমানিত জিম পশ্চাদ্ধাবন করল সঙ্গে সঙ্গে। তার পর সে এক খণ্ড-প্রলয়। ঘরের একটা কোণে দাঁড়িয়েছিল ফুলটুসী। তার দিকে ক্রুদ্ধ চোখে তাকিয়ে তেমনি দাঁত বার করে গর্জন করছিল জিম। সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল শোভেন। মিনু ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ফুলটুসী জিমের মুখের ওপরে। ক্ষত-বিক্ষত করে দিয়েছিল কুকুরের মুখ। রাগে অন্ধ হয়ে তাকে তাড়া করল জিম। সারা ঘর জুড়ে সে কি হুটোপাটি! কাপড় ছিঁড়ল, চাদর ছিঁড়ল, চেয়ার পড়ল ছিটকে। টেবিলটা নাড়া খেয়ে দাঁড়িয়ে রইল কোন মতে। চিৎকার করে স্বামীকে জড়িয়ে ধরল মিনু। ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছিল সে। কতক্ষণ যে চলত সে-কাণ্ড, বলা যায় না। এমন সময়ে ছুটে এল হীরাচাঁদ। এক লাফে জিমের গলা ধরে ঠাস ঠাস করে চড় কষিয়ে দিল দুটো। ঘরের বিশৃঙ্খল অবস্থা দেখে লজ্জার হাসি হেসে বলল, এক্সকিউজ মি মিঃ মুখার্জি, রাস্কেলটা এত পাজি হয়েছে। বাবুলালকে ফেলে দিয়ে ছুটে এসে ঢুকেছে এখানে। মিসেস মুখার্জির বিল্লীর ওপরে কি যে ওর আক্রোশ। হয়েছে ঠিক শাস্তি। এই ত্যাখ না, আর একটু হলে চোখটা নষ্ট হয়ে যেত।

সত্যি, দেখলে খারাপ লাগে। একদলা মাস ছিঁড়ে গুটিয়ে গেছে চোখের পাশে।

যেমন শয়তানি, তেমনি শাস্তি হয়েছে। আর আসবি কখনো? কুকুরকে টেনে নিয়ে চলে গেল হীরাচাঁদ।

বুকের কাঁপন থামলে মিনু বলল, এখানে থাকব না আমি। আজই রেখে এস আমাকে।

এমন একটা বিপর্যয়ের জন্ত প্রস্তুত ছিল না শোভেন। উত্তর দিতে পারল না সে।

এখানে থাকলে সব যাবে আমার। এই দেখ শাড়ি ছিঁড়েছে, চাদর ছিঁড়েছে ফালা-ফালা হয়ে। তুমি বলবে ওকে, দাম দিয়ে দেয় যেন। রোষে, অনুযোগে চোখে জল এসে গেল মিনতির। ওই বাঘা কুকুর কোন দিন আমাকেও ছিঁড়ে ফেলবে অমনি টুকরো টুকরো করে।

হাত ধরে তাকে কাছে টানল শোভেন। একরাশ নরম ফুলের মত স্বামীর কোলে মুখ গুঁজে পড়ল মিনু। একটি সান্ত্বনার বাক্যও উচ্চারণ করতে পারল না শোভেন। স্ত্রীর পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে আদর করে বলল, ফুলো বেড়াল।

চোখের সামনে কাগজ, অথচ একটি অক্ষর পড়া যাচ্ছিল না। আহত মিনু সান্ত্বনার পরিবর্তে অবহেলা লাভ করে রান্নাঘরে গেছে রাগ করে। ফাউন্টেনপেন কুড়িয়ে, চেয়ারটা তুলে, টেবিল গুছিয়ে রাখল শোভেন; ছেঁড়া কাপড় আর চাদর রাখল সরিয়ে। তারপর আবার তুলে নিল কাগজ।

চোখের জলে ভেসে যাচ্ছিল মিনুর মুখ। উৎপাত তো শুধু কুকুরেরই নয়। তার মালিকের ব্যবহারও যে অসহনীয়! দেখা হলেই তেরছা চোখে তাকাবে। ঠোঁট বেঁকিয়ে হাসবে বিশ্রী ভাবে। লোকটার স্বভাব চরিত্র বিশেষ ভাল নয়, সে আর কে না জানে? রেস যখন খেলে, তখন মদ কি আর না খায়? শনিবার রাত করে ফেরে, কখনো আবার ফেরেই না। কোথায় রাত কাটায় সে কি বোঝে না কেউ? তবু ওর সঙ্গে শোভেনের অন্তরঙ্গতা অক্ষুন্ন। স্বামীর কাণ্ড দেখে জ্বলে যায় মিনুর সর্বাঙ্গ।

একটি একটি করে কাটল দু'টি সপ্তাহ। ইদানীং আর জিম সাহস করে আসে না এদিকে। ফুলটুসীর নখের আঁচড় ভোলেনি সে এখনও। কিন্তু হীরাচাঁদ যেন বেশী বাড়াবাড়ি শুরু করেছে আজ-কাল। ঘন ঘন ঘরে আসার চেষ্টা। শোভেন না থাকলেই বেশী। অকারণ কথা বলার উৎসাহ। মাঝে মাঝে পাঠিয়ে দেয় মিষ্টি খাবার। মিনু ছুঁয়েও দেখে না সে সব। শোভেনের কিন্তু কোন বিকার নেই।

ওই লোকটার বিশ্রী হ্যাংলাপণা অসহ্য লাগে মিনুর। তবু স্বামীকে খুলে বলতে পারে না সব কথা। সেদিন বাইরের তারে মেলে-দেওয়া কাপড় তুলে আনার সময়ে দেখা হয়ে গেল হীরাচাঁদের সঙ্গে। সিঁড়ি দিয়ে নামছিল সে কুকুরের চেন ধরে। গঙ্গার ধারে বেড়াতে যাবে বোধ হয়। পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছিল মিনু। ডাকল তাকে হীরাচাঁদ। পালাচ্ছেন কেন মিসেস মুখার্জি? আমি তো কোন দোষ করিনি?

বিরক্তি চেপে মুখে হাসি টেনে দাঁড়িয়ে গেল মিনু।

মাটি শুঁকতে শুঁকতে এগিয়ে যাচ্ছিল জিম। তার শিকল টেনে জিজ্ঞাসা করল হীরাচাঁদ, মুখার্জি কোথায়?

এখনও আসেননি। এইবারে আসবেন বোধ হয়। কোন দরকার আছে?

দরকার? কৃত্রিম দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল হীরাচাঁদ। না, দরকার বিশেষ আর কি? আপনার সেই বিল্লী কেমন আছে?

ভ্রূ কুঁচকে তাকাল মিনু। ভালই আছে। বলে পা বাড়াল সে ঘরের দিকে।

আপনি বড় নিষ্ঠুর, মিসেস মুখার্জি! দুটো কথা বলে একটু আনন্দ দিতেও আপনার কৃপণতা?

বিরক্তিতে বিষিয়ে ওঠে মন। তবু হাসিমুখে বলতে হয়, অনেক কাজ পড়ে রয়েছে—

সে তো আছেই। কাজের মানুষ আপনারা। কিন্তু আমার বুকটা যে খাঁ-খাঁ করে দুটো কথা বলার জন্ত। মুখার্জিকে সত্যি বড় হিংসে হয়। আচ্ছা যান, আটকাবো না আপনাকে। একা থাকি, ভাল লাগে না কিছু। কাজের অবসরে যদি এক-আধ দিন একটু ডেকে কথা বলেন, এইটুকুই মাত্র আমার দাবী। আচ্ছা চলি, নমস্কার। সত্যি সত্যি বেরিয়ে গেল সে কুকুরের চেন ধরে। হাঁফ ছেড়ে বাঁচল মিনু।

এ সব কথা জানে না শোভেন। জানলেও আমল দেবে না মিনুর আশঙ্কা। বিশ্বাস করবে না হীরাচাঁদের দুরভিসন্ধি। এমন সুন্দর ঘর-দুয়োর, ঘাস-ঢাকা বাইরের কম্পাউণ্ড, আলো-বাতাসের এমন প্রাচুর্য, সব যেন বৃথা, অকিঞ্চিৎকর হয়ে উঠেছে ওই একটি লোকের জন্ত। মালিকের ভাইপো, কারবার দেখা-শুনোর ভার ওরই ওপরে। ওকে ঘাঁটাতে যাবে না শোভেন। চাকরির ভয় আছে তার। নিরুপায় অভিমানে দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসে মিনতির।

সেদিনও এক রবিবারের বিকেল। শোভেনের ঘুম ভাঙেনি তখনও। উঠে মুখে-চোখে জল দিয়ে ষ্টোভ ধরিয়ে চায়ের জল চাপাচ্ছিল মিনতি। কানে এল ফুলটুসীর গর্জন। আবার মুখপোড়া কুকুর নিশ্চয়ই পেছু নিয়েছে।

দাঁতে দাঁত চেপে বাইরে এল মিনু। ওপরে ওঠার সিঁড়ির শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে বাঁকা ধনুকের মত পিঠ ফুলিয়ে শব্দ করছে ফুলটুসী। আ মোলো, ও আবার ওপরে উঠতে গেল কেন? হতচ্ছাড়া বেড়ালও হাড়ে হাড়ে লেগেছে?

কা'কে ডাকবে সে এখন? চুপি চুপি ওপরে উঠে ধরে আনলে হয় এই বেলা। পায়ের শব্দে পিছনে তাকিয়ে টুক টুক করে আরও কয়েক পা এগিয়ে গেল ফুলটুসী। আচ্ছা জ্বালাতন!

ওপরের বারান্দার প্রান্তে চেন-বাঁধা জিম সামনের দু পা তুলে লাফালাফি করছিল। মিনুকে দেখে চেঁচিয়ে উঠল ঘেউ ঘেউ করে। ফুলটুসীও ঘরের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। বিপদে পড়ল মিনু। ফিরে যাবে সে নিচেয়? মরুক হতচ্ছাড়া বেড়াল। কিন্তু এতদূর এসে ওকে না নিয়ে যাওয়া কি ঠিক হবে? যদি চেন ছিঁড়ে এসে কামড়ায় জিম? ওর মনে তো রাগ পোষা আছে। বড় আদরের বেড়াল তার। মানুষ করেছে চোখ ফোটার আগে থেকে। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল মিনু।

বেড়ালটাও এমন পাজি, পেছনে তাকে আসতে দেখে সুট করে ঢুকে পড়ল ঘরে। ঘুমোচ্ছিল বোধ হয় হীরাচাঁদ। কুকুরের ডাকে বাইরে এসে দাঁড়াল। পরনে পাতলুন আর গেঞ্জি। হাত তুলে আড়মোড়া ভাঙল সে। বলল, কি ভাগ্য আমার! গরীবের ঘরে এলেন তাহলে শেষ পর্যন্ত?

অপ্রস্তুত হয়ে মিনু বলল, বেড়ালটা পালিয়ে এসেছে ওপরে।

হ্যাঁ, সে তো দেখতে পাচ্ছি। ওই যে রয়েছে দাঁড়িয়ে। কিন্তু আমাকে কি ধরা দেবে? আপনি বরং ধরে নিয়ে যান ওকে।

অগত্যা অনিচ্ছাসত্ত্বেও ঘরে যেতে হয় মিনুকে। আজ ওকে নিচে নিয়ে গিয়ে বেঁধে রাখবে সে। খেতে দেবে না সারা রাত। যেমন পাজি হয়েছে, তেমনি শাস্তি দিতে হবে।

বিশেষ বাধা দিল না ফুলটুসী। ওকে কোলে তুলে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল মিনু। দরজায় দাঁড়িয়ে ছিল হীরাচাঁদ। বলল, এখনই চলে যাবেন? গরীবের ঘরে একটু বসবেন না?

বিব্রত হয়ে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছিল মিনু। পথ আড়াল করে হীরাচাঁদ বলল, এমন নিষ্ঠুর হবেন না। যদি এলেন ওপরে, একটা কথাও না বলে যাবেন, সে কি করে হয়? আচ্ছা, পাঁচ মিনিট বসুন, তারপর না হয় ছেড়ে দেব।

না, না, সরুন, কাজ রয়েছে আমার। ওকে ধাক্কা দিয়ে পাশ কাটিয়ে যেতে চাইল মিনতি।

ঘোলাটে চোখে তার দিকে চেয়ে হীরাচাঁদ বলল, এখুনি ছাড়তে পারি না আপনাকে। এসেছেন যখন, পাঁচ মিনিট বসে যেতেই হবে, মিনুর হাত ধরে আকর্ষণ করল সে ঘরের ভিতর।

ভয়ে, উত্তেজনায় দিশেহারা হয়ে গেল মিনু প্রথমটা। তারপর নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করে বলল, কি ছেলেমানুষি করছেন? ছেড়ে দিন আমাকে।

না, ছাড়ব না, ডোণ্ট আস্ক মি টু লিভ ইউ সো সুন, মাই সুইট। দু'হাত দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরবার চেষ্টা করতে লাগল হীরাচাঁদ। রাগে বিরক্তিতে মরীয়া হয়ে উঠল মিনতি। টানাটানির চাপে পড়ে আহত ফুলটুসী গর্জন করে উঠল তার কোলের ভিতরে। হঠাৎ সম্বিত ফিরে পেল মিনতি। এক ঝটকায় ফুলটুসীকে ডান হাতে তুলে নিয়ে চেপে ধরল হীরাচাঁদের মুখে। ক্রুদ্ধ পশু ফ্যাঁস-ফ্যাঁস করে বসিয়ে দিল কয়েকটা আঁচড়। আরে ব্যাপ। বলে চিৎকার করে লাফিয়ে পালাল হীরাচাঁদ ঘরের অন্য প্রান্তে। ছাড়া পেয়ে দুড়-দুড় করে ছুটে পালাল মিনু নিচেয়। আর তার পিছু-পিছু ফুলটুসী। বারান্দায় শিকলবাঁধা জিম ঘেউ-ঘেউ করে নাচানাচি করতে থাকল প্রাণপণে।

ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল মিনু। দ্রুত নিশ্বাসে ওঠা-পড়া করছিল বুকখানা। পায়ে পা ঘষছিল ফুলটুসী। তার কান ধরে ছোট্ট চড় কষিয়ে দিল সে।

ঘুম ভেঙে উঠে বসেছিল শোভেন। বলল, আবার বুঝি তোমার বেড়াল ঝগড়া করতে গিয়েছিল?

জিমের ডাক শোনা যাচ্ছিল নিচে থেকে। গম্ভীর মুখে স্বামীর কথার উত্তরে শুধু একটা—হুঁ, বলে চুপ করে বসে পড়ল মিনতি। তাকে টেনে নিল শোভেন। একরাশ নরম ফুলের মত স্বামীর কোলে মুখ গুঁজে পড়ে রইল মিনু। তার পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে আদর করে বলল শোভেন, ফুলো বেড়াল!

এ বারে আর রাগ করল না মিনু।

ছড়ায় আঁকা

সোনালী চৌধুরী

কোথায় তুমি পৌরাণিক ছড়ায় আঁকা মেয়ে?
যমুনাবতী, সরস্বতী কিংবা সতী কঙ্কাবতী
রোদের বাঁকা কলস কাঁখে চলেছ গান গেয়ে?

বটেগাছের কড়ে আঙুল ছায়াটি দোলে জলে।
কালের চর তেপান্তর ব্যঙ্গ করে বানায় ঘর
আবার সে বালু-শহর ভাঙে শিশু ছলে।

লঙ্কাগাছে রবিবারটি রাঙা টুকটুক করে।
এখন শুধু ক্রুদ্ধ দিন আকাশে তোলে বাঁকা সঙিন
বৃষ্টি পড়ে মনে মনের ধূসর ছায়াঘরে।

কোথায় তুমি গিয়েছ চলে লজ্জাবতী মেয়ে,
বকুলতলা অন্ধকার অচিন কালের পাখীটার
বন্ধ দ্বারে দিগন্তের হৃদয় করে ধু-ধু।

প্রশান্ত চৌধুরী

চুপচাপ বসে ছিলুম একা। সামনে আমার নানাবিধ আয়ুধ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। দেবী দশপ্রহরণধারিণীর দশটি হাতের দশ রকম প্রহরণই শুধু নয়, বিভিন্ন কালের বিভিন্ন মনুষ্যগোষ্ঠীর বিচিত্র সব হাতিয়ারও খুঁজে পাওয়া যাবে এখানে। যত রকমের অস্ত্র রয়েছে, স্বয়ং দশানন লঙ্কেশ্বর রাবণরাজা তাঁর বিশটি বিশাল হাতের প্রত্যেকটি মুঠোয় খান দশেক কোরে তুলে নিলেও কিছু বাকি থেকে যাবে নিঃসন্দেহে।

ছয় হাজার খৃষ্টপূর্বাব্দের ভোল্‌গা-তীরবর্তী অরণ্যতুষারচারী মানবগোষ্ঠীর প্রস্তরনির্মিত ভোঁতা বল্লম থেকে শুরু কোরে একেবারে বিংশ শতাব্দীর অটোম্যাটিক রিভলবারটি পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে এখানে। খুঁজে-পেতে দেখলে প্রাগৈতিহাসিক যুগের খড়্গদন্তী শ্বেতব্যাঘ্রের হৃৎপিণ্ড কেটে টুকরো করবার চকমকি পাথরের ছোরাও যে এক-আধখানা না পাওয়া যাবে, এমন নয়। কবচ-কুণ্ডল-বর্ম-শিরস্ত্রাণেরও অপ্রতুলতা নেই। শিরস্ত্রাণের আশেপাশে ছিন্ন মনুষ্যশিরও আছে।

সে শিরের গঠন বা চক্ষু-কর্ণ-নাসিকার আকৃতি দেখে তার জাতি বা গোষ্ঠী নির্ণয় করা অতিবড় নৃতত্ত্ববিদেরও অসাধ্য। বলা অসম্ভব, ঐ ছিন্নমুণ্ডের অধিকারীরা ছিল কোন দেশের, কোন যুগের মানুষ। বলা অসম্ভব, কোন ভাষায় কথা বলতো তারা; উদীচী না শকাভীরী, প্রবন্তী না পৈশাচী। বলা অসম্ভব, তাদের পূর্বপুরুষ ছিলেন কোন মানবগোষ্ঠীর অন্তর্গত;—পিথেক্যানথ্রপাস না নিয়েনডার্থাল, ক্রো-ম্যাগনন না নর্ডিক।

পৃথিবীর আদিকাল থেকে সুরু কোরে একেবারে এই বিংশ শতাব্দীর যে কোন যুগের, যে কোন স্থলাংশের, যে কোন গোষ্ঠীর, যে কোন জাতির, যে কোন ভাষাভাষী মানুষের ছিন্নমুণ্ড হতে পারে ওগুলো। আর, প্রয়োজন মতো তাই হতে পারার জন্যই ওদের সৃষ্টি।

চুপচাপ বসে বসে তাকিয়ে দেখছিলুম ঐ বিচিত্র ছিন্ন শিরগুলির দিকে,—এমন সময় খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর সুদূর অতীত থেকে ভেসে এল স্থানেশ্বরের পরম ভট্টারক রাজাধিরাজ শিলাদিত্য হর্ষবর্দ্ধনের উদাত্ত কণ্ঠস্বর,—'গত পাঁচ বৎসরে আমার রাজকোষে সঞ্চিত সমস্ত ধনরত্ন আমি এই পবিত্র গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থলে দাঁড়িয়ে মহেশ্বর ও তথাগতকে স্মরণ কোরে বিনীত চিত্তে ভিক্ষু অভিক্ষু স্বধর্মী বিধর্মী ব্রাহ্মণ বৌদ্ধ সকলের মধ্যে বিতরণ করে দিলাম। আমার বহুমূল্য রাজপরিচ্ছদ ও অলঙ্কারাদি উন্মোচন করে গ্রহণ করলাম চীরবাস।

প্রজাপুঞ্জ জয়ধ্বনি করে উঠলো,—জয় পরম ভট্টারক মহারাজ শিলাদিত্য হর্ষবর্দ্ধনদেবের জয়।

তারপর শোনা গেল করতালি। এবং সেই করধ্বনি একেবারে সম্পূর্ণ মিলিয়ে যাবার আগেই অকস্মাৎ দেখতে পেলাম চীরধারী মহারাজ হর্ষবর্দ্ধন স্বয়ং ছুটে এসে দাঁড়িয়েছেন আমারই সম্মুখস্থ আয়ুধস্তূপের সামনে। আলোর স্বল্পতা কিংবা কালের দুস্তর ব্যবধানের জন্য তা বলতে পারি না,—দেখতে পেলেন না আমাকে। ব্যগ্রহস্তে আয়ুধস্তূপ সরিয়ে ডবল ব্যারেল বিদেশী অর্বাচীন আগ্নেয়াস্ত্রটার পিছন থেকে সযত্নে বের করলেন শালবৃক্ষের শুষ্ক পত্রনির্মিত একটি ঠোঙা। তারপর সেই ঠোঙার অভ্যন্তরে একটিবার মাত্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করেই কান্যকুব্জাধিপতি পরম সৌগত হর্ষদেব চীৎকার করে উঠলেন,—কোন হালায় আমার ডালবড়া খাইসে রে? তারপরেই ছুটে বেরিয়ে গেলেন।

ভাষাটা ঠিক খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর মতো শোনাল না। ভঙ্গিটাও মোটেই হর্ষবর্দ্ধনোচিত নয়। গোটা রাজকোষটাই অকাতরে বিলিয়ে দিয়ে এসে সামান্য ডালবড়ার জন্য মহারাজ শ্রীহর্ষ এমন নিতান্তই প্রাকৃতজনসুলভ আক্ষেপোক্তি করছেন, এমন অবিশ্বাস্য হৃদয়বিদারক কথা না উল্লেখ করেছেন হুয়েন্ সাঙ তাঁর বিবরণীতে, না করেছেন বাণভট্ট তাঁর হর্ষচরিতে।

কিন্তু তবু শুনলুম।

অনেক কিছুই শুনতে না চাইলেও শুনতে হয় এখানে। দেখতে না চাইলেও দেখতে হয়।

এখানে সীতা শূর্পণখাকে দেখায় নতুন কানবালার ডিজাইন, লর্ড ক্লাইব সিরাজদ্দৌল্লাকে খাওয়ায় মোরগ-মসল্লম!

বিচিত্র এ স্থান! বিচিত্র এ জগৎ! এখানকার ঐ ছিন্নমুণ্ডের মধ্যে এবং মহাভারতীয় যুগের ঐ গদা নামক বিশেষ প্রহরণটির অভ্যন্তরে আছে একই বস্তু। সে বস্তুর সঙ্গে শিমুল কিংবা কার্পাসের সম্পর্কটা নিবিড়। মাঝে মাঝে ঐ নিতান্তই নিরীহ লঘুভার বস্তুগুলি বিদ্রোহী হয়ে বেরিয়ে পড়তে চায় ছিন্নমুণ্ড আর গদার খোলস ছেড়ে;—অমূল্য বাবুর নিপুণ অভ্যস্ত হাতের সীবনী-বিদ্ধ হয়ে আবার কারাবাস গ্রহণ করে।

শুনেছি, স্বর্গে প্রজাপতি ব্রহ্মার ভাঁড়ার ঘরে প্রাণ নাকি থাকে

অভিধাহীন হয়ে। তার পর লগ্ন যখন আসে, মর্ত্যভূমিতে নামবার পালা যখন শুরু হয়, তখন সৃষ্টিকর্তার হস্তস্পর্শে সেই রূপহীন অভিধাহীন প্রাণ পায় রূপ, পায় অভিধা ;—নিমেষে কেউ হয়ে ওঠে অ্যামিবা, কেউ বা ডাইনোসর।

জুপিটার থিয়েটারের ঐ অমূল্য বাবুর পোশাক-ঘরের ছারপোকার দাগ-লাগা দেওয়ালটাকে যদি স্বর্গ বলে ধরে নেওয়া যায়, তাহলে সেই স্বর্গে ঐ ছিন্ন মুণ্ডগুলোও থাকে জাতিহীন, বর্ণহীন, পরিচয়হীন হয়ে। সময় যখন আসে, রঙ্গমঞ্চের মর্ত্যভূমিতে নামবার পালা যখন শুরু হয়,—তখন ঐ ছিন্নমুণ্ডদের প্রজাপতি ব্রহ্মা শ্রীঅমূল্যধন বসাকের কুশলী হাতের স্পর্শে নিমেষে ওদের কেউ হয়ে ওঠে পুরুষ, কেউ নারী। কেউ হয় জয়দ্রথ, কেউ বা ফারুকশিয়র।

অদ্ভুতকর্মা এই অমূল্যধন বসাক! চার ফুট দশ ইঞ্চির এই খর্বকায় কৃষ্ণবর্ণের মানুষটিকে দেখে বয়স আন্দাজ করা শক্ত। মাথায় টাক পড়েছে, কিংবা সারা জীবনে কোন দিনই চুল গজায়নি সেখানে,—সে কথা আর যাই হোক, অমূল্য বাবুর মাথা পরীক্ষা কোরে অন্তত যে কিছুতেই বলা যাবে না, এ কথা হলফ করেই বলতে পারি।

অতি বড় পাকা দুর্বৃত্তও পালাবার সময় ভুল কোরে কোথাও না কোথাও একটু-আধটু চিহ্ন রেখে যায় বোলে শুনেছি। অমূল্য বাবুর মাথায় চুল যদি কোন কালে থেকেও থাকে, তাহলে তারা এমন বেমালুম ভাবে সট্‌কে পড়েছে যে, স্বয়ং শার্লক হোম্‌স সাহেব এসেও এমন কোন চিহ্ন খুঁজে বের করতে পারবেন না, যার দ্বারা নিঃসন্দেহে প্রমাণ হতে পারে যে, এই কপিত্থবৎ মস্তকপ্রদেশে কোন দিন কেশ নামক কোন পদার্থের অস্তিত্ব ঘটেছিল।

অমূল্য বাবুর কেশ না থাক, গুম্ফ আছে। সংখ্যায় তারা সর্বসাকুল্যে এগারোটি। ঠোঁটের বাঁদিকে পাঁচটি,—ডান দিকে ছয়। কথা বলার সময় অমূল্য বাবুর ঠোঁট বাঁদিকের চেয়ে ডানদিকেই বেঁকে যায় বেশি। ডানদিকের গুম্ফের সংখ্যাধিক্যের ভারেই হয়তো!

থুৎনির নিচে সাদা সুতোর মতো সাতগাছা লোম উঁকি দেওয়াকে যদি দাড়ি গজানো বলতে কারুর তেমন আপত্তি না থাকে, তাহলে দাড়িও তাঁর মাঝে মাঝেই গজায়; এবং সন্না নামক এক প্রকার ক্ষুদ্র উৎপাটক যন্ত্র সহকারে সেই দাড়ি উৎপাটনও তিনি করেন। নাকে রসকলি, কপালে তিলক আছে তাঁর সর্বদাই। 'শচীদুলাল' পালার বৈষ্ণব গায়কদের কপালে পেউড়ি আর জিঙ্ক অক্সাইড দিয়ে তিলক এঁকে দিলেও নিজের কপালের তিলক-কোঁটার বেলায় কিন্তু অকৃত্রিম তিলক-মাটিই ব্যবহার করেন তিনি। তাঁর নিজের গলায় তিনকণ্ঠীটাও আসল তুলসীকাঠের।

নকল অস্ত্র, নকল বর্ম, নকল বাঘছাল, নকল রাজমুকুটের ভাণ্ডারী হয়েও মানুষটা কিন্তু নকল হয়ে ওঠেনি আজও। নকল রাজমহিষীদের জন্ম ঝুটো মুক্তোর মালা গাঁথলেও নিজে মানুষটা সাঁচ্চাই হয়ে গেছেন এত কাল পরেও।

এত কাল মানে কত কাল?

উনি নিজে বলেন,—পঁয়ত্রিশ বছর এ-লাইনে আছি। অনেকের কিন্তু ধারণা, ওটা পঁয়ত্রিশ নয়, তিপ্পান্ন!

তার আগে?

তার আগে ছিলেন রাসু অধিকারীর যাত্রাদলে।

ঐ যে বিজয়, ড্রেসার বিজয়, মাঝারি অভিনেতাদের পরচুলটা টেনেটুনে দেয়, জামার বোতামটা এঁটে দেয়, কোন্ সীনে ছড়িটা কোন্ সীনে ছাতাটা নিয়ে ঢুকতে হবে মনে করিয়ে দেয় যে ;—সে কিন্তু ঐ রাসু অধিকারীর যাত্রাদল অবধি শুনেই থামে না। জিজ্ঞেস করে,—অমূল্যদা, তার আগে?

বহুমূল্য রাজপোশাকের বোতামে সিগারেটের রাঙতা জড়াতে জড়াতে অমূল্য বসাক বলে,—মামার বাড়ী।

—তার আগে?

—মাতৃগর্ভে।

—তার আগে?

—দুঃ শালা!

বিজয় হেসে বলে,—তাহলে বিড়ি দাও একটা।

একটা অলিখিত চুক্তি আছে বিজয় আর অমূল্যধন বসাকের মধ্যে। কেউ কাউকে গাল দিলেই বিড়ি খাওয়াতে হবে। যত গাল, তত বিড়ি। বিজয় দুটোই সমান আনন্দে পান করে। বিড়িতেষ্টা পেলেই পোশাক-ঘরে এসে গালাগাল একটা সে যেন তেন প্রকারে বের করে নেয় অমূল্য বসাকের মুখ থেকে। তারপরেই পরম হৃষ্টচিত্তে হাত পাতে।

—কৈ? আমার পাওনা বিড়িটা অমূল্যদা'? [ক্রমশঃ।

তোমার চোখে

সন্তোষ চক্রবর্তী

তোমার চোখে অনেক মাধুরীর
আনীল ধারা। অবাক চেয়ে থাকা,
অতল হ্রদে উতল ঝিরিঝির
হাওয়ায় হলো পুষ্পকলি পাখা।

তোমার চোখে আকাশ-অঞ্জলি
ঝিলমিলিয়ে উঠলো কতো সোনা,
কী সুর বাজে, কী এক কথাকলি!
ভুরুর কাছে আলোর পাড় বোনা।

তোমার চোখে—চোখের হৃদয়েও
পরম আলো-ছায়ার ছবি এঁকে,
'ফাগুন-মেঘে পরার লিখে যেও'—
সময় বলে আকাঙ্ক্ষারে ডেকে।

কিছুতে আর মন ভরে না
বাদল আসে ছেয়ে
দুষ্টু আমার মিষ্টি হল
কোলে লজেন্স পেয়ে॥
কোলে
লজেন্স ও টফি
Kolay
CONFECTIONERY
প্রস্তুত কারক
কোলে বিস্কুট কোং প্রাইভেট লিঃ
কলিকাতা-১০

নীলকণ্ঠ

চল্লিশ

স্বপ্ন দেখছিলো মঞ্জরী। ভোরের স্বপ্ন একেবারে মিথ্যে হলো না। প্রজাপতি সত্যই উড়েছিলো। সেটা অলীক নয়। কলকাতায় ফিরে আসা মাত্র বিয়ের বাজনা বেজে উঠলো। সমুদ্রে যাওয়ার সময় অবশ্য শ্যামচাঁদ গড়াই জানতেন, তীব্র মান-অভিমানের পালা জমবে। তারপর এক সময়ে মানভঞ্জন মিটে গেলে রসের পালা আরও মধুর হবে। শ্যামচাঁদ এত কাণ্ডর পরও মঞ্জরীর তাঁর সঙ্গে গোপালপুর আসার কারণেই, ভেবে আত্মসন্তুষ্ট ছিলেন যে মঞ্জরীর তাহলে আলোক মিত্র সম্বন্ধে মোহমুক্তি ঘটেছে নিঃসংশয়েই। আর আলোকেরও শ্যামচাঁদ-মঞ্জরীর এই যুগল যাত্রার মুহূর্তেই স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে সুনিশ্চিত। কিন্তু শ্যামচাঁদ গড়াই রাতের পর রাত মঞ্জরীর বিছানায় গড়াগড়ি গেলেও মঞ্জরীকে জানতেনই কেবল, চিনতেন না।

শ্যামচাঁদ গড়াইরা কখনই মঞ্জরীদের চিনতে চায় না। মানুষের রক্তলিপ্সু পশুর মতই মেয়েমানুষের শরীরলিপ্সু শ্যামচাঁদ মানুষের মনের খবর রাখেন না। শুধু সঙ্গীতচর্চ্চা করেন যখন, সেই সময়টুকুই শ্যামচাঁদকে আশ্রয় দেন ডক্টর জিকিল। বাকী সময়টুকু শ্যামচাঁদের ওপর ভর করে মিষ্টার হাইড। শ্যামচাঁদ তাই এতটুকু প্রস্তুত ছিলেন না, এমন অসময়ে এমন চমৎকার নাটকের সম্পূর্ণ অভাবিত, অপ্রত্যাশিত, অকস্মাৎ যবনিকা পতনের জন্যে। মঞ্জরীর মুখে, 'আপনি আমাকে বিয়ে করবেন?' শুনে অপ্রস্তুত শ্যামচাঁদ তাই বেসামাল হয়েছিলেন এতদূর, যে জীবনের দাবাখেলায় সুচতুর শ্যামচাঁদও রাজাকে সামলাবার আর সময় পেলেন না মুহূর্তমাত্রও। এক চালে কিস্তিমাৎ করে মঞ্জরী নিজে গেলো আলোকের কাছে।

শ্যামচাঁদ মঞ্জরীকে চিনতেন না। মঞ্জরী শ্যামচাঁদকে ভালো করেই চিনতো। তাই দাবার চাল তাকে দিতেই হয়েছিলো। জানি, কারুর কারুর চোখে মঞ্জরীর এই চাল বাহুল্য বলে মনে হবে। মনে হবে প্যাঁচের জন্যই যেন এই প্যাঁচ কষা, এর কোনও প্রয়োজন ছিলো না। প্রয়োজন ছিলো না বলে প্রতিভাত হবে তাদের চোখে। কারণ তারা দেখছে আলোক যেখানে মঞ্জরীকে বিয়ে করতে প্রস্তুত এবং শ্যামচাঁদের অস্তিত্ব সত্ত্বেও সেখানে শ্যামচাঁদের কাছ থেকে চলে আসবার জন্যে কসরতের প্রয়োজনটা কোথায়? এমন কথা তারা বলবে, অত্যন্ত সহজেই বলতে পারবে। কারণ তারা সবাই কেউ উপন্যাসের পাঠক কেউ পাঠিকা। কিন্তু তাদের মধ্যে একজনও জীবনের দর্শক নয়। জীবনরসিক জানে বামনের চাঁদ হাত দেওয়া, বামনের পক্ষে কতখানি,—চাঁদের পক্ষে বামনের কাছে এসে ধরা দেওয়া তার চেয়ে এতটুকু সহজ নয়।

মঞ্জরীর প্রয়োজন ছিলো শ্যামচাঁদকে সুযোগ দেওয়ার জন্যে নিজে থেকেই সরে যাওয়ার। মঞ্জরী না হলে কেউ বুঝবে না এই প্রয়োজনের মর্ম। শ্যামচাঁদরা মঞ্জরীদের বাঁচবার জন্যে অপরিহার্য। আবার মঞ্জরীদের টুঁটি টিপে মারবার জন্যেও শ্যামচাঁদরাই সব চেয়ে বড় অস্ত্র। আলোকের সঙ্গে মঞ্জরীর অন্তরঙ্গতার চরম মুহূর্তে শত্রুর শেষ না রাখবার বীজমন্ত্র বিস্মৃত হয়নি মঞ্জরী। শ্যামচাঁদকে মঞ্জরী ত্যাগ করলেও শ্যামচাঁদ তাকে ছাড়তেন না। তাই এমন কিছু করবার প্রয়োজন ছিল, যার ফলে শ্যামচাঁদই মঞ্জরীকে ত্যাগ করেন। অনেকটা স্নায়ুযুদ্ধের মতো। দুপক্ষই লড়তে রাজি। শুধু প্রেমে আক্রমণের অখ্যাতি নিতে নিজের ঘাড়ে কেউ রাজি নয়। তাই প্রতিমুহূর্তে অন্যকে যৎপরোনাস্তি প্ররোচিত করা যাতে তার ধৈর্য্যের বাঁধ অন্তত: একবার বাধা না মানে। একটি মুহূর্তের জন্যে। আর তারপর? তারপরই আসন্ন যুদ্ধারম্ভের শূন্য লগ্ন। শূন্য নয়; শুভ লগ্ন।

মঞ্জরী গোপালপুর গিয়েছিলো অভিসারে নয়; অভিমানে। তার অভিনেত্রী-জীবনে আগুন নিয়ে খেলার সর্বনাশ অভিমানে। পুড়ে ছাই হয়ে যাবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা সত্ত্বেও অনেক দিন ধরেই সে নিজেকে প্রস্তুত করছিলো। সেখানে তাই শ্যামচাঁদের অত্যাচারের মাত্রা সীমা ছাড়ালেও মঞ্জরীর ধৈর্যের ঢেউ সংযমের বাঁধ অতিক্রম করেনি। অপেক্ষা করছিলো সে। চরম মুহূর্তে ভেঙ্গে ছত্রভঙ্গ করে দিতে শ্যামচাঁদের সমস্ত বাধা। সেই কারণেই সে বিবাহের প্রস্তাব করবার করেছিলো দুঃসাহস। শ্যামচাঁদ গড়াই জীবনে কামিনী-কাঞ্চন স্পর্শ করবেন না, এমন প্রতিজ্ঞা করলেও, মঞ্জরীকে বিবাহে সম্মতি দান করা তাঁর পক্ষে ছিলো অলীকতম স্বপ্নেরও অগোচর। কিন্তু সে বার্তা অগোচর ছিলো না মঞ্জরীর। মঞ্জরী স্থির-নিশ্চয় ছিলো; ছিলো দৃঢ়প্রত্যয়। আর ছিলো বলেই অত সহজে তার পক্ষে বলা সম্ভব হয়েছিলো। বিয়ের প্রস্তাব করেছিলো মঞ্জরী এমন ভাবে, যেন কিছুই নয়। যেন এক গ্লাস জল গড়িয়ে দেবার প্রস্তাব। কিন্তু উত্তর জানা ছিলো প্রশ্নের। নির্ভুল উত্তর।

শ্যামচাঁদের পক্ষে আইনগত কারণেও মঞ্জরীকে বিয়ে করা সম্ভব ছিলো না। শ্যামচাঁদ বিবাহিত। মঞ্জরীকে বিয়ে করতে হতো রেজেষ্ট্রি করে। রেজেষ্ট্রি বিবাহ বিবাহিত লোকের পক্ষে করা আইনের চোখে শুধু অসিদ্ধ নয়; অপরাধ। কিন্তু যদি তাও না-ও হতো, তাতেও শ্যামচাঁদ কিছুতেই মঞ্জরীকে কোনও দিন ঘরের বউ

করতো না। শ্যামচাঁদরা কখনও তা করে না; কোনও দিন না। বয়স হবার আগেই শ্যামচাঁদের বাপ-ঠাকুর্দারা ডানাকাটা পরীকে ঘরে নিয়ে আসে ছেলের বউ করে। বয়স হবার সঙ্গে সঙ্গে ছেলে রাত কাটাতে শেখে বাইরে। উড়তে শেখে। বউয়ের ছেলে-পিলে না হলে আবার বিয়ে করে শ্যামচাঁদরা। বউ বাঁজা বলে ধরে নেয় সবাই ডাক্তার দেখালেও,—বউকেই দেখায়, শ্যামচাঁদদেরও যে ডাক্তার দেখানোর দরকার, তা ভাববার মত একজনের অভাব হয়।

কিন্তু ছেলের সাত খুন মাফ, শুধু বিয়ে করবার বেলায় স্বাধীনতা নেই তনয়ের। সেখানে ঠিকুজি-কুলজি মিলিয়ে তবে চার হাত এক হয়। না বলবারই সাহস করে না কেউ। করলে বাপ নয়, সম্পত্তি চোখ রাঙায়। তাই শ্যামচাঁদরা ঘরের ভাত আর হোটেলের রান্নার ফারাক রীতিমতো জানে এবং কদাচ বিস্মৃত হয়। শ্যামচাঁদ গড়াইয়ের বেলায়ই বা তার ব্যত্যয় হবে কেন? মঞ্জরীকে বিবাহ করা তো বাতুলতার চরম, বিবাহের প্রস্তাব করবার আস্পর্ধা করতে পারে কখনও কোনও মঞ্জরীর মতো মেয়ে? এটাই ছিলো শ্যামচাঁদের পক্ষে একটা অভিজ্ঞতা। শ্যামচাঁদকে সেইখানেই আঘাত করার বাসনা পোষণ করছিলো মঞ্জরী আলোক মিত্র তার জীবনে আবির্ভূত হওয়ার মুহূর্ত থেকেই। যেখানে আঘাত করতে পারলে মানুষ ক্ষতবিক্ষত হয় কিন্তু সেখানে আঘাত করলে রক্তক্ষরণ হয় না এক ফোঁটা। অর্থাৎ হৃৎপিণ্ড ছিন্ন-ভিন্ন করে দিতে চেয়েছিলো মঞ্জরী বাইরে থেকে, যার আঘাত অন্য লোকের চোখে সম্পূর্ণ অদৃশ্য থাকে।

আর করেও ছিলো মঞ্জরী তাই। একদম আচমকা। এতটুকু প্রস্তুত হবার সময় না দিয়েই নিশীথ রাত্রির জ্যোৎস্নায় ধোঁয়া-আলোর আকাশ থেকে বজ্রপাতে বিদীর্ণ হয়েছিলো শ্যামচাঁদের পাথর-হৃদয়। নির্দয় শ্যামচাঁদ মদ খেয়ে জীবনে যা হননি রাগে তাই হয়েছিলেন। মাতাল। হাতের কাছে অস্ত্র থাকলে কি করতেন বলা যায় না। ছিলো না বলে সমস্ত শরীরের শক্তি দিয়ে লাথি মেরেছিলেন মঞ্জরীকে। বউকে যে লাথি মারলে মৃত্যুর পর অক্ষয় স্বর্গ হতো হিন্দু সতীর, সেই লাথি মঞ্জরীকে মারার ফলে মঞ্জরীর কিছুই হয়নি। খোঁড়া হয়ে গিয়েছিলেন কেবল শ্যামচাঁদ গড়াই নিজে।

এক মোক্ষম চালে শত্রুপক্ষকে ধরাশায়ী করবার পরমুহূর্তেই যাবার জন্যে প্রস্তুত হলো মঞ্জরী নিজেও। দেরী করলো না আর। কলকাতায় চলে এলো সে।

স্বপ্ন শুধু মঞ্জরীই দেখেনি। স্বপ্ন দেখছিলো আলোক মিত্রও। স্বপ্নে দেখছিলো সে; হিমাদ্রিশৃঙ্গে আসন্ন হয়ে এলো আষাঢ়, মহানদ ব্রহ্মপুত্র অকস্মাৎ দুর্দাম দুর্বার, তট-অরণ্যের তলে তরঙ্গের ডম্বরু বাজায় সে ক্ষিপ্তপ্রায় ধূর্জটির মতো। স্রোতস্বতী তমসার তীরে আদিকবির রক্তবেগ-তরঙ্গিত বুকে গম্ভীর জলদমন্দ্রে বারম্বার আবর্তিত হচ্ছে নতুন ছন্দ। সে ছন্দ অশ্রুত হবার আগেই আলোক মঞ্জরীর সঙ্গে তার পরিণয়-বার্তা ঘোষণা করলো। গ্রামে-গ্রামে সেই বার্তা রটে গেলো ক্রমে। প্রথমে মুখে, তারপর কাগজে। দুজনের ছবির সঙ্গে ছাপা খবর সেদিন তরল পানীয়ের সঙ্গে সঙ্গে কোথাও চাটের কাজ করলো। বহুদিন পর কলকাতায় জোরালো

উত্তেজক মুখরোচক খবর পরিবেশন করবার কৃতিত্বে কাগজগুলো গদগদ হয়ে উঠলো।

ছাপার অক্ষরে ছাড়া যে-কোনও খবরই যারা গুজব বলে উড়িয়ে দেয়; আর খবর-কাগজে ছাপা হলেই যাকে ধ্রুব সত্য বলে মেনে নেয় যারা, তারাই সত্যিকারের প্রগতির বাহক এই বিংশ শতাব্দীতে। বিংশ শতাব্দীতে সেই প্রগতির পীঠস্থান শহর কলকাতায় কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙলো। দীর্ঘ দিন সে উপবাসী। মুখরোচক খবর পায় নি সে দীর্ঘ দিন খেতে! ঘুমভাঙা মাত্র ভাগ্যের শিকে ছিঁড়ে মুখে এসে পড়েছে সব চেয়ে মুখরোচক গুজ-খবর। অলিতে গলিতে, চা-খানায় সবাই মিলে, পায়খানায় একা বিড়ি ফুঁকতে ফুঁকতে উত্তেজিত হয়ে উঠলো ফিল্মফ্যানেরা অকারণ। তারা কেউ চ্যাংড়া, কেউ ছাপোষা কেরাণী। ঘরের বউ-ঝিরা পর্যন্ত নেপথ্যে সরব হলো। শাশুড়ি-পিসি-মাসি-মায়ের দল বকল মুখের গহ্বরে দোক্তা ফেলে দিতে দিতে; মা গো! কি ঘেন্না!

চা-খানায় এক দল অবশ্য ইতিমধ্যেই মাতব্বরি চালে আওয়াজ দিলো যে তারা সবই জানতো। টিটকিরি দেবার সুযোগে একদল প্রতিবাদ করলো: জানতে তো চুপচাপ ছিলে কেন ব্রাদার? ছিলাম, কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় দেখবার জন্যে। ফিল্ম লাইনের সঙ্গে যার ছিটেফোঁটা লেগে আছে সেই শফরীরাই ফর-ফর করতে লাগলো সব চেয়ে বেশী। গুজবের জলকে আরও ঘোলা, রহস্যকে আরও ঘোরালো করে তুললো তারাই। শূন্য কুম্ভরাই গর্জন করলো আকাশ-ফাটানো। যাদের জ্যাঠা পিসে, দূর সম্পর্কের, অতি দূর-সম্পর্কের মামা-মেসো কারুর যাতায়াত আছে টলিউডের অন্দর মহলে, আসল মওকা পেলো তারাই। এবং এ মওকা তারা ছাড়লো না। পায়ের তলায় গজাতে দিলো না ঘাস। সঙ্গে সঙ্গে গুজব-তৎপর হলো ভাগ্যবানেরা। প্রতিদিন নতুন অগ্রগতির, প্রতিদিন নতুনতর ঘটনার মোড় নেওয়ার আরব্যোপন্যাসের করল অবতারণা। কাল যে কথা বলেছিলো আজ তার সম্পূর্ণ বিপরীত রং লাগালেও কাহিনীতে প্রতিবাদের ক্ষীণ আওয়াজ ধোপে টিঁকলো না, সমর্থকদের নতুন নতুন গুল শুনবার উদগ্র ঔৎসুক্যের তোড়ের মুখে। নেশার তোপের মুখে যুক্তির পদাতিকরা উড়ে গেলো একের পর এক।

কেমন করে আলোকের সঙ্গে মঞ্জরীর দেখা হয়! কেমন করে প্রণয়ের সূত্রপাত! পরিণয়ের পথে অগ্রগতি তার এক চোণা সত্যি এক বালতি মিথ্যের দুধের সঙ্গে মিশিয়ে রীতিমত উপন্যাসের সৃষ্টি করল তারাই মুখে মুখে, যারা ইস্কুল জীবনেও এক ছত্র কিছু রচনা করেনি কোনও দিন।

কিন্তু কুকুরের চীৎকারে কান ঝালাপালা হলেও হাতী যেমন ফিরেও তাকায় না, তেমনি জননন্দিতা মঞ্জরীবালা ভ্রূক্ষেপ করল না কারুর কথায়, আক্ষেপও করল না অত্যন্ত হীন অপমানকর অসম্মানজনক আলোচনার উৎস নিজের জন্ম-অমর্যাদার জন্যে এতটুকুও! জীবনযুদ্ধে বিজয়িনী সে। নায়কের নির্দেশে যেমন সৈন্যরা ছককাটা রাস্তা ধরে এগিয়ে চলে শত্রু নিকেশ করতে করতে, তেমনই নিজের বুদ্ধির নির্ভুল নির্দেশে নিজের নিয়তি-নির্দিষ্ট জন্মভাগ্য-চক্রের রেখা সে পালটে দেবে নিজের হাতে। তাই লোকনিন্দা, ঈর্ষ্যা, ঘৃণা, কটূক্তি, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, জ্বালা, বিষ সব পায়ের তলায় পিষে দলে এগিয়ে গেলো মঞ্জরী। জীবনের সিংহাসনে অভিষিক্ত হবার পুণ্যমুহূর্ত সমাগতপ্রায়। যৌবনের জয়পতাকা উড়ছে জীবনের তোরণে। কলঙ্কিত জন্মের পঙ্কে প্রস্ফুটিত হবে জীবনের শতদল পদ্ম। রাত্রির কালো খাম ছিন্ন করে প্রকাশ হবে জীবনের জয়পত্র। জয় হবে নবজন্মের! জয় হবে মহাজীবনের!

রাজকীয় পরিবেশে বিবাহের উদ্যোগ-পর্বের সূচনা হলো। শহর-শুদ্ধ, শত্রু-মিত্র নির্বিচারে নিমন্ত্রিত হলো। মঞ্জরী আর আলোক নিজে গিয়ে আমন্ত্রণ করলো। পত্রের দ্বারা নিমন্ত্রণের ত্রুটি মার্জনার জন্যে নয়, যাতে কেউ না 'না' বলতে পারে, সেই কারণে। এ বিবাহে একজনও না এলে চলবে না মঞ্জরীর। শুধু গণ্যমান্যরা নয়, নগণ্যদেরও সমান আপ্যায়নে আমন্ত্রণের ত্রুটি রাখলো না মঞ্জরী। আলোককেও রাখতে দিলো না। এ বিবাহ আলোকের পক্ষে দুঃসাহস, সমাজদ্রোহিতা। কিন্তু মঞ্জরীর পক্ষে এ বিবাহ জীবনমরণ সমস্যা। অনেক ভেবে, অনেক দিন ধরে, একটু একটু করে যে মালা সে গেঁথে তুলেছে, কোন কারণেই তাকে ছিন্নভিন্ন হতে দেবে না সে। বিবাহে প্রীতি অনুষ্ঠানপর্ব আসলে লোকসাক্ষীর প্রয়োজনেই জন্ম নিয়েছে। এ বিবাহে সেই লোকসাক্ষীর আয়োজন হওয়া চাই সমাজের সর্বাঙ্গ-সম্মত। না হলে অন্ততঃ মঞ্জরীর পক্ষে এ বিবাহের সার্থকতা অতি স্বল্প অথবা একেবারেই নেই।

যত ঘটা করে বিবাহের আয়োজন এগুতে থাকে ততই ঘনঘটা করে আষাঢ়-আকাশে জমতে থাকে মেঘ। সেই ঘনঘটায় আশঙ্কার কৃষ্ণবর্ণ একটা ছটা দেখতে পেলো মঞ্জরী। দেখে ভয় পেলো সে। আষাঢ়-আকাশে কৃষ্ণমেঘের ছায়া গাঢ় হতে হতে এক সময়ে সম্পূর্ণ চেহারা নিলো আতঙ্কের। সে আতঙ্ক মঞ্জরীর অতি পরিচিত। তার মূর্তি স্পষ্ট। তার নাম জানা। শ্যামচাঁদ গড়াই। সমুদ্রতীর থেকে মঞ্জরী ফিরে এসেছিলো একা। শ্যামচাঁদ সঙ্গে আসেননি। কিন্তু মঞ্জরী জানে নিঃশব্দে সে মার হজম করবে, তার নাম শ্যামচাঁদ গড়াই নয়। সুযোগ খুঁজবেন শ্যামচাঁদ। ওঁৎ পেতে থাকবেন। শ্যামচাঁদ মরীয়া হয়ে শেষ কামড় দেবার জন্যে নিশ্চয়ই প্রস্তুত করছেন নিজেকে। ঠিক সময়ে সমস্ত পণ্ড করবার জন্যে তাঁর অশুভ প্রতীক্ষারই একটি ভয়ঙ্কর ছায়া এই আষাঢ়-আকাশের ঘনঘটায় উৎকীর্ণ। রক্তখেকো বাঘেরই স্বজাত শ্যামচাঁদ। বাঘ না হলেও, বনবিড়াল। বনবিড়াল কোণ নিচ্ছে ক্রমশ। এবং বিড়াল একবার কোণ নিলে বাঘের চেয়েও মারাত্মক হয় সে। তখন তাকে আর কোণঠাসা করে কার সাধ্য! বিবাহের দিন যতই এগিয়ে আসতে লাগলো ততই সেই অশুভ সম্ভাবনার পদধ্বনি চকিত করে তুললো মঞ্জরীকে ঘুমে-জাগরণে।

মঞ্জরীর আশঙ্কা নিতান্ত অমূলক নয়। তার প্রমাণ কয়েক দিনের মধ্যেই হাতে-নাতে না হোক, আভাস-ইঙ্গিতে ধরা পড়ে গেলো। কা'রা যেন কথাটা হাওয়ায় রটিয়ে দিলো। আর তারই সূত্র ধরে শুভানুধ্যায়ীরা শেষবারের মতো আরেক বার নিরস্ত করতে এলেন আলোকের মাকে এই বিবাহ অনুমোদনের ব্যাপারে। তারা সোজাসুজিই বলে বসলেন: এ সব কি শুনছি—না না, এ ঠিক নয়, —যা রটে তার খানিকটা তো বটেই! আলোকের মা-ও সোজাই পাল্টা প্রশ্নে জানতে চাইলেন, কি ভালো নয়? কি শুনছেন তারা?

শুভানুধ্যায়ীরা যেন ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগে উদ্যত এমন সাফল্য-সুনিশ্চিত হাসিতে জানিয়ে দিলেন যে অত্যন্ত বিশ্বস্তসূত্রে তাঁরা অবগত হয়েছেন যে শ্যামচাঁদ নাকি মঞ্জরীর মুখ এসিড দিয়ে পুড়িয়ে দেবেন বলে শাসিয়ে এসেছেন, কিন্তু তাতে তাঁরা বিন্দুমাত্র বিচলিত নয়। কারণ অমন মেয়ের তাই হচ্ছে যোগ্য শাস্তি,—কিন্তু ওই সঙ্গেই শ্যামচাঁদ নাকি তার মুখের গ্রাস ছিনিয়ে নেবার কারণে আলোককেও দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেবার জন্য প্রস্তুত, ভয়ের কথাটা হচ্ছে এই। আলোকের মা শুনে একটি কথাও বললেন না। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে থেকে শুভানুধ্যায়ীর দল ফিরে এলেন,—তাঁদের সতর্কবাণীর ঔষধ ধরেছে, এমনই আত্মপ্রসাদ সম্বল করে উদ্ধত বিজয়ী বীরের মত।

আলোকের মা কানপাতলা মানুষ নন। অত্যন্ত শক্ত মহিলা। পৃথিবী উলটে গেলেও তাঁর মুখের একটা 'হাঁ' কে 'না' করা শক্ত, না-কে 'হাঁ' করা। সেই তিনিও সাময়িক বিচলিত হলেন। শ্যামচাঁদদের পক্ষে কিছুই শক্ত নয়, কিছুই নয় অসম্ভব। স্ত্রীলোক মাত্রই এমন লোকদের মুখের গ্রাস। সেখানে হাত পড়লে খুন-জখম করবে এরা হাসতে হাসতে। আগেকার কাল হলে নিজেরাই করতো। এখনকার কাল বলে লোক লাগিয়ে করবে এবং টাকার জোরে সাক্ষীর অভাব ঘটিয়ে ঘুরে বেড়াবে স্বাধীনভাবে নিহতের নাকের ওপর দিয়েই। আলোককে ডেকে পাঠালেন তিনি। অবহিত করলেন। জানতে চাইলেন আলোকের কানেও কথাটা গিয়ে উঠেছে কি না। হ্যাঁ। উঠেছে। আলোকও জানে। ঠিক সেই মুহূর্তে আলোকের মাকে এসে জানালো বাড়ীর সরকার মশাই, শ্যামচাঁদ বাবু এসেছেন নীচে। আলোকের মার সঙ্গে দেখা করতে চান।

আলোকের মা মুহূর্তেই উপলব্ধি করলেন এবার ঝড় উঠবে। শ্যামচাঁদ যদি সত্য-সত্যই তার মনস্কামনা সিদ্ধ করতে চায় তো এখন এসেছে সেই অনিবার্য পরিস্থিতি ঘটানোর আগে শেষ বারের মতো হুমকী দিয়েই কাজ উদ্ধার করে যেতে। উপলব্ধি করার অনতিবিলম্বেই পালটে গেলো আলোকের মায়ের মুখশ্রী। বাচ্চার উপর আক্রমণে উদ্যত শত্রুর মুখোমুখী মায়ের মুখ যেমন ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে তেমনি বীভৎস দেখাচ্ছে তাঁকে এখন। চোখে আগুন, চোয়াল শক্ত, নিঃশ্বাস নয়, ঝড় বইছে যেন! নাকের ডগা ফুলে উঠেছে। নিজেকে কোনও রকমে সামলে রেখে সরকার মশাইকে তিনি বললেন, নিয়ে আসুন তাঁকে এখানে।

শ্যামচাঁদ গড়াই এসেই আলোকের মা-কে প্রণাম করলেন। তার পর হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করলেন: কেন এসেছি বলুন তো? আলোকের মা বললেন: কেমন করে জানব? কিছু জানাও নি তো? শ্যামচাঁদ আরও উচ্চকিত হাসিতে সরব হলেন। জানেন না? সবাই জানে যে, খুন করতে এসেছি আলোককে। মায়ের ভয়ঙ্কর মুখ আবার ভয়ঙ্কর হলো। শ্যামচাঁদের মধ্যে যে পশু এতদিন ছিলো, সেই পশুর মধ্যে সবার উপরে আজ যা আবার সত্য হয়ে উঠেছে তা মানুষ নয়, মনুষ্যত্ব। শ্যামচাঁদ আলোকের হাত টেনে নিয়ে হাতে পরিয়ে দিলেন সোনার হাতঘড়ি। শ্যামচাঁদের আশীর্বাদী। মা-কে বলে গেলেন এ বিয়েতে পাত্রপক্ষের কর্তা তিনি। নিজের গাড়ীতে আলোককে নিয়ে যাবেন বিয়ে দিতে।

শ্যামচাঁদ এসেছিলেন মঞ্জরীর বাড়ী থেকে, মঞ্জরীর বিয়ের বেনারসী কিনে দিয়ে।

শ্যামচাঁদ গড়াই সত্য-সত্যই জমিয়ে তুললেন বিয়ের আয়োজন। হাঁক-ডাকে, দৌড়-ঝাঁপে, কেনা-কাটায়, লোক-লস্কর, গাড়ী-ঘোড়ায় হুলুস্থুল কাণ্ড বেধে গেল। এতদিনে মনে হলো আলোকের এবার তাহলে বিয়ে হচ্ছে। ছোট ছেলেপিলের হাসি-কান্না ছাড়া প্রাসাদকেও যেমন পোড়োবাড়ী বলে মনে হয়, তেমনি শ্যামচাঁদ গড়াইয়ের মতো একজন লোক ছাড়া বিয়েবাড়ীকে মনে হয় ম্যারেজ-অফিস। সানাই বাজলেই বিয়ে-বাড়ী হয় না, সানাইয়ের পোঁ ধরার জন্তে চাই শ্যামচাঁদের মতো মানুষ। রাজনন্দিনীদের বিয়ে হতো যেমন আড়ম্বরে তার চেয়েও সাড়ম্বর স্বাগত জানালো শহর-সুদ্ধ অগণ্য গণ্যমান্তদের মঞ্জরীর বিবাহ বাসর। শুধু আপ্যায়ন, শুধু ভোজনে পরিতৃপ্তি নয়,—গণ্যমান্তদের স্বাক্ষর সংগৃহীত হলো সযত্নে। উপস্থিতির সাক্ষ্য। পরের দিন খবর-কাগজের প্রভাতী সংস্করণের প্রথম পৃষ্ঠায় গোদা-গোদা হরফে বিবাহ-সংবাদের সচিত্র বিবরণ ছাপা হলো। সংগৃহীত স্বাক্ষরের প্রতিলিপি হলো মুদ্রিত। সব দিক বেঁধে, বেরুবার সব রাস্তা বন্ধ করে তবে কাজে নেমেছে মঞ্জরী। সাবাস!

বিবাহের হাঙ্গামা মিটে যাবার কয়েক দিন পর। পাশের ঘরে দুপুরবেলা আলোক শুয়েছিলো একা। মঞ্জরী ছিলো অন্য ঘরে। সুর করে রাস্তায় ফিরিওলা হাঁকছিলো: কুলটা হলো কুলের বউ! মঞ্জরী বারান্দায় বেরিয়ে এলো। ইসারায় লোকটাকে ডাকলো ওপরে। বুড়ো মোটা একটা লোক। হাঁফাচ্ছিলো। মাথার বোঝা নামাতেই মঞ্জরী জিজ্ঞেস করলো: তোমার কাছে কত বই আছে? পাঁচশো আছে এখন,—অফিসে আরও আছে। মঞ্জরী: কত দাম? ফেরিওলা: সব নিলে কমে দেব।

মঞ্জরী সমস্ত বইগুলি কিনে নিয়ে উনুনের সামনে বসলো উবু হয়ে। একটা একটা করে বই দিতে লাগলো আগুনের মধ্যে। আগুনের আলোয় দেখা গেলো মঞ্জরীর ঠোঁটের দু'কোণে বিচিত্র রহস্যময় এক হাসি ছড়িয়ে পড়েছে। কি সেই হাসি—যুগে যুগে সে হাসি হেসেছে ক্লিওপেট্রা, জোসেফিন আর ট্রয়ের হেলেনরা।

সেই হাসি এমনিতে যার কোনও মানে হয় না, অথচ যা গভীর, অর্থপূর্ণ।

[আগামী সংখ্যায় 'উপসংহার']

"Regret is an appalling waste of energy. You can't build on it, it is only good for wallowing."
—Katherine Mansfield.

রাজলক্ষ্মী
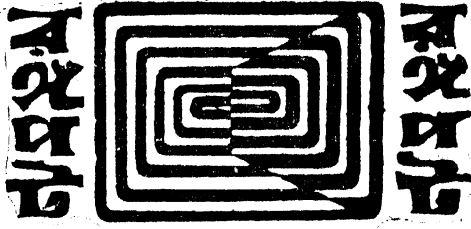
অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের অপূর্ব্ব সৃষ্টি 'শ্রীকান্ত'। সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ এতে প্রতিফলিত হয়ে উঠেছে। অনেকে বলেন, শরৎচন্দ্রের আত্মজীবনী পরিস্ফুট হয়েছে তাঁর এই শ্রীকান্তে। অবশ্যি শ্রীকান্ত শরৎচন্দ্রের আত্মজীবনী কি না সে বিষয়ে মতদ্বৈধতা থাকলেও মরমী শিল্পী শরৎচন্দ্র তাঁর আত্মচরিত কিছুটা শ্রীকান্তে অঙ্কিত করেছেন, এ বিষয়ে অনস্বীকার্য্য। তবে উপন্যাস লিখতে হলে অনেকগুলি ঘটনার সমাবেশ করতে হয়, একথা সমালোচকেরা বলে থাকেন। তাই শ্রীকান্তে আমরা দেখতে পাই বহু ঘটনা ও সংঘাতের সমাবেশ। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের আর একটা বড় দিক রয়েছে মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অভাব-অভিযোগ, আশা-আকাঙ্ক্ষা তাঁর রচিত উপন্যাস অথবা গল্পে মূর্ত্ত হয়ে উঠে। তাই ঔপন্যাসিক হিসেবে আজও শরৎচন্দ্রের স্থান সকলের উপরে। সর্ব্বাঙ্গীন ভাবে বিবেচনা করলে আত্মজীবনী হলেও এ একখানা রম্য উপন্যাস নয়, সকল শ্রেণীর জনমানসের কাছে রয়েছে একটা বিশেষ আকর্ষণ। এখানে শরৎচন্দ্রের অন্যান্য রচনা ও উপন্যাসের চরিত্রগুলির বিষয়বস্তু উল্লেখ না করেও দ্বিধাহীন ভাবে আমরা বলতে পারি শ্রীকান্ত শরৎচন্দ্রের সার্থক সৃষ্টি।

সাম্প্রতিক একটি ছবিতে অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়

এই শ্রীকান্তের তৃতীয় ও চতুর্থ পর্ব্ব অবলম্বনে স্বনামধন্য যশস্বী নাট্যকার দেবনারায়ণ গুপ্ত মশাই শরৎচন্দ্রের মর্ম্মলোক—মানসী রাজলক্ষ্মী নাটক রচনা করেছেন। শরৎচন্দ্রের রচনার বিষয়বস্তুকে সামগ্রিক ভাবে যথাযথ রেখে সুনিপুণ হস্তে নাটক রচনা করা কম কৃতিত্বের কথা নয়। দেবনারায়ণবাবু এ কার্য্যে সিদ্ধহস্ত, তা বহু পূর্ব্বেই স্বীকৃত হ'য়েছে। ষ্টার থিয়েটারের সাম্প্রতিক উন্নতির মূলে নাট্যকার দেবনারায়ণের অবদান সামান্য নয়।

ষ্টার থিয়েটারের একমাত্র স্বত্বাধিকারী সলিলকুমার মিত্র এই রাজলক্ষ্মী নাটকখানি মঞ্চস্থ করবার ব্যবস্থা করে জনসাধারণের ধন্যবাদভাজন হ'য়েছেন, একথা অনায়াসেই বলা যেতে পারে। বর্ত্তমান কালে বঙ্গ নাট্যশালার পুনরুজ্জীবিতকল্পে এবং অগ্রগতির মূলে রয়েছেন সলিল বাবু। বঙ্গ রঙ্গমঞ্চেও তাঁর অবদান অসামান্য। একদিন যখন বিংশ শতাব্দীর নাট্যশালার ইতিহাস লেখা হবে, সেদিন সলিলকুমারের নাম ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে, এ বিশ্বাস আমাদের আছে।

"রাজলক্ষ্মী" নাটকখানির প্রযোজনায় শিশির মল্লিক মহাশয়ের অবদান বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর সংগঠনী শক্তি এই নাটকখানির সাফল্য অর্জ্জনে বিশেষ সহায়তা করেছে। নাটকখানি যাতে যথাযথ ভাবে সু-অভিনীত হয়, তজ্জন্য তিনি প্রথম থেকেই করেছেন অক্লান্ত পরিশ্রম এবং তাঁর অক্লান্ত প্রচেষ্টার ফলেই 'রাজলক্ষ্মী' নাটকটির সাফল্য এনে দিয়েছে। অবশ্য তাঁর সাথে আর একটি মহৎপ্রাণ করেছেন দিবা-রাত্রি পরিশ্রম। নাটকখানির অভিনেতা-অভিনেত্রী নির্বাচনে তাঁর সাহায্য না পেলে বোধ হয় এত শীঘ্র নাটকটি সাফল্য অর্জ্জন করতে সক্ষম হতো না। তিনি হচ্ছেন বর্ত্তমান কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিনেতা জহর গঙ্গোপাধ্যায়। তার পরেই আমরা নাম করতে পারি নাট্যকার দেবনারায়ণ গুপ্তের। তিনি একাধারে নাট্যকার ও সু-অভিনেতা। নাটকের চরিত্র নির্বাচনে ও মহড়ায় এঁর প্রচেষ্টাও উল্লেখযোগ্য।

'রাজলক্ষ্মী' নাটকখানির সমালোচনা করতে গিয়ে প্রথমে যাঁর কথা মনে পড়ে, তিনি হচ্ছেন নাটকখানির অন্যতম চরিত্র প্রসন্ন ঠাকুর্দ্দা। জহর গাঙ্গুলী এই চরিত্রটিকে যথাযথ রূপদান করেছেন। মাত্র তিনটি দৃশ্যে অবতরণ করলেও দর্শক-সমাজের মনে তিনি গভীর রেখাপাত করেছেন তাঁর সাবলীল মনোরম অভিনয়ে। তিনি যে বর্ত্তমান কালের একজন শ্রেষ্ঠ অভিনেতা, তা এ থেকেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। নাটকখানি দেখতে গিয়ে একবারও মনে হয় না যে, অভিনয় দেখছি। মনে হয়, এ সেকালের সত্যি সত্যি প্রসন্ন ঠাকুর্দ্দা। এখানেই অভিনয়ের সাফল্য, অভিনেতার কৃতিত্ব। তার পরেই নাম করতে হয় 'কমললতা'র ভূমিকায় মিতা চট্টোপাধ্যায়ের এবং 'রাজলক্ষ্মী'র নাম-ভূমিকায় শিপ্রা দেবীর। এ দুইটি চরিত্র সৃষ্টি অপূর্ব্ব এবং এতে যথাযথ রূপদান করে শিপ্রা দেবী ও মিতা চট্টোপাধ্যায় অকুণ্ঠ প্রশংসা পেয়েছেন এবং ভবিষ্যতেও অর্জ্জন করবেন, এ বিশ্বাস আমরা রাখবো। তাঁদের কীর্ত্তন-গানগুলি মনে গভীর রেখাপাত করে। শিপ্রা দেবী ও মিতা চট্টোপাধ্যায়ের সুমধুর কণ্ঠে গীত কীর্ত্তনগুলি বিদগ্ধ জনগণের হৃদয়ে সুধাবর্ষণ করে।

এর সঙ্গে গীতশ্রী শ্যামলী মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গীতও বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

'শ্রীকান্ত' চরিত্রের যথাযথ রূপ দানে অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় পুরোপুরি সক্ষম হয়েছেন। খ্যাতিমান নট হিসেবে তিনি পরিচিত। এবারেও তিনি তাঁর পূর্ব-সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। তাঁর সুকণ্ঠ, সুচেহারা ও সংযত অভিনয় সত্যিই অনবদ্য। কুমারী-গৃহিণীরূপে অপর্ণা দেবী অপূর্ব। তাঁর ভাবাব্যক্তি সকলের হৃদয়কে সিক্ত করে। এঁদের পরেই রতনের ভূমিকায় তুলসী চক্রবর্ত্তী, গহরের অংশে প্রশান্তকুমার, কালিদাস মুখার্জীর রূপদানে কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়। মন্মথ চরিত্রের অভিনয়ে প্রেমাংশু বোস, মধু ডোমবেশী পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য, বজ্রানন্দ—অনুপকুমার, নয়নচাঁদ চক্রবর্ত্তী,—প্রীতি মজুমদার, নবীন—শ্রীকণ্ঠ গুপ্ত, দুর্গা—কল্যাণী দাস এবং বালক অভিনেতা শ্রীমান স্বপনকুমারের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

সুনন্দার অংশে গীতা দে, পুঁটুরাণী, মঞ্জু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি সকলেই নিজ নিজ অংশে সু-অভিনয় করেছেন। এক কথায় বলতে গেলে সকল অভিনেতা অভিনেত্রীর অভিনয় সুন্দর, টিম ওয়ার্ক চমৎকার! সুরকার মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে আমরা অভিনন্দন জানাই তাঁর সুরসৃষ্টির জন্যে। পরিশেষে আমাদের বক্তব্য যে 'রাজলক্ষ্মী' নাটকখানি দর্শক-সমাজের প্রচুর আনন্দ দান করতে সক্ষম হবে। আমাদের বিশ্বাস, এ নাটকখানি দর্শকদের মনে স্থায়ী আসন লাভ করবে।

মায়ামৃগ

রঙমহল রঙ্গমঞ্চে বর্তমানে সগৌরবে প্রদর্শিত হচ্ছে "মায়ামৃগ"। নীহার গুপ্তের লেখা এই নাটকে প্রধানত দুটি রমণীকে মুখ্য চরিত্র হিসেবে অঙ্কিত করে তাদের মাতৃত্বের মমতাময়ী রূপ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। দুই বোনকে নিয়ে গল্প। বড় বোন ধনী, ছোট দরিদ্র। বড়র বাড়ী বহু আশ্রিতে পরিপূর্ণ। ছোটও তার পঙ্গু স্বামীকে নিয়ে দিদির আশ্রয়েই ওঠে। ছোট বোনের একটি ছেলে ছিল, সেই ছেলেকে মানুষ করে তোলে বড় বোন। ছেলেটি জানে, এরাই তার মা-বাবা, তার আসল পিতৃ-মাতৃ পরিচয় তার কাছে অজানাই থেকে যায়। পরে নানাবিধ ঘটনার প্রবাহে শুভ্র তার আসল পিতৃ-মাতৃ পরিচয় জানতে পারে।

নাটকটিতে মাতৃহৃদয়ের ব্যাকুল আবেদন চমৎকার ফুটে উঠেছে। দুটি মাতৃচরিত্র অবশ্য ভিন্নধর্ম্মী। সীতার সব থেকেও কিছু নেই, সে প্রতিজ্ঞাবদ্ধা—কখনও নিজের ছেলের উপর সে দাবী করবে না। সব থেকেও তার কিছু নেই,কোন রকমে দু'-একবার যা চোখের দেখা ঘটে—তাই তার সব, তাতেই তার সুখ, তাই থেকেই জন্ম তার পরিতৃপ্তির। সাবিত্রী তার সর্বপ্রকার স্নেহ নিয়ে আঁকতে থাকে শুভ্রকে, যদি সে কোন রকমে জেনে ফেলে তার আসল পরিচয়। সীতার বঞ্চিত মাতৃহৃদয় আজ যদি হঠাৎ কোন এক অসতর্ক মুহূর্তে শুভ্রকে কেড়ে নেয়। এই চিন্তায় উদ্বিগ্নতায়, দুর্ভাবনায় তার অশান্তির শেষ নেই। সীতা শুভ্রকে দূর থেকে দেখেই তৃপ্তা, যদি বা কখনও তার মাতৃহৃদয় জেগেছে, শুভ্রর দিকে হাত বাড়াতে চেয়েছে তার মাতৃচিত্ত, সে প্রবৃত্তিকে চোখের জল দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে নষ্ট করে ফেলেছে সীতা। কিন্তু সাবিত্রী শুভ্রকে একেবারে বুকের মধ্যে পেয়েও তো সে অতৃপ্তা, এক কল্পিত আশঙ্কায় তো তার মনের দহনকার্য শুরু হয়ে গেছে

এই সংঘাতের মধ্যে দিয়ে নাটকের গতি। সুখ্যাত পরিচালক বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের পরিচালনা গুণে নাটকটি 'পরম উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। নাটকের মধ্যে অন্তর্নিহিত ভাব নাট্যরস-রসজ্ঞ দর্শক-সমাজকে বিশেষ আনন্দ দেবে বলে আশা রাখি। সাবিত্রীর

সাম্প্রতিক একটি ছবিতে সুচিত্রা সেন

আশ্রিত চরিত্রগুলির মধ্যে হাস্যরসের খোরাক জোগানো হয়েছে। শুভ্রর আসল পরিচয় উদ্‌ঘাটনের দৃশ্যটিতে যথেষ্ট মুন্সিয়ানার ছাপ পাওয়া যায়।

অভিনয়ে সাবিত্রী-সীতার রূপ দু'টি নিখুঁত ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন নাট্যসম্রাজ্ঞী সরযূবালা ও কেতকী দত্ত। শুভ্রর ভূমিকায় দর্শকচিত্ত জয় করেছেন শ্রদ্ধেয় অভিনেতা স্বর্গীয় নির্মলেন্দু লাহিড়ীর সুযোগ্য পুত্র নবকুমার (নবগোপাল লাহিড়ী)। নবকুমারের অন্তরস্পর্শী অভিনয় বহু দিন মনে থাকবে। তাঁর বাচনভঙ্গীতে চলাফেরা যথেষ্ট প্রতিভার পরিচায়ক। সাবিত্রীর স্বামী অমিয়নাথের চরিত্রটি যথেষ্ট ব্যক্তিত্বের সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন নীতীশ মুখোপাধ্যায়—মহেন্দ্রের ভূমিকায় রবীন মজুমদারের অভিনয়ও অভিনন্দনের যোগ্যতা রাখে। সীতার হতভাগ্য স্বামী বিভূতির বেদনাময় চরিত্রটি যথাযথ নিপুণতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক অভিনেতা সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়। ভৃত্যের ভূমিকায় জহর রায়কেও ভালো লাগবে। এঁরা ছাড়া অল্প আবির্ভাবেও প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেলেন যে ক'জন শিল্পী, তাঁদের মধ্যে গোপাল মজুমদার, বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়, হরিধন মুখোপাধ্যায়, অজিত চট্টোপাধ্যায়, কার্তিক সরকার, বলীন সোম, অজয় ভট্টাচার্য, সুনীত মুখোপাধ্যায়, লীলা পাল, শুক্লা দাস, প্রিয়া চট্টোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। কবিতা সরকার কাজ চালিয়ে নিয়েছেন মাত্র তবে গীতা সিং রীতিমত ব্যর্থ। সঙ্গীত পরিচালনায় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন সুরকার অনিল বাগচী।

লুকোচুরি

অশেষ প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে দিয়েও বোম্বাই চিত্রজগতের মাধ্যমে বাঙলার যে ক'টি কীর্তিমান সন্তান সারা ভারতের চিত্রামোদীদের চিত্তজয়ে সমর্থ হয়েছেন, গাঙ্গুলী-ভ্রাতৃবৃন্দ তাঁদের অন্যতম। এঁদের মধ্যে কিশোরকুমারের অভিনয়ও আজ সারা ভারতের আদরের বস্তু এবং অভিনয়-ব্যক্তিত্বে পরিপূর্ণ। এতাবৎকাল কিশোরকুমারের অভিনয় প্রতিভার প্রত্যক্ষ ছাপ বাঙলার ছায়ালোকে পড়েনি কিন্তু আজ সে অভাব পূর্ণ হয়েছে তাঁরই প্রযোজিত ছবি লুকোচুরির দ্বারা। একজোড়া যমজ ভাইকে কেন্দ্র করে গল্প। দুটি ভাই ভিন্ন চরিত্রের কিন্তু তাদের মনের মিল অটুট। শঙ্কর ধীর, স্থির, গায়ক, সুরকার, মৃদুভাষী। বুঙ্কু চপল-চঞ্চল-হাস্যময়-মসীজীবী। দুই ভাই ভালো বাসল দুটি বোনকে। দুই ভাইয়ের এক রকম চেহারা, সুতরাং তাই থেকে মেয়ে দুটির ভুল করা আর ভুল বোঝাও অস্বাভাবিক নয়। হ'লও তাই। তার পর নানা হাস্যরস-সমৃদ্ধ পরিস্থিতির পরে কাহিনীর সমাপ্তি। ছবিটির গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত কৌতুকে পূর্ণ কিন্তু তাই বলে ছবিটিকে কেবলমাত্র হাল্কা হাসির ছবি বললে ভুল করা হবে। হালকা হাসির পেছনে একটি বিরাট ইঙ্গিত রয়েছে ছবিটির মধ্যে যা যেমনই যুগোপযোগী তেমনই তাৎপর্যপূর্ণ। এখানে নির্মাতারা চলচ্চিত্রের মাধ্যমেই চলচ্চিত্রজগতের এক বিরাট গলদের স্বরূপ ফুটিয়ে তুলেছেন যা বাড়তে দিলে চলচ্চিত্র-জগতের তথা মানুষের রুচি ও পরিচ্ছন্নতার ধ্বংস অনিবার্য।

অসঙ্গতিও এ ছবিতে আছে বৈ কি। একটি অফিস যে ভাবে এঁরা দেখিয়েছেন তাতে সেটা অফিস না হয়ে চিড়িয়াখানা হয়ে গিয়েছে। প্রণয়িনীর বাড়ীতে হাতে-নাতে ধরা পড়ে গিয়ে শঙ্কর যে রকম উপস্থিত-বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে তা তার মত ধীর শান্ত লোকের পক্ষে সম্ভব নয়। ঐ ধরণের পরিস্থিতির অবতারণা করা বুঙ্কুর পক্ষে সম্ভব। বরণের সময় গীতা পরিষ্কার বুঙ্কুকে বরবেশে দেখে গেল তার পর মুহূর্তেই শঙ্কর যখন তার কাছে এসে দাঁড়াল ভিন্ন পরিচ্ছদে তখনও গীতা কি করে শঙ্করকেই তার বোনের স্বামী বলে ভুল করতে লাগল? বুঙ্কু উঠেছিল শঙ্করের বাড়ীতে তার বাবাকে না জানিয়ে—এবং নিশ্চয়ই তার বাবা রমেশ চৌধুরীর সঙ্গেও তার পত্রালাপ হয়েছে। সুতরাং সেই ঠিকানা তাঁর জানা। অসুখে বুঙ্কু যখন শঙ্করের ঠিকানা তার বাবাকে দিচ্ছে দুই ভাইয়ের বোম্বাইয়ের ঠিকানার অভিন্নতা তখনও রমেশ বাবুর চোখ এড়িয়ে গেল কি করে?

রবীন্দ্রনাথের "মায়া-বন-বিহারিণী" গানটি কিশোর-দম্পতির দ্বারা সুগীত হয়েছে। আলোকচিত্র ও সঙ্গীতাংশে যথাক্রমে অনিল দাশগুপ্ত ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায় শক্তির পরিচয় দিয়েছেন!

অভিনয়াংশে অকৃত্রিম অভিনন্দন জানাই কিশোরকুমারকে। সারা ছবিটি তাঁর দ্বৈত অভিনয়ে পূর্ণ, শুধু তাই নয়, দুটি চরিত্রে তাঁর গলার স্বরও দু'রকম শুনিয়েছে। কিশোরকুমারের অভিনয় অত্যন্ত প্রাণপূর্ণ, সজীব ও আড়ষ্টতাহীন। এ ছাড়া অন্যান্য শিল্পীদের মধ্যেও সকলেই স্ব স্ব সুনাম পূর্ণমাত্রায় রক্ষা করেছেন। কিশোরকুমার ব্যতীত অন্যান্য শিল্পীদের মধ্যে বিপিন গুপ্ত, অনুপকুমার (গঙ্গো) সমীরকুমার, নবেন্দু ঘোষ, মণি চট্টোপাধ্যায় নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, অজিত চট্টোপাধ্যায়, মালা সিনহা, অনীতা গুহ, রাজলক্ষ্মী দেবী ও সতী দেবীর নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ছবিটি পরিচালনা করে নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন কমল মজুমদার।

স্বর্গমর্ত্য

বর্তমানে যে ক'টি নতুন বাঙলা ছবি বিভিন্ন চিত্রগৃহের মাধ্যমে প্রদর্শিত হচ্ছে তাদের মধ্যে লুকোচুরি ছাড়া আরও একটি হাসির ছবি দেখানো হচ্ছে। তার নাম স্বর্গমর্ত্য। যমালয়ে জীবন্ত মানুষের ছায়াবলম্বী হলেও এর গতি ভিন্নমুখীন।

কেরাণী চিন্তা আর অভিনেতা লালুর মধ্যে ভাব খুব। একদিন দু'জনেই বাস থেকে পড়ে মৃত্যুমুখে পতিত হ'ল। চার শ' বিশ নম্বর যমদূত তাদের স্বর্গে নিয়ে গেল—সেখানে গিয়ে জানা গেল যে তাদের ভুল করে আনা হয়েছে। পরে ঐ যমদূতই আবার তাদের পৃথিবীতে রেখে গেল, কিন্তু ঐখানেই একটি ভুল করল চিন্তার দেহে লালুকে ঢোকাল আর লালুর দেহে ঢোকাল চিন্তাকে। প্রকৃত হাস্যরস সেইখান থেকেই শুরু। লালুর দেহধারী চিন্তা অভিনয় করতে গিয়ে লাঞ্ছিত হয়, চিন্তার দেহধারী লালু তার অফিসের কাজও ঠিকমত করতে পারবে না। লালুর মুখ থেকে চিন্তার ভাষা ও কণ্ঠস্বর বেরোয় আর চিন্তার মুখ থেকে বেরোয় লালুর। প্রণয়ের ব্যাপারেও গোলযোগ। লালুর প্রণয়িনীকে স্নেহের চোখে দেখে চিন্তা—অন্য ভাব তার সম্বন্ধে আনতে পারে না—লালুর প্রণয়িনীও এ ব্যাপারে আঘাত পায়—আবার চিন্তার দেহধারী প্রকৃত লালু যখন তাকে সম্ভাষণ করে, তখন তার ভাগ্যে জোটে লাঞ্ছনা,

চিন্তার ভাগনা লালুকে চিন্তা মনে করে প্রণাম করে—লালু তাকে চেনে না—আবার লালুর দেহধারী চিন্তা ভাগনেকে দেখতে পেয়ে পরম স্নেহের সঙ্গে যখন তাকে ডাকে—সে ডাকে কোনও ফল হয় না—চিনতে না পেরে ভাগনা চলে যায়। নিজের স্ত্রীর সঙ্গে কথা কয়ে শান্তি পায় না চিন্তা; বাড়ীময় কলঙ্কের রব পড়ে যায়। কারণ লোকচক্ষে দেখা যায় কথা হচ্ছে লালুতে ও মহামায়াতে। শেষে দুই বন্ধু আত্মহত্যার সঙ্কল্প করল অনেক ঘটনার পর—নতুন সেক্রেটারিয়েট থেকে লাফিয়ে পড়ল দু'জনে—তারপর হাসপাতাল। সেখানে নির্ব্বাসিত যমদূত তার ভুল সংশোধন করে নিল, পূর্বের মত লালু লালু হয়ে গেল, চিন্তা হয়ে গেল চিন্তা। তারপর মধুময় সমাপ্তি।

ছবিটিতে কতকগুলি গুরুতর অসঙ্গতি চোখে পড়ে, যার ফলে এর মর্যাদার বহুলাংশে হানি ঘটেছে। যেমন, বাস থেকে যেভাবে পড়া দেখা গেল সেভাবে পড়লে কেউ মরে না—আর পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মারা গেল—এও অসম্ভব! সিনেমার প্লে-ব্যাক হয়তো ধরা যায় না—চোখের সামনে চিন্তাবেশী লালুর ঠোঁটনাড়া লালুর প্রণয়িনী ধরতে পারছে না—এ হাস্যকর নয় কি? না, এ জেগে জেগে ঘুমোনোরই নামান্তর? চিত্রনির্মাতাদের মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্বন্ধেও সন্দেহ আসে যখন দেখা যায় যে, নায়কদ্বয় তেরো তলার উপর থেকে লাফিয়ে পড়েও মারা গেল না—হাসপাতালে গেল এবং তার পরেই লাফালাফি আরম্ভ করেছে। যে জায়গা থেকে লাফাল ওখান থেকে লাফালে হাড়-গোড় চুরমার হয়ে যাবে, চিহ্ন পর্যন্ত থাকবে না। হাসপাতাল তো দূরের কথা। ছবিটিতে হাস্যরস অবশ্যই আছে কিন্তু তা অন্তঃসারশূন্য ছাড়া কিছুই নয় এবং হাস্যরসের অবতারণা করতে গিয়ে সাধারণ জ্ঞান ও বাস্তববোধ পরিচালক হারিয়ে ফেলেছেন।

অভিনয়ে অসাধারণ শক্তির পরিচয় দিয়েছেন ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় ও জীবেন বসু। রূপান্তরের ফলে অসহায়তার ছাপ দু'জনের অভিনয়েই স্পষ্ট ধরা পড়ে। এই জাতীয় অভিনয়ে ধারাবাহিকতা রেখে যাওয়া যথেষ্ট শক্তিরই নামান্তর কিন্তু দু'জনেই সেই শক্তির পরীক্ষায় সমানাংশে কৃতকার্য হয়েছেন। মঞ্জু দে ও শীলা পালের অভিনয়ও প্রশংসার যোগ্য। এঁরা ছাড়াও বিকাশ রায়, মিহির ভট্টাচার্য, অমর মল্লিক, তরুণকুমার, নবদ্বীপ হালদার, শ্যাম লাহা ও আরতি দাস, ও সন্ধ্যা দেবীর অভিনয়ও প্রশংসার দাবী রাখে। এঁরা ছাড়াও এতে অভিনয় করেছেন তুলসী চক্রবর্ত্তী, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, অজিত চট্টোপাধ্যায়, সৌরীন ঘোষ, প্রীতি মজুমদার, মণি শ্রীমানী, ভানু রায়, সুনীত মুখোপাধ্যায়, আশা দেবী, শান্তা দেবী, ঊষা দেবী প্রভৃতি। প্রচারপুস্তিকাটি থেকে নেপথ্য শিল্পিদ্বয়ের নাম দুটি কেন বাদ দেওয় হল বুঝতে পারলুম না। এঁদের নাম সতীনাথ মুখোপাধ্যায় ও গায়ত্রী বসু। ছবিটির কাহিনী রচনা করেছেন প্রতাপ মুখোপাধ্যায় ও পরিচালনা করেছেন অসীম পাল। আলোক চিত্রায়ণে শক্তির স্বাক্ষর রেখে গেছেন অনিল গুপ্ত। সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন কালীপদ সেন।

রঙ্গপট প্রসঙ্গে

ভারতের স্বনামধন্য সুরসাধক ওস্তাদ আলী আকবর খানের সুরযোজনায় বিশু দাশগুপ্তের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে 'হিন্দোল'। রূপায়ণের ভার পড়েছে ছবি বিশ্বাস, কমল মিত্র, দীপক মুখোপাধ্যায়, প্রবীরকুমার, পদ্মা দেবী, সুপ্রিয়া চৌধুরীর উপর। * * * আশাপূর্ণা দেবীর 'শশীবাবুর সংসার'এর চিত্রনাট্য রচনা করেছেন নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ। সুধীর মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় এতে অভিনয় করতে দেখা যাবে ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ী সান্যাল, বসন্ত চৌধুরী, জীবেন বসু, অনুপকুমার, অমর মল্লিক, গঙ্গাপদ বসু, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, পশুপতি কুণ্ডু, চন্দ্রাবতী দেবী, অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় ও তপতী ঘোষ প্রমুখ যশস্বী শিল্পীদের। * * * চিত্রকর-পরিচালক সন্তোষ গুহ-রায়ের পরিচালনায় গৃহীত হচ্ছে 'পাখীর বাসা'র চিত্ররূপ। বিভিন্ন চরিত্রে অবতীর্ণ হচ্ছেন ছবি বিশ্বাস, উত্তমকুমার, গঙ্গাপদ বসু, মলিনা দেবী, নমিতা সিংহ, রেণুকা রায় প্রভৃতি। নায়িকার ভূমিকায় সুচিত্রা সেন অথবা অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়কে দেখা যাবে। * * * দিলীপ বসু পরিচালিত 'অযাচিত' ছবির কাহিনী রচনা করেছেন 'তাসের ঘর' খ্যাত রাসবিহারী লাল। সঙ্গীতের ভার নিয়েছেন শ্যামল মিত্র। রূপালী পর্দার বুকে দেখা যাবে কমল মিত্র, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, অনিল চট্টোপাধ্যায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায় এবং বাসবী নন্দী প্রভৃতি শিল্পিবৃন্দকে। * * * 'হাসপাতাল' ছবিটির পরিচালনকার্য এগিয়ে চলছে সুখেন ধরের পরিচালনায়। গল্পাংশের চরিত্রগুলির রূপ দেওয়ার দায়িত্ব নিয়েছেন ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ী সান্যাল, কমল মিত্র, অসিতবরণ, মিহির ভট্টাচার্য, তরুণকুমার, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, বেচু সিংহ এবং বর্তমান বাঙলার অন্যতমা অসামান্যা অভিনেত্রী সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ শিল্পিবৃন্দ।

এই ডালহৌসী

শ্রীঅমিত বসু

এই ডালহৌসী বেতনে বন্দী করেছে ব'লে
প্রত্যহ দেখি চয়ে-খাওয়া যত ধেনুর দলে,
এক পোঁচ রঙ একটু আঁচড় দিয়েছ টেনে
উলু-খাগড়ার বনে আর বলো কে কাকে চেনে ?

হায় পারমিতা, তবু প্রজাপতি হলুদ ফিতে
হারানো দিনের রামধনু রঙ এসেছে দিতে
শ্রম-লাঞ্ছিত জীবনের এই জ্যৈষ্ঠমাসে
কৃষ্ণচূড়ার শোভা দেখে ছুটি উর্ধ্বশ্বাসে।

হাজরার মোড়ে বহু কেড়ে-কুড়ে এক-পা ঠাঁই
তাও ফুটবোর্ডে দু'বাহুর জোরে যদি বা পাই,
ঝরে জলধারা রসে থই-থই এ মর দেহ
এ পোড়া কপালে জোটে দৈবাৎ আসন স্নেহ।

বাদুড়ের মত শূন্যে ঝুলেই কাটলো দিন,
কাছা ও কোঁচায় এক দেহে আজ হয়েছে লীন।

তবুও দেখেছি খণ্ডযুদ্ধ যেখানে শেষ
ঘন সবুজের সীমারেখাঙ্কিত হলুদ বেশ,
নীল সমুদ্র আছড়ে পড়েছে আরেক দিন
দু'চোখে এখনো দূরবিসারিত স্বপ্ন ক্ষীণ।

যেখানে পাখীরা ডাকে সাড়া দেয় সংকেতময়
বকুল যেখানে ঝরে-ঝরে যায় সেখানে নয়,
অবশেষে কি না দু'জনে সমান দাঁতার কলে
বাঁধা প'ড়ে গেছি বেতনের ফাঁস কঠিন গলে।

শ্রম বিভাগের কেরামতি

"সকল প্রদেশে কলকারখানা সম্বন্ধে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হস্তক্ষেপ করিবার কোন অধিকার নাই। সুতরাং শ্রমসচিব মহাশয় প্রশ্ন এড়াইয়া যাইবার জন্যই এ কথা বলিয়াছেন। তবে তাঁহার কথার স্বীকৃতি আছে—অন্য কয়টি রাজ্যের পঙ্গপাল আসিয়া পশ্চিমবঙ্গে 'সার শস্য গ্রাসে'—সুতরাং বাঙ্গালীর পক্ষে 'খোসাভুষি শেষে'—অবশিষ্ট থাকে। অবশ্য সচিব অনেক আছেন। কেন যে শ্রমসচিব মহাশয় মাড়বারীদিগের কথা বলিলেন না—তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম। তাহার পরে তিনি হুমড়ী খাইয়া পড়িয়াছেন—প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতির উপরে। সে কাজ করাই আজকাল 'ফ্যাশন' হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তিনি আরও বলেন—নিম্নলিখিত কয়টি বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হইবে—উচ্চ-শিল্প মাঝারী শিল্প। শিক্ষার সহিত গ্রাম্য প্রয়োজনের সামঞ্জস্যসাধন তিনি কিরূপে করিতে বলেন, তাহা বিশদ করিয়া বলিলে ভাল হইত। আমরা শ্রমসচিব মহাশয়ের বহু হিসাব-কণ্টকিত বিবৃতি পাঠ করিলাম। তাহাতে পশ্চিমবঙ্গের লোক রহিল—'যে তিমিরে সে তিমিরে।' বেকার-সমস্যা ছারপোকার বংশের মত বাড়িয়া চলিয়াছে ও চলিবে। আমরা কেবল জিজ্ঞাসা করি—যদি ভারতের অন্যান্য রাজ্যে শিল্পপ্রতিষ্ঠা ব্যতীত পশ্চিমবঙ্গের বেকার-সমস্যার সমাধান সম্ভব না হয়, তবে যত দিন তাহা না হইবে তত দিন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শ্রম-বিভাগটি বন্ধ করিয়া দিলে কি অন্ততঃ অর্থের ব্যয় হ্রাস হয় না? অবশ্য তাহাতে সচিব হইতে চাপরাশী পর্য্যন্ত লোক বেকার হইবেন। কিন্তু সো'ভি আচ্ছা—কারণ তাহাও মন্দের ভাল হইবে।" —দৈনিক বসুমতী।

ছাত্রছাত্রীর লেখাপড়া

"হায়দরাবাদ ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষা সংস্কার সম্পর্কীয় সেমিনারের উদ্বোধন বক্তৃতায় বিশ্ববিদ্যালয় অর্থমঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান ডাঃ সি ডি দেশমুখ বলেন, ভারতবর্ষে যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন ঘটিতেছে, তাহার সহিত সঙ্গতি রাখিয়া আমাদের পঠন-পাঠন ও পরীক্ষা গ্রহণ ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটাইতে হইবে। বলা বাহুল্য, একথা সঙ্গত ও সুচিন্তিত। যে শিক্ষা মানুষকে কতকগুলি তত্ত্বের সন্ধান দেয় মাত্র, জীবিকার্জনের পথে সামান্যই সহায়তা করে, তাহার ব্যাপক প্রসারে দেশে শুধু শিক্ষিত বেকারের সংখ্যাই বৃদ্ধি পাইয়াছে। যে বিদ্যা হাতে-কলমে খাটাইয়া পেটের ভাত করা যায়, তেমন শিক্ষাই সর্বাগ্রে প্রয়োজন। কিন্তু তাহার ব্যবস্থা হিসাবে এ পর্যন্ত কি বা কতটা কাজ গভর্ণমেণ্ট করিয়াছেন? বাঙলা দেশে আমরা দেখিতেছি, বিজ্ঞান ও বহুমুখী শিক্ষা লাভের জন্য হাই স্কুলগুলিকে এগারো ক্লাসে উন্নীত করার ব্যবস্থা হইয়াছে এবং ১৯৬০ সাল হইতে তিন শ্রেণীর ডিগ্রি কলেজ চালানোর প্রস্তাব বিশ্ববিদ্যালয় গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু মাত্র তিন শত স্কুল এই নূতন এগারো ক্লাসের পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছে। কলেজে এখনো পরিবর্তন হয় নাই, তবে হইবে এবং অর্থমঞ্জুরী কমিশনের সহায়তা লইতে হইলে, তাহাদের ছাত্রসংখ্যা দেড় হাজারে সীমাবদ্ধ করিতে হইবে। আর এগারো ক্লাসে রূপান্তরিত হইতে অক্ষম স্কুলগুলিকে নামিয়া আট ক্লাসের জুনিয়ার হাই স্কুলে পরিণত হইতে হইবে। তখন স্কুল-ফাইনাল ও ডিগ্রি পাশের সুযোগই যাইবে নিতান্ত সঙ্কুচিত হইয়া। ফলে শিক্ষিত বেকারের বোঝা কমিবে ঠিকই। কিন্তু এই যে অজস্র ছাত্রছাত্রী ছাঁটাই তালিকায় পড়িবে, তাহাদের কি ব্যবস্থা? হাতে-কলমে করিয়া খাওয়ার মতো বিদ্যা শেখানোর প্রতিষ্ঠান হিসাবে তাহাদের জন্য এখনো ত সারা দেশে জুনিয়ার টেকনিক্যাল স্কুল দেখা দেয় নাই? ইহাদের জন্য দেশে কল-কারখানা কাজ-কারবারও ত দিকে দিকে প্রসারিত হয় নাই? বাঙলার অবস্থা যা, অন্যান্য রাজ্যের অবস্থাও তাই। কাজেই পঠন-পাঠনের মতো পরীক্ষা গ্রহণ ব্যবস্থার সংস্কারেও দেশের সমস্ত ছাত্রছাত্রী উপকৃত হইবে না, হইবে মুষ্টিমেয় সুযোগপ্রাপ্তেরা। দুর্ভাগ্য যে, ইহাকেই আমরা সংস্কার বলি!" —যুগান্তর।

গান্ধী-স্মৃতি

"গান্ধী স্মারকনিধি গান্ধীবাদ সম্পর্কে গবেষণার জন্য 'গান্ধী পিস ফাউণ্ডেশান' নামক একটি সংস্থা গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। উক্ত সংস্থার গঠনতন্ত্র রচনার জন্য শ্রীদিবাকরের সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠন করা হইয়াছে এবং সংস্থা গঠনের দরুণ ব্যয়ভার বহন করিবার জন্য বরাদ্দ করা হইয়াছে এক কোটি টাকা। আশা করা যায়, আগামী তিন মাসের মধ্যে কমিটি গঠনতন্ত্র প্রণয়নের কাজ শেষ করিতে পারিবেন। কমিটির সভাপতিরূপে শ্রীদিবাকর সাংবাদিকদিগের নিকট এই তথ্য উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন যে, ভারতের চল্লিশটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেকটির সহিত একটি করিয়া গান্ধী ভবন নির্মাণ করিবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সহিত চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে এবং স্থির হইয়াছে, ওই সব ভবনে গান্ধীজীর রচনা ও তাঁহার মতবাদে বিশ্বাসী লেখকদের পুস্তক রক্ষিত হইবে। দেখা যাইতেছে, গান্ধী স্মারকনিধি এ কথা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছেন যে, কেবলমাত্র স্মৃতি-সৌধ ও মর্মরমূর্তি প্রতিষ্ঠা করিলেই

মহাত্মাজীর মত বিরাট চিন্তানায়ক ও কর্মবীরের স্মৃতির প্রতি সম্যক্‌রূপে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয় না। তাঁহার জীবন-বেদের মূলমন্ত্র ও তাহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা নিহিত রহিয়াছে ভাবগর্ভ তাঁহার অমর বাণীর মধ্যে। সে বাণী শুনিবার জন্য শুধু ভারত নয়, পরন্তু সংগ্রামসন্ত্রস্ত সমগ্র বিশ্ব উৎকর্ণ হইয়া রহিয়াছে। গান্ধী স্মারকনিধি বিশ্বময় সে বাণী প্রচারের ব্যবস্থা করিবার আশ্বাস দিয়া আতঙ্কিত বিশ্বকে আশ্বস্ত করিলেন। এই প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতেই যে একদা 'গান্ধী শান্তি পুরস্কার' প্রদানের উদারতর সিদ্ধান্ত ঘোষিত হইবে না, তাহা কে বলিতে পারে!" —আনন্দবাজার পত্রিকা।

আমড়ার আমসত্ত্ব

"কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী মোরারজি দেশাই কলিকাতা আসিয়াছিলেন। বর্তমান কংগ্রেসী কর্তাদের তথাকথিত বিরোধী বলিয়া খ্যাত গুটিকয়েক লোক দেশাইজির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিয়াছেন—কংগ্রেস বর্তমানে জনপ্রিয়তা হারাইয়া ফেলিয়াছে, ইহার আশু প্রতিবিধান দরকার। ডাঃ রায় সোজা জবাব দিলেন—কংগ্রেস জনপ্রিয়তা হারাইয়া থাকিলে মন্ত্রিত্ব গঠন করিল কিরূপে? অতুল্য ঘোষ আরও এক ধাপ উঠিয়া হিসাব দিলেন—বাঙ্গলাদেশের মিউনিসিপালিটিগুলিতে কংগ্রেস আগের চেয়ে এখন অনেক বেশী আসন লাভ করিয়াছে। বেচারীরা ইহার পর আর কি করিবে? মুখ চুণ করিয়া মাথা চুলকাইয়া সুড় সুড় করিয়া সরিয়া পড়িয়াছে। আরে বাবা, আসল কথা প্রাণ খুলিয়া বলিয়া দিলেই তো হইত? কংগ্রেস সুশীল ব্যানার্জ্জি, জ্যোতিষ মৈত্রদের পাত্তা দিতেছে না। তাই তাঁহারা চেলাচামুণ্ডাদের (যদি থাকে) সমর্থন হারাইতেছেন। তাঁহাদের দাবী তো বেশী নয়। অতি সামান্য, মিটাইয়া দিলেই তো ল্যাঠা চুকিয়া যায়।"—যুগবাণী (কলিকাতা)

"রাবণ দি সেকেণ্ড"

"মাদ্রাজের কুম্বকোর্ণাম নামক স্থানে বিভিন্ন দেওয়ালে নতুন ধরণের পোষ্টার দেখা যায়। উক্ত পোষ্টারে মাত্র দুটি কথা লেখা ছিল "প্রণাম রাবণ"। প্রকাশ দ্রাবিড় কজাঘম দলের নেতা শ্রী ই, ভি, রামস্বামী নাইকারের সম্বর্ধনায় উক্ত পোষ্টার লাগানো হয়। তিনি ছয় মাস কাল কারাবাস করিয়া সম্প্রতি মুক্তি পাইয়াছেন। দ্রাবিড় কজাঘমের মতে রাবণ একজন প্রকৃত বীর এবং পূজ্য ব্যক্তি। বাল্মীকি তাঁহার মহাকাব্যে নায়করূপে যে রামকে দেখাইয়াছেন তাহা সত্যই উক্ত মহাকাব্যটিকে সংগতিহীন করিয়া দিয়াছে। নাইকার ইহা সদর্পে ঘোষণা করেন যে, তামিলনাদকে বাদ দিয়া ভারতবর্ষের মানচিত্র পোড়াইবার জন্য ২০,০০০ স্বেচ্ছাসেবক তিনি যে কোন মুহূর্তে হাজির করিতে পারেন।"

—স্বস্তিকা (কলিকাতা)।

বামপন্থীগণ জবাব দিবেন কি?

"চন্দননগর কর্পোরেশনের চাকুরীতে শিক্ষক নিয়োগে পক্ষপাতিত্ব ও স্বজনপোষণ কেন? ১। ছাত্র ফেডারেশন নেতা জগন্নাথ দত্তের বঙ্গবিদ্যালয়ে নিয়োগ। ২। কম্যুনিষ্ট নেতা লক্ষ্মী পালের এসেসমেণ্ট বিভাগে নিয়োগ। ৩। কাউন্সিলার-পত্নী শেফালী নন্দী ও ভাইঝি ইন্দু নন্দীর নারী-শিক্ষা-মন্দিরে নিয়োগ। জাগ্রত জনমত কর্তৃক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা।" —সংগ্রাম (হুগলী)।

ঘুম নাই

"সুসিদ্ধান্ত পঞ্জিকার মতে এবার শনি রাজা, কুজ মন্ত্রী এবং মেঘনায়ক পুষ্কর। সুতরাং শাস্ত্র মতে রাজফলে 'তস্করাদ্যৈঃ ভ্রমন্তি লোকাঃ ক্ষুধিতাশ্চ দেশান্।' আর মন্ত্রীফলে 'কুন্তকাসুগতাভূপা যত্র মন্ত্রী ধরাত্মজঃ' এবং মেঘনায়কের ফল হইতেছে 'পুষ্করে দুষ্করা বারি শস্যহীনা বসুন্ধরা।' শাস্ত্রসিদ্ধান্তের উল্লেখ করা বর্তমান কালে অত্যন্ত কুসংস্কারের অভিব্যক্তি বলিয়া নিন্দিত হইলেও আমরা দেখিতেছি, কোন সুদূর অতীতের শাস্ত্রবাক্য অক্ষরে অক্ষরে মিলিতেছে। আমাদের রাষ্ট্রপালকগণ অবশ্য বলিতেছেন মাভৈঃ, বিদেশ হইতে ধারে কেনা প্রচুর শস্য গুদামে আছে। দেশবাসী এ আশ্বাসবাণীতে ভরসা করিতে পারিতেছে না। সামনের আঠার মাস কি করিয়া কাটিবে, সে দুর্ভাবনায় পল্লীবাসীর চোখে ঘুম নাই।" —বীরভূম বাণী

অশান্ত সীমান্ত

"আসাম ও পূর্ব্ব-পাকিস্তান সীমান্তের সুরমা নদী এবং ডাউকী এলাকায় পাকিস্তান আবার গোলযোগ আরম্ভ করিয়াছে। পূর্ব্বে উচ্চ নীচ বিবিধ পর্য্যায়ের যুক্ত বৈঠকে স্থিতাবস্থা রক্ষা এবং সংঘর্ষ বিরতির কয়েকটি চুক্তি হইয়াছিল। কিন্তু পাকিস্তান ক্রমাগত চুক্তিভঙ্গ করিয়া সামরিক আয়োজন চালাইতেছে। স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ যে কারণেই হউক, শান্তি স্থাপনে আগ্রহশীল নহে। তাই প্রতিটি যুক্তবৈঠক এবং চুক্তিই ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইতেছে। ঢাকায় দিনকয়েক পূর্ব্বে চীফ সেক্রেটারীদ্বয়ের বৈঠকে উভয়পক্ষ শান্তি স্থাপনের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শিলং-এ পাকিস্তানের সহকারী হাই কমিশনের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদের সহিত নাগা বিদ্রোহীদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে বহু চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশ পাইয়াছে। কাছাড় ও উত্তর কাছাড় জেলার মধ্য দিয়া নাগা-পাকিস্তানী যোগসাজসের সংবাদও পাওয়া যাইতেছে। মোটের উপর এমন অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে যে, পাকিস্তানের শাসকদের কথার উপর কেহই আর আস্থা স্থাপন করিতে পারিতেছেন না। তথাপি ভারত-পাকিস্তান সীমান্ত বিরোধের চূড়ান্ত মীমাংসার উদ্দেশ্যে এখন উভয় রাষ্ট্রের কমনওয়েলথ সেক্রেটারীদ্বয়ের এক বৈঠকের প্রস্তাব চলিয়াছে। কিন্তু আগষ্ট মাসের পূর্ব্বে নাকি পাকিস্তানের কমনওয়েলথ সেক্রেটারীর সময় হইবে না। অগত্যা আগষ্ট মাসেই হয়ত উক্ত বৈঠকের ব্যবস্থা হইবে। উভয় রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের যুক্ত সিদ্ধান্তকে পাকিস্তান বরাবর যে ভাবে অমান্য করিয়া আসিতেছে, তাহাতে পুনরায় এই ধরণের সম্মেলনের সাফল্য সম্পর্কে অনেকেই সন্দিহান। তবুও শেষ চেষ্টা হিসাবে এই অতি উচ্চ পর্য্যায়ের আলোচনার সার্থকতা হয়ত আছে। কিন্তু সম্মেলনে স্থায়ী কোন মীমাংসা হইয়া যাইবে বলিয়া নিশ্চিন্ত হইবার কোন কারণ নাই।" —যুগশক্তি (করিমগঞ্জ)।

আদর্শ পল্লীর ইট বিক্রয় হইতেছে?

"বোলপুর থানার অন্তর্গত পাঁচশোয়া গ্রামে আদর্শ পল্লীর জন্য যে ইট কাটা হইয়াছিল, তাহা সরকার বাহাদুরের সাহায্যপ্রাপ্ত কয়লা ও বিলিফের টাকার মাধ্যমে। উক্ত ইটগুলি পাঁচশোয়া গ্রামের

শ্রীবামাচরণ চৌধুরী ও ২১১ ব্যক্তি পেট্রোল অনুসন্ধানকারীদের নিকট ৪২৲ টাকা হাজারে বিক্রয় করিয়া দিতেছে। ইহার মর্ম কিছুই বুঝিতে পারা যাইতেছে না। সরকার বাহাদুর বন্যাবিধ্বস্ত অসহায় ব্যক্তিদিগের জন্য যদুপুরের গরীব চাষীদের জমি দখল করিয়া আদর্শ পল্লী গঠন করিতে যাইতেছেন। জল অভাবে বাড়ী তৈয়ারী সুরু হয় নাই, এখন সুরু হইবার সময় এ ভাবে সরকারের ইটগুলি উক্ত ব্যক্তিরা বেশী দরে বিক্রয় করিতেছে। কাহার নির্দ্দেশে তাহা জানিবার দাবী অসঙ্গত নহে। অবিলম্বে ঘটনার উপযুক্ত তদন্ত বা এইগুলি বিক্রীর কারণ স্থানীয় জনসাধারণ জানিতে চায়। কর্তৃপক্ষকে এই সম্পর্কে অবহিত হইতে অনুরোধ করিতেছি।"

—বীরভূম বার্তা।

দেশের দুর্দশা

"আজ মানুষের ভরসা করিবার মত কিছু নাই। সরল, সৎ ও সহজপথে চলা মানুষ আজ নিজেদের চতুষ্পার্শ্বের অবস্থা দেখিয়া হতবাক হইয়া যাইতেছে। অর্থ শিকারের সমারোহ ও প্রতিযোগিতায় আজ সততা, সাধুতা ও সরলতা নির্ম্মূল হইয়া যাইতেছে। আমাদের স্বপ্নের ভারত, স্বাধীন ভারতের এ অবস্থা কে কবে কল্পনা করিয়াছিল! আজ গোঁজামিল দিয়া, সত্যকে মিথ্যা দিয়া, সাধুতাকে বিসর্জ্জন দিয়া নীতিবোধকে বিদায় দিয়া দেশ চলিতেছে কিন্তু আগামী কালে, অনাগত ভবিষ্যতে ভারতের কি হইবে তাহা চিন্তা করা যায় না। টেষ্ট রিলিফ, ক্যাস ডোল, মুষ্টিভিক্ষা দিয়া দেশ গঠন করা যায় না। ১৯৪৩ সালে জেলায় জেলায় বৃটিশ শাসক লঙ্গরখানা খুলিয়াছিল কিন্তু জনহানি রোধ করিতে পারে নাই। জাতিকে ভিক্ষুকে পরিণত করিয়া কোন দেশ মুষ্টিমেয় ধনীদের বক্ষে ধারণ করিয়া বড় হইতে পারে না। কিন্তু ভারতের ভাগ্যে আজ তাহাই হইয়াছে। তাহার পরিণতি আজ দিকে দিকে বীভৎস হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। দেশের জনসাধারণ আজ কঠিন দারিদ্র্যে নিষ্পেষিত হইতেছে, অন্ন সংস্থানের পথ খুঁজিয়া পাইতেছে না, বিফল মনোরথে নিষ্প্রভ ও নিস্তেজ হইয়া চরম পরিণতির দিকে অগ্রসর হইতেছে। কাহার ইচ্ছায় এরূপ হইতেছে তাহা বলা কঠিন কিন্তু বর্ত্তমান কালের মানুষের সাধ্য নাই যে ইহা রোধ করে। যে শক্তির বলে ইহা সংঘটিত হইতেছে তাহার অভিপ্রায় কে বলিতে পারে?"

—ত্রিস্রোতা (জলপাইগুড়ি)।

লাভ চাই না কিল চাপড় হইতে বাঁচাও

"বারাসাত মহকুমা ফুড কনট্রোলারের অধীন কয়েক শত ডীলার আগামী সপ্তাহ হইতে দোকানে মাল তুলিবে না বলিয়া জানিতে পারা গিয়াছে। তাহাদের ক্ষোভের কারণে প্রকাশ, পুরা কোটার এক-পঞ্চমাংশ চাউল ও গম তাহারা পাইতেছে না। দেশগ্রাম জুড়িয়া ক্ষুধা হাহাকার—এই সামান্য মাল কাহাকে দিবে আর কাহাকে দিবে না? সরকারী খাদ্যশস্য বেচিয়া দুই পয়সা লাভ করা অপেক্ষা ক্রুদ্ধ জনতার হাতের কিল চাপড় তাহাদের প্রধান ভয়ের কারণ। অন্ততঃ কিল চাপড়ের হাত হইতে রেহাই পাইবার মত চাউল গম সরবরাহ করা হইলে তাহারা মাল গ্রহণ করিবে বলিয়া জানা গিয়াছে।"

—বারাসাত বার্তা।

উদ্বাস্তু পুনর্ব্বাসন

"উদ্বাস্তু পুনর্ব্বাসনকল্পে কলিকাতায় উচ্চ পর্য্যায়ের বৈঠকে আগামী বৎসর ৩১শে জুলাই-এর মধ্যে সমস্ত উদ্বাস্তু-শিবির হইতে উদ্বাস্তুদের পশ্চিমবঙ্গ ও বিভিন্ন রাজ্যে পুনর্ব্বাসিত করিয়া সমস্ত শিবিরগুলি তুলিয়া দেওয়া হইবে ও "ক্যাশডোল" দেওয়া বন্ধ করা হইবে এইরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে। শিবিরবাসী মোট ৪৫ হাজার উদ্বাস্তু পরিবারের মধ্যে ১০ হাজার পরিবারকে এই রাজ্যের ভিতরে এবং বাকী ৩৫ হাজার পরিবারকে পশ্চিমবঙ্গের বাহিরে বিভিন্ন রাজ্যে পুনর্ব্বাসিত করিতে আশ্রয় ও কাজ দেওয়ার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকার লইয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গের বাহিরে উদ্বাস্তু পুনর্ব্বাসন ব্যবস্থা সমর্থন করিয়া আমরা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি। নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পুনর্ব্বাসন সমাধা করার এই সিদ্ধান্তকেও আমরা আন্তরিক সমর্থন জানাইতেছি। সময় নির্দ্দিষ্ট করিলে তাড়াহুড়ার জন্য গোঁজামিলের সম্ভাবনা থাকিলেও দীর্ঘসূত্রতার অবকাশ থাকে না। আমাদের সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত স্বার্থসম্মত ব্যাপারেও যখন অনেক অব্যবস্থা অপচয় প্রভৃতি ঘটে, তখন উদ্বাস্তু পুনর্ব্বাসনের এই বিরাট জটিল কার্য্যে বহু ত্রুটি ও অসঙ্গতি অবশ্যই থাকিবে। তবে ঐগুলি আন্তরিকতার অভাবজনিত বলিয়া কর্তৃপক্ষের কার্য্যের বিরূপ সমালোচনা না করাই উচিত মনে হয়। সহযোগিতা ও যুক্তিযুক্ত আলোচনার দ্বারা সেগুলি ধীরে ধীরে দূর করাই অধিক মঙ্গলকর পন্থা। বিশেষতঃ শিবিরবাসী উদ্বাস্তুরা যে অবস্থায় আছেন, তদপেক্ষা নূতন ব্যবস্থা বহুলাংশে শ্রেয়ঃ এবং মানবোচিত।"

—আসানসোল হিতৈষী।

সঙ্ঘগুরুর প্রভাত বাণী

"কোন সনাতন কাল থেকে জড়ের উপর আত্মার জয় ঘোষণা করতে ভারত উন্নত। কিন্তু আজও সে জড়েরই আক্রমণে অধিক বিপন্ন। তবুও কি বলতে হবে—আমরা এগিয়েছি। অতীতের সাধনা আমাদের মুক্তির পথ খুলে দিয়ে গেছে। মোহ আমাদের শঙ্খবণিকের করাতের মত দুই দিকেই যে কেটে খণ্ড-খণ্ড করে! ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম—দুইই তাই ত্যাগের বস্তু। শুভ বা অশুভ যে কোনও আশ্রয়েই মোহ সমান ভাবেই আমাদের বিমূঢ় করে। বাহিরের দিক্ থেকে সংগ্রাম করে' আসে ক্লান্তি ও নৈরাশ্য। অন্তরের দিক্ থেকে যুদ্ধ করতে-করতে মানুষের চিত্ত সম্মোহিত হয়। ধর্ম্ম সাধনার অহঙ্কারও বুদ্ধির বিকার ঘটায়—যেন তারা সাধারণের উপরে, এই আত্মছলনায় জগতের উপর তারা উপেক্ষাশীল হয়। কিন্তু কার্য্যতঃ ইহারাও আহার-নিদ্রাদি প্রাকৃতিক বন্ধনে সমান-ভাবেই আবদ্ধ। এই আত্মমোহ থেকে মুক্তির উপায় কি, তাহাই চিন্তনীয়। ধর্ম্ম অমৃতস্বরূপ। সে অপার্থিব রসায়ন যে পান করে, রুদ্র তার ভিতর গর্জ্জন করে উঠেন। সেই অমৃতের সন্ধানে ভারতের মহাত্মারা একে-একে এগিয়ে গেছেন—" "জাতির জীবন তো আজিও সেই অমৃত দিয়ে সিদ্ধ হল না। তোমরা প্রবর্ত্তক, উদ্দেশ্য সেই একই—কিন্তু সেই প্রাচীন গতানুগতিক পথই কি তোমরা একান্ত শ্রেয়ঃ করবে? ধর্ম্ম চাই। কিন্তু বুঝি আজ পথের পরিবর্ত্তন প্রয়োজনীয়। তার জন্য তোমরা প্রস্তুত হও।"

—নবসঙ্ঘ (চন্দননগর)।

ক্রমবর্দ্ধমান নিত্য-ব্যবহার্য্য দ্রব্যমূল্য

প্রত্যেকটি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের দাম হু হু শব্দে বাড়িয়া চলিতেছে। সাধারণ লোকের আয় বাড়িতেছে না অথচ ব্যয়ের মাত্রা দিন দিনই বাড়িতেছে।

চাল সাধারণ	২৭৲. ২৮৲
ঐ সরু	৩০৲, ৩২৲
ধান	১৬৲, ১৬৷০
গুড়	২০৲ উর্দ্ধে
চিনি	৩৮৲, ৪০৲
ময়দা	২০৲, ২৫৲
আটা	১৮৲, ২০৲
গম	১৬৲, ১৮৲
তৈল	৮৫৲, ৯০৲
ডাল সকল রকম	২৫৲, ৩০৲
কলাই ঐ	১৮৲, ২২৲
পোস্ত	৭০৲
মরিচ	৬৮৲
সুপারি	২২৫৲
হলুদ	২৬৲
ধনে	৩২৲
জিরা	১৮০৲
সোডা	৪৮৲
খইল প্রতি বস্তা	২৬৲, ২৭৲

—দৃষ্টি (বর্দ্ধমান)।

হাহাকার

"আষাঢ় মাস শেষ হইতে চলিল, এ পর্য্যন্ত বর্ধমান জেলার কোথাও চাষের উপযুক্ত বৃষ্টি হইল না! দামোদর ক্যানেল ও ডি, ভি, সি, ক্যানেলেও এ পর্যন্ত স্বচ্ছ ভাবে জল দেওয়া হয় নাই। ইডেন ক্যানেলেও এই মাত্র জল ছাড়া হইয়াছে, কিন্তু উহা এ পর্যন্ত কোন জমিতেই উঠে নাই; আষাঢ়ের মাঠে যেখানে ধান্ত রোপণের কোলাহলে আকাশ-বাতাস মুখরিত হইবে সেখানে খোলা মাঠে গরু চরিতেছে। চাষী হতাশ হইয়া আকাশের প্রতি চাহিয়া আছে। স্বল্পবিত্ত চাষী ও দিন মজুরের ঘরে অন্ন নাই। কাজ নাই কে মজুর খাটাইবে? ভবিষ্যৎ ফসল সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত না হইলে কে মজুত ধান্ত কর্জ্জ দিবে? বর্দ্ধমানের মত ধান্তপ্রধান জেলার পল্লী অঞ্চলে আজ চাউলের দর ৷৶০ হইতে ৸০ আনায় উঠিয়াছে। চারিদিকে এইরূপ অনাবৃষ্টি কোন দিন দেখা যায় নাই। অনাবৃষ্টির বৎসর শস্যহানি যাহাতে না ঘটে তাহার জন্তই সরকার রাজকোষ হইতে অজস্র অর্থ ব্যয় করিয়া ক্যানেল কাটিলেন, কিন্তু তাহাও কাজের সময় অচল দেখিতেছি! এদিকে সেচমন্ত্রী বিধান সভায় হিসাব না করিয়াই একরে ১০ টাকার অনধিক একটা আন্দাজ ক্যানেলকর ধার্য্য করিবার জন্ত বিল আনয়ন করিয়াছেন।"

—দামোদর (বর্দ্ধমান)

প্রত্যক্ষদর্শী জেলাশাসক

"স্থানীয় জমিদারদের অত্যাচারের দৃশ্য জেলাশাসক শ্রীবুন্তালিয়া কলসী পরিদর্শনে আসিয়া বিগত ১লা এবং ৬ই জুলাই স্বচক্ষে দেখিয়া গিয়াছেন। বাজারের কর্দ্দমাক্ত অবস্থা, শুটকী পচা গন্ধ এবং গরু-ঘোড়ার রজ্জু-বিহীন যদৃচ্ছ বিচরণ দেখিয়া তিনি তাঁহার সঙ্গীদের সঙ্গে আলোচনা করিয়াছেন শুনা গিয়াছে। কলসী কৃষি-গবেষণাগারের সন্ত ফসল নষ্টের দৃশ্য প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ তাঁহার দৃষ্টিগোচরে আনিয়াছেন। ইহাতে বোধ হয়, জমিদারগণ চটিয়া গিয়াছেন। জেলাশাসক যাওয়ার পর হইতে জমিদারগোষ্ঠী সংযত হওয়া দূরে থাকুক, এবার এলেকাতে যেন মহিষ, গরু, ঘোড়া জনগণের অত্যাচারের জন্ত চালানই দিয়াছে। প্রত্যক্ষদর্শী জেলাশাসক কি করেন তাহাই দেখিবার জন্য জনসাধারণ অপেক্ষা করিতেছে।"

—জাগরণ (আগরতলা)।

শোক-সংবাদ

সূর্য্যনাথ চট্টোপাধ্যায়

ভারতের অন্ততম শ্রেষ্ঠ রাইফেল চালক ও বাঙলার রাইফেল আন্দোলনের প্রাণস্বরূপ বাটা স্যু কোম্পানীর চীফ সেক্রেটারী সূর্য্যনাথ চট্টোপাধ্যায় গত ১৪ই আষাঢ় মাত্র ৫২ বছর বয়সে পরলোক গমন করলেন। এঁর লোকান্তরে বাঙলার রাইফেল-জগতের এক অপূরণীয় ক্ষতি হল। রাইফেল আন্দোলন ছাড়া আরও বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওঁর সংযোগ বিত্তমান ছিল। ভারতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী মহিলা রাইফেল চালিকা সবিতা চট্টোপাধ্যায় এঁর সহধর্মিণী।

হরেন্দ্রনাথ বল্লভ

ধান্তকুড়িয়া বসিরহাট মহকুমার সুপ্রসিদ্ধ দানবীর স্বর্গত শ্যামাচরণ বল্লভ মহাশয়ের পুত্র হরেন্দ্রনাথ বল্লভ (৭০) গত ১ই আষাঢ় ১৩৬৫ কলিকাতায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন। হরেন্দ্রনাথ তাঁহার পারিবারিক এই ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন, ধনী দরিদ্র নির্ব্বিশেষে তিনি সকলের প্রীতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

অত্যন্ত কোমলচিত্ত, পরদুঃখকাতর হরেন্দ্রনাথের নিকট হইতে কোন প্রার্থীই রিক্তহস্তে ফিরিত না। এইরূপ গোপনদান তাঁহার অজস্র, তিনি নিজে খুব অধ্যয়নশীল ছিলেন, সাধারণের মধ্যে জ্ঞানানুশীলনের প্রসারার্থে তিনি তাঁহার পিতার নামে এই উৎকৃষ্ট মূল্যবান গ্রন্থাগার স্থাপন করিয়াছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি তাঁহার সহধর্ম্মিণী, চার পুত্র ও দুই কন্তা রাখিয়া গিয়াছেন।

সম্পাদক—শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

কলিকাতা, ১৬৬নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "বসুমতী রোটারী মেসিনে" শ্রীতারকনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সাহিত্যে মরুভূমি
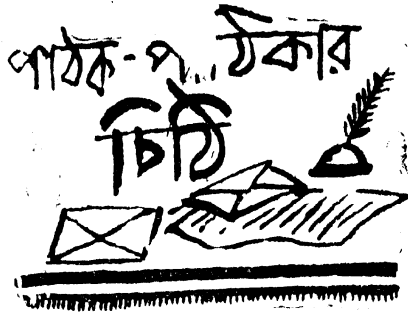
গত সংখ্যার মাসিক বসুমতীতে (পৃঃ ১১৩) উপরোক্ত প্রবন্ধে লেখক শ্রীসুনীলকুমার নাগ বলছেন, "সাহারার গর্ভে খনিজ দ্রব্যের কোন সন্ধান অদ্যাবধি পাওয়া যায় নি।···বছরের পর বছর ধরে পরীক্ষাকার্য্য চালাবার পর বিশেষজ্ঞগণের ধারণা যে, সাহারার তলদেশ থেকে মানুষের প্রয়োজনে লাগাবার মত কোন লাভেরই ক্ষীণতম সম্ভাবনা নেই। সাহারা সত্যই সাহারা।"

লেখক মহাশয়ের এরূপ বিবৃতি ভ্রমাত্মক, কারণ ফরাসীগণ চেষ্টা ও বহু অর্থব্যয়ের ফলে সাহারায় খনিজ তৈলের সন্ধান পেয়েছেন। এমন কি আলজিরিয়াতে পেট্রলের পাইপলাইন বসানো হয়ে গেছে এবং বহু বাধাবিপত্তি (রাজনৈতিক) সত্ত্বেও কাজ এগুচ্ছে। আলজিরিয়ার অন্তর্গত Hassi Messaoud, Tirechoumine প্রভৃতি সাহারা মরুপ্রদেশে যা পেট্রল পাওয়া যাবে তার প্রাক্কলন (estimate) বিশেষজ্ঞদের মতে বছরে প্রায় এক কোটি গ্যালন। আলজিরিয়ার পেট্রল থেকে তাঁদের চাহিদার এক-তৃতীয়াংশ মিটবে, ফরাসীগণ এরূপ আশা করেন।

[দ্রষ্টব্য—Sand In My Eyes by Jinx Rodger, The National Geographic Magazine, May, 1958.]—শ্রীমানসপ্রসূন চট্টোপাধ্যায়।

"বিদেশী কুকুরপ্রীতি কেন"

গত কয়েক মাসের মাসিক বসুমতীতে পাঠক-পাঠিকাদের চিঠিতে "বিদেশী কুকুরপ্রীতি কেন", এই শিরোনামায় আলোচনা চলছে। মাসিক বসুমতীর পাঠিকা হিসাবে আমিও এই বিষয়ে কয়েকটা কথা বলতে চাই।

গত জ্যৈষ্ঠ মাসের মাসিক বসুমতীতে শ্রীঅনিতা হাজরা বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী ম্যাকমিলানের এক উক্তি উদ্ধৃতি ক'রে ভারতের কমনওয়েলথে থাকার যৌক্তিকতা প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন। কমনওয়েলথ যদি Commonwealth of States হতো তাহলে আমাদের আপত্তির কোন কারণ থাকত না। কিন্তু এই কমনওয়েলথ হচ্ছে British Commonwealth. এ ছাড়া কমনওয়েলথের উদ্বোধনী ভাষণে ইংলণ্ডের রাণী এলিজাবেথ বৃটিশ কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত দেশের অধিবাসীদের "My subject" বলে সম্বোধন করেছেন। এই কথাগুলি যে কোনও স্বাধীন দেশের পক্ষে অসম্মানজনক।

দ্বিতীয়তঃ কমনওয়েলথের সভ্য পাকিস্থান প্রতি বৃটেনের পক্ষপাতিত্ব। ভারত, পাকিস্থান উভয়েই কমনওয়েলথের সভ্য। কিন্তু স্বস্তি-পরিষদে কাশ্মীর-সমস্যা আলোচনার সময় বৃটন যে ভাবে প্রকৃত সত্য ঘটনাকে উপেক্ষা করে পাকিস্থানকে অন্ধভাবে সমর্থন করছে, তা কি সমর্থন করতে পারা যায়? এর পরও কি ভারত কমনওয়েলথে থাকতে পারে?

তৃতীয়তঃ, ভারত আজ স্বাধীন। ভারত আজ যে কোনও দেশের সঙ্গে অবাধ বাণিজ্য চালাতে পারে। কিছুদিন আগে ভারতের চেকোশ্লোভাকিয়া থেকে অস্ত্রশস্ত্র কেনা নিয়ে বৃটেনে যে আন্দোলন উপস্থিত হয়েছিল তা যে কোনও স্বাধীন দেশের পক্ষে অপমানজনক। দক্ষিণ-আফ্রিকায় কৃষ্ণাঙ্গদের উপর অত্যাচার, পাকিস্থানে হিন্দুদের উপর অত্যাচার, এর প্রতিবাদ বৃটেন কখনও ক'রেছে কি? অথচ পাকিস্থান ও দক্ষিণ-আফ্রিকা বৃটিশ কমনওয়েলথের সদস্য। এর পরও যদি ভারত বৃটিশ কমনওয়েলথ ত্যাগ না করে তবে তাকে বিদেশী কুকুরপ্রীতির নিদর্শন বলা চলে না কি?

"বিদেশী কুকুরপ্রীতি" এই শব্দগুলিতে আপত্তির কিছুই নেই। শালীনতায় বাধা উচিত ব'লে মনেও হয় না। এ কথা ভুললে চলবে না যে পরাধীনতার যুগে এই বৃটিশরাই হোটেলে "Dogs and Indians are not allowed." লিখতে সাহস করেছিল।

আমাদের বিদেশী প্রীতির চেয়ে বৃটিশ-প্রীতিটাই বেশী। উদাহরণ হিসাবে বলতে পারি যে, কিছুদিন আগে বৃটেন থেকে Indian Air Force এর জন্ম কতকগুলো Bomber কেনা হয়। যে দামে সেগুলো কেনা হয়েছিল তার চেয়ে অনেক কম দামে রাশিয়া থেকে সেই qualityর প্লেন কেনা যেত। রাশিয়া এই জাতীয় Bomber বিক্রি করতে প্রস্তুতও ছিল। শুধু এক্ষেত্রে নয়, ব্যবসা-বাণিজ্যের অনেক ক্ষেত্রে ভারত বৃটেন থেকে অযথা চড়া দাম দিয়ে জিনিষ কিনছে। অথচ সেই জিনিষগুলো ইউরোপের অন্য দেশে অনেক কম দামে পাওয়া যেত। একে কি আমরা বৃটিশপ্রীতির নিদর্শন বলতে পারি না?—শ্রীমতী শুক্লা সেনগুপ্তা। কলিকাতা—২৬।

অদ্য ও প্রত্যহ

আমি মাসিক বসুমতীর গ্রাহক না হলেও বিগত ছ'বছর ধরে মাসিক বসুমতী কিনে আসছি। ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে প্রায়ই কলকাতা যেতে হয়, সেজন্য হাতেই পত্রিকা নিই। অপ্রিয় সত্যবাদী নীলকণ্ঠ রচিত 'চিত্রবিচিত্র' নামায়ন মাসিক বসুমতীতে

পূর্ব্বে প্রকাশিত হয়েছে। বর্ত্তমানে অস্ত ও প্রত্যহ মাসিক বসুমতী'তে ক্রমশ প্রকাশিত হচ্ছে।

'চিত্র বিচিত্র'তে তিনি যেরূপ বিচিত্র ভাবে মধ্যবিত্তদের জীবনধারা প্রকাশ করেছেন সেরূপ ইতিপূর্ব্বে কোন লেখক পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পাঠকদের সামনে তুলে ধরতে পারেননি। বর্ত্তমানে 'অস্ত ও প্রত্যহ'তে অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় দিচ্ছেন এক নূতন জগতের দ্বারোদ্‌ঘাটন করে। আশা করি, মোহগ্রস্ত তরুণদের মোহ ভেঙ্গে যাবে তাঁর এই বিচিত্র জগতের ও বিচিত্র চরিত্রের কাহিনী পড়ে। অবশ্য কর্ত্তব্য সিনেমামোহগ্রস্ত তরুণদের অনুরোধ করি, তাঁরা যেন নিয়মিত 'অস্ত ও প্রত্যহ' পড়ে নিজের ভুল ভাঙ্গেন। এমন বহু তরুণদের জানি, যাঁরা বহ্নিপতঙ্গের ন্যায় কাগজের বিজ্ঞাপন পড়ে রাতারাতি অশোক রাজকাপুর হবার আশায় স্কুল কলেজের পড়ায় ইতি করে বাপ-মায়ের ক্যাশবাক্স ভেঙ্গে বোম্বাই পাড়ি দিয়ে অবশেষে যথাসর্ব্বস্ব হারিয়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এসেছে। ফলে বাপ-মায়ের তিরস্কার, ও বন্ধু-বান্ধবদের টিটকারীর জ্বালায় কেউ হয়েছে নিরুদ্দেশ কেউ বা করেছে আত্মহত্যা। বোম্বাই কেন? এই কলকাতার বুকেও কিছুদিন পূর্ব্বে অমুক প্রোডাকসন্স তমুক প্রোডাকসন্স নাম নিয়ে কলকাতার অলিতে গলিতে কয়েকটি কোম্পানী গজিয়ে উঠেছিল। এদের আসল উদ্দেশ্য ছিল শেয়ার বিক্রী করে টাকা রোজগার করা। এদের ফাঁদে মফঃস্বলবাসীরা ত পা দিয়েই ছিল, এমন কি খাস কলকাতার বহু তরুণ-তরুণী পতঙ্গের মত ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। এই ভুয়ো কোম্পানীগুলির আকর্ষণ করার উপাদান হিসাবে কয়েকটি মাইনে করা তরুণী ব্যবহৃত হত। ফলে যুবকরা ঠিক টোপ গিলত এবং ডাঙ্গায় উঠত। এমন কি, মহরৎ উৎসব থেকে দু'একটা আউট ডোর বা ইনডোর স্যুটিং পর্য্যন্ত হত এবং নামকরা দু'-একজন অভিনেতা-অভিনেত্রী উক্ত ভুয়ো কোম্পানীগুলোতে যাতায়াত করতো, ফলে কোম্পানীর প্রতি কারো কোন সন্দেহই থাকতো না। তার পর কোম্পানী এক দিন সুযোগ বুঝে সময়মত সরে পড়তো। সব শেষে অফিসের দরজায় বাড়ীওয়ালার বিজ্ঞাপন থাকতো 'To Let'। এই ত এদের ইতিহাস! এই ভাবে কত তরুণ-তরুণীদের জীবন নষ্ট হয়েছে, কত তরুণ-মন ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে গেছে, কেই বা তার হিসেব রাখে? যারা এক দিন সুযোগ পেলে অশোক-মধুবালা বা সুচিত্রা-উত্তম হতে পারতো কিন্তু উপযুক্ত সুযোগের অভাবে তাদের তরুণ শিল্পি-মন অঙ্কুরেই বিনষ্ট হ'ল। ঠিক উপযুক্ত সময়ে নীলকণ্ঠ মহাশয় বিচিত্র জগতের বিচিত্র কাহিনী পরিবেশন করে সমাজের বহু উপকার করছেন, সেজন্য অন্তর থেকে কৃতজ্ঞতা জানাই 'অস্ত ও প্রত্যহ' লেখক শ্রদ্ধেয় নীলকণ্ঠ মহাশয়কে। —শ্রীপার্ব্বতীশঙ্কর রায়।

চিল্কীগড়, মেদিনীপুর।

গ্রাহক-গ্রাহিকা হইতে চাই

বৈশাখ হইতে আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত ১৩৬৫ সালের মাসিক বসুমতীর চাঁদা ৭৷৷৹ পাঠাইলাম। পত্রিকা পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। অঞ্জলি মজুমদার। Berhampore, Ganjam.

[illegible]ding herewith Rs. 7·50 for 6 months [illegible]ly Basumati)—Reba Samadder—Alipurduar, Jalpaiguri,

আমার প্রিয় 'বসুমতী'র (মাসিক) জন্য আপাততঃ পাঁচ টাকা চাঁদা পাঠাইলাম। বৈশাখ সংখ্যা হইতে অনুগ্রহ করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় পাঠাইবেন। মায়া দেবী। Garganda, Dooars.

I am remitting herewith the sum of Rs 15/- only towards annual subscription for Masik Basumati. Kindly acknowledge and send me from Baisakh.—Joya Mitter, Bhopalpura, Udaipur.

মাসিক বসুমতীর বার্ষিক চাঁদা ১৫৲ টাকা পাঠাইলাম—গীতা বসু। Tezpur, Assam.

The subscription for Monthly Basumati for 1st six months is sent herewith in advance. It will be appreciated if the magazine is send to me in due time—Usha Mookherjee—Alambagh Lucknow.

Sending M. O. of Rs. 18/- as yearly subscription for M. Basumati—Mrs. P. Hazra, B. A.—Soami Bagh, Agra.

মাসিক বসুমতীর গ্রাহিকা হতে চাই। ছয় মাসের অগ্রিম চাঁদা পাঠালাম। এ বছরের আরম্ভ থেকে সব সংখ্যাগুলো দয়া কোরে পাঠাবেন। Bina Dutta, M. A—Sambalpur.

Sending herewith Rs. 7·50 only being advance for the month of Jaistha to Kartick 1365,—Mrs. Bani Bhattacharya, Kodarma.

আষাঢ় মাস হইতে আমি মাসিক বসুমতীর নিয়মিত গ্রাহিকা হইতে চাই। এই সঙ্গে ১৫৲ টাকা পাঠাইলাম—Aloka Sadhu Khan—Masjid Bari Street, Calcutta.

Please enroll me as a subscriber of Masik Basumati from Baisakh Sankhya and start sending copies immediately—P. C. Banerjee—New Delhi.

মাসিক বসুমতীর বার্ষিক চাঁদা পাঠাইলাম। আগামী সংখ্যা হইতে আমাকে গ্রাহক করিয়া লইবেন। Biren Barma—Garo Hill, Assam.

বৈশাখ '৬৫ হইতে আশ্বিন '৬৫র মাসিক বসুমতীর চাঁদা বাবদ ৭৷৷৹ টাকা পাঠাইলাম। Manju Bose—Mandharpur, Singhbhum.

(তেলরঙ)

নৌকাডুবি

—বি, বি, পাল চৌধুরী

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত
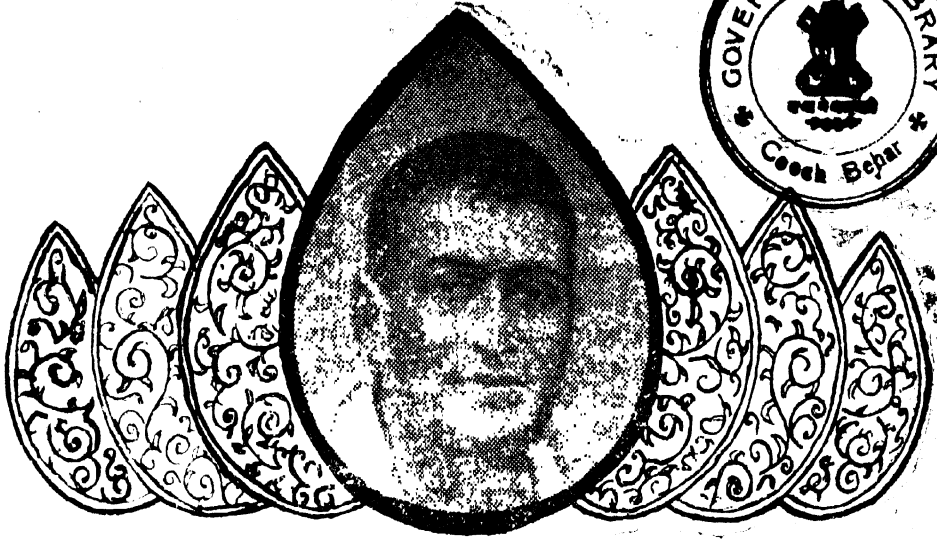
মাসিক বসুমতী

৩৭শ বর্ষ—শ্রাবণ, ১৩৬৫] ॥ স্থাপিত ১৩২৯ ॥ [প্রথম খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা

কথামৃত

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। এ হাড় মাসের খাঁচাটার উপর মনকে সচ্চিদানন্দ হ'তে ফিরিয়ে কিছুতেই আনতে পারলুম না! সর্ব্বদা শরীরটাকে তুচ্ছ, হেয় জ্ঞান ক'রে যে মনটা জগদম্বার পাদপদ্মে চিরকালের জন্য দিয়েছি, সেটাকে এখন তাঁ থেকে ফিরিয়ে শরীরটাতে আনতে পারি কি রে?

দেখি কি—যেন, গাছপালা, মানুষ, গরু, ঘাস, জল সব ভিন্ন ভিন্ন রকমের খোলগুলো! বালিসের খোল যেমন হয়, দেখিস নি? —কোনোটা খেরোর, কোনোটা ছিটের, কোনোটা বা অন্য কাপড়ের, কোনোটা চারকোণা, কোনোটা গোল—সেই রকম। আর, বালিসের ঐ সব রকম খোলের ভিতরেই যেমন একই জিনিস —তূলা ভরা থাকে—সেই রকম, ঐ মানুষ, গোরু, ঘাস, জল, পাহাড় পর্ব্বত সব রকম খোলগুলোর ভিতর সেই এক অখণ্ড সচ্চিদানন্দ রয়েছে! ঠিক ঠিক দেখতে পাই রে, মা যেন নানা রকমের চাদর মুড়ি দিয়ে নানা রকম সেজে ভিতর থেকে উঁকি মারচেন! একটা অবস্থা হয়েছিল, যখন সদা সর্ব্বক্ষণ ঐ রকম দেখতুম। ঐরকম অবস্থা দেখে বুঝতে না পেরে সকলে বোঝাতে, শান্ত করতে এল; রামলালের মা-টা সব কত কি ব'লে কাঁদতে লাগলো; তাদের দিকে চেয়ে দেখছি কি—যে, (কালীমন্দির দেখাইয়া) ঐ মা-ই নানা রকমে সেজে এসে ঐ রকম করচে! ঢং দেখে হেসে গড়াগড়ি দিতে লাগলুম আর বলতে লাগলুম, 'বেশ সেজেচে!' একদিন কালীঘরে আসনে ব'সে মাকে চিন্তা করচি; কিছুতেই মার মূর্ত্তি মনে আনতে পারলুম না। পরে দেখি কি—রমণী ব'লে একটা বেশ্যা ঘাটে চান করতে আসত, তার মত হয়ে পূজার ঘটের পাশ থেকে উঁকি মারচে! দেখে হাসি আর বলি—'ও মা, আজ তোর রমণী হ'তে ইচ্ছে হয়েছে—তা বেশ, ঐরূপেই আজ পুজো নে!' ঐ রকম ক'রে বুঝিয়ে দিলে—'বেশ্যাও আমি—আমা ছাড়া কিছু নেই!' আর এক দিন গাড়ী ক'রে মেছোবাজারের রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে দেখি কি—সেজে, গুজে, খোঁপা বেঁধে, টিপ প'রে বারাণ্ডায় দাঁড়িয়ে বাঁধা হুঁকোয় তামাক খাচ্চে, আর মোহিনী হ'য়ে লোকের মন ভুলাচ্চে! দেখে অবাক্ হ'য়ে বললুম—'মা! তুই এখানে এই ভাবে রয়েছিস?'—ব'লে প্রণাম করলুম।

পলাশীর যুদ্ধ ও তদানীন্তন বাংলার বিদগ্ধ সমাজ

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন শাস্ত্রি-তর্কতীর্থ

উনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মনীষী বঙ্কিমচন্দ্র 'পলাশীর যুদ্ধের' পাণ্ডুলিপি পাঠ করিয়া নবীনচন্দ্রকে লিখিয়াছিলেন, যে, 'পলাশীর যুদ্ধ বঙ্গ সাহিত্যের সর্ব্বপ্রধান কাব্য মেঘনাদবধের সমকক্ষ না হইলেও তাহার পরবর্ত্তী স্থান পাইবার যোগ্য।'

পলাশীর যুদ্ধের প্রথম বীজ অঙ্কুরিত হয় ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দেরও আগে। যশোহরেই নবীনচন্দ্রের প্রথম কর্ম্মজীবনের (ডেপুটি) সূত্রপাত। মধুর ব্যবহারে তিনি অল্প সময়ের মধ্যেই সেখানকার জনসাধারণের বিশেষ প্রিয়পাত্ররূপে পরিগণিত হন। তাঁহার স্বভাবস্বারল্যে সবাই মুগ্ধ হইত। নবীনচন্দ্র কখনো অলস জীবন যাপন করিতে পারিতেন না, নিয়ত কর্ম্মব্যস্ততাই ছিল তাঁর প্রকৃতি। সৃষ্টিপ্রেরণা যাঁহাতে বিদ্যমান তাঁহার কর্ম্মহীন হইয়া বসিয়া থাকিবার উপায় নাই। নবীনচন্দ্রেরও সৃষ্টিকুশলী মন বসিয়া রহিবে কিরূপে? সমগ্র দিন কর্ম্মময় জীবন যাপন করিয়া সান্ধ্য বিনোদনের জন্য তাঁহাদের কয়েক জন বন্ধু মিলিয়া সাধারণ সমিতি নামে একটি সভাগৃহ স্থাপন করেন। সাহিত্য-সমিতি ছিল তাহার শাখা। তাহার সদস্য ছিলেন নবীনচন্দ্র নিজে, যশোহর স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক জগবন্ধু ভদ্র ও উকিল মাধবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। এই সমিতির এক বিশেষ অধিবেশনে স্থির হয় যে, তাঁহারা তিন জনে তিনখানি গ্রন্থ রচনা করিবেন। নবীনচন্দ্র পলাশীর যুদ্ধ রচনার ভার নিলেন। শৈশবকালেই কবি স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখিতেন। কৈশোরে তাহা গাঢ়তর হয়, বিশেষতঃ কবিধাত্রী চট্টলার কোমল-কঠিন নিসর্গশোভা কবিমনে সৌন্দর্য্যতৃষ্ণার সাথে সাথেই দেশমাতৃকার-বন্ধন মুক্তির বিশেষ আকাঙ্ক্ষা জাগায়। তারপর 'কলেজে অধ্যয়ন সময়ে রামপুর বোয়ালিয়া যাইবার পথে পলাশীর যুদ্ধের ও যুদ্ধক্ষেত্রের যে গল্প শুনিয়াছিলাম তাহা আমার সর্ব্বদা মনে পড়িত এবং যুদ্ধক্ষেত্র সর্ব্বদা আমার নয়ন সমক্ষে ভাসিত।'

নবীনচন্দ্রের কথায় ও কাজে খুব বেশী ব্যবধান থাকিত না। তিনি মনে যাহা ভাবিতেন, যে রস নিবিড় ভাবে অনুভব করিতেন তাহা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ভাষায় দানা বাঁধিয়া উঠিত। তাহা সম্পূর্ণ রূপ লাভ না করা পর্য্যন্ত তিনি শান্তিলাভ করিতে পারিতেন না। প্রকাশের বিলম্বে তিনি মুহ্যমান হইতেন। আবেগময়ী তাহার রচনাশৈলী স্বতঃস্ফূর্ত্ত ঝরণাধারার মত বহিয়া চলিত, কোনো বাধা মানিত না। রাখিয়া ঢাকিয়া বলিবার বা সাজাইয়া গুছাইয়া প্রকাশ করিবার মত ধৈর্য্যও তাঁহার ছিল না। মুক্ত কল্পনার আলোকরেখাই কবিকে পথ দেখাইয়া দিত। কল্পনার অনুপ্রেরণাতেই প্রথম পলাশীর যুদ্ধ শীর্ষক একটি দীর্ঘ কবিতা রচনা করেন। তাহার আরম্ভ নিম্নরূপ—

'পোহাইল বিভাবরী পলাশী-প্রাঙ্গণে,
পোহাইল ভারতের সুখের রজনী
চিত্রিয়া ভারত ভাগ্য আরক্ত বিমানে
উঠিলেন দুঃখভরে বীরে দিনমণি।
শান্তোজ্জ্বল কররাশি চুম্বিয়া অবনী
প্রবেশিল আম্রবনে, প্রতিবিম্ব তার
শ্বেতমুখ শতদলে ভাসিল অমনি;
ক্লাইভের মনে হল স্ফুর্ত্তির সঞ্চার,
সিরাজ স্বপ্নান্তে করি রবি দরশন
ভাবিল এ বিধাতার রক্তিম নয়ন।'

ইহার কিছুকাল পর কবি তিন মাসের ছুটি গ্রহণ করেন। উপর্য্যুক্ত কবিতাটি আরো বড় করিয়া লিখিবার জন্য এক বিশিষ্ট অন্তরঙ্গ বন্ধু তাঁহাকে অনুরোধ করেন। এই অবকাশে বন্ধুর অনুরোধ রক্ষা করিতে যাইয়া তিনি 'পলাশীর যুদ্ধ' রচনা সম্পূর্ণ করেন। রচনাকাল ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দ। দুই বৎসর ছাপাখানার কবলে থাকিবার পর ১৮৭৫ সালে পলাশীর যুদ্ধ প্রকাশিত হয়। ইহা কবির প্রকাশিত দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ। ইহার পূর্ব্বে প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার নিজ প্রেস হইতে কবির প্রথম কাব্য গ্রন্থ অবকাশরঞ্জিনী প্রকাশ করেন।

পলাশীর যুদ্ধ প্রকাশিত হইবার পর সমগ্র বাঙ্গলা দেশে গ্রন্থের স্বপক্ষে-বিপক্ষে তুমুল আন্দোলন গড়িয়া উঠে। তদানীন্তন বাঙ্গলা সাহিত্যে দেশাত্মবোধক রচনার খুবই অভাব ছিল। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ নবীনচন্দ্র তখন এডুকেশন গেজেটে স্বদেশপ্রেম-ব্যঞ্জক অনেক কবিতা লিখেন, মনীষী ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের উক্ত পত্রিকা ব্যতীত অন্য কোন মাসিক বা সাপ্তাহিক পত্রিকা তখন ছিল না। প্রকাশিত কবিতা কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম,—

'ভারতের ইতিহাস শোকের সাগর
কেন পড়িলাম হায় কেন পাইলাম
আপনার পরিচয়
আর্য্যবংশ কীর্ত্তিচয়
কেন দেখিলাম হায় কেন জানিলাম
স্বাধীন বংশেতে মোরা অধম পামর।'

এই স্বদেশপ্রেমই ঘনীভূত আকারে পলাশীর যুদ্ধে পরিদৃষ্ট হয়। তদানীন্তন টেকস্ট বুক কমিটির একজন বিশিষ্ট কর্ণধার নবীনচন্দ্রের এই স্বদেশপ্রেমকে যে ভাবে দেখিয়াছিলেন তাহা পরম কৌতুকাবহ,—

'আমি তোমার পলাশীর যুদ্ধ বুঝিতে পারি না। পলাশীর যুদ্ধে মুসলমান বাঙ্গলা হারাইল। হিন্দুর তাহাতে উচ্ছ্বাস কিসের ও কেন? মোহনলালই বা দুঃখ করে কেন? মুসলমানের চাকর বলিয়া? তুমি হিন্দু, সেটা কি তোমার গায়ে সয়? আর মোহনলালের মুখে ওরূপ আক্ষেপোক্তি দিয়া তুমি কি বৃটিশ গভর্ণমেন্টের প্রতি disloyalty দেখাও নাই? পলাশীর যুদ্ধ সম্বন্ধে হিন্দুর মনে ভাবের তরঙ্গ উঠে কেন বুঝিতে পারি না। জন কতক হিন্দু বাঙ্গলাটা ইংরাজকে ধরাইয়া দিয়াছিল বলিয়া কি? যদি তাহাই হয়, তুমি কি সত্য সত্যই বিশ্বাস কর যে পলাশীতে ইংরাজ হারিলে বাংলায় বা ভারতে হিন্দুরাজ স্থাপিত হইত? যদি

সেই বিশ্বাসেই পলাশীর যুদ্ধ লিখিয়া থাক, তাহা হইলে অভিপ্রায়টা যে একেবারেই ফুটাইতে পার নাই ইহা বলিতে হইতেছে।'

পলাশীর যুদ্ধ প্রকাশিত হইবার অল্পকাল পরেই তখনকার ইন্‌স্পেক্টর মিঃ মার্টিন পূর্ব্ববঙ্গের ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার পাঠ্যগ্রন্থরূপে উহা নির্ব্বাচিত করেন। পর পর দুই বৎসর পলাশীর যুদ্ধ পাঠ্যতালিকাভুক্ত ছিল। তারপর স্কুলকমিটী পলাশীর যুদ্ধকে ক্লাসিক গ্রন্থরূপে ও তাহাতে রাজনৈতিক ইঙ্গিতের আবিষ্কার করিয়া পাঠ্যতালিকা হইতে সরাইয়া দেন। নবীনচন্দ্র কমিটীর বিরুদ্ধে লেখালেখি করেন। অবশেষে কমিটীর সব কুকীর্ত্তি বাহির হইয়া পড়ে। সমস্ত কলিকাতায় আন্দোলন জাগে। স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়দ্বয় নবীনচন্দ্রের পক্ষ সমর্থন করেন। পরে পলাশীর যুদ্ধের (পরিবর্ত্তিত আকারে) স্কুল সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এই আন্দোলনের ফলে টেক্‌স্‌ট বুক কমিটী উঠিয়া যায়। ডিরেক্টরের হস্তে সমস্ত ক্ষমতা অর্পিত হয়। একটিমাত্র গ্রন্থকে অবলম্বন করিয়া সমগ্র দেশে এরূপ আন্দোলন আর কোনো গ্রন্থের ভাগ্যে ঘটিয়াছে কি না জানি না।

তদানীন্তন কুমিল্লার সিভিল সার্জ্জন ফ্রেঞ্চ মলেন, 'পলাশীর যুদ্ধের কবিত্ব-প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়া উহার ইংরাজী অনুবাদ করেন, তিনি পলাশীর যুদ্ধের কবিকে রাজকবির সম্মানদানের পক্ষপাতী ছিলেন। যে গ্রন্থ উত্তরকালে কবিকে রাজদ্রোহে অভিযুক্ত করে, সেই গ্রন্থই মার্টিন সাহেব ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত করেন। সিভিল সার্জ্জন মলেন সাহেব কাব্যের উচ্চ কবিত্বে মুগ্ধ হইয়া তাহার ইংরেজী অনুবাদ করেন। আবার উচ্চপদস্থ সরকারী বাঙ্গালী কর্ম্মচারী এই কাব্যের ভিতর কোন শক্তি বা সদ্‌গুণের লেশমাত্রও দেখিতে পান না, কেবল রাজানুগত্যের অভাবটাই তিনি বিশেষ ভাবে প্রকটিত দেখেন। একটিমাত্র কাব্যগ্রন্থকে কেন্দ্র করিয়া এত বিচিত্র দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পরম বিস্ময়কর নিঃসন্দেহ।'

মনস্বী রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় তাহার গ্রন্থে পলাশীর যুদ্ধ সম্বন্ধে নিম্নরূপ লিখিয়াছেন—'His first great work Palasir Juddha, came like a surprise and joy to his countrymen and pleased the reading public by its freshness and vigor and its voluptuous sweetness.'

বান্ধবে সমালোচক কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় পলাশীর যুদ্ধের বিশেষ সুখ্যাতি করিয়া এক প্রবন্ধ লিখেন। গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি পাঠ করিয়া বঙ্কিম বাবু যে অভিমত জানান, গ্রন্থ প্রকাশের পর যখন ইহাকে কেন্দ্র করিয়া বিচিত্র সমালোচনা সুরু হয় তখন তাঁহার মতের পরিবর্ত্তন ঘটে। নবীন বাবুকে তিনি পত্রে জানান,—'It is unfortunate, Hem should have made his debut before you.' তোমার মন্দভাগ্য যে, হেম তোমার পূর্ব্বে আসরে নামিয়াছেন। অবশ্য পরে তিনি বঙ্গদর্শনে 'পলাশীর যুদ্ধের' এক সমালোচনা করিয়া নবীনচন্দ্রকে 'বাঙ্গালার বায়রণ' বলিয়া অভিহিত করেন। 'কুরুক্ষেত্র' প্রকাশিত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত নবীনচন্দ্র এই নামেই বাঙ্গলার সাহিত্যিক সমাজে পরিচিত ছিলেন। খ্যাতনামা কবি ও নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় পলাশীর যুদ্ধকে নাট্যরূপ দেন ও স্বয়ং ক্লাইভের অভিনয় করিয়া প্রশংসা অর্জ্জন করেন।

উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বাঙলা কাব্যের সাধারণ বিষয়বস্তু ছিল দেবস্তুতি ও দেবগণের চরিত্র অবলম্বনে হাস্য-করুণাদি রসের অবতারণা। মধুসূদন 'মেঘনাদবধে' দেবতার ঊর্দ্ধে মনুষ্যত্বকে স্থান দিয়াছেন। নবীনচন্দ্রও পূর্ব্বরীতির অনুসরণ না করিয়া নূতন ভাবেই কাব্য রচনা করিলেন।

বায়রণের সহিত নবীনচন্দ্রের কেবল একটি বিষয়ে সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। বায়রণের মত নবীনচন্দ্রের ভাবাও গৈরিক নিঃস্রাবের মত স্বতঃজ্বালাময়ী, তীব্র আবেগে ভরপুর। মন্ত্রমুগ্ধের মত পাঠককে আবিষ্ট করিয়া রাখে। লেখকের যেমন অন্য ভাবনা নাই পাঠকের মনেও তেমনি অন্য চিন্তার অবকাশ থাকে না। এই কাব্য রচনায় কবি স্বদেশপ্রেমে অনুবিদ্ধ হৃদয় ও উন্মুক্ত কল্পনাকে অবলম্বন করিয়া ভারত-ইতিহাসের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। প্রথম বয়সের এই রচনাতেই তিনি যে অপূর্ব্ব কবিত্বশক্তির পরিচয় দিয়াছেন তাহা কোনো কালের সাহিত্যে সুলভ নহে। তাঁহার কল্পনাকুশল ভাবদৃষ্টি অনন্যসাধারণ। নিদর্শনস্বরূপ প্রথম সর্গের প্রকৃতি বর্ণনার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি—

> 'ভয়ানক অন্ধকারে ব্যাপ্ত দিগন্তর
> তিমিরে অনন্তকায় শূন্য ধরাতল
> বিনাশিয়া যেন এই বিশ্ব চরাচর
> অবিবাদে অন্ধকারে বিরাজে কেবল।'

পরাধীনতার দুঃসহ গ্লানিভারে অবনমিত কবি-আত্মার করুণ আর্ত্তনাদও বিশেষ ভাবে স্মরণীয়—

> 'সাধে কি বাঙ্গালী মোরা চির-পরাধীন
> সাধে কি বিদেশী আসি দলি' পদভরে
> কেড়ে নেয় সিংহাসন, করে প্রতিদিন
> অপমান শত শত চক্ষের উপরে?
> স্বর্গমর্ত্ত্য করে যদি স্থান বিনিময়
> তথাপি বাঙ্গালী নাহি হবে একমত।
> প্রতিজ্ঞায় কল্পতরু সাহসে দুর্জ্জয়
> কার্য্যকালে খোঁজে সব নিজ নিজ পথ।'

পলাশীর যুদ্ধে কবির বিষণ্ণ অন্তরের অশ্রু-বিমথিত বাংলার শতবর্ষের ইতিহাস অনন্যসাধারণ কল্পনালোকে ধরা পড়িয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পাশ্চাত্যের আচমকা আলো আসিয়া তদানীন্তন বাঙ্গালী সমাজে যে দিগ্‌ভ্রান্তি জন্মাইয়াছিল এবং তাহার মোহাবরণ ভেদ করিয়া যে কয় জন মনস্বী বাঙ্গালী, আত্মরক্ষা সমাজ রক্ষা তথা সাহিত্যরক্ষার জন্য তৎপর হইয়াছিলেন, নবীনচন্দ্র তাঁহাদের অন্যতম। অধীনতার অভিশাপ হইতে জাতিকে মুক্ত করিতে না পারিলে তাহার কোন দেশনাই সত্য ও সার্থক হইতে পারে না। জাতির সমস্ত শক্তিই যে ঐ একটা অনর্থকে কেন্দ্র করিয়া বৃথা অপচিত হইতে পারে, তাহা নবীনচন্দ্র আপন মর্ম্মলোকে বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। জীবনের পরিপূর্ণ আবেগে, প্রাণবন্ত জাতীয় জীবনে স্বজাতিপ্রেম উদ্দীপিত করাকেই তিনি

সর্ব্বপ্রধান কবিধর্ম্ম ও কবিকর্ম্ম বলিয়া বাছিয়া লইয়াছিলেন। পরাধীন স্বর্গবাস হইতে স্বাধীন নরকবাসকেই কবি অধিকতর কাম্য বলিয়া মনে করিতেন।

'পরাধীন স্বর্গবাস হতে গরীয়সী
স্বাধীন নরকবাস'

পলাশীর যুদ্ধের মর্ম্মরূপটাই বর্ত্তমান প্রবন্ধে মুখ্যতঃ আলোচনা করিলাম। কাব্যের দোষ-গুণ প্রবন্ধান্তরে আলোচিত হইবে। স্বদেশকে জীবনের অধিক ভালবাসিতে না পারিলে একজন উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীর পক্ষে 'পলাশীর যুদ্ধের' মত কাব্য রচনা কখনো সম্ভব হইতে পারে না। কাব্যে সত্য ভাষণের এমন দুর্জ্জয় সাহস নবীনচন্দ্র ভিন্ন তদানীন্তন অন্য কোন কবির ছিল না বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। জাতীয় চেতনায় স্বাধীনতার সঙ্কল্প ঘোষণাও নবীনচন্দ্রের অন্যতম কবিকর্ম্ম। ইতিহাসকে অবলম্বন করিয়া কাব্য রচনায়ও তিনি পথিকৃৎ। ঘনতমসাচ্ছন্ন ইতিহাসরাজ্যে স্বাধীন কল্পনার দিব্যালোক ভিন্ন কোন তথ্যসংগ্রহও যেথানে সম্ভব ছিল না এবং এই দুঃসাহসও একমাত্র নবীনচন্দ্রের মত স্বাধীনতাকামী স্বভাবকবির পক্ষেই সম্ভব হইয়াছিল।

The faculty of delight
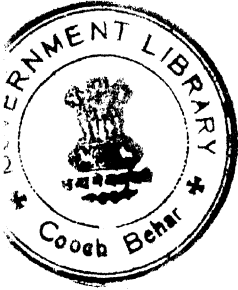
Among the mind's powers is one that comes of itself to many children and artists. It need not be lost, to the end of his days, by any one who has had it. This is the power of taking delight in a thing, or rather in anything, everything, not as a means to some other end, but just because it is what it is, as the lover dotes on what may be the traits of the beloved object. A child in the full health of his mind will put his hand flat on the summer turf, feel it, and give a little shiver of private glee at the elastic firmness of the globe. He is not thinking how well it will do for some game or to feed sheep upon. That would be the way of the wooer whose mind runs on his mistress's money. The child's is sheer affection, the true ecstatic sense of the thing's inherent characteristics. No matter what the things may be, no matter what they are good for or no good for, there they are, each with a thrilling unique look and feel of its own, like a face ; the iron astringently cool under its paint, the painted wood familiarly warmer, the clod crumbling enchantingly down in the hands, with its little dry smell of the sun and hot nettles ; each common thing a personality marked by delicious differences......

The right education, If we could find it, would be to work up this creative faculty of delight into all its branching possibilities of knowledge, wisdom and nobility. Of all three it is the beginning, condition, or raw material.

—*Charles Edward Montague (Disenchantment)*

রবীন্দ্রসাহিত্যে প্রেম

শ্রীবিবেকানন্দ দাশ

এক জন খ্যাতিমান সমালোচক বলেছেন—Love is the solar passion of the race—প্রেম মানবজাতির প্রবলতম প্রবৃত্তি। প্রেমের বিচিত্র গতি। প্রেমের অগ্রগতি হয় না জ্যামিতিক সরল রেখা ধরে। দুর্বার হৃৎবৃত্তি প্রেমের দ্বারা চালিত হলে নেয় অত্যদ্ভুত রূপ। প্রেম ব্যষ্টির জীবনে সৃষ্টি করে বিরাট আলোড়ন। ব্যষ্টি লাভ করতে চায় বাঞ্ছিতকে। সমষ্টি বা সমাজ শত-সহস্র বাধা-নিষেধের শৃংখল নিয়ে এগিয়ে আসে এবং ব্যষ্টির প্রেমের পথে হয় প্রবল প্রতিবন্ধক। তখন মানবচিত্তের গহন-বনে চলে বিপরীতমুখী দ্বৈত-সত্তার দ্বন্দ্ব—ব্যক্তিসত্তা ও সমাজসত্তার নিরন্তর সংঘর্ষ। যেখানে মানুষের সমাজ-চেতনা তার ব্যক্তি-চেতনাকে সবলে দাবিয়ে রাখতে চায়, সেখানেই স্বাভাবিক রূপ নেয় তার বিপরীত চিত্তবৃত্তির দ্বন্দ্ব। চিত্তবৃত্তির বৈপরীত্যই করে তোলে মানব-চরিত্রকে জটিল, সূক্ষ্ম ও গভীর।

বাংলা সাহিত্যে বিভিন্ন চিত্তবৃত্তির দ্বন্দ্বের প্রথম পরিচয় পাই রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি'তে। 'চোখের বালি' বাংলা সাহিত্যের যুগান্তকারী প্রথম মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাস। এখানেই অত্যাধুনিক বাস্তবধর্মী উপন্যাসের সূত্রপাত।

সমাজনীতির দিক থেকে প্রেমকে ভাগ করতে পারি দু' শ্রেণীতে। বৈধ প্রেম ও অবৈধ প্রেম। বিবাহিত নরনারীর প্রেমই সমাজানুমোদিত ও বৈধ। এ প্রেম নির্বাধ। এ হোল প্রেমের প্রাচীন ও সনাতন আদর্শ। তাই এ বহু-প্রশংসিত প্রেমের আদর্শ রামচন্দ্র ও সীতাদেবীর দাম্পত্য-জীবন। প্রেমের এ আদর্শের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সীতা, সাবিত্রী ও দময়ন্তী।

বিবাহিত নর-নারী ছাড়া অন্য নর-নারীর প্রেম সমাজের চোখে কলংকিত, নিষিদ্ধ ও অবৈধ। এ প্রেম অত্যাধুনিক। এ প্রেম হৃৎবৃত্তির দ্বারা চালিত হয়ে চলে প্রবৃত্তির পাল তুলে দুর্বার দুকূল-প্লাবী অন্তর বেগে। এ প্রেম মানে না নিবৃত্তির হাল, বাধা-নিষেধের শৃংখল। এ প্রেম মানে না জাতি-কুল, বংশ-মর্যাদা, কুমারী-বিবাহিতা-বিধবা পাত্রাপাত্রভেদ। এ প্রেম love at first sight, রূপজ, গুণজ, অগণিত রূপ নিতে পারে।

কুমারীর অবৈধ প্রণয়ের চেয়ে বিধবা ও বিবাহিত মহিলার অবৈধ প্রণয় আরো গর্হিত ও নিন্দনীয়। অবৈধ প্রেমের তীব্রতা ও মাদকতা অত্যন্ত বেশি। এ অবৈধ, সমাজ-বিগর্হিত প্রেমের মনস্তত্ত্ব আলোচনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'চোখের বালি' ও 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসে। 'চোখের বালি'তে বিধবা বিনোদিনী ও বিবাহিত মহেন্দ্র পরস্পর প্রেমাসক্ত। 'ঘরে-বাইরে'র বিবাহিতা বিমলা পতির বন্ধু সন্দীপের প্রেমে আকৃষ্ট।

বাংলা-সাহিত্যে সর্বপ্রথম বঙ্কিমচন্দ্র বিধবার প্রেমকে আলোচ্য বিষয় করেন তাঁর 'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসে। রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' ও 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের উপজীব্য বিধবা বিনোদিনী ও বিধবা দামিনীর প্রেম। শরৎচন্দ্র বিধবার নিষিদ্ধ প্রেম নিয়ে লিখেছেন 'বড়দিদি', 'পথনির্দেশ', 'পল্লীসমাজ', 'শ্রীকান্ত' ও 'চরিত্রহীন'।

বাংলা কথাসাহিত্যে দেখি, বিধবার প্রেমাভিযানের ক্রম-বিকাশ। প্রথমে কুন্দনন্দিনীর কুণ্ঠিত, সলজ্জ, প্রেম বিহ্বল মূর্তি ও পরে দেখি ভোগলিপ্সু রোহিণীর কামনাদীপ্ত প্রেম। মায়াবিনী বিনোদিনী প্রতিহিংসা-পরায়ণা, প্রতিহিংসা-সাধনে সে হতে চায় বিজয়িনী। যে বিষবৃক্ষ রোপণ করল মহেন্দ্র অকালে তার সংসারে, সেই অশান্তির কালো মেঘ ঘনিয়ে তুলল তাদের সুখের সংসারে। দামিনী জীবন-রসের রসিক, প্রবৃত্তিপন্থী। শরৎ-সাহিত্যে রমা, রাজলক্ষ্মী ও সাবিত্রীর মধ্যে দেখি, বিধবার অন্য এক মূর্তি। তারা চেয়েছে সঙ্গতি স্থাপন করতে প্রেমাকাঙ্ক্ষা ও ধর্ম-সংস্কারের মধ্যে।

'চোখের বালি'র বিবাহিত মহেন্দ্র ও বিধবা বিনোদিনীর প্রণয়লীলা নিষিদ্ধ ও সমাজ-বিগর্হিত। এ প্রেমের বিচারে নেই কোনো নীতি—কথার বাহুল্য আছে, শুধু প্রেমের ক্রম-বিকাশের সূক্ষ্ম ও পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ। মহেন্দ্রের আপন অন্তর্নিহিত শালীনতা-বোধের দ্বারা এ অবৈধ প্রেম হয়েছে বাধাপ্রাপ্ত। আবার বিহারী ও বিনোদিনীর প্রেমের সনাতন মহিমা ঘোষিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সত্যই বলেছেন—'লেখক প্রেমের প্রতি পুরাতন মনোভাব একেবারে বর্জন না করিয়া নূতন মনোভাবের স্পষ্ট আভাস দিয়াছেন। অবৈধ প্রেমিক-প্রেমিকার অবৈধ প্রণয়লীলার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে আছে লেখকের দরদ ও সহানুভূতি। প্রেমের পুরাতন ও সনাতন আদর্শের শ্রেষ্ঠ রূপকার বঙ্কিমচন্দ্র আর প্রেমের নূতন ও অত্যাধুনিক আদর্শের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ রূপকার দরদী কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র। রবীন্দ্রনাথ নূতন ও পুরাতন প্রেমের সন্ধিস্থল। তাঁর 'চোখের বালি' বেঁধেছে বঙ্কিম ও শরতের যুগকে নিবিড় ঐক্যবন্ধনে—শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীকুমার বাবুর এ উক্তি সার্থক ও সঙ্গত।

'ঘরে-বাইরে'র কুলনারী বিমলা পরপুরুষ সন্দীপের প্রতি আসক্ত। বস্তুতন্ত্রের প্রতীক সন্দীপ স্বাদেশিকতার মুখোস পরে করল ত্যাগনিষ্ঠ নিখিলেশের পত্নী বিমলাকে আকর্ষণ। সে বিমলার কর্ণে দিল স্বাদেশিকতার মধুর মন্ত্র। তাকে বোঝাল যে, সে শক্তির প্রতীক স্বাধীনতা-অভিযানের অগ্রদূত। সন্দীপ তাকে বলে মৌচাকের মক্ষিরাণী। বিমুগ্ধা বিমলা বুঝতে পারল না স্বার্থের স্তুতিবাদ। সন্দীপ গ্রহণের রাহু হয়ে ধরল অমাবস্যার পূর্ণচন্দ্রের রূপ। সন্দীপের প্রবল আকর্ষণ বিমলাকে করল মাতাল, বিমলা হোল 'পতঙ্গবৎ বহ্নিমুখং বিবিক্ষুঃ।' সন্দীপ ও বিমলা হোল অবৈধ প্রণয়ে আসক্ত।

সন্দীপ ভোগসর্বস্ব, ক্ষমতালোভী, নারীদেহলোলুপ। তাই সে ধারণ করে স্বাদেশিকতার গৈরিক। স্বার্থ ছাড়া তার কোনো সম্পর্ক নাই স্বদেশের সংগে। বিমলার প্রতি দেহগত লালসা ছাড়া তার নেই আর কোনো মহত্তর প্রবৃত্তি। স্বাদেশিকতার নাম করে সে বিমলাকে টাকা চুরি করতে প্ররোচিত করেছে এবং অমূল্যের ন্যায় শত শত নিষ্পাপ যুবককে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছে। নিট্‌শের ভক্ত সন্দীপ সগর্বে বলে—'আমি বস্তুতন্ত্র, উলঙ্গ বাস্তব আর ভাবুকতার জেল ভেঙে বেরিয়েছি আলোকের মধ্যে।'

মোহর চুরি ও নিষ্পাপ অমূল্যের প্রাণদানে বিমলার অন্তর্দ্বন্দ্ব হোল তীব্র ও আবেগময়। যেদিন বিমলা জানল যে, সন্দীপ

নারীদেহলোলুপ, অর্থগৃধ্নু, আর তার স্বাদেশিকতা, স্তব-স্তুতি স্বার্থসিদ্ধির পন্থামাত্র, সেদিন সন্দীপের প্রতি বিমুগ্ধা বিমলা হোল বিরূপ ও বিমুখ। সন্দীপের রাজবেশের অন্তরাল থেকে বের হোল খড়মাটি-বাংতার শুষ্ক কংকাল, তার দেশপ্রীতির আবরণ থেকে বের হোল নির্লজ্জ ভোগলোলুপতার বীভৎসতা, এক কুশ্রী ঈর্ষ্যাপরায়ণ, স্বার্থপরায়ণ অতি সাধারণ মানুষ।

কবির বিন্দুমাত্র সহানুভূতি নেই সন্দীপের অবৈধ প্রেমের প্রতি। তাই তিনি সন্দীপকে চিত্রিত করন নি নিখিলেশের যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী করে। কবি সন্দীপকে নিখিলেশের যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী করে আঁকলে বিচার এত সহজ হোত না। এ প্রসঙ্গে শ্রদ্ধাস্পদ ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের উক্তি উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন—'অবৈধ প্রেমকে হীনবর্ণে চিত্রিত করিয়া বৈধপ্রেমের উৎকর্ষ প্রমাণ করা সহজ; মানদণ্ড নিরপেক্ষ ভাবে ধরিলে বিচার এত সহজ হইত না।'

কবির কাছে নিখিলেশের আদর্শ প্রেম সন্দীপের অবৈধ প্রেমের চেয়ে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। বিমলা ও সন্দীপ উভয়ে মিলে যে বিষবৃক্ষ রোপণ করেছে, লেখক সে বিষবৃক্ষে ফল ধরার অবকাশ দেন নি। তাই কুন্দনন্দিনীর মত বিমলাকে করতে হয়নি বিষপান। তার পূর্বেই অবৈধ প্রেমিকা বিমলাকে লেখক করেছেন পূর্ণ সচেতন, বিমলা কাটিয়ে উঠেছে সন্দীপের দুর্নিবার মোহ। লেখক ছেদ-রেখা টেনে দিয়েছেন অবৈধ প্রেমে মগ্ন যুবক-যুবতীর প্রেমে। স্বদেশী নেতা সন্দীপ আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছে 'বন্দে মাতরম্' এর পরিবর্তে 'বন্দে মোহিনীম্' ও 'বন্দে প্রিয়াম্' মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে।

সন্দীপ অবাস্তব চরিত্র; সে নয় স্বদেশী আন্দোলনের সত্যিকার প্রতিনিধি। রাজনৈতিক আন্দোলন সন্দীপের মত চরিত্র সৃষ্টি করে না। সন্দীপ চরিত্র শ্রীঅরবিন্দের বিদ্রূপালেখ্য নয়; আর সন্দীপের মুখ দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ব্যঙ্গ করেন নি গীতায় তথা হিন্দুনারীর সতীত্বের আদর্শকে, ব্যঙ্গ করেছেন ইউরোপীয় জড়বাদ (materialism) ও বস্তুতান্ত্রিকতাকে (realism)।

বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র—কথাশিল্পিত্রয়ী মনে-প্রাণে স্বীকার করেছেন আনুষ্ঠানিক বিবাহের পরম পবিত্রতাকে। কেউ অমান্য করতে চাননি সামাজিক বিধি-নিষেধ। তবে বিধিভঙ্গকারীদের প্রতি সমবেদনা ও দরদ পরবর্তীদের মধ্যে ক্রমবর্দ্ধমান। এদের প্রতি বঙ্কিমের নেই বিন্দুমাত্র সহানুভূতি, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র মানুষকে মানুষরূপে গণ্য করে তাঁকে প্রতিষ্ঠা করতে চান মানুষের পূর্ণ গৌরবে। তাই তাঁরা সমবেদনাপরায়ণ সমাজবিধি অমান্যকারীদের প্রতি।

সাধারণতঃ নিষিদ্ধ প্রেমের উপর নির্বিচারে বর্ষিত হয় নিন্দা-গঞ্জনা, কিন্তু এ কঠোর ধর্মনৈতিমূলক মনোভাবের সংগে রবীন্দ্রনাথের নেই বিন্দুমাত্র সহানুভূতি। সংসারের যাত্রাপথে কি রকম অনিবার্য্য কারণে নরনারীর মধ্যে জটিল সম্পর্কের সৃষ্টি হয়, তা সমবেদনার সংগে বিশ্লেষণ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি বিধবা বিনোদিনী ও কুলবধূ বিমলার প্রেম বিশ্লেষণের দ্বারা নূতন আলোকপাত করেছেন প্রেমের রহস্যময় গতি ও প্রকৃতির উপর। মনুসংহিতার বিধির যান্ত্রিক বিচারে যে প্রেমের প্রকৃত মর্য্যাদা ও আদর্শ ক্ষুণ্ণ হয়—কবি সে বিষয়ে সচেতন। তাই রবীন্দ্রনাথ অবৈধ প্রেমকে সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করতে না পারলেও অবস্থা-চক্রে পতিত প্রবৃত্তি চালিত অবৈধ প্রেমিক-প্রেমিকার প্রতি তাঁর মনোভাব উদার ও সহানুভূতিপূর্ণ।

'চোখের বালি' ও 'ঘরে বাইরে'র রচনাশৈলীর পার্থক্য।

এখন আমরা আলোচনা করব 'চোখের বালি' ও 'ঘরে বাইরে' উপন্যাস দুটির রচনাভঙ্গীর পার্থক্য সম্বন্ধে।

'চোখের বালি' ও 'ঘরে বাইরে' দুখানিই উপন্যাস। 'চোখের বালি'তে আছে সাধারণ মানুষের সাধারণ কথা। সে সাধারণ কাহিনী অসাধারণ হয়েছে নরনারীর চরিত্রের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে। এ উপন্যাসে গার্হস্থ্য জীবনের জটিলতার মধ্য দিয়ে কবি ফুটিয়ে তুলেছেন মানব-চরিত্রের সত্যিকার অন্তর্দ্বন্দ্ব। লেখকের লক্ষ্য নৈতিক বিচারের চেয়ে তথ্যানুসন্ধান ও মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ। 'চোখের বালি'তে ঘটনার চেয়ে ভাবনার প্রাধান্য। লেখক ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে প্রবেশ করেছেন মানুষের অলি-গলিতে। মানুষের অবচেতন মনে যে সব জটিল ও সূক্ষ্মচিন্তা বাসা বেঁধে আছে, তার বর্ণনার সংগে আমরা ছিলুম না পরিচিত। মানব মনের ডুবুরি রবীন্দ্রনাথ মহেন্দ্র ও বিনোদিনীর নিষিদ্ধ প্রেমের কারণ বীজ খুঁজে বের করেছেন তাদের মনের অতল সাগর থেকে এবং তার অগ্রগতি ধীরে ধীরে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। এ উপন্যাসে আছে লেখকের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ শক্তি ও বাস্তব দৃষ্টির পরিচয়।

'ঘরে বাইরে' আসলে উপন্যাস নয়—এক শ্রেণীর নূতন ধরণের সাহিত্য সৃষ্টি। এ গ্রন্থ রূপক নাট্যশ্রেণীর আত্মীয়। শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসকে বলেছেন রূপক কাব্য। তাঁর মতে নিখিলেশ হচ্ছেন প্রাচীন ভারতবর্ষ, সন্দীপ নবীন ইউরোপ, আর বিমলা বর্তমান ভারত। সত্যিই তাই। এ উপন্যাসের চরিত্রগুলি যেন সাধারণ রক্তমাংসের জীবন্ত মানুষ নয়,—শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরীর ভাষায়—'কয়েকটা মতবাদ বা ভাবের শরীরী প্রকাশ মাত্র। উপন্যাস বা নাটকের চরিত্রাবলীর মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব বা বিপরীত চিত্তবৃত্তির সংঘাত না থাকলে আমরা তাদের জীবন্ত মানুষ বলে মানতে পারি না।' 'ঘরে বাইরে' উপন্যাস সমালোচনা প্রসঙ্গে পূজনীয় বিশ্বপতি বাবু লিখেছেন :—

'ঘরে বাইরে'র ভিতর দিয়া যে সকল সত্য আত্মপ্রকাশ করিয়াছে তাহারা ঠিক স্বাভাবিক ভাবে মানব-জীবনের ভিতর দিয়া আপনা হইতে উৎসারিত হয় নাই, উহাদিগকে যেন মানব-জীবন হইতে সূক্ষ্ম যুক্তিতর্ক এবং সচেতন বিশ্লেষণ বুদ্ধির সাহায্যে আবিষ্কার করা হইয়াছে।'

'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসের প্রতি চরিত্রের আছে সূক্ষ্ম বিচার-বুদ্ধি ও নিপুণ বিশ্লেষণের শক্তি। চরিত্রগুলি অসাধারণ, তাদের ভাষাও নয় সাধারণের ভাষা। এ উপন্যাস আমাদের মুগ্ধ করে এর সুতীক্ষ্ণ, শাণিত অথচ কবিত্বময় ঝংকারমুখর অপূর্ব লেখন-ভঙ্গিমার জন্য।

'চোখের বালি'র পরিবেশ গার্হস্থ্য ও বাস্তব, আর 'ঘরে-বাইরে'র পরিবেশ অবাস্তব। প্রথমটিতে ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথের প্রাধান্য, দ্বিতীয়টিতে কবি রবীন্দ্রনাথের প্রাধান্য। প্রথমটিতে কবি দিয়েছেন মানব-জীবনের রূপায়ণ, দ্বিতীয়টিতে কবি মানব-জীবন থেকে উত্তাপটুকু সংগ্রহ করে প্রাণহীন চিন্তাগুলিকে মানুষের ভাষার মধ্য দিয়ে করেছেন সজীব। 'চোখের বালি'তে ঔপন্যাসিকের

উদ্দেশ্য চরিত্র-সৃষ্টি, আর 'ঘরে-বাইরে'তে কবির লক্ষ্য আপন চিন্তারাজির রূপায়ণ।

'চোখের বালি' ভাবনাপ্রধান, আর 'ঘরে-বাইরে' তত্ত্বপ্রধান। প্রথমটিতে হৃৎবৃত্তির প্রাধান্য, দ্বিতীয়টিতে চিৎবৃত্তির প্রাধান্য। প্রথমটিতে সামাজিক পরিবেশ ও বাস্তবতার প্রবর্তন, আর দ্বিতীয়টিতে বাস্তবতার পরিণতি। প্রথমটিতে সূক্ষ্ম মনো-বিশ্লেষণ, দ্বিতীয়টিতে কবিত্বময় ভাষণ। প্রথমটিতে কবি ঔপন্যাসিকের ধর্ম পালন করেছেন পূর্ণভাবে, আর দ্বিতীয়টিতে কবি ঔপন্যাসিকের ধর্ম পরিহার করে চরিত্রগুলির মাধ্যমে আপন বক্তব্য উপস্থাপিত' করেছেন চরিত্রগুলির আত্মকথার আকারে।

'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসের টেকনিক বা গঠনরীতি কবির অন্যান্য উপন্যাস থেকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এ উপন্যাসে চরিত্রগুলি যেন অতীত জীবনের অভিজ্ঞতা বা আত্মজীবনী বর্ণনা করেছেন, আর লেখক তা' লিপিবদ্ধ করেছেন। 'বিমলার আত্মকথা' দিয়ে হয়েছে উপন্যাসের সূচনা। উপন্যাসগুলি পরস্পর সংশ্লিষ্ট কতকগুলি প্রবন্ধের সমষ্টি। এ প্রবন্ধ বা আত্মকথাগুলি গ্রথিত করা হয়েছে একটি সূক্ষ্ম অন্তর্লীন ভাবসূত্রের দ্বারা। এক একজনের চিত্তের পরিণতিমুখে এ উপন্যাসের তত্ত্বালোচনা এক একটা ধাপমাত্র। এ প্রসঙ্গে ডাঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত সত্য কথাই বলেছেন—

'তত্ত্বের অনবদ্য মীমাংসা বা ব্যাখ্যানের অপেক্ষায় উপাখ্যানটি কোথাও বসিয়া থাকে নাই। তত্ত্ব ব্যাখ্যানের গতিমুখে উপাখ্যান অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। তত্ত্ব ব্যাখ্যান এইরূপে উপন্যাসের রসমূর্তির ভিতরে অপরিহার্য অংশ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহার একটি আলোচনা বাদ দিলে তার পরের অংশের গ্রন্থিসূত্র ছিন্ন হইয়া যাইবে।'

'চোখের বালি' ও 'ঘরে বাইরে' উভয় উপন্যাসে কবি ইউরোপীয় ও ভারতীয় শিল্প-শৈলীর সঙ্গতি স্থাপন করতে চেষ্টা করেছেন, কিন্তু সাফল্যলাভ করতে পারেন নি। উভয় উপন্যাসের পরিসমাপ্তি করা হয়েছে ভারতীয় আদর্শে অর্থাৎ পূর্ণতা, শান্তি ও সুকল্যাণ পরিণতির আদর্শে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'সাহিত্যের 'লক্ষ্যই পরিপূর্ণতার সৌন্দর্য।' এটি কালিদাসের তথা ভারতীয় আদর্শ। বিনোদিনী ও বিমলার সৃষ্টি ইংরেজি শিল্পের আদর্শে। হৃদয়াবেগ সাহিত্যের একটা উপকরণ মাত্র। ইউরোপ উপাদানকে করেছে লক্ষ্য। ইউরোপীয় টেকনিক ও ভারতীয় শান্তির আদর্শের শিল্পরীতি স্বভাবতঃই পরস্পর-বিরোধী। এদুটি বিরোধী শৈল্পিক রীতির সমন্বয় সাধনে কবি ব্যর্থ হয়েছেন। তাই 'চোখের বালি'র সমাপ্তিতে অনিবার্য ভাবে পাঠকচিত্তে আসে একটা অতৃপ্তি বোধ। এখানেই উপন্যাসের পরিণতির অসঙ্গতি।

মহেন্দ্র বিনোদিনীর অবৈধ প্রেমলীলার মধ্যে কবি দেখিয়েছেন কার্য-কারণ সম্বন্ধের দৃঢ় গ্রন্থি, কিন্তু গ্রন্থের শেষ দিকে লেখক হারিয়েছেন বাস্তবধর্মী শিল্পীর ধৈর্য ও সতর্কতা। উপন্যাসের শেষের দিকে বিনোদিনীর বিহারী-প্রীতি অপ্রত্যাশিত ও আকস্মিক। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরীর উক্তি উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন—

'লেখক প্রেমের তীর্থপথ দিয়া বিনোদিনীকে এক সম্পূর্ণ নূতন জীবনের শুভ্র ক্ষেত্রে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছেন। ভোগলিপ্সু, আত্মসর্বস্ব, স্বার্থপর, মায়াবিনী বিনোদিনী প্রেমের সোনার কাঠির স্পর্শে রাতারাতি সহসা এক মহিমময়ী দেবীতে পরিণত হইল। এই পরিবর্তন উপন্যাসের বিশ্লেষণাত্মক ক্রম-বিবর্তনের কঠিন মাটির পথ ধরিয়া সাবধানে পা ফেলিয়া ধীরে ধীরে আসে নাই, আসিয়াছে রোমান্সের কবিত্বময়, উচ্ছ্বাসময় শূন্য পথে ডানা মেলিয়া।'

'ঘরে বাইরে'র সমাপ্তিতেও ভারতীয় আদর্শের জয়। সন্দীপ ও নিখিলেশ দুটি' মনোবৃত্তির প্রতীক, সন্দীপ negative ও নিখিলেশ positive সন্দীপের প্রভাব প্রত্যক্ষ, বাস্তব ও সহজ অনুভবযোগ্য। নিখিলেশের প্রভাব'অপ্রত্যক্ষ ও ভাবগত।

উলঙ্গ পাশ্চাত্যবাদের প্রতীক সন্দীপ ও প্রাচীন ভারতের শান্তি মৈত্রী ও' প্রেমের প্রতীক নিখিলেশ এ উভয়ের মধ্যে বিমলার মন দ্বিধাগ্রস্ত। এ ভাবে অচলা এক দিকে নির্বিকার উদাসীনতা অর্থাৎ মহিম, আর এক দিকে উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলতা অর্থাৎ সুরেশের আকর্ষণে হয়েছিল অচলা, ·গতি শক্তিহীনা। সন্দীপ বিমলাকে দুর্নিবারবেগে আকর্ষণ করছে আর নিখিলেশ তাকে বার বার টেনে ধরে রাখছে। এখানেই 'ঘরে ও বাইরের' সংঘর্ষ। শেষে হোল বাইরের পরাজয় কিন্তু সে ঘরের উপর এঁকে দিল প্রবল পরিবর্তনের চিহ্ন। সন্দীপ বিমলাকে করেছে সন্দীপ্ত, আর নিখিলেশ, বিমলার নিখিল সত্তার ঈশ, রক্ষক বিমলাকে করেছে রক্ষা। শেষে বিমলা বিমল হয়ে ফিরে এল নিখিলেশের কাছে। বর্তমান ভারত গড়ে তুলতে হবে প্রাচীন ভারতের আধ্যাত্মিকতার উপর ইউরোপের কর্ম ও ভোগকে প্রতিষ্ঠা করে। এ ইঙ্গিতেই গ্রন্থের পরিসমাপ্তি।

ইউরোপীয় ও ভারতীয় শিল্পরীতির সঙ্গতি সাধনের জন্য 'চোখের বালি' ও 'ঘরে বাইরে' উপন্যাস দুটির সৃষ্টি করেছেন এবং ইউরোপীয় হৃদয়াবেগের আদর্শের উপর ভারতীয় পূর্ণতার আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন কবি রবীন্দ্রনাথ।

"Writing is hard. If writing was easy, everyone would do it. You must sit in a chair six or seven hours a day for two years to write a book."

—*James Michener.*
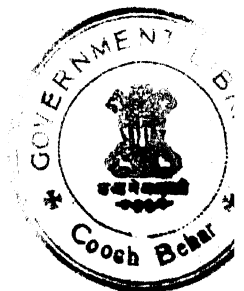
শিশু-শিল্প

শ্রীবিনায়কশঙ্কর সেন

সাধারণ শিক্ষাকেন্দ্রে ছাত্রদের শিল্প শিক্ষা ও শিল্পরসবোধ জাগানো সম্পর্কে বর্ত্তমানে শিক্ষক ও সন্তানের মাতা-পিতা বা অভিভাবকেরা কিছু সচেতন হয়ে উঠেছেন। তবুও বিদেশে এ সম্বন্ধে ওঁরা যত সচেতন হয়েছেন সে তুলনায় ভারতের শিক্ষায়তন বা শিক্ষার কেন্দ্রস্থল বিশ্ববিদ্যালয় এখনও খুঁড়িয়ে চলছেন। যতদূর মনে হয়, এদেশে ও বিষয়ে প্রথম পথ প্রদর্শন করে শান্তিনিকেতন। কিন্তু তাও শান্তিনিকেতনেই সীমাবদ্ধ থেকে যায়; বাইরে তা বেশী প্রসার লাভ করেনি। অবশ্য শান্তিনিকেতনে যে শিল্প শিক্ষা দেওয়া হয় তার সঙ্গে শিশু-শিল্পের বেশ একটু তফাৎ আছে। তাঁরা শিল্পী সৃষ্টি করেছেন, সৌখীন এবং পেশাদারী দুই-ই। কিন্তু শিশু-শিল্প—শিল্পী সৃষ্টি করবার চেষ্টা করে না, শুধু তার প্রাথমিক পথ দেখায় মাত্র।

এখানে-সেখানে দু'-এক জায়গায় শিশু-শিল্পের দিকে নজর দেওয়া হচ্ছে বটে কিন্তু আগেই বলেছি যে, তা এখনও দানা পাকিয়ে ওঠেনি। তবু যে প্রেরণা ও লোকের যে রুচিবোধ জেগেছে, তাতে মনে হয়, শীঘ্রই দেশের বিদগ্ধজনের দৃষ্টি এদিকে প্রসারিত হবে।

শিশু-শিল্প সম্বন্ধে বলতে গেলে প্রথমেই দেখা দরকার, বর্ত্তমানে তা কোথায় রয়েছে এবং অতীতে কোথায় ছিল। কোন সুদূর অতীতে স্কুল-শিক্ষা-পরিষদ 'ড্রইং মাষ্টার' বলে এক শিক্ষকশ্রেণী সৃষ্টি করেছিলেন, দুঃখের বিষয় যে, আজও তাই আছে। এঁরা শিল্পী অর্থাৎ আর্টিষ্ট নন। আর্টের ঔপপত্তিক কোন জ্ঞানই এঁদের নেই এবং হাতে-কলমের জ্ঞানও অতি সামান্য। এঁরা যা শেখান বা বলা উচিত যা করান, তা হচ্ছে বাজার চলতি কতগুলো ড্রইংবুক দেখে হয়তো একটা হাতী বা ঘোড়া বা একটা পাতা বা ফুল বা পাখী আঁকানো কিম্বা একটা বৃত্ত বা একটা চতুষ্কোণ বা কতকগুলো সমান্তরাল রেখা কোন জ্যামিতিক যন্ত্রপাতির সাহায্য না নিয়ে খালি হাতে আঁকতে পারা। এই যে হাত পাকানোর পদ্ধতি, এর সঙ্গে ছবি আঁকা বা তাঁর চাইতেও বড় কথা, শিল্পপ্রেরণার কোন সম্পর্কই নেই। এতে শুধু যে ছাত্রদের সময়ই নষ্ট করা হয় তা নয়, বহু ক্ষেত্রেই বহু বৃহত্তর সম্ভাবনাকেও ধ্বংস করা হয়। 'শিশু-শিল্প' এ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু।

শিশু-শিল্পের গোড়ার কথাই হচ্ছে, কাগজ, রং, তুলি, কাঠ, কাদা, কাপড়, চক, পেন্সিল ইত্যাদি বস্তুর ভিতর দিয়ে শিশুর চিন্তাধারাকে প্রকাশ করতে সাহায্য ও তার সৃষ্টির প্রেরণাকে উদ্বুদ্ধ করা। প্রকৃত পক্ষে সে কাজ করবার জন্য শত শত বিভিন্ন বস্তু এবং শত শত বিভিন্ন ধারার ব্যবহার করা যেতে পারে যা নির্ভর করবে শিল্প শিক্ষকের জ্ঞান ও কল্পনার দৌড়ের উপর। উৎসাহী শিক্ষক তাঁর নিজের রুচি, প্রয়োজন এবং সামর্থ্য অনুযায়ী তাঁর বস্তু সংগ্রহ করবেন। শিক্ষকের শিশু-চিত্ত সম্বন্ধে তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি থাকবার এবং শিশু সম্বন্ধে গভী[র] সহানুভূতি-সম্পন্ন হবার দরকার, তবেই তিনি সত্যকা[র] শিক্ষা দিতে পারবেন। তাঁর কাজ সমস্ত বস্তু সংগ্রহ ক[রে] এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি করা, যেখানে ছেলেরা তাদে[র] পছন্দমত বস্তুর সাহায্যে তার শিল্পবোধ ও সৃষ্টি প্রেরণা[র] বিকাশ করতে পারে। এই যদি করা যায় শিশু যে কত খুসী[র] সঙ্গে কত সুন্দর ও কত অভিনব বস্তু ও শিল্প সৃষ্টি করে থাকে দেখে অবাক হয়ে যেতে হয়। শিশু যখন কাজ করবে তখন তাকে যতদূর সম্ভব কম সংশোধন করতে হবে। কারণ একটা কথা মনে রাখা উচিত যে, সে বয়স্ক এবং তৈরী শিল্পী নয় এবং তা হতেও যাচ্ছে না। তা ছাড়াও সে শিশু হলেও তার নিজের একটি দৃষ্টিভঙ্গী আছে যা হয়তো শিক্ষকের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে এক না-ও হতে পারে। অবশ্য তার মানে এই নয় যে, সংশোধন তাকে করতেই হবে না। কথা এই যে, সংশোধন খুব ধীরে এবং খুব বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে হওয়া চাই; কারণ সংশোধনের মাত্রা বেশী হয়ে পড়লে শিক্ষার উৎসাহ দমে যাবে, যাতে করে কাজ এগোবে না। শিশু যখন ভাষা শেখে তখন সে ব্যাকরণ শেখে না, তা আসে তার পরবর্ত্তী জীবনে স্কুলে পাঠকালে। এ-ও তেমনি কাজ এগোবার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমোন্নতি নিজে থেকেই আসবে। অনেক সময়েই দেখা যায় যে, তারা এমন বস্তু সৃষ্টি করেছে যা কোন বয়স্ক ব্যক্তি পারতো না বা সাহসই করত না। তার কারণ—বয়স্ক ব্যক্তি তার কল্পনার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে, এবং অপর পক্ষে তার সমালোচকের বিচারের ভয় আছে, যা শিশুর নেই।

শিশু সম্বন্ধে অত্যন্ত সহানুভূতিশীল, শিশুমনস্তত্ত্বের কিঞ্চিৎ অধিকারী এবং কিঞ্চিৎ শিল্পজ্ঞান যুক্ত বা শিল্পমেজাজী যে কোন ব্যক্তি একটি ভাল শিশু-শিল্প শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারেন। সত্য কথা বলতে কি, অনেক আর্ট স্কুলের পাশকরা গবেট আর্টিষ্টের চেয়ে তিনিই বেশী উপযুক্ত। তবে তাঁর হাতে-কলমে কাজ করবার একটু শক্তি থাকার দরকার। যার সে শক্তি এবং কল্পনা দুই-ই রয়েছে তিনিই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর শিল্পশিক্ষক হতে পারেন। যখন একটা কিছু দেখিয়ে দেবার দরকার হয় আর শিক্ষক তা করেন, সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রের মনে একটা নতুন অনুভূতি আসে। 'আমাদের মাষ্টার মশাইও আঁকতে পারেন!' শিশু-মনে এই ভাবের প্রভাব অতি বৃহৎ।

প্রথমেই বলা হয়েছে, শত শত বস্তুর সাহায্যে শিল্প-শিক্ষা দেওয়া যায়, সত্যই শত-সহস্র বস্তু ব্যবহার করা যেতে পারে যা নির্ভর করবে সেই শিক্ষকের জ্ঞান ও প্রয়োজনের উপর। তবে মোটামুটি কয়েকটি অতি সাধারণ বস্তু হচ্ছে—সাধারণ গুঁড়ো রং যা বাজারে কিনতে পাওয়া যায়, সাধারণ 'গাম' বা আঠা তাও বাজারে পাওয়া

যায়। কিছু নানা আকারের তেলরঙ ও জলরঙের তুলি। ছুটো-একটা বড় চ্যাপটা দরজা-জানলা, রং করবার ব্রাস, সাধারণ হলুদ রঙের পাতলা পোষ্টবোর্ড। সস্তা দামের কাগজ, প্যাষ্টেল, রঙীন চক্. স্কুলের ছেলেদের জন্ত তৈরী সাধারণ জলরঙের বাক্স, সরু-মোটা সীসের পেন্সিল, ইণ্ডিয়ান ইঙ্ক-এর বোতল নানা আকারের কলম (রেড ইঙ্ক নিবকে ছেনী দিয়ে কেটে তৈরী করে নেওয়া যায়, ট্যারচা করে কাটতে হয়)। উন্নুনের বা উন্থন জ্বালাবার কাঠ-কয়লা কাদা ইত্যাদি। রং যাই হোক না কেন, তুলি মোটামুটি রকমের ভাল হওয়া চাই। যে কোন রং দিয়েই যে কোন কাগজের উপরে ছবি আঁকা চলে কিন্তু তুলি খারাপ হলে কোন কাজই করা চলে না। কারণ, তুলির উপরে শাসন না থাকলে তা দিয়ে কিছুই করা সম্ভব নয়।

প্রথমে গুঁড়ো রংএ আঠা মিশিয়ে দরজা রং করবার ব্রাশ দিয়ে পোষ্টবোর্ডের উপরে আগা-গোড়া যে কোন রংএর একটি প্রলেপ দিয়ে শুকিয়ে নেওয়া দরকার, তার পর তা' ছেলেদের দিতে হয়। সে প্রলেপ হলুদে, লাল, কালো, খয়েরী, সবুজ, নীল, ফিকে নীল, যে কোন রং-এরই হতে পারে। এর নীচে ছুটি কারণ বর্ত্তমান। প্রথম—একটি সাদা কাগজের উপরে ছেলেরা কাগজটা নষ্ট করবার ভয়ে কিছু একটা করতে ভয় পায়; যার ফলে তাদের স্বতঃস্ফূর্ত্ত ভঙ্গিমা বিকাশ লাভ করে না। আর দ্বিতীয়—ছেলেরা কখন ছবি আঁকে সব সময় সমস্ত জায়গা রং দিয়ে ভরাট করতে পারে না। কাগজের এই রং সেখানে ফাঁক পূরণের কাজ করে। এই ধরণের তৈরী কাগজে এই একই রং ব্যবহার করতে হয়।

মাটির হাঁড়ী, কলসী, কুঁজো, বাটি, ধূপদান ইত্যাদির উপরে চমৎকার নক্সা করা যেতে পারে। তাতেও রং-এর ব্যবহার আঠা দিয়ে করতে হয়। সে জিনিষ জলের সংস্পর্শে আসে এমন কোন কাজে ব্যবহার করা যায় না। সাধারণ ভাবে টুকি-টাকী জিনিষ রাখতে তা চমৎকার বটে, তবে তার প্রধান মূল্য ঘর সাজানোর প্রয়োজনে। যথেষ্ট রকম ভিন্ন এবং সুরুচিপূর্ণ আকৃতির বাসন না পাওয়া গেলে নিজের পছন্দ মত পরিকল্পনা দিয়ে কুমোরের কাছ থেকে ফরমাস মত জিনিষ তৈরী করিয়েও নেওয়া যায়। তাতে নিজের এবং কুমোরের দুয়েরই উপকার হয়। রং গুলবার এবং ছবি আঁকবার সময় জল রাখবার জন্য যথেষ্ট মাটির পাত্র মজুদ থাকা দরকার। মাটির পাত্র এ বিষয়ে খুব ভাল জিনিষ; কারণ তা' সস্তা, সহজলভ্য, সুন্দর এবং সম্পূর্ণ ভারতীয়।

কাদার কাজ করবার জন্ত ভাল কাদার কোন প্রয়োজন নেই, সাধারণ ভাবে স্কুলের বাগান বা মাঠ থেকেই মাটি তুলে নেওয়া যেতে পারে। তবে সে মাটিকে প্রথমে একটু তৈরী করে নিতে হয়। কাঠ-কুটো, ইট-পাথর, গাছের শিকড়, খোলার কুচি এ সব বার করে ফেলে দেওয়া দরকার। তার জন্য দরকার হয় দুটো বড় বড় জালা ও চালুনী। প্রথমে সমস্ত মাটিটা একটা জালায় জল দিয়ে গুলে চালুনী দিয়ে অন্ত জালায় ছেঁকে ফেলতে হয়। মাটিকে খুব বেশী পরিষ্কার করবার প্রয়োজন নেই। কারণ খুব পরিষ্কার মাটি শুকোলে ভয়ানক ফেটে যায়। একটু বালিমেশানো থাকলে ফাটে খুব কম। সেই জন্ত একটু বড় ফুটোর চালুনী নেওয়া দরকার। চালুনী সহজেই তৈরী করেও নেওয়া যেতে পারে। যে কোন একটা টিনের পোর্ট বা বাক্স বা কেরোসিন তেলের কেনেস্তারার নিচে পেরেক দিয়ে ফুটো করে নিলেই তা দিয়ে খুব ভাল চালুনীর কাজ চলে। মাটি ছাঁকা হয়ে যাবার পর কিছুক্ষণ বাদে যখন মাটিটা নিচে জমে পড়ে, তখন উপর থেকে আলগা জলটা ফেলে দিয়ে শুকিয়ে কাদা ঠিক প্রয়োজন মত অবস্থায় এলে তা দিয়ে ভাস্কর্য্যের সমস্ত জিনিষই করা সম্ভব। মাটির কাজ নানা রকমেই করা যায়, তবে দুটি অত্যন্ত সাধারণ ধারা হচ্ছে মাটি নিয়ে একটু একটু করে জুড়ে জুড়ে কোন বস্তু তৈরী করা, আর একটি এক তাল কাদা নিয়ে টিপে টিপে তাকে প্রয়োজন মত আকার দেওয়া। দু'রকম ধারারই বিশেষ গুণ আছে। প্রথমোক্ত ভাবে অনেক সূক্ষ্ম কাজ করা যায় যা শেষোক্ত উপায়ে হয় না। আবার শেষোক্ত ভাবে করা কাজের ভেতরে কোন জোড় না থাকাতে শুকোলে অনেক জমাট হয় যা প্রথমোক্ত উপায়ে সম্ভবপর নয়। দু'রকম কাজেই প্রয়োজন মত যন্ত্রপাতি বা 'ক্লে মডেলিং টুলস' ব্যবহার করা চলে। ছাঁচে ঢেলেও মাটির নানা রকম জিনিষ তৈরী করতে পারে ছেলেরা। ছাঁচ কিনতেও পাওয়া যায়—নিজেরাই তৈরী করে নিতে পারে। প্রথম নির্দ্দেশ পাবার জন্য দু'-একটা কেনা চলে, কিন্তু যতদূর সম্ভব নিজেদেরই ছাঁচ তৈরী করা উচিত। তাতে শিল্পকলার আর একটা বিভাগ রপ্ত হয় আর তা ছাড়া নিজের প্রয়োজন নিজে মেটালে আনন্দের মাত্রা বেশী বই কম হয় না।

মাটির জিনিষকে স্থায়ী করতে হলেও দুটি অতি সহজ উপায়ে করা যায়। এক, তাকে একেবারে পুড়িয়ে নেওয়া। সে কাজে ঘুঁটে খুব সুবিধা জনক। আষ্টে-পৃষ্ঠে উপরে নীচে ঘুঁটে দিয়ে জ্বালিয়ে দিতে হয়। আর হচ্ছে কাগজ দিয়ে সমস্তটা মুড়ে দেওয়া অনেকটা ব্যাণ্ডেজের মত। ছোট ছোট টুকরো কাগজ কেটে নিয়ে তাতে আঠা মেখে আগাগোড়া মুড়ে দেওয়া, দু' তিন, চার, পাঁচ বা ইচ্ছেমত পলেস্তারা দেওয়া চলে। তারপর শুকিয়ে গেলে তাতে নানা রকম রঙ দেওয়া যায়। ব্রোঞ্জের রং দিলে—যে কোন 'ক্লে মডেলিং' এর মতই মনে হয়। রং সাধারণ আঠা দিয়েই দেওয়া যেতে পারে, তবে শিরীষের আঠা দিলে দেখতে সুন্দর ও বেশী স্থায়ী হয়।

এই কাগজের পলেস্তারাতে কাজের সূক্ষ্মতা একটু নষ্ট হয় বটে কিন্তু তাতে কাজের মর্য্যাদা নষ্ট হয় না। পলেস্তারা দেবার পর কতখানি সূক্ষ্মতা নষ্ট হবে তার বিচারবোধ জন্মালে শিল্পী তার গোড়ার কাজেই সে সাবধানতা অবলম্বন করতে পারে। তাতে শিশু মস্তিষ্ক চালনারও পথ পায়। লাগাবার আগে কাগজ একটু জলে ভিজিয়ে নরম করে নিলে, সযত্নে টিপে টিপে অনেকটা সূক্ষ্মতা রাখাও যায়।

এখানে গুটিকতক পদ্ধতি দেওয়া হলো যা কিনা যে কোন স্কুল সামান্ত খরচে এবং যৎসামান্ত পরিশ্রমেই চেষ্টা করতে পারেন। যা' সত্যকার প্রয়োজন তা হচ্ছে করবার ধারা ও পদ্ধতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞান ও ছাত্রশিক্ষায় এর প্রয়োজনীয়তার

সজাগ অনুভূতি। কাঁচামাল যতদূর সম্ভব সস্তায় কেনা উচিত, কারণ ব্যয় বেশী হলে শেষে ব্যয়টাই চিন্তার এবং আশঙ্কার কারণ হয়ে ওঠে। যার জন্য কাজ বাধা পায়। এমন কি প্রথম ড্রই করবার জন্য সাধারণ সংবাদপত্র বা দোকানের পোঁটলা বাঁধা বাদির কাগজও ব্যবহার করা যেতে পারে। তাতেও অনেক বালক-বালিকা এত সুন্দর ড্রইং সৃষ্টি করেছে যা যাদুঘরের সংগ্রহে রেখে দেবার যোগ্য। এই ব্যয়ভার স্কুলকেই বহন করতে হবে। কারণ সমস্ত প্রয়োজনীয় বস্তুসম্ভার সংগ্রহ করবার ভার নিতে হবে স্কুলকেই। ছাত্রদের পক্ষে তা করা সম্ভবপর নয়। তার জন্য বৎসরের প্রথমেই তাঁরা একটা 'আর্ট মেটিরিয়াল ফিজ' বলে প্রত্যেক ছাত্রকে সমান দাবী করতে পারেন।

শিল্প-শিল্প শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হলে দু'টি স্বতন্ত্র ঘর দরকার। একটি ক্লাশ, কারখানা বা ষ্টুডিও হিসেবে ব্যবহার করতে হবে আর অপরটি হবে প্রদর্শনী-গৃহ। এই প্রদর্শনী-গৃহে বাছা বাছা সব কাজ ছাত্রদের নিরন্তর দেখবার জন্য স্থায়িভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে রেখে দিতে হবে। লোকের 'বাহবা' শিশু-মনে বৃহত্তর প্রেরণা জোগায়। প্রদর্শনী গৃহ অপরিহার্য্য কিন্তু দুটি ঘরের ব্যবস্থা করা সম্ভবপর না হলে একটি ঘরেই সব কাজ চালাতে হবে। অপর পক্ষে দুটি ঘরের ব্যবস্থা করতে পারলেও, ক্লাশ-রুমেও কিছু কাজ সাজিয়ে রাখা দরকার। ছেলেদের কাজের প্রেরণা ও নির্দেশ যোগাবার জন্য। প্রদর্শনীতে একটি ঐতিহ্যের সৃষ্টি করে—যাতে ছেলেদের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলে, তা নইলে উন্নতিতে বাধা পায়ই, অনেক সময় অবনতিও দেখা দেয়।

গীতাপাঠের রীতি

শ্রীকালীচরণ চট্টোপাধ্যায়

গীতা ক্রমোন্নতিমূলক গ্রন্থ, অর্থাৎ জ্ঞান যেরূপ যেরূপ উন্নত হইবে শিক্ষাও সেই মত হইবে। সেই জন্য কোন একটি বিশেষ শ্লোকের উপর জোর দিয়া উহাই গীতার চরম বাণী, এইরূপ ভাবা উচিত নহে—গীতা সমগ্রভাবে পাঠ করা উচিত। দৃষ্টান্তস্বরূপ ২।৪৭এ আছে—"কর্ম্মেতেই তোমার অধিকার কর্ম্মফলে কভু নয়,

ফল আশায় যেন প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি না করায়।"

যদি এইটাই চরম বাণী হইত, তাহা হইলে গীতাকে ধর্ম্মগ্রন্থ না বলিয়া কর্ম্মতত্ত্বের পুস্তক বলা চলিত কিন্তু একটু জ্ঞান হইলেই তার পরে ৩।২৭এ পাওয়া যায়:—

"প্রকৃতির তিন গুণেতেই সর্ব্বপ্রকার কর্ম্ম করে,
অহঙ্কারে বিমূঢ় হয়ে, লোক নিজে কর্ত্তা মনে করে।"

আর এই সুরেই—

"তত্ত্বজ্ঞানী যোগী 'করি না আমি কিছু' মনে করেন—
তাই দর্শন শ্রবণ স্পর্শ আহার শ্বাস-গ্রহণ,
ঘ্রাণ গমন শয়ন বাক্যালাপ ত্যাগ গ্রহণ,
চক্ষু খোলা বন্ধ করা ইন্দ্রিয়কৃত ইহা জানেন।" ৫।৮-৯

ও আরও জ্ঞান হইলে গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে পাইবেন—

"প্রকৃতি সর্ব্ব কর্ম্ম করে আত্মা কর্ত্তা নহে,
যে এরূপ অনুভব করে সে ঠিক কহে।" ১৩।২৯

আর সেই সুরেই—

"জ্ঞানিগণ দেখে যবে গুণ ছাড়া কেহই কর্ত্তা নয়,
ত্রিগুণের পরে যিনি তাঁরে জেনে আমার ভাব পায়।" ১৪।১৯

তাই শেষে "যুদ্ধ করিব না' যাহা ভাবিছ তুমি অহঙ্কার করি,
মিথ্যা তাহা, প্রকৃতি তোমায় করাবে যুদ্ধ বলে ধরি।" ১৮।৫৯

আমাদের জানিতে হইবে, ঈশ্বর তাঁহার ইচ্ছা আমাদের দ্বারা করাইয়া লন; তাই—

"কুন্তীর কুমার, তোমার স্বভাবজাত কর্ম্মেতে তুমি বাধ্য,
মোহে যাহা না করিছ প্রকৃতি বশে তাহা না করা অসাধ্য।
অর্জ্জুন, সর্ব্বভূতের হৃদে থাকি ঈশ্বর তাহাদের
ঘুরান মায়াতে, চক্র যথা ঘুরান যন্ত্রারূঢ়দের।
হে ভারত, সর্ব্বতোভাবে তাঁহারই স্মরণ লইবে,
তাঁর প্রসাদে পরম শান্তি ও নিত্যপদ পাইবে।"

১৮।৬০—৬২

সুতরাং দাঁড়াইল এই যে, প্রথমে যে "কর্ম্মে অধিকার আছে" বলা হইয়াছে আসলে তাহা নহে, প্রকৃতিই ঈশ্বরের কার্য্য লোককে করিতে বাধ্য করিতেছে।

এখানে যেন মনে করা না হয় যে, মানুষের বুঝি কোন হাত নাই, সমস্ত প্রকৃতি-নিবদ্ধ। আর যদি সমস্ত প্রকৃতির খেলা হয় তাহা হইলে মানুষের পাপ-পুণ্য কেন হইবে? খুব সংক্ষেপে বলিতে হইলে যাহা মূলগত প্রকৃতি তাহা করায়, বাকী সব মানুষের পূর্ব্ব অধিকার আর নির্লিপ্তভাবে কর্ম্ম না করিলে প্রকৃতির সঙ্গবশে যাহা করা যায় তাহার জন্য দায়ী হইতে হয়,—

"যে পুরুষ প্রকৃতি-সঙ্গ বশে গুণ ভোগ করে,
তাহারে তাহার জন্য ভাল মন্দ জন্মেতে ধরে।
কিন্তু যে পুরুষ অনুমোদক, সাক্ষী, ভর্ত্তা কি ভোক্তা
দেহেতে থাকিয়াও হন মহেশ্বর কি পরমাত্মা।
যে এমতে জানে নির্গুণ পুরুষ আর সগুণ প্রকৃতিরে,
সে সকল কর্ম্ম করেও পুনরায় জন্মগ্রহণ না করে।"

১৩।২১—২৩

ক্ষুধা পাইলে প্রকৃতি খাইতে বাধ্য করায় কিন্তু কি খাইবে, তাহা নিজের হাতে—কুপথ্য করিলে ভুগিতে হয়। প্রকৃতি মূলগত কার্য্য করিতে বাধ্য করাইলেও বহু বিষয়ে আমাদের সামাজিক প্রথা ও নিয়ম মানিয়া চলিতে হয়; নচেৎ নিজেকে ভুগিতে হয়।

যদি এইরূপ সমগ্র ভাবে গীতা পাঠ করা যায়, তাহা হইলে কোন সাম্প্রদায়িক ভাব আসে না—উদার ভাবে সবই পাওয়া যায়।

তখন জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মযোগ সবই এক হইয়া যায়। খুব সংক্ষেপে বলিতে হইলে, জ্ঞানযোগীর—

"আত্মাতেই সর্ব্বভূত আর সেই আত্মা সর্ব্বভূতে,
যার আত্মা যোগযুক্ত তিনি দেখেন সমদৃষ্টিতে।
যে সবই আমাতে দেখে, সর্ব্বত্র দেখে আমারে,
ছাড়ে না তিনি আমারে, আমিও ছাড়ি না তাহারে।

৬।২৯—৩০

এই যে ঈশ্বরের সঙ্গে একত্ব, এই জ্ঞান হলেই ঈশ্বর সব করিতেছেন বা করাইতেছেন জ্ঞান হয়—ইহাই কর্ম ও ভক্তিযোগের সীমানা। আবার ভক্তিযোগে ৯।১৭

"এ জগতের পিতা মাতা ধাতা পিতামহ—সবই আমি,
আমি জ্ঞাতব্য পবিত্র ওঙ্কার ঋক্ সাম ও যজুঃ আমি।"

এবং ৯।১৫ :—

"আবার কেহ একত্বে কিম্বা পৃথকত্বে আমায় জ্ঞানে উপাসনা,
আর যজন করিয়া সর্ব্বতঃ প্রকাশ আমাকে করে আরাধনা।

কিম্বা ৯।২৭ :—"যাহাই কর, হোম দান তপস্যা বা ভক্ষণ,
হে কৌন্তেয়, সবই আমাকে করিবে অর্পণ।"

ও ৯।২৯ :—

"নাহি মোর কেহ প্রিয় বা দ্বেষ্য, সমভাবে সবেতে আছি,
যে মোরে ভক্তিতে ভজে, সে আমাতে ও আমি তাহাতে আছি।"

আবার ৯।৩০ :—

"অতি দুরাচারী অনন্য মনে আমায় যদি ভজে,
তাকে সাধু মনে করিবে, স্থিরবুদ্ধি সে পেয়েছে যে।"

আবার ৬।৩১ :—

"ভজন করে যে আমায় এক ভাবি সর্ব্বভূতে,
সে কর্ম্মযোগী সব অবস্থাতে থাকেন আমাতে।"

[এক ভাবি সর্ব্বভূতে—এ আবার জ্ঞানের কথা]।

শেষে :—

"আমাতে চিত্ত রাখি, ভক্ত হও আমারি,
কর যজন আর নমস্কার আমারি
.........................।"

৯।৩৪ ও ১৮।৬৫

ও পরিশেষে ১৮।৬৬

"সর্ব্বধর্ম্ম ছাড়ি, এক যে আমি সেই আমাকে আশ্রয় ধরি,
চিন্তা কি আর, কর্ম্মবন্ধন হইতে আমিই যে মুক্ত করি।"

আবার—

"কেহ ধ্যানে, কেহ আপনাতে করে আত্মদরশন,
কেহ জ্ঞানে, কেহ কর্ম্মযোগে পান আত্মার দর্শন।
কেহ এ ভাবে না পেয়ে অন্যের কাছে শুনে এ তত্ত্ব,
পার হন মৃত্যুকে, শ্রদ্ধায় সাধনাতে হয়ে মত্ত। [১৩।২৪-২৫]

সর্ব্ববিষয়েই গীতার এইরূপ সুন্দর সমন্বয় আছে। আলাদা একটি শ্লোককে গীতার চরম বাণী ধরিলে চলিবে না। তাই সমগ্র ভাবে গীতা পাঠ করিতে হয়। ভাবিয়া দেখিলে সত্য বহুপ্রকারের। সকালে সূর্য্য উঠিয়াছে বলিলে সত্য বলা হয় কিন্তু অধিকতর জ্ঞানী হয়তো বলিবেন সূর্য্য স্থির, সুতরাং উঠে না সেই উক্তিও সত্য, বরং উচ্চস্তরের সত্য। এইরূপ জ্ঞানের ক্রমোন্নতিতে সত্যের উপরে সত্য আছে—গীতা ক্রমোন্নতিমূলক গ্রন্থ, তাই সমগ্র ভাবে ও উদার ভাবে পাঠের প্রয়োজন।

[উপরোক্ত বাঙ্গালা ছন্দ লেখকের "ছন্দোগীতা" হইতে উদ্ধৃত করা হইল—মূল সংস্কৃত দুই লাইনে, ছন্দোগীতায় লেখক যতদূর সম্ভব দুই লাইনে অতি সহজ ভাষায় ও শুদ্ধ বা সঠিক অর্থে সর্ব্বসাধারণের জন্য অনুবাদ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কারণ মূল সংস্কৃতের দুই লাইন স্থলে চারি বা বেশী লাইনে অনুবাদ করিলে অনেক সময় অহেতুকর অতিরিক্ত শব্দ আসে]।

ভারত সভ্যতায় বাঙ্গালী মৎস্যেন্দ্র নাথ

শ্রীসুরেশচন্দ্র নাথ-মজুমদার

পুণ্য-ভূমি ভারতবর্ষে প্রাচীন যুগে যে সকল সত্যদর্শী তপোনিরত যোগাচার্য ঋষি আবির্ভূত হইয়া স্বকীয় সাধনার প্রভাবে ভারতীয় সাধনার ধারাকে মহিমামণ্ডিত করিয়া গিয়াছিলেন, নাথগুরু বাঙ্গালী মৎস্যেন্দ্র নাথ তাঁহাদের অন্যতম। ইঁহার জীবনের উজ্জ্বল অধ্যায় আজও জনসমাজে সম্পূর্ণরূপে উদ্‌ঘাটিত হয় নাই। ভারতবর্ষ, নেপাল, তিব্বত, চীন, প্রভৃতি এশিয়ার বিভিন্ন স্থানে মৎস্যেন্দ্র নাথ বিভিন্ন নামে পরিচিত ও পূজিত হইতেছেন। এবং বিভিন্ন দেশে তাঁহার অলৌকিক প্রভাবের পরিচয় আজও পাওয়া যাইতেছে। তিনি যেন অধ্যাত্ম লোক হইতে অবতরণ করিয়া তাঁহার মধুময় ধর্মবাণী বিভিন্ন দেশের জনসাধারণের মধ্যে বিলাইয়া দিয়া তাঁহাদের শুষ্ক জীবনকে শান্তিময় রসময় করিয়াছিলেন। ভগবান বুদ্ধের পর ভারত ও ভারতের বাহিরের জনসাধারণের মধ্যে ধর্মক্ষেত্রে বাঙ্গালী মৎস্যেন্দ্র নাথ ও তদীয় শিষ্য গোরক্ষ নাথের মত প্রভাব বিস্তার আর কোন যোগাচার্য করিতে পারিয়াছেন কি না জানি না!

মৎস্যেন্দ্র নাথ আজও নেপালের প্রধান দেবতারূপে পূজা পাইতেছেন। আজও তিনি তিব্বতের মঙ্গল দেবতা। বিখ্যাত ঐতিহাসিক হডসন সাহেব বলেন, নেপালের দ্বাদশ বৎসরব্যাপী অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষ নিবারণের উপায় উদ্ভাবনের জন্য নেপালরাজ নরেন্দ্রদেব কর্তৃক বিশেষ ভাবে আহূত হইয়া আন্দাজ ৫ম খৃষ্টীয় শতাব্দীতে মৎস্যেন্দ্র নাথ আসামের পুতলক পর্বত হইতে নেপালে গিয়াছিলেন (R. A. S. J—series VII, part 1, page 137)। চীন পর্যটক হিউ এন চাং বলেন, কপিলের শিষ্য ভববিবেক ৫৫০ খৃঃ অব্দে বর্তমান ছিলেন এবং তিনি মৎস্যেন্দ্র নাথের সহিত দেখা করিয়াছিলেন। শ্রীগুণানন্দ এবং শ্রীশিবশঙ্কর সিংহ প্রণীত এবং কেম্ব্রিজ বিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত নেপালের ইতিহাসে লিখিত

আছে যে মৎস্যেন্দ্র নাথ কলিযুগ ৩৬২৩ বৎসর গতে অর্থাৎ ৫২২ খৃঃ অব্দে নেপালের দ্বাদশ বৎসরব্যাপী অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষ নিবারণ করার জন্য নেপালরাজের বিশেষ অনুরোধে নেপাল গিয়াছিলেন। নেপালের প্রসিদ্ধ ধর্মগ্রন্থ করণ্ডব্যুহে মৎস্যেন্দ্র নাথের জীবনী আলোচিত এবং উক্ত মত সমর্থিত হইয়াছে।

যাহা হউক ৫২২ খৃঃ-অব্দে যে মৎস্যেন্দ্র নাথ নেপাল গিয়াছিলেন তাহাই নির্ভরযোগ্য তথ্য। তিনি নেপাল গিয়া প্রকৃতির উপর প্রাধান্য বিস্তার করতঃ তথাকার দীর্ঘদিনের দুর্ভিক্ষ ও অনাবৃষ্টি দূর করিয়া নেপালে শান্তিস্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার অলৌকিক প্রভাব দৃষ্টে নেপালীরা তাঁহার প্রচারিত শৈবধর্মে দীক্ষিত হইয়া ক্রমশঃ হিন্দুভাবাপন্ন হইতেছিল। তাঁহার নেপাল গমনের ১১৫০ বৎসর গতে ৭৯২ নেপালাব্দে অর্থাৎ ১৬৭২ খৃঃ অব্দে তৎকালীন নেপালের রাজা শ্রীনিবাস কর্ত্তৃক নেপালের মৎস্যেন্দ্র নাথের মন্দিরের তোরণ সহিত স্বর্ণদ্বার স্থাপিত হইয়াছিল, এবং তাঁহার নেপালে শুভাগমনের বার্তা বিখ্যাত স্মৃতিফলকের শ্লোকে রক্ষিত হইয়াছে। ইহার শিলালিপিতে আছে—

"শ্রীলোকেশ্বরায় নমঃ—
মৎস্যেন্দ্রং যোগিনাম্ মুখ্যাঃ শাক্তাশক্তি বদন্তি যং।
বৌদ্ধা লোকেশ্বরং তস্মৈ নমঃ ব্রহ্মস্বরূপিণে॥
নেপালাব্দে লোচনাচ্ছিদ্র সপ্তে
শ্রীপঞ্চম্যাং শ্রীনিবাসেন রাজ্ঞে
স্বর্ণদ্বারং স্থাপিতং তোরণেন
সার্দ্ধং শ্রীলোকনাথস্য গেহে।"

(Inscription from Nepal in Indian Antiquary Vol IX)।

অর্থাৎ যোগিগণের শ্রেষ্ঠগুণ যাঁহাকে মৎস্যেন্দ্র বলেন, শাক্তগণ যাঁহাকে শক্তি বলেন, বৌদ্ধগণ যাঁহাকে লোকেশ্বর বলেন, সেই ব্রহ্মস্বরূপকে নমস্কার করি।

নেপালে প্রচলিত মৎস্যেন্দ্র নাথ স্তোত্রে বলা হইয়াছে—

যং বিষ্ণুং প্রবদন্তি বৈষ্ণবগণাঃ শৈবাঃ শিবং;
শক্তিকা শক্তিং ভাস্বর ভক্তিকা দিনমণিং;
ব্রহ্মস্বরূপং দ্বিজাঃ মৎস্যেন্দ্রং মুনয়ো বদন্তি সততং;
লোকেশ্বরং বৈদিকা, অন্তে তু করুণাময়ং;
প্রতিদিনং স্তৌমি লোকেশ্বরম্॥
(গকারাদি গোরক্ষ সহস্রনাম)।

আমেরিকার ড্রু বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্ম ইতিহাসের অধ্যাপক গ্রীগস সাহেব ও ডক্টর মোহন সিং এবং ডক্টর কল্যাণী মল্লিক বলেন, পাশুপতের বেশেই মৎস্যেন্দ্র নাথ নেপাল গিয়া শৈবধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন [গোরক্ষ নাথ (ইংরাজী), ২৫২ পৃঃ। এবং নাথ সম্প্রদায়ের ইতিহাস দর্শন ও সাধন প্রণালী—)। প্রসিদ্ধ বিদেশীয় ঐতিহাসিক হডসন সাহেব বলেন, মৎস্যেন্দ্র নাথ বৌদ্ধধর্মে নাথধর্ম প্রবর্ত্তন করেন। গোরক্ষ নাথের নাথধর্ম ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধধর্মের সংযোজক সেতুস্বরূপ (R. A. S. J. of Bengal Vol., 18)। গোরক্ষ নাথ আজও নেপালের মঙ্গল দেবতা। নেপালের গোরক্ষ নাথ স্তোত্রে আছে—

গকার গুণসংযুক্ত,
রকার রূপলক্ষণ।
ক্ষকারেণ অক্ষয় ব্রহ্ম,
শ্রীগোরক্ষ নমোঽস্তু মে॥

(ডক্টর গোপীনাথ কবিরাজ সম্পাদিত গোরক্ষ সিদ্ধান্তসংগ্রহ —৪২ পৃঃ)।

গোরক্ষ নাথকেও কেহ কেহ বাঙ্গালী বলেন কিন্তু এ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কিন্তু মৎস্যেন্দ্র নাথ যে বাঙ্গালী সে সম্বন্ধে মতভেদ নাই। তিনি চন্দ্রদ্বীপের (বাখরগঞ্জের) লোক।

আমাদের সাহিত্যাচার্যেরা একবাক্যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, মৎস্যেন্দ্র নাথ (ইনি মীন নাথ নামেও পরিচিত ছিলেন) বাঙ্গালা ভাষার আদিম লেখক। কিন্তু ইহারা বাঙ্গালা রূপের উদ্ভব ৭ম খৃঃ অব্দের পূর্বে হয় নাই বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। মৎস্যেন্দ্র নাথ বাঙ্গালা ভাষার আদিম লেখক এবং তাঁহার সময় যখন ৫২২ খৃঃ অব্দ, তখন বাঙ্গালা রূপের উদ্ভব ৫ম খৃঃ অব্দে বা তৎপূর্বেই হইয়াছে, বলিতে হইবে। "প্রায় আড়াই হাজার বৎসর হইতে চলিল, বুদ্ধদেবের সময়ে বঙ্গলিপি নামে একটি স্বতন্ত্রলিপি প্রচলিত ছিল। যখন বঙ্গলিপির সৃষ্টি হইয়াছিল, সে-সময় স্বতন্ত্র বঙ্গভাষা প্রচলিত থাকা কিছু বিচিত্র নহে। কিন্তু তখনকার বঙ্গভাষা কিরূপ ছিল, তাহা নিঃসন্দেহে জানিবার উপায় নাই" [বিশ্বকোষ (১৩১৪ বাং) অষ্টাদশ ভাগ, ১৯ পৃঃ]।

তাহা হইলে এরূপ অনুমানই বিচারসহ হইবে যে, বুদ্ধদেবের আমলে বঙ্গভাষা গড়িয়া উঠিতেছিল এবং হাজার বছরের পরিবর্তনের মধ্য দিয়া ৫ম খৃঃ অব্দে তৎপূর্বে ইহা যে রূপপরিগ্রহ করিয়াছিল, তাহা ক্রমশঃ পূর্ণতা লাভ করিয়া চর্যা রচনার আমলে (৯৫০—১২০০ খৃঃ অব্দে See History of Bengal Vol I, Chap XII) যথার্থ ভাবে বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করিয়া সাহিত্যের উপকরণ যোগাইয়াছে। বলা বাহুল্য, আমাদের সাহিত্যরথীরা বাঙ্গালা ভাষাকে যত প্রাচীন বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালা ভাষা তাহার চেয়ে বহু বহু প্রাচীন।

"Writing is the most exhausting and debilitating work—sometimes I would almost sooner spend a day in the dentist's chair than sit at a desk."

—*C. S. Forester.*

চোরের গৃহে জাঁ দ্য লা ফঁতেন

জুল ল্যামাথ

[বিখ্যাত ফরাসী কবি—জাঁ দ্য লা ফঁতেন। ঘটনাটি ঘটে তাঁর নিজের জীবনে, চিত্তাকর্ষক নিঃসন্দেহে। আশা করি, পাঠকদের আনন্দ দান করবে।]

সবান্ধব নৈশ ভোজন শেষ করে জাঁ দ্য লা ফঁতেন যখন র্যা জাক রাস্তার একটি বাড়ী থেকে বের হলেন তখন প্রায় মধ্যরাত্রি। তাঁর হাতে একটি হারিকেন। কেন না, রাত্রি খুব অন্ধকার আর সহরটির রাস্তাগুলোতে কোনো আলো নেই। কিন্তু যখন তিনি বাড়ীর পথে নোতরদাম পুলটি পার হচ্ছিলেন হঠাৎ একটা দমকা হাওয়া উঠে নিবিয়ে দিল তাঁর আলোটি। আলো-জ্বালবার বস্তুটি ভুলে গেছেন সঙ্গে আনতে, কাজেই তাঁর আলোটি আর জ্বালাতে পারলেন না।

তিনি দেখলেন, একটি লোক এগিয়ে যাচ্ছে তাঁর সামনে দিয়ে। হাতে তার একটি বাতি যাতে তার ছোরার স্পেনীয় খাপকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। ফঁতেন তার কাছ থেকে আলোটি জ্বালিয়ে নেবার জন্য তাকে অনুসরণ করতে লাগলেন। কিন্তু যে মুহূর্তে তাঁরা দুজন জেটীর মোড়ে পরস্পরের সম্মুখীন হ'লেন লোকটি তার পকেট থেকে আলো জ্বালবার একটি বস্তু বের ক'রে তার আলোটি নিবিয়ে দিল, ঝাঁপিয়ে পড়ল ফঁতেনের ঘাড়ে, বললে ভদ্রভাবে কিন্তু দৃঢ়স্বরে, টাকা নয় প্রাণ—তাকে আলো দিয়ে পথ দেখানোর কষ্টস্বরূপ।

—মঁসিয়ে, তাকে বললেন জাঁ, আগেরটি কি পরেরটি কোনটিই না দেওয়া আমার ইচ্ছে। কিন্তু যেহেতু দুটোর ভেতর কোন একটি আমাকে বেছে নিতে দিচ্ছেন তখন আপনাকে আমার থলেটিই দেব। অনেকক্ষণ ধরে তিনি কোটের পকেট হাতড়ালেন—পেলেন না কিছুই।—মঁসিয়ে, বললেন তিনি, অত্যন্ত বিরক্তিকর ব্যাপার, টাকার থলেটি দেখছি আনতে ভুলে গেছি, বিশ্বাস করুন, তা হ'লে আমার প্রাণটিই আপনাকে দিতে হচ্ছে। কিন্তু একজন সামান্য কবির প্রাণ নিয়ে কি করবেন আপনি ?

—আঃ! মঁসিয়ে একজন কবি? বলে উঠল চোরটি—উৎসাহিত হয়ে।

—অন্তত চেষ্টা করছি কবি হ'তে, উত্তর দিলেন জাঁ। কিন্তু জামা খুঁজতে গিয়ে দেখছি আমার বাড়ীর চাবিটি, মনিব্যাগ, আর আলো জ্বালবার যন্ত্রটি আনতে ভুলে গেছি। সুন্দর তারাটির নীচেই রাত কাটাতে হবে তা হ'লে দেখছি। এটা 'কথার একটা ধরণ মাত্র। কারণ আকাশেও যেমন নেই একটিও তারা আমার পকেটেও নেই তেমন একটিও পয়সা, যদি না সরাইখানা গোছের একটি কিছু পেয়ে যাই কাল অবধি পড়ে থাকতে দেবার জন্য।

—মঁসিয়ে, চোরটি বললে, আপনাকে ভদ্র ব'লে মনে হচ্ছে। আর বেশ মিশুকও, অধিকন্তু, আপনার আছে অন্তরের নির্বিচলতা যা জ্ঞানীর সম্পদ, যদি অসুবিধে না হয়, আমিই দেব আপনাকে আমার কুটীরে আশ্রয়।

মঁসিয়ে ফঁতেন উত্তর দিলেন আমি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে রাজী।

চোরটি তার আলোটি জ্বালল। এবার দু' জন দু' জনকে ভালো ক'রে দেখবার সুযোগ পেল। মনে হ'ল দু' জনেই খুশী। চোরটির পরনে গলা থেকে কোমর পর্যন্ত একটি কালো সাটিনের জামা। নিশ্চয়ই কোনো ধনী ব্যক্তির কাছ থেকে পাওয়া। মুখে যোদ্ধার ভাব, কিন্তু কাঠিন্য নেই কিন্তু অতি তীক্ষ্ণ গোঁফ যুগল ভীতিপ্রদ। আর ফঁতেন সঙ্গে সঙ্গে খুশী করলেন কবি অথবা দার্শনিকসুলভ নরম নাক, বিশ্বাসসূচক দৃষ্টি আর অবিন্যস্ত পোষাক দিয়ে। দু' জনে কথা বলতে বলতে স্যাঁ দেনি রাস্তা ধরলেন।

—মঁসিয়ে, চোরটি বললে, আমি কবিদের সম্মান করি। আমি নিজেই একজন কবি। এক সময় আমি নভের কলেজে শিক্ষা গ্রহণ করি। আমি আজ এই মুহূর্তে হয়তো অলঙ্কার শাস্ত্রে দিকপাল হ'তে পারতাম যদি না দুর্ভাগ্য আমাকে ক্ষেত্রান্তরে প্রবেশ করতে বাধ্য করত। আমি এখন যা করছি সেটি অত্যন্ত গৌরবের কিছু নয় কিন্তু এতে যে অবসর পাই তাকে সম্মান দিই 'মূ্যজের' রচনায় উৎসর্গ ক'রে। আমি দিনে ও রাতে পাতা উল্টে যাই আমাদের প্রসিদ্ধ কবিদের: কর্ণেই, এসতোফল, লা সের, আরদি, তেওফিল, ম্যাঁ ভ্যানিয়ে, কোর্ত্যাঁ, মেনাজ, আর প্রিসর্জাঁ। আমি প্রায় সব রকম ফরাসী পদ্ধতিতেই লিখি। কিন্তু সহজ ধরণের কবিতাতেই সব চাইতে বেশী চর্চা করি। আমি ফেরিওয়ালাদের জন্য গান রচনা করি, আমিই সভের আর বোরতো এ দুটি স্থানের যত রাস্তা আর সরাইখানা নতুন গানে গানে ভরে দিয়েছি; আশঙ্কা করি আমি হয়তো সম্মতির সুযোগ নিচ্ছি যাকে প্রথমেই আমার প্রশংসা করতে হবে না। কিন্তু এ সুযোগ আমি ছাড়ব না। মনে হচ্ছে আপনি একজন যোগ্য বিচারক—অনুমতি দিলে, আমার নৈশ জাগরণের কিছু ফল আপনাকে শোনাই।

—মঁসিয়ে, বললেন ফঁতেন—আমি শুনছি।

চোরটি, তার ভঙ্গিতে যেন বাতিদানটি উজ্জ্বল দীর্ঘরশ্মি রচনা করতে আরম্ভ করল, রাজ্য জয়ের ওপর লেখা একটি কবিতা আবৃত্তি করল। তার সাভয়ের জন্য রচিত সর্বশেষ গানটি তামাকের গুণাবলীর উৎসব দেখা যায় কবির আকর্ষণটা তার স্ত্রীর চেয়ে পাইপের প্রতিই বেশী।

—মঁসিয়ে, বললেন ফঁতেন, আপনার প্রথম কবিতাটি বেশ উঁচু দরের। কিন্তু আপনার গানটিতে আমি বেশী খুশী হয়েছে ওটি সহজ আর জনপ্রিয় ধরণে লেখা হয়েছে বলে।

—মঁসিয়ে, চোরটি বললে, আমার মনে হয় আপনার বিচার ঠিক, কিন্তু আমার স্বভাব এতো ভালো যে আমি তাদের ক্ষমা করি যারা আমার সমস্ত রচনা সমান ভাবে পছন্দ করতে না পারে। কিন্তু, মঁসিয়ে, আপনি আমার সম্মানার্থে আপনার কিছু রচনা আবৃত্তি করবেন না আমি বিচার করব ব'লে নয়, আমি বিস্মিত হব ব'লে।

—মঁসিয়ে, বললেন ফঁতেন, আমাকে খুশী করবার জন্ত আমার প্রতি যে সুন্দর ব্যবহার করেছেন, এর পর এই সামান্ত উপকারটুকু প্রত্যাখ্যান করতে পারি না। আমি আপনার কাছে একটি অংশ আবৃত্তি করছি আজ সকালেই এটা লিখেছি। আমি চেষ্টা ক'রেছি এতে শব্দের সঙ্গে কোমলতার একটা সম্বন্ধ ঘটাতে, কারণ তাই আমার পছন্দ। তিনি আরম্ভ করলেন খুব নীচু স্বরে—'রতির প্রতি'—যার শেষটা এই রকম :

উল্লাস, উল্লাস, ব্যথা ছিল এক সময় কর্ত্রী
গ্রীসের সব চাইতে সুন্দর মনের।

—চমৎকার! নিঃসন্দেহে বলে উঠল চোরটি।

—আপনি ঠিকই বলেছেন মঁসিয়ে।

তিনি পড়ে চললেন :

তুচ্ছ ক'রো না আমায়, এসো, থাকবে আমার গৃহে
হবে না তোমার সেখানে কর্মাভাব।
ভালোবাসি আমি খেলা, প্রেম, পুস্তক, সঙ্গীত
নগর আর পল্লী—সব।
সব কিছুই আমার কাছে বিশেষ মূল্যবান হ'তে পারে
এমন কি একটি আর্ত-হৃদয়ের বিষণ্ণ আনন্দও······

চোরটি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল, তার পর বার কয়েক প্রশংসাসূচক শব্দ ক'রে আভূমি প্রণতি জানাল টুপিটি তুলে।

মঁসিয়ে, বললে সে। এই কবিতা সত্যকারের কাব্য, এ রকম এর আগে শুনেছি বলে মনে হয় না। কবিতাগুলো যেন ফুটে উঠেছে ফুলের চেয়েও সহজ ভাবে। আমি বুঝতে পারছি এখন যে, আমি একজন ছাত্র মাত্র আর আপনি অধ্যাপক। বিশ্বাস করুন মঁসিয়ে, আজ থেকে আমি আপনার আজ্ঞাবাহক মাত্র। কিন্তু আপনি কি এই বিস্ময়কর লোকটির নাম বলতে পারবেন না—যিনি সত্যিকার কবিতা কি আমার কাছে প্রকাশ করলেন আজ।

—জঁা দ লা ফঁতেন। আমিও জানাই আপনাকে আমার কৃতজ্ঞতা। কিন্তু এ নাম আপনি শুনেছেন বলে মনে হয় না। কেন না, আমার কবিতা এখন অবধি ছাপাই হয় নি। আর আপনি কি আমার কাছে সম্মানীয় বীরের নাম গোপন করবেন যিনি 'মৃজে'র উপহার—রসগ্রহণে এমন সফলতা লাভ করেছেন?

—মঁসিয়ে, বললে চোরটি, আমি কখনই আপনার কাছে আমার নাম গোপন করব না। আমাকে সবাই ডাকে—"ক্যাপ্টেন কাসকারে"। আমি একজন রাজকর্মচারী বলে নয়—আমার একটি দল আছে, আপনি শীগ্‌গিরই তাদের দেখবেন।

উভয়ে সত্যিই সেণ্ট দেনিসের দরজায় এসে উপস্থিত হলেন। তার ডান দিকে ঘুরে একটি দুর্গের ওপর প্রতিষ্ঠিত ভগ্নপ্রায় একটি বাড়ীর কাছে থামলেন।

—এখানে, বললে কাসকারে।

তারা একটি বড় ঘরের ভেতর প্রবেশ করল। নীচু ছাদ, ত্রেমলিন স্বল্পসংখ্যক বাতিদান, অন্ধকার দূর করবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। টেবিলের সামনে বসে জন কয়েক লোক টিনের পাত্রে পান করছিল আর হল্যাণ্ডীয় পাইপ টানছিল।

কাসকারেকে আসতে দেখে সকলেই উঠে দাঁড়াল। সে তার বন্ধুর পরিচয় দিল এই ভাবে—মঁসিয়ে একজন বন্ধু, এঁর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হও।

তার পর একটি খালি টেবিল লক্ষ্য ক'রে ফঁতেনকে অনুরোধ করলে তার সামনে সেখানে বসতে। একটি স্থূলকায় স্ত্রীলোক তাদের দিয়ে গেল একটি বোতল আর কয়েকটি পানপাত্র।

—তোমরা মঁসিয়ের সামনে কথাবার্তা বলতে পারো, কাসকারে তার বন্ধুদের বলল।

তারপর তাদের যেমন ডেকে যেতে লাগল : বস্ত্রি! লা ব্রেম! লা বলীন্! ল্যাগুর্ভা! রুসগে! ব্র্যাদেসতক! তারা একে একে আসতে লাগল তার সামনে টুপী নীচু ক'রে সেদিন সন্ধ্যার কাজের হিসেব দিতে। কয়েক জন তাকে দিল নানা ধরণের অলঙ্কার : হার, আংটি প্রভৃতি ও প্রচুর সোনা ও রূপা—এর মধ্যে কিছু হালকা জিনিষও ছিল। কিন্তু দলের নেতা সেগুলো ওজন করলে না—সেগুলো গ্রহণ করল না দেখেই—ওগুলো যে পুরো ওজনের হবে না এ তার জানাই। কেউ কেউ আনল কিছু কাপড়-চোপড়, টুপী, রান্নার জিনিষপত্র ও অন্তান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও কিছু বিলাস-সামগ্রী যেগুলো ঘরটির এক কোণে জমা কোরে রাখতে বললে কাসকারে।

—ভালো, মঁসিয়ে, অবশেষে সে বললে। কালকে আপনাকে দেখান হবে এগুলোর বিতরণ। আপনি এখন পান আরম্ভ করতে পারেন। জঁা দ লা ফঁতেন সমস্ত দৃশ্যটি সপ্রসন্ন কৌতূহল নিয়েই দেখলেন।

—মঁসিয়ে, কাসকারেকে উদ্দেশ্য করে তিনি বললেন ; আমার ভালো লাগল এই দেখে যে আপনি বিশৃঙ্খলাকে নিয়মে বাঁধতে পেরেছেন—বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছেন এদের ওপর, আমি এসব বে-আইনী মনে ক'রে দোষারোপ করছি না, এরকম নিয়মানুবর্তিতা আর আজ্ঞাপালন—যা একটি ভালো সমাজেও সচরাচর দেখা যায় না।

—মঁসিয়ে, উত্তর দিলে কাসকারে, সত্যি বলছি, এতে আমার কোনো অসুবিধে নেই। কারণ, আমি দেখেছি যে কতকগুলো মিল বেঁধে দেয়া কষ্টকর, আমার এই সব সাহসী লোকদের আছে অতুলনীয় বুদ্ধির খ্যাতি, আর এজন্তই এরা আমাকে মানে স্বেচ্ছায়। মৃৎজের সুন্দর জগৎ এরা জানে এদের ধরণে। এদের বেশীর ভাগই আমার চেয়ে অনেক চতুর। এদের উদ্ভাবিত অসংখ্য কলাকৌশল আপনাকে বলে শেষ করতে পারব না। এই যে, এ ব্যক্তি, এর নাম বস্ত্রি—গেল বছর ঢেউয়ের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ছিল একটি কাঠের অসি নিয়ে।

—আপনি বলতে চান তাকে শাস্তিস্বরূপ রাজার নৌকায় দাঁড় টানতে হয়েছিল?

—আপনি ঠিক ধরেছেন। বস্ত্রি দলের ভেতর সব চাইতে বেশী চালাক। বাজারে সে চাষীর বেশে, রাজপ্রাসাদে তাকে দেখা যায় রাজপ্রতিনিধির পোষাকে, মাননীয়দের মধ্যে যখন সে থাকে ঠিক ভদ্রভাবচ্ছন্ন। এই সব জায়গায় তার কাজে আসে এমন কিছু যদি সে দেখে—দৃষ্টিমাত্র সেখানে গিয়ে তার হাত পৌঁছয়।

ওখানে যে দাঁড়িয়ে—ব্র্যাদেসতক—সে তার দলকে ছুরির ফলা জোগাড় দেয়—এগুলো তার কাছে আসে খুব সস্তায়। কারণ, সে ঢোকে গিয়ে একটি ছুরির দোকানে তার কোমরের ছুরির খাপটি থাকে খালি—যখন দোকানী নানা রকম ছুরি তাকে দেখাতে ব্যস্ত—সে একটা ঢুকিয়ে দেয় খালি খাপের ভেতর। আর এই তৃতীয়টি, লা ব্রেস, এর উদ্ভাবনী শক্তি কিছু কম নয়। ও যখন একটি বাড়ীতে গিয়ে ঢোকে—লোকজনের অনুপস্থিতিতে আর যখন একটা কিছু সে হাতিয়েছে—উচ্চহাস্যে না ছুটে কিছুক্ষণ গোবেচারীর মত সে পথ চলতে আরম্ভ করে তারপর পা চালায়। চোরের অনুসন্ধানী লোকজন কাউকে দেখলে তাদের সামনেই এগিয়ে যায় ধীরে ধীরে আর মালসহ তাদের পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যায়। আর চতুর্থটি, লা বোলীন কখনও কখনও তার পাতলুনের ওপর চাপায় একটা ঘাগরা, মাথায় একটা উড়ুনী, নাকের ওপর একটা আবরণ—এই ছদ্মবেশে স্পষ্ট দিবালোকে আক্রমণ করে ধনী ব্যক্তিদের রাস্তার ওপরেই পথচারীরা মনে করে দাম্পত্য কলহ কেউ আর নাক গলায় না এতে। অথবা সন্ধ্যার সময় রাস্তার এক কোণে ও রাথে বস্ত্রসজ্জিত দুটি মূর্তি যখন ধনী ব্যক্তিরা কেউ উপস্থিত হয়—কিন্তু মঁশিয়ে আমি হয়তো আপনাকে বিরক্ত করছি।

জাঁ দ্য লা ফঁতেন ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। ঘরটির এক কোণে কাঠের সিঁড়ির ওপর কতকগুলো পায়ের শব্দে জেগে উঠলেন। একটি নারীবাহিনী—কাস্তীন, পারতেনিস, আমারান্ত, মিলভি, নানোঁ, জিলেত্ত, সিমনেত আর জিবুল্যজ তাদের ঘর থেকে নেমে এলো। মিশে পড়ল যারা পানরত ছিল তাদের সঙ্গে। দুটি কি তিনটি বেশ সুন্দরী। কিন্তু প্রত্যেকেই অতিরিক্ত রং মেখেছিল আর তাদের পরনে ছিল পুরনো বস্ত্র। কেউ কেউ নিঃসন্দেহে কিছুটা বিতণ্ডার পর তাদের মুখের ওপর লাগিয়েছিল পোকার মত লম্বা লম্বা পোঁচ যেন তাদের ছড়ে যাওয়া ঘায়গাগুলোতে চাপড়া লাগান হয়েছে। এরা থামতেই মৃগনাভির একটি কড়াগন্ধ ঘরময় ছড়িয়ে পড়ল।

কাসকারে, লা ফঁতেন জেগে উঠেছেন দেখে আরম্ভ করলে: এই স্ত্রীলোকেরা এই সব লোকদের বন্ধু, এদের জীবনযাত্রা প্রায়ই কষ্টকর। এরা নানারকমে সাহায্য করে। এদের হৃদয় এতটা বিশ্বস্ত যে যদি এরা চায় এদের খুশীমত অপরিচিত লোকের সঙ্গে মিশতে অত্যন্ত সামান্য অর্থের জন্যও—তা এদের বারণ করা হয় না। এরা আমাদের সমিতিকে অন্যরকম কাজও দেয়। এরা আমাদের পোষাক-পরিচ্ছদ-রক্ষক। পোষাকের রূপ বদলে দিতে এরা এত কুশলী যে ধনী ব্যক্তিদের কাছ থেকে চুরি ক'রে আনা পোষাক-পরিচ্ছদ ভিন্ন শেলাই দিয়েই হোক, বোতাম বদলে দিয়েই হোক বা কলারটি উল্টে দিয়েই হোক এমন বদলে দেয় যে যাদের কাছে এগুলো ছিল তাদের ওতে চোখ পড়লেও ওগুলো চিনতে পারবে না কখনো। এই সব সুন্দরীরা থাকে ওপরতলায় আঁজিলব্যার্তের অধীনে—ইনি একজন সম্মানীয়া কর্ত্রী যাকে দেখছেন ওই যে ওখানে টেবিলের সামনে বসে একটি স্থূলকায়, লাল, স্বল্পতম লোকের সঙ্গে।

—এই লোকটির মুখ, বলছেন লা ফঁতেন, অত্যন্ত ভীষণ আর সরল—নির্বোধ দৈত্য লেসত্রিগনদের মত। এও কি আপনার দলের?

—ইনি একজন বাড়ীর বন্ধু, প্যারীর বিচারালয়ে একজন সহায়ক, আমাদের সম্মানার্থে প্রায়ই এখানে আসেন আমাদের সঙ্গে পানে যোগদান করতে। আমাদের ব্যবসায়ে প্রধান বিচারকদের সঙ্গে একটা মধুর সম্বন্ধ তৈরী করতে এর খুব প্রয়োজন। ফাঁসির দণ্ডে দণ্ডিত আসামীদের এই সব লোকেরা রক্ষা করতে পারেন। রাজদণ্ড প্রয়োগ করবার পূর্বে আসামীর ঘাড়ে এক চাপটা চর্বিও এরা লাগাতে পারেন—

—এ-সব ভাববার—গম্ভীর ভাবে বললেন ফঁতেন, তাঁর চোখ দুটি মিট-মিট করছিল, কোথায় এসে পড়ছেন কোন পরিষ্কার ধারণাই করতে পারছিলেন না।

আমাদের মত এমন একটি খোলা ব্যবসায়ে—শুরু করলে কাসকারে, সব কিছুই আমাদের ভাবতে হয় আর সম্ভব হলে সব কিছুর অংশই আমাদের গ্রহণ করতে হয়। কিন্তু মঁসিয়ে, আমার কাব্য-প্রতিভা ছাড়া আরো ভিন্ন সম্পদও আছে—কিন্তু আইন এ গুলোকে ছ্যাঁচড়ামো'র ধারায় ফেলে। কেউ যদি তার শত্রুর ওপর প্রতিশোধ নিতে চান—তবে আমারই কাছে আসেন। আমরা ষাঁড়ের রগের চাবুকের, বেতের অথবা নাকের ওপর সামান্য কয়েকটি ঘুষির—প্রত্যেকটি কাজের জন্য আমরা যথাযোগ্য নিয়ে থাকি। খুন-খারাপী আমরা কখনো করি না, কারণ আমাদের মনুষ্যত্ববোধ আছে—চাতুর্য বা জ্ঞানও।

বেশ সহানুভূতির সঙ্গে খোলামনে কাসকারে বললে: আমার সমস্ত শাসন প্রণালী আপনাকে জানালাম মঁসিয়ে। আমি যে রকম ন্যায্যভাবে পরিচালনা করি তা 'সাতলের' অনেক বিচারককে বা অনেক প্রাদেশিক শাসন কর্তাকে লজ্জা দেবে। আমরা সামাজিকতার ধার ধারি না। আমাদের কিছু কিনতে হয় না কিন্তু আমাদের প্রয়োজনীয় যা কিছু সবই আমরা পাই। আমরা প্যারীতে আছি নেকড়ে যেমন থাকে বনে। আমার দিক থেকে আমি চেষ্টা করি ব্যবসাকে একটু উন্নত করতে সততার দ্বারা। যদিও আমি অনুভব করি একটা বিপদের ভেতর রয়েছি। যা সব সময়ই আমার ব্যবসার পক্ষে ভীতিপ্রদ আর যাকে হেসে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এই বৃহত্তর বিপদ যাতে মৃত্যুর ঝুঁকি আছে চোরদের ব্যবসাকে করে মহত্তর। তাছাড়া স্বেচ্ছাচারকে আমি পছন্দ করি। মঁসিয়ে গাসান্দির'র মতের কিছু ছায়া পূর্বে আমার ছিল কিন্তু তাঁর ঘটনাবলী তুমি ঠেলে এতদূর নিয়ে গিয়েছ যে ভদ্রলোক এতটা অবধি ভাবতে পারেন নি। এই দর্শন আমার অবস্থার সঙ্গে বেশ মেলে আর আমার অবস্থাকে সমর্থন করে। আপনার কি তা মনে হয় না মঁসিয়ে?

—মঁসিয়ে, সব কিছুই নির্ভর করে, সত্যি বলতে অস্ফুট কণ্ঠে বললেন লা ফঁতেন।

তিনি সব কিছুই সমর্থন করলেন; এক আরামদায়ক আলস্য তার চোখ ঢেকে ফেলল। তিনি কাস্তীন আর সিমনেত্তের প্রতি একটু হাসি বিতরণ করলেন। তারা ধীরে ধীরে এগিয়ে এলো আর তাঁকে সপ্রেম দৃষ্টি নিবেদন করল।

—মঁসিয়ে, কাসকার বললে, এই সুন্দরীযুগলের মধ্যে কেউ যদি খুশী করবার জন্য নির্বাচিত হয়—আপনি জানবেন আমরা নীচ ঈর্ষ্যার অনেক ওপরে।

—মঁসিয়ে, জড়িতস্বরে বললেন ফঁতেন—কি করে জানব?

—আপনার তো এর এক সহজ উপায় আছে। কাব্যের আপনি আমার গুরু—আমার রচনা আপনি সংশোধন করবেন।

জাঁ ত লা ফঁতেন ক্যাপ্টেনের গৃহে তিনটি সুন্দর দিন যাপন করলেন। তিনি শয্যা ত্যাগ করতেন বিলম্বে, খেতেন ভালো, পানও করতেন যথেষ্ট আর উপভোগ করতেন তাঁর সঙ্গী অজ্ঞাত দৃশ্যাবলী। যখন সকলে বাইরে বেরিয়ে যেত তিনি কাসকারের কবিতাগুলো সংশোধন করতেন, তার জন্য তিনি নিজে কতকগুলো কবিতাও লিখে দিয়েছিলেন। আর আঁজিসবার্ত নামে একটি মহিলার সঙ্গে কথাবার্তা বলতেন। তাকে তাঁর খুব বুদ্ধিমতী হ'লে মনে হয়েছিল আর অন্য সময় ঘুমিয়েই কাটাতেন।

চতুর্থ দিন দুপুরে তাঁর নির্জন কক্ষে তিনি ছিলেন তন্দ্রামগ্ন। একটি তরুণ উকিল প্রবেশ করল—সাজপোষাক আধুনিক। ছোট একটি টুপী, মাথায় লালচে পরচুলা, ছোট একটি কোট, মস্ত কলার—লম্বা হাতা আর যথেষ্ট পালক যার জন্য তাকে মনে হচ্ছিল একটি পায়রার মত। ধীর যুবক ফঁতেনের দিকে এগিয়ে গিয়ে বললেন :

—ক্যাপ্টেন কাসকারে, নিশ্চয়ই ?

জাঁ মাথা নামালেন—আগন্তুকটিকে প্রতারিত করবার জন্য নয়, তিনি যে আরামদায়ক আমেজের মধ্যে ছিলেন সেই অবস্থায় কথা বলা মাথা নেড়ে না বলা তাঁর কাছে অত্যন্ত অভদ্রতাজনক মনে হ'ল।

তখন তরুণ উকিলটি বললেন সবিস্তারে যে, বিখ্যাত ক্যাপ্টেন কাসকারের কাছে তিনি এসেছেন এইজন্য যে তিনি প্রতিশোধ নিতে চান এক ধনী ব্যক্তির ওপর, যিনি তাঁর প্রণয়িনীকে নিয়ে সরে পড়েছেন। তাকে কিছুটা উত্তম-মধ্যম দিতে হবে আর তার মুখের আকৃতির কিছুটা পরিবর্ত্তন করতে হবে। তার দেখা পাওয়া যাবে এই দিনে, এই স্থানে, এই বাড়ী থেকে বের হ'তে, তা'ছাড়া, বললে উকিলটি, আমি সেখানে কাছেই থাকব। দেখিয়ে দেব আপনাকে বা আপনার নিযুক্ত লোককে—এর জন্য যা প্রয়োজন আমি দেব।

জাঁ ত লা ফঁতেন অর্দ্ধতন্দ্রায় শুধু বললেন—ইতিমধ্যে কথাবার্ত্তায় তিনি কিছুটা সজাগ হয়েছেন :

মঁসিয়ে আমায় যা করতে বলছে—তা অত্যন্ত নীচ। আমি ও-সব কিছু করতে পারব না। ধনী যুবকটি খুব রেগে উঠতে যাচ্ছিল কিন্তু কাসকারের মত লোকের সঙ্গে ছোরা নিয়ে যার কারবার—ঝগড়ার বিপদের কথা ভেবে শান্ত হ'ল।

একটু অভিভূত হয়ে জাঁ ত লা ফঁতেন বললেন : বাপু, আমি তোমার ব্যথা বুঝতে পারছি। কিন্তু যখন তুমি গোলকুণ্ডার রত্ন আমাকে দিতে চাও, তুমি আমাকে দিয়ে যা করাতে চাও তা করাতে পারবে না। অত্যাচার আমার স্বভাব নয় আর তাছাড়া প্রেমের ব্যাপার নিয়ে।

—যদি প্রয়োজন হয়, নবীন যুবকটি বললে, আমি ষাট মুদ্রা পর্য্যন্ত উঠতে রাজী।

—কিন্তু জাঁ তার কথায় কর্ণপাত না ক'রেই বলতে আরম্ভ করলেন : তোমার উদ্দেশ্য, যদিও এর ভেতর সাহস বা বিশ্বস্ততা কিছুই নেই, আমার মনে হয় অত্যন্ত যুক্তিহীন। আমিও কখনো কাউকে ভালোবেসেছি নিজে কারো ভালোবাসা না পেয়ে। আমি আশ্রয় নিয়েছি তখন মদ, নিদ্রা অথবা দ্বিতীয় প্রেমের। আমি যেমনটি করেছি, করো। হৃদয়কে বাধ্য করা যায় না। তোমার প্রণয়িনীকে দেখবার সৌভাগ্য আমার হয় নি। কিন্তু আমি নিঃসন্দেহ যে, এই সুন্দরীটি তোমাকে ছেড়ে অন্য এক ব্যক্তিকে পছন্দ ক'রে একটি দুর্দমনীয় বৃত্তির কাছে নতি স্বীকার ক'রেছে। যদি সে তোমার প্রতিদ্বন্দ্বীকে সত্যি সত্যি ভালোবেসে থাকে, আমার মনে হয় সে শুধু ক্ষমাই নয়—আকর্ষণীয়ও। বরং তুমি তাকে তার আন্তরিকতার জন্য তাকে প্রশংসা করতে বাধ্য। যদি তাকে তোমার প্রণয়িনী ভালোবেসে থাকে—হয়তো সে একজন হৃদয়বান ব্যক্তি অথবা তার আছে প্রচুর অর্থ। নিজেকে বলতে পারো সে অহঙ্কারী, সে তোমার যোগ্য ছিল না। নিজেকে সান্ত্বনা দেবার যুক্তির কখনো অভাব হয় না, যদি জানো তার প্রয়োগ। তা ছাড়া, তুমি যুবক, সমর্থ, ভদ্রভাবে সজ্জিত, আর আমি লক্ষ্য করেছি তুমি বুদ্ধিমানও—তুমি সহজেই অন্য যে কোন সুন্দরীর ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারবে যে তোমার এ-ক্ষতি পূরণ করতে পারবে। তুমি কখনো মনে ক'রো না যে নতুন ক'রে ভালোবাসা আর তোমার পক্ষে সম্ভব নয়। নতুনেরাও আমাদের প্রায় একই আনন্দ দেবে—তীব্র কিন্তু ক্ষণিক আমাদের কল্পনাই তা বাড়িয়ে তোলে ক'রে তোলে সূক্ষ্মতর রম্যতর, বিচিত্রতর আশা আর স্মৃতি দিয়ে—তোমার মত যুবকের পক্ষে এটা একটা বাধা নয় আর তা হয়ই যদি তার সমাধানও দূরে নয়। যাও যাও আর কথা নয়, আর বিরক্ত করো না আমাকে, অনেক কাজ আছে আমার আজ। দরজার দিকে সস্নেহে ঠেলে দিলেন যুবকটিকে। হতবুদ্ধি হ'য়ে গেল সে একটা ডাকাতের আড্ডায় এতটা সুমিষ্ট ব্যবহার আর নিস্পৃহতা দেখে, কিছুটা খুশীও হ'ল তার শেষের কয়েকটি কথায়। পেল যথেষ্ট সান্ত্বনা।

কিন্তু জাঁ ত লা ফঁতেন যেমন তাঁর আসনের দিকে যাবেন ধাক্কা লাগল কাসকারের সঙ্গে। অপেক্ষা করছিলেন তিনি, বাহু দুটি ছিল আড়াআড়ি ভাবে ভাঁজ করা।

মঁসিয়ে, ক্যাপ্টেন বললে, অত্যন্ত গম্ভীর স্বরে আমি—ওপরের সিঁড়িতে ছিলাম আপনাদের কথাবার্তা সব শুনেছি। আপনাকে আমাদের বন্ধু বলে মনে করেছিলাম আর আপনার জন্য আজ ষাটটি মুদ্রা হারালাম।

মঁসিয়ে, উত্তর দিলেন ফঁতেন, আমি যাচ্ছি, এনে দিচ্ছি আপনার ষাটটি মুদ্রা। তাকে একটি দীর্ঘ অভিবাদন করে তিনি বেরিয়ে গেলেন। তিনি সোজা তাঁর বাড়ীতে এসে ষাটটি মুদ্রা নিলেন থলে থেকে, ভাগ্যক্রমে সেটি বেশ ভারীই ছিল তারপর কাসকারের বাড়ীর পথে বেরিয়ে পড়লেন। কিন্তু পথে দেখা হ'ল এক বন্ধুর সঙ্গে, তাকে নিয়ে হল নৈশভোজন অতঃপর নাট্যালয়ে। পরদিন অনেক বেলা অবধি ঘুমোলেন, তারপর বুলোইফ-এর বনে ঘুরে বেড়ালেন। পরদিন তিনি যাত্রা করলেন র‍্যাঁ সহরে তাঁর বন্ধু মোক্রয়ার কাছে কাটালেন দু'-সপ্তাহ এ রকমটা চলল কিছুদিন ধরে। প্রায় তিন মাস পরে তিনি এসে উপস্থিত হলেন ক্যাপ্টেন কাসকারের গৃহে।

মঁসিয়ে এই যে আপনার মুদ্রা, আপনার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম কয়েক দিন পূর্বে।

—আমি আপনার জন্য বসে নেই—অত্যন্ত শুষ্কস্বরে বললেন কাসকারে।

—আমার কোনো খারাপ মতলব আছে বলে মনে করেছেন?

কাসকারে তখন ভাণ পরিত্যাগ করলেন।—আর আপনি, আপনি ভেবেছেন মঁসিয়ে—মঁসিয়ে নয়, আমার গুরু, আমার বন্ধু, আপনার কথা অবিশ্বাস করব? আপনি কি সত্যিই মনে করেন, এই মুহূর্তে আমার হৃদয় এত নীচ যে এই হীন মুদ্রা গ্রহণ করব? এটা ঠিক যে, আমাকে অসুবিধায় ফেলেছিলেন আর তা আপনার সহৃদয়তার মহানুভবতার জন্য তার কিছুটা মর্য্যাদা আমি রক্ষা করতে চাই। আপনাকেই কি আমি কোনো অসুবিধায় ফেলিনি? আমার সামান্য গানগুলোতে এখানে ওখানে আপনার অপূর্ব পদ বসিয়ে দিয়েছেন। অত্যন্ত নীচ আত্মা আমি যদি আমার থলেতে ভরি—ওই মুদ্রা নিঃসন্দেহে যা আপনারই প্রতিভার পুরস্কার। না, না, জাহান্নামে গেলেও নয়, তবে আপনি যদি চান তবে এই সব সহজ সরল লোকদের সঙ্গে একত্রে আহার ও পানের ব্যবস্থা করি।

সমস্ত বাড়ীটি হ'ল উৎসবমুখর জাঁ দ্য লা ফঁতেনের উদ্দেশ্যে। আরও দুদিন ও বাড়ীতে না থেকে পারলেন না। প্রত্যেকে তাঁকে দিল আলিঙ্গন, জানাল সমাদর, মাঝে মাঝে আসবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তবে পেলেন ছাড়া। তিনি পরে বার কয়েক ওখানে গিয়েছিলেন।

অনুবাদক—শ্রীরবি গুপ্ত

ঢাকাই মসলিন

শ্রীভাগবতদাস বরাট

ঢাকাই মসলিন আজ লুপ্তপ্রায়। তাই তার প্রসিদ্ধির কথা আমাদের কাছে কিংবদন্তীরই রূপান্তর। এই লুপ্তপ্রায় শিল্পের গৌরবগাথা ও খ্যাতি আজও বাংলার জনমানসে সমুজ্জ্বল। বর্ত্তমান যন্ত্রযুগেও তদানীন্তন মসলিন বস্ত্রের কাটুনি তাঁতিদের স্বভাবজাত বৈজ্ঞানিক প্রতিভা প্রকৃতই বিস্ময়কর ও বিস্ময়বস্তু উল্লেখযোগ্য।

অধুনা কাপড় বুননের কারখানায় কৃত্রিম উপায়ে যে আর্দ্রতার সৃষ্টি করা হয়, অতীতের এই সব বয়ন-শিল্পীদেরও কাপড় বুনন স্থানে বায়ুর আর্দ্রতা রক্ষা করা হত। সুতরাং এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, আগেকার দিনে মসলিন বয়ন-শিল্পীদেরও বৈজ্ঞানিক জ্ঞান যথেষ্ট ছিল। তারা জানত যে, আবহাওয়ার উপরই সূতার সূক্ষ্মতা ও দীর্ঘতা নির্ভর করে। সেই জন্য ঢাকার কাটুনিরা উষাকাল হতে সকাল ন'টা পর্য্যন্ত এবং বিকাল চারটা থেকে সন্ধ্যাকাল পর্য্যন্ত সূতা কাটত। কারণ, দুপুরের খর রৌদ্রের উত্তাপে বায়ুর আর্দ্রতা থাকে না। সেই সময় সূতা কাটলে সূতা কেটে টুকরো টুকরো হ'য়ে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। এ তথ্য তাদের জানা ছিল। আবার গ্রীষ্ম-প্রান্তে যখন আবহাওয়া সূতা কাটার উপযোগী থাকত না, সেই সময় কাটুনিরা একটি সমতল পাত্রে কিঞ্চিৎ পরিমাণে জল রেখে তার মধ্যে টোকাটি স্থাপন করে সূতা কাটতে সুরু করত। কাটুনিদের এই উদ্ভাবিত বৈজ্ঞানিক পন্থায় জল থেকে যে বাষ্প উঠত, তাতেই সূতা কাটার স্বল্পায়তন স্থানে বায়ুর আর্দ্রতা রক্ষা হত। ফলে সূতা কাটার অনুকূল অবস্থাও সংরক্ষিত হ'ত।

এই সব কাটুনিরা অধিকাংশই ছিল হিন্দু ললনা। তাদের বয়স ছিল ত্রিশ বৎসর বা তদপেক্ষা নিম্ন। সূক্ষ্ম সূতা কাটায় তারা ছিল অভিজ্ঞ। সূতা কাটার অবসর সময়ে তারা গৃহস্থালী কাজ-কর্ম্মে লিপ্ত থাকত। সুতরাং আলস্য যে কা'কে বলে, তা তারা জানত না। সূক্ষ্ম সূতা কাটতে ও তুলার পাঁজ তৈরী করতে তাদের ধৈর্য্যও ছিল অপরিসীম। এই সব কাটুনি স্ত্রীলোকদের তুলা চিনবার দক্ষতাও প্রশংসনীয়। জলীয় আবহাওয়ায় যে তুলার আঁশ সামান্য সামান্য স্ফীত হয়ে উঠত, সেই তুলাই তাদের মতে সূতা কাটার পক্ষে উৎকৃষ্ট বলে বিবেচিত হ'ত। দীর্ঘ বৎসরের কর্ম্মতৎপরতা ও বংশানুক্রমিক সঞ্চিত অভিজ্ঞতা থেকে তাদের এই জ্ঞান লাভ হয়েছিল। কোন পাঠ্য-পুস্তকের সহায়তায় বা কোন ব্যক্তিবিশেষের শিক্ষা-দীক্ষা থেকে তাদের এ-হেন সুদৃঢ় অভিজ্ঞতা অর্জ্জিত হয় নি।

বোয়াল মাছের চোয়াল, চালতা কাঠের তক্তা, লোহার একটা হুক্‌, ছোট ধুনুনি, কাষ্ঠনির্ম্মিত বেলন, নল খাগড়া ও কুচে মাছের মসৃণ নরম চামড়া; এই ছিল তাদের তুলা বীজ থেকে আঁশ বিচ্ছিন্ন করবার এবং আঁশগুলি পিঁজে পাঁজ-তৈরী করবার নিতান্ত নগণ্য যন্ত্রোপকরণ। আর কাটুনির যন্ত্রপাতির মধ্যে ছিল,—পুনি, টেকো, ঝিনুক ও চা-খড়ির গুঁড়ো। এই সব অপকৃষ্ট ও অতি সাধারণ বস্তু-সমূহের সাহায্যে গৃহস্থ ঘরের কুলবধূরা তৎকালে বয়নশিল্পে এক নব যুগের প্রবর্ত্তন করেছিল।

তাঁতিরা বস্ত্র বয়ন-কালে টানার সূতার নীচে এক অগভীর পাত্রে জল ঢেলে রাখত। সেই জল থেকে যে বাষ্প উঠতো, তাতেই বয়নের সূতাগুলি আর্দ্র হ'ত। ফলে বয়নকালে সূতা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হত না। ঢাকার তাঁতিরা তাদের সূক্ষ্ম স্পর্শজ্ঞান দ্বারা সূতার সূক্ষ্মতা নির্ণয় করতে পারত। ওজন সম্পর্কেও তাদের সূক্ষ্মানুভূতি ছিল। জমিতে এক হাত পরিমিত ব্যবধানে দু'টি বাঁশের কঞ্চি পুঁতে তার মধ্যে অতি সতর্কতার সঙ্গে তারা সূতা জড়াত। এই ছিল তাদের সূতা ওজন করবার পদ্ধতি বা কৌশল। তারা জানত যে, এক শ' পঞ্চাশ হাত দীর্ঘ মসলিনের ওজন সাধারণতঃ এক রতি। এক রতির ওজন প্রায় দু' গ্রেণ। ওজন করে দেখা গেছে যে, এক পাউণ্ড সূতা বিস্তার করলে পঁচিশ মাইল লম্বা হয়। সহজাত বুদ্ধির থেকেই তাদের এই জ্ঞান জন্মেছে।

এই সব হিন্দু-তাঁতিদের দেহের গঠন ছিল দীর্ঘ ও কোমল। দেহের এই বৈশিষ্ট্যের মধ্যে তাদের বয়ন-শিল্পের অসাধারণত্ব নিহিত ছিল। দীর্ঘ কোমল অঙ্গুলি, আজানুলম্বিত বাহু, দেহপেশী সঞ্চালনে অসামান্য ক্ষমতা, অতি সূক্ষ্ম বস্ত্র বয়নের উপযোগী ছিল। স্থৈর্য্য ও ধৈর্য্য সহকারেও বস্ত্রের তারতম্য অনুসারে এক একখানি মসলিন বুনতে তাদের বিশ দিন থেকে ষাট দিন পর্য্যন্ত সময় লাগত। আধখানা মখমল থান, যার দাম তখনকার দিনে ষাট টাকা থেকে

আশী টাকা পর্য্যন্ত ছিল, তা বুনতে তাদের অন্যূন পাঁচ-ছ'মাস সময় লাগত। বিশ্বের বয়ন-শিল্পের এই অপ্রতিদ্বন্দ্বী কারিগরেরা দেহে ও মনে একান্ত ভাবে ছিল কারু-শিল্পী। শ্রেষ্ঠ শিল্প-প্রতিভার তারা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। দরিদ্র হয়েও তারা অর্থলোভী ছিল না। নিকৃষ্ট জাতীয় বস্ত্র বয়ন করে, তাদের প্রতিভাকে নিস্তেজ করে দিয়ে, নিজের সুনাম ও যশ খুইয়ে পয়সা রোজগারের প্রবৃত্তি তাদের মনে কোন দিনই জাগে নি। সন্ধ্যাশিশির, সরকারালী, তৃণজেব, নয়নসুখ, বুদ্বুনখান, কুসীম, ঝুনা, রঙ্গ, তুরুণদম প্রভৃতি বিভিন্ন মসলিনের নামের মধ্যেও যেন তাদের শিল্পিমনের পরিচয় অজ্ঞাতে প্রকাশ পাচ্ছে।

ঢাকাই তাঁতিদের এই অসাধারণ শিল্পপ্রতিভার প্রভাব কয়েক শতাব্দীব্যাপী সমগ্র বিশ্বে অলন্ত জ্যোতিষ্কের ন্যায় প্রতিভাত ছিল। ইংলণ্ডের যন্ত্রে তৈরী বস্ত্রের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করেও এই কারু-শিল্পী তন্তুবায়গণ নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের গৌরবে সমাসীন ছিল। কিন্তু বৃটিশ সরকারের অপকৌশলে এই শিল্প ধীরে ধীরে ক্ষয় পেতে থাকে। তার পর এই শিল্পিগোষ্ঠী লুপ্তপ্রায় হয়ে যায়।

অনন্তের চোখে

শ্রীঅলোক

'অনন্ত' অর্থাৎ সান্তের মধ্যে যে অনন্ত। যেমন শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীচৈতন্য, যীশুখৃষ্ট।

ঐহিক মানুষের চোখে সংশয় যেমন দেখা যায়, 'অনন্তের' চোখেও কি সেইরূপ?

সেইরূপ নিশ্চয় হইতে পারে না, কেন না, উভয়ের দৃষ্টিকোণ বিভিন্ন। গভীর জলচারী মৎস্যের পক্ষে সমুদ্র যেমন দেখা যায়, আকাশ হইতে তাহা নিশ্চয়ই বিভিন্ন দেখা যায়।

বিভিন্ন যে দেখা যায়, তাহার প্রমাণ আছে—শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীচৈতন্য, যীশুখৃষ্টের কথায়, আচারে ও ব্যবহারে।

মাষ্টার গিয়াছেন শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত দেখা করিতে। শ্রীরামকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—তোমার পরিবারটি কেমন? মাষ্টার উত্তর দিলেন,—আজ্ঞে ভাল, তবে বড় অজ্ঞান।

মাষ্টার নিশ্চয়ই 'অজ্ঞান' কথাটা নিজের তুলনায় ব্যবহার করিয়াছিলেন। তিনি নিজে শিক্ষিত, অতএব 'জ্ঞানী', তাঁহার স্ত্রী অশিক্ষিত, অতএব 'অজ্ঞান'।

ঐহিক লোকের চোখে মাষ্টারের কথায় ভুল ধরিবার বিশেষ কিছু নাই। শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রই তাঁহাদের অশিক্ষিত পত্নী যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাংসারিক জ্ঞান-বুদ্ধিহীন, তাহার অজস্র অভিজ্ঞতা প্রতিনিয়ত লাভ করিয়া থাকেন।

কিন্তু মাষ্টারের কথায় ত্রুটি তৎক্ষণাৎ ধরা পড়িল অনন্তের চোখে। শ্রীরামকৃষ্ণ সবিদ্রূপে উত্তর করিলেন,—'আর তুমি বুঝি খুব জ্ঞানী?'

শ্রীরামকৃষ্ণের দৃষ্টিতে শিক্ষিত মাষ্টারের 'জ্ঞান' ও তাঁহার অশিক্ষিত পত্নীর 'অজ্ঞান' তুল্যমূল্য বিবেচিত হইল।

ঐহিকের চোখে যে পার্থক্য চিরকাল বর্ত্তমান থাকিবে, যে পার্থক্যে আমরা দৈনন্দিন জীবনে প্রতিনিয়ত অনুভব করিতে অভ্যস্ত,—অনন্তের চোখে সে পার্থক্য বিলুপ্ত।

একজন দেশবরেণ্য ব্যক্তি সুখের সাগরে লালিত-পালিত হইয়াছেন। ঐহিক সকল সুখভোগে তিনি অভ্যস্ত। উপযুক্ত সময়ে তিনি ভগবানের চরণে মন সমর্পণ করিলেন। তাঁহার এই কার্য্য প্রেয়ের মধ্যে থাকিয়া শ্রেয়ঃকে বরণ, দেশবাসীর নিকট শ্লাঘ্য ভাবেই বরণীয়। ঐহিকের চোখে, 'ন জাতু কামঃ কামানাম্ উপভোগেন শাম্যতি।' জাগতিক এই সত্যের ঊর্দ্ধে যিনি উঠিয়াছেন, তাঁহার স্থান জগতের চক্ষে স্বভাবতঃ অনেক ঊর্দ্ধে।

এই মহৎ কার্য্য অনন্তের চোখে কিরূপে প্রতিভাত হইল? যতদূর ভোগ করবার তা তো হ'ল, এখন ঈশ্বরে মন না দেবে তো কখন আর দেবে? ভোগ অধিকাংশ জীবনের সাধন ও লক্ষ্য। সুতরাং এই ভোগ আয়ত্তের মধ্যে পাইয়াও যে তুচ্ছ করিতে পারে, সাংসারিক নিয়মের নিকট সে সুমহান।

অনন্তের চোখে কিন্তু ভোগ মুমুক্ষুত্বের পূর্ব্বেকার অবস্থা মাত্র। ভোগ অপূর্ণ থাকতে মুক্তির ইচ্ছা হয় না, ঈশ্বরে মন যায় না, সুতরাং ভোগ যাহার পূর্ণ হইয়াছে, সে ঈশ্বরকে ডাকিবে না তো কে ডাকিবে? যাহার ভোগ পূর্ণ হয় নাই সে? সুতরাং ঐহিকের চক্ষে যে কার্য্য সুমহান্, অনন্তের চোখে তাহা নিম্নশ্রেণীর পাঠার্থীর পাঠ পূর্ণ হওয়াতে উচ্চশ্রেণীতে পাঠারম্ভ মাত্র, বিশেষ কিছু গরিমার কার্য্য নয়।

ঐহিক চোখে ও অনন্তের চোখে একই বস্তুবিচারে, একই বিষয়ের মূল্যমান নির্ণয়ে, এই গুরুতর প্রভেদ, এই অসীম পার্থক্য।

মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রভেদ চিরকাল আছে ও থাকিবে। মানুষে মানুষে এই পার্থক্য ক্ষেত্রবিশেষে হস্তী ও পিপীলিকার পার্থক্যের সহিত তুলিত হইয়াছে। অর্থের ক্ষেত্রে, মান, সম্ভ্রম, বিদ্যা, বুদ্ধি, যশঃ প্রতিপত্তি, প্রভৃতি সহস্র ক্ষেত্রে এই পার্থক্য বর্তমান। এই পার্থক্যের ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত উচ্চস্তরের ব্যক্তির ব্যবহার তাহার নিম্নস্তরের ব্যক্তির প্রতি অনুকম্পা মিশ্রিত হয়। অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরের ব্যক্তি উচ্চস্তরের ব্যক্তির প্রতি সসম্ভ্রম ব্যবহার করেন। অনেক ক্ষেত্রে উচ্চশ্রেণীর ব্যবহারের সহিত মিশ্রিত থাকে দর্প, ও অহঙ্কার, নিম্নশ্রেণীর প্রতি অবজ্ঞা। নিম্নশ্রেণীর ব্যবসায়ের সহিত মিশ্রিত থাকে উচ্চশ্রেণীর প্রতি ঈর্ষ্যা, ও হিংসা।

অনন্তের চোখে এই উচ্চ নীচ মানব-সমাজ কিরূপে প্রতিভাত? মনুমেণ্টের নীচে যতক্ষণ থাক, ততক্ষণ গাড়ী, ঘোড়া, সাহেব, মেম এই সব দেখা যায়। উপরে উঠলে কেবল আকাশ, সমুদ্র ধূ-ধূ করছে। বাড়ী ঘোড়া গাড়ী এখন ভাল লাগে না, পিপড়ের মত দেখায়।

আমাদের ঐহিক মানবের দৃষ্টিভঙ্গি হইতে অনন্তের দৃষ্টিভঙ্গির কি গভীর পার্থক্য! ঐহিক জগতে যাহা চিরন্তন, দৈনন্দিন, নিষ্ঠুর সত্য, যাহা সমস্ত সামাজিক অশান্তি ও শ্রেণীসংগ্রামের মূল, অনন্তের চোখে তাহা তুচ্ছাতিতুচ্ছ; সব পিপড়ের মত দেখায়, শ্রেণীবিভাগ সেখানে অবলুপ্ত।

৺রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের অপ্রকাশিত চিঠি

(স্বর্গত শিশিরকুমার চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত)

১

1 Wood Street, কলিকাতা।

৬—১১—১৯৪০।

কল্যাণীয়েষু—

তোমার চিঠি পাইয়াছি! 'গ+++'কে বলিবে, সব জমির ও সব বাড়ীরই জল বাহির হইবার পথ থাকে। আমার বাড়ীর জমিটার সদর সরকারী রাস্তার দিকটা উঁচু, পেছনের দিকটা নীচু। নীচু পেছনের দিক দিয়াই জল বাহির হইত; উঁচু দিক দিয়া জল বাহির হয় না, কখনও হইত না।

বাড়ীর একটা switch board টানিয়া তার বাহির করিয়া ফেলিয়াছিল, লিখিয়াছিলে। তাহা সারাইয়া দিবে ত?

অক্টোবর মাসের ভাড়া যদি পাইয়া থাক এবং পদুকে * এখনও না দিয়া থাক, তাহা হইলে এখন ১০।১৫ দিন হাতে রাখিও। ঐ টাকাটা আমার দরকার হইতে পারে।

বাড়ীর কোথায় উই লাগিতেছে, তাহা ঘন ঘন দেখিও।

ব্রহ্মমন্দিরের জমিটির দেওয়াল দিবার কথা ভুলি নাই। এখন যুদ্ধের জন্তে অনেকের আয় কমিয়াছে এবং বীরভূম, মেদিনীপুর প্রভৃতি কয়েকটা জেলায় দুর্ভিক্ষ হইয়াছে। বাঁকুড়ারও কোন কোন অংশে দুর্ভিক্ষ হইতে বসিয়াছে। এখন সামান্ত চাঁদা তুলাও কঠিন! এইজন্য দেওয়ালটা আরম্ভ করিতে বলি নাই। উহার জন্য মোটে ২৫৲ টাকা আমার হাতে আছে। চাঁদা তুলিয়া যে কাজ করা হয়, তাহা খুব সাবধানে করা দরকার। নানা লোকে নানা কথা বলে। একজনকে বলিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন, '২০০৲ টাকা বড় বেশি। অত খরচ উহাতে হইতে পারে না।' আমি সুযোগ বুঝিলেই কাজ আরম্ভ করাইব।

Cess Revaluation Office আর কয় মাস থাকিবে, তাহা জিজ্ঞাসা করিও। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী

—শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

২

1 Wood Street, Park Street P. O.

কলিকাতা। ১৮—৫—১৯৪০।

কল্যাণীয়েষু—

আমার ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা হওয়ায় দুর্ব্বল হইয়াছিলাম। দুর্ব্বলতার মধ্যেই অনেক কাজ করিতে হইয়াছে ও হইতেছে। কিন্তু সারিয়া উঠিতেছি। এখন কোন উপসর্গ নাই।

লাবণ্যকে* চিঠি লিখিব। সে আমার একটি ফোটো চাহিয়াছিল। তাহা আমার কাছে না থাকায় তাহাকে চিঠি দি নাই। পরে লিখিব। বিশিগুা বাঁকুড়া হইতে কত দূর? বরাবর পাকা রাস্তা আছে কি?

ড্রাফটটি পাইলাম। মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স দেওয়া হইয়া গেলে রসিদ পাঠাইয়া দিও।

১৩৪৬ চৈত্রের চেয়ে ১৩৪৭ বৈশাখের কাগজ কলিকাতায় বেশী বিক্রী হইয়াছিল। জ্যৈষ্ঠের কাগজ বৈশাখের চেয়েও এ পর্য্যন্ত ১৩৮ খানা বেশী বিক্রী হইয়াছে। ইহা কলিকাতার নগদ বিক্রী। আমাদের কাগজ সব মাসিকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তাহা বুঝিবার মত জ্ঞান ও শিক্ষা চাই। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবি ও লেখক রবীন্দ্রনাথ ইহাতে যত লেখেন অন্য কোন কাগজে তত লেখেন না।

"ভারত" এখন কত যাইতেছে?

গৌরীকে† তাহার চিঠি দিয়াছি। ইতি।

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

৩

ওঁ

6, Rawdon street, কলিকাতা।

৩-১২-১৯৪১।

কল্যাণীয়েষু—

তোমার ২রা তারিখের পোষ্টকার্ড পেলাম।

কাল রাত্রে তোমাকে একটা পোষ্টকার্ড লিখেছি।

আমি আর কখনও সুস্থ হ'ব কিনা বিশেষ সন্দেহস্থল। না হবারই সম্ভাবনা বেশী।

আমি বিষ্ণুপুর থেকে ১৫ই রাত্রে বাঁকুড়া পৌঁছিব এবং ১৬ই সেখানে নিশ্চয় থাকব। ১৭ই দুপুরের ট্রেণে চলে আসব। এর মধ্যে তুমি খান মাড়িয়ে ফিরে আসতে পারবে। ব্রহ্মমন্দির প্রভৃতি দেখতে হবে। ইতি। শুভানুধ্যায়ী।

—রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

---

* শ্রীসন্তোষকুমার চট্টোপাধ্যায় (ডাকনাম পদু)

* শ্রীমতী লাবণ্যপ্রভা দেবী (৺শিশিরকুমার চট্টোপাধ্যায়ের প্রথমা কন্যা)

† শ্রীগৌরীকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

৪

I Wood Street, Park Street P. O. কলিকাতা।

১৪-১২-১৯৩১।

কল্যাণীয়েষু—

তোমার চিঠি আজ সন্ধ্যার সময় পেয়েছি।

কাল থেকে তোমাকে "ভারত" পাঠাবার জন্যে এইমাত্র টেলিফোনে মাখন* বাবুকে জানালাম। অন্যান্য কথা পরে তাঁহাদের লোককে জানাব।

তুমি লিখেছ যে ভারতে বাজারদর থাকে না, কিন্তু আমি দেখলাম আজকার কাগজে রয়েছে।

খবর অন্য কাগজেও কোন কোনটা দেরিতে কোনটা বা আগে বাহির হয়। "ভারত" কাগজের কাট্‌তি বাড়ায় উহা রাত্রে অনেক আগে ছাপা আরম্ভ করতে হয়, নইলে সকালে ফেরিওয়ালাদিগকে যথেষ্ট কাগজ দেওয়া যায় না। "রোটারী" মেশিন হ'লে শেষ রাত্রে ছাপা আরম্ভ করলেও চলবে। কিন্তু যুদ্ধের জন্যে এখন রোটারী আনান অসম্ভব! সকাল সকাল ছাপা আরম্ভ করতে হয় বলে, একটু বেশী রাত্রে যে সব খবর আসে, তা পরের দিনের "ভারতে" বেরয় না, একদিন পরে বেরয়। তা ছাড়া, কোন কোন রকম খবর কম থাকে বটে; তেমন অনেক বক্তৃতা প্রভৃতি যা অন্য কাগজে থাকে না বা পরে প্রকাশিত হয়, তা ভারতে থাকে।

বাংলাদেশে ও ভারতবর্ষে খুব দলাদলি আছে। সেই জন্যে কেউ গান্ধীভক্ত, কেউ বা তাঁর উপর বিরক্ত। সবাইকে খুশি করা অত্যন্ত কঠিন—অসম্ভব বললেও চলে।

আমাদের প্রেসে এখন বড় কাজের ভিড়। সেজন্য এখন বিল ছাপানো বড় মুস্কিল।

আমি কাল মেদিনীপুর যাব, ১৯শে বিষ্ণুপুর যাব, ২২শে শান্তিনিকেতন যাব।

"ভারত" কাগজে আমার কোন স্বার্থ নাই। কেদারও* কিছু পায় না। দেশের কাজ বলে ওর ভাল চাই।

ইতি—

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

পুঃ—আমি ১৬ই ১৭ই মেদিনীপুরে থাকব, ১৯শে বিষ্ণুপুরে এবং ২২শে থেকে ৩১শে শান্তিনিকেতনে। র, চ,

কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের অপ্রকাশিত পত্রাবলী

[এই চিঠিগুলিতে কর্মী সুকান্তর সর্বদা ব্যস্ত উদ্যোগী স্বরূপের খানিকটা পরিচয় পাওয়া যাবে। এ চিরকুটগুলির কোনটি হয়তো পত্রগ্রহীতাকে বাড়িতে না পেয়ে চাপা দিয়ে রেখে গেছে টেবিলে, কোনোটি তাড়াতাড়ি লিখে পাঠিয়েছে কারো হাতে। কয়েকটি বা কার্ডে লিখেছে, দূর থেকে। কবিতা আর কর্ম এ দুয়েরই মূল্য ছিলো তার কাছে সমান। একবার চূড়ান্ত দৈহিক অসুস্থতার সময়ে কোনো কারণে কারো পত্রে একটু ক্ষুব্ধ হ'য়ে লিখেছিলো: আমার কবিসত্তা অভিমান করতে চায়, কর্মী-সত্তা চায় আবার উঠে দাঁড়াতে, এই দুই সত্তার দ্বন্দ্বে মনে হয়, কর্মীসত্তাই জয়ী হবে। আর এই কর্মী-সত্তারই জয় ঘোষণা সে করে গেছে চরম ভাবে অপারগ হ'য়ে পড়ার জীবনের শেষ মুহূর্তটি পর্যন্ত।—চিঠিগুলি অরুণাচল বসুকে লিখিত।]

শ্যামবাজার

২১, ১২, ৪৩

অরুণ!

আমি এখনো এখানেই আছি। অথচ আমি কেমন আছি এই খবরটা নেবার যে তোর দরকার হয় না, এইটাই আমাকে বিস্মিত ক'রেছে। যদিও বুঝি যে এর পেছনে রয়েছে তোর Duty'র প্রতিকূলতা। (তোর কোনো অসুখ হয়নি তো?) তাই তোর এ ঔদাসীন্যকে সহজেই ক্ষমা করা যায়।

যাই হোক, কাল (২২, ১২, ৪৩) তুই তোর 'Duty' ৩ টেয় শেষ ক'রে অন্যান্য কাজ আধ ঘণ্টায় সেরে ৪ টের মধ্যে এখানে আসবি গাড়ি চেপে। সঙ্গে Govt. Art school এ Exhibition দেখতে যাবার মতো গাড়ি ভাড়াও আনিস। তোর অসুখ না হয়ে থাকলে আশা করি আমার এ অনুরোধ পালিত হবে।

—সুকান্ত

কলকাতা

২, ২, ৪৫

অরুণ!

কাল-পরশু-তরশু যেদিন হয় শৈলেনের কাছ থেকে সংস্কৃত নোটখানা নিয়ে বেলা পাঁচটার মধ্যে আমার সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করিস। বেলেঘাটার···দের কি বক্তব্য জেনে আসিস, আমি তা কৈফিয়ৎ দেবার চেষ্টা করবো। দেখাটা ৪-৫ টার মধ্যে হ'লেই ভালো হয়। মনে রাখিস, অন্যথা অক্ষমণীয়।—সুকান্ত।

অরুণ!

মনে আছে তো আজ কিশোর-বাহিনীর শারদীয় উৎসব অশোক যেতে চায়, ওকে নিয়ে তুই চারটের মধ্যে ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন হলে পৌঁছুস, আমি একটু ঘুরে যাব কিনা।

—সুকান্ত

* শ্রীমাখনলাল সেন (সম্পাদক, "ভারত")।

* শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদক, "প্রবাসী" "Modern Review" রামানন্দ বাবুর জ্যেষ্ঠপুত্র)।

২১।৭

অরুণচন্দ্র !

কলকাতায় এতো কাণ্ড, এতো মিটিং অথচ তোর পাত্তা নেই, বাড়িতে এসে দেখি সেখানেও নেই, পাত্তাটা কোথায় মিলবে ?

...আগামী বুধবার এখানে আসতে রাজি হ'য়েছে। তার জন্য আয়োজন করতে থাক, আমার তাড়া থাকায় আমি চললাম।

২—৪৫ মি: —সুকান্ত

দুপুর ২১।১।১৯৪৫

৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৪৫
সকাল

অরুণ !

আমি পরশু জামবাজার যাচ্ছি। কাজেই দু'-একটা কাজের ভার তোকে দিচ্ছি, আগামী কাল রাত্তিরের মধ্যে কাজগুলো ক'রে তুই আমার সঙ্গে নিশ্চয়ই কাল দেখা করবি। কাজগুলো হচ্ছে :—

১। ...র কাছ থেকে 'খবর' ইত্যাদি কবিতাগুলো জোর ক'রে আদায় ক'রে আনবি।

২। দেবব্রত বাবুর কাছ থেকে আমার ছড়ার বইয়ের পাণ্ডুলিপি যে ক'রে হোক সংগ্রহ ক'রে আনা চাই।

৩। যে জিনিসটার জন্যে তোকে নিত্য তাগাদা দিচ্ছি পারিস তো সেটাও আনিস।

কাজগুলো খুব জরুরী। যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব ওপরের তিন দফা জিনিসগুলো হস্তগত ক'রে আমার সঙ্গে দেখা করবি। অনেক সুখবর আছে। —সুকান্ত

বুধবার
সকাল ১০টা

অরুণ !

তোকে কাল যে ওষুধটা পাঠিয়েছি ভাত খাওয়ার পর দু'চামচ ক'রে খাচ্ছিস তো ? ওটা তোর পক্ষে অমোঘ ওষুধ। দিন তিনেকের মধ্যেই জ্বর বন্ধ হ'য়ে যাবে আশা করছি।

তোর কথা মতো তোর জন্যে দু'খানা টিকিট এনে ফেলেছি। তা'ছাড়া আরো দু'টো টিকিট এনেছি...এবং তোর ভক্তদের কাছে বিক্রী করার জন্যে। টিকিট চারটে পাঠালাম (দাম প্রতিটি এক টাকা)। ডাক্তার আমাকে শয্যাগত করে রেখেছে, কাজেই তুই একমাত্র ভরসা। যেমন করে হোক টিকিট চারটে বিক্রী করে শনিবারের মধ্যে দামগুলো আমার বাড়িতে পৌছে দিবি। এটা হুকুম নয় অনুরোধ।

তাছাড়া শনিবারে তোর বাড়িতে "চতুর্ভুজ" বৈঠকের কথা ছিলো সেটা আমার বাড়িতেই করতে হবে। আমি নিরুপায়। ভূপেনকে সেই অনুরোধ জানিয়েই আজ চিঠি দেবো। আশা করছি, তুই আমার অবস্থাটা বুঝবি। —সুকান্ত

অরুণ !

সন্ধ্যে সাতটা থেকে ন'টার মধ্যে যে করে হোক আমার সঙ্গে দেখা করতে আমার বাড়িতে আসিস। এই রকম জরুরী দরকার খুব কম হয়েছে এ পর্যন্ত। অত্যন্ত জরুরী মনে রাখিস।

—সুকান্ত

বাংলার কিশোর বাহিনী কেন্দ্রীয় অফিস

৮, ভবানী দত্ত লেন,
কলিকাতা।
৩০শে জুলাই '৪৪

প্রিয় বন্ধু,

তোমাদের চিঠি পেয়ে খুব চঞ্চল হ'য়ে উঠেছি। তোমাদের ওখানকার দুরবস্থা সত্যিই খুব মর্মান্তিক, কিন্তু তার জন্যে তোমাদের চেষ্টার কোনো রিপোর্ট পেলাম না। তোমরা যারা কিশোর তারা যত অসহায়ই হও না কেন, তোমরা একসঙ্গে দল বেঁধে অনেক কিছুই করতে পারো, তোমরা গ্রামের লোকের জন্য ভিন গাঁয়ে গিয়েও দরখাস্ত করে আনতে পারো, জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে দুরবস্থা জানিয়ে। অসুবিধা দূর করবার দাবি করতে পারো। তোমরা দল বেঁধে বাড়ি বাড়ি গিয়ে সবাইকে জনরক্ষা সমিতিতে এক হতে বলো না কেন ? আমাদের আপাতত তোমাদের কাছে যাওয়া সম্ভব নয়, পরে যাবার চেষ্টা করা হবে। তোমরা কিশোর বাহিনীর জেলা কমিটি গড়ার চেষ্টা করো। কার্ড পাঠাচ্ছি।

কিশোর অভিনন্দন।
সুকান্ত ভট্টাচার্য

[এ চিঠিখানি সুকান্ত লিখেও পাঠায়নি। চিঠিটি লিখেছিলো বোধ করি কোনো বার্ষিক সাহিত্য-সংকলনের সম্পাদককে।]

২০, নারকেলডাঙ্গা মেইন রোড
কলিকাতা—১১
২৮.১১।৪৬

মাননীয়েষু,

খোঁজ নিয়ে জানলাম আপনি শ্রীযুক্ত বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে আমার একটি কবিতা নিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে আপনাকে জানিয়ে দেওয়া উচিত মনে করছি বলেই জানাচ্ছি যে, শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায়কে আমি কবিতাটি পাঠিয়েছিলাম দক্ষিণার সর্তে. আপনি যদি এই সর্তে রাজী থাকেন, তা হলেই কবিতাটি প্রকাশ করবেন, নতুবা যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব ফেরৎ পাঠাবেন, এইটুকুই এ চিঠির বিনীত বক্তব্য।

সশ্রদ্ধ নমস্কার সহ
সুকান্ত ভট্টাচার্য

দোস্ত,

কয়েকটা কারণে আমার তোর ওখানে যাওয়া হলো না। যেমন

১। কিশোর বাহিনীর দুধের জন্য নতুন আন্দোলন শুরু হ'লো (১৪ই জুন 'জনযুদ্ধ' দ্রষ্টব্য)।
২। ১৫ই জুন A. I. S. F. Conference.
৩। কিশোর বাহিনীর কার্ড এখনো ছাপা হয়নি।
৪। ১৩ই জুন A. I. S. F.-এর অভিনয় শ্রীরঙ্গমে।
৫। ১১ই জুন কিশোর বাহিনীর জরুরী মিটিং।
৬। কিশোর বাহিনীর ৪নং চিঠি এ সপ্তাহে লিখতেই হবে।
৭। ১৬ই জুন আমাদের বাড়িতে বৌভাত।
৮। এখন আমার শরীর অত্যন্ত খারাপ।

তোদের ওখানকার কিশোর বাহিনীকে আমায় ক্ষমা করতে বলিস। নতুন আন্দোলনের জন্ত···আমাকে ছাড়লো না। তোর মা করবেন না জানি, কিন্তু তুই এ বিশ্বাসঘাতকের প্রতি কি রকম ব্যবহার করবি, সেটাই লক্ষ্যণীয়।

তুই অনেক দিন কলকাতা ছেড়েছিস···এবং আমার মতে তোর এখন ফেরার সময় হ'য়েছে। ১৫ তারিখের মধ্যে তোর কলকাতায় আসা পার্টির বাঞ্ছনীয়।

অরুণ!

নানা রকম সংকটের জন্তে তোর চিঠিটার জবাব দিইনি, পরে একটা বড়ো চিঠি পাঠাবো। তুই এখানে আসবি বলেছিলি, কিন্তু তার কোনো উদ্যোগ দেখছি না। অবিলম্বে তোর এখানে এসে স্থায়িভাবে পড়াশুনা আরম্ভ করা দরকার। তুই তোর পরম হিতাকাঙ্ক্ষী বাবার অবর্ণনীয় এবং অবিরাম পরিশ্রমের কথা ভুলে, তাঁর চিঠির উত্তর না দিয়ে স্বচ্ছন্দে 'ত্রিদিব' নিয়ে কাল কাটাচ্ছিস? তাঁর প্রতি তোর এত বড় অকৃতজ্ঞতা অসহনীয়।

—সুকান্ত

অরুণ!

তোর খবর শুনে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়েছি। আমার পুরো ১খানা চিঠি পরে পাঠাচ্ছি। যথাসম্ভব তোদের সার্বজনীন কুশল প্রার্থনা করি।—সু

[সুকান্তর সর্বশেষ চিঠি। এ চিঠি লেখার কয়েক দিন পরেই যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতালে সাধারণের থেকে অনেক বেশি জীবন্ত, জীবনের সম্পর্কে অনেক বেশি আশাবাদী, মানুষের ভবিষ্যতে দুর্দমনীয় আত্মপ্রত্যয়ের অধিকারী কবি-কিশোরের জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটল। তার রচনার মধ্যেই কেবল এই অকাল নিবৃত্তির প্রবলতম এক প্রতিবাদ আজ এবং আগামী কালের জন্ম ধ্বনিত হয়ে আছে।]

Jadabpur T. B. Hospital
L. M. H. Block
Bed No—1.
Po. Jadabpur College
24 Parganas

অরুণ!

সাত দিন হ'য়ে গেলো এখানে এসেছি। বড়ো একা একা ঠেকছে এখানে। সারাদিন চুপচাপ কাটাতে হয়। বিকেলে কেউ এলে আনন্দে অধীর হ'য়ে পড়ি। মেজদা নিয়মিত আসে কিন্তু সুভাষ (মুখোপাধ্যায়) নিয়মিত আসে না। কাল মেজ-বৌদি, মাসিমাকে নিয়ে মেজদা এসেছিলো। চলে যাবার পর বড়ো মন খারাপ হ'য়ে গেলো। বাস্তবিক শ্যামবাজারের ঐ পরিবেশ ছেড়ে এসে রীতিমত কষ্ট পাচ্ছি।

তুই কি এখনো দাঙ্গার অবরোধের মধ্যে আছিস? না কলকাতায় যাতায়াত করতে পারছিস? যাই হোক, সুযোগ পেলেই আমার সঙ্গে দেখা করবি। দেখা করার সময় বিকেল চারটে থেকে ছ'টা। শিয়ালদা দিয়ে ট্রেনে করে আসতে পারিস, কিম্বা ৮এ বাসে। এখানে "লেডী মেরী হার্বার্ট ব্লক" এক নম্বর বেডে আছি। আশা করি আমার চিঠি পাবি। দেখা করতে দেরী হ'লে চিঠি দিস।

৮.৪.৪৭

—সুকান্ত

ইরাক-বিদ্রোহ

সৈয়দ হোসেন হালিম

এশিয়া জননী কাঁপছে রে, মধুর যাতনা উঠলো ফের,
গর্ভে নড়ছে আবার কে? নতুন যাতনা ভুমিষ্ঠের।
খিল ধরে গেল হাত-পা সব, সকল শরীরে লাগছে টান,
গর্ভে নড়ছে আবার কে? জন্ম চাইছে এ কোন্ প্রাণ?

অনেক বছর আগে তো এই কাঁটাতে-ফুটানো যন্ত্রণা!
ভরেছে শরীর শঙ্কাতে, তনু-দেহ-মন আনমনা!
হায় রে সে সব যন্ত্রণা—লজ্জা-মাখানো-গোপন-ভয়
ব্যর্থ হোয়েছে সকল তো—দানব-শিশুরা জন্ম লয়!

তবে কি আবার সেই সে বেদনা—কালিমা-মাখানো যন্ত্রণা
শরীর-সাগরে তুলছে ঢেউ—শঙ্ক নাগিনীর কাল-ফণা!
তবে কি আবার রক্তশোষকদানবশিশুরা মুক্তি চায়
নতুন করিয়া জননীরে বিকাতে বিদেশী-স্বার্থ-পায়!

তাই যদি হয়, নাই রে শঙ্কা—পৃথিবীর আলো চোখ খুলে
দেখবার আগে সুতিকাগৃহেই দেবেন জননী বিষ তুলে!
নীল হোয়ে যাবে সারাটি অঙ্গ—নতুন কালিমা হবে না ফের,
এই ভেবে মাতা ফিরালেন আঁখি পার্শ্বে শোয়ানো ভুমিষ্ঠের—

কোথা রে বেদনা, জমানো লজ্জা, গ্লানির কালিমা—মিথ্যা ভয়,
পার্শ্বে হাসছে নব-কার্ত্তিক—দানব বিজেতা—জ্যোতির্ময়!
চাঁদিমা-চোয়ানো শুভ্রবরণ—মুখেতে মুক্তি-মন্ত্র, না,
ধন্য জননী—ধন্য ইরাক—ধন্য গর্ভযন্ত্রণা!

শ্রীপরেশনাথ মুখোপাধ্যায়

[ভারতের নানা স্থানের ডাক ও তার বিভাগের ভূতপূর্ব সর্বাধ্যক্ষ]

প্রাক-স্বাধীনতা যুগে ভারতীয় ডাক ও তার বিভাগের সুষ্ঠু কর্ম্মধারায় যে স্বল্পসংখ্যক উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী প্রাণকেন্দ্র-স্বরূপ ছিলেন, তন্মধ্যে ডেপুটী ডিরেক্টর জেনারেল শ্রীপরেশনাথ মুখোপাধ্যায় এক বিশিষ্ট স্থানাধিকারী।

১৮৮২ সালের ডিসেম্বর মাসে পরেশনাথ জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ৺হরিচরণ মুখোপাধ্যায় ও মাতা ৺হরিদাসী দেবী। আদি নিবাস ২৪ পরগণা জেলার খড়দহান্তর্গত রহড়া গ্রামে এবং মাতুলালয় পার্শ্ববর্ত্তী ঘোলা গ্রামে। রহড়া পাঠশালা হইতে উচ্চ প্রাথমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ৺চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত বন্দীপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হন। পরে তিনি রিপণ কলেজিয়েট স্কুল হইতে ১৮৯৭ সালে এণ্ট্রান্স, প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে ১৯০১ সালে বি, এ এবং দেড় বৎসরের মধ্যে ১৯০২ সালে ইংরাজীতে এম, এ পাশ করেন। ১৯০৪ সালে তিনি সুপারিনটেনডেণ্ট অব পোষ্ট অফিস হিসাবে ডাক বিভাগে প্রথম কর্ম্ম গ্রহণ করেন। কতিপয় বিভাগের ভারপ্রাপ্ত হিসাবে কাজ করিবার পর ১৯১৩ সালে তিনি সহকারী পোষ্টমাষ্টার জেনারেল এবং ১৯১৭ সালে ডিরেক্টর জেনারেলের সহকারী হন। ১৯২০ সালে ডাক বিভাগীয় অনুসন্ধান কমিটীর সেক্রেটারী হিসাবে জুনিয়ার কর্ম্মচারিবৃন্দের বেতনের স্কেল ও চাকুরীর মান নির্ণয় কার্য্যে লিপ্ত থাকেন। ১৯২১ সালে পুনর্গঠন কমিটীর সদস্য হিসাবে কার্য্য করেন।

১৯২২ সালে ইয়োরোপীয় দেশ সমূহের ডাক বিভাগীয় প্রথা ও কর্ম্মপদ্ধতি অবগত্যার্থে ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মাণী, প্রভৃতি কয়েকটি দেশ পরিভ্রমণ করেন। ১৯২৪ সালে ষ্টকহোমে আন্তর্জ্জাতিক পোষ্টাল কংগ্রেসে যোগদান করেন। প্রত্যাবর্ত্তনের পর তিনি ভারতের সহিত অন্যান্য দেশের ডাক বিভাগের দ্রব্যাদি বিনিময়ের জন্য আইন বিধিবদ্ধ করিতে থাকেন। ১৯২৫ সালে তিনি সহকারী ডি, জি, রূপে ডাক ও তার বিভাগের অর্থাদি বিষয়ে ভারপ্রাপ্ত হন। ১৯২৯ সালে লণ্ডনে অনুষ্ঠিত আন্তর্জ্জাতিক পোষ্টাল কংগ্রেসে যোগদান করেন। ১৯৩১ সালে তিনি ডেপুটী ডিরেক্টর জেনারেল পদে নিযুক্ত হন। পর বৎসর আফগান রাষ্ট্রের সহিত ডাক বিভাগীয় সম্পর্ককে উন্নততর করার জন্য তাঁহাকে কাবুল যাইতে হয়। ইহার পর ১৯৩৩ সালে তিনি মাদ্রাজ সার্কেলের পি, এম, জি নিযুক্ত হন। সেই সময় সমগ্র দাক্ষিণাত্য তাঁহার এলাকাভুক্ত ছিল। উক্ত বৎসরের শেষার্দ্ধে তিনি বিহার ও উড়িষ্যার পোষ্টমাষ্টার জেনারেল হইয়া পাটনায় আগমন করেন। পর বৎসর কায়রোতে অনুষ্ঠিত ডাক বিভাগীয় সম্মেলনে তিনি ভারতীয় দলের নেতা হিসাবে যোগদান করেন এবং পরে য়ুরোপ পরিভ্রমণ করেন। প্রত্যাবর্ত্তনান্তে ১৯৩৪ সালে তিনি বঙ্গ ও আসামের পোষ্টমাষ্টার জেনারেল নিযুক্ত হন। সেই সময় তিনি পূর্ব্ববাঙ্গালা ও আসাম প্রদেশে ট্র্যাঙ্ক টেলিফোনের বিস্তার সাধন করেন। ইহার পর পুনরায় তাঁহাকে সিনিয়র ডেপুটী ডিরেক্টর জেনারেল হিসাবে দিল্লী-সিমলায় অবস্থান করিতে হয় এবং ১৯৩৯ সালে অবসর গ্রহণ করেন।

১৯২৬ সালে তিনি "রায় বাহাদুর" এবং ১৯৩৩ সালে C. B. E খেতাব লাভ করেন।

সুঠাম স্বাস্থ্যের অধিকারী ও সুসম সাংগঠনিক হওয়ায় শ্রীমুখোপাধ্যায়কে দ্বিতীয় মহাসমরের সময় এয়ার-রেড ও সিভিক-গার্ড অধিকর্ত্তারূপে নিয়োগ করা হয়। ১৯৪২ সালে যুদ্ধের সময় তিনি ডাক ও তার বিভাগের ওয়েলফেয়ার অফিসার হিসাবে কার্য্য করেন। ১৯৪৪ সালে পূর্ব্বাঞ্চলের জনসংভরণ বিভাগের ডি, সি, জিরূপে কলিকাতা দপ্তরে সমাসীন হন।

শ্রীপরেশনাথ মুখোপাধ্যায়

১৯৪৫ সালে তিনি সরকারী ও সাংসারিক-কর্মপ্রবাহ হইতে নিজেকে বিচ্যুত করিয়া ধর্মচর্চায় মনোনিবেশ করেন। অভীষ্ট গুরুর সন্ধানে কয়েক বৎসর তিনি ভারতের অধিকাংশ তীর্থক্ষেত্রসমূহ পরিভ্রমণান্তে মধুপুর কপিলমঠাধ্যক্ষ স্বামী ধর্মমেঘ-আরণ্য মহোদয়ের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। উক্ত স্বামীজির গুরু ও কপিলমঠের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমৎ স্বামী হরিহরানন্দ-আরণ্য সাংখ্যযোগ শাস্ত্রের টীকাকাররূপে সুপরিচিত। তৎলিখিত "পাতঞ্জল-যোগদর্শন" কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম অধীত পুস্তক।

১৯৫৪ সালে পরেশনাথ "সাংখ্য ও যোগ-পরিচয় ও সাধনা" নামে একটি পুস্তক প্রকাশ করেন ও স্বামী হরিহরানন্দ-আরণ্য লিখিত যোগদর্শনের টীকা ইংরাজীতে অনুবাদ করেন। ইহা ব্যতীত ডাক ও তার বিভাগ সম্বন্ধীয় কয়েকটি পুস্তক তিনি প্রকাশ করেন।

ছাত্রবয়স হইতে তিনি টেনিস ও ব্রিজ খেলার অনুরক্ত ছিলেন। ১৯১১-১২ সালে তিনি কলিকাতায় পি এণ্ড টি ক্লাব প্রতিষ্ঠা করেন। বিভিন্ন সময়ে রোটারী ক্লাব ও অটোমোবাইল এসোসিয়েশনের সভাপতি ছিলেন। অভিনেতা হিসাবে তাঁহার অভিনয় ছাত্রাবস্থায় প্রশংসিত হইত।

তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত-পুত্রদ্বয় ৺প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় রেজিষ্ট্রেশন বিভাগের আই, জি, এবং প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় আলীপুরের বিশিষ্ট ব্যবহারাজীব ও বার এসোসিয়েশনের সভাপতি ছিলেন। নিজ ভ্রাতা ৺প্রভাত মুখোপাধ্যায় কলিকাতা পুলিশের ডেপুটি কমিশনার ছিলেন। একমাত্র পুত্র শ্রীবীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইন্স করপোরেশনের চীফ ট্রাফিক ম্যানেজার।

পরেশনাথ কলিকাতা সিমলা অঞ্চলের ৺তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা শ্রীমতী সমীরবালা দেবীর সহিত ১৯০২ সালে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন।

বিচারপতি শ্রীগোপেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র

[কলিকাতা হাইকোর্টের অন্যতম বিচারপতি]

১৯০৬ সালের অক্টোবর মাসে বিহার রাজ্যের মজঃফরপুর সহরে কলিকাতা হাইকোর্টের অন্যতম বিচারপতি শ্রীগোপেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র জন্মগ্রহণ করেন। আদিনিবাস হুগলী জেলার চুঁচুড়ার সন্নিকটবর্তী সুগন্ধা গ্রামে। ম্যালেরিয়া প্রকোপের জন্য পিতা ৺অপূর্ব্বকৃষ্ণ মিত্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মজঃফরপুরে কর্মকেন্দ্র স্থাপনা করেন। নিজ দক্ষতায় ও কর্মগুণে অপূর্ব্বকৃষ্ণ সমগ্র বিহার প্রদেশে একজন বিশিষ্ট আইনজীবিরূপে পরিগণিত হন। সেই সময় কবিগুরুর জামাতা ৺শরৎ চক্রবর্ত্তী (কবি-গুরু বিহারীলাল চক্রবর্ত্তীর পুত্র) তথায় আইন ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন। গোপেন্দ্রকৃষ্ণের মাতৃদেবী ৺কিরণবালা দেবী ছিলেন বিশিষ্ট এটর্নী ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম উপাধ্যক্ষ (১৯২৩-২৪) ৺ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের কন্যা।

শ্রীমিত্র মজঃফরপুরস্থ মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় হইতে বৃত্তিসহ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯২২ সালে স্থানীয় উচ্চ ইংরাজী স্কুল হইতে এক মাসের ব্যবধানে নব-প্রবর্তিত স্কুল-ফাইন্যাল ও ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় যথাক্রমে প্রথম ও তৃতীয় স্থান অধিকার

শ্রীগোপেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র

করেন। পাটনা কলেজ হইতে ১৯২৪ সালে প্রথম বিভাগে আই, এস, সি এবং ১৯২৬ সালে রসায়ন শাস্ত্রে অনার্স সহ বি, এস, সি পাশ করেন। উক্ত বৎসরের শেষ দিকে তিনি ইংল্যাণ্ড গমন করেন এবং লিঙ্কনস্ ইন্ হইতে ১৯৩০ সালে ব্যারিষ্টাররূপে স্বদেশে ফিরিয়া আসেন।

পাটনা হাইকোর্টের ব্যবহারাজীবরূপে তিনি ১৯৩১-৩৪ সাল পর্য্যন্ত মজঃফরপুরে অবস্থান করেন। কর্মপরিধি বৃদ্ধি মানসে ১৯৩৫ সালে তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের আদিম-বিভাগে আইনজীবী হিসাবে যোগদান করেন।

ছাত্রজীবনে তিনি ফুটবল, হকি ও টেনিস খেলায় উৎসাহী ছিলেন এবং বর্ত্তমানে অবসর সময়ে পড়াশুনায় নিমগ্ন থাকেন।

কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতিদের মধ্যে ডাঃ ৺বিজন মুখোপাধ্যায়, স্যার রূপেন্দ্র মিত্র ও সুধীরঞ্জন দাসের বিচারপ্রণালী অনুধাবন করিয়া গোপেন্দ্রকৃষ্ণ মুগ্ধ হন আর বিগত দিনের আইনজীবী হিসাবে ৺শরৎচন্দ্র বসু, ৺এস, এন, ব্যানার্জ্জি, মিঃ পেজ ও মিঃ পিউ-এর কর্মদক্ষতার ভূয়সী প্রশংসা করেন। ৺শরৎচন্দ্র বসু একত্রে একাধিক মামলা গ্রহণ করিতেন না, সে কথাও তিনি উল্লেখ করেন। ইংরাজ আইনজীবী অধ্যুষিত কলিকাতা হাইকোর্টে অসাধারণ দক্ষতায় লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ যে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন তাহা এক অস্বাভাবিক ঘটনা বলিয়া শ্রীমিত্র মনে করেন। আইন-বিষয়ক যাবতীয় তথ্য যে স্যার বিনোদচন্দ্র মিত্রের নখদর্পণে প্রতিফলিত হইত—তাহা গোপেন্দ্রকৃষ্ণ স্যার বি, সি, মিত্রর পূর্ব্বতন জুনিয়ার বর্ত্তমানে পশ্চিমবঙ্গের এ্যাডভোকেট জেনারেল স্যার সুধাংশুমোহন বসুর নিকট জানিতে পারেন। কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী শ্রীঅশোক সেনের কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যারিষ্টার হিসাবে অমানুষিক পরিশ্রম সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। ১৯৩৪ সালে গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বিশিষ্ট এটর্নী ৺চারুচন্দ্র বসুর কন্যা শ্রীমতী পার্ব্বতী দেবীর সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। ১৯৫২ সালের অক্টোবর মাসে ভারত সরকার তাঁহাকে কলিকাতা হাইকোর্টের অন্যতম বিচারপতিপদে নিয়োগ করেন।

আইনের কথায় তিনি বলেন যে, কেন্দ্রীয় সরকার আইনকে সহজলভ্য করিবার জন্য উদ্যোগী হইয়াছেন। তিনি জানান যে, জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ হওয়া সত্ত্বেও কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যবসা-বাণিজ্য বিষয়ক (Commercial) মামলা প্রচুর আসিয়া থাকে। তজ্জন্য তথায় কর্ম্মের চাপও যথেষ্ট রহিয়াছে এবং আইনজ্ঞদের সুসম অর্থাগম হইয়া থাকে।

বর্ত্তমানে দেশে সর্ব্বস্তরের মামলা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণ হিসাবে আমাদের নৈতিক অবনতি কিছু পরিমাণে দায়ী বলিয়া শ্রীমিত্র মনে করেন।

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ

[সুপ্রসিদ্ধ সাংবাদিক]

সিপাহী-বিদ্রোহের পটভূমিকায় এবং নীলকর সাহেবদের অমানুষিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে কেবল শিক্ষিত বাঙ্গালীর জন্য নয়—বাংলার প্রতিটি বাসিন্দার পক্ষ হইতে প্রতিবাদ জ্ঞাপনের জন্য যশোহর জেলার অমৃতবাজার গ্রামের ঘোষ-পরিবারের স্বনামধন্য ভ্রাতৃবর্গ ৺বসন্তকুমার, ৺হেমন্তকুমার ও ৺শিশিরকুমার ১৮৬৩ সালে যশোহর-খুলনা জেলার এক নিভৃত গ্রাম হইতে উনবিংশ শতাব্দীর ষষ্ঠদশকে বাংলা ভাষায় ক্ষুদ্রাকারে একটি সংবাদপত্রের পত্তন করেন। মাত্র দুই বৎসরের মধ্যে পূর্ব্ব-প্রতিষ্ঠিত বিশিষ্ট সংবাদপত্রত্রয় 'হিন্দু-প্যাট্রিয়ট', 'ইণ্ডিয়ান মিরার' এবং 'সোমপ্রকাশ'এর পর্য্যায়ে উহা আসিয়া পৌঁছায়। তাই ১৮৭০ সালে ফরাসী প্রাচ্য-বিশারদ Garcin de Tassy সম্পাদিত Histoire de la Litterature Hindoue et Hindoustanieতে অমৃতবাজার পত্রিকার নামোল্লেখ আমরা দেখিতে পাই। গ্রামটির নাম ছিল মাগুরা, পরে উক্ত ভ্রাতৃবৃন্দের মাতা অমৃতময়ী দেবীর স্মরণার্থে উহার 'অমৃতবাজার' নামকরণ হয়।

অত্যাচারিত কৃষককুলের পক্ষাবলম্বন করিয়া নীলকর ও সরকারী কর্ম্মচারীদের বিষদৃষ্টিতে পতিত হওয়ায় এবং জেলায় ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বৃদ্ধি পাওয়ায় ১৮৭২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে পত্রিকা ৮২নং হিদারাম ব্যানার্জ্জি লেনে স্থানান্তরিত করা হয় এবং তথা হইতে দ্বিভাষী সাপ্তাহিকরূপে প্রকাশিত হইতে থাকে। কাগজের প্রসারের জন্য স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় ১৮৭৪ সালের এপ্রিল মাসে উহাকে বাগবাজার ষ্ট্রীটস্থ ২নং আনন্দ চ্যাটার্জ্জি লেনে আনয়ন করা হয়। পত্রিকার ১৮৭৫ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় চতুর্দ্দশ বৎসর বয়স্ক রবীন্দ্রনাথের বাইশ স্তবকের একটি কবিতা প্রথম মুদ্রিত হয়। স্বাধীনমতাবলম্বী অমৃতবাজার পত্রিকার জ্বালাময়ী লেখনীকে স্তব্ধ করার জন্য বিদেশী শাসকবৃন্দ ২০শে মার্চ্চ ১৮৭৮ সালে Vernacular Press Act বিধিবদ্ধ করেন। কিন্তু পরদিনই 'পত্রিকা' ইংরাজী সাপ্তাহিকরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া সরকারী ও বেসরকারী মহলে বিস্ময়ের সৃষ্টি করে।

১৮৯১ সনের ফেব্রুয়ারী মাস হইতে উহা 'দৈনিকপত্র' হিসাবে আত্মপ্রকাশ করিতে থাকে। বিগত শতাব্দীতে 'পত্রিকা' বৃটিশ শাসকদের জনমত দমন, ভারতীয়দের উচ্চ শিক্ষায় বঞ্চিত করা, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন না দেওয়া, দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্র-সমূহের উপর প্রচণ্ড 'সেন্সার' আরোপ করা এবং স্বাধীনচেতা দেশীয় নৃপতিদের উপর অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়া সরকারী ও বে-সরকারী মতবাদকে ন্যায্যপথে পরিচালনা করিতে সক্ষম হয়। ১৮৯১ সালে Age of Consent Bill লইয়া প্রবল আন্দোলন হইলে, 'পত্রিকা' ও 'ইণ্ডিয়ান মিরার' উহা সমর্থন করেন কিন্তু 'বঙ্গবাসী' ও 'কেশরী' উহার বিরুদ্ধতা করেন। ১৮৮৫ সালে জাতীয় কংগ্রেস গঠিত হইলে 'পত্রিকা' উহার কার্য্যকলাপ পূর্ণভাবে সমর্থন করে। ১৯০৫—৬ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় 'পত্রিকা' ও 'বেঙ্গলী' লেখনীর মাধ্যমে ভারতীয়দের বিরুদ্ধতা যথার্থরূপে প্রতিফলন করে। সেই সময় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত সমাবর্ত্তন উৎসবে লর্ড কার্জ্জন বাঙ্গালীর তোষামোদপ্রিয়তা ও সত্যের অপলাপ সম্বন্ধে মন্তব্য করিলে 'পত্রিকা' দুই দিনের মধ্যেই লর্ড কার্জ্জন লিখিত 'Problems of Far East' পুস্তক হইতে কোরিয়াতে তাঁহার নিজের মিথ্যার বেসাতি ও নিম্নস্তরের তোষামোদ অবলম্বনের কথা স্মরণ করাইয়া দেন।

'অমৃতবাজার পত্রিকা'র বর্ত্তমান সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ ১৮৯৯ সালের ৪ঠা অক্টোবর কলিকাতা বাগবাজারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা পরমবৈষ্ণব, স্বনামধন্য, মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ এবং মাতা ৺কুমুদিনী ঘোষ। আদিনিবাস যশোহর জিলায় অমৃতবাজার গ্রামে এবং মাতুলালয় কৃষ্ণনগরে। ছয় ভ্রাতা ও দুই ভগিনীর মধ্যে তুষারকান্তি সর্ব্বকনিষ্ঠ। শ্রীঘোষ প্রথমে টাউন স্কুলে ও পরে হিন্দু স্কুলে বিদ্যা শিক্ষা করেন এবং তথা হইতে ১৯১৫ সালে প্রবেশিকা ও ১৯১৭ সালে বঙ্গবাসী কলেজ হইতে আই, এ পাশ করেন। অসুস্থতার জন্য এক বৎসর পড়া বন্ধ রাখিয়া ১৯২০ সালে বিদ্যাসাগর কলেজ হইতে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। সেই সময় ৺সারদারঞ্জন রায় উক্ত কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন এবং নটগুরু শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী ইংরাজীর অন্যতম অধ্যাপক ছিলেন। ছাত্রাবস্থায় তুষারকান্তি ফুটবল, ক্রিকেট, টেনিস ও ব্যাডমিণ্টন খেলায় পারদর্শী ছিলেন। তদ্ব্যতীত দাবা

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ

ও ক্যারম খেলায় তিনি বরাবর 'অপরাজিত' আখ্যায় অধিকারী। শিকার, রাইফেল ও বন্দুক চালনায় তিনি সিদ্ধহস্ত। ১৯২০ সালে মেদিনীপুর সহরের শ্রীঅমূল্যকুমার দত্তের কন্যা শ্রীমতী বিভারাণী দেবীর সহিত তিনি পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। পুলিশ বিভাগের ডেপুটী কমিশনার শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁহার সহাধ্যায়ী ছিলেন।

কলেজে পাঠকালে তিনি পত্রিকা প্রেসে প্রুফ দেখা শিক্ষা করেন। ১৯২১ সালে তিনি 'পত্রিকা'র সাব-এডিটর রূপে যোগদান করেন। ১৯২৬ সালে সহঃ সম্পাদক (বার্তা) এবং ১৯২৮ সালের ১৬ই ডিসেম্বর মাত্র ৩০ বৎসর বয়সে তিনি সম্পাদকপদে বৃত হন। ১৯৩১ সালে নবগঠিত 'অল ইণ্ডিয়া এডিটরস্ কনফারেন্স'এর পক্ষ হইতে সর্ব্বকনিষ্ঠ সদস্য হিসাবে তিনি কস্তুরীরঙ্গ ও সি, ওয়াই, চিন্তামণিসহ লর্ড আরউইনের সহিত দেখা করিয়া সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করার জন্য চালু অর্ডিন্যান্সগুলি প্রত্যাহারের দাবী করেন। ১৯৪৬ সালে Empire Press Conference এ ভারতীয় দলের নেতা হিসাবে লণ্ডনে রাজা ষষ্ঠ জর্জ্জের সহিত সাক্ষাৎকালে এদেশের গভর্ণর-জেনারেলরূপে লর্ড ওয়াভেলের কর্ম্ম-সম্পাদনার কথা তাঁহাদের মধ্যে আলোচিত হয়।

১৯৫০ সালে তুষারকান্তি Indian Press Delegation এর নেতা হিসাবে মিশর পরিভ্রমণ করেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আন্তর্জ্জাতিক প্রেস ইনঃর দ্বিতীয় এশিয়ান সম্মেলনে অন্যতম ভারতীয় প্রতিনিধি হিসাবে তিনি সিংহলে গমন করেন। ১৯৫৭ সালে I. P. I.র অন্যতম ডেলিগেটরূপে তিনি য়ুরোপ, আমেরিকা, জাপান ও পূর্ব্ব-এশিয়ার কয়েকটি দেশে গমন করেন। সেই সময় এক সাক্ষাৎকারে প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ারের নিকট শ্রীঘোষ আমেরিকায় আগত ভিন্নদেশীয় ব্যক্তিদের 'Finger-Print' প্রথা অবসান করার কথা উত্থাপন করেন। ইহার অব্যবহিত পরেই প্রেসিডেণ্ট এক আদেশে উক্ত প্রথা রদ করিয়া দেন।

১৯৩৫ সালে হাইকোর্ট বিচারপতি নিয়োগ সম্পর্কে এক প্রবন্ধ পত্রিকায় প্রকাশিত করার জন্য শ্রীঘোষ কয়েক মাস কারাদণ্ড ভোগ করেন। তিনি A. I. N. E. C. I & E. N. S, P. T. I প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানগুলির সহিত সক্রিয়ভাবে জড়িত আছেন।

শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের কথায় তিনি বলেন, "কেবলমাত্র সংবাদপত্র শিল্পে নয়, প্রতিটি শিল্পে প্রত্যেক কর্ম্মীর সহিত মালিকের এক সুমধুর সম্পর্ক গড়িয়া উঠা একান্ত প্রয়োজন। কারণ, পারস্পরিক সহযোগিতা ও বন্ধুত্বপূর্ণ আবহাওয়ায় শিল্প পরিচালিত হইলে উহার উন্নতি ঘটিয়া থাকে।"

তিনি আরও জানান, "আমি চাই যে মহান ভারতের একই সূত্রে প্রতিটি রাজ্য গ্রথিত থাকুক, সমগ্র উপ-মহাদেশের উন্নতি ও প্রগতির জন্য সমুদায় প্রদেশগুলি গঠনমূলক কর্ম্মে নিযুক্ত থাকুক আর সেই সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ ও বাঙ্গালীর উন্নতি সহায়ক কর্ম্মগুলি সুচারুভাবে সম্পাদিত হউক।"

তুষার বাবু লিখিত Bengal Famine পুস্তকটি পাঠে ১৯৪৩ সালের মন্বন্তর ও অন্নহীন দেশের দুর্গতি সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে জানা যায়। তৎরচিত 'বিচিত্রকাহিনী' এবং 'আরও বিচিত্রকাহিনী' পুস্তকদ্বয়ের মাধ্যমে তাঁহার বাল্য ও কৈশোর জীবনের অনেক কিছু জানা যায়।

অল্পবয়সে পিতৃমাতৃহীন হওয়ায় জ্যেষ্ঠভ্রাতা ৺পীযূষকান্তি ও তদীয় সহধর্ম্মিণী ব্রজবালা দেবী পিতামাতার অভাব পূরণ করিয়াছিলেন—তাহা অদ্যাবধি তুষার বাবু শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিয়া থাকেন। শ্রীঘোষের পরিচালনায় কলিকাতা সংস্করণ 'পত্রিকা' ও তাঁহার প্রতিষ্ঠিত এলাহাবাদ সংস্করণ 'পত্রিকা' 'যুগান্তর' ও হিন্দী 'অমৃত পত্রিকা'র নাম বর্ত্তমানে কাহারও নিকট অবিদিত নয়। তুষারকান্তি বাবু মাসিক বসুমতীর গুণগ্রাহী শুভার্থী ও লেখক।

শ্রীঘোষের একমাত্র পুত্র শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ রাজ্যসরকারের অন্যতম রাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন।

শ্রীমতী বাণী পাল-চৌধুরী

[বাংলার প্রথম মহিলা বি-সি-এস]

নারী কখনই পুরুষের সমকক্ষ নয়, তার স্থান শুধু মাত্র অন্তঃপুরে, একথা যাঁরা বলে এসেছেন, বা বলেন—তাঁদের জানা উচিত, বৈদিক যুগেই নয়, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ থেকে মেয়েরা সর্ব্বক্ষেত্রে পুরুষের সমান প্রতিভার পরিচয় দিয়ে আসছে। আজ আর নারী শুধু কল্যাণময়ী গৃহবধূ নয়, পুরুষের সহকর্ম্মিণী এবং মন্ত্রণাদাত্রীও। পুরুষের সংগে সে সমতালে এগিয়ে চলেছে—গৃহের পূর্ণকর্ত্রীত্ব বজায় রেখেও। আজকে এখানে যাঁর কথা উল্লেখ করছি—তিনি বাংলার প্রথম মহিলা বি-সি-এস শ্রীমতী বাণী পাল-চৌধুরী।

পর্দ্দার অন্তরালে, লোকচক্ষুর সীমানার বাইরে থেকে, প্রশংসা বা খ্যাতির সামান্য প্রত্যাশিনী না হয়ে, নীরবে এবং নির্ভীকচিত্তে যে কর্তব্য পালন করে এসেছেন তিনি গত পাঁচ বছর ধরে, তা আর অপ্রকাশ্য ও অজ্ঞাত থাকতে পারে না। সংকট-সংকুল বাংলার সংকটাপন্ন অবস্থায় তিনি বাস্তুহারা পুনর্বাসন মন্ত্রীর একান্ত সচিব

[শ্রীমতী বাণী পাল-চৌধুরী

হিসাবে যে কর্মদক্ষতা ও দরদী মনের পরিচয় দিয়েছেন, তা স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

শ্রীমতী বাণী পাল-চৌধুরীর জন্ম নদীয়া জেলার রাণাঘাটে। পিতার নাম শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ প্রামাণিক। শ্রীমতী চৌধুরীর মাতৃবিয়োগ ঘটে অতি অল্পবয়সে। স্বভাবতঃই পিতার স্নেহছায়ায় লালিতা হতে থাকেন মাতৃহারা মেয়ে। বাংলার নারীশিক্ষার অন্যতম বিদ্যাপীঠ বেথুন স্কুল, পরে বেথুন কলেজে তিনি শিক্ষালাভ করেন। ছাত্রীজীবনে তিনি মেধাবী ছাত্রী হিসাবে সুপরিচিতা ছিলেন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তি পেয়ে এসেছেন। ইণ্টারমিডিয়েট ক্লাশে পড়ার সময় তিনি ফরিদপুর জেলার ভোজেশ্বর নিবাসী অনিলকৃষ্ণ পাল-চৌধুরীর সংগে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রশাসনিক বিভাগের অক্লান্ত কর্মী হয়েও তিনি সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ হারান নি। সাহিত্যপাঠ এবং সাহিত্যচর্চা করা তাঁর দৈনন্দিন জীবনের অন্যতম কর্মসূচী। সমাজ-সেবায়ও তাঁর সেবাধর্মী মন সদাই উন্মুখ। নিখিল ভারত নারী-সম্মেলনের তিনি এক জন উৎসাহী সদস্যা।

১৯৫০ সালে বি-সি-এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হয়ে পুনর্বাসন-মন্ত্রীর একান্ত সচিবরূপে গত পাঁচ বছর কাজ করার পর বর্তমানে রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীমতী পূরবী মুখোপাধ্যায়ের একান্ত সচিবরূপে রাইটার্স বিল্ডিংয়ে নিযুক্ত আছেন।

অক্লান্তকর্মী শ্রীমতী পাল-চৌধুরীর জীবন দেশসেবার জন্য উৎসর্গীকৃত। বিশেষতঃ উদ্বাস্তুদের প্রতি তাঁর মমত্ববোধ অতুলনীয়। আমরা প্রার্থনা করি, কর্মের মধ্য দিয়ে তিনি যে সেবার সুযোগ পেয়েছেন, তা' সার্থক হয়ে উঠুক তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত মন্ত্রণায়।

বৃহদারণ্যক

ভাস্কর দাশগুপ্ত

স্পর্দ্ধিত বিটপিশিরে অকৃপণ আলো আর উদ্দাম সমীর,
নিচে আর্দ্র অন্ধকার, সরীসৃপ, বিষবাহী পতঙ্গের ভিড়।
ক্রুরচক্ষু তরক্ষুর, হিংস্রদংষ্ট্রা শার্দ্দূলের সন্তর্পণ গতি,
আলোক-পিপাসা-ক্লিষ্ট, পদানত শষ্প-গুল্ম মুক্তি মাগে
নিঃশ্বাস নিরোধি।

বঞ্চি' তৃণ-উদ্ভিদ-লতায় শক্তিমত্ত মহীরুহ দল,
দিকে দিকে বাহু মেলি, আত্মসাৎ করিছে কেবল,
সূর্য্যের উত্তাপ, আলো, পবন-হিল্লোল।
দুঃস্বপ্নের মত রাত্রি, পুঞ্জীভূত আর্ত্তনাদে কেঁপে ওঠে বনের অন্তর।
শাখায় শাখায় শত তমিস্রার প্রেত, জাগায় আসর।
মাঝে মাঝে ভেসে আসে—ঘুমভাঙ্গা চিতার চীৎকার,
হায়েনার অট্টহাসি, সম্বরের উচ্চকিত রব।
কখন মিলায়ে যায়, জান্তব রাজ্যের মায়া—হিংসা দ্বেষ ত্রাস।
প্রত্যূষ-বিহগকণ্ঠে জেগে ওঠে শান্তির আশ্বাস।

কালের অদৃশ্য হস্ত হানিতেছে নির্ম্মম কুঠার,
গর্ব্বোদ্ধত বৃক্ষমূলে লোভ-দম্ভ-ঈর্ষ্যা-লালসার।
যদিও বনের দেশে লুণ্ঠন চলিছে অনিবার,
হিংসায় নির্লজ্জ পশু পানলুব্ধ শোণিত-আসব,
যদিও নিষ্কম্প, দৃঢ় অতিকায় অরণ্য পাদপ,
সময় ঘনায়ে আসে—স্পষ্টতর আঘাতের ধ্বনি—ঠক্‌-ঠকাঠক্‌।
হে সময়! ক্ষমাহীন কুঠারচালক!
অমোঘ অক্লান্ত তুমি, সূক্ষ্ম বিচারক!
বলদর্পী বনস্পতি দিগন্ত প্রকম্প রবে ধরাশয্যা লবে একদিন।
মুক্তি পাবে অরণ্য জঠর হতে শৃঙ্খলিত আঁধারের প্রেত,
বন্ধহীন বায়ুস্রোতে, আলোকবন্যায় হয়ে যাবে লীন।
ভয়ত্রস্ত শ্বাপদের ক্ষিপ্র নিষ্ক্রমণ, মুক্তির ঘোষক,
ঐ শোনো ভেসে আসে একটানা রব—ঠক্‌-ঠক্‌-ঠক্‌।

বিবেকানন্দ স্তোত্রে

সুমণি মিত্র

৬৭

"তত্রাপি ন মাহাত্ম্যজ্ঞানবিস্মৃত্যপবাদঃ।
তদ্বিহীনং জারাণামিব।" ১

* * *

প্রেমিকা মানুষবোধে
প্রেমিককে পেতে চায়
জাগতিক ভালোবাসাটাতে,
কিন্তু দিব্য প্রেমে
ঈশ্বর-বুদ্ধিটা
সর্বদা জাগ্রত থাকে। ২

স্বর্গীয় প্রেম আর
লৌকিক কামনার
তফাৎটা হোলো এইখানে।
প্রেমিকা প্রেমিকই চায়,
ছোটেনাকো প্রেমিকের
দিব্য সত্তাটার টানে।

কৃষ্ণাসক্তমনা
ব্রজের গোপাঙ্গনা
মন-প্রাণ দিয়েছিলো যাঁকে,
তারা কি ভুলেছে তাঁর
দিব্য বিভূতি আর
শুদ্ধ ব্রহ্ম-সত্তাকে?

যখন শ্রীভগবান
ব্রজসুন্দরীদের
বোল্লেন—'কোন আক্কেলে
এমন গভীর রাতে
স্বামী ও পুত্র ফেলে
জনহীন অরণ্যে এলে?

স্ত্রীলোকের ধর্মই
পতির সেবা করা,
উপপতি সেবা করা নয়;
সদ্গতিকাঙ্খিনী
দুশ্চরিত্র স্বামী—
তারও প্রতি অনুরাগী হয়;

উপপতি অনুরাগ
ভয়াবহ অপরাধ,
অতএব কল্যাণীগণ,
এক্ষুনি যাও ঘরে,
নারীদের সংসারে
নিমগ্ন থাকাই শোভন।'

—এই কথা যেই শোনা
কৃষ্ণাসক্তমনা
গোপীরা যা' শোনালেন তাঁকে,
বোঝা গ্যালো সেইখানে
তারা সব সজ্ঞানে
চেয়েছিলো পরমাত্মাকে।

বোলেছিলো—'আমাদের
স্বামী ও পুত্রসেবা
স্বধর্ম বললে যে গুণী,
তা' তোমার সেবাতেই
তাদের সেবাই হয়,
সকলের আত্মা যে তুমি।

১। "এমন কি গোপীদের সেই অবস্থাতেও (অর্থাৎ কৃষ্ণের প্রতি মন-প্রাণ সর্বস্ব অর্পণ কোরে নিজেদের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত ভুলে যাওয়া সত্বেও) তারা শ্রীকৃষ্ণের দেবত্ব, তাঁর দিব্য মাহাত্ম্যের কথা ভোলেনি। যে ভালোবাসায় এই মাহাত্ম্যজ্ঞান নেই, সে ভালোবাসা দৈহিক, সাধারণ প্রণয়ীর ইন্দ্রিয়চর্চা মাত্র।"

—ভক্তিসূত্র, দেবর্ষি নারদ (২২—২৩)

২। দেবর্ষি নারদের মতে গোপিনীরা শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বর বুদ্ধিতে ভালোবেসেছিলেন বোলেই তাদের ভালোবাসা কামগন্ধহীন। যে ভালোবাসায় কোনো কামনা নেই, আত্মেন্দ্রিয় চরিতার্থ করবার কোনো তাগাদা নেই—সেই হোচ্ছে যথার্থ প্রেম। এই প্রেম গোপীদের ছিলো। নারদের মতে প্রেমের মূল কথা হোচ্ছে—ঈশ্বরবোধ, এবং এই কারণেই নারদের দৃষ্টিতে গোপীপ্রেম ভক্তি-ধর্মের শেষ কথা।

কিন্তু স্বামিজীর দৃষ্টিতে গোপী-প্রেমের মাহাত্ম্য অন্তকারণে। গোপীরা শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বর-বুদ্ধিতে ভালোবেসেছিলেন ঠিকই, কিন্তু স্বামিজীর মতে সেইটাই গোপী-প্রেমের চূড়ান্ত কথা নয়। গোপী-প্রেমের আসল রহস্ত হোচ্ছে—তারা শ্রীকৃষ্ণকে শুধু প্রেমময় হিসেবেই কাছে কাছে চেয়েছে। তিনি যে সর্বশক্তিমান, বিপুল বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা, তা' তারা জানতেও চাইতো না। এবং সেই কারণেই, স্বামিজীর মতে গোপী-প্রেম ধর্মের ইতিহাসে একটা নতুন অধ্যায়।

শাস্ত্রনিপুণ যারা
তোমাকেই চায় তারা,
তুমি ছাড়া অসত্য সব।
তোমায় যে বাদ দিয়ে
সংসার চায়, তার
সংসার বেদনাদায়ক।

অতএব পরমেশ!
ছিন্ন কোরো না তুমি
আমাদের আশালতাটাকে,
কমলার প্রিয় ঐ
তোমার চরণ পেয়ে
সংসারে চাইবোটা কা'কে?

জানি সখা—তুমি এই
পৃথিবীর সবেতেই
প্রকাশিত হোয়ে আছো নিজে,
যশোদার ছেলে নও
নিখিল প্রাণীর তুমি
অন্তরাত্মদর্শী যে।

বিশ্বরক্ষাবোধে
ব্রহ্মার অনুরোধে
যদুকুলে জন্ম তোমার,
তোমার চরণরেণু
শিবও মাথায় দিয়ে
পাপ থেকে পান উদ্ধার।'

* * * *

"মৈবং বিভোঽর্হতি ভবান্ গদিতুং নৃশংসং
সংত্যজ্য সর্ব্ববিষয়াংস্তব পাদমূলং।
ভক্তা ভজস্ব দুরবগ্রহ মা ত্যজাস্মান্
দেবো যথাদিপুরুষো ভজতে মুমুক্ষূন্।
যৎ পত্যপত্যসুহৃদামনুবৃত্তিরঙ্গ
স্ত্রীণাং স্বধর্ম্ম ইতি ধর্ম্মবিদা ত্বয়োক্তম্।
অস্ত্বেব মেতদুপদেশপদে ত্বয়ীশে
প্রেষ্ঠো ভবাংস্তনুভৃতাং কিল বন্ধুরাত্মা।
কুর্ব্বন্তি হি ত্বয়ি রতিং কুশলা স্ব আত্মন্
নিত্যপ্রিয়ে পতিসুতাদিভিরার্ত্তিদৈঃ কিম্।
তন্নঃ প্রসীদ বরদেশ্বর মাস্ম ছিন্দ্যা
আশাং ভৃতাং ত্বয়ি চিরাদরবিন্দনেত্র।"

* * * *

"যর্হ্যম্বুজাক্ষ তব পাদতলং রমায়া
দত্তক্ষণং কচিদরণ্যজনপ্রিয়স্য।
অস্প্রাক্ষ্ম তৎ প্রভৃতি নান্যসমক্ষমঙ্গ
স্থাতুং ত্বয়াভিরমতা বত পারয়ামঃ।
শ্রীর্যৎ পদাম্বুজরজশ্চকমে তুলস্যা
লব্ধাপি বক্ষসি পদং কিল ভৃত্যজুষ্টং।
যস্যাঃ স্ববীক্ষণকৃতেঽন্যসুরপ্রয়াস-
স্তদ্বয়ঞ্চ তব পাদরজঃ প্রপন্নাঃ।"

* * * *

"ধন্যা অহো অমী আল্যো
গোবিন্দাঙ্ঘ্র্যব্জরেণবঃ।
যান্ ব্রহ্মেশৌ রমা দেবী দধুর্মূর্দ্ধ্ন্যঘনুত্তয়ে।"

* * * *

"ন খলু গোপিকানন্দনো ভবান্
অখিল-দেহিনামন্তরাত্মদৃক্।
বিখনসার্থিতো বিশ্বগুপ্তয়ে সখে
উদেয়িবান্ সাত্বতাং কুলে।"৩

৩। "গোপীরা বোললেন—ভগবান, এমরকম নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করা তোমার উচিত হোচ্ছে না। আমরা সমস্ত বিষয় পরিত্যাগ কোরে তোমারই পাদমূল ভজনা কোরছি। হে স্বাধীন, দেব আদিপুরুষ যেমন মুমুক্ষু ব্যক্তিদের পরিত্যাগ করেন না, গ্রহণই করেন, তুমিও সেই রকম স্বচ্ছন্দে আমাদের গ্রহণ করো।

হে কৃষ্ণ, পতি-পুত্র-বন্ধুবর্গের অনুবর্তন করাই স্ত্রীদের স্বধর্ম—ধর্মজ্ঞ তুমি এই যে আমাদের উপদেশ দিলে, তা' সত্য; আমরা তাই কোরবো। এই উপদেশকর্তা ঈশ্বর তুমি, তোমাকে সেবা কোরলেই আমাদের পতি-পুত্রদের সেবা করা হবে; কেননা তুমিই হোচ্ছ দেহীদের প্রিয়তম বন্ধু, আত্মা ও নিত্যপ্রিয়। যাঁরা শাস্ত্রনিপুণ, তাঁরা নিত্যপ্রিয় আত্মরূপী তোমাকেই ভালোবাসেন। পতি বা পুত্র দুঃখদায়ক, তাদের নিয়ে কি হবে?

অতএব হে পরমেশ, আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও। হে কমলাক্ষ, বহুকাল থেকে যে-আশা আমরা পোষণ কোরে আসছি, তা' ছিন্ন কোরোনা।"

—শ্রীমদ্ভাগবত (দশম স্কন্ধ, উনত্রিংশ অধ্যায়, ২৮-৩০)।

"গোপীরা বোললেন—হে অম্বুজাক্ষ, তোমার চরণতল কমলার আনন্দজনক। তুমি অরণ্যজনপ্রিয়; অরণ্যে তোমার সেই চরণতল যে-অবধি স্পর্শ কোরেছি এবং যে-অবধি অরণ্যে তুমি আমাদের আনন্দ দিয়েছো, সেই অবধি আমরা আর অন্যের কাছে থাকতে পারছি না। যে-কমলার কটাক্ষ লাভের জন্যে অন্যান্য দেবতারা সর্বদাই ব্যগ্র, সেই কমলা তোমার হৃদয়স্থ হোয়েও তুলসীর সহিত একত্র ভৃত্যসেবিত যে পদরেণু কামনা করেন, আমরা তাঁরই মতো সেই চরণরেণুর আশ্রয় নিলাম।"

—শ্রীমদ্ভাগবত (দশম স্কন্ধ, উনত্রিংশ অধ্যায়, ৩৩-৩৪)।

"গোপীরা বোললেন—হে সখিগণ, এই সকল কৃষ্ণপদরেণু অতি পবিত্র বস্তু, যেহেতু ব্রহ্মা, মহেশ এবং লক্ষ্মীদেবী পাপক্ষালনের জন্যে এই রেণু মস্তকে ধারণ করেন। এসো, আমরা সকলে এই পুণ্যপূত চরণরেণুপুঞ্জে অভিষিক্ত হই।"

—শ্রীমদ্ভাগবত (দশমস্কন্ধ, ত্রিংশ অধ্যায়, ২৫)।

"গোপীরা বোলেছিলেন—সখা, বাস্তবিক তুমি যশোদার ছেলে নও; নিখিল প্রাণীর তুমি বুদ্ধি, সাক্ষী। বিশ্বরক্ষার জন্যে ভগবান ব্রহ্মা প্রার্থনা কোরেছিলেন বোলেই তুমি যদুকুলে জন্মগ্রহণ কোরেছো। অতএব বিশ্বপালনের জন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হোয়ে ভক্তদের উপেক্ষা করা তোমার উচিত নয়।"

—শ্রীমদ্ভাগবত (দশম স্কন্ধ, একত্রিংশ অধ্যায়, ৪)।

৩৮

"আর এক গোপীপ্রেমের স্বাভাবিক চিহ্ন।
যে প্রকারে হয় প্রেম কামগন্ধহীন।
গোপী-প্রেমে করে কৃষ্ণমাধুর্য্যের পুষ্টি।
মাধুর্য্য বাড়ায় প্রেম হঞা মহাতুষ্টি।
প্রীতি বিষয়ানন্দে তদাশ্রয়ানন্দ।
তাঁহা নাহি নিজ সুখ বাঞ্ছার সম্বন্ধ।
নিরুপাধি প্রেম যাঁহা তাঁহা এই রীতি।
প্রীতি বিষয়সুখে আশ্রয়ের প্রীতি।
নিজ প্রেমানন্দে কৃষ্ণ-সেবানন্দ বাধে।
সে আনন্দের প্রতি ভক্তের হয় মহাক্রোধে।

* * *

'অঙ্গস্তম্ভারম্ভমুত্তুঙ্গয়ন্তং
প্রেমানন্দং দারুকো নাভ্যনন্দৎ।
কংসারাতের্বীজনে সাক্ষা-
দক্ষোদীয়ানন্তরায়ো ব্যধায়ি।' ৪

* * *

'গোবিন্দপ্রেক্ষণাক্ষেপি বাষ্পপূরাভিবর্ষিণম্।
উচ্চৈরনিন্দদানন্দমরবিন্দবিলোচনা।' ৫

* * *

আর শুদ্ধ ভক্ত কৃষ্ণপ্রেম সেবা বিনে।
স্বসুখার্থ সালোক্যাদি না করে গ্রহণে।

* * *

'মদ্গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে।
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোহম্বুধৌ।
লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতম্।
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে।' ৬

* * *

'সালোক্য-সার্ষ্টি-সারূপ্য-সামীপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ।' ৭

* * *

'স এব ভক্তিযোগাখ্য আত্যন্তিক উদাহৃতঃ।
যেনাতিব্রজ্য ত্রিগুণাং মদ্ভাবায়োপপদ্যতে।' ৮

* * *

'মৎসেবয়া প্রতীতং তে সালোক্যাদি-চতুষ্টয়ম্।
নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ কুতোঽন্যৎ কালবিপ্লুতম্।' ৯

* * *

কামগন্ধহীন স্বাভাবিক গোপীপ্রেম।
নির্ম্মল উজ্জ্বল শুদ্ধ যেন দগ্ধ হেম।
কৃষ্ণের সহায়, গুরু, বান্ধব, প্রেয়সী।
গোপীকা হয়েন প্রিয়া, শিষ্যা, সখী, দাসী।

* * * *

'সহায়া গুরবঃ শিষ্যা ভুজিষ্যা বান্ধবাঃ স্ত্রিয়ঃ।
সত্যং বদামি তে পার্থ গোপ্যঃ কিং মে ভবন্তি ন।' ১০

* * * *

গোপিকা জানেন কৃষ্ণের মনের বাঞ্ছিত।
প্রেমসেবা পরিপাটি ইষ্ট সমীহিত।

* * *

'মন্মাহাত্ম্যং মৎসপর্য্যাং মৎশ্রদ্ধাং মন্মনোগতম্।
জানন্তি গোপিকাঃ পার্থ নান্যে জানন্তি তত্ত্বতঃ।' ১১

* * *

সেই গোপীগণমধ্যে উত্তমা রাধিকা।
রূপে গুণে সৌভাগ্যে প্রেমে সর্ব্বাধিকা।" ১২

[ক্রমশঃ।

৪। 'দারুক শ্রীহরিকে চামরবীজন কোরছিলেন, এমন সময় প্রেমানন্দ উপস্থিত হোয়ে তাঁর সর্বাঙ্গে জড়তা বিস্তার কোরছিলো, কিন্তু দারুক তাকে সাক্ষাৎ হরিসেবার অন্তরায় জ্ঞান কোরে তার প্রতি আদর প্রদর্শন করেননি।'

—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, পশ্চিম-বিভাগ (২।২৪)

৫। 'পদ্মনয়না গোবিন্দভাবিনী রুক্মিণী কৃষ্ণ-দর্শনের অন্তরায় স্বরূপ অশ্রুরাশি বর্ষণশীল আনন্দকে যারপরনাই নিন্দা কোরেছিলেন।' —ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, দক্ষিণ-বিভাগ (৩.৩২)

৬। 'আমার গুণ শ্রবণমাত্র সর্বান্তর্য্যামি ও পুরুষোত্তম আমার প্রতি সমুদ্রগামী জাহ্নবী-জলের ন্যায় অবিচ্ছিন্না, অহৈতুকী (ফলানুসন্ধানশূন্যা), অব্যবহিতা (জ্ঞান কর্মাদির ব্যবধানশূন্যা) মনোগতিরূপ যে ভক্তির সঞ্চার হয়, সেইটেই নির্গুণভক্তিযোগের লক্ষণ।' —শ্রীমদ্ভাগবত (৩।২৯।১০-১১)।

৭। 'আমার ভক্তগণ কেবল আমার সেবা ছাড়া সালোক্য, সার্ষ্টি, সারূপ্য, সামীপ্য বা একত্ব (সালোক্য—সমানলোকে অর্থাৎ বৈকুণ্ঠাদিতে বাস। সার্ষ্টি—সমান ঐশ্বর্য। সারূপ্য—সমানরূপত্ব। সামীপ্য—সমীপে অবস্থিতি। একত্ব—সাযুজ্য।) প্রদান কোরলেও তা' গ্রহণ করেন না।' —শ্রীমদ্ভাগবত (৩.২৯।১২)।

৮। 'এইটেই আত্যন্তিক ভক্তিযোগ নামে অভিহিত। এর দ্বারা জীব ত্রিগুণাত্মিকা মায়া অতিক্রম কোরে আমার ভাব (আমার বিমল প্রেম) প্রাপ্ত হন।' —শ্রীমদ্ভাগবত (৩.২৯।১৩)।

৯। 'আমার সেবার দ্বারাই ভক্তগণের অন্তঃকরণ পরিপূর্ণ; তাঁরা সেই সেবাপ্রভাবে স্বয়ং উপস্থিত সালোক্যাদি মুক্তি-চতুষ্টয়ই যখন কামনা করেন না, তখন যা' কালবশে বিনষ্ট হয়, সেই স্বর্গাদির কামনা কোরবেন কেন?'

—শ্রীমদ্ভাগবত (৯।৪।৬৭)।

১০। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বোলেছিলেন—পৃথানন্দন, গোপিকারা আমার যে কি নয়, তা' বোলতে পারিনা। তাঁরা আমার সহায়, গুরু, শিষ্যা, দাসী, বন্ধু, প্রেয়সী,—যা' বলো তাই।'

—গোপীপ্রেমামৃত।

১১। 'আমার মাহাত্ম্য, পূজা, আমার প্রতি শ্রদ্ধা এবং আমার মনোভীষ্ট কেবলমাত্র গোপিকারাই জানেন। হে পার্থ, স্বরূপতঃ ঐ সকল অন্য কেউই জানেনা।'

—আদিপুরাণ।

১২। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, আদিলীলা।

যেদিন ফুটলো বিয়ের ফুল

বিবি

দুরু-দুরু

কাগজে যেদিন খবর বেরুলো প্রতিমা করেছে বি, এ, পাশ,
সেই রাত্তিরে বিয়ে হ'ল ওর, বুধবারে সেটা আষাঢ় মাস।
বেশ আছে ওরা, খুব নিরিবিলি, দু'জনাতে গুণে দু'জনার,
সেখানেতে সব সংখ্যাগণিত দুয়ের অঙ্কে একাকার।
দু'টো ভরা প্রাণ দু'টো ভরা নদী, খুঁজে পেয়ে গেছে মোহানায়,
দু'জনাকে ধরে জড়িয়ে জড়িয়ে, নিংড়ে নিংড়ে, বয়ে যায়।
কলেজি ডিগ্রি, প্রজাপতি বিয়ে দুই গেল ঘটে এক সাথে,
মেঘ-ঘোমটায় লাজুক জ্যোৎস্না, লঘুবর্ষণ সেই রাতে।

কলেজেতে ঢুকে এক আর দুই, বাছা বাছা রোল নাম্বার,
পাশাপাশি বসি, ললিতা চট্টো, শ্রীমতী প্রতিমা সরকার।
লেকের কাছেই দু'জনার বাড়ী, ইস্কুল থেকে এক ক্লাশে,
এতো ভাব, ক'টা ডাব খাস রোজ, মেয়েরা শুধোয় চার পাশে।
তপতী মিত্র কলেজে সেদিন বেঁধে দিয়েছিল গাঁটছড়া,
এতো তন্ময়, বুঝতে পারি নি, আঁচলে আঁচলে গেরো পড়া।
মাথায় সিঁদুর ডেঁপো সুষমা তো বলেছিল মুখ টিপে হেসে,
আমি ঠিক জানি, ওদের মধ্যে কেউ ব্যাটা-ছেলে ছদ্মবেশে।

সেই থেকে গেছে চারটে বছর, দু'জনে হয়েছি গ্র্যাজুয়েট,
কাগজে যেদিন খবর বেরুলো, প্রতিমার বেলা খোলা গেট।
সরস্বতীর মধুবন থেকে বেরিয়ে তখুনি পেলো বর,
গল্প ফুরোলো, নটেটা মুড়োলো, প্রাণ জুড়িয়েছে তারপর।
ললিতাকে নিয়ে আজো বোলখেলা, আশায় আশায় কাটে বেলা,
মনে মনে বসে শুধু ছবি আঁকা, শুধু মনে মনে ছিঁড়ে ফেলা।
কে জানে কেমন লাগে প্রতিমার, আমার তো খুব লজ্জা করে,
কি সকলে ভাবে, ওরা শুয়ে থাকে, এক বিছানায় বন্ধ ঘরে।

কাল এসেছিল বেড়াতে প্রতিমা, পাঞ্জাব মেলে কাল যাবে,
সিমলায় গিয়ে, অরুণের বুকে আবার স্বর্গ ফিরে পাবে।
বিয়ের আগেই হয়েছে বদলি, বর মিলিটারি অফিসার,
দু'পাশে পাহাড় পাহাড়ের বুকে ছবির মতন কোয়ার্টার।
তপ্ত প্রেমেতে সাহেব মেমের ছোট মনে হয় দিন-রাত,
বাবুর্চি আয়া, আর কিছু নেই তৃতীয় জনের উৎপাত।
এমন বেহায়া, নিজেই বললে, একলা কি করে দিন কাটে,
ডেকে ডেকে মরে উতলা শ্রাবণ, ডুকরে আমার বুক ফাটে।

পনেরোটা দিন, বিয়ের পরেতে, কোথা দিয়ে দিলে চম্পট,
পনেরো মিনিটে, পনেরোটা পাখী, উড়ে গেল করে ছটফট।
বললে, ডাকাত, সব নিয়ে গেছে, মিষ্টি কথায় কেড়ে কেড়ে,
কি বলবো ভাই, কি হাত সাফাই, দেখতে দিলে না চোখ মেলে।
লুঠ করে নিলে যা কিছু পেয়েছে, রসসাগরের পাইরেট,
ফেলে রেখে গেছে ঝড়লাগা শুধু চোখ মুখ বুক এক সেট।
পনেরো দিনেই আষাঢ় লুকোলো, শ্রাবণের মাঝে ডুব দিয়ে,
এই ঝর-ঝর মেঘে ভরা মন, দিন কাটে বল কা'কে নিয়ে?

বললে প্রতিমা, সারা দেহ-মন শুধু চায় আরো লুঠ হই,
অণু-পরমাণু চীৎকার করে, আরো কই, ওরে আরো কই।
কে জানতো বল ভেতরে ভেতরে এতো আকাঙ্খা ছিল ভরে,
শুধু এক মাস রয়েছি একলা, তবু সারা মন হু হু করে।
বাবা-মা সবাই দাদার কাছেই, দাদা নিয়ে গেল আসামেতে,
উনত্রিশ দিন কেটেছে সেখানে, বিরহ শয়ন পেতে পেতে।
মিছেই আসামে ঝরেছে শ্রাবণ, বিদ্যুৎ মিছে চমকেছে,
মিছেই করেছে হাওয়া দুষ্টুমি, নাচিয়ে নাচিয়ে নেচে নেচে।

খাওয়া-দাওয়া সেরে রাত দশটায় দু'জনে গেলুম উঠে ছাতে,
বললে প্রতিমা অনেক কথাই, হাতটা আমার নিয়ে হাতে।
আমার কাছেই রাতটা কাটাবে, সকালেই যাবে মামার বাড়ী,
তারপর সেই সাতটা তিরিশে, সন্ধ্যেবেলায় ধরবে গাড়ী।
একলাই যাবে রিজার্ভ বার্থে, 'কার' এনে বর কালকাতে,
ড্রাইভ করবে, নিয়ে চলে যাবে, মেমসাহেবকে একসাথে।
ফিস ফিস করে বললে প্রতিমা, ওদের গোপন কাহিনী নানা,
অবিরাম প্রেম, সূর্য-চন্দ্র, সমান্তরাল লাইন টানা।

অফিস পালিয়ে প্রায়ই তো অরুণ দুপুরবেলায় বাড়ী আসে,
বড়ো সাহেব সে রসিক মানুষ, ছুটি দিতে গিয়ে মৃদু হাসে।
নির্জন ঘর, স্তব্ধ দুপুর কপোত-কূজন যায় শোনা,
টিক্ টিক্ টিক্ ঘড়ির কাঁটাটা প্রবল নেশায় দায় গোণা।
অলস দুপুরে, মিলন শয়নে, সাহেব-মেমের থাকে না হুঁস,
মনে হয় যেন বেলা এগোয় না, সূর্য যেন সে নিয়েছে ঘুষ।
যেন দু'টো বাজে, আয়া চাকরের আসবার বুঝি অনেক দেরী,
চা খাবার বুঝি বহু বিলম্ব, চলুক এখনো সুধার ফেরি।

মাঝে মাঝে কথা দুটো একটাই, দু'জনার ঠোঁটে বিষম লাগা,
জাগররাতের চোখ ঢুলু ঢুলু, দিনের বেলাও কেবল জাগা।
ম্লান হয়ে এলো ভেতরে-বাইরে ঘরে পড়ন্ত রোদ খেলে,
কলিং বেলটা টেপে বাবুর্চি, চা-পাতা টি-পটে ভিজে এলে।
দিনে নেই ঘুম, রাত্তিরে নেই, চোখ দুটো খুব গেছে বসে,
মন-প্রাণ যেন বর্ষা-রাত্রি, ভিজে জবজব ঘন রসে।
সারা রাত্তির একই কথা শুধু, ভালোবাসি আর ভালোবাসি,
দিনের বেলায়ও সেই একই সুর, তা' নিয়ে ঝগড়া রাশি রাশি।

সে দিন দেখেছি প্রতিমার দিকে, খুবই ভালো করে চেয়ে চেয়ে,
মনে হল যেন কোথা চলে গেছে, কলেজের সেই লক্ষ্মী মেয়ে।
মাথায় সিঁদুর জ্বল জ্বল করে, এ মেয়েটা যেন অন্য কেউ,
হারিয়েছে সীমা, যেন ছুটে চলে প্রাণ-সাগরের বন্যা-ঢেউ।
প্রতিমা তো ছিল, মুখচোরা মেয়ে, বেশ তো লাজুক, শান্ত খুব,
সে কেন হঠাৎ কার ইঙ্গিতে, উতলা নদীতে দিয়েছে ডুব ?
সে দিন দু'জনে পাশাপাশি বসে খেয়েছি তো সেই আগের মত,
বার বার মনে বেজেছে আমার, আগের প্রতিমা, হয়েছে গত।

ইস্কুল থেকে রোগা রোগা ছিল, ঐ ক'টা দিনেই সেরেছে বেশ,
বিয়ের জল তো গায়ে পড়েছেই, এখন চলেছে হাওয়াই 'রেস'।
অন্য জগতে নভো-নীলিমায়, রসের বিমান ওড়ে ওদের,
রেশারেশি পরে বহু গলাগলি, সহজিয়া ভাব খাঁটি নদের।
পিয়াসী ব্রণটা দক্ষিণ গালে, যাই যাই করে বসেই আছে,
নীচের ঠোঁটটা প্রায়ই কামড়ায়, চোখ দুটো জ্বলে, জোনাকি নাচে।
কেমনটা যেন চটপটে খুব, অথচ কেমন অন্যমনা,
এতো সুন্দর হয়েছে চেহারা, সারা শরীরেতে রূপের ফণা।

মধুচন্দ্রিমা ? চুপ কর তুই, সে রাতে আমি তো মহারাণী,
অরুণ সে দিন সাধারণ প্রজা, ছলছল চোখ, করুণ-বাণী।
দরখাস্ত সে পেশ করে যতো, আমি সই করি 'নামঞ্জুর,'
থরথর করে সারা দেহ কাঁপে, বুকে গর্জায় সমুদ্দুর।
মচকাবো কেন, ভেঙ্গে যাওয়া ভালো, মর্যাদা নিয়ে থাকতে,
আমি মহারাণী, তূর্য্য নিনাদে, বড়া ভালো মনে রাখতে।
তাই জানালুম, বলুম তাই, বাজিয়ে রাণীরই ট্রামপেট
আমি মহারাণী, আমার সুমুখে চিরদিনই কোরো মাথা হেঁট।

বললে প্রতিমা, হাসতে হাসতে, সব কিছু তুই বুঝে নিবি,
ছাঁদনাতলার যে শুভ লগনে, বরের গলায় মালা দিবি।
পাটিগণিতটা সবটাই ভুল, সে কথা সে দিন বুঝবি তুই,
এক দুই ছাড়া সংখ্যাই নেই, আসল অঙ্ক এক ও দুই।
এতো করে এতো লেখাপড়া শেখা এতো পরীক্ষা রাত জাগা,
কতো ছবি আঁকা মনে মনে বসে, কতো গান, কতো ভালোলাগা।
তখন বুঝবি পুরুষের বুকে, মুখ গুঁজে আর চোখ বুঁজে,
কুড়িয়ে যা এলি, সে স্বপনগুলো, এতো দিন পরে পেলি খুঁজে।

আবার বললে ইয়ারকি করে, তোর লাভারের খবর বল,
পাশের বাড়ীর হবু ডাক্তার, দয়া করে তাকে দিলি কি কল ?
ওকেই ধরালি ভয়ানক রোগ, অনঙ্গ ব্যাধি বড়ো ভীষণ,
বদ্যি তো তুই, ও বেচারি রুগী, চিকিৎসা বল হবে কখন ?
পাশের বাড়ীতে ডাক্তার থাকে, একটু ওষুধ দিলেই বাঁচে,
দিন কাটে বসে বুকটা সেঁকতে, তোর গনগনে রূপের আঁচে।
দু'-একটা শুধু আদরের বড়ি, তাই দিস ওকে তাই দিস,
ওষুধ দেবার আগেই কিন্তু, নাড়ী ভালো করে দেখে নিস।

শুয়েছি যখন ঘরে দু'জনায়, সারা পৃথিবীটা নিঝুম ঘুমে,
প্রতিমা সেজেছে অরুণ তখন, সেই সিমলার টু-বেড রুমে।
বললে আমাকে, তেত্রিশ দিন, প্রাণপণে বুকে জড়িয়ে ধরে,
তেত্রিশটাই একশো বছর, কোথায় কাটালে কেমন করে ?
দূর অসভ্য, বলে ফেললুম, ভুলে গিয়ে আমি প্রতিমা রায়,
কে শোনে সে কথা, ঘন বিদ্যুৎ চমকে বললে চুমুই খায়।
কি জোরে জড়ায় বেহায়া মেয়েটা, হাড়গোড় যেন গুঁড়িয়ে যাবে,
মনে হল যেন তৃষ্ণা-কমল, মৌমাছিটাকে গিলেই খাবে।

সকালবেলাই চা-খাবার খেয়ে মামার বাড়ীতে বন্ধু গেল,
পৌঁছে দিলুম ট্যাকসিতে তাকে, হাসতে গিয়েই কান্না এল।
তার পর থেকে বিমর্ষ মনে কেবল ভাবছি অসম্ভব,
এ রকম করে জীবন কাটানো, যেন বা একটা জ্যান্ত শব।
এর চেয়ে ভালো সন্ন্যাসিনীর গেরুয়া বসন জড়িয়ে নিয়ে,
প্রাণ-বলি-করা 'জগদ্ধিতায়' মন্দিরে, মঠে, তীর্থে গিয়ে।
রূপ-রস আর ঐ সব কিছু, সব ভুলে যাবো এবার থেকে,
ললিতা এবার অতল সাগরে ডুব দেবে, কেউ পাবে না ডেকে।

এম-এ ক্লাশে আমি ভর্তি হয়েছি, এটা মন্দের হয়েছে ভালো,
তবু বই নিয়ে ভুলে থাকে মন, তবু এতোটুকু আঁধারে আলো।
এখানে-ওখানে পথে-মাঠে ঘাটে, যতো কিছু পাই কুড়িয়ে মরি,
কতো সুন্দর পৃথিবীটা লাগে, মনে হয় বুকে জড়িয়ে ধরি।
কতো হাসি আর কতো ফুল আছে, এই জীবনের মহোৎসবে,
কতো ভুল এই মধুর ভুবনে, হাসি-কান্নায় লুকোলো কবে।
পথে চলি, আর চোখ দুটো কতো তরুণের চোখে লাফিয়ে উঠে,
জিজ্ঞেস করে, তোমার মর্মে আমার ছবি কি উঠেছে ফুটে ?

প্রতিমা তো গেল ইয়ার্কি করে, প্রেমে পড়ে নাকি গিয়েছি আমি,
পাশের বাড়ীর হবু ডাক্তার, তার ধ্যান করি দিবসযামী।
ব্যাপারটা কিছু সিরিয়াস নয়, নিজেই আমি তো বলেছি ওকে,
প্রথম প্রথম ছাদের ওপরে ক'দিন ধরেই পড়েছে চোখে।
দাঁড়িয়ে থাকতো প্রতিদিন এসে, সন্ধ্যেবেলায় ওদের ছাদে,
ভাণ কোরতো সে বই পড়বার, বই একখানা থাকতো হাতে।
দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বেড়িয়ে বেড়িয়ে পড়ার ওপর চোখটা রেখে,
আসলে তাকাতো আমার দিকেই, চাউনিটা যেন উঠতো ডেকে।

পাশের বাড়ীর নিখিলেশ রায় পরীক্ষা নাকি দেবে এবার,
তারপর শুনি, ডিগ্রি পেয়ে, কথা হয়ে আছে বিলেত যাবার।
বাপের মস্ত প্র্যাকটিস আছে, ডিসপেনসারি, দু'খানা বাড়ী,
গাড়ীই নাকি তিন-চারখানা, মেয়েদের গায়ে গহনা ভারি।
আগে আসতো না, আজকাল দেখি, আমাদের বাড়ী প্রায়ই আসে,
মাকে খুব ডাকে, মাসীমা, মাসীমা, চোখ দুটো ওর কেবল হাসে।
সে'দিন এসেছে ফাঁকা সেজে কাছে, হঠাৎ বললে আপনা থেকে,
তোমার বন্ধু সীমা বলছিল, ললি অদ্ভুত কবিতা লেখে।

[ক্রমশঃ।
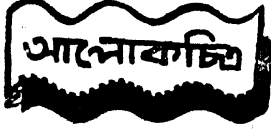
[ছবি পাঠানোর সময়ে ছবির পেছনে নাম ধাম
ও ছবির বিষয়বস্তু লিখতে যেন ভুলবেন না]
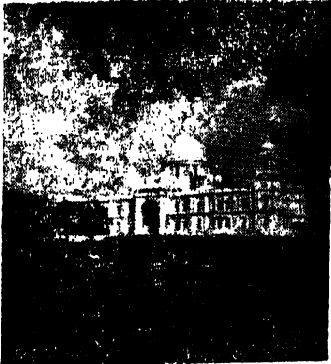
হাতী (মহাবলীপুরম)

—দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

ভিক্টোরিয়া স্মৃতি

—অমিত সরকার

আলপনা

—শ্রীমতী প্রীতা ভট্টাচার্য্য
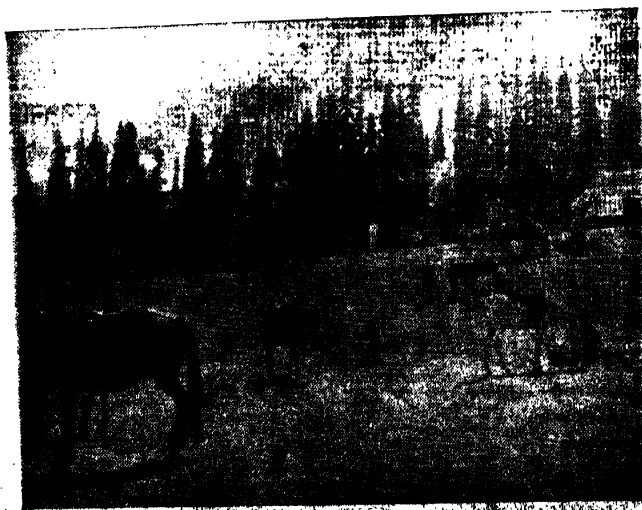
হিমালয়কন্যা —অরুণকুমার দত্ত

কাশ্মীরকন্যা

—জি, ডি, বাগরী

গুলমার্গ (কাশ্মীর) —সুধাসিন্ধু বিশ্বাস

স্কো —রথেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

রাসমঞ্চের অভ্যন্তর (বিষ্ণুপুর)

—তৃপ্তিশেখর দত্ত-রায়

বাঁশের ভেলা —এস, এস, হায়দার

লছমনঝোলার গঙ্গা —পারিজাত বসু

জলক্রীড়া —আশুতোষ সিন্‌হা

রবীন্দ্রায়ণ

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

৺খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
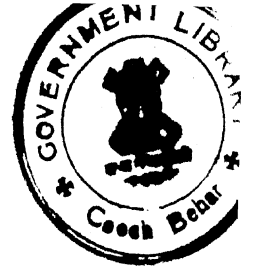
খ্যাতিতে বিচলিত হওয়া কবির স্বভাববিরুদ্ধ, তাই সমাবর্তন উৎসবের কয়েক বৎসর পূর্বে যখন তাঁহার পঞ্চসপ্ততি জন্মোৎসবের আয়োজন হয় তখন কেবল বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের এক সান্ধ্য অনুষ্ঠান ছাড়া অপর সকল অনুষ্ঠান যাহাতে না হয় তজ্জন্য কবি সংবাদপত্রে সকলকে অনুরোধ জানাইয়া তাহা বন্ধ করেন ও সমাবর্তনের দশ মাস না যাইতে যাইতেই ৪ঠা জুন ১৯৪১ অর্থাৎ তিরোভাবের মাত্র দুই মাস তিন দিন পূর্বেও বিশ্বজগৎ তাঁহার একখানি ইংরাজিতে লিখিত খোলা চিঠিতে তাঁহার তরুণোচিত নির্ভীকতা দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল যে দেশপ্রাণ রবীন্দ্রনাথ তখনো পূর্ণভাবে জীবন্ত, বার্ধক্য ও রোগ তাঁহার ভাষায় বা যুক্তিতে কিংবা শ্লেষোক্তিতে কিছুমাত্র দৌর্বল্য আনে নাই। উপলক্ষ হইল সংবাদপত্রে প্রকাশিত জওয়াহরলালকে উদ্দেশ করিয়া বৃটিশ পার্লামেন্টের জনৈকা সভ্যা ইংরাজ মহিলা কুমারী র‍্যাথবোনের এক পত্র। কবি বোলপুরে তাঁহার রোগশয্যা হইতে শ্রুতিলিখনে লেখাইয়া দৈনিক সংবাদপত্রে প্রচার করেন— I do not know who Miss Rathbone is * * * Through the Official British-Channels of education in India that have flowed to our children in schools not the best of English thought but its refuse, which has only deprived them of wholesome repast at the table of their own culture. (Open letter to Miss Rathbone)

ইহার বহু বৎসর পূর্ব হইতে তিনি ইহা বলিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার শিক্ষা সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ বক্তৃতাবলী, 'পয়লা নম্বর' (ছোট গল্প), 'তোতাকাহিনী' (রূপক) প্রভৃতিতে বুঝিতে পারা যায়। 'কথা কও হে মৌন অতীত' নামক কবিতাতেও পাওয়া যায়।

বাঙলার রাজনৈতিক চেতনা উদ্বোধনের যুগে যখন মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সম্প্রদায় জনসাধারণের সহিত স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দেন, তখনই কবি সর্বাগ্রে 'উপরতলা' ছাড়িয়া উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে সাধারণের সহিত মিলিত হন এবং সকলের বিশ্বস্ত বন্ধু ও পথ-প্রদর্শক কি ভাবে হইয়াছিলেন তাহা ৺বিপিনচন্দ্র পালের Indian Nationalism পুস্তকে আছে।

বর্তমানের সহিত সম্পূর্ণ যোগ রাখিয়া যতটা পারা যায় প্রাচীন ইতিহাস ও সাহিত্য হইতে জীবনের মূল সত্য ও সততা অর্জন আবশ্যক বোধ করেন কবি। তাঁহার 'অরণ্যকে' কিম্বা Message of the Forest এ পূর্বপুরুষের প্রতি শ্রদ্ধা, নিভৃত চিন্তা ও তপস্যা দ্বারা যে প্রকৃত মনুষ্যত্ব, হৃদয়ের প্রশস্ততা ও জীবের হিতজনক বাণীলাভের সহায় হয়, তাহার আভাস পাওয়া যায় কিন্তু তাহাকে কর্মরচনা ও সংসারের যাবতীয় প্রয়োজনে নিয়োগ না করিলে শুধুই intellectual dissipation এ পর্যবসিত হয়। তাই তিনি জগৎ দেখিতে ও বিভিন্ন মনুষ্য কেন্দ্রের নানা দেশে নানা চেষ্টা দেখিতে বাহির হন। কেবল স্বদেশিয়ানা নয়, জাতির সংঘবদ্ধ একতার গ্রন্থি দানে পরিণত বয়সের অনেকটাই অতিবাহিত করেন এবং সাফল্যলাভ করিলেও স্বদেশের দৈনন্দিন দুর্দশায় ব্যথিত হইয়া ইংরাজি শিক্ষাতে প্রবঞ্চিত হওয়ার কথা অকপটে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। যে ক্ষিপ্রগতিতে অন্যান্য জাতিরা নিজেদের জনসাধারণে শিক্ষা, শিল্প ও বাণিজ্যের বিস্তার করিতেছে তাহার সহিত আত্মচেষ্টা ও সাহসভরে ভারতীয়দের যোগ রাখা ও চলা আবশ্যক। তাই প্রশ্ন—

দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেরী
আসিল যত বীরবৃন্দ আসন তব ঘেরি'
দিন আগত ঐ
ভারত তবু কৈ ?

উচ্চতর মানবতার আবির্ভাব পূর্বগগন হইতেই হইবে ও জগৎবাসী শ্রদ্ধার সহিত সে আলোকে পুলকিত হইবে, এই স্থির প্রতীতি দেশবাসী আত্মীয়গণকে জানানো আবশ্যক বোধ হইল আর এই জীবত্বকেই সার বোধে অনুভূতি-পথে আত্মোন্নতির মন্থর গমনেই সন্তোষলাভের উপায় কবি স্থির করিয়া গিয়াছেন।

১৯৪০-এর সেপ্টেম্বর হইতে কবির দৈহিক দুর্বলতা বৃদ্ধি প্রতিদিন বোধ হইতে থাকে ও মধ্যে মধ্যে জ্বর দেখা দেয়। ১৯৪১এর জুনে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় অস্ত্রচিকিৎসক ডাঃ ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কে সঙ্গে লইয়া শান্তিনিকেতন যাত্রা করেন ও কবির মূত্রাশয়ের বিকৃতির লক্ষণ দেখা দেওয়ায় তাঁহারা তাঁহাকে ভালোরূপ পরীক্ষা করিয়া তাঁহাকে কলিকাতায় আনিবার ব্যবস্থা করেন। ২৫এ জুলাই এক রোগী-বহা হালকা খাটে শায়িত অবস্থায় মোটর লরি করিয়া শান্তিনিকেতন হইতে বোলপুর ষ্টেশনে আনা হয়। ইহাই কবির শান্তিনিকেতন হইতে শেষ বিদায়। জেলা বোর্ড তৎপর হইয়া রাস্তাটিকে খানা-খোন্দল বুজাইয়া সুগম করিয়া দেন। এবারেও রেল কর্তৃপক্ষ কবির প্রতি শ্রদ্ধাপ্রযুক্ত যথাসম্ভব আরামের ব্যবস্থা করিয়া তাঁহার সেবকদের সহযোগিতা করেন। অশ্রুপ্লুত অধিবাসী ছাত্রছাত্রী অধ্যাপকবৃন্দ, ভৃত্যবর্গ এবং গ্রামবাসী জনসাধারণের সভক্তি প্রণাম ও বিষাদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ আশ্রমের প্রতি চাহিয়া শেষ বিদায় গ্রহণ

পূর্বক পিতৃপিতামহের বাস্তুভিটায় স্বীয় জন্মস্থান কলিকাতার জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে সমাবর্তন করিলেন। 'ঘরোয়ার' পাণ্ডুলিপি পাঠে যে সন্তোষ পাইয়াছিলেন তাহা স্নেহের ভ্রাতুষ্পুত্র অবনীন্দ্রনাথকে জানাইলেন ও সকলকে সস্নেহ আশীর্বাদ করিলেন ও অপেক্ষাকৃত ভালো ছিলেন। অবনীন্দ্র যে একটা জাতির সৌন্দর্য-চেতনা জাগাইতে সক্ষম হইয়াছেন তজ্জন্য সেই ৭০ বৎসর বয়স্ক ভ্রাতুষ্পুত্রকে 'বাণীর বরপুত্র' বলিয়া আশীর্বাদ করেন ও তাঁহার আসন্ন সপ্ততিতম জন্মতিথি জন্মাষ্টমীর দিন স্মরণে জয়ন্তী উৎসব করিতে বিশ্বভারতীর সচিবমণ্ডলীকে ও কয়েকজন খ্যাতনামা অবনীন্দ্র-শিষ্যকে নির্দেশ করেন ও সকল সংকোচ ত্যাগ করিয়া তাহাতে যোগ দিয়া সম্বর্ধনা গ্রহণ করিতে অবনীন্দ্রকে অনুরোধ করেন।

শল্যচিকিৎসকেরা কবির অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন অনুভব করিয়া ৩০এ জুলাই বেলা দশটায় তাহা করিতে স্থির করেন কিন্তু কবিকে তাহা জানানো হয় না। তিনি কিন্তু অনুমান করিয়াছিলেন এবং operation tableএ স্থান গ্রহণের আধ ঘণ্টা পূর্বেও মুখে মুখে রচনা করিয়া নিম্নলিখিত কবিতাটি লিখাইয়া দেন—

তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি বিচিত্র রহস্য জালে
হে ছলনাময়ী।

(তিরোভাবের পর প্রকাশিত 'শেষ লেখা' দ্রঃ)।

স্থানীয় অসাড়তা উৎপাদক ঔষধের সাহায্যে তাঁহাকে সচেতন অবস্থায় অস্ত্রোপচার করা হয় ও চিকিৎসক সুফল আশা করেন। কিছু লাগিয়াছিল কি না জিজ্ঞাসা করায় তিনি Dr. L. M. Banerjee-কে বলেন—Why force me to a lie? পরদিন কবি শ্রীমান্ প্যারীমোহন রবীন্দ্রনাথকে দেখিতে আসিয়া তাঁহার চরণ স্পর্শ করিয়া প্রণামকালে দেখেন যে কবির পদদ্বয় একটু ফোলা। তিনি কবিকে বলেন—আপনার পা একটু ফুলেছে দেখছি যেন। কবি স্মিতহাস্যে উত্তর দেন—চরণে মরণ শরণ নিয়েছে, তাকে কি তাড়ানো উচিত? ১লা অগাষ্ট অপরাহ্ণ হইতে অবস্থা ক্রমশ খারাপ হইতে থাকে ও শংকাজনক হইয়া উঠে, প্রবল হিক্কা দেখা দেয় ৬ই অগাষ্ট মধ্যাহ্ন হইতে ও ৭ই অগাষ্ট ১৯৪১ বৃহস্পতিবার ২২এ শ্রাবণ বেলা ১২টা ১৩ মিনিটে ধরায় রবি অস্তগমন করেন। হিক্কার সঙ্গে সঙ্গেই comaয় আচ্ছন্ন ছিলেন। কিন্তু এই চরম মুহূর্তের জন্য তিনি বহু পূর্ব হইতে প্রস্তুত ছিলেন। তাঁহার ভস্মাবশেষ শান্তিনিকেতনে কোথায় রক্ষিত হইবে, কোন কোন মন্ত্র কি কি গান তাঁহার আত্মার সদ্‌গতির কামনায় পঠিত ও গীত হইবে, তাহাও নির্বাচন করিয়া sealed খামে রাখিয়া যান যাহাতে কেবলই ভগবানের কথা ও তাঁহাতে আত্মনিবেদন। কোমা আরম্ভ হইবার পূর্বে তাঁহার পূরবী সুরে 'সমুখে শান্তি পারাবার' গানটি তাঁহাকে শুনানো হয়। তাঁহার তিরোভাবের আধ ঘণ্টা পরেই সংবাদটি প্রচারিত হয় বেতারে, সংবাদপত্রগুলির রবি 'অস্তমিত' শিরোনামাযুক্ত টেলিগ্রামে ও জোড়াসাঁকো ভবনে চারিদিক হইতে মুহুর্মুহু টেলিফোনে সংবাদ লওয়া হইতে থাকে দশ মিনিট পরেই। তাঁহার মহাসমাবর্তনে মহানগরীর আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই হৃদয়ঙ্গম হয় আমরা কি রত্ন হারাইলাম। দৈনিক পত্রগুলি কয় দিন অন্য সংবাদ প্রায় প্রকাশ স্থগিত রাখিয়া রবীন্দ্র-কথায় মুখর ছিল।

পেয়েছি ছুটি, বিদায় দেহ ভাই
সবারে আমি প্রণাম ক'রে যাই।

বেলা ২টার সময় অভূতপূর্ব বিপুল জনতার সমাগম হয় জোড়াসাঁকো ভবনে ও তাহার প্রাঙ্গণে। ডাঃ শ্রীমান্ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া সকলকে স্থির থাকিতে অনুরোধ করেন বার বার এবং আচার্য রাধাকৃষ্ণন প্রমুখ মনীষিবৃন্দ, সাহিত্যিকবৃন্দ, শিল্পিবৃন্দ ও কয়েকজন নেতাও সমবেত হন বিশ্ববরেণ্য মহাভাগকে তাঁহাদের শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে তাঁহার পার্থিব আধারকে কেন্দ্র করিয়া। বেলা তিনটার সময় এই বিপুল জনতার শোকযাত্রা তাহাদের বরেণ্য ও প্রিয় রবীন্দ্রনাথের নশ্বর দেহ লইয়া বাহির হইয়া শহরের প্রধান প্রধান রাস্তা দিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট ভবনের সম্মুখে পাঁচ মিনিট দাঁড়ায় ও খাট রাখে। এই শোকযাত্রায় লরিতে করিয়া কলিকাতার স্কুল কলেজগুলির নামলেখা পতাকাসহ ছাত্র-ছাত্রী ও অধ্যাপকদের দলও অন্যান্য লরিতে অসংখ্য ভারতীয় জাতীয় পতাকা শোভিতদল যোগ দেয়। অতঃপর সেনেট ভবন হইতে এই বিরাট জনমণ্ডলীসহ কবির দেহ নিমতলা শ্মশানে আনীত হয়। সারাপথে প্রত্যেক ভবনে বাতায়নে, গবাক্ষে ও ভবনশীর্ষে কেবল অগণিত জনমণ্ডলী দেখা গিয়াছিল ও কবির উদ্দেশে পুষ্প ও লাজ (খৈ) বর্ষণ তথা হইতে হইয়াছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মুখে শবাধার রক্ষিত হইলে ভাইস-চান্সেলার ও সিণ্ডিকেটের সভ্য ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে পণ্ডিতাগ্রগণ্য দেশনায়ক চিন্তানায়ক শ্রেষ্ঠ মনীষীর দেহকে পুষ্পমাল্য দ্বারা শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন, যিনি বলিতেন তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন নাই। শ্মশানে ভাগীরথী তীরে একখণ্ড নূতন ভূমি কর্পোরেশান ও পোর্ট ট্রাষ্টের কর্তৃপক্ষের চেষ্টায় যেন এই পবিত্র শব শিরে বহন করার জন্য উন্মুখ হইয়াছিল, তদুপরি বিশ্বকবির মরদেহের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়। তাঁহার জীবিত একমাত্র পুত্র শ্রীমান্ রথীন্দ্রনাথ শ্মশানে উপনীত হইবার পর মানসিক ও শারীরিক অসুস্থতা বোধ করায় শেষ কাজ করিতে অক্ষম হওয়ায় কবির লোকান্তরে অগ্রগামী স্নেহের ভ্রাতুষ্পুত্র ৺সুরেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান সুবীরেন্দ্রনাথ ঠিক যখন আকাশ-রবি অস্ত গিয়াছেন তখন ধরায় রবির শ্রদ্ধাতর্পণাদি অন্তে নশ্বর দেহে শেষ অগ্নি-স্পর্শ দেন। কলিকাতা বেতার প্রতিষ্ঠান নিমতলা শ্মশানে চিতায় কবিকে তুলিবার পূর্ব হইতেই শ্মশানে যন্ত্রপাতি লাগাইয়া ঘোষক দ্বারা চিতা নির্বাপণ পর্যন্ত সমস্ত খুঁটিনাটি সংবাদ পর পর বিশ্বময় বেতারে ঘোষণা করিতে থাকেন।

শ্রীমান্ রথীন্দ্রনাথ পরদিন প্রভাতে কবির চিতা-ভস্ম লইয়া বোলপুর যাত্রা করেন ও পিতামহের রক্ষিত ভস্ম-সমাধির পার্শ্বে পিতার ভস্মও শান্তিনিকেতনের ছাতিমতলায় বিধিমত সমাধিস্থ করেন। রবীন্দ্রনাথ আসন্ন মৃত্যুর প্রত্যাশায়, শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের পাঁচ দিন পূর্বে বিশ্বভারতীকে তাঁহার শেষ দান প্রায় লক্ষ টাকা মূল্যের তাঁহার কলিকাতাস্থ সাধের লাল কুঠিটি এবং কয়েকটি আয়বান সম্পত্তি অর্পণ করিয়া গিয়াছেন ও জনৈক বিলাত-ফেরৎ চিকিৎসককে কলিকাতায় একটি বাড়ী দান করিয়া গিয়াছেন।

বাঙ্ময় ব্যক্ত জগৎ হইতে ভাষা শব্দহীন অব্যক্ত জগতে জীবের প্রবেশ সম্বন্ধে কবি তাঁহার 'জীবন' অভিধাযুক্ত কবিতায় লিখিয়াছেন

তার পরে মুছে ফেলে বর্ণ তার, রেখা তার,
উদাসীন চিত্রকর কালো কালি দিয়ে ;
কিছু বা যায় না মোছা সুবর্ণের লিপি
ধ্রুব তারকার পাশে জাগে তার জ্যোতিষ্কের লীলা।

শেষ দুই পংক্তিতে মানব জীবনের তাৎপর্যের সংকেত। এ দেশের চিরন্তন সংস্কার আত্মা অবিনাশী এবং সুকৃতির সুফলে মর্ত্যবাসীর তিমির-যাত্রার পথপ্রদর্শক guiding star রূপে তাহার ক্ষীণ জ্যোতির দ্বারা জগতের হিতসাধন করিতে থাকে, পার্থিব কর্মের ভালো মন্দের ফলে তাহার ভবিষ্যৎ কর্ম ও জীবন নির্ধারিত হইয়া থাকে। জগতকল্যাণ কামনা ও ভগবৎভক্তির পরিণতি যে লোকোত্তর জ্যোতির্ময় অবস্থায় অবাধ বিচরণ, ইহারই আভাস দিয়াছেন। যুগযুগান্তের অনন্ত চৈতন্যপ্রবাহে অপরিণত অপরিপুষ্ট মানব সমুদ্রের মধ্যে তরঙ্গের শিখরে মাঝে মাঝে এক একটি পরিপূর্ণ মানবের সন্দর্শন ঘটে। কিছুকাল এ মর্ত্যভূমে তাঁহাদের মহৎ চিন্তার প্রতিভা ও মহীরুহতুল্য জীবদুঃখ-কাতর প্রশস্ত হৃদয়ের নয়নাভিরাম জ্যোতি বিকীরণ করিয়া বুদবুদের মতো সেই মহাবোধের লহরী মধ্যে লয় পায়। কেন হয় বলা যায় না, সকলই চিন্ময় পুরুষের মঙ্গল ইচ্ছা ও লীলা। কিন্তু চক্ষুর অন্তরাল হইলেও চিৎ-সরিতের মধ্যে পরবর্তী তরঙ্গদলের কণাগুলিকে শক্তি ও গতি দিতে থাকে! এইজন্যই জগৎ-ইতিহাসে, যুগের অচিন্তানীয় প্রয়োজনবোধে, বিপুল মানবরাশি ও স্রোতের মধ্যে একটি শাক্যসিংহ, একটি সক্রেটিস, একটি মহাবীর তীর্থংকর, একটি যীশু, একটি শ্রীচৈতন্য, একটি শ্রীরামকৃষ্ণ ও একটি শ্রীরবীন্দ্রনাথ উত্থিত হইয়া যুগপ্রবর্তকরূপে জন্মগ্রহণ করেন। তেমনি একটা আলেকজাণ্ডার, একটা চেঙ্গিস খাঁও পৃথিবীর গণসমূহকে চমৎকৃত করিয়া থাকেন। ইহার কারণ নির্দেশে পাশ্চাত্য দর্শন কোনো সন্তোষজনক যুক্তি দিতে অক্ষম কিন্তু পিথাগোরাস, প্লেটো প্রভৃতি গ্রীক্ দার্শনিকেরা, সম্ভবত প্রাচ্যদর্শন প্রভাবে, কথঞ্চিৎ জন্মান্তরবাদ ও কর্মফলের পারম্পর্য স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহাদের অনুসরণ করিয়া ইংরেজ খৃষ্টান কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ Pantheism জড়ের মধ্যে চৈতন্য, ও immortal আত্মার অমরতা স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

Trailing clouds of glory do we come
From God who is our home.

সেই পরমেশ্বর আমাদের আরামের বাসস্থান বা গৃহ,—তাঁহার নিকট হইতে আমরা (অর্থাৎ মানবাত্মা) জ্যোতিষ্মান মেঘবিন্দুর প্রলম্বিত মূর্তি বা কিরণস্বরূপ আসিয়াছি। আমাদের ইহলোকের জীবন যেন নিদ্রা ও পূর্বকথা বিস্মরণ হওয়া, তবু যেটুকু চৈতন্য অবশিষ্ট থাকে তাহারই জন্য আমরা ধন্য, ইতিপূর্বে হয়তো অন্য কোনো গগনে তাহা অস্তমিত হইয়াছে। সুতরাং মৃত্যুর দ্বার দিয়া আমাদের পূর্বতন গৃহে কবি গ্রে'র মতে—

B ck to its mansion goes the fleeting breath
(Greys El'egy)

ম্যান্‌সানে গমন বা মহাসমাবর্তন ও অন্ত আকাশে চিন্ময় জ্যোতিতে আত্মার পুনঃপ্রকাশ সম্ভব। ইহা যে রবীন্দ্রনাথের অন্তরতম বাণী ছিল, পার্থিব রহস্য উদ্‌ঘাটন ও কৌতুকপ্রিয়তা তার বহিরাবরণ ছিল, তাহা তাঁহার শেষ তিন চারি বৎসরের গান কবিতা প্রভৃতির মধ্যে ভালো করিয়া দেখিলে কিছু কিছু পাওয়া যায়, অন্ততঃ সুরের পরিবর্তন লক্ষিত হইবে।

সকল উৎসবের অঙ্গস্বরূপ- একটি তৈল বা ঘৃতপূর্ণ প্রদীপে মোটা সলিতা দিয়া হাঁড়ির মধ্যে জ্বালাইয়া রাখা এ দেশের প্রথা। এমন কি, বর-কনের অব্যূঢ়ান্ন বা আইবুড়ো অবস্থায় শেষ ভাত খাওয়াতেও ব্যবহৃত হয়। বিশেষ পূজায়, অধিবাস হইতে বিসর্জন পর্যন্ত ঘট বা প্রতিমার পার্শ্বে উহা রক্ষিত হয় এবং কয়েক দিবসব্যাপী হইলে, যাহাতে ইতিমধ্যে কোনো প্রকারে নির্বাপিত না হয় তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্ন লইতে হয় নতুবা কাম্য কর্মে অমঙ্গল সূচনা করে। আরতিরও প্রধান অঙ্গ দেবোদ্দেশে দীপদান ও তদ্দারা আরত্রিক সম্পন্ন করা, তাই বরণ-ডালায় মঙ্গল-ভাঁড়ের মধ্যে দীপ জ্বালাইয়া বর-কনেকে আপাদ-মস্তক তাহার আলো ও তাপ দিয়া বরণ করিবার প্রথা। শ্রাদ্ধবাসরে পিণ্ডদানকালে ও পাত্রীয় অন্ন-ব্যঞ্জন সমর্পণের সময়ে একটি দীপ জ্বালাইয়া অপেক্ষা করিতে হয়। প্রদীপের শিখার ঊর্ধ্বতা ও ঔজ্জ্বল্য দেখিয়া বুঝা যায় পিতৃপুরুষগণ কিরূপ তৃপ্তির সহিত ভোজন করিলেন। হোমকুণ্ডেও অগ্নি রক্ষা করিতে হয় ও তাহার প্রজ্বলিত শিখায় হোমের ও কর্মের সফলতা জ্ঞাপন করে। ফুৎকার দ্বারা অগ্নি জ্বালানো ও প্রদীপ নিবানো নিষেধ ও দোষের। তাহাতে সুফল হয় না, বংশের হানি ঘটে, যেহেতু ফুৎকার উচ্ছিষ্ট। হোমাগ্নি 'সমুদ্রং গচ্ছ' বলিয়া দধি, উদকাঞ্জলি, তাম্বুল ও রম্ভা দ্বারা নির্বাপিত করিতে হয়, পূর্ণাহুতি ও পূর্ণপাত্রস্থিত তণ্ডুলাদি প্রদান পূর্বক তৎপূর্বে কর্মসমাপনের অনুমতি অগ্নিদেবের নিকট যাচঞা করিতে হয়। কাজেই কর্মান্তে দীপ আচ্ছাদন করার ব্যবস্থা, সরা বা অন্য হাঁড়ির দ্বারা বা উদ্দেশে হস্ত দ্বারা উহা সম্পাদিত হয়। তাহাতে উৎসবের সমাপ্তির পরও সকলের মনে মাঙ্গলিক কার্যের আরামপ্রদ তাপ ও স্নিগ্ধ জ্যোতির ভাবটা যেন কিছুক্ষণ পর্যন্ত ধরিয়া রাখা হয়।

উৎসব দীপ, গানের রেশের মতো স্বীয় স্বাভাবিক গতিতে লয় পায়। জ্যোতিষ শাস্ত্রে বলে, যে মানব স্বীয় জন্ম সময়ের গ্রহনক্ষত্র সংস্থান অবগত নহেন, তাঁহার জীবন প্রদীপশূন্য কক্ষের মতো। গৃহস্থালীর এই সামান্য অথচ অত্যাবশ্যকীয় বস্তুটি তাই আমাদের সাহিত্যে অনেক স্থলে উপমেয় হইয়াছে এবং হিন্দু মাত্রেরই নিকট জীবনের প্রতীকস্বরূপ সমাদৃত। জীবন হইতে তপস্যা, যৌবন, প্রতিভা, বুদ্ধি ও অধ্যাত্ম-বিভূতি সবগুলিই বোধগম্য করিতে, মানবাধারে রক্ষিত চিন্ময় শিখার অপরাজিত দীপ্তিকে আমাদের নিকট সম্যক পরিস্ফুট করিতে, ঈড়া, পিঙ্গলা সুষুম্না বাহী 'ক্রোধ না ক্রোধনিষ্ঠা' ও তৎসৎরূপী সর্বকর্মপ্রযোজক তেজ বা স্ফূর্তিকে যেন মূর্তিমন্ত করিয়াছে। ব্যক্তিত্ব বুঝিতে তাহার বহিঃপ্রকাশ, রূপ, যশ, ধৈর্য, বীর্য, দক্ষতা ও কল্যাণপ্রসূ উর্বরতা তেমন করিয়া বিশ্লেষণের অবকাশ পাই না, তাই সমগ্রভাবে 'তৈলাধার পাত্র কি পাত্রাধার তৈল' রূপ একটা যুক্তিতে সুধাকর ও জ্যোৎস্নার প্রভেদ না করিয়া বা গোলাপের সৌরভে ও আকারে মনে ভিন্নতা না রাখিয়া, কোনো বিশেষ ব্যক্তিকে তাঁহার নামরূপের অন্তরালে তাহার গুণাবলীর একটা সাধারণ ধারণা যাহাতে আমাদের হৃদয় তৃপ্তি ও আনন্দ পায়, তাহাই তাঁহার মনুষ্যত্ব বলিয়া ধরিয়া লই। কিন্তু অসাধারণ মানবের প্রভাব কি প্রকট অবস্থায় কিংবা আচ্ছাদিত অবস্থায়, যুগধর্ম গঠনের সহায়তা করে। তাঁহাদের জীবন-প্রদীপ

জাতিকে জ্ঞানে, বুদ্ধিতে ও সম্ভ্রমে শ্রদ্ধায় কিছুকাল সমুন্নত রাখে। তাঁহাদের বিবিধ দুঃখ ও দুঃখ জয়ের কাহিনী উত্তর পুরুষের বল ও আশ্বাস সঞ্চয় কার্যে পুণ্যশ্লোক পঠনের ফলপ্রসূ হয়।

বাঙলা দেশের ভাগ্য আশী বৎসর ধরিয়া যে 'কুসুমদাম সজ্জিত দীপাবলী তেজে উজ্জলিত নাট্যশালাসম ছিল যে পুরী,' সেই পুরুষের দেহাবলম্বনের দেব অংশুমালী যে নিত্য পবিত্রতা অর্পণ করিয়া সহস্ররশ্মি-হাজার দীপের উৎসব বা 'দেওয়ালী' জাগাইয়া রাখিয়াছিলেন তাহা ৭ই আগষ্ট ১৯৪১এর দিবা দ্বিপ্রহরে বঙ্গবাসী, ভারতবাসী তথা বিশ্ববাসীর লোচনপথে চিরতরে আচ্ছাদিত করিলেন।

বাঙলা দেশের তথা ভারতের এই দুর্দিনে বাঙলার গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে যে বিষণ্ণতা ব্যাপ্ত হয় ও তাহা প্রকাশের যে ব্যাকুলতা দৃষ্ট হয় তাহাতে প্রতীয়মান হয় যে, যে অননুভূত হৃদয়াবেগ নরনারী নির্বিশেষের স্মৃতিপটে সে দিনটি অঙ্কন করিয়া গিয়াছে তাহা লিপিবদ্ধ করা দুঃসাধ্য। আলোছায়ার সংমিশ্রণে মুগ্ধ যে প্রেমিক একদিন 'রাহুর প্রেম'কে রূপ দিয়াছিলেন তিনি বঙ্গাব্দ ১৩৪৮ সালের ২২এ শ্রাবণ মধ্যাহ্নে (১৮৬৩ শকাব্দে, ১৯৯৮ সংবতে) সমাবর্তন উৎসব দিবস হইতে ঠিক এক বৎসর পরে মহাসমাবর্তন মানসে নীরবে 'শান্তি পারাবারে' পাড়ি দিলেন, পৌর্ণমাসী সংযোগে একটি সকল কামনা ও সত্যাশ্রিত সকল বাণীর সন্ধান আমরা পাই। ১২৯৬ সালে প্রকাশিত 'মানসী'পুস্তকে "ঝুলন পুর্ণিমা" কবিতায় যাহা উচ্চারিত হয়, সেই আকাঙ্খা তাঁহার একাশীতম বৎসরে ফলিয়া গেল। তাঁহার স্মৃতি, বাণী ও কীর্তি জয়যুক্ত হইয়া উত্তরোত্তর দেশবাসীকে প্রদীপ্ত করিতে থাকুক। উদীয়মান তরুণরা স্বীয় সন্তান সন্ততিদের কবির ভাবের কিছু দিতে থাকুন।

রবীন্দ্রনাথ moribund বা morbid sentiment মৃতপ্রায় কিংবা বিকৃতপ্রাণ-পরিচায়ক ভাবের প্রশ্রয় কখনো দিবার পক্ষপাতী ছিলেন না। তবে মৃত্যুর রহস্য উদঘাটনে তাহাকে স্বাভাবিক রূপে দেখিতে বরাবরই প্রয়াস পাইয়াছেন। আগম ও নিগমের দ্বারস্বরূপ নৈর্ব্যক্তিক (impersonal) ভাবে তাহাকে অবলোকন করেন না —যে আমাদের এক জীবন হইতে অন্য জীবনে উত্তরোত্তর লইয়া যাইতেছে, কাণ্ডারীস্বরূপ তাহাকে তিনি ভিন্নমূর্তি Personification দিয়াছেন। 'Ferryman over the Stygian waters' বৈতরণীতারণ কর্ণধারের সহিত সখ্যতা স্থাপনে তিনি যত্নবান—

(আমি) পরাণের সাথে খেলিব আজিকে মরণ খেলা

বা—মরণ রে, তুহুঁ মম শ্যাম সমান

সাধারণ মানবের সাধারণ ভাব বা সাধারণ ধারণানুযায়ী নহে। কি উল্লাসে যে তাঁহার লেখনী নিসৃত তাহা অনুভবের বিষয়। এমন কি অন্তিমকালেও মৃত্যু-চিন্তা তাঁহার ছন্দবিলাসে অভিনবভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার আদর্শবাদী মন মৃত্যু ও অবসান— বিচ্ছেদ ও বিরহ—ছায়া ও আঁধারের মর্মস্থল ভেদ করিতে চায়, অন্তরঙ্গতা প্রয়াসী। ইহা সামান্য মন নহে, ইহা তাঁহার মনের স্বভাবজাত বিশিষ্ট গঠনেরই পরিচয়, চেষ্টাকৃত বা অধীত বিদ্যার ফল বা সংস্কার নহে। তাঁহার এই অসামান্যতা বর্ণনার মধ্যে যাহা মেলে তাহার অতীন্দ্রিয় বুদ্ধির সাহায্যে রস গ্রহণীয়। ঝটিকা-বিক্ষুব্ধ সমুদ্র দর্শনে তিনি অভিব্যক্তিতে বলিয়া উঠেন—

নীল মৃত্যু মহাক্রোশে শ্বেত হয়ে উঠে।

কি ভাবে যে ধবল মর্মরের সৌন্দর্যের আধার তাজমহল তরলীভূত হইয়া—

এক বিন্দু নয়নের জল

কালের কপোলতলে শুভ্র সমুজ্জ্বল

হইয়া তাঁহার নিকট দেখা দিয়াছিল তাহার উপমায় যেন নশ্বরতার ছায়া লাগিয়া আছে, অথচ সুন্দর। ইহা গভীর প্রেরণা বা intuition দিয়া বুঝিতে হয়, সাধারণ বাস্তববুদ্ধি দ্বারা বোধগম্য হয় না; কারণ ইহা যুক্তিমূলক উপমা (intellectual similitude) নহে। তাঁহার লেখায় অনেক স্থলে ভাবমূলক উপমার (emotional similitudes) সমাবেশ। রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিতেও মানসিকতা প্রবল কিন্তু তাহাতে বিজ্ঞানাতীত ভাবুকতার (spiritualism) আমেজ ও সংমিশ্রণ থাকায় সে তর্জনী উঠাইয়া আস্ফালন করে না। লোকোত্তর স্থানের ও কালের ভাবনা মানবীয় সংস্কৃতি। ইহাই যুগে যুগে মানুষের চিন্তাকে আলোড়িত করিয়া আসিতেছে। রোগ আরোগ্য অপেক্ষা প্রতিরোধ করাই শ্রেয় (Prevention is better than cure) কিন্তু প্রেমানন মৃত্যু চিরবান্ধবের কার্য করে। বৈদিক ঋষিরা জীবন-প্রদীপের সন্ধান পাইয়াছিলেন তাই চিরজীবী মার্কণ্ডেয়ের নিকট মানবেরা গুড় তিল সংমিশ্র দুগ্ধের গণ্ডুষ বার্ষিক জন্মতিথিতে পান করিয়া আয়ু কামনা করে।

কালের অব্যাহত গতি লক্ষ্য করিয়াই মহর্ষি গৌতম ঋগবেদের প্রথম মণ্ডলের চতুর্দ্দশ অনুবাকে অষ্টম সূক্তে উষার বর্ণনা দিতেছেন—

পুনঃ পুনর্জায়মানা পুরানীসমান ংবর্ণমভিশুম্ভমানা

শ্বঘ্নীব কৃত্নুর্বিজ আবিমানা মর্ত্তস্য দেবী জরয়ন্ত্যায়ুঃ।

অর্থাৎ—উষাদেবী চিরন্তনী এবং বার বার জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। ইঁহার রূপ একই প্রকার। কর্তনশীলা ব্যাধস্ত্রী যেমন পক্ষাদিচ্ছেদন দ্বারা পক্ষীদিগকে সতত হিংসা করিয়া থাকে, সেইরূপ ইনি সমস্ত প্রাণীর আয়ু নষ্ট করিয়া থাকেন।

১৩৪৮ বঙ্গাব্দের ২২এ শ্রাবণ দিবসে সূর্যোদয়ের প্রাক্কালে যে গৌতমবর্ণিত উষা সমুপস্থিত হইলেন, তিনি খৃষ্টীয় বিংশ শতাব্দীর বাঙালীর জাতীয় জীবনের আয়ু হনন করিয়া ধীরে ধীরে উৎসব-প্রদীপটি আচ্ছাদিত করিতে লাগিলেন। বৈজ্ঞানিক মণ্ডলী (চিকিৎসকেরা) ঘোষণা করিলেন কবীন্দ্রের পার্থিব দেহস্থিতির আর আশা নাই। সেদিন "রাখী" পুর্ণিমা তিথির শুভ সংযোগ ছিল। 'রাহুপ্রেমে'র রূপকার সীমাহীন মহাগগনে অচিরেই তাঁহার আকাঙ্ক্ষার বস্তু 'সুন্দর হৃদিরঞ্জন' অমৃতময় পূর্ণ ইন্দুর সাক্ষাৎ লাভ পাইলেন আর আমরা শুনিয়া গেলাম অযুতকণ্ঠে ধ্বনিত রবীন্দ্রনাথ জিন্দাবাদ, 'Rabindranath no more,' 'Long live Rabindranath for All India—the land and people he so dearly loved.' আজ তাঁহারই রচিত রচনায় তাঁহার উদ্দেশে ধ্বনিত হইতেছে—

স্বদেশের যে ধূলিরে শেষ স্পর্শ দিয়ে গেলে তুমি

বক্ষের অঞ্চলপাতে, সেথায় তোমার জন্মভূমি।

বিশ্বের বন্দনা বাজে শব্দহীন সুমহান গীতে,

জাগো দেহহীন স্মৃতি মৃত্যুহীন প্রেমের বেদীতে।"

সমাপ্ত

জে, বি, প্রিষ্ট্‌লে
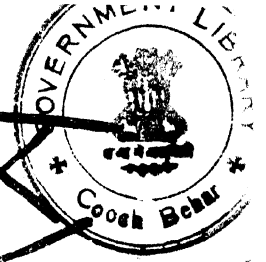
তৃতীয় অঙ্ক

[পর্দা উঠলে সবাইকে দেখা যায় দ্বিতীয় অঙ্কের শেষ দৃশ্যের আপন আপন জায়গায়]

অলওয়েন। মার্টিন আত্মহত্যা করেনি !

ফ্রেডা। মার্টিন আত্মহত্যা —

অলওয়েন। না—আমিই তাকে গুলী করেছিলাম ! (বেটি ৎকার করে ওঠে। আর সবাই অলওয়েনের দিকে তাকিয়ে থাকে ম্ময়-বিস্ফারিত দৃষ্টিতে)।

রবার্ট। না অলওয়েন, এ একেবারে অবিশ্বাস্য কথা, কিছুতেই স্তব নয়।

গর্ডন। তোমার কেমন রসিকতা অলওয়েন ?

অলওয়েন। উঃ, সত্যিই যদি রসিকতা হ'ত ! (দু'হাতে খ ঢেকে হতাশ ভাবে বসে পড়ে)।

গর্ডন। অলওয়েন, অলওয়েন !

রবার্ট। হঠাৎই ও অসুস্থ হয়ে পড়েছে। শুনেছি, এরকম অবস্থায় অনেকেই নাকি অন্যের অপরাধকেও নিজের বলে স্বীকার করে বসে !

ষ্ট্যানটন। (মাথা নেড়ে) অলওয়েন মোটেই অসুস্থ নয় ; ও ঠিক কথাই বলেছে।

বেটি। (ফিসফিস করে) তার মানে, অলওয়েন কি বলছে ও মার্টিনকে খুন করেছে ?

ষ্ট্যানটন। (স্নিগ্ধকণ্ঠে) সম্ভব হলে এবার সব খুলে বল, অলওয়েন ! আমি অবশ্য এতে একটুও আশ্চর্য হইনি। প্রথম থেকেই এ আমি সন্দেহ করেছিলাম।

অলওয়েন। (একদৃষ্টে ষ্ট্যানটনের দিকে তাকিয়ে) আমাকেই তুমি সন্দেহ করেছিলে— ? কিন্তু কেন ?

ষ্ট্যানটন। তিনটে কারণে। প্রথমত—মার্টিনের আত্মহত্যার কোন সঙ্গত কারণই আমি খুঁজে পাইনি। টাকাটা যে সে নেয়নি সে ত আমার জানাই ছিল, আর ধার-দেনা ও অন্যান্য দুশ্চিন্তার কথা ধরলেও—সেজন্য আত্মহত্যা করবার ছেলে মার্টিন অন্তত নয়। দ্বিতীয়ত, আগেই বলেছি, আমি জানতাম সেদিন তুমি অনেক রাত পর্য্যন্তই মার্টিনের ওখানে ছিলে। তৃতীয় কারণটা এখন আমি বলছি না। কিন্তু সব মিলে আমার ধারণা হয়েছিল ব্যাপারটা নেহাতই একটা এ্যাক্‌সিডেণ্ট—দৈবাৎই ঘটে গেছে। কেমন, তাই না ?

অলওয়েন। (নিম্নকণ্ঠে ও বিষণ্ণ ভাবে) হ্যাঁ, সত্যিই এ্যাক্‌সিডেণ্ট। সব কিছুই আমি খুলে বলছি। কারুরই কিছু আর এখন লুকোবার নেই।

ষ্ট্যানটন। তার আগে তুমি একটু কিছু নেবে কি, অলওয়েন ?

অলওয়েন। ধন্যবাদ ! হ্যাঁ, এক গ্লাস সোডা পেলে খুব ভাল হয়। (ষ্ট্যানটন গ্লাশে সোডা ঢেলে অলওয়েনকে দেয়)।

রবার্ট। (নিজের আসন ছেড়ে) এখানে এসে বসবে অলওয়েন ?

অলওয়েন। (অগ্নিকুণ্ডের দিকে যেতে যেতে) ধন্যবাদ ষ্ট্যানটন ! না রবার্ট ! আমি বরং এই চুল্লীটার কাছেই বসি। (বসে) আমি যে সেদিন মার্টিনের কাছে গিয়েছিলাম। সে ত তোমরা আগেই শুনেছ। আমি গিয়েছিলাম টাকাটার বিষয়ে তাকে জিজ্ঞেস করতে। মার্টিন জানত, আমি তাকে পছন্দ করি না। কিন্তু সেই সঙ্গে রবার্ট সম্বন্ধে আমার দুর্বলতার কথাও তার জানা ছিল। রবার্টই টাকাটা নিয়েছে, তার এই ধারণার কথা বলে, সে শুরু করে দিল বিশ্রী রকম সব ঠাট্টা। ভাবখানা 'দেখলে ত তোমার আদর্শ লোকটির কাণ্ড !'

ফ্রেডা। (চাপা তিক্ত কণ্ঠে) হ্যাঁ, তা তার পক্ষে খুবই সম্ভব। মাঝে মাঝে কি বিশ্রী রসিকতাই যে তাকে পেয়ে বসত ! কোন কিছুই তখন আর তার মুখে আটকাত না।

অলওয়েন। সেই রসিকতার স্বাদ তুমি বোধ হয় নিজেও সেদিন কিছুটা পেয়ে এসেছিলে, ফ্রেডা !

ফ্রেডা। হ্যাঁ, তা আর পাইনি ? উঃ, সেদিন সে কি চূড়ান্তটাই না করলো !

অলওয়েন। হ্যাঁ চূড়ান্তই বটে! এর আগে ওই ধরণের কিছু আমার কল্পনারও বাইরে ছিল। এক এক সময় আমার মনে হচ্ছিল, বুঝি বা সে পাগলই হয়ে গেছে!

রবার্ট। (আহত কণ্ঠে) এ-সব তুমি কি বলছ, অলওয়েন?

অলওয়েন। (স্নিগ্ধ কণ্ঠে) ক্ষমা ক'র রবার্ট! তোমাকে অন্ততঃ এই সব আমি জানাতে চাইনি। কিন্তু এখন ত আর উপায় নেই। মার্টিন সেদিন কি সব খেয়েছিলো—

রবার্ট। কি সব মানে? তুমি কি নেশার জিনিষের কথা বলছ নাকি?

অলওয়েন। হ্যাঁ। সেটা একটু বেশী মাত্রায়ই খেয়েছিল।

রবার্ট। তুমি ঠিক জান অলওয়েন? আমার কিন্তু এ বিশ্বাস হচ্ছে না।

ষ্ট্যানটন। অলওয়েন ঠিকই বলছে। মার্টিনের ও বিষের কথা আমারও বেশ জানা ছিল।

গর্ডন। আমারও। একবার ত সে আমাকেও কতকগুলো কি খাইয়েছিল, কিন্তু আমার ও সমস্ত সহ্য হত না।

রবার্ট। ও-সব সে কখন ধরলো?

গর্ডন। সেই যে যুদ্ধে গিয়েছিল, সেই সময় থেকেই। তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে তখন সে কি রকম ঘাবড়ে গিয়েছিল?

রবার্ট। হ্যাঁ, তা সে ঘাবড়ে গিয়েছিল বটে।

গর্ডন। তখনই কে একজন তাকে ওটা খেতে শেখায়। ওটা খেলে নাকি, কোন ভয়-ভাবনাই আর থাকে না। যুদ্ধে গেলে অনেকেই ওটা খায়। তাছাড়া, সাহিত্যিক ও অভিনেতা অভিনেত্রীদেরও ওটা খাওয়া একটা ফ্যাসানেই দাঁড়িয়ে গেছে।

রবার্ট। কিন্তু মার্টিন—

গর্ডন। হ্যাঁ, সে-ও। আর ওটা তার খুবই ভাল লেগে গিয়েছিল, তাই পরিমাণটাও দিচ্ছিল ক্রমশ: বাড়িয়ে।

রবার্ট। কিন্তু তোমরা'ত তাকে বারণও করতে পারতে?

গর্ডন। হ্যাঁ, সে ত বারণ শোনবারই পাত্র কি না! কিছু বলতে গেলে স্রেফ হেসেই উড়িয়ে দিত। তোমরা তাকে বুঝবে না। সে চাইত সব সময় ফুর্তিতে ডুবে থাকতে!

ষ্ট্যান্টন্। ওটা মার্টিনের একারই কোন বৈশিষ্ট্য নয়, ওটা আমরা সবাই চাই!

রবার্ট। তা ঠিকই। কিন্তু আমার মনে হয়, গর্ডন সে ফুর্তির কথা বলছে না!

ফ্রেডা। সে তুমি ঠিকই বুঝেছ, রবার্ট! ফুর্তি বলতে সে শুধু একটা জিনিষই বুঝত, আর তাতেই সে চাইত ডুবে থাকতে। ওষুধটা খেলেই সে ফিরে পেত তার উত্তেজনা, আর তারপর সে যা শুরু করতো, তা তোমাদের কল্পনারও বাইরে! পাগলের মত সে তখন চাইত নিঃশেষে দুনিয়ার সব মজা লুঠে নিতে!

বেটি। (আবেগের সঙ্গে) সে ত' সবাই চায়, আমরাও চাই! কেমন তাই না?

রবার্ট। হ্যাঁ, তারপর, অলওয়েন?

অলওয়েন। (শান্ত আবেগের সঙ্গে) সে সব বিশ্রী ব্যাপার বলতেও আমার লজ্জা করছে। মার্টিনের ধারণা ছিল, কোন মেয়ে কিংবা ছেলেই তাকে না ভালবেসে পারে না।

ফ্রেডা। সত্যিই তাই। আর সে ধারণা তার একেবারে মিথ্যেও নয়।

অলওয়েন। মার্টিন জানত, তাকে আমি পছন্দ করি না। কিন্তু সে আমাকে বোঝাতে চাইল, আসলে আমার এই বিতৃষ্ণা নাকি তার প্রতি আমার আকর্ষণেরই নামান্তর। যৌনজীবন সম্বন্ধে আমার নাকি অহেতুক একটা ভীতি আছে, আর তারই ফলে ঐ বিতৃষ্ণা। আমাদের দীর্ঘ পরিচয়ের কথা ভেবে, তার ওসব কথা আমি ত'ত গায়ে মাখলাম না। কিন্তু এতে করে তার ঝোঁক গেল আরও বেড়ে। যৌন অবদমনের কুফলের কথা বলে, আমাকে সে উত্তেজিত করতে চাইলো জঘন্যতম কতকগুলো ছবি দেখিয়ে।

ফ্রেডা। (সবেগে মুখ ঘুরিয়ে) উঃ, ভগবান! (ফোঁপাতে থাকে)

অলওয়েন। (ফ্রেডার কাছে গিয়ে) মাফ করো ফ্রেডা! আমি বুঝতে পারিনি তুমি এতে এত কষ্ট পাবে।

ফ্রেডা। (কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে) উঃ, মার্টিন, মার্টিন!

অলওয়েন। তুমি না হয় আর শুনো না, ফ্রেডা! কিংবা বল ত' আমিই এবার থেমে যাই।

ফ্রেডা। উঃ! তোমরা বিশ্বাস করো, আগে কখনও মার্টিন ও রকম ছিল না। আগে সে সত্যিই ভাল ছিল।

অলওয়েন। সে ত বটেই! আমরা ত' তাকে সবাই ভাল বলেই জানতাম।

রবার্ট। হ্যাঁ অলওয়েন, তারপর? এখন আর তোমার থামা চলে না।

ফ্রেডা। (ভাঙ্গা গলায়) হ্যাঁ, তুমি ব'ল অলওয়েন!

অলওয়েন। অবশ্য বলবার আর বেশী কিছু নেইও। ছবিগুলো আমি ঠেলে সরিয়ে দিতে, মার্টিন যেন গেল ক্ষেপে। চীৎকার করে বলে চললো, ঐ ছবিগুলোতে দেখান বিষয়ের স্বাদ পেলেই নাকি আমি বুঝতে পারবো—জীবনের সত্যিকারের মূল্য। আর আমার অনিচ্ছাকে মজ্জাগত কুসংস্কার আখ্যা দিয়ে বার বার পীড়াপীড়ি করতে লাগলো আমার পোষাক খুলে ফেলবার জন্য। আমার কোন যুক্তিই তখন তার কানে যাচ্ছে না। এমন কি অনুরোধও নয়। অগত্যা তাকে ধাক্কা মেরেই আমায় উঠে দাঁড়াতে হ'ল। কিন্তু সে তখন বদ্ধ উন্মাদ! টেবিল থেকে রিভলবারটা তুলে নিয়ে সে গিয়ে দাঁড়াল দরজা আটকে। আর চীৎকার করে বলতে লাগলো, বিপদ আর ভয় নাকি যৌন সম্ভোগকে করে তোলে আরও অনেক বেশী উদ্দাম। এবার সুরু হয়ে গেল প্রচণ্ড এক ধ্বস্তাধ্বস্তির পালা; আমি চেষ্টা করছি তাকে দরজা থেকে সরিয়ে দিতে, আর সে চাইছে আমার পোষাক টেনে ছিঁড়ে ফেলতে। উঃ, সে যে কি ভীষণ অবস্থা, ভাবলে এখনও শিউরে উঠি! কিন্তু ধ্বস্তাধ্বস্তির উত্তেজনায় হঠাৎই কি করে যেন তার রিভলবারটা ঘুরে গেল তার নিজেরই দিকে, আর সঙ্গে সঙ্গে গুলীও বেরিয়ে গেল দুম্ করে! (দু'হাতে মুখ ঢেকে) উঃ! কি সাংঘাতিক! ভাবতেও আমি আঁতকে উঠি! মার্টিন জীবিত থাকলে নিশ্চয়ই আমি চলে আসতাম না। কিন্তু সে তখন সম্পূর্ণই মৃত!

রবার্ট। তোমায় তা বলতে হবে না, অলওয়েন, আমরা জানি।

অলওয়েন। ভীষণ ভয় পেয়ে আমি ছুটে গিয়ে চেপে বসলাম আমার গাড়ীতে। কিন্তু তারপর আর কোন সামর্থ্যই রইল না। জনহীন সেই পরিবেশে বসে আমি কাঁপতে লাগলাম আর আমার সমস্ত চেতনাকে আচ্ছন্ন করে দিয়ে জুড়ে বসলো অদূরের সেই নিস্তব্ধ, ভয়াবহ বাংলোটা! উঃ, সে যে কি ভীষণ! (ভেঙ্গে পড়ে দু'হাতে মুখ ঢেকে কোঁপাতে থাকে)

বেটি। (উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে চাপা গলায়) কি সাংঘাতিক! কিন্তু তোমার'ত এতে কোন দোষই নেই, অলওয়েন!

ষ্ট্যানটন। (উঠে দাঁড়িয়ে) হ্যাঁ, অলওয়েন সম্পূর্ণ নির্দোষ। আর আমাদের প্রতিজ্ঞা করা উচিত, এসব কথা কোন দিনই আমরা কাউকে বলব না। (সকলেই শান্ত ভাবে মাথা নেড়ে এ প্রস্তাবে সম্মতি জানায়)

গর্ডন। (তিক্তকণ্ঠে) সেই সঙ্গে এ-ও আমাদের স্বীকার করতে হবে, যে এ ব্যাপারে কেউই আমরা ষ্ট্যানটনের মত অবিচলিত থাকতে পারিনি।

ষ্ট্যানটন। অবিচলিত আমিও খুব ছিলাম না। তবে কি না তোমাদের মত আশ্চর্য্যও আমি হইনি। তার কারণ, প্রথম থেকে এরকমই কিছু আমি অনুমান করেছিলাম।

রবার্ট। কিন্তু শুধু অলওয়েনকে মার্টিনের বাংলোর দিকে যেতে দেখেই এত কিছু অনুমান করে ফেলা বেশ একটু আশ্চর্য্যজনক নয় কি, ষ্ট্যানটন?

ষ্ট্যানটন। আমি ত আগেই বলেছি, এ ছাড়াও আমার অনুমানের আর একটা কারণ ছিল। পরদিন ভোরেই ফ্যালোজ এণ্ডের পোষ্টমিসট্রেস আমায় ফোন করে। আমি যখন সেখানে গিয়ে পৌঁছই তখন সবে গ্রাম্য চৌকিদার আর ডাক্তারই এসে হাজির হয়েছে। প্রথম বিস্ময় কাটিয়ে উঠে এদিক ওদিক তাকাতেই হঠাৎ আমার নজর পড়লো, মেঝেতে পড়ে-থাকা একটা জিনিষের ওপর। সবার অলক্ষ্যে তখুনি আমি সেটা তুলে নিই। আর সেই থেকে বস্তুটা আমার পকেট-বইয়ের মধ্যেই রয়ে গেছে। (পকেট বই বার করে, ছোট এক ফালি ছাপার কাপড় তা থেকে টেনে তুলে সকলকে দেখিয়ে) জানই ত দৃষ্টিটা আমার একটু বেশীই তীক্ষ্ণ।

অলওয়েন। (গভীর আগ্রহে) দেখি? (পরীক্ষা করে) হ্যাঁ, এটা আমার সেদিনের পোষাকেরই একটা টুকরো; ধ্বস্তাধ্বস্তির সময় পড়ে গিয়েছিল। (ষ্ট্যানটনের দিকে তাকিয়ে) তাহলে এ থেকেই তুমি বুঝেছিলে?

ষ্ট্যানটন। (অলওয়েনের কাছ থেকে টুকরোটা নিয়ে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে ফেলে দিয়ে) হ্যাঁ, এ থেকেই।

অলওয়েন। কিন্তু এত দিন বলনি কেন?

গর্ডন। তা কেন বলতে যাবে? ও চেয়েছিল সবাই জানুক মার্টিন আত্মহত্যা করেছে। তবেই ত টাকা চুরির অপরাধটা তার ঘাড়ে চাপান যাবে।

রবার্ট। (ক্লান্ত ভাবে) খুব সম্ভব তাই। ষ্ট্যানটনের অজ্ঞাত কথা থেকেও তাই প্রমাণ হয়।

ষ্ট্যানটন। না, আরও অনেক বেশী গুরুতর কারণের জন্যই কথাটাকে আমি চেপে গিয়েছিলাম। আমি বুঝেছিলাম, অলওয়েন কখনই মার্টিনকে খুন করেনি। যা ঘটে গেছে, তা নেহাৎই দৈবাৎ। অলওয়েনকে খুব ভাল ভাবে জানি বলেই, এটা বুঝতে আমার কষ্ট হয়নি। আর তা বোঝবার পর, সবটা চেপে যাওয়া ছাড়া অন্য পথও আমার ছিল না। কারণ অলওয়েনই হচ্ছে একমাত্র ব্যক্তি, যার সব কিছু সম্বন্ধেই আমি আগ্রহান্বিত। যদিও আমার সম্বন্ধে কোন আগ্রহই ওর নেই।

অলওয়েন। কিন্তু তোমার অনুমানের কথা, আমাকেও ত তুমি বলনি ষ্ট্যানটন?

ষ্ট্যানটন। খুবই আশ্চর্য্য লাগছে, না অলওয়েন? ভাবছ, আমার সম্বন্ধে তোমাকে আগ্রহান্বিত করার এমন সুযোগটা কেন আমি ছেড়ে দিলাম? কিন্তু আজকের দিনের এই হিংস্র জীবন-সংগ্রামের মধ্যেও মানুষের মন উদগ্রীব হয়ে থাকে এমন একজনের জন্য—যার কাছে সে নিজেকে তুলে ধরতে চায় সমস্ত দীনতা হীনতার উর্দ্ধে। আমার জীবনে তুমিই হচ্ছ সেই ব্যক্তি। টাকার ব্যাপারে মার্টিনের নির্দোষিতা তোমারও ত অজানা ছিল না অলওয়েন, কিন্তু রবার্টকে বাঁচাবার আগ্রহে তুমিও কি সব চেপে যাওনি?

বেটি। (শ্লেষে ফেটে পড়ে) আহা রে! ষ্ট্যানটনের এমন প্রেমটা শেষে কি না মাঠে মারা গেল!

রবার্ট। (স্নিগ্ধ কণ্ঠে) এ-সবে তুমি থেক না বেটি! এ-সব তুমি বুঝবে না।

ফ্রেডা (সবিদ্রূপে) আহা, তা কি আর বুঝবে!

বেটি। (ফ্রেডার দিকে তাকিয়ে ঝাঁঝিয়ে উঠে) ওভাবে কথা বলার মানে?

ফ্রেডা (ক্লান্ত ভাবে) কথাটার ভাবই যে ঐ।

অলওয়েন। (ষ্ট্যানটনের দিকে তাকিয়ে) অথচ, আমি কিন্তু আর একটু হলে সব কিছুই তোমায় বলে ফেলছিলাম, ষ্ট্যান্টন।

ষ্ট্যান্টন। (বিস্মিত ভাবে) কি রকম?

অলওয়েন। গাড়ীতে বসে একটু সুস্থ হয়ে উঠতেই, ইচ্ছে হ'ল অন্ততঃ একজন কাউকেও সব খুলে বলতে। আর তোমার বাংলোটাই ছিল সব থেকে কাছে।

ষ্ট্যান্টন। (গভীর শঙ্কা ও চাঞ্চল্যের সঙ্গে) সে কি! তুমি কি তাহলে আমার বাংলোয়ও গিয়েছিলে নাকি?

অলওয়েন। হ্যাঁ, গিয়েছিলাম বৈ কি! রাত তখন প্রায় এগারোটা কি তারও বেশী। গাড়ীটাকে ভেতরে না নিয়ে, গলির মুখেই রেখে গিয়েছিলাম। কিন্তু বাংলোতে ঢুকেই, আবার আমায় বেরিয়ে আসতে হ'ল।

ষ্ট্যান্টন। বাংলোর ভেতরেও তুমি ঢুকেছিলে?

অলওয়েন। হ্যাঁ, হ্যাঁ! একেবারে ভেতরেই ঢুকেছিলাম। তারপরই সোজা আবার বেরিয়ে এসেছিলাম। এখন আর বোকা সেজে কি হবে ষ্ট্যান্টন?

ষ্ট্যান্টন। ও, তাহলে তুমি ত দেখছি ঠিক সময়টিতেই গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলে! আর তার পর নিশ্চয়ই আমার সম্বন্ধে যেটুকু বা তোমার আগ্রহ ছিল, তাও আর রইল না।

অলওয়েন। তা তোমার ওখানে গিয়ে পড়ায় আমার অভিজ্ঞতার যেটুকু বাকি ছিল সেটুকুও ষোলকলায় পূর্ণ হয়ে গেল! মানুষ সম্বন্ধে আর একটা নতুন দিক আমার কা

খুলে গেল। সেদিন থেকে এখানে-সেখানে, কাজে-কর্মে যাদের সঙ্গেই দেখা হয়, তাদের সকলকে দিয়েই আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে অমনি একটা দৃশ্য। বল ত কি বিরক্তিকর! তোমরা হয়ত লক্ষ্য করে থাকবে, সেদিন থেকে বাংলো মাত্রই আমি এড়িয়ে চলি!

ফ্রেডা। (রহস্যতরল কণ্ঠে) হ্যাঁ, চাই কি আমাদের ছেলেমানুষ বেটিও তা লক্ষ্য করেছে!

[বেটি দুহাতে মুখ ঢেকে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে]

রবার্ট। (সন্ত্রস্ত ভাবে) এ কি! কি হ'ল তোমার বেটি?

গর্ডন। উঃ বেটি, কি মিথ্যে কথাটাই না তুমি আমায় এত দিন বলে এসেছ?

বেটি। (কান্না ভরা গলায়) হ্যাঁ, এখন শুধু আমারই দোষ, নিজেরা সব ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির কি না!

রবার্ট। (বিভ্রান্ত ভাবে) সত্যিই ত, বেটি আবার কবে মিথ্যে কথা বললো?

গর্ডন। আঃ রবার্ট, কি বোকামী হচ্ছে? আমি বলছি, ও এক নম্বরের মিথ্যেবাদী!

রবার্ট। কিন্তু কেন?

ফ্রেডা। সে-কথা বেটিকেই জিজ্ঞেস কর না?

অলওয়েন। (ক্লান্ত ভাবে) যাক্‌গে, যা হয়ে গেছে, হয়ে গেছে। তাই নিয়ে ঐ বাচ্চা মেয়েটাকে জ্বালিয়ে কি হবে?

বেটি। (উদ্ধত ভঙ্গীতে) মোটেই আমি আর এখন বাচ্চা নই! ঐটেই ত তোমাদের সবচেয়ে বড় ভুল।

রবার্ট। (এতক্ষণ ভেবে ভেবে হঠাৎই যেন বুঝে) সে কি, ষ্ট্যানটন আর তুমি!—ওরা কি তাই বলছে নাকি? মোটেই তুমি ওদের ঐ জঘন্য কথায় কান দিও না, বেটি!

ফ্রেডা। (বিরক্তির সঙ্গে) আচ্ছা, তুমি এত বোকা কেন রবার্ট, দেখছ না কান না দিয়ে আর উপায় নেই?

অলওয়েন। (স্নিগ্ধ কণ্ঠে) বুঝছ না রবার্ট, সেই রাতে ষ্ট্যানটনের সঙ্গে বেটিকেই আমি দেখেছিলাম।

রবার্ট। (এক মুহূর্ত্ত অবাক হয়ে থেকে) ক্ষমা কর অলওয়েন! এমন কি তুমি বললেও একথা আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। তা ছাড়া অন্য কোন কারণেও ত বেটি সেখানে গিয়ে থাকতে পারে।

ষ্ট্যানটন। মেলাই ত হ'ল রবার্ট, এবার অন্তত চেপে যাও না? আমি কিন্তু এবার যাচ্ছি।

রবার্ট। (সবেগে ষ্ট্যানটনের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে) না, তুমি যাবে না!

ষ্ট্যানটন। আঃ রবার্ট, কি বোকামো হচ্ছে? এর সঙ্গে তোমার ত কোন সম্পর্ক নেই।

ফ্রেডা। (রহস্যভরে) এই রে! শেষে তুমিও ভুল করছ, ষ্ট্যানটন? এইটের সঙ্গেই ত রবার্টের সব চাইতে বেশী সম্পর্ক!

রবার্ট। এইবার বল বেটি।

বেটি। (সভয়ে) আমি আর কি বলবো?

রবার্ট। সে-রাতে সত্যিই কি তুমি ষ্ট্যানটনের বাংলোয় ছিলে?

বেটি। (চাপা সুরে) হ্যাঁ।

রবার্ট। তোমার সঙ্গে কি ষ্ট্যানটনের কোন সম্পর্ক ছিল?

বেটি। (মুখ ফিরিয়ে মাথা নীচু করে) হ্যাঁ।

রবার্ট। (ধীরে ধীরে ফিরে দাঁড়িয়ে গভীর আবেগে ষ্ট্যানটনের দিকে বদ্ধমুষ্টি তুলে) উঃ, ষ্ট্যানটন, আমার ইচ্ছে করছে (হঠাৎ কি ভেবে উত্তেজনায় ফেটে পড়ে) কিন্তু বেটি, তুমিই বা কি করে পারলে? কি করে, কি করে।

বেটি। (হঠাৎ উত্তেজিত স্বরে) কেন, না পারারই বা এতে এমন কি আছে? যাই আপনারা ভাবুন না কেন, এমন কিছু আর আমি নাবালিকা নই। সত্য জানার যখন এতই আপনার ঝোঁক, তখন ভাল করেই জানুন। হ্যাঁ, সে রাতে আমি ষ্ট্যানটনের সঙ্গেই ছিলাম। আর শুধু সে রাতটাই বা কেন? আরও অনেক—অনেক রাতই আমি তার সঙ্গে কাটিয়েছি। আমি জানতাম, ষ্ট্যানটন আমাকে ভালবাসে না। আর ওই রকম লোককে আমার ভালবাসার কথাই ওঠে না। কিন্তু তবু, তবু আমায় যেতে হ'ত। আর সেজন্য গর্ডনই দায়ী! বিয়েটাকে আপনারা যত বড় করেই দেখান না—আসলে সেটা কি? সেদিক দিয়ে গর্ডনের সঙ্গে আমার বিয়ে আবার একটা বিয়ে নাকি? গর্ডনের যা কিছু সবই ত মার্টিনের সঙ্গে—ওকে আবার কেউ পুরুষ বলে নাকি?

ফ্রেডা। (তীক্ষ্ণকণ্ঠে চীৎকার করে ওঠে) আঃ, এ-সব তুমি কি বলছ, বেটি?

বেটি। ঠিকই বলছি। হ্যাঁ, বিয়ে আমি ওকে ভালবেসেই করেছিলাম। ভেবেছিলাম তাতেই আমি সুখী হব। ও সত্যিকারের পুরুষ হলে হয়তো তা হতামও, কাউকেই আর তাহলে আমার দরকার হত না।

গর্ডন। সাট্ আপ্, বেটি—এখনও চুপ কর বলছি।

বেটি। কেন, চুপ করব কেন? মোটেই না। তোমরাই ত সত্য শুনতে চেয়েছিলে, শোন তবে। লজ্জা আর বিরক্তি ছাড়া, কিই বা জুটেছে আমার তোমার কাছ থেকে?

অলওয়েন। এসব তোমার না বলাই উচিত বেটি!

বেটি। কেন বলবো না শুনি? তোমরা ভাব, এখনও আমি কচি খুকিটি আছি—না? থাকলে হয়ত ভালই হত কিন্তু সে আমি আর এখন নই। তোমাদের মত আমিও স্ত্রীলোক। একমাত্র ষ্ট্যানটনই তা বুঝেছিল, এবং সেই জন্যই সে স্ত্রীলোক হিসেবে আমায় পেয়েছে।

গর্ডন। (শ্লেষের সুরে) তাহলে এই ষ্ট্যানটনই তোমার সেই বড়লোক কাকা, যে তোমাকে সৌখীন জামা-কাপড় যোগাত।

বেটি। হ্যাঁ যোগাত। কিন্তু তাতেই বা হয়েছে কি? তোমার কাছ থেকে ত সেটুকুও আমার জুটত না, সবই ত তোমার যেত মার্টিনের চাহিদা মেটাতে! আমি জানতাম ষ্ট্যান্‌টন্ আমায় ভালবাসে না। কাজেই, আমিও যতদূর যা পেয়েছি ওর কাছ থেকে আদায় করে নিয়েছি! (এতক্ষণে ষ্ট্যান্‌টন্ তাকায় বেটির দিকে কৌতুকমিশ্রিত বিস্ময়ের হাসি হেসে—বেটিও সে হাসির উত্তরে) হ্যাঁ, নিয়েছিই ত, কেনই বা নেব না? যে লোক ভালবাসে একজনকে, আর বাংলোয় নিয়ে গিয়ে মজা লোটে আর একজনের সঙ্গে—তার সঙ্গে এই রকম ব্যবহারই করা উচিত!

ফ্রেডা। তাহ'লে কি এই জন্যই হঠাৎ তোমার পাঁচশো পাউণ্ডের দরকার হয়ে পড়েছিল, ষ্ট্যান্‌টন্?

ষ্ট্যানটন্। হ্যাঁ—তাই-ই বটে! দেখলেত' কোথাকার জল মাথায় এসে গিয়ে গড়ালো! (উঠে গিয়ে গ্লাসভর্ত্তি হুইস্কি নিয়ে আসে)

গর্ডন। আসলে তবে বেটিই এসবের জন্য দায়ী—তাই কি মার্টিনের মৃত্যুর জন্যও!

বেটি। উঃ, এখনও সেই মার্টিন! কিন্তু আমিই যদি সব কিছুর জন্য দোষী হই, তাহলে তোমার অবস্থাটা কি দাঁড়ায়? যা কিছু আমি করেছি সবই ত তোমার জন্য। তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে না হলে এর কোন কিছুই ঘটত না।

গর্ডন। হ্যাঁ, সেইটাই আমার ভুল হয়ে গেছে।

ফ্রেডা। (আক্ষেপের সুরে) হ্যাঁ, এখন দেখা যাচ্ছে, আমাদের পরিবারের সবাই আমরা সেই একই অপরাধে অপরাধী।

বেটি। আমার উচিত ছিল অনেক আগেই তোমাকে ছেড়ে যাওয়া. পুরুষ হিসেবে তুমিও যা, একটা মরা মানুষও তাই।

গর্ডন। হ্যাঁ, সত্যিই আমি মৃত! এক বছর আগে শনিবারের সেই রাতে অলওয়েনই আমাকে মেরে ফেলেছে! উঃ, মার্টিন, মার্টিন!

রবার্ট। (আধ গ্লাস হুইস্কি ঢেলে নিয়ে) এ আলোচনা আমিই শুরু করেছিলাম, কেমন তাই না? এবার আমিই তা শেষ করবো। কিন্তু তার আগে আর একটা কথা। আচ্ছা বেটি, তুমি জানতে আমি তোমায় ভালবাসতাম?

ফ্রেডা। তা আবার কোন মেয়ের বুঝতে বাকি থাকে?

রবার্ট। (ফ্রেডার দিকে তাকিয়ে ভারী গলায় কেমন যেন উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে) এখন আমি বেটির সঙ্গে কথা বলছি, এতে তোমার না থাকলেই ভাল হয়। (বেটির দিকে আবার ফিরে) বেটি, জানতে কি তুমি, আমি তোমায় ভালবাসি?

বেটি। হ্যাঁ জানতাম, কিন্তু তাতে আমার কোন আগ্রহই ছিল না।

রবার্ট। (বিদ্রূপের সুরে) না, তা কেন থাকবে?

বেটি। না, আপনি যা ভাবছেন তা নয়। আমি জানতাম, স্ত্রীলোক হিসেবে কোন টানই আপনার আমার ওপর নেই। আপনি ভালবাসেন আমার ভেতর দিয়ে আপনার মন-কল্পিত এক মানসীকে! দুয়ের মধ্যে যে অনেক তফাৎ।

রবার্ট। হ্যাঁ, সে কথা সত্যি। তোমার চাহিদা সম্বন্ধে কোন ধারণাই আমার ছিল না। তোমাকে ও গর্ডনকে আমি সুখী বলেই মনে করতাম।

বেটি। আমরা যে তাই-ই সবাইকে বোঝাতে চাইতাম।

রবার্ট। (আরও খানিকটা হুইস্কি ঢালতে ঢালতে) হ্যাঁ, অভিনয়টা তোমরা নিখুঁতই করে এসেছ!

গর্ডন। হ্যাঁ, তা করেছি বৈ কি! হয়ত ঐ অভিনয় করতে করতেই একদিন আমরা সুখী হতে পারতাম।

বেটি। না, কোন দিনই তা পারতাম না।

অলওয়েন। সে কথা সঠিক ভাবে কিছু বলা যায় না। আমাদের কার মনে যে কি আছে, তা কি নিজেরাই আমরা সব সময় বুঝতে পারি? আমার মনে হয়, সত্য বলে সত্যিই যদি কিছু থেকে থাকে—তবে আর যাই হোক্, ঠিক এভাবে আলোচনা করে তা জানা সম্ভব নয়। এতে শুধু অর্দ্ধ সত্যই জানা যায়, যা কি না জীবনের যেটুকু বা মাধুর্য্য আছে তাও দেয় নষ্ট করে।

ষ্ট্যানটন। সব কিছুর মত, এ ব্যাপারেও তোমার সঙ্গে আমি একমত অলওয়েন!

রবার্ট। (আরও খানিকটা হুইস্কি ঢেলে নিয়ে) একমত! (বিদ্রূপের সুরে টেনে টেনে)।

ষ্ট্যানটন। যত বিদ্রূপই তুমি কর না কেন রবার্ট, আমার কিন্তু কোন সহানুভূতিই তুমি পাচ্ছ না।

রবার্ট। তোমার সহানুভূতি? হাসালে ষ্ট্যানটন! তোমার মুখদর্শন করতেও আমার ঘৃণা হয়। একটা মিথ্যেবাদী চোর ও লম্পট ছাড়া আর কিছুই তুমি নও।

ষ্ট্যানটন। সেই সঙ্গে তুমিও একটি আস্ত হস্তিমূর্খ ছাড়া আর কিছুই নও। নিজেকে যত বড়ই মনে কর না কেন, আসলে তোমার ভাইয়ের মত তুমিও আর এক ধরণের পাগল। বাস্তবকে অস্বীকার করে তুমি চাও কল্পনার রঙীন নেশায় মশগুল থাকতে? আজকের এই সন্ধ্যার ঘটনাই তার প্রমাণ। সত্য জানবার নেশায়, নিজের ও অপরের জীবনকে কি সুন্দরই না তুমি করে তুললে! (হুইস্কির গ্লাশ নিঃশেষ করে সশব্দে টেবিলে রাখে।)

রবার্ট। (ষ্ট্যানটনের পরিত্যক্ত গ্লাশটা তুলে নিয়ে, একবার গ্লাশটা ও তার পর ষ্ট্যানটনের দিকে তাকিয়ে, আস্তে আস্তে জানলার কাছে গিয়ে গ্লাশটা বাইরে ছুঁড়ে ফেলে।) ওটার সঙ্গে তুমিও এবার যেতে পার। দূর হও বলছি। (আর এক গ্লাশ হুইস্কি ঢেলে নেয়)

ষ্ট্যানটন। গুড নাইট, অলওয়েন! এ-সব কিছুর জন্য সত্যিই আমি দুঃখিত।

অলওয়েন। (এগিয়ে এসে নিজের হাত বাড়িয়ে দেয়, ষ্ট্যানটন সাগ্রহে হাতখানি স্পর্শ করে) আমিও। গুড নাইট।

ষ্ট্যানটন। গুড নাইট, ফ্রেডা!

ফ্রেডা। গুড নাইট।

ষ্ট্যানটন। (দরজার দিকে যেতে যেতে, বেটি ও গর্ডনের দিকে তাকিয়ে) তোমরাও যাবে না কি?

গর্ডন। গেলেও, তোমার সঙ্গে নয়। হ্যাঁ, ভাল কথা ষ্ট্যানটন, ঐ পাঁচশো পাউণ্ডের কথা যেন ভুলে যেও না, আর সেই সঙ্গে পদত্যাগপত্রটাও।

ষ্ট্যানটন। (ঘুরে দাঁড়িয়ে) ও, তোমরা তাহ'লে ব্যাপারটাকে এই ভাবেই নিতে চাইছ?

গর্ডন। হ্যাঁ, তাই চাইছি।

ষ্ট্যানটন। (বিদ্রূপের সুরে) বেশ, তবে তাই হবে। (দরজা দিয়ে বেরিয়ে যায়)

অলওয়েন। একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেল না' গর্ডন? ষ্ট্যানটনের যত দোষই থাক না কেন, কাজে কিন্তু ওর জুটি পাওয়া ভার। এতে ওর চেয়ে কোম্পানীরই ক্ষতি হবে বেশী।

গর্ডন। সে ক্ষতি কোম্পানীকে মেনেই নিতে হবে। এর পর ত আর ওর সঙ্গে কাজ করা চলে না!

রবার্ট। কোম্পানী নিয়ে আর না ভাবলেও চলবে, কোম্পানীর যা হবার হয়ে গিয়েছে।

ফ্রেডা। কি সব বাজে বকছো?

রবার্ট। তাই কি? আমার ত মনে হয় না।

গর্ডন। (বেটির দিকে তাকিয়ে স্নেহের সঙ্গে) এবার তাহ'লে চল, খুকুমণি, আমরাও আমাদের ছোট্ট সুখী সংসারে ফিরে যাই।

বেটি। (তরলকণ্ঠে) ভাল হবে না বলছি গর্ডন!

ফ্রেডা। চল আমি তোমাদের এগিয়ে দিয়ে আসি।

রবার্ট। (বেটি উঠে দরজার কাছে যেতে) বিদায়! (বেটি ফিরে তাকালে, তার কাছে গিয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে)

বেটি। (তরলকণ্ঠে) বিদায়। বা রে, আপনি ওভাবে তাকাচ্ছেন কেন?

রবার্ট। (স্বপ্নাচ্ছন্নের মত) তুমি ভুল করছ বেটি, বিদায় আমি তোমায় বলিনি, তোমায় আমি চিনি না। কোন দিন যে চিনতাম তাও মনে হচ্ছে না। বিদায় নিয়েছি আমি এর কাছে। (আঙুল দিয়ে বেটির মুখখানা ও শরীরটা দেখিয়ে। বেটির মুখে ফুটে ওঠে কেমন যেন বুঝতে না পারার ভয়। আর কিছু না বলে চট করে সে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে—সেই সঙ্গে গর্ডন ও ফ্রেডাও। রবার্ট ধীরে ধীরে ঢেলে নেয় আর এক গ্লাশ হুইস্কি)।

অলওয়েন। আর খেও না রবার্ট! জানি তুমি কষ্ট পাচ্ছ। কিন্তু এতে ত আর সে কষ্ট কমবে না?

রবার্ট। ক্ষমা কর অলওয়েন, আমি দুঃখিত! তোমার প্রতি যে শ্রদ্ধা ছিল, তা আরও বেড়ে গেল। একমাত্র তুমিই আজ আমায় নিরাশ করনি। সত্যি অবাক লাগছে, তুমি কি করে আমায় ভালবাসলে?

অলওয়েন। চিরদিনই আমি তোমাকে ভালবেসে এসেছি, রবার্ট!

রবার্ট। সত্যিই আমি দুঃখিত, অলওয়েন!

অলওয়েন। আমার কিন্তু কোন দুঃখই নেই। প্রথমে খুবই কষ্ট হ'ত—কিন্তু এখন দেখছি আমার ভালবাসাই আমায় সব কিছুতে প্রেরণা যোগায়।

রবার্ট। জানি।—কিন্তু আমার যে সব প্রেরণাই চলে গেল। ভেতরের কি যেন একটা ভেঙ্গে গেল। আমি যে আর চলতে পারছি না, অলওয়েন!

অলওয়েন। না রবার্ট, ও কথা ব'ল না। কাল দেখবে এতটা আর খারাপ লাগবে না।

রবার্ট। কালের ওপর আমার আর কোন বিশ্বাসই নেই অলওয়েন!

অলওয়েন। তাছাড়া ফ্রেডা রয়েছে, যাই হোক না কেন, সে ত তোমায় অপছন্দ করে না?

রবার্ট। না তা করে না, কিন্তু মাঝে মাঝে সে আমায় ঘৃণা করে। ঘৃণা করে এই ভেবে যে, আমি কেন মার্টিন না হয়ে রবার্ট হলাম—আর মার্টিন মরে গিয়ে আমি কেন বেঁচে রইলাম!

অলওয়েন। এবার থেকে হয়ত সে অন্য রকমই ভাববে।

রবার্ট। হয়ত তাই। কিন্তু তাতে এখন আর কোন ক্ষতি-বৃদ্ধিই আমার নেই—সেইখানেই ত বিপদ।

অলওয়েন। (গভীর আবেগে) তাহ'লে চল রবার্ট! আমরা কোথাও চলে যাই। তুমি ত জান, তোমার জন্য সবই আমি করতে পারি।

রবার্ট। সত্যিই আমি কৃতজ্ঞ অলওয়েন! কিন্তু তা করবারই বা জোর পাচ্ছি কই? কোন কিছুই যে আর আমার মধ্যে সাড়া জাগাতে পারছে না। (নিজের বুক দেখিয়ে) কি যেন একটা ঘটে গেছে, কি যেন এখানে একটা ভেঙ্গে গেছে, সবই মনে হচ্ছে কেমন যেন ফাঁকা। (ফ্রেডা ভেতরে এসে দরজা বন্ধ করে দেয়)

ফ্রেডা। কথাটা বেসুরো শোনালও আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, আমার এবার ক্ষিদে পেয়েছে। তুমি কি করবে অলওয়েন? (রবার্টের দিকে তাকিয়ে) তুমি কি এখন খাবে? না, হুইস্কি খেয়েই পেট ভরিয়েছ?

রবার্ট। হ্যাঁ, হুইস্কিতেই পেট ভরে গেছে।

ফ্রেডা। তা আর যাবে না? সব কিছুতেই তোমার বাড়াবাড়ি।

রবার্ট। (ক্লান্তভাবে) হ্যাঁ! (দুহাতে মুখ ঢেকে মাথা নীচু করে)

ফ্রেডা। এতটা ত শুধু তোমার জন্যই গড়ালো।

রবার্ট। হ্যাঁ, তার ফলও আমি পেয়েছি।

ফ্রেডা। অবশ্য বেটির ব্যাপারটা প্রকাশ না হওয়া পর্য্যন্ত এতটা তুমি মুষড়ে পড়নি।

রবার্ট। তুমি তাই ভাবছ জানি, তবু কিন্তু তা সত্যি নয়। আসলে তোমাদের সব কিছু প্রকাশ হয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বেটিই হয়ে উঠেছিল আমার একমাত্র ভরসার স্থল। মনে হয়েছিল, ওর মধ্যেই বুঝি বা রয়েছে জীবনের যতটুকু যা সৌন্দর্য্য!

ফ্রেডা। শুধু আজকের কথাই হচ্ছে না। অনেক দিন থেকেই দেখছি, বেটি তোমার কাছে একটা অসাধারণ কিছু! অথচ ওর কিছুই আমার অজানা নয়। এক এক সময় ইচ্ছেও হয়েছে, তোমায় সব খুলে বলবার।

রবার্ট। না বলেছ বলে আমি দুঃখিত নই।

ফ্রেডা। দুঃখিত হওয়াই কিন্তু উচিত ছিল।

রবার্ট। কেন?

ফ্রেডা। ভুল ধারণা যত তাড়াতাড়ি ভেঙ্গে যায়, ততই মঙ্গল।

রবার্ট। কিন্তু মার্টিন সম্বন্ধে তোমার ভুল ধারণা ভেঙ্গে দেওয়ায় তুমি সুখী হয়েছ কি?

ফ্রেডা। মার্টিন সম্বন্ধে কোন ভুল ধারণাই আমার ছিল না। তার সবই আমি জানতাম, আর তা জেনেও তাকে ভালবাসতাম। কোন রঙ্গীন ধারণাই আমার ছিল না।

রবার্ট। ও-কথা তোমার আমি মানলাম না ফ্রেডা! রঙ্গীন ধারণা তোমারও ছিল। কারণ ভালবাসার মূলেই থাকে তাই।

অলওয়েন। তবে ত কথাই নেই। দরকার মত আবার একটা ধারণা গড়ে নিলেই মিটে গেল।

রবার্ট। কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে, গড়তে চাইলেই গড়া যায় না। অনেক সময়, যা দিয়ে সেটা গড়া হয়, সেই বস্তুটিরই হয়ে পড়ে অভাব।

অলওয়েন। তাহলে তখন রঙ্গীন ধারণার আশা ছেড়ে দিয়েই বাঁচতে হবে।

রবার্ট। আধুনিক মানুষরা হয়ত তা পারে, কিন্তু আমাদের যুগের মানুষদের পক্ষে তা সম্ভব নয়। আমরা চিরদিন রঙ্গীন ধারণা নিয়েই বাঁচতে অভ্যস্ত।

ফ্রেডা। (কঠোর স্বরে) সে কথা আর বলতে!

রবার্ট। (ক্রমশই উত্তেজিত হয়ে) কিন্তু এতে তোমার অসন্তোষের কি আছে? সত্য হোক, মিথ্যে হোক, আদর্শই মানুষের জীবন। আদিমকাল থেকে এই আদর্শই তাকে প্রেরণা যুগিয়েছে সব কাজে। নইলে শুধু এই দেহ আর তার বিশ্রী পরিবেশের গণ্ডীর মধ্যে এক মুহূর্ত্তও মানুষ বাঁচতে পারত না। আমার জীবনে রঙীন ধারণাই ছিল আমার আদর্শ।

ফ্রেডা। (তিক্তকণ্ঠে) তবে সেই ধারণা নিয়ে সন্তুষ্ট না থেকে, সত্য সত্য বলে ক্ষেপে উঠেছিলে কেন?

রবার্ট। তার কারণ—আমার বোকামী। ষ্ট্যানটনই ঠিক বলেছে সত্যিই আমি বোকা। বাচ্চা ছেলেদের আগুন নিয়ে খেলার মত আমিও গিয়েছিলাম সত্যকে নিয়ে খেলা করতে। জানতাম না সত্যই হ'ল আগুন। সে আগুনে সবই আমার গেল জলে-পুড়ে ছাই হয়ে! ভাইয়ের মধুর স্মৃতি। নিষ্ঠাবতী না হলেও কর্ত্তব্যপরায়ণা স্ত্রী, বিশ্বস্ত বন্ধু আর সেই সঙ্গে রঙীন নেশা ধরাবার মত নিষ্পাপ একটি তরুণী—এসবই আমার ছিল। কিন্তু এখন?

অলওয়েন। (বিপন্নভাবে) না রবার্ট, এ-সব কথাবার্ত্তা এখন থাক। এত' সবই আমরা জানি।

রবার্ট। (উন্মাদের মত) না, না। তোমরা জান না, জানা তোমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। জানলে কখনও এত শান্ত থাকতে পারতে না।

অলওয়েন। (কাঁদকাঁদ ভাবে) ফ্রেডা তুমি বরং—

রবার্ট। তুমি ভুল করছ অলওয়েন! দেখছ না আমার দুনিয়ায় ওরা কেউই আর নেই। কেউ নেই—সবাই ওরা চলে গেছে—আমার ভাই একটা যৌন-উন্মাদ—

ফ্রেডা। (তীক্ষ্ণতম কণ্ঠে) রবার্ট!

রবার্ট। (না থেমে) স্ত্রী তারই সঙ্গে ব্যভিচারিণী, বন্ধুদের একজন মিথ্যেবাদী, চোর ও লম্পট। অন্য জন যে কি, ভগবানই জানেন (অলওয়েন ও ফ্রেডা দুজনেই চেষ্টা করছে ওকে থামাতে) আর যে মেয়েটিকে নিষ্পাপ জেনে মনে মনে পুজো করে এসেছি সে হচ্ছে নেহাৎই দেহসর্বস্ব একটা পণ্যা মেয়ে—

অলওয়েন। (চীৎকার করে) না, রবার্ট না, কি সর্ব্বনাশ! তুমি কি পাগল হয়ে গেলে? (অপেক্ষাকৃত নীচু স্বরে) লক্ষীটি, এত অধীর হয়ো না, কাল দেখবে সব ঠিক হয়ে গেছে।

রবার্ট। (বদ্ধ উন্মাদের মত) কাল, কাল, কাল! বলছি আমার সব শেষ হয়ে গেছে। কাল আর আমার আসবে না! (রেগে দরজার বাইরে চলে যায়।)

ফ্রেডা। (চীৎকার করে অলওয়েনের কাছে ছুটে গিয়ে তার হাত ধরে) অলওয়েন, রিভলবার, রিভলবার! ওর শোবার ঘরে!

অলওয়েন। (চীৎকার করে দরজার দিকে যেতে যেতে) থাম রবার্ট! থাম, থাম!

[কিছুক্ষণ থেকেই আলো ম্লান হয়ে আসছিল, এবার নেমে আসে পরিপূর্ণ অন্ধকার। পরক্ষণেই অন্ধকারের বুক চিরে ভেসে আসে একটা রিভলবারের শব্দ। তার পরই স্ত্রীকণ্ঠের একটা আর্ত্তনাদ। মুহূর্ত্তের নিস্তব্ধতা—তার পর একটানা ফোঁপানোর শব্দ, ঠিক যেমনটি শোনা গিয়েছিল প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে।]

অলওয়েন। (অন্ধকারের মধ্যে থেকে দৃঢ়কণ্ঠে কেমন যেন একটা রহস্যময় ভঙ্গীতে) না, না, না। এ হতে পারে না। এ আমি কিছুতেই হতে দেব না!

[এবার আবার মৃদুকণ্ঠে ভেসে আসে মিস্ মকারিজের কণ্ঠস্বর। ধীরে ধীরে আলোগুলোও ওঠে জ্বলে। মঞ্চের ওপর দেখা যায় চার জন মহিলাকে। ঠিক যেমন দেখা গিয়েছিল প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে।]

মিস্ মকারিজ। ক'টা দৃশ্য যেন আমাদের বাদ পড়েছে?

অলওয়েন। বোধ হয় পাঁচটা।

[ফ্রেডা গিয়ে রেডিওটা বন্ধ করে দেয়]

মিস মকারিজ। ঐ পাঁচটা দৃশ্য পর্য্যন্তই হয় ত তারা মিথ্যে কথা বলছিল, আর সেই জন্যই শেষের দৃশ্যে ঐ লোকটা অমন রেগে গিয়েছিল···মানে আমি ঐ স্বামীটির কথা বলছি।

[পাশের খাবার ঘর থেকে ভেসে আসে পুরুষদের একটা দমকা হাসির শব্দ]

বেটি। ঐ শুনুন, ওদিকে কি চলছে!

মিস মকারিজ। কি আবার চলবে, নির্ঘাৎই কোন অশ্লীল আলোচনা।

বেটি। না হয় ত শুধুই পরচর্চ্চা! উঃ, কত সময়ই না ওতে ওরা নষ্ট করে!

ফ্রেডা। তা আর বলতে! তাছাড়া, এখনও ওরা তিন জনেই এক কোম্পানীর ডাইরেক্টার। এখন আর ওদের পায় কে?

মিস মকারিজ। আমার কিন্তু ভারী ভাল লাগে, তোমাদের এই ছোট্ট সুখী পরিবেশটি।

ফ্রেডা। ছোট্ট সুখী পরিবেশ? উঃ, কথাটা কি বিশ্রী!

অলওয়েন। আমার কিন্তু বেশ চমৎকারই লাগে, এলে ত আমি আর এখান থেকে বেরুতেই চাই না।

মিস মকারিজ। (ফ্রেডার দিকে তাকিয়ে) আচ্ছা ফ্রেডা, তোমার দেওরের কথা ভেবে নিশ্চয়ই খুব কষ্ট পাও? সে-ও ত শুনেছিলাম এখানেই কোথায় থাকতো?

ফ্রেডা। আপনি রবার্টের ভাই মার্টিনের কথা বলছেন?

[অলওয়েন, বেটি ও ফ্রেডা তাকায় পরস্পারের দিকে, আর ঘরের মধ্যে নেমে আসে কেমন যেন একটা স্তব্ধতা]

মিস মকারিজ। এই যাঃ, প্রসঙ্গটা দেখছি আমি নেহাৎ বোকার মতই উত্থাপন করে বসেছি।

ফ্রেডা। না, না। সে কি কথা! তা কেন? তবে ব্যাপারটা খুবই দুঃখের কি না! এখন অবশ্য সবই সহ্য হয়ে গেছে। জানেন বোধ, হয় মার্টিন গুলী করে আত্মহত্যা করেছিল?

মিস মকারিজ। হ্যাঁ। সত্যিই কি মর্ম্মান্তিক! ও রকম একটা সুপুরুষ খুব কম দেখা যায়। তাই না?

[ষ্ট্যানটন ও গর্ডনের প্রবেশ। গর্ডন সোফার কাছে গিয়ে বেটির হাত তুলে নেয়।]

অলওয়েন। হ্যাঁ, খুবই সুপুরুষ ছিল।

ষ্ট্যানটন। কে খুব সুপুরুষ, জানতে পারি কি?

ফ্রেডা। তুমি যে নও, তা'ত বুঝতেই পারছ ষ্ট্যানটন!

গর্ডন। আলোচনাটা ওদের আমাকে নিয়েই। আচ্ছা বেটি,

তোমার যদি একটুও লজ্জা থাকে। তুমি কেন ওদের সঙ্গে আমার সম্বন্ধে আলোচনা করতে যাও?

বেটি। চেপে যাও, লক্ষীটি। আড্ডা আর পুরোনো ব্র্যাণ্ডি মিলে তোমার অবস্থা যে কাহিল করে তুলেছে, সে তোমার মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে।

[ঘরে এসে ঢোকে রবার্ট]

রবার্ট। আজও দেরী হয়ে গেল ফ্রেডা, আমি দুঃখিত! কিন্তু সে জন্ম ঐ হতভাগা কুকুরটাই দায়ী।

ফ্রেডা। কেন? ও আবার কি করলো?

রবার্ট। আর বল কেন? এক সময় তাকিয়ে দেখি, দিব্যি বসে সোনিয়া উইলিয়ামের উপন্যাসের পাণ্ডুলিপিটা চিবুচ্ছে। পাছে আবার অসুখে পড়ে তাই ছুটতে হল কুকুরের ডাক্তারের কাছে। এই যে! এ যে দেখছি মিস্ মকারিজ! লেখক-লেখিকাদের সম্বন্ধে আমাদের প্রকাশকদের মতামতটা শুনে ফেললেন ত?

মিস মকারিজ। তা শুনলাম বৈ কি! তবে আমি কিন্তু এতক্ষণ ধরে আপনাদের এই ছোট্ট সুখী পরিবারটির প্রশংসাই করছিলাম। সত্যি, আপনারা কি সুখী?

ষ্ট্যানটন। ও-সব সুখী-টুখী কিছু নয় মিস মকারিজ! আসলে আমাদের অনুভূতিই এসেছে ভোঁতা হয়ে! তাই মধ্যবিত্তর গতানুগতিকতাকেই আমরা মেনে নিয়েছি সুখ বলে।

রবার্ট। বেটির বিষয়ে কিন্তু ওকথা খাটে না। এখনও রয়ে গিয়েছে ঠিক আগের মতই প্রাণচঞ্চল।

ষ্ট্যানটন। সে শুধু গর্ডন ওকে দরকার মত ঠ্যাঙানি দিতে শেখেনি বলে।

মিস মকারিজ। শুনলে ত' অলওয়েন? এই জন্তই বলছিলাম মিঃ ষ্ট্যানটনের একটা ব্যবস্থা হওয়া দরকার। নাহলে ও আরও বেশী সিনিক হয়ে উঠবে।

গর্ডন। (রেডিওর ডায়াল ঘোরাতে ঘোরাতে) আঃ, কি যে গোলমাল হচ্ছে, কিছুই যদি শোনা যায়!

ফ্রেডা। এই শুরু হল। আঃ, গর্ডন, বন্ধ করে দাও বলছি। একটু আগেই আমরা রেডিও শুনেছি।

গর্ডন। কি শুনলে তোমরা?

ফ্রেডা। একটা নাটকের শেষের দিকটা।

অলওয়েন। আর তার নাম হচ্ছে "ঘুমন্ত কুকুর।"

ষ্ট্যানটন। সে আবার কি?

মিস মকারিজ। আমরাও ঠিক বুঝিনি। তবে ব্যাপারটা মিথ্যে কথা বলা নিয়ে—আর তার জন্ত শেষ পর্য্যন্ত এক ভদ্রলোক গুলী করে আত্মহত্যা করলেন।

ষ্ট্যানটন। বি, বি, সি ত? ওদের দৌড় আর তার চেয়ে বেশী কি হবে?

অলওয়েন। এবার যেন নাটকটার অর্থ ধরতে পেরেছি বলে মনে হচ্ছে। আসলে "ঘুমন্ত কুকুর" হ'ল সত্যরই রূপক। ঐ স্বামী ভদ্রলোকটি জিদ ধরেছিলেন তাকে জাগাতে—অর্থাৎ জানতে।

রবার্ট। সে জিদকে ত খুব সঙ্গতই বলতে হবে।

ষ্ট্যানটন। তাই কি? হবেও বা। তবে আমার মনে হয়, ওটা ঠিক ষাট মাইল বেগে মোড় ঘোরবার মতই সঙ্গত।

ফ্রেডা। জীবনে মোড়েরও যখন কোন কমতি নেই। কেমন তাই না?

ষ্ট্যানটন। কমতি বাড়তি অবশ্য জীবনে কে কোন রাস্তা নেয়, তার ওপরই নির্ভর করে।

ফ্রেডা। (নিস্পৃহ ভাবে) কিন্তু এবার অন্ত কিছু আলোচনা করলে হ'ত না? আপনারা কেউ পানীয় কিছু নেবেন কি, কিংবা সিগারেট? রবার্ট, দাও না ওদের সিগারেট?

রবার্ট। (টেবিল থেকে সিগারেটকেস নিয়ে খুলে) এতে ত দেখছি একটাও নেই।

ফ্রেডা। (টেবিল থেকে আর একটা সিগারেটকেস তুলে নিয়ে) এটায় নিশ্চয়ই আছে। নিন মিস্ মকারিজ, অলওয়েন?

অলওয়েন। (কেসটার দিকে তাকিয়ে বিস্মিত কণ্ঠে) আরে এ কেসটা দেখছি আমার পরিচিত, খুললেই দিব্যি একটা সুর বাজতে থাকে—তাই না? সুরটা এখনও আমার মনে আছে। (কেসটা খুলে ফেলে—আর সেটা বাজতে থাকে।)

গর্ডন। (রেডিওর ডায়াল ঘোরাতে ঘোরাতে) আঃ, একটু থাম ত, ব্যস এইবারে শোন! (রেডিওতে বেজে চলে চমৎকার একটা সুর)

বেটি। (উঠে দাঁড়িয়ে) কি চমৎকার!

ষ্ট্যানটন। এটা কি সুর?

বেটি। এটা "এস আমরা মিটিয়ে ফেলি" সুর।

মিস্ মকারিজ। কি সুর বললে?

গর্ডন। "এস আমরা মিটিয়ে ফেলি।"

[এর পর রবার্ট মিস মকারিজের চেয়ারটা ও ফ্রেডা টেবিলটাকে টেনে সরিয়ে আনে জানলার কাছে। ষ্ট্যানটন, মিস মকারিজকে অনুরোধ জানায়—নাচবার জন্ত, কিন্তু তিনি তাতে রাজী নন। অলওয়েন এগিয়ে যায় রবার্টের দিকে, তারপর বাজনার সুরে দু'জনে মিলে সুরু করে দেয় নাচতে।]

বাজনার সুরে সুরে সকলের মন নেচে ওঠে আনন্দে। ক্রমশঃ চড়া সুরের মধ্যে নেমে আসে যবনিকা।

অনুবাদিকা—শ্রীমতী করবী গুপ্তা।

সমাপ্ত

আপনার
আনন্দের
মুহূর্তকে
মধুর
করুন
শতাব্দীর ঐতিহ্য বরণীয়
লক্ষ্মীবিলাস
তৈল
বিশুদ্ধতায়
সৌগন্ধে
রুচিতে

ডক্টর নবগোপাল দাস, আই, সি, এস

তেরো

প্রদীপ বরানগরে ফিরল ভারাক্রান্ত মন নিয়ে। সুমিত্রা ঠিকই বলেছে, এ কি অলস অবহেলায় সে নষ্ট করছে অমূল্য মুহূর্ত্তগুলো? কাজ? কাজের কি কোন অভাব আছে? অভাব যদি থেকে থাকে সে হচ্ছে তার ইচ্ছার, তার উন্মাদনার। শৃঙ্খলিত দেশ প্রত্যেকটি নরনারীর কাছ থেকে আশা করে ত্যাগ, নিঃস্বার্থ এবং নিষ্কাম কর্ম্ম। নিজের কথা না ভেবে তার ভাবা উচিত দেশের কথা।

বন্দনাই কি অবশেষে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে? সুমিত্রা মুখে কিছু বলেনি বটে, কিন্তু তার তিরস্কারের পেছনে এই ইঙ্গিতটাই কি বার বার দেখা দেয়নি? বন্দনা ত কোন বিষয়েই তার প্রতিবন্ধক হয়নি? প্রেরণা হয়ত জোগাতে সে পারেনি, কিন্তু, কিন্তু—

আরেক জনের কথা হয়ত উঠতে পারে, সে হচ্ছে তার গায়ত্রী দিদি। কিন্তু সে-ও ত কোন বাধার সৃষ্টি করেনি! বরং তাকে সাহায্য করতে চেষ্টা করেছে নানা ভাবে। অথবা, এই সাহায্যটাই কি প্রকারান্তরে প্রতিবন্ধকের সৃষ্টি করেছে? আজ যদি বরানগরে এই ভাবে নিশ্চিন্ত থাকতে না পেত তাহলে কে জানে সে ঝাঁপিয়ে পড়ত কি না নতুন এক অভিযানে!

হঠাৎ তার মনে পড়ল ছবির কথা। ছবিকে যে নতুন পথে তুলে দিতে পেরেছে—নবকিশোরের সাহায্য না পেলে হয়ত সেটা সম্ভব হতনা—এটাও কি একটা কাজ নয়? কাজ কি সবসময় হতে হবে নির্ব্যক্তিক? না—ভুল সে করেনি। তবে ভাববার, চিন্তা করবার সময় এসেছে।

ঘুরতে ঘুরতে সে এল আলিপুরে, রসময়ের চা'-এর ক্যাবিনে। সন্তোষ বেরিয়ে যাচ্ছিল। প্রদীপকে দেখে থমকে দাঁড়াল।

—এই যে, প্রদীপ বাবু! সেই রাতের পর আর যে দেখাই নেই! কাজ হাসিল করে একেবারে পলায়ন! আপনার কাছ থেকে এরকম ব্যবহার আশা করিনি।

—আপনি ভুল বুঝবেন না, সন্তোষ বাবু! নানা জঞ্জালে জড়িয়ে পড়েছিলাম। আপনাকে এড়িয়ে চলবার মতলবই যদি আমার থাকবে আজ আবার এদিকে আসব কেন?

কথাটা অযৌক্তিক নয়, সন্তোষ একটু শান্ত হল। তারপর বলল, আপনার পেটে পেটে যে এমন বুদ্ধি আছে তা ভাবিনি, আপনার পায়ের ধূলো নিতে ইচ্ছে করছে।

—তার মানে?

—মানে আর কি? ছবিকে কোথায় সরিয়েছেন বলুন ত? রসময় ত আমার উপর রেগেই টং! বলল, তোমার সেই বন্ধুকে ছবির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার ফলে তাকে চিরদিনের মত হারালাম! দুদিন পরে ছবির বাড়ীতে গিয়ে শোনে কোন্ এক ভদ্রলোক নাকি তাদের অন্যত্র নিয়ে চলে গেছেন। আমি তখনই আন্দাজ করলাম কে এই ভদ্রলোক!

প্রদীপ মনে মনে তৃপ্তির হাসি হাসল। রসময়ের হাত থেকে ছবি মুক্তি পেয়েছে, এবং এই মুক্তি পাওয়ার মধ্যে তার অবদানই সব চেয়ে বেশী, এটা আনন্দের বিষয় বই কি।

বলল, আপনি ভুল করছেন, সন্তোষ বাবু। সেই রাতের পর ছবির সঙ্গে আমার দেখাই হয়নি এ পর্য্যন্ত। আমি ছাড়া অন্য লোকের সঙ্গেও ছবির পরিচয় ছিল সেটা ভুলে যাবেন না। তাঁদেরই কেউ হয়ত রসময় বাবুর প্রসারিত বাহুবন্ধন থেকে ছবিকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছেন।

তার পর বলল, আপনাকে আরেকটা গোপনীয় কথা বলি। পরের দিন আমি নিজে ছবির ওখানে গিয়েছিলাম, গিয়ে দেখি, পাখী আমি পৌছবার কয়েক ঘণ্টা আগেই উড়ে গেছে।

—বলেন কি?

—সত্যি বলছি।

—ডুবে ডুবে বেশ জল খেতে পারেন ত আপনি? কিন্তু এই ভদ্রলোককেও প্রশংসা না করে পারছি না। এক ঢিলে কেমন তিন পাখী মারলেন, ছবিকেও পেলেন, রসময় এবং আপনাকে কদলী প্রদর্শন করালেন।

মুখখানা কালো ক'রে প্রদীপ জবাব দিল, অদৃষ্ট মন্দ, সন্তোষ বাবু, নইলে এমন হবে কেন?

—ছবি মেয়েটা বেশ ছিল, কি বলেন? সন্তোষের কথার মধ্যে উদ্দাম লালসার প্রকাশ।

রাগে প্রদীপের সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে উঠল, কিন্তু কোন রকমে নিজেকে সম্বরণ করে সে জবাব দিল, সে আর বলতে হয়?

দুদিন পরে অপ্রত্যাশিত ভাবে নবকিশোরের সঙ্গে প্রদীপের দেখা, চৌরঙ্গীর মোড়ে। নবকিশোর প্রথমে তাকে দেখতেই পায়নি, প্রদীপই তাকে ডাকল।

—আরে, এই যে প্রদীপদা'! সেই বরানগরে যাবার পর অবধি একেবারে ডুমুরের ফুল হয়ে রয়েছ দেখছি, দেখাই পাওয়া যায় না!

—বরানগর কলকাতার বাইরে, নবু! খুসী হ'লেই ত আসা যায় না।

—জানো, আমি নতুন গাড়ী কিনেছি? আমার এই গাড়ীতে তোমাকে চড়তেই হবে। নবকিশোর বলল।

—কেন, তোমার সেই গাড়ীটার কি হল? সেটাও ত বেশ নতুন ছিল!

—আরে ছোঃ, সেটা ছিল সেভরোলে, তা'-ও তিন বছরের পুরানো। এবার কিনেছি বুইক, লেটেষ্ট মডেল। ওঃ, যা' স্পীড নেয়, যেন তুফানের মত চলে!

—তোমার গাড়ী চালান দেখে আমার ভয় করে।

—পাগল! গাড়ী একটু তাড়াতাড়ি চালাই বটে, কিন্তু ষ্টিয়ারিং-এর ওপর কণ্ট্রোল আছে পুরোমাত্রায়। তুমি খানিকক্ষণ দেখলেই বুঝতে পারবে।

—আজ থাক্।

নবকিশোর যেন একটু ক্ষুণ্ণ হ'ল। বলল, তোমার এক কথা, আজ থাক্।—আজ থাক্ ত কবে হবে? কোথায় তোমার দেখা পাব?

—কেন, তোমাদের বাড়ীতে আসতে পারি। আর যদি ব'ল তুমি যেখানে কাজ কর সেখানেও যেতে পারি।

নাকটা সিঁটকে নবকিশোর জবাব দিল, বাড়ী? আমাদের বাড়ীকে আমি ঘৃণা করি। নোংরা, সেকেলে, কোন ভদ্রলোক এখানে থাকতে পারে? তাছাড়', সব সময় জবাবদিহি করতে য় বাবার কাছে, কোথায় গিয়েছিলাম, কেন দেরী হ'ল।—কেন, আমি কি কচি খোকা নাকি?

তারপর বলল, বোঝার উপর আবার শাকের আঁটি। আজকাল তোমার বন্দনাও বাবার সঙ্গে সমান ওজনে গলা মিলিয়ে গতিবিধির বিশদ বিবরণ চায়।

তোমার এই কথাটার উপর নবকিশোর যেন ইচ্ছে করেই একটু জোর দিল। প্রদীপ ভাণ করল যেন সে শোনেনি।

—তাহ'লে তোমার অফিসেই যাব না হয়।

—সেখানেও আমাকে পাবে না, আমার সময়ের কোনই স্থিরতা নেই, কখন আসি, কখন যাই। আমার বেশীর ভাগ কাজই বাইরে।

—কি কাজ তুমি কর, নবু?

—হরেক রকমের কাজ। কনট্রাক্ট নেওয়া, জিনিষ কেনাবেচা করা, সরকারী গুদামে মাল চালান দেওয়া।—আমার দু'জন মোটা মাইনের অ্যাসিষ্ট্যান্ট আছে, তাছাড়া একজন এংলোইণ্ডিয়ান মেয়ে রিসেপসনিস্টও রেখেছি। জানই ত, আজকাল ইংরেজ আর আমেরিকানদের নিয়ে কারবার—সুন্দরী মেয়ে রিসেপসনিস্ট রাখলে কাজের সুবিধে হয়।

—আমাকে তোমার ওখানে একটা চাকুরী দাও না, নবু।—প্রদীপ হঠাৎ বলল।

নবকিশোর যেন আকাশ থেকে পড়ল। বলল, চাকুরী করবে তুমি? না, প্রদীপদা, চাকুরী তোমাকে দিয়ে হবে না। চোখ-কান বুজে মনিবের হুকুম তামিল করতে, তুমি পারবে না।—চাকুরী মানে গোলামি, নিজের অস্তিত্ব ভুলে গিয়ে প্রভুর ইষ্ট কিসে হয় তার আরাধনা করা।

চাকুরীর এই সংজ্ঞায় প্রদীপ না হেসে পারল না।

—হাসছ তুমি, কিন্তু যা' বললাম তা' একবিন্দু মিথ্যে নয়। সরকারী ক্ষেত্রে দেখছ না, আমাদেরই দেশের লোকগুলো কি নিঃসঙ্কোচে বিদেশী সরকারের হুকুম মেনে যাচ্ছে! অর্ডার এল, গুলী চালাও—অমনি চলল গুলী। উপরওয়ালা বললেন, সার্চ্চ কর, গ্রেপ্তার কর।—অমনি সুরু হ'ল সার্চ্চ, গ্রেপ্তার।—কেউ একবার ভাবছে না, চিন্তা করছে না।—মনিবের হুকুম তামিল করা চাকুরীর একটা প্রধান অঙ্গ, কিন্তু তাই বলে এমন নির্ব্বিচারে!

—কিন্তু তুমিই না বললে চোখ-কান বুজে মনিবের হুকুম তামিল করাটা চাকুরীর প্রথম এবং প্রধান কর্ত্তব্য?

—দুটো ক্ষেত্রে তফাৎ আছে প্রদীপদা'। বিদেশী সরকারের হুকুম বিনা দ্বিধায় মেনে নেওয়াটা কিছুতেই আমাদের উচিত নয়, বিশেষ করে হুকুম তামিল করতে গিয়ে যদি দেশের লোকের উপর অত্যাচার করতে হয়। কিন্তু ধর আমার অফিসে যারা চাকুরী করছে তারা ত আর বিদেশীর হুকুম মানছে না। তাদের হুকুম দিচ্ছে তাদেরই একজন, শ্রীনবকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায়। আমার কর্ম্মচারীদের এবং আমার স্বার্থ অভিন্ন।

—তোমার যুক্তিটা আমি মেনে নিতে পারলাম না নবু!

—সেইজন্যেই ত বলেছি প্রদীপদা' চাকুরী করা তোমাকে দিয়ে হবে না। তুমি হচ্ছ বড্ড স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়, তোমার উচিত বনে গিয়ে ভগবানের আরাধনা করা। আচ্ছা কংগ্রেসের চাকুরী তুমি এতদিন কি করে করলে?

—কংগ্রেসের চাকুরী?

—চাকুরী ছাড়া আর কি? তোমার নেতারা যা বলছেন নির্ব্বিচারে মেনে নেওয়া এবং প্রাণপণ করে তা পালন করা চাকুরী নয়ত কি?

—আমার ধারণা ছিল কংগ্রেসের প্রতি তোমার সহানুভূতি আছে।

—সহানুভূতি নেই কে বলল তোমাকে? অসহিষ্ণু ভাবে নবকিশোর জবাব দিল। আমি শুধু প্রমাণ করতে চেষ্টা করছি যে সবই চাকুরী।

—তুমি আজকাল বেশ ভাবতে শিখেছ দেখছি!

—ঠেকে শিখেছি, প্রদীপদা'। থাক এসব আবোল-তাবোল বক্তৃতা, সত্যি তুমি আজ আমার সঙ্গে আমার নতুন গাড়ীতে আসবে না?

—আরেক দিন হবে। তোমার গাড়ী ত উড়ে যাবে না।

—তা' বলা যায় না, একটা মস্ত ডিল নিয়ে পড়েছি, যদি লেগে যায় তাহলে বুইকটা বিক্রী করে একটা ক্যাডিলাক কিনব। তা বেশ, তুমি ক্যাডিলাকই চড়ো—

প্রদীপ প্রশ্ন করল, ছবির কোন খবর পেয়েছ?

—ছবি? ওঃ, তোমাকে বলতেই ভুলে গিয়েছিলাম। ও যে এখন কলকাতায়, গত হপ্তায় এসেছে।

—কোথায় আছে? কি করছে? প্রদীপের প্রশ্নে নিবিড় ঔৎসুক্য।

—ধীরে, প্রদীপদা, ধীরে। ওকে পি, জি, হাসপাতালে নার্স-এর ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করে দিয়েছি, ওখানে নার্সদের কোয়ার্টারে থাকে।

—স্কলারসিপ পেয়েছে?

—এখনও পায়নি, তবে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আশা দিয়েছেন, খুব সম্ভব পাবে। যতদিন না পায় আমিই খরচ জুগিয়ে যাব বলেছি। আর ওদিকে ওর বাড়ীতেও টাকা পাঠাচ্ছি।

—তোমার মনটা সত্যি বিশাল, নবু!

—বিশাল মোটেই নয়, অত্যন্ত সাধারণ আমার মন! তোমাদের আশীর্ব্বাদে ব্যবসায়ে লাভ মন্দ হচ্ছে না, তার সামান্য একটা অংশ যদি একটা দুঃস্থ পরিবারের কল্যাণে খরচ করতে না পারি তাহলে বৃথাই রোজগার করছি।

—সবাই কিন্তু তোমার মত ভাবে না, নবু।

নবকিশোর এবার একটু আত্মপ্রসাদের হাসি হাসল।

প্রদীপ বলল, আমি একবার ছবিকে দেখতে যাব। কখন গেলে ওর সঙ্গে দেখা পাওয়া যাবে বলত ?

—তুমি আর ওখানে গিয়ে কি করবে, প্রদীপদা' ? সে বেশ আছে, তাছাড়া আমিই ত দেখাশুনো করছি !

—তবু একবার দেখব, কেমন আছে, নতুন জীবন তার কেমন লাগছে।

—একটা অসুবিধে আছে। নার্সদের কোয়ার্টারে বড় কড়াকড়ি, আত্মীয় এবং বিশেষ বন্ধু ছাড়া ওখানে কাউকে ঢুকতেই দেয় না !

—তুমি কি ভাবে যাচ্ছ ?

—আমি ? কেন, আমি বলেছি যে আমি তার দাদা, স্থানীয় অভিভাবক।

—আমিও ঐ জাতীয় একটা পরিচয় দেব না হয় !

—বোকামি করো না, প্রদীপদা', ওতে কর্তৃপক্ষের সন্দেহ হ'বে।

প্রদীপ চুপ করে রইল। খানিকক্ষণ চিন্তা ক'রে নবকিশোর বলল, এক কাজ করা যাক্, প্রদীপদা। একটু পরেই ছবির অফডিউটি, তুমি আমার গাড়ীতে চলো, আমি ওকে ডেকে নিয়ে আসব, তারপর আমার গাড়ীতে, নতুবা অন্য কোথাও গিয়ে কথা বলবে। কেমন ?

অগত্যা প্রদীপ এই প্রস্তাবেই রাজী হ'ল।

নবকিশোরের বুইকখানা প্রশংসা করবারই মত বটে ! সুন্দর ছাই-এর মত রং, ভেতরে গভীর লাল আস্তরণ, ড্যাসবোর্ড-এর প্যানেলে লেটেষ্ট মডেলের ঘড়ি। একটা রেডিয়োও বসান আছে। চলে ঘণ্টায় সত্তর আশী মাইল বেগে, অথচ এমনই মসৃণ তার গতি যে মনেও হয় না গাড়ী চলছে।

গাড়ীর উপর যে তার সম্পূর্ণ কন্ট্রোল আছে তার নিদর্শনও নবকিশোর প্রদীপকে দিল। দু'তিনবার সে বিপুল বেগে চালিয়ে শেষ মুহূর্তে গাড়ীর গতি এনে ফেলল ঘণ্টায় পাঁচ মাইলের মধ্যে। প্রদীপের প্রশংসা পাবার আশায় নবকিশোর তার দিকে তাকাল।

পি, জি, হাসপাতালের বাইরে গাড়ীটা এসে থামল। নবকিশোর বলল, তুমি এখানে অপেক্ষা কর, আমি ওকে ডেকে নিয়ে আসছি।

মিনিট পনর পরে নবকিশোরের সঙ্গে ছবি এসে উপস্থিত হ'ল। নার্স-এর উনিফর্ম ছেড়ে সে সাধারণ একখানা শাড়ী পরে এসেছে। প্রদীপকে সে নমস্কার করল।

প্রদীপ লক্ষ্য করল এই কয়েক দিনেই ছবির বেশ খানিকটা পরিবর্তন ঘটেছে। মোমিনপুরের ফ্লাটএ যে লজ্জাবনতা ছবিকে দেখেছিল তার স্থানে উপস্থিত হয়েছে নিজের শক্তি সম্বন্ধে সচেতন এক তরুণী। চোখের কালিমা মিলিয়ে গেছে অনেকখানি, তাছাড়া কবরীবিন্যাস থেকে আরম্ভ ক'রে চপ্পলপাদুকা ব্যবহার পর্য্যন্ত তার প্রত্যেকটি আচরণ ব্যবহারে ফুটে উঠেছে সপ্রতিভতা।

—তুমি ভাল আছ ত, ছবি ? প্রদীপ প্রশ্ন করল।

ছবি ঘাড় নেড়ে জানাল যে সে ভাল আছে।

তারপর দু'জনেই নীরব। প্রদীপের হয়ত আরও অনেক প্রশ্ন ছিল, কিন্তু নবকিশোর সামনেই দাঁড়িয়ে আছে, সে চুপ করে রইল।

নবকিশোর বোধ হয় সেটা বুঝল। বলল, ছবির হাতে আরও এক ঘণ্টা সময় আছে, চলো, আমরা গঙ্গার ধারে যাই, সেখানে বসে গল্প করা যাবে।

প্রিন্সেপ ঘাটের অদূরে গাড়ীটা নবকিশোর থামাল। বলল, এই সামনে বেশ খানিকটা ফাঁকা আছে, লোকজনও কেউ নেই, চলো, ওখানে গিয়ে বসি।

প্রদীপ এবং ছবি গঙ্গার উপকূলে বসল। নবকিশোর বসতে রাজী হ'ল না, বলল, আমি একটু ঘুরে আসছি, প্রদীপদা', তোমাদের কথাবার্তা এর মধ্যে শেষ করে নাও। আধ ঘণ্টা সময় দিলাম তোমাদের।

অর্থসূচক এক হাসি হেসে সে হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে গেল।

প্রদীপই কথা শুরু করল, নবকিশোর বড় ভাল ছেলে, ছবি। ও যে এই ভাবে তোমাদের সব ভার গ্রহণ করবে আমি ভাবতেই পারিনি। এখানে, হাসপাতালে, তোমার কষ্ট হচ্ছে না ত ?

—না, কষ্ট আর কি ?

—শুনেছি নার্সদের নাকি খুব খাটতে হয়। তা' বছর দুই দেখতে দেখতে কেটে যাবে। ডিপ্লোমা নিয়ে যখন বেরিয়ে আসবে তখন দেখবে বাজারে তোমার দাম কত বেড়ে গেছে ! চাকুরী পেতে কোনই অসুবিধে হবে না তোমার।

—চাকুরীই কি সব ? ছবি হঠাৎ প্রশ্ন করল।

প্রদীপ চমকে উঠল। এ কি প্রশ্ন ছবির মুখে ? তাহলে ছবি বুঝি তার বিগত জীবন ভুলতে পারেনি এখনও ? সে অস্বস্তিবোধ করল।

ছবি বলল, আপনাদের অনুগ্রহ কখনও ভুলতে পারব না। কিন্তু কেন আপনারা এই অনুগ্রহ করছেন ? এর বিনিময়ে কি দাম দিতে হবে আমাকে ?

সতেরো বছরের মেয়ের মুখে এ কি প্রশ্ন ?

প্রদীপ বলল, বিনিময়ে দাম দিতে হবে একথা তোমার কে মনে হচ্ছে, ছবি ? দাম না দিয়ে কি কেউ কারো উপকার করতে পারে না ?

—পারে ? আপনি সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করেন ? ছবি প্রশ্ন করল। তার কণ্ঠস্বরে অপ্রত্যয়ের গভীর ছাপ।

—আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, ছবি !

—আমিও ঠিক বুঝতে পারছি না—ব'লে জিজ্ঞাসুনেত্রে প্রদীপের দিকে তাকাল।

—আমার নাম প্রদীপ, প্রদীপ গুহ।

—আমিও ঠিক বুঝতে পারছি না, প্রদীপ বাবু। আজ আপনাকে সোজাসুজি প্রশ্ন করছি, আপনার সঙ্গে আমার পরি[illegible] কতটুকু ? আর কি সূত্রে সেই পরিচয় ? আমাকে দেখে হঠা[illegible] আপনার মহানুভবতা জেগে উঠল কেন ? সত্যি কি আপ[illegible] মহানুভব ?—আর নবকিশোর বাবু, যিনি আমাকে আগে দেখেনও[illegible] আপনার সঙ্গে যে সামান্য পরিচয়টুকু হয়েছিল তাঁর সঙ্গে সেটুকু[illegible] অভাব ছিল, সেদিন যজ্ঞের মত এসে আমাদের তাঁর নিজের গাড়ী[illegible] তুলে নিয়ে এলেন ষ্টেশনে, টিকিট করে গাড়ীতে বসিয়ে দিয়ে[illegible] সযত্নে, আমার হাতে একশ' টাকা গুঁজে দিলেন এবং বলে[illegible]

টাকা পয়সার জন্য যেন ভাবনা না করি। তারপর, আমার এই ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা, বাড়ীতে মাসে মাসে টাকা পাঠানো, এসবই করছেন অকাতরে।—কিন্তু কেন? কেন?

ছবির প্রত্যেকটি কথায় নিবিড় সংশয়। সে যেন বলতে চায়, বেশ ছিল সে, জীবনের গতি চলছিল এক ভাবে, আলো-অন্ধকারময় পথে নিজেকে নিয়ন্ত্রিত করে নিয়েছিল এক রকম। এখন তাকে নতুন পথে নিয়ে আসা হয়েছে, কিন্তু সত্যি কি এ পথ নতুন? না, শীগ্‌গিরই মহানুভবতার যবনিকা উঠে গিয়ে প্রকাশিত হবে লালসার ইঙ্গিত, তাকে আবার বইতে হবে বুকভাঙা দীর্ঘশ্বাসের শিলাস্তূপ? তাই যদি অভিপ্রায়, তাহ'লে আর দেরী না করে খুলে ফেলো তোমাদের অবগুণ্ঠন, সরিয়ে দাও তোমাদের আবরণ।

প্রদীপ বলল, তোমার মনটা এখনও সুস্থ হয়নি, ছবি, তাই কেবল ভূত দেখছ।

ছবি একটু হাসল।

প্রদীপ আবার বলল, তোমার কোন ভয় নেই, ছবি, আমার কোনই দুরভিসন্ধি নেই। আর নবকিশোর, সে যা করছে সংই আমার অনুরোধে। আমার অর্থবল নেই, তাই আমাকে তার সাহায্য নিতে হয়েছে।

ক্ষণিকের জন্য দীপশিখা জ্বলে উঠল যেন। ছবি বলল, অর্থবল যে আপনার নেই তা কি আপনি আগে থেকেই জানতেন না? কোন্ অধিকারে আমাকে টেনে আনলেন এই পরিস্থিতির আবর্তে?

কথাবার্তা আর অগ্রসর হল না, কারণ নবকিশোর এসে জানাল যে আধ ঘণ্টারও বেশী হয়ে গেছে, এবার ছবিকে হাসপাতালে ফিরে যেতে হবে।

ছবিকে হাসপাতালে পৌঁছে দেবার পর নবকিশোর প্রশ্ন করল, এবার কোথায় যাবে প্রদীপদা'?

—আমাকে এসপ্ল্যানেড-এর মোড়ে নামিয়ে দাও।

গাড়ী থেকে নামবার আগে নিষ্পলক ভাবে নবকিশোরের দিকে তাকিয়ে প্রদীপ বলল, একটা কথা বলবার আছে, নবু! ছবির জন্যে তুমি অনেক কিছু করেছ এবং করছ, কিন্তু তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি, এর পেছনে যদি কোন সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা থেকে থাকে এবং তার প্রকাশ আমি দেখতে পাই তাহ'লে তোমাকে জীবনে আমি ক্ষমা করব না।

ব'লে নবকিশোরের জবাবের কোন প্রতীক্ষা না করেই সে বেরিয়ে এল।

চৌদ্দ

অটলবিহারী বাবু আর সুমিত্রার ভবিষ্যদ্বাণীই ফলল। বাংলার বুকে পড়ল দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া, কলকাতার পথে বিপথে, অলিতে গলিতে শোনা গেল শীর্ণ দুঃস্থ নরনারী, বালক বালিকার করুণ আর্তনাদ, দুটি ভাত দাও, মা, তোমার পায়ে পড়ি, একটি পয়সা ভিক্ষে দাও, বাবা। দু'মুঠো ভাতের অভাবে মরতে লাগল হাজার হাজার লোক।

সে এক বীভৎস দৃশ্য, যেমন মর্মান্তিক, তেমনই হাস্যকর। ক্ষুধার তাড়নায় আশে-পাশের গ্রাম থেকে দলে দলে কলকাতার দিকে আসতে লাগল সেখানকার বাসিন্দারা, একা নয়, সপরিবারে। গ্রামে চাল নেই, থাকলেও যে পরিমাণে পাওয়া যায় তাতে ক্ষুধা মেটে না অথবা যে দাম দোকানী চায় তা' তাদের পক্ষে দেওয়া অসম্ভব। তাই তারা চলল মহানগরী কলকাতায়।

এসে চালের দোকানের সামনে সারি দিয়ে দাঁড়াল। ক্ষুধার্ত, ক্লিষ্ট তারা, কিন্তু শৃঙ্খলার শাসন অতিক্রম করল না। তারপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা' যখন ধরে এল, তখন বসল। শেষে বসতেও পারল না। শুয়ে পড়ল। প্রথম দিন চাল পাওয়া যায়নি, পরের দিন পাওয়া যাবে নিশ্চয়। রৌদ্রে, বৃষ্টিতে পথের উপর পশুদের মত জীবন্মৃত নরনারীর ভিড় জমে গেল।

বেঁচে থাকবার সখ তাদের প্রবল, তাই ক্ষুধার্ত রুগ্ন কুকুরের মত তারা ডাষ্টবিন-এর ড্রেণ থেকে খাদ্যসংগ্রহ করবার চেষ্টা করল। কিন্তু কুকুরেরই মত আজ্ঞাবহ এই বাহিনী একবারও চেষ্টা করল না একটা চালের দোকান আক্রমণ করতে, না খেতে পেয়ে শুয়ে রইল, তবু একবারও চেষ্টা করল না খাবারের দোকানের কাচ ভাঙতে। শেষ পর্যন্ত যাদের এতটুকু সামর্থ্য ছিল তারা আবার ভিড়ল "কিউ" এর সারিতে, অথবা ঘুরতে লাগল ভিক্ষাপাত্র হাতে।

কিন্তু সামর্থ্য খুব কম লোকেরই ছিল। দীর্ঘদিনের অনশনে, রৌদ্রে বৃষ্টিতে ফুটপাতে শুয়ে থাকার ফলে এবং নোংরা কদর্য জায়গা থেকে খাদ্যসংগ্রহ করে তা দিয়ে জঠরানল তৃপ্ত করবার চেষ্টায় একে একে তারা মরতে সুরু করল। মুমূর্ষুর আর্তনাদে কলকাতার হাওয়া বাতাস বিষাক্ত হয়ে উঠল। পথের পাশে মায়ের বুকের শুষ্ক স্তন টানতে টানতে কত শিশুর ক্ষীণ আয়ুশিখা নিবে গেল। মৃত শিশু বুকে নিয়েও মা কাঁদতে পারল না, কারণ সেও অভুক্ত, ক্ষুধা সম্পূর্ণ ভাবে লোপ করে দিয়েছে তার অন্যান্য বোধশক্তি। উঠবার চেষ্টা করল। কিন্তু হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। আর উঠল না। তাদের দলের যারা পুরুষ স্বামী, ছেলে, ভাই বা গ্রামসুবাদে খুড়ো বা জ্যেঠা, তারা নিষ্পলকনেত্রে তাকিয়ে দেখল এই দৃশ্য, কিন্তু তাদেরও খেয়াল হ'ল না এর প্রতিকারের চেষ্টা করে। জেলে যেতে পারলে হয়ত তাদের প্রাণ বাঁচত, কিন্তু আইনবিরুদ্ধ, সমাজবিরুদ্ধ কোন কাজই তারা করল না। মূক ভাষাহীন বিহ্বলতা তাদের এগিয়ে দিল চিরনিদ্রার জন্যে।

অথচ সরকার শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কিছুতেই স্বীকার করলেন না যে সত্যি দুর্ভিক্ষ এসেছে। দলে দলে যখন লোক মরছে তখনও বিলেতের লোকসভায়, দেশের এসেম্বলি এবং কাউন্সিলে, প্রশ্নের উত্তরে সরকারের মুখপাত্রগণ বললেন, বাংলা দেশে চালের বা অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের অভাব নেই, শুধু অজন্মার ফলে এবং কতিপয় লোলুপ ব্যবসায়ীর সমাজবিরুদ্ধ ব্যবহারে সাময়িক অভাবের সৃষ্টি হয়েছে মাত্র!

প্রদীপ পাগলের মত এদিকে ওদিকে ছুটোছুটি করতে লাগল। গায়ত্রীর ওখানে গিয়ে তাকে জানাল তীব্র তিরস্কার।

—তিন মাস আগে তুমি আমাকে কি বলেছিলে মনে আছে? আমি যখন আমার আশঙ্কার কথা বলেছিলাম তুমি ত হেসেই উড়িয়ে দিয়েছিলে! আর এখন? আলিপুরের প্রাসাদোপম বাংলোর বাইরে এসে একবার চোখ খুলে দেখ কি হচ্ছে।

গায়ত্রী নতমুখে প্রদীপের তিরস্কার মেনে নিল।

প্রদীপ ছুটল অটলবিহারী বাবু এবং নবকিশোরের কাছে।

তাঁদের অনুরোধ জানাল, তাঁরা যেন খুলে দেন অন্নসত্র। টাকার অভাব নেই তাদের, সদ্ব্যবহার হোক্ তাঁদের অর্থের।

অটলবিহারী বাবু হেসে বললেন, কত মাথার ঘাম পায়ে ফেলে এই টাকা রোজগার করেছি তা' তুমি জান না, প্রদীপ। এককালে আমিও ছিলাম ওদের মত পথের ভিখিরি, সেই শ্রেণীর উর্দ্ধে যদি আজ আমি উঠতে পেরে থাকি তাহলে সেটা সম্ভব হয়েছে নিতান্তই নিজের পরিশ্রমে, অধ্যবসায়ে। ওরা কাজ করে না কেন? কাজের ত অভাব নেই!

—কি করে কাজ করবে, কাকাবাবু? ওদের শরীরের অবস্থা দেখছেন না, দীর্ঘ দিনের অনশনে এতটুকু শক্তি যে অবশিষ্ট নেই। আগে ওদের বাঁচিয়ে তুলুন, তার পর কাজ করবে।

—তোমারও যেমন কথা! পেট ভরে খেতে পেলে ওরা কখনও কাজ করবে? কোঁচড় ভর্ত্তি করে চাল নিয়ে পালিয়ে যাবে ওদের গ্রামে, যেখান থেকে এসেছে!

—কিন্তু ওদের মধ্যে যারা মেয়ে, যারা বৃদ্ধ, যারা শিশু, তাদের কথা ভাবুন। কি অপরাধ করেছে তারা?

—অপরাধ? অপরাধ এই যে ওরা গ্রাম ছেড়ে চলে এসেছে কলকাতায়। কি প্রয়োজন ছিল এখানকার সহজ জীবন-ধারার মধ্যে অশান্তি সৃষ্টি করায়? মরতেই যদি হয় তাহলে গ্রামে নিজেদের ভিটেয় মরলেও ত পারত।

—আপনি বড় হৃদয়হীনের মত কথা বলছেন, কাকাবাবু! সখ করে কি কেউ মরতে চায়? ওরা এসেছে ক্ষুধার তাড়নায়। গ্রামে চাল নেই—আশা, কলকাতায় চাল মিলবে হয়ত বা!

—হৃদয়হীন আমি নই, হৃদয়হীন হচ্ছে তোমাদের সরকার! দুর্ভিক্ষের প্রতিকার করবেন সরকার, আমরা নয়।

—সরকার যদি কর্ত্তব্য করতেন তাহ'লে আপনাদের দ্বারস্থ হ'তাম না, কাকাবাবু! সরকারের কর্ম্মচারীরা বলেন, সরকার দানসত্র খুলে বসেননি, যতটুকু তাঁদের সাধ্য তাঁরা করছেন। আর আপনারা বলেন, দায়িত্ব হচ্ছে সরকারের, আপনাদের নয়। দায়িত্ব আমাদের সবার, কাকাবাবু! এরা আমাদেরই দেশের লোক, এরাও মানুষ।

এতক্ষণ চুপ করে নবকিশোর এদের কথোপকথন শুনছিল। বলল, বাবা হিন্দু মহাসভা রিলিফ ফাণ্ড-এ দু'হাজার টাকা দিয়েছেন, প্রদীপদা।'

—মাত্র দু'হাজার টাকা? দু'হাজার টাকায় কি হবে নবু?

অটলবিহারী বাবু বিরক্তির সঙ্গে বললেন, আমি কি লক্ষপতি প্রদীপ? দু'হাজারেও যদি তোমরা সন্তুষ্ট না হ'ও তাহ'লে আমি নাচার।

তাঁর সামনের টেলিফোনটা বেজে উঠল। অটলবিহারী বাবু তুলে ধরলেন রিসিভারটা।

—হ্যালো: হ্যাঁ, আমি অটল বাবু বলছি। ওঃ শেঠজী, আপনি? বলুন। দাম পঁয়তাল্লিশ টাকায় উঠেছে? এখন ছাড়বেন কি না জিজ্ঞাসা করছেন? না, এখনও না। পুরো পঞ্চাশ পর্য্যন্ত উঠতে দিন, তার পর ছাড়বেন। আপনারই লাভ, কমিশন বেশী পাবেন।—হ্যাঁ, আপনাকে অথরিটি দিচ্ছি পঞ্চাশে উঠলেই ছেড়ে দিতে পারেন।

নবকিশোর বলল, এ লাভটা কিন্তু আমার পরামর্শ মত হ'ল বাবা। আমায় বুইকটা বদলে ক্যাডিলাক কেনবার টাকাটা যেন পাই।

ভগ্ন হৃদয় নিয়ে প্রদীপ এল সুমিত্রার কাছে। দেখল সুমিত্রার ওখানে লোকের ভিড়। খুব জোর আলোচনা চলছে।

—প্রদীপ, তুমি পাশের ঘরে একটু বসো। আমি এখুনি আসছি, সুমিত্রা বলল।

পাশের ঘরে বসে প্রদীপ শুনতে লাগল এদের কথাবার্ত্তা। কে একজন বলছে, আমাদের ফাণ্ডএ মোটেই টাকা উঠছে না, সুমিত্রা দেবি! সরকারের ভয়ে কংগ্রেস ফাণ্ডে অনেকে টাকা দিতে চায় না। অথচ হিন্দুমহাসভা, রামকৃষ্ণ মিশন, অলপার্টি রিলিফ ফাণ্ড-এ কত টাকা উঠেছে। ওরা সবশুদ্ধ গোটা দশেক অন্নসত্র খুলেছে, আর আমরা একটার বেশী এপর্য্যন্ত খুলতে পারলাম না। এ ভাবে চললে আমরা যে হটে যাব, সুমিত্রা দেবি!

সুমিত্রা বলছিল, দোষ ত আপনাদেরই। যারা পঁসালো তাদের কাছে কি দাবী নিয়ে যেতে হয় তা' আপনারা জানেন না। আজ যদি বাবা জেলে আটক না থাকতেন তাহলে দেখতেন তিনি কি করতেন। অনুরোধ উপরোধে কাজ যদি না হয় তাহলে ভয় দেখাতে পারেন না? বলতে পারেন না, কংগ্রেসের হাতে ক্ষমতা একদিন আসবে, তখন তারা মনে রাখবে তাদের, যারা অসহযোগিতা করছে কংগ্রেস কমিটির সঙ্গে।

আরেক জন বলল, আমি ঐভাবে প্রায় এক লাখ টাকা তুলেছি সুমিত্রা দেবি! বলেছি যে কংগ্রেস অকৃতজ্ঞ নয়, যারা কংগ্রেসকে সাহায্য করবে তারা উপযুক্ত পুরস্কার পাবে যথাসময়ে।

সুমিত্রা বলল, এই ত চাই। শুনুন, আজ পর্য্যন্ত আমাদের ফাণ্ডে উঠেছে দু'লক্ষ বাইশ হাজার টাকা। এমাসের শেষে এটা পাঁচ লক্ষে তুলতে হবে। আপনাদের প্রত্যেককে সেক্টর ভাগ করে দিয়েছি, টার্গেটএ পৌছান চাই-ই।

তৃতীয় একজন বলল, সবচেয়ে মুস্কিল হয়েছে বামপন্থীদের নিয়ে। ওরা বলছে যে কংগ্রেস যুদ্ধে অসহযোগিতা করার ফলে সরকার ক্ষমতা তাদের হাতে দেবে না, দেবে বামপন্থীদের হাতে। কাজেই অদূর ভবিষ্যতের কথা ভেবে লোকে যেন কংগ্রেসের ফাণ্ডএ চাঁদা না দেয়। ওদের ফাণ্ড-এ নাকি দু'লক্ষ টাকা উঠেছে!

সুমিত্রা বলল, ওরাই হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে বড় শত্রু! গান্ধীজি জেল থেকে বেরিয়ে আসুন না, আমরা ওদের প্রকৃত পরিচয় তুলে ধরব দেশের লোকের সামনে। সরকারের সহায়তা দেশের রোষের হাত থেকে ওদের কি ভাবে রক্ষা করে দেখে নেব।

মিটিং ভাঙ্গল। সুমিত্রা এল প্রদীপের কাছে।

—কি প্রদীপ? কি খবর? দেখছ ত দেশের অবস্থা! মাসকয়েক আগে আমি যখন দুর্ভিক্ষের আভাস দিয়েছিলাম আমার কথায় তোমার প্রত্যয় হয়নি। আর এখন?

—আমার ভুল হয়েছিল সুমিত্রা।

—তুমি আমার কমিটিতে এস না কেন? তোমাদের বরানগর অঞ্চলে আমাদের কোন ভাল কর্ম্মী নেই, তুমি যদি ঐ অঞ্চলটার ভা[র] নাও তাহলে বেশ হয়।

—আমি যে রামকৃষ্ণ মিশনের একটা অন্নসত্রে কাজ করছি।

—ওঃ, তুমি এরই মধ্যে কংগ্রেস ছেড়ে অন্য দলে ভিড়েছ? চমৎকার!

—এর মধ্যে দল কোথায় সুমিত্রা? মিশন ত কোন দলাদলির মধ্যে যায় না যেখানে দুঃস্থ, আর্ত্ত দেখতে পায় সেখানেই ছোটেন মিশনের সেবাব্রতীরা। ওঁরা যা করছেন তা অতুলনীয়।

—হুঁ, আর সরকারের খাতায় তাদের কর্মীদের নাম উঠছে বোধ হয়! ভবিষ্যতে মেডেলও মিলতে পারে।

—একি বলছ তুমি? ওঁরা যে সংসারত্যাগী, কোনপ্রকার পুরস্কার বা লাভের আশা রেখে তাঁরা কাজ করেন না।

সুমিত্রা অবজ্ঞাসূচক ভ্রূভঙ্গী করল। বলল, ভাল কথা। তবে আমাদের পুরানো কর্ম্মী তুমি, আমাদের সঙ্গে কাজ করলেই শোভন হত বেশী।

—মিশনই যে প্রথমে নামল কর্ম্মক্ষেত্রে। কিছু করতে না পেয়ে আমি হাঁপিয়ে উঠেছিলাম, তাই তাড়াতাড়ি যোগ দিলাম ওদের সঙ্গে।

—তাহলে তুমি আজ এসেছ কি উপলক্ষ্য নিয়ে?

প্রদীপ আহত বোধ করল। বলল, উপলক্ষ্য কিছুই নেই, সুমিত্রা। চার দিকের অবজ্ঞা, নীচতা, স্বার্থান্ধতা দেখে পীড়িত বোধ করছিলাম, তাই ছুটে এলাম তোমার কাছে, এই আশায় যে এখানে খানিকটা সান্ত্বনা, খানিকটা মনের খোরাক পাব। এখন দেখছি, ভুল করেছি।

—ভুল নিশ্চয়ই করেছ। ভুল করেছ আমাদের পরিত্যাগ ক'রে।

—মিথ্যে অপবাদ দিয়ো না। কংগ্রেসকে আমি ছাড়িনি। বেশ একটু রাগত স্বরেই প্রদীপ বলল।

পনেরো

আরও এক বছর কেটে গেল। এর মধ্যে অনেক পরিবর্ত্তন ঘটল। লিন্‌লিথগো বড়লাটের মসনদ পরিত্যাগ করলেন এবং তাঁর স্থানে এলেন যুদ্ধবিজয়ী লর্ড ওয়াভেল। বাংলার গভর্ণমেণ্ট হাউসে এলেন অষ্ট্রেলিয়া থেকে মিঃ কেসী, দুর্ভিক্ষোত্তর বাংলাকে শান্তি শৃঙ্খলার মধ্যে ফিরিয়ে আনতে।

আরও অনেক কিছু ঘটল, যথা প্রকাশ্য দিবালোকে জাপানী বোমারুর কলকাতায় বোমাবর্ষণ, গান্ধীজির সহধর্ম্মিণী কস্তুরবাঈএর দেহত্যাগ, এবং ভারত সরকার কর্তৃক পুস্তিকা প্রকাশ—বিয়াল্লিশ সালের গোলমালের পেছনে কংগ্রেস এবং গান্ধীজির কতখানি সহযোগিতা ছিল তার প্রমাণসহ। গান্ধীজি প্রতিবাদ জানালেন নতুন বড়লাটের কাছে। জবাব এল সংক্ষিপ্ত এবং সুস্পষ্ট, সরকার মনে করেন না গান্ধীজির এই প্রতিবাদের কোন মূল্য আছে।

ওদিকে বিলেতে লোকসভায় মিঃ এমেরি অবশেষে স্বীকার করতে বাধ্য হ'লেন যে বাংলা দেশে সত্যি সত্যি দুর্ভিক্ষ হয়েছিল এবং তাতে লোক মারা গেছে অন্যূন পঁয়ত্রিশ লক্ষ। কিন্তু সঙ্গে

সঙ্গে তিনি এ-ও বললেন যে, সরকারের দিক থেকে উপযুক্ত প্রতিকার ব্যবস্থার কোনই ত্রুটি হয়নি।

ইউরোপে জার্ম্মানী এবং ইটালির অবস্থা সঙ্গীন, পদে পদে তারা হটে যাচ্ছে বৃটেন, রাশিয়া এবং যুক্তরাষ্ট্রের শক্তির সম্মুখে। প্রশান্ত মহাসাগরেও জাপানীরা হটছে, কিন্তু তারা একবার শেষ চেষ্টা করছে বৃটেনের সঙ্গে শক্তিপরীক্ষা করতে। সিঙ্গাপুরে আজাদ হিন্দ গভর্ণমেন্ট স্থাপিত হয়েছে, নেতাজীর নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ ফৌজ চলে এসেছে মণিপুর সীমান্তে।

তার পর অপ্রত্যাশিত ভাবে সরকার গান্ধীজিকে মুক্তি দিলেন। ইস্তাহারে তাঁর অসুস্থতার কারণটা খুব প্রকট করে বলা হ'ল, যাতে দেশের লোক মনে না করে যে কংগ্রেসের প্রতি সরকারের নীতির কোন পরিবর্ত্তন ঘটেছে। তার প্রমাণও এল মাস দুয়েকের মধ্যে। গান্ধীজি যখন লর্ড ওয়াভেলের সঙ্গে দেখা করবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, তখন জবাব এল, তিনি অত্যন্ত দুঃখিত, যত দিন পর্য্যন্ত কংগ্রেস অপরাধ স্বীকার না করছে, কংগ্রেসের কারো সঙ্গে দেখা করতে তিনি প্রস্তুত নন।

ঘটনার এই ঘাত-প্রতিঘাতে প্রদীপ খানিকটা বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। সে অনুভব করছিল, দেশ যেন একটা নিঃসাড় অবস্থার মধ্যে এসে পৌঁছেচে। সরকারের প্রহারে, দুর্ভিক্ষের নির্ম্মম আঘাতে সকলেই যেন হয়ে পড়েছে কেমন প্রাণহীন, নিস্তব্ধ। দুর্ভিক্ষের সময়ে বেদনার যে তীব্রতা, যে নিষ্ঠুরতা, যে সুগভীর মনস্তাপ সমসাময়িক নর-নারীর অনেককে অস্থির ও বিক্ষুব্ধ করে তুলেছিল, তাও যেন তারা ভুলে যেতে বসেছে কালের অতল প্রবাহে।

কেন এমন হয়? এই কি মনের ধর্ম্ম? ব্যাপক সর্ব্বনাশের দৃশ্য খুব বেশী দেখলে, খুব বেশী আলোচনা করলে মনের বেদনার তীক্ষ্ণতা কি সত্যি কমে আসে?—অথবা ভুলে যাওয়াই কি মনের স্বাভাবিক রীতি?

সুমিত্রার সঙ্গে তার বিশেষ দেখা হয়নি, এই একটি বছরে। সে বুঝতে পেরেছিল, সুমিত্রার জগতে বিচরণ করতে সে অসমর্থ, সুমিত্রাও তাকে তাদের দলের একজন বলে মেনে নিতে অনিচ্ছুক। সুমিত্রার সান্নিধ্য সে যথাসম্ভব এড়িয়ে চলতে লাগল।

বন্দনার সঙ্গে তার মাঝে মাঝে দেখা হত, কিন্তু সে অনুভব করতে সুরু করেছিল যে সেখানেও সে অপাংক্তেয়। দুর্ভিক্ষের সময় অন্নসত্র খোলা নিয়ে অটলবিহারী বাবু এবং নবকিশোরের সঙ্গে বাদানুবাদের পর অবধি তাঁরা তার সঙ্গে বাক্যালাপ প্রায় বন্ধ করে দিয়েছিলেন। প্রদীপ যে তাঁদের প্রতি ঘোরতর অবিচার করেছে, এটা প্রকাশ পেত তাঁদের প্রত্যেকটি সংক্ষিপ্ত সম্ভাষণে, তাঁদের সুস্পষ্ট অবহেলায়। বন্দনাও যেন তার বাবা এবং দাদার পক্ষ সমর্থন করছিল।

তার একমাত্র স্থান ছিল গায়ত্রীর গৃহে। সেই তিরস্কারের পর গায়ত্রী যেন একটু কোমল, একটু সহিষ্ণু হয়ে উঠেছিল। আজকাল সে প্রদীপের উক্তি, প্রদীপের অভিমত শুনতে আরম্ভ করেছিল একটু বেশী অভিনিবেশের সহিত। এমন কি, মিঃ করও তাঁর অফিসিয়াল মুখোশটা মাঝে মাঝে খুলে ফেলতেন তার সম্মুখে, তাকে প্রশ্ন করতেন নানা বিষয়ে। তবে প্রদীপের মনে হত, এটা হয়ত সাময়িক ক্লান্তির প্রতিক্রিয়া।

সেদিন আলোচনা হচ্ছিল কংগ্রেসকে নিয়ে। গায়ত্রীই প্রসঙ্গটা তুলেছিল, মিঃ কর ছিলেন শ্রোতা।

—আচ্ছা, প্রদীপ, তোমার কি মনে হয় না গান্ধীজির তখন উচিত এই নিঃসাড় অবস্থাটার অবসান করে দেওয়া, অন্ততঃ একবার শেষ চেষ্টা ক'রে দেখা? কি লাভ হচ্ছে এই তুচ্ছ আত্মশ্লাঘায়? ধরেই নিলাম না হয় বিয়াল্লিশ সালের গোলমালের জন্ত কংগ্রেস দায়ী নয়, কিন্তু এখন, এই চুয়াল্লিশ সালের শেষার্দ্ধে, ঐ ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি করার কোন সার্থকতা আছে কি?

—কিন্তু পুনরাবৃত্তি ত গান্ধীজি করছেন না। পুনরাবৃত্তি করছেন সরকার।

—না, প্রদীপ, সরকার করছেন না। সরকার গান্ধীজির মুখ থেকে শুধু এইটুকু শুনতে চান যে তাঁর ভুল হয়েছিল।

—গান্ধীজি ত সহযোগিতার জন্ত হাত বাড়িয়েই আছেন, দিদি! এই সেদিন তিনি বলেছেন, তিনি সরকারের সঙ্গে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করতে রাজী আছেন যদি সরকার বলেন যে, ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দেওয়া হবে অবিলম্বে।

মিঃ কর বললেন, এটা বড্ড বাড়াবাড়ি করছেন তিনি। যুদ্ধ এখনও শেষ হয়নি, শত্রু আমাদের ঘরের দরজায়, এখন কি ক'রে বৃটেন ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দেবে, প্রদীপ বাবু?

—কেন, গান্ধীজি ত সে পথও খোলা রেখেছেন। তিনি বলেছেন যে যুদ্ধ চালাবার জন্ত বৃটিশ সৈন্তদের যদি ভারতবর্ষে থাকতে হয়, এক-দুই-বা-তিন বৎসর, তিনি আপত্তি করবেন না। তবে তারা থাকবে স্বাধীন ভারতের রক্ষক হিসাবে, পরাধীন ভারতের ভক্ষকরূপে নয়।

—এ শুধু পুরানো কথার পুনরাবৃত্তি। যুদ্ধের অবসানে স্বাধীনতা আসবে, এ প্রতিশ্রুতি ত সরকার পক্ষ থেকে অনেকবার দেওয়া হয়েছে। মিঃ কর বললেন।

—আপনি ত জানেন বৃটেনের প্রতিশ্রুতির দাম কতটুকু। গান্ধীজি মনে করেন, বৃটেন এখন যদি স্বাধীনতা না দেয় তাহ'লে যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে, বিপদের অবসানে, কিছুতেই স্বাধীনতা দেবে না।

—কিন্তু এ যে রীতিমত ব্ল্যাকমেল, প্রদীপ বাবু! গান্ধীজির কাছ থেকে আমরা এটা আশা করিনি'।

—যা খাঁটি কথা তা অস্বীকার করলে চলবে কেন, মিঃ কর? একে ব্ল্যাকমেলই বলুন আর যাই বলুন, এ ছাড়া আমাদের আর পথ নেই।

—আপনি নিশ্চিত জানবেন, প্রদীপ বাবু, এভাবে স্বাধীনতা আপনারা পাবেন না। একদিকে গান্ধীজি করছেন ব্ল্যাকমেল আর অপর দিকে নেতাজী দিচ্ছেন হুমকি। সরকার এখনও এমন দুর্ব্বল হয়ে পড়েননি যে ব্ল্যাকমেল বা হুমকিতে ভয় পাবেন। বেশ জোরের সঙ্গেই মিঃ কর বললেন এবং আবার তাঁর খবরের কাগজে মনঃসংযোগ করলেন।

গায়ত্রীর দিকে তাকিয়ে প্রদীপ বলল, আচ্ছা, তুমিই বল না, দিদি, স্বেচ্ছায় অন্যের হাতে ক্ষমতা কেউ দিতে চায় কি!

ক্ষমতা কেড়ে নিতে হয়, ছলে, বলে, কৌশলে। গান্ধীজি এই অত্যন্ত সোজা কথাটা বুঝেছেন।

—আমি মেয়েমানুষ, তোমাদের পলিটিক্স বুঝিনে, প্রদীপ! তবে এটুকু বুঝি যে কংগ্রেস আজ গভর্ণমেন্টের বাইরে আছে বলে দেশেরই সমূহ ক্ষতি হচ্ছে। পাকিস্তান, আকালিস্থান, তপশীল-স্থানের জন্য যে কলরব হচ্ছে সেটা কি দেশের পক্ষে কল্যাণকর?

—নিশ্চয়ই নয়, দিদি! কিন্তু এদের উস্কে দিচ্ছে কে? বৃটেন। আজ বৃটেন ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা দিয়ে দূরে সরে যাক, দেখবে দু'দিনের মধ্যেই আমাদের এই ঘরোয়া ঝগড়া মিটে যাবে।

—আপনি পরিস্থিতিটাকে যতখানি সহজ আর সরল ভাবছেন, ততখানি সহজ সরল তা নয়। মিঃ কর আবার বললেন।

—হয়ত নয়, কিন্তু তাতে বৃটেনের এত মাথাব্যথা কেন? যদি আমরা মারামারি কাটাকাটি করি তাহ'লে ক্ষতি ত হবে আমাদেরই, বৃটেনের নয়।

যদিও প্রদীপ জোর গলায় মিঃ কর আর গায়ত্রীর সঙ্গে তর্ক করল তবু তার মনেও সংশয় জাগতে সুরু করেছিল। সত্যি ত, স্বাধীনতার কি মূল্য থাকবে যদি স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরেই আরম্ভ হয় কলহ? কেন লোকে ভাবছে না যে স্বাধীনতা পকেটে পুরে রাখবার মত একটা পদার্থ নয়, এ হচ্ছে একটা নিবিড় অনুভূতি, এ হচ্ছে সর্ব্বতোভাবে বিকশিত হবার একটা সুযোগ। স্বাধীনতা দেশবাসীকে করবে মহৎ, উদার। ক্ষুদ্রতা, নীচতা যাবে মুছে, মহাত্মাজীর কথায়, স্বাধীনতা নিজেদের নতুন করে চেনবার জানবার সুযোগ দেবে।

গায়ত্রীদের ওখান থেকে বেরিয়ে অন্যমনস্ক ভাবে হাঁটতে সুরু করল। খানিকপরে লক্ষ্য করল নিজেরই অজ্ঞাতে সে এসে পড়েছে রসময়ের চায়ের ক্যাবিনের সম্মুখে।

একটু ইতস্তত করে সে ঢুকে পড়ল। দেখল যারা সেখানে বসে আছে তাদের কাউকেই সে চেনে না। সন্তোষ সেখানে নেই।

রসময়ের কাছে সে এগিয়ে গেল। প্রশ্ন করল, সন্তোষ বাবু আজকাল এখানে আসেন না?

রসময় তার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে বলল, আপনাকে যেন চেনা-চেনা মনে হচ্ছে। কোথায় দেখেছি বলুন ত?

—কেন? এখানেই। অনেক দিন পরে এলাম।

—ওঃ, তা সন্তোষ বাবু আজকাল বিশেষ আসেন না। উনি এখন ওয়ার্ডেন হয়েছেন, গরীবের এই দোকানে তাঁর পদধূলি পড়ে না।

—ওর ঠিকানা জানেন?

—ঠিকানা? ঠিক জানিনে। আচ্ছা দাঁড়ান, জিজ্ঞাসা করে বলছি।

রসময় অভ্যাগত একটি ছেলেকে ডাকল। বলল, ওহে, সীতেশ, সন্তোষ মুখুজ্যের ঠিকানা জান? এই ভদ্রলোক জানতে চাচ্ছেন।

সীতেশ প্রদীপকে ঠিকানা বলল। সন্তোষ কোন্ ওয়ার্ডের ওয়ার্ডেন সেটাও প্রদীপ জেনে নিল, তার পর রসময়কে অজস্র ধন্যবাদ জানিয়ে সে বার হয়ে এল।

স্থির করল সন্তোষের খোঁজটা একবার করে যাবে। সীতেশের প্রদত্ত ঠিকানাটা খুলে পড়ল। এখান থেকে একটা বাস ধরতে হবে, তার পর খানিকটা হাঁটতে হবে।

বাস থেকে নামল। রাস্তাটা যেন চেনা-চেনা মনে হচ্ছে না? হ্যাঁ, এবার মনে পড়েছে। এখানেই সে সন্তোষের সঙ্গে এসেছিল, ছবির সঙ্গে তার পরিচয়ও এখানেই। সন্তোষ তাহ'লে কাছাকাছিই থাকে দেখছি। আচ্ছা, ঐ বাড়ীটাতেই সন্তোষ তাকে নিয়ে এসেছিল না?

না, ভুল হয়নি। সেদিন সে এসেছিল রাত্রির অন্ধকারে, আজ দিনের আলোয় সে সব স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। ঐ ত সিঁড়ি, ওখান দিয়েই সে উঠে গিয়েছিল দো'তলায়।

সত্যি, কি নেশায়ই না সেদিন তাকে পেয়েছিল! কেন যে এসেছিল তার সঙ্গত কারণ আজও সে খুঁজে পায়নি। ছবির চেহারাটাও মনে আসছে না যেন। শেষ দেখা সেই প্রিনসেপ ঘাটের ওখানে। তার পর একটি বছর কেটে গেছে, কোন খোঁজ সে নেয়নি। মনেও হয়নি ছবির কথা। তার ট্রেনিংও ত প্রায় শেষ হতে চলল। কেমন আছে সে? ভালই আছে নিশ্চয়। নবকিশোরকে জিজ্ঞাসা করবে অবসর মত।

বাড়ীটা পেরিয়ে সে এগিয়ে গেল আরও চল্লিশ পঞ্চাশ গজ। অবশেষে সন্তোষের ঠিকানা মিলল। কিন্তু সন্তোষ বাড়ীতে নেই, তার ওয়ার্ডেন পোষ্টও চলে গেছে। হ্যাঁ, সেখানে গেলে নিশ্চয়ই দেখা হবে, সন্তোষের ছোট ভাই বলল।

ফেরবার পথে সেই বাড়ীটার পাশ দিয়েই আবার যেতে হবে। আচ্ছা, প্রকাণ্ড একটা গাড়ী এসে দাঁড়াল যেন। গাড়ীর ষ্টিয়ারিং হুইলে বসে কে ও? অনেকটা নবকিশোরের মত মনে হচ্ছে যেন।

না কোনই সন্দেহ নেই। নবকিশোরই। পকেট থেকে একটা সিগারেট কেস বার করে লাইটার দিয়ে একটা সিগারেট ধরাল, তার পর পাশের দরজাটা খুলে দিল।

গাড়ী থেকে নামল একটি মেয়ে। অ্যাঁ, ছবি? কিন্তু তাকে যে চেনাই যায় না এখন। সুন্দর জর্জ্জেটের শাড়ি, কণ্ট্রাষ্ট রংএর ব্লাউজ, পায়ে শান্তিনিকেতনী চটি, হাতে মানানসই ব্যাগ, আর ঠোঁটও যেন একটু অস্বাভাবিক রকম লাল।

ছবির পেছনে পেছনে নবকিশোরও নামল। তারপর তারা সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেল ওপরে।

একটু দূরে প্রদীপ বজ্রাহতের মত দাঁড়িয়ে রইল। [ক্রমশঃ।

বিশ্বের এই অনন্ত রূপে, এই অনন্ত মূর্তিস্রোতে কি তোমার বিশেষ রূপ, কি তোমার বিশিষ্ট মূর্তি, আমরা তোমার সেই মূর্তি দেখিতে চাই।

—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ।

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

ডক্টর এক্স

দুঃসহ বেদনার অগ্নিতে দগ্ধ করে ঈশ্বর কমলকে কৃপা করেছেন। যখন কমল ভাবছিল আসন্ন সর্ব্বনাশকে সে আর কোন ক্রমেই ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না, তখন অপ্রত্যাশিত ভাবে সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেল।

কিছু দিন আগে ভাল ঘরে ভাল বরে মীরার বিবাহ হয়ে গেছে। এ বিবাহের সম্পূর্ণ ব্যয় চিত্রার অভিভাবক বহন করেছেন। বিনিময়ে তিনি শুধু সমরকে চিত্রার জন্ম চেয়ে নিয়েছেন। সমরের মত ছেলের সঙ্গে চিত্রার বিবাহের তিনি কোন বাধাই বড় মনে করেননি।

চিত্রাকেও কমল অনেক ভাবে পরীক্ষা করেছে। কমলের কাছে তাদের ইতিহাস শুনে সমরের রিসার্চ্চের জন্ম সব কষ্ট চিত্রা সহ্য করতে প্রস্তুত হয়েছে।

কমলের অনুরোধে সমরও এ বিবাহে সম্মতি দিয়েছে। কথা ছিল, মীরার বিবাহ হয়ে গেলেই সমরের বিবাহ হবে। আজ সেই বহু-প্রতীক্ষিত শুভদিন এসেছে।

উৎসব-কোলাহলে বাড়ী মুখর হয়ে উঠেছে। সমর এবার যাত্রা করবে। স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বালিকা সকলে হল ঘরে এসে দাঁড়িয়েছে। কোণে, ভিজা কাপড় ঢাকা ঝুড়িতে রাখা ফুল ও মালার গন্ধে চারি দিক ভরে উঠেছে। ঝুড়ি থেকে একটা গোড়ে মালা নিয়ে মীরা ডাঃ সেনের ফোটোতে টাঙ্গিয়ে দিল। ডাঃ সেনের ছবিকে প্রণাম করে সমর মিসেস সেনের পায়ে মাথা রেখে প্রণাম করল।

মীরা পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল, সে বলল—ওঠ দাদা ওঠ, অত করে প্রণাম করতে হবে না। দেখ তো, চন্দনের কৌটা কি রকম নষ্ট করে ফেললে?

ঘরের যে দিকটায় লোক কম, সেখানে নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে কমল উৎসব, আশা-আকাঙ্ক্ষার এই উচ্ছ্বসিত প্রবাহ দেখছিল আর ভাবছিল, আজকের এই যে আনন্দস্রোত এ বাড়ীর এত দিনের সঞ্চিত গ্লানির আবর্জ্জনাকে বন্যার জলের মত ধুয়ে নিয়ে যাচ্ছে; সে স্রোত কেন তাকে স্পর্শ করছে না?

কেন তার মনে হচ্ছে, দুঃখ, অপমানের কালিতে লেখা তাদের বিগত দিনের জীবনযাত্রার ইতিহাস যাকে আর সকলে অতি সহজে বর্জ্জন করেছে, তাকে শুধু সেই আর কোন দিন ত্যাগ করতে পারবে না।

কেন তার মনে হচ্ছে, এ ইতিহাস শুধু আজকের নয়, ভবিষ্যতের সব আনন্দ হতে তাকে চিরকাল বঞ্চিত করে রাখবে? পাড়ার দু'-তিন জন মেয়ে কমলকে দেখতে পেয়ে তার কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল। কমলকে অন্যমনস্ক দেখে তাদের এক জন বলল—ও মা, ঐ দেখ কমল চুপটি করে দাঁড়িয়ে আছে! দাদাকে দেখে তোমার হিংসা হচ্ছে নাকি ভাই? তোমার তো ভাল-ই হল। এবার তোমার পালা, ভাল করে মহড়া দিয়ে নাও, খুব সুন্দরী বউ এবার তোমার জন্য আমরা নিয়ে আসবার বন্দোবস্ত করছি।

মেয়েদের কথায় কমলের চমক ভাঙ্গল। এখনও একটু কাজ তার বাকী আছে। দু'পা এগিয়ে সমরকে ডেকে সে বললে—দাদা, একবার এদিকে এস, তোমার সঙ্গে একটু কথা আছে।

সমর জিজ্ঞাসা করল—কি কথা রে?

সমরের হাত ধরে টেনে তাকে বাইরে নিয়ে যেতে যেতে কমল বলল—না না এখানে নয়, আড়ালে এস—ঠাকুরঘরে চল।

—হাত ছাড়, চল যাচ্ছি।

ঠাকুরঘরের সামনে এসে কমল বলল—শোন দাদা, এই ঈশ্বর-সাক্ষী করে আজ তোমাকে একটা কথা আমায় দিতে হবে, বল দেবে?

—সাধ্য হলে নিশ্চয়ই দেব।

—চিত্রাকে কখনও দুঃখ দিও না। ও যদি কোন অপরাধও করে তাহলেও স্বচ্ছন্দ মনে ওকে ক্ষমা কোরো। চিরদিন মনে রেখো ও তোমার জন্য অনেক ত্যাগ করেছে।

—তাই হবে কমল!

—দাদা, তুমি আমায় আজ বড় সুখী করলে। একজামিনের পর আমায় মিলিটারীতে যেতে হবে। হয় ত আর তোমার সঙ্গে দেখা হবে না, তাই তোমাকে আজ এ কথা বলে গেলাম। তুমি কিছু ভেবো না দাদা, সব ঠিক হয়ে যাবে।

রিসার্চ্চ করে এক দিন তুমি নিশ্চয়ই বড় হবে। বিশ্ববিধানে সত্য, ন্যায়, নিষ্ঠা একাগ্রতার যদি কোন মূল্য থাকে এক দিন তুমি সেই মূল্য নিশ্চয়ই পাবে। এস এবার যাই।

অপথ্যালমোলজীর প্র্যাকটিকাল পরীক্ষা একটু আগে শেষ হয়েছে। অপারেশান রুমের পাশের ছোট ঘরটায় viva voce একজামিন হচ্ছিল। সেখান হতে বেরিয়ে কমল দেখল, পাশের লম্বা টানা বারান্দার এক দিক হতে অন্য দিক পর্য্যন্ত একেবারে খালি। মাঝে মাঝে দু'-একটি নার্সের আসা-যাওয়ার শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দও শোনা যায় না। একজামিনের জন্য হাসপাতালে ষ্টুডেণ্টদের আসা বন্ধ, তাই এ নির্জ্জনতা।

বিকালের পড়ন্ত রোদ যাতে ভিতরে না আসে তাই বারান্দার আর্দ্ধেক পর্দা দিয়ে ঢাকা। X-Ray ডিপার্টমেণ্টের কাছে আণ্ডারগ্রাউণ্ড ষ্টোর হতে একজন কমপাউণ্ডার উঠে আসছিল। কমলকে দেখে সে নমস্কার করল।

পাঁচ বছর কমলের এই আবেষ্টনে কেটেছে। এবার তাকে এ কলেজের মায়া কাটাতে হবে। সার্জ্জারী ওয়ার্ডের সামনে এসে কমলের মনে পড়ল, হাসপাতালে তার প্রথম দিনের ডিউটির কথা। ওয়ার্ডে ঢোকবার সময় সেদিন কমল একটি ষোল-সতের বছর বয়সের সুন্দরী মেয়েকে তার মৃত স্বামীর বুকের ওপর পড়ে আকুল হয়ে

...াকতে দেখেছিল। গলষ্টোনের জন্ত তার স্বামীর অপারেশান হবার ...র সেই মাত্র সে মারা গিয়েছিল। সকালে অপারেশান থিয়েটারে প্রফেসরের লেকচার শুনতে শুনতে যখন কমলরা এ অপারেশান দেখেছিল তখন তারা কি ভাবতেও পেরেছিল যে, এত স্বাস্থ্য, এত প্রাণপ্রাচুর্য, চিকিৎসার এত সমারোহ সব ব্যর্থ করে মৃত্যুই জয়ী হবে ?

ward এর সামনে একজন ইংরাজ নার্স ট্রলির উপর ড্রেসিং-এর জিনিষ ঠিক করছিল। গ্লাভসে ফ্রেঞ্চ চক দিতে দিতে কমলকে সে হেসে জিজ্ঞাসা করল Finished with your awful exam ?

কমল উত্তর দিল—Yes thanks.

—Hope you will get through ?

—Think so.

—It is too hot, will you have a cold drink ?

—No thanks.

নার্সটি দেখতে অনেকটা তার দিদির মত। তাকে দেখে আজ কমলের দিদির কথা মনে পড়ছে। এক বছর আগে এই সময়, এই হাসপাতালেই দিদি মারা গিয়েছিল। টাইফয়েডে ইনটেসটিনাল পার্ফোরেসন হবার পর অপারেশান হয়েছিল, তার পরও দিদি প্রায় আঠার ঘণ্টা বেঁচে ছিল।

টেলিগ্রাম পেয়ে মিঃ সেন যখন দিদিকে দেখতে এসেছিলেন, তখন দিদির শেষ অবস্থা।

ওয়েটিং রুমে মিসেস সেনকে নিয়ে গিয়ে কমল বলেছিল—মা, দিদির অপারেশান হয়েছে, তার আর বাঁচবার আশা নেই। ওর পাশে কেউ বসে থাকতে পারেনি, শুধু আমিই সারা দিন সেখানে বসে আছি। দিদির এখনও সম্পূর্ণ জ্ঞান আছে। সে যে মরছে, তা সে জানে না। ওকে আমি শান্তিতে মরতে দিতে চাই, তাই ওর সামনে গিয়ে আমি তোমায় অস্থির হতে দেবো না। যদি এক ফোঁটাও চোখের জল না ফেলে, একটুও বিচলিত না হয়ে ওর মৃত্যু তুমি দেখতে পার, তাহলেই আমি তোমাকে ওর পাশে নিয়ে যাব, নইলে নয়। ভেবে দেখ ভাল করে, কি করবে।

মিসেস সেন শুধু বলেছিলেন—আমি সব সহ্য করব। একবার আমাকে তুই ওর কাছে নিয়ে চল।

মিসেস সেন আর কমল সেই মৃত্যুপথযাত্রিনীর পাশে তার শেষ সময় পর্য্যন্ত বসেছিলেন।

সারা দিন অসহ্য তৃষ্ণায় দিদি ছটফট করছিল, তবু এক বিন্দু জল তাকে কমল খেতে দেয়নি। জল দিতে ডাক্তারের বারণ ছিল। জল খেয়ে বমি হলে ষ্টিচ্ ছিঁড়ে যাবার আশঙ্কা ছিল।

ঘণ্টায় ঘণ্টায় ডাক্তার এসে দেখে যাচ্ছিলেন। একবার তিনি কমলকে বললেন—Just feel the pulse and count it.

—Yes sir, I have counted it.

—What do you think about it ?

—It is very rapid, over 190 per minute, and is of extreme low volume and tension.

—You understand what it means ?

—Yes, I do.

—Be prepared for the end then.

ডাক্তার চলে যেতে ব্যগ্র-ব্যাকুল কণ্ঠে মিসেস সেন জিজ্ঞাসা করেছিলেন—ডাক্তার কি বললে রে কমল ?

কমল উত্তর দিয়েছিল—কিছু না মা, ওই দেখ দিদি তোমায় কি বলছে। কি চাই দিদি, মাকে বল।

—মা দেখ না, একটু জল কমল আমায় দিচ্ছে না। একটা বড় গ্লাসে ভরে এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল আমায় দে কমল, আমি এ তেষ্টা আর সইতে পারছি না।

দিদির কথায় মা বলেছিলেন—একটু জল ওকে দে কমল, তুই কি দেখতে পাচ্ছিস না কি হচ্ছে ?

একটা বরফের টুকরো দিদির মুখে দিয়ে কমল বলেছিল—এইটা মুখে রাখ দিদি, একটু পরেই তেষ্টা কমে যাবে। আর তোমার কষ্ট হবে না।

গঙ্গার জলে যখন দিদির চিতাভস্ম, অস্থি বিসর্জ্জন করা হয়েছিল তখনও কি দিদির তৃষ্ণা মেটেনি ?

দিদি মরেছিল কিন্তু কমল সেদিন মরতে পারেনি। সবচেয়ে ছোট হয়েও সেই সেদিন সকলকে সান্ত্বনা দিয়েছিল। সমরকে প্রবোধ দিয়েছিল। তার দুঃখের ভার নিজে বহন করেছিল।

সমরকে দিদি বড় ভালবাসত, তাই সমরের বিসার্চের কথা একদিন কমল দিদিকে জানিয়েছিল। দিদি সেদিন তাকে বলেছিল—ভাই, আমি পরাধীন সামান্যা স্ত্রীলোক, এর জন্ম কিছু করবার সাধ্য তো আমার নেই। কিন্তু তুই যেন কখনও সমরকে ছাড়িস না, ও যাতে ভাল হয় তাই করিস। ওর জন্ম কোন দুঃখেই যেন তুই হার মানিস না। মনকে শক্ত করিস। সেই দিন হতে আপনার মন কমল শক্ত করেছিল, কোন দুঃখই তারপর আর তাকে বিচলিত করতে পারেনি।

কিন্তু এর জন্ম কি মূল্য তাকে দিতে হয়েছিল ? সমরের চিন্তাকে সামনে রেখে আর সব ভোলবার জন্ম, দয়া, মায়া, স্নেহ, মমতা হৃদয়ের সুকুমার বৃত্তিগুলি সে এক এক করে নির্ম্মূল করেছিল। নিজের হৃদয়কে স্বহস্তে হত্যা করতে পেরেছিল বলেই বোধ হয় আসন্ন মৃত্যু একটি হৃদয়ের সামনে বসেও অন্য চিন্তা করতে তার বাধেনি। কি ভেবেছিল সে সেদিন ?

দিদিকে ওষুধ খাওয়াবার সময় ? ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলায় ? মার মুখের দিকে তাকিয়ে ? কা'কে সে সেদিন দেখতে চেয়েছিল ?

সমর ? তার ভবিষ্যৎ ?

সেদিনের নির্লিপ্ততার, অবহেলার শোধ দিতেই কি মৃত্যুর পরপার হতে সেদিন আজ আবার নূতন করে তার সামনে এসে দাঁড়াল ? মৃত্যু ? মৃত্যুর স্মৃতি দিয়েই কি আজ এই স্থান তাকে ধরে রাখতে চায় ? মৃত্যুর স্মৃতি কি জীবনের চেয়েও দুঃসহ ?

প্রায় তিন মাস হয়ে গেল একজামিন দিয়ে কমল বাড়ী এসেছে। বাড়ীর সামনে খোলা জায়গার এক পাশে পাতা একটা দড়ির খাটিয়ায় শুয়ে কমল তার জীবনের খাতায় চোখ বুলিয়ে যাচ্ছিল। কত স্মৃতি, কত ব্যথা, কত আনন্দ সেখানে সঞ্চিত হয়ে আছে। মানুষ বদলাল, সমাজ বদলাল, পৃথিবী বদলাল কিন্তু জীবনের এই খাতায় যা একবার লেখা হয়ে গেল তার আর বদল হল না !

মিসেস সেন ঘর হতে বার হয়ে এসে কমলের পাশে দাঁড়ালেন।

শীতের সূর্য্য মাথার উপর এসেছে, তার আলো থেকে চোখকে আড়াল করবার জন্ত চোখের উপর হাত রেখে কমল শুয়েছিল, তাই মিসেস সেনকে সে দেখতে পেল না। ক্ষণকাল কমলের দিকে তাকিয়ে মিসেস সেন তার মাথায় হাত রেখে বললেন—মিলিটারী থেকে কোন চিঠি কি আজও আসেনি কমল ?

মুখের উপর হতে হাত সরিয়ে কমল উত্তর দিল—এসেছে মা, আমার একটা চোখ খারাপ বলে মিলিটারী মেডিকেল বোর্ড আমায় শেষ বারের মত রিজেক্ট করেছে। এই নিয়ে তিনবার এক্জামিন হল কিন্তু কোন লাভই হল না—ওরা আমাকে কিছুতেই চাকরী দেবে না।

—তাহলে কি হবে ?

—তাই ভাবছি।

—কমল— ।

—আমি জানি না এর পর তুমি কি বলবে—সংসারের অচল অবস্থার কথা আমি ভাল করেই জানি। মিলিটারী স্কলারশিপের সামান্ত টাকা আমি এখনও বাঁচিয়ে রেখেছি। তাই দিয়ে কিছুদিন চালাও। এরই মধ্যে প্রাইভেট প্র্যাক্‌টিশ করে আমি টাকা রোজগারের চেষ্টা করব। যে রকম করেই হোক, টাকা আমি তোমায় এনে দেব। তাছাড়া তোমার টাকাই তো নয়, আমার বিসার্চের সংস্থানের জন্তও যে আমায় উপার্জ্জন করতে হবে !

কাজের চেষ্টা হয় ত আমায় কাল থেকেই করতে হবে, তাই তোমায় অনুরোধ করছি, আজ আর আমায় কিছু বলো না। জীবনের যত অকাজ আমার সঞ্চিত হয়েছে তাকে নিয়েই আজ আমায় থাকতে দাও।

কমলের শীর্ণ, ক্লান্ত মুখের দিকে তাকিয়ে মিসেস সেন-এর চোখে জল আসছিল, সে অশ্রু কোন রকমে রোধ করতে তিনি বাড়ীর ভিতরে চলে গেলেন।

বহুদিন পরে আজ মৃত স্বামীর কথা মনে পড়ে তাঁর হৃদয় ব্যথায় দীর্ণ হতে লাগল। কমল যেখানে শুয়ে আছে, গরমের দিনে ঐখানেই বিছানা পেতে কমলকে পাশে নিয়ে তিনি শুতেন।

আজ যদি তিনি বেঁচে থাকতেন! আজ যদি তিনি কমলের পাশে থাকতেন! যে স্মৃতির জগতে মিসেস সেন সান্ত্বনা পেতে চাইছিলেন সেই স্মৃতির পৃথিবীর সঙ্গে, সেই বহুদিনের হারিয়ে-যাওয়া জগতের সঙ্গে, কমলেরও যেন নূতন করে পরিচয় হচ্ছিল।

সামনের গাছের আড়ালে, গলির ওপারের বড় মাঠটার দিকে একদৃষ্টিতে কমল তাকিয়ে ছিল।

সেখানে বাড়ী তৈরী হবে। তাই সেখানকার নবাবী আমলের পুরান বাড়ীটা মজুরেরা ভেঙে ফেলেছে।

ভূতের বাড়ী নাম হওয়া সত্ত্বেও ছোটবেলা হতেই বাড়ীটা এক অদ্ভুত আকর্ষণে কমলকে টানত।

গোপনে, নিষিদ্ধ বই পড়বার জন্ত ঐ বাড়ীরই একটা ঘরে সে স্থান ঠিক করে রেখেছিল।

ছুটির দিনে—বিশেষ করে গরমের ছুটির দিনে অখণ্ড অবসর কাজে অকাজে যখন আর কমলের কাটতে চাইত না, তখন নিদ্রামগ্না মার পাশ হতে উঠে বই হাতে করে সে ঐ বাড়ীতে পালিয়ে যেত।

রহস্ত-বিভীষিকা-পূর্ণ বই পড়ার উত্তেজনা যখন চরমে উঠে গা শিরশির করত, তখন তার মনে হত সেই জীর্ণ গৃহের অশরীরী আত্মার দীর্ঘশ্বাসের মত জ্যৈষ্ঠের উত্তপ্ত বায়ু যেন তাকে একটু একটু করে ঘিরে ফেলছে।

তার সামান্ত অন্তমনস্কতার সুযোগেই সে দীর্ঘশ্বাস যেন তাকে তার পরিচিত জগৎ হতে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে !

প্রাণপণে আপনাকে সংযত করে কমল একদৌড়ে সেখান হতে তার মায়ের স্নেহাঞ্চল তলে পালিয়ে যেত।

পৃথিবীর সেই সবচেয়ে নিরাপদ স্থানে শুয়ে চোখ বন্ধ করে সে আপনার মনের ভয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করত।

উত্তেজিত নিশ্বাস-প্রশ্বাস যখন শান্ত হয়ে আসত, কানের পাশটা আর যখন দপদপ করত না, তখন মাঝে মাঝে চোখ খুলে সে, ভাঙ্গাবাড়ীর প্রেতাত্মাটা তাকে তাড়া করে এসেছে কি না দেখত।

সেই দীর্ঘ দিন এ ভাবে কেটে গিয়ে নেমে আসত খেলাধূলা, হাসি-কোলাহলে ভরা বিকাল ও সন্ধ্যা।

গলির মোড়ের কেরাসিনের আলোটা মিউনিসিপ্যালিটির লোক এসে জ্বালিয়ে দিয়ে যেত।

সে সন্ধ্যাও ধীরে ধীরে অন্ধকার রাত্রিতে মিলিয়ে যেত। রাত্রির আহার শেষ করে কমল ডাঃ সেন-এর বিছানায় চুপ করে শুয়ে থাকত।

অনেক রাত্রে ডাঃ সেন যখন বিছানায় এসে বসতেন, তখন কমল তাঁকে জড়িয়ে ধরে বলত বাবা, তুমি এত দেরী করে এলে কেন? আমি গল্প শুনব বলে কতক্ষণ তোমার জন্ত জেগে আছি। একটা গল্প বল, বাবা!

বিছানার পাশে ছোট, সবুজ রং-এর একটা টেবিলে রাখা সোরাই হতে জল ঢেলে খেয়ে ডাঃ সেন বলতেন, তোমার মা তো এখনি তোমায় তুলে নিয়ে যাবেন, কতক্ষণই বা গল্প শুনতে পাবে ?

কমল উত্তর দিত তা হোক, তুমি একটা ভাল গল্প বল।

ডাঃ সেন কমলকে দক্ষিণ-ভারতের কোন এক ঠাকুরের চোখের অভিশপ্ত হীরা চুরির গল্প বলতেন।

অনেকক্ষণ গল্প শোনবার পর রাস্তার আলোটার প্রতি দৃষ্টিপাত করে কমলের মনে হয়, তারই মত গল্প শোনবার জন্ত ঐ আলোও যোধ হয় উৎকণ্ঠ হয়ে জলছে।

খাটের পায়ার কাছে রাখা, মসকুইটো কিলারের ধোঁয়া ঘুরে ঘুরে উপরে উঠত। সেই ধোঁয়া, আর বাবার মুখের সিগারের গন্ধে, মাথা ভারী হয়ে কমলের ঘুম আসত। গভীর রাত্রে ঘুম ভেঙে কমল দেখত সে তার মার পাশে শুয়ে আছে। রাস্তার আলোটা জলে জলে কখন নিবে গেছে। অন্ধকারে তার ভয়-ভয় করত। মাকে জড়িয়ে ধরে কমল তাঁর বুকে মুখ লুকিয়ে নিত।

যে শৈশবকে আজ কমল ছবির মত স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে, সেই নিষ্কলঙ্ক শৈশবে কি একবারও ফিরে যাওয়া যায় না ?

কালস্রোতকে বন্ধন করে যে সেতুটা অতীত বর্তমানকে যোগ করে মায়ের স্নেহের মত সুন্দর, রামধনুর রং-এ রঙীন, সেই সেতুটা কি তার কাছে চিরদিনের মত হারিয়ে গেছে ?

আকাশের ঘন নীল রং কমলের চোখের উপর গত কয়েক ঘণ্টায় ধূসর হয়ে এসেছে। অতীত স্মৃতির স্বপ্নরাজ্যের মায়ায় ঘেরা চারিদিকের এই পূর্ণ প্রশান্তির মধ্যে মনে হচ্ছে, আধুনিক জীবনযাত্রার উন্মত্ততা যেন এই বাড়ীর চারিদিকে এসে স্তব্ধ হয়ে গেছে। শুধু আজকের মত যেন এই গণ্ডী তাকে অভয় দিয়েছে। আজ তার নিশ্চিন্ত বিশ্রামের শেষ দিন।

বেলা বারটার সময় ডিসপেনসারী হতে ফিরে কমল দেখল, মিসেস সেন তারই প্রতীক্ষায় দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন।

কমলকে দেখে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—আমায় একটা টাকা দিবি কমল? কিছু টাকা কি আজ পেয়েছিস?

নিজের সাইকেল বারান্দায় রাখতে রাখতে কমল উত্তর দিল—আজ টাকা পাইনি মা!

একটা টাকা কি কোন রকমেই আমায় দিতে পারবি না কমল! বড় দরকার ছিল।

—বিকালের মধ্যে টাকা পেলে কি তোমার চলবে?

—হ্যাঁ।

—তাহলে, আবার যখন কাজ শেষ করে বাড়ী ফিরব বিকালে, তখন তোমায় টাকা দেব। চল এখন আমায় খেতে দাও, বড় দেরী হয়ে গেছে।

খেয়ে উঠেই সাইকেল নিয়ে আবার কমলকে বার হতে দেখে মিসেস সেন বললেন—এই তো খেয়ে উঠলি কমল, একটু বসবি না?

কমল উত্তর দিল—আর সময় নেই মা, ত্নটোর মধ্যে আমায় কাজে পৌঁছাতেই হবে।

—তোর মুখ এত শুকনো লাগছে কেন রে? দেখি এদিকে আয়।

—কি দেখবে? কিছুই আমার হয়নি।

কমলের কপালে হাত দিয়ে মিসেস সেন বললেন—কিছু হয়নি কি রে? তোর যে বেশ জ্বর হয়েছে!

সাইকেল বাইরে নামিয়ে কমল বলল—ও কিছু নয়।

—এই জ্বর নিয়ে আর সাইকেল করে যাসনে কমল, গাড়ী করে যা।

—একটা টাকা তোমায় দিতে পারলাম না, গাড়ী ভাড়া আমি কোথায় পাব?

—এত ভার নিয়ে তুই বাঁচবি না কমল! একবার বল তুই, আমি সংসারের অবস্থা জানিয়ে সমরকে চিঠি লিখি।

—না, মা, টাকার জন্য সমরকে চিঠি লিখতে আমি কিছুতেই দেব না। সমর যাতে বিনা বাধায় রিসার্চ করতে পারে, যাতে চাকরীর বোঝার উপরেও সংসারের বোঝা তার কাঁধে না চাপে, সেজন্য এই কষ্ট, এই দুঃখ আমি স্বেচ্ছায় মাথা পেতে নিয়েছি।

আজ যদি তুমি আমার কথা অমান্য কর, আভাসেও সমরকে সংসারের কথা জানাও, তাহলে এটা স্থির জেনো যে, তুমি আমায় হারাবে।

তুমি জান না মা, সমরের জন্য আমি কি সহ্য করেছি।

দিনের পর দিন জরাজীর্ণ পোষাক পরে, আধভাঙা এই সাইকেল চড়ে আমাকে ডাক্তারী করতে যেতে হয়েছে।

অসম্ভব পরিশ্রমের পর যে সামান্য অর্থ আমি উপার্জ্জন করেছি, তার সবই আমি সংসারের জন্য তোমায় দিয়েছি।

এর পর নিজের রিসার্চের খরচের জন্য টাকা না থাকায়, টাকা রোজগারের জন্য বাধ্য হয়ে আমাকে টিকা দেবার এই পার্টটাইম কাজ নিতে হয়েছে। ভাবতে পার সে কি কাজ?

ভাবতে পার, সহরের এককালের সবচেয়ে বিখ্যাত চিকিৎসকের পুত্র রাস্তার ধারে বসে লোক ডেকে কলেরার টিকা দিচ্ছে?

একটা কুকুরও যে গরমে পথে বার হয় না, সেই গরমে মাইলের পর মাইল তাকে সাইকেল চালিয়ে কাজে যেতে হচ্ছে?

তৃষ্ণায় যখন তার বুকের ভেতরটা পর্য্যন্ত শুকিয়ে উঠেছে—যখন পৃথিবীর সমস্ত ঠাণ্ডা জলের স্মৃতি মরীচিকার মত তার ক্লান্তিতে আচ্ছন্ন চোখের সামনে ভেসে উঠেছে তখনও সে সাইকেল চালিয়েছে—কিছু না দেখে শুধু রাস্তার ল্যাম্পপোষ্ট গুণেছে আর নিজেকেই বলেছে—পনেরটা, বারটা সাতটা! আর সাতটা পোষ্ট পার হলেই তো কাজের জায়গায় পৌঁছে যাবে। একটু কষ্ট কর—থেমো না, নেবো না—তাহলে আর সাইকেল চালাতে পারবে না। ভাবতে পার এ কথা?

এত সহ্য করেছে তবু সে ভেঙ্গে পড়েনি—মানুষ, সমাজ, ঈশ্বর, নিয়তি কারও কাছে সে একবারের জন্যও অভিযোগ করেনি। কারণ সে জেনেছে, সমরকে সংসার-শৃঙ্খল হতে মুক্তি দেবার জন্য তার এ সংগ্রাম শুধু সংগ্রামই নয়, এ তার সত্যের সন্ধান। সত্যের এ পথ তাকে একলাই খুঁজে নিতে হবে।

—কমল!

—আপনার আত্মসন্ধানের মধ্য দিয়ে যাকে পৃথিবীর নিপীড়িত, অত্যাচারিত মানুষের দুঃখের প্রতিকার সন্ধান করতে হয় আত্মরক্ষার স্থান তার জীবনে থাকে না। নিজের কাছে নিজের মাথা আমি কিছুতেই নীচু করব না মা, কিছুতেই না। ও প্রলোভন আর তুমি আমায় দেখিও না!

যাও মা, ভেতরে যাও। এই গরমে বাইরে দাঁড়িয়ে থেকো না। আমি যাচ্ছি।

কমলের চাকরীর মেয়াদ কিছুদিন হল শেষ হয়েছে, তাই সে নিজের রিসার্চের প্রতি আজ-কাল একটু সময় দিতে পারছে।

বেলা একটার সময় ডিসপেনসারীর কাজ শেষ করে কমল, ইউনিভারসিটির কেমিষ্ট্রির প্রফেসার ডাঃ চ্যাটার্জির কাছে ষ্টিরোল কেমিষ্ট্রির উপর কিছু প্রামাণ্য বই নিতে যাচ্ছিল।

কমলের একজন পিতৃবন্ধু দয়া করে কমলকে তাঁরই এক ওষুধের দোকানে বসতে দিয়েছেন। শূন্য দোকানে রোগীর প্রতীক্ষায় কমল যতক্ষণ বসে থাকে ততক্ষণ তার জীবন যেন এক সীমাহীন যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়।

দীর্ঘ এই সময় যেন একটার পর একটা প্রতীক্ষার খণ্ড দিয়ে তারই সামনে গঠিত হতে থাকে। নিরবচ্ছিন্ন সেই গঠনকার্য্য তার জীবনের সমস্ত রস যেন বিন্দু বিন্দু করে শোষণ করে নেয়।

যখন এই অসহ্য প্রতীক্ষার শেষ হয় তখন কমলের জীবনের কংকাল, আশা, আকাঙ্খা, কল্পনার মেদ-মজ্জায় সজ্জিত হয়ে যেন আবার নূতন করে গড়ে ওঠে। হায়, প্রমিথিউস!

পিছন হতে একটা মোটর-হর্ণের তীব্র শব্দ কানে আসতে চম্‌কে পথের এক পাশে সরে গিয়ে কমল সাইকেল হতে নেমে পড়ল। ততক্ষণে মোটরটা তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। তারই এক সহপাঠী বন্ধু ডাক্তারের গাড়ী। ষ্টিয়ারিং হুইলে হাত রেখে সে কমলকে বলল—এত কাছে এসে হর্ণ দিচ্ছি তবু শুনতে পাও না? কি ভাবছিলে এত? এখনই চাপা পড়তে ত? লজ্জিত ভাবে কমল উত্তর দিল—তোমার হর্ণ আমি একেবারেই শুনতে পাই নি। আজ-কাল আমার রিসার্চ্চের বিষয়ে বড় চিন্তিত থাকি, তাই বোধ হয় এরকম অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছি।

—রিসার্চ্চ? তোমার সেই ক্যানসারের উপর না কি?

—হ্যাঁ।

—এখনও ঐ পাগলামী তোমার যায় নি? আমার কথা শোন, রিসার্চ্চ ছেড়ে দাও, ওতে পেটের ভাত জুটবে না। পাশ করবার পর এ দু'বছর তো দেখলে, লাভ হল কিছু রিসার্চ্চে? ডিসপেনসারী নিজের কর একটা, আমার মত কার কেন, বেশী নয়, নয়-হাজার পড়বে, তারপর ভাল করে প্র্যাকটিশ কর।

আচ্ছা এবার চলি। একবার সিনিয়ারের বাড়ী যেতে হবে।

মোটরের পিছনের ল্যাম্পটা অনেক দূর পর্য্যন্ত দেখা গেল।

মোটর একটা মোড় ঘুরে অদৃশ্য হতে সে দিক থেকে জোর করে দৃষ্টি ফিরিয়ে কমল নিজের প্রতি ফিরে দেখল।

রিসার্চ্চে কিছু হয়নি—রিসার্চ্চ তার পক্ষে কেবল দুর্ভাগ্যই টেনে এনেছে, এ কথা বর্ণে বর্ণে সত্য।

তার সর্ব্বাঙ্গে, তার চারি দিকে, সর্ব্বগ্রাসী দারিদ্র্যের স্পর্শচিহ্ন সুস্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে!

সাইকেলে আর চড়বার অবস্থা নেই। হ্যাণ্ডেলটা এ্যাকসিডেণ্টে বেঁকে গেছে। একটা প্যাডেল ভেঙ্গে খুলে গেছে। টায়ার ছিঁড়ে টিউব বেরিয়ে পড়েছে। কোনটাই পয়সার অভাবে ঠিক করান হয়নি।

প্যাণ্টের পায়ের দিক ছিঁড়ে সুতো বেরিয়েছে। ময়লা কোটের তলায় জামাটাও ছেঁড়া। তবু এতে অনুযোগ করবার তার কিছু নেই। এ দুঃখ তো সে স্বেচ্ছায় বরণ করেছে।

অনুযোগ করবার কিছু নেই, এ কথা ভাল করে জেনেও কেন সে আজ আপনার দারিদ্র্যকে চেয়ে দেখল? মোটরের কথায় অপমানের ইঙ্গিত কি তাকে বিদ্ধ করেছে?

ঐ রকম মোটরে একবার চড়বার, ষ্টিয়ারিং হুইলে হাত রেখে ঐ ভাবে কথা বলবার লোভ কি তাকে প্রলুব্ধ করতে চেষ্টা করেছে?

যে লোভ, যে মোহ, ঈর্ষ্যা, অপমানবোধ মানুষের সদ্‌বুদ্ধি, নির্ম্মল চৈতন্যকে মলিন করে সে কি এত দিন পরে আজ কমলের জীবনে ছায়া ফেলতে আসছে? কি নিয়ে কমল এই দুর্ব্বার শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করবে? ভবিষ্যৎ? ভবিষ্যতের আশা? অনাগত দিনের সুখ-সুবিধার উজ্জ্বল চিত্র?

হায় রে! উপেক্ষা, অবহেলা, অপমান, বিদ্রূপের বোঝা মাথায় করে সত্যের সন্ধানে যাদের প্রতিপদে ক্ষতবিক্ষত হতে হয়, তারাও ভবিষ্যতের আশা নিয়ে সান্ত্বনা পেতে চায়। কিন্তু সব ত্যাগ করলেও এই সামান্য আশা করাও কি তাদের পক্ষে অন্যায়? এ-ও যদি তাদের সম্বল না থাকে, তা হলে কি নিয়ে তারা বাঁচবে?

কমল যখন প্রফেসর চ্যাটার্জ্জির বাড়ী পৌছাল, তখন বেলা দুটো বেজে গেছে। প্রফেসর চ্যাটার্জ্জি বাড়িতেই ছিলেন। কমল ড্রয়িংরুমে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবার পর, তিনি এসে কমলকে বললেন—আপনি কি চান?

কমল উত্তর দিল—গত কয়েক বছর আমি ক্যানসারের উপর রিসার্চ্চ করছি। কেমিষ্ট্রি, বিশেষ করে ষ্টিরোল কেমিষ্ট্রি আর তার সঙ্গে ক্যানসারের সম্বন্ধ আমার রিসার্চ্চের বিষয়বস্তু। কিন্তু বায়োকেমিষ্ট্রি সম্বন্ধে আমার জ্ঞান বড়ই কম, তাই বায়োকেমিষ্ট্রি ভাল করে পড়বার জন্য আমি আপনার কাছে কয়েকটি বই চাইতে এসেছি। আপনি কি দয়া করে আমাকে কয়েকটি বই দিয়ে সাহায্য করবেন?

—কতদূর কেমিষ্ট্রি আপনি পড়েছেন?

—ইণ্টারমিডিয়েট পাশ করে আমি মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হয়েছিলাম, তাই কেমিষ্ট্রি ইণ্টারমিডিয়েট কোর্সের বেশী আর পড়তে পারিনি।

—তাহলে তো কেমিষ্ট্রি পড়তেই আপনার বহু দিন লাগবে! আপনাকে অনেক কিছু পড়তে হবে।

—তাই আমি পড়ব, ঠিক করেছি।

—আপনি রিসার্চ্চ কোথায় করেন?

—নিজেরই বাড়ীতে, অবসর সময়ে।

—এত বড় রিসার্চ্চ আপনি বাড়ীতে করেন? আপনি ফাইন্যানশিয়াল হেল্‌প কোথায় পান?

—হেল্‌প তো কোথাও পাই না। প্রাইভেট প্র্যাকটিশ করে আমি নিজের রিসার্চ্চের আর সংসারের খরচ চালাই।

—ইয়ংম্যান, আই এ্যাডমায়ার ইউ। আসুন, যা বই আপনি চান, নিয়ে যান। এদিকে যতদূর সম্ভব আমি আপনাকে নিশ্চয়ই হেল্‌প করব।

বিকাল হয়েছে। মিসেস সেন রান্নাঘরে কাজে ব্যস্ত ছিলেন। মীরা শ্বশুরবাড়ীতে আছে, তাই সব কাজ তাঁকে একলাই করতে হয়।

ঘরের টালির ছাদটা এক দিকে অনেকটা ভেঙ্গে গেছে। সেখান দিয়ে রোদ এসে তাঁর পায়ের কাছে পড়েছে। আকাশের কোণে মেঘ জমছে। একটু পরেই বোধ হয় বৃষ্টি হবে। বৃষ্টির আগে রান্না শেষ না করে নিলে এই ভাঙ্গা ঘরে আর রান্না করা যাবে না।

চালের পাত্র হতে মিসেস সেন খানিকটা চাল বার করলেন কমলের জন্য খানিকটা চালভাজা করে দেবেন। বৃষ্টির সময় হয়ত তার ভাল লাগবে খেতে। কমল কোন কিছু খাবার জন্য কখনও তাঁকে বলে না। ভাল কাপড়, ভাল জামা, ভাল খাবার সব কিছু সম্বন্ধে ক্রমশই সে নির্লিপ্ত হয়ে আসছে।

কমলের এই নির্লিপ্ততা দেখতে আজকাল মিসেস সেনের ভ[illegible] করে। অগ্নিবলয়ের কেন্দ্রস্থিত সন্ন্যাসী যেমন করে তপস্যা করে কৃচ্ছসাধনার বহ্নিতে আপনাকে আবৃত করে, কমল যেন সেই রকম কোন এক দুশ্চর তপস্যায় মগ্ন হয়ে আছে।

কি চায় সে? কি প্রার্থনা করে? কোন দুর্নিরীক্ষ, দুর্লভ ব[illegible] পাবার জন্য তার এ সাধনা?

সমরের শুভ কামনা? তার জন্যই কি সে এভাবে আপনাকে নষ্ট করছে? এই কি সত্য? কি লাভ হবে এতে? কার লাভ হবে?

সমরের সম্বন্ধে কি তিনি সত্যই ভুল করেছেন? সত্যই কি কোন মহৎ বস্তু তিনি নষ্ট করেছেন?

—মা!

একটা টেষ্ট-টিউব হাতে করে রান্নাঘরের দরজার কাছে এসে কমল মিসেস সেনকে ডাকল।

সঙ্গোপনে আপনার চোখের জল মুছে, চালভাজার কড়াটা নামিয়ে মিসেস সেন জিজ্ঞাসা করলেন—কি চাই রে কমল?

টেষ্ট-টিউব দেখিয়ে কমল উত্তর দিল—এই জিনিসটা আমি গরম করব মা, উনুনটা একটু ছেড়ে দাও।

—কি করে গরম করবি?

—তোমার ঐ এনামেলের বাটিটাতে জল রেখে, ওয়াটার বাথ তৈরী করে তাতে এইটা ফোটাব।

—টেষ্ট-টিউব ধরে রাখবি কি করে?

—কেন তোমার চিমটা দিয়ে ধরব?

—তার মানে এই রান্নাঘর এখন তোকে ছেড়ে দিতে হবে?

—মাত্র কিছুক্ষণের জন্য। আমি খুব তাড়াতাড়ি সব করে নেব।

টেষ্ট-টিউবে ফুটন্ত কেমিকেলের দিকে কমল একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল। গত দিনগুলির কঠিন সংগ্রামের স্মৃতি টিউবের মধ্যের বুদ্‌বুদের মত তার মনে ভেসে উঠছিল। এরই পটে সে ভবিষ্যতের ছবি আঁকছিল।

এই রোগের বিরুদ্ধে এখন পৃথিবীব্যাপী রিসার্চ্চ হচ্ছে।

সে যেমন করে আজ এই টেষ্ট-টিউবের প্রতি তাকিয়ে আছে ঠিক তেমনই করে হয়ত আরও অনেকে তাদের টেষ্ট টিউবকে দেখছে! সেল কালচার করে, ইলেকট্রণ মাইক্রোসকোপের মধ্য দিয়ে, ক্রোমোসোম আর জিন্‌স-এর রহস্যভেদ করবার চেষ্টা করছে।

এদেরই মধ্যে একজন হয়ত এমন কিছু আবিষ্কার করবে, যার কাছে কমলের এই প্রচেষ্টার কোন মূল্যই আর থাকবে না।

সেই আবিষ্কারের পর হতে আর কেউ ভাববে না, পৃথিবীর এক কোণে একজন দরিদ্র অবজ্ঞাত রিসার্চ্চ-ওয়ার্কার এই রোগের বিরুদ্ধে সংগ্রামে কি করে নিজেকে উৎসর্গ করেছিল—হত্যা করেছিল।

তার জীবনব্যাপী দুঃখের ইতিহাসের। তার লেখা রিসার্চ্চ নোটের কয়টি পাতার মূল্য হয়ত ছেঁড়া কাগজের চেয়ে সেদিন বেশী হবে না; তবু এতটুকু কষ্ট তখন আর কমলের মনে থাকবে না।

ষড়্‌জের সুরে বাঁধা দুটি তারের মত সেই অনাগত আবিষ্কারকের মনের আনন্দ তার মনেও ঝঙ্কৃত হতে থাকবে।

—কমল, বৃষ্টি এসে গেল যে, আর কত দেরী করবি?

মিসেস সেন-এর ডাকে মুখ তুলে তাকিয়ে কমল দেখল, মেঘের আড়ালে সূর্য্য ডুবে গেছে। চারি দিক অন্ধকার হয়ে এসেছে।

টেষ্ট-টিউবটা জল হতে তুলে নিতে নিতে সে বলল—হয়ে গেছে মা, তুমি এস।

কেমিক্যালটা তৈরী হয়েছে, এবার এটা কমলকে একটা গিনিপিগের উপর পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

অনেক কষ্টে অনেক খোঁজার পর সহরের এক কোণে মুসলমান পাড়ায় একটা দোকানে কমল গিনিপিগের খবর পেল। দোকানীকে একটা গিনিপিগের দাম জিজ্ঞাসা করাতে সে জানাল, এক একটার দাম চার টাকা।

চার টাকা! এত দাম! কমলের অজ্ঞাতসারেই তার মুখ দিয়ে কথাটা বেরিয়ে গেল। কমল মাত্র একটা টাকা সঙ্গে এনেছিল। গত কয় দিন তার কিছুই উপার্জ্জন হয়নি, তবু এক অদৃশ্য আকর্ষণে, ড্রয়ারের কোণে পড়ে-থাকা ঐ একটি টাকা নিয়েই সে বেরিয়ে পড়েছিল। তার ধারণা ছিল, ঐ টাকাতেই গিনিপিগের দাম হয়ে যাবে। তাই সে ডিসপেনসারী যাবার আগে গিনিপিগ কিনতে এসেছিল। যে ঔষধটা সে তৈরী করেছে বেশী দিন পড়ে থাকলে সেটা নষ্ট হয়ে যাবে, তাই সে তাড়াতাড়ি করছিল। কিন্তু গিনিপিগের দাম শুনে তার সব ভরসা নষ্ট হয়ে গেল। কত দিনে বাকী তিন টাকা সে উপার্জ্জন করতে পারবে কে জানে?

যে গিনিপিগটাকে কমল হাতে করে তুলেছিল সেটা নামিয়ে রেখে দোকানীকে সে ক্ষীণকণ্ঠে বলল—আচ্ছা এটা রেখে দাও, আমি দু-একদিনের মধ্যে এসে নিয়ে যাব। কাউকে এটা দিয়ে দিও না। এই এক টাকা আগাম দিচ্ছি, তোমার কাছে রাখ।

গিনিপিগ দেখে ডিসপেনসারী এসে পর্য্যন্ত কমল আর কোন কাজ করতে পারল না। একটা কাগজ টেনে নিয়ে তাতে সে কেবলই লিখতে লাগল—তিন টাকায় আটচল্লিশ আনায় একশ বিরানব্বই পয়সা। এ পয়সা তাকে উপার্জ্জন করতেই হবে। গিনিপিগ একটা তার চাই-ই। এই সময় একজন লোক কমলের ঘরে ঢুকে তাকে বললেন—ডাক্তার বাবু, আপনার সঙ্গে আমার একটু প্রাইভেট দরকার আছে। একটা কথা বলতে চাই। কমল উত্তর দিল—কি কথা বলুন?

তার মন আশায় আনন্দে ভরে উঠল। একজন রোগী তাহলে এসেছে। এর কাছ হতেই হয়ত সে তিন টাকা পেতে পারবে।

একটু ইতস্তত করে লোকটি বললেন—একজন মেয়ের আজ দু'মাস ঋতুস্রাব হয়নি, আপনি কোন ঔষধ দিয়ে সেটা করিয়ে দিন।

কমল উত্তর দিল—ঋতুস্রাব না হয়ে থাকলে তিনি নিশ্চয়ই গর্ভবতী হয়েছেন।

—মেয়েটি অবিবাহিতা। তার ঋতুস্রাব আপনাকে করিয়ে দিতেই হবে। এর জন্য যত টাকা চান আমি দেব। পঞ্চাশ—একশো—দু'শো।

পঞ্চাশ! একশো! দুশো! ভদ্রলোকের কথা শুনে কমলের মাথা ঘুরে উঠল। কটা গিনিপিগ কেনা যায় ঐ টাকায়—কত পয়সা হয়? এই ঘরের চারি দিক কি ঐ পয়সায় আবৃত করা যায়?

প্রাণপণ চেষ্টায় কমলের মুখ হতে মাত্র দুটি কথা বার হল—একাজ আমি করি না, আপনি যান।

কমলের হাত চেপে ধরে ভদ্রলোকটি অনুরোধ করলেন—ডাক্তার বাবু, এই বাপটি আপনি আমায় বাঁচান—আমি চিরদিন আপনার কেনা হয়ে থাকব।

—না—না—না—চলে যান—এখনই যান এখান হতে। বলতে বলতে আপনার হাত ছাড়িয়ে নিতে গিয়ে কমলের দৃষ্টি নিজের অনামিকার উপর পড়ল।

সেখানে মিঃ সেনের দেওয়া একটা আংটি রয়েছে। সহস্র দুঃখেও এই আংটি কমল হস্তচ্যুত করেনি কিন্তু আজ।

গিনিপিগের উপর কমলের এক্সপেরিমেন্ট শেষ হয়েছে। মিঃ সেন-এর দেওয়া আংটি বন্ধক রেখে কমল গিনিপিগ কিনেছিল। গিনিপিগটাকে যেদিন প্রথম কমল ইনজেকশন দিয়েছিল, সেদিন সারা রাত্রি তার এক উন্মত্ত অধীরতায় কেটেছিল।

ঘরের কোণে প্যাকিং-বাক্সের খাঁচায় গিনিপিগটা রাখা ছিল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সেই বাক্সের পাশে কমল বসেছিল। মধ্যে মধ্যে গিনিপিগটা তুলে নিয়ে তার কোন বৈলক্ষণ্য ঘটছে কি না সে উদ্‌গ্রীব হয়ে দেখছিল। ক্ষুদ্র কোমল সেই প্রাণীটির জীবনের স্পন্দন সে রাত্রে কমল যেন এক ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করতে পেরেছিল। রাত্রি গভীর হতে গভীরতর হয়েছিল। সেই উত্তেজনা—সে চরম প্রতীক্ষা আর সহ্য করতে না পেরে কমল ক্ষণকালের জন্য বিস্মৃতি চেয়েছিল—নিদ্রাকে কামনা করেছিল। ঘড়ি চোখের সামনে হতে সরিয়ে রেখে, মাথায় জল ঢেলে, খালি গায়ে কমল মাটিতে শুয়েছিল। ভেবেছিল, মাটির শীতল স্পর্শে হয়ত—হয়ত তার একটু ঘুম আসবে। কিন্তু সর্ব্বসন্তাপহর সেই নিদ্রা সে রাত্রে তাকে কিছুতেই ধরা দেয়নি।

সেই অসহ্য রাত্রিও এক সময়ে শেষ হয়েছিল। ভোরের সূর্য্যের আলোয় গিনিপিগটাকে খেলা করতে দেখে কমল মোহাচ্ছন্নের মত দাঁড়িয়ে ছিল অনেকক্ষণ। তারপর যেন নিজের আত্মাকে সম্বোধন করে সে অস্ফুট স্বরে বলেছিল—দুর্জ্জয় নিয়তিকেও আমি জয় করেছি! আজ আমি জয়ী। হায়! যদি সে সে দিন তার ভবিষ্যৎ দেখতে পেত!

দিন শেষ হয়ে এসেছে। কমল তার ঘরে বসে নিজের রিসার্চ্চের কয়েকটি মূল্যবান তথ্য টাইপ করছিল।

মিসেস সেন ঘরে ঢুকে তাকে বললেন—সারা দিন তুই একবারও ঘর হতে বার হলি না কমল, ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘরে বসে টাইপ করলি। এরকম করলে তোর যে শরীর খারাপ হবে! এসব রেখে একবার বাইরে ঘুরে আয়।

কমল উত্তর দিল—একটু পরে যাব মা! আর একটা পাতা টাইপ করতে বাকী আছে। অন্য লোকের কাছ হতে টাইপরাইটার এনেছি, তাকে সন্ধ্যার আগেই এটা ফিরিয়ে দিতে হবে

—আজ স্বাধীনতা দিবস। আজও তুই কোথাও গেলি না?

—ভাল লাগছিল না, মা!

স্বাধীনতা দিবস!

এক বছর হল ভারত পরাধীনতার শৃঙ্খলমুক্ত হয়েছে। যেদিন ভারত স্বাধীন হয়, ১৯৪৭-এর সেই পনেরই আগষ্টের রাত্রে আলোয়, আনন্দে, হাঁসি-গানে উজ্জ্বল সহরের জনস্রোতের মধ্যে দাঁড়িয়ে সকলের মত কমলও ভেবেছিল, এবার হয় ত তার আশা পূর্ণ হবে।

ভারতের প্রধান মন্ত্রীকে সব কথা জানিয়ে সে সমরের মত প্রতিভাকে রক্ষা করতে তাঁকে অনুরোধ জানাবে। সমরকে এবার সে নিশ্চয়ই তার যথাযোগ্য স্থানে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে।

যখন সদ্যপ্রাপ্ত স্বাধীনতার উচ্ছ্বাস শান্ত হয়ে এসেছিল, তখন কমল তাদের আশা, আকাঙ্খা, তাদের সংগ্রামের কথা জানিয়ে প্রধান মন্ত্রীকে একটা চিঠি লিখেছিল।

প্রধান মন্ত্রীর কাছ হতে সে চিঠির জবাবও যথাসময়ে এসেছিল। তিনি লিখেছিলেন, আপনার চিঠি কাউন্সিল অফ সায়েণ্টিফিক রিসার্চ্চকে পাঠান হচ্ছে।

বহুদিন পরে কাউন্সিল অফ সায়েণ্টিফিক রিসার্চ্চ হতে কমলকে জানান হয়েছিল, অর্থাভাবে এবিষয়ে কিছু করতে তাঁরা অক্ষম।

স্বাধীনতার বন্যাস্রোত দেশের উপর হতে চলে যাবার পর যে আবর্জ্জনার অংশ পড়ে থাকবে তাই কমলের ভাগ্যে জুটবে, এ কি সে কখনও ভাবতে পেরেছিল?

মীরা এসে ঘরের আলোটি জ্বালিয়ে দিতে কমল চমকে উঠল। মিসেস সেন কখন চলে গেছেন, ঘরে কখন সন্ধ্যার অন্ধকার এসেছে, এ সে দেখেনি। মীরাকে দেখে তার মন ভরে উঠল। কিছু দিন হল সে শ্বশুরবাড়ী হতে এসেছে। স্বামীর স্নেহে, সন্তান-বাৎসল্যে তার জীবন পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। সে জীবনে দুঃখের বিভীষিকা হয়ত আর কখনও আসবে না।

আলো জ্বালিয়ে, ঘরের কোণে বিছানাটা ঠিক করে পেতে রেখে মীরা বলল—তাড়াতাড়ি টাইপ করা শেষ কর না দাদা! মা তোমাকে ঘর হতে বার হতে বললেন।

টাইপরাইটারে নূতন কাগজ পরিয়ে কমল সস্নেহ কণ্ঠে উত্তর দিল—আর একটু আছে রে। এটা শেষ করেই যাচ্ছি।

সন্ধ্যা বিদায় নিচ্ছে, রাত্রি আসছে। টাইপ করা শেষ করে কিছুক্ষণ হল কমল ছাদে এসেছে।

এখন আর কিছুই তার ভাল লাগছে না। সারা দিন কাজে কর্ম্মে কেটে যায় কিন্তু যখনই খানিকটা অবসর হয়, তখনই কমলের মনে নানা রকম ভাবনা জড়ো হতে থাকে।

কিছু দিন আগে কমল একটি টি-বি রোগী দেখেছিল। কমলের এক অসতর্ক মুহূর্ত্তে সেই রোগী তার মুখের উপর কেশেছিল—কমল ঢাকবার সুবিধা পায়নি; তার পর হতে এই কয় দিন কারণে-অকারণে কমলের কেবলই মনে হয়েছে, তার বোধ হয় টি-বি হবে। আজ সে ভাবনাই আবার তার মনকে চেপে ধরেছে। নিজেকে বড় ক্লান্ত, অবসন্ন, ভীত মনে হচ্ছে কমলের। বহু দিন পরে, বিস্মৃতির যবনিকা সরিয়ে আজ তার চোখের সামনে ডাঃ সেন-এর মুখ ভেসে উঠল।

প্রদীপ্ত সূর্য্যের মত ভাস্বর সেই মুখ, তার অন্ধকার হৃদয় আলোয় ভরিয়ে যেন তাকে বলতে লাগল—"পৃথিবীর কোটি কোটি লোক আজ তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। যে দুরারোগ্য ব্যাধি মানব-সমাজকে চিরদিন পঙ্গু করে রাখতে চেষ্টা করছে, তার বিরুদ্ধে তোমার সংগ্রাম আজ আরম্ভ হল মাত্র। আপনাকে প্রস্তুত কর—সংশয়মুক্ত হও—অগ্রসর হও। পিছন ফিরে তাকিও না। আশীর্ব্বাদ করি, এ সংগ্রামের জয়-পরাজয়, দুঃখ-আনন্দ সব যেন শান্ত মনে সমান ভাবে গ্রহণ করতে পার। কোন দুঃখই যেন তোমাকে বিচলিত না করতে পারে।"

[ক্রম

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

চক্রপাণি

বরাকরে সূর্য্য উঠছে, মাথার ওপর রোপওয়েতে ঝুলন্ত টবগুলোর পাশ দিয়ে আস্তে আস্তে অন্ধকার সরে গেল। ঘটাং টাং করে লোহার বোতাম লাগানো শক্ত শক্ত দরজাগুলো খুলে গেল একে একে। ভেতর থেকে বকম্ বকম্ করে উঠল পায়রা। বাড়ীর সামনের রাস্তাটুকু জল দিয়ে ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার করল গৃহকর্ত্তার নোকর। আর বাকী রাস্তাটুকু পড়েই রইল—সেটুকু নিশ্চয়ই মিউনিসিপ্যালিটির কাজ। তারপর ছোলা পড়ল উঠোনে পায়রাগুলোর জন্যে—ধূপ-ধুনো পড়ল বাইরের বড় বড় ঘরে, গণেশের কাছে প্রণাম করলেন আড়তদার—তারপর তাকিয়ায় হেলান দিয়ে পাটির ওপর বসে পড়লেন আজমীড়-মাড়ওয়ারের সুযোগ্য সন্তান—সুরু হল কাপড়ের হিসেব, খনির হিসেব, বকেয়া পাওনার ওপর সুদের হিসেব আর একান্তই চুনোপুটি যারা তাদের ঠিকেদারির হিসেব। এরা কথা বলে বিচিত্র ভাষায়—গঞ্জামের কুলি-কামিনদের সঙ্গে তেলেগু মেশানো উড়িয়া বলে অনর্গল, বিলাসপুরীদের সঙ্গে বলে চোস্ত বিলাসপুরী, পাশের রাজ্যের ভোজপুরীদের সঙ্গে ভোজপুরী আর হিন্দী, গুজরাটী, বাংলা, রাজস্থানী—এ চারটে ভাষা নাকি মুখে নিয়েই এরা জন্মায়। তবু ইংরেজিটা এখনও তেমন রপ্ত হয়নি। সাদা বেণেদের ভাষা ইংরেজী—এ না হলে ব্যবসা চলে না। কলিয়ারীর সাহেব হামেশাই টাকা ধার চান চড়া সুদে—কলকাতা থেকে ঠিক সময়ে টাকা এসে না পৌছুলেই লেবারদের পেমেন্ট বন্ধ আর তখনই ছোটো মফৎলালের গদিতে একশোয় এক টাকা সুদ এক মাসে, শুধু মাত্র হ্যাণ্ডনোটে টাকা ধার দেন মফৎলাল।

আসলে বরাকরের লোকেরা না বাঙালী, না বিহারী, না মাড়োয়ারী, না হিন্দুস্থানী, মহাজনী, কোম্পানী আর দেহাতি—এ নিয়ে বরাকরের লোকেরা বরাকরী, নোকরদালাল, লেড়কা-লেড়কী, চাচা-চাচী, ভাগনা-ভাগনী, ভাতীজা-ভাতীজাই এ সবে মিলে হুজুর হুজুরাইন মহাজনদের দল, সবচেয়ে নতুন মডেলের মোটরে চাপে তারা আর চেনা সাহেবের অতি জীর্ণ গাড়ীর সামনে থেমে 'গুড মর্ণিং' জানায়। কোম্পানীর কুলকে চিরকাল সেলাম জানিয়ে এসেছে জগৎ শেঠের কুল। মাইন, ফায়ারব্রিক, আইরণ, ষ্টীল—এ সবের যারা ব্যবসা করে তারা সব কোম্পানীর দল আর এই যে নতুন সরকারী বেণে এসেছে ডি, ভি, সি—এ-ও তাই। এরা সবই নোকর। কিন্তু নোকরী কার? বলে—কোম্পানীর নোকর। লেকিন ভাই, কোম্পানী ত আদমী নেহী! তোমাদের মনিব কে? বুড়ো জগদীশলাল—মফৎলালের বাবা—সাদা আকাশের দিকে অপলকনেত্রে তাকিয়ে থাকেন আর ভাবেন—এ আবার কি রকম নোকরী! হুজুর নেই হুজুরাইন নেই, গদি নেই, খানদান নেই, অথচ লাখো লাখো টাকার কারবার করে এরা। জগদীশলালের জমানা খতম হয়ে এসেছে—এ হাওয়ার গন্ধস্পর্শ তাঁর ইন্দ্রিয়াতীত।

পাতালের রত্ন নিয়েই জীবন গড়ে উঠছে কোম্পানীর আর মহাজনের। কিন্তু বলা বাহুল্য, এদের কারোরই দেশ বরাকর নয়! বরাকর যাদের দেশ, তারা দেহাতি—তারা না সাঁওতালী, না বাঙালী, না কুর্মি না মাহাতো। তাদেরই উদ্দেশ্য করে বলছি তারাই খাঁটি বরাকরী। কোন যুগে যে তারা লোক-লস্কর নিয়ে দেশের ওপর স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করত, সে খবর তারাও জানে না, আমরাও জানি না। তাদের মধ্যে ভাগ্যবান যারা তারা এখন তিন শিফটে ডিউটি দেয় কোম্পানীর কারখানায়। মাটির ওপর কাজ পায় যারা তারা রাজা, আর মাটির তলায় কাজ পায় যারা তারা নসিবকে অভিশাপ দেয় দু'বেলা। নীচেও সুখ নেই, ওপরেও সুখ নেই—পাতালে ছায়ার মত পিছু পিছু ঘোরে যম আর মর্ত্ত্যে দুঃখ-দারিদ্র, অনাচার, অত্যাচার, ঘৃণা, বিদ্বেষ, হিংসা, কলহ—শয়তান ঢেকে ফেলেছে সারা দুনিয়া—সূর্য্যের আলোও বুঝি সেখানে অন্ধকার হয়ে যায়। দেহাতের সবটুকু রস উজাড় করে নিয়েছে মাটির ওপরের কুলিরা—দেহাতি সমাজের সবচেয়ে খুবসুরত লেড়কীরা তাদের গলায় মালা দেয় দীর্ঘদিনের স্বামিসঙ্গের আশায় আর খনির কয়লা কাটার শ্রমিক ইয়াসিন ভাবে—আবদুলের তাগৎ কি তার চেয়েও ভালো ছিল? তবে ইয়াসিনকে ছেড়ে ইস্পাত কোম্পানীর ঐ কুলিটাকে কেন সাদী করল মর্জিনা।

এসব বলতে বলতে ইয়াসিন কেঁদে ফেলেছিল আর বলেছিল—আমাদের নাচ-টাচের দিকে আর তোমরা যেও না বাবু! শেষ বয়সে আর বৌটি মেরো না। ব্যর্থ প্রেমিক ইয়াসিন কলিয়ারীর সে নাচের পরের দিনই ক্যাণ্টিনে একলা পেয়ে ধরেছিল আমাকে আর মর্জিনার বিশ্বাসঘাতকতা থেকে আরম্ভ করে বাইজীদের দালালী অবধি সমস্ত কথাই নিঃসঙ্কোচে বলে গিয়েছিল সে। জরু-গরু বালবাচ্চা কিছুই নেই ইয়াসিনের। মর্জিনা যেদিন শাদী করল, আসমানের চাঁদের দিকে চেয়ে সেদিন শপথ করেছিল সে,—কভী নেহী, এ জীবনে বিয়ে আর সে করবে না, তবে হ্যাঁ রূপেয়া তার চাই—রূপেয়া তাকে কামাতেই হোবে, তা' সে যেমন করেই হোক, এর পর থেকে চুরি, রাহাজানি, গুণ্ডামি, লুঠতরাজ—কোনটাই বাদ দেয়নি ইয়াসিন। টাকার পর টাকা, সোনার পর সোনা জমা করেছে ইয়াসিন আর সব উজাড় করে দিয়েছে মেহবুবার

পায়ে। খাঁটি সোনার গয়না গায়ে দিয়ে নাচত মেহবুবা আর নাচের পর ঝুপড়িতে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ত ইয়াসিনের বুকে, বলত—সর্দার, এ বুঢ়া কাম ছোড় দোও, শেষ পর্যন্ত ইয়াসিনকেই ভালবেসেছিল মেহবুবা—পাথরের মত শক্ত তার দেহ, ফুলের মত নরম তার মন। ইয়াসিনকে বিয়ে করে স্বামি-পুত্র নিয়ে ছোট্ট এক সংসার বাঁধবার স্বপ্ন দেখেছিল মেহবুবা—কিন্তু ইয়াসিন অটল, শাদী সে করবে না। এর পর অন্য সব বাইজীদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মদ খেতে সুরু করল মেহবুবা। বারণ করেছিল ইয়াসিন কিন্তু মেহবুবা হেসে উঠেছিল হো-হো করে আর এক গ্লাস এগিয়ে দিয়ে বলেছিল—পিও সর্দার, তুম্‌ভি পিও। আওরত কা দিল তুম্‌হেঁ ক্যায়সে মালুম।" যে রাতে মরল মেহবুবা, সে রাতেও এমনি করে মদ খেয়েছিল সে আর যত জড়োয়া বসন-ভূষণ ছিল সব চাপিয়েছিল দেহের ওপর। মেহবুবার সে রূপ দেখে চমকে উঠেছিল কলিয়ারীর সাদা চামড়ার সাহেবরা পর্যন্ত—নাচ সুরু হবার পাঁচ মিনিটের মধ্যেই তার আঁচল ভর্ত্তি হয়ে গিয়েছিল রূপোয় আর সোনায়। উড়নী ছুড়ে দিয়েছিল সে ইয়াসিনের কাছে আর ইয়াসিন এগিয়ে দিয়েছিল আসমানী রঙের এক দোপাট্টা। নাচতে নাচতে যখন পড়ে গিয়েছিল মেহবুবা, বড় সাহেব এসেছিল ছুটে, বলল—হসপিটাল লে চলো। কিন্তু হাসপাতাল যাবে না মেহবুবা।

ইয়াসিনকে বলল—আমায় ঘরে নিয়ে চলো। ইয়াসিনের কোলে মাথা দিয়ে মরবার সময় অবধি বলে গিয়েছিল মেহবুবা—সর্দার, এ বুঢ়া কাম ছোড় দোও। শেষ পর্য্যন্ত কথা দিয়েছিল ইয়াসিন—নাঃ, গুণ্ডামি আর সে করবে না। মেহবুবা বলল—ফুলজানকো লে আও সুলতানপুরসে। উভী আচ্ছী নাচতী হায়—আর শেষবার অনুরোধ করল—ফুলজান আমার চাচার মেয়ে, ওকে তুমি শাদী কোরো, আর বচন দেও বুঢ়া কাম কভী নেহী করোগে।

কথা দিয়েছে ইয়াসিন—খারাপ কাজ সে আর কখনও করবে না। এক ডজন আলিগড়ী ছুরি ছিল তার কাছে আর কতকগুলো বর্শা—সে সব ফেলে দিল সে বরাকরের জলে।

ফুলজানকে নিয়ে এলো সুলতানপুর থেকে। নিজের যা টাকা ছিল আজ তা' দু-হাতে দান করেছে ইয়াসিন কুলি-মজুরের কল্যাণে। কোন লেবারের চাকরী গেলেই ছোটো ইয়াসিনের কাছে, যত দিন না ফের নোক্‌রী মেলে খাও দাও থাকো ইয়াসিনের হোটেলে।

দূরে ট্যাপ থেকে চায়ের জল ভর্ত্তি করছিল কেটলীতে সুনীল বাবু। আঙুল দিয়ে দেখালো সুনীল বাবুকে ইয়াসিন আর বললো, ঐ যে সুনীল বাবু সিনিয়ার ফিটার ছিল কারখানার, সেবারে ষ্ট্রাইকের পর যখন তার নোকরী গেল আর কোম্পানী সুনীল বাবুর কোয়ার্টার ভি নিয়ে নিল, এই আমিই ত ওকে বাঁচাল।

সূর্য্য অস্ত যাচ্ছিল পশ্চিম দিকে। ক্যান্টিনের মধ্যেই চাদর বিছিয়ে মাথায় সাদা টুপি পরে নমাজ পড়তে বসে গেল ইয়াসিন, সুনীল বাবু চায়ের জল বসিয়ে দিল উনুনে। আর আমাদের দিকে তাকিয়ে বলল—ইয়াসিনের সম্বন্ধে অনেক কথাই শুনতে পাবেন এ অঞ্চলে। কিন্তু আমাদের মত হতভাগাদের এখন একমাত্র আশ্রয় ঐ ইয়াসিন।

মেহবুবার সবই কথাই রেখেছে ইয়াসিন শুধু একটি বাদে। ফুলজানকে দেশ থেকে সে নিয়ে এসেছিলো, মেহবুবার সমস্ত বসন-ভূষণ তাকে দিয়ে বলেছিল—লাও, ফির আগ জ্বালাও। কিন্তু মেহবুবার মুখ রাখতে পারেনি ফুলজান। প্রথম নাচে যেদিন হাজির হল সে, গোটা নাচের পরও আঁচল তার ভরল না। অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে ঝুপড়িতে এসে কেঁদে ফেলল সে—ইয়াসিন সারা রাত ধরে তাকে সান্ত্বনা দিয়েছিল। চোখের জল মুছে দিয়ে পা থেকে তার ঝুমুর খুলে দিল ইয়াসিন। বলল—আরাম করো। আর আরাম! ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল ফুলজান বালিশে মুখ লুকিয়ে, বলল—সর্দার, তোমার মুখে কালি দিয়েছি আমি আর সেই সঙ্গে মেহবুবারও। ভোর হতেই সর্দারকে এসে বলল ফুলজান—আজই চলো, আমি লখিয়াকে নিয়ে আসব সুলতানপুর থেকে।

লখিয়া! ও কোন হ্যায়?

নিয়ে এলেই দেখবে। বেহেস্তের হুরীও হার মেনে যায় তার কাছে।

হঠাৎ রোল-কলের ঘণ্টা পড়ল ঢং ঢং করে। বাকীটুকু আর শোনা হল না সুনীল বাবুর কাছ থেকে, দৌড়ে চলে এলাম লেক্‌চার টেন্টে। প্রফেসার লেকচার দিয়ে চললেন। নদীর এ পারে থিয়োডোলাইট—ষ্টেশন দুটো—তার মাঝে 'বেস-লাইন' মাপো চেন দিয়ে। তারপর ফোকাস করো ও পারে কোনো 'ফিক্সড পয়েন্টে' কোণ মেপে নাও ফিক্সড পয়েন্ট আর বেসলাইনের মধ্যে। ব্যস, নদীর মাপ বের করে নাও এবার কাগজের ওপর ফিক্সড পয়েন্ট থেকে বেস-লাইনের ওপর লম্বা টেনে।

কায়ুমও তাই করছিল। হাতের কাছের থিওডোলাইট উঠিয়ে নিয়ে কখন যে সে আর এক ষ্টেশনে বসিয়েছে খেয়াল নেই। সূর্য্যও মাথার ওপর অনেকখানি উঠেছে। হঠাৎ চম্‌কে উঠলাম কায়ুমের চীৎকারে। বেসলাইনের ওপর চেন ফেলে সবকারও ছুটল। এক ঝাঁক দেহাতি ঘিরে ধরেছে কায়ুমকে আর সে বেচারী যন্ত্রটার টেলিস্কোপের দিকে হাত নেড়ে, তাদের কি যেন বোঝাবার চেষ্টা করছে। কিন্তু কিছুতেই শান্ত হয় না তারা—টাকা তাদের চাই-ই! সামনের ঘাটেই স্নান করছিল ক'টি দেহাতি মেয়ে। ঐ লম্বা কালো নল আর ছোটো পেতলের চাকা-বসানো থিওডোলাইট দিয়ে নিশ্চয়ই তাদের ছবি তুলেছি আমরা। টেলিস্কোপ ফোকাস করা ছিল ওপারে ফ্ল্যাগম্যানের দিকে। একে একে ডাক্‌লাম সব ক'জন দেহাতিকে।

আঁখ লাগাও, দেখো উধার কোন দেখাই দেতা।

ষ্ট্যাণ্ড ধরে রইলাম জোর করে। চোখ তারা লাগিয়েই থাকে তাদের কি বিশ্বাস হল কে জানে! জোয়ানগুলো সরে পড়ল বাচ্চা-কাচ্চা কয়েক জন তখনও চেঁচাতেই রইল—বাবু পয়সা দে পয়সা দেবার জন্যে সত্যি পকেটে হাত দিয়েছি—ও পাশ থেকে পোল ফেলে দৌড়ে এল বারো নম্বর পার্টির কুলি মংলু সর্দার এসেই চীৎকার করে উঠল—নিকাল যা বেয়াদব। দুড়-দুড় করে দৌড়ে পালাল কালো কালো ন্যাংটা ছেলেগুলো। স্নান শেষ করে ভিজে কাপড় গায়ে উঠে আসছিল কয়েকটি মেয়ে। তাদের দিকে রোষকষায়িত নেত্রে চাইল মংলু আর বলল—ঐ কলকেত্তেই বাবুরা ত বাড়িয়েছে এদের। নদী খাদ ডুঙর জমি—সব উলটা-পালটা করে দিচ্ছে মাইথনের কোম্পানী। ঘরবাড়ী সব ডুবে যাবে না

পানীতে। কোম্পানী পুরোনো খুপরি ভেঙে নয়া জমিন আর মোকাম্ দিচ্ছে পাঁচ মাইল দূরে—আর এই আওড়ংগুলো বেসরম বেহায়ার মত মরদের পিছু পিছু ঘুরে বেড়াচ্ছে রুপিয়ার লেগে। হাজার হাজার আওরৎ মাটি আর সামান বইছে কল্যাণেশ্বরীর পাহাড়ে, পেট-ভর দারু পিয়েছে হরদম আর পরদেশী কুলিদের নিয়ে নাচছে সারা রাত।

দেহাতিরা আগেও দারু খেয়েছে। তবে সে হপ্তায় একবার। হপ্তা-ভোর কাজ করেছে রাস্তায়, মাঠে, খনিতে, কারখানায় আর শনিবার রাতে আদিবাসী ছেলেমেয়েরা জড়ো হয়ে একসঙ্গে নেচেছে আগুনের সামনে নিজেদেরই আওরৎ মরদের সঙ্গে ; আর নাচের পর পেট ভর্ত্তি করে খেয়েছে পচাই—বাপ দিয়েছে ছেলেকে, ছেলে দিয়েছে বাকে। আর যদি নেশার ঘোরে কোন কুমার-কুমারীর দেমাকই বিগড়ে গেছে ত তারা শাদী করেছে পরের হপ্তাতেই। হাসিখুসি, নাচগান—সহজ স্বচ্ছ সরল হয়ে নিজেদের মধ্যেই সম্পূর্ণ জীবনযাপন করে এসেছে তারা কিন্তু আজ ট্রাক্টর, বুলডজার এসে তাদের ঘরও ভেঙেছে, সমাজও ভেঙে দিয়েছে চুরমার করে। নিজের জাতের ছেলেদের আর পছন্দ হয় না আদিবাসী মেয়েদের। কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে মাটি বইছে তারা গোটা ভারতের কুলিদের সঙ্গে—পুরুষ সঙ্গীর কাছ থেকে বিড়ি চেয়ে সর্দ্দারের কাছ থেকে দেশলাই নিয়ে আগুন জ্বালাচ্ছে মুখে। পচাই ছেড়ে সরাব ধরেছে তারা। চায়ের গেলাসে চায়ের বদলে সরাব খায় সারা রাত আর পাল্লা দিয়ে হি-হি করে হাসে, নাচে আর সঙ্গীদের গায়ে ঢলে পড়ে!

দাঁতে দাঁত ঘষে চেন নিয়ে উঠে দাঁড়াল মংলু সর্দ্দার। বলল—আগে কি ছিল জানো বাবু! আমাদের মেয়ের গায়ে হাত দিলেই সে মেয়ে নষ্ট হয়ে যেত। এখানকার কলিয়ারীরই 'ছোটবাবু' ছিল এক বাঙ্গালী—মাথায় হাত দিয়ে সে আশীর্ব্বাদ করেছিল আমাদের জাতের এক মেয়েকে, তার পরের দিনই তীরধনুক নিয়ে হাজির হয়ে গেল একদল পুরুষ—সঙ্গে রয়েছে সেই মেয়েটি। মাথায় হাত দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নষ্ট হয়ে গেছে সে—তাকে আর কে শাদী করবে? বাঙালী বাবু ত ব্যাপার শুনে অবাক! তা' আমরা তাকে ছাড়ি নি! তার সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলাম সেই মেয়েটার।

আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম মংলুর কথা শুনে। প্রৌঢ় বঙ্গ-সন্তানের স্ত্রী-পুত্র থাকা সত্ত্বেও তাকে এক আদিবাসী দারপরিগ্রহ করতে হয়েছিল এবং শেষ জীবন তারা নাকি বেশ সুখেই কাটিয়েছিল আত্মীয়-পরিজন নিয়ে, আর এখন সেই আদিবাসীর বংশের কুমারীরা নতুন আনন্দের আস্বাদ পেয়েছে যন্ত্রের আশীর্ব্বাদে—জীবন যৌবন উজাড় করে বেচে দিয়েছে তারা পরপুরুষের কাছে—দু'হাত ভরে টাকা উপায় করতে তারাও শিখেছে। স্বল্পাবৃত নারীদেহের বঙ্ক সৌন্দর্য্য ছবিতে বেঁধে রাখত পেশাদারী অপেশাদারী শিল্পীদের ক্যামেরা। দুষ্প্রাপ্য ছিল তখন এ ছবি—টাকার বিনিময়েও পাওয়া যেত না মনোরম দেহভঙ্গিমা। কিন্তু আজ আর সে ভঙ্গিমা দুর্লভ নয়—শিল্পীদের খুঁজতে হয় না নারী। তারাই খোঁজে শিল্পীদের—যত খুশি 'পোজ' নাও, বিনিময়ে দাও শুধু একটা সিকি বা এক বাণ্ডিল বিড়ি।

মংলু আবার সাবধান করে দিল—খবরদার, এদের খপ্পরে পড়লে আর রক্ষে নেই, সাংঘাতিক মেয়ে এরা!

কই এদের মুখ দেখে ত তেমন সাংঘাতিক বলে মনে হয় না! মংলুর সব কথা বিশ্বাস করিনি!

বরাকরের জল তখন শুকিয়ে এসেছে। দুটো পাহাড়ের মাঝখানে শুকনো খাদের মত পড়ে আছে বরাকর—এপার থেকে ওপার অবধি উঁচু হয়ে উঠছে মাটির বাঁধ। নদীতল থেকে প্রায় দেড়শো ফুট উঁচু হবে বাঁধের মাথা। এ বাঁধের সামনে সারাবছরের জল এসে জমা হবে—তৈরী হবে বিরাট হ্রদ, ডুবে যাবে অগণিত জনপদ আর ভূধর প্রান্তর! ভাবীকালের সেই হ্রদ থেকে মাটি কাটছে বড় বড় ব্লেড-লাগানো 'এক্সক্যাভেটার' কাটা মাটি যন্ত্র দিয়েই তুলে ভর্ত্তি করা হচ্ছে লরীতে। ডালা তুলে লরীর মাটি ফেলে দেওয়া হচ্ছে, ট্র্যাক্টরের মস্ত বড় বাক্সে। আকাশে বাক্স উঠিয়ে বোঁ করে ঘুরে যাচ্ছে ট্র্যাক্টরের ক্রস নদীর মধ্যে। তলার ঢাকনা খুলে যাচ্ছে বাক্সের, ঝর ঝর করে মাটি পড়ছে বাঁধের ওপর। তার পর আসছে 'গ্রেডার' সামনের মোটা 'বাম্পার' দিয়ে দুরমুশ করতে করতে। সব চেয়ে পিছনে আসে 'শিপফুট রোলার' মস্ত বড় গোল ড্রামের পরিধিতে ভোঁতা-খুর বসানো ইস্পাতের পা—দেখতে ভেঁড়ার পায়েরই মত। স্তরে স্তরে পেটাই হচ্ছে মাটি, সমতল হয়ে উঠেছে শক্ত মাটির স্তর। মাটির ডেলা ছুঁড়ে ছুঁড়ে জলের ভাগ পরীক্ষা করছে সবে পাশ করা ট্রেনী ইনজিনিয়াররা। মাটির ঘনত্ব হবে সব চেয়ে বেশী আর সেই 'ম্যাক্সিমাম ডেনসিটি'র জন্য চাই 'অপটিমাম ময়েশ্চার কনটেন্ট', অর্থাৎ মাটিতে আবদ্ধ জলের পরিমাণ হবে সেই ঘনত্বের পক্ষে সব চেয়ে উপযোগী।

ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন থেকে এসেছে মালায়ালীরা—ষ্টিয়ারিং ধরে থাকে তারা ট্র্যাক্টরের ওপর; স্বপ্ন দেখে 'ওনাম' চলেছে লেগুনের ওপর দিয়ে। নৌকোর দাঁড়ের তালে তালে উদ্দাম হয়ে উঠেছে নাচ আর গান, গান আর বাজনা—কেরালার জাতীয় উৎসব 'ওনাম।' শরতের মেঘ বাংলায় নিয়ে আসে আগমনী আর কেরালায় নিয়ে যায় 'ওনাম', ফলে ফুলে ভরে ওঠে সারা দেশ—সঙ্গীতে নাচে উৎসবে, হিল্লোলে মুখর হয়ে ওঠে নদী আর হ্রদ—সুরু হয় নৌবাহনের মেলা অরণমূলায়, চেম্পাকুলমে, ডেম্বানাদে, পাল্লা দিয়ে ছুটে চলে বিচিত্র আকারের ময়ূরপঙ্খী।

মাটি ঢালা হচ্ছে বাঁদিকে, পাথর কাটা হচ্ছে ডান দিকে। বাঁদিকে বাঁধ, ডান দিকে টানেল। বর্ষাকাল এগিয়ে আসছে, সমস্ত জল আটকে দিতে হবে বাঁধের আগে, তার পর ঘুরিয়ে দেওয়া হবে বরাকরের প্রবাহ টানেলের মধ্যে দিয়ে। সামনের দিক থেকে লাফ দিয়ে ঢুকলাম টানেলের হেডিং-এ, খট্ খট্ করে পাথর কেটে যাচ্ছে নিউম্যাটিক ড্রিল। মেঝের ওপর খাড়া করে সোজাসুজি ড্রিল চালিয়ে দিচ্ছে পাথরের ভেতর পাগড়ি-পরা বলিষ্ঠ দেহ শিখেরা। হাত দুটো দিয়ে জোরে ধরে আছে ড্রিলের আংটা, কম্প্রেসর থেকে হারকিউলিসের শক্তি নিয়ে বেরিয়ে আসছে দ্রুতগতি বায়ু—রবারের নল দিয়ে সে বায়ু প্রবেশ করছে সমস্ত বায়বীয় যন্ত্রগুলোতে—নিউম্যাটিক ড্রিল, নিউম্যাটিক ডিসেল, নিউম্যাটিক স্পেসার।

পাথর-ফাটানোর যন্ত্রসূচী ড্রিল, ফাটা পাথর সমান করে কেটে দেওয়ার অমোঘ-যন্ত্র 'চিসেল' বা বাটালি; টানেলের ছাদের সমস্ত গর্ত্ত সিমেণ্ট দিয়ে 'গ্রাউটিং' বা ভর্ত্তি করে দেওয়ার বায়বীয় ক্ষেপণী 'প্রেয়ার'। ভগবানের তৈরী পাহাড়ের সঙ্গে অবিশ্রান্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে পৃথিবীর মানুষ এই নিউম্যাটিক যন্ত্রগুলোর সাহায্যে, লাইন বসেছে সামনে যুদ্ধের ফ্রণ্টিয়ারে অ্যাম্বুলেন্সের মত—ফাটাপাথর বোঝাই হয় ট্রলিতে—হতাহতদের সরিয়ে নতুন সীমান্ত উন্মোচন করে দেয় মেহনতী মানুষ। কাজ চলেছে দিন-রাত। "হাইড্রলিক ষ্টেশন" থেকে খবর এসেছে এবারে বর্ষা আসবে আরো আগে। হাতে আছে মাত্র কয়েক মাস। এর মধ্যেই শেষ করে ফেলতে হবে পাকা টানেল সিমেণ্ট দিয়ে, বালি দিয়ে, মেঝেতে সমান ঢাল লাগিয়ে, ছাদে পুরু প্লাষ্টার দিয়ে।

টানেল থেকে যখন বাইরে বেরুলাম সন্ধ্যে হয়ে গেছে। ওপারের ছোট্ট মাইথন শহর তখন দেওয়ালীর রাতের মত আলোকসজ্জায় ঝলমল করে উঠেছে! এপারে কল্যাণেশ্বরীর পাহাড়গুলোর আরও পিছনে অনেক দূর থেকে অতীতের স্মৃতি যেন জীবন্ত হয়ে একটানা সুর গেয়ে যাচ্ছে—ধিতাং, ধিতাং, ধিতাং। কারা নাচছে কে জানে! কি গাইছে তাই বা কে জানে!

জানা-শোনার মধ্যে আছে শুধু ঐ ছোট্ট একটুকু চাঁদ। ও ত বড় আকাশে মেঘের ফাঁকে ফাঁকে কি লুকোচুরিই না খেলছে! সুরের আলিম্পন টেনে টেনে বিরহীর দুয়ারে যেন হাজির হয়েছে বাতাস। মৌসুমের মাধুর্য্যে আকৃষ্ট হয়ে আকাশের চাঁদও যেন মুগ্ধ নয়নে চেয়ে আছে প্রিয়া ধরিত্রীর দিকে।

চিন্তাস্রোতে হঠাৎ থামার বাধা পড়ল। ঐ যে সোরাবজী সাহেবের পাশের বাংলো—তার বাগানে পা মেপে মেপে পায়চারি করছে কে? অরুণ না? সেই একই রকম পোষাক—সাদা কোঁচানো ধুতি আর পাঞ্জাবী—কোঁচার খুট পাঞ্জাবীর পকেটে গোঁজা। নাঃ, এটা ত দেশাই সাহেবের বাড়ী নয়, তবে—তবে? এক দুর্নিবার কৌতূহল আমায় পেয়ে বসল। গতি আরো মন্থর করে সামনের রাস্তায় লম্বা পথ ধরে ভাবছি, একবার যাব আর ফিরব—যদিও পায়চারি করছি, কেউ বুঝবে না যে পায়চারি করাই আমার উদ্দেশ্য।

এইবার স্পষ্ট চোখে পড়ল বাংলোর বাঁদিকের ঘরে আলো জালিয়ে টেবিলের ওপর একটা বই রেখে নিবিষ্ট মনে পড়ছে সুমতি। আস্তে আস্তে পোর্টিকো দিয়ে বারান্দায় উঠল অরুণ। তারপর সে ঘরের দরজার সামনে গিয়ে কি বলল—বিরক্তির ভাব দেখিয়ে সুমতি পাশে তাকাল। অরুণ ঘরে ঢুকল। কিন্তু কতক্ষণ! বাংলোর সীমানা অতিক্রম করতে না করতেই বেরিয়ে এল অরুণ। গেটের বাইরে বেরুতেই একেবারে আমাকে সামনে দেখে হকচকিয়ে গেল সে।

গুড ইভনিং, মিঃ অরুণ!

আর এক দফা চমক খেল সে। চোর ধরা পড়লেই প্রথমে যেমন খানিকটা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে, অরুণের অবস্থাও সেই রকম। পরিবেশ সহজ করার জন্যে অতি স্বাভাবিক কণ্ঠে বললাম—এটা কার বাড়ী অরুণ?

মিঃ সেনের।

কি সেন? কি করেন? কেনই বা তার বাড়ীতে অমন করে যাওয়া? এ প্রশ্নের পরিপূরক হিসেবে অরুণ হয়ত এ সমস্ত প্রশ্নই আশা করেছিল। কিন্তু অবস্থা একবার সঙ্গীন করে দিয়ে বলে ফেললাম, আমি সব দেখে ফেলেছি, এইবার চলো আমাদের ক্যাম্পে।

শুধু একদিনের দেখাতেই অরুণকে চিনে ছিলাম। তাই ভরসা ছিল, এ অবস্থায় আমার কাছ থেকে সহানুভূতির সাড়া পেয়ে অরুণ বড় জোর বুকভরা অভিমান হালকা করার জন্যে ছোট ছেলের মত হু-হু করে কেঁদে ফেলতে পারে, কিন্তু ফিরতি আক্রমণ সে কখনই করবে না।

আমিই ফের জিজ্ঞেস করলাম—কি বলছিলে সুমতিকে? মনে হল খুব বিরক্ত হয়ে গেল সে।

কি আর বলব? জিজ্ঞেস করলাম তোমার পরীক্ষা কবে? তা আমায় উত্তর দিল, রোজ এক কথা! একদিন ত বলেইছি ছুটি ফুরুলেই পরীক্ষা।

তারপর?

তারপর আর কি। জিজ্ঞেস করলাম—মিঃ সেন কোথায়? বলল—বাইরে। এখন ফিরবেন না? না। আমিও বেরিয়ে এলাম।

ব্যস।

হাঁ।

তা মিঃ সেন তোমার বাবার বয়সী, তার সঙ্গে তোমার কি দরকার থাকে?

কেন থাকতে পারে না? ছোটবেলা থেকেই মিঃ সেন আমার সঙ্গে বন্ধুর মত ব্যবহার করেন। তাই তার সঙ্গে কথা বলে প্রচুর আনন্দ পাই।

বিলক্ষণ! 'প্রাপ্তেষু ষোড়শে বর্ষে পুত্রং মিত্রবৎ আচরেৎ।' কিন্তু তিনি ছাড়া কি আর কোন আকর্ষণ নেই ও বাড়ীতে?

প্রশ্ন করতেই অরুণ হেসে ফেলল। আমি চুপ করে রইলাম। নিস্তব্ধ হয়ে খানিকটা চলার পর অরুণ বলে উঠল—তোমাদের বাঙ্গালী জাতটা ভারী নীরস।

কথাটা শুনে আমার মনে হল, রাধার বিরহে কাতর হয়ে কৃষ্ণ যেন কোন গোপিনীকে ডেকে বলছেন—সখী, তোমাদের নারী জাতটা ভারী বেইমান!

তা এ হতভাগ্য বাঙ্গালী জাতের ওপর তোমার ও অভিমানের কারণ?

তা নয়ত কি। যত ভালো ভাবেই কথা বলি না কেন, ও একদিনও মিষ্টিমুখে আমার সঙ্গে কথা বলেনি। জন্মাবার সময় বোধ হয় মধুও খায়নি।

ও! মানে তুমি সুমতির কথা বলছ ত?

কিন্তু এটা তুমি মস্ত বড় অপবাদ দিলে। কারণ সুমতির মত শান্ত মেয়ে খুব কমই দেখা যায়! আমার মনে হয়, সে শুধু তোমার সঙ্গেই অমনি ব্যবহার করে থাকে!

কেন, কি দোষ আমার? ডলি আমার সঙ্গে দু'বেলা ঝগড়া করে, কিন্তু সে ত আমায় অতটা অবজ্ঞা করে না?

অভিমানে কণ্ঠস্বর জড়িয়ে গেল অরুণের। আমার তখ

একটা কথা মনে পড়ল। সোরাবজী সাহেবের বাড়ীতে সুমতির সামনেও অরুণের কথা উঠতেই এমনি ভাবেই গলার স্বর জড়িয়ে গিয়েছিলো সুমতির। শেষ কালে অন্দর মহলে পালিয়ে লজ্জা লুকিয়েছিল সে।

সহানুভূতির সাড়া পেয়ে মনের কথা উজাড় করে বলে ফেলল অরুণ। কৈশোরের দিনগুলো স্মরণ করে নিঃশ্বাস ফেলল সে। কোন জড়তা ছিল না তখন। দুপুরে-বিকেলে সকালে-সন্ধ্যায় সুমতির সঙ্গে রাস্তায় ছাদে মাঠে ঘাটে মনের আনন্দে ঘুরে বেড়িয়েছে তারা। দেওয়ালীর সময় একসঙ্গে প্রদীপ জালিয়েছে—হোলির সময় এক সঙ্গে ভূত সেজেছে রং মেখে। কিন্তু আজ যেন বড় বেশী সচেতন হয়ে উঠেছে সুমতি। তার অবহেলা ত অবজ্ঞারই সামিল। আর সহ্য হয় না অরুণের।

বলল—পড়াশোনায় পর্য্যন্ত মন বসে না আমার। সারা সপ্তাহ ধরে ধানবাদে, একটা কথা শুধু মনে হয়—কি দোষ আমার? থেকে থেকে গোটা জীবনটার ওপরই বিতৃষ্ণা জন্মে যায়।

পকেট থেকে কোঁচার খুঁট নামিয়ে দিল অরুণ আর দূর আকাশের দিকে চেয়ে বলে চলল—আমার একমাত্র দোষ আমি বেণেদের জাত, আমার দাদু ছিলেন ঠিকেদার, সেই নানার কথা স্মরণ করে আমার চোখে এখনও জল আসে, রাধা-কৃষ্ণের মূর্ত্তির সামনে বসে বসে নার্সীমেতার ভজন গাইতেন নানা আর আমাকে কাছে বসিয়ে বলতেন, 'পর দুঃখকে করে উপকার তে এ মন অভিমান এ আনে রে।' ভাঙা গলা নিয়ে দু'হাতে তালি বাজিয়ে নানা গেয়ে চলতেন—'কাচ কাচ মন নিশ্চল রাখে ধন্ধ ধন্ধ জননী তেনী রে, বৈষ্ণবজনতো তেনে কহিঁয়ে।'

বৈষ্ণবজনের সংজ্ঞা দিয়েছেন নার্সীভাই, পরদুঃখে নিরভিমান মনে যিনি উপকার করেন, তিনিই বৈষ্ণব। বচন, ব্যবহার, ও মন যাঁর নিশ্চল তাঁর জননী ধন্ধ, তাঁকেই বলা হয় শ্রীবিষ্ণুর ভক্ত।

নানাকে জিজ্ঞেস করেছিল অরুণ—আচ্ছা নানাজী, তুমি কাজ ছেড়ে দিলে কেন? শিশুর এ প্রশ্নে এতটুকুও বিচলিত হননি তিনি। গোপালের মূর্ত্তির দিকে হাত বাড়িয়ে বলেছিলেন—ঐ গোপালই আমায় কাজ দিয়েছিল, সেই আবার কেড়ে নিয়েছে। বড় হয়ে পিতাজীর কাছ থেকে শুনেছিল অরুণ সব। রেলের ঠিকেদার হবার প্রথম থেকেই পাঁচ পারসেন্ট সেলামী দিয়ে বিলের টাকা পেতেন মোহনভাই। কিন্তু সে বারে যখন দশ লাখ টাকার এক কাজ পেলেন, বিলবাবু এসে বলল—শেঠজী, নতুন রেট হয়েছে এবারে। ক্যাপিট্যাল ওয়ার্কে পাঁচ পারসেন্ট আর 'রেভিনিউ' এ দশ। তুমি যে কাজটা পেয়েছ সেটা 'রেভিনিউ'-এর। বলেই এক পারসেন্ট চেয়ে বসল সে, কাজ আরম্ভ করার আগেই—'অন্-একাউন্ট' বিলের সময় আট আর ফাইন্যালের সময় বাকী এক 'পারসেন্ট'। সবে দীক্ষা নিয়েছিলেন তখন নানা সাহেব, বললেন—না, আর নয়। ঘুষও দোব, গালও খাব, আমাদের কি এতটুকুও সম্মান নেই? কাগজপত্র সই করার আগেই নাম কাটিয়ে দিলেন তিনি। লাল খেরোবাঁধা মোটা মোটা হিসেবের খাতাগুলোর ওপর দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল, ভস্মাবশেষগুলো বরাকরের জলে ফেলে দিলেন নানাভাই, আর বড় বড় করে শোবার ঘরের দরজার সামনে লিখে রাখলেন :—

"জিহ্বা তকী অসত্য না বোলে পর ধনো না ঝালেহা তরে,
মোহমায়া ব্যপে ন ষেনে দ্রন বৈরাগ্য যেনা মন মাঁরে
রামনাম শুঁ তারি লাগি"।

জিভ দিয়ে যাঁর কখনও মিথ্যে বেরোয়নি, পরধন যিনি একবারও স্পর্শ করেননি, যাঁর মোহমায়া নেই, যিনি বৈরাগী, তাঁর কাছে রামনামের কি প্রয়োজন? অনেক দূর আকাশে সপ্তর্ষির দিকে তাকালেন নানাভাই। টপ টপ করে চোখ দিয়ে জল পড়ছে তাঁর। পাশ থেকে আমায় কোলে টেনে নিলেন দাদু আর বললেন—কখখনো ঠিকাদার হসনি ভাই, তুই যদি মাথায় মোট বয়েও অন্নসংস্থান করিস, পরলোক থেকে আমি তোকে আশীর্ব্বাদ করবো, কিন্তু তবুও ও পথ যেন কখনও মাড়াসনি।

দূর আকাশের বুকে নিশ্চল হয়ে ফুটে আছে অগণিত নক্ষত্র। ঐ নক্ষত্রের মত সুস্থির কর আমার মন। পাগলা নার্সীমেতা গোটা পৃথিবীর হয়ে যেন এখনও প্রার্থনা করছে, ভগবান স্থির কর, শান্ত কর, মানুষের মন, মানুষের বচন! শান্তি দাও, মঙ্গল দাও, জ্ঞান দাও, মনুষ্যত্ব দাও। পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ—সব দিক থেকে ভেসে আসুক মহত্ত্ব,—মহান-ভাব মহান-চিন্তা মহান-আচরণ! "আ নো ভদ্রাঃ ক্রতবো যন্তু বিশ্বতঃ"। মিত্রের জীবনে উন্নতি দাও, শত্রুর মনে শান্তি দাও। শোকতাপের জর্জ্জর থেকে মুক্তি দাও এ মাটির পৃথিবীকে।

দু'হাত ওপরে তুলে প্রণাম করলাম আকাশকে। সপ্তর্ষি মণ্ডল যেন জীবন্ত হয়ে জ্বল্ জ্বল্ করে উঠল।

কণ্টুর হল, রিভার সার্ভে হল, রেলওয়ে প্রজেক্ট হল, ছুটি দাও এবার, দলের পর দল যাচ্ছে প্রফেসরের কাছে—কাল শনিবার, পরশু রবিবার, দুদিনের জন্মে ক্যাম্প ছাড়বার অনুমতি দিন—পরেশনাথ যাব, গয়া যাব, রাঁচী যাব, কেউ বা বলে কলকাতা যাবো। ভালো মানুষ প্রফেসর নকল অভিভাবকের সই করা চিঠি দেখেন আর অনুমতি দেন। তবে সোমবার ঠিক ফিরে এসো।

কখনও বা জিজ্ঞেস করেন অধ্যাপক—কোথায় থাকবে? আত্মীয়ের নাম-লেখা জায়গাটা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় ছাত্র আর বলে, এই যে আমার দিদির বাড়ী এখানে। কারুর বা মামার, কারুর বা কাকীর, কারুর বা মাসীর।

আমি কিন্তু মিথ্যে কথা বলিনি—বার্মোতে সত্যি আমার জামাইবাবু থাকেন। বার্মোয় কয়লা আর দশ মাইল দক্ষিণে বয়লার—বোকারোয় থার্ম্মাল পাওয়ার ষ্টেশন। আর তারও আগে কোনার বাঁধ. বোকারো ব্যারেজের সাহায্যে সারা বছর জল সরবরাহ করবে কোনার বাঁধ থার্মাল পাওয়ার ষ্টেশনের সাততলা উঁচু বয়লারগুলোর জন্মে।

ইস্পাতের তারের ওপর দিয়ে লোহার টব বয়ে নিয়ে আসছে কয়লা বার্মোর খনি থেকে। টগবগ করে জল ফুটছে বয়লারগুলোর ভেতরের টিউবগুলোতে। আর তার নীচে বিরাট চুল্লী বার্মোর গুঁড়ো কয়লায় আর ফ্যানের জোর বাতাসে গম-গম করে জ্বলছে। বাইরে তার এতটুকুও আভাস পাওয়া যায় না। নিঃশব্দে ঘুরছে টার্ব্বাইনের জলীয় বাষ্পভরা বৃহদায়তন চাকা। বড় বড় বাক্সের ওপর বোতাম টিপে চাপ তাপ, জল ও বিদ্যুৎ-এর পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ

করছেন একতলায় অপারেটররা। সামান্য যেটুকু ইনজিনিয়ারিং শিখেছিলাম এক মুহূর্তে সব ভুলে গিয়ে হাঁ করে তাকিয়ে রইলুম বিরাট টার্বাইনগুলোর দিকে।

হঠাৎ পিঠে এক চাপড় পড়ল পিছন থেকে। চেয়ে দেখি, অপারেশন টেবিলের ধারে দাঁড়িয়ে অরিন্দমদা'। আমি যখন সেকেণ্ড ইয়ারে উঠি তখন পাশ করে বেরিয়ে গেল কলেজ থেকে ইলেকট্রিক্যাল ইনজিনিয়ার অরিন্দম ব্যানার্জি। খেলাধুলো, পড়াশোনায় চৌকস ছেলে অরিন্দমদা'। আমি যখন কলেজে ঢুকেই সমস্ত খেলা একসঙ্গে শিখে ফেলার জন্যে উঠে-পড়ে লেগে গেছি, এমন সময়ে টেনিসের মাঠে প্রথম দিনেই দেখা অরিন্দমদা'র সঙ্গে। আর পাঁচটা খেলার মত এ খেলাও আমার কাছে নতুন। আমার সার্ভিসের বহর দেখে চীৎকার করে ডাকলেন তিনি—এ মাষ্টার, এদিকে শোনো। র‍্যাকেট হাতে নিয়ে এক দৌড়ে হাজির হলাম আহ্বানকারীর সামনে। আমার দিকে মুখ না ফিরিয়েই তিনি বললেন—ব্রাদার, খেলা এখন মাঠের বাইরে কোর্টের মধ্যে খেলবো আমরা, আর আমাদের বল কুড়িয়ে দেবে তুমি, আগে বল কুড়োনো শেখো, তারপর র‍্যাকেট ধরো। রাগে তখন আমার সমস্ত রক্ত মুখে উঠে জমেছে। একপর্দা চড়িয়ে বললাম—তার মানে? এইবার মহাশয় হেসে ফেললেন। তারপর ধীর ভাবে বললেন—টেনিস খেলা শিখতে গেলে প্রথমে টেনি-বয় হয়ে বলের পিছু পিছু দৌড়ুতে হয়; তারপর নেটের সামনে। বলেই তিনি বিশ্বের এক পয়লা নম্বরের টেনিস খেলোয়াড়ের নাম করলেন। তিনিও নাকি প্রথম জীবনে ম্যাচের সময় বল কুড়োতেন। বলা বাহুল্য, এর পর থেকেই আমাকে টেনিস খেলা শেখাবার জন্যে উঠে-পড়ে লেগে গেল অরিন্দমদা'। কিন্তু আর পাঁচটা খেলার মতো এতেও নিয়মরক্ষা হল,—আমাকে পার্টনার নিয়ে কেউই খেলতে চাইত না আর ষ্ট্রেট সেটে গেম খেতাম সিঙ্গলসে। হতাশ হয়ে শিক্ষকতা ছেড়ে দিল অরিন্দমদা'। বলল—না গদা, তোর দ্বারা কিছু হবে না। হেরে গেল অরিন্দমদা' আমার কাছে। জিজ্ঞেস করল, হ্যালো গুডি, ছোটবেলায় ড্যাংগুলি খেলেছিলে?

বললাম, না।

এইবার যেন আশ্বস্ত হল দাদা। বেশ করেছ, তবে ত কোন খেলাই তোমার দ্বারা হবে না।

সেই অরিন্দমদা' শার্টের কলার ধরে বলল—কি রে গদাই, কখন এসেছিস?

সকাল সাতটার ট্রেণে।

সাতটা আর এখন এগারোটা, এই চার ঘণ্টা ধরে কি দেখছিস? দেখবার আছে ত বাড়ীর সামনের দেওয়ালে আঁকা ছবিগুলো। ভেতরের সব দেখা ও বোঝার জন্যে যখন চার বছরও যথেষ্ট নয়, তখন কেন মিছিমিছি চার ঘণ্টা নষ্ট করলি? তা এখন যাবি কোথায় এখান থেকে?

রাঁচী।

আর কোনো যাবার জায়গা পেলে না? কি দরকার সেখানে?

বেড়াতে যাবো।

বেড়াবারও আর সময় পেলে না? বলেই হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল অরিন্দমদা'। মাথায় কি খেয়াল হলো কে জানে! প্রায় গোটা সিগারেটটা মুখ থেকে ফেলে দিল আর জিজ্ঞেস করল—দুপুরে খাবি কোথায়?

কেন, আপনাদের ঐ ক্যান্টিনে?

তবেই হয়েছে। আগে থেকে খবর দিয়েছিস ওখানে? এটা তোমার কলকাতা নয় যে, কড়ি ফেললেই তামাম খাবার হাজির হবে তোমার সামনে! তার পর একটু থেমে নিজে থেকেই বললেন—তা দুপুরে আমার কাছেই খাস।

কিন্তু আমাদের ত এখনি ট্রেণ। দুপুর একটায় প্যাসেঞ্জার আর এখন বাজে বারোটা।

ও! এই ট্রেণেই তোরা যাবি! তবে চল, ক্যান্টিনেই চল। পকেট থেকে এক টুকরো কাগজে কি লিখে পাঠিয়ে দিল অরিন্দমদা' ক্যান্টিনে।

আমরা বসলুম চেয়ারে। অরিন্দমদা' দাঁড়িয়েই রইল। হঠাৎ যেন ভয়ঙ্কর চঞ্চল হয়ে উঠেছেন দাদা। ঘন ঘন ঘড়ির দিকে তাকায় আর বলে—তাড়াতাড়ি খেয়ে নে। ট্রেণের সময় হয়ে এল! গাড়ীটা যাবার বিফোর টাইমে আসে।

বলা বাহুল্য, ট্রেণ ত বিফোর টাইমে এলই না, এল আধ ঘণ্টা দেরীতে। অরিন্দমদা' তখন ধৈর্য্যের শেষ সীমায় পৌঁছেছেন। ট্রেণে ওঠার সময় খেয়ালই ছিল না যে অরিন্দমদা' সামনে নেই।

সীটে বসেই মনে হল অরিন্দমদা'র কথা। গাড়ী তখন চলতে আরম্ভ করেছে। জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখলাম, পাশের রাস্তা দিয়ে অরিন্দমদা' চলেছে। সামনে ঐ আকাশের বুকে আঁকা পটের মত ছোটো ছোটো বাংলোগুলোর দিকে বড় বড় পা ফেলে এগিয়ে চলেছে অরিন্দমদা', হাতে তার ছোট্ট স্যুটকেশ, পাশে তার তন্বী শ্যামা শিখরিদশনা, অরিন্দমদা'র সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তিনি চলেছেন—তার শুভ্রবাস দেহবল্লরীর পরিমিত অংশে সুষ্ঠু আচ্ছাদন দিয়েছে! একটা ছোট পাহাড়ের গায়ে বাঁক নিল আমাদের গাড়ী—অরিন্দমদা' তখনও চলেছে। [ক্রমশঃ।

অক্টোপাশ

(Ogden Nash লিখিত The Octopus অবলম্বনে)

বলবে কি গো, অক্টোপাশ, বলবে দয়াভরে?
ও-গুলো তোমার হাত-কি পা বুঝব কেমন করে?
উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠি, যখন তোমায় দেখি—
ইচ্ছে করে নামটি "আমি" পালটে যোরা রাখি।

অনুবাদিকা—মিনতি ঘোষ
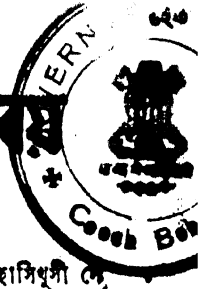
রজত সেন

বাড়ির কোনো জায়গা থেকেই মোড়টা দেখা যায় না, তাই বাসন্তী রাস্তাটা পেরিয়ে দর্জির দোকানে ঢুকল। এখানে জামা তৈরী করায় সে। বড় কাঁচি দিয়ে কাপড় কাটছিল দর্জি, ত্রিরিশের কাছাকাছি বয়স হবে। চেহারায় ধার আছে, পালিশটা নেই। কিছু খোঁচা-খোঁচা দাড়ি, কিছু অসংবৃত গোঁফ। তবু কপালটা প্রশস্ত। শান্ত চোখের দৃষ্টি। স্বাস্থ্যটা মোটামুটি ভাল। ঘি, দুধ, মাছ মাংসের যা অভাব। বাসন্তী একবার শুনেছিল, পাকিস্থানের লোক, যৎসামান্য কিছু লেখাপড়াও শিখেছে।

নূতন কাপড় কিছু আনালেন না কি রাখাল বাবু?

কাঁচি সরিয়ে রেখে সন্ত্রস্ত হয়ে দাঁড়াল সে, গোটা কয়েক ভয়েল এনেছি, দেখুন না, যদি পছন্দ হয়। কাপড়ের বাণ্ডিল ক'টা নামিয়ে দিল সে।

আপনি কাজ করুন, আমি দেখছি।

গালে হাত বুলাল রাখাল, তারপর কাঁচিটা তুলে নিল, ওর গায়ে যে ব্লাউজটি—সেটা তারই তৈরী, অত্যন্ত যত্নের কাজ, কোথাও একচুল বাড়তি-কাপড় নেই। কোথাও পড়েনি একটা অনাবশ্যক ভাঁজ। এমন স্বাস্থ্য হলে তবে না এমন জামার কাট হয়। জামা শরীরের আবরণ, তাতে রাখালের সন্দেহ নেই, কিন্তু কাঠামো যাতে না ঢাকা পড়ে—সেদিকে নজর রাখতে পারে ক'জন দর্জি? রাখাল একবার লুকিয়ে তাকাল, কোমর, বুক, গলা—কোথাও এতটুকু খুঁত নেই, ব্লাউজটা যেন রাখালেরই কোনো ব্যক্তিগত ব্যাপার।

কাপড়গুলি নাড়াচাড়া করছিল বাসন্তী, কিন্তু চোখ ছিল তার রাস্তার মোড়ে কৃষ্ণচূড়া গাছটার নিচে। ঘড়ি দেখল সে, আর একটু পরেই সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসবে, সুন্দর কপালটা একবার কুঁচকাল সে, লম্বা ভ্রূর মাঝখানে দুটি সরল রেখা স্পষ্ট হয়ে উঠল।

এই কাপড়টা আপনাকে ভাল মানাবে, বলল, একটা জামা বানিয়ে দেব না কি?

মুখ ফিরাল বাসন্তী। তার সুডৌল চিবুকে পড়ন্ত সূর্যের এক টুকরো নরম আলো বারেকের জন্যে চকচক করে উঠল, দীর্ঘপক্ষ্ম চোখে বাসন্তী তাকাল।

জামা? তা একটা করতে পারেন, বলল বাসন্তী, কাপড়টা ত বেশ ভালই লাগছে! মাপ ত আছে আপনার কাছে?

মাপ? হ্যাঁ, মাপ তার কাছে আছে, নিশ্চয়ই; কিন্তু কোনো খাতায় নয়, এ-কথা ত আর বলা যায় না তার কাছে, তবু না বলে সে পারল না, মাপ আমার মনে আছে।

মনে আছে?

কিন্তু রাখাল ততক্ষণে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, হয়ত ভাবছিল বাতিটা জ্বালিয়ে দেওয়া প্রয়োজন, পাশের ষ্টেশনারী দোকান থেকে আলো এসে পড়েছে ফুটপাতে।

বাসন্তী দেখতে পেল কৃষ্ণচূড়া গাছের নিচে লম্বা পাঞ্জাবী ঘুরে বেড়াচ্ছে, আচ্ছা তাহলে একটা তৈরী করুন, কেমন?

ফুটপাতে নামল সে। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, এখন তার এদিক ওদিক তাকাবার দরকার নেই, এগিয়ে গেল সে।

এই তোমার ছ'টা? সময়ের জ্ঞান কবে হবে? গা ঘেঁষে দাঁড়াল বাসন্তী।

চল।

কোথায় যাবে?

আমাদের বাড়ি চল, বাড়ি ফাঁকা আজ, নিশ্চিন্তে গল্প করা যাবে।

কোথায় গেল সব? বাসন্তী হাসল।

থিয়েটার দেখতে গেছে, ফিরবে সেই দশটায়। হাত-পা ছড়িয়ে গল্প করা যাবে।

কিন্তু অত দূর, ফিরব কখন? একটু উদ্বিগ্ন শোনাল বাসন্তীর গলা।

দূর? নিশ্চিন্ত হাসল আগন্তুক, বড় বেশি নিশ্চিন্ত নিজের সম্বন্ধে।

আরও সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল; দূরে দূরে গ্যাস-বাতি জ্বলছে।

যা করবার কর, বলল বাসন্তী, বাবা অফিস থেকে ফিরবেন এখুনি, এখানে দাঁড়ানো আর নিরাপদ নয়।

এসো।

ভবানীপুর থেকে শ্যামবাজার, শ্যামবাজার থেকে দমদম পৌঁছতে এক ঘণ্টা পঁচিশ মিনিট লাগল।

সদর রাস্তা থেকে একটা সরু গলিতে ঢুকল তারা। প্রায় অন্ধকার পল্লী, ঝিঁঝির ডাক শোনা যায়; ছোট একতলা এলোমেলো বাড়ি, এদিকটায় এখনও বিদ্যুৎ সরবরাহ হয়নি।

এই যে। এটাই আমাদের বাড়ি।

অস্পষ্ট অন্ধকারে বাড়ির সামনে একটু বাগান দেখতে পেল, বাঁশের বেড়া চার দিকে, ভিতরে ঢুকল তারা।

কি করছ? মৃদু গলায় জিজ্ঞেস করল বাসন্তী।

একটা গোলাপ ফুটেছিল—সকালে দেখে গেছি।

থাক, ছিঁড়ো না।

বারান্দায় উঠে জড়সড় হয়ে দাঁড়াল বাসন্তী। রেস্তোরাঁর উজ্জ্বল কামরায় চার পাশ থেকে অনেক কলরব শোনা যায়, কেল্লার পাশে আলো-ছিটানো নির্জনতার নিরাপত্তার অভাব নেই; আর এখানে! আলো নেই, কলরব নেই।

কিন্তু ভয়টা কিসের? নিজেকে আশ্বস্ত করল সে, জায়গাটা অচেনা, কিন্তু লোকটা যে অনেক দিনের জানা! অন্ধকারে আবার সপ্রতিভ আর সহজ হয়ে উঠল সে।

কড়া নাড়ল তার সঙ্গী।

দরজা খুলে দিল একজন মধ্যবয়স্ক, ছোটখাটো লোক।

একটু চা কর নন্দ!

বাইরের ঘর বলতে কিছু নেই, দেখেই বোঝা যায়। ঘরের কোণায় ছোট টেবিলের উপর হ্যারিকন লণ্ঠন জ্বলছিল, নন্দ পলতেটা বাড়িয়ে দিল।

কিছু খাবার আছে?

ঘাড় নাড়ল নন্দ। আছে কি নেই, বোঝা গেল না।

দরজা খোলাই ছিল, পাশের ঘরে এল ওরা।

এটা আমার ঘর, লণ্ঠনের পলতে তুলে বলল সে, তোমারও ঘর, ইজিচেয়ারটায় বসতে পার, বিছানায়ও বসতে পার যেখানে খুশি। জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেই দেখতে পাবে আকাশ—যা তুমি সব সময়েই ভালবাসো, এবারে বল তোমার জন্যে কি করতে পারি?

বাসন্তী ইজিচেয়ারে বসল, ছোট ব্যাগটা কোলের উপর রেখে, অনেক কিছুই করতে পার, সুব্রত!

ঘর ছোট, কিন্তু পরিপাটি, দেয়ালের পাশে একটি ছোট ষ্টিল আলমিরা, তার পাশে আলনা, আলনার হ্যাঙ্গারে প্যাণ্ট, কোট আর টাই ঝুলছে, নিচে কয়েক জোড়া পালিশকরা জুতা। পাঞ্জাবীটা ঝুলিয়ে রেখে খাটের উপর পা ঝুলিয়ে বসল সুব্রত, জিজ্ঞেস করল বথা?

বথা নোটিশটা আর পিছিয়ে রেখো না, চল, কালই রেজিষ্ট্রারের অফিসে গিয়ে নোটিশ সই করে আসি, পনেরো দিন আগে নোটিশ দিতে হয় না?

হাঁ, কাল? দাঁড়াও, সরু গোঁফে আঙুল বুলিয়ে নিল সে, দাঁড়াল, দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ, সোম, মঙ্গল, বুধ—এ ক'টা দিন অফিসে কাজ থাকবে খুব, বৃহস্পতিবার কর, কেমন? তুমি দুপুরবেলা বেরুতে পারবে ত—ইউনিভার্সিটি থেকে?

স্বচ্ছন্দে। সোজা হয়ে বসল বাসন্তী।

তা হলে ঐ কথা থাকল।

থাকল।

একটার সময় গ্রেট ইস্টার্ণ হোটেলের নিচে অপেক্ষা করবে, ওখান থেকে যাওয়া যাবে।

ঠিক একটা কিন্তু।

একটা। সুব্রত আবার বসল খাটে, একটা সিগারেট ধরাল, এবারে সে হাত-ঘড়িটা খুলে রাখল।

সময় কত জিজ্ঞেস করতে গিয়ে সামলে নিল বাসন্তী, আর দরকার কি সময়ের হিসাব নিয়ে?

বড় রাস্তায় একটা বাস দৌড়ে গেল, আবার সব চুপচাপ, জানালা দিয়ে এলোমেলো হাওয়া আসছে, বাইরে গাছের পাতার শব্দ! বাসন্তী আবার হেলান দিয়ে বসল, মাথার ওপর দুটো হাত তুলে দিয়ে, নিঃশ্বাসের সঙ্গে বুকটা তার উঠছে-নামছে, শরীরে আবেশ ঘনিয়ে এল। দেয়ালের দিকে তাকিয়েও বুঝতে পারল সে, সুব্রতর দৃষ্টি কোথায় আবদ্ধ হয়ে আছে। শুধু সে সোজা হয়ে বসল না, বুকের আঁচল দিল না বিন্যস্ত করে। দূরে কোথাও একটা কুকুর চীৎকার করে উঠল, ক্ষুধার চীৎকার হয়ত, কিংবা ভয়ের স্বপ্ন দেখেছে। হঠাৎ মনে হওয়া বিচিত্র নয়, রাত অনেক, কিন্তু ক'টা হবে? হয়ত পৌনে আটটা কিংবা আটটা। কিন্তু আজকের দিনে অন্ততঃ রাত্রি কতক্ষণ হল, তা নিয়ে মাথা ঘামাবে না সে।

সুব্রত সিগারেট টানছে, বলল, লাইব্রেরী থেকে একটা বই বদলে আনার দরকার ছিল, রাত্রে পড়বার নেই কিছু। কিন্তু বাসন্তী কোনো সন্তোষজনক মন্তব্য করল না।

আরো কয়েকটা টান দিয়ে সিগারেটের টুকরোটা সে ছুঁড়ে ফেলল জানালার বাইরে।

অন্য দিন কত অজস্র কথা বলেছে তারা। অর্থহীন, যুক্তিহীন কত কথা। ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবার পরও কত জিজ্ঞাসা মগজের মধ্যে ঝড় তুলেছে, কত নূতন কথা দানা বেঁধেছে; কিন্তু আজ তাদের হল কি? কোথায় হারাল কথার স্রোত?

সিগারেটের প্যাকেটটা নাড়াচাড়া করতে লাগল সুব্রত, দরজার দিকে তাকাল কয়েক বার। বাসন্তী তেমনি বসে আছে হাত তুলে, হয়ত বাস্তবিকই কোনো কথা বলবার প্রয়োজন বোধ করছে না সে।

চায়ের পেয়ালা নিয়ে নন্দ ঘরে ঢুকতে সুব্রত বলল, বাঁচালে। বাসন্তী বসল সোজা হয়ে। নন্দর হাত থেকে পেয়ালা নিয়ে সুব্রত বলল, নাও।

নন্দ বেরিয়ে গিয়ে আবার এল ঘরের মধ্যে, দু'হাতে আরও দুটি প্লেট, ওমলেট।

সুব্রত হাসল, এর মধ্যে কখন এত কাণ্ড করলে নন্দ?

এবারে নন্দও একটু হাসল, অনেকগুলি দাঁত নেই তার।

খেতে খেতে সুব্রত জিজ্ঞেস করল, দর্জির দোকানে কি করছিলে তুমি?

তুমি দেখতে পেয়েছিলে?

পাব না? তোমাকে যে দেখতে পাবে না, বুঝতে হবে তার চোখের দোষ আছে।

বাসন্তী হেসে উঠল, আর যে-বাতাসটা জানালা পর্যন্ত এসে সংকোচে থেমে যাচ্ছিল বার বার, এবারে অবলীলাক্রমে ঘরে এসে ঢুকল, সব কিছুই স্পর্শ করল, বাসন্তীর কানের কাছে স্খলিত চুলের গোছা পর্যন্ত, এমন কি তার বুকের বসন পর্যন্ত!

একটা জামা করতে বললাম, কি করব বল, ঢুকে পড়েছি হঠাৎ। বাড়ির বারান্দা থেকে রাস্তা দেখা যায় না। তুমি না বলেছিলে, লক্ষ্ণৌ থেকে ব্রাউজের কাপড় আনিয়ে দেবে—ওখানে তোমাদের ব্রাঞ্চ-অফিসের কাঁকে বলে ?

দেবো, নিশ্চয়ই দেবো, ভুলিনি।

চা ওমলেট শেষ হয়ে গেল।

নন্দ এসে প্লেট-পেয়ালা তুলে নিল, সুব্রত বলল, একটা কাজ করবে নন্দ ?

নন্দ তাকাল।

টেবিলের উপর ঐ যে বইটা আছে—ফেরৎ দিয়ে আর একটা বই নিয়ে আসবে ? বইয়ের কথা আমার বলা আছে।

প্লেটের সংগে বইটাও তুলে নিল নন্দ।

লাইব্রেরী কত দূর ? জিজ্ঞাসা করল বাসন্তী।

এই ত কাছেই। দেড় মাইল পথ।

আর একখানি বাস দৌড়ে গেল বড় রাস্তা দিয়ে, সেই কুকুরটা আবার চীৎকার করে উঠল।

দরজায় শব্দ হল, নন্দ বেরিয়ে গেল। সুব্রত বলল, দাঁড়াও, দরজাটা বন্ধ করে আসি।

সুব্রত দরজা বন্ধ করল, লণ্ঠনটা নিবিয়ে দিয়ে আবার ঘরে এল সে। বাসন্তী ততক্ষণে তার আঁচলটা গুছিয়ে নিয়েছে, চুলের কাঁটাগুলি গুঁজে দিয়েছে খোঁপায়।

সিগারেটের প্যাকেটটা তুলে নিল সুব্রত, আবার সরিয়ে রাখল, কোলের উপর একটা বালিশ টেনে বলল, দেখছ ত কেমন নির্জন, কারুর গলার শব্দ পর্য্যন্ত শোনা যাচ্ছে না। এত নির্জন যে, গা শির-শির করে।

গা শির-শির করে ? কেন ? এস এখানে এস, পাশে।

এখানে বেশ বসেছি।

এখানে আরও ভাল বসবে বালিশে হেলান দিয়ে, উঠে এস।

না।

না ত না। সিগারেটের প্যাকেটটা আবার তুলে নিল সুব্রত। মুখ ফিরিয়ে রইল দরজার দিকে, একটা সিগারেট বার করে প্যাকেটটা ছুঁড়ে রাখল টেবিলের উপর। লণ্ঠনের আলোটা একবার দপ করে উঠল।

তেল নেই বোধ হয়। বলল বাসন্তী, শরীরটাকে আবার সোজা করল সে।

তাই হবে। উত্তর দিল সুব্রত।

একটা পায়ের উপর আর এক পা তুলে দিল বাসন্তী, হাঁটুর উপর সাড়ির প্রান্তটা টান করে দিল।

সেদিকে একবার তাকিয়ে সুব্রত বলল, লণ্ঠনটা নিবেও যেতে পারে, তাহলে অন্ধকারে তোমার গা আরও শির-শির করবে, তার চাইতে চল তোমায় পৌঁছে দিই যেখানে অনেক আলো আর অনেক লোক। ওঠবার একটা ভঙ্গি করল সে।

কিন্তু এবার আগেই বাসন্তী দাঁড়িয়ে পড়ল, বসল এসে খাটের উপর সুব্রতর গা ঘেঁষে। কথায় কথায় রাগ, ঘর করবে কি করে ? হাসল বাসন্তী, একটু বেশি করেই হাসল, সাদা দাঁতের সারি তার ঝকঝক করে উঠল।

বালিশটা পাশে নামিয়ে রাখল সুব্রত, সিগারেটটা মাটিতে পড়ে যেতে দিল, রাগ করিনি, তুমি অতিথি, অতিথির সামান্যতম অসুবিধার কথা ভাবতে হবে বৈ কি।

বাসন্তী ঝুঁকে পড়ল তার গায়ের উপর, ইতিমধ্যে সুব্রত আরও ঘন হয়ে এসেছে, বাসন্তী একবার খোলা দরজার দিকে তাকাল, আর একবার জানালায় বাইরে অন্ধকারের দিকে।

সুব্রত তার পিঠে হাত রাখল, তোমার দর্জিটা চমৎকার জামা তৈরী করে, কিন্তু পিছন দিকে জামায় হুক কেন ?

ওতে সুবিধে আছে, সামনে একটুও বাড়তি কাপড় থাকে না, জামা গায়ে ভাল ফিট করে।

সুব্রত ততক্ষণে তিন আঙুলের সাহায্যে একটা হুক খুলে ফেলেছে। ডান হাত দিয়ে সে বাসন্তীর মুখটা টেনে আনল নিজের মুখের উপর।

বাসন্তী হাত দিয়ে ওর মুখটা সরিয়ে দেবার চেষ্টা করল, কি হচ্ছে !

নূতন কি হবে আর, বল ? ওর গালের উপরেই কথাগুলি বলল সুব্রত ; তার দুটি হাত বেষ্টন করল বাসন্তীকে !

না, ছেড়ে দাও। বলল বাসন্তী, বাস্তবিক চেষ্টা করল সে নিজেকে মুক্ত করবার, আর আজ এই প্রথম সুব্রতর দুটো হাতের শক্তি দেখে বিস্মিত হয়ে গেল সে, ছেড়ে দাও, লোকটা এসে পড়বে এখুনি। গলার শব্দটা নিজের কানেই মিনতির মত শোনাল।

না, আসবে না।

কিন্তু—

বাসন্তী কথা শেষ করতে পারল না, আর একখানি মুখের বাধা পেল, একটি অস্ফুট কথা পর্য্যন্ত উচ্চারিত হল না।

আর ঠিক সেই মুহূর্ত্তে বাতিটা তিন বার দপ-দপ করে নিবে গেল।

চল্লিশ মিনিট পরে দরজার কড়া নড়ল। সুব্রত ইজিচেয়ারে গা ডুবিয়ে সিগারেট টানছিল, গেঞ্জিটা পায়ের কাছে। বাসন্তীর হয়ত একটু তন্দ্রা আসছিল, হয়ত বাড়ি ফিরবার তাগিদটা আর তেমন অনুভব করছিল না ; শরীরটাকে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বিছানায় উঠে বসল সে, জামাটা ক্ষিপ্র হাতে গায়ে দিল, সাড়িটাকে নিল গুছিয়ে।

আবার কড়া নড়ল।

সুব্রত দাঁড়াল, নিবানো লণ্ঠনটা তুলে নিয়ে পাশের ঘরে এল সে, চৌকাঠে জ্বলা বাতিটা এনে সে রাখল টেবিলের উপর, সলতেটা বাড়িয়ে দিল, একবার তাকাল বাসন্তীর দিকে, বাসন্তী বসেছে পা ঝুলিয়ে।

দরজা খুলল সুব্রত। নন্দ বলছে, আজ রোববার, লাইব্রেরী বন্ধ !

আজ রবিবার, কি আশ্চর্য ! আমার মনেই ছিল না দেখ ত ! কত কষ্ট দিলাম তোমায়, লণ্ঠনটায় তেল নেই !

নন্দর পায়ের শব্দ।

সুব্রত এল। বাসন্তী বলল, চল ; দেখ ত একবার কটা বাজল !

টেবিলের উপর হাত-ঘড়ি দেখল সুব্রত, বলল, দশটা বাজতে পাঁচ মিনিট বাকি।

ইস। বাসন্তী ঝটকা দিয়ে নেমে পড়ল খাট থেকে, বাস পাব ত?

হ্যাঁ, সোয়া দশটায় শেষ বাস। চল। গেঞ্জিটা নিয়ে গায়ে দিল সুব্রত, লম্বা-ঝুলের পাঞ্জাবীটা পরল, চটিটা পায়ে দিল।

জামার হুক ক'টা এঁটে দেবে?

যত্ন করে জামায় হুক আটকাল সুব্রত।

বাইরে আরও অন্ধকার, কোনো বাড়িতেই আলো দেখা যাচ্ছে না, গাছের শাখা দুলছে নিঃসঙ্গ বাতাসের ধাক্কায়।

বাস-ষ্ট্যাণ্ডে বেশিক্ষণ দাঁড়াতে হল না তাদের। একটা বাস আসছে।

তা হলে বৃহস্পতিবার একটায়। বাসন্তী স্মরণ করিয়ে দিল।

নিশ্চয়ই। যেতে পারবে ত একা?

পারব।

বাস দাঁড়াতে বাসন্তী উঠে পড়ল, সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে হাত নাড়ল, সুব্রত হাত নেড়ে জবাব দিল। প্রায় ফাঁকা বাস, বাসন্তী বসে পড়ল যে-কোনো একটা আসনে, যাত্রীরা সবাই এক সংগে তাকাল তার দিকে, তার সমস্ত স্নায়ুতে তখনও রিমঝিম মন্দিরা বাজছে। বাসটা ভালো করে দৌড় করবার আগে সে আর একবার তাকাল রাস্তায়, অন্ধকার চার দিক। সিঁড়ির কাছে হাতল ধরে দাঁড়িয়ে সুব্রত, জীবনের মতই জীবন্ত। হাসল সে, বাসন্তীর পাশে এসে বসল।

বাসন্তী খুশি হয়েছে, হাসির আবেশে তার সারা মুখ মধুর হয়ে উঠল।

কি হল? বাড়ি গেলে না?

পয়সার জন্তে পকেটে হাত দিল সুব্রত, তোমাকে একা যেতে দিতে পারলাম কৈ?

বাসন্তী সুব্রতর একটা বলিষ্ঠ বাহু জড়িয়ে ধরল।

ফেরবার বাস পাবে ত?

খুব, এগারোটায় শেষ বাস।

শ্যামবাজারে সুব্রত বাসন্তীকে আবার বাসে উঠিয়ে দিল তার হাত ধরে। বাস ছাড়বার পর যতক্ষণ বাসন্তীকে দেখা যায়—ততক্ষণ হাত নাড়ল।

ঠিক পৌণে এগারোটায় বাড়ির কাছে বাস থেকে নামল বাসন্তী। একটা রিক্সা তাকে দেখে থামল, ঘণ্টা বাজাল কয়েক বার; পাঁচ সাত মিনিটের পথ, হেঁটেই যাবে সে, কেমন যেন ঘুমের আবেশ সমস্ত শরীরে।

বাড়ির সরু রাস্তাটায় পা দিয়েই সে দেখতে পেল "মডার্ণ টেলারিং হাউসের" ছোট ঘরটায় তখনও আলো জ্বলছে; ইচ্ছে করেই রাস্তার এ পাশে এল সে।

ছোট টেবিলটার উপর দুটো কনুই রেখে হাতের মধ্যে চিবুক ডুবিয়ে রাখাল রাস্তার দিকেই তাকিয়ে ছিল, বাসন্তীকে দেখে সোজা হয়ে বসল, আর সাহস করে একটুখানি হাসল। বাসন্তীকে দাঁড়াতে হল দোকানের সামনে, আপনাদের সমস্ত দোকান বন্ধ। আপনি এখনও দোকান বন্ধ করেন নি?

এতটা আশা করেনি রাখাল, চেয়ার থেকে দাঁড়িয়ে পড়ল সে, এই এবার বন্ধ করব আর কি।

এই অসময়েও একটু হাসি বা দুটো কথা বিতরণ করতে আজ একটুকু কার্পণ্য বোধ করল না বাসন্তী, আপনি কি দোকানেই থাকেন না কি?

হ্যাঁ, ভিতর দিকে একটু ঘর মত আছে।

আর খাওয়া দাওয়া?

হোটেলে খাই।

রিক্সায় কেউ একজন আসছে, বাসন্তী ভালো করে দেখবার চেষ্টা করল, দাদা নয় ত? দাদারও ফেরবার সময় হয়েছে। রিক্সা কাছে এল, না, অন্ত কেউ। রাখালের দিকে তাকিয়ে সে বলল, ও! আচ্ছা।

রাখাল অযথা নমস্কার করবার জন্তে হাত তুলছিল, কিন্তু বাসন্তী ততক্ষণে পিছন ফিরেছে, অন্ধকার রাস্তায় হিল-উঁচু জুতোর খুট খুট শব্দ শুধু। রাখাল দরজার কাছে এসে দাঁড়াল।

কড়াটা আস্তে আস্তে নাড়ল বাসন্তী, বাবার ঘুম ভেঙে যেতে পারে।

বাসন্তীর মা দরজা খুলে দিল।

লেকচারে মন দিতে পারল না বাসন্তী। সাড়ে বারোটায় ক্লাস শেষ হবে, তার অনেক আগেই উসখুস করতে লাগল সে, ক্লাসটায় না এলেই হত।

ক্লাশ শেষ হবার সংগে সংগেই বই গুছিয়ে নিয়ে ছুটল সে। রাস্তাটা পার হয়ে বাসের জন্তে অপেক্ষা করতে লাগল। প্রয়োজন যত বেশি, বাস আসবে তত দেরিতে, এ ত জানা কথা। খালি একটা ট্যাক্সীকে হাতের ইসারায় থামিয়ে উঠে পড়ল সে, গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেল।

গাড়ির ভিড় কম, এক-দৌড়ে ট্যাক্সী এসে থামল হোটেলের সামনে। ভাড়া মিটিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল সে, একটি ফিরিঙ্গি মেয়ের হাত-ঘড়ির দিকে নজর পড়ল তার, একটা বাজতে পাঁচ মিনিট বাকি এখনও, নিশ্চিন্ত হল সে, হৃৎপিণ্ডের গতি স্বাভাবিক হয়ে এল।

ভককুলীদের একটা মিছিল গেল। এয়ারওয়েজ-এর গাড়ি এসে থামল হোটেলের সামনে, কয়েক জন যাত্রী নামল, সামান্ত একটু সোরগোল; আবার সব চুপচাপ। যতগুলি ট্রাম, বাস, ট্যাক্সী আসছে—কোনোটাই বাসন্তীর দৃষ্টি এড়াল না, চোখ তার জ্বালা করতে লাগল, বইগুলি কতবার যে হাত বদলাল—তার আর ইয়ত্তা নেই। কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে সে ওয়েষ্ট এণ্ড-এর ঘড়িটা দেখে এল, পৌণে দু'টো। সুব্রতর দেরি হবার কি-ই যে কারণ ঘটতে পারে বুঝে উঠতে পারল না বাসন্তী, রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস থেকে এটুকু পথ যদি সে হেঁটেও আসে, তাহলেও পনেরো মিনিটের বেশি লাগতে পারে না। অফিসে জরুরি কাজ? সম্ভব নয়। নামবার সময় সিঁড়িতে পা হড়কে গেছে? আসবার সময় বেবি ট্যাক্সী ল্যাম্প পোষ্টে ধাক্কা মেরেছে? রুমাল দিয়ে মুখ মুছল সে, হাতের নিচে ঘাম ঝরছে, মাথার নিচে হাঁটুর পাশ দিয়ে ঘামের ফোঁটা গড়িয়ে গেল, বার বার ঘষার ফলে মুখ থেকে স্নো আর পাউডারের প্রলেপ

অনেকক্ষণ উঠে গেছে, মুখটা একবার আয়নায় দেখে নিতে পারলে হত, কিন্তু সে ব্যাগে আয়না রাখে না, পাউডার রাখে না। ঠোঁটে একটু পালিশ লাগিয়েছিল, এতক্ষণে তাও বোধ হয় নষ্ট হয়ে গেছে।

হঠাৎ গায়ের একেবারে কাছে একটা মোটর থামতে সে একেবারে আমূল চমকে উঠল। দরজা খুলে নামল একজন মিলিটারী অফিসার, কাঁধে অশোক স্তম্ভ আর দুটো ফুল, তাকে দেখে চোখ নাচাল, সে খানিকটা থুথু ফেলল ফুটপাতে। সমর-কর্মচারী লম্বা পা ফেলে হোটেলে ঢুকে পড়ল।

এবারে আর এক জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল না বাসন্তী। পায়চারী করতে লাগল অনেকখানি জায়গায়। এমন কি লালদীঘির মাঝামাঝি পর্যন্ত কয়েক বার এল সে; আবার ঘড়ি দেখল, আড়াইটা।

যখন সে বুঝল সুব্রত আজ আর এল না বা আসতে পারল না—তখন তার উত্তেজনা আস্তে আস্তে কমে এল। না, বাস ধরবে না সে, আস্তে আস্তে ক্লান্ত পায়ে এ্যাসপ্লানাডে এল; একটা রেস্তোরাঁয় এসে প্রথমে ঠাণ্ডা দু'গ্লাস জল পান করল; তারপর ভারি রকমের একটা খাবারের হুকুম দিল সে। লোকটা চলে যাবার পর পর্দাটা ভাল করে টেনে দিয়ে পায়ের আঙুলগুলোয় হাত বুলাতে লাগল।

খাবারটা শেষ করবার পর মোটামুটি স্বাভাবিক হয়ে এল, গরম কফিটা পেটে যাবার পর আর কোনোই ক্লান্তি রইল না তার, সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠল। অতক্ষণ গরমে দাঁড়িয়ে মনটা কেমন যেন ভোঁতা হয়ে গিয়েছিল, এবারে আস্তে আস্তে দেখা দিল দুশ্চিন্তা! নিশ্চয়ই কোনো দুর্ঘটনা ঘটেছে। হয়ত হাসপাতালের এমার্জেন্সী ওয়ার্ডে ঘোলাটে চোখে তাকেই খুঁজছে! দাঁড়াল বাসন্তী, বাইরে এল, ম্যানেজারের পিছনে ক্রেতাদের জন্তে আলাদা টেলিফোন। ডায়াল ঘুরিয়ে দুরু-দুরু বুকে অপেক্ষা করতে লাগল সে।

না, মেডিক্যাল কলেজে একটা থেকে দুটোর মধ্যে কোনো এ্যাকসিডেন্ট কেস আসেনি। শম্ভুনাথে একটি বারো বছরের ছেলেকে আনা হয়েছে, দোতলা থেকে রাস্তায় পড়ে গেছে।

নিঃশ্বাসটা ভারি হয়ে এল বাসন্তীর, বাঁচবে?

টেলিফোনের অন্ত প্রান্ত থেকে হাসির সঙ্গে শোনা গেল, বাঁচবে মানে? বলতে গেলে কিছুই নয়, ডান হাতের কব্জীতে প্ল্যাস্টার করতে হবে শুধু।

প্রেসিডেন্সি জেনারেল থেকে খবর পাওয়া গেল, নো, নান; এ্যান ওল্ড উওম্যান ওয়াজ ব্রট ইন—বাট সী ইজ অলরেডি ডেড।

ও থ্যাংকস্‌।

সুব্রতর অফিসে টেলিফোন করতে তার ভরসা হল না, অফিসের প্রায় সবাই এ-ব্যাপারটা জানে, এবং এ-নিয়ে সুব্রতকে নানা রকম ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে।

অতএব বাড়ি ফিরল সে; ছ'টা নাগাদ সুব্রত নিশ্চয়ই আসবে তাদের বাড়ি।

কিন্তু রাত ন'টা যখন বাজল, তখন বাসন্তী বুঝতে পারল, সুব্রত আর আসবে না। তাহলে নিশ্চয়ই জ্বরে পড়ে আছে, কি আশ্চর্য! এই সহজ কথাটা একবারও কি না মনে হয়নি তার! তখুনি চিঠি দিল সে, একটা দমদমে আর একটা অফিসের ঠিকানায়। নিজের হাতে ফেলে দিয়ে এল ডাকবাক্সে।

কিন্তু রবিবারের মধ্যেও কোনো জবাব এল না। আবার চিন্তা বাড়তে লাগল তার, পড়ায় মন দিতে পারল না, অথচ পরীক্ষারও আর খুব বেশি দেরি নেই। দিন সাতেক পরে যখন সে বুঝতে পারল চিঠির জবাব পাবার কোনো সম্ভাবনা নেই, অফিসে টেলিফোন করল সে, সুব্রত ছুটি নিয়েছে এক মাসের, না, মেডিক্যাল লীভ নয়।

আবার চিঠি লিখল সে। কিন্তু পাঠাবে কা'কে দিয়ে? মডার্ন টেলারিং হাউসে গেল সে।

আপনার জামাটা হয়ে গেছে, একবার দেখবেন না কি গায়ে দিয়ে?

না, এখন নয়, আমার একটা কাজ করে দিতে পারবেন?

বলুন না, কেন পারব না? রাখাল চেয়ারটা ঠেলে দিয়ে দাঁড়াল, বসুন না।

আপনি বসুন। হাতেই ছিল চিঠিটা, এই চিঠিটা নিয়ে একবার দমদম যেতে পারবেন? এই যে। এই ঠিকানা, আর কারুর হাতে দেবেন না, নিজে দেখা করে জবাব নিয়ে আসবেন, কিন্তু দোকান ছেড়ে আপনি যাবেন কেমন করে?

বারোটা থেকে চারটে পর্যন্ত দোকান ত বন্ধ রাখি আমি, কোনোই অসুবিধে হবে না। চিঠিটা পকেটে রাখল রাখাল।

বাসন্তী একটা টাকা রাখল টেবিলের উপর।

না, না, এ-সব কি? তাহলে কিন্তু আমি যাব না, না, এ সব করবেন না।

অগত্যা টাকাটা তুলে নিল বাসন্তী।

একটায় খেতে যাব, তারপরই বেরিয়ে পড়ব, আপনি চারটে নাগাদ আসবেন, আমি ঠিক জবাব নিয়ে আসব।

ঠিক চারটের সময় বাসন্তী এল।

চিঠিটা ফেরৎ দিল রাখাল, খামটি সম্পূর্ণ অক্ষত। ভদ্রলোক দমদমে নেই, বাইরে গেছেন বেড়াতে—দার্জিলিং।

খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল বাসন্তী। টেবিলের কোণায় হাত রেখে, আর ভয়ানক আশ্চর্য হয়ে গেল যে তার হাত কাঁপছে দেখে।

তবু সে একটু হেসে বলল, অনেক ধন্যবাদ, কত 'কষ্ট দিলাম আপনাকে—দুপুর রোদে।

না, কিছুই কষ্ট নয়।

বাসন্তী ফুটপাতে নেমে এল।

রাখাল একটু বিস্মিত হল। ভেবেছিল, রাস্তায় নামবার আগে একবার অন্তত সে তাকাবে।

দিন সাতেক বাসন্তী বাড়িতে বসে রইল চুপচাপ, তারপর আবার ক্লাশ করতে লাগল।

এক মাস পরে সে সুব্রতর অফিসে টেলিফোন করল। না, সুব্রত অফিসে নেই।

তাহলে দত্ত-বাবুকে যেন একবার টেলিফোনটা ধরতে বলে।

রুদ্ধনিঃশ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগল বাসন্তী।

হ্যালো, আমি দত্ত কথা বলছি।

আমি বাসন্তী, সুব্রত বাবু একদিন আলাপ করিয়ে দিয়েছিল আপনার সংগে, মনে আছে?

নিশ্চয়! আপনাকে মনে-না-রাখা খুব সহজ ভাবছেন না কি আপনি? সুব্রতকে আবার বাবু কেন? ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল কি? তাহলে আমার একটা প্রস্তাব ছিল, যদি—

শুনুন। কোথায় সুব্রত?

লক্ষ্ণৌ।

চুপচাপ। কয়েকটা অস্পষ্ট শব্দ কানে এল বাসন্তীর, তার পর টাইপ-রাইটারের খট খট আওয়াজ আর ব্যস্ত গলার কথাবার্তা।

আপনি আছেন? দত্ত জিজ্ঞেস করল।

আছি। বলল বাসন্তী।

দার্জিলিংএ যাবার আগে ও জেনে গিয়েছিল, লক্ষ্ণৌ ব্রাঞ্চ-অফিসে একজন বদলি হবার কথা, ম্যানেজারকে বলেই রেখেছিল, ছুটি ফুরোবার আগেই ওকে তার করা হয়েছিল, দার্জিলিং থেকে ও লক্ষ্ণৌতে জয়েন করেছে, কলকাতা আসেনি। কিন্তু ব্যাপারটা কি?

বাসন্তী খুব—খুব আস্তে রিসিভারটা নামিয়ে রাখল।

পার্ক স্ট্রীটে ডাক্তার চৌধুরীর চেম্বার আর ক্লিনিক। ঠাণ্ডা, সাজানো বসবার ঘর, বাসন্তী একটা মাসিক পত্রিকার পাতা ওল্টাচ্ছিল। একটি মধ্যবয়স্কা পার্শি মহিলা আর একটি ফিরিঙ্গি যুবতী চুপচাপ অপেক্ষা করছিল কোলের উপর হাত রেখে। বাসন্তী লক্ষ্য করল, ফিরিঙ্গি মেয়েটির ঢিলে ব্লাউজটা পেটের উপর প্রায় আধ হাত উঁচু হয়ে রয়েছে, সোফায় মাথা রেখে বসেছে সে, ক্লান্ত, বিধ্বস্ত।

বোরখা-ঢাকা একটি মুসলমান-স্ত্রীলোক বেরিয়ে এল ডাক্তারের চেম্বার থেকে। মোটা, পরিষ্কার গলায় হাঁক এল, মিসেস দারুওয়ালা!

পার্শি মহিলা ভিতরে গেল।

একটা ছোট গল্পে মন দেবার চেষ্টা করল বাসন্তী। কয়েকটা পংক্তি পড়ে ফেলল সে, আবার পড়ল নূতন করে, কিছুই মাথায় ঢুকছে না তার, পত্রিকা রেখে দিল।

পার্শি রমণীটি চলে যাবার পর আবার ডাক এল, মিসেস হোয়াইট!

পাঁচ মিনিট পরে মিসেস হোয়াইট-এর পিছনে পুরু কালো ফ্রেমের চশমা, ছোট-করে-ছাঁটা কাঁচা-পাকা চুল, নিরেট পাথরের মত শক্ত চোয়ালের ডাক্তার চৌধুরী বেরিয়ে এল, এ্যাপেন্টমেন্ট ছিল?

বাসন্তীর হৃৎপিণ্ডে একটা ধাক্কা লাগল, দাঁড়িয়ে বলল, না।

চকিতে একবার তাকিয়ে ডাক্তার বলল, আসুন। ডাক্তারের পিছনে চেম্বারে ঢুকল সে। টেবিলের উপর স্টেথেসকোপ, ব্লাডপ্রেশার মাপবার যন্ত্র, টেলিফোন, লেখবার প্যাড, একটি কলম। হ্যাঙ্গারে ডাক্তারের কোট ঝুলছে, দেয়ালের কাছে একটা ছোট আলমিরাতে সারি সারি বই। পাখা ঘুরছে।

বসুন। ডাক্তার বসল তার চেয়ারে। বাসন্তী বসল টেবিলের অন্য দিকে—মেরুদণ্ড সোজা করে। বলুন! ডাক্তার তাকাল, কে আপনাকে পাঠিয়েছে?

বাসন্তী ঢোক গিলল, গলার কাছে কি যেন আটকাচ্ছে বার বার। কেউ পাঠায়নি, আমি নিজে এসেছি,—টেলিফোন ডাইরেকটরী দেখে,—ঠিক করলাম আপনার কাছেই আসব। চশমার ভিতর দিয়ে বাসন্তী দেখতে পেল ডাক্তারের উজ্জ্বল, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তার মুখে।

ডাক্তার চৌধুরী একটু হাসল, বাসন্তী তার শক্ত, সাদা দাঁত দেখতে পেল কয়েকটি।

কি দরকার?

বাসন্তী বুঝল, তার কপাল ঘামছে কিন্তু ব্যাগ থেকে রুমালটা বার করতে পারল না।

দেখুন, এখন—বাসন্তী থামল, ডান দিকে পর্দাটা পাখার হাওয়ায় দুলছে, তার ফাঁক দিয়ে লম্বা করিডোর চোখে পড়ল তার, মনের মধ্যে ভেসে উঠল ছোট ছোট ঘর, লোহার খাট, সাদা দেওয়াল—

অনেকখানি সাহস সঞ্চয় করে বলে ফেলল সে, এখন আমি ছেলেপুলে চাই না, অনেক অসুবিধে।

কিসে অসুবিধে? কলমটা তুলে নিয়ে মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগল ডাক্তার।

সামনেই আমার এম-এ পরীক্ষা, একটা স্কলারশিপের জন্তে দরখাস্ত করেছি, কমিটি বলেছে এম-এতে ভাল রেজাল্ট করতে পারলে স্কলারশিপটা আমি পেতে পারি, আমি পাব, বুঝলেন ডাক্তারবাবু! আমার চাইতে ভাল ক্যাণ্ডিডেট আর কেউ নেই, রেজাল্ট বেরোবার সংগে সংগেই আমায় বিলেতের জাহাজ ধরতে হবে। তাই, বুঝলেন? বাসন্তী নিজেই অবাক হয়ে গেল এমন সহজ ভাবে কথাগুলি বলতে পেরে।

টেলিফোন বেজে উঠল, টেলিফোনে কথা বলল ডাক্তার দু'মিনিট, তারপর তাকাল বাসন্তীর দিকে, ভাল করেই তাকাতে লাগল।

না, আমার মাথায় সিঁদুর নেই, বাসন্তী বলল তাড়াতাড়ি, আমরা খৃষ্টান।

ক'টা কোর্স মিস করেছেন?

এক মুহূর্ত ভেবে বাসন্তী বলল, তিনটে।

কিন্তু তার আগে আপনার স্বামীকে একটা ফর্ম সই করতে হবে।

কিসের ফর্ম? বাসন্তী আবার ঢোক গিলল, আবার ঘেমে উঠল তার কপাল।

এই—আপনার স্বামীর আপত্তি নেই, তিনি সমস্ত দায়িত্ব নিচ্ছেন।

টেলিফোনটা আবার বেজে উঠল দু'বার, কিন্তু থেমে গেল; হাত বাড়িয়েও হাতটা গুটিয়ে নিল ডাক্তার।

সব জায়গায় কি এই নিয়ম?

হ্যাঁ, সব জায়গায়, তবে কলকাতা সহরে shady জায়গার অভাব নেই, সে-সব জায়গায় আপনি যেতে পারেন, কিন্তু আমি আপনাকে মনে রাখতে বলব, ডাক্তার হাত মেলে ধরল টেবিলের উপর, আঙুল গুণে গুণে বলল, পয়লা নম্বর এ্যাবরসানটা ক্রিমিন্যাল, দ্বিতীয় নম্বর হাতুড়ে ডাক্তার, আপনার জীবনের পরোয়া তারা করবে না; তৃতীয়—অনেক টাকা নেবে ওরা। চতুর্থ—জানাজানি হবার সম্ভাবনা; পুলিশ কেস হতে পারে, এবং তারও পরে, বুড়ো আঙুলটা ধরে ডাক্তার বলল, ব্ল্যাকমেল; কেন স্বামীকে দিয়ে একটা সহজ বিবৃতি দিতে আপনার অসুবিধে কি?

না, অসুবিধে নেই।

তবে তাই করুন।

বাসন্তী উঠল, হাত তুলে নমস্কার করল।

'মডার্ণ টেলারিং হাউস'-এ তখনও বাতি জ্বলেনি।

বাসন্তীকে দেখে বাতিটা জ্বেলে দিল রাখাল, বলল, জামাটা একবার দেখবেন .নাকি গায়ে দিয়ে? ভিতরে জায়গা আছে, অসুবিধে হবে না।

এখন থাক, পরে হবে, আপনার সংগে একটু কথা ছিল।

বলুন না? বসুন, চেয়ারটায়। চেয়ারটা ঠেলে দিল রাখাল।

আপনি?

আমি বসছি, এই যে চৌকি রয়েছে। কিন্তু টেবিলে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েই রইল রাখাল।

বাসন্তী বসল। সব কথাই আস্তে আস্তে খুলে বলল সে। পারবেন আমায় এই সাহায্যটুকু করতে? আপত্তি আছে কিছু?

ছোট একটি নিঃশ্বাস ফেলল রাখাল।

কাগজের উপর কলমটা ধরে ডাক্তার বলল, বলুন, নাম বলুন।

রাখাল বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে ডাক্তারের দিকে একবার তাকাল, আর একবার বাসন্তীর দিকে, বাসন্তী হাসির আভায় উৎসাহিত করল তাকে।

রাখালচন্দ্র দস্তিদার।

ডাক্তার নাম লিখল।

ঠিকানা?

ঠিকানা বলল রাখাল।

পেশা?

দর্জি।

বয়স?

তিরিশ।

স্ত্রীর নাম?

রাখাল দস্তিদার ভেঙ্গে পড়ল টেবিলের উপর।

বাসন্তী দস্তিদার। বলল বাসন্তী।

নিন এখানে সই করুন। কাগজটা এগিয়ে দিল ডাক্তার।

সই করল রাখাল।

কাল আসবেন, সকাল দশটায়, পাঁচ সাত দিন থাকতে হবে এখানে।

আচ্ছা।

রাস্তায় রাখাল জিজ্ঞেস করল, কাল কি আমায়ও আসতে হবে?

আসতে পারলে ত খুবই ভাল হয়।

হাতের তালু দুটি বার বার জামায় মুছতে লাগল রাখাল।

পরদিন বাড়ির সামনে ট্যাক্সী দাঁড় করিয়ে স্যুটকেস্ আর বিছানা নিয়ে ট্যাক্সীতে উঠে বসল বাসন্তী, সাত দিনের জন্যে মধুপুরে দিদির কাছে বেড়াতে যাবে সে।

রাখালের দোকানের সামনে ট্যাক্সী থামিয়ে স্যুটকেস আর বিছানা নামিয়ে দিল বাসন্তী, রাখাল এদিক-ওদিকে তাকিয়ে জিনিষ দুটো ঢুকিয়ে রাখল তার দোকানে। দোকান বন্ধ করতে দু'মিনিটও লাগল না, ট্যাক্সীতে উঠে বসতে বাসন্তী সরে এল তার গায়ের কাছে।— চলল।

ডাক্তার তাদের দেখে বলল, দশ মিনিট দেরি করে ফেলেছেন, ঠিক সাড়ে দশটায় আমার একটা বড় অপারেশন আছে, আসুন তাড়াতাড়ি।

রাখাল বলল, ভয় নেই, আমি বসে আছি।

ড্রইং রুমের একটা সোফায় গা ডুবিয়ে দিল রাখাল দস্তিদার, হাত-পা তার আস্তে আস্তে অবশ হয়ে আসছে, তাকেই যেন ক্লোরোফরম করা হচ্ছে।

ছ'মাস পরে এক ছুটির দিনে সুব্রতকে দেখা গেল, বাসন্তীদের বাড়ির কড়া নাড়ছে।

বাসন্তী বাড়ি ছিল না, তবে জানতে পারল, একটু এগিয়ে গিয়ে যে দর্জির দোকান—সেখানেই বাসন্তীকে পাওয়া যেতে পারে।

সুব্রত হেসে উঠল, কি সাংঘাতিক ব্লাউজের নেশা মেয়েদের!

কিন্তু সে-দোকান আর নেই, পাশের তিনতলা বাড়িটার নিচের বড় ঘরটায় দর্জির দোকান স্থানান্তরিত হয়েছে। দূর থেকে দোকানের জাঁকজমক দেখে সুব্রত রীতিমত বিস্মিত হয়ে গেল। ঐ নিরীহ, গোবেচারা লোকটাও শেষ পর্যন্ত ভেল্কী দেখিয়ে দিল, কলকাতা সহরে সবই সম্ভব তাহলে!

সারা ঘরটায় মাদুর বিছানো, ঝকঝকে পালিশ-করা আলমিরায় তৈরী-করা সার্ট, প্যান্ট আর ব্লাউজ ঝুলছে, দেয়ালে খান চারেক ছ'ফুট লম্বা আয়না, তাক-বোঝাই কাপড়, মেহগনী পালিশ কাউণ্টারের ওপাশে সেই লোকটা, কিন্তু চেহারার কি আশ্চর্য পরিবর্তন ঘটেছে এই কয় মাসে? ব্যাক-ব্রাশ-করা চুল, পরিষ্কার কামানো গাল, চেহারায় স্বাস্থ্যের দীপ্তি, পরনে স্যানটার ট্রাউজার, গায়ে ফুজী সিল্কের সার্ট। বলল, আসুন, বসুন চেয়ারে। ঘরের অন্য প্রান্তে দু'জন ক্রেতা, একটি ছোকরা তাদের গায়ের মাপ নিচ্ছে আর একজন খাতায় টুকছে সেই মাপ।

সুব্রত লক্ষ্য করল, তার বাঁ দিকে কাঠের পার্টিশানদেয়া ছোট ঘর, বাইরে কাঠের গায়ে লেখা—ম্যানেজার।

এখানে কি একজন—একজন ভদ্রমহিলা এসেছিলেন খানিক আগে? সুব্রত জিজ্ঞেস করলে।

ভদ্রমহিলা ত এখানে সব সময়েই আসছেন? রাখাল তার ব্যাক-ব্রাশ-করা চুলে হাত বুলিয়ে বলল, কার কথা বলছেন ঠিক বুঝতে পারছি না, নামটা বলতে পারেন?

নাম বাসন্তী, এই আপনাদের এই পাড়াতেই থাকেন।

রাখাল পার্টিশান-দেয়া ঘরটা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে একটু জোর গলায় বলল, একটি ভদ্রলোক এসেছেন।

বাসন্তী বেরিয়ে এল; আরও সুন্দর হয়েছে সে, আরও লোভনীয় আরে, সুব্রত যে! কি খবর তোমার? লক্ষ্ণৌ থেকে কবে এলে বোস, বোস! সত্যিই খুব আহ্লাদিত হলাম। তোমার সংগে আলাপ করিয়ে দিই, ইনি রাখাল দস্তিদার, আমার—

বাসন্তীর কপালে সিঁদুর জ্বল-জ্বল করছে।

সেই দর্জিটা না?

ঠিকই মনে আছে দেখছি! আশ্চর্য গুণী লোক কিন্তু, চোখে দেখেই বুকের মাপ বলে দিতে পারে, ফিতের দরকার হয় না সেজন্যে শহরের বিখ্যাত মেয়েরা জামা তৈরী করতে এখানেই আসে সরবৎ খাবে একটু? সিঁড়িটা পার হয়ে তাড়াতাড়ি রাস্তা নামবার সময় প্রচণ্ড হোঁচট খেল সুব্রত। চটির স্ট্রাপ ছিঁড়ে গেল সমস্ত গলিটা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতে হল তাকে।

সতী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

এখনও আধ ঘণ্টা হয়নি—এই ঘর থেকে বিদায় নিয়েছে রেবেকা ব্রাউন। আমার সামনের ছোট টেবিলটার ওপাশে এখনো শুকিয়ে যায়নি তা'র ফেলে-যাওয়া কয়েকটি অশ্রুবিন্দু। অভিনেত্রীর কৃত্রিম চোখের জল ? আমাকে কি ঠকিয়ে গেছে রেবেকা ? জানি না। সাত বছর, হ্যাঁ সাত বছরই হবে—একটা ক্ষণিক ঘটনার মতোই সেকথা আমার অনেক কাজে-ব্যস্ত-মনের কোথায় যেন হারিয়ে গিয়েছিল। আজ আকস্মিক ভাবে চকিত দেখা রেবেকার সঙ্গে আবার দেখা হ'য়ে গেল। আমার মনের দমিত কৌতূহল আর যেন চাপা থাকতে চাইলো না। ওকে নিয়ে এলাম আমার বাসায়। সাত বছর আগে ওরা দু'জনে কৌতূহলের চমক লাগিয়ে নিরুদ্দেশ হয়েছিল হঠাৎ—আজ এত দিন পরে ওদেরই একজনকে কাছে পেয়ে ছেড়ে দিতে মন চাইলো না। মনের গভীরে ঘুমিয়েছিল যে জিজ্ঞাসা—রূপান্তরিতা আজকের রেবেকাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গেই সে যেন হঠাৎ জেগে উঠেছিল। ওকে ডেকে এনেছিলাম বাসায়। জানতে চেয়েছিলাম ওদের দু'জনের সেদিনের রহস্যময় ঘনিষ্ঠতার কথা। রেবেকা আমার কেউ নয়, ভাস্করও কেউ ছিল না আমার। অনায়াসেই সে কথা বলতে অস্বীকার করতে পারতো রেবেকা। কিন্তু অস্বীকার না করে সে সব কথা বলে গেল। আমি মন্ত্রমুগ্ধের মত সে কাহিনী শুনে গেলাম। কিন্তু সেকথা পরে।

প্রান্ত বিহারের শ্যাম-সবুজ সেই সুন্দর স্বাস্থ্যাবাসটির দৃশ্য আজ দীর্ঘ সাত বছর পরে যেন চোখের সামনে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠছে। কর্ম্মব্যস্ত জীবনের সাময়িক অবকাশে বেড়াতে গিয়েছিলাম সেখানে। এক বন্ধুর বাগানবাড়ী ছিল। সুন্দর পটভূমিকার মাঝখানে ছবির মত ছোট্ট বাড়ীটির নাম 'ছায়ানট'। প্রতিদিন সন্ধ্যায় বাড়ীটির পেছনের বাগান থেকে প্রাণভরে উপভোগ করতাম দিনান্তের নৈসর্গিক দৃশ্যাবলী। বাগানের সীমান্ত যেখানে হঠাৎ ঢালু হ'য়ে নেমে গিয়ে মিশেছিল রঞ্জনার শীর্ণ বালুচরে, সেখানে দুটি বেঞ্চি পাতা ছিল। একটি সামনে আর একটি পেছনে। দু'টির মাঝে ব্যবধান ছিল একটি পত্রবহুল বনজ গুল্মের। প্রতিদিন গোধূলি বেলায় সেখানে এসে বসতাম। জীবনে অনেক জায়গায় গেছি কিন্তু কোথাও যেন তেমন তৃপ্তি পাই নি—যা' পেয়েছিলাম সেদিন সেখানে।

সেদিনও প্রতিদিনের মতই দিনের ক্লান্ত সূর্য্য ঢ'লে পড়ছিল পশ্চিমের উঁচু পিয়াল-পাহাড়ের আড়ালে। পাহাড়ের মাথায় মাথায়, অসংখ্য গাছের চূড়ায়, লতাগুল্মে পড়ছিল তির্য্যক রৌদ্ররেখা। পাখীর অবিশ্রান্ত কলরবে স্থানটির নির্জ্জনতা যেন কেঁপে কেঁপে উঠছিল। নাম-না-জানা অনেক ফুল আর বন-ভেষজের গন্ধ ব'য়ে বাতাস যেন বিবশ হ'য়ে পড়ছিল। রঞ্জনার শীর্ণ বালুচরে পাহাড়ী মেয়েরা ভীড় করেছিল গাগরী ভরণে। কোথায় কোন জংলী ছেলের হাতের বাঁশী বাজছিল অরণ্য ছন্দে আর পাহাড়ী সুরে। আমি প্রতিদিনের মতই তন্ময় হ'য়ে গিয়াছিলাম সেই ছন্দোবদ্ধ প্রকৃতির গহনে।

হঠাৎ আমার মনোযোগ ছিঁড়ে গেল। আমার বাঁ দিকের কাঁটা-ঝোপের অন্তরালে একটা গুঞ্জন শুনলাম। একটি মেয়ে যেন ফুঁপিয়ে উঠলো। আমিও উৎকর্ণ হ'য়ে উঠলাম। তখনো দিনের শেষ আলো একেবারে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যায়নি। ঘাড় তুলে দেখলাম সেই কাঁটাঝোপের ওপাশে বাগানের প্রান্ত সীমায় যেখানে প্রোথিত আছে একটা পাথরের খণ্ড, সেখানে বসে আছে একটি ছেলে আর একটি মেয়ে। সেই মুহূর্তে ক্ষণিকের মধ্যে যা দেখেছিলাম আজ তার বর্ণনা দিতে অনেক সময় লাগবে।

আমি সজাগ হ'য়ে উঠেছিলাম। যদিও কল্পনায় আগেই ভেবে নিয়েছিলাম সুদূর স্বাস্থ্যাবাসের সেই ছায়ানটে অনেক যৌবনের বোঝা-পড়া হয়ে গেছে, অনেক মিলন-বিরহের সুখ, দুঃখের গ্রন্থি পড়ে গেছে সেই সুন্দর জায়গাটিতে। তবুও সেই সময় আমার নিঃসঙ্গতাকে দীর্ণ করে দু'টি তরুণ-তরুণীর সেই উপস্থিতি প্রত্যক্ষ ক'রে আমি চমকে না উঠে পারিনি। আজকের দিন হ'লে হয়তো লজ্জা হ'তো। সাত বছর পরের এই নিস্পৃহ মন আর গতযৌবন দেহটাকে নিয়ে নীরবে ওদের অজ্ঞাতসারে স'রে আসতাম। কিন্তু সেদিন তা' পারিনি।

ওরা যে জায়গায় ঘনিষ্ঠ হ'য়ে বসেছিল, সেখান থেকে আমাকে ওরা দেখতে পাবে না বুঝতে পেরে আমি নীরবে বসে রইলাম। কান্না—মেয়েটি কাঁদছিল। ছেলেটি নির্ব্বাক্। কয়েক মিনিট পরে মেয়েটি যেন নিজেকে সামলে নিল। আমি শুনলাম, কান্না-ভেজা গলায় সে বলছে—আর চুপ করে থেকো না ভাস্কর, আর এড়িয়ে যেতে চেয়ো না। কি তোমার বলার আছে ? কি বলার জন্তে আমাকে এমন করে এখানে টেনে নিয়ে এলে ?

আমার মনে অবশ্য কৌতূহল জাগলো। কাঁটাঝোপের অন্তরাল থেকে উঁকি দিলাম। শুনলাম, মেয়েটির সেই রহস্যময় আর্ত্ত প্রশ্নের উত্তরে ছেলেটির দুর্ব্বোধ্য উত্তর—জায়গাটা কি সুন্দর, দেখেছো রেবেকা ? এখানে এসে আর যে সেকথা বলতে ইচ্ছে করছে না। যদি বলি এই সুন্দর সন্ধ্যা, সুন্দর দেশ আর সুন্দরী তুমি আমাকে সে কথা ভুলিয়ে দিয়েছো ?

তার পর ওদের দীর্ঘ নীরবতা। দেখলাম ওদের। ভাস্কর আর রেবেকা। আড়াল থেকে দেখলাম। পাথরটার ওপর পাশাপাশি বসেছিল দু'জনে। এক পাশ থেকে দেখতে পেলাম ওদের। রুক্ষ চুলের অবিন্যস্ত ঢেউয়ের মাঝখানে ভাস্করের মুখখানা যেন পাটল পাথরে খোদাই তারুণ্যের একটি রেখায়িত ছন্দ। পিয়াল-পাহাড়ের ছায়ায় পরিম্লান।

আর রেবেকা ? অবিশ্বাস্য ভাবে প্রদীপ্তা। সুগৌর অঙ্গে তার হাল্কা নীল রং-এর একখানি সাড়ী জড়ানো। গাঢ় নীল একটি ব্লাউজ। রেবেকার প্রোফাইলে ঠিক তখনই আমি আবিষ্কার ক'রেছিলাম এক অনেক দূরের বিদেশিনীকে। তার সুরেল স্বরের কণ্ঠে তখনই শুনেছিলাম অনেক ঢেউয়ের জলতরঙ্গ। বিদেশিনীর গলায় নিখুঁত বাঙলা শুনে অবাক হয়েছিলাম। তার পাশেই দেখলাম সুরূপ ভাস্করের দেহ-ভাস্কর্য্য। কেমন এক বিষণ্ণতায় পাণ্ডুর। অবাক হলাম রেবেকার আর্ত্ত প্রশ্নের সাথে ভাস্করের নিস্পৃহ জবাবটি শুনে। এ'কে লোকালয় হ'তে বহুদূরে সেই সব ভুলিয়ে-দেওয়া প্রকৃতির মাঝে যৌবনমুগ্ধ দুটি প্রাণের প্রণয় প্রলাপ বলে মন স্বীকার করে নিতে চাইলো না। ওদের সেই দুর্ব্বোধ্যতার মাঝে ঠিক তখনই যেন আবিষ্কার করেছিলাম একটি দোলা। জীবনের উপকূলে যে শত-সহস্র ঢেউয়ের দোলা নিত্য-নিয়ত আপন খেয়ালে ঘটিয়ে চলে অবক্ষয়, আমার মনে হয়েছিল তারই একটি ঢেউ যেন ওদের অন্তরে ক্রুদ্ধ আক্রোশে ফুঁসে

উঠছিল। আর সেদিনের রোমাঞ্চপ্রিয় আমার মন উঠছিল ব্যাকুল হ'য়ে।

ওদের সেই দীর্ঘ নীরবতা ভেঙেছিল এক সময়ে। আবার ফুঁপিয়ে উঠেছিল রেবেকা। কান্নার মাঝেই বলেছিল—না, না, তুমি আমাকে এড়িয়ে যাচ্ছো ভাস্কর! হরিদ্বারে বলতে পারোনি, দার্জ্জিলিং-এ নিয়ে গেলে সেখানেও না। শিলং-এও রইলে চুপ করে। এখানেও কি তেমনি চুপ করে থাকবে?

নিখুঁত ভাষায় নারীর চিরন্তন হৃদয়াবেগ। আমার সমস্ত অন্তর অকারণ মোচড় দিয়ে উঠলো।

—কেন তুমি চুপ করে আছো? কি হয়েছে তোমার? কি হয়েছে, বলো, বলো ভাস্কর?

অন্ধকার আপন খেয়ালে গভীর হয়ে উঠেছিল কখন। পিয়াল-পাহাড়ের মাথার ওপর ঝকমক করে উঠেছিল সন্ধ্যাতারাটা। পেছনে অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল তিঙ্গা আর হৈলমের চূড়া দু'টি। আবছা হ'য়ে গিয়েছিল রঞ্জনার শীর্ণ বালুচর। জংলী ছেলের ক্লান্ত বাঁশী মন্থর হয়ে এসেছিল। আর আমার সামনে কয়েক হাত দূরে বসে-থাকা রেবেকা আর ভাস্করও অস্পষ্ট হ'য়ে উঠেছিল। ওরা দু'জনে এক সময়ে উঠে দাঁড়ালো। ভাস্করের নিরুত্তাপ কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম—বলার কথা ছিলো রেবেকা, বলবো। চলো, আজ যাই।

আমি দেখলাম, ছায়াময় দেহটায় যেন একটা মোচড় দিয়ে ভাস্করের পাশাপাশি চলতে সুরু করলো রেবেকা। এক সময়ে অদৃশ্য হয়ে গেল আমার দৃষ্টিপথ থেকে।

পরদিন আবার দেখা হোল। তার পরেও দেখলাম, তেমনি আড়াল থেকে নীতিবোধের সব দেউলেপণা নিয়ে। পর পর ক'টি সন্ধ্যায় দেখলাম সেই একই অভিনয়, একই অসমাপ্তি। কি জানি কেন, ওখানে গিয়েই আমার মনে হয়েছিল অনেক মন-জানাজানির নীরব সাক্ষী ঐ সুন্দর বাগানটি, নির্জ্জন ছায়ানটের বুকের বাতাস যেন আমার স্পর্শকাতর মনকে ফিসফিসিয়ে শুনিয়ে যেতো অতীতের অনেক প্রণয়-গুঞ্জন। কিন্তু রেবেকা আর ভাস্কর যেন তারা নয়। ওদের কথায়-বার্ত্তায়, ওদের চেহারায় আর ওদের আচরণে ওরা যেন পৃথক যৌবনের ডালি নিয়ে এসেছিল রহস্যময় হয়ে। পর পর ক'দিনই আড়ালে রইলাম। সাহস ক'রে পরিচয় করতে পারিনি। ভয় ঠিক নয়, লজ্জাও নয়। সত্যি বলতে কি, কেমন যেন ধারণা হয়েছিল ওরা দু'জনেই নিঃসঙ্গ। একজন শুধু আর একজনকে চেয়েই সে নিঃসঙ্গতার ব্যথা ভরিয়ে নিতে চায়। সেখানে তৃতীয় জনের উপস্থিতি ওরা কেউই হয়তো পছন্দ করবে না। কৌতূহলের সঙ্গেই রেবেকার জন্তে মনে কেমন যেন একটু সহানুভূতিও জেগে উঠেছিল। তারই মত আমিও ভাস্করের এড়িয়ে-যাওয়া উত্তরটি শোনার জন্তে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলাম। পর পর কয়েকটি দিনের গোপনে শোনা ওদের কথাবার্ত্তার মাঝখান থেকে ওদের সম্বন্ধে কিছুই জানতে পারিনি। শুধু অবাক হয়েছি রেবেকার বাঙলা কথাবার্ত্তায়, তার অদ্ভুত আত্মনিবেদনের ভঙ্গিমায়, আর উদ্‌ভ্রান্ত হয়েছি স্বভাব-গম্ভীর ভাস্করের মূঢ় নীরবতায়।

শেষে একদিন ঠিক করলাম আলাপ করবো। কারণ, অসহ্য হয়ে উঠেছিল লুকোচুরি। আমার শুধুই মনে হোল, ওদের জন্তে যেন ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে সেই সবচেয়ে সুন্দর লগ্নগুলি। যা আর কোন দিনই ওরা ফিরে পাবে না জীবনে। সুতরাং—

সেদিনও পিয়াল-পাহাড়ের মাথার ওপর জ্বলছিল সন্ধ্যাতারাটি। ঘনায়মান সন্ধ্যার সীমানায় বিলীয়মান রঞ্জনার পাণ্ডুর বালুচর ধীরে ধীরে মিশে যাচ্ছিল। রেবেকার আর্ত্ত প্রশ্নের উত্তরে নীরব ভাস্কর উঠে দাঁড়িয়েছিল। উঠে দাঁড়িয়েছিল রেবেকাও। ভাস্করের শান্ত আকর্ষণে তার সারা দেহটায় একবার মোচড় দিয়ে চলতে সুরু করেছিল পাশাপাশি। রঞ্জনার তীরে তীরে ওরা ফিরে যাবে জানতাম। তাই কিছু আগেই অন্ত পথে আমিও নেমে গিয়ে দাঁড়ালাম। ওরা দু'জনে এগিয়ে আসতেই যুক্ত কর বুকে ঠেকিয়ে বললাম—নমস্কার!

ওরা দু'জনে প্রতি-নমস্কার জানালো। শেষ আলোয় রক্তিম ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম—আমি এই বাড়ীতেই থাকি। আপনারা? Changer? তা আসুন না, বাসায় বসে একটু গল্প করা যাক।

রেবেকা অস্বীকৃতি জানালো মৃদু হেসে—না, আজ থাক। আজ ওঁর শরীরটা খারাপ। মাথাটা সামান্ত ঘুরিয়ে যেন সমর্থন জানালো ভাস্কর।

আমি মরিয়ার মত বলে ফেললাম—তাহলে কোথায় উঠেছেন? হোটেলটায় বুঝি? আচ্ছা তা'হলে আজ থাক। কাল আসবেন। সকালে—চায়ের নিমন্ত্রণ রইলো।

ওরা যেন ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল চলে যেতে। রেবেকা সম্মতি জানিয়ে ভাস্করের হাত ধরে ধীরে ধীরে সরে গেল। আমি চাইলাম সম্মুখের অনন্ত অন্ধকারের দিকে। চেয়ে চেয়ে মনে হোল, প্রকৃতির হাতের বাঁধা বীণার সব ক'টি তার গেছে ছিঁড়ে, নিষ্ঠুর হাতে ছিঁড়ে দিয়েছি আমি। সেখানে ঝঙ্কার তুলতে গিয়ে প্রকাশ করেছি অজ্ঞতা।

অবশেষে আমার সন্দেহই ঠিক হোল। পরদিন ওরা এলো না।

বিকালেও না। ভাবলাম, ভাস্কর হয়তো অসুস্থ হয়ে পড়েছে। সন্ধ্যায় হোটেলটিতে যেতে আমার সন্দেহ পরিষ্কার হোল। আগের রাত্রেই ওরা আকস্মিক ভাবে চলে গেছে। কোনো চিহ্ন ফেলে যায়নি। আমি ফিরে এলাম, নিজের মনে অনেক ধিক্কারের স্তূপ উঠলো ভ'রে। হরিদ্বার, দার্জিলিং, শিলংয়ের মনোহর সৌন্দর্য্যের মাঝে আত্মমগ্ন ভাস্করের যে কথা বলা হয়নি অনন্তা রেবেকাকে, হয়তো ছায়ানটের অনেক কথার বোবা সাথী সেই অর্দ্ধ-প্রোথিত পাথরখণ্ডে ব'সে, ঘনায়মান সন্ধ্যার বুকে বিলীয়মান পিয়াল পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে সে কথা বলা হোত। কিম্বা হোত না। সে যাই হোক, তা'দের জীবনের একটি দুর্ম্মূল্য লগ্নকে এভাবে ব্যর্থ ক'রে দেবার সমস্ত অপরাধে অপরাধী হ'য়ে রইলো আমার মন।

মনে মনে ভাস্করের সেই না-বলা কথার বহু ভাবে ব্যাখ্যা ক'রতে চেয়েছি, কিন্তু কোনটাই মনঃপুত হয়নি। হঠাৎ-দেখা দু'টি বাস্তব যৌবনের মাঝে কোন্ অজ্ঞাত জীবন-জিজ্ঞাসা সহসা নিরুত্তরের মাঝে ধ্বংস হ'য়ে গেল—এই বিরাট প্রশ্ন নিয়েই মন রইলো নিশ্চল। ধীরে ধীরে সে ঘটনা আপনা থেকেই মুছে এলো। অনেক কাজের হাটে ব্যস্ত হ'য়ে পড়লাম ধীরে ধীরে। ভুলে গেলাম ছায়ানটের সেই ঘটনা, যেমন ক'রে ভুলে গেছি জীবনের অনেক নিরুত্তর জীবন-জিজ্ঞাসা। ভুলে গেলাম রেবেকা আর ভাস্করকে—যেমন ক'রে ভুলে গেছি অনেক মুখ—এতো ভুলে গেছি, যে আজ তাদের অনেককে শত চেষ্টাতেও মনে করতে পারি না।

কিন্তু কে জানতো আজ সাত বছর পরে আবার দেখা পাবো রেবেকার? দেখা পাবো নতুন রূপে, নতুন ভাবে? কে জানতো সাত বছর পরের অনেক রং-নিঃশেষ হ'য়ে যাওয়া এই চোখ দু'টো তা'কে ঠিক চিনতে পারবে, আর তা'কে নিজের ড্রয়িংরুমে ডেকে এনে সাত বছর মনের মাঝে ঘুমিয়ে-থাকা কৌতূহলের পরিসমাপ্তি ঘটাতে পারবো? আজ সকালেও কি জানতাম এই বাস্তব রূঢ় জীবনে ইঙ্গিত পাবো এমন একটি অমর ভালোবাসার—যা' দেশ-কালের অনেক ঊর্দ্ধে, দেহগত বিলাসের গণ্ডী ছাড়িয়ে জীবনের দগ্ধ ভস্মস্তূপে আহত অনির্ব্বাণ হ'য়ে জ্ব'লে চলেছে?

—আজ আমাদের অফিসে কতকগুলি টাইপিষ্ট নিয়োগের কথা ছিল। প্রার্থিনীরা ইণ্টারভিউয়ের জন্যে অপেক্ষা করছিল ওয়েটিং রুমে। লিস্টে রেবেকা ব্রাউন নামটা দেখেও আমার মনে কোনো চমক লাগেনি। তার পালায় যখন সে এসে দাঁড়ালো, আমার টেবিলের সামনে মুখ তুলে তাকালুম। হাল্কা রং-এর একটি জীর্ণ স্কার্ট তার পরনে, হাল্কা রং-এর প্রলেপে গতশ্রী দু'টি ঠোঁট, আর হাতে ধরা এক স্তবক যুঁই ফুলের মত তার ছোট্ট মেয়ে। সহজে খুঁজে পাইনি সাত বছর আগের সেই হাল্কা নীল রং-এর সাড়ী জড়ানো যৌবনবতী মেয়েটিকে। কোথাও কোনো সাদৃশ্য ছিল না, তবু আচমকা আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এসেছিল—রেবেকা!

রেবেকাও অবাক দু'টি চোখ মেলে তাকিয়েছিল আমার দিকে। প্রসাধনে, পোষাকে যা'কে খুঁজে পাইনি, নীল চোখের অতলান্ত দু'টি তারায় আমারি মনের অনেক বিস্মৃতি ঘুচিয়ে তা'কে খুঁজে পেলাম। হঠাৎ সেই দিনটির কথা মনে পড়লো যেদিন অপ্রত্যাশিত ভাবে খবর পেয়েছিলাম ওদের নিরুদ্দেশের।

মেয়ের হাত ছেড়ে যুক্ত করে নমস্কার জানিয়ে বসলো সে। তার নত মুখের দিকে চেয়ে আমার মনে হোল সে-ও বিব্রত হ'য়েছে। দেখলাম, তার নীল তারার বুকে জেগেছে জলের জোয়ার; বিবর্ণ দু'টি ঠোঁটে অব্যক্তির ব্যথাকম্পন। বললাম—চিনতে পেরেছেন?

হ্যাঁ। ঘাড় নেড়ে রুমালে চোখ দু'টো মুছে নিলো রেবেকা।

আমার ড্রয়িংরুমে ব'সেই গল্প শুনলাম রেবেকার। দীর্ঘ তিন ঘণ্টা ধরে ওদের কাহিনী শুনলাম। বার বার খেই হারিয়ে ফেললো রেবেকা, বার বার কাঁদলো। ওর মেয়ে সতী আমার দেওয়া টফি চুষতে চুষতে বোবা হ'য়ে চেয়ে রইলো ওর মার দিকে। দু'বার কফির পেয়ালা নিঃশেষ করলাম আমরা দু'জনে। ঘড়ির পেণ্ডুলামটা নির্ব্বিকার ভাবে দুলতে থাকলো।

রেবেকার জন্ম বাঙ্গলায়। কলকাতায়। ওর বাবা ছিলেন ডাক্তার। জনসেবার মহান দায়িত্ব নিয়ে সাতসমুদ্দুর পাড়ি দিয়ে এদেশে এসেছিলেন। সঙ্গে এসেছিলেন তাঁর পতিপ্রাণা স্ত্রী। রেবেকার জন্মের রাত্রেই তার মা মারা যান। ওর বাবা ছিলেন সেই ধরণের মানুষ যাঁদের মহান হৃদয় বর্ত্তমানের আওতায় এসে অতীতের সব সংস্কার ভুলে যায়। এদেশে এসে ইংল্যাণ্ডের কথা তিনি মনে রাখতে পারেননি। বাংলার মাটিকে তিনি শ্রদ্ধা করতেন, ভালবাসতেন বাঙলার মানুষকে। তাছাড়া এদেশের মাটিতে তাঁর প্রেয়সী স্ত্রী চিরদিনের জন্যে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন—সেটাও হয়তো তাঁর ভাবপ্রবণ মনে বাঙলাকে আঁকড়ে থাকবার একটা প্রেরণা জাগিয়েছিল। বাঙলার কল্যাণে তিনি নিজের সামাজিক জীবনেও বাঙলার প্রভাব টেনে এনেছিলেন। রেবেকা বাঙালী ঝির হাতে মানুষ। বাঙালীর স্কুলেই তার শিক্ষা। সেখান থেকেই সে ম্যাট্রিক পাশ করে। এক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ছিলেন তার বাবার অন্তরঙ্গ বন্ধু। ভাস্কর তাঁরই ছেলে। রেবেকার সঙ্গে ছেলেবেলা থেকেই জানাশুনা থাকলেও ঘনিষ্ঠতা হয়নি ভাস্করের মা যত দিন বেঁচে ছিলেন। ভাস্করের বাবা ব্রাহ্মণ হ'লেও হৃদয় ছিল তাঁর উদার। তার মার কথা বলতে গিয়ে বললো রেবেকা—আমার বাবার পক্ষে যতটা সহজ ছিল তাঁর সহজাত সংস্কার ত্যাগ করা—ভাস্করের মার ততটা সহজ ছিল না। তাঁর মৃত্যুর পর আমাদের ঘনিষ্ঠতা হয়। তবু, আমি তার মাকে আজও শ্রদ্ধা করি, মিঃ মুখার্জ্জী!

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে আবার বলে চললো রেবেকা—বাঙ্গালী সমাজের সর্ব্বত্রই ছিল বাবার যাতায়াত। আমার ধারণা ছিল, বাবার যা সুনাম তার মাঝে কোনো ফাঁকি ছিল না! হঠাৎ একদিন সে ভুল আমার ভাঙ্গলো। বাবা মারা গেলেন—তাঁর অনেক টাকার স্বপ্ন আমার মন থেকে মুছে গেল। বাবার যা কিছু সামান্য সঞ্চয় ছিল তার ওপর আমার চেয়ে বেশী অধিকার ছিল মিশনের।

আবার থামলো রেবেকা। মেয়ের পানে চেয়ে বললো—বোধ হয় ওর ঘুম পেয়েছে, মিঃ মুখার্জ্জী!

আমি উঠে তাকে সোফায় শুইয়ে দিলাম। মেয়েটি চুপ করে শুয়ে রইলো। নিজের আসনে এসে বসতেই শুনলাম, রেবেকার একটি দীর্ঘশ্বাসের শব্দ।

আমার মনে বার বার ভাস্করের কথা জেগে উঠছিল। বললাম— ভাস্কর কোথায়?

তার কথা শুনবেন বলেই তো এখানে নিয়ে এলেন মিঃ মুখার্জ্জী। বলবো—সব কথাই বলবো। আপনার মতো এতো আদর করে আমাদের কথা তো কেউ জানতে চায়নি? আপনি কি বিরক্ত হচ্ছেন?

আমি দেখলাম, রেবেকার চোখ ছু'টি ভয়াতুর হ'য়ে উঠলো। অভয় দিলাম তাকে—না, না। সে কি কথা, বলুন? সিগারেটে শেষ টান দিয়ে এ্যাশট্রেয় গুঁজে দিলাম। চেয়ারে এলিয়ে দিলাম দেহটা।

বাবা মারা যাবার পর একটা মার্চেন্ট অফিসে চাকরী নিলাম। সেখানেই ভাস্করকে আরো কাছে পেলাম। আমি জানতাম না আমার মাঝে ইতিমধ্যেই কি যেন খুঁজে পেয়েছিল লাজুক ভাস্কর। আর আমি? ভাস্করের কথা আপনার মনে আছে তো মিঃ মুখার্জ্জী? তার মুখে কি যেন ছিল, আমি—

কথাটা অসমাপ্তই রেখে দিল রেবেকা। আমি পুরুষ, রেবেকা নারী, তাই এটুকু তার স্বাভাবিক সঙ্কোচ। আমি ভাবলাম, কেমন ক'রে এত কথা সে এমন কুণ্ঠাহীন ভাবে আমাকে বলছে! হয়তো পাগল হ'য়ে গেছে সে। কিন্তু না, সে লক্ষণ তো ওর কোথাও নেই? কিন্তু এত কথা জেনেই বা আমার কি লাভ? বললাম—আপনারই অসুবিধে হচ্ছে রেবেকা ব্রাউন! আমি শুধু জানতে চেয়েছিলাম ভাস্কর কোথায়, আর সেদিন অমন করে আপনার প্রশ্নের কোন্ জবাব সে এড়িয়ে গিয়েছিল।

না, তা' হয় না।—দৃঢ় ভাবে ঘাড় নাড়লো রেবেকা। শুধু সেটুকু বললে সবই আপনার কাছে অস্পষ্ট থেকে যাবে মিঃ মুখার্জ্জী! জানি আপনার ধৈর্য্যেরও—

আমি বাধা দিয়ে উঠি—না, না—আপনি বলুন, যেমন বলছিলেন।

সংক্ষেপ করি। ভাস্করের বাবা মারা গেলেন। সংসারে সে-ও হোলো আমার মত একা। তার নিঃসঙ্গতা আর আমার নিঃসঙ্গতার মাঝে মিল ছিল যত, অমিল ছিল তার চেয়ে অনেক বেশী। কিন্তু অমিলকেই ভালোবাসতো ভাস্কর। সে ছিল শিল্পী, কবি ছিল সে। তার মনের মাঝে ছিল এক ভাবুক—সে ভাবতো, গভীর ভাবে ভাবতো।

আবার সাময়িক স্তব্ধতা।

আপনি ভাবছেন, এত কথা আমি কেমন করে বলছি আপনাকে? কতটুকুই বা চিনি আপনাকে—তাই না? কিন্তু মিঃ মুখার্জ্জী, একটু বিবেচনা করুন, একটু ধৈর্য্য—আপনি দয়া করে আর একটু অপেক্ষা করুন। যে-কথা কাউকে বলতে পারিনি, আপনি আদর করে সে-কথা শুনতে চেয়েছেন—ওঃ, আপনার কত দয়া! আপনার কাছে কি আমি কিছু গোপন রাখতে পারি?

এক মিনিট—বাধা দিলাম আমি—আমাকে শুধু একটা কথা আগে বলে দিন—ভাস্কর কি নেই?

না, মিঃ মুখার্জ্জী। সে নেই।

সোফায় শুয়ে টানা-টানা চোখ ছু'টি মেলে রেবেকার মেয়েটি চেয়েছিল আমাদের দিকে, সে ঘুমোয়নি। তার দিকে ম্লান চোখে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলো রেবেকা। বাইরে তখন পার্কটার নিম গাছের মাথায় সূর্য্যের শেষ আলো ছুঁয়েছে। চাকর এসে ঘরের আলোটা জ্বালিয়ে দিয়ে গেল। আবার কথা বললো রেবেকা।

তার বাবা মারা যাওয়ার পর, একথা নিষ্ঠুর হলেও সত্যি, তাকে আমি নিবিড় করে পেয়েছিলাম। তাকে গভীর ভাবে চিনেছিলাম। ভাস্কর বলতো, আমাকে অদ্ভুত প্রশংসা করে বলতো—সে আমার মাঝে দেখে পৃথিবীর সমস্ত মেয়েকে। সে বলতো যেদিন তুমি মা হবে, তোমার সন্তানের পরিচয় হবে, সে কোন দেশের মানুষী নয়, সে পৃথিবীর সন্তান।

এবার কিন্তু একটুও সঙ্কোচ বোধ করলো না রেবেকা। দেয়ালের গায়ে টাঙানো একটা ল্যাণ্ডস্কেপের পানে চেয়ে বলে যেতে লাগলো।

সে আমাকে নতুন আলো দেখিয়েছিল, বাবা মারা যাওয়ার পর, মিশন আমার মনটাকে আবার পশ্চিমের পানে ঘুরিয়ে নিতে চেয়েছিল, কিন্তু ভাস্কর তার দিকেই টেনে নিলো। ভাস্কর বলতো—প্রেমের বিচার নেই। প্রেম করে জাতিহীন সৃষ্টি। উঃ, আমার জন্যে তাকে কি অদ্ভুত ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছিল! তার আজীবনের অনেক সংস্কার ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাকে ছাড়তে হয়েছিল তার গোঁড়ামীতে বাঁধা সমাজকে। তবু আমি বলবো—সে তা' পেরেছিল তার সৃষ্টির স্বপ্নের জন্যে। সে বলতো, আমাদের সন্তান হবে সারা পৃথিবীর সন্তান। আজকের পৃথিবীর দিগন্তে দিগন্তে যে সংকীর্ণতা—সে হবে তা থেকে মুক্ত।

আমি কিছুক্ষণ ধরে লক্ষ্য করছিলাম, কেমন যেন আত্মমগ্ন হয়ে গেছে রেবেকা, বিশ্রী ভাবে ক্লান্ত দেখাচ্ছে তাকে। চাকরকে ডেকে কফি আনতে বললাম আবার। মেয়েটির জন্যে দুধ।

কফি শেষ করে রেবেকা তার দুঃখের কাহিনী শেষ করলো। ধীরে ধীরে বলে গেল কেমন করে ঠিক যখন তারা দুজনে ঘনিষ্ঠতার শেষ সীমায় এসে পৌঁছেচে, তখনই তার জীবনের চরম বিপর্য্যয় ঘটে গেল। কেমন যেন রূঢ় হয়ে উঠলো একদিন ভাস্কর। বদলে গেল তার সমস্ত। নীরব হয়ে উঠলো সে। রেবেকার সঙ্গেই সে যা কথা বলতো, কিন্তু সেই রেবেকাকেও যেন কি একটা কথা বলতে পারলো না। কেঁপে উঠলো রেবেকা। হাজার প্রশ্ন করেও তার সেই নিষ্ঠুর নিস্পৃহতার কোনো উত্তর পেলো না রেবেকা। মেয়েদের মন সব সময় সন্দেহে কুটিল। সেও যেন ক্ষেপে উঠলো। দিন দিন কেমন যেন শুকিয়ে যেতে লাগলো ভাস্কর। তার পর এমনি যখন পরিস্থিতিটা ঘোরালো হয়ে উঠেছে ঠিক তখনই একদিন ওরা ছুটি নিয়ে বসলো। ভাস্কর বললো—চলো হরিদ্বার। সেখানে গিয়ে যা তোমার শোনার আছে বলবো। রেবেকা পাগলের মত সেখানে গেল কিন্তু সব কথাই না বলা র'য়ে গেল। সেখান থেকে দার্জ্জিলিং—সেখানেও না। গেল শিলং—বলি বলি ক'রেও সেই রূঢ় সত্যটি বলতে পারলো না ভাস্কর। শিলং থেকে সেই স্বাস্থ্যাবাস। যেখানে আমার সঙ্গে ওদের দেখা। সেখানে তো সে কথা বলা হয়নি, আমি জানতাম। রাতারাতি নিরুদ্দেশ হ'য়ে ওরা এবার গেল সাগরতীরে। পুরী।

কাঁদতে কাঁদতে বলল রেবেকা—সেইখানেই তা'র সব বলার কথা বলা হ'য়ে গেল মিঃ মুখার্জ্জী। সে চলে গেলো।

চলে গেলো? আমি বিস্মিত হ'য়ে প্রশ্ন করলাম।

হ্যাঁ, দুর্নিবার কান্নায় যেন বন্ধ হ'য়ে যায় রেবেকার গলা। —একদিন খুব ভোরে চক্রতীর্থের বীচে বসে আছি। মনে হোল অত্যন্ত অসুস্থ সে। দু'-একদিন ধরে একটু কাশি হ'য়েছিল। সেদিন হঠাৎ এলো একটা কাশির দমক—আর, এক ঝলক টাটকা রক্ত তা'র মুখ থেকে ঝ'রে পড়লো বালিতে। প্রায় এক বছর ধ'রে আমার আড়ালে রেখেও সেদিন আর কোন কথাই গোপন রাখতে পারলো না সে। এত চেষ্টা ক'রেও যে কথা সে বলতে পারেনি, এক ঝলক তাজা লাল রক্তই সে কথা আমাকে বলে দিল।

তারপর—জানতে চাইলাম আমি।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে রেবেকা বললো—আর মাত্র চার দিন। সে এক দুঃস্বপ্ন আমার কাছে। আর একটি বার মাত্র ভাস্কর কথা বলেছিল। বলেছিল, হঠাৎ এক ডাক্তার রোগটা ধরেন। ভাস্করের উচিত ছিল অনেক আগে সব কথা বলে বিদায় নেওয়া। কিন্তু সে পারেনি। আমার মুখের দিকে চেয়ে সে বলতে পারেনি; যদি সেই কালরোগের ভয়ে আমিই তা'কে ত্যাগ করি।—আবার হু-হু ক'রে কেঁদে ফেলল রেবেকা। কাঁদতে কাঁদতেই বলল—কি নিষ্ঠুর দেখেছেন মিঃ মুখার্জী, কি ছেলেমানুষী! তা' নয়, আমি জানি ও বলতে পারেনি, আমার মুখের দিকে চেয়ে! সে যে কোনো আঘাত আমাকে দিতে পারতো না। পাগল ছিল সে, সত্যিই পাগল ছিল।

আমি শান্ত হবার জন্যে অনুরোধ করলাম রেবেকাকে।

শান্ত হোলো। বলে চলল—আজ তাই এক এক সময় ভাবি, মিঃ মুখার্জী! এই শক্ত পৃথিবীর মাটিতে দাঁড়িয়ে জীবনের এক একটা সময়ে কত সহজ ভুল ঘটে যায়; ভাবি, কেন আমাকে জানালো না ভাস্কর? কেন চিকিৎসার চেষ্টাটুকুও ক'রতে দিলো না। আবার ভাবি এই ভুলগুলোই তো কত মধুর—

তিন বছরের মেয়েটি আমার কাছে তখন এক বিস্ময়! সে ধীরে ধীরে সোফা ছেড়ে উঠে আমার কোলের কাছে এসে দাঁড়ালো। কি ভাবলো কে জানে? ক্রন্দনরতা মায়ের মুখ দেখে বোধ হয় ভাবলো—আমি কিছু একটা তার মাকে দিতে পারি, যাতে তার মা আর কাঁদবে না। তার শিশু-মনে বোধ হয় তাই একটা নির্ভর পেলো আমার ওপর। কাছে সরে এসে আমার হাত দু'খানা আঁকড়ে ধরলো। আমি দেখলাম তার চোখের সাগর-নীল তারায় তার মায়ের চোখের ডাগর প্রতিচ্ছায়া। তার সোনালী চুলে হাত বুলিয়ে আদর করতে লাগলাম।

ও ভাস্করের সন্তান নয়, মিঃ মুখার্জী! ও পাপের মেয়ে। সেদিন ছুটি দীর্ঘ করার অপরাধে ফিরে এসে দেখি চাকরী নেই। ভাস্করের সঙ্গেই বিদায় নিলো আমার সব সহজতা। বাংলার বুকে বেড়ে উঠে যা' পেয়েছিলাম, তার সব কিছুই কেড়ে নিয়ে গেল সে। রইলো আমার বাঁচার তাগিদ। নিজের সমাজ থেকে দূরে সরে এসেছিলাম। দু'-একজনের কাছে ধর্ণা দিলাম। ব্যর্থ হলাম। আমার অসহায়তায় তার নিষ্ঠুর হাসি হাসলো। ধর্ম চিরকালই হয়তো উদার, মিঃ মুখার্জী, কিন্তু সমাজ বড় নৃশংস। আমার সামনে দেখলাম পৃথিবীর রূপ, দেখলাম আমি নিঃসম্বল। আমার মধ্যে জেগে উঠলো ইউরোপের অভাব, দারিদ্র্যপীড়িত কুমারী মেয়ে। দু'দিনের যৌবন যা'দের কাছে বেঁচে থাকার পাথেয়, সৌন্দর্য্য যা'দের মূলধন আর দেহ যা'দের জীবিকা।—আবার হু-হু করে জলের বান ডাকলো রেবেকার চোখে। হঠাৎ কেমন যেন ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলো। চোখের জল না মুছেই বললো—ভাস্কর আমাকে অত নীচে নামিয়ে দিয়েছিল, হাঁ ভাস্করই। আমার সে দুর্দ্দশার জন্যে সেই তো দায়ী—নয় কি মিঃ মুখার্জী?

আমি আর কি বলবো? নীরবে ওর মেয়েটিকে আদর করতে লাগলাম।

আবার নরম হয়ে গেল রেবেকার গলা—

আমার সেই দুঃস্বপ্নের দিনগুলোর মাঝেই আমি পেলাম ওই অভাগীকে। কিন্তু বিশ্বাস করুন মিঃ মুখার্জী, কোথা দিয়ে আবার কি যেন হয়ে গেল! ওকে কোলে পাবার পরই আবার আমার বুক থেকে হারিয়ে যাওয়া ভাস্করের ছবিটা কোথা থেকে ফিরে এলো। ভিক্ষে করে, হোটেলের মেড হ'য়ে আর ওকেই সামনে রেখে ওকে এত দিন আগলে রেখেছি। নাম দিয়েছি সতী। জানি এর চেয়ে বড় মিথ্যা আর নেই। তবু, আমি ওকে বাঁচাতে চাই মিঃ মুখার্জী! ওকে যেন আমার মত বিশ্বাসঘাতিনী না হতে হয়। ওর মাঝেই যেন ভাস্করের স্বপ্নকে সার্থক করতে পারি। সতী যেন তার চোখের স্বপ্ন হয়ে নিজেকে নিঃশেষে এদেশের পায়ে বলি দিতে পারে—আজ ওকে সেই আশীর্ব্বাদ করুন। এবারে থামলো রেবেকা ব্রাউন।

আমার কোল ঘেঁসে দাঁড়িয়ে ক্ষুধাতুর সতী মায়ের বিহ্বল মুখের পানে চেয়ে ভয়ে ঝাপটে ধরেছিল আমাকে। তার রেশমী চুলের স্তবকে হাত বুলিয়ে আদর করলাম। অনুভব করলাম তার মাখনের মত তুলতুলে দেহধারায় নিষ্পাপ কোমলতা। আশীর্ব্বাদ তাকে করেছি। বুকে জড়িয়ে ধরে চুমু দিয়েছি দু'টি গালে। মনে মনে বলেছি—আয়ুষ্মতী হও। তোমার মাঝেই ভাস্করের অমৃত স্বপ্ন সার্থক হোক। ভাস্কর আর রেবেকা ব্রাউন, পূর্ব্ব আর পশ্চিমের নিবিড় প্রেমের প্রদীপ হয়ে তুমি এদেশের, শুধু এদেশের নয়, দিক-দিগন্তের বুকের জমাট অন্ধকার অপসারিত করো।

মেয়ের হাত ধরে ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেছে রেবেকা ব্রাউন। তা'কে বাঁচিয়ে রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়েছি—সতীকেও।

সাত বছরের দমিত কৌতূহল মিটিয়ে চলে গেছে রেবেকা। একটা অতি সুন্দর গল্প বলে গেছে। টেবিলের ওপাশে রেখে গেছে কয়েক ফোঁটা চোখের জল। কিছুতেই সে গল্প অবিশ্বাস করতে পারলাম না। যদিই ওই অশ্রুবিন্দুগুলি কৃত্রিম হয়—ক্ষতি কি? একথা তো ঠিক—পূর্ব্ব পশ্চিম সকল দেশের সমস্ত প্রবঞ্চিত নারীর চোখেই ওগুলোর অক্ষয় সঞ্চয়, ওগুলোর তো জাত নেই?

চোরের দণ্ড আছে, নির্দয়তার কি দণ্ড নাই? দরিদ্রের আহার সংগ্রহের দণ্ড আছে, ধনীর কার্পণ্যের দণ্ড নাই কেন?

—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

শ্রীনীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত

ষোল

মার্লিনকে বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে ফিরে আসার সময় মার্লিনের মা আমাকে বলেছিলেন,—বাবা! তুমি আবার এসো। যদি সম্ভব হয় কিছুদিন রোজই একবার এসে মার্লিনকে দেখে যেও। মার্লিনও এক ফাঁকে আমাকে বলেছিল, মার কথাটা ভুলো না। রোগী দেখতে রোজই কিন্তু আসতে হবে। তবুও রোজ মার্লিনদের বাড়ীতে যেতে ক্রমে এক বাধার উৎপত্তি হলো। সেই কথাটাই এইবার বলি।

• • • •

মার্লিনকে নিয়ে যখন বাড়ী পৌঁছে দিলাম—মার্লিনের মা একাই বাড়ীতে ছিলেন, বাবরারা ছিল না। শুনেছিলাম—বাবরারা টমের সঙ্গে ডভিটনে গিয়েছে, কি ছ'-চারটে জিনিষ কিনতে। মার্লিনের মার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম ওদের সদর দরজায়—মার্লিনও এলো আমার সঙ্গে সঙ্গে। দরজাটি খুলে বাইরের দিকে চেয়ে দেখি—সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, আধখানি চাঁদ রয়েছে ভেসে আকাশের গায়। দু'হাত দিয়ে মার্লিনের দুটি হাত ধরে চাইলাম বিদায়। মার্লিন কোনও কথা না বলে, সেই তার নিজস্ব প্রাণঢালা চাহনিটি মুখে মাখিয়ে আমার হাত দুটি আরও একটু জোরে ধরল চেপে, ভাবটা—যেতে দেব না। আমি মার্লিনের হাত দুটি ধরে ক্রমে তাকে আমার বুকের কাছে এগিয়ে নিতে লাগলাম—চোখের সেই অপূর্ব ভাবটি হয়ে উঠল যেন আরও নিবিড়। ঘর পল্লীগ্রাম—চারি দিকে সবই চুপচাপ নিস্তব্ধ।

হঠাৎ চমকে উঠলাম—কে যেন পাশে এসে দাঁড়াল। কখন যে ইতিমধ্যে মরটন এগিয়ে এসেছিল—এতক্ষণ টেরই পাইনি। চেয়ে দেখলাম—ভজিতের মতন মরটন চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। চোখ দুটো যেন জ্বলছে।

• • • •

এই হল সূচনা। তার পর থেকে রোজই মার্লিনদের বাড়ীতে গিয়ে দেখি, মরটন ইতিমধ্যে এসে বসে আছে। এবং ক্রমে লক্ষ্য করলাম—আমি যতক্ষণ থাকতাম, মরটনও থাকতই—আমাকে বা মার্লিনকে এক মুহূর্ত্ত চোখের আড়াল করত না।

শুধু তাই নয়, লক্ষ্য করলাম—আমার সঙ্গে তার ব্যবহারটি মোটেই আর ভদ্রোচিত বলা চলে না। আমার সঙ্গে কোনও কথা বলতেই সে যেন আর রাজী নয়—নেহাত আমার দু'-একটা কথার উত্তরে যা হয় একটা কিছু বলে মুখ ফিরিয়ে নেয় অন্য দিকে। মরটনের ব্যবহারটি অবজ্ঞা করে অনায়াসে ওদের সঙ্গে দেখাশোনা করে আসব। মনে মনে এই রকম একটা ঠিক করে নিলেও মরটনের উপস্থিতি এবং বিশেষ করে ঐ রকম ব্যবহারে আমি যতক্ষণ ওদের বাড়ীতে থাকতাম, মনে সারাক্ষণই একটা অস্বোয়াস্তি অনুভব করতাম, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

মার্লিনও যে ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছিল, তার প্রমাণ পেলাম মার্লিন বাড়ীতে ফিরে যাওয়ার দিন পাঁচ-ছ'-এর মধ্যেই। এক দিন মার্লিন মরটনের সামনেই আমাকে বলল, বিকো! শরীরটা কিছুতেই যেন ঠিক হচ্ছে না। কেমন যেন ক্লান্ত লাগে। শরীরটার উপর আস্থা কিছুতেই যে পাচ্ছি না ফিরে।

বললাম, তোমার আরও বিশ্রামে থাকা দরকার।

এইখানেই বলে রাখি, মার্লিন যদিও সকলের সামনেই আমাকে বিকো বলে ডাকতে সুরু করেছিল, 'নীলা' নামটি আমি কিন্তু রেখেছিলাম লুকিয়ে। সকলের সামনে সেটিকে প্রকাশ করতে কেমন যেন লজ্জা পেতাম।

মার্লিন আমাকেই বলল, এক কাজ কর। তুমি ত আমার ডাক্তার। হাসপাতালের মতন এখানেও একটা নিয়ম করে দাও—দর্শনপ্রার্থীদের দর্শন নিষেধ।

ইঙ্গিত সুস্পষ্ট, কিন্তু মরটন যেন কথাটা বুঝেও বুঝল না। মার্লিনকে বলল, আমারও মনে হয়, তোমার কিছু দিন হাওয়া বদলাতে যাওয়া উচিত। আমার এক পিসীমা হ্যাসটিংসে আছেন—সমুদ্রের ঠিক ধারেই। বল ত আমি তাঁকে চিঠি লিখে ব্যবস্থা করে দিতে পারি।

মার্লিনের মা বললেন, তার দরকার কি। আমার বোনেরও চমৎকার হোটেল আছে—কর্ণওয়ালে 'লু'তে ঠিক সমুদ্রের উপরেই। নাম-করা স্বাস্থ্যকর জায়গা—'লু'। মার্লিন ইচ্ছা করলেই সেখানে গিয়ে কিছু দিন ঘুরে আসতে পারে। আমার বোন লিখেছেও সে-কথা।

বললাম এখনও হাওয়া বদলাতে যাওয়ার মতন অবস্থা ঠিক হয়নি। শরীরটা আরও একটু মজবুত হোক্। ইতিমধ্যে মার্লিন ঠিকই বলেছে। আমাদের এখন কিছুদিন এ বাড়ীতে না আসাই ভাল।

মার্লিন বলল, না না—তোমাকে ত আসতেই হবে বিকো! তুমি যে ডাক্তার।

মরটন বলল, তা ভদ্রের কষ্ট করে এখন আর রোজ আসার দরকার কি। প্রয়োজন মতন খবর দিলেই হবে।

মার্লিন ঈষৎ একটু উত্তেজিত ভাবে বলল, সেটা আমি তোমার চাইতে ভাল বুঝব কিন—আমার উপর ছেড়ে দিলেই ভাল হয়।

কথাটা সেদিন এই পর্য্যন্তই হয়ে রইল। আমিই কথাটা ঘুরিয়ে দিয়েছিলাম অন্য দিকে।

• • • •

তার দুদিন পরের ব্যাপার। সেদিন আমার মার্লিনদের বাড়ীতে যেতে একটু দেরী হয়ে গেল—ছ'টা বেজে গেছে। আমি মার্লিনদের বাড়ীর কাছাকাছি যেতেই দেখি—মরটন সশব্দে মার্লিনদের বাড়ীর সদর দরজা বন্ধ করে দিয়ে হন্ হন করে এলো বেরিয়ে। আমার সঙ্গে চোখোচোখি হওয়াতে কথা কওয়া ত দূরের কথা, মুখ ঘুরিয়ে নিল।

সদরের কড়া নাড়তেই মার্লিন এসে দরজা খুলে দিল। মুখে মৃদু হাসি মাখিয়ে শুধাল—এত দেরী?

শুধালাম, মহুটনের কি হল ? রেগে বেরিয়ে গেল বলে মনে হল ?

বলল, হ্যাঁ। আজ স্পষ্টই বলে দিয়েছি।

শুধালাম, কি রকম ?

মার্লিন বলল, আজ আবার সেই কথা তুলেছিল, যেন আমাকে একটা লেকচার দিয়ে বোঝাতে চায়—ডকের কোনও দিক দিয়েই আর রোজ এরকম আসা বাঞ্ছনীয় নয় ইত্যাদি। আমারও রাগ হয়ে গেল।

শুধালাম, কি বললে ?

বলল, বললাম—আমার শরীর যখন এখনও সম্পূর্ণ সুস্থ নয়, ডাক্তারের কথা মেনে চলা সকলেরই উচিত। এখন কিছুদিন এ বাড়ীতে ওরই না আসা ভাল।

হেসে বললাম বেশ ত—শেষটা আমার দোহাই দিয়েই—

বলল, বাঁচা গেল—অনেক ইঙ্গিত দিয়েছি, কিছুতেই ত শোনে না।

শুধালাম খুব রেগে গেল—না ?

বলল, ভীষণ। মুখ লাল করে বেরিয়ে গেল। যাওয়ার সময় কি বলে গেল জান ?

শুধালাম, কি ?

বলল, বলে গেল—এই ডাক্তারই তোমার সর্ব্বনাশ করবে।

ঘরের ভিতর গিয়ে মার্লিনের মার সঙ্গে দেখা হলো। আমাকে দেখেই শুভসন্ধ্যা জানিয়ে বললেন, ডক্। এসেছ ভালই হয়েছে। আমার বোন আজ আবার একখানা চিঠি পাঠিয়েছে। 'লু'তে এখনই মার্লিনের যাওয়া যদি সুবিধা না হয়, আমাকে ও মার্লিনকে তিনি কিছুদিন নিয়ে উইসবীচে রাখতে চান। এ কথায় আমারও মন ষোল আনা সায় দেয়। বারবারা পরশু চলে যাবে বলছে, তাহলে আমরা বারবারার সঙ্গেই চলে যেতে পারি। তুমি কি বল—উইসবীচও বেশী দূর নয়—এটুকু মার্লিন এখন যেতে পারবে, না ?

বারবারাও ইতিমধ্যে ঘরের ভিতর ঢুকেছিল। বলল, উইসবীচেও ত ভাল ভাল ডাক্তার আছে—মার্লিনকে কিছুদিন রেখে যদি দরকার হয় ত সেখান থেকে 'লু'তে দেবেন পাঠিয়ে।

মার্লিন পরশুই এখান থেকে চলে যাবে—মনটা হঠাৎ কেমন যেন এলোমেলো হয়ে গেল। কি যে বলব ঠিক বুঝে পেলাম না। অথচ হাওয়া বদলানও মার্লিনের প্রয়োজন—ডাক্তার হিসাবে সে কথাও ত অস্বীকার করা চলে না।

মার্লিন বলল, শরীরটা এখনও যে রকম দুর্ব্বল বোধ করি—

বললাম, উইসবীচ ত নেহাৎ কাছে নয়—মার্চে বাস বদল করতে হয়—

বারবারা বলল, বাসে যেতে হবে না। মা আমার জন্ত পরশু ত গাড়ী পাঠাবেনই—

গম্ভীর ভাবে বললাম, তবুও এতখানি রাস্তা গাড়ীর ঝাঁকুনী—আরও দু'-চারটে দিন যাক্ না।

সবাই চুপ করে গেল। মার বোধ হয় কথাটা তত পছন্দ হলো না। রুগ্ন মেয়েকে নিয়ে বোনের বাড়ীতে গিয়ে নিজের মনটাকে নিশ্চিন্ত বিশ্রামে একটু সুস্থ করে আনার জন্ত তিনিও হয়েছিলেন আকুল। —টম সন্তর্পণে ঘরে ঢুকল হাতে চা-এর সরঞ্জাম নিয়ে।

* * * *

পরের দিন মার্লিনদের বাড়ী গেলে মার্লিনের মা বললেন, ভেবে দেখলাম, তোমার কথাই ঠিক ডক। অত দূর গাড়ীর ঝাঁকানী খেতে খেতে মার্লিনের এখন না যাওয়াই ভাল। যাক আর কিছু দিন। পরে না হয় প্রয়োজন বুঝলে 'লু'তেই ওকে দেব পাঠিয়ে।

বললাম, আমারও ত' তাই মনে হয়। তবে অবশ্য মার্লিন সেটা সবচেয়ে ভাল বুঝবে।

মা বললেন, মার্লিন এখনও বড় দুর্ব্বল। কাল তুমি চলে যাওয়ার পরই শুয়ে পড়ল—রাত্রে আর উঠল না।

মার্লিনের দিকে চাইলাম—মার্লিন চুপ করে বসেছিল, মুখের মধ্যে কোনও ভাবের আভাস পেলাম না।

মা নিজের মনেই বলে যেতে লাগলেন, তা ছাড়া ওদের বাড়ীতে বড় হৈ-হৈ। মার্লিনের ঠিক বিশ্রাম ওখানে হবে না।

হঠাৎ মনে হল—এসব কথা ত মার্লিনেরই মনের কথা—মার মুখে শুধু তার প্রতিধ্বনি শুনছি। হয়ত কাল রাত্রে মাকে এই সব বুঝিয়েছে। মার্লিনের দিকে চেয়ে দেখলাম—চুপ করেই আছে বসে।

মার্লিনের সঙ্গে কথা হল চলে যাওয়ার সময়। ঐ সময়টাই যা দু'-একটা কথা নিরিবিলি মার্লিনের সঙ্গে আমার হত। সাধারণতঃ মার্লিনই একলা আমাকে দরজার বাইরে রাস্তা পর্য্যন্ত এগিয়ে দিয়ে যেত—টম বা বারবারা, কেন জানি না, কেউই সঙ্গে আসত না।

একটু হেসে শুধালাম, উইসবীচে গেলে না কেন ?

বলল, তোমাকে জ্বালাব বলে।

শুধালাম, জ্বালাবে বলে না জ্বলবে বলে ?

হেসে বলল, একই আগুন ত'—জ্বালালেই জ্বলতে হয়।

বললাম, কিন্তু উইসবীচ ছেড়ে দাও। 'লু'তে কিছুদিন হাওয়া বদল করে এলে ভালই হয়।

সঙ্গে সঙ্গে বলল, যাব ত'—তাও ভেবে রেখেছি।

বললাম, আগুন নিবিয়ে দিয়ে ?

বলল, না গো। সমুদ্রের হাওয়ায় আরও ভাল করে আগুন জ্বালাব বলে।

বললাম, সে আগুনে তাহলে ত' একলাই পুড়ে মরবে।

একটু হেসে বলল, তাই নাকি ? তুমিও যাবে—একসঙ্গেই জ্বলব।

একটু অবাক হয়ে শুধালাম, আমিও ?

বলল, হ্যাঁ। আমি গেলে তুমিও ছুটি নিয়ে যাবে 'লু'তে।

অবাক হয়ে ভাবলাম—তাই ত ছ' মাসের উপর কাজ হয়ে গেল। পনেরো দিন ছুটি ত আমার পাওনা হয়েছে।

* * * *

আরও দু'-তিন দিন পরের কথা। আমি মার্লিনদের বাড়ী থেকে বিদায় নিয়ে লংভেলের রাস্তাটি ছেড়ে মাঠের বাঁধান পথটিতে মোড় ফিরেছি, হঠাৎ চোখে পড়ল—কে একজন সেই বাঁধান পথটির উপর পায়চারী করছে, সন্ধ্যা তখন ঘনিয়ে অল্প অল্প অন্ধকার হয়ে গেছে—কাছে না গেলে লোক চেনা যায় না। লোকটির কাছাকাছি আসতেই লোকটি দাঁড়িয়ে গেল। চেয়ে দেখলাম—মহুটন।

চারি দিক চুপচাপ নিস্তব্ধ। সন্ধ্যার অন্ধকারে হঠাৎ মহুটনের সঙ্গে এ রকম দেখা হওয়াতে কেন জানি না, শরীরটা ছম-ছম করে উঠল।

মুখে হাসি মাখিয়ে বললাম, এ কি মক্‌টন ! আপনি এখানে ? আপনাকে আর দেখতে পাই না কেন ?

সে কথার কোনও উত্তর না দিয়ে গম্ভীর ভাবে আমার দিকে চেয়ে বলল, ডক ! আপনার সঙ্গে আমার বিশেষ জরুরী কথা আছে।

শুধালাম, কি কথা ?

বলল, আপনি বিদেশী—আপনি বিবাহিত। আপনি আমাদের দেশের সামাজিক প্রথার বিষয় কিছুই বোধ হয় জানেন না। তাই আপনাকে একটু সাবধান করে দিতে চাই।

আমিও একটু গম্ভীর হয়ে গেলাম। বললাম, বলুন।

বলল, আপনি যে ভাবে মার্লিনের সঙ্গে মেলামেশা করেন—আমাদের দেশে কোনও বিবাহিত পুরুষ কুমারী মেয়ের সঙ্গে ও ভাবে মেশে না। তাতে শুধু যে বদনাম হয়, তাই নয়। সেই মেয়েরও সর্ব্বনাশ করা হয়।

বললাম, সেটা ত আপনার চাইতে মার্লিন বা তার মা ভাল বুঝবেন।

বলল, ওদের কথা ছেড়ে দিন। মার্লিন ত ছেলেমানুষ—নিজের ভাল-মন্দ এখনও ঠিক বোঝে না। আর তার মাকে—মার্লিন যা বোঝায় তাই বোঝে। আমরা ওদের সমাজের লোক—তাই ওদের ভাল-মন্দ দেখা আমাদেরই কর্ত্তব্য।

মক্‌টনের সঙ্গে দাঁড়িয়ে এ বিষয়ে আলোচনা করার ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি আর হলো না। চলতে আরম্ভ করলাম।

বললাম, আচ্ছা শুভরাত্রি—আপনার কথাটা ভেবে দেখব।

মক্‌টন সেইখানেই চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল—শুভরাত্রির উত্তরে শুভরাত্রিও আমাকে জানাল না। একটু এগিয়ে গিয়েছি, হঠাৎ সেইখান থেকেই চেঁচিয়ে বলল, কথাটা মনে থাকে যেন। কথাটার ভঙ্গীতে একটু শাসনের ভাব ছিল—তা আমার লক্ষ্য এড়ায়নি।

* * * *

পরের দিন মার্লিনকে মক্‌টনের সঙ্গে দেখা হওয়ার বৃত্তান্ত সবই বললাম। মার্লিন একটু চুপ করে থেকে শুধু বলেছিল, তুমি ওর সঙ্গে দেখা হলেও কোনও কথা বল না। কিন্তু মার্লিন যে ব্যাপারটা শুনে চুপ করে ছিল না এবং সেও যে তার পরের দিন সকালে মক্‌টনকে একখানা চিঠি লিখে বেশ কড়া ভাবে জানিয়ে দিয়েছিল যে, মক্‌টন যেন মার্লিনের জীবনের কোনও ব্যাপারে কোনও হস্তক্ষেপ না করে। এ সব খবর অবশ্য টের পেয়েছিলাম অনেক দিন পরে। কিন্তু ফল তাতে কিছুই হয়নি এবং এর দু' দিন পরে মক্‌টনের সঙ্গে আবার দেখা হয়েছিল।

মার্লিনের বাড়ী থেকে হাসপাতালে ফিরে যাচ্ছি—সন্ধ্যা এসেছে বেশ ঘনিয়ে। ডডিংটনের চার্চ্চ-এর পাশ দিয়ে ঘুরে এসে পড়েছি ডডিংটনের সদর রাস্তায়, যেটা গিয়েছে কেম্ব্রিজের দিকে। এই মোড়ে একটি সবুজ ঘাসে ঢাকা ত্রিকোণ জমিতে তিনটি বসবার বেঞ্চ পাতা ছিল—পথিকদের বিশ্রামের জন্য। হঠাৎ লক্ষ্য করলাম, একজন লোক একটি বেঞ্চির উপর ছিল বসে এবং আমাকে দেখেই উঠে দাঁড়াল। সন্ধ্যার অন্ধকারে লোকটিকে ঠিক চিনতে পারিনি—তবে মনে হ'ল যেন মক্‌টন। যাই হোক, সেদিকে কোন লক্ষ্য না করে একটু দ্রুত পদে সোজা চললাম হাসপাতালের দিকে।

দু'-চার পা গিয়েছি, হঠাৎ লোকটির গলা কানে আসাতে চমকে উঠলাম। বেশ জোরের সঙ্গে বলল, সাবধান করে দিচ্ছি, আমার কথাটা মনে আছে ত ?

বুলা ! হাজার হলেও বাঙ্গালীর প্রাণ—সমস্ত পথটা থেকে থেকে উঠছিল কেঁপে। চলতে চলতে অনেক বার পিছন ফিরে চেয়েও দেখেছি, সে কথা অস্বীকার করব না।

* * * *

পরের দিন মার্লিনকে সমস্ত কথা বলাতে মার্লিন খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। তার পর বলল তুমি এক কাজ কর। সন্ধ্যাবেলা ও পথে ফিরো না। আমাদের বাড়ীর সামনের পথ ধরে সোজা চলে যেও পূবমুখো—মাইল খানেক গেলেই পাবে উইমব্লিংটন রেল-ষ্টেশন। তার কাছেই ডডিংটন থেকে মার্চ্চে যাওয়ার সদর রাস্তা। সেখানে মার্চ্চের বাস পাবে—বাস ধরে হাসপাতালে যেও চলে।

যদিও মার্লিনের কথাতে মন ষোল আনা সায় দিয়েছিল, তবুও একটু সাহস দেখিয়ে বললাম, অত ঘুরে যাওয়ার কি দরকার ? করবে কি মক্‌টন ?

বলল, না না জান না। লোকটি গোঁয়ার।

হেসে বললাম, বেশ। তাতে যদি তোমার মন সুস্থ থাকে তবে তাই করব।

* * * *

এই ভাবে আরও পাঁচ-সাত দিন কাটল—মক্‌টনের সঙ্গে দেখা আর হয়নি। মার্লিনের কথা অনুযায়ী এর পর থেকে রোজই উইম্‌ব্লিংটন ঘুরে বাস ধরে হাসপাতালে ফিরে যাই, কিন্তু তাতে সময় নষ্ট হত অনেকটা কিন্তু উপায়ই বা কি ?

ইতিমধ্যে মার্লিনের 'লু'তে হাওয়া বদলাতে যাওয়ার ব্যাপারটা পাকা হয়ে গেল। মার্লিনই বিশেষ করে কথাবার্ত্তা বলে মাকে দিয়ে মাসীকে চিঠি লিখিয়ে যাওয়ার দিনটা পর্য্যন্ত নিল ঠিক করে। আমাকেও ছুটি নেওয়ার ব্যাপারটা মনে করিয়ে দিতে ভোলেনি। বলেছিল, আমি যাওয়ার দু' দিনের মধ্যেই কিন্তু তোমাকে গিয়ে হাজির হতে হবে। আমিই গিয়ে তোমার জন্য একটা হোটেলে ঘর ঠিক করে রাখব।

বলেছিলাম বেশ। তুমি থাকবে কোথায় ?

বলেছিল, আমি আমার মাসীর হোটেল রোজ এণ্ড ক্রাউন—সেইখানে থাকব।

জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আমার জন্য কি সেই হোটেলেই ঘর ঠিক করবে ?

বলেছিল, সেটা গিয়ে দেখি। 'লু'তে ত হোটেলের অভাব নেই। না হয় কাছাকাছি কোনও একটা হোটেলে বন্দোবস্ত করব।

যদিও মার্লিন আমাকে বারণ করেনি তবুও আমার যাওয়ার বিষয় সব ব্যাপারটা গোপনই রয়ে গেল। আমিও ওদের বাড়ীতে কাউকে কিছু বলিনি সে কথা এবং মার্লিনও সে কথা তোলেনি কারও সামনে।

ক্রমে এলো মার্লিনের যাওয়ার আগের দিন সন্ধ্যাবেলা—পরের দিন সকালের ট্রেণে মার্লিনের চলে যাওয়ার কথা। ওদের বাড়ী থেকে বিদায় নিয়ে সদর রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছি, মার্লিন তখনও দাঁড়িয়ে আছে বাড়ীর ফটকে—হঠাৎ মার্লিন পিছন থেকে ডাকল—ডিকো !

ছোট্ট মুন্নি কেন কেঁদেছিল

মুন্নি ফোঁপাতে আরম্ভ করল তারপর আকাশফাটা চিৎকার করে কেঁদে উঠল। মুন্নির বন্ধু ছোট্ট নিনু ওকে শান্ত করার আপ্রাণ চেষ্টা করছিল, ওকে নিজের আধ আধ ভাষায় বোঝাচ্ছিল—"কাঁদিসনা মুন্নি—বাবা আপিস থেকে বাড়ী ফিরলেই আমি বলব—" কিন্তু মুন্নির ভ্রুক্ষেপ নেই, মুন্নির নতুন ডল পুতুলটির দুধে আলতায় মেশানো গালে ময়লার দাগ লেগেছে, পুতুলের নতুন ফ্রকের ওপর পড়েছে ময়লা আঙুলের ছাপ—আমি আমার জানলায় দাঁড়িয়ে এই মজার দৃশ্যটি দেখছিলাম। আমি যখন দেখলাম যে মুন্নি কোন কথাই শুনছেনা তখন আমি নিজে এলাম। আমাকে দেখেই মুন্নির কান্নার জোর বেড়ে গেল—ঠিক যেমন 'এঙ্কোর, এঙ্কোর' শুনে ওস্তাদদের গিটকিরির বহর বেড়ে যায়। আমাদের প্রতিবেশির মেয়ে নিনু—আহা বেচারা—ভয়ে জবুথবু হয়ে একটা কোনায় দাঁড়িয়ে আছে। আমি ঠিক কি করব বুঝতে পারছিলামনা। এমন সময় দৌড়ে এলো নিনুর মা সুশীলা। এসেই মুন্নিকে কোলে তুলে নিয়ে বলল—"আমার লক্ষ্মী মেয়েকে কে মেরেছে?"

কান্না জড়ানো গলায় মুন্নি বলল—"মাসী, মাসী, নিনু আমার পুতুলের ফ্রক ময়লা করে দিয়েছে।"

"আচ্ছা, আমরা নিতুকে শাস্তি দেব আর তোমাকে একটা নতুন ফ্রক এনে দেব।"

"আমার জন্যে নয় মাসী, আমার পুতুলের জন্যে।"

সুশীলা মুন্নিকে, নিতুকে আর পুতুলটি নিয়ে তার বাড়ী চলে গেল আমিও বাড়ীর কাজকর্ম্ম সুরু করে দিলাম। বিকেল প্রায় ৪ টার সময় মুন্নি তার পুতুলটা নিয়ে নাচতে নাচতে ফিরে এলো। আমি উঠোন থেকে চিৎকার করে সুশীলাকে বললাম আমার সঙ্গে চা খেতে।

যখন সুশীলা এলো আমি ওকে বললাম "ডলের জন্যে তোমার নতুন ফ্রক কেনার কি দরকার ছিল?"

"না বোন, এটা নতুন নয়। সেই একই ফ্রক এটা। আমি শুধু কেচে ইস্ত্রী করে দিয়েছি।" "কেচে দিয়েছ? কিন্তু এটি এত পরিষ্কার ও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।"

সুশীলা একচুমুক চা খেয়ে বলল—"তার কারন আমি ওটা কেচেছি সানলাইট দিয়ে। আমার অন্যান্য জামাকাপড় কাচার ছিল তাই ভাবলাম মুন্নির ডলের ফ্রকটাও এই সঙ্গে কেচে দিই।"

আমি ব্যাপারটা আর একটু তলিয়ে দেখা মনস্থ করলাম। "তুমি তখন কতগুলি জামাকাপড় কেচেছিলে? আমাকে কি তুমি বোকা ঠাউরেছ? আমি একবারও তোমার বাড়ী থেকে জামাকাপড় আছড়ানোর কোন আওয়াজ পাইনি।"

সুশীলা বলল, "আচ্ছা, চা খেয়ে আমার সঙ্গে চল, আমি তোমায় এক মজা দেখাবো।"

সুশীলা বেশ ধীরেসুস্থে চা খেল, আর আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি মুচকি হাসছিল। আমার মনের অবস্থা কিন্তু অন্যরকম। আমি একচুমুকে চা শেষ করে ফেললাম।

আমি ওর বাড়ী গিয়ে দেখলাম একগাদা ইস্ত্রীকরা জামাকাপড় রাখা রয়েছে। আমার একবার গুনে দেখার ইচ্ছে হোল কিন্তু সেগুলি এত পরিষ্কার যে আমার ভয় হোল শুধু ছোঁয়াতেই সেগুলি ময়লা হয়ে যাবে। সুশীলা আমাকে বলল যে ও সব জামাকাপড়ই সানলাইটে কেচেছে। ওই গাদার মধ্যে ছিল—বিছানার চাদর, তোয়ালে, পর্দ্দা, পায়জামা, সার্ট, ধুতী, ফ্রক আরও নানাধরনের জামাকাপড়। আমি মনে মনে ভাবলাম বাবা: এতগুলো জামাকাপড় কাচতে কত সময় আর কতখানি সাবান না জানি লেগেছে। সুশীলা আমায় বুঝিয়ে দিল—"এতগুলি জামাকাপড় কাচতে খরচ অতি সামান্যই হয়েছে—পরিশ্রমও হয়েছে অত্যন্ত কম। একটি সানলাইট সাবানে ছোটবড় মিলিয়ে ৪০-৫০টী জামা কাপড় স্বচ্ছন্দে কাচা যায়।"

আমি তক্ষুনি সানলাইটে জামাকাপড় কেচে পরীক্ষা করে দেখা স্থির করলাম। সত্যিই, সুশীলা যা বলেছিল তার প্রতিটি কথা অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেল। একটু ঘষলেই সানলাইটে প্রচুর ফেণা হয়—আর সে ফেণা জামাকাপড়ের সুতোর ফাঁক থেকে ময়লা বের করে দেয়। জামাকাপড় বিনা আছাড়েই হয়ে ওঠে পরিষ্কার ও উজ্জ্বল।

আর একটি কথা, সানলাইটের গন্ধও ভাল—সানলাইটে কাচা জামাকাপড়ের গন্ধটাও কেমন পরিষ্কার পরিষ্কার লাগে। এর ফেণা হাতকে মসৃণ ও কোমল রাখে। এর থেকে বেশি আর কিছু কি চাওয়ার থাকতে পারে?

S. 2588-X52 BG

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড, কর্ত্তৃক প্রস্তুত।

থমকে দাঁড়ালাম। তখন সন্ধ্যার অন্ধকারে জগৎটা প্রায় ঢাকা পড়ে গেছে। মার্লিন বলল দাঁড়াও আসছি।

মার্লিন এলো রাস্তায়। বলল, চলো তোমার সঙ্গে খানিকটা যাই।

বললাম, তুমি আবার কেন যাবে? শুধু শুধু ক্লান্ত করবে নিজেকে।

সে কথার কোনও উত্তর না দিয়ে শুধু বলল, চল—একটু জোরে জোরে পা চালিয়ে। মার্লিনের মুখ গম্ভীর।

ব্যাপারটা কিছু বুঝতে পারলাম না। যাই হোক, দু'পা এগিয়েই চেয়ে দেখি—রাস্তার পাশে একটা ছোট গাছের তলায় মর্কটন চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে।

চুপি চুপি মার্লিনকে বললাম, মর্কটন না?

সে কথার কোনও উত্তর না দিয়ে বলল, ওদিকে তাকিয়ো না। সোজা চল।

পথে আর কোনও কথা হল না। ক্রমে এলাম সেই মাঠের উপর সরু বাঁধান রাস্তাটার মোড়ে। সেখানে এসে দাঁড়িয়ে বলল, আর আমি যাব না। তুমি আজ এই মাঠের রাস্তা ধরেই সোজা চলে যাও।

ইতস্ততঃ করে বললাম, কিন্তু তুমি এই সন্ধ্যেবেলা এই অবস্থায় একলা—

কথা থামিয়ে দিয়ে শুধু বলল, আমার জন্ত ভেবো না,—তুমি যাও।

মার্লিনের কথার মধ্যে কি ছিল জানি না—আমার আর দ্বিতীয় কথা বলা হলো না। চললাম মাঠের পথ ধরে। একটু গিয়ে পিছন ফিরে চেয়ে দেখি, মার্লিন সেইখানেই চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে।

* * * *

পরের দিন সকালবেলা আমি হাসপাতালের কাজে ব্যস্ত, এমন সময় একটা চিঠি এলো আমার হাতে। মার্লিনের চিঠি খামে মোড়া—তখনই খুলে পড়লাম। মার্লিন লিখেছে—আমি 'লু' যাওয়ার জন্ত রওয়ানা হচ্ছি, তুমি কিন্তু পরশু দিন নিশ্চয়ই এসো। কাল রাত্রের ব্যাপারটা নিয়ে পাছে কিছু ভাব, তাই এই চিঠি দিয়ে গেলাম।

খবর নিয়ে শুনলাম—একটি লোক চিঠিখানা নিয়ে এসেছে, বাইরে আছে দাঁড়িয়ে। তখনই বাইরে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করলাম—লোকটি টম।

শুধালাম, মার্লিন চলে গেল?

বলল হ্যাঁ, মার্ক্কে তাকে ট্রেণে তুলে দিয়ে সোজাই আমি হাসপাতালে এসেছি।

শুধালাম, মার্লিনের মা কবে যাচ্ছেন উইসবীচ?

মার্লিন চলে গেলে মার্লিনের মা উইসবীচে গিয়ে বোনের কাছে কিছুদিন থাকবেন—এ ব্যবস্থার কথা আমি আগেই শুনেছিলাম। টম বলল, আজ বিকেলেই গাড়ী আসবে—তাঁকে নিতে।

টমের মুখখানা কেমন যেন মলিন হয়ে গেল। বলল, মার্লিন গিয়ে কি রকম থাকে সে খবর চিঠিতে নিশ্চয়ই আসবে আপনার কাছে। আমি বুঝি মাঝে মাঝে এসে আপনার কাছ থেকে খবর নিয়ে যাই—আপনার আপত্তি নেই ত?

বুঝলাম, আমার 'লু' যাওয়ার কথাটি মার্লিন কাউকে বলেনি, টমকেও না। টমের কথাগুলো শুনে টমের মুখখানার দিকে চেয়ে কেমন যেন একটা মায়া হল।

বললাম, আমিও থাকব না টম্! আমিও মনে করছি এই সময় ছুটি নিয়ে কিছুদিন বাইরে ঘুরে আসব। কিন্তু আমি মার্লিনকে আজই লিখে দেব—মাঝে মাঝে চিঠি দিয়ে তোমাকে খবর দিতে।

অনেক ধন্যবাদ, বলে টম চুপ করে গেল।

* * * *

'লু'। কর্ণওয়ালে সমুদ্রের ধারে ছোট্ট সহরটি 'লু'। একটি ছোট নদী 'লু'র মাঝখান দিয়ে বয়ে এসে সমুদ্রে মিশেছে—তার দুপাড়েই ছড়ান 'লু' এর বাড়ী-ঘর ইত্যাদি। নদীটির বাম পাড়ে সরু সরু বাঁধান দু-তিনটি রাস্তার দুধারে ছোট ছোট বাড়ী এবং তার নীচের তলায় নানান রকমের সব দোকান সুন্দর সাজান—এইটেই বোধ হয় 'লু'র আদি গ্রাম। এই পাড়েই নদীর ধারে ধারে জেলেদের সব কুটীর—প্রায়ই দেখা যায় মাছ ধরার বড় বড় জাল রৌদ্রে টেনে মেলে দেওয়া হয়েছে, জেলেদের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা তার চারিধারে খেলা করছে মহা আনন্দে। এই পাড়েই সমুদ্রের ধারেই বেশ চওড়া খানিকটা বাঁধান স্থান—রাস্তাগুলি এসে মিশেছে এইখানেই এবং সেখানে বসবার সব বাঁধান বেঞ্চ রয়েছে—সকাল থেকে সন্ধ্যেবেলা সব সময়ই লোকের ভীড়।

নদীটির দক্ষিণ পাড়ের আবহাওয়া একটু স্বতন্ত্র। বাম পাড়েরই একটি সরু রাস্তা ক্রমে চওড়া হয়ে নদীর উপরের একটি সাঁকো পেরিয়ে ও পাড়ে গিয়েছে ঘুরে, উঠে গিয়েছে পাহাড়ের উপর। কেন না, নদীর দক্ষিণ পাড়ে একটি পাহাড় সোজা উঠেছে সমুদ্রের গা বেয়ে। রাস্তাটি, এই দক্ষিণ পাড় ঘুরে এসে সমুদ্রের ধার দিয়ে পাহাড়ের উপর বেয়ে চলে গিয়েছে অনেক দূর। এই রাস্তাটির এক ধারে পাহাড়ের উপর বড় বড় সব বাড়ী—বেশীর ভাগই হোটেল—এক দৃষ্টিতে দিন-রাত চেয়ে আছে সমুদ্রের দিকে। রাস্তাটির অপর দিকে ছোট ছোট সব ফুলের বাগিচা, নানা রংএর ফুল ফুটে রয়েছে এবং এই বাগিচাগুলির মধ্যে মাঝে মাঝে পাতা রয়েছে সব বেঞ্চ—বসে সমুদ্রের শোভা উপভোগ করবার জন্ত।

আমি 'লু'তে যখন গিয়ে পৌঁছলাম তখনও সন্ধ্যার অন্ধকার ঠিক ঘনিয়ে আসেনি। পৌঁছে খবর নিয়ে সোজা গেলাম রোজ এণ্ড ব্রাউন হোটেলে। রোজ এণ্ড ব্রাউন হোটেলটি 'লু'র দক্ষিণ পাড়ে পাহাড়ের গায়ে রাস্তার ধারে কিন্তু সামনে নদী, সমুদ্র নয়—রাস্তাটি তখনও ঘুরে গিয়ে সমুদ্রের ধার দিয়ে যায়নি। হোটেলে গিয়েই দেখা হল মার্লিনের সঙ্গে—মার্লিন হোটেলেই ছিল। আমাকে দেখেই মুখখানি একটু সলজ্জ মধুর হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। বলল, এসেছ তাহলে?

বললাম, হাঁ রে। কথাই ত ছিল।

বলল, চল, তোমার হোটেলে তোমাকে নিয়ে যাই।

শুধালাম, আমার হোটেল আবার কোথায়? এখানে নয়?

বলল, কাছেই—হেড্‌ল্যাণ্ড হোটেল। এখান থেকে ত সমুদ্র দেখতে পাবে না। সেখানে দোতলায় তোমার একটি সুন্দর ঘর ঠিক করে রেখেছি—জানালা দিয়ে দিনরাত সমুদ্র দেখতে পাবে।

বললাম, দিন-রাত শুধু সমুদ্র দেখতে ত আমি এখানে আসিনি?

বলল, ভয় নেই—দিন-রাত্ত সমুদ্র দেখতে হবে না। মাঝে মাঝে আমি গিয়ে সমুদ্র আড়াল করে দাঁড়াব।

* * * *

সত্যিই হেডল্যাণ্ড হোটেলের ঘরটি বড় সুন্দর! সমুদ্রের দিকে মস্ত বড় একটা জানালা—চোখের সামনে সর্ব্বদাই ভেসে রয়েছে অন্তহীন নীল জলরাশি। হেডল্যাণ্ড হোটেলটি রোজ এণ্ড ক্রাউন থেকে বেশী দূরে নয়—রাস্তা দিয়ে একটু গিয়ে সমুদ্রের দিকে মোড় নিলেই রাস্তার ধারে হেডল্যাণ্ড হোটেল। সুন্দর তিন তলা বাড়ী এবং বাড়ীর সামনে ছোট একটি ফুলের বাগান।

যদিও মালিনকে মুখে কিছু বলিনি, কিন্তু মনে মনে একটা ভয় হয়েছিল—সমুদ্রের ধারের হোটেলে সমুদ্রের উপরেই ঘর, না জানি কত টাকাই না লাগবে ওখানে থাকতে! কিন্তু যখন শুনলাম, সপ্তাহে মাত্র সাড়ে তিন গিনি থাকা এবং খাওয়ার খরচা—তখন মনে মনে নিশ্চিন্ত হয়েছিলাম, সন্দেহ নাই। এবং বুলা! এইখানেই বলে রাখি, এত দিন হাসপাতালে কাজ করার দরুণ কিছু টাকাও আমার হাতে তখন জমেছিল।

পনেরটা দিন ছিলাম—'লু'তে। জীবনের মাত্র পনেরটা দিন। কিন্তু এই পনেরটা দিন সোনার অক্ষরে লেখা হয়ে আছে আমার জীবনে—কোনও দিনই ভুলিনি, ভুলবও না কখনও। আজ জীবনের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে সেই দিনগুলি একটা মধুর স্বপ্নের মতন মনে হয়, বাস্তবে আজ তার যেন কোনও অস্তিত্ব নেই। কিন্তু তার মধুর স্মৃতিটি একটি সূক্ষ্ম হারিয়ে-যাওয়া বাঁশীর সুরের অন্তরতম অন্তরে সদাই বাজে—মাঝে মাঝে ভুলিয়ে দেয় বর্ত্তমান, ভুলিয়ে দেয় জীবনের সমস্ত কাজ।

প্রেম! সৃষ্টির আদিযুগ থেকে প্রেম এসেছে মানুষের জীবনে, থাকবেও তত দিন, যত দিন না সৃষ্টির পরিণতি ঘটে। এইটেই যে বিশ্ব-সৃষ্টির আদি অনুপ্রেরণা। প্রচণ্ড অপ্রতিহত এর শক্তি, একটা মন্ত্রপূত তীক্ষ্ণ বাণের মতন ছুটে চলেছে সমস্ত সৃষ্টির মধ্য দিয়ে, হয়ত সৃষ্টির অন্তে প্রলয়ে হবে এর মহাসমাপ্তি। পৃথিবীর এক প্রান্তে কর্ণওয়ালের সাগরতীরে পনেরোটা দিন সমস্ত জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মার্লিনকে নিয়ে এক প্রেমের তপস্যায় এই সত্যটি মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করেছিলাম। আরও উপলব্ধি করেছিলাম—সেই মন্ত্রপূত বাণের মন্ত্রশক্তিতে সৃষ্টির সমস্ত সৌন্দর্য্য মধুর হয়ে ঘনীভূত হয়ে উঠে মানুষের জীবনে এই প্রেমের পরশে। হয়ত বা তাঁরই সৃষ্টির কৌশলে মহাপ্রেমের মহাসাধনার এইটেই প্রথম সোপান। জানি না, অতটা উপলব্ধি আমার হয়নি।

বুলা! ভয় পেয়ো না। এই পনেরটা দিনের প্রেমের কাহিনী বিস্তারিত কিছুই বলব না। গোপনে আমার মনের নিবিড়ে আজ সে নিয়েছে বাসা। তাকে টেনে বাইরে এনে জাহির করে তার স্বাভাবিক মর্য্যাদাটুকু ক্ষুণ্ণ করার ইচ্ছা আমার আদৌ নাই। সে শক্তিও আর নাই বোধ হয়।

তবে আমার কাহিনীটুকু বোঝবার জন্য যেটুকু যা বলার প্রয়োজন সেইটুকুই বলব—বেশী নয়।

* * * *

ছু'বেলাই আমরা একসঙ্গে বেড়াই। সকালবেলা ব্রেকফাষ্ট খেয়ে মার্লিন আসে আমার হোটেলে, ছু'জনে চলে যাই সমুদ্রের ধারের রাস্তাটি দিয়ে, চলে যাই মানুষের বসবাস ছাড়িয়ে নির্জ্জন বনভূমিতে—যেখানে পাহাড়ের পায়ের তলায় সমুদ্র এসে বারে বারে জানায় প্রাণঢালা প্রণতি। সেইখানে কোনও একটি গাছের তলায় ছু'জনে বসি পাশাপাশি—বসে থাকি অনেকক্ষণ। আবার বিকেলে সাপার খেয়ে যাই—থাকি অনেক রাত পর্য্যন্ত। তিথি ছিল শুক্লপক্ষ—রোজই পাই আকাশে চাঁদ, যতক্ষণ থাকি একদৃষ্টে চেয়ে থাকে আমাদের পানে। দিনের বেলায়ও বৃষ্টি-বাদল নাই—মাঝে মাঝে ঝকঝক করে ওঠে সূর্য্যের আলো। সমস্তক্ষণই প্রাণমন দিয়ে অনুভব করি—ভগবান তাঁর সৃষ্টির সমস্ত সৌন্দর্য্য ঢেলে দিয়ে দুহাতে সমস্তক্ষণই আমাদের করেন আশীর্ব্বাদ।

একদিন সকালবেলা ছু'জনে এই রকম বসে আছি—সেদিন পরিষ্কার সূর্য্যের আলো ছিল। সমুদ্রের গাঢ় নীল জলে দূরে দূরে জেলেদের নৌকাগুলি ভেসে বেড়াচ্ছে—এক একটা বড় বড় রাজহাঁসের মতন, দেখতে ভালই লাগছিল চোখে। হঠাৎ মার্লিন বলল বিকো! চলো একদিন পরপেলো বেড়িয়ে আসি।

শুধালাম, সে কোথায়?

বলল, জান না? এখান থেকে মোটর-বোটে সমুদ্রের উপর দিয়ে যেতে হয়। সকালবেলা ন'টায় বোট ছাড়ে—বেলা ছুটোর মধ্যে আসে ফিরে। আমাদের হোটেল থেকে অনেকে বেড়িয়ে এসেছে।

শুধালাম, পরপেলোটা কি?

বলল, তা-ও জান না! একটা ছোট জেলেদের গ্রাম—সমুদ্রের

ধারে পাহাড় দিয়ে ঢাকা। এখান থেকে মোটর-বোটে যেতে ঘণ্টা দেড়েক লাগে। শুনেছি—এই পাহাড়ের ধার দিয়ে মোটর-বোটটি যায়, ভারি সুন্দর দৃশ্য!

বললাম, বেশ ত। চল কালই যাই।

বলল, নদীর ওপার থেকে বোট ছাড়ে—ঠিক বেলা ন'টায়।

*   *   *   *

পরের দিন গেলাম বেড়াতে পরপেলো। নদীর ওপারে সমুদ্রের ধারে বাঁধান জায়গাটির পাশ দিয়ে নদীর উপর বোটে উঠবার ঘাট—দুজনে উঠলাম বোটে। বোটটি নদী দিয়ে এসে পড়ল সাগরে, দুলতে দুলতে চলল আমাদের পাহাড়ের গা ঘেঁসে। বোটে আমাদের মতন আরও কয়েক জন লোক ছিল—ভাড়া দিয়ে তারাও যাচ্ছে বেড়াতে পরপেলো। আমরা দুজনে, বোটের এক কোণে বেঞ্চের উপর নিলাম নিজেদের স্থানটুকু করে—সেখান থেকে পাশ দিয়ে হাত বাড়ালে সমুদ্রের জল ছোঁয়া যায়—মার্লিন মাঝে মাঝে হাত ডুবিয়ে সমুদ্রের জল নিয়ে খেলা করছিল। আমি মার্লিনের দিকে মুগ্ধ হয়ে চাইছিলাম বারে বারে।

সত্যিই বড় সুন্দর দেখাচ্ছিল মার্লিনকে। একটি নীল রং-এর ওভারকোট গায়ে, মাথায় বেঁধেছে একটি নীল রং-এর রেশমী রুমাল—সমুদ্রের হাওয়ার অত্যাচার থেকে চুলগুলিকে বাঁচাবার জন্ত। মার্লিনের দিকে চেয়ে চেয়ে বারে বারে মন গর্ব্বে উঠছিল ভরে—এই নীল সমুদ্রবক্ষে নীলবসনা সুন্দরী আমার, একান্ত আমারই।

ক্রমে বোট এলো পরপেলোয়। সমুদ্র থেকে একটু বেঁকে আমাদের বোটখানি ঢুকল দুটি পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে ছোট একটি নীল জলাশয়ে। এই জায়গাটি সমুদ্রের একটি অংশ বলা যেতে পারে, তবে জল স্থির, এখানে কোনও ঢেউ নেই। বোট থেকে নামলাম পরপেলোয়।

পরপেলো গ্রামটি দেখে মুগ্ধ হলাম। এরকম গ্রাম জীবনে দেখিনি, আর দেখবও না বোধ হয় কখনও। সত্যিই চারি দিকে পাহাড় দিয়ে ঢাকা একটি অজ পল্লীগ্রাম—একটি মাত্র বাঁধান সরু রাস্তা পাহাড়ের গা ঘেঁসে জলাশয়টিকে ঘিরে রয়েছে এবং তার পাশে পাশে ছোট ছোট কুটীর প্রায় সবই জেলেদের। জলাশয়টিতে সারি সারি নৌকা বাঁধা এবং জলাশয়ের একটা দিক সিমেণ্ট দিয়ে বাঁধান। বোট থেকে এই বাঁধান স্থানটিতে উঠে গ্রামটির দিকে চেয়ে মনে হল—গ্রামটি যেন ঘুমিয়ে আছে সমস্ত জাগ্রত জগত থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে, নিজের মধুর স্বপ্নে হয়ে আছে ভরপুর। মনে হল—কোন দিন যদি গ্রামটিকে জাগিয়ে পৃথিবীর মানচিত্রে জাগ্রত জগতের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হয়, তবে যেন লজ্জাতেই যাবে মরে।

মার্লিন বলল, চল কোথাও একটু চা খেয়ে নেওয়া যাক।

বললাম, সে ত খুব ভাল কথা কিন্তু এখানে কি চা পাওয়া যাবে?

বলল, চল ঘুরে দেখি—দু' ঘণ্টা ত সময় হাতে আছে।

পাওয়া গেল। বাঁধান স্থানটি ধরে গ্রামের পাশ দিয়ে একটু ঘুরেই দেখি—একটি ছোট্ট চা'-এর দোকান—ছোট একটি নীচু ঘর, তাতে দু'খানি—বেঞ্চ পাতা, মাঝখানে একটা টেবিল। আরও দু'-একজন বসে চা খাচ্ছে। চা চাওয়াতে, একটি বর্ষীয়সী স্থূলাঙ্গী মহিলা এসে চা দিয়ে গেল। চা-এর সঙ্গে খাবার চেয়ে সুবিধামত কিছুই পাওয়া গেল না। কেক অবশ্য দিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু মার্লিন বলল, ঐগুলো টাটকা নয়, খেয়ো না।

চা-এর পর্ব্ব শেষ করে আমরা গ্রামটির রাস্তা ঘুরে ক্রমে গ্রাম ছাড়িয়ে এসে পড়লাম একটা নিরিবিলি স্থানে—যেখান থেকে সমুদ্র পরিষ্কার দেখা যায়। বসলাম দু'জনে পাহাড়ের গায়ে সমুদ্রের দিকে চেয়ে। একটি হাত দিয়ে মার্লিনকে কাছে টেনে নিলাম—মার্লিনও অনায়াসে আমার হাতের মধ্যে ধরা দিয়ে আমার কাছ ঘেঁসে বসে মাথাটি রাখল আমার কাঁধের উপর। এইখানেই বলে রাখি—মার্লিন এই রকম করে বসতে বড় ভালবাসত এবং ঘণ্টার পর ঘণ্টা এই রকম করে চুপ করে থাকত বসে, কথা বিশেষ কিছু বলত না। আজও সেই রকম খানিকক্ষণ চুপ করে থাকার পর শুধালাম, লীনা! কি ভাবছ?

বলল, ভাবছি আমরা দু'জনে যদি পরপেলোর লোক হতাম ত বড় ভাল হত।

শুধলাম কি রকম?

যেন একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস চেপে নিয়ে বলে যেতে লাগল, তুমি চলে যেতে নৌকা নিয়ে দূরে দূরে মাছ ধরতে, ফিরে আসতে বিকেলবেলা। আমি তোমার জন্ত রান্না-বান্না করে আমাদের কুটীরটি সুন্দর করে সাজিয়ে এইখানে এসে দাঁড়িয়ে চেয়ে থাকতাম সমুদ্রের দিকে—কখন তোমার নৌকা আসবে।

হেসে বললাম, লীনা! তোমার কল্পনা শক্তি আছে, তুমি ইচ্ছে করলে বড় কবি হতে পারতে।

একটু চুপ করে থেকে আবার বলল, আচ্ছা বিকো! জীবনটাকে এখনও সে রকম করে নেওয়া যায় না?

একটু অবাক হয়ে শুধালাম, তার মানে?

বলল, ধর এইখানে যদি আমরা দু'জনে একটা কুটীর নিই—জগৎটার দিকে পিছন ফিরে সমস্ত জগৎ থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে—দুজন দুজনকে নিয়ে—

হেসে বললাম, আমি মাছ ধরব?

বলল, কেন ধরবে না? কি কব, তাতে কি এসে যায়—মনের শান্তিটাই ত বড় কথা।

বললাম, আমি ত মাছ ধরতে জানি না?

বলল, শিখে নেবে।

বললাম, তাহলে ডাক্তারী বিদ্যেটা ত একেবারে মারা গেল?

বলল, ডাক্তারীও করবে—মাছও ধরবে। বলে হঠাৎ নিজের মনেই খিল-খিল করে উঠল হেসে।

*   *   *   *

দেখতে দেখতে 'দু'তে পনেরোটা দিন কেটে গেল—এল আমার ফিরে যাওয়ার দিনটি। কথা হয়েছিল—আমি ফিরে যাওয়ার সপ্তাহখানেক পরে মার্লিনও যাবে ফিরে। বলেছিল—একলা এখানে আমার মন ভাল থাকবে না।

যেদিন চলে যাব, তার আগের দিন সন্ধ্যাবেলা আমরা দুজনে গিয়ে বসেছি—সেই পাহাড়ের উপরের রাস্তা ধরে মানুষের বসবাস ছাড়িয়ে নির্জ্জন বনভূমিতে, সামনেই পাহাড়ের তলায় সমুদ্র। সেদিন বোধ হয় ছিল পূর্ণিমা—আকাশে পূর্ণ চন্দ্র ক্রমে একটা

মায়াজাল ছড়িয়ে দিল সমস্ত জগৎটার উপরে, আমরা দু'জনেও ধরা পড়ে গেলাম সেই জালের মায়ায়। মার্লিন যেমন বসন্তে ভালবাসে—চুপ করে বসেছিল আমার পাশ ঘেঁষে মাথাটি কাৎ করে রেখেছিল আমার কাঁধের উপরে। খানিকক্ষণ এই রকম চুপ করে বসে আছি, কারও মুখে কোনও কথা নাই—হঠাৎ যেন মার্লিনের বুক ভেঙ্গে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ল, বয়ে গেল আমার বুকের উপর দিয়ে।

সস্নেহে শুধালাম, লীনা! কি হল?

আস্তে বলল, না কিছু না।

আবার শুধালাম, অমন একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ল?

সে কথার কোনও উত্তর না দিয়ে শুধাল, তুমি কবে ফিরে যাবে?

বললাম, জান ত—কালই।

বলল, সে কথা বলছি না। তুমি কবে দেশে ফিরে যাবে?

মার্লিনের মুখে হঠাৎ এ প্রশ্ন শুনে অবাক হলাম। সেই যে হাসপাতালে মার্লিন বলেছিল—তুমি আমাকে ছেড়ে চলে যাবে না ত—তার পর থেকে মার্লিন এ বিষয়ে কোনও দিন কোনও কথা বলেনি। এমন কি, আমার দেশের বিষয় কোনও দিন কিছুই জানতে চায়নি। সে দিক দিয়ে কোনও ইঙ্গিতও পাইনি তার কাছে কোনও দিন।

শুধালাম, হঠাৎ আজ এ প্রশ্ন কেন?

বলল, কথাটা ত ভোলবার নয়।

একটু চুপ করে রইলাম। তার পর বললাম, সে এখনও অনেক দেরী। সে বিষয় পরে ভাবা যাবে।

বলল, যেতে ত হবেই তোমাকে একদিন ফিরে।

বললাম, কেন? তুমিই ত আমাকে ফিরে যেতে বারণ করেছিলে—হাসপাতালে মনে নাই?

বলল, সে কথার কোন মানে নেই।

শুধালাম, কেন?

বলল, দেশের দিক দিয়েও ত তোমার একটা মস্ত বড় কর্ত্তব্য আছে—আমি কেন তার বাধা হই? কথার মধ্যে ঈষৎ উত্তেজনার আভাস সহজেই পেলাম।

বললাম, বাধার কথা ত কিছু নয় লীনা! আমিই যে তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারব না।

একটু চুপ করে রইল। তার পর হঠাৎ একটু জোরের সঙ্গে বলল, না যেতেই হবে তোমাকে ফিরে। আমার যা হয় হবে।

বললাম, শোন লীনা! কথাটা যে আমিও ভাবিনি তা নয়। একবার যাব দেশে ফিরে—বাবাকে দেখে আসার জন্য। চিঠি পাচ্ছি—বাবার শরীর মোটেই ভাল যাচ্ছে না। বাবাকে দেখে আবার ফিরে এসে এই দেশেই বসবাস করব, এইখানেই করব ডাক্তারী।

লীনা একটু খুব চাপা রকমের হাসি হেসে উঠল।

শুধালাম, হাসলে যে?

বলল, অতি দুঃখেও মানুষের হাসি পায়।

আবার শুধালাম, হাসলে কেন লীনা, শুনি?

বলল, একবার দেশে গেলে আর তুমি ফিরে এসেছ!

[ক্রমশঃ।

স্বপ্ন-তরী

(শ্রীঅরবিন্দের Dream boat কবিতার অনুবাদ)

স্বপ্ন-বহ্নি-তরী বেয়ে কে এল আজিকে মোর পানে
অগ্নি-শিখাসম ভাল, তপন-কাঞ্চন-তনু তার।
—নীরবতা ভেঙ্গে যায় সুমধুর মৃদু-গুঞ্জরণে—
'এখন আসিবে কি গো? জ্বলিছে কি বহ্নি-শিখা প্রাণে?'

নিভৃত অন্তর-কোণে গোপনে কি যেন শিহরায়—
জাগে মনে জীবনের সঞ্চিত হরষরাশি যত—
—পুলক-সম্ভার এত দিতে হবে ছাড়ি' চিরতরে—
তরণী ফিরিয়া যায়, হেম-কান্তি দেবতা মিলায়।—

করিছে সে বাস আজ শূন্য-বক্ষে এই বসুধায়—
প্রেমের সমাধি হল, আনন্দের হল অবসান।
নিয়েছে বিদায় সুখ চির-জনমের তরে হায়!
স্বর্ণ-দেব, স্বর্ণ-তরী এল না ত কভু ফিরে আর!

—অনুবাদক সুধীরকান্ত গুপ্ত

ভাবি এক, হয় আর

শ্রীদিলীপকুমার রায়

কুড়ি

পল্লবের সঙ্গে ঋতার ভাব হয়ে গেল দেখতে দেখতে। ঋতা ওকে কত কথাই যে বলল নিজের জীবনের। কোনো মেয়ে যে কোনো সত্তপরিচিতের কাছে এত সহজে নিজেকে খুলে ধরতে পারে, এটা পল্লব ভাবতেই পারেনি—বিশেষ করে এ-জাতীয় পরিবেশে। তার উপর এমন সব মনের কথা বলা যা অন্তরঙ্গকেও মেয়েরা সহজে বলে না। মিষ্টার টমাস ওদের বর্তমান হৃদ্যতা দেখে খুশি হ'য়ে একদিন পল্লবকে চুপি চুপি বললেন: তোমার সঙ্গে ওর বনিবনাও হওয়ায় আমি সত্যই আশ্বস্ত হয়েছি বাকচি! কেবল আমার একটি অনুরোধ তুমি রেখো। ওর অভিনেত্রী হওয়ার ছলনায় ভুলেও সায় দিও না—মানে যদি ওর সত্যিকার শুভার্থী হও।

পল্লবের একটু আশ্চর্য লাগল এ ধরণের অনুরোধে। বুঝল—মিষ্টার টমাসের নিষেধে ঋতা কর্ণপাত করেনি। কিন্তু তাই যদি হয়, তবে পল্লবের মতামতে কান দিতে যাবে ও কি দুঃখে? দু'দিনের আলাপী বৈ তো নয়?

ভাবতে বাজে—তবু অস্বীকার ক'রে তো লাভ নেই যে ওদের দেখাও যেমন আকস্মিক ছাড়াছাড়িও হয়ত হবে তেমনি—এক মুহূর্তে। ভাগবতের একটি উপমা মনে পড়ে যায়—বন্যার স্রোতে দুটো কুটো কয়েক মিনিটের জন্যে কাছাকাছি এসেছিল, তারপরেই ঐ স্রোতের ডাকেই তারা উধাও—দুজনে দুপথে।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কোথা দিয়ে যেন একটা বিদ্রোহের সুরও বেজে ওঠে: আনন্দের এত আলো রূপ রস গন্ধ মানুষের কাছে এসে পৌঁছয় তো মানুষেরি মাধ্যমে—সহযাত্রীর সখ্যে, সহযোগে। এ সবই কি আকস্মিক হতে পারে—আজ আছে কাল নেই? মানুষ কেন তবে বার বার জন্মায় এ সুন্দর ধরণীর আলো ছায়া আনন্দ বেদনা আশা নিরাশার পরিবেশে? একটা গান গুনগুনিয়ে ওঠে ওর মনে:—

যদি সৃষ্টি মিছে মায়া
তবে কেন আলো ছায়া?
কেন বেদনারি বৃন্দাবনে বন্ধু ধরে কায়া?

ঋতা কেন এল ওর জীবনে দু'দিনের জন্যে? কিসের টানে ওরা পরস্পরের এত কাছাকাছি এসে পড়ল? এই আকস্মিক সান্নিধ্য যদি অর্থহীনই হবে, তবে কেনই বা দিনে দিনে এর মধ্যে দিয়ে ফুটে ওঠে এক অনামা সার্থকতার পূর্বরাগ? ঋতা মাঝে মাঝে খুব বিষণ্ণ হ'য়ে পড়ত, তখন পল্লবের মনেও লাগত সে বিষাদের ছোঁওয়া। এই সূত্রেও ঋতার কাছে কয়েকটি বিষাদের গান শিখে নিল—একটি গানের কী যে সুন্দর প্রাণ-উদাস করা সুর—ও কোনো দিনও কি ভুলবে? গাইতে গাইতে ঋতার সেই গাল বেয়ে অশ্রু ঝরা, বিশেষ করে যখন সে গাইত:—

La vie est vaine :
Un peu d'amour,
Un peu de haine,
Et puis bonjour !

La vie est brève :
un peu d'espoir,
Un peu de rêve,
Et puis bonsoir !

গানটির মধ্যে ফুটে উঠত মানুষের সেই চিরন্তন বৈরাগ্য—সবই বৃথা, বৃথা, বৃথা—all paths of glory lead but to the grave। ও এ-গানটির তর্জমা ক'রে একদিন ঋতাকে শোনাল ঐ একই সুরে:

জীবন বিফল মেলা:
একটু বিরাগ দ্বেষ,
একটু প্রণয় খেলা,
তার পরে দিন শেষ!

ক্ষণিক হায়, জীবন:
একটু আশার ভাতি,
একটু সুখ-স্বপন,
তারপরে শেষ রাতি।

ঋতা তৎক্ষণাৎ উজিয়ে উঠল, বলল: তোমাদের ভাষার সঙ্গে শুধু ফরাসি গানের নয়, ভাষারও যেন আত্মীয়তা আছে। তোমাকে ফরাসি ভাষা ও গান ভালো ক'রে শিখতেই হবে। আর আমি হব তোমার প্রথম গুরু।

ওর সুবিধে হয়ে গেল ঋতার আন্তরিক ঔৎসুক্যে। দেশে ও ফরাসি ভাষা চলনসই গোছের শিখেছিল এক ফরাসি শিক্ষকের কাছে। কিন্তু ফরাসি বলতে বাধত—আরো ফরাসি ভাষার সন্ধির (liason) জন্যে। ওর কান ধরতে পারত না আলাদা আলাদা কথাগুলি। ঋতা নাছোড়বান্দা হ'য়ে ওর সঙ্গে নিরন্তর ফরাসিতে কথা বলতে বলতে ওর কান দু-দিনেই অভ্যস্ত হ'য়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ও একলা নিজের ঘরে ক্রমাগতই ফরাসি পড়ত ও চেষ্টা ক'রে আপন মনেই কথা কইত। ফলে ওর ফরাসিতে কথা বলা একটু একটু ক'রে রপ্ত হয়ে গেল। ঋতা ওকে কম্প্লিমেণ্ট দিল: তোমার শুধু গানেই নয় মনামি, (mon ami—বন্ধু আমার) ভাষারও দেখছি খাসা সহজ-পটুতা আছে। ঋতার প্রতি আকৃষ্ট হবার সঙ্গে সঙ্গে ফরাসি ভাষা ও ফরাসি গান এ-দুয়েই ওর উৎসাহ বেড়ে গেল। আরো একটা সুবিধে হ'য়ে গেল এই জন্যে যে, ফরাসিতে কোথাও বেধে গেলেই ও ইংরাজিতে কথাটা শেষ করত ও ঋতা তৎক্ষণাৎ ফরাসি ভাষায় সেটা অনুবাদ ক'রে দিয়ে ওকে উৎসাহিত করত। তা ছাড়া ঋতার মুখে ফরাসি ভাষা এত শ্রুতিমধুর হ'য়ে ওর কানে বাজত যে, সে সব ছেড়ে ও ফরাসি ভাষা আর গান নিয়ে পড়ল এবং মাসখানেকের মধ্যেই ফরাসি ভাষায় কথা বলায় ও গান গাওয়ায় আশাতীত উন্নতি করল। ফলে ঋতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ওর কাছে আরো তৃপ্তিকর হ'য়ে উঠল।

কেবল এক জায়গায় ওর ঋতার সঙ্গে ক্রমাগতই বাধত। ঋতা মাঝে মাঝে বিষণ্ণ হ'লেও ওর স্বভাবের মূল প্রবণতাটি ছিল প্রফুল্লতারই দিকে। ও বিষণ্ণ অবস্থায় নানা psalm জাতীয় স্তব গাইলেও প্রফুল্ল অবস্থায় গাইত শুধুই উচ্ছলতার গান। পল্লবের সে সব গান তত ভালো লাগত না, বলত, এ সব গানের ভাব ও সুর অগভীর। আর কোথায় যাবে? ঋতা উদ্দীপ্ত হ'য়ে তর্ক জুড়ে

সুপার হোয়াইট কলিনস

দিয়ে দৈনিক মাত্র **একবার** দাঁত মাজলে দাঁতের ক্ষয় ও মুখের দুর্গন্ধকারী জীবাণু ধ্বংস হবে।

* পরিবারের সকলেই সুপারহোয়াইট 'কলিনসের' শীতল তৃপ্তিদায়ক মিষ্টি স্বাদ পছন্দ করবে।

যাদের পক্ষে প্রত্যেকবার খাবার পর দাঁত মাজা সম্ভব নয়, মনে রাখবেন, দৈনিক মাত্র একবার সুপার হোয়াইট 'কলিনস' দিয়ে দাঁত মাজলে, আপনার দাঁত ক্ষয়প্রাপ্ত হবেনা উপরন্তু অধিকতর সাদা ঝকঝকে পরিষ্কার হবে।

দাঁতের ক্ষয় নিবারণ করে।

পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, দৈনিক একবার মাত্র সুপার হোয়াইট 'কলিনস' দিয়ে দাঁত মাজলে দাঁতের ক্ষয় ও গহবর উৎপাদনকারী জীবাণুর বেশীভাগ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।
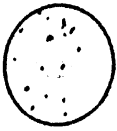
মুখের দুর্গন্ধ দূর করে

সুপার হোয়াইট 'কলিনস্' সঙ্গে সঙ্গে মুখের বিস্বাদ, দুর্গন্ধ দূর করে এবং সকাল থেকে রাত্র পর্যন্ত আপনার নিশ্বাস প্রশ্বাস মধুরতর রাখে।

দাঁত আরও পরিষ্কার করে ! মুখে সুস্বাদ বজায় রাখে।

সুপার হোয়াইট 'কলিনস্' কত তাড়াতাড়ি আপনার দাঁতকে উজ্জ্বলতর ও আরও শুভ্র করে তোলে এবং মুখ পরিষ্কার করে প্রফুল্লতা আনে, তা পরীক্ষা করুন।

চরম প্রমাণ

পরীক্ষাগারে প্রমাণিত হয়েছে যে, মাত্র একবার সুপার হোয়াইট 'কলিনস্‌দ্বারা' দাঁত মাজার পর মুখের দুর্গন্ধকারী ও দাঁত ক্ষয়কারী জীবাণু সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়।

সুপার হোয়াইট 'কলিনস্' চেয়ে নিন।

Registered User
Geoffrey Manners & Company Private Limited

দিত : তোমাদের ঐ এক কথা ; হাসির চেয়ে কান্না বড়, উল্লাসের চেয়ে দীর্ঘনিশ্বাস। আমাদের মধ্যেও ছিল এ প্রবণতা—ছিল কেন, আজও আছে। তাই গির্জায় আজও আমরা গেয়ে থাকি : 'Man walketh in a vain shadow—The days of man ave but as grass : for he flourisheth as a flower of the field—এই সব মামুলি বৈরাগ্য, বন্ধ্যা দুঃখ বিলাস। প্যারিসে আমার এক প্রিয় সখী একজনকে ভালোবেসে ঘা খেলেন, অমনি মেয়ের ঠুনকো হৃদয় ভেঙে পড়ল, তিনি এক কারমেলাইট কনভেন্টে গিয়ে মুখ লুকোলেন : কিছুই কিছু নয়, শুধু ভগবানই আমাদের একমাত্র আশ্রয়—ভাবটা পাহাড়ের মতন ঘুরোনো, আর ঠিক তেমনিই অচল : এ-জগত হ'ল শুধু ছায়াবাজি—Change and decay in all around I see—সুতরাং, O Thou, who changest not, abide with me ! শোনো পল ! এ বড় সর্বনেশে ফাঁদ, এতে পা দিও না। জীবনে যত দুঃখ-কষ্টই থাক না কেন, জীবনে বিশ্বাস হারিও না। আমি এক সময়ে হারাতে বসেছিলাম, তাই জানি এ-বিশ্বাস হারানোর পরিণাম কি দারুণ। আংকল্-এর কাছে শুনেছি, মা এই বিশ্বাসটুকু রাখতে পারেন নি ব'লেই করেছিলেন আত্মহত্যা। তাই বলি—ঝাঁকুনি দিয়ে বৈরাগ্যকে ঝেড়ে ফেলে দাও—গেয়ো না মিথ্যে হতাশার গান। কবিদের অশ্রুল উচ্ছ্বাসে কান দিও না :

Tears from the depth of some divine despair—
O Death in Life, the days that are no more !

কি

O Daughter of death and our Lady of pain !

না মনামি, না—এ চলবে না এ-যুগে। যে-যুগে চলত সে-যুগে মানুষ ভগবান ও পরলোক নিয়েই অস্থির হ'ত—ইহলোক ও মানবতার মাটিকে বিশ্বাস করতে না পারার দরুণ। তাই তারা দেখেও দেখতে চায়নি যে 'ভগবান ভগবান' করে মানুষ তখনই, যখন জীবনের খেলায় সে হার মানে।

পল্লব উষ্ণ হ'য়ে উঠত, বলত : মানে ভগবান নাস্তি, অস্তি শুধুই এই বস্তুজগত—এই তো ? এ এ-যুগের বাণী হ'তে পারে, কিন্তু যাই এ-কেলে তাই যে সত্য তা তো নয়—পরে একদিন এ-কেলে কায়া হ'য়ে যাবেই তো সেকেলে ছায়া। তখন ?

রিতার পিঠ পিঠ জবাব : তখন ফের নতুন কায়া আসবে তাকেই বরণ করব—কেন না এরই নাম তো চলা। তাছাড়া—ব'লে হেসে—তোমার ভগবান অস্তি কি না জানি না, কিন্তু বস্তুজগতে যে নাস্তি নয় এটা প্রত্যক্ষ ভাবে জানি। আর জানি বলেই বিশ্বাস করতে বাধে যে, ভগবান যদি সত্যিই থাকেন তবে তিনি কখনই এমনধারা কোনো অদ্ভুত নিয়ন্তা এমনই খামখেয়ালি যে, আমাদের অনর্থক পাঠিয়েছেন এই ছায়াবাজির জগতে—শুধু এখানে মিথ্যে ঘুরে মরে তাঁর কাছে গিয়ে হাহাকারের দরবার করতে। তাই তো আস্তিকদের দেখলেই আমার সব প্রথম প্রশ্ন করতে সাধ যায়—জীবনের উদ্দেশ্য কি শুধু বাঁচার প্রায়শ্চিত্ত করে মরার বখশিস পাওয়া ? জিজ্ঞাসা করি : ভগবানই যদি আমাদের একমাত্র খুঁটি, তবে সে-খুঁটি ছেড়ে আমরা এ নিরাশ্রয় লোকে এলাম কি করতে ? না পল, যদি গান গাইতেই হয় তবে গেয়ো না :

Be thou thyself before my closing eyes

গাও শেলির আশার সুরে সুর মিলিয়ে :

To love and bear, to hope till hope creates
From its own wreck the thing
it contemplates.

পল্লব হেসে বলত : কিন্তু আশা যদি এতই সর্বশক্তিমান, আর ভগবানের কাছে দরবার করা এতই মিথ্যে—তবে সেদিন গাইছিলে কেন শুনি—জীবন বিফল মেলা ?

রিতা বলে : বলে না স্টীম থেমে গেলেও গাড়ি খানিকক্ষণ চলে ? এ হ'ল সেই সেকেলিয়ানার সংস্কারের জের টেনে চলা—যখন সেকেলি বিশ্বাস ফুরিয়ে গেছে। কিন্তু এ-বিষাদ টিঁকবে না মনামি—তরুণ জগত ও নবীন জীবনের টান এত প্রবল যে তোমার ঐ বুড়ো বৈরাগ্য যাবেই যাবে ভেসে। এই ধরণের কথা বলতে বলতে রিতা উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠত, পল্লব মুগ্ধ হ'য়ে শোনার চেয়ে দেখতই বেশি।

এক এক সময়ে ওর মনে ভয় আসত ঘনিয়ে : কেন ও এ-মেয়ের সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠতা করছে—সান্নিধ্যের স্রোতে গা ভাসিয়ে ? এর পরিণাম কোথায় ? মনে পড়ত কুঙ্কুমের শাসন : খবরদার ! আগুন নিয়ে খেলা নয়।

আগুন ! কথাটা মিথ্যেই বা বলে কি ক'রে ? দিনের আলোয় যে সব চিন্তাকে ও দমন করত বহু চেষ্টায়, স্বপ্নে তারা ছাড়া পেত। একদিন হঠাৎ দেখল : রিতার সঙ্গে চলেছে এক স্বপ্নময় সোনার তরীতে ভেসে। কোন্ পারে এসে লাগবে এ মায়াতরী ?—শুধালো রিতা। এমন সময়ে উঠল ঝড়, সে কি ঢেউ ! সঙ্গে সঙ্গে শিলাবৃষ্টি, চোখ-ধাঁধানো বিদ্যুৎ আর মেঘের হুঙ্কার। রিতা ভয় পেয়ে ওর বাহুবন্ধনের মধ্যে আশ্রয় নিল—অম্নি ঘুম ভেঙে গেল।

এ কি ব্যাপার ? নিশুত রাতে ভাবে ও ! বুকের মধ্যে এ কোন কোমলতার স্রোত—ব্যথার সঙ্গে মিশে ? স্বপ্নে যাকে পেয়েছিল এত কাছে সে বাস্তবে দূরে ভাবতে বাজেই বা কেন ? এরই নাম কি প্রেম ? ও চম্‌কে ওঠে। আনন্দ আসে অথচ ভয়ও লাগে পাশাপাশি।

এক একবার ওর মনে হয়—আর নয়—কুঙ্কুম ঠিকই বলেছে—এ মিথ্যা আবেগকে প্রশ্রয় দেওয়া কিছু নয়—এখান থেকে এবার প্রস্থান। কিন্তু হায় রে, তাই বা পারে কই ? মনে গুন-গুনিয়ে ওঠে :

জড়ায়ে আছে বাধা, ছাড়ায়ে যেতে চাই,
ছাড়াতে গেলে ব্যথা বাজে।

আরো এক মুস্কিল—যাবে কেমন করে ? মিষ্টার টমাসকে কথা দিয়েছে যে ছুটিটা এখানেই কাটাবে—তখন হঠাৎ চ'লে গেলে অশোভন দেখাবে না কি ?

তাছাড়া যাবে কোথায় ? লণ্ডনে ? সেখানে মোহনলাল আছে সুলতার কাছে—সুলতাকে ওর একটুও ভালো লাগেনি। সঙ্গে সঙ্গে উলটো যুক্তিও আসে : এখানে রিতার কাছে ফরাসি গান তথা ভাষা শেখাও তো হচ্ছে। ভেবে-চিন্তে একদিন ও রিতাকে বলে : গান শিখতে হ'লে কোথায় যাওয়া ভালো ?

রিতা বলল: যদি সত্যি ভালো গান শিখতে চাও তবে তোমাকে যেতে হবে হয় প্যারিসে, নয় বার্লিনে, নয় ভিয়েনায়।

ও মন স্থির ক'রে ফেলল—ট্রাইপস প'ড়ে আর সময় নষ্ট করা নয়—মাসখানেক বাদে কুঙ্কুমের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে প্যারিসেই যাবে গান শিখতে—কিম্বা ভিয়েনায়। বার্লিনে যেতে ওর অসাধ—যাদের মন্ত্র বলং বলং বাহুবলম্। সঙ্গে সঙ্গে ওর অন্তর-অশান্তি একটু থিতিয়ে আসে—যাবেই যখন চ'লে দুদিন বাদে তখন আরো মাস দেড়েক এখানে কাটানো মন্দ কি?

কিন্তু মনের অস্বস্তি কেটেও কাটে না। রিতার দিকে ওর মন যে ক্রমশই বেশি ঝুঁকছে, এ কথা ও অস্বীকার করে কেমন ক'রে? তার উপর মনে পড়ে ক্রমাগতই কুঙ্কুমের নিষেধ। ফের সেই টলমান অবস্থা।

এমনি সময়ে একদিন সকালে উঠেই পেল ও মোহনলালের এক চিঠি। কুঙ্কুম ফিরেছে জার্মনি থেকে, আছে ২১ নম্বর রাসেল স্কোয়ারে। পল্লব যেন অকূলে কূল পেয়ে গেল, তৎক্ষণাৎ কুঙ্কুমকে লিখল এক দীর্ঘ পত্র, সব কথা জানিয়ে কিছুই গোপন না ক'রে। শেষে লিখল, মোহনলালকেও যেন কুঙ্কুম এ চিঠি দেখায়।

* * * *

দু'দিন বাদে এল কুঙ্কুমের উত্তর:

ভাই পল্লব,

তোমার চিঠি পেয়ে উদ্বিগ্ন হ'য়ে উঠেছি বৈ কি! কাল অনেক রাত পর্যন্ত মোহনলালের সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনা করেছি। ও বলে ভালোই হয়েছে, তুমি এত দিনে কৈশোরের ডাঁশামির চৌহদ্দি পেরিয়ে যৌবনের কোঠায় পা দিলে বুঝি? শেষে বলল: পল্লব সুস্থ সবল বুদ্ধিমান্ যুবক, মানুষ হোক—এত ভয় কিসের? এই ধরণের যত সব মডার্ণ বুলি! কিন্তু আমার ভয় করে আরো এই জন্যে যে, আমি জানি যে এর নাম প্রেম নয়—আর যদি হয়ই তাতেই বা কি? তুমি এসেছ এ দেশে রমণী নিয়ে প্রেমবিলাস করতে নয়, তোমার দৃষ্টিকে গভীর করতে, জ্ঞানকে পুষ্ট করতে; সবার উপর, দেশের সেবক হবার আদর্শে নিজেকে গ'ড়ে তুলতে। তুমি গানকে ব্রত করতে যাচ্ছ খুব আনন্দের কথা। মিষ্টার টমাস তোমাকে ঠিক উপদেশই দিয়েছেন। কিন্তু কিছু মনে কোরো না ভাই—আমার মন বলছে তিনি ঐ সঙ্গে চান রিতারও মঙ্গল—তাই চান তার একটা হিল্লে করতে। কিন্তু এ ভাবে রিতার হিল্লে হ'লেও তোমার হিল্লে হবে না, মানে তুমি কখনই সুখী হবে না, কারণ আমার মনে হয় না, যে মেয়ের অভিনেত্রী হবার দিকেই এত ঝোঁক, সে কারুর গৃহলক্ষ্মী হ'য়ে সুখী হ'তে পারে? আমি নিজে হয়ত কোনো দিনই বিবাহ করব না। কিন্তু তা ব'লে তো আমি গোঁয়ার বা অবুঝ নই যে বলব—চিরকুমার ব্রত না নিলে কেউ যথার্থ দেশসেবক হ'তে পারে না? কেবল একটা কথা আমি বলবই বলব: বিবাহ যদি করোই তবে এমন মেয়েকে বরণ কোরো যে দেশের কাজে তোমার সহায় হবে। না, না, না—কোনো রঙিন প্ররোচনায়ই কান দিও না, তোমার নিজের বা আর কারুর। মিষ্টার টমাসের কথা শুনে তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা হয়েছে। কিন্তু একটি কথা কিছুতেই ভুলো না যে তিনি স্বাধীন দেশের আবহাওয়ায়ই গড়ে উঠেছেন। কাজেই তাঁর যুক্তি স্বাধীন দেশের যুবকদের বেলায় খাটলেও তোমার আমার মতন পরাধীন দেশের যুবকদের বেলায় অচল টাকা।

রিতাও স্বাধীন দেশেরই মেয়ে, আমাদের দেশের পরিবেশে কখনই সুখী হবে না। সব চেয়ে বড় কথা হ'ল এই যে, পুনরুক্তি ক্ষমা কোরো ভাই, তোমার কাছ থেকে দেশ অনেক কিছু আশা করে। তোমার মামাও কখনই সায় দেবেন না এ ধরণের বিবাহে। আমার মনে কত কথাই যে ভিড় ক'রে আসছে কি বলব? সব কি চিঠিতে লেখা যায়? অথচ এখানে আমি দু-একটা জরুরি কাজে বিষম ব্যস্ত, তাই এখনি তোমার কাছে ছুটে যেতে পারছি না। তবে যদি তুমি সত্যিই চাও এ বিষয়ে খোলাখুলি কথাবার্তা কইতে তা হ'লে আমি সময় ক'রে নিয়ে যাব তোমার ওখানে আগামী শুক্রবারে। মিষ্টার টমাসকে আমার ধন্যবাদ জানিও তাঁর নিমন্ত্রণের জন্যে। তবে বলতে কি, আমার কিছুতেই সাউথেণ্ডে যেতে মন চাইছে না—সেখানে রিতা আছে ব'লে। তার যে বর্ণনা তুমি দিয়েছ তাতে মনে হয় না আমাকে তার ভালো লাগবে। আমিও কিছু তার প্রতি প্রসন্ন নই। এরূপ ক্ষেত্রে সবচেয়ে ভালো হয় যদি তুমি দু দিনের জন্যে লণ্ডনে আসো। কি বলো? একটু শান্ত হয়ে ভেবে-চিন্তে লিখো, কেবল এ বিষয়ে যে মিষ্টার টমাসকে কিছু বলা বাঞ্ছনীয় নয় তা তো বুঝতেই পারছ। মোহনলালের কথায়ও কান দিও না। ও পারে নিজেকে সাম্‌লে মেয়েদের সঙ্গে মিশতে। শুনলাম এখানে সুলতা ব'লে একটি নব্যার সঙ্গে ও খুব মেশে। মিশুক, ওর জন্যে আমার ভয় করে না। কিন্তু—রাগ কোরো না ভাই, আমি নিতান্ত সরল ভাবেই বলছি একথা—ও যা পারে তা তুমি পারবে, বলে আমার মন নেয় না। ও জীবনে অনেক পোড় খেয়ে বেশ শক্ত হয়েই গড়ে উঠেছে। কিন্তু তুমি ভাই, বয়সে সাবালক হ'লেও মনে এখনো নাবালক। তোমাকে সাবধান হ'তেই হবে।

প্রথমে ভেবেছিলাম, এত কথা খোলাখুলি চিঠিতে লিখব না—কে জানে তুমি মনে আঘাত পেতেও তো পারো? কিন্তু কাল রাতে মোহনলালের মতামত শুনে মনে হল ও হয়ত তোমাকে উপদেশ দিয়ে বসবে—ভয় না করতে, বেপরোয়া হ'তে—তাই আরো আমি উল্টো গাইছি। আমার মনে হয়—তোমার পক্ষে বেশি বে-পরোয়া হ'তে যাওয়া নিরাপদ নয়। খৃষ্টদেবের একটি প্রার্থনায় আমার মনের পূর্ণ সায় আছে: Lead us not in to temptation. মহাভারতে যুধিষ্ঠির বলেছেন এই কথাই অন্য ভাবে: 'প্রক্ষালনাদ্ধি পঙ্কস্য বরং বা অস্পর্শনং নৃণাম্' ধুলো-কাদায় হাত দিয়ে হাত ধোয়ার চেয়ে ধুলো-কাদায় হাত না দেওয়াই ভালো। তোমার আমার আদর্শের কাছে বিদেশিনী মোহিনীর রূপলাবণ্য ধুলো-কাদারই সামিল হওয়া উচিত।

আশা করি আমাকে ভুল বুঝবে না। আমি বলছি না রিতা খারাপ মেয়ে। কিন্তু ওর মতিগতি যে ধরণের তাতে তোমার আমার পক্ষে ও নিশ্চয়ই 'অস্পর্শনীয়া।' আমার ভালোবাসা নেবে। ইতি তোমার নিত্যশুভার্থী বন্ধু কুঙ্কুম।

পুনশ্চ। হ্যাঁ, একটা কথা বলতে ভুল হ'য়ে গেছে। মোহনলালকে তুমি যে চিঠি লিখেছিলে সে চিঠি ও আমাকে পাঠিয়েছিল। আমি তখন মুনিকে। আমি ওর চিঠি পেয়ে

খুশিই হয়েছিলাম—তুমি অবশেষে গানকেই বরণ করবার মতন মনের জোর পেয়েছ এতে তোমার প্রতি শুভার্থীরই খুশি হওয়া উচিত। কারণ সঙ্গীতে তোমার সহজ-নৈপুণ্য আছে। আমার মনে হয় তুমি নতুন পথ কেটে চলতে চেয়ে ভালোই করেছ। গতানুগতিকতার পথে আরাম ও সুবিধা থাকতে পারে—কিন্তু বড় স্বপ্ন, বড় আশা, বড় আদর্শের পথ কুসুমাস্তৃত না হলেও সত্যি পথ বলি তাকেই। মুনিকে আমার একটি জর্মন বন্ধু লাভ হয়েছে, সে নবীনদের মধ্যে না কি একজন নামজাদা সুরকার। সে বলল—তুমি যদি সত্যিই য়ুরোপীয় গান শিখতে চাও তবে তোমার পক্ষে বার্লিনে কোনো কন্‌সারভেটোরিয়ামে ভরতি হওয়াই ভালো। আমিও ভাবছি বার্লিনে ফের যাব মাসখানেক পরে। তাই আমার অনুরোধ, তুমি আমার সঙ্গে বার্লিনে চলো। আমার সেই বন্ধুটি তোমার সব ব্যবস্থাই করে দিতে পারবেন। কিন্তু একটা কথা—তুমি কিছুতেই আর সাউথেণ্ডে থেকো না। তোমাকে আমার নিজের কথাও অনেক বলবার আছে যে সব কথা পত্রে লেখা নিরাপদ নয়। তাই ফের বলি—তুমি পত্র পাঠ লণ্ডনে চলে এসো—যদি পারো। শেষ কথা: গ্রন্থি যদি কাটতেই হয় এক আঘাতেই কাটা ভালো। মনে রেখো ভাই—Life is real, life is earnest এবং things are not what they seem.

একুশ

পল্লব কুঙ্কুমের চিঠিটি তিন-চার বার পড়ল। যত বারই পড়ে বুকের মধ্যে কোথায় যেন একটা ব্যথার মিড় রণিয়ে ওঠে। এক একবার অভিমানও আসে: কি! মোহনলাল সাবালক আর আমি নাবালক? কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যে কে যেন বলে: কুঙ্কুম অপ্রিয়-সত্য বলে বন্ধুর কাজই করেছে। সঙ্গে সঙ্গে ওর মনে উচ্ছ্বাস জেগে ওঠে—কুঙ্কুম ওর জন্যে এত ভাবে, ওকে এত ভালোবাসে? এ ভালোবাসা যে পেয়েছে সে কি তার মর্যাদা না দিয়ে পারে? কুঙ্কুমের মতন চরিত্রের ভালোবাসা পাওয়া কি সোজা কথা! গর্বে মন ওর ভরে ওঠে, প্রাণে একটু জোরও আসে বৈ কি। না, কুঙ্কুম ঠিকই বলেছে—রিতার সঙ্গে আর বেশী মাখামাখি না করাই ভালো। কি হবে এ ধরণের ঘনিষ্ঠতায় যার চরম পরিণতির কথা ভাবতেও এখনো ওর বুক কাঁপে? ও স্থির করল পরশু—সোমবারেই যাবে লণ্ডনে, কুঙ্কুমের কাছে। কিন্তু ঠিক এই সময়েই ঘটল একটা ঘটনা।

পরদিন ছিল রবিবার। মিষ্টার টমাস প্রতি রবিবার সকালে ছেলে-মেয়েদের নিয়ে প্রাতর্ভ্রমণে বেরুতেন। সেদিন ঠিক হ'ল ওরা যাবে একটু দূরে বনভোজন করতে। টিফিন-ক্যারিয়ারে খাবার দাবার নিয়ে ওরা বেরুবে, এমন সময় হঠাৎ দোরে ক্রিং—ক্রিং—ক্রিং। পরিচারিকা ছুটে গিয়ে দোর খুলতেই এক গম্ভীর স্বর ওদের কানে এল: মিষ্টার টমাস আছেন কি? রিতার মুখ ছাইয়ের মতন সাদা হয়ে গেল। মিষ্টার টমাস ওকে জড়িয়ে ধরে বললেন: ভয় কি মা? আমি আছি।

* * * *

দুর্দান্ত কাউণ্ট পিনো সশরীরে! ওদের বনভোজন ভেস্তে গেল। মিষ্টার টমাস ভদ্র ভাষায় বললেন: বসুন কাউণ্ট!

কাউণ্ট ব'সে কেমন-যেন একরকম হেসে ধরালেন একটি লম্বা সিগার। পল্লব তাঁকে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। চমৎকার চেহারা কিন্তু! মুখাবয়ব যেন কোনো নিপুণ ভাস্করের খোদাই করা। রিতার মুখের সঙ্গে আদল আসে। কেবল চিবুক ও ঠোঁটের ভঙ্গি দেখলে মনে হয়—নিষ্ঠুর। কিন্তু এজন্যে মন একটু খুঁৎ-খুঁৎ করলেও চোখ খুশি হ'য়ে ওঠে বৈ কি। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে যায় রিতার একটি উদ্ধৃতি বাইবেল থেকে: শ্মশানের উপরটা দেখতে কি পরিষ্কার—শাদা ছাইয়ে আস্তৃত, কিন্তু তলায় শুধু জীর্ণ হাড় আর হাড় আর হাড়!

মিষ্টার টমাস পল্লবকে দেখিয়ে বললেন: মিষ্টার বাকচি—আমাদের অতিথি।

কাউণ্ট তৎক্ষণাৎ একগাল হেসে পল্লবের করপীড়ন ক'রে বললেন: আমি মিসেস নর্টনের কাছে আপনার কথা কত যে শুনেছি মিষ্টার বাকচি! আপনি না কি রিতার কাছ থেকে খাস ফরাসি গা'ন শিখেছেন অনেকগুলি, আর সে-গান নাকি এমন চমৎকার ভঙ্গিতে গান যে, লোকে বুঝতেই পারে না আপনি বিদেশী।

পল্লব বিব্রত কণ্ঠে না না করে। মিষ্টার টমাস বলেন: ওর না না শুনবেন না। ইভেলিন ঠিকই বলেছে। এমন আশ্চর্য কণ্ঠ খুব কমই শোনা যায়।

খানিকক্ষণ কেউই কথা কয় না। রিতা উশখুশ সুরু করে। অস্বস্তি কাটাতে মিষ্টার টমাস জোর করে হেসে বললেন: আপনি তো ইংলণ্ডকে কথায় কথায় গাল দেন। তবে হঠাৎ আজ অভ্যুদয় এ-ছাই দেশে?

কাউণ্ট একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন: আপনাদের ভাষায় বলে না needs must when the devil drives? আমাকে অশান্ত হতে হল, যার দরুণ তাকে বলা যায় She-devil.

রিতার মুখ লাল হয়ে উঠল, চকিতে। পল্লবের দিকে তাকিয়েই বলল: কাউণ্টের মতন ভাষা বটে—সবার সামনে!

কাউণ্ট ব্যঙ্গ হেসে বললেন: O la la quelle pudeur virginale! (মরি মরি! কি লজ্জাবতী কুমারী!) পল্লবকে: ওর আপত্তি কেলেঙ্কারি করায় নয়—তাকে বাইরের লোকের সামনে প্রচার করায়। বলেই ফের একগাল হাসি।

মিষ্টার টমাস ঈষদুষ্ণ সুরে বললেন: তার মানে?

কাউণ্ট বললেন তপ্ত সুরে: মানে? পারিসে ঢিঢিক্কার প'ড়ে গেছে। আমি মুখ দেখাতে পারি না ভদ্রসমাজে। গুজব রটেছে রিতা গৃহত্যাগিনী হয়েছে এক হোটেলের ম্যানেজারের সঙ্গে। oh quel scandale! Mon dieu!

রিতা চেঁচিয়ে বলে উঠল: যদি রটে থাকে এ কথা, তবে কে এ মিথ্যা রটিয়েছে তা-ও জানবেই সবাই দু দিনে—la verité se dêcoud toujours! Le diable t'emporte! (সত্য প্রকাশ হবেই একদিন না একদিন—নরকে যাও তুমি!)

কাউণ্ট যেন মিষ্টার টমাসকে শালিসি মেনে নালিশের সুরে বললেন: দেখছেন তো—কেলেঙ্কারির দিকে ঝোঁক কার বেশি? উনি যা ইচ্ছে বলবেন বাইরের লোকের সামনে—কেবল আমি কিছু বললেই কোঁসকোঁসানি। বলেই থেমে রিতার দিকে চেয়ে পরুষকণ্ঠে: শোনো, আমি এখানে কেন এসেছি তুমি বেশ জানো। তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে। বাইরের লোকের সামনে পারিবারিক

আলোচনা করতে আমিও নারাজ। তাই—ব'লে পল্লবের দিকে চাইতেই পল্লব উঠে দাঁড়ায়। রিতা সঙ্গে সঙ্গে ওর হাত চেপে ধ'রে বলে: না, তুমি যাবে না। মিস্টার টমাস বিব্রত হ'য়ে ওর দিকে তাকাতেই রিতা চেঁচিয়ে বলে: না আংকল্! আমার সঙ্গে কাউন্টের কোনো প্রাইভেট কথাই নেই—থাকতে পারে না। আমি এখন সাবালিকা—নিজের বুদ্ধিতেই চলব। Moi, je ris au nez du diable. (শয়তানকে আমি হেসে উড়িয়ে দিই।)

কাউন্ট ব্যঙ্গ হেসে বললেন: চমৎকার! কেবল একটু মুস্কিল এই যে, বুদ্ধি থাকলেও পথ খোলা না থাকলে পথ চলা যায় না। তাছাড়া বাপ শয়তান হ'লেও মেয়ের উপর তার জোর থাকেই থাকে।

রিতা উদ্দীপ্ত কণ্ঠে ব'লে উঠল: আমি মানি না একথা। তুমি আমাকে ঢের যন্ত্রণা দিয়েছ—কিন্তু এখন আমি তোমার মুঠোর বাইরে।

কাউন্ট হেসে বললেন: বটে! আর তাই বুঝি আশ্রয় নিয়েছ এমন একজনের কাছে যে তোমাকে রাখতে চায় হাতের মুঠোর মধ্যে? Quelle bêtise! O la la! (বোকামি বটে! হায় হায়!)

মিষ্টার টমাসের মুখ আরক্ত হ'য়ে উঠল: কাউন্ট, একটু ভেবে-চিন্তে কথা কইবেন। এদেশটা ইংলণ্ড, যুগটাও মিডীভাল নয়, আর বাড়িটা ভদ্রলোকের।

কাউন্টের মুখের চেহারা বদলে গেল, রুক্ষ কণ্ঠে বললেন: ভদ্রলোক? যে মেয়েকে বাপের বিপক্ষে উস্কোয়, কুপরামর্শ দেয়, ফ্রান্সে তাকে আমরা অন্য উপাধি দিয়ে থাকি।

রিতা বলল তীক্ষ্ণ কণ্ঠে: রাগ ক'রে যা তা ব'লে পার পেতে পারো স্বদেশে—চাকর বাকর মোসাহেবদের কাছে—কিন্তু বিদেশে মেজাজ দেখাতে গেলে ফল পাবে হাতে হাতে, মনে রেখো। Celui qui sème la vent et récolte la tempête-va ten. (যে কাঠ খায় আংরা হ্যাড়ায়। বেরিয়ে যাও এখান থেকে)।

কাউন্টের মুখ লাল হয়ে উঠল, পল্লবের দিকে চেয়ে বললেন: মিষ্টার বাকচি, আপনার কথা আমি মিসেস নটনের কাছে শুনেছি অনেক। এ-ও শুনেছি যে আপনি অতি ভদ্র, সুশীল। বলুন তো—এখানে অভদ্র ভাষা ব্যবহার করছে কে? আপনি যদি দয়া ক'রে একটু বাইরে গিয়ে ওর মান রাখেন তো বাধিত হব। ওর সঙ্গে আমার নিরালায়—

রিতা বাধা দিয়ে বলল: না, উনি যাবেন না। তোমার যদি কিছু আমাকে বলার থাকে বলো সবার সামনে। নৈলে আমিই বেরিয়ে যাব মনে রেখো, আমি আজ তোমার নাগালের বাইরে।

কাউন্ট বললেন: চমৎকার! কেবল তোমার নাগাল পেলেন আজ কেন শুনি? মিউজিক হলের পাণ্ডা, না বিদেশী শাঁসালো শাকরেদ? বলেই পল্লবকে: আপনাকে বাহন পেয়ে ওর মাথা গরম হ'য়ে গেছে, তাই ও ভাবছে বাপের চেয়ে চেলা বড়।

পল্লব উষ্ণ সুরে বলল: কি বলছেন আপনি কাউন্ট? বাহন, চেলা এসব কি কথা? আমি রিতার বন্ধু—চেলা কি শাকরেদ নই। ওঁর কাছে যেমন আমি দু চারটে ফরাসি গান শিখেছি তেমনি উনিও আমার কাছে কয়েকটি বাংলা গান শিখেছেন। তবে আপনার একটা কথা ঠিক—আপনাদের পারিবারিক কথাবার্তা আমার মতন বাইরের লোকের সামনে না হওয়াই শোভন সব দিক দিয়েই।

ব'লে ফের উঠে দাঁড়াতেই মিষ্টার টমাস বললেন: বোসো বাকচি! এ বাড়ি আমার, তাই শোভন অশোভনের বিধান দেবার ভার এখানে আমারই, আর কারুর নয়। ব'লে কাউন্টের দিকে চেয়ে: দেখুন কাউন্ট, আমরা ফরাসি নই, ইংরেজ—হাঁক-ডাক 'সীন' ভালোবাসি না। তাই আপনাকে ভদ্র ভাষায় বলছি, শেষ বার, যে আপনি মিথ্যে দাপাদাপি করবেন না। আপনার রিতার উপর এখন কোনো অধিকারই নেই, ও সাবালিকা—তাছাড়া আমার আত্মীয়া আশ্রিতা। আপনার যদি কিছু বলবার থাকে ভদ্রভাষায় বলতে পারেন তো বলুন সংক্ষেপে। নৈলে চাকর ডেকে বার ক'রে দিতে হবে—সেটা আমি চাই না। কারণ, আপনি অভদ্র ও অমানুষ হ'লেও রিতা আপনার মেয়ে, মেয়ের সামনে বাপের অপমান করতে মন চায় না।

কাউন্ট ক্ষিপ্তবৎ লাফিয়ে উঠে বললেন: অপমান করবেন? কার? আর কে কার আশ্রিত? ব'লেই অসংলগ্ন ভাবে: রিতা! আমি এসেছি দু'টি কারণে: এক, তোমাকে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে তোমার বিয়ে দিতে, যেহেতু তুমি আমার মেয়ে; দুই, আমার স্ত্রীর গহনা নিয়ে তুমি পালিয়ে এসেছ। এর নাম চুরি—মনে রেখো।

মিষ্টার টমাস বললেন: মোটেই না। সে গহনা সিলভিয়া আপনার কাছ থেকে পায় নি—পেয়েছিলো তার মার কাছ থেকে। তাই আইন-অনুসারে সে গহনা রিতার, আপনার নয়। আপনি ইচ্ছে করলে কোর্টে যেতে পারেন—গুড্ বাই। বলেই উঠে দাঁড়িয়ে ঘণ্টা বাজালেন।

কাউন্টের সুন্দর মুখ-চোখও বিপর্যয় ক্রোধে কুৎসিত হ'য়ে উঠল, তিনি বললেন জ্বলে উঠে: বেশ। আমি দেখে নেব। ব'লে উত্তেজিত সুরে: যেমন আশ্রিতা তেমনি আশ্রয়দাতা—যে চায় ভদ্রঘরের মেয়েকে থিয়েটারের নাচ-উলি দাঁড় করাতে।

মিষ্টার টমাস বললেন: মিথ্যা কথা। কিন্তু সে যাক্—এই সময়ে ঘরে ভ্যালেটের আবির্ভাব. মিষ্টার টমাস তাকে বললেন: কাউন্টকে বাইরে নিয়ে যাও।

কাউন্ট দাউ-দাউ ক'রে জ্বলে উঠে হাতের সিগার ছুড়ে ফেলে দিয়ে বললেন: আচ্ছা—আমি দেখে নেব। ব'লেই রিতাকে: শেষবার বলছি তোকে আমার সঙ্গে আয়। তোর আমি বিয়ে দেব—কাউন্ট ফ্লুশে—

রিতা বলল: যে তোমার চেয়েও দুঃসহ, দুর্দান্ত। আমি বিয়ে যদি করি করব ভদ্রলোককে, দু-পেয়ে জানোয়ারকে নয়।

কাউন্ট হা-হা ক'রে হেসে উঠে বললেন: বলো না কেন চেলাকে—যার সঙ্গে এখানে এসে এত গলাগলি—চুটিয়ে ফ্লার্টেশন—ভদ্রলোককে বিয়ে করবেনই বটে, মরি মরি!

ভ্যালেট কাছে এসে নিচু সুরে বলল: বাইরে আসবেন কি?

কাউন্ট দুম্-দুম্ ক'রে বেরিয়ে গেলেন।

সঙ্গে সঙ্গে রিতা ভেঙে পড়ে—কি কান্না!

মিষ্টার টমাস ওকে জড়িয়ে ধ'রে বললেন: কেঁদো না রিতা! কোনো ভয় নেই। আমি আছি। ওকে তো চিনেছ হাড়ে হাড়ে। অমানুষের কথায় কি মানুষ কিছু মনে ক'রে?

[ক্রমশঃ।

শ্রীমণি সিংহ

শীতের অলস অপরাহ্ন। ব্যারাকপুরের উপকণ্ঠে গঙ্গার ধারে রৌদ্রস্নাত সাদা দোতলা বাড়ীখানি ঝিমিয়ে আছে যেন!

সংলগ্ন ছোট্ট বাগানটিতে নানা রঙের মৌসুমী ফুল আর গোলাপের সমারোহ। ফুলগুলিও যেন আরামে রোদ পোহাতে পোহাতে ঝিমুচ্ছে।

প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক অশোক চৌধুরী নীচের তলায় তাঁর লাইব্রেরী-ঘরে বসে তন্ময় হয়ে লিখছিলেন। মাঝে মাঝে বাগানের ভেতর ফুলগুলি দেখছিলেন জানালা দিয়ে, অন্যমনস্ক ভাবে।

লেখার ভেতর ডুবেছিলেন অশোক চৌধুরী। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। বুদ্ধিদীপ্ত মুখখানির ভেতর অদ্ভুত স্বপ্নালু চোখ দুটি। রগের কাছে কয়েক গাছি সাদা চুল চিক্-চিক্ করছে।

চমকে উঠলেন অশোক চৌধুরী। দু'খানি কোমল করপল্লব তাঁর চোখ দুটি চেপে ধরেছে পেছন থেকে। শাড়ীর খস-খস শব্দ। চাপা হাসি। মৃদু সুবাস।

চেনা। সবই চেনা। চেনা এই হাতের পরশ। চেনা এই অ্যাম্বার ডি রোজেস-এর মৃদু সুবাস। স্নিগ্ধ হাসিতে অশোক চৌধুরীর সুন্দর মুখখানি অপরূপ হয়ে ওঠেছে।

কোমল হাত দু'খানি ধরে মৃদু আকর্ষণ করে পারমিতাকে একেবারে সামনে নিয়ে আসেন অশোক। আদর করে চেয়ারের হাতলে বসিয়ে দেন। তার পর স্নিগ্ধস্বরে জিজ্ঞেস করলেন, হঠাৎ এলে যে মিতা? কলেজ ছুটি হবার তো অনেক দেরী? অসুখ করেনি তো? কণ্ঠস্বরে রীতিমত উদ্বেগের আভাস।

অশোকের গলা জড়িয়ে ধরে পারমিতা বলে, না গো মিতা, না। অসুখ করতে যাবে কেন? স্পোর্টস্-এর জন্য কলেজ দু' দিন ছুটি হয়ে গেল। চলে এলাম। ঐ যাঃ! ভুলেই গেছি। শোন মিতা, আমাদের কলেজের প্রফেসর রমাদি' এসেছেন আমার সঙ্গে। তোমার একজন গুণমুগ্ধ ভক্ত।

ব্যস্ত হয়ে ওঠেন অশোক চৌধুরী। বলেন, কোথায়—কোথায় তিনি? ছিঃ, ছিঃ! আগে বলতে হয়। কোথায় রেখে এলে তাঁকে?

নমস্কার, মিঃ চৌধুরী! নিজেই ঢুকে পড়েছি অনুমতির অপেক্ষা না করে। কি করি। পারমিতা বাড়ীতে ঢুকেই যে ভাবে ছুটে এসে ঢুকলো আমাকে একলা ফেলে।

হাসতে হাসতে প্রবেশ করেন রমা ব্যানার্জি। বিস্মিত মুগ্ধদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন অশোক চৌধুরী। প্রতি-নমস্কার করতে ভুলে যান।

একটি বিদ্যুৎলতা যেন আকাশ থেকে নেমে এলো। জ্বলন্ত অগ্নিশিখার ন্যায় রূপ। স্ত্রীলোকের সঙ্গে সম্পর্ক খুব কম অশোকের। নিজের স্ত্রী ছিল অতি সাদাসিদে ধরণের। কোথাও মিল ছিল না তার সঙ্গে অশোকের। আজ আট বৎসর হোল, তার মৃত্যু হয়েছে। একমাত্র পুত্র সুবিমানকে হোস্টেলে পাঠিয়ে দিয়ে, লেখা-পড়ার মধ্যে ডুবে আছেন স্ত্রীর মৃত্যুর পর থেকেই। বাইরের জগতের সঙ্গে সম্পর্ক প্রায় চুকিয়ে দিয়েছেন। আজ এইক্ষণে সমস্ত ওলট-পালট করে দিয়ে প্রবেশ করলো রমা ব্যানার্জি তাঁর ঘরে। তাঁর জীবনেও বুঝি।

বসুন, বসুন রমা দেবি! ভারি অন্যায় মিতার। দেখুন তো—

না না, কোন অন্যায়ই হয়নি। ব্যস্ত হবেন না মিঃ চৌধুরী! অন্যায় বরং আমারই হয়েছে—বিনা নিমন্ত্রণে, অনুমতি না নিয়েই এসে পড়েছি। হাসতে হাসতে বলে রমা।

অনুগ্রহ করে এই ছন্নছাড়া ঘরে এসেছেন, এতে আমার যে কি আনন্দ হয়েছে, আপনাকে বোঝাতে পারবো না রমা দেবি! অনেক অসুবিধা হবে আপনার, কারণ, চাকর-বাকরের ওপর নির্ভর করতে হয় তো। কোন যত্নই হবে না হয় তো। কিন্তু মনে হচ্ছে আজ আপনার আসাটা আমার জীবনে একটা অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা। রমার গভীর কালো চোখ দুটির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে বলেন অশোক। স্বরে সত্যিকার আন্তরিকতা।

সে দৃষ্টি সইতে পারে না রমা। মাথা নীচু করে। পরমুহূর্ত্তে মুখ তুলে আস্তে আস্তে বলে, আজকের এই মুহূর্ত্তটা আমিও কোন দিন ভুলতে পারবো না মিঃ চৌধুরী! কিন্তু কি সুন্দর ছবির মত আপনার বাড়ীখানি! আর কি সুন্দর বাগানটি! কলকাতা থেকে এসে চোখ, দেহ-মন জুড়িয়ে গেল। এখন বুঝতে পারছি এমনি সুন্দর স্নিগ্ধ পরিবেশের জন্যই আপনি অত সুন্দর রস সৃষ্টি করতে পারেন আপনার লেখার ভেতর। জানেন মিঃ চৌধুরী, আপনার সব লেখাই আমি পড়েছি। এবং প্রত্যেকটি লেখা আমার খুব ভাল লেগেছে। কিন্তু একটা দোষ আপনার। সব লেখাই আপনার ট্রাজেডি। পড়া শেষ হয়ে গেলেও অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বুকের ভেতর কান্না গুমরে উঠতে থাকে। সত্যি সত্যি চোখ দুটি ছল-ছল করে ওঠে রমার।

সমবেদনায় কাতর হয়ে ওঠেন অশোক চৌধুরী। বিস্মিত হয়ে ভাবেন কি ব্যথা আছে ওর মনে? যার জন্য কল্পিত দুঃখের কাহিনীর বেদনা ওর মনে সঞ্চারিত হয়? কিংবা হয়তো ওর মনটাই স্পর্শকাতর।

কিছু বলতে পারেন না অশোক। মুগ্ধদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন রমার দিকে। পর-মুহূর্ত্তে হেসে ওঠে রমা। দেখুন তো মিঃ চৌধুরী, আপনার লেখার একটা ছোট্ট সমালোচনা করে দেখলাম।

নিধিরাম প্রবেশ করে গলাখাঁকারি দিয়ে। খাবার ঘরে চা দেওয়া হয়েছে, বাবু! মেমসাহেবকে নিয়ে সেখানে যেতে বললেন দিদিমণি। খবরটা দিয়েই চলে যায় নিধিরাম।

খেয়াল হয় অশোকের, পারমিতা কখন ঘর ছেড়ে চলে গেছে।

চলুন রমা দেবি! দেখি মিতা কি ব্যবস্থা করেছে।

অশোকের আহ্বানে রমা ওর সঙ্গে চলতে থাকে। যেতে যেতে পারমিতার কথা বলেন অশোক। ওঁর কাছেই একরূপ মানুষ ছোটবেলা থেকে। বন্ধুকন্যা পারমিতা। বন্ধু স্ত্রীর রেঙ্গুণে থাকে কাজের জন্য। ওর যত দুষ্টুমি যত আবদার অশোকের কাছে। কলেজ ছুটি হলে এখানেই চলে আসে। পাকা গিন্নীর মত সংসারের ভার নিজের হাতে তুলে নেয়। দুজনেই দুজনকে মিতা বলে ডাকে। সমবয়সী বন্ধুর মত অশোককে পরামর্শ দেয়। দুঃখে সান্ত্বনা দেয়। বড় মিষ্টি স্বভাব। ও এলেই বাড়ীর আবহাওয়া বদলে যায়। ঝি-চাকর সবার মুখে হাসি দেখা দেয়।

আপনার ছেলে বিমানের কথা পারমিতা বলেছে আমাকে। যেতে যেতে বলে রমা। কি বলেছে মিতা তার কথা আপনাকে? থমকে দাঁড়িয়ে বলেন অশোক।

ওঁর ভাবান্তর লক্ষ্য করে না রমা। বলে, খেলাধূলায় খুব ভালো। সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজে পড়ে হোষ্টেলে থাকে। বলেছে পারমিতা।

হুঁ। বলে অন্যমনস্ক ভাবে চলতে থাকেন অশোক।

খাবার ঘরে টেবিলে কেক্, প্যাষ্ট্রি, সন্দেশ, কচুরি, নিমকি প্লেটে সাজানো। দুটি কাচের ফুলদানিতে পুষ্পগুচ্ছ। গোলাপ আর মৌসুমী ফুলের তোড়া। পারমিতা চা ঢালছে টি-পট্ থেকে।

দেখুন রমা দেবি! মিতা এসেই ঘরের চেহারা ফিরিয়ে দিয়েছে। বাঃ, এই সুন্দর টেবিল-ক্লথটা কোথায় ছিল? এই ফুলদানি দুটোই বা জোগাড় করলে কোত্থেকে মিতা? এগুলো বাগানের ফুল বুঝি? আর এই খাবারগুলিই বা এলো কোত্থেকে?

সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলেন অশোক। কোন জবাব না দিয়ে হাসিমুখে চা তৈরী করতে থাকে পারমিতা, অশোকের প্রশংসায় মুখখানি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

চা খেতে খেতে অশোক গল্প করেন রমার সাথে। একটু পরেই পারমিতা চলে যায় রান্নাঘ'রর দিকে। অতিথি বাড়ীতে। রাত্রের খাবার ব্যবস্থা করতে হবে।

ঠাকুরকে উপদেশ দেয় পারমিতা। নিধিরামকে বাজারে পাঠিয়ে দেয়, মাছ, মাংস, আর কিছু তরি-তরকারী, ভাল মশলা আনতে। ভাঁড়ার ঘরে কিছুই নেই।

চা'-পান পর্ব্ব শেষ হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। অশোক এবং রমা গল্পে ডুবে আছে। এই অতি অল্প সময়ের মধ্যে দুজনের ভেতর একটা নিবিড় যোগাযোগ সৃষ্টি হয়েছে। খুব ভাল লাগছে অশোকের এই নবলব্ধ বান্ধবীর সঙ্গে বসে বসে কথার জাল সৃষ্টি করতে। প্রগলভ হয়ে উঠেছেন অশোক আজ। খুব ভাল লাগছে রমারও এই আশ্চর্য্য মানুষটির কথা শুনতে। এর কথা শুনলে মনটা যেন অন্য জগতে চলে যায়। ঘরের ভেতর সন্ধ্যার ছায়া পড়ে।

চলুন মিঃ চৌধুরী, আপনার বাগানটা দেখা যাক্ অন্ধকার হবার আগে। এক সময় বলে রমা।

ব্যস্ত হয়ে ওঠেন অশোক চৌধুরী। বলেন, তাই তো! সন্ধ্যা হয়ে আসছে খেয়ালই করিনি। বসে বসে গল্পই করছি। চলুন রমা দেবি, আপনাকে বাগানটা দেখিয়ে আনি।

ঘর ছেড়ে বাইরে আসে দু'জনে। বাগানের ভেতর পারমিতা মালিকে দিয়ে ফুলগাছে জল দেওয়া‍‌চ্ছে। চার দিকে ফুলের মেলা, তার ভেতর আশ্চর্য্য সুন্দর দেখাচ্ছে পারমিতার মুখখানি। বহুদিনকার পুরানো মালি হেসে হেসে কথা বলছে পারমিতার সঙ্গে আর কাজ করে যাচ্ছে।

এগিয়ে চলে দু'জনে সে দিকে হাসিমুখে। থমকে দাঁড়ান অশোক চৌধুরী। রমাও থেমে যায়। বাগানের ও পাশের গেটটা খুলে ঢুকছে সুবিমান সাইকেল ঠেলে। গেটটা বন্ধ করে দিয়ে সাইকেলে চ'ড়ে ঝড়ের বেগে আসছে ও ওদেরই দিকে। বাড়ীতে ঢুকতে হ'লে ঐ এক রাস্তা। আর ওরা দুজন দাঁড়িয়ে আছে সেই রাস্তার উপরই।

এই শীতের সন্ধ্যারও দর্-দর্ করে ঘাম ঝরছে সুবিমানের চুল দিয়ে, গাল বেয়ে। ফ্লানেলের সার্টটা ঘামে ভিজে সপ্ সপ্ করছে। ধূলোর একটা প্রলেপ পড়েছে মুখের ওপর। কিন্তু তারই ভেতর দিয়ে টকটকে রক্তিমাভা ফুটে বেরুচ্ছে। কোঁকড়া কোঁকড়া অবিন্যস্ত চুলের গুচ্ছ হাওয়ায় উড়ছে। অস্তগামী সূর্য্যের শেষ রশ্মি পড়েছে সুবিমানের মুখে। আগুন লেগেছে বুঝি ওর চুলে। রমার মনে হয়, অগ্নিশিখার মত জ্বলছে সুবিমানের চুলের রাশি।

ওদের সামনে এসে ব্রেক ক'রে সাইকেল থেকে নেমে পড়ে সুবিমান।

হঠাৎ এ ভাবে এ সময়ে এসে পড়লে যে খোকা? চিন্তিত ভাবে জিজ্ঞেস করেন অশোক।

এসে পড়লাম এমনি, বাবা! ভালো লাগলো না, কাল ভোরে উঠেই চলে যাবো। নির্ব্বিকার ভাবে বলে সুবিমান।

রমাকে দেখে বিস্মিত হয় ও। মুগ্ধ দৃষ্টিতে এই অপরূপ সুন্দরী যুবতীর মুখের দিকে তাকায়। রমাও তাকিয়ে আছে ওর দিকে। চোখে চোখ পড়তে রমার গৌরবর্ণ মুখখানিতে আবীর ছড়িয়ে পড়ে।

হঠাৎ চলে যায় সুবিমান। ওর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে রমা। অশোক কি ভাবছিল ছেলের দিকে তাকিয়ে। বাগান থেকে দেখছে পারমিতা এই মূক অভিনয়।
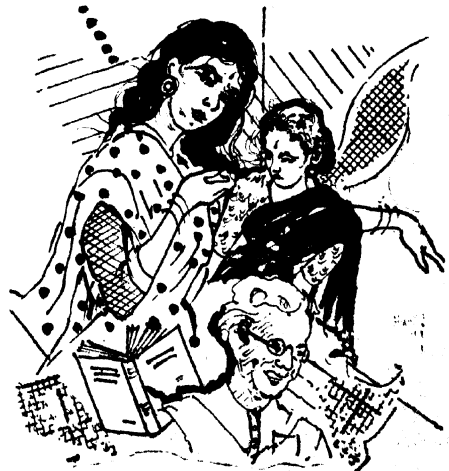
মালিটা শূন্য ঝাঁঝরি নিয়ে যাচ্ছে জল আনতে। সন্ধ্যা উত্তরে গেল। রাত্রির অন্ধকার নেমে আসে।

অশোক আর রমা ড্রইং-রুমে বসে গল্প করছে। সুবিমল স্নান করছে বাথরুমে।

পারমিতা এসে বলে, মিতা, একবার সহরে যেতে হবে। গাড়ীটা বের কর। চল গিয়ে জিনিষপত্র নিয়ে আসি।

বেশ তো, চল একবার ঘুরে আসি। চলুন না রমা দেবি! আপনিও। অশোক বলেন রমার দিকে তাকিয়ে।

আপনারা দুজনে ঘুরে আসুন। আমি বরং বসে বসে আপনার নূতন বইটা পড়ি। ওটা পড়া হয়নি এখনও আমার। রমা বলে হেসে।

আমরা দুজনে তাহলে যাই। বেশী দেরী হবে না আমাদের। ওরা দুজনে চলে যায়।

ঘণ্টাখানেক পরে ফিরে আসে ওরা! রমার সঙ্গে গল্প করছে সুবিমান। খুব হাসছে রমা, খেলার ছলে ওর চুল ধরে টানছে রমা।

ওরা আসতেই উঠে যায় সুবিমান অপ্রসন্ন ভাবে। পারমিতার সঙ্গে একটা কথাও বলে না।

পরদিন ভোর হতে না হতে সুবিমান চলে যায়। অত সকালে রমার সঙ্গেই শুধু দেখা হয় ওর, আর সকলে ঘুমুচ্ছে।

গেট পর্য্যন্ত দুজনে হাঁটতে হাঁটতে যায় পাশাপাশি। গায়ে গায়ে ছোঁয়া লাগছে ওদের। আড় চোখে তাকাচ্ছে সুবিমান রমার মুখের দিকে। ভোরের আলোতে আরও সুন্দর মনে হচ্ছে ওর মুখখানি। ঘুম-ভাঙ্গা ফোলা-ফোলা চোখ দুটিতে অপরূপ মাদকতা।

গেট থেকে বেরিয়ে সাইকেলে চড়বার আগে পূর্ণ-দৃষ্টিতে তাকায় সুবিমান রমার মুখের দিকে। তারপর কোন কথা না বলে ঝড়ের বেগে অদৃশ্য হয়ে যায়।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে রমা সেইখানে।

এর পর এক বছর কেটে গেছে। কলেজ ছেড়ে দিয়েছে পারমিতা। অশোকের একখানা বইয়ের নায়িকা হয়ে নেমেছে পারমিতা সিনেমায়। ছোট একখানি বাড়ী ভাড়া নিয়ে কলকাতায় স্থায়িভাবে বাস করছিল অশোক। সুটিং-এ নিয়ে যান রোজ পারমিতাকে। আবার নিয়ে আসেন। সারা দিন প্রায় ষ্টুডিওতেই কাটাতে হয়। রাত্রে ফিরে এসে অনেক রাত পর্য্যন্ত লেখেন।

পারমিতা আলাদা ফ্ল্যাটে থাকে অন্য জায়গায়। অশোক বলেছিলেন ওঁর বাড়ীতেই থাকতে, কিন্তু রাজী হয়নি পারমিতা।

কেন তুমি আলাদা বাড়ীতে থাকতে চাও? জিজ্ঞেস করেছিলেন অশোক।

তোমার কাছে থাকতে চাই বলেই তো দূরে যাচ্ছি, মিতা, অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলেছিল পারমিতা হাসতে হাসতে। আর কলকাতাতেই তো রইলাম, তার পর প্রায় রোজই তো দেখা হচ্ছে। আর কোন কথা বলেননি অশোক, এই তরুণী মেয়েটিকে যেন আর চিনতে পারছেন না তিনি! দিন দিন বদলে যাচ্ছে ও।

মনে পড়ে অশোকের একদিনের কথা। পারমিতার তখন দশ-বারো বৎসর বয়স। দুজনে গঙ্গার ধারে বেড়াতে গিয়েছিলেন। হঠাৎ বৃষ্টি এলো। বৃষ্টিতে ভিজে কাঁপছিল পারমিতা শীতে। ওকে বুকের ভেতর জড়িয়ে নিয়ে বাড়ী নিয়ে এসেছিল অশোক। নিশ্চিন্ত মনে সেই নিরাপদ আশ্রয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল ছোট্ট মেয়েটি ওর গলা জড়িয়ে ধরে।

সেই ছোট্ট মেয়েটিকে আর চেনা যায় না আজ। ওর কথাগুলিও মাঝে মাঝে হেঁয়ালিপূর্ণ মনে হয়। এক এক সময় অশোকের মুখের দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে আজ-কাল।

প্রতি সন্ধ্যায় রমার বাড়ীতে যান অশোক। যত দেরীই হোক। ষ্টুডিওতে দেরী হলেও পারমিতাকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে রমার বাড়ী যান। অনেক দিন রাত্রির আহারটা ওখানেই সারতে হয় রমার সনির্বন্ধ অনুরোধে।

সুবিমান বি, এস, সি পাশ করে একটা ফ্যাক্টরীতে ঢুকেছে শিক্ষানবীশ হয়ে। ফ্যাক্টরী সংলগ্ন একটা মেসে থাকে। অশোকের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ নেই। আর্থিক অনটন সত্ত্বেও বাবার কাছ থেকে কোন সাহায্যই নিতে রাজী নয় সে। কি হয়েছে ছেলেটার বুঝতে পারল না অশোক। কি একটা আক্রোশ যেন জন্মেছে বাবার ওপর। কোন সংস্রবই রাখতে চায় না অশোকের সঙ্গে।

অশোক জানেন না কারণ। কিন্তু রমা জানে, আর জানে পারমিতা।

সেদিন সন্ধ্যায় বিদায়ের পূর্ব্বে রমার হাত দু'খানি ধরে বললেন, অশোক, রমা, আর কত দিন অপেক্ষা করবো আমি? কবে আসবে আমার ঘরে?

কটাক্ষ হেনে বলেছিল রমা, আমি তো তোমারই। কিন্তু নীড় বাঁধবার সময় হয়নি যে এখনও আমার। কিছু দিন অপেক্ষা কর, লক্ষ্মীটি।

আর অপেক্ষা করতে পারছি না আমি, রমা! তুমি অনুমতি দাও, সামনের মাসেই বিয়ের দিন স্থির করি। রমাকে বুকের ভেতর টেনে নিয়ে মিনতি ভরা কণ্ঠে বলেন অশোক।

দরজাটা পেছনে ছিল অশোকের। ওর কাঁধের ওপর দিয়ে রমা তাকিয়ে দেখে সুবিমান দাঁড়িয়ে আছে দরজায়। চোখে-মুখে ক্রোধ এবং ঘৃণার এক বিজাতীয় অভিব্যক্তি। রমার মনে হোল, এই মুহূর্ত্তে বুঝি ও অশোকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে ওঁকে।

একটা অস্ফুট শব্দ করে ওঠে রমা। বিস্মিত হয়ে হাতের বাঁধন আলগা করে দেন অশোক। ওর আলিঙ্গন থেকে ছিটকে বেরিয়ে যায় রমা। মুখখানি ফ্যাকাসে হয়ে গেছে ওর। কাঁপছে থর-থর করে রমা।

কি হয়েছে রমা? অমন করে কাঁপছো কেন? নিশ্চয় অসুস্থ হয়েছো তুমি? ডাক্তার ডাকবো?

ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করেন অশোক। না, না, কিছু হয়নি আমার। হঠাৎ মাথাটা ঝিম্‌ঝিম্ করে উঠলো। এখন সম্পূর্ণ সুস্থ হয়েছি আমি। অনেকটা স্বাভাবিক স্বরে বলে রমা।

সুবিমান অদৃশ্য হয়েছে তক্ষণে। আলা হয়েছে রমার অশোক চলে গেলে প্রতি রাত্রে আসে সুবিমান। অনেক রাত্রি

পর্য্যন্ত থাকে। কোন দিন রাতটা কাটিয়ে দেয় রমার ঘরে। ও যেন দস্যু। জোর করে পাওনা আদায় করে ওর।

অশোককেও বিমুখ করতে পারে না রমা। এই কুৎসিত দোটানায় পড়ে শান্তি হারিয়ে ফেলেছে রমা। কি করবে ভেবে পায় না! একেবারে দিশেহারা হয়ে গেছে ও। আজ অশোক এবং রমাকে এতটা অন্তরঙ্গ অবস্থায় দেখে ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে গেছে সুবিমান। হয়তো আসবে না আর ও।

কান্নায় একেবারে ভেঙ্গে পড়ে হঠাৎ রমা। অশোক ওকে আদর করে জিজ্ঞেস করে, কাঁদছো কেন রমা? কি তোমার দুঃখ আমায় বলবে না?

ওগো, আমার দুঃখ বুঝবে না তুমি। কেউ বুঝবে না। তুমি আজ যাও। যাও—

অশোককে ঠেলে ঘরের বার করে দেয় রমা। তারপর ওর মুখের ওপর দরজাটা দড়াম্ করে বন্ধ করে দিয়ে হাঁপাতে থাকে।

এর পর থেকেই সুবিমান সমস্ত সংস্রব ত্যাগ করেছে অশোকের সঙ্গে।

অশোক চেষ্টা করেছেন ছেলের সঙ্গে দেখা করতে, কিন্তু একরূপ অপমানিত হয়ে ফিরে এসেছেন। কোন কথাই বলেনি ওঁর সঙ্গে। কেমন অদ্ভুত দৃষ্টিতে ওঁর দিকে তাকিয়েছে। তার পর নীরবে ঘর ছেড়ে চলে গেছে।

পারমিতা জানে, সুবিমানের সঙ্গে রমার অস্বাভাবিক অন্তরঙ্গতার কথা। মেয়েরা কেমন করে যেন বুঝতে পারে এসব ব্যাপার। ওদের একটা স্বাভাবিক ক্ষমতা আছে এ বিষয়ে। কোন্ পথে, কেমন করে এসব খবর ওদের কাছে পৌঁছে যায় যেন!

কিন্তু কোন কথা বলেনি ও অশোককে। শুধু এক দিন বলেছিল, রমাদি' তোমার উপযুক্ত নয় মিতা! ও ভালো না।

কেন বলছো ও-কথা মিতা! আর্ত্তস্বরে জিজ্ঞেস করেছিলেন অশোক।

নিজের ভুল বুঝতে পেরেছিল পারমিতা ততক্ষণে। সঙ্গে সঙ্গে হেসে বলেছিল, এমনি বলছি। সব কথার বা সব কাজের কি কারণ থাকে সব সময়?

তার পর নানা গল্পের ভেতর দিয়ে চাপা পড়েছিল কথাটা। অশোকও গুরুত্ব দেয়নি কথাটার।

পারমিতার ছবিটা শেষ হয়েছে। আপাতত ষ্টুডিওতে আর যেতে হয় না। ওর বাড়ীতে এখন ডাইরেক্টর, প্রডিউসার এবং ফিল্ম-জগতের লোকের ভীড় জমে থাকে প্রায় সর্ব্বদা। বাজারে জোর গুজব, এই নূতন অভিনেত্রী চলচ্চিত্র জগতে এক অভিনব আবিষ্কার।

নানা স্থান থেকে ওর কাছে আবেদন আসছে নূতন নূতন ছবিতে অভিনয় করবার জন্ত।

কয়েক দিন ধরে অশোকের সঙ্গে দেখা নাই। সেদিন রাত ন'টার সময় ওর বসবার ঘরে বসে নূতন একটা ছবির কনট্রাক্ট নিয়ে আলোচনা করছিল পারমিতা একজন প্রডিউসারের সঙ্গে। অশোক কখন নিঃশব্দে এসে কোণের একটা সোফায় বসেছেন, লক্ষ্য করেনি। হঠাৎ ওঁকে দেখতে পেল পারমিতা।

এ কয় দিনে কি পরিবর্ত্তন অশোকের! বয়স যেন দশ বৎসর বেড়ে গেছে এর মধ্যে। চোখের কোণে কালি পড়েছে। অনেকগুলি চুল পেকে গেছে। ওঁকে দেখে মনে হয় বুঝি বাজীতে সর্ব্বস্ব খুইয়ে এসেছেন এই মাত্র।

প্রডিউসারকে তাড়াতাড়ি বিদায় করে দেয় পারমিতা। তারপর ছুটে আসে অশোকের কাছে। কি হয়েছে তোমার মিতা? উদ্বিগ্নস্বরে জিজ্ঞেস করে পারমিতা।

অশোক নীরব।

কি হয়েছে, আমাকে বলবে না তুমি? আবার জিজ্ঞেস করে পারমিতা কাতর স্বরে।

বলছি। তোমাকে বলব বলেই এসেছি। এক গ্লাস জল দিতে বল আগে। ভগ্ন কণ্ঠে বলেন অশোক।

আমি নিয়ে আসছি। বস তুমি। বলে ছুটে যায় পারমিতা। একটু পরেই পারমিতা একটা প্লেটে করে কয়েকখানি সন্দেশ নিয়ে আসে। পেছন পেছন এক গ্লাস জল নিয়ে আসে চারু। চারু একাধারে পারমিতার সঙ্গিনী ও রাঁধুনী।

কোন কথা না বলে একটি সন্দেশ তুলে নেন অশোক। সন্দেশটি খেয়ে জলটা নিঃশেষে পান করে গ্লাসটা চারুর হাতে ফিরিয়ে দেন অশোক। পারমিতার হাত থেকে প্লেটটা নিয়ে চলে যায় চারু।

ঘরের মধ্যে নীরবতা সহ্য করতে পারছে না পারমিতা। অশোক কোন কথা বলছে না কেন? দু'-হাতে মাথা চেপে বসে আছে কেন? কি বেদনা ওঁর? কি দুঃখ?

মনের ভেতর নানা প্রশ্ন ভীড় করে আসে পারমিতার। কিন্তু জিজ্ঞেস করে না কোন কথা। একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে অশোকের বেদনাক্লিষ্ট মুখের দিকে।

অবশেষে যেন এক যুগ পরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে জেগে ওঠেন অশোক। তারপর আস্তে আস্তে বলেন, মিতা, আমার পরাজয় হয়েছে। কার কাছে জানো? খোকার কাছে। আর কি লজ্জার কথা! কয়েক দিন থেকেই রমার বাড়ী গিয়ে ফিরে আসছি। ওর ঝি বলে বাড়ী নেই। আজ দরজা খোলা দেখে সোজা ঢুকে গিয়েছিলাম। না গেলেই ভালো ছিল মিতা! রমার বসবার ঘরে একটা সোফাতে রমা আর খোকা—

থাক্ থাক্ আর বলতে হবে না। অশোকের মুখ চেপে ধরে পারমিতা। তারপর অস্বাভাবিক ভাবে হেসে বলে, হয়তো ভুল দেখেছো তুমি মিতা। এ কখনও হোতে পারে?

কিন্তু আমি যে দেখলাম, দু'জনে নিবিড় ভাবে বসে আছে? দ্বিধাগ্রস্ত ভাবে বলেন অশোক।

না—না। আমি বলছি ভুল হয়েছে তোমার, মিতা, দু'দিন পরেই দেখবে রমাদি' ছুটে আসবে তোমার কাছে। তোমাকে যে পেয়েছে, পৃথিবীর সমস্ত ঐশ্বর্য্য তার কাছে তুচ্ছ। আর কেউ না জানুক, আমি তো জানি। শেষের কথাগুলি বলতে বলতে কান্নায় ভেঙে পড়ে পারমিতা।

কাঁদছো তুমি? কেঁদো না মিতা, কেঁদো না। আমার এই ছন্নছাড়া জীবনটাকে নিয়ে কি খেলাই খেলছেন বিধাতা! তার জন্ত কেঁদে কি লাভ?

সান্ত্বনা দেন অশোক পারমিতাকে। তোমার দুঃখই যে আমার দুঃখ, সে কথা কি করে বোঝাবো তোমাকে? আর কেন যে কাঁদছি, তা বুঝবে না তুমি। আর বুঝবে না তুমি যে তোমার মুখে বেদনার ছায়া দেখলে আমার বুকের ভেতরটা ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। যাক্ ও কথা, আজ তোমার মন ভাল নেই। এখানে থাকো আজ রাতটা। তোমাকে কিছুতেই ছেড়ে দেবো না এ অবস্থায়। একটা বাড়তি ঘর আছে এখানে জান তো? সব ব্যবস্থা করছি আমি। কেমন?

আব্দারের স্বরে বলে পারমিতা। অশোককে আপত্তি করবার অবকাশ না দিয়ে ছুটে চলে যায় ঘর থেকে। ওঁর খাবারের বন্দোবস্ত করতে।

সেদিন অনেক রাত পর্য্যন্ত অশোকের সেবা করলো পারমিতা। ওঁর চুলের ভেতর হাত বুলিয়ে ঘুম পাড়াতে চেষ্টা করলো। পা টিপে দিল। মাথা টিপে দিল।

অসাড় হয়ে পড়ে রইলেন অশোক। পারমিতা বুঝতে পারে ঘুমোন নি অশোক। থেকে থেকে কেঁপে কেঁপে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসছে ওঁর বুকের ভেতর থেকে। অনেক রাত্রে ঘুমিয়ে পড়লেন অশোক। এক সময় ওঁর বুকের ওপর মাথা রেখে পারমিতাও ঘুমিয়ে পড়ে।

ভোর হোল। নূতন সূর্য্যের একটা রশ্মি এসে ছুঁয়ে আছে পারমিতার মুখখানিকে। ঘুম ভেঙে বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে থাকেন অশোক ওর অশ্রু-কলঙ্কিত সুন্দর পবিত্র মুখখানির দিকে। কাঁদছিল পারমিতা? কিন্তু কেন?

ওর ঘুম ভাঙাতে মায়া হয় অশোকের। অতি সন্তর্পণে ওর মাথাটি নামিয়ে বালিশের ওপর রাখেন। তারপর অতি আদরে ওর রক্তিম গালে একটি চুম্বন এঁকে দিয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে যান।

ঘুমের ভেতরই একটা তৃপ্তির হাসি ফুটে ওঠে পারমিতার মুখে।

সুবিমানকে কোন দিনই সহ্য করতে পারে নি পারমিতা। ছোটবেলা থেকে দুজনে প্রায় এক সঙ্গেই মানুষ হয়েছে। কিন্তু পারমিতা চিরকাল এড়িয়ে যেতো ওর সঙ্গ। পারমিতার কোমল মনটি সুবিমানের নিষ্ঠুর এবং স্বার্থপর ব্যবহার দেখে সঙ্কুচিত হয়ে যেত।

রাস্তায় কুকুরের বাচ্চা দেখলেই ধরে নিয়ে আসতো সুবিমান। তারপর গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে দিত গাছের ডালে। বেড়াল-ছানাগুলিকে পুকুরের ভেতর ছুড়ে ফেলে দিত। বাসা থেকে পাখীর ছানা পেড়ে এনে বলি দিত সুবিমান পৈশাচিক উল্লাসে।

পারমিতার মনে একটা ঘৃণা জন্মেছিল সুবিমানের ওপর, তার এই নিষ্ঠুর স্বভাবের জন্ত। কিন্তু হঠাৎ দেখা গেল, সুবিমান ঘন ঘন আসছে পারমিতার বাড়ী। পারমিতাও ওর সঙ্গে প্রায়ই সন্ধ্যার পর বেরুচ্ছে সাজগোজ করে হাসতে হাসতে।

একদিন অনেক রাতে ফিরলো দু'জনে। সুবিমান নাকি সে রাতটা পারমিতার ফ্ল্যাটেই কাটিয়েছিল। কিন্তু তেমনি হঠাৎই সুবিমান অন্তর্দ্ধান করলো। রমারও কোন সন্ধান নেই। কলেজের চাকরী ছেড়ে দিয়ে কোথায় চলে গেছে!

কিছুদিন চেষ্টা করেছিলেন অশোক রমাকে খুঁজে বের করতে। বহুদিন পরে একদিন দেখতেও পেয়েছিলেন ওকে। কা'কে যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে রমা চৌরঙ্গীর একটা মদের দোকানের কাছে। মনে হোল অশোকের, দোকানটার ভেতর বসে সুবিমান মদ খাচ্ছে। রমা বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে। বোধ হয় সুবিমানের জন্তই। বড় রোগা হয়ে গেছে রমা। সমস্ত সৌন্দর্য্য তার অন্তর্দ্ধান হয়েছে যৌবনের সঙ্গে। মুখে অকাল বার্দ্ধক্যের ছাপ।

মুখ লুকিয়ে পালিয়ে এসেছিলেন অশোক। তারপর থেকেই নিজেকে সঙ্কুচিত করে নিয়েছেন তিনি নিজের ভেতর। কোথাও বড় যান না। বাড়ীতে বসে বসে শুধু লেখেন।

ওঁর এই সময়কার লেখা উপন্যাসগুলি সাহিত্য-জগতে এক অভিনব আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। ওঁর লেখা সাধারণতঃই ট্র্যাজেডি, কিন্তু এই সময়কার লেখাগুলির ভেতর দিয়ে একটা চাপা কান্না যেন শোনা যায় সারাক্ষণ। একটি পথহারা আত্মার করুণ ক্রন্দন। পারমিতা পড়ে আর ফুলে ফুলে কাঁদে।

আজ রাত্রে এখানে খাবে মিতা! সকাল সকাল আসবে কিন্তু। ভুল হয় না যেন। সেদিন টেলিফোনে নিমন্ত্রণ করল পারমিতা অশোককে।

কি ব্যাপার মিতা? হঠাৎ নিমন্ত্রণ কিসের? হেসে জিজ্ঞেস করেন অশোক।

নিমন্ত্রণ নয়, ভিক্ষা। ভুলো না যেন। পারমিতার স্বরটা যেন ভারি-ভারি, ভেজা-ভেজা।

কি হয়েছে তোমার? শরীর অসুস্থ নয়তো? উদ্বিগ্ন ভাবে জিজ্ঞেস করেন অশোক।

কোন জবাব নেই। টেলিফোন রেখে দিয়েছে মিতা।

লেখায় আর মন বসে না অশোকের। কি একটা অস্বস্তি মনের ভেতর খচ্‌ খচ্‌ করে। কয়েক দিন ধরে পারমিতার সঙ্গে দেখা হয়নি। কেমন আছে, কে জানে! নূতন একটা ছবিতে নামবার কথা চলছে ওর, শুনেছিলেন অশোক। তার পর লেখার ভেতর ডুবেছিলেন, ভুলেই গিয়েছিলেন ওর কথা।

নাঃ, সত্যিই অন্যায় হয়ে গেছে। এর পর থেকে রোজই খোঁজ নিতে হবে ওর। বন্ধুর ওপর নির্ভর করে ওর বাবা নিশ্চিন্ত হয়ে আছে। আর মা-হারা মেয়েটার খোঁজও নেন না অশোক! ভারি অন্যায় হয়ে গেছে। নিজেকে ধিক্কার দেন অশোক।

সন্ধ্যা হোতে না হোতে পারমিতার ফ্ল্যাটে উপস্থিত হন। এ কি! ফুলে ফুলে সাজিয়ে, বসবার ঘরখানাকে অপূর্ব শ্রীমণ্ডিত করেছে পারমিতা। শুধু রজনীগন্ধা। অশোকের প্রিয় ফুল মৃদু সুবাসে ঘরের আবহাওয়া স্বপ্নময় মনে হয়।

বিস্ময়ের ওপর বিস্ময়। অশোকের একখানি প্রকাণ্ড তৈলচিত্র টাঙানো হয়েছে দেওয়ালের মাঝখানে। রজনীগন্ধার প্রকাণ্ড একটা মালা ঝুলছে ছবিটাকে ঘিরে। তার সামনে একটি টুলের ওপর জয়পুরী ধূপদানিতে জ্বলছে, সুগন্ধি ধূপকাঠি।

কি উৎসব আজ পারমিতার ঘরে? এই ছবিটাই বা কবে তৈরী করাল মিতা? কিন্তু কোথায় মিতা?

দরজা খুলে দিয়েছিল চারু। দিদিমণি স্নান-ঘরে। বসুন আপনি। এক্ষুণি আসছেন। বলে চলে যায় চারু।

একটা কৌচে বসেন অশোক। আজকের এই সন্ধ্যা, সুবাসভরা এই ঘর, আলোকোজ্জ্বল ঘরের এই শুভ্র পুষ্পসজ্জা—সব মিলে একটা অবাস্তব অনুভূতির সৃষ্টি করে অশোকের মনে।

আজ হঠাৎ একটা জিজ্ঞাসা ওর মনের ভেতর জেগে ওঠে। ভুল করেছেন কি তিনি? একটা প্রকাণ্ড ভুলের পেছনে কি ছুটে বেড়িয়েছেন তিনি এত দিন? পারমিতা কি ভালবাসে তাঁকে? তাঁর মত একজন প্রৌঢ়কে পারমিতার ন্যায় সুন্দরী তরুণী ভালবাসে—এ কথা বিশ্বাস করা কঠিন। কিন্তু—

নিজের মনের গহনে ডুব দেন অশোক। কত দিনের ছোট-খাটো ঘটনা তাঁর মনের মণি-কোঠায় উজ্জ্বল রত্নের মত সযত্নে রেখে দিয়েছেন তিনি, দেখে বিস্ময় লাগে তাঁর। আজ তাঁর বার বার মনে করতে ইচ্ছে হয় সেই সব তুচ্ছ ঘটনাগুলি, যেগুলির গুরুত্বই দেননি এর আগে। আজ বার বার মনে করতে ইচ্ছে করে অশোকের সেই বর্ষণমুখর রাত্রির কথা। যেদিন ছোট পারমিতা কচি কলমিলতার মত নেতিয়ে পড়েছিল ওঁর বুকের ভেতর দু-হাতে ওঁর গলা জড়িয়ে ধরে।

নীচে রাস্তায় মহানগরীর গর্জন। ট্রাম, বাস, মোটরের অবিশ্রাম কলরব। অশ্রান্ত মনুষ্য-স্রোতের কোলাহল। বর্ষণক্লান্ত আকাশে শ্রাবণের মেঘের গুরু-গুরু ডাক। ক্ষণে ক্ষণে বিজলীর ঝিলিক্।

দিনের আলোকে যে কথা অসম্ভব বলে মনে হোত, আজকের এই স্বপ্নময় সন্ধ্যায় তা সত্য বলে মনে হয় অশোকের। অ্যাম্বার ডি রোজের গন্ধ রজনীগন্ধার গন্ধের সঙ্গে মিশে যায় হঠাৎ।

পারমিতা এসেছে স্নান সেরে। পারমিতার অতি প্রিয় সেন্ট অ্যাম্বার ডি রোজ। প্রসাধন করে এসেছে মিতা। ফিকে নীল রঙের নাইলনের সাড়ী ও ব্লাউজ পরেছে পারমিতা। গলায় এক গাছি সরু সোনার চেন, প্রকাণ্ড একটা লকেট ঝুলছে তা থেকে। লাল টকটকে প্রকাণ্ড একটা পাথর সেট করা। কানে দু'টি ছোট রিঙ। দু'টি হীরা চিক্‌মিক করছে তা থেকে। দু'টি ব্রেসলেট দু'-হাতে।

অশোক চোখ ফেরাতে পারেন না পারমিতার মুখ থেকে। কি অপূর্ব মনে হচ্ছে ওকে আজ! নূতন করে দেখলেন যেন আজ অশোক ওকে।

পারমিতার মুখখানি যেন বড় পাণ্ডুর মনে হচ্ছে। বড় রোগা হয়ে গেছে। কিন্তু কি সুন্দর লাগছে ওকে!

এক ঝলক্ রক্ত উঠে আসে পারমিতার মুখে অশোকের মুগ্ধ দৃষ্টি দেখে। মুখ ফিরিয়ে নেয় মিতা।

তারপর হঠাৎ হেসে ওঠে খিল-খিল করে। অপ্রস্তুত হয়ে যান অশোক। জোর করে রাশ টেনে ধরেন নিজের মনের। এতক্ষণ ধরে যে কথাগুলি তাঁর মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, পারমিতার উপস্থিতিতে বড় অবাস্তব মনে হয় সেগুলিকে।

অসম্ভব! এই উদ্ভিন্নযৌবনা অপরূপ সুন্দরী তরুণী, যার দ্বারে নবীন যুবকের দল এসে ভীড় করেছে, সে কি ভালবাসতে পারে তাঁর মত এক প্রৌঢ়কে?

হাসছো কেন, মিতা? জিজ্ঞেস করেন অশোক।

এমনি হাসছি। হাসি পেল, হাসলাম। কারণ আবার কি? হাসতে হাসতে বলে মিতা।

কিন্তু ব্যাপার কি? এত ফুলের ঘটা কেন? ঐ ছবিটা তো আগে দেখিনি? আসল লোকটা থাকতে ওটাকে ফুল দিয়ে সাজানোর মানে হয় না। হেসে বলেন অশোক।

তেমনি হেসে বলে পারমিতা, আসল লোকটার তো দেখা মেলে না, তাই ছবি নিয়েই সাধ মেটাতে হয়। কিন্তু তুমি কি ভুলে গেছ, আজ তোমার জন্মতিথি?

খুসিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে অশোকের মুখ। মিতা মনে রেখেছে। প্রতি বৎসর পারমিতাই পালন করে ওঁর জন্মদিন। এবারও ভুল হয়নি ওর।

কিন্তু এবার যেন কোথায় একটা পার্থক্য রয়েছে অন্যান্য বারের সঙ্গে। এই উৎসবের পেছনে কোথায় যেন একটা আত্মা গুমরে গুমরে কাঁদছে। এ যেন বিদায়ের পূর্বক্ষণে প্রাণের সমস্ত আনন্দ উজাড় করে ঢেলে দেওয়া।

পারমিতার মুখের ওপর স্থির দৃষ্টি রেখে আস্তে আস্তে বলেন অশোক, ভুলেই তো গেছি। তুমি ছাড়া সকলেই ভুলে গেছে হয়তো। কিন্তু—

কিন্তু কি মিতা? উৎসুক কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে পারমিতা।

বুঝতে পারছি না আমি, মিতা! সব গুলিয়ে যাচ্ছে আমার। এত আনন্দের ভেতরও মনটা কেন যে বিষাদে ভরে উঠছে, বুঝতে পারছি না। যেন আপন মনেই বলেন অশোক।

সপ্ত সমুদ্র গর্জন করছে পারমিতার মনের ভেতর। কিন্তু স্থির হয়ে বসে শুনছে ও অশোকের কথা।

ও কি? কাঁদছো তুমি মিতা! কিন্তু কেন কাঁদছো?

পারমিতার হাতখানি ধরে বলেন অশোক। কাঁদছি না তো। তুমি ভুল দেখেছো, ভগ্নকণ্ঠে বলে পারমিতা। কিন্তু পরক্ষণে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে।

কেঁদো না মাণিক, কেঁদো না। তোমার কান্না সহ্য করতে পারছি না আমি। পারমিতাকে বুকের ভেতর টেনে নিয়ে আদর করে বলেন অশোক কম্পিত কণ্ঠে। অশোকের কোলের ভেতর ফুলে ফুলে কাঁদে পারমিতা। ওর কান্না দেখে অশোকেরও দু'চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে।

হঠাৎ মুখ তুলে তাকায় পারমিতা। ওর অশ্রুধৌত মুখখানি দেখে সমস্ত ভুলে যান অশোক। নিজেকে ভুলে যান। পৃথিবী ভুলে যান।

ওকে বুকের ভেতর টেনে নিয়ে আবেগ ভরা কণ্ঠে বলেন, মিতা, মাণিক আমার! Oh my love! Oh my love!

অত্যুগ্র আনন্দে থর-থর করে কাঁপছে পারমিতা।

অশোকের গালে গাল রেখে বলে পারমিতা, আবার বল মিতা! ঐ কথা দুটি আবার বলো।

Oh my love! Oh my love! বলেন অশোক আবেগ ভরা কণ্ঠে। পারমিতাকে বার বার চুম্বন করে সাধ মেটে না ওঁর।

কিন্তু বড় দেরী হয়ে গেছে, মিতা, বড় দেরী হয়ে গেছে। আগে আসনি কেন তুমি? ওগো আগে আসনি কেন? অশ্রুভরাকণ্ঠে বলে পারমিতা।

তোমাকে ছেড়ে আর যাবো না আমি মিতা! আর যাবো না। ওর কথায় কান না দিয়ে বলেন অশোক।

পারমিতা অশোকের কোলের ভেতর মুখ গুঁজে ফুলে ফুলে কাঁদে। কোন কথা বলে না।

সেই দিন শেষ রাত্রে টেলিফোনের ক্রীং ক্রীং শব্দে ঘুম ভেঙ্গে যায় অশোকের। হ্যালো, নিদ্রাজড়িত স্বরে বলেন অশোক।

ওধার থেকে কে একজন স্ত্রীলোক কথা বলছে। একটু শুনেই ঘুম টুটে যায় অশোকের। তারপর শুনতে শুনতে মুখ বিবর্ণ হয়ে যায়।

ডাক্তার নিয়ে এখুনি আসছি আমি চারু! তুমি মিতার কাছে যাও। বলে, টেলিফোন নামিয়ে রেখেই অশোক ছুটে যান গ্যারেজে। তারপর গাড়ী নিয়ে বেরিয়ে পড়েন তাড়াতাড়ি।

ডাক্তার মুখার্জি অশোকের বন্ধু। তাকে নিয়ে যখন পৌছলেন পারমিতার বাড়ী, ভোর হয়ে এসেছে প্রায়। রাস্তায় জল দিচ্ছে করপোরেশনের লোক। সবে ট্রাম চলতে আরম্ভ করেছে।

আচ্ছন্নের মত পড়ে আছে পারমিতা। সর্ব্ব দেহ নীল হয়ে গেছে। মুখের কস্ বেয়ে ফেনা গড়িয়ে পড়ছে।

দেখেই বললেন ডাক্তার, এ যে আফিম খেয়েছে দেখছি! হাসপাতালে পাঠানো দরকার। তবে বড্ড বেশী দেরী হয়ে গেছে। কিন্তু এ কি! পারমিতার দেহ পরীক্ষা করে বিস্মিতকণ্ঠে বলেন ডাক্তার।

কি ডাক্তার? উৎকণ্ঠিত স্বরে জিজ্ঞেস করেন অশোক।

She is carrying ওর পেটে সন্তান রয়েছে। And she is in advanced stage. গম্ভীর কণ্ঠে বলেন ডাক্তার।

তাহলে হাসপাতালে না পাঠিয়ে তুমিই চিকিৎসা কর ওর ডাক্তার! বুঝতে পারছো তো? ব্যাকুল ভাবে অনুনয় করেন অশোক ডাক্তারের হাত ধরে।

বুঝেছি ভাই! দেখি কত দূর কি করা যায়। আর হাসপাতালে পাঠিয়েও বিশেষ লাভ হবে বলে মনে হয় না। এই অবস্থায় মিছিমিছি টানা-হেঁচড়া করাই সার হবে। একটা ইন্‌জেকসন দিতে দিতে বলেন ডাক্তার।

ইন্‌জেকসন দিতে একটু জ্ঞান হোল পারমিতার। তন্দ্রাচ্ছন্ন চোখে তাকালো অশোকের দিকে।

অশোক ঝুঁকে আছে ওর মুখের ওপর। ডাক্তার ষ্টম্যাক্ পাম্প রেডি করছে। শেষ চেষ্টা করতে হবে একবার। কিন্তু বড্ড দেরী হয়ে গেছে। too late—too late আপন মনে বলছে ডাক্তার।

এবার পূর্বজ্ঞান ফিরে এসেছে পারমিতার। অশোকের দিকে তাকিয়ে অতি মধুর হাসলো। অবশ হাতখানি দিয়ে অশোকের গলা জড়িয়ে ধরে ফিস ফিস করে বললো, Oh my love! Oh my love!

পরক্ষণে হাত দু'খানি খসে পড়ে গেল অশোকের গলা থেকে। নিবে যাবার আগে প্রদীপটা হঠাৎ জলে উঠেছিল মুহূর্ত্তের জন্ত।

ষ্টমাক পাম্প নিয়ে এসে ডাক্তার থমকে দাঁড়ালো। তার পর ধীরে ধীরে নামিয়ে রাখলো যন্ত্রটা। নাড়ীটা দেখলো। ষ্টিথসকোপ দিয়ে পরীক্ষা করলো হৃদযন্ত্র। তার পর আস্তে আস্তে বলে, সব শেষ!

অশোকের ঠোঁট নড়ছে। বার বার বলছে, Oh my love! Oh my love!

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে চারু এক কোণে।

ডাক্তার তাকিয়ে আছে জানালা দিয়ে বাইরের দিকে। আকাশ ভেঙ্গে বৃষ্টি নেমেছে বাইরে।

বালিশের নীচে ছোট্ট কাগজখানি চোখে পড়লো অশোকের, যন্ত্রচালিতের স্তায় ভাঁজ খুলে পড়েন অশোক।

এত দেরী করে এলে কেন মিতা? শুধু তোমার জন্তে কালী মাখলাম গায়ে। কিন্তু কোন ফলই হোল না। ভেবেছিলাম, বিমানকে টেনে নেবো রমাদি'র কাছ থেকে। তা হলে হয়তো রমাদি'কে পেতে তুমি মিতা! কিন্তু সব বৃথা হোল, শুধু এই দেহটাকে অশুচি করাই সার হোল।

মিতা, তোমাকে ভালবেসেছি কবে থেকে জানি না, কিন্তু আজ বিদায়ের পূর্ব্বক্ষণে শুধু মনে হচ্ছে এত ভালো কোন মেয়ে পুরুষকে বাসেনি।

আমি মরে গেলে, আমার কানে কানে দু'টি কথা শুধু বোলো Oh my love! Oh my love!

বাইরে বৃষ্টি পড়ছে ঝম্ ঝম্।

শ্রান্ত-ক্লান্ত হয়ে এত দিনে বুঝি নিশ্চিন্ত আরামে ঘুমিয়ে পড়েছে পারমিতা!

অবিচার

নমিতা সেনগুপ্তা

ফুল-ফল আশে চারাটি রোপিল, স্বপিরে জুড়াবে বাতাসে।
শুধু ঝটিকায় ভেঙ্গে গেল সে যে, ঝরা পাতা রাখে কি আশে?
কত সযতনে নিজ হাতে সে যে জল দেছে নিতি গোড়াতে
পথ চাহি শুধু বসে ছিল সে যে ফুল ফুটিবার আশাতে।

যে বৃক্ষ-মাঝারে নাহি আছে বল, রোধিতে না পারে ঝড়েরে
তুমি ওরে দীন ফুল-ফল আশে কেমনে ঠেকাবে তাহারে?
এ বিশ্বমাঝারে আশা তারি মেটে যার আছে ভূরি-ভূরি
কোনও আশা কভু রাখিবে না মনে, দীন তুমি মনে করি।

ভুবন যে আজি ভরা অবিচারে, জিনিবে গো তুমি কেমনে?
বিধাতাও আজি করে অবিচার, বল গো সহিব কেমনে?
যারে তুমি তব সহায়ক ভাবো, সে-ও করে শুধু ছলনা
সহায়তা যদি পেতে চাও তুমি, ধনী হও তবে, দীন না।
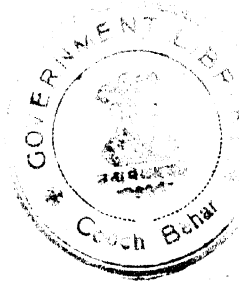
প্রতিমা দাশগুপ্তা

২৬ খৃঃ-পূর্ব্বাব্দের সময়টা ছিল রাজনৈতিক বিপ্লবের যুগ। উত্তর-ভারতে অবস্থিত কয়েকটি ছোট ছোট রাজ্যের বিশেষ করে 'ভৃগুকচ্ছ' ও 'ধারানগর' রাজ্য। দুটির তখন প্রায় পতনোন্মুখ অবস্থা। প্রজাপালন-বিমুখ, অক্ষম ও অতিবিলাসী এই দুই রাজ্যের রাজা নিজেদের ভোগবিলাসেই মত্ত, কাজের বিশৃঙ্খলা, অন্যায়-অনিয়মের প্রতিকার করবেন সে সময় তাদের কোথায়? তা' ছাড়া তাদের পোষা একদল অমাত্য সপ্তরথীর মতো সদাসর্ব্বদা এই দুই রাজাকে ঘিরে থাকতো, যাতে বাইরের কোন খবর এঁদের কানে না ঢোকে। তাঁদের বিলাসের নিত্য-নতুন ইন্ধন জোগাবার এত তড়িৎ ক্ষিপ্রতা বোধ হয় তারা ছাড়া সে রাজ্যের আর কারুরই ছিল না। তাদের এই অদ্ভুত কর্ম্মতৎপরতায় মহা খুসী হয়ে রাজারা তাঁদের পরম সুখ ও আবেশময় দিনগুলি নির্ব্বিবাদে কাটিয়ে যাচ্ছিলেন, আর তারই সুযোগ নিয়ে এই চাটুকার অমাত্যবৃন্দ নিজেদের স্বার্থ-সুবিধার পরম চরিতার্থতা সাধন করে নিচ্ছিল। সেই মাৎস্যন্যায়ের সময়েই এই কাহিনীর আরম্ভ।

উত্তর-ভারতে তখন যে কয়টি রাজ্য ছিল, তার মধ্যে মগধ ছিল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। শুধু রাজ্যের আয়তন বা প্রজাবাহুল্য হিসাবেই নয়, রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ সুশাসনে, সুশৃঙ্খলায় ছোট-বড় নির্ব্বিশেষে সকলেরই দিন সুখে কাটছিল। অভাব-অভিযোগ কারুরই বিশেষ কিছু ছিল না। শুঙ্গবংশীয় মগধরাজ 'দেবভূতি' তখন পরম গৌরবে তাঁর সিংহাসনে আসীন। স্বভাব-চরিত্রে হয় তো তিনি দেবোপম ছিলেন না, কিন্তু সে জন্য তিনি তাঁর রাজকর্ত্তব্য, বিষয়-বুদ্ধি তাঁর প্রতিবেশী ভ্রাতাদের মতো একেবারে জলাঞ্জলি দেননি। মগধের তখন অতি সমৃদ্ধ অবস্থা। এই সমৃদ্ধির বহুল কারণ দেবভূতির দক্ষিণ হস্ত ও প্রধান অমাত্য বাসুদেব কাম্ব। প্রায় একাদশ বৎসর ধরে বাসুদেব কাম্ব মগধরাজের মন্ত্রিত্ব অতি নিপুণ ও দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করে আসছেন। মগধরাজ দেবভূতির অতি বিশ্বাসভাজন ছিলেন তিনি। বাসুদেবকে ছাড়া রাজকার্য্য চালনার কথা ভাবতেই পারতেন না দেবভূতি।

এক গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় দেবভূতি তাঁর প্রাসাদের শয়নকক্ষের বাতায়নে দাঁড়িয়ে ছিলেন। সান্ধ্য-পূজা শেষ হয়েছে, রাজভৃত্য তাঁর কৌষেয় পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিয়ে শয়নকক্ষের ধূপাধারে অজস্র 'কালাগুরু' ছড়িয়ে দিল। ধূপের ঘন ধোঁয়ার অন্তরালে বিচিত্র বর্ণের শামাদানগুলি একে একে জ্বলে উঠলো। ভৃত্যটি চলে যেতেই দেবভূতি হস্তিদন্ত-নির্ম্মিত বৃহৎ পালঙ্কে অর্দ্ধশায়িত হোলেন। খসখসের পাখাখানি তুলে নিয়ে আস্তে আস্তে ব্যজন করতে করতে উৎসুক নয়নে দ্বারের দিকে তাকালেন, মুখে তাঁর ঈষৎ হাসি ফুটে উঠল। বেশীক্ষণ তাঁকে অপেক্ষা করতে হোলো না। দ্বারপ্রান্তে অস্পষ্ট নূপুর শিঞ্জনের আওয়াজ হোতেই তিনি পালঙ্কের ওপর সোজা হোয়ে বসলেন—মৃদুকণ্ঠে আহ্বান জানালেন: হলা সখী সুবলিতে! দ্বারপ্রান্তে নূপুর শিঞ্জন স্তব্ধ হয়ে গেল। দেবভূতি এবার নিজে উঠে দ্বারের বাইরে গেলেন। হেসে বললেন—স্বাগতম্ সুভগা! শ্রোণিভারা-দলসগমনা—

আপাদমস্তক সূক্ষ্ম চীনাংশুকে আবৃতা দেবভূতির কনিষ্ঠা প্রিয়তমা রাণী সুভগার দেহ ঈষৎ আন্দোলিত হোলো। দেবভূতি সাদরে তাঁকে হাত ধরে ঘরে নিয়ে এলেন। এর পূর্ব্বের কিছু ইতিহাস বলা প্রয়োজন। দেবভূতির তৃতীয়া রাণী সুভগা মালওয়া রাজ্যের রাজা পুরুষোত্তম সিংহের কনিষ্ঠা কন্যা। কিঞ্চিদধিক ছয় মাস পূর্ব্বে দেবভূতি এঁর পাণিগ্রহণ করেছেন। তিনি তাঁর দুই রাণীকে নিয়ে সুখেই জীবন যাপন করছিলেন, পুনরায় দার পরিগ্রহের কথা ইতিপূর্ব্বে ভাবেননি। 'শিবরাত্রি' শুঙ্গবংশীয় রাজাদের বিশেষ উৎসবের দিন। সারাদিন উপবাসী থেকে সন্ধ্যায় শিবমন্দিরে রাণীদের নিয়ে দেবভূতি অঞ্জলি দিতেন। তারপর প্রসাদ গ্রহণের পর তিনি একাকী রাজধানী গিরিব্রজে যেতেন মন্দুরা থেকে সবচেয়ে সুলক্ষণ তাঁর প্রিয় ঘোড়ার পিঠে চেপে।

প্রতি বৎসর শিবরাত্রির সময় গিরিব্রজে একটি মেলা বসতো। ঘুরে ঘুরে এই মেলা দেখা ও সেখান থেকে রাণীদের জন্য কিছু উপহার কেনা দেবভূতির একটি উপভোগ্য বস্তু ছিল। এ বৎসরও তার ব্যতিক্রম হয়নি। প্রিয় অশ্ব ইন্দ্রনীলের মাথায় কিংখাপের তাজ পরিয়ে, পিঠে রেশমের কাজ-করা পুরু মখমলের গদী চাপিয়ে ও নিজের সারা অঙ্গ সুরভিত পুষ্পনির্য্যাসে আপ্লুত করে সুসজ্জিত সুবেশ দেবভূতি উৎফুল্লমনে তার পৃষ্ঠে আরোহণ করলেন। কপিশ রং-এর তেজস্বী ইন্দ্রনীল আনন্দিত হ্রেষা রব করে গ্রীবা বাঁকিয়ে প্রভুকে স্বাগতম্ জানালো; তারপর যেন বাতাসের ওপর ভর দিয়ে ছুটে চলল। সে সন্ধ্যায় দেবভূতি মেলায় যেতে পারেননি। যোজন খানেক পথ অতিক্রম করেছেন—সহসা গতি হ্রাস করলেন। অদূরে 'একলিঙ্গেশ্বর' শিব-মন্দিরের সম্মুখে কা'র শিবিকা এসে থামলো? তার চার পাশ ঘিরে প্রহরীর দল। দেবভূতি অনুমান করলেন মালওয়া-রাজের কোন অন্তঃপুরিকা মন্দিরে অঞ্জলি দিতে এসেছেন। কারণ, এই মন্দিরটি মালওয়া-রাজেরই অধিকৃত।

ইন্দ্রনীলকে একটি হিন্তাল গাছের সঙ্গে বেঁধে তিনি তার পেছনে আত্মগোপন করে রইলেন। শিবিকা থেকে যে কিশোরীটি অবতরণ করলেন, চকিতে তাঁর মুখপানে চেয়ে দেবভূতি মুগ্ধবিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেলেন! এই অপরূপ লাবণ্যময়ী কিশোরীটি কি তারই প্রতিবেশী মালওয়া-রাজের কন্যা? পূজা সমাপ্ত করে কিশোরী আবার শিবিকায় আরোহণ করলেন, আবার দেবভূতি তাঁকে দেখলেন। মসীকৃষ্ণ অন্ধকারে যখন সমস্ত প্রান্তর অবলুপ্ত হয়ে এলো তখন দেবভূতি চেতনা ফিরে পেলেন। মালওয়া-রাজের দল কখন চলে গেছে, এতক্ষণ তিনি একাকী এই প্রান্তরে স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে ছিলেন। প্রাসাদে ফিরে দেবভূতি সেদিন নিদ্রাহীন রাত্রি যাপন করলেন।

দেবভূতি মালওয়া-রাজের কাছে কোন ভাট পাঠাননি, দিন দুয়েক পর নিজেই উপযাচক হয়ে মালওয়া-রাজ পুরুষোত্তম সিং-এর কাছে উপস্থিত হোলেন। সাদরে, সসম্মানে পুরুষোত্তম তাঁকে নিজের অন্তঃপুরে নিয়ে গেলেন। অনুসন্ধানে দেবভূতি জানলেন, তাঁর ধারণা ভ্রান্ত নয়। পরমা সুন্দরী কিশোরী প্রকৃতই মালওয়া-রাজকন্তা। তাঁর যাচ্ঞা শুনে পুরুষোত্তম বহুক্ষণ নীরব রইলেন। তাঁর এই নীরবতা দেবভূতিকে অসহিষ্ণু করে তুললো, একটু উষ্ণও হোলেন। পুরুষোত্তম ভেবেছেন কি? শৌর্য্যে, বীর্য্যে শ্রেষ্ঠ মগধরাজকে জামাতৃরূপে পাওয়া তো ক্ষুদ্র মালওয়া-রাজের পক্ষে সৌভাগ্যের বিষয়। পুরুষোত্তম দ্বিধাগ্রস্ত হচ্ছেন কেন? বিশেষ করে স্বয়ং মগধরাজ নিজে প্রার্থিরূপে তাঁর দ্বারে উপস্থিত হয়েছেন, এ তো মালওয়ার-রাজের আশাতীত সৌভাগ্য!

সহসা নীরবতা ভঙ্গ করে পুরুষোত্তম বললেন, আপনি ইতিপূর্ব্বে একাধিক দার পরিগ্রহণ করেছেন, শুনেছিলাম?

দেবভূতি উত্তর দিলেন, কেন? একাধিক দার পরিগ্রহণ করা তো ক্ষাত্রধর্ম-বিরুদ্ধ নয়? তাঁর স্বরে ক্রোধের ব্যঞ্জনা ফুটে উঠলো।

পুরুষোত্তম ঈষৎ হাসলেন, বললেন, না, আমি সে কথা বলিনি। সুভগা আমার সর্ব্বকনিষ্ঠা কন্তা, কন্তাদের মধ্যে সে আমার সবচেয়ে প্রিয়। পার্থিব সমস্ত প্রকার সুখে সে সুখিনী হোক, তাই আমার কাম্য।

দেবভূতি উঠে দাঁড়ালেন, বললেন, আমাকে কন্তা সমর্পণ করলে তিনি কি দুঃখিনী হবেন, বলতে চান?

না না, বাধা দিয়ে পুরুষোত্তম বললেন, আমি আপনার বয়োজ্যেষ্ঠ, আমার কথায় অসহিষ্ণু হবেন না। আপনার আসন গ্রহণ করুন, আমার বক্তব্য সরল ভাবেই প্রকাশ করছি। আপনার কয় বিবাহ?

সংক্ষেপে দেবভূতি উত্তর দিলেন, দুই।

সন্তানাদি?

পুত্র-সন্তান এখনও হয়নি। প্রধানা রাণীর গর্ভজাতা একটি মাত্র কন্তা।

পুরুষোত্তম বললেন, আমি সানন্দে আপনাকে কন্তাদান করতে সম্মত আছি, কিন্তু তার আগে আপনাকে অঙ্গীকার করতে হবে, আপনার প্রধানা মহিষীর মৃত্যুর পর আমার কন্তাকে তাঁর স্থলাভিষিক্তা করবেন অথবা ঈশ্বর না করুন, আপনার অভাবে রাজকার্য্য পরিচালনার ভার আমার কন্তার ওপরই অর্পণ করে যাবেন।

বহুক্ষণ নীরব থেকে দেবভূতি বললেন, কিন্তু রাজবিধি অনুসারে এ তো ন্যায়সঙ্গত হবে না?

পুরুষোত্তম বললেন জানি, রাজবিধি অনুসারে আপনার দ্বিতীয়া পত্নী সেই স্থানের অধিকারিণী। কিন্তু কন্তাস্নেহে অন্ধ পিতা আমি, আমি চাই আমার সুভগাকে মগধের একমাত্র অধিকারিণীরূপে দেখতে।

দেবভূতি বললেন, ইতিমধ্যে যদি আমার দুই স্ত্রীর গর্ভে কোন পুত্র-সন্তান জন্মে—

তাঁর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে পুরুষোত্তম বললেন, তা হোলেও প্রতিশ্রুতি দিতে হবে মগধরাজ। আপনার ভাবী পত্নী সুভগাই হবেন মগধের একমাত্র অধীশ্বরী। নিতান্তই যদি তা' সম্ভব না হয়, তবে একে আমার দুর্ভাগ্য বলেই মেনে নিতে হবে। আপনাকে বিফল মনোরথ করার দুঃখ আমার জীবনে যাবে না।

দেবভূতি বুঝলেন পুরুষোত্তম স্থিরপ্রতিজ্ঞ, কোন উপায়েই তাকে টলানো যাবে না। কিন্তু সামান্ত একটি বালিকার জন্ত তিনি এত কালের রাজবিধি এমন ভাবে বিসর্জন দেবেন? মনে পড়লো তাঁর দ্বিতীয়া রাণী অভিমানিনী নিরঞ্জনার কথা। পরক্ষণেই চোখের সম্মুখে ভেসে উঠলো মালওয়া-রাজকুমারী সুভগার অনিন্দ্যসুন্দর মুখখানি। ভ্রমর-কৃষ্ণ চুলের মাঝখানে পদ্মের মতো মুখশ্রী। আশ্চর্য্য! মানুষের মুখ এত সুন্দর হয়? বড় একটা নিশ্বাস ফেলে দেবভূতি বললেন, তবে তাই হোক্। আপনার কথাই মেনে নিলাম মালওয়ারাজ! গভীর আবেগে পুরুষোত্তম তাঁকে আলিঙ্গন করলেন।

—এবার পূর্ব্বের কথায় ফিরে আসা যাক। দেবভূতি যখন সাগ্রহে তাঁর কনিষ্ঠা রাণীর হাত থেকে তাঁর সযত্ন-রচিত তাম্বুলটি গ্রহণ করছেন, তখন তাঁর দ্বিতীয়া রাণী নিরঞ্জনা প্রাসাদের অন্দর মহলের উন্মুক্ত গবাক্ষের কাছে দাঁড়িয়ে অস্তসূর্য্যের রঙীন সমারোহ একমনে দেখছিলেন। কক্ষে কার পায়ের আওয়াজে সাগ্রহে ফিরে দাঁড়ালেন। দু'পা এগিয়ে গিয়ে উচ্চারণ করলেন গিয়েছিলি ক্ষেমা?

গিয়েছিলাম। কিন্তু আজও দেখা পেলাম না।

দেখা পেলি না! কেন?

মহারাজার প্রধান পরিচারক বাধা দিলে। বোধ হয় পরিচারিকার কণ্ঠস্বর নীচু হোলো, কনিষ্ঠা রাজমহিষী সঙ্গে আছেন।

মুহূর্ত্তকাল স্তব্ধ থেকে নিরঞ্জনা দাসীকে আদেশ করলেন, আচ্ছা তুমি যেতে পারো।

দাসী চলে যেতেই তিনি নিজের মনে উচ্চারণ করলেন,

মহারাজা বোধ হয় এখন আমাদের কনীনিকার সঙ্গে বিশ্রম্ভালাপে মগ্ন। আজ তিন দিন ক্রমান্বয়ে তাঁর দর্শন কামনা করে লোক পাঠাচ্ছি কিন্তু একবারও তাঁর দর্শন পেলাম না, অথচ খুব বেশী দিনের কথাও তো নয়, অধরোষ্ঠ দংশন করে তিনি চুপ করলেন, মুখে যে রক্তিমাভা ফুটে উঠলো তা পূর্ব্বের প্রণয়-মধুর দিনগুলির কথা স্মরণ করে না অবরুদ্ধ বহ্নিমান বিক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ, বলা কঠিন। কোমল গালিচার ওপর নিজের দেহভার ন্যস্ত করে অনেকক্ষণ নিরঞ্জনা অর্দ্ধশায়িতা রইলেন, পরে এক সময় সবেগে উঠে দাঁড়ালেন। দেহের প্রতিটি বঙ্কিম রেখায় ফুটে উঠলো একটা দৃঢ় কাঠিন্য। কক্ষের এক প্রান্তে স্থাপিত সুবৃহৎ একটি পেটিকা খুলে তার ভিতর থেকে বের করলেন তাঁর স্বর্ণ মঞ্জুষা। তারপর নিজের দেহ থেকে সমস্ত অলঙ্কার একটি একটি করে খুলে তার মধ্যে নিক্ষেপ করে যথাস্থানে মঞ্জুষাটি রেখে আবার পেটিকা বন্ধ করলেন।

প্রাচীরগাত্রে বৃহৎ দর্পণের মধ্যে নিজের নিরাভরণ প্রতিবিম্বের দিকে চেয়ে নিরঞ্জনার মুখে তীক্ষ্ণ হাসি ফুটে উঠলো। শক্ত করে কঞ্চুলিকা টেনে বেঁধে আপাদমস্তক জড়িয়ে নিলেন গাঢ় কৃষ্ণবর্ণের উত্তরীয়ে। পায়ের শিঞ্জিনী ক্ষিপ্র হাতে খুলে নিয়ে পদাঘাতে সরিয়ে রাখলেন পর্য্যঙ্কের নীচে। তারপর অর্গলমুক্ত করতে গিয়ে দ্বিধাগ্রস্ত হোয়ে থেমে পড়লেন। যে দুঃসাহসিক কাজ করতে যাচ্ছেন, যদি তা' কোনও ক্রমে দেবভূতির কর্ণগোচর হয়, তবে? কোথায় স্থান হবে তাঁর? আপাদমস্তক কণ্টকিত হোলেন তিনি। পরক্ষণেই মনে পড়লো বিশেষ একটি মুহূর্ত্তের কথা। প্রত্যহ সন্ধ্যায় যখন দেবভূতি তাঁর সান্ধ্যপূজায় বসতেন, তখন থেকে আরম্ভ হোতো নিরঞ্জনার প্রসাধন। উক্ত সফেন দুগ্ধে নিজের সারা দেহ মার্জনা করে স্ফটিকস্বচ্ছ শীতল জলে স্নান করে বহু মূল্য বারাণসীর ক্ষৌমবস্ত্রে ও রত্নালঙ্কারে নিজেকে ভূষিত করে সাগ্রহে অপেক্ষা করতেন দেবভূতির পূজা সমাপনের। মুখে লিপ্ত মুক্তাচূর্ণ, শঙ্খরেণু ভেদ করে ফুটে উঠতো স্বেদবিন্দু। নিজের গাত্র নিঃসৃত অগুরু-কস্তুরীর গন্ধে নিজেই মোহিতা হোতেন। পূজা সমাপনান্তে দেবভূতি তাঁর কক্ষে প্রবেশ করতেন, সপ্রেম হেসে তাঁর করঙ্ক থেকে সাদরে গ্রহণ করতেন দু'-একটি পূগ অথবা তাম্বুল। আজ কোথায় গেল সেই মধুসন্ধ্যা? সে জায়গায় আজ সগৌরবে প্রতিষ্ঠিতা মালওয়া-রাজকুমারী আর অবহেলিতা নিরঞ্জনা দলিতা দ্রাক্ষার মতো তাদের পদতলপিষ্টা। দৃঢ় হাতে নিরঞ্জনা দ্বার অর্গলমুক্ত করলেন। অন্দর মহলের অনতিদূরে বিশাল দীর্ঘিকা, তার চার পাশে সারি সারি বৃহৎ তাল গাছ। তারই আড়ালে আত্মগোপন করে নিরঞ্জনা এগিয়ে যেতে লাগলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই উপনীত হোলেন দেবভূতির বিচিত্র শ্বেতমর্ম্মরে তৈরী বিলাস-গৃহের নিকটে। সেখানে মুহূর্ত্তকাল স্থির হয়ে দাঁড়ালেন। অদূরে দেখতে পেলেন প্রহরী এই মাত্র তার গতি পরিবর্ত্তন করেছে। নিরঞ্জনার পদক্ষেপ দ্রুত হোলো।

বাসুদেব কাথ তাঁর গৃহে কৃষ্ণাজিনের আসনে উপবেশন করে পুস্তকপীঠে ব্রাহ্মণাপনিষৎ স্থাপন করে গভীর মনোনিবেশ করেছেন, গৃহদ্বারে মৃদু করাঘাতের আওয়াজে পুঁথি থেকে চোখ তুলে চাইলেন। করাঘাত স্পষ্টতর হোলো, বাসুদেব বললেন, অর্গল মুক্ত, ভিতরে প্রবেশ করুন।

নিষ্কিপ্ত তীরের মতো অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন নিরঞ্জনা। বিস্মিত বাসুদেব উঠে দাঁড়ালেন। নিরঞ্জনা তাঁর মুখের অবগুণ্ঠন ঈষৎ সরাতেই বিপুল বিস্ময়ে বাসুদেব প্রায় চীৎকার করে উঠলেন, মধ্যমা রাজ্ঞী আপনি? অধরে তর্জ্জনী স্থাপন করে নিরঞ্জনা তাঁকে নীরব হোতে ইঙ্গিত করলেন, তার পর নিজ হাতে বাইরের দ্বার রুদ্ধ করলেন, বাসুদেবকে নির্দ্দেশ দিলেন অন্দরের দ্বার রুদ্ধ করতে। যন্ত্রচালিতের মতো বাসুদেব তাঁর আদেশ পালন করলেন। উত্তেজনায় তখন তাঁর হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া দ্রুততর হোয়েছে, অস্ফুট স্বরে উচ্চারণ করলেন, আমি কিছু বুঝতে পারছি না মধ্যমা রাজ্ঞী! যদি আমার উপস্থিতি প্রয়োজন হোতো তবে আপনার প্রাসাদে আমাকে উপস্থিত হোতে আদেশ করলেন না কেন?

বাসুদেবের মুখের ওপর অকুণ্ঠিত দৃষ্টি স্থাপন করে নিরঞ্জনা বললেন শোন বাসুদেব! গুরুতর প্রয়োজন না থাকলে এত বড় দুঃসাহস আমি করতাম না। মহারাজা যদি আমার এই অভিযানের কথা জানতে পারেন তবে রাজপ্রাসাদের দ্বার আমার কাছে চিরদিনের মতো রুদ্ধ হয়ে যাবে।

বাসুদেব উত্তর দিলেন রাজমহিষী, আপনার কাছে শুধু প্রাসাদের দ্বার রুদ্ধ হবে, আমার কাছে কিন্তু পৃথিবীর দ্বার চিরদিনের মতো রুদ্ধ হয়ে যাবে।

নিরঞ্জনা বললেন, বৃথা বাক্য ব্যয়ে নষ্ট করবার মতো সময় আমার নেই। শোন বাসুদেব! তোমাদের মধ্যমা রাজ্ঞীর হৃতমান পুনরায় ফিরিয়ে আনার ক্ষমতা সারা মগধে শুধু একটি মাত্র লোকের আছে, আর সে লোক হচ্ছ তুমি।

বিস্মিত বাসুদেব উত্তর দিলেন, সারা মগধের সাধ্য কি রাজমহিষী যে, আপনার মানের বিন্দুমাত্র হানি ঘটাতে পারে?

নিরঞ্জনা বাধা দিয়ে বললেন, সেই সাধ্যাতীত ব্যাপার সহজসাধ্য হয়েছে নিতান্ত একটি বালিকার কাছে।

কে সে দুঃসাহসিকা বালিকা? বলুন আমাকে। আমি তার যথোপযুক্ত প্রতিবিধান করবো।

পারবে তুমি বাসুদেব? নিরঞ্জনার কণ্ঠস্বর কম্পিত হোলো।

তাঁর উত্তেজনা লক্ষ্য করে বাসুদেব আরও বিস্মিত হয়ে বললেন, যদি না পারি তবে মহারাজার দত্ত মাসিক ভৃত্তি কি বৃথাই গ্রহণ করি?

নিরঞ্জনা বললেন মনে থাকে যেন বাসুদেব, তুমি আমাকে কথা দিলে। যার প্রতি আমার এই অভিযোগ সে হচ্ছে মালওয়া-রাজকুমারী সুভগা। মহারাজার কনিষ্ঠা মহিষী —বাসুদেব, কোন প্রশ্ন করো না, আমার কথা শোন। সর্পিণী দলিতা হোয়ে যখন বিষ উদগিরণ করতে না পারে তখন তার মনের ভাব যেমন হয় আমারও মনের অবস্থা এখন ঠিক সেই রকম। সভাসদদের মধ্যে মহারাজার সব চেয়ে বিশ্বাসভাজন তুমি, এ কাজ তুমি ছাড়া আর কারুর পক্ষে সম্ভব হবে না। বাসুদেব, একটু একটু করে মালওয়া-রাজকুমারীর ওপর মহারাজার মন তোমায় বিরূপ করে তুলতে হবে। একটু চুপ করে থেকে নিরঞ্জনা বললেন, নীরব হোলে কেন বাসুদেব?

বাসুদেব উত্তর দিলেন, কনিষ্ঠা রাজ্ঞীর কি অপরাধ রাজমহিষী?

তিক্ত হেসে নিরঞ্জনা বললেন, অপরাধ তার অপরূপ

সৌন্দর্য্যের, যার মোহে মহারাজা আমাকে চুষিত আম্রির মতো অবহেলা ভরে সরিয়ে দিয়েছেন, আর রাজকাজ, দেবকাজ, সমস্ত বিসর্জন দিয়েছেন ঐ বালিকাটিরই কাছে। ধিক, শত ধিক মহারাজার কর্ত্তব্য-বুদ্ধিকে। ক্ষোভে নিরঞ্জনার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হোলো।

বাসুদেব বুঝলেন চিরাচরিত ব্যাপার, যা সর্ব্বত্র ঘটে থাকে। সপত্নী-ঈর্ষ্যায় নিরঞ্জনা কাতর, কিছুক্ষণ মৌন থেকে বাসুদেব বললেন, মধ্যমা রাজ্ঞী, আপনি প্রধানা মহিষীর কাছে এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করলে ভালো করতেন। হয়তো তিনি আপনাকে কিছু উপদেশ দিতে পারতেন।

বিরক্ত হোয়ে নিরঞ্জনা বললেন, সে পৃথ্লার কথা আমার কাছে বোলো না, কন্থা ও দিবানিদ্রা নিয়েই সে সর্ব্বদা ব্যস্ত। বাইরের কোন খবরই রাখে না, রাখতে চায়ও না। মহারাজার প্রতিও সে নিতান্ত নিস্পৃহা। সহসা নিরঞ্জনা চঞ্চল হোয়ে উঠলেন, বললেন আর বেশী বিলম্ব করতে পারবো না, আমার প্রশ্নের উত্তর চাই বাসুদেব!

বাসুদেব বললেন, কনিষ্ঠা মহিষীর ওপর মহারাজাকে বিরূপ ভাবাপন্ন করালে আপনার কি লাভ মধ্যমা রাজ্ঞী?

লাভ? নিরঞ্জনার কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ হোলো, তা কি এখনও বুঝতে পারো নি? লাভ স্বামীর হৃত সম্প্রীতির পুনরাগমন।

অন্তরের ভাব যদি দর্পণে প্রতিফলিত হোতো তা হোলে দেখা যেতো বাসুদেবের অন্তরে কি তুমুল আলোড়ন চলছে। আরো কিছুক্ষণ নীরব থাকবার পর বাসুদেব বললেন, যদি আদেশ করেন তবে মগধের সমস্ত রাজ্যপাট আপনার পায়ের কাছে এনে উপস্থিত করাতে পারি কিন্তু আমার ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করুন, এ কাজ আমা দ্বারা সম্ভব হবে না।

নিরঞ্জনা বুঝলেন, অধৈর্য্য হোলে কোন লাভ হবে না। তাই সংযত স্বরে বললেন, বাসুদেব, আমি তো তোমার নিতান্ত অপরিচিতা নই, তারই জোরে আমি তোমাকে অনুরোধ করছি, এত শীঘ্র কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হোয়ো না, স্থির মস্তিষ্কে পুনরায় বিবেচনা করে দেখো।

বাসুদেব বললেন, মধ্যমা রাজ্ঞী, আমি বিস্মৃত হয়নি, আপনার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভৃগুকচ্ছরাজ কপিলদেবের নর্ম্মসহচর ছিলাম আমি। কিন্তু আপনি যে প্রস্তাব করছেন, তাতে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা। যদি বিফলমনোরথ হই, তবে মহারাজা যে শাস্তি আমাকে দেবেন, তা কল্পনাও করতে পারি না। তা ছাড়া—দু'-একবার ইতস্ততঃ করে বাসুদেব বললেন, বোধ হয় আপনার জানা নেই, মগধের ভাবী উত্তরাধিকারিণী মহারাজার কনিষ্ঠা মহিষী।

বাসুদেব! নিরঞ্জনার কণ্ঠস্বর প্রায় আর্ত্তনাদের মতো শোনালো।

শান্ত স্বরে বাসুদেব উত্তর দিলেন, আমি যথার্থই বলছি, না হোলে এ বিবাহ সম্ভব হোতো না।

প্রস্তরমূর্ত্তির মতো নিরঞ্জনা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন, পরে বললেন, কি পারিতোষিক তুমি চাও বাসুদেব?

আমার কোন বাচ্ঞা নেই রাজমহিষী, আপনি প্রাসাদে গমন করুন, আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য, আমি পুনরায় এ বিষয়ে বিবেচনা করবো।

কিন্তু তোমার বিবেচনার ফলাফল আমি কেমন করে জানতে পারবো?

ধৈর্য্য ধরুন রাজমহিষী, যথাসময়ে সবই জানতে পারবেন।

আশা করছি বাসুদেব, উপযাচিকা হোয়ে যে অনুরোধ তোমাকে করে গেলাম, তার অনুকূলেই তুমি কাজ করবে—সারা মুখ উত্তরীয়ে ঢেকে নিরঞ্জনা বেরিয়ে গেলেন।

নিরঞ্জনা চলে যাওয়ার পর বাসুদেব কিছুক্ষণ অশান্ত ভাবে কক্ষে পদচারণা করলেন। পুনরায় আসন গ্রহণ করে উপনিষৎ খুলে বসলেন। ভূর্জপত্রের অক্ষরগুলি তাঁর চোখে কতকগুলি মসী-অঙ্কিত রেখার মতো প্রতীয়মান হোলো, কোন রকমেই তাতে মনোনিবেশ করতে পারলেন না। বহুক্ষণ আসনের ওপর স্তব্ধ হোয়ে বসে রইলেন। শিবাদলের মিলিত ঐক্যতানে তাঁর চেতনা ফিরলো। বক্ষ-সংলগ্ন উপবীত নিজের মুঠিতে চেপে ধরে উচ্চারণ করলেন, ক্ষত্রিয়ের অসির চেয়ে ব্রাহ্মণের উপবীত অনেক বেশী শক্তি ধরে। সহসা চঞ্চল হয়ে নিজের দক্ষিণ পঞ্জর স্পর্শ করলেন, অস্ফুট স্বরে বললেন, এই গভীর ক্ষতচিহ্ন কত বৎসর ধরে পোষণ করে আসছি, আজ বুঝি তার সময় এলো। উপনিষৎ অবহেলাভরে এক পাশে সরিয়ে রেখে এক ফুৎকারে তিনি সম্মুখের বর্ত্তিকা নির্ব্বাপিত করলেন।

পক্ষকাল পরে দেবভূতি আজ প্রথম রাজ-দরবারে উপস্থিত হয়েছেন, তাও বাসুদেবের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে। সভাসদ, অমাত্যবর্গ সকলেই দেবভূতিকে দেখে সন্তুষ্ট হোলো। নিজেদের মধ্যে তারা বলাবলি করতো, তৃতীয়া মহিষী আসার পর থেকে মহারাজা দরবার একেবারে ত্যাগ করেছেন, আগে তো এ রকম ছিলেন না! লক্ষণ খুব ভালো বোধ হচ্ছে না।

বাসুদেব সেদিন শীঘ্র সভা ভাঙবার অনুমতি নিয়ে রাজতক্তের নিকটে এসে দাঁড়ালেন—মহারাজা! আপনার সঙ্গে নিভৃতে কিছু কথা বলার প্রয়োজন ছিল।

অপ্রসন্ন মুখভাব নিয়ে ভ্রূ তুলে দেবভূতি তাঁর দিকে তাকালেন। গম্ভীর স্বরে বললেন, বলতে পারো।

বাসুদেব ইঙ্গিতে চামরধারিণীদের চলে যেতে বললেন। তারপর কণ্ঠস্বর নীচু করে বললেন, মহারাজা কি তাঁর প্রতিবেশী ভ্রাতাদের পথানুসরণ করবেন?

দেবভূতি উত্তর দিলেন, যা বলতে চাও স্পষ্ট করে বলো।

সারা মগধের সমবেত অনুনয় করজোড়ে আপনার কাছে নিবেদন করছি, এমন ভাবে আমাদের ত্যাগ করবেন না। মগধকে সর্ব্বনাশের মুখে ঠেলে দেবেন না।

দেবভূতি কিছু লজ্জা অনুভব করলেন। বললেন, আমি তো নাম মাত্রই রাজা বাসুদেব! তুমিই তো কূর্ম্মরূপী নারায়ণের মতো সারা মগধ পিঠে ধারণ করে আছো?

ঘাড় নেড়ে বাসুদেব বললেন, তা হয় না মহারাজ! সারা মগধকে হয়তো বহন করতে পারি কিন্তু রাজাহীন সিংহাসন বহন করবার ক্ষমতা আমার নেই, আমাকে ক্ষমা করবেন।

আচ্ছা বাসুদেব, আমি কথা দিলাম, কাল প্রভাত হোতে নিয়মিত সভায় উপস্থিত থাকবো।
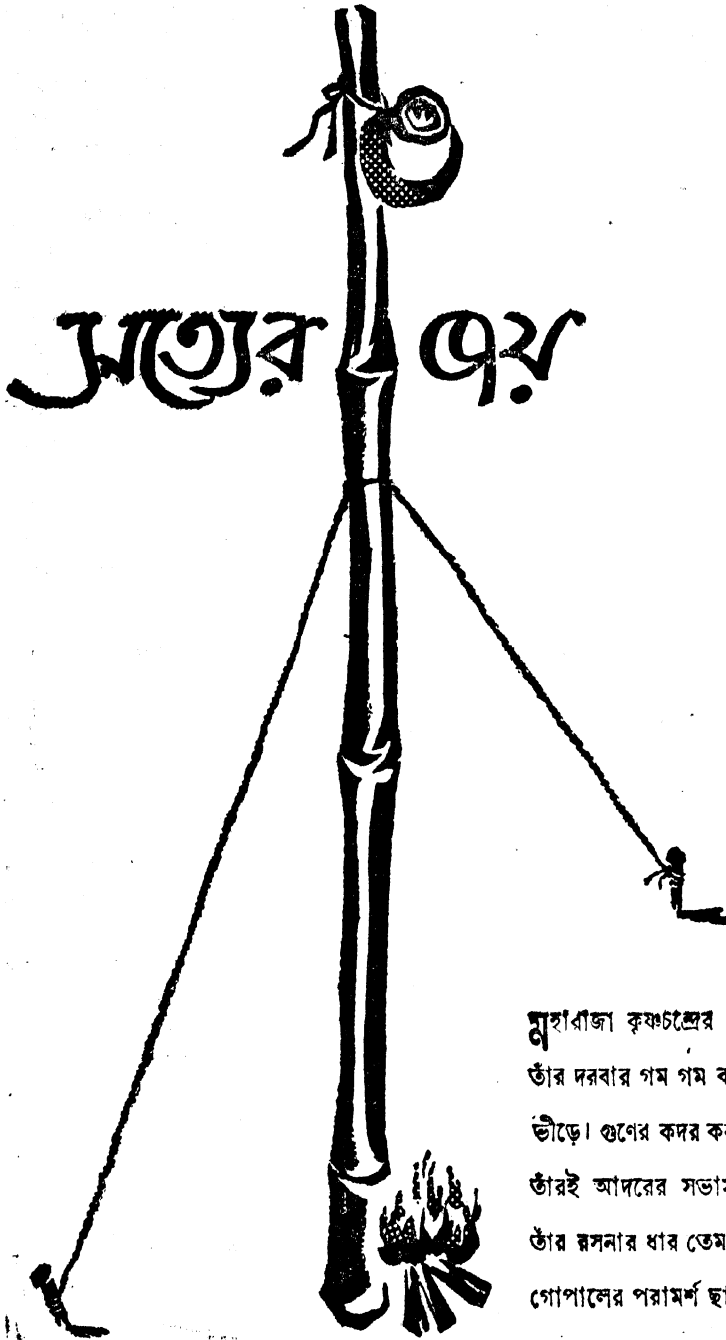
সত্যের জয়
মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের তখন দেশজোড়া খ্যাতি। তাঁর দরবার গম গম করছে জ্ঞানী ও গুণী লোকের ভীড়ে। গুণের কদর করতে রাজার আর জুড়ী নেই। তাঁরই আদরের সভাসদ গোপাল ভাঁড়। যেমন তাঁর রসনার ধার তেমনিই তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি। রাজা গোপালের পরামর্শ ছাড়া কোন কাজ করেন না
রাজার মাথায় সময় সময় অদ্ভুত সব খেয়াল চাপত।

একদিন সারা সহরে ট্যাঁড়া পড়ে গেল যে রাজার বাড়ীর দীঘিতে এই মাঘ মাসের শীতে যে গলা পর্যান্ত ডুবিয়ে সারা রাত বসে থাকতে পারবে তাকে ১০০০ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। পুরস্কারের লোভেও কেউ সেই অসমসাহসিক কাজ করতে রাজী হোলনা শুধু এক গরীব ব্রাহ্মণ ছাড়া। সে সারারাত গলা জলে দাঁড়িয়ে থেকে যখন পুরস্কার নিতে এলো তখন এক দুষ্ট সভাসদ রাজার কানে কানে বলল—"রাজবাড়ীর চিলে কোঠায় আলো জ্বলছিল আর সেই আলো পড়ে দীঘির জল ছিল গরম; ওকে পুরস্কার দেওয়া উচিৎ নয়।" রাজারও মনে হোল ঠিক কথা। গলা ধাক্কা দিয়ে বার করে দেওয়া হোল ব্রাহ্মণকে। ব্রাহ্মণ কাঁদতে কাঁদতে গেল গোপালের কাছে। সব শুনে গোপাল বললেন—"আচ্ছা, দাঁড়াও, আমি জব্দ করছি ওদের।" তার পর দিন সব অমাত্য শুদ্ধু রাজার নেমন্তন্ন হোল গোপালের বাড়ী। রাজা সদলবলে এলেন খেতে। গোপাল করজোড়ে সবাইকে বসালেন, আপ্যায়িত করলেন কিন্তু খাবারের নাম গন্ধও নেই। বেলা বেড়েই চলল। শেষে ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হয়ে রাজা বললেন "কোথায় খাবার হে গোপাল?" গোপাল বললে "ভাতটা হলেই দিয়ে দেব মহারাজ।" "সেকি, ভাত হতে এত সময়? চল তো দেখি।" সবাই এলেন গোপালের সঙ্গে। এসে দেখেন উঠোনে এক বিরাট লম্বা বাঁশের আগায় একটা হাঁড়ী বাঁধা আর তলায় মাটিতে ধিক ধিক করে জ্বলছে একটু আগুন। রাজা তো রেগে আগুন। "তুমি কি রসিকতা করছ আমার সঙ্গে? এইখানে আগুন আর ওইখানে হাঁড়ী—ও চাল কি জীবনেও সেদ্ধ হবে?" গোপাল বিনীত মুখে বললেন "আজ্ঞে, আপনার চিলে কোঠায় জ্বলছিল আলো আর সেই আলোতে দীঘির জল হয়ে উঠল গরম, তবে আমার চাল কেন ফুটবেনা?" রাজা সব বুঝলেন। সঙ্গে সঙ্গে জড়িয়ে ধরলেন গোপালকে। তারপর সেই ব্রাহ্মণকে ডেকে দ্বিগুণ পুরস্কার দেওয়া হোল।

সত্যকে সব সময় নিজে যাচাই করে নিতে হয়। অন্যের কথায় কান দিলে ঠকার সম্ভাবনাই বেশি। এই ধরুন না ডালডা মার্কা বনস্পতির কথা। প্রথম প্রথম 'ডালডা' সম্বন্ধেই কি কম কথা হয়েছিল? কিন্তু আজ লক্ষ লক্ষ পরিবার নিজেরা 'ডালডা' ব্যবহার করে যাচাই করে নিয়েছেন, 'ডালডা'র গুণাগুণ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়েছেন। তাই অসংখ্য রান্নাঘরে 'ডালডা'র আজ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। 'ডালডা' সবাইয়ের সাধ্যের মধ্যে এবং পুষ্টিকর। প্রতি আউন্স 'ডালডায়' ৭০০ আন্তর্জাতীক ইউনিট অর্থাৎ ভাল ঘিয়ের সমান ভিটামিন 'এ' যোগ করা হয়। এতে আরও যোগ করা হয় ভিটামিন 'ডি'। 'ডালডায়' রান্নাবান্না ভাল হয় এবং শীলকরা বায়ুরোধক টিনে 'ডালডা' সব সময় তাজা পাওয়া যায়। এই সব কারণেই আজ লক্ষ লক্ষ পরিবারে 'ডালডা' মার্কা বনস্পতির এত আদর।

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড, বোম্বাই

DL. 443B-X52 BG.

শুধু তাই নয় মহারাজা, মগধের এখন অতি সমৃদ্ধ অবস্থা, এই বৃহস্পতির দশাকে হেলায় যেতে দেবেন না। মগধের বিভূতি লাভের চেষ্টা করুন।

বাসুদেবের কণ্ঠস্বরে কিছু একটা রহস্যের আভাস পেয়ে কৌতূহলী হোয়ে দেবভূতি তাঁর দিকে তাকালেন।

হ্যাঁ মহারাজা! ধারানগর ও ভৃগুকচ্ছ এই দুই রাজ্যের এখন অতি দুরবস্থা। মূর্খ রাজারা সর্ব্বদা আসব ও যোষিৎ-ক্রিয়াতেই মত্ত। রাজকার্য্যের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নেই, আর তারই সুযোগ নিয়ে রাজ-পরিজনরা অবাধে স্বেচ্ছাচার চালিয়ে যাচ্ছে। রাজ্যের অবস্থা প্রায় গজভুক্তকপিত্থবৎ। এমন সুযোগ হারাবেন না।

দেবভূতি বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন, বলো কি বাসুদেব! ভৃগুকচ্ছের রাজা কপিলদেব আমার পরম আত্মীয়, মধ্যমা মহিষীর সহোদর, তার প্রতি বিরুদ্ধাচরণ করা আমার পক্ষে অসম্ভব!

বিরুদ্ধাচরণ কা'কে বলেন মহারাজা?

বাধা দিয়ে দেবভূতি বললেন, তুমি যতোই যুক্তি দেখাও না কেন, কপিলদেবের প্রতি বৈরী ভাব মনে পোষণ করাও আমার অতি ধর্ম্মবিরুদ্ধ কাজ করা হবে।

ভুল বললেন মহারাজা! রাজনীতির শব্দকোষে অধর্ম্ম বলে কোন বাক্য নেই। এ হোচ্ছে রাজোচিত বীরধর্ম্ম। গভীর ভাবে চিন্তা করুন মহারাজা! আপন রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা করা কোন নৃপতির পক্ষেই নীতিভ্রষ্ট কাজ নয়। উত্তর-ভারতের একচ্ছত্র রাজছত্র ধারণ করবেন আপনি। এর মধ্যে আত্মীয়-অনাত্মীয়ের কোন প্রশ্ন আনবেন না।

দেবভূতির ললাটের কুঞ্চন গভীরতর হোলো।

ধারানগরের রাজা নরনারায়ণ অতি অল্পবয়স্ক, দিব্যকান্তি যুবক। সঙ্গদোষে বিপথগামী হোলেও মাঝে মাঝে সহসা চেতনা ফিরে পান, সাময়িক অনুতাপবোধ মনে জাগে, অস্থির হোয়ে চার দিকে ঘুরে বেড়ান। চাটুকাররা তখন প্রমাদ গুণে লাঙ্গুল গুটিয়ে পশ্চাদপসরণ করে। এমনিই এক অপরাহ্নে নরনারায়ণ একাকী রাজবর্ত্মের নির্জ্জন এক অংশে পদচারণা করছিলেন, মানসিক উত্তেজনা ভ্রূ ও ললাটের গভীর কুঞ্চনে স্পষ্ট হোয়ে ফুটে উঠছিল। দূরে কার ভগ্নকণ্ঠের কাতর বিলাপে তাঁর গতি স্তব্ধ হোলো। উৎকর্ণ হোয়ে চার দিকে তাকালেন, কাউকে দেখতে পেলেন না। প্রশস্ত রাজপথ সঙ্কীর্ণতর হোয়ে যেখানে তাঁর প্রমোদ-উদ্যানের প্রবেশ-পথ শেষ হোয়েছে, সেখানে পৌঁছে তিনি দেখলেন, আপাদমস্তক মলিন বস্ত্রে আচ্ছাদিত একটি লোকের দেহ কি এক বিক্ষেপে ক্রমাগত কুণ্ডলী পাকিয়ে যাচ্ছে, আর সে বিলাপধ্বনি তারই।

নরনারায়ণ তার কাছে এগিয়ে গেলেন। প্রশ্ন করলেন, কে তুমি? কি হোয়েছে তোমার?

মাথা তুলে লোকটি তাঁর দিকে তাকালো। ক্লিষ্ট মুখ তার উদ্ভাসিত হোলো, বহু সৌভাগ্য আমার। মহারাজার চরণে আমার অসংখ্য প্রণিপাত।

ধমক দিয়ে নরনারায়ণ বললেন, থামো। কি হোয়েছে তোমার বলো।

বিচর্চ্চিকা মহারাজা! সারা দেহ জর্জ্জরিত হোয়ে গেছে সেই চর্ম্মপ্রদাহে।

তা রাজপথে শুয়ে আর্ত্তনাদ করছো কেন? কোন বৈদ্যের কাছে যাও।

মহারাজা! আমি মগধবাসী। আজ মধ্যাহ্নেই এখানে এসেছি। আপনার শরণাপন্ন হবো বলেই এখানে আমার আগমন।

বিস্মিত হয়ে নরনারায়ণ বললেন, মগধবাসী হোয়ে তুমি ধারানগরে এসেছো নিরাময় হওয়ার জন্য? কেন মগধে কি সম্প্রতি বৈদ্যাভাব ঘটেছে?

লোকটি উত্তর দিল, ঠিক তার বিপরীত মহারাজা! বহু গুণী ভিষকের কাছে গিয়েছিলাম। ঘৃণায় তাঁরা আমাকে পরীক্ষা পর্য্যন্ত করলেন না। বললেন এ মহারোগ। অথচ আমি নিশ্চিত জানি তাঁদের ধারণা ভুল। অস্পৃশ্য কুকুরের মতো তাঁরা আমাকে তাঁদের গৃহদ্বার থেকে বিতাড়িত করলেন—বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে লোকটি চুপ করলো।

ঈষৎ হেসে নরনারায়ণ বললেন, মগধরাজ মাসিক বৃত্তি দিয়ে বেশ এক পাল রূপী মর্কট পোষণ করছেন তো? আচ্ছা, আমি শিবিকা পাঠিয়ে দিচ্ছি, তারা তোমাকে আজ রাত্রে আমার অতিথিশালায় রেখে আসবে। আমার প্রধান বৈদ্যকে বলে দোব, কাল থেকে তাঁর চিকিৎসাগারে তোমাকে রেখে তোমার যথোপযুক্ত চিকিৎসা করাতে।

দুই হাত জোড় করে লোকটি বললো, মহারাজার জয় হোক!

—মাসান্তে এক প্রভাতে প্রহরী পরিচালিত হোয়ে একটি লোক ধারানগরের রাজসভায় উপনীত হোলো। ভ্রূ কুঞ্চিত করে নরনারায়ণ তার দিকে তাকালেন, প্রশ্ন করলেন, কে তুমি?

প্রসন্ন হাসিতে সারামুখ ভরিয়ে লোকটি উত্তর দিল, ঠিক এক মাস পূর্ব্বে মহারাজা আমাকে এই একই প্রশ্ন করেছিলেন। আমি হতভাগ্য মগধবাসী সেই রুগ্ন ব্যক্তি।

তার সুস্থ চেহারার দিকে তাকিয়ে নরনারায়ণ খুশী হোলেন। বললেন, বেশ সেরে উঠেছো দেখছি। মগধের ভিষকদের কাছে গিয়ে এবার বুক ফুলিয়ে বলতে পারবে তারাই শুধু পৃথিবীর সর্বেসর্বা রোগ-নির্ণয়কারী নয়। কবে রওনা হবে সেখানে?

লোকটি উত্তর দিল, আবার মগধ ফিরে যাবো বলে তো ধারানগর-রাজের শরণাপন্ন হইনি?

নরনারায়ণ বললেন তার অর্থ? তুমি কি ধারানগরেই স্থায়িভাবে বাস করতে চাও নাকি?

লোকটি উত্তর দিল, যথার্থ মহারাজা! যে রাজ্য তার অসুস্থ, পীড়িত প্রজাকে পথের কুকুরের মতো পদাঘাতে তাড়িত করে সে রাজ্যে পুনবার ফিরে যাওয়ার সাহস অথবা স্পৃহা আমার নেই।

রাজ্যের প্রজাবৃদ্ধির জন্য অসুখ কোন রাজার মনেই জাগে না, তাই নরনারায়ণ তার এই প্রার্থনায় বিরক্ত হোলেন না। তবু বললেন, তোমাকে আমার রাজ্যে স্থান দিলে মগধরাজ হয়তো আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হবেন।

তার চেয়েও বেশী অসন্তুষ্ট হবেন ফিরে গেলে, যখন জানবেন ধারানগর রাজ্যের প্রধান ভিষক আমাকে নিরাময় করেছেন।

বেশ, বাস করো তবে তুমি আমার রাজ্যে। কি নাম তোমার?

অধীনের নাম চিরঞ্জীব।

কালের চক্র নিয়মিত গতিতে এগিয়ে যায়। দুই মাস ধারানগরে অতিবাহিত করবার পর চিরঞ্জীব আনন্দিত মনে আবিষ্কার করলো নরনারায়ণের অতি বিশ্বাসভাজনের অধিকারী হয়েছে সে। চাটুকারদের অভিশাপ বিফল করে দিয়ে সে নরনারায়ণের প্রধান অমাত্যের পদে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এক মনোরম সন্ধ্যায় নরনারায়ণ তাঁর পুষ্পোদ্যানে এক কৃত্রিম নির্ঝরিণীর পাশে বসেছিলেন, পাশে দাঁড়িয়েছিল চিরঞ্জীব। নরনারায়ণ বলছিলেন দ্যাখো চিরঞ্জীব, জীবনদর্শী কবিরা বলেছেন জীবনে যা সত্য পথ তা শাণিত ক্ষুরধারার মতো দুর্গম কিন্তু সেই দুর্গম পথই হোলো জীবনের একমাত্র পথ। তোমার কি মনে হয় বলো তো চিরঞ্জীব? কি সে সত্য পথ?

চিরঞ্জীব উত্তর দিল, এ বড় কঠিন প্রশ্ন মহারাজা! শত শত ধীমান সেই সত্য পথকে খুঁজতে গিয়ে তার দুর্গম পথে নিজেদের আত্মবলি দিয়েছে, তবুও তারা তাদের প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পায়নি। ওটা বোধ হয় জীবনযুদ্ধে পরাজিতদের সান্ত্বনাবাক্য।

মাথা নেড়ে নরনারায়ণ বললেন, উপনিষদের স্রষ্টা কখনও পরাজিত বা ব্যর্থ হোতে পারেন না চিরঞ্জীব! আমার কি মনে হয় জানো? মনুষ্যত্বের বিকাশের চেষ্টা যার জীবনে পরম সাধনা, আর সেই সাধনা যে চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করে তাই হয়তো জীবনের সত্যপথ। এ ছাড়া আর কি বলবো। নিজের অন্তরে যদি কেউ এ ভাবাবেগ বহন করে তা হোলেই এর সত্যকার মহিমা পরিস্ফুট হবে। সেই শুভদিনটির প্রতীক্ষায় আমি উন্মুখ হোয়ে আছি। করতলে তিনি চিবুক ন্যস্ত করলেন।

কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করে চিরঞ্জীব বলল, যদি অভয় দেন তবে একটি কথা নিবেদন করি। আনত মুখেই নরনারায়ণ বললেন, বলো।

মহারাজা! মদোদ্ধত কতকগুলি পঙ্গু জীব যে বসে বসে পৃথিবীর ভার বৃদ্ধি করছে তাদের উচ্ছেদ করে শান্তি স্থাপনের চেষ্টাও তো মহারাজার একটা কর্ত্তব্য-বিশেষ?

নরনারায়ণ বললেন, ঠিক বুঝতে পারলাম না তো?

মহারাজা! অনাচার, অরাজকতা দুর্নীতি আজ যে সমগ্র উত্তর-ভারতকে উৎসন্নের মুখে ঠেলে দিচ্ছে তাকে প্রতিরোধ করতে পারে, এমন শক্তি আপনি ছাড়া আর কার আছে?

আমার একার শক্তিতে তার কতটুকু সম্ভব হবে, চিরঞ্জীব?

প্রগলভতা ক্ষমা করবেন। শক্তি যতই সীমাবদ্ধ হোক না কেন, তাতে কোন অপমান নেই, অপমান সেই শক্তির অপচয়ে। আপনি আপনার নির্ভীকতা নিয়ে অগ্রসর হোন, দেখবেন আপনার সীমাবদ্ধ শক্তি গণ্ডি ছাড়িয়ে আরও বহু দূরে বিস্তৃত হয়ে পড়েছে। অযোগ্য লোককে অপসৃত করে যোগ্যতর লোকের অভ্যুত্থানই তো প্রত্যেক রাজ্যের কাম্য মহারাজা!

নরনারায়ণ নির্বোধ নন, বুঝলেন চিরঞ্জীব কি বলতে চায়। হেসে তিনি বললেন, কাব্যের কমলবনে তুমি দেখছি রাজনীতির মত্ত হস্তীকে প্রবেশ করাতে চাও চিরঞ্জীব! ও সব দ্বন্দ্ব প্রতিযোগিতা আমার দ্বারা সম্ভব হবে না, ভালোও লাগে না। এমনিই আমি বেশ আছি।

এই প্রতিযোগিতা, এই সংগ্রামই তো যোগ্যতমের যোগ্যতা প্রতিষ্ঠার সহায়ক মহারাজা!

ভৃগুকচ্ছের রাজা কপিলদেব অন্তঃপুরে তাঁর সপ্ত পত্নী-পরিবেষ্টিত হোয়ে মধ্যাহ্নের বিশ্রাম-সুখ উপভোগ করছিলেন। তাঁদের সঙ্গে কিছু হাস্য-পরিহাস করছিলেন, তার ফাঁকেই চোখে তন্দ্রার ঘোর নেমে আসছিল, আবার জেগে উঠছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে রাণীদের মধ্যে কেউ কেউ সিক্ত ময়ূরপঙ্খ, চন্দন-খসখসের পাখা নিয়ে তাঁকে ব্যজন করছিলেন, কেউ বা কর্পূরগন্ধী স্ফটিকস্বচ্ছ সুশীতল জলের পানপাত্র তাঁর মুখের কাছে ধরছিলেন। পুনরায় কপিলদেব তন্দ্রার ঘোরে তলিয়ে যাচ্ছিলেন, দ্বারের বাইরে নারী-কণ্ঠের আওয়াজে জেগে উঠলেন। অর্দ্ধ-নিমীলিত চোখে প্রশ্ন করলেন কি ব্যাপার?

অন্তঃপুরের প্রধানা দাসী ব্যক্ত করলো, বৃদ্ধ কঞ্চুকী মহারাজাকে কিছু নিবেদন করতে চায়।

শ্লেষ্মাজড়িত কণ্ঠে কপিলদেব বললেন, তার সাহস তো বড় কম নয়! অসময়ে রসভঙ্গের শাস্তি কি, তা সে জানে না?

দাসী উত্তর দিল, অনেক বলেও তাকে নিরস্ত করতে পারলেম

না। বলছে, বিশেষ প্রয়োজন না থাকলে আমার প্রাণ গেলেও মহারাজার বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটাতাম না।

আবার চোখ বুঁজে কপিলদেব বললেন, আচ্ছা, তাকে নিয়ে এসো। তার যা বক্তব্য দ্বারের বাইরে দাঁড়িয়ে বলতে বলো।

মুহূর্ত্ত পরে ভীমকায় কঞ্চুকী দ্বারের বাইরে দাঁড়িয়ে তার বক্তব্য কপিলদেবের শ্রুতিগোচর করালো। বিদেশী এক রাহী মহারাজার দর্শনপ্রার্থী।

গুলাকলের মতো চোখ দু'টি মেলে কপিলদেব বললেন, তোর স্পর্দ্ধা তো কম নয়, এই তুচ্ছ কারণে আমার দিবানিদ্রার ব্যাঘাত ঘটালি? কে সে রাহী? বন্দী করে রাখ্‌ তাকে।

কঞ্চুকী বললো, কোন যুক্তিই সে মানতে চায় না মহারাজা! আমার পায়ে ধরতে উদ্যত সে।

কাল প্রভাতে তাকে রাজসভায় আনতে বলো।

তা-ও বলেছিলাম। সে বললো, এক মুহূর্ত্তের অপব্যবহারও সমূহ ক্ষতিকর। তার বক্তব্যের ওপরই নির্ভর করছে ভৃগুকচ্ছের শুভাশুভ।

কপিলদেবের তন্দ্রার ঘোর কেটে গেল। কৌতূহলী হয়ে বললেন, কি ব্যাপার? অনুসন্ধান নিতে হোচ্ছে তো? স্পর্দ্ধিত লোকটাকে একবার নিরীক্ষণ করাও প্রয়োজন। কঞ্চুকীকে বললেন, আচ্ছা, তাকে আমার বাইরের বিশ্রামাগারে নিয়ে এসো। খলিত নীবিবন্ধন আঁটতে আঁটতে শ্লথগতিতে, অপ্রসন্ন মুখে তিনি অন্তঃপুর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

অপ্রসন্ন চোখের দৃষ্টি বিদেশ-প্রত্যাগত লোকটার উপর নিক্ষেপ করে কপিলদেব বললেন, তোমার কি বলবার আছে, বলতে পারো। তবে মনে রেখো, তা যদি অকিঞ্চিৎকর হয়, তবে তার ফল তোমার কাছে বড় শুভ হবে না।

যুক্তকরে লোকটি বললো, মহারাজা! তাই যদি আমার বক্তব্য হোতো, তা হোলে আপনার সম্মুখে উপস্থিত হবার দুঃসাহস কখনও করতাম না। যে অশুভ ছায়া ভৃগুকচ্ছের ওপর নেমে আসছে, তারই কথা নিবেদন করতে আমি এখানে এসেছি।

গম্ভীর স্বরে কপিলদেব বললেন, অযথা সময় নষ্ট কোরো না, সরল ভাবে প্রকাশ করো তোমার বক্তব্য।

সে কথা প্রকাশ করতে আমার রসনা স্তব্ধ হয়ে যাচ্ছে মহারাজা!

শোন বিদেশী, এই মুহূর্ত্তে তুমি যদি তা উচ্চারণ না কর, তবে তুমি নিজেও চিরদিনের মতো স্তব্ধ হয়ে যাবে।

মহারাজা, ধারানগরের রাজা নরনারায়ণ—

তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে কপিলদেব বললেন, আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে চায়?

শুধু তাই নয়, তার ওপরও তাঁর কিছু আকাঙ্খা আছে। নীরব হোলো সে।

গর্জ্জন করে কপিলদেব বললেন, বলো।

তাঁর—তাঁর আকাঙ্খা, মহারাজার পঙ্কমা রাজ্ঞী।

কপিলদেবের দুই হাতের দশ অঙ্গুলি পক্ষিচঞ্চুর মতো বাঁকা হোয়ে বিদেশী লোকটির কণ্ঠদেশ লক্ষ্য করে এগিয়ে গেল।

আতঙ্কে শিউরে উঠে লোকটি পিছিয়ে গেল, মহারাজা, আমি শুধু বার্ত্তাবহ মাত্র।

উদ্যত হাত নিরস্ত করে কপিলদেব বললেন, ঠিক তোমার কোন দোষ নেই। কিন্তু তুমি কে? তোমার নাম কি?

হাত জোড় করে লোকটি বললো, আমি ধারানগরবাসী নগণ্য এক হালকীর, নাম অরিন্দম।

কপিলদেবের অবরুদ্ধ আক্রোশ বক্ষপঞ্জর ভেদ করে নিরপরাধ লোকটির ওপর সশব্দে ফেটে পড়তে চাইলো, কষ্টে আত্মসংবরণ করে তিনি বললেন, তুমি তা হোলে নরনারায়ণের প্রজা। তাঁর প্রজা হোয়ে তাঁরই অপযশের কথা তুমি আমাকে শোনাতে এলে?

মহারাজা, সহ্যের সীমা অতিক্রম করেছি। অধীন তাঁরই অত্যাচারে জর্জরিত হতভাগ্য এক ব্যক্তি। রক্ষক হোয়ে ভক্ষকের মতো তিনি আমার সর্ব্বস্ব অপহরণ করেছেন, আমাকে লক্ষ্মীহারা করে আমার গৃহ খালিয়ে দিয়েছেন, তার পর কোড়া দিয়ে সর্ব্বাঙ্গ রক্তাপ্লুত করেছেন। দুই হাতে মুখ ঢেকে লোকটি ফুঁপিয়ে উঠলো।

কপিলদেব বর্দ্ধিততর ক্রোধে আপন মনে উচ্চারণ করলেন, নরনারায়ণ কি ভেবেছে রাজকাজে উদাসীন, খেয়ালী বলে কি আমার আত্মসম্মান পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়েছি? এ অপমান পঙ্গুর মতো সহ্য করবো? পরদারলোভীকে কেমন করে ঠাণ্ডা করতে হয় আমি জানি।

কপিলদেবের শ্যামল মুখ ভয়াল হোয়ে উঠলো, দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, ধারানগরে আমি এমন আগুন জ্বালাবো যে, ভাগীরথীর সমস্ত জলও তা নেবাতে পারবে না।

লোকটি মুখের ওপর থেকে হাত সরিয়ে বললো, মহারাজা, যুদ্ধবিগ্রহে সব সময় অভিলাষ সিদ্ধ হয় না।

ভীম গর্জ্জনে কপিলদেব বললেন, বলো কি তুমি! এ অবমাননার প্রতিশোধ আমি নেবো না? ভৃগুকচ্ছে একটি মাত্র প্রাণী জীবিত থাকলেও আমি যুদ্ধ চালিয়ে যাবো।

ধৈর্য্য ধরুন, অযথা লোকক্ষয়, ধনক্ষয় করে কোন লাভ হবে না। কৌশল অবলম্বন করুন। আমার পরামর্শ শ্রবণ করুন।

ত্রিযামা রজনীর দ্বিতীয় পাদ অতিক্রান্ত হোলো। শৃগালের দল ঊর্দ্ধমুখে তীক্ষ্ণ স্বরে চীৎকার করে উঠলো। কৃষ্ণবসনাবৃতা একটি রমণী একটি গৃহের দ্বারে মৃদু করাঘাত করলো। সঙ্গে সঙ্গে দ্বার খুলে গেল এবং পরমুহূর্ত্তে রুদ্ধ হোলো। বাসুদেব দীপ প্রজ্বলিত করলেন। অবগুণ্ঠন উন্মোচন করে রমণী বললো, মধ্যমা রাজ্ঞী আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। কিন্তু এ নগণ্যার ওপর এ কি দুরূহ কাজের ভার দিয়েছেন মন্ত্রিপ্রবর?

বাসুদেব বললেন, আমার আয়োজন সম্পূর্ণ, এখন তো আর পিছিয়ে গেলে চলবে না?

কিছুক্ষণ মৌন রইলো সে নারীমূর্ত্তি। পরে অস্ফুট স্বরে বললো, বড় দ্বিধাগ্রস্ত হচ্ছি। পরকালে এ গুরুতর অন্যায়ের কি জবাব দোব?

গম্ভীর স্বরে বাসুদেব বললেন, সে পাপ তো তোমায় স্পর্শ করবে না। শোন ক্ষেমা! রাষ্ট্রনীতির সূক্ষ্ম কৌশল তুমি বুঝতে পারবে না। রাষ্ট্র পরিচালনার ভার যাঁদের ওপরে, তাঁরা নিজের ক্ষমতার বলে রাজ্যের ভিত্তিটি ভেঙ্গে-চেঙ্গে অনেকখানি বদলে দিতে পারেন।

একে অন্যায় বলে ভুল করো না। রাষ্ট্রনীতির সুষ্ঠু ও সমস্ত মিলন যত দিন না ঘটবে তত দিন রাজ্যের এবং রাজ্যের সর্ব্বসাধারণের মঙ্গল হবে না। একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বাসুদেব বললেন, দৈহিক গঠনে তোমার সঙ্গে কনিষ্ঠা মহিষীর কিছু সাদৃশ্য আছে, তাই এ কাজ তুমি ছাড়া আর কারুর পক্ষেই সম্ভব হবে না। মনে কোন দ্বিধা রেখো না ক্ষেমা! আর মধ্যমা রাজ্ঞীর কাছে আমার কথামত তুমি কিছু প্রকাশ করনি তো?

নতমুখে, নীরবে সে রমণী মাথা নাড়লো।

আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করো, দাসীপদ থেকে তোমাকে চিরদিনের মতো অপসৃত করাবো আমি।

ধারানগর রাজ্যের সীমানা যেখানে শেষ হয়েছে, তার ওপারেই চোখে পড়ে বিশাল এক বনানী। সসীম যেন অসীমের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য অপ্রতিহত গতিতে ধেয়ে চলেছে, আপন গাম্ভীর্য্যে সুগম্ভীর।

আসন্ন প্রদোষের ক্ষীণ আলোয় বিশাল এক মহীরুহের আড়ালে পদচারণা করছিলেন ধারানগরের রাজা নরনারায়ণ। চিরঞ্জীবের মন্ত্র বৃথা হয়নি, নরনারায়ণ বুঝেছেন যোগ্যতমের যোগ্যতা প্রতিষ্ঠার সহায়ক অন্তঃপুর অথবা চাটুকারের চাটুবাক্য নয়। জীর্ণ রাষ্ট্রব্যবস্থার বনিয়াদ ধূলিসাৎ করে যোগ্যতরের আসনই তিনি পাতবেন সেখানে। হয়তো সেখানে তিনি তাঁর পূর্ণ বিকাশের পথ খুঁজে পাবেন—কে জানে? কিন্তু চিরঞ্জীবের এত বিলম্ব হচ্ছে কেন? তাঁরই পরামর্শে নরনারায়ণ এখানে আজ একাকী উপস্থিত হয়েছেন, কোন দেহরক্ষী সঙ্গে আনেননি। গোপনে আজ শুধু পরীক্ষা করতে এসেছেন গিরিব্রজের ভৌগোলিক সীমানা ও অবস্থান। তা ছাড়া চিরঞ্জীব আশ্বাস দিয়েছে যে, এই গভীর বন তাদের পক্ষে বিশেষ সহায়ক। কারণ ঐ বনের মধ্যে পৃথক ভাবে ছড়িয়ে আছে কতকগুলি বৃহৎ দানবীয় গাছ। এদের প্রকৃতি ঠিক বর্ণচোরা আমের মতো। যদি কেউ কখনও এ গাছের তলায় এসে দাঁড়ায়, তবে আর রক্ষা নেই। দানবীয় গাছগুলির তীক্ষ্ণ-শুল্ক তন্তুগুলি সমষ্টিবদ্ধ হয়ে এসে এমন মরণালিঙ্গনে তাকে জড়িয়ে ওপরে টেনে নেবে যে, কারুর সাধ্য নাই তাকে মুক্ত করে। তার মেদ-মজ্জা সব চুষে নিয়ে সেই বৃক্ষরূপী দানব কয়েক দিন পরে নিজেই সেই মানুষের কঙ্কালটিকে মুক্ত করে মাটির ওপর নামিয়ে দেয়। তাই চিরঞ্জীব বলেছে, আক্রমণের উদ্যোগ যদি এইখানেই করা হয় তবে বিশেষ সুবিধা হবে।

অধৈর্য্য হোয়ে নরনারায়ণ চার দিকে তাকালেন। চিরঞ্জীবের তো এত দেরী হওয়ার কথা নয়? দুই দণ্ড পরেই তো এখানে এসে নরনারায়ণের সঙ্গে মিলিত হবার প্রস্তাব আগে থেকেই ঠিক ছিল। তবে কি তার কোন বিপদ ঘটলো? চঞ্চল হোয়ে উঠলেন তিনি। ভাবলেন আজ না হয় ফিরেই যাই, আর এক দিন চিরঞ্জীবকে একেবারে সঙ্গে নিয়ে আসবো।

আর কোনও দিন ফেরা হয়নি নরনারায়ণের। সহসা নিজের বুকে হাত দিয়ে আহত একটা আর্ত্তনাদ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন তিনি। বুকে বিদ্ধ তীক্ষ্ণ শর উঠিয়ে ফেলবার ব্যর্থ চেষ্টা করতে করতে তাঁর বিস্ফারিত চোখের দৃষ্টি অক্ষিকোটর পরিভ্রমণ করে নভোচারী পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্রটির দিকে স্থির হোয়ে রইলো।

হাতের ধনু অবহেলা ভরে মাটিতে ফেলে দিয়ে কপিলদেব অট্টনাদে হেসে উঠলেন। সারা বনানী কম্পিত হয়ে উঠলো তাঁর সেই উন্মত্ত হাসিতে। তাখো হালকীর, পরদারলোভীর শাস্তি। আক্ষেপ রয়ে গেল জীবিত কালে তার গুনক-সুলভ লোভের জন্য কোন নিগ্রহ তাকে করতে পারলাম না। তারপর অরিন্দমের বাহুমূল আকর্ষণ করে বললেন, আর এখানে থাকবার প্রয়োজন নেই, চলো প্রভাত হওয়ার আগেই ভৃগুকচ্ছে পৌছতে হবে। ঐ ঘৃণিত দেহটা ঐখানেই পড়ে থাকুক। শৃগাল-কুকুরের উপাদেয় ভোজ্য হবে।

অরিন্দম নিজের হাত মুক্ত করে নিয়ে বললো, কিন্তু আমার প্রয়োজন তো একটু বাকী রয়ে গেছে মহারাজা!

আবার কিসের প্রয়োজন তোমার?

প্রয়োজন আমার আপনাকে।

বিস্মিত কপিলদেব মুখ তুলে তাকাতেই অরিন্দম বলল, চেয়ে দেখুন, যে মাটি পা দিয়ে স্পর্শ করে আছেন তা ভৃগুকচ্ছের নয়, মগধের।

তার কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিমেষের মধ্যে যেন মৃত্তিকার অভ্যন্তর থেকে প্রমথ-অনুচরের মতো কতকগুলি মূর্ত্তি তাঁকে ঘিরে ফেললো, কয়েকজন বজ্রমুষ্টিতে তাঁর বাহুযুগল পেষণ করে মণিবন্ধে পরিয়ে দিল লৌহনিগড়। বাধা দেবার মুহূর্ত্ত সময় পেলেন না তিনি। অরিন্দমের মুখের দিকে চেয়ে তিনি বললেন তুমি কে?

মহারাজা, আমার তিন নাম। কোনটি ব্যক্ত করবো বলুন! অধম শ্রীচিরঞ্জীব নৈগম, বনাম অরিন্দম হালকীর আর নামান্তরে সুদক্ষ নিযুক্ত, মগধরাজের ভৃত্য আর সেটাই হোলো আসল পরিচয়।

কপিলদেব বললেন, নরনারায়ণের প্রতি তোমার এ অভিযোগ তা হোলে সত্য নয়?

এর প্রতিটি অক্ষর মিথ্যা। পূর্ব্বের চক্রান্ত অনুযায়ী সর্ব্বাঙ্গে সিজমনসার কাঁটার বিষাক্ত রসে দূষিত ব্রণ বের করে ধারানগরে এসে নরনারায়ণের কৃপা লাভে সমর্থ হই। তারপর আমি আমার জাল বিস্তার করতে আরম্ভ করলাম। ভৃগুকচ্ছের মহারাজাও আমার স্বরচিত ফাঁদে পা দিতে মুহূর্তমাত্র দ্বিধা করেননি, অতি অল্প আয়াসেই আমার কাজ সিদ্ধ হয়েছে।

কপিলদেব বললেন, এমন করে নির্দোষ একটি বালকের মৃত্যু ঘটালে?

নিজের উদরে হাত দিয়ে লোকটি বললো, এই গহ্বরটার চাহিদা বড় বেশী মহারাজা! তার পর অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বললো, আমার সান্ত্বনা রইলো, বিশ্বাসঘাতকের মুখ নিয়ে আমাকে নরনারায়ণের সম্মুখে দাঁড়াতে হোলো না।

দেবভূতির সান্ধ্যপূজা সমাপ্ত হোয়েছে। বার বার তিনি উৎসুক নয়নে দ্বারপ্রান্তের দিকে চাইছিলেন। আজ সুভগার এত দেরী হোচ্ছে কেন? সুভগা কি জানে না, এই মুহূর্তটির জন্য কতখানি উন্মুখ হোয়ে থাকেন দেবভূতি? নিজের মনে স্বীকার করতে লজ্জা পেলেন, ইষ্টদেবতার বন্দনাতেও বোধ হয় এই জন্য তিনি

নিবিষ্ট হোতে পারেন না। চঞ্চল হোয়ে উঠলেন দেবভূতি। হঠাৎ যেন আবিষ্কার করলেন, সুভগার মধ্যেই সম্পূর্ণ ভাবে নিজেকে তিনি হারিয়ে ফেলেছেন। রাজকাজে ঠিকমতো মন বসাতে পারেন না, কত গুরুত্বপূর্ণ কাজ অবহেলিত ভাবে পড়ে রয়েছে, বহুবিধ কর্ত্তব্যের ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা তাঁর মনে পড়লো। বহুদিন পরে দ্বিতীয়া রাণী নিরঞ্জনার মুখখানা তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠলো, গভীর অভিমানে জলদ-গম্ভীর—বর্ষণোন্মুখ আয়ত চোখের দুই কূল সামান্য মাত্র আঘাতেই ঝরঝর ধারায় ভেসে যাবে। শিশু-কন্যাটির কথা একবার মনে পড়লো—কত দিন তাদের দেখেন নি তিনি। নিজের মনে অন্যায় বোধ করলেন, ভাবলেন অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই এর ক্ষতিপূরণ করবেন, সাদরে, কৌশলে নিরঞ্জনার মান ভাঙ্গাবেন, সস্নেহে কন্যাটিকে আপন বক্ষে ধারণ করবেন।

দেবভূতির চিন্তাগ্রস্ত মন বাধা পেলো। সুভগার পায়ের গুঞ্জরি-পঞ্চম এমন অসমছন্দে বাজছে কেন?—দীর্ঘ অবগুণ্ঠনে অবগুণ্ঠিতা সুভগার দিকে দৃষ্টিপাত করে সহাস্যে দেবভূতি বললেন, আজ এ কি বেশ সুভগা? চন্দ্রমা কি রাহুকে দেখে সন্ত্রস্তা?

অবিচল দীপ শিখার মতো নিষ্কম্প রইলেন সুভগা।

কপট একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে দেবভূতি বললেন, প্রভাতে না জানি আজ কার মুখ দেখে উঠেছিলাম, অদৃষ্টে দেখতে পাচ্ছি আজ আমার অনেক দুঃখ আছে। তার পর সুভগার দিকে হাত বাড়িয়ে বললেন, দাও আমার প্রতিদিনের প্রাপ্য।

অবগুণ্ঠনবতী নীরবে বস্ত্রের অন্তরাল থেকে বের করে আনলেন সুবর্ণময় করঙ্ক।

দেবভূতি উচ্চারণ করলেন, অপরাধী জানিল না কিবা তার দোষ বিচার হইয়া গেল। বলি সুভগা, আমার প্রাপ্য অধিকার থেকে আমাকে বঞ্চিত কর কোন্ অপরাধে? সুভগার হাত থেকে তাম্বুলটি গ্রহণ করবার জন্য তিনি অধরোষ্ঠ ঈষৎ ফাঁক করলেন। চিত্রার্পিতার হাত করঙ্কটি দেবভূতির সম্মুখে স্থাপিত করে আবার বস্ত্রের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলো। নিরাশ হোয়ে দুঃখিত মনে দেবভূতি নিজেই করঙ্ক থেকে একটি তাম্বুল তুলে নিলেন। পরক্ষণেই দেবভূতি বিদীর্ণ কণ্ঠে চীৎকার করে উঠলেন—সুভগা!

আকুঞ্চিত শ্বাসনলী তাঁর অন্তিম আহ্বান অর্দ্ধপথে থামিয়ে দিল। দেবভূতির হলাহল-জর্জরিত প্রাণহীন দেহ সশব্দে মর্ম্মর মণ্ডিত কুট্টিমে পতিত হোলো। অদূরে দণ্ডায়মানা নারীমূর্ত্তি অবগুণ্ঠনের এক প্রান্তে তার দুই চোখ মার্জনা করলো।

সুভগা শয্যার ওপর উঠে বসলেন। অপরিচিত পরিবেশের দিকে বিস্মিতা হোয়ে তাকিয়ে নিজেকেই প্রশ্ন করলেন, আমি কোথায়?

মনে পড়লো সান্ধ্যস্নান সমাপনান্তে নিয়মিত সুশীতল মাধ্বীপূর্ণ পানপাত্রটি শেষ করার পরই অত্যন্ত অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছিলেন তিনি। নিজেকে আর কিছুতেই স্থির রাখতে পারছিলেন না। সারা রাজ্যের শ্রান্তি তাঁর দেহখানিকে পরম অবসাদে ঘিরে দিচ্ছিল।

তার পর আর কিছু স্মরণপথে আনতে পারলেন না তিনি। অস্থির হয়ে শয্যা থেকে নেমে দাঁড়ালেন। অদূরে প্রবেশমান পুরুষ-মূর্ত্তিটিকে দেখে ত্রস্তে তিনি অবগুণ্ঠন টেনে দিলেন।

পুরুষমূর্ত্তি কথা বলে উঠলো, কনিষ্ঠা রাজ্ঞী সমীপে অধীনের অসংখ্য অভিবাদন! আশা করি রাজমহিষী এখন সম্পূর্ণ সুস্থ হোয়েছেন।

যুগপৎ বিস্মিতা ও শঙ্কিতা হোয়ে সুভগা অস্পষ্ট স্বরে উচ্চারণ করলেন, কে আপনি? আমি কোথায় এসেছি?

আপনার সন্তানগৃহে জননি! ধরিত্রী মাতার মতো সসম্মানে চিরদিন সন্তানের গৃহে অন্নপূর্ণার মূর্ত্তিতে বিরাজ করুন। কোন অভাব বোধ, কোন ক্লেশ কোন দিন আপনাকে প্রপীড়িতা করতে পারবে না। শত শত সেবিকা সর্বক্ষণ আপনার সেবায় নিয়োজিতা থাকবে। আমি এখন বিদায় হই।

পুরুষমূর্ত্তি অপসৃত হোলো। তড়িৎ গতিতে সুভগা গৃহের দ্বার খুলে বাইরে বেরুবার জন্ত এগিয়ে এসে সভয়ে দেখলেন, বাহির হোতে অর্গল রুদ্ধ।

কৃষ্ণপক্ষের গাঢ় তমিস্রা রজনীতে এক ব্যক্তি অতি স্বল্প দ্যুতি-বিচ্ছুরিত দীপিকা হাতে নিয়ে সাবধানে পথ চলছিল। সতর্ক চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হোয়ে চার ধার একবার ঘুরে এলো—সন্দেহজনক কিছু দেখতে না পেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে আবার চলতে আরম্ভ করলো। চার ধারের গভীর নিস্তব্ধতার মাঝে দীপবাহী নিজের পদক্ষেপের অস্পষ্ট আওয়াজেই বার বার চমকে উঠছিল। এক সময় তার চলার শেষ হোলো। গভীর একটা নিঃশ্বাস ফেলে দীপবাহী দুই দণ্ড স্থির হোয়ে দাঁড়ালো, আর একবার সতর্ক দৃষ্টিতে চার ধার দেখে নিল। তারপর হাতের দীপ ভূমিতে রেখে নিজের কটিবস্ত্রের অভ্যন্তরে লুকানো কঠিন একটা বস্তু হাত দিয়ে অনুভব করলো! অনুর্ব্বর মৃত্তিকা-নির্ম্মিত একটি স্তূপের নীচে ধাপে ধাপে কাটা রয়েছে পাথরের সোপানাবলী। দীপবাহী সাবধানে একটির পর একটি সেই সোপান অতিক্রম করে চললো। সোপান যেখানে শেষ হোয়েছে তার লম্বালম্বি চলে গেছে সঙ্কীর্ণ একটি সরণি, সেই সরণি বেয়ে দীপবাহী আবার এগিয়ে চললো। বিশাল এক লৌহকপাটের সম্মুখে সে মূর্ত্তি দণ্ডায়মান হোলো। দু'জন প্রহরী সেখানে স্থির হোয়ে দাঁড়িয়েছিল, দীপবাহীকে দেখে সসম্ভ্রমে মাথা নীচু করলো। তাদের দিকে তর্জ্জনী হেলনে দীপবাহী কি এক সঙ্কেত জানালো, নিঃশব্দে প্রহরী দু'জন স্থান ত্যাগ করে বিপরীত পথে অদৃশ্য হোলো।

লৌহকপাট উন্মুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অভ্যন্তরে উপবিষ্ট এক ব্যক্তি সবেগে উঠে দাঁড়ালো। হাতের প্রদীপ বাইরে রেখে দীপবাহী ভিতরে প্রবেশ করলো। কক্ষের প্রজ্বলিত দীপালোকে দুই ব্যক্তি পরস্পরের মুখের দিকে দুই দণ্ড তাকিয়ে রইলো। একজন অবলোকন করলো জলবাহী পয়োদের মধ্যে গম্ভীর শ্যামল-সুন্দর মুখকান্তি অবরুদ্ধ আক্রোশে রোষিত, আত্মাবমাননায় দীর্ণ, আর একজন নিরীক্ষণ করলো এক অকাল বৃদ্ধের শীর্ণ তনু, সহস্র বলি-রেখাঙ্কিত আনন, গম্ভীর বিক্ষোভে বিক্ষুব্ধ, ধূমায়িত।

কিছুক্ষণ পর রোষ-গম্ভীরকণ্ঠে এক ব্যক্তি অপরকে প্রশ্ন করলো, এ সব প্রহসনের অর্থ কি?

দীপবাহীর সারা মুখ শাণিত হাস্যে ভরে গেল—বুঝলাম মহামহিম এ প্রহসনের ঠিক অর্থ ও তাৎপর্য্য অনুধাবন করতে পারেননি। যে প্রহসন একদা অপনি স্বয়ং সৃষ্টি করেছিলেন এ তারই নামান্তর মাত্র। প্রভেদ এই যে, সেদিন আপনার সৃষ্টি সে প্রহসনে করতালির অভাব হয়নি। আজ এ প্রহসনের স্রষ্টা ও দ্রষ্টা একমাত্র আমি। দুঃখ রইলো যে করতালি দেওয়ার জন্য কেউ উপস্থিত থাকবে না।

অপর ব্যক্তি বিস্মিত হোয়ে বললো, কে তুমি? তোমার এসব অসংলগ্ন কথার অর্থ কি?

দীপবাহী উত্তর দিল, বুঝলাম মহামহিম, আমাকে চিনতেও পারেন নি। অবশ্য এজন্য তাঁকে দোষও দেওয়া যায় না। কালের গতি অতি অকরুণ ভাবে তার পদচিহ্ন আমার সর্ব্বাঙ্গে রেখে গেছে।

অধৈর্য্য হোয়ে অপর ব্যক্তি বললো, থামো। বাতুলের প্রলাপ শুনবার'মতো মানসিক অবস্থা আমার নয়। শীঘ্র বল, কেন তোমরা আমাকে এমন ভাবে রুদ্ধ করে রেখেছ? আর এই অদ্ভুত·আচরণের অর্থ কি?

অপেক্ষা করুন, ধৈর্য্যহারা হবেন না। সম্ভবতঃ আর বেশীক্ষণ বাতুলের প্রলাপ শুনতে হবে না, শীঘ্রই যবনিকা পাত হবে। শুনুন প্রস্থিত ভৃগুকচ্ছরাজ—

সচমকে কপিলদেব প্রায় চীৎকার করে উঠলেন, কি? কি বলে তুমি আমাকে সম্বোধন করলে?

শান্ত কণ্ঠে দীপবাহী উত্তর দিল, যথোচিত সম্বোধনই করেছি। ভৃগুকচ্ছ বর্ত্তমানে মগধ-অধিকৃত।

আশ্বস্ত হোয়ে কপিলদেব বললেন, তুমি কে আমি জানি না। তোমার অসম্বদ্ধ ব্যবহার ও ততোধিক অসম্বদ্ধ কথা শুনে মনে হয় তুমি বায়ুরোগগ্রস্ত। তোমাকে জানিয়ে দিচ্ছি, মগধরাজ দেবভূতি আমার পরম আত্মীয়। আমার একমাত্র প্রিয়তমা সহোদরার স্বামী। তিনি কখনও সচেতনায় আমার প্রতি এরূপ অন্যায়াচরণ করতে পারেন না। তোমাদের অক্ষক্রীড়ার চালে নিশ্চয়ই কোথাও মারাত্মক ভুল হোয়ে গেছে। শোন, যদি ঐ জীর্ণ অস্থিপঞ্জর ক'খানার মায়া ত্যাগ না করতে চাও তবে শীঘ্র আমাকে মুক্ত করে দাও। অন্যথায় দেবভূতির সম্মুখে তোমাকে উপস্থিত করিয়ে তোমার প্রাণান্তের দণ্ড ঘটাবার ব্যবস্থা করবো আমি।

হেসে উঠলো দীপবাহী, মগধরাজ দেবভূতি সমীপে উপস্থিত হোতে আশা করি আমার আরও কয়েক বৎসর বিলম্ব আছে। আর অযথা কালক্ষেপ করে কোন লাভ নেই। আমার বক্তব্য শ্রবণ করুন। মহারাজা যে অক্ষক্রীড়ার চালের কথা এই মাত্র ব্যক্ত করলেন সে চালের ভ্রম আমার হয়নি, অতি সুষ্ঠু ভাবেই তা চেলেছি। পক্ষান্তরে সে ভ্রম হয়েছিল আপনার। আমি ছিলাম তখন আপনার হাতের ক্রীড়ণক, প্রবলের কুক্ষিগত, আজ দেখুন দুর্ব্বলের অস্থিপঞ্জরও কত শক্তি ধরতে পারে!

উত্তরোত্তর বিস্ময়ে এতক্ষণ কপিল দেব তার কথা শুনছিলেন এবার প্রশ্ন করলেন, তোমার কথা শুনে মনে হোচ্ছে আমি তোমা

নিতান্ত অপরিচিত নই, কিন্তু আমি তোমাকে চিনি না। কে তুমি?

হ্যাঁ, এইবার তার সময় এসেছে। আমার পরিচয় গ্রহণ কর কপিলদেব! দীপবাহী ভূমিস্থিত দীপ তুলে নিয়ে উত্তরীয়ের কিয়দংশ সরিয়ে নিজের দক্ষিণ পঞ্জর অনাবৃত করে দীপশিখা অত্যুজ্জ্বল করে দিল। কপিলদেব বিস্ফারিত দৃষ্টিতে দুই দণ্ড সেদিকে চেয়ে রইলেন; তাঁর প্রশ্নের উত্তর যেন অতি নিকটেই আছে অথচ তিনি তা খুঁজে পাচ্ছেন না। আর একবার তিনি দীপবাহীর দক্ষিণ পঞ্জরের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন, পরক্ষণে তাঁর উচ্চ কণ্ঠস্বর কারাগৃহের নিরবলম্ব কঠিন শূন্যতার মধ্যে সজোরে প্রতিধ্বনিত হোয়ে রণ রণ করে উঠলো—বাসুদেব?

সংযত হাতে বাসুদেব উত্তরীয়ে নিজের বক্ষ পুনরায় আবৃত করলেন। পরে শান্ত স্বরে বললেন, হ্যাঁ, কপিলদেবের নর্মসহচর।

কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন কপিলদেব। পরে বললেন, বহু দিন পূর্ব্বেই সেই ঘটনা আমি প্রায় বিস্মৃতই হোয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু তুমি তা ভোলোনি দেখছি!

ভুলবো আমি? বাসুদেবের নাসারন্ধ্র স্ফীত হোলো। তুমি কি বুঝবে ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণের কাছে ব্রাহ্মণ্যদেবের অপমান কি ভয়ঙ্কর? প্রতিটি মুহূর্ত্ত এত দিন আমি প্রার্থনা করে এসেছি তোমার সত্যকে রক্ষা করতে যদি আমার সর্ব্বস্ব যায় যাক, কিন্তু আমার কাছে তোমার সত্যের অসম্মান না ঘটে।

কপিলদেব বললেন, কিশোর-সুলভ চপলতায় তোমার প্রতি ঐ অন্যায়টা করে ফেলেছিলাম, কিন্তু তারই প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তোমার এ সমস্ত আয়োজন।

শুধু এই একটি কারণই নয়, বহুবিধ কারণ মিলে আমার এই বিরাট আয়োজন। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে উত্তর-ভারতের মুকুটধারীরা রাজ্য পরিচালনার নামে যে যথেচ্ছচারিতা চালিয়ে এসেছিলেন, আমি তারই সামান্য অদল-বদল করে নিলাম মাত্র। অক্ষমের নিকট রাজ্য পরিচালনার ভার আর লম্পটের কাছে শৌণ্ডিকালয় উন্মুক্ত করে দেওয়া একই কথা। উভয়ই নীতিচ্যুত, সমাজ ও ততোধিক জন-অহিতকর। তাই তাদের সরিয়ে উপযুক্ত ব্যক্তিকে সে স্থানে আমি উপবিষ্ট করাবো। আর সেই যোগ্য ব্যক্তি এই মুহূর্ত্তে তোমার চোখের সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে। কপিলদেব, রজনী বিগতপ্রায়। আমার বক্তব্যে পূর্ণচ্ছেদ টানবার সময়ও আসন্ন। একটি উৎসব-মুখরিত সন্ধ্যার কথা স্মরণ কর কপিলদেব! তোমার সেই ঐশ্বর্য্যমদোদ্ধত আড়ম্বরে উপস্থিত থাকতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছিলাম, জোর করে টেনে নিয়ে এলে। মদ্যপানে পরাঙ্মুখ এই ব্রাহ্মণকে তুমি উপহাস করলে বললে: নিস্তেজ ব্রাহ্মণের সততা তাদের ভীরু হৃদয়ের দৌর্ব্বল্য ছাড়া আর কিছু নয়। তাদের অপৌরুষ আচরণকে তাই তারা সর্ব্বদা সাধুতার কৃত্রিম মুখাবরণ দিয়ে ঢেকে রাখতে চায়। কিন্তু বীর ক্ষত্রিয় জানে, কেমন করে তাদের খরধার অসি দিয়ে সেই ভণ্ড মুখাবরণকে টেনে নামিয়ে তার সত্যকার রূপ প্রকাশ করে দেওয়া যায়। ক্ষুণ্ণ ব্রাহ্মণ-সন্তান বলেছিল: অন্তর্য্যামী নিরীক্ষণ করছেন ক্ষত্রিয়ের হৃদয়ের দীনতা নির্লজ্জ কৃপণতা। ক্ষত্রিয়ের অপমান

ব্রাহ্মণ্যদেবকে স্পর্শও করতে পারে না, বরঞ্চ তার হীন হৃদয়ের ঔদ্ধত্যটাই স্পষ্ট হোয়ে ফুটে ওঠে। সুরাপানে উন্মত্ত, হিতাহিত জ্ঞানশূন্য কপিলদেব ক্ষিপ্তের মতো ছুটে এসে নিজের পাদুকা খুলে সেই ব্রাহ্মণের দক্ষিণ পঞ্জরে প্রবল আঘাত করলো। কিশোর ব্রাহ্মণের শীর্ণ অস্থিপঞ্জর ভেদ করে কাষ্ঠপাদুকা অর্দ্ধ প্রোথিত হোয়ে গেল, তোমার পারিষদবৃন্দ সরবে হেসে উঠলো, তুমিও উপহাস করলে বললে, কোথায় রইলো তোমার ব্রাহ্মণ্যদেব? এখন তোমাকে রক্ষা করতে এগিয়ে এলো'না? তোমার উপহৃত পাদুকা টেনে ফেলে দিয়ে সে রাত্রেই আমি ভৃগুকচ্ছ ত্যাগ করলাম। অসহ্য যন্ত্রণায় সারা দেহ বিকল হোয়ে ভেঙ্গে পড়তে চাইছিল, কিন্তু কপিলদেব, সে আঘাত তুমি আমায় করোনি, করেছিলে সমগ্র ব্রাহ্মণের জীবাত্মাকে। সে অন্তর্দাহের কাছে বাইরের এ আঘাত অতি তুচ্ছ। নিজেকে গঞ্জনা দিয়ে বলেছিলাম ব্রাহ্মণের অহম্‌কে যদি পুনঃ স্থাপিত না করতে পারি তবে ব্রাহ্মণের উপবীত ত্যাগ করবো। আজ তার সময় হোয়েছে, 'ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং' যিনি—তাঁর বজ্রমূর্ত্তি আজ প্রত্যক্ষ করো।

এতক্ষণ পর কপিলদেব বললেন, বুঝলাম প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি চরিতার্থ করতে তুমি বদ্ধপরিকর। যে ঘটনাকে আমি অতি অকিঞ্চিৎকর বলে বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে দিয়েছিলাম অযথা তুমি তাকে পুনর্বার ফেনায়িত করে তুলছো! ভালো, কি শাস্তি আমাকে তুমি দিতে চাও—মৃত্যু?

সহাস্যে বাসুদেব উত্তর দিলেন, শত্রু হোলেও তুমি আমার বাল্যসঙ্গী, তাই সে শাস্তি আমি তোমাকে কখনও দিতে পারি না। তোমার দত্ত উপহার তোমাকেই আবার ফিরিয়ে দিয়ে তোমাকে মুক্ত করে দোব।

বাসুদেব নিজের কটিবন্ধের অভ্যন্তর থেকে কঠিন কোন বস্তু বের করে কপিলদেবের চোখের সম্মুখে ধরলেন।

দুরন্ত ক্রোধে কপিলদেবের সারা দেহ থর-থর করে কেঁপে উঠলো। মেঘমন্দ্রিত সুরে বললেন, শোন ব্রাহ্মণ! ক্ষত্রিয় শুধু অসি চালনা করতেই শেখেনি, কি করে মরতে হয় তা সে জানে। যদি বুঝে থাকো তোমার শূন্য আস্ফালনে, তোমার ভীতি প্রদর্শনে ভীত হোয়ে গললগ্নীকৃতবাসে তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবো, তাহোলে বুঝবো ক্ষাত্রবীর্য্যকে তুমি চেনোনি। তার ঐশ্বর্য্যের যেমন শেষ নেই, শক্তিরও তেমন অন্ত নেই।

ব্যঙ্গের হাসি হেসে উঠলেন বাসুদেব। তোমার গর্ব্বের ঔদ্ধত্যে মহাকালকে তুমি বিদ্রূপ করে এসেছো, আজ দেখা যাক কোথায় থাকে তোমার সেই অহমিকা।

কপিলদেবের শৃঙ্খলাবদ্ধ দুই হাত পরস্পরকে নির্মম ভাবে পেষণ করে চললো, মনে হোলো দেহের সমস্ত শোণিত-স্রোত উত্তাল হোয়ে দেহাভ্যন্তর থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে।

অত্যন্ত শান্ত পদক্ষেপে বাসুদেব কপিলদেবের নিকটে এগিয়ে এলেন, তারপর তাঁর শীর্ণ দেহের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করে তাঁর দারুময় উপানৎ-এর এক পাটি কপিলদেবের দক্ষিণ পঞ্জর লক্ষ্য করে সজোরে নিক্ষেপ করলেন। রুধিরধারা বেগে বেরিয়ে এলো। সেই দিকে চেয়ে উচ্চ হেসে উঠলেন বাসুদেব, মনে রেখো ক্ষত্রিয়! ক্ষমতারও ক্ষয় আছে, ঐশ্বর্য্যেরও অবসান আছে।

অর্দ্ধ দণ্ড পরে কারারক্ষীদের ডেকে তিনি আদেশ দিলেন, এই অর্দ্ধমূর্চ্ছিত দেহটাকে বহন করে ত্রিযাম শেষ হওয়ার আগে তোমরা উত্তর ভারতের সীমানার বাইরে রেখে আসবে। সাবধান! এর ব্যত্যয় যেন কিছুতেই না হয়। তিনি কারাকক্ষ ত্যাগ করলেন।

গভীর নিশীথে শোকাকুলা এক রমণী বাসুদেবের প্রকোষ্ঠে উদভ্রান্তার মতো প্রবেশ করলো। উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনে আকুল হয়ে উঠলো সে নারী। এ তুমি কি করলে বাসুদেব? এ তো আমি চাইনি!

স্তব্ধ পাষাণমূর্ত্তির মতো অবিচল ভাবে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ ক্রন্দনপরায়ণা নারীর দিকে নীরবে তাকিয়ে রইলেন বাসুদেব। পরে শান্তস্বরে বললেন, শান্ত হোন মধ্যমা রাজ্ঞী! ঈশ্বর প্রেরিত সব ঘটনা মঙ্গলের জন্য। আমরা শুধু নিমিত্ত মাত্র

স্তোকবাক্যে ভোলাবার চেষ্টা আমাকে করো না বাসুদেব! পরক্ষণে আবার আকুল ক্রন্দনে ভেঙ্গে পড়লেন নিরঞ্জনা, এত বড় অধর্ম করতে তুমি একবারও পশ্চাৎপদ হোলে না? এতদিন শুধু ভুল বুঝিয়ে এসেছো আমাকে, আমার অহমিকাকে খর্ব করে পথের ধূলোয় নামিয়ে দিলে?

বাসুদেব উত্তর দিলেন, দশের মঙ্গলের জন্য আপনার নিজস্ব যা ক্ষতি হোলো তা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। মধ্যমা রাজ্ঞী! বৃথা তিরস্কারে এই হতভাগ্যকে আর ক্লেশ দেবেন না। যে ক্ষতি আপনার হোয়েছে স্বয়ং ঈশ্বর ছাড়া তার ক্ষতিপূরণ আর কেউ করতে পারবে না। সমগ্র উত্তর-ভারতের মঙ্গলের জন্যই আমার এই উদ্যোগ। আমাকে ভুল বুঝবেন না মধ্যমা রাজ্ঞী! উত্তর-ভারতের সমুদয় রাণীদের যথোচিত আসন চিরদিন সসম্মানে অটুট থাকবে। মগধের একটি ধূলিকণারও সাধ্য নেই যে আপনাদের যোগ্যস্থান থেকে বিচ্যুত করে। আমি চিরদিন আপনাদের আজ্ঞাবহ হোয়ে রাজ্য পরিচালনা করে যাবো।

মুখের ওপর লুটিয়ে পড়া বিস্রস্ত কেশপাশ দুই হাতে সরিয়ে দিতে দিতে নিরঞ্জনা উঠে দাঁড়ালেন—নিজের বিবেক-দংশনকে চাপা দেওয়ার জন্য বহু সারগর্ভ যুক্তির অবতারণা তুমি করছো বাসুদেব! কিন্তু যদি মনে করে থাকো তোমার সে যুক্তি আমাকে বিন্দুমাত্র প্রবোধ দান করতে পারবে, তা হোলে তুমি অত্যন্ত ভুল করেছো। বাসুদেব! এতদিন শুধু তুমি আমাকে মগধের মধ্যমা রাজ্ঞী বলেই জেনে এসেছো, কপিলদেবের ভগিনী বলে কখনও জানোনি।

নিরঞ্জনার দক্ষিণ হাতের মুঠি দৃঢ়বদ্ধ হোলো, হস্তধৃত ছুরিকার মুঠ ম্লান দীপের আলোয় একবার ঝলসিত হোয়ে উঠলো। বাসুদেব ঈষৎ হেসে দুই পদ সরে দাঁড়ালেন। মুহূর্ত্তের মধ্যে নিরঞ্জনার হস্ত নিক্ষিপ্ত ছুরিকা প্রাচীরের কিয়দংশ চূর্ণ করে সজোরে সেখানে প্রোথিত হোলো। সেদিকে তাকিয়ে শান্তকণ্ঠে বাসুদেব বললেন, রাজনীতির কূট চালে আপনি আমার কাছে শিশুমাত্র মধ্যমা রাজ্ঞী!

পরক্ষণে যে দেহ অসহায়ের মতো মাটিতে লুটিয়ে পড়লো তা বাসুদেবের নয়, নিরঞ্জনার।

কাশির মূলকারণ দূর করুন
OF IMITATION
SIROLIN
'ROCHE'
for COUGHS COLDS and all irritable and inflamed conditions of the Chest and Respiratory Tract
VOLTA
সিরোলিন খান
নিরাপদ পারিবারিক ওষুধ
সিরোলিন কেবল যে কাশি 'থামিয়ে দেয়' তা নয়— কাশির মূলকারণ দুষ্ট-জীবাণুগুলিকেও ধ্বংস করে।
একমাত্র ডিষ্ট্রিবিউটার্স:—
ভলটাস লিমিটেড

মিতা সেন

প্রত্যহ বিকেলে তারা তিন রকমের খোঁপা বাঁধে। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তিন রকমের সাড়ী। তবু তারা তিন বন্ধু। পাশাপাশি কোয়ার্টারে থাকে তারা। 'বি', 'সি', আর 'ডি' কোয়ার্টারে।

'বি' কোয়ার্টারে থাকে হীরা। গায়ের রঙ শ্যাম। ক্ষীণাঙ্গী, তন্বী। হারমোনিয়াম বাজিয়ে হাল্কা সুরের গান গাইতে পারে সে। আর ভাবে, একদিন সে রেডিওতে গান গাইবে। নামজাদা কোন এক গায়িকার কণ্ঠের মত তার কণ্ঠ।

'সি' কোয়ার্টারে থাকে বন্ধা। গায়ের রঙ ফর্সা, বাদামী। বেশ স্বাস্থ্য, মুখটা গোল। সে দেখতে সুন্দরী। তাই রোজ অনেক বার করে আয়নায় মুখ দেখে, মুখের এ কোণে ও কোণে পাউডারের পাফ বুলোয়, চুলগুলিকে ফাঁপিয়ে ষ্টাইল করে। তার পর বার বার আয়নায় নিজেকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে স্নো-হোয়াইটের বিমাতার মতো তার মনে হয় সে পৃথিবীর সুন্দরীদের অন্যতমা।

'ডি' কোয়ার্টারে থাকে কবিতা। চেহারা যদিও সুশ্রী, কিন্তু তার স্বাস্থ্য নেই। গালের অনেকটা ভেতরে বসা, চোখের কোণে কাজলমায়া যেন একটু বেশী। সারাদিন সে জানালার ধারে বই নিয়ে পড়ে। হাল্কা উপন্যাস, সিনেমার মাসিক পত্রিকা, পড়তে পড়তে আবার কখনও উদাস দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে নীল আকাশের দিকে। যেখানে শঙ্খচিল পাক খেয়ে বেড়ায়, পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ জমা হয়ে থাকে। আবার কখনও তারা তিন জনে একত্র হয়ে বসে, তিন জনে বলে তিন রকমের কথা।

হীরা বলে: জানিস ভাই, আজ কলেজে যাচ্ছি, হঠাৎ শুনতে পেলাম পেছনে কতকগুলি ছেলে বলাবলি করছে, আমার গলা না কি ঠিক সন্ধ্যা মুখার্জীর মতো। এবারের ওদের ফাংসনে আমাকে দিয়েই আরম্ভ করবে।

বন্ধা আর কবিতা শোনে ওর কথা।

তার পর বন্ধা বলে: আমারও ভাই ও-রকম হয়। সেদিন হেঁটে হেঁটে ফিরছি, হঠাৎ শুনি পেছনে তিনটে ছেলে বলাবলি করছে, আমার চেহারাটা নাকি ঠিক সুচিত্রা সেনের মতো। আমি তো ভাই অবাক্।

কবিতা এক সময় চোখ নামিয়ে বলে: ফাল্গুনীর 'সন্ধ্যারাগ' পড়েছিস তোরা? ও, তোরা কেমন করেই বা পড়বি! দেখিস মাধুরীর ক্যারেক্টার কি কন্‌ফ্লিক্টিং—

তবু তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ নেই।

রোজ বিকেলে হারমোনিয়াম বাজে, আয়নায় বাদামী মুখের ছায়া দোলে, বই-পড়া ক্লান্ত চোখ আকাশের দিকে চেয়ে কি যেন খুঁজে বেড়ায়। তার পর এক সময় তারা একত্র হয়, যে যার কথা বলে সন্ধ্যে অবধি, তার পর ঘরে চলে যায়।

'সি' কোয়ার্টারের মুখোমুখি কোয়ার্টারে নতুন লোক এলো। তার সঙ্গে এলো একটি নাদুস-নুদুস মেয়ে, লম্বায় ওদের চেয়ে একটু ছোটই হবে বোধ হয়। তিন জনেই দেখলো ওকে। দেখে, তিন জনেরই মুখের কোণে এক টুকরো হাসি ফুটে উঠলো। তিন জনেই বেরিয়ে পড়লো। মাঝপথেই দেখা হল ওদের।

হীরা বললো: দেখেছিস ভাই, মেয়েটার গলা কি মোটা আর খরখরে। ঠিক পুরোনো কাটা রেকর্ডের মত।

বন্ধা বলে: বাব্বাঃ, চেহারাটা যেন একটা ফুটবল। মুখটা যেন একটা বাতাবী নেবু।

শেষে কবিতা বললো: কি একটা বইয়ে এমন একটা ক্যারেক্টার পড়েছি। খুব হিউমারাস্—

তবু তিন জনের সাথে ওর ভাব হয়ে গেল। মেয়েটি নিজেই এসে ওদের সঙ্গে ভাব করলো।

হীরাকে গিয়ে বললো: তুমি চমৎকার গান গাইতে পারো হীরাদি'! খুব মিষ্টি গলা।

হীরা মেয়েটিকে টেনে নিয়ে যায় ঘরে। বলে: যাঃ, বাজে বলছ।

মেয়েটি বলে: সত্যি, আমি যে শুনেছি কাল।

হীরা অমনি হারমোনিয়াম বের করে। তার পর গান করে। মেয়েটি ধৈর্য্যের সঙ্গে সবটা শোনে। তার পর একটা প্রশংসার ফুল ছড়িয়ে চলে যায়।

বন্ধাকে গিয়ে বলে: তুমি খুব সুন্দর বন্ধাদি'!

বন্ধার ঠোঁটের কোণে হাসি খেলে যায়। বলে: তাই নাকি?

মেয়েটি বলে: বাঃ রে, আমার যেন চোখ নেই?

বন্ধা একটু ভাবে। তারপর ওর হাত ধরে টেনে নিয়ে যায় ঘরে, বড় আয়নাটার সামনে। বলে: বলতো কার মতো দেখতে?

মেয়েটি আন্দাজে বলে: সুচিত্রা সেনের মতো।

কবিতার সঙ্গে দেখা হলে মেয়েটি বলে: সত্যি কবিতাদি', আশ্চর্য্য আপনার পড়ার ক্ষমতা। খুব কম মেয়েই আছে, যারা এত পড়তে পারে।

কবিতা চোখ তোলে। বলে: তাই নাকি?

মেয়েটি বলে, সত্যি ভাই।

মেয়েটির নাম ময়না।

ওদের কোয়ার্টারের পাশে আরেক ঘর লোক এলো। এলো একটি সুদর্শন যুবক। চুলগুলি তার ঢেউখেলানো। সুন্দর সুঠাম শরীর। চোখ দুটো বিস্তৃত।

ওরা তিন জনেই দেখলো ওকে, অনেকক্ষণ ধরে। তারপর তিন জনাই বেরিয়ে পরলো। মাঝপথেই দেখা হলো ওদের।

হীরা বললো: ঠিক অনেকটা নামজাদা শিল্পীর মতো দেখতে। কি মিষ্টি গলা ভাই!

বন্যা বললো: চেহারাটা দেখতে ঠিক উত্তমকুমারের মত। সিনেমায় নামলে দু'দিনেই বিখ্যাত হয়ে যাবে।

শেষে কবিতা বললো: এর সঙ্গে মিলে যাচ্ছে শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্তের চেহারা অথবা পথের দাবীর অপূর্ব্বর চেহারার বর্ণনা।

ময়না এসে বললো: ওর নাম অমল।

হঠাৎ ওদের দিনগুলি যেন বদলে গেল। দুপুর গড়িয়ে বিকেলের ছায়া দুলতে না দুলতেই 'বি' কোয়ার্টারে হারমোনিয়াম বেজে ওঠে: ওগো মোর গীতিময়, মনে নাই—সে কি মনে নাই—

সি কোয়র্টারে, আয়নার সামনে অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রসাধন করে বন্যা। মুখে পাউডারের প্রলেপ, চোখের কোণে নীল কাজল আর ঠোঁটে আপেলের রঙ। সব শেষ করে সে এসে দাঁড়ায় বারান্দায়। থামে হেলান দিয়ে। সামনের দিকে অপূর্ব ভ্রূভঙ্গি করে।

আর 'ডি' কোয়ার্টারের বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে বই পড়ে চলে কবিতা। দু'-একটা উড়ু উড়ু চুল ছড়িয়ে পড়ে তার মুখে। পড়তে পড়তে এক সময় তার উদাস চোখ আকাশে কি যেন খুঁজে বেড়ায়।

ময়না এসে বলে হীরাকে: অমলদা' বলছিল, তুমি নাকি চমৎকার গান গাইতে পারো। খুব মিষ্টি গান।

হীরা চমকে ওঠে। বুক দুরু-দুরু করে। বলে: নাঃ, ও বলতেই পারে না।

ময়না বলে: সত্যি বলছি, বিশ্বাস করো।

তারপর বন্যার আয়নার কাছে গিয়ে বলে: বন্যাদি', অমলদা বলছিল তুমি খুব সুন্দর দেখতে। ঠিক যেন—

বন্যা হঠাৎ কেঁপে ওঠে। বলে: যাঃ, ও বলতেই পারে না।

ময়না বলে: বিশ্বাস করো, এই গা ছুঁয়ে বলছি।

কবিতার সামনে এসে ময়না বলে: অমলদা' বলছিল, এমন পড়ুয়া মেয়ে সে কখনও দেখেনি। আরও এ মেয়েদের ওর খুব—

কবিতার হাত থেকে বইটা মাটিতে পড়ে যায়।

সেদিন হীরা ময়নাকে চুপি চুপি ডেকে নিয়ে এলো। বললো, একটা কাজ করে দেবে ভাই?

ময়না বললো: নিশ্চয়ই করবো।

হীরা বললো: অমলদা'কে বলো, হীরাদি' দুটো নতুন গান চেয়েছে।

ময়না ঘাড় নাড়লো।

বন্যাও ডেকে নিয়ে এলো ময়নাকে। বললো: অমলদা'কে গিয়ে বলো, বন্যাদি' সিনেমার বই চেয়েছে।

ময়না বললো : বলবো।

কবিতার সঙ্গে দেখা হতেই কবিতা ময়নার হাতে এক টুকরো কাগজ দিলো। বললো, অমলকে বলো, এ বই দুটো যদি আমাকে পড়তে দিতে পারে, তবে আমি খুব খুশী হবো।

ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালো ময়না।

সেদিন বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে বন্তা। থামে হেলান দিয়ে। হীরা এসে বললো : কি রে, আজ-কাল যে তোর মেক্-আপ ছাড়া দিন চলে না দেখছি !

একটি কথায় বন্তা হঠাৎ রেগে গেল। বললো : চেহারা আছে তাই নিই। আর আজ-কাল যে তোর দু'-বেলা প্রেমের সঙ্গীত চলেছে কি জন্তে, বুঝতে পারি না ?

দুজনে কতক্ষণ কথা-কাটাকাটি করলো। তারপর চলে গেল যে যার ঘরে।

বন্তা এসে বললো কবিতাকে। বাব্বাঃ, অত পড়লে যে অনেক উঁচুতে উঠে যাবি। আর যে তোর নাগাল্ পাওয়া যাবে না।

কবিতা এর তীক্ষ্ণ জবাব দিলো : পড়ি, নিজের ঘরে বসে। তবু ভাল যে সেজেগুজে ময়ূরপুচ্ছ ধারণ করে কারো হৃদয় জয় করতে যাই না বা কোকিলকণ্ঠী হয়ে কারো হৃদয়ে জোয়ার টানতে চাই না।

হীরা শুনতে পেল শেষটুকু। তারপর নিঃশব্দে ফিরে গেল নিজের ঘরে।

তবু কেউ কারো কর্তব্য ছাড়লো না। তেমনি করে রোজ হারমোনিয়াম বাজতে লাগলো। আয়নায় ফুটতে লাগলো গোল মুখের ছায়া। আর উদাস বই পড়া ক্লান্ত চোখ তেমনি আকাশে কি যেন খুঁজে ফিরতে লাগলো।

সেদিন ময়না হীরার কাছে এলো। বললো : হীরাদি,' চলে যাচ্ছি।

হীরা অবাক হলো। বললো : কোথায় ?

ময়না বললো : আসানসোলে। বাবা বদলী হয়েছেন।

হীরা কিছুক্ষণ ভাবলো যেন। তারপর হঠাৎ ময়নার হাত দুটো ধরে ব্যাকুল স্বরে বললো : যাবার আগে একটা কাজ করে দেবে ভাই ? বলো ?

ময়না ঘাড় নাড়লো। হীরা ওর হাতে একটা চিঠি দিলো। বললো : অমলকে দিও। বলো, হীরাদি' দিয়েছে। দেখো ভাই, কেউ যেন টের না পায়। ময়না আবার ঘাড় নাড়লো।

বন্তা প্রসাধন করছিল। ময়না এসে দাঁড়ালো পেছনে। আস্তে বলল, বন্তাদি,' আমরা চলে যাচ্ছি।

বন্তা অবাক হয়ে মুখ ফেরালো। ময়না সব খুলে বললো। বন্তাও কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ময়নার দু'হাত ধরে বললো: আমার একটা কাজ করে দেবে ভাই ?

ময়না বললো : বলো, নিশ্চয় করব।

বন্তা তার হাতে একটা চিঠি দিলো। বললো : অমলকে বলো, বন্তাদি' দিয়েছে। কিন্তু দেখো ভাই খুব গোপনে, জানাজানি না হয়।

সে চিঠি নিয়ে ময়না এলো কবিতার ঘরে। শেষ দেখা করতে। খুলে বললো সব কথা। শুনে কবিতা ভাবলো কতক্ষণ। তারপর ঠিক তেমনি ভাবে ময়নার হাতে দিলো একটা চিঠি। বললো, অমলকে আমার নাম করে দিও। দেখো ভাই, কাক-পক্ষীতেও যেন টের না পায়। ময়না ঘাড় নাড়লো, তারপর চলে গেল।

দিন কাটে। আশায়, উত্তেজনায় ওদের হৃদয়ের স্পন্দন দ্রুততর হয়ে ওঠে। চিঠি আসবে, নিশ্চয় চিঠি আসবে। হঠাৎ একদিন তিনটে চিঠি এলো। তিন জনের নামে। ব্যগ্র হাতে, থর-থর কাঁপা হাতে তিন জনেই খুললো সেই চিঠি। দেখলো, হলুদ-কাগজে ছাপা চিঠি, সঙ্গে এক টুকরো চিরকুট। ময়না লিখেছে: আসছে পঁচিশে আমার বিয়ে। অমলের সাথে। জানি তোমরা আসতে পারবে না, তবু তোমাদের শুভেচ্ছা চাইছি। আর তোমাদের সেই চিঠিগুলি আমি যত্ন করেই রেখে দিয়েছি।

পড়তে পড়তে চোখ ঝাপসা হয়ে এলো। কি রকম একটা চাপা ব্যথা ছড়িয়ে পড়লো সারা বুকে। তারপর বিচ্ছেদের কথা ভুলে ওরা ছুটে গেল তিন জনের উদ্দেশে। মাঝ-পথেই দেখা হল ওদের। তিন জনের হাতেই খোলা চিঠি। তিন জনে তিন জনের দিকে তাকিয়ে রইলো কতক্ষণ। তারপর ছুটে চলে গেল তাদের ঘরে। লুটিয়ে পড়লো বিছানায়।

আজও বিকেল হলে 'বি' কোয়ার্টারে হীরার হারমোনিয়াম বেজে ওঠে। হলুদ বিকেলের করুণ বিষণ্ণতাকে মুখর করে তোলে ওর গান। হীরা ভাবে, আবার হয়ত কেউ আসবে। সুন্দর সুঠাম দেহ। মিষ্টি গলা যার, নামকরা শিল্পীর মতো।

বন্তার ঘরেও আয়নায় প্রতিবিম্ব দোলে। বারান্দার থামে হেলান দিয়ে অপূর্ব ভ্রূভঙ্গি করে বন্তা ভাবে। আবার কেউ হয়ত আসবে। সুন্দর সুঠাম দেহ, কোঁকড়া চুল যার, নামকরা অভিনেতার মতো যার চেহারা।

আর পড়তে পড়তে উদাস ক্লান্ত চোখে আকাশের দিকে তাকিয়ে কবিতা ভাবে। আবার হয়ত কেউ আসবে। সুন্দর সুঠাম দেহ যার। কোন উপন্যাসের নায়কের চেহারার মতো চেহারা যার।

আবার হয়ত কেউ আসবে।

সমষ্টির জীবনে ব্যষ্টির জীবন। সমষ্টির সুখে ব্যষ্টির সুখ। সমষ্টি ছাড়িয়া ব্যষ্টির অস্তিত্বই অসম্ভব। এই অনন্ত সত্য জগতের মূল ভিত্তি।

—স্বামী বিবেকানন্দ

প্রায়ান্ধকার সেজের আলোয় পাথর-কাকুর গল্প শুনছিলাম। মনে আছে, আমরা বসে ছিলাম যেন পাথর। সত্য মিথ্যার জ্ঞান তখন হয়নি, গল্প যাচাই করে দেখবার বয়েস তখন নয়। তাই সবটাই বিশ্বাস করেছি, শুধু বিশ্বাস নয়, আমাদের স্বপ্ন-খাঁজা মনগুলি তাঁর কথায় দুলে উঠছিল। অতীতের হারিয়ে-যাওয়া কাহিনী চোখের সামনে ঘটে-ওঠা ঘটনার মত দেখছিলাম যেন।

পাথর-কাকু বলতে লাগলেন: তোমাদের মত আমার তরুণ বয়সের কথা বলছি এখন। জ্যাঠার কাছে গল্প শুনেছিলাম এক রাজার। কোন দেশের, কি নাম—তার কি দরকার? রাজা মানেই রাজা, যার রাজ্যপাট থাকতেও টাকার লোভ থাকে। টাকা মানেই সোনা। প্রচুর স্বর্ণ থাকতেও সেই রাজা আরও সোনা পাবার জন্তে ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। পার্ষদবর্গ থেকে আরম্ভ করে মন্ত্রী উপদেষ্টারা কেউই কোন সাহায্য করতে পারলো না। শেষে একজন বললে, মহারাজ, পুরোনো পুঁথি-পত্তর খোঁজ করুন, হয়তো মিলে যেতেও পারে কোনও হদিস।

রাজ্যের পুরনো পুঁথি আর কেতাবের স্তূপ জমে গেল। সে সব অস্পষ্ট লেখা উদ্ধার করা এক মহা ব্যাপার! যত পণ্ডিত লেগে পড়লো মোটা মোটা চশমা আর মোটা মোটা অভিধান নিয়ে। অক্ষর দেখা যায় তো মেলে না অভিধানে। ভাষাই যে আলাদা। অতি কষ্টে একজন মহাপণ্ডিত রায় দিলেন, কীটদষ্ট একখানা পাতার মধ্যে নাকি মহামূল্য তথ্যটি লুকিয়ে আছে।

রাজা খুশি, রাজ্যের সবাই খুশি। কিন্তু দুঃসাহসী অর্বাচীন কীট আসল জায়গাটি যে খেয়ে রেখেছে! সেই জায়গায় ছিল এমন একটি ফরমুলা যা দিয়ে সোনা তৈরীর একমাত্র পদ্ধতিটি সম্ভব হবে।

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

শ্রীশৈল চক্রবর্ত্তী

বহু গবেষণার পর পাওয়া গেল এক দুষ্প্রাপ্য ফরমুলার নাম। যথা লিখিত প্রক্রিয়ায় সমস্ত মশলা মিশিয়ে তৈরী হলো ওষুধ। ওষুধটি খেতে হবে স্বয়ং রাজাকে।

সাড়ম্বরে মহারাজ ঢেলে দিলেন গলায় ঐ ধূমায়মান পাঁচনটি। কিছুক্ষণ ধরে রাজা পড়ে রইলেন মুমূর্ষুর মত। তার পর ধীরে ধীরে কথা বললেন, হাসলেনও। মনে পড়লো, ঔষধের অব্যর্থ শক্তি দেখার সময় হয়েছে। কাছে ছিল একটা ধূপাধার, পিতলের তৈরী। কম্পমান হাত দিয়ে রাজা ধরলেন সেটি। আশ্চর্য কাণ্ড, ধূপাধারটি ঝকমক্ ক'রে উঠলো! সোনার হয়ে গেছে সেটা। অট্টহাস্যে ফেটে পড়েন রাজা। হাতের কাছে কয়েকটা জিনিষ এক নিশ্বাসে সোনা ক'রে রাজা হাঁফিয়ে পড়লেন। আনন্দের আতিশয্যে ভোজ্যদ্রব্যের আদেশ দিয়ে তিনি ভাবছেন, পৃথিবীর অতুল স্বর্ণের অধিকারী হ'তে তাঁর কতক্ষণ লাগবে আর!

ভোজ্যদ্রব্যের সঙ্গে রূপার চামচ থালা রাজকীয় হাতের স্পর্শে যখন গিণি সোনা হয়ে গেল, তখন তিনি গল্দা চিংড়ির কাটলেটটিতে কামড় দিয়েছেন। কিন্তু এ কি! দাঁত ভেঙে যাবার উপক্রম হলো, এতো শক্ত কাটলেট! নামিয়ে দেখেন সেটা খাঁটি সোনায় রূপান্তরিত হয়েছে! তখন মালাইকারী, সন্দেশ, ক্ষীরকদম্ব সবগুলিকেই চেষ্টা করে দেখেন, কিন্তু প্রত্যেকটিই সোনা হয়ে গেছে। হায়, হায়, ক্ষুৎপীড়িত রাজার খাদ্য কোথায়? আসন্ন অনাহারের চিন্তায় পাগল হয়ে ওঠেন তিনি—আর্তনাদের সঙ্গে প্রত্নতত্ত্বের সেই পণ্ডিতকে জড়িয়ে ধরেন। হায়, কি করলে তুমি? কিন্তু পণ্ডিতের বাক্যস্ফূর্তি হয় না। অনড় অচল পণ্ডিত একটি সোনার ষ্ট্যাচু। দেহরক্ষীরা ছুটে এলো, রাজাকে হতজ্ঞান অবস্থায় তুলে নিয়ে যায় অন্তঃপুরে, কিন্তু তাদের অসাড় হাত থেকে খসে পড়েন রাজা। তারাও যে প্রাণহীন সোনার হয়ে গেছে। উন্মত্ত রাজার তখন কি যে অবস্থা, তা তোমরা কল্পনা করতে পারবে না।

অবশ্য চরম বিপদ এড়িয়ে গেলেন তিনি। ক্রমে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এলো এবং তাঁর স্পর্শক্ষমতাও লুপ্ত হলো। সুখের বিষয়, ঐ ঔষধের ক্রিয়া বেশিক্ষণ থাকে না—পণ্ডিত ও দেহরক্ষীরাও জীবন্ত হয়ে উঠলো।

এই হচ্ছে গল্প, এখন জানি, এটা একটা হাসির গল্প ছাড়া আর কিছু নয়। তবে তরুণ বয়সে মনে হয়েছিল যে ঐ রকম কোনও ফরমুলা থাকা খুবই সম্ভব এবং তার ক্রিয়াটাও অসম্ভব নয়! তার পরে বড় হয়ে মনে হলো কোন না কোন দ্রব্যের এমন গুণ থাকতে পারে, যা স্পর্শ মাত্রেই কোনও ধাতু তার স্বধর্ম হারিয়ে সোনা হয়ে যায়।

পরশ পাথর বা স্পর্শমণির কথা শোনার পর থেকে আমার ধারণা হলো, এরকম পাথর বা মণি পৃথিবীর কোনও না কোন জায়গায় নিশ্চয়ই আছে। মানুষ তার এখনও খোঁজ পায়নি।

এ প্রসঙ্গটা মিহিরের খুব ভাল লাগছিল না। সে বোধ হয় ঐ রাজার কথাই ভাবছিল। সে বলে উঠলো, আচ্ছা, কাকু, সেই রাজার কাটলেট আর সন্দেশগুলো সোনা হয়েই রইলো ত?

আমি ধমক দিয়েছিলাম, দূর পাগল, তা কখনও হয়? পাথর-কাকু বললেন, ওষুধের জাদুক্রিয়ার শক্তি কিছুক্ষণ থাকে, তাই সেটা ফুরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে কাটলেট যেমন কাটলেট তেমনি সন্দেশ

দ্রোণাচার্য্যের এক সুন্দর মূর্ত্তি গড়লেন। আর সেই মূর্তিটিকে গুরুদেব মনে করে একলব্য একমনে অস্ত্রচালনা শিক্ষা করলেন।

সাধনায় কি না হয়? ক্রমে ক্রমে একলব্য অসাধারণ বীর হয়ে উঠলেন কিন্তু কেউ জানলে না তাঁর মনের ব্যথা।

গভীর বনে একমনে একলব্য শরচালনা করছেন, ঠিক সেই সময় পাণ্ডবরা শিকার করতে এলেন। পাণ্ডবদের সংগে ছিল একটি কুকুর। একলব্যের কাছে গিয়ে কুকুরটি বার বার চিৎকার করতে লাগল। একলব্য বিরক্ত হয়ে, তখনই কুকুরের মুখ এমন ভাবে বন্ধ করে দিলেন যে কুকুরের আর চিৎকারের শক্তি রইল না।

কুকুরটির এই অবস্থা পাণ্ডবরা যখন দেখলেন, তখন অবাক হয়ে গেলেন, কে এই বীর!

একলব্যকে দেখলেন, তারপর আরও দেখতে পেলেন—গুরুদেব দ্রোণাচার্য্যের মূর্তি। কি আশ্চর্য! ধন্য একলব্য! পাণ্ডবরা অবাক হয়ে গেলেন, একলব্যের এই অসাধারণ বীরত্ব দেখে।

অর্জ্জুনের বড় অভিমান হল। তাঁর ধারণা ছিল, তাঁর মত বীর কেউ নেই, আর দ্রোণাচার্য্যের প্রিয় শিষ্য অর্জ্জুন। কাজেই অর্জ্জুন দ্রোণাচার্য্যের কাছে অভিমান করে ফিরে এলেন।

জানালেন: গুরুদেব, এ কি আপনার অভিনয়! আপনি বলেছিলেন, কাউকে অস্ত্রচালনা শেখাবেন না। কিন্তু আমি দেখে এলাম, আপনার এক শিষ্য যে ধনুর্বিদ্যায় আমাদের সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ?

তাই না কি? দ্রোণাচার্য্য হেসে বললেন, চলতো দেখে আসি কত বড় বীর, আর কি রকম তার গুরুভক্তি।

তাঁরা সবাই সেই গভীর বনে চললেন। যেখানে একলব্য আপন সাধনায় মগ্ন।

সেই গভীর বনে, দ্রোণাচার্য্যকে আসতে দেখে একলব্য তাঁর পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়লেন। চোখের জলে ভিজে গেলো পা। তা হলে তাঁর স্বপ্ন সার্থক হয়েছে।

দ্রোণাচার্য্য গম্ভীর কণ্ঠে বললেন: কি হে, তুমি নাকি আমার শিষ্য?

একলব্য যুক্তকরে বললেন: মনে মনে আপনাকেই গুরুরূপে বরণ করেছি। যেদিন আপনি আমায় ঘৃণা ভরে প্রত্যাখ্যান করলেন সেদিন থেকে আপনাকে নিত্যপূজা ও প্রণাম করে অস্ত্রচালনা অভ্যাস করেছি।

দ্রোণাচার্য্য মুগ্ধ হলেন একলব্যের ভক্তিনিষ্ঠা দেখে। বললেন: আমাকে যদি গুরুরূপে বরণ করেছ, তাহলে তার দক্ষিণা কই? দাও।

একলব্য বললেন বলুন কি চান? যা চাইবেন তাই দেব।

দ্রোণাচার্য্য বললেন: উত্তম, তবে তোমার ঐ বুড়ো আঙুলটি আমাকে উপহার দাও।

দ্রোণাচার্য্যের এই নিষ্ঠুর প্রস্তাবে পাণ্ডবরা শিউরে উঠলেন। কিন্তু একলব্যের মুখ সহসা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তবে কি তাঁকে গ্রহণ করছেন গুরুদেব? আজ তিনি ধন্য।

হাসিমুখে দ্রোণাচার্য্যের পায়ের তলায়, রক্তমাখা বুড়ো আঙুলটি উপহার দিয়ে একলব্য বললেন: আজ আমি ধন্য! আমার মত ব্যাধের ছেলেকে আপনি শিষ্য বলে গ্রহণ করেছেন দেখে।

দ্রোণাচার্য্য বললেন: একলব্য, আমি আশীর্বাদ করছি, তোমার গুরুভক্তি পৃথিবীর সমস্ত মানব শ্রদ্ধার সংগে স্মরণ করবে। তুমি ধন্য।

শুনলে তো? একলব্যের ভক্তি? অবাক হচ্ছ, তাই না?

সত্যি অর্জ্জুন বীর বটে, কিন্তু একলব্য মহত্বে ও বীরত্বে অতুলনীয়। তাই না?

কাছের মানুষ যদুনাথ

শ্রীচিত্তরঞ্জন বিশ্বাস

অনেক কথাই মনে পড়ে। আবার অনেক কথাই ভুলে গিয়েছি। তারিখ মনে নেই। সালও না।

তবে বছর চারেক বা তার কিছু বেশী হবে বলে মনে হয়। প্রেসিডেন্সী কলেজের কি একটা অনুষ্ঠান বোধ হয়। খবরের কাগজের সভা-সমিতিতে পড়েছিলাম। পড়েছিলাম আচার্য্য যদুনাথ উপস্থিত থাকবেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ে ছুটলাম। সংগে নিলাম অটোগ্রাফ খাতাটা। উক্ত অনুষ্ঠানের আর কিছু-র জন্যে আমি ব্যগ্র হইনি। কেবল মাত্র আচার্য্যের মুখে কিছু শুনব এবং একটা অটোগ্রাফ নেব এ-ই আমার আশা ছিল।

অনুষ্ঠান শেষে আচার্য্যের সম্মুখে উপস্থিত হলাম অটোগ্রাফের জন্য। আমার মত আরও কয়েক জন অটোগ্রাফ-কাঙাল ছিলেন। কিন্তু কাউকে তিনি অটোগ্রাফ দিলেন না। কেবল বললেন, বাড়ীতে যেও। নিরাশ হয়ে ফিরলাম। ওঁর অটোগ্রাফ যে পাব সে আশাই ছিল না। প্রথমতঃ ঠিকানা জানি না। দ্বিতীয়তঃ একটা অটোগ্রাফের জন্যে আবার একজন বৃদ্ধ ব্যক্তিকে জ্বালাতন করব? এই রকম নানা কথাই মনে হতে লাগল। আবার ভাবলাম যাই না। যেতে যখন বলেছেন।

অবশেষে একদিন ঠিকানা যোগাড় করে হাজির হলাম সকাল বেলার দিকে আচার্য্য যদুনাথের লেক টেরেসের বাড়ীতে।

বাড়ীর ভেতর ঢুকে দেখি, একাকী বসে আছেন। হাতে একখানা খুব পুরোন বই। আমায় দেখে বইখানা রেখে দিলেন। এবং জিজ্ঞেস করলেন কি চাই তোমার?

আমি—আপনার কাছেই এসেছি।

—বুড়ো মানুষের কাছে?

—অটোগ্রাফের জন্যে।

—অটোগ্রাফ আমি দিই না।

এই কথা শুনে আমি ফিরে আসবার উপক্রম করছি, এমনি সময়ে বলে উঠলেন রাগ করলে? বস। কথা আছে।

মেঝেতে ধপ করে বসে পড়লাম।

উনি বললেন, চেয়ারে বস।

—না।

—লজ্জা, না? দাদুর কাছে লজ্জা করতে আছে? তুমি আমার নাতি-নাতনীর বয়সের। উঃ ওরা যদি——

হঠাৎ ওঁর চোখের দিকে তাকিয়ে দেখি, চোখ দুটো অশ্রুসজল হয়ে এসেছে। পুরোন দিনের স্মৃতি এখনও উনি ভুলতে পারেন নি। তবে তা ভোলবার জন্যে অন্য প্রসংগে এলেন।

বললেন—ইতিহাস পড় ?

—হ্যাঁ।

—গল্প, উপন্যাস ?

—হ্যাঁ।

—অনেক উপন্যাসের চেয়ে অনেক গল্পের চেয়ে ইতিহাস ভাল লাগে না ?

হ্যাঁ।

—এখন ঐগুলোই পড়বে। আর পড়তে পড়তে এমন মন হবে, জানবার জন্যে এমন স্পৃহা হবে যে, খটখটে শুকনো ইতিহাস থাকে বলে তাও ভাল লাগবে। অনেক কিছু জানবার, অনেক কিছু শিখবার আছে। সব পড়তে পাবে না। পারবে না। তবুও যথাসম্ভব চেষ্টা করো। এখন ত কত সুবিধে। সব কিছু সাজান গোছান রয়েছে। কেবল একটু নিয়ে পড়বে। কিন্তু আমাদের সময়ের কথা চিন্তা করতে পারো ? অল্প যা কিছু ছিল তা সব বিক্ষিপ্ত অবস্থায়। যোগাড়-যন্তর করবার মত সুযোগ খুব কমই হত। আর একটা বড় প্রতিবন্ধক ছিল পরাধীনতা। আমাদের দেখিয়ে দেবার মত লোকও ছিল না। কিন্তু আজ ? তোমাদের পথ কত সহজ। সহজ হলে কি হবে ? চারিত্রিক উন্নতি চাই। আসল জিনিষ চাই। ধৈর্য্য চাই। স্পৃহা চাই। জানবার মন চাই। তোমরা অনেকে গভর্ণমেন্টের দোষ দাও। বেশ ত। তোমরাই ত গভর্ণমেন্ট আজ। আজ তুমি। কাল সে। কেবল বুলি আওড়ালে চলবে না। কাজ করা চাই। খাঁটি লোক চাই।

প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে আপন করে অনেক কথাই বলেছিলেন সেদিন। অনেক অভিযোগ। অনেক অভিমান সেদিন জানিয়েছিলেন। আধুনিক শিক্ষার গলদের অনেক কথাও বলেছিলেন। শান্তিনিকেতনের পরিবর্তন—হীন আদর্শ সম্বন্ধেও কয়েকটা অভিযোগ আচার্য্য যদুনাথ করেছিলেন।

আমার একজন নিতান্ত অপরিচিত ব্যক্তি। একজন শ্রেষ্ঠ মনীষী আমাকে অর্থাৎ একটা তরুণকে—যে এমন আপনার করে নেবেন তা কোন সময় ভাবতেও পারি নি।

সেদিন ফিরে আসবার সময় বললেন—এসো। আবার এসো ভাই। তোমাদের সাথে দুটো কথা বলে আমি একটু আনন্দ পাব। নিজের কাজে একটু ভাল করে মন দিতে পারব।

* * * *

এর পরে অনেক বারই গিয়েছি আচার্য্য যদুনাথের কাছে। প্রতিবারই নানারকম গল্প। বিশেষ করে ইতিহাসের বীরদের কাহিনীগুলো যে কি রকম ভাবে তিনি গল্পের মত বলতেন, তা না শুনলে অবিশ্বাস্য বলেই মনে হবে। ওঁর লাইব্রেরীর বই চেয়েছিলাম একদিন। চাইতেই উনি দিলেন। বললেন—পড়। এখানে বসেই পড়। আমি জিজ্ঞেস করব।

সবচেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয় ছিল—যখনই আমি বই চাইতাম, তখনই তিনি শিবাজী, শের শাহ বা লক্ষীবাঈয়ের বই দিতেন।

* * * *

আচার্য্যের সাথে শেষ যেদিন আমি দেখা করতে গেছি, সেদিন হঠাৎ বলে উঠলেন—ভাই, আজ আমি একটু খোলা মাঠে বেড়াব। যাবে ? বিকেলে আসবে ?

—নিশ্চয়ই।

—এসো।

বিকেলে গেলাম। বললেন—সকালে ভেবেছিলাম গঙ্গার দিকে যাব। কিন্তু শরীরটা ভাল নয়। চল বাড়ীর কাছেই। বেরুলাম। বেরিয়েই আবার বাড়ীতে ফিরলেন উনি। অত্যন্ত অসুস্থতা বোধ করছিলেন।

বাড়ী ফিরেই শুয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর উঠে বসলেন। একটু ভাল বোধ করছিলেন। বললেন, আচ্ছা, তুমি আমার কাছে প্রথম দিন এসেছিলে অটোগ্রাফের জন্যে, না ?

—হ্যাঁ।

—নিয়েছ অটোগ্রাফ ?

—না।

—কেন ?

আমি নিরুত্তর রইলাম। তার পর আবার উনি বলে উঠলেন—এই ক' বছর ধরে অটোগ্রাফ দিলাম, এতেও হল না ? আরো চাই ? আমার জীবনের অটোগ্রাফ তোমায় দিলাম।

কোন দিন আচার্য্য যদুনাথের কাছ থেকে ফিরবার সময় প্রণাম করিনি। হঠাৎ সেদিন ফিরবার সময় প্রণাম করলাম। কেন জানিনে। উনিও আশীর্ব্বাদ করলেন, হাত ধরে বললেন—মানুষ হবার চেষ্টা করো, দেশের সেবা করো। মানুষে-মানুষে আজ যে হানাহানি, কাটাকাটি চলেছে, তা বন্ধ করবার ভার তোমাদের ওপর। বাংলার যুবশক্তিকে আবার উঠাতে হবে, জাগাতে হবে। তবেই বাংলা আবার তার লুপ্তমর্য্যাদা ফিরে পাবে।

তাজা ঝরঝরে ও সুন্দর হয়ে উঠুন
হিমালয় বোকের সাহায্যে
এই ঠাণ্ডা এবং স্নিগ্ধ
আপনাকে সুরক্ষিত ও
সতেজ রাখবে।
হিমালয়
বোকে
স্নো
Erasmic
HIMALAYA
BOUQUET
SNOW
হিমালয়
বুকে স্নো
Erasmic
Himalaya Bouquet
TOILET POWDER
MADE IN INDIA FOR ERASMIC - LONDON
এই মোলায়েম সুগন্ধ পাউডারটি দিয়ে
আপনার প্রসাধন সম্পূর্ণ করুন আর দেখুন
আপনাকে দেখতে কত সুন্দর লাগছে।
হিমালয় বোকে
টয়লেট পাউডার
এরাসমিক কোং লিঃ লণ্ডন এর পক্ষে হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড কর্তৃক ভারতে প্রস্তুত।

প্রশান্ত চৌধুরী

২

রঙ্গমঞ্চের অদ্ভুতকর্মা বেশকার এবং রূপসজ্জাকর এই সব বিজয় এবং অমূল্য বাবুদের কল্যাণে যে সব উদরাময়ের রোগী হন বৃকোদর, লম্বোদরা হন ক্ষীণকটি, বিরলকেশা হন কেশবতী ; যে সব কৃষ্ণকান্তরা হন গৌরবর্ণা, ষটপঞ্চাশীরা হন ষোড়শী, রঙ্গালয়ের সামনের সারির গদীমোড়া আসনে বসে সেই সব ভাগ্যবান-ভাগ্যবতীদের অঙ্গবিক্ষেপ ও বচন-প্রক্ষেপের গুণাগুণ বিচার করে কোন একটি সংবাদপত্রের কলম ভর্ত্তি করার চাকরি করছি। এক কথায় যাকে বলে নাট্য-সমালোচনা। কে ভেবেছিল যে, কোন দিন এই আমাকেই নাট্য-সমালোচকের সুরক্ষিত নিশ্চিন্ত আরামপ্রদ আসন ছেড়ে মেক্‌আপ টেবিলের হাজার-বাতির আলোর মুখোমুখি হয়ে গলগল্ করে ঘামতে হবে !

গ্রহ ! গ্রহ !

নৈলে আমিই বা হঠাৎ অকারণে চার বছর আগে খান দুই নাটক লিখে চার বছর পরেও তার পাণ্ডুলিপি হারিয়ে ফেলব না কেন ? আর, জুপিটার থিয়েটারের মালিকই বা হঠাৎ একদা অতি প্রত্যূষে মুষ্টিবদ্ধ বামহস্তের অনামিকা ও কনিষ্ঠা অঙ্গুলির ফাঁকে এক খণ্ড জলন্ত গোল্ডফ্লেক স্থাপন করে তাতে মুহুর্মুহু টান দিতে দিতে আমাদের বাড়ীর বৈঠকখানায় এসে পা নাচাতে যাবেন কেন ?

লোকে কথায় বলে, লেপের আরাম দার্জিলিঙ-এ। হয়তো সৌভাগ্য হওনি আমার লেপখানাকে আমার ঘরের বাইশ ফুট উচ্চতা থেকে তুর্জয়লিঙ্গের সাত হাজার একশো সাতষট্টি ফুট উচ্চতায় তুলে নিয়ে যাবার। কিন্তু এই বাইশ ফুটেও লেপ নামক বস্তুটাকে কিছু কম আরামদায়ক মনে করবার যে কিছুমাত্র সঙ্গত কারণ নেই, এ কথা আমি জোর গলায় বলতে পারি।

আর তাই, একদা নভেম্বরের প্রত্যূষে আমার নক্সাকাটা সুকোমল লেপের সঙ্গে প্রায় 'বাগর্থাবিবসম্পৃক্ত' আমাকে যখন মেথুলাল এসে ডেকে তুলে বললে,—দাদাবাবু, নিচে আপনাকে এক গাড়ীওলা বাবু ডাকছেন—এবং লেপের উষ্ণ আলিঙ্গন ছেড়ে চোখে-মুখে নভেম্বরের কন্‌কনে জলের ছিটে দিয়ে আমাকে যখন ভদ্রতা রক্ষার জন্য নিচে নামতে হল, তখন মনে মনে উক্ত গাড়ীওলা ভদ্রলোকটির মুণ্ডপাত করেছি।

নিচে নেমেই বৈঠকখানার ফরাসে হাঁটুর তলায় তাকিয়া টেনে নিয়ে যাঁকে পা নাচাতে দেখলুম, তিনি সহাস্যে এবং সবিনয়ে শুধু বললেন,—আমি জুপিটার থিয়েটার থেকে আসছি।

বাদ বাকি কথা বললে আমাদের দরজায় থামানো তাঁর বড় কালো রঙের গাড়ীটা এবং তাঁর মোটা-মোটা আঙুলের খান চারেক আংটি ! বুঝতে বিলম্ব হল না, জুপিটার থিয়েটারের খোদ মালিক আমার সম্মুখে উপবিষ্ট।

এ গরীবের বৈঠকখানায় চিত্র ও মঞ্চরাজ্যের অনেক ব্যক্তিরা পদধূলি দিয়ে থাকেন কখনো-সখনো। আসেন নিমন্ত্রণপত্র দিতে,—অর্থাৎ 'পাস'। আর, সে 'পাস' পেয়েই বুঝতে পারি নাটকটি নির্ঘাৎ 'ফেল' করেছে।

জুপিটার থিয়েটারে এমনি একটা ফেলকরা নাটকই চলছি তখন। কাজেই বুঝতে বিলম্ব হল না মালিকের আগমনে হেতুটা : পূর্ব-অভিজ্ঞতায় বেশ বুঝলুম, এইবার শুনতে হা হা-হুতাশ, শুনতে হবে কোন মহান্ আদর্শ নিয়ে ভদ্রলোক লাইনে নেমেছেন ; শুনতে হবে,—সমালোচককুলের শিরোম এই আমার মতো নিরপেক্ষ সত্যনিষ্ঠ সৎসাহসী সমালো বাঙলা দেশে বিরল। এবং তারপর সবার শেষে শুনতে সেই অতি পুরাতন কথা,—দয়া করে বাঁচান দাদা, সওয়া লাখ টা ঢেলেছি, নৈলে ধনে-প্রাণে মারা যাব।

নাট্য-সমালোচকরাই নাকি ফ্লপ নাটকের অক্সিজেন সিলিণ্ডা নাটকের মৃত্যু ঠেকাতে না পারলেও বিলম্বিত করতে তাঁরা পারেন। অন্তত পাস দিতে এসে ফ্লপ নাটকের মালি প্রতিনিধিরা তো হামেসাই এমন কথা বলে থাকেন। মুখের কথাতেই অবশ্য বিশ্বাস করতেন না কেউ, যদি না সঙ্গে ওঁরা ফাউলের প্লেট কিংবা কচুরি-সিঙ্গাড়ার বাক্স ধরা সামনে। এর পরেও ওঁদের সততায় সন্দেহ প্রকাশ করা সমালোচকদের এতখানি মন্দলোক মনে করবার কোন কারণ নে

জুপিটার থিয়েটারের মালিকের কাছ থেকেও এমনি একটা আবেদন শোনবার আশঙ্কায় ভ্রূজোড়া যখন আগে থাক কুঞ্চিত করে রেখেছি, ঠিক তখনই এমন একটা প্রস্তাব করলেন, যা শুনে কুঞ্চিত ভ্রূযুগল বিস্ময়ে ঊর্দ্ধে উঠে গেল কি

—আপনার লেখা দু'খানা ভাল নাটক আছে শুনেছি। আমাদের ষ্টেজে অভিনয় করাবার জন্যে তার একখানা চাই।

কিছুকাল পূর্বে নিতান্তই দুর্বুদ্ধি বশতঃ কোন এক সৌখীন নাট্যকে দলকে দিয়েছিলুম আমার একখানা নাটক অভিনয় করতে। উক্ত জুপিটার থিয়েটারের মঞ্চ ভাড়া নিয়েই এক রাত্রির প্লে করেছিলেন তাঁরা। বুঝলুম, আমার যশঃসৌরভ সেই রাত্রেই প্রবিষ্ট হয়েছে জুপিটার থিয়েটারের মালিকের নাসিকাপ্রদেশে, তার সুপুষ্ট গুম্ফজালের ভিতর দিয়ে ফিলটার্ড হয়ে।

এর পরেও মেন্দুলালকে ডেকে দু'কাপ গরম গরম চা করে আনতে বলব না, এতখানি অভদ্র আমি নই।

নাট্য-সমালোচক থেকে হওয়া গেল নাট্যকার। কিন্তু কে জানত তখন যে, ভট্টাচার্জি থেকে শেষ অবধি খোদ বরকর্তা সাজতে হবে এই আমাকেই? কাঁধে জরিদার চাদর আর হাতে রূপো-বাঁধানো লাঠি নিয়ে! রঙ্গনাথ নটরাজ যে আমার সঙ্গে এতখানি রঙ্গ করবেন, স্বপ্নেও ভেবেছিলুম কি কোন দিন?

৩

আমার নতুন নাটকের রিহার্স্যাল চলছে তখন। পরিচালক নবীন। উৎসাহে উদ্দীপ্ত। আগ্রহে চঞ্চল। নবীন বলেই বোধ হয় আমার মতো আনকোরা নতুন নাট্যকারকে রিহার্স্যাল ও শিল্পী নির্বাচনের ব্যাপারে সহায়তা করতে বলতে বাধেনি তাঁর। রোজ তাই আসতে হচ্ছে।

রিহার্স্যাল-রুমটা তিনতলায়। ষ্টেজের বাঁদিক থেকে একটা সিঁড়ি সোজা উঠে গেছে রিহার্স্যাল-রুম অবধি। তার খানিকটা কাঠের খানিকটা ইটের। কাঠের শেষ এবং ইটের সুরুর জায়গাটায় একটা চাতাল। চাতালের একদিকে একটি সবুজ রং-এর কাঠের দরজায় তেলরং-এ বড় বড় অক্ষরে লেখা আছে,—'Danger! বিপদ!'

সেই বিপদসঙ্কুল দরজা ঠেলে ভিতরে প্রবেশ করবার দুঃসাহস নেই আছে এখানকার প্রত্যেকটি লোকের। ওটা প্রস্রাবাগার! ও ঠিক উল্টোদিকের যে-দরজায় 'পুরুষ' লেখা আছে,—আসল বিপদ সেইখানেই। বিপদের পরিমাপটা চার হাজার ভোল্টের! দি গ্রেট ন্যাশনাল সাইনবোর্ড পেন্টিং-এর গদাই মিস্ত্রী দরজা দুটো উল্টো-পাল্টা করে ফেলেছিল মাস ছয়েক আগে! সে-ভুল সংশোধন করবার প্রয়োজন ঘটেনি এ যাবৎ।

এ সিঁড়ি দিয়ে শুধু মানুষ নয়, আর এক প্রকার প্রাণীও ওঠা-নামা করে যথেচ্ছা। প্রথম যেদিন এই সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠছিলুম, সেদিন মাঝপথেই মোলাকাৎ হয়েছিল সেই প্রাণী-বিশেষটির সঙ্গে। না, শুয়োর নয়, ইঁদুরই!

আতঙ্কে সিঁড়ির রেলিঙ-এ ভর দিয়ে কিছুক্ষণ শূন্যে সাইকেল চালাবার পর পা-দুটিকে সবেমাত্র মাটিতে ঠেকাতেই পিছনে একটি বিকার কণ্ঠস্বর শোনা গেল—

: দানী বাবুর আমলের।

পিছন ফিরে চোখাচোখী হতেই অত্যন্ত বিনীত ভাবে দুটি হাত জোড় কোরে নমস্কার জানালেন একটি শীর্ণকায় বৃদ্ধ।

: আমার নাম নকুল ঘোষাল স্যার! আপনার নাটকে বুড়ো চাকরের পার্ট পেয়েছি। ওরা এ থিয়েটারে বহুকাল আছে স্যার! কাউকে কিছু বলে না। পেলে খায়, না পেলে ঘোরাঘুরি করে। পাঁউরুটির শক্ত মাথাটা খেতে বড় ভালবাসে স্যার!

জুপিটার থিয়েটারের এই সব পুরোনো বাসিন্দাদের পাশ কাটিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠে তিনতলায় যে লম্বা কাঠের বারান্দাটা দেখা যায়, তারই এক ধারে ছোটোখাটো অভিনেতাদের বারোয়ারী সাজঘর, অন্যধারে রিহার্স্যাল-রুম।

রিহার্স্যাল-রুমের সুইচবোর্ডে সুইচ নেই একটাও। বোর্ডের গায়ে অতিকায় আরশোলার শুঁড়ের মতন উঁকি মারছে শুধু কয়েক জোড়া তার। ঐ শুঁড়গুলিকে সন্তর্পণে মিলিত করে নিতে পারলেই আলো জ্বলে, পাখা ঘোরে।

পরিচালকের আমন্ত্রণে আসতে হয় রোজ এই ঘরে। রিহার্স্যাল চলে। সেই সঙ্গে শিল্পীনির্বাচনও কিছু কিছু। রিহার্স্যালের মাঝে মাঝে রামখেলন আসে এক হাতে টিনের বালতি, আর এক হাতে সর্বাঙ্গ তোবড়ানো একটি কেৎলি হাতে নিয়ে। কেৎলিটা কষ্টিপাথরের নয়, অ্যালুমিনিয়মেরই। ম্যাগনিফাইং গ্লাস নিয়ে একটু অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করলেই তার গায়ে এখনো কোথাও কোথাও আবিষ্কার করা যেতে পারে অ্যালুমিনিয়মের রজতবর্ণ। আর মাস ছয়েক বাদে মাইক্রোসকোপের প্রয়োজন ঘটবে।

টিনের বালতিটার গায়ে কলি-চুণের ছোপটা স্পষ্ট। বেশ বোঝা যায়, রাজমিস্ত্রি লাগলে ঐ বালতিটাই ভাড়ার বাঁশে চেপে কলি বহন করে নিয়ে যায় মিস্ত্রির হাতের কাছে। এখন বহন করছে মৃত্তিকাভাণ্ড।

উক্ত বালতি এবং কেৎলি হস্তে রামখেলনের প্রবেশ ঘটলেই রিহার্স্যাল স্থগিত থাকে কিছুক্ষণের জন্য। ছোট ছোট মৃত্তিকাভাণ্ডে কেৎলিস্থ এক প্রকার ঈষদুষ্ণ পাঁচন পরিবেশন করে যায় রামখেলন। জুপিটার থিয়েটারের অভিধানে ঐ ঈষদুষ্ণ পাঁচনেরই নাম চা।

রামখেলন এ থিয়েটারের দৌবারিক। সিক্‌টার-ব্যাচের নিত্যানন্দ বলে দরবানজী। অর্থাৎ দরোয়ান। জন্মভূমি ছাপরা জেলার সঙ্গে সকল সম্পর্ক ঘুচিয়ে দিয়ে এই থিয়েটারে পঁচিশ বছর আছে। নাম এবং কাছা আঁটার ধরণটুকু ছাড়া ছাপরা জেলার

কোন চিহ্নই আর অবশিষ্ট রাখেনি কোথাও। চেহারা দেখলে বরং বঙ্গদেশস্থ হরিপাল নামক অতিবিখ্যাত স্বাস্থ্যকর স্থানটির অধিবাসী বলেই মনে হওয়ার প্রচুর সম্ভাবনা। অবসর সময়ে অনামিকা ও কনিষ্ঠা অঙ্গুলির মাঝখানে বিড়ি গুঁজে ঘুসি পাকিয়ে টানে কাঠের টুলে বোসে বোসে। একেবারে খোদ মনিবের ভঙ্গি। কারণটা পরে জেনেছিলুম। পঁচিশ বছরের চাকরি-জীবনে তের বার মনিব বদল হয়েছে তার। সেই সঙ্গে বিড়িটানার ভঙ্গিরও! যখন যিনি মনিব, তখন তাঁর ধরণেই অলস্ত বিড়ি টানে ও। প্রভুভক্তির অলন্ত নিদর্শনটা করতলগত করে রাখতে চায় বোধ হয়।

প্রথম যেদিন এ থিয়েটারে আসি, ম্যানেজারের অফিসঘরটা খুলে দিয়ে পাখার সুইচটা টেনে দিয়ে আমাকে অনেক উপদেশ দিয়েছিল ও। অনভিজ্ঞের প্রতি অভিজ্ঞের উপদেশ।

: নৌতুন নাটক লিখছেন ?

: হ্যাঁ।

: পৌর্ণিক ?

: না।

: হিষ্টীক্ ?

: না।

: সামেজিক ?

: হুঁ।

: নাচা দিয়েছেন ?

: হাসলুম : না।

: দিবেন।—টেবিলটা ঝাড়ন দিয়ে ঝাড়তে ঝাড়তে বলেছিল ও : দিবেন। ভাল নাচা দিবেন, গানা দিবেন। পাব্লিকবাসা আছেন, মেনজারবাবুর উয়ো হচ্ছেন,—চোমোৎকার নাচা গানা করেন! উনার একটা নাচা রাখবেন। মেনজারবাবুকে খুশি রাখবেন। আপনার রোয়েল্‌টির টাকা দিন দিন মিলে যাবে, বাকি থাকবে না।

রামখেলনের উপদেশ পালন করতে পারিনি। সামাজিক নাটকের মাঝখানে কারুর জন্মতিথি লাগিয়ে দিয়ে সখীর নাচের একটা দৃশ্য জুড়ে দেবার সহজ রাস্তা ইতিপূর্বে অনেক নাট্যকার দেখিয়ে দিয়ে গেলেও সেই মহাজন-পন্থা অনুসরণ করতে অক্ষম হয়েছি। কিন্তু রামখেলনের উপদেশে একটা উপকার হয়েছে। উক্ত মেনজারবাবুটিকে চিনে নিতে আর একটুও কষ্ট হয়নি।

রিহার্স্যাল চলে।

ঘরময় ছড়িয়ে থাকে তরুণের দল। বিভিন্ন বয়সের তরুণ। কেউ বিয়াল্লিশ বছরের টাকে কংগ্রেসী টুপি ঢাকা-দেওয়া তরুণ; কেউ বা পনেরো বছরের কচি নরম গালে দিনে তিনবার ভোঁতা ব্লেড-ঘষা তরুণ। কেউ বারাসাত থেকে আসবার পথে সারা রাস্তা খায় বাসের ঝাঁকুনি; ফিরে গিয়ে খায় চাকুরে দাদার গঞ্জনা। কেউ বালিগঞ্জ থেকে সান্‌বীম্ ট্যালবট হাঁকিয়ে আসে গোল্ড-ফ্লেকের ধোঁয়া খেতে খেতে; ফিরে গিয়ে খায় হাফ প্লেট চিকেন স্যুপ-এর পর এক কাপ কফি। মুখে কিন্তু ওদের সবারই রোম্যান্টিক হিরোর মার্কা-মারা হাসি;—চোখে দুর্গাদাস বাঁড়ুজ্যে হওয়ার স্বপ্ন।

ওদের মধ্যে প্রথম দিন থেকেই কেমন ভাল লেগে গিয়েছিল একটি ছেলেকে। ভারী আমুদে ছেলেটা। শিশির ওর নাম। একটু ফাজিল; কিন্তু বড়র সম্মানটুকু রাখতে জানে।

ঐ শিশিরই একদিন কানে কানে বললে: উটের পিঠে ভগবান কুঁজ দিয়েছেন কেন বলুন দিকিনি স্যার ?

হেসে বললুম: হঠাৎ এ প্রশ্ন ?

ও বললে: বলুনই না।

বললুম: জানোয়ারটাকে মরুভূমিতে চলাফেরা করতে হয়, খাবার-দাবার তো প্রায়ই জোটে না; শুনেছি ঐ কুঁজের ভিতরে থাকে চর্বি, আর সেই চর্বি খেয়েই দিনের পর দিন সে কাটিয়ে দিতে পারে।

শিশির বললে: শুনেছি নয় স্যার,—ফ্যাক্ট। বেছে বেছে তাই তো ভগবান এত জানোয়ারের মধ্যে ঐ উটকেই ছেড়ে দিয়েছেন মরুভূমিতে।

বললুম: তা' হঠাৎ তোমাকে এমন আচম্‌কা উটে পেয়ে বসল কেন ?

শিশির ফিসফিসিয়ে বললে: হঠাৎ নয় স্যার,—দরজার দিকে মুখ ফিরিয়ে দেখুন।

দেখলুম। স্থূলকায় ম্যানেজার কখন রিহার্স্যাল রুমের দরজায় এসে দাঁড়িয়ে পা ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে চুরুট ফুঁকছেন।

: দেখছেন ?—শিশির ফিস-ফিস করে।

: হুঁ কিন্তু কি ?

শিশির কানের কাছে মুখটাকে এগিয়ে এনে বললে: আমাদের প্রোপাইটার সাহেবও ঐ একই কারণে ঐ হিপোপোটেমাসটিকে এই জুপিটার থিয়েটারের মরুভূমিতে ছেড়ে দিয়েছেন বোধ হয় স্যার! টিকিট বিক্রীর অবস্থা তো এখানকার দেখছেন ক'দিনে। একটা উটের কুঁজের কমসে কম তিন ডবল চর্বি নির্ঘাত আছে ওঁর ভুঁড়িতে। মাস ছয়েক মাইনে না পেলেও চলে যাবে।

হাসি চেপে কিছু বলতে যাচ্ছি, সহসা শিশির আফশোষের সুরে বললে: ক্ষিধে না হয় মিটল। কিন্তু তেষ্টা ?

: তেষ্টা ?

: এখনও টের পাননি বুঝি ? সবে তো ক'দিন হল এসেছেন। সময়ে বুঝতে পারবেন।

ততক্ষণে আন্দাজ করে নিয়েছি।

আন্দাজের ওপর ভরসা করে থাকতে হয়নি বেশি দিন। কিছু দিন যেতে না যেতেই বুঝলুম, ভদ্রলোকের তৃষ্ণাটাই শুধু প্রবল নয়, পানীয়ের ব্যাপারে হাতটাও দরাজ। রাত আটটার পর নিজের ঘরে বসে পান করেন, এবং সে সময় সামনে কোন রসিক গুণী অতিথি থাকলে তাঁর দিকে পাত্র এগিয়ে দিতেও কার্পণ্য করেন না। রকমারী পানীয়ের লাগতাই মিশ্রণের ব্যাপারে কৃতী পুরুষ বলেও নাকি বাজারে তাঁর দস্তুরমতো নাম-ডাক আছে।

নতুন কোন রসিক অতিথি হলেই এক পাত্র পানীয় তাঁর দিকে এগিয়ে দিয়ে গর্বের সঙ্গে বলেন, পাঞ্চটা কি রকম ?

তার পর উত্তরের জন্যে এক মুহূর্তও অপেক্ষা না করেই বলেন: আমেরিকান ট্যুরিষ্ট মিঃ রবিনসন এ থিয়েটারে এসে আমার হাতের পাঞ্চ খেয়ে কি বলেছিল জানেন ?

এই অবধি বলেই একটু থেমে গর্ব ভরে নিজের গলার টাইয়ে হাত বোলাতে বোলাতে শেষ করেন : বলেছিল, নেকটাই ফর গড্।

ওয়াকিবহাল ব্যক্তিরা বলেন, বেচারা রবিনসন অপরাধের মধ্যে না কি বলেছিল—নেকটাই ফর দি গড্স !

ওপরে চলে রিহার্স্যাল, নিচে ষ্টেজে চলে প্লে, আজ কেদার রায়, কাল চরিত্রহীন, পরশু মেবার পতন, তার পরদিন সাজাহান। সোমবার যদি হয় অমুক ব্যাঙ্কের 'তখতে তাউস' তো মঙ্গলবার হয় তমুক নাট্যসঙ্ঘের 'ডাইবিন।' এ রোববার যদি হয় নটরাজ নবকুমারের নৃত্য সম্প্রদায়ের 'কুমারসম্ভবম্' নৃত্যনাট্য, তো ও রোববার হয় যাদুকর প্রোফেসার ইউ, কে, মাইতির অত্যাশ্চর্য ভোজবাজী।

নতুন নাটকের রিহার্স্যালের দিনগুলোয় ষ্টেজ ভাড়া দিয়ে যা দু' পয়সা আসে আর কি।

ষ্টেজের 'মোমছাল' আর 'কলেরাপটাসের' মুহুর্মুহু কামান-ধ্বনিতে রিহার্স্যাল-রুমের বৈরাগীর একতারা ছিঁড়ে যায় মাঝে মাঝে। রিহার্স্যাল ছেড়ে হুড়-মুড় কোরে ছেলে-ছোকরার দল ছুটে যায় ষ্টেজের দু'ধারের আলো-ফেলা আর সিন-ওঠানো-নামানোর কাঠের বারান্দায়। কিছুক্ষণ পরে বড়রাও কেউ কেউ। বাদ পড়ি না আমিও।

সেই অনেক উঁচু কাঠের বারান্দায়, যেখানে রেলিঙ-এর হাতলে সিন্-এর মোটা দড়িগুলো সারি সারি টান করে বাঁধা আছে এস্রাজের তারের মতো, সেইখানে দাঁড়িয়ে অনেক দড়ি আর অজস্র বাঁশের ফাঁক দিয়ে নিচের দিকে তাকালে কোন দিন দেখা যায়, নীল সাটিনের পোশাকের সাদা ঝালর দেওয়া আস্তিন-এর গহ্বর থেকে দু'খানি কৃষ্ণবর্ণ শিরাবহুল হাত বের কোরে কোমরে হাত দিয়ে হাসছে পর্তুগীজ-জলদস্যু কার্ভালো, হাঃ, হাঃ, হাঃ!

জলদস্যু কার্ভালো। মুখ তার টকটকে লাল! হাত দুটি কালো। পেন্ট মুখ থেকে নেমে হাত পর্যন্ত পৌঁছবার অধিকার পায় নি! বাটা কোম্পানীর কালো রবারের ফিতে-বাঁধা বুট জুতো তার পায়ে। পোশাকটাকে গায়ে ফিট করাতে গিয়ে এক ঐ কার্ভালোর জন্যেই আড়াই পাতা সেফটিপিন লেগেছে।

কথায় কথায় হাসছে কার্ভালো। কোমরে হাত দিয়ে পিছন দিকে ধনুকের মতো বেঁকে বিকট অট্টহাস্য হাসছে। আর মাঝে মাঝে কাঠের কি একটা নিয়ে আস্ফালন করলেই উইংসের ধার থেকে কে একজন মোমছাল আর কলেরাপটাশ দিয়ে চাবি-পটকা ফাটাচ্ছে। সে এক লোমহর্ষক দৃশ্য!

কোন দিন বা দেখা যায় বৃদ্ধ পঙ্গু বন্দী সাজাহান কর্তব্যপরায়ণ মহম্মদকে নিজের শিরোভূষণ দান করতে গিয়ে 'বেণীর সঙ্গে মাথা'র মতো কিছু বেশিই দিয়ে ফেলছেন;—রাজমুকুটের সঙ্গে শ্বেতশুভ্র পরচুলটাও!

কোন দিন বা দেখা যায় সেকেলে থিয়েটারের ভাড়াকরা সখীর ব্যাচ মানময়ী গার্লস স্কুলের বালিকা ছাত্রীদের ভূমিকায় নেমে নেচে নেচে কোরাসে গান ধরেছেন। একেবারে সেই মহারাজ নন্দকুমার নাটকের আর্মানী নর্তকীদের নাচ। ঐটেই তৈরী ছিল বোধ হয়। গানের সুর যেমনই হোক কথাগুলো কিন্তু মূল নাটকেরই,—"আনাজের সেরা ওল। কেহ বা লম্বা, কেহ বা গোল।"

নৃত্যকারিণীরাও তাই। কেহ বা লম্বা কেহ বা গোল।

কিন্তু আমার নাটকের উদ্বোধন-দিবসের আটচল্লিশ ঘণ্টা আগে যে এত বড় একটা-গণ্ডগোল ঘটবে, কে-ইবা তা ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পেরেছিল?

উদ্বোধন-দিবসের আটচল্লিশ ঘণ্টা আগে ড্রেস রিহার্সালের মাঝখানে সবাই যখন হৈ হৈ করে মাংস-রুটি আর রসগোল্লা খাচ্ছে হঠাৎ খবর পাওয়া গেল, অমুক বাবু কনট্রাক্ট সই না কোরে চলে গেছেন। সর্বনাশ! এ নাটকের একটা প্রধান চরিত্রে অভিনয় করছিলেন যে তিনি! ব্যাপারটা কি?

কেউ জানে না তা। জানেন শুধু মালিক আর ম্যানেজার সাহেব, আর কিছু কিছু ঐ নবীন পরিচালকও।

কিন্তু এ যে বিয়ের পিঁড়ি থেকে বর উঠে যাওয়া! গায়ে-হলুদ হওয়া মেয়ের কি হবে? নির্দিষ্ট লগ্নে পাত্র না পেলে পতিত হবে যে সমাজে!

মেয়ের বাপ মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছেন; অর্থাৎ জুপিটার থিয়েটারের মালিক শ্রীহৃদয়রাম কোন্ডার। সকলেই খুঁজছেন চারি দিকে, কে আছে এমন স্বঘরের ছেলে, এসেছে কোমরে গামছা জড়িয়ে পরিবেশন করতে, যাকে ধরে বেঁধে বসিয়ে দেওয়া যায় বরের পিঁড়িতে? যোগ্য না মেলে অযোগ্যই হোক্। হোক্ কানা-খোঁড়া, স্বজাত-স্বঘর হলেই হল। মেয়ের ভাগ্যে সুখ থাকলে তাইতেই সুখী হবে সে। এখন এ-যাত্রা জাতটা তো রক্ষে হোক।

খুঁজছে সবাই মনে মনে। আমিও। এমনি সময় ঐ অমূল্যধন বসাক কোথা থেকে একটি লোককে নিয়ে ঢুকলেন ঘরে। এবং সটান্ আমার দিকে এগিয়ে এসে লোকটিকে শুধু বললেন: এঁরই।

সঙ্গে সঙ্গে লোকটি আমার মাথার দিকে অভিনিবেশ সহকারে কিছুক্ষণ দৃষ্টিদান কোরে মুখখানাকে এমনই চিন্তিত করে তুললেন যে রীতিমত ভয়-ভয় করতে লাগল। লোকটা আমার মগজ সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করছে না তো?

অমূল্য বাবু বললেন: চলবে?

লোকটি মাথা নেড়ে বললে: উঁহু।

ভাবলুম চীৎকার করে বলি,—কি চলবে না? মানে কি এসবের?

তার আগেই লোকটি বললে: এগারো।

চীৎকার করে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হল; কতর মধ্যে এগারো নম্বর পেলুম? কিন্তু তার আগেই অমূল্য বাবু বললেন: তাহলে আমাদের সেই 'গৃহলক্ষ্মী' নাটকের ফণীন্দ্র বাবুর পরচুলটা তো ঠিকঠাক করে নিলেই চলে এখন। কি বল ইয়াসিন?

লোকটি বললে: তা চলে।

চীৎকার করে বললুম: তার মানে?

হৃদয়রাম কোন্ডার হাত দুটোকে জড়িয়ে ধরে বললো: বড় নিরুপায় হয়েই এ-কাজ করতে হল তার!

অর্থাৎ? অর্থাৎ? অর্থাৎ?

রাস্তার দেওয়ালে দেওয়ালে তাখো লাল থেকে নীল-হয়ে-আসা বড় বড় কাঠের টাইপের অক্ষরে নিজের নাম 'ষ্টার সাইজ' পোষ্টারে। মেক্-আপ টেবিলের হাজার বাতির আলোর সামনে বসে গল্ গল্ করে ঘামো আলোর গরমে আর ভয়ে। [ক্রমশঃ।

ভবানী মুখোপাধ্যায়

সাত

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল স্যার হিউ সিসিল চাম্‌লীর (Cholmondely) স্ত্রী লেডী মেরী ষ্টুয়ার্ট চাম্‌লী ভগিনীপতি জর্জ বার্ণার্ড শ'কে শুধু The intelligent Women's Guide to Socialism and Capitalism লিখতে প্রেরণা সঞ্চার করেছিলেন তা নয়, বার্ণার্ড শ'র বিখ্যাত নাটক Captain Brassbound's Conversion লেডী চাম্‌লীর সঙ্গে পরিচয়ের প্রত্যক্ষ ফল। বার্ণার্ড শ' যখন লেডী চাম্‌লীর সঙ্গে সৌজন্যসূচক আলাপাচারে ব্যস্ত তখন লেডী চাম্‌লী তাঁর পরিচয় না জেনে অনেক কথাই বলেছিলেন।

উৎকৃষ্ট ভদ্রব্যক্তির মতো বার্ণার্ড শ' অতিমধুর ভঙ্গীতে তার উত্তর দিয়েছেন। সামরিক শাস্ত্রে যে তাঁর অসীম জ্ঞান সে পরিচয়ও তিনি দিয়েছিলেন। লেডী চাম্‌লীকে শ' বললেন, সামরিক শাস্ত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ পাঠ্যপুস্তক Arms and the Man, Man of Destiny ও Cæser & Cleopatra।

শ'র শ্যালিকা লেডী চাম্‌লী কোনো দিন এই সব গ্রন্থের নামও শোনেন নি। বার্ণার্ড শ' লেডী চাম্‌লীর ব্যবহারে ও সৌজন্যে মুগ্ধ হয়েছিলেন, বিশেষতঃ ব্রিগেডিয়ারের মত দুর্দান্ত ব্যক্তিটিকে পোষমানানো বড় সহজ কথা নয়। এই সাক্ষাৎকারের পর শ' তাঁর ডায়েরীতে লিখলেন—

"পরাধীন রাষ্ট্র সর্বদাই সেই সব মানুষদের দ্বারা শাসিত হয় যারা প্রভুদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসে। নারীর অধীনতার অর্থ নারী জাতি কর্তৃক ত্রাস সঞ্চার। কোনও সুন্দরী রমণী নারী জাতির স্বাতন্ত্র্য কামনা করেন না। তাঁদের একমাত্র উদ্দেশ্য পুরুষের হাতে প্রচুর ক্ষমতা সঞ্চয় করা, কারণ একথা তাঁর অজানা নেই যে পুরুষকে শাসন করবে নারী।

সুচতুরা, সুদর্শনা রমণী তার সমগ্র শক্তি ভীরুতা ছদ্মবেশে গোপন রাখেন, তাঁর অবিবেচনার নাম নারীসুলভ সারল্য, সহায়হীনতা। সরল পুরুষ তাঁদের দ্বারা প্রতারিত হন। যাঁরা গর্বিত, যাঁদের মনোভংগী সহজ এবং স্পষ্ট, সোজা পথে যাঁরা চলেন তাঁরাই শাসিত হতে চান না, বাঁধন থেকে মুক্তি কামনা করেন।"

এই আলাপের ফলেই Captain Brassbound's Conversion-এর নাটকের নায়িকা লেডী সিসিলির চরিত্রের সৃষ্টি। এই নাটক নিয়ে বার্ণার্ড শ' এবং এলেনটেরীর মধ্যে যে আলোচনা হয়েছিল তা ইতিমধ্যে বলা হয়েছে। বার বার এই ভাবে পরিচিত নর-নারীর চরিত্র নাটকায়িত করেছেন বার্ণার্ড শ'। You never can tell নাটকের মিসেস ক্লানডন সম্পর্কে মিঃ আর, এফ, র‍্যাটরে বলেছেন—অনেকে বলেন মিসেস ক্লানডন চরিত্রটির ভিত্তি মিসেস এ্যানী বেসান্ট, কিন্তু এই চরিত্রে বার্ণার্ড শ'র জননী লুসিণ্ডা এলিজাবেথের ছাপ সুস্পষ্ট। মিসেস বেসান্টই হয়ত বার্ণার্ড শ'র আদর্শ, তবে একটি চরিত্র অনেক সময় বহু চরিত্রের সমাবেশে সৃষ্ট হয়, বার্ণার্ড শ'ও তাই করতেন।

দ্বিতীয় অঙ্কের আরম্ভে গ্লোরিয়া সহসা জননী মিসেস ক্লানডনের কণ্ঠলগ্ন হয়ে আলিঙ্গন করায় জননী বিব্রত ভঙ্গীতে বলেন, My dear you are getting quite sentimental—জননীর এই মৃদু তিরস্কারে কন্যা কুণ্ঠিত হয়। লুসিণ্ডা এলিজাবেথের প্রকৃতির সঙ্গে এই ভঙ্গিটুকু মিলে যায়। তৃতীয় অঙ্কেও গ্লোরিয়ার প্রেমিক ভেনটিষ্ট ভ্যালেনটাইনকে মিসেস ক্লানডন বলেছেন—I am going to speak of a subject of which I know very little—perhaps nothing. I mean love—

বার্ণার্ড শ'র বন্ধু-বান্ধবীরাও তাঁদের আলাপাচারের মধ্যে শ'র নাটকের বহু সংলাপের সূত্র দিয়েছেন।

প্রতি বৃহস্পতিবার ওয়েব-দম্পতি এবং শ'-দম্পতি একত্রে নৈশ ভোজ সমাধা করতেন। একদিন শ' বললেন রাম, শ্যাম, যদুর চাইতে আমার জনতার সবাই সীজার হোক, এই আমি চাই।

মিয়াত্রিস ওয়েব প্রতিবাদ করলেন, বা রে, তাহ'লে আমাদের মেয়েদের দল কোথায় থাকবে?

জবাবে শ' বললেন প্রয়োজন নেই তাদের, ওরা বড়ো কনভেনসন্যাল (কেতাদুরস্ত)।

বিয়াত্রিস মনে করলো শ' এতদ্দারা নারী-সমাজকে আক্রমণ করলেন। তাই তিনি সরোষে বললেন, নিশ্চয়ই আমরা কন্‌ভেনশন্যাল থাকবো, নইলে আমাদের অতি নির্মম, নিষ্ঠুরতার সঙ্গে সবাই ভুল বোঝে। আক্রান্ত না হলে তুমিও ত' মনের কথা বলো না।

সিডনী ওলিভিয়ার দীর্ঘকাল পরে সাক্ষাৎকারের পর বললেন—তোমাকে ভাই চমৎকার দেখাচ্ছে, মনে হচ্ছে বেশ আনন্দে আছো। পরমানন্দে দিন কাটাচ্ছো।

সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করলেন বার্ণাড শ'—আমি এতদ্দারা ঘোষণা করছি যে আমি সুখী মানব নই। হয়ত আমি বিজয়ী, সাফল্যের শিখরে উঠেছি, কিন্তু তার জন্য মূল্য দিতে হয়েছে, সে মূল্য আমার শান্তি। যেদিন আমরা বিবাহ করেছি সেই দিনই বিসর্জন দিয়েছি শান্তিকে।

বার্ণাড শ'র এই উক্তি পরিবর্তিত আকারে ট্যানারের মুখে দেওয়া হয়েছে Man and Superman-এ।

সার্লোট প্রথমটার আহত হয়েছিলেন, বিবাহের ফলে সুখ-শান্তি বিসর্জন দিতে হয়েছে, এ আবার কেমন কথা! পরে ভাবলেন, প্রতিভাধর মানুষদের কাণ্ডই এই রকম। বার্ণার্ড শ'র ধারণা, তিনি যেন সোনার খাঁচায় বন্দী পোষা পাখি, আর সার্লোটের আনন্দ যে গীতিমুখর পাখিটিকে সে পুষছে, তাকে ধরতে পেরেছেন।

একদিন সন্ধ্যায় সার্লোট বললেন—"প্রধানমন্ত্রী আর্থার বালফুরকে আমার ভালো লাগে, তিনি সাময়িক মানুষের চাইতে দার্শনিক মানুষকেই স্বীকৃতি দিয়েছেন।"

স্ত্রীর এই উক্তিতে বার্ণার্ড শ'র মুখখানি, আনন্দে ভরে উঠল। লিখলেন—

I sing, not arms and the hero, but the philosophic man : he who seeks in contemplation to discover the inner will of the world, in inventions to discover the means of fulfilling that will, and in action to do that will be the so-discovered means.

সার্লোটের কাছে Man and Superman যখন পড়ে শোনানো হল, তিনি বললেন—"এই নাটক Captain Brassbound's Conversion"-এর মত হয়নি, সেখানে নারী মহীয়সী, শিকারের পাত্রী নয়।

শ' সার্লোটের এই প্রতিক্রিয়ার কথা নিয়ে রহস্য করতেন।

শ'র নাটক কোর্ট থিয়েটারে অভিনয়ের পর ইংরাজী নাটকের দর্শকরা বার্ণার্ড শ'কে গ্রহণ করলো, তার পর Man and Superman-এর অভিনয় দেখার পর বার্ণার্ড শ'র অতি কঠোর সমালোচককেও নাট্যকারের প্রতিভা স্বীকার করতে হয়েছে। ধীরে ধীরে এই নাটক ও সেই সঙ্গে নাট্যকারের জনপ্রিয়তা বেড়ে চললো, বার্ণার্ড শ'র নাটকে শুধু যে দর্শকের দিকেই নজর থাকে তা নয়, অভিনেতারাও উপেক্ষিত নয়, অতি ক্ষুদ্র ভূমিকাও বৈশিষ্ট্যে পরিপূর্ণ।

নাট্যকার হিসাবে বার্ণার্ড শ'র কলাকুশলতা সম্পর্কে তেমন আলোচনা হয়নি। সমালোচকেরা সংলাপকেই প্রাধান্য দিয়েছেন কিন্তু নাটকীয় ঘটনা সৃষ্টি সম্পর্কে তেমন লক্ষ্য দেওয়া হয়নি। বার্ণার্ড শ'র সরস উক্তি এবং সাহসিক বক্তব্য সকলকে বিস্মিত করেছে—দৃশ্যাবলী অ-সাধারণ এবং অদ্ভুত—সারা রঙ্গমঞ্চে প্রচণ্ড বর্ণ সমারোহ। যেখানে বক্তব্য বা যুক্তি কিঞ্চিৎ কঠিন, সেখানে দর্শকের মুখ চেয়ে পারিপার্শ্বিক অবস্থা হাল্কা করার চেষ্টা করেছেন শ'।

এই সব ব্যাপারে বার্ণার্ড শ' ছিলেন পথিকৃৎ। নাটক লিখেই তিনি শান্ত ছিলেন, নাটককে পাঠ্য করার জন্যও বার্ণার্ড শ' বিচিত্র উপায় উদ্ভাবন করেছিলেন। ১৮৯৮এর গোড়ার দিকে বার্ণার্ড শ'র দুই খণ্ড নাট্যগ্রন্থাবলী প্রকাশিত হয়—Pleasant (সরস) এবং Unpleasant (বিরস), প্রকাশ করেন গ্রান্ট রিচার্ডস। পাঠক-সাধারণ নাটক পাঠ করা ত্যাগ করেছিল অপাঠ্য হিসাবে, তার আর একটি কারণ নাটক ভালোভাবে ছাপা হত না, বাজে কাগজে অতি সাধারণ অঙ্গসৌষ্ঠবে তা প্রকাশ করা হত, প্রয়োজনের খাতিরে সেই সব নাটক লোকে হাতে করত, আগ্রহে নয়। তা ছাড়া এই সব নাটকে যে সব নির্দেশ থাকতো তা প্রযোজকের পক্ষে প্রয়োজনীয়, পাঠকের কাছে অর্থহীন।

বার্ণার্ড শ' বুঝেছিলেন, নাটক পাঠে মানুষের বিরাগের কারণ, মোটা অক্ষরে ছাপা নির্দেশাবলী পাঠকের চোখে লাগে। বার্ণার্ড শ'র Plays, Pleasant and Unpleasant তাই উপন্যাস ও নাটকের এক সংমিশ্রণ। সংক্ষিপ্ত মঞ্চ নির্দেশের পরিবর্তে পাঠকের কাছে ঘটনার সুদীর্ঘ বিবরণ এবং চরিত্রের খুঁটিনাটি পরিচয় দেওয়া হল। কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে নাটকীয় চরিত্রের ভাবাবেগ সম্পর্কেও বিবরণ দেওয়া হল, কোথায় নারীচরিত্র লজ্জায় লাল হবে কিংবা পুরুষ সাময়িক ভাবে কুণ্ঠিত হবে, এসব খুঁটিনাটি বার্ণার্ড শ' বিস্তারিত ভাবে দিলেন। এ ছাড়া সুদীর্ঘ ভূমিকায় প্রতিটি নাটকের মূল বক্তব্য বলার চেষ্টা করেছেন লেখক, আবার নাটকের সঙ্গে সম্পর্কহীন কথাও আছে, এমন কি আত্মজীবনী-মূলক কথারও অভাব নেই। এই ভাবে নাটক প্রকাশন ক্ষেত্রে বার্ণার্ড শ' এক বিপ্লব সৃষ্টি করলেন।

শিল্পী পুরুষ আর জননী রমণী। একজন সৃষ্টি ও সংহার করেন, দ্বিতীয়া সংরক্ষণ ও সংবর্ধনে ব্যস্ত, Man and Superman-এ এই দুই চরিত্র সংগ্রামরত। সমালোচকরা এর নামকরণ করেছেন—যৌন-দ্বন্দ্বযুদ্ধ (Duel of Sex)। নর-নারীর মধ্যে উদ্দেশ্য এবং অভীপ্সার পার্থক্য এখানে অবিশ্বাস্য রকমের

গভীর। ট্যানার তাই ওকটাভিয়াসকে সতর্ক করে,—বলে সাবধান হও এ্যান, তোমাকে বিয়ে করার মতলব করছে—

"ট্যানার—ট্যাভি, স্ত্রীলোকের মনোভঙ্গীর এ এক শয়তানি দিক, ওরা এমন অবস্থা সৃষ্টি করে যার ফলে তুমি আত্মসংহারে সচেষ্ট হও।

ওকটাভিয়াস—কিন্তু এ তো সংহার নয়, এ যে পরিপূর্তি!

ট্যানার—হ্যাঁ, কিন্তু তারই উদ্দেশ্যের পরিপূর্তি! সেই উদ্দেশ্যের অর্থ তোমার বা তার শান্তি নয়—সে শান্তি প্রকৃতির। নারীর সজীবত্ব সৃষ্টির অন্ধ আক্রোশ। নারী এইখানে আত্মবলিদান দেয়—তোমার কি মনে হয় তোমাকে বলি দিতে তার বাধবে?

ওকটাভিয়াস—কেন? আত্মবলিদান দিতে পারে বলেই যাকে সে ভালোবেসে তাকে বলি না দিতেও পারে।

ট্যানার—সেইটুকুই নিদারুণতম ভুল, ট্যাভি ···"

এই সংলাপ প্রশ্ন চিহ্নে পরিপূর্ণ! শ'র মতে নারী প্রকৃতির কাছে আত্মবিক্রয় করে, এমন এক প্রচণ্ড শক্তির কাছে পরাভূত থাকে প্রতিহত করার ক্ষমতা তার নেই। যে-পুরুষকে নারী ক্রীতদাস করতে চায় সে নিজেও তার মত সহায়হীনা।

কিন্তু আর্টিষ্ট পুরুষও নিজের উদ্দেশ্য সাধনে কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞান-বর্জিত হয়ে ওঠে, একথাও ট্যানার বলেছেন—The true artist will let his wife starve, his children go bare foot, his mother drudge for his living at seventy sooner than work at anything but his art.

Man and Superman ইংরাজী নাট্য-সাহিত্যের এক বিশিষ্ট পথচিহ্ন। দার্শনিক চিন্তাধারা এই সর্বপ্রথম নাটকায়িত হল। এই নাটক পুরুষকে আনন্দ দান করেছে, নারীকে বিরক্ত করেছে। হ্যাটরে বলেছেন, এই বিষয়ে তিনি যখন বক্তৃতা করেন তখন উত্তেজিত হয়ে একটি মহিলা বলেছিলেন—"আমরা জানি এ সব সত্য, কিন্তু পুরুষরা এসব জানুক তা আমরা চাই না।"

এই নাটকের ভূমিকায় শ' সর্বপ্রথম তাঁর Life-Force সংক্রান্ত মতবাদ প্রচারিত করেন। বের্গস'র Elan Vital (সৃজনীমূলক বিবর্তন) মতবাদ থেকেই Life-Force-এর উৎপত্তি। এই নাটকের ভূমিকার প্রতিটি লাইন মূল্যবান।

বার্ণার্ড শ'র কাছে এই ধর্ম,—এই ধর্মের তিনি প্রচারক। Life-Force বলতে বার্ণার্ড শ' কি বলতে চেয়েছেন তা বোঝা সহজ নয়। শ' কি ঈশ্বরবিশ্বাসী? এই প্রশ্ন মনে জাগতে পারে—তাঁর সমসাময়িকরা বলেছেন, এক অদৃশ্য পরমা শক্তিতে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। যাঁরা ঈশ্বরে বিশ্বাসী তাঁরা ঈশ্বরের শক্তি-সামর্থ্য ক্রিয়া-কলাপ সম্পর্কে অবহিত। কিন্তু শ'র Life-Force-এর শক্তির পরিমাণ কতটুকু সে সম্পর্কে তিনি নিজে কিছুই বলেননি।

শ'র মতবাদ অনুসারে তাই ঈশ্বর পরাভূত অসৎ শক্তির কাছে, অসতের অস্তিত্ব প্রমাণ করে যে ঈশ্বর সর্বগুণান্বিত ন'ন, তবে নিখুঁত হওয়ার জন্ত সচেষ্ট।

এ ধরণের নাটক এর আগে আর মঞ্চস্থ হয়নি, দর্শক-সাধারণের পক্ষে এই নাটক বুঝতেও সময় লেগেছে—তারপর যখন মূল বক্তব্য বেশ বোধগম্য হয়েছে, আঙ্গিকের বৈচিত্র্য ও সংলাপের বৈশিষ্ট্য মনে লেগেছে, তখন দর্শক নাট্যকারকে অভিনন্দিত করেছেন। সাহিত্যের ইতিহাসে বার্ণার্ড শ'ই একমাত্র লেখক—যিনি তাঁর দর্শক, পাঠক, অভিনেতা স্বহস্তে গড়েছেন।

আট

The Devils Disciple-এর মতো বার্ণার্ড শ' তাঁর Man and Superman নাটকের জন্ত বিশেষ অর্থ লাভ করেছেন আমেরিকা থেকে। এর জন্ত বার্ণার্ড শ'র তরুণ ভক্ত রবার্ট লোরেনের কৃতিত্ব সমধিক। রোমান্টিক ভূমিকায় অভিনেতা হিসাবে লোরেন খ্যাতি লাভ করেছিলেন, লোরেন ছিলেন সুপুরুষ, তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল মধুর। লোরেনের পিতৃদেবও ছিলেন একজন অভিনেতা। বিচিত্র জীবন ছিল লোরেনের। তিনি বুয়র যুদ্ধ এবং প্রথম মহাযুদ্ধে যোগদান করেছিলেন, বৈমানিক হিসাবেও তিনি একজন পথিকৃৎ। আইরিশ সাগরে তাঁর বিমান পড়ে যাওয়ায় একবার জীবন বিপন্ন হয়েছিল।

বুয়র যুদ্ধের শেষে তিনি মার্কিণ রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হন। অচিরেই তাঁর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি হয়। অবশ্য এই জনপ্রিয়তা এবং আকৃতির প্রশংসা তাঁর আন্তরিক বিরক্তির কারণ হয়। এমন সময় তাঁর হাতে এল Man and Superman,—উত্তেজনায় আকুল হয়ে উঠলেন লোরেন, তিনি লিখেছেন—

"জীবিকার জন্ত নতুন কোনও পথ খুঁজছিলাম মরিয়া হয়ে, এমন সময় বোষ্টন থেকে ন্যু ইয়র্ক যাচ্ছিলাম এমন সময় পড়লাম Man and Superman—'ইউরেকা' (পেয়েছি) বলে চীৎকার করেছিলাম কি না জানি না, তবে বুঝলাম এ এক অপরূপ নাটক, রঙ্গমঞ্চে এর সাফল্য হতে বাধ্য—ট্রেনের করিডোরে আমি আনন্দে পদচারণা করে নৃত্য করলাম। নাটকটির চমৎকারিত্বে আমি অভিভূত হলাম—এই মহৎ নাটকের প্রযোজনা এবং অভিনয় করার জন্ত আমি আকুল হয়ে উঠলাম। বুঝেছিলাম এ নাটকে আমার সৌভাগ্য সাফল্য এবং যশোলাভ অনিবার্য।"

ন্যু ইয়র্কের থিয়েটার-ম্যানেজাররা কিন্তু এত উৎসাহ বোধ করলেন না, ব্যবসার দিক থেকে এর সাফল্য সম্বন্ধে তাঁরা সন্দিহান। তাঁরা লোরেনের প্রস্তাবটিকে বাতুলতা মনে করলেন। এর মধ্যে নাটকীয় বিষয়বস্তু কই, খালি বক্তৃতা।

লোরেনও ছাড়বার পাত্র নন, তিনি বললেন—তাহলে Arms and the Man এবং The Devils Disciple নাটক নিয়ে ম্যানসফিল্ড কি করে সাফল্য লাভ করলেন?

থিয়েটার-কর্তৃপক্ষরা বললেন, সেটা নাটকের গুণ নয়, ম্যানসফিল্ডের অভিনয়-দক্ষতাই তার জন্ত দায়ী।

হতাশ হওয়ার পাত্র নন লোরেন, তিনি পনের জন বিভিন্ন ম্যানেজারকে নাটকটি পড়ে শোনালেন। তাঁরা সকলে অভিনেতা লোরেনকে গ্রহণ করতে আগ্রহান্বিত, কিন্তু শ'র নাটক নিয়ে নয়।

লী সুবার্ট একজন বিখ্যাত ষ্টেজ-ম্যানেজার, তিনি লোরেনের কাছ থেকে দু'বার নাটকটি শুনলেন, তার পর বললেন—"বেশ ছোট শহরে, দ্বিতীয় শ্রেণীর নট-নটী সহযোগে অভিনয় করে দেখা যাক্।"

লোরেন প্রতিবাদ করলেন—"তা হয় না, যদি অভিনয় করতেই

য়, তাহলে শ্রেষ্ঠ মঞ্চে প্রথম শ্রেণীর নট-নটী দিয়েই এই নাটক অভিনয় করতে হবে, দৃশ্য পর্যন্ত করতে হবে চমকপ্রদ।"

লী সুবার্ট শেষ পর্যন্ত রাজী হলেন না। লোরেন হাল ছাড়লেন না, এই উদ্দেশ্যে নিউইয়র্কে আশানুরূপ অর্থ সংগ্রহের সম্ভাবনা না থাকায় লোরেন লণ্ডনে চলে এলেন।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দ, কোর্ট থিয়েটারের প্রথম অধিবেশনে তখন Man and Superman অভিনীত হচ্ছে। লোরেন অভিনয় দেখতে গেলেন। গ্রানভিল বার্কারের প্রযোজনা তাঁর ভালো লাগল না।

বারান্দায় দেখা হল বার্ণার্ড শ'র সঙ্গে। বার্ণার্ড শ'র সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎকারের বর্ণনা অতি চমৎকার ভাবে তিনি লিখেছেন। তিনি বলেছেন—"এই আশ্চর্য মানুষটির প্রচণ্ড প্রাণশক্তি এবং অধ্যাত্মশক্তিতে আমি বিস্মিত হলাম। এমনটি আর দেখিনি।"

এই লণ্ডনেই চার্লস ফ্রোমান নামক জনৈক বৃদ্ধ ইহুদীর সঙ্গে স্যাভয় হোটেলে আলাপ হল রবার্ট লোরেনের। তিনি এমনই সৎ মানুষ ছিলেন যে, তাঁর সঙ্গে কারো চুক্তিপত্র সই করতে হয়নি, তার কথাই ছিল যথেষ্ট।

সেদিন স্যাভয় হোটেল থেকে হাসিমুখে ফিরলেন লোরেন, ফ্রোমান রাজী হলেন নিউইয়র্কের রঙ্গমঞ্চে Man and Superman নাটকের জন্ম আর্থিক সাহায্য করতে! অথচ লোরেনকে নাটকটি পড়ে শোনাতে হয়নি ফ্রোমানকে।

মহা উৎসাহে লোরেন নাটকটির প্রযোজনার ব্যবস্থা সুরু করলেন, যা সর্বশ্রেষ্ঠ তাই তাঁর চাই। ভূমিকা বণ্টনের পর বার বার নট-নটী পরিবর্তন করেছেন, কিছুতেই অভিনয় মনঃপূত হয় না, বহু অর্থ ব্যয়ে বিভিন্ন অঞ্চলের নট-নটীকে সংগ্রহ করলেন।

এমন এক আশ্চর্য প্রযোজক ফ্রোমান আর দেখেন নি, তিনি শংকিত হলেন, এইবার অর্থক্ষতি অনিবার্য।

১৯০৫-এর সেপটেম্বরে নু্য ইয়র্কের হাডসন থিয়েটারে Man and Superman অভিনীত হ'ল, ট্যানারের ভূমিকায় নামলেন স্বয়ং লোরেন। এই রঙ্গমঞ্চে ন'মাস ধরে নাটকটি অভিনীত হল। প্রথম থেকেই সাফল্যের লক্ষণ দেখা গেল, প্রথম মাসেই যে পরিমাণ অর্থলাভ হল, আমেরিকার রঙ্গমঞ্চে তা অভূতপূর্ব!

১৯০৬-এর সেপ্টেম্বরে এই নাটক নিয়ে সাত মাস ভ্রাম্যমাণ দল নিয়ে অভিনয় করলেন, তাঁর নিজস্ব লাভ চল্লিশ হাজার পাউণ্ড। কিন্তু এইখানেই শেষ নয়, ১৯০৭-এর জুন মাসে লণ্ডনে কোর্ট থিয়েটারে লোরেনের প্রযোজনায় এই নাটক অভিনীত হল, সুদীর্ঘ তৃতীয় অঙ্কসহ। লোরেন এইবার ডন জুয়ানের ভূমিকা গ্রহণ করলেন।

শ্যালিকা লেডী চাম্‌লীর খেয়াল চরিতার্থ করার জন্ম এই বিশেষ দিনটিতে বার্ণার্ড শ' বার্কার, লোরেন এবং শ্যালিকা সহ বেলুনে উঠলেন।

ওয়ানডস্‌ওয়ার্থ গ্যাস ওয়ার্কস থেকে বেলুন আকাশে উঠল, বৈমানিক বেলুনটিকে এমন টানলেন যে আতংকে বার্ণার্ড শ'র মুখ ম্লান হয়ে গেল—১০০০ ফিট ওপরে উঠে হাওয়ার গতিতে এক গৃহস্থের বাগানে গাছের ধাক্কা খেয়ে বেলুন মাটিতে পড়ল। ভদ্রলোকের চমৎকার মাঠটি জনতার ভিড়ে নষ্ট হয়ে গেল।

বিরক্ত গৃহস্বামীর হাত থেকে লোরেনকে উদ্ধার করলেন বার্ণার্ড শ'। মার্জনাভিক্ষার পর বার্ণার্ড শ'কে সদলবলে অতিথি সৎকারে আপ্যায়িত করলেন ভদ্রলোক।

বিপর্যয় এবং দুর্ঘটনার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেলেন বার্ণার্ড শ' এবং তাঁর বন্ধুবর্গ।

আবার আর একবার বিপদে পড়েছিলেন এই রবার্ট লোরেনের সহযোগে। সে বারও বিচিত্র অবস্থায় বার্ণার্ড শ'র জীবন রক্ষা হয়েছিল।

মেভাগিসে দু' বছর গ্রীষ্ম যাপন করেছিলেন শ'-দম্পতি। ১৯০৭-এ রবার্ট লোরেন ওঁদের অতিথি হয়েছিলেন। ছোট ম্যাকসওয়েল মোটর গাড়িতে ঘুরে বেড়াতেন, বার্ণার্ড শ' শিশুর মতো আনন্দে অসংখ্য ফটো তুলতেন, মহানন্দে দিন কাটতো।

এরই পরের বছর ওয়েলসের লানবেদরে দু'-এক সপ্তাহের জন্ত এলেন লোরেন। পাহাড়ে পাহাড়ে সারা দিন ঘুরতেন সবাই। অতি প্রাতে উঠে শ' বেড়াতে যেতেন এবং ব্রেকফাষ্টের আগে ফিরতেন আর রাত দশটার মধ্যে সবাই শুয়ে পড়তেন।

রাত সাতটায় ডিনার সেরে পড়ার ঘরে বসতেন সবাই, মিসেস শ' পড়তেন দর্শনশাস্ত্র, শ' এক কোণে বসে লিখতেন বা পড়তেন, আর এক ধারে বসে লোরেন পড়াশোনা করতেন। প্রতিদিন প্রাতে সাড়ে দশটার সময় ওঁরা স্নান করতেন।

এক দিন জোয়ার-স্রোতে উভয়েই ভেসে গেলেন, পরিশ্রান্ত ও অবসন্ন হয়ে সাঁতার কাটারও আর ক্ষমতা নেই।

পরে লোরেন প্রশ্ন করেছিলেন—"ডুবে যাওয়ার সময় নাকি সমগ্র জীবনের প্রতিচ্ছবি চোখের সামনে ভেসে ওঠে, এমনই একটা কুসংস্কার আছে, আপনার কি মনে হল?"

শ' বললেন—"প্রায় হয়ে গিছল আর কি! এ সব আমার মনে আসে নি।"

—"বটে? ঈশ্বর, স্বর্গ বা নরক এমনই কিছু?"

—"না, মৃত্যুর মুখোমুখি পৌঁছে কি রূপ-কথার কাহিনী মনে আসে? আমি কয়েকটি প্রয়োজনীয় কথা স্মরণ করেছি। যেমন তোমাকে বলতে চেয়েছিলাম আর সাঁতার দিও না। কিন্তু তুমি অনেক দূরে, সমুদ্র গর্জনে কিছু শুনতে পেলে না। তারপর মনে হল চীৎকার করলেও কি কেউ শুনবে? কাছাকাছি কেউ নেই। আর মনে হল আমার উইলে আমার গ্রন্থ অনুবাদকদের জন্ত কোনো চুক্তির ব্যবস্থা করা হয় নি এবং লাঞ্চের সময় উত্তীর্ণ হলে ফিরছি না কেন, এই কথা সার্লোট হয়ত চিন্তা করছে। এমন সময় পায়ে একটা পাথর ঠেকল, আমি ঈশ্বরের নাম না করে বলে উঠলাম—ড্যাম্। তারপর তুমি নেই, ভাবলাম আমার কর্তব্য তোমাকে উদ্ধার করা, কিন্তু সে শক্তি নেই, একা ফিরলে লোকে কি বলবে—তারপর দেখি তুমি পাশেই দাঁড়িয়ে, যাই হোক, খুব বেঁচে গেছি।"

[ক্রমশঃ।
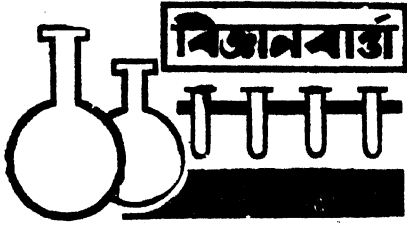
পক্ষধর মিশ্র

অনেক দিন পরে আবার মহাকাশের খবরাখবর নিতে বসেছি।

রাশিয়ার এবং আমেরিকার কৃত্রিম উপগ্রহগুলির মহাকাশ পরিভ্রমণের ফলে যে সব মূল্যবান তথ্যাবলী পাওয়া গিয়েছে, তাই এবার সংক্ষেপে বিবৃত করছি। এই সব তথ্য বেতার সঙ্কেতের মাধ্যমে বিজ্ঞানীদের গোচরে আসতে সক্ষম হয়েছে। কৃত্রিম উপগ্রহের ভিতর অবস্থিত যন্ত্রপাতির ক্রিয়াকলাপ নির্ভরযোগ্য এবং নিশ্চিত করবার জন্য শীততাপ-নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে তাদের অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে রাখা হয়েছিল।

রাশিয়ার বিজ্ঞানীরা স্পুটনিকের সহায়তায় মহাজাগতিক রশ্মি বিষয়ক বহু মূল্যবান গবেষণা চালিয়েছেন। মহাজাগতিক রশ্মির বিশেষ বিশ্লেষণ দ্বারা তাঁরা যে বিষুবরেখার অবস্থান নির্ণয় করেছেন, তার সঙ্গে ভূ-চুম্বক বিষুবরেখার পার্থক্য বিদ্যমান। পৃথিবীপৃষ্ঠের নিকটে অবস্থিত চুম্বকক্ষেত্রের প্রভাবের ফলে আমরা যে বিষুবরেখার সন্ধান পাই, তা মহাকাশের বুকে বিচরণশীল মহাজাগতিক রশ্মির চরিত্রকে নিয়ন্ত্রিত করে না বলেই নির্ণীত এই উভয় বিষুবরেখার মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। পৃথিবী থেকে অনেক উচ্চে অবস্থিত চুম্বকক্ষেত্র মহাজাগতিক রশ্মির উপর প্রভাব বিস্তার করে, তাই মহাজাগতিক রশ্মির মাধ্যমে অতি উচ্চে অবস্থিত এই চুম্বকক্ষেত্রকে পরীক্ষা করা যায়। স্পুটনিকের সহায়তায় অতি উচ্চের বায়ুমণ্ডলে বিদ্যুৎতরঙ্গ বিকিরণের অনেক তারতম্য লক্ষ্য করা গিয়েছে।

জীবন্ত প্রাণীর উপর মহাকাশের কি প্রভাব, তা নির্ধারণ করবার জন্য দ্বিতীয় স্পুটনিকের সঙ্গে একটি কুকুর পাঠান হয়েছিল। দেখা গিয়েছে, কৃত্রিম উপগ্রহ কক্ষপথে যাত্রা করার এবং কক্ষপথ পরিভ্রমণ করার সময় ঐ প্রাণিদেহের রক্ত চলাচল ও নিশ্বাস-প্রশ্বাস জীবনের অনুপযুক্ত কোনরকম অস্বাভাবিক পরিবেশের সৃষ্টি করেনি। স্পুটনিকের মহাকাশ পরিভ্রমণের সর্বপ্রকার অবস্থায়ই প্রেরিত কুকুরটি মোটামুটি ভালোই ছিল। স্পুটনিকটির মহাকাশে যাত্রা করার পথে কুকুরটির দেহের কার্য্যকলাপ কি ধরণের হয় তা জানবার জন্য বিজ্ঞানীরা বিশেষ ভাবে উৎসুক ছিলেন। প্রচণ্ড গতিতে উপগ্রহটি মহাশূন্যের দিকে ছুঁড়ে দেওয়া হলো, এই সময় রকেটটির গতিবেগের ত্বরণ মাধ্যাকর্ষণ শক্তির ত্বরণের চেয়ে অনেক বেশী ছিল। স্পুটনিক থেকে প্রাপ্ত ফলাফলের দ্বারা দেখা গিয়েছে, কুকুরটির ওজন ত্বরণের বৃদ্ধিহারের অনুপাতে বৃদ্ধিলাভ করেছিল। ত্বরণের হার একটি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ হলেই দেখা গিয়েছে দেহের তৎকালীন ওজন তার বৃদ্ধি প্রতিরোধ করে। রাশিয়ার বিজ্ঞানীদের পরিবেশিত সংবাদে জানা যায়, ওজন বৃদ্ধির ফলে জন্তুটি মেঝের উপর চেপে পড়ে ছিল এবং এর বিশেষ কোন নড়াচড়া লক্ষ্য করা যায় নি। কক্ষপথে উঠার পর যে কেন্দ্রবিমুখী শক্তি স্পুটনিকের কার্য্যকলাপের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল, তার সঙ্গে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির কাটাকুটি হয়ে যাওয়ার জন্য এক ওজনবিহীন পরিবেশের সৃষ্টি হয়। প্রাণীর দেহ আর মেঝের উপর চেপে থাকে না, সে সাবলীল ভাবে নড়াচড়া করতে পারে। যদিও এই অবস্থায় স্পুটনিকে অবস্থিত কুকুরটির খুব সামান্য নড়াচড়াই পরিলক্ষিত হয়েছিল।

* * * *

রাশিয়ার বিজ্ঞানীরা অন্যান্য আর যা তথ্য সংগ্রহ করেছেন তা এবার তাঁদের প্রচার-দপ্তরের ভাষাতেই এখানে তুলে দিচ্ছি:

"স্পুৎনিক হইতে প্রাপ্ত সঙ্কেত উদ্ধার করার পর দেখা যায়, ক্ষেপণের পর মুহূর্ত্তেই হৃৎপিণ্ডের সঙ্কুচনের পৌনঃপুন্য প্রায় তিন গুণ বৃদ্ধি প্রায়। বৈদ্যুতিক হৃল্লিখ বিশ্লেষণ করিয়া কোনরূপ বিকারের লক্ষণ দেখা যায় নাই। এক অদ্ভুত রকমের বর্দ্ধিত হৃদঘাত দেখা যায় (তথাকথিত সাইনাসয়ডাল ট্যাকিকার্ডিয়া), পরে, ত্বরণের ফল চলিতে থাকে, এমন কি বৃদ্ধিও পায়, হৃদঘাতের পৌনঃপুন্য হ্রাস পায়। টেলিমিটারের সঙ্কেত লিপি হইতে দেখা যায়, স্পুৎনিক কক্ষপথে স্থাপিত হইলে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের পৌনঃপুন্য ক্ষেপণকালের অপেক্ষা তিন চার গুণ বৃদ্ধি পায়।

"স্পুৎনিক কক্ষপথে উঠিলে, যে অপকেন্দ্রিক শক্তির প্রভাব স্পুৎনিকের উপর ছিল, সে শক্তি পৃথিবীর অভিকর্ষ শক্তি বিনষ্ট করিয়া দেয় এবং একরূপ ওজনবিহীন অবস্থা দেখা দেয়।...বর্দ্ধিত ওজনের ফলে জন্তুটির বুক মেঝের সঙ্গে চাপিয়া ছিল, এবার আর সে অবস্থা নাই, ফলে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের পৌনঃপুন্য হ্রাস পায়। সামান্য কাল হৃদ্ঘাত ত্বরণের পর ক্রমেই ইহা কমিতে থাকে এবং শেষ পর্য্যন্ত হৃদঘাতের পৌনঃপুন্য প্রায় স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসে। অবশ্য ইহা ঘটিতে পরীক্ষাগারে পরীক্ষাকালের প্রায় তিন গুণ সময় লাগে।"

* * * *

কক্ষপথে যাত্রা এবং ওজনবিহীন অবস্থায় কক্ষপথে পরিভ্রমণকালে দ্বিতীয় স্পুটনিকের সঙ্গে অবস্থিত কুকুরটির দেহের কার্য্যকলাপ মোটামুটি স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু বিজ্ঞানীদের মনে সন্দেহ জেগেছে যে, গ্রহান্তরের কর্ম্মক্ষেত্রে দীর্ঘকাল ধরে এই ওজনবিহীন পরিবেশে প্রাণী বাস করতে পারবে কি না? রাশিয়ার বিজ্ঞানীরা এই জন্য এমন নিখুঁত ভাবে আবদ্ধ কক্ষ নির্ম্মাণ করতে চেষ্টা করেছেন যাতে এই সমস্যার সমাধান হওয়া সম্ভব। এই কক্ষে শতকরা ২০ থেকে ৪০ ভাগ অক্সিজেন এবং ১ ভাগ কার্বণ-ডাই-অক্সাইড মিশ্রিত গ্যাসের সহায়তায় বায়ুকে সর্বদাই গ্রহণযোগ্য করে রাখা হবে এবং এই বায়ুর চাপ স্বাভাবিক পর্য্যায়ে থাকবে। কক্ষে রাসায়নিক দ্রব্যের সাহায্যে বাষ্প এবং কার্বণ-ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে নেওয়া হবে এবং তার সঙ্গে চলবে অক্সিজেনের উৎপাদন। বিজ্ঞানীরা আশা করেন, এই ধরণের কক্ষ নির্ম্মাণ করে তাঁরা মানুষকে দীর্ঘকালের জন্য মহাকাশের কোন অঞ্চলে নিশ্চিত নিরাপদে অবস্থান করবার সুযোগ এবং সুবিধা করে দিতে সক্ষম হবেন।

* * * *

দ্বিতীয় স্পুটনিকের সঙ্গে কুকুর লাইকা মহাশূন্যে যাত্রা করেছিল কিন্তু তাকে আর ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয় নি। লাইকার অপমৃত্যুতে

শ্বের কুকুরপ্রেমিকরা অশ্রুজল বিসর্জ্জন করেছিলেন,—আজও কলে বিজ্ঞান সভ্যতার জয়যাত্রার জন্ত অবোধ এই প্রাণীটির াত্মবিসর্জ্জনের কথা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেন। লাইকার াত্মবিসর্জ্জনের মধ্যে দিয়ে মহাকাশ বিজয়ের বিরাট এক সমস্যা জ্ঞানী মহলের কাছে আরও প্রকট হয়ে উঠেছে। যে কৃত্রিম পগ্রহকে মহাকাশে পাঠানো হবে তাকে যে করেই হোক আবার থিবীর বুকে ফিরিয়ে আনা চাই। তা না হলে এই পথে আর গ্রসর হওয়া চলবে না। মহাশূন্যের গোপন চরিত্রের চূড়ান্ত দ্ঘাটনের জন্ত প্রাণীকে এবং শেষে মানুষকে পর্য্যন্ত নিশ্চয়ই পগ্রহের সঙ্গে পাঠাতে হবে কিন্তু তাকে ফিরিয়ে না আনতে পারলে ধরণের প্রাণিহত্যা গবেষণার নামে করতে বিজ্ঞানীদেরই ন চাইবে না। কোন বিজ্ঞানী যদি লাইকার পরিবর্ত্তে আত্মবিসর্জ্জন দতেন তাহলে বিজ্ঞানী মহল ফিরিয়ে আনার সমস্যার সমাধান না টিয়ে এই দায়িত্ব দ্বিতীয় বার দিতে বোধ হয় চাইতেন না। াশিয়ার বিজ্ঞানীদের মনে লাইকার মৃত্যুও কম আঘাত দেয়নি, এই ারণেই বোধ হয় বিশালকায় তৃতীয় স্পুটনিকের সঙ্গে কোন প্রাণীকে াঠান হয়নি। তাঁরা উঠে-পড়ে লেগেছেন, যেমন করেই হোক পগ্রহকে ফিরিয়ে আনতে হবে। মহাকাশ বিজয়ের গবেষণার পথে ফিরিয়ে আনার সমস্যা এ যুগের বিজ্ঞানীদের এক কঠিন পরীক্ষার ম্মুখীন করেছে।

উপগ্রহকে ফিরিয়ে আনার জন্ত রুশিয়ার বিজ্ঞানীরা এক নতুন রিকল্পনা রচনা করেছেন। ঢালু ডানাযুক্ত জেট চালিত একটি কেট বিমান পৃথিবীর উপরে উড়ান হবে। উড়ন্ত রকেট বিমানের তি সেকেণ্ডে পাঁচ মাইল হলেই এর ইঞ্জিন যাবে বন্ধ হয়ে এবং এটি ত্রিম উপগ্রহের ন্যায় পৃথিবীকে পরিভ্রমণ করতে থাকবে। এর পর মানের সামনের দিকে রকেট বিস্ফোরণের সহায়তায় গতি কমিয়ে ওয়া হলেই রকেট বিমানটি মাধ্যাকর্ষণের সহায়তায় পৃথিবীর দিকে ামতে শুরু করবে। সহজ অবতরণের কাজে বিশেষ ভাবে নির্ম্মিত ানা এবং ইঞ্জিন থেকে বিমানটি অনেক সহায়তা পাবে। ঘন ায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করলেই বায়ুর ঘর্ষণে রকেট বিমানটি উঠবে গরম য়ে। এই গরম বিমানটিকে ঠাণ্ডা না করে একেবারে নামিয়ে ানা সম্ভব নয়, কারণ এই চেষ্টায় উত্তপ্ত বিমানটি জ্বলে যাবে। তাই কে ঘন বায়ুমণ্ডল থেকে হাল্কা বায়ুমণ্ডলের স্তরে উঠিয়ে ঠাণ্ডা রতে হবে। এর ফলে অবশ্য রকেট বিমানটি তার পূর্ব্বের উচ্চতায় ঠবে না। ঠাণ্ডা হলে আবার নামিয়ে আনা হবে ঘন বায়ুমণ্ডলে, বেশী নামতে গিয়ে গরম হয়ে উঠলেই ঠাণ্ডা করার জন্ত তোলা হবে উপরে। এই রকেট বিমানটি যতক্ষণ না পর্য্যন্ত সাধারণ বিমানের গতিবেগ প্রাপ্ত হয়ে সহজ উপায়ে পৃথিবীর উপরে অবতরণ করে ততক্ষণ এই পদ্ধতি থাকবে চলতে। বিজ্ঞানীরা আশা করছেন, ক্রমাগত উঠা-নামার জন্ত তীব্র গতিবেগ হারিয়ে সাধারণ বিমানের গতিবেগ পেতে রকেট বিমানটির খুব বেশী সময় বোধ হয় লাগবে না। নিথরজলের উপরিভাগ ছুঁয়ে একটা ঢিল ছুড়ে দিলে, ঢিলটি যে রকম উঠ-নামা করে, রকেট বিমানের উঠা-নামাও দেখতে হবে প্রায় একই রকম। এই ভাবেই কৃত্রিম উপগ্রহকে নামিয়ে আনার চেষ্টা করা হবে।

* * * *

আমেরিকার বিজ্ঞানীরাও মহাজাগতিক রশ্মি বিষয়ক তথ্যাবলী তাঁদের কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে বেতার সঙ্কেতের মাধ্যমে লাভ করেছেন। এই সব সঙ্কেত তাঁরা টেপ রেকর্ডের সহায়তায় লিপিবদ্ধ করেন এবং তাদের বিশ্লেষণকার্য্য মোটামুটি সমাপ্ত হয়েছে। আইওয়া স্টেট্ ইউনিভারসিটির পদার্থ-বিজ্ঞানী অধ্যাপক যোশেফ কাস্পার (Joseph Kasper) টেপ রেকর্ড থেকে হিসেব করে জানিয়েছেন যে, মহাশূন্যে মহাজাগতিক রশ্মির প্রভাব পৃথিবীর উপরিভাগের চেয়ে প্রায় চারগুণ বেশী। রশ্মির আঘাত মহাকাশে প্রচণ্ডতর হলেও মনে হয় মানুষের উপর এই পরিমাণ মহাজাগতিক রশ্মির প্রভাব বিশেষ কিছু ক্ষতিকারক হবে না। জাপানী বিজ্ঞানীরাও মার্কিণ উপগ্রহের সঙ্কেতধ্বনি টেপ রেকর্ড করেছিলেন এবং তাদের প্রাপ্ত ফলাফল শোনা যাচ্ছে, মার্কিণ বিজ্ঞানীদের পর্য্যবেক্ষণ থেকে কিছু পৃথক। জাপানী বিজ্ঞানীদের গৃহীত সঙ্কেতধ্বনির রেকর্ড আমেরিকার বিজ্ঞানীদের কাছে পাঠান হয়েছে। উভয় বিজ্ঞানীদের আলোচনা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে আশা করা যায়, শীঘ্রই এই পার্থক্যের কারণ প্রকাশিত হবে। আয়েনোস্ফীয়ার বা বিদ্যুৎসমুদ্র বিষয়ক অনেক মূল্যবান তথ্যাবলীও আমেরিকার কৃত্রিম উপগ্রহ কর্ত্তৃক প্রেরিত হয়ে মানবসমাজের জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধিশালী করেছে। মার্কিণ উপগ্রহ প্রতিদিন ১২ বার বিদ্যুৎ-সমুদ্রের সীমানা ছাড়িয়ে যাচ্ছে এবং তার সঙ্কেত পৃথিবীতে আসছে এই বিদ্যুৎসমুদ্র ভেদ করেই। ভেদ করার সময় বিদ্যুৎসমুদ্রের প্রভাবে বেতার সঙ্কেতের পথের যে পরিবর্ত্তন হয় তাই বিচার বিশ্লেষণ করে বিদ্যুৎসমুদ্রের উপাদান, প্রতিক্রিয়া ও চরিত্র বিষয়ক অনেক গোপন তথ্যাবলীর সন্ধান পাবার আশা বিজ্ঞানীরা করছেন।

অল্পবিত্তের গ্লানি

শ্রীজগদীশচন্দ্র দাশ

শ্যামবাজারের ফুটপাথে
থাম-সংলগ্ন এক বৃহৎ আরসিতে
শীর্ণা ভিখারিণীর কালো দাঁতের বাহার।
অদূরে মৃত পচনশীল ইঁদুরের প্রতি
সতর্ক কাকের নিষ্ঠা।
আমি জীবনের হাতে বন্দী
এক অর্দ্ধবেকার।
তিনটি বিচ্ছিন্ন দৃশ্য
বিশ্বের এক সূত্রে গ্রথিত।
আমার বাড়ীতে আয়না নেই,
মনে নেই কাকের নিষ্ঠা।
আছে ইঁদুরের লোভ।
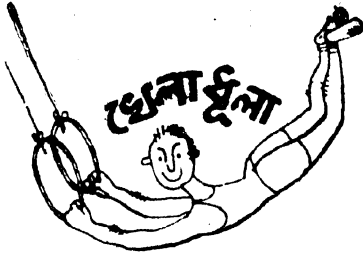
গত সংখ্যায় উল্লেখ করেছিলাম ক'লকাতা মাঠে প্রথম ডিভিসন লীগ খেলা সম্পর্কে আলোচনা করব।

সামগ্রিক ভাবে আলোচনা করলে দেখা যাবে, তরুণ খেলোয়াড়-পুষ্ট ইষ্টার্ণ রেল দলের কৃতিত্ব সত্যই প্রশংসার দাবী রাখে।

ইষ্টার্ণ রেল দলের কাছে দু' বারই মহামেডান দলকে পরাজয় স্বীকার করে নিতে হয়েছে এবং মোহনবাগান দলের অপরাজয়ের গৌরবকে ফিরতি খেলায় ক্ষুণ্ণ করে দিয়ে কম কৃতিত্বের পরিচয় দেয়নি। ইষ্টবেঙ্গল দলের সংগে রেল দলের ফিরতি ম্যাচের অপরিত্যক্ত খেলার ফলাফল আই, এফ, এ কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করেনি। এ খেলায় রেল দলকে বিজয়ী বলে ঘোষণা করলে রেল দলই লীগ চ্যাম্পিয়ানের আখ্যা লাভ করবে। রেল দলের এ সম্মানে প্রতিটি বাঙালীরই খুসী হওয়ার কথা। কারণ, ইতিপূর্ব্বে এগার জন বাঙালী খেলোয়াড় নিয়ে কোন দলই লীগ বিজয়ের গৌরব অর্জ্জন করতে পারেনি।

রেল দলের বাঙালী খেলোয়াড়রা প্রমাণ করে দিলো ক'লকাতা মাঠে বহিরাগত খেলোয়াড়ের বিশেষ কোন প্রয়োজন নেই। সুযোগ এবং সুবিধা পেলে বাঙালীর ছেলেরা যে কোন প্রদেশের ছেলে অপেক্ষা ভাল খেলতে পারে। এ নিদর্শন থেকে ক'লকাতার বড় বড় ক্লাব-কর্ত্তৃপক্ষরা বাঙালী তরুণ খেলোয়াড় সংগ্রহ করার দিকে লক্ষ্য করলে বাংলার ক্রীড়ামান নিঃসন্দেহে উন্নত হবে।

বহিরাগত খেলোয়াড়দের পিছনে বড় বড় ক্লাবগুলি যে হারে খরচ করেন, ঠিক সেই হারে খরচ করলে কিছু ভাল বাঙালী খেলোয়াড়দের সন্ধান পাওয়া যাবে ও বাঙালীর ছেলেরা অধিক ভাবে খেলার দিকে মনোযোগ দেবে।

কর্ত্তৃপক্ষরা হয়ত বলবেন, ঠিক মত বাঙালী খেলোয়াড় না পাওয়ার দরুণ বাইরে থেকে খেলোয়াড় আনাতে হয়। আমি বলব, তাঁরা খেলোয়াড় পান না নানান কারণে। তার কয়েকটি মূল কারণ নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব।

প্রথমতঃ অর্থনৈতিক অবস্থা। বাঙালীর অর্থনৈতিক কাঠামো দিন দিন ভেঙে পড়ছে। তাই বাড়ীর অভিভাবকদের কাছে খেলাধুলা বিলাস মাত্র। অভিভাবকরা ছেলেদের খেলাধুলার দিকে উৎসাহ দিতে পারেন না। বাঙালীকে লেখাপড়া শিখে কোনরকমে সংসারকে অর্থসংকট থেকে উদ্ধার করার জন্ত সবিশেষ মনোযোগী হতে হয়। লক্ষ্য করে দেখলে দেখতে পাওয়া যাবে, কোন ছেলে স্কুল এবং কলেজ-জীবনে বেশ ভালই খেলছিলো। ঠিক মত সুযোগ-সুবিধা পেলে সে হয়তো একজন বড় খেলোয়াড় হতে পারতো। কিন্তু দুর্ভাগ্য তার অর্থনৈতিক সমস্যা। তাই জীবন-সংগ্রামে অভিভাবকদের সাহায্য করার জন্ত এগিয়ে আসতে হয়। কিন্তু চাকরী পাওয়া ত সহজসাধ্য নয়। তাই ক্রমে সেই সমস্ত তরুণদের জীবনে ব্যর্থতা নেমে আসে। খেলোয়াড়-জীবন ও সামাজিক-জীবন দুই-ই ব্যর্থ হয়।

দ্বিতীয়তঃ ভবিষ্যৎ। ইতিপূর্ব্বে বাংলাদেশের খেলোয়াড়দের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উদাহরণ দিয়েছি মাসিক বসুমতীর পাতায়। দারিদ্র্যের কবল থেকে উদ্ধার করার জন্ত ক্লাব-কর্ত্তৃপক্ষরা এগিয়ে আসেন না। অথচ ঐ সমস্ত খেলোয়াড় দ্বারা ক্লাবের প্রভূত সম্মান অর্জ্জন হয়েছে এবং হয়। আই, এফ, এ কর্ত্তৃপক্ষ দুঃস্থ খেলোয়াড়দের কোনরূপ সাহায্য করেন না। যেখানে কোন ভবিষ্যৎ নেই, সেখানে কোন্ সাহসে বাঙালী তরুণরা এগিয়ে আসবে?

এই সমস্ত দিকগুলো বিবেচনা করে দেখতে অনুরোধ করি। বাংলা দেশের দুর্ভাগ্য—বাংলা দেশের বাঙালী খেলোয়াড়দের স্থান হয় না; বাঙালীর ছেলেরা যোগ্যতা থাকা সত্বেও চাকুরী পায় না। যেখানে শুধু ব্যর্থতা, সেখানে বাঙালী খেলোয়াড় যে পাওয়া যাবে না, এ আর এমন কিছু নতুন নয়।

বাংলা দেশে বাঙালীর হয়ে বলার মত মানুষ কোথায়? এ ভাবে দেশ অগ্রসর হলে বাঙালীর ধ্বংস অনিবার্য।

এবারকার লীগে রেল দল নিঃসন্দেহে ভাল খেলেছে। মাঝের দিকে মোহনবাগান, মহামেডান, ইষ্টবেঙ্গল ও রেল দলের মধ্যে যখন চতুর্দ্দলীয় প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হয়েছিল, তখনই ক'লকাতা মাঠে খেলাধুলার পূর্ণতা উপলব্ধি করা গিয়েছিল। ছোটখাট দলগুলির মধ্যে ইণ্টারন্যাশনাল, বালী প্রতিভা প্রমুখ দলগুলি নিজ নিজ শক্তি অনুযায়ী যথেষ্ট ভাল খেলেছে। তরুণ খেলোয়াড়পুষ্ট ইণ্টারন্যাশনাল দলের খেলা বিশেষ করে চোখে পড়েছে। কিন্তু শেষের দিনের লীগ খেলার মধ্যে যে এক অস্বস্তিকর পরিবেশের সৃষ্টি হ'ল তা বোধ হয় ইতিপূর্ব্বে লক্ষ্য করা যায়নি। মহামেডান দল খেলায় অংশ গ্রহণ করল না আর তার পদাঙ্ক অনুসরণ করলো শেষ পর্য্যন্ত ইষ্টবেঙ্গল দল।

মহামেডান ও ইষ্টবেঙ্গল দলের এ সিদ্ধান্ত খেলোয়াড়জনিত মনোভাবের পরিচয় নয়। যদি তাঁদের অভিযোগ করার কিছু থাকে, তাহলে তাঁরা প্রকাশ্য ভাবে অভিযোগ করুন কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত খেলায় অংশগ্রহণ না করা কেমন যেন দৃষ্টিকটু।

কলকাতা মাঠের আবহাওয়া কেমন যেন বিষাক্ত হয়ে পড়েছে। এর জন্য সম্পূর্ণ দায়ী আই-এফ-এ, কর্তৃপক্ষ। ইতিপূর্ব্বে নানান পত্র-পত্রিকায় আই-এফ-এ কর্ত্তৃপক্ষের ত্রুটি-বিচ্যুতি নিয়ে আলোচনা হয়েছে কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কোনরূপ পরিবর্ত্তন দেখা যায়নি। দেখা গিয়েছে, কর্ত্তৃপক্ষ কোন কোন সময়ে লঘু অপরাধে গুরুদণ্ড ও গুরু অপরাধে লঘুদণ্ড প্রদান করেছেন। আমাদের বলার এই উদ্দেশ্য যে, কোন সংস্থা তার নিয়ম অনুযায়ী যদি না বিচার করে এবং পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করে, তাহলে তার মধ্যে যে বিরাট একটা ভাঙন ধরছে, এ কথা বলা চলে। এই ভাঙন বা দুর্নীতির প্রশ্রয় কোন মতেই দেওয়া উচিত নয়। এ প্রসঙ্গে আর একটি কথা উল্লেখ করা যায়, যেটা আমাদের রাজ্য সরকারের খেলাধুলা সম্পর্কে চরম ঔদাসীন্য। ক্যালকাটা স্পোর্টস বিল পাশ হয়ে গেছে বহুদিন। কিন্তু সে বিল এখনও কার্য্যকরী না হওয়ার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। এ বিষয়ে বিধান সভার বিরোধী পক্ষের নেতা শ্রীজ্যোতি বসু স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীকালীপ

মুখার্জ্জিকে প্রশ্ন করেন। কিন্তু মন্ত্রী মহাশয় কোন সদুত্তর দিতে পারেন নি।

ক'লকাতা মাঠে ষ্টেডিয়াম সম্পর্কে ইতিপূর্ব্বে মাসিক বসুমতীর পাতায় সবিশেষ আলোচনা হয়েছে, তাই তার পুনরাবৃত্তি করা, অরণ্যে রোদন ছাড়া আর কিছু নয়। সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখের বিষয়, ক'লকাতার মত স্থান—যে ভারতের ফুটবলের জনক, তার দর্শকদের জন্য ষ্টেডিয়াম নেই! এবং অচির ভবিষ্যতে যে ষ্টেডিয়ামের কোনরূপ আশা আছে বলে মনে হয় না। ষ্টেডিয়ামের অভাবে ক্রীড়ামোদীদের নানান অসুবিধার কথা কারও অবিদিত নেই। প্রায় প্রতি বৎসরই গাছ থেকে পড়ে গিয়ে ক্রীড়ামোদীরা আহত হয়েছেন এবং কয়েক বছর পূর্ব্বে গাছ থেকে পড়ে গিয়ে একজন ক্রীড়ামোদী প্রাণ হারিয়েছেন এ সংবাদ মর্ম্মান্তিক! পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ষ্টেডিয়াম সম্পর্কে উৎসাহ প্রকাশ করেছিলেন কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁর মত বিচক্ষণ ব্যক্তির উৎসাহ প্রকাশেও ক'লকাতা মাঠের ষ্টেডিয়াম সম্পর্কিত ব্যাপারে কোনরূপ স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব হোল না! জানি না ক'লকাতার ক্রীড়ামোদীদের কপালে এ দুর্ভাগ্য আরও কত দিন আছে।

খেলার মাঠে অশোভন আচরণ সম্পর্কে ইতিপূর্ব্বে দেখা যেত দর্শকদের মধ্যে। তার অবশ্য একটা বাহ্য কারণও থাকতো। অন্ধ সমর্থকরা নিজ দলের পরাজয় কোন মতেই মেনে নিতে পারতো না। তাই খেলার মধ্যে যদি কোনরূপ ত্রুটি-বিচ্যুতি প্রকাশ হয়ে পড়তো, তখনই অশোভন আচরণ ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিত। এর জন্যে সংবাদপত্রে দর্শকদের অশোভন আচরণ নিয়ে রূঢ় সমালোচনা হয়েছে। কিন্তু খেলার মাঠে খেলোয়াড়দের অখেলোয়াড়োচিত আচরণ কোন ক্রমেই আশা করা যায় না। এবারকার লীগ খেলায় ইষ্টবেঙ্গল ও এরিয়ান ক্লাবের ফিরতি খেলায় দুই দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে মারপিট। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত রেফারী আর খেলা আরম্ভ করেন নি। এ খেলায় রেফারী ও এরিয়ান্স দলের খেলোয়াড় এস, হালদারের পরস্পরবিরোধী উক্তি বিস্ময়ের সূচনা করেছে। আই, এফ, এ কর্ত্তৃপক্ষ ইষ্টবেঙ্গল দলকে বিজয়ী বলে স্বীকার করে নিয়েছে। এবং এস, হালদারের বিরুদ্ধে লঘুদণ্ড প্রদান করেছে। এস, হালদারের বিবৃতি সত্য বলে মেনে নিলে রেফারীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত। দুইজনের বিবৃতির মধ্যে একজনের বিবৃতি সত্য হতে বাধ্য।

এস, হালদারকে আই, এফ, এ কর্ত্তৃপক্ষ সতর্ক করে দিয়েছেন। কিন্তু ইষ্টবেঙ্গল দলের খেলোয়াড় বালুর বিরুদ্ধে রেফারীর কোন অভিযোগ না থাকায় আই, এফ, এ কর্ত্তৃপক্ষ কোনরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নি। অথচ এ কথা অনস্বীকার্য, বালুও এদিন মাঠের মধ্যে অত্যন্ত অশোভন আচরণ করেছেন।

খেলোয়াড়দের বিরুদ্ধে যেমন যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন ও খেলাগুলির সুষ্ঠু পরিচালনা করা যেমন উচিত, তেমনি দর্শকদের খেলা দেখার সুবন্দোবস্ত করা আই, এফ, এ কর্ত্তৃপক্ষের আশু কর্ত্তব্য হওয়া উচিত। এই দুটির প্রতি শিথিলতা প্রকাশ না করে আই, এফ, এ কর্ত্তৃপক্ষ যদি কর্ম্মতৎপর হন তাহলে আশা করা যাবে ক'লকাতা মাঠে উন্নততর ক্রীড়ানৈপুণ্য। তার পূর্ব্বে নয়।

রাতের প্রহরী

শ্রীআনন্দমোহন মুখোপাধ্যায়

রাতের প্রহরী আমি, রাতের প্রহর গোণা শেষ
পুব আকাশ লালে লাল, নয়নেতে ঘুমের আবেশ।
এবার আমার ছুটি, তোমাদের নব জাগরণে
রাজপথে ক্ষীণ আলো ক্ষীণ হয় প্রতি ক্ষণে ক্ষণে,
দূরের বৃক্ষের চূড়া স্পষ্ট হয় অস্পষ্ট আলোকে
তোমাদের জাগরণে ভাসে বিশ্ব অপূর্ব্ব পুলকে।

রাতের প্রহরী আমি দেখিয়াছি অতি সঙ্গোপনে
রাতের ভীষণ রূপ, বিভীষিকা—অম্লান-বদনে
ছুরি মেরে চলে যায়, আর্ত্তনাদে নিঃশব্দ-রজনী
ক্ষণিক শিহরি উঠে পুনরায় নির্ব্বাক যেমনি।
লুব্ধ-দৃষ্টি দ্বার খুলি উঁকি দিয়ে ফেরে দ্বারে দ্বারে
শান্তির মন্দির কাঁদে অকস্মাৎ ব্যর্থ হাহাকারে।
মোহমত্ত পিশাচেরা মদিরার আবেশে বিহ্বল,
বারাঙ্গনা-জীবনের কদর্য্যতা, পাপের শৃঙ্খল,
ষড়যন্ত্র কু-মন্ত্রণা, আরো বন্ধু আরো আছে কত
বর্ণনার শক্তিহীন—অন্ধকারে ঘটে অবিরত।

তুমি ত দেখনি বন্ধু, বিভীষিকা এই পাপরাশি
আমি শান্তিদূত, শান্তি-প্রতিষ্ঠায় যাপি সারা নিশি।
বিনিদ্র প্রহরী আমি, এবার ফুরালো রাত মো[illegible]
এবার শান্তির শয্যা, কেহ ভাঙাবে না ঘুম-ঘোর।
এবার আমার কার্য্যে ধরণীর নাহি প্রয়োজন
আলোকের অভ্যুদয়ে তোমাদের নব-আয়োজন।
এ আলো আবার যবে ম্লান হবে গোধূলি-বেলায়
পাখীর কূজন যবে স্তব্ধ হবে—অনন্ত সন্ধ্যায়
চারিদিক ছেয়ে যাবে—তখন উঠিব শয্যা ছাড়ি
আবার যাপিব নিশি' চারিদিক নেহারি নেহারি।
কান পাতি অন্ধকারে অপেক্ষিব মৃত্যুধ্বনি আশে
দিগ হতে দিগন্তরে ছুটে যাব ভৈরব হরষে।

পুব আকাশ লালে লাল, শুকতারা বিবর্ণ প্রভায়
নিশি শেষ হল, আর দাঁড়াবার সময় ত নাই।
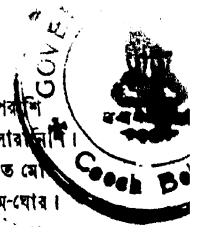
ভারত থেকে তিব্বত

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

রায় বাহাদুর শরৎচন্দ্র দাস

দ্বিতীয় অধ্যায়

তিব্বতের দিকের হিমালয়ে

"—কোন ইউরোপীয় বা ভারতীয় আজ পর্যন্ত যাম-থং বা চ-থং লা গিরিপথ অতিক্রম করার সৌভাগ্য অর্জন করেন নি।"—এস. সি. দাস, জানুয়ারি, ১৯০৮।

২৭এ জুন—কোন রকমে অর্ধ সিদ্ধ ভাতে ভাত দিয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি করে ভোরের আলোয় আলোয় রওনা হওয়া গেল। এবারকার পথ হল সম্পূর্ণ ভাবে আলাদা। জলের আঘাতে ভেঙ্গে পড়া পাথর আর তুষারস্রোতের দ্বারা বহু দূরবর্তী স্থানে আনীত বেশ বড় বড় আকারের পাথরের মধ্য দিয়ে। উদ্ভিদের বালাই নেই—কাচিৎ কোন গাছ পালা আমাদের নজরে পড়ে, কেবল দেখা গেল নরম স্পঞ্জের মত শৈবাল জাতীয় তৃণ আর মস বিক্ষিপ্ত ভাবে চারদিকে ছড়ান রয়েছে। তলতলে ভূমি। জলাভূমিও দেখা গেল। দূরে বহু দূর থেকে আমাদের চার পাশে শোনা যেতে লাগল শৈলগাত্র-স্খলিত বিপুল তুষার-স্তূপ পতনের প্রতিধ্বনি। তুষারপথে সেই ধ্বনি সতর্ক করে দিচ্ছিল আমাদের প্রতি পদক্ষেপ। হঠাৎ এই প্রাণিহীন জগতে চারটে লেজবিহীন ছুঁচো পাহাড়ের তটদেশে ছুটোছুটি করে প্রমাণ করে দিলে যে এই জায়গাটা একেবারে নিষ্প্রাণী নয়। আমাদের গাইড বললে এরা তুষার-জলার মস জাতীয় তৃণে জন্মায় আর তাই খেয়েই বেঁচে থাকে। মাথার ওপর দিয়ে চাতক পাখীর মত কতকগুলো পাখীও উড়ে গেল। এরা নাকি তিব্বতে গ্রীষ্মকালে ঝাঁকে ঝাঁকে দেখা দেয়।

আমরা এখন চিরতুষার রাজ্যে। দক্ষিণে এবং বামে দুটি তুষার প্রবাহ এগিয়ে গেছে সমান্তরালে। সেই দুটি প্রবাহের মাঝখান দিয়ে ওপর দিকে উঠতে হচ্ছে অতি ধীরে, সন্তর্পণে। কিছুক্ষণ পরে সেই গিরিশ্রেণী দিক পরিবর্তন করলে উত্তর থেকে উত্তর-পশ্চিম অংশে। সামনে বাঁকের মুখে উপত্যকার ওপর কতকগুলি বিরাট বরফের স্তূপ—দূর থেকে ভ্রম হয় মন্দিরের চূড়ো বলে। তাদের মধ্যে বড়টি অন্তত: ৫০ ফুটের কম নয়। সমগ্র দৃশ্যটিও ঢেউখেলান সাদা যেন সাগর-লহরীর মত। তার ওপর দিয়ে চলেছি আমরা ক'জন। পথ আর ফুরোয় না। মাইলের পর মাইল, তিন মাইল অতিক্রম করার পর এল অবসাদ, এল ক্লান্তি। বাতাসের অস্বাভাবিক বিরলতায় আমার নিশ্বাস নিতে কষ্ট হতে লাগল। কষ্ট আরও বাড়তে লাগল যখন আমরা ১৯ হাজার ফুটের ওপরেও উঠতে লাগলুম। বুকের স্পন্দন বেড়ে গেল। এর সঙ্গে চোখ-ঝলসানো তুষার-আলো। সে আলো চোখের কি কষ্টদায়ক যে সবুজ চশমা পরেও তা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়নি। আমার অবস্থা তো শোচনীয় কিন্তু লামার অবস্থা আমার চেয়েও শোচনীয়, শুধু চোখের দিক থেকে নয় তার দৈহিক স্থুলত্বের জন্য। কি করবো তা ভেবে পাইনি, হতাশ হয়ে পড়লুম; আর আধ ঘণ্টা মৃতবৎ সেখানে পড়ে রইলুম। অবশেষে গিয়া-ৎসো আমাদের গাইড ফুরচুঙকে প্রচুর বকসিস দেওয়ার লোভ দেখালে যদি সে আমাকে পরবর্তী কোন উপযুক্ত স্থানে কাঁধে করে নিয়ে পৌছে দিতে পারে। ফুরচুঙ রাজি হল। তার কাঁধে চড়ে আধ মাইল দূরে এক তুষার-বিরল স্থানে পৌছুলুম। আমাকে সেখানে নামিয়ে সে ফিরে গেল তার নিজের বোঝা আনতে।

সে ফিরে এলে আবার আমরা চলতে সুরু করলুম। ক্রমে ৬টা বেজে গেল, আমাদের চলার শক্তিও কমে আসতে লাগল। এমন জায়গায় এসে পৌছুলুম—সেখানে কোন গুহা নেই, আশ্রয় পাবার মত কোন পাহাড় নেই, পান করবার জলও নেই—ছিল শুধু তুষারের কঠিনতা, আড়ষ্টতা—আর বাতাসের কনকনানি ভাব। খোলা মাঠে শুয়ে থাকা অসম্ভব। চলার শক্তি না থাকলেও চলতে হল। এক মাইল এগুবার আগেই অন্ধকার ঘনিয়ে এল—যদিও তুষারের ঔজ্জ্বল্যে কিছুটা আলো দেখা যাচ্ছিল। তখন সন্ধ্যা ৭টা। একটা বরফের চাঁইএর ওপর বসান একটা বড় পাথর ছিল। গাইড বললে—রাত্রে বরফ গলবে না—সুতরাং আমরা ওখানে নির্ভয়ে রাতটা কাটাতে পারি—কিন্তু ভোর হবার আগেই আমাদের বেরোতে হবে—নচেৎ বরফ গলে যাবার সম্ভাবনা আছে। আমরা সেই পাথরের ওপরে কম্বল বিছিয়ে শোবার ব্যবস্থা করলুম। ক্লান্তিতে চোখ জুড়িয়ে এল। আগের দিন কিছু খাইনি—তবুও তখন খাওয়ার প্রতি কিছুমাত্র আসক্তি ছিল না। নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিদ্রাদেবীর অঙ্কে শায়িত করলুম।

২৮এ জুন—তুষার-সমুদ্র ভেদ করে আমরা সকালেই যাত্রা করলুম। কেবল বরফ আর পাথর। উদ্ভিদের কোন চিহ্ন নেই। যদি সবুজ গাছপালা দেখা যেত তবে আমাদের অবসাদগ্রস্ত চক্ষু হয়তো কিছুটা আরামের স্বাদ পেত—তাকে অভ্যর্থনা জানাতো। আরামহীন, আনন্দহীন হলো আমাদের এই যাত্রাপথ। শ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্ট হতে লাগল আমাদের প্রত্যেক পদক্ষেপে। পদযুগল একবার তুলছি—এগিয়ে যাচ্ছি, আবার তাকে সেই আলাকর বরফের মধ্যে ডুবিয়ে দিচ্ছি—প্রায় হাঁটু পর্যন্ত। অসাড়, অনড় হয়ে পড়ছে পদযুগল, দেহও। গিয়া-ৎসোকে যেন বেশ প্রফুল্ল দেখাচ্ছে। কিন্তু আমি? আমার হাঁটু দুটো যে অবশ হয়ে যাচ্ছে—আমার পা দুটো যে অক্ষম হয়ে পড়ছে! আমি কি চা-থং-লা'র (২১) তুষারময় ঢালু পথ পর্যন্ত এগুতে পারব? আর পারি না—ঠিক সেই সময় আমার প্রিয় অনুচর ফুরচুঙ এল আমার সাহায্যের জন্যে। তার বোঝাটি সে বরফের ওপর রেখে দিলে। তার লম্বা লাঠিটা খাড়া করে তার কোমর-বেষ্টনীর সঙ্গে বাঁধলে। উদ্দেশ্য সেই তুষার-পথে চলতে পিছলে না পড়ে যায়, কোন ফাটলের মধ্যে না গিয়ে পড়ে। এই অবস্থায় সে আমাকে পিঠে তুলে নিলে। আমি তাকে

২১। চা-থং-লা'র পূর্বদিকে তুষার-পাহাড় আছে, তার নাম জনসং-লা বা মুদসোদ-সান লা, এর অর্থ হচ্ছে গুপ্ত সম্পদের পথ। এটা সম্প্রতি মিঃ ডগলাস ফ্রেসফিল্ড, এফ-আর-জি-এস অতিক্রম করে এটা যে সমুদ্রতটরেখা থেকে ২০,০০০ ফুট উঁচু তা প্রকাশ করেছেন। তিনি জনসং-লা'র শেষ চূড়ার উচ্চতা বলেছেন ২৪,৩৪০ ফুট। (১৩ই নভেম্বর ১৮৯৯)।—Round the Kang-chen Junga.

আমার চশমাটা পরতে দিলুম। আমি তখন অসাড় নিস্পন্দভাবে তার পিঠে চড়লুম। চোখ বুঝে রইলুম যতক্ষণ না চা-থং-লার তলদেশ থেকে ১ মাইল দূরে অপর একটি তুষার-প্রান্তরে এসে পৌছুলুম। এখানকার তাজা তুষার ১ ইঞ্চির বেশী গভীর নয়। আমি কোন রকমে অতি কষ্টে চলতে লাগলুম। আমাকে নামিয়ে রেখেই ফুরচুঙ্গ তার বোঝাটা ফিরে আনতে ছুটল, বোঝাটা ততক্ষণে তুষারে চাপা পড়ে গেছে। যে সূর্য দুপুরে আমাদের পীড়াদায়ক সেই সূর্যের অবস্থিতি এখন পাহাড়ের পশ্চিম গগনে। পাহাড়ের ঢালুপথ দুরতিক্রম্য, কিন্তু তা পার হওয়া ছাড়া আর উপায় নেই ; অবশেষে আমরা প্রধান লা'তে পৌছুলুম। এর বিপরীত দিকে আমাদের আশ্রয় নিতে হবে। আমি অতি কষ্টে এগুতে লাগলুম—পা পিছলে যেতে লাগল—কখনও কখনও গড়িয়ে গড়িয়ে যেতে হল। ফুরচুঙ্গ তার কুরকী (নেপালী ছুরী) দিয়ে বরফ কেটে কেটে পা ফেলার পথ করতে লাগল—আর আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে যেতে লাগল। তুষার বর্ষণের বেগ বেশ বৃদ্ধি পেতে লাগল। আমাদের আশঙ্কা হল হয় তো আমাদের এখানেই জীবন্ত সমাধি হবে। শেষ প্রার্থনার সময় এগিয়ে এল—তবুও দেহটাকে কোন রকমে টেনে নিয়ে যাচ্ছি। নেহাৎ পরমায়ু আছে। তাই অপ্রত্যাশিত ভাবে একটা গুহার সন্ধান পেলুম। গত রাত্রে আমরা যেখানে বাস করেছি তার তুলনায় এটা যেন স্বর্গ। রাতটা আরামে কাটাবার উদ্যোগ করছি এমন সময়ে গাইড জানালে—এর পর আমাদের প্রস্তুত হতে হবে সর্বাপেক্ষা কষ্টকর আর বিপজ্জনক পথ অতিক্রম করার জন্যে। এই পথটুকু অতিক্রম করলে আমরা বাকী পথটুকু অনায়াসে ও স্বচ্ছন্দে যেতে পারব। এই অবস্থায় যদি আমরা বিখ্যাত চা-থং-লা পার হয়ে তিব্বতে চলে যেতুম—তা হলে এই ভয়ঙ্কর অঞ্চলের জনহীন প্রান্তরের চিত্র, নিদারুণ আতঙ্ক, ক্ষণে ক্ষণে মৃত্যুভয়—আর বিশ্বাসঘাতক তুষারনদীর ফাটলের হাত থেকে রক্ষা পেতুম—অথবা অনন্ত তুষার সাগরের মধ্যেই আমাদের যাত্রাপথের শেষ হত। তুষার ও বরফের ভয়ঙ্কর রাজ্যে প্রতি পদে আমাদের পদস্খলনের আতঙ্ক চোখে ফুটে উঠতে লাগল। এই আতঙ্কানুভবের মাঝেই আমরা আমাদের কম্বল বিছিয়ে অবশ, শিথিল দেহকে শায়িত করলুম। গুহাটি বরফের চাঁদোয়া দিয়ে ঢাকা। ওপরের পাথরের ফাটল দিয়ে মাঝে মাঝে জলের ফোঁটা পড়ছে—তাতে আমাদের কাপড় পর্যন্ত ভিজে গেল। জল গরম হওয়া এখানে অসম্ভব, জ্বালানি কিছুই নেই, আর আমরা কোন কাজ করার সামর্থ্যও হারিয়ে ফেলেছি। এ জায়গাটা পং-ফে-কুং ও জোগু-ওগ থেকে অনেক ওপরে। চা-থং-লা সম্ভবতঃ জগু থেকে ২০০০ ফুট উঁচু আর সমুদ্রতটরেখা থেকে ২০,০০০ ফুট ওপরে।

২১এ জুন—খুব ভোরে আমরা লা থেকে নামতে সুরু করলুম। ৬ ঘণ্টা চলার পর বাদামী রঙের গাছপালার দৃশ্য আমাদের চোখে পড়ল। ১টার সময় এক ধীর প্রবাহিতা নদীর তীরে পৌছলুম। নদীটি এবড়ো-খেবড়ো ক্ষয়া পাথরের ফাঁকে ফাঁকে বেরিয়ে আসছে। এখান থেকেই বোধিসত্বের পবিত্র দেশ দেখতে পেলুম। একটা ঢালু পথে পৌছবার কিছু পরেই নবতৃণাচ্ছাদিত প্রান্তরে এসে পড়লুম। এই স্থানটিকে বলে গ্যিমি-থোথো ; নেপাল ও সিকিমের সঙ্গে চীন
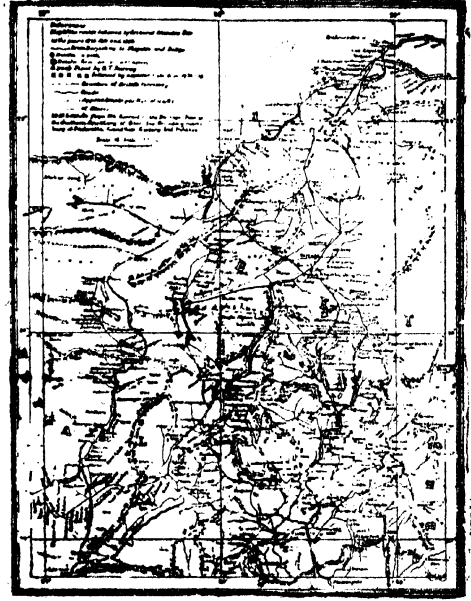
শরৎচন্দ্র দাস পরিকল্পিত তিব্বত ও সিকিমের মানচিত্র
(১৮৭৯-১৮৮২)

দেশের সীমারেখা। কথিত আছে, এই স্থানে গুর্খাদের সঙ্গে যুদ্ধের সময় চৈনিক সেনাপতি একটি মজবুত খুঁটির প্রাচীর নির্মাণ করেন এবং ফিরে যাবার সময় চ-থং-লা গিরিপথকে চিরকালের জন্য বন্ধ করে দিয়ে গেছেন। গ্যিমি-থোথো(২২) পার হয়ে আমরা পেলুম একটা বড় নদী, যার বাঁদিকে কঠিন আর তৃণলেশহীন বালুময় গিরিশ্রেণী। এটি হচ্ছে জেসি নদীর প্রধান জল কাঞ্চনজঙ্ঘার উত্তর ঢালুপথ ধৌত করে মিলিত হচ্ছে, তিস্তা নদীর পশ্চিমী প্রধান নদী লা চেনে। এখানে একটুকরো ঘাসও দেখা যায়নি। দক্ষিণ-পশ্চিমে সেই নদীর গতিপথ ধরে কিছুদূর অগ্রসর হয়ে আমরা দেখতে পেলুম এক দল ভোজনরত চমরু। আমাদের গাইড ডকপাসকে(২৩) দেখে ভয় পেয়ে গেল। কারণ তার ওপর এই গিরিপথের তদারকের ভার আছে, আর সেই কাজের বিনিময়ে গভর্ণমেণ্ট তাকে অনুমতি দিয়েছে লুঠপাট করতে সেই সব পথিকদের যারা এই গিরিসঙ্কট অতিক্রম করতে সাহস করে। গাইড এ খবর জানতো, প্রকাশ করেনি। আমাদের ছাড়পত্র এখানে কোন কাজেই লাগবে না, কারণ আমরা এখানে বি-পথ ধরে এসেছি। দক্ষিণের ডকপাস ও চোরটেন নিও-লা উত্তর তিব্বতের সাধারণের হিতের জন্য সর্ব রকমের পথচারীদের কাছে এই পথ নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। আমরা এক পাহাড়ের গুহায় লুকিয়ে রইলুম—সন্ধ্যা

২২। 'গ্যিমি' অর্থে চীন-অধিবাসী আর 'থোথো'র অর্থ সীমারেখা।

২৩। তিব্বতীয় মেষপালকেরা চমরু গাই, ভেড়া, ছাগল প্রভৃতি চরিয়ে জীবিকা অর্জন করে। এই সব পশুদের তারা হিমালয়ের অভ্যন্তরের বহুদূর থেকে নিয়ে আসে।

না হওয়া পর্যন্ত বাইরে বেরুইনি। আমরা নিঃশব্দে বালি আর পাথরের ওপর দিয়ে নদীটির প্রায় ১ মাইল পেরিয়ে গেলুম। নদীটি তিনটি দুরন্ত স্রোত নিয়ে ত্রিস্রোতা হয়ে চলেছে। আমরা প্রথমে একটা টিলায় উঠলুম। তারপর উঁচু পাহাড়ে, সেখান থেকে চোরটেন ঙ্গিমা-লা'র(২৪) দক্ষিণ পার্শ্ব দেশে। দূরে বিস্তৃত মালভূমি এখান থেকে চন্দ্রালোকে বেশ স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে। তার বামে ও দক্ষিণে তুষারময় পর্বত। চন্দ্রকিরণে তুষারের অস্তিত্ব খুব কমই মনে হল, ওর চূড়াগুলো দেখাচ্ছে নিষ্প্রভ, শবের ন্যায় শাদা। আমাদের সামনে খোলা মাঠ, আর চাঁদের আলো, চোখে ক্লান্তি, নিদ্রাদেবীর আগমনের উপযুক্ত এই অবসর, কম্বল পেতে গভীর নিদ্রায় রাতের যবনিকা।

৩০এ জুন—আজকের দিনে আমাদের চলার পথ ক্লান্তিজনক হলেও তেমন দুর্গম ছিল না। কিন্তু ক্ষুধা আর তৃষ্ণায় আমরা এত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলুম তা কহতব্য নয়। তিন দিন ধরে আমাদের পেটে কিছুই পড়েনি। ৮ মাইল হাঁটবার পর আমরা চোরটেন ঙ্গিমা-লা'র দক্ষিণ পাদদেশে পৌঁছুলুম। অপূর্ব শোভা এই স্থানটার। তৃণগুল্মহীন পাহাড়ের বন্ধুর চূড়াগুলি, তুষারাচ্ছন্ন গুহাগুলি যেন পথটির ওপরে চন্দ্রাতপের মত সজ্জিত হয়ে রয়েছে। তিব্বতের নির্মেঘ আকাশে, হিমাচ্ছন্ন গিরিশৃঙ্গের পশ্চাৎ থেকে উঁকি ঝুঁকি মারছে, হিমনদীর সবুজ নীলাভ রেখা তুষারাচ্ছন্ন ঢালু স্থানটিকে অতিক্রম করে এঁকে বেঁকে চলে যাচ্ছে—এতগুলি অভূতপূর্ব দৃশ্যাবলী অস্বাভাবিক ও দুর্গম হলেও মনোরম। স্তরবিন্যাসযুক্ত প্রস্তর আর কৃষ্ণ স্ফটিকের মত পর্বতটি দেখতে। ফুরচুঙ্গের সাহায্যে আমি এর কঠিনতম অংশে উঠলুম। এখানকার অঘন আবহাওয়ায় আমরা বেশ শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট অনুভব করলুম—কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে গিরিচূড়ায় উঠে তিব্বতের উচ্চ অধিত্যকায় দৃশ্য দেখে মুগ্ধ হলুম। উত্তরের শেষপ্রান্তে মেঘমুক্ত অনন্ত আকাশকে ঘিরে আছে নীল শৈল-প্রবাহ। একটা প্রস্তরস্তূপের কাছে আমি শুয়ে পড়লুম। সেখানে চিহ্নিত আছে লাপ-সে (গিরিপথ বা গিরি উচ্চস্থান) বা মোঙ্গলদের "ওবো"। স্তূপটির ওপরে মোটা মোটা নলখাগড়ায় অনেক পতাকা বাঁধা আছে দেখলুম। বন্ধু ইউজেন আমার পাশে এসে শুল। আধঘণ্টা বিশ্রামের পর আমরা তিব্বতের মালভূমির দিকে নামতে লাগলুম। বেলা ৩টার সময় আমরা এক সুন্দর হ্রদের পাশে এলুম। চারদিকে বরফের মাঝে এটাকে যেন ফিরোজা রংএর মণির মত দেখাচ্ছে। ভারতীয় পশ্চিম আকাশে সূর্য ধীরে ধীরে অস্তমিত হচ্ছে আর তার লোহিত আভা বাতাসের সঙ্গে কেঁপে কেঁপে আসছে। পশমের মত কোমল আকাশের মাঝে পাহাড় আর চূড়াগুলি স্বচ্ছ নির্মল হ্রদের জলে প্রতিবিম্বিত হচ্ছে। হ্রদটি ডিম্বাকৃতি দৈর্ঘ্যে প্রায় সিকি মাইল ও প্রস্থে ১৫০ গজ। চোরটেন ন্যি-মা নদী এখান থেকেই প্রবাহিত হচ্ছে—একেই অনুসরণ করে যেতে হবে। গম আর চিনি খেয়ে শরীরটাকে একটু তাজা করে নেওয়া হল। আমাদের দু'ধারের স্থান যতদূর দেখা যায় উদ্ভিদ-বিহীন। তৃণশূন্য পর্বতীয় স্থানের দৃশ্যে আর হিমালয়ের উদ্ভিদ সমৃদ্ধ দৃশ্যে আমরা এক অবর্ণনীয় পার্থক্য লক্ষ্য করলুম। নামবার সময় চোরটেন ন্যি-মার মঠের চৌকীদারদের চোখে পড়বার ভয় আমাদের সব সময় ছিল। কখন কখন আমরা পাহাড়ের ফাটলে লুকোতে লাগলুম। ভেড়া বা চমরু তাড়াবার জন্য ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত পাথর দেখেও আমরা বেশ ভয় পেতে লাগলুম। হ্রদ থেকে এরকম ভাবে ৫ মাইল যাবার পর আর চোরটেন ন্যি-মা বা "সূর্যদেবের চৈত্যে" এসে পৌঁছলুম। সেখানে পরিব্রাজক আর সন্ন্যাসীদের থাকার জন্য বড় বড় ঘর আর ক্ষোদিত পাথরের স্তূপ। এই চৈত্যটি প্রাচীন কালে ভারতীয় বৌদ্ধদের দ্বারা স্থাপিত। সমস্ত তিব্বতের এমন কি মঙ্গোলীয় ও চীনদেশের পরিব্রাজকরা বৎসরে একবার এই পবিত্র স্থানে জমায়েৎ হয়। এখানে ভাওলেট রঙের সুগন্ধি পুষ্পের ছোট ছোট ঝোপ দেখতে পেলুম। ফুরচুঙ্গ গুঁড়ি মেরে সেই মঠের দিকে দেখতে লাগল সেখানে কেউ আছে কিনা—কাউকে দেখতে না পেয়ে রাঁধবার জন্য এক থলে জ্বালানি ঘুঁটে নিয়ে এল। ৬টার সময় এই প্রথম আমরা ভাত রাঁধতে বসলুম ১৭০০০ ফুট উঁচুতে, এর স্ফুটনাঙ্ক ১৮১° তে। আমাদের এই ক্লান্তির পর আমরা খুব আগ্রহের সঙ্গে দ্বিগুণ আহার করলুম। সন্ধ্যা হয়ে এল আমরাও টেংরি জং ও কম্বা জংএর পথ ধরবার জন্য প্রধান সড়ক ধরলুম। আমরা সোজা রাস্তা ছেড়ে অন্য রাস্তা নিলুম নিজেদের গোপন রাখার জন্যে। যদি আমরা ধরা পড়তুম, কম্বা-জংএর কয়েদখানায় আমাদের আশ্রয় নিতে হতো। আবহাওয়া সুন্দর আকাশও পরিষ্কার। কাঁটা ঝোপে যে ফুল ফুটে আছে তার সুগন্ধ আমাদের আমোদিত করে দিলে। নদীর উভয় পার্শ্বের বালুতীর শত শত গজ চওড়া। মূল রাস্তাটি ৪০ ফুট চওড়া। উত্তর হিমালয়ে আমরা নানা রকমের পাথর দেখলুম কিন্তু সেখানে শ্লেটপাথর দেখতে পেলুম না। চোরটেন ন্যি-মা ও ছোট ছোট পাহাড়ে নানা রকমের শ্লেটপাথর দেখেছি আর তার নমুনাও সংগ্রহ করেছি অনেক। সাধারণ কাল মাটি-শ্লেট ছাড়া ঘন কাল, শ্লেট পাথরের স্তরবিশিষ্ট পাষাণও দেখেছি। মাটির শ্লেট প্রচুর। এর ভেতরে শান দেওয়া শ্লেট আছে অনেক, যার রং শাদা আর সবুজে মেশান। ঘন সবুজ রঙের মসৃণ অভ্রক শ্লেট, যার কথা আমি বই-এ পড়েছি। নদীর পোষকরূপে কতকগুলি পড়ে আছে। অনুমান হল যে তাতে নদীর তলদেশ ক্রমশঃ উঁচু হচ্ছে। মাটির শ্লেট অনেক রকমের রয়েছে। নদীর উভয় পার্শ্বের পাহাড়গুলি মাটির শ্লেটে ভর্তি। [আগামী বারে সমাপ্য]

অনুবাদক—শ্রীশৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ

২৪। রয়েল জিওগ্র্যাফিক্যাল সোসাইটির প্রাক্তন সম্পাদক মিঃ ডগলাস ফ্রেশফিল্ড, এফ-আর-জি-এস তাঁর বিখ্যাত ভ্রমণ গ্রন্থ 'Round Kangchen Junga'য় লিখেছেন—"আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে চন্দ্র দাস চোরটেন ঙ্গিমা-লা অতিক্রম করেছেন। ঐ নামই এই দেশে সুপরিচিত। এর চূড়ায় যে অদ্ভুত উচ্চ বন্ধুর পর্বতগুলির বর্ণনা তিনি দিয়েছেন—তা ১৮১২ সালে মিঃ ক্লড হোয়াইট গৃহীত ফটোর সঙ্গে হুবহু মিল আছে।"

কিছুতে আর মন ভরে না
বাদল আসে ছেয়ে
দুষ্টু আমার মিষ্টি হল
কোলে লজেন্স পেয়ে।
কোলে
লজেন্স ও টফি
Kolay
CONFECTIONERY
প্রস্তুত কারক
কোলে বিস্কুট কোং প্রাইভেট লিঃ
কলিকাতা-১০

অঙ্গন ও প্রাঙ্গণ

বহু কাল পরে, লালকুঠি আবার উৎসব-মুখরিত হয়ে উঠলো। নানা রং-এর নিওন লাইটে ঝলমলিয়ে উঠলো প্রকাণ্ড লাল প্রাসাদখানা।

বৈশাখের সপ্তম তারিখে সুমিতার বিয়ে, আর তো মোটে মাঝে তিনটি দিন।

অজি, বিজি, অনিরুদ্ধ এসেছে। মিসেস বর্দ্ধণ এসেছেন অলকাপুরীর নামকরা ছেলে-মেয়েদের নিয়ে, বিয়ের দিন হবে অভিনব প্রোগ্রাম, তার রিহার্সাল চলছে।

অনিরুদ্ধ'আর অনিল উঠে-পড়ে লেগে গেছে কত নতুন, কত বিচিত্র ভাবে বাড়ী সাজানো যেতে পারে, খাদ্যতালিকা দিয়ে কোন ডিজাইনে মেনু ছাপানো হবে? কলকাতার কোন কোন নামকরা ঘরে নিমন্ত্রণ করা হবে? কাজের কি অন্ত আছে?

অসীমও অবশ্য অন্তরালে থেকে সব বিষয়েই সহযোগিতা করছিলো এবং তার মতামতই সর্বক্ষেত্রে কার্য্যকরী করে তুলছিলো অনিল।

সারা বাংলা, বোম্বাই, দিল্লী, মাদ্রাজ, আসাম, ওদিকে দক্ষিণ-ভারতের যত কিছু রমণীয় পরিচ্ছদ, আর আভরণ গাড়ী বোঝাই করে আনলো রতনলাল কেডিয়া। এর ভেতর থেকে পছন্দ করে বাছাই করে শাড়ী, ব্লাউজ, গহনা রাখছেন অলকাপুরীর মাসিমা আর মিসেস রায়। বাকী জিনিস ফেরৎ যাচ্ছে, আবার আসছে তার দ্বিগুণ। রতনলালের নাওয়া-খাওয়ার, সময় নেই, গাড়ী নিয়ে ছুটোছুটি করছে দিন-রাত।

জাতিস্মর

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

বারি দেবী

প্রসাধন দ্রব্যের ভার নিয়েছে পদ্মিনী রাও, অজি আর বিজি। করবীকে সঙ্গে নিয়ে নিউমার্কেট দিনের মধ্যে ওরা সাত বার প্রদক্ষিণ করছে, ঠিক মনোমত দ্রব্যের সন্ধান যেন কিছুতেই মিলছে না।

যাকে কেন্দ্র করে চলেছে এই মহোৎসবের আয়োজন শুধু সে যেন প্রাণহীন জড় পুত্তলিকা! মহা আড়ম্বরপূর্ণ দুর্গোৎসবের মাটির প্রতিমা। দুর্গোৎসবটি সার্ব্বজনীন। প্রত্যেকেই কর্ম্মকর্ত্তা আর কর্ত্রী। সঠিক মালিকানা কারুর নয়; আবার সকলকারই আছে প্রভুত্ব। কেউ কারুর অধীনতা স্বীকার করতে রাজি নয়। বিরাট যজ্ঞের আয়োজনে মেতেছে সবাই। কেউ কারুর কথা মানছে না, সকলে একসঙ্গে যেন নেশার ঝোঁকে আবোল-তাবোল বকে চোলেছে। দিদিমা মাঝে-মাঝে, মিতার মাকে স্মরণ কোরে চোখে আঁচল চাপা দিয়ে ফোঁপাচ্ছেন আর করবীর দিকে চেয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলছেন। নাতনীর জন্যে, তাঁর স্নেহের মরানদীতে যেন হঠাৎ জোয়ার এসেছে! অমন বাঁধভাঙা আদরের তুফানে নিজেকে বড় বিব্রত বোধ করছে সুমিতা।

ওঁর শাণিত বাক্য শোনা, শুষ্ক নিয়মানুবর্ত্তিতার নির্দেশ মেনে চলা, মিতার আবাল্য অভ্যাসে পরিণত হয়েছে, কিন্তু এখন তার পরিবর্ত্তে এমন চোখের জলে ভেজানো আদর, কেমন যেন ঠেকছে অস্বাভাবিক! সেজন্তে আনন্দের বদলে অস্বস্তির মাত্রাই তার বেশী বেড়েছে।

—আহা, আমার কণা যে একরত্তি দুধের বাছাকে ফেলে পালিয়েছিলো, বাপ তো দেখলে না, আমি কি পারলাম? নিজের ঘর-সংসার ভাসিয়ে দিয়ে পরের সংসার আগলে বসে আছি। কত ঝড়-ঝাপটা কাটিয়ে বাছাকে এত বড়টি কোরে তুললাম, এখন পরের হাতে তুলে দিয়ে কেমন করে থাকবো?

কান্নাভরা গলায় বলছেন দিদিমা। আশে-পাশে রোয়েছেন যাঁরা, তাঁরা কেউ কেউ চাটুবাক্য দ্বারা সান্ত্বনা দিচ্ছেন, কেউ বা আড়ালে আবডালে চাপাহাসি টিটকারীর গুঞ্জন তুলে, বিয়ে-বাড়ী গুলজার করে তুলছেন।

রাজাবাহাদুর মহেন্দ্রপ্রতাপ রাও, রোজ একবার করে আসছেন, হলে আসর জাঁকিয়ে বসে, গল্প করছেন লালকুঠির পুরোনো দিনের জাঁকজমকের কাহিনী। তাঁকে ঘিরে বসে গল্প শুনছেন নারী-পুরুষ মিশ্রিত একটি বিরাট দল। দিশি ও বিলিতি দুরকম খাবারের আছে ঢালাই ব্যবস্থা, যার যেমন রুচি খাচ্ছে, ফেলছে, গৌরীসেনের টাকা, ভাববার কিছু নেই।

ভালো লাগে না। এত সমারোহ, হৈ-চৈ, স্ফূর্ত্তি কোলাহলের ভিড়ে হাঁপিয়ে ওঠে সুমিতা। তাই পালিয়ে এসেছিলো অফিস হাউসের ভেতর। ফোয়ারার জলের ধারে বোসে, পা দুটি ডুবিয়ে দিলো ফোয়ারার জলস্রোতে। ঝিরঝিরে জলকণাগুলো এসে স্নিগ্ধ পরশ বুলিয়ে দিলো ওর সর্ব্বাঙ্গে। বড় ভালো লাগছে, দু'চোখে জড়িয়ে আসছে যেন শতাব্দীর ঘুমঘোর! শ্বেত পাথরের হংসমিথুনের গায়ে হেলান দিয়ে চোখ বুজলো সুমিতা।

—কার কোমল হাতের উষ্ণ পরশে খেলে যায় পুলক শিহরণ, প্রতি অঙ্গে অঙ্গে। কার মধুভরা কণ্ঠস্বরে মন-প্রাণ হয়ে ওঠে অমৃত-সিক্ত?

মিতা! এখানে শুয়েছো কেন? জলে যে তোমার সর্ব্বাঙ্গ ভিজে গেলো!

—কে? কে? সুদাম? দামীদা'? তুমি এসেছো, ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো সুমিতা! দু'হাতে জড়িয়ে ধরলো ওর হাত দুটো!

—আমায় এখান থেকে নিয়ে চলো দামীদা'! আমি আর পারছি না! আর যে সইতে পারছি না!

—দিদিভাই! ও দিদিভাই! আরে আসমানকা চাঁদ! ধূলোয় গড়াগড়ি দিস কাহেরে মাণিক?

চমকে উঠলো সুমিতা রামভজন সিং-এর ডাকে! দু'চোখ ছেড়ে পালালো পুলক নিদ্রা! চোখ মেলে দেখলো, বুড়ো ভজন দাদার হাত দুটো, নিজের দু'হাতে জড়িয়ে ধরা আছে।

নিদ্রায় জড়তা কাটিয়ে উঠে বসলো সুমিতা, ভজনদা' তুমি? দু'হাতে চোখ মুছে বললো—

হাঁ দিদি! দামুদাদাকে স্বপন দেখেছিলে, বুঝি? হাউ-হাউ করে কেঁদে ফেললো ভজন সিং। গায়ে জড়ানো কালো চেককাটা চাদরের খুঁটটা তুলে চোখ মুছতে মুছতে বললো—বুঝি রে দিদি, সব বুঝি, তোর দিলটা বিলকুল জখমি হোয়ে গেছে, কিন্তুক শুধাই তোকে, এ কাম কেনো করলি দিদি, সুধা ছোড়কে গরল পিয়াসি কাহেরে বহিন?

নির্বাক হয়ে ওর দিকে চেয়ে বসেছিলো সুমিতা একখানি শ্বেতপাথরে-গড়া প্রতিমার মত। কি জবাব দেবে ভজনদা'কে? সে তো নিজেই জানে না কেমন করে কোথা দিয়ে, কি হয়ে গেলো? নাঃ, আর ভাববে না সে, পিতৃবাক্য মেনে নেবে, প্রারব্ধ কর্মফলকে শান্ত চিত্তে গ্রহণ করতে হবে।

ভজন সিং-এর হাত দুটো জড়িয়ে ধরে বললো সে, সেদিনের কথা তোমার মনে আছে ভজনদা'? সেই যে দিন দামীদা' বিলেত যাবার আগে এসেছিলো, তুমি ফুল তুলে দিলে, আর আমি এইখানে বোসে মালা গাঁথলাম?

সে কথা কি ভোলা যায় রে দিদি? তার চাঁদমুখটা যে হরবখত বুকের ভেতর ঝল-মল করছে, তাকে ভুলি কেমনে বল?

বিষাদের হাসি হাসলো সুমিতা, বললো—জানো ভজনদা', সেদিনের মালাটা বোধ হয় ভালো করে গাঁথা হয়নি, বড্ড তাড়াতাড়ি গেঁথেছিলাম কি না, শক্ত করে গিঁট দিতে বোধ হয় ভুলে গিয়েছিলাম। তাই পথে যেতে যেতে সে মালাটা ছিঁড়ে গেছে আর ফুলগুলো ছড়িয়ে কোথায় পড়ে গেছে। সে-ও বুঝতে পারেনি, কখন ছিঁড়ে গেলো মালাটা; শুধু বুঝলো মালাটা গলায় নেই, কখন কোথায় যেন ছিঁড়ে পড়ে গেছে। জানো ভজনদা', কি যে মর্মান্তিক যাতনায় সে ছটফট করেছে মালাটা হারিয়ে;
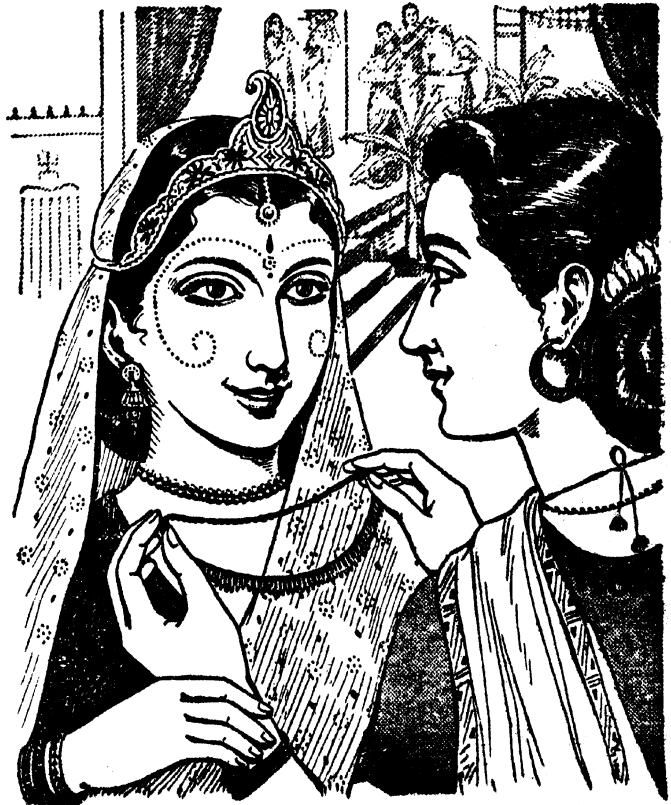
আর সেই ছেঁড়া মালাটা পথে পথে খুঁজে বেড়াচ্ছে, কিন্তু একথা জানে না, যে আরেক জন ঐ মালাটা কখন যে চুরি করে নিয়ে নিয়েছে! এইবার জানবে সে, সব জানতে পারবে, আর কিছু গোপন থাকবে না!

কথা থামিয়ে আপন মনে হেসে উঠলো সুমিতা। এইবার সব জানবে সে, সব জানবে, আকাশের দিকে চোখ দুটি মেলে দিয়ে ব্যথা-ছলো-ছলো কণ্ঠে বার বার নিজেকেই শোনালো কথাটা!

—ছোড় দেও, দিদিভাই ছোড় দেও ও-সব বাত! এই লালকুঠিতে জনম নেয় যারা তারা কেউ সুখভোগ করতে আসে না দিদি, তারা আসে বড় বড় কাম কোরতে! দেখিস না আমার জনম দুখিনী সীতামাঈ; রামচন্দ্রকে পতিরূপে পেয়েও পেলে না, রাবণ রাজার অশোকবনে কেতো দুখ ভোগ করলো, আবার আগমে জোলে সাচ পরীক্ষা দিলো, হায়, হায়, এততেও মায়ীর দুখের শেষ হলো না, বনবাস করে মনের দুখে পাতালে চোলে গেলো! চোখের জল মুছে আবার বলতে লাগলো বুড়ো—এ দুনিয়াকা এহি রীত হায়! ভালোমানুষ সাচ্চা মানুষ হোবে তো বহুৎ দুখ পাবে! তোমার ঠাকুমা বহুরাণী কমলা ছিলো সাক্ষাৎ লছমী! আহা চোখের জলে তার পাষাণ ভিজলো বুকভরা দুখ নিয়ে এ রাজপ্রাসাদ ছেড়ে চোলে গেলো আমার রাজলছমী! ছোড় দে দিদি, দুদিনের সুখ দুখকা বাত ছোড়দে এ সব ঝুটা হায়! মায়াকা খেল!

এক হাতে সুমিতাকে বুকের কাছে টেনে এনে তার মাথার অপর হাতখানি বুলিয়ে দিতে দিতে বললো রামভজন্—ডরো মাত দিদি! হরবখত্, রামজীকো শরণ লেও, সীতামাঈকা পাদপদ্ম ধেয়ান করো', তোমার শাপমোচন হোয়ে যাবে!

মুগ্ধ দৃষ্টি মেলে দেখছিলো সুমিতা রামভজন সিং-এর মুখখানা! কুঞ্চিত তোবড়ানো কালো গাল বেয়ে দর-দর করে ঝরে পড়ছে চোখের জলের ধারা! অসংখ্য অভিজাত শ্রেণীর নারী-পুরুষে গম্ গম্ করছে বিরাট প্রাসাদখানা, ওদের আছে কত সম্মান, আভিজাত্য, ঝলমলে বসন-ভূষণ, বড় বড় ডিগ্রি, কিন্তু ওর প্রতি সমবেদনাশীল এমন দরদী হৃদয় বন্ধু আর একটিও কি আছে ঐ বিরাট জনতার মধ্যে? পরম প্রশান্তিতে বুক ভরে ওঠে সুমিতার, বুড়োর কাঁধের ওপর মাথাটা এলিয়ে দিয়ে বললো—ভজনদা',! তুমি কত বড়, কত মহৎ, কত শান্তি তুমি দিলে আমায় আজ, এমন তো কেউ দেয় না, তুমি বোধ হয় আর জন্মে আমার সত্যিই দাদা ছিলে, তাই না?

—একগাল হাসি হেসে বললো ভজন সিং। আর জনমে ছিলাম দিদি, আর এ জনমে নেই? ওরে দিদিভাই, তুই যে আমার কতখানি তা মুখ্যু মানুষ, কেমন করে বলবো? তুই যে আমার রাজাবাবুর আমার মা অন্নপূর্ণার বংশের একটুখানি শিবরাত্তিরের সলতে। বাজিপাট সব কোথায় কর্পূর হয়ে উবে গেলো, শুধু রইলো এই বুড়ো বাঁদরটা! আর রয়েছো আমার সোনার কমল, আমার সাতরাজার ধন এক মাণিক। আমার বুকের কোলজে! ওরে বহিন্, তোর শুক্নো মুখ দেখলে যে আমার এই ছাতিটা ফেটে যায় রে। ভেবেছিলাম যোগ্য দেওতা রাজুলালার হাতে তোকে তুলে দিয়ে এবারে আমি ছুটি নেব, চোলে যাবো অযোধ্যাধামে; কিন্তু—কিন্তু যাওয়া আমার হলো না দিদি! যাওয়া আমার হলো না—ঐ যাঃ সুমিতাকে ছেড়ে দিয়ে সচকিত হয়ে উঠলো ভজন সিং—

—কি হলো ভজন দা? কি বলছিলে বলো, যাওয়া তোমার হলো না কেন? আমি তো আর তিন দিন বাদে চোলে যাবো।

—আর দাঁড়াতে পারছি না দিদি! তোমাদের ঐ নাচউলী মাসীমা ফুল চেয়েছেন, দেরী হলে ক্যাট-ম্যাট করে অংরাজি ঝাড়বে, গোসা করবে, সে আমার সইবে না দিদি, ওদের গোলামী করতে পারবে না এ বুড়োটা! বল্‌বো, সে কথা বল্‌বো, আরেক দিন বলবো, সে কথা, আজ নয়, আরেক দিন বলবো, আপন মনে বিড় বিড় কোরে বক্‌তে বক্‌তে থপ থপ করে পালালো বুড়ো!

ওর মহাব্যস্ত হয়ে চোলে যাওয়ার পানে চেয়ে ম্লান হেসে বললো সুমিতা—তুমি না বোললেও আমি বুঝেছি ভজনদা'! দামোদা' ছাড়া আর কারুর প্রতি বিশ্বাস যে তোমার নেই; তাই আমায় ছেড়ে এক পা-ও কোথাও যাবার ছুটি এ জীবনে তোমার আর বোধ হয় মিলবে না। তোমার ঐ কষ্টিপাথর চোখ দুটো যাচাইএ ভুল করেনি ভজনদা'!

[ক্রমশঃ।

মেয়েদের কো-অপারেটিভ

মীরা সরকার

আজকের দিনে এখানে যে পরিবেশ তাতে কো-অপারেটিভ-এর সম্ভাবনা কতটুকু বা কতদূর সীমিত? বিশেষতঃ মেয়েদের কো-অপারেটিভ?

বাজার তার মন্দা ভাবটা উঠেছে কাটিয়ে সরকারী আর বেসরকারী শিল্পবিকাশের আওতায়, এদিকে ভোগ্যপণ্যের মূল্যমান উধাও হচ্ছে নাগালের বাইরে। অর্থাৎ বেকারী কমছে বটে কিন্তু টাকার দামটাও পড়ছে জোর কদমে। সুতরাং বাড়তি আয়ের প্রয়োজনটা কেউ কি পারেন উড়িয়ে দিতে?

তাছাড়া যুদ্ধোত্তর বিপর্য্যয় এবং বর্তমান আন্তর্জাতিক ঘোরালো অনিশ্চয়তা, দেশভাগ, মুদ্রাস্ফীতি আর পরিকল্পনার টানাপোড়েন, এ-হেন চূড়ান্ত সঙ্কটে আজ ঘরটা একান্ত ভাবেই অন্দরমহল রইছে না। এদেশের নারী জাতটার সঙ্গে বৃহত্তর সমাজের সম্বন্ধটা একেবারে আগাপাশতলা ঢেলে নতুন ছাঁচে ফেলা হচ্ছে। এ যেন এক গলিত ইস্পাতের যুগ, বিশেষতঃ জেনানা সংস্কারের শুধু সামাজিক নয়, একান্ত-ভাবে ব্যক্তিগত কাঠামোর ক্ষেত্রেও। আর সেও কারো নির্দিষ্ট করে দেবার নয়।

আজকে বিশেষ করে পশ্চিম-বাংলায় যে রাজনৈতিক আর অর্থনৈতিক কঠোর চাপ সৃষ্টি হয়েছে এবং যে দ্রুত লয়ে সামন্ততান্ত্রিক সংস্কারগুলোর শেষ পর্য্যায়টুকু পার হচ্ছেন মেয়েরা, তাতে কো-অপারেটিভ আন্দোলন গড়ে তোলার এত বড়ো উর্বর ক্ষেত্র কখনো আর ঘটেছে কি না সন্দেহ!

তা'হলে সব দিক দিয়েই মেয়েদের মধ্যে কো-অপারেটিভ আন্দোলন প্রসারিত হওয়ার উপবিবেশ হাজির। কিন্তু এগোচ্ছে না কেন?

তার কারণ শিক্ষিতা মেয়েরা এখনো নারীসমাজের নেতৃত্বে, তবু তাদের সঙ্গে দেশের বৃহত্তর নারীসমাজের একটা বেদনাদায়ক বিচ্ছেদ আছে। কবে তাঁরা মর্শ্মে মর্শ্মে উপলব্ধি করবেন যেখানে লক্ষ লক্ষ নারী দুঃসহ পরিবেশের অন্ধ ক্রীতদাস সেখানে মুষ্টিমেয়ের প্রাণহীন উন্নতি সামান্য একটা সঙ্কটের ঝাপটাও সইবে না?—ইতিহাসের প্রত্যেকটি পৃষ্ঠা তার জবানবন্দী। কারণ যে গাছের গোড়ায় নেই মাটি তার ফুল ফোটান চক্ষুপীড়াদায়ক ভাবেই পরনির্ভর।

অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ী-ছাপ না পেলে কিংবা অর্থনৈতিক তথা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার মত আয়ে সক্ষম না হলেই মেয়েরা অশিক্ষিত হয়, এ দুর্ব্বহ ভুলের বোঝা আতঙ্কের মতো নির্ম্মম ভাবে আর কোন দিন ভেঙ্গে পড়েনি বাংলা দেশের মেয়ের মনে।

তবু আমি তথাকথিত অশিক্ষিত নারী-সমাজের স্বপক্ষে একটা ক্ষুব্ধ অভিমান তুলতে পারি। শিক্ষিতা বোনেরা তাঁদের শিক্ষার সার্থকতা যদি এই সঙ্কটে নিরুপায় ডুবে-যাওয়া বোনেদের সাথে ভাগ করে নেন। তাই কো-অপারেটিভ আন্দোলনের কথাটা এত জরুরী।

কো-অপারেটিভের বিস্তৃতির ধারা কতকটা ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের মতোই। প্রথম যুগের ট্রেড ইউনিয়নের মতো এ আন্দোলনের নেতৃত্বে থাকবে তৎকালীন সবচেয়ে সমাজ-সচেতন শ্রেণী আর সংগঠনে থাকবে সেই সব জনপ্রিয় কাগজ, যাদের কলামগুলি কঙ্কন-বলয়িত হাতে বেশী পৌঁছয়।

কিন্তু পরের কথা পরে থাক, এখুনি ঠিক কোন পণ্যের ক্ষেত্রে কো-অপারেটিভ সম্ভব? বাজারে কো-অপারেটিভের নেই ঘাটতি, আর তাদের মধ্যেও তীব্র প্রতিযোগিতা।

রণকৌশলের মোদ্দা কথাটা কি; যেখানে সংগঠনের সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশী, প্রতিযোগিতার সুযোগ কম, সেখানেই আমরা ধরুন প্রথম নাক গলালাম? পণ্যটা এমন হবে, যেখানে প্রতিযোগিতাকে পাশ কাটানো যাবে, আয়টা হবে না ন্যূনতম আর তার ভিত্তি যেন হয় মেয়েদের বিশেষ শিল্প-চেতনা (যেখানে সম্ভব)।

এখানে প্রশ্ন জাগবে, সেলাই কো-অপারেটিভগুলো তো বুদ্‌বুদের মত পাড়ায় পাড়ায় গড়ছে আর ভাঙ্গছে, মাসখানেকের আয়ু। নতুন করে আন্দোলনটা চালিয়ে লাভ? এ ক্ষেত্রে ব্যর্থতার কারণ ক্রেতাদের ক্রয়-ক্ষমতার দ্রুত সঙ্কোচন আর প্রতিযোগিতার সবচেয়ে তীব্রতা। জীবিকা যাঁদের সেলাই, তাঁদের সুনিপুণ দক্ষতার সাথে শিক্ষার্থীদের অপটু হাত পেরে উঠবে কেন? সুতরাং মেয়েদের বেলায় কেবল সূক্ষ্ম কারুকর্ম্মের মর্য্যাদা পাওয়া সেলাই-এর টিকে থাকবার ভরসা আছে।

বক্তব্যটা হচ্ছে সহজাত ক্ষমতা আর যোগ্য নৈপুণ্য না থাকলে সেই মহিলাকে সেই অনুপযুক্ত কো-অপারেটিভে নিলে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা দু' পক্ষেরই। যোগ্যতা অনুযায়ী নির্বাচন।

সেই জন্যেই কো-অপারেটিভকে নিছক সেলাই কিংবা তাঁত বড়ো জোর জ্যামজেলী তৈরী করায় সীমাবদ্ধ রাখতে গিয়েই এ পশ্চাদপসরণ —অর্থাৎ জিনিষটি হবে বহুমুখী। চাই সব শ্রেণীর মেয়ের প্রতিনিধিত্ব।

বাংলা দেশের নারী মহলের শ্রেণীবিন্যাসটি খুঁটিয়ে দেখলে মনে হয়, শ্রমিক মেয়েদের বিশেষ করে যারা ক্ষুদ্র কারখানার সঙ্গে পিসরেটে ফড়িয়ার আড়কাটিতে সংযুক্ত সেখানে সবচেয়ে শক্তিশালী ভিত্তের সংগঠন গড়া যায়। আর শৈল্পিক দিকটা যাঁদের জৈবিক তাড়নাকে অতিক্রম করেছে সেই সংস্কৃতি সেলগুলো এমন কি সৌখীন রপ্তানি বাজারেও বৈদেশিক মুদ্রা আনতে পারে। চীনে দু' ধরণের সংগঠনেই সরকারী বা বেসরকারী প্রযোজক বোর্ড হাজির।

শ্রমিক মেয়েরা বাড়ীর পুরুষদের মারফত ক্ষুদ্রশিল্পের কারখানা থেকে অর্ডার নিয়ে তৈরী করেন, কিংবা পালিশ ইত্যাদি করেন যা উৎপাদনের আনুসঙ্গ পণ্য। অতি অবিশ্বাস্য কম পিসরেটে। হাড়ভাঙ্গা দিনে-রাতে পালিশ সেরে জোর দশ পয়সা কি তিন আনা আয়, তাও অর্ডার ফুরোলে দিন আর চলে না। কো-অপারেটিভ তাঁদের সংগঠিত করবে, আনবে অর্ডার আর দরাদরি করে ন্যায্যমূল্যের রেট করবে আদায়।

ন্যায্যমূল্যের বিক্রয়-সংস্থা বিশেষ করে উচ্চমূল্যের অঞ্চলগুলিতে। এক বিশেষ স্বাগত কর্ম্মসূচী হতে পারে, যখন আজকালকার বাজার পাইকারী বিক্রেতাদের মর্জ্জীর ওপর হাল ছেড়ে দিয়েছে। বিশেষতঃ আমাদের দৈনন্দিন কেনাকাটার দুরূহ সঙ্কটটি যদি ন্যায্যমূল্যের এই সব কেন্দ্রগুলো দেয় মিটিয়ে তবে উদ্বৃত্ত পয়সা ক'টি ধরুন একটু মনো-প্রসাধনের কাজেই 'অপচয়' হোল? উদ্বৃত্ত

জানলায় সবুজ পর্দার নিমন্ত্রণ আর টেবিলে তাজা ফুলের শীষ? সে থাকগে।

কো-অপারেটিভের আর উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ কি? জিনিষটি ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের মতোই মেয়েদের জীবিকা থেকে সন্তান পালন সমস্ত সমস্যা নিয়েই সময় এবং পরিবেশ অনুযায়ী মাথা তুলতে পারে। এমন কি মেয়েদের মধ্যে কারিগরী শিক্ষা ছড়ানোর কাজও।

এখন এই ধরণের বহুমুখী কো-অপারেটিভ করতে গেলে সংগঠনটা বেশ মজবুত হওয়া চাই। বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা করেছেন রাজনৈতিক দলগুলো। বিচ্ছিন্নতার মৌলিক অসুবিধে এক তো যথোপযুক্ত পুঁজি তোলা যায় না, তাছাড়া অর্ডার সংগ্রহ কিংবা আরো যে সব উপর মহলের কাজ কারবার করে বুনিয়াদ খাড়া করা দরকার সেটাও ক্ষুদ্র সংগঠনের গণ্ডীর শক্তিতে কুলোয় না।

ওপর দিকে হোক মহিলাদের কো-অপারেটিভ কমিটি কিংবা তারও ওপরে সারা ভারত কোন সংগঠন। নীচের দিকে থাকুক কো-অপারেটিভ সেলগুলো, নিজেদের কর্মক্ষেত্র করুক বিস্তারিত। সবার চূড়োয় রইল এক কো-অর্ডিনেশন কমিটি, যা বিভিন্ন প্রদেশের, সমস্ত শ্রেণীর সরকারী বেসরকারী সংগঠনগুলোর মধ্যে রাখবে যোগসূত্র করবে আন্তঃভারতীয় পরিচালনা।

পাঞ্জাব, মাদ্রাজ আর বম্বের নারী-সমিতিগুলো বিচ্ছিন্ন প্রয়াসে এগিয়েছেন অনেক দূর। এমন কি, পাঞ্জাবে এক জেনানা হাসপাতাল পর্য্যন্ত হয়েছে চালু। বাংলা দেশের প্রচেষ্টাগুলোই প্রাথমিক কর্মক্ষেত্র হতে পারে যদি গতানুগতিকতার বাঁধ ভেঙ্গে এ আন্দোলন নারী-সমাজের সর্ব্বস্তরে ভেঙ্গে পড়ে। নেয় যেন সুদূরপ্রসারী কর্ম্মিক আর সাংস্কৃতিক যোজনা।

কাজটা দ্রাষ্টার মারার নয়—ভিত গড়ার। সুতরাং চেষ্টাটা ব্যাপক হলেই সফল হবে, বিচ্ছিন্নতায় নয়।

চীনে কো-অপারেটিভ আন্দোলনে কোটি কোটি নারীর অভূতপূর্ব সক্রিয়তাই প্রমাণ করে এখানেও ও-জিনিষ সার্থক হবে, কারণ চীনা মেয়েরাও ঠিক আমাদেরই মত সামন্ততান্ত্রিক যুগটার শেষ ধাপ আসছে কাটিয়ে।

শেষ কথাটা আবার গোড়ার কথাও—কো-অপরেটিভের মূলধন টাকা নয়, আত্মবিশ্বাস। অর্থনৈতিক সংকটে বোবা মারখাওয়া মেয়েদের যন্ত্রণা ভরা চোখে বিশ্বাস ফিরিয়ে আনুন। এ যুগের সমাজ-সচেতন মেয়েদের সে এক গূঢ় দায়, যে দায় মেনে সব নারীই অন্যের বোন।

রাগ-রাগিণী

অমিতা ঘোষাল

রতনপুরের ঘুম-ডাকা অসাড় বুকের ওপর আবার পাগলা হাওয়া দিয়েছে, চৈত্রের হাওয়া। সহরতলীর নিঝুম পড়ন্ত বেলা। এক ধরণের জাওলা-ধরা আলো-আঁধারে ঘেরা বাড়ীগুলো, যেন কত যুগের বিষণ্ণতা জমে আছে। জরাজীর্ণ ঘুণধরা বাঁশের মাচায় লতিয়ে ওঠা লম্বা লম্বা শুকনো পাকা লাউ ঝুলছে, আর তারি আশে-পাশে জঞ্জালের ঝোপ। অবহেলায় অযত্নে বর্দ্ধিত। বড় জোর দু'-একটা বুনো চামেলী লতাও আছে হয়তো কিন্তু সব বাড়ীতেই খিড়কীর দোরগোড়ায় দু'একটা সজনে নয়তো বাতাবী গাছ অবশ্য আছে। কাজেই এই ভরা চৈত্রের পাগলা বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে সজনে আর বাতাবী ফুলের গন্ধে। অদ্ভুত নেশাভরা ঐ দুটো, নিতান্ত জংলী ফুলের গন্ধ।

ঠিক এমনি সময় চিঠি লিখতে লিখতে অন্যমনস্ক হয়ে যায় সরমা। কেমন একটা বিচিত্র বেদনার অনুভূতি! মাত্র বছর কয়েক ধরেই এমনি নিঃসঙ্গতা অনুভব করছে সরমা। বিশেষ করে এমনিতরো নির্জ্জন পড়ন্ত বেলায়। থামতে দেখে পিসিমা তাগাদা দেন। যা রে, হাঁ করে দেখছিস কি? কি যে হয় মাঝে মাঝে, ভাল লাগে না বাপু ন্যাকামী,—তাড়াতাড়ি দু'লাইন লিখে আমায় খস্ত করে দিলেই তো হয়, নেহাৎ উপায় নেই, তা না হলে এমন অদৃষ্ট হবে কেনো? পিসিমার গলা ভারী হয়ে ওঠে। নিতান্ত একঘেয়ে ব্যাপার। যত তাড়াতাড়িই লিখুক না সরমা পিসিমার অফুরন্ত আত্মীয়-কুটুমের অবান্তর খবরাখবরের ইতিবৃত্ত আর ফুরোয় না। রাগে সর্ব্বাঙ্গ জ্বলতে থাকে সরমার।

—তুমি বলে যাও না পিসি, আমি লিখছি।

—কি লিখছিস তা তুই জানিস, কিন্তু জেনে রাখ, যদি সব ঠিক জবাব না আসে তবে—

—হ্যাঁ তবে আমায় আস্তো কেটে খেও, হবে তো?

—আহা, মেয়ের কথার ঝাঁঝ বাড়ছে দিন দিন দেখো! আচ্ছা আসুন আজ তোর পিসেমশাই—আজই টেলিগ্রাফ করিয়ে দোব, ঘর-শত্তুর আর পুষছি না, জানিস?

—বেশ তাই দিও পিসি এখন বলো ত চিঠি শেষ করি।

বলা বাহুল্য, পিসিমা দাঁতে দাঁত ঘসে নিজেকে সংযত করে নিয়ে বলতে থাকেন, ছোট বৌমার শরীর একটু সারিয়াছে কি না, মুখে রুচি আছে কি না, এখন সর্বদা সাবধানে রাখিবে। প্রার্থনা করি, মা ষষ্ঠী আর পাঁচটির মতো তাহাকে শীঘ্র মুক্ত করুন।

সরমা লিখতে লিখতে নিজের জন্তও পিসিমার কবল থেকে মুক্তি প্রার্থনা করলো। নিস্তব্ধ, বড় নির্জন মনে হয় রতনপুরের রাখালপাড়া, যেন অঘোরে ঘুমিয়ে পড়ে এমনি সময়। শুধু সরমার রোজ এই একঘেয়ে অবান্তর কাজ থেকে মুক্তি নেই। কিন্তু সরমার সর্বান্তঃকরণ চমক দিয়ে হঠাৎ ভেসে এলো গানের সুর। আশ্চর্য্য! এ কি ব্যতিক্রম আজ? পাড়াসুদ্ধ উৎসুক হয়ে কান পেতেছে নিশ্চয়। অঘটন বই কি? রতনপুরের রাখালপাড়ায় তিন পুরুষে কেউ কখনো শোনেনি যা। নিধু বৈরাগীর একচেটিয়া কৃষ্ণ শতনাম ছাড়া দ্বিতীয় শোনেনি কেউ এমনি অসময়। কেউ বললে, গান নয়, বাঁশী। কেউ বললে, বাঁশী নয় রে, বেহালা। কেউ বললে, কে যেন কাঁদছে, গান নয় রে।

সরমার ছোট ভাই গুলতি তৈরী করছিল, দিদির কাছে এসে জিগ্যেস করলো,—যাবো দিদি, দেখে আসবো ও-বাড়ীতে কারা এসেছে? সরমা ভেতর বাড়ীর দিকে তাকালো, পিসিমা ডাল বাছতে বসেছেন।

—যা, এক ছুটে যাবি আর আসবি। সত্বর জামাটা ভাঁজ করে প্যান্টে গুঁজে দিলো সরমা। সন্ত প্রাণপণে ছুটে চলে গেল।

জানলার গরাদে ধরে দাঁড়িয়ে রইলো সরমা। আশ্চর্য্য এ

অনুভূতিতে। কান্নায় বুকখানা মুচড়ে উঠেছে তার। কতো কথা মনে পড়ে যায়, কতক হারিয়ে যাওয়া আবছা ধূসর স্মৃতি। মা, দাদা, দিদি সবাই চলে গেল এক এক করে, বাবা পাগলের মতো হয়ে গেলেন—তারপর এই পিসিমার কবলে এসে পড়লো সরমা আর সন্তু। কিন্তু এখন সরমার বাবা ভাল হয়েছেন, ভাল চাকরী পেয়েছেন। মাদ্রাজ অনেক দূরের পথ। হ্যাঁ, তবু চলে যাবে সরমা বাবার কাছে, এমনি করে আর পারে না। অনেক কিছুই ভেবে স্থির করে নেয় সরমা।

সুর থেমে গেছে, পড়ন্ত রোদ নেবে এসেছে রক্তগেঁদার ঝোপে। সন্তুর ফেরবার নাম নেই। অস্থির হয়ে ওঠে সরমা। ওদিক থেকে পিসিমার মধুবর্ষণ সুরু হয়েছে,—হাড় জালিয়ে খেলো পরের আপদ ঘরে ঢুকিয়ে, আমার পাপের শাস্তি। পিসিমার কণ্ঠস্বর ক্রমশঃ উঁচু তারে চড়তে থাকে।

সন্তু প্রজাপতির মত নাচতে নাচতে ফিরে এলো। আনন্দে গরবে যেন উপচে পড়ছে সে। কিন্তু দিদির কাছে এসেই নিবে এতটুকু হয়ে গেল, যেন কতো অপরাধ করেছে। এমনি গুটি মেরে উঠে এলো হাতখানা পকেটে ঢুকিয়ে। সরমার চোখে জল দেখে সন্তু ভেবে নিতে পারে অনেক কিছু।

—পিসিমা বকেছে বুঝি দিদি ?

—তোর কি তাতে ? এত তাড়াতাড়ি ফিরে এলি কেনো, আজ ওখানেই থাকলে পারতিস।

—আমি তো আসতে চাইছিলাম, উদয়দা' জোর করে ধরে রেখেছিলো।

—উদয়দা ? কে সে ?

—বাঃ, সেই তো বাজনা বাজাচ্ছিলো। জানো দিদি, কত সুন্দর সুন্দর ছবির বই আছে ও বাড়ীতে, কত রকমের পুতুল, কতো খেলার জিনিস তার ঠিক নেই।

—হুঁ, তুই বুঝি তাই হ্যাংলার মতো দেখছিলি এতক্ষণ ধরে ?

—বা রে তা কেনো,—আমায় কত আদর করে ডেকে নিয়ে গেল ভেতরে জানো তা ? আমি কি বোকা যে নিজেই যাবো ? শুধু লুকিয়ে লুকিয়ে দেখেই ছুটে পালিয়ে আসছিলাম আর ওমনি উদয়দা' দেখতে পেয়ে গেল। আর একটা কুকুর কি ভীষণ তাড়া করে এলো জানো ? উদয়দা' বললো—দৌড়ো না খোকা, তবেই কামড়ে দেবে। তারপর আমায় জোর করে ভেতরে নিয়ে গেল। আর আসতেই দেয় না।

সরমা বিরক্ত হয়ে ধমকে বলে,—চুপ কর। কোথাকার কে না কে উদয়দা', উদয়দা'! আর কখনো বাড়ীর বার হবি তো দেখিস।

সন্তু বিনা দ্বিধায় চিৎকার করে আবার বলে, হ্যাঁ দিদি উদয়দা'। এই যে আমার চকোলেট, কে দিল ? উদয়দা'। হাতটা মেলেই আবার বন্ধ করে মহাবিজ্ঞের মতো হাসতে থাকে সন্তু।

ভারি রাগ হয় সরমার। কান ধরে সন্তুকে টেনে আনে এক পাশে, তারপর বলে, অসভ্য কোথাকার, যা এক্ষুণি ফিরিয়ে দিয়ে আয়, লজ্জা করে না—পরের কাছ থেকে জিনিস আনতে, যা এক্ষুণি ফিরিয়ে দিয়ে আয়।

সন্তু শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো খানিক। তারপর বললে, তুমি কিছু জানো না দিদি, ভারী বোকা, উদয়দা' বুঝি পর ? সরমা উত্তর দেওয়ার পূর্ব্বে পিসিমা এসে দাঁড়ালেন মাঝখানে।

—কি হোল আবার ? তোদের নিয়ে আর পারি না, আজই আমি লিখে দোব দাদাকে, অসভ্য ছেলেমেয়ে দুটোকে নিয়ে যাক, আমার হাড় জুড়োক, দিন-রাত লেগেই আছে আর পারি না। বিরক্ত বিদ্বেষ ভরে চলে গেলেন পিসিমা যেমন এসেছিলেন।

সন্তু আপাততঃ মুক্তি পেয়ে গেল এই ফাঁকে, ছুটে আবার বেরিয়ে গেল সে। সরমা অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে দেখলে, সন্তু যাওয়ার সময় দ্রুত হাতে কতোগুলো রক্তগেঁদা ছিঁড়ে নিয়ে গেল। হয়তো আবার সেই উদয়দা'র কাছেই ছুটলো সে। হয়তো কেন সত্যি।

রোজকার মত যথারীতি পিসেমশাই ফিরলেন সহর থেকে, আর পিসিমা সারাদিনের সঞ্চিত নালিশগুলি নিয়মিত ভাবে শোনাতে লাগলেন। শুনে শুনে সরমা অভ্যাস হয়ে গেছে, তবু আজ হঠাৎ কেমন বিদ্রোহ করে মন—চোখের পাতা ভারী হয়ে আসে, হাতের কাজ শিথিল হয়ে যায়, ঘুরে ফিরে এসে দাঁড়ায় সে জানালার গরাদে ধরে। চৈত্রের হাওয়া বয়ে যায় শুক্লাতিথির ভরা জোয়ারে বাতাবী ফুলের গন্ধ মেখে। স্পষ্ট হয়ে ওঠে আবার সেই পড়ন্ত রোদের গান উত্তীর্ণ সন্ধ্যার বুকে। না আর পারে না সে, বাবাকে নিজের হাতে লিখে দেবে এবার যদি না নিয়ে যাও, তবে একাই রওনা হবো তোমার কাছে, আর পিসিমার বাড়ী কিছুতেই থাকবো না, অভিমানে ফুলে ফুলে কাঁদে সরমা।

সহরতলীর নতুন হেলথ অফিসার। প্রায় এক মাস পেরিয়ে গেল উদয়ভানু কাজে যোগ দিয়েছে। কলকাতার সদাবিক্ষত জীবন থেকে মুক্তি পেয়ে রতনপুরের সম্পূর্ণ স্বাধীন জীবন বিচিত্র এক স্বপ্নরাজ্যের মতোই অনুভূত হয়। বিগত ক'বছর কি অসম্ভব অত্যাচারই না সহ্য করেছে উদয়। যদিও স্বচ্ছল পরিবারের সন্তান, তবু কত না বঞ্চনা, কত অন্যায় শাসন বাঁধনের কঠিন রীতি-নীতি দিয়ে ঘেরা ছিল কলকাতার জীবন। বিশেষ করে উদয়ের সংগীতপিপাসু মন বার বার আহত হয়েছে। এইবার উদয় যথাযোগ্য সুযোগ পেয়েছে।

রবিবারের ছুটি। সকাল থেকে হাল্কা মেঘের আস্তরণে

বসন্ত আকাশ আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে। বেহালায় পুরোন তার খুলে নতুন তার লাগাতে বসছে উদয়। ও বাড়ী থেকে সন্তু চুপি চুপি এসে ঢুকলো, জানলো না উদয়। অতি দ্রুত হাতে ছোট একটি প্যাকেট নাবিয়ে রেখে সন্তু ছুটে পালালো। উদয় ডাকলো, ফিসফিস চেঁচালো যার কত বাঁধা অবস্থায়, সন্তু পেছু ফিরে আর তাকালো না। সুন্দর কাজকরা নীল কাপড়ের ছোট প্যাকেটটি তুলে নিলো উদয়, নরম হাতে খুলে ধরে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে সে। নিপুণ শিল্পীর হাতে তৈরী সূক্ষ্ম লেসের নক্সাকরা একটি বালিসের ওয়াড় ছোট্ট একটি কাঠের ফুলদানী। সঙ্গে এক টুকরো কাগজে লেখা, "মাষ্টার মশাই-এর জন্মদিনে, সন্তু'।"

বেহালার তার বাঁধা আর হোল না। উদয় জানে, বেশ ভাল করে জানে, এ সরমার দেওয়া উপহার কিন্তু এ আবার কেন, উদয় কি দিয়ে শোধ করবে এ ঋণ? ভেবে পায় না, সন্তুর হাতে সামান্ত একটি ছবির বই নয়তো একটা পাঁচ টাকা দামের মেকানোবক্স-এর বেশী কি দিতে পারে? সরমা নামটি শুধু জানা সন্তুর মুখে। তার সঙ্গে দুটি ভাইবোনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। কতটুকুই বা বোলতে পারে সন্তু, তাই নিয়ে বসে বসে ভাবনার জাল বুনতে থাকে উদয়।

বসন্ত-আকাশে মেঘের আস্তরণ ঘন হয়ে আসে। এক দিন, মাত্র একটি দিন সন্ধ্যা-ধূসর ছায়ায় সরমার স্নিগ্ধ সুন্দর ছায়া দেখেছিল মাত্র উদয়—আজ তাই নিয়ে মনে মনে রঙে রঙে জাল বুনতে থাকে উদয়। দেখতে দেখতে সন্তুর পরম আপন জন হয়ে উঠলো উদয়। উদয়ের কাছে দু' বেলা পড়ে, খেলা শেখে, দেশ-বিদেশের রীতি-নীতি নিয়মকানুন নিয়ে আলোচনা করে, প্রত্যেকটি বিষয় উদয়কে ভাবতে হয় এখন সন্তুর জন্যে, সরমা থেকে গেল যেমন অন্তরালে ছিলো ঠিক তেমনি।

পিসিমার অসাধ্য সাধনায় সরল মানুষ পিসেমশাইএর মনেও বিদ্বেষ-বিষ জমতে শুরু হয়েছে ক'দিন ধরে। এক দিন তিনি সন্তুকে ধরে বেশ খানিকটা শাসন করে বলেন—গরীবের ছেলে গরীবের মতো থাকবি, খবরদার আর ঐ সাহেবের বাবুগিরি শিখতে যাবি না, বুঝলি? পিসিমা খুব আত্মপ্রসাদ লাভ করলেন ও বাঁধা দিয়ে বললেন—দেখো ও ছোট, তুমি বরং ঐ ভদ্রলোককেই যা বলার বলে এসো, সত্যি তো অমন শিক্ষায় আমাদের চলবে কি করে, এখনই সন্তু একটুকু ময়লা জামা গায়ে দেয় না, খালি পায়ে হাঁটে না, পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে মিশতে চায় না, আর খাতা বই-এর তো শেষ নেই, তার সঙ্গে রং-পেনসিল আরো কতো কি, মাথা ঘুরিয়ে দিচ্ছে ছেলেটার। তার পর সামলাবো কি করে? ওদের নাই কানাকড়ি, সবই তো তোমার আমার ঘাড়ে! খুব ভালো করে বুঝিয়ে বলবে, ভদ্রলোক যেনো আর ওকে না ডাকেন।

পর্দার আড়ালে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়েছিল সরমা। লজ্জায় অপমানে শিউরে ওঠে সে, প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে কণ্ঠস্বর কেঁপে ওঠে, তবু বললো,—পিসেমশাই, আমিই সন্তুকে আটকে রাখবো, তুমি তাঁকে কিছু বোল না।

পিসিমা ওদিক থেকে ফোঁস করে উঠলেন—তুমি আটকাবে! এমন করে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতে, যার তার কাছে ভিক্ষে করতে তুই তো শিখিয়েছিস্ সন্তুকে।

—ওকে ভিক্ষে বলো না পিসিমা, কেউ যদি আদর করে কিছু দেয় ফিরিয়ে দেওয়াটা নিতান্ত অভদ্রতা। কথাটা একটু জোরের সঙ্গে বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সরমা।

রাগে অপমানে জ্বলে উঠলেন পিসিমা—দেখেছো, দেখেছো মেয়ের আস্পর্দ্ধা? না, যেমন করে হোক তাড়াও, না হলে আমি চলে যাবো দিদির বাড়ী। অনেক সয়েছি আর নয়।

পিসিমা ডুকরে কেঁদে উঠলেন মুখে আঁচল দিয়ে, পিসেমশাই অপ্রস্তুত। এইতো সকাল বেলায় মাদ্রাজ থেকে পাঠানো বকুর —দুশো পঞ্চাশ টাকার নোটগুলো জমা হয়েছে, এরই মধ্যে ছেলে-মেয়ে দুটোকে তাড়ালে চলবে কি করে?

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেল, সন্তু পড়তে এলো না, তার পরের সকালেও নয়। উদয় আর থাকতে পারে না চুপ করে। অফিস যাওয়ার পথে খবর নিতে এলো। বাড়ীতে ঢোকবার মুখে সরমা দেখলো ঘর থেকে। সন্তুকে চুপি চুপি পাঠিয়ে দিল সে—বল গিয়ে, দিদির অসুখ করেছে তাই পড়তে যাসনি, কাল যাবি সে কথাও বলে দিস। পিসিমা স্নানে গেছেন। পূর্ণিমার গঙ্গা স্নান, পিসেমশাই এর আজ ছুটি, কাগজ হাতে ঘুমিয়ে আছেন।

—মাষ্টার মশাই!

—মাষ্টার মশাই নয়, উদয়দা'। সন্তুকে জড়িয়ে ধরলো উদয়, যেন কত কাল পরে দেখা। সন্তুর চোখ দুটো ছলছল করে ওঠে অভিমানে।

—কি হয়েছে সন্তু, পড়তে আসো না যে?

—দিদি বলেছে দিদির অসুখ, তাই। ভয়ে মুখখানা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে সন্তুর। উদয় পায়ে পায়ে এগিয়ে চলেছে ঘরের দিকে। সন্তু চুপি চুপি বলে, যাবেন না উদয়দা', পিসেমশাই খুব রেগে গেছেন।

—কেন সন্তু? ঘুরে দাঁড়ালো উদয়। সন্তু চারদিক তাকিয়ে দেখে, তারপর ভয়ে ভয়ে বলে, না উদয়দা', ও কথা জানলে আপনিও খুব রাগ কোরবেন। উদয় সন্তুর হাত ধরে এক রকম টেনে নিয়ে গেল বাইরে বাগানে, আড়াল পড়ে গেল তাদের।

অধৈর্য্য হয়ে উঠেছে সরমা, সেই যে সন্তু গেছে আর ফেরবার নাম নেই; প্রায় এক ঘণ্টা পেরিয়ে গেল। পিসিমা ফিরে এসেছেন, পূজাপাঠে আজ একটু বেশী বিব্রত, পিসেমশাই-এর নাসিকাধ্বনি শোনা যাচ্ছে। সন্তু চুপি চুপি ফিরে এসে দাঁড়ালো দরজার আড়ালে, তারপর এদিক ওদিক দেখে নিয়ে সোজাসুজি সরমার সামনে দাঁড়িয়ে হাতখানা বাড়িয়ে দিলে সরমার দিকে,—এই নাও চিঠি,— আগে পড়ে দেখো, পরে আমায় যতো পারো মেরো।

—চুপ, চেঁচাবি না বলছি। হাত থেকে চিঠিখানা ছিনিয়ে নিল সরমা। সুন্দর হস্তাক্ষরে ইংরাজিতে তার নাম লেখা খামের ওপরে। নীল খামের ওপরে কালো কালির আঁচড়ে আরো সুন্দর হয়ে উঠেছে তার নাম। সন্তর্পণে খুলে একটু আড়াল করে দাঁড়ালো সরমা। সবশেষ ছত্রটুকু বার বার করে পড়লো সরমা, 'আমার আন্তরিক অনুরোধ, যদি সম্ভব হয় সন্তুকে আমার কাছ থেকে না সরিয়ে আমাকে তার পরম শুভাকাঙ্খী আত্মীয় বলেই মনে করবেন।'

একদিনের মধ্যে যেন বেপরোয়া বিদ্রোহিণী হয়ে উঠেছে মুখচোরা সরমা। এর পর থেকে সন্তু আবার নিয়মিত যাতায়াত শুরু করলো

[এ]বং নীল খামে সরমার নামটা আরো সুন্দরতর হয়ে নিয়মিত আসতে [ল]াগলো।

এদিকে পিসিমা-পিসেমশাই অস্থির হয়ে টেলিগ্রাম করে ছেড়েছেন [শে]ষ পর্য্যন্ত। সরমার বাবার মতো বিচিত্র মানুষ হয়তো আর [জ]ন্মায়নি, এটাই দৃঢ়বিশ্বাস পিসিমার। পিসেমশাই বলেন,—যাই [ব]লুক সংসারটা চলেছিলো সহজে। ছেলেমেয়ের ছুটোর পেছনে যে [ট]াকা ঢালছে, তাইতেই চলে যায় আমার সংসার, তা না হলে নতুন [জ]মিটা আর কেনা হোত না। পিসেমশায়ের কণ্ঠস্বর ক্রমে খাটো [হ]য়ে মিশে যায় রাত্তের গভীরতায়। ওধারে সরমার ঘুম আসে না [জ]ানলার গরাদে ধরে বসে থাকে। বসন্ত-পূর্ণিমার জোয়ারে লাবণ্যের [ঢ]ল নেমেছে রত্নপুরের বুকে।

সেদিন একটু সকাল করে রুগী দেখা শেষ করাল উদয়। রাত্রের [গ]াড়ী ধরতে হবে, তা না হলে ফিরে এসে এত কাজ সামলে [উ]ঠতে পারবে না সে। যাবে কোলকাতায়, জরুরী মিটিং। [ত]ার পর দু'-এক বেলা বাড়ীতে কাটাতে হবে। উদয়ের মনটা [আ]জ হালকা হয়ে উড়ছে যেন। প্রায় ছ'-মাস পেরিয়ে গেল, [ব]াবা মা, দাদা, বৌদি,—ছোটরা সব—কি খুশিই না হবে।

ভাবতে ভাবতে ষ্টেশনের দিকে চললো উদয় গাড়ী রিজার্ভের [ব]্যবস্থা করতে।

—এই যে বাবু আপনার কাছেই যাচ্ছিলাম, বড় বিপদ ডাক্তার [ব]াবু। পথ আগলে দাঁড়ালো রামদয়াল। কুলিসর্দ্দার রামদয়াল ভগৎ।

—কী হয়েছে রামদয়াল ? থমকে দাঁড়াল উদয়।

—চৌমাথার মোড়ে এক জন বাবু অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেছেন। কন্ট্রাক্টর বাবু বললেন আপনাকে নিয়ে আসতে। উদয় আর [প্র]শ্ন না করে দ্রুত পদে এগিয়ে চ'ললো। কুলিদের ভীড় জমে [গে]ছে এরি মধ্যে—নতুন সড়কের কাজের একশো কুলি সব এসে [জ]মা হয়েছে ফিরতি পথে। কন্‌ট্রাক্টার সুন্দর বাবু এগিয়ে এসে [উ]দয়কে বললেন,—বাঁচালেন মশাই, এই যে এদিকে ভদ্রলোক [ব]োধ হয় নাগপুর মেলে এসেছেন কারণ সঙ্গে যে ব্যাগটি রয়েছে [ত]াইতে মনে হয় ট্রেণের যাত্রী।

কোন উত্তর না করে উদয় কাজে মন দিলো। প্রায় আধ [ঘ]ণ্টার চেষ্টায় ভদ্রলোক সম্পূর্ণ স্মৃতিশক্তি ফিরে পেয়ে উঠে [ব]সলেন। অশেষ কৃতজ্ঞতা জানিয়ে পরে যা জানতে চাইলেন [ত]াতে উদয়ের বিস্ময়ের আর সীমা রইলো না। তিনিই সম্ভব রুগ্ন [চ]িন্তিত পিতৃদেব হঠাৎ টেলিগ্রাম পেয়ে অস্থির হয়ে বেরিয়ে পড়েছেন। [উ]দয়ের কাছে সন্তানের কুশল সংবাদ পেয়ে, দু' হাত তুলে কপালে [ঠ]েকালেন—ভগবান মঙ্গলময়, জয় হোক!

রাস্তা থেকে বাড়ীটি দেখিয়ে দিয়ে, নমস্কার জানিয়ে বিদায় [ন]িয়ে চলে গেল উদয়। প্রভাত বাবু বাড়ীতে ঢোকবার আগেই [দু]ই ভাই-বোনে এসে বাবাকে জড়িয়ে ধরলো।

প্রায় দিন চার-পাঁচ ধরে পিসিমার অফুরন্ত নালিশ চললো, তার [প]র এক দিন পিসিমার অন্তরাত্মায় দাবানল জ্বালিয়ে প্রভাত বাবু তার [এ]কান্ত বাসনার কথা উত্থাপন করলেন—আমার ইচ্ছে, অশেষ দোষে [দু]ষ্ট সেই ডাক্তার ছেলেটির হাতেই আমার সরমাকে তুলে দেওয়া। [ত]াহলে পাড়া-প্রতিবেশী আত্মীয়-স্বজন যথার্থ খুশি হবে—সরমার [উ]পযুক্ত শাস্তি হবে, কি বলো দিদি? কি বলেন জামাইবাবু?

—ছিঃ, ছিঃ, ছিঃ, এতো বড়ো কেলেঙ্কারির কথা কি করে ভাবতে পারলি, বাপ হয়ে? এই যদি তোর ইচ্ছে ছিলো, আমার ঘরে মানুষ করার কি দরকার ছিলো? মাদ্রাজে কি জায়গা ছিল না? পিসিমার গলা ধরে গেল, বিষ-বাণ হেনে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। তার পর বললেন, আর একদিনও না, এতো অনাচার আর আমি এক দিনও সহ্য করবো না।

এইবার পিসেমশাই গড়গড়া নামিয়ে রেখে উঠে দাঁড়ালেন—বিদেশে প্রবাসে থেকে থেকে সমাজ, লোকাচার ভুলে গেছো প্রভাত, এতোটা বাড়াবাড়ি কি ভালো? ভেবে দেখো ঠাণ্ডা মাথায়।

শেষ পর্য্যন্ত রত্নপুরের বুকে নামলো এক দামাল বৈশাখী-সন্ধ্যা। পিসেমশাই বললেন, দুঃখ কোর না লক্ষ্মী, আরো কিছু টাকা দেবে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে প্রভাত, তাতে আমাদের নতুন জমির বাড়ীটা নিশ্চয় হয়ে যাবে। বলা বাহুল্য, আশীর্বাদের সময় পিসিমা নিজের হাতেই শাঁখটা তুলে নিলেন।

শ্রাবণ-গাথা

শ্রীমতী বেলা দেবী

বহু দিন পরে আজিকে আবার শ্রাবণী বায়
বন্ধ আমার মনের দুয়ারে ঘা দিয়ে যায়
ভুলে-যাওয়া কথা মনের মাঝেতে ফিরে ফিরে খুঁজে মরে।

আবছায়া লাগে শ্রাবণের দিন
মনের মাঝেতে বাজাল কি বীণ
মল্লার রাগ বেজে চলে মৃদু মৃদু লয়ে তালে।
শ্রাবণের বারি পড়ে ঝরে ঝরে—
কোন সে খেয়ালী খেয়ালের সুরে
সেতারেতে তার বাঁধে,
চির-পুরাতন পৃথিবীরে যেন নূতন করে—
নিরখিনু আজি মুগ্ধ আমার দৃষ্টি ভরে।

বর্ষার বারি ঝরে অবিরাম—
পৃথিবী পেয়েছে নূতন পরাণ—
সবুজে সবুজে ভরে চার ধার—
র'চে পান্নায়—মাঠ-ঘাট।

প্রাণময় দেখি জড় প্রকৃতিরে—
রিম্ ঝিম্ ঝিম্ বর্ষণ-তালে—
উচ্ছ্বাসে যেন নৃত্য করে—
বিরহী পরাণে না বলা কথা গুমরি মরে—
কোন সে সুদূর মেঘলোক হতে
শ্রাবণ-ধারা ঝরিয়া পড়ে।

ঝরিয়া পড়িছে শ্রাবণের ধার—
কবিতা মিলায় কোন সে ছন্দকার।
বিশ্বেরে দেখি অপরূপ রূপবাণী—
হৃদয় পেয়েছে ফিরিয়া আবার—
হারান পরশখানি।

বাঙ্গালী কোথায় ?

আমাদের কুলচুরড় মহলের দিকে দিকে হঠাৎ রব উঠেছে। জ্ঞানী-গুণীরা একে অন্যকে প্রশ্ন করছেন, 'বাঙ্গালী কোথায়'? রাজনৈতিক, আইনজীবী, ব্যবসায়ী প্রভৃতি এক এক ক্ষেত্রের এক এক যুগন্ধর তাঁদের নিজ নিজ বক্তব্য বা মনোভাব ব্যক্ত করছেন! বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ এবং ঠিক এই প্রশ্নেই আমাদের ভবিষ্যতের উত্তর নির্ভর করছে। প্রশ্নোত্তর যদিও দিনের পর দিন চালিয়ে গেলেও দেখা যাবে 'বাঙালী কোথায়' তার সঠিক উত্তর মিলছে না। অর্থাৎ বাঙালী যে তিমিরে সেই তিমিরেই থাকবে। বাঙালী কোথায়? এ প্রশ্নের এক কথায় উত্তর সেরে দেওয়া যায় অতি সহজে, 'বাঙালী জাহান্নমে'। নীতিবাদ যাঁরা জানেন, তাঁরা হয়তো নীতির দোহাই তুলে আপত্তি জানাবেন। বাঙলার মেকী কালচারের ধ্বজাধারীরা হয়তো একটা জেনারেল ষ্ট্রাইক ঘোষণা করবেন। তা হোক, তবুও আর একটা সদুত্তর দেওয়া যায় 'বাঙালী রাজনীতিতে।' আর্ম-চেয়ার রাজনীতি হয়, স্রেফ পরস্পরকে ঠকানোর ইতরামি আর নোংরামির রাজনীতিতে প্রচুর বাঙালীকে খুঁজে পাওয়া যাবে। স্লোগান নেই, প্লাটফর্ম নেই, জনহিতকর প্রচেষ্টার নামে দলগঠনের চেষ্টা শুধু তাঁদের। বাঙালী রাজনৈতিক,—কৈ তাও একজনকে দেখতে পাওয়া যায় না আর—যাঁর কণ্ঠনিনাদের প্রচণ্ড ধ্বনিতে জনগণ প্রতিধ্বনির সুর তুলবে। বাঙালীকে খুঁজে পাওয়া যাবে সিনেমার আর চাকরীর জন্যে লাইনে। বাঙালী কোথায়? তথাপি আর এই প্রশ্ন কেন? জ্ঞানী-গুণীরা অনেক কথা বলছেন, বাঙালীর অতীত আর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে গবেষণার মত ফতোয়া জারী করছেন, অনেকে অনেক সংকথা বলছেন। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, জ্ঞানীজন লজ্জায় আসল কথাটি এড়িয়ে চলেছেন। 'বাঙালী আজ রাস্তায়, গাছের তলায়'—এটাও একটা উত্তরের মত উত্তর। আমরা জানি কেউ কেউ সেই ইহুদীদের কঠোর কষ্টের আর দুঃখময় জীবনের নজীর তুলবেন, উন্নাসিক ভাষায় বলবেন, 'বাঙালী বাস্তুহারা।' বাঙলা দেশে এত অজস্র জোয়ান ভাই থাকতে বাঙালী নারী আর শিশুদের বাস্তু ত্যাগ করতে হয়েছে! বাঙালী কোথায় চোখ থাকতেও দেখতে পান না গুণীজন। মেরুদণ্ডহীন বাঙালীজোয়ানের দল নওজোয়ানের সাজে পথচারিণী মেয়েদের পেছনে। কটু মন্তব্যের সঙ্গে সঙ্গে অনুসরণ করছে পিছু-পিছু। বাঙলায় এখন তাই লেখাপড়ায় মেয়েদের স্থান আগে, ছেলেরা থাকে প্রায় পেছনে।

বাঙলার এই আসল ছবি কেউ আঁকতে চাইছেন না। আসল কথাও লজ্জায় ব্যক্ত নয়, তাই। বাঙলার আশে-পাশে এখন সৈন্যসামন্ত গুলী আর বন্দুকের (অটোমেটিক) মহড়া চালিয়ে চলেছে অবলীলায়। মর্টার দাগছে কথায় কথায়!

এই দুঃসময়ে বাঙলীর হাতে হাতে কোথায় ত্রিভঙ্গভাব দেখতে পাওয়া যাবে! কিন্তু বাঙালী জাতি কি সেই জাহান্নমেই থাকবে!

উল্লেখযোগ্য সাম্প্রতিক বই

স্মৃতিচিত্রণ

মাসিক বসুমতী যাঁদের নিয়মিত পাঠ্য, পরিমল গোস্বামীর স্মৃতিচিত্রণ-এর সঙ্গেও যে তাঁদের গভীর পরিচয় বিদ্যমান, এ বিষয়ে কোন সন্দেহেরই অবকাশ থাকতে পারে না আর রসজ্ঞ ও সুবোদ্ধা পাঠক-সমাজ বিশেষ ভাবেই অবহিত যে, স্মৃতিচিত্রণ-এর রচনামূল্যের গভীরতাও কতখানি অন্তঃস্পর্শী। পরিমল গোস্বামীকে সাহিত্যিকরূপে যাঁরা দেখে এসেছেন, চিনে এসেছেন, জেনে এসেছেন, তাঁরা এবার এই গ্রন্থটির মাধ্যমে দেখতে পাবেন যে শিল্পী হিসেবেও তাঁর দক্ষতা কতখানি অনন্যসাধারণ! পরিমলবাবুর শিল্পদক্ষতার ছাপ এই গ্রন্থের পাতায় পাতায় পরিস্ফুট। তুলি দিয়ে নয়, রঙ দিয়ে নয়, কথা দিয়ে, ঘটনা দিয়ে যে শিল্প সৃষ্টি করা যায় সেই দুরূহ কর্মে সগৌরবে উত্তীর্ণ হয়েছেন পরিমল গোস্বামী। এই চিত্রধর্মী স্মৃতি-কাহিনীটি সেইজন্যেই বোধ হয় স্মৃতিচিত্রণ নামাঙ্কনে সার্থক হয়ে উঠেছে। আনন্দের সঙ্গে আরও লক্ষ্য করা যায় যে, এই স্মৃতি-কাহিনীটি "আমি"র ভারে জর্জরিত নয়, সকলের আসা-যাওয়ায় সহজ এবং সুন্দর অধিকাংশ কৃতী লেখকদের ক্ষেত্রেও দেখা গেছে যে, স্মৃতির ছবি আঁকতে গিয়ে সকলকে গৌণ করে নিজের ছবিই মুখ্য করে এঁকে রেখেছেন যা আত্মস্মৃতি-সাহিত্যের ধর্মবিরোধী। বলতে বাধা তো নেই-ই, বরং আনন্দ আছে যে পরিমলবাবুর আঁকা স্মৃতিচিত্রণ উপরোক্ত দোষে দুষ্ট নয়। লেখক বা শিল্পী এখানে গ্রহণ করেছেন দ্রষ্টার ভূমিকা। তাঁর যাট বছরের জীবনে যে সকল ঘটনা ঘটে গেছে, যে সকল চরিত্রের সংস্পর্শে তিনি এসেছেন, যে বহুবিধ বৈচিত্র্যের সম্মুখীন হতে হয়েছে তাঁকে, তাদেরই স্মৃতির পাতা থেকে কাগজের পাতায় তুলে ধরেছেন পরিমল গোস্বামী। নিজেকে যতদূর সম্ভব তিনি আড়ালে রেখেছেন। এ সংযম তাঁর

নন্দনযোগ্য। বহুজন-নন্দিত এই গ্রন্থখানি প্রকাশ করে কমল ঘোষও আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।—প্রকাশক, া প্রকাশনী, ১৪ আনন্দ চ্যাটার্জী লেন, কলকাতা—৪। —ছ' টাকা মাত্র।

ফুলমণি ও করুণার বিবরণ

বাঙলা সাহিত্য বিশ্ব-সাহিত্যের দরবারে একটি অটল আসনের কারী এবং তা বহুলাংশে পুষ্ট হয়েছে উপন্যাসের দ্বারা। ত্যের মধ্যে উপন্যাস এক অবর্ণনীয় সম্পদ। একশ' বছর গ (১৮৫৮) এর প্রথম আবির্ভাব—আলালের ঘরের দুলাল। এ ধারণা অভ্রান্ত নয়—তারও ছ' বছর আগে বাঙলা ভাষায় ম উপন্যাস লেখা হয়। ১৮৫২ সালে 'ফুলমণি ও করুণার রণ' এর মধ্যে দিয়ে বাঙলা ভাষায় উপন্যাস জন্ম নেয়। য়ের কথা এই যে, বাঙলা উপন্যাস প্রথমে কোন বাঙালীর নী থেকে জন্ম নেয় নি—জন্ম নিল এক বিদেশিনীর লেখনী ক। সেই পূজনীয়া মহিলার নাম হানা ক্যাথারিন ম্যলেন্স, ত সযত্নে যাঁকে আমরা আজ বিস্মৃতির অতলগর্ভে তলিয়ে যেতে াধ্য করেছি। 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ'-এ নারীচরিত্রই াধান্য পেয়েছে। নারীরাই এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্রের কারিণী। বিদেশিনী ম্যলেন্সের যে বাঙলা ভাষায় রীতিমত পত্তি ছিল তা তাঁর প্রাঞ্জল ভাষা ও স্বচ্ছ বর্ণনাভঙ্গীই বিশেষ ভাবে াণ করবে। শতাব্দীকাল পূর্বে বাঙলাদেশের সমাজচিত্র, ন্দিক ব্যবহারিক জীবনধারা, মানুষের চিন্তাসূত্র নিখুঁতভাবে উঠেছে। অবশ্য মিশনারী খৃষ্টানদের দিকেই কিঞ্চিদধিক মাণে আলোকপাত করা হয়েছে। হানা ক্যাথারিনের প্রতি ালী পাঠক মাত্রেই কৃতজ্ঞ। এই গ্রন্থটি সম্পাদন করে তনামা প্রবন্ধকার চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ও আমাদের ধন্যবাদ-জন হয়েছেন। গ্রন্থে লেখিকার একটি আলোকচিত্র ও জীবনী ় গ্রন্থটি সম্পর্কে আলোচনা স্থানলাভ করেছে। প্রকাশক নারেন্স প্রিন্টার্স অ্যাণ্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১১৯ তলা ষ্ট্রীট, কলকাতা—১৩। দাম পাঁচ টাকা মাত্র।

বাঙলা সাহিত্যের ভূমিকা

বাঙলা দেশের সাহিত্য ভারতের সাহিত্যকে জন্ম দিয়েছে। ভারতবর্ষে কেন, পৃথিবীর নানা দেশের মানুষের অনুর্বর মন র হয়ে উঠেছে বাঙলা সাহিত্যের কল্যাণে। আজ সারা বিশ্বের াদরে ঝলমলিয়ে উঠেছে এ দেশের সাহিত্য। আজকের এই শ্বব্যাপী সম্বর্ধনা লাভে তাকে সহায়তা করেছে তার দীর্ঘ দিনের বিস্তৃত ইতিহাস। যে সব যুগ, যে সব কাল, যে সব দিন অনেক ছনে ফেলে রেখে আমরা এগিয়ে চলছি, সেই সব দিনগুলির প্রতিটি র্ত সাহিত্যকে বিকাশের পথে অকৃত্রিম সহায়তা করে এসেছে। কল যুগের সকল কালের সমাজের, রাষ্ট্রের, জীবনের প্রতিচ্ছবি ফুটে ঠেছে সাহিত্যে। আমাদের সাহিত্যের ইতিহাস শুধু স্মরণীয়ই নয়, ণীয় ও তদুপরি বৈচিত্র্যপূর্ণ। অনেকগুলো শতাব্দী অতিক্রম করে আবর্তন-বিবর্তনের স্পর্শ পেয়ে বহু পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে বাঙলা হিত্য আজকের রূপ পেয়েছে। এই ইতিহাসকে কেন্দ্র করে একটি সুপাঠ্য নাতিদীর্ঘ গ্রন্থ রচনা করেছেন কবি-সাংবাদিক নন্দগোপাল সেনগুপ্ত। এই গ্রন্থ বহুকাল আগে প্রথম প্রকাশিত হয়, তার পর দীর্ঘকাল পরে বর্তমানে এর পুনঃপ্রকাশ সুধী সমাজ সাদরে বরণ করবেন বলেই বিশ্বাস রাখি। বহু পথিকৃতের সাক্ষরচিত্র এর শোভা বর্ধন করেছে। নন্দগোপালকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠিখানি বিশেষ ভাবে পঠনীয়। প্রকাশক—ধনঞ্জয় প্রামাণিক। এজেন্টস: ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী, ৯ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলকাতা ১২। দাম তিন টাকা পঁচিশ নয়া পয়সা মাত্র (সাধারণ) এবং চার টাকা মাত্র (বিশেষ)।

হলদে পাখীর পালক

শিশুদের জন্যে সাহিত্য-সৃষ্টি করে যাঁরা খ্যাতির আসন অলঙ্কৃত করেছেন লীলা মজুমদার তাঁদেরই অন্যতমা। শিশুসাহিত্যে এঁর অবদান আজ সর্বজনস্বীকৃত। তাঁর উপরোক্ত গ্রন্থখানিও শিশুমহলে যথেষ্ট সাড়া জাগিয়েছে। শিশুমনের ধ্যান-ধারণা চিন্তাধারা লেখিকার লেখনীর মধ্যে দিয়ে সুন্দর ভাবে রূপলাভ করেছে। শিশু বা বালকরা নিজেরাই মনের মধ্যে একটি বিশেষ জগতের স্রষ্টা—সেই জগতের অনেক কিছু তথ্যই বড়দের দরবারেও সরবরাহ করেছেন লীলা মজুমদার তাঁর শক্তিশালী লেখনীর মাধ্যমে। প্রশান্ত রায়ের আঁকা প্রচ্ছদচিত্র ও অন্যান্য চিত্রগুলিও প্রশংসার দাবী রাখে। প্রকাশক ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাঃ লিঃ। ৯৩, গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭। দাম দু' টাকা মাত্র।

করবী

বাঙলা দেশের খ্যাতিমান সাহিত্যিক ডাঃ শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল) এর লেখনীর গতি শুধু বড়দের দরবারেই সীমাবদ্ধ নয়, ছোটদের অন্দরেও তার অবারিত দ্বার। তাঁর গল্প বড়দেরও যেমনই আনন্দ দেয়, ছোটরাও তাঁর গল্প তেমনই সমান ভাবে উপভোগ করতে পারে। দু'দলের জন্যেই তাঁর লেখনী সচল। উপরোক্ত গ্রন্থটি তাঁর লেখা কয়েকটি বালকপাঠ্য ছোট গল্পের সকলন। গল্পগুলি বিশেষ ভাবে ছেলেদের আকৃষ্ট করবে—এবং প্রত্যেকটির গতি, ভাষা এবং বর্ণনাভঙ্গী বিশেষ হৃদয়গ্রাহী। সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে ছেলেদের মন যা চায়, যা পেতে তারা উৎসুক সেই দিকেও বনফুলের দৃষ্টি দরদী ও সহানুভূতিশীল, যার প্রমাণ তাঁর লেখার মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে। লক্ষ্যভ্রষ্ট, চেহারা বদল, রাজা, নবাব সাহেব প্রভৃতি গল্পগুলির নাম সবিশেষ উল্লেখনীয়। প্রকাশক, ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ, ৯৩, গান্ধী রোড, কলকাতা—৭। দামঃ এক টাকা পঁচাত্তর নয়া পয়সা মাত্র।

মৌসুমী

প্রেমের মূল্য রজতচক্রে নিরূপিত হবার নয়। তুলাদণ্ড দিয়ে ওজন করার মত বস্তু প্রেম নয়। অর্থের মাপকাঠির থেকে বহু উর্দ্ধে প্রেমের অবস্থিতি। সুখ্যাত সাহিত্যশিল্পী প্রেমেন্দ্র মিত্রের "মৌসুমী" উপন্যাসটি এই কথাই সগর্বে ঘোষণা করছে। তাপসী, ডাঃ ভৌমিক, কল্যাণ ও নমিতাকে কেন্দ্র করে মানুষের মনের চিরন্তন এই অন্তর্দ্বন্দ্ব মৌসুমী উপন্যাসটিতে রূপলাভ করেছে।

জয়-পরাজয় ও আশা-নিরাশার মধ্যে শাশ্বত প্রেমের প্রতিষ্ঠাই উপন্যাসের প্রধান উপজীব্য। প্রকাশক—ইণ্ডিয়ান য়্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাঃ লিঃ, ১৩, গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭। দাম তিন টাকা মাত্র।

নিষিদ্ধ দেশে সওয়া বৎসর

তন্ত্রের দেশ তিব্বত। তুষার-ধবল মৌন-শান্ত তিব্বতভূমিতে ছড়িয়ে রয়েছে মন্ত্র-তন্ত্রের বীজ। তিব্বতভূমিতে যাওয়া কিন্তু একদিন খুব সহজসাধ্য ছিল না (যদিও সুদূর অতীতে দীপঙ্কর বাঙলা দেশ থেকে তিব্বতে পদার্পণ করেছিলেন জ্ঞানের দীপ জ্বালাতে)। বাঙলা দেশের সঙ্গে তিব্বতের সাংস্কৃতিক যোগসূত্র ক্রমেই নিবিড় হতে নিবিড়তর হয়ে উঠেছে। শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও আশুতোষ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বরেণ্য বাঙালীদের তিব্বত উপাধি-ভূষিত করেছে। তিব্বতে ভ্রমণ করা কালীন বহু চিত্তাকর্ষক কাহিনী উপরোক্ত গ্রন্থে বিবৃত করেছেন উত্তরপ্রদেশের সুপণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন। ইনি শুধু সুখ্যাত লেখকই নন, একজন বিখ্যাত পর্যটকও। রাহুল সাংকৃত্যায়ন বর্ণিত এই ভ্রমণ কাহিনীর মধ্যে রাষ্ট্রের এবং সমাজের নানা যুগের ইতিহাস ধরা পড়ে গ্রন্থটিকে সুখপাঠ্য করে তুলেছে। সুন্দর কয়েকখানি আলোকচিত্রও স্থানলাভ করেছে। বর্ণনাভঙ্গী মাঝে মাঝে জীবন্ত হয়ে ওঠে। ভ্রমণপ্রিয় তথা সাহিত্যপ্রিয় ব্যক্তিমাত্রেই এই রমণীয় গ্রন্থটি পাঠে তৃপ্তিলাভ করবেন। মূল গ্রন্থ থেকে বাঙলায় এটি অনুবাদ করেছেন শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়। কেদার বাবুর অনুবাদ-কুশলতাও প্রশংসার দাবী রাখে। প্রকাশক—ইণ্ডিয়ান য়্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাঃ লিঃ, ১৩, গান্ধী রোড, কলকাতা-৭। দাম পাঁচ টাকা মাত্র।

শেষ সওগাত

ঝড়ের সঙ্গে বর্তমান শতাব্দীর যে দু'-একটি কবির তুলনা করা চলে, তাঁদেরই মধ্যে নজরুল ইসলামের নামোল্লেখ বিশেষ ভাবে করণীয়। কবিতার পাঠক-সমাজ নজরুলের লেখনী থেকেই পেয়েছে ঝড়ের গতি। দুর্দম, চঞ্চল, উদ্দাম। প্রাণপূর্ণ এক যৌবনময় চপলতার অধিকারী ছিলেন নজরুল ইসলাম। নজরুলের ব্যবহারিক বিশেষত্বের প্রভাব তাঁর সৃষ্টির মধ্যে বিশেষ ভাবে পরিব্যাপ্ত। নজরুলের কবিতা বাঙলা-কাব্যকে অনাস্বাদিত এক নতুন রসের সন্ধান দিয়েছে। কবিতায় মানবতাবোধ নবজন্ম লাভ করেছে নজরুলের কল্যাণে। নিপীড়িত নর-নারীর প্রতি দরদ, তাদের পক্ষ নিয়ে ঈশ্বরের দরবারে আবেদন, শোষক সম্প্রদায়ের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন প্রভৃতি নজরুলের কবিতার মুখ্য বৈশিষ্ট্য, এদেরই মাধ্যমে সাধারণ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী এক নতুন ধারায় ঘুরিয়ে দিতে সমর্থ হয়েছেন নজরুল। তাঁর কতকগুলি কবিতা সংকলিত হয়ে উপরোক্ত নামে গ্রন্থরূপ লাভ করেছে। কবিতাগুলি নজরুলের প্রতিভার এবং দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচায়ক। ভূমিকা লিখে দিয়ে গ্রন্থের মর্যাদাবৃদ্ধি করেছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। প্রকাশক—ইণ্ডিয়ান য়্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাঃ লিঃ, ১৩, গান্ধী রোড, কলকাতা-৭। দাম—চার টাকা মাত্র।

হে বিদেশী, চেয়ে দেখ

(W. H. Auden লিখিত Look Stranger অবলম্বনে)

হে বিদেশী চেয়ে দেখ, এমন সুন্দর এই দ্বীপে—
মেঘের আড়াল হতে অকস্মাৎ সূর্য্যালোক
হোলো উদ্ভাসিত,
তোমার প্রীতির তরে।

হয়ে অচঞ্চল হেথা
দাঁড়াও নীরবে,
যেমন সুড়ঙ্গপথে বহে নদীস্রোত
তেমনি তোমার কানে পশে যেন অনায়াসে
নীল সাগরের ঘুম পাড়ানিয়া গান।

সবুজ মাঠের প্রান্তের চলা এখানেই গেল থেমে,
যেখানে দাঁড়িয়ে চকের শুভ্র প্রাচীর
ঝাঁপিয়ে পড়েছে সাগর-বক্ষে এসে।

খাড়া পাড় তার
বাধা দেয় সেই দুরন্ত শক্তিকে,
জোয়ার ভাঁটাকে রুখে।
তৃষিত তরঙ্গাঘাতে রুমঝুম বাজে তটে নুড়ির নূপুরে।
ক্ষণেকের তরে সেথা সাগর বিহঙ্গেরা
বসে শৈল চূড়ে।

বহুদূর সমুদ্রে ভাসমান বীজেদের মতন জাহাজেরা সব
ছড়িয়ে গেল, জরুরী বার্ত্তা নিয়ে
যে যার নির্দ্দিষ্ট পথে;
এ সমস্ত ছবি জেনো, তোমার স্মৃতির পটে
রইবে আঁকা, করবে যাওয়া-আসা।
যেমন করে এই মেঘেরা ঘুরে বেড়ায়
বন্দরের আয়নায় ছায়া ফেলে।
সমস্ত নিদাঘে যারা সাগরের বুকে
এক প্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে ভেসে চলে।

অনুবাদিকা—শ্রীমতী গীতা মিত্র

মৌলিকতায়, নির্ভরতায় ও আধুনিকতায়
গিনি গোল্ড জুয়েলারী স্পেশালিস্ট
১৬৭ সি, ১৬৭ সি/১, বহুবাজার স্ট্রীট, কলি ১২
ফোন ৩৪-১৭৬১ • গ্রাম • ব্রিলিয়ান্টস
ব্রাঞ্চ : বালিগঞ্জ - ২০০/২/সি - রাসবিহারী এভিনিউ
কলিকাতা - ২৯ • ফোন : ৪৬-৪৪৬৬
ফোন : জামশেদপুর - ৮৫৮
ব্রাঞ্চ - জামশেদপুর
শো রুমের পুরাতন ঠিকানা ১২৪, ১২৪/১ বহুবাজার স্ট্রীট · কলিকাতা - ১২ কেবলমাত্র রবিবার খোলা থাকে

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

সুলেখা দাশগুপ্তা

মঞ্জু যখন যাদবপুরের বাস-ষ্ট্যাণ্ডে নেমে রিক্সায় উঠল তখন আষাঢ়ের আকাশে মেঘ ও রৌদ্রের শান্ত আসা-যাওয়ার খেলা চলছে। এবং তাদের সেই শান্ত খেলার ছায়াটা শান্ত পায়ে আসা যাওয়া করছে মাটির উপর। কখনো মঞ্জুর মাথার উপর একআকাশ রোদ কখনো এক আকাশ ছায়া। বাস থেকে নেমে ও যখন রিক্সায় ওঠে তখন আকাশটা ছিল ছায়া ভরা, তাই হুডটা তুলে দেওয়ার কথা মনে হয়নি। খানিক বাদে রোদটি এসে মাথায় পড়তেই চেষ্টা করল সে রিক্সার হুডটা তুলে দিতে। পারল না। রিক্সাওলাকে বলবে, না আবার সে থামবে। সাইকেল থেকে নামবে, তুলবে—থাকগে। রোদ যে গরমটুকু ধরাচ্ছে ছায়া আর হাওয়া এসে তখনই প্রায় সেটা দূর করে দিচ্ছে, কষ্ট হবে না। রেল লাইন, রাস্তার দুপাশের দোকান বাজার, রাস্তার উপর ভোরের বাজারের অবশিষ্ট শুকনো মলিন শাক তরকারীর ডালা-ঝুড়ি নিয়ে বসে থাকা দোকানীদের পার হয়ে সাইকেল-রিক্সাটা ছুটে চললো বেল বাজাতে বাজাতে। মমতাকে পাওয়া যাবে কিনা, মমতার মা ওকে কি ভাবে গ্রহণ করবেন, ওর বাবা ফিরে এসেছেন কি? মা যদি ওকে দেখে মুখ ফেরান আজ? ও বুঝবে ওকে অসম্মান করার জন্য নয়। চোখের জল আড়াল করবার জন্য। যদি আরো সমব্যথী আত্মীয় বন্ধু বাড়ীতে থেকে থাকে! এতক্ষণে একটু যেন অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করল মঞ্জু—না, অশোভন বা বেখাপ অবস্থায় পড়লে নীল নিশ্চয়ই উদ্ধার করবে। এ সবই ভাবতে ভাবতে চলছিল—রিক্সাটা বাঁক নিয়ে উদ্বাস্তু কলোনীর কাঁচা রাস্তায় পড়লে, বিষম এক ঝাঁকুনী খেয়ে শক্ত হয়ে বসল মঞ্জু। সামনে কাঁচা রাস্তার এবড়ো-খেবড়ো পথ। আরো কিছু ঝাঁকুনী খেতে হবে।

আষাঢ়ের বৃষ্টি পেয়ে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠের রোদ-দগ্ধানো গাছগুলো কচি নতুন পাতায় বেড়ে উঠেছে। বর্ষার ঝোপে ঝাড়ে ঘন লতাপাতায় সবুজে দূর থেকে সমস্ত কলোনীটাকে দেখাচ্ছে, একটা বনের মতো। এগারোটা বাজে। পল্লীটার কর্মব্যস্ততাও বুঝি তাই প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। পুরুষরা চলে গেছে কাজে, নয়তো কাজের খোঁজে। ছেলেরা স্কুলে-কলেজে। মেয়ে-বৌরা কেউ গা-ছাড়া ভঙ্গিতে রাস্তার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কেউ কাঁচামাটির রকে দাঁড়িয়ে হলুদ-মাখা আঙুলে চুলের বিনুনী খুলছে। কেউ বাসনের পাঁজা নিয়ে চলেছে পুকুরঘাটের দিকে। পানা-ভরা পুকুরে এককোমর জলে দাঁড়িয়ে নারকেল গাছের গুঁড়ি দিয়ে বানান ভাঙ্গা ঘাটটা মেরামত করছে ক'জন লোক। রাস্তার পাশের টিউবওয়েলটার সামনে মেটেকলসী আর বালতির ভিড়। কামারের হাপরের মতো হাঁপাতে হাঁপাতে রোগা শিরতোলা-হাতে জল পাম্প করছে মেয়ে-বৌরা। তাদের পেট-টিংটিং-এ ছেলেমেয়েগুলো মায়েদের জল ভরার সময়টুকুতে কেউ একটু খেলে নিচ্ছে। কেউ হাঁ করে রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছে শিশু-মুখে বৃদ্ধের অবসাদ আর বিষণ্ণতা নিয়ে। তার পর মায়েদের জল-ভরা হলে পেছন পেছন বাড়ী ফিরছে।

ঘন বসতিটা ছাড়িয়ে প্রান্তঘেঁষা মমতাদের বাড়ীর দরজায় নেমে রিক্সাওলাকে ভাড়া মিটিয়ে ভেতর ঢুকল মঞ্জু। পুঁই-ঝাঁকা থেকে টেনে টেনে নিবিষ্ট মনে পাতা খাচ্ছিল যে ছাগলটা, ওকে দেখে সে দু'পা সরে দাঁড়ালো মাত্র। বাড়ীতে কেউ নেই নাকি? মঞ্জু তাকালো বাড়ীটার দিকে। না, আছে। দরজা খোলা রয়েছে দু'টো ঘরেরই। ও বারান্দায় উঠল, ঘরে ঢুকল কিন্তু তবু কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। কা'কে ডাকবে—কি বলে ডাকবে ভাবছে—পাশের ঘর থেকে কথা কানে এলো। বোধ হয় সাময়িক বিরতিতে থেমেছিল। কোন পুরুষকণ্ঠ পূর্বকথার রেশ ধরে বলছে—কিন্তু ডার্লিং, ভালো থেকে এগুচ্ছে কিছু? সম্মান পেলে—বিশ্বাস মিলল?

গলাটা এমন চেনা-চেনা লাগছে কেন। লোকটি তখন বলে চলেছে, এর চাইতে অনেক বেশী দূর এগুতে পারতে—এমন কি বিদেশ পর্যন্ত। এ পুপেই তোমায় ঢুকিয়ে দিতেন প্রফেসর বোস যদি তাঁকে একটু খুসীও করতে। আমার মতো তো সবাই নয় ডার্লিং যে, বিনামূল্যে বিকিয়ে বসে থাকবে।

কার, কার—কার গলা এটা! ভুরু ঘন করে তুলল মঞ্জু। এখানে কে ওদের চেনাজানা আসতে পারে—এ জাতীয় কথা বলতে পারে। কিন্তু কোথাও এ গলাও নিশ্চয়ই শুনেছে—নিশ্চয়ই।

—আমার কি এগুতো ডক্টর সেন, আমি তো তা জানিই। আপনার কি এগুতো সেটা কিন্তু বুঝে ওঠতে পারছিনে।

—আমার? কিছু না—কিছু না। তবে হাঁ, কর্তার ইচ্ছায় কর্ম। কর্তাকে সুখী করতে পারলে আখেরে ভালো ফল দেয় বৈ কি। কিন্তু বিশ্বাস করো, আমার কথা ভেবে আমি তোমায় প্রফেসর বোসকে খুসী করতে বলছিনে। আমার জন্য আমিই যথেষ্ট। এবার লোকটির গলায় যেন আবেগ এসে গেল—প্রথম যেদিন অচেনা অজানা একটি মেয়ে তোমায় গেটে দাঁড়িয়ে দ্বিধায় সঙ্কোচে ইতস্তত: তাকাচ্ছো দেখতে পাই তখন মমতা তোমার জন্য কোন মমত্ব বোধই তো ছিল না তবু মমতা বোধ করেছিলাম। সেদিন থেকে বন্ধু হিসাবে তোমায় ভালো করে আসছি, ভালো চেয়ে আসছি। চিরকাল তাই চাইবো। একটু থেমে বোধ হয় চুরুট বের করে দু ঠোঁটের চাপে চুরুটটা চেপে ধরে বললো, লোকটার অসীম ক্ষমতা। যদি তার তুষ্টি সাধন করতে পারো আমি বাজি রেখে বলতে পারি—

নিঃশ্বাস টানল মঞ্জু—ভদ্রলোকটি ছোট পিসীর সেই ডাক্তার দেওর। যার মুখে নার্সদের কীর্তি-কাহিনী শুনে ছোট পিসী ঘেন্নায় মরে যান, শিউরে শিউরে উঠেন। এতক্ষণ যে গলাটা চিনতে পারছিল না চুরুট-চাপা ঠোঁটের দুটো কথায় মুহূর্তে সে গলা চেনা হয়ে গেল ওর। কারণ ঐ ভাবেই ডাক্তার কথা বলেন প্রায় সর্বসময়

অন্তত রোগীর বাড়ী গিয়ে। আর হাঁ, মমতার সঙ্গে তাঁর দেওরেরই প্রথম দেখা হয়েছিল ছোট পিসীও তো তাই বলেন। নিঃশব্দ পায়ে তামাকের সরঞ্জামের পাশের তেলচটা ইজিচেয়ারটায় গিয়ে বসল মঞ্জু। মৌরী নিশ্চয়ই বলবে, ভয়-ডর তো নেই—ঘাবড়ানো কা'কে বলে তাও জানিস নে—সামনে গিয়ে লোকটাকে জিজ্ঞাসা করলি নে কেন? কিন্তু না—এমন মন্দ লোক আছে যাদের ঐ ভালোর মুখোসটুকুই একমাত্র ভালো। ওটা টেনে খুলে দিতে নেই। দিলে তাতে লাভের চাইতে লোকসানই হয় বেশী। এ বাড়ীর এই ঘরটা আর এই কোণটাই মঞ্জু চেনে। তাই ওখানটায় গিয়েই সে বসল। কথা শুনবার জন্ম নয়। কিন্তু ওখানে বসলে কথা না শুনে উপায় নেই—বাধ্য হয়েই সে শুনতে লাগল।

মমতা বললো—সবাই বলে হাসপাতালে আপনার রোগী দেখার চাইতে বড় কাজ প্রফেসর বোসের পরিচর্যা করা, আর তার মন-মেজাজ দেখা।

—তাতে লজ্জা পাবার কিছু নেই। যে দেশের যে আচার পালন করার মতো বাঁচতে হলে যে যুগে যে ধর্ম সেটাও অবশ্য পালনীয়। এ যুগে কর্মকর্তাদের কোন কাজ দিয়ে খুসী করা যায় না, একমাত্র তাঁদের খুশী করার কাজ ছাড়া। যারা বলে, খোঁজ নিয়ে দেখোগে, তারাও এই করছে। বড় হবার আর কোন উপায় নেই।

—বড় হবার নয়, বলুন ছোটর বড় হবার।

—না। বলবো বড়রও বড় হবার এই এক পথ। যত বড় গুণীই হোক খোসামোদ তদ্বির-তদারক আর কৌশল ছাড়া কোন পথ নেই আজ বড় হবার, প্রতিষ্ঠিত হবার—খ্যাতি অর্জন করবার। একদমে বলে যেতে লাগলো ডাক্তার—যে এসব পারে না সে যত বড়ই হোক ছোট হয়ে থাকে এবং মরে। যে পারে সে ছোট হলেও বাঁচে, প্রতিষ্ঠা অর্জন করে।

—বড়রা ও-সব পারে না, তাই ছোটরাই আজ-কাল বড় হচ্ছে এবং ছোট ছাড়া বড় কাজ, মহৎ কাজ কিছু হচ্ছে না।

—দেখো ডার্লিং—

—প্রিজ ডক্টর সেন, আপনার ঐ বিতিকিচ্ছি সম্বোধনটা যুগধর্মের খাতিরেও আর আমি শুনতে পারছিনে।

—কেন, করেছে কি সে তোমার? সে তো আর ছুটে গিয়ে তোমায় জড়িয়ে ধরতে পারছে না? ইচ্ছায়ই হোক আর অনিচ্ছায়ই হোক শরীরটাকে জড়িয়ে ধরতে পারলে তবু যে কিছু পাওয়া যায়। যে সম্বোধনে মন সাড়া দেয় না—তার মূল্য কি? সে তো আমার চাইতেও করুণার পাত্র প্রিয়ে—থাক্ থাক্ তুমি বোস। আর না হয় ও-সব বেরসিক সম্বোধন করব না।

মৌরী হলে এ জাতীয় কথায় কানে হাত চাপা দিত। মঞ্জু চোখ দুটোকে শুধু কুঁচকে তুললো। ওরা এখনো জানে না, পুরুষের জগতে কাজ করতে নামলে এজাতীয় কথা দু'কান ভরে কত শুনতে হয় আর ওগরাতে হয়।

মমতা বললো—না সে জন্ম উঠছি নে। ও-সব গা সওয়া হয়ে গেছে। আমি উঠছি আমার ডিউটির সময় হয়ে গেছে।

ডাক্তার নিশ্চয়ই পা নাড়তে নাড়তে কথা বলছে। তার ভারী জুতো কাঁচা মাটিতে ঈষৎ ঢব ঢব শব্দ তুলছে। উৎসাহের সঙ্গে বলে উঠল সে—বেশ বেশ যতটুকু পাওয়া যায়। প্রিয় সম্বোধনটুকুই বা মন্দ কি? মহার্ঘ খাবার স্বাদে গন্ধে মুখে পুরে দেবার মতো ভাগ্য কি গরিবের হয়? তাদের ঘ্রাণে নাক, দেখায় চোখ, তৃপ্ত করেই তুষ্ট থাকতে হয়। এও সেই রকম। ডেকেই আনন্দ। শুধু শিশুই কি মাকে নামের নেশায় ডাকে—মানুষ তার প্রিয়কেও ডাকে। হাতের বই-টই কিছু একটার উপর জোর থাবড়া মারল ডাক্তার—বোস তুমি। ডিউটির জবাব দেবে তো আমার কাছে।

—যুগের গতি অনুযায়ী হাসপাতালের ডিউটি না করে কর্তাব্যক্তিকে খুসী করবার ডিউটিটাই আমাকে করতে বলছেন।

—দেখই করে। একবার এ বিদ্যেটা যদি আয়ত্তে এনে ফেলতে পারো তবে আজকের যুগে কোথায় ওঠ।

নিশ্চয়ই চেষ্টা করবো। চলুন। চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়ালো মমতা।

—এই তোমার চেষ্টা করা! গম্ভীর কণ্ঠ ডাক্তারের—তোমার মাকে তোমার মাসিমা এসে নিয়ে যাবার পর থেকে দুবেলা আসছি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলে যায়। কথা বলি—কখনো জবাব দাও। কখনো চুপ করে থাকো। কখনো বলি এক কথা, জবাব দাও অন্য কথা—

—সত্যি একেবারে অনর্থক সময় নষ্ট হয় আপনার—চলুন। মমতার জুতোর শব্দ পাওয়া গেল—পা বাড়াবার।

এবার হাতের নিবন্ত চুরুটটা ছুঁড়ে ফেলে দিল ডাক্তার। সেটা এসে পড়ল মঞ্জু যে ঘরে বসেছিল সে ঘরে। উঠে মমতা বোধ হয় কিছু বলতে যাচ্ছিল বিকৃত মুখে বাধা দিয়ে বললো—তুমি এখন আমায় যা বলবে সে আমার বহু শোনা। আমার কাছে তোমার আর প্রফেসর বোসের কাছে আমার জবাব দিতে না হওয়া, তোমার মার অনুপস্থিতি, দাদার বাড়ী না থাকা—এগুলো আমার কাছে মস্ত সুযোগ! তোমার কাছে নয়। তোমার বাধা তুমি নিজে। তোমার কাজের জবাব সব আগে তোমার কাছে—এই সব আর কি। অবহেলা ভরে থামল ডাক্তার।

এবার বোধ হয় মমতা একটু হাসলো। বললো—না, এ কথাগুলো আর আমি বলব না। আমার কথায়, আমার চলায় ধাতস্থ হওয়া নিশ্চয়ই কঠিন। আপনারা আমি পারলাম না কিন্তু আপনাদেরটায় আমি প্রায় তো ধাতস্থ হয়ে এলাম নয়? এবার চলুন। আর আমি এক মিনিটও দেরী করতে পারবো না। আপনি যদি আপনার হাজিরার খাতা এখানে এনে হাজির করেন —তবু নয়।

মঞ্জু একটু নড়ে-চড়ে সোজা হলো। এবার দরজা বন্ধ করতে মমতা নিশ্চয়ই আসবে এ ঘরে। এ ভাবে বসে থাকলে যে বিষম রকম একটা অপ্রস্তুত অবস্থার ভেতর পড়তে হবে, এতক্ষণ এ খেয়ালটা ছিল না—কি করা যায়! কিন্তু মমতার হাইহিলের ঠক ঠক শব্দের পেছন পেছন ডাক্তারের ভারী জুতার শব্দ বেরিয়ে গিয়ে নামল উঠোনে। দরজা খোলা থাকবে! সেই কথাটাই জিজ্ঞাসা করল ডাক্তার। মমতা বললে—কিছুই ক্ষতি ছিল না। মূল্যবান বস্তুর ভেতর রয়েছে তো দাদার কিছু বই। ও চোরে—ছোঁবেও না। তবে আমি খালি রেখে যাচ্ছিনে। বলে বেশ কষ্ট করো

গলা তুলে ডাক দিল যেন কাঁকে—ছুট-টু-উ-উ। তক্ষুণি জবাব এলো—আই তা-ছি-ই। আর এই ছুটুর আসবার অপেক্ষায়ই বোধ হয় দাঁড়িয়ে রইল মমতা। হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল—ভালো কথা, ডক্টর চাটার্জ্জি নাকি বিয়ে করছেন ডক্টর সেন ?

—হাঁ। গম্ভীর এবং কুঞ্চিত ঠোঁটের জবাব।

আহত কণ্ঠে মমতা বললো—'হাঁ' বলছেন আপনি ?

—আমি 'না' বললে কি চ্যাটার্জ্জীর বিয়ে থেমে থাকবে ? আর তুমি সংবাদটা শুনে যতটা মর্মাহত হচ্ছ আর যার কথা ভেবে হচ্ছ সেই নমিতা একটুও আহত হয় নি। আজও চ্যাটার্জ্জি আর নমিতাকে নাইট ডিউটির পর আমি একসঙ্গে হাসিমুখে বের হয়ে আসতে দেখেছি—চা খেতে দেখেছি। নমিতারা জানে, বিয়ে আর ওদের ভেতর সংঘাত নেই কোথাও।

—ডাকতাছ কেন মমতাদি ? একটা কচি গলা। ছুটে এসে হাঁপাচ্ছে।

—আমি বেরুচ্ছি। দাদা না ফেরা পর্য্যন্ত বসবি। এই এক্ষুণি দাদা ফিরবেন। আমি এসে তোকে বিস্কিটের পয়সা দেবো এঁ্যা ?

সম্মতিতে ছুটু মাথা ঝাঁকুনির উপর জবাবটা সারলো। ওদের গাড়ীর দরজা বন্ধ হবার শব্দ হলো। গাড়ীটা বেরিয়ে গেলে এবার উঠে দাঁড়ালো মঞ্জু। মমতারা চলে গেলে ও নিজেও চলে যাবে এই সে ভেবেছিল। কিন্তু মমতা বলে গেল, দাদা এক্ষুণি ফিরবেন। একটু অপেক্ষা করা যাক। আর ছেলেটাও ওকে দেখলে ঘাবড়ে যাবে হয়তো। ইজিচেয়ারটা ছারপোকায় ভরা। এতক্ষণ ওকে একটুও স্বস্তিতে বসতে দিচ্ছিল না। হাতের নানা জায়গা ফুলে উঠেছে লাল হয়ে হয়ে। ওটাতে আর বসতে ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু চৌকিতে গিয়ে বসলে খোলা দরজা দিয়ে ছুটুর ওকে দেখে ফেলার সম্ভাবনা আছে। অগত্যা ওকে ফের চেয়ারটাতে বসতে হলো।

ছুটু পুঁইমাচাটা থেকে একটা কঞ্চি টেনে নিয়ে প্রথমে হৈ হৈ করে ছাগলটাকে তাড়ালো। তারপর গিয়ে বসল সিঁড়ির উপর। কঞ্চিটা নাড়তে নাড়তে একা-একা কথা করে চললো সে—মমতাদি যদি চাইর আনার পয়সা দেয় তবে একটা চকলেট আইসক্রিম খামু। বলেই পায়ের দু হাঁটু চাপড়ে হা, হা করে হেসে উঠল সে খুশীতে। তারপরই আবার বললো, না, চকলেট আইসক্রিম খামু না। উঁহু একটা বাটির দামই চাইর আনা নিব। একটা দুধ আইসক্রিম খামু দুই আনার। কটুর লেইগা বিস্কুট নিমু চাইর পয়সার। বাবার লেইগা বিড়ি নিমু চাইর পয়সার—না হইল না। মায়ের লেইগা তো রইল না! আবার বাজেট ছাঁটতে বসল ছুটু। দুধ আইসক্রিম বাউক গিলা। চাইর পয়সার একটা জল আইসক্রিমই খামু। মার লেইগা চাইর পয়সার বরফে ঠাণ্ডা জর্দা পান নিমু—ঠিক হায়। কঞ্চিটা দিয়ে কষে মাটিতে গোটা কয় বাড়ি মারল সে।

ইজিচেয়ারটার ছারপোকাগুলো নিশ্চয়ই উধাউ হয়ে যায়নি বা হঠাৎ আতিথেয়তাও শুরু করেনি। কিন্তু নিশ্চয়ই মঞ্জুকে তারা আর কামড়াচ্ছে না। নইলে এতক্ষণ তাদের অত্যাচারে স্থির হয়ে বসতে পারছিল না। কেবল এ কাত সে কাত্তে চেয়ারটা থেকে শরীরটাকে আলগা রাখতে চেষ্টা করছিল—এখন কেমন গা ঠেসে বসে সকৌতুকে কথা শুনছে ছুটুর। ছুটু তখন মমতাদি যদি চার আনা না দিয়ে দু' আনা দেয় তবে কি ভাবে সামলাবে তাই ঠিক করছে এবং মুহূর্তে চার পয়সাকে ছেঁটে দু পয়সা করে বাজেট সামলে ফেলেছে। হৈ হৈ করে গরু ছাগল যা হয় একটা কিছু তাড়িয়ে আবার এসে সিঁড়িটায় বসল সে। আইচ্ছা, আমারে যদি কেউ একটা মস্ত ঘোড়া দিত তবে—

চেয়ারটা নিঃশব্দে টেনে একেবারে জানালাটার কাছে নিয়ে এলো মঞ্জু। একটা ঘোড়া পেলে এই কচি ছুটু কি করে তা শুনবার জন্য।

—আরে ছুটু, তোকে আজও বাড়ী পাহারায় বসিয়ে রেখে গেছে তোর মমতা দি' ? এতো বড় অত্যাচার—চালাচ্ছে সে তোর উপর ?

চট করে উঠে দাঁড়ালো মঞ্জু চেয়ার ছেড়ে। যে পর্যন্ত কোণ ঘেঁসে ও বসে আছে কারণটা তার নীল বুঝতে ও পারবে না, জিজ্ঞাসাও করতে পারবে না। মনে মনে অবাক হবে। কয়েক পা এগিয়ে ঘরের মাঝখানটায় এসে দাঁড়ালো সে।

—নে চারটে পয়সা নে। লজেন্স খাস।

মঞ্জু দেখল নীল এ পকেট সে পকেট হাতড়াচ্ছে। তারপর পকেট থেকে শূন্য হাতটা টেনে বের করে এনে উসকো চুলের ভেতর চালাতে চালাতে বললো—না রে, ভাঙতি নেই। বিকেলে আসিস।

পয়সার অপেক্ষায় ছুটু নীলের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিল। বললো—দেও না। লজেন্স কিনলেই তো দোকানদার ভাঙতি দিয়া দিব।

অপ্রস্তুত মুখে হাসল নীল। আমি কি বলেছি আজ আছে ? যা, বললাম যে বিকেলে দেবো।

—হুঃ, বলে বিষম অপ্রস্তুত মুখ করে রাস্তার দিকে দৌড়োলো ছুট ওর অপ্রতিভ মুখের ছুটে পালানোর দিকে তাকিয়ে একটু সময় দাঁড়িয়ে রইল নীল। তারপর এসে ঢুকল ঘরে। চার দিকের একটা ছোট জানলা দিয়ে ঘরে যে আলোটুক এসে ঢুকছিল তাতে বাইরের তুলনায় ভেতরটাকে একেবারে অন্ধকারই বলা চলে। কিন্তু সে জন্য নীলের মঞ্জুকে চিনতে আটকালো না। প্রথম নজরেই সে ওকে চিনতে পারলো। কিন্তু মঞ্জুকে এখন এ বাড়ীতে দেখা এমনই অবিশ্বাস্য ঘটনা যে, দরজার কাছেই অপরিমেয় বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে পড়লো সে।

—চিনতে পারছেন না ?

ঘরে এসে ঢুকল নীল। আপনাকে চিনতে পারবো না ? কি যে বলেন ! বিশ্বাস করে উঠতে পারছিনে। হাতের বই ক'টা চৌকিতে নামিয়ে 'বসুন, বসুন' বলে ইজিচেয়ারটা কোণ থেকে টেনে আনতে গিয়েও হাতটা ফিরিয়ে আনল সে। বললো—না, চলুন ও ঘরে গিয়ে বসা যাক। দু' ঘরের মাঝখানের শাড়ীকাটা পরদাটা তুলে ধরল নীল।

এ ঘরটা নীলের। হাত সাত-আটেকের বেশী হবে না একটা ছোট ঘর। এক দিকের ধার ঘেঁষে একটা টেবিল। টেবিলটা ঘরটার পক্ষে অতিরিক্ত বড়। সেটা কাগজ-পত্র-বইএ ঠাসা। ও ঘর থেকে বরাবর এ টেবিলটাকেই দেখা যায়। ওরা প্রথম

দিন নীলকে এখানে বসেই লিখতে দেখে গেছে। টেবিলটার নীচে বিছানো খবরের কাগজের উপর তাক-তাক করে সাজানো প্রায় টেবিল-সমান উঁচু বই। আর উল্টো দিকের ধার ঘেঁষে রয়েছে একটা ছোট্ট তক্তপোশ। তার উপরের বিছানাটা একটা আধময়লা চাদর ঢাকা। তার সঙ্গে লাগানো একটা বেতখসা রং-চটা বেতের চেয়ার। চেয়ারটার পিঠের তোয়ালেটা কুঁচকে মুচকে পড়ে গেছে নীচে। পেছনের বালিশটা আছে চেপটে। টেবিলের সামনের চেয়ারটা বেতের চেয়ারটার কাছে টানা। দুটো চেয়ারেরই পাশে মেঝের উপর দুটো কাপ। একটায় তলানী চায়ে ভিজে আছে কিছু টুকরো-করা ছেঁড়া কাগজ আর একটাতে ফুলে ঢোল হয়ে আছে গোটা কয় চুরুট।

—বসুন, বলে বেতের চেয়ারটা দেখিয়ে দিল নীল মঞ্জুকে। মঞ্জু বসলে অপর চেয়ারটায়, বসে পাঞ্জাবীর হাতটা ঠেলে উপর দিকে তুলে দিতে দিতে বললো—যাক্ কাউকে না পেয়ে যে আপনি চলে যাননি আর ছুটু যে আপনাকে বুদ্ধি করে এনে ঘরে বসিয়েছে। পকেট থেকে একটা চারমিনারের প্যাকেট বের করে বললো—সেদিন তো অনুমতি নেওয়া হয়ে গেছে—ধরাতে পারি? মঞ্জুর দিকে তাকালো সে। মঞ্জু ঈষৎ মাথা কাত করে সম্মতি জানালে সিগারেটটা ধরিয়ে নিয়ে বললো—আচ্ছা, বলুন তারপর খবর কি? দিদির বিয়ে হয়ে গেল? হাসিমুখটা একটু উপর দিকে তুলে এক-মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললো—তারপর আপনার কাছে-ধারে ভালো পাত্র মিলল?

মুখ গম্ভীর করল মঞ্জু। বললো—মনে হচ্ছে।

—এসব ভালো পাত্রদের বাস কোথায় যদি একবার জানতাম।

—কি করতেন তবে?

—একবার দেখে নিতাম।

—তাঁদের অপরাধ?

একবার মুখটা সোজা করল নীল। বললো—আপনাদের মতো ভালো ভালো মেয়েদের নিয়ে গিয়ে ঘরবন্দী করে। তা দিদির বিয়ের নেমন্তন্নটা তো ফাঁকিই দিলেন আপনার নেমন্তন্নটা খাচ্ছি করে বলুন?

—আপনি যে দিন বলবেন।

—আমি যে দিন বলবো! হঠাৎ যেন বোকা বনে গেল নীল। আপনি কি আমার মত নিয়ে আপনার বিয়ের দিন স্থির করবেন নাকি?

—করবো।

—করবেন। নীল তাকালো ওর দিকে।—আশা করি মনে রাখবেন কথাটা?

—রাখবো।

—বেশ।

এদিকে রাখবো বলেই কিন্তু থমকে গিয়েছিল মঞ্জু। এক দিকে প্রশ্নের টান আর এক দিকে ওর মজা দেখবার প্রকৃতি ওকে ঠেলে কোথায় এনে ফেলল! 'বেশ' বলে আচমকা যেন ওকে জলে ফেলে দিল নীল।

কিন্তু হৃদয়হীন নয় নীল। জলে ফেললেও 'মাকানিচোবানি' খাওয়ালো না। তক্ষুণি তুলে দাঁড় করিয়ে দিল পাঁকে। উঠে

দাঁড়িয়ে বললো—দাঁড়ান, দেখি একটু চায়ের ব্যবস্থা করা যায় কি না।

'বা-ব্বাঃ', বলে মনে মনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল মঞ্জু। তাড়াতাড়ি হাতের ঘড়িটা দেখে নিয়ে নীলের দিকে ওর হাতটা একটু বাড়িয়ে ধরে বললো—দেখুন, বারোটা বাজে। এখন আর চা খাবো না। যে কথাটা বলতে এসেছি, সেটা বলে আমি এবার উঠবো।

—সেটা আমার শোনা হয়ে গেছে।

—সোজা হয়ে উঠল মঞ্জু। মানে, আমি কি আপনাকে ঐ আগের কথাগুলো বলতে এসেছিলাম নাকি ?

হেসে ফেলল নীল। বললো—নিশ্চয়ই না। শোনা হয়ে গেছে বলাটা ভুল হয়েছে আমার। বলা উচিত ছিল বোঝা হয়ে গেছে। ও থাক। এ সময়টুকু আমরা অন্ত কথা বলতে পারি এবং একটু চা-ও অনায়াসে খেতে পারি—অবশ্যি যদি ব্যবস্থা করতে পারি, তবেই। এক ঘণ্টার রাস্তা এলে অন্তত আধ ঘণ্টাও বসতে হয়। নইলে গৃহস্থকে অপমান করা হয়। নীল বেরিয়ে গিয়ে পুঁই-মাচাটার কাছে দাঁড়িয়ে মমতারই মতো ডাক দিল, ছুটু-টু-উ-উ।

তেমনি চেঁচানো গলায় জবাব এলো—আইতাছি-ই।

—তোর মাকে জিজ্ঞাসা কর, দু' কাপ চা পাঠাতে পারবে কি না।

—জিগাইতাছি-ই—বলে সে বোধ হয় মার কাছে জেনে নিয়ে জবাব দিল—পারব-ও-ও।

—একটু তাড়াতাড়ি কিন্তু-উ।

—আইচ্ছা-আ-আ।

নীল এসে চেয়ারে বসে পকেট থেকে ফের সেই চারমিনারের প্যাকেটটা বার করল। কিন্তু খুলে দেখল, একটা সিগারেটও নেই। খালি প্যাকেটটাই সে পকেটে ঢুকিয়ে রেখেছিল। ফেলে দিল সে সেটাকে বাইরে।

যদিও খুবই স্পষ্ট, নীল ও-সব কথায় ঢুকতে চায় না, তুলতে চায় না। তবু মঞ্জু না বলে পারল না। বললো—আপনি আমার বাবার কাছে ক্ষমা চেয়েছেন। কিন্তু সেটা উল্টো ক্ষমা চাওয়া হয়ে গেছে। অপরাধের বোঝা আমাদের। ক্ষমা চাইব আমরা। এ কথাটাই বলতে এসেছি আমি।

এবার হেসে উঠলো না নীল। শুধু একটু হাসল।—তবে আমাকেও কিছু বলতে হয়—বলে একরাশ ঘন চুলের ভেতর আঙুল চালালো কিছুক্ষণ চুপচাপ। তার পর বললো—মমতা কেন বিয়েতে রাজী হয়েছিল, আজও আমি জানিনে। এ কাজে সে ক্লান্ত কি না, তাও বলতে পারব না। সেও বলেনি, আমিও জানতে চাইনি। বাবা-মার কথাটা বুঝি—সেটাই বলছি।

—সেটা আমিও বুঝি। তাই থাক।

—আপনি যখন আপনার পারিবারিক দায়িত্ব পালন করলেন, আমাকেও তখন একটু করতে হয়। ক্ষমা চাইলেন, সে আপনাদের মহত্ত্ব। সত্যিকারের অপরাধ তো আমাদের।—হাঁ, মমতার পেশাটা সমাজে সম্মানিত নয়—মা-বাবার মনে এ নিয়ে শান্তি ছিল না। মেয়ের একটা বিয়ে দেবার জন্ত আহার-নিদ্রার আহারটা তাঁরা ছেড়েছিলেন কতটা চিন্তায় আর কতটা অবস্থার চাপে বলতে পারবো না—ঘুম যে তাঁদের ছিল না এ ঠিক। যাক—তাঁরা জানতেন পেশার কথাটা যেমন আপনাদের কাছ থেকে গোপন রাখতে হবে তাঁদের ছেলেমেয়ের কাছ থেকে তেমনি গোপন রাখতে হবে গোপন রাখবার কথাটা। আমি এখানে ছিলাম না। মমতার বাড়ী-ঘর একরকম হাসপাতালই। কাজটা তাই শক্ত হয়নি। কিন্তু তাঁরা মিথ্যাচারী নন্ এ-ও সত্য। মাথার চুলে আঙুল চালাতে চালাতে কথা বলছিল নীল। হয়তো সিগারেটের অভাব বোধ করছিল সে। কথা শেষে চুল থেকে হাত নামিয়ে বললো—ব্যস। এখন অন্ত কথা। এক মিনিট—বলে উঠে গেল নীল। কিন্তু আসতে যতটা দেরী করল—আগে বুঝতে পারলে মঞ্জু নিশ্চয়ই উঠে বইগুলো নেড়ে-চেড়ে দেখতো কি বিষয়বস্তু ওগুলোর।

সিগারেট আনতে গিয়েছিল সে, একটা ধরিয়ে এসে বসে বললো, আপনি নাকি ইতিহাসের ছাত্রী ?

—হাঁ। শুধু ছাত্রী নই—ইতিহাস আমার সব চাইতে প্রিয় বিষয়।

নীল একটু ঝুঁকে বসল ওর দিকে। ইতিহাস আপনাকে সব চাইতে বড় কথা কিছু শিখিয়েছে কি ?

একটু সময় চুপ করে রইল মঞ্জু। বোধ হয় ভাবল। তারপর বললো—ইতিহাস আমায় সব চাইতে বড় কথা শুনিয়েছে।

—কি ?

—কোন কিছুই থেমে থাকে না। ইতিহাসের স্বাভাবিক নিয়মে দেশে ও সমাজে বিপ্লব দেখা দেয়—এই তার প্রকৃতি। থামল মঞ্জু। কিন্তু নীল ওর দিকে ঠিক তেমনি ভাবে তাকিয়ে চুপ করে রয়েছে—যেন আরো কিছু শোনার প্রতীক্ষা করছে, তাই বললো—হয়তো দেশ ও সমাজের অবস্থা শতাব্দীর পর শতাব্দী একই রকম থেকে যেতে পারে আবার মুহূর্তে বিরাট পরিবর্তন এসে যেতে পারে—কিন্তু সে আসে। জলের বাষ্প হয়ে ওড়া আর বরফ হয়ে জমার আগের স্তরগুলো যেমন আমাদের অজ্ঞাতে প্রস্তুতির পথে এগোয়, বিপ্লবের প্রকৃতিটাও নাকি সেই রকম। এবং বিপ্লবই হলো নাকি নিঃস্ব নিপীড়িত মানুষের উৎসবের দিন। ইতিহাসের এই শিক্ষার পর যে দিকে তাকাই দুঃখ নয়, অভাব নয়, দেখতে পাই চলছে কেবল সেই ইতিহাসের উৎসব দিনের আয়োজন।

হীরের নীল আলোটার মতো একটা আলো যেন নীলের চোখে ছুটোছুটি করে বেড়াতে লাগল।

দু'হাতে দু'টো ভরা পেয়ালা নিয়ে অতি সন্তর্পণে পা ফেলতে ফেলতে ঘরে এসে ঢুকল ছুটু। পাটপাতা সেদ্ধ জলে দুধ মেশালে যে রকমের দেখতে হয় তেমনি চেহারার দু' পেয়ালা চা রাখল চৌকিটার উপর। চা রেখেই চলে যাচ্ছিল সে।

তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে ওর হাতটা ধরলো মঞ্জু। বললো, আরে শোন শোন। কাছে টেনে আনল মঞ্জু ওকে। বললো, একটা মস্ত ঘোড়া পেলে তুমি কি করো সে গল্পটা আমার শোনা হয়নি। সেটা আমাকে শুনতেই হবে। দেখব একটা ঘোড়া পেলে আমি যা করতাম তার সঙ্গে মেলে কি না।

ছুটু লজ্জায় হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ছুটে পালালো।

নীল বললো, একটা ঘোড়া পেলে আপনি কি করবেন ?

চায়ের কাপটা হাতে তুলে নিতে নিতে মঞ্জু বললো, সঙ্গীদের সঙ্গে দিল্লী চলো দিল্লী চলো খেলবো।

—মৃত নগরের মৃত সঙ্গীদের নিয়ে কি এ খেলা জমবে আপনার ?

মঞ্জুর দুষ্টুমিভরা গভীর চোখে যে শান্ত ভাব কখনো দেখা যায় না তাই দেখা দিল। বললো, বিসমার্ক জার্মাণ সাম্রাজ্যটা গড়ে দিয়ে গেলেন তাঁকে যখন সমস্ত ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেওয়া হলো তখন একটা বিখ্যাত কার্টুন বেরিয়েছিল, 'ড্রপিং দি পাইলট।' আজ আমাদের অবস্থাও তাই। নিজেদের মৃত বলব কেন ?

নীল ওর দিকে দৃষ্টিটা স্থির রেখে শরীর টান করল। গুণী নতুন যন্ত্র হাতে তুলে নেবার আগে যেমন তার সুর পরখ করে নীল তেমনি কিছু এতক্ষণ করছিল কি না কে জানে! সে বললো, আমরা একটা স্কুল করছি। যাবেন দেখে আসতে ?

—স্কুল ?

—হাঁ। এক দিকে অবৈতনিক অপর দিকে অর্থাভাব। মাইনে দেবো মাষ্টারদের তেমন ক্ষমতা নেই। তবু করছি।

একটা দারুণ উৎসাহ বোধ করল মঞ্জু। স্কুল করা মানে নিজ হাতে একটা প্রতিষ্ঠান গড়া। সোজা কথা না কি। নীল একতাড়া কাগজ নিয়ে এলো। বলতে লাগল পরিকল্পনাটা ওদের কি ? বেলা যে গড়িয়ে চললো সে ওরা খেয়াল করল না। দু হাতে ভাতের থালা ধরে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে এসে ঘরে ঢুকল ছটু। থালাটা টেবিলের কাগজ-পত্রের উপরই নামিয়ে রেখে টেনে নিঃশ্বাস নিতে নিতে বললো, দুইটা বাইজা গেছে। তুমি খাইবা না ? মায় তোমার খাওনেরটা পাঠাইয়া দিছে। ছটুও তার স্নান-খাওয়া বোধ হয় খুব বেশীক্ষণ ধরে শেষ করে নি। পেটটা তার প্যাণ্টের উপর দিয়ে ফুলে উঠেছে। মাথার ভিজে চুলগুলো পাট পাট করে আঁচড়ানো।

এক রকম লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালো মঞ্জু—দুটো !

নীল তার হাতের কাগজের উপর চোখ রেখেই বলল—খাচ্ছি। রেখে যা।

—জল ভইরা দিয়া যামু ?

—যা।

ছটু রান্নাঘর থেকে তেমনি দু'হাতে ধরে একটা জলভরা গ্লাস এনে টেবিলে রেখে চলে গেল। মঞ্জু মনে মনে প্রমাদ গণল, দেবে আজ বৌদি। মুখে বললো—এবার আমি উঠলাম।

কাগজপত্র রেখে টেবিলটার কাছে যেতে যেতে নীল বললো—স্কুলটা একটু দেখবেন তারপর বাসে তুলে দিয়ে আসবো। দুটো বেজেছে তো হয়েছে কি ?

—বাড়ীতে আজ ভীষণ দরকার আছে।

—বাড়ীতে মানুষের রোজ দরকার থাকে। নীল ওর ভাত ঢাকা দিয়ে আনা থালাটায় ভাত ডাল তরকারী আদ্ধেক আদ্ধেক তুলে মঞ্জুর দিকে এগিয়ে ধরল।

দাঁড়িয়েছিল মঞ্জু—এ কি! বলে দু', পা পিছিয়ে যেতে গিয়েও থালাটার দিকে তাকিয়ে থেমে গেল সে। থালার মাঝখানে লাল মোটা চালের ভাত। তার উপর ডাল ঢেলেছে নীল, পাশে একটু তরকারী। থালাটা ধরল মঞ্জু। অপর থালাটায় ঠিক এই ভাবে ডাল তরকারী ঢেলে নিয়ে মঞ্জুর দিকে তাকালো নীল। কোথায় বসা যায় বলুন তো ? আচ্ছা দাঁড়ান। রাখুন এই এটার উপর। নীল চৌকির উপরের দৈনিক কাগজটা দেখিয়ে দিল। নিজে রাখল টেবিল থেকে একটা কাগজ টেনে। দাঁড়ান আর এক গ্লাস জল নিয়ে আসি। জল আনতে গেল নীল। মঞ্জু থালাটা নামিয়ে রেখে বসল। ও এতটা হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল যে নীলকে থামিয়ে, সে জলটা ভরে আনছে—এ কথাটা পর্য্যন্ত বলতে ওর খেয়াল হলো না। জলের গ্লাস দুটো মাটিতে রেখে বসে বললো—নিন খেয়ে নিন, দুর্দান্ত ক্ষিদে পেয়েছে। গ্রাস গ্রাস মুখে ভাত তুলে দিতে লাগল নীল। দু' এক গ্রাস খেয়েই গলাটা বাঁ হাতে চুলকোতে লাগল সে। মঞ্জু যদিও বুঝল গলার চুলকানীটা বাইরের নয় ভেতরের—তরকারীর কচু গলায় হুল ফোটাতে চলেছে। ঝট করে গলাটা পার করে দেবার জন্ত গিলে ফেলতে লাগল মঞ্জু গরাসগুলো। দুর্দান্ত ক্ষিদে পেয়েছে বলছেন। আপনার তো 'পেট ভরবে না।

—দু'জনারই আদ্ধেক আদ্ধেক হোক।

দরজায় শিকল তুলে মঞ্জুকে সঙ্গে নিয়ে নীল যখন বেরুলো, তখন আড়াইটা বেজে গেছে।

মঞ্জু যখন স্কুল দেখে মিটিং শুনে বাড়ী ফিরল অমিতা গম্ভীর মুখ আরো গম্ভীর করল ওকে দেখে। বললো—এই তোমার একটার ভেতর ফেরা ?

—সত্যি বৌদি! একেবারে অনিচ্ছায় হয়ে গেছে। আজ দুটো ছবি দেখব—ছ'টা ন'টা।

—মমতার সঙ্গে দেখা হয়েছিল ?

—এ্যাঁ—এই এ্যাঁটা করে মঞ্জু ভেবে নিল কি বলবে। হাঁ। সে অনেক কথা। পরে হবে। এখন না বেরিয়ে পড়তে পারলে টিকিট পাওয়া যাবে না কিন্তু।

সবে আসল ছবিটা আরম্ভ হয়েছে, হঠাৎ ডেকে উঠল মঞ্জু—দিদি!

—কি হলো আবার ?

—আমি একটু বাইরে যাচ্ছি।

—কেন ? বিস্মিত ভাবে অসন্তুষ্ট দৃষ্টিতে মৌরী তাকালো মঞ্জুর দিকে।

—চকলেট কিনবো।

চাপা গলায় ধমক দিল মৌরী—ফাজলামো করবিনে।

—হাঁ রে, সত্যি বলছি ভীষণ ইচ্ছে করছে।

চুপ করে রইল মৌরী।

মঞ্জু যাবার আগে মাথা নিচু করে ফিস-ফিস করে বলে গেল—এই যাবো আর আসবো। তবে একটু দেরী হলে হল ছেড়ে বেরিয়ে পড়িসনে বা চিন্তা করিস নে। বুঝলি ?

বুঝল না ওরা কিছুই। শুধু বুঝল মঞ্জু চকলেট কিনতে যাচ্ছে না। মৌরী অমিতা পরস্পরের দিকে তাকালো। দুজনের চোখই বললো, ধন্ত মেয়ে!

মঞ্জু হাঁটা দিল গ্র্যাণ্ডের দিকে। নিউ এম্পায়ার আর গ্র্যাণ্ড এই তো এক মিনিটের পথ। কতক্ষণ লাগবে ফিরতে। একেবারে ভুলে গিয়েছিল যে রজতকে চিঠি দেওয়া হয়নি, খবর দেওয়া হয়নি। সে এসে উপস্থিত হবে না ত ?

[ক্রমশঃ।

উপযুক্ত লোক—উপযুক্ত কাজ

উপযুক্ত কাজের জন্য ইচ্ছামাত্র উপযুক্ত লোক খুঁজে পাওয়া একটি কঠিন প্রশ্ন। লোক বাছাই করার পদ্ধতিটি সেজন্য যতদূর সম্ভব নিখুঁত হওয়া দরকার। কোথায় কি ধরণের কর্মী নিযুক্ত হলে প্রত্যাশিত কাজ সুষ্ঠুভাবে হতে পারে, সেটা জানতে ও বুঝতে হবে আগে ভাগে। যোগ্যতা আদৌ নেই অথচ স্বজন বলে কিংবা শক্ত সুপারিশ আছে বলে নিয়োগপত্র দিতে হবে, এমনটি সমীচীন নয়। সহজ কথায় লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন বেশ ভালভাবে—উপযুক্ত লোকই যেন উপযুক্ত স্থানটিতে এসে বসতে পারেন।

চাকরীর ক্ষেত্রে লোক বাছাই-এর জরুরী প্রশ্নটি আজকের দিনেই যে দেখা দিয়েছে, এমন নহে। লোক-সংগ্রহের যখনই প্রয়োজন হয়েছে উহাও প্রায় পাশাপাশি থেকে এসেছে বরাবর। এযুগে কর্মী নির্বাচনের (সিলেকসান) জন্য বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে প্রার্থীর 'ইণ্টারভিউ' আহ্বান করা হয়। আবার কতকগুলো ক্ষেত্রে পরীক্ষা (লিখিত বা মৌখিক কিংবা উভয়ই) মারফত এ কাজটি সম্পন্ন করার রীতি চলতি। অবশ্য আমাদের দেশে উপযুক্ত কাজের জন্য উপযুক্ত লোক খুঁজে পাওয়ার এই ধরণের অনুসৃত ব্যবস্থাদি কতখানি পক্ষপাতশূন্য, অনেকের মনে এ জিজ্ঞাসা বিদ্যমান।

কি সরকারী কি বেসরকারী বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজের বহর বৃদ্ধি পাচ্ছে যতই, প্রশ্নটি নিয়ে চিন্তা ও আলোচনার প্রয়োজন পড়েছে অনুরূপ মাত্রায়। অতীত দিনে কোন বিশেষ কাজের জন্য লোক নির্বাচন বা কর্মী বাছাই কি ভাবে হতো, প্রসঙ্গত এ নিশ্চয়ই জানবার বিষয়। ইতিহাস পর্য্যালোচনা করতে যেয়ে দু'টি প্রধান পদ্ধতি আমাদের চোখে পড়ে প্রথমেই—এর একটি বৃটিশ পদ্ধতি অপরটি এশিয়া ভূখণ্ডের চীনা পদ্ধতি। এক্ষণে এ পদ্ধতি দুটো কি নিবিড় ভাবে বিন্যাস ও বিশ্লেষণ করে দেখা যেতে পারে?

লোক বাছাই বা যাচাই-এর পুরাতন বৃটিশ পদ্ধতিটি ছিল অনেকটা নিম্ন ধরণের। তখনও 'ইণ্টারভিউ' আহ্বান করা হতো, তবে 'ইণ্টারভিউ' (সাক্ষাৎকার) কালে কর্মপ্রার্থীর যোগ্যতার মুখ্য মাপকাঠি ছিল সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির পরিচয়পত্র। নির্বাচকমণ্ডলী ম্যাহগ্যানি টেবিল ঘিরে বসতেন এবং প্রার্থীকে জিজ্ঞাসা করতেন সর্বপ্রথমে তাঁর নাম। নামটি যেইমাত্র বলা হলো, অমনি প্রশ্ন অমুক অমুকের (সম্ভ্রান্ত বা পদস্থ ব্যক্তিবিশেষ) সহিত প্রার্থীর কোন আত্মীয়তা বা রক্তের সম্পর্ক আছে কি না। এরূপক্ষেত্রে উত্তর বার বার নেতিবাচক হলেই এতটুকু ভরসা থাকত না চাকরী হবে বলে। বলতে কি, সঙ্গে সঙ্গে কর্মপ্রার্থী লোকটিকে 'ইণ্টারভিউ' দপ্তর থেকে বিদায় নিয়ে ঘরমুখী হতে হতো। আর প্রার্থীকে যদি চটপট কোন বিশিষ্ট লোকের সঙ্গে নিজের সম্পর্ক বা আত্মীয়তা (সত্য হোক কি মিথ্যা হোক) বাতলাতে সক্ষম দেখা যায়, অমনি নির্বাচন-তালিকায় তাঁর নাম উঠে গেল, ধরে নিতে অসুবিধা নেই।

বিলেতে নৌ-বিভাগে লোক সংগ্রহের ব্যাপারে আবশ্যক 'ইণ্টারভিউ' পুরাতন পদ্ধতিতেই চলে বহু কাল। কিন্তু কড়াকড়ি ছিল একটি জায়গায়—যেখানে বিশিষ্ট বা প্রতিষ্ঠাবান কেউ সম্পর্কিত থাকলেই যথেষ্ট বলে ধরা হতো না। পরীক্ষা ও বিচারে উত্তীর্ণ হবার জন্য প্রার্থীকে নাম করে দেখাতে হতো—নিকট আত্মীয়ের মধ্যে ক'জন নৌ তথা সামরিক বিভাগে রয়েছেন এবং কি পদমর্য্যাদায়। যে যুবক তৎপরতার সঙ্গে বলতে পারল, এডমিরাল—আমার কাকা, ক্যাপ্টেন—আমার বাবা, কমাণ্ডার—পিতামহ, মায়ের বাবা এডমিরাল—, এবং বড়ভাই রয়েল মেরিনসএ লেফটেনান্ট ইত্যাদি, তাকেই ধরে নেওয়া হতো আদর্শ প্রার্থী।

যেখানে এ মানবিশিষ্ট দুই জন কি তিন জন প্রার্থী পাশাপাশি এসে দাঁড়াত, এদের মধ্যে তাকেই চাকরী দেওয়া হতো, যার সংসাহস ও উপস্থিত বুদ্ধি অন্যদের তুলনায় অধিক। নির্বাচকমণ্ডলী (সিলেক্সান বোর্ড) হয়ত জিজ্ঞাসা করলেন—যে ট্যাক্সিটি করে আপনি ইণ্টারভিউ দিতে এসেছেন, তার নম্বর কত? ট্যাক্সিতে আদৌ না এলেও আদর্শ প্রার্থীকে সঙ্গে সঙ্গে একটা কোন নম্বর বলে দিতে হবে। সরকারী সূত্রে দাবী—এইরূপ ব্যবস্থায় কর্মী নির্বাচনে বাস্তবক্ষেত্রে সুফল পাওয়া যেতে পারে প্রচুর।

কাজের জন্য লোক বাছাই-এর যে প্রথা বা পদ্ধতি চীনে চালু ছিল অতীত দিনে, সেটি অনেক দেশেই অনুকরণ করতে দেখা যায়। পদ্ধতিটি হচ্ছে—প্রার্থীদের ডেকে এনে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা লওয়া। চীনের এই বিশেষ ব্যবস্থাটি ১৮৩২ সালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীও নিজেদের ক্ষেত্রে প্রবর্ত্তন করেন। ১৮৫৫ সালে লর্ড ম্যাকলেকে চেয়ারম্যান করে গঠিত একটি কমিটি কর্তৃক উক্ত ব্যবস্থার কার্য্যকারিতার দিক বিবেচিত হয়। এর পরই ১৮৫৫ সাল থেকে সিভিল সার্ভিসে প্রার্থীদের নিয়মিত ভাবে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা চলে। গোড়াতেই এর উদ্দেশ্য স্থির ছিল—প্রকৃত বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন কর্মক্ষম আদর্শ প্রার্থীকে খুঁজে পাওয়া।

আজ-কাল বেশীর ভাগ দেশেই বেকার সমস্যা খুব প্রকট—কর্মপ্রার্থীর তুলনায় কর্ম-সংস্থান নিতান্ত নগণ্য। এই অবস্থায় প্রার্থী-নির্বাচনের কাজটি আরও শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে, বলা যায়। প্রকৃত প্রস্তাবে একটি কোন কাজের খোঁজ হলেই দেখা যাবে—'ইণ্টারভিউ'র জন্য শত শত প্রার্থী হাজির। লোক বাছাই-এর জন্য এ ক্ষেত্রে কোন্ পদ্ধতি অনুসরণ সঙ্গত ও অনুকূল হবে, সেটি না ভাবলে নয়। বৃটিশ পদ্ধতি বা চীনা পদ্ধতি কার্য্যকরী না হলে নতুন বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি বা সূত্র আবিষ্কার প্রয়োজন। মোটের উপর, উপযুক্ত কাজের জন্য উপযুক্ত লোক যেমন করেই হোক খুঁজে পেতে হবে—এ ব্যাপারে ধরাধরি বা সুপারিশের প্রশ্ন কখনই যেন বড় হয়ে না দেখা দেয়।

হস্তশিল্প ও আধুনিক ভারত

সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে 'হ্যাণ্ডিক্র্যাফ্‌টস' বা হস্তজাত শিল্পের সাধারণ ভাবে উন্নতি হয়ে আসছে। যেমন বহির্বিশ্বের নানা জায়গায়, তেমনি আমাদের ভারত ভূমিতেও। একথা ঠিক, সেদিনে ইংরেজ আমলের প্রথম ধাপ অবধি হস্তশিল্পে ভারতের যে বিশিষ্ট স্থান ছিল, পরাধীনতার নাগপাশে সেটি ক্ষুন্ন হয়েছে অনেকখানি। কিন্তু তাই বলে ভারত যখন স্বাধীনতা অর্জন করে শিল্পায়নের বড় বড় পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে, তখন এই শিল্পক্ষেত্রেও সে আর পিছিয়ে পড়ে থাকে নি।

ভারতের মধ্যে বাংলার হস্তশিল্পের সমাদর ছিল এককালে সবচেয়ে বেশী। এ দেশের সূক্ষ্ম মসলিনের কথা সারা বিশ্বে প্রবাদের মত ছড়িয়েছিল। সুনিপুণ বাঙালী শিল্পী ও কারিগরের হাতে তৈরী আরও কত শিল্প প্রচুর অর্থ জুগিয়ে এনেছে বিদেশী বাজার থেকে। সে সব অমূল্য শিল্পের কোন কোনটি আজ অবলুপ্ত হলেও হস্তশিল্পে বাংলার অব্যাহত উদ্যম ও অগ্রগতি অস্বীকার করা যায় না। বেত ও চামড়াজাত পণ্য, মাটির খেলনাদি; হাতীর দাঁত ও মহিষের শিঙের চিরুণী, বোতাম ইত্যাদি এবং রেশম ও তাঁত বস্ত্র—এ সকলই এখানকার হস্তশিল্পের অগ্রগতির নিদর্শন বহন করছে।

আধুনিক ভারতে শুধু পশ্চিমবঙ্গেই নয়, প্রায় সকল রাজ্যেই হস্তজাত শিল্প তথা কুটীরশিল্পের উন্নতি ও সম্প্রসারণের চলেছে ব্যাপক চেষ্টা। স্বীকার করতে হবে—যন্ত্রশিল্পে দেশকে সমৃদ্ধ ও সুগঠিত করার প্রয়োজন যেমন রয়েছে, পাশাপাশি হস্তশিল্পকে বাঁচিয়ে রাখার প্রয়োজনীয়তাও তেমনি কম নয়। জাতীয় সরকার যে এই যুক্তিটি বিনা প্রশ্নে মেনে নিয়েছেন—ইহা আশার কথা।

বিদেশের বাজারে বিভিন্ন ভারতীয় হস্তশিল্পের চাহিদা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে, একটি সুখের বিষয়। ষ্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশনের (রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য কর্পোরেশন) বিভাগীয় কর্মকর্তা বা মুখপাত্রের এক বিবরণীতে সম্প্রতি নিম্নোক্ত তথ্য প্রকাশ পেয়েছে—বহির্ভারতে হস্তশিল্পের চাহিদা বাড়াবার জন্যে সরকার যে 'হ্যাণ্ডিক্র্যাফটস এক্সপোর্ট কর্পোরেশন' (হস্তশিল্প রপ্তানী কর্পোরেশন)। গঠন করেছেন, তাঁদের কাজ নিশ্চিত এগিয়ে চলেছে। এরই ভেতর এই সংস্থাটির প্রচেষ্টায় ভারতের হস্তজাত শিল্প রপ্তানী হয়ে যাচ্ছে সোভিয়েট ইউনিয়ন, চেকোস্লোভাকিয়া, যুগোস্লাভিয়া ও পোল্যাণ্ড—ইউরোপের এ দেশগুলোতে এবং বিশ্বের অন্যত্রও।

সরকারী হিসাবেই প্রকাশ—১৯৫৭ সালে অর্থাৎ বিগত বর্ষে সোভিয়েট ইউনিয়নে যে পরিমিত হস্তজাত শিল্প রপ্তানী হয়ে যায়, মূল্য ছিল এর দশ লক্ষ টাকা। এ সময়ে চেকোস্লোভাকিয়ায় রপ্তানী হয় প্রায় তিন লক্ষ টাকার হস্তজাত পণ্য। এতদ্ব্যতীত পোল্যাণ্ড, যুগোস্লাভিয়া ও পূর্ব্ব-জার্মানী—এই তিনটি রাষ্ট্রে যথাক্রমে ৭৫ হাজার টাকা, ৩০ হাজার টাকা ও ২৫ হাজার টাকার শিল্পদ্রব্য রপ্তানী হয়ে গেছে এবং তাহাও বিগত একটি বৎসরেই। সরকারী সূত্রেরই সংবাদ—রুশিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া প্রভৃতি দেশ থেকে চলিত ১৯৫৮ সালেও ১৫ লক্ষাধিক টাকার ভারতীয় হস্তজাত জিনিস চেয়ে পাঠানো হয়েছে। এই শিল্পোদ্যমকে সমধিক জনপ্রিয় করে তোলার জন্যে সরকারী সাহায্য ও সহযোগিতা চাই সকলের আগে, এইটি মেনে নিতেই হবে।

দৈহিক ওজন হ্রাসের ব্যবস্থা-পত্র

রোগা ও দুর্ব্বল দেহ নিয়ে যেমন কার্য্যক্ষেত্রে স্বস্তি নেই, তেমনি অতিমাত্র চর্ব্বিযুক্ত বা মেদবহুল হওয়াটাও উদ্বেগ-বিশেষ। সেজন্য আগে থেকে সতর্ক হওয়া দরকার—কোন অবস্থাতেই শরীরের অস্বাভাবিক স্ফীতি যাতে না ঘটে। অতিরিক্ত মেদ বা চর্ব্বি জমা হয়ে গেলে অবিলম্বে বিজ্ঞান অনুমোদিত ব্যবস্থাপত্র খুঁজে না নিলে নয়। লক্ষ্য রাখতে হবে—দেহ-কাঠামোটি যেন ভবিষ্যতের জন্য ব্যাধিমুক্ত হয়, উহার অস্বাভাবিক বাড়তিটা যেন কমে যায় প্রত্যাশিত মাত্রায়।

শরীরের অত্যধিক স্ফীতি হ্রাস অর্থাৎ দৈহিক ওজন কমাবার জন্যে রকমারী ব্যবস্থাপত্রই চিকিৎসা-বিশেষজ্ঞগণ নির্দ্ধারণ করে আসছেন। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই যে ব্যবস্থাপত্রটির উপর জোর দেওয়া হয়ে থাকে, সেটি হল—'খাওয়া কমাও, অন্ততঃ অযথা মেদ বৃদ্ধি পেতে পারে, এমন খাওয়া ছাড়।' আরও একটি সাধারণ ব্যবস্থাপত্র—মনকে সব সময় একটা কোন চিন্তা বা দুশ্চিন্তার মধ্যে রেখে দেওয়া। এই ব্যবস্থাপত্রের যাঁরা প্রণেতা, তাঁদের দাবী—চিন্তা-ব্যাধিতে বাড়তি মেদ যতখানি সহজে কমতে পারে, চোখের উপর হ্রাস পেয়ে যাবে দৈহিক ওজন, তেমনটি অন্য ব্যবস্থায় প্রায়ই সম্ভব নয়।

খাদ্য-নিয়ন্ত্রণের কড়াকড়ির দিকে না যেয়ে শরীরের অতিরিক্ত স্ফীতি কমাবার জন্যে আরও বিচিত্র ব্যবস্থাপত্রের কথা শুনতে পাওয়া যায়। না ঘুমিয়ে রাত্রি কাটানো, কাজে অকাজে অনুক্ষণ ঘুরে বেড়ানো, মাথা গুলিয়ে যায়, এমন কিছুতে হাত দেওয়া—এ সব কত কি। এই ব্যবস্থাপত্রগুলো অনুসরণে সাফল্য যে কোথাও দেখা দেয় নি বা দিবে না, এমন কিছু বলা চলে না। এ প্রসঙ্গে আর একটি অভিনব ব্যবস্থাপত্রের কথা উল্লেখ করা যায়—বাড়তি ওজন বা মেদ কমাবার জন্যে বাঁধাবাঁধি কোন খাদ্য-তালিকার প্রয়োজন নেই। খেতে বসে সব রকম খাদ্যই খাওয়া চাই, তবে মাত্রা কমিয়ে অর্থাৎ কোনটাই পুরোপুরি নয়।

দেহ-বিজ্ঞানী ও চিকিৎসা-বিশেষজ্ঞগণ মেদবহুল ও অতিকায় মানুষের প্রশ্ন নিয়ে গবেষণা করে আসছেন বহুদিন থেকেই। বিলেতেই বরং এই গবেষণা ব্যাপক আকারে লক্ষ্য করা যায় এবং সেখানে বিজ্ঞানসম্মত অনেক ব্যবস্থাপত্রই বাস্তবক্ষেত্রে পরীক্ষিত হচ্ছে। এর ভেতর একটি ব্যবস্থাপত্র বিশেষ জনপ্রিয় এবং এর অনুসরণে দ্রুত সুফল পাওয়া যায় বলে দাবী করা হয়। এই ব্যবস্থাপত্রে মেদবহুল বা অত্যধিক ওজনবিশিষ্ট মানুষের জন্যে ২২টি খাদ্য নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। নিষিদ্ধ খাদ্যের তালিকাটি এইরূপ—গ্রেভি (মাংসের নির্য্যাস), আইস-ক্রীম (মালাই বরফ), রাইস (ভাত), ক্যাণ্ডি (মিছরি জাতীয় মোদক), সিরিয়াল্‌স (ভক্ষ্য শস্যাদি), চকোলেট, অয়েল (তৈল), জেলিজ ও জ্যামস, সুপস (ভারী ওজনের), স্পেঘেটি (পিষ্টক বিঃ), সুগার (চিনি), নুডলস, নাটস্‌ (বাদাম), কেক, ক্র্যাকার (শক্ত বিস্কুট), কাষ্টার্ড (দুগ্ধ, ডিম ও চিনি মিশ্রিত সুস্বাদু খাদ্য), ক্রীম (দুধের সর), ব্রেড (রুটি), বাটার (মাখন), পেষ্ট্রিজ, পটেটো ও পুডিং।

গীতি-নাট্যকার হ্যাণ্ডেল

জর্জ ফ্রেডারিক হ্যাণ্ডেল—ইনি ছিলেন একজন অতিকুশলী সঙ্গীত রচয়িতা ও সুর-সাধক কিন্তু এর আসল পরিচয়—বিশ্বের একজন শ্রেষ্ঠ গীতি-নাট্যকার ইনি। অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপে তাঁকে নিয়ে সত্যি গর্বের অবধি ছিল না। এই শিল্পী-মানুষটি এক কথায় তাঁর যুগের জেরেম কার্ণ।

হ্যাণ্ডেলের জীবন কাহিনী নানা দিক থেকে রোমাঞ্চকর ও উপভোগ্য। ইউরোপের জার্মাণ ভূমিতে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৬৮৫ সালে কিন্তু জীবনের বেশীর ভাগ সময়টাই তাঁর কেটেছে ইংল্যাণ্ডে। খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা অর্জনে শ্রম ও সাধনা করতে হয় তাঁকে অপরিসীম। প্রকৃত প্রস্তাবে, তাঁর উন্নতি ও সাফল্যের মূলে ছিল পরম নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়।

কর্ম-জীবনের প্রথম অধ্যায়ে এই উদ্যোগী পুরুষটি ঘুরে বেড়িয়েছেন দেশ থেকে দেশান্তরে। কিন্তু বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করবার—সকল অবস্থাতেই তাঁর ভেতর জুড়ে ছিল একটি সজীব শিল্পি-মন। সঠিক পথ ধরে একান্ত সুন্দর ভাবে আত্মপ্রকাশের দুরন্তপণা এর কম ছিল না। বার্লিন, হামবার্গ, লণ্ডন, ভেনিস, ফ্লোরেন্স, রোম, নেপল্‌স—কত যায়গায় কত বার তিনি সফর করেছেন। উদ্দেশ্য—আর কিছু নয়, জীবনে শিল্পী হিসাবে স্থায়ী প্রতিষ্ঠা অর্জন, যেমন করেই হোক, চরম সিদ্ধি খুঁজে পাওয়া।

আপনার প্রিয় জন্মভূমিতেই জর্জ ফ্রেডারিকের জীবনের গোড়াকার কয়টা বছর কেটে যায়। সেখানে পড়াশুনো সমাপ্তি হতে না হতেই সুরের নেশায় তিনি মত্ত হয়ে উঠেন। সঙ্গে সঙ্গে চলে তাঁর বলিষ্ঠ লেখনী মারফত বিচিত্র সঙ্গীত রচনা। নানা অঞ্চল ঘুরে ইংল্যাণ্ডে গিয়ে যখন তিনি পৌঁছলেন, অল্প সময় মধ্যে সহজ দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন সেখানকার রসপিপাসু নাগরিকদের। সার্থক গীতি-নাট্যরচনার জোর উৎসাহ ও প্রেরণা এমনি করেই এসে জুটল তাঁর ভাগ্যে।

ইংল্যাণ্ডের উর্দ্ধতন মহল থেকে নীচুতলা পর্য্যন্ত ছাড়িয়ে তখন হ্যাণ্ডেলের নাম। তাঁর রচিত সঙ্গীত বা গীতিনাট্যের যেখানেই জলসা—লোকে লোকারণ্য! এক এক ক্ষেত্রে এমন হয়ে দাঁড়ায়—টিকিট ঘরেও ভীড় নিয়ন্ত্রণের উপায় নেই। ডিউক, লর্ড, ব্যারণ প্রভৃতি সকল সম্ভ্রান্ত পরিবারের স্ত্রী-পুরুষের হ্যাণ্ডেলের নামে একরূপ পাগল হয়ে পড়েন।

গান-রচনাতেই যে জর্জ ফ্রেডারিক সিদ্ধহস্ত ছিলেন, এমন নয়। পরন্তু-গানের জলসা পরিচালনাতেও তাঁর ছিল দক্ষতাপূর্ণ অগ্রগামী ভূমিকা। হার্পসিকর্ডে (বাদ্যযন্ত্র) যখনই তাঁর হাত পড়তো, সুর-ঝঙ্কার কানে পৌঁছামাত্র কত সুন্দরী ও কত বিদূষী জ্ঞানহারা হয়ে যেতেন, তার হিসাব নেই। এমনও দেখা গেছে—পথে ঘাটে, প্রমোদকুঞ্জগুলোতে নর-নারীর কণ্ঠে কণ্ঠে হ্যাণ্ডেলের গানের সুর, তাঁর রচিত গীতিনাট্য সমূহের অকুণ্ঠ প্রশংসা। হ্যাণ্ডেল রচনাবলী পুস্তকাকারে যখন প্রকাশিত হয়, তখনও দেখা যায়,—কেবল ইংল্যাণ্ডেই নয়, ইউরোপ-এর কী বিপুল চাহিদা!

এই শিল্পি-প্রবরের জীবন-পথ সব সময়ই কিন্তু এমনি কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। লণ্ডনে থাকাকালীন 'এসথার', 'মেসায়া' প্রভৃতি বিখ্যাত গীতি-নাট্যগুলো রচনায় যখন তিনি ব্যস্ত, সে সময় প্রবল বাধা আসে স্থানীয় বিশপের দিক থেকে। বলা হল—ধর্ম্মীয় কাহিনী বা বিষয়বস্তু নিয়ে কোনপ্রকার জলসা বা বিকৃত অভিনয় চলবে না। কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারী হয়ে গেল হ্যাণ্ডেলের গীতি-নাট্যের অনুষ্ঠানগুলোর উপর। ফলে অপ্রত্যাশিত দৈন্য ও আর্থিক অস্বচ্ছলতায় পড়তে হয় এই প্রতিভাশালী মানুষটিকে। অবশ্য দুদিন দীর্ঘস্থায়ী হল না—অন্ধকার কাটিয়ে আলোর আবির্ভাব হয় অল্পদিন মধ্যেই। হ্যাণ্ডেল রচিত 'মেসায়া' গীতি-নাট্যটি এমনি অপূর্ব হল যে, সমগ্র ইংল্যাণ্ডবাসী মুগ্ধ ও স্তম্ভিত হয় এবং সারা ইউরোপে যুগপৎ এর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা চলে।

শিল্পী জর্জ ফ্রেডারিকের জীবনযাত্রা সম্পর্কে বহু বিচিত্র কথা-কাহিনী আজও চলতি শোনা যায়। সঙ্গে সঙ্গে এও ঠিক—তাঁর সেদিনের বেশীর ভাগ গান বা গীতি-নাট্যই এদিনে হুবহু বেঁচে নেই। অর্থাৎ ইউরোপবাসীর নিকটও সেগুলো বিস্মৃত। কিন্তু হ্যাণ্ডেলের অনবদ্য লেখনীপ্রসূত 'এসথার', 'দেবোরা', 'সল', 'মিশরে ইস্রায়েল', 'মেসায়া',—এ গীতি-নাট্যগুলোর প্রত্যেকটি চিরস্থায়িত্বের দাবী রাখে, এইটি বলাই বাহুল্য।

এত বড় উঁচুদরের সুরশিল্পী বা সঙ্গীত রচয়িতা হয়েও হ্যাণ্ডেলকে একটি দিকে মস্ত বঞ্চনা ভোগ করতে হয়েছে। কোন নারী তাঁকে স্বামিরূপে বরণ করতে এগিয়ে এসেছে, এমন শোনা যায়নি কখনও। দুটি ক্ষেত্রে তাঁর বিবাহের প্রস্তাব হয়েছিল মাত্র কিন্তু সুর ও সঙ্গীত সাধকের জীবন সদাচঞ্চল বলে উভয় প্রস্তাবই সরাসরি প্রত্যাখ্যাত হয়। তৎক্ষণাৎ তিনি সিদ্ধান্ত করে ফেলেন—চিরকুমার থাকবেন। এ কঠিন সিদ্ধান্ত অটুট ছিল তাঁর গৌরবদীপ্ত জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত এবং পরে এজন্যে তাঁকে কখনও আর বিচলিত হতেও দেখা যায়নি। হ্যাণ্ডেলের যশঃ ও সুনাম যখন দেশ-বিদেশ ছড়িয়ে, এমনি মুহূর্তে ১৭৫৯ সালে তাঁর জীবন-দীপ নির্বাপিত হয়। সত্যি একজন সার্থক শিল্পী ছিলেন তিনি—শিল্পই ছিল তাঁর প্রকৃত জীবনসঙ্গী, যাকে দূরে ঠেলে রাখেননি তিনি কোন দিন কোন অবস্থায়।

রেকর্ড-পরিচয়

"এইচ্-এম্-ভি" ও "কলম্বিয়া" রেকর্ডে প্রকাশিত নতুন গানের সংক্ষিপ্ত পরিচয় :—

হিজ্ মাষ্টার্স ভয়েস

N 82787—শিল্পী মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের চিত্তজয়ী কণ্ঠে দু'খানি সম্পূর্ণ নতুন ধরণের আধুনিক গান। "ও আমার চন্দ্রমল্লিকা" ও "বনে নয় মনে মোর।"

N 82788—মধুর কণ্ঠের জন্ম সর্বজনপ্রিয় শিল্পী বাণী ঘোষাল এবার "সেই তুমি" ও "এতো গান নিয়ে এসেছি" আধুনিক গান পরিবেশন করেছেন।

N 76071—"কালামাটি" বাণীচিত্রের "আর তোরা আয় তোরা" ও "আকাশ ডাকে" জনপ্রিয় গান দু'খানি গেয়েছেন যথাক্রমে শ্রীমতী প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায় ও মৃণাল চক্রবর্তী।

কলম্বিয়া

GE 24897—"শেষের কবিতা মোর দিয়ে যাই আজ" ও "তন্দ্রাহারা রাত ঐ জেগে রয়" আধুনিক গান দু'খানি হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সুরে গেয়েছেন শিল্পী শ্রীমতী প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়।

GE 24898—গীতশ্রী কুমারী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের মধুক্ষরা কণ্ঠে গাওয়া দু'খানি কীর্তন গান। "সখি চিকণ কালা গলায় মালা" ও "সই, না কহ ওসব কথা।"

GE 30399—"নাগিনীকন্যার কাহিনী" বাণীচিত্রের দু'খানি গান। "চাঁপা ফুলের মোহনমালা" ও "সে মোর সোনা লখিন্দর" গেয়েছেন কুমারী গায়ত্রী বসু।

GE 30400—"নাগিনীকন্যার কাহিনী" বাণীচিত্রের অন্য দু'খানি গান। "মনে কি ভাবনা হইল রে" ও "যেমন বাবুর চাঁদমুখ" গেয়েছেন যথাক্রমে গায়ত্রী বসু ও গায়ত্রী বসু ও শৈলেন মুখোপাধ্যায়।

আমার কথা (৪৩)

শ্রীরত্নেশ্বর মুখোপাধ্যায়

সঙ্গীত ব্রহ্ম—উহার সম্মান মানসিক উন্নতিতে—উহার উৎকর্ষতা নিয়মিত চর্চায়—উহার রাজসিকতা ভাষা-মাধুর্য্যে, উহার তামসিকতা ভাবার অপকর্ষে—আর উহার আকর্ষণ একাগ্র সাধনার মাধ্যমে। জানালেন সঙ্গীত-রত্নাকর শ্রীরত্নেশ্বর মুখোপাধ্যায় প্রথম দেখায়। তার পর আরম্ভ করেন :

১৯০৪ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারী (১৫ই মাঘ ১৩১০) বরিশাল জিলার উজীরপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করি। উহা cutlery শিল্পের জন্য বিখ্যাত। পিতা ৺গজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কলিকাতা সার্ভে দপ্তরে ডিরেক্টরের P. A. ছিলেন। মাতা শ্রীমতী সুশীলাসুন্দরী দেবী। মাতুলালয় ফরিদপুর সহরে। দশটি ভ্রাতার মধ্যে আমি দ্বিতীয়। উজীরপুর বিদ্যালয়ের ৪র্থ শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িয়া বরিশাল [illegible] তখন আমাদের প্রধান শিক্ষক ছিলেন ৺জগদীশ মুখোপাধ্যায়। তিনি প্রতি রবিবার ছাত্রদের লইয়া ধর্ম্ম ও ভক্তিমূলক আলোচনা করিতেন। মহাত্মা অশ্বিনীকুমার স্বয়ং তত্ত্বাবধান করিতেন। সঙ্গীতপ্রিয় বাবা সুগায়ক ছিলেন এবং প্রতি শনিবার স্থানীয় শিল্পীদের লইয়া গৃহে সঙ্গীতানুষ্ঠান করিতেন। তজ্জন্য বাল্যকাল হইতে আমি সঙ্গীতের প্রতি আকৃষ্ট হই। ১৯২২ সালে বরিশাল জিলা সম্মেলনে আমি জাতীয় সঙ্গীত গাই। উহাতে ভারতবরেণ্য নেতা আলী ভ্রাতৃদ্বয়, বিপিন পাল, গান্ধীজি, দেশবন্ধু ও আরও অনেকে যোগদান করেন। সেই সময় অসহযোগ আন্দোলনের ফলে বি, এম, স্কুল দ্বিধা-বিভক্ত হইয়া জাতীয় বিদ্যালয় ও মডেল স্কুল নামে পরিচালিত হইতে থাকে। একমাত্র জগদীশ বাবু ভিন্ন অন্যান্য শিক্ষকেরা শেষোক্তে যোগদান করেন। আমার মাতামহ ৺আনন্দ চট্টোপাধ্যায়ের পীড়াপীড়িতে আমি মডেল স্কুলের ছাত্র হিসাবে ১৯২৪ সালে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করি। ইহার পর কলিকাতায় আসিয়া সদ্য রূপান্তরিত আশুতোষ কলেজ হইতে ১৯২৭ সালে I. Scতে উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা মেডিক্যাল স্কুলে যোগদান করি। দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পাঠ কালে অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্র রাখিয়া স্ত্রীবিয়োগ হইলে পূর্ব্ববঙ্গে ফিরিয়া যাই এবং নৌকাযোগে বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ করিতে থাকি। পিতা ও ভ্রাতাদের স্নেহের ডাকে কলিকাতায় আসিয়া পুনরায় দারপরিগ্রহ করি। পড়াশুনায় আর অগ্রসর হই নাই। বিদ্যালয়ে নিম্ন শ্রেণীতে পড়ার সময় রায়ের কাঠি জমিদারের

শ্রীরত্নেশ্বর মুখোপাধ্যায়
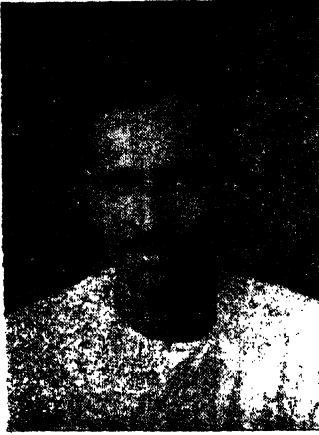
সভা-গায়ক আমার এক জ্যাঠামশায় আমাকে গানের সহিত তবলার মাধ্যমে তাল শিক্ষা দিতেন। গ্রামে থাকাকালীন চালু স্বদেশী ও জাতীয় সঙ্গীত, যাত্রা গান, কবিগান ও তরজা নিজ প্রেরণায় শিখি। কিন্তু সঙ্গীতের প্রেরণা পাই বাবার কাছে।

গ্রামের ন্যায় কলিকাতার গৃহে বাবা প্রতি শনিবার সঙ্গীতাসর বসাইতেন। উহাতে নিয়মিত যোগদান করায় আমার দক্ষতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়। ফলে, কলেজে গায়ক হিসাবে আমার নাম কর্ত্তৃপক্ষ জানিতে পারেন এবং ১৯২৪ সালে বিশ্ববিদ্যালয় সঙ্গীত সম্মেলনে আমার নাম পাঠান হয়। উহাতে পর পর তিন বৎসর আমি প্রথম স্থান অধিকার করি। ১৯২৪ সালে ওস্তাদ বিপিনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নিকট ধ্রুপদ ও টপ্-খেয়াল শিক্ষা করিতে থাকি। ১৯২৮ সনে শ্রদ্ধানন্দ পার্কে অনুষ্ঠিত নিখিলবঙ্গ ছাত্র-সম্মেলনের সঙ্গীত বিভাগে আমি প্রথম হই। উহার সভাপতি হিসাবে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু আমাকে প্রদত্ত সার্টিফিকেটে নিজ নাম স্বাক্ষর করেন। কীর্ত্তন, টপ্পা, ঠুংরী ও লঘুসঙ্গীতে (বাংলা) স্বর্ণপদকও লাভ করি। উক্ত অনুষ্ঠানে উজীর খাঁনের ছাত্র ওস্তাদ মেহেদী হোসেন আমার গান শুনিয়া সন্তুষ্টচিত্তে আমাকে তাঁহার শিষ্য হিসাবে গ্রহণ করেন। ১৯৩১ সাল পর্য্যন্ত হোসেন সাহেবের নিকট নিয়মিত খেয়াল, হোলী ও ঠুংরী শিখিতাম, এখনও আমি তাঁহার শিষ্য।

১৯৩৪ সালে ভট্টপল্লীতে অনুষ্ঠিত দুই দিবসব্যাপী জলসায় যোগদান করি। এবং সেই স্থান হইতে 'সঙ্গীত-রত্নাকর' উপাধি লাভ করি। শ্রীপঞ্চানন তর্কবাগীশ মহাশয় উহাতে পৌরোহিত্য করেন এবং সংস্কৃত ভাষায় লিখিত অভিনন্দন-পত্রটি আমায় হাতে অর্পণ করেন।

নানারূপ রাজনৈতিক সভাসমিতির জাতীয় সঙ্গীতে অংশ গ্রহণ করার জন্য আমি দেশগৌরব সুভাষচন্দ্রের (নেতাজী) স্নেহ-দৃষ্টি লাভ করি। তজ্জন্য ১৯৩১ সালে অল্ডারম্যান সুভাষচন্দ্র কলিকাতা করপোরেশনে আমাকে অন্যতম সঙ্গীত-শিক্ষক হিসাবে গ্রহণ করার ব্যবস্থা করিয়া দেন।

১৯২৪-২৫ সাল হইতে কাজী নজরুল ইসলামের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত হই। তাঁহার সহায়তায় আমি বহু বিশিষ্ট আসরে সঙ্গীতশিল্পী হিসাবে যোগদান করি। এমন কি তিনি আমার ছায়াছবিতে অবতরণে আগ্রহান্বিত হন কিন্তু বাবার অমত থাকায় আমি উহা হইতে নিরস্ত হই।

কি জানি কেন, কীর্ত্তন-গানে আমার বরাবর প্রচণ্ড অনুরাগ ছিল। আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মাষ্টার যাদু আমার উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীতে তবলা সঙ্গত করিত। যক্ষ্মারোগে তাহার অকাল-মৃত্যুতে আমি বড়ই মর্ম্মাহত হই। তজ্জন্য খুব অভিনিবেশ সহকারে যেন যাদুর স্মৃতির উদ্দেশ্যে শেষ দিকে বেশী ঝোঁক দিলাম কীর্ত্তন গানে। তজ্জন্য ১৯৩৬-৩৭ সালে ব্রজগোপাল বাবাজীর নিকট কলিকাতায় কীর্ত্তন গান শিখিতে আরম্ভ করি। সেই সময় ব্রজেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী ও নিবারণ সমাজপতি তাঁহার সঙ্গীত-শিষ্য ছিলেন।

১৯২৮ সালে কলিকাতা বেতার কেন্দ্র হইতে প্রথম বৈঠকী সঙ্গীত পরিবেশন করি এবং ১৯৩৯ সালে কলিকাতা বেতার কেন্দ্রে প্রথম কীর্ত্তন গান করি। উহার পর নিয়মিত আমার প্রোগ্রাম থাকে। এচ এম ভি তে আমার দু'খানা গ্রামোফোন রেকর্ড আছে। হিন্দুস্থান রেকর্ডে বাউল এবং ভারত রেকর্ডে কীর্ত্তন গান গৃহীত হয়।

বাসন্তী বিদ্যাবীথি ও বাণী বিদ্যাবীথিতে কয়েক বৎসর সহাধ্যক্ষ রূপে কার্য্য করিয়াছি। পরে যাদবপুর ভারত সঙ্গীতায়নে অধ্যক্ষ হই। বর্ত্তমানে লেডি প্রতিমা মিত্র প্রতিষ্ঠিত 'শঙ্কর মিত্র কীর্ত্তন শিক্ষালয়' প্রিন্সিপ্যাল হিসাবে যুক্ত রহিয়াছি, কলেজে সহপাঠী হিসাবে সঙ্গীত-বিশারদ অম্বিকা মজুমদার (বার্লিন), হর্ষদেব রায়, ধীরেন চট্টোপাধ্যায় এবং সঙ্গীতে বন্ধু হিসাবে বিমলাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় ও রমেশ বন্দ্যোপাধ্যায়কে পাই।

আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সিদ্ধেশ্বর, ভ্রাতুষ্পুত্র মানবেন্দ্র ও পুত্র দিলীপ মুখোপাধ্যায় সঙ্গীতজ্ঞ মহলে সুপরিচিত।

আমার সঙ্গীতশিষ্যা হিসাবে ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়, তুষারকণা ভড়, মাধবী ব্রহ্ম, পারুল বিশ্বাস, রমা চট্টোপাধ্যায়, অণিমা দাস, ভারতী বসু, অমিয়া রায়, বাণী দাস প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

... এ মাসের প্রচ্ছদপট ...

এই সংখ্যার প্রচ্ছদে সিঙ্গাপুরে অবস্থিত হাউপার ভিলায় বুদ্ধের তিনটি বিভিন্ন মূর্তির আলোকচিত্র প্রকাশিত হয়েছে। ছবিগুলি শ্রীমতী শ্যামলী ভট্টাঠাকুরতা গৃহীত।

সকলেরই ভিত্তি বাস্তব-মডেলের ওপর। চরিত্র না দেখলে চরিত্র সৃষ্টি করা সেক্সপীয়রের পক্ষেও শক্ত হত, দস্তয়েভস্কীর পক্ষেও, অন্ত ও প্রত্যহের লেখকের পক্ষেও। যা দেখা যায় তার হুবহু কার্বণ কপি যেমন সাহিত্য নয়, তেমনি যা দেখা নেই তা লেখা আর যারই কাজ হোক সাহিত্যিকের পক্ষে তা অকর্তব্য।

কিন্তু এই মডেল প্রায়ই বিশেষ 'কেউ' বা 'কোনও একজন' নাও হতে পারে। অনেক ফুলে মালা গাঁথার মত অনেক মুখ থেকে একটু একটু নিয়ে মুখর হতে পারে উপন্যাসের চরিত্র।

মঞ্জরীবালাও কোনও বিশেষ কারুর প্রতিচ্ছায়া নয়। জীবনের দর্পণে অন্ত ও প্রত্যহ, প্রতিদিনই চলমান মুহূর্তের ছায়া পড়ছে। তারই কোনও ছায়াকে চিরকালের মত ধরে রাখার জন্যেই জন্ম জীবনদর্পণ সাহিত্যের। মঞ্জরীবালার মধ্যে যদি কেউ বিশেষ কারুর ছায়া দেখে থাকেন তাহলে বলব এর অনেকটাই তাঁর নিজের রচনা। সে পাঠক অথবা সে পাঠিকাকে লেখক কোনও কালে দেখেননি, তাঁরই কোনও কোনও রচনায় সেই পাঠক অথবা পাঠিকা নিজের ভূত দেখে চমকে ওঠেন। কেন এমন হয়, হয় তার কারণ, চেহারার সাদৃশ্যের মত মনের সাদৃশ্য সুদুর্লভ নয়। তাছাড়া এতটুকু মিলের তিল খুঁজে পেয়ে তা থেকে নিজের সঙ্গে হুবহু সাদৃশ্য তাল বানিয়ে তোলার কৃতিত্ব উপন্যাস পাঠক অথবা পাঠিকার অনস্বীকার্য। মঞ্জরীবালার মধ্যেও বিশেষ কোনও মুখের আদল পেয়েই বিপুল পার্থক্য বিস্মৃত হয়ে কেউ কেউ নিজের মনের মাধুরী মিশিয়ে কল্পনায় রচনা করেছেন আরেক মঞ্জরীবালা,—অন্ত ও প্রত্যহর নায়িকা মঞ্জরীবালা যার থেকে এত দূরে যে সে সম্পর্কে কোনও জবাবদিহি করার দায় নেই অন্ত ও প্রত্যহের রচয়িতার।

অন্ত ও প্রত্যহ রচনার পেছনে কোনও উদ্দেশ্য নেই। যে উদ্দেশ্যে সব রচনার জন্ম,—লেখকের নিজের মনের ভারমুক্ত হওয়া,—অন্ত ও প্রত্যহ রচনার উদ্দেশ্য তা-ই। মঞ্জরীবালার অনেক কথা অনেকদিন ধরে একটু একটু করে লেখকের মনে আষাঢ় আকাশে মেঘ জমার মত করে জমেছিল। অবিরাম বর্ষণে সেই মেঘের যেমন মুক্তি কলমের মুখ থেকে কাগজের ওপর তেমনি মঞ্জরীবালার এসে দাড়ানো মাত্র লেখক অপার ভারমুক্ত। এ ভার,—গুরুভার। এ ভার দুর্বহ। যদি কেউ ধরে নিয়ে থাকেন যে অন্ত ও প্রত্যহ রচনার নেপথ্যে মহত্তর কোনও উদ্দেশ্য আছে তিনি এর রচয়িতাকে তার প্রাপ্যের চেয়ে বেশী সম্মান দিয়েছেন। টলিউডের মরীচিকায় পথভ্রান্ত যুবকদের অকাল মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে নীতিকথা রচনার জন্যে জন্ম নয় অন্ত ও প্রত্যহের। এ দেশটাকে এমনিতেই মর্যাল লেকচারে-লেকচারে মাঝে মাঝে দেশের পরিবর্তে 'উপদেশ' বলেই ভুল হয়। এবং দেশের আর যাতেই উপকার হোক উপদেশে কিছু হয় এমন ধারণার বশবর্তী নয় বর্তমান লেখক। তবু যে অন্ত ও প্রত্যহের আরম্ভে কিছু কিছু এমন ভয়াবহ ভুলের চিত্র তুলে ধরেছি টলিউডের আসল চেহারা আঁকবার সময়ে সে শুধু ডেনমার্কের রাজপুত্তুর ছাড়া হ্যামলেট অসম্ভব এই কারণে। অন্ত ও প্রত্যহ বহিরঙ্গ হলে এটুকু। তবে আত্মা,—মঞ্জরীবালার ইতিবৃত্ত।

সে ইতিবৃত্ত পাঠ করে যদি কেউ মনে করেন যে অধ্যবসায়, বুদ্ধি এবং ক্ষমতার ত্র্যহস্পর্শে যে কোনও তামা অমনিই সোনা হয়ে যেতে পারে, তাহলে তাকে অনুরূপ ভ্রান্ত ধারণার হাত থেকে নিশ্চয়ই নিবৃত্ত করব। মঞ্জরীবালার জীবন বৃত্তান্ত আর যে জন্যেই তুলে ধরে থাকি, দেল কর্ণেগীর মত How to become successful though Bengali লিখে আধমরাদের ঘা মেরে বাঁচাবার কোনও বৃহৎ কর্তব্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে ধরিনি কলম। মঞ্জরীবালা,—জীবনযুদ্ধে যারা আরম্ভেই পতিত তাদের প্রেরণা নয়। মঞ্জরীবালা মহাজন নয় যে যে পথে সে গমন করে স্মরণীয় হয়েছে, সেই পথ ধরলা করে আর কেউ এগুলেই বরণীয় হবে।

মঞ্জরীবালার পথ ধরে এগুলে চোরাবালীতে পা আটকে যেতে পারে, মরীচিকার পেছনে ছুটে তৃষ্ণায় ছাতি ফাটলেও এক ফোঁটা জল না মিলতে পারে। আলেয়াকে ভুল হতে পারে আলো বলে,—শুধু আর একজনও কেউ মঞ্জরীবালা থেকে হতে পারে না মঞ্জরী দেবী। জীবনে সার্থক হবার, জয়যুক্ত হবার কোনও জানা অথবা অজানা ফর্মুলা নেই যা অঙ্কে ঠিক ঠিক সব করে এলে উত্তর মিলে যায় অবিকল। জীবনে পা ঠিক ঠিক ফেলেও লক্ষ্যে পৌছন স্বতঃসিদ্ধ নয়; স্বতই তা বেঠিক জায়গায় নিয়ে যায়। কেন যে জীবনের প্রশ্নপত্রে নির্ভুল উত্তর লিখেও নম্বরের বেলায় মস্ত বড় শূন্য মেলে জীবনের আঁক কেন কিছুতেই মেলে না—জীবনের পাটিগণিতে লিপিবদ্ধ নেই তার কোনও কারণ।

ছাপার অক্ষরে যখন 'গল্প হলেও মিথ্যা নয়'—এই শিরোনামায় জীবনে যাঁরা কৃতীপুরুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন, তাঁদের ছেলেবেলার দিনের অদ্ভুত ধৈর্য, দুঃখ সহ্য করবার ক্ষমতা, শৃঙ্খলিত জীবনযাত্রার বিশদ সচিত্র বিবরণ পড়ি, তখন শক্ত হয় হাস্য-সম্বরণের চেষ্টা। কারণ এদের জীবনে এগুলি মিথ্যা না হলেও বহু লোকের জীবনেই শেষ পর্যন্ত এর কিছুই সত্য হয়নি, সার্থক হয়নি,—হয়নি লক্ষ্যে পৌছনর যোগ্য উপলক্ষ্য। অনেকেই ছেলেবেলাতেই লক্ষ্য ঠিক করতে পারে জীবনের, এগুতে পারে পরের পর পা ফেলে ফেলে ধৈর্য তাদেরও অসীম, অবিশ্বাস্য রকমের কষ্টসহিষ্ণুতায় তারাও কম নয়। তবু শেষ পর্যন্ত লক্ষ্যের কাছেও এরা পৌছতে পারে না,—ছিটকে চলে যায় কোথায়। তা না হলে লক্ষে একটা কেন হবে সার্থক যশোমধন্য লোক,—সবাই যদি লক্ষ্যে পৌছবার পেয়ে যেত বাঁধানো রাস্তা!

তা হয়নি; তা হয় না। মঞ্জরীবালার ওঠবার 'মোডা

পারেস্তি' যদি কেউ নিজের জীবনেও কার্যকরী করার চেষ্টা করে, তবুও হুবহু সেই প্রক্রিয়া অনুসরণ করলেও, অনুকরণ করলেও, তা কাজের হবে না শেষ পর্যন্ত। মঞ্জরীবালা থেকে মঞ্জরী দেবী,—স্টুডিওর ইতিহাসে ওই একবারই সম্ভব হয়েছে। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে, কিন্তু চট করে ঘটে না। দীর্ঘ দিন অপেক্ষা করতে হয় তার জন্যে। বহু যুগের ব্যবধানে পুনরাবৃত্তি হয় ইতিহাসের। ব্যর্থতার ইতিহাস যত তাড়াতাড়ি। যত বেশী লোকের জীবনে বার বার দেখা দেয়, সাফল্যের ইতিহাস কিন্তু অত দ্রুত, অত সহজে অত লোকের জীবনে করে না পুনরাবর্তন।

আগে বলেছি, মঞ্জরী দেবীর জয়যাত্রার ইতিবৃত্ত সূর্যালোকের মত সর্বচক্ষে সমান উদ্ভাসিত। তাই তাতে বিস্ময়ের অবকাশ অকিঞ্চিৎকর। ঠিক। কিন্তু আমার নিজের কাছে মঞ্জরী দেবী কম কৌতূহলের নয়। সত্যিই নয়। নয় তার কারণ আজও আমার জানতে ইচ্ছে করে,—মঞ্জরীবালা থেকে মঞ্জরী দেবীতে উত্তীর্ণ হবার পর তার মন হিসাব মিলাতে গররাজি কি না। জীবনের পাশা খেলায় সর্বস্ব জিতে নিয়েও এখনও বাকী আছে নাকি আরও কোনও বৃহত্তর লাভের লোভ, অথবা প্রত্যাশা? জীবনে মানুষ যা চায় তা পায় না; যা চায় না তাই পেয়েই তাকে ভুলতে হয়, যা চেয়ে পায়নি তার বেদনা। কিন্তু জীবনে যে চেয়ে পায়—তার কি পেয়ে চাওয়া ফুরোয়। বোধ হয় ফুরোয় না।

মহাভারতের মহাপ্রস্থান-পর্বে জীবনের কানামাছি খেলায় বিজয়ী, জয়লাভের মুকুট মাথায় রাজা যুধিষ্ঠির আর হৃতসর্বস্ব, পরাজয়ের লজ্জা আর লাঞ্ছনায় লুণ্ঠিত মহাবীর দুর্যোধন,—মহাকালের কষ্টি-পাথরে এঁদের দুজনেই কি তুল্যমূল্য নয়? সমস্ত আত্মীয় মৃত, বন্ধু বিগত, রাজ্য পুনরুদ্ধারের উত্তেজনা অন্তর্হিত, মিথ্যা কথা উচ্চারণের জ্বালা জীবনের লেজারে ডেবিটের পাতায় এই,—আর রাজ্যলাভ—এই একমাত্র সঞ্চয় জমার ঘরে—রাজা যুধিষ্ঠির কি দিয়ে কতটুকু পেলেন। আর অন্য দিকে—শেষ দিন পর্যন্ত রাজার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত, বন্ধু আত্মীয় পরিবৃত, সূচ্যগ্র মেদিনী বিনা যুদ্ধে প্রত্যর্পণ না করবার প্রতিজ্ঞায় উদ্বুদ্ধ, অন্যায় গদাযুদ্ধে পরাজিত-অপরাজিত দুর্যোধন যখন ভূলুণ্ঠিত,—আর কৃষ্ণের নির্দেশে ভীম পদাঘাত করতে উদ্যত, তখন বলরামের মুখে মহাভারতকার বসিয়েছেন একটি অক্ষরে একটি শব্দে সম্পূর্ণ একটু বাক্য: ছিঃ!

এই একটি 'ছিঃ'-তে যুধিষ্ঠির জয় হয়েছে দুর্যোধনের পরাজয়ের থেকে অনেক, অনেক বেশী হতশ্রী!

মঞ্জরীবালা যেদিন মঞ্জরী দেবী হতে চেয়েছিল,—সেদিন তার মধ্যে ছিল উত্তেজনা, ছিল উন্মাদনা, জীবনে ছিলো একটা বাঁচবার বিপুল অবলম্বন। আর যেদিন সে সত্যি মঞ্জরী দেবীতে উত্তীর্ণ হল, প্রতিষ্ঠা এল, অর্থ এল, সামর্থ্য এল, সবার শেষে এল জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কামনা মূর্তি ধরে,—সমাজে গৃহীত হল সমাজেরই একজন বলে,—সেদিন আর বাকী কি রইল চাওয়ার? পাওয়ার? ইচ্ছে করে জানতে,—জীবনের যুদ্ধে সে পরাজিত তার তবু দিন কাটে ধিক্কার দিতে দিতে, কিন্তু সংগ্রামে সে আজীবন অপরাজিত রইল। জয়ের পর তার জন্যে রইল কি? কোন অবলম্বন সম্বল করে তার দিন কাটে? রাত পোহায়?

মঞ্জরী দেবীর জীবনে বিজয়লক্ষ্মী নিজে এসে ধরা দিয়েছেন। চঞ্চলা লক্ষ্মী জীবনের সিংহাসনে আসীন হয়ে আছেন অচঞ্চল। চলচ্চিত্রের ইতিহাসে একটি পরিচ্ছেদ সংরক্ষিত হয়ে আছে মঞ্জরী দেবীর জন্যে নিঃসংশয়ে। পরাজিতের স্তাবকতা, প্রতিষ্ঠার গৌরব। অত্যন্ত মুষ্টিমেয়র জন্যে প্রবেশ অনুমোদিত সংরক্ষিত মহলে অবাধ যাতায়াত, সবই জুটে নিজে নিজে থেকে এসে অলঙ্কার হয়েছে মঞ্জরী দেবীর সর্বাঙ্গে। তবু? তবুও জানতে ইচ্ছে করে মঞ্জরী দেবী হয়ে মঞ্জরীবালার সব নিঃশেষ হয়েছে কি? মঞ্জরী দেবীর মধ্যে তার পুনর্জন্মেই মৃত্যু হয়েছে কি মঞ্জরীবালার?

কুয়ো ভ্যাডিস? মানুষের জীবনের শেষ জিজ্ঞাসা আজও তার জবাব খুঁজে পায়নি। মঞ্জরী দেবীর মধ্যে মঞ্জরীবালা সব পেয়েছে শুধু তার জীবনজিজ্ঞাসার কোনও জবাব আজও পায়নি।

মঞ্জরীবালার জীবনের সেই একটি মাত্র প্রশ্নের মধ্যেই মাথা উঁচু করে আছে সমস্ত মানুষের জিজ্ঞাসা, তারপর? অন্ত ও প্রত্যহ মঞ্জরীবালার ইতিবৃত্ত না হয়ে রূপকথা হলে লেখা, তারপর অর্ধেক রাজত্ব আর রাজপুত্রকে নিয়ে সুখে ঘর করতে লাগল মঞ্জরী।

কিন্তু জীবন তো রূপকথা নয়, মানুষের জীবন রূপকথার চেয়ে অনেক বড়। শেষ পৃষ্ঠায় কি লেখা আছে তা অজানা বলেই তা রূপকথা নয়; মানুষের জীবন মানুষের অপরূপকথা।

সমাপ্ত
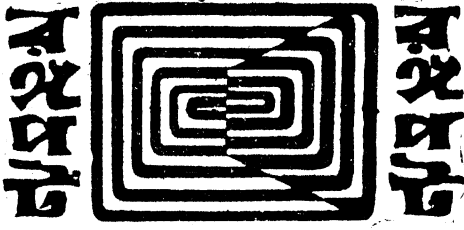
সিসিল বীটন কে ?

কত ভরসা ছিল ছেলের উপর। ডাক্তার হবে নয় তো ব্যারিস্টার হবে, নয় তো ইঞ্জিনিয়ার কিংবা বড় ব্যবসাদার কিছু না হোক, উচ্চপদস্থ সম্মানিত রাজকর্মচারীর আসনই অলঙ্কৃত করুক, সেই ছেলে জীবন কাটাতে চায় কি না ছবি তুলে; শেষকালে একটা চিত্রকর! হতাশায় ভেঙে পড়েন ছেলের বাবা-মা, অন্যান্য গুরুজনেরা, শুভানুধ্যায়ীর দল। ছেলে কিন্তু অটল। ক্যামেরাই তার জীবন, বাটারই হচ্ছে তার লক্ষ্য, ফিল্ম তার কাছে হৃদযন্ত্র। কাঠগড়ার দিকে তার চোখ নয়, নয় স্তেথিস্কোপের দিকে, নয় টেপ-ফিতের দিকে—দৃষ্টি তার স্থির নিবদ্ধ লেন্সের উপর, পড়াশুনা অবশ্য তার থামে না তবে তার মধ্যে ঐকান্তিকতার স্পর্শপ্রভাব ছিল না এতটুকু। যদি বা একখানা কোন ছবি তার চোখের সামনে পড়ল, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল কতটা আলোর মধ্যে ছবিটি তোলা, কতদূর থেকে শটটি নেওয়া, যার ছবি তার অবয়বের কোন কোন জায়গায় কতটা শেড পড়েছে, কতটা ছায়া। সারা পৃথিবী সেই সময়ে তার কাছে মুছে যায় একেবারে!

কি কুক্ষণেই না নবম জন্মদিনে বক্স-ক্যামেরাটি উপহার পেয়েছিল সিসিল, সেই ক্যামেরাই তো হল কাল, ক্যামেরাটি দেখার পর থেকেই তো ছবি-ছবি করে পাগল হয়ে উঠল সিসিল, কে যে দিল এই যন্ত্রটি? এখন যদি একবার তাকে চোখের সামনে পাওয়া যায়?

'সাধনা থাকিলে হইবে সিদ্ধি, বিধি মিলাইবে পুরস্কার', কথাটি জীবন্ত হয়ে উঠল সিসিলের ক্ষেত্রে। দেখতে দেখতে ক্যামেরার অনেক কিছু রহস্য পরিষ্কার হয়ে গেল তার কাছে। ক্যামেরা তাকে অনেক কিছু শেখালে, দেখালে, জানালে। বয়েসটাও একটু একটু করে বাড়ছে। আকৃতিরও হয়ে চলেছে ক্রম-পরিবর্তন, এমনি করেই সেদিনকার ক্যামেরা-পাগল বালক সিসিল আজ পরিণত হয়েছেন জগতের অন্যতম ধুরন্ধর আলোকচিত্রী সিসিল বীটন-এ।

বীটনের আজ বয়েস কত, সঠিক ভাবে আমরা তা না জানলেও তাঁর জীবন-কাহিনী অনুধাবন করে একটি অনুমানে আসতে পারি যে ১৯৫৮ সালে তাঁর বয়েস হতে পারে কম বেশী পঞ্চান্ন বছর।

কেমব্রিজ থেকে তাঁর সৌভাগ্যের সূত্রপাত। সেইখানেই তাঁকে স্বীকার করা হ'ল a photographer with a difference হিসেবে। সেখান থেকে লণ্ডনের এক প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হল তাঁর ছবি। ছবিটিতে বিশেষত্ব আরোপ করতে তিনি যে প্রণালী বা কৌশল অনুসরণ করতেন, সেই প্রণালী বা কৌশলই তাঁকে লণ্ডনের অভিজাত মহলে জনপ্রিয় ও প্রসিদ্ধ করে তুলল। কিন্তু এই প্রণালী অনুসরণ করতে সাধারণের তুলনায় তাঁকে অনেক বেশী ব্যয় করতে হোত, সেইজন্যেই যে পারিশ্রমিক তিনি পেতেন তাতে তাঁর নিজেরই ব্যয় নির্বাহ ঠিক ভাবে হোত না।

বন্ধু এসে উপদেশ দিলেন—আমেরিকা চলে যাও, টাকা সেখানে ছড়ানো আছে। হলিউডে এলেন বীটন। বীটনের মত গুণীকে সমগ্র হলিউড লুফে নিল সাদরে। বারোখানি ছবির (তাও শুধু portrait) জন্য বীটন নিজের পারিশ্রমিক নির্ধারণ করলেন তিন শ' ডলার।

কিন্তু চলচ্চিত্র তাঁর চিত্ত জয় করতে পারল না। ১৯২৯ সালে বীটন যখন লণ্ডনের একজন শ্রেষ্ঠ আলোকচিত্রী তখন একটা নতুন পরিকল্পনা বাসা বাঁধল বীটনের মস্তিষ্কে। রঙ্গমঞ্চ। মঞ্চ-মালাকর হওয়ার সাধ জাগে বীটনের মনে। বাল্যকালে নিজেরা যখন খেলার ছলে অভিনয় করতেন তখনও তার মঞ্চসজ্জার ভার নিতেন তিনি নিজে। প্রথম সুযোগ পেলেন ১৯৩৬ সালে। সি. বি. কোচ্রান তাঁকে আমন্ত্রণ জানালেন তাঁর "ফলো দি সান" এর মঞ্চসজ্জার জন্যে। অপূর্ব শিল্পচাতুর্যের জন্যে অভিনন্দিত হলেন বীটন। এক মাসের মধ্যেই ডাক এল মণ্টিকার্লো'র রুশীয় ব্যালে থেকে ডেভিড লিশিনের (David Lichine) নতুন ব্যালে লে পাভিলিয়'র (Le Pavillion) মঞ্চসজ্জার ভার গ্রহণ করতে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ঘটল ভয়াল আবির্ভাব। বৃটেনের সরকার তাঁকেই ভার দিলেন প্রত্যেক সমরনায়কের আলোকচিত্র গ্রহণ করার এবং সমগ্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকে ছবির মধ্যে ধরে রাখার ভারও তাঁকেই দেওয়া হয়। এর জন্যে জীবন বিপন্ন করে বহু সমরক্ষেত্রে তাঁকেও পদার্পণ করতে হয়েছে।

যুদ্ধ শেষ হয়ে গেল। শান্তির মঙ্গল-শঙ্খ বেজে উঠল ঘরে ঘরে। বীটন ফিরে এলেন আবার মঞ্চলোকে 'লেডি উইণ্ডামিয়ারস ফ্যান' এর মাধ্যমে। তারপর ছায়া-ছবির মধ্যেও তাঁর শিল্পকার্য্যের স্পর্শ বহন করল 'য়্যান আইডিয়াল হাসব্যাণ্ড'। 'য়্যানা কারেনিনা'র ভিভিয়ান লির পরিচ্ছদ কল্পনাও তাঁর।

ইংল্যাণ্ডের রাজপরিবারের অনেকেই ধরা দিয়েছেন বীটনের ক্যামেরার সামনে। এই পরিবারের মধ্যে সর্বপ্রথম যাঁর ছবি বীটন তোলেন তিনি ছিলেন ভিক্টোরিয়ার চতুর্থী কন্যা আরগিলের ডাচেস যুবরাজ্ঞী লুইসি (১৮৪৮-১৯৩৯)। পঞ্চম জর্জের চতুর্থ পুত্র দ্বিতীয় মহাসমরের সময় বিমান দুর্ঘটনায় করুণভাবে নিহত কেণ্টের ডিউক যুবরাজ জর্জ (১৯০২-৪২) বিবাহের পূর্বে তাঁর ভবিষ্যৎ সহধর্মিণী গ্রীসের যুবরাজ্ঞী মারিণার (কেণ্টের ডাচেসরূপে সাধারণে খ্যাতা, জন্ম ১৯০৬) একখানি সুন্দর আলোকচিত্র বীটনকে দিয়েই গ্রহণ করান। এর মধ্যে দিয়েই জর্জ ও মারিণার (কেণ্টের ডিউক ও ডাচেস) সঙ্গে বীটনের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়। জর্জের সর্বশেষ আলোকচিত্র তিনিই গ্রহণ করেছিলেন। এঁরা ছাড়া ঐ পরিবারের আরও অনেককেই বীটন ধরে রেখেছেন তাঁর ক্যামেরার মধ্যে দিয়ে।

সার্থক চিত্রকর সিসিল বীটনের খ্যাতি জগতের কোন প্রান্তেই আজ জানতে বাকী নেই। তাঁর অভিনব সৃষ্টির মাধ্যমেই তিনি লাভ করেছেন অমরত্ব কিন্তু সেই সঙ্গেই এ-ও জানা থাক যে প্রতিভাবান লেখকদের তালিকা থেকেও বহু গ্রন্থের সার্থক গ্রন্থকার সিসিল বীটনের নামও বাদ দেবার নয়।

ডাক্তারবাবু

সমাজের বিভিন্ন পেশাবলম্বীদের মধ্যে ডাক্তারের সঙ্গে তুলনা চলে নীলকণ্ঠ শিবের। পৃথিবীর সমস্ত বিষ নিজের কণ্ঠে ধারণ করে তাকে মুক্ত করেছিলেন হলাহলের কবল থেকে দেবাদিদেব মহাদেব। সমাজ থেকে রোগ-ব্যাধির সমস্ত বীজ দূরীভূত করে সেখানে সুস্থ সবল প্রাণপ্রাচুর্যের প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব সেবাব্রতী চিকিৎসকের। চিকিৎসার ক্ষেত্র ছাড়াও আর এক জগতে এই চিকিৎসাব্রতীদের দেখতে পাওয়া যায়, যেটা তার নিজের জগৎ, যেখানে সে-ও একজন সাধারণ মানুষ। বাস্তব-জীবনের সুখ-দুঃখ হাসি-কান্না, ঘাত-প্রতিঘাত, আনন্দ-বেদনা দিয়ে যে চলার পথ তৈরী সেই পথের সে-ও অন্যতম যাত্রীবিশেষ। যেগুলি দিয়ে জীবন পেয়ে থাকে বৈচিত্রের আস্বাদ, সেও তার ফল ভোগ করতে বাদ পড়ে না। এমনতর এক ডাক্তারের কাহিনী অবলম্বন করে উপরোক্ত ছবিটির সৃষ্টি। ডাক্তারের ব্যক্তিগত সাংসারিক জীবনের প্রতিই এখানে বেশী আলোকপাত করা হয়েছে। সেই ঘরকন্না, রান্নাবান্না গান-বাজনা নিয়ে গল্প, তবে তারই মধ্যে কিছুটা যেন ব্যতিক্রমের ঝিলিক, কিছুটা যেন অভিনবত্ব, কিছুটা যেন অসাধারণত্ব দেখতে পাওয়া যায়, আর বোধ হয় সেইখানেই বিজন ভট্টাচার্যের লেখনীর সার্থকতা। ডাঃ সুরেন রায় কাহিনীর নায়ক। কৃতিত্বের সঙ্গে চিকিৎসাবিদ্যা করায়ত্ত করে সে শহরের আর্থিক প্রলোভন ত্যাগ করে অভাবকে শিরোধার্য করে নিয়ে গ্রামেই সে ডাক্তারী শুরু করল। ছোট ভাই রণেন কলকাতায় থেকে পড়াশুনো করে প্রথম হয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষায়ও উত্তীর্ণ হ'ল। এই সময় ধনিকন্যা লীলার সঙ্গে তার মন-বিনিময় হয় এবং বিয়েও করতে চায় তাকে, সুরেন বাধা দেয় না। বিয়েও হয়, লীলাও আসে শ্বশুরবাড়ীতে, কিন্তু তার পরই সুরু হয় সংঘাত। সেকেলে শাশুড়ীর সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারে না লীলা। রণেন স্ত্রীকে নিয়ে পৃথক হয়। ভগ্নহৃদয়ে তাদের মা দেহত্যাগ করেন। এদিকে প্রতিবেশী নরহরি উকীল মামলা জোড়ে সুরেনের বিরুদ্ধে। কারণ তার ইচ্ছা ছিল রণেনকে জামাই করার। সেই ইচ্ছা মনে মনে পোষণ করেই মাঝে মাঝে সুরেনকে তিনি অর্থ সাহায্যাদি করতেন, মনস্কামনা পূর্ণ না হওয়ায় মামলা জোড়েন সুরেনের বিরুদ্ধে। প্রতিবেশীরা চাঁদা করে মামলা চালাতে লাগল, মামলার এক দিন প্রসূতিকে দেখতে গিয়ে সুরেন আটকে পড়ল। মামলায় জিতলো নরহরি। বাস্তুচ্যুত হল সুরেন। এদিকে লীলা বাবার আশ্রয়ে থাকতে বাধ্য হয়, রণেন যায় জার্মানীতে। রণেন ফিরে এসে লীলাকে নিয়ে চলে আসে দেশের দিকে। এসে দেখে, বাড়ীতে তালাবন্ধ। নরহরির কাছেই সব ব্যাপার সে জানতে পারে। নরহরিও তখন অনুতপ্ত, তার মুমূর্ষু ছেলেকে নিজের রক্ত দিয়ে সুরেন বাঁচিয়েছে। তার ফলে দুর্বলতাজনিত ব্যাধিতে সুরেন মৃত্যুর পথে। রণেন-লীলা-নরহরি একসঙ্গে এসে ক্ষমা চায় সুরেনের কাছে। সুরেনের বাড়ী নরহরি সসম্মানে ফিরিয়ে দেয় তাকে। সকলের মুখে ফোটে ওঠে মিলনানন্দ জনিত হাসি।

বিশু দাশগুপ্তের প্রথম পরিচালিত এই ছবিখানিতে জুড়ে আছে কাঁচা হাতের ছাপ। যে ডাক্তার অকাতরে অর্থ ব্যয় করছে (অবশ্য ধার করেও) তার আয়ের দিক সম্বন্ধে পরিচালক নীরব। যে কৈলাস ছায়ার মত বিপদের দিনেও আঁকড়ে রয়েছে সুরেনকে, শেষাংশে সেই বা কোথায়? মোকদ্দমা শুনলুম ভোলা প্রভৃতি সকলে মিলে চালাচ্ছে, অথচ আগাগোড়া ঐ ব্যাপারে কৈলাসের সঙ্গে রাখাল ছাড়া তৃতীয় কোন প্রাণী চোখে পড়ল না।

বিশু দাশগুপ্ত নতুন পরিচালক। যে যুগে সত্যজিৎ রায়ের শুভ আবির্ভাব ঘটেছে সেই যুগে দেখা দিয়েছেন ইনি, সুতরাং এঁর মধ্যে দিয়ে আমরা নতুন কালের ছাপই পেতে চাই। কিন্তু এঁর ছবিতেও সেই বনভোজনে চা করতে করতে এঁকে-বেঁকে গান গাওয়া, জানলার গরাদ ধরে "দয়া কর, ক্ষমা কর" জাতীয় পিতামহদের আমলের মঞ্চসুলভ সংলাপের ব্যবহার দেখে আমরা শুধু অবাকই হই নি, নিরাশও হয়েছি। সবচেয়ে হতাশ হলুম বিশু বাবুর কাণ্ডজ্ঞানের বহর দেখে যে, চাঁপাহাটির মত রীতিমত পল্লীগ্রামে যেখানে কালেভদ্রে এক-আধটা সাইকেল ছাড়া কিছু চোখে পড়ে না, সেইখানে থেকে রণেন-লীলা সান্ধ্যভ্রমণ করে বাড়ী ফিরে আসছে ট্যাক্সি চড়ে। কোথা থেকে পেল তারা কলকাতার ট্যাক্সি? দর্শকদের পক্ষ থেকে বিশু বাবুর কাছে আমাদের এই প্রশ্নের কি উত্তর তিনি দেবেন?

অভিনয়াংশে ছাপ রেখে গেছেন উত্তমকুমার। সেই সঙ্গে কমল মিত্র, গঙ্গাপদ বসু, অনুপকুমার, অপর্ণা দেবী ও সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়ের নামও সমভাবে উল্লেখযোগ্য। তবে "অন্তরীক্ষ"-এর সার্থকনাম্নী অভিনেত্রী কাজল চট্টোপাধ্যায় যে এত জঘন্য অভিনয় করতে পারেন তা আমাদের ধারণার বহির্ভূত ছিল। অন্তরীক্ষ এমন কি অবাস্তিকেও কাজল চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয়ে যে অপূর্বত্ব ধরা পড়েছিল, কোথায় গেল তাঁর সেই সুধী-স্বীকৃত অভিনয়-প্রতিভা? রাতারাতি তিনি প্রথম শ্রেণী থেকে তৃতীয় শ্রেণীতে এমন করে নেমে এলেন কি করে? এঁরা ছাড়া বিভিন্ন চরিত্রে রূপ দিয়েছেন তরুণকুমার, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ হরেন, পঞ্চানন ভট্টাচার্য, শ্রীমান তিলক, পদ্মা দেবী, রেখা মল্লিক, অপর্ণা দেবী প্রভৃতি। রাজেন সরকারের সঙ্গীত পরিচালনা খারাপ না হলেও প্রশংসার যোগ্য নয়।

নাগিনীকন্যার কাহিনী

পর্দার উপর যাঁরা নতুনত্বের প্রতিফলন দেখতে চান, "নাগিনী-কন্যার কাহিনী" তাঁদের তৃপ্ত করবে আশা রাখি। পৃথিবীর বুকে বয়ে চলেছে বৈচিত্র্যের সমারোহ। সে বৈচিত্র্য শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে মানুষের মধ্যে দিয়ে। কত বিভিন্ন শ্রেণীর, কত বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর, কত বিভিন্ন জাতের বৈচিত্র্য বয়ে যাচ্ছে মানুষকে কেন্দ্র করে—কে রেখেছে তার হিসেব, কে রেখেছে তার ঠিক-ঠিকানা অথচ আপনার আমার আশে-পাশেই এরা ঘুরে বেড়ায়, আমাদের বাড়ীর হয়তো নিকটেই এদের বাস। এমন কি অপরিচয়ও নেই আমাদের সঙ্গে ওদের,—যেমন বিষবেদের দল। সাপ নিয়ে যারা খেলা করে, সর্পবিষ নিয়ে যারা নাড়াচাড়া করতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করে না, সর্পদেবীই যাদের উপাস্য, তাদের সম্বন্ধে আমাদের ধ্যান-ধারণা কতটুকু? সমাজের এই অবহেলিত সম্প্রদায়ের নানা তথ্য স্থান পেয়েছে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখনীজাত

উপরোক্ত উপন্যাসে, যার চিত্ররূপ দিয়েছেন সলিল সেন। ছবিটিতে বেদেদের সমাজের একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্রই তুলে ধরা হয়েছে, আমাদের সামনে যেভাবে বেদেরা ধরা দেয়, সেইটেই তাদের একমাত্র রূপ নয়। আমরা দেখতে পাই নানারকম খেলা দেখাতে এবং নানাবিধ ঔষধ সওদা করতে, এই হোল আমাদের সমাজে তাদের রূপ, কিন্তু নিজেদের সমাজে তাদের রূপ অন্তরকম। সেখানে সর্পদেবীর মানসকন্তারূপে দেবীর মত তারা পূজো করে এক কন্তাকে, তাকেই বলে নাগিনীকন্যা, মানবীর দেহধারণেই তার অধিকার কিন্তু মানবীর ধর্মপালনের অধিকার তার নেই, ভালবাসার সুখ থেকে সে বঞ্চিত, বেদেদের প্রধান শিরবেদে, এখানে দেখতে পাচ্ছি এই লোকটি অত্যন্ত স্বার্থান্বেষী ও কুচক্রী, এরই চক্রান্তে এক নাগিনীকন্যা সমাজ থেকে বিতাড়িতা, নৌকোর মধ্যে তার বাস, আর একটি তাকে হত্যা করে পালিয়ে গিয়ে বাঁচে। নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্ম নরহত্যাতেও সে কুণ্ঠাবোধ করে না। শিরবেদেকে হত্যা করে শবলা জলে ঝাঁপ দিয়ে অন্যত্র আশ্রয় পায়, তার আসন অলঙ্কৃত করে পিঙ্গলা (বিয়ের রাতে যে বিধবা হয়) তারও সেই অবস্থা, দেবীত্বের বেড়াজালে সে হাঁপিয়ে ওঠে, তার কাছে আলোকের বারতা নিয়ে আসেন নাগুঠাকুর। নাগুঠাকুরের হাতে হাত মিলিয়ে সে সন্ধান পায় নবজীবনের, তাকে আশু আত্মহত্যার হাত থেকে বাঁচাতে গিয়ে নিজের জীবন বিসর্জন দেয় শবলা।

ছবিটিতে 'কৌতূহল' যথেষ্ট আছে। এবং ঘটনার প্রবাহে দর্শকচিত্তও ভরে ওঠে। শেষাংশের ঘটনাগুলি তো মুগ্ধ-বিস্ময়ে স্তব্ধ করে রাখে দর্শকসাধারণকে, এ ক্ষেত্রে সলিল সেনের মুন্সীয়ানা প্রশংসনীয়। অভিনয়াংশে মহিলা শিল্পীরাই সর্বাগ্রে অভিনন্দন পাবেন। মঞ্জু দের অভিনয় অভূতপূর্ব, মঞ্জুলা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সন্ধ্যা রায়ও অনন্যসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। বিশেষ করে প্রথমোক্তার অভিনয়ে তাঁর উত্তরকালের অভিনেত্রীজীবনের ঔজ্জ্বল্যের পূর্বাভাস ধরা পড়ে। ছবি বিশ্বাস, কালী বন্দ্যোপাধ্যায় ও কালীপদ চক্রবর্তীর অভিনয়-কুশলতাও অনবদ্য। প্রবীরকুমার, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, দিলীপ রায়, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় ও জহর রায়ের অভিনয়ও প্রশংসনীয়, এঁরা ছাড়া হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবী নিয়োগী, রসরাজ চক্রবর্তী ও বেচু সিংহের অভিনয়ও এতে দেখা যাবে। নৃত্যপরিচালনায় দক্ষতার ছাপ রেখে গেছেন দেবেন্দ্রশঙ্কর। সঙ্গীতাংশও আনন্দ দেবে। গানগুলি সুগীত ও সুশ্রাব্য। সঙ্গীত পরিচালনায় অবর্ণনীয় অভিনন্দনের অধিকারী হয়েছেন রবিশঙ্কর। বহু ছবিতে সুরকাররূপে রবিশঙ্করকে আমরা পেয়েছি কিন্তু "নাগিনীকন্যার কাহিনী"র সুরকাররূপে রবিশঙ্করের কৃতিত্ব চিত্রামোদী দর্শকসাধারণের মনে এক বিশেষ ধরণের প্রভাব বিস্তার করে।

রঙ্গপট প্রসঙ্গে

গীতিকার গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারকে এবারে কাহিনীকারের ভূমিকাতেও দেখা যাবে। তাঁর লেখা 'সূর্যতোরণ' পরিচালনা করছেন অগ্রদূত। বিভিন্ন চরিত্রগুলিতে রূপ দিচ্ছেন ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ী সান্যাল, কমল মিত্র, বিকাশ রায়, উত্তমকুমার, অসিতবরণ, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, শিশির বটব্যাল, শিশির মিত্র, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় তুলসী চক্রবর্তী, সুচিত্রা সেন, শোভা সেন, প্রভৃতি শিল্পিবর্গ। * * * খ্যাতনামা নৃত্যশিল্পী গোপীকৃষ্ণকে নৃত্য-পরিচালকরূপে দেখতে পাবেন সুধীরবন্ধু পরিচালিত "নৃত্যেরই তালে তালে" ছবিটিতে। এতে সুরযোজনা করেছেন রথীন ঘোষ। বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছেন ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ী সান্যাল, অসিতবরণ, পদ্মা দেবী, অনুরাধা গুহ, মিতা চট্টোপাধ্যায়, ভারতী রায় তৎসহ ত্রিবাঙ্কুরের বিখ্যাত রাগিণী ও সুকুমারী ভগিনীদ্বয়। * * * ডাঃ সুরেশ রায়ের রচনা 'অন্তরাগ'এর চিত্ররূপ তাঁরই পরিচালনায় গৃহীত হচ্ছে। এর মাধ্যমে পর্দায় যে সব শিল্পীদের দেখা যাবে তাঁদের মধ্যে কমল মিত্র, নীতীশ মুখোপাধ্যায়, অসিতবরণ, রবীন মজুমদার, তুলসী চক্রবর্তী, পদ্মা দেবী, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, বনশ্রী প্রভৃতির নাম উল্লেখনীয়। এর চিত্রধর ও সুরকাররূপে দেখা যাবে যথাক্রমে বীরেন দে ও কালোবরণকে। * * * ভুজঙ্গ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় "মাষ্টারমশাই" ছবিতে অভিনয় করছেন বিকাশ রায়, সমর রায়, প্রেমাংশু বসু, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, প্রণতি ঘোষ, মিতা চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি। সঙ্গীতাংশের ভার নিয়েছেন সত্যজিৎ মজুমদার। * * * "ক্ষুধিত পাষাণ" ছবিটির কথা চিত্রামোদীরা অনেক দিন ধরে শুনে আসছেন। পুষ্পিতানাথ চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনায় এর চরিত্রগুলির রূপায়ণে আছেন ছবি বিশ্বাস, নীতীশ মুখোপাধ্যায়, জীবেন বসু, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, নবদ্বীপ হালদার, চন্দ্রা দেবী, শোভা সেন, তপতী ঘোষ, প্রীতিধারা প্রভৃতি শিল্পীরা।

"One of the defects of the first Edison incandescent lamps was that they burned out very quickly. A little blue glow would appear at the base of the delicate filament in the lamp and soon the filament would snap at that point. Edison worked for years to eliminate the trouble. It was known as the "Edison effect." It was to the incandescent lamp what static is to radio, and everybody was laboring to get rid of it. Any yet, what do you suppose it was? It was radio. And we thought it was just a nuisance."

—Dr. Willis R. Whitney.

চামৌলী ব্রীজ

—চামেলী চট্টোপাধ্যায়
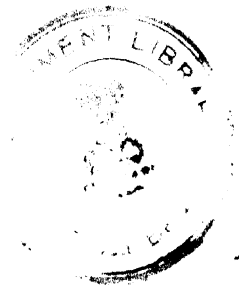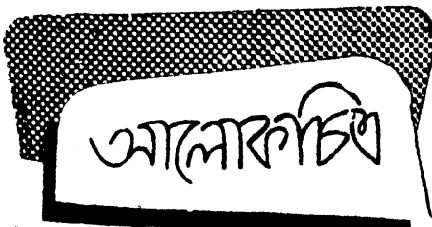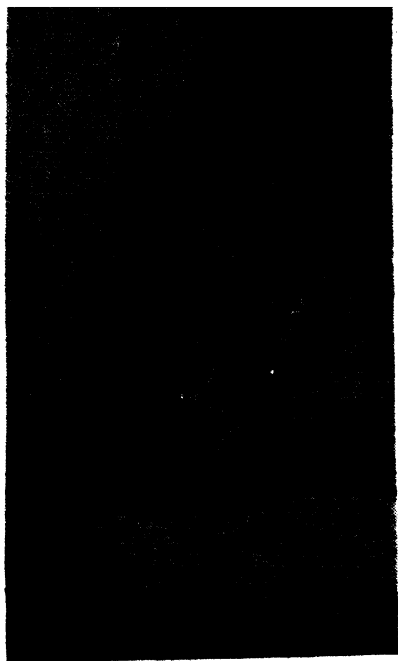
—মনোজিৎ মৈত্র
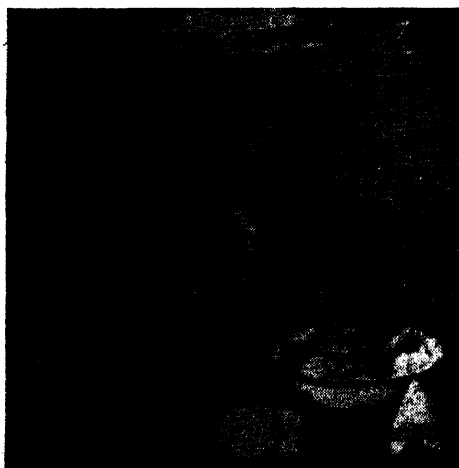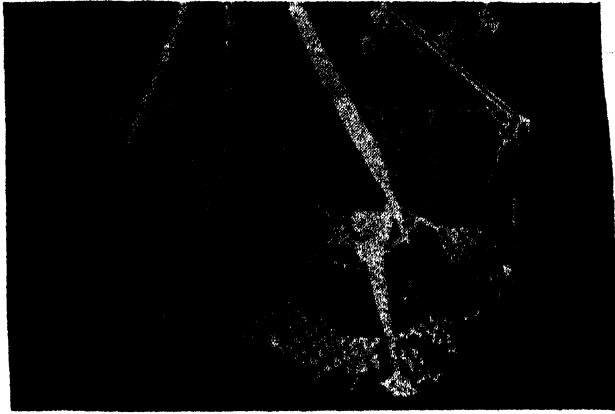
—শিশিরকুমার ঘোষ

শিশুর মেলা

—সুকুমার পাল-চৌধুরী

—মদন বসু

আগামী দিন

—মিস সুনীত ব্রহ্ম

—সন্তু ঘোষ

পরেশনাথ মন্দির (কলকাতা)

—কেশবরঞ্জন সেন
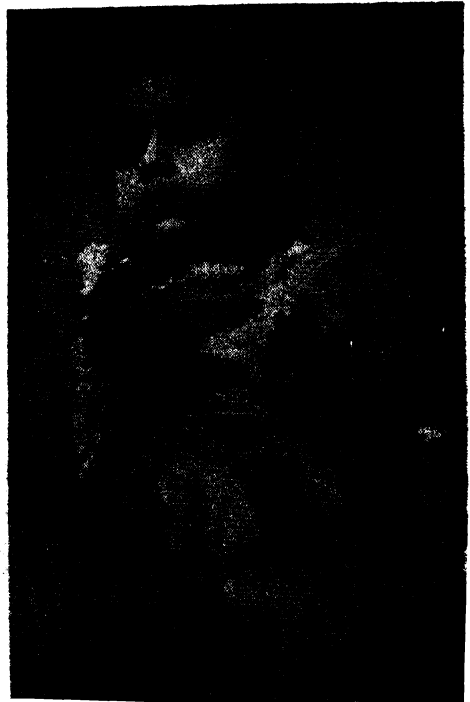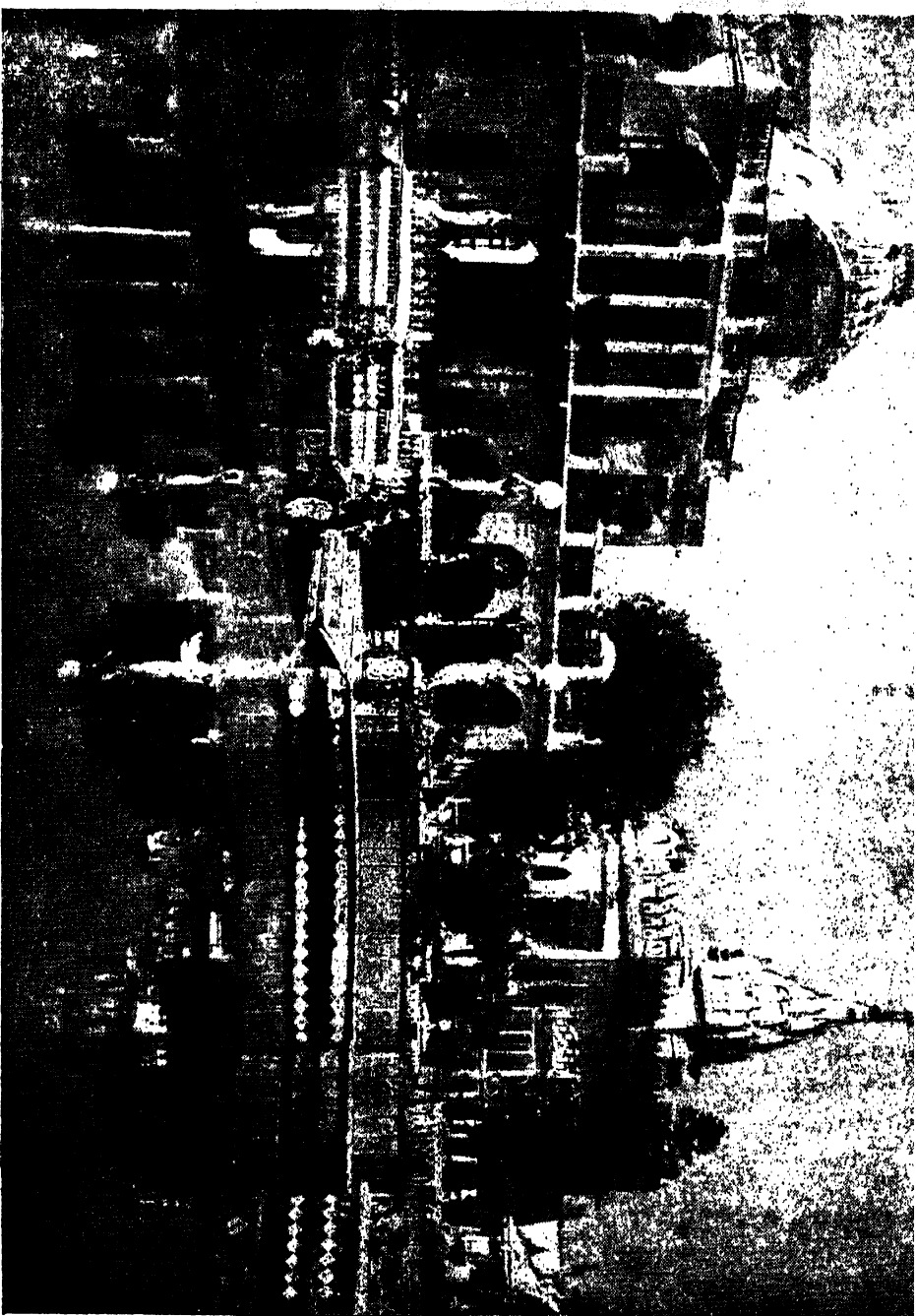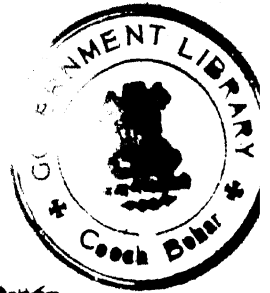
সংবাদপত্র ও সরকার

"সমালোচনার সর্ব্বপ্রধান প্রতিষ্ঠান—সংবাদপত্র। সেই সংবাদপত্র সম্বন্ধে শ্রীরাজাগোপালাচারী যাহা বলিয়াছেন, তাহা এইরূপ—'ইংরেজ শাসনে অর্থাৎ ভারতীয়দিগের হস্তে রাজনীতিক ক্ষমতা হস্তান্তরিত হইবার পূর্ব্বে সংবাদপত্র যেভাবে প্রকাশ করিত এখন তাহার বিপরীত দিকে গিয়াছে। ফলে প্রধান মন্ত্রী প্রভৃতির প্রশংসাই কীর্ত্তন করা হয় এবং তাঁহারা আর সমালোচনার দ্বারা উপকৃত হইতে পারেন না।' লর্ড রিপণ এদেশে বড়লাট হইয়া আসিয়া যখন লর্ড লিটনের ভারতীয় ভাষায় পরিচালিত সংবাদপত্রের স্বাধীনতাসঙ্কোচক আইন বাতিল করেন, তখন তিনি তাঁহার কার্য্যের সমর্থনে যে যুক্তি দিয়াছিলেন, তাহাই সাধারণ—সর্ব্বত্র গৃহীত—সংবাদপত্রের স্বাধীনতাসমর্থক মত বলা যাইতে পারে—মানসিক ও সামাজিক উন্নতির জন্য সংবাদপত্রের স্বাধীনতা প্রয়োজন। সরকারও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হইতে উপকৃত হইয়া থাকেন। কারণ, সরকারের প্রস্তাবিত কার্য্য সংবাদপত্রে আলোচিত হয়—'The Government derives very great advantage from that discussion ; any error that may creep into its proposals are pointed out ; suggestions, often very valuable, are made and the Government has an opportunity of learning in what respects the public misinterprets or misapprehends the intentions by which it is animated, so that by timely explanation the real meaning of those intentions may be made plain.' সরকারের প্রস্তাবে যদি কোন ভুলভ্রান্তি প্রবেশ করিয়া থাকে, তবে সে সব দেখাইয়া দেওয়া হয়; সংবাদপত্রে মূল্যবান করণীয় প্রদর্শিত হয়: সরকার যদি বুঝেন, জনগণ তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ভুল বুঝিয়াছে বা অকারণ ভয় পাইতেছে—তবে সময় মত বুঝাইয়া সে সব অপসারিত করা যায়—লোক সরকারের প্রকৃত উদ্দেশ্য উপলব্ধি করিতে পারে। এইরূপে অনেক অকারণ আশঙ্কা ও আতঙ্ক দূর করা যায়—অবিশ্বাসের সম্ভাবনা দূর হয় এবং শাসিত ও শাসক উভয়ের মধ্যে প্রীতির সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত ও সহযোগ প্রবর্ত্তিত হইতে পারে। সংবাদপত্র যদি তাহার প্রাথমিক কর্ত্তব্য বর্জ্জন করিয়া (যে কোন কারণেই কেন হউক না) শাসক সম্প্রদায়ের—কেবল প্রশংসাই করে, তবে তাহার ফলে শাসক ও শাসিত উভয় সম্প্রদায়েরই ক্ষতি অনিবার্য্য হয়।"

—দৈনিক বসুমতী।

মেয়েদের উপার্জ্জন

"ইউরোপ-আমেরিকায়, এমন কি শিল্পোন্নত জাপানে এবং নবজাগ্রত চীনেও শিল্প প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে জীবনযাত্রার মানের দ্রুত উন্নতি ঘটিতেছে। ফলে লোক অধিকতর আরাম-আয়াস চাহিতেছে এবং অর্থোপার্জ্জনের উপর উহা নির্ভরশীল বলিয়া কর্মরত লোকসংখ্যা বাড়িতেছে। ঐ সকল দেশে সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে মাত্র বয়স্ক পুরুষদিগের উপার্জ্জন দ্বারা সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে পারিবারিক ব্যয় বহন করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। সে কারণেও বটে, অর্থের ব্যাপারে স্বাবলম্বী হওয়ার জন্যও বটে—ঐ সকল দেশের নারীরা উপজীবিকার ক্ষেত্রে পুরুষের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছে। অফিসে ও দোকানে স্বল্প শ্রমসাধ্য কাজে নারীর সংখ্যাই বেশী। এমন কি ট্রেণ, মোটরগাড়ী, লিফ্‌ট প্রভৃতি চালাইবার কাজে এবং কলকারখানায়ও বহু শ্রমসাধ্য কাজেও পুরুষ ও নারীর মধ্যে প্রতিযোগিতা ক্রমশঃ তীব্রতর হইয়া উঠিতেছে। একজনের রোজগারে সংসার চলিত না, কিন্তু স্বামি-স্ত্রী দু'জনের রোজগারে সংসারের অভাব-অনটন দূর হইয়াছে। ভারতেও সংসার খরচ যে হারে চড়িয়াছে এবং ন্যূনতম স্বাচ্ছন্দ্য-লাভের দাবী যেরূপ দুর্দ্দম হইয়া উঠিতেছে, তাহাতে মাত্র পুরুষের উপার্জ্জন দ্বারা অভাব-অনটন মেটানো সম্ভব নহে। সুতরাং পারিবারিক স্বাচ্ছন্দ্য এবং শান্তির জন্যও গৃহের নারীদিগকে অর্থকরী কার্য্যে আত্মনিয়োগের সুযোগ দেওয়া আবশ্যক। কিন্তু শিল্প এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন দ্বারা আনুষঙ্গিক নানা ব্যবসায়ে রুজি-রোজগারের প্রসার ব্যতীত তাহা সম্ভব হইবে না।" —যুগান্তর।

বিহারের সুবিবেচনা

"বিহার বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সুবিবেচনার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। ১৯৫১ সালের ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় ছাত্রের পক্ষে ইংরাজী অথবা মাতৃভাষায় প্রশ্নোত্তর প্রদানের অধিকার থাকিবে। বাংলা ওড়িয়া এবং উর্দ্দু যে সকল ছাত্র-ছাত্রীর মাতৃভাষা তাহাদের প্রতি ইহা সুবিচারের পরিচায়ক সন্দেহ নাই। একমাত্র হিন্দীতে প্রশ্নোত্তর প্রদানের রীতি আবশ্যিক করিলে তাহা অবশ্যই সেই সকল অ-হিন্দীভাষী ছাত্রের পক্ষে সঙ্কটের ব্যাপার হইত, যাহারা হিন্দীতে শিক্ষা গ্রহণ করে নাই। কিন্তু এই সুবিধা শুধু ১৯৫১ সালের পরীক্ষার্থীদিগের দেওয়া হইল, বিহার বিশ্ববিদ্যালয়ের এই সিদ্ধান্তে ভবিষ্যতের সমস্যা ও উদ্বেগের হেতু থাকিয়া যাইতেছে। এই নীতির ফলে ভবিষ্যতের অবস্থা যে একেবারে পরিচ্ছন্ন হইয়া যাইবে, এইরূপ মনে করা যায় না। বিষয়টি বিরোধের বিষয়ে পরিণত হউক, ইহা আমরা চাহি না। মাতৃভাষায় শিক্ষা লাভের সুযোগ ও অধিকার,

যাহা ভাবাগত মাইনরিটির অধিকার হিসাবে সরকারী ভাবে গৃহীত হইয়াছে এবং যাহার সুরক্ষা রাজ্য পুনর্গঠন আইন অনুযায়ী আঞ্চলিক পরিষদের অন্যতম দায়িত্বরূপে বর্ণিত হইয়াছে, তাহার অন্যথাচরণ যাহাতে না হয় এইরূপ সুস্থায়ী ব্যবস্থা আমরা দেখিতে চাহি।"

—আনন্দবাজার পত্রিকা।

কলিকাতা হইতে আফিস অপসারণ

"কলিকাতা হইতে একের পর এক সরকারী আফিস বাহিরে পাঠাইয়া দেওয়া হইতেছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কেন্দ্রীয় একাউণ্টস আফিস এবং ভারতীয় ব্যুরো অফ মাইন্‌স নাগপুরে যাইবে। নাগপুর ভারতের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত—এই নাকি যুক্তি। যদি তাই হয়, তবে দিল্লী এবং বোম্বাইয়ের আফিসগুলি নাগপুরে যায় না কেন? কলিকাতা হইতে নাগপুর ৭০০ মাইল, বোম্বাই হইতে নাগপুর ৫২০ মাইল। রাজ্যের এয়ারমেলে নাগপুর সারা ভারতের কেন্দ্র। যদি ইহাই কারণ হয়, তবে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এবং ষ্টেট ব্যাঙ্কের হেড আফিস নাগপুরে আসে না কেন? প্রায় ৭০০ মাইল দূরে দিল্লীর ব্যুরো অফ মাইনস এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আফিসগুলিই বা নাগপুরে উঠিয়া আসিবে না কেন? দিল্লী রাজধানী, বোম্বাই বড় ব্যবসাকেন্দ্র, এই যদি ঐ সব জায়গার ব্যাঙ্কের আফিস রাখিবার কারণ হয়, তবে পূর্ব্ব-ভারতের বৃহত্তম ব্যবসাকেন্দ্র কলিকাতায় থাকিবে না কেন?"

—যুগবাণী (কলিকাতা)।

চাকরী ও ব্যবসায় বাঙালীর ছেলে

"চাকুরীর ক্ষেত্রে বাঙ্গালী যুবকের যেমন অযোগ্যতা রহিয়াছে, অনুরূপ অযোগ্যতা ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে রহিয়াছে। দুর্গাপুরে বা সারা আসানসোল মহকুমায় অবাঙ্গালী ব্যবসাদারদের কেহ নিমন্ত্রণ করিয়া আনে নাই—তাহারা লোটা-কম্বল সঙ্গে করিয়া আসিয়া বড় বড় গদীর মালিক হইয়া শেঠ হইয়া বসিয়াছে। দুর্গাপুরে ইতিমধ্যে অবাঙ্গালী ব্যবসাদার কারবার সুরু করিয়া দিয়াছে। দুর্গাপুরে বাঙ্গালীর মূলধন নাই বলা চলে না, কারণ তাহারা জমির যে খেসারত পাইয়াছে এবং এই খেসারত ন্যায্যমূল্য অপেক্ষা সরকার বহুগুণ বেশী দিয়াছে, অনায়াসে স্থানীয় যুবকরা ইহার একাংশ ব্যয় করিয়া ব্যবসায়ে নামিতে পারিত, কিন্তু তাহারা তাহা করে নাই। সামান্য দু'-চারজন যাহারা করিয়াছে তাহারা যদি টিকিয়া থাকে নিঃসন্দেহে একদিন তাহারা ব্যবসায়ে কৃতিত্ব দেখাইতে সক্ষম হইবে। আমরা যখন বাঙ্গালী বেকারের কথা বলি, তখন একথা যেন ভুলিয়া না যাই যে, অধিকাংশ বাঙ্গালী বেকার যুবক মধ্যবিত্ত ভদ্রগৃহের সন্তান—যাহারা কখনও হাতে কলমে কাজ করে নাই বা তাহাদের সমাজের কাহাকেও দেখে নাই—ফলে তাহারা শ্রমশীল কাজ এক দিকে যেমন অপটু অপর দিকে তেমন শ্রদ্ধার চোখে দেখিতে অভ্যস্ত নহে। ফলে অবাঙ্গালীরা শ্রমশীল কাজ দখল করিয়া বসিয়া আছে। এবং বাঙ্গালী যুবকরা এই স্থান দখল করিতে প্রস্তুত হইবে না। তত দিন শ্রমমন্ত্রী হাজার চেষ্টা করিয়াও কারখানায় অবাঙ্গালী নিয়োগ বন্ধ করিতে পারিবেন না।"

—বঙ্গবাণী (আসানসোল)

পাকিস্তানী ফৌজদের হাতে ভারতীয় হিন্দু রমণী

"ইতিহাসের শিশুকণ্ঠে যাহারা বার বার ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছে, হিন্দু মন্দির বার বার লুণ্ঠন করিয়াও যাহাদের লোভ মিটে নাই—হিন্দু রাজা মহারাজা ও সম্রাট পরিবারের নারীদের অলঙ্কার লুণ্ঠন করিয়াছে তাহাদের নাম শোনা যাইবে। ইতিহাসে সেই ধারা পথে যবনদের ভারত লুণ্ঠন লোভ পুনরায় মাথা চাড়া দিয়া উঠিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত অঞ্চলে পাকিস্তানী ডাকাত অর্থাৎ পাকিস্তানী সরকারের প্রেরিত ফৌজ ভারত এলাকায় প্রবেশ করিয়া লুঠতরাজ সুরু করিয়া দিয়াছে। ভারতের জনগণই ভারতের রাজা, পাকিস্তানী ডাকাতেরা সেই রাজাদের কুটীর হইতে ধান, গরু, পিতল কাঁসার বাসন হইতে মূল্যবান স্বর্ণালঙ্কার যাহা পাইতেছে লইয়া যাইতেছে। সীমান্তের ভারতীয় গ্রামবাসীরা আবার আর এক ধরণের উৎপাত উপদ্রবের মুখে পড়িয়াছে। পাকিস্তানী ডাকাত ফৌজ এখন আর লুঠতরাজ করিয়া ক্ষান্ত হইতেছে না, গ্রামবাসীদের মারিয়া ধরিয়া গৃহ হইতে তাড়াইয়া দিয়া কায়েম হইয়া বসিয়াছে। যদি কোন দুর্ভাগা ভারতীয় রমণী ডাকাতদের হাতে পড়ে তবে তো সেই নারীঘাতী শিশুঘাতী ডাকাতদের শিবিরে জালসা বসে। ইহার পূর্ব্বে দাঙ্গার সময় সহস্র সহস্র হিন্দু রমণী পাকিস্তানের লৌহ যবনিকার অন্তরালে বন্দিনী রহিয়াছে—মানবতার করুণ আহ্বানে সেই হতভাগ্য নিগৃহীত মানবীদের তাহারা ফেরৎ দেয় নাই বা শয্যার পাশবিক অত্যাচার হইতে মুক্তি দেয় নাই। এখন তো আবার সেই পাকিস্তানী ডাকাত ফৌজদের হাতে পাকিস্তানী সরকার ও উজির মন্ত্রীদের ব্লাঙ্ক চেক্ দেওয়া হইয়াছে, যদি আরও কিছু ভারতীয় হিন্দু রমণী ধরিয়া পাকিস্তানে লৌহ যবনিকার অন্তরালে লইয়া যাইতে পারে, তবে এই সুবর্ণ সুযোগ তাহারা ছাড়িবে কেন? ইহার সহিত আবার সীমান্তের ভারত এলাকায় পাকিস্তান-দরদী ভাই বেরাদার গুপ্তচর ও পঞ্চমবাহিনী লোকজনদের উস্কানী এবং গোপন সহায়তা রহিয়াছে, কাজেই বাজিমাতের পাকাপাকি ব্যবস্থা তৈরী হইয়া রহিয়াছে।"

—বারাসাত বা[র্ত্তা]

আয়ুর্ব্বেদকে স্বীকার

"আয়ুর্ব্বেদ কলেজের ছাত্রদের মেডিক্যাল গ্রেডে উন্নীত করিব দাবী লইয়া লক্ষ্ণৌতে যে বিরাট ছাত্র-বিক্ষোভ দেখা দিয়াছে, তাহা পরিণতিতে ছাত্র ধর্ম্মঘট, লক্ষ্ণৌ কাউন্সিল হাউসের সম্মুখে বি[ক্ষোভ] বিক্ষোভ, ছাত্রদের ইষ্টক বর্ষণ, পুলিশের গুলী ও লাঠিচালনা, গ্রেপ্তার ঘটিয়াছে। কর্তৃপক্ষ আয়ুর্ব্বেদ ছাত্রদের মেডিক্যাল গ্রে[ডে] তুলিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। কিন্তু মেডিক্যাল অধ্যক্ষ ও ছাত্ররা বলিতেছেন, আনাড়ীদের মেডিক্যাল গ্রেডে নেওয়া চলে না। বিরোধ এখন সেইখানে। কোন্ ছাত্রদের কথা রক্ষা করিবে বিরোধ যে ছাত্রে-ছাত্রে। তবে আমরা কখনও গুলীচালনা সম[র্থন] করি না। নেতারা যদি গণতান্ত্রিক আন্দোলন কণ্ট্রোল করি[তে] না পারেন, তবে বুঝিতে হইবে নেতৃত্ব বড় দুর্ব্বল—গণতন্ত্রের দুর্দ্দিন।"

—জনমত (জলপাইগুড়ি)

মেদিনীপুরে খাদ্যাভাব

"এক সময়ে মেদিনীপুর ছিল পশ্চিমবঙ্গের শস্য-ভাণ্ডার। ৫০-এর মন্বন্তরের পর হইতে সে অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। বিদেশী শাসনকালে আমাদের জীবনেই দেখিয়াছি, মেদিনীপুর সহরে এক পয়সায় ৩।৪ সের বেগুন, ২।০ টাকা মণ ভাল চাল। আট আনা পয়সার বাজার করিলে, ১৯২৮—৩২ সালে একটি থলি ভর্ত্তি হইয়া যাইত। আর স্বাধীন ভারতে সেই মেদিনীপুরের কি দুর্দ্দশাই না হইয়াছে! আলু, বেগুন, পটল এমন কি কলমী শাক পর্য্যন্ত দুর্মূল্য, ২৫।২৬।০ টাকা মণ দরের মোটা চাল অখাদ্য। মাঝারী মিহিচালের মূল্য মণ-প্রতি ২৭।২৮৲ টাকা। সম্প্রতি কণ্টাই-এর ন্যায় চাউল-প্রধান অঞ্চলে ধানের মূল্য ১৬।০ টাকা এবং চালের মূল্য ২৭।০ টাকা হইয়াছে। আলু ২০৲ টাকা মণ দরে বিক্রয় হইতেছে। মেদিনীপুর সহরে বেগুন বারো আনা চৌদ্দ আনা সের, পটলও বারো আনার নীচে নাই। আর মৎস্য? বাঙ্গালীর এই প্রিয় খাদ্যটি এখন সাধারণ মানুষের নাগালের বাহিরে। এবার মেদিনীপুর সহরে ইলিশের দাম ৫৲ টাকা সের দেখিয়াছি। সাধারণ রুই বা মৃগালের দাম ত ৩৲ টাকার নীচে নামিতে দেখি নাই। এই অবস্থায় দরিদ্র ত দূরের কথা, মধ্যবিত্তের পক্ষে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। প্রকাশ, কাঁথিতে অভাবগ্রস্ত মধ্যবিত্তগণ জমি বিক্রয় করিবার জন্য সাবরেজিষ্টারের অফিসে ভিড় করিতেছেন। এই দুরবস্থায় অত্যল্প কালের মধ্যে অনেকেই পতিত হইবেন, সন্দেহ নাই। মেদিনীপুর জেলার দুঃখের আর শেষ নাই। ১৯৩০ হইতে রাজনৈতিক নৈসর্গিক কত ধাক্কাই তাহাকে সামলাইতে হইয়াছে। ভাবিয়াছিলাম, স্বাধীনতার পর এই অবস্থা দূর হইবে—আবার ধন-ধান্যে মেদিনীপুর হাসিয়া উঠিবে। কিন্তু সে স্বপ্ন দিক-চক্রবালে কোথায় বিলীন হইয়া গেল! কর্ত্তৃপক্ষের ঔদার্য্য, জনগণের প্রতি দরদবোধ যদি সত্যই থাকিত, তাহা হইলে সমাজদ্রোহীরা দেশে এই অবস্থা ঘটাইতে পারিত না।"　—মেদিনীপুর হিতৈষী।

শংকাজনক

"বেলডাঙ্গা চিনিকল সম্পর্কে সম্প্রতি যে সর্বশেষ সংবাদ আমাদের নিকট আসিয়াছে তাহা পুনরায় বিস্তারিত ভাবে আলোচনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতেছি। প্রকাশ যে, উক্ত চিনিকল ক্রয় করিবার অভিলাষ জানাইয়া দুইটি প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে রিসিভারের আহ্বানে টেণ্ডার প্রদান করা হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে একটি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমবায় দপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন একটি সমবায় সমিতি, অপরটি উত্তর-প্রদেশের একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান। যাঁহারা সর্বোচ্চ মূল্য দিতে প্রস্তুত থাকিবেন, ইহা নিশ্চিত যে, চিনিকলের রিসিভার তাঁহাদেরই হাতে মিলটির মালিকানাস্বত্ব হস্তান্তর করিবেন। দুর্ভাগ্যক্রমে যদি উত্তর-প্রদেশের ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানটির টেণ্ডার-প্রদত্ত দর সর্বাধিক হয়, তাহা হইলে মিলটির যাবতীয় যন্ত্রপাতি এবং সম্পত্তি তাঁহাদের হস্তগত হইবে। আশংকার কথা এই যে, উত্তর-প্রদেশের ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানটি বেলডাঙ্গায় মিল চালু করিতে প্রস্তুত নহেন এবং মিলের যন্ত্রপাতি উত্তর-প্রদেশে স্থানান্তরিত করাই তাঁহাদের অভিপ্রায়। এই অবস্থা সৃষ্টি হইলে আমরা মনে করি, মিলটি স্থানান্তরিত করার ব্যবস্থাকে বাতিল করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সর্বশক্তি নিয়োগ করা কর্তব্য। প্রয়োজনবোধে অর্ডিনান্স জারী করিয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই মিলটির দায়িত্বভার গ্রহণের কথা বিবেচনা করা উচিত। ন্যায্যদরের অতিরিক্ত মূল্য দিয়া ক্রয় করিবার ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমবায় বিভাগ সজাগ হইয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।"　—জনমত (বহরমপুর)।

পার্ব্বত্যবাসীর প্রাপ্য টাকা

"মাছমারা অঞ্চলের কড়ইছড়া হইতে যেত্তা চাকমা জানাইতেছেন যে, দেও অঞ্চলে পার্ব্বত্যজাতির কল্যাণের জন্য সরকার ৩৬ হাজার টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। এখানে এক জনরব উঠিয়াছে যে, উক্ত টাকা হইতে প্রত্যেক পরিবারকে ৫০৲ টাকা করিয়া দেওয়া হইবে। গ্রামবাসিগণ এই সংবাদে সার্কেল অফিসারের নিকট পুনঃপুনঃ সংবাদ লইতেছে। অন্য এক খবরে জানা যায়, রিয়াং চৌধুরীগণ নিজেরা টাকা বিলি করিবেন কি অন্যে টাকা বিলি করিবেন, তাহা ঠিক হয় না বলিয়া অযথা সময়ক্ষেপ করা হইতেছে। অভাবের সময় যদি সাহায্য না পাওয়া যায় তবে এইরূপ সাহায্যের অর্থ কি? এই দিকে রিয়াংগণ লুসাই বাড়ীতে তিন দিন কাজ করিয়া এক টিন ধান্য মজুরী বাবদ পাইয়া অতি কষ্টে দিন যাপন করিতেছে। অতি শীঘ্র সাহায্য দেওয়া দরকার।"

—সেবক (আগরতলা)।

নান্নুর কীর্ণাহার রাস্তা

"পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রাস্তা উন্নয়ন বিভাগ গত তিন বৎসর পূর্ব্বে নান্নুর কীর্ণাহার রাস্তার উন্নয়নের কাজ শুরু করিলেও তাহার অগ্রগতি এত মন্থর যে, তিন বৎসরেও মাত্র পাঁচ মাইল রাস্তার কাজ শেষ হইল না! আশ্চর্য্যের কথা—গত দুই বৎসরের মধ্যে মাটি ফেলার কাজ হয় নাই। এই রাস্তাটি এতদঞ্চলের অত্যন্ত

প্রয়োজনীয় রাস্তা এবং ইহাও আন্তঃ-জেলা রাস্তার সহিত সংযোগ রক্ষা করে। এই রাস্তায় একহাঁটু কাদা থাকার ফলে মানুষের কীর্ণাহার যাতায়াতের সমস্ত সংযোগ বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। রাস্তার অবস্থা এত খারাপ যে মানুষের পায়ে হাঁটা বা গোগাড়ী যাতায়াতের পক্ষেও অত্যন্ত কষ্টকর।" —বীরভূমবার্ত্তা।

রেলপথের পুনঃপ্রবর্ত্তন

"বাঁকুড়া দামোদর রীভার রেলপথ বা বি, ডি, আর রেলপথটি বাঁকুড়া সহর হইতে বর্দ্ধমান জেলার রায়নার নিকটবর্ত্তী রায়নগরের মাঠের মাঝে অবস্থিত। সেখানে কোন বাজার দোকান বা বস্তী নাই। লাইনটি মাত্র এক মাইল বৃদ্ধি করিয়া রায়না বাজারের পূর্ব্ব দিকে আনিলে জনসাধারণের অশেষ উপকার হয় এবং ঐ রেলপথ দিয়া বহু মাল চলাচল করিতে পারে। এ বিষয়ে বহুদিন পূর্ব্বে উক্ত রেলকর্তৃপক্ষকে সরকারের সচেতন করা উচিত ছিল। প্রজা সোস্যালিষ্ট পার্টি কর্ত্তৃক আহুত রায়না ও জামালপুর থানার অসংখ্য জনসভায় উক্ত লাইনকে জামালপুর পর্য্যন্ত মাত্র পাঁচ মাইল সম্প্রসারিত করিয়া বি, পি, আরের সহিত সংযোগ সাধন করিবার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনগণের দাবীকে অগ্রাহ্য করিয়া বি, পি, আর লাইনকে তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। আমরা উক্ত রেলপথের পুনঃ প্রবর্ত্তনের দাবীও করিতেছি।"

—দামোদর (বর্দ্ধমান)।

বনমহোৎসব

"এই বনমহোৎসব উপলক্ষ্যে একটি কথা বলা প্রয়োজন মনে করছি। প্রতি বৎসর বনমহোৎসব উদ্‌যাপিত হয়, কতকগুলি বৃক্ষচারা রোপণও করা হয়। কিন্তু তাহাদের বাঁচাইবার কোন ব্যবস্থা থাকে না। তাহারা জলের ও রক্ষার অভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। যদি নিয়ম রক্ষার মত বনমহোৎসব করিতে হয় তবে একটি চারা লাগাইয়া কর্ত্তব্য শেষ করিলেই তো হয়? অনর্থক কতকগুলি চারা প্রতি বৎসর এইরূপ নষ্ট করার কি সার্থকতা? সরকারের সেচ বিভাগের বিরাট কম্পাউণ্ড আছে, তাহাতে যদি প্রতি বৎসর কিছু কিছু চারা রোপণ করিয়া তাহার যত্ন করা হইত তবে আজ ৫।৬ বৎসরে বেশ ভাল গাছ জন্মিত, তাহা দেখিতেও সুন্দর হইত। কিন্তু ইহা করার জন্য কাহাকেও চেষ্টিত দেখিলাম না! রাস্তার পার্শ্বে যে সব চারা লাগান হয় তাহার রক্ষার ব্যবস্থা আছে কিন্তু এমন অসময়ে তাহা রোপণ করা হয় যে তাহারাও মরে। এই বৃষ্টির সময় যদি রাস্তার পার্শ্বে চারা লাগানোর ব্যবস্থা হয় তবেই ভাল হয়। কিন্তু এমনই সরকারী ব্যবস্থা তাহা হইবার না কি উপায় নাই। ইহাই সরকারী কর্ম্মচারিগণ বলেন।" —নারায়ণ (কাঁথি)।

অন্নের জন্য লাঠিপেটা

ভাত দিবার মালিক নয়
নাক কাটবার গোঁসাই।

"কৃষ্ণনগরের জেলা মহকুমা হাকিমদের নিরন্নদের অন্ন যোগাইবার ক্ষমতা নাই, লাঠিপেটা করিতে বেশ মজবুদ! যে দেশের লোকের দুই বেলা খেতে দিবার মুরোদ নাই সেই দেশ কোন্ সাহসে নিরস্ত্র নিরন্ন জনতার উপর লাঠি চালায়, এই কথা আমরা ভাবিয়া পাই না! ইহারা যে সহরে লুঠতরাজ না করিয়া অন্যের কাছ হইতে খাদ্য ছিনাইয়া না লইয়া হুজুরে আরজি পেশ করিতে গিয়া ভাতের পরিবর্ত্তে লাঠি খাইল, এই পরিকল্পনাটি দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মধ্যে কোনটির অন্তর্ভুক্ত, অনুগ্রহ করিয়া দিল্লীর অধিকরণ জানাইবেন কি?" —দোকান-শ্রমিক

শোক-সংবাদ

যোগমায়া দেবী (লেডী মুখোপাধ্যায়)

স্বর্গীয় ডাঃ স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সহধর্ম্মিণী ও স্বর্গীয় ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জননী যোগমায়া দেবী (লেডী মুখোপাধ্যায়) গত ৩১এ আষাঢ় বেলা ১১-৫৭ মিনিটে পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুকালে এঁর ৭৮ বছর বয়েস হয়েছিল।

কবিরাজ সত্যব্রত সেন

সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ সত্যব্রত সেন মঙ্গলবার ২০এ শ্রাবণ ৬৬ বছর বয়েসে লোকান্তর যাত্রা করেছেন। কবিরাজ হিসাবে এঁর খ্যাতি সর্বজনবিদিত। পৌর প্রতিষ্ঠানের সদস্য, নিঃ ভাঃ কংগ্রেস কমিটির সদস্য, ওয়ার্ড কংগ্রেসের সভাপতি, প্রাদেশিক কংগ্রেসের কার্য্য-নির্বাহক সমিতির সভ্যপদ সমূহ এঁর দ্বারা অলঙ্কৃত। তা ছাড়া সাহিত্য, শিল্প, সমাজসেবার উন্নয়নমূলক আরও বহু প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ইনি ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন।

ফণী বর্মা ও সতীশ দাশগুপ্ত

খ্যাতিলব্ধ চিত্রপরিচালকদ্বয় ফণী বর্মা (৬১) ও সতীশ দাশগুপ্ত (৫২) যথাক্রমে ৩১এ আষাঢ় ও ২৩এ শ্রাবণ দেহান্তরিত হয়েছেন। প্রথম জনের অভিনেতা হিসেবেও যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। বিষবৃক্ষ, জনকনন্দিনী, কৃষ্ণসুদামা, প্রহ্লাদ, হরিশচন্দ্র, জয়দেব, দাতাকর্ণ, প্রভাস মিলন, নিমাই সন্ন্যাস, ব্যবধান প্রভৃতি চিত্রগুলি প্রথম জনের এবং আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী, পথের দাবী, পোষ্যপুত্র, মহানিশা, মরণের পরে প্রভৃতি চিত্র সমূহে দ্বিতীয় জনের পরিচালনা-কার্য্যের স্বাক্ষর-বিশেষ।

সম্পাদক—শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক
কলিকাতা, ১৬৬নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "বসুমতী রোটারী মেসিনে" শ্রীতারকনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত
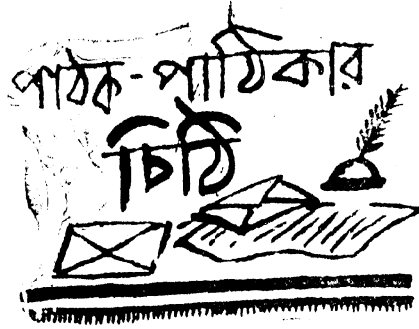
পত্রিকা সমালোচনা

বাল্যকাল থেকে বসুমতীর সঙ্গে আমাদের মিতালি। শুধু আমাদেরই নয়, আমাদের পরিবারেরও। বসুমতীর মতন প্রথম শ্রেণীর পত্রিকাকে প্রশংসা করার জন্যে যতখানি শক্তির প্রয়োজন, বলতে বাধা নেই, সে শক্তি আমাদের অধিকারভুক্ত নয়, তাই তা করতে যাওয়া ধৃষ্টতারই নামান্তর। সাময়িক পত্রিকার জগতে আপনার মত সম্পাদক গর্বের বস্তু, আপনার মত সুধী সাহিত্যিক নিয়ে যে কোন জাত গর্ব করতে পারে, আজ এ কথা সকলেই বলবেন যে, বসুমতীর এই বর্তমান শ্রীবৃদ্ধির মধ্যে আপনার প্রভাব কতখানি বিদ্যমান। কেবল মাত্র সাহিত্যের মধ্যেই বসুমতীর দৃষ্টি সীমাবদ্ধ নয়, বিজ্ঞান, রঙ্গজগত, ব্যবসা-বাণিজ্যও বসুমতীর এলাকা-বহির্ভূত নয়। বাঙলাদেশের আজকের দিনে যাঁরা স্বনামধন্য সাহিত্যিক তাঁদের বহুজনকে আমরা সর্বপ্রথম দেখতে পেয়েছি বসুমতীর মাধ্যমে। সাহিত্য পরিচয়ের মধ্যে যে নিরপেক্ষ মতবাদ আপনারা প্রচার করেন তা যেমনই হৃদয়গ্রাহী, তেমনই সংবেদনশীল। যুগ যেভাবে ক্রমশঃ এগিয়ে চলছে তার সঙ্গে তাল রেখে বসুমতীও সেই ভাবে অগ্রসর হচ্ছে, তাই তো বসুমতীর মধ্যেই যুগের পরিচয় এত পরিষ্কার ফুটে ওঠে। আর এইখানেই বহু পত্র-পত্রিকা ব্যর্থতা বরণ করেছেন। "রাজায় রাজায়" ও "স্মৃতিচিত্রণ" তো শেষ হয়ে গেল, এদের জায়গায় কি দিচ্ছেন? নীলকণ্ঠের লেখাও ভাল লাগছে। বাঙলা সাহিত্যের নানা অলি-গলি দিয়ে আজ দুর্নীতি প্রবেশ করছে, বসুমতীই পারে সেই দুর্নীতি দূর করতে, সুদূর মাদ্রাজ থেকে তাই বসুমতীর দিকেই আশাভরা মন দিয়ে চেয়ে রইলুম। কারণ আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, বসুমতীই বাঙলা সাহিত্যের সকল সমস্যার আজ সমাধান। নমস্কারান্তে—জয়ন্তী ঘোষ ও তপতী সেন, মাদ্রাজ।

মহাশয়,

রচনাসম্ভারে ও সুযোগ্য সম্পাদনায় মাসিক বসুমতী, সাহিত্য জগতে যে শ্রেষ্ঠ স্থান অলঙ্কৃত করে আছে, তা নিঃসন্দেহ এবং বলা বাহুল্য। "চায়না টাউনের" জেনী ওয়াঙ-এর দৃষ্টিভঙ্গী সত্যি অপরূপ! নীলকণ্ঠের "অন্ত ও প্রত্যহ" এক অদ্ভুত সৃষ্টি! "বিবেকানন্দ স্তোত্র" অতুলনীয়। উপন্যাস হিসাবে "এক মুঠো আকাশ"ও প্রশংসার দাবী করতে পারে—যেমন পারে "বাতিঘর"। এক কথায় মাসিক বসুমতীই একমাত্র পত্রিকা, যার প্রতিটি পৃষ্ঠা সাহিত্যপিপাসুদের কাছে সমভাবে সমাদৃত।

৮।৯ বছর আগে আপনার পত্রিকায় শ্রীবারি দেবী রচিত "দরবারী কানাড়া" পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলাম। তারপর তেমন রচনা পাইনি যা তেমনি মনকে নাড়া দিতে পারে। এতদিন পরে শ্রীবাসবী বসু লিখিত "বন্ধনহীন গ্রন্থি" পড়ে বহুদিনের অভাব মিটল। "দরবারী কানাড়া" ভাবপ্রবণতায় ভর্তি কিন্তু "বন্ধনহীন গ্রন্থি" সাহিত্য-জগতে মাসিক বসুমতীর ইতিহাসে এক অপরূপ সৃষ্টি! অজয় ডাক্তারের যে দৃষ্টিভঙ্গী প্রকাশ পেয়েছে তা সত্যি প্রশংসনীয় এবং এই অনবদ্য রচনার জন্য শ্রীযুক্তা বাসবী বসুকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন না জানিয়ে পারছি না। অভিনন্দন জানাই সম্পাদক মহাশয়কেও তাঁর এই নির্বাচনের জন্য।

বর্তমান পৃথিবীতে আমাদের বাংলায় মেয়েদের বাস্তবরূপ ফুটে উঠেছে সুমিতা, চিনু ও কণিকার মধ্যে, আজ তারাই বেশী। পুরুষের মধ্যে বেশীর ভাগ হচ্ছে অসীম, পিনাকী ও বিনোদ ও মিঃ সোম, কিন্তু তারাই সব নয়; তাদের মধ্যে আজও আছে অজয় ডাক্তার, কণিকার মত সমস্যা আজ এতটা প্রকট না হলেও নেহাৎ কম নয়। মানুষের মনের এই emotionকে ক্ষমা করে না আমাদের সামাজিক শিক্ষা। পুরুষের মনে যদিও বা মেনে নেয় অমার্জনীয় অপরাধ হয়ে থাকে মেয়েদের জীবনে। রক্তমাংসে গড়া মানুষ হয়েও এর বিচার হয় না। ক্ষণিক আত্মবিস্মৃতি ও মুহূর্তের ভুলটুকুই চরম অভিশাপ হয়ে থাকে তাদের জীবনে। তাই কী? ক্ষণিকের অপরাধ কি ধূলিসাৎ করে দেবে এতদিনের প্রেম, ভালবাসা ও বিশ্বাসকে? না— অতীত তা অতীত। বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে দিতে হবে প্রাধান্য। পুরুষের যে দৃষ্টিভঙ্গী অজয় ডাক্তারের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে তা অতুলনীয় এবং এর চেয়ে সত্য, এর চেয়ে মহৎ ও বড় আর কিছু নেই। জনমতের উপর সাহিত্যের প্রভাব খুবই বেশী ও কার্য্যকরী। কণিকা ও অজয়ের মত সমস্যার সম্ভাবনা আজ প্রচুর, তাই এর যে সুষ্ঠু সমাধান এঁকে দিয়েছেন, তাতে মনে হয় এই সমস্যা জর্জরিত পুরুষ ও নারী খুঁজে পাবে তাদের সত্যিকারের জীবনযাত্রার পথ। ঘৃণা ও অবহেলার চেয়ে প্রেম বড়। প্রেম দিয়ে যদি অপরাধ না ঢেকে দেওয়া গেল সে প্রেম প্রেম নয়। সে হচ্ছে ধাপ্পাবাজী। প্রতিটি পুরুষের মধ্যে জেগে উঠুক—অজয় ডাক্তার। "Amor vincit omnia" আর একবার ধন্যবাদ জানাই আপনাকে এই অনবদ্য রচনা পরিবেশন করার জন্য।—শ্রীদিলীপকুমার দেব। ঘাটশিলা।

গ্রাহক-গ্রাহিকা হইতে চাই

মাসিক বসুমতীর বার্ষিক মূল্য বাবদ ১৫৲ টাকা পাঠাইলাম। সত্বর পত্রিকা পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।—Miss Sabita Dam, Paltanbazar, Goubati.

মাসিক বসুমতীর এক বছরের টাকা পাঠাইলাম।—নীলিমা মুখোপাধ্যায়, পাটনা।

Please find herewith my subscription towards M. Basumati for the period from Ashar to Agrahayan. Kindly ensure regular delivery of my copy of M. Basumati. Leela Ghose—Jubalpur.

জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা হইতে এক বৎসরের জন্য মাসিক বসুমতীর গ্রাহক করিয়া লইবেন।—Mrs. Lilabati Mookherjee, Kanpur.

এই বর্ষের মাসিক বসুমতীর চাঁদা পাঠাইলাম। বর্ত্তমান বৎসরের প্রথম সংখ্যা হইতে মাসিক বসুমতী পাঠাইবেন।—Sreemati Rekha Banerjee, M. A. Basantpore Colony, Patna.

Remitting Rs. 15/- towards yearly subscription for the Monthly Basumati for the year 1365 B. S.—Hena Dey, Berhampore, W. Bengal.

বার্ষিক চাঁদা ১৫৲ টাকা পাঠাইলাম। নিয়মিত পত্রিকা পাঠাইবেন।—Renuka Chakravorty, Raipur.

আগামী আষাঢ় সংখ্যা হইতে ৬ মাসের চাঁদা পাঠাইলাম। নিয়মিত ভাবে মাসিক বসুমতী পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।—Mrs. Bani Chakravorty, Sabarmati, Ahmedabad.

আগামী শ্রাবণ মাস হইতে মাসিক বসুমতীর গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করি। এই বৎসরের চাঁদা ১৫৲ টাকা পাঠাইলাম।—Rama Das, Bagnapara, Burdwan.

১৫৲৲০ পাঠাইলাম। আমাকে এই শ্রাবণ হইতে বার্ষিক গ্রাহিকা করিয়া লইবেন।—Mrs. Nandita Bose, Sahibgung, S. P.

এই সঙ্গে ৭৷০ পাঠাইলাম। ১৩৬৫ সনের বৈশাখ মাস হইতে মাসিক বসুমতী পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।—Reba Das Gupta, Tatanagar.

Please resume the sending of the Journal from the month of Jaistha—Nilima Bhar—Karol Bagh, New Delhi.

Sending herewith Rs 15/- being my annual subscription for Monthly Basumati. Kindly continue to send the magazine for a further period of one year and oblige.—Mrs. Protima Das, Rajkot.

I am sending herewith the sum of Rs 15/. as my subscription for the year 1365 B. S.—Manoka Sundari Devi, Lalpur, Ranchi.

Rs 51/- being the annual subscription of Monthly Basumati.—Maya Das Gupta Mangaldai, Assam.

Herewith sending Rs 7·50 being my six monthly subscription.—Sulekha Sen, Lake Avenue Road, Calcutta.

মাসিক বসুমতীর বার্ষিক দেয় চাঁদা ১৫৲ টাকা পাঠাইলাম। আশা করি, গত বৈশাখ হইতে আমাকে গ্রাহিকা করিয়া লইবেন।—বীথি বসু, Kalahandi, Orissa.

স্বতন্ত্র ডাকযোগে ছ'মাসের চাঁদা পাঠাচ্ছি। গ্রাহিকা শ্রেণী-ভুক্ত করে নেবেন।—ইন্দ্রাণী সেনগুপ্তা, জলপাইগুড়ি।

বসুমতীর গ্রাহক হতে চাই। পনেরো টাকা পাঠালুম। স্বীকৃতি-পত্র দিয়ে সুখী করবেন।—প্রসাদ মৈত্রেয়, বারাণসী।

আপনাদের মাসিক বসুমতী পত্রিকার গ্রাহিকা হইতে চাই। তজ্জন্য ছয় মাসের চাঁদা অগ্রিম পাঠাইলাম।—নিভাননী কুণ্ডু, বর্দ্ধমান।

আপনার সম্পাদিত মাসিক বসুমতীর নিয়মিত গ্রাহিকা হতে চাই। এক বৎসরের চাঁদা হিসেবে পনেরো টাকা পাঠালুম।—কল্যাণী মহলানবীশ, রাণাঘাট।

মাসিক বসুমতীর গ্রাহিকা হতে ইচ্ছা করি। পনেরো টাকা মণিঅর্ডারে পাঠাচ্ছি। গ্রাহিকা করে নেবেন।—রত্না ঘোষ, এলাহাবাদ।

আপনাদের মাসিক পত্রিকার গ্রাহক হইবার সৌভাগ্যলাভ করিলে আনন্দিত হইব। মহাশয়ের নামে তজ্জন্য পঞ্চদশ মুদ্রা এক বৎসরের চাঁদা হিসাবে মণি অর্ডার যোগে পাঠান হইল।—গোপালচন্দ্র হালদার, লক্ষ্ণৌ।

বসুমতীর গ্রাহিকা হতে চাই। এক বছরের চাঁদা আলাদা ডাকযোগে আপনার নামে এই সঙ্গে পাঠালুম।—সুমিতা বন্দোপাধ্যায়, জব্বলপুর।

ন্যুড
—বার্ণাড মেনিনিস্কি অঙ্কিত

পূর্ণিমা
—চিরোসিগি অঙ্কিত

নার ফল
-র‍্যাফায়েল অঙ্কিত

সে
—হেনরী মাতিস অঙ্কিত

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত
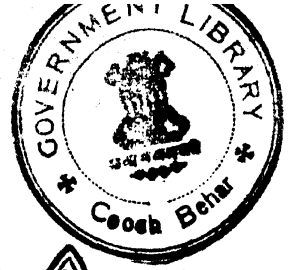
মাসিক বসুমতী

৩৭শ বর্ষ—ভাদ্র, ১৩৬৫] ॥ স্থাপিত ১৩২৯ ॥ [প্রথম খণ্ড, ৫ম সংখ্যা

কথামৃত

ব্রাহ্মণীর ও সব ঝঞ্ঝাট তো নাই—কাজেই প্রথম দর্শনের অল্প দিন পরে জপ করিতে করিতে ঠাকুরের নিকট আসিবার ইচ্ছা হইবামাত্র দুই-তিন পয়সার দেদো সন্দেশ কিনিয়া লইয়া দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত। ঠাকুর তাঁহাকে দেখিবামাত্র বলিয়া উঠিলেন—“এসেছ—আমার জন্য কি এনেছ দাও।” গোপালের মা বলেন, “আমি তো একেবারে ভেবে অজ্ঞান, কেমন ক'রে সে 'রোঘো' (খাবাপ) সন্দেশ বার করি—এঁকে কত লোকে কত কি ভাল ভাল জিনিস এনে খাওয়াচ্চে—আবার তাই ছাই কি আমি আসবামাত্র খেতে চাওয়া!” ভয়ে, লজ্জায় কিছু না বলিতে পারিয়া সেই সন্দেশগুলি বাহির করিয়া দিলেন। ঠাকুরও উহা মহা আনন্দ করিয়া খাইতে খাইতে বলিতে লাগিলেন, “তুমি পয়সা খরচ ক'রে সন্দেশ আনো কেন? নারিকেল নাড়ু ক'রে রাখবে, তাই দুটো-একটা আসবার সময় আনবে। না হয়, যা তুমি নিজের হাতে রাঁধবে, লাউশাক চচ্চড়ি, আলু-বেগুন-বড়ি দিয়ে সজনেখাড়ার তরকারী—তাই নিয়ে আসবে। তোমার হাতের রান্না খেতে বড় সাধ হয়।”

গোপালের মা বলেন, “ধর্ম্মকর্ম্মের কথা দূরে গেল, এইরূপে কেবল খাবার কথাই হ'তে লাগলো। আমি ভাবতে লাগলুম, ভাল সাধু দেখতে এসেছি—কেবল খাই খাই, কেবল খাই খাই; আমি গরীব কাঙ্গাল লোক—কোথায় এত খাওয়াতে পাব? দূর হোক্, আর আসবো না। কিন্তু যাবার সময় দক্ষিণেশ্বরের বাগানের চৌকাঠ যেমন পেরিয়েচি, অমনি যেন পেছন থেকে তিনি টানতে লাগলেন। কোনমতে এগুতে আর পারি না! কত কোরে মনকে বুঝিয়ে টেনে-হিঁচড়ে তবে কামারহাটি ফিরি!” ইহার কয়েক দিন পরেই আবার 'কামারহাটির ব্রাহ্মণী' চচ্চড়ি হাতে করিয়া তিন মাইল হাঁটিয়া পরমহংসদেবের দর্শনে উপস্থিত। ঠাকুরও পূর্ব্বের ন্যায় আসিবামাত্র উহা চাহিয়া খাইয়া “আহা কি রান্না, যেন সুধা, সুধা” বলিয়া আনন্দ করিতে লাগিলেন। গোপালের মা'র সে আনন্দ দেখিয়া চোখে জল আসিল। ভাবিলেন, তিনি গরীব কাঙ্গাল বলিয়া তাঁহার এই সামান্য জিনিসের ঠাকুর এত বড়াই করিতেছেন।

ভোল্‌গা থেকে গঙ্গার ঐতিহাসিক পর্যালোচনা

শ্রীসাতকড়ি মুখোপাধ্যায়

ভারতবর্ষ অতি প্রাচীন কাল হতেই এক সভ্য দেশ। অন্যান্য দেশের মতই এদেশেরও সভ্যতা মানব-সমাজের বিভিন্ন বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে গড়ে উঠেছে। এই সভ্যতার বিভিন্ন ধারা বিভিন্ন যুগে পুষ্টিলাভ করেছে। গবেষক পণ্ডিতমণ্ডলীর সাধনায় সেই অতীত ইতিহাস অনেকাংশে আত্মপ্রকাশ করেছে, আবার, ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাসের অনেকাংশে এখনও অজ্ঞাত রয়েছে। বর্তমান ইতিহাসের গণ্ডী যতদূর অতীত পর্যন্ত বিস্তৃত, ততদূরের ইতিহাস আলোচনা করলে ভারতীয় সভ্যতার প্রাক্‌আর্য, আর্যবৈদিক, বৌদ্ধ প্রভৃতি ধারার পরিচয় পাওয়া যায়। বিভিন্ন ধারায় বিভক্ত ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস অবশ্য অতি আধুনিক কালে লিখিত হয়েছে, তাও অধিকাংশই বিদেশী পণ্ডিতদের চেষ্টায়। বহু স্থানে বিরূপ মতামত প্রকাশ করলেও প্রাচীন ভারতীয় আর্য (হিন্দু ও বৌদ্ধ দুই-ই) সংস্কৃতির মূল্য ও উৎকর্ষ পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণও স্বীকার করেছেন।

বিদেশী পণ্ডিতেরা কখনও ভ্রমপ্রমাদ বশতঃ কখনও স্বাজাত্যাভিমানে এই সভ্যতার ইতিহাস রচনা ও তার মূল্য নিরূপণে গ্রহণের অযোগ্য মত প্রকাশ করেছেন। ভারতীয় পণ্ডিতগণেরও যে ভুল হয় নি তা নয়, কিন্তু যদি এই বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগেও দেখি এক অশেষ বিদ্যানিষ্ণাত ভারত-সন্তান কোন পাশ্চাত্ত্য সমাজবিজ্ঞানের তত্ত্বকে প্রমাণিত করবার উদ্দেশ্যে ঐ তিন ধারার অন্যতম বৈদিক আর্য (বা হিন্দু) ধারার ধর্ম, দর্শন সাহিত্য প্রভৃতির সাক্ষ্যকে বিকৃত করছেন এবং তাদের প্রবর্তক আচার্য ও গ্রন্থকারগণের চরিত্রে অকারণ কুৎসিত কলঙ্ক লেপন করেছেন, তখন আমাদের ক্ষোভের সীমা থাকে না। যদি কোনও মনীষীর সমাজবিজ্ঞানের তত্ত্ব সত্য হয় তবে তার উদাহরণ ইতিহাসে স্বভাবতঃই পাওয়া যাবে কিন্তু তাকে প্রমাণিত করবার জন্য ইতিহাসকে বিকৃত করতে বা কোনও কবি দার্শনিক বা মহাপুরুষের চরিত্রকে মসীলিপ্ত করতে হবে কেন? মহাপণ্ডিত রাহুল-সাংকৃত্যায়ন এইরূপ নিন্দিত কর্মে আত্মনিয়োগ করেছেন।

সংশ্লিষ্ট সকলেই জানেন, পণ্ডিত রাহুল-সাংকৃত্যায়ন বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। পরে তিনি মার্ক্সীয় বস্তুবাদে সম্যক আকৃষ্ট হয়ে তারই আলোচনা ও প্রচারে নিযুক্ত আছেন। হিন্দী সাহিত্যের তিনি একজন প্রসিদ্ধ লেখক ও নিপুণ সমালোচক, সমাজবিজ্ঞানিরূপেও তিনি সমধিক খ্যাত, তাঁর অধিকাংশ গ্রন্থই হিন্দী ভাষায় রচিত। তাঁর "বোল্‌গা সে গঙ্গা" "বৈজ্ঞানিক ভৌতিকবাদ" "মানব-সমাজ" "দর্শন" "দিগ্‌দর্শন" প্রভৃতি গ্রন্থগুলি ইতিমধ্যে প্রচারলাভ করেছে। মার্ক্সবাদের প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে এগুলিরও প্রচার অনিবার্য। মার্ক্সবাদ ও বৌদ্ধ ধর্ম সম্বন্ধে কোনও বিরূপতা প্রদর্শন করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, বৌদ্ধ ধর্মের যা কিছু উৎকর্ষ তাকে উদারভাবে গ্রহণ করবার জন্য আমরা (হিন্দুরা) চিরকালই প্রস্তুত। ভগবান বুদ্ধ অবতার হিসাবে আমাদের পূজ্য। আর মার্ক্সবাদ সম্বন্ধে, বর্তমান নিবন্ধকারের কোনও মতামত প্রকাশ করবার নেই। এই মতবাদ কল্যাণকর ও সত্য কিনা তন্মতাবলম্বী এতদ্দেশীয়দের আচরণ ও সাফল্য ভবিষ্যতে তা প্রমাণ করবে। কিন্তু সেই মতের প্রতিষ্ঠার জন্য রাহুলকে হিন্দু-বৈদিক ভারতের ইতিহাস ও লিখিত গ্রন্থের সাক্ষ্য কেন বিকৃত করতে হল সুধিগণই তা' বিচার করবেন।

বর্তমান নিবন্ধে আমরা মুখ্যতঃ রাহুলের "বোলগা সে গঙ্গার"ই আলোচনা করবো। উক্ত গ্রন্থের এলাহাবাদ হতে প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণই আমাদের অবলম্বন। উক্ত গ্রন্থের সুধীর দাশ ও অসিত সেন কৃত বাঙলা অনুবাদও (৩য় সং) আমাদের হাতে এসেছে। 'স্বাধীনতা' কার্যালয়ের শ্রীযুক্ত মহাদেব সাহা মহোদয় এই অনুবাদ-গ্রন্থের ভূমিকা লিখে দিয়েছেন। পাঠকবর্গের নিকট অনুরোধ, তাঁরা যেন উক্ত ভূমিকা মনোযোগ সহকারে পাঠ করেন এবং আমাদের মতে বা কথায় সম্প্রতি বিশ্বাস না করে প্রতিটি উদ্ধৃতি নির্দেশিত মূল গ্রন্থ সমূহের সঙ্গে মিলিয়ে প্রকৃত তথ্য আহরণ করেন।

বিশেষ মজার ব্যাপার এই যে, রাহুল স্বয়ং তাঁর দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় লিখেছেন,—"লেখককী এক এক কহানীকে পীছে উস যুগকে সংবন্ধকী বহ (?) ভারী সামগ্রী হৈ ; জো দুনীয়া কী কীতনী হী ভাষায়োঁ, তুলনাত্মক ভাষাবিজ্ঞান, মিট্টী, পাথর, তাঁবে, পিতল, লোহে পর সাঙ্কেতিক লিখিত সাহিত্য অথবা অলিখিত গীতোঁ, কহানীয়োঁ, রীতি রিবাজোঁ টোটকে টোনেমে পাই জাতী হৈ।"

আর অনুবাদের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত সাহা মহোদয় লিখছেন :—

"...হয়ত একথা সত্য যে, রাহুলের নির্দ্ধারিত মতামত কোনও ক্ষেত্রে এখনও স্বীকৃতির অপেক্ষা রাখে এবং প্রকৃত পক্ষে ভূমিকা-লেখকও বহুতর ক্ষেত্রে রাহুলের মতামতকে সম্পূর্ণতঃ স্বীকার করে না—বহু স্থানে ইতিহাসের ইঙ্গিত মাত্র আশ্রয় করে রাহুল কাহিনীতে যে গাঢ় বর্ণলেপ দিয়েছেন, তাও হয়তো সর্ব্বত্র যথাযথ না হয়ে থাকতে পারে ; কিন্তু শুধু তারই জন্য যে উপায়ে এবং যে দৃষ্টি নিয়ে রাহুল এই সুদীর্ঘ প্রাগৈতিহাসিক অধ্যয়ন করেছেন তার মূল্য তুচ্ছ হতে পারে না। এই দুই উক্তির বৈপরীত্য অবশ্যই লক্ষ্য করবার মত।"

মূল গ্রন্থে রাহুল বিভিন্ন আখ্যানের মধ্য দিয়ে সমাজ বিবর্তনের মার্ক্স ও এঙ্গেলস সম্মত ধারাগুলি দেখাতে চেয়েছেন। ঐ সকল উপাখ্যানের সূত্র হিসাবে প্রথম পর্যায়ের কাহিনীগুলির জন্য তাঁর নিছক কল্পনাই সম্বল,—এ কথা ভূমিকালেখক স্পষ্টতঃ স্বীকার করেছেন। 'ভোলগা সে গঙ্গার' প্রথম কয়েকটি কাহিনীতে বাস্তব তথ্য প্রমাণে স্বাভাবিক অপ্রতুলতা রয়েছে। কিন্তু অন্য কাহিনীগুলির ভিত্তি কি, তা' রাহুল স্বয়ং না বললেও তাঁর বন্ধু সুবিজ্ঞ শ্রীযুক্ত সাহা মহাশয় নিম্নলিখিতরূপে, রাহুলের রচিত উপাখ্যান সমূহের আধার নির্দেশ করেছেন :—

উপাখ্যান	আধার
১। পুরুধান হতে প্রবাহণ	১। বেদ, ব্রাহ্মণ, মহাভারত, পুরাণ এবং বৌদ্ধভাষ্য।
২। সুদাস	২। ঋগ্‌বেদ।
৩। প্রবাহণ	৩। ছান্দোগ্য,বৃহদারণ্যক,উপনিষদ ও বৌদ্ধ অট্‌ঠকথা।
৪। সুপর্ণ যৌধেয়	৪। গুপ্ত পুরালেখ, রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, অভিজ্ঞানশকুন্তলম্, ফাহিয়ানের বিবরণ।
৫। দুর্মুখ	৫। হর্ষচরিত, কাদম্বরী, হিউ-এন-সাঙ এবং ইংসিং।
৬। চক্রপাণি	৬। নৈষধ, খণ্ডনখণ্ডখাদ্য, বস্তুলেখমালা।

রাহুল যত জোরের সঙ্গেই বলুন—তাঁর হাতে প্রতিটি কাহিনীর প্রচুর প্রমাণ (ভারী সামগ্রী) আছে,—তাঁর সে বাহ্বাস্ফোট যে নিষ্ফল তা' শ্রীযুক্ত মহাদেব সাহার ভূমিকা পাঠেই জানা যাবে। আসলে, মার্ক্সবাদের তথা পাশ্চাত্য সমাজ-বিজ্ঞানীদের মতবাদে অন্ধ বিশ্বাসী রাহুল স্বকপোল-কল্পনাকে একমাত্র পাথেয় করে ইতিহাস-বিকৃতির ঘৃণ্যপথে পা দিয়েছেন। প্রথম পর্য্যায়ের কাহিনীগুলোর ঐতিহাসিক অপ্রতুলতা শ্রীযুক্ত সাহা অনুবাদের ভূমিকায় স্বীকারই করেছেন। পরবর্ত্তী কাহিনীগুলোর অধিকাংশ স্থানেই রাহুল মতবাদের যুপকাষ্ঠে প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্য তথা ভারতের বরণীয় সন্তানদের যশকে বলি দেওয়ার হীন চেষ্টা করেছেন। আর তার ছত্রে ছত্রে প্রকাশিত হয়েছে এই ধর্মত্যাগী ব্রাহ্মণ-সন্তানের ব্রাহ্মণ্যদ্বেষ তথা হিন্দুদ্বেষ; শুধু ব্রাহ্মণ হওয়ার অপরাধে যাজ্ঞবল্ক্য থেকে কালিদাস পর্য্যন্ত কেউ বাদ পড়েননি এবং হিন্দু হওয়ার অপরাধে বিক্রমাদিত্য ও শ্রীহর্ষ প্রভৃতি কারও প্রকৃত ইতিহাস তাঁর হাতে বিকৃত হওয়া থেকে অব্যাহতি পায়নি। আর এর মধ্যে কাজ করেছে চরম পরমতসহিষ্ণুতা এবং পরমতকে বিচার না করেই জঘন্যভাবে আক্রমণের ঘৃণ্য প্রবৃত্তি।

পরম পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মহাদেব সাহা মহাশয় ভূমিকা লিখে এই মিথ্যাচারকে লোকচক্ষে গোঁজামিল দিতে চেয়েছেন—আর সুযোগ্য অনুবাদকদ্বয় শ্রীসুধীর দাশ ও শ্রীঅসিত সেনের পাণ্ডিত্যের আর কি প্রশংসা করব? তাঁদের উল্লিখিত মূল গ্রন্থগুলির সাথে পরিচয় বেশ দৃঢ় নয় বলে মনে হয়। কারণ মূল হিন্দীর বর্ণাশুদ্ধিগুলি পর্য্যন্ত অনুবাদেও অক্ষরান্তরীকরণে (Transliteration) হুবহু নকল করে গেছেন। তাঁদের বাংলা ভাষা জ্ঞানের প্রশংসা না করে থাকতে পারি না। সারা বইটিতে 'সত্তা' পদটি কোথাও শুদ্ধভাবে মুদ্রিত নেই (এটা নিশ্চয়ই মুদ্রাকর প্রমাদ নয়) আর "বাল্মীকির"ই বা কি দুরবস্থা !

'সুদাস' তো সম্পূর্ণ ঋগবেদের উপর নির্ভর করে লেখা। ঐ কাহিনীর শেষ পাতার পাদটীকা—"য়হ আজসে ১৪৪ পীঢ়ী পহলেকে সর্বজনকে কহানী হৈ। ই'সী সময় পুরাতনতম ঋষি বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, ভরদ্বাজ ঋগবেদকে মন্ত্রোঁকী রচনা কর রহে থে, ইসী সময় আর্য পুরোহিতোঁকী সহায়তাসে কুরু পঞ্চালকে আর্য সামন্তোঁনে জনতাকে অধিকার পর অন্তিম ঔর সবসে জবর্দস্ত প্রহার কিয়া।"—(পৃঃ মূলহিন্দী ১১৭)।

অনুবাদ—"১৪৪ পুরুষ আগেকার কাহিনী এই সময় আদি ঋষিরা বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র ও ভরদ্বাজ ঋগবেদের শ্লোকসমূহ রচনা করেছিলেন।" ইত্যাদি (পৃঃ ৯৭)।

আমাদের বিনীত জিজ্ঞাস্য, ঋগবেদটি কি তাহলে কেবল বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র ও ভরদ্বাজ এই তিনজনের রচনা? মধুচ্ছন্দাঃ মেধাতিথি, শুনঃশেফ প্রভৃতি শতর্চী ঋষিগণ বাদ পড়লেন কেন? সম্ভবতঃ (৫।৬টি) দানস্তুত্যাত্মক ঋক্ যা বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র ও ভরদ্বাজের রচনা, তাকেই চাটুকারিতারূপে অত্যুক্তিপূর্ণ বর্ণনা করে সম্পূর্ণ ঋগবেদকে "পেটের দায়ে" (মূল পৃঃ ১২৯, অনুবাদ পৃঃ ১০৭) রচনা বলে প্রমাণের জন্য। অন্যান্য শত শত ঋক ও অসংখ্য ঋষি সম্বন্ধে তো সে অভিযোগ আনা যাবে না। কাজেই ঋগ্বেদকর্তৃত্ব তিনজনের উপর অর্পিত হল। কৌতূহলী পাঠক, ঋগবেদের অসংখ্য ঋষির বিবরণ শৌনকের প্রামাণ্য বৃহদ্দেবতা নামক গ্রন্থে দেখতে পাবেন।

রাহুল, প্রবাহণ নামক আখ্যানে লিখেছেন—বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্রও পেটের দায়ে বেদ রচনা করেছিল। প্রমাণ?—উত্তর-পাঞ্চাল রাজা দিবোদাসের "শবরদুর্গ" অধিকারের পর কবিতার পর কবিতা রচিত হ'য়েছিল··ইত্যাদি (পৃঃ—১০৭)। মজার ব্যাপার হ'ল, এই ব'লে তিনি ঋগবেদের ৬ষ্ঠ মণ্ডলের ২৬ সূক্তের ৫ম ঋক্‌টি উদ্ধৃত করেছেন—মূল ঋক্‌টি হচ্ছে এই—

> ত্বং তদুক্থমিন্দ্র বর্হণাকঃ
> প্রযচ্ছতা সহস্রা শূরদর্ষি।
> অবগিরের্দাসং শম্বরং হন্ প্রাবো
> দিবোদাসং চিত্রাভিরূতী॥

এর ভাষ্যে সায়ণাচার্য অন্বয় করেছেন,—হে ইন্দ্র, বর্হণা ত্বম্ উক্থং তৎ কঃ। হে শূর শতা সহস্রা প্রদর্ষি, দাসং গিরেঃ শম্বরং অবহন্। চিত্রাভিঃ উতীদিবোদাসং প্রাবঃ।

সায়ণভাষ্য অনুসারে এর এই অর্থ হয়···"হে ইন্দ্র শত্রুহন্তা তুমি সেই প্রশস্ত অর্থাৎ মহৎ কর্ম নিষ্পন্ন করিয়াছ। হে বীরেন্দ্র! শম্বরাসুরের শত সহস্র অনুচরকে বিদারিত করিয়াছ অর্থাৎ নিহত করিয়াছ। তুমি যাগযজ্ঞের অপহন্তা শম্বরকে পর্বত হইতে (অবতরণ করিবার কালে) হত্যা করিয়াছ—এবং নানাবিধ উপায়ে দিবোদাসকে রক্ষা করিয়াছ।" এই ঋকে Griffith কৃত অনুবাদ দেওয়া গেল,

"[God = Indra] Thou madest good the laud, what time there rentest a hundred and thousand fighting foes; O Hero, thou) slewest the Dāsa SAMBARA of mountain, and with strange aids succour Divodâsa."

ইহা স্পষ্টই বোঝা যায়, এই ঋকের দেবতা স্বয়ং ইন্দ্র। অল্প শক্তিবিশিষ্ট দিবোদাস ইন্দ্রের শক্তিতে রক্ষিত মাত্র। এটা কি দিবোদাসের প্রশংসার প্রমাণ? শবরদুর্গ জয়ের কথা এ ঋকে এল কোথা থেকে? ঋকে ত' স্পষ্ট লেখা আছে "দাসং শম্বরম্"। 'শম্বর' ও শবরদুর্গ কি এক কথা? এ যেন 'বর' আর 'বরকন্দাজ' একই কথার মত (সুকুমার রায়)। আশা করি, পণ্ডিত সাংকৃত্যায়ন, শ্রীযুক্ত সাহা মহোদয় ও অনুবাদকদ্বয় এই প্রশ্নের

উত্তর দেবেন। রাহুলের মূল গ্রন্থে (হিন্দী সং পৃঃ ১২৯) ছাপার ভুলে 'সহস্রা' স্থলে 'সহসা' 'প্রাবো' স্থানে 'প্রাবী' এবং ঋক্ সংখ্যা '৬।২৬।৫' স্থানে ৬।২৬।২৫ ছাপা ছিল; অনুবাদেও হুবহু সেই ভুল অক্ষরান্তরিত করা হয়েছে। পণ্ডিত রাহুল প্রভৃতি 'শবরদুর্গ' জয়ের প্রশংসাত্মক কয়েকটি কবিতা উদ্ধৃত করে দেখাবেন কি? সুদাস ও দিবোদাস এর আখ্যান অবলম্বন ক'রে রাহুল ত' বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র ও ভরদ্বাজকে অন্নপ্রার্থী চাটুকার সাজিয়ে সম্পূর্ণ ঋগ্বেদকে অন্নকষ্ট-প্রসূত বলে বর্ণনা করে থিওরী রক্ষা করলেন। কিন্তু সমগ্র ঋগবেদ কি রাজার স্তুতিতেই ভরা না তাতে আর কিছু আছে? অবশ্যই স্বীকার করতে হবে ৬,১৬,৫।৬,৪৭,২২ প্রভৃতি ঋকে দিবোদাস ও ও সুদাসের দানস্তুতি আছে। কিন্তু বিপুল ঋগবেদের মধ্যে তা নগণ্য মাত্র। প্রবন্ধ বিস্তৃত হয়ে পড়ে নইলে দেখাতাম যে ঋগ্বেদের ১৭।১৮ স্থানে যে দিবোদাসের নাম উল্লিখিত আছে, অধিকাংশ স্থানেই তিনি রক্ষিত ও ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতা তাদের রক্ষক, তিনি পলায়মান এমন বর্ণনাও আছে। আশা করি এগুলি স্তুতি নয়। একাধিক স্থানে দিবোদাসের রক্ষার জন্য ইন্দ্র কর্ত্তৃক সদলে ও সবংশে শম্বরাসুর (শবরদুর্গ নহে) হত্যার বিবরণ আছে। সেগুলি ইন্দ্রস্তুতি মাত্র এবং মনে হয় ঋষিরা ঐসকল ঋকে বহু পূর্ববর্তী ঐতিহ্যের (কিংবদন্তীর) উল্লেখমাত্র করেছেন; নগদ লাভের আশায় সমসাময়িক বর্ণনা করেন নাই। ২।৩ স্থানের দানস্তুতি অবশ্যই স্বীকার করা যায়—তাই বলে অসংখ্য ঋষিদৃষ্ট ঋগবেদকে উদরান্ন লাভেচ্ছুদের রচিত রাজস্তুতি বলা সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা ও রাজনৈতিক অন্ধতা মাত্র।

একথা সকলেরই জানা আছে যে, উপনিষদই ভারতীয় সকল দর্শনের বীজস্বরূপ। উপনিষদেই ব্রহ্মতত্ত্ব প্রথম সুস্পষ্ট ও সুসংবদ্ধ ভাবে আখ্যায়িকার সাহায্যে বিবৃত ও আলোচিত হয়েছে। বৌদ্ধ ও অনাত্মবাদী রাহুল এই ঔপনিষদিক ব্রহ্মবাদকে মোটেই সুনজরে দেখতে পারেন না। যে কোনও দর্শনে বিশ্বাস ও তার প্রচার করবার অধিকার অবশ্যই প্রত্যেকের আছে। তেমনি, যুক্তি সহায়ে কোনও দার্শনিক মতবাদকে খণ্ডনের অধিকারও সকলেরই আছে। রাহুলের শক্তি থাকলে তিনি যুক্তি-তর্কের সাহায্যে উপনিষদের মতবাদ খণ্ডন করতে পারেন কিন্তু রাহুলের মত পণ্ডিত সে পথে না হেঁটে উপনিষদের ব্রহ্মবাদের আচার্য্যদের চরিত্রকে অযথা আক্রমণ করে তাঁদের পবিত্র নামে অকারণ কলঙ্ক আরোপের ঘৃণ্য পন্থা অনুসরণ করেছেন 'প্রবাহণ' নামক আখ্যায়িকায়। অনুবাদের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত সাহা মহোদয় তো বললেন 'প্রবাহণের' আধার 'ছান্দোগ্য' ও বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ও তার সঙ্গে "অথথো (অটঠকথা)।" আমরা শুনেছি খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীতে বৌদ্ধ আচার্য পূজ্যপাদ বুদ্ধ ঘোষ সিংহলীগ্রন্থ আশ্রয়ে পালি ত্রিপিটকগ্রন্থের "অথকথা (অট্‌ঠকথা?) নামক টীকা-গ্রন্থ রচনা করেন। শ্রীযুক্ত সাহার মতে উহা যদি প্রবাহণের আধার হয়, তবে বলতে হয়, খৃষ্টপূর্ব ৭০০ অব্দের (রাহুলের মতে) আখ্যান রচনায় ৫ম খৃষ্টশতাব্দীর রচনা 'অথকথা' কিরূপে আধার হতে পারে? অথকথায় প্রবাহণ যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতির যদি কোনও উল্লেখ বা বিবরণ থাকে, সমসাময়িক কোনও সমর্থক তথ্য (corroborative evidence) না পেলে তার কোনও মূল্য নাই। এখন দেখা যাক, 'ছান্দোগ্য' ও বৃহদারণ্যক উপনিষদের সাক্ষ্য-প্রমাণ রাহুল কিরূপ ঐতিহাসিকতার সঙ্গে ব্যবহার করেছেন।

"প্রবাহণ" উপাখ্যানে তিনি প্রতিপাদন করতে চেয়েছেন রাজা প্রবাহণ শোষিত প্রজাকুলকে অন্ধকারে রেখে কায়েমী স্বার্থ বজায় রাখতে ব্রহ্মবাদ ও পুনর্জন্মবাদের কল্পনা করলেন। কিন্তু ব্রহ্মবাদ তথা অধ্যাত্মবিদ্যা যে ঋক্ সংহিতার মধ্যে সুস্পষ্টরূপে বিদ্যমান, তা ভারত-বিখ্যাত দার্শনিক পূজ্যপাদ ম, ম, যোগেন্দ্র সাংখ্যবেদান্ততীর্থ মহাশয় তাঁর 'ভারতীয় দর্শনের সমন্বয়' প্রবন্ধে নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রমাণ করেছেন। তদ্ভিন্ন ছান্দোগ্য-উপনিষদে প্রবাহণের নাম যেখানে সর্বপ্রথম উল্লিখিত হ'য়েছে, সেখানে প্রবাহণের সহিত ব্রহ্মবিদ্যায় পারদর্শী আরও দুজনের নাম উল্লিখিত হয়েছে। যথা—

ত্রয়ো হ উদ্‌গীথে কুশলা বভূবুঃ, শিলকঃ শালাবত্য—
চৈকিতায়নো দাল্‌ভ্যঃ প্রবাহণো জৈবলিরিতি (১।৮।১)

অর্থাৎ "শলাবৎ-পুত্র শিলক, দল্‌ভ্যগোত্রীয় চৈকিতায়ন এবং জীবলতনয় প্রবাহণ—এই তিন জন পুরাকালে উদ্‌গীথজ্ঞানে পারদর্শী হইয়াছিলেন।" (অনুবাদ উদ্বোধন সং)। প্রবাহণ অপর দুই জনকে 'ব্রাহ্মণ' বলিয়া সম্ভাষণ করায় স্বামী গম্ভীরানন্দ (অনুবাদক—উদ্বোধন সং) প্রভৃতি মনে করেন, 'প্রবাহণ' স্বয়ংই ক্ষত্রিয় ছিলেন। এই অনুমান সত্য না-ও হ'তে পারে, কারণ ব্রাহ্মণেও ত' অনেক সময় স্বজাতীয় ব্যক্তিকে ব্রাহ্মণ বলে সম্বোধন করতে পারে। আর যদি তিনি ক্ষত্রিয়ই হন, ক্ষত্রিয় হ'লেই ত রাজা হয় না? (লক্ষ্যণীয় যে গার্গী ব্রাহ্মণ-কন্যা হয়েও ব্রাহ্মণগণকে 'ভগবন্তো ব্রাহ্মণাঃ' এই বলে সম্ভাষণ করছেন)

প্রবাহণ চরিত্রে যে ভোগলোলুপতা স্বার্থপরতা আরোপিত হয়েছে আলোচ্যমান আখ্যানে, (মূল পৃঃ ১২৯-১৩৩) তাই বা কোন্ উপনিষদে আছে? সুপণ্ডিত গ্রন্থকার, অনুবাদকদ্বয় ও ভূমিকা-লেখকের উত্তর শোনার জন্য আমরা উদ্‌গ্রীব রইলাম।

কিন্তু এই ত' কলির সন্ধ্যা; শ্রীযুক্ত রাহুল বিদ্যা, বিচারশক্তি ও সত্যনিষ্ঠার পরাকাষ্ঠা দেখালেন 'প্রবাহণ' শীর্ষক উপাখ্যানের তৃতীয় অংশে, যেখানে যাজ্ঞবল্ক্য বেচারার স্কন্ধে চরম চরিত্রগ্লানির বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হোল। বৃহদারণ্যক উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ের গার্গী-যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদ আশা করি সকলেরই জানা আছে। সেই আখ্যায়িকাকে রাহুল চূড়ান্ত ভাবে বিকৃত করে পরমতসহিষ্ণু ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। প্রথম অংশে (পৃঃ মূল ১৩০, অনুবাদ ১০৮) লিখলেন, "..রাজাদের অন্তঃপুরে প্রতিপালিত দাসীদের ব্রহ্মবাদীরা বেশী পছন্দ করত। এই উক্তির স্বপক্ষে কিছু নির্ভরযোগ্য তথ্যপ্রমাণ (ভারী সামগ্রী) রাহুলজী উপস্থাপিত করুন।

এই শেষ নয়। জনক-সভায় যাজ্ঞবল্ক্যের কাহিনী বিবৃত করতে গিয়ে লেখা হল—যাজ্ঞবল্ক্য অনেকগুলি পরিষদে বিজয়ী হয়েছে। এবার সে বিদেহ (তিহুর্ত) এর জনক পরিষদে খুব বড় রকমের একটা বিজয়লাভ করল, এবং তার শিষ্য সোমশ্রবা হাজার গরু তাকে দান করল। বিদেহ থেকে আরম্ভ করে কুরু পর্যন্ত সেই গরুগুলিকে হাঁকিয়ে আনার কষ্ট কেন স্বীকার করবে? সেগুলিকে ব্রাহ্মণদের মধ্যে ভাগ করে দিল। এজন্য তার যথেষ্ট খ্যাতি হ'ল। হীরে, মুক্ত সোনা দাসদাসী অশ্বরথ এ সমস্ত অবশ্যই সে নিজের সঙ্গে নৌকো ভরে কুরুদেশে নিয়ে এসেছিল। (পৃঃ মূল ১৩০, অনুবাদ ১০৮) স্থানান্তরে (মূল পৃঃ ১৩৪ অনুবাদ পৃঃ ১১১) বলা হল, "পরিষদ

বিজয়লাভ করে যাজ্ঞবল্ক্য যে সমস্ত গাভী পেয়েছিল তা দান করে—বিদেহ রাজার কাছ থেকে পাওয়া সুন্দরী দাসীদের অন্তঃপুরে নিয়ে এসেছিল।" যাঁরা বৃহদারণ্যক উপনিষদ পড়েছেন তাঁদের কাছে এই-ই যথেষ্ট। যাঁরা পড়েননি তাঁদের জন্য একটু বিশ্লেষণ করা যাক। বৃহদারণ্যক উপনিষদে (৩।১।১) আছে "ওঁ জনকো হ বৈদেহো বহুদক্ষিণেন যজ্ঞেনেজে, তত্র হ কুরু পাঞ্চালানাং ব্রাহ্মণা অভিসমেতা বভূবুঃ, তস্য হ জনকস্য বৈদেহস্য বিজিজ্ঞাসা বভূব, কঃস্বিদেষা মনূচানতম ইতি। স হ গবাং সহস্রমবরুরোধ দশ দশপাদা একৈকস্যাঃ শৃঙ্গয়োরাবদ্ধা বভূব।" অর্থাৎ 'পুরাকালে বিদেহাধিপতি মহারাজ জনক 'বহুদক্ষিণ' যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, সেই যজ্ঞক্ষেত্রে কুরুদেশীয় ও পঞ্চালদেশীয় ব্রাহ্মণগণ সমবেত হইয়াছিলেন। সেই বিদেহাধিপতি জনকের হৃদয়ে বিশেষ জিজ্ঞাসার উদয় হইয়াছিল—তিনি জানিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন যে এই ব্রাহ্মণগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবিৎ ব্রাহ্মণ কে? তিনি (এই উদ্দেশ্যে) সহস্র গাভী পৃথক করিয়া রাখিয়াছিলেন, এবং প্রত্যেক গো'র শৃঙ্গদ্বয়ে দশদশপাদ সুবর্ণ বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। (দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থের অনুবাদ)। জনকের আহ্বানে যখন কোনও ব্রাহ্মণই অগ্রসর হলেন না, তখন—"যাজ্ঞবল্ক্য স্বমেব ব্রহ্মচারিণমুবাচৈতাঃ সোম্যোদজ সামশ্রবাত ইতি, তা হোদাচকার।" (৩।১।২) অর্থাৎ "অতঃপর যাজ্ঞবল্ক্য নামক ঋষি নিজের ব্রহ্মচারীকেই বলিলেন—'হে সৌম্য সামশ্রবা, (সোমশ্রবা নহে; মূলহিন্দীতে সম্ভবতঃ বর্ণশুদ্ধি আছে অথবা রাহুল অনবধানতা বশতঃ সোম্য সামশ্রবাকে সোমশ্রবা লিখেছেন—আর সুযোগ্য অনুবাদকদ্বয় তাঁদের অনুবাদক নাম সার্থক করেছেন) তুমি এইগুলি হইয়া যাও, ব্রহ্মচারী সেই গরুগুলিকে লইয়া চলিলেন।" (দুঃ সাঃ অনুবাদ)

এখন পাঠকগণ বিচার করুন গরুগুলির দাতা কে? শিষ্য সামশ্রবা না রাজর্ষি জনক? সামশ্রবা তখন আশ্রমবাসী ব্রহ্মচারী মাত্র, তিনি সহস্র গরু দান করতে পেলেন কোথায়? যাই হোক, তিনি ত গরুগুলি আশ্রমে নিয়ে চললেন। এর পর সন্দেহের অবকাশ থাকে না, গরুগুলি দান করল কে? শিষ্য সামশ্রবা না রাজা জনক? সামশ্রবা ত' তখন আশ্রমবাসী ব্রহ্মচারী অন্তেবাসী; তিনি সহস্র গাভী দান ক'রতে পাবেন কোথায়? জনকসভায় বিজয় লাভের পুরস্কার হিসাবে সামশ্রবাই বা কেন গাভী দান করবেন? যাই হোক তিনি ত' গরুগুলিকে আশ্রমাভিমুখে নিয়ে চললেন (হোদাচকার)। অতএব রাহুলের মতে ব্রাহ্মণদের মধ্যে দান ও যশোলাভ ইত্যাদি, এগুলি কি কু উদ্দেশ্য প্রণোদিত স্বকপোল-কল্পনা নয়? দান তো দূরে থাকুক যখন অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন—"ত্বং নু খলু নো যাজ্ঞবল্ক্য ব্রহ্মিষ্ঠোঽসিত ইতি।" তখন যাজ্ঞবল্ক্য বললেন (স হোবাচ) নমো বয়ং ব্রহ্মিষ্ঠায় কুর্মো গোকামা এব বয়ং স্ম ইতি (৩।১।২)।" "(অশ্বল প্রশ্ন করিলেন)—'যাজ্ঞবল্ক্য! আমাদের মধ্যে তুমিই কি সর্বোত্তম ব্রাহ্মণ? (তদুত্তরে) যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, আমরা ব্রহ্মিষ্ঠকে নমস্কার করি আমরা হইতেছি গোকাম অর্থাৎ গো-লাভের অভিলাষী মাত্র!" (দুর্গাচরণ সাংখ্যতীর্থের অনুবাদ) কোথায় অপ্রয়োজনীয় বোধে যাজ্ঞবল্ক্য কর্তৃক গাভী বিতরণ, আর কোথায় যশোলাভ! আর সোনা দানা দাস ও সুন্দরী দাসীদের কথা কোথা হ'তে এল তা ভগবানই জানেন! প্রায় সকলেই জানে বাচক্নবী গার্গী যাজ্ঞবল্ক্যকে দু'বারে বহু জটিল প্রশ্ন করেন, এবং শেষে সন্তুষ্ট হ'য়ে যাজ্ঞবল্ক্যের জয় স্বীকার করেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদের ১।৮।৫ ও ৩।৮।১২ সংখ্যক মন্ত্র যথাক্রমে এইরূপ, "সা হোবাচ নমস্তেঽস্তু যাজ্ঞবল্ক্য যো ম এতং ব্যবোচঃ।" অর্থাৎ—[যাজ্ঞবল্ক্য প্রশ্নের উত্তর দিলে গার্গী বলিলেন]—"হে যাজ্ঞবল্ক্য, তোমার উদ্দেশে নমস্কার করি, যে তুমি আমার এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছ।" (দুর্গাচরণ সাংখ্যতীর্থের অনুবাদ) এবং "সা হোবাচ ব্রাহ্মণা ভগবন্তস্তদেব বহুমন্যেধ্বম্ যদস্মান্নমস্কারেণ মুচ্যেধ্বম্ ন বৈ জাতু যুষ্মাকমিমং কশ্চিদ ব্রহ্মোদ্যং জেতেতি; ততো হ বাচক্নব্যু পররাম।" অর্থাৎ "সেই গার্গী ব্রাহ্মণগণকে সম্বোধন পূর্বক বলিলেন—হে পূজনীয় ব্রাহ্মণগণ, তোমরা ইহাই যথেষ্ট মনে কর যে কেবল নমস্কার করিয়াই তোমরা ইঁহার নিকট হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিলে; অর্থাৎ ইঁহাকে জয় করার আশা দুরাশা মাত্র। এখন তোমাদের মধ্যে এমন কেহই নাই যিনি কখনও এই ব্রহ্মবাদী যাজ্ঞবল্ক্যকে বিচারে পরাজিত করিতে পারিবে।" ইহার পর বাচক্নবী নিবৃত্ত হইলেন। (দুর্গাচরণ সাংখ্যতীর্থের অনুবাদ)

এবার পাঠকগণ উক্ত উদ্ধৃতি সমূহের সঙ্গে রাহুলের অসংলগ্ন উক্তিগুলির তুলনা করুন। তিনি লিখছেন—

"জনকের পরিষদে যাজ্ঞবল্ক্য যেভাবে ধোঁয়া দিয়ে তাকে পরাস্ত করেছিল গার্গী তা কখনও ভুলতে পারেনি।" (পৃঃ ১০৯), গার্গীর মুখ দিয়ে বলান হচ্ছে (পৃঃ ১১০)—"একে পরাস্ত বলে না।" "···কিন্তু তার কথায় নয় কথার ধমকে আমাকে চুপ করতে হয়েছে," ইত্যাদি। তাছাড়া ঐ কল্পিত আখ্যানের সুপরিকল্পিত কথোপকথনের মধ্যে বোঝাতে চাইলেন যে, গার্গী চুপ না করলে যাজ্ঞবল্ক্য গার্গীর মস্তক ছেদন করে ফেলতেন। এ বিষয়ে (১১০ পৃঃ) লোপার উক্তিগুলিতেই রাহুলের বক্তব্য পরিস্ফুট হয়ে রয়েছে। ঘটনার বিবরণ এই ভাবে দেওয়া হয়েছে যেন—

যাজ্ঞবল্ক্যের ধমকে গার্গী চুপ করলেন এবং তাতেই তাঁর মাথা রক্ষা পেল। যথা "···আমি এজন্য জানতে পারলাম যে, নিজ চোখে তোমার কাঁধের উপর মাথাটা দেখতে পাচ্ছি।" (পৃঃ ১১০)। কিন্তু বৃহদারণ্যক উপনিষদে দেখা যায়, যাজ্ঞবল্ক্যের গার্গীর প্রতি মূর্ধা পতনের শপথের (৩।৬।১) গার্গী পুনরায় প্রশ্ন করার অধিকার পান (৩।৮।১) তার পর তিনি প্রশ্নের উত্তরে সন্তুষ্ট হয়ে যা বলেন তা পূর্বেই উদ্ধৃত করা হয়েছে।

ব্রহ্মবাদীরা বিরোধী পক্ষের (মনে রাখা উচিত গার্গীও ব্রহ্মবাদিনী) মস্তক ছেদন ক'রত তার কোনও প্রমাণ উপনিষদ থেকে পাওয়া যায় কি? যে মূর্ধা পতনের কথার উল্লেখ নিয়ে রাহুল এতটা পল্লবিত করেছেন তা আসলে কুতার্কিকদিগকে নিরস্ত করার জন্য এক শপথ বাক্য মাত্র—যেমন এখন কালের 'মাথার দিব্যি'। ছান্দোগ্য উপনিষদের ১।৮।৮ প্রভৃতি মন্ত্রে এই শপথের ব্যবহার দেখা যায়। বিশেষতঃ ছান্দোগ্য উপনিষদের ১।৮।৮ মন্ত্রে প্রবাহণ জৈবলি শালাবত্যকে বললেন "···অন্তবদ বৈ কিল তে শালাবত্য সাম, যস্ত্বেতর্হি ব্রূয়ান্মূর্ধা তে বিপতিষ্যতীতি মূর্ধা তে বিপতেদিতি।" নবীন ব্যাখ্যাতাগণ কি ইহাকেও মস্তকচ্ছেদনের ইঙ্গিতরূপে ব্যাখ্যা ক'রে থিওরী রক্ষা করবেন? কৌতূহলী পাঠকগণ ছা. ১।৮।৬ এর শাঙ্করভাষ্য একটু আলোচনা করে দেখতে পারেন।

এই উপাখ্যান ও আধার হিসাবে উল্লিখিত উপনিষদের সাহায্য

সুধীগণ বিচার করবেন। সাধারণ পাঠকগণকে জ্ঞাতসারে বিভ্রান্ত করার এর চেয়ে বেশী চেষ্টা, সম্ভবতঃ ভূমিকালেখকের পক্ষে সম্ভব নয়। রাহুল যুক্তি-তর্কে ব্রহ্মবাদ খণ্ডন করতে না পেরে লিখলেন—"প্রবাহণের মিথ্যাবাদকে সে ষোল কলায় পূর্ণ করেছে" (পৃঃ ১১০)। বেদান্তের রশ্মিষ্ঠ আচার্য মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের প্রতি থর্বের উদ্ধৃতিগুলিতে এবং প্রবাহণের প্রতি (১১১ পৃষ্ঠা) "···মরবার তিন দিন আগেও বিশ্বামিত্র কুলের পুরোহিতের সুবর্ণকেশী কন্যা তার রতিগৃহে এসে রাত্রিবাস করেছিল"—ইত্যাদি উক্তিতে যে সত্যনিষ্ঠা রাহুল দেখালেন তা' কি তাঁর ব্রতচ্যুতির কোনও কার্যকরী সমর্থন হিসাবে কাজে লাগবে?

একথা অনস্বীকার্য যে, ভারত সন্তানের নিকট উপনিষদরাজি উত্তরাধিকারসূত্রে লব্ধ এক অমূল্য রত্নভাণ্ডার স্বরূপ। জাতিধর্ম তথা রাজনৈতিক ইজম্ নির্বিশেষে ইহা আমাদের সকলেরই শ্রদ্ধার সামগ্রী। (সৈয়দ মুজতবা আলীর শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।) এই অত্যুৎকৃষ্ট দর্শন ও তার পূজ্য আচার্যগণকে অকারণ অপমান করায় হীন চক্রান্তের কৈফিয়ৎ ব্রতচ্যুত লেখকের নিকট স্বদেশীয় জনসাধারণ অবশ্যই আশা করেন।

অতঃপর রাহুল পুনর্জন্মবাদ সম্পর্কে রাজন্য তথা উপনিষদিক ঋষিকে হীন প্রতিপন্ন করতে গিয়ে নিজের জালে নিজে জড়িয়েছেন। এই অংশটি সূক্ষ্মভাবে বিচার করা উচিত।

সকলেই জানেন, রাহুল বৌদ্ধধর্ম অবলম্বন করেছিলেন, ভগবান্ তথাগতের প্রতি তাঁর আন্তরিক শ্রদ্ধা আছে, অন্ততঃ থাকার কথা। কিন্তু ভারতীয় সংস্কৃতির গৌরব, বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মহামানব ভগবান্ তথাগত ও রাহুলের পরধর্মদ্বেষের আতিশয্যে পড়ে তাঁর হাতে হীন **Hypocrite** প্রতিপন্ন হ'তে চলেছেন। বুদ্ধ সম্বন্ধে তিনি বলেন —"ক্ষণিক অনাত্মবাদের মহান্ আচার্য বুদ্ধ সম্বন্ধে স্বীকার করিতেই হইবে যে, তিনি দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের আচার্য কার্ল মার্ক্সের মতই দূরদৃষ্টি-সম্পন্ন ছিলেন।" (বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ—পৃঃ ৩৮)। আবার তিনি আলোচ্যমান গ্রন্থে বলেন "আপন ধর্মের স্বপক্ষে যে পুরুষ এতবড় কথা বলার স্পর্ধা রাখেন তিনি নিশ্চয়ই সত্য ও তার অন্তর্নিহিত শক্তিকে উপলব্ধি করেছেন।" (পৃঃ ১৬১)

এই দুই উক্তিতে রাহুল বুদ্ধের শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ব স্বীকার করলেন। আর পুনর্জন্মবাদ সম্বন্ধে রাহুলের মত হল এই—ভারতের সামন্ত শাসকগণ দুনিয়াতে বিদ্যমান দারিদ্র্য, বৈষম্য, শোষক-শোষিত ভেদ ও নিজের প্রভুত্ব কায়েম রাখার উদ্দেশ্যে উহার (পুনর্জন্মবাদের) সৃষ্টি করেন। বৈদিক পরলোকের কল্পনা সেজন্য পর্যাপ্ত নয় বলিয়া শোষিত জনগণের সামনে জন্মান্তরবাদের কুহেলিকা রচনা করা হয়। উপনিষদের ঋষি তথা পরবর্তী ধর্মাচার্যগণ সুবিধা দেখিয়া উহাকে গ্রহণ করেন। (বস্তুবাদ পৃঃ ৭১) অন্যত্রও তিনি পুনর্জন্মবাদকে প্রবাহণ রাজার হাতিয়ার বলেছেন। (পৃঃ ১২৪ ভগা)।

কিন্তু একথাও সকলেরই জানা আছে যে, ভগবান্ তথাগত ঈশ্বরের অস্তিত্বে নীরব ও বৈদিক কর্মকাণ্ডের সফলতায় আস্থাহীন হয়েও পুনর্জন্মবাদে বিশ্বাসী ছিলেন—বিশ্বাসী ছিলেন কেন, বুদ্ধ প্রচারিত আদি বৌদ্ধ মতের (যাতে দুঃখ, দুঃখসমুৎপত্তি, দুঃখ অতিক্রম ও অতিক্রমের পথ এই চার আর্য সত্য স্বীকার করা হয়েছে) পুনর্জন্মবাদই অন্যতম স্তম্ভস্বরূপ। বুদ্ধ ধর্ম-চক্র-প্রবর্তন-সূত্রে বলেছেন (৬ নং সূত্র)—যাথং তণহা পোনোব্ভবিকা নন্দিরাগসহগতা তত্র তত্রাভিনন্দিনী ইত্যাদি। ইহার বৌদ্ধভিক্ষুণী Sister Varijâ কৃত অনুবাদ এইরূপ—··· **"It is the craving that leads back to rebirth."**

এখন আমাদের বিনীত প্রশ্ন এই যে, সত্যদ্রষ্টা ও কার্ল মার্ক্সের সমান দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ও সত্যের অন্তর্নিহিত শক্তিতে বিশ্বাসী বুদ্ধ যে পুনর্জন্মবাদ স্বীকার করলেন, এ কি তাঁর অজ্ঞতা? না তিনিও দারিদ্র্য, বৈষম্য, শোষক-শোষিত ভেদ ও নিজেদের প্রভুত্ব কায়েম রাখিবার উদ্দেশ্যে পুনর্জন্মবাদকে হাতিয়ারস্বরূপ গ্রহণ করলেন? এই সব উক্তির স্ববিরোধ অবশ্যই চতুর রাহুল ধরতে পেরেছিলেন, কাজেই কোন রকমে সব দোষ আস্তিক প্রবাহণের উপর চাপিয়ে বুদ্ধকে বাঁচানর চেষ্টা করলেন। "এ বিচার অনুযায়ী প্রবাহণ রাজার আবিষ্কৃত হাতিয়ার ছিল, তার জন্যই পুনর্জন্মবাদের পুরোপুরি স্থিতির জায়গা হ'ল। (এই অংশের অনুবাদ অস্পষ্ট)। যদি গৌতম বুদ্ধ নিছক জড়বাদই প্রচার ক'রত তাহলে নিশ্চয়ই শ্রাবস্তী, সাকেত, কৌশাম্বী, রাজগৃহ ভদ্রিকার শ্রেষ্ঠীরা অজস্র টাকা ব্যয় ক'রত না এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, সামন্তরা ও রাজারা তার পায়ের ধূলো নেবার জন্য ভিড় ক'রত না।" (পৃঃ ১২৪-২৫)।

তা হলে রাহুল স্বীকার করছেন বুদ্ধ সত্য জেনেও কেবল শ্রেষ্ঠী সামন্ত, ব্রাহ্মণ ইত্যাদির শ্রদ্ধা ও অর্থ পাবার জন্য প্রবাহণের আবিষ্কৃত মিথ্যাবাদের এক হাতিয়ারকে নিজের ধর্মের মধ্যে স্থান দিলেন। কিন্তু এতে স্ববিরোধ এড়ান যায় নি—তার বাক্যজালবিস্তার আগাগোড়াই হাস্যকর রয়ে গেল। কি অপরিসীম ধৃষ্টতা! এই অস্থিরমতি ব্রতচ্যুত ব্যক্তি বলতে চান, যে রাজকুমার বিপুল ঐশ্বর্য রাজপ্রাসাদ ও প্রমোদকাননের অজস্র প্রলোভন, যুবতী স্ত্রী ও দেবকুমারোপম পুত্রকে জীবের দুঃখ নিবারণ ও সত্যানুসন্ধানের জন্য তুচ্ছাতিতুচ্ছরূপে পরিত্যাগ করেছিলেন, যিনি শত প্রলোভনের আকর 'মার'কে অবহেলে জয় করেছিলেন, সেই সর্বত্যাগী বুদ্ধ শ্রেষ্ঠীদের অর্থ ও হীন প্রতিষ্ঠার লোভে জ্ঞাতসারে মিথ্যার প্রশ্রয় দিয়েছিলেন। আশা করি, বৌদ্ধগণ ও বুদ্ধানুরাগী ভারতীয়গণ ভগবান বুদ্ধের এই অপমান ক্ষমা করবেন না!

তার পর আসা যাক 'প্রভা' নামক উপাখ্যানে। প্রমাণ না থাকলেও রাহুল প্রতিপাদন করবেন যে বৈদিক ধর্মাশ্রয়ী সকল ঋষি, কবি বা দার্শনিক রাজানুগৃহীত, রাজার অন্নদাস, শোষণ ও অনাচারের সমর্থক, লম্পট ইত্যাদি এবং বৌদ্ধ কবি বা দার্শনিক বা কবিগণের প্রতি পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা নিয়েই বলছি যে, এই প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে নিন্দনীয়। প্রাজ্ঞ বৌদ্ধ ভিক্ষু ও পণ্ডিতগণও আশা করি আমাদের মত সমর্থন করবেন। যাই হোক, বাল্মীকি যখন বেদমতাশ্রয়ী তখন আর কথা কি? তিনি হলেন পুষ্যমিত্র শুঙ্গের সমসাময়িক বা তারও পরবর্তী এবং শুঙ্গ রাজাদের আশ্রিত—সভাকবি। প্রমাণ? প্রমাণে কি প্রয়োজন? শ্রীযুক্ত মহাদেব সাহাকৃত রাহুল সাংকৃত্যায়নের উক্তি—এই-ই স্বতঃপ্রমাণ। কে হে তোমরা মহামূর্খের দল, এ সকল সিদ্ধান্তের প্রমাণ চাও? দেখ ১৫০ পৃঃ। মহাপণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভিক্ষু (?) রাহুল সাংকৃত্যায়ন কর্তৃক আখ্যাত হচ্ছে—

বাল্মীকি প্রথমতঃ শুঙ্গ বংশের আশ্রিত কবি, দ্বিতীয়তঃ শুঙ্গবংশের রাজধানীর (অযোধ্যার) মহিমাকে উন্নীত করবার জন্যই জাতকের

দশরথের রাজধানীকে বারাণসী থেকে সরিয়ে সাকেত বা অযোধ্যায় এনেছেন ; তৃতীয়তঃ শুঙ্গ-সম্রাট পুষ্যমিত্র বা অগ্নিমিত্রকেই রামরূপে মহিমান্বিত করেছেন।

প্রমাণ ? হাফ ডজন "যদি"।

এই মত প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে তিনি সমস্ত ইতিহাসকে উপেক্ষা করেছেন। রামায়ণ রচনার কাল কমপক্ষে ৪০০-২০০ খৃঃ-পূর্বাব্দের মধ্যে, এই-ই হল প্রতিষ্ঠিত মত। পাশ্চাত্য সংস্কৃতজ্ঞ ও ভারততত্ত্ব নেতৃগণ (Indologist) মনে করেন রামায়ণে ২য় হতে ৬ষ্ঠ কাণ্ড পর্যন্ত আদিম বা প্রাচীন অংশ এবং ১ম ও ৭ম কাণ্ড পরবর্তী সংযোজন। অবশ্য প্রাচীন অংশেরও মধ্যে মধ্যে প্রক্ষিপ্ত শ্লোক অনেকই রয়েছে। রামায়ণের আদি অংশের রচনা কালে A. A. Macdonell এর মতে ৫০০ খৃঃ-পূর্বাব্দ বা তারও পূর্ববর্তী। সংস্কৃত সাহিত্যে সুপণ্ডিত Dr A. B. Keith মহোদয় স্বকৃত Classical Sanskrit Literature গ্রন্থের ১১ পৃষ্ঠায় বলেছেন—"Apart from the question of language there is now abundant evidence to show that the epics existed in some form in Sanskrit before Panini." পাণিনির কাল পাশ্চাত্য মতে খৃঃ-পূঃ ৪র্থ শতাব্দী অতএব Keith ও Macdonell একমত। রামায়ণের বর্তমান আকার পরবর্তী কালে পরিবর্তিত ও পুষ্ট স্বীকার করলেও উহার আদিম অবস্থা বাল্মীকি কৃত বলে স্বীকার করা উচিত। কারণ লোকোক্তি অনুসারে বাল্মীকি লৌকিক সাহিত্যের আদিকবি। কাজেই অপরের গ্রন্থ সংস্কার করে বর্তমান গ্রন্থ নির্মাণ কখনও বাল্মীকির কাজ হতে পারে না। 1. Winternitz তাঁর A History of Indian Literature এর প্রথম খণ্ডের ৫১৭ পৃষ্ঠায় বলেছেন, "It is probable that he original Rimiyana was composed in the hird century B. C. by Vālmiki on the basis of ncient ballads."

এখন রামায়ণ ও মহাভারতকে গুপ্তযুগে পুনর্লিখিত বলে স্বীকার করলেও (এমত অবশ্য ঠিক নয়, কারণ গুপ্তযুগের তাম্রশাসনে দেখা যায় যে গুপ্তযুগেই বর্তমান মহাভারত স্মৃতিশাস্ত্রের মর্যাদায় আরূঢ়) Macdonell কথিত রামায়ণের আদিম আকৃতির রচয়িতা হিসাবে, বাল্মীকিকে স্বীকার করতে কোনও বাধা নেই। তাঁর আবির্ভাব কাল যে শুঙ্গ-পূর্বযুগে এতে কোনও সন্দেহ রইল না, কারণ শুঙ্গ অভ্যুদয় খৃঃ-পূঃ ২য় শতকের ঘটনা। বিশেষতঃ বাল্মীকি অরণ্যাশ্রমবাসী ঋষিরূপে রামায়ণের প্রথম ও শেষ কাণ্ডে চিত্রিত। বিনা প্রমাণে তাঁকে শুঙ্গ রাজসভায় এনে রাজার স্তাবকরূপে বর্ণনা করা কিরূপ ঐতিহাসিকতা, তা গ্রন্থকার ও ভূমিকা-লেখকই জানেন।

আরও জিজ্ঞাস্য পুষ্যমিত্রের বা শুঙ্গ রাজাদের রাজধানী কি সাকেত বা অযোধ্যা ? পুষ্যমিত্র শুঙ্গ ১৮৭ খৃঃ পূর্বাব্দে মৌর্যবংশের শেষ রাজা বৃহদ্রথকে হত্যা করে মগধরাজ্য অধিকার করেন। তখন মগধের রাজধানী ছিল পাটলিপুত্র, অযোধ্যা নহে। Cambridge History of India (Vol I) পাঠে জানা যায় পুষ্যমিত্র ও তাঁর বংশধরগণের রাজধানী ছিল প্রধানতঃ বিদিশাতে। তবে পুষ্যমিত্র পাটলিপুত্রেও কিছুদিন শাসন চালিয়েছিলেন এটা সত্য। কিন্তু অযোধ্যা বা সাকেত শুঙ্গদের রাজধানী ছিল, এমন কোনও প্রমাণ নেই।

'প্রভা' নামক উপাখ্যানে ভারতীয় নাটকের উৎপত্তি সম্বন্ধে যে মত তিনি প্রকাশ করেছেন, তাতে প্রকাশ পেয়েছে প্রকৃত তথ্য সম্বন্ধে তাঁর অজ্ঞতা। তিনি মনোরম কাহিনীর শেষে সিদ্ধান্ত করলেন যে ভারতীয় নাটক যবন (অর্থাৎ গ্রীক) নাট্যকলার অনুকরণে উদ্ভূত। কিন্তু এ মত হল Weber, Windisch প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের (তাও বহুপূর্বে খণ্ডিত) মতে চর্বিত-চর্বণ মাত্র। প্রায় নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রমাণিত হয়েছে যে ভারতীয় নাটকসমূহ ও নাট্যকলা ভারতেই স্বাধীনভাবে উদ্ভূত। এমন কি গ্রীক আক্রমণের পূর্ব হতেই ভারতে নাটক রচনা ও অভিনয়ের অস্তিত্ব ছিল। নাটক রচনার ও অভিনয়ের বিধি-নিষেধাত্মক গ্রন্থ রচিত হয়েছিল—গ্রীক প্রভাব এদেশের প্রান্তে বদ্ধমূল হবার আগেই। এ সম্বন্ধে পরে বিস্তৃত আলোচনা করা যাচ্ছে।

তিনি ১৫৭ খৃষ্টাব্দীয় (অবশ্য তাঁরই মতে) অশ্বঘোষ সম্বন্ধে লিখলেন, "যবন নাট্যকলাকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য নাটকের চিত্রপটসমূহের নাম রাখল 'যবনিকা'। এই উর্বশী বিয়োগ হ'ল প্রথম ভারতীয় নাটক এবং অশ্বঘোষ হ'লেন প্রথম ভারতীয় নাট্যকার।" (পৃঃ ১৫৮) এই তিনটি মতই অসত্য। প্রথমতঃ, 'যবনিকা' কথা যে যবন বা গ্রীক প্রভাব সূচিত করে না এ ভুল অনেক দিন আগেই ধরা পড়েছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ মনোমোহন ঘোষ (ভরত-নাট্যশাস্ত্রের অনুবাদক) বিশ্বভারতী প্রকাশিত 'প্রাচীন ভারতীয় নাট্যকলা' পুস্তিকায় (পৃঃ ৬৪) লিখছেন···"এ বিষয়ে প্রমাণের জন্য 'যবনিকা' শব্দের উপর তাঁদের কেউ কেউ জোর দিয়েছেন। সে শব্দটি মোটেই যবন (Ionian) শব্দের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত নয়। মূল কথাটি হচ্ছে 'যবনিকা' যা সেকালের প্রাকৃতে দাঁড়িয়েছিল 'জবনিকা'। এ শেষোক্ত শব্দটি 'জ' কার পরিবর্তন করে আবার 'যবনিকা' রূপ ছদ্ম সংস্কৃত রূপ (Pseudo Sanskrit) নিয়েছে।"

উর্বশী নাটকের বিবরণ তো কোনও সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে মিলছে না ! এই গ্রন্থের কোনও সংস্করণ বা পাণ্ডুলিপি শ্রীযুক্ত রাহুলজী দেখে থাকলে অনুগ্রহ করে তার সূত্র জানাবেন। অশ্বঘোষের 'সারিপুত্ত প্রকরণ' নামক নাটকের খণ্ডিতাংশই মধ্য এশিয়া হ'তে আবিষ্কৃত হ'য়েছে বলে শোনা যায়। যাঁরা অশ্বঘোষকে কালিদাস অপেক্ষাও প্রাচীন মনে করেন (A. B. Keith প্রভৃতি) তাঁদের মতে অশ্বঘোষের সারিপুত্ত প্রকরণই প্রাপ্তব্য ভারতীয় নাটক সমূহের মধ্যে প্রাচীনতম। সারিপুত্ত প্রকরণের সঙ্গে আবিষ্কৃত অন্য দুই নাটকের যে খণ্ডিতাংশ পাওয়া গেছে তাদের নাম আবিষ্কৃত হয় নি। অতএব উর্বশী বিয়োগ নাটকের উল্লেখ কাল্পনিক ও অনৈতিহাসিক। সূর্যনারায়ণ চৌধুরী তৎসম্পাদিত বুদ্ধচরিতের ভূমিকায় বলেছেন, (পৃঃ ছ) "দূসরে নাটককী তরহ, তীসরে কা ভী পতা নহীঁ হৈ।" ইত্যাদি।

অবশ্য কালিদাস অশ্বঘোষের কাছে ঋণী না অশ্বঘোষ কালিদাসের নিকট ঋণী, বা দু'কবির মধ্যে কে পূর্ববর্তী তা নিয়ে যথেষ্ট তর্কবিতর্ক আছে। আধুনিক ভারতীয় পণ্ডিতদের মধ্যে ডাঃ রমেন্দ্র বসু অধ্যক্ষ জ্ঞানরঞ্জন রায়, অধ্যাপক কে. এস. রামস্বামী শাস্ত্রী প্রভৃতি

কালিদাসকে অশ্বঘোষের পূর্ববর্তী বলে প্রমাণ করেছেন। তাঁদের যুক্তিগুলিও মোটেই অসার নয়, এবং তাঁরা কেউ-ই প্রাচ্যবিদ্যায় Dr. A. B. Keith প্রভৃতি অপেক্ষা ন্যূন ন'ন।

অশ্বঘোষ কালিদাসের পূর্ববর্তী হলেও, তাঁরও পূর্বে যে ভারতে নাটক ও নাট্যশাস্ত্র রচনা এবং অভিনয় সুবিদিত ছিল তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। এ বিষয়ে কিছু প্রমাণ উপস্থাপিত করাও প্রয়োজন মনে করি। পূর্বেই বলা হয়েছে, পাণিনির আবির্ভাব কাল কমপক্ষে খৃঃ-পূঃ ৪র্থ শতাব্দী। পাণিনি ব্যাকরণে 'পারাশর্যশিলালিভ্যাম ভিক্ষু-নট সূত্রয়োঃ' (৪।৩।১১০) এবং 'কর্মন্দকৃশাশ্বাদিনিঃ' (৪।৩।১১১) সূত্রদ্বয়ে স্পষ্টই শিলালী ও কৃশাশ্ব প্রণীত নট সূত্রের উল্লেখ আছে। নট সূত্র যে নাট্যশাস্ত্র (Dramatergy) জাতীয় গ্রন্থ, তা প্রায় সন্দেহাতীত। এবং নাটকের প্রচলন হওয়ার বেশ কিছুদিন পরেই এ জাতীয় গ্রন্থ রচনা সম্ভব। অতএব পাণিনির বহু পূর্বেই নাটকের অস্তিত্ব ছিল। বাল্মীকি যে অশ্বঘোষের পূর্ববর্তী তা রাহুলজী স্বয়ংই স্বীকার করেছেন (পৃঃ ১৫১)। অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিতে বাল্মীকির উল্লেখ আছে—"বাল্মীকিরাদৌ চ সসর্জ পদ্যং জগ্রন্থ যন্ন চ্যবনো মহর্ষিঃ।" (১।৪৭ Johnston's Edition, Lahore)। সেই বাল্মীকির রামায়ণে (প্রাচীন অংশহিসাবে স্বীকৃত অংশে) নট ও নাটক এই উভয় শব্দেরই ব্যবহার আছে। অযোধ্যাকাণ্ডের ৬৭তম সর্গের ১৫'শ শ্লোকে নট শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। ঐ নট শব্দ সেখানে অভিনেতা অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে নর্তক অর্থে। কারণ নর্তক কথাটিও সঙ্গে সঙ্গেই প্রযুক্ত হয়েছে। মূল শ্লোকাংশটি এইরূপ—"প্রহৃষ্ট-নট-নর্তকাঃ।" আর ঐ কাণ্ডেরই ৬৯ তম সর্গের ৪র্থ শ্লোকে নাটক শব্দের ব্যবহার আছে। অতএব এতেই প্রমাণিত হ'ল অশ্বঘোষ প্রথম নাট্যকার নন আর তাঁর রচনা ভারতের প্রথম নাটকও নয়। আর গ্রীক প্রভাবে ভারতীয় নাটকের উদ্ভব যে স্বদেশীয় পণ্ডিতপুঙ্গবেরা কল্পনা করেন, গ্রীক ও সংস্কৃত সাহিত্যে পারদর্শী একজন বিদেশীয়ের উক্তি তাঁদের সম্মুখে উপস্থাপিত করছি—

"The improbability of theory is emphasised by the still greater affinity of the Indian drama to that of Shakespeare,…The Indian drama has had a thoroughly national development, and even its origin, though obscure, easily admits of an indigenous explanation," (page 146, A History of Sanskrit Literature by A. A. Macdonell, London 1909).

আসল কথা হ'ল এই যে, প্রাচীন গ্রীকদের সময় থেকে আজ পর্যন্ত পাশ্চাত্য দেশীয়দের (অবশ্য ম্যাকডোনেল, উইন্টারেনিজ, পলডয়সেন্ প্রভৃতি উদার পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ এ দলের মধ্যে পড়েন না) ধারণা যে 'শ্বেতচর্মের' বাইরে উৎকৃষ্ট শিল্প বা বিজ্ঞান সম্ভব নয়, যদি এই নিয়মের কোথাও ব্যতিক্রমই স্বীকার করতে হয়, তবে, তা পাশ্চাত্ত্যদের অনুকরণ মাত্র। যেমন খৃষ্টীয় ১ম—২য় শতকের গ্রীক আলঙ্কারিক ডিয়ো খ্রুসোস্তোমোস (Dio Xsuootouos) মত প্রকাশ করলেন যে, ভারতীয়রা নিজেদের ভাষার মাধ্যমে হোমারের কবিতা পাঠ করে থাকে। মহাভারতকে লক্ষ্য করে তিনি প্রচার করলেন, আসলে মহাভারত Iliad মহাকাব্যের সংস্কৃতানুবাদ মাত্র। খৃষ্টীয় উনবিংশ শতকেও সংস্কৃতাভিজ্ঞ Dr. Weber এর কণ্ঠে সেই সুরেরই প্রতিধ্বনি শোনা যায়। 'সংস্কৃতভাষা লাতিন ভাষার অনুকরণে ব্রাহ্মণদের নির্মিত" এইরকম থিওরী দেওয়ার মত পণ্ডিত লোকও উনবিংশ শতকে ইউরোপে মিলত। বলা বাহুল্য, এগুলি আসলে অলীক কল্পনা মাত্র। দুঃখের কথা মহাপণ্ডিত রাহুল সেইরকম পাশ্চাত্য মতের রোমন্থন করেছেন—আর শ্রীযুক্ত মহাদেব সাহা সেই চর্বিতচর্বণকেই বিস্ময়-বিস্ফারিত দৃষ্টিতে ভক্তিবিগলিত কণ্ঠে প্রাগৈতিহাসিক অধ্যয়ন বলে স্তুতি করেছেন।

তাছাড়া তাঁর মতে ভারতীয় দর্শন গ্রীক্‌দর্শনের মতবাদে পরিপূর্ণ। এই মতের আর বেশী আলোচনায় প্রয়োজন নেই। স্কুলপাঠ্য ইতিহাসে জ্ঞান থাকলেই এই মতের অসারতা ধরতে পারা যায়। বিশেষতঃ, বৈজ্ঞানিক ভৌতিকবাদ গ্রন্থে ভারতীয় বিভিন্ন দর্শনের সঙ্গে গ্রীক্‌ দর্শনের যে মূলগত অনৈক্য রাহুল দেখিয়েছেন—'প্রভা' উপাখ্যানের শেষ অংশের সঙ্গে তার স্ববিরোধ সুস্পষ্ট।

ভারতীয় নাটক-দর্শনাদিতে গ্রীক প্রভাবের কথা পল্লবিত আকারে প্রচার ক'রে রাহুল তার স্বদেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি কিরূপ ব্যবহার ক'রলেন তা বিশ্লেষণে আর প্রয়োজন নেই। তবে ঐ গ্রীক্‌ প্রভাব সম্বন্ধে বৈদেশিক ইতিহাসবিদগণের মন্তব্য আশা করি প্রসঙ্গের অনুপযোগী হবে না। Cambridge History of India, Vol I (Page 345) এ Prof. E. R. Bevan মহোদয় লিখছেন—"India, indeed, and the Greek **world only touched each other on their fingers;** and there was never a chance for elements of the Hellenistic tradition, to strike roots in India, as, a part of Hellenism struck root in the near East and was still vital in the Muhammadan largely Hellenistic culture of the Middle ages. There are, however, the unquestainable cases of transmission which will be noted in subsequent chapters—the artistic types conveyed by the School of Gandhâra, and the Greek astronomy which superseded the primitive native system in the latter part of the fourth century A.D.

কত অভিনব কথা রাহুল লিপিবদ্ধ করেছেন, তার শেষ নেই। 'প্রবাহণ' উপাখ্যানে (পৃঃ ১০১) ক্রীতদাস প্রথার যে চিত্র তিনি এঁকেছেন, উপনিষদের যুগে ভারতে তা অচল ছিল। ভারতে ক্রীতদাস প্রথা অনেক পরের আমদানী। মেগাস্থিনিসের সময়ও ভারতে ক্রীতদাস প্রথা ছিল না। কেউ কেউ বলেন যে, তখন ভারতে ক্রীতদাস প্রথা প্রবর্তিত হয়েছিল, তবে তা এত অত্যাচারবিহীন ছিল যে মেগাস্থিনিস আদৌ তার অস্তিত্ব বুঝতে পারেন নি। দ্বিতীয় মত সত্য হলেও, উপনিষদের যুগে তীব্র পীড়নময় ক্রীতদাস প্রথার অস্তিত্বের কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। বিশেষতঃ আশ্রমবাসী ঋষিদের সংসারে সহস্র সহস্র ক্রীতদাস থাকতো ও তাদের পশুর মত নির্দয়ভাবে টাকার বিনিময়ে বিক্রয় করা হ'ত, এ মূল্যবান (!) তথ্য

রাহুল কোন্ উপনিষদ থেকে আহরণ করলেন, ইতিহাসের অনুরাগী মাত্রই তা জানতে চাইবেন। (পৃঃ ১০০)

ঐ স্থানেই তিনি বৈদিক ঔপনিষদিক যুগের গুরুকুলবাসী ব্রহ্মচারী ছাত্রদের বিনা প্রমাণে ব্রতে ব্যভিচারিরূপে চিত্রিত ক'রে এবং তাদের সমস্ত সংযম সাধনাকে "···এসব ছল সম্মান প্রতিষ্ঠার জন্য ; মানুষ একে ব্রাহ্মণ-কুমারদের কঠিন তপস্যা বলে মনে করে (পৃঃ ১০১)"—ইত্যাদি মন্তব্য দ্বারা দূষিত ক'রে সঙ্কীর্ণ ধর্মদ্বেষের পরিচয় দিয়েছেন।

এ সব সংযম সাধনার কতটা প্রয়োজন ও কতটা অপ্রয়োজন এ বিষয়ে অবশ্যই মতভেদ থাকতে পারে, বিশেষতঃ বস্তুবাদীরা ব্রহ্মচর্য প্রভৃতির মূল্য স্বীকার করেন না, তাও আমরা জানি কিন্তু সেটা যে লোকদেখানো ও ব্রাহ্মণকুমারদের প্রতিষ্ঠা লাভের একটা উপায় মাত্র, একথা বিনা প্রমাণে প্রতিপাদন করতে যাওয়া অত্যন্ত আপত্তিকর। বিশেষতঃ ব্রহ্মচর্য ও সংযম সাধনা সকল ধর্মেই স্থান পেয়েছিল, কাজেই তাকে হিন্দুধর্মের আবিষ্কৃত দুরভিসন্ধিপূর্ণ মতলব বলতে যাওয়া একদেশদর্শিতাও বটে।

এখানে আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে, ভগবান বুদ্ধ ভিক্ষুমণ্ডলীকে যে দশ সিক্‌খাপদ উপদেশ দিয়েছিলেন, ব্রহ্মচর্য সংযম সাধনার সঙ্গে তার ত' বিশেষ কোনও প্রভেদ নেই। বিশেষতঃ সংযম সাধনার বিলাস বর্জন প্রভৃতি যে সকল বহিরঙ্গগুলি নিয়ে রাহুল এত আলোচনা করেছেন দশ সিক্‌খাপদে তাদের হুবহু মিল পাওয়া যায়। তবে সেগুলিও কি সম্মানপ্রতিষ্ঠার ভণ্ডামিপূর্ণ প্রচেষ্টা মাত্র ?

খুদ্দক পাঠে ভগবানের বাণীগুলি এইরূপ পাওয়া যায় :—

৩। অব্রহ্মচরিয়া বেরমণী সিক্‌খাপদং সমাদিয়ামি।

৫। সুরা-মৈরেয়-মজ্জ-পমাদট্‌ঠানা বেরমণী সিক্‌খাপদং সমাদিয়ামি।

৭। নচ্চ-গীত-বাদিত-বিসূক দস্‌সনা বেরমণী সিক্‌খাপদং সমাদিয়ামি।

৮। মালা-গন্ধ-বিলেপন-ধারণ-মণ্ডন-বিভূসনট্‌ঠানা বেরমণী সিক্‌খাপদং সমাদিয়ামি।

৯। উচ্চাসয়ন মহাসয়না বেরমণী সিক্‌খাপদং সমাদিয়ামি।

১০। জাতরূপ-রজত-পটিগ্‌গহা বেরমণী সিক্‌খাপদং সমাদিয়ামি।

উক্ত সিক্‌খাপদগুলির অনুবাদও শ্রীধর্মজ্যোতিমহাস্থবির মহাশয়ের গ্রন্থ হ'তে দেওয়া গেল—

৩। অব্রহ্মচর্য হইতে বিরতি শিক্ষাপদ গ্রহণ করিতেছি।

৫। সুরা-মৈরেয়-মদ্য প্রভৃতি পান হইতে বিরতি শিক্ষাপদ গ্রহণ করিতেছি।

৭। নৃত্য-গীত বাদ্য দর্শন ও শ্রবণ হইতে বিরতি শিক্ষাপদ গ্রহণ করিতেছি।

৮। মালা-গন্ধ-বিলেপন ধারণ ও মণ্ডন হইতে বিরতি শিক্ষাপদ গ্রহণ করিতেছি।

৯। উচ্চশয্যা মহাশয্যায় শয়ন ও উপবেশন হইতে বিরতি শিক্ষাপদ গ্রহণ করিতেছি।

১০। স্বর্ণরৌপ্য প্রতিগ্রহণ হইতে বিরতি শিক্ষাপদ গ্রহণ করিতেছি।

এগুলি যে সম্যক্ সম্বুদ্ধ নির্দেশিত তাহা আমরা উক্ত সংস্করণের ভূমিকা হতে জানতে পারি।

এর পর আসা যাক্ 'সুপর্ণ যৌধেয়' নামক উপাখ্যানে। শ্রীযুক্ত সাহা বলেন, "সুপর্ণ যৌধেয়" কাহিনীতে এসে পুরোপুরি গুপ্তযুগের বিবরণ পাওয়া গেল—এর বহু বিবরণ গুপ্তযুগের পুরালেখ থেকে আহৃত হ'য়েছে। অবশ্য অধিকাংশ রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ থেকেই গৃহীত, তাছাড়া চৈনিক পরিব্রাজক ফা'হিয়েনের ভারত বৃত্তান্তও কাজে লেগেছে।

আমরা প্রথমেই বলতে চাই, শ্রীযুক্ত সাহার এই উক্তি অযৌক্তিক ও অসত্য ; প্রথমত রাহুল আদৌ গুপ্তপুরালেখ সমূহের ব্যবহার এই গ্রন্থে করেন নি, ফা'হিয়েনের বর্ণনার সাক্ষ্য তিনি একটুও আমল দেন নি। আর গুপ্তযুগের বিবরণ রচনায় রঘুবংশ, কুমারসম্ভব ও অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ থেকে তথ্য আহরণ একেবারেই অসম্ভব।

গুপ্তযুগের বিবরণ 'অধিকাংশ' কেমন করে রঘুবংশ কুমারসম্ভব ও অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ থেকে পাওয়া যেতে পারে ? মহাকবি কালিদাস ত' ঐগুলিকে গুপ্তযুগের বিবরণ বলে কখনও স্বীকার করেন নি ? বিশেষতঃ ঐগুলি কাব্য ও নাটক, ওদের বিষয়বস্তু রামায়ণ মহাভারত থেকে আহৃত, অলঙ্কারশাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত, কুমারগুপ্ত বা স্কন্দগুপ্ত সম্বন্ধে কোনও প্রত্যক্ষ উল্লেখ গ্রন্থগুলিতে, তাদের পুষ্পিকায় বা অন্যত্র কোথায়ও নেই। তদ্ভিন্ন রাহুলের বর্ণনা মত বিবরণ উক্ত গ্রন্থত্রয়ের কোনও স্থানে নেই। শ্রীযুক্ত সাহা মহাশয় একটু পরিশ্রম করে সামঞ্জস্যগুলি দেখালে আমরা সত্যই উপকৃত হব।

অবশ্য কালিদাসের ব্যবহৃত স্কন্দ, কুমার, গুপ্ত প্রভৃতি শব্দগুলি কোনও কোনও কল্পনাবিলাসী গুপ্তরাজন্যবর্গের উল্লেখ মনে করেন। সেই অনুমানের সূত্র অতীব ক্ষীণ। স্কন্দ কুমার প্রভৃতি শব্দ কালিদাস—সাধারণ কার্তিকেয় অর্থেই ব্যবহার করেছেন। পূর্ব হইতে ঐ সকল শব্দের বহুল ব্যবহার ছিল মহাভারত প্রভৃতিতে। ঐটুকুকে অবলম্বন করে রাহুল কাহিনীতে গাঢ়বর্ণ লেপ দিয়ে কালিদাসের চরিত্রকে কলঙ্কিত করে চিত্রিত করলেন তা সত্যই দুঃখকর। দুঃখের মধ্যেও আমাদের ললিত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের 'পুষ্পকচন্দ্রশালা' রসিকতাটি মনে পড়ে। যাই হোক, এ সম্বন্ধে রাহুলের উক্তিগুলি দেখা যাক, (১) "কিন্তু রাজার সম্বন্ধে তাঁর দাসমনোবৃত্তি আমার বড়ই খারাপ লাগত। (পৃঃ ১৮৬) (২) এই সময় কবি 'কুমারসম্ভব' লিখছিলেন। আমাকে বলেছিলেন, বিক্রমাদিত্যের পুত্র কুমারগুপ্তকেই আমি এখানে শঙ্করপুত্র কুমার কার্তিকেয় নামে অমরতা প্রমাণ করতে চাই।" (পৃঃ ১৮৬) এই উক্তি দুটির বিস্তৃত সমালোচনা নিরর্থক। রাহুলের সগোত্র মহাত্মাগণ একদিন রবীন্দ্রনাথকে বুর্জোয়া কবি আর কালিদাসকে ফিউডেল কবি বলে কাব্যরসবোধের উৎকর্ষের পরিচয় দিতেন ; ইদানীন্তন কালে তাঁরা অজ্ঞাত (?) কারণে সে মত পরিবর্তন করে রবীন্দ্রনাথের ভক্ত হয়েছেন, শুনেছি কালিদাস সম্বন্ধেও তাঁদের মত পাল্টেছে। এ সকল কথা বেশী ঘাঁটলে আবার আমার অনেক হিতৈষী গোসা করবেন, তাই ওঁ শান্তিঃ।

অন্যত্র তিনি কালিদাসের মুখ দিয়ে বলাচ্ছেন "কিন্তু সুপর্ণ, আমি নিছক কবি, অশ্বঘোষ কবি ও মহাপুরুষ দুই-ই ছিলেন। তাঁর কাছে সংসারের সুখভোগের কোনই মূল্য ছিল না, আমি চাই বিক্রমাদিত্যের প্রমোদশালার সুন্দরীদের মত সুন্দরী, চাই স্বর্ণবর্ণ

ব্রাক্ষাসুরা, চাই প্রাসাদ এবং পরিচারক। আমি কেমন করে অশ্বঘোষ হ'তে পারি?" (পৃঃ ১৮৭)।

এই সকল প্রলাপ বাক্য উত্তর দেওয়ার যোগ্য বলে আমরা মনে করি না। একমাত্র কথা, যা একটু উল্লেখ করা প্রয়োজন তা হল এই, অশ্বঘোষ বৌদ্ধ ছিলেন বলে ত কালিদাসকে তাঁর চেয়ে অনেক হীন প্রতিপন্ন করার চেষ্টা হল। কিন্তু কালিদাসের অপরাধ কি? না, তিনি বিক্রমাদিত্য নামক কোনও রাজার সভাকবি ছিলেন বলে কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। কিন্তু অশ্বঘোষ (তাঁর প্রতি কবি ও দার্শনিক হিসাবে আমাদের শ্রদ্ধা অণুমাত্র কম নয়) কি একেবারে হিমালয়ের গুহায় বাস করতেন, না বোধিদ্রুমের নীচে সারাজীবন ধ্যানস্থ থাকতেন? তিনি যে কণিষ্ক নামক বিদেশী রাজার সভায় অবস্থিতি করতেন, সে সংবাদ ত' মিথ্যা নয়, নিতান্ত কিম্বদন্তীও নয়, স্বীকৃত ঐতিহাসিক সত্য। কালিদাসের মুখে আরও বলান হ'ল—"আমার রঘুবংশে ছদ্মনামে আমি গুপ্তবংশেরই প্রশংসা করেছি, যাতে প্রসন্ন হয়ে বিক্রমাদিত্য এই প্রাসাদ দিয়েছেন, কাঞ্চনমালার মত যবনসুন্দরী আমাকে প্রদান করেছেন—পনেরো বছর আমার সঙ্গে থেকেও আমায় তার সোনালী কেশপাশে বেঁধে রেখেছে। আমি এখন 'কুমারসম্ভব' রচনা করছি, দেখো এ এখন আরও কত কি এনে দেয় আমার হাতে।" (পৃঃ ১৮৮)।

'রঘুবংশে' বা 'কুমারসম্ভবে' গুপ্তরাজগণের কোনও প্রত্যক্ষ উল্লেখ বা স্তুতি নেই—এ কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থে প্রযুক্ত গুপ্ততমেন্দ্রিয়াঃ, স্কন্দ, কুমার প্রভৃতি পদ বা শব্দের উপর নির্ভর করে রাহুল যতদূর উঠেছেন ধরাশায়ী হওয়াই তার অনিবার্য পরিণাম। রঘুবংশে সূর্যবংশীয় রাজগণের সমৃদ্ধি ও সুশাসনের যে বর্ণনা আছে তা গুপ্তবংশের বর্ণনা বলে যদি ধরা যায়, তবে অশ্বকোষকৃত "সৌন্দরানন্দ" কাব্যে বর্ণিত কপিলাবস্তু ও শাক্য রাজগণের বর্ণনাও কুশল রাজবংশের বলে ধরব না কেন? কালিদাস কাঞ্চনমালা নাম্নী যবনসুন্দরীর সোনালী কেশপাশে তথা প্রণয়পাশে (শুনলেও পাপ হয়) আজীবন আবদ্ধ ছিলেন এই মূল্যবান্ (!) তথ্য কোন রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, অভিজ্ঞানশকুন্তলে পাওয়া যাবে মহাপণ্ডিত (?) রাহুল বা তাঁর সহচর শ্রীযুক্ত সাহা মহোদয় দয়া করে দেখাবেন কি? যাজ্ঞবল্ক্য, প্রবাহণ, কালিদাস, শ্রীহর্ষ প্রভৃতির প্রত্যেকের চরিত্রকে একই ভাবে লাম্পট্য-কলুষিতরূপে চিত্রিত করা দেখে আমাদের ত ঈশপস্ ফেবলস্-এর সেই ছিন্নলাঙ্গুল জম্বুকের কাহিনীই একটু পরিবর্তিত আকারে মনে পড়ে। মহাকবি ভবভূতির গ্রন্থেও 'কুমার' 'স্কন্দ' 'চন্দ্র' প্রভৃতি শব্দের বহুল প্রয়োগ দেখা যায়, তাই বলে ত' ভবভূতিকে কেউ গুপ্তযুগে ফেলতে চাইবেন না? যদি ঐ সকল কল্পনাকে আশ্রয় ক'রে কালিদাসকে গুপ্ত রাজসভায় নিয়ে ফেলতে হয় তবে, মালবিকাগ্নিমিত্রের ভরতবাক্যস্থিত রাজা অগ্নিমিত্রের উল্লেখটুকুই বা উপেক্ষা করা হবে কেন? এ সব বিস্তৃত আলোচনার স্থান এটা নয়। তর্কের খাতিরে ধরা গেল কালিদাস গুপ্তযুগীয়, এবং রাহুলের অবশ্যই সে মতে বিশ্বাস করবার অধিকার আছে। কিন্তু তাই বলে ঐ রকম দুর্নাম বা কলঙ্ক অর্পণ কেমন সত্যনিষ্ঠা, তা তাঁরাই জানেন। এদেশের কোনও কোনও অঞ্চলে কালিদাসের জীবনী সম্বন্ধে অলীক, অবান্তর বহু গাল-গল্প প্রচলিত আছে—তাতে অনেক স্থানে কালিদাসকে দুশ্চরিত্র বলে বর্ণনাও আছে—সেই সমস্ত লোকোক্তিতে ব্যথিত হ'য়ে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "এই গল্পগুলি জনসাধারণ কর্তৃক কালিদাসের কাব্য-সমালোচনা। ইহা হইতে বুঝা যাইবে, জনসাধারণের প্রতি আর যে কোনো বিষয়ে আস্থা-স্থাপন করা যাক, সাহিত্যবিচার সম্বন্ধে তাদের উপর অন্ধ নির্ভর করা চলে না।" অতি ক্ষোভের কথা, রাহুলজী মার্ক্সবাদে বা বৌদ্ধশাস্ত্রে যত বড় পণ্ডিতই হোন, রবীন্দ্রনাথ নির্দিষ্ট সেই অন্ধত্বের উপরে উঠতে পারেন নি। কবি-জীবনী আলোচনা করার ধৃষ্টতা প্রকাশ তিনি না করলেই পারতেন।

এর পর তিনি আরও এগিয়েছেন। নিতান্ত ভ্রান্ত এক মতবাদে বিশ্বাস স্থাপন করে বৌদ্ধ দার্শনিক দিঙ্‌নাগকে কালিদাসের সমকালীন ও প্রতিদ্বন্দ্বী বলেছেন। এ সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য এই রকম।—"কালিদাস গুপ্তরাজ, রাজতন্ত্র এবং তাদের পরম সহায়ক ব্রাহ্মণ্য ধর্মের একনিষ্ঠ সমর্থক ছিলেন। আর কি অভিপ্রায় থেকে তা ছিলেন, সে কথা আগেই বলেছি। দিঙ্‌নাগকে তিনি তাঁর কাজের পরাক্রান্ত বিরোধী বলে মনে করতেন। বলতেন, 'এই দ্রাবিড় নাস্তিকের সামনে শুধু বিষ্ণু নয়, তেত্রিশ কোটি দেবতারই আসন টলে ওঠে। রাজা ও ব্রাহ্মণের স্বার্থের জন্য ধর্মের নামে আমি যা কিছু কূট-কলাকৌশল বের করি, তার রহস্য তার কাছে অজ্ঞাত থাকে না, মুস্কিল এই ছিল যে, বৃদ্ধ বসুবন্ধুর মত গুরু সে পেয়েছিল।' —পৃঃ (১১২৩), এত বাগাড়ম্বর আসলে শ্রীযুক্ত সাহার ভাষায় "ইতিহাসের ইঙ্গিতমাত্র আশ্রয় করে কাহিনীতে গাঢ় বর্ণলেপ মাত্র।"

উক্ত উদ্ধৃতিতে নিবদ্ধ মত নিছক ভ্রান্তি ও ম্যাক্সমূলারের মতের রোমন্থন। মেঘদূতের ১।১৪ সংখ্যক শ্লোকে যে 'দিঙ্‌নাগানাম্' পদ আছে তার টীকায় মল্লিনাথ ও দক্ষিণাবর্তনাথ বলেন যে, এখানে কালিদাস তাঁর কাব্যের কোন স্থূলপ্রতিভ কু-সমালোচকের প্রতি কটাক্ষ করেছেন। ভারতীয় আধুনিক পণ্ডিতদের বিশ্বাসযোগ্য মত এই যে, ঐ ব্যাখ্যা মল্লিনাথ প্রভৃতির ভুল। কারণ, প্রথমতঃ ঐ ভাবে কারও সমালোচনা বা কারও প্রতি কটাক্ষ করা কালিদাসের স্বভাববিরুদ্ধ। তাছাড়া 'দিঙ্‌নাগানাং' এই বহুবচনান্ত পদের ব্যাখ্যায় মল্লিনাথ যে বলেছেন "পূজায়াং বহুবচনম্" সেটা তাঁর স্ববিরোধী উক্তি। ঐ প্রমাদপূর্ণ উক্তির উপর নির্ভর করেছেন বলে অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার এবং ঐ মতের অনুগামীরা সকলেই ভ্রান্ত। আরও লক্ষ্য করার কথা, উক্ত 'দিঙ্‌নাগ' যে বৌদ্ধ দার্শনিক আচার্য দিঙ্‌নাগ তা' ত মল্লিনাথ থেকে বোঝা যায় না। মল্লিনাথ দিঙ্‌নাগের এই মাত্র পরিচয় দিয়েছেন 'দিঙ্‌নাগাচার্য্যস্য কালিদাসপ্রতিপক্ষস্য' সেই দিঙ্‌নাগ যে বিখ্যাত নৈয়ায়িক দিঙ্‌নাগ তারই বা প্রমাণ কোথায়? কালিদাস হলেন "নিছক কবি" আর দিঙ্‌নাগ দার্শনিক (সম্ভবতঃ মহাপুরুষও!)। তাঁদের প্রতিপক্ষতা কিরূপে সম্ভব? কালিদাস রাজতন্ত্র ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের জন্য কি কি কৌশল বের করতেন? আর দার্শনিক দিঙ্‌নাগই বা কোথায় কালিদাসের সেই সকল মত খণ্ডন করেছেন? বাস্তবিক পক্ষে কালিদাস ও বৌদ্ধ দিঙ্‌নাগের সমসাময়িকত্ব ও দিঙ্‌নাগের বসুবন্ধুর শিষ্যত্ব সম্পূর্ণ অনুমানের ব্যাপার। কাজেই কালিদাসের সম্বন্ধে পূর্বোদ্ধৃত উক্তিগুলি অনৈতিহাসিক ও ভ্রান্তিমূলক। (কালিদাস সম্পর্কিত অংশের রচনায় অধ্যাপক রমেন্দ্র বসু, স্বর্গীয় অশোকনাথ শাস্ত্রী, M. R. Kale প্রভৃতি পণ্ডিতবর্গের নিকট ঋণ স্বীকার করিতেছি)।

গুপ্তরাজাদের প্রতি রাহুলের আক্রমণও নিছক সাম্প্রদায়িক

...বাদমূলক সঙ্কীর্ণতা। তৎসম্পর্কিত উক্তিগুলিও ইতিহাস বিপরীত। গুপ্তরাজাদের অপরাধ, তাঁরা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। রাহুল লিখেছেন—"...কিন্তু গুপ্তশাসন কি দেশের প্রত্যেক পরিবারকে এতই সুখী করে রেখেছে, যে বাটপাড়ি, রাহাজানি সম্পূর্ণ উঠে গেল? না, গুপ্তরাজারা কর আদায়ের ব্যাপারে পূর্বতন সকল শাসককেই হার মানিয়েছে।" (পৃ: ১৮৯) অন্যত্র লেখা হ'ল—

"...কিন্তু এতে লাভ কার? সকলের চেয়ে বেশী গুপ্তরাজাদের, যারা সকল পণ্যের উপর অত্যধিক শুল্ক আদায় করে থাকে,...গ্রামের কৃষক এবং কারিগরেরা এত গরীব কেন? এবং ছোট-বড় রাজপথ গুলোকে সুরক্ষিত রাখবার জন্য গুপ্তরাজাদের এত তৎপরতা কেন?"... ইত্যাদি (পৃ: ১৯০)। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, রাহুল বলতে চান, গুপ্তরাজারা ছিলেন অত্যাচারী, তাঁদের রাজ্যে দরিদ্র কৃষক ও কারিগরেরা নিপীড়িত হ'ত। রাজারা যে পথ-ঘাট নির্মাণ প্রভৃতি করতেন, তা কেবল নিজেদের স্বার্থে বেশী শুল্ক আদায় করবার জন্য। কর আদায়েও তারা ছিলেন রূঢ় ও উৎপীড়ক। এ সকল কথার বিরুদ্ধে অধিক প্রমাণের দরকার নেই।

কেবল যে ফা'হিয়েনের বৃত্তান্তকে শ্রীযুক্ত সাহা গুপ্তযুগের বিবরণের উৎস বলে স্বীকার করেছেন, তারই কিছু অংশ পাঠকদের সম্মুখে উপস্থাপিত করবো। ফা'হিয়েনের ভ্রমণ-বৃত্তান্তের এক অনুবাদ পিকিং এর Chinese Buddhist Association থেকে বর্তমান সালে, "A Record of the Buddhist Countries" নামে প্রকাশিত হয়েছে। তা থেকেই উপস্থিত উদ্ধৃত করা গেল।

"The people are rich and contented unencumbered by any poll-tax or official restrictions. Only those who till the king's land pay a tax and they are free to go or stay as they please". (Page—34)

"The people are rich and prosperous".
(page—60)

আর পথ-ঘাট নির্মাণ ও রক্ষার ব্যবস্থাকে ত গুপ্ত-রাজাদের লাভজনক ব্যবসা বলে, ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যার মুখরক্ষা হ'ল, কিন্তু ফা'হিয়েন যে দেশময় চিকিৎসালয়, বিদ্যালয় প্রভৃতি দেখেছেন তার কি রকম অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা হবে?

উৎপীড়ন ও কর আদায় ভিন্ন গুপ্তরাজাদের বিলাসিতার বর্ণনা করতে গিয়েও তিনি অনুরূপ ভুল করলেন। বৌদ্ধ সম্রাট অশোক সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নীরব থেকে তাঁর সমস্ত বিলাসিতার বর্ণনাগুলি গুপ্ত-রাজাদের স্কন্ধে চাপিয়ে দিলেন। তিনি লিখলেন,—"রাজপ্রসাদ তৈরী করতে আরও কত অর্থই না ব্যয় হয়েছে। পাহাড়, নদী, সরোবর, সমুদ্রকে সশরীরে উঠিয়ে এনে এবং আপন প্রাসাদের সংলগ্ন করে রাখবার প্রয়াস পেয়েছে।" (পৃ: ১৮৯) ঐতিহাসিকতার প্রশ্ন বাদ দিলেও এই অংশে মজার কথা, নদী, সমুদ্র, সরোবর প্রভৃতিকে সশরীরে উঠিয়ে আনা—মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। আসলে প্রস্তরস্তূপ দিয়ে উদ্যানে কৃত্রিম পর্বতে ও উপবন প্রভৃতি নির্মাণ সম্রাট অশোকের কীর্তি। রাহুলজী অবশ্য বৌদ্ধ বলে তাঁকে অব্যাহতি দিয়ে সব দোষ গুপ্তরাজাদের স্কন্ধে চাপিয়েছেন। পাঠকের সন্দেহ হয় অনুগ্রহ করে পূর্বোল্লিখিত ফা'হিয়েনের ভ্রমণ বৃত্তান্তের (A Record of the Buddhist countries) ৫৮-৬০ পৃষ্ঠা পড়ে দেখবেন—

মহারাজ অশোকের রাজপ্রাসাদ এত বিশাল ও কারুকার্যপূর্ণ ছিল যে ফা'হিয়েন তাকে ভূত ও দৈত্যদের অমানুষিক শক্তিতে সৃষ্ট মনে করেছিলেন। অশোকের উদ্যানে পর্বত ও গুহা নির্মাণের কাহিনীও ফা'হিয়েন সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন।

আমরা অবশ্য একথা বলছি না, গুপ্তরাজারা বিলাসী ছিলেন না, শুধু বলতে চাইছি যে রাহুলের বর্ণনা অনৈতিহাসিক, যুক্তিহীন অত্যুক্তিপূর্ণ ও বিদ্বেষাত্মক।

এ ছাড়া তিনি বাণভট্ট, হর্ষশিলাদিত্য, প্রভৃতি সম্বন্ধেও অনৈতিহাসিক অনেক উক্তি করেছেন। বাহুল্য বোধে সেগুলি আমরা আর আলোচনা করলাম না। ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিরুদ্ধে রাহুল যে সকল কটূক্তি করে নিজের গাত্রদাহ নিবারণের প্রয়াস পেয়েছেন তার আলোচনা আমরা করতে চাই'না। কারণ একজন বিধর্মীর ঐ সকল প্রলাপময় উক্তিতে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ স্বীকৃত ধর্মের এতটুকুও মর্যাদা হানি সম্ভব নয়। কাল বশে হিন্দুসমাজে অনেক গলদ প্রবেশ করেছে, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ তার প্রতিকারের চেষ্টা করেছেন বা করে আসছেন কিন্তু বেদ উপনিষদ ও দর্শন-সমৃদ্ধ হিন্দু সনাতন ধর্মের ভিত্তি টলান রাহুলের মত অস্থিরচিত্ত ধর্মত্যাগীর সাধ্য নয়—তার প্রমাণ আড়াই হাজার বৎসরের ইতিহাস।

ভারতীয় যাদুবিদ্যার জয়যাত্রা

যাদুসম্রাট পি, সি, সরকার

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর দুনিয়ার চেহারার বিরাট এবং বিস্ময়কর পরিবর্তন ঘটেছে। বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, অগ্রগতির এত দ্রুত গতি এর আগে নাকি দেখা যায়নি।

দুনিয়া মানে শুধু মানবগোষ্ঠীই নয়, তার সমস্ত সৃষ্টি, সাহিত্য, শিল্প, ভাস্কর্য্য ও কলাবিদ্যাতেও নূতনের ছাপ লেগেছে। এটা স্বভাবী। সৃষ্টির আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত ধাপে ধাপে সভ্যতার ক্রমবিকাশ ঘটেছে, ঘটবে। এটাই হ'ল পৃথিবীর ধর্ম।

প্রগতির প্রভাব থেকে যাদুবিদ্যাও পরিত্রাণ পায়নি। বর্তমান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী কয়েক বছরের কথা ধরা যাক। এখন স্টেজে যাদুবিদ্যা বা ম্যাজিকের যে চেহারা ফুটে উঠেছে, তাতে স্পষ্টই বোঝা যায়, যাদু কোন স্তর থেকে কোথায় এসে পড়েছে। যাদুবিদ্যার ক্রমোন্নতির ক্ষেত্রে ভারতে বাংলা দেশের দান বড় কম নয়।

অনেকে মনে করতে পারেন যে, এ যুগের মঞ্চে আমরা যাদুবিদ্যার যে ম্যাজিকী চেহারা দেখছি সেটা খাঁটি ভারতীয় বস্তু নয়। স্বাধীন ভারতে ভারতীয়-মার্কা নির্ভেজাল যাদুবিদ্যাকে পাদপ্রদীপের উজ্জ্বল আলোর সামনে টেনে আনা হোক। আপাতদৃষ্টিতে এরূপ মনে

হ'লেও প্রকৃত ঘটনা তাঁরা যদি সম্যক ভাবে অবগত হন, মত পাল্টাতে বাধ্য হবেন।

অথর্ববেদ অথবা শঙ্করাচার্য্য লিখিত গ্রন্থাদিতে মায়াবিদ্যার উল্লেখ আছে। যেমন রামায়ণে রাম-রাবণের যুদ্ধের বাণ-মারণ অস্ত্রের বিচিত্র কাহিনী। মহাভারতে তো আরও বেশী আছে। ঐ সব অদ্ভুত কাহিনী নিছক কল্পনা বা এর পেছনে যাদুবিদ্যার কোন ছোঁয়াচ আছে কি না জানা যায় নি। যদি ভীষ্মের শরশয্যা, গঙ্গাবতারণ প্রভৃতিকে যাদুবিদ্যার প্রয়োগ কৌশল বলেও ধরে নেওয়া হয়, তাহলে বলতে হয় ঐ সমস্ত যাদুর গোপন কৌশল গোপনই থেকে গেছে, কোথাও কোন হদিস পাওয়া যাচ্ছে না। তা ছাড়া মনে রাখতে হবে যে, যাদুবিদ্যা হচ্ছে একটি অতীব গুপ্তবিদ্যা। প্রাচীনযুগের গুরুমুখী বিদ্যা শিক্ষার যুগে এই বিদ্যা গুরুর মুখ থেকে শিষ্য শুনে শিখেছেন, তার পর আর শিষ্য, তার পর—বিলুপ্তি। মুদ্রাযন্ত্রের এই যুগে এখনও বহু তন্ত্র বিদ্যা কাগজে ছাপা হয় না। গুরুর নিষেধ।

খাঁটি ভারতীয় যাদুবিদ্যার যে কয়টি 'আইটেম' আজ পর্য্যন্ত গবেষকদের মারফত জানা গেছে, সেগুলি প্রায়শই হস্তলাঘব শ্রেণীর। আর বড় জাতের যে কয়েকটি যাদুর খেলা মূল কৌশল সমেত জানা গেছে তারই কয়েকটি এককালে আমিও দেশ-বিদেশে দেখিয়েছি। কিন্তু আজ সেই খেলাগুলির কৌশল রূপটি বজায় রেখে এখানকার দর্শকগোষ্ঠীকে পরিবেশন করতে সাহস পাচ্ছি না। কারণ কি? এ এক গতিশীল নূতন যুগ। এই বিজ্ঞান-আধুনিক যুগে রেডিও, টেলিভিষন, রকেট প্রভৃতি মানুষের চিন্তাধারায় এক নূতন প্রলেপ দিয়ে রূপান্তর ঘটিয়েছে। দেশ বিদেশের দূরত্বের সীমা সঙ্কীর্ণ হয়ে পড়েছে। আর ভাব বিনিময়ের গণ্ডীও বিস্তার লাভ করেছে। ভারতে বাহিরের যাদুবিদ্যার গতি দেখবার, বোঝবার এবং মতবিনিময়ের সুবর্ণ সুযোগ পাওয়া গেছে। ভারতীয় যাদুবিদ্যা সম্পর্কে যে তথ্য পাওয়া গেছে তা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়—এদেশের যাদুবিদ্যা হচ্ছে কঠোর শ্রম-কেন্দ্রিক এবং কঠিন মনঃসংযোগের উপর এর কাঠামো। নিরবচ্ছিন্ন অভ্যাসই হচ্ছে ভারতীয় যাদুবিদ্যার শিক্ষার সোপান। কিন্তু ওদেশের যাদুবিদ্যা হচ্ছে যন্ত্র-প্রধান। ওদেশের শিল্পীরা অভ্যাসকে সংক্ষেপিত করার জন্য সর্ব্বদাই চেষ্টা করেন। ফলে ক্রমশঃ ওরা অভ্যাসের দাসত্ব থেকে মুক্ত হতে গিয়ে যন্ত্রের দাস হয়ে পড়েছেন। আমরা কিন্তু দুটিই বজায় রেখে চলছি, এইমাত্র তফাৎ।

সে যাই হোক, যাদুবিদ্যার নবতম সংস্করণে বিজ্ঞানের সব রকম ছাপই এর স্তরে স্তরে ফুটে উঠেছে। বিজ্ঞানের যুগে বিজ্ঞানকে অবহেলা করার মানে হচ্ছে জলে থেকে কুমীরের সঙ্গে বিবাদ করার সামিল। কাজেই আমার "ইন্দ্রজাল" প্রদর্শনীতেও বিজ্ঞানকে নিতে হয়েছে। তাইতো নিওন লাইট, ব্ল্যাক লাইট, বেগুনে আলো **Ultra Violet light** প্রভৃতি আছে। আবার এরই সঙ্গে দৃশ্যপট, দামী পোষাক, রঙিন সাজপাট সবই আছে।

যুদ্ধপূর্ব্ব যুগে যখন এ সবের বালাই ছিল না, তখন কি হোতো? তারও জবাব আছে। এককালে আমিও সেই কালো টেলকোট আর কাল টুপী পরে কাল পর্দ্দাকে পেছনে রেখে বড়লোকের আসরে ম্যাজিক দেখিয়েছি। সে ম্যাজিক দেখে কি দর্শকরা খুসী হন নি? নিশ্চয়ই হয়েছেন। কিন্তু আজ যদি আবার আমি সেই পুরান পোষাক আর টুপী মাথায় দিয়ে কাল পর্দ্দাকে পেছনে রেখে সেই পুরোনো **item** পরিবেশন করি কতটা ভালো লাগবে দর্শকদের? আমার তো মনে হয় প্রগতিবাদী কোন দর্শকেরই মনঃপূত হবে না।

মানুষ নূতনের উপাসক। পুরাতনকে ধীরে ধীরে বর্জ্জন করে আমিও নূতনের দিকে অগ্রসর হচ্ছি। পাশ্চাত্যের যাদু কৌশলকে উপেক্ষা করিনি কিন্তু ষ্টাইল ষোল আনা ভারতীয়। আমার "ইন্দ্রজাল" প্রদর্শনী হচ্ছে ভারতীয় ভাবধারার পরিপোষক এবং সাংস্কৃতিক ধারা বিশেষ। এদেশের বিদগ্ধ সমাজ আমার ইন্দ্রজাল প্রদর্শনী দেখে খুসী হয়েছেন, অভিনন্দন জানিয়েছেন, আমিও ধন্য হয়েছি। কিন্তু কর্ত্তব্যের বোঝা তাতে লাঘব হয়নি, বরং বেড়েছে। ভারতের চিত্রকলা, ভারতের বেশভূষা, আদব কায়দা কত রুচিসম্মত কত সূক্ষ্ম রসবোধক। আমি আমার ইন্দ্রজালের পশরায় তার কিছুটা আলেখ্য প্রমাণ হিসাবে বিদেশের দরবারে দরবারে দেখাবার জন্য একান্ত অনুগত ভারতের সাংস্কৃতিক দূত হয়ে দূর দূরান্তরে ছুটে চলেছি।

এক সময়ে শ্বেতকায় জাতির বংশধরেরা এদেশের রাজত্ব কায়েম করার প্রথম পর্য্যায়ে ভারতীয় শিল্পীদের নৈপুণ্য এবং গুণপণাকে পর্য্যুদস্ত করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। স্বার্থসিদ্ধির অনুকূলে বিদেশী শাসকেরা এক সময়ে এই বাংলা দেশের মসলিন কাপড় বোনার সুনিপুণ শিল্পীদের বুড়ো আঙ্গুলগুলি কেটে দিয়ে তাঁদে তাঁতের কাজে খড়্গাঘাত করে নীচতার পরিচয় দিয়েছিলেন। কিন্তু এত সত্ত্বেও বাংলার তাঁতীকুল মরেনি, তাঁতশিল্প আজও বেঁচে আছে এবং থাকবেও। এই ইংরেজেরই ঘরে গিয়ে আমি ম্যাজিক দেখিে এসেছি। স্বাধীন ভারতের নাগরিক আমি। কারও তাঁবেদা নই। তাঁতীদের আঙ্গুল কাটার সেই দুর্ব্বুদ্ধি আজও তাদের কমেনি কিন্তু আমার আঙ্গুলে ছুরি বসেনি, বসাতে পারেনি, তার বদলে ইংরাজ জাতির বিদগ্ধ সমাজ আমাকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ যাদুকর হিসাে ঘোষণা করে সম্মানিত করেছেন। সবই যুগধর্ম্মের প্রভাব আমেরিকায় বিশ্ব যাদুকর সম্মেলনের ভোজসভায় আমায় সম্মানি অতিথি হিসাবে সকলে এক সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে সম্ভ্রম দেখালেন সেদিন জাতীয় গর্ব্বে আমার বুকটা ফুলে উঠল। আমেরিকা ভোজসভায় প্রদত্ত এই মর্য্যাদা একক আমার প্রাপ্য নয়। মর্য্যাদা প্রদর্শিত হয়েছে ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকার ধারক ও বাহ ভারতবর্ষকে, বিশ্ববন্ধু জওহরলালের হিন্দুস্থানকে। জয় হিন্দ!

"Many beautiful women are useless beings, but I have them at my parties instead of flowers, just to be decorative."

—Elsa Maxwell.

পত্রাবলী

অধ্যাপক সুরেশচন্দ্র সরকার

ইহা বহুকথিত উক্তি যে রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ অভিন্ন যুগ্ম-পুরুষ। একজন ধ্যানমৌন তপস্যার মধ্য দিয়া যে জ্ঞান অর্জন করিলেন, অপর জন বিশ্বহিতার্থে সেই জ্ঞান কর্মের মধ্য দিয়া দেশে-বিদেশে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে অকাতরে দান করিয়া গেলেন। কেহ কেহ সেই জ্ঞান মনে প্রাণে গ্রহণ করিয়া ধন্য হইলেন। কেহ যুক্তিতর্কের দ্বারা তাহা বুঝিতে চাহিলেন আবার কেহ সংস্কার ও সন্দেহের গণ্ডিজালে আবদ্ধ রহিলেন। কিন্তু এই কাজ যেন একই জীবনে সাধিত হইল—বিবেকানন্দের জীবদ্দশায় রামকৃষ্ণের তিরোধান যেন একটা লৌকিক ঘটনা মাত্র।

যাহা হউক, ক্রমেই বোধ হইতেছে দেশ ও সমাজ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের কথা গভীর ভাবে চিন্তা করিতেছে। সম্ভবত, ধনী ও মানী ব্যক্তিগণ তাহাদের ধন ও প্রতিপত্তির স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া তাঁহাদের বাণী স্মরণ করিতেছেন। পক্ষান্তরে নির্ধন ও অপমানিতের দল যুগান্ত-সঞ্চিত দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, ভয় ও অপমানের অবসানের উদ্দেশ্যে তাঁহাদের আদেশ ও উপদেশ গ্রহণ করিতেছে। কারণ যাহাই হউক, শুভ লক্ষণ সন্দেহ নাই। বিঘ্নসঙ্কুল জাতীয় জীবনে এই সাধু প্রচেষ্টার মূল্য কম নয়।

এই প্রচেষ্টাকে সফল করিবার সহজ পন্থা কি? উচ্চ দার্শনিক তত্ত্বের দিক দিয়া যাঁহারা বিচার করেন, তাঁহারা অদ্বৈতবাদ (জ্ঞান) বা দ্বৈতবাদ (জ্ঞান ও ভক্তি) প্রভৃতির যুক্তিযুক্ততা বিচার করিতে পারেন। কিন্তু আমাদের মত সাধারণ লোকের পক্ষে দার্শনিক তত্ত্বের সুদীর্ঘ আলোচনার সময় ও সুযোগ অতি অল্প। আমাদিগকে কিছুটা জানিতে হইবে এবং সেই সংগে কিছুটা জীবনে প্রতিফলিত করার চেষ্টাও পাইতে হইবে। আমাদের যতই দোষ থাকুক এটা অতি সত্য যে ভারতবর্ষ দার্শনিকের দেশ। যুগ যুগ ধরিয়া এ দেশে যে শত শত দার্শনিক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, আমি এখানে তাঁহাদের কথা বলিতেছি না। পুরুষানুক্রমে নিরক্ষর অগণ্য গ্রাম্য লোকের কথা বলিতেছি।

তাহাদের মুখে শুনিয়াছি, "এই দেহ!—এ তো ছেঁড়া কাপড়, সময়মত ফেলে দিয়ে নতুন কাপড় পরলেই হলো!" যেখানে আশা করা যায় না, এমন স্থানে এইরূপ কথা যায় শোনা। তথাপি কি উচ্চ স্তরে, কি নিম্ন স্তরে কথা ও কাজের মধ্যে বিলক্ষণ ব্যবধান দেখিয়া অনুমান হয় আমাদের উক্তি ও উপলব্ধির মধ্যেও প্রচুর ব্যবধান রহিয়াছে। প্রসঙ্গত, সক্রেটিশের জ্ঞান-ধর্ম তত্ত্বের কথা (**knowledge-virtue dictum**) স্মরণ হয়। সক্রেটিশের আপাতবিরোধী বক্তব্য এই যে, কোন লোকে অজ্ঞানতা বশতঃ অন্যায় করিলে তাহা ক্ষমার অযোগ্য, অথচ জ্ঞানত করিলে তাহা ক্ষমার্হ। সাধারণ ভাবে বিবেচনা করিলে এই মত সমর্থন করা যায় না। কিন্তু এস্থলে তাৎপর্য্য এই যে, জ্ঞান সত্ত্বেও প্রবৃত্তির অভাব—ইহা [illegible] রক্ষিতে হইবে প্রকৃত জ্ঞানেরই অভাব ঘটিয়াছে। সেইরূপ স্থলে যাহাকে জ্ঞান বলিয়া অভিহিত করা হয়, সক্রেটিশের মতে তাহাকে ব্যক্তিবিশেষের মতামতের অধিক কোন আখ্যা দেওয়া চলে না। সুতরাং দর্শনসম্মত গুরু-গম্ভীর উক্তি অনেক ক্ষেত্রেই অর্থহীন কথার কথা মাত্র।

সুতরাং উক্তিই যথেষ্ট নয়—উক্তির পশ্চাতে উপলব্ধির প্রয়োজন রহিয়াছে এবং এরূপ ক্ষেত্রে উপলব্ধিমাত্রই সুদীর্ঘ সাধনা-সাপেক্ষ। বিশেষত রামকৃষ্ণের ভাব ভাষার দিক দিয়া সহজ হইলেও আচরণের দিক দিয়া অতি দুরূহ, অতি দুঃসাধ্য। রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে বিবেকানন্দের সুচিন্তিত অভিমত:—**"His life is a searchlight of infinite power thrown upon the whole mass of Indian religious thought. He was the living commentary to the vedas and their aim. He had lived in one life the whole cycle of the national religious existence in India."** (পত্রাবলী, ৩য় ভাগ, ১৪২ পৃঃ)

রামকৃষ্ণ স্বদেশে ও বিদেশে মহামনীষিগণের স্বীকৃতি লাভ করিয়াছেন এবং তাঁহার অলৌকিক অনুভূতি অবলম্বনে অজস্র তথ্যবহুল গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। রামকৃষ্ণের প্রভূত ভাব যেমন গ্রন্থ হইতে গ্রন্থে বিচরণ করিতেছে, তেমনি যাহাতে সঠিক ভাবগুলি লেখক ও পাঠকের চিত্তকেও অধিকার করিতে পারে সে দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। প্রকৃত ভাবরাজির যথাযথ অনুভূতি যে কেন সহজসাধ্য নয় তাহার একটি কারণ স্বামিজী বহু পূর্বেই নির্ধারণ করিয়াছেন। আমেরিকা হইতে জনৈক শিষ্যকে তিনি লিখিয়াছেন: "তাঁর (রামকৃষ্ণের) অদ্ভুত গল্পগুলি সম্বন্ধে বক্তব্য এই, আমি তোমাকে পরামর্শ দিচ্ছি, তুমি সেগুলি থেকে—আর যে সব—ওগুলি লিখছে, তাদের থেকে তফাৎ থাকবে। সেগুলি সত্য বটে কিন্তু আমি নিশ্চিত বুঝছি,—সে গুলো তালগোল পাকিয়ে খিঁচুড়ি করে ফেলবে।" (পত্রাবলী ৫ম ভাগ, ৮১পৃঃ) পুনরায় তিনি আলাসিংগাকে লিখিতেছেন: "রামকৃষ্ণ-কৃত অলৌকিক ক্রিয়া সম্বন্ধে কি পাগলামি হচ্ছে? আমার অদৃষ্টে সারাজীবন দেখছি—ইত্যাদি।" (পত্রাবলী ৫ম ভাগ, ৮৪ পৃঃ)। পক্ষান্তরে কিন্তির পত্রেই তিনি লিখিয়াছেন: "রামকৃষ্ণকে প্রচার কর। যে পেয়ালা খেয়ে তোমার তৃষ্ণা মিটেছে তা অপরকে খাইয়ে দাও।" সুতরাং রামকৃষ্ণের জীবনী অবলম্বনে উভয় প্রকার গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। আবার কোন কোন গ্রন্থে উভয় ভাবই পাশাপাশি থাকা অসম্ভব নয়—তালগোল পাকান খিচুড়ি এবং পান-পরিতৃপ্তির পেয়ালা। তথাপি উদ্বেগের কোন কারণ নাই—পরিতৃপ্তির পেয়ালা যথেষ্ট রহিয়াছে এবং দৃষ্টান্তস্থলে পরিতৃপ্তির অন্যতম শ্রেষ্ঠ পেয়ালা পত্রাবলী।

যাহা হউক, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ প্রসংগ অবলম্বনে যে এক

বিশাল সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা অনস্বীকার্য। বিশাল সাহিত্য মাত্রেই এক একটি প্রবেশ-পথ রহিয়াছে। যেমন রবীন্দ্র সাহিত্যের কথাই যদি ধরা যায় তবে তাহারও প্রবেশ-পথ নির্ধারণ করিতে হয়। নতুবা, তরুণেরা কোন পথ ধরিয়া তাহাতে প্রবেশ করিবে? প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে যেমন রবীন্দ্রনাথের "কথা ও কাহিনী" (কাব্য গ্রন্থের) ও "গল্পগুচ্ছ" (গল্প সাহিত্যের), তেমনি স্বামিজীর "পত্রাবলী"কে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ দেউলের তোরণদ্বার বলা যাইতে পারে। একবার এ বিশাল পুরীতে প্রবেশ করিতে পারিলে প্রাচ্য-পাশ্চাত্য, কর্মযোগ, ভক্তিযোগ প্রভৃতি এক কক্ষ হইতে, অন্য কক্ষে ভ্রমণের ন্যায় সহজ ও স্বাভাবিক মনে হয়। "জনসাধারণ ব্যক্তিকে চায়, আর শিক্ষিত সম্প্রদায় চায় নীতি।" (পত্রাবলী ৩য় ভাগ, ১৩০ পৃঃ)। মনস্তত্ত্ব, শিক্ষাতত্ত্ব বা যে কোন দিক দিয়া বিচার করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে তরুণদের পক্ষে ব্যক্তিকে অবলম্বন করিয়া নীতির দিকে অগ্রসর হওয়াই শ্রেয়ঃ।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ প্রসংগে রচিত গ্রন্থের কথা বলিতেছিলাম ঠাকুরের একটি কথা বিশেষ ভাবে স্মরণ করিয়া। একজন ব্রাহ্মভক্তের সংগে কথাবার্তায় ঠাকুর জানিলেন যে ভক্তটি ধর্ম-সভা ও বক্তৃতার জন্য দিবারাত্র পরিশ্রম করিতেছেন। ঠাকুর বলিলেন, কাজ অতি উত্তম সন্দেহ নাই—তবে ভক্তটি আদেশ পাইয়াছেন কি না তিনি কেবল তাহাই জানিতে চাহিলেন। স্বামিজী নিজেও এই আদেশের উল্লেখ করিয়াছেন—কেবল গ্রন্থ রচনায় নয়, জীবনের প্রতিটি কাজেই সেই আদেশ। একজনকে স্বামিজী লিখিতেছেন—"আমি যখন আদেশ পাবো, তখন ফিরে যাবো।" (পত্রাবলী ৫ম ভাগ, ১২৯ পৃঃ)। আমাদের দুঃখের কারণ এই যে বিনা আদেশেই আমরা বহু কাজে প্রবৃত্ত হই।

মানবপ্রেমিক বিবেকানন্দের উক্তি, "জগতের সমুদয় ধনরাশির চেয়ে মানুষ হচ্ছে মূল্যবান্।" (পত্রাবলী, ৫ম ভাগ ১৪৫ পৃঃ)। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, আমরা এক দিকে যেমন প্রাকৃতিক সম্পদের অন্য দিকে তেমনি মানবীয় সম্পদের অপচয় করিতেছি। আমরা প্রকৃত কর্তব্যপরায়ণ, ন্যায়নিষ্ঠ ও চরিত্রবান তরুণ সম্প্রদায় চাই বলিলেই পাওয়া যাইবে না। আমাদের জানা এবং বুঝা উচিত যে ধর্মও একপ্রকার বিজ্ঞান এবং ধর্মজীবনও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আয়ত্ত করিতে হয়। ঠাকুরের একটা সাধারণ দৃষ্টান্ত—সংকীর্তন। প্রথমে সংকীর্তন শুনিতে হয়, লীলা কীর্তন শুনিবার বা বুঝিবার যোগ্যতা আসে অনেক পরে।

পত্রাবলীকে আমরা প্রবেশদ্বার বলিয়া অভিহিত করিয়াছি। কিন্তু প্রবেশদ্বারেও প্রবেশ পদ্ধতি আছে। ধর্মজীবনে কর্মতৎপরতার প্রয়োজন সমধিক এবং পত্রাবলী সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কর্ম-পদ্ধতি অনুসরণ করা যাইতে পারে।

প্রথম শিক্ষার্থী পত্রগুলিকে পারম্পর্যক্রমে যথাযথ ভাবে সাজাইয়া লইবে। যেমন—

১৮৮৮ খৃষ্টাব্দ

ভাগ	পৃষ্ঠা	পত্রের সংখ্যা	স্থান	তারিখ
৩	৫	৫	বরাহনগর	৪ ফেব্রুয়ারী
	ইত্যাদি		ইত্যাদি	

তারপর ভারতবর্ষ ও পৃথিবীর মানচিত্র আঁকিয়া পরিব্রাজক স্বামিজীর পথ-পরিক্রমা মানচিত্রে চিহ্নিত করিয়া সেই অনুসারে পত্রগুলি পর পর পড়িতে থাকিবে। অপরে এই সম্বন্ধে কোথায় কি বলিয়াছেন বা না বলিয়াছেন, তাহা এই মুহূর্তে জানার প্রয়োজন নাই। যাহা হউক, অধ্যয়নের সংগে সংগে যে উক্তিগুলি সমধিক হৃদয়গ্রাহী বোধ হইবে তাহা পাঠক সংগ্রহ করিতে থাকিবে। এইভাবে কিছুদূর অগ্রসর হইলেই পাঠকের স্বতঃই মনে হইবে যেন পাঠক স্বামিজীর সাহচর্য লাভ করিয়াছে এবং প্রসঙ্গক্রমে যেন অনেক কথা তাহার উদ্দেশ্যেই বলা হইতেছে। এমন কি, কোন কোন উপদেশ সাক্ষাৎ ফলপ্রদ—তাহার ব্যক্তিগত সমস্যা সমাধানে সাহায্য করিতেছে!

স্বামিজীর জীবনী ও জীবনদর্শনের প্রতিচ্ছবি পত্রাবলী একটি মূল গ্রন্থ। জীবনীকার মাত্রেই পত্রাবলী হইতে প্রচুর উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন। অজ্ঞাত, অখ্যাত নিঃসম্বল বাঙ্গালী যুবক কি ভাবে বিভিন্ন অবস্থার মধ্য দিয়া বিশ্ববিশ্রুত বিবেকানন্দে পরিণত হইলেন তাহার অনেক সন্ধান ইহাতে রহিয়াছে। কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করা প্রবন্ধকারের উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য এই তরুণ পাঠক নিজেই সেইগুলি সংগ্রহ করিয়া আবিষ্কারের আনন্দলাভ করিবে। স্থানে স্থানে প্রয়োজনবশে রচিত উপদেশমূলক উক্তিগুলি যেন কর্মবীর স্বামিজীর 'কথামৃত'। তাহাদের যে কোন একটি মনে প্রাণে গ্রহণ করিতে পারিলে জীবনের ভিত্তি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।

স্বামিজী এক স্থানে বলিয়াছেন: "অসীম বিশ্বাস ও ধৈর্যই কৃতকার্য হবার একমাত্র উপায়।" (পত্রাবলী, ৫ম ভাগ, ১৩১ পৃঃ)। ইহার পর আর সাধারণ প্রশ্ন হয় না। তথাপি যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন—বিশ্বাস ও ধৈর্য লাভের উপায়? তাহার উত্তর বিশ্বাসের দ্বারাই বিশ্বাস এবং ধৈর্যের দ্বারাই ধৈর্য অর্জন করিতে হয়। "অথাতো"—জিজ্ঞাসা অবশ্য সম্ভব। কিন্তু সে জিজ্ঞাসা অতি অল্প সংখ্যকের জন্য বিশেষ অবস্থায় এবং প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে কখনও নয়।

"If you must write, write. But keep away from literary circles. There people only talk books but seldom write them."

—*Georges Simenon.*

রবীন্দ্রনাথকে লেখা জগদীশচন্দ্র বসুর চিঠি

১

২১।৬।১৯০৪

বন্ধু,

তোমার শারীরিক অবস্থা কিরূপ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, সে সম্বন্ধে যে নিরুত্তর! ইহার অর্থ কি? তুমি যদি সম্পূর্ণরূপে সারিয়া না আইস, তবে তোমার সঙ্গে বোঝাপড়া আছে।

তোমার সহিত কবে দেখা হইবে? আমার মনটা একটু বিষণ্ণ আছে, একটা বড় কিছু লইয়া এখন থাকিতে চাহি। আমার নিজের কাজ তো একরূপ বন্ধ। কারণ ১১টি Papers লিখিয়াছি, তাহার একটাও প্রকাশিত হইতে পারিতেছে না। কি হইল, তাহাও বুঝিতে পারিতেছি না। বই লিখিব মনে করি, কিন্তু সেই পুরাতন লেখা এখন দেখিতে ইচ্ছা করে না।

ভাল কথা, আমার যে প্রতিদ্বন্দ্বী, আমার আবিষ্ক্রিয়া চুরি করিয়াছিল, সে একখানা পুস্তক লিখিয়াছে, তাহাতে লেখা আছে যে, পূর্বে লোকে মনে করিত কেবল sensitive plantএ সাড়া দেয়: "But these notions are to be extended and we are to recognise that ANY vegetable protoplasm gives electric response."

"I have used all kinds of vegetable protoplasms."

"We are to recognise"—কাহার discoveryর দ্বারা ইহা হইয়াছে, তাহার কোন উল্লেখ নাই।

তাহার পর আমার পুস্তকে physiologistsদের প্রকাণ্ড একটা ভুল ধরিয়া দিয়াছিলাম—আমার আবিষ্কার হইতে প্রমাণ হইয়াছে যে, তাহাদের গোড়ায় গলদ—যাহা তাহারা negative বলে, তাহা positive। ইহা অপেক্ষা সাংঘাতিক আর কি ভুল হইতে পারে? তাহার উত্তরে প্রতিদ্বন্দ্বী লিখিয়াছে (আমার নাম করিতে নাই, আমার নাম physicist).

"But in the present state of our physiological literature is it wise to attempt to use the proper expression? No doubt the confusion is very great, no doubt the main bulk of our electro-physiological literature is to tally unintelligible to physicists. Shall we not, however, lay the foundation of a further mass of worse-confounded confusion by any sudden and unauthorised endeavour to call white white and black black, when for the last twenty or thirty years our readers have been content to call white black and black white?

আমরা এতদিন whiteকে black বলিয়াছি। unauthorised physicist আসিয়া আমাদিগকে শিখাইতে চায় white is white কি ভয়ানক!

তুমি কি মনে করিতে পার, বিলাতের বিজ্ঞান এখন কিরূপ অবস্থায় পড়িয়াছে?

ইহা হইতে বুঝিতে পারিবে যে, কিরূপ বাধার সহিত আমায় সংগ্রাম করিতে হয়। এ সব কথা তোমাকে লিখিয়া বোঝা অনেকটা দূর হইল, কয়দিন পর পুস্তক লিখিতে আরম্ভ করিব।

স্কুলের কথা শুনিয়া আশ্বস্ত হইলাম। ভাল কথা, সেদিন আমার কোন বিশেষ বন্ধু তাঁহার সন্তানের শিক্ষার জন্য আমার পরামর্শ চাহিয়াছিলেন। দেশী লোকদের জন্য ৫৲র পরিবর্তে ১০৲ বেতন St. Xaviers-এ ধার্য্য হইয়াছিল। ইহাতে দেশীয় কর্ত্তৃপক্ষগণ পরম সৌভাগ্য মনে করিতেছিলেন। এখন সরকার হইতে হুকুম আসিয়াছে যে দেশীয়দিগকে যেন আর না ভর্ত্তি করা হয়। Loretto হইতে—এর চিঠি আসিয়াছে মেয়েগুলিকে দূর করিবার জন্য। এখন কথা, কোন নেটিভ স্কুলে ছেলে-মেয়ে দেওয়া যায়। হায়, এত অপর্য্যাপ্ত রাজভক্তির এই পুরস্কার!

মায়াবতীতে একজন আমেরিকান আসিয়াছে, সে কল কারখানায় বিশেষ মজবুত। আমার ইচ্ছা তুমি শীতকালে কয় মাসের জন্য তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া স্কুলে আনাও।

সদানন্দ মৃতপ্রায় হইয়া আসিয়াছেন। দিনু ও রথীর কি পরিবর্ত্তন দেখিলে? সদানন্দ তোমার উৎসাহপূর্ণ চিঠির জন্য উন্মুখ হইয়া আছেন। বুঝিতে পারিলাম যে, শেষ মুহূর্ত্তে অনেকে পৃষ্ঠভঙ্গ দেওয়ার জন্য খরচ অনেক বেশী লাগিয়াছে।

Sister Nivedita ও Christine তোমার বাড়ীতে স্কুল খুলিবার জন্য বিশেষরূপে লাগিয়াছেন। তবে ছাত্রী জোগাড় কি করিয়া করিবেন জানি না। আর টাকারও দরকার মনে হয়। নিবেদিতা আশা করিতেছেন যে, তাঁহার নূতন পুস্তক বিক্রয়ের দ্বারা এই অভাব কতকটা দূর হইবে। তুমি শুনিয়া সুখী হইবে যে বিলাতে Web of Indian life পুস্তকের বহু প্রশংসা হইতেছে। ভারত-বিদ্বেষী কাগজেও লিখিতেছে যে Kipling ইত্যাদির ভারতবর্ষের চিত্র হয় তো ঠিক নয়, ভিতরের যথার্থ চিত্র এইরূপই

হইবে। সম্ভবতঃ এই পুস্তকের বহুল প্রচার হইবে। আমেরিকার এডিশানও ইহার মধ্যে বাহির হইয়াছে। তবে Publisherএর নিকট হইতে পয়সা আদায় করা কঠিন।

বঙ্গদর্শনের ইউনিভারসিটির বিল পড়িয়া সুখী হইয়াছি। ভাষায় ইঙ্গিতে অতি সুন্দর হইয়াছে।

তোমার
জগদীশ

২

Assyline Villa
Darjeeling
16-5-1905

বন্ধু,

এখানে আসিয়া কাজ আরম্ভ করিয়াছি। তুমি যে সদুপদেশ-পূর্ণ খবরের কাগজের কর্ত্তিত অংশ পাঠাইয়াছ, তজ্জন্য ধন্যবাদ জানিবে। তুমি যেদিন অবধি পুলিশের তত্ত্বাবধানে আছ সে অবধি তোমার আধ্যাত্মিক (?) উন্নতির খবর আমি জানি।

ভাণ্ডারের লেখা বেশ হইয়াছে। তবে মেষচর্ম্মে আবৃত সিংহনাদ বুঝিতে পারিবে। এরূপ লেখা হইলে আমার বইখানা সহজেই বোধগম্য হইবে।

তোমার
জগদীশ

৩

Bala Hissar Cottage
Mussorie
26. 5. 1905.

বন্ধু,

অনেক বাধা বিপত্তির মধ্যে এই Plant response লিখিতে হইয়াছে। আমার প্রগাঢ় প্রীতির ক্ষুদ্র নিদর্শনস্বরূপ গ্রহণ করিয়া সুখী করিও।

তোমার
জগদীশ

৪

২৩এ অক্টোবর, ১৯০৫

বন্ধু,

তোমাকে একটা বিষয় পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে। সর্ব্বপ্রথম আমাদের বঙ্গভবন প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক। একটি মূর্ত্তিমান এবং বর্দ্ধমান জিনিষ আমাদের উৎসাহের প্রধান সহায় হইবে। তারপর এই স্থানে কেন্দ্র করিয়া যত বড় কাজ আরম্ভ হইবে। এই স্থানে ৫০০০ লোকের বসিবার হল যেন নির্ম্মিত হয়। সেখানে প্রতি পক্ষে নিয়মিতরূপে ছাত্রদের জন্য বক্তৃতা, কথকতা প্রভৃতি হইবে। তারপর আমাদের সেই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতা এখানে নিয়মিতরূপ দেওয়া হইবে। এ বিষয়টি অতি গুরুতর, কারণ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ছাত্রদিগকে বহিষ্কার জন্য বিবিধ সময়োচিত চেষ্টা হইতেছে—ইহার প্রতিবিধান একান্ত আবশ্যক।

তারপর জাতীয় ভবনে তোমার সমাজের অধিবেশন হইবে, নানা বিভাগে শিল্প-বাণিজ্য ইত্যাদির জায়গা থাকিবে।

চাঁদা তুলিয়া কাপড়ের কল ইত্যাদি করিবার চেষ্টা ভুল। এই কেন্দ্র হইতে নানা বিষয়ের অনুসন্ধান সংবাদ ইত্যাদির দরকার।

এখানে রামমোহন রায়, বঙ্কিম, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ইত্যাদির স্মৃতিচিহ্ন থাকিবে, ইত্যাদি।

তুমি এ বিষয়ে অতি সুন্দর প্রবন্ধ প্রস্তুত করিবে। ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিন নানাস্থানে পঠিত হইবে।

এ সময়ে আমাদের বিজ্ঞজনেরা বিবিধ জ্ঞানগর্ভ উপদেশ দিবেন এবং ঘুমাইবার পরামর্শ দিবেন। এখনই জাগ্রত থাকিবার সময়। তোমাকে চৌকিদারী করিতে হইবে।

তোমার—বন্ধু,

৫

১১ই মার্চ্চ, ১৯০৭

বন্ধু,

তুমি মনস্তত্ত্ব বিদ্যা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে বলিয়াছিলে। সেই কথা অনুসারে পরীক্ষা আরম্ভ করিয়াছিলাম। তাহার ফলে যে অদ্ভুত আবিষ্কার হইতেছে তাহা লিখিয়া জানাইতে পারি না। সুখ ও দুঃখের মৌলিক ঘটনা কি, তাহা প্রত্যক্ষ হইয়াছে এবং তাহা হইতে Psychologyর মূল নিয়ম ধরা পড়িয়াছে। দুঃখের বিষয়, এরূপ কোন লোক দেখিতেছি না যাহার সহিত একসঙ্গে আলোচনা করিতে পারি। তুমি যদি কলিকাতা না আইস তবে আমার এই অধ্যায়টি তোমাকে দেখিতে পাঠাইব। আমি যে কিরূপ ব্যস্ত আছি জানাইতে পারি না। আগামী মাসের মধ্যেই পুস্তকখানা শেষ করিতে হইবে। অথচ অনেক নূতন জিনিস আবিষ্কার হওয়াতে পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি হইতেছে। যাহা হউক, আশা করিতেছি, আর দুই মাসের মধ্যে এই পুস্তক শেষ হইবে।

জাতীয় শিক্ষা পরিষদের বক্তৃতা এই কারণে দিতে পারিলাম না। তুমি তাহাদিগকে বুঝাইয়া লিখিবে। ছুটির পর হয় তো সময় পাইব। আর যত শীঘ্র কার্য্য হইতে অবসর পাইতে পারি তাহারও চেষ্টা দেখিব, অন্ততঃ দীর্ঘ ছুটি লইব মনে করিতেছি।

তুমি কেমন আছ, কি করিতেছ, কি লিখিয়াছ, জানাইও।

তোমার
জগদীশ

৬

কলিকাতা
১৮ই মার্চ্চ ১৯০৭

বন্ধু,

আমি দিন দিন পরিষ্কাররূপে দেখিতে পাইতেছি যাহা সত্য তাহাই অতি সহজ এবং সেইজন্যই লোকের দৃষ্টির অগোচর। সমস্ত ভবিষ্যতের আশা, মনুষ্য গঠন দ্বারা। তাহার একমাত্র উপায় কোমল শিশু জীবনে দু একটি মন্ত্র চিরমুদ্রিত করা। এ জন্য তুমি যাহা করিতেছ তাহার সার্থকতা আমরাই দেখিয়া যাইতে পারিব।

তোমার
জগদীশ

৭

মায়াবতী
৭ই জুন, ১৯০৭

বন্ধু,

বাড়ীতে চাকরের প্লেগ হওয়ায় পলাতক হইতে হইয়াছিল। তোমার কন্যার শুভবিবাহ উপলক্ষে উপস্থিত হইতে না পারিয়া দুঃখিত হইলাম। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, আমাদের সকলের আদরের কন্যাটি যেন চিরসুখী হয়। আমাদের বিলাতে যাইবার পূর্ব্বে জামাতাকে লইয়া একদিন আসিও।

আমি পুস্তকখানি শেষ করিতেছি। শেষের অধ্যায়টি লেখা হইয়াছে আর পূর্ব্বের প্রুফগুলি প্রায় দেখা হইয়াছে। তোমার অনুরোধে পড়িয়া যে মনস্তত্ত্ব বিষয় লিখিয়াছিলাম, তাহাও বিশেষরূপে বর্দ্ধিত হইয়াছে—এখন তিন অধ্যায়ে দাঁড়াইয়াছে। যতই এ বিষয় ভাবি, ততই আশ্চর্য্য বলিয়া মনে হয়। স্মৃতি সম্বন্ধেও এক নতুন অধ্যায় লিখিয়াছি। তোমার তাড়া না হইলে এ সব হইত না।

পৃথিবীর খবর তোমার নিকট পৌছিয়াছে, বুদ্ধিমান লোকের বুঝিতে আর বাকী নাই। পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া এই সব পরম শান্তিকর ঘটনার মধ্যে পড়িতে আমার কিরূপ অভিরুচি বুঝিতে পারিবে। উদ্ধার কবে জানি না। তোমার নির্জ্জন কুটিরে স্থান পাইব মনে করিয়া একটু সান্ত্বনা পাই।

তোমার
জগদীশ

৮

৩১এ আগষ্ট ১৯০৭

বন্ধু,

তোমার লেখা পড়িয়া মনে হইল যে, যাহার জন্য লিখিয়াছ তাহার পক্ষে সহ্য করা সহজ হইবে। মিটিং ইত্যাদির সহানুভূতি অপেক্ষা কত বড় একটা ভাবে সে নিজের জীবন দিতে পারিবে। লেখাটা কেন কাগজ প্রকাশ কর না? তাহা হইলে লোকে এই ঘটনাকে প্রকৃতভাবে দেখিতে পারিবে। আমার সেই বক্তৃতাটা মঙ্গলবার ৩রা সপ্টেম্বর দিব। তুমি আসিতে পারিবে কি? আমরা ৫ই রওয়ানা হইব।

তোমার
জগদীশ

৯

বোম্বাই
৭ই সেপ্টেম্বর ১৯০৭

বন্ধু,

বোম্বাই পৌছিয়া এই কয় পংক্তি পাঠাইতেছি। তোমার সহিত দেখা হইল না বলিয়া দুঃখ রহিল, কিন্তু দূর দেশে যাইয়াও নিকটে রহিব। সর্ব্বদা চিঠি লিখিও।

এই দুর্দ্দিনে যাহা বৃহৎ, তাহাই আমাদের আশ্রয়। তুমি এই বার্ত্তা প্রচার করিবে।

তোমার লেখা দেখিবার জন্য উৎসুক রহিব। গাড়ীতে আর অধিক লিখিতে পারিলাম না।

তোমার
জগদীশ

১০

London
6. 12. 07.

বন্ধু,

ডাকে তোমার নিকট জাহাজ হইতে দীর্ঘপত্র লিখিয়াছিলাম, প্রতি ডাকে তোমার চিঠির অপেক্ষা করিয়াছি। তুমি কি আমার চিঠি পাও নাই?

আমার নূতন পুস্তক পাঠাই, গ্রহণ করিয়া সুখী করিবে। তুমি যে বাঙলা প্রবন্ধ লিখিবে বলিয়াছিলে তাহা কি লিখিয়াছ?

তোমার লেখা কিছুই পাই না। রামমোহন রায়ের স্মৃতিসভায় তোমার লেখা দেখিবার জন্য উৎসুক ছিলাম। যাহা লিখ, পাঠাইও। জার্ম্মাণীতে এক মাস ছিলাম। তাহাতে আমার অসুখ অনেক সারিয়াছিল, কিন্তু শীতের প্রকোপে আবার একটু খারাপ হইয়াছে।

তোমার স্কুলের খবর লিখিও।

আমি চিকিৎসা লইয়াই এতদিন ব্যস্ত ছিলাম। শীঘ্রই কার্য্য আরম্ভ করিব। রথীর খবর কি? আগামী বর্ষে আমেরিকা যাইবার ইচ্ছা করিয়াছি।

তোমার
জগদীশ

১১

London
19th Decr. 1907.

আমার বন্ধু,

তোমার এই শোকের সময় কেবলমাত্র আমার হৃদয়ের বেদনা জানাইতেছি। তোমার সুখদুঃখের সাথী আমি। কি করিয়া তোমাকে সান্ত্বনা দিব জানি না।

আমাদের দু'জনেরই অনেক প্রিয়জন পরপারে। সুতরাং সে দেশ আর দূরদেশ বলিয়া মনেই হয় না।

কেবল এ কয়দিনে যথাসাধ্য কার্য্য সমাপন করিয়া লইতে হইবে। তোমার বিদ্যালয়ের কথা যতই মনে করি ততই মন উৎফুল্ল হয়। অন্ততঃ কয়েকটির জীবন যে তোমার শিক্ষায় অমর হইবে তাহার সন্দেহ নাই।

এখানে নূতন রকমের কল দেখিয়া ইচ্ছা হয় যে, তোমার স্কুলে ছোট কারখানা খোলা হয়। ছোট কেরোসিনের এঞ্জিন ১৫০৲ টাকা মাত্র। অতি সহজেই চলে। বিদ্যুতের আলোর কল তাহা দ্বারা চালানো যাইতে পারে, উহার জন্য আর ৫০৲ টাকা। আমার শিষ্য সুরেশের সহিত তোমার স্কুল সম্বন্ধে সর্ব্বদা আলোচনা করি। ছোট **American lathe** সম্ভবত ২০০৲র মধ্যে পাওয়া যাইবে। ৫।৬ শত টাকা হইলে তোমার ছোট কারখানা আরম্ভ করা যাইতে পারে।

তোমার জামাতাকে সেদিন নিমন্ত্রণ করিয়াছিলাম। তাহাকে দেখিয়া বিশেষ সুখী হইয়াছি। এক মুহূর্ত্তও তাহার সময় অপব্যয় হয় না, যত অল্প সময়ে সম্ভব তাহাতেই তাহার এখানকার কার্য্য সমাপ্ত হইবে। তুমি হয়তো তাহাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল আছ, এ কয়মাস দেখিতে দেখিতে শেষ হইবে।

রথীর খবর আমাকে জানাইবে। আমি আগামী বর্ষে হয়তো আমেরিকা যাইতে পারি।

তোমার
জগদীশ

১২

মঙ্গলবার

বন্ধু,

পরম্পরায় শুনিলাম তুমি কলিকাতায় আসিয়াছ। আজ দুই সপ্তাহ হইল আমি অতি আশ্চর্য্য কয়টি নূতন আবিষ্ক্রিয়া করিয়াছি। তাহাতে একেবারে অভিভূত হইয়াছি। সেগুলি এরূপ আশ্চর্য্য যে, তাহা প্রকাশ করিবার ভাষা পাইতেছি না। তাহার প্রসার অতি সুবিস্তৃত। আমি কবে পুস্তক শেষ করিব জানি না।

যদি পার তবে আজ সন্ধ্যার সময় আসিও, নতুবা কাল সকালে কি সন্ধ্যায়। অনেক কথা আছে।

তোমার
জগদীশ

১৩

দার্জ্জিলিঙ
২১এ আশ্বিন

বন্ধু,

তোমার রাখী-সঙ্গীত পড়িলাম। তোমার লেখনী স্বর্ণময় হউক।

তোমার
জগদীশ

১৪

লণ্ডন
২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯০৮

বন্ধু,

তোমার পত্র পাইয়া অনেক শান্তিলাভ করিয়াছি। দেশের সংবাদ পাইয়া মর্ম্মাহত হইয়াছিলাম। তুমি যাহা চিরন্তন ও কল্যাণ সে সব লিখিয়াছ বলিয়া সেই কষ্ট দূর হইল।

প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্সে তোমার বক্তৃতা শুনিবার জন্য উৎসুক রহিলাম। তুমি যে সকলকে সন্তুষ্ট করিতে পারিবে এরূপ মনে করি না। তথাপি আমাদের প্রকৃত লক্ষ্য কি এ কথা তুমি যেরূপ পরিষ্কাররূপে দেখাইতে পারিবে, অন্য দ্বারা তাহা সেরূপ হইবে না।

তোমার স্কুলের কথা সর্ব্বদা ভাবি। এই তোমার প্রধান কার্য্য। এইরূপ মানুষ গড়ার চেয়ে কোন কাজ শ্রেষ্ঠ হইতে পারে না।

প্রবাসীতে গোড়ার ইতিহাস দেখিতেছি। সব সময় প্রবাসী পাই না। তোমার লেখা যাহা বাহির হয় পাঠাইও। দুইখানি পুস্তক পাঠাইয়াছিলে তাহা পড়িয়া সুখী হইয়াছি। আজ এখানেই শেষ করি। শীঘ্রই পুনরায় লিখিব। মাঝে আমার বড় অসুখ গিয়াছে, মৃত্যুমুখে পড়িয়াছিলাম, এখন সারিয়াছি।

তোমার
জগদীশ

১৫

14. 5. '08

বন্ধু,

কেমন আছ জানিবার জন্য এই দুই পংক্তি লিখিতেছি।

তোমার লেখা পাঠাইও। প্রবাসী সব সময় দেখিতে পাই না। তোমার স্কুলের খবর লিখিও। এ সময় যাহা মহান্ তাহাই যেন দেখিতে পাই।

তোমার
জগদীশ

১৬

কলিকাতা
২০এ জুলাই ১৯০৮

বন্ধু,

তোমার চিঠি পাইয়া সুখী হইলাম। তুমি রবি, সুতরাং সম্ভবতঃ এই উত্তাপে তুমি আরামে আছ, কিন্তু আমাদের প্রাণ অস্থির, তা ছাড়া বিলাতের নূতন আগন্তুক কবে ঘাড়ে চড়িবে তাহা জানি না।

তোমার পক্ষে কতক দিন বিশ্রাম একান্ত আবশ্যক। একবার কাশ্মীর ঘুরিয়া আইস।

তোমার চিঠি পড়িয়া মনে হইল স্কুলের কথা মনে করিয়া চিন্তিত আছ। যতদিন না কেহ সমস্ত ভার গ্রহণ করে ততদিন অন্য কেহ সেই ভার লঘু করিবার চেষ্টা করে না। এটা হয়তো বাঙালীর ভাবপ্রবণতার চিহ্ন। কিন্তু তোমার স্কুল দেখিয়া অন্য দেশে স্কুল দিতেছে। তাহারা ভাবুক নয় কিন্তু কর্ম্মী। সুতরাং তোমার চেষ্টা হয়তো অন্য দেশে অধিকরূপ পরিস্ফুট হইবে।

আর তোমার স্কুলের ছেলেরা অন্ততঃ কয়েক বৎসর নির্ভয়ে বাড়িতে পারিয়াছে। আজকালকার দিনে এ কথাটা কম নয়। তা ছাড়া এতগুলি ছেলের মধ্যে কেহ কেহ তোমার শিক্ষার সার্থকতা করিবে। হয়তো আমরা দেখিয়া যাইতে পারিব না, কিন্তু তাহা এক দিন হইবেই হইবে।

আর এক কথা, তোমার স্কুল-মাষ্টারী কাজ ফাউ, তোমার আসল কাজ অন্যরূপ। যা বেশীর ভাগ, তার জন্য এত দুশ্চিন্তা কেন করিবে? আর আমি দেখিয়াছি, যখন কোন কাজ সম্বন্ধে মনে এরূপ করিতে পারিয়াছি, হউক বা না হউক, কিছুই আসে যায় না, তখনই সেটা হয়। একটু দূরে গেলেই দেখিবে, যেটা যত মারাত্মক মনে করিয়াছিলে, সেটা তত নয়।

তোমার ওখান হইতে একবার **Sundew** আনিয়াছিলাম। যদি কেহ আসে, তবে তাহার সঙ্গে কতকগুলি পাঠাইয়া দিও, নূতন পরীক্ষা করিব মনে করিয়াছি।

তোমার
জগদীশ

১৭

London
24. 7. '08

বন্ধু,

তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। দিনের পর দিন কেবল দুঃসংবাদ পাইতেছি। মুহূর্ত্তও মন তিষ্ঠিতেছে না। তোমার প

পাইলে অনেকটা সান্ত্বনা পাই। হয়তো এই দুর্দ্দিনের পর যাহা প্রকৃত, যাহা চিরস্থায়ী তাহার প্রতিষ্ঠা হইবে। যাহা ক্ষুদ্র, তাহার লোপ হইবে, আর যেসব প্রকৃত মাহাত্ম্যের চিহ্ন দেখা দিয়াছে, তাহা মহত্তর হইবে।

তোমার স্কুলের সংবাদ আমাকে সর্ব্বদা জানাইবে। যদি কারখানা করিবার অসুবিধা হয়, তবে এখন তাহা নাই করিলে। ভাল একজন শিক্ষক না পাইলে কল অযত্নে নষ্ট হইয়া যাইবে, এই মনে করিয়া আমি এখনও পর্য্যন্ত যন্ত্রাদি ক্রয় করি নাই। তোমার সব টাকা তোমার জামাতার নিকট মজুত আছে, আবশ্যকমত তাহাকে ফিরাইয়া পাঠাইতে বলিবে।

আমি সম্ভবতঃ দু'-তিন মাস পর আমেরিকা যাইব, লণ্ডনের ঠিকানায় চিঠি লিখিলেই চলিবে।

তোমার

জগদীশ

১৮

Dublin
20. 9. '08.

বন্ধু,

তোমার পত্র এখানে পাইলাম। আমরা এখন আমেরিকা যাইতেছি, লণ্ডনে আর ফিরিব না।

আমি ইতিপূর্ব্বে Cambridge গিয়াছিলাম, Christs' College এর master এর সঙ্গে দেখা হইয়াছিল। তিনি বলিলেন যে, কলেজের ছাত্র-সংখ্যা এত বাড়িয়াছে যে নূতন ভর্ত্তি দুরূহ। তথাপি তাঁহার নিকট নয়নমোহনের জন্য লিখিলাম। যদি সম্ভব হয় তবে নিশ্চয়ই ভর্ত্তি করিবেন। নয়নের ঠিকানা জানি না।

আমরা এখন England ছাড়িয়াছি। সুতরাং সমরের জন্য কোন বন্দোবস্ত করিতে পারিলাম না। Dr. Osteoald এর বাড়ীতে থাকিলে সুবিধা হইবে। পরিবারে থাকা বিশেষ আবশ্যক। এখন বিলাতে ছেলে পাঠানয় বিপদের আশঙ্কা।

তুমি একটু শরীরের উপর যত্ন রাখিবে। একবার এক বৎসরের জন্য এদিকে আসিলে ভালো হইত। শরীরের উপর অত্যাচার আর কতদিন সহিবে?

তোমার

জগদীশ

১৯

Cambridge, Mass, U. S. A.
20th Nov. '08.

বন্ধু,

তোমার নিকট কতবার চিঠি লিখিতে বসিয়াছি, কিন্তু কি আর লিখিব। সপ্তাহের পর সপ্তাহ কেবল ঘোর দুঃসংবাদ পাইতেছি, ইহার মধ্যে আমার সংবাদ কি আছে জানি না। তুমি যে মাসে মাসে বই পাঠাইয়াছ তাহার প্রতি ছত্র পড়িয়া তোমাদের প্রতি সুখ দুঃখে নিমজ্জিত আছি। গানের পুস্তকে তোমার যে ছবি দেখিলাম তাহাতে একান্ত ক্লিষ্ট হইলাম। তোমার শরীর যে এরূপ ভাঙিয়া গিয়াছে তাহা মনেও করিতে পারি না। তুমি কি কয়দিনের জন্যও ছুটি লইতে পার না। তুমি ছাড়া যে তোমার কাজ চলে না বুঝিতে পারি, কিন্তু এই ভগ্নশরীর লইয়া কতদিন যুঝিবে? এ সম্বন্ধে আমার স্বার্থ আছে মনে করিও। দেশে ফিরিলে আমাকে ঘন ঘন বোলপুরে ও শিলাইদহে দেখিতে পাইবে। তোমার স্কুল ও তোমার গ্রাম্য সমিতির কথা সর্ব্বদা মনে করি। যে রূপ দেখিতেছি তাহাতে কার্য্য করিবার প্রসার অনেক সংক্ষেপ হইবে। তবে এই দুইটি যদি প্রকৃষ্টরূপে চলে তাহা হইলেই অনেক। তোমার স্কুলের কথা আমাকে সর্ব্বদা বিস্তারিতরূপে লিখিও। মনে রাখিও তোমার প্রতি কার্য্যে আমার মন আকৃষ্ট। এই দুর্দ্দিনে মনে কোনরূপ শান্তি পাইতেছি না, কেবল তোমার আশ্রমের কথা স্মরণ করিয়া মন স্থির করিতে চেষ্টা করি। আমাদের বন্ধুরা দেবতার করুণা বলিয়া মনে করি। তুমিও নানা অশান্তির মধ্যে আছ, তোমার মনের ভাব আমাকে বহন করিতে দাও।

এখানে বরফ পড়িতেছে, কিন্তু এ সময় তোমার ছোট দোতলার ঘরে বসিয়া বোলপুরের সীমাহীন প্রান্তর দেখিতে পাইতেছি। পিসিমাকে আমার প্রণাম জানাইও। এই সন্ধ্যায় সমস্ত তোমার কুটীরের প্রত্যেক দৃশ্য আমার চক্ষে ভাসিতেছে।

রথীর সহিত দেখা হইবে। জানুয়ারী মাসে ওদিকে যাইব। এখন এ দেশে অনেক বাঙালী ছেলে, অনেক সময় তাহাদিগকে কষ্ট করিয়া চালাইতে হয়। তবে তাহাদের নিজের উপর নির্ভর করিবার প্রয়াস দেখিয়া সুখী হইলাম।

তোমার

জগদীশ

২০

দার্জ্জিলিঙ,
২, ৬, ১৯০৯

বন্ধু,

তুমি ধন্য!!!

তোমার

জগদীশ

. . . এ মাসের প্রচ্ছদপট . . .

[এই সংখ্যার প্রচ্ছদে কলকাতা শহরতলীর একটি ব্যক্তিগত প্রমোদ-উদ্যানের আলোকচিত্র প্রকাশিত হয়েছে।
আলোকচিত্র মীরেন অধিকারী কর্তৃক গৃহীত।]

ভবানী মুখোপাধ্যায়

নয়
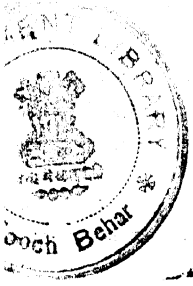
বার্নার্ড শ'র সরস নাটকাবলীর মধ্যে Arms and the Man প্রথমতম ১৮৯৪-এ অতি দ্রুত এই নাটকটি রচনা করেন শ'। কিন্তু এই নাটকের রঙ্গমঞ্চে তেমন সাফল্য লাভ হল না। ফ্লোরেন্স ফার স্থির করলেন, যে Widowers' House নাটকের পুনরুজ্জীবনের। বার্নার্ড শ' কিন্তু নতুন নাটক লিখতে সুরু করেছেন ইতিমধ্যে। এই নাটকই **Arms and the Man.**

তাড়াতাড়ি মহলা দিয়ে নাটক ২১শে এপ্রিল ১৮৯৪ মঞ্চস্থ করা হল। নট-নটীরা মাথামুণ্ডু কিছু না বুঝেই অভিনয় করলেন, দর্শক-সাধারণ সব কিছুতেই প্রচুর হাসলেন। অভিনেতারা এই হাসির বন্যায় মনে করলেন নাটকটি প্রহসন মাত্র, তাঁরাও প্রহসনের ভঙ্গীতে অভিনয় করলেন। শ' কিন্তু এই ভাবে নাটকের পরিকল্পনা করেন নি, অভিনয়ও প্রহসনের ভঙ্গীতে হওয়ার ফলে নাটকের মূলরস ক্ষুণ্ণ হল। এই রাত্রেই শ' যখন অভিনয়ান্তে রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হলেন তখন গ্যালারী থেকে একজন ব্যঙ্গ করে একটি বিকৃত শব্দ করে ওঠেন—শ' অনেক সভায় বক্তৃতা করেছেন, এই সব তাঁর কাছে অতি তুচ্ছ ব্যাপার। তিনি বাধা পেয়ে বলে উঠলেন—'হে অচেনা বন্ধু! আপনার সঙ্গে আমিও একমত। কিন্তু এই হলভর্তি বিরুদ্ধ মতবাদীদের কাছে শুধু আপনি আর আমি দুজন কি করতে পারি?'

এই উক্তি কিন্তু সার্থক হল। প্রথম রজনীর হট্টগোলের পর নাটকটি কিন্তু দাঁড়িয়ে গেল। এগার সপ্তাহ ধরে নাটকটি অভিনীত হল, লাভের চেয়ে লোকসান হল অনেক বেশী।

সপ্তম এডওয়ার্ড তখন প্রিন্স অব ওয়েলস, তিনি এই নাটকের অভিনয় দেখে প্রশ্ন করলেন—এই নাটকের নাট্যকারটি কে?

কে একজন বললেন—জর্জ বার্নার্ড শ'।

বার্নার্ড শ'র নাম তাঁর কাছে অপরিচিত এবং অর্থহীন, তবু তিনি বললেন—লোকটি নিশ্চয়ই পাগল।

Arms and the Man নাটকের প্রথমে নামকরণ করা হয়েছিল **Alps and Balkans** বার্নার্ড শ'র এটি চতুর্থ নাটক। এ্যাভিন্যু থিয়েটারে মিস এ্যানী এলিজাবেথ হরনিম্যান এই নাটকটি প্রযোজনা করেন। বিখ্যাত কোয়াকার পরিবারের মেয়ে মিস হরনিম্যানের বাবা ছিলেন ধনী চা-ব্যবসায়ী, মাতামহের দিক থেকেও তিনি কিছু অর্থলাভ করেন উত্তরাধিকার সূত্রে।

মিস এ্যানী হরনিম্যানই সর্বপ্রথম বার্নার্ড শ'র নাটক সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের জন্য অর্থব্যয় করেন, তিনি ডব্লু, বি, ইটসের **Kathleen ni Houlipan** নামক একটি ছোট্ট নাটিকাও প্রযোজনা করেন।

ফ্লোরেন্স ফার মিস হরনিম্যানকে এই দিকে আগ্রহান্বিত করেন। মিস হরনিম্যান নীতিবাগীশ পরিবারের দৃষ্টি এড়িয়ে আত্মগোপন করে ফ্লোরেন্স ফারকে সাহায্য করতে রাজী হন। প্রথম নাটক ডাঃ জন টড হন্টারের The Comedy of Sighs'—কিন্তু এই নাটক জমলো না। এই সময় ফ্লোরেন্স বার্নার্ড শ'কে অনুরোধ করেন Widowers' House নাটকটি পুনরুজ্জীবনের। শ' তাতে রাজী না হয়ে নতুন নাটক লিখেছিলেন **Arms and the Man.**

যদিও এই নাটক সাফল্যলাভ করলো না, বার্নার্ড শ'র সাফল্যের এই কিন্তু সূচনা। মিস হরনিম্যানের অনেক টাকা নষ্ট হল, শ'মাত্র কয়েক পাউণ্ড পেলেন,'১৯০৪ খৃষ্টাব্দে শ' নিজেই এই নাটক সম্পর্কে বলেছেন— **"Startled to find what flimsy, fantastic, unsafe strait it is"**—

অর্থনৈতিক ক্ষতি বার্নার্ড শ'র মত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মানুষের কাছে কিছুই নয়, তিনি এইবার আবার একটি নাটক রচনায় মন দিলেন। এই নাটকের নাম Candida—১৮৯৪ ডিসেম্বরের মধ্যে নাটকটি রচনা শেষ হল।

Arms and the Man সেদিন সাফল্যলাভ না করলেও ১৯২৭-এ নাট্যকার এলফ্রেড সুটরোকে একখানি চিঠিতে শ' লিখেছিলেন তাঁর এই নাটক সম্পর্কে—**"never had a really whole hearted-success until after the war when soldiering had come home to the London playgoer's own door—"**

এই নাটক উপলক্ষ্যেই বিখ্যাত নট রিচার্ড ম্যানসফীলডের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার সূত্রপাত।

রিচার্ড ম্যানসফীলড সুইস পেশাদার সৈনিক Bluntschli চরিত্রটিতে আকৃষ্ট হলেন। তবে দ্বিতীয় অঙ্কে এই সুইস চরিত্রের অনুপস্থিতি তাঁকে কিঞ্চিৎ নিরুৎসাহ করল। তাঁর স্ত্রী কিন্তু এই নাটকটিতে বিশেষ আনন্দ পেলেন, মিসেস ম্যানসফীলড তাই স্বামীকে বললেন—'অবিলম্বে মার্কিনী স্বত্ব কিনে নাও।'

দ্বিতীয় অংকে Bluntschlir অনুপস্থিতি বার্নার্ড শ'র স্বকীয় নাট্য রচনা-কৌশলের অন্যতম। আঙ্গিক সম্পর্কে তিনি রক্ষণশীল ন'ন। লোকে ভাবত তিনি মঞ্চপদ্ধতি সম্পর্কে অজ্ঞ, আসলে কিন্তু শ' নতুন ধারার প্রবর্তনে সচেষ্ট।

ম্যানসফীলড **Arms and the Man** আমেরিকায় প্রযোজনা করলেন, কয়েক বছর ধরে তাঁর প্রযোজিত নাটকাবলীর মধ্যে এই নাটক অন্যতম ছিল, তখনও দীর্ঘদিনস্থায়ী নাট্য প্রদর্শনীর কাজ আসেনি, তবু ম্যানসফীলডের প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হল।

এই নাটকের অনুকরণে রচিত হালকা অপেরা The chocolate Soldier কিন্তু বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে।

Candida রচনার পর নাট্যকার বন্ধু হেনরী আর্থার জোনসকে ফোকস্টোন থেকে এক পত্রে বার্ণার্ড শ' লিখলেন—

"—My passion, like that of all artists, is for efficiency, which means intensity of life and breadth and variety of experience ; and already I find, as a dramatist, that I can go at one stroke to the centre of matters that reduce the purely literary man to colourless platitudes—"

কিন্তু দর্শক-সাধারণ পর্যন্ত পৌঁছানো কঠিন। তদানীন্তন অভিনেতৃবৃন্দ প্রাচীনপন্থী দর্শক নিয়েই শান্তি ও স্বস্তিতে দিন কাটাচ্ছেন, নতুন তন্ত্রের দর্শকসৃষ্টির প্রয়োজন তাদের কাছে তখনও তেমন বোধগম্য নয়।

Candida পড়ে শোনানো হল রসিকমহলে। বিদগ্ধ সোস্যালিষ্ট এডওয়ার্ড কার্পেন্টার বললেন—"No Shaw ; it won't do—"

চার্লস উইনডহ্যাম ত' নাটকটির শেষ দৃশ্যে রুমালে চোখ মুছলেন। বললেন—শ,' তোমার এই নাটক আজ থেকে পঁচিশ বছর পরের মানুষের জন্য লেখা, এখন কেউ বুঝবে না।

অদ্ভুত পোষাকে সজ্জিত হয়ে শ' উইনডহ্যামের অফিসে পৌঁছে পকেট থেকে একটি ছোট্ট নোট-বই বার করলেন, তারপর প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে আর একটি নোট-বই টেনে তুললেন, আর একটি পকেট থেকে তৃতীয় নোট-বই, এই ভাবে চতুর্থ ও পঞ্চম নোট-বইও বেরোল।

বিস্মিত উইনডহ্যাম প্রশ্ন করলেন—ব্যাপার কি হে, ম্যাজিক শিখছ নাকি?

শ' হেসে বললেন—মজা লাগছে তোমার না? ভাবছ এই সব পকেট-বই কিসের? আসল কথা কি জানো, আমি ত' বাসে বসেই আমার নাটক লিখি কিনা, তাই এত ছোট পকেট-বই প্রয়োজন।

বার্ণার্ড শ এই নাটকটি হাতছাড়া করতেন না সহজে, কাউকে পড়তে দেন নি, নিজেই পড়ে শোনাতেন সবাইকে। এলেন টেরীকে লিখেছিলেন—কাউকে পড়তে দিই না, নিজে পড়ে বরং শোনাই, তাদের চাপাকান্না অনেক দূর পর্যন্ত শোনা যায়।

বার্ণার্ড শ স্বয়ং নাটকটিকে স্বর্গীয় সুষমামণ্ডিত বলে মনে করতেন, এলেন টেরীকে তাই লিখেছিলেন—তোমাকেই শুধু বলি, ক্যানডিডা ভার্জিন মেরী ছাড়া আর কেউ নয়।

মিসেস ওয়েব কিন্তু ক্যানডিডাকে বললেন, ভাবালু স্বৈরিণী (a Sentimental prostitute)।

প্রশংসার আতিশয্যে বার্ণার্ড শ' একবার বিরক্ত হয়ে বললেন—ওরা সবাই Candidamanics, বেশী বাড়িয়ে বলছে। আমার নতুন নাটক Devil's Disciple এর মত মেলোড্রামা আর কখনও মঞ্চস্থ হয়নি।

এই চমৎকার কমেডি বার্ণার্ড শ'র পঞ্চম নাটক। 'ক্যানডিডা'র রচনারীতিও সুসংবদ্ধ। কিন্তু ১৮৯৭—৯৮-এর আগে এই নাটকটি মঞ্চস্থ হয়নি। তাও লণ্ডনের পল্লী অঞ্চলে প্রথম অভিনয় হল, জ্যানেট আচার্চ প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করলেন। জনশ্রুতি, বার্ণার্ড শ' জ্যানেট আচার্চকে নামভূমিকায় রাখার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়ার জন্যই লণ্ডনে বা ন্যু ইয়র্কে Candida, অভিনয়ের সাফল্যের এত দেরী ঘটেছে। ম্যান্সফীল্ড স্পষ্টই বলেছিলেন—জ্যানেট আচার্চের মত মধ্যবয়সী রমণীকে দিয়ে নামভূমিকায় অভিনয় করানো অর্থহীন।'

১৯০৩-এ আরনল্ড ডালি আমেরিকায় Candida সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করেন। ন্যু ইয়র্কে এই নাটক ১৫০ বার অভিনীত হওয়ার পর, ভ্রাম্যমান দল বিভিন্ন অঞ্চলে অভিনয় করেন। সেই সব প্রদর্শনীও সফল হয়েছিল, বার বার এই নাটক পুনরুজ্জীবিত হয়েছে। বার্ণার্ড শ'কে আমেরিকাই সর্বপ্রথম স্বীকৃতি দিয়েছে, গ্রহণ করেছে।

১৯০৪-এর আগে Candida লণ্ডনে প্রদর্শিত হয়নি, তাও এক হিসাবে আংশিক। সেই বছর ২৬শে এপ্রিল ভেডরেণে-বার্কার সম্প্রদায় রয়াল কোর্ট থিয়েটার রঙ্গমঞ্চে ছ' দিন ম্যাটিনী শো'র ব্যবস্থা করলেন।

এই সম্প্রদায়ের প্রচেষ্টা সফল হল, পাঁচটি বিভিন্ন নাটক নিয়ে সাতাশ দিনব্যাপী অভিনয়ের ব্যবস্থা করা হল। ইউরিপিডাস, মরিস মাডারলিংক, লরেন্স হাউসম্যান প্রভৃতি নাটকের সঙ্গে Candida এবং শ'র অপ্রকাশিত নতুন নাটক 'John Bull's Other Island' নাটক অভিনীত হল। এইবারকার প্রচেষ্টা সাফল্যলাভ করল।

ভেডরেণে-বার্কার সম্প্রদায়ে যদি ভেডরেণে না থাকতেন, তাহলে বিপর্যয় ঘটতো। কারণ গ্রাণভিল বার্কার যেমন খেয়ালী, বেহিসাবী এবং কল্পনাবিলাসী ভেডরেণে তেমনই হিসাবী, এক পাউণ্ড খরচ করার প্রয়োজন হলে তিনি পাঁচ শিলিং-এ কাজ সারার চেষ্টা করতেন।

গ্রাণভিল বার্কারের দেহে নাকি কিঞ্চিৎ ইতালীর রক্ত ছিল, মানুষটি অদ্ভুত কবি-প্রকৃতির! তিনি নিজে ভালো অভিনয় করতেন, অপরকেও কি ভাবে অভিনয় করতে হবে, তা শিক্ষা দিতে পারতেন। কাব্যধর্মী নাটকের মত বাস্তববাদী নাটক তিনি সমান দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করতে পারতেন। তাঁর চরিত্রে প্রতিভার স্পর্শ ছিল। নাটকও লিখেছেন লরেন্স হাউসম্যানের সঙ্গে সংযুক্ত ভাবে। বার্ণার্ড শ' তাঁর নাটকের প্রশংসা করেছেন। বার্কার বিলাসী ছিলেন, আরামপ্রদ ধনীর জীবনে তাঁর আগ্রহ ছিল। পরবর্তী কালে Prefaces to Shakespeare নামক প্রবন্ধাবলী রচনা করেছিলেন বার্কার।

বার্ণার্ড শ' বার্কারকে এত স্নেহ করতেন যে, সর্বত্র কানাকানি চলতো বার্কার বার্ণার্ড শ'র অবৈধ সন্তান। অবশ্য তাঁর জননীর নাম কেউ জানতো না। বার্ণার্ড শ' এবং সার্লোট দু'জনেই সমভাবে স্নেহ করতেন বার্কারকে। যেন বার্কার তাঁদের পোষ্যপুত্র।

এই প্রীতির সম্পর্ক কিন্তু ছিন্ন হল, গ্রাণভিল বার্কার বিবাহ করেছিলেন অভিনেত্রী লীলা ম্যাক্‌কারথীকে। লীলাও বার্ণার্ড শ'র অতিশয় প্রিয়পাত্রী। বার্কার লীলাকে ডিভোর্স করলেন। বার্ণার্ড শ' অতিশয় আধুনিক বা প্রগতিশীল মানুষ হলেও বিবাহ বিচ্ছেদ

পছন্দ করতেন না। তাই এই বিচ্ছেদে তিনি বিশেষ আহত হলেন।

একদিন আর্থার বালফুরের সভাপতিত্বে একটি সভায় গ্রাণভিল বার্কার বক্তৃতা করলেন, সভা শেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে উঠলেন বার্ণার্ড শ,' সেই ভাষণে তিনি গ্রাণভিল বার্কারের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে ইঙ্গিত করে অনেক কটু উক্তি করলেন। সভায় বার্কারের সদ্য বিবাহিতা দ্বিতীয়া পত্নীও উপস্থিত ছিলেন। বক্তৃতা এমন অবস্থায় পৌঁছল যে আর্থার বালফুর জোর করে বার্ণার্ড শ'কে চুপ করালেন। সেই দিনই সব বন্ধুত্বের অবসান ঘটালো।

এর পর আর একবার গ্রাণভিল বার্কার শ'র বাড়ীতে উপস্থিত হয়ে অনুরোধ করলেন, লীলা ম্যাক্কারথীর আত্মজীবনীতে ভূমিকা যেন শ' না লেখেন।

বার্ণার্ড শ' এইবারও রূঢ় ভাবে সে অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করলেন। এর কিছু কাল পরে ১৯৪৬-এর ৩০শে আগষ্ট প্যারীতে বার্কারের মৃত্যু হয়। বেতারে এই মৃত্যু-সংবাদ শুনলেন শ'। মনে মনে বার বার বার্কারকে স্মরণ করেছেন শ,' দেখবার বাসনাও হত কিন্তু তা হয়ে উঠেনি। বার্কারের মৃত্যুর পর The Times Literary supplément-এ একটি করুণ চিঠি লিখেছিলেন বার্ণার্ড শ'—

"The shock the news of his death gave me made me realize how I had cherished the hope that our old intimate relation might revive, But

'Marrige and death and division

Make barren our lives'

and the elderly professor could have little use for a nonagenarian ex-play wright."

কবি সুইনবার্ণের বিখ্যাত কবিতার দুটি লাইনে বার্ণার্ড শ'র স্নেহশীল মনের ছাপ সুস্পষ্ট।

দশ

John Bull's other Island নাটকটি ডব্লু, বি, ইটসের অনুরোধেই বার্ণার্ড শ' লিখেছিলেন। তাঁদেরই Abbey Theatre-এর জন্য ইটস বার্ণার্ড শ'কে একটি নাটক লিখে দিতে বলেন।

১৯০৪-এর সেপ্টেম্বর মাসে বার্ণার্ড শ' এই নাটকটি লিখলেন, কিন্তু যাঁদের উদ্দেশ্যে নাটকটি লেখা হল তাঁরা শেষ পর্যন্ত নাটকটি মনোনীত করলেন না। ভদ্রভাবে তাঁরা জানালেন এই নাটক অভিনয় করবার মত আইরিশ অভিনেত্রীর অভাব। ইটস কিন্তু বলেছিলেন তিনি এই নাটকের মাথামুণ্ডু কিছুই বোঝেন নি। পরে অভিনয় দেখে বলেছিলেন—আশাতীত উৎরেছে বটে, তবে হয়ত অভিনয়ের গুণ। নাটকটি অত্যন্ত দীর্ঘ, কুৎসিত এবং কিম্ভূতকিমাকার। তবে দর্শককে খুসী রাখে। আমার এতটুকু ভালো লাগেনি।

ইটসের চরিত্র একটু বিচিত্র। তিনি বার্ণার্ড শ'কে কোনো দিনই প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করেন নি। রবীন্দ্রনাথকেও তিনি কিছু সাহায্য করেছিলেন কিন্তু পরে তাঁর পত্রাবলীর মধ্যে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে যা উক্তি করেছেন তা অতি ক্ষুদ্র মনের পরিচায়ক।

Man and Supermanএর মতো এই নাটকেও দুটি চরিত্রে শ' আপনাকে ধরা দিয়েছেন Candida নাটকেও তাই, তবে Candida মূলতঃ মনস্তাত্ত্বিক। John Bull's other Island-এ দার্শনিক তত্ত্ব পরিস্ফুট। প্রতিদ্বন্দ্বিমূলক দৃষ্টিভঙ্গীর সমন্বয়। এখানে প্রতিদ্বন্দ্বী মনোহারিণী রমণী নয়, ইংরাজ। সেভিয়ান ইংরাজ, সেভিয়ান রাজনীতিবিদ্, Broadbent চরিত্রটি লক্ষ্য করার মতো। শ' স্বয়ং Larry Doyle ও Father Keegan-এর সমন্বয়। ডয়েল সাংসারিক আইরিশম্যান বাস্তব প্রেরণার তাগিদে ইংরাজ সেজে ইংরাজের ওপর প্রতিশোধ গ্রহণে আগ্রহান্বিত আর ফাদার কীগান মনে করেন—**"Every jest is an earnest in the womb of time."**

ফাদার কীগান আর ব্রডবেনটের নিম্নলিখিত সংলাপ লক্ষ্য করুন—

ব্রডবেনট—পৃথিবীটা ত' দেখছি আমার কাছে ভালোই, চমৎকার জায়গা।

কীগান—তুমি তাহ'লে এতেই তুষ্ট?

ব্রডবেনট—আমি যুক্তিবাদী মানুষ, সেই হিসাবে বলি হাঁ আমি তুষ্ট। আমি পৃথিবীতে কোনো কিছু অশুভ দেখি না। অবশ্য স্বাভাবিক অশুভবস্তু বাদে। স্বাধীনতার দ্বারা স্বায়ত্ত-শাসনের দ্বারা তার প্রতিকার সম্ভব নয়। একথা আমি ইংরাজ হিসাবে বলি না, সাধারণ বোধ থেকেই বলছি।

কীগান। তাহলে পৃথিবীটা তোমার কাছে ভালোই লেগেছে?

ব্রডবেনট। নিশ্চয়ই, কেন? তোমার ভালো লাগে না?

কীগান। (স্বাভাবিক গভীরতা বশে)—না।

ব্রডবেনট। বরং ফসফরাস পিল খেয়ে দেখতে পারো। আমার মাথাটা যখন জটিল হয়ে ওঠে আমিও তাই করি। অক্সফোর্ড ষ্ট্রীটের ঠিকানাটা তোমাকে দেব।

নাটকের শেষে লারী ডয়েল স্বপ্ন দেখা সম্পর্কে তার আন্তরিক ঘৃণা প্রকাশ করে, সে ঘৃণা শ'র নিজস্ব। তিনি কোনো মায়া বা ভাববাদে বিশ্বাসী ছিলেন না, আর ব্রডবেনট বলেন স্বর্গটা কি ভয়ংকর জায়গা তা আমি স্বপ্নে দেখেছি। আর কীগানের স্বপ্ন বার্ণার্ড শ'র নিজস্ব মনোবিলাস—এটা তাঁর কাছে মায়া বা ভাববাদ নয়।

"আমার স্বপ্নে একটি দেশ চোখে ভাসে, সেখানে রাষ্ট্র হচ্ছে চার্চ আর চার্চ হচ্ছে জনগণ—একে তিন, তিনে এক। এ এক অদ্ভুত কমনওয়েলথ, এখানে কাজের নাম খেলা এবং খেলার নাম জীবন; একে তিন, তিনে এক। এ এক মন্দির, যেখানে যাজকই যজমান আর যজমানই পূজা পায়—একে তিন, তিনে এক"—

জনবুলের শেষ অংকে বার্ণার্ড শ' তাঁর মতবাদ অকুণ্ঠ ভাবে প্রকাশ করেছেন—এই ক'টি পৃষ্ঠা সর্বজন-পরিচিত বার্ণার্ড শ'র নিজস্ব মতবাদ। এই মানুষই একদিন উদ্ধত ভঙ্গীতে লিখেছিলেন, **"My heart knows only its own bitterness"**—এই লেখক সম্পর্কেই আইরিশ কবি A. E. বলেছেন—"Suffering Sensitive soul."

ইংরাজী রঙ্গমঞ্চের পক্ষে ১৯০৪ একটি স্মরণীয় বছর। এত দিনে বার্ণার্ড শ' স্বীয় মর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত। ভেডরেণে বার্কার সম্প্রদায়ের অভিনয়খ্যাতি ইংলণ্ডের বাইরেও ছড়িয়ে পড়ল—নাট্য সাহিত্যের

বিশেষ উন্নতি হল। এই বছরই ষ্টেজ সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হল। প্রাচীন রঙ্গমঞ্চের এত দিনে অবসান ঘটলো। কনটিনেন্টে বার্ণার্ড শ'র খ্যাতি প্রচারিত হল।

কোর্ট থিয়েটারে **John Bull's Other Island** বিশেষ সাফল্যলাভ করল। শিক্ষিত ইংরাজ দর্শক এই নাটকটি গ্রহণ করলেন। প্রধানমন্ত্রী আর্থার বালফুর (পরে আর্ল বালফুর) চার বার অভিনয় দেখলেন, দুদিন সঙ্গে নিয়ে এলেন বিরোধী দলের ক্যাম্বেল ব্যানার ম্যান এবং এ্যাসকুইথকে। কিন্তু সবচেয়ে জমলো ১৯০৫-এর ১১ই মার্চ, সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের আদেশে অনুষ্ঠিত সান্ধ্য অভিনয়ে। খবরটা পেয়ে বার্ণার্ড শ' একটু চিন্তিত হয়ে ভেডরেণেকে লিখলেন—"**short of organising revolution I have no remedy**—"

ভেডরেণে তখন আনন্দে আটখানা। বার্ণার্ড শ'র চিঠি তাঁর কাছে রসিকতা, তিনি রয়্যালবক্সের জন্য চেয়ার ভাড়া করতে ছুটলেন। সম্রাট আসছেন, তাঁর বসবার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করতে হবে।

সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড **Arms and the Man** দেখে বলেছিলেন—কে লিখেছে হে? লোকটা পাগল।

কিন্তু **John Bull's Other Island** দেখে এত অট্টহাস্য করলেন যে ভেডরেণের ভাড়া করা চেয়ার ভেঙে পড়ল। কৃপণ ভেডরেণে অম্লানবদনে সেদিন চেয়ারের দাম মিটিয়েছিলেন।

প্রতি রজনীতেই এমনই হাসির রোল উঠত যে দর্শকদের সামলানো দায়। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে যখন এই নাটক পুনরুজ্জীবিত হল তখন বাধ্য হয়ে বার্ণার্ড শ' দর্শকদের প্রতি এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেন। এই সামান্য বিজ্ঞপ্তিরও সাহিত্যিক মূল্য আছে।

জনবুলের সাফল্যের অন্যতম কারণ এই নাটকের ইংরাজ চরিত্র ভাবালু, সরল এবং সফল। এইরূপেই তাঁরা নিজেদের দেখতে ভালোবাসেন, আর আইরিশ চরিত্র চতুর, তবে জীবন-সংগ্রামে অসার্থক।

Saturday Review পত্রিকায় বার্ণার্ড শ'র উত্তরাধিকারী নাট্য-সমালোচক ম্যাকস বীরবোহম লিখলেন—'সম্রাটের আনন্দ নিঃসন্দেহে বার্ণার্ড শ'র জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করেছে।' মুখে মুখে বিদগ্ধ সমাজে এই নাটকের খ্যাতি সম্পর্কে আলোচনা চলছিল; সম্রাট অভিনয় দর্শন করার পর সে খ্যাতি চারি দিকে ছড়িয়ে পড়ল। ম্যাকস বীরবোহম লিখেছেন—"**That evening Mr. Shaw became a fashionable craze, and within a few days all London know it.**" [ক্রমশঃ।

কবির প্রতি

[কবিতাটি বহুদিন পূর্ব্বে ময়মনসিংহে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সম্বর্দ্ধনা সভায় তাঁহার সুরেলা কণ্ঠের আবৃত্তিতে ও প্রশংসা লাভে ধন্য]

শ্রীবিভাবতী আচার্য্য-চৌধুরী

বিধাতার মত গরিমাদীপ্ত
সৃজন পুলকে আপনা হারা
সুরের জগত করেছ রচনা
লীলা চঞ্চল জীবনী ধারা।
তোমার কাননে ফোটে ফুলদল
তোমারো ভুবনে মেঘে ঢালে জল
আসে অমানিশা পূর্ণচন্দ্র
নীলাকাশে ফোটে উজল তারা
আঁখিজলে ভাসে আনন্দ গীতি
মুক্তির মাঝে মায়ার কারা।
বাজিল যেদিন বীণাখানি তব
কোন্ সে অজানা গিরির শিরে
সেদিন পুলক উঠিল জাগিয়া
নির্ঝরিণীর স্বপন ঘিরে,
যেদিন তোমারে সুরের দেবতা
বলেছিল তার মরমের কথা
উপহার দিয়ে ইন্দ্র সভার
নৃত্য চপল ছন্দটিরে
তটিনীর বুকে সেদিন তোমার
সোনার তরণী নাচিল ধীরে।

অজানার পথে চলিতে চলিতে
রচিলে তোমার বিশ্বখানি
রামধনু রংয়ে ছেয়ে দিলে তারে
আপনার মনে কবে না জানি।
তোমার মনের বরণের রাগে
তরুলতিকায় যৌবন জাগে
ফুলে ঢেকে দিলে কাঁটা ভরা পথ
সান্ত্বনা ঢাকে ব্যথার গ্লানি
অণু পরমাণু করিলে অমর
নিজেরি প্রাণের পীযুষ দানি।
আজিকার তুমি নহ শুধু কবি
যুগে যুগে এলে ধরার মাঝে
নিখিলের সুরে বুঝিগো তোমার
হৃদয় রাগিণী নিয়ত বাজে
অরুণিমা সনে জেগেছিল প্রাণ
পাখীর কণ্ঠে গেয়েছিলে গান
কত বরষার ব্যথার মাঝারে
ভুলেছিলে তুমি সকল কাজে
প্রতিভাদীপ্ত ললাটে তোমার
বিশ্ব কবির বিভূতি রাজে।

চলন বিলের মর্ম্মকথা

[উত্তরবঙ্গের মধ্যযুগীয় কাহিনী সম্বলিত]

শ্রীকুঞ্জবিহারী সাহা

আমায় বুঝি চিনতে পারছ না!—আমি যে 'চলন'! তা' চিনবেই বা কেমন ক'রে? এখন কি আমায় চিনতে পারা যায়! আমার কি সে দিন আছে—না সে রূপ আছে? যা'ক আমি নিজেই না হয় আত্মপরিচয় দিচ্ছি। এখন আমায় সবাই 'চলন বিল' বলে। আমার অবস্থিতি উত্তর বঙ্গে।

আজ আমার বার্দ্ধক্য ভারাবনত লোল-চর্ম্ম ক্ষীণ দেহ দেখে আর কি আমায় চিনবার উপায় আছে? আজ আমি জীর্ণ শীর্ণ জরাগ্রস্ত স্থবির, কিন্তু আমি চিরদিন এমনি ছিলাম না। আজই আমার এই কঙ্কালসাররূপ দেখছ। জানি না অদৃষ্টের কোন নির্ম্মম পরিহাসে এক্ষণে আমি পূর্ণ যৌবনেই বৃদ্ধত্ব প্রাপ্ত হ'য়েছি। আমার অতীত জীবনের কথা মনে হ'লে আমি নিজেই বিস্মিত হই। আমার সেদিন ছিল যেন একটা অপরূপ সুখ স্বপ্ন। সে স্মৃতি ভাবলে আমার হৃদয় শতধাবিচ্ছিন্ন হয়। ভাবি আমার সে সুখের স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল কেন? একদিন ছিল,—যখন আমার ভুবন-বিমোহন সৌন্দর্য্য সুরলোকেও বুঝি ছিল দুষ্প্রাপ্য। একদিন ছিল যখন আমার স্বর্গীয় সুষমার কত আকর্ষণই না ছিল। কত পূজারীই না আমার অনির্ব্বচনীয় রূপের ক'রেছে স্তব স্তুতি। ক'রেছে ধ্যান কত স্তবকে! তাই ভাবি আমার সে দিন গেল কোথায়? কোন মহাপাপের ফলে আজ আমার এ দুর্দ্দশা!

ভেবেছিলাম—আমি স্থির-যৌবন হ'য়েই সারা জীবন কাটাতে পারব। আমার অপরূপ সৌন্দর্য্যের জন্য বুঝি আমার গর্ব্বও ছিল খুব। তাই মনে হয়,—দেবতার অভিশাপে আজ আমায় যৌবনেই বিরূপ-বিকৃত হ'য়ে বার্দ্ধক্যের শেষ সীমায় উপনীত হ'তে হ'য়েছে! আবার বলি,—আমার বেশ স্পষ্ট মনে পড়ছে,—একদিন ছিল—যখন আমার ঢলঢল যৌবন, সুদর্শন সুগঠিত অবয়বের বিস্ময়কর পরিস্ফুটন, সবে মিলে আমার অনুপম সৌন্দর্য্য, আমার মনোহর দেহ লাবণ্য দর্শক মাত্রেরই হৃদয়ে যুগপৎ আনন্দ ও বিস্ময়ের উদ্রেক ক'রত। সত্যই তখন আমার রূপ ছিল অতুলনীয়, অতীব নয়নাভিরাম।

আমার বংশ পরিচয়টা শোন। আমার জন্মের ইতিহাস আজ গভীর বিস্মৃতিগর্ভে নিহিত—ঘোর প্রহেলিকাচ্ছন্ন। আমার জন্ম কোন সুদূর অতীতে তাও আজ অজ্ঞাত। কোন অপ্রত্যাশিত প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ের মধ্যে হয়ত আমার জন্ম হয়েছে একদিন। আমার জন্মের কোন ঠিকুজিও নেই। আর আমার জন্মের সাক্ষ্য দিবার মত বয়োবৃদ্ধও ত কেউ নেই। এমন কি আমার সমবয়সীই বা আছে কে? জন্মাংশে আমি মহাকুলীন। কিন্তু ভাগ্যদোষে আমি বংশগত কৌলিন্যমর্য্যাদা হারিয়ে আজ পতিত হ'য়ে পড়েছি। ভাবতে গেলে দারুণ মনঃকষ্ট হয় যে, মহাকুলীনের পর্য্যায়ভুক্ত হ'য়েও কোন মহাপাপের ফলে আমি নিম্ন শ্রেণীতে অবনমিত হ'য়ে সাধারণ বিল সমাজের অন্তর্ভুক্ত হ'য়েছি। অহো! এ দুর্গতির কথা মনে হ'লে হৃদয়ে শত বৃশ্চিক দংশনের তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করি।

প্রকৃত পক্ষে আমার স্বজাতি বা স্বগোত্রীয় কেউ বঙ্গদেশে নেই। উড়িষ্যা, মাদ্রাজ রাজপুতানা প্রভৃতি অঞ্চলে আমার স্বজাতি ও জ্ঞাতি বর্গ এখন ও স্ব স্ব আভিজাত্য পূর্ব্ববৎ বজায় রেখে সগৌরবে অবস্থান করছে। আমার জন্মের বিবরণ পর্য্যালোচনার ভার পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণের গ্রহণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। তা' হ'লে এক মহাবিস্ময়ের ইতিহাস আবিষ্কার হবে। সে ইতিহাস হ'বে নিশ্চয় কৌতূহলোদ্দীপক এবং বাঙ্গালীর জাতীয় গৌরবের অমূল্য সম্পদ। সে ইতিহাস হবে বৃহৎ বঙ্গের মহা গৌরবময় সভ্যতা ও বিরাট সংস্কৃতির দিক দিয়ে কুবেরের ভাণ্ডার। কোন বিষয় পুরাতত্ত্ববিদ এখনও সে বিষয়ে উদাসীন।

আমার জীবন-পর্য্যায় তোমাদের মত নয়। আমার শৈশব বা কৈশোর কোন দিন ছিল না। আমার জন্ম হয় পূর্ণ যৌবন নিয়ে। আমার তৎকালীন অপূর্ব্ব সুন্দর লীলায়িত-যৌবন দর্শন ক'রে রূপতৃষ্ণার্ত হত বিমুগ্ধ, বিস্মিত। সবাই সতৃষ্ণ-নয়নে আমার অলৌকিক সৌন্দর্য্য চেয়ে চেয়ে দেখত। আমার বিশালত্ব বিরাটত্ব উভয়ই ছিল আশ্চর্য্যজনক। আমার দেহের দৈর্ঘ্য অন্যূন ত্রিংশ মাইল এবং বিস্তারও ন্যূন কল্পে পঞ্চ দশ মাইল জুড়ে ছিল। উত্তর বঙ্গের রাজসাহী ও পাবনা জেলাদ্বয়ের এক সুবিস্তৃত অংশে ছিল আমার অবস্থান। আমার বর্ত্তমান সংকীর্ণ আকার দেখে আমার পূর্ব্বের বিশালতার কথা বিশ্বাস করা যায় না বলছ ত? তা আমিও অকুণ্ঠিত ভাবে স্বীকার করছি। কিন্তু আমার কথা কিছুমাত্র অবিশ্বাস্য নয়। দুর্ভাগ্যবশতঃ কালক্রমে নানা দুর্দ্দৈব হেতু আমার স্বাস্থ্যসুন্দর বিরাট দেহ শুষ্ক হয়ে অনেকস্থানে মজে গিয়ে হয়েছে বর্ত্তমানে ক্ষুদ্রত্বে পরিণত। সে দুঃখের কাহিনীও কিছু বলছি শোন।

একদিন খরস্রোতা আত্রেয়ী ও করতোয়া হল অকারণ আমার উপর বিরূপ। জানি না কোন বিদ্বেষের বশবর্ত্তী হয়ে তারা উভয়েই নিষ্ঠুরের ন্যায় আমার সুকোমল দেহ দ্বিধা বিভক্ত করে ছুটে চলল পৈশাচিক নৃত্য করতে করতে পূর্ব্বাভিমুখে। আমার অসহ্য যন্ত্রণা আমার আকুল কান্না, আমার তীব্র আর্ত্তনাদেও তাদের পাষাণ-হৃদয় কিছু মাত্র বিগলিত হল না—বরং অট্টহাস্য করতে করতে চলে গেল ছুটে। তাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণে আর একদিন বেগবতী চঞ্চলমতি পদ্মাও নির্ম্মম ভাবে করল আমার আহত দেহ ছিন্নভিন্ন। সেও উদ্দাম গতিতে চলল পূর্ব্ব দিকে। অতঃপর মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা নীতি অবলম্বন করল দুর্দ্দান্ত বড়ল আর নারদ। আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি। ইতিহাস খুললেই নজির মিলবে—সত্যতা প্রমাণিত হবে। খেয়ালী পদ্মার বুঝি স্বকৃত কর্ম্মের জন্য একটু অনুশোচনা হয়েছিল, তাই সে সে-গতি পরিবর্ত্তন করে শেষে বহুদূর দিয়ে নিজ পথ নির্ম্মাণ করল। কিন্তু অন্যেরা আমার মর্ম্মপীড়া একটুও বুঝল না। ওরা যে আমার কি সর্ব্বনাশ করেছে তা অবর্ণনীয়। তারা আমার দেহের অভ্যন্তরে কত আবিলতা কত ক্লেদময় পঙ্ক, কত রাশি রাশি বালি করেছে নিক্ষেপ দিনের পর দিন—তার ফলে

অবাক

—স্বরূপা বন্দ্যোপাধ্যায়

চারমন্দির (বড়নগর)

—শচীকুমার মিত্র

যাদুঘর (কেরালা)

—দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়
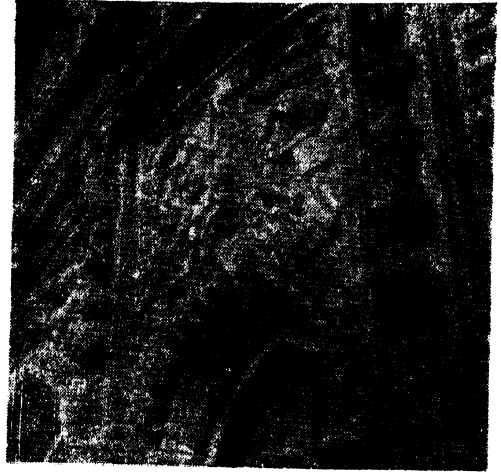
হংসমিথুন —নিমাইরতন গু

[ছবি পাঠানোর সময়ে ছবির পেছনে নাম ধাম
ও ছবির বিষয়বস্তু লিখতে যেন ভুলবেন না]

অস্তগামী
—অমলকুমার মেহেরা

অন্যমনা —শিবানী চট্টোপাধ্যায়

গঙ্গা (উলুবেড়িয়া) —খগেশ ঘোষ

—মৃণালকান্তি চন্দ

মুখোস না রাক্ষস ?
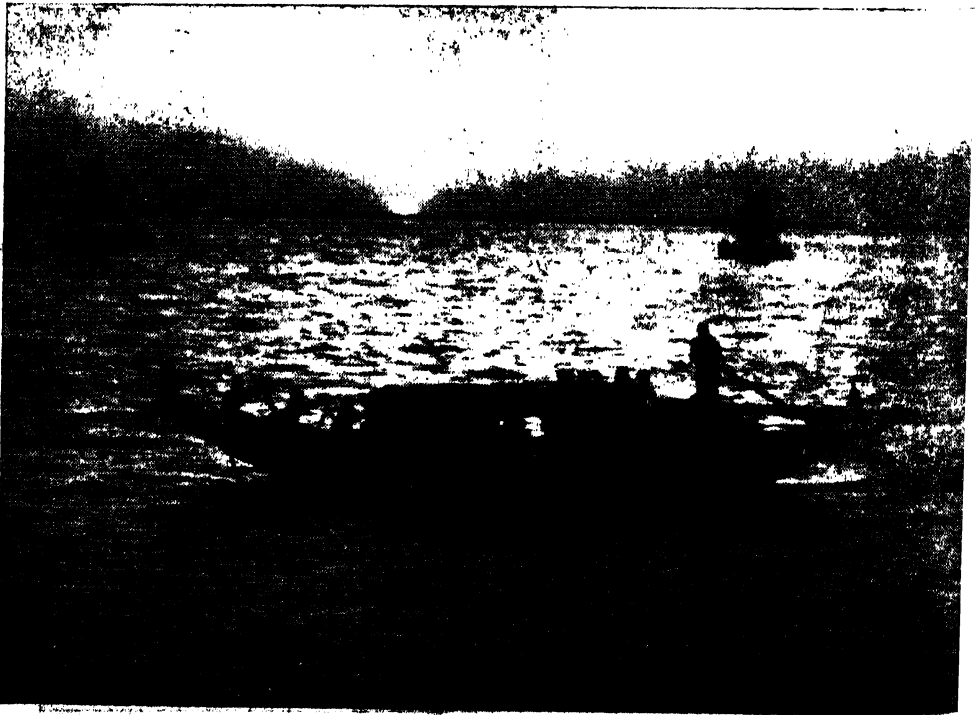
পর্ব্বতাকার আবর্জ্জনা-স্তূপ আমার গর্ভে সঞ্চিত হয়ে আমার হৃৎস্পন্দন করল যেন একেবারে স্তব্ধ ; আমি হয়ে পড়লাম জীবন্মৃত, আমার রক্তবাহিকা শিরা এখন বিশুষ্ক ; আমার এখন নাভিশ্বাস দশা বললেই হয়।

দরদী সুহৃদগণ! একটু কষ্ট স্বীকার ক'রেই না হয় শোন আমার মর্ম্মের কথা তোমরা। আমার সেই মহিমামণ্ডিত অতীত কাহিনী, আমার সেই গৌরবময় ইতিবৃত্ত বলতে না পারলে প্রশমিত হচ্ছে না আমার বিদগ্ধ হৃদয়ের তীব্র জ্বালা। সর্ব্বাগ্রে আমার নির্ব্বন্ধ অনুরোধ যে, আমার কথা অবিশ্বাস কর না তোমরা। উত্তর বঙ্গের কথার সঙ্গেই যে আমার মর্ম্মের কথা জড়িত ওতপ্রোতভাবে। তৎকালীন বঙ্গসভ্যতা-ভাণ্ডারে আমার অবদান তুচ্ছ নয় অবশ্য। সেই যুগে আমার কূলে কূলে যে এক বিশিষ্ট সভ্যতা এবং সংস্কৃতির উদ্ভব ও বিকাশ হয়, তাই ত মধ্যযুগীয় উত্তরবঙ্গ সভ্যতা। একদা আমার উপকূলে আবির্ভাব হ'য়েছে কত মহাজ্ঞানীর, কত প্রবীণ পণ্ডিতের, কত মহাসাধকের, কত মহাকবির, কত দানবীরের, কত শৌর্য্য-বীর্য্য-শালী বীরের, কত ধর্ম্মপরায়ণ মহাপুরুষের ইয়ত্তা নেই তার। আমার উপকূলে বসে কত মহামনীষী রচনা ক'রেছেন—কত দর্শন, কত কবিতা, কত ইতিহাস—যা লাভ ক'রে সমৃদ্ধ হ'য়েছে ভারতীয় জ্ঞান-ভাণ্ডার। কত নীতি, কত ধর্ম্মভাব, কত বীর্য্যগরিমার উন্মেষ হ'য়েছে আমার তটভূমে। এই বরেন্দ্রেই—আমারই উপকূলে—আবির্ভাব হ'য়েছিল, বঙ্গবীর সপ্তদুর্গাধিপ রাজা কংস রাম অথবা কংস নারায়ণের, (গণেশ নারায়ণের) যাঁর অসাধারণ প্রতিভা ও অসীম বাহুবলে স্বাধীন হ'য়েছিল সমগ্র বঙ্গ বিদেশী মুসলমানের কবল থেকে। সেই বঙ্গাধিপ কংস নারায়ণেরই গৌড়ীয় রাজসভায় বসেই তাঁরই নির্দ্দেশ ক্রমে, একদা এক শুভক্ষণে প্রসব ক'রেছিল জগদ্বরেণ্য মহাকবি কৃত্তিবাসের অমর লেখনী রামায়ণ মহাকাব্য—যা আজও শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মগ্রন্থরূপে আদৃত ও পূজিত হ'য়ে আসছে—সমভাবে, পর্ণ-কুটীর থেকে রাজপ্রাসাদ অবধি, সেই মহাগ্রন্থের দেবদুর্লভ সুধারস পান করে ধন্য হ'য়েছে, কৃতার্থ হ'য়েছে জগদ্বাসী, সার্থক হ'য়েছে আমার নাম সেই মহামহিমান্বিতদ্বয়কে পেয়ে।

বার ভূঁইয়ার আমলে যে সকল বিরাট পুরুষকার-সম্পন্ন সামন্ত নরপতি সার্থক করেছিলেন বঙ্গ মাতার সুসন্তানপ্রসবিণী নাম তন্মধ্যে অন্যতম ভূঁইয়া রাজ অশেষ গুণান্বিত ধর্ম্মপরায়ণ, তাহির পুরাধিপতি কংসনারায়ণের নাম সর্ব্বজনবিদিত। তিনি অনন্যসাধারণ প্রতিভাবলে যে শুধু বহু বিস্তৃত ভূসম্পত্তিরই অধীশ্বর হ'য়েছিলেন তাই নয়। তাঁর প্রগাঢ় ধর্ম্মানুরাগ ও নিঃস্বার্থ জনকল্যাণব্রত ক'রেছে তাঁকে সর্ব্বজনবরেণ্য ও সর্ব্বযুগপূজ্য। এই গুণে তিনি হ'য়েছেন বিশ্ববরণীয়। এই যুগে তিনিই সর্ব্বপ্রথম কলির মহাযজ্ঞস্বরূপ ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মোৎসব তথা বাঙ্গালীর সার্ব্বজনীন জাতীয় উৎসব শারদীয়া দুর্গাপূজার যে বিপুল আয়োজন ও মহাসমারোহপূর্ণ অনুষ্ঠান করেন, তা'তে সমগ্র বঙ্গব্যাপী এক মহানন্দের ধূম পড়ে যায়। সেই বিপুল আনন্দোৎসবে মুখরিত হয়ে উঠে বাংলার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত। সে অনুষ্ঠানকে বলা যেতে পারে কলির দক্ষযজ্ঞ। এতে ব্যয় হয় তাঁর অন্যূন অষ্ট লক্ষ মুদ্রা (বর্ত্তমান কালের অন্ততঃ পঞ্চাশ লক্ষ)। কংসনারায়ণের মহাসমারোহপূর্ণ নূতন যজ্ঞের পূর্ণ সফলতা ও জয়জয়কার, তাঁর দেশব্যাপী যশঃ ও খ্যাতিতে বিদ্বেষভাব প্রণোদিত সপ্তদুর্গাধিপতি মহারাজ অবনীনাথ (?) অধিকতর ব্যয়বহুল, অধিকতর আড়ম্বরপূর্ণ বাসন্তী দুর্গোৎসবের প্রতিযোগিতামূলক বিপুলতর আয়োজন করেন। কিন্তু তাঁর কামনাগন্ধযুক্ত উৎসব, ব্যক্তিগত যশোলাভার্থে অনুষ্ঠিত পূজায়োজন সার্থক হয়নি আদৌ। তাঁর স্বার্থ ও প্রতিহিংসাগন্ধ-কলুষিত বিরাট যজ্ঞানুষ্ঠান কিছুমাত্র ম্লান করতে সক্ষম হয়নি মহানুভব কংসনারায়ণের নিষ্কাম জাতীয় উৎসবের যশঃসৌরভ।

'ভারত আতঙ্ক' নামে অভিহিত—বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যা-আসাম বিজয়ী যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী বীরের ভয়ে একদা সুখনিদ্রার ব্যাঘাত ঘটেছিল দিল্লীশ্বর আকবর শাহের—যাঁর নামোচ্চারণ মাত্র আসমুদ্র হিমাচল প্রকম্পিত হ'য়ে উঠত এক অত্যাসন্ন ভীতিতে, যে অজেয় বীরের আগমনবার্ত্তা ঘোষণামাত্র ভারতবাসী আত্মগোপন করত বন-জঙ্গলে, যে দুর্জয় বীরের আগমনসূচক কাড়া-নাকাড়া-ধ্বনি শ্রবণমাত্র মন্দিরের দেবতার আসন উঠত টলে—সেই ক্ষণজন্মা বীরবরের, সেই বিরাট পুরুষকারবিশিষ্ট 'কালাপাহাড়ের' জন্মও হ'য়েছিল এই উত্তরবঙ্গেরই এক সাধারণ পল্লীতে। দুঃখ হয় যে, তৎকালীন হিন্দু সমাজ সেই সরলহৃদয় কালাপাহাড়ের প্রতি একটু সদয় হ'লে, তাঁর প্রতি এতটুকু উদারতা প্রদর্শনে কুণ্ঠিত না হ'লে, পরবর্ত্তী ভারত-ইতিহাস যে নবরূপে রচিত হ'ত, তাতে নেই কোন সন্দেহ।

বঙ্গের অন্যতম ধর্ম্মশীল ও প্রতাপশালী ভূঁইয়া জমিদার পুঁঠিয়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ও তাঁর সুযোগ্য বংশধরগণের কীর্ত্তিকলাপও কম গৌরবের বিষয় নয়। তাঁদের লাঠির জোর ত আজও প্রচলিত আছে উত্তরবঙ্গে প্রবাদস্বরূপ। এই রাজবংশের বিপুল কীর্ত্তি বঙ্গের বাহিরে পর্য্যন্ত আছে ছড়িয়ে।

সপ্তদুর্গা ও শাঁতোড়ের প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁদের ভয়ে বাঘে-গরুতে জল খেতো এক ঘাটে। কিন্তু আশ্চর্য্য যে, এই দুই শক্তিশালী রাজ্য ছিল সতত পরস্পরবিরোধ-পরায়ণ। যদি এই প্রভাবান্বিত রাজ্যদ্বয় সদ্ভাবসূত্রে হত গ্রথিত, তবে বঙ্গদেশে হিন্দু স্বাধীনতা-সূর্য্য বোধ হয় ক্ষণস্থায়ী হত না।

তার পর বলি, ইতিহাস-বিখ্যাত নাটোর রাজ্যের কথা—যার মহাগৌরবান্বিত নাম হত পরিকীর্ত্তিত ভারতের যত্রতত্র। এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতৃ ভ্রাতৃযুগল ছিলেন রামজীবন ও রঘুনন্দন। তাঁরা অসাধারণ বুদ্ধিবলে যে বিস্তৃত জমিদারী অর্জ্জন করেন, তা সুশৃঙ্খল ভাবে পরিচালন করেছিলেন বিচক্ষণ দেওয়ান দয়ারাম রায়। অতুলনীয় বুদ্ধিমান ও অশেষ গুণশালী দেওয়ান ছিলেন অর্দ্ধবঙ্গ বিস্তৃত নাটোর রাজ্যের স্তম্ভস্বরূপ। এই ভারত-বিখ্যাত রাজকুলে সাক্ষাৎ লক্ষ্মীস্বরূপা ছিলেন ধর্ম্মশীলা রাণী ভবানী। তিনি যখন অষ্টম বর্ষীয়া বালিকা সবে ধূলিখেলা-রতা—তখন সুযোগ্য দেওয়ানজীই তাঁকে পথের ধার থেকে এনে ছিলেন কুড়িয়ে বললেই হয়—আর করেছিলেন সেই সুলক্ষণা ভবানীকে রাজ রাজেশ্বরী। দানশীলা ভবানী সমগ্র ভারতে পূজিতা হচ্ছেন প্রাতঃস্মরণীয়ারূপে। তাঁর অর্দ্ধবঙ্গব্যাপী রাজ্যের সদর মালগুজারি ছিল বায়ান্ন লক্ষ তিপ্পান্ন হাজার টাকা এবং সমগ্র রাজ্যের বার্ষিক আয় ছিল অন্যূন দেড় কোটি মুদ্রা। রাজ্যের শক্তি ছিল এক বৃহৎ স্বাধীন রাষ্ট্রের সমতুল্য। নাটোরের শক্তিশালী

চতুরঙ্গ সৈন্যবাহিনী থাকত সতত যুদ্ধার্থে প্রস্তুত। রাণী ভবানীর অতুলনীয় দানশীলতা, একনিষ্ঠ ধর্ম্মপরায়ণতা, আদর্শ প্রজাবাৎসল্য আজও প্রবাদবাক্য স্বরূপ।

ভূষণাধিপতি বীর শ্রেষ্ঠ সীতারামকে মুর্শিদাবাদের নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ দমন করবার ভার প্রদান করেন নাটোর রাজ্যকে। বাধ্য হয়েই নাটোর বাহিনী এক বিশাল অভিযান করেন বীরপুরুষ সীতারামকে বন্দী করবার জন্য। অভিযান পরিচালন করেন দেওয়ান দয়ারাম স্বয়ং। সে অভিযান যে কি বিরাট ব্যাপার! সহসা সৈন্য বাহিনীতে পড়ে গেল 'সাজ-সাজ' রব, সৈনিকেরা উঠল উৎসাহে মেতে। তাদের বীর পদক্ষেপে আমার শান্ত হৃদয় উঠল সহসা কম্পিত হ'য়ে এক অনিশ্চিত আশঙ্কায়। দয়ারামের শ্রেষ্ঠতর রণ-কৌশলের নিকট বীর-শ্রেষ্ঠ সীতারামের ঘটলো নিদারুণ পরাজয় দুর্ভাগ্যক্রমে। অবশেষে তিনি হ'লেন নাটোর বাহিনীর হস্তে বন্দী। সঙ্গে সঙ্গে ভূষণার বুকভরা আশা ভরসা হ'ল চিরতরে অবলুপ্ত। ধনজনপূর্ণ সমৃদ্ধ ভূষণা নগরী হ'ল লুণ্ঠিত। বিজয়ী সৈন্য কর্ত্তৃক ধর্ম্মপ্রাণ সীতারামের প্রাণের দেবতা যা লুণ্ঠনের শ্রেষ্ঠ অংশ তা দেওয়ান স্বয়ং গ্রহণ করলেন এবং তাকে মহাধুমধামে স্বগৃহে করলেন প্রতিষ্ঠিত। 'পলাশীর' ভয়াবহ পরিণাম সম্বন্ধে নাটোরের পক্ষ থেকে যে সতর্কবাণী প্রদত্ত হ'য়েছিল তাও ত পারছিনা আমি ভুলতে। ক্ষোভের বিষয় এই পরাক্রান্ত নাটোর রাজ্যেও ধরল ভাঙ্গন। অল্পকাল মধ্যে রাণীর দত্তক পুত্র সাধকশ্রেষ্ঠ মহারাজ রামকৃষ্ণ (রায় রায়াণ) হলেন উদাসীন, তিনি পুণ্যতোয়া অত্রেয়ী তীরে পঞ্চমুণ্ডী আসনে বসে ধ্যানমগ্ন হলেন। জমিদারী উঠতে লাগল নীলামে পরগণার পর পরগণা। তিনি তাতে দুঃখিত হলেন না আদৌ, বরং মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলে জয়কালী মা'র ভোগের বরাদ্দ দিলেন দ্বিগুণ বর্দ্ধিত ক'রে। তাঁর এই নির্ব্বিকার অবস্থায় সময়ে তাঁরই রাজ্যের ধ্বংসাবশেষের উপর উদ্ভব হল উত্তরবঙ্গে ক্ষুদ্র বৃহৎ বহু জমিদারীর। দানশীল বিদ্যোৎসাহী দিঘাপাতিয়া রাজবংশের সুবিস্তৃত জমিদারীর পত্তনও এই সময়েই।

পরবর্ত্তী কালে উত্তর-বঙ্গের অভিজাত সম্প্রদায় হয়ে পড়েন অত্যন্ত দুর্নীতিপরায়ণ। তাঁদের কুকীর্ত্তির কথা বলতে গেলে অষ্টাদশপর্ব্ব মহাভারত রচনা ক'রতে হয়। আবার তা' প্রকাশ করা হ'লেও কত অভিজাত বংশের সমুচ্চ আভিজাত্যাভিমান হ'য়ে পড়ে ভূলুণ্ঠিত। কিন্তু কিছু না বলতে পারলেও যে মর্ম্মজ্বালায় আমার হৃদয় হয় দগ্ধ। এস্থলে দু'একটি কথা তাই বলছি। হয়ত তা'তে আমার হৃদয়ের দুঃখভার কিছু লাঘব হবে। তাদের কেহ কেহ আমারই শান্ত-শীতল বক্ষের উপর দিনের পর দিন ক'রেছে কত ভয়ানক নৃশংস কার্য্য। কত অভিজাতবংশধর রাত্রির গভীর অন্ধকারে সেজেছে দুর্দ্দান্ত দস্যু। ক'রেছে নিষ্ঠুর ভাবে কত নরহত্যা, কত নারীহত্যা, কত শিশুহত্যা নির্ব্বিচারে—তাদের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করবার অভিপ্রায়। আক্রান্ত নর-নারী আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার বুকফাটা আর্ত্তনাদে, কাতর ক্রন্দনে আমার স্থির বক্ষ উঠেছে অব্যক্ত যন্ত্রণায় কেঁপে। অসহায় জনগণের করুণ ক্রন্দনে অনুনয় বিনয়ে দুরাচারদের পাষাণ হৃদয়ে হয়নি এতটুকু দয়ার উদ্রেক—তাদের কাতর অশ্রুধারায় নির্ম্মম দস্যুদের হৃদয় হয়নি কিছুমাত্র বিগলিত। নরপিশাচেরা রাতারাতি লুণ্ঠন দ্রব্যাদি সহ স্বচ্ছন্দে ক'রেছে স্বগৃহে প্রস্থান নিরাপদে। তারপর মালামাল ক'রেছে ধনাগারজাত মনের আনন্দে। আর দিবাভাগে সেজেছে হিতৈষী সমাজপতি, সদাশয় জমিদার, গরিব প্রজার 'মা-বাপ'। এই শ্রেণীর এক অভিজাতকে দুর্ভাগ্যক্রমে ক'রতে হ'য়েছে স্বকৃত দুষ্কার্য্যের জন্য যথোপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত—পানোন্মত্ত অবস্থায় দস্যুতাকালে স্বীয় স্নেহাস্পদ জামাতাকে স্বহস্তে বধ ক'রে।

আর এক অদ্ভুত ছদ্মবেশী দস্যুর কথা বলি শোন। ঘটনার পাপ চক্রে এক শাস্ত্রজ্ঞ ধর্ম্মশীল ব্রাহ্মণকে ধরতে হয় অস্ত্র শাস্ত্র ছেড়ে। তাঁর রূপলাবণ্যবতী সুন্দরী স্ত্রীকে দুর্বৃত্ত পাঠান সর্দার হরণ করলে তিনি ক্ষমতাশালী ভূস্বামীদের দ্বারে দ্বারে প্রতীকারপ্রার্থী হ'য়ে বিফল মনোরথ হন। তখন এই প্রতিহিংসপরায়ণ নিরীহ ব্রাহ্মণ স্বয়ং একটি পরাক্রান্ত দল গঠন করে সাধ্বী স্ত্রীর উদ্ধার তথা দুষ্টের দমনের জন্য গৃহত্যাগ ক'রতে বাধ্য হন। তিনি প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও অপহৃতা পত্নীকে উদ্ধার ক'রতে সক্ষম হননি। কিন্তু এই ব্রত পালনের জন্য তিনি অসংখ্য পাঠানের মুণ্ডপাত ক'রেছেন আমার বক্ষের উপর আমার চোখের সামনে। দীর্ঘকাল নিষ্ফল প্রয়াসের পর তিনি নীতি পরিবর্ত্তন করতঃ স্বীয় জীবন উৎসর্গ ক'রেছিলেন নিঃসহায় দরিদ্রনারায়ণের সেবায়। তিনি দলবল নিয়ে সম্পন্ন মুসলমান গৃহে এবং প্রজাপীড়ক ও সমাজের অনিষ্টকারী ধনী হিন্দু গৃহে অভিযান ক'রতেন। তিনি তাঁদের ধনসম্পত্তি অবাধে লুণ্ঠন ক'রে নিরন্ন দরিদ্রগণকে নিঃস্বার্থ ভাবে দান করতেন। অপহৃত ধনের এক কপর্দক স্বয়ং ভোগ করতেন না। তিনি সংবাদ দিয়ে আক্রমণ করতেন। কেহ তাঁহার আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারত না। তাঁর নামে পরপীড়ক জমিদারের হৃদয় উঠত কেঁপে।

আমি যে দিনের কথা বলছি তখন আমিই ছিলাম উত্তরবঙ্গের প্রাণকেন্দ্র। আমার আকাশ, আমার বাতাস, আমার জল, আমার স্থল, আমার তীরস্থ শ্যামল প্রান্তর, হাটবাটই রেখেছিল উত্তরবঙ্গবাসীকে সজীব করে। তখনও রেল বা ষ্টীমারাদির নামও ছিল না। যাতায়াতের একমাত্র সুবিধাজনক যান ছিল নৌকা। গো-গাড়ী অবশ্য ডাঙ্গায় চলত। সম্পন্ন ব্যক্তিগণ শিবিকা বা অশ্বারোহণে যাতায়াত করলেও সেকালের উত্তরবঙ্গে ছিল নৌকাই একমাত্র যান বললে অত্যুক্তি হবে না। ছোট বড় নানা প্রকারের ডিঙ্গি বা পানসী নৌকায় যাত্রীরা গ্রাম হতে গ্রামান্তরে করত চলা-ফেরা। বাণিজ্যও চলত নদীপথেই। নৌকার মাঝিরা যখন দাঁড় ও বৈঠার তালে তালে জারি, সারি প্রভৃতি লোক-সঙ্গীত মনের আনন্দে সমস্বরে গাইত, তখন তাদের সেই সুললিত গানের সুমধুর সুর-লহরী আমার সুশীতল বক্ষের উপর দিয়ে যেত অপূর্ব্ব পুলক-শিহরণ। আনন্দের আবেগে আমার হৃদয় উঠত উল্লাসে বিহ্বল হয়ে,—আমি হয়ে যেতাম আত্মহারা। নৌকায় যাত্রীরা ছইয়ের ভিতর বসে পরস্পর করত সুখ-দুঃখের আলাপন—আমি একমনে থাকতাম কান পেতে তা শুনবার জন্য। তাদের সুখের কথায় আমার মনে হত কত সুখ আবার তাদের দুঃখের করুণ কাহিনী শুনতে শুনতে আমি হ'য়ে পড়তাম কেমন অভিভূত, কেমন যেন আনমনা।

তাদের সে কাহিনী যে আমার আপন জনেরই কাহিনী

তাদের মর্ম্মপীড়ায় আমার হৃদয় আকুল হবে না কেন? আমার বেশ মনে পড়ে সেই সপ্তম বা অষ্টম বর্ষীয়া সদ্যোবিবাহিতা বালিকা-বধূদের 'বুক ফাটা' কান্না। তাদের স্নেহময় জনক-জননীর বক্ষ হতে বিচ্ছিন্ন ক'রে—আজন্মের প্রিয় সাথী সঙ্গীদের মধুর সাহচর্য হতে জোর করে বিচ্ছিন্ন করে—যখন কোন অজানা অচেনা নূতন অনভ্যস্ত পরিবেশে নিয়ে যেত নূতন শ্বশুরালয়ে, তখন মনে হত কোন নিষ্ঠুর পাষণ্ড বুঝি তাদের বক্ষ-পঞ্জর থেকে তাদের হৃৎপিণ্ড উৎপাটিত করেছে। তাদের মর্মস্পর্শী আকুল কান্না আমার মর্মস্থলে প্রবেশ করে তীব্র ব্যথা ও যন্ত্রণায় আমায় করত উন্মনা—নিদারুণ ভাবে পীড়িত। আবার এমনও দেখেছি—কেউ বা পিতৃগৃহ বিচ্ছেদ জনিত অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে ঝাঁপ দিয়ে পড়তে উদ্যত হ'ত আমার স্নেহপূর্ণ বক্ষে—তখন আমি নিতান্ত ব্যথিত হৃদয়ে তাদের অলক্ষ্যে করতাম আমার স্নেহবাহু সাদরে প্রসারিত—তাদের আমার স্নেহ-শীতল বক্ষস্থলে আশ্রয় দিবার জন্য; তাদের পীড়াজর্জ্জর হৃদয়ে কিঞ্চিৎ শান্তি-সুধা বর্ষণ করবার জন্য।

আমার প্রাকৃতিক শোভা-সৌন্দর্য ছিল পরম রমণীয়। আমার সুবিশাল বক্ষে ডাহুক-ডাহুকী, সারস-সারসী, চক্রবাক-চক্রবাকীর সানন্দ জলক্রীড়া, চিল ও মাছরাঙ্গার সুকৌশল মৎস্য শিকার এবং অন্যান্য জলচর পক্ষিগণের আনন্দ-দায়ক অবাধ জল-বিহার কেউ দর্শন করেছ কি?

পক্ষিগণের কল-কোলাহল-মুখরিত আমার অনির্ব্বচনীয় নিসর্গ শোভা—বিশেষ জলচরদের সমারোহপূর্ণ বিরাট ভোজের আয়োজন কেমন মনোহর! নৃত্য-কুশল-সুকণ্ঠ-বিহঙ্গ শিল্পীদের নৃত্য-গীতমুখর সেই অদৃষ্টপূর্ব জলসা সত্যই পরম উপভোগ্য। শিকারী পক্ষীদের শিকারার্থে রহস্যময় মৌন প্রতীক্ষা এবং উড্ডীয়মান বিহঙ্গদলের ঝাঁকে ঝাঁকে শন্ শন্ শব্দে এপার হ'তে ওপার পারাপারের মনোহর দৃশ্য কেমন মনোরমই না দেখাত! আমার বিস্তীর্ণ জলরাশির উপর প্রভাত-সৌরকর কেমন এক অপার্থিব সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করত। রংয়ের যাদুকর সূর্য্যদেবের সেই অপরূপ ইন্দ্রজাল ছিল অতীব মনোমুগ্ধকর। সায়ংকালে অস্তাচল চূড়াবিলম্বী সান্ধ্যরবি দিতেন যখন আমার সর্বাঙ্গে রঙের ফাগ্ ছড়িয়ে—যখন আমার স্বচ্ছ জলের উপর স্বর্গীয় রঙের বসন্তোৎসব চলত, তখনকার সেই পরম নয়নানন্দদায়ক সৌন্দর্য্যকেও প্রত্যক্ষ করেছ কি? যাঁরা প্রত্যক্ষ করেছেন, তাঁরা মহাভাগ্যবান্। আবার দারুণ নিদাঘে যখন মহাপ্রলয়ঙ্করী কালবৈশাখীর তাণ্ডব উঠত আমার বিশাল স্থির বক্ষের উপর—পৈশাচিক ক্রীড়ায় উন্মত্ত হ'য়ে অট্টহাস্য সহকারে—তৎকালীন সেই ভয়ঙ্কর ভীমরূপ ভাবতে পার কি কেউ?

সেদিন ছিল না আমার এপার-ওপার। এপার থেকে দেখলে মনে হ'ত আমি অপার, অসীম। ওপার থেকেও দেখাত তাই। দিকচক্রবাল রেখার সঙ্গে আমার মেশামেশি একাকার হ'য়ে গেছে বলে ভ্রম হ'ত। আমার অগাধ অথৈ জলে বাস ছিল কত অসংখ্য জলজ উদ্ভিদের। আমার সুস্বাদু অতল জলতলে মনের সুখে বিচরণ করত কত বিভিন্ন জাতীয় জলচর প্রাণী! তারা সবাই ছিল আমার স্নেহের দুলাল। সবাই যেন পরমাদরণীয় পুত্র-কন্যা। আমার বিশাল বক্ষে তাদের অবাধ ছুটাছুটি, লম্ফ-ঝম্ফ রাখত আমায় সতত স্নেহমুগ্ধ ক'রে। তাদের ক্রীড়া-কৌতুক আমার লাগত বড় ভাল। বড় বড় রুই-কাতলার ঝাঁক যখন ক'রত চঞ্চল ভাবে ইতস্তত বিচরণ, তখন কেমন চিত্তাকর্ষক দৃশ্যই না হত! মৎস্যজীবী ধীবরেরা ছোট ছোট ডিঙ্গি নৌকায় নানা প্রকার জাল নিয়ে আসত মাছ ধরতে। অত্যল্পকাল মধ্যে তাদের নৌকা বোঝাই হ'ত আশাতীত মৎস্যে। আমার কৃপায় তৎকালে উত্তরবঙ্গে ছিল যেমন মৎস্যের প্রাচুর্য্য, তেমনি ছিল তা' চরম সুলভ। বড় বড় রুই-কাতলা মিলত মাত্র চার আনা, আট আনা মূল্যে। সর্ব্বত্র ছিল দুগ্ধেরও অনুরূপ প্রাচুর্য্য। এই সেদিনেও (বৎসর কুড়ি পূর্ব্বের কথা মাত্র) আট সের দশ সের রসগোল্লা মিলত এক টাকায়। সুজলা বরেন্দ্রভূমি ছিল ধন-ধান্যে, মৎস্যে-দুগ্ধে ভরা। এ দেশবাসীর ছিল মনে অতুল আনন্দ, হৃদয়ে বিমল শান্তি, দেহে পূর্ণ শক্তি, কর্ম্মে ঐকান্তিক উদ্দীপনা। বার মাসে ছিল তেরো পার্ব্বণ—তাতে ছিল কত আমোদ-প্রমোদ, কত ধুমধাম, গান-বাজনা, বিশেষ ভুরিভোজের মহা সমারোহ।

সেকালের বরেন্দ্রের আর একটি উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান ছিল নৌবিহার। বড় বড় রাজারা আসতেন জল-বিহারে, মহা আড়ম্বরে। নানাবর্ণ রঞ্জিত বজরা, ভাউলে, পান্সী, ডিঙ্গী প্রভৃতি নানা জলযানের সুবৃহৎ বহর নিয়ে। সঙ্গে থাকত বহু সংখ্যক পরিচারক, মোসাহেব, আত্মীয় পরিজনাদি। যানগুলি নব সাজে নব সজ্জায় ও নানা বর্ণ বিচিত্র পতাকায় পরিশোভিত হয়ে অভিনব রূপ ধারণ করত। নানা প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসম্ভারে পরিপূর্ণ করা হত যানগুলি। নৌবহর মধ্যে একখানা বজরা থাকত আকারে সুবৃহৎ এবং বিবিধ বহুমূল্য উপকরণ দ্বারা করা হত তা উত্তমরূপে বিভূষিত। সেটাকে দেখে ভ্রম হত একটি সুরম্য প্রাসাদ বলে। সমগ্র বহরটি প্রতীয়মান হত একটি ভ্রাম্যমাণ প্রাসাদপুরীরূপে। সেই চলন্ত পুরী যখন উদ্দাম স্ফূর্ত্তিতে ভেসে চলত হেলে দুলে, তখন তা অপরূপ দর্শনীয় দৃশ্য হলেও আমার শান্তির রাজ্যে চরম বিঘ্ন উৎপাদিত হত। তাদের সোল্লাস নৃত্য-গীত, পান-ভোজন ও হৈ-হুল্লোড়ে কম্পিত হয়ে উঠত আমার শান্ত বক্ষ বিরক্তি ও ঘৃণায়। তাদের খেয়াল খুশিতে ব্যয় হত অজস্র অর্থ আর দলিত মথিত হত আমার কোমল দেহ। আমার শত অভিযোগেও সে উদ্দাম অত্যাচারের কোন প্রতিকার কোনদিন সম্ভব হয়নি।

সাধারণতঃ দস্যুর উপদ্রবও কম ছিল না তৎকালে। তারা দ্রুতগামী ছিপ্ নিয়ে দলবদ্ধভাবে বিচরণ করত—আর সুবিধা সুযোগ মত বিক্ষিপ্ত যাত্রীর বা মালবাহী নৌকা আক্রমণপূর্ব্বক সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন ত করতই—নির্মমভাবে নরহত্যা করতেও তারা পশ্চাদপদ হত না। ডাকাতের ভিটা, মুণ্ডমালা প্রভৃতি অনেক দ্বীপই আজও দস্যুদের অমানুষিক অত্যাচারের করুণ স্মৃতি করছে বহন! আর প্রতিদ্বন্দ্বী জমিদারদের শক্তির প্রতিযোগিতাও হত প্রায়শঃ আমারই বক্ষের উপর। জমির দখল নিয়ে উভয় পক্ষে হাজার হাজার লাঠিয়াল শক্তি-পরীক্ষায় সমবেত হ'ত। লড়াই চলেছে কখন কখন কয়েকদিন পর্য্যন্ত সেই জমি বা চর দখল উদ্দেশ্যে। নরহত্যাও হ'য়েছে কত! আমি বৃথাই 'হায়! হায়!' করেছি মনে মনে।

সেকালে আমার উপকূলস্থ গ্রামবাসীদের নৌ-'বাচ' ছিল এক পরম উপভোগ্য ব্যাপার। অসংখ্য ডিঙ্গী, পান্‌সি, ছিপ প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার দ্রুতগামী নৌকা যোগদান করত বাচ প্রতিযোগিতায়। যোল দাঁড় যুক্ত দীঘল ছিপগুলি ছুটে চলত নক্ষত্র-বেগে। নৌকা

গুলি নানাবর্ণের পতাকায় পরিশোভিত হ'ত। কোন কোন নৌকার সম্মুখ ভাগে দুই পার্শ্বে থাকত পিতলের হাঙ্গর মূর্ত্তি। আবার নৌকাগুলি নানা-বর্ণে রঞ্জিত এবং চিত্রিতও করা হত নিপুণ চিত্রকর দ্বারা। দ্রুতগামী নৌকাগুলির অসংখ্য বৈঠার 'ছপাৎ ছপাৎ' শব্দ নীরব ভাষায় তুলত যে মধুর সঙ্গীত লহরী তা শুনতে আমার বড় ভাল লাগত। দাঁড়ের তালে তালে দাঁড়িগণ মনের আনন্দে প্রাণের আবেগে, গাইত জারি, সারি, ভাটিয়ালী, কীর্ত্তন, পাঁচালি প্রভৃতি লোকসঙ্গীত মধুর কণ্ঠে। আমার মনে হ'ত যেন সুরলোক থেকে অমৃত স্রোত নেমে আসছে। সেই মর্ম্মস্পর্শী গীত-লহরী—সেই অপূর্ব্ব সুর—সেই মূর্ত্ত রাগ-রাগিণী আমার মনের কানায় কানায় ঢেলে দিয়ে যেত সুধা ভাণ্ড! নব পুলকে, নব স্পন্দনে, নব আবেশে উঠত আমার মন প্রাণ শিহরিত হয়ে। আমার তীরে তীরে অসংখ্য নরনারী—আবালবৃদ্ধবনিতা সমবেত হ'ত আগ্রহভরে সেই নৌবাচ আনন্দ উপভোগ ক'রবার জন্য।

আমার সবচেয়ে প্রিয় সঙ্গী ছিল পল্লীর রাখাল বালকগণ ও কৃষকের দল। রাখালেরা আসত অতি প্রত্যুষে নিজ নিজ গরুর পাল নিয়ে আমার তীরবর্ত্তী সুকোমল শষ্পাচ্ছাদিত গোষ্ঠে। গাভীরা মনের সুখে আমার বক্ষ-পীযূষ-পুষ্ট নবতৃণাঙ্কুর ভক্ষণরত থাকত, আর রাখালেরা অনতিদূরে কোন ছায়া-তরুতলে নানারূপ ক্রীড়া-কৌতুকে মত্ত হত। পিপাসিত গাভীর দল যখন আসত আমার অমৃততুল্য সলিল পানার্থে তখন তাদের সঙ্গে নীরব দুর্ব্বোধ্য ভাষায় হ'ত আমার কত সস্নেহ আলাপন। কৃষকেরা রৌদ্রে পুড়ে, জলে ভিজে জমি চাষ করতে করতে ক্লান্ত দেহে উপবিষ্ট হ'য়ে পরস্পর নানা সুখ দুঃখের আলাপন করত, আমি তখন কেমন ভাবাবিষ্ট হ'য়ে তা' শুনতাম;—সমবেদনায় আমায় হৃদয় অভিভূত হত স্বতঃই। দিবাবসানে রাখাল ও কৃষকেরা চণ্ডীদাস বা গোবিন্দ দাসের পদাবলীর দুই একটি অন্তরা গ্রাম্য কণ্ঠে সমবেতভাবে গাইতে গাইতে গ্রামের পথমুখরিত ক'রে ফিরত যখন গৃহে—আমি তখন থাকতাম তাদের পথের পানে উন্মুখ হ'য়ে। ভাবতাম কখন আবার ভোর হবে, কখন আবার প্রিয় জনের দল আসবে আমার নিকট নতন কথা নিয়ে।

আমায় আত্মস্তরি ব'লে মনে করছ বুঝি? বিশ্বাস কর বা না কর, তাতে কিছু এসে যায় না। আমার সব কথাই সত্য, একবর্ণও অতিরঞ্জিত নয়। আবার বলছি সেদিন আমিই ছিলাম উত্তর-বঙ্গের একমাত্র প্রাণ কেন্দ্র। আমার সুপ্রচুর জলরাশিতে স্নাত ও পুষ্ট উত্তরবঙ্গ ছিল 'সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা,' আমার তীরে তীরে অবস্থিত ছিল কত সমৃদ্ধ জনপদ, কত ধনজনপূর্ণ নগর। আমার তীরে তীরে ছিল 'ধান্যে ভরা মাঠ পণ্যে ভরা হাট'। আমাকে কেন্দ্র ক'রে গড়ে উঠেছিল বরেন্দ্রভূমে এক মহান বিশিষ্ট সভ্যতা, এক বিরাট ঐতিহ্য। এক মহগৌরবোজ্জল কৃষ্টি। সেদিনের বাংলা ধন্যা হ'য়েছে বরেন্দ্রের সুযোগ্য সন্তানদের বীরত্বে, পাণ্ডিত্যে, কীর্ত্তিতে ও গরিমায়! সেদিনের যার যা কিছু গর্ব্বের তা' সবই ছিল আমারই অবদান। সেদিনের বরেন্দ্র ছিল, আমারই কৃপায়, ভারতের জ্ঞানতীর্থ, শিল্প-সম্ভারের জন্মভূমি, শৌর্য্য-বীর্য্যের লীলানিকেতন, সাধনার পীঠস্থান, ধর্মভাবে শ্রেষ্ঠ তীর্থ।

ওঁ শান্তি! ওঁ শান্তি! ওঁ শান্তি!

প্রস্তাব

শ্রীপরিমল ঘোষ

অতএব গান হোক।
পাপড়ির প্রাচীরে প্রাচীরে
সে সৌরভ-সুধার রক্ত নিত্য হতেছে জমাট;
সে আবেগ আকাশে বন্দী;

তাই বিহঙ্গীরে
আপন পাখার ভ'রে মুক্ত করো—
ভাঙুক কপাট।
সে প্রত্যাশা,—
প্রাবৃট বটের তলে বক্তাক্ত নিরাশা;
অসংখ্য নক্ষত্রালোকে
সে ব্যর্থতা—
বেদনা-বিহ্বল;
সে হাসি অশ্রুর লাবণ্যে সৃষ্টি জীবন-তিয়াসা;
সেই প্রাণ—
রাতের শিশির শব্দে প্রত্যহ বিকল।

অতএব গান হোক।
আকাশের নীল-কণ্ঠ হ'তে
অকল্প ওঙ্কার নাদ রোদ হয়ে ঝরুক বাতাসে;
উল্কাপিণ্ড, নীহারিকা, হিমবাহ—
তারি মূর্চ্ছনাতে
গ'লে গ'লে ক্ষয়ে যাক—
এ পৃথিবী হাসুক আকাশে।

অতএব গান হোক।
হতাশার প্রাচীরে-প্রাচীরে
প্রাণের সবুজ রক্ত ফোটাবে বিশল্যকরণীরে।

শ্রীসুরজিৎচন্দ্র লাহিড়ী

[কলিকাতা হাইকোর্টের অন্যতম প্রবীণ বিচারপতি]

"গ্রামের ছেলে আমি—শহরবাসেও ভুলিনি নৌকাচালনা, হালধরা আর সন্তরণ এই বয়সে—বারে বারে মনে পড়ে নিজে গ্রামের কথা—যেথান থেকে মানুষ হয়েছি—দেশ-বিভাগের জন্য আজশুধু তার স্মৃতিটুকু মনের মণিকোঠায় সযত্নে ধরে রেখেছি"—এই কথাগুলির মাধ্যমে জানতে পারলাম বিচারপতি শ্রীসুরজিৎচন্দ্র লাহিড়ীকে আর সেই সঙ্গে তাঁর সরলতা, সুমধুর ব্যবহার ও সদাহাস্যময় আলাপ তথা স্বদেশপ্রীতি।

১৯০১ সালের ১০ই জুন পাবনা জেলার নগরবাড়ী গ্রামে শ্রীলাহিড়ী জন্মগ্রহণ করেন। পিতা জেলার সর্বপ্রধান উকিল শ্রীরণজিৎচন্দ্র লাহিড়ী এবং মাতা গুরুবংশীয় ও সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত জাহ্নবীচরণ ভট্টাচার্য্যের কন্যা ৺ইন্দুমতী দেবী। দশ মাসের শিশু পুত্রকে রাখিয়া মাতৃদেবী পরলোকগমন করেন এবং পিতা (বর্ত্তমান বয়স ৮৫ বৎসর) পুত্রপালনের সমস্ত দায়িত্ব স্বহস্তে গ্রহণ করেন।

শ্রীলাহিড়ী ১৯১৭ সালে বিভাগীয় বৃত্তিসহ পাবনা সরকারী বিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা, ১৯১৯ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে প্রথমস্থানাধিকারী হিসাবে আই, এ, ১৯২১ সালে তথা হইতে দর্শনশাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হিসাবে বি, এ, এবং ১৯২৪ সালে উক্ত বিষয়ে প্রথম শ্রেণীর প্রথম স্থানের ছাত্র হিসাবে এম, এ পাশ করেন। তাঁর পিতামহ ও পিতা প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র ছিলেন। ১৯২৩ সালে সর্বপ্রথম ভারতবর্ষে (এলাহাবাদে) I. C. S. পরীক্ষা গৃহীত হয়। সুরজিৎচন্দ্র নবম স্থান পাওয়ায় নির্ব্বাচিত হন নাই। উক্ত বৎসর বাঙ্গালীদের মধ্যে শ্রী জে, এন, তালুকদার, বি, কে, গুহ, শৈলেন্দ্র গুহরায় ও সুকুমার বসুকে সিভিল-সার্ভিসে গ্রহণ করা হয়। ১৯২৫ সালে কিছুদিনের জন্য তিনি অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্রের স্থলে প্রেসিডেন্সী কলেজে অস্থায়ী দর্শনাধ্যাপক হিসাবে কার্য্য করেন। পরে দুইবার বঙ্গীয় শিক্ষা বিভাগে যোগদানের আহ্বান আসে। কিন্তু বেতনের পরিমাণ অল্প হওয়ায় শ্রীলাহিড়ী উহা প্রত্যাখ্যান করেন। ১৯২৬ সালে তিনি আইন পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হন।

তাঁহার অন্তরঙ্গ সহপাঠীদের মধ্যে পরলোকগত ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও 'আনন্দবাজার' পত্রিকা-সম্পাদক শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য্যের নাম উল্লেখযোগ্য। স্বর্গীয় শ্যামাপ্রসাদের নিরহঙ্কার ভাব ও প্রাণখোলা মেলামেশার কথা তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেন।

১৯২৬ সালে সুরজিৎচন্দ্র পাবনা জেলা-আদালতে আইন-ব্যবসা সুরু করেন এবং প্রথম মামলায় যোগদান তদানীন্তন প্রাদেশিক সরকারের বিরুদ্ধে এবং নিজ পিতার পক্ষাবলম্বন। উক্ত বৎসরের জুলাই মাসে পাবনা সহরে কতিপয় মুসলমান হিন্দু দেব-দেবীর মূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া দাঙ্গা হাঙ্গামা সুরু করে। ইহার প্রতিবাদে স্থানীয় হিন্দুবাসিন্দারা ভগ্নমূর্ত্তিসমূহ লইয়া সহরে একটি প্রতিবাদ শোভাযাত্রা করেন ও মুসলমানেরা বাধা দেয়। কিছুদিনের মধ্যে পিতা, শিতলাইর জমিদার শ্রীযোগেন্দ্র মৈত্র প্রমুখ কয়েকজন নেতৃস্থানীয় হিন্দুদের গ্রেপ্তার করা হয়। স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ হলো তাঁহাদের তিন মাস কারাদণ্ডের আদেশ দেন। আপীলে জেলা-জজ তাঁহাদের বেকসুর খালাস দেন। ইহার পর সরকার কলিকাতা হাইকোর্টে আপীল করেন এবং এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলার স্বর্গীয় স্যার প্রভাসচন্দ্র মিত্রের প্রচ্ছন্ন সহায়তায় কলিকাতা বারের বিশিষ্ট আইনবিদগণ স্যার নৃপেন্দ্রনাথ সরকার, শরৎচন্দ্র বসু, কে, এন, চৌধুরী প্রভৃতি বিনা পারিশ্রমিকে আসামী-পক্ষ সমর্থন করেন। কিন্তু প্রধান বিচারপতি র‍্যাঙ্কিন ও বিচারপতি ছোটজনার নিম্ন আদালতের রায় বহাল রাখেন। তৎকালীন জাতীয় পত্রিকাগুলির তুমুল আন্দোলনে লাট সাহেব সকলকেই মুক্তি দেন। এই ব্যাপারে সুরজিৎচন্দ্র বিশিষ্ট আইনজ্ঞদের সংস্রবে আসিয়া পিতার মামলার তদারক করিতে থাকেন। তৎপরে ১৯২৭ সালে তিনি কলিকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায়ে লিপ্ত হন।

শ্রীসুরজিৎচন্দ্র লাহিড়ী

১৯৪৭ সালে তিনি হাইকোর্টে জুনিয়ার পাবলিক প্রসিকিউটার নিযুক্ত হন এবং ১৯৪৯ সালের ৩রা জানুয়ারী উহার অন্যতম বিচারপতিরূপে মনোনীত হন।

প্রথানুযায়ী তিনি সহকারী হিসাবে কোন বিশিষ্ট আইনবিদের সহিত লিপ্ত ছিলেন না, তবে প্রখ্যাত আইনজ্ঞ পরিচালিত মামলাগুলি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মরূপে অনুধাবন করিতেন।

ঢাকার প্রসিদ্ধ উকিল ৺আনন্দচন্দ্র রায়ের পুত্র শ্রীধীরেন্দ্রচন্দ্র রায়ের একমাত্র কন্যা শ্রীমতী সুপ্রভা দেবীর সহিত শ্রীলাহিড়ী পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন।

ছাত্রজীবনে খেলাধূলা ও সঙ্গীতে অনুরক্ত ছিলেন, এখন খেলাধূলা করেন না, তবে গান বাজনা শুনিতে ভালবাসেন।

ডাঃ শ্রীঅমিয়কুমার সেন

[অন্যতম প্রখ্যাত শল্য-চিকিৎসক]

প্রায় পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে চিরস্মরণীয় সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থ "পবনদূত" এর লেখক ও মহারাজ লক্ষ্মণসেনের প্রধান সভা-পণ্ডিত নদীয়া জেলার তেহট্ট নিবাসী ধুহি (ধোয়ী) সেনের বংশধরেরা ঢাকা জিলার বিক্রমপুর পরগণায় আসিয়া বসবাস আরম্ভ করেন। বিভিন্ন সময়ে নানা কারণে সেন বংশ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অবস্থান করেন। শেষে এই পরিবারের ৺অক্ষয়কুমার সেন সোনারং গ্রামে বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন। ডাঃ অমিয় সেন তাঁহার তৃতীয় পুত্র। ভারতের প্রধান নির্ব্বাচনাধিকারিক সিভিলিয়ান শ্রীসুকুমার সেন ও কেন্দ্রীয় আইন-মন্ত্রী শ্রীঅশোককুমার সেন অমিয়কুমারের সহোদর ভ্রাতৃদ্বয়। মাতা অভিজাত-বংশোদ্ভবা শ্রীমতী সুষমা দেবী। মাতুল শ্রীঅতুলচন্দ্র সেনগুপ্ত নাগপুর মরিস কলেজের অধ্যক্ষ ও মধ্যপ্রদেশের (D. P. I.) ছিলেন।

ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট (পরে জেলা-শাসক) পিতার ঘন ঘন বদলীর জন্য অমিয়কুমারকে বাংলা প্রদেশের নানা বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে হয়। ১৯১৯ সালে কলিকাতা হেয়ার স্কুল হইতে প্রবেশিকা ও ১৯২১ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে আই, এস, সি পরীক্ষোত্তীর্ণ হন। ১৯২২ সালে বি, এস, সি পাঠকালে তিনি কলিকাতা কারমাইকেল কলেজে (বর্ত্তমানে আর, জি, কর) ভর্ত্তি হইয়া ১৯২৮ সালে এম, বি, হন।

১৯৩০ সালে বিলাতে গিয়া তিনি লণ্ডন য়ুনিভার্সিটি কলেজ অব মেডিসিন ও মিডলসেক্স হাসপাতালে শিক্ষালাভ করেন। পরে ডি, পি, এচ, (লণ্ডন) এবং ১৯৩৫ সালে F.R.C.S. (Eng) ডিগ্রীদ্বয় লাভ করেন। সেই সময় তিনি সেণ্ট বার্থোলোমিউ ও সেণ্ট টমাস হাসপাতাল দুইটিতে যুক্ত থাকেন এবং কিছুদিন ব্যক্তিগতভাবে চিকিৎসা করেন। ইহার পর ডাঃ সেন জার্ম্মানী ও ভিয়েনাতে স্নাতকোত্তর শিক্ষার জন্য কিছুকাল অবস্থান করেন। ১৯৩৪ সালে তাঁহারই উদ্যোগে বিহারে ভূমিকম্পে প্রপীড়িত ব্যক্তিদের সাহায্যার্থ লণ্ডনে অনুষ্ঠিত অভিনয়লব্ধ অর্থ প্রেরণ একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

১৯৩৫ সালে ভারতে ফিরিয়া অমিয়কুমার কারমাইকেল মেডিকাল কলেজে Visiting Surgeon হিসাবে যোগদান করেন। উক্ত কলেজের ছাত্রদের মধ্যে তিনিই প্রথম F. R. C. S. ডিগ্রীপ্রাপ্ত হন। ১৯৩৭ সালে তিনি ন্যাশনাল মেডিক্যাল ইনষ্টিটিউটে সার্জ্জারীর সহযোগী অধ্যাপক ও তত্রস্থ হাসপাতালে সার্জ্জন নিযুক্ত হন। ১৯৪৮ সালে R. G. Kar-এ সার্জ্জারীর অধ্যাপক ও ১৯৫০ সালে চিত্তরঞ্জন ক্যান্সার হাসপাতালে সার্জ্জিক্যাল ইউনিটের প্রধান হিসাবে উহাকে সুসংবদ্ধ করেন। ১৯৫২ সালে তিনি ন্যাশানাল মেডিক্যাল ইনঃ-এর বিভাগীয় প্রধান পদ ও হাসপাতালের সংস্রব ত্যাগ করেন। আর, জি, কর কলেজের গভর্ণিং বডিতে তিনি ক্রমান্বয়ে চারি বৎসর নির্ব্বাচিত সদস্য ছিলেন। ১৯৩৬ সালে তিনি State Medica Facultyর পরীক্ষক এবং পর বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ও পরে সার্জ্জারীর পরীক্ষক নিযুক্ত হন। বর্ত্তমানে তিনি মাষ্টার অ সার্জ্জারীর পরীক্ষক এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের নির্ব্বাচি সদস্য।

অতৃপ্ত জ্ঞান-পিপাসা মিটাইবার জন্য ১৯৫২ সালে পাশ্চা দেশ সমূহের শল্যচিকিৎসায় অগ্রগতির চাক্ষুষ পরিচয় লাভের উদ্দে ডাঃ সেন য়ুরোপ ও আমেরিকার প্রধান হাসপাতাল ও গবেষ কেন্দ্রগুলি পরিদর্শন করিয়া আসেন।

১৯৫৬ সালে ডাঃ মুদালিয়ারের সভাপতিত্বে কুর্ম্নুলে মেডিক কলেজ স্থাপনা সম্পর্কে নিযুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনে অমিয়কু অন্যতম সদস্য মনোনীত হন।

১৯৫৭ সালে ডাঃ সেন R. G. Kar কলেজে বিভাগীয় ও ও সার্জ্জারীর পরিচালক অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। উপরন্তু বর্ত্ত তিনি P. G. Hospital (S.S.K.M.) সংলগ্ন ইনষ্টিটিউ মেডিক্যাল এডুকেশন এণ্ড রিসার্চ্চ-এ Surgeryর পরিদর্শক অধ্য পদে নিযুক্ত ও তথায় তিনি স্বয়ং আধুনিক চিকিৎসা সম্বন্ধে গ কার্য্যে ব্রতী আছেন। পাঠ্য পুস্তক হিসাবে তাঁহার f "Basic Surgery" ও ভারতের বিভিন্ন মেডিক্যাল জ প্রকাশিত তাঁহার সারগর্ভ প্রবন্ধসম্ভার প্রশংসিত হইয়াছে।

ডাঃ সেন বাল্যাবধি বিভিন্ন ক্রীড়া, সঙ্গীত ও শিল্পকলায় অনু

ডাঃ শ্রীঅমিয়কুমার সেন

তাঁহার একমাত্র কন্যা শ্রীমতী হৈমন্তী সেন (মজুমদার) বর্ত্তমানে বাঙলার একজন বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী।

খ্যাতি এবং উন্নতির শীর্ষে আরোহণ করিয়াও আলোচনার অবকাশে সেদিন তিনি বললেন, "পুত্রকন্যাদের মানুষ করিয়া তোলার জন্য আমাদের পিতামাতা ঐকান্তিক চেষ্টা ও প্রচুর ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন। জানিনা, তাঁহাদের সেই আশা আমরা সার্থক করিতে সক্ষম হইয়াছি কি না।" এই আন্তরিকতাপূর্ণ উক্তি তাঁহার সৌজন্য এবং বিনয় গুণেরই পরিচায়ক।

শ্রীরাধাবল্লভ স্মৃতি-ব্যাকরণ জ্যোতিস্তীর্থ

[জ্যোতিস্তীর্থ উপাধিধারী প্রথম বাঙালী]

জ্যোতিস্তীর্থ ?—ভাগ্যগণনাকারী গণক ?—না বরাহনগরের ৬৩নং কালীনাথ মুন্সী লেনে গেলে এ ধারণা আপনার বদলে যাবে। গৃহমধ্যে বসে আছেন নিরভিমান হাসিমুখ এক ব্রাহ্মণ, আশেপাশে পুঁথি ও গ্রন্থরাজি, সত্যই সেস্থান যেন জ্যোতিষীদের তীর্থ হয়ে উঠেছে। ঋত্বিক ব্রাহ্মণের মুখের অভয় হাসি ভাগ্যান্বেষীদের সান্ত্বনা। কত মনীষী, কত শিক্ষার্থী, কত জ্ঞান-পিপাসু যে সেই অশীতিপর বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে ঘিরে থাকে তার ইয়ত্তা নেই।

বাংলা ১২৮৮ সালের ১৬ই ভাদ্র (৩১শে আগষ্ট, ১৮৮১ খৃঃ) মৈমনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল মহকুমার বড়বেলতা গ্রামে রাধাবল্লভের জন্ম হয়। তাঁর পিতার নাম ৺কৃপানাথ পাঠক এবং মাতার নাম ৺হরিসুন্দরী দেবী। ইঁহারা বালার্ক সম্প্রদায়ভুক্ত শাকদ্বীপি ব্রাহ্মণ। পণ্ডিত রাধাবল্লভ চার সহোদরের মধ্যে জ্যেষ্ঠ। তাঁর বাল্যশিক্ষা গ্রাম্য পাঠশালায়; তারপরে সন্তোষ জাহ্নবী স্কুল থেকে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। তারপর কিছুদিন সন্তোষের উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করেন। কিন্তু তাঁর জ্যোতিষ শিক্ষার আগ্রহ তাঁকে এদিকে অগ্রসর হতে দেয় নাই। সেকালে জ্যোতিষ শিক্ষার তেমন সুবিধা ছিল না। প্রথমে পাবনার ৺নবকুমার সিদ্ধান্তের নিকট, তারপর বর্দ্ধমানের রাজজ্যোতিষী পণ্ডিত জীবানন্দ জ্যোতিঃশেখরের নিকট তিনি জ্যোতিষ শিক্ষার জন্য যান। কিন্তু অভীপ্সিত লক্ষ্যে পৌছিবার মত শিক্ষাপ্রণালীর অভাব দেখে তিনি নবদ্বীপের পণ্ডিত শশিভূষণ স্মৃতিতীর্থের নিকট কিছুকাল নব্যস্মৃতি অধ্যয়ন করেন। তারপর জ্যোতিষ শিক্ষার জন্য কাশীধামে উপস্থিত হয়ে কুইন্স কলেজে জ্যোতিষ অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। কিন্তু তাতেও বাধা পড়ল। সে সময়ে কাশীতে প্লেগ মহামারী আকারে দেখা দেওয়ায় তিনি কাশীধাম ত্যাগ করতে বাধ্য হন। এবার কলিকাতার গভর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজে স্বর্গত পণ্ডিত পঞ্চানন সাহিত্যাচার্য্য মহাশয়ের নিকট জ্যোতিষ অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। কলিকাতা কেন্দ্র থেকে তিনি ১৯০৬ সালে প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করে জ্যোতিষের উপাধি জ্যোতিস্তীর্থ লাভ করেন। সর্বোচ্চ নম্বর পাওয়ার জন্য তিনি একশত টাকা পুরস্কারও পান। বাঙালীদের মধ্যে পণ্ডিত রাধাবল্লভই প্রথম জ্যোতিস্তীর্থ। প্রকৃতপক্ষে তাঁর এই উপাধিলাভ বাঙলার জ্যোতিষ-শিক্ষা বা পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রে নবযুগের সৃষ্টি করে।

ইংরেজী ১৯১১ সালে তিনি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে জ্যোতিষের ও ব্যাকরণের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তাঁর অধ্যাপনার খ্যাতিতে আকৃষ্ট হয়ে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার নানা স্থানের নানা শিক্ষার্থী সংস্কৃত কলেজে ভীড় জমান। বর্তমান কালের বহু প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী তাঁরই ছাত্র। সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপনাকালে তিনি ব্যাকরণ ও স্মৃতিশাস্ত্রের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি উক্ত দুই শাস্ত্রের উপাধিও লাভ করেন।

তিনি জানতেন—আমাদের দেশের জ্যোতিষ-ব্যবসায়ী বা জ্যোতিষ শিক্ষার্থীদের প্রকৃত শিক্ষার অভাব কতখানি। সেজন্য অত্যন্ত উদ্বেলচিত্তে তিনি জ্যোতিষ-শিক্ষার্থীদের ও জ্যোতিষীদের খোঁজখবর আজও নিয়ে থাকেন। দীনতার অন্ধতমকূপে পতিত সাধারণ জ্যোতিষীদেরও সহজবোধ্য জ্ঞান-ভাণ্ডার আবিষ্কারে অগ্রণী এই অক্লান্তকর্মী পণ্ডিত আজ পর্য্যন্ত বহু গ্রন্থ সম্পাদনা ও রচনা করেছেন। সংস্কৃত কলেজ থেকে অবসর গ্রহণ করেও তিনি এ কাজে ক্ষান্ত হননি। বাংলা ১৩১৯ সালে তিনি বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকার অন্যতম গণক নিযুক্ত হন। আজও তাঁর প্রণীত 'চারণবল্লভ' নামক গ্রন্থ অনুসারে বিশুদ্ধ দৃক্‌সিদ্ধ পঞ্জিকাগুলি গণিত হয়ে থাকে। ১৩২৫ সালে বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সভা কর্তৃক নির্বাচিত স্বর্গীয় ডাঃ স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে যে বঙ্গীয় পঞ্জিকা-সংস্কার সমিতি স্থাপিত হয়, তাতে তিনি বিশেষ স্থান অধিকার করেন। পঞ্জিকা সংস্কার ব্যাপারে তাঁর দান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। নিখিল বঙ্গ জ্যোতিষ সম্মেলনে তিনি সভাপতিত্ব করেন। ঐ সভায় বেদান্তরত্ন স্বর্গীয় হীরেন্দ্রনাথ দত্ত অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন। তিনি বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা সমিতি, ঢাকা সারস্বত সমাজ, আসাম সংস্কৃত পরিষদের জ্যোতিষশাস্ত্রের পরীক্ষক আছেন। কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতিষশাস্ত্রেরও পরীক্ষকের কাজ কিছুকাল করেছিলেন। তাঁর একমাত্র কন্যা এখন বিবাহিতা; কোন পুত্র-সন্তান তাঁর নেই।

তীর্থকামী সাত্ত্বিক বৈষ্ণব এই ব্রাহ্মণ সস্ত্রীক কুমারিকা থেকে কেদার-বদরী পর্য্যন্ত প্রায় সকল তীর্থই ভ্রমণ করেছেন। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে মূল জ্যোতিষশাস্ত্রের উন্নয়নকারী বিপ্রগণের সন্ধানেও পরিভ্রমণ করেছেন। উত্তরপ্রদেশ, আসাম, বিহার, উড়িষ্যা, কাশ্মীর ও আসামের সেই সূর্য্য বিপ্রগণের বা শাকদ্বীপি ব্রাহ্মণগণের তত্ত্ব সংগ্রহ করে বিরাট ইতিহাসও তিনি লিখেছেন। জনহিতব্রতী পণ্ডিত রাধাবল্লভের গোপন দানের কথা অনেকেই জানেন। প্রায় কটিবন্ধধারী এই দরিদ্র বিপ্র ছাত্রগণের সাহায্যের জন্য খ্যাত। অধুনা কাশীপুর নর্থ সুবার্বন হাসপাতালে তিনি দু' হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ দান করেছেন। তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থগুলির মধ্যে—(১) ভাস্করাচার্য্য প্রণীত লীলাবতী, (২) শ্রীনাথ ভট্ট কৃত কোষ্ঠীপ্রদীপ, (৩) হোরাবল্লভ, (৪) ভাস্করাচার্য্যের বীজগণিত, (৫) সিদ্ধান্ত-শিরোমণি গোলাধ্যায়, (৬) গণিতাধ্যায়, (৭) লীলাবতীর অনুবাদ, (৮) শাকদ্বীপি ব্রাহ্মণ বিবরণ, (৯) উড়ুদার প্রদীপ, (১০) জৈমিনীর সূত্র, (১১) গ্রহযাগুল, (১২) করণবল্লভ, (১৩) জাতকবল্লভ, (১৪) মুহূর্ত্তবল্লভ প্রভৃতি গ্রন্থ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শ্রীশিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

[কলিকাতার ডেপুটী পুলিশ কমিশনার ও সদালাপী ব্যক্তি]

দেশের আভ্যন্তরীণ আইন শৃঙ্খলা ও শান্তিরক্ষা যাঁহাদের উপর ন্যস্ত—নিজেদের দুঃখকষ্ট ও অভাব অভিযোগ সহ্য করেন যাঁহারা—জনসাধারণের সুখসুবিধা ও মান প্রাণ রক্ষার দায়িত্ব যাঁহাদের —'আরাম হারাম হ্যায়' নীতি যাঁহারা সতত মানিয়া চলেন—তাঁদের সামান্য ত্রুটি বিচ্যুতি উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে চিত্রিত করা মানবোচিত আদর্শের পরিপন্থী। হয়ত পরাধীন ভারতে রাজনৈতিক কারণে এইরূপ সমালোচনার প্রয়োজন ছিল, কিন্তু স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিবর্ত্তিত অবস্থায় যাঁদের বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গী ও অধিনায়কত্বে পুলিশ বিভাগ 'জনসাধারণের সেবা প্রতিষ্ঠান' হিসাবে রূপান্তরিত হইতে চলিয়াছে—সমগ্র সংস্থাগত তাঁহাদের সম্বন্ধে গঠনমূলক আলোচনারই প্রয়োজন আজ সর্ব্বাধিক। ইহার যাথার্থ্য হৃদয়ঙ্গম করিলাম কলিকাতা দক্ষিণাঞ্চলের ডেপুটী পুলিশ কমিশনার শ্রীশিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সহিত প্রথম পরিচয়ে।

১৯০৩ সালের ডিসেম্বরে ২৪-পরগণা জেলার বাহু 'মহেশ্বরপুর গ্রামের এক বিশিষ্ট বংশের সন্তান শ্রীচট্টোপাধ্যায় মুর্শিদাবাদে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ৺অধরনাথ চট্টোপাধ্যায় ১৮৯৬ সালে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সরকারী কার্য্য গ্রহণ করেন। কার্য্যোপলক্ষে আগত অধরনাথ চুঁচুড়ায় স্থায়িভাবে বসবাস করিতে থাকেন। শিবচন্দ্রের মাতা কমলাদেবী উত্তরপাড়া নিবাসী ৺ত্রৈলোক্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ৺শেখরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং পুত্রবধূ ছিলেন সাহিত্য-সম্রাজ্ঞী ৺অনুরূপা দেবী। আর অন্য পুত্র হইলেন মার্টিন-বার্ণ কোম্পানীর অন্যতম অংশীদার এবং স্বর্গীয় ডাঃ স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের জামাতা শ্রীপ্রভাতনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ছয় ভ্রাতার মধ্যে শিবচন্দ্র হইলেন দ্বিতীয়। জ্যেষ্ঠ অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট বঙ্কিমচন্দ্র, তৃতীয় আইনজীবী বিভূতিভূষণ, চতুর্থ ন্যাশনাল মেটারজিক্যাল গবেষণাগারের সহঃপরিচালক ডক্টর অনিলচন্দ্র, পঞ্চম কলিকাতা কাষ্টমসের এপ্রেজার শ্যামাপদ ও সর্ব্বকনিষ্ঠ তারাপদ।

বাল্যে শিবচন্দ্র পিতার সহিত বঙ্গদেশের বহুস্থানে গমন করেন। ১৯২১ সালে রাজশাহী বিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষা এবং ১৯২৩ সালে স্থানীয় কলেজ হইতে আই-এ পাশ করেন। ১৯২৫ সালে হুগলী মহসীন কলেজ হইতে গ্রাজুয়েট হন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে এম, এ ও বি, এল পড়িবার সময় ১৯২৭ সালে তিনি কলিকাতা পুলিশ বিভাগে সাব্‌ইন্সপেক্টারের পদে মনোনীত হন। ইহার পর কলিকাতার বিভিন্ন থানায় সংশ্লিষ্ট থাকার পর নিজ কর্ম্মদক্ষতায় ১৯৪৭ সালের প্রথম ভাগে তিনি সহকারী কমিশনার হন। ১৯৫১ সালে অস্থায়ী ডেপুটী কমিশনার পদে উন্নীত হন এবং ১৯৫৩ সালে উহাতে পাকাপাকি ভাবে নিযুক্ত হন।

শিবচন্দ্র ডেপুটি কমিশনার হিসাবে প্রথমে পোর্ট পুলিশে, পরে নর্থ ডিষ্ট্রীক্টে ও বর্ত্তমানে সাউথ ডিষ্ট্রীক্টে যুক্ত রহিয়াছেন। উত্তর কলিকাতায় থাকার সময় তিনি নানাবিধ জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত জড়িত ছিলেন এবং অধিবাসীদের খুব প্রিয় হন। এই সময় রক্ষীবাহিনী গঠন করিয়া তিনি কর্ম্ম প্রতিভার পরিচয় দেন। ১৯৫৩ সালে আট মাসের জন্য তিনি নিজ কার্য্য ছাড়াও ডেপুটী কমিশনার ডিটেকটিভ ডিপার্টমেণ্ট হিসাবে কর্ম্মসম্পাদনা করেন। আগামী ডিসেম্বর মাসে একত্রিংশ বৎসর চাকুরীর পর তিনি অবসর গ্রহণ করিতে মনস্থ করিয়াছেন।

ব্রিটিশ কর্ত্তৃত্বাধীনে দেশের শাসন ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য 'পুলিশ বিভাগ' সৃষ্ট হয় বিভীষিকাময় জবরদস্ত শাসনকে কায়েম করার জন্য। আর সেইজন্য উহার কর্ম্মচারীদের বহু সময় বহু অপ্রিয় কাজ করিতে হইত, স্বাধীনতা সংগ্রামের পরিপন্থী হিসাবে এবং উহাতে বলি হইতেন স্বাধীনতাকামী পূজারীরা। কিন্তু দেশ স্বাধীন হওয়ার সাথে সাথে অনেকে চাহিয়াছিলেন এই সমস্ত সরকারী কর্ম্মচারীদের নব শাসন ব্যবস্থায় স্থান না দেওয়ার জন্য। বরং আমাদের নেতারা লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে ইঁহাদের মধ্যে অনেকে আছেন যাঁহারা পরিবর্ত্তিত অবস্থায় ঠিক মত নিজেদের চালিত করিবেন, শ্রীচট্টোপাধ্যায় ছিলেন তন্মধ্যে অন্যতম।

কলিকাতা পুলিশে বর্ত্তমানে সমাবেশ হইয়াছে একাধিক ধর্ম্মপরায়ণ ও স্বভাব বিনীত উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদের। তজ্জন্য অধস্তনেরা হইয়া উঠিতেছেন জনসাধারণের যথার্থ সেবক। ভগবৎ বিশ্বাসী ও সহযোগ মনোভাবসম্পন্ন শ্রীচট্টোপাধ্যায় জনসাধারণের ও নিজ কর্ম্মচারীদের নিকট খুবই প্রিয়।

মনের দিক থেকে এখনও যিনি তেজোময় ও দৃপ্ত ও শারীরিক গঠনে এখনও যিনি বলিষ্ঠ ও কর্ম্মঠ—সেইজন্যেই এত সত্বর অবসর গ্রহণের কথায় আশ্চর্য্য হয়েছিলাম কিছুটা।

শ্রীশিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

**"Whether to marry or not to marry?
Whichever you do you will repent.**

—Socrates.

শ্রীনীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত

সতের

"লু" থেকে ফিরে আসার সাত দিন পরে মার্লিনের চিঠি অনুযায়ী যখন মার্লিনকে আনবার জন্য মার্চ্চ রেলওয়ে-ষ্টেশনে গেলাম, তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। গিয়ে দেখি, ষ্টেশন-প্ল্যাটফর্মে টমও এসে অপেক্ষা করছে। হেসে শুধালাম, কি হে টম, তুমিও এসেছ মার্লিনকে নিতে?

টম বলল, মার্লিনের মা আমাকে পাঠিয়ে দিলেন।

শুধালাম, মার্লিনের মা উইসবীচ থেকে কবে ফিরলেন?

বলল, কাল বিকেলে। আমাকে উইসবীচ থেকে চিঠি পাঠিয়েছিলেন—আমি ওদের ঝি মিসেস স্কটকে ঠিক করে রেখেছিলাম।

হেসে শুধালাম, মার্লিনের চিঠি পেয়েছ ত?

বলল, একখানা পেয়েছিলাম। বিশেষ ধন্যবাদ স্যার!

শুধালাম, তা তোমাদের সব খবর ভাল?

বলল, হ্যাঁ স্যার! ধন্যবাদ!

কেন জানি না শুধালাম, মঙ্কটনের খবর কি হে?

বলল, মঙ্কটন কাল সন্ধ্যাবেলা এসেছিল। মার্লিনের মা'র সঙ্গে দেখা করতে।

শুধালাম, মার্লিনের মা ফিরেছেন—কি করে খবর পেল?

বলল, মার্লিনের মা'র চিঠি পেয়ে আমিই বলেছিলাম। আমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল।

হঠাৎ মনে হল, এইবার যদি টম জিজ্ঞাসা করে আপনি কোথায় হাওয়া বদলাতে গিয়েছিলেন ইত্যাদি—কি বলব? ভাবছি, কিন্তু কেন জানি না, টম সেদিক দিয়ে কিছুই জিজ্ঞাসা করল না।

ক্রমে ট্রেণ এসে দাঁড়াল প্ল্যাটফর্মে। নামল মার্লিন ট্রেণ থেকে। টম কামরার ভিতর গিয়ে মার্লিনের স্যুটকেশটি নিয়ে এল। তিন জনে এলাম ষ্টেশনের বাইরে—রাস্তায়।

ট্যাক্সি পাওয়া যায় না, বাসেই যেতে হল। কিন্তু মার্চ্চ ষ্টেশন থেকে ডডিংটন পর্য্যন্ত সোজা বাস নাই। উইসবীচের বাস মার্চ্চ ষ্টেশনের পাশ দিয়ে মার্চ্চ-বাজার পর্য্যন্ত যায়—সেখানে বাস বদল করে ডডিংটনের বাস ধরতে হয়।

সেই ভাবেই গেলাম। যেতে যেতে মার্লিন একবার আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, যাচ্ছ ত আমাদের ওখানে?

বলেছিলাম, না। আজ রাত হয়ে গেল। আজ আর নয়। কাল যাব।

বলেছিল কাল কিন্তু সকাল সকাল করে এস।

ডডিংটনে ব্লক টাওয়ারের কাছে মার্লিন ও টম নেমে গেল। আমি সোজা গিয়ে নামলাম—হাসপাতালের কাছে।

পরের দিনই ব্যাপারটা ঘটল। পরের দিন একটু সকাল সকালই গেলাম মার্লিনদের বাড়ীতে। বেশ ঝকঝকে সুন্দর অপরাহ্ণ। মার্লিনদের বাড়ীর কাছাকাছি গিয়ে দেখি, মার্লিন নিজেদের সদর দরজার কাছে আছে দাঁড়িয়ে, চেয়ে আছে একদৃষ্টে পথের দিকে। মার্লিনের এই আকুলতাটুকু প্রাণ-মন দিয়ে উপভোগ করতে করতে মার্লিনের কাছে গিয়ে শুনলাম—এই আকুলতাটুকুর পিছনে অন্য একটু কারণও ছিল।

একটা যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে মার্লিন বলল, যাক, ঠিক এসেছ তাহলে? শুধালাম কেন, আসব ত বলেছিলাম।
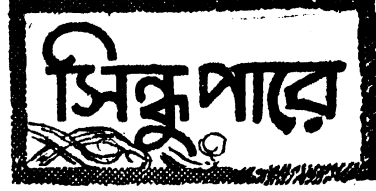
বলল, মঙ্কটন যেন বড় গোলমাল করছে, তাই আমার ভয় হচ্ছিল, আসবার সময় তোমার সঙ্গে পথে কোনও হাঙ্গামা না করে।

শুধালাম, ব্যাপার কি?

বলল, কাল রাত্রে মার সঙ্গে এসে দেখা করে মাকে যাচ্ছেতাই করে গেছে। কোথা থেকে জানি না শুনেছে—তুমিও 'লু'তে আমার সঙ্গে ছিলে। কাল রাত্রে মার সামনে টেবিলের উপর ঘুঁষি মেরে বলে গেছে—সে এ জিনিষ বন্ধ করবেই, এত বড় অন্যায় সে কিছুতেই ঘটতে দেবে না। মার মনটা সেই থেকে বড় অস্থির হয়ে আছে।

শুধালাম, কেন—তিনিও জিনিষটা ভাল চোখে দেখেননি নাকি?

বলল, না—না—সেদিক দিয়ে নয়। মার আমার উপর অগাধ বিশ্বাস। (একটু মৃদু হেসে) মার মতে—তাঁর মেয়ে জীবনে কোনও অন্যায় করতে পারে না।

শুধালাম, তবে?

বলল, আমাকে নিয়ে এই রকম একটা কথার সৃষ্টি হয়েছে—মঙ্কটন মার মুখের উপর কড়া কড়া কথা শুনিয়ে শাসিয়ে গেল—মনটা অস্থির ত হবেই। চল মার কাছে।

দুজনে ঢুকলাম ঘরের মধ্যে—মার সঙ্গে দেখা হল। আমাকে দেখে সন্দেহ দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে শুধালেন, কেমন আছ বাবা?

যদিও মার্লিন বলেছিল—আমার "লু"তে যাওয়া নিয়ে মার মনে কোনও দ্বিধার সৃষ্টি হয়নি, তবুও মার সামনে যেতে প্রথমটা একটু সঙ্কোচ যে হয়নি এমন নয়। কিন্তু তাঁর সস্নেহ ব্যবহারে সহজেই সে সঙ্কোচটুকু গেল কেটে। করমর্দ্দন করে শুধালাম, আপনি ভাল আছেন ত?

বললেন, হ্যাঁ—এখন অনেকটা ভাল বোধ করি। তারপর বললেন, "লু"তে তোমাদের বেশ ভাল ভাবেই কেটেছে শুনে খুশী হয়েছি। চেহারা দেখে ত মনে হয় মার্লির অনেক উন্নতি হয়েছে।

বললাম, হ্যাঁ। এত অল্প দিনে যে এতটা উপকার হবে আশা করিনি। পরে বেশ ডাক্তারী চালে—যেন মার্লিনের দিক দিয়ে ডাক্তারীটাই আমার একমাত্র বিবেচনার বিষয়—বললাম, আরও কিছু দিন থাকতে পারলে আরও ভাল হত। আমি চলে আসার সময় মার্লিনকে বলেও এসেছিলাম সে কথা।

বললেন, তুমি চলে আসাতে একেবারে একলাটি হয়ে গেল—ভাল লাগল না। ও ত তেমন মিশুকে নয়। অপরিচিত লোকের সঙ্গে গায়ে পড়ে আলাপও করতে পারে না।

মার্লিনের দিকে চেয়ে দেখি, তার চোখে একটা দুষ্টু হাসি খেলে যাচ্ছে।

বলল, তা বটে। এখন ফিরে এসে দেখছি, আরও মাসখানেক থেকে এলেই হত ভাল।

একটু ব্যাকুল ভাবে মা শুধালেন, কেন ? এসে কি আবার শরীর কিছু খারাপ বোধ হচ্ছে ?

মার্লিন বলল, না—না। তবে ডাক্তারের কথা ত সব সময়েই মেনে চলা উচিত।

নানান কথায় সময় কেটে যেতে লাগলো। মনে মনে একটা ভয় যে ছিল না এমন নয়—মার্লিনের মা মক্কটন প্রসঙ্গ তুলে কিছু না বলেন। কিন্তু মার্লিনের মা মক্কটন প্রসঙ্গ একেবারেই তুললেন না। সেদিক দিয়ে ক্রমে মনের ভয়টা কেটে গেলেও মনটি ঠিক নিশ্চিন্ত হচ্ছিল না। হাজার হলেও বাঙ্গালীর মন ত, থেকে থেকে একটা আতঙ্ক মনের মধ্যে উঁকি মারছিল—ফিরে যাওয়ার সময় মক্কটন পথে কোনও হাঙ্গামা না করে। পথে যদি আমার সঙ্গে দেখা করে বেশ দু' ঘা আমাকে বসিয়ে দেয়, আমি ওর সঙ্গে পেরেও উঠব না এবং আস্তিন গুটিয়ে মারামারি করবার সাহস ও ভরসা আমার একেবারেই হবে না। তাই মনে মনে ভেবে ঠিক করেছিলাম—একটু বেলা থাকতে থাকতেই যাব চলে।

কিন্তু কথাটা বলি-বলি করেও সহজে বলা হয়ে উঠল না—পাছে মার্লিন মনে করে আমি সত্যিই ভয় পেয়েছি। পরে বাইরের দিকে চেয়ে যখন দেখলাম, সন্ধ্যা আগতপ্রায়, তখন বলে বসলাম এইবার আমি উঠব, একটু কাজ আছে।

আশ্চর্য্য হলাম। মার্লিনও সঙ্গে সঙ্গে বলল, হ্যাঁ, এইবার যাও—আর দেরী কর না।

অল্প অল্প দিন—আমি যাব—বলার পরেও মার্লিন অন্ততঃ আরও আধ ঘণ্টা আমাকে বসিয়ে রাখে।

যাওয়ার জন্য বাইরে এসে দাঁড়িয়েছি—মার্লিনও আছে সঙ্গে—টমও বেরিয়ে এল, মাথায় টুপী পরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে। ইতিমধ্যে কখন যে টমকে মার্লিন কি বলে রেখেছিল—আমি কিছুই টের পাইনি। শুধালাম টম কোথায় যাচ্ছে ?

মার্লিন বলল তোমার সঙ্গে। হাসপাতাল পর্য্যন্ত তোমাকে পৌঁছে দিয়ে বাসে উইম্‌লিংটন দিয়ে আসবে ঘুরে।

মনে মনে অবশ্য খুবই নিশ্চিন্ত হলাম। কিন্তু মুখে বললাম কেন ? কি দরকার ?

মার্লিন বলল না, তোমার একলা না যাওয়াই ভাল। তারপর একটু হেসে বলল, কিন্তু এক কাজ কর বিকো !

ডডিংটন চার্চের পাশ দিয়ে যেতে টমের হাতখানি নিয়ো ধরে। তখন ত সন্ধ্যা আরও ঘনিয়ে আসবে কি বল টম—তা হলেই হবে ত ?

টম একটু হাসল—কোনও কথা বলল না।

আমি হেসে বললাম হাত কেন ? আমি ও জায়গাটা টমকে জড়িয়ে ধরে নিয়ে যাব।

টম বলল অত ভয় পাই না।

চললাম দু' জনে। ক্রমে মাঠের রাস্তাটি পার হয়ে এলাম ডডিংটনের চার্চটির পাশে। ধরলাম টমের হাতখানি। বললাম টম, ভয় করছে না ত ?

টম বলল, না। কিন্তু হাতটি সরিয়েও নিল না। তখন সেই পুরানো চার্চটির আশে-পাশে বড় বড় গাছের মধ্যে দিয়ে সন্ধ্যা বেশ ঘনিয়ে নেমেছে। স্তব্ধ পল্লীসন্ধ্যা—কোনও দিকে কোনও জনমানব নাই। সত্যিই গা ছম্ ছম্ করে ওঠে।

চলেছি দু জনে চার্চের পাশের রাস্তাটি দিয়ে, হঠাৎ মক্কটন, কোন গাছের আড়ালে লুকিয়ে ছিল জানি না, এসে দাঁড়াল আমার সামনে। হাতে তার রিভলবার। সোজা আমার বুকের দিকে লক্ষ্য করে বলল, নোংরা কালো কুকুর ! তুমি মার্লিনের সঙ্গে মেলামেশা বন্ধ করবে কি না ?

চোখে সবই অন্ধকার হয়ে গেল। হৃৎপিণ্ডটা এত দ্রুত কাঁপতে লাগলো, মনে হল বুক ফেটে বেরিয়ে যাবে। মুখ দিয়ে আমার কোনও কথা বেরুল না।

টম পাশেই ছিল দাঁড়িয়ে—হঠাৎ যেন বাঘের মতন লাফিয়ে পড়ল মক্কটনের উপরে। সেই ধাক্কায় দুজনেই পড়ে গেল মাটিতে—রিভলবারটা মক্কটনের হাত থেকে ছিটকে পড়ল একটু দূরে।

ক্ষণিকের জন্য বোধ হয় স্তম্ভিতের মত দাঁড়িয়েছিলাম। সহসা চমক ভাঙ্গল। ছুটে গিয়ে রিভলবারটা তুলে নিলাম হাতে। চেয়ে দেখি—বেচারা টমকে মাটিতে ফেলে মক্কটন তার বুকের উপর বসে ভীষণ প্রহার করছে। রিভলবারটা হাতে করে, মনে কি সাহসের উদয় হল জানি না, সোজা মক্কটনের মাথার কাছে রিভলবারটা তুলে বললাম মক্কটন ! থামাও। নইলে—

মক্কটন প্রহার থামিয়ে চাইল রিভলবারটার দিকে। ধীরে উঠে দাঁড়াল। রিভলবারটা তখনও আমার হাতে—সোজা লক্ষ্য রেখেছি মক্কটনের দিকে।

জোরের সঙ্গে বললাম যাও, এখান থেকে চলে, এই মুহূর্ত্তে।

একটু চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে মক্কটন দ্রুতপদে চলে গেল মাঠের দিকে।

বুলা ! ডিটেকটিভ উপন্যাস অনেক পড়েছি। কিন্তু তারই একটি দৃশ্য যে আমার জীবনে এমন করে অভিনীত হবে, কখনও ভাবিনি। শুনলে নিশ্চয়ই অবাক হবে না—তখনও পর্য্যন্ত জীবনে আমি রিভলবার হাতে করিনি। কলকাতায় থাকতে বন্ধুদের সঙ্গে একবার মাত্র উল্টোডাঙ্গার জলায় পাখী শিকার করতে গিয়েছিলাম—তাও বন্দুক নিয়ে, রিভলবার নয়।

* * * *

অনেকক্ষণ চেয়ে রইলাম মক্কটনের দিকে—ক্রমে মক্কটন চার্চের পাশের রাস্তাটি পার হয়ে মাঠের মধ্যে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। চাইলাম ফিরে টমের দিকে—টম ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু সেই সন্ধ্যার অস্পষ্ট আলোকে বুঝতে আমার দেরী হল না যে, টমের মুখের দু' জায়গা দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে।

বললাম টম, চল হাসপাতালে। তোমার মুখ কেটে গিয়েছে দেখছি—ওষুধ দিয়ে প্রয়োজন হয়ত বেঁধে দেব।

টম বলল চলুন।

সস্নেহে টমের দিকে চেয়ে বললাম টম ! তোমার বোধ হয় হাঁটতে কষ্ট হবে। আমার বাহুটি ধরে আস্তে আস্তে চল।

বাহুটি বাড়িয়ে দিলাম। টম বলল না সার, ঠিক আছে—আমার পায়ে কোনও চোট লাগেনি।

খানিকক্ষণ দুজনেই চুপচাপ চলতে লাগলাম। ক্রমে ডডিংটনের সদর রাস্তার উপর এসে টমের হাতটি ধরে বললাম টম ! তোমার কাছে যে আমি কতখানি কৃতজ্ঞ—ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। তুমিই আজ আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ।

টম কেমন যেন একটু অপ্রস্তুত হয়ে গেল। সলজ্জ ভাবে বলল না—না সার। মার্লিনের প্রতি আমি আমার কর্তব্যটুকু করেছি মাত্র।

* * * *

হাসপাতালে এসে টমের ক্ষতস্থান পরীক্ষা করে যথারীতি ওষুধ লাগিয়ে দিলাম। মাথার একটি ক্ষত একটু গুরুতর বলে মনে হয়েছিল—সেটাকে ব্যাণ্ডেজ দিয়ে দিলাম বেঁধে। শুধালাম, তুমি একলা ফিরে যেতে পারবে ত? না হয় বল—আমি তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।

বলল, না। তার প্রয়োজন নেই। আমি ত বাসে যাব।

বললাম, কিন্তু উইমলিংটন ষ্টেশনের কাছ থেকে ত হাঁটতে হবে খানিকটা?

বলল সে ঠিক হবে।

টমকে বাসে তুলে দেওয়ার সময় তার হাতে রিভলবারটি দিয়ে বললাম, তোমার কাছেই রেখে দাও। মার্লিনকে দিয়ে দিও।

রাত্রে বিছানায় শুয়ে সহজেই টের পেলাম—মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে আছে। আজ খুব বেঁচে গিয়েছি—প্রথমটা মনের মধ্যে এই যে একটা স্বস্তির হাওয়া বইছিল, ক্রমে সেটা গেল থেমে। মনের কোনও কোণে সহজে নিঃশ্বাস নেওয়ার মতন একটুও হাওয়া খুঁজে পেলাম না। ভয় পেয়েছি, দারুণ ভয় পেয়েছি—সে কথা নিজের মনের কাছে ক্রমে পরিষ্কার হয়ে উঠল আর অস্বীকার করা চলে না। অদৃষ্ট ক্রমে আজ না হয় বেঁচে গিয়েছি, কাল না-ও বাঁচতে পারি—যে রকম পাগলের মতন হয়ে উঠেছে মঙ্কটন, বিশ্বাস কি—যদি না-ও বেরোই কোনও দিন হয়ত হাসপাতালে এসেই দেবে গুলী চালিয়ে। অথচ এমনই ঘটনার পরিহাস, আমার মনের এই আতঙ্কের খবরটি কাউকে ত বলা চলে না—মার্লিনকে ত নয়ই। ভাববে কি—ভারতবর্ষের লোকেরা এত ভীরু! হাঁফিয়ে উঠে মনের অন্য কোণে মুখ ফেরালাম—যদি একটু সহজ হাওয়া পাই! মার্লিন ত আমার—তাকে নিয়েই ত আমার ইংল্যাণ্ডের জীবনটা অভূতপূর্ব ভাবে সরস ও মধুর হয়ে উঠেছে। সে ত একান্ত আমারই। কোনও গুলীর সাধ্য নেই তাকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়। কিন্তু আবার হাঁফিয়ে উঠলাম—তার সঙ্গে সহজ মেলামেশার পথটি গেল বন্ধ হয়ে। তার সঙ্গে দেখা না হলেই বা বাঁচব কি করে? অনেকক্ষণ এ-পাশ ও-পাশ করে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম মনে নেই।

পরের দিন সকালবেলা ঘুম ভেঙেই দেখি—মনটা যেন অবশ হয়ে পড়েছে এলিয়ে। মার্লিন—কিন্তু আজ আর একলা তার সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার ভরসা মনের মধ্যে একেবারেই পেলাম না। অথচ না গিয়েই বা থাকব কি করে? বলবই বা কি?

একটু পরেই টম এল হাসপাতালে কিন্তু একা এল না। সঙ্গে এল মার্লিন। টমের ক্ষতগুলি পরীক্ষা করতে করতে মার্লিনকে বললাম, সব শুনেছ ত?

গম্ভীর ভাবে বলল, শুনেছি।

বললাম, ভাগ্যিস টম ছিল, নইলে কালকেই আমার জীবন শেষ হয়ে যেত।

সে কথার কোনও কথার উত্তর দিল না। একটু পরে আবার শুধালাম, রিভলবারটি কি করলে?

বলল, আমার কাছেই আছে। দেখি ভেবে।

শুধালাম, কার রিভলবার? মঙ্কটনের নিজের?

বলল, না বোধ হয়। মঙ্কটনের ত রিভলবার ছিল না?

টমের ক্ষতগুলির যথারীতি ব্যবস্থা হলে মার্লিন ও টম যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হল। আমিও সঙ্গে সঙ্গে গেলাম হাসপাতালের সদর ফটকটি পর্য্যন্ত। ভাবতে ভাবতে গেলাম—এইবার একফাঁকে মার্লিনকে বলে দেব, আজ আর আমি যেতে পারব না। কিন্তু কেন? সেইখানেই কথাটা বলতে বাধল।

সদর ফটকটির কাছে এসে মার্লিন দাঁড়াল। আমার দিকে চেয়ে বলল, বিকো!

বললাম, কি?

বলল, তুমি দু'-চারদিন খুব সাবধানে থেকো। হাসপাতাল থেকে একেবারেই বেরিয়ো না।

বললাম, কিন্তু—

বেশ জোরের সঙ্গে বলল, না—দেখি, আমি এর কোনও বিহিত করতে পারি কি না।

বললাম, বেশ ত। বিনা দোষে শেষ পর্য্যন্ত আমারই হাসপাতালে বন্দী হওয়ার হুকুম হোল।

কথাটা শুনে একটু হাসল। বলল, ভয় নেই। দু-তিন দিনের মধ্যেই হুকুম রদ হবে।

সেই দিনই সন্ধ্যাবেলা আমার জীবনে প্রথম এল—আর্থার রোলাণ্ড।

বলা বাহুল্য, সেদিন হাসপাতাল থেকে আমি একেবারেই বেরোইনি। এমন কি বলতে লজ্জা করব না—বিকেলে একটু বাগানে গিয়ে বসারও ভরসা আমার হয়নি। কি জানি কোন দিক দিয়ে মঙ্কটন আবার এগিয়ে আসে—রিভলবার হাতে নিয়ে। ভয়ে ভয়ে সমস্ত দিনটা হাসপাতালের ঘরের মধ্যেই দিলাম কাটিয়ে।

সন্ধ্যার পরে আবার খেতে যাওয়ার আগে, হাসপাতালের দোতালার লাউঞ্জে (বসবার ঘরে) বসে আছি, এমন সময় একটি পরিচারিকা এসে খবর দিল—একটি ভদ্রলোক আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়। বুকটা কেঁপে উঠল—মঙ্কটন নয় ত?

শুধালাম, কে ভদ্রলোক? নাম কি?

পরিচারিকা বলল, তা ত জানি না!

বললাম, খবর নিয়ে এস।

পরিচারিকা চলে গেল এবং একটু পরেই ফিরে এল—হাতে একখানি কার্ড নিয়ে।

লেখা আছে **Arthur Rowland B. A. (Oxon)** একটু অবাক হলাম। ইনি আবার কে? পরিচারিকাকে বললাম, নিয়ে এস।

দু-তিন মিনিটের মধ্যেই আর্থার রোলাণ্ডকে ঘর দেখিয়ে দিয়ে পরিচারিকাটি চলে গেল। ঘরে ঢুকেই আর্থার রোলাণ্ড হাত বাড়িয়ে আমার দিকে এগিয়ে এসে শুধালেন, ডাঃ চাউডুরী?

বললাম, হ্যাঁ, করমর্দ্দনে পরিচয় হল।

আর্থার রোলাণ্ডকে দেখেই মুগ্ধ হয়েছিলাম। অসাধারণ সুপুরুষ বললেও অত্যুক্তি করা হয় না। নাতিদীর্ঘ দোহারা চেহারা, বয়স ২৫।২৬ এর বেশী হবে না বলে মনে হয়—মুখের একটি স্বাভাবিক

ভদ্রতা এবং সৌজন্যের সুস্পষ্ট ছাপ চাইলেই চোখে পড়ে। ভাবপ্রবণ চোখ দুটির নীচে পাতলা দুটি ঠোঁটে মাঝে মাঝে একটি মৃদু হাসিতে চরিত্রগত সংস্কৃতির পরিচয় দেয়। সুশ্রী করে আঁচড়ান ঘন চুলের নীচে মাথাটির গড়নে একটু তীক্ষ্ণ বুদ্ধির আভাস সহজেই মেলে। দু'জনে বসার পর আমিই শুধালাম, আমি আপনার জন্য কি করতে পারি মিঃ রোলাণ্ড ?

মাথা নীচু করে বলল ডাঃ চাউডুরী, আমি অত্যন্ত দুঃখিত। আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছি।

অবাক হয়ে শুধালাম, কেন ?

বলল, যে রিভলবারটি নিয়ে আপনাকে আক্রমণ করা হয়েছিল, সে রিভলবারটি আমার। মঙ্কটন মিথ্যে কথা বলে আমার কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছিল।

শুধালাম, আপনি মঙ্কটনকে জানেন তাহলে ?

বলল, হ্যাঁ। সে আমারই স্বগ্রামবাসী। একটু চুপ করে থেকে বলল, যদি জানতাম যে মঙ্কটন ঐ রকম একটা উদ্দেশ্য নিয়ে রিভলবার চেয়েছিল, বিশ্বাস করুন, কখনই তাকে আমি রিভলবার দিতাম না।

বললাম, আপনি তাহলে সবই শুনেছেন ?

বলল, হ্যাঁ। মঙ্কটন সব কথা আমাকে বলতে বাধ্য হয়েছে।

বললাম, যাক্—যা হবার তা হয়ে গেছে। এ নিয়ে আমি আর কিছু করতে চাই না।

বলল, আপনারই উপযুক্ত কথা। ভাবি, এরা কেন বোঝে না পরের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবার আমাদের কারও কোন অধিকার নাই। এই সোজা কথাটুকু বুঝলেই জগতের বেশীর ভাগ অশান্তিই বোধ হয় কেটে যায়।

কথাবার্ত্তা বলে সত্যই মুগ্ধ হলাম। যদিও মুখ ফুটে কিছু বলেনি, তবুও এটুকু বুঝতে আমার দেরী হল না যে, আমার কাছ থেকে ফেরত নিয়ে যাওয়াই আমার সঙ্গে দেখা করতে আসার প্রধান উদ্দেশ্য। তাই শেষ পর্য্যন্ত আমিই বললাম, রিভলবারটি ত আমার কাছে নেই, নইলে এখুনিই আপনাকে ফেরত দিয়ে দিতাম।

শুধাল, রিভলবারটা কোথায় ?

বললাম, মিস ফ্রেজারের কাছে।

বলল, তাঁর বাড়ীর ঠিকানা ত আমি ঠিক জানি না !

ঠিকানা বলে দিলাম। যাওয়ার সময় আবার দুঃখ প্রকাশ করে বিদায় নিল।

* * * *

পরের দিন সকালবেলা মার্লিনের কাছ থেকে একখানা চিঠি এল—টম সকালে হাসপাতাল আসার সময় নিয়ে এল চিঠিখানি হাতে করে।

মার্লিন লিখেছে, 'আজ বিকেল ৫টার সময় মার্চ্চ বাজারে, যেখানে বাসগুলি থেমে যায়, আমার সঙ্গে দেখা করো। হাসপাতাল থেকে সোজা বাসেই এস—বিকেল সাড়ে চার আন্দাজ যে বাসটি তোমাদের হাসপাতালের সামনে দিয়ে যায়, সেই বাসে উঠলেই হবে। হয়ত আমিও সেই বাসেই উঠব—ব্রুক্ টাওয়ারের কাছে। অনেক কথা আছে। তোমার লীনা।'

চিঠিখানি পেয়ে মনটা যে আনন্দে ভরে উঠল, সে কথা লেখাই বাহুল্য—মার্লিনের সঙ্গে দেখা হবে। কিন্তু যাওয়ার সময় একটা ভয়ে মনটা যে থেকে থেকে একটুও কেঁপে ওঠেনি, এমন কথা বললে মিথ্যে কথা বলা হবে। এবং বৃথা ! তোমার কাছে সে মিথ্যাটুকু বলার কোনও প্রয়োজন দেখি না। রাস্তায় দাঁড়িয়ে বাসের জন্য অপেক্ষা করার সময় বারে বারে এদিক ওদিক চেয়ে দেখেছি—সে কথা আজও মনে আছে। এবং বাসে উঠেও একবার ভাল করে বাসে যাত্রীদের সকলকে দেখে নিয়েছিলাম—মঙ্কটন নাই ত !

ব্রুক্ টাওয়ারের কাছে এসে দাঁড়ালে জানালা দিয়ে চেয়ে দেখেছিলাম—কে কে বাসে উঠছে। কিন্তু কই—মার্লিন ত এ বাসে উঠল না। মঙ্কটনও যে ওঠেনি—সেটুকুও বিশেষ ভাবে খেয়াল করেছিলাম।

মার্চ্চ-বাজারে বাস এসে দাঁড়াতেই দেখতে পেলাম, মার্লিন দাঁড়িয়ে আছে ফুটপাথের উপরে। নেমে মার্লিনের কাছে গিয়ে মার্লিনের হাতটি ধরে শুধালাম, তুমি আগেই চলে এসেছ ?

বলল, হ্যাঁ, এই একটু আগে। ব্রুক্ টাওয়ারের কাছে এসে দেখি—একটি বাস দাঁড়িয়ে আছে। ভাবলাম তোমারই বাস। তাড়াতাড়ি উঠে পড়লাম। তোমাকে দেখলাম না। পরে বুঝলাম—বাসটা তোমাদের ওদিকের নয়। আসছে কেমব্রিজের দিক থেকে।

বললাম চল, কোথাও গিয়ে বসে চা খেতে খেতে গল্প করা যাক।

বলল, চল।

কাছেই একটা রেস্তোরাঁতে গেলাম দু'জনে। রেস্তোরাঁটি রাস্তার ধারেই কিন্তু দোতলার উপরে। বেশ বড় রকমের একটা ঘর—রাস্তার ধারের জানালাগুলিতে সুন্দর পর্দা দিয়ে সাজান তারই একটি জানালার ধারে একটি টেবিলে দুজনে গিয়ে বসলাম চা খেতে খেতে শুধালাম, খবর কি ? তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে অনেক খবর আছে।

মৃদু হেসে বলল, কিছু কিছু আছে বই কি।

বললাম, বল।

শুধাল, মিঃ রোলাণ্ডকে তোমার কেমন লাগলো ?

বললাম, ভালই, বিশিষ্ট ভদ্রলোক বলে মনে হল।

বলল, সে কথা দিয়েছে, মঙ্কটন আর কোনও হাঙ্গামা করবে না।

শুধালাম, কি রকম ?

বলল, ভদ্রলোক রিভলবার চাইতে এসেছিলেন—জানই ত প্রথমে আমি রিভলবার ফেরত দিতে চাইনি। বলেছিলাম—এরকম গুণ্ডামীর বিহিত হওয়া উচিত। বলেছিলাম—রিভলবারটি আমি চিঠি লিখে পুলিশে পাঠিয়ে দেব। শেষ পর্য্যন্ত লোকটি মঙ্কটনের হয়ে জামিন হওয়াতে রিভলবারটি ফেরত দিলাম।

বললাম, ওঁর জামিন হওয়ার মূল্যটা কি ? মঙ্কটন কারও কথা শুনে চলার মতন লোক কি না !

বলল, মূল্য একটু আছে। মঙ্কটনরা ওদেরই অধীনস্থ প্রজা।

শুধালাম, কি রকম ?

বলল, ওরা অসম্ভব বড়লোক ! মঙ্কটনদের গ্রামের পাশে প্রায় পঁচিশ-ত্রিশ একর জমির উপরে প্রকাণ্ড ওদের বাড়ী। শুনেছি সেখানে ওদের বাগানটি দেখার মতন জিনিষ। মিঃ রোলাণ্ডের বাপ-স্যার হেনরী রোলাণ্ড সৈন্য বিভাগে মস্ত বড় কাজ করতেন। সেখা থেকে অবসর গ্রহণ করে ওইখানেই এসে বসবাস করছেন। গ্রামে প্রায় সকলেই ওদের জমিদারীতে বাস করে।

মনে মনে লোকটির রুচির প্রশংসা না করে পারলাম না। আ

লোকের ছেলে—কই কাল রাত্রে কথায়-বার্ত্তায় ত এতটুকুও ভাস দেয় নি !

শুধালাম, তা তুমি ওদের বিষয় এত জানলে কি করে ?

বলল, ওদের কথা ত এ অঞ্চলের সবাই জানে। লোকটি মাদের বাড়ী এসে চলে যাওয়ার পর মা আবার বিস্তারিত করে দর বিষয় কত কি বললেন—এ অঞ্চলের বহু পুরানো া ত ওরা !

শুধালাম, তা লোকটি নিজে করে কি ? বলল, জানি না । বোধ বিশেষ কিছু করে না। একটা মস্ত বড় বেণ্টলী গাড়ী করে এসেছিল আমাদের বাড়ীতে। ঐ সবই করে বেড়ায়।

মার্লিনের কথা শুনে মার্লিন লোকটির বিষয় আরও কতটা জানে, নবার কৌতূহল কেন যে হয়েছিল, বলতে পারি না। শুধালাম, জ কত দূর জান ?বলল, জানি না। বিদ্যে বোধ হয় বিশেষ কিছু । বড়লোকের ছেলে কি আর কষ্ট করে বেশী লেখাপড়া শিখেছে ?

হেসে বললাম, লোকটি অক্সফোর্ডের গ্রাজুয়েট ।

মার্লিন শুধাল, তাই নাকি ? কি করে জানলে ?

বললাম, আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্য যে কার্ড পাঠিয়েছিল—তে লেখা ছিল ।

মার্লিন বলল, তা হবে। তাই ধরণ-ধারণ কথাবার্ত্তা খুব ভদ্র র্জিত বলে মনে হয়েছিল। একটু চুপ করে কি যেন ভাবতে লো। শুধালাম, ভাবছ কি ? মিঃ রোলাণ্ডের কথা ?

বলল, না। শোন। যদিও মিঃ রোলাণ্ড কথা দিয়েছে, টন আর কোনও হাঙ্গামা করবে না, তবুও তুমি ঠিকই বলেছ—টনকে ঠিক বিশ্বাস নেই। এর পর থেকে আমরা কিছু দিন রকম মার্চ্চে এসেই দেখা করব—কি বল ?

বললাম, বেশ ত—তুমি যা বলবে। তবে এত দূর বাসে আসতে মার কষ্ট হবে না ?

বলল, না না। আমার শরীর একেবারে ঠিক হয়ে গেছে।

আবার চুপ করে রইল। ক্রমে লক্ষ্য করলাম, মুখের গম্ভীর টি কেটে গিয়ে চোখের নীচে একটা চাপাহাসি খেলা করে যেতে লো—যেন কি একটা ভেবে, মনে মনে বিশেষ একটা কৌতুক ভব করছে।

বললাম, তোমার কথা ত এখনও শেষ হয়নি লীনা !

খিল খিল করে চাপা রকমের হাসি হেসে উঠল। বলল, ই ত নি।

বললাম, বল ।বলল, জান—মিঃ রোলাণ্ড মার কাছে আবার সবার অনুমতি নিয়ে গেছেন।

কথাটির তাৎপর্য্য বুঝতে আমার দেরী হল না। বললাম, ত খুব ভাল কথা।

বলল, মা কি বলেছেন জান ?

শুধালাম, কি ?

বলল, মা আনন্দে তাকে বারে বারে আসার নিমন্ত্রণ জানিয়েছেন চলে গেলে আমাকে বলেছেন—রোলাণ্ডের মত স্বামী পাওয়া ্যাণ্ডের যে কোনও মেয়ের পক্ষে পরম সৌভাগ্যের কথা।

হেসে বললাম, এ ত অত্যন্ত সুখবর। এখন মা ও মেয়ের টি এক হলেই সর্ব্ব দিক রক্ষা হয়।

আবার সেই প্রাণঢালা চাহনি ফিরে এল চোখে। আমার দিকে চেয়ে বলল, তুমি বড় দুষ্টু।

* * * *

সেদিন আমরা দু'জনে এক বাসেই ফিরে গিয়েছিলাম—মার্লিন নেমে গিয়েছিল ব্লকটাওয়ারের কাছে। ঠিক হয়েছিল—আবার ঐরকম মার্চ্চেই আমাদের দেখা হবে, পরের দিন। হলও তাই। আজও আমরা দুজনে গিয়ে বসলাম—সেই নিরিবিলি কোণটিতে চা খাওয়ার জন্য। মার্লিন বলল, একটা ব্যাপার ত বুঝতে পারছি না ?

শুধালাম, কি ?

বলল, মঙ্কটনের নামে একটা চিঠি এসেছে আমাদের ঠিকানায়, উইসবীচ থেকে—মাসীর হাতের লেখা।

বললাম, তিনি মঙ্কটনের ঠিকানা জানেন না বুঝি ?

বলল, না। সেটা অবশ্য কিছু আশ্চর্য্য ব্যাপার নয়। কিন্তু মাসী হঠাৎ মঙ্কটনকে চিঠি লিখলেন কেন ?

শুধালাম চিঠিখানা কোথায় ?

বলল, ঠিকানা কেটে মঙ্কটনের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিয়েছি।

শুধালাম, কবে ? বলল, কাল এসেছিল, কালই দিয়েছি পাঠিয়ে।

শুধালাম, তোমার মাসীর সঙ্গে কি মঙ্কটনের আলাপ আছে ?

বলল, অনেক দিন আগে মাসী একবার আমাদের ওখানে এসেছিলেন—তখন বোধ হয় হয়েছিল।

একটু ভেবে বললাম, তোমার মাসীদের ত মস্ত বড় ব্যবসা। সেই দিক দিয়ে মঙ্কটনের সঙ্গে বোধ হয় কোনও কাজের কথা লিখেছেন।

বলল, তাই, না এদিকে কোনও সুবিধা হল না দেখে মাসীকে আমাদের বিষয় বিস্তারিত সব লিখেছে মঙ্কটন।

একটু ভেবে বললাম, তা হতেও পারে। দুজনেই একটু চুপ করে রইলাম। আমি শুধালাম, তা'হলে ?

বলল, তাহলে আর কি ? এ ত আর চিরদিন গোপন থাকবে না ? গোপন আমি রাখতেও চাই না। আজ না হোক কাল সবাই সবই জানবে। সেদিক দিয়ে আমার মন তৈরী।

বললাম, তবে আর অত ভাবছ কেন ?

বলল, একটু ভাবছি মার জন্য। এই মা ও মাসীর মধ্যে একটা মনোমালিন্যের সৃষ্টি না হয়।

শুধালাম, তার কি উপায় আছে বল ?

বলল, উপায় কিছুই নেই। জীবনে যে পথ বেছে নিয়েছি, ঝড়-ঝঞ্ঝা আমাকে সইতে হবেই। আমি কি তা জানি না বিকো !

একটু চুপ করে থেকে শুধালাম, তোমার মা কি বলেন ?

জিজ্ঞাসা করল, কি বিষয় ?

বললাম, তোমার মাসীর চিঠির বিষয়। একটু হেসে বলল, মা এক মজার কথা বলেন ।শুধালাম, কি রকম ?

বলল, মা বলেন—বারবারা যখন এখানে ছিল, আমি তখন হাসপাতালে, মঙ্কটনের প্রতি বারবারা নাকি বিশেষ অনুরক্ত হয়ে উঠেছিল। সেটুকু মার লক্ষ্য এড়ায় নি। তাই মা বলেন—বোধ হয় মাসী সেটুকু টের পেয়েছেন এবং তাই মঙ্কটনের সঙ্গে একটা যোগাযোগের ব্যবস্থা করছেন। কোনও মেয়েরই ত বিয়ে হচ্ছে না।

হেসে বললাম, তা হলে ত খুব ভালই হয়।

বলল, হ্যাঁ। কিন্তু মঙ্কটনকে কোনও মেয়ে বিয়ে করার কথা ভাবে কি করে—আমি ত ধারণাই করতে পারি নি।

সঙ্গে সঙ্গে বললাম, রোলাণ্ড হলেও বা হত—কি বল?

তার নিজস্ব ধরণে খিল-খিল করে হেসে উঠল। বলল, রোলাণ্ডের কথা তুমি ভোলনি দেখছি।

বললাম, বা রে! আমার স্মরণশক্তি কি এতই খারাপ?

বলল, স্মরণশক্তি বেশী ভাল হওয়াও সব সময় ভাল নয়।

শুধালাম, তার খবর কি? আর আসেনি?

মৃদু হেসে বলল, এসেছিল। শুধালাম, আবার এসেছিল—কবে?

বলল, কাল সকালে। বললাম, এই খবরটাই এতক্ষণ বলনি।

বলল, খবরটা যে তোমার মনের দিক দিয়ে এত বড় সেটা ত বুঝতে পারিনি।"

শুধালাম, কি বলল এসে?

বলল, না, এমন কিছু নয়। বেশীক্ষণ ছিলও না। ঐ পথ দিয়ে যাচ্ছিল—নেমে মার খবর নিয়ে গেল।

শুধালাম, আর মেয়ের খবরটি নেয়নি?

বলল, না। মেয়ে সামনে বেশী যায়ই নি।

শুধালাম, কেন? মেয়ের দিক দিয়ে এই বিরাগের কারণটা কি?

হেসে বলল, সেটা বুঝতে তোমার দেরী আছে।

ক্রমে দুজনে এলাম বাস ছাড়ার জায়গায়—ফিরে যাব বলে। সন্ধ্যা আগতপ্রায়, রাস্তার আলোগুলিও জ্বলে উঠেছে। হঠাৎ মনটা কেঁপে উঠল, চেয়ে দেখি, একটু দূরে মঙ্কটন দাঁড়িয়ে। মঙ্কটন আমাদের দেখেই মুখ ফিরিয়ে নিল অন্য দিকে।

মার্লিন বলল, চল আমরা কোথাও একটু বেড়িয়ে আসি। রাস্তা ধরে চললাম মার্চ্চ ষ্টেশনের দিকে। যেতে যেতে দু-তিনবার পিছন ফিরে চেয়ে দেখেছিলাম—মঙ্কটন আমাদের পিছু নিয়েছে কি না। শেষ পর্য্যন্ত মার্লিন যখন বেশ জোরের সঙ্গে বলল, ও রকম পিছন ফিরে চেও না। তখন পিছন ফিরে চাওয়া বন্ধ করলাম। কিন্তু মনের আতঙ্কটি গেল না।

খানিকটা গিয়ে ফিরলাম—মঙ্কটনকে দেখতে পেলাম না। মন কতকটা যেন শান্ত হল। মার্চ্চ বাজারে বাস ছাড়বার জায়গাতে এসেও মঙ্কটনকে আর দেখিনি। দুজনে ডডিংটনের বাসে উঠলাম। বাসে উঠবার সময় ভাল করে বাইরে ভিতরে চেয়ে দেখেছিলাম মঙ্কটন কোথাও আছে কি না, সে কথা বলাই বাহুল্য।

বাসে যেতে যেতে মার্লিন বলল, বিকো! তোমার কথাই ঠিক। মঙ্কটন এখনও তোমার পিছু নিয়েই আছে।

বললাম, কি করা যাবে বল?

একটু ভেবে বলল, আর ত কিছু নয়। লোকটার রাগলে জ্ঞান থাকে না।

হঠাৎ আবার তোমাকে কোন দিন আক্রমণ না করে বসে। বললাম, কিন্তু রোলাণ্ড ত জামিন হয়েছে।

সে কথার কোনও উত্তর না দিয়ে চুপ করে রইল। ক্রমে এল উইমলিংটন ষ্টেশন। মার্লিন সেইখানেই নেমে গেল। আগেই বলেছিল—আজ আর ব্লকটাওয়ারের রাস্তায় যাবে না। যাওয়ার সময় আমাকে বলে গেল, তুমি কাল হাসপাতাল থেকে বেরিও না। কবে কোথায় দেখা হবে, আমি খবর দেব।

হাসপাতালে বাস থেকে নেমে দু' পা চলতেই বুঝলাম, মনটা আমার ভারী হয়ে উঠেছে। কারণগুলি প্রত্যক্ষ খুঁজে নিতে দেরী হল না। মঙ্কটন আবার হাঙ্গামা সুরু করল—কবে আবার মার্লিনের সঙ্গে দেখা হবে কে জানে? এর পরে নিশ্চিন্ত মনে দেখা করবই বা কি করে—ইত্যাদি। কিন্তু এসব সাদা মেঘের মতন ভাসা-ভাসা উপরের কারণগুলির পিছনে মনের এক কোণে যে একটি কাল মেঘ জমা হয়ে উঠছিল, সেটা টের পেলাম অনেক পরে—রাত্রে বিছানায় শুয়ে।

রোলাণ্ড—সুবেশী, সুদর্শন, সুমার্জ্জিত রোলাণ্ড—তার স্বাভাবিক চরিত্রগত মাধুর্য্যের আকর্ষণী-শক্তি ত অস্বীকার করা চলে না। সে রোজ যাতায়াত সুরু করেছে মার্লিনদের বাড়ীতে। তার যাতায়াতের কারণটা যে মার্লিনের মা'র খবর নেওয়া নয়, সেটুকু ত সহজেই বোঝা যায়। সে যাতায়াত সুরু করেছে একটা সহজ সরল ন্যায্য দাবী নিয়ে—যার পিছনে একটা স্বাভাবিক জোর আছে। আর আমার দাবীটা সহজও নয়, সরলও নয় এবং আমার দাবীর পিছনে জোর ত একেবারেই নাই। তবে? রোলাণ্ড ত মঙ্কটন নয়। মার্লিন যে রোলাণ্ডকে অপছন্দ করে না, মালিনের কথাবার্ত্তায় সে আভাসটুকুও ত পেয়েছি। আর এমনই অদৃষ্টের পরিহাস, ঠিক এই সময় মঙ্কটন এসে দাঁড়াল একটা পাহাড়ের মতন আড়াল করে—আমার ও মার্লিনের সহজ মেলামেশার মধ্যে। তবে কি শেষ পর্য্যন্ত মার্লিন—বিছানায় শুয়ে রাত্রের অন্ধকারে একটা কাল মেঘে সবই কেমন অন্ধকার হয়ে গেল অন্ধকার-মনে।

সকালবেলা ঘুম ভেঙ্গে জানালা দিয়ে চেয়ে দেখলাম, বাইরে সুন্দর ঝকঝকে সূর্য্যের আলো ফুটেছে। ক্রমে কাল রাত্রের কাল মেঘের কথাটা মনে পড়ল। কিন্তু কই—আজ ত মনে মেঘ নাই। মনে পড়ল মার্লিনের সেই প্রাণঢালা চাহনি। নিজের মনকে ধিক্কার দিয়ে বললাম—ছিঃ ছিঃ, এত দৈন্য তোমার! মার্লিনকেও তোমার সন্দেহ!

* * * *

তিন দিন পরে সকালবেলা হঠাৎ সব যেন সহজ হয়ে গেল। মার্লিনের এক চিঠি নিয়ে এল টম হাসপাতালে। মার্লিন সেই দিনই বিকেলবেলা তাদের বাড়ীতে যাওয়ার জন্য আমাকে অনুরোধ জানিয়েছে। লিখেছে—মঙ্কটন এ অঞ্চল ছেড়ে কাল চলে গেল। থর্ণিতে মাসীদের একটা হোটেল আছে—রোজ অ্যাণ্ড ক্রাউন। সেই হোটেলে ম্যানেজারের অ্যাসিষ্টেণ্ট-এর চাকরী নিয়ে গেল চলে। পরে নাকি ম্যানেজার হবে। মা বলেন—বারবারার সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যেই মাসী মঙ্কটনের জন্য এতটা করছেন। থর্ণি থেকে উইসবীচে যাতায়াতের সোজা ট্রেণ আছে—নিশ্চয়ই মঙ্কটনের মাঝে মাঝে নিমন্ত্রণ হবে উইসবীচে।

সেদিন যে মার্চ্চবাজারে মঙ্কটনকে দেখেছিলাম—এখন মনে হচ্ছে উইসবীচে গিয়ে মাসীর সঙ্গে দেখা করে ফিরছিল। যাই হোক, তুমি আজ এলে বিস্তারিত কথা হবে—ইত্যাদি।

আজ জীবনের অপরাহ্নে সমস্ত জীবনটার দিকে চেয়ে ভাবি—জীবনস্রোতের কোন সে অতল গভীরে কি যে তরঙ্গের ঘাত-প্রতিঘাত চলে, উপরে ভেসে ভেসে আমরা ত কিছুই জানি না। কোনও প্রতিরোধ করার শক্তিও নাই আমাদের। অথচ উপরের ভাঙ্গা-গড়া সবই হয় তারই ফলে—আমরা শুধু হাবুডুবু খেয়েই মরি। এ কোন্ শক্তির মহালীলা?

[ক্রমশঃ।

বাইশ

পল্লব খানিকক্ষণ সমুদ্রের তীরে একলা ঘুরে বেড়িয়ে ফিরে এসে মিষ্টার টমাসের বাগানে একটি বেঞ্চিতে বসল—একটি ফোয়ারার সামনে। প্রতি রবিবার সকালে ফোয়ারাটি খুলে দেওয়া হত। পল্লব বিমনা হয়ে ফোয়ারাটির দিকে চেয়ে থাকে। আথাল-পাথাল কত রকমের দুর্ভাবনাই যে ওর মাথার মধ্যে হানা দেয়! কিন্তু সব ছাপিয়ে ফিরে ফিরে একটি মাত্র চিন্তা ওকে যেন চাবুক মারে। চেলা—চেলা—চেলা—ফ্লার্টেশন! ছি ছি! তা আবার সবার সামনে!

খানিক পরে রাগ প'ড়ে আসতে না আসতে ওর মনে জেগে ওঠে রিতার জন্যে সহানুভূতি। একটু আত্মগ্লানিও আসে বৈ কি! কেন না, রিতার সঙ্গে হৃদ্যতা সত্ত্বেও ওর ভালো লাগত না যখন সে কাউন্টের সম্বন্ধে যা-তা বলত। মনে হত—হাজার হোক বাপ তো, এত আক্রোশ কি ভালো? আজ প্রথম বুঝল ইংবাজি প্রবচনটির মর্ম—জুতোর কোথায় বেঁধে জানে শুধু সে-ই যে জুতো পরে। আহা, বেচারি মেয়ে—এ-হেন 'জুপেয়ে জানোয়ার' যার জন্মদাতা! সঙ্গে সঙ্গে যেন একটা বিদ্যুৎস্রোত শির শির করে ওঠে ভাবতে, যে রিতা ওকে পর ভাবে না, নৈলে কি ও ঘর থেকে বেরিয়ে আসবার জন্যে উঠে দাঁড়াতেই প্রকাশ্যে ওকে টেনে বসায়? মনে পড়ে ওর হাতের উষ্ণ স্পর্শ আর সঙ্গে সঙ্গে দেহে-মনে জেগে ওঠে পুলক!

কিন্তু তার পরেই মনে পড়ে ফের কুঙ্কুমের নিষ্করুণ অনুশাসন—"আগুনের সঙ্গে খেলা"! মনে হয় কুঙ্কুম ঠিকই বলেছে—রিতা যখন ওর গৃহলক্ষ্মী হ'তে পারে না—নাঃ, সে কথা ভাবাই যায় না। রিতাকে দেখে ও মুগ্ধ হ'লেও এটুকু বোঝে যে এর নাম প্রেম নয়—আসক্তি মাত্র। প্রেম গ'ড়ে ওঠে বনেদ পাকা হ'লে তবেই না। যৌবনের উচ্ছ্বাস জোয়ারের জলের মতন—আসতেও যেমন যেতেও তেমনি।

অথচ রিতাকে চিরদিনের জন্যেই ছেড়ে যাবে, ওর কাছে আর কখনো শিখবে না ফরাসি গান, করবে না এ-ও-তা নিয়ে অফুরন্ত আলোচনা, শুনবে না ওর মনের নিহিত বেদনার কাহিনী—ভাবতেও মনের কোথায় যেন খচ-খচ ক'রে ওঠে। মনে পড়ে রিতার কথা। আমি চাই না বিবাহ, চাই স্বাধীন হ'তে। কিন্তু স্বাধীন হব বললেই কি স্বাধীন হওয়া যায়? হাজারো সূক্ষ্ম কামনা-বাসনা, রঙিন আশা অথবা স্বপ্নের তন্তুতে আমাদের ইচ্ছাশক্তি বাঁধা—বার বার ভাবি এক হয় আর—কে বলতে পারে জোর ক'রে যে যাকে স্বাধীন ইচ্ছা বলা হয় সে সত্যই নিরঙ্কুশ? পদে পদে আমাদের মনকে প্রভাবিত করে লোকমত, পরিবেশ, আপ্তবাক্য, সংস্কার আরো কত কী—কেউ কি জানে? অথচ অন্য দিকে প্রতি মোড়েই কি ডাকে না দুটো পথ—যার একটাকে নিলে অন্যটাকে ছাড়তে হয়ই হয়? পদে পদেই দুটোর একটা পথই তো বেছে নিতে হয়? তবে? এ-বাছাবাছিও কি আগে থেকে নির্ধারিত? "দূর—তা কখনো হয়?" বলে ও রুখে উঠে। "এই দেখ না কেন আজই আমি ইচ্ছা করলেই তো এখান থেকে চলে যেতে পারি বরাবরের জন্যে, পারি না কি? নিশ্চয় পারি।"

সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়: সত্যিই কি পারি? ধরো যদি রিতা এসে ধরে, কাতর কণ্ঠে বলে: এখনি যেও না পল, থাকো আরো দু'দিন ক্ষতি কি? তাহলেও কি ও পারে রিতাকে সোজাসুজি 'না' বলতে? অথচ পারা কি উচিত নয়?—বিশেষ যখন এ-মেলামেশার পরিণাম কোন দিকে গড়াবে আগে থাকতে কেউই জোর ক'রে বলতে পারে না? এই রকম কত যে উলটো-পালটা চিন্তা, অসংবদ্ধ চিন্তা, বিস্বাদ চিন্তা! সবার উপর, মন ওর আজ কেমন যেন ব্যথায় নরম হ'য়ে গেছে রিতার অসহায়তার কথা ভেবে, সে নরম মনকে কি 'শক্ত হও' হুকুম দিলেই সে তক্ষুণি শক্ত হ'তে পারে? ওর সমস্ত কোমলতা, দরদ আজ শুধু চায় রিতার সহায় হ'তে। কিন্তু অমনি মনে হয়: যত সব বাজে সেন্টিমেন্টালিটি—উচ্ছ্বাসের ফেনা! রিতার সহায় হবে ও কেমন করে? তাছাড়া বার বার ওকে এত নিঃসহায় ব'লে দয়া করতে ইচ্ছাই বা হচ্ছে কেন—মিষ্টার টমাস ও মিসেস টমাস নর্টন থাকতে? যতই ভাবে ততই মনে হয় যে রিতা মুখে যা-ই বলুক না কেন, অন্তরে জানে যে ওর সহায় পল্লব নয়। তবু কেন আসে এ-মায়া যুক্তি যে পল্লব ওকে কিছু শক্তির পাথেয় দিতে পারে? মোহ কি এরই নাম নয়?

ভাবতে ভাবতে ওর মন কালো হ'য়ে আসে। ও স্থির করে—এবার বিদায় নেবেই নেবে। যে-গ্রন্থি শুধুই বাঁধে, আশ্রয় দেয় না, তাকে সওয়া ভালো নয়। মোহ যদি না-ও হয়—একটা প্রবল টান ওকে পেয়ে বসছে বৈ কি। এক একবার এমনও মনে হয় যে রিতা হয়ত সত্যিই ওকে পাকে ফেলতে চায়—কে বলতে পারে মেয়েদের মন কখন কোন দিকে মোড় নেয়? কিন্তু অমনি সঙ্গে সঙ্গে ধিক্কার আসে—ছিঃ ছিঃ, রিতা ওর সঙ্গে ফ্লার্ট করে নি তো একবারও। এক সঙ্গে ওরা বেড়িয়েছে, টেনিস খেলেছে, অশ্রান্ত গল্প করেছে, গান করেছে—ব্যস্। এর বেশি কিছুই তো করে নি! কখনো হয়ত বা একটু হাতে হাত ঠেকেছে, এমনি সরল হাসির ডাকে সহজ হাসির সাড়া। এর নাম কি ফ্লার্টেশন? কখনই নয়। তবে এত ভয়-ভাবনা কিসের? মনে পড়ে মোহনলালের একটি প্রায়োক্তি—

কোথায় ভোলা মন পালাবি—জাল কেটে হায় ডুববি দ-য়ে!
যা আসে চলার পথে তাকে কাজে লাগানোই জ্ঞানের বাণী।

হাবুডুবু খাবার ভয়ে যে জলে নামতে না চায় তার সাঁতার শেখাও হয় না কোনো দিন।

কিন্তু ওদিকে আবার কুঙ্কুম ওকে সাবধান ক'রে দিয়েছে—খবর্দার। মোহনলালের কথায় কান দিয়েছ কি ডুবেছ! নাঃ—কুঙ্কুমের কথাই গ্রহণীয়: **Lead us not into temptation** এই-ই ঠিক। মানুষের মন তো! চেষ্টা ক'রে কেউ বীর হ'তে পারে না—যে পারে সে আপনি পারে। ওর পকেটে ছিল পোষ্টকার্ড, ও লিখল: ভাই কুঙ্কুম, তুমি ঠিকই বলেছ। আমি কালই লণ্ডনে যাব। তোমায় আসতে হবে না।

কা'কে লেখা হচ্ছে শুনি?

রিতার হাসি ভরা প্রশ্নে—সঙ্গে সঙ্গে কাঁধে ওর কোমল করস্পর্শে পল্লব চমকে ওঠে। ফের সর্ব অঙ্গে সেই শিহরণ ওঠে জেগে। ও পোষ্টকার্ডটি ঝটিতি পকেটে পুরে বলে: এক বন্ধুকে।

রিতার মুখে মেঘ ছেয়ে আসে: এড়িয়ে যাচ্ছ কেন পল, বললেই বা—যদি অবশ্য খুব গোপন কথা না হয়।

ভাব এক, হয় আর

শ্রীদিলীপকুমার রায়

পল্লব বিব্রত কণ্ঠে বলে : গোপন কথা হ'তে যাবে কেন ? আমি—বোসো না।

রিতা বসল বেঞ্চিতে ওর কাছ ঘেঁষে। খানিকক্ষণ নিশ্চুপ।

রিতা বলে : এবার বলো।

পল্লব জানত কুঙ্কুমের প্রতি রিতা প্রসন্ন নয়। কুঙ্কুম সম্বন্ধে দু'-একবার উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেই এইটুকু ও বুঝতে পেরেছিল যদিও রিতা খোলাখুলি কখনো কোনো ঝাঁঝালো মন্তব্যই করে নি কুঙ্কুমের সম্বন্ধে। তবু যেখানে মানুষ খুব স্পর্শকাতর সেখানে সাড়া না পাওয়া কি আঘাত পাওয়ারই সামিল নয় ? উভয় সংকট : মিথ্যা বলতেও ভালো লাগে না, অথচ সত্য বলতেও বিপদ !

রিতা টপ ক'রে বলল : আমি বলব—কা'কে লিখছিলে ? তোমার গুরুদেব কুঙ্কুমকে।

পল্লব আশ্চর্য হ'ল বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একটু অপ্রসন্নও হয়ে উঠল বৈ কি। মিসেস নর্টনের চিঠির শেষ অংশটুকু মনে প'ড়ে গেল—কুঙ্কুমকে রিতার 'মর্নো ম্যানিয়াক' উপাধি দেওয়া। ওর আক্ষেপ হ'ল কেন ছাই ও কুঙ্কুম সম্বন্ধে এ-হেন মেয়ের কাছে দু-একবার উচ্ছ্বাস প্রকাশ ক'রে ফেলেছিল ? অথচ আজকের দিনে ও কোন প্রাণে রিতার সঙ্গে বিতণ্ডা জুড়ে দেবে ? ভাবল—মনে যখন মানুষ খুব আঘাত পায় একজনের কাছ থেকে—তখন সময়ে সময়ে ঠিক এই ভাবেই সে শোধ তুলতে চায় আর একজনের উপরে চড়াও হয়ে। পল্লব চুপ করে নিজেকে কেবলই বলতে থাকে : আজ ওর সঙ্গে ভুলেও যেন তর্কাতর্কি না করি—বেচারি মেয়ে ! ভাবতে ভাবতে ওর মনের অপ্রসন্নতা একটু ফিকে হয়ে আসে।

রিতা জবাব না পেয়ে হেসে বলে : কী ভাবছ ? যে, মেয়েরা টেলিপ্যাথি জানে ?

খানিকটা বৈ কি।

রিতা আঙুল তুলে শাসিয়ে বলে : বাকিটাও বলতে পারি।

কী—বলো তো ?

মনটা রুখে উঠছে অথচ আজকের দিনে আমার সঙ্গে তর্কাতর্কি করতে সাধ যায় না—আমি খুব ঘা খেয়েছি বলে—এই ভাবছিলে কি না—সত্যি বলো তো ?

এবার পল্লব সত্যিই আশ্চর্য হয়ে বলে ; সত্যিই তুমি টেলিপ্যাথি জানো না কি ?

রিতা খিল খিল করে হেসে বলে : বলব কেন যখন তুমি কিছুই ফাঁশ করতে চাও না ?

পল্লব গম্ভীর মুখে বলে : শোনো রিতা ! এ হাসির কথা নয়। আমি সত্যিই কুঙ্কুমকে গভীর শ্রদ্ধা করি, অথচ যখন জানি তুমি তাকে পছন্দ করো না।

কেমন করে জানলে ?

টেলিপ্যাথি না জানলেও কখনো কখনো মানুষ অপরের মনের কথা টের পায় না কি—বিশেষ করে যেখানে সে একটু—মানে, স্পর্শকাতর ?

রিতা গম্ভীর হয়ে গেল মুহূর্তে—যেমন ও প্রায়ই হত—এই আলো, এই ছায়া, গুমট, তার পরেই দমকা হাওয়া। বলল : শোনো পল, কথাটা যখন উঠল বলেই ফেলি। কেবল, আগুন হয়ে উঠো না লক্ষীটি ! তোমার মনে আমি সত্যিই আঘাত দিতে চাই না—বিশেষ করে আজ। সময়ে সময়ে আমি তর্কাতর্কির মাথায় অকথা কুকথা বলে ফেলি, জানোই তো আমাকে হাড়ে হাড়ে। কিন্তু তবু আশা করি এ-ও জানো যে, আমি পেশায় অভিনেত্রী হতে চাইলেও স্বভাবে অভিনেত্রী নই। যা মনে হয় দুমদাম করে বলে ফেলাই আমার রীতি। এজন্যে কত যে ভুগেছি জানো না। কিন্তু মানুষের স্বভাব কি বদলায় পল !

পল্লবের মন নরম হয়ে আসে : না রিতা, আমি তোমাকে বিশ্বাস করি।

রিতা হাসে : বেশী বিশ্বাস করলেও আবার বিপদ—কারণ আমরা অপরকে যা ভাবি তার পিছনে থাকে আমাদের ইচ্ছা—সে এমনটি হোক। ভাবতে ভাবতে বিশ্বাস করে বসি—বুঝি সে ঠিক তেমনি, পরে ঘা খাই যখন দেখি যে তাকে যা ভেবেছি সে ঠিক তাই নয়। না, কাউকে বেশি বিশ্বাস করা কোনো কাজের কথা নয়—এ আমি ঠেকে শিখেছি—আর একবার নয়, বার বার। বলে একটু থেমে ওর একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে বলে : কেবল একটা জিনিস সত্যিই ভালো বলে আমার এখনো মনে হয়—অপরকে বুঝতে চাওয়া।

পল্লব টপ ক'রে ব'লে ফেলে : কিন্তু তুমি নিজে কি কোনো দিন বুঝতে চেয়েছ কুঙ্কুমকে ?

রিতা বলল : তাঁকে আমি দেখলাম কবে বলো দেখি, যে বুঝতে চাইব ? আণ্টির সঙ্গে কেবল তোমার প্রসঙ্গেই তাঁর সম্বন্ধে এক আধ বার আলোচনা হয়েছে মাত্র। তবে আমি—ব'লে থেমে : বলব খোলাখুলি ?

বলবে না ? বাঃ !

রাগ করবে না ?

রাগ করব কেন ? আমি কি জানি না ?

কী জানো ? যে, তোমার গুরুদেবকে আমি পছন্দ করি না ? এরই নাম ভুল বোঝা। আসলে আমার মাথা ব্যথা তাঁকে নিয়ে নয়—তোমাকে নিয়ে।

আমাকে ?

অবিকল। কারণ তোমাকে আমি বন্ধু মনে করি। শোনো : কাউণ্টের কথায় ভড়কে যেও না। আমি বিবাহ করব না—তোমাকে তো নয়ই—কাউকেই নয়। তাছাড়া সত্যিই আমি ফ্লার্ট নই—বিশ্বাস কোরো।

পল্লব নিজের মুঠোর মধ্যে ধরা ওর হাতে চাপ দিয়ে বলে : জানি রিতা ! এ বিস্বাদ প্রসঙ্গ কেন তুললে ? তোমার কাউণ্ট কী ধরণের লোক চাক্ষুষ করনি কি এই মাত্র ?

রিতার মুখে ছায়া নামে, বলে : যা চাক্ষুষ করেছ তা সামান্যই। আংকল ওকে বলেন অমানুষ, আমি বলি দু'পেয়ে পশু। তোমাকে কতটুকুই বা বলেছি ওর সম্বন্ধে ? আমার মা আমার নামে একটি চিঠি লিখে রেখে গিয়েছিলেন আংকলের কাছে। সাবালিকা হবার পরে সে চিঠি তিনি আমার হাতে দেন—মা'র এই রকমই আদেশ ছিল। দেখবে সে চিঠি ? ব'লেই উদাসকণ্ঠে : না থাক ! কী হবে তোমার মনে ফের দুঃখ দিয়ে—যে তুমি বলতে গেলে আমার একমাত্র বন্ধু না হও—শুভার্থী তো বটে।

পল্লব আর্দ্র কণ্ঠে বলল : বন্ধু বলতেই বা বাধা কী রিতা ! যখন—
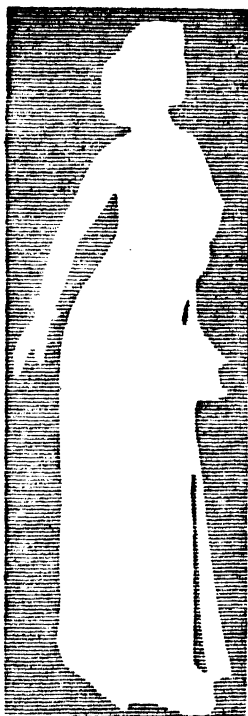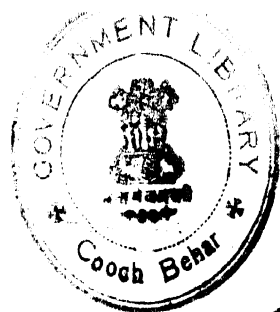
আপনার
আনন্দের
মুহূর্তকে
মধুর
করুন
বিশুদ্ধতায়
সৌগন্ধে
রুচিতে
শতাব্দীর ঐতিহ্য বরণীয়
লক্ষ্মীবিলাস
তৈল

ব'লে জোর ক'রে—যখন আমরা দুজনেই জানি যে আমরা পরস্পরের কাছে তার বেশি কিছু হ'তে পারি না ?

রিতা ওর চোখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে বলে : বেশ কথা। ভয় যখন কাটিয়ে উঠেছ তখন আমরা বন্ধু পাতাই এখন থেকে। কেমন ? রাজি তো ?

ভয় কাটিয়ে উঠেছি মানে ?

রিতা খিল-খিল করে হেসে ফেলল : মানে কি সত্যিই জানো না ? আমি বাজি রেখে বলতে পারি—একজন তোমাকে ভয় দেখিয়েছে প্রাণপণে।

পল্লব আমতা-আমতা না করে পারে না। ভয় দেখিয়েছে ? কী যে বলো !

রিতা ভর্ৎসনার সুরে বলে : বন্ধুও হবে অথচ ভানও করবে ? ছী মনামি !

পল্লব একটু চুপ করে থেকে বলে : তোমার কথা সত্যি। কুঙ্কুম মনে করে—তোমার আমার মেলামেশা মানে—

রিতা ওর হাত ছেড়ে দিয়ে বলে : সর্বনাশ এই তো ? না, আপত্তি কোরো না। আমি অনেক দিন আগেই আন্দাজ করেছি যে তিনি নিজের অধিকারের বাইরে যেতে চান—পাছে মক্কেল হাত ছাড়া হ'য়ে যায় এই ভয়ে।

পল্লবের মনে বিমুখতা জেগে ওঠে মুহূর্তে : এরকম ঠেশ দিয়ে কথা বলা তোমার কখনই উচিত নয়।

রিতা রুখে উঠে বলে : আর তোমার জীবনের গতি কোন দিকে গেলে তোমার মঙ্গল হবে, সে নিয়ে অপরের এত মাথা ব্যথা কি উচিত ?

কুঙ্কুমকে তুমি কি এখন ঠিক বুঝতে চেষ্টা করছ, বলতে চাও ?

শুধু চেষ্টা করা নয়, খানিকটা আঁচ পেয়েছি ব'লেই আপত্তি করছি। তোমার নিজের বিবেক, শিক্ষা, বুদ্ধি—কী নেই বলো তো ? তবু এক সমবয়সী বন্ধুর গুরুবাক্যে উঠতে বসতে তোমার লজ্জা করে না ? তোমার কাছেই শুনেছি তোমার আর এক বন্ধুর একটি কথা : নিজের বুদ্ধিতে চ'লে ফকির হওয়াও ভালো, অপরের বুদ্ধিতে চ'লে রাজা হওয়ার চেয়ে।

পল্লব রাগ দমন ক'রে বলে : কুঙ্কুমের বুদ্ধিতে চ'লে আমি রাজা হ'তে চাই না কিম্বা তাকে আমার গুরু ব'লেও মনে করি না। তবে তাকে গভীর শ্রদ্ধা করি, সে মহৎ, ত্যাগী, অসামান্য মানুষ ব'লে। তাকে তুমি জানো না, চেনো না, দেখোনি, শুধু তার একটা মনগড়া রূপ কল্পনা ক'রে তার উপর অবিচার করছ না কি ?

রিতা বাধা দিয়ে বলে : ঠিক তিনিও কি আমার প্রতি ঐ অবিচারই করেননি, বলো তো—আমাকে না জেনে, না চিনে, না দেখে ?

পল্লবের ফের রাগ হয়, এবার সে একটু বিরস কণ্ঠেই বলে : কুঙ্কুম তোমার বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত ভাবে কিছুই বলেনি। তার শুধু ভয়, পাছে আমি দেশের সেবা ছেড়ে—

কথাটা শেষ করতে পারে না, রিতা পাদ পূরণ করে : মোহিনী বিলাসিনীর হুকুমবরদার ব'নে যাও এই তো ? বলো তো, তোমার সম্বন্ধে যার এত কম আস্থা তাকে তোমার বন্ধু ব'লে স্তব করতে মনে গ্লানি আসে না ? তোমার সত্যিকার বন্ধু যদি কেউ থাকে সে কে বলব ? ঐ অন্য বন্ধুটি—মিষ্টার ঘোষ, যিনি ক্রমাগত তোমাকেও বলেন নিজের বুদ্ধিতে চলতে। এই-ই তো আত্মসম্মানীর মতন কথা। অপরে তোমাকে চালাবে কেন, তা সে যতই কেন না মহৎ, ত্যাগী বা অসামান্য ডিকটেটর হোক।

পল্লব এবার রীতিমত ক্রুদ্ধ হ'য়ে ওঠে : আর কুঙ্কুমকে একটুও না জেনে তাকে গালি-গালাজ করতে তোমার মনে গ্লানি আসে না ?

রিতা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে, কোদালকে কোদাল বললে তার নাম গালি-গালাজ, এ আমার জানা ছিল না। কিন্তু তোমার মন রাখতেও আমি পারব না, আগাছাকে গোলাপ ফুল বলতে বলেই উঠে হন হন ক'রে চলে গেল।

পল্লব উদ্বিগ্ন হ'য়ে উঠে দাঁড়ায়। কিন্তু ওর পিছনে দু' পা গিয়ে ক'রেই থেমে যায়। নাঃ, কাজ নেই। যে-মেয়ে এত অসংযমী তার সঙ্গে মেলামেশায় লাভ কি ? কুঙ্কুম মিথ্যা বলেনি। ও নিজের ঘরে গিয়ে মোহনলালকে এক দীর্ঘ পত্রে সমস্ত কথা লিখে শেষে লিখল কুঙ্কুমকে বোলো যে আজ কিম্বা কাল আমি এখান থেকে বিদায় নেব সে ঠিকই বলেছিল : আগুন নিয়ে খেলা কিছু নয়।

লিখে নিজেই গিয়ে চিঠিটা ডাকবাক্সে দিয়ে এল স্পেশাল ডেলিভারির ডবল টিকিট লাগিয়ে। ঘণ্টা দুইয়ের মধ্যে এ চিঠি মোহনলালের ঠিকানায় পৌছবেই পৌছবে।

কিন্তু চিঠিটা ডাকে দিয়ে বাড়ি ফিরেই মন ওর উঠল অশান্ত হয়ে এ ও কী ক'রে বসল ? বন্ধুদের জানিয়ে দিল যা রিতা ওকে বলেছিল বিশ্বাস ক'রে। ওর মন আরো খারাপ হ'য়ে গেল এই ভেবে যে, রিতা ওকে অকথা কুকথা যাই বলুক বলেছিল বন্ধু ভেবে, বিশ্বাস ক'রে তার উপর রাগের মাথায়। তা ছাড়া ঠিক হোক, বেঠিক হোক, স্বাধীন মত প্রকাশ করবার অধিকার সবারই আছে—এ নিয়ে রিতার সঙ্গে ঝগড়া করা চলতে পারে, কিন্তু তার ঝোঁকের মাথায় বলে ফেলা কথা অপরের কাছে ফাঁশ করা—ছি ছি ! রিতা যদি কখনো কোন সূত্রে টের পায়—কী ভাববে ওকে ? ও না কথা দিয়েছিল—রিতার বন্ধু হবে ? রিতা ওর কাছে এসেছিল তো শুধু একটুখানি সহানুভূতির প্রত্যাশী হ'য়ে, আর এসেছিল বড় ঘা খেয়েই। আরও কত কথাই যে মনে হয় !

কিন্তু সব উলটো-পালটা চিন্তা ছাপিয়ে ওর মনে এই খেদটিই সর্বেসর্বা হ'য়ে দাঁড়ায় যে রিতার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হ'ল এই ভাবে—শেষরক্ষা হ'ল না। জগতে অনেক দুঃখই আছে যার উলটো পিঠে ক্ষতিপূরণ মেলে স্মৃতির সান্ত্বনায়—যা ঘটেছে তার জন্যে অন্ততঃ আমি দায়িক নই—এই চিন্তায়। এখানে সে-সান্ত্বনারও পথ রইল না। আহা, বেচারি মেয়ে ! বড় অসময়ে ওর সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাতেই তো এসেছিল—যদি কুঙ্কুম ওর প্রতি বিমুখ জেনে ও তার প্রতি একটু বেশি রকম রেগে উঠেই থাকে, তবে তাতে এমন কী অপরাধ হয়েছে ?

কিন্তু কী বিড়ম্বনা। এখন ভুল-সংশোধনের পথ পর্যন্ত নেই। সব গেছে ভেস্তে। হঠাৎ মনে হ'ল—মোহনলালকে একটা তার করে দেওয়ার কথা। টেলিগ্রাম ফর্ম নিয়ে দ্রুতহস্তে লিখল : বিশেষ অনুরোধ—রিতা কুঙ্কুমের সম্বন্ধে যা বলেছে কুঙ্কুমকে বা আর কাউকে জানিও না—এ বিষয়ে আলাদা চিঠি লিখছি পরে।

এমন সময়ে দোরে আঘাত। দোর খুলতেই দেখে বাটলার।

স অভিবাদন ক'রে বলল : একটি ভদ্রলোক সার ! ড্রয়িংরুমে তাকে বসিয়ে রেখে এসেছি। এই তাঁর কার্ড।

পল্লব কার্ড দেখেই চমকে ওঠে : এ কী ! কুঙ্কুম !! ওর বুকের রক্ত উচ্ছল হ'য়ে ওঠে।

তেইশ

পল্লব ড্রয়িংরুমে ঢুকতেই দেখে—মিষ্টার টমাস কুঙ্কুমের সঙ্গে হাসিমুখে কথা কইছেন। পল্লব ঘরে ঢুকতেই কুঙ্কুম উঠে ওকে জড়িয়ে ধরল। মিষ্টার টমাস বিচক্ষণ লোক, সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে প্রসন্ন কণ্ঠে বললেন : বাকচি, মিষ্টার সেন এখানে লাঞ্চ না খেয়ে যেন চ'লে না যান দেখো, তোমার উপর ভার রইল। তোমাদের দু' বন্ধুর নিশ্চয় এখন বিস্তর কথা আছে, আমারও একটু কাজ আছে। তোমরা কথাবার্তা কও এখানে—কেউ আসবে না। ব'লে ঘরের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে : এখন বেলা বারটা, একটায় লাঞ্চ—মনে রেখো। ব'লেই বেরিয়ে গেলেন।

কুঙ্কুম হাসিমুখে বলল : চমৎকার জায়গা ! আর তার চেয়েও চমৎকার গৃহকর্তা। তোমার অদৃষ্ট ভালো পল্লব, যেখানেই যাও বন্ধু জোটাও অনিন্দনীয়। আমার ভাগ্যে বিলেতে একটি বন্ধুও লাভ হয়নি—একটি মাত্র বান্ধবী লাভ হয়েছে বটে—তাও তোমার সুপারিশে।

পল্লব হেসে বলল : তুমি কি বন্ধু-বান্ধবী চাও ভাই, যে খেদ করছ ? তোমাকে কি আমি জানি না—যার এক ধ্যান এক জ্ঞান—দেশ। বন্ধু পেতে হ'লে তাকে চাইতে হয়—**Seek and thou shall find**—বলেন নি কি খৃষ্টদেব ?

কুঙ্কুম হেসে বলল : উঁহুঃ। ভাগ্যবানে কবে বুঝেছে ভাগ্যহীনদের দুরদৃষ্টের কথা ? 'চির সুখী জন ভ্রমে কি কখন ব্যথিত-বেদন বুঝিতে পারে ?' কিন্তু বাজে কথা থাক, শোনো : তোমাকে আমার অনেক কথা বলবার আছে, তোমার কাছে শোনবার আছে অনেক কিছু। তাই আগে আমার কথাটা ব'লে নিই—যথাসম্ভব সংক্ষেপে—মাত্র এক ঘণ্টা সময়। না না, আমাকে এখনি লণ্ডনে ফিরতে হবে, আজই রাতে আমার এক আইরিশ শীন ফেন বন্ধুর সঙ্গে ডাবলিন রওনা হব—ফিরতে অন্তত দু' সপ্তাহ।

দু' সপ্তাহ ? অত দিন কী করবে ডাবলিনে ?

বলছি, শোনো মন দিয়ে। ব'লে কুঙ্কুম রুমাল বার ক'রে মুখ মুছে বলে : আমি বার্লিনে গিয়ে কয়েক জন বিপ্লবীর সঙ্গে কথাবার্তা ক'য়ে সব ঠিক করে এসেছি। কী করে—সে অনেক কথা, সব বলবার সময় নেই। মোট কথাটা এই যে, আবার একটা বিশ্বযুদ্ধ বাধলো ব'লে। ভার্সেলস সন্ধিতে জর্মনিকে অত্যধিক সাজা দেওয়ার ফল। জর্মনি ভিতরে ভিতরে গড়ে তুলছে এক নতুন দল—এবার ওরা যুদ্ধও করবে না কি একেবারে নতুন পদ্ধতিতে। সে যাক্। আমি স্বয়ং হিণ্ডেনবার্গের সঙ্গে কথাবার্তা কয়ে এসেছি। ঠিক হয়েছে—ইংলণ্ডের সঙ্গে জর্মনির যুদ্ধ বাধলেই আমরা সিপাইদের ক্ষেপিয়ে তুলব। জর্মনির কাছ থেকে পাব কামান, বন্দুক ও বোমা—এখানে আর কেউ অতিথি নেই তো—বাঙালি টাঙালি ?

না না। শুধু রিতা—সে ফরাসি মেয়ে, বাংলা জানে না একবর্ণও। তুমি বলো বলো—আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছে ! কামান, বন্দুক, বোমা, হিণ্ডেনবার্গ—তুমি তো দেখছি বাজি মাৎ ক'রে এসেছ তাহলে ?

কুঙ্কুম হাসল, ঈষৎ বিষণ্ণ হাসি : বাজি মাৎ-এর কথা কেন ভাই ? জানোই তো আমাদের দেশের লোককে—সাড়ে পনর আনাই এখনো ঘুমিয়ে। যে দু-চারজন জেগেছে, বা জেগেছিল বলাই ভালো, মহাত্মাজি তাদের কানে ফের অহিংসার ঘুমপাড়ানি গান গাইছেন। বলতে বলতে ও উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে : অহিংসায় কোনো দেশ কখনো স্বাধীন হয়েছে ?

পল্লব মৃদু স্বরে বলল : একটু ও না। ওরা যদি কাউকে ডরায়—সে বোমারুকে। যেটুকু রিফর্ম আমরা পেয়েছি আজ সে ঐ কজনের জন্যেই—'ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেছে যারা জীবনের জয়গান।' কিন্তু থাক ও-কথা। মহাত্মাজিকেও আমাদের কাজে লাগাতে হবে। তাঁর কাছে কোনো কথা ফাঁস করলেই সব পণ্ড। তিনি দেশময় অসন্তোষের আগুন জ্বালান—করুন অসহযোগের প্রচার। কিন্তু পিছনে থাকব আমরা—বোমা বন্দুক ও গীতার বীরবাণী নিয়ে : 'যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ'। কেবল তাহ'লেই ওরা আপোষ করবে মহাত্মাজির সঙ্গে। মহাত্মাজি ও তাঁর ধামাধরারা অবিশ্যি বলবেন যে, কাজ হাসিল করলেন তাঁরাই। তা বলুন যত ইচ্ছে। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য—দেশকে স্বাধীন করা। আমাদের সবাই ভুল বুঝবে—বুঝুক। আমরা চাই না এমন কি দেশবাসীরও সহানুভূতি। আমাদের লক্ষ্য হবে শুধু বিপ্লব—আগুন জ্বালানো পন্থা—দেশের লোককে জাগানো আর আত্মবলিদান। এ ছাড়া দেশ স্বাধীন হ'তে পারে না—কখনো হয় নি, কখনো হবে না। তোমাকে আজ বলছি পল্লব, তুমি তোমার ডায়রিতে লিখে রেখে দাও : যে আমাদের দেশ স্বাধীন হবে কেবল তখন যখন আমাদের সিপাইরা ক্ষেপে উঠবে, তার আগে নয় নয় নয়। অসহযোগ, বয়কট, ধর্মঘট এ সবে কোনো কাজ হবে না এমন কথা বলছি না—কিন্তু ওরা এ সবের ভয়ে পোঁটলা পুঁটলি বেঁধে চম্পট দেবে একথা যে ভাবে সে মোহমুগ্ধ, দ্রষ্টা নয়। কিন্তু সে যাক্—আমি কাজের কথাটা আগে বলে নিই।

কুঙ্কুমের গৌরবর্ণ মুখ উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে, স্বর নামিয়ে বলে : আমি জর্মনি থেকে ফিরে এসে ভাগ্যবশে এক শীনফেন চক্রে ঢুকতে পেরেছি। তারা আমাকে বিশ্বাস করে অনেক কিছু ব্যাখ্যা করেছে—কী ভাবে ওরা ইংরাজ সৈন্যদের চোখে ধূলো দিয়ে দেশময় অসন্তোষের আগুন জ্বালছে। এ সব তথ্য দেশে ফিরে আমাদের বিশেষ কাজে আসবে। কিন্তু ওদের টেকনিক সম্বন্ধে আরো অনেক কিছু খুঁটিয়ে জানতে হবে—তাই যাচ্ছি ডাবলিন। অবিশ্যি মহাত্মাজিকে এ সব কথা ঘুণাক্ষরেও বলব না। কাজ কি ? চাণক্য বলেন নি কি—'মনসা চিন্তিতং কর্ম বচসা না প্রকাশয়েৎ ?' আমি তাই এখন কিছু দিন এ দেশের ডিপ্লমাসিরও চর্চা করব। আজকাল পাঠ নিচ্ছি বিসমার্ক, ম্যাকিয়াভেলি, মেটারনিক, কাভুর—এঁদের কীর্তিকলাপ তথা রীতিনীতির। লেনিনের লেখাও পড়ছি—সুইজর্লণ্ড থেকে বেরোয় তাঁর পত্রিকা—হয়েছি তার গ্রাহক। কী অদ্ভুত সংকল্প ! কী ঐকান্তিকতা ! এইই তো চাই—কিন্তু সে যাক, যা বলছিলাম। আমি আপাতত শীনফেনদের দল গড়ার পদ্ধতি সম্বন্ধে কিছু ভিতরকার খবর জানতে যাচ্ছি ডাবলিনে। আজই যেতে হবে—**to strike the**

iron while hot, বুঝলে না? ডি, ভ্যালেরা আমাকে ডেকেছেন—ওঁদের চক্রান্তের সঙ্গে আমাদের চক্রান্ত কী ভাবে মেলাতে হবে সেই সব আলোচনার জন্যে। আজ রওনা না হ'লেই নয়—তাই ছুটে এসেছি এখানে কয়েক ঘণ্টার জন্যে তোমাকে বলতে যে, তুমি জর্মনি যেও বছরখানেক পরে—হয়ত আমাকেও ফের যেতে হবে, সেই সঙ্গে তুমিও যাবে। কিন্তু সে অনেক পরের কথা। এখন আমার বলবার কথা এই যে, তুমি আরো এক বৎসর কেমব্রিজেই থাকো—ওদের 'মিউসিক স্পেশ্যাল' পরীক্ষায় ওরা য়ুরোপীয় সঙ্গীতের থিওরি শেখায়—তোমার কাছেই শুনেছি। সেই থিওরি একটু পড়লেই বা—বনেদ পাকা হবে। ব্যাপারটা সংক্ষেপে এই যে, বিপ্লববাদের টেকনিক ভালো করে রপ্ত করতে আমাকে আরো এক বৎসর এদেশে থাকতেই হবে। এ সময়টা তুমি কাছে থাকলে ভাল হয়। আমি অবশ্য লোক দেখাতে 'মেণ্টাল অ্যাণ্ড মরাল সায়েন্স' পরীক্ষা দেব। কিন্তু সে অবান্তর। আসল এই যে, তোমার সঙ্গে আমার আলোচনা করবার আছে—কী ভাবে তুমি আমাদের কাজে যোগ দেবে গুপ্তভাবে—গান গেয়ে দেশকে জানাবে এই সব। এক বৎসর বাদে দেশে ফিরেই আমি পলিটিক্সে ঝাঁপ দেব। আমার মনে হয়, ফিরতে ফিরতে আমাকে ওরা জেলে পুরবে। পুরুক। জেলে যাওয়া অনেক দরকার সব দিক দিয়েই। কিন্তু আমি চাই না—তুমি জেলে যাও। তুমি থাকবে বাইরে—ঐ যে বললাম, গান গেয়ে আমাদের ঝিমিয়ে-পড়া মনকে জাগিয়ে তুলবে। আমার কি জানি কেন মনে হয়—এইই তোমার স্বধর্ম। কিন্তু প্রকাশ্যে তুমি পলিটিক্সে যোগ দেবে না, বুঝলে? আমাদের এজেণ্ট থাকবে সর্বত্র—নানা ছদ্মবেশে। তুমি হবে তাদের মধ্যে চারণদলের নেতা—অন্ততঃ এই আমার আশা। না আশা নয়—অনুরোধ। তোমাকে আমরা চাই। সময় এসেছে, এখন তোমার মন স্থির করতে হবে। তুমি কি দেশের ডাকে সাড়া দেবে না ভাই? এত বড় কাজে পাব না তোমার সহায়তা?

পল্লবের বুকের রক্ত দুলে ওঠে, কুঙ্কুমের হাতে হাত দিয়ে বলে: কুঙ্কুম, তুমি জানো তোমার সম্বন্ধে আমার—শুধু আমার কেন, আমাদের সকলেরই—কী ধারণা? আমি কথা দিচ্ছি যে, তুমি যদি আমাকে জেলে যেতেও বলো—যাব, যদিও ভাই বলতে কি, জেলে যেতে আমার একটুও ইচ্ছে করে না।

কুঙ্কুম হেসে ফেলল: আমাদেরই বুঝি করে? কিন্তু উপায় কি? ইতিহাসে দেখতে পাবে—দুঃখবরণ বিনা কোথাও কখনো কোনো বড় আদর্শের প্রচার হয়নি। তাই ত্যাগকে আমি বরণ করেছি—কিন্তু লক্ষ্য ব'লে নয়, উপায় ব'লে। কিন্তু সে অন্য কথা। তোমাকে আমি জেলে যেতে ডাক দেব না, কথা দিচ্ছি। তাই পলিটিক্সের ধর্মক্ষেত্র ওরফে কুরুক্ষেত্রে তোমাকে ঢুঁ মারতে বলি না। কেবল বলি—তুমি অন্তরে থেকো আমাদের সহযোগী, বুঝলে?

পল্লব গাঢ়কণ্ঠে বলল: কুঙ্কুম, তুমি আমার মতন সুখপ্রিয় 'সদা-টলমান' বন্ধুকে অন্তরঙ্গতার মর্যাদা দিয়ে তোমার মহৎ ব্রতে যোগ দিতে ডাকছ, এ আমার কত বড় গৌরবের কথা—তোমাকে কী ক'রে বোঝাব? কেবল তোমাকে আগে থাকতেই ব'লে রাখি ভাই—আমি তোমার মতন সবলচিত্ত নই, সত্যিই ভারি দুর্বল। তাই আমার অনুরোধ—আমাকে তুমি গ'ড়ে নিও, তোমার মনের জোর আমার মধ্যে ইনজেক্ট ক'রে—আর—আর আমি ভুলচুক করলেও আমাকে ত্যাগ কোরো না।

কুঙ্কুম আশ্চর্য হয়ে বলল: ভুলচুক? কী? রিতা?

পল্লব মুখ নিচু ক'রে থাকে।

কুঙ্কুম ওর হাত নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলল: ব্যাপার কী পল্লব? জড়িয়ে পড়োনি তো?

পল্লব ম্লান মুখে বলে: না, ভগবান রক্ষা করেছেন। আর সে হয়ত এই জন্যেই যে, আমি দুর্বল হ'লেও মিথ্যাচারী নই। তবে কে জানে, একথা তুমি আজ বিশ্বাস করবে কি না!

কুঙ্কুম ওর হাত চেপে ধরে গাঢ় কণ্ঠে বলে: ছিঃ ছিঃ পল্লব, এমন কথা তুমি মুখে আনতে পারলে? তোমাকে বকি-ঝকি ভাই শুধু স্নেহেরই অধিকারে, এজন্যে নয় যে আমি তোমার চেয়ে বড়।

পল্লব উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে: বড়—ভাই, অনেক বড়। কোথায় তুমি, আর কোথায় আমি? তবু যে আমাকে বন্ধুত্বের বরণমালা দিয়েছ, সে তো শুধু তোমার নিজের দাক্ষিণ্যে।

কুঙ্কুম বলল: না পল্লব! তুমি স্বভাবে বিনয়ী ব'লেই বুঝতে পারো না, তুমি কেন এত লোকের মন টানো? তা ছাড়া আমি তোমার চেয়ে বড় কিসে? মানি—আমার মধ্যে ভগবান দিয়েছেন কয়েকটি শক্তি। কিন্তু তোমার মধ্যেও কি দেন নি? শোনো, তুমি প্রায়ই কথাচ্ছলে ব'লে থাকো, আমার মনের জোর দেখে তোমার হিংসে হয়। কিন্তু আমি বলব, কেন তোমাকে আমার হিংসে হয়। না, তোমার সঙ্গীত-প্রতিভার কথা বলছি না—আমার তোমাকে হিংসে হয়—পরকে তুমি এত সহজে আপন ক'রে নিতে পারো ব'লে। ঠিক সেই জন্যেই আমার তোমার কাছে এত বেশি আশা, আর তাই তো তোমার উপর আমি এত জোর-জুলুম করি। কিন্তু বিশ্বাস কোরো ভাই, তোমার উপর আমি জোর করি, জোর খাটাতে নয়—দেশের কথা ভেবেই। আমাদের দেশ এখনো ঘুমিয়ে। তাকে জাগাতে হবে। কিন্তু জাগার কে?—না, সে জেগেছে, বটে তো? বড় বংশে তোমার জন্ম, বিদ্যা-বুদ্ধি প্রতিভা-বিবেকে তুমি জেগেছ। সবার উপর, তোমার আছে বহুকে ভালোবাসার শক্তি, অফুরন্ত প্রাণশক্তি, নিজেকে তুমি বিলোতে পারো দু' হাতে। এত সম্পদ দিয়ে বিধাতা কম লোককেই এ-জগতে পাঠান—শুধু আমাদের দেশে নয়—এদেশেও। তাই না আমি এত ভয় পাই পাছে এমন জীবন্ত প্রেত বিপথে গিয়ে মরুভূমিতে ম'জে যায়। এ-ভয়ের যে কারণ আছে তা তুমি নিজেও জানো ও মানো। রিতার ক্ষেত্রে ঠেকেই তো শিখেছ একথা—যার দাম খুবই বেশি। কিন্তু সে যাক্। তুমি বিশ্বাস কোরো যে আমি তোমার উপর জবরদস্তি করি তোমার সার্থকতার কথা ভেবেই। বাইরের লোকে যাই বলুক না কেন, তুমি অন্তত জানো আমি স্বভাবে ডিকটেটর নই, নিজেকে তোমার গুরু ব'লেও মনে করি না।

পল্লব চমকে ওঠে—কী আশ্চর্য—ঠিক এই দুটি কথাই যে রিতার মুখ দিয়ে উচ্চারিত হয়েছিল মাত্র ঘণ্টা দুই আগে। সে আর থাকতে পারল না, কুঙ্কুমের হাত ছেড়ে দিয়ে মুখ নিচু ক'রে মৃদুকণ্ঠে একটানা ব'লে গেল যা যা ঘটেছে—কিছুই বাদ না দিয়ে। শেষে বলল: কিন্তু ভাই, মিথ্যা বলব না, রিতার সঙ্গে এ ভাবে ছাড়াছাড়ি হ'ল—তা আবার তোমাকে নিয়ে—ভাবতেও ভারি কষ্ট হচ্ছে।—না, তুমি যা ভাবছ তা নয়, ওর ঠিক প্রেমে আমি পড়ি নি—ও-ও বলছিল,

আজই সকালে, যে বিবাহ করবে না কোনো দিনও। তাই আমার ভয় ওখানে নয়। আমার ভয় আসে এই ভেবে যে, এ ক্ষেত্রে আকস্মিক যোগাযোগে আমি নিষ্কৃতি পেলেও ভবিষ্যতেও যে পাব, এমন কথা জোর ক'রে বলতে বাধে—বিশেষ ক'রে এই সূত্রে নিজের দুর্বলতার পরিচয় পেয়ে।

কুঙ্কুম গম্ভীর হ'য়ে একটু ভাবে। তারপর বলে: ভালোই হয়েছে হয়ত একদিক দিয়ে যে, তুমি কারেত প'ড়ে নিজের মনের সঙ্গে মুখোমুখি হ'তে পারলে। কিন্তু আমার মনে একটা দৃঢ় বিশ্বাস আছে: যে কথা গেটে বলেছেন তাঁর ফাউস্টের প্রোলোগে: যে, সত্যনিষ্ঠ খাঁটি মানুষ হোঁচট খেতে পারে কিন্তু খন্টায় পড়ে না—যে মনে প্রাণে সরল ও জিজ্ঞাসু, স্বয়ং ভগবান তার সহায়। তাই আমার শক্তির দরকার নেই ভাই, ভগবানের করুণায়ই তুমি উত্তীর্ণ হবে যদি ভবিষ্যতে ফের এমনিধারা বা এর চেয়েও কোনো কঠিন পরীক্ষায় পড়ো। ব'লে একটু থেমে: তবে আমাকে বেদরদী ভেবো না। রিতার দুঃখে আমারও সহানুভূতি আছে, বিশ্বাস কোরো। ওর সঙ্গে যদি দেখা হয় খাওয়ার টেবিলে, তাহ'লে আমি চেষ্টা করব যাতে—

এমনি সময়ে দোরে আঘাত।

মিষ্টার টমাস হাসিমুখে বললেন: কী? দুই বন্ধুর মনের কথা সারা হ'ল?

কুঙ্কুম হেসে বলে: কিছু হ'ল, তবে অনেক কিছুই বাকি রয়ে গেল।

তবে থাকুন না এখানে দু'-একদিন। যাবার এত তাড়া কি?

ধন্যবাদ! থাকবার লোভ তো আছে ষোলো আনাই—কেবল হয়েছে কি জানেন? আপনাদের ছুটন্ত দেশে এসে আমাদের মতন ঘুমন্ত মানুষের মনেও ব্যস্ততার ছোঁয়াচ লাগে। তাই আমাকে এখনি বিদায় নিতে হবে। আজই সন্ধ্যায় রওনা হব ডাবলিন। ফিরতে দিন পনের। তবে ঐ যে বললাম, লোভ হচ্ছে খুবই। তাই যদি অনুমতি দেন তবে আয়র্লণ্ড থেকে কেমব্রিজ ফিরবার পথে এখানে দু'দিন জিরিয়ে যাব।

মিষ্টার টমাস বললেন: বাকচির বন্ধু যে আমাদেরও বন্ধু, একথা কি আপনাকে ও জানায় নি?

কুঙ্কুম বলল: জানিয়েছে বৈ কি। তাই তো না ব'লে-ক'য়ে চলে এলাম।

মিষ্টার টমাস বললেন: খুব ভালো করেছেন। কিন্তু এখন খেতে আসুন, চলো বাকচি!

চব্বিশ

কাউন্ট আসতেই বিরক্ত হ'য়ে মিসেস টমাস ছেলেমেয়েদের নিয়ে বনভোজনে চলে গিয়েছিলেন, কাজেই একটা ছোট টেবিলে মাত্র চার জনের জায়গা করা হয়েছিল। মিষ্টার টমাস তাঁর এক পাশে বসালেন কুঙ্কুমকে, এক পাশে পল্লবকে। মুখোমুখি সামনের চেয়ারটা নির্দিষ্ট ছিল রিতার জন্যে—কিন্তু কোথায় রিতা?—মিষ্টার টমাস একটু উদ্বিগ্ন হ'য়ে বাটলারকে জিজ্ঞাসা করায় সে বলল: মিস পিনো আধ ঘণ্টার উপর হ'ল বেরিয়ে গেছেন। আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন টেলিগ্রাফ-আপিসটা কোথায়?

মিষ্টার টমাস পল্লবের দিকে তাকালেন। পল্লব বলল: ও কাল বলছিল বটে কে এক থিয়েটারের ডিরেক্টরকে ফোন করতে হবে, ফোনে না পেলে তার করবে।

কুঙ্কুম বলল: একটু অপেক্ষা করা যাক না।

মিষ্টার টমাস বললেন: না, ঠিক আড়াইটেয় আমার সঙ্গে এক ভদ্রলোক দেখা করতে আসবেন। ব'লে একটু চিন্তিত স্বরে: কিন্তু লাঞ্চের সময়—যেতে দাও, ও অমনি নিজের তালেই চলে ও চলবে, উপায় নেই। আমরা সুরু করি।

কুঙ্কুমের সঙ্গে পল্লবের দৃষ্টি বিনিময় হয়। পল্লব মুখ নীচু করে।

মিষ্টার টমাস জোর করে কণ্ঠে সহজ স্বর টেনে কুঙ্কুমকে বললেন: রিতার কথা শুনেছেন হয়ত আপনার বন্ধুর মুখে?

কুঙ্কুম বলল: কিছু কিছু। সত্যি, ভারি দুঃখের কথা!

বাটলার স্যুপ দিয়ে গেল।

মিষ্টার টমাস বললেন: আমার ভারি ইচ্ছে ছিল আপনার সঙ্গে ওর আলাপ করিয়ে দিতে। কিন্তু বিষম ঝোঁকালো মেয়ে—তার উপর আজই ঐ 'সীন' হ'য়ে গেছে—কে জানে হয়ত বা তার ক'রে দিয়ে সোজা লণ্ডনেই গেছে ঐ ডিরেক্টরের সঙ্গে দেখা করতে। তা হ'লে আপনার সঙ্গে আজ আর তার আলাপ হবে না।

কুঙ্কুম ব'লে বসে: হয়ত ভালোই হ'ল এক দিক দিয়ে। কারণ আমাকে তাঁর ভালো লাগবার কথা নয়।

মিষ্টার টমাস আশ্চর্য হ'য়ে বললেন: সে কি! আপনার সম্বন্ধে ও কী জানে?

কুঙ্কুম ব'লেই বুঝেছিল কথাটা একটু বেফাঁশ হ'য়ে গেছে, শুধরে নিতে বলল: আমার সম্বন্ধে উনি কত কী-ই শুনেছেন—এর-ওর-তার কাছে।

মিষ্টার টমাস বললেন: যদি শুনে থাকে তবে শুনেছে—হয় ইভেলিনের কাছে, নয় তো বাকচির কাছে। কিন্তু সে-শোনার ফল বিপরীত হবার কথা নয়।

পল্লব বিব্রত বোধ করে, প্রসঙ্গ বদলাতে বলে: রিতা খানিক আগে আমার কাছে এসেছিল বাগানে। বড় ঘা খেয়েছে তো! তাই বলছিল ও ঠিক করেছে, বিবাহ ও কোনো দিন করবে না। মনে হয় ও ঠিক করেছে—থিয়েটারেই ঢুকবে।

মিষ্টার টমাস হুঁ ব'লে একটু চুপ ক'রে থেকে কুঙ্কুমের দিকে চেয়ে বললেন: বাকচির কাছে শুনেছি আপনি খানিকটা সন্ন্যাসী প্রকৃতির মানুষ—তাই না জানি ওর মতিগতি দেখে কী ভাবছেন? কিন্তু বাইরে একটু বেশি ঝোঁকালো হ'লেও ভিতরে ও সত্যিই ভালো মেয়ে। মনে ওর কোনো প্যাঁচ নেই—খোলা হাওয়া।

কুঙ্কুম কী বলবে ভেবে না পেয়ে স্যুপের মধ্যে চামচ ডুবোয়। এমনি সময়ে রিতার আবির্ভাব। কুঙ্কুম ও পল্লব উঠে দাঁড়ায়।

মিষ্টার টমাসের মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল, উঠে দাঁড়িয়ে বললেন: এসেছ? বাঁচা গেছে। আমরা ভেবে সারা—বোসো বোসো। ব'লে পরিচয় করিয়ে দিতে বললেন: ইনি আমাদের আদরিণী রিতা পিনো, আর ইনিই মিষ্টার কুঙ্কুম সেন—বাকচির হিরো, যার গুণগানে বাকচি উজিয়ে ওঠে।

কুঙ্কুমের মুখ ঈষৎ রক্তাভ হ'য়ে উঠল। এগিয়ে এসে রিতার

সঙ্গে করপীড়ন ক'রে বলল : এ সব জনশ্রুতির কোটায়ই পড়ে মিস পিনো! তাই আপনি আশা করি আমল দেন নি?

রিতার গাল দুটি লাল হ'য়ে উঠল, কিন্তু সামলে নিয়ে জোর করে মুখে হাসি টেনে বলল : আমল দিলেই বা ক্ষতি কী মিষ্টার সেন? 'হিরো' তো আর দুর্নাম নয়।

কুঙ্কুম বলল : It depends, মিস পিনো! এ হ'ল স্বাতন্ত্র্যের যুগ—অশ্রদ্ধার যুগ। মিডীভাল বিশেষণটি এ যুগে খুব কম লোকের কাছেই আদরণীয়।

রিতা স্যুপের ডিশে চামচ দিয়ে নাড়তে নাড়তে বলে : কা'ন্টিনেণ্টে কিন্তু পায় এখনো। আমার এক অতি-মডার্ণ সখী সেদিন ডুব দিয়েছেন এক কারমেলাইট কনভেণ্টের অতলে। তাঁর উপাধি লাভ হয়েছে—পুণ্যবতী। তাছাড়া স্বাতন্ত্র্যের যুগ পড়া যায় শুধু বইয়েই—চোখে যা দেখি তার সঙ্গে মেলে না।

কুঙ্কুম একটু আশ্চর্য হ'য়ে রিতার মুখের দিকে তাকাতেই রিতা অম্লানবদনে বলল : ধরুন না কেন, মেয়েদের কথা। আপনারা শুনে এসেছেন—আমরা খুব দুর্দান্ত, স্বাধীন, বেপরোয়া এই সব, বটে তো-? কিন্তু, আপনারই ভাষায় এ-সবই জনশ্রুতি। বাস্তব হচ্ছে এই যে, এখনো স্বাধীন আমরা কেবল চিন্তার বেলাই—কাজের বেলা আমাদের এতটুকু ছাড়া পেতে হ'লেও লড়তে হয় প্রাণপণে শুধু বাপমার সঙ্গেই নয়, আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব—কার সঙ্গে নয় বলুন?

মিষ্টার টমাস কৌতুকোজ্জ্বল চোখে বললেন : রিতা! তুমি দরদের জন্যে হাত পেতেছ একটু অস্থানে। মিষ্টার সেন হ'লেন Born-fighter তাই বলবেনই বলবেন—এই-ই তো চাই, স্বাধীন যে হ'তে চাইবে তাকে লড়াইয়ের দাম দিতেই হবে, না লড়াই ক'রে কেউ কি কিছু পেয়েছে পাবার মতন? কি বলেন মিষ্টার সেন? বেপরোয়াও হব অথচ গায়ে আঁচড়টি পর্যন্ত লাগবে না এ কি কখনো হয়? You can't have it both ways.

কুঙ্কুম বলল : বটে। কিন্তু তবু সত্যের খাতিরে বলতেই হবে যে এমন লড়াইও মানুষকে করতে হয়েছে যা না করতে হ'লেই ভালো হ'ত। যেমন ধরুন, শুধু বাঁচবার অধিকারের জন্যে লড়াই—জর্মনদের ভাষায় Lebensraum, তবে একথার মানে হয়ত আপনাদের বোঝাতে একটু বেগ পেতে হবে।

মিষ্টার টমাস বললেন : মানে, বলতে চাইছেন তো দেশের স্বাধীনতার জন্যে লড়াই করা? কিন্তু আমরা এ কথার মর্ম বুঝব না ভাবছেন কেন—যে আমরা balance of power বজায় রাখতে যুগ যুগ ধ'রে দুর্দান্ত লড়াইই ক'রে এসেছি? এই সেদিনও কাইসারের সঙ্গে লড়াই করলাম, আবার শুনছি নতুন একদল যোদ্ধা উঠতি মুখে—জর্মনিতে তথা রাশিয়ায়। কে জানে হয়ত তাদের entente এর সঙ্গেই এবার লড়তে হবে ফের? না, মিষ্টার সেন! আমরা আর কিছু বুঝি না বুঝি, লড়াই করার মর্ম বুঝি হাড়ে হাড়ে। আর তাই তো আমার এত আক্ষেপ হয় ভাবতে যে, বাঁচবার অধিকারের জন্যে আমরা আবহমান কাল ল'ড়ে এসেও—অন্য জাতকে দিতে চাই না সে-অধিকার। কিন্তু এর ফলে হয় কি জানেন? আমরা অজ্ঞাতে ঘড়ির কাঁটা পেছিয়ে দিই। জগতে যদি সত্যিকার দুঃখের কিছু থাকে তবে সে এই পিছিয়ে যাবার প্রবৃত্তি। কেন না, আমরা মুখে যতই কেন না বলি—আমরা দুর্গত জাতদের শাসন করছি তাদের মঙ্গলেরই জন্যে, মনে মনে বিলক্ষণ জানি—এ শুধু মন-ভোলানো কথা। তাই তো আপনার সঙ্গে আলাপ করার জন্যে আমার এত আগ্রহ ছিল। না, শুনুন, আমি জানি—আপনি আমাদের সঙ্গে ল'ড়ে দেশকে স্বাধীন করতে চান—for a place in the sun—আপনার ভাষায়, 'লেবেনস্-রাউম'-এর জন্যে। ইভেলিন আমাকে উচ্ছ্বসিত হ'য়েই লিখেছে আপনার জ্বলন্ত দেশভক্তি তথা আদর্শবাদের কথা। ব'লে একটু হেসে : এখানে কেবল একটা কথা বলি : ভারতবর্ষে যে সব ইংরেজ যায় তাদের দেখেই আমাদের বিচার করবেন না। কারণ, আমরা সত্যিই স্বাধীনতা ভালবাসি, তাই যারা স্বাধীনতার জন্যে সব ছাড়তে চায়, তাদেরকে যখন বাইরে নিন্দা করি তখনও অন্তরে শ্রদ্ধা করি জানবেন। তাছাড়া আমি আরো চাই আপনারা স্বাধীন হন, কেন না তাতে ক'রে শুধু যে আপনারা লাভ করবেন তাই নয়, আমাদেরও সমূহ লাভ, যেহেতু অপর জাতির উপর যারা চড়াও হয় তারা বাইরের দিক থেকে যতটুকু পায়—খতিয়ে অন্তরে যে তার চেয়ে ঢের বেশি খোয়ায়—একথার মার নেই।

কুঙ্কুমের মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল, বলল : আপনার কথা শুনে শুধু যে ভালো লাগল তাই নয়, সেই সঙ্গে একটা মস্ত লাভও হ'ল প্রত্যক্ষ পরিচয় পেয়ে যে বড় ইংরেজ কী বস্তু। পল্লব তো আপনার ঔদার্যের কথা বলতে আত্মহারা।

মিষ্টার টমাস ঈষৎ বিব্রত স্বরে হেসে বললেন : বড় ছোটর কথা যেতে দিন। ছোটর মধ্যেও বড় লুকিয়ে থাকে, বড়র মধ্যেও ছোট। আমার শুধু একটা ভাবনা হয় আপনাদের মতন মহৎ বিদ্রোহীর আদর্শবাদ সম্বন্ধে। সেটা এই যে, আমাদের যদি আপনারা লড়াই ক'রে হারিয়ে তাড়ান তাহ'লে একটা বিপদ আসতে পারে হয়ত।

বিপদ? কী ভাবে?

দেখুন, কিছু মনে করবেন না, আমার মনে হয় যে এক সময় ছিল যখন দেশভক্তি মানুষকে এগিয়ে দিয়েছিল। পরিবার থেকে গোত্র, গোত্র থেকে স্বদেশবাসী—আবহমান কাল এইই হ'য়ে এসেছে আমির বাঁধন থেকে মানুষের ক্রমমুক্তির পথ। কিন্তু আজকের দিনে আমরা আরো গভীর ডাক শুনেছি : সৌভ্রাত্রের, বিশ্বমৈত্রীর। তাই আমার ভয় হয়—আরো দুর্ধর্ষ জর্মণদের কীর্তিকলাপ দেখে—পাছে মায়াবিনী দেশভক্তি ফুশলে আপনাদেরকে চালায় বিজাতি-বিদ্বেষের দিকে।

কুঙ্কুম বলল : আপনার আশঙ্কার কোনো ভিত্তি নেই, এমন কথা বলব না। কেবল বলব একটা কথা : যে, ভারতের আত্মাকে আমি শুধু যে বিশ্বাস করি তা নয়, আমার বুকের রক্তে অনুভব করেছি। কারণ আমাদের দেশে শুধু যে চিরন্তন ঋষিদের বাণী আজো জীবন্ত, তাই নয়—যে-ঋষিরা একবাক্যে গেয়েছিলেন বিশ্ব-মানবের সামগান : 'এষ দেব বিশ্বকর্মা মহাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ'—কি না, এই মহান বিশ্বনাথ প্রতি মানুষের হৃদয়ে বিরাজিত—আমাদের দেশে এখনো ঋষির জন্ম হয় যাঁরা শুধু সৌভ্রাত্রের বাণী প্রচার করেই থামেন না, বলেন যে, নিঃস্বের মধ্যেই আছেন বিশ্বরাজ, দারিদ্র্যের মধ্যেও নারায়ণ—তাই মানুষকে ঘৃণা করলে সেটা হবে ভগবানকেই অপমান করা। এই কারণে

আমার মনে হয় যে, আমাদের দেশভক্তির সঙ্গে আপনাদের দেশভক্তির একটু তফাৎ আছে—অন্তত আদর্শের এলাকায়। আপনাদের কাছে দেশ প্রিয় নয় বলি না, কিন্তু জন্মভূমি দেবী নয়—স্বর্গাদপি গরীয়সী নয়। আপনাদের কাছে দেশ সুখের নিলয়, প্রিয়জনের আশ্রয়, স্মৃতির ধাত্রী। আমাদের কাছে দেশ সাক্ষাৎ দেবী, মা—দেশের মাটি শুধু ধনধান্যই জোগায় না, সর্বময়ী ভগবতীর সারূপ্য লাভ করে দেবতার, জননীর মতই জাগ্রত। তাই এই সাক্ষাৎ মাকে যখন বিদেশীর হাতে লাঞ্ছিত দেখি, তখন আমরা অস্থির হ'য়ে উঠি। গান্ধিজির অহিংসা মন্ত্রে যে আমি সাড়া দিতে পারি না সে প্রধানত এই জন্যেই। গান্ধিজি বলেন—অহিংসায় যদি দেশ স্বাধীন না হয় নাই হ'ল। একথা শুনলে আমার রক্ত গরম হয়ে ওঠে। কেন না এ হ'ল থিওরির কাছে নীতির পায়ে মাকে বলি দেওয়া—যে মা থিওরির ও নীতির বহু ঊর্ধ্বে। তাই আমি বলি—মাকে লাঞ্ছনা থেকে, দুর্গতি থেকে মুক্ত করবার জন্যে দরকার হয় তো ভূমিকম্প জাগাব, আগুন জ্বালাব—ধ্বসে পুড়ে মরব সেও ভালো, কিন্তু থিওরির মোহে দিনগত পাপক্ষয় ক'রে চলে মা-হারা হয়ে জীবন্মৃতের মতন বেঁচে থাকব না। ঠিক এই মুহূর্তে কুঙ্কুমের চোখ পড়ল রিতার চোখের পরে: রিতা একদৃষ্টে ওর দিকে চেয়ে। কুঙ্কুম থমকে গিয়ে বলল সলজ্জ হেসে: মাফ করবেন মিস পিনো, আপনার রায় হয়ত ভুল নয়—আমার এ হয়ত পাগলামি, মনোম্যানিয়া। কিন্তু যতক্ষণ একে পাগলামি বলে না চিনছি ততক্ষণ এই পাগলামিই আমার কাছে জীবনবেদ—আপনাদের ভাষায়, বাইবেল।

রিতার মুখ লাল হ'য়ে উঠল, পল্লবের দিকে কটাক্ষ করেই চোখ নামিয়ে নিল। পল্লব মুখ নীচু করল।

মিষ্টার টমাস ওর দিকে চকিত কটাক্ষ করেই কুঙ্কুমের দিকে ফিরে বললেন: আপনার কাছে আজ সত্যি শুনলাম একটা নতুন কথা। অবিশ্যি আমি জানি না—এ আপনাদের সবারই আদর্শ, না শুধু আপনার মত দু'-চারজন স্বপনীর। কিন্তু যদি এ শুধু একা আপনারই আদর্শ হয় তা হ'লেও আমি অন্তত নিঃসঙ্কোচেই বলব যে, এ আদর্শ যার মনে ফুটে উঠেছে তার একমাত্র কর্তব্য—একে লালন করা। কারণ এই ভাবেই বড় আদর্শ বাতি হয়ে প্রথম জ্বলে ওঠে এক আধ জনের মধ্যে—পরে জনমনে দীপালির রূপ নেয় ক্রমে ক্রমে। কেবল সেই সঙ্গে একটি কথা আমি বলতে চাই—ক্রিটিক ভাবে নয়, বন্ধু ভাবেই: যে, দেশকে মা ব'লে বরণ করার মধ্যে মিথ্যা কিছুই না থাকলেও এই কথাটি ভুললে চলবে না যে, সব দেশই তার সন্তানদের কাছে এমনি মা'র পদ দাবী করতে পারে। কিন্তু একথার মর্ম উপলব্ধি করতে হ'লে সব দেশকেই একটু ভালোবাসতে হবে, আর ভালোবাসতে হ'লেই বুঝতে হবে যে, প্রেমের একমাত্র বনেদ সহিষ্ণুতা—ঠিক যেমন অপ্রেমের ভিৎ হ'ল অসহিষ্ণুতা। তাই আমি শুধু চাই—যেন আপনারা ভুলেও না ভোলেন যে একটা বিরাট শক্তি সারা জগতে উত্তরোত্তর মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে একটা বিশেষ লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে, আর সে লক্ষ্যে আমাদের সবাইকেই পৌঁছতে হবে—আমরা চাই বা না চাই। সুতরাং আমরা ভুল করব যদি আমরা ভুলে যাই যে, স্বাধীন হওয়া মনুষ্যত্বের লক্ষ্য নয়—লক্ষ্যে পৌঁছবার একটি উপায় মাত্র। আর সে-লক্ষ্য হচ্ছে—মানুষে মানুষে ঐক্য, সম্প্রীতি, মৈত্রী। তাই বিদ্বেষের চেয়ে বন্ধুত্ব বড়, বিচারের চেয়ে দরদ বড়: এই-ই হ'ল এযুগের বাণী।

কুঙ্কুমের মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে, বলে: আপনার কথা শুনে বড় ভালো লাগল মিষ্টার টমাস! আরো এই জন্তে যে, আপনার মধ্যে দিয়ে হঠাৎ দেখতে পেলাম—ঐ যে বললাম—বড় ইংরাজকে। আপনাকে তাই আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

এই সময় বাটলার একটি কার্ড এনে ধরল। মিষ্টার টমাস বললেন: হাঁ, নিয়ে বসাও আমার লাইব্রেরিতে। মিষ্টার সেন, আপনারা আলাপ করুন ড্রয়িংরুমে।

কুঙ্কুম বলল: না মিষ্টার টমাস, আমি সোজা যাব ষ্টেশনে।

পল্লব বলল: চলো, আমি তোমাকে পৌঁছে দিই। মাত্র পনের মিনিটের পথ তো।

রিতা বলল: মিষ্টার সেন, আপনার সঙ্গে আমার একটু কথা আছে—আমিও আপনাদের সঙ্গ নিতে পারি কি ষ্টেশন অবধি?

কুঙ্কুম প্রীত কণ্ঠে বলল: নিশ্চয়।

সবাই উঠল। মিষ্টার টমাস কুঙ্কুমের করপীড়ন করে বললেন: আলাপ জমবার মুখে ভেঙে গেল। তাই অনুরোধ রইল—অন্তত আর একবার আপনাকে আসতেই হবে। আপনার সঙ্গে আলাপ করে আরো শুনতে চাই আপনার কথা—যদি অবিশ্যি আমাকে বিশ্বাস করে বলেন মনের কথা।

কুঙ্কুম বলল: সে কি কথা মিষ্টার টমাস! আপনার সঙ্গে—সম্প্রীতি যে আমার কাছে কতখানি মূল্যবান—কিন্তু থাক, সেকথা আপনাকে পত্রযোগেই জানাব।

পল্লব বলল: তবে চলো রিতা!

মিষ্টার টমাস বললেন: আমার মোটর পৌঁছে দেবে কি?

কুঙ্কুম বলল: না না। মাত্র তো এক মাইল। তার উপর চমৎকার ঠাণ্ডা। তিন জনে গল্প করতে করতে বেশ যাব। গুড বাই, মিষ্টার টমাস!

মিষ্টার টমাস বললেন:—না, বলুন: ও রিভোয়ার!

পঁচিশ

তিন জনে বেরিয়ে বাগানের গেট পর্যন্ত পৌঁছতেই হঠাৎ রিতা পল্লবকে বলল: একটু দাঁড়াবে পল? ব'লেই ছুটে চ'লে গেল নিজের ঘরের দিকে।

ওরা দু'জনে পাঁচ মিনিট বাগানে পায়চারী করে। কিন্তু রিতার দেখা নেই।

কুঙ্কুম বলল: ব্যাপার কী?

পল্লব বলল: সেটা ভালো দেখাবে না। আরো একটু অপেক্ষা করা যাক। বেশি দেরি হ'লে পথে একটা ট্যাক্সি নিলেই চলবে।

ওরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কথাবার্তা চালায়।

পল্লব বলল: জর্মনি থেকে ফিরতে না ফিরতে যেন চললে ডাবলিন! ভয় হয়—পাছে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের নেকনজরে পড়ো।

কুঙ্কুম হেসে বলল: যদি পড়ি মানে? পড়িনি না কি এখনো? যেদিন থেকে আই-সি-এস-এ ইস্তফা দিয়েছি সেদিন থেকেই এরা আমাকে নজরবন্দী ক'রে রেখেছে। এদের যে কী আশ্চর্য অর্গানাইজেশন, কী বলব? এরা আমার নাড়ীনক্ষত্রের খবর রাখে। তাই তো আমি চাই নি মিস পিনোকে ওরা আমার সঙ্গে

পথে দেখে। কিন্তু তিনি সঙ্গে আসতে চাইলেন—না বলি কেমন ক'রে ?

পল্লব হেসে বলল : ওকে তুমি কতটুকু জানো ? ভয়কে ও-মেয়ে একটুও ভয় করে না।

কুঙ্কুম বলল : জেদী মেয়ে, স্বীকার করছি। না, আরো একটু বলব। ওঁকে আমি যা ভেবেছিলাম উনি ঠিক তা নন। অন্তত আমার বুকের একটা মস্ত বোঝা নেমে গেছে যে উনি তোমার জন্যে ফাঁদ পাতেন নি। তাই এখন তুমি এখানেই থাকতে পারো—যত দিন না আমি ডাবলিন থেকে ফিরি। তোমাকে অনেক কথা বলবার আছে। আজ হ'ল না—নাই হোক্—সময় আছে। কেবল একটা কথা—বলব ?

কী ?

পারো তো ওঁকে থিয়েটারি জীবন নিতে দিও না।

বেশ বললে। ও কি কারুর কথা শুনে চলবার মেয়ে ?

কুঙ্কুম একটু চুপ ক'রে থেকে বলে : ঠিক সেই জন্যেই আমার ভালো লেগেছে ওঁকে। আমাদের দেশকে তুলতে হ'লে চাই এই ধরণেরই তেজী মেয়ে, জেদী মেয়ে। 'তন্বী শ্যামা শিখরিদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী' নয় 'তেজোদীপ্তা, বিমলচরিতা, দেশমিত্রা বরেণ্যা'।

পিছনে পায়ের শব্দে ওরা চমকে ফিরে দাঁড়ায়। অভিবাদন করে পরিচারিকা কুঙ্কুমের হাতে মিস পিনো, সার, ব'লে একটি চিঠি দিয়েই চলে গেল।

কুঙ্কুম আশ্চর্য হ'য়ে খোলে : দেখ দেখি—কী কাণ্ড ! আমাকে চিঠি !

ওরা দুজনে পড়ে একসঙ্গে :

"মিষ্টার সেন,

সদ্য-পরিচিতার কাছ থেকে হঠাৎ এধরণের পত্রাঘাতে হয়ত একটু অবাক হবেন। কিন্তু আমি ভেবে দেখলাম যে, যা বলতে চাই মুখে বলতে পারব না, বিশেষ ক'রে আর কারুর সামনে—রাস্তায়। তাই এই চিঠি—

অনেক কথাই হয়ত বলতাম আপনাকে একলা পেলে। কেন আপনাকে বলতে চাই, নিজেই জানি না। আমি রোখালো ও ঝোঁকালো মেয়ে—হয়ত শুনে থাকবেন। তাই যদি কিছু মনে করেনও, আমার স্বভাব ভেবে ক্ষমা করবেন, এই অনুরোধ রইল।

আমি যা—আমি তাই হ'তে চাই। সমাজের মতামত মেনে চলতে চাই না। অথচ থিয়েটারের জীবন অবলম্বন করতে একটু বাধে বৈ কি। মুখে তর্ক করলেও মনে মনে তো জানি, রোখালো মানেই জোরালো নয়। তা ছাড়া আমার সংযমও অত্যন্ত কম—রাগের মাথায়, ঝোঁকের মাথায় কখন কী যে বলি, কী ক'রে বসি, নিজেই জানি না। তাই ভয় হয়। আপনি স্বভাবে ঐকান্তিক, সংযমী। ঠিক আমার উল্টো। তাই আপনাকে দেখবামাত্রই আমার উদ্ধত মন আপনা থেকেই নত হয়েছে। এ-ও হয়ত ঝোঁক—জানি না। কেবল একটা জিনিস জানতে পেরেছি—যেটা জেদের বশেই এত দিন মানতে চাইনি—যে আপনি মহৎ মানুষ। এ রকম জ্যোতির্ময় মানুষ আমি আজ পর্যন্ত কখনো চাক্ষুষ করিনি, যার শুধু মুখে-চোখে নয়—প্রতি ভঙ্গিমায়ই মহত্ত্বের আলো বিকীর্ণ হ'তে থাকে। তাই আপনার কাছে অকুণ্ঠে ক্ষমা চাইছি। আপনার বিরুদ্ধে আপনার বন্ধুর কাছে আজই সকালে কত কী-ই যে বলেছি—ছিঃ ছিঃ !

অনুতপ্তা রিতা"।

[ক্রমশঃ।

শবরী

ঊর্মিমালা চক্রবর্তী

ব্যথাহত চোখে তার ঘনালো হায় নিকষ শর্বরী
শ্রাবণের সুবেলা সন্ধ্যায় !
দুঃসহ প্রতীক্ষা-ক্লান্ত অধরোষ্ঠ কাঁপে থরথরি'
কোন এক মৌন জিজ্ঞাসায়।
আঠারোটি শীত—
অজস্র অতীত,
আঠারোটি বসন্তের তিলে তিলে সঞ্চিত সঞ্চয়
মানব-উল্লাস নিয়ে লুঠে নিয়ে গেছে দুঃসময় ;
ফেলে রেখে গেছে হতাশা,
না-মেটা পিপাসা।
সে-মেয়ে কাঁদে না,
সে-মেয়ের তরে হায় কোনো চোখেই জমে না
এক ফোঁটা জল—
অষ্টাদশী মনের সম্বল।
তবু, সে-মেয়ে চেয়ে থাকে, শুধুই চেয়ে থাকে
নিবিড় প্রত্যাশায় !

যার জন্য কাঁদল না কেউ,
দুটো প্রেমের কথা যাকে শুনালো না কেউ
অষ্টাদশ বসন্তের বিনিময়ে,
পঞ্চশরাহত প্রাণে এ সময়ে ;
কার প্রাণে যে তার সৌরভ ছড়ায়, মাধুরী ঝরায় ?—
তবু, সে-মেয়ে চেয়ে থাকে কেবলই চেয়ে থাকে
পরম নিশ্চয়তায় !
মনের অতলে চলে পক্ষ-বিধূনন রঙিন পাখির,
রাঙা প্রজাপতির ;
অষ্টাদশী-মন ওড়ে মনে,
দেহজ বাহু-লতা পড়ে প্রলোভনে।
স্বপ্নাবেশ কাটে। মুঠো খুলতেই
দু' মুঠো কুয়াশা ছড়িয়ে পড়ে সেই
নীলিম-রঙে-রাঙা মনে।
সে-মন কেঁদে ওঠে করুণ হাহাকারে দারুণ বেদনায়
সে-মেয়ে চেয়ে থাকে, তবুও চেয়ে থাকে কোন প্রত্যাশায় ?
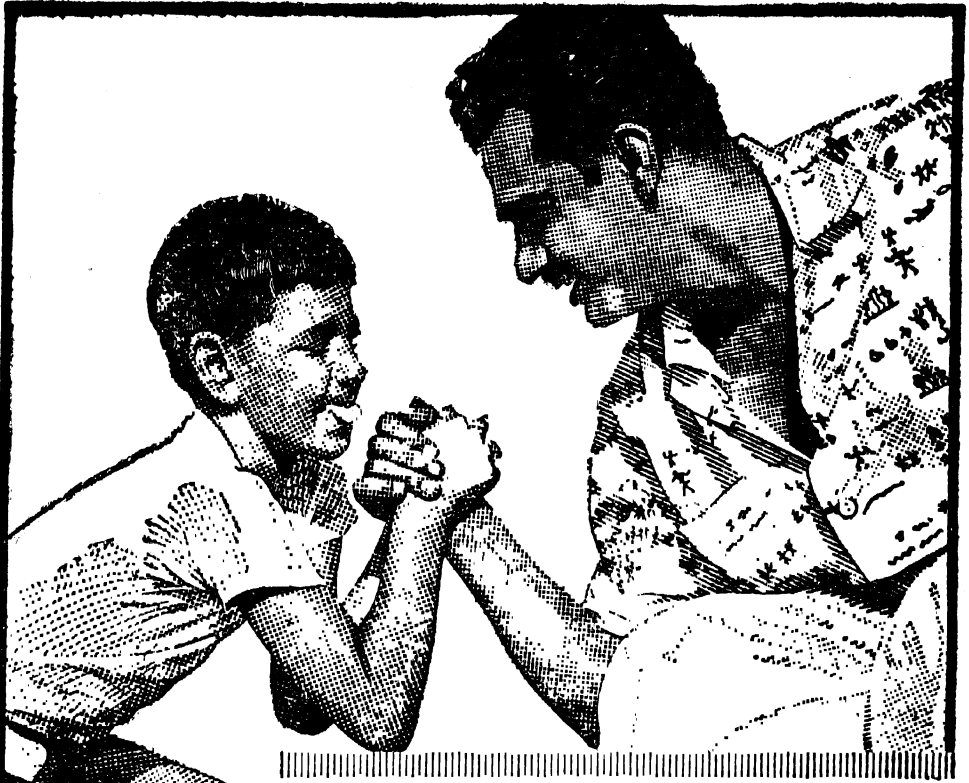
যাঁরা ভাল স্বাস্থ্য ভালবাসেন তাঁরা সবসময়
লাইফবয় দিয়ে স্নান করেন
খেলাধুলোই বলুন বা কাজকর্ম্মই বলুন আমরা কখনই ধূলোময়লার থেকে নিরাপদ নয়। আর ময়লা বহন করে রোগের বীজাণু যা সবসময় আপনার স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। লাইফবয় সাবান এই বীজাণুগুলি ধুয়ে সাফ করে দেয় এবং আপনার স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখে।
প্রত্যেকদিন লাইফবয় সাবান দিয়ে স্নান করে আপনার স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখুন—এটি আপনাকে এত ঝরঝরে করে তোলে।
LIFEBUOY
SOAP
হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড, কর্তৃক প্রস্তুত।

আলব্যার কাম্যু

—চরিত্র—

বুড়ো চাকর	: বয়সের হিসেব নেই।
মার্থা (বোন)	: ৩০ বছর।
মা	: ৬০ বছর।
জাঁ, (ছেলে)	: ৩৮ বছর।
মারিয়া, (ওর স্ত্রী)	: ৩০ বছর।

বোহিমিয়ার একটি ছোট শহর।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[দুপুর। সরাইয়ের বসবার ঘর। ছিমছাম, খোলা-মেলা। সব কিছুই পরিচ্ছন্ন।]

মা। ও ফিরে আসবে।

মার্থা। তোমায় বলে গেছে ?

মা। হ্যাঁ।

মার্থা। একা ?

মা। তা জানি না।

মার্থা। লোকটার চেহারা দেখে ত গরীব মনে হয় না ?

মা। আর সরাইয়ের ভাড়া শুনে ও বেশ নির্বিকার ছিল।

মার্থা। তা বেশ। বড়লোক ত সাধারণত একা দেখাই যায় না। সে জন্যেই আমাদের এই দুরবস্থা। নিঃসঙ্গ ধনীর সন্ধানে থাকতে গেলে বহু কাল অপেক্ষা করতে হয় এমন সুযোগের জন্য।

মা। হ্যাঁ বাপু, এমন সুযোগ সহজে পাওয়া ভার।

মার্থা। এত বছর সে জন্যেই ত আমাদের ফুর্সতের অভাব হয়নি। সরাইটা বলতে গেলে ফাঁকাই ছিল। গরীব যারা এসে ওঠে, তারা বেশি দিন থাকে না। পথ ভুলে যা-ও বা দু'-একজন বড়লোক আসে, সে ত কত কাল বাদে বাদে।

মা। তার জন্যে দুঃখ করার কিছুই নেই। বড়লোক আসা মানেই অসম্ভব খাটনি।

মার্থা। (ওর দিকে চেয়ে) দামের বেলায়ও তারা তেমনি দিলদরিয়া। (খানিক চুপ করে) তুমি মা সত্যিই বড় অদ্ভুত! কিছু দিন থেকে দেখছি তুমি যেন কেমনধারা হয়ে গিয়েছ।

মা। হয়রাণ হয়ে গেছি, মা ; এবার একটু বিশ্রামের জন্য প্রাণ আমার আকুল হয়ে উঠেছে।

মার্থা। তোমার যা কিছু আজও করণীয় এ-বাড়ীতে, সে-সবই আমি স্বচ্ছন্দে নিজে করতে রাজী আছি। তা হলেই ত তুমি নিজের মত থাকতে পারবে।

মা। ঠিক সে বিশ্রামের কথা বলছি না। নাঃ, এ বার্দ্ধক্যেরই স্বপ্ন। আমি চাই শান্তি, চাই নিজেকে গুটিয়ে নিতে। (নিস্তেজ ভাবে হেসে) বলতেও মাথা কাটা যায় মার্থা, কিন্তু জানিস, এক একদিন সন্ধ্যে নাগাদ ধমমো-কমমের আস্বাদ পাবার জন্যে মনটা আমার যেন উতলা হয়ে ওঠে।

মার্থা। তোমার এখনো ও-সবের বয়েস হয়নি মা! ওর চেয়ে ভালো কিছু তুমি এখনো অনায়াসে করতে পার।

মা। বুঝলি না, ঠাট্টা করছিলাম। কিন্তু তিন কাল গিয়ে এক কালে এসে ঠেকার পর তখন নিজের যা খুসী কি করা চলে না ? চিরকালই কি তোর মত শুকিয়ে কাঠ হয়ে থাকতে হবে, মার্থা! তোর বয়েসে এমন ভাবে থাকাটাই অস্বাভাবিক। নিজের চোখে কত মেয়ে দেখেছি, যারা তোরই পিঠ-পিঠ জন্মেছে, তারা আজও ত নির্বোধের মত গায়ে হাওয়া লাগিয়ে দিব্যি ঘুরছে ফিরছে!

মার্থা। তুমি ভাল ভাবেই জান, আমাদের চেয়ে নির্বোধ ওরা মোটেই নয়।

মা। থাক ও-সব কথা।

মার্থা। (ধীরে ধীরে) মনে হচ্ছে আর কিছু বলবার জন্যে তোমার ঠোঁঠ নিস-পিস করছে ?

মা। আমার কাজ যদি আমি করি, তোর তাতে কি আসে-যায় ? যাকৃগে! বলছিলাম, এক-আধ সময়েও কি তোর হাসতে নেই ?

মার্থা। আমারও ধারণা আমি হাসি।

মা। আজ অবধি তা চোখে পড়েনি।

মার্থা। তার কারণ আমি আমার ঘরে, যখন একা থাকি, তখন হাসি আপন মনে।

মা। (একদৃষ্টে ওর দিকে চেয়ে) কি কঠিন যে তোর মুখটা, মার্থা! (ধীর ভাবে এগিয়ে এসে) আমার মুখটা তোমার বুঝি ভাল লাগে না ?

মা। (তখনো একদৃষ্টে তাকিয়ে) ভালই ত লাগে, তবু!

মার্থা। (উত্তেজিত ভাবে) মা! বুঝলে! অনেক টাকা যখন আমাদের হাতে আসবে, আর দম-আটকানো এই দেশ ছেড়ে যেতে যখন বাধা থাকবে না, যখন ফেলে যেতে পারব এই সরাইখানা আর এই বাতুলে দেশ, অন্ধকারে ঢাকা এই দেশ যেদিন ভুলতে পারব, আমার চিরদিনের স্বপ্ন-ভরা সেই সাগর-কিনারের নতুন দেশে যেতে পারব, সেদিন, সেদিন তুমি আমায় হাসতে দেখবে। কিন্তু সেখানে গিয়ে স্বাধীন ভাবে থাকতে গেলে যে অনেক টাকার দরকার। সেই জন্যেই আর কোন কিছু ভয় করলে চলবে না। সেই জন্যেই ত আজকের অতিথিকে ঠাঁই দিতে হবে। কারণ, ও যদি তেমন বড়লোক হয়, ওরই আগমনের সাথে সাথে হবে আমাদের স্বাধীনতার সূত্রপাত।

মা। হ্যাঁ, ওর যদি টাকা থাকে, আর একা যদি আসে।

মার্থা। আর একা যদি আসে। ঠিক ত! নিঃসঙ্গ যারা তাদেরই ত চাই আমরা। তোমার সঙ্গে ও কি অনেক কথা বলল ?

মা। না। সবশুদ্ধ দুটি মাত্র কথা।

মার্থা। ঘর ভাড়া চাইবার ধরণটা কেমন লাগল ?

মা। তা জানিনে বাপু! চোখে ঠাওরই করতে পারি না ; ওকে ভাল ভাবে দেখতেও পাইনি। তা ছাড়া, এত দিনে এটুকু বুঝেছি যে ও-সব লোককে না দেখতে পাওয়াই ভাল। যাকে চিনি না, তাকে

খুন করা যে অনেক সোজা। (একটু থেমে) নে, এবার ফুর্তি কর। আর কোনকিছুর আমি তোয়াক্কা করি না।

মার্থা। এই ভাল। ও-সব হেঁয়ালী আমি পছন্দ করি না। অন্যায় অন্যায়ই। কি করতে হবে তা নিজের কাছে পরিষ্কার রাখা কাম্য। আমার ত মনে হয়, আজকের অতিথির কথার জবাব দিতে গিয়ে তুমি বেশ ভাল ভাবেই এ ব্যাপারটা আঁচ করেছিলে। কারণ ইতিপূর্বে তুমি এ সম্বন্ধে নিজেও কম ভাবনি।

মা। না, এ বিষয়ে আমি আগে থেকেই ভেবেছি বললে ভুল হবে। তবে, অভ্যাসের শক্তি নেহাৎ কম নয়।

মার্থা। কিসের অভ্যাস? তুমি যে বলেছিলে এমন সুযোগ সচরাচর পাওয়া যায় না?

মা। তা অস্বীকার করি না। কিন্তু দ্বিতীয় অপরাধের সাথে সাথেই আমার অভ্যাসের সুরু। প্রথম অপরাধটা কিছুই না; ক্ষণস্থায়ী। আর এমন সুযোগ যদিই বা বড় একটা না এসে থাকে, বহু বছর ধরে তাদের প্রভাব যে মনের ওপর বিস্তার করে আসছে, সে কথা জানিস নিশ্চয়ই। তারই স্মৃতি পর্যবসিত হয়েছে অভ্যাসে। হ্যাঁ মা, অভ্যাসের বশেই আগন্তুকটির কথায় জবাব দিয়েছি তার মুখের দিকে না তাকিয়ে, কারণ অভ্যাস বশতই বুঝতে পেরেছিলাম এই হচ্ছে আমাদের শিকার।

মার্থা। সত্যি, মা, ওকে খুন করা চাই।

মা (নীচু গলায়)। নিশ্চয়ই ওকে খুন করতে হবে।

মার্থা। কেমন অদ্ভুত ভাবে কথাটা বলছ যেন!

মা। না, মা, বড় ক্লান্ত লাগছে। আমার ইচ্ছে, একে দিয়েই আমাদের অপরাধের শেষ হোক। খুন করা যে ভীষণ ক্লান্তিকর। যদিও তোর সেই সমুদ্রের তীরে গিয়ে মরা আর এখানে মাঠ-ঘাটের মাঝে মরা আমার কাছে একই কথা, তবুও এ কাজ সারা হবার সাথে সাথেই আমি তোকে নিয়ে এ দেশ ছাড়তে চাই।

মার্থা। আমরা চলে যাব; কখন আসবে সেই ক্ষণ? তৈরী হও মা! অল্পই বাকী আছে। ওকে নিজে হাতেও মারতে হবে না। ও এসে চা খাবে, ঘুমিয়ে পড়বে, তারপর জ্যান্ত মানুষটাকে নদীতে নিয়ে যাব। বহুদিন বাদে ওকে খুঁজে পাওয়া যাবে, বাঁধের গায়ে লেপ্টে থাকা অবস্থায়; আশে-পাশে আর যেগুলো পাওয়া যাবে সেগুলোর কপাল আরো খারাপ। নদীর জলে সজ্ঞানে তাদের ঝাঁপ দিতে হয়েছিল। বাঁধ পরিষ্কার করতে গিয়েছিলাম যেদিন, সেদিন তুমি আমায় বলেছিলে যে আমাদের শিকারগুলোই সব চেয়ে কম কষ্ট পায়; আর মানব জীবনের তুলনায় আমাদের নিষ্ঠুরতা কিছুই নয়। তৈরী হয়ে নাও মা, তোমার বিশ্রাম এবার পাবে, আর আমি, আমি দেখতে পাব আজো যা দেখিনি।

মা। হ্যাঁ তৈরী হয়ে নিচ্ছি। মাঝে মাঝে সত্যিই বড় ভাল লাগে এই ভেবে যে, আমাদের হাতে ওদের বেশী কষ্ট পেতে হয় না। আমাদের এটাকে অপরাধ বলা চলে না। অপরিচিত জীবনের গতিকে একটু বাধা দেওয়া, একটু বুড়ো আঙুলের ঠেলা-মাত্র দেওয়া। আর নিঃসন্দেহে বলা যায় যে মানুষের জীবন আমাদের চেয়ে বহুগুণে নির্দয়। সে-জন্যেই সম্ভবত নিজেকে কখনো আমি অপরাধী বলে মনে করতে পারি না।

(বুড়ো চাকর এসে ঢুকল। কাউন্টারের সামনে গিয়ে নীরবে বসল। দৃশ্যের শেষ অবধি ওখান থেকে ও নড়বে না।)

মার্থা। ও এলে কোন্ ঘরে যায়গা দেব?

মা। যে-কোন একটায় দিলেই হয়, তবে দোতলায়।

মার্থা। হ্যাঁ, গত বার ওপরতলায় কি হাঙ্গামটাই না পোহাতে হয়েছিল! (এতক্ষণে ও বসল।) আচ্ছা মা, ওদেশের সাগরতীরের বালিতে নাকি পা পুড়ে যায়?

মা। জানিস ত বাছা, সেখানে আমি কখন যাইনি। কিন্তু শুনেছি বটে, ওখানকার রোদ হল সর্বগ্রাসী।

মার্থা। একটা বইয়ে পড়েছি যে ওখানকার রোদ অন্তঃকরণ অবধি শুষে খেয়ে নেয়; সমস্ত শরীরটা হয়ে ওঠে উজ্জ্বল, কিন্তু ভেতরটা শূন্য।

মা। আর তারই স্বপ্নে তুই মশগুল মার্থা?

মার্থা। হ্যাঁ মা! আর যে বিবেকের ভার বইতে পারি না; সেইজন্যেই ত অধীর হয়ে উঠেছি সেখানে যাব বলে, যেখানকার রোদ মানে যে সমস্ত প্রশ্নের মরণ। এখানে আমার দেশ নয় মা!

মা। তার আগে যে কত কাজ পড়ে আছে! সব-কিছু যদি আশানুরূপ চলতে থাকে তবে আমি নিশ্চয় তোর সঙ্গে যাব। কিন্তু স্বদেশ ভেবে সেখানে আমি যেতে পারব না। এমন বয়েস আসে যখন কোন দেশে সোয়াস্তি পাওয়া যায় না। ইট কাঠে তৈরী এমন খেলনার মত এক বাড়ী তৈরী করে রাখতে পারা অবশ্য সত্যিই ভাগ্যের কথা; এখানের প্রতি আসবাবপত্রই স্মৃতি দিয়ে ঘেরা; এখানেই কেবল মাঝে-মাঝে আমার ঘুম আসতে পারে। কিন্তু সেই ঘুমের মাঝেই যদি সব-কিছু ভুলে যেতে পারতাম, তবেই না!

(উঠে দরজার দিকে অগ্রসর হলেন।)

মা। নে মার্থা, গুছিয়ে নে। (খানিক বাদে) আচ্ছা মার্থা, সত্যিই কি এত হাঙ্গামার দরকার আছে?

(মার্থা ওঁর গমন-পথের দিকে চেয়ে রইল। আর একটা দরজা দিয়ে নিজেও বেরিয়ে গেল)

দ্বিতীয় দৃশ্য

(কয়েক সেকেণ্ডের জন্য বুড়ো চাকরটা এক।ষ্টেজে বসে। জাঁ-র প্রবেশ। একটু থামল, ঘরের চারি দিক দেখল ; কাউণ্টারের পেছনে বুড়োকে দেখতে পেল।)

জাঁ। কেউ নেই ?

(বুড়ো ওকে দেখল। উঠে দাঁড়াল। ষ্টেজের মাঝখান দিয়ে হেঁটে বেরিয়ে গেল।)

তৃতীয় দৃশ্য

(মারিয়ার প্রবেশ। চকিতে জাঁ তার দিকে ফিরে চাইল)।

জাঁ। তুমি আমার পেছন পেছনই এলে ?

মারিয়া। ক্ষমা কর। কিন্তু আমি আর থাকতে পারছিলাম না। এখুনি হয়ত চলে যাব। কিন্তু তার আগে দেখে যাই কোথায় তোমায় রেখে যাচ্ছি।

জাঁ। এস, তাতে আপত্তি নেই, কিন্তু যে উদ্দেশ্যে এখানে আমার আসা তা সফল হবে না।

মারিয়া। অন্তত কেউ যতক্ষণ না আসছে, ততক্ষণ অবধি থাকি। তার পর, তোমার আপত্তি সত্ত্বেও, তোমার পরিচয় তাকে দিয়ে চলে যাব।

(জাঁ ঘুরে বসল। খানিক বাদে)।

মারিয়া (চারি দিক দেখতে দেখতে)। এই খানে ?

জাঁ। হ্যাঁ, এই খানে। এই দরজা দিয়ে প্রায় কুড়ি বছর আগে বেরিয়ে গিয়েছিলাম। আমার বোন তখন খুবই ছোট। এই কোণে বসে ও খেলছিল। আমার মা সেদিন উঠে পর্যন্ত আসেননি আমার বিদায় আলিঙ্গন জানাতে। অবশ্য তার তেমন মূল্যও আমার কাছে ছিল না সেদিন।

মারিয়া। জাঁ, আমার বিশ্বাস হচ্ছে না যে তোমার মা তোমায় দেখেও চিনতে পারলেন না ! ছেলেকে মা যে সর্বদাই চিনতে পারেন, অন্তত সেটুকু তাঁর কাছে যে কেউ আশা করতে পারে।

জাঁ। তা পারে, কিন্তু কুড়ি বছরের বিচ্ছেদে অনেক কিছুই ওলট-পালট হয়। আমি চলে যাবার পর জীবনধারা থেমে যায়নি। আমার মার বয়েস হয়েছে। তাঁর দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে গেছে। আমি নিজেই যে তাঁকে চিনতে পেরেছি, ভাগ্যের কথা।

মারিয়া (অধীর ভাবে)। জানি, তুমি এসেছিলে, 'সুপ্রভাত' বলেছিলে, তার পর এখানে বসেছিলে। কিন্তু তোমার ফেলে-যাওয়া ঘরের সাথে এ ঘরের মিল কোথাও খুঁজে পাওনি।

জাঁ। না, আমার স্মৃতিশক্তি তেমন প্রবল নয়। আমায় এরা বিনা বাক্য-ব্যয়ে অভ্যর্থনা জানাল। আমার পছন্দ মত 'বিয়ার' এনে দিল। আমার দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে ছিল বটে, কিন্তু চেয়ে দেখেনি। সব কিছুই ধারণাতীত ভাবে উল্টো পথে চলেছে।

মারিয়া। এমন কিছু উল্টো পথ ত আমি দেখছি না ! তুমি মুখের একটা কথা খসালেই সব চুকে যেত। এমন ক্ষেত্রে, এই যে আমি, এসেছি বলে এগিয়ে গেলেই সব কিছু স্বচ্ছন্দে আশানুরূপ হয়ে ওঠে।

জাঁ। তা সত্যি, কিন্তু আমার স্বপ্নেই যে আমি বিভোর ছিলাম। কত আদর করে, সমারোহের সাথে খেতে বসাবে আশা করেছিলাম, তার বদলে কি না টাকার বিনিময়ে দিল 'বিয়ার।' আমার মুখের সব কথা লোপ পেয়ে গেল এই ব্যবহারে ! আমার মনে হল, এই ভাবেই চলুক না কেন।

মারিয়া। ও-ভাবে চালানোর মানে ? এই তোমার আর এক খেয়াল। শুধু একটা মুখের কথা ত খসানো !

জাঁ। খেয়াল নয় মারিয়া, ঘটনাবর্তের টানে আমি ভেসে গেলাম। এই শক্তিতে আমি বিশ্বাস করি। তা ছাড়া তাড়াহুড়ো করার প্রয়োজনই বা কি ? এখানে এসেছি নিজের সুদিন কামনায়, আর তার সাথে যদি পাই সুখ। সেদিন আমার বাবার মৃত্যু-সংবাদ পেয়েছিলাম, সেদিনই বুঝেছিলাম এদের দুজনের প্রতি আমার কত দায়িত্ব—আর সে-কথা বোঝার পর আজ এসেছি আমার কর্তব্য সম্পন্ন করতে। কিন্তু এখন দেখছি 'আমি ফিরে এসেছি' বলামাত্র একজন বিদেশীকে ছেলে বলে মেনে নেওয়া ওদের পক্ষে অত সোজা নয়।

মারিয়া। কিন্তু তুমি যে এসেছ, সে-কথা জানাতে আপত্তিটা কোথায় ? এ-সব জায়গায় আর দশ জনের মতই করতে হবে। নিজের পরিচয় দিয়ে, নামটুকু বললেই ত মিটে যায় ; তার বাড়া প্রমাণ নেই। যা নও, তাই সাজতে গিয়ে ব্যাপারটা আরো ঘোলাটে হয়ে উঠবে। যেখানে বিদেশীর মত এসে হাজির হয়েছ, সেখানে তোমার সাথে বিদেশীর মত ব্যবহার করবে না ত কি ? না বাপু, এ তুমি ভাল করছ না।

জাঁ। আরে, এই সামান্য ব্যাপারেই এত ব্যস্ত হয়ে উঠলে ? তা ছাড়া আমি যেমনটি ভেবেছি, ঠিক সেই ভাবেই তা'হলে কাজ করাও এখন সুবিধে হবে। এই সুযোগে আমি ওদের একটু যাচাই করে নিতে পারব বাইরে থেকে। ভাল করে বুঝতে পারব, কিসে ওরা সত্যিকারের সুখী হবে। তার পর একটা কোনও পরিস্থিতির সৃষ্টি করব, যাতে ওরা আমায় চিনতে পারে। একটা শুধু কথার অপেক্ষা।

মারিয়া। এর একমাত্র উপায় হল, হঠাৎ গিয়ে "এই যে আমি" বলে হাজির হওয়া ; প্রাণের কথা খুলে বলা।

জাঁ। প্রাণটা যে অত সোজা নয় !

মারিয়া। কিন্তু প্রাণের ভাষা ত খুবই সোজা। এমন কিছু দুরূহ কাজ করতে হত না, যদি তুমি সরাসরি গিয়ে বলতে, "আমি তোমার ছেলে। এই আমার স্ত্রী। ওর সাথে পছন্দসই এক দেশে এত দিন আমরা ছিলাম, সমুদ্রের ধারে, প্রচুর রোদের আওতায়। তবু আমি সুখী হতে পারিনি ; আমার আজ তাই তোমাদের সঙ্গ দরকার।"

জাঁ। ভুল বুঝ না মারিয়া ! ওদের সঙ্গের কোন প্রয়োজনই আমার নেই। কিন্তু আমি জানি যে, ওদের পক্ষে আমার সাহচর্য কত আবশ্যক। নয়ত পুরুষ মানুষ আবার একা কোথায় ?

(খানিক থেমে মারিয়া ঘুরে দাঁড়াল)

মারিয়া। বোধ হয় তোমার কথাই ঠিক। আমি মাফ চাইছি। কিন্তু এদেশে আসা অবধি আমার মনটা কেমন সন্দেহে ছেয়ে গেছে। একটাও কি হাসিমুখ এদেশে নেই ?

এই ইউরোপ! কী বিষণ্ণ এর রূপ! এখানে আসা অবধি একবারও তোমায় আমি হাসতে দেখলাম না, আর আমার মনটাও সংশয়ে ভরে গেছে! হায়! কেন আমার দেশ ছেড়ে এলাম? চল, জাঁ, এদেশে বৃথাই সুখের সন্ধানে ঘুরে মরছ।

জাঁ। সুখের সন্ধানে ত আসিনি মারিয়া! আমাদের কি সুখের অভাব?

মারিয়া। (ঝাঁঝের সাথে)। তবে সেই সুখ নিয়ে তুষ্ট থাকতে আপত্তি কি?

জাঁ। সুখই সব না; মানুষের জীবনে কর্তব্যও আছে। আমার কর্তব্য হল আমার মার কাছে আর আমার স্বদেশের কাছে নিজের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা।

(মারিয়া মুখভঙ্গী করল। জাঁ তাকে নিরস্ত করল: বাইরে পায়ের আওয়াজ শোনা গেল।)

জাঁ। কে আসছে। যাও, মারিয়া, লক্ষ্মীটি!

মারিয়া। অসম্ভব! এমন ভাবে চলে যাওয়া অসম্ভব!

জাঁ। (পায়ের শব্দ এগিয়ে আসছে)। যাও ওইখানে লুকিয়ে পড়।

(ঘরের পেছনের দরজার আড়ালে জাঁ মারিয়াকে ঠেলে দিল।)

চতুর্থ দৃশ্য

(পেছনের দরজা খুলে বুড়োটা মারিয়াকে লক্ষ্য না করেই ঘরে ঢুকল; তারপর বাইরের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল।)

জাঁ। দোহাই তোমার; এবার তাড়াতাড়ি চলে যাও। স্বচক্ষে ত দেখলে ভাগ্য আজ প্রসন্ন।

মারিয়া। না, আমি এখানেই থাকব। চুপ করে আমি বসে থাকব, যতক্ষণ না ওরা তোমায় চিনতে পারছে।

জাঁ। না, তা হলেই ধরা পড়ে যাব।

(মারিয়া ফিরে এসে মুখোমুখি ওর দিকে চেয়ে রইল।)

মারিয়া। জাঁ, পাঁচ বছর হল আমাদের বিয়ে হয়েছে।

জাঁ। শীগগির-ই পাঁচ বছর পুরো হবে।

মারিয়া। আর আজ রাত্রেই আমাদের প্রথম বিচ্ছেদ। (জাঁ চুপ করে রইল। মারিয়া আবার ওর দিকে তাকাল)।

মারিয়া। বরাবরই তোমার সব-কিছুই আমি ভালবেসেছি, এমন কি তোমার প্রকৃতিতে যা কিছু দুর্বোধ্য, তা অবধি। আজও তোমায় আমি অন্য চোখে দেখতে চাই না। স্ত্রী হিসাবে আমি তেমন অবাধ্য নই। কিন্তু আজ, আজ ওই শূন্য বিছানার কথা ভেবে আমি শিউরে উঠছি, যে বিছানায় তুমি আমায় ফিরে যেতে বলছ। আরো ভয় লাগছে যে তুমি আমায় ফেলে চলে যাবে।

জাঁ। বোকা মেয়ে! আমার ভালবাসায় কি সন্দেহের কোন অবকাশ পেয়েছ?

মারিয়া। না গো! সন্দেহ আমি করছি না। কিন্তু তোমার ভালবাসাও যেমন আছে, তেমনি ত তোমার খেয়াল—তোমার ভাষায়, তোমার কর্তব্যও আছে,—ও একই কথা। কত সময় যে তোমায় বুঝে উঠতে পারি না। এমন মুহূর্তে মনে হয় তুমি যেন আমার সান্নিধ্য এড়িয়ে চলছ। কিন্তু তোমায় ছেড়ে যে আমি থাকতে পারব না, বিশেষত আজকের এই সন্ধ্যা (কাঁদতে কাঁদতে ওর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে), এই সন্ধ্যা আমার কাছে অসহনীয়।

জাঁ। (ওকে টেনে নিয়ে) তুমি ত আচ্ছা ছেলেমানুষ দেখছি!

মারিয়া। বটেই ত, আমিই ত ছেলেমানুষ! ওখানে কি সুখেই না দিন কাটত আমাদের। এ দেশের এই সন্ধ্যায় আমার যদি ভয় করে, সে কি আমারই দোষ? না গো, দোহাই তোমার, আমায় একা থাকতে বোল না।

জাঁ। কেন বুঝছ না মারিয়া, প্রতিশ্রুতি যে আমায় রক্ষা করতেই হবে। অতি জরুরী এ কাজ।

মারিয়া। কিসের প্রতিশ্রুতি?

জাঁ। নিজের কাছে আমি যে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম সেদিন,—যেদিন বুঝলাম আমার মার জীবনে আমার সান্নিধ্য কতটা অপরিহার্য।

মারিয়া। তোমার যে আরো একটা প্রতিশ্রুতি আছে।

জাঁ। কিসের?

মারিয়া। সেই প্রতিশ্রুতি—যা তুমি দিয়েছিল, সেদিন, যেদিন থেকে আমার সঙ্গে একত্র বাস করবে বলে তুমি কথা দিয়েছিলে?

জাঁ। আমারও ধারণা, দুটি প্রতিশ্রুতিই আমি রাখতে পারব। কিন্তু তোমার কাছে কি এটুকু সাহায্যও পাব না? একে খেয়াল বলে উড়িয়ে দেবে? একটি সন্ধ্যা, একটি রাত আমায় ভাবতে দাও, আমার স্বজনদের ঠিকমত জানবার ফুরসৎ দাও, কি ভাবে তাদের সুখী করতে পারব, তা নির্ণয় করবার সুযোগ দাও।

মারিয়া। (মাথা নেড়ে) তবু, প্রিয়জনের বিচ্ছেদ যে চিরকাল এই রকমই কঠিন!

জাঁ। পাগলী কোথাকার! জানই ত তোমায় আমি কত ভালবাসি।

মারিয়া। মোটেই না। পুরুষ মানুষ কোন দিন ভালবাসতে পারে না। সে সুখী কিছুতেই হয় না। সে শুধু জানে স্বপ্ন দেখতে, নতুন নতুন কর্তব্যের অজুহাত বের করতে, নতুন দেশের খোঁজ করতে আর নতুন করে ঘর বানাতে। আর আমরা, আমরা জানি প্রেমে বিভোর হতে, এক শয্যায় শুতে, হাত পেতে থাকতে, বিচ্ছেদে মুষড়ে পড়তে। একবার আমরা ভালবাসলে আর কোনো খেয়ালকেই প্রশ্রয় দিই না।

জাঁ। এত কথায় লাভ কি মারিয়া? এসেছি ত শুধু আমার মা'র সঙ্গে দেখা করতে, তাঁকে সাহায্য করতে, আর সুখী করতে। আমার খেয়াল বা কর্তব্যের নজীর দেখালে আমি নিরুপায়। ও-সব বাদ দিলে আমার অস্তিত্বই বা কি, আর ও-সব না থাকলে তুমিই আমায় তেমন ভালবাসতে পারতে?

মারিয়া। (হঠাৎ ওর দিকে পিছন ফিরে) জানি বাপু, তর্কে তোমার যুক্তি অকাট্য, আমায় হার মানতেই হয়। তবু তোমার কথা আমি শুনতে চাই না; কান বন্ধ করে রইলাম। কারণ, তোমার এ-স্বর আমি চিনি; এ প্রেমের স্বর নয়, এ-স্বর হল নির্জনতার!

জাঁ। (ওর পেছনে দাঁড়িয়ে) ও কথা থাক মারিয়া! আমার একান্ত অনুরোধ, আমায় এখানে তুমি একা থাকতে দাও, যাতে করে সব কিছু আমি ভাল ভাবে বিবেচনা করে দেখতে পারি। এত ভয়ের কিছুই নেই এতে; নিজের মা'র সাথে এক বাড়ীতে যদি-ই বা আজ শুই, তাতে কি এমন এসে গেল? আর যা কিছু তা ভগবানের

হাতেই ছেড়ে দাও। তিনি জানেন এত সব ঝামেলা আমি পোহাচ্ছি, তা তোমায় ভুলে যাব বলে নয়। নির্বাসনে বা বিস্মৃতির মাঝে কেউ সুখী হতে পারে না ; চিরকালই কেউ পরবাসী থাকতে পারে না। মানুষের জীবনে সুখের দরকার আছে, স্বীকার করি ; কিন্তু নিজের সত্তাও কি তাকে জানতে হবে না ? আমার ধারণা স্বদেশে ফিরে আসা, আমার স্বজনকে সুখী করা, এ-সব সেই উদ্দেশ্যের পথেই আমায় নিয়ে যেতে সাহায্য করছে। আর কিছু আমি ত এর মধ্যে দেখি না !

মারিয়া। সোজা সরল ভাবে দুটো মুখের কথা খসালেই এ-সব তুমি অনায়াসে করতে পারতে। কিন্তু তোমার যে সবই উল্টো।

জাঁ। উল্টো নয় ; ঠিক পথই বেছে নিয়েছি, কারণ এ-পথেই আমি জানতে পারব আমার এই স্বপ্নগুলোর কোন বাস্তবিক অর্থ আছে কি না।

মারিয়া। আশা করি অর্থ থাকুক, যুক্তি থাকুক তোমার এ-প্রয়াসে। কিন্তু আমার যে আর কোন স্বপ্ন নেই, শুধু যেখানে আমরা সুখী ছিলাম, সেই দেশে ফিরে যাওয়া ছাড়া ; আমার আর কোন কর্তব্য নেই, তুমি ছাড়া।

জাঁ। (ওকে বুকে টেনে নিয়ে) আমায় বাধা দিও না, লক্ষ্মীটি। একটু সবুর করলেই আমি সব কিছু ব্যবস্থা করে ফেলব।

মারিয়া। (নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে) বেশ, স্বপ্নই দেখ তবে। তোমার প্রেম পেলাম কি না তাতে কি এসে-যায় ! তোমার পথে এত বাধাই যদি হয়ে থাকি, তবে আমিই বা নিজেকে অসুখী করি কেন ? ধৈর্য্য ধরে থাকব, অপেক্ষা করব যত দিন তোমার এ-খেয়ালের হাত থেকে তুমি নিজেকে না মুক্ত করতে পারছ। তারপর আমার সুখের দিন শুরু হবে। আজ আমি অসুখী এইজন্যে যে, আমি বড় আশা করে এসেছিলাম তোমার ভালবাসা পাব বলে, আর তুমি আমায় ফিরিয়ে দিলে ! সেই জন্যেই ত পুরুষের প্রেম এত নিষ্ঠুর, সব কিছু ক্ষত-বিক্ষত করে দিতে পারে। তার একান্ত যা কাম্য, তা-ই ফিরিয়ে দেওয়াটা হচ্ছে তার স্বভাবের অদমনীয় রীতি।

জাঁ। (ওর মুখ ধরে হাসতে হাসতে) বড় সত্যি এ-কথা, মারিয়া ! কিন্তু আমার দিকে চেয়ে দেখ ত ; আমায় কি বিচলিত দেখছ ? বেশ ঠাণ্ডা মাথায় যা আমি করব বলে এসেছি, তা-ই করছি। এক রাত্তিরের জন্যে আমার মা-বোনের কাছে আমায় একা থাকতে দেবার মধ্যে তুমি এমন কি ভয়ঙ্কর দেখলে ?

মারিয়া। (নিজেকে মুক্ত করে) বেশ, বিদায়। আমার প্রেম তোমায় রক্ষা করবে।

(দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল)

মারিয়া। (নিজের শূন্য হাত দেখিয়ে) কিন্তু চেয়ে দেখ এই রিক্তার দিকে। তুমি চললে নতুনের সন্ধানে, আর আমায় দিয়ে গেলে অধীর প্রতীক্ষা।

(একটু ইতস্তত করে মারিয়া চলে গেল)

পঞ্চম দৃশ্য

(জাঁ বসল। মার্থা এসে ঢুকল।)

জাঁ। সুপ্রভাত ! ঘর দেখে নিতে এলাম।

মার্থা। তা জানি। ঘর গুছনো হচ্ছে। আপনার নামটা আমাদের বইয়ে লিখে নিতে হবে।

(বই নিয়ে এল।)

জাঁ। আপনাদের চাকরটা যেন কী !

মার্থা। এই প্রথম ওর নামে নালিশ শুনতে হল। ওর যা কাজ, ঠিক সেটুকু ও নিখুঁত ভাবেই করে।

জাঁ। না, না, আমি নালিশ করছি না ! বলছিলাম যে আর দশটা চাকরের মত ও নয়। আচ্ছা, ও কি বোবা ?

মার্থা। না ত !

জাঁ। কথা বলতে পারে তবে ?

মার্থা। বলে, যতটা সম্ভব কম, আর শুধু অপরিহার্য্য কথাই।

জাঁ। যাই হোক, দেখে মনে হয় না, যা ওকে বলা হয় ও তা শুনতে পায়।

মার্থা। ও শুনতে পায় না, এ-কথা বলা চলে না। ও কম শোনে। যাক গে, আপনার নাম আর পদবীটা এখন জানতে চাই।

জাঁ। হাসেক, কার্ল।

মার্থা। শুধু কার্ল ? আর কিছু না ?

জাঁ। না।

মার্থা। জন্মস্থান ও তারিখ ?

জাঁ। আমার বয়স আটত্রিশ বছর।

মার্থা। বলি জন্মেছেন কোথায় ?

জাঁ। বোহিমিয়ায়।

মার্থা। পেশা ?

জাঁ। পেশা নেই।

মার্থা। কোনও কাজ না করে থাকতে গেলে হয় খুব ধনী হতে হয়, নয়ত খুব গরীব।

জাঁ (হেসে)। খুব গরীব আমি নই, আর সে জন্যে বহু কারণে আমি সুখী।

মার্থা (অন্য স্বরে)। জাতিতে আপনি চেক্ নিশ্চয়ই ?

জাঁ। নিশ্চয়ই।

মার্থা। সাধারণত কোথায় থাকা হয় ?

জাঁ। বোহিমিয়ায়।

মার্থা। সেখান থেকেই এখন আসছেন ?

জাঁ। না, এখন দক্ষিণ দেশ থেকে আসছি। (মার্থা না-বোঝার ভাণ করল।) সমুদ্রের ও-পার থেকে আসছি।

মার্থা। তা জানি। (একটু থেমে) ওখানে বুঝি প্রায়ই যান ?

জাঁ। বেশ ঘন ঘন।

মার্থা (অল্পক্ষণের জন্য অন্যমনস্ক থেকে, নিজেকে সামলে নিয়ে) যাচ্ছেন কোথায় ?

জাঁ। ঠিক জানি না। অনেক কিছুর ওপর তা নির্ভর করছে।

মার্থা। এখানে কিছুদিন থাকতে চান ?

জাঁ। ঠিক জানি না। এখানকার অবস্থার ওপর তা নির্ভর করছে।

মার্থা। তাতে কিছু যায়-আসে না। কিন্তু আপনার প্রতীক্ষায় কেউ নেই ?

[ক্রমশঃ।

অনুবাদক—পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

ডক্টর নবগোপাল দাস, আই, সি, এস

ষোলো

স্তম্ভিত ভাবটা একটু কেটে যাবার পর প্রদীপ ভাবতে লাগল, এখন কি করা উচিত ? যদি সে নবকিশোর এবং ছবির পশ্চাদ্ধাবন করে তাহলে সেটা অত্যন্ত হাস্যকর হবে না কি ? তাছাড়া তাদের ব্যক্তিগত জীবনে হস্তক্ষেপ করায় তার কি অধিকার ? ছবি তার কে ? ভাবতেই প্রদীপের চোখ-কান লাল হয়ে উঠল।

কিন্তু, না, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই খেলা দেখা, শুধু দেখা নয়, বেমালুম হজম করে যাওয়া, তার স্বভাব এবং নীতিবিরুদ্ধ। সে সোজা চলে যাবে ওপরে, প্রশ্ন করবে দু'জনকেই, এ-সব লুকোচুরির কি প্রয়োজন ছিল তাদের ? কিন্তু নবকিশোর যদি বলে, ছবি স্বেচ্ছায় তার কাছে আত্মসমর্পণ করেছে, তখন কি জবাব দেবে প্রদীপ ?

দ্বিধাগ্রস্ত মনে প্রদীপ আরও খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল, তারপর উঠে গেল ওপরে। যে কামরায় প্রথমে ছবির সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছিল, সেখানেই তারা দু'জনে প্রবেশ করেছে। ভেতর থেকে দরজা বন্ধ।

সে দরজায় আঘাত করল। প্রথমে কোনই সাড়া এল না, তার পর শোনা গেল নবকিশোরের গলা, প্রশ্ন করছে, কে ?

—দরজা খোলো অত্যন্ত জরুরী। প্রদীপ বলল।

মিনিট দুই পরে দরজাটা একটুখানি খুলে মুখ বাড়াল নবকিশোর। দণ্ডায়মান প্রদীপকে দেখে সে প্রথমে হতভম্ব। আকস্মিকতার আঘাত খানিকটা সামলে নিয়ে বলল, কি চাও তুমি, প্রদীপদা' ?

—দরজাটা ভাল করে খোলো, একটু শান্ত ভাবে বসতে দাও, বলছি।

—আমি বাইরে আসছি, তুমি একটু অপেক্ষা কর।

অসহিষ্ণু ভাবে প্রদীপ জবাব দিল, বাইরে অপেক্ষা করতে আমি প্রস্তুত নই, আমাকে ভেতরে যেতে হবে।

এবার নবকিশোর স্বমূর্তি ধারণ করল। বলল, লাটসাহেব এসেছেন আর কি ! এরকম জুলুম করবার কি অধিকার তোমার আছে ? আমি তোমাকে ভেতরে আসতে দেব না।

—দিতেই হবে। দৃঢ়স্বরে প্রদীপ জবাব দিল।

নবকিশোর সুর একটু নরম করে অনুনয়ের ভঙ্গীতে বলল, কেন একটা সীন করছ, প্রদীপদা' ? তুমি যা সন্দেহ করছ তা নয়। কোন অসদুদ্দেশ্যে ছবিকে আমি এখানে নিয়ে আসিনি, নিয়ে এসেছি নিরিবিল্লিতে ওর সঙ্গে কয়েকটা বিষয় আলোচনা করতে।

—সেটা ছবির মুখ থেকেই শুনতে চাই। বলে নবকিশোরের আপত্তির অপেক্ষা না রেখেই তাকে ঠেলে সে ভেতরে ঢুকল। নবকিশোরও এল তার পেছনে পেছনে, দরজাটা আবার বন্ধ করে দিল।

প্রদীপ চোখ বুলিয়ে নিল ঘরটার চারদিকে। আসবাবপত্র ঠিক একই আছে, এমন কি স্বামী বিবেকানন্দের ছবিটিও। পরিবর্ত্তনের মধ্যে দেখল ডিভ্যানের আবরণী বদলান হয়েছে। আর টেবিলের বাতিটা জ্বলছে না।

ছবি বসে আছে ডিভ্যানের উপর। এক পাশে তার হ্যাণ্ডব্যাগ। পা নগ্ন, শান্তিনিকেতনী চটিটা পড়ে আছে টেবিলের নীচে।

স্থির অচঞ্চল চোখে ছবি প্রদীপের দিকে তাকাল।

প্রদীপ প্রথমে একটু থতমত খেয়ে গেল। সে আশা করেছিল, ছবিকে দেখবে নতমুখী, অশ্রুসজল। এই উদ্ধত রূপ সে প্রত্যাশা করেনি।

প্রশ্ন করল, নবকিশোর এখানে কি উদ্দেশ্যে তোমাকে নিয়ে এসেছে ছবি ?

—যে উদ্দেশ্যে আপনি এখানে এসেছিলেন এক বছর আগে। ছবি জবাব দিল। তীক্ষ্ণ জবাব, দ্বিধা বা জড়তার চিহ্নমাত্র নেই।

—কত দিন এ-সব চলছে ?

—তাতে আপনার প্রয়োজন ? ছবি পাল্টা প্রশ্ন করল।

—প্রয়োজন আছে। আমি চেষ্টা করেছিলাম এ পথ থেকে তোমাকে ফিরিয়ে নিতে। নবকিশোরকে ভার দিয়েছিলাম, সে আশ্বাসও দিয়েছিল আমাকে।

—সে প্রশ্নটা আমাকে না ক'রে আপনার বন্ধুকেই করুন না ?

প্রদীপ এবার অন্য প্রশ্ন করল।—আমি জানতে চাই তুমি স্বেচ্ছায় এখানে এসেছ কি না ?

—সেটা কি আমার ভাবভঙ্গী, কথাবার্ত্তা থেকে বুঝতে পারছেন না ? আজ-কাল জোর ক'রে কেউ কাউকে নিয়ে আসতে পারে ? ছবি জবাব দিল।

প্রদীপ চুপ ক'রে রইল।

নবকিশোর এবার কথা বলল।—তুমি খুসী হয়েছ আশা করি, প্রদীপদা' ! যাক্, মুখোমুখি কথা হয়ে গেল, এক হিসেবে ভালই হ'ল। এর পর তোমার কাছে আমাকে জবাবদিহি করতে হবে না।

—তুমি থাম, নবু ! তিক্তকণ্ঠে প্রদীপ বলল। তারপর ছবির দিকে তাকিয়ে বলল, আমার ভুল হয়েছে, ছবি, আমাকে ক্ষমা করো।

ছবির ঠোঁট দুটো একবার নড়ে উঠল, সে যেন চেষ্টা করল কিছু বলতে। প্রদীপ অপেক্ষা করল আরও মিনিট দুই, তারপর নিঃশব্দে বেরিয়ে এল।

বাইরের ক্যাডিলাকটার দিকে আর একবার তাকাল, তারপর হন-হন করে সে ছুটল বাসষ্টপের দিকে।

কল্পনার আর একটা প্রতিমা আজ ভাঙ্গল, নির্ম্মম ভাবে, অকরুণ প্রহারে। কেন এমন হয় ? মানুষকে বিশ্বাস করতে সে চায়, কিন্তু মানুষ কেন এমন ব্যবহার করে, যাতে বিশ্বাসের ভিত্তি

গোড়া থেকে নড়ে ওঠে? নবকিশোরকে সে মনে করেছিল মহান, উদার, কিন্তু এখন সে দেখতে পেল তার বাইরের মহানুভবতার পেছনে লুকিয়ে আছে কুটিল পঙ্কিলতা, পরোপকারবৃত্তির স্থান অধিকার করে আছে নগ্ন লুব্ধতা! অবশ্য এর আগে—যখন ছবির সঙ্গে তার শেষ দেখা হয় প্রিন্সেপ ঘাটে—তার সন্দেহ একটু হয়েছিল, কিন্তু স্বভাবসুলভ প্রত্যয়ে সন্দেহকে সে বেশী দিন মনে স্থান দেয়নি।

নবকিশোরের অপরাধ কি খুবই গুরুতর? ছবির সম্পূর্ণ সম্মতি না পেলে সে কি সাহস করত তার নবার্জ্জিত স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করতে? প্রদীপ শুনেছে, পড়েছে, যে বিলেত দেশে এ রকম ঘটনা হামেশাই ঘটে থাকে, তা নিয়ে বাইরের লোকে মাথা ঘামায় না কখনও। দুটি ছেলে-মেয়ে পরস্পরকে যদি পছন্দ করে তাহলে বিয়ের অনুষ্ঠান নাকি তাদের কাছে নিতান্তই গৌণ!

কিন্তু ছবিকে কি বিলেতের স্বাধীনা নারীদের পর্য্যায়ে ফেলা যায়? তার স্বাধীনতা কি অধীনতারই নতুন সংস্করণ নয়? কৈশোরের প্রারম্ভ থেকে যে ঝড়ঝাপটার মধ্য দিয়ে ছবির দিন কেটেছে তার প্রভাব কাটিয়ে ওঠা কি এতই সহজ? তার কাছ থেকেও ছবি কতটুকু সাহায্যই বা পেয়েছে? নবকিশোরের ঘাড়ে দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েই সে খালাস হয়েছিল, তার কি উচিত ছিল না নিজে ছবির তত্ত্বাবধান করে? ওদিকে যে তার ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করে দিয়েছে, তার পরিবারের ভরণ-পোষণের ভার নিয়েছে, তার প্রতি সাধারণ একটা কৃতজ্ঞতা প্রকাশও যে করা দরকার। ছবি যদি তার যৌবনের উপঢৌকন দিয়ে তার কৃতজ্ঞতা জানিয়ে থাকে তাতে প্রদীপের প্রতিবাদ করবার কি অধিকার আছে?

তবু, তবু—প্রদীপ কেবলই ভাবতে লাগল, তবু এমনটি হওয়া উচিত ছিল না। নবকিশোরকে সে ক্ষমা করতে পারবে, কিন্তু ছবিকে সে কিছুতেই ক্ষমা করবে না। তার স্বপ্ন ভেঙ্গে দিয়েছে ছবি, ধূলোকাদায় টেনে এনেছে কল্পনার বিগ্রহ। সে ত ছবির কোন ক্ষতি করেনি, তবে?

সপ্তাহখানেক পরে সে আবার গেল গায়ত্রীর কাছে। এর মধ্যে নিজেকে সে খানিক সামলে নিয়েছিল, কিন্তু সম্পূর্ণ আত্মস্থ হ'তে পারেনি।

প্রখর দৃষ্টিতে গায়ত্রী বুঝল এমন একটা কিছু ঘটেছে, যাতে প্রদীপের মন হয়ে পড়েছে অত্যন্ত বিপর্য্যস্ত।

—বন্দনার সঙ্গে তোমার ঝগড়া হয়নি ত? গায়ত্রী প্রশ্ন করল।

সুপ্তোত্থিতের মত প্রদীপ জবাব দিল, বন্দনা? না ত! একথা কেন জিজ্ঞাসা করছ দিদি?

—তোমার মনটা যেন তোমার শরীরের ভেতর নেই!

—মনটা সত্যি ভাল নেই, দিদি!

—বন্দনাকে তুমি আমার কাছে নিয়ে আসবে বলেছিলে, আনলে না ত?

—ওদের ওখানে যাওয়া হয়ে ওঠেনি', এর পর যেদিন যাব ওকে জিজ্ঞাসা করব।

—ওর ভাই-এর সঙ্গে তোমার খুব ভাব, না?

—এক কালে ভাব ছিল, এখন সে ক্যাডিলাক্ গাড়ী হাঁকিয়ে বেড়ায়।

—হুঁ, বুঝেছি।

—তার পর গায়ত্রী প্রশ্ন করল, বন্দনাকে দেখবার জন্য তোমার মন ব্যাকুল হয় না প্রদীপ?

—হয়ত হয়, হয়ত বা হয় না।

—এ আবার কি ধরণের জবাব?

—মনস্তত্ত্ব একটু-আধটু তুমি নিশ্চয়ই বোঝ দিদি! নিজের ব্যাকুলতা প্রকাশ করলে ও পক্ষ একটু কম ব্যাকুল হবে, তাই দর বাড়াবার চেষ্টা করছি।

—যত সব বাজে কথা। তিরস্কারের সুরে গায়ত্রী বলল। যত শীগগির সম্ভব বন্দনাকে তুমি আমার কাছে নিয়ে এসো, আমি ওর সঙ্গে কতকগুলো কথা আলোচনা করতে চাই।

—অর্থাৎ তুমি জানতে চাও, বন্দনা আমাকে সত্যি ভালবাসে কি না। অথবা, কতটুকু ভালবাসে?

—যদি তাই আমার উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তাতে দোষ আছে কি? আমি তোমার দিদি, আমাকেই হস্তক্ষেপ করতে হবে যদি তুমি এগোতে রাজী না থাক।

—দোহাই তোমার দিদি, ঘটকালী করতে যেয়ো না। দেশ স্বাধীন হবার আগে বিয়ের কথা ভাবতেই পারিনে, তা' সে বন্দনাই হোক আর সুমিত্রাই হোক।

প্রদীপের বলার ভঙ্গীতে গায়ত্রী না হেসে পারল না।

গায়ত্রীর নির্দ্দেশ মত পরের দিন সে গেল অটলবিহারীর ওখানে। প্রদীপের ভাগ্য ভাল, অটলবিহারী বা নবকিশোর দু'জনের কেউই সেদিন বাড়ীতে উপস্থিত ছিল না।

প্রদীপ সোজাসুজি বলল, গায়ত্রীদি' তোমাকে দেখতে চান, বন্দনা!

বন্দনা কাতর কণ্ঠে বলল, কেন আমাকে নিয়ে টানাটানি করছ? কারো সঙ্গে নতুন করে পরিচয় করবার মত মনের অবস্থা আমার নেই।

—কিন্তু আমি যে কথা দিয়েছি বন্দনা! তাছাড়া এত দিন তুমিও ত তেমন গভীর ভাবে অমত জানাওনি?

বন্দনা চুপ করে রইল। প্রদীপ বলল, শুধু একটি দিনের জন্য চলো। তারপর তোমার ইচ্ছে না হয় আর যেয়ো না।

—তোমার মুখে তোমার দিদির কথা যা শুনেছি তাতে ঐ একটি দিনও তাঁর সম্মুখীন হতে আমার ভয় হয়। তিনি বড় বুদ্ধিমতী।

—তাতে ভয়ের কি আছে? বুদ্ধি ব্যবহার করে তিনি ত তোমাকে খেয়ে ফেলবেন না!

বন্দনা অবশেষে রাজী হ'ল যে এক দিন প্রদীপের সঙ্গে গায়ত্রীর ওখানে যাবে।

তার পর সে বলল, তোমার সঙ্গে দু'-একটা বিষয়ে পরামর্শ করার আছে প্রদীপ! তুমি ছাড়া আর কা'কেই বা বলব? তুমি কিন্তু মৃগাঙ্করেও আর কাউকে জানতে দিও না, তোমার দিদিকেও নয়।

—ব'লো।

—আমার বাবা এবং দাদা দু'জনকে নিয়েই বেশ চিন্তিত হয়ে

উঠেছি আমি। প্রথমে আমি কিছুই বুঝতে পারিনি, কিন্তু এখন আমার কাছে স্বচ্ছ হয়ে এসেছে ওদের কর্ম্মপদ্ধতি।

—খুলেই ব'লো না!

—বাবা অনেক দিন থেকেই ব্ল্যাকমার্কেটিং করছেন, কিন্তু এখন যেন সেটা মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। লাভের পর লাভ করে তাঁর ক্ষিদে যেন ক্রমশঃ বাড়ছে, আগে যে সঙ্কোচ, সতিক্তাটুকু ছিল, তাও যেন দিন দিন লোপ পেয়ে আসছে। এই সেদিন শুনলাম, কোথাকার মাল কোথায় সরিয়ে তা বিক্রী করলেন প্রায় দশ গুণ দামে। অধিকাংশ কারবার করেন টেলিফোনে, কেবল টাকাটা নেন স্বহস্তে। তাও পার্টির কাছ থেকে নয়, দু'-একজন লোকের মাধ্যমে। আমার কেবলই ভয় হয়, এক দিন যদি ধরা পড়ে যান তাহ'লে কি উপায় হবে? যারা মাধ্যম হিসেবে কাজ করছে, তারাই যদি এক দিন ধরিয়ে দেয় বাবাকে?

—তোমার বাবাকে ব'ল না, যথেষ্ট টাকা ত উপার্জ্জন করেছেন, এখন একটু বিরতি দিলে ক্ষতি কি?

—আমি ঐ রকম একটা কথা এক দিন বলেছিলাম। বাবা এমন রেগে গেলেন যে, আমাকে চুপ করে যেতে হ'ল। বললেন, ন্যায়সঙ্গত উপায়ে টাকা রোজগার করছেন, কাউকে ভয় করেন না তিনি। কিন্তু আমি ত জানি, উপার্জ্জনটা মোটেই ন্যায়সঙ্গত নয়।

—আর তোমার দাদা?

—দাদা বেশ আছেন। বাবাকে নানা রকম ফন্দী বাংলে দেন। মাঝে মাঝে বিজিনেস্‌ও এনে দেন, বাবা বকশিস হিসেবে মুঠো মুঠো টাকা তুলে দেন দাদার পকেটে। আমার ধারণা, দাদা বাইরেও বেশ কিছু রোজগার করেন, যার খবর বাবা রাখেন না!

—তোমার দাদা যদি সাধু ভাবে উপার্জ্জন করেন, তাহ'লে ভয়ের কি আছে?

—ঐখানেই ত আমার ঘোরতর সন্দেহ! যে লোক রাত বারোটা একটার আগে বাড়ীতে ফেরে না, যদিও বা ফেরে তাও মদে চুর হয়ে, তার সাধুতার আস্থা স্থাপন করা যায় কি? তা ছাড়া অন্যান্য বদখেয়ালও যে দাদার হয়েছে, তার পরিচয়ও পেয়েছি।

—তুমি এ সম্বন্ধে ভেবে কি করতে পারবে বন্দনা? ওদের যা' হবার হবে।

—আমি ত ততটা নির্লিপ্ত ভাবে থাকতে পারি না, প্রদীপ! ওদের অপমানে যে আমারও অসম্মান।

—তুমি ভেবো না বন্দনা! ওরা তোমার আমার চেয়ে অনেক বেশী বুদ্ধি রাখে, সহজে ধরা দেবে না।

সতেরো

দেখতে দেখতে আরও কয়েক মাস কেটে গেল। এসে পড়ল ১৯৪৫ সাল। চার দিকে যুক্তশক্তির জয়জয়কার, ইউরোপের নানা প্রাঙ্গণে হঠছে মুসোলিনি এবং হিটলার, জাপান হঠছে এশিয়ায়। "আজাদ হিন্দ ফৌজ" মণিপুর থেকে তুলে নিয়ে গেছে তাদের ঘাঁটি। বৃটেন পুনরধিকার করেছে সমস্ত বর্ম্মাদেশ।

ওদিকে বিলেতে নির্ব্বাচনের নতুন জোর আয়োজন চলেছে।

প্রদীপ এক দিকে যেমন স্তম্ভিত অপর দিকে তেমনি ঘর্ম্মাক্ত হয়ে উঠল। নবকিশোর অত্যন্ত বুদ্ধিমান, সে এমন ভাবে বলেছে বন্দনার যেন কিছুতেই মনে না হয় যে সে অকারণ কুৎসা করে বেড়াচ্ছে! আর এই অধ্যায়ে তার, নবকিশোরের, যে অংশ তা নিশ্চয়ই বেমালুম গোপন করে গেছে!

বন্দনা বলে চলল, দাদা কি সহজে বলতে চায়! কি কথায় কথায় তার মুখ থেকে বেরিয়ে গেল তোমার এই কীর্ত্তির কথা। আমি যতই পীড়াপীড়ি করি ততই সে এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করে। তারপর যখন বলতে বাধ্য হ'ল তখনও চেষ্টা করল প্রমাণ করতে যে তোমার কোনই দোষ ছিল না।

—প্রথম থেকেই ছবির কথা তোমাকে না বলে যে মূর্খতা করেছি তার প্রতিফল পাচ্ছি আজ। কিন্তু বিশ্বাস ক'রো, আমি এমন কোন কাজ করিনি, যার জন্যে বিবেকের কাছে আমি লজ্জিত বোধ করতে পারি।

—প্রত্যেকের বিবেক স্বতন্ত্র, প্রদীপ! বিশেষ করে পুরুষ মানুষের বিবেক। কাজেই তোমার বিবেকের কাছে তুমি সাফাই থাকতে পার স্বচ্ছন্দে। তুমি না আমাকে ভালবাস?

প্রদীপ চুপ ক'রে রইল।

তীব্র কণ্ঠে বন্দনা বলে চলল, তবু আমার একটা সান্ত্বনা থাকত যদি শুনতাম তুমি আসক্ত হয়েছ ভদ্রঘরের কোন মেয়ের প্রতি। কিন্তু এ কি তোমার রুচি? প্রেম নিবেদন করবার আর পাত্রী পেলে না? যে সকলের উপভোগের সামগ্রী তার দিকেই ঝুঁকল তোমার কামনা? ঘৃণায়, অপমানে আমি মরে যাচ্ছি, প্রদীপ!

প্রদীপ আর একবার চেষ্টা করল তার প্রতিবাদ জানাতে, কিন্তু প্রতিবাদ ভাষা হয়ে প্রকাশ পেল না।

বন্দনা বলল, আমি তোমাকে সত্যি ভালবেসেছিলাম, প্রদীপ, খুবই গভীর ভাবে ভালবেসেছিলাম। পৃথিবীতে তুমি যে নিতান্তই একা, সেটাও বুঝতে পেরেছিলাম। তুমি যদি নিজে এসে আমাকে বলতে যে একাকীত্বের বোঝা বইতে না পেরে তুমি সান্ত্বনা খুঁজতে গিয়েছিলে ছবির আলিঙ্গনে, তাহ'লেও আমি সইতে পারতাম আমার এ অপমান। আমি যা তোমাকে দিতে পারছি না তা' তুমি, পুরুষ মানুষ, খুঁজছ অন্যের কাছে, এটা অপ্রিয় হ'লেও অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু তুমি সে পথও আমার জন্যে খোলা রাখলে না! বলতে বলতে বন্দনা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

সসঙ্কোচে প্রদীপ বন্দনার গায়ের উপর তার হাতখানা রাখল। বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত বন্দনা ছিটকে দাঁড়াল প্রদীপের এবং নিজের মাঝখানে ব্যবধানের সৃষ্টি ক'রে। বলল, আমার গায়ে হাত দিয়ো না প্রদীপ! তোমার স্পর্শও আমার কাছে অশুচি। আমাদের বাড়ীতে তুমি আর এসো না, আমি যে প্রদীপকে জানতাম, ভালবাসতাম, সে মরে গেছে, মরে গেছে!

বন্দনার শেষ কথাগুলো ডানাহীন পাখীর মত ঘুরে বেড়াতে লাগল ঘরের চার দিকে। মাথা হেঁট করে প্রদীপ বেরিয়ে এল।

যাক, শেষ বন্ধনও আলগা হয়ে এল! প্রদীপ এখন সম্পূর্ণ স্বাধীন, কাজ অকাজ, বিলাস আলস্য কোন কিছুর জন্যই তাকে জবাবদিহি করতে হবে না, কারো কাছে।

কিন্তু এই স্বাধীনতা, এই মুক্তি ত তাকে আনন্দ বা তৃপ্তি দিচ্ছে না এতটুকু! দেশ স্বাধীন হলে মানুষের মনে জাগে উল্লাস, আর মানুষ যখন বন্ধনের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি পায় তখন জীবন কেন মনে হয় দুর্ব্বহ?

সে স্থির করল, ভারতবর্ষে আর থাকবে না। এখানকার প্রত্যেকটি পাতা, প্রত্যেকটি ফুল, প্রত্যেকটি মাটির কণার সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে রয়েছে বন্দনের স্মৃতি। যত দিন সে এখানে থাকবে এই সব পুরানো চিহ্ন তাকে করবে উপহাস। তাকে চলে যেতে হবে দূরে, অনেক দূরে, সেখানে অতীতের তীক্ষ্ণ ফলক তাকে প্রতিনিয়ত আঘাত দেবে না।

কোথায় সে যাবে? সে যাবে বৃটেনে, যে বৃটেন ভারতবর্ষকে করে রেখেছে পদানত। সেখানেই সে থাকবে, যত দিন দেশ স্বাধীন না হয়। এটা হবে তার এক প্রকারের শাস্তি। অপরাধের শাস্তি যদি সে গ্রহণ না করে তাহ'লে মনে শান্তি আসবে না কিছুতেই।

কিন্তু পাথেয় জোগাবে কে? যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে, সমুদ্রযাত্রা এখন অপেক্ষাকৃত সহজ, কিন্তু জাহাজের সর্ব্বনিম্ন শ্রেণীর ভাড়াও ত কম নয়!

না, আত্মসম্মান সে বিসর্জ্জন দিয়েছে অনেক আগেই। আর একটু বেশী বিসর্জ্জন দিলে ক্ষতির অঙ্ক নিশ্চয়ই খুব বেশী বাড়বে না।

গায়ত্রীর কাছে চিঠি লিখল সে, তার অভিপ্রায় জানিয়ে। লিখল, আমার উচ্ছৃঙ্খল মনকে কিছুতেই এখানকার আবহাওয়ায় খাপ খাইয়ে নিতে পারছি না, তাই বিলেতে যেতে চাই। এর জন্য প্রয়োজন ভাড়ার টাকা, আর পাসপোর্টের দরখাস্তর উপর মিঃ করের স্বাক্ষর। যদি আমাকে সাহায্য করতে পার চিরঋণী হয়ে থাকব।

গায়ত্রীর জবাব এল ফেরৎ ডাকে। লিখল, যদিও সে প্রদীপের এই সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ অনুমোদন করছে না তবু বাধার সৃষ্টি সে করবে না। তাই ইনসিওর করে হাজার টাকার ড্রাফ্‌ট তাকে পাঠান হল, সে যেন নিঃসঙ্কোচে ঋণ হিসাবে তা গ্রহণ করে। তাছাড়া পাসপোর্ট-এর জন্য তার দরখাস্ত যেন সে অবিলম্বে পাঠিয়ে দেয়। মিঃ কর তাতে স্বাক্ষর করতে রাজী হয়েছেন। আর বিলেতে পৌঁছে প্রদীপ যেন চিঠি লেখে এবং ভবিষ্যতে টাকার প্রয়োজন হলে তাকে যেন জানায়। কতদূর সে সাহায্য করতে পারবে এখন বলতে পারে না, তবে যথাসাধ্য চেষ্টা সে করবে।

গায়ত্রীর চিঠি পেয়ে প্রদীপের চোখ ছল-ছল করে উঠল। পাসপোর্টের দরখাস্তের সঙ্গে যে চিঠি সে লিখল তার মধ্যে অন্যান্য কথার মধ্যে এই কথাটি ছিল: আই-সি-এস-এর গৃহিণীর ভাই হওয়াতে যে কত সুবিধে তা আজ আবার বুঝতে পারলাম, দিদি!

ছেচল্লিশ সালের মার্চ্চ মাসে প্রদীপ যখন কলকাতা থেকে একটা মালবাহী জাহাজে উঠল, তখন ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দেবার প্রস্তাব নিয়ে বৃটিশ ক্যাবিনেটের তিন জন মহারথী এসে পৌঁছেচেন দিল্লীতে। প্রদীপের কেবলই মনে হতে লাগল, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা উৎসবে অংশ গ্রহণ করবার সৌভাগ্য তার হল না। দেশ যখন সত্যি স্বাধীন হবে, সে থাকবে অনেক দূরে, সম্পূর্ণ অপরিচিত এক পরিবেশে। এটা পরিহাস ছাড়া আর কি? ভবিষ্যতের গর্ভে তার জন্যে নিয়তির আরও কত বিচিত্র পরিহাস সঞ্চিত রয়েছে, কে জানে?

[প্রথম পর্ব্ব সমাপ্ত: ক্রমশঃ।

যেদিন ফুটলো বিয়ের ফুল

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

বিবি

বলে, শোনো ললি, ভালো কথা বলি, মাসীমা এখুনি বলছিলেন,
কাশো নাকি তুমি সারারাত্তির, কাশলেই বুকে মাইন্ড পেন।
সাবধানে থেকো, চলছে এখন ভীষণ 'ফ্লু'এর এপিডেমিক,
কবিতা লিখলে রেহাই তো নেই, অসাবধানকে ধরবে ঠিক।
আজকালকার মেয়েগুলো সব, কথা শোনে না ভুলেও কারুর,
অবাধ্যতার ফল ভুগছে, খুব জ্বর কাল হয়েছে চাকর।
বাবাকে গলাটা বুকটা দেখিয়ে প্রেসকৃপসন লিখিয়ে নিও,
তুমি ভুলে যাবে, ওষুধ আনার ভারটা না হয় আমাকে দিও।

হাসি মনে মনে, ডাক্তারবাবু, কাঁচা সর্দিতে উথলে উঠে,
উনুনে বসানো কেটলির বুকে, জলের মতন উঠছে ফুটে।
সেদিন তো ছাতে আমি একলাই, পেছুন ফিরেই চমকে দেখি,
ফিরিঙ্গি বেশে নিখিলেশ রায়, বুদ্ধি তো নেই, আস্ত ঢেঁকি।
বললে, একটা কবিতার বই, প্রেমের কবিতা, দিতে কি পারো,
কিম্বা কোনো সে অতীতের গাথা, অবশ্য কি মঞ্জুডারো?
বললে, ললিতা, ডাক নাম ধরে, খুব ভালো লাগে ডাকতে ললি,
কিছুদিন ধরে খুঁজছি সুযোগ, আজ কথাটাকে তোমায় বলি।

পেয়েছে সুযোগ সত্যি সত্যি, মা কাকীমা তো বাড়ীতে নেই,
সিকে ছিঁড়ে গেছে, ছিটকে বেরাল, এসেছে শব্দ শুনেছে যেই।
বললুম তাকে, চোখ নিচু করে, আমাকে বলার কি-ই বা আছে?
টিপ-টিপ করে বুকের ভেতর, দক্ষিণ চোখ উথলে নাচে।
বললুম, তুমি নিচে চলে যাও, কেউ যদি আসে হঠাৎ ছাতে,
নিখিলেশ রায়, বলে হায় হায়, বুদ্ধি কি নেই আমার মাথে?
বলতে এসেছি যে কথা, সেটা তো শক্তিই নেই মুখে বলার
এই চিঠিতেই প্যাক্ করা আছে, পালভারাইজ্‌ড্ বুকটা আমার।

চমকে যেমন ছুটে এসেছিল, বিদ্যুৎ যেন আকাশ বুকে,
তাড়াতাড়ি করে নিয়ে চলে গেল, দপ করা নেবা মলিন মুখে।
ব্লাউজেতে পুরি বন্ধ চিঠিটা, ধক্-ধক্ করে যেখানে বুক,
যেখানে পৌঁছে, কবিরা বলেন, চিঠিদের নাকি পরম সুখ।
হায় ওগো হায়, নিখিলেশ রায়, তুমি তো জানো না আমার মাকে,
গোঁড়া নেবু জানো, তার চেয়ে গোঁড়া, সকলের সেরা গোড়ার ঝাঁকে।
নিখিলেশ রায়, তোমরা বদ্যি, আমরা হলুম জাত বামুন,
তেল আর জলে মিশ খাবে না তো, চিনির মধ্যে কি হবে নুণ?

প্রতিমা গিয়েছে জিজ্ঞেস করে, বল, কতো দিনে পাবো খবর,
নিখিল ললিতা পালিয়ে গিয়েছে, লজ্জা সরমে দিয়ে কবর?
বলে গেছে তোরা সিমলায় যাস, প্রেমের মুকুট মাথায় পরে,
যত ছি-ছি আর টি-টি দিকে দিকে, সব কিছু যাবে দুদিনে মরে।

ছি-ছি ফুল তার মালাটা গলায়, টি-টি জুতো দিয়ে পা দুটো ঢাকা,
প্রেমে জ্বল-জ্বল রাজা ও রাণীকে, জয়টীকা দেবে পূর্ণ রাকা।
বুঝবি সেদিন জাতকুলমান, সব অপমান, প্রেমের কাছে,
প্রেমের মতন এমন শক্তি পৃথিবীতে কিছু আর কি আছে?

চিঠিতে লিখেছে নিখিলেশ রায়, প্রেমের মামুলি বুকনিগুলো,
সারা প্রাণ হায়, ললি দগধায়, যেন দাউ-দাউ জ্বলছে চুলো।
লিখেছে, তুমি তো কিছুই বোঝো না, কতো যে কামনা আমার মনে,
কতো মেয়ে আছে, ভালো লাগে নাকো, মোটেই আমার অন্তজনে।
তোমাকেই সব দিয়ে তো দিয়েছি, না নিলে সবটা ফেলেই দিও,
তারপর যদি দয়া হয় মনে, ধুলো থেকে ফের কুড়িয়ে নিও।
তুমি সুন্দর, স্বপনেতে গড়া, অনন্যা তুমি আমার চোখে,
তোমাকে দেখেছি গোপন গহনে, তোমার বসতি স্বপনলোকে।

হায়, ওগো হায়, নিখিলেশ রায়, কবিত্ব করে কি হবে বলো,
তুমি আমি রবো চিরদিন দূরে, মিছে চিঠি লিখে কি ফল হোলো?
তরুণের প্রেম প্রথম পেয়েছি, উথলে উঠেছে আমারও নদী,
হেলা করিনিকো তোমার প্রেমকে, এ কথাটা তুমি বুঝতে যদি।
বুঝতেই যদি যে নারী পেয়েছে, ভালোবাসা তার প্রথম স্বাদ,
তার বুকে ফোঁসে কামনা নাগিনী, হত্যা করে সে নিরপরাধ।
হ্যামলেট তার মা যেমন করে হনন করলো প্রেমের তরে,
তেমনিতো পারি, নয় বেঁচে যাই, পরফিরিয়ার মতন মরে।

সুন্দর করে লিখে পাঠালুম, কবিতার বই তার ভেতর,
কাগজে ও খামে মাখিয়ে দিলুম, বেশ করে কিছু যুঁই-আতর।
লিখলুম, ওর প্রেম চিরদিন ধ্রুব তারকার ছদ্মবেশে,
ললিতাকে তার পথ দেখাবেই দূর নীলিমায় স্নিগ্ধ হেসে।
লিখলুম, শোনো, যদি পারতুম, দেখতে তখন অন্তরূপ,
জ্বলতো তোমার মন্দিরেতেই, আমার বুকের গন্ধধূপ।
উপায়তো নেই, আমি সব জানি, সম্ভব নয় দু'জনে মেলা,
ললিতাকে তুমি মার্জনা কোরো, মনে করে নিও এ শুধু খেলা।

চিঠিটা পাঠাবো ইচ্ছে তো খুব, কিছুতে পারিনি পাঠিয়ে দিতে,
অথচ বলেছি পাঠিয়ে দিয়েছি, তাই লিখি ভুল শুধরে নিতে।
মনে বলে কেন তাড়াতাড়ি করো, মিছে কোরো নাকো নিজেকে টিপ,
তেষ্টায় প্রাণ ছটফট করে, হঠাৎ নিও না আঁধারে লিপ।
দেখ না ক'দিন না চিঠি লিখলে, নিখিলেশ ফের লিখবে চিঠি,
বাড়বে তোমার কিছু প্রেসটিজ, তবু কিছু হবে সিকিউরিটি।
চিঠিটা পেয়েই জবাব পাঠাবে, কেন গায়ে পড়া ভাব দেখাও,
ছুটে চলে যাবে তু করে ডাকলে, কি বেহায়া মেয়ে, তাই কি চাও?

বাঁকা ভুরু

এক দুই করে পাঁচ দিন গেল, তিন পাঁচে ঠিক পনেরো বার,
আমাদের বাড়ী নিখিলেশ এলো, পায় না নাগাল তবু আমার।
মার কাছে নয় কাকীমার পাশে, আমি সাবধানে এড়িয়ে চলি,
বক্ষানদীর ও গেরুয়া জল, আমি সেই স্রোতে লুকোনো পলি।
আমাকেই নিয়ে নেচে বেড়াচ্ছে, তবু অবিরাম হাতড়ে মরে,
এ যেন নিজের কানেতে লাগিয়ে, চশমাটা খোঁজা পৃথিবী ভরে।
মনোমিলেবিক হ্যাঁ হুঁ শুধু বলি, না বললে নয় কথা যখন,
তাকালেই দেখি তাকিয়েই আছে, চোখে-মুখে জ্বলে ভীষণ পণ।

এর মাঝে বুঝি দু'দিনের দিন, দুঃসাহসের অন্ত নেই,
আমার টেবিলে বই রেখে গেছে, খামে-ভরা চিঠি কেতাবে সেই।
লিখেছে ললিতা, বুঝতে পেরেছি, আমাকে তুমি তো চাও না মোটে,
চিঠি লিখলে না, কাছে এলে কথা একটা ফোটে না তোমার ঠোঁটে।
আমি পাছে ফের বিরক্ত করি প্ল্যান করে বেশ এড়িয়ে চলো,
কাল হয়েছিল একলাই দেখা, তক্ষুণি ছুটে পালানো হ'ল,
মা কাকীমাকে র‍্যাপারের মত, দিন-রাত গায়ে জড়িয়ে রাখো,
কখন আসবো, সেই ভয়ে বুঝি গায়ে কাঁটা দেয় শিউরে থাকো?

চিঠিটা আবার ব্লাউজেতে পুরে, ভয়ে থর-থর কেঁপেই মরি,
কাকীমা এসেই বললেন, ললি, ওটা কার বই 'ম্যাডাম সরি'?
ভাগ্যে দেখেনি হাতে করে বই, চিঠিটা তা'হলে দেখতে পেতো,
ম্যাডাম তা'হলে 'সরি' কেন শুধু 'ভেরি সরি' হয়ে আফিং খেতো।
প্রেমে পড়ে নাকি ব্যালান্স থাকে না, হ্রস্ব দীর্ঘ থাকে না জ্ঞান,
শাড়ীর বদলে হাফ প্যান্ট পরে, কামিজ পরতে সেমিজে টান।
কিন্তু এ যেন ভারী বাড়াবাড়ি, নিখিলেশ সব ছাড়িয়ে সীমা,
দক্ষ কশাই ছুরি হাতে করে নারীর লাজকে করছে কিমা।

তবু তো একথা সকলেই জানে, মেয়েদের মন ওটাই চায়,
দুঃসাহসী ও ডানপিটেদের সব মেয়ে দেয় মালা গলায়।
এক কথাতেই বেশ সহজেই, যে পারে আঁচড়ে কামড়ে নিতে,
ঝড়ের মতন এক ঝাপটায়, সব আবরণ সরিয়ে দিতে।
ভূমিকা না করে, বুকেতে যে পারে, সোজা নিয়ে নিতে হেঁচকা টানে,
মুখে যা বলুক, মেয়েদের মন উল্টে তাদের পোষই মানে।
মূর্তিধ্বংসী, আই কোনো ক্লাস্ট, সব কিছু যারা ভাঙতে পারে,
তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় মেয়েরা ইচ্ছে করেই হারে।

দেখতে পারতো কাকীমা চিঠিটা, তার পরই যা কাণ্ড হ'ত,
দাবড়ীর সেরা বাবড়ী গেলা তো ললিতাকে দুই জায়েতে যত।
আরো আছে, শেষ ওখানেই নয়, নিখিলেশকেও ডাকিয়ে এনে,
যত বাছা বাছা অপমানগুলো, সব দিতো তার মাথায় হেনে।
মা তো নিশ্চয় বলতো আমাকে, এক্ষুণি বেরো এখান থেকে,
কুলে কালি তুই দিলিই যখন, ডুবে মর গিয়ে এক্ষুণি লেকে।
হয়তো বলতো নিখিলেশকেও, ভদ্রলোকের এই ব্যবহার।
দুশ্চরিত্র এতো বড়ো তুমি, আমাদের বাড়ী এসো না আর।

তৃতীয় অঙ্কে ক্রাইসিশ আসে, নিখিলেশ বুঝি মরিয়া হয়ে,
কোন উপায়েতে লিখে পাঠাতোই, এতো অপমান কি হবে সয়ে?
হাওড়ায় গিয়ে আপার ক্লাশের বুকিং-অফিস, তার সমুখে,
সাড়ে ছ'টা থেকে দাঁড়িয়ে থাকবো, মেঘ-দুর-দুর বিধুর বুকে।
সাড়ে সাতটায় পাঞ্জাব মেল, পেয়ে তো গিয়েছি একটা 'কুপে,'
এক কাপড়েই চলে এসো তুমি, কোন অছিলায় বেরিয়ে চুপে।
বেডিং আনার প্রয়োজন নেই, কিনেছি বিছানা আমি নতুন,
আর যত কিছু চাই রাস্তায়, নখের পালিশ স্নানের নুন।

তারপর ছোটে হু-হু-হু-হু করে ধ্বক-ধ্বক বুকে প্রেমের মেল,
প্রথম লজ্জা ভাঙবে আমার, নিখিলেশ রায় ছিঁড়ে লেবেল।
অনূঢ়া মেয়েকে ছুঁতে নেই নাকি, কে মানে সেকথা বলো সে-রাতে,
পুরুষের হাত গায়ে পড়ে যদি, কুমারীর মহাপাতক তাতে।
বিয়ের জন্যে অপেক্ষা কোরো, তার পর কিছু নেইকো মানা,
এসব তো হ'ল মামুলি লেবেল, অনেক দিনের ছাপিয়ে আনা।
সাহসী পুরুষ বুকে টেনে নেবে, আমি মুখে বলি না, না, না, যতো,
সত্যি কথাটা বলতো ললিতা, মুখে লাজ পেটে খিদেটা কতো?

বড়ো মায়া লাগে, দু'দিন পরেই দিলুম একটা সুযোগ ওকে,
ওদের বাড়ীতে গেলুম একলা, পা দুটো টলছে নেশার ঝোঁকে।
তাকাতে পারি না, তবু তাকালুম, বললুম, দিতে এসেছি বই,
সবটা পড়েছি, তার পর জিবে এনাসৃথেসিয়া, কি কথা কই!
মুখ আর মন, সব শরীরটা জোট বেঁধে গেছে সুতোর মতো,
একটা ছাড়াতে বাকীটা জড়ায়, যতো খুঁজি কথা, ঘামছি ততো।
নিখিলেশ বলে সবটা পড়েছো, ম্যাডাম সরির কপাল ভালো,
এখন জ্বলেছে দেশলাই শুধু, আসল আলোটা এবার জ্বালো।

পড়ার তো শুধু বইটাই নয়, খামে-ভরা কিছু ছিল তো হায়,
ওগো নিষ্ঠুর, প্রথম খামের কান্না-বাহন দ্বিতীয়টায়।
কি যে তুমি চাও, কেবল কাঁদাবে, পাথর দিয়ে কি তৈরী মন,
হাজার ধনুক এ বুকে ভেঙেছে, আর ক' হাজার তোমার পণ?
তবু দয়া করে এসেছো যে আজ, নিঃশ্বাস নিলে আমার কাছে,
তবু চোখ তুলে দাঁড়ালে একটু, আমার ময়ূর উথলে নাচে।
জিজ্ঞেস করি কোথায় জবাব, পর পর দুটো চিঠি দিলুম,
ভালোবাসা, তার সোনার কাঠিটা চোখে ছোঁয়ালুম, এখনো ঘুম?

নিখিলের মা তো শুধোলেন এসে, ললিতা এখন আছো কেমন?
বাঁচলুম, ঐ প্রেমের নাট্যে ঝপ করে হল ড্রপ পতন।
কাশিটা কমেছে? বুকের ব্যথাটা? আর কোন কথা বলবো ওঁকে
আমি বললুম, ন', না, ভালো আছি, শুকনো গলায় তিনটে ঢোকে
অনেক চেষ্টা করে তাকালুম, নিখিলের দিকে দু'-একবার,
ম্যাডাম সরিকে হাতে নিয়ে আছে, হতাশার ভাব মুখেতে তার।
দেখতে পায়নি, জবাব লিখেছি একটা লাইন : আশা তো নিল
অদৃষ্ট নয় অনুকূল মোটে, খেয়ে চুরি করো এবার কিল।

মধুর গভীর সুরেতে বাজছে আমাদের বাড়ী ক'দিন ধরে,
দীক্ষাগুরু সে মা ও কাকীমার এসেছেন বহু দিনের পরে।
ভৈরবী তিনি শ্রীশ্রীযোগমায়া, আশ্রম তাঁর আলমোড়ায়,
শীতকালে প্রায় কাশীতে থাকেন, এবার এলেন কোলকাতায়।
যেখানে ভক্ত সেথা ভগবান, শিষ্যারা হেথা ভক্তিমতী,
তাই অহেতুকী করুণার বশে, মন্ত্রগুরুর এখানে গতি।
ধর্মকথা ও কীর্তনরত অনেক ভক্ত সমাবৃত
সমাধি আসনে শ্রীশ্রীযোগমায়া থাকেন ব্রহ্মপদাশ্রিত।

আমার মনও বদলে গিয়েছে, ভাবছি সুখের কামনা ছেড়ে,
আলমোড়া গিয়ে গুরুমার পাশে বসবে ধ্যানের আসন গেড়ে।
জৈবজীবন, মাংসল মন, ঐ সব নিয়ে ঝামেলা মেলা,
নিশ্চয় আমি শেষ করে দেবো চিরদিন তরে এ বোকা খেলা।
কি হ'বে মিথ্যে দাসত্ব করে, বিয়ে করা মানে গোলামি করা,
ভোগের জীবন ঘায়ে ঘায়ে পচা, কেবল রক্ত-পুঁযেই ভরা।
তারপর যিনি শ্রীস্বামী হবেন, রোজ নাও তাঁর পায়ের ধূলো,
পরমারাধ্য পতিদেবতার পা ছাড়া নেইকো নারীর চুলো।

নামকীর্তন সকাল-সন্ধ্যে, নিখিলেশ রায় তারই ফাঁকে,
আরো একখানা চিঠি রেখে গেছে, প্রণাম করেই শ্রীশ্রীমাকে।
লিখেছে, একটা লাইন লিখেই, নিষ্ঠুরতার শেষ কথায়,
পূর্ণচ্ছেদ কি টেনে দিলে তুমি, বজ্র হানলে মোর মাথায়?
আশা করবার কিছু বুঝি নেই, এতোটুকু আশা ভালোবাসার?
তা' ছাড়া কিছুতো চাইনাকো আমি, নাই বা পড়লো দান পাশার
মনে মনে শুধু এই কথা ছিল, ললি বুঝে নেবে আমার কথা,
আশা ছিল কিছু সহানুভূতির, স্বতোচ্ছ্বসিত মদোদ্ধতা।

আবার লিখেছে, তোমাদের বাড়ী, কীর্তনে জাগে পরম ভূমা,
তবু ভেবে দেখো, হিমালয়ে বসে কি যে চেয়েছিল তাপসী উমা।
পুরুষের তরে তপস্যারত অপর্ণা হ'ল উপোস করে,
কতো দুর্দশা শকুন্তলার লম্পট তার স্বামীর তরে।
জিজ্ঞেস কোরো গুরুমাকে তুমি, ত্যাগ করে সব সবাই যদি,
সূর্য চন্দ্র আর কি উঠবে, আর কি বইবে সাগর নদী?
ললি, তুমি সব ত্যাগ করে দিও, আগে ভোগ করো, এইটে রীতি,
ভোগ আছে বলে তাই যোগ আছে, মায়াবন্ধনে পরম স্থিতি।

তা' ছাড়া তোমার ভালোর জন্যে, বলছি তোমায়, খেয়াল রেখো,
গাঁজার ধোঁয়া ও ধর্ম-টর্ম, কন্টাজিয়াস সামলে থেকো।
আজকালকার মেয়ে তুমি ললি, বিশেষ হাইলি-এডুকেটেড,
ন'হাত মাটীতে পুঁতে ফেলে দিও, মাটনের মতো যা কিছু ডেড্।
কবে কোন দিন মান করেছিল বৃন্দাবনের কিশোরী রাধা,
যীশু চড়ে যান জেরুজালেমেতে, কোন পবিত্র মহান গাধা।
ওগুলো সেকেলে পুরোনো কাহিনী, ও নিয়ে কেন যে ফেটিস এতো,
বুঝতুম যদি ভক্তরা সব সিদ্ধি-গাঁজার প্যাটিস খেতো।

ভয় ওর পাছে যদি যোগমায়া ললির মনকে করেন চুরি,
নিখিলেশ রায় বড়ো ব্যথা পায়, শুধু মনে মনে শাণায় ছুরি।
সেদিন কি হ'ল, হল ঘরে চলে, মান মাথুরের করুণ গান,
ভাঁড়ার ঘরেতে আর কেউ নেই, সেইখানে গেছি সাজতে পান।
হঠাৎ এসেছে মত্ত নিখিল, একেবারে বুকে জড়িয়ে ধরে,
বললে, কিছুতে ছেড়ে দেবো নাকো, যদি যাই যাবো, এখানে মরে।
চিঠি যে দিলুম, জবাব কোথায়? বলো ললি, তুমি হবে আমার,
ঠেলে সরালুম, বললুম, ছি, ছি, লজ্জা সরম নেই তোমার?

ঝিন-ঝিন করে ঘাম দেয় গায়ে, থর-থর করে কেঁপেই মরি,
প্রথম পুরুষ জড়িয়ে ধরেছে, প্রথম লজ্জা দিগম্বরী।
কি সাহস দেখো, অনুমতি বিনা, বুকের ওপর টেনেই নিলে,
যতো নিবারণ করতে গেলুম, ঠোঁট দুটো যেন জ্বালিয়ে দিলে।
এসে পড়েনিকো, সে ঘরে তখন কোন লোকজন ভাগ্যে কেউ,
তা' হলে ভাসাতো মাথুরের পালা, ঘোলাটে রং-এর নোংরা ঢেউ।
সময় এসেছে সোজা কথাটাকে, বেশ ভালো করে বলে দেবার,
আর যদি আসে কখনো এখানে, চাকরের হাতে খাবে প্রহার।

ঘুমোতে পারিনি সারা রাত্তির, থেকে থেকে শুধু কান্না পায়,
এক দুই করে ঘড়িটা শুনেছি, সমস্ত রাত তাকিয়ে ঠায়।
কোন স্পর্দ্ধায় নিখিলেশ এসে এতো অপমান করে যে গেলো,
কতো ভালগার, এত অধিকার, কবে কার কাছে কোথায় পেলো?
ছটফট করি কাকীমার পাশে, কাকীমা বলেন কি হল ললি,
শুনতে পেলি তো চারটে বাজলো, গুড়াকেশ তুই আজ কি হলি?
দুবার দেখেছি, জেগেই আছিস, গা গরম, জ্বর এলো কি তোর?
গায়ে ও মাথায় হাত বুলোলেন, বললেন, ঘুমো রাত যে ভোর।

তবু কানে কানে বলার মতন, একটা তো আছে কথা গোপন,
সেটা শুধু জানে প্রেমের দেবতা, সেটা শুধু জানে আমার মন।
সেটা শুধু মোর অথই অতলে রক্তপ্রবাল কৌটো ভরা,
সাতটা রাজার রতন মাণিক, প্রথম প্রেমের স্বপনে গড়া।
মনে পড়ে যায় প্রতিমার কথা, দেহ-মন চায় কেবল লুঠ,
জোর করে টানা পুরুষের বুকে, জোরে ঠোঁটে চাপা ওষ্ঠপুট।
ওপর ওপর যতো ফণা ধরি, ফোঁস ফোঁস করি রাগের ভরে,
বুকের ভেতরে কামনা নাগিনী, কি যেন নেশায় এলিয়ে পড়ে।

পাঁচটা বাজলো ছেঁড়া ছেঁড়া ভোরে ছেঁড়া ছেঁড়া ঘুম চোখে তখন,
স্বপ্ন দেখছি, ফিরে এসেছে সে সন্ধ্যেবেলার পরম ক্ষণ।
নিখিলেশ রায় জোর করে টেনে জড়িয়ে ধরেছে বুকের পরে,
ঠোঁট দুটো তার আমার দু' ঠোঁটে দু'চোখে লালসা গড়িয়ে পড়ে।
একি অদ্ভুত, আমিও দিলুম ঠোঁট দিয়ে তার আদরে সাড়া,
বললুম তাকে, কবে শেষ হবে আমার জীবনে অন্ধকারা?
কবে চলে যাবো, তুমি আর আমি দু'জনে স্বাধীন জীবন পেয়ে?
কথা বলে নাকো নিখিলেশ রায়, হু হু করে জল দু' চোখ বেয়ে।

জেগে উঠলুম, দলিতা নাগিনী, ফণা ধরে ওঠে ভীষণ রেগে,
শুধু মনে হয় সব হারিয়েছি, অশুচি হ'য়েছি ময়লা লেগে।
মনে করলুম, চিঠি লিখে তাকে, কড়া কথা ব'লে কোরবো মানা,
কোনও দিন আর আমাদের বাড়ী আসে না দেখাতে ও মুখখানা।
ভাবলুম, তাকে লিখে জানাবোই, এত অসভ্য বুঝিনি আগে,
মোট কথা, তাকে ঠিক কি লিখবো ভেবেই পাই না প্রবল রাগে।
ঠিক করলুম, মাকে বলি, তুমি কখনো যেও না ওদের বাড়ী,
বড়ো চাল দেয় নিখিলেশ রায়, ওরা বড়ো লোক অহঙ্কারী।

দিন কাটছেই, শ্রীশ্রীযোগমায়া শমদম আর ত্যাগের বাণী,
ডেকে ডেকে কেন আমাকে বলেন, আমি ও সবের কি-ই বা জানি।
বলেন, জীবন সবটা ত্যাগের, সন্তান তরে শুধু পুরুষ,
মেও যদি থাকে মা হবার সাধ, ঐ ধরণের কথা পরুষ।
বিয়ে কোরো নাকো কামের জন্যে, বর্জন করো জীবনে কাম,
কাম কতোটুকু, সারা পৃথিবীতে রাজত্ব করে কেবল রাম।
মাকে বললেন, বিয়ে দাও ওর, সংযমী কোন ছেলেকে বেছে,
পরম কারণে যার বিশ্বাস, যে শুধু কালীতে রয়েছে বেঁচে।

ক'দিন উঠেছি একলাই ছাতে, নিখিলেশকে তো যায় না দেখা,
লজ্জা পেয়েছে নিশ্চয় খুব, অনুতাপে জ্বলে নিজেই একা।
হঠাৎ হারালো সংযম সব, ব্যবহার করে নীচ নেহাৎ,
এখন একলা লজ্জায় মরে, নিজে কামড়ায় নিজের হাত।
যা' হবার হ'ল, তবু তো ললিতা, নিখিলেশকেও করেছে ক্ষমা,
রূপ-যৌবন ধন্য হয়েছে, হয়ে তরুণের স্পর্শরমা।
ভুল করেছে নিশ্চয় ও তো, সিরিয়াস তবু নয়কো কিছু,
তরুণ প্রেমিক কে আছে না ক'রে ললিতার কাছে নিজেকে নিচু।

কাকীমার কিছু লিবারেল মন, তার কাছে গিয়ে ধন্না দিয়ে,
বললুম কথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে, সীতার হয়েছে বেজাতে বিয়ে।
কলেজেতে পড়ে সীতা হালদার, বামুনের মেয়ে বদ্যি বরে,
বাপ মার মত নিয়ে বিয়ে করে, বেশ সুখে আছে শ্বশুরঘরে।
ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে কাকীমা বললেন, ললি, কি তুই চাস ?
বললুম, কিছু আমি তো চাই না, সমাজের ঢিলে হচ্ছে রাশ।
রেগে বললেন, আজকালকার ছেলেমেয়েদের আছেই জানা,
ফিরিঙ্গি ঢং আমরা মানি না, এখানে অচল সাহেবিয়ানা।

এইবার বুঝি ললিতার পালা, লিখে ছিঁড়লুম অনেক চিঠি,
শেষে লিখলুম, অন্যায় করে তুমি হয়ে গেছো সেলিব্রিটি।
ওরকম করা উচিত হয়নি, এ বিষয়ে নেই কোন ডাউট,
দেহ তার কোন মূল্যই নেই, মন যদি থাকে উইদাউট।
শুধু অনুরোধ এইটুকু করি, অমনটা তুমি কোরো না আর,
তবু নিখিলেশ দুঃখ্য কোরো না, রাগ পড়ে গেছে সব আমার ;
কেন মিছেমিছে ঐ সব করা, কেবল বাড়ানো মিথ্যে জ্বালা,
কে জানে কোথায় চলে যেতে হ'বে, তোমার গলায় না দিয়ে মালা ॥

তবু ভাবলুম, পাঠাবো না চিঠি, আস্কারা পেয়ে যাবে নিখিল,
চারটে দেয়ালে লুকিয়ে থাকবো, সব দরজায় লাগিয়ে খিল।
একবার ওতো গণ্ডী পেরুলো, খুব সাবধানে থাকতে হ'বে,
যদি কারু চোখ পড়ে যায় তবে, আর কি বাড়ীতে জায়গা রবে ?
তা' ছাড়া মিলন সম্ভব নয়, যতই উথলে উঠুক নদী,
মা কাকীমার মত তো হবে না, ফেরারেতে থাকে দুনিয়া যদি ;
তা' ছাড়া ঐ যে অসভ্য লোক, শেষটা করবে কাণ্ড কি যে,
তার চেয়ে ভালো আপনার মান, বাঁচিয়ে রাখাটা আপনি নিজে ;

নিখিলেশ রায় লজ্জা পেয়েছে, মাড়ায় না ভুলে আমার ছায়া,
আর আসে নাকো আমাদের বাড়ী, কাটিয়ে ফেলেছে আগের মায়া।
মা তো করেছেন নেমন্তন্ন, তিন দিন ওকে প্রসাদ খেতে,
আসেনি মিথ্যে অজুহাত করে, তিন দিনই কোথা হয়েছে যেতে।
সত্যি কথাটা কেন বোলবো না, ললিতার বুক খাঁ-খাঁ-ই করে,
রাগ হয় মনে অতো সতীত্ব, কি হবে কেলেঙ্কারির পরে ?
মনে হয় ছুটে ডেকে আনি, বলি, এসো, আমি সব ভুলেই গেছি,
মা বসে আছেন কড়াটা চড়িয়ে শুকিয়ে যাচ্ছে লুচির নেচি।

হায় নিখিলেশ, দাগ দিয়ে গেলে, চিরদিন মনে থাকবে আঁকা,
তার পর তুমি কোথায় থাকবে, কোথায় যে হ'বে আমার থাকা।
যদি কোন দিন ঘর খুঁজে পাই, যদি কোন দিন নিজের ঘর,
আর এক রাজা নিয়ে নেয় যদি, সব মন প্রাণ দেহের কর।
যদি এক দিন আচমকা আসো, হয় এক দিন আবার দেখা,
আবার ফুটবে দু'জনার মনে সেই সন্ধ্যের রক্ত-লেখা।
হবে কি সেদিন জোর করে হাসি, ফুটিয়ে তুলতে আমার মুখে ?
হয়তো তখন মুখটা লুকোবো, তোমার সম্মুখে পরের বুকে।

শেষ

[রাসেল-স্কয়ার—অক্টোবর ১৯৫১]

হিমানীশ গোস্বামী

রয়্যাল হোটেলের জানালা দিয়ে দেখা যায় লণ্ডন। অর্থাৎ লণ্ডনের একটি পাড়ার একটি অংশ। জানালা দিয়ে মুখ বার করলে ঠাণ্ডা হাওয়া লাগে মুখে—ভালই লাগে। একটু কুয়াসার আভাস। সেই কুয়াসা ভেদ ক'রেও চোখে পড়ে ওলাকার রাস্তা এবং গতি। বাস, ট্যাক্সি, মোটরগাড়ি ছুটে চলেছে। ছুটে চলবার প্রতিযোগিতা, সঙ্গে সঙ্গে রাস্তার আলোর হুঁশিয়ারী, পুলিসের ব্যস্ততা, লোকেদের রাস্তা পারাপার। এই প্রথম দিনের লণ্ডন। লণ্ডন কেমন জায়গা? আমাদের বন্ধুদের বর্ণনা থেকে যতটুকু বোঝা গিয়েছিল লণ্ডনের?—"না হে, বন্ধুরা যা বলেছে সে রকম মোটেই নয়।" আমার বন্ধু পুলক বসু ঘোষণা করলো জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে। ছায়ার রাজ্য—রোদ নেই, লোকেরা ছুটে চলেছে। পাঁচতলার উপর থেকে লোকেদের বেশ ক্ষুদ্র মনে হয়। খানিক পর বন্ধু বললো, জানো বোধ হয় দার্শনিক ফ্রেডরিক নীয়টশে বলেছেন, "সুখ ব'লে কোনো বস্তু নেই, কিন্তু কেবল ইংরেজরাই তার সন্ধান ক'রে?"

আমি বললাম, "কথাটা মোটেই জানা ছিল না—কিন্তু লণ্ডনের দিকে তাকিয়ে ইংরেজদের খুঁজবার চেষ্টা ক'রো না—ঠ'কে যাবে, নান্নুদার কথা মনে নেই, তিনি বলেছিলেন, লণ্ডনে জার্মান, ইটালিয়ান, চীনে, জাপানী, বার্মিজ, সিলোনিজ, মরিশাসবাসী, ভারতীয়, ফরাসী, পোলিশ, এমন কি গণ্ডায়-গণ্ডায় রাশিয়ানও চোখে পড়তে পারে, কিন্তু ইংরেজদের দেখা মেলে না। হয়তো তুমি যাদের দেখছ, তাদের কেউই ইংরেজ নয়। হয়তো লণ্ডনে কোনো দিনই ইংরেজ দেখতে পাবে না একটি।"

পুলক বললো, "সে তো নান্নুদার ইম্প্রেশন, তার মূলে কোনো সত্যতা নেই।"

আমি বললাম, "আমরা যতটুকু সময় পাব, ইম্প্রেশনই আমরা নিতে পারব। আমরা চিরকাল ইম্প্রেশনই নিয়ে এসেছি। ইম্প্রেশনই সত্য—এ ছাড়া আর কিছুই সত্য নয়।" পুলক আকাশের দিকে তাকালো।

ছাই রঙের আকাশ। অর্থাৎ আকাশ চোখে পড়ে না, ছাইটাকেই চোখে পড়ে। কুয়াসার সঙ্গে মেশানো ছাই-এর রাশি। তার সঙ্গে মিলিয়ে যেন বাড়িগুলোর রঙ—ছাই রঙের। মানুষের পোষাক—ছাই রঙের, মানুষের ছাতা—ছাই রঙের, এমন কি জানালা দিয়ে দু-একটি গাছ যা দেখতে পেলাম, মনে হল তার পাতাগুলিও ছাই রঙের।

এই আশ্চর্য ছাই-এর রঙের দেশ, দেখে বোধ হয় একঘেয়েমি লাগে। একঘেয়েমি লাগতে বাধ্য। একটু লক্ষ্য করে দেখলাম, লণ্ডনের যেটুকু চোখে পড়ে, চিমনি—সমস্ত বাড়ীর উপরে চিমনির রাশি, আর প্রায় প্রতিটি থেকে বেরুচ্ছে কয়লার ধোঁয়া। লণ্ডনে ঘর গরম করবার জন্য বিদ্যুতের ব্যবহার কম। অর্থাৎ শহরটা এখনো পুরোনোই রয়ে গেল।

পুরোনো, পুরোনো…লণ্ডন। আর দেখতে পেলাম, নিচে মোটরগাড়ির সমারোহ, নতুন বেণ্টলি, রোলস রয়েসের শোভাযাত্রা, আর তার সঙ্গে পুরোনো ট্যাক্সির প্রতিযোগিতা। এত পুরোনো সে ট্যাক্সি যে মনে হয় সেগুলো ফেলে দেওয়া চলতে পারে। অথচ তা নয়, লণ্ডনের ট্যাক্সি অমনিভাবেই তৈরি। তার রঙ প্রথম থেকেই ছাই-রঙা, তার চেহারা প্রথম থেকেই কিম্ভূত। হঠাৎ দেখলে মনে হ'তে পারে, বৃটিশ মিউজিয়াম থেকে ঐ গাড়িগুলিকে হঠাৎ বার করে আনা হয়েছে কিউরেটরের দৃষ্টি এড়িয়ে। কিন্তু ভুল ভাঙে। ট্যাক্সি-ড্রাইভার জিজ্ঞেস করলে বুঝিয়ে দেয়, পৃথিবীর মধ্যে সব চাইতে ভাল ট্যাক্সি হল লণ্ডনের ট্যাক্সি, কারণ এই ট্যাক্সিতে পাঁচ জন লোক বসতে পারে, কেবল তাই নয়, দুটো কেবিনট্রাংক এবং তিনটে স্যুটকেস তাতে ঢোকানো চলতে পারে। যাত্রীদের অসুবিধে না করেও। এর যন্ত্রপাতি এত ভাল যে খুব অল্প জায়গাতে গাড়ি ঘোরানো চলতে পারে।

ট্যাক্সি-ড্রাইভারেরা সাধারণত মোটাই হয়। এত মোটা অবশ্য কিছুটা হয় তাদের পোষাকের গুণেও। প্রচুর জামা কোট, মাফলার ইত্যাদি পরে বসে থাকে রাজার মতো। সাধারণত যাত্রীদের জিনিসপত্র নিয়ে সাহায্য তাদের করতে হয় না। তবে প্রয়োজন হলে তাও করতে রাজি—অবশ্য সেই সঙ্গে বকশিসের পরিমাণটাও বাড়বে বলে সে আশা করে। প্রত্যেক বারই ট্যাক্সি-ড্রাইভারেরা বকশিস পায়। সাধারণত ছ পেনি, কিন্তু দূরত্ব বেশি বা জিনিসপত্র বেশি হলে বকশিসের পরিমাণটাও বেড়ে যায়।

ট্যাক্সি যারা চালায় তাদের নিজস্ব ভাষা আছে। ট্যাক্সি-ড্রাইভাররা লণ্ডনের সহস্র সহস্র রাস্তার প্রতিটি মনে রাখে। কেবল তাই নয়, বিখ্যাত ক্লাব, হাসপাতাল, বিখ্যাত বাড়ি, রেস্তোরাঁ পৃথিবীর সমস্ত দেশের রাষ্ট্রদূত-ভবনগুলি—এ সমস্তই তাদের জানতে হয়। এদের পরীক্ষা দিয়ে পাস করতে হয়—তবেই ওদের লাইসেন্স মেলে। বেশ কঠিন পরীক্ষা। তাই গর্ব এদের খুব বেশি। তারা লণ্ডনের আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত জানে। এদের আলাদা ভাষা আছে। এরা একজন আরোহী থাকলে বলে, **Single Pin** আর **Roader** মানে যে যাবে ছ মাইলের বেশি। লণ্ডনের ট্যাক্সি ছ মাইল পর্যন্ত যায় মীটারে, তারপর যেতে হলে একটু দরাদরি করতে হয়। এতে অসুবিধে এই যে, ট্যাক্সি-ড্রাইভারেরাই এতে সব সময়ে জিতে যায়। নতুন ট্যাক্সি-ড্রাইভারদের পুরোনোরা নাম দেয় **Butter Boy**। যারা বকশিস দেয় না—এদের সংখ্যা নিতান্তই কম—তাদের বলে **A Legal**।

আমরা যখন আমাদের হোটেলের পাঁচতলায় ঘর দু'খানিতে (একজনের জন্য একখানা ঘর) একটু গুছিয়ে বসলাম, তখন দেখলাম, ঘর দু'খানি পাশাপাশি এবং দুটি ঘরের মধ্যের দেয়ালে একটি দরজা আছে। হলদে রঙের দরজা—আর ক্রিম রঙের ওয়াল পেপার।

একখানি খাট, পরিপাটি বিছানা। ঘরে একখানি মুখ ধোওয়ার বেসিন—জল সব সময়ে পাওয়া যায়। দু'রকম জল—ঠাণ্ডা এবং গরম। ঠাণ্ডা জলের ব্যবহার হয় যখন কেউ জল খায়। ঘরগুলি খুব আলোকিত নয়। বাইরে আলো থাকলে তবে তো ঘরে আলো হবে। বই ইত্যাদি পড়তে ঘরে আলো জ্বালানোর প্রয়োজন। একটি ওয়ার্ড্রোব রয়েছে ঘরের মধ্যে। এর মধ্যে তিনটি ভাগ—ওপরে টুপি এবং শার্ট রাখবার জায়গা, মাঝখানে জ্যাকেট, কোট এবং ট্রাউজারস রাখবার জায়গা এবং একেবারে তলায় জুতো এবং জুতো পালিসের সরঞ্জাম রাখবার জায়গা। মাথার কাছে একটি ছোট রেডিও। শুনলাম এই হোটেলের সাতশোরও বেশি ঘরের প্রত্যেকটিতে একটি করে রেডিও রয়েছে। রাত্রে শোওয়া এবং ব্রেকফাস্টএর মূল্য সাড়ে আঠারো শিলিং। অন্য খাদ্যের জন্য অতিরিক্ত মূল্য দিতে হয়।

জানালা দিয়ে কিছুক্ষণ দেখবার পর যখন আমরা দেখলাম নতুনত্ব কিছুই আর চোখে পড়ছে না—ট্র্যাফিক আলো বদলাচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে বাস, মোটর গাড়ি থামছে আবার চলছে। তখন আমরা আস্তে আস্তে তলায় নেমে এলাম লিফ্‌টএ ক'রে। লিফটম্যানের চেহারায় কোনো বিশেষত্ব নেই। সাধারণ এবং বৃদ্ধ। পরে দেখেছি লণ্ডনের সমস্ত লিফটম্যানই সাধারণত বৃদ্ধ। এর কারণও আছে। এ কাজ করা অপেক্ষাকৃত সহজ এবং মাইনে কম। সহজে কোনো যুবক এ কাজ করতে চায় না।

আমাদের দু'টি ঘরের জন্য দু'টি আলাদা চাবি। এ চাবির আকার প্রকাণ্ড। এত বড় চাবি যে তা দিয়ে অনায়াসে খণ্ড যুদ্ধ চালানো যেতে পারে। এত বড় চাবি করার উদ্দেশ্য হল এই যে, চাবিটি হোটেলের লোকেদের কাছে জমা দিয়ে যেতে হয়। ছোটো চাবি হারিয়ে যাবার সম্ভাবনা। হোটেলে বিশাল হলঘর। এই ঘরের এক পাশে একটা টেবিল, তার পেছনে হোটেলের কিছু সংখ্যক কর্মচারী ব্যস্ত। এদের কাজ হ'ল টেলিফোন কল এলে সেটি যথাস্থানে পৌঁছে দেওয়া, সে লোক না থাকলে মেসেজ নেওয়া চাবি জমা রাখা এবং দেওয়া, অধিবাসীদের অভিযোগ শোনা এবং তার প্রতিকার করা। এছাড়া এদের আরও কাজ হল চেহারা মনে রাখা। হোটেলে, বিশেষ করে বড় হোটেলে দৈনিক এত লোক আসে যে তাদের মধ্যে দু'-একজন বদ চরিত্রের লোক থাকা আশ্চর্য নয়—এবং পুলিস প্রায়ই হোটেল-কর্মচারীদের শরণাপন্ন হয় কোনো লোককে খুঁজতে বেরিয়ে।

এই হলঘরের মাঝখানে একটা বিশাল টেবিল। টেবিলের এক কোণে গাদা ক'রে রাখা খবরের কাগজ—তিন জাতের। ঈভনিং স্ট্যাণ্ডার্ড, ঈভনিং নিউজ এবং স্টার। তিনটেই 'সান্ধ্য' কাগজ বটে, কিন্তু বেলা সাড়ে দশটায় তাদের প্রথম সংস্করণ ছাপা হয়। সমস্ত দিনে চার-পাঁচবার সংস্করণ বদলানো হয়। সমস্ত সংস্করণে সমস্ত খবর পাওয়া যায় না। তাই বেলা সাড়ে দশটার খবরে হয়তো দেখা গেল কোনো একটি বাড়িতে আগুন জ্বলছে, তার সংবাদ, বেলা চারটের সময় যে কাগজ বেরুলো তাতে দেখা গেল, আগুন নিবে গেছে তার সংবাদ। রাত আটটার সময় সেটি খবরই নয়, পুরোনো ইতিহাস।

এই খবরের কাগজের হেডলাইন আমাদের চোখে পড়লো 'রাসেল স্কয়ার অঞ্চলে নরহত্যা।' সঙ্গে সঙ্গে একটি কাগজ আমরা কিনে ফেললাম। দেড় পেনি—(বা ছ' পয়সা) দাম। কিনে সেটাকে তৎক্ষণাৎ পড়ে ফেলা গেল। একটি লোক সত্যিই খুন হয়েছে রাসেল স্কয়ার অঞ্চলে। অর্থাৎ যে অঞ্চলে আমরা ছিলাম। একটুও ভীত হলাম না সেকথা জোর করে বলা চলে না। সেও একটি হোটেলে থাকতো। দৈনিক ভাড়া দিত সাড়ে সাত শিলিং। লোকটি ভাগ্যবান ছিল সন্দেহ নেই—সাড়ে সাত শিলিং দৈনিক ভাড়ায় রাসেল স্কয়ার অঞ্চলে সে হোটেল পেয়েছিল—এটাই তার প্রমাণ। হোটেলের ঠিকানা দেওয়া ছিল না—নতুবা সে হোটেলের সামনে ঘরটাকে নেবার জন্য জনতা দাঁড়িয়ে যেত। পুলক একবার বললোও যে ঐ হোটেলে থাকতে পারলে সস্তায় থাকা যেত।

হোটেল থেকে বেরিয়ে দেখলাম কুয়াসা একটু বেড়েছে। লণ্ডনের বহুকালের সঙ্গী এই কুয়াসা। লণ্ডনের সঙ্গে কুয়াসার অদ্ভুত একটা সম্পর্ক হয়তো বিনা কারণেই আছে। কুয়াসা প্যারিসেও হয় এবং বেশ প্রবল কুয়াসাই হ'য়ে থাকে। বন বা বার্লিনেও প্রচুর কুয়াসার সংবাদ চোখে পড়ে, কিন্তু লণ্ডনের সঙ্গে তার সাহিত্যিক বা আত্মিক সম্পর্ক। লণ্ডন থেকে কুয়াসা সরিয়ে নিলে লণ্ডন আর লণ্ডন থাকবে না। কুয়াসার মধ্যে বেরুলাম আমরা খাদ্যের সন্ধানে—বেলা তখন তিনটে। এতক্ষণ খাওয়া হয়নি।

খানিকক্ষণ হেঁটে হোটেল খুঁজতেই বেশ গরম হ'য়ে গেলাম। রয়্যাল হোটেলেই অবশ্য খেয়ে নিতে পারতাম, কিন্তু যা দাম দেখলাম তাতে সেখানে খাওয়া উচিত হবে না ব'লে মনে হল। একটি খাদ্যের দাম প্রায় সাত শিলিং। পুলক বললো, "আমাদের সমস্যা হ'ল একটা সস্তা এবং ভদ্র রেস্তোরাঁ খুঁজে বার করা।" পরে দেখেছি সমস্ত লণ্ডনের লোকেরই সেই এক সমস্যা। সস্তা এবং ভদ্র রেস্তোরাঁর খোঁজে আমরা বেরুলাম। বোধ হয় কিংসওয়েতে পেয়ে গেলাম একটা দোকান। সেখানে দাঁড়িয়ে খাবারের দাম দেখছি। হিসেব করে দেখলাম শিলিং চারেক খরচ হবে।

প্রায় ঢুকবো এমন সময় এক ভদ্রলোক এসে বললেন, এখানে খেতে যাচ্ছ?

আমরা বললাম, হাঁ।

ট্যাক্সি-ড্রাইভারেরা বেশ মোটা হয়

ভদ্রলোক আস্তে আস্তে বললেন, যদি খেতেই চাও, তাহ'লে আর এখানে ঢুকো না। আমি কাল এখানে খেয়েছি কিন্তু এইটুকু খেতে দেয়। ব'লে নিজের তিনটে আঙুলের ডগা একত্র করে পরিমাণ দেখালেন। সে রেস্তোরাঁয় আর আমরা কখনো ঢুকিনি। ভদ্রলোক সত্যি কথা বলেছিলেন কি মিথ্যে কথা বলেছিলেন তা এখনো অজ্ঞাতই রয়ে গেল।

পুলক বললো, স্যাণ্ডউইচ খাবে সে এবং আমাকেও খেতে হবে, কারণ সস্তায় হবে। স্যাণ্ডউইচের দোকান অতএব খুঁজতে আরম্ভ করলাম। প্রথমে গাওয়ার ষ্ট্রীট, ম্যালেট ষ্ট্রীট গর্ডন স্কয়ার, মিউজিয়াম ষ্ট্রীট ইত্যাদি জায়গায় খুঁজলাম; পেলাম না। এইসময় স্থির করলাম কাউকে জিজ্ঞেস করা যাক্। জিজ্ঞেস করেই বুঝলাম আমরা বহুদিন ইংরিজি পড়েছি বটে কিন্তু উচ্চারণ সম্বন্ধে জ্ঞান জ্ঞান হয়নি। ইংরেজ ভদ্রলোক বেশ খানিক সময় নিলেন আমাদের আসল উদ্দেশ্য বুঝতে। তারপর তিনি যখন শুরু করলেন তাঁর কথাবার্তা, তাতে এইটুকু বোঝা গেল যে তিনি বলছেন, স্যাণ্ডউইচ লণ্ডনের সর্বত্র পাওয়া যায়—যে কোনো দিকে পাঁচ মিনিট হাঁটলেই স্যাণ্ডউইচের দোকান। আমরা যখন বললাম, মিনিট পোনের হেঁটেও কোথাও স্যাণ্ডউইচের দোকান পাইনি, তখন তিনি বললেন যে, সে সব কথা তিনি বিশ্বাস করেন না। বলে হনহন করে চলে গেলেন।

খানিক পরে আমরা ঘুরতে ঘুরতে রাসেল স্কয়ার টিউব ষ্টেশনে এসে পৌঁছে গেলাম। এই আমাদের প্রথম একটি টিউব ষ্টেশন দেখা। বাইরে থেকে দাঁড়িয়ে কিছুটা বুঝবার চেষ্টা করলাম। টিউব ষ্টেশনের সামনে একজন জুতো পালিশওয়ালা ব'সে আছে। (একজোড়া জুতো পালিশ করতে নেয় ছ' পেনি।) সমস্ত লণ্ডনে সর্বসমেত বোধ হয় জন চারেক জুতো পালিশওয়ালা দেখেছি। প্রায় সকলেই নিজেদের জুতো নিজেরাই পালিশ ক'রে থাকেন।

টিউব ষ্টেশনকে বাইরে থেকে মনে হয় যেন একটা কিছুর দোকান। এটা যে রেলোয়ে ষ্টেশন, লিফটে করে নিচে নেমে যে অন্য জগতে প্রবেশ করা যায়, যে জগতে আছে কেবল গতি আর ষ্টেশন তা আর বোঝা যায় না। টিউবে ভ্রমণ মানে বাইরের কোনো দৃশ্য দেখা নয়। মাটির তলার সুড়ঙ্গের চেহারা সর্বত্রই এক। মাটির দেওয়াল এত কাছে থাকে যে তা দেওয়াল হিসেবে নজরে পড়ে না। টিউব থেকে বাইরে কেউ তাকায় না। এতো গেল শহরের টিউব। শহর থেকে বেরুলেই সুড়ঙ্গ ছেড়ে ট্রেনেরা খোলা জায়গায় বেরিয়ে পড়ে। তখন আশ্চর্য মনে হয়। হ্যাম্পষ্টেড ষ্টেশন থেকে গোল্ডার্স গ্রীন ষ্টেশন বা হাইগেট থেকে ইষ্ট ফিঞ্চলী যেতে এই রকম দৃশ্য চোখে পড়ে।

টিউবের পাশেই স্ন্যাক্‌বারের দোকান। এই হ'ল আমাদের সস্তা স্যাণ্ডউইচের দোকান। পুলক ভেবে ভেবে বললো, ক'খানা স্যাণ্ডউইচ খাওয়া যায়। কোলকাতার কফী হাউসের স্যাণ্ডউইচ তো খানছয়েক খেয়েও পেট ভ'রত না—যাই হোক এক একজন ছ'খানা করে নিয়ে প্রথমে দেখা যাক। পুলক একটু কথাবার্তা বলায় ওস্তাদ ছিল। সে গিয়ে বারোখানা স্যাণ্ডউইচ চাইল দুটি প্লেটে। ছ'খানি প্লেটে করে ও যখন বারোখানা স্যাণ্ডউইচ নিয়ে এলো তখন আমি রীতিমতো আঁতকে উঠলাম। বিশাল চেহারার রুটী দিয়ে সে স্যাণ্ডউইচগুলি তৈরি। কোলকাতায় আমরা যেরকম স্যাণ্ডউইচ খেতাম এর এক একখানার আকার তার আট গুণ।

এ অবস্থায় আমি কেন আমাদের আশে-পাশে বিস্তর লোক ছিল, তারা আমাদের দিকে বিস্ময়ের দৃষ্টিতে তাকালো। এমন বিস্ময় তাদের চোখে এর পর আর দেখিনি। ইংরেজরা শুনেছিলাম অন্য কারুর কোনো ব্যাপারে বিশেষ নজর দেয় না। কথাটা সত্যি নয়। তারা সাধারণত কোনো ব্যাপারে কৌতূহল বোধ করে না। কিন্তু আমাদের স্যাণ্ডউইচের ব্যাপারটা কি সাধারণ ছিল? আপ রুচি খানা; কিন্তু সে হল গিয়ে খাদ্যের প্রকারের কথা, পরিমাণের কথা নয়। খাদ্যের পরিমাণ গ্রেট বৃটেনে রেলের লাইনের মতোই মাপ জোক করা, একটু কম বা বেশি করবার উপায় নেই। রোগা, বেঁটে, মোটা, লম্বা এরা প্রত্যেকেই একই পরিমাণের খাবার খায়। সাধারণত দুপুরে যারা স্যাণ্ডউইচ খেয়ে জীবন যাত্রা চালায়—(দায়ে পড়ে নয়, অনেকে শখ ক'রেও স্যাণ্ডউইচ খেয়ে থাকে, কিন্তু পৃথিবীর বিস্বাদতম যদি কোনো স্যাণ্ডউইচ থেকে থাকে তো সে হ'ল বৃটিশ স্যাণ্ডউইচ।)

তারা বিস্ময়ের দৃষ্টিতে তাকালো

পুলক আমার কাছে এসে বললো, "লোকগুলো কেমন তাকাচ্ছে।"

আমি বললাম, "তাকাবে না? এত স্যাণ্ডউইচ খাবে কেমন করে?"

পুলক বললো, "খেতেই হবে।"

আমি হিসেব করে দেখলাম, একখানা, বড় জোর দেড়খানা ঐ বাঘা স্যাণ্ডউইচ খেতে পারবো। বললাম তাই পুলককে।

পুলক বললো, "চেষ্টা করা যাক্, কিন্তু এই শুকনো জিনিস খেতে কয়েক গ্লাস জলের প্রয়োজন।"

পুলক এক গ্লাস ক'রে জল আর দু' কাপ ক'রে চা এনে বসলো কুম্ভকর্ণের জলযোগ পর্ব শেষ করতে। পুলক সোয়া দুই এবং আমি দেড়খানা স্যাণ্ডউইচ খেয়ে কোনোরকমে বেরিয়ে বেঁচেছিলাম।

বেরিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, স্যাণ্ডউইচ খুব সস্তা না কি, কত ক'রে?

পুলক বললো, "চার কাপ চা আর চারোটা স্যাণ্ডউইচে খরচ পড়েছে ষোলো শিলিং। রয়্যাল হোটেলের লাঞ্চ খাইনি ভেবে কষ্ট পেয়েছিলাম।"

একটু এদিক-ওদিক ঘুরে পুলক বললো, "একবার টিউবে চড়া যাক্।"

শখ আমারও। বললাম, "যাই কোথায়?"

পুলক বললো, "কোথাও চল, যে কোনো জায়গায়।"

কিন্তু আগে টিকেট কিনতে হয়, হুট করে বললেই তো হয় না যে কোনো জায়গার টিকিট একখানা দাও—অতএব আমরা একটি ম্যাপ দেখে বার করলাম কোথায় যাব। বণ্ড ষ্ট্রীটের নাম আগে শোনা ছিল, পিকাডিলির নামও শোনা ছিল কিন্তু মনে হ'ল বণ্ড ষ্ট্রীটটা বেশি ভাল হবে।

আমরা দু'খানা বণ্ড ষ্ট্রীটের টিকিট চাইলাম। দু'খানা তিন পেনি দামের টিকিট পেয়ে গেলাম। সেই টিকিট নিয়ে দেখলাম তাতে বণ্ড ষ্ট্রীটের নাম কোথাও লেখেনি, কেবল রাসেল স্কয়ারের নাম লেখা আছে আর দাম লেখা আছে। টিকিটটি নিয়ে এদিক ওদিক ঘুরতে লাগলাম নিচে যাবার সিঁড়িও খুঁজে পেলাম। সিঁড়ি দিয়ে যাচ্ছি এমন সময় আমাদের কে যেন বললো লিফটে করে যেতে। দেখি পাশেই বিশাল একটা লিফট আছে, যাকে প্রথমে মনে করেছিলাম একটা মাঝারি গোছের ঘর। সেই ঘরটাই নামতে আরম্ভ করলো। আস্তে আস্তে নেমে এক জায়গায় থামলো। আমরা বেরুলাম, এক জায়গায় লেখা আছে 'টু দি ট্রেনস্' সঙ্গে তীর এঁকে দেখানো। আমরা ট্রেনের দিকে ছুটলাম। দুটি প্ল্যাটফরম্ দুদিকে যাবার—একটি প্ল্যাটফরমের দেয়ালে লেখা বণ্ড ষ্ট্রীট এবং অন্যান্য ষ্টেশনের নাম, যেমন হোবর্ন, কভেণ্ট গার্ডেন, পিকাডিলি, ইত্যাদি। আমরা ম্যাপে দেখেছিলাম একবার বদল করতে হবে ট্রেন। বদল করতে হবে হোবর্নে। আমরা হোবর্নে নেমেই দেখতে পেলাম লেখা আছে সেন্ট্রাল লাইন পেতে হ'লে ঐ দিকে যান ব'লে তীর এঁকে দেখানো আছে। সেন্ট্রাল লাইনে আছে বণ্ড ষ্ট্রীট। রাসেল স্কয়ার ছিল পিকাডিলি লাইনে। লণ্ডনের আণ্ডারগ্রাউণ্ডে ছ'রকম লাইন আছে, ছ'রকম লাইনের ছরকম রঙ। ম্যাপে রঙ দেখেই বোঝা যায় কোন লাইন।

আমরা বণ্ড ষ্ট্রীটে গিয়ে উপস্থিত তো হ'লাম। উঠে দেখি বিশাল জনসমুদ্রের মধ্যে আমরা পড়ে গিয়েছি। প্রথম যেটা আমাদের আকর্ষণ করলো তা হ'ল এই এতগুলি লোকের যাতায়াত, কোনো-রকম গোলমাল নেই। বহুদিন আগে আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রীও এই ব্যাপারটা লক্ষ্য ক'রে অবাক হ'য়েছিলেন। বৃটিশ লোকেদের শান্তিপ্রিয়তা আধুনিক নয়। অবশ্য তুলনায় আগে অনেক বেশি গোলমাল করতো তারা। সভ্যতার এই হ'চ্ছে আর একটি মাপ-কাঠি। যে জাতি যত নীরব তারা তত শ্রেষ্ঠ। এই শ্রেষ্ঠত্ব কাম্য কি না সে প্রশ্ন অবশ্য আলাদা। এই নীরবতার সঙ্গে সভ্যতার কতখানি সম্পর্ক আর কতখানি ঠাণ্ডা জলবায়ুর তা আমি জানি না। তবে আমার মনে হয় যত কম লোকের সঙ্গে পরিচয় থাকে, তত কম আমরা কথা বলি। এই হিসেবে বৃটিশ লোকেদের নীরবতার একটি কারণ হয়তো বার করা যায়। তবে বণ্ড ষ্ট্রীট হ'ল দোকান এবং অফিস পাড়া। এখানে স্বভাবতই পরিচিত লোক পাওয়া শক্ত।

তখন হয়তো পাঁচটা বাজে। অফিস ছুটি হ'চ্ছে—(আদালত অন্য পাড়ায়)। দোকান পাট সমস্ত বন্ধ হ'চ্ছে হয়েছে বা হবে। এই ব্যাপারটা আমাদের আরো আশ্চর্য লেগেছিল। কোলকাতায় রাত নটা দশটার সময় হঠাৎ গেঞ্জি কিনে আনা যায়, কিন্তু লণ্ডনে ওষুধের দোকানগুলি পর্যন্ত সাড়ে পাঁচটা ছটায় বন্ধ হ'য়ে যায়। দু'-একটি দোকান অবশ্য সমস্ত লণ্ডনে সারারাত খুলে রাখে, ওষুধ বেচবার জন্য। সন্ধ্যের পর লণ্ডন হঠাৎ ভয়ানক রকম নির্জন হ'য়ে পড়ে।

বণ্ড ষ্ট্রীট এবং রাসেল স্কয়ার, দূরত্বে মাইল খানেক মাত্র। এর মধ্যে কিন্তু চরিত্রে আকাশ-পাতাল তফাত। বণ্ড ষ্ট্রীট ফ্যাশনের রাজ্য, এখানে লণ্ডনের সবচেয়ে দামি ফার কোট, দামি জুতো পাওয়া যায়।

আর রাসেল স্কয়ার অঞ্চল হোটেল এবং বিদ্যার কম্বিনেশন। এই রাসেল স্কয়ারে লণ্ডন ইউনিভার্সিটি, ব্লুমসবেরি অঞ্চল, যেখানে সাহিত্যিক উন্নাসিকতা তার সঙ্গে সঙ্গে চলছে বিরাট কায়দার হোটেলের ব্যবসা। এখানে এত হোটেল আছে যে তাদের নাম মনে রাখা সম্ভব নয়। এত বেশি ঘর কোনো কোনো হোটেলে যে তার হিসেব দেখলে চমকাতে হয়। আমাদের রয়্যাল হোটেলে ঘরের সংখ্যা ছিল সাতশোর কাছাকাছি। লণ্ডনে এত বেশি বাইরের লোক আসেন এবং নির্দিষ্ট এবং অনির্দিষ্টকালের জন্য থাকেন যে হোটেলের ব্যবসায় কখনো মন্দা হয় না। হোটেলের ব্যবসায়ে লাভও অনেক বেশি হয়। রাসেল স্কয়ার অঞ্চলে আছে গীলফোর্ড ষ্ট্রীট, এখানে আছে একটি ভারতীয় ছাত্র ছাত্রীদের হষ্টেল, সাধারণত ভারতীয়রা এখানে বেশিদিন থাকেন না। আর আছে রাসেল স্কয়ার থেকে খুব দূরে নয় ওয়াই. এম. সি. এ. ফিটজরি স্কয়ারে। সম্প্রতি তৈরি এই বাড়িটি ভারতীয় ছাত্রদের অনেক সুবিধে করে দিয়েছে।

লণ্ডন আন্তিকালের শহর। এ শহরে এত জাতের লোক থাকে যে পৃথিবীর সমস্ত জাতের লোককে দেখবার জন্য পৃথিবী আর ঘুরবার প্রয়োজন নেই। এখানে প্রচুর ফরাসী, স্প্যানিশ, ইটালিয়ান, জার্মান থাকেন। এখানে থাকেন চীনেরা, এখানে থাকেন হাজার হাজার ভারতীয়, পোলিশ, রাশিয়ান, গ্রীক, সাইপ্রাসের লোক; এখানে থাকেন ঈজিপ্টের, টিউনিসিয়ার লোক। তা ছাড়া থাকেন নানা জাতের কালো লোক।

এরকম শহর আর নেই। কেউ কেউ প্যারিসের নাম করেন, কিন্তু প্যারিসের বৈশিষ্ট্য—প্যারিসের লুভর, আইফেল টাওয়ার, সীন নদীর সৌন্দর্য, নতর দাম ইত্যাদিতে তাকে ছবির মতো দেখায়। লণ্ডনের অমন সৌন্দর্য নেই, কিন্তু সমস্ত সুবিধে আছে। লণ্ডনের লোক কোনো বিদেশীর দিকে অবাক হ'য়ে তাকায় না। লণ্ডন কোনো ব্যাপারেই উৎসাহ বোধ করে না। তাই ব'লে লণ্ডন মৃতনগরী নয়। লণ্ডনের বিশালত্ব এর জন্য দায়ী। এ এতই বড় যে এক ভূমিকম্প ছাড়া কোনো জিনিস লণ্ডনের সর্বত্র একসঙ্গে ঘটে না কখনো। ভূমিকম্পও প্রায় ঘটনা। প্যারিস যেমন 'বাস্তিল দিবসে' ব্যস্ত হয়ে ওঠে, লণ্ডন এমন কি 'গাই ফকস ডে'-তেও নিতান্তই শান্ত। ক' একটি জায়গায় বাজি পোড়ানো হয় মাত্র। লণ্ডনের শোক নেই, উৎসব নেই। বিশাল নদীর মতো বয়ে চলেছে। ছোটো পুকুরেই মাছের লাফ বলবার মতো হয়—বড় সমুদ্রে জাহাজ ডুবিও একটা সামান্য ঘটনা। লণ্ডনকে একটা সমুদ্রের সঙ্গে তুলনা করা যায়। এখানে সমস্তই আছে সমুদ্রের বিশালত্ব নিয়ে। [ক্রমশঃ।

"Every woman should marry, and no man."
—Benjamin Disraeli.

আঁনাতোলে ফ্রাঁস

কোরসা-লা-রাইনের নির্জন পরিত্যক্ত পল্লী। সীন নদীর সবুজ তটভূমি, পূর্বদিকের ছায়াবিস্তৃত পুরাতন শাখাবহুল বৃক্ষগুলি, স্তব্ধ গম্ভীর নীলাকাশ, নির্মেঘ, বাতাসশূন্য, ভগ্নচিহ্নহীন অথচ হাস্যরেখামুক্ত প্রকৃতি—সবগুলি যেন একসংগে এক সুগভীর নিস্তব্ধতায় বিজড়িত, মিশ্রিত ছিল। এটি গ্রীষ্মকালীন দিনের সুস্পষ্ট চিহ্ন।

টুইলারিজ থেকে হাঁটিতে হাঁটিতে এক পথিক চৈলত পাহাড়ের দিকে আস্তে আস্তে অগ্রসর হইতেছিল। তার চেহারায় তরুণ যৌবনের উপযোগী লাবণ্যরেখা প্রকটিত, পরনে কোট, পাজামা এবং কালো মোজা—এ সমস্ত তৎকালীন প্রচলিত মধ্যবিত্ত সমাজের ভূষণস্বরূপ। হাঁ, তার মুখমণ্ডল উৎসাহপূর্ণ অপেক্ষা বরং স্বপ্নাচ্ছন্ন মনে হয়। হাতে একখানি পুস্তক। পড়িতে পড়িতে সে কোন জায়গায় আসিয়া থামিয়াছে, পাতার মধ্যে রক্ষিত আঙুলটি সেটি দেখাইয়া দিতে যেন তৎপর। কিন্তু ইতিমধ্যে পড়া সে বন্ধ করিয়াছে। মধ্যে মধ্যে তার পথচলা পর্যন্ত স্থগিত; আর সেই সময় প্যারিস থেকে উত্থিত কোনো ক্ষীণ, অথচ ভয়ংকর গুঞ্জনধ্বনি সে কান পাতিয়া শোনে। দীর্ঘশ্বাসের চেয়ে ক্ষীণতর একটি অস্পষ্ট আওয়াজে কল্পনানেত্রে সে চাহিয়া দেখে,—মৃত্যু এবং ঘৃণা, উল্লাস ও প্রীতি, জয়ভেরীর নিনাদ, আগ্নেয়াস্ত্রের শব্দ—প্রকৃতপক্ষে বোধহীন মত্ততা ও গৌরবময় উৎকট আনন্দের নানা জাতীয় সুদীর্ঘ উচ্চ ও কর্কশ চীৎকার রাষ্ট্রবিপ্লব সুরুর সংগে সংগে জনতাপূর্ণ রাস্তা থেকে আকাশ পর্যন্ত মুখর করিয়া তুলিতেছে। মাঝে মাঝে সে ঘাড় ঘুরাইয়া দেখিবামাত্র সমস্ত শরীরের মধ্যে কী এক অজানা শিহরণ খেলিয়া যাইত।

সমস্ত বিবরণ সে শুনিয়াছে; কয়েক ঘণ্টা পূর্বেকার, নিজের চোখে দেখা এবং শোনা প্রতিটি ব্যাপার ভয়াবহ বিশৃঙ্খল চিত্ররূপে মস্তিষ্ক তাহার পূর্ণ করিল। জনতার দ্বারা অধিকৃত ব্যাসটাইল দুর্গ এবং উহার মুক্ত দুর্গপ্রাচীর, ক্রুদ্ধ জনতার গুলীতে নিহত ব্যবসায়ী-সমিতির অধ্যক্ষ, হোটেল-দ্য-ভিল এর ঠিক সিঁড়ির ওপরে শ্রদ্ধেয় শাসনকর্তা দ্য-লনেকে খণ্ড খণ্ড করিয়া হত্যা; ভয়ংকর জনসম্প্রদায় দুর্ভিক্ষপীড়িত অথবা মৃত্যুশংকার ন্যায় শুষ্কপাণ্ডুর মুখ, প্রচণ্ড উন্মত্ততা, শোণিততৃষ্ণা ও গৌরব লাভের স্বপ্নে সমাচ্ছন্ন এবং গ্রীভ্ হইতে ব্যাসটাইল পর্যন্ত ক্রমাগত ঘূর্ণায়মান ঐ জনতা, হাজার হাজার প্রবঞ্চিত জনগণের মাথার উপরে আলোকস্তম্ভ হইতে দোদুল্যমান ছিন্ন মৃতদেহগুলি, নীল সাদা পোষাক পরিহিত জয়োল্লাস গর্বিতদের ওকপত্রশোভিত ললাট, প্রাচীন দুর্গের চাবি, রৌপ্যপাত্র এবং রেজিষ্টার পুস্তকসহ বিজয়ী বীরগণের আনন্দধ্বনির মধ্যে রক্তমাখা সিঁড়ি বাহিয়া আরোহণ এবং সেই জনসমুদ্রের অগ্রে জনপ্রিয়, সমুন্নতশীর্ষ, উত্তেজিত, বিস্মিত শাসক লা-ফায়েতে এবং বেলির আকাশচুম্বী স্পর্ধিত মস্তক। তার পর বন্ধনমুক্ত জনতার মধ্যে, সহসা রাত্রিতে রাজকীয় সৈন্যবাহিনীর পুনরাগমনের ফলে বিক্ষিপ্ত কোলাহল, রাজপ্রাসাদের লৌহ গরাদগুলি ভাঙিয়া চুরিয়া বল্লমে রূপান্তরিত করার মধ্যে, অস্ত্রাগার লুণ্ঠনে, রাস্তায় রাস্তায় বাধাস্বরূপ নাগরিকদের অস্থায়ী প্রাচীর নির্মাণ চেষ্টায়, বিদেশী সৈন্যদের উপরে বর্ষণের উদ্দেশ্যে সেই সহরের স্ত্রীনাগরিকদের সহায়তায় ছাদে ছাদে প্রস্তরস্তূপীকরণের মধ্যে একটা কণ্টকিত আশংকা প্রবল ভাবে বিদ্যমান।

রাষ্ট্রবিপ্লবের এই দৃশ্যাবলী ঐ স্বপ্নাচ্ছন্ন যুবকের কল্পনানয়নে সংযত ভাবে প্রতিভাত হইল। 'সমাধিস্তম্ভে চিন্তার অবকাশ' নামক তাহার একখানি প্রিয় ইংরাজী বই সংগে ছিল। কোরসা-লা-রাইনের বৃক্ষতল দিয়া সীন্ নদীতটের পথ ধরিয়া কোনো সাদা রং-এর বাড়ির অভিমুখে সে চলিতেছিল এবং দিবা-রাত্র মন তাহার ঐ নির্দিষ্ট বাড়ির চিন্তায় মগ্ন ছিল।

তাহার চারি দিক শান্ত নিস্তব্ধ। দেখিল নদীর ধারে জন কয়েক লোক জলে পা ডুবাইয়া ছিপে মাছ ধরায় ব্যস্ত। শূন্য মনে নদীর রাস্তা ধরিয়া সে চলিতে লাগিল। চৈলত পাহাড়ের নিম্নাংশে পৌঁছিলে একদল প্রহরীর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। প্যারিস এবং ভারসালিসের মধ্যে যোগাযোগ রাস্তার ওপর ইহাদের সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। বন্দুক, টাঙ্গি এবং সামরিক আগ্নেয়াস্ত্রাদি সজ্জিত এই সৈন্যদল, সিল্ক অথবা চর্মের আবরণে শোভিত শ্রমিকশ্রেণী, কৃষ্ণপোষাক পরিহিত আইনজীবী, একজন পুরোহিত এবং সার্টপরা শ্মশ্রুগুম্ফ, নগ্নপদ একটি দৈত্যাকার মানব লইয়া গঠিত। যে কোনো পথিককে যথারীতি জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া অনাবশ্যক বুঝিলে তবেই তাহারা ছাড়িয়া দিত। কোর্ট এবং ব্যাসটাইল প্রাসাদের মধ্যবর্তী স্থানে সমস্ত খবরাখবর তাহারা খুঁজিয়া বাহির করিত। এবং সেই সময় আতংকের একটা বিবর্ণ ভাব যেন সর্বত্র বর্তমান।

কিন্তু এই তরুণ পথিকের আকৃতিতে মহত্ত্বের চিহ্ন সুস্পষ্ট। দু'টি-একটি কথা বলিতে না বলিতেই ঐ সৈন্যদল সহাস্যে তাহাকে চলিয়া যাইবার অনুমতি দিল।

তারপর সেই পাহাড়ের তলদেশের এক পুষ্পসুগন্ধি গলি ধরিয়া চলিতে চলিতে অর্ধপথে থামিয়া এক উদ্যানফটকের সম্মুখে সে দাঁড়াইল। বাগানটি নিতান্তই ক্ষুদ্র, কিন্তু আঁকাবাঁকা গলিপথ এবং উচ্চনীচ রাস্তার মোড়ে মোড়ে চলাফেরার সংকীর্ণ স্থান অনেকখানি বিস্তৃত। উইলোবৃক্ষের শাখাগ্র নিকটের কোনো জলাশয়কে স্পর্শোন্মুখ, কতকগুলি হাঁস সেখানে ক্রীড়ারত। রাস্তার এক কোণে অল্পদিনমাত্র নির্মিত এক নির্জন গৃহসম্মুখে প্রসারিত এক পরিসর সজীব তৃণাচ্ছাদিত ভূখণ্ড। ঠিক এই জায়গায় কোনো এক যুবতী পুষ্পমাল্যজড়িত একটি প্রকাণ্ড টুপি মাথায় নতমুখে বেঞ্চির ওপর বসিয়াছিল। ডোরাকাটা, সাদা এবং গোলাপী পোষাকপরা ঐ তরুণীটির পেটিকোটসন্নিহিত নিম্নভাগে একখানি আলাদা অল্পচওড়া সুদৃশ্য কাপড় যুক্ত ছিল। আঁটসাটভাবে জামার আস্তিন দিয়া মোড়া তাহার বাহুদ্বয় তখনো পাশে শ্লথ নিশ্চল। পায়ের তলায় একটি পুরনো ঝুড়িতে অনেকগুলি পশমের বল। কাছে একটি ছেলে শাবল দিয়া খুঁড়িয়া বালুকারাশি স্তূপীকৃত করিতেছিল। সোনালী চুলের ফাঁকে ফাঁকে তাহার নীল চোখের দীপ্তি প্রকাশমান।

তরুণীটি মন্ত্রমুগ্ধবৎ চুপ করিয়াছিল। ফটকের সম্মুখে দাঁড়িয়ে ঐ যুবকটি এমন মধুর স্বপ্নাভিভূতাকে বাধা দিবার আগ্রহ দেখাইল না। শেষে যুবতীটি আপন মস্তক তুলিতেই মুখে তাহার শিশুসুলভ নবীনতা, যৌবনের কলঙ্কমুক্ত সৌন্দর্যরাশি, বন্ধুভাবাপন্ন নমনীয়তা প্রকাশ পাইল। সে তাহাকে নমস্কার জানাইবা মাত্র মেয়েটি তাহার হাত বাড়াইল।

মধুরকণ্ঠে তরুণীটি কহিল, মঁসিয়ে জারমেন, কেমন আছ? খবর কি? সংগে কি কোনো সংবাদ এনেছ? গান ছাড়া, আমি তো বেশি কিছু জানি না।

তোমার এই স্বপ্নভংগের জন্যে আমায় ক্ষমা করো। হাতের ওপর মস্তক রেখে তোমার এমন একাকীত্ব এবং নীরবতা আমার এতো ভালো লেগেছে যে মনে হচ্ছিল যেন তুমি স্বপ্নের দেবকন্যা।

সে বলিল, 'একা! একা!' যেন কেবল এই শব্দটিই সে শুনিতে পাইয়াছে। আমি কি সত্য সত্যই একা?

অবোধের ন্যায় তবুও তাহার দিকে সে চাহিয়া আছে দেখিয়া মেয়েটি আবার বলিয়া উঠিল—যথেষ্ট হয়েছে, আমার সবটাই শুধু কল্পনা, এখন তোমার কি খবর বল ত?

অতঃপর স্বাধীনতার ভিত্তি, ব্যাস্টাইল দুর্গ অধিকার এবং ঐ স্মরণীয় বিখ্যাত দিনটির ঘটনাসমূহ একটি একটি করিয়া সে অনর্গল বলিয়া যাইতে লাগিল।

গাম্ভীর্যের সংগে একমনে সোফিয়া তাহার কথাগুলি শুনিল, পরে বলিল—এখন আমাদের কর্তব্য আনন্দ করা, বন্ধু আত্মবিসর্জনের মধ্যে দিয়ে এসেছে বলে এই উল্লাস কঠোর প্রকৃতির হওয়া উচিত। অতএব ফরাসীরা এখন আর তাদের নিজস্ব লোক নয়। যে রাষ্ট্র-বিপ্লব সারা দুনিয়া পরিবর্তিত করতে চলেছে, তারা সেই বিপ্লবেরই দাস।

মেয়েটির এই কথাগুলি বলিবার সময় কাছে ক্রীড়ামগ্ন ছেলেটি আসিয়া আনন্দে তাহার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

দেখ মা, মা, একবার চেয়ে দেখ—কি সুন্দর আমার এই বাগানটি!

তাহাকে জড়াইয়া চাপিয়া ধরিয়া সে কহিল, বৎস এমিল, ঠিকই বলেছ, সুন্দর বাগান সৃষ্টি করাই জগতে একমাত্র বিজ্ঞতম কাজ।

জারমেন বলিয়া উঠিল, হাঁ, ও ঠিক কথাই বলেছে, সবুজ বাগানের বিচরণ-পথের সংগে কি বিচিত্র প্রস্তর নির্মিত স্বর্ণোজ্জ্বল দীর্ঘপথ তুলনীয় সম্ভব?

এই সংগে সে একবার ভাবিয়া দেখিল, এই সুন্দরী রমণীকে বৃক্ষের ছায়ায় আপন বাহু দিয়া ধরিয়া লইয়া গেলে কত সুখেরই না হইবে। তাহার দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি মেলিয়া সে বিস্ময় প্রকাশ করিল, আহা, আমার কাছে ঐ বিদ্রোহ বিপ্লব আর লোকজনেরই বা কি দরকার?

মেয়েটি উত্তর করিল, না, না, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী এক মহান জনতা সম্বন্ধে আমার এই চিন্তা এত সহসা আমি পরিবর্তন করতে পারি না। মঁসিয়ে জারমান, এই নূতন নূতন কল্পনা আমার হয়ত তোমায় অবাক করে দিয়েছে। খুব অল্পদিন মাত্রই আমরা পরস্পরকে চিনেছি, বুঝেছি। তুমি অবশ্য জান না, সোস্যাল কনট্র্যাক্ট এবং এর মূল সূত্রগুলো আমার বাবা আমায় শিখিয়েছিলেন। একদিন বেড়াতে বেড়াতে তিনি ইংগিতে দেখালেন—ঐ জীন জ্যাক্‌স রুসো যাচ্ছেন। আমার তখন শৈশবকাল, কিন্তু জগতের অন্যতম জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ পুরুষের সেদিন বিমর্ষ মুখ দেখে আমার চোখ ফেটে অশ্রু বেরিয়েছিলো। বয়োবৃদ্ধির সংগে দেশের কদাচার, কুসংস্কারের ওপর আমার ঘৃণা বাড়তে লাগল। পরবর্তীকালে, আমার স্বামী, আমারই ন্যায় একজন প্রকৃতির পূজারী, মনস্থ করলেন—আমাদের পুত্রের নাম দেওয়া হোক এমিল, তাকে নিজের হাতে শ্রম করা শেখাতে হবে। যে জাহাজে কয়েক দিন আগে তাঁর মৃত্যু হয়, সেই জাহাজে বসে তিনি বছর আগে যে শেষ চিঠিখানি তিনি আমাকে লেখেন, তাতে নির্দেশ আছে—রুসোর বাণী সমস্ত মন দিয়ে যেন পালন করি। নব যুগের এই নতুন উদ্যমে আমি দীক্ষিত। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সত্য এবং ন্যায়ের জন্য আমাদের সংগ্রাম করতে হবে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া জারমান কহিল,—তোমার মতো বন্ধু ধর্মোন্মত্ততা এবং অত্যাচার দেখলে আমার প্রাণ শঙ্কিত হয়। তোমারই মতো আমি স্বাধীনতা ভালোবাসি, কিন্তু আমার আত্মা প্রতি মুহূর্তেই যেন বলহীন মনে হয়। তাই আমার চিন্তাও আমার নিয়ন্ত্রণের বাইরে। যেহেতু আমি তার নিজেকে সংযত করতে পাচ্ছি না এবং এই কারণেই মানসিক ক্লেশে আমায় ভুগতে হয়।

শুনিয়া তরুণী কোনো জবাব দিল না। এই সময় একটু অধিক বয়স্ক লোক ফটক ঠেলিয়া ভিতরে ঢুকিল। আপন টুপিটি হাত দিয়া আন্দোলিত করিতে করিতে সম্মুখে আসিল। পরচুলা অথবা পাউডার সে ব্যবহার করে নাই। টাকমাথার চারি পাশে কয়েকগাছি লম্বা ধূসর রং-এর চুল। বকলসহীন জুতা, নীল মোজা এবং মেটে রংএর পোষাক সে পরিয়াছিল।

চীৎকার করিয়া সে বলিল—জয়! জয়ের সুসংবাদ! সোফিয়া, দৈত্যটি আমাদের হস্তে বন্দী। এই সংবাদটি আনিই তোমার কাছে বহন করে আনলাম।

বন্ধু প্রতিবেশী, এইমাত্র মঁসিয়ে জারমানের কাছ থেকে এই খবরটি পেয়েছি। এঁকে তোমার সংগে পরিচয় করিয়ে দিই। এঁর মা এবং আমার মা অ্যানজারসে বন্ধুরূপে থাকতেন। ছ'মাস কাল প্যারিসে থাকার সময় মাঝে মাঝে ইনি আমায় অনুগ্রহ করে ঐ নিভৃত বিচ্ছিন্ন এলাকায় দেখা করতে আসতেন। মঁসিয়ে জারমান, এই ভদ্র মহাশয় আমার প্রতিবেশী এবং বন্ধু; মঁসিয়ে ফ্র্যানচৌ-প্ত-সাক্যাভেন—বিদ্বান ব্যক্তি।

নিকোলাস ফ্র্যানচৌকে শ্রমিক বলাটাই বরং সংগত।

প্রিয় বন্ধু, আমি জানি, শস্য-সম্বন্ধীয় বাণিজ্য বিষয়ের তুমি একটি গ্রন্থ লিখেছ। তাহলে মঁসিয়ে নিকোলাস ফ্র্যানচৌ, তোমার সৌজন্যার্থে এই কথাটাই আমায় বলতে হয়, চাষীর লাঙল চালানোর চাইতে লেখনী-চালনে তোমার হাত ঢের বেশী পাকা।

প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি আবেগে জারমানের হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল; তাহলে দুর্গের পতন ঘটেছে। এই দুর্গে বার বার অপরাধী এবং অপরাধহীনের একই রকম শাস্তি হয়েছে। যে লৌহদ্বারের আড়ালে বাতাসশূন্য আলোহীন জায়গায় আট মাস কাটিয়েছি, সেই লৌহদরজার অর্গল সমস্ত ভেঙে চুরে ফেলা হয়েছে। ১৭৫৮খৃঃ ১৭ই ফেব্রুয়ারী; ৩১ বছর আগেকার কথা। সহনশীলতা সম্পর্কে একটা নিবন্ধ লেখার জন্যে আমি ব্যাসটাইল দুর্গে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলাম। আর, আজ, শেষে জনসাধারণ এর প্রতিশোধ নিলো। সত্য এবং আমি উভয়েই বিজয়ী। বিশ্ব-জগতের অস্তিত্ব যত দিন থাকবে, এই দিনটির স্মৃতি তত দিন অক্ষত থাকবে। এর একমাত্র সাক্ষী সূর্য হারমোডিয়াসের ধ্বংস এবং টারকুইনের পলায়ন দেখেছে।

মঁসিয়ে ফ্র্যানচৌর বজ্রকণ্ঠে বালক এমিল ভীত হইল। সে তৎক্ষণাৎ মায়ের কাপড় জাপটাইয়া ধরিল। এদিকে ফ্র্যানচৌ হঠাৎ ছেলেটির উপস্থিতি আবিষ্কার করিয়া মাটি হইতে তাহাকে শূন্যে তুলিয়া উৎসাহভরে বলিয়া উঠিল, বাছা, আমাদের চাইতে আরো বেশী তোমরা সুখী হও এবং স্বাধীন মন নিয়ে আরো বড়ো হও।

কিন্তু এমিল শঙ্কিতচিত্তে অন্য দিকে মুখ ফিরাইল। তারপর উচ্চস্বরে কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

পুত্রের চোখের জল মুছাইয়া সোফিয়া বলিল, ভদ্র মহাশয়, আপনারা আজ আমার সংগে রাতে দয়া করে কি আহার করবেন? আমি মঁসিয়ে ডুভারনের আসার অপেক্ষায় আছি। অবশ্য তিনি যদি ইতিমধ্যে তাঁর কোনো রোগীর শয্যাপার্শ্বে আটক না থাকেন।

তারপর জারমেনের দিকে ফিরিয়া বলিল, নিশ্চয়ই তুমি জান, রাজচিকিৎসক মঁসিয়ে ডুভারনে মুক্ত প্যারিসের একজন নির্বাচক। ন্যাশন্যাল এসেমব্লির তাঁর ডেপুটি হওয়ার কথা, যদি না মঁসিয়ে-দ্য-কনডরসেটের মতো সম্মানজনক পদের প্রলোভন ত্যাগ করেন। এই ব্যক্তি অনেক উচ্চ গুণসম্পন্ন। তাঁর কথোপকথন শোনাও তোমার পক্ষে আনন্দদায়ক এবং লাভজনকও বটে।

ফ্র্যানচৌ বলিল, ওহে যুবক, মঁসিয়ে জাঁন ডুভারনেকে চিনি। তাঁর এমন এক ঘটনার কথা জানি, যা শুনলে মনে হবে সে সত্যই সম্মানের পাত্র। বছর দুই আগে, ডফিন যখন মৃত্যুশয্যায়, রাণী তাঁকে সেই সময় ওর জন্যে ডেকে পাঠালেন। তখন ডুভারনে সেভরেসে বাস কচ্ছিলেন। রোজ সকালে রাজপ্রাসাদ থেকে একখানি গাড়ি তাঁকে নিয়ে সেন্ট ক্লাউডে পৌঁছে দেওয়ার জন্যে পাঠানো হত। কারণ রাজপুত্র সেখানে পীড়িত ছিল। একদিন গাড়িটি খালি অবস্থায় প্রাসাদে ফিরে এলো। ডুভারনে আসেনি। রাণী পরদিন তাঁকে অনুপস্থিতির জন্য তিরস্কার করলেন।

তিনি বললেন, ডাক্তার বাবু, আপনি আপনার রোগী ডফিনকে, তাহলে ভুলে গেছেন?

সেই মহৎ গুণসম্পন্ন ব্যক্তিটি বললেন, মহাশয়া, অত্যন্ত যত্নের সংগে আপনার পুত্রের চিকিৎসা কচ্চি। কিন্তু গতকাল একজন গর্ভবতী কৃষকরমণীর শয্যাপার্শ্বে প্রসব বেদনার সময় আমাকে বাধ্য হয়ে উপস্থিত থাকতে হয়েছিল।

এই সময় সোফিয়া মন্তব্য করিল, চমৎকার তো! এতে কি তাঁর মহত্ত্বের পরিচয় নেই এবং আমাদের এই বন্ধুর জন্য কি আমরা গর্বিত নই?

জারমেন বলিল, হাঁ, সুন্দর বটে।

পিছন হইতে একটি গম্ভীর সুমিষ্ট স্বর ঠিক এই মুহূর্তে বাধা দিয়া বলিল, আপনাদের প্রশংসার দিকে উত্তেজনার দ্বারা নিয়ে যাচ্ছে, সেটা কি—আমার তো তা বোধগম্য হচ্চে না! কিন্তু আপনাদের এই সুখময় কথাবার্তা শ্রবণ করা মনোরম নিঃসন্দেহ। আজকালকার দিনে এমন অনেক প্রশংসনীয় দর্শনীয় কাজ ঢের ঢের দেখতে পাওয়া যায়।

পরচুলা এবং কুঞ্চিত জামাপরা এক ভদ্রলোক এই কথাগুলি বলিতেছিলেন, তিনি জাঁন ডুভারনে ছাড়া আর কেহই নহেন। মঁসিয়ে জারমান প্যালে রয়ালে খোদিত মুখাবয়বের সহিত ইঁহার সামঞ্জস্য দেখিতে পাইল।

ডুভারনে কহিলেন, এই মাত্র ভারসেলিস থেকে আসছি। সোফিয়া, আজকের এই স্মরণীয় দিনে তোমায় দেখার সৌভাগ্যের জন্যে অরলিয়েনের ডিউকের কাছে আমি ঋণী। সেন্ট ক্লাউড অবধি তাঁর নিজের গাড়িতে বসিয়ে আমায় এনেছেন। বাকি রাস্তাটুকু খুব আরামেই এসেছি, অর্থাৎ এটুকু হেঁটেই এসেছি।

কিন্তু কার্যত দেখা গেল, তাঁহার রূপালি জুতা এবং কালো মোজা একেবারে ধূলিসমাচ্ছন্ন।

এমিল দুটি ক্ষুদ্র হাত দিয়া ডাক্তারের কোটের চকচকে ষ্টীলের বোতাম শক্ত করিয়া ধরিল এবং ডুভারনে তখন আপন জানুসন্নিকটে ছেলেটির গায়ে হাত বুলাইয়া দেখিতে লাগিলেন।

সোফিয়া ন্যাননকে ডাকিতে লাগিল। একটি মজবুত চেহারার মেয়ে আসিয়া ছেলেটিকে বাহু দিয়া তুলিয়া লইল এবং চুম্বন করিতে করিতে তাহার কান্না থামাইবার চেষ্টায় সেখান হইতে প্রস্থান করিল।

বাগানের এক নিভৃত প্রান্তে একটি টেবিল সজ্জিত। সোফিয়া টুপিটি উইলোবৃক্ষশাখায় ঝুলাইয়া রাখিল, তাহার সুন্দর কেশসম্ভার কোঁকড়াইয়া তাহার কপোলদেশের চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল।

সে বলিল, ইংরেজী ষ্টাইলে অত্যন্ত সহজ পন্থায় আপনারা ভোজন করুন।

ঐ স্থানে বসিয়া দূরের গৃহচূড়া, প্রাসাদ গম্বুজ, সীননদীর অংশ-বিশেষ তাহাদের চোখে পড়িল। এই দৃশ্যাবলী দেখিতে দেখিতে তাহাদের কথাবার্তা থামিয়া আসিল, মনে হইল যেন এই প্রথম প্যারিস নগরীর দিকে তাহারা চাহিয়া দেখিতেছে। কিছুক্ষণ পরে সেই দিনের বিক্ষিপ্ত ঘটনাগুলি, এসেমব্লির ব্যাপার, সর্বজনীন দুঃখকাহিনী, জাতির বন্ধনমোচন এবং মঁসিয়ে নেকারের নির্বাসনদণ্ড সম্পর্কে আলোচনায় তাহারা রত ছিল। সর্বশেষে এই সিদ্ধান্তে তাহারা পৌঁছিল যে, চিরন্তন মুক্তির দিন এখন আগত। মঁসিয়ে ডুভারনে নবশাসনের অভ্যুত্থানকে স্বাগত জানাইয়া জনির্বাচিত সদস্যদের গভীর জ্ঞানের কত প্রশংসা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার মন অতো উচ্চ চিন্তাযুক্ত ছিল না। মাঝে মাঝে তাঁহার আশা

একপ্রকার অস্বস্তিতে যেন ভরিয়া উঠিতেছিল। নিকোলাস ফ্রানচৌর কোনো দিকে লক্ষ্য ছিল না। সে কিন্তু নূতন যুগের মৈত্রী এবং জনগণের শান্তিপূর্ণ জয়লাভকেই সগৌরবে ঘোষণা করিয়া বসিল।

ঐ ডাক্তার এবং যুবতী স্ত্রীলোকটি বৃথাই বার বার তাহাকে এই বলিয়া আশ্বস্ত করিল, এখন কেবলমাত্র সংগ্রাম সুরু হয়েছে। জয়ের প্রথম সোপানে আমরা আরোহণ করেছি মাত্র।

সে জবাব দিল, দর্শনই আমাদের শাসক, যদি সংগত যুক্তিই মানুষের মধ্যে না থাকে, তাহলে তাতে লাভটাই বা কি? কবি যে স্বর্ণযুগের কথা বলেছেন, সেইটে সত্য সত্যই আসবে। উন্মত্ততা এবং উৎপীড়ন যে সমস্ত কদর্য পাপরাশি সৃষ্টি করেছে, সেই সব কোথায় বিলীন হয়ে যাবে। গুণী এবং বিদ্বান লোক সব রকম সম্ভবপর সুখ উপভোগ করবে। আমি—কি বলছি? চিকিৎসক এবং রসায়ন শাস্ত্রের সাহায্য নিয়ে সে জগতে অমরতার আসন লাভ করারও সুযোগ পাবে। একমনে সোফিয়া শুনিতেছিল, কেবল একবার মস্তক সঞ্চালন করিল মাত্র।

তরুণী বলিল, তোমার যদি মৃত্যুকে—আমাকে বঞ্চিত করার ইচ্ছা থাকে, তবে প্রথমে যৌবনের উৎসধারার সন্ধান কর। এটা না থাকলে তোমার অমরতা সম্বন্ধে আমার সন্দেহ জেগে উঠবে।

প্রবীণ দার্শনিক হাসিতে হাসিতে বলিলেন, তুমি কি খৃষ্টধর্মীয় মতবাদের পুনরুত্থানের মধ্যে কোনো কিছু শান্তির আভাস পেয়েছ?

গ্লাসের জল খাইয়া গ্লাসটি খালি করিয়া যুবকটি বলিল, যদি আমার কথাই বলতে হয়, তাহলে এ কথাই বলবো যে দেবদূত এবং সাধু পুরুষেরা বিধবাদের চাইতে কুমারী গায়িকাদের বেশি অনুগ্রহ দেখান—এতে আমার আশংকা করার যথেষ্ট কারণ আছে।

যেন সমাহিতচিত্তে যুবকের পানে চাহিয়া তরুণীটি বলিল, জানি না, মাটির ধূলি থেকে সৃষ্ট এই-সব ক্ষণস্থায়ী সৌন্দর্য দেবদূতের কাছে কিরূপ মূল্যবান? কিন্তু আমার নিশ্চিত ধারণা যে, ভগবানের অসীম ক্ষমতা সময়ের এই ক্ষতিটুকু অন্তত শান্তিময় ঘরে ঘরে এমন ভাবে পূরণ করে দেবেন, মনে হবে মানুষের দুঃখের এমনি ভাবেই লাঘব হওয়া প্রয়োজনীয়, তা ছাড়া আরো বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হবে পদার্থ-বিজ্ঞান এবং রসায়নবিদ্যায় পণ্ডিতেরাও এ ভাবে জগতের উপকার করতে পারবে না। মঁসিয়ে ফ্রানচৌ, তুমি তো নাস্তিক, সম্ভবত বিশ্বাস কর না—ঈশ্বর স্বর্গে রাজত্ব করেন, এই জগতে রাষ্ট্রবিপ্লব যে ভগবানের উপস্থিতির চিহ্নস্বরূপ, এ কথা তুমি হয়ত বুঝতে পারবে না।

মেয়েটি উঠিয়া দাঁড়াইল। রাত্রির অন্ধকার ঘনীভূত। বহু দূরে আলোয় আলোয় মহানগরী দীপান্বিতা।

মঁসিয়ে জারমান সোফিয়ার দিকে তাহার হস্ত এই সময় প্রসারিত করিল। এবং অপর বয়স্ক দুই জন পরস্পর তর্ক-বিতর্ক করিতে করিতে বাগানের সরু রাস্তা ধরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। জারমান লক্ষ্য করিল, কথোপকথনে তাহারা তন্ময় হইয়া চলিতেছে। সোফিয়াও যাইতে যাইতে তাহাদের নাম, ধাম প্রভৃতি সম্বন্ধে তাহাকে বলিয়া যাইতে লাগিল। সে বলিল, এখন আমরা অ্যালি-দ্য-ডিন জ্যাকসে আছি। এই রাস্তা ধরে সোলন-দ্য-এমিল পর্যন্ত যাওয়া যায়। এই রাস্তাটি বরাবর সোজা। অন্য রাস্তা দিয়ে আমরা বহু পুরাতন ওকবৃক্ষতলায় এলাম। এই গ্রাম্য বেঞ্চিখানি সারাদিন গাছটির ছায়া পায়। আমি এটির নাম দিয়েছি 'বন্ধুর বিশ্রাম মহল'।

সোফিয়া কহিল, এক মুহূর্ত কাল আমরা এই বেঞ্চিতে বসব।

এই বলিয়া তাহারা উভয়ে বসিয়া পড়িল। সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে জারমান আপন হৃদয়ের ঘন ঘন কম্পন শুনিতে পাইল।

সে মৃদুস্বরে কহিল, সোফিয়া, তোমায় আমি ভালবাসি। বলিতে বলিতেই তাহার হাত চাপিয়া ধরিল।

আস্তে আস্তে সে হাতখানি টানিয়া লইল। এবং যুবকটিকে অঙ্গুলি সংকেতে দেখাইল, মৃদু-মন্দ বায়ুর মর্মরধ্বনি গাছের পাতায় পাতায় শুনিতে পাওয়া যাইতেছে।

সে বলিল, তুমি কি পত্রমর্মর শুনতে পাচ্ছ না? আমি কিন্তু পাতার মধ্যে বাতাসের মর্মর শুনতে পাচ্ছি।

মাথা নাড়িতে নাড়িতে তরুণীটি কণ্ঠে যেন সংগীত-সুধা ঢালিয়া মিষ্টস্বরে কহিল, মঁসিয়ে জারমান, কে তোমায় বলল যে বাতাস পাতায় পাতায় খেলা করছে? তোমায় কে বলল, আমরা একলা রয়েছি? তাহলে তুমি কি সাধারণ মানবাত্মাদের মধ্যে একজন? যারা জগতের অদৃশ্য রহস্যময় অমঙ্গল চিহ্নগুলি অনুভব করতে অপারগ?

কটাক্ষপূর্ণ ইংগিতে যখন সে ইহার জবাব দিল, তাহাতে কেবল বিহ্বলভাব মিশ্রিত ছিল।

যুবতী কহিল, জারমান, তুমি কি দয়া করে উপর তলায় আমার ঘরে যাবে? সেখানে একখানি ছোটো বই টেবিলের ওপর দেখবে এবং সেই বইখানিই আমার কাছে নিয়ে এসো।

তাহার অনুরোধ সে পালন করিল। যতক্ষণ সে অনুপস্থিত ছিল, তরুণী বিধবা ততক্ষণ রাত্রির বাতাসে কম্পমান পত্রপুঞ্জের প্রতি স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়াছিল। যুবক ইতিমধ্যে স্বর্ণমণ্ডিত প্রান্তযুক্ত এক খণ্ড গ্রন্থ লইয়া আসিল।

সোফিয়া কহিল, হাঁ গেসনারের আইডিলস বইখানিই বটে। গ্রন্থকার যেখানে মিথ্যা সম্বন্ধে বর্ণনা দিয়েছেন, সেই অংশটুকু খোল। আর চাঁদের আলোয় যদি পড়তে পারো। তাহলে পড়ে যাও।

এই কথাগুলি সে পাঠ করিল। হায়, আমার আত্মা কি প্রায়ই তোমার আশে-পাশে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়? প্রায়ই যখন তুমি মহৎ এবং উচ্চ চিন্তায় মৌন হয়ে তন্ময় থাক, সে সময় অল্প একটু নিঃশ্বাসের বাতাস তোমার গণ্ডদেশ বুলিয়ে দেবে, আর ঠিক সেই মুহূর্তে তোমার আত্মা যেন আনন্দশিহরণে সচেতন হয়ে উঠুক।

তরুণী তাহার পড়া থামাইয়া দিল। এখন, তুমি তো বুঝতে পারছ, মঁসিয়ে, যে আমরা কখনই একা নহি; আর যতক্ষণ না সমুদ্রসমীরণ স্থলের ওপর দিয়ে এসে ওকগাছের পাতা নড়াবে, তার আগে পর্যন্ত কোনো কথার মর্মার্থ আমার বোধগম্য হবে না। আবার সেই বয়স্ক লোক দুটির কণ্ঠস্বর ক্রমশঃ নিকটবর্তী হইতে লাগিল।

ডুভারনে কহিলেন, ঈশ্বর মহৎ।

ফ্রানচৌ বলিল, ভগবান শয়তান! আমরা একে বিনাশ করবো।

তারপর ইহারা উভয়ে এবং জারমান মঁসিয়ে সোফিয়ার নিকট বিদায় লইল।

তরুণীও কহিল, ভদ্রমহোদয়গণ, বিদায়! এস আমরা চীৎকার করে বলি স্বাধীনতার জয় হোক, রাজা দীর্ঘজীবী হউন। এবং তুমি, হে আমার প্রিয় প্রতিবেশী, মরণের যখন আমাদের প্রয়োজন হবে, তখন কিন্তু মরতে আমাদের বাধা দিও না।

অনুবাদক : শ্রীসুনীলকুমার দাস

শ্রীগণেশচন্দ্র দাস

ব্যাঙ্কের সুবৃহৎ কাউন্টারে বসে অবিরল ভাবে টাকা লেন-দেন করে কলুব-বলদ জীবনের সার্থকতা প্রতিপন্ন করছি, এমন সময় দেশীয় কায়দায় একটা দীর্ঘ সেলাম ঠুকে সামনে এসে দাঁড়ালো জাহাঙ্গীর খান। সকাল থেকে এসে অবধি অজস্র ডেবিট-ক্রেডিটের ছোবলে মনটা বিষাক্ত হয়ে রয়েছে, তার পর বড় সাহেবের মন জোগানো কাজ আর কাষ্টমারের আদেশ পালন করতে গিয়ে যেন হৃৎপিণ্ডের প্রতিক্রিয়াটাই বন্ধ হয়ে আসছিল। সত্যি কথা বলতে কি, যতক্ষণ কাজ করি ততক্ষণ মনে হয়, আমি যেন সেই পরাধীন ভারতেরই অধিবাসী, আমার যে স্বাধীন ইচ্ছেটার কোনই মূল্য নেই তা বেশ ভাল'ভাবেই অনুধাবন করতে পারি। এখানে কেবল যেন সকলের আদেশ পালন করবার জন্যেই কাজে বহাল হয়েছি। আমারও যে একটা আদেশ-শক্তি আছে, তা আর যেন কেউ বিশ্বাস করতে চায় না!

কখনো কখনো মনটা খুবই তিক্ত হয়ে ওঠে, তার জন্যে হয়তো উত্তরটা একটু কর্কশ হয়, কিন্তু পরমুহূর্তেই নিজেকে সামলে নিতে হয়। কারণ, শক্তিহীন কেরানীকুলের ওপরওয়ালাদের সঙ্গে বিরোধিতা করে টেঁকে থাকা একে তো অসম্ভব, উপরন্তু অন্ততঃ জীবন ধারণের জন্যে সর্ব্বদুঃখহারিণী সর্ব্বসন্তাপনাশিনী দু'শো টাকা মাইনের চাকরিটা তো বাঁচিয়ে রাখতেই হবে। কৃষকের লাঙলে-জোতা গরুর সঙ্গে ঠিক নিজেকে তুলনা করতে ইচ্ছে করে। কাজতো পূর্ণ দমে করতেই হবে অধিকন্তু বড় সাহেবের কোমল পদে তৈল মর্দন করতে করতে যেন খোসামুদি পেশাটাই অভ্যাসগত হয়ে উঠছিলো। ভারত স্বাধীন হলেও বিদেশী সাহেবদের দাপট যে পূর্ণ মাত্রায় অটুট রয়েছে, তার প্রশস্ত স্বাক্ষর দিচ্ছে এই বড় বড় বিলিতি অফিসের সাহেবগুলো। মাঝে মাঝে সবার অলক্ষ্যে ও অগোচরে নিজ মনেই সব কিছু নিন্দা করি পঞ্চমুখে, গোপনে কথা বলতে হয়, কারণ আমাদের মধ্যেই তো গুপ্তচরের দল আছে? কি জানি হয়তো শেষ পর্য্যন্ত বড় সাহেবকে জবাবদিহি করতে হবে।

জাহাঙ্গীর খান আজ আমার অপরিচিত নয়, যেদিন থেকে ব্যাঙ্কের এ্যাটেনডেন্স রেজিষ্টারে আমার নাম উঠেছে, সেদিন থেকেই প্রায় তার সঙ্গে আমার পরিচয়ের সূত্রপাতটা হয়েছিলো। কাষ্টমারের দলকে আমি যতটা ভয় করি, জাহাঙ্গীরের প্রফুল্ল কান্তিটাকে ঠিক ততটা ভয় করি না। যদিও সে আমাকে বিরক্ত করতেই আসে, কারণ সে যে একজন ব্যাঙ্ক-কাষ্টমারের বিশ্বস্ত দূত। তবু তার সঙ্গে জীবনের সুখ-দুঃখের দু-চারটা কথা বলে মনটা হাল্কা করা যায়। নামটা জাহাঙ্গীর হলেও সম্রাট জাহাঙ্গীরের সঙ্গে তার কোন সাদৃশ্যই নেই বরং বৈসাদৃশ্যের মাত্রাটাই বেশী। এই সামান্য বেতনভোগী পঁয়ষট্টি বৎসর বয়স্ক 'পেনসিয়ান' পথযাত্রী চা কোম্পানীর বৃদ্ধ দারওয়ানটা আমাদের কেরাণী দলের নিষ্ফল জীবনে রসের সামগ্রীস্বরূপ ছিলো।

যেমনি সে ব্যাঙ্কের রাজদ্বার দিয়ে প্রবেশ করলো অমনি তার রসপ্রিয়তার সুযোগ নিয়ে বিভিন্ন দিক থেকে তাকে লক্ষ্য করে রব উঠলো। কেউ হয়তো বলছেন—এই খান, এবারে খুব ভালো চা দিবি কিন্তু, গত বারের চা'টা মোটেই ভাল ছিলো না, আবার কেউ বলছেন হয়তো—তোর দেশের শাক-সব্জি কবে পাচ্ছি, আবার হয়তো তিরস্কারের সুরে কেউ বলছেন, কবে সেই বলে দিয়েছি, এখনও কেন কোন জিনিষ এসে পৌছালো না রে? যেন পুজোর ছুটির আগেই ঠিক পাই।

স্নেহের গিফ্‌ট বলে সকলে তার থেকে কোম্পানীর চা, দেশের ফল-সব্জি ইত্যাদি চাপ দিয়ে আদায় করতো। তাই আমি যখন চাকুরিতে প্রথম বহাল হয়েছিলাম তখন সে আমাকেও তার গিফ্‌ট এনে দিয়েছিলো। আমি কিন্তু সেই দ্রব্য সামগ্রী নিতে নারাজ হওয়ায় ডিপার্টমেন্টের সিনিয়ার ক্লার্ক গোপাল বাবু তিরস্কারের স্বরে বলেছিলেন, কি মশাই, আপনি এই সেদিন ঢুকে আমাদের সেই পুরোনো নিয়মটার ব্যতিক্রম ঘটাবেন না কি?

যখন বুঝতে পারলাম যে, এখানে গিফ্‌টের নামে ঘুস নেওয়াটাও নিয়মাবদ্ধ, তখন আর কোন প্রতিবাদ করিনি। সেই অবধি জাহাঙ্গীর খানের কাছ থেকে অনেক বার দ্রব্য-সামগ্রী পেয়েছিলাম, গোপনে তাকে অনেক বার এসব বন্ধ করবার জন্যে নির্দেশ দিয়েছিলাম, কিন্তু সে তা কানে নেয়নি। কালক্রমে জাহাঙ্গীর ও আমার সঙ্গে অন্তরঙ্গতাটা একটু বেশী হয়ে উঠলো কিন্তু সেটা শুধু এই গিফটের ব্যাপারেই নয়। আমি ছিলাম ব্যাঙ্কের পেয়িং কেসিয়ার আর জাহাঙ্গীর কোম্পানীর টাকা তুলতে প্রায়ই আমার কাছে আসতো। যত কাজই থাক সে আমার সঙ্গে যেন দু-চার কথা না বললে তৃপ্তি লাভ করতো না। অনেক দিন দেখেছি আমার সঙ্গে কথা বলবার জন্যে বহুক্ষণ অপেক্ষা পর্য্যন্ত করেছে। জাহাঙ্গীর একদিন বলেছিলো যে, সে প্রায় সাঁইত্রিশ বছর আগে ইরাক থেকে কলকাতায় চলে এসে বসবাস আরম্ভ করেছে, সংসারে তার

অন্ধের যষ্টি হচ্ছে তার একমাত্র শিশু কন্যা ফতিমা। বোধ হয় সেই জন্যেই সে এত ভাল বাংলা ভাষা আয়ত্ত করে ফেলেছিলো। বলা বাহুল্য, আমি জাহাঙ্গীরের সঙ্গে বাংলা ভাষার মাধ্যমেই কথোপকথন করতাম, কিন্তু প্রথমে আমি হিন্দিতে কথা কইবার লোভটা সংবরণ করতে পারি নি, কিন্তু আমার পশ্চিমবঙ্গীয় ও রাষ্ট্রীয় ভাষার সংমিশ্রণ সহকর্মীদের মধ্যে হাসির জোয়ার ডেকে আনতো। সেই জন্যে আমি ওই অভ্যাসটা ত্যাগ করলাম বটে, কিন্তু তারা যে আমার চেয়ে এদিক থেকে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন না, তা জানতাম।

দোষই বা কি তাদের? তারা তো সেই গৃহপ্রাণগত পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী, তাদের বিপুলা চ ধরণী ভ্রমণের অবসর বা অর্থ কোথায়? একদিন আমি দীর্ঘ কথাবার্তার মধ্যে পরিহাসছলে জাহাঙ্গীরকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—তুমি তো সম্রাট মানুষ, তোমার আর অর্থের দরকার কি?

সে হেসে বলেছিলো, বাবু, নামের সঙ্গে যদি কাজ মিলতো তবে আর অভাব কি ছিলো? প্রত্যেক গরীব মানুষই এক-একটা রাজা-উজিরের নাম নিয়ে বড় লোক সাজতো কিন্তু তা তো হবার নয়, তার জন্যে দেখেন না বাবু, যার নাম গোরাচাঁদ তার দেহের রংও অনায়াসে কয়লার কৃষ্ণতার সঙ্গে তুলনাযোগ্য। যে নাম নিয়েছে সিংহ সিং সে-ও ছাগের আস্ফালন দেখে দীর্ঘ পদবিক্ষেপে দ্রুত গতিতে চম্পট দিয়ে তুফানকেও হার মানিয়ে দেয়।

যা হোক, একদিন এই ভাবে জাহাঙ্গীর আমাদের মনস্তুষ্টি করে গিয়েছিলো প্রত্যেককে পাউণ্ড তিনেক করে চা দিয়ে। তাই কৃতজ্ঞতা-স্বরূপ তার বিচিত্র জীবনধারা নিয়ে আমরা আলোচনা করতে বসেছিলাম টিফিনের সময় ক্যানটিন রুমে। কাজে আমার চেয়ে অল্পদিনের সিনিয়ার মোহন বাবু বলে উঠলেন, জাহাঙ্গীরের জ্যোতির্বিদ্যায় বেশ জ্ঞান আছে, কারণ সে বার আমি এম, এ পরীক্ষায় পড়ার অভাবে খুবই খারাপ করে ফেলেছিলাম, ভাবলাম বুঝি এই বুড়ো বয়সে জীবনে ফেলের প্রথম আস্বাদটা গ্রহণ করতে হবে। জাহাঙ্গীর আমার হাত দেখে অতীতের অনেক কিছু ঘটনা ঠিক ঠিক বিবৃত করে বলেছিলো—বাবু, আপনি নিশ্চয় পাশ করবেন। আশ্চর্য্য এই যে, আমি অত খারাপ পরীক্ষা দিয়েও সেকেণ্ড ক্লাস পেলাম।

গোপাল বাবু প্রতিবাদ করে বলে উঠলেন—সব বাজে কথা, ওসব তোমার মনের ভ্রান্তি—বেটা আবার **jack of all trade master of none** হতে চায়। ভাগ্যগণনা অত সোজা কথা নয়। যদি সে জ্যোতির্বিদ্যায় সত্যিই পারদর্শী হতো, তবে সে ওই সামান্য বেতনে আর চা কোম্পানীর দারোয়ানগিরি করতো না—কোন জ্যোতিষালয় খুলে বোকা লোকের মাথায় হাত বুলিয়ে দু'হাতে টাকা লুঠতো।

আমি বললাম, দেখুন—সকলেরই তো মনোবৃত্তি একরকম নয়, সে হয়তো ওটা পছন্দ করতে না-ও পারে।

আমি জাহাঙ্গীরের পক্ষ নিয়েছি দেখে—গোপাল বাবু চটে গিয়ে একটা বিকট মুখভঙ্গি করে বললেন ঢের হয়েছে, আর মশাই ওকালতি বুদ্ধি জাহির করবেন না। অর্থ উপার্জ্জনে কারোর অরুচি দেখেছেন? আর তাই যদি হয়, কেন যে এই সামান্য বেতনের চাকরি করছে? ভাগ্য-গণনায় যদি তার অত প্রতিভাই থাকে, তবে কেন সে নিজের ভাগ্য ফেরাতে পারে নি, বলতে পারেন?

আমি ভাবলাম, মূর্খের সঙ্গে যুক্তি-তর্কের অবতারণা করে মিছে কেন নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দেব? ভাগ্য-গণনা ও ভাগ্য-পরিবর্তনের মধ্যে যে একটা বিরাট পার্থক্য আছে তা এই স্থূলবুদ্ধিসম্পন্ন স্বার্থপর গোপাল বাবুটার জানা নেই।

এর পর যেদিন জাহাঙ্গীর এলো সেদিন আমি জিগ্যেস করলাম—তুমি নাকি ভাল ভাগ্যগণনা করতে পারো? সে হাসির সঙ্গে দ্রুত মাথা নেড়ে জানিয়ে দিলো যে ওতে তার কোন জ্ঞানই নেই। আমি কোন প্রতিবাদ করি নি। এর অনেক দিন পরে কোন ঘটনা ক্রমে পঞ্চান্ন বৎসর বয়স্কা ষ্টুয়ার্ট মেমসাহেবের কাছ থেকে জানতে পেরেছিলাম যে—জাহাঙ্গীরের জ্যোতির্বিদ্যায় শুধু সামান্য নয় অগাধ পাণ্ডিত্য আছে। তিনি বললেন—জাহাঙ্গীর আমার হাত দেখে বলেছিলো যে আমার ভাগ্যে দুতরফা অপ্রত্যাশিত ভাবে টাকা পাবার আশা আছে। জাহাঙ্গীরের ভবিষ্যৎবাণীকে আমিও তোমার মতো প্রথমে উপহাস করেছিলাম। কিন্তু সেদিন অবিশ্বাস বিশ্বাসে পরিণত হলো, যেদিন আমি নিতান্ত আকস্মিক ভাবেই রেঞ্জার্সের ফার্ষ্ট প্রাইজ স্বরূপ চল্লিশ হাজার টাকা পেলাম। এর পর জাহাঙ্গীরকে আমি জিজ্ঞাসা করলুম—এক তরফা টাকা তো পাওয়া গেল, অন্যটা কোথা থেকে আসবে? জাহাঙ্গীর হেসে বলেছিলো, অন্যটা আসবে দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়ের দৌলতে। ষ্টুয়ার্ট মেমসাহেব বলে চললেন নিকট বা দূরসম্পর্কীয় আত্মীয় বলতে তো কাহারও কথা মনে পড়ছে না, দেখি কি ভাবে যোগাযোগটা মিলে যায়।

এই বৃদ্ধাটির সম্বন্ধে কিছু বলে রাখা দরকার—আমি ব্যাঙ্কে কাজ নেবার দু'-চার দিনের মধ্যেই ষ্টুয়ার্ট মেম সাহেবের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হয়। কারণ তিনি ছিলেন স্পষ্টবাদী আর অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে তিনি সব সময়ই তৎপর ছিলেন। আর এই সদ্গুণের জন্যেই তিনি চাকরী-জীবনে উন্নতি না করতে পেরে ত্রিশ বছরের পর মাত্র পাঁচশো টাকা মাইনে পাচ্ছেন। অথচ যাঁরা কালকে ঢুকেছেন তাঁরা নিজেদের অশিক্ষা ও অক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও খোসামোদি বৃত্তিতে পারদর্শিতা দেখিয়ে প্রারম্ভিক বেতনই পাঁচশো টাকা পাচ্ছেন। তাই নতুন লোকের সামান্য ভুল-ভ্রান্তির সুযোগ নিয়ে যখন সহকর্মীরা আমাকে শ্লেষাত্মক বাক্যবাণে অচৈতন্য করে ফেলতো, তখন ষ্টুয়ার্ট মেম সাহেব এগিয়ে আসতেন তার তীব্র প্রতিবাদ করতে। সময়-অসময় সাহায্য করাবার আশ্বাসটুকুও তিনি মাঝে মাঝে আমাকে দিতেন।

তিনি একদিন আমাকে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন যে—তুমি কি খুব ভাল মিথ্যে কথা বলতে পার? আমি তাঁর হেঁয়ালী না বুঝতে পেরে না-ই বলেছিলাম। তিনি উত্তর করলেন—তবে তোমায় এই পঁচিশ বৎসরের শেষে এখান থেকে চারশো টাকা বেতন নিয়েই বিদায় নিতে হবে। হেসেছিলাম আমি। সত্যি কথা বলতে কি, কার্য্যোপলক্ষে সকলের সঙ্গে আমার মেলামেশা থাকলেও আমার মনের মানুষ বলতে এই দুজন—জাহাঙ্গীর খান আর ষ্টুয়ার্ট মেম সাহেব। আমি যে তাঁর বিদেশে অধ্যয়নরত ছেলের স্থান নিয়েছিলাম এটাই তো সকলের মনে ক্রোধ এনে দিয়েছিলো। বন্ধুরা তাই বিদ্রূপছলে টিপ্পনি কেটে বলতো—আপনার আর মশাই অভাব কি, একটা মা'র জায়গায় দুটো 'মা' দুদিকের অভাব মেটাচ্ছে।

যাই হোক, এবারে যেদিন জাহাঙ্গীর খান এলো সেদিন আমি

কোন শৈলাবাস থেকে

মিতা,

এত কাণ্ড, এত তোড়জোড়ের পর সত্যিই পৌঁছলাম। উনি যে শেষ পর্য্যন্ত ছুটি পেলেন এই আমার ভাগ্যি। ছুটির এই কটা দিন কি ভাবে কাটাবো তাই নিয়ে কত জল্পনা কল্পনা করেছি কিন্তু এখানে মন বসছেনা। ১৫ বছর আগে এসেছিলাম তারপর এই, কিন্তু কত বদলে গেছে। আমরা যে নির্জন জায়গাগুলিতে বসে সূর্য্যোদয়, সূর্য্যাস্ত দেখতাম, সারাদিন কাটাতাম, সে সব জায়গাগুলি এখন লোকে লোকারণ্য। অনেক জায়গায় জঙ্গল কেটে ফোয়ারা তৈরী হয়েছে, বেঞ্চ বসানো হয়েছে কিন্তু আগের সে সরল সৌন্দর্য্য আর নেই। এখন রাস্তাঘাট, হোটেল, বাংলো সব লোকে লোকে ছয়লাপ। যাই হোক আমার মানসিক অবস্থাটা বুঝতেই পারছ। বিমু ঠীক ভাল। ওরা কবে মিতা মাসীর কাছে যাবে, ভালমন্দ খাবে তারই দিন গুনছে। কর্ত্তা এখানেও বইয়েমুখ গুঁজে থাকার চেষ্টা করছেন। চিঠি লিখো।

কমু

কমু,

তোমার কোথায় ব্যাথা লাগছে বুঝতে পারছি। তুমিই সত্যিই রোম্যান্টিক। পরিবর্ত্তনকে মেনে নেওয়াই ভাল। ১৫ বছর আগে আমরা যা দেখেছিলাম আজ তা না থাকাই তো স্বাভাবিক। মানুষের জীবনে এই ১৫ বছরে কত পরিবর্ত্তন এসেছে ভাব তো! বর্ত্তমানের মধ্যেও আনন্দের খোরাক অনেক পাবে যদি মনটাকে খোলা রাখ। তারপর দেখবে ১৫ বছর পরে এই দিনটির কথা কত মনে হবে।

মিতা

মিতা,

তুমি একেবারে মাষ্টারনী। প্রানের দুঃখের কথা তোমায় বললাম কোথায় একটু আহা উহু করবে না সঙ্গে সঙ্গে উপদেশ। কিন্তু একটা জৈবীক সমস্যার সমাধান করে দাও তো। তোমার মনে আছে এখানে হোটেলে খাবার দাবার কেমন ভাল ছিল। সেই আশাতেই তো আমি রান্নাবান্নার জিনিষ না নিয়ে এলাম—ভাবলাম একটা দিন সত্যিই ছুটি পাব। কিন্তু মাগো! কি অবস্থা হয়েছে। জিনিষপত্রের দাম আগুনের মত। হোটেলের খাবার দাবার যে কি ঘি দিয়ে রাঁধে জানিনা, কিন্তু একেবারে ভাল লাগেনা। খাঁটি ঘি পাওয়া দুস্কর আর পাওয়া গেলেও বড্ড দাম। কিন্তু রান্না আমাকে সুরু করতেই হবে—তানাহলে থাকতে হবে না খেয়ে।

কমু

কমু,

একটা কথা আছে ঢেঁকী স্বর্গে গেলেও ধান ভানে। তোমারও সেই অবস্থা। আমি তোমার সঙ্গে একমত। ছুটিতে খাওয়া দাওয়াই যদি না

জমল তাহলে আর হোল কি ? তুমি এক কাজ কর। কিছু মাটির হাঁড়ীকুঁড়ি কিনে নাও আর একটা তোলা উনুন।—র' বাজারে খুব ভাল তরি-তরকারী আর মাছ মাংস পাওয়া যায়। রোজ সকালে বিনু আর হীরুকে নিয়ে নিজে চলে যেও বাজারে। বেশ বেড়ানো হবে, বাজারও হবে। আর রান্নাবান্নার জন্যে ভাল ঘি পাওয়া যাচ্ছেনা বলে মন খারাপ কোরনা। 'ডালডা' কিনো। শীলকরা টিনে 'ডালডা' বনস্পতি সবসময় তাজা পাওয়া যায়। 'ডালডায়' খাঁটি ঘি'র সমপরিমান ভিটামিন 'এ' যোগ করা হয়। এতে আরও যোগ করা হয় ভিটামিন 'ডি'। তাই 'ডালডা' স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল। কিন্তু এত গুণ থাকা সত্ত্বেও 'ডালডা'র দাম কত কম। তোমার রন্ধনপর্বের ফলাফল জানার জন্যে উৎসুক রইলাম।

মিতা

মিতা,

তুমি কি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছ ? হাঁড়ীকুঁড়ির ব্যাপার তো বুঝলাম। কিন্তু তুমি কি ভেবেছ আমরা দিনের মধ্যে চারবার শুধু মিষ্টি খেয়ে থাকব ? 'ডালডায়' তো শুধু মিষ্টিই হয় কিন্তু অন্যান্য রান্না ?

কমু

কমু,

'ডালডায়' সব রান্নাই ভাল হয়। গত কয়েক বছর ধরে আমার বাড়ীর সব রান্নাই 'ডালডায়' হচ্ছে। আমাদের মত এরকম লক্ষ লক্ষ বাড়ী আছে যেখানে সব রান্না—শাক, ডাল, চচ্চড়ী, ঘন্ট, মাছের ঝোল সবই 'ডালডায়' হয়। তেল, ঘি দিয়ে যে সব রান্না হয় তার সবই 'ডালডায়' করা চলে। 'ডালডায়' খাবার দাবার রান্না ভাল হয় কারণ 'ডালডা' খাবারের আসল স্বাদটি ফুটিয়ে তোলে। 'ডালডা' সাধারণ তেলের থেকে ভাল, কারণ এতে যোগ করা হয় ভিটামিন 'এ' এবং 'ডি'। আমাদের বাড়ীর রান্নার ভুরি ভুরি প্রশংসা তো তুমি নিজের কানেই শুনছ। চেষ্টা করে দেখোনা।

মিতা

মিতা,

এতদিনে মনে হচ্ছে সত্যিই ছুটিতে এসেছি। বেশ কিছুদিন পরে আরাম করে খাওয়া দাওয়া করলাম। রান্নাটা আনন্দের হয়ে উঠেছে। 'ডালডা' সত্যিই সব রান্নার জন্যে ভাল। অনেক ধন্যবাদ।

কমু

DL. 447B-X52 BG

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড, বোম্বাই

জিগ্যেস করলাম—ওহে, তুমি কেন সেদিন আমাকে মিথ্যে বললে যে—তোমার ভাগ্য-গণনায় কোন জ্ঞানই নেই ?

সে হেসে বললো—বাবু, সামান্ত একটু-আধটু জানি, তা আবার নিজের মুখে কি করে জাহির করবো বলুন ?

সে যতটুকু অভিজ্ঞতাই থাক না কেন আমার হাতটা দেখ দেখি ? বলে ডান হাতটা বাড়িয়ে দিলাম।

জাহাঙ্গীর হেসে বললো—রাজা সাহেব, যেদিন আমার বাড়ীতে পদার্পণ করবেন, সেই দিনই কিন্তু হাত দেখবো—তার আগে নয়, কিন্তু। বলে দ্রুতপদে চলে গেল।

এবারে সংসারে শোকের ঝড়-ঝাপ্টা নেমে এলো—প্রায় এক মাস হলো দিদিমা মারা গেছেন, এর পর একদিন পিসিমাও আমাদের ছেড়ে বিধির নির্ম্মম ডাকে সাড়া দিলেন। বাবা অনেক দিন হলো দীর্ঘ রোগশয্যায় আছেন, এবারে তাঁর অবস্থা যেন দ্রুত খারাপের দিকেই চললো, ক্ষুদ্র সামর্থের শেষ চিহ্নটুকু নিঃশেষ করে সকল নামজাদা ডাক্তার-বদ্যিই আনা হলো, ফল কিন্তু তেমন আশাপ্রদ পাওয়া যাচ্ছিল না, বাবার সমস্ত শরীরেই যেন আসন্ন মৃত্যুর ছাপট ফুটে উঠেছিলো। বাবাকে কেন্দ্র করে নানা রকম চিন্তা করতে করতে রাস্তা দিয়ে একজন দক্ষিণ-কলিকাতার বিখ্যাত চিকিৎসকের বাড়ীতে চলেছি। এমন সময় সেলাম করে পথরোধ করে দাঁড়ালো জাহাঙ্গীর খান।

সে বললো, বাবু, আপনাকে কেন এত দিন অফিসে দেখতে পাইনি ?

আমি বললাম, ছুটি নিয়েছি।

জাহাঙ্গীর একটু ইতস্তত: করে বললো, হুজুর, আপনার কি শরীর খারাপ ?

আমি না বলে, সংক্ষেপে মানসিক ক্লেশের সব কিছু কথা তাকে বললাম।

জাহাঙ্গীরের বোধ হয় আজ আমার রুক্ষ চেহারাটার ওপর একটু মায়া জন্মেছিলো, তাই সে সান্ত্বনার সুরে বলে উঠলো না বাবু, আপনার বাবা নিশ্চয়ই সেরে উঠবেন—বলে আমার হাতটা সে টেনে নিয়ে ক্ষানিকক্ষণ দেখবার পর একটা অদৃশ্যপ্রায় হাতের রেখা দেখিয়ে বললো, এই তো হুজুর, এখন আপনার পিতৃবিয়োগ হচ্ছে না। আপনার বাবা নিশ্চয় এ যাত্রায় রক্ষা পাবেন। হাঁ আমার কথা কিন্তু কিছুতেই মিথ্যে হবে না—তার কথা আমি অবিশ্বাস করিনি।

কালক্রমে বাবা ঠিক সময় আরোগ্যের পথে চললে জাহাঙ্গীরের কথার সত্যতা প্রতিপন্ন করলেম। মাকে আমি সব কিছু কথাই বলেছিলাম এবং একমাত্র মায়েরই পরামর্শে বাবা সেরে যাবার পর আমি একবার তাকে মিষ্টি খাবার জন্মে দুটো টাকা দিতে গিয়েছিলাম।

সে হাত জোড় করে বলেছিলো—বড়বাবু যে সেরে উঠেছেন সেটাইতো খুব আনন্দের কথা, তাতে আবার মিষ্টি খাইয়ে আনন্দ দেবার দরকার কি হুজুর ? যদি আজ্ঞা করেন তবে একদিন বড়বাবু আর মাকে দেখতে গিয়ে দুটো মিষ্টি খেয়ে আসবো।

আমি বললাম তা না হয় যাবে কিন্তু এখন গরীবের অন্ততঃ এই দু'টো টাকা নাও।

সে বললো, কে বলেছে আমার হুজুর গরীব, না না, তিনি রাজা মানুষ। জাহাঙ্গীর বলে চললো হুজুর—সেদিন আমি আপনার হাত দেখে দুটো কথা বলেছিলাম বলে আজ তার দাম দিতে এসেছেন—আমি সব কিছু বুঝতে পেরেছি। এটা নিলে আমি নিজের ওপরই অবিচার করবো কিন্তু। বলতে বলতে তার চোখ দিয়ে দু' ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়লো। আমি তখন আর তাকে টাকা দেবার চেষ্টা করলাম না।

বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে জীবন গড়িয়ে চলেছে, সব কিছু জিনিষে যথার্থ মনোযোগ দিতে পারি না। অনেক কিছু আমার অলক্ষ্যেই ঘটে যায়, আবার অনেক তুচ্ছ কাজও বহু সময় সূক্ষ্ম দূরদর্শিতার জ্ঞান দাবী করে বসে। তাই এই রকমই সামান্য ব্যাঙ্কের একটা ঘটনা আজ কয়েক দিন হলো আমার মনটাকে বেশ কষ্ট দিচ্ছিলো। ব্যাপারটা হলো এই যে—আমাদের ডিপার্টমেন্টের ইনচার্জ স্মিথ সাহেব ভারতবর্ষে প্রায় ত্রিশ বৎসর ব্যাঙ্ক সংশ্লিষ্ট কাজে জড়িত থাকবার পর রিটায়ার হয়ে স্বদেশে ফিরে যাচ্ছিলেন কিছুদিনের মধ্যেই ব্যাঙ্ক-কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে তাঁকে বিদায় সম্ভাষণ দেওয়া হবে। এই সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষ কিছুদিন আগে একটা বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে—প্রত্যেক কর্ম্মচারীকে এই 'ফেয়ার-ওয়েল' পার্টিতে যোগ দিতে হবে।

বলা বাহুল্য, ইউনিয়ান এর তীব্র বিরোধিতা করে পার্টিতে যোগদান করা বয়কট করলো। কিন্তু আমি এদিক থেকে ইউনিয়ানের সঙ্গে ঠিক একমত হতে পারিনি। এভাবে পার্টি থেকে বিরত থাকাটা যেন আমার কাছে কাপুরুষতা মনে হয়েছিলো। ইচ্ছে থাকলেও আমি শেষ পর্য্যন্ত সকলকে পরিতুষ্ট করবার জন্যে যোগদানে বিরত থাকলাম। স্মিথ সাহেবের চরিত্র নিয়ে আলোচনা করতে চাই না, তবে তিনি যে একজন সৎ মানুষ ছিলেন, একথা বেশ জোর করেই বলা যায়। একজনের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে গিয়ে অন্যকে অপমানিত ও বিপদগ্রস্ত যেন আজকালকার রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই অন্য সাহেবদের শায়েস্তা করতে গিয়ে নিরীহ স্মিথ সাহেবকে এই ভাবে নির্যাতিত করে সত্যিই আমি মর্ম্মান্তিক আঘাত পেয়েছিলাম।

শেষ দিনে যাবার সময় স্মিথ সাহেব শেকহ্যাণ্ড করে বিদায় নিতে এসে—আমার সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা কইলেন। তিনি বললেন, তুমি আমার 'ফেয়ার ওয়েল' পার্টিতে যাওনি বলে আমার তাতে কিছু এসে-যায় না। কিন্তু তুমি যে নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে কাজ করেছো সেটাই আমাকে বড় দুঃখ দিচ্ছে। তুমি নিজের আত্মাকে এভাবে অন্যের কাছে বিক্রি করে দিয়েছো এ আমার জানা ছিল না। তিনি বলে চললেন, তুমি এখনও যুবক—আমি জানি, তোমার পার্টিতে যোগদান করতে খুবই ইচ্ছে ছিলো, কিন্তু এ সামান্য কাপুরুষোচিত প্রবৃত্তিটাকে দমন করতে পারলে না ? যা হোক এটাকে দমন করতে চেষ্টা করবে, তা না হলে এটাই তোমার জীবনে অশেষ প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে। সব শেষে বললেন—অনেক কিছু বললাম বলে কিছু মনে কোর না, এটা বড়োর উপদেশ বলেই নিও—বলে তিনি হাসলেন।

তাঁকে যে অর্থহীন হাসি সমেত দীর্ঘায়ু কামনা করে দু একটা কথা বলে বিদায় দেব—এরকম মনের অবস্থা আমার তখন ছিলো না। স্মিথ সাহেব চলে গেলেন, স্বার্থপরের দল এগি

এলো, সাহেব এতক্ষণ কথা কইলেন কেন, তার কৈফিয়ত নেবার জন্যে। সন্দেহজনক ভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, কি মশাই, সাহেবকে বলে কোন ভাই টাইয়ের চাকরী ম্যানেজ করলেন নাকি? কোন কিছু না বলে শুধু বললাম—তিনি কাজ সম্বন্ধে কিছু উপদেশ দিয়ে গেলেন। তাতেও রেহাই নেই, তাঁরা বললেন, ডিপার্টমেন্টে এত সিনিয়ার লোক থাকতে আপনাকে এসব কথা বললেন কেন? অদূর ভবিষ্যতে কোন পোজিসান পাচ্ছেন নাকি? উত্তর দিলাম না কিছু। ভাবলাম সাহেব আমার মনটা বুঝে ফেলেছেন। সত্যিই আমি পরবুদ্ধি-চালিত হয়ে আজ এই অবস্থায় উপনীত হয়েছি। তা না হলে বোধ হয় এর চাইতে স্বচ্ছন্দ ও সুবিধাজনক স্থানে প্রতিষ্ঠিত হতে পারতাম।

স্মিথ সাহেবের শূন্য স্থান পূরণ করবার জন্যে লণ্ডন থেকে এলেন মার্শ সাহেব। সকলেই প্রথম দিন অন্যদিনের চাইতে একটু ভাল ভাবেই সেজে এসেছিলেন—নতুন সাহেবের দৃষ্টিটা নিজেদের দিকে আকৃষ্ট করবার জন্যে। দেখলাম, আমাদের নতুন সাহেবের মুখে তারুণ্যের ছাপটা ফুটে উঠেছে, তিনি যেন যৌবনের মধুর স্বপ্নে বিভোর। জানলাম এসব কাজে তাঁর তেমন কিছু, মানে প্রায় কোন অভিজ্ঞতাই নেই, এই সেদিন পর্য্যন্ত তিনি অক্সফোর্ডের ছাত্র ছিলেন। উচ্চবংশসম্ভূত ছাড়াও তিনি যে ব্যাঙ্কের একজন ডিরেক্টরেরই আত্মীয়, সেকথা আগে থেকেই জানতে পেরেছিলাম।

যা দেখলাম, ঠিক তাই; নতুন মার্শ সাহেব নিজের উচ্চশিক্ষা ও প্রখর বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে গিয়ে ব্যাঙ্কের সেই চিরাচরিত প্রথাগুলোকে তছনছ করে পদে পদে নিজের বুদ্ধিহীনতার জাহির করলেন। উচ্চবংশোদ্ভূত ছাড়াও তিনি যে লণ্ডনের বিখ্যাত 'বিজনেস ম্যাগনেট' লর্ড হ্যাণ্ডিহামের নিকট জামাতা পদে অধিষ্ঠিত হতে চলেছেন, এটাই যেন প্রত্যেক কর্মধারার মধ্য দিয়ে প্রতিপন্ন করতে চাইছিলেন। যা হোক, তিনি খুব মিশুকে লোক ছিলেন বলে অল্পদিনের মধ্যেই তিনি সকলের জনপ্রিয় হয়ে উঠলেন। লাঞ্চ পিরিওডের সময় তিনি সামান্য কেরাণীদের সঙ্গে দ্বিধাহীন আলাপ করে পুরাতন নিয়মটার ব্যতিক্রম ঘটিয়ে উচ্চ ও নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারীদের ব্যবধানটা অনেক নিকটে এনে ফেলেছিলেন।

সাহেবের সঙ্গে আলাপ করে জানতে পেরেছিলাম এই যে—যদিও সম্বন্ধের সূত্রটা খুবই সূক্ষ্ম—বৃদ্ধ ষ্টুয়ার্ট মেমসাহেব তাঁর দূরসম্পর্কীয়া আত্মীয়া। আর মার্শ সাহেবের সঙ্গে কথা বলে এটাও আমার বদ্ধমূল ধারণা হয়েছিলো যে, তিনি আত্মগর্বিশীল হলেও চরিত্রহীন পুরুষ নন। এর পর থেকে মার্শ সাহেবের সঙ্গে বিবিধ প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করাটা আমার কাজের একটা অঙ্গ হয়ে উঠেছিলো। একদিন আমাদের এইরূপ আলোচনার বিষয়বস্তু ছিলো—জ্যোতির্বিদ্যা। সাহেব সগর্বে জানিয়ে দিলেন যে তিনি জ্যোতিষীদের ভবিষ্যদ্বাণী বিশেষত: ভারতীয় জ্যোতিষীদের কথা একেবারেই বিশ্বাস করেন না। ভারতবর্ষের কথাটা তুলতে আমি একটু ঘা খেয়েছিলাম, তার জন্যে নিজের যুক্তিকে দাঁড় করাবার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগলাম—কথায় কথায় আমি জাহাঙ্গীরের ভাগ্য-গণনার কথা বলে ফেললাম এবং সেটা যে আমার জীবনে কি ভাবে সত্য হয়েছে, তা-ও বললাম।

সাহেব কিন্তু সেটাকে হেসে উড়িয়ে দিলেন। তারপর হেসে বললেন, আমি এরকম আজগুবি গল্প বহু শুনেছি, নিজ প্রত্যক্ষ দৃষ্টিতে যতক্ষণ না এ-সব উপলব্ধি করছি ততক্ষণ আমি বিশ্বাস করতে নারাজ। আরও বললেন মার্শ সাহেব—নিয়ে এসো তোমার জাহাঙ্গীর খানকে, আমি তাকে গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান সম্বন্ধে দু'-চারটে প্রশ্ন করবো।

আমি উত্তরে বললাম, সে নিতান্তই মূর্খ মানুষ, একমাত্র ভাগ্য-গণনা ছাড়া আর সে কিছু জানে না।

সাহেব বললেন, বেশ তাই হবে, আমি তাকে আমার হাত দেখাতে রাজী আছি; তবে সে যদি আমার অতীত সম্বন্ধে ঠিক কিছু বলতে পারে তবেই তাকে আমি আমার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বলতে দেব, তা না হলে নয়।

আমিও নিজের গোঁ বজায় রাখবার জন্যে জাহাঙ্গীরের আগমনের প্রতীক্ষায় দিন গুণতে লাগলাম। এ অবধি জাহাঙ্গীর ব্যাঙ্কে আসা একেবারেই কমিয়ে দিয়েছিলো। কারণ মাঝে সে বেশ কিছুদিন পক্ষাঘাত রোগে ভুগেছিলো। দিন পনেরো অপেক্ষার পর এক রকম অধৈর্য্য হয়েই আমি তার বাড়ীতে এই প্রথম বারের মতো গেলাম, পার্ক সার্কাসের এক জীর্ণ বস্তীর মধ্যে সে একমাত্র শিশুকন্যার সঙ্গে বাস করে। আমাকে দেখতে পেয়ে বৃদ্ধ ও ফতিমা আনন্দে আত্মহারা হয়ে নানাভাবে পরিচর্য্যা করে আমাকে তুষ্ট করলো। জাহাঙ্গীর এইরূপ আকস্মিক ভাবে বাড়ীতে পদার্পণ করার কারণটা জিজ্ঞাসা করায়—আমি সব কথা সংক্ষেপে বিবৃত করলাম। এবং নিজের সুবিধা মত তাকে একদিন ব্যাঙ্কে আসবার কথা বলে এলাম।

এই ক'দিনের মধ্যেই জাহাঙ্গীরের চেহারার এত পরিবর্ত্তন ঘটেছিলো যে, তাকে আমাদের সেই পুরোনো—রসিক জাহাঙ্গীর বলে মনেই হয় না। কষ্টে সে ভেঙ্গে পড়েছে, আসন্ন মৃত্যুর ছাপ প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ফুটে উঠেছে—তাকে এভাবে কষ্ট দিতে আমারও মনটা যেন কেমন করছিলো। জাহাঙ্গীর এবার যেন উপযাচক হয়েই একটা নির্দ্দিষ্ট দিন ধার্য্য করে দিলো। আমি বললাম, শরীর খারাপ থাকলে যেতে হবে না।

জাহাঙ্গীর উত্তর করলো, রাজা সাহেবের জন্যে প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করতে রাজী আছি—হ্যাঁ, আমার শরীর নিশ্চয় ভালো থাকবে।

আসবার সময় জাহাঙ্গীরের হাতে পাঁচটা টাকা দিতে গেলাম, সে হাত জোড় করে বলল—হুজুরের খেয়েই তো বেঁচে আছি, আবার এতগুলো টাকা দিচ্ছেন কেন? পাশেই দাঁড়িয়েছিলো ফতিমা, তার হাতে টাকা ক'টা গুঁজে দিয়ে বললাম, এতে তোমার কিন্তু বলবার কিছু নেই। জাহাঙ্গীর হেসে মেয়েকে বললো—হুজুরকে প্রণাম কর। এগিয়ে এসে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলো ফতিমা। আমি একটু অপ্রতিভ হয়ে বললাম থাক্ থাক্, এই কচি মেয়েটার ছোট্ট প্রণামটা পেয়ে মনটা যেন দুলে উঠলো—মনে হলো স্নেহ ও ভক্তি মিশ্রিত এই প্রণামটার দাম কি শুধু পাঁচ টাকা! কই এর আগে তো বহু সভা-সমিতিতে এর চাইতে অনেক বেশী টাকা দান করেছি, কই কখনো তো কেউ আমাকে এভাবে প্রণাম করেনি? আসবার সময় ফতিমাকে বললাম, তোমাকে একদিন আমাদের বাড়ীতে নিয়ে যাব।

নির্দ্দিষ্ট দিনে জাহাঙ্গীর এসে উপস্থিত হলো। বাবুদের কাছে আজ

আর জাহাঙ্গীরের তেমন কোন আদর নেই। কারণ সে তো আর বাবুদের দেশের ফল মূল বা কোম্পানীর চা এনে দেয় না, শরীর কেমন আছে এই সামান্য কথাটা জিগ্যেস করতেও কারোর মুখ সরলো না। কারণ, "যেখানে মধু সেখানেই মৌমাছির ভীড়" এটাই যে আজকালের রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে সেটাতো ভুললে চলবে না! মার্শ সাহেবকে গিয়ে বললাম এই হচ্ছে জাহাঙ্গীর খান, আর এরই কথা আপনাকে আমি বলেছিলাম। সাহেব নাসিকা কুঞ্চিত করে বললেন—তুমিই জাহাঙ্গীর, তুমি জ্যোতিষী নাকি? আমাকে মাঝে থেকে দোভাষীর কাজ করতে হলো। কারণ জাহাঙ্গীর ইংরিজি বা মার্শ সাহেব হিন্দি কথা বুঝতে পারতেন না। অফিসের বাবুরা সাহেবের চাটুকারিতা করবার জন্যে চারি দিকে ভীড় করেছিলেন। সকলে জাহাঙ্গীরকে আজ আর নাম ধরে ডাকছেন না। অতবড় নামটার পরিবর্ত্তে অধিক বাক্যব্যয় না করে 'ব্যাটা' বলেই সম্বোধন করছেন। অনেকে সাহেবকে সন্তুষ্ট করবার জন্যে বলছেন, কি রে বেটা, আর জামা-কাপড় জুটলো না, এই নোংরা কুর্ত্তাটা পরে সাহেবের কাছে এসেছিস? আবার কেউ বলছেন, খুব বড় দরের সাহেব ইনি, ভালো করে হাত দেখবি, না হলেই বিপদ।

এই বাকবিতণ্ডার মধ্যেই জাহাঙ্গীর তার ভাঙ্গা পুরোনো চশমাটার সুতো কানে জড়িয়ে নিলো। সাহেব এবার অশেষ ঘৃণাভরে জাহাঙ্গীরের দিকে হাতটা এগিয়ে দিলো। জাহাঙ্গীর অনেকক্ষণ ধরে হাতটা দেখলো—তারপর একে একে বলতে লাগলো অতীতের ঘটনাগুলো, কবে পিতৃ-মাতৃ বিয়োগ হয়েছে, পড়ালেখার সীমা কতদূর, অতীতের আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল ছিলো কি না। জীবনে কোন বড় বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করতে হয়েছে কি না, ইত্যাদি আরও কত কি।

সাহেবের মুখটা রক্তিম হয়ে উঠেছিলো, বোধ হয় তিনি একটু ঘাবড়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু মুখে তেমন কিছু চঞ্চলতা প্রকাশ না করে, মাঝে মাঝে একটু হাসছিলেন। খানিকক্ষণ পরে সাহেব একটু বিরক্ত হয়েই বলে উঠলেন—বাস, বাস, ঢের হয়েছে, এবারে আমার ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে কিছু বল দেখি? আবার ভালো করে হাত পরীক্ষা করতে লাগলো জাহাঙ্গীর। তারপর আস্তে আস্তে বললো, হুজুর সত্যি কথাই বলছি, আপনার হাতের রেখাগুলো দেখে মনে হচ্ছে যে, আপনার ভবিষ্যৎ জীবন মোটেই সুখের হবে না। পুনরায় সাহেবের মুখ রক্তিম হয়ে উঠলো। তারপর জাহাঙ্গীর বলে চললো, আপনার কোন মনস্কামনাই পূর্ণ হবে না, আপনি বোধ হয় একজন ধনপতি কন্যার সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হতে যাচ্ছেন, কিন্তু তা শেষ পর্য্যন্ত ফলপ্রসূ হবে না, আপনি শেষ জীবনে একজন নষ্টচরিত্র পুরুষ হবেন।

সাহেব এবারে ভাবলেন যে, কয়েক জন নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারীর মাঝখানে তাকে অপমানিত করবার জন্যেই জাহাঙ্গীরকে আনা হয়েছে। তাই তিনি ক্রোধে চিৎকার করে বলে উঠলেন, ঠিক ভাবে সব কিছু বল। বাবুদের মধ্যে থেকে কেউ কেউ বলে উঠলেন—বেটা বড় সাহেবের সঙ্গে কথা বলতে শিখিসনি? কোনরকমে আমি সকলকে ঠাণ্ডা করলাম। জাহাঙ্গীর এবারে আমাকে জিগ্যেস করলো—বাবু, আজ থেকে দশ মাস পরে ঠিক কত তারিখ হবে বলুন তো? আমি একটু হিসেব করে বললাম—এই বছরের ১৫ই অক্টোবর তারিখ। জাহাঙ্গীর এবার সাহেবকে বললো—আপনি শেষ পর্য্যন্ত জীবনে কোন ডাকাত দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়বেন, আর আজ থেকে ঠিক দশ মাস পরে—উন্মাদ অবস্থায় নিজেই বিষপ্রয়োগে আপনি জীবনের অবসান ঘটাবেন।

এবারে সাহেব কিন্তু নিজের ক্রোধ রোধ করতে না পেরে জাহাঙ্গীরকে প্রচণ্ড পদাঘাত করে বললেন—সামনে থেকে দূর হয়ে যা **dirty beech,** বাবুরাও কেউ কেউ দু'-চার ঘা দিলেন অসহায় বৃদ্ধটাকে। তাঁরা বলে চললেন —বেটা বড্ড বড় জ্যোতিষী হয়ে পড়েছে—মুখে যা আসছে তাই বলে অপমান করবে সাহেবকে! কেউ কেউ বললেন, নাকখত দে, আর না হয় তো পা ধরে বড় সাহেবের কাছ থেকে ক্ষমা চা বেটা!

জাহাঙ্গীর চিৎকার করে কেঁদে ফেলে বললো—হুজুর গরীব লোক হতে পারি কিন্তু মিথ্যে কথা বলতে শিখি নি। কোন রকমে তাকে সকলের কাছ থেকে নিয়ে গিয়ে ব্যাঙ্কের দরজা পর্য্যন্ত এগিয়ে দিলাম। দেখলাম, বৃদ্ধ আজ তার আত্মমর্য্যাদায় প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছে।

এর পর অনেক দিন হয়ে গেছে—আমি এ প্রসঙ্গ নিয়ে আর কোন দিন কোন কথা উত্থাপন করি নি। জাহাঙ্গীর ব্যাঙ্কে আসা প্রায় একেবারেই কমিয়ে দিয়েছিলো—বোধ হয় এ ঘটনার পর সে আর একবার ব্যাঙ্কে এসেছিলো—দেখেছিলাম মুখটা তার অস্বাভাবিক গম্ভীর, সেদিন কাষ্টমারের সংখ্যা যথেষ্ট বেশী ছিলো, যদিও সে আমার কাছেই এসেছিলো—তবুও তার সঙ্গে কথা বলবার সুযোগ আমার হয়ে ওঠে নি। সে যেন আমাকে এক রকম এড়িয়েই চলে গেল।

প্রায় মাস ছয়েক এর পর কেটে গেছে—ফতিমাকে আমি একদিন ব্যাঙ্কের কাউণ্টারে দেখে চমকে উঠেছিলাম, সঙ্গে ছিলো আর একজন বৃদ্ধ। ছুটে তার কাছে গিয়ে জিগ্যেস করলাম—জাহাঙ্গীর ভালো আছে তো? ফতিমা, আজ কিন্তু তোমাকে আমাদের বাড়ীতে নিয়ে যাব বলতে কোন উত্তর না করে—বাচ্ছা মেয়েটা হু-হু করে কেঁদে ফেললো। বৃদ্ধ লোকটাকে জিজ্ঞাসা করলাম কি হয়েছে?

সে বললো—জাহাঙ্গীর প্রায় তিন দিন হলো মারা গেছেন—বাবু, পয়সা-কড়ির অভাবে ডাক্তার-বদ্যি কিছুই দেখাতে পারলাম না—বলে সে-ও কেঁদে ফেললো। বাবু, জাহাঙ্গীর দারিদ্র্যের তীব্র কশাঘাত তিলে তিলে সহ্য করে পৃথিবীর বুক থেকে বিদায় নিয়েছে। বৃদ্ধ হঠাৎ জিগ্যেস করলো বাবু! এখানে রাজা সাহেব বলে কেউ আছেন?

আমি চমকে উঠে বললাম, কেন? বৃদ্ধ বললো, জাহাঙ্গীর যখন অসুখে ভুল বকছিলো তখন সে কেবল মাত্র রাজা সাহেবেরই নাম করছিলো—আর শুধু বলছিলো যে রাজা সাহেবকে দেখতে পেলে তার সমস্ত কিছু অসুখ সেরে যাবে। মরবার কিছুক্ষণ আগে সে আমাকে বললে, রাজা সাহেবকে আমার সেলাম দিয়ে বলো, যেন তিনি আমাকে ক্ষমা করে দেন—আর রাজা সাহেবকে আরও বলো যে জাহাঙ্গীর খান মরবার শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাঁরই অনুগত দাস ছিলো।

মনটা দুলে উঠলো, যেন বুক ফেটে কান্না বেরিয়ে আসতে চাইছিলো—কিন্তু সকলের সামনে নিজের দুর্ব্বলতাটাকে ঢাকা দেবার জন্যে বললাম—তুমি জাহাঙ্গীরের কে হও?

বৃদ্ধ বলে চললো—বাবু, আমি জাহাঙ্গীরের সম্পর্কে ভাই হই। আর ওই একই কোম্পানীতে কাজ করি— আর তাই ফতিমার আমিই এখন দেখা-শোনা করি।

বললাম, তা এখানে কেন এসেছো ?

বৃদ্ধ বললে, জাহাঙ্গীরের প্রভিডেণ্ড ফাণ্ডের টাকা ক'টা তুলতে এসেছি। আর ওই টাকা ক'টা দিয়ে ফতিমাকে ইরাকে ওর দিদিমার কাছে পাঠিয়ে দেব।

নিজেকে নির্মম পাষণ্ড বলে ধিক্কার দিতে ইচ্ছে করলো। ভাবলাম, আমিও কি এমনই স্বার্থপর যে তাকে একবার দেখে আসতে সময় করে উঠতে পারি নি ? জাহাঙ্গীর যে মরবার আগে আমার থেকে ক্ষমা ভিক্ষা করেছে, সেটাই যেন আমাকে তার সেই চরম নির্য্যাতনের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিলো।

একটার পর একটা দিন আগের মতোই কেটে যাচ্ছিলো—একদিন লক্ষ্য করলাম, আমাদের মার্শ সাহেব আগের চেয়ে একটু যেন বিভিন্ন ভাবে জীবন ধারণ করছেন। তিনি যখন প্রথম এখানে আসেন তখন তাঁর কোন রকম নেশা-না-করার অভ্যাসটা আমাদের সকলকেই আশ্চর্য্য করেছিলো। আজ দেখে চমকে উঠলাম যে—তিনি বেশ ভাল রকমই নেশা করে এসেছেন। তাঁর হাত-পা ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছে দেখে, তিনি যে এদিক দিয়ে অভিজ্ঞ নন, তা বুঝতে পারলাম। তিনি তাছাড়া ঠিক সময় অফিসে তো আসতেনই না উপরন্তু রীতিমতো কামাই করতে লাগলেন। তিনি প্রায় বছর চারেক আমাদের ব্রাঞ্চে এসেছেন কিন্তু একটা নিছক খামখেয়ালীর জন্যে সে বারে ব্যাঙ্কের পঞ্চাশ হাজার টাকা ক্ষতি হল।

অফিসের লোকের সঙ্গে তাঁর দুর্ব্যবহারের মাত্রাটা যেন দিন দিন বেড়ে যেতে লাগলো। কাষ্টমারদের সঙ্গে তার অসদ্ব্যবহারের মাত্রাটা এতই বেড়ে গেল যে—প্রত্যেকে তীব্রভাষায় নালিশ করে ব্যাঙ্কের সুনাম নিয়ে টানাটানি করতে লাগলেন। কিছু দিন আগে এক লাখ টাকার একটা ফৌজদারি কেসে তিনি নিজেকে এমন ভাবে জড়িয়ে ফেললেন যে—বিচারে প্রমাণিত হলো তিনি এ মামলার সঙ্গে প্রত্যক্ষ ভাবে জড়িত আছেন এবং মামলার তিনি প্রধান আসামী। কোন রকমে ব্যাঙ্ক-কর্তৃপক্ষ তাঁকে সেবারের মতো বাঁচিয়ে দিলেন। এর পর আমি অনেকেরই মুখে মার্শ সাহেবের সম্বন্ধে কুৎসিত ও হিংসামিশ্রিত ঘটনাকাহিনী শুনেছি। অল্প দিনের মধ্যেই তিনি আইন-বিরুদ্ধ ভাবে গাড়ি চালিয়ে তিন জন পথচারীকে নিহত আর একজনকে সাংঘাতিক ভাবে আহত করলেন। তাঁর বিরুদ্ধে দিন দিন নালিশ আর মামলার সংখ্যা বেড়ে উঠতে লাগলো। বোধ হয় তিনি ডিরেক্টারের আত্মীয় বলেই তাঁকে চাকরিতে রাখা হয়েছিলো। নানা রকম দুর্নীতিমূলক কাজ করে তিনি সকলকে স্তম্ভিত করতে লাগলেন। সহপাঠীদের মুখে শুনেছিলাম যে, মার্শ সাহেবের নামে খারাপ রিপোর্ট বিলাতের হেড অফিসে ইতিমধ্যেই পাঠানো হয়েছে—আর সেখান থেকে নির্দ্দেশ না পেলে সাহেবের বিরুদ্ধে কোন রকম শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভবপর নয়।

অফিসের কাজে আমাকে প্রায়ই ইনকাম ট্যাক্স-অফিসে যেতে হতো—সেদিন অফিসে যেতে না যেতেই নির্দেশ দিলেন যে, আমাকে একবার সেখানে যেতে হবে, শীঘ্রই সেখানে যাত্রা করলাম। প্রায় বেলা একটার সময় সমস্ত কাজ সমাপন করে ডালহৌসি স্কোয়ারের জনপূর্ণ রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি। মনটা নানা কথায় তোলপাড় করছিলো। এমন সময় অতর্কিতে একটা গাড়ী প্রচণ্ড গতিতে আমার সামনে এসে ব্রেক করলো—চমকে উঠে ছুটে গিয়ে ফুটপাতে উঠলাম দেখে একজন পথচারী বলে উঠলেন—কি মশাই, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে রাস্তা চলছেন নাকি? কথাটা কানে গেল না, কারণ দেখলাম আমাদের অফিসের সেই পরিচিত ব্যাঙ্ক-ভ্যানটাই সামনে এসে দাঁড়িয়েছে—আর তার মধ্যে উন্মত্তের ন্যায় লাফালাফি করে নিজের মাথার চুল ছিঁড়ে শরীর ক্ষত-বিক্ষত করে ফেলছেন আমাদের মার্শ সাহেব। সাহেব চিৎকার করে ডেকে আমাকে বলছেন, তুমি শীগ্‌গির গাড়ীর ভেতর এসো, তোমায় অনেক কিছু বলবার আছে। মূঢ়ের মতো কি যে হচ্ছে কিছুই বুঝতে না পেরে ভ্যানচালক অবনীপ্রসাদকে জিজ্ঞাসা করলাম—ব্যাপার কি? সে বললো—ভিতরে এখন আসুন, পরে সব কথা শুনবেন।

আপাততঃ গাড়ীতে উঠে বসলাম—সাহেব পাগলের মত চেঁচিয়ে বলছেন—শয়তান ম্যানেজারকে আমি একবার দেখে নেব। ব্যাঙ্কের তহবিল ভেঙ্গে আমি মাত্র তিরিশ হাজার টাকা নিয়েছি বলে সে আজ আমাকে কি না বরখাস্ত করে দেশে পাঠিয়ে দিচ্ছে। সে এখনো জানে না আমার শক্তি কতখানি। সে এখনো জানতে পারেনি আমি কত বড় বংশের ছেলে—আমি তাকে খুন করবো। আবার তিনি বিকট চিৎকার করে বললেন—হ্যাঁ, আর সেই জালিয়াত জ্যোতিষীটাকেও আমি বধ করবো—কারণ সেই আমার জীবনকে অভিশপ্ত করেছে। মার্শ সাহেব বলে চললেন—তোমাকে বিচারালয়ে গিয়ে সাক্ষী দিতে হবে—যে আমার ওপর কি ঘোর অবিচার করা হয়েছে—বলতে বলতে তিনি মূর্চ্ছিত-প্রায় হয়ে গাড়ীর মধ্যেই পড়ে গেলেন।

কোন রকমে সাহেবের কাছ থেকে নিজেকে উদ্ধার করে অফিসে যখন ফিরলাম তখন বেলা প্রায় তিনটে। এই অস্বাভাবিক দেরীর কৈফিয়ৎ সাহেবকে দিতে হলো। পরে অন্যান্য বাবুদের কাছ থেকে জানতে পেরেছিলাম যে—বিলেত থেকে এই নির্দেশ এসেছিলো যে, মার্শ সাহেব যদি আর কোন রকম খারাপ বা নীতিবিরুদ্ধ কাজ করেন তবে কোন রকম দ্বিধা না করে যেন তাকে বিলেতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তাই কর্তৃপক্ষের ওয়ারনিং অগ্রাহ্য করে তিনি কাল সন্ধ্যায় ব্যাঙ্ক তহবিল ভেঙ্গে যে তিরিশ হাজার টাকা নেন, আজ সকালে ম্যানেজার তা জানতে পেরেই মার্শ সাহেবকে বরখাস্ত করে বিলেতে পাঠাবার বন্দোবস্ত করে দিলেন।

আগের মতোই রোজ অফিসে যাওয়া-আসা করি, কিন্তু আমার ওপর যে একটা বিরাট পরিবর্তন এসেছে তা কেউ না বুঝতে পারুক, আমি তা নিজেই বেশ বুঝতে পারি। এক দিন বড় সাহেবের ঘরে হঠাৎ ডাক পড়লো, এইরূপ আকস্মিক ডাকে আমি ঘাবড়ে গিয়েছিলাম—যা হোক, তাঁর ঘরে ঢুকতেই তিনি জিজ্ঞেস করলেন 'লেট' মার্শের প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড একাউণ্টে কত টাকা আছে?

'লেট' কথাটা শুনে আমার সারা শরীরে যেন রক্তের প্রবাহ থেমে গেল। আমি বললাম, তা প্রায় আট হাজার টাকা হবে।

তিনি বললেন, সেটা যেন মিসেস হার্বার্ট স্টুয়ার্টের একাউণ্টে জমা করে দেওয়া হয়। কোন রকমে একটা ছোট্ট হাঁ বলে চলে এলাম নিজের জায়গায়। পরে জানতে পেরেছিলাম যে, মার্শ সাহেব বিলেতে ফিরে গিয়ে অর্দ্ধ-উন্মত্ত অবস্থায় একটা ছোট হোটেলে আশ্রয় নিয়েছিলেন, সেখান থেকে তিনি একবার লর্ড স্যাণ্ড্রিংহামের সঙ্গে দেখা করতে যান কিন্তু লর্ড তার কার্য্যকলাপের কথা আগে থেকেই জানতেন; তাই মার্শ সাহেবকে তিনি প্রত্যাখ্যান করলেন। এর পর তিনি উন্মাদ পাগল হয়ে যান—তার পর তাঁকে সেণ্ট্রাল লণ্ডন এসাইলামে স্থানান্তরিত করা হয়। আর গারদে অবস্থানকালেই তিনি ১৫ই অক্টোবর তারিখে রাত্রির ১১-৫৯ মিনিটের সময় তাঁর 'ক্যাপসেল' বিষপ্রয়োগে আত্মহত্যা করেন।

তিনি মরবার আগে বলে যান যে, তাঁর সমস্ত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি যেন তাঁর একমাত্র আত্মীয়া হার্বার্ট স্টুয়ার্ট পান। মারা যাবার কিছু দিন আগে তিনি প্রায়ই আতঙ্কে মূর্চ্ছা যেতেন আর জাহাঙ্গীর, জাহাঙ্গীর বলে চিৎকার করতেন দেখে ডাক্তাররা মনে করতেন, তাঁর ওপর কোন ভৌতিক প্রতিক্রিয়া প্রভাব বিস্তার করেছে। কেউ এমন নিদারুণ সত্য ভবিষ্যৎ বাণী করতে পারে ভেবে স্তম্ভিত হলাম! মুহূর্ত্তে মনে পড়লো জাহাঙ্গীরের কথা, আমার অলক্ষ্যেই তার আত্মার উদ্দেশ্যে ঝরে পড়লো দু' ফোঁটা চোখের জল।

বিজয়া দশমীর দিন কোন এক বন্ধুর সঙ্গে সন্ধ্যাবেলায় গড়ের মাঠ ঘুরে হেঁটে বাড়ী ফেরবার সময় ক্লান্ত হয়ে ব্যাঙ্কের সামনে গাঢ় তিমিরাচ্ছন্ন প্রকাণ্ড মাঠটায় কিছুক্ষণ বিশ্রাম করতে বসে ভাবছিলাম—দেবী দুর্গতিনাশিনী দশভুজা এক বছরের মতো আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছেন কিন্তু আবার তিনি এক বছর পরে আসবেন। কিন্তু জাহাঙ্গীর আমার মনোমন্দির থেকে চিরদিনের মত বিদায় নিয়েছে। মার্শ সাহেব পৃথিবীর বুক থেকে বিদায় নিয়েছে আর ফতিমাও আমার কাছ থেকে দূরে চলে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে ইরাকের মরুভূমির পাষাণ ক্রোড়ে। হঠাৎ দেখতে পেলাম মার্শ সাহেব তার টেবিলে বসে আছেন, পাশে জাহাঙ্গীর দাঁড়িয়ে তার হাতের রেখা পরখ করছে—সাহেব তাকে প্রচণ্ড পদাঘাত করলো। আমি প্রাণপণে ছুটে গেলাম জাহাঙ্গীরকে রক্ষা করতে—আর কেঁদে লুটিয়ে পড়লো জাহাঙ্গীর। ব্যস, আর কিছু মনে নাই। রোগশয্যায় তার পর শুয়ে ছিলাম অনেক দিন।

ক্লান্ত জীবনের ব্যয়ভার বয়ে মৃত্যুর স্রোতের দিকে ছুটে চলেছি ব্যাঙ্কের রাজদ্বার দিয়ে অনর্গল প্রভাবে বিভিন্ন ধরণের লোক যাওয়া আসা করছে। মাঝে মাঝে যেন জাহাঙ্গীরকে লোকের ভীড়ের মধ্যে দেখতে পাই—কিন্তু মুহূর্ত্তে ভেঙ্গে যায় সে ভ্রান্তি। মার্শ সাহেব আর নেই, জাহাঙ্গীরও আজ আর আমাদের মধ্যে নেই—শ্যামল ধরিত্রীর বুকে আবার আশ্রয় নেবে শত শত জাহাঙ্গীর খান। তাদের কাহিনী ইতিহাসের পাতায় সুবর্ণ অক্ষরে লেখা থাকবে না। কারণ ধূলোর মধ্যেই তারা জন্ম নেবে আর ধূলোতেই মিশে গিয়ে তারা শান্তি পাবে। সবার অগোচরে তারা জন্ম নেবে, সবার অলক্ষ্যেই তারা পৃথিবী থেকে বিদায় নেবে। সাধারণ জাহাঙ্গীরের কথা জানতে পারে না, জানতে চাইবে না, কারণ সে তো সামান্য একজন দরওয়ান ছাড়া আর কেউ নয়?
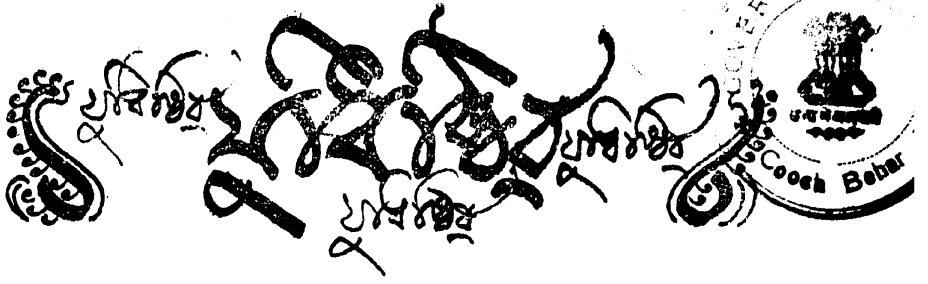
শীতাংশু মৈত্র

চরিত্র

মা		
কুর্চি	—	মেয়ে
অভিমন্যু	—	ছেলে
সোমেন	—	অভিমন্যুর বন্ধু
মিঃ চক্রবর্তী	—	প্রচার ব্যবসায়ী

[নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের কলকাতার বাসাবাড়ী। ঘরখানিকে বাইরের ঘরও বলা চলে আবার অভিমন্যুর পড়ার ঘর, আঁকবার ঘরও বলা চলে। অর্থাৎ নিম্ন-মধ্যবিত্ত গৃহে অন্দর-বাহির যে নেই, তারই নিদর্শন হল এই ঘরখানি। জানলার কাছে বসলে একটু আলো পাওয়া যায়। সেইখানে বসেই অভিমন্যু ছবি আঁকে। ঘরে একখানা নড়বড়ে টেবিল; তার সামনে একখানি শিথিল-পদ চেয়ার। অভিমন্যু চেয়ারে বসে।]

(কুর্চির প্রবেশ)

কুর্চি। দাদা!

[অভিমন্যু একমনে ছবি দেখছিল—অবনীন্দ্রনাথের তিষ্যরক্ষিতা। সস্তা প্রিন্ট, রং দেখলে রাগ ধরে। সে উত্তর দেয় না।]

ও দাদা!

[উত্তর দেয় না এবারেও। রাণী তিষ্যরক্ষিতা ও বোধিবৃক্ষের এক জায়গায় আঙুল দিয়ে সে চুপ করে বসে।]

ও দাদা!

অভিমন্যু। উঃ! (বলে লাফিয়ে উঠল)

কুর্চি। কি হল?

অভিমন্যু। চেয়ারখানায় গরম জল দিতে পার না? ছবিখানায় সবে মন দিয়েছি, অমনি তোমার পোষা ছারপোকার রক্তপান করবার ইচ্ছে হল?

কুর্চি। (হেসে উঠে) ভাগ্যিস ছারপোকাটা ছিল। তা না হলে তুমি ত গিয়েছিলে।

অভিমন্যু। (ছবিখানা তুলে নিয়ে আবার দেখতে দেখতে) তার মানে?

কুর্চি। ঐ তিষ্যরক্ষিতার কবলে। কিন্তু প্রমাণ হয়ে গেল রাণীর চেয়ে ছারপোকার জোর বেশী—অবনীন্দ্রনাথের চেয়ে আমার ভাঙা চেয়ারের।

অভিমন্যু। তাতে তোর কি লাভ হল? (ছবি রেখে দিল)

কুর্চি। কাল ভাইফোঁটা, তা খেয়াল আছে?

অভি। ধোৎ, সে ত তুই দিবি, আমি নেব। তা নিয়ে আমাকে জ্বালাচ্ছিস কেন? যা বাপু, ধান কুড়োতে যা।

কুর্চি। চা খাবে একটু?

অভি। (আবার চেয়ারে ব'সে) তোর সুমতি যেদিন হবে সেদিন—

কুর্চি। সেদিন কি?

অভি। আগে চা দে, তবে বলব।

কুর্চি। দিলে আর বলবে না।

অভি। বললে আর দিবি না।

কুর্চি। তা হলে তাই। বিশ্বাস যখন করলে না তখন পেলে না। বিশ্বাসে মিলয়ে বস্তু—

(সোমেনের প্রবেশ। সে কুর্চির শেষ কথাগুলি শুনেছে।)

সোমেন। অতএব তর্ক করছি না। বস্তু আসুক।

কুর্চি। সাধনা চাই।

অভি। এতখানি পথ হেঁটে ও এল আর আমি সেই থেকে ত শুধু হাত জোড় করতে বাকী রেখেছি। তাতেও যখন তুই নরম হলি না তখন আমি নিজেই ক'রে খাব। (উঠতে উদ্যত)

কুর্চি। (তাকে ধরে বসিয়ে) দোহাই তোমার, চিনির আর শ্রাদ্ধ করতে হবে না।

অভি। তাহলে এবার কথাটা শেষ করি?

কুর্চি। কর।

অভি। সেদিন তোর বিয়ে হ'য়ে যাবে। (বলেই আবার ছবি দেখতে বসে। ওর মুখের দিকে আর তাকায় না। সোমেন মুচকি হেসে অভিমন্যুর পাশে জানলার ওপর গিয়ে ব'সে একটা বিড়ি ধরায়)।

কুর্চি। (ঠোঁট কামড়ে ধরে দাঁড়ায়। তারপর গিয়ে অভিমন্যুর সামনে থেকে ছবিখানা টেনে সরিয়ে নেয়; কুচি কুচি করে ছিঁড়ে সোমেনের গায়ে ছুড়ে দেয়; কোমরের দুই দিকে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে এদের দিকে তাকিয়ে থাকে।)

সোমেন। কিন্তু—

কুর্চি। তোমাদের মুখে ফুলচন্দন পড়ুক। (বেরিয়ে যায়)।

(এরা হাসতে থাকে)

(আবার ঢুকে সোমেনকে) কাল ভাইফোঁটা, মনে থাকে যেন। [প্রস্থান।

সোমেন। বাব্বাঃ, নেমন্তন্নর ধরণটা একবার দেখলি অভি?

অভি। আর ক্যাপাস নে।

সোমেন। ও মোটেই ক্যাপে নি। বিয়ের কথায় কোন কালে কোন মেয়েই ক্যাপে না।

অভি। ওকে আমি বুঝি না ঠিক। ভয়ানক চাপা। হয়ত তুই ছিলি বলেই বাধ্য হয়ে ছবিখানা ছিঁড়ে রাগ দেখিয়ে গেল। এখন যদি তারই রেশ টেনে চা না দেয়, তাহলেই ত গেছি।

সোমেন। যদি চা না দেয়, ওর নাকের ডগা দিয়ে দোকান থেকে কিনে আনব ; সিঙাড়া দিয়ে খাব।

অভি। মা-কে বলে দেবে। আর মা অমনি উপদেশ দিতে থাকবে যে খালি পেটে শুধু চা খেতে নেই ; তার চেয়ে বরং ভাত খেয়ে নাও—ভাত হয়ে গিয়েছে। অথচ আমার এখনও ছবিতে হাতই দেওয়া হল না (ভাবতে থাকে)।

[দ্বারপ্রান্তে কুর্চির প্রবেশ। এরা কি বলাবলি করছে শুনতে উদ্‌গ্রীব]

(হঠাৎ) আচ্ছা, এই সোমেন, মানুষের রক্তশোষণরত ছারপোকার ছবি দেখেছিস কখনও? দেখিস নি ত? হুঁ। যদি কেউ আঁকতে পারত ত সে কে জানিস? গইয়া (Goya) জীবনের ধাপ্পাবাজিতে ভোলে নি ঐ একটি চিত্রকর। কবে যে অবন-নন্দলালের লতানো হাত আর ছিপছিপে সাঁওতাল মেয়ের পায়ের সুপুষ্ট পেশীর যুগ শেষ হবে, তাই ভাবি!

কুর্চি। (দরজার কাছ থেকেই) ভাব, আর যামিনী রায়ের মত স্রেফ ধ্যাবড়া করে কালি লাগাও।

[প্রস্থান।

(সোমেন কিছু বলার আগেই কুর্চির অন্তর্ধান)

অভি। (মুচকি হেসে) সকাল থেকে শালা একটা theme আমার মাথায় আসছে না। আজই এ্যাপ্রুভ না করাতে পারলে আবার সাত দিনের ধাক্কা। এ দিকে কাল কুর্চির ভাইফোঁটার টাকা নেই। ওর গানের ছাত্রী হঠাৎ ছেলে হ'তে হাসপাতালে চলে গিয়েছে। কুর্চির সন্দেহ সন্তান-সঙ্গীতেই এখন ওর ছাত্রীর দাম বেশী হয়ে পড়বে। করি কি বল ত?

সোমেন। সব চা-এর ওপর নির্ভর করছে। তুই একটু কুর্চিকে খোসামোদ ক'রে আয় ; আমি ততক্ষণ তিষ্যরক্ষিতাকে ছাড়িয়ে শাজাহান, যামিনী রায়, মায় চিন্তামণি কর পর্যন্ত চক্কর দিয়ে আসি।

অভি। দূর! ঐ তিষ্যরক্ষিতার শাঁখের মত রং আর করবীর-ডালের মত হাত-ই ত সকাল থেকে আমার মাথা খাচ্ছে। ওটা কুর্চি ছিঁড়ে দিয়ে ভালোই করেছে। আমি ঐ ছারপোকাই আঁকব। (প্রস্থানোদ্যত)।

[কুর্চির প্রবেশ। হাতে দু' কাপ চা এবং ডিসে খান কয়েক বেগুনি। সেগুলি সে নড়বড়ে টেবিলের ওপর রাখে)।

সোমেন। ভাইফোঁটার খাওয়াটা আজই শেষ ক'রে দিতে চাও, এই ত?

অভি। সত্যি কুর্চি, তোর নাম মা যে কেন দ্রৌপদী রাখলে না, তাই ভাবি। এই দেখ, বেগুনির খবর দিয়ে এবং তার পরেই এনে তুই আমার মাথায় কি কাণ্ডটা বাধিয়ে দিলি! বেগুন থেকে আমি বেলুনে এবং সেখান থেকে রকেটে ক'রে চাঁদে গেলাম এবং পৃথিবীর মানুষ চাঁদে প্রথম উপহার পাঠাল sipton কা চা! What an idea!

(লাফিয়ে উঠে সে কুর্চির থুতনি ধ'রে নেড়ে দিয়ে ঘরে পায়চারি ক'রে বেড়াতে লাগল)।

সোমেন। ব্লিপ ব্লিপ ব্লিপ ব্লিপ—sputnik থেকে signal আসছে—বেগুনিও পাঠাতে হবে আর সেই সঙ্গে চাঁদ-চাওয়া কুর্চিকেও।

অভি। All right কুর্চি, তুই ব'সে যা। তোকেই আজ মডেল ক'রে আমি প্রথম চাঁদে পাঠাব। নে বোস।

(ধ'রে নিয়ে এসে কুর্চিকে সামনের জানলায় বসাতে যায়। সে কিন্তু কিছুতেই বসবে না)।

কুর্চি। আমি মুখ ভেঙিয়ে থাকব আর চোখ মিট-মিট করব।

অভি। দাদার দুটো পয়সা আসবে তা তুমি চাও না? এমন বেহেড মেয়েও ত দেখিনি কখনও?

সোমেন। তার চেয়ে তুই আমায় মডেল কর অভি—জন্মটা সার্থক হোক। শুধু মুখটা একটু oval ক'রে দিস, এ রকম চতুষ্কোণ রাখিস না।

অভি। ধোৎ, তোর বিড়ির গন্ধেই আমার সিপটনের চা-য়ের দম বন্ধ হয়ে যাবে। লক্ষ্মীটি কুর্চি, বোস। এই পাঁচ মিনিট। স্কেচটা করেনি।

কুর্চি। আগে খেয়ে নাও।

সোমেন। অতি উত্তম প্রস্তাব। চাঁদ দূরের কথা—হাতের কাছে বেগুনি যে ছাড়ে, সে মূর্খ।

(খেয়ে নেয় সকলে, কুর্চি শুদ্ধ)

অভি। (তার হাতে চা-এর কাপ) আচ্ছা কুর্চি, তোর ডান গালের তিলটা যদি বাঁ গালে transfer করে দিই? ডান গালে তিল চক্রবর্তী সাহেবের পছন্দ নয়।

কুর্চি। তাহলে চক্রবর্তীর গালে একটি চড় কষাই। আমার গালে তিল, তাতে চক্রবর্তীর কি?

অভি। তুই কথাটার Commercial aspectটা একেবারেই বুঝলি না। তুই যেমন তেমনি থাকবি, মাঝখান থেকে আমি দশটা টাকা বিনা পরিশ্রমে বেশী পাব।

সোমেন। কুর্চির মত নেবার তোর কি দরকার? ও ত আর তোকে দিয়ে পোর্ট্রেট আঁকাচ্ছে না?

কুর্চি। (ভেঙিয়ে) পোর্ট্রেট আঁকাচ্ছে না?

অভি। দেখ, দু'জনে ঝগড়া বাধিয়ে মুডটির মাথা খেও না। নে কুর্চি, বসে যা। আজ আমি তোর তিলকে তাল করব।

(মা-এর প্রবেশ। হাতে একখানি চিঠি)

অভি। এই দেখ। কাজ করতে বসলেই বাধা! কার চিঠি মা?

মা। খুলে দেখ্। সোমেনের আজ অফিস নেই বুঝি?

(অভি চিঠি নিয়ে পড়তে থাকে)

কুর্চি। অফিস থাকবে না কেন? উনি যাবেন না।

সোমেন। আচ্ছা মাসিমা, ঐ কুর্চিটার কবে বুদ্ধি হবে বলতে পারেন? বলি আমার অফিস কি শ্বশুরবাড়ী, যে ইচ্ছে করলেই কামাই করা যায়?

কুর্চি। নইলে কি কেউ অকারণ কামাই করে?

সোমেন। ছুটি যে কি জিনিষ, তা ত' বুঝলে না। অকারণে ছুটির

মত মিষ্টি জিনিষ ঐ তোমার বেগুনিও নয়। দাঁড়াও একটা কেরাণীগিরি জুটিয়ে দি, তার পর বুঝবে।

মা। সে সব বন্দোবস্তও হচ্ছে বুঝি?

সোমেন। কেন মাসীমা, দোষ কি?

মা। না, দোষ আর কি; চাকুরী-করা মেয়েই ত আজকালকার বেকার ছেলেরা পছন্দ করে।

সোমেন। চাকরী করলে আবার বিয়ের দরকার কি?

মা। খেলে বুঝি আর ঘুমোতে নেই? না রাঁধলে চুল বাঁধতে নেই?

কুর্চি। না তা নয়, মা! তবে দুকূল সামলানো যায় না।

মা। বড় জ্যাঠা হয়েছিস। যাও, ভাতটা নামাওগে যাও।

কুর্চি। এখন আমি কি ক'রে যাব?

মা। কেন?

কুর্চি। দাদা যে আমার ছবি আঁকবে।

মা। সে আবার কি? ছবি আঁকার জন্যে সামনে হাঁ করিয়ে বসিয়ে রাখবার কি দরকার?

অভি। (চিঠি থেকে চোখ না সরিয়ে) উঁহু, ওর এখন নড়া বারণ। ওকে চাঁদে পাঠাচ্ছি।

মা। তুই ওর মাথা-টা খেলি অভি!

সোমেন। তাহলে ওর মাথা একদিন ছিল বলছেন?

কুর্চি। কালকে ভাইফোঁটার পর (ব'লেই দুই হাতের বুড়ো আঙুল দেখায়)।

অভি। না, ছবিটা আর আঁকা হ'ল না।

কুর্চি। বাঁচলুম! (উঠে পড়ল)

অভি। বাঁচলি না, গেলি। আমি আঁকলে ঐ ছবিতেই তুই বিজয়িনী হতিস। কিন্তু তোর কপালে নেই।

কুর্চি। আমার তিলটা খুব জোর বেঁচে গেল, সোমেন দা'!

সোমেন। কিন্তু অভির হল কি? অমন কাঠঠোকরার মত ঠোঁট নামিয়ে দিল কেন?

অভি। এখনি যেতে হবে। চাকরী পাওয়া যাচ্ছে।

কুর্চি। চাকরীর কাছে ছবি চিরকালই হার মানে।

মা। তুই থাম দেখি। খুলে বল না অভি!

অভি। ষ্টেনো টাইপিষ্টের চাকরী—মাইনে এখন ১৭৫৲ টাকা।

মা। ভাগ্যি ষ্টেনোগ্রাফিটা শিখেছিলি। নইলে এখন কি হত? তখনই বলেছিলুম যে আঁকাটাকা শিখে কি হবে। ও নিষ্ফলা বিদ্যে। ও সব পোষায় বড়লোকদের। যাক, কবে থেকে যেতে হবে?

অভি। আজ থেকেই।

কুর্চি। ও চাকরী নিও না দাদা! তোমার এঁকেই ওর থেকে বেশী আয় হবে।

মা। আহা, মেয়ের বুদ্ধি দেখ না! বলি, একটা স্থায়ী আয় ত চাই। অবসর সময়ে যত পারে তোকে বসিয়ে বসিয়ে হিজিবিজি কাটুক না।

সোমেন। যা বলেছেন মাসীমা! যত হিজিবিজি কি ওর মাথায় খেলে! এই দেখুন না, চাকরীর পরে আমি আর একটি দিনও সেতারে হাত দিইনি। ও সব হ'ল নিষ্কর্মাদের কাণ্ড।

কুর্চি। আমি চাকরীও করব, গানও করব; সোয়েটারও বুনব, চপও ভাজব।

সোমেন। কিন্তু বিয়ে?

কুর্চি। ওটা ত কপালের লেখা। ও সব মা জানে।

মা। মেয়েমানুষের অত বাচালতা ভাল নয়, কুর্চি! তা অভি, তাহলে নেয়ে-খেয়ে বেরিয়ে পড়।

[মায়ের প্রস্থান।

অভি। তা হলে সোমেন, তুই ওদের ব'লে যা যে আজ সন্ধ্যায় আমি যাব। ঠিকানাটা আমাকে দিয়ে যা।

কুর্চি। কাদের বাড়ী দাদা?

অভি। একটা রবীন্দ্রসঙ্গীতের টুইশনি পাচ্ছি।

কুর্চি। তাহলেই হয়েছে! মেয়ে না ছেলে?

সোমেন। ছেলে।

কুর্চি। বয়স কত?

সোমেন। এত খবরে তোমার কি দরকার শুনি?

কুর্চি। বলই না?

সোমেন। আঠারো কি উনিশ।

কুর্চি। মার খেয়ে মরবে আর কি।

অভি। কুর্চি, ভাঙচি দিসনে বলছি। ভালো হবে না। মুখপুড়ি নিজেও শিখবে না, কাউকে শেখাতেও দেবে না।

কুর্চি। সোমেন দা, সময় থাকতে সাবধান হও। আচ্ছা, বল ত, আমার বয়েস কত?

সোমেন। কুড়ি পেরোয়নি।

কুর্চি। পেরিয়েছে এবং বুড়ী হয়েছি। আচ্ছা, কুড়ি-বাইশ বছরের বোনের গালে দাদা কখনও চড় মারে শুনেছ? বল?

সোমেন। অর্থাৎ তোমাকে—

কুর্চি। হ্যাঁ, দাদা—

অভি। (শাসনের স্বরে) কুর্চি!

কুর্চি। হ্যাঁ, দাদা, এই পরশু দিন আমার গালে এমন চড় কষিয়েছিল যে মা এসে দাদার কান ম'লে দিয়েছে। ব্যাপারটা শোন: আমি ওকে বললুম, দাদা, তোমার গলায় ভৈরবী আসে ভালো; আমাকে রবীন্দ্রনাথের ঐ গানটা তুলিয়ে দাও—'চরণ ধরিতে
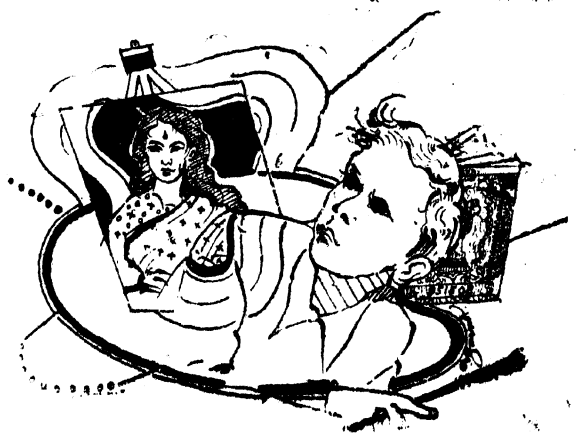
দিও গো আমারে, নিও না নিও না সরায়ে।' দাদা রাজী হয়ে গেল। তখনই আমার খোঁকা লাগল। অমন তাড়াতাড়ি রাজী হবার লোক ত উনি নন! একে ভৈরবী, তাতে ধরল খাদে—আমার গলায় বেরোবে কেন? বার দুই তিন গা রে সা ক'রেই আমার গালে—

অভি। চড় নয়, চুমো।

(কুর্চি থমকে যায় অভি-র গলার স্বরের পরিবর্তন দেখে)

কুর্চি। ইস!

সোমেন। গান-বাজনার ব্যাপারে মারধোরের কিন্তু রীতি আছে। ধর, কোমল রেখাব কিছুতেই বেরোচ্ছে না। একটু নাকটি মলে দাও, অমনি রে রে করে বেরিয়ে আসবে।

অভি। (হেসে) তুই তাহলে ওদের খবরটা দিয়ে যাস।

[সোমেনের প্রস্থান।

আচ্ছা, গানের টুইশনিতে যখন গেলামই না তখন আমার এত তাড়া কিসের? ইন্টারভ্যুতে ডেকেছে ত সেই বারোটায়—এখন পৌনে ন'টা। তুই ভাই ব'সে যা। আমি ছবিটা এঁকে ফেলি।

কুর্চি। তুমি কেবল গভীর করে তাকাবে আর একটু ক'রে আঁকবে—আমার ভারী লজ্জা লাগবে।

অভি। লাগুক। তখন তুই মুখ নীচু করবি কিংবা জোর করে হাসবার চেষ্টা করবি। যা করবি তাই হাতে উঠে আসবে।

(কুলুঙ্গী থেকে রঙের শিশি, তুলির ভাঁড়, কাগজ, একটা কাঠের পাট পেড়ে রেখে, কুর্চিকে দিয়ে একভাঁড় জল আনিয়ে, মাটিতে বসল, কুর্চি বসল জানলায়। অভি পেন্সিলে স্কেচ শুরু করল।)

সোজা আমার দিকে তাকাও কুর্চি!

কুর্চি। আমি পারব না।

অভি। আঃ, মুখ একেবারে বন্ধ! সোজা আমার দিকে তাকাও। আচ্ছা, তাকিয়ে থাক, (এঁকে যায়, ধীরে ধীরে তাকায় কুর্চির মুখের দিকে, আবার কথাও বলে যায়) সেই যেমন করে তাকিয়েছিলে, অবাক হয়ে, মিহিজাম ইষ্টিশানে, জ্যোৎস্নায় ভরা প্লাটফর্মের ওপর শায়িত সর্বাঙ্গ আবৃত মানুষগুলোর দিকে। নিঃসাড় সব শুয়ে আছে, ... প্লাটফর্ম, গাড়ী এসে ঢুকল যেন এক মায়াবী দৈত্য—এক-আধজন কুলি এদিক-ওদিক ঘুরল লণ্ঠন হাতে, বাঁশী বাজল গার্ডের, যেন বহুদূর থেকে টেনে টেনে বলল 'মি—হি—জা—ম'; হিম-হিম হাওয়া বইল মুড়িদেওয়া লোকগুলোর ওপর দিয়ে; গাড়ী ছেড়ে দিল; চলল দৈত্য ঘুমের পুরী ছেড়ে; শুধু চাঁদ রইল জেগে—শুধু চাঁদ রইল জেগে—ঘুম-ঘুম চোখে, কার প্রতীক্ষায়, ... বহু উর্দ্ধে, ধরা-ছোঁওয়ার বাইরে। তুই তাকিয়ে রইলি ... দেখা যায় ঐ ঘুমন্ত মানুষগুলোর দিকে। তারা নড়ে না ... না, যেন কার শাপে পাথর হয়ে ঐখানেই পড়ে রয়েছে। এক-আধজন যারা ঘুরছে তারা প্রেত—জেগে পাহারা দিচ্ছে। চলে গেল ... শিস দিতে দিতে ঐ হিম বাতাসে।

(শিস দিয়ে উঠল অভি)

... তুমি কি করে জানলে আমি মিহিজামে অমনি করে তাকিয়েছিলুম। আমি ত বুঝতেও পারিনি তুমি আমাকে লক্ষ্য করছ!

অভি। স্পিকটি নট। (ঠোঁটের উপর আঙুল রাখলো কুর্চি, হেসে উঠল) আরও একটু হাস; আর একটু। এই সেদিন সিনেমা দেখতে গিয়ে হলের মধ্যে ধপ করে পড়ে গিয়ে, কিছু লাগেনি বোঝাবার জন্যে, যেমন করে হেসেছিলি ঠিক তেমনি করে।

কুর্চি। যাও।

অভি। এই, এই দাঁড়া, মুখখানাকে ধরে রাখ। খবরদার ছাড়বি না—ঠিক এখন যেমনটি। লোকেরা সব তাকে সাহায্য করবার জন্যে উঠি-উঠি করছে আর তুই উ মা গো, বলার বদলে বলছিস—

কুর্চি। আমি চললুম।

অভি। ব্যস। ছেড়ে দে।

কুর্চি। কা'কে ছেড়ে দেব?

অভি। মুখখানাকে—মানে—টোলটি তুলে নিয়েছি। এখন তোর মুখ free.

কুর্চি। কি ভাষা বাবা! এই বুঝি তোমাদের আঁকার পরিভাষা! কই—আগে ত এ রকম শুনিনি?

অভি। তুই ত আগে কখনও মডেল হসনি? (বলে তুলি কামড়ে ধরে কি যেন ভাবতে থাকে। তার পর ভাবতে ভাবতে যেন আপন মনেই বলে) তোর এত রূপ কুর্চি! তোর আমি এমন বরের সঙ্গে বিয়ে দেব যে বলবি দাদার চোখ আছে। কেমন ক'রে খুঁজে খুঁজে তাকে আমি বের করব? তুই অপেক্ষা করে বসে থাকবি পিঁড়িতে আলপনা দিয়ে, কপালে কুমকুমের তিলক পরে গোধূলির কনে-দেখা-আলোয়। তুই আমার কত আদরের বোন—তোকে কি আমি যার-তার হাতে দিতে পারি? (তাকায় কুর্চির মুখের দিকে) ধ্যেৎ! তুই ভারী দুষ্টু!

কুর্চি। (গভীর হেসে চোখ মুকুলিত করে) কি দুষ্টুমি করলুম। তুমি যা-তা বলবে আর আমি বসে বসে সইব। ভারী মজা পেয়েছ না?

অভি। (তাড়াতাড়ি আঁকতে আঁকতে) just the look! please কুর্চি, আর একটু ধরে রাখ! সত্যি, তোর মুখে expression গুলো এমন pure আর classical হয় যে কি বলব। (আর তার দিকে তাকায় না।)

কুর্চি। তোমার রং কাগজ সব আমি ফেলে দেব এইবার। আমি চললুম।

অভি। তোকে থাকতে বলেছে কে? বেরো, বেরো এখান থেকে। আমাকে খ্যাসাসনি বলছি কুরি।

কুর্চি। তবে এই বসলুম। কাজ ফুরুলেই পাজি।

[অভি রং দিতে থাকে। কুর্চি বসে বসে দেখে তন্ময় হয়ে; দেখে নিজের রূপের অপরূপ আলেখ্য। তিলটা ত অভি বাঁ গালেই রেখেছে। হাতে চায়ের পেয়ালা; বসে আছে চাঁদের ওপরে। পায়ের কাছে পড়ে আছে মর্ত্যের sputnik। দেখে নিজের ওপর ভারী মায়া হয় কুর্চির আর ভাবে দাদার কথা। যার তুলির টানে সে কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই এমনি করে গড়ে উঠল সে আরও কত মনোহর রূপ কল্পনা করতে পারে? চিত্রে, সঙ্গীতে, সাহিত্যে, এমনি যার অধিকার সেই লোকটা আজ ১৭৫৲ টাকায় আত্মবিক্রয় করতে যাচ্ছে! নর্টহাণ্ডে প্রতিলিখন ক'রে ক'রে ক্লান্ত আঙুলে সে আর হয়ত তুলিই ধরবে না; সাজ-সরঞ্জামগুলিতে কুলুঙ্গিতে ধুলো পড়বে। গানের

আবেগেই হয়ত ম'রে যাবে। তখন এই গৌরবচ্যুত দাদা অতি সাধারণ স্তরে নেমে গিয়ে ঐ দ্বিতীয় সোমেন হবে। আর নিজে তখন হয়ত বহু দূরে ছেলেপিলে নিয়ে ঘরসংসারের কাজে থাকবে ব্যস্ত। মাঝে মাঝে মনে পড়বে আজকের এই দিনের কথা—বহু দূর থেকে ভিজে বাতাসে ভেসে-আসা বকুলের গন্ধের মতো। এই ছবিখানা কোনো মতে তাকে রাখতেই হবে। এমন দিনটি জীবনে দু'বার আসবে না। ছবিটা শেষ করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে থাকে অভি। একবারও আর ফিরে তাকায় না কুর্চির দিকে। ছবিখানাই অভির কাছে সব, কুর্চি কিছু নয়।]

কুর্চি। দাদা!

অভি। হুঁ।

কুর্চি। ছবিখানা আমাকে দেবে?

অভি। কত টাকা দিবি?

কুর্চি। যা উপযুক্ত দাম ব'লে মনে কর তা আমার যৌতুকের টাকা থেকে কেটে নিও।

অভি। গলা যেন ভার-ভার মনে হচ্ছে। (তাকায় তার মুখের দিকে। দেখে চোখে জল) কাঁদছিস কেন রে?

কুর্চি। আমার টাকা থাকলে এ ছবি তোমায় ক্যালেণ্ডারে ছাপার জন্যে বিক্রী করতে হত না।

অভি। (যতখানি সম্ভব নৈরাশ্য ও ব্যঙ্গ কণ্ঠস্বরে ঢেলে) টাকা! যদি আজ না পাই কাল তুই ভাইফোঁটা দিবি কি দিয়ে? মানুষের সুন্দর দেহের তলায় যেমন কঙ্কাল তেমনি সামাজিক জীবনের তলায় এই টাকার কঙ্কাল। যারা সেই কঙ্কাল নিয়ে শবসাধনা করে তারা সিদ্ধ কাপালিক। তাদের কাছে মন্ত্র নেবার জন্য সবাই উন্মুখ। কিন্তু তারা বড় সহজে শবের ভাগ দিতে চায় না। জ্যান্ত মানুষ দেখলেই তারা লুব্ধ হয়ে ওঠে—কবে ওদের শবের ওপর আসন ক'রে বসতে পারবে এই আশায়। এই জ্যান্ত মানুষগুলোই ওদের যত বিপদ ঘটায়। তাই তাদের ওরা কারণ খাইয়ে বশ করতে চায়—টাকা দিয়ে কিনে নিতে চায়। বুঝলি?

[দরজায় কে ডাকে]

আসুন।

[মিঃ চক্রবর্তীর প্রবেশ। চোস্ত সাহেবী পোষাক। ইনিই ক্যালেণ্ডারের জন্যে ছবির বরাত দিয়েছেন। ঢুকেই কুর্চিকে দেখে বিহ্বল চোখে দাঁড়িয়ে পড়েন। কুর্চি চলে যায়।]

আরে মিঃ চক্রবর্তী! এখানে! আশাতীত সৌভাগ্য! বসুন!

চক্রবর্তী। (চেয়ারে বসে) আপনার ঠিকানা সংগ্রহ করে নিয়ে আসতে বাধ্য হলুম; যদিও জানতুম যে, আপনি আজ দুপুরে আপিসে আসবেন। আমাকে আজ বিকেলেই চলে যেতে হচ্ছে বম্বে। সঙ্গে ছবি না নিয়ে গেলে discredited হব। কই, আপনার ছবি তৈরী?

অভি। এইমাত্র শেষ করলুম। (ছবিখানা দিল চক্রবর্তীর হাতে। (চক্রবর্তী খানিকক্ষণ দেখে)।

চক্রবর্তী। Grand! সত্যি, আপনার উচিত ছিল Commercial Artist না হয়ে Painter হওয়া। (আবার দেখতে লাগলেন) কি করে মাথায় খেলল আপনার—বাঃ, Sputnikএ করে চাঁদ আকাশে! This is the very thing! (একটু চুপ করে থেকে) আচ্ছা, যদি কিছু মনে না করেন ত একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। ঐ যিনি আমি আসতেই ঘর থেকে চলে গেলেন, উনিই বুঝি আপনার মডেল? (ছবি দেখতে থাকেন)

অভি। (অপমানে, ক্ষোভে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে ওঠে। একটু সামলে নিয়ে) না, ও আমার বোন। দেন, ছবিখানা দেন। (হাত বাড়ায়)।

চক্রবর্তী। (কিছু বুঝতে না পেরে ছবিখানা তার হাতে ফেরত দিয়ে) ওঃ, Excuse me. But she is exquisitely fair.

অভি। এ ছবিখানা বিক্রির জন্যে নয় মিঃ চক্রবর্তী! ও সামনে বসে থাকায় ওর মুখেরই আদল এসে গিয়েছে। ছবিখানা ওকেই দেব।

চক্রবর্তী। তাহলে আমার ছবির কি হবে?

অভি। হয়ে উঠল না।

চক্রবর্তী। মানে? Are you joking?

অভি। না মিঃ চক্রবর্তী! আমি এ ছবি বিক্রি করব না।

চক্রবর্তী। আপনি বুঝছেন না মিঃ রায়, ছবিটা কত effective হয়েছে। কে জানছে আপনি আপনার বোনকে মডেল করেছিলেন? দেন, ছবিখানা দেন। (পকেট থেকে একখানা একশ টাকার নোট বের ক'রে)। এইটা আপাততঃ রাখুন; পরে বিল করবেন। আর আপনি যদি আমাদের কোম্পানীতে permanent কিছু চান তাহলে একখানা দরখাস্ত নিয়ে যাবেন আজ। আচ্ছা, good day [ব'লে ছবিখানা একরকম অভির হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে নোটখানা গুঁজে দিয়ে, চকিতে প্রস্থান।

(কুর্চির প্রবেশ)

(অভি তখনও হতবাক্। চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে নোটখানার দিকে তাকিয়ে। হঠাৎ নোটখানা ছিঁড়ে ফেলতে গেল। আবার থামল; মুঠো করে ধরল সেখানা।)

কুর্চি। (ভয়-চকিত কণ্ঠে) দাদা!

অভি। (ফিরে দাঁড়িয়ে, নোটখানা দেখিয়ে) এই নে, তোর রূপের দাম! দাদা নিজে হাতে বেচেছে!

(দুই হাতে মাথার দুই দিক টিপে ব'সে পড়ল)

(নোট রইল মাটিতে প'ড়ে; কুর্চি দাঁড়িয়ে মুখ নীচু ক'রে। ঘরে পরিপূর্ণ স্তব্ধতা। এক বালতি ধূমায়িত জল নিয়ে মায়ের প্রবেশ।)

মা। (এদের দিকে দৃষ্টি না দিয়েই) কুচি, জল চড়িয়ে ভুলে ব'সে আছিস। আমার যে এখনও কাপড় সেদ্ধ করতে হবে। এই নে। (মুখ তুলে তাকিয়ে এদের অবস্থা দেখে বালতি রেখে এগিয়ে গিয়েই দেখেন নোটখানা মেঝেতে প'ড়ে। ততক্ষণে কুর্চি এসে বালতি নিয়ে চেয়ারের কাছে এসে গিয়েছে) অভি, তুই না আপিস যাবি? এখনও রং-তুলি নিয়ে ছেলেখেলা করছিস দুই জনে? (অভি উঠে দাঁড়ায়। নোটখানা তুলে আঁচলে বাঁধেন)।

কুর্চি। দাদা, তোল ও সব এইবার। টেবিলে, চেয়ারে গরম জল দেব।

মা। টাকা কে দিয়ে গেল রে? মাটিতে ফেলে রেখেছিস কেন?

(কেউ কোন উত্তর দিল না। অভি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল

সব ফেলে রেখেই। কুর্চি আঁকবার জিনিষপত্র কুলুঙ্গিতে তুলে রাখতে গিয়ে তুলিগুলি প্রথমে ধুতে আরম্ভ করে।)

কি হয়েছে কুর্চি? অভি অমন ক'রে কথার জবাব না দিয়ে চ'লে গেল?

কুর্চি। (স্থির গলায়) ছবির দাম কম দিয়েছে, তাই।

মা। বাড়ী ব'য়ে এসে ছবি নিয়ে গেল, এক শ' টাকা দাম দিয়ে গেল—তাও বলছিস কম দিয়েছে?

কুর্চি। কালকে ভাইফোঁটার জন্যেই দাদাকে বাধ্য হয়ে টাকাটা নিতে হয়েছে।

মা। বাঁচা গেল; অভির আজ পনের দিন ওষুধ নেই। তোরও ত একখানা শাড়ী চাই।

কুর্চি। (শরীর যেন তার রি রি ক'রে ওঠে) ওই এক শ' টাকাতে তুমি সারা কলকাতা কিনবে!

মা। আমার কলকাতা ঐ এক শ' টাকাতেই কেনা হবে। তোমাদের আজকাল আকাশের চাঁদেও মন ওঠে না।

কুর্চি। কেন মা, অকারণ আমাকে কতকগুলো কথা বলছ? টাকা ত পেয়েছ।

মা। (প্রস্থান করতে করতে) এ ঘরের কাজ তাড়াতাড়ি সেরে অভির খাবার জায়গা ক'রে দে। [প্রস্থান।

[অঙ্কন-সরঞ্জাম তোলা শেষ হ'লে কুর্চি ঘরখানা ঝাঁট দিয়ে নিয়ে মগে ক'রে গরম জল তুলে ঢেলে দেয় চেয়ারের ওপর। দিতে দিতে হঠাৎ সে হেসে ওঠে: মনে পড়ে অভির কথা—শোষণরত ছারপোকার ছবি কেউ এঁকেছে কি না। আঁকলে একমাত্র Goyaই আঁকতে পারতেন। শোষণরত ছারপোকার ছবি—অর্থাৎ চক্রবর্ত্তী যেন দাদার হাত থেকে ছবিখানা ছিনিয়ে নিচ্ছে। আবার গম্ভীর হ'য়ে যায় কুর্চি। তাকে এক ঝলক দেখে মুগ্ধ হয়েই কি আগে ভাগে এক শ' টাকা দিয়ে গেল চক্রবর্ত্তী? তাই কি অভি মর্মাহত হ'য়ে তাকে বলল ঐ কথা! তাকে দেখে এক শ' টাকা দিয়ে গেল দাদাকে। তাকে দেখে···।

(মগ থেকে গরম জল পায়ে পড়তেই চমকে উঠে, আবার চেয়ারে তাড়াতাড়ি জল দিতে থাকে কুর্চি।)

মঞ্চে মৃদু নীল আলো; সারা মঞ্চে যেন কুয়াশার বিস্তার। চরিত্রগুলি আসছে যাচ্ছে আবছায়া আবছায়া। কাউকেই স্পষ্ট রূপরেখায় দেখা যাচ্ছে না।

(ঘরে ঘরে sipton এর তিনরঙা ক্যালেণ্ডার ঝুলছে। চা হাতে করে চাঁদ থেকে কুর্চি মনোহর হাসি হাসছে। হঠাৎ কুর্চি উদ্‌ভ্রান্তের মত এসে ক্যালেণ্ডারগুলো নির্মম হাতে টেনে নামাচ্ছে আর ছিঁড়ে কুটি কুটি করছে। কিন্তু যত ছিঁড়ছে ততই যেন আপনি আপনি এসে দেয়ালের সেই সেই স্থানে থেকে তারা আবার ঝুলছে। কারা যেন জানলা দিয়ে ছুড়ে ছুড়ে দিচ্ছে ঐ ক্যালেণ্ডার। হকারদের হাঁক কানে আসছে। তারাও কুর্চির নাম করে এবং সেই সঙ্গে আরও অনেক ঘৃণ্য কথা জুড়ে দিয়ে ঐ ছবি রাস্তায় রাস্তায় ফেরী করছে। ক্রোধে দিগ্বিদিক-জ্ঞানশূন্য হয়ে কুর্চি জানলাগুলো দমাদম শব্দে বন্ধ করে দিয়ে চেয়ারে এসে বসল দুই কানে আঙুল দিয়ে, চোখ বুঁজে)।

(মা-এর প্রবেশ)

মা। কি কেলেঙ্কারী, কুর্চি! অভি না কি তোর ছবি এঁকে বাজারে ক্যালেণ্ডারের জন্যে বিক্রী করেছে? ছি, ছি, পাড়ায় যে আর কান পাতা যাচ্ছে না! এর চেয়ে তোর সিনেমায় নামাও যে ভালো' ছিল! [প্রস্থান

(সোমেনের প্রবেশ)

সোমেন। অভিটা একটা idiot; একটুও অদল-বদল না ক'রে একেবারে তোমার replica দিয়েছে sipton-এর calender-এ। সবাই ছি ছি করছে! দারিদ্র্যের জন্যে অভি এতখানি নেমে গেল! নিজের বোনকে বাজারে— [প্রস্থান

(কুর্চি টেবিলে মাথা গুঁজে বসল। আর সইতে পারছে না)।

(চক্রবর্ত্তীর প্রবেশ)

চক্রবর্ত্তী। এই যে মিস রায়! আপনার ছবিটা যা হিট করেছে না! সত্যি ওরকম রূপ চন্দ্রলোকেরই যোগ্য! এই নেন আমাদের Director আপনাকে অভিনন্দন পাঠিয়েছেন আপনি একদিন দেখা করলে তিনি খুশী হবেন। আপনি হুকুম করলেই আমি এসে নিয়ে যাব।

(হি-হি করে হাসতে থাকে। কুর্চি একেবারে কাণ্ডজ্ঞানশূন্য হয়ে তাকে মারতে যায় পায়ের চটি খুলে।)

[চক্রবর্ত্তীর প্রস্থান

(মাটিতে বসে পড়ে হাঁপাতে থাকে কুর্চি। চোখ যেন কোটর থেকে বেরিয়ে আসতে চায়)।

(অভির প্রবেশ)

অভি। ছুটো চাকরীই নিয়ে নিলাম কুর্চি—Stenotypist আর Commercial artist এর। এইবার একটা খবরের কাগজের Sub-editorই পেলেই সোনায় সোহাগা হয়। (পকেট থেকে একখানা লম্বা বৃত্তাকৃতি কাগজ বের করে কুর্চিকে দিতে দিতে) এই নে তোর ছবির originalটা।

(কুর্চি 'দাদা' ব'লে চীৎকার করে মাটিতে পড়ে গেল উপুড় হয়ে অভি অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।)

(বেলা তিনটের কাছাকাছি। অভির প্রবেশ। চেয়ারে ব'সে টেবিলে মাথা রেখে কুর্চি দিবানিদ্রায় মগ্ন। মাথার চুল ছড়িয়ে পড়েছে পিঠের ওপর। খুব ঘন ঘন শ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়ায় দেহ আন্দোলিত হচ্ছে।)

অভি। কুর্চি, ও কুর্চি! (জানলার ওপর গিয়ে বসে।) কুর্চি ও না (কাছে গিয়ে তাকে ধাক্কা দিয়ে) এই কুর্চি! (ধড়মড় ক'রে উঠে কুর্চি হতচকিত হয়ে তাকিয়ে থাকে অভির মুখের দিকে কি রে কি হল? (চোখ কচলে ভালো ক'রে অভিকে দেখে তাকে চেপে ধরে দুই হাত দিয়ে। তারপর চকিতে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। অভি অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে ঘরের মাঝখানে তারপর চেয়ারে বসে। একখানা খাম পকেট থেকে বের ক'রে রাখে টেবিলে। আর এক পকেট থেকে আর একখানা খামও রাখে আগের খানির পাশে। ম্লান হাসে।)

কাজ। কাজ হল। এইবার নিশ্চিন্ত। (আবার হাসে; আবার ম্লান) আজকে সকাল থেকেই লাভের পালা পড়েছে আমার!

(কুর্চি আসে ফিরে হাতে খাবারের ডিস নিয়ে। টেবিলে রাখতে গিয়ে খাম দুটো চোখে পড়ে। তুলে নিয়ে একে একে পড়ে খানি চিঠি। ধীরে ধীরে খামে ভরে আবার রেখে দেয়।)

র্চি। চা নিয়ে আসছি। [প্রস্থান।

ভি। (খাবার খেতে থাকে। সামনে এসে বসে পোষা বেড়াল; তার সামনে ছুঁড়ে দেয় আস্ত একখানা লুচি।) কি, আর নিবি? আজ থেকে তুই খেয়ে খেয়ে মোটা হয়ে উঠবি; শেষে হয় চর্বি ফেটে মরে যাবি না হয় ত' লোমে পোকা হবে। তুই কুর্চির বিয়েতে তত্ত্ব নিয়ে যাবি। মা তোকে আদর করে বলবে—আহা ষষ্ঠীর বাহন! (কণ্ঠস্বর বদলে) কিন্তু আমার ধারে কাছে ঘেঁষবি না বলে দিচ্ছি। বেরো এখান থেকে। বেরো!

(বেড়ালটা ওঠে না। মিউ মিউ করে। মাটিতে পা ঠুকে আবার তাড়া দেয়; আবার বেড়াল মিউ মিউ করে আর কুৎকুৎ করে তাকায়। অভি জোরে তাড়া দেয়। বেড়াল গিয়ে বসে জানলায়।) ও বুঝেছি! আজ এত দিন পরে বিকেলে খাবারের থালা দেখে প্রলুব্ধ হয়ে উঠেছিস। বুঝেছি। তোর দোষ কি! তার দোষ কি! আহা, খা, খা। (আবার একখানি লুচি ছুঁড়ে দেয়) খাবার জন্যেই ত সব—স-অ-ব!

(মুগ্ধ চোখে বেড়ালের খাওয়া দেখে অভি। এর আগে বেড়ালের না, মানুষেরও খাওয়া সে নজর করে দেখেনি। অনেক দিন পরে ও যেমন আজ লুচি খাচ্ছে, বেড়ালও তেমনি। কপ কপ করে খাচ্ছে বেড়ালটা আর মুখের ওপর জিভ বোলাচ্ছে পরম সন্তোষে। ত দিনের সঞ্চিত ক্ষুধা আর বাসনা সে আজ তৃপ্ত করছে—কত দিন র। লজ্জার বালাই নেই বলে যে সন্তোষ ওর চোখে মুখে, ভে, রোমে, নখের নড়নে উপচে পড়ছে, লজ্জার প্রকোপে মানুষ কেই কত ছলে, কত কৌশলে প্রকাশ করছে। তাই কি আজ ন সুগন্ধি তেল দিয়েছে কুর্চি—গন্ধে ঘর ছিল ভর ভর। জকে পেট ভরে খেয়ে ঐ বিড়ালী বহুদিন যে আদর করেনি জের বাচ্চাগুলোকে আজ সেই আদর করবে; বিড়াল কাছে লে ঝেঁকে উঠবে না। এমনি করে খেতে খেতে হৃষ্টপুষ্ট হয়ে হয়ত কোনো দিন কোন বড়লোকের মেয়ের নজরে পড়ে যাবে।)

আহা, খা! খাবার জন্যেই ত সব!

(একটু সন্দেশ ছুঁড়ে দিয়ে) যাকে বলে পেটের মধ্যে ভস্মকীট—সে সব হজম ক'রে ফেলে—শেষ পর্যন্ত খোরাক না দিতে পারলে, এই দেহটাকেও। (এক টুকরো ভাজা মাছ ছুঁড়ে দেয় বিড়ালকে)

(কুর্চির প্রবেশ, হাতে চা)

চি। (চা টেবিলে রেখে) ও কি! ওকে মাছ খাওয়াচ্ছ কেন? খিদে নেই বুঝি তোমার?

ভি। (হেসে উঠে) খিদে আবার নেই! খিদের জন্যেই ত সব। দেখ না, কত দিন পরে আজ মাছ, লুচি, সন্দেশ খেয়ে, আহ্লাদে ওর চোখ প্রায় বুঁজে এসেছে। (বাকী মাছখানাও বিড়ালকে দিয়ে) নে, পেট ভরে খা।

চি। কি হচ্ছে কি, দাদা! ক্ষেপেছ না কি?

ভি। (কুর্চির দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে, তাকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে) না, ক্ষেপিনি, শুধু পরিপূর্ণ আত্মহত্যার আগে ব্যাপারটা সমঝে নিচ্ছি ভালো করে। খেতে না পেলে মানুষ ছেলে বেচে, মেয়ে বেচে, সতীত্ব বেচে, প্রেম বেচে, কিন্তু প্রাণটুকু বেচে না। ঐ ধুকধুকিটুকু জীইয়ে রেখে সে সৌধ রচনার মরীচিকা দেখে। কিন্তু মরীচিকা দূরে যেতে যেতে একদিন তাকে ফেলে ধু ধু বালির মধ্যে। সে আর ওঠে না। আকণ্ঠ তৃষ্ণা নিয়ে সে বালির মধ্যে প্রোথিত হয়। আজ সকালে তোর রূপ বেচেছি। আমার আঁকার ভবিষ্যৎ সবটুকু বেচে দিয়ে এলুম। গান বেচব রোজ; ষ্টেনোগ্রাফিতে দেহের শক্তি রোজ নিঃশেষ করে দিয়ে আসব। কিসের জন্যে? দেহের খিদে মিটিয়ে নিশ্চিন্ত মনে মানুষের মত কিছু করতে পারব বলে। কিন্তু জানি তা হবে না। বিক্রীই আমার সার হবে। সব পুঁজি দিনের পর দিন শেষ করে দিয়ে শুধু ভিখারীর মত শেষ জীবনে জীবনের দিকে তাকিয়ে থাকব জীবনভরা তৃষ্ণা নিয়ে; অভিমানে গলা দিয়ে স্বর বেরুবে না। কিন্তু কার ওপর?

কুর্চি। তুমি ও ছবি ফিরিয়ে নিয়ে এস দাদা!

অভি। তারপর?

কুর্চি। তারপর জানি না।

অভি। আমি জানি। তাই বেচেছি। চেয়ে দেখ, ঐ বেড়ালটার পানে। আরও যদি দিই আরও খাবে। শেষে ছানাপোনাকে ডেকে আনবে। (আবিষ্টের মত হাসে।

(মা-এর প্রবেশ)

মা। কি রে, কি হল?

অভি। (বেড়ালের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ ক'রে বলে) ঐ দেখ।

মা। সে আবার কি!

অভি। গলা পর্যন্ত চাকরীতে ভর্তি ক'রে এসে ঐ উগরে দিয়েছি, বেড়ালটা খাচ্ছে। (মায়ের দিকে তাকিয়ে, ধীরে ধীরে) দুটো চাকরী হয়েছে মা, মাসে পাঁচশো টাকা।

মা। প্রথম মাইনে পেয়েই আমাকে কালীঘাটে নিয়ে যাবি। এত দিনে মা মুখ তুলে চেয়েছেন। শুধু তোমার সুমতি হলেই বাঁচি, এগুলো যেন আর ছেড়ে ব'সে থেক না। ঘাড়ের ওপর আইবুড়ো বোন ঝুলছে, মনে থাকে যেন।

[কুর্চির প্রস্থান।

অভি। তাহলে ওকে পার ক'রে চাকরি দুটো ছেড়ে দেব, এ্যাঁ?

মা। কী যে অনাসৃষ্টি কথা বলিস!

[প্রস্থান।

অভি। সত্যিই তাই। দ্রোণের মরাই যেখানে এক মাত্র কাম্য সেখানে 'ইতি গজঃ' জোরে বলা চলবে না। বললে জোরে বাজবে পাঞ্চজন্য—ডুবিয়ে দেবে আমার গলা। তাই সুরে সুর মিলিয়ে দিতে হবে—সুরে সুর মিলিয়ে দিতে হবে। (উদ্‌ভ্রান্তের মত) যদি না দিই—যদি না দিই—যদি বলি, বলে দিই—(হেসে) কে শুনবে? সবাই বলবে পাগল—ছেলেটার মাথা খারাপ হয়ে গেল আ হা!

[চেয়ারে বসে পড়ল ধপ ক'রে। বেড়ালটা তখনও খেয়ে চলেছে একমনে। চা-এর কাপে চা থেকে ধোঁয়া ওঠা বন্ধ হয়েছে অনেকক্ষণ]।

যবনিকা

মায়া বসু

কাগজের ফুলগুলো হাওয়ায় কাঁপছে। লাল, সাদা, হলদে, গোলাপী নানা রং-এর মরশুমী ফুল। টেবিলের ওপর কাচের ফুলদানীতে রাখা। ফুলের রং বিবর্ণ হয়ে এসেছে, পাপড়ির ওপরে পড়েছে পাতলা ধূলোর আবরণ।

কিন্তু আমি আর ও ফুল ঝেড়ে সাজিয়ে রাখব না, ফেলেও দেব না কোন দিন। যেমন আছে তেমনই থাক। মনে পড়ে গত বছর আমাদের বিয়ের তারিখে উনি কিনে এনেছিলেন। বলেছিলেন কাগজের ফুল অনেক দিন থাকবে, আর রোজ এইদিনের কথা মনে পড়বে। চমৎকার দেখতে ফুলগুলি। উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলাম।

কি সুন্দর দেখতে—আমার দাও ওগুলো। ওঁর হাত থেকে নিয়ে এলাম আমি। কিন্তু ফুলের চেয়েও সুন্দর দেখতে যার হাতে শোভা পাচ্ছে ওগুলো।

যাঃ-ও, বলে সরে গেলাম আমি। সত্যি আমিও সেদিন খুব সুন্দর করে সেজেছিলাম। আয়নার ভেতর নিজেকে দেখে নিজেই মুগ্ধ হয়েছিলাম।

ফুল দু'জনে মিলে একটি একটি করে সাজিয়েছিলাম ফুলদানীতে। আমি বলেছিলাম, রোজ এই ফুলগুলো দেখব, আর এই সন্ধ্যের কথা মনে পড়বে, কেমন ?

তার পর রাত্তিরে ছাদে তারা-ভরা আকাশের নীচে আমি গান গেয়েছিলাম অনেক আর উনি চুপচাপ শুনে গেছেন। কিন্তু প্রশংসায় মুখর না হয়ে উঠলেও আমি জানি আমার গান উনি কত ভালবাসেন। বিয়ের তারিখে বন্ধুদের নেমন্তন্ন করে হৈ-চৈ করার পক্ষপাতী আমরা মোটেই নই। দু'জনের মিলনের এই দিনটির স্মৃতি শুধু দু'জনেই মনে করব। ঘরের প্রদীপকে হাটের মাঝে আনলে প্রদীপের মূল্য যাবে হারিয়ে। তার স্নিগ্ধতা অনুজ্জ্বলতার অগৌরবে ম্লান হয়ে যাবে।

আমি বেশী গোলমাল একেবারেই পছন্দ করি না, লোকের ভীড়ে যাই দিশাহারা হয়ে। আমার বাবা ফরেষ্ট-অফিসার। জীবনের আঠারোটা বছর শুধু জঙ্গলে কাটিয়েছি। সামাজিক রীতি-নীতি কিছুই জানি না। ভয় করে লোকের সামনে অসামাজিক যদি কিছু করে বসি। তাই আমাদের দুজনকে ঘিরেই দুজনের জীবন মসৃণ গতিতে এগিয়ে চলেছে। কিছুদিন আগে থেকে উনি বলতে আরম্ভ করেছিলেন পড়াশুনো করতে। উনি প্রফেসর আর আমি লেখাপড়া বিশেষ জানি না। জঙ্গলে মানুষ আমি, পড়ার সুযোগ ছিল না, তবু কোনরকমে ম্যাট্রিকটা পাশ করেছিলাম, কিন্তু আর এগোয়নি।

উনি বলছিলেন আরও পড়াশুনো করতে কিন্তু পড়ায় আমার আগ্রহ বিশেষ নেই। আমি গাছপালা ভালবাসি। পাহাড়-অরণ্যের বিশালতাই দু'চোখ ভরে দেখতে চাই, বই-এর পাতায় চোখ বন্ধ রাখতে চাই না। এখানে এই ইট-কাঠে ঘেরা শহরেও আমার ঘরের সামনের বারান্দায় আর ছাদে কত রকমের গাছ লাগিয়েছি। বাপের বাড়ীর কথা মনে হলেই সেই গাছগুলোর দিকে চেয়ে থাকি, তাদের পাতায় হাত বুলিয়ে পাই স্নেহমধুর পরশ। আমার বাপের বাড়ী শুধু ফরেষ্ট কোয়ার্টারটুকুতেই সীমাবদ্ধ নয়—তার পরিধি আরও বড়। ঘন সবুজ অরণ্যে আর নীল ধোঁয়াটে পর্বতমালার বিশালতায়।

যাই হোক্—ওঁর ইচ্ছাকে অমান্য করতে পারলুম না ভর্ত্তি হলাম কলেজে। বাসে যাব, কারণ শহরের রীতি-নীতি তেমন রপ্ত নয় আমার, যে কোন মুহূর্ত্তে চাপা পড়তে পারি।

কলেজে গিয়ে মুখচোরা হয়ে থাকি। অচেনা মেয়েদের সঙ্গে ভাব করে নিতে পারি না। বাড়ী ফিরে হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। এসময় আলাপ হোল অরুন্ধতীর সঙ্গে। একদিন ক্লাসের শেষে অফ-পিরিয়ডে আমাকে নিয়ে গেল কলেজের ছাদে। বসে বসে কত গল্প করলাম দুজনে। পেলাম পরস্পরের পরিচয়। মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে। বাবা ষ্টেশন-মাষ্টার, বদলীর চাকরী। এখানে ও মামার বাড়ী থেকে পড়ে। লেখাপড়ায় খুবই ভাল আর দেখতে বেশ সুশ্রী। বিশেষতঃ ওর মুখ এমন মায়ামাখানো যে দেখলেই ভালবাসতে ইচ্ছা করে। আমার পরিচয়ও দিলাম।

অরুন্ধতী বললে, তুমি একলাটি ঘুরে বেড়াও কেন ভাই? এবার থেকে আমরা দুজনে একসঙ্গে থাকব, কেমন ?

অনুভূতিপ্রবণ মন আমার। এত দিন জানতুম শহর প্রাণহীন। যত কোমলতা বুঝি অরণ্যের শ্যামলতায়। আজ দেখলাম, না এখানেও প্রাণ আছে।

ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে লাগলো বন্ধুত্ব। একদিন নিমন্ত্রণ করলাম তাকে আমার বাড়ী। স্বামী ছিলেন। দুজনের পরিচয় করিয়ে দিলাম। অবশ্য অরুন্ধতীর পরিচয় তাঁর কাছে নতুন নয়। কত দিন তাঁর কাছে অরুন্ধতীর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছি।

আমি গান গাইলাম। গলা আমার ভাল। অরুন্ধতী গান জানে না। বুঝলাম দুজনেই শুনে মুগ্ধ হয়েছে।

এর পর আরম্ভ হোল পড়াশুনার কথা। আমি এ আলোচনায় বিশেষ উৎসাহী নই। অরুন্ধতী ভাল ছাত্রী আর উনি প্রফেসর মানুষ। কথায় কথা বেড়ে যেতে লাগলো। আর ওদের দুজনের গল্পের অবসরে আমি রান্নার তদারক করতে উঠে গেলুম।

দিনটা আজ মিষ্টি-মিষ্টি। প্রকৃতির পরিবেশে বেড়ে ওঠা আমি, বেশী লোকের সঙ্গ সহ্য করতে গেলে হাঁফিয়ে উঠি। কিন্তু স্পর্শকাতর মন আমার ভালবাসা পাবার জন্য ব্যাকুল। বাপের বাড়ীতে বিস্তীর্ণ ফুলের মাঠে যখন ঘুরে বেড়াতুম, মনে হোত আমি একলা নই। কত আমার বন্ধু চার দিকে ; তাদের লাল, নীল, হলদে রং-এর মুখ বার করে সবুজ জামা পরে নরম গন্ধ ছড়িয়ে আমার দিকে চেয়ে হাসছে। মনে হচ্ছে সেই আনন্দলাগা দিনটি আজ অনেক দিন পরে ফিরে এসেছে। অনাড়ম্বর চুপচাপ পরিবেশে আমার ভাললাগা বন্ধু এসেছে।

আমি পাশের ঘর থেকে শুনতে পাচ্ছি স্বামীর কণ্ঠস্বর, যাঁর ভালবাসায় আমি ধন্য হয়েছি। আর শুনতে পাচ্ছি অরুন্ধতীর কথা, হাসি। মানুষের ভব্যতায় এত দিন শুধু কৃত্রিমতার রূপ দেখলাম কিন্তু এখানে পেয়েছি প্রাণের পরশ। তার সহানুভূতির উত্তাপে নরম হয়ে গলে পড়ছে আমার মন। আর আজকের এই সন্ধ্যায় অনেক দিন পর বাপের বাড়ীর স্পর্শ খুঁজে পেলাম খাবার সাজিয়ে নিয়ে এসে দেখি, দু'জনে আমার ছবির এ্যালবা

দেখছে আর আমারই সম্বন্ধে কথা বলে হাসছে। আমার স্বামী আমার নরম মনের সন্ধান জানেন, তবুও মাঝে মাঝে আমাকে নিয়ে ঠাট্টা করেন। আগে কত দিন তাঁর ঠাট্টা বুঝতে পারিনি কিন্তু এখন আমিও সেটা উপভোগ করি।

দেখুন, পাহাড়ের ধারে তিস্তা এই যে দাঁড়িয়ে আছে ওর মুখটা দেখে মনে হচ্ছে বাড়ী থেকে বেদম বকুনি খেয়ে এসে দাঁড়িয়েছে।

দেখলুম যে ছবিটা বাবা বছর চারেক আগে আমার জন্মদিনে তুলেছিলেন সেটার কথা বলছে। আমি প্রকৃতিকে ভালবাসতুম আর যেখানে ছিলুম তার চার দিকেই ছিল প্রকৃতির রাজত্ব। কাজেই আমার প্রায় সব ছবিগুলোই ছিল হয় নদীর ধারে, নয় গাছের নীচে, নয়তো পাহাড়ের এঁকেবেঁকে-ওঠা পথের ধারে। এটা যেদিন তোলা হয়েছিল সেদিনের কথা মনে পড়ছে। বাবা বললেন তিস্তা মা, তুমি ক্যামেরা চেয়েছিলে, তাই শহর থেকে আনিয়েছি আর এটাতে প্রথম তোমারই ছবি তুলব।

তাই করা হয়েছিল। আমার মনের আনন্দের ছায়া মুখে ফুটে উঠেছিল, ছবিতে সেটা স্পষ্ট ধরা পড়েছে। উনিই আমায় কত দিন বলেছেন, ছবিটাতে তোমার বনদেবীর রূপটা পারফেক্ট ফুটেছে।

অরুন্ধতীও সপ্রশংস দৃষ্টিতে ছবিটা দেখছিল। ও বুঝলো এটা আমাকে রাগাবার কৌশল। তাই বলে উঠলো, যে যার চশমাতে জগৎ দেখে। ছোটবেলায় নিশ্চয়ই ভাল ছেলে বলে বাবা-মার কাছে বকুনি জুটতো আপনার কপালে, তাই দিয়েই সকলের ছোটবেলা বিচার করেন আপনি ?

দু'জনের গল্প আমাকে ঘিরে। দু'জনই আমার প্রিয়পাত্র। উনি আমার জীবনে প্রথম পুরুষ আর অরুন্ধতী আমার প্রথম বন্ধু। দু'জনকেই বড় ভালবাসি আমি।

অরুন্ধতী বললো, এই কাগজের ফুলগুলো ভারী সুন্দর ! ঠিক সত্যিকারের মত।

আমি বলতে গেলাম, নাও না ওগুলো, কিন্তু দেখলাম ওঁর চোখে নিষেধের ছায়া। বুঝলাম যেদিনের স্মরণে ও জিনিষ কেনা তা উনি কাউকে দিতে নারাজ।

ক্রমে ক্রমে রাত বাড়লো। শহরের পথে পথে ঘরমুখো মানুষের ভীড়।

অরুন্ধতী বলল, এবার আমিও উঠি, রাত হয়ে যাচ্ছে।

আমি আর উনি দু'জনে ওকে বাড়ী পৌঁছে দেবার জন্য উঠলাম।

আমাদের ছোট্ট সংসারে আমার একটি মাত্র প্রিয় অতিথিকে আমি প্রায়ই নিয়ে আসতুম, আর সেগুলো হোত আমার বিশেষ আনন্দের দিন।

বাবাকে চিঠিতে লিখতাম অরুন্ধতীর কথা, আমাকে তার ভালবাসার কথা। এবারে ছুটিতে নিশ্চয়ই ওকে নিয়ে যাব আমার বাপের বাড়ী। নীল-নীল ধোঁয়া-ধোঁয়া রং-এর পাহাড়, যারা আমার একান্ত আপন তাদের এলাকায় নিয়ে যাব ওকে। হাসি-ভরা ফুল-বাগানের ফুলগুলোকে দেখাব আমার নতুন পাওয়া বন্ধুকে।

অরুন্ধতীকে বলতাম। ও হাসতো। উনিও হাসতেন, ঠাট্টা করতেন। আজ-কাল উনি অরুন্ধতীর সামনেই 'বনদেবী' বলে ডাকতেন। বললেন, বনদেবী তাঁর জঙ্গলের রাজত্ব না দেখিয়ে শান্তি পাচ্ছে না।

অরুন্ধতী বলতো, না—না, তিস্তার রাজত্বটা জঙ্গলের রাজত্ব বলে ঠাট্টা করলে চলবে না। ওর রাজ্য প্রকৃতির আপন সীমানায়। ওখানে ছেলেবেলা কাটানো বহু ভাগ্যে হয়। ভাবলে আনন্দ হয় আর সেই সঙ্গে হিংসাও হয়। ওর ছেলেবেলার অনুভূতিগুলো আমরা বোধ হয় কল্পনাও করতে পারি না। এ শহরে ও আপনার টেবিলের ওই কাগজের ফুল দিয়ে নিজেকে ভুলিয়ে রেখেছে কিন্তু ওর আপন প্রাণের বিকাশ সেই প্রকৃতির রাজত্বেই, ও সত্যিই বনদেবী।

অরুন্ধতীকে ভাল লাগত আমার আরো এইজন্যে যে, যে কথাগুলো আমি বুঝিয়ে বলতে পারি না, সেগুলো ও কেমন স্পষ্ট করে বুঝিয়ে বলতে পারে।

দেখতে দেখতে দিনগুলো কেটে যেতে লাগল। আমাদের পরীক্ষার দিন এলো এগিয়ে। অরুন্ধতী আর আমাকে পড়ার ব্যাপারে উনি যথেষ্ট সাহায্য করতেন। তার পর একে একে উদ্বেগাকুল দিনগুলো পেরিয়ে গেল। আমাদের পরীক্ষা শেষ হোল। আমার পরীক্ষা মোটামুটি কিন্তু অরুন্ধতীর বেশ ভালই পরীক্ষা হোল। ও ভাল ছাত্রী, পরীক্ষা ভাল হবে আগেই আশা করা গিয়েছিল। কিন্তু ও বলতো, সুদেব বাবু না থাকলে কিছুতেই আমার ভাল পরীক্ষা হোত না।

আমি প্রতিবাদ করতুম। উনি তো আমাকেও পড়িয়েছেন কিন্তু আমার কেন অত ভাল হোল না ?

উনি দুই বন্ধুর ঝগড়া দেখে হাসতেন। সত্যিই উনি পড়ার ব্যাপারে আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। প্রফেসর মানুষ, পড়ানোতে উৎসাহ তাঁর স্বাভাবিক ভাবেই ছিল।

পরীক্ষার পর গরম পড়ে গেছে। আমার বাপের বাড়ী যাওয়ার কথা উঠছে। ওঁর খুবই আপত্তি যেতে দিতে কিন্তু জোর দিয়ে না বলতেও পারছেন না। প্রকৃতি আমায় হাতছানি দিচ্ছে তার উদার-সম্পদের আকর্ষণ দিয়ে। লুব্ধ আমি, উন্মুখ হয়ে উঠেছি। এবার আমার রাজ্যে অরুন্ধতীকেও নিয়ে যেতে ভাল লাগছে। কিন্তু ইচ্ছা
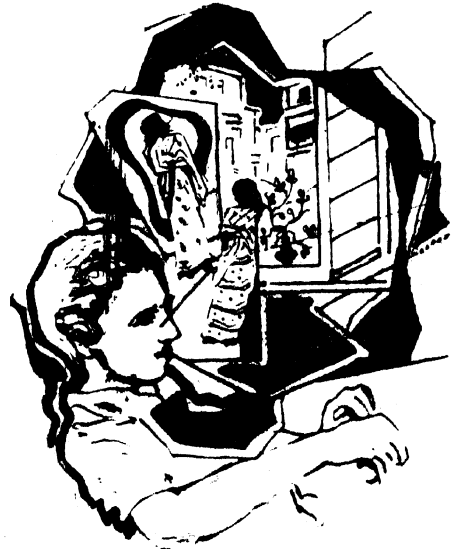
থাকলেও তার যাবার উপায় নেই। মামাবাড়ীর আপত্তি। মনটা সেজন্য বিমর্ষ।

এমন সময় একটা অপ্রত্যাশিত ব্যাপার ঘটলো। অরুন্ধতী এলো এক দিন বিকেলবেলা। মুখটা লাল, চুলগুলো উস্কোখুস্কো।

তিস্তা!

কি রে, ব্যাপার কি?

চল্, একবার ওপরে ছাদে। তোর সঙ্গে কয়েকটা কথা আছে।

উদ্বিগ্ন হলাম আমি। ছাদে গিয়ে একটা কোণে বসলাম দুজনে। কতকগুলি গাছের টব সে-কোণে একটা সুন্দর পরিবেশের সৃষ্টি করেছে। এইখানে বসে আমরা কত দিন গল্প করে কাটিয়েছি।

কিন্তু আজ কোন দিকে লক্ষ্য নেই আমার। অরুন্ধতীর দিকে উদ্বেগের দৃষ্টিতে চেয়ে আছি। অরুন্ধতী আমার ডান হাতটা চেপে ধরলো, তোকে বিশ্বাস করে একটা কথা বলবো কি?

বল্।

তুই আমাকে ভুল বুঝবি না তো?

না, নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে আমার। কি বলবে ও যার জন্য এত ভণিতা?

আমি একটি মুসলমান ছেলেকে ভালবাসি। নাম আব্বাস। সে বড় বিপদে পড়েছে। তাই ছুটে এসেছি তোর কাছে।

আশ্চর্য্য হলাম আমি। আমাদের এত দিনের মেলামেশার মাঝে কোন অসতর্ক মুহূর্ত্তেও আমাকে জানায়নি কাউকে ও ভালবাসে। জানতে চেয়ে ঠাট্টা করেছি, উত্তরে ও হেসে এড়িয়ে গেছে।

দেখ, জাতবিচারের বোধটা আমাদের মধ্যে এত বড় যে একথা কাউকে জানাইনি। কিন্তু আজ তোকে জানাতেই হোল, কারণ তোর সাহায্য একান্তই দরকার।

মনে অভিমান হোল। ও, তা নয়তো কিছু বলতিস না?

বলব ভেবেও সাহস পাইনি। কারণ আব্বাস মুসলমান জেনে তুই যদি কিছু ভাবিস। কিন্তু আব্বাসের পরিচয় আমার কাছে ধর্ম্মের চেয়ে বড় হয়ে গেছে। সে মানুষ এটুকুই বুঝেছিলাম। বাবা বদলীর চাকরী করতেন। বাংলা ভাগ হবার আগে বাবা যখন পূর্ববাংলায় ছিলেন সে সময় ওরাও আমাদের কাছে থাকত। পাশাপাশি বাড়ী। দুজনেই আমরা খুব ছোট। কত খেলাধূলো করে কাটিয়েছি। তখনো ধর্ম্মের তফাৎবোধ জাগেনি। তারপর সব ভাগ হয়ে গেল। কিন্তু পরিচয়ের সূত্র রয়ে গেল। এখন ও কলকাতার মেডিকেল কলেজে পড়ে। ওর বাবা-মা থাকেন পাকিস্তানে কিন্তু সম্প্রতি ওর বিশেষ দরকার পড়েছে দু'শ টাকার। আমার হাতে এই ক্ষয়ে-যাওয়া চুড়ি দুটো ছাড়া আর কিছু নেই, তাও মামাবাড়ীর সতর্ক চোখ আছে এর ওপরে। কাজেই তোর শরণাপন্ন হলাম।

অরুন্ধতীর কথা শুনে আমার রাগ হোল। আব্বাস মুসলমান, এজন্যই আমার কাছে এত দিন কিছু বলেনি। তবে বন্ধু হয়েও ও আমায় চিনতে পারেনি। কিন্তু অরুন্ধতীর শুকনো চেহারা দেখে কেমন মায়া হোল। মনের সংশয় নিয়ে বেচারী কি ভাবে দিন কাটায় মামাবাড়ীতে! আজ মনের কথা একজনের কাছে প্রথম বলে ফেলে কেমন হকচকিয়ে গেছে। মনের গোপন কথা বাইরের আলোতে প্রকাশ হয়ে চমক দিচ্ছে ওকে। সান্ত্বনা দিলাম। তোর কিছু চিন্তা নেই। চলতো। নীচে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উনি বাড়ী এলেন। বললেন, আরে তুই বন্ধুতে ছাদে ছিলে কেন? ঘরে কি ঠাঁই নেই, তাই মুক্ত আকাশের নীচে?

অরুন্ধতী বিব্রতমুখে চুপ করে রইলো। উনি মুখ-হাত ধুতে বাথরুমে গেলেন। আমি আলমারি খুলে দু'শ' টাকা অরুন্ধতীকে দিলাম। অরুন্ধতী আজ বেশীক্ষণ রইল না। খানিকক্ষণ পরে চলে গেল।

দিন তিনেক পরে দুপুরবেলা আমি শুয়ে একটা বই পড়ছি। কড়া নড়ে উঠলো। কে? উনি কি? অসময়ে? দোর খুলে দেখি অরুন্ধতী আর অপরিচিত একটি ছেলে।

অরুন্ধতী পরিচয় করিয়ে দিল। এই আব্বাস। সোজা লম্বা চেহারা, ফর্সা রং-এ সুছাঁদের মুখশ্রীতে ব্যক্তিত্ব পরিস্ফুট। আব্বাস বলল, আপনাকে আমি 'বহিনজী' বলে ডাকব ঠিক করেছি। অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাকে। আপনার গল্প অনেক শুনেছি। 'বনদেবী' আপনি। এদিকে আপনার সঙ্গে আমার মিল আছে। আমি পূর্ব-বাংলার ছেলে। জল, মাটি, গাছগালা আমিও খুব ভালবাসি।

আমি বেশী কথা বলতে পারছিলাম না। অরুন্ধতী সামলাচ্ছিল। আব্বাস বুঝলো আমার স্বভাব। আসুন বহিনজী, একদিন আমরা বেড়াতে যাই। ইট-কাঠের শহর আপনার ভাল লাগে না। কিন্তু এ শহরেও নদী আছে আর তাতেও চাঁদের আলো পড়ে; ঠিক আপনার বাপের বাড়ীর দেশের গাছপালার ওপরে জ্যোৎস্না রাতে যেমন আলো ঠিকরে পড়ে, সেই রকম।

আব্বাস কত ভাল। অরুন্ধতী ঠিকই করেছে এমন ছেলেকে ভালবেসে। এরা সবাই ভাল। উনি যদি আসতেন এসময় খুব ভাল হোত। আমার ভাল লাগার ভাগ ওঁকে দিতে এত ভালো লাগে!

সেদিন রাত্রে ওঁকে বললাম সব কথা। অরুন্ধতী আর আব্বাসের কথা। উনি কিছু বললেন না।

কয়েক দিন ধরেই বড্ডো দেরীতে আসছেন। পরীক্ষা হয়ে গেছে। পড়াশুনোর জন্য অরুন্ধতীর আসাটা বেশী ছিল এখন সে-ও কম আসে। বড় ফাঁকা-ফাঁকা লাগে।

সেদিন গম্ভীর ভাবে বললেন, তুমি বাপের বাড়ী যেতে চাওতো আমার আপত্তি নেই।

কথাটা কেমন যেন বেসুরা ঠেকলো। বরাবর উনি যেতে দিতে আপত্তি করেন। এমন ঠাণ্ডা নিষ্প্রাণ গলার স্বর তো কখনো শুনিনি!

কিন্তু যাওয়াটা যে আরো তাড়াতাড়ি আর এমন ভাবে ঘনিয়ে আসবে, তখনো ভাবতে পারিনি।

নিঝঝুম দুপুর। কড়াটা নড়ে উঠলো। আব্বাস! একা! এমন ভাবে?

আব্বাস বসলো আমার ঘরে। কথা বলতে লাগলুম দুজনে। ও সেই দু'শ' টাকা ফেরত দিতে এসেছে। বহিনজী, অনেক ধন্যবাদ আপনাকে, বড় বিপদের সময় টাকাটা উপকারে লেগেছিল।

সামনের টেবিলের ওপর টাকাটা রেখে দিলাম। আব্বাসকে চা তৈরী করে দিলাম। অরুন্ধতীকে নিয়ে আসবার সুযোগ করে ওঠা যায়নি। রক্ষণশীল মামাবাড়ী।

আব্বাস বলল, বহিনজী, আপনি কত ভাল। আশা করি আপনার ভাগ্যও ভাল যাবে। আমি কিছু কিছু হাত দেখতে জানি। দেখি আপনার সৌভাগ্য-রেখা কত দূর?

আমার হাতখানা আব্বাস নিয়েছে, ঠিক তখুনি পর্দ্দাটা নড়ে উঠলো। চোখ ফিরিয়ে দেখলাম, ওঁর জুতো শুদ্ধ পা সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাচ্ছে। কিন্তু উনি ঘরে ঢুকলেন না কেন? কেন অমন ভাবে চলে গেলেন? বিস্বাদ হয়ে উঠলো সব।

আব্বাস দরজার দিকে পিছন ফিরে বসেছিল কিছু বুঝতে পারল না। আমার করতল-রেখার দিকে একাগ্র দৃষ্টি।

হাতটা টেনে নিলাম। বিস্মিত হোল সে। আমার মুখের ভাব ভাবে বোধ হয় অবাক হোল। বহিনজী, অন্যায় করে থাকিতো মাফ চাচ্ছি। ক্ষমা করুন, আজ চলি বহিনজী!

আব্বাস চলে গেল। আর এক জায়গায় চুপ-চাপ বসে রইলাম আমি। রাস্তা দিয়ে বাসনওয়ালা ঠং ঠং করে বাসন নিয়ে চলে গেল। অনেক দূর অবধি আওয়াজটা কানে আসতে লাগলো। কার্ণিশের ওপরে কাকটা কর্কশস্বরে ডেকে উঠলো। আমি নড়তে পারলাম না। ভাবতে পারলাম না কিছু। আরও ঘণ্টাখানেক পরে উনি ফিরে এলেন। আব্বাসের চায়ের শূন্য কাপটা তখনো এক ভাবে পড়ে আছে আর টেবিলের ওপর রাখা দুশ' টাকার নোটগুলো ফ্যানের হাওয়ায় অল্প অল্প কাঁপছে। উনি আনলায় জামাটা রোজ যেমন রাখেন রাখলেন, তারপর ইজিচেয়ারে যেমন বসেন বসলেন। তাঁর গম্ভীর মুখের দিকে চেয়ে আমি কিছু বলতে পারলাম না। গলার স্বর আটকে গেল।

তুমি কবে যাচ্ছ বাপের বাড়ী?

নির্ব্বাক্ আমি।

তারপর উনি চেয়ারে বসে বসেই পাশের টেবিলের কাগজের ফুলগুলোকে একটা একটা করে আস্তে আস্তে ফেলে দিতে লাগলেন মেঝের ওপর। যদি ধাতব জিনিষের মত আওয়াজ শোনা যেত তবে আমার বুকটা ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়ার আওয়াজে সমস্ত ঘর ভরে উঠতো। কিন্তু কিছুই হোল না। চুপচাপ বসে রইলাম আমি আর উনি।

* * * *

দুটো দিন কেটে গেছে, তারপর কিন্তু এ অসহ্য অবস্থায় আর থাকতে রাজী নই আমি। কাগজের ফুলগুলোকে তাদের যথাস্থানে সাজিয়ে রেখেছি বটে কিন্তু সেগুলো আজ আমাদের দুজনের কাছেই মূল্যহীন।

যাবার দিন ঠিক হয়েছে কাল। আমি ওঁকে বলতে পারিনি, আমি কোন অন্যায় করিনি, যার জন্য এত বড় শাস্তি পাব। কিন্তু আমার অন্তরাত্মা বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। শিক্ষাদীক্ষা শহরের মানুষের ওপরের পোষাকটাকে বদলালেও ভেতরের আদিম হিংস্রতাকে বদলাতে পারে নি। তাই আমি পালাতে চাই এখান থেকে আমার সেই বুনো দেশে।

সন্ধ্যেবেলা উনি বারান্দার অন্ধকারে গম্ভীর আড়ষ্টমুখে বসে আছেন আর আমি ঘরের ভেতর। সিঁড়ির দরজাটা খুলে গেল। এল অরুন্ধতী আর আব্বাস, বুকটা আমার ধ্বক্ করে উঠলো।

অরুন্ধতী আব্বাসের সঙ্গে ওঁর পরিচয় করিয়ে দিল। অরুন্ধতী আব্বাস কেউ কিছুই জানে না আমাদের অন্তর্দ্বন্দ্বের খবর। আব্বাস বুঝতেই পারছে না না জেনে ও আমার জীবনের কত ক্ষতি করে বসে আছে! বহিনজী, আপনি চুপ করে বসে? সুদেব বাবু, আমার বহিনজীর মতো মেয়ে এযুগে দেখা যায় না। বনের পাখী শহরের খাঁচায় আটকা পড়েছে।

ওঁর অনেক দিন আগের একটা কথা আমার মনে পড়লো। উনিও একথা আমায় বলেছিলেন একদিন।

অরুন্ধতী একটু লজ্জিত হচ্ছিল আজ বোধ হয় আব্বাসের জন্য। ও ভেবেছে আমার সঙ্কোচও বুঝি আগের মতো লোকবাহুল্যের ভীতিতে। বেশীক্ষণ ওরা রইল না। মামাবাড়ী থেকে সন্ধ্যের পর বেশীক্ষণ বাইরে থাকাটা অরুন্ধতীর পক্ষে অসম্ভব। ওরা বোধ হয় কোন সুযোগে এখানে এসেছিল।

তারপর রাত্রিবেলা। শুতে এলাম ঘরে। একদিন যদিও এক শয্যায় শুয়েছি, কথা একটাও হয়নি। লজ্জা ও আড়ষ্টতা আমাকে মূক করে রেখেছে। যা স্বপ্নেরও অগোচর তা সত্যকদর্যতার রূপ নিয়েছে ওঁর মনে। কাঁদতে পারছি না, কান্না শুকিয়ে গেছে।

এইতো রাতটা এভাবে কেটে যাবে। কাল এতক্ষণ থাকব ট্রেণে। কোথায়? কতদূরে? উনি যদিও পৌঁছে দিতে সঙ্গে থাকবেন কিন্তু সে তো এক-রেলগাড়ী লোক থাকার মতো উনিও একজন। উনি কে আমার? কেউ না। একটা প্রশ্ন করেননি, একটা কথা বলেননি। যে বাপের বাড়ী যাওয়াটা আমার এত আনন্দের ব্যাপার ছিল তা কোথায় গেল? এবারও তো কত কি ভেবেছিলাম। যা ভাবি তা কি হয়? আমরা কি এক মুহূর্ত্ত আগেও বুঝতে পারি এক মুহূর্ত্ত পরের কথা? অথচ কত সবজান্তা আর গর্বিত আমরা।

অন্ধকার ঘরে শুতে এলাম। কিন্তু কত আশ্চর্য্য ব্যাপার যে আমার জন্য অপেক্ষা করছিল! শুতে যেতেই কার দুখানি হাত আমাকে কাছে টেনে নিল। এ তো আমি এক মুহূর্ত্ত আগেও কল্পনা করতে পারিনি। ওঁর গম্ভীর গলার গভীর সুরের কথা কানে এল। আমাকে ক্ষমা কর, তিস্তা! নিজের মনের অন্যায়ে তোমাকেও কলুষিত করেছি। তুমি বনদেবী। তোমার কাছে কিছুই লুকোব না যে অরুন্ধতীর ওপর আমার মনের কোন অসতর্ক মুহূর্ত্তে দুর্ব্বলতা এসে গিয়েছিল, তাতেই আব্বাসের ওপর বিদ্বেষ এসেছিল। সেজন্য আব্বাসের সঙ্গে তোমার ওপরেও বিদ্বেষ করেছি। নিজের মনের জ্বালায় তোমাকেও কষ্ট দিয়েছি। কিন্তু সত্য সব পরিষ্কার করে দিয়েছে। চল কাল তুমি, আমি, আব্বাস আর অরুন্ধতী বেড়াতে যাই। আমার দোষ তুমি মার্জ্জনা কর।

করুণাময়, তোমার কত দয়া! তুমি সবই জান, সবই কর। তাই আজ সন্ধ্যায় ওদের এনে দিয়েছিলে। ওঁর মনের সব গ্লানি হরণ করে নিলে।

বুকের ভেতরটা রুদ্ধ আবেগে টনটন করে উঠলো। কেন তুমি ভুল বুঝেছিলে? ভুল বুঝে আমাকে ছোট করলে, নিজেও ছোট হলে! মনের ব্যথা ঝরে পড়লো চোখের জলের ভেতর দিয়ে। আর সে জল মুছিয়ে দিতে আর একজন এগিয়ে এলো। অন্ধকারে যার মুখ না দেখেও বুঝতে পারলাম আত্মগ্লানি, অনুশোচনা আর ভালবাসায় ভরা তার দুচোখের ভাষা।

মীরা বন্দ্যোপাধ্যায়

ঘুম আসছিল না মোটেই।

রাত বারোটা বাজলো টং-টং করে পাশের বাড়ীর ঘড়িটায় আর সেই সঙ্গে ঠুং-ঠাং রিক্সার আওয়াজও শোনা গেল রাস্তার মোড়ে—রাত্রির নিস্তব্ধতাকে ফুটো করে। একটা ভারী গলার হুঙ্কার উঠলো—এই রোখো হিঁয়া উল্লুক! রিক্সাটা ঘট-ঘট করে ঘষড়ে থামলো পুরোমাত্রায় ছুটন্ত গতিবেগ সামলে। পাশের বাড়ীর ঢেংকা ভদ্রলোক ফিরলেন এতক্ষণে। রোজই প্রায় রাত বারোটা-একটা বাজে তাঁর ফিরতে। আর তার পর দরজায় দুমদাম লাথি, ঘরের মধ্যে চীৎকার, হুঙ্কার, গালিগালাজ—মিনিট পনেরো যাবৎ পাড়াপড়শীর ঘুম ভাঙিয়ে ঘুমন্ত রাতটা সরগরম করে তোলেন উনি। ভদ্রলোক একেই বদমেজাজী, তার উপর রোজই একটু বেশ 'রঙিয়ে' ফেরেন নাকি—তুর্জনে রটিয়ে বেড়ায়। যাই হোক, এই মূর্তিমান অপদেবতাটির নৈশ উৎপাত পাড়ার একটা নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার, প্রায় গা-সয়ে গেছে এখন।

আজ বোধ হয় মাত্রাটা একটু চড়েছিলো, তাই রিক্সায় চেপে ফিরেছেন, একটু বাদেই তার প্রমাণ পেলাম। রিক্সাওয়ালার কাতর অনুনয় কানে এলো—আউর দো আনা দে দিজিয়ে বাবুজি, শিয়ালদাসে পুরা তিন মীল হো বাবুজি, ফির এ্যায়সা জবরজাড়—পাওভী বিলকুল নিসাড় হো গিয়া, মেহেরবানি করকে দিজিয়ে আউর দো আনা—

দরজায় দুম্ করে এক লাথির ঝড়ঝড় আওয়াজের সাথে বাবুর উত্তরটা মিলে গেল। পরক্ষণে আবার শুনতে পেলাম রিক্সাওয়ালার অনুনয়—দে দিজিয়ে বাবুজি!

বাবুজি এবার রুদ্রকণ্ঠে হুঙ্কার ছাড়লেন—আরে, তেরি—যা ভাগ! ফির দিক্ করতা হ্যায় এই সা রাত দুপুরমে—! মাঝরাতকো ওয়াস্তে বহুৎ মিলগিয়া—ভাগ, উল্লুক!

রিক্সাওয়ালার দীর্ঘশ্বাসটা আর শুনতে পেলাম না। একটু পরেই ঘট-ঘট আওয়াজে বুঝলাম—ও ফিরে গেলো।

শুয়ে শুয়ে ভাবছিলাম ঐ ব্যাপারটাই! সত্যি, মানুষ যে কেন মানুষের উপর এমন দুর্ব্যবহার করে অকারণে! কি হতো আর

দু' আনা পয়সা দিয়ে দিলেই, আহা বেচারা! এই মাঘ মাসের শীত। গায়ে হয়ত একটা আস্ত জামাও নেই—খালি পা! ঘরে আবার ক'টা উপবাসী শিশু মুখ চেয়ে আছে কে জানে? আহা!

ভাবতে ভাবতে বোধ হয় পুরা এক ঘণ্টা কেটে গেছে। হঠাৎ আবার ঠুং-ঠুং শব্দে সচকিত হয়ে উঠলাম। আবার কোন নৈশবিহারী ফিরছেন কে জানে! আরেক বেচারার কপালে হয়ত আবার এক চোট গালাগাল নাচছে। মনটা খারাপ হয়ে গেলো আরো—ভাবতেই!

কিন্তু এ রিক্সাটাও আবার ঐ আগের বাড়ীটার সামনেই থামলো। খানিক পরে শঙ্কিত দ্বিধাগ্রস্ত হাতে দরজার কড়া নাড়তে শুনলাম—ঠুক্‌ঠুক্ করে! নীচু গলায় কে ডাকলো—বাবু, বাবুজি!

কি ব্যাপার? সেই রিক্সাওয়ালাই আবার ফিরে এলো নাকি? তাই তো মনে হচ্ছে। কিন্তু কেন আবার মরতে এল হতভাগা! দু' আনা পয়সার মায়া কি এখনো ছাড়তে পারেনি বেচারা! হয়তো এবার বলবে কেঁদে—বাবুজি, দোঠো বচ্চা উপাস রহা হ্যায়—মেহেরবানি কিজিয়ে—

রিক্সাওয়ালা ডেকেই চলেছে—বাবু—বাবুজি! বেশি জোরে ডাক্‌তেও সাহস পাচ্ছে না, পাছে অন্য লোকের ঘুম ভেঙে যায়। আবার গালাগাল শুনতে হয়। তবু ডেকেই চলেছে নীচু গলায় একটানা—ঝাড়া পাঁচ মিনিট ধরে!

বেশ কৌতূহলী হয়ে উঠলাম। ভাবলাম উঠে দরজা খুলে দেখবো নাকি—কি ব্যাপার যদি সত্যিই ও বেচারা পয়সার জন্য ফিরে এসে থাকে এই শীতের মধ্যে পৌণে এক ঘণ্টা পরে—তবে আমিই ওকে আট আনা পয়সা দিয়ে দেবো'খন!

এই ভেবে, বেশ একটু শিভালরাস ভঙ্গিতে লেপ ছেড়ে উঠলাম। উঃ, কি শীত বাইরে, হাড় কনকন করে ওঠে। হাতড়ে সুইচ টিপে দরজার দিকে এগোলাম। কিন্তু দরজার কাছে পৌঁছবার আগেই শুনি আমাদের বাড়ীর কড়া নড়তে সুরু করেছে। বোধ হয় আলো জ্বলতে দেখে—যাই হোক তাড়াতাড়ি গিয়ে দরজা খুললাম।

গায়ে একটা পুরোনো ছেঁড়া কোট—মাথায় ময়লা গামছাখানা কান জড়িয়ে বাঁধা। তবু ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছে বেচারা! ডানহাতের আঙুলে জড়ানো ঘণ্টিটা পর্যন্ত কঁপুনির চোটে দুলছে। আর বাঁ হাতে তার দু'টো পেল্লায় ফুলকপি। আমায় দেখে নিতান্ত অপরাধীর ভঙ্গিতে সে বললো—দেখিয়ে মাইজী, বহুৎ গড়বড় হো গিয়া, ও কোঠিকা বাবুজি তো মেরা রিক্সামে আয়ে থে—বারা বাজে—লেকিন এহি চীজ তো হামারা রিক্সামে ঠহর গিয়া—হাম ভি ভুল গয়ে, উনলোগ ভি ভুল গয়ে, তো ফির খালপুল তক্ যাকে মুঝে মালুম হুয়া কি কোই চীজ তো ঠহর গিয়া মেরা রিক্সাকে গদীপর উসী লিয়ে হাম তো ফির চলা আয়া—বহুৎভী হাঁকডাক কিয়া তো লেকিন কোই পত্তা না মিলি বাবুজিকা।

আমি এতক্ষণে বললাম—ও, তাহলে তুমি এই কপি দুটো ফিরিয়ে দিতে এসেছো?

রিক্সাওয়ালা ঘাড় নেড়ে বললো জী হাঁ, জরুর! উসীকা ওয়াস্তে তো ফির দো মীল উলট চলা আয়া, নেহি তো হামারা ঘর তো হ্যায় ওহি পটলডাঙামে—যানে দিজিয়ে লেকিন, মায়িজী উয়ো বাবুজিকা কোই সাড়া ভি তো নেহি মিলা ঈসী লিয়ে হাম

ফির এতনা রাতসে আপ লোঁগোনে জবরদস্ত কর দিই। আপনে মেহেরবানি করকে ইস চীজকো রাখ দিজিয়ে, তো কাল ফজিরমে মালিককো দে দেনা।

আমি এতখানি অবাক হয়েছিলাম যে কথা কইতে পারলাম না কিছুক্ষণ। তারপর বললাম তা বেশ তো, আমি বাবুকে কাল বলে দেবোখ'ন। তুমি বরং কপি দুটো নিয়ে যাও তোমার ছেলেমেয়েরা খাবে।

রিক্সাওয়ালা সজোরে মাথা নেড়ে বললো নেহি, নেহি, এ ক্যায়সা বাৎ, মায়িজী! উ বাবু যব পহোলে হামরা রিক্সামে উঠে থে উনহোনে আপনাসে হামকো পাছ পুছকিয়া—আচ্ছা রিক্সায়ালা বাতাও তো, ক্যায়সা চীজ হুয়া, তো থোড়া জাস্তি ভাও লে লিয়া, লেকিন বাল বাচ্চালোগ বহুৎ খুশ তো যায়গা। আপহি বাতাইয়ে তো মায়িজী, বালবাচ্চাকো ওয়াস্তে যো চীজ উনহোনে লায়েথে হামনে ভি সবকুছ জানকর ক্যায়সে লে যায়েঙ্গে আপনা ঘর? হামারা ভি তো বালবাচ্চা হ্যায় ঘরমে, ফির হামারা বালবাচ্চা তো কবভি কপি খাতা নেহি—কাঁহাসে মিলেগা কহিয়ে! বলে হাসলো একটু।

আরও অবাক হোলাম। তবুও আবার পীড়াপীড়ি কোরলাম তাকে অন্ততঃ একটা কপিও নিয়ে যাবার জন্যে। কিন্তু সে কিছুতেই নেবে না, আর ঐ এক কথা বাবুজি ছেলেপিলের জন্যে যে কপি কিনেছেন সখ করে তা সে জেনে-শুনে নিয়ে যাবে কি করে—নিজে ছেলের বাপ হয়ে? তাই দু' মাইল বয়ে এই তিন পহর রাতে আবার ফিরিয়ে দিতে এসেছে। আর তাছাড়া তার বাচ্চারা কপি খেতে জানে না—কোথায় পাবে। ছাতু-রুটীই জোটে না।

কপি যখন নেওয়ানো গেলো না আর কিছুতেই তখন বললাম, বেশ কপি না নাও না নেবে, কিন্তু ঐ আট আনা পয়সা নিয়ে যাও—তোমার ছেলেদের মিষ্টি খেতে দিও।

রিক্সাওয়ালা হাত সরিয়ে নিয়ে একটু অদ্ভুত হাসলো, শীতের আড়ষ্ট রাতেও সে হাসিকে অনেকখানি তরল আর প্রাণতপ্ত মনে হোল; মাথাটা একটু নুইয়ে সে বললো হাম রিক্সা ঠেলতা হ্যায়, মজুরি করতা হ্যায়, হাম মজুর হ্যায়। লেকিন কৌশিশ মাংতা নেহি। নমস্তে মায়িজী, আপকো বহুৎ দয়া—

আর কোনো দিকে না তাকিয়ে সে সোজা গিয়ে রিক্সার হাতল দুটো ধরলো। তারপর অসাড় গাড়িটাকে তুলে ঘুরিয়ে আবার যথারীতি ঠুং-ঠুং করতে করতে রাস্তার মোড়ে মিলিয়ে গেলো।

আমি খানিকক্ষণ খোলা দরজার সামনে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর ঠাণ্ডা হাওয়ায় সচকিত হয়ে দরজা বন্ধ করলাম, চোখ পড়লো দরজার পাশে রাখা কপি দুটোর উপর। সবুজ পাতায় ঘেরা পূর্ণফোটা শুভ্র নিষ্কলঙ্ক। ঐ রিক্সাওয়ালার অন্তরের মতই।

শুতে যেতে যেতে মনে হলো—আচ্ছা, সত্যিকার 'মানুষ' 'ভদ্রলোক' কে? ঐ নোংরা ছেঁড়া জামাপরা রিক্সাওয়ালা, না ঐ এম, এ পাশ ধোপদুরস্ত ভব্যসভ্য বাবুজি?

শান্তিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

কথাটা শুনে শিউরে উঠলো রিমছি। ফ্যাকাশে চোখ দুটো জিংখা মারাকের মুখের ওপর আলতো করে তুলে অসহায়ের মত অস্ফুট স্বরে বললে, দুজা, দুজা, ও কথা কানে শোনাও পাপ।

দুজা? না? দোগুা! বলিষ্ঠ দুটো চওড়া হাতের থাবায় রিমছির আঁটোসাঁটো দেহটা খামচে ধরে গর্জে উঠলো জিংখা মারাক। না য়া অঙ্গ বাক্সা রিনা নাঙা। যেতেই হবে তোকে। আমি কথা দিয়ে এসেছি। ভারি তো একটা থলথলে দেহ, তার আবার জাত, তার আবার ইজ্জৎ, থুঃ।

ছিটকে পড়তে পড়তেও কোন ক্রমে বাঁশের মাচানের একটা খুঁটি চেপে ধরেছিল রিমছি, তেমনি ভাবেই দাঁড়িয়ে রইলো সে। নড়লো না, উত্তরও দিল না কথার।

মিশ-কালো গেঞ্জিটার নিচে হলুদ-রঙ শক্ত-সমর্থ পুষ্ট দেহটা কাঁপছে, বুকটা দ্রুত ওঠা-নামা করছে ভীত উত্তেজনায়, থরথর নড়ছে কালচে পুরু ঠোঁট দুটো। চোখ দুটি মরা ছাগলের চোখের মত স্থির, নিষ্প্রভ।

রিমছির গোটা দেহটা একবার লেহন করলো জিংখা মারাকের হিংস্র দৃষ্টি। তারপর হ্যাঁচকা একটা টান দিয়ে সে দেহটা আয়ত্তের মধ্যে আনবার চেষ্টা করে চিৎকার করে বললে, উঠে আয়? চেডাং বো? বেইমান।

সে চোখের দিকে চেয়ে আর প্রতিবাদ করবার ভরসা পেলো না রিমছি। আচমকা বাঁশের খুঁটি ছেড়ে হুমড়ি খেয়ে পড়লো তার পায়ের ওপর। অস্ফুট আর্তনাদ করে বললে, নাংগো কেমা বিয়া। আমায় তুমি ক্ষমা কর। নাংগো কেমা বিয়া।

নাংগো কেমা বিয়া? গর্জে উঠলো জিংখা মারাক। ক্ষমা? তোর জন্যে আমি কথার খেলাপ কোরবো? বেইমান হব? দুজা দুজা।

মরা ছাগলের দৃষ্টিতে আর একবার জিংখা মারাকের মুখের ওপর তাকালো রিমছি। এবার আর কথা ফুটলো না তার মুখে।

: নাং—গো কেমা বিয়া। থুঃ। হ্যাঁচকা টানে পা দুটো ছাড়িয়ে নিয়ে মুখটা বিকৃত করলে জিংখা মারাক। টাকা নিয়েছি, জবান দিয়েছি। সে জবান আমায় রাখতেই হবে। প্রস্তুত থাকিস, আমি আসছি।

কথাটা শেষ করেই মাচান থেকে দাওয়া, দাওয়া থেকে খোলা উঠোনে পড়ে টিলা ভেঙে ভেঙে নামতে শুরু করে দিল নিচের দিকে। রাগের তাপে ছোঁক ছোঁক করছে সমস্ত দেহ। দুচোখ জুড়ে আশ্চর্য জ্বালা। ধ্বক ধ্বক করে ঘা পড়ছে পেশীবহুল দেহটায়।

নাংগো কেমা বিয়া। চলতে চলতে দাঁত কিড়মিড় করে গর্জে উঠলো। তাহলে ইজ্জতটা থাকে কোথায়, স্রক সাহেব আর ভালু সাংমার কাছে? কথার খেলাপ হবে না? টাকা নিয়ে বেইমানী করবে সে?

ভালু সাংমা বলেছে, সাহেব খুসী হলে আরো টাকা মিলবে। মুঠো ভরে। গোটা একটা হাতের মুঠোয় যত টাকা আঁটবে, তত টাকা।

খুসী? তা হবে সাহেব। আর কিছু না থাক, রূপ আছে, দেহ আছে রিমছির। দেহের ভাঁজে ভাঁজে টস টস করছে যৌবন। আঁটসাঁট গড়ন। এক চিলতে কালো কাপড় আর মিশকালো একটা গেঞ্জির নীচে ঢাকা থাকে না, এমন যৌবন। আগুনের মত ছড়িয়ে পড়তে চায় যেন। তাই, শুধু খুসী নয়, রক্তের স্বাদ-পাওয়া বাঘের মত ক্ষেপে উঠবে স্রক সাহেব রিমছিকে দেখলে।

আদা আর বুনো কচুর চাষ করে আর দিন চলে না। কাপাসের চাষও তেমন নয়, যাতে বাড়তি দুটো পয়সার আশা থাকে। এক ভরসা ঠিকাদারদের কাছে কুলি খাটা। কিন্তু তাই বা ক'দিনের জন্যে। বাঁচতে হলে আরো টাকা চাই। আগে তবু বুনো জন্তু শিকারে দু-চারটে পয়সা আসতো, মাংস এবং চামড়া বেচে। ইদানীং বন্দুকের আমদানী হওয়াতে, সে পথও প্রায় বন্ধ হয়ে এসেছে।

একটা মাত্র পথ আছে এখন। শুনেছে শহরে পয়সা আছে। আনতে পারলে অনেক পয়সা। কিন্তু সেই সহরে যেতে হলেও তো পয়সা চাই। তার ওপর রয়েছে লোভ। চোখ মেলে দুপাশে তাকালেই নতুন জগত হাতছানি দেয়।

গ্রামের অনেকেই কিছু না কিছু করে সহরে যাচ্ছে। জমি বেচছে, ক্ষেতের ফসল বেচছে। বিনিময়ে এটা-ওটা আনছে ঘরে। বদলে ফেলছে পুরোনো হালচাল, নয়া রুচি দিয়ে।

আগে গ্রামের লোকে মুখ দেখতে জানতো না, লেবেল-আঁটা বোতলের মদের স্বাদ জানতো না। এখন তারা আরসীতে মুখ দেখতে শিখেছে, গারো চু'র বদলে বিলিতি মদ আনছে ঘরে সবার চোখের ওপর।

সহর এবং তার আশে-পাশের গারোরা আরো চালাক হয়েছে। লাল সাহেবদের সঙ্গে থেকে তাদের মত কোট-প্যান্ট পরতে শিখেছে, বাঁশের হুঁকোর বদলে বিড়ি সিগারেট খেতে শিখেছে। জুতো পরতে শিখেছে। এমন কি, গির্জ্জায় গিয়ে ইংরিজী বাজনার সঙ্গে গলা মিলিয়ে বিচিত্র ঢংয়ের গান গাইতেও শিখেছে। এবং তার চেয়েও অবাক হবার মত কথা হোলো, সেই লাল সাহেবরা অবাধে মিশছে গারো মেয়েদের সঙ্গে, একটুও ঘৃণা বা অবজ্ঞা না করে।

তা ছাড়া নিজের চোখে দেখা, মিশনারীদের গির্জ্জায় পাশাপাশি

বসে বুকে যিশু-ক্রশ ঝুলিয়ে একসঙ্গে গান করছে, প্রার্থনা করছে। এ ও কি সম্ভব?

অথচ সম্ভব। স্রফ সাহেব বলেছে, সব হবে। টাকা হলে তারও সব হবে। অতএব টাকা তার চাই। এবং তা যেমন করেই হোক।

স্রফ সাহেব লোকটা ঝানু ব্যবসাদার। গত পনেরো বছর ধরে কন্‌ট্রাক্টরী করছে এ দেশে। বহু দেখেছে, শুনেছে। বলতে গেলে এ সব তার নখদর্পণে। তাই তার কথার দাম আছে বৈ কি? তার ওপর ভালু সাংমা। তার কথাটা ফেলনা নয়। গারোদের মধ্যে তার ভারি নাম-ডাক।

বাচু গিরি এখান থেকে ক্রোশখানেক। সেখান থেকে সরকারী পাকা রাস্তা ধরে বাসে চড়ে মাইল তিরিশেক গেলে সহর। তার স্বপ্নের দেশ।

রঙরাম সহরের ন' মাইল আগে পড়ে। আদা আর কাপাসের মরশুমে বার কয়েকই সেখানে গেছে সে। কিন্তু তার পরের পথটুকু পাড়ি দিয়েছে এই সেদিন।

তুরার হাট শনিবারে। সেই হাটে মংখা সিরার সঙ্গে গিয়েছিল সে।

সেই একটা দিন। সেই একটা দিনের ক'টা ঘণ্টার মধ্যেই যেন চোখের ওপর দুনিয়াটার রঙ বদলে গেছে তার। যত দেখেছে তত বিস্ময় বেড়েছে। যত বিস্ময় বেড়েছে তত নিঃস্ব, অসহায় মনে হয়েছে নিজেকে। যত চোখ মেলে দেখে, তত লোভ, তত আকর্ষণ।

থৈ-থৈ মানুষ-ভরা বাজারটার আশে-পাশে ঝলমলে সব দোকান। তার গহ্বরে অদ্ভুত রঙচঙে সব জিনিষ। এখানে ওখানে রকমারী খানাপিনার দোকান।

সেই সঙ্গে চমকে দেবার মত কলের যন্ত্র। তার মধ্যে একটা যন্ত্র সব চেয়ে বেশী আকর্ষণ করেছে তাকে। অদ্ভুত সেটা! একটা কাঠের বাক্স'র ওপরে কালো কালো কি আপনি ঘোরে, তার ওপরে সাপের মত চকচকে কি একটা নাচে। অমনি শব্দ হয়, গান হয়। আশ্চর্য্য তার সুর। গারোদের নাঙ্গোরে গোসে রঙের মত সুর নয়, বাজনা নয়। শুনতে শুনতে কেমন ঝিমঝিম করছিল মাথাটা, রক্তে যেন চমক লাগছিল বার বার। ইচ্ছে হচ্ছিল পায়ের পাতায় ভর দিয়ে উঠে তাল ফেলে নাচে।

মংখা সিরাকে ফিস-ফিস করে জিজ্ঞেস করে জেনে নিয়েছিল তার নামটা। ওটার নাম গিরমীফোন। হাওয়াই বাতর হয় ওতে!

হাটে পুরুষ আর মেয়েরা বাজার করতে আসে। সে অবশ্য গারোদের চিরাচরিত প্রথা। কিন্তু ওদের কি সাজ, কি হাসির ধমক, অশন বসনের চেনাই যেমন ঝকঝকে তেমনি, রঙচঙে।

তখন এক একবার রিমছিকে মনে পড়েছিল তার। কিন্তু বেশী দূর কল্পনা করতে পারেনি তাকে নিয়ে। নিজেরই কেমন লজ্জা করছিল। রিমছি ও পরিবেশের যোগ্য নয়। বড় জোর হাটের আর দশটা দোকানী মেয়ের মত পিঠে ছেলে বেঁধে বা অমনি, বাজারের আনাচে কানাচে বসে বাঁশের হুঁকো টানতে টানতে তিন-পাথরের উনুনের ওপর মাটির হাঁড়ি চাপিয়ে চাল সেদ্ধ করতে পারবে আর শুঁটকী নাখাম-মাছের তরকারী পেলে গোগ্রাসে গিলতে পারবে।

কথাটা মনে হতেই বিজাতীয় একটা ঘৃণার ঢেউ দেহের নীচু থেকে ওপর পর্য্যন্ত ছুঁয়ে ছুঁয়ে গেল অনুভূতির প্রতিটি রন্ধ্র পথ।

থমকে পথের ওপর দাঁড়িয়ে অকথ্য ভাষায় রিমছির উদ্দেশ্যে একটা গাল দিয়ে আবার নামতে লাগলো জিংখা মারাক।

এখান থেকে আর ক'টা টিলা ডিঙোলেই বাঁ দিকে বাচু গিরির গেট, ডান দিকে একটা টিলার মাথায় সাহেব কুঠি। সহরের লোকেরা বলে ডাক বাঙলো। বড় বড় সব লোকেরা এলে নাকি ওখানেই থাকে। এর আগেও অবশ্য মাঝে মাঝে দেখেছে ওখানে হাওয়াই গাড়ী চড়ে লাল সাহেবরা এসেছে। তার সঙ্গে এসেছে ঝকঝকে লাল লাল মেয়ে। আহা, কি তাদের রূপ, কি তাদের জৌলুস!

এসেছে বুকে ক্রশ ঝোলানো, ঝোলা ঝোলা বিংখাব পরা পাদ্রি সাহেবও। দূর থেকে তাদের দেখেছে। দেখেছে আর পলক ফেলতে ভুলে গেছে অনেকক্ষণের জন্যে। কিন্তু কাছে যাবার ভরসা হয়নি কোন দিন।

এবারই কি হোত? ভালু সাংমার দৌলতে, স্রফ সাহেবের সঙ্গে মুখোমুখি না হলে ও রাজ্য চিরদিনই রহস্যে ডুবে থাকতো তার কাছে।

রিমছিকে নিয়ে বাচু গিরির হাট থেকে ফিরবার পথে ভালু সাংমার সঙ্গে দেখা। পাশে ছিল স্রফ সাহেব। চোখে কালো চশমা, পরনে লাল সাহেবদের মত প্যান্ট-কোট, হাতে একটা গাদা বন্দুক।

সেই তার বুঝি নজর পড়েছিল, তাই ভালু সাংমাকে দিয়ে ডাকিয়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করলো গ্রামের কথা, ঘরের কথা, অবস্থার কথা, সব শেষে রিমছির কথা।

সেই প্রথম। বুকটা অস্বাভাবিক ঢিপ-ঢিপ করছিল, চোখ উঠছিল না ওপর দিকে। কিন্তু ভরসা করে যখন তাকালো মুখের দিকে, ব্রফ সাহেবের মিষ্টি হাসিতে সব দুর্বলতা কেটে গেল।

বাইরে বেরুতে ভালুই কথাটা পাড়লে। সাহেব কাজের মানুষ। দেখা-শুনা করবার কেউ নেই, এমন একটা লোক নেই সঙ্গে যে সেবা শুশ্রূষা করবে। অবশ্য শুধু রাতটুকুর জন্যেই। সাতটা দিনের সাতটা অন্ধকার রাত মাত্র খরচ করতে হবে সাহেবের জন্যে। সারাটা দিন ভর, ঘরের সেঙাত ঘরেই থাকবে। অথচ তার জন্যে পুরো টাকাই পাবে। এবং সে টাকা মুঠো ভরেই।

খুব গররাজী হবার মত কাজ নয়। তাই সহজেই রাজী হয়েছে সে। মাত্র সাতটা রাত। তারপরই তার ঘরের সেঙাই ঘরে থাকবে। অথচ বিনিময়ে একমুঠো কড়কড়ে টাকা! ভাবতেও কেমন রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে সমস্ত দেহ।

কোমড়ের ফাঁসে হাত ঢুকিয়ে আর একবার চকচকে নোট ক'খানা স্পর্শ করলো জিংখো মারাক। নগদ পাঁচটা টাকা নিশ্চিন্তে জড়িয়ে রয়েছে তার নোংরা কাপড়ের ভাঁজে ভাঁজে। আসবার সময় এক রকম জোর করেই হাতে গুঁজে দিয়েছিল ভালু সাংমা।

তাছাড়া সাহেব বলেছে, এর পরে সহরে যাবার সুবিধে করে দেবে। গ্রামের অন্ধকারে আর চোখ বুজে পড়ে থাকতে হবে না তাকে। সহরে কাজ আছে, কাজের উপযুক্ত মূল্য আছে।

তারও পর আছে মিশনারী সাহেবরা। শুধু নামটা খাতায় তুলে দিলে সময়ে অসময়ে তারাই দেখবে। দরকার হলে খাদ্য দেবে, দাওয়াই দেবে। চাই কি অক্ষর জ্ঞানটাও ঢুকিয়ে দেবে মগজে। জাতে তুলে নেবে তাদের।

তা' হলে আর চাই কি। সহর আর তার আশ্চর্য্য মোহের স্বাদ নিতে আর কত দেরী হবে তার?

এক বাধা শ্বশুর, বুড়ো শয়তানটা। ওটাই পথ আটকাবে, বেইমানী করবে। সহরের ওপর, লাল সাহেবদের ওপর তার ভয়ানক আক্রোশ। রিমছির মা'কে নাকি ঐ সহর আর সাহেবরাই তুকতাক করে বের করে নিয়ে গেছে, রিমছির জন্মের দু'বছরের মাথায়। তাই বুড়ো শয়তানটা ক্ষেপে ওঠে ওদের কথা শুনলে। প্রতিবাদ করতেও সাহস হয়না। ঐ শয়তানটার মেয়েকে বিয়ে করেই সে ওর ঘরে এসেছে।

সনসারী ধর্ম্মের নিয়মই তাই। নারী স্বাধীন জাত। মেয়েরা বিয়ের পর ছেলের ঘর করবে না, ছেলেকেই এসে বাস করতে হবে মেয়ের বাপের ঘরে, ছেলে যদি না থাকে। আদপে, সম্পত্তির মালিক মেয়েরাই।

হাঃ। আপন মনেই একটা কটূক্তি করে ক্ষেদ জানাল জিংখো মারাক। নিয়মটা যদি ঠিক উল্টো হোতো? যদি তারই মুঠোয় এসে পড়তো মেয়েটা। তা'হলে—তা'হলে কি আর বিনয় করে ইচ্ছাটা প্রকাশ করতে হোতো, সামান্য একটা বর্বর মেয়ের কাছে? সাঁড়াশীর মত দুটো শক্ত মুঠোয় চেপে, নিয়ে তুলতো রিমছিকে সাহেবের ডাক বাঙলোয়।

কিন্তু, তাই করতে হবে। যেমন করেই হোক, কথা তাকে রক্ষা করতেই হবে। নইলে সাহেবের কাছে, ভালু সাংমার কাছে বেইমান হতে হবে, মিথ্যে হয়ে যাবে তার সহরের স্বপ্ন।

সারাটা বিকেল ছটফট করে কাটালো জিংখো মারাক। কিছুতেই সুস্থির হতে পারছে না। আজ যেন বিস্বাদ হয়ে গেছে সব কিছু। এই পাহাড়, এই বন-জংগল, ঝর্ণার কলতান, এই গ্রাম, যেন কেমন অসহ্য ঠেকছে আজ চোখে। সেই পুরোনো সব। চোখ খুলে যা দেখেছে, আজও তাই। এর চেয়ে সহর কত উজ্জ্বল, কত মধুর। সেখানে প্রাণ আছে, সুখের জিয়ন কাঠি রয়েছে। চোখের পাতা বুজে এলেই যেন মনে হয়, সহর তাকে ডাকছে হাতছানি দিয়ে। সে জীবন আর এই জীবন? থুঃ! যেন এক ঢোঁক পচা বমি উঠে এলো তার কণ্ঠনালী বেয়ে, তেমনি করে থুক ফেললে জিংখো মারাক।

দূর থেকে একটা গোঁ গো আওয়াজ আসছিল। কান পাততেই মনে পড়ে গেল কথাটা। ঠিক ঐ সময়ই সেই চকচকে বাঘ-ছাপ গাড়ীটা যায় সহরে।

আজ ক'দিন ধরেই এই এক নেশা হয়েছে তার। ও গাড়ীটার আওয়াজ পেলেই তীরের ছিলার মত ছিটকে পথে পড়ে ছুটে যায় সরকারী রাস্তায়। গাছের আড়ালে, পাহাড়ের খাঁজে লুকিয়ে থেকে দেখে সে গাড়ীর লোকগুলিকে। দেখে আর মোচড় দিয়ে ওঠে বুকটা। কত সুখী ওরা, ঐ যারা হাওয়া গাড়ীতে চড়ে সহরে যাচ্ছে। তার মনও ছুটে যায় তার পিছু পিছু।

কিন্তু আজ আর সরকারী রাস্তা পর্যন্ত যাওয়া হোলো না। সূর্যের দিকে চোখ তুলতেই বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠলো। এর পরে হলে দেরী হয়ে যায়। অন্ধকার নেমে আসবে, দুর্গম হয়ে আসবে ডাক বাঙলোর পথ। ওখানকার অন্ধকারকে বিশ্বাস নেই। সুযোগ পেলেই সে জীব-জন্তুর রূপ ধরে, অশরীরী ছায়া হয়ে এসে হামলা করে।

তা ছাড়া বুড়ো শয়তানটাকে গিয়ে বশ করতে হবে অঢেল চু খাইয়ে। ঐ এক গুণ বুড়োর। মাত্রার ওপর উঠলে আর মনের মধ্যে বিষাক্ত পশুটা বাস করে না। নইলে যা চণ্ডাল স্বভাব, রিমছিকে জোর করে টেনে আনা দূরে থাক, উল্টে হয়তো তারই শিরটা টেনে রেখে দেবে ধারালো অস্ত্র দিয়ে।

ফিরে দাঁড়িয়ে দ্রুত পা চালিয়ে দিল জিংখো মারাক বাড়ীর দিকে। এখান থেকে বাড়ী যতটা পথ, তার দ্বিগুণ হবে ডাক বাঙলোর রাস্তা। তাও শুধু হাতে হলে হোতো। কিন্তু ওটা, ঐ বর্বর শয়তানের বাচ্চাটা কি সহজে যেতে চাইবে?

কিন্তু ঘরে এসেই অবাক হয়ে গেল। দাওয়ার নীচে হাঁটু মুড়ে বসে দু'টো মোর্গাকে নিয়ে লড়াই শেখাচ্ছে রিমছি। আঁটসাট করে পেছন দিকে টেনে চুল বাঁধা, মুখখানা চকচক করছে তেরীর তেলে, গোটা দেহটা অনেক পরিষ্কার আগের চেয়ে। সযত্ন পরিপাটির ছাপ তাতে স্পষ্ট।

বুড়োটা ধারে কাছে কোথাও নেই। শীত প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। জুম-এর সময় হয়ে এলো বলে। এখন থেকেই আগুন দিয়ে জংগল সাফ করতে হয় চাষের জন্যে। ভাবলো, বুড়ো বোধহয় সেই কাজেই গেছে।

অকারণেই খুসী হয়ে উঠলো তার মন মেজাজ। এদিক ওদিক

...ওঁকে অবজ্ঞা করবেন না

সাধারণ একজন গৃহকর্ত্রী... কিন্তু ওঁর ইচ্ছে অনিচ্ছের মূল্য আমাদের কাছে অনেক। ওঁর কি প্রয়োজন শুধু এইটুকু জানার জন্যেই আমরা সারা দেশে মার্কেট রিসার্চের কাজ পরিচালনা করি। সেইজন্যেই হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী জিনিষ-পত্রের মান নির্ণয় করছেন গৃহকর্ত্রীরাই। এই জিনিষগুলির গুণাগুণের যাতে কোন তারতম্য না ঘটে সেইজন্যে উৎপাদনের বিভিন্ন স্তরে নানাধরনের পরীক্ষা চালানো হয়। তাই আমরা আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী ভাল জিনিষপত্র সরবরাহ করতে সক্ষম।

দশের সেবায় হিন্দুস্থান লিভার

HLL. 15-X52 BG

দেখে নিয়ে শিস দিয়ে হাত নেড়ে ডাকলে রিমছিকে। হেসে বললে, এই ইয়ানোনো রিবাবো ? . এদিকে শোন ?

প্রথমটা উঠলো না, শুধু তীর্যক দৃষ্টিতে একবার তার দিকে চেয়ে ঠোঁট চেপে হাসলে। তারপর সোজা দেহটা ঠেলে তুলে অত্যন্ত সহজ পদক্ষেপে এসে দাঁড়ালো সামনে রিমছি।

সেই চটুল পা ফেলে আসা, কামমোহিতার দৃষ্টিতে আড়ে আড়ে চেয়ে দেখা, কাঁপা লাল ঠোঁটের ভাঁজে ভাঁজে ফুটে-ওঠা এক গুচ্ছ অনুরাগের ছোঁয়া, ফুলে ফুলে ওঠা নিটোল বক্ষদেশ জিংখা মারাকের মনে অকস্মাৎ কামনার ঝড় তুললো। এ যেন প্রতি মুহূর্তে দেখা, স্বাদ নে'য়া রিমছি নয়। নতুন লাগছে, আশ্চর্য লোভনীয় লাগছে আজকের রিমছিকে।

: কনাবো ? শোন ? আচমকা হ্যাঁচকা এক টানে প্রথমে বুকের কাছে, পরে প্রায় দেহের ওপর চেপে তুলে এনে দাঁড়ালো ধানের মরাইর ওপাশে, একেবারে শিশু গাছটার নীচে রিমছির গোটা দেহটা জিংখা মারাক। কানের কাছে মুখ নিয়ে পরিশ্রান্ত স্বরে বললে, না য়া মাই কো নাংগো ? সহের যাবি, আঁই ?

চোখ দু'টি বুঝি এক পলক নাচলো রিমছির জিংখা মারাকের কামাতুর মুখের ওপর চেয়ে, নাকটা তুলে কিসের যেন স্বাদ নিলে একবার শব্দ করে। তারপর চোখ নামিয়ে বললে, উঁই। রেয়াং বো। হ্যাঁ, যাবো।

খুসী আর লোভে চকচক করে উঠলো জিংখা মারাকের দু'চোখ শ্বাপদের দৃষ্টির মত। দু'হাতের মুঠোর মধ্যে রিমছির দেহটা সজোরে চেপে বললে, উঁই ?

: উঁই। মুখ তুললে না, মাটির ওপর আঙুলের আঁক কষতে কষতে অস্ফুটে উত্তর দিলে রিমছি।

টান টান করে সেই নতদৃষ্টি মুখখানা দেখলে আর হাসলে জিংখা মারাক। রসালো দৃষ্টিতে লেহন করলো রিমছির গোটা যৌবনপুষ্ট দেহখানা বার কয়েক। তারপর বাঁ হাতে চিবুক স্পর্শ করে বললে, চু খাবি ?

কিন্তু কথাটা বলেই আচমকা সিদে হয়ে দাঁড়ালো সে। বুড়ো ? সেই বুড়ো শয়তানটা যদি এসে পড়ে এরই 'মধ্যে ? পা বাড়াতে গিয়েও থমকে দাঁড়ালো সে। ঝুঁকে মুখের কাছে মুখ নিয়ে প্রশ্ন করলে, বুড়োটা কোথায় ?

দাঁতে-চাপা ঠোঁটটা একটু ফাঁক হোলো রিমছির, ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়ালো জিংখা মারাকের। অস্ফুটে বললে, ঘরে নেই। শিকারে গেছে।

: উঁই ? হ্যাঁ ?

: উঁই। খিল খিল করে হেসে এবার ঢলে পড়লো রিমছি ওর গায়ের ওপর।

: খুব ক'রে মদ খাইয়েছিস বুঝি ওকে ?

: উঁই।

হা হা করে আচমকা হেসে উঠলো জিংখা মারাক। এতক্ষণে সে নিশ্চিত। মদ গিলে এই অবেলায় শিকারে গেছে বুড়ো। অর্থাৎ আজ রাত্রে আর ফিরবে না। সারা রাত বুনো শূয়ার আর হরিণের পিছু পিছু ছুটে বেড়াবে বনের মধ্যে।

রিমছির বুকে একটা ধাক্কা দিয়ে বললে, হয়া নামবিয়া। সাব্ বাস্।

: পরমুহূর্তে হাতটা শক্ত করে চেপে ধরে বললে, চল, ঘরে যাই। খুব কষে মদ খাবো এখন দু'জনে। মদ খাবো আর নাচবো, নাচবো আর—কথাটা শেষ করলে না জিংখা মারাক, মুখে এক বিচিত্র স্বাদ নেবার শব্দ করে চোখ ছোট করে টিপে টিপে হাসলে।

কিন্তু খটকা লাগলো ডাকবাঙলো থেকে ফিরে আসবার পর। বুড়ো আপদটা না হয় নেশার ঝোঁকে সহজ করে দিয়েছে তার জিদ, কিন্তু রিমছি ? কি করে বদলে গেল মেয়েটার মন সামান্য সময়ের ব্যবধানে ? যার মন এই দুপুরবেলা পর্যন্ত টলানো যায়নি, গোটা একটা সহর হাতের মুঠোয় এনে দেবার প্রতিশ্রুতিতেও, সে 'কি করে হঠাৎ আপনা থেকেই রাজী হয়ে গেল ?

লোভ ? তা' অবশ্য বিচিত্র নয়। সরল মনে একবার মোহের ক্রিয়া শুরু হলে, মত বদলাতে বেশীক্ষণ লাগে না।

হেসে ফেললে এবার জিংখা মারাক। এই মেয়েদের মন! আকর্ষণের বেলাই যত ছল, কিন্তু একবার আয়ত্তের মধ্যে এনে ফেলতে পারলে আর সহজে ফিরতে চায় না।

ঘরে ফিরে এক দফা মদ গিলে শুয়েছিল, উঠে আবো খানিকটা চু গলায় ঢেলে, চাঁচের বেড়ার গোঁজ থেকে বাঁশের চোঙটা পেড়ে টেনে বের করলে করকরে নোটগুলি। উল্টে-পাল্টে দেখলে বারকয়েক, নাকের কাছে নিয়ে টেনে টেনে সুবাস নিলে একবার, তারপর রেখে দিয়ে এসে শুয়ে পড়লো।

আমেজে দু'চোখের পাতা ভারি হয়ে আসছে ক্রমশঃ। আর সেই ভারি চোখের পাতায় ফুটি-ফুটি করছে গোটা সহরটা। কল্পনারও আশ্চর্য স্বাদ আছে। অদ্ভুত ভাল লাগছে তাই চোখ বুঁজে থাকতে।

স্বপ্ন দেখছে জিংখা মারাক। সহরে চলে গেছে সে! কাজ পেয়েছে সেখানে, মুঠো ভরে টাকা আসছে হাতে তার বিনিময়ে।

টান টান করে হাত-পা ছড়িয়ে দিল সে। কল্পনা করেও সুখ। সহর। সেই সহরে এবার সে যেতে পারবে। রিমছি তাকে হাত ধরে নিয়ে পৌঁছে দেবে সহরে!

হঠাৎ রিমছিকে মনে পড়ে গেল। এখন কোথায় সে ? এখনও কি সে ডানা গোটানো ভীরু পাখীর মত অন্ধকার দাওয়ায় বসে আছে ভয়ে কুঁকড়ে, ভানু শর্মার তীক্ষ্ণ দৃষ্টির নজরবন্দী হয়ে ? না কি ফ্রফ সাহেবের ঘরে।

ফিরে আসবার সময় একবার ভাল করে লোকটাকে দেখে এসেছে সে। বাঘের মত থাবা পেতে বসেছিল লোকটা ঘরের অস্পষ্ট আলোয়। গায়ে একটা ভারি কোট। পাশে পড়েছিল গাদা বন্দুকটা। শুধু সমর্থ নয়, পেশীর ভাঁজে ভাঁজে লোকটার আশ্চর্য রক্তের তেজ। চ্যাপটা মুখের প্রতিটি সর্পিল রেখায় আদিম কাঠিন্য। দু'চোখে ঝকমক্ করছে তীব্র নেশার ঝাঁজ।

দাওয়া দিয়ে যাবার মুখে চোখাচোখি হয়েছিল একবার। আচমকা একটা লাফ দিয়ে উঠে বসে গর্জে উঠেছিল, কে ?

কিন্তু পরক্ষণেই সামলে নিয়েছিল সে ভাবটা। গলার স্বর অনেকটা সহজ করে হাত নেড়ে ডেকে বলেছিল, ও রিবাবো, রিবাবো। এসো এসো।

আর তখন, তার মনে হয়েছিল যেন, গোটা সহরটাই হাতছানি দিয়ে ডাক দিল তাকে।

রিমছির সঙ্গে তাকেও মনে পড়লো। কি করছে এখন লোকটা? চন করে মেজাজটা ঝাঁঝিয়ে উঠলো জিংখা মারাকের। মুহূর্ত্তের জন্যে ঝাপসা হয়ে এলো দু'চোখের দৃষ্টি। বোধ হয় নেশাটা চাপছে ক্রমশঃ।

দুমড়ে দুমড়ে নিজের দেহটা নিয়ে বার কয়েক এপাশ ওপাশ করলে। শিরায় শিরায় যেন কিসের একটা জ্বালা। তিল তিল করে যেন কামনার ইন্ধন জোগাচ্ছে দেহের কোন পাশব রিপুটা। আঃ এই সময় যদি রিমছি পাশে থাকতো! ভাবলে জিংখা মারাক। জ্বালাটার নিবৃত্তি হোতো তবে। বিয়ের পর থেকে আজ পর্যন্ত একটা দিনও ওকে বাদ দিয়ে রাত-বাসর কাটেনি। সমবয়সীরা তাই নিয়ে কত রসের কথা বলেছে। গ্রাহ্য করেনি সে। কিন্তু আজ হোলো। সেই আশ্চর্য মিথ্যে স্বপ্নটাও আজ সত্য হোলো, মাত্র এক মুঠো টাকার লোভে।

হোক। তবু ভাল লাগছে, ভাবতে। বিনিময়ে সে মাত্র আর ক'টা দিন পরেই সহরকে হাতের মুঠোর মধ্যে পাবে। এই একমুঠো টাকার মতই অক্লেশে।

শীতের জড়তা একটু একটু করে বাড়ছে। পাতলা তেল চিটচিটে একখণ্ড নোংরা কাপড়ে গোটা দেহটা ঢেকেও স্বস্তি হচ্ছে না। ক্রমশঃ যেন কুঁকড়ে আসছে সমস্ত দেহ।

একটু আগুন পেলে ভাল হোতো। হাত-পা সেঁকে তাজা করে যেতো শরীরটাকে।

এতদিন রিমছি পাশে ছিল, তাই শীতের এই তীব্রতা অনুভব করতে পারেনি। একটা নরম তুলতুলে দেহ আর তার উষ্ণ সান্নিধ্য শীতের হাত থেকে বাঁচিয়ে রেখেছিল তাকে। দেহ তো নয়, ভাবলে জিংখা মারাক যেন একতাল কাদা মাটির সজীব একটা পুতুল। খেয়াল খুসী মত তাকে নিয়ে ভাঙা গড়া খেলা, ঘন আয়ত্বের মধ্যে লুপ্ত করে দেয়া, আজ যেন তার স্বাদ বুঝলে, গুরুত্ব বুঝলে।

আর সেই চিন্তাই একসময় চঞ্চল করে তুললো তাকে। না: অসম্ভব। রিমছি পাশে না থাকলে আজ আর ঘুম আসবে না চোখের পাতায়, শীতের হাত থেকে রক্ষা করা যাবে না দেহটাকে। সেই উষ্ণ পরশ, ভীরু আত্মসমর্পণ, সেই দু'টো বাহুর আড়ালে লুপ্ত হয়ে যাওয়া ক্ষুদ্র একটা দেহসর্বস্ব পাখীর মত ভীরু প্রাণ, এ ছাড়া তার কাছে গোটা রাতটাই দুর্বিষহ।

এখানে সে শীতে কষ্ট পাচ্ছে! অথচ ডাক বাঙলোর ঘরে? এতক্ষণে সমস্ত বাড়ীর আলোগুলি নিভে গেছে। আর সেই ঢেউ ঢেউ অন্ধকারে সাঁতার কাটছে হয়তো রিমছির স্বপ্ন মন। আর তার ভীরু শ্লথ দেহটার ঘন সীমানায় থেকে শীত কাটাচ্ছে ব্রফ সাহেব।

তেঁতো এক ঝলক বমি মদের স্বাদ নিয়ে ছলাকে উঠে এলো কণ্ঠনালী বেয়ে। বিকৃত একটা স্বর তুলে ছিটিয়ে দিলে থুথুটা ঘরের মধ্যেই। অস্ফুটে গাল পাড়লে ব্রফ সাহেবের উদ্দেশে। পরক্ষণে তীরের ছিলার মত ছিটকে বিছানায় উঠে বসলো জিংখা মারাক। লাফিয়ে নেমে পড়লে মাচান থেকে। অসহ্য। এ বিছানায় এখন নিঃস্ব হয়ে রাত কাটানো তার পক্ষে অসম্ভব। সাতটা রাত থাক, একটা রাতও বাজে খরচ করতে পারবে না সে। তার জন্যে যদি ভালু সাংমার কাছে, ব্রফ· সাহেবের কাছে বেইমান হতে হয়, তাতেও পেছপাও নয় সে।

এলোমেলো পা ফেলে আন্দাজে চাঁচের বেড়ার কাছে এগিয়ে, বাঁশের চোঙটা পেড়ে খামচে টাকাগুলি বের করে কোমরে গুঁজে নিয়ে গায়ের জোরে একটা লাথি মেরে দরজাটা খুলে এসে দাঁড়াল দাওয়ায়। সেখান থেকে উঠোনে।

থরথর করে কাঁপছে উত্তেজনায়। সমস্ত দেহ বেড় দিয়ে ক্রমশ উর্দ্ধগামী হচ্ছে একরাশ তীব্র বিষের জ্বালা, দ্রুত হচ্ছে শিরা-উপশিরার রক্তস্রোত। কিন্তু পা বাড়াতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালো মুহূর্ত্তের জন্যে। স্থির হয়ে গেল দৃষ্টি সামনের দিকে তাকাতে গিয়ে। দূরে রংচুগিরি গেটের ক'হাত দূরের পাহাড়ের চূড়ায়, ডাক বাঙলোর দেয়ালে দেয়ালে, ঝিকমিক জোনাকী আলোর ছোঁয়া দেখা যাচ্ছে। যেন একটা খসে-পড়া তারা সাপের মণির মত চকচক করে জ্বলছে টিলাটার মাথায়। আর তারই গহ্বরে, কোন এক বন্ধ ঘরের বিস্রস্ত সজ্জায় ক্রমশ ক্ষয়ে নিষ্প্রভ হয়ে আসছে আর একটা ঝকমকে তারা, একখণ্ড খাঁটি সোনা। লোমশ দু'টো বাহুর নির্মম পেষণে।

কথাটা মনে হতেই শিকারী জন্তুর মত চক চক করে উঠলো জিংখা মারাকের চোখের তারা দু'টো।

: শালা বেইমান। থুঃ। সশব্দে খানিকটা থুথু ছিটিয়ে ভালু সাংমার উদ্দেশ্যে চাপা গর্জ্জন করে উঠলো সে। টাকা? থুঃ! থুঃ। রিমছি পাশে থাকলে, রাত্রের নিশ্চিন্ত সজ্জায় তাকে কাছে পেলে, অমন অনেক টাকা রোজগারের বল পাবে সে বুকে।

শক্ত মুঠোয় কোমরের টাকাগুলোয় একবার চাপ দিল জিংখা মারাক। মনে মনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হোলো। ভালু শাংমার সঙ্গে মুখোমুখি হলে মুঠোভরা টাকাগুলি নির্মম হাতে তার মুখের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে বলবে, বেইমান জিংখা মারাক নয়, বেইমান তুই। জাতের কাছে। ধর্মের কাছে তুই বেইমান। জিংখা মারাক একটা মোহে পড়ে ভুল করতে পারে, কিন্তু জাত নিয়ে বেইমানী করে না। তার ধর্ম আছে, ইজ্জৎ আছে। থুঃ!

তারপর বলিষ্ঠ দু'টো বাহুতে তুলে, ছিনিয়ে নিয়ে আসবে রিমছির ছোট্ট দেহটা ব্রফ সাহেবের গ্রাস থেকে। বুক টান করে একবার শ্বাস নিলে সে। তারপর চোখ নামিয়ে উৎরাই ভেঙে নামতে লাগলো লাফিয়ে লাফিয়ে। শুধু সেই নীচু চোখের তারায় বার বার ঝিকমিক আলোর মত চকচক করতে লাগলো এক-ঝাঁক জোনাক-ছায়া।

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

ডক্টর এক্স
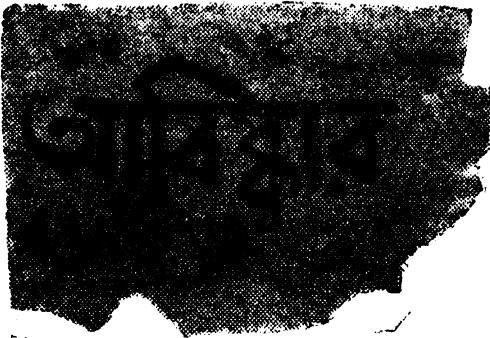
যেদিন হতে কমলের মনে যক্ষ্মা রোগের সংক্রমণের ভয় হয়েছে সেদিন হতে কমল নিয়মিত পালস আর টেমপারেচার নিয়ে রেকর্ড করেছে। আজও সকালে, টেমপারেচার নেবার জন্য থার্মোমিটার হাতে করতে কমল শুনল মিসেস সেন দরজার কাছে দাঁড়িয়ে তাকে বলছেন, কমল, প্যারিস থেকে সমরের নামে একটা চিঠি এসেছে।

—প্যারিস থেকে চিঠি? সমরের নামে? কি বলছ তুমি? বলতে বলতে ঘুরে দাঁড়াতে গিয়ে, উত্তেজনায় কমলের হাত হতে থার্মোমিটারটা পড়ে ভেঙ্গে গেল।

—এই দেখ না। বলে মিসেস সেন চিঠিটা তাকে দিলেন।

—খামটা হাতে নিয়ে তার উপরের বাঁদিকের কোণে ছাপা প্রেরকের নামটা পড়ে কমল বুঝতে পারল, কার কাছ হতে চিঠিটা এসেছে, আর কেনই বা এসেছে।

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে কমল এই চিঠি আসবার পুরো ইতিহাসটা ভাবতে লাগল।

যেদিন কমল কাউন্সিল অফ সায়েন্টিফিক রিসার্চ হতে সমরের সম্বন্ধে চিঠি পেয়েছিল সেই দিনই সে প্যারিসে প্রফেসর গার্ডিনিকে, সমরের নাম একটা চিঠি লিখেছিল।

সমরের রিসার্চের একটা কপিও সে ঐ সঙ্গে পাঠিয়ে দিয়েছিল। সেদিন কমল ভেবেছিল যদি এ চিঠির জবাব আসে, যদি প্রফেসর গার্ডিনি সমরের সম্বন্ধে কোন ভাল কথা বলেন, তাহলে সে কাউন্সিল অফ সায়েন্টিফিক রিসার্চকে দেখিয়ে দেবে সমরকে অবহেলা করে কত বড় মূর্খতা তারা করেছে। সেই চিঠিরই জবাব আজ এসেছে। প্রফেসর গার্ডিনি লিখেছেন :

প্রিয় মিঃ সেন, আপনার রিসার্চ পড়িয়া আমার মনে হইতেছে, থিয়োরিটিকাল ফিজিক্স-এ রিসার্চ করিবার আপনিই উপযুক্ত লোক। সুযোগ পাইলে আপনি অনেক বড় কাজ করিতে পারিবেন। সেই সুযোগ আমি আপনাকে দিতে চাই। আপনি ইচ্ছা করিলে আমার ল্যাবরেটরীতে কাজ করিতে পারেন। আপনার মত আরও কয়েকটি উৎসাহী যুবক কেমিষ্ট্রি ও ফিজিক্স-এ এখানে রিসার্চ করেন।

আপনি যদি ভারত গভর্ণমেন্টের নিকট হইতে স্কলারশিপ লইয়া এখানে আসিতে পারেন তাহা হইলে আমি সানন্দে আপনাকে এখানে অভ্যর্থনা করিব।

চিঠিটা হাতে করে কমল নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। অন্তত একজনও যে সমরের যথার্থ মূল্য বুঝতে পেরেছে এই ভেবে আনন্দে, হর্ষে তার হৃদয় ভরে উঠল।

বহুক্ষণ পরে এ উত্তেজনার প্রথম সংঘাত কেটে গেলে কমল দেখল, তার যে ক্ষুব্ধ মন কাউন্সিল অফ সায়েন্টিফিক রিসার্চের অবিবেচনায় ব্যথিত হয়ে তাকে এই চিঠি লেখার জন্য প্ররোচিত করেছিল আজ সেই মনের যেন নবজন্ম হয়েছে। বহুদূর ভবিষ্যত সে যেন আজ কমলের সামনে এনে দেখিয়ে দিচ্ছে।

সে ভবিষ্যতে কাউন্সিল অফ সায়েন্টিফিক রিসার্চের কোনই স্থান নেই।

এ চিঠি কাউন্সিল অফ সায়েন্টিফিক রিসার্চকে পাঠালে স্কলারশিপ তো তাঁরা দেবেনই না উপরন্তু এর দায়িত্ব এড়িয়ে যাবার জন্য নানা অজুহাত সৃষ্টি করতে তাঁদের একটুও সময় লাগবে না। নোবেল প্রাইজ পাওয়া একজন বৈজ্ঞানিকের মতামতের কোন মূল্যই যে তাঁরা দেবেন না, এ যেন আজ সে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। তাই এই চিঠির মধ্য দিয়ে স্কলারশিপের চেষ্টা করবার কথা চিন্তা করতেও আজ কমলের মন ঘৃণায় জর্জ্জর হয়ে উঠছে।

কিন্তু স্কলারশিপ কিংবা কিছু টাকা না পেলে কি হবে?

ভাঙ্গা থার্মোমিটারের পারা ছোট ছোট রূপার বলের মত ধূলার উপর এদিক ওদিক ছড়িয়ে গেছে, সেদিকে তাকিয়ে কমলের মনে একই প্রশ্ন উঠতে লাগল—কি হবে? সমরের কি হবে?

এই থার্মোমিটার দিয়ে আজ চার মাস কমল প্রত্যহ টেম্পারেচার নিয়েছে। প্রতিদিন কমল টেম্পারেচার নর্ম্মাল হতে দেখেছে আর ভেবেছে, আরও একদিন তাহলে সে সুস্থ হয়ে বাঁচতে পারবে—যক্ষ্মা বোধহয় আর তার হবে না।

দীর্ঘ দিন এইভাবে যে মৃত্যুর সঙ্গে কমল যুদ্ধ করেছে আজ সমরের জন্য তাকেও নিজের দেহে আহ্বান করে নিতে হয়ত তার বাধবে না।

আজ যদি তার শরীরে যক্ষ্মারোগের লক্ষণ দেখা দেয়। তাহলে হয়ত নিজের মৃত্যুমূল্যে, গবেষণার জন্য আপনার শরীর বিক্রয় করে স্বাধীন ভারতের কাছে কমল, সমরের উপকার চেয়ে নিতে পারবে।

যেদিন কমল, সমরের মর্ম্মান্তিক দুঃখের কথা প্রথম জানতে পেরেছিল—দশ বছর আগের সেই দিন হতে আজ পর্য্যন্ত, সমরকে দেবার জন্য সে নিজের জীবন ছাড়া আর কিছুই সঞ্চয় করতে পারল না। তাই সমরের চরম প্রয়োজনের দিনে, অনেকবারের মত আজও নিজের দেহের মূল্যের কথাই, বোধহয় কমলের মনে পড়ল।

এদিক দিয়ে সমরের উপকার করতে পারলে সে ধন্য হয়ে যেত।

কিন্তু এই চিন্তাকে আশ্রয় করে সমরের উপকারের চেষ্টা করলে এখন তার চলবে না। যদি প্রয়োজন হয় মৃত্যুমূল্যের অধিক মূল্য দিয়েও সমরের কল্যাণ তাকে ক্রয় করতে হবে।

সমরের কল্যাণ কামনায়, সমরেরই কাজে একদিন কমলকে দরজা ভেঙ্গে চোরের মত সমরের ঘরে ঢুকতে হয়েছিল।

আজ তার চেয়েও বড় প্রয়োজনের দিনে কমল কি করবে?

চুরি? ডাকাতি? নরহত্যা?

আজও কি অর্থ উপার্জ্জনের জন্য কোন ঘৃণিত পন্থা অবলম্বন করলে তার অপরাধ হবে?

নীচতা, অন্যায়, অধর্ম্ম, এসব বিবেচনা করে কাজ করবার প্রয়োজন কি এখনও তার জীবনে আছে? অস্থির হয়ে ঘরের এক

প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত কমল ঘুরে বেড়াতে আরম্ভ করল।

থার্মোমিটারের ভাঙ্গা কাঁচে পা কেটে রক্ত পড়তে লাগল তবু তার চলা বন্ধ হল না।

একদিন সে সমরের জন্য রক্ফেলার ইনসটিটিউটে আপনাকে বিক্রয় করতে গিয়েছিল, আজও কি সে নিজেকে বিক্রয় করে সমরের জন্য অর্থ সংগ্রহ করতে পারে না?

কিন্তু কি করে সে আপনাকে বিক্রয় করবে? কে তাকে গ্রহণ করবে? এই সভ্যজগতে নিজেকে বিক্রয় করবার তার কি ন্যায়সঙ্গত পথ আছে?

ভাবতে ভাবতে কমলের বিক্ষুব্ধ মনে বিদ্যুচ্চমকের মত একটা কথা উদয় হল। ন্যায়সঙ্গত ভাবে বিক্রীত হবার একটিই পথ তার খোলা আছে।

সে পথ—বিবাহের পথ!

বিবাহ করে যৌতুক নিয়ে আপনাকে বিক্রয় করলে পৃথিবীর ধর্ম্মাধিকরণে সে নিশ্চয়ই অপরাধী হবে না!

কিন্তু বিবাহের নামে এ পরিহাসের পর নিজের মরুভূমির মত জীবনে একটি আশা, আকাঙ্খা, প্রেমপূর্ণ হৃদয়কে সে কোথায় স্থান দেবে? বিবাহের এ মিথ্যাকে সত্য বলে দেখবার জন্য, আপনার স্ত্রীর সুখস্বপ্নকে রক্ষার জন্য, অসহ্য দুঃখের বোঝা বয়েও কমলকে দিনের পর পর দিন সুখ-আনন্দের অভিনয় করতে হবে! প্রতিরজনীর নিদ্রাহীন, কণ্টকশয্যাকে ফুলশয্যায় সাজিয়ে, সামান্য কথায়—সামান্য কলহে—প্রতিস্পর্শে—প্রতিচুম্বনে অনুরাগের বিভিন্ন রূপ তাকে গড়ে তুলতে হবে।

মানবজীবনের যা পরম শুদ্ধ বস্তু। একটি রমণীহৃদয়ের নিষ্কলঙ্ক, নিষ্পাপ, পবিত্রপদ্মরাগমণির আভার মত সুন্দর সেই প্রথম প্রেমকে এতবড় ছলনা কমল কি করে করবে? মানুষের তৈরী আইনকে ফাঁকি দিলেও নিজের মনের গভীরের সদাজাগ্রত বিচারককে এত বড় অপরাধের কি জবাব কমল দেবে?

কিন্তু এ ছাড়া আর তার কোন উপায় নেই! সেদিন বিবাহ সঙ্কল্প একবারে স্থির করে কমল সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়েছিল যাতে তাড়াতাড়ি কোন বিবাহ সম্বন্ধ ঠিক হয়।

বিজ্ঞাপনের উত্তরে কমল কয়েকটি লোভনীয় সম্বন্ধ পেয়েছিল। এদের মধ্যে যে কোন একটি জায়গায় বিবাহ করলে তার নিজের ভবিষ্যত সুদৃঢ় হয়ে থাকত। খ্যাতি, গৌরব, অর্থ তার পায়ের কাছে স্তূপীকৃত হত। কিন্তু এ তো সে চায়নি!

তাই এই সব চিঠির উত্তরে কমল, কি সর্ত্তে সে বিবাহ করতে চায় তাই জানিয়েছিল। কোন কথাই সে গোপন করেনি। কিন্তু কোন স্থান হতে তার প্রস্তাবে সম্মতি আসেনি। যে ছেলে কেবলমাত্র অপরের উপকারের জন্য সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়ে এভাবে বিবাহ করতে চায়, তার মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্বন্ধে হয়ত এঁদের সন্দেহ হয়েছিল।

রাত্রিবেলা খেতে বসে কমল যখন এসব কথা চিন্তা করছিল তখন মিসেস সেন তাকে বললেন—কমল আমি তোমার বিয়ের ঠিক করেছি।

মিসেস সেন-এর কথায় মুখ তুলে কমল জিজ্ঞাসা করল—আমাকে না জানিয়ে একাজ তুমি কেন করলে মা?

মিসেস সেন বললেন—খবরের কাগজে তুমি বিয়ের জন্য বিজ্ঞাপন দিয়েছিলে এজন্য লোকে আমাকে অনেক কথা বলছিল, তাই আমাকে একাজ করতে হল।

কমল জিজ্ঞাসা করল—লোকে তোমায় কি কথা বলছিল মা যাতে তুমি একাজ করলে ?

—তারা বলছিল, আমি নাকি তোমার উপার্জ্জনের প্রত্যাশায় তোমার বিয়ে দিতে চাই না। আমি নাকি তোমার ভবিষ্যত নষ্ট করছি।

—তুমিও কি একথা বিশ্বাস কর ?

মিসেস সেন-এর কাছ হতে কোন উত্তর না পেয়ে কমল শান্ত ধীর কণ্ঠে বলল—এ সন্দেহের ছায়া যদি আজ তোমার মনে পড়ে থাকে তাহলে আমি তোমায় দোষ দিই না মা, তবে একটা কথা তোমায় বলব—নিজের মনের বিশ্বাস নষ্ট হতে দিলে মানুষ নিজেই কষ্ট পায়, আর অহরহ সেই কষ্ট ভোগ করার চেয়ে দুঃসহ ভার আর কিছুই তার জীবনে থাকে না।

—কমল, আমি—আমাকে।

—আর কিছু বোলো না মা। বিয়ের বিষয়ে আমার ইচ্ছা সম্বন্ধে তোমাদের ধারণা নষ্ট করবার জন্য আমি কোন প্রতিবাদই করব না শুধু একটা কথা তোমায় জানাব—আমি কেবল অর্থের প্রয়োজনেই বিবাহ করতে যাচ্ছি। যেখানে আমি আমার প্রয়োজনীয় অর্থ পাব, সেখানে আমি বিনা দ্বিধায় নিজের বিবাহে সম্মতি দেব।

—তাই হবে কমল। আর কোন কথা আমি তোমার কাছে জানতে চাইব না। যেখানে আমি তোমার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করেছি তুমি সেখানে যত টাকা চাও ততই পাবে। এর পরও কি তুমি এ বিবাহে আপত্তি করবে ?

—না।

—জীবনে অনেক কষ্ট তুমি সহ্য করেছ, আশীর্ব্বাদ করি এবার তুমি সুখী হও। আমি ওদের লিখে দিচ্ছি তুমি মেয়ে দেখতে যাবে।

—মেয়ে দেখার অনুরোধ তুমি আমায় কোরোনা মা, মনে রেখ আমি কেবল টাকার জন্যই বিয়ে করছি। মেয়ের জন্য নয়। তাছাড়া এই একটি বিষয়ে আমি ভাগ্যকে মেনে নেব।

—মা, ছোট বয়সে তোমার বিয়ে হয়েছিল। হয়ত কোলের পুতুল ফেলে রেখে তুমি স্বামীর ঘর করতে এসেছিলে। স্বামী কি বস্তু তার কোন অস্পষ্ট ধারণাও তখন তোমার মনে ছিল না। তবু তোমার জন্মান্তরের সংস্কার, ভাগ্যের উপর বিশ্বাস, সেই স্বামীকে স্বচ্ছন্দে মেনে নিতে সাহায্য করেছিল। নিজের হাসি, কান্না, সব তাঁকে দিয়ে তাই তুমি তাঁর একান্ত আপনার হতে পেরেছিলে। তোমার নয় বছরের বিশ্বাসকে তুমি বিশ বছরের মেয়ের অভিজ্ঞতা দিয়ে যাচাই করে নিতে যাওনি। যে ভাগ্যকে আশ্রয় করে তুমি দেবতার মত স্বামী পেয়েছিলে আজ আমি তারই উপর নির্ভর করলাম। অন্ততঃ এই একটি বিষয়ে ভাগ্যের সঙ্গে যুদ্ধ আমি করব না। এই পথে যা আসবে তাকেই আমি স্বচ্ছন্দে মেনে নেব। এতটুকু দ্বিধা মনে রাখব না। আমার বিয়ের আয়োজন তুমি কর।

—ও কমল ওঠ, অনেক বেলা হয়েছে যে !

মিসেস সেন-এর ডাকে কমল চোখ খুলে দেখল, রোদে ঘর ভরে গেছে। তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে নেমে সে বলল—আমি মুখ ধুয়ে বাইরে যাচ্ছি মা, ওখানেই আমার চা পাঠিয়ে দাও। আজ উঠতে দেরী হয়ে গেল।

মিসেস সেন জিজ্ঞাসা করলেন—কাল রাত্রে কি তোর ভাল ঘুম হয়নি ? উঠতে দেরী হল কেন ?

কমল উত্তর দিল—না, মা কাল রাত্রে আমি একটুও ঘুমাতে পারিনি। পরন্তু, খাবার সময় গলায় যেখানে কাঁটা বিঁধেছিল সেখানটা খুসখুস করেছে, ব্যথাও একটু হয়েছে। আজ আবার জ্বর জ্বর মনে হচ্ছে। জ্বরটা কেন হল বুঝতে পারছি না। যাই হোক তুমি কিছু ভেবো না চায়ের সঙ্গে একটা এ্যাসপিরিন খেয়ে নিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

সকালের রোদ গাছের মাথা ছাড়িয়ে অনেক নীচে নেমে এসেছে। রোদে দাঁড়িয়েও কমলের শীত করছিল। চা খেলে শরীর ঠিক হয়ে যাবে কমল ভেবেছিল, তাও হয়নি। খালি কাশি পাচ্ছে। গলার কাছে কি যেন আটকে আছে মনে হচ্ছে। জোর করে একবার কাশতে, কমল দেখল কাশির সঙ্গে অনেকটা রক্ত বেরিয়েছে। সেই রক্তের দিকে তাকিয়ে সে সম্মোহিতের মত দাঁড়িয়ে রইল।

কেন রক্ত পড়ল ? কোথা হতে রক্ত পড়ল ? যে ভয় সে এই কয়মাস ধরে করে আসছে এ কি তারই প্রথম ইঙ্গিত ?

না কিছুতেই না—এ রক্ত টিউবারকুলোসিসের জন্য পড়েনি ! এ নিশ্চয় স্পুরিয়াস হিমপটেসিস ! আপার রেসপিরেটরী ট্র্যাক্ট হতে এ রক্ত পড়েছে। সামনের যে রক্তাক্ত বিভীষিকা কমলের চৈতন্যকে গ্রাস করতে আসছে, আপনার চিকিৎসা-বিদ্যার সামান্য জ্ঞান নিয়ে কমল তার সঙ্গে প্রাণপণে যুদ্ধ করতে লাগল।

দাঁত থেকে কিংবা গলায় যেখানে কাঁটা বিঁধেছিল সেখান থেকে এ রক্ত পড়েছে। Calcium অথবা Vitamin C-র অভাবও হতে পারে।

তা ছাড়া অন্য কিছু, অন্য কোন অসুখের লক্ষণও তো তার শরীরে নেই !

এখনও কেউ দেখেনি। এ রক্ত ঢাকা দিয়ে দিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে !

আঙুল দিয়ে আঁচড়ে মাটি তুলে কমল সেই রক্তের উপর দিতে লাগল।

মাটি ! মাটি ! মাটি !

ওই সামান্য রক্তের উপর কমল এত মাটি দিচ্ছে তবু তার মনে হচ্ছে একটু রক্ত যেন কিছুতেই চাপা দেওয়া যাচ্ছেনা। সে রক্ত যেন তাকে ব্যঙ্গ করে বলছে—তোমার তো খুব সাহস। রিসার্চের জন্য জীবন দেবেনা ? আমাকে দেখে এখন ভয় পাচ্ছ কেন ? আমাকে মাটি চাপা দিয়েই কি আমার পিছনে যে আসছে তাকে তুমি ঠেকাতে পারবে ?

কমলের মনে হল, ইঁদুরকে মারবার আগে বেড়াল যেমন তাকে নিয়ে খেলা করে, এই রক্তচিহ্ন তাকে নিয়ে ঠিক সেরকমই খেল,

আরম্ভ করেছে। সমস্ত পৃথিবীতে কোথাও পালিয়ে বাঁচবার স্থান আর সে কমলের জন্য রাখবে না!

এই বিভীষিকাকে অস্বীকার করে বাঁচবার জন্যই যেন কমল দুহাতে চোখ মুছতে মুছতে চীৎকার করে উঠল—কেন এমন করে আমায় ভয় দেখাচ্ছ? আমি জানি তুমি মিথ্যা! তুমি মিথ্যা! তুমি মিথ্যা!

নিজের গায়ের জামার সামনেটা ছিঁড়ে ফেলে, দুহাতে পাশের থামটা ধরে কমল হাঁপাতে লাগল।

তার বুকের ভিতরটা পর্য্যন্ত যেন জ্বলে যাচ্ছে। ঘামে শরীর ভিজে গেছে। আঙুলের ডগা বরফের মত ঠাণ্ডা!

এ কি চেতনা হারাবার পূর্ব্বলক্ষণ?

এবার কি পরম শান্তিময় বিস্মৃতি তাকে আশ্রয় দেবে?

না না চেতনা হারালে তার চলবে না। উঠে তাকে দাঁড়াতেই হবে!

স্পুটাম, থ্রোট একজামিন করিয়ে, এক্স-রে পিক্‌চার নিয়ে এর শেষ আজ তাকে দেখতেই হবে!

বিলুপ্তপ্রায় চেতনার যে ক্ষীণ ধারা তখনও তার শরীরে প্রবাহিত হচ্ছিল তাকে সঞ্জীবিত করবার জন্য একটা ভাঙ্গা ইট তুলে কমল হাতের আঙুলের উপর সজোরে আঘাত করল।

সেই মথিত আঙুলের মধ্য দিয়ে যে অসহ্য যন্ত্রণার স্রোত কমলের সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়তে লাগল, তারই বেদনায় কমলের চোখের সামনে ঘনিয়ে আসা অন্ধকার অতি ধীরে পরিষ্কার হয়ে আসতে লাগল। রক্তাক্ত আঙুলটা আপনার হাতের মধ্যে ধরে কমল টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল।

—আমার মনে হয় রক্তটা আপনার গলা থেকেই পড়ছে। আপনার ফ্যারিনকস বড় গ্র্যানুলার আর কনজেশটেড? স্পুটাম একজামিন করিয়েছিলেন?

থ্রোট স্পেশালিষ্টের প্রশ্নের উত্তরে কমল বলল—হ্যাঁ, স্পুটাম দেখিয়ে তবে আপনার কাছে এসেছি, ওতে কিছুই নেই। এবার এক্স-রে করাব ভাবছি।

এক্স-রে করানই ভাল। যদিও কিছু নেই বলেই মনে হয়, তবু নিঃসন্দেহ হওয়াই ঠিক।

'ইয়ার, নোস, থ্রোট' স্পেশালিষ্ট-এর বাড়ী হতে কমল যখন বার হল, তখন বিকাল হয়ে এসেছে। পাশের মাঠে ফুটবল খেলা হচ্ছে। তার আনন্দ-কোলাহল কমলকে আজ যেন মনে করিয়ে দিচ্ছে বহু দিন আগে সেও এ রকম করে খেলাধূলা করত। তার জীবনেও এক দিন আনন্দকে অনুভব করার শক্তি ছিল।

এখান হতে শহরের দূরপ্রান্তে এক্স-রে ক্লিনিকটা পর্য্যন্ত যেতে কমলকে অনেকক্ষণ সাইকেল চালাতে হবে। খেলার মাঠের দিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে, কমল সাইকেলে চড়ল। প্রায় দু' ঘণ্টা পরে কমল যখন এক্স-রে ক্লিনিক-এ পৌঁছাল, তখন সন্ধ্যাকে অতিক্রম করে রাত্রি নামছে। সারা দিনের অনাহারে ক্লান্তিতে অবসন্ন শরীরে এই পথটুকু আসতে কমলের শেষ শক্তিটুকুও যেন নিঃশেষ হয়ে গেছে।

ক্লিনিক-এ ডাক্তার এখনও আসেন নি। বারান্দায় লম্বা বেঞ্চ-এর এক কোণে বসে কমল তার চারিদিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল। ক্লিনিকটার এই দিকে সত্তর নতুন করে গড়া হচ্ছে। সামনের একটা অর্দ্ধ-সমাপ্ত বাড়ীর মজুরেরা দিনের কাজ শেষ করে, আগুন জ্বালিয়ে তার পাশে বসে ভজন গাইছে। ওদের মত নিরুদ্বেগ জীবন কমল যদি কাটাতে পারত, তাহলে কার কতটুকু ক্ষতি হত?

কতক্ষণ এ ভাবে কমলকে অপেক্ষা করতে হবে কে জানে?

পাশের নূতন চূণকাম-করা দেওয়ালের উপর চোখ পড়তে কমলের একটা কথা মনে হল। আজ সকাল হতে বহুবার কমল জোর করে শ্লেষ্মা তুলে তার মধ্যে রক্তচিহ্ন আছে কি না পরীক্ষা করেছে কিন্তু দেওয়ালের মত সাদা জায়গায় তো সে একবারও শ্লেষ্মা ফেলে দেখেনি? যদি পাশের দুধের মত সাদা দেওয়ালে কমল একবার শ্লেষ্মা ফেলে দেখে, তাহলে হয়ত—হয়ত সেই নিষ্কলঙ্ক শুভ্রতার উপর সামান্য রক্তচিহ্নও নিশ্চয় ফুটে উঠবে।

অভিভূতের মত বার বার পাশের দেওয়ালে শ্লেষ্মা ফেলে আর আঙুল দিয়ে তাই ছড়িয়ে কমল তার মধ্যে অদৃশ্য রক্তচিহ্নও খুঁজতে লাগল।

কিছুই নেই! একবারে ঠিক হল না—আর একবার!

অর্দ্ধোন্মত্ত কমলের মনে হল, এই শ্লেষ্মার মধ্যে অদৃশ্য এক শোণিতস্রোত তার মনো-জগতকে ভাসিয়ে নিয়ে যেন নিশ্চিহ্ন করে দিতে চাইছে। সেই স্রোতে তার পরম প্রিয়জনের স্মৃতি যেন এক এক করে মিলিয়ে যাচ্ছে। কমলের মনে হল, এই বিভীষিকার মধ্যেও
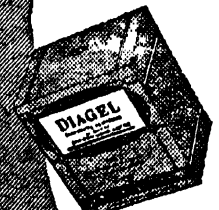
একটি বহু-পরিচিত মুখ যেন প্রাণপণে ভেসে থাকতে চাইছে আর তাকে বলছে—ভয় পাসনে কমল, ভয় পাসনে! তুই এমন করলে আমার কি হবে? আমি যে তোর মুখ চেয়েই সব সহ্য করে আছি!

ওটা কি সমরের মুখ? সত্য-মিথ্যা ছায়া-কায়া—সামনে ওটা কি কমলের সঙ্গে কথা বলছে?

কমলের প্রশ্নের উত্তরেই যেন একটি মোটরের হেড লাইটের তীব্র আলো তার চোখের সামনে হতে সব মিলিয়ে দিল। বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়ান সেই মোটরের হর্ণ শুনে কমল যেন তড়িতাহতের মত সচকিত হয়ে উঠল।

ডাক্তার এসে গেছেন। ডাঃ মল্লিক এখানের সব চেয়ে বড় স্পেশালিষ্ট। এঁরই এক্স-রে রিপোর্টের উপর সব নির্ভর করছে। এখনও শেষ হয়নি, এখনও কমলকে এই কষ্ট সহ্য করতে হবে। এক্স-রে না হওয়া পর্য্যন্ত তার মুক্তি নেই। ডাঃ মল্লিক মোটর হতে নামতে কমল অতি কষ্টে দেওয়াল ধরে উঠে দাঁড়াল। তাকে ঐ অবস্থায় দেখে ডাঃ মল্লিক জিজ্ঞাসা করলেন, ডাঃ সেন! কি চাই আপনার? আপনাকে বড় অসুস্থ মনে হচ্ছে?

কমল উত্তর দিল, অসুস্থ? হাঁ, না ঠিক অসুস্থ নয়, আপনাকে দিয়ে একবার আমার লাংস এক্স-রে করাতে চাই।

—আসুন, ভিতরে আসুন। কেন এক্স-রে করাচ্ছেন?

কমল সব কথা খুলে বলবার পর ডাঃ মল্লিক তাকে এক্স-রে রুমে নিয়ে গেলেন। সবুজ ফ্লোরেসেন্ট স্ক্রীণের উপর এবার কমলের লাংসের ছবি ফুটে উঠবে। কি থাকবে সেখানে? জীবন না মৃত্যু?

এই চরম পরীক্ষার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নিজেকে এখন কমলের খুব শান্ত মনে হচ্ছে। হৃৎপিণ্ডের উন্মত্ত স্পন্দন আর শোনা যায় না। অকস্মাৎ কমল যেন এই অপরিসীম যন্ত্রণার হাত হতে উদ্ধার পেয়েছে। এই অন্ধকার ঘরে, এই স্নিগ্ধ সবুজ আলোর অঙ্কে সে যেন এখনই নিরুদ্বেগে ঘুমিয়ে পড়তে পারে।

তার অর্দ্ধ-আচ্ছন্নতার মধ্যে কমল শুনতে পেলে ডাঃ মল্লিক বলছেন স্ক্রীণ-এ তো কিছু দেখা যাচ্ছে না? আমার মনে হয় ইট ইজ পারফেকটলি নর্ম্মাল।

—নর্ম্মাল? আপনি ঠিক বলছেন কিছু নেই? ঠিক বলছেন?

—আমি এবিষয়ে একেবারে নিশ্চিত। আপনি কিছু ভাববেন না, কাল এসে রিপোর্টটা নিয়ে যাবেন।

কমল যখন বাড়ী ফিরল তখন রাত সাড়ে আটটা। মিসেস সেন দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তাকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, সারাদিন কোথায় ছিলি রে কমল? আমি যে ভেবে মরছিলাম? একটা খবরও তো দিতে হয়? তোর মুখ ওরকম কেন রে? অসুখ করেছে?

—মা!

—ওকি—ওকি অমন করে আমার পায়ের উপর পড়লি কেন? কেন কাঁদছিস কমল? কি হয়েছে, ওরে অমন করে কাঁদিস না, কি হয়েছে আমায় বল?

কেন কাঁদছে কমল, এ প্রশ্নের উত্তর কি সে নিজেই ভাল করে জানে? লোকচক্ষুর অন্তরালে, নিন্দা-প্রশংসার অতীত হয়ে প্রতিক্ষণে আপনার সংশয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করে মৃত্যুর নিঃশব্দ পদসঞ্চার যাদের শুনতে হয়—মৃত্যুর অমোঘ স্পর্শকে এড়িয়ে তাদের প্রাণ একটু একটু করে সঙ্কুচিত হয়ে বাঁচতে চেষ্টা করে, সেই বিজ্ঞান-সাধকদের দুঃসহ সংগ্রামের যথার্থ মূল্য কি আজ কমল বুঝতে পেরেছে?

বৈজ্ঞানিক আদর্শের জন্য যারা মৃত্যু বরণ করে, তাদের মৃত্যুকে নির্ভীকের মৃত্যু, গৌরবের মৃত্যু বলে দেওয়া মহিমার চেয়ে বড় মিথ্যা যে আর সংসারে কিছু নেই এ মর্ম্মান্তিক সত্য কি আজ কমল জানতে পেরেছে?

মৃত্যু-বিভীষিকা তার মিথ্যা গৌরববোধকে ধূলায় লুটিয়েছে—তার এতদিনের আত্মবঞ্চনাকে নগ্ন করে দেখিয়েছে; এই লজ্জাই কি কমলের চোখে জল এনেছে?

কমলের বিবাহের পর এক বছর কেটে গেছে। ডিসপেনসারী হতে ফিরে, খাওয়া-দাওয়ার পর নিজের ঘরের পাশের টানা বারান্দায় একটা ডেকচেয়ারে শুয়ে কমল সমরের একটা চিঠি পড়ছিল। সমর লিখেছে যে তার রিসার্চের কয়েকটি প্রিলিমিনারী সম্বন্ধে সে একটি প্যামফ্লেট ছাপাতে চায় এর জন্য তার কিছু অর্থের প্রয়োজন।

শ্রাবণ মাসের আকাশ সকাল হতে মেঘাচ্ছন্ন ছিল; এখন বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে।

সেই বৃষ্টিধারার প্রতি দৃষ্টিপাত করে কমল তাদের বিচিত্র দুর্ভাগ্যের কথা চিন্তা করতে লাগল।

নিজের বিবাহে সে যে অর্থ পেয়েছিল তার আর কিছুমাত্র অবশিষ্ট নেই।

কিছু অর্থ বিবাহের ব্যয়েই খরচ হয়েছিল। বিবাহটা যদি শুধু কমলেরই হত তাহলে এ ব্যয় হয়ত সংক্ষেপ করা যেত, কিন্তু কমলের বিবাহের সঙ্গে ডাঃ সেনের বংশমর্য্যাদা, তাঁর বহু-বিস্তৃত সম্মানের প্রশ্ন জড়িত থাকায় সে সম্মানের মর্য্যাদা দিতে এ অর্থের বিশেষ অংশ ব্যয় হয়েছিল। সমরই তাকে এতে বাধ্য করেছিল।

নিজের বিবাহের স্থির করে কমল যখন সমরকে তার এ বিবাহের উদ্দেশ্য জানিয়েছিল তখন সমর শুধু একবার তাকে বলেছিল—কেন আমাকে সব না জানিয়ে তুই একাজ করলি কমল?

কমল উত্তর দিয়েছিল—আমার যে আর কোন উপায় ছিল না দাদা!

সমর জিজ্ঞসা করেছিল—আর একটু ভেবে তুই একাজ করলি না কেন?

কমল বলেছিল—এই দীর্ঘকালের ভাবনার পরও কি তুমি আমাকে ভাবতে বল দাদা? কি ভাবব আমি? অন্ততঃ চিন্তাস্রোতের কোনখানটা আমি অঞ্জলি করে নেব? আমি যদি ভাবনা চিন্তার বাইরে এসে এ কাজ করে থাকি তাহলে কি তুমি আমায় দোষ দেবে?

সমর বলেছিল—দোষ তোকে আমি দেব না কমল কিন্তু এর অপর দিকটা কি তুই ভেবে দেখেছিস? যদি কোন কারণে আমার যাওয়া না হয় বিদেশে—যদি—যদি এ টাকা নিতে আমার দ্বিধাবোধ হয়?

কমল বাধা দিয়ে বলেছিল—ওকথা যদি তোমার মুখে আর আমি একবার শুনি দাদা তাহলে আমি তোমার সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করব। দ্বিধা? আমার অর্থ নিতে তোমার দ্বিধা? কই তোমার জন্য এত বড় কাজ করতে আমার তো দ্বিধা হয়নি?

সমর বলেছিল—তুই বোধ হয় ভুল করলি কমল, তবে কথা যখন তুই দিয়েছিস তখন এ বিবাহ তোকে করতেই হবে, কিন্তু নিয়তির স্বাক্ষর হয়ত তোর এ কাজও পরিবর্ত্তিত করতে পারবে না। ভবিষ্যৎ হয়ত এত সহজে আমাকে নিষ্কৃতি দেবে না।

কমল বলেছিল—ভুল করেছি কি না জানি না—ভবিষ্যৎ তোমার জন্য কি গোপন করে রেখেছে তাও জানি না কিন্তু একটা কথা আমি নিশ্চিত জানি যে, নিয়তির সামনে আমি কখনও মাথা নীচু করব না—এর সঙ্গে আমি চিরদিন মাথা সোজা করেই সংগ্রাম করব। তুমি ভয় পেও না দাদা, আমার ভবিষ্যতের পঞ্জরাস্থির উপর তোমার ভবিষ্যতের যে সৌধ আমি আজ গড়ে দিয়ে যাব, কল্পান্ত পর্য্যন্ত তা তোমার-আমার মত লোকের আশ্রয় হবে—এ সত্য আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।

কমলের সেদিনের সব আশা, কল্পনা ছাপিয়ে সমরের আশঙ্কাই সত্য হয়েছিল। বিবাহের বয়ের পর যে অর্থ কমল সঙ্গোপনে সঞ্চিত করে রেখেছিল, সে অর্থ সমস্তই মিসেস সেন-এর এক দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধিতে চিকিৎসার জন্য তাকে ব্যয় করতে হয়েছিল।

মিসেস সেন-এর রোগজীর্ণ মুখের অসহায়তার ছায়া, তাঁর অসহ্য রোগযন্ত্রণার কষ্টও কমলকে বিচলিত করেনি কিন্তু সমর যেদিন তাকে বলেছিল—কমল, যে টাকা মা'র মৃত্যুর বিনিময়ে আমাকে নিতে হবে, সে টাকা তুমি বললেও আমি স্পর্শ করব না। সেদিন হতে কমল সমস্ত অর্থই মিসেস সেন-এর চিকিৎসায় ব্যয় করেছিল।

মিসেস সেন যেদিন ভাল হলেন, সেই দিন কমল সমরকে বলেছিল—দাদা, মা'র মৃত্যুশয্যার পাশে দাঁড়িয়ে আমি তোমার কথার জবাব সেদিন দিতে পারিনি কিন্তু আজ বলছি, তুমি যে কাজ করলে, তার ফলাফলকে হয়ত ভবিষ্যতের সমস্ত হৃদয়াবেগ দিয়েও তুমি ফেরাতে পারবে না—এক দিন এর জন্য তোমাকে নিশ্চয়ই অনুতাপ করতে হবে! মা'র কিছু হলে তার জন্য আমি তোমার অপেক্ষা কম শোক পেতাম না, কিন্তু তোমার জন্য যদি আর কিছু করতে আমি না পারি, তাহলে তার শোক আমাকে জন্মান্তরেও নিষ্কৃতি দেবে না!

—এই!

অতীত-স্মৃতির অরণ্যে হারিয়ে যাওয়া কমলের মন বরুণার এই ছোট কথায় বর্ত্তমানের পথ আবার যেন খুঁজে পেল। ঘরের কাজ শেষ করে এসে বরুণা তার পাশে দাঁড়িয়েছিল। তার হাত হতে বইটা কেড়ে নিয়ে সে আবার বলল—এই, শুনতে পাচ্ছ না?

বরুণার হাত হতে বইটা নেবার চেষ্টা করে কমল উত্তর দিল—কি বলছ?

—কেমন সুন্দর বৃষ্টি হচ্ছে, একটু ভিজে আসি।

—এই সব মতলব হচ্ছে? সেদিন না তোমার জ্বর হয়েছিল?

—সে তো কবেকার কথা! একবারটি যাই—ওই যেখানে জল বয়ে যাচ্ছে, সেখানে দাঁড়াই!

—আবার দুষ্টুমী, আবার জলে যাচ্ছ? মাকে ডাকি তাহলে, বলি—মা দেখ, একজন জলে যাচ্ছে, আমার কথা শুনছে না!

—যাও, আমি তোমার সঙ্গে কথা বলব না।

—রাগ করোনা, এস আমার কাছে বোস, গল্প করি। চাদরটা পায়ে ঢাকা দাও—দেখতো জল লেগে পা কি রকম ঠাণ্ডা হয়েছে! বলতে বলতে কমল বরুণার পায়ে হাত দিতে বরুণা তার হাত ধরে বলল, ছি ছি, পায়ে হাত দিও না পাপ হবে যে আমার।

কমল উত্তর দিল—ভালই তো, পাপীরা যেখানে যায় সেখানে আর আমাকে একলা যেতে হবে না একজন সঙ্গী পাব।

—যাও, দুষ্টু কোথাকার!

—বৃষ্টি দেখলেই বাড়ীর জন্য তোমার মন কেমন করে না?

—ভীষণ মন কেমন করে। বৃষ্টির দিন সকলে একসঙ্গে ঠাকুমার কাছে বসে গল্প শোনার কথা মনে পড়ে।

—কি গল্প বৃষ্টির দিন বলেন ঠাকুমা?

—রূপকথা।

—ছোট খুকী, রূপকথা শুনতে!

—আহা, তুমি তো খুব বড় আছ তাহলেই হয়েছে!

—আচ্ছা, ঠাকুমা যখন আমার কথা তোমার জিজ্ঞাসা করত তখন তুমি কি বলতে?

—কিছুতেই বলব না!

—আমাদের বিয়ের দিনের কথা আজ কেন মনে পড়ছে বল তো?

—কি জানি!

—তোমাকে বিয়ের রাতে কখন ভাল করে দেখলাম জান? প্রায় শেষ রাতে। হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে মনে হল আমি যেন এক নূতন জগতে এসে পড়েছি। দোতলার ছোট ঘরে লালপাড় শাড়ী পরে

ছোট্ট মুন্নি কেন কেঁদেছিল

মুন্নি ফোঁপাতে আরম্ভ করল তারপর আকাশফাটা চিৎকার করে কেঁদে উঠল। মুন্নির বন্ধু ছোট্ট নিনু ওকে শান্ত করার আপ্রান চেষ্টা করছিল, ওকে নিজের আধ আধ ভাষায় বোঝাচ্ছিল—"কাঁদিসনা মুন্নি—বাবা আপিস থেকে বাড়ী ফিরলেই আমি বলব—" কিন্তু মুন্নির ভ্রুক্ষেপ নেই, মুন্নির নতুন ডল পুতুলটির দুধে আলতায় মেশানো গালে ময়লার দাগ লেগেছে, পুতুলের নতুন ফ্রকের ওপর পড়েছে ময়লা আঙুলের ছাপ—আমি আমার জানলায় দাঁড়িয়ে এই মজার দৃশ্যটি দেখছিলাম। আমি যখন দেখলাম যে মুন্নি কোন কথাই শুনছেনা তখন আমি নিজে এলাম। আমাকে দেখেই মুন্নির কান্নার জোর বেড়ে গেল—ঠিক যেমন 'এঙ্কোর, এঙ্কোর' শুনে ওস্তাদদের গিটকিরির বহর বেড়ে যায়। আমাদের প্রতিবেশির মেয়ে নিনু—আহা বেচারা—ভয়ে জবুথবু হয়ে একটা কোনায় দাঁড়িয়ে আছে। আমি ঠিক কি করব বুঝতে পারছিলামনা। এমন সময় দৌড়ে এলো নিনুর মা সুশীলা। এসেই মুন্নিকে কোলে তুলে নিয়ে বলল—"আমার লক্ষী মেয়েকে কে মেরেছে?"

কান্না জড়ানো গলায় মুন্নি বলল—"মাসী, মাসী, নিনু আমার পুতুলের ফ্রক ময়লা করে দিয়েছে।"

তুমি যেখানে মাটিতে পাতা বিছানায় শুয়েছিলে সেখানে একফালি জ্যোৎস্না এসে পড়েছিল।

সে জগতে যাবার আসবার সেই যেন সেতু!

বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেল। সামনের বাড়ীর পাশ দিয়ে চাঁদ অস্ত গেল। তোমার মুখে এসে লাগল প্রথম সূর্য্যের সোনার আলো।

সানাইতে বাজতে লাগল ভোরাই সুর।

তোমার বিপর্য্যস্ত কেশে নূতন সিঁদূরের চিহ্ন সেই আলোয় যেন রক্তের মত লাল হয়ে উঠল। মনে হল সেই রক্তস্বাক্ষর যেন আমার বহুপরিচিত।

বর্ত্তমানের সেই স্বাক্ষরে আমি যেন আমাদের অতীত ভবিষ্যতের বহু আবির্ভাবকে স্পষ্ট দেখতে পেলাম।

তারপর কতদিন কেটে গেল!

তোমাকে দিনের পর দিন নিবিড় করে পেয়ে আমার নিজের দুঃখ-আনন্দের মধ্যে আমি যেন পৃথিবীর আনন্দ-দুঃখকে আপনার বলে অনুভব করলাম। আমার সামান্য আনন্দও তারপর আর আমি নিজস্ব করে রাখতে পারলাম না। মনে হল নিজের আনন্দ, নিজের সুখের সঞ্চয়কে অকৃপণ হস্তে দান করে যেন আমাকে রিক্ত হয়ে যেতে হবে। আপনার বলতে আর যেন আমার কিছুই না থাকে।

এই অনুভূতিই কি জীবনশক্তি? এই কি সত্য? জন্ম-মৃত্যু শৃঙ্খলের মধ্যে একেই কি আমরা খুঁজে বেড়াই?

—ও গো?

—কি বরুণা?

—তুমি অমন করে কথা বোলো না। তুমি যখন ওসব কথা বল তখন আমার বড় ভয় করে। মনে হয় তুমি যেন এ সংসারের কেউ নও—কিছুই যেন তোমাকে বাঁধতে পারেনি। মনে হয় কি এক দুঃখের আগুনে পুড়িয়ে কেউ যেন তোমাকে অনেক বড় করে আমাদের নাগালের বাইরে অনেক দূরে সরিয়ে দিয়েছে। কত দিন দেখেছি তুমি কথা বলতে বলতে অন্যমনস্ক হয়ে যাও—এই রকম সব কথা বল—কি যেন ভাব! এত দিন আমি তোমায় কিছুই বলিনি—আজ বলছি, তোমার সব কথা কি আজও আমায় বলবে না? তোমার দুঃখের ভার কি আমাকেও নিতে দেবে না?

—তুমি ঠিকই বুঝেছ বরুণা, তাই আমার বাইরের আনন্দ দিয়ে আমার অন্তরের দুঃখকে আমি তোমার কাছে গোপন করতে পারিনি। তুমি আমায় অনেক দিয়েছ বরুণা, তার বদলে আমি তোমায় কিছুই দিতে পারিনি। দিতে পারব না জেনেও একদিন আমি তোমায় গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলাম—ভেবেছিলাম যেদিন তুমি আমার সব কথা জানবে সেদিন আমার নিরুপায়তাকে স্মরণ করে তুমি নিশ্চয় আমায় ক্ষমা করবে। আমার বড় প্রয়োজনের দিনে তুমি আমার কাছে এসেছিলে বরুণা তার বড় প্রয়োজন মানুষের বোধ হয়, হয় না!

আমার কাছে এসে সেদিন শুধু আমাকেই তুমি রক্ষা করনি, আমার চেয়ে অনেক বড় অনেক মহৎ এক বস্তুকেও রক্ষা করেছিলে। তোমার সে বিশ্বাসের, সে দানের মূল্য দেবার জন্য আমি প্রাণপণে আপনাকে তোমার গ্রহণযোগ্য করবার চেষ্টা করেছি। তোমার মুখের হাসি—তোমার আনন্দ আমায় জানিয়েছে সে চেষ্টায় আমি নিষ্ফল হইনি।

এই বোধ হয় আমার জীবনের একমাত্র শান্তি।

আমার অনেক গেছে বরুণা কিন্তু আজ আমার অনন্ত দুঃখের কথা তোমায় জানিয়ে তোমার আনন্দের মাঝে আমার যে আশ্রয় তাকে আমি কোনক্রমেই ধ্বংস করতে পারব না।

অনেকের অপরাধের—অনেকের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে হয়ত আমাকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে হবে কিন্তু তাতে আমার দুঃখ নেই তবে সত্যকার শুভকামনার যদি কোন মূল্য থাকে তাহলে আমি আশীর্ব্বাদ করছি, আমার চেয়েও তোমার ত্যাগে, তোমার দানের মূল্য, জগতের লোক যেন একদিন দিতে পারে।

যদি আমার ব্রত সফল হয়—যদি ঈশ্বর দিন দেন তাহলে আমার সব কথা একদিন তুমি নিশ্চয়ই জানবে। কিন্তু আজ আর কথা থাক—কোন—কোন দুঃখ মনে না রেখে আজকের এই পরম সুন্দর ক্ষণটিতে আমার হৃদয় তুমি সুধারসে ভরে দাও। ভবিষ্যতের অনেক দুঃখের দিনকে হয়ত এর মূল্যেই আমায় ভুলতে হবে। [ক্রমশঃ।

বাতায়ন-পথে

মানসী চট্টোপাধ্যায়

কতটুকুই সম্বল মোর, কী বা আমার পুঁজি,
তারি মাঝে হৃদয় কেরে অমৃতধন খুঁজি!
কোথায় পাব গিরিশ্রেণী, কোথায় সাগরবেলা,
ঝাউয়ের পাতায় শনশনানি, ঝিনুক নিয়ে খেলা!
রাঙামাটির পথটি কোথায়, গাঁয়ের কোলে কোলে,
তালপুকুরের ঠাণ্ডাজলে তালের ছায়া দোলে।
ছোট্ট নদী লাফিয়ে চলে, নুড়ির কাঁকন বাজে,
হঠাৎ বুঝি হারিয়ে গেল, বালুচরের মাঝে।
দেবালয়ের পাষাণ গায়ে মূর্ত্তি শত শত,
ঘুমিয়ে আছে ইতিহাসের নীরব কথা যত।
ভাবুক মনের স্বর্গভূমি জানি এ সব ঠাঁই,
এদের মাঝে বাঁধব বাসা, এমন বরাত নাই।

ছোট্ট ঘরের জানলা আছে, কাঠের ফ্রেমে ঘেরা,
একটুখানি আকাশ সেথা দেয় আমারে ধরা।
উষার আলোর আভাস ফোটে সেই আকাশের কোলে,
কোন সে দূরের গাছের মাথা একটুখানি দোলে।
সেই দোলনের পুলক জাগে আমার বুকের মাঝে,
অতীত দিনের হাজার কথা ভুলায় সকল কাজে।
ছোট্ট ঘরের গণ্ডী-ঘেরা তুচ্ছ জীবনটাকে,
পাগল-করা সুরে কেন দূরের আকাশ ডাকে?
একটুখানি আলোর ছোঁয়া পূব-আকাশের কোলে,
কোন জাদুতে মনের আকাশ রাঙিয়ে এমন তোলে?
উষার ডাকে সাড়া দিয়ে নীড়ছাড়া এক পাখি,
দিগন্তরে মিলিয়ে গেল—আমি চেয়েই থাকি!

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

চক্রপাণি

রাঁচী রোড থেকে চল্লিশ মাইল পাহাড়ের বুকের ওপর ওঠা-নামা করতে করতে বাস সমতলে পৌছুলো। রাঁচী বাজার থেকে রিকশা নিয়ে আমার গন্তব্যস্থলে পৌছে দিল ফিলিপস্। দেশ তার রাঁচী থেকে ছ' মাইল দূরে। মায়ের নাম মেরী, বাপের নাম সিড্‌নি। পুলিশ সাহেব মুখার্জ্জির বাড়ীতে আয়ার কাজ করে মেরী। আর ইমারতি কাজ জোগাড় দেয় সিডনি। মিশনারী সাহেবরা টাকা দিয়েছেন, সেবা দিয়েছেন, বিদ্যা দিয়েছেন, শিক্ষা দিয়েছেন আর সেই সঙ্গে খৃষ্টধর্ম্ম প্রসার লাভ করেছে দেশ থেকে দেশান্তরে!

শহর থেকে কাঁখে মেণ্টাল হসপিটালের দিকে সোজা যে রাস্তা চলে গেছে, তার ধারে গোটা-গোটা পাথরের ভর্ত্তি ছোট্ট একটা পাহাড় আর তার পাশেই একটা পাহাড়ী নালা। সেই নালার বুকে বাঁধ দিয়ে জলাধার তৈরী হচ্ছে রাঁচী সহরের জল সরবরাহের জন্যে। শক্ত মাটি দিয়ে প্রস্তুত করা হয়েছে বাঁধের দুটো ধার আর নীচু কংক্রীটের দেওয়াল দেওয়া হয়েছে মাঝখানে, তার ওপরে জলের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণের জন্যে বড় বড় ইস্পাতের গেট বসানো। মাটির বাঁধের ওপর দিয়ে খানিকটা এগিয়েছি, ফিলিপস পিছন থেকে দৌড়ে এসে বলল—বাবু, রাতমে কাঁহা রহেঙ্গে ?

কাঁহে, তুমি কি সি, আই, ডির লোক নাকি ?

বুরবাকের মত তাকিয়ে রইল ফিলিপস। স্রোতের নীচে জলের 'ফিলটার-বেড' ঢালাই করছিল কলকাতার সিমপ্লেক্স কোম্পানী, তাদের এক বাবুগোছের সুপারভাইজার লক্ষ্য করছিল আমাদের অনেকক্ষণ ধরে। ফিলিপসের সঙ্গে কথাবার্ত্তাও শুনেছিল বোধ হয়। হনহন করে ওপরে উঠে এসেই এক দাবড়ানি দিল সে ফিলিপসকে। হতবাক ফিলিপস তখন পশ্চাদপসরণ করেছে!

বাবুটি এবার বলল পরিষ্কার বাংলায়—শিকার খুঁজছিল শয়তান। রিক্‌শা চালিয়ে হয় না, দালালি ধরেছে এবার।

ব্যাপার কি ?

আর বলেন কেন ? সভ্য হয়েছে হতভাগারা। টাকা চিনেছে গাঁয়ের পাট উঠিয়ে সব এসে জড় হয়েছে শহরে—কাজ পাওয়া যায় ত ভালো, মেয়ে-পুরুষ মিলে চলে যায় কলকাতার দিকে আর না পাওয়া যায় ত বস্তি ভর্ত্তি করে অনাচার চালায় মেয়েগুলো—শুধু বাইরের টুরিষ্ট নয়, শহরের ভেতর ভদ্র ছেলেদেরও নষ্ট করছে এরা।

হাসিতে উচ্ছ্বাসে উচ্ছল হয়ে মশলা বইছিল নীচে পূর্ণযৌবনা কৃষ্ণাঙ্গীরা, স্বাস্থ্যে আর প্রাণপ্রাচুর্য্যে সারাদেহ তাদের টলমল। ভদ্রলোকের সঙ্গে নীচে নামলাম। ফুলকাটা ছাপা শাড়ী পরে কংক্রীটের কড়াই চালছিল এক কামিন। কড়াই সে ঢালছে ত ঢালছে—মিস্ত্রীর সঙ্গে হাসিঠাট্টা আর থামে না। হুঙ্কার করে উঠলেন সুপারভাইজার বাবু আর সাঁওতালী ভাষায় গাল দিলেন তাদের। ভাষা আলাদা হলেও গালিগালাজের মধ্যে যেন একটা সাধারণ বোধগম্যতা আছে।

বললাম—এমন করে গাল দিচ্ছেন কেন ?

কেন দিচ্ছি! কুকুরকে লাই দিলে মাথায় ওঠে। এরা সেই কুকুরের জাত। এতটুকু ভালো ব্যবহার করলেই এরা ফাঁকি দিয়ে রঙ্গরস চালায়। আজ চল্লিশ বছর এদের দেখে আসছি মশায়, আমার আর চিনতে বাকী নেই।

কিন্তু দেখলে ত আপনার অত বয়স মনে হয় না!

না হলে আর কি করব বলুন না ? আমার বয়স এখন পুরো বিয়াল্লিশ। এই রাঁচীতেই জন্মিছি, রাঁচীতেই মানুষ হয়েছি, রাঁচীতেই আমার শিক্ষাদীক্ষা, রাঁচীতেই বিবাহ, বাংলাদেশে আমি একদিনের বেশী কখনও থাকিনি!

কেন ? সেখানে কি একদিনের বেশী থাকতে ইচ্ছে হয় না ?

কে-ই বা আছে সেখানে ? আর থাকবোই বা কোথায় ? সমস্ত আত্মীয় বিহার, ইউ পি আর, মধ্যপ্রদেশে ; বাংলা দেশও এখন বিদেশ হয়ে গেছে। বাবা ছিলেন উকীল, পাবনা থেকে রাঁচীতে এসে প্র্যাকটিস সুরু করলেন তিনি। কাকা আগে থেকেই ছিলেন পাটনায়, মামার বাড়ী জব্বলপুর, ভায়েরা কেউ থাকে গয়া, কেউ বা হাজারিবাগ।

বাংলার বাইরে আর একটা বাঙালী-জগৎ, ভাবতেও যেন শিহরণ জাগে! কলকাতার কোম্পানী রাঁচীর কাজের জন্যে শিক্ষিত স্থানীয় সুপারভাইজার খুঁজছিল। ম্যাট্রিক পাশ সুরেন বাবু ওভারসিয়ারী স্কুলে পড়েছিলেন এক বছর আর রাঁচী শহরের বড় বড় ইমারতের কাজ তদারকও করেছেন আজ বছর দশেক, সহজেই কাজ পেলেন তিনি রাঁচীর নির্ম্মীয়মান জলসরবরাহ কেন্দ্রে।

মাটির ভাঁড়ে চা অফার করলেন সুরেন বাবু, তারপর আবার সুরু করলেন শহরে আদিবাসীদের নির্ব্বিচারে মুণ্ডপাত।

জিজ্ঞেস করলাম—এ কাজ শেষ হয়ে গেলে কি কোরবেন ?

আবার একটা কাজ খুঁজে নোবো এখানে! রাঁচী ছেড়ে আমি একপা'ও নড়তে রাজী নই।

কেন ?

কেন তা জানি না। এখানেই জন্মিয়েছি, এখানেই বড় হয়েছি, মরবোও এখানে।

নিজের মায়ের সঙ্গে সঙ্গে জন্মভূমিকেও ভালবেসেছেন এঁরা শিশুর মত। স্বর্গের চেয়েও বড় সেই জননী আর জন্মভূমি—নিভৃতে নিঃশব্দে সেই জগদ্ধাত্রীর চরণে যেন শ্রদ্ধা পাঠিয়ে দিলেন ওরেন বাবু।

ফেরার পথে বাস আটকে গেল রামগড়ের আগেই। প্রবল বর্ষণ নেমেছে পাহাড়ের বুকে। ঘন অন্ধকারে ঢেকে গেছে প্রকৃতি। এত জলে ঘোড়ার খুরের মত আঁকা-বাঁকা পাহাড়ী রাস্তা দিয়ে নামবার সময় ষ্টিয়ারিং ধরে থাকা কষ্টসাধ্য আর টায়ার স্লিপ করার ভয় পদে পদে। বৃষ্টির বেগ কমল, উল্টোদিকের বাস এসে পথের নিরাপত্তা সংবাদ ঘোষণা করল, আমাদের বাস ছাড়ল। টাটা-পাটনা প্যাসেঞ্জার ধরাবার জন্যে বাস ছুটেছিল বিদ্যুদ্বেগে। যে বিপদের সম্ভাবনায় একটু আগেই বাস থামিয়েছিল উৎকণ্ঠিত চালক, সেই বিপদকেই যেন যাত্রীর মত সঙ্গে নিয়ে চলেছিল সে। এক হাত জায়গা পাশে রেখে কালো পিচের রাস্তার ওপর দিয়ে ঝড়ের বেগে অবিরাম ছুটে চলেছিল বাস আর হেড লাইটের আলোয় কালো দানবের মত এক দিকে ভয়ঙ্কর জঙ্গলাকীর্ণ ভূধর আর তার কোলেই আর এক দিকে কয়েক হাজার ফুট নীচু গভীর খাদ চোখে আসছিল।

মনে আনন্দ আর চোখে সন্ত্রাস নিয়ে ষ্টেশনে যখন পৌছুলাম, গাড়ী এসে দাঁড়িয়ে আছে। শুধু একটি মাত্র এক-দাঁড়ি মার্কা কম্পার্টমেণ্ট ছিল রাঁচী রোডের জন্যে। তার দরজা তখনই বন্ধ হয়ে গেছে—সামনে ঝুলছে কাগজ, চারটে বার্থে চারটি আরোহী, নো ভেকান্সী। তা সত্বেও ধাক্কা দিলাম, অন্ধকার ঘর অন্ধকারই রইল ট্রেণ ছাড়ার ঘণ্টা তখন বেজে গেছে। কনডাক্টর গার্ডের কাছে দৌড়ুলাম। রেলের পাশ দেখিয়ে অনুরোধ করলাম সাব, থোড়া কুছ বন্দোবস্ত কিজিয়ে। গার্ড সাহেব ভাবলেন, তার পর বললেন আইয়ে। লেডিজ ফার্ষ্ট ক্লাসের তালা খুলে সাহেব বললেন যাইয়ে ইসমে, লেকিন কোই জানানা আয়ী তো ইসকো ছোড়নে পড়েগা।

কর্ত্তব্যের খাতিরে নিয়মের নির্দ্দেশ জানালেন কনডাক্টর, নীরেট গর্দ্দভের বুদ্ধি নিয়ে আর একান্ত প্রয়োজনীয় সুবিধের বিনিময়ে তার নির্দ্দেশ হজম করলাম আমি সর্ব্বভুক্ ছাগলের মত।

ছুটো লোয়ার আর ছুটো আপার বার্থ নিয়ে লেডিজ ফার্ষ্ট ক্লাশ। সিলিং লাইট ছুটো খারাপ, সব কটা সুইচ নিয়ে নাড়ানাড়ি করবার পর জ্বললো একটা সবুজ 'রিডিং লাইট'। হু-হু করে ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে বর্ষণক্লান্ত ভূধর প্রান্তরের ওপর দিয়ে। জানলার কাচ তুলে দিয়ে কপাট বন্ধ করলাম। ভেতর থেকে ক্যাচার লাগাতে বারণ করেছিলেন কনডাক্টর সাহেব। আপার বার্থে হাওয়াভরা রবার বালিশ নিয়ে শুয়ে পড়লুম। দোলনায় শুয়ে দোল খেতে খেতে তন্দ্রা নেমে এল। কতক্ষণ কেটেছে ঠিক খেয়াল নেই!

তন্দ্রা কেটে গেল এক সময় মানুষের আওয়াজে। বার্থে শুয়েই চোখে পড়ল প্ল্যাটফর্ম্মের সামনেই টিকিটঘরে ওঠার সিঁড়িগুলো, তার পরেই বাইরে যাওয়ার গেট। অতি পরিচিত বোখারো ষ্টেশন।

ঘরের মধ্যে প্যাণ্ট-শার্ট পরিহিত এক পুরুষ ছায়ার মত নড়ে চড়ে বেডিং খুলে বিছিয়ে দিচ্ছেন উলটোদিকের লোয়ার বার্থে। লম্বা করে তোষকের ওপর চাদর ফেলেই তিনি মৃদুস্বরে ডাকলেন 'শকুন্তলা!' অনুমানে বুঝলাম, আমার বার্থের নীচেই বসে আছেন ভদ্রমহিলা—তিনি বোধ হয় ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিলেন, ডাক শুনেই অঞ্চলের প্রান্ত কাঁধের ওপর গুটিয়ে নিয়ে এসে দাঁড়ালেন তিনি। কোনো গ্রীক ভাস্করের খোদাই গ্রীকদেবীর মূর্ত্তির প্রতিটি খাঁজে খাঁজে কে যেন বর্ত্তমান যুগের শুভ্র রেশমী শাড়ী জড়িয়ে দিয়েছে। সবুজ বাতির আবছা আলোয় তাঁর সাদা শাড়ী রঙীন হয়ে যেন চোখে-মুখে হোলির রং মাখিয়ে দিল।

ভদ্রলোকের পায়ের ওপর মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলেন শকুন্তলা দেবী। তাঁর হাত ছুটি টেনে দুহাতে তাঁকে সোজা ভাবে দাঁড় করালেন ভদ্রলোক। পকেটের রুমাল দিয়ে চোখ মুছোতে মুছোতে সান্ত্বনা দিলেন তিনি ছিঃ, কেঁদো না ওমন করে। আর ভাবনা কি লক্ষ্মী, আসছে মাসে আমি নিশ্চয়ই মাইথন যাবো—আর তারপর একদিনও দেরী নয়। বলেই শকুন্তলা দেবীকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেলেন তার কপালে। ট্রেণের হুইসল দিয়ে দিল। শকুন্তলা দেবী আরও ঘনিষ্ঠভাবে তাঁর বক্ষলগ্না হলেন। তাঁর চোখের ভাষায় কি ছিল জানি না। আমি চোখ বুজলুম। ভদ্রলোকটি বাইরে বেরিয়ে গিয়ে দরজা লাগাতে লাগাতে বললেন, ভেতর থেকে দরজার সব ক্যাচার লাগিয়ে দাও। রাস্তায় কেউ ঠেললেও যেন খুলো না। এইবার আমার ঘুমের শেষ আমেজটুকুও কেটে গেছে। অতি পরিচিত কণ্ঠস্বর।

ঘচাং করে ষ্টার্ট দিল পাটনা প্যাসেঞ্জার। পরিচিত মানুষ এগিয়ে এলেন আলোর কাছে। সাদা স্পোর্টস গেঞ্জি আর গ্যাবার্ডিনের প্যাণ্ট পরে দাঁড়িয়ে আছে অরিন্দমদা'। কি আশ্চর্য্য! এতক্ষণ আমার ঘরে রইলেন অরিন্দমদা'। তিনিও আমায় দেখতে পেলেন না, আমিও তাকে বুঝতে পারলাম না! হতভম্ব হয়ে শুয়ে রইলুম ওপরে—নড়াচড়ার কোনো উপায় নেই, শকুন্তলা দেবী কি ভাববেন কে জানে, আর ভয়ে যে চীৎকার করে উঠবেন না, তারই বা ভরসা কি? জানলার কাচে মাথা দিয়ে অনেকক্ষণ বসে বসে চোখের জল মুছলেন শকুন্তলা দেবী। তার পর ঝুপ করে শুয়ে পড়ে চাদরটা টেনে দিলেন বুকের ওপর। বলা বাহুল্য, ক্যাচার লাগাতে একেবারেই ভুলে গেলেন তিনি।

আমার পোড়া চোখ থেকে ঘুম যেন উবে গেছে! 'আপার গণ্ডোয়ানার ওপর দিয়ে ছুটে চলেছে ট্রেণ। প্রকৃতির সঙ্গে নাচছিলেন মহাদেব। নটরাজের অভিশাপে নৃত্যরতা প্রকৃতি যেন হঠাৎ থেমে পাষাণ হয়ে গেছে! মেঘমুক্ত হয়েছে গগন; চাঁদ বেরিয়ে এসেছে আকাশের বুকে। ধাপে ধাপে বিরাট সিঁড়ির মত ভূভাগ উঠে পরিণত হয়েছে পাহাড়ে—সর্ব্বাঙ্গ তার কুঁচোনো ভেড়ার গায়ের মত। পরক্ষণেই নেমে এসেছে সে ভূভাগ একেবারে অতর্কিতে হাজার হাজার ফুট নীচে—তৈরী করেছে খাদ, ঝোরা, নালা। পাহাড়ের মাথায় বসে আছে শঙ্খচূড় সতর্ক প্রহরীর মত। তার নীচে ছোট ছোট ঝুপরীতে কালো কালো মানুষ। আগুনের কুণ্ডলীর পাশে গোল হয়ে মেয়ে-মরদে মাতাল হয়ে নাচছে কোনো দল। নাচের মধ্যেই ক্লান্ত হয়ে মাটির ওপর ঝিমিয়ে পড়েছে কেউ। নেকৃড়ে বাঘ পড়েছে কোথাও। ছোট্ট শিশুকে মায়ের কোল থেকে সতর্কে নিয়ে গেছে এরা ঘন জঙ্গলে। গাছের ওপর থেকে কুণ্ডলী পাকিয়ে সাপ নেমেছে কোথাও—দংশন করে ছুধ পান করেছে এরা বোবা গরুর দেহ থেকে। সবই চলেছে পুরোদমে। আর সেই সঙ্গে ঘর্ঘর করে ঘুরছে চাকা—

কয়লা বেরুচ্ছে অনাদিকালের গণ্ডোয়ানার অন্তর্দেশ থেকে। গোটা গণ্ডোয়ানায় যন্ত্রের আওয়াজ ছিল আগে দু' রকম—এক খনির, আরেক রেলগাড়ীর। আর এখন হয়েছে একশো রকম—কয়লার সঙ্গে লোহা, লোহার সঙ্গে শিল্প, নদীর সঙ্গে বাঁধ, বাঁধের সঙ্গে বিদ্যুৎ। এই যে চমৎকার রজনী—শান্ত, স্নিগ্ধ, মধুর, আর এই যে চমৎকার প্রকৃতি—স্তব্ধ প্রশান্ত, গম্ভীর কেবল এখানে এত আলোড়ন! 'গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ড' যেন জীবন্ত হয়ে মোহিনী মূর্ত্তি ধরে আমার চোখে এসে বসল! শকুন্তলা দেবী পাশ ফিরলেন!

প্রহর এগিয়ে চলল। আমারও পোড়া চোখে ঘুম নেমে এল! রজনীর শেষ প্রহরে ঘুম ভাঙল। চমকে উঠে দেখলাম—চাঁদ ডুবে গেছে, লাল পূর্ব্বগগনে আয়োজন চলেছে সূর্য্যোদয়ের। কোথায় আমার গোমো! গোমো ছেড়ে অন্ততঃ দেড় শো মাইল চলে এসেছি! খানিক আগেই গয়া ছেড়ে এসেছে গাড়ী। তড়াক্ করে লাফিয়ে পড়লাম বার্থ থেকে।

ঘুম ভেঙ্গে গেল শকুন্তলা দেবীর—সটান উঠে বসেই চেনের দিকে হাত বাড়ালেন তিনি। টুথপেষ্ট ফেলে দিয়ে প্রায় চীৎকার করে উঠলাম—একি করছেন শকুন্তলা দেবি! প্রথমে ভীত হয়েছিলেন তিনি; এবার আমার মুখে তাঁর নাম শুনে একেবারে চমকে গেলেন! যা আশা করেছিলাম তাই জিজ্ঞেস করলেন—আপনি কে? এটা লেডিজ কম্পার্টমেণ্ট জানেন না?

বিলক্ষণ জানি। জানি বলেই ত ক্যাচাব না লাগিয়ে চুপচাপ এক কোণে আপার বার্থে মট্‌কা মেরে পড়েছিলাম!

মানে? কোত্থেকে উঠেছেন আপনি?

রাঁচী রোডে।

হ্যাঁ? বোখারোতেও আপনি ওখানে শুয়েছিলেন?

তা আর যাই কোথা বলুন? কনডাক্টর সাহেব অবশ্য বলেছিলেন—কোনো জানানা এলেই গাড়ী ছেড়ে দিতে হ'বে! কিন্তু রেলের কর্মচারী নীরেট গাধা হতে পারে, তা বলে আপনি ত আর অবুঝ নন? আপনিই বলুন, অত রাতে কোথায় যাব?

তাহ'লে আপনি বোখারোতে জেগেছিলেন?

তা' ঘুমিয়েছিলাম বললে ভুল হয়, কারণ গাড়ী যখন ছাড়ে তখন বোখারো ষ্টেশনে অরিন্দমদা'কে প্ল্যাটফর্ম্মের আলোয় দেখতে পাই।

মুখ তুলে ভাল করে তাকালেন এবার শকুন্তলা দেবী আর চাদরটা ঠিক করে জড়িয়ে নিয়ে বললেন,—অরিন্দম দা'! কে অরিন্দম দা'?

ঐ যে, যিনি আপনাকে গাড়ীতে তুলে দিয়ে গেলেন?

কিন্তু তাকে আপনি চিনলেন কি করে?

তিনি যে আমাদের কলেজে পড়তেন। আমি যখন সেকেণ্ড ইয়ারে উঠি উনি তখন পাশ করে বেরিয়ে গেলেন।

এইবার শকুন্তলা দেবী আরও সহজ হলেন। আদেশের সুরে জিজ্ঞেস করলেন—

তা এখানে কি জন্যে আসা হল? ভাববাচোর প্রশ্ন। উত্তর দিলাম কর্ত্তৃবাচো। কলেজ থেকে ক্যাম্প, ক্যাম্প থেকে বোখারো, বোখারো থেকে রাঁচী আর রাঁচী থেকে আজকের প্রত্যূষ পর্য্যন্ত সমস্ত ঘটনা তিনি মন দিয়ে শুনলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন—আচ্ছা, মনোহরও ত ওখানে পড়ে? তার কি খবর?

কে, মনোহর কাপুর? আমি লাফিয়ে উঠলাম। মনের মধ্যে কি রকম এক সন্দেহ হচ্ছিল—তা প্রকাশ করেই বললুম, ও, আপনিই তার দিদি বুঝি? বার্ণপুরে চাকরী করেন?

হ্যাঁ, শকুন্তলা দেবী হাসলেন।

এবার আমাকে নিজের বার্থ ছেড়ে তাঁর বার্থে বসতে হলো। সত্যিই ত সেই এক রকম টান চোখে-মুখে, একরকম হাসি, একরকম কপাল! আমি যে তাঁকে কি বলে আমার আনন্দ জানাবো ভাষা খুঁজে পেলুম না। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মনোহরের সংবাদ নিলেন শকুন্তলাদি'! ডলির প্রসঙ্গও উঠল—এড়াবার চেষ্টা করেও পারলাম না। নিপুণ আইনজীবীর মত জেরা করে সমস্ত বের করে নিলেন তিনি। তারপর বললেন—বুঝেছি, তুমিই হলে তবে শ্রীমান—রায়। তবে তুমি যাই হও না কেন বাপু, আমার মতে তুমি একটি আস্ত গাধা, তা না হলে বরাকরের প্যাসেঞ্জার কখনও গয়া চলে আসে?

গাধা হয়েছিলাম বলেই ত আপনার সঙ্গে আলাপ হল।

হ্যাঁ, আলাপ করাও বেরিয়ে যাবে, যখন বিনা টিকিটে ধরা পড়বে।

হুঁঃ, ধরতে পারলে ত? পাশের রং দেখেই ওরা চলে যায়, ভেতর কেউ পড়ে?

তা না হয় হল, কিন্তু ক্যাম্পে ত অ্যাবসেণ্ট হয়ে যাবে!

না, তাও ম্যানেজ করবো। আগের ষ্টেশন জাহানাবাদেই নেবে পড়বো। সেখান থেকে ডাউন ট্রেনে গোমো, গোমো থেকে বরাকর, সেখান থেকে একবারে ফিরে এসে চাইব পারসেণ্টেজ, বলব, ডাইনিং টেণ্টে ছিলাম রোল কলের সময়।

ঘড়ি দেখলেন শকুন্তলাদি'। বললেন, তা জাহানাবাদ এখনও ঘণ্টা দেড়েক। ফ্লাস্ক খুলে চা বের করলেন শকুন্তলাদি'। কাচের গেলাসে আমায় খানিকটা চা দিয়ে ফ্লাস্কের ঢাকনায় নিজের চা নিলেন। আমি হাঁ করে তাকিয়ে আছি শকুন্তলাদি'র মুখের দিকে। নাক-মুখ চোখ-কপাল পেরিয়ে সীঁথিতে গিয়ে দৃষ্টি আটকে গেল। কি যেন

খুঁজছিলাম সেখানে। না, কিছু নেই সেখানে রং তার একেবারে সাদা।

তবে, তবে কি-ই বা সম্বন্ধ থাকতে পারে অরিন্দমদা'র সঙ্গে! বোকার মত শকুন্তলাদি'কেই জিজ্ঞেস করলাম—আচ্ছা, অরিন্দমদা' আপনাদের কেউ হয়? চায়ের বাটি থেকে মুখ তুললেন শকুন্তলাদি' তার পরই হেসে ফেললেন।

মিঃ ব্যানার্জ্জি! উনি—আর যেন ভাষা পেলেন না তিনি খুঁজে। সঙ্গে সঙ্গে অন্য কথা লাগিয়ে বললেন, কে আবার? আমরা পাঞ্জাবী, ওরা বাঙালী, কোন সম্বন্ধ নেই। শেষের কথাগুলো বলতে গিয়ে কণ্ঠরোধ হয়ে আসছিল শকুন্তলাদি'র। প্রশ্নের উত্তর আমার মোটেই মনঃপূত হ'ল না। আমি আবার বললাম।

কিন্তু এ কি বলছেন শকুন্তলাদি'? মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ যে মানুষের তৈরী সমস্ত গণ্ডীর বাইরে। বলেই আমি রবীন্দ্রনাথের দু' পঙ্‌ক্তি সঙ্গে সঙ্গে যোগ দিলাম।

শকুন্তলাদি' একটু মুচকি হাসি হাসলেন। বললেন, বাঃ তুমি দেখছি সাহিত্যেরও প্রচুর খবর রাখো? আচ্ছা মশায়, বলো ত ঐ পঙ্‌ক্তি দু'টো রবীন্দ্রনাথের কোন কবিতা থেকে নেওয়া হয়েছে?

অত-শত জানি না। মনে এল তাই বলে ফেললুম। শকুন্তলাদি' কবিতাটির নাম বললেন আর যোগ দিলেন, এক সময়ে আমি শান্তিনিকেতনের ছাত্রী ছিলাম, বুঝলে?

কি!

আশ্চর্য্য হচ্ছ? আমার শিক্ষা-দীক্ষা সমস্ত বাংলাতেই। আমি বি, এ, পাশ করেছি, তাও বাংলা অনার্সে।

উঃ, কাপুর তা'হলে আমাকে সমস্তই গোপন করেছিল? লজ্জায় আমি বাইরের দিকে চেয়ে রইলাম। পূবের আকাশ তখন ঘন লাল থেকে পীতাভ হয়ে উঠেছে—অন্তহীন ছটায় উদ্ভাসিত করে রথের লাগাম ধরেছেন আদিত্যদেব। পনেরো বছর আগে ফিরে গেছেন শকুন্তলাদি'!

আগ্রার পি, ডবলু, আই এর ছোট্ট মেয়ে শকুন। লাইনের দু'ধার থেকে ব্যালাষ্ট সরিয়ে মাঝখানে এনে উঁচু করা হচ্ছে, ফিশ প্লেট খুলে তেল ঢালা হচ্ছে বোল্টের গর্ত্তগুলোতে। ছুটো লাইনের জয়েন্টে ফাঁক বন্ধ হয়ে গেছে কোথায়—টেনে টেনে গ্যাপ উন্মুক্ত করে ফিশ-প্লেট পরাচ্ছে গ্যাংম্যান, গেজ-রড নিয়ে দু' লাইনের মাঝখানে পাঁচ ফুট ছ' ইঞ্চি দূরত্ব মাপ করে দেখছে 'কিমান'। ঘট করে পিছনে এসে দাঁড়িয়ে যায় পি, ডবলু, আই সাহেবের ট্রলী। 'মাষ্টার রোল' আসে, 'গেজ' পরীক্ষা আরম্ভ হয় আবার, পোর্টারের সঙ্গে দুপুরের খাবার নিয়ে আসে সাহেবের ছোট্ট মেয়ে শকুন।

চারচাকা ট্রলী মাথায় ছাতা নিয়ে লাইনের বাইরে পড়ে আছে, সামনে লাল ফ্ল্যাগ। কিশোরীর মন চঞ্চল হয়ে উঠে! আবদার ধরে বাপুজীর কাছে, ট্রলী চাপবে সে। ধমক দেন পি, ডবলু আই সাহেব শঙ্করলাল! কিন্তু কী-ম্যান মন রাখে খোকী'র! সাইডিং-এর লাইনে ট্রলী উঠিয়ে শকুন্তলাকে চাপায় কী-ম্যান। প্রথম প্রথম খুব ধমক দিতেন শঙ্করলাল। পরে বিরক্ত হয়ে ওদিকে দেখেও দেখতেন না। সারা দুপুর মেয়ে থাকত লাইনে। ফিরত সন্ধ্যের সময় বাড়ী শঙ্করলালের সঙ্গে। বাড়ী এসে খবর দিত বাবাকে—তিন নং কালভার্টের ফিস-প্লেট আলগা, এগারোর পাঁচ মাইল পোষ্টে লাইনের জয়েন্ট উঁচু হয়ে গেছে, ট্রলী জাম্প করছে! মেয়ের বকবকানি শুনে প্রথম প্রথম বিরক্ত হোতেন শঙ্করলাল। কিন্তু যেদিন দেখলেন তিন নং ক্যালভার্টের ফিশ-প্লেটের বোল্ট থেকে সত্যি নাট খোলা রয়েছে, এগারোর পাঁচ মাইল পোষ্টে ট্রলী সত্যি সত্যিই জাম্প করে উঠল, সেদিন থেকে মেয়ের ওপর বিশ্বাস তাঁর বেড়ে গেল: সুযোগ পেলেই মেয়েকে নিতেন সঙ্গে ইনসপেক্‌শনের সময়। স্লিপার, ব্যালাষ্ট, কটার, ফিশ-প্লেট—প্রথম ভাগের 'অজ-আম' ওর মত মুখস্থ হয়ে গেছে খুকীর। হঠাৎ এক দিন ট্রলী চালাতে চালাতে আধ মাইল চলে এল শকুন্তলা। শঙ্করলাল তখন সারা সপ্তাহের পরিশ্রমের পর দিবানিদ্রা দিচ্ছেন। গ্যাংম্যান কিষণ এসে খবর দিল—পাঁচ নং ট্রলী শেড থেকে পাওয়া যাচ্ছে না। বিছানা থেকে লাফিয়ে পড়লেন শঙ্করলাল, তার পরই চীৎকার করে উঠলেন—শকুন! পাত্তা পেলেন না শকুনের কোথাও।

শকুনকে পেলেন ডি-ঈ-এন, ব্যানার্জ্জি সাহেব। রুটিন ইন্সপেক্সানে বেরিয়েছিলেন নবনিযুক্ত ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনীয়ার মিঃ ব্যানার্জ্জি। আপ, লাইনে মোটর-ট্রলী চালিয়ে আগ্রার দিকে ফিরে আসছিলেন তিনি। ডিসট্যান্ট সিগন্যালের কাছে আসতেই বাঁদিকে চেয়ে দেখলেন, ডাউন লাইনের ওপর পুশ-ট্রলী দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা। দুটো ট্রলীম্যান বসে আছে ট্রলীর ওপর আর সাদা সালোয়ার আর কামিজ-পরা ছোট্ট এক মেয়ে লাইনের ফিশপ্লেটের কাছে উপুড় হয়ে কি দেখছে—তার লম্বা বেণী এসে লুটিয়ে পড়ছে স্লিপারের ওপর। ঘট করে ব্রেক কষলেন মিঃ ব্যানার্জ্জি। ট্রলীম্যান দুটো তখন এক রকম টেনে তুলেছে শকুন্তলাকে। জলদগম্ভীর কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন ডি-ঈ-এন—এ কোন্ হ্যায়? ট্রলীম্যান দুটো তখন ভয়ে কাঁপছে। সোজা হয়ে দাঁড়াল শকুন আর মুখে মুখে জবাব দিল—পি-ডবল্যু-আই শঙ্করলাল সাব কী লড়কী হুঁ! ব্যানার্জ্জি সাহেব যেন একটু অপ্রতিভ হলেন। জিজ্ঞেস করলেন—কি করছিলে এখানে?

ফিশপ্লেটের কাছে লাইনের গ্যাপ দেখছিলাম। এইবার হেসে ফেললেন ব্যানার্জ্জি সাহেব। শকুন্তলা তখনও বলে চলেছে—জয়েন্টের মুখ বন্ধ হয়ে গেছে, ট্রলী জাম্প করছে।

ট্রলীম্যানকে হুকুম দিলেন, ব্যানার্জ্জি সাহেব—আভী ঘর লে যাও ইসকো।

বাড়ীতে এসেই তিনি তলব করলেন শঙ্করলালকে। রাধাকিষণকে প্রণাম করে শঙ্করলাল এসে সেলাম জানালেন ব্যানার্জ্জি সাহেবকে। মিঃ ব্যানার্জ্জি জিজ্ঞেস করলেন—আচ্ছা শঙ্করলাল, ডিউটিফুল ইন্সপেক্টার হিসেবে আপনার ত খুব নাম এ অঞ্চলে। কিন্তু আজ দুপুরে পাঁচ নম্বর ট্রলী কোথায় ছিল জানেন?

মুখ নীচু করে রইলেন পি-ডবল্যু-আই। মিঃ ব্যানার্জি আবার জিজ্ঞেস করলেন—কর্ত্তব্যে যারা অবহেলা করে তাদের কি শাস্তি হওয়া উচিত?

বিবেকের দংশন আর সহ্য হল না শঙ্করলালের। অনাহারে অর্দ্ধাশনে মরণ সে-ও ভালো, তবু বেইমানি করে চাকরী বজায় রাখবে না শঙ্করলাল।

নো স্যার, আপনি আমাকে আজই চার্জ-শীট দিন।

ব্যানার্জি সাহেব পাকা জহুরী—খাঁটী সোনা চিনতে তাঁর এতটুকুও দেরী হয় না!

তাজা ঝরঝরে ও সুন্দর হয়ে উঠুন
হিমালয় বোকের সাহায্যে
এই ঠাণ্ডা এবং স্নিগ্ধ স্নো টি আপনাকে সুরক্ষিত ও সতেজ রাখবে।
হিমালয় বোকে স্নো
Erasmic
HIMALAYA BOUQUET SNOW
হিমালয় বুকে স্নো
এই মোলায়েম সুগন্ধ পাউডারটি দিয়ে আপনার প্রসাধন সম্পূর্ণ করুন আর দেখুন আপনাকে দেখতে কত সুন্দর লাগছে।
হিমালয় বোকে টয়লেট পাউডার
Erasmic
Himalaya Bouquet
TOILET POWDER
MADE IN INDIA FOR ERASMIC-LONDON
HBS. 14-X52 BO
এরাসমিক কোং লিঃ লণ্ডন এর পক্ষে হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড কর্তৃক ভারতে প্রস্তুত।
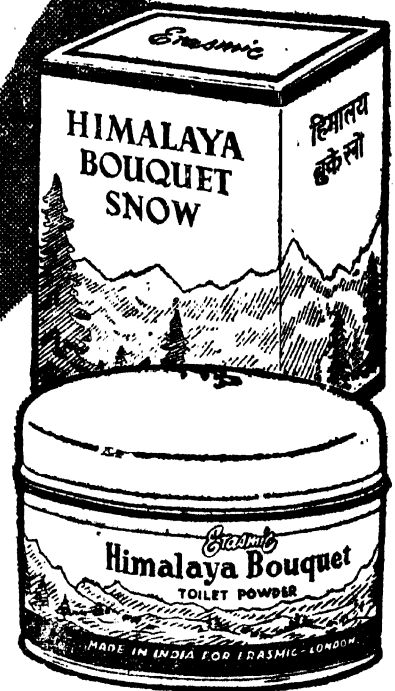
আচ্ছা আপনি এখন আসতে পারেন! তবে হ্যাঁ আপনাকে কিছু চার্জ দেবার আগে আপনার মেয়েকেও একবার দেখা উচিত। তাকে একবার পাঠিয়ে দেবেন আমার কাছে।

পরের দিনই এলো শকুন্তলা। ব্যানার্জি সাহেব জিজ্ঞেস করলেন—কুছ পড়তী হ্যায়?

নেহী।

কাঁহে?

আচ্ছা নেই লাগতা।

পড়তে একটুও ভালো লাগে না তোমার?

ব্যানার্জি সাহেব চশমা লাগালেন চোখে। ইধার আও,—খুকী কাছে গেল! ভালো করে তাকালেন ব্যানার্জি সাহেব শকুন্তলার দিকে! হঠাৎ তাঁর চোখ দুটো ছলছল করে উঠল। ঠিক এরকম জেদ আর এরকম মুখ ছিল না তাঁর মিতার! শুধু পাঁচটি বছর বেঁচে ছিল সে, ছেলে হওয়ার চার বছর বাদেই জন্মেছিস ঐ একটি মাত্র মেয়ে। ব্যানার্জি সাহেব তার চোখে-মুখে হাত বোলাতে লাগলেন।

মা, তুমি আমার কাছে পড়বে? খুকী তখন এত ভালো বাংলা বোঝে না, ভারী সুন্দর লাগল তার।

বলল—আচ্ছা।

ওদিকে রেগে গেল ডি, ঈ, এন সাহেবের একমাত্র ছেলে মাষ্টার অরিণ। পরের দিন পড়ার ঘরে ঢুকেই সে দেখল দরজার দিকে পিছন করে তার চেয়ারে বসে প্রথম ভাগ পড়ছে একটা ছোট্ট মেয়ে। তার বেণী ধরে টেনে তুলে জিজ্ঞেস করল—কে তুই? শকুন চীৎকার করে উঠল।

শাঁকচুন্নীর মত চেঁচাচ্ছিস কেন?

তুমি আমায় মারছ কেন?

বেশ করছি, তুই কে?

আমি পি, ডবলু, আই, সাহেবের মেয়ে।

কিন্তু তুমি কে?

সে কথার উত্তর দিল না মাষ্টার ব্যানার্জি! মাথায় এক গাঁট্টা দিয়ে বলল—ও তুই-ই সেই গ্যাম্যান মেয়েটা!

শকুন্তলা দেবী হেসে ফেললেন!

ডি, ঈ, এন সাহেবের ছেলেকে ছোট সাহেব বলতুম আমি। ব্যানার্জি সাহেবের মোটর ট্রলীর কাছে গিয়ে ছোট সাহেবকে বলতুম—চাপাও না একবার। ক্ষেপে উঠত ছোট সাহেব। রেগে বেণী ধরে টেনে বলত—দেখ, এখানে তুই পড়তে এসেছিস। দিন-রাত ট্রলী ট্রলী করবি ত ঘরে চাবি দিয়ে রাখবো। আমার রাগ হত। পিছু ফিরেই দৌড়তাম বাড়ীর দিকে। ছোট সাহেবও দৌড়ুত পিছু পিছু। তা' ছোট সাহেবের সঙ্গে পারবো কেন? আমার হাত দুটো ধরে ঝাঁকানি দিয়ে বলতো—চল, পড়বি চল, বলচি! দুম দুম করে বুকে কয়েকটা কিল বসিয়ে দিতাম আমি। ছোট সাহেব চোখ দুটো বড় বড় করে হাঁ করে তাকিয়ে থাকত আমার দিকে। আমি হু হু করে কেঁদে ফেলতাম! সেই ছোট সাহেব যখন ম্যাট্রিক পাশ করে কলেজে পড়বার জন্যে আদ্রা ছাড়ল, আমি তখন ক্লাস সেভেনে, ছোট সাহেব বলল, আমি এবার কলকাতার কলেজে পড়বো; শকুন, তুই যাবি? বলেই এক কোঁচড় কালোজাম আর পেয়ারা আমার কোলে ঢেলে দিল। ছোট সাহেব চলে যাবে শুনেই সমস্ত বিস্বাদ লাগল আমার! ফলগুলো সব মাটিতে ফেলে দিয়ে দু'হাতে চোখ ঢাকা দিয়ে কেঁদে ফেললাম।

দুজনে বোধ হয় সেই থেকে সারা দিন-রাত কেঁদেছি। ছোট সাহেবকে না দেখে একদিনও থাকা ছিল আমার পক্ষে অসম্ভব! সেই ছোট সাহেব আই, এস-সি পড়ল, ইনজিনিয়ারিং পড়ল, বোকারোয় এসে চাকরী আরম্ভ করল, কিন্তু এখনও—এখনও সেই পুরোনো দিনের মত তার সঙ্গে থাকতে পারলুম না।

বাষ্পরুদ্ধ হয়ে এল শকুন্তলাদি'র কণ্ঠ, শাড়ীর আঁচলে চোখ রগড়াতে লাগলেন তিনি।

দুঃখ করছেন কেন শকুন্তলাদি'! উনি ত মাইথনে আসছেনই বদলি হয়ে—আর ত ক'টা দিন।

শকুন্তলা দেবী আবার হেসে উঠলেন। কিন্তু তুমি এ সব জানলে কি করে?

আমি সব শুনেছি।

গাড়ীর বেগ কমে এল।

আমার সুটকেশটা হাতে দিয়ে বললেন,—যাও, নেবে যাও, ঐ তোমার ডাউন গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে।

জাহানাবাদে নেমে পড়লাম।

গয়ার ট্রেণ চলতে সুরু করেছে। বাইরের দিকে চেয়ে তখনও যেন দেখতে পাচ্ছি—অরিন্দমদা' চলেছে—হাতে তার ছোট্ট কৃষ্ণ চর্মপেটিকা, পাশে তার তন্বী শ্যামা শিখরিদশনা—অরিন্দমদা'র সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তিনিও চলেছেন—প্রভাতের রবি যেন আবীর ছড়িয়ে দিয়েছে তাঁর শুভ্র সীমন্তে। [ক্রমশঃ।

বেদনাময়ী

সন্তোষ চক্রবর্তী

তুমি ব'লেছিলে: 'বেদনা সবার ভালো'
কাছে থেকে চোখ চেয়ে,
সেই চোখে কাঁপে আকাশপুরীর আলো
ঠিক্‌রিয়ে প'ড়ে ঝ'রেছে কপোল বেয়ে।

তুমি ব'লেছিলে: 'বেদনা ত' ভালো নয়'
দূরে চ'লে যাবো জেনে,
সেই চোখে কাঁপে পাতালপুরীর ভয়
একটি নিমেষে ফেলেছে হৃদয় ভেঙে।

প্রশান্ত চৌধুরী

৪

সবেমাত্র ভাঙলো প্রথম দিনের প্লে। জুপিটার থিয়েটারের গেট-এ লাগানো ফুলের ছড় আর মালা তখন শুকিয়ে এসেছে। চায়ের দোকানের হরি বাবু তখন খুচরো আনি-দুয়ানি-পয়সাকে এক টাকার থাক করে করে সাজাচ্ছেন। চায়ের ভাঁড় আর সরবৎ চুষে খাওয়ার কাগজের সরু সরু নল ছড়িয়ে পড়ে আছে যাওয়া-আসার পথের হেথায়-হোথায়। গেটকীপাররা প্রেক্ষাগৃহের সব ক'টা দরজা খুলে দিয়েছেন! দর্শকরা বেরোচ্ছেন গুঞ্জন করতে করতে।

শেষ অঙ্কের শেষ দৃশ্যের অভিনয় শেষ করেই ষ্টেজের সিঁড়ি দিয়ে উঠে নিচের মেক-আপরুমের ভিতর দিকের যে দরজাটা খুলে একটা সরু গলিপথ দিয়ে সামনের ছাদে যাওয়া যায়, সেই দরজা দিয়ে একা পালিয়ে এসে ছাদে এসে দাঁড়িয়েছি। মেক-আপ না তুলেই। পরচুল না খুলেই। অন্ধকার ছাদে। একটা গ্যালভানাইজড় লোহার ট্রাঙ্ক আছে মস্ত। তা থেকে অনেকগুলো পাইপ ছাদ ফুঁড়ে নিচে নেমে গেছে। পুরোনো ছাদ পিচ আর কাঁকর দিয়ে মেরামত করা হয়েছে, তাই মেঝেটা অসমতল। এক ধারে জড়ো করা আছে থিয়েটারের পুরোনো অব্যবহার্য্য সেট-সেটিং-এর কাঠের ফ্রেম আর ছিঁড়ে-যাওয়া রঙ-লাগা চট। এক ধারে পড়ে আছে একটা রঙ-ওঠা কাঠের সিংহাসন।

জুপিটার থিয়েটারের অনাদৃত রাজসিংহাসন।

একদিন হয়তো ঐ সিংহাসনের পাশে দাঁড়িয়ে ক্ষীরোদপ্রসাদের ভীষ্ম সমস্ত প্রজাপুঞ্জ এবং দাসরাজ ও দাসরাণীকে বিস্মিত করে দিয়ে গম্ভীর উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন।

> শুন দাস প্রতিজ্ঞা আমার—
> আজি হতে করিলাম ব্রহ্মচর্য সার।
> আজি হতে ধরণীর সমস্ত রমণী
> আমার জননী। আজি হতে পুরুবংশে
> যে হইবে রাজা, আমি তাঁর প্রজা।

হয়তো গিরিশচন্দ্রের সিরাজউদ্দৌল্লা ঐ সিংহাসন থেকে কাতর অনুনয় জানিয়েছেন মীরজাফর-জগৎশেঠদের কাছে,—ঐ সিংহাসনে বসে নীরবে পুত্রশোকাতুরা বীরাঙ্গনা জনার তীব্র ধিক্কার সহ্য করেছেন রাজা নীলধ্বজ,—ঐ সিংহাসনে বসে দ্বিজেন্দ্রলালের ঔরঙ্গজিব কূট কৌশলে ব্যর্থ করে দিয়েছেন জাহান-আরার সকল প্রচেষ্টা,—ঐ সিংহাসন থেকে গড়িয়ে পড়েছে জাহান্দার শা'র প্রাণহীন দেহ সম্রাট ফাররুকশিয়রের পথ নিষ্কণ্টক করে দিতে,—ঐ সিংহাসনে রামচন্দ্রের কাষ্ঠপাদুকা স্থাপন করে ত্যাগিশ্রেষ্ঠ ভরত করেছেন অযোধ্যা পালন,—ঐ সিংহাসনে বসে ইংরেজ বণিকের কুর্নিস গ্রহণ করেছেন শাহানসা শাজাহান। ঐ সিংহাসনকে কেন্দ্র করে অভিনীত হয়েছে কত ঐতিহাসিক আর পৌরাণিক নাটকের কত অবিস্মরণীয় দৃশ্য!

আজ সেই বহু নাটকের স্মৃতিমণ্ডিত সিংহাসন হৃতগৌরব হয়ে পড়ে আছে এখানে, লোকচক্ষুর অন্তরালে।

পরিত্যক্ত ছাদের মাঝখানে একা দাঁড়িয়ে তাকালুম মাথার উপরকার আকাশের দিকে। নির্মেঘ নক্ষত্রখচিত আকাশ। জগৎ জোড়া কোন বিরাট রঙ্গমঞ্চের পাদপ্রদীপের কাঁপা আলোর মতো জ্বলছে লক্ষ লক্ষ তারা। একটা লোহার সিঁড়ি এ ছাদ থেকে ওপরের অনেক উঁচু কোন ছাদের দিকে ঘুরে ঘুরে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে উঠে গেছে। উন্নতির পথ। যশের সোপান।

এই সিঁড়ি দিয়ে একদিন ওপরে উঠেছিলেন যাঁরা, তাঁরাই একদিন রঙ্গমঞ্চে ব্যবহার করেছেন ঐ সিংহাসন। সে সিংহাসন আজ আবর্জনার স্তূপে নিক্ষিপ্ত। আর তাঁরা? কোথায় তাঁরা? কে তাঁরা? 'দেহপট সনে নট সকলি হারায়।'

পাঁচিলের ধারে এসে দাঁড়ালুম। চোখে পড়ল একটা বাড়ীর পিছন দিক। ভাঙ্গা ট্যাঙ্কের সদা প্রবাহিত জলধারা বাড়ীর ইট বের-করা দেওয়ালটাকে শুধু শ্যাওলার আস্তরণে মণ্ডিত করেই ক্ষান্ত হয়নি, ভাঙ্গা কার্নিশের অশ্বত্থ গাছের চারাটাকেই নিয়ত জলসেচনে পুষ্ট করে তুলেছে।

সাবেকী বাড়ী। মস্ত মস্ত জানালা। অনেক জানালা। তারই ভিতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে এ বাড়ীর বিভিন্ন ভাবাভাবী বাসিন্দাদের। একটি ঘরে একটি চীনা রমণী কাগজের প্যাকেটে সলটেড বাদাম ভরছে। ওপাশে তারই ছোট্ট ছেলেটি একটা বাঁশের চেয়ারে বসে কাঠি দিয়ে ভাত তুলে তুলে খাচ্ছে একটা নক্সাকাটা সস্তাদরের পোর্সিলেনের বাটি থেকে। আর একঘরে শীর্ণা জননী তাঁর শীর্ণতর ক্রন্দনশীল শিশুপুত্রটিকে শান্ত করতে না পেরে নির্দয়ভাবে ঠেঙ্গিয়ে চলেছেন। ছেলেটির কান্নার শব্দে কিংবা জননীর প্রহারের শব্দে ঘুম ভেঙ্গে উঠে ড্যাব-ড্যাব করে চেয়ে আছে শিশুর স্বাস্থ্যহীন দাদা-দিদির দল। নিচের একটা ঘর

থেকে শোনা যাচ্ছে একটি মাতালের অসংলগ্ন অশ্লীল প্রলাপ, সব কথার অর্থ না বুঝতে পারলেও বেশ বোঝা যাচ্ছে ভাষাটা হিন্দী। অন্য একটা ঘরে এক পাঞ্জাবী ছুতোর-মিস্ত্রি কেরোসিন ল্যাম্পের অস্পষ্ট আলোয় র‍্যাঁদা চালাচ্ছে কাঠের ওপর এই রাতে। তাকে সাহায্য করছে যে, নিশ্চয়ই স্ত্রী সে তার। সারাদিন খাটাখাটুনির পর কুড়িয়ে-আনা টুকরো কাঠকে চেঁচে-ছুলে তৈরী করছে হয়তো নিজের ঘরের আসবাব। হয়তো অনাগত একটি শিশুর জন্যে তৈরী হচ্ছে কাঠের দোলনা।

প্রত্যেকটি জানালায় চলেছে একটি মূল নাটকের বিভিন্ন দৃশ্যের অভিনয়। সে নাটকের নাম দারিদ্র্য।

: স্যার !

চমকে পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখি অমূল্য বাবু। তার পিছনে পরিচালক এবং তারও পিছনে জুপিটার থিয়েটারের মালিক শ্রীহৃদয়রাম কোঙার।

ক্রমে ক্রমে আরো অনেকে।

সকলের মিলিত প্রশংসার বন্যায় ভাসতে ভাসতে কখন যে ছাদ পেরিয়ে, সেই অন্ধকার গলিপথ পেরিয়ে, নিজের সাজঘরে এসে পৌঁছে গেছি! কখন যে পরিচালক করে গেছেন করমর্দন, হৃদয়রাম কোঙার জানিয়ে গেছেন হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা, ড্রেস'র বিজয় করে গেছে প্রণাম, সিফটার ব্যাচের নিত্যানন্দ, আলোর কর্তা মিলন বাবু, কনসার্ট পার্টির বেহালাদার বুড়ো শিব বাবু সবাই সাফল্যের আনন্দে উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন জানিয়ে বিদায় নিয়ে গেছেন, টেরই পাইনি কিছুই। মনটা কোন সুদূরে ভেসে চলে গিয়েছিল! হাতঘড়ির কাঁটাটা গিয়েছিল পিছিয়ে। সেকেণ্ড মিনিট ঘণ্টা'র বেড়া ডিঙ্গিয়ে আরো অনেক অনেক পিছনে।

উনিশশো চৌত্রিশ সাল বুঝি। বিহারে ভীষণ ভূমিকম্প হয়ে গেছে। পাড়ায় পাড়ায় ঠেলাগাড়ীতে হারমোনিয়ম নিয়ে গান বেরিয়েছে,—'ভিক্ষা দাও গো পুরবাসী।' ছাদ থেকে বারান্দা থেকে জানলা থেকে পুরোনো ধুতি-শাড়ী-জামা পড়ছে গানের দলের টান-কোরে-পাতা দু'-পাট-করা শাড়ীর উপর। পড়ছে টাকা-পয়সা-আনি-দুআনি। আমাদের গৃহশিক্ষক অনিল বাবু এক পুঁটলি কাপড়-জামা আর কিছু টাকা সংগ্রহ কোরে নিজেই ছুটে গেছেন বিহারে। থমথম করছে সারা কলকাতা।

কাকাদের সাঁতারের ক্লাব থেকে ঠিক হল টাকা তোলা হবে। কি কোরে? না, চ্যারিটি পারফরম্যান্স কোরে। কি পারফরম্যান্স হবে? না, নাটক হবে। কারা করবে? কি নাটক হবে? সাঁতারের ক্লাবের কাকাদের বন্ধুরা সবাই বললেন,—সে জানে সেজদা'।

অর্থাৎ বাবা।

বাবা বললেন,—নাটক তবে ডি, এল, রায়ের 'পুনর্জন্ম' আর ভুপেন বাঁড়ুজ্যের 'বেজায় রগড়'। আর প্লে করবে কারা? না, বিচিত্রা বয়েজ ক্লাব।

ঠিকানা কি সে ক্লাবের? মেম্বার কারা?

মেম্বার আমরা। অর্থাৎ আমরা খুড়তুতো, জ্যাঠতুতো আর পিসতুতোয় মিলিয়ে সাত ভাই, আর পাড়ার সমবয়সী বন্ধু পাঁচ জন। বয়েস তের থেকে দশ। ঠিকানা? আমাদেরই সাবেকী বাড়ি ছাগলের ঘরের পিছনের উঠোন।

ক্লাব নতুন নয়। মাস আষ্টেক হল পত্তন হয়েছে। পাড়ার রজনী বাবুর রবারষ্ট্যাম্পের দোকান থেকে বারো আনা দিয়ে আধ এক রবারের আলগা ইংরিজি টাইপ কিনে এনেছে কাকী। সেই টাইপ সাজিয়ে ক্লাবের নামে প্যাড ছাপিয়েছি বালির কাগজের রাফখাতার পাতা ছিঁড়ে। এগজামিনের পর বড়দিনের ছুটিতে আমরা তিনতলার দালানে ষ্টেজ খাটিয়ে প্লে করেছি অসিত হালদারের লেখা 'রাজা সাজা'। দিস্তে দিস্তে কাগজ আঠা দিয়ে জুড়ে জুড়ে পুরুষোত্তমের দিয়ে দু-আনার দোল খেলবার চার রকম গুঁড়ো রং আনিয়ে বাবার ছবি আঁকবার তুলি দিয়ে নিজেরা ছবি এঁকে তৈরী করেছি সীন। বাড়ীর পাশের বস্তির বক্‌সিমশাই তাঁর মেরি আর্ট কটেজ থেকে বিনিপয়সায় সাপ্লাই করেছেন রাজাদের ঝক্‌মকে পোশাক আর ঢাল-তলোয়ার তীর ধনুক। আমাদের সে প্লে দেখে শুধু আড়াই বছরের ছোট বোন শৈলী ছাড়া, মা, জ্যাঠাইমা, কাকী, পিসিরা সবাই বাহবা-বাহবা করেছেন। কিন্তু আমাদের সে প্লে যে বাবাও কোন ফাঁকে উঁকি দিয়ে দেখে গিয়েছিলেন, তা কি ছাই জানতেও পেরেছিলুম আগে?

তখন এম-এ ক্লাসের কিসের সব বুঝি খাতা এসে জমেছিল বাবার খাটের ওপর। লাল-নীল পেন্সিল দিয়ে কি সব নম্বর লিখছিলেন ক'দিন থেকে। সে সব এক পাশে সরিয়ে রেখে সুরু হল 'পুনর্জন্ম' আর 'বেজায় রগড়' বইয়ের পাতায় কাটাকুটি করা।

কেটে-কুটে বই দুটোকে আমাদের অভিনয়ের উপযোগী করে নিয়ে সুরু করে দিলেন রিহার্সাল। সিকদার বাগানের যাত্রাদলের কর্তা বাবু, ভোমলা বাবু আর খুনু বাবু মেজদার বন্ধু লোক। তবলা, বেহালা আর হারমোনিয়ম নিয়ে লেগে গেলেন তাঁরা গানের সুর তুলতে। সে এক হৈ-হৈ ব্যাপার!

প্লে হল হ্যারিসন রোডের লোহিয়া বিল্ডিং-এর একতলার হলঘরে। দস্তুরমতো সত্যিকারের স্টেজ খাটিয়ে। হুইসিল-এর আওয়াজে সরসর কোরে চেরা পর্দা এসে পড়ল,—দৃশ্যে দৃশ্যে এক সিন গুটিয়ে অন্য সিন নেমে এল চক্ষের পলকে!

বাবা একাধারে পরিচালক, অভিনয়-শিক্ষক, প্রমটার এবং মেক্-আপ-ম্যান। আর ড্রেসার ছিলেন মা।

সেদিন প্লের শেষে আদর, আশীর্বাদ, বাহবা, চকোলেট, লজেন্স আর মেডেল-এ বোঝাই হয়ে গিয়েছিল আমাদের সাজঘর। সে কী আনন্দ! সে কী ভরপুর মন! সে কী ফুর্তি!

: স্যার, এই যে নারকেল তেল।

বিজয় নারকেল তেলের শিশিটা শব্দ কোরে টেবিলের উপর রাখতেই ঘড়ির কাঁটা এক লহমায় ফিরে এল আবার ঠিক জায়গায়। রাত সাড়ে দশটা।

সাজঘর ফাঁকা। শুধু বিজয় পোশাক গুছোচ্ছে। ওপরের বারোয়ারী সাজঘর থেকে আসছে নানা কণ্ঠের অস্পষ্ট কলরব। নিচে মেয়েদের সাজঘর থেকেও আসছে কলধ্বনি। ও-ধারে ম্যানেজারের ঘরে চলেছে গুঞ্জন। একটা চাদর পাট করতে করতে বিজয়ও নেমে গেলো নিচে।

নারকেল তেলটা ঢাললুম হাতে। মেক্-আপ ওঠাতে হবে।

বাইরের দিকের ভেজানো দরজাটায় আলতো ঠেলা পড়ল যেন কার!

: ডাক্তার আছো?

: কে?

দরজা ঠেলে ভিতরে প্রবেশ করলেন একটি শীর্ণকায় বৃদ্ধ। কপালের ওপরে এ্যালবোট-তোলা সাদা ধবধবে চুল, সাদা ঝোলা গোঁফের প্রান্তদ্বয় সযত্নে মোম দিয়ে পাকানো, গলায় পাকানো উড়ুনি, গায়ে সাদা লংক্লথের ডবল কফ দেওয়া ফলস-কলার সার্ট, পরনে চুনুট করা জালজ্যালে জরিপাড় ধুতি, পায়ে দু-কোণে ইলাষ্টিক দেওয়া কালো এ্যালবোট জুতো, হাতে গোমেদের একটি ঢিলে আংটি। মূর্তিমান **anachronism**!

মনে হল, ১৮৯৭ সালের একটি মানুষ বুঝি পথ ভুল কোরে এসে দাঁড়িয়েছেন আমার সামনে!

: বড় আনন্দ দিয়েছ তুমি আজ ডাক্তার! ভদ্রলোক বসলেন একটা চেয়ারে। নাটকে আমার ডাক্তারের পার্ট ছিল।

: আমার নাম বনোয়ারীলাল দত্ত। তোমাদের ঐ হৃদয়রাম চেনে আমাকে। ঐ যে তোমাদের কনসার্টের বেহালাদার বুড়ো শিবু আড্ডি? ওকে জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারবে আমার পরিচয়। বড় নাড়া দিয়েছ বাবা এই বুকখানায়। তা বাবা, এখন না আছে আমার হাতের নোয়া, না আছে সিঁথের সিঁদুর, তাই এই, এই সামান্য কিছু এনেছি তোমার জন্যে।

বৃদ্ধের একটি হাত জামার তলায় লুকোনো ছিল এতক্ষণ। সেটি বের করে ধরলেন আমার সামনে। একটি শালপাতার ঠোঙায় খান আষ্টেক গুঁজিয়া।

ঠোঙাটিকে টেবিলের উপর নামিয়ে রেখে বৃদ্ধ বললেন: আজ আসি বাবা, অনেক রাত হল। বড় আনন্দ দিলে বাবা! বেঁচে থাকো। বড় হও।

বিড়-বিড় করতে করতে যেমন হঠাৎ এসেছিলেন, তেমনি হঠাৎ চলে গেলেন ভদ্রলোক, দরজাটি সন্তর্পণে ভেজিয়ে দিয়ে। মাথায় ছিট আছে নির্ঘাৎ। ওধার থেকে বিজয় এসে ঢুকল।

: এখনো মেক্-আপ তোলেন নি স্যার?

হাতের নারকেল তেলটা মুখে ঘষতে সুরু কোরে বললুম: আচ্ছা, বনোয়ারীলাল দত্ত বলে কাউকে চেনো বিজয়?

শুনেই সম্ভ্রমে যেন শিউরে উঠল বিজয়।

: ওরেব্‌, বাবা! ওঁকে চেনে না কে?

ঘুরে বসলুম।

: মানে?

আমার মাথার চুলে জল স্প্রে কোরে দিয়ে চেয়ারের পিছনে দাঁড়িয়ে মাথা ঘষে দিতে দিতে বিজয় বললে: সেই আঠারোশো ছিয়ানব্বই সালে কালাপাহাড় নাটকে চিন্তামণি বাবাজী আর লেটো সেজে গিরিশ বাবু আর দানী বাবু দুই বাপ-ব্যাটায় যখন হাত ধরাধরি করে নেচেছেন ষ্টেজের ওপর, উনি সেই তখনকার দর্শক। শুনেছি, কলকাতায় হেন থিয়েটার হয়নি, যা উনি দ্যাখেন নি স্যার!

: আচ্ছা।

: হ্যাঁ স্যার! মস্ত বনেদী ঘরের ছেলে। শুনেছি, চিৎপুরের রাস্তা দিয়ে ব্রুহাম্ গাড়ী হাঁকিয়ে যেতেন সন্ধ্যেবেলা, বাঁহাতে বেলফুলের মালা জড়িয়ে। আর, থিয়েটারের দিন একটা না একটা থিয়েটারের বক্সে উনি থাকতেনই থাকতেন। এর আর নড়চড় হত না। নিজের ছিল সখের যাত্রাদল। নৌকোয় গঙ্গা দিয়ে একেবারে সটান্ কাশী-বিশ্বনাথে পর্যন্ত গিয়ে যাত্রার পালা গেয়ে এসেছেন। থিয়েটারের মস্ত সমঝদার স্যার! ঐ যে রুবী থিয়েটারের বেচু বাবু, নৃপেন বাবু, জগদিন্দ্র বাবু, বাণী থিয়েটারের নীলু বাবু, সুধীর লাহিড়ী, কেশব চৌধুরী,—সব তো ওঁরই যাত্রাদলে ছিলেন এক কালে। ওঁরই হাতে গড়া। শুনেছি, থিয়েটার দেখে কারুর পার্ট ভাল লাগলে, কাঠের বারকোশে এক বারকোশ সন্দেশ পাঠাতেন তাকে।

তাকালুম একবার শালপাতার ঠোঙাটার দিকে।—আটখানি গুঁজিয়া!

বিজয় বলেই চলেছে: এখন আর কিছুই নেই স্যার। আহীরিটোলার ওদিকে কোন একটা কাঠের গোলার পেছনে খান দুই ঘর নিয়ে কষ্টেসৃষ্টে থাকেন। এখনও কিন্তু যে থিয়েটারেই যান, খাতির কোরে বসায় সবাই। পয়সা দিয়ে টিকিট কেনবার পয়সাও নেই; কেনবার দরকারও হয় না।

বৃদ্ধের কথাগুলোর এতক্ষণে অর্থ খুঁজে পেলুম,—'তা এখন বাবা

না আছে হাতের নোয়া, না আছে সীঁথির সিঁদুর। তাই এই, এই সামান্য এই এনেছি তোমার জন্যে।'

তুলে নিলুম সেই শালপাতার ঠোঙা। গর্বে আনন্দে ভরে উঠেছে বুক। শ্রদ্ধার সঙ্গে দুখানা গুঁজিয়া তুলে মুখে ফেলে বললুম: এক গ্লাস জল দিও তো বিজয়!

: আবার এলুম ডাক্তার!

হন্তদন্ত হয়ে ঢুকলেন আবার বৃদ্ধ বনোয়ারীলাল দত্ত। সিঁড়ি ভেঙ্গে হাঁপাচ্ছেন।

: ভুলে হাতের লাঠিটা ফেলে গিয়েছিলুম।

লাঠিটা নিয়ে তেমনি হন্তদন্ত হয়ে চলে যাচ্ছিলেন, এবার উঠে পথরোধ করে দাঁড়ালুম।

: নমস্কার জানাতে ভুলে গিয়েছিলুম তখন। ক্ষমা করবেন।

নমস্কার নেবেন না কিছুতেই। পুরোনো মন।

: শুনেছি ব্রাহ্মণ তুমি। ছি ছি নমস্কার করবে কি? পাপ হবে যে আমার!

গায়ের জোরে পারলেন না। নমস্কারটা সেরে নিয়ে বললুম, আসবেন দয়া করে মাঝে মাঝে। বয়সে অভিজ্ঞতায় সমঝদারিত্বে অনেক বড় আপনি। অনভিজ্ঞ নতুন আমরা,—আপনার কাছ থেকে আমরা শুনতে চাই, জানতে চাই, শিখতে চাই।

ঘোলাটে চোখ দুটো ছলছল করে উঠল বৃদ্ধের। আমার কাঁধে সস্নেহে হাত রেখে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বিড়-বিড় করে বললেন: এম্যারেল্ড—ক্ল্যাসিক—মনোমোহন,—নতুন রাস্তা তৈরির জন্যে সেই থিয়েটারের বাড়ী ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে যেদিন রাবিশ কোরে ফেলে দেওয়া হল, আমরাও সেদিন থেকে ঐ রাবিশ-এর সামিল হয়ে গেছি ডাক্তার! দাম কি আমাদের অভিজ্ঞতার? আমরা চিৎপুরের সরু রাস্তায় বর্মি পনিতে টানা ফিটনে চলতুম; তোমরা চওড়া কংক্রীটের রাস্তায় ছুটেছ পেট্রল-টানা মোটরগাড়ীতে বিদ্যুদ্বেগে। আমাদের কাছে আবার জানবার কি আছে? তোমরা অনেক জানো, অনেক শিখেছ।

বললুম: ও কথার আমি ভুলছি না। আসবেন বলুন মাঝে মাঝে? বলে দেবেন কোথায় ভুল ত্রুটি হচ্ছে?

: আসবো, আসবো ডাক্তার।

বেশ টের পেলুম আনন্দে কেঁপে কেঁপে উঠছে বৃদ্ধের কণ্ঠ।

: নিশ্চয়ই আসবো, নিশ্চয়ই আসবো।

: পুরোনো দিনের কথা সব শোনাতে হবে কিন্তু।

: পুরোনো দিন?—পুরোনো দিন?—আচ্ছা, আজ চলি বাবা,—তোমার রাত হয়ে যাচ্ছে অনেক। চলি আজ।

কতোকালের সব স্মৃতি যেন সাবেকী নরম বালাপোষের মতো উষ্ণ-আরামে জড়িয়ে ফেলেছে তখন বৃদ্ধের সর্বশরীর। সেই সুখাবেশ নিয়ে বীর পদে বেরিয়ে গেল বেনোয়ারীলাল দত্ত।

ততক্ষণে আমার মেক্-আপ তোলা হয়ে গেছে। চুল আঁচড়ে কাপড় ছেড়ে পাঞ্জাবীটা মাথায় গলাচ্ছি, এমন সময় স্টেজের দু'দিকের উইংস দিয়ে একসঙ্গে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী নায়কের মতো আমার সাজঘরের দু'দিকের দরজা দিয়ে একসঙ্গে এক মুহূর্তে ঢুকল শিশির এবং ম্যানেজার সাহেব।

শিশিরের ডায়ালগ শুরু হবার আগে ম্যানেজার সাহেব তাঁর মোটা সোলের ফিতে-বাঁধা জুতোর মসমস শব্দ তুলে আমার দিকে এগিয়ে এসে পাঞ্জাবীর হাতায় অর্দ্ধেকটা গলানো আমার ডান হাতে প্রবল ঝাঁকুনি দিয়ে মিলিটারী কায়দায় করমর্দন করে বললেন,—'কনসোলেশন! কনসোলেশন!'—তারপর আর দ্বিতীয় কথাটি না বলে কোন প্রয়োজনীয়তর কর্তব্য সম্পাদনের জন্য ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

হতভম্ব হয়ে গেছি!

শিশির পাশে এসে মুচকি হেসে বললে: শুধু কি মুখের বাক্য শুনেছ দেবতা? শোন নি কি ম্যানেজারের অন্তরের কথা?

বললুম: কী সেটা?

শিশির বললে: কনগ্র্যাচুলেশন!

৫

দ্বিতীয় অভিনয় রজনী।

নিজের গোঁফ বাঁচিয়ে অতি সন্তর্পণে তুলি দিয়ে স্পিরিট-গাম লাগিয়ে কাঁচা-পাকা ক্রেপের নকল-গোঁফ আঁটছি। ঢাকা দিচ্ছি নিজের গোঁফ। ঢাকা দিচ্ছি নিজেকে। স্পিরিট-গামের গন্ধটা নাকে লাগছে।

চাইনিজ ইঙ্কের গন্ধটা লাগছে নাকে।

বাবা ছবি আঁকবার চাইনিজ ইঙ্ক দিয়ে গোঁফ এঁকে দিচ্ছেন আমার বারো বছরের রোমহীন ঠোঁটের ওপর, গন্ধটা তারই। সুড়সুড়ি লাগছে ঠোঁটে তুলির স্পর্শে। হাঁচি আসছে। ঠোঁট বেঁকিয়ে ফেলে বার বার বকুনি খাচ্ছি বাবার কাছে।

নতুনদার বকুনি খাওয়া শেষ হয়ে গেছে। পাকা গোঁফ আর পাকা চুলে কাঁধে চাদর নিয়ে পনেরো বছরের নতুনদা' দিব্যি ডি-এল-রায়ের 'পুনর্জন্মের' আধা-বুড়ো 'যাদব চক্রবর্ত্তী' সেজে ভবিষ্যুক্ত হয়ে বসে আছে সাজের বাক্সর ওপর। আমার 'অশ্বিনী'তে রূপান্তর চলছে। ওধারে আট বছরের ছোট ভাইকে নিজের এগারো হাত শাড়ী জড়িয়ে 'সৌদামিনী' সাজাচ্ছেন মা।

ঘোষেদের উঠোনে প্লে হবে আমাদের দুখানি নাটক, 'পুনর্জন্ম' আর 'বেজায় রগড়'। দর্শকদের মধ্যে আছেন বিখ্যাত 'নদীয়া-বিনোদ' যাত্রাদলের মুরুব্বিরা। শম্ভু 'বেজায় রগড়ে' পদ্মলোচন সেজেছে। 'কুমীর শালা মামাকে টেনে নিয়ে গেল গো' বলে ওর খুব খানিকটা কান্না ছিল। 'মামা শালা কুমীরকে টেনে নিয়ে গেল গো' বলে ফেলে ও নিজে যত হাসল, দর্শককে হাসাল তার চেয়ে বেশি। আমরা তো লজ্জায়-ঘেন্নায় তখন মরে গেছি একেবারে! আট বছরের ছোট ভাই অসিত রামকমলের শ্রাদ্ধের দৃশ্যে কীর্তনউলী সেজে গাইলে 'ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা বঁধু'। ঘোষেদের বুড়ো কর্তা বাহবাও যত দিলেন, অনুযোগও করলেন তত। বাড়ীর মেয়েকে বাঈজী সাজানোয় তাঁর ঘোরতর আপত্তি। শেষ অবধি অসিত মেয়ে নয়, পুরুষ জেনে ভদ্রলোকের সে কী হাসি আর আনন্দ।

: নমস্কার।

নকল গোঁফের উপর ভিজে তোয়ালে চেপে ধরে আর্সির ভিতর দিয়েই দেখতে পেলুম সদানন্দবাবুকে।

: আসুন। আসুন! তোয়ালের ভিতর থেকে ঠোঁট যথাসাধ্য অল্প নাড়িয়েই বললুম, বসুন।

বসলেন সদানন্দ বাগচী, ওরফে শিশুবাবু! শিশুবাবু শৈশবকে বিদায় জানিয়ে এসেছেন মাত্র ষাট বছর আগে। শিশুপালবধ নাটকে শিশুপালের ভূমিকায় অসামান্য অভিনয়-নৈপুণ্য দেখিয়ে দর্শক সমাজকে মুগ্ধ করেছিলেন যখন, তখন তাঁর বয়স তিরিশ। সেই থেকে আজ পর্যন্ত শিশু হয়েই আছেন।

হাত বাড়িয়ে টেবিলের উপর থেকে আমার সিগারেট-কেসটা তুলে নিলেন শিশুবাবু।

: দুটো সিগ্রেট নিচ্ছি ভাই তোমার। মাই পার্স ইজ নট ফট এনাফ টু পে টু পার্চেজ মাই স্পাইস। দুটো নয়, পুরো তিনটেই নিচ্ছি ভাই, মনে কোর না কিছু।

উত্তরের অপেক্ষা না করেই বেরিয়ে গেলেন তিনখানি সিগ্রেট নিয়ে! কালই তো মাইনের এস্তভ্যাগ পেয়ে চার টিন দামী সিগ্রেট কিনে সকলকে বিলিয়ে খেয়েছেন। আজ পকেট শূন্য!

এই ওঁর স্বভাব। এই কদিনে জেনেছি। হাতে পয়সা যতক্ষণ, ততক্ষণ একেবারে বাদশার মেজাজ।

অনেক কালের জমিদার বংশে জন্ম, রূপোর চামচ মুখে নিয়ে। বকুলপুরের বাগচী বাবুদের জলের ঘরে থাকতো বড় বড় পঞ্চাশটা মাটির জালা। প্রত্যেকটা জালায় ছ'মাস ধরে শুধু ফুল জমিয়ে রাখা হতো। কোনটায় বেল, কোনটায় জুঁই, কোনটায় চাঁপা, কোনটায় গন্ধরাজ। টাটকা ফুল ঢালা হতো, আর পরদিন বাসি ফুল তুলে ফেলে দেওয়া হতো। এমনি ছ'মাস সাত মাস। তারপর সেই জালায় হতো জল ঢালা। বৈশাখে যদি খাওয়া হতো বেল জালার জল, তো জ্যৈষ্ঠে জুঁই-জালার। আষাঢ়ে যদি চাঁপাজালার মুখ খোলা হল, তো শ্রাবণে গন্ধরাজের।

বকুলপুরের সেই বাগচী বাড়ীর রূপবান ছেলে সদানন্দ বাগচী সতের বছর বয়সে কলকাতায় এলেন লেখাপড়া করতে। লেখাপড়া করার অব্যবহিত পরের কাজটাই অবশ্য সারলেন আগে। গাড়ী ঘোড়াটাই চড়লেন, লেখাপড়াটাকে বাদ দিয়ে। সন্ধ্যের সময় সেই গাড়ীঘোড়া' থামতে লাগল বিশেষ একটি ফিরিঙ্গি দোকানে। বিলিতি সোমরসের দোকান। সেইখানেই আলাপ সর্বস্বান্ত ইংরেজ নাবিক হলবিন-এর সঙ্গে। পয়সা নেই, কড়ি নেই, শুধু এক পেট নেশা নিয়ে পড়ে আছে শুঁড়ির দোকানের দরজায়। একমুখ দাড়ি আর শতছিন্ন পোশাকে একধারে দাঁড়িয়ে বাড়িয়ে আছে তোবড়ানো একটা মগ।

: আমস টু দি বেগার।

আমস মানে অবশ্য মদই শুধু এক্ষেত্রে।

দিলদরিয়া সদানন্দ বাগচী শুধু নিজের বোতলের ছিপি খুলে আমসই দিলেন না, খোদ বেগারটিকেই তুলে নিলেন গাড়ীতে। সেখান থেকে সোজা বাড়ীতে। বিদেশী বন্ধুটিরে পেট মদের পিপের মতোই ফুলিয়ে দিয়ে প্রশ্ন করলেন: বিদ্যে-সিদ্যে কি জানা আছে বেরাদার?

বেরাদার বললে, থিয়েটারের সীন আঁকার বিদ্যেটা জানা আছে ভাল।

: ভেরী গুড, থ্যাঙ্ক। সদানন্দ বাগচী বললেন: ঐ বিদ্যেটা তুমি শেখাও আমাকে, তার বদলে, গোত্র-নামে ব্রাহ্মণার অহং দদামি।

ব্রাহ্মণটির নাম হলবিন। দাতার নাম সদানন্দ। দেয় বস্তুটির নাম 'ওল্ড পোর্ট'।

শিষ্যের আদর বেশি দিন ভোগ করতে হল না গুরুকে। তিন মাসেই ভবলীলা সাঙ্গ করলেন। সাঙ্গ করবার আগে লিভারটাকে পচিয়ে যেতে ভুললেন না।

মৌলালীর ওদিকে কোন বিবির রাস্তার ধারে পুরোনো গোরস্থানে গোর দেওয়া হল গুরুকে। সুদূর ওয়েলসের মানুষটার জন্যে যে কলকাতায় জমি কেনা ছিল, জানতো কে-ই বা?

সদানন্দ বাগচী প্রচুর টাকায় বানিয়ে দিলেন শ্বেতপাথরের স্মৃতিস্তম্ভ গোরের উপর। তার উপর বসিয়ে দিলেন শ্বেতপাথরের ফাঁপা বোতল। তলায় লিখে দিলেন,—

'এইখানে নেশায় বুঁদ হয়ে আছে বিখ্যাত চিত্রকর হলবিন, জন্ম যার ওয়েলসে, মৃত্যু নেই যার, বোতল যার পূর্ণ হয়ে থাকবে স্বর্গের মদে চিরকাল।'

স্বর্গের উপর অবশ্য ভরসা করে থাকতে পারেন নি তরুণ সদানন্দ বাগচী। পুরো একটি মাস প্রতিদিন সন্ধ্যায় সেই শ্বেতপাথরের বোতলে নিজ হাতে বিলিতি মদ ঢেলে দিয়ে এসেছেন।

গুরু গেলেন। ওদিকে দেশের বাড়ীতে মহাগুরু নিপাতও হয়ে গেল। বেশ কয়েক সহস্র টাকা রেখে দেহরক্ষা করেন সদানন্দের পিতা। মা হলেন ৺কাশীবাসী। আর সদানন্দ তত দিনে হয়ে উঠলেন কলকাতার সৌখীন সীন-পেইণ্টার।

ডাক পড়ে ঘন ঘন থিয়েটার থেকে। টানাটানি করে সব ক'টা থিয়েটারের লোক। এত টাকা দেব, ওদের সীন না এঁকে শুধু আমাদের সীন এঁকে দিন।

টাকা? সদানন্দ বাগচীকে টাকা দেখায় থিয়েটারের লোক? ফুঃ! সদ্য-কেনা নতুন জামা-কাপড় পরে সীন আঁকে যে—রঙের ছিটে লাগবার পর সে-জামা যে বিলিয়ে দেয় শিফটারদের,—তাকে দেখায় টাকার লোভ? ছ্যাঃ!

টাকা লুব্ধ করতে পারে না সদানন্দ বাগচীকে। কিন্তু সদানন্দ বাগচী লুব্ধ করেন বিজনবালাকে।

শুধু বিজনবালাই বা কেন? মানদাসুন্দরী, ইন্দুমুখী, ছোট মতি, কা'কে নয়!

ধবধবে সাদা গায়ের রং, কালো কোঁকড়া চুল, হাতে হীরের আংটি, জামায় হীরের বোতাম, পকেটে চেন-এ বাঁধা সোনার ঘড়ি; বিনি পয়সায় সীন এঁকে দেয়,—আঠারো বছর বয়সে খায় গেলাস গেলাস মদ, অথচ তাকায় না কোন দিন থিয়েটারের মেয়েদের দিকে; —লুব্ধ না হয়ে উপায় কী?

সীন এঁকে বাড়ী ফিরছেন তরুণ রূপবান সদানন্দ। বাইরে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে একসঙ্গে চারটে গাড়ী। মানদাসুন্দরীর টমটম, ইন্দুমুখী আর ছোট মতির ল্যাণ্ডো, বিজনবালার জুড়ি। চার গাড়ীর সহিস-কোচম্যান সেলাম জানায়। সদানন্দ কোন গাড়ীতেই পা দেন না।

শেষকালে দিয়ে ফেললেন একদিন। গাড়ীতে নয়, ফাঁদে। আঠারো বছরের সদানন্দ পা দিলেন উনচল্লিশ বছরের বিজনবালার ফাঁদে।

ফিরে যায় তাবড় তাবড় সব রইসি আদমীর দল বিজনবালার দোর থেকে। ফিরে যায় তাঁদের ল্যাণ্ডো ব্রুহাম টমটম। সময় নেই বিজনবালার।

বিজনবালা তখন গঙ্গার ধারের রাস্তায় বেরিয়েছেন নিজে হাতে ঘোড়ার লাগাম টেনে নিয়ে। অঙ্গে তাঁর রাজার পোষাক,—মাথায় পালখ-দেওয়া পাগড়ী, পায়ে জরির নাগরা। পাশে ঐ একই পোষাকে বসে আছেন সদানন্দ বাগচী। যেন সমবয়সী দুই কিশোর রাজপুত্র। লালকমল, আর নীলকমল। বেরিয়েছেন নগর পরিক্রমায়।

তারপর ?

বিজনবালা থেকে মানদাসুন্দরী, মানদা থেকে ইন্দুমুখী, ইন্দু থেকে ছোট মতি। থামলেন যখন সদানন্দ বাগচী, বয়স তখন তিরিশ, দেহ ব্যাধিমন্দির, সিন্দুক ফাঁকা। তখন আর সৌখীন সীন-পেইন্টার নন, পেশাদার অভিনেতা! শিশুপাল-বধ নাটকের খ্যাতিমান শিশুপাল। সদানন্দ নন ;—শিশু বাবু।

লেখাপড়া হয়নি স্কুল-কলেজের। সেক্সপীয়র কিন্তু প্রায় কণ্ঠস্থ। ঐ হলবিনই আলাপ করিয়ে দিয়েছিল এক সাহেব নাটুকের সঙ্গে। সেক্সপীয়র পড়ার নেশাটা সেইখান থেকেই আমদানী।

বয়েসের তাড়নায় আজ স্বাস্থ্য গেছে, অর্থ গেছে, খ্যাতি গেছে, স্মৃতিশক্তিও পলাতক। এখনও তবু মাঝে মাঝেই আউড়ে যান সেক্সপীয়রের ভাষা,—কখনও কিং লীয়র থেকে, কখনো অ্যাজ ইউ লাইক ইট, কখনো হ্যামলেট, কখনও উইনটার্স টেল, কখনও বা টুয়েলফথ নাইট।

কিন্তু সেক্সপীয়রের দ্বাদশ রজনী এখন মাথায় থাকুক, আমার নাটকের দ্বিতীয় রজনীর ওয়ার্নিং বেল সুরু হয়ে গেছে ওদিকে, এখনও সাজের অনেক বাকি।

৬

প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় কোরে কোরে কেটে গেল অনেকগুলো অভিনয়-রজনী। পঞ্চাশৎ অভিনয়ের আসন্ন উৎসবের তোড়জোড় চলছে পুরোদমে।

নকল চুল আর দাড়ি এঁটে রামপ্রসাদের কলুর চোখবাঁধা বলদের মতো রিভলবিং ষ্টেজের ঘানিগাছে জুড়ে গিয়ে সেই যে ঘুরে চলেছি তার আর শেষ নেই। হোক নিজের লেখা নাটক, তবু ঐ একই নাটকের একই কথা একই ভাবে বলতে ভাল লাগে না আর, তবু রেহাই নেই।

অভিনয় করি, আর তারই ফাঁকে ফাঁকে চুপ-চাপ এসে বসে থাকি অমূল্য বাবুর ভাঁড়ার ঘরে। যেখানে অর্জ্জুনের গাণ্ডীব থেকে শিবাজীর বাঘনখ, কর্ণের কবচকুণ্ডল থেকে বৃদ্ধ কৃষ্ণকান্তের উইলের কাগজ, জানকীর কেয়ূর থেকে তটিনীর ভ্যানিটি ব্যাগ, বিশ্বামিত্রের কাঠের খড়ম থেকে ভ্যাঙ্কিটাটের বুটজুতো, ছাদনাতলার কলাগাছ থেকে শ্মশান-চিতার চন্দনকাঠ পর্যন্ত সাজানো রয়েছে থরে থরে; লিষ্টি মিলিয়ে যখন যেটি চাও পাবে।

অমূল্য বাবুর ঐ অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে বিচিত্র কিউরিওর বসে থাকি;একটা ডেকচেয়ার টেনে নিয়ে, আর গল্প করি!

: ওটা কি অমূল্য বাবু ?

: ওটা ? বাঘছালের পোশাক। ছালটা দিয়েছিলেন ছাতিমগড়ের কুমার। নিজের হাতে শিকার করা রয়্যাল বেঙ্গলের ছাল।

: পোশাকটা ?

: তার কি কোন ঠিক আছে স্যার ? শিবচতুর্দশীর হোল-নাইটে ঐ পোশাক শিবের গায়েও দিচ্ছি, আবার 'ত্রিশঙ্কু' নাটকের তাপসবালাদের নাচের সীন-এ চাকবালার গায়েও লাগিয়েছি। গোটা কতক সেফটিপিনের এদিক-ওদিকের ওয়াস্তা। ঐতিহাসিক পৌরাণিক নাটক সব ছিল ভাল স্যার! এক সেট পোশাকে দশখানা বই ম্যানেজ করা যেত। হিরণ্যকশিপুই বলুন আর চন্দ্রগুপ্তই বলুন, পোশাকের তো আর বদল ছিল না। সেই ভেলভেট আর সাটিন, সলমা চুমকি আর জরির ফিতে। দুর্জন হলে দাও কপালের তিলকটা বেঁকিয়ে, আর সুজন হলে আঁকো সেটা কপালের মধ্যিখানে সিদে কোরে। ব্যাস চুকে গেল।

সত্যিই চুকে যেত। কেমন নির্বিঘ্নে চুকে যেত।

তখন নিতান্তই বালক। বৌবাজারে মামার বাড়ীর উঠোনে জগদ্ধাত্রী পুজোর রাত্রে সারা রাত যাত্রা হতো তখন। একবার, কি একটা পালা ছিল, মনে নেই নাম। সখীর ব্যাচের পিলে-ওলা কালো-কালো ছেলেগুলো ঘুম-চোখে বড় বড় হাই তুলে তুলে হাত-পা নেড়ে গান গেয়ে গেছে। সেই গান শুনে মহারাজ তো ছোট ছোট এলুমিনিয়মের গেলাসে লাল লিমনেড না কি খেতে খেতে পা টলিয়ে কথা এড়িয়ে প্রচণ্ড কামনার অগ্নিতে একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়তে পড়তে ঢুকে গেছেন সাজঘরের কানাৎ-এর আড়ালে। কূটচক্রী মন্ত্রী একটু বেঁকে ঝুটো মুক্তোর মালা বাঁ হাতের তালুতে নাচিয়ে নাচিয়ে হেসে গেছেন হাঃ হাঃ কোরে। সতী-সাধ্বী মহারাণী কামনালুব্ধ অসুররাজের পাপ প্রস্তাবকে বাম পদাঘাতে চূর্ণ করে দিয়ে কেমন একটা আশ্চর্য অমানুষিক সরু কনকনে গলায় তীব্র অভিশাপ দিয়ে পাগলিনীবৎ ছুটে চলে গেছেন পত্রভ্রান্ত রাজার পিছু পিছু। গেরুয়াধারী ডিসপেপটিক বিবেক ঝাঁপতালে 'ওরে সমঝে চল' গানটাকে ফেরাই দিয়ে দিয়ে গেয়ে গেছে তিন-তিনটে এঙ্কোর নিয়ে। বিকট হাঁ-এর মধ্যে ডেলা ডেলা তালমিছরি আর লবঙ্গ-কাবাবচিনি রেখে 'রাজার উক্তি' 'রাণীর উক্তি' গেয়ে ক্ল্যারিওনেটকে কালোয়াতি দেখাবার চান্স দিয়ে বসে পড়েছেন। উকিলের কালো শামলা পরা জুড়ি-গাইয়ের দল। ক্ল্যারিওনেট জলতরঙ্গকে সুর ধরিয়ে দিয়ে বিড়ি ধরিয়েছেন। জলতরঙ্গও অনেক কসরতির পর যখন ভোরের কাক ডাকার কিছুক্ষণ আগে থেমে গিয়ে সমস্ত সভাটাকে একেবারে থমথমে নিস্তব্ধ করে দিয়েছেন, ঠিক তখনই সাজঘরের ভিতর থেকে এসে আসরের, সতরঞ্চির উপর রেখে গেলেন কে একজন তিনখানি হলদে রঙের ফুটো-ফুটো-ওলা ফোল্‌ডিং চেয়ার।

কি ব্যাপার ? কি ব্যাপার ?

হঠাৎ সাজঘর থেকে শব্দ,—হালুম! হালুম! হালুম!

কে আসে ? কে আসে ?

ও মা! হেসে মরি! এ যে নারদ! হ্যাঁ, নারদই তো। এই তো কিছুক্ষণ আগেই হরিগুণ-গান গেয়ে গেছে যে একটাও তার-না-ওলা বীণাযন্ত্রে আঙুল নেড়ে নেড়ে। পরনে সেই হলদে ধুতি। গায়ে সেই

নামাবলী। অবশ্য তখন কেমন খোলা-মেলা ছিল, এখন যেন আঁট কোরে জড়ানো গায়ে। আর হলদে কাপড়ের কাছাটা খোলা।

কিন্তু মরে যাই কাণ্ড দেখে! নারদ অমন হামাগুড়ি দিয়ে আসে কেন? মুখেই বা হালুম হালুম শব্দ কেন? আর,—কিছুক্ষণ আগে যে সাদা দাড়িটা দাড়ির জায়গাতেই ঝুলছিল, সেটা এখন কপালে বেঁধে ঘাড়ের দিকে ছড়িয়ে দেওয়া কেন?

হালুম! হালুম! হালুম!

হামাগুড়ি দিয়ে নারদ এসে দাঁড়ালেন সেই পাশাপাশি বসানো ফোলডিং-চেয়ারের সামনে,—ঠিক আমাদের ঐ টেবি কিম্বা জন-এর মতো চারপায়ে। তারপর পিজবোর্ডের আটখানা বাড়তি হাত পিঠে বেঁধে বেনারসী কাপড় পরে এলেন সেই লোকটি, কিছুক্ষণ আগেই যিনি হাতের দশ আঙুলের নখে দশখানা জ্বলন্ত মোমবাতি এঁটে নাচ দেখিয়ে গিয়েছিলেন হেলে দুলে। সটান এসে দাঁড়ালেন তিনি মাঝখানের ফোলডিং চেয়ারের ওপর। নড়বড়ে চেয়ার টললো একটু, কিন্তু পড়লেন না। এলেন তার পর সখীর ব্যাচের দুটি ছেলে—একজন পদ্ম আর একজন ঐ নারদের বীণাটাকেই নিয়ে। ততক্ষণে চিনে নিয়েছি সবাইকে, বুঝে নিয়েছি ব্যাপারটা। ততক্ষণে কার্তিক আর গণেশ দাদা এসে আর ফোলডিং চেয়ার না পেয়ে শূন্যেই, বসার ভঙ্গিতে পা মুড়ে দাঁড়িয়ে গেছেন, আর মহিষাসুর নীরবে এসে একেবারে দুর্গা ঠাকুরের চোরার ভঙ্গিতে খড়্গ তুলে একটা হাতের কুনুই ঢুকিয়ে দিয়েছে নারদের হাঁ-করা মুখের মধ্যে।

মা লক্ষ্মী চেয়ারের ব্যালান্স ঠিক রাখতে না পেরে একবার উল্টোতে উল্টোতে রয়ে গেলেন; বসার ভঙ্গিতে পা মুড়ে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে তিনবার তীর-ধনুক শুদ্ধ হাতটাকে তুলে সরস্বতীর চেয়ারে ভর দিয়ে দিলেন কার্তিক দাদা।—নারদের দাড়ি সিংহের কেশর হতে রাজি না হয়ে কেবলি দাড়িত্বে প্রত্যাবর্তনের বাসনায় ঝুলে ঝুলে পড়তে লাগলো কপাল থেকে চিবুকে। অট্টহাস্যে আসর ভরিয়ে তোলবার উপকরণ আর কী হতে পারে এর বেশি?

কিন্তু কোথাও এতটুকু হাসির শব্দ নেই।

তিন-ফোকর ঠাকুরদালানের ডান ধারের সেই নিচু-নিচু কাঠের পাটা পাতা ঝুলোনো বারান্দায় বসে দিদিমাদের দল সবাই গলায় আঁচল দিয়েছেন তখন। চোখে তাঁদের জলের ধারা। কাঁপা-কাঁপা বুজে-আসা গলায় কনে-দিদিমাকে আমি যখন বলতে শুনলুম,—'মা গো, আবার এসো!'—তখন বলবো কি, সেই দশমীর ভোর হয়ে-হয়ে-আসা সকালে ঠাকুরদালানের প্রতিমা আর যাত্রার আসরের ঐ অভিনব মহিষমর্দিনীর দিকে তাকিয়ে আমারও কেমন কান্না পেতে লাগলো। দিদিমাদের দেখাদেখি আমিও দুটি হাত জোড় কোরে যাত্রাদলের সেই মহিষমর্দিনীকে বললুম,—'এসো মা আবার।'

অমূল্য বাবুর কথাটা খাঁটি সত্যি একেবারে। সত্যিই সবকিছুই কেমন অল্পেই চুকে যেত তখন।

: আর এখন? অমূল্য বাবু একটু অনুযোগের সুরেই বলেন: এ-নাটকের জমিদারবাড়ীর সীন আর ও-নাটকের জমিদারবাড়ীর পর্দার রঙটা পর্যন্ত নায়ক-নায়িকার মানসিক অবস্থাভেদের সঙ্গে সঙ্গে পালটানো চাই। ফ্যাচাং একেবারে সতেরো হাজার রকমের।

: তখন? অমূল্য বাবু বুক ফুলিয়ে বলেন: বুড়ি নয়নতারার বেনিফিট-নাইটে প্লে হচ্ছে মিশরকুমারী। কম্বিনেশন প্লে। রূপ-মহলের ফণীন্দ্র বাবু আবন, নাটমন্দিরের বিমলেন্দু বাবু সামন্দেশ, শুভেন রায় কাকাতুয়া, যমুনাবালা নাহরিণ। মিশরের নীলনদের আমনদেবের মূর্তি চাই। কোথায় পাওয়া যায়? বললুম, যতক্ষণ আমি আছি, ভয় নেই কিছু, সব ঠিক হো যায়গা।

: কি করলেন? প্রশ্ন করি উৎসুক কণ্ঠে।

: করবো আবার কী? মীরাবাঈ-এর দরুণ কেষ্ঠঠাকুরের পট ছিল একখানা, সেইটেকেই বেমালুম দাঁড় করিয়ে দিলুম স্টেজের এক কোণে, আর আলোর ডিপার্টমেন্টের কালীকে বললুম, পটের ওপর ছায়া-ছায়া রাখতে। ব্যস হয়ে গেল। নীলনদের দেবতা যখন, তখন গায়ের রংটা নীল না হয়ে যায় কোথায়?

: কেউ হাসলে না?

: হাসবার জো কী? ফণী বাবুর সে আবন কি আর দেখেছেন আপনারা? গলার সে কী দাপট! সুরের সে কী ওঠানামা! পর্দায় পর্দায় গলাকে চড়িয়ে চড়িয়ে কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে সে কী অদ্ভুত ঝুলিয়ে দেওয়া! সেদিনের সে সব গলা কোথায় আজ? মনে করবেন না কিছু, সব গিয়ে আজ শুধু ঐ আলো আর পোশাক, আবহসঙ্গীত আর সীনসীনারীর চটক নিয়ে পড়েছে সবাই। তেমন অ্যাকটিং-এর জোর থাকলে কোলকাতার রাজপথের সীন ঝুলিয়ে চোখ বাঁধা বাবা মুস্তাফা আর মর্জিনা বাঁদীকে স্টেজে পাঠিয়ে দিলেও হাস তো দেখি কার কত হিম্মৎ?

নির্বাক শ্রোতা আমি। শুধু শুনে যাই, আর দেখে যাই।

দেখি, কনসার্ট পার্টির বেহালাদার বুড়ো শিবু আড্ডিকে। কাঁধে-বোতাম ছিটের পাঞ্জাবীটি গায়ে। রোগা আঙুলের শিরগুলো মোটা মোটা আর সবুজ। হাতের নখ দাঁতে কেটে কেটে একেবারে প্রায় নিশ্চিহ্ন করে তোলা। বাঁ-হাতের তালুতে গোল একটা হলদে ছোপ আছে। খৈনী টেপার না গাঁজার কলকের দাগ, ঠিক জানি না। প্রথম মহাযুদ্ধে রাঁধুনী না কিসের কাজ নিয়ে গেছলেন একবার মেসোপটেমিয়ায়। সেই মিলিটারী পোশাকের সব গিয়ে শুধু দু'-পায়ের পট্টু টিকে আছে। আর, কবে কোন যুগে বুঝি রেল কোম্পানীতে কাজ করেছিলেন ক'মাস, তার খোদাই-করা পেতলের বোতাম আছে খানকতক। এই অমূল্য বস্তু দুটি এ-থিয়েটারের কা'কে যে একবারো দেখাননি, বলা ভারী শক্ত। গান-বাজনার ঝোঁকটা চিরকালই ছিল। আগে থিয়েটারের কনসার্ট পার্টিতে যখন দু'-হাতের আশ্চর্য কায়দায় করতাল বাজাতেন, ভিড় জমে যেত শ্রোতার। করতালের যুগ শেষ হতে বেহালা ধরেছেন।

দেখি কুৎসিতা কলাবতীকে। মুখরা ঝি কিংবা সরলা চাষী বৌ-এর ভূমিকায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী। কোন ছাইগাদায় জন্ম। শিক্ষা নেই দীক্ষা নেই। রূপ নেই দেহে। সুর নেই কণ্ঠে। জানা আছে নাচ একটু-আধটু। সে ঐ এক-দুই-তিন, এক-দুই-তিন, তিন-এর পাক ঘুরুন পর্যন্ত। অর্থাৎ নাচের ফার্ষ্ট বুকের ঐ ঘোড়ার পাতা অবধি। আর আছে অভিনয়ের একটা সহজ ক্ষমতা। ঠোঁটে লিপষ্টিক দেয়, চোখে গগলস দেয়, হাতে ঝুলোয় ভ্যানিটি ব্যাগ। ও বেশ জানে, তার ঐ চেহারায় এসব মানায় না একটুও। অমু

সং সাজে। সিনেমা-থিয়েটারের অ্যাক্‌ট্রেস হতে গেলে এ যে পরতে হয়, বলেছে সবাই তাকে। বৈষ্ণব হলে যেমন কাটতেই হবে তিলক-ফোঁটা, উকিল হলে যেমন পরতেই হবে কালো কোট, পুরুত হলেই যেমন রাখতেই হবে টিকি। এ-ও তাই। ভারী ভদ্র মন। ভারী নরম। বাচালতা নেই এতটুকু। শিফটারদের সবাইকার দিদি। ছেলেটার তড়কা, মেয়েটার মায়ের দয়া, বৌটার রক্ত নেই গায়ে—দিদি আছে ওদের।

দেখি উঠতি অভিনেত্রী অণিমাকে। স্টেজে এসেছে পুব-বাঙলার ছিন্নমূল মানুষের জোয়ারে, কচুরিপানার মতো। অফিসের প্লেটে নামছিল পঁচিশ-তিরিশ টাকায়। পাবলিক থিয়েটারে সবেমাত্র এসেছে। চেহারাটা ঢলঢলে। বয়সটা অল্প। আমার নাটকে থান-কাপড়-পরা পিসি সেজে উত্তক মনটা ক্ষুন্ন। চুলে পাউডার দিতে নারাজ। কপালে বলি রেখা আঁকতে দিতে চায় না কিছুতেই। দু' চক্ষে দেখতে পারে না এ-নাটকের তরুণী নায়িকার ভূমিকাভিনেত্রী মালবিকা দেবীকে। এখনও আমল পায়নি বড়দের স্তরে। আড়ালে-আবডালে কনসার্ট পার্টির ছোক্‌রাদের সঙ্গেই হাসাহাসি করে, আর জলন্ত দৃষ্টিতে তাকায় আমার দিকে।

আমার অপরাধ, আমিই ওকে পিসির ভূমিকায় নির্বাচিত করেছিলুম।

ঐ পিসির ভূমিকায় অভিনয় করে সুনাম পেয়েছে ও অনেক। তবু, তবু আমি বেশ টের পাই, চোখের চাহনিতে ভস্ম করতে চায় ও আমাকে অহরহ।

এক দিন।

তৃতীয় অর্থাৎ শেষ অঙ্কের প্রথম দৃশ্যের অভিনয় চলছে ষ্টেজে। দ্বিতীয় অঙ্কেই অধিকাংশ অভিনেতা-অভিনেত্রীর পার্ট শেষ হয়ে গেছে। বাড়ী চলে গেছেন যে যার মেক্‌-আপ তুলে। শেষ অঙ্কের শেষ দৃশ্যে পার্ট আছে আমার। অন্ধকারে বসে আছি চুপচাপ অমূল্য বাবুর ভাঁড়ারঘরে, নিজের ডেক্‌চেয়ারটিতে। বৃদ্ধ সদানন্দ বাবু ষ্টেজের ওপর জমিয়ে তুলেছেন তাঁর পার্ট এক্সেনট্রিক জমিদারের ভূমিকায়। অমূল্য বাবু পাশের কেবিনে চা খেতে গেছেন। এমন সময় সেণ্টের তীব্র গন্ধে সমস্ত ঘরটাকে ভরিয়ে দিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল একটি তরুণী। ঘরের নেবানো আলোটা জেলে দিলে। অঙ্গে পাতলা জরিদার হাওয়াই বেনারসী। গায়ে উগ্র টকটকে লাল একটা আঁটসাঁট ব্লাউজ। গলাটা যতখানি খোলা, হাত দুটো ঠিক ততখানি ঢাকা দেওয়া। খোঁপায় জড়ানো বেলফুলের মালা। চোখে সুর্মা, ঠোঁটে লিপষ্টিক। আঁকা ভুরুর একটিকে অনেকখানি ওপরে তুলে তাকাল আমার মুখের দিকে ঘাড় বেঁকিয়ে। কথা বললে না কিছু। আলোটা নিবিয়ে দিয়ে চলে গেল।

অণিমা রায়।

দু' মিনিট বাদে ঢুকলো আবার। এবারে জ্বাললে না আলো। অন্ধকারেই দাঁড়াল এসে আমার মুখোমুখি।

: এতক্ষণ আমার কথাই ভাবছিলেন তো?—কি মনে হল? বিধবা বুড়ি পিসি ছাড়া আর কিছু সাজানো কি একেবারেই যেত না আমাকে?—কী? উত্তর দিচ্ছেন না যে?

অন্ধকারেও বেশ টের পেলুম ও একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে আমার দিকে, আর কিসের উত্তেজনায় জোরে জোরে নিশ্বাস নিচ্ছে। আর, নিশ্চয়ই ওর নাসারন্ধ্র স্ফীত হয়ে উঠেছে।

উঠলুম।

: উঠে দাঁড়ালেন যে?

: বাইরে যাব। প্লে আছে।

: আমি জানি, প্লের আপনার অনেক দেরী।

: চাদরটা ওপরের সাজঘরে ফেলে এসেছি।

: আমি জানি, ঠিক সময়েই বিজয় এনে দেবে আপনার চাদর। রোজ তাই এনে দেয়।

কোন উত্তর না দিয়ে এগোলুম।

চীৎকার করে উঠল সহসা অণিমা রায়: জানি, জানি,—আমি খারাপ, আমি মুখ্যু, আমার মা-বাপ নেই, ভাই-বোন নেই, সংসার নেই,—তাই আমার সঙ্গে কথা বলতেও আপনার ঘেন্না! মালবিকা বি-এ পাশ, তার বাবা-মা আছেন, তার স্বামী আছে, তার বোন আছে, ভাই আছে,—তাই সে মানুষ,—সে সুন্দর,—সে ভাল পার্ট করে, সে সব। কিন্তু এ আমি বলে রাখছি—

শোনা হল না শেষটুকু। তার আগেই বেরিয়ে এসেছি। শেষের দিকে ওর চীৎকারটা কান্নায় ভেঙে গিয়েছিল কি না।

পরদিন চাকরিতে ইস্তফার চিঠি পাঠালে একটা থিয়েটারে। তার পর কোথায় একেবারে উবে গেল সে। একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল!

[ক্রমশঃ।

জনৈক কৃষকের কবিতা

শ্রীমতী বকুল মুখোপাধ্যায়

বাংলা দেশের রূপকথা শুনি একা একা,
কাশ-কুন্তল এলায়িত মাঠ পিতামহী
রূপকথা বলে; রাজকন্যাকে যায় দেখা
ধূলিসন্নিভ ঘোমটার তলে, সোনা-মহী।

এখানে মাঠের ঘাসে ঘাসে কত রাজকন্যা,
বাতাসে বাতাসে রাজপুত্রেরা ঘোড়সওয়ার
সবিতা সরিৎ-শিশিরবিন্দু চুণী পান্না,
রোজ ভোরে আমি রূপকথা শুনি বাংলা মা'র।

আকাশী মেয়েরা শরৎ-প্রভাতে গাঁথে মালা,
একসাজি ফুল, শুভ্র সতেজ সফেন মেঘ,
স্বয়ম্বরের স্বপ্নালু বুঝি দ্রুপদ-বালা
সূর্য্য-আলোকে গর্ব্বিত গতি শুভ্রাবেগ।

জোনাকী প্রদীপ, ঝিঁ ঝিঁ কীর্ত্তন, এ সন্ধ্যায়,
মাটীর স্নায়ুতে রূপকথা গাঁথা শত শত
সে মাটীর বুকে ফলাব ফসল ষোল কলায়
রূপকথা নয়, ইতিহাসময় শাশ্বত।

পাশ্চাত্যশিক্ষাভিমানী
একদল দিশী-ইংরেজ
গোপীদের প্রেম-লীলাটার
যৌন-তাৎপর্য ছাড়া
কোনোকিছু পেলেননা আর।
ভাগবত অশ্লীল
ইউরোপী বোলেছেন,
—এই হোলো কারণটা তার!

"Many of our people
Think
That Krishna
As the lover of the Gopis
Is
Something rather uncanny,
And
The Europeans
Do not like it.
Dr. So-and-so
Does not like it.

Certainly then
The Gopis have to go!
Without
The sanction of the Europeans
How can Krishna live?
He can not!

In the Mahabharata
There is no mention of the Gopis
Except
In one or two places,—

In the prayer of Draupadi
There is
Mention of a Brindavan life,
And
In the speech of Sisupala
There is again
Mention of this Brindavan.

All these
Are interpolations!
What
The Europeans
Do not want
Must be thrown off!

সুমণি মিত্র

All these
Are interpolations!
The mention of the Gopis
And of Krishna too!"[১]

* * *

ইউরোপী পণ্ডিতে
যে যাই বোলুক,
যে যতোই যুক্তির তুফান তুলুক,
গোপীদের প্রেমলীলা
কি বুঝবে বেণে?
চাঁদি ছাড়া ইউরোপ
আর কিছু চেনে?

* * *

১। "আমাদের মধ্যে অনেকের ধারণা—শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের সঙ্গে প্রেমলীলা কোরেছেন, এটা যেন কেমন-কেমন। ইউরোপীরা এটা বড়ো পছন্দ করেননা। অমুক পণ্ডিত গোপীপ্রেমটাকে সুনজরে দ্যাখেননা। তবে আর কি? গোপীদের জলে ভাসিয়ে দাও! সাহেবদের অনুমোদন বিনা কৃষ্ণ টঁ্যাকেন কি কোরে? কখনোই টিঁকতে পারেননা। মহাভারতে দু-একটা জায়গা ছাড়া গোপীদের উল্লেখ নেই। কেবল দ্রৌপদীর স্তবের মধ্যে এবং শিশুপালের বক্তৃতায় বৃন্দাবনলীলার উল্লেখ আছে মাত্র। অতএব এ-গুলো প্রক্ষিপ্ত। সাহেবরা যা' না-চায়, সবই উড়িয়ে দিতে হবে! সবই প্রক্ষিপ্ত, গোপীদের কথা, এমনকি কৃষ্ণের কথা পর্যন্তও!"
—*Sages of India, Lectures from Colombo to Almora* (*page*-178).

"Well,
With these men,
Steeped in commercialism,
Where
Even the ideal of religion
Has become commercial,
They are all
Trying to go to heaven
By doing something here ;
The Buniya
Wants compound interest,
Wants to lay
By something here
And enjoy it there.

Certainly
The Gopis
Have no place
In such a system of thought."২

৭০

যখোন ডাক্তার
নগ্ন নারীর ঐ
অন্ধকার যোনি-পথ থেকে
আনকোরা প্রাণটাকে
পৃথিবীর আলোতে আনেন,
তখোন কি চিন্তাতে তাঁর
যৌন-তাৎপর্য থাকে
স্ত্রীলোকের ঐ যোনিটার ?
ম্রিয়মান শিশুটাই
সমস্ত চিন্তাকে
গোগ্রাসে করে অধিকার।

তেমনি কামনাহীন সিদ্ধ সাধক
যৌন-বিষয় নিয়ে
আলোচনা করেন যেখানে,
যৌন-তাৎপর্য তার
একেবারে গৌণ সেখানে।

সাধকের বৃহত্তর,
মহত্তর উদ্দেশেতে তাঁর
অপমৃত্যু ঘটে ঐ
সঙ্গমের যৌন-চেহারার।
শ্লীলতা বা অশ্লীলতার
প্রশ্নই ওঠেনা তখোন ;
যোনি বা সঙ্গম
যৌন-রূপকে ছেড়ে নিমেষে কখোন
হোয়ে ওঠে সুমহান
কোনো এক ভাবের প্রতীক,
—যে-ভাব দেহের নয়,
বিমল, দিব্য, দেহাতীত।
দেহটা মুখ্য নয় আর,
তখোন সে সাধকের
অলৌকিক আদর্শের,
দেহাতীত ভাবের আধার।

* * *

যে-পথে বিজ্ঞান
চরম সত্যের দিকে
কেবলি এগিয়ে যেতে চায়,
সেটা হোলো—
জানা থেকে
তমসাবৃত অজানায়।
একমাত্র এ-পথেই
নির্ভয়ে পা বাড়াতে পারি,
জানাকে পাথেয় কোরে
অজানার সন্ধানে
আমাদের দিতে হবে পাড়ি।

* * *

তত্ত্বের ব্যাপারেও তাই,
আমরা সত্যি যদি
দেহাতীত কোনোকিছু চাই,
দেহকে কেন্দ্র কোরে
দেহের অতীতে যেন যাই।

কারণটা এই—
স্থূল এই দেহকে নিয়েই
আমাদের হাসি-কান্না
আনন্দ-বেদনার পুঁজি।
দেহগত স্তরেতেই বুঝি
সুখ ও দুঃখ বলে কা'কে,
দেহাত্মবোধেতেই
পাওয়ার সুখটা বুঝি
না-পাওয়ার অবসাদটাকে।

২। "ইউরোপী—যারা বণিগবৃত্তিতে একেবারে ডুবে আছে, যাদের ধর্মের আদর্শ পর্যন্তও ব্যাবসাদারীতে দাঁড়িয়েছে, তাদের সকলেরই মতলব এই—ইহলোকে কিছু কোরে তারা স্বর্গে যাবে। ব্যাবসাদার সুদের সুদ তস্য সুদ চেয়ে থাকে, তারা এখানে এমন কিছু পুণ্য সঞ্চয় কোরে যেতে চায়, যাতে স্বর্গে গিয়ে সুখভোগ কোরতে পারে! এ-ধরণের ধর্মপ্রণালীতে অবিশ্যি গোপীদের কোনো স্থান নেই।"
—*Sages of India, Lectures from Colombo to Almora* (*page*-178-179).

দেহবোধ নিয়েই প্রিয়ার
অভাবজনিত ব্যথা জানি,
দেহবোধ আছে তাই
প্রিয়ার স্পর্শে বুঝি
রোমাঞ্চ জাগে কতোখানি।

দেহবোধ নিয়েই মানুষ
অবৈধ প্রণয়ের
চরম আনন্দটা বোঝে ;
মধুর আতঙ্কের
জানে কতো মাধুর্য
পরকীয়া প্রণয়োৎসবে।

দেহবোধ নিয়েই আমরা
বুঝি কতো রোমাঞ্চ
কামনান্বিত লগ্নের ;
স্পর্শ-মহোৎসবে
বুঝি কতো আনন্দ
সব কিছু বিস্মরণের।

দেহবোধ নিয়েই আবার
রমণানন্দ বুঝি,
বুঝি তার পরিণামটিও ;
বুঝি সবশেষে ওর
দেহবোধ হারানোর
লগ্নটা কতো লোভনীয়।

• • •

এই কারণেই
পরমানন্দ লাভ কোরেছেন যাঁরা,
আত্মা ও পরমাত্মার
রমণের আনন্দ বোঝাতে গিয়েই
পরকীয়া-প্রণয়কে তাঁরা
প্রতীক হিসেবে নিয়েছেন।
তাঁরা যে জানেন—
জীব-দেহে মানুষ যা' চায়,
চরম আনন্দের
বাস্তব স্বাদ যাতে পায়,
সেটা হোলো—অবৈধ প্রেম।
অতএব
তাঁরা এটা বুঝেছেন ঠিক—
জান্তব জীবনের কাছে
অনাস্বাদিত ঐ
ব্রহ্মানন্দটার
এইটেই শ্রেষ্ঠ প্রতীক ;
চরম আনন্দ যা'
মানুষের জানা,
তারই আশ্রয় নিলে তবে
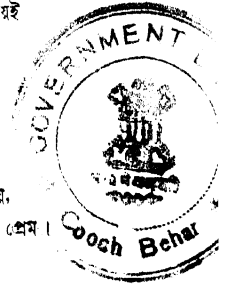
দেহাতিরিক্ত ঐ
অজানা আনন্দের
অন্ততঃ আভাস সে পাবে।

৭১

শ্রীরামকৃষ্ণদেবও তাই,
আমরা বদ্ধজীব
ঈশ্বরানন্দের
একটু আভাস যাতে পাই,
বোল্লেন—'শোনো
মানুষের সারা দেহে
রোমকূপ আছে যতোগুলো,
মনে করো তারা সব
এক-একটা যোনি ;
প্রত্যেক রোমকূপে
একত্র রমণের
রোমাঞ্চ ধরো যতোখানি,
যে-আনন্দ অনুভূতি এর,
ঈশ্বরানন্দও
অনেকটা সেই ধরণের।'

*　*　*

এ-কথায় ঠাকুরকে
অশ্লীল বলা চলে নাকি ?
এখানে দেখতে হবে
ঠাকুরের মনোভাব,
বক্তার মতলবটা কি।
সেটা যদি অশ্লীল হয়,
তবেই প্রশ্ন ওঠে
ঠাকুরের অশ্লীলতার।
এখানে অভিপ্রায় তাঁর—
দেহবোধে বাঁধা জীব
কিছুটা আভাস পাক
দেহাতীত আনন্দটার।

*　*　*

আর,
ভাগবত-বর্ণিত
গোপীদের প্রণয়-লীলার
ঐ একই উদ্দেশ,
ঐটেই মূলসুর তার।

৭২

এমন বিরাট
আর মহান অভিপ্রায় যার,
তার প্রতি সজ্ঞানে
অভিযোগ আনে যারা
কুরুচি ও অশ্লীলতার,
যথার্থ করুণার পাত্র তারাই।
তারাই তো ঢাক্ পিটে
খামকা প্রচার করে
তাদের বুদ্ধিহীনতাই,
অর্থাৎ গায়ে প'ড়ে
গুঁতিয়ে প্রমাণ করে
নিজেদের অশ্লীলতাই।

*　*　*

"There was a
Stump of a tree,
And
In the dark,
A thief
Came that way
And said,
'That is a policeman.'

A youngman
Waiting for his beloved
Saw it
And thought
That
It was his sweetheart.

A child
Who had been told
Ghost stories
Took it
For a ghost
And
Began to shriek.

But
All the time
It was
The stump of a tree."[৩]　[ক্রমশঃ।

৩। "একটা জায়গায় একটা গাছের গুঁড়ি ছিলো। এখন অন্ধকারে একটা চোর সেই দিকে এলো এবং গুঁড়িটাকে দেখে বললে,
'আরে ঐ যে একটা পুলিশ।'
একটি যুবক তার প্রিয়তমার জন্তে অপেক্ষা কোরছিলো। সে গুঁড়িটাকে দেখে ভাবলে—তার প্রেয়সী।
একটি ছেলে ভূতের গল্প শুনেছিলো। সে সেটাকে ভূত মনে কোরে ভয়ে চীৎকার কোরতে লাগলো। কিন্তু আসলে সব সময়েই ওটা একটা গাছেরই গুঁড়ি।"
—The real nature of man, Jnana Yoga (page 48).

চিত্রতারকাদের লাবণ্যের মতই
আপনার লাবণ্য সুন্দর হয়ে উঠুক
মালা সিনহা সত্যিই অপূর্ব সুন্দরী। ওঁর সৌন্দর্য্যের গোপন কথাটি কি জানেন? মালা সিনহা বলেন—"আমি আমার ত্বক মসৃন ও সুন্দর রাখার জন্যে লাক্স টয়লেট সাবান প্রত্যহ ব্যবহার করি।" লাক্স টয়লেট সাবান ব্যবহার করলে আপনার ত্বকও সুন্দর হয়ে উঠবে। আজই লাক্স টয়লেট সাবান কিনুন।
বিশুদ্ধ, শুভ্র
লাক্স
টয়লেট সাবান
চিত্রতারকাদের
সৌন্দর্য্য সাবান
LUX
TOILET SOAP
সুন্দরী মালা সিন্হা
কিশোর ফিল্মের
"লুকোচুরী"
চিত্রের তারকা
L.T.J. 581-X52 BG
হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড, কর্তৃক প্রস্তুত।
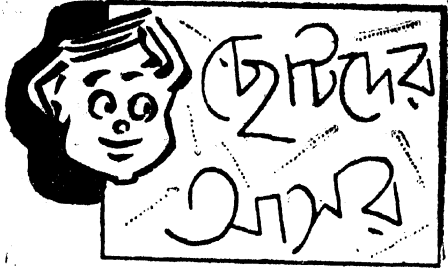
এই রকম কত গল্পই না শুনেছি পাথরকাকুর কাছে।

কিন্তু, সে যাক, চিঠিতে গল্প লিখে আর তোমার সময়ের ওপর অত্যাচার করবো না। আমি মনে মনে একটা পরিকল্পনা করে রেখেছি, সেটার সম্বন্ধে তোমাকে একটুখানি ইঙ্গিত দিয়ে রাখছি মাত্র। কেন না, সেটির সম্বন্ধে আরও চিন্তা করার আছে, খুঁটি-নাটি ব্যাপারে অনেক ভাববার আছে। প্ল্যানটি, তুমি বোধ হয় আন্দাজ করতে পারবে। সেটা আর কিছুই নয়, সেটা হচ্ছে ঝুলি-ঝালা কাঁধে পাহাড়ে-পথে বেরিয়ে পড়া! হ্যাঁ, তুমি হয়তো ভাবছ মৃত শ্রীপ্রস্তর ওরফে পাথরকাকুর পাগলামি আমার ঘাড়ে চেপেছে। হয়তো তাই। কিন্তু এ ছাড়া উপায় নেই। নিশ্চিন্ত মনে ঘরে বসে থেকে যারা জীবন কাটিয়ে দেয় আমি অন্ততঃ তাদের দলে নই।

পরে বিস্তারিত লেখার ইচ্ছা রইল। ললিতার ক্ষুদ্র একটি চিঠি পেয়েছি। আশা করি, তোমরা খুব ভাল আছ এবং তোমাদের রবিচক্র নিয়মিত বসছে। কলকাতায় ফিরে রবিচক্রে আমার ভ্রমণ কাহিনী পড়ে শোনাবার ইচ্ছা রইল। এইখানেই পূর্ণচ্ছেদ টানছি।

ইতি—তোমাদের প্রীতিধন্য 'শান্তনু'

যথাসময়ে কিশোরের হাতে চিঠি পৌঁছেচে এবং ডেকচেয়ারে হেলান দিয়ে চিঠিটি আদ্যোপান্ত পড়েছে কিশোর।

দেখি, দেখি—ঝড়ের মত ঘরে ঢুকে কিশোরের পাশে দাঁড়ালো ললিতা। নিশ্চয়ই শান্তনুদা'র চিঠি! বলে উঠলো সে। বেশ মজা! বা রে, আমার চিঠির কোনও উত্তর নেই আর বন্ধুকে দিস্তে দিস্তে কাগজে লেখা হচ্ছে!

মেয়েদের আবার লিখবে কি? একটু বিরক্তি নিয়েই বললে কিশোর।

ও, তাই নাকি? মেয়েদের কাছে লেখবার বুঝি নেই কিছু?

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

শ্রীশৈল চক্রবর্ত্তী

হ্যাঁ, আছে। তবে তোমার এখনও সেই সময় আসেনি। কিশোরের কণ্ঠস্বর গম্ভীর।

কবে আসবে সেই দিন শুনি?

বিয়ের পরে।

হাসিতে ফেটে পড়লো ললিতা, বললে, দরকার নেই আমার সে চিঠির, আর বিয়েই বা করছে কে! আপাততঃ দাও ত পত্রখানা? দেখি পাথরকাকুর চেলা শ্রীশান্তনুর প্রস্তরীভূত হতে কত বাকী?

চিঠিটা মন দিয়ে পড়লো ললিতা। মুখটা একটু গম্ভীর হলো। তারপর খুশিমুখে বললে দাদা, একটা কথা বলবো?

বল না।

আমরাও যদি যাই কেমন হয়? শান্তনুদা' ত একা, আমরা যদি যোগ দিই তাহলে ছোট-খাটো বেশ একটা **team** তৈরী হবে। আর পাহাড়ে চড়া আমার ভীষণ ভাল লাগে। চল না **mountaineering** এর অভিজ্ঞতা ত হবে।

চিন্তা করতে করতে কিশোর বললে, আমিও ঠিক ঐ কথাই ভাবছিলাম। তবে তোর কথা ভাবিনি। মেয়েদের সঙ্গে নিয়ে বিপদে পড়তে হবে। আমি আর শান্তনু আর একজন-দুজন শেরপা সঙ্গে—বাস্। তোফা একটা **team**!

কখ্খনো না। জোর দিয়ে বললে ললিতা। আমাকে ফেলে তুমি কিছুতেই যেতে পারবে না, বলে দিচ্ছি। দেখে নিও, আমি সঙ্গে থাকলে তোমাদের সুবিধাই হবে। মেয়েদের সম্বন্ধে আগেকার কুসংস্কার ছাড়ো দেখি। এখনকার মেয়েরা কি ইংলিশ চ্যানেল সাঁতরে পার হচ্ছে না? দেখেছ ত, সাইকেলে চেপে মার্কিণ মেয়ে দুজন পৃথিবী ঘুরে বেড়াচ্ছে! সঙ্গে তোমাদের মত কোন গার্জেন পর্যন্ত নেই!

সত্যি কথা; কিশোর বললে, দেখ লালী, ওদের দেশের মেয়েদের সঙ্গে আমাদের ঘরের মেয়েদের তফাৎ আছে।

আছে কিন্তু কত দিন থাকবে? আমিই যদি সেই তফাৎটা মুছে দিই। পাইওনিয়ার হবার গর্বটা আমারই থাকবে।

কিশোর চিঠিখানা ড্রয়ারের মধ্যে রেখে বললে, আমি তর্ক করচি না। শুধু পাইওনিয়ারকে একটা কথা বলছি—এট, যতটা সহজ ভাবছিস ততটা সহজ নয়। জলজ্যান্ত একটা ভাল্লুকের সামনে পড়লে তখন দেখবো পাইওনিয়ার মহাশয় হাঁউ-মাউ করে ধরাশায়ী হয়ে পড়বেন। আমাদের মুস্কিলের কথা ভাব দেখি তখন? তোর মুখে-চোখে জলের ছিটে দেব না ভাল্লুকের সঙ্গে **fight** করবো?

হাসতে হাসতে ললিতা বললে, এমনও হতে পারে ত যে তোমাদের পার্টটা আমাকেই করতে হবে।

সাহসের পরীক্ষার উপযুক্ত প্রমাণ ও সাক্ষ্যের অভাবে তর্কটা ঐখানেই স্তব্ধ হলো। তারপর দেখা গেল, দুজনে মহা উৎসাহে কালিম্পং যাত্রার তোড়জোড় করতে লাগলো। আরও দেখা গেল, তারা বাবা ও মায়ের কাছে অনুমতিও পেয়ে গেছে। অবশ্য খুব সম্ভব, প্রকৃত মূল অভিপ্রায়টি তাঁদের কাছে কিছু অদল-বদল করেই প্রকাশিত হয়েছিল। কিছুদিনের জন্যে চেঞ্জ, এবং কালিম্পং-এ শান্তনুদা'র বাসা যখন আছে সেখানে কয়েক দিনের জন্যে বেড়িয়ে আসা, এরকম প্রস্তাবে বাবা-মা সহজেই মত দিলেন।

একটা মোটা বই-এর পাতা উল্টে যাচ্ছিল শান্তনু। বইটা ভূতত্ত্বের। ষ্ট্যালাকটাইটের একটা সুন্দর ছবির দিকে তার নজর

পড়লো। বটগাছের ঝুরির মত পাথরের অসংখ্য ঝুরি নেমেছে পর্বতগুহার উপরিতল থেকে। অন্ধকার গুহাগাত্রে কী অপূর্ব দেখাচ্ছে সেগুলি !

ঝির-ঝির করে ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে জানলা দিয়ে। ডান দিকের তাকের ওপর কতকগুলো পাথরের টুকরো পড়ে আছে। কতকগুলো অর্কিড গাছ বারান্দায় ঝুলছে। ছোট্ট বাংলো একটি। পাথরের দেয়াল, মাথায় অ্যাসবেসটসের চাল। কালিম্পং-এর এই বাসায় থাকে শান্তনু আর তার অনুগত ভৃত্য নাথু। আর থাকে ঝুমরী। ঝুমরীর মাথায় গায়ে বড় বড় চুল, দাড়ি থেকেও ঝুলছে আট ইঞ্চি লম্বা চুলের গোছা। ঝুমরী দরজার কাছাকাছি মাটিতে গলার দড়িটা টেনে টেনে পরীক্ষা করছে। ঝুমরী একটি বয়স্ক পাহাড়ী ছাগল। তার গলার ঘড়-ঘড় আওয়াজ শুনলে মনে হয়, সে যেন বলছে, দড়িটা একবার আলগা পেলে ঐ ডালিয়া ফুলগুলোকে দেখে নিতুম। দেখে নিতুম মানে চেখে দেখতুম! ডালিয়ার টেষ্ট নাকি কতকটা ডালের মত। অবশ্য ঝুমরীর মন্তব্য শুনে ডালিয়ারাও চুপচাপ নেই। তারাও গলা বাড়িয়ে তামাসা করছে ওর সঙ্গে 'আয় না দেখি, আয় না দেখি' ভাবটা! এমন সময় নাথু এক কাপ চা আর কয়েকটা ক্রীম-ক্র্যাকার নিয়ে বারান্দা ঘুরে তার বাবুর ঘরে ঢুকলো।

ঝুমরী চেঁচিয়ে উঠলো, আর চা কই? নাথুর সম্বন্ধে ঝুমরীর রাগের অন্ত নেই। কখনো ঠিক সময়ে সে ব্রেকফাষ্ট দেয় না তাকে। তারও যে চায়ের নেশা আছে নাথুটা কিছুতেই বোঝে না।

হঠাৎ আধখানা ক্রীমক্র্যাকার এঁকে-বেঁকে ঝুমরীর সামনে এসে পড়লো। এ নিশ্চয়ই বাবুর কাজ। ঝুমরী বুঝে নিলে। সত্যিই শান্তনু জানলা থেকে তার দিকেই তাকিয়ে ছিল। ঝুমরী বিস্কুটটা চিবুতে চিবুতে ভাবলে, কি আশ্চর্য! শুধু বিস্কুটে কি ব্রেকফাষ্ট হয়? বাবুর এটুকু জ্ঞান থাকা দরকার। তবে, চা'টা ত আর ছুঁড়ে দেওয়া যায় না—সত্যিই ত। তাতে আরও বিপদ হোত। তাহলে, বাবুকে দোষ দেওয়া যায় না। কিন্তু নাথু বেটা—

হঠাৎ ঝুমরীর গলা দিয়ে বেসুরের আওয়াজ বেরুলো। এ রকম ডাক সে দৈবাৎ দেয়। এ যেন সন্দেহের ডাক, নতুন কিছু দেখার ডাক অনেক সময় এ ডাকে বিপদবার্তাও বোঝায়।

শান্তনু ত্রস্তপদে ঘর ছেড়ে বারান্দায় পা দিতেই দেখলো, তার কাছ থেকে বড় জোর দশ হাত দূরে দুটি প্রাণী। তার চোখ দুটো বড় বড় হয়ে গেল, বারান্দায় লাফ দিয়ে বলে উঠলো, ল-লি-তা, কি-শোর।

অনেক দিন পরে দুই বন্ধুর সাক্ষাৎ এবং তা আবার অকস্মাৎ। সব চেয়ে বড় কথা হোল, ললিতা এসেছে তার প্রবাসের আস্তানায়। পথের ক্লান্তিতে ওদের শুকনো দেখাচ্ছিল বটে, কিন্তু মনের অপরিসীম আনন্দ টলটল করছিল ওদের চোখে-মুখে।

কেমন তাক লাগিয়ে দিলাম, ললিতা বললে।

তা দিয়েছ। বললে শান্তনু। আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি, তোমরা এখানে চলে আসবে।

কেন আসবো না? বললে কিশোর। তোর শেষ চিঠির মধ্যেই ত যথেষ্ট লোভ দেখিয়েছিস।

শান্তনু অবাক হয়ে বলে ওঠে, কি রকম? কি লিখেছিলাম আমি?

ললিতা বাধা দিয়ে বলে, এখন সে কথা থাক দাদা, ও পরে হবে। এসো আমরা বাসাটা ভাল করে দেখি। কী সুন্দর লাগছে আমার।

বাসাটা ঠিক পাখীর, তাও আবার কাক-চিলের মত হতচ্ছাড়া পাখীর বাসার মত। সুন্দর মোটেই নয়। সুন্দর যদি কিছু দেখতে চাও বাইরে গিয়ে দেখ। দিগন্ত জুড়ে আঁকা রয়েছে বিধাতার চিরসুন্দর ছবি!

নাথুর আর বিরাম নেই। চা করা, হালুয়া করা, জল গরম করা। তারপর খাবার জোগাড় চাই। আলু, পেঁয়াজ, স্কোয়াশ, বীন নিয়ে সে মহা দুশ্চিন্তায় পড়েছে। ললিতা ফার্ষ্ট ইয়ারের ছাত্রী হলে কি হবে, সে রান্নাঘরে গিয়েই সব ব্যবস্থা করে ফেললো। ডাল, ভাজা আর একটা তরকারী।

ললিতা এ-ঘর ও-ঘর করে আর হাতের কাছে যে জানলাটা এসে পড়ে তার মধ্যে দিয়েই দৃষ্টি ছড়িয়ে দেয় দূরে। সত্যিই বিধাতা যেন চিরসুন্দর ছবির এলবামটি মেলে ধরেছেন দিকে দিকে! এর আগে সে ছোট-বড় অনেক পাহাড় দেখেছে কিন্তু হিমালয় দর্শন এই তার প্রথম। তার ইচ্ছে হচ্ছে এখনই যেন সে বেরিয়ে পড়ে ঐ নীলাভ ছায়ায় ঢাকা গিরি-শ্রেণীর উদ্দেশে।

পাশের ঘর থেকে কানে আসে দুই বন্ধুর আলাপ। কলকাতা শহরের খুঁটিনাটি কত সংবাদ। ছোট-বড় কত ঘটনা সে যেন কান দিয়ে গিলছে। গড়ের মাঠের ফুটবল থেকে আরম্ভ করে পাথুরিয়াঘাটার কানাগলির বঙ্কিম মাষ্টারের কৌতুক কাহিনী, কোনটা বাদ নেই।

আহার ও বিশ্রামের পর তারা তিন জনে বসলো গুরুতর আলোচনায়। বিষয়টাতে যতই গুরুত্ব আরোপ করুক তারা,

ঝুমরী বললে, ডালিয়ার টেষ্ট নাকি কতকটা ডালের মতন।

আলোচনায় সেটা যথেষ্ট হাল্কা হয়ে পড়ে। 'পথি নারী বিবর্জ্জিতা' ইত্যাদি যতই যুক্তি থাকুক না কেন এবং সেগুলিকে অব্যয় ভাবে যতই প্রয়োগ করা হোক না কেন, লীলাকে কিছুতেই টলানো গেল না। তাকে যদিও অনেকগুলি সর্তে রাজি হতে হলো তবুও শেষ পর্যন্ত তারই জয়লাভ হলো।

পরের কাজগুলির ভার শান্তনু নিলে, যথা তাদের অভিযানের সহযাত্রী হিসাবে কয়েক জন শেরপা সংগ্রহ করা এবং আবশ্যকীয় জিনিসপত্রগুলিও সংগ্রহ করা। দুর্গম পথ সম্বন্ধে কিশোর যতটা সম্ভব ললিতাকে সচেতন করার ভার নিলে।

সরকার থেকে আরও একদল লোক তিস্তা-তীরে এসে কিছুদিন ধরে কাজ করছিল। তাদের উদ্দেশ্য খনিজ তেলের সন্ধান করা। তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করলো শান্তনু। যাতে তিন সপ্তাহ মধ্যেই রওনা হওয়া যায়, সেই ভাবে তোড়জোড় চলতে লাগলো পুরাদমে।

[ক্রমশঃ।

ম্যাজিক ম্যাচ-বাক্স

যাদুকর এ, সি, সরকার

হাতে আছে একটি দেশলাইয়ের বাক্স—কাঠিতে ভর্তি। এ থেকে একটি কাঠি বের করে নিয়ে জনৈক দর্শকের সিগারেট জ্বালিয়ে দিলাম তা দিয়ে। দর্শকেরা সবাই দেখলেন যে, একটি সাধারণ কাঠি-ভর্তি ম্যাচ-বাক্স রয়েছে আমার হাতে। এর পরে আরম্ভ করলাম আসল খেলা। দেশলাইটাকে উঁচু করে ধরে দর্শকদের বললাম, 'এই যে ম্যাচ-বাক্স এটি কিন্তু সাধারণ নয় মোটে, এর উপরে আছে ভূতের দৃষ্টি। যার ফলে এর ভেতরে ঘটে যায় নানা ভূতুড়ে কাণ্ড! বাক্সের ভেতরে ভূতকে জাগ্রত করার জন্যে একটু মন্ত্র পাঠের দরকার আছে বটে তবে তা খুব কঠিন নয়। মন্ত্র পাঠ করে যাদুর কাঠি বুলিয়ে নিলেই সব ব্যাপার ভাল ভাবে দেখতে পাওয়া যায়।' এই কথা বলে আমি ম্যাজিকের মন্ত্র পড়লাম ভূতকে জাগ্রত করার জন্য :

ক্লিং ক্লিং ক্লিন
নাচো রে ধিন ধিন
ম্যাচ-বাক্সের ভূতবাবাজী
ওহে কায়াহীন
ক্লিং ক্লিং ক্লিন
দেখাও যাদুর কেরামতি
যে গুণেতে ভানুমতি—

হলেন যাদুর রাণী
ম্যাচ-বাক্সে দেখাও সে গুণ আনি।

মন্ত্রপাঠ শেষ হতেই আমি দেশলাইয়ের বাক্সটি খুললাম আর তার ভেতর থেকে বেরিয়ে এল একটি মাঝারী সাইজের সিল্কের রুমাল। কাঠির কোনই পাত্তা পাওয়া গেল না আর এই বাক্সের ভেতরে। এই অবাক কাণ্ড দেখে তো সবাই হলেন বিস্ময়ে হতবাক্।

এখন শোন কেমন করে এই অবাক কাণ্ডটি দেখানো সম্ভব হয়। মন্ত্র-তন্ত্র বা ভূত-প্রেত সবই ফাঁকি। আসল ম্যাজিক যা তা আছে ঐ ম্যাচ-বাক্সের ভেতরে। ম্যাচ-বাক্সের যে অংশটার ভেতরে কাঠি থাকে তার ভেতরেই যত কারসাজি।

করতে হয় কি জানো? এই দেরাজের মতন অংশটির উল্টো দিকে আঠা মাখিয়ে তাতে সেঁটে দিতে হয় কতকগুলি দেশলাইয়ের কাঠি, এমন ভাবে যাতে নীচেকার কাগজ চোখে না পড়ে। ঐ সঙ্গে একটা আলগা কাঠিও রেখে সাবধানে ঐটিকে গলিয়ে দিতে হয় খোলের ভেতরে।

এই খোলের কিন্তু দু'দিকেই লাগানো থাকা চাই একই মার্কার ছাপওয়ালা ছবি। অন্য একটা দেশলাইয়ের খোল থেকে একই মার্কার ছবি একটি তুলে এনে খোলের উল্টোদিকে সেঁটে দিলেই হবে। একটা খুব পাতলা সিল্কের রুমাল নিয়ে সেটিকে যদি এই ম্যাচের দেরাজের মধ্যে ভাল ভাবে গুঁজে ভরে রাখো তবে উল্টোদিক থেকে ম্যাচ খুলে যখন কাঠি বের করে দেখবে তখন দর্শকেরা এই রুমাল দেখতে পাবেন না। এর পরে মন্ত্র পড়ার ফাঁকে বাক্সটাকে উল্টে নিয়ে যদি দেরাজের মত অংশটিকে টেনে বের করে তার ভেতর থেকে রুমাল টেনে বের কর, তবে তো অবাক হবারই কথা! পেছনের পিঠে যে আঠা দিয়ে কাঠি সাঁটা আছে তা তো আর জানে না কেউ!

উৎসাহী পাঠকবর্গ আমার সঙ্গে পত্রালাপ করতে পারো। পোষ্ট বক্স—১৬২১৪, কলিকাতা—২৯ এই ঠিকানায়।

অচিন দেশের রাজকন্যা

[হিন্দুস্থানী উপকথা]

পুষ্পদল ভট্টাচার্য্য

অচিন দেশের রাজার তিন ছেলে আর এক মেয়ে কমলা। কমলার হাসিতে ঝরে সুগন্ধি ফুল আর কান্নায় মুক্তা। ঠিক পাঁচ গোলাপের ওজন কমলার, এক যুঁই কম বেশী হয় না কোন দিন।

গোলাপজলে রাঁধা সুগন্ধি পুরান চালের ভাত মধু দিয়ে পাঁচটি গরাস খায় রাজকুমারী। তারপর ফুলপরীদের সঙ্গে খেলতে খেলতে নরম ফুলের বিছানায় ঘুমিয়ে পড়ে।

একদিন এক দুষ্ট দানব এই পরমাসুন্দরী রাজকন্যাকে তার সখীদের সঙ্গে চুরি করে নিয়ে গেল। রাজামশায় শিকারে গিয়েছিলেন। বাড়ী ফিরে সব শুনে তিন ছেলেকে পাঠালেন রাজকুমারীর সন্ধানে।

বার বছর ধরে রাজকুমারেরা বোনকে দেশ-বিদেশে খুঁজে বেড়াল। একদিন দুপুরে তারা ক্লান্ত হয়ে এক পাহাড়ের ধারে বিশ্রাম করছে, এমন সময়ে তাদের পায়ের কাছে প্রথমে একরাশ ফুল, তারপর

একরাশ মুক্তো ঝরে পড়ল। রাজকুমারেরা দেখে, সেই পর্ব্বতশিখরের এক অপূর্ব্ব প্রাসাদ থেকে সেই ফুল আর মুক্তো ঝরে পড়ছে।

ছোট রাজকুমার বলল, দাদা, বোনটি নিশ্চয় ঐ প্রাসাদে বন্দী হয়ে আছে।

অন্য ভাইয়েরাও এবার ফুল আর মুক্তাগুলি চিনতে পারল। রাজকুমারেরা তখনই সেই প্রাসাদে যাত্রা করল। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও তারা সেই মসৃণ, খাড়া পাহাড়ে উঠতে পারল না।

তিন ভাইয়ে হতাশ হয়ে বসে ভাবছে, এমন সময়ে শুনল কাছেই এক ঝর্ণার ধারে বসে এক বুড়ি গান গাইছে।

'আকাশ-পারের ঐ যে প্রাসাদ বাগবাগিচায় ভরা,
হোথায় থাকে কুমারী এক, অপূর্ব্ব অপ্সরা।
রূপকুমারীর রূপের বুঝি, নাইক কোনই ওর,
হাসিতে তার পুষ্প ঝরে, মুক্তা আঁখির লোর।
ফুলপরীদের সনে তারে বন্দী করে এনে,
রাখল হোথায় দুষ্ট দানব রূপের কথা শুনে।
রাজকুমারী হাসে কাঁদে পথটি চেয়ে থাকে,
আসবে কবে দাদারা তার, মুক্তি দেবে তাকে।
একে একে দিন চলে যায়, আসে না'ক তারা,
রাজকুমারী কেঁদে কেঁদে পথটি চেয়ে সারা।'

গান শুনে রাজকুমারেরা বুঝল বুড়ি নিশ্চয়ই রাজকুমারীর খবর জানে। তারা তাই বুড়ির কাছে গিয়ে পাহাড়ের উপরে যাবার পথ জিজ্ঞাসা করল।

বুড়ি বলল, যে পথ চায়, তাকে নিজে খুঁজে নিতে হয়। বড় রাজকুমার বলল, আমরা অনেক খুঁজেও পথ পাইনি। তুমি যদি দেখিয়ে দাও তো তোমাকে অনেক ধন-রত্ন দেব।

বুড়ি রেগে বলল, বনের খাই, বনের পরি। ধন-রত্নের ধার ধারি না। যা পালা এখান থেকে, নইলে এখনি দানব এসে তোদের খেয়ে ফেলবে।

অনেক তোষামোদ করেও বুড়িকে প্রসন্ন করতে না পেরে বড় ভাইয়েরা ফিরে গেল। তখন ছোট ভাই এসে বুড়ির কাছে বসে জিজ্ঞাসা করল—দিদিমা, এই বনে একলা থাকতে তোমার ভয় করে না?

দিদিমা ডাক শুনে খুসী হয়ে বুড়ি বলল, না রে নাতি, তোদের মতন আমার অত প্রাণের ভয় নেই।

প্রাণের ভয় আমিও করি না। কমলা বোনটিকে উদ্ধার করতে আমি একাই দানবের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারি।

রাজকুমারের সাহস দেখে বুড়ি জিজ্ঞাসা করল, নাতি, তুই তীর ছুঁড়তে পারিস?

রাজ্যের সব সেরা তীরন্দাজকে আমি হারিয়ে দিয়েছি, দাদারা কেউ আমার মত তীর ছুড়তে পারে না।

শুনে বুড়ি চুপ করে কি ভাবতে লাগল। ছোট রাজকুমার দেখছিল, বুড়ি কেবল তার ডান পায়ের বুড়ো আঙুলে হাত বুলোচ্ছে। হঠাৎ সে বুড়ির পা নিজের কোলে তুলে নিয়ে বলল, দেখি দিদিমা, কি হয়েছে তোমার পায়ে?

বুড়ি ব্যস্ত হয়ে উঠল, আরে, আরে, রাজকুমার হয়ে গরীবের পায়ে হাত দিচ্ছ কেন?

ছোট রাজকুমার হেসে উঠল, দিদিমার পায়ে হাত দেব, তার আবার গরীব, বড়লোক কি?

বুড়ির পায়ে একটা কাঁটা ফুটেছিল। ছোট রাজকুমার যত্ন করে সেটা তুলে দিল। খুসী হয়ে বুড়ি আকাশপুরীতে যাবার উপায় বলে দিয়ে, অনেক আশীর্ব্বাদ করে চলে গেল।

বুড়ি যেতেই বড় রাজকুমারেরা এসে জিজ্ঞাসা করল, বুড়ি কি বলে গেল রে?

বুড়ি বলল—দানবের ডান পায়ের তলায় তলোয়ারের খোঁচা মারলে তবেই সে মরবে। আর আমাদের একজনের ঘোড়া মেরে তার চামড়ার দড়ির সিঁড়ি তীরের সাহায্যে ঐ আকাশপুরীর দরজায় বেঁধে সেই সিঁড়ি দিয়ে ওখানে উঠতে হবে।

বড় রাজকুমারেরা তাদের ঘোড়া মারতে রাজী হল না! ছোট রাজকুমার বলল, আমাদের বোনের প্রাণের কাছে একটা ঘোড়া তুচ্ছ। এস, আমার ঘোড়াটাকেই কাজে লাগাই। সিঁড়ি তৈরী হলে বড় দুই রাজকুমার অনেক চেষ্টা করেও সেটাকে আকাশপুরীর দরজায় আটকাতে পারল না।

তখন ছোট রাজকুমার বোনের মুখ স্মরণ করে তীর ছুঁড়ল। তীরটা সোঁ করে গিয়ে আকাশপুরীর দরজায় আটকে গেল। এবার সেই অজানা পুরীর ভেতর যেতে হবে। বড় দুই ভাই সেই বিপদের রাজ্যে যেতে রাজী হল না। কাজেই ছোট রাজকুমারই খোলা তলোয়ার হাতে সিঁড়ি বেয়ে আকাশপুরীতে গেল। প্রাসাদে পৌঁছে খুঁজতে খুঁজতে একটি মহলে সে বোনটির দেখা পেল।

ভাইকে দেখে রাজকুমারী ছুটে এসে তার গলা জড়িয়ে কাঁদতে লাগল। খানিক পরে বলল, ছোড়দা, তুমি এখনই পালিয়ে যাও। দানবের ফেরার সময় হয়েছে। তোমাকে দেখলেই সে মেরে ফেলবে।

বলতে না বলতেই ঝড়ের মত দানব এসে হাজির। ছোট রাজকুমারকে দেখেই সে তার ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। দু'জনে খানিকক্ষণ যুদ্ধ হবার পর দানব ছোট রাজকুমারকে তুলে মাটিতে আছড়ে দিল। সেই প্রচণ্ড আঘাতে কাতর হলেও ছোট রাজকুমার জ্ঞান হারাল না। সে শুয়ে শুয়েই তলোয়ার দিয়ে দানবের ডান পায়ের তলায় খোঁচা মারল। অমনি বিকট চিৎকার করে দানব পড়ে মরে গেল।

দানবের মৃত্যুতে খুসী হয়ে পরী-রাজকন্যা ছোট রাজকুমারকে মালা পরিয়ে দিল। এই আকাশপুরী ছিল পরীদের রাজবাড়ী। দানব পরীদের রাজা-রাণীকে মেরে পরী-রাজকন্যা ও তার সখীদের বন্দী করে রেখেছিল। পরী রাজকন্যা বলল—পরী রাজকুমারও এই প্রাসাদের কোথাও বন্দী হয়ে আছেন। কিন্তু অনেক খুঁজেও তাকে পাওয়া গেল না।

ছোট রাজকুমার দানবের মৃতদেহ আকাশপুরী থেকে ফেলে দিতে সেটা মাটিতে পড়ে পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

এইবার সবাই আকাশপুরী থেকে নীচে নামতে লাগল। রাজকুমারী কমলা আর পরী রাজকুমারী সখীদের নিয়ে যেই নীচে এসেছে অমনি বড় দুই রাজকুমার ছোট ভাইকে হিংসে করে সিঁড়িটা কেটে দু' টুকরো করে দিল। ছোট রাজকুমার আর নীচে নামতে পারল না।

বড় ভাইরা এবার রাজকুমারীদের ভয় দেখাল, বাড়ী গিয়ে কেউ ছোট রাজকুমারের কোন কথা বললেই তাকে কেটে ফেলবে।

দেশে ফিরে দুই রাজকুমার বাপকে জানাল, দানবের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে ছোট রাজকুমার মারা গিয়েছে। আমরা দুই ভাই মিলে দানবকে মেরে কমলা, পরী-রাজকুমারী ও তাদের সখীদের উদ্ধার করে এনেছি।

এদিকে হয়েছে কি, দানবের শত্রু এক যাদুকর দানব মারা গিয়েছে শুনে আকাশপুরীর রাজা হবার লোভে পাহাড়ের নীচে এসে মন্ত্র বলে আকাশপুরী মাটিতে নামিয়ে আনল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আকাশপুরী যাদুকরেরই ঘাড়ের উপর পড়ে তাকে চিঁড়ে চ্যাপটা করে দিল।

ছোট রাজকুমার একলা আকাশপুরীতে বেড়াতে বেড়াতে একটা বড় ঘরে কালো পাথরের মস্ত এক দাঁড়কাক দেখতে পেল। কাকের ঠোঁট সোনার। তার দুই চোখ দিয়ে অবিরত জল পড়ছে। ছোট রাজকুমার অবাক হয়ে আঁজলা করে সেই চোখের জল নিয়ে জিনিষটা কি, তাই দেখছে, এমন সময়ে এক ফোঁটা জল পড়ল সেই দাঁড়কাকের মাথায়। অমনি পাথরের কাক পুড়ে ছাই হয়ে এক সুন্দর রাজপুত্র হয়ে গেল।

সেই রাজপুত্র বলল, দানব আমাকে দাঁড়কাক করে রেখেছিল। তুমি আজ আমাকে তার যাদু থেকে মুক্ত করলে। আমি পরী-রাজকুমার।

দুই বন্ধু এবার ছদ্মবেশে ছোট রাজকুমারের দেশে ফিরে গেল। বাপের সঙ্গে দেখা করে সব কথা বলল ছোট রাজকুমার। রাজকুমারী কমলা আর পরী রাজকন্যাও তার পক্ষে সাক্ষী দিল।

সব শুনে রাজামশাই রেগে দুই অকৃতজ্ঞ ছেলেকে রাজ্য থেকে দূর করে দিলেন আর ছোট রাজকুমারকে যুবরাজ করলেন।

তার পর একদিন খুব ধূম-ধাম করে ছোট রাজকুমারের সঙ্গে পরী রাজকন্যার আর রাজকুমারী কমলার সঙ্গে পরী-রাজকুমারের বিয়ে হয়ে গেল।

বড় হ'তে হবে

শ্রীহরপ্রসাদ ঘোষ

তোমাদের কার না ইচ্ছে করে যে সুস্থ ও সবল ভাবে বেঁচে থেকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য পুরোপুরি ভোগ করতে—যতখানি সম্ভব জ্ঞান লাভ করে দেশ ও দশের মাঝে একজন হ'তে। কিন্তু শুধু ইচ্ছা থাকলেই চলবে না, এর সঙ্গে চাই সুস্থ শরীর। কারণ সুস্থ শরীরই মানুষকে সাহায্য করে তা'র ইচ্ছাকে রূপ দেবার। সুস্থ ভাবে বেঁচে থাকতে গেলে যে-সকল নিয়ম পালন করা দরকার সে-সকল নিয়মগুলি লক্ষ্মীছেলের মতন পালন করতে হবে। তোমাদের ইচ্ছা যা'তে সার্থক হয়ে ওঠে তার জন্য স্বাস্থ্যবিজ্ঞান কয়েকটি সুন্দর নির্দ্দেশ দিয়েছে। আশা করি, তোমরা সকলে সে-গুলি পালন করবার চেষ্টা করবে। স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের নির্দ্দেশ :—১। শরীরের উপযুক্ত খাদ্য ও পানীয় বিশেষ দরকার। ২। শরীরের পক্ষে প্রচুর পরিমাণ পরিষ্কার বাতাস ও সূর্য্যের আলো দরকার। এমন ঘরেতে শুতে হবে যে ঘরে বাতাস ও সূর্য্যের আলো বেশ ভাল ভাবেই আসে। বাতাস ও আলো আসবার জন্য ঘরের দু'-একটা জানালা অবশ্যই খুলে রাখতে হবে। তাই বলে যেন ভেবো না, শুধু গরম কালেই বেশ ফুর-ফুর করে বাতাস আসবার জন্য রাত্রিবেলা দু'-একটা জানালা অনায়াসেই খুলে রাখা যেতে পারে। কারণ এতে শরীর-রক্ষার নিয়ম পালনও করা হয় আর সেই সঙ্গে ঠাণ্ডা বাতাসে মেজাজ করে ঘুমানোও যায়। কিন্তু তা' চলবে না। শীতকালেও ঠিক এরকম দু'-একটা জানালা খুলে রাখতে হবে। তবে গায়ে দমকা হাওয়া যা'তে না লাগে—সেজন্য মাথার বা গায়ের পাশের জানালা বা দরজা বন্ধ রাখতে হবে আর সেই সঙ্গে গায়ে একটা চাদর কিংবা তোষক ঢাকা দিয়ে রাখতে হবে। শীতকালে ঠাণ্ডা লাগবার ভয়ে সমস্ত জানালা-দরজা যদি বন্ধ করে শোও, তাহলে ঘর গরম থাকবে স্বীকার করি, কিন্তু সেই গরম ঘর হ'তে বাইরে এলেই সর্দ্দি-কাশী হবে। এজন্য দেখা যায়, শীতকালে ছোট ছেলেমেয়েদের সর্দ্দি-কাশি লেগেই আছে। ৩। প্রত্যেক দিন একই সময়ে মল-মূত্র ত্যাগ করতে হবে। ৪। শরীরে বেশী ঠাণ্ডা ও বেশী উত্তাপ লাগানো উচিত নয়। ৫। শরীরের পক্ষে প্রত্যেক দিন উপযুক্ত ব্যায়াম ও বিশ্রাম দরকার। সকলের পক্ষে সবচেয়ে ভাল ব্যায়াম হ'ল সকালে সূর্য্য ওঠবার আগে কিংবা সন্ধ্যার সময়ে একটু বেড়ান। এমন ভাবে বেড়াতে হবে যাতে ক্লান্তি বোধ না হয়। শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমের পর ক্লান্তি বোধ হ'লেই বিশ্রাম করতে হবে। ৬। বেশী রাত্তিরে ঘুমানো ঠিক নয়—এ অভ্যাস স্বাস্থ্য একেবারে নষ্ট করে দেয়। রাত ন'টা কিংবা দশটায় শোওয়া উচিত এবং ভোরে পাঁচটায় ওঠা উচিত। কিন্তু আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধান অনুযায়ী ছাত্র-ছাত্রীদের রাশি রাশি বই পড়তে হয়। এতে তাদের পক্ষে রাত ন'টা কিংবা দশটায় শোওয়া একরকম অসম্ভব হ'য়ে ওঠে। সুতরাং পড়াশুনা করতে গিয়ে রাত জাগার ফলে শরীরটা একেবারে নষ্ট হয়ে যায় এবং অনেকে কঠিন কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ৭। চোখ, কান ও দাঁতের যত্ন করতে হবে। ৮। শরীরে যা'তে কোনও মতে বসন্ত ইত্যাদি সংক্রামক রোগের বিষ প্রবেশ করতে না পারে সে বিষয়ে সব সময়ে হুঁসিয়ার থাকতে হবে।

স্বাস্থ্যরক্ষার এ-সব হ'ল মোটামুটি নিয়ম। এখন উপযুক্ত খাদ্য কি, সে সম্বন্ধে কিছু বলা যাক্। কি বল? স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের মতে যে সকল খাদ্যে নীচেকার উপাদানগুলির একটা বা তার বেশী উপাদান আছে সে সকল হ'ল উপযুক্ত খাদ্য। এখন উপাদানগুলির নাম শোনো। (ক) আমিষ বা ছানা জাতীয় উপাদান—দুধ, সব রকম মাছ, মাংস, ডিম, ছানা, সব রকম ডাল এই সব হ'ল আমিষ জাতীয় খাদ্য। (খ) তেল বা চর্ব্বিজাতীয় উপাদান—জীবজন্তুর চর্ব্বি, মাছের তেল, সরষের তেল, চীনা বাদাম, মাখন, ঘি, দুধ, নারকেল তেল, ডিম এইগুলি হ'ল তেল জাতীয় খাদ্য। (গ) শ্বেতসার ও শর্করা—চাল, মুড়ি, চিড়া, খই, ময়দা, আটা, সাগু, বার্লি, এরারুট, চিনি, গুড়, আম, কাঁটাল, আনারস, তালের রস, দুধ ইত্যাদি শর্করা জাতীয় খাদ্য। (ঘ) লবণ বা খনিজ পদার্থ—গন্ধক, ক্লোরিণ, সোডিয়াম, লৌহ ইত্যাদি। লবণ বা খনিজ জাতীয় পদার্থ। এইগুলি আমরা খাদ্যের মধ্যে যৌগিক অবস্থায় খাই। যেমন সোডিয়াম আর ক্লোরিণ মিশিয়ে যে লবণ হয় তা আমরা ভাতের সঙ্গে খাই। (ঙ) খাদ্যপ্রাণ বা ভাইটামিন—পালংশাক, বাঁধাকপি, মাছ, মাংস, টম্যাটো, ছোলা, কমলালেবু, পাতিলেবু, আপেল, বেদানা মটর, মেটলে, টাটকা ফল ও সজী ইত্যাদি বহু রকম খাদ্যে ভাইটামিন

প্রচুর পরিমাণে আছে। (চ) জল—প্রায় সব রকম খাদ্যেই একটু-আধটু জল আছে। সুতরাং শরীর সুস্থ রাখতে হ'লে স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের নির্দেশ মেনে তোমাদের চলতে হবে এবং সেই সঙ্গে খাদ্যের দিকে নজর বিশেষ ভাবে রাখতে হবে। কারণ, স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের নিয়ম মেনে চলার সঙ্গে সঙ্গে খাদ্য ঠিকমত না খেলে স্বাস্থ্য রক্ষা করা অসম্ভব। শুধু ওষুধ খেলেই স্বাস্থ্য রক্ষা করা যায় না। ভগবান এমন ভাবে খাদ্য তৈরী করেছেন যে, কি গরীব কি বড়লোক সকলের পক্ষেই তাঁর দেওয়া খাদ্য খেয়ে সমান ভাবে ও সুস্থ শরীরে বেঁচে থাকা সম্ভব। সুতরাং পয়সার অভাবে স্বাস্থ্য রক্ষা করতে পারছি না, একথা বলতে পারব না। কেন না সস্তায় ভাল ভাল খাদ্য ওপরের তালিকা হ'তে অনায়াসে বেছে নিয়ে সুস্থ ও সবল ভাবে জীবন যাপন করে দেশ ও দশের একজন তোমরাও হতে পার।

কাগজ ছাড়া জগৎ চলে না

শ্রীকমলকুমার মিত্র

কাগজ ছাড়া জগৎ অচল। এক কথায় বর্ত্তমান পৃথিবীকে 'কাগজের ফানুস' বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। কারণ, ফানুস কাগজের মায়াজালে চতুর্দ্দিকে জড়িত; বর্ত্তমান পৃথিবীও তদ্রূপ, প্রাতঃকাল হইতে গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত কাগজের কত কোটি কোটি ব্যবহার আমাদের দৃষ্টিগোচর হইতেছে। কাগজকে পৃথিবীর সভ্যতা বিস্তারের অগ্রদূত বলিলে কিছুমাত্র ভুল হইবে না।

বর্ত্তমান সভ্যজগতে কাগজের সহিত কে না পরিচিত? তবুও পরিচয় অধিকতর গভীর করিবার জন্য নিম্নে কয়েকটি কথা বলিবার বিশেষ প্রয়োজন বোধ করি।

মিশরকেই কাগজের জন্মদাতা বলা যায়। কারণ, মিশরেই সর্ব্বপ্রথমে একপ্রকার পাতলা কাগজের সৃষ্টি হয়। নীল নদের ধারে ধারে 'প্যাপিরাস' নামে নলজাতীয় এক প্রকার গাছ জন্মাইত। এই গাছের শাঁস ও ছাল হইতে প্রাচীন মিশরবাসীরা একপ্রকার কাগজ তৈয়ারী করেন। তথাকার অধিবাসীরা ইহার নাম দিয়াছিলেন, 'প্যাপাইরাস।' এই 'প্যাপাইরাস' শব্দ হইতেই ইংরাজী শব্দ 'পেপার' আসিয়াছে। আবার প্যাপাইরাসকে গ্রীসের লোকেরা বলিত 'বিবলস্' গ্রীক ভাষায় বিবলসের মানে হইয়া গেল বই। সম্ভবতঃ এই 'বিবলস' কথা হইতেই যীশুর উপদেশমূলক ধর্ম্মগ্রন্থের নাম 'বাইবেল' হইয়াছে। বহু শতাব্দী ধরিয়া এই 'প্যাপাইরাস' কাগজই সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল।

কয়েক শতাব্দী অতিবাহিত হইল। বর্ত্তমানে আমরা যে কাগজ ব্যবহার করি, তার প্রথম প্রবর্ত্তক চীনদেশ। প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে এই স্থানেই প্রথম কাগজের আবিষ্কার হয়। শুনিলে বিস্ময়বোধ লাগে যে, অধুনা সভ্য য়ুরোপেও যীশুর মৃত্যুর ১০০|৮০০ বৎসর পরে পর্য্যন্ত কাগজের কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। চীনদেশীয় প্রথায় ইউরোপীয় কাগজের প্রথম ছাপা বই হচ্ছে 'ম্যামারিন বাইবেল', ছাপা হয় ১৪৫৬ সালে। কথিত আছে, ৭৫১ খৃষ্টাব্দে চীনাদের সহিত সমরখন্দের শাসনকর্ত্তার যুদ্ধ বাধিলে যে সকল চীনা বন্দীকে আরবেরা আটক করিয়া লইয়া গিয়াছিল—তাহাদের অনেকেই কাগজ তৈয়ারী করিতে জানিত। বলা বাহুল্য, তাহাদের নিকট হইতেই আরবেরা, এবং আরবদের নিকট হইতেই পশ্চিমের লোকেরা কাগজ তৈয়ারী শিক্ষা করিবার সুযোগ পায়। বোধ হয় এই কারণেই চীনদেশে সর্ব্বপ্রথম কাগজের তৈয়ারী ঘুড়ির বিশেষ প্রচলন হয়।

জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভূতত্ত্ববিদ ও বৈজ্ঞানিক স্যার অ্যারেলষ্টাইন, মাটি খুঁড়িয়া মধ্য এসিয়ার মরুপ্রায় ভূমি হইতে প্রাচীনকালে ছাপান কতকগুলি চীনা কাগজপত্র পান। কাগজগুলিতে তারিখও দেওয়া ছিল। সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন কাগজখানির তারিখ ৮৬৮ খৃষ্টাব্দ। কাগজগুলির কোনখানিই ১৩।১৪ ফুটের কম হইবে না। চীন ও জাপান দেশ দুইটি খুব নিকটবর্ত্তী। ইহাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি, তদানীন্তন কালে প্রায় একরূপ ছিল। বৌদ্ধধর্ম্মের নানা মন্ত্র ছোট ছোট কাগজে ছাপান হইয়া জাপানে যাইত। জাপানের প্রাচীন ইতিহাসে আছে, ৭৭০ খৃষ্টাব্দে চীন দেশ হইতে বহুলক্ষ মন্ত্র-সম্বলিত কাগজ জাপানে আসিয়াছিল। সম্প্রতি মন্ত্রখচিত একখানি কাগজ আবিষ্কৃত হইয়া বৃটিশ মিউজিয়মে সংরক্ষিত আছে। ইহাই জগতে সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন ছাপা কাগজের মূর্ত্তি।

অতীতকালে কাগজ না থাকায় পাথর-গাত্রে খোদাই করিয়া অনেক কিছু লিখিত আছে। ভারতের ইতিহাসে অশোকই প্রথম বৌদ্ধধর্ম্মের উপদেশাবলী খোদাই করাইয়া যুগ যুগ অমর করিয়া রাখিয়াছেন। পুরাকালে মেষ কিম্বা ছাগচর্ম্ম পরিষ্কার করিয়া, একপ্রকার কাগজ তৈয়ারী করা হয়; তাহার নাম 'পার্চমেণ্ট কাগজ।' এককালে ইউরোপের লোক চামড়ার উপর লিখিত। চামড়ার উপর হইতে সমস্ত লোম চাঁচিয়া ফেলিয়া, বস্ত্রের মত সূক্ষ্ম একপ্রকার কাগজ তৈয়ারী হইত। কাগজগুলি খুব শক্ত ও দীর্ঘস্থায়ী। ইহাদের দ্বারা মূল্যবান দলিলপত্রাদি লিখিত হইত।

পাতাকে কাগজরূপে ব্যবহার করিয়া, তাহার উপর খাঁকের কলমে লেখা অনেক পুঁথি পুরাকাল হইতেই আমাদের এই দেশে রহিয়াছে। কচি তালপাতা কয়েক দিন কাদায় পচাইয়া, পরে পরিষ্কার করিয়া লিখিতে হয়। বৃক্ষপত্রে লিখনকার্য্য সম্পাদনের জন্যই চিঠির অন্য নাম পত্র। উড়িষ্যার লোক তীক্ষ্ণ লৌহশলাকা দিয়া তালপাতার উপর লিখিত। উড়িষ্যার অধিকাংশ বর্ণমালাই গোলাকৃতি। লৌহশলাকা দিয়া, তালপাতার উপর সরলভাবে লেখা বেশ কঠিন; তালপাতা ছিঁড়িয়া যায়। বোধ করি লিখিবার সুবিধার্থে ঐ বর্ণমালাগুলি ঐরূপ হইয়াছে।

ঘাস, বাঁশ, গাছের ছাল প্রভৃতি হইতে যে শক্ত কাগজ তৈয়ারী হয়, উহাকে 'ভূর্জপত্র' নামে অভিহিত করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া ছেঁড়া নেকড়া-চোপড়া, পাট, শণ, খড়, চট, প্রভৃতি হইতেই আজ-কাল অনেক উন্নত ধরণের কাগজ তৈয়ারী হয়।

কাগজ কি করিয়া তৈয়ারী হয়, জানা একান্ত দরকার মনে করি। প্রথমে সাবান, ক্ষারাদি দ্বারা দ্রব্যগুলি পরিষ্কৃত করিয়া, উহা ঢেঁকি বা কলের দ্বারা ভাল ভাবে চূর্ণ করিয়া লইতে হয়। পরে লৌহ-শলাকাময় ছাঁকনীর উপর ঢালিলে প্রসারিত হইয়া থাকে এবং উহার জলীয় অংশ নীচে পড়িয়া থাকে। তখন ঐ ছাঁকনীর উপর সরের মত যে পদার্থ থাকে, তাহা কোন মসৃণ কাষ্ঠখণ্ডের উপর রাখিয়া উহার উপর চাপ দিলে জলীয় অংশ নিঃশেষ হইয়া যায়। পরে উহার সহিত ভাত, কচু বা আলুর মণ্ড মাখাইয়া শুকাইয়া, চতুষ্কোণ করিয়া কাটিয়া কাগজ তৈয়ারী করা হয়। এখন অবশ্য নানারূপ বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের দ্বারা, অতি অল্প সময়ে ও কম খরচায়,

সুন্দর সুন্দর কাগজ তৈরী হইতেছে। নানাবর্ণের কাগজ দৃষ্টিগোচর হয়। মণ্ডের সময় উহাতে যে রঙ মিশান হইবে, কাগজেরও সেই রঙ হইবে। তেঁতুলবীজের সারাংশ মণ্ডে মিশাইয়া, তুলা হইতে যে কাগজ তৈয়ারী হয়, উহাকে 'তুসট' কাগজ বলে। তবে বিলাতী ধরণের কাগজ তৈরীর কল, সর্ব্বপ্রথম এদেশে গড়ে ওঠে ১৭৬১ সালে দিনেমারদের রাজ্যে, মাদ্রাজের তাঞ্জোর জেলায়।

আধুনিক সমাজ-জীবনে সংবাদপত্রের প্রভাব অনস্বীকার্য্য। রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি, সাহিত্য, ধর্ম্মনীতি, শিল্প, শিক্ষা, বিজ্ঞান, যুদ্ধবিগ্রহ, খেলাধূলা, সিনেমা, থিয়েটার, বাজার দর, বেতারবার্ত্তা, দিনপঞ্জী, কর্ম্মখালি, কর্ম্মপ্রার্থী, পাত্রপাত্রী, শেয়ার মার্কেট, মামলা-মোকদ্দমা, প্রভৃতি বিষয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। সুতরাং সকল রুচির পাঠক-পাঠিকার ইহা একান্ত দরকার। বৃহত্তর পৃথিবীকে হস্তমুষ্টিতে তুলিয়া ধরিয়া, দূরকে নিকট করিয়া, চেনা ও অচেনার সহিত যোগসূত্র স্থাপন করিবার ভার লইয়াছে,—এই সংবাদপত্র। আধুনিক যুগ গণতন্ত্র ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের যুগ। সরকারের জনকল্যাণ-বিরোধী নীতির সমালোচনা করিয়া স্বকীয় মত ও চিন্তাধারা ব্যক্ত করিতে, সংবাদপত্র বিশেষ সহায়তা করে। আধুনিক ধরণের জনসাধারণের জন্য প্রচার পত্রিকার জন্মস্থান, ইতালীর ভেনিস নগরে বলা চলে। তবে পৃথিবীর বৃহত্তম বার্ত্তাসংঘ 'রয়টার'। আমাদের দেশে প্রথম ছাপা সংবাদপত্র প্রকাশ করেন, শ্রীরামপুরে খৃষ্টান মিশনারীরা। ইহাদের আগে ভারত গভর্ণমেণ্টের 'ইণ্ডিয়া গেজেট' নামক সংবাদপত্র প্রথম প্রকাশিত হয়। বাংলা মুদ্রাযন্ত্রের প্রবর্ত্তন করিয়া মিশনারীরা 'দিগদর্শন' নামক মাসিক ও 'সমাচারদর্পণ' নামক সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রকাশ করেন।

মুদ্রাযন্ত্রের প্রচলন, শিক্ষাবিস্তারের প্রধান অঙ্গ। কিন্তু কাগজ ব্যতীত ইহার কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে না। ১৲, ২৲, ৫৲, ১০৲, ১০০৲ টাকা প্রভৃতি নোট এবং শত, হাজার, লক্ষ টাকার চেক, কাগজের সম্মানকে বহুগুণে বৃদ্ধি করিতেছে। পুরাকালে চীনদেশে নোটের পূর্ব্বপুরুষ কাগজের মুদ্রার ব্যবহার ছিল, ইউরোপ 'মার্কোপোলোর' নিকট তাহা অবগত হয়। কিন্তু ইহার অনেক পরে বৃটিশ সাম্রাজ্যে কাগজের নোটের প্রথম প্রচলন বিলাতেই হয়। বিলাত ব্যাঙ্কের প্রধান ক্যাশিয়ার আব্রাহাম নিউল্যাণ্ড প্রত্যেক নোটের উপরেই নিজের নাম সহি করিতেন। সুতরাং তখনকার নোটগুলিকে 'আব্রাহাম নিউল্যাণ্ড' নামে অভিহিত করা হইয়াছিল। বর্ত্তমানে নোট অর্থাৎ টাকার উপরই পৃথিবী ঘুরিতেছে। 'পার্চ্চমেণ্ট' কাগজ নোটের বিশেষ উপযোগী।

দলিল কাগজেরই তৈয়ারী, ইহা জায়গা-জমির মালিক নির্দ্দেশে প্রতীক। ইহা ব্যতীত জগতে বসবাসের এতটুকুও অধিকার থাকে না। পোষ্ট অফিসের যাবতীয় কাজ, ডাকটিকিট হইতে আরম্ভ করিয়া টেলিগ্রাফ পর্য্যন্ত, কাগজ অপরিহার্য্য অঙ্গ। কাগজ ব্যতীত অফিস দোকান, আদালত, থানা, বিশেষতঃ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান একেবারেই অচল।

এক দেশ হইতে অন্য দেশ যাইতে কাগজেরই তৈয়ারী অনুমতিপত্র বিশেষ দরকার। ইহা ব্যতীত গেলে, সেই দেশের সরকার আটক করিয়া রাখেন। ব্যবসা-বাণিজ্য, ঋণ প্রভৃতির চুক্তিপত্র কাগজেরই। ইহা কোন কারণে নষ্ট হইলে ধারণাতীত ক্ষতি হয়।

মানুষের শিক্ষিত অশিক্ষিতে ভেদ করে সার্টিফিকেট—কাগজেরই তৈয়ারী। উহা ব্যতীত মানুষ শিক্ষিত বলিয়া পরিচিত হইতে পারে না। গুরুতর দণ্ড—ফাঁসী, নির্ব্বাসন, সশ্রম কারাদণ্ড প্রভৃতি আদেশ বাহক এই কাগজ।

অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎকে প্রেরণা জোগায় এই কাগজ। অতীতের কার্য্যকলাপকে সজীব করিতে, পুস্তকগুলির অবদান যথেষ্ট। কারণ ঐ পুস্তকগুলির কাহিনী ও প্রেরণাতেই আমাদের পরবর্ত্তী জাতীয় জীবন গঠিত হয়। বাল্মীকির রামায়ণ, বেদব্যাস (কৃষ্ণদ্বৈপায়নের) মহাভারত, শ্রীকৃষ্ণের গীতা, প্রভৃতি গ্রন্থগুলি আজিও তদানীন্তন যুগের কীর্তিকলাপকে তুলিয়া ধরে। তাহা ছাড়া বেদ, চণ্ডী, ভাগবৎ, পুরাণ—চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল, ধর্ম্মমঙ্গল শিবমঙ্গল, অন্নদামঙ্গল প্রভৃতি পুস্তকগুলি আজিও রচয়িতাদের কলাকুশলী ও সেই যুগের কাহিনীগুলিকে স্মরণ করাইয়া দেয়।

দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, কবি, সাহিত্যিক, চিকিৎসক, নাট্যকার গায়ক, প্রভৃতিদের সম্বন্ধে কাগজবদ্ধ গ্রন্থেই তাহাদের প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। বীরের বীরত্ব, সতীর সতীত্ব, ধার্ম্মিকের ধার্ম্মিকত্ব, দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন, প্রভৃতি কাহিনীগুলির পরিচয় পুস্তকগুলিতেই পাওয়া যায়। কাগজ সভ্যতার বাহন ও জ্ঞান বিস্তারের সহায়ক। কাগজের আবিষ্কার হইবার পর মানব সভ্যতা আত্মপ্রচারের সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায় খুঁজিয়া পাইয়াছে। সুতরাং কাগজের আবিষ্কারকে মনুষ্যপ্রতিভার শ্রেষ্ঠ অবদান বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হইবে না। সর্ব্বদিকে চিন্তা করিলে আমাদের একবাক্যে স্বীকার করিতে হইবে, 'কাগজ ছাড়া জগৎ চলে না।'

অঙ্গন ও প্রাঙ্গণ

চোখ ধাঁধানো নিওন লাইট আর মনভোলানো পুষ্পস্তবকে সুসজ্জিত প্যাণ্ডেলে, রমণীয় বরাসনে বিজয়ী বীরের মত বসেছিলো অসীম। চারিপাশে অসংখ্য নিমন্ত্রিত নরনারীর কলগুঞ্জন। কারা বরপক্ষ, বা কন্যাপক্ষ কিছুই বোঝবার উপায় নেই! বিচিত্র বেশভূষাধারী মানুষের বিরাট সমাবেশ প্যাণ্ডেলের মধ্যে। আইসক্রীম, সোডা, লেমনেড, চা, ককটেল হুইস্কি থরে থরে সাজানো টেবিলে, যার যা অভিরুচি নিয়ে খাচ্ছে। সামনে ছোট্ট একটি ষ্টেজে, অলকাপুরীর মাসীমার পরিচালনায় বিচিত্র অনুষ্ঠান সুরু হয়েছে।

মাঝে মাঝে আতর গোলাপের ফোয়ারায় সুরভিত হচ্ছেন নিমন্ত্রিতগণ।

কর্ত্তাহীন কর্ম্ম, শিবহীন যজ্ঞ, বেজায় হট্টগোল। ওপাশের প্যাণ্ডেলে, টেবিলে খাবার সাজানো রেডি। মাইকে ঘোষণা করা হচ্ছে, দলে দলে পুরুষ-মহিলারা হৈ-হুল্লোড় করে সেখানে প্রবেশ করছেন। চেয়ার দখল করে খেতে সুরু করছেন। আবাহনের বালাই নেই। সৌজন্যতার প্রয়োজন নেই। যত খুসি বেলেল্লাগিরি করা অশোভন নয়।

শুকতারা এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে জানে। অনিল আর শুকতারা, দর্শকদের মনমাতানো রোমাণ্টিক মাণিকজোড়। সিনেমা ষ্টার। অসাধারণ জগতের জীব ওরা, সাধারণের নাগালের বাইরে। ওদের আশে-পাশে আধুনিক আর আধুনিকার ভিড়।

জাতিস্মর

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

বারি দেবী

কৌতূহলী জনতা নিচ্ছে অটোগ্রাফ, ওদের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে নিজেদের কৃতার্থ বোধ করেছে। বিদগ্ধ জনগণের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ড্রিঙ্ক করলো শুকতারা, ষ্টেজে অর্দ্ধনগ্ন অবস্থায় নৃত্যকলা প্রদর্শন করলো, চটুল লাস্য ভঙ্গিমায়। মদিরা-বিহ্বল দৃষ্টিবাণ নিক্ষেপ করে অনেক পুরুষের মনে কামনার জ্বালা ধরিয়ে দিলো।

—ওদিকে ঘন ঘন হুলুধ্বনি আর শঙ্খনিনাদ সুরু হয়েছে, কলাতলায় স্ত্রী-আচার হবে, অসীম এসে দাঁড়িয়েছে শিলের ওপর। সাতপাক ঘোরাবার পর, শুভদৃষ্টির পালা। মিতার হাতে সুগন্ধি ফুলের গোড়ের মালা তুলে দিয়ে বললেন পুরোহিত, দাও মা মালাটি পরিয়ে দাও।

মালাটি দুহাতে চেপে ধরে কেমন উদাস দৃষ্টি মেলে পিঁড়ির ওপর বসে রইলো সুমিতা।

—বাব্বাঃ,—বরতো আর তোর অচেনা নয় আর কতক্ষণ দেখবি রে?

চাপাহাসির সঙ্গে বললো কয়েকটি মেয়ে—ওরে বাবা, হাতগুলো যে গেলো আমাদের আর কতক্ষণ পিঁড়ে ধরে থাকবো?

পিঁড়ি সমেত মিতার বাহকেরা অধৈর্য্য ভাবে ঝাঁকুনি দিলো সুমিতাকে।

এত কথার ঝড়েও ধ্যান ভাঙলো না সুমিতার। ওষ্ঠপ্রান্তে ফুটেছে ওর মৃদুমধুর হাসি, ভাবাবেশে অর্দ্ধমুদিত চোখ দুটি।

কানের পাশে সুগম্ভীর কণ্ঠস্বর—দাও মা,—তোমার পতির গলায় মালাটি পরিয়ে।

কম্পিত হাতে মালা পরালো সুমিতা, তার চির প্রিয়তমের গলায়।—অসীমও মালা দিলো মিতার গলায়।

ঘন, ঘন, উলুধ্বনি, শাঁখের শব্দে চম্‌কে উঠলো সুমিতা—একি? কোথায় গেলো সুদাম? এ—যে—

—থর থর কোরে কেঁপে উঠে হুমড়ি খেয়ে পিঁড়ে থেকে পড়ে যাচ্ছিলো সুমিতা,—পতনোন্মুখ দেহখানি ওর দুহাতে জড়িয়ে ধরলো অনিরুদ্ধ।

তারপর একটা বিরাট হৈ-চৈ শব্দ।

নারীকণ্ঠের কান্নার রোল, গোলমাল ছুটোছুটি।

ডাক্তার—ডাক্তার—একি সর্বনাশ হলো গো, বাজনা, নৃত্য গীত, সব থেমে গেলো।

সুমিতার অচৈতন্য, হিমশীতল দেহখানি খোলা বারান্দায় শুইয়ে চোখে-মুখে জলের ঝাপটা দেওয়া হতে লাগলো।

ডাক্তার এসে পরীক্ষা করে বললেন,—ভয় পাবার কিছু নেই, অত্যন্ত ভিড়, গোলমালের জন্য এটা হয়েছে; নার্ভাসনেশ,—এখুনি সুস্থ হয়ে উঠবে।

দিদিমা কপাল চাপড়ে কেঁদে উঠলেন—ওমা শুভকাজের গোড়াতেই বিঘ্ন, কি অলক্ষণ—না জানি বাছার বরাতে কি আছে গো! মিসেস বাসু দিদিমাকে সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে গেলেন। করবী আর অনিরুদ্ধ রইলো সুমিতার কাছে।

মহাবিরক্ত চিত্তে ওষ্ঠ দংশন করে বাইরে লনে বসে সিগারেট ধরালো অসীম। দক্ষযজ্ঞ যেন পণ্ড হয়ে গেছে। নিমন্ত্রিতের দল বিদায় নিলো। মাসীমা এসে বসলেন অসীমের পাশে।

—ওর কি ফিটের অসুখ আছে? শুধোলেন মাসীমা।

—কে জানে? বিরক্তভরে জবাব দিলো অসীম, ওসব বড়মানুষী

চাল, ননীর পুতুল,—একটু আঁচ লাগলেই গলে পড়ছেন। যতো সব ঝামেলা আমার কাঁধে।

—খুক-খুক করে হাসলেন মাসীমা। পেটে খেলেই পিঠে সয় হে! অমন একটু-আধটু ঝামেলা তো থাকবেই, অন্য দিকটাও তো—বুঝলে কি না—সেইটাই তো আসল ব্যাপার।

—সবুর করুন। গাছে কাঁঠাল, গোঁফে তেল—এও সেই ব্যাপার, সন্নিসি ব্যাটা বড় ঘুঘু লোক। পঞ্চাশ হাজার ঠেকিয়ে দিয়ে পালিয়েছে দু' মাস পরে ফিরে এসে ভালোয় ভালোয় সব হাতে তুলে দেয় তবেই বাঁচোয়া—তা না হলে ঐ ছিঁচ কাঁদুনে মৃগীরুগীই বরাতে সার হবে। যাক্‌গে, গলাটা বড্ড শুকিয়ে উঠছে—

—তাই নাকি, তা এতক্ষণ বলোনি কেন? এসো, এসো, দামী দামী মাল গড়াগড়ি খাচ্ছে ওদিকে—অসীমের হাত ধরে মাসীমা এগিয়ে গেলেন দামী মালের সন্ধানে।

—আকাশে দপ্‌ দপ্‌ করে জ্বলছে শুকতারাটা। শেষ রাতের ফুরফুরে হাওয়ায় ছড়ানো যেন শুদ্ধশান্তির বীজমন্ত্র। হাসনাহানার ঝাড়ের পাশে বসেছিলো শুকতারা। সারা রাতের প্রমোদ-বিধ্বস্ত মদিরতপ্ত দেহটা বড় অবসন্ন লাগছিলো। ভালো লাগছে এখন এই শীতল সমীরণ—স্নিগ্ধ, পবিত্র, পুষ্পগন্ধ। মনটাও কেমন যেন উদাস হয়ে উঠছে। কি যেন চাই—সম্মান, অর্থ, রূপ, প্রতিপত্তি—এসব তো তাকে ভরপুর করে রেখেছে, তবে নেই কি? নেই মনের সামান্যশান্তি।

বহু পুরুষের সঙ্গে আছে মাদকতা, সেই মাদকতা যেন বড্ড শ্রান্তি এনেছে ওর দেহে মনে! শান্তি নেই। এখন মনটা চাইছে একটি সাধারণ গৃহস্থবধূর মতো শান্তিভরা গৃহকোণ—আর সেখানে থাকবে না অনেক লালায়িত পুরুষের ভিড়, থাকবে শুধু একজন, সে তার স্বামী—আর তারপরে কোলে আসবে একটি ফুলের মতো সন্তান।

হ্যাঁ, এই প্রয়োজনই সব নারীর জীবনে শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করে! সেও নারী,—

বহু পুরুষের সঙ্গসুখ তো মিলেছে ওর, কতজনকে গ্রহণ করলো, আবার ছাড়লো, কিন্তু প্রকৃত সুখের সন্ধান মিললো কৈ? মনের মধ্যে তো দিনরাত শুধুই অতৃপ্তির দহন জ্বালা! না আর ও পথ নয় এবারে চাই সেই একান্ত আপন শান্ত গৃহকোণ; চাই নিবিড় শান্তি। অত্যন্ত গুরুপাক আহারের পর যেমন মানুষ আর চায়না কালিয়া-পোলাও খেতে, সে চায় একটু পাতলা মাছের ঝোল ভাত; আজ শুকতারার মনোভাব বুঝি কতকটা সেই প্রকারের।

পিঠে কার হাতের স্পর্শ পেয়ে চমকে উঠলো শুকতারা, পাশে দাঁড়িয়ে অনিল।

অমন আনমনা হয়ে কি ভাবছো তারা? কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি পাশে, ধ্যান যে তোমার ভাঙে না। ওর হাতখানি নিজের হাতের মুঠোর চেপে ধরে বললো শুক্‌তারা—বোসো অনিল।

মনস্থির করে ফেলেছে শুকতারা। স্বামী হিসেবে এ লোকটা মন্দ হবে না। দুজনেই এক জাতের, মানে সিনেমা জাতের, সেজন্য কেউ কাউকে দোষ দেবে না। আর অভিনয় বন্ধ করার বায়না ধরবে না। অন্য কেউ হলে বড় বেশী স্বামিত্ব ফলাতে চাইবে।

কি ভাবছিলাম? নেহাতই শুনবে? মিটি-মিটি হাসির সঙ্গে বললো শুকতারা।

শোনাবার উপযুক্ত মনে করো যদি নিজেকে ভাগ্যবান মানবো। ওর হাতখানি চেপে ধরে বললো অনিল।

স্থির দৃষ্টিতে ওর দিকে চাইলো শুকতারা, মৃদুকণ্ঠে বললো—নিজেকে বড় শ্রান্ত বোধ করছি অনিল! এখন মনটা চাইছে কি জানো—ধন নয়, মান নয়, শুধু চাই একখানি বাসা আর ভালোবাসা। কিন্তু ভয় হয়, নিজের সম্বন্ধে, যাকে নিয়ে ঘর বাঁধবো, তিনি যদি আমার এই অভিনেত্রী জীবনটাকে মেনে নিতে না পারেন?

—সিনেমা-আকাশের উজ্জ্বল তারকাই তো তোমার শ্রেষ্ঠ পরিচয় তারা, সে জীবনের মূল্য যে তোমাকে দিতে না পারবে, তোমার স্বামী হবার যোগ্যতা তার কোথায়? তবে কারুকে যদি তুমি ভালোবেসে থাকো, তবে সে কথা আলাদা। ম্লান কণ্ঠে বললো অনিল।

অস্তগামী চাঁদের ফিকে আলো ছড়িয়ে পড়েছে ওদের সর্বাঙ্গে। বিয়ে বাড়ীর রাশি রাশি ফুলের গন্ধে বাতাস ভরপুর; সানাইয়ে বাজছে ভৈঁরো রাগিণী।

সুমিতা সুস্থ হয়েছে। প্রথম রাতের লগ্ন পার হয়ে গেছে; শেষ রাতের লগ্নে এবারে সম্প্রদান হবে। বাড়ীর ভেতরে আবার সাজ সাজ রব উঠেছে।

—কে সে ভাগ্যবান আমায় বলবে তারা? দুরু দুরু বক্ষে শুধোলো অনিল, ওর হাতখানি নিজের বুকে চেপে ধরে।

—সে কথা কি এখনও কথা দিয়ে প্রকাশ করতে হবে? প্রাণের ভাষা কি বোঝ না? মাথাটি ওর বুকে এলিয়ে দিয়ে জবাব দিলো শুকতারা।

লগ্ন পেরিয়ে যায়, আরেকটু পরেই রাত ভোর হয়ে যাবে। তাড়াহুড়ো কোরে প্রাণহীন মন্ত্র পাঠের সঙ্গে বিয়ের বাকী অনুষ্ঠান পর্ব্ব সমাধা করা হল।

—নিচের হলে বাসর শয্যা সুসজ্জিত করা হয়েছিলো। বাসর ঘরে প্রমোদোৎসবের জন্য মাসীমার কত রকমের প্ল্যান ছিলো, কিন্তু ডাক্তারের নজরবন্দী সুমিতাকে কিছুতেই আনা সম্ভব হলো না বাসর ঘরে।

এতদিন ধরে মহড়া দেওয়া নাচগুলো কেউ দেখবে না? তা কি হতে পারে?

অনিল আর শুকতারা জাঁকিয়ে এসে বসলো ভাঙা বাসরে। সঙ্গে সঙ্গে তখনও যাঁরা ছিলেন বিয়ে বাড়ীতে সকলে এসে ভিড় জমালেন সেখানে!

এক পাশে অসীম, অপর পাশে অনিলকে নিয়ে বসলো শুকতারা, মাসীমা বসলেন তবলা নিয়ে। হারমোনিয়াম বাজালো রতনলাল ক্ষেত্রি। নাচ সুরু হলো। হা, হা, হি, হি, হাসির স্রোত বইতে লাগলো, জমে উঠলো বাসর ঘর।

ওপরে নিজের ঘরের খাটে ক্লান্তিভাবে চোখ বুজে শুয়েছিলো সুমিতা। অদূরে চেয়ারে উপবিষ্ট ডাক্তার। অনিরুদ্ধ মাথার কাছে বসে, গোলাপ জল দিয়ে মুছিয়ে দিচ্ছিলো ওর মাথার চুলগুলো।

চোখে গোলাপ জল বুলিয়ে দিয়ে বাতাস করে ওকে সুস্থ করবার চেষ্টা করছিলো।

করবী কয়েক চামচ কমলা লেবুর রস খাওয়ালো ওকে জোর করে। সারা দিন-রাত উপোস গেছে, এত বড় যজ্ঞি গেলো যাকে কেন্দ্র করে সেই রইলো উপবাসী, এত স্ফূর্ত্তি আমোদের ঝড় বইছে যাকে উপলক্ষ্য করে, সেই রইলো বিষাদাচ্ছন্ন। এত আলোর মালা জ্বললো যার জন্যে, সে রইলো দীপনেবা ঘরে। একেই বুঝি বলে নিয়তির পরিহাস।

একটু ঘুম হলেই উনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবেন, মন্তব্য করলেন ডাক্তার, আমি একটা ইনজেকসান দিতে চাই।

ইনজেকসান দিয়ে ডাক্তার বিদায় নিলেন।

ঘুমসাগরের রাশি রাশি স্নিগ্ধ শ্যাম তরঙ্গপুঞ্জ যেন গড়িয়ে আসছে মিতার চোখে। স্নায়ুমণ্ডলীর তীব্র প্রদাহ জ্বালা নিবে যাচ্ছে ঐ ঘন আঁধার ঘুম প্রবাহের স্নিগ্ধ ধারায়! নিদসায়রের অতলতলে তলিয়ে গেলো ওর সচেতন সত্তাগুলো!

বিয়েবাড়ীর কোলাহল, জাঁকজমক, সব কোথায় মিলিয়ে গেছে, আছে শুধু স্বস্তি, নিরবচ্ছিন্ন শান্তি কেউ নেই কোথাও, চারিপাশে মহামুক্তির আনন্দ ধারা ঝরে পড়ছে।

মহানন্দে এগিয়ে চলেছে সুমিতা! এখানে রাতও নেই, দিনও নেই। আছে এক স্নিগ্ধ শান্ত নীলাভ আলো। সামনে একটি হ্রদ, তাতে কাকচক্ষুর মতো কালো জল থৈ-থৈ, করছে। রাশি রাশি পদ্মফুল ফুটে আছে। জলের মাঝে একটি ছোট্ট দ্বীপ। কার মধুর কণ্ঠসঙ্গীত ভেসে আসছে ঐ দ্বীপ থেকে?

মনটা উতোল হয়ে ওঠে ঐ দ্বীপে যাবার জন্যে। জলে নেমে দুহাতে পদ্মফুল আর পাতা সরাতে সরাতে এগিয়ে চললো সুমিতা।

আঃ কি অপূর্ব্ব গন্ধ ভেসে আসছে কোথা থেকে! মহাসুরভি ভারে যেন বাতাস মন্থর হয়ে উঠেছে। মলয় চন্দন যেন কে গুলে দিয়েছে জলে, আঃ, একি মনোহর স্থানে এসে পড়েছি? হ্রদের জল ক্রমশঃ গভীর হচ্ছে। মনের উল্লাসে দুহাতে জল ঠেলে এগিয়ে চলেছে সুমিতা। সাঁতার জানে না, কাজেই জলের ভেতর হেঁটে চলতে হচ্ছে। আর সামান্য একটু এগুলেই দ্বীপে পৌঁছোনো যাবে, কিন্তু আর যে এগোবার উপায় নেই। গলা-জলে দাঁড়িয়ে সুমিতা দুটি হাত বাড়িয়ে দ্বীপটাকে ধরবার চেষ্টা করে। আবছা আলোয় দেখলো সুমিতা, গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো কে একজন। সে ঝুঁকে পড়ে ওর প্রসারিত হাত দুটি ধরে ফেললো।

আঃ বাঁচালে আমায়। কে গো তুমি? তুমি কি গাইছিলে অমন অপূর্ব্ব সুরের গান? ব্যাকুল কণ্ঠে বললো সুমিতা।

হ্যাঁ আমিই গাইছিলাম মিতা! আমায় কি চিনতে পারছো না? দেখো, ভালো করে চেয়ে দেখ।

—কে? কে? দামীদা'?

দুহাতে সুদামের হাত দুটি শক্ত করে চেপে ধরে আর্ত্তকণ্ঠে বললো সুমিতা। দামীদা'! তুমি? নাও; তোমার ঐ স্বর্গে আমার টেনে তুলে নাও, আমি যে কিছুতেই যেতে পারছিনা গো, আমার হাত তুমি ছেড়ে দিও না দামীদা। সামনে কি গভীর কালো জল, ছেড়ে দিলে আমি কোথায় তলিয়ে যাবো, আমি কত আশা নিয়ে এসেছি, তোমার ঐ দ্বীপে যাবো বোলে।

ওর হাত দুখানি নিজের হাতে চেপে ধরে ওর দিকে চেয়ে মৃদু মৃদু হাসতে লাগলো সুদাম। ওর দুটি চোখ দিয়ে যেন ঝরে পড়তে লাগলো অপার্থিব জ্যোতির স্নিগ্ধ ধারা। সে ধারায় স্নাত হয়ে থেমে গেলো সুমিতার সব চঞ্চলতা—দ্বীপে ওঠার ব্যাকুল বাসনার দীপ হলো নির্ব্বাপিত। বিমুগ্ধ আত্মা ওর অনির্ব্বাণ নির্বাত দীপশিখার মত ঊর্দ্ধমুখি হয়ে চেয়ে রইলো, সেই জ্যোতির্ম্ময় মুখখানির দিকে। ওর হাতে রইলো ওর হাত দুটি বাঁধা।

বায়ুহিল্লোলে ভেসে এলো সেই মনমাতানো মহাসুরভি। ওদের সর্ব্বাঙ্গে ঝর ঝর করে ঝরে পড়ছিলো জল-ছুঁই-ছুঁই গাছগুলো থেকে রাশি রাশি ঝরা ফুল।

বিভোর হয়ে চেয়ে রইলো দুজন দুজনার পানে। নিবিড় শান্তিতে আচ্ছন্ন হৃদয়, যেন মহাসমাধি লাভ করেছে। মহাসত্যের উজ্জ্বল জ্যোতিতে ভাস্বর হয়ে উঠেছে দুজন। সকল মিথ্যার গণ্ডি ভেঙে, সব মোহ অন্ধকার পেরিয়ে এসেছে ওরা শাশ্বত জ্যোতির্লোকে।

[ক্রমশঃ।

তবুও শান্তি পাই

প্রতিভা রায়

তবুও শান্তি পাই। আমি ক্ষণে ক্ষণে
যত বার দেখেছি তোমায়
নীরবে কথার মালা দিয়ে উপহার
তোমাকে করেছি বরণ অতি সঙ্গোপনে।
তোমার চোখের ভাষা নীরব কবিতা
সেই ভাষা মন্ত্রমুগ্ধ করেছে আমায়।
জানি, ও দেহ প্রাণহীন হ'লে হবে যে অসার
কুৎসিত শবের গন্ধে ভরিবে বাসর।
কোথায় মিলাবে তখন সকল কবিতা?
তাসের ঘরের মত তোমার নিশ্বাসে
সব ভেঙে যাবে। একা-একা হবে স্বয়ম্বর
তোমার পুরানো স্মৃতি—মধুঝরা মাসে।
তবুও শান্তি পাই, যত বার দেখি তোমাকেই;
সেদিনও আসবে জানি তুমি কিম্বা আমি পাশে নেই।

দেউল ও দয়িতা

আভা পাকড়াশী

[মহীশূর হইতে পঞ্চাশ মাইল দূরে অবস্থিত বহু পুরাতন হালিবিড ও বেলুড় মন্দিরের বিষয়ে প্রচলিত কাহিনী হইতে লিখিত আমার এই রচনা।]

—নিঝুম নিশুতি রাত, দু'পাশের জঙ্গল ভেদ কোরে হু হু কোরে বাস ছুটে চলেছে। মাইশোর থেকে হোষাল ডাইনেষ্টির হালিবিড মন্দির দেখতে চলেছি। বাইরের বৃষ্টির ছাট দু'পাশের ত্রিপল ভেদ করে ভেতরে ঢুকছে। বাসের যাত্রীরা বেশীর ভাগই নিদ্রাচ্ছন্ন। আজ সপ্তমী পূজা বেলুড়ে দিয়েছি। কাল মহাষ্টমী। ভাবছি কানপুরে না জানি কত হৈ-চৈ হচ্ছে।

আমার পেছনেই একজন মাদ্রাজী ভদ্রলোক আমার স্বামীকে ঐ মন্দির সম্বন্ধে অনেক কিছু বলছেন, ঝাঁকুনিতে দু'-চারটে টুকরো কথা ছাড়া আমি আর বিশেষ কিছুই শুনতে পাচ্ছি না।

প্রথমে শুনলাম ঐ মন্দির ও এথানকার বেলুড় মন্দির টুয়েলভথ সেঞ্চুরীতে রাজা বিষ্ণুবর্দ্ধন তৈরী করান। এঁরই রাণী সন্তরার নাচের ভঙ্গিমা দেখে শিল্পী ঐ সব মনোহর মূর্ত্তি তৈরী করে। বেলুড় এই মাত্র দেখে এলাম। অদ্ভুত তার কারুকার্য্য। মূর্ত্তিগুলি যেন জীবন্ত। কত রকম যে নাচের ভঙ্গিমা আর কি সুন্দর ভঙ্গী ঐ মূর্ত্তিগুলিতে জীবন্ত হয়ে উঠছে না দেখলে অনুমান করা যায় না।

পৌছে গেলাম হ্যালিবিডে। নরম ভিজে মাটির সোঁদা গন্ধ। ভিজে রাস্তার ওপর দিয়ে হেঁটে চলেছি। চার দিকে ফেউ ডাকছে। ভাবছি, এ আবার কোথায় এসে পড়লাম। বেলুড়টা কিন্তু একটা বেশ বড় গ্রাম ছিল। এখানে এই বাস ষ্টপেই কফিখানা, আর সঙ্গে ছোট হোটেল আছে আর কোথাও কিছু নেই। খুব বিরল বসতির অজ পাড়াগাঁ। আমারা ঐখানেই কফি আর দোসা খেয়ে রেষ্ট হাউসের দিকে চললাম। লোকেরা বললো, ক'দিন থেকে বড় বাঘের উৎপাত হয়েছে, আপনারা তাড়াতাড়ি যান। তখন রাত হয়ে এসেছে। চতুর্দ্দিকে ঝিঁঝিঁ ডাকছে।

যা ভেবেছিলাম তা নয়, রেষ্ট হাউসটি সত্যিই বেশ। কিন্তু ঘরে বড় বাদুড় আর চামচিকের গন্ধ। মনে হয় যেন কোন মানুষের অগম্য জায়গায় এসে পড়েছি। বড় বড় কাচের জানলা। সামনে পেছনে চওড়া বারান্দা, বেশ বড় বড় ঘর দুখানা পাশাপাশি। দুটোতেই অ্যাটাচ বাথ আছে, বেসিন আছে। পাম্প আর ইলেকট্রিক লাইটও আছে। পাম্পটা চালু নয়, ওথানকার দরওয়ান জল ভরে দিয়ে গ্যাল টবে! ঘরে ফার্নিচারও অনেক—যেমন বেতের খাট, ড্রেসিং টেবিল, চেয়ার, আলনা এই সব। ওপাশের ঘরে আছেন একজন তরুণ আর্টিষ্ট। মানে স্কাল্পচার আর কি। তিনি তিন মাস এখানে আছেন।

রাত কত হবে জানি না, সঙ্গে গরম কাপড় কিছুই নেই। সেপ্টেম্বরের শেষ। কানপুরে এসময়ে কিছুই লাগে না। অথচ এখানে বেশ ঠাণ্ডা। ঘুমও পেয়েছে খুব।

মিষ্টি নূপুরের আওয়াজ আসছে, আসবার সময়ে রেষ্ট হাউসের কাছেই অনেকখানি পুঞ্জীভূত অন্ধকার দেখিয়ে কুলিটা বলেছিল, সাব, টেম্পল।

মন্দিরের দুপাশে দুটো ফিনিক্সের মত সিংহ মূর্ত্তি। অসঙ্কোচে ভেতরে চলেছি হাতে পূজার সম্ভার। নূপুর আমার পায়েই বাজছে।
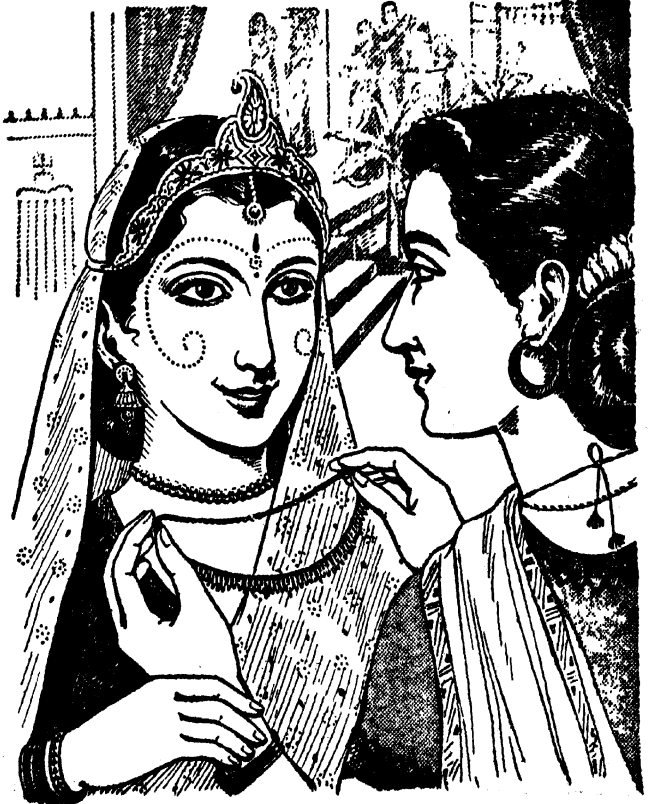
আমাদের পাশের ঘরের আর্টিষ্ট ভদ্রলোকও আমার পাশে পাশে চলেছেন, তাঁরও হাতে মাঙ্গলিক। স্যুটের বদলে পরেছেন ধুতি ও উত্তরীয়। কানে কুণ্ডল।

হঠাৎ মৃদু গম্ভীর কণ্ঠে কেউ ডাকে: দেবী সন্তরা! আজ মহাষ্টমী আমার মোহিনী মূর্ত্তি শেষ হয়েছে। অবলোকন করুন। থমকে দাঁড়িয়ে দেখি। তাইতো, কি সূক্ষ্ম কারুকার্য্য এই মূর্ত্তির অলঙ্কারে।

কাঁপা রুদ্রাক্ষের মালাটি নাভিদেশে নেমে এসেছে। মনে হয়, ওটি বিচ্ছিন্ন কিন্তু তা নয়, ঐ একই পাথর কেটে ওটি তৈরী। প্রশ্ন করি, এই অপরূপ মূর্ত্তি হস্তহীন কেন শিল্পী?

উত্তর আসে, আজ আপনি মধুমণ্ডিতে নৃত্য করবেন আর আমি সেই নৃতপরা সুডৌল হস্ত এর অঙ্গে স্থাপন কোরব।

সে কি! আমি? আমি? নৃত্য কোরব? এ তুমি কি বলছ শিল্পী!

হ্যাঁ দেবী, আপনি। স্মরণ করুন সেদিনের ঘটনা।

এবার চিত্তপটে ভেসে ওঠে, অপরূপ এক দৃশ্য। বিরাট গোপুরম। সম্মুখে মন্দির অভ্যন্তরে বিশাল বিষ্ণুমূর্ত্তি, তাঁর সামনে গোল মসৃণ প্রস্তর চত্বর। লোকে লোকারণ্য, চতুর্দ্দিকে নাটমন্দির। একপার্শ্বে মহারাজ বিষ্ণুবর্দ্ধন সমাসীন, কিঙ্করীরা ব্যজনরতা। আস্তে আস্তে ধীর পদক্ষেপে অগ্রসর হই, আমার প্রত্যেক পদক্ষেপে ফুটে উঠছে নৃত্য-ভঙ্গিমা। কি অভিনব আমার সজ্জা, অলক্তক সিঞ্চিত চরণে নূপুর, নাভির নিম্নে নীবিবন্ধনী, কটিতে মেখলা, বক্ষে কঞ্চুলি, কণ্ঠে মুক্তার সাতনরী, প্রকোষ্ঠে হীরকবলয়, কর্ণে কুণ্ডল ও মস্তকে সিঁথিমৌড়। হস্তে মুকুর নিয়ে বিস্ময়াবনত চক্ষে দেখি, অপরূপ এক রূপসী মুক্তা সদৃশ দন্ত বিকশিত কোরে হাস্য কোরছে।

মহারাজ জয়ন্ত! সচমকে দেখি, আমার স্বামী। চুড়িদার পাজামা নেই, গায়ে শেরোয়ানী নেই। একি অদ্ভুত বেশ!

পরিধানে সুন্দর গরদের জোড়, গলায় স্বর্ণ উপবীত। কর্ণে কুণ্ডল, প্রকোষ্ঠে স্বর্ণবলয়, আমায় স্বস্তি করেন,—শুভমস্তু! দেবদাসী নৃত্য আরম্ভ হোক্।

সেই কষ্টিপাথরের গোল চত্বরের উপর উদ্দাম নৃত্যে নেচে চলেছি। ভরতনাট্যম্, কথকলি, ভস্মমোহিনী, স্বৈরিণী, কিঙ্করী, শচী, কত বা সে নাচের নাম, কত বা মুদ্রা। হঠাৎ সম্মুখে চেয়ে দেখি, সেই চিত্রকর নিবিষ্ট নিথর হয়ে পারিপার্শ্বিক ভুলে একাগ্রদৃষ্টিতে মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে আমারই দিকে।

মহারাজ রোষকষায়িত লোচনে রাগত কণ্ঠে বলে ওঠেন, কে এই দুর্বিনীত যুবক? যার এত বড় স্পর্দ্ধা! দেবতা ও রাজার প্রসাদী জিনিষে ওভাবে দৃষ্টিক্ষেপ করে? সভাসদ উত্তর দেয় সভয়ে, মহারাজ। ও পুরোহিত-পুত্র অম্বর। মহারাজ সক্রোধে সম্বোধন করেন, অম্বর! তুমি আমার সম্মুখে উপস্থিত হও, মস্তক অবনত কোরে অম্বর অগ্রসর হয় মহারাজের সমীপে।

কি তোমার পরিচয়?

আমি শিল্পী।

পার তার কোন নিদর্শন সর্বসমক্ষে উপস্থিত করতে?

বিনীত উত্তর আসে, পারি মহারাজ।

পার এই দেবদাসীর নৃত্যভঙ্গিমা পাষাণে প্রতিফলিত করতে? আজ্ঞা করুন।

কত। কত দীর্ঘসময় চাই তোমার একটি মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করতে?

তিন মাস। কিন্তু প্রত্যহ যদি এঁর এই অপূর্ব্ব নৃত্যভঙ্গিমা অবলোকনের সৌভাগ্য হয়, তবে।

তথাস্তু, কিন্তু যদি অপারগ হও—তবে রাজরোষে, রাজ অবরোধে হবে তোমার স্থান।

পুরোহিতের কণ্ঠের শিবস্তোত্র স্তিমিত হয়ে আসে, হস্তধৃত পঞ্চপ্রদীপ কেঁপে ওঠে পুত্রের অমঙ্গল আশঙ্কায়। আরতি শেষে সভা ভঙ্গ হয়।

মহারাজার আদেশে প্রতিহারী ঘোষণা করেন, ঐ দেবদাসী সন্তরা তিন মাস পরে মহাষ্টমী তিথীতে রাণী সন্তরাতে পরিবর্ত্তিত হবেন। সেই দিন এই শিল্পী তাঁর মূর্ত্তি সর্বসমক্ষে বিচারের জন্য প্রকাশ কোরবে আর প্রকৃত শিল্পী কিনা তার প্রমাণ দেবে।

আজ সেই মহাষ্টমী তিথি। অম্বরের পরীক্ষার দিন। আমি বিস্ময়াব্যাকুল কণ্ঠে প্রশ্ন করি। কেমন কোরে? অম্বর, তুমি এর এই কঠিন প্রস্তরময় মুখে আমার মুখের পেলবতা উৎকীর্ণ করেছ? কি যন্ত্র দিয়ে কোরেছ এই সব অলঙ্কারের সূক্ষ্মতার সৃষ্টি? বিস্ময়ে হতবাক হয়ে জিজ্ঞেস করি, কে তুমি শিল্পী? সত্য বল কোথায় পেয়েছ তোমার এই অদ্ভুত প্রতিভা। কে দিলো তোমায় এই প্রেরণা?

বিগলিত স্বরে উত্তর দেয় অম্বর, তুমি! তুমিই দিয়েছ দেবদাসী। তোমায় আমি সমস্ত অন্তর দিয়ে আমার সব সত্তা দিয়ে ভালবাসি দেবদাসী! তোমার ঐ মোহিনী মূর্ত্তি আমার অন্তরের অন্তস্তলে মুদ্রিত হয়ে আছে। আমি সেই রূপ সেই মুদ্রা তাই অতি সহজেই কঠিন প্রস্তরে উৎকীর্ণ করেছি।

মন্দিরের অভ্যন্তরে রাজ-পুরোহিতের অন্তর কেঁপে ওঠে, তিনি দুই হস্ত প্রসারিত কোরে ব্যাকুল ভাবে ছুটে এসে পুত্রকে আলিঙ্গন করে বলেন, এ তুই কি বললি অম্বর? ভুলেও ও-বাক্য আর উচ্চারণ করিস না, জানিস কি এর শাস্তি—আজীবন অন্ধ হয়ে রাজ কারাগারে বন্দী থাকতে হবে।

মৃদু হাস্যে নত মস্তকে উত্তর দেয় অম্বর, অন্ধ হলেও পারি আমি ঐ মূর্ত্তি প্রস্তরে প্রতিফলিত করতে।

শিউরে উঠে রুদ্ধস্বরে বৃদ্ধ বলেন, ওরে না না, তুই আমার একমাত্র পুত্র, সে ক্ষতি আমার সহ্য হবে না।

পাত্র-মিত্র সভাসদে মন্দির-প্রাঙ্গণ ও দেউল ভরে গিয়েছে। মহারাজ রাজগুরুর পদবন্দনারত। এই বার তিথিপূজা ও বিবাহের লগ্ন সমাগত।

আমি স্থির অচঞ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। আর অম্বর? মুখে তার প্রতিভা-উদ্ভাসিত কিন্তু ম্লান। আরতি প্রদীপ সদৃশ দুই চক্ষু দিয়ে সে যেন শেষবারের মত আমারই আরতিরত। ওর ঐ দৃষ্টিতে আমার অন্তর ব্যথা ও লজ্জায় কেঁপে উঠছে।

শঙ্খ ও ঘণ্টাধ্বনির মধ্যে তিথিপূজা শেষ হোল। রাজগুরু তাঁর আসন গ্রহণ করলেন। মহারাজ পাত্রমিত্র সহ প্রস্তর পট্টে সমাসীন।

প্রতিহারী ঘোষণা করলো, অম্বর এবার তার মূর্ত্তির আবরণ সর্বসমক্ষে উন্মোচন করুক, যদি কৃতকার্য্য হয় তবে তার যাচ্ঞা মহারাজ পূর্ণ করবেন।

আর যদি প্রমাণিত হয়, তার ঐ মূর্ত্তিতে দেবদাসীর নৃত্যের প্রতিকৃতি প্রতিফলিত হয়নি, তবে সে আজীবন রাজকারাগারে বন্দী থাকবে।

সকলের মিলিত গুঞ্জন ধ্বনিতে দেবদেউলের অভ্যন্তর গম-গম করতে থাকে। অম্বর প্রথমে নারায়ণকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে, তারপর পিতার দিকে ক্ষণকাল স্থির দৃষ্টিপাতে আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করে। রাজপুরোহিত শুভকামনার সঙ্গে একটু প্রসাদী ফুল পুত্রের হস্তে অর্পণ করে তার শিরশ্চুম্বন করেন। যথাক্রমে অম্বর রাজগুরু ও মহারাজকে প্রণাম করে ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে গিয়ে অতি যত্নের সঙ্গে মোহিনী মূর্ত্তির আবরণ উন্মোচন করে। রাজা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে তাকিয়ে থাকেন এই অপূর্ব্ব জীবন্ত মূর্ত্তির দিকে। আবেগ ভরে আস্তে আস্তে উচ্চারণ করেন, ধন্য তুমি অম্বর, ধন্য তোমার শিল্প-সাধনা। তোমার ভাস্কর্য্য অনন্তকাল ধরে তোমার পরিচয় বহন করবে। এই রূপলাবণ্যময়ী সন্তরা একদিন জরাগ্রস্তা হবে, আমার এই রাজত্বও একদিন কালগ্রাসে বিলীন হয়ে যাবে। কিন্তু অম্বর, তোমার শিল্প হবে অমর চিরস্থায়ী। এরই মধ্যে জীবিত থাকবে সন্তরার অপূর্ব্ব নৃত্যকৌশল। বল তোমাকে কি পুরস্কার দেব? কোন পুরস্কার তোমার যোগ্য হবে শিল্পী? (এই রাজা ছিলেন অত্যন্ত গুণগ্রাহী কিন্তু ধৃষ্টতা সহ্য করতে পারতেন না।)

অম্বর বলে, মহারাজ! আমি এই দেব-দেউলের সমস্ত প্রাচীর-গাত্রে ঐ দেবদাসীর প্রত্যেকটি নৃত্যভঙ্গিমা এমনি জীবন্ত কোরে ফুটিয়ে তুলবো আজীবন কাল পর্য্যন্ত। বিনিময়ে আপনি আমাকে ঐ মূর্ত্তিমতী শিল্পী দেবদাসীকে প্রত্যর্পণ করুন মহারাজ!

জিহ্বা সম্বরণ কর যুবক! মহারাজের রোষগম্ভীর কণ্ঠস্বর সারা দেউলে প্রতিধ্বনি তোলে, কিন্তু সভা একেবারে নিস্তব্ধ। অন্যথা ইচ্ছা প্রার্থনা কর যুবক। যশ, অর্থ, উপাধি অন্য যা তোমার যাচ্ঞা হয় আমায় দুঃসাধ্য হলেও পশ্চাদপদ হবো না।

না মহারাজ! আর কোন, যাচ্ঞাই আমার নেই, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। অবনত মস্তকে অতি ধীরে এই উত্তর দেয় অম্বর। এর পর মহারাজ অতিশয় বিরক্ত ও রাগান্বিত হয়ে গম্ভীর সুউচ্চ কণ্ঠে ডেকে ওঠেন—

প্রতিহারী! প্রহরীকে বল এই দুর্ব্বিনীত যুবককে কারাগারে নিক্ষেপ করুক আর আজ রাত্রির মধ্যযামে এর দুই চক্ষে যেন তপ্ত লৌহশলাকা প্রবেশ করিয়ে একে অন্ধ করা হয়। ঐ দূষিত দৃষ্টি যেন আর কখনো দেবদাসীকে কলুষিত না করে। গভীর দুঃখিপাতে আমার কাছে শেষ বিদায় নিয়ে চলে যায় শৃঙ্খলিত অম্বর। ঐ প্রস্তরমূর্ত্তি নারায়ণ তাঁর সাদা মণিময় চক্ষু মেলে সমস্ত কিছুই দেখলেন কিন্তু হৃদয়ে দয়া তাঁর হোল না। আমার দু' নয়ন অশ্রু পূর্ণ হয়ে গেল। সভা নিস্তব্ধ।

গুরুগম্ভীর কণ্ঠে রাজগুরু বলেন, দেবদাসী, শেষবারের মত আজ-তুমি দেবসমক্ষে নৃত্য কর। তাঁর প্রসাদ ভিক্ষা কর।

আমার হস্তপদ নিষ্ক্রিয়প্রায়। নিজের এই সুন্দর দেহের প্রতি এসেছে অসহ্য ঘৃণা। মনে এসেছে আমার ক্ষোভ। আমার এই অসার দেহের জন্য আজ একটি তরুণের সারা জীবনে নেমে আসবে অন্ধকার। অথচ আমি নিরুপায় ক্রীড়নক। নিয়মের নিগড়ে বাঁধা। এই রাজ্যের প্রথা মত বিংশতি বর্ষ পর্য্যন্ত দেবতা আমার স্বামী তার পর রাজা হবেন ভর্ত্তা। এই বিবাহের পরে আমি হবো রাজকুলবধূ। রাজ-অন্তঃপুরে হবে আমার স্থান।

উদ্দম আকুল হয়ে পূজারিণী আমি নৃত্য করছি। হে শিলাময় কঠিন দেবতা, কৃপা কোরে কিছু উপায় কোরে দাও। এলো মনে, এলো উপায়। ভগবানের চরণে প্রাণভরা প্রণতি জানিয়ে আমার নৃত্য শেষ করি। সবাই তখন আমার নৃত্যে বিভোর।

সুরু হয় বিবাহের মঙ্গলানুষ্ঠান। আমার সখীরা আমায় বধূসজ্জায় সজ্জিত করছে। এ কি? এ যে ঠাকুরঝি? আর এ যে বৌদি আর নমিতা। আর আমার মস্তকে সিঁথিমৌড় পরাল সে যে বীণাদি। কি অপরূপ লাগছে এদের এই বেশে। আমারই মত নীবিবন্ধ আর কঞ্চুলী পরিধানে। চরণে নূপুর, কটিতে মেখলা, সূক্ষ্ম কারুকার্য্য খচিত বক্ষোবাস, ভারী অদ্ভুত এক অনুভূতি হচ্ছে এদের দেখে।

বিবাহের অনুষ্ঠান শেষে আমি ও মহারাজ পুষ্পমাল্য গলে নারায়ণের সম্মুখে এসে দাঁড়াই। পুরোহিত ভগবানের হয়ে আমাকে রাজার হস্তে সমর্পণ কোরে রাজাকে প্রণাম কোরতে বলেন। প্রণামান্তে মহারাজ প্রথা অনুযায়ী আমার তিনটি ইচ্ছা পূরণ করতে চান। এই উপায়ই আমার মনে এসেছিল। প্রথম ইচ্ছায় প্রার্থনা করি অম্বরের চক্ষু। উত্তর হয় 'তথাস্তু।' সলজ্জায় দ্বিতীয় ইচ্ছা জানাই, কামনা করি অম্বরের মুক্তি। মহারাজ প্রশ্ন করেন গম্ভীর কণ্ঠে—রাজ্ঞি। তুমিও কি ওর প্রতি অনুরক্ত? নির্ভীক ভাবে উত্তর দিই না মহারাজ, অনুকম্পা। সহাস্যে উত্তর প্রদান করেন, বেশ, এর পর? এবার মিনতি পূর্ব্বক তৃতীয় ইচ্ছায় রাণী হবার পরও দেব সমক্ষে নৃত্যের অনুমতি প্রার্থনা করি। অল্প হাস্যের সঙ্গে উত্তর দেন। সন্তরা, তোমার উদ্দেশ্য আমার অগোচর নেই। অনুকম্পা ওর প্রতি আমারও আছে। অতবড় প্রতিভা বিনষ্ট হবে না। তুমিই আমার উপযুক্ত রাণী সন্তরা, যাও রাজ্ঞী সন্তরা, বন্দীকে নিজ হস্তে মুক্তি দিয়ে এসো। শ্রদ্ধাবনত চিত্তে তাঁকে প্রণাম করে প্রহরীর সঙ্গে অগ্রসর হই কারাগারের সুড়ঙ্গ পথে। সেই বাদুড় আর চামচিকের গন্ধ। সমস্ত সুড়ঙ্গ-পথ যেন এই উৎকট গন্ধে ভরে আছে, নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে যেন। এই গন্ধ অনেক অতীতের ঘটনা স্মরণে আনে। ঝন ঝন শিকলের শব্দে সম্বিৎ ফিরে আসে। দুই হস্ত আমার অনাবৃত স্কন্ধে স্থাপন কোরে অম্বর বলে ওঠে এ কি তুমি? সন্তরা তুমি এখানে? আমি দুই পদ পিছিয়ে গিয়ে সরোষে বলে উঠি, ছিঃ পরস্ত্রীকে স্পর্শ কোর না অম্বর!—

কি হয়েছে? এই শান্তা? কার সঙ্গে কথা বলছ? ওঠো! ন'টার বাস ছেড়ে যাবে যে, মন্দির দেখতে যাবে কখন? আমার দুই কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে বলে ওঠেন আমার স্বামী।

হতভম্ব হয়ে বসে থাকি খাটে। কি আশ্চর্য্য! তাহলে এতক্ষণ একটানা স্বপ্নই দেখেছি। কি অদ্ভুত সব জীবন্ত ব্যাপার দেখলাম। সত্যি কি এটা স্বপ্ন না জাতিস্মরের মত পূর্ব্বজীবনের ছায়া দেখেছি! উনি আবার তাড়া দিয়ে ওঠেন, কই বোসে রইলে কেন যাও বাথরুমে যাও। ইস, চামচিকের গন্ধে ঘর ভরে গেছে, আমি জানলা খুলে দিলাম কিন্তু সত্যিই তো ঐ গন্ধই আমাকে নিয়ে গিয়েছিল ঐ দূর অতীতে। ঠক্-ঠক্ শব্দ ওঠে দরজায়, চমক ভেঙ্গে বলে উঠি কে? কে ওখানে?

উনি দরজা খুলে দিতে, সত্যোস্নাত আর্টিষ্ট ভদ্রলোক কফিভরা গ্লাস ওঁর দিকে এগিয়ে দেন। আমি লজ্জায় তাঁর দিকে চাইতে পারছি না। আমার জড়সড় ভাব দেখে ভদ্রলোক অপ্রস্তুত হয়ে, 'এক্সকিউজ মি' বলে চলে গেলেন। ওঁকে বললাম, তুমি ভদ্রলোকের সঙ্গে যাও, মন্দিরে আমি স্নান সেরে এখুনি আসছি।

এই চামচিকের গন্ধ বেলুড় মন্দিরেও ছিল। এ যেন পুরোন ঐতিহ্যের প্রতীক। ঐ সুড়ঙ্গ-পথ ছিল মন্দিরের, গর্ভগৃহে যাবার রাস্তা। ঐ মন্দিরের সারা গায়ে, বাইরের দিকে ছিল অপূর্ব্ব সুন্দরী-মূর্ত্তি খোদাই করা। প্রত্যেকটি নাচের ভঙ্গিমায়। আর ছিল ঐ মনোহারিণী মোহিনী মূর্ত্তি যার প্রতিটি অঙ্গে মনোহর নাচের মুদ্রা, ফুটে উঠেছে জীবন্ত হয়ে। রাস্তায় আসতে আসতে ঐ বাসের মধ্যে মাদ্রাজী ভদ্রলোকের কথার টুকরোয় আর ঐ সব স্মৃতি মিলিয়ে আমার এই অদ্ভুত স্বপ্ন গড়ে উঠেছে যার অনুভূতি এখনও আমার মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

হলিবিড মন্দিরও ঐ বিষ্ণুবর্দ্ধনেরই তৈরী, তবে আরও পুরান মনে হোল। শুনলাম, ওর মধ্যে বাঘের বাসা হয়েছিল। চতুর্দ্দিক নিবিড় জঙ্গলে ভরা ছিল। মহারাজা কৃষ্ণরাজা ওয়াডিয়ার একদিন শিকারে এসে এই মন্দির আবিষ্কার করেন ও সংস্কার করান। আর ঐ নিবিড় জঙ্গল নষ্ট করে বসতি স্থাপন করেন। এই মন্দির বেলুড় মন্দিরের চেয়েও বড়। ভেতরে বিরাট শিবলিঙ্গ আছেন। আর দোতলা সমান উঁচু কষ্টিপাথরের তৈরী বিরাট নন্দীমূর্ত্তি আছে দুইটি। একটি ভগ্নপ্রায় অপরটি অখণ্ড। এই মন্দিরের বৈশিষ্ট্য এই যে, এর সারা গায়ে সমস্ত রামায়ণ-মহাভারতের অষ্টাদশ পর্বের ঘটনা খোদাই করা আছে। নারায়ণের কপট নিদ্রা থেকে আরম্ভ কোরে ভীষ্মের শরশয্যা পর্য্যন্ত সব আছে। কি সূক্ষ্ম সুন্দর কাজ! কি মুখের ভাব! ভীম দুঃশাসনের নাড়ি-ভুঁড়ি টেনে বার কোরছেন, মুখে ফুটে উঠেছে পৈশাচিক উল্লাস, দ্রৌপদী সেই রক্ত প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী চুলে মাখাচ্ছেন, মুখে ফুটে উঠেছে আত্মতৃপ্তির আভাস। মৃত দুঃশাসনের মুখ যন্ত্রণায় বিকৃত। এমনি বেলুড়েও ছিল। প্রত্যেকটি নাচের অভিব্যক্তি নর্ত্তকীর মুখে পরিষ্কার ফুটে উঠেছে, মনে হয় যেন ট্যাবলো দেখছি। এমন কি মুকুর হাতে হাসছে, তখন তার দাঁতগুলি পর্য্যন্ত দেখা যাচ্ছে। শিব-পার্ব্বতী বিবাহের পর কৈলাস যাচ্ছেন শিব পার্ব্বতীকে নিয়ে। শিবের মুখে বিজয়গর্ব্ব, আর পার্ব্বতীর ম্লান নতমুখে লজ্জা আর বিচ্ছেদ-ব্যথা যেন একসঙ্গে ফুটে উঠেছে।

জয়-বিজয়ের মূর্ত্তির গলায় দেখলাম, আমার সেই স্বপ্নে-দেখা কাঁপা রুদ্রাক্ষের মালা আর অলঙ্কারের সূক্ষ্ম কারুকার্য্য। এই মন্দিরে চুরাশীটি কোণ আছে। ঝড়, বৃষ্টি, রোদের প্রভাব থেকে যাতে মূর্ত্তিগুলিকে বাঁচান যায়, সেইজন্য এ ভাবে কোণ কেটে তৈরী করা হয়েছে।

আশ্চর্য, এখানে স্বামি-স্ত্রীতে একসঙ্গে মাঙ্গলিক হাতে গলায় মালা পরে পুজো দিতে হয়। পুরোহিত কপালে রোলি পরিয়ে দেবতা ও স্বামীকে প্রণাম করতে বলেন। জানি না, পুনরাবৃত্তি হোল কি না। আর একটি কথা, জয়-বিজয়ের হাত দুটি কালের প্রভাবে নষ্ট হয়ে গেছে।

নয়টা বাজলো—বাস হর্ণ দিচ্ছে। এখন সোজা যাব ব্যাঙ্গালোর।

প্রেম

শ্রীসাধনা সরকার

তুমি যেন স্বপ্ন নিয়ে এলে অন্ধকার হাতের মুঠোয়
গন্ধ-রস-স্নিগ্ধতার মেঘস্নিগ্ধ উন্মুখ নিচোলে
জড়ানো লাজুক মন। পৃথিবীর রূপকথা-রাত
এলোমেলো স্মৃতি নিয়ে পাতার মতন ঝরে গেলে
সময়-ছিন্ন প্রেম শিশিরের মত যদি কেঁপে ওঠে?
আদিম রাতের যত অশান্ত কামনার দিন
বিশাল বন্যার মত ছুঁয়ে যাবে পৃথিবীর বুক
দ্বিখণ্ড প্রেমের আভা জ্বলে তবু লাল দুটি ঠোঁটে
ইচ্ছার ফলের মত। অপ্সরীর স্তনে-ভরা অজন্তার স্বপ্নের রাত
পৃথিবীর ঘাস খড় নীল ডিম-নীড়ের আহ্বানে
লুকানো নক্ষত্র ঘিরে ঢেকে রাখে হৃদয়ের ঘ্রাণ,
পালকের নিরিবিলি রূপো দিয়ে অন্ধকার প্রাণে
ছড়াবে দু-হাতে যেই পিঙ্গলা কামনার ফুল।
চিতার চোখের মত জ্বলজ্বলে বুনো নীল-মন
জীবন্ত প্রেমের ঘ্রাণে হয়ে ওঠে যদি কামাতুর
শরীরী পঞ্চম সুরে এঁকে দিয়ো মৃদু চুম্বন
ধূসর মেঘের ভিজে মুখে। হাজার চাঁদের চূড়া ভেঙে
আরব্য-রজনী যদি নেমে আসে পথ চিনে চিনে
তোমার ও কালো আঁখি জোনাকির মত জ্বলবেই
লাজুক মধ্যরাতে। স্থবির আলেখ্য-ভরা দিনে
এই দেহ জেগে রবে নির্জন এক দ্বীপ হয়ে
বিন্দু বিন্দু উষ্ণতার পাতাঝরা প্রথম হাওয়ায়
শান্ত মন। বুক জুড়ে স্তব্ধতার নীল অন্ধকার
আনত আকাশ শুধু দগ্ধ করে চোখের চাওয়ায়।

নারী নিকেতন

শ্রীমতী বাণী দাশগুপ্তা

ভারত বিভক্ত হল—সে কি ঝড় উঠলো পূর্ব্বে ও পশ্চিমে! সে ঝড়ের গতির তেজে ভেঙ্গে গেল বহু সংসার—ভেঙ্গে গেল ধনীর ধনভাণ্ডার, ভেঙ্গে গেল জমিদারের জমিদারী, ভেঙ্গে গেল কৃষকের লাঙ্গল। ধনী সে ফিরে এল ভারতে, তার বহু অট্টালিকা ছেড়ে মাত্র দু'-পাঁচ লাখ টাকা নিয়ে। মধ্যবিত্ত গৃহী পূর্ব্বপুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে এক বস্ত্রে কপর্দ্দকহীন হয়ে এল ভারতে, কেহ বা প্রাণ দিল, কেহ বা স্ত্রী-পুত্র-কন্যা দুর্বৃত্তের হাত থেকে উদ্ধার না করতে পেরে ফিরে এল অধোবদনে। বহু শরণার্থীর চোখের জল আজও শুকায়নি—যখন তারা নিজ চক্ষে দেখেছে পুত্রের হত্যা, কন্যার লাঞ্ছনা। এই হতভাগিনী কন্যাদের কি হ'ল তা জনসাধারণের অনেকেই জানেন না। এই হতভাগিনী মেয়েরা কেউ ছিল সংসারের কর্ত্রী, সুখে স্বামি-পুত্র নিয়ে সংসার করছিল। কেহ বা বিবাহযোগ্যা হ'য়ে বিবাহের সুখস্বপ্নে নিমগ্ন ছিল, কেহ বা নাবালিকা ছিল—সংসারের পাশবিকতা যে কত দূর যেতে পারে সে বিষয়ে অনভিজ্ঞ। এমনি ফুলের মত কোমল কুঁড়িও এ ভারত-বিভক্ত যজ্ঞে আহুতি দিয়েছিল।

ভুলভুলিয়া (লক্ষ্ণৌ)

—সুধাবিন্দু বিশ্বাস

দ্ধমন্দির (বুদ্ধগয়া)

—অরুণকুমার দত্ত

তৃষ্ণা —অজিত মিত্র
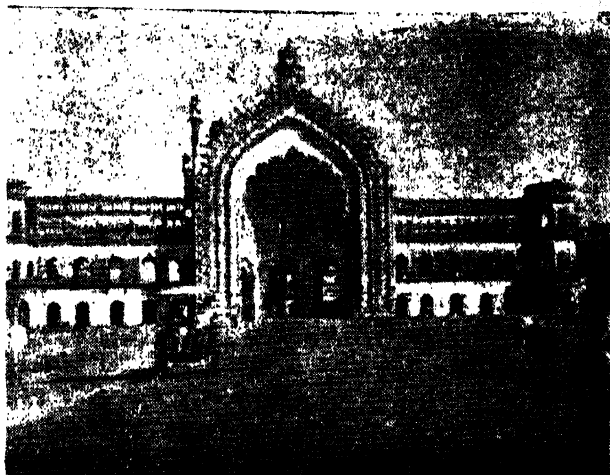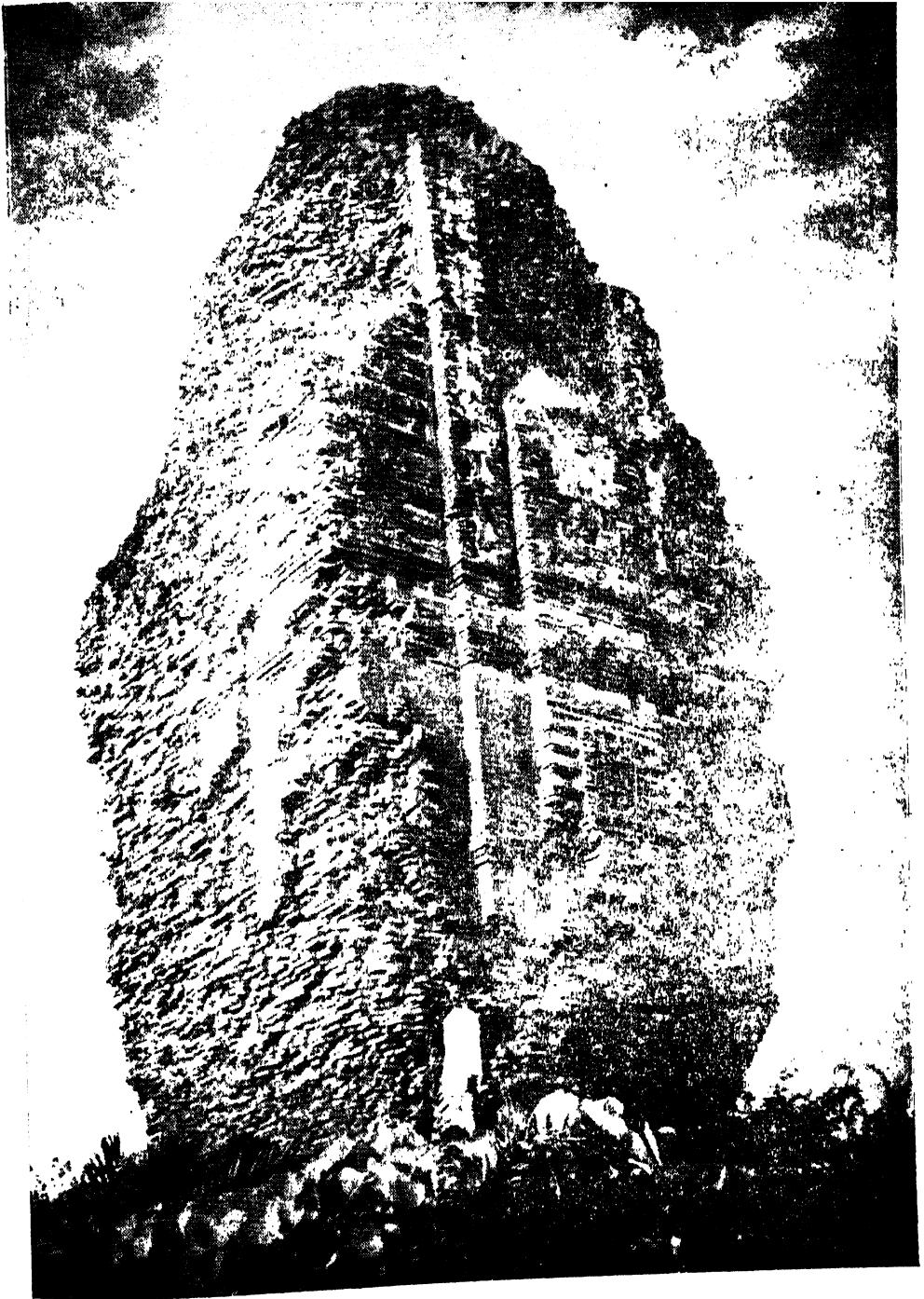
—রামকিঙ্কর সিংহ

অতীতের সাক্ষ্য

বসন্তের প্রারম্ভে —তিলোত্তমা বন্দ্যোপাধ্যায়

শিকার —শ্যামলী সরকার

যখন ইংরেজ-রাজ গেল, আমরা পেলাম স্বাধীনতা, পাকিস্থানের হ'ল জন্ম—এমনি দেশের সন্ধিক্ষণে গুণ্ডাদের পশুবৃত্তি উঠলো বেড়ে সব জায়গায়। মানুষের মধ্যে সে পশু লুক্কায়িত থাকে, তা সুযোগ ও সুবিধা পেলেই তার স্বরূপ প্রকাশ করে—তেমনি সেই সময় হিন্দু মুসলমান পাকিস্থানী সব দুর্বৃত্তরা লেগেছিল এই কাজে। সেই সময় শরণার্থীর ভীড় আর দুর্বৃত্তের মেয়েদের উপর পাশবিকতার ও অপহরণের সংবাদ আসতে থাকে চতুর্দ্দিক থেকে। এমনি সন্ধিক্ষণে ভারত সরকার নানা সমস্যায় বিব্রত যখন ছিল তখন এই সমস্যাও সরকারকে কম বিব্রত করে তোলেনি। এ ভিন্ন বহু বেসরকারী সমিতি, সমাজ-কল্যাণ সঙ্ঘ, গড়ে উঠলো এবং তারাও সরকারের সঙ্গে হাত মিলিয়ে লেগে গেল এই অভাগিনী মেয়েদের খুঁজে উদ্ধার করার কাজে। এ কাজ অতি শক্ত কাজ ছিল, প্রত্যেক কর্ম্মীকে অধ্যবসায়ের পরীক্ষা দিতে হয়েছিল। স্বাধীনতা পাবার দু'-এক বৎসর পর লাঞ্ছিতা অপমানিতা মেয়েদের কিছু কিছু করে উদ্ধার করতে লাগলো, নারীরক্ষা সমিতি সরকার ও অন্যান্য সঙ্ঘ। এই নারীরক্ষা সমিতি All India Moral and Social Hygiene এর দিল্লী শাখা।

এই সময় ডাঃ সুশীলা নায়ার, শ্রীমতী শান্তি কাবীর, শ্রীমতী রামেশ্বরী নেহেরু প্রভৃতি সমাজ-কল্যাণকামী মহিলাদের অক্লান্ত চেষ্টায় একটি নারীনিকেতন অথবা Resque Home স্থাপিত হয়। যখন দলে দলে এই মেয়েদের উদ্ধার করা হতে লাগলো তখন এদের কোথায় স্থান দেওয়া যায়, এই নিয়ে মহা সমস্যা হয়েছিল প্রথমে। ১৯৫০ সালে দিল্লী সহরের রংমহল ধর্ম্মশালায় এদের নিয়ে রাখা হয়। কিন্তু ধর্ম্মশালা অতিথিশালা, সেখানে এদের বেশী দিন রাখা সম্ভব হল না। চার বছর বহু চেষ্টার পর ১৯৫৫ সালে কিংসওয়ে কেম্পের কাছে Poor House এর খানিকটা অংশ ভাড়া দিয়ে পাওয়া গেল। ১৯৫৩ সালে নারীরক্ষা সমিতির ইচ্ছানুসারে পুলিশ কাঠবাজার, জি, বি, রোড প্রভৃতি স্থানে রেইড ক'রে বহু অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়েদের উদ্ধার করে।

ডাঃ সুশীলা নায়ার ও অন্যান্য কর্ম্মীরা লিখতে থাকে এই লাঞ্ছিতা রিক্তা বোনদের দুঃখের কাহিনী। বহু মেয়েদের দিয়ে রূপজীবিকার ব্যবসা সুরু করান হ'য়েছিল। এদের মধ্যে যারা ছিল সতের আঠার বয়সের তারা হ'য়ে উঠলো উন্মাদিনী। তাদের বশ মানান হ'য়ে উঠলো মুস্কিল। নারীরক্ষা সমিতির কর্তৃপক্ষের কোন কথাই তারা শুনতে চায় না, মানতে চায় না। তাদের মধ্যে কেউ ব'লতো যে সমাজ ওদের রক্ষা ক'রতে পারেনি, যে সমাজ এখনও তাদের পূর্ব্ব সম্মান দিতে পারবে না, সে সমাজে ফিরে লাভ কি—তার চেয়ে রূপজীবিকার জীবন ভাল—ভাল খাবে ভাল পরবে, প্রতিদিন দুটো মিষ্টি কথা শুনবে। এই যুবতীদের বশ মানান যেন এক মহা সমস্যার বিষয় হ'য়ে দাঁড়াল। কিন্তু অল্পবয়সী মেয়েদের যাদের উদ্ধার করা হয়েছিল তারা যেন এই নিশ্চিন্ত আশ্রয় পেয়ে খুসীই হ'য়ে উঠলো। তারা রান্নার কাজে ছোটবোনের মত বড়দের সাহায্য ক'রতো। নিজেদের বাসন ধোওয়া, কাপড় ধোওয়া, ঘর পরিষ্কার বেশ বাধ্য মেয়ের মত করে যায়। ওরা বহু ঝড়-ঝাপটার পর আবার স্নেহ-ভালবাসা পেয়েছে মাতৃসমান মেট্রেনের কাছে। মেট্রন এদের নিজের সন্তানের ন্যায় দরদ দিয়ে এদের প্রত্যেকের সুখ-সুবিধার দিকে নজর রাখেন।

এই নিকেতনের ব্যয়ভার বহুদিন নারীরক্ষা সমিতি বহন করেছে। সরকার থেকে অর্থ সাহায্য ও ডোনেসনের উপরও নির্ভর ছিল। সম্প্রতি কয়েক বছর ধরে এই নিকেতনের ব্যয়ভার সরকার পুরোপুরি ভাবে গ্রহণ করেছেন। তবে তত্ত্বাবধানের ভার এখনও নারীরক্ষা সমিতির উপর আছে। এখন অপ্রাপ্ত, (মাইনর) বয়স্ক মেয়েরা যাদের ভুলিয়ে অথবা জোর করে এই রূপজীবিকার জীবন যাপন করতে বাধ্য করা হয় তাদের নারীরক্ষা সমিতি পুলিশের সাহায্যে উদ্ধার করে ও নিকেতনে পাঠায়।

এদের মধ্যে অনেকেই কুৎসিত ব্যাধি নিয়ে আসে—সেজন্য নিকেতনে ডাক্তারও আছে। এ স্থানে একটা কথা বলা প্রয়োজন—যে সমস্ত অভাগিনী মেয়ের সন্তান-সম্ভাবনা হয় তাদের সরকারী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এই সন্তানদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা নিকেতনেই হয়ে থাকে। এখানে রাস্তায় কুড়িয়ে পাওয়া, মা-বাপহীন নাবালিকাদের, যুবতীদের স্থান দেওয়া হয়। এখানে তিরিশ বৎসর বয়স্ক মেয়েদের পর্য্যন্ত রাখা হয় অর্থাৎ যে বয়স পর্য্যন্ত নৈতিক চরিত্রের অবনতির ভয় থাকে।

এই নারী-নিকেতনে তিনটি বিভাগ আছে। প্রথমটি নাবালিকা মেয়েদের জন্য, এদের মধ্যে তিন হ'তে বার-তের বৎসর বয়স্ক মেয়েদের দেখা যায়। এদের লেখাপড়া শেখান, গান শেখান ও প্রার্থনা শেখান হয়, গানের ও শিক্ষার জন্য তিনটি শিক্ষয়িত্রী আছেন।

School of Social Service Institute দিল্লী থেকে বহু ছাত্র এ দর নানা প্রকার খেলা-ধূলা শিখাইবার জন্য আসে। এদের উত্তম রীতি-নীতি শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। একটি শিশু দেখলাম মেট্রনের কাছে ছুটে এসে কিছু পাবার বায়না ধরলো—মেট্রন আদরের সঙ্গে পিঠে হাত বুলিয়ে কি যেন বললেন। সে অত্যন্ত খুশী হয়ে চলে গেল। এদের মধ্যে যে কালো দাগ একবার পড়েছে তা আস্তে আস্তে মুছে যাবে।

দ্বিতীয় বিভাগে যুবতীদের রাখা হয়। এখানে চৌদ্দ-পনের বৎসর থেকে তিরিশ বৎসর বয়স্ক মেয়েদের রাখা হয়। এদের লেখাপড়া, গান শিখাবার জন্য শিক্ষয়িত্রী আছেন, সরকার থেকে সেলাইয়ের মেশিন দিয়েছে—নানা প্রকারের কাটা-ছাঁটা শিখান হয়। এদের তাঁত বোনার কাজ, কুরুসীর কাজ, বোনার কাজ, এবং যাবতীয় কাজ যা বিবাহিত মেয়েদের সংসার চালাতে হলে শেখা দরকার তা শেখান হয়। এই মেয়েদের শিক্ষা দেওয়ার পর যদি সম-অবস্থার পাত্র পাওয়া যায় তবে এদের সরকারের বরাদ্দমত খরচ করে বিয়ে দেওয়া হয়। বহু মেয়েকে সংসারী করে দিয়েছে নারীনিকেতন থেকে। একটি মেয়ে আমরা যেতেই আমাদের পায়ে ধরে বলে, আমায় বাইরে যেতে দাও। মেট্রন বললেন যে মেয়েটির বিয়ে হয়নি—বয়স সতের হয়েছে, পাড়ার যে কোন পুরুষ ওকে ডাকলেই চলে যায় আর বিপদে পড়ে। এই জন্য ওর মা ওকে নিকেতনে দিয়ে গেছে। মেয়েটির মা নিজেও কাজ করে।

তৃতীয় বিভাগ হচ্ছে অন্ধ, কালা, বোবা, নুলো, মস্তিষ্ক-বিকৃত মেয়েদের জন্য, এক কথায় handicapped girls—যাদের অভিভাবক নেই। এদের মধ্যে কয়েকটি দেখলাম, বাহ্যজ্ঞানশূন্য, ময়লা, নোংরা যা পাচ্ছে, খাচ্ছে। কেউ অন্ধ ও বোবা, সারা দিন

এক জায়গায় বসে আছে পাথরের মত। এদের রোজ তুলে পরিষ্কার করা, খাওয়ান, এক বিরাট কাজ। এদের দেখলে সত্যি এত দুঃখ হয়, সবই ঈশ্বরের সৃষ্টি—মনুষ্য আকৃতি অথচ সাধারণ প্রাণীর বুদ্ধিও নেই। শুধু প্রাণটুকু আছে, ক্ষুধা-তৃষ্ণা আছে—কিন্তু নিজের কোন কাজই করার ক্ষমতা নেই। কয়েকটি মেয়ে দেখলাম, বোবা অথচ কথা জিজ্ঞাসা করলে উত্তর দেয়। একটি বিবাহিতা মেয়ে বোবা—তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, স্বামীর কাছে যাবে কি না—সে ইসারায় আমাদের বুঝিয়ে দিল যাবে না, কারণ স্বামীর আর এক স্ত্রী আছে। বেচারী বোবা, কিন্তু সাধারণ মানুষের ন্যায় সপত্নীর প্রতি ঈর্ষ্যা আছে। মেট্রন বললো, মেয়েটি বুদ্ধিমতী, সব কাজ করে, শুধু কথা বলতে পারে না।

সম্প্রতি ১০৮টি মেয়ে আছে নারী-নিকেতনে। নিকেতনের ব্যয়ভার সরকার গ্রহণ করেছেন এবং সরকার নারী-নিকেতনের জন্য বাড়ী তৈয়ারী ক'রছেন। বাড়ীর কাজ আরম্ভ হয়ে গেছে।

আজ আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি—নিজেদের শক্তি বাড়াচ্ছি, অন্য দেশের সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হচ্ছি, ক্রমশঃ দেশকে উন্নত করে তুলছি। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের এ দুঃখীদের কথাও চিন্তা করতে হবে—তাদের জন্যও সমাজে স্থান করতে হবে।

শরৎ-প্রণাম

শ্রীমতী স্নিগ্ধা সান্যাল

প্রকৃতির নিয়মে যেমন গাছের পুরাতন পাতা হয় স্থানচ্যুত, নূতন এসে স্থান নেয় সেখানে। তেমনি একটি একটি করে দিন যায় সরে আগামী দিনের জন্য স্থান ছেড়ে। এই গতানুগতিক আসা-যাওয়ার মাঝে কান্না-হাসির দোলন দিয়ে নিজেকে বিশেষ ভাবে চিহ্নিত করে যায় এদেরই এক একটি—মানুষের আনন্দ ও বেদনা বোধই তাকে ভুলতে দেয় না ঐ বিশেষ চিহ্নিত দিনগুলিকে। এমনি একটি দিন ৩১শে ভাদ্র বাংলার দরদী অপরাজেয় কথাশিল্পী 'শরৎচন্দ্র' মাটীর পৃথিবী স্পর্শ করেছিলেন এই ৩১শে ভাদ্রে।

৩১শে ভাদ্রকে প্রণাম জানাব এই বলে যে, শরৎ-সাহিত্য শুধু দেশের জ্ঞানীদের নয় দেশের জনসাধারণের কাছে কেন এত প্রিয়? কারণ, আমি যে তাদেরই একজন, বাঙালী মাত্রেই শরৎ-সাহিত্য কেন এত ভালবাসে তার অনুসন্ধানে প্রথমেই চোখে পড়ে এর বাস্তবতা। সম্পূর্ণ বাস্তবকে কাঠামো করে গড়ে উঠেছে এই সাহিত্য। এর মধ্যে নেই কোনো রাজারাজড়ার কাহিনী, নেই অবাস্তব কল্পনা, এর চারিপাশে ছড়িয়ে আছে, আমাদের মত মাটীর মানুষ। মানুষকে ভালবেসে যাঁরা সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন, শরৎচন্দ্রকে তাঁদের শ্রেষ্ঠতম বললেও ভুল বলা হয় না বোধ হয়। মানুষের সুখ ও দুঃখ তিনি অন্তরের সঙ্গে বুঝেছিলেন, তাই তার নীচতা তাঁকে যেমন ব্যথা দিয়েছে তেমনি আনন্দ পেয়েছেন তার হৃদয়ের উদারতায়।

সর্বোপরি মানুষকে তিনি ভালবেসেছিলেন মানবীয় ধর্ম্মের চরম বিচারে, মানবীয় মমতাবোধে—তাইত তিনি দেখেছিলেন যে, মানুষের মধ্যে শুধু অন্যায় পাপ ত্রুটি-বিচ্যুতি নেই, সঙ্গে আছে স্নেহ-প্রেম-ক্ষমা ও মহত্ব। তাই তিনি তাঁর অন্যায়কে যেমন কঠোর ভাবে প্রকাশ করেছেন সকলের সামনে তাঁর মানস পুত্র কন্যাদের মধ্য দিয়ে। তেমনি মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করেছেন তাঁর সুন্দরকে, সেই জন্য তাঁর সাহিত্যের মধ্য দিয়ে আমরা দেখতে পাই যে, যে-সংসারে রয়েছে রাসবিহারীর মত কুচক্রী, বেণীর মত স্বার্থপর, জনার্দ্দন শিরোমণির মত সমাজপতি, সেখানেই আছে রমেশ ও নরেনের মত উদার প্রাণ, যাদবের মত স্নেহময়, বিপ্রদাসের মত ন্যায়নিষ্ঠ দৃঢ়চেতা—আছে দ্বিজদাসের মত ভাই, এক সঙ্গে আছে জ্ঞানদার জ্যাঠাইমা ও এলোকেশী আর রমেশের জ্যাঠাইমা। নারায়ণীর মত স্নেহময়ী নারীর পাশে তারই মা'র মত সঙ্কীর্ণমনা নারী। ভাল-মন্দর এই অপূর্ব্ব সংমিশ্রিত চরিত্রগুলি শরৎ-সাহিত্যের জনপ্রিয়তার অন্যতম প্রধান কারণ।

শরৎচন্দ্র প্রথমত তাদের হয়েই কলম ধরেছিলেন—যারা সমাজে নিপীড়িত অবহেলিত, সমাজ যাদের দেখত ঘৃণার চক্ষে। এ সম্বন্ধে তিনি নিজেই বলেছেন,—"সংসারে যারা শুধু দিল পেল না কিছুই, যারা বঞ্চিত, যারা দুর্ব্বল, উৎপীড়িত, মানুষ যাদের চোখের জলের হিসাব নিলোনা কখনো নিরুপায় দুঃখময় জীবনকে যারা কোনোদিন ভেবেই পেল না সমস্ত থেকেও কেন তাদের সব নেই—এদের বেদনাই দিল আমার মুখ খুলে, এরাই আমাকে পাঠাল মানুষের কাছে মানুষের নালিশ জানাতে।"

বাংলার নারীসমাজ ছিল এদের অন্যতমা তিনি তাদের প্রাধান্য দিলেন তাঁর সাহিত্যে—খুলে ধরলেন তাদের প্রকৃত রূপ, তাইত তাঁর সৃষ্ট নারীচরিত্রে সাহস, ধৈর্য্য, তেজ, সহ্যশক্তির সঙ্গে প্রেমমাধুর্য্য ও কোমলতার হয়েছে অপূর্ব্ব সমন্বয়। তাঁর মত মানবদরদী শিল্পীর পক্ষেই সম্ভব হয়েছিল জনতার মাঝ থেকে পোড়া কাঠকে খুঁজে বের করা। কত পোড়া কাঠ ত দেশের বুকে চিরকাল ছড়িয়ে আছে কিন্তু কে রেখেছে তাদের সন্ধান, বাইরের শুষ্ক আবরণের মধ্যে মানুষের যে আরো একটা অন্তর আছে তার খোঁজ কে নিয়েছিল এমন করে? বাংলার ঘরে ঘরে কত কুরূপায় তো চোখের জল ফেলছে অহরহ সমাজের অত্যাচারে, কিন্তু তাদের সেই চোখের জলের খোঁজ নিয়েছিল ক'জন?

এক কথায় সমাজ যাদের অস্তিত্বকে অস্বীকার করে, শরৎচন্দ্র তাদেরই প্রচার করেছেন সর্ব্বসমক্ষে, ধনীর অন্যায় শাসন আর শোষণ চিরকালই মুখ বুজে সহ্য করে এসেছে সর্ব্বহারা গফুরের দল তাদের সর্ব্বস্ব দিয়ে, কিন্তু তাদের সেই মূক ব্যথা এমন মুখর হয়ে উঠেছে কোন্ শিল্পীর তুলির স্পর্শে?

শুধু তাই নয়, সমাজের নীচতা হীনতা, সমাজের কুসংস্কার, যেখানেই দেখা দিয়েছে সেখানেই তিনি প্রতিবাদ করেছেন তীব্র ভাবে। তবু শরৎ-সাহিত্যকে শুধু সমাজ-সংস্কার সাহিত্য বললে সব বলা হয় না। এককথায় সমগ্র শরৎসাহিত্য হল মানব-ধর্ম্মী সাহিত্য, তাইত মানুষের হৃদয়কে জয় করার ক্ষমতা এর অসাধারণ। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "অন্য লেখকেরা অনেক প্রশংসা পেয়েছেন, কিন্তু সর্ব্বজনীন হৃদয়ের এমন আতিথ্য পাননি, এ বিস্ময়ের চমক নয়, এ প্রীতি।

মহাকবির কণ্ঠে ধ্বনিত বাঙ্গালীর অন্তরের বাণী, কারণ কান্না-হাসির, দুঃখ-সুখের সংমিশ্রণে যে বিচিত্র সৃষ্টি হয়েছে শরৎ-সাহিত্যে বাঙ্গালী তার মধ্যে খুঁজে পেয়েছে নিজেকে, তাইত সে সৃষ্টির সঙ্গে তার স্রষ্টাকেও স্মরণ করে আন্তরিক শ্রদ্ধা দিয়ে।

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

সুলেখা দাশগুপ্তা
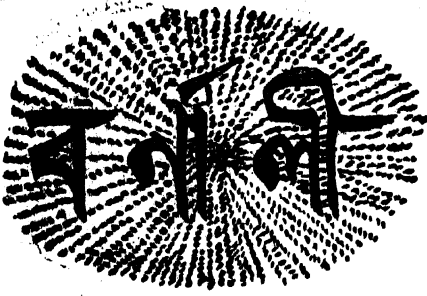
নিউ এম্পায়ার হলটা থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়ালো মঞ্জু হলটার বাইরের ঢাকা বারান্দার নীচে। ভেতর আর বাইরের তাপমাত্রার তারতম্যটা যেন ওর ঠাণ্ডা শরীরটার ওপর উপুড় করে কতকগুলো গরম সীসে ঢেলে দিল। থামল মঞ্জু। বোধহয় গরমটাকে শরীরে সইয়ে নিতে। তারপর হলটার সামনের অপেক্ষমান গাড়ীগুলোর ভেতর পথ করে বেরিয়ে এসে পড়ল রাস্তায়। পার হলো রাস্তাটা। নিয়ন আলোয় আলোকিত দোকানগুলোর সামনে দিয়ে হাঁটা দিল সোজা।

পানের দোকানে বরফের মস্ত চাই-এর উপর ঠাণ্ডা হচ্ছে লাল মসলা ছড়ানো ছাঁচি পান, মিঠে পান। পানের চার পাশ দিয়ে বরফ থেকে রেখায় রেখায় ঠাণ্ডা ধোঁয়া উঠছে সাদা কুয়াশার মতো। দোকানটার এক পাশে ঝুলোনো মোটা দড়ির আগুনটা ফুঁয়ের জোরে বাঁচিয়ে রাখার মতো বাতাসে জ্বলছে নিবছে। একটি মেয়ের হাতে স্ট্র সমেত কোকাকোলার বোতল তুলে দিল তার সঙ্গী। আয়না থেকে চোখ ফিরিয়ে মিষ্টি হেসে হাত বাড়ালো মেয়েটি। দোকানটা পার হতে হতে জর্দা কিমামের মিষ্টি গন্ধে ডুবার বেশী নিঃশ্বাস টানল মঞ্জু। বই-এর দোকানের পাশ দিয়ে মোড় ঘুরে পড়ল গিয়ে চৌরঙ্গীর ছাদ-ঢাকা প্রশস্ত ফুটপাতে।

আশ্চর্য নগরীর অত্যাশ্চর্য ফুটপাথ। কত খেলাই না চলছে এখানে! কানের কাছে মুখ নিয়ে চলতে চলতে যে বলে যাচ্ছে 'প্যারিস পিকচার স্যর', সে লোক চিনতে ভুল করছে না। লোক চিনতে ভুল করছে না ঐ যে আধো অন্ধকারে দাঁড়িয়ে এক মাথা বাবরি চুলওয়ালা লোকটা বিড়ি টানছে সেও। এ্যংলো, বাঙ্গালী, নেপালী—দু'ঠোঁট ফাঁক করা মাত্র সে পৌছে দেবে তাদের ঠিক জায়গায়। অভিজ্ঞ চোখ মুহূর্তে বুঝে নিচ্ছে ঐ যে ছাড়া ছাড়া ভাবে দাঁড়িয়ে ত্রস্ত ভীরু চোখে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে মেয়ে ক'টা, তারা সদ্য সংগৃহীত কোন বণিকের পণ্য! বিচিত্র বস্তুর পশরা নিয়ে ঘুরছে সব ফেরিওয়ালা। পথচলতি মানুষ আর ফেরিওয়ালার সংখ্যা বুঝি সমান। রুমাল চাই? চশমা? ফুল-মালা? খেলনা—আরো কত, কত কি। 'নেন না দিদি একটা চার পয়সার মালা। সারা দিন খাই নাই।' সঙ্গে চলতে চলতে ক্রমাগত বলতে থাকে একটা লোক। প্যারিস পিকচারওলা আর চার পয়সার ফেরিওলা—যেন কলকাতা নগরীর দুটো চোখ। একটা ধক-ধক করছে প্রবৃত্তিতে। আর একটা জ্বলছে ক্ষুধায়। আর এই দুই আগুনে পুড়ে ছাই হচ্ছে সব মানুষ।

'দিদি মালাটা।' বেল কুঁড়ির মালাটা বাড়িয়ে ধরলো লোকটা ব্যথাকরুণ দৃষ্টিতে। থামতেই হলো মঞ্জুকে। ব্যাগ খুলে পয়সা দিয়ে মালাটা হাতে জড়িয়ে নিল সে। 'কলম নেবেন? বিলিতি কলম?' পাশ কাটালো মঞ্জু। ওর চলার টানা গতির সঙ্গে পথের সন্ধ্যার ঢিলে চলার গতি একটুও মিলছিল না। রজত যদি রওনা হয়ে পড়ে! ভদ্রলোক তো বুঝে উঠতেই পারবেন না ব্যাপারটা কি? আর বাবার মেজাজের যে অবস্থা, তিনি কি ব্যবহার করে বসবেন তাই বা কে জানে! এ ক'দিন মনে না হওয়ার যথেষ্ট সঙ্গত কারণ থাকতে পারে, কিন্তু আজ যখন সকাল বেলা বেরুবার সময় দিদি ওকে গ্র্যাণ্ডে আসছে কিনা জিজ্ঞাসা করেছিল তখন নিশ্চয়ই ওর মনে-পড়া উচিত ছিল। তবু সময় মতো না হলেও একেবারে সময় পার করে যে মনে হয়নি—এই রক্ষে। আরে জয়া নয়—দাঁড়িয়ে পড়ল মঞ্জু। না, জয়া হলে ওকে দেখে চলে যেত না। উপুড় হয়ে ছেঁড়া কাগজ কুড়োচ্ছিল যে পিঠকুঁজো লোকটা তাকে পাশ কেটে, বাবরি চুলওয়ালা বিড়ি টেনে চলা লোকটার পাঞ্জাবী ছুঁয়ে হোটেলের দরজায় ঢুকে গেল মঞ্জু। লোকটা দুটো লালচে চোখ তুলে একটু তাকালো।

ডিনারের সময় হয়ে এসেছে। পুরুষেরা জোড়ায় জোড়ায় চলেছে করিডোর দিয়ে। তাদের ভারী জুতো আর হাইহিল পুরু কার্পেটের উপর ভোঁতা শব্দ তুলছে। দেশী বিদেশী নির্বিশেষে মুখে ইংরেজী ভাষা। সঙ্গিনীরা বলছে, সঙ্গীরা শুনতে শুনতে হাঁটছে। পরিচিতের সঙ্গে সাক্ষাতে পরস্পর স্মিত হেসে একটু মাথা কাত করছে। এগুতে পারল না মঞ্জু। তাদের পেছনই চলতে হলো। এসে গেছে। এখন আর তাড়া বোধ করছে না সে। রজত চলে গিয়ে থাকলে তাকে এই করিডোরটা দিয়েই বেরুতে হবে তো। নিশ্চিন্ত মঞ্জু। সবার পেছন পেছন এসে পড়লো সে 'খোলা হাওয়ার রেস্তোঁরা—শাহেরাজাদ'এর সামনে। রাতে হোটেলের চেহারাই যেন আলাদা। আর এটা তো হোটেল নয়—যেন কুঞ্জবন। লনভর্তি মাথা ঝাঁকড়া নিচু নিচু গাছ আর লতাপাতার কুঞ্জ। তারি এটার ধারে ওটার নীচে পাতা রয়েছে গ্লাস, টপ-ওলা টেবিল আর বেতের চেয়ার। মাথার উপর তারা ভরা নীল আকাশ। ফুল পাতার ফাঁকে ফাঁকে আকাশের তারারই মতো মিটমিট করে জ্বলছে ছোট ছোট লাল-নীল-সবুজ আলো। সমস্ত জায়গাটা জুড়ে নানা রং-এর সংমিশ্রণের এক রহস্যময় অস্পষ্টতা! পামপাতার মাথা ছুঁয়ে ছুঁয়ে বয়ে যাচ্ছে হাওয়া। গানের উঁচু পর্দার স্বর ভেসে আসছে কানে।

সে দিন সকালের দেখা শূন্য চেয়ারগুলো ভরে উঠেছে লোকে। গ্লাসটপের টেবিলগুলো ভরে উঠেছে গ্লাসে গ্লাসে। ওয়েটার ট্রের উপর গ্লাস আর সরু কোমরের উপর গোল মাথাওলা কাচের ওয়াইন-গ্লাস নিয়ে ঘুরে ঘুরে পরিবেশন করে চলেছে—রাম, হুইস্কি, জিন আর লেডিজ ড্রিঙ্ক শেরী শ্যাম্পেন। সোনালী আর জাম-কালো রং-এর টলটলে পানীয়ের গ্লাসগুলোর গা ঘেমে উঠছে ঠাণ্ডায়। আর কোন খাবার থাক আর নাই থাক, চৌকো চৌকো চিজের টুকরো, বাদাম আর ভিনিগারে ভেজানো পেঁয়াজ রয়েছে সবার সামনে। গান শুনতে শুনতে, গল্প করতে করতে গ্লাসে ঠোঁট ছোঁয়াচ্ছে সবাই। অল্পে-অল্পে গ্লাস খালি হচ্ছে। গ্লাসের

রংটা ধরছে গিয়ে চোখে। আর দু'-এক পেগের পর ধরবে মনে। গান থামবে। বেজে উঠবে অর্কেষ্ট্রা। শুরু হবে নাচ।

ওর করিডোর সঙ্গিনীরা ডানদিকে ঘুরে 'শাহেরাজাদ'-এ প্রবেশ করে চেয়ার টেনে টেনে বসতে লাগল। মঞ্জুর স্বভাব-কৌতূহলী মন তার চলার গতিটাকে দিল একটু মন্থর করে। দেখতে দেখতে চললো সে। পামগাছের অন্ধকার কোণে ফেনাভরা গ্লাস সামনে নিয়ে স্তব্ধ হয়ে বসে আছে একটা লোক। ফেনার বুদবুদ ক্রমেই মিলিয়ে আসছে তবু মুখে তুলছে না। একটি মেয়ে গা ছেড়ে চেয়ারে মাথাটাকে কাত করে দিয়েছে। সঙ্গের ভদ্রলোকটি বিব্রতমুখে হাতে ঠাণ্ডাজল নিয়ে নিয়ে বুলিয়ে দিচ্ছে কপালে। এদিক ওদিক থেকে কিছু কিছু দৃষ্টি তাদের উপর গিয়ে পড়ছে। ভেতরের প্ল্যাটফর্মের উপর মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে গান গাইছে একটি মেয়ে। লিপষ্টিক-রাঙ্গানো ঠোঁটের ভেতর দিয়ে মাঝে মাঝে ঝক্‌ঝক্ করে উঁকি দিচ্ছে তার সাদা দাঁতের সারি। লাল টকটকে গাউনটা তার কোমর থেকে নেমে ঠেকছে এসে মাটিতে কিন্তু উপর অঙ্গ বলতে গেলে নিরাবরণ। অদ্ভুত ঠেকছিল সব মঞ্জুর অনভ্যস্ত চোখে। ছবিতে দেখেছে বটে এসব। কিন্তু ছবির দেখা আর সত্যি দেখা তো এক নয়?

'আপ কি ধার যায়েঙ্গে?' একটা বেয়ারা এসে দাঁড়ালো সামনে। কণ্ঠে কোন সম্ভ্রম নেই· দৃষ্টিতে নেই বিনয়। এই রং, রূপ আর সাজের হাটের মেলায় চটি পায়ে, ছাপার শাড়ী পরা সাদা মাটা ঠোঁট-গালের মঞ্জু যে এ জগতের কেউ নয় বোধ হয় সেটা বুঝেই। মঞ্জু স্থির চোখে তাকালো লোকটার দিকে। কেন, আমি কি ভুল পথে এসেছি? আমি রুম নম্বর সেভেণ্টিথ্রিতে যাবো।

রুম নম্বরটা শোনামাত্র মস্ত এক সেলাম ঠুকলো লোকটা। সসম্ভ্রমে পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়ে পৌঁছে দিল লিফটের সামনে। লিফটম্যানকে রুম নম্বর বলে মঞ্জু লিফটের আয়না ঘেরা দেয়ালে নিজের বেশবাস আর রংশূন্য প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়ে হাসল। বেয়ারাটা যে ওকে 'এই আয়া' বলে সম্বোধন করে বসেনি—এই যথেষ্ট। রুজ লিপষ্টিকে গাল ঠোঁট রাঙ্গিয়ে সিফন জর্জেটে সেজে, সঙ্গীর হাতে হাত জড়িয়ে, পায় হাই হিলের ঠক্-ঠক্ শব্দ তুলতে তুলতে আর মুখে ইংরেজীর তোড় ছুটাতে ছুটাতে এখানে ঢুকছে দৃশ্যটা মনে হতেই শব্দ করে হেসে ফেলল মঞ্জু। লিফটম্যান আশ্চর্য্য হলো না। শুধু একবার তাকিয়ে দেখল বেশী খেয়েছে কি না। ঝাঁকি দিয়ে লিফট থামলো। লোহার দরজা টেনে ধরে সরে দাঁড়ালো লিফটম্যান। মঞ্জু নেমে এয়ারকণ্ডিসণ্ড লম্বা বারান্দাটা পার হয়ে গিয়ে রজতের বন্ধ দরজায় দাঁড়িয়ে টোকা দিল।

রজত তখন ধুতি পরে পাঞ্জাবীর বোতাম লাগাতে গিয়ে ঠেকে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছিল। বোতামের মাথাগুলো কিছুতেই সে ঢুকিয়ে উঠতে পারছিলো না মুখ বোজা ঘরগুলোতে। ধুতি পাঞ্জাবী সে এক রকম পরেই না। সবরকম নেমন্তন্ন আমন্ত্রণ সে স্যুট পরেই সারে। সবার সসম্ভ্রম দৃষ্টির সামনে বিরাট গাড়ী থেকে নামে। কড়া ইস্তিরিকরা সাদা পোষাক পরিহিত ড্রাইভার দরজা খুলে ধরে। বিশ-পঁচিশ মিনিট বসে। সজ্জিত নববধূ বা কনেকে হাসি মিশ্রিত কৌতূহলের সঙ্গে দেখে। প্যাক করা মহার্ঘ উপহার হাতে তুলে দেয়। ঘরে ফিরে শান্তির হাত ঝাড়া দিয়ে বলে, বাস্, এইবার বসা যাক। যেন দুঃসাধ্য কাজ শেষ করে এলো। কতকটা তাই। যেদিন সকালে নোট বই খুলে নেমন্তন্নের ব্যাপার রয়েছে দেখতে পায়, সেদিন একটুও প্রসন্ন বোধ করে না সে। কিন্তু আজকের তারিখটা রজতকে নোট বই-এর স্মরণ করিয়ে দিতে হয়নি।

সকালবেলা চোখ খুলে কফির পেয়ালা মুখে ধরেই প্রথম যে কথাটা মনে পড়েছে তা হলো, আজ মঞ্জুর বিয়ে। যেতে হবে। স্যুট পরা চলবে না। ধুতিপাঞ্জাবী বাড়ী থেকে আনিয়ে নিতে হবে। আশ্চর্য্য মানুষের মন! বিছানায় শুয়ে শুয়ে মঞ্জুকে সে নববধূর পোষাকে এনে সামনে দাঁড় করালো। তারপর দূরে দাঁড়িয়ে এক লক্ষ্যে দেখতে লাগল বিয়ে। শুয়ে শুয়ে পাক্কা এক ঘণ্টা ভাবলো উপহারটা কি নেওয়া যায়। সন্ধ্যার কিছু আগে বেরিয়ে হ্যামিলটনের দোকান থেকে গিয়ে কিনে আনল একটা নীলার মালা। যেন সূর্য্যের উজ্জ্বল নীল রং টেনে নেওয়া কতকগুলো টলটলে জলের ফোঁটা এক সঙ্গে গাঁথা। মূল্য জানলে বিস্মিত হতে হবে। অনায়াসে কাচ ভাবা যাবে মূল্য না জানলে। আর কিনল এক প্রস্থ সুগন্ধি চন্দন কাঠের বোতাম। কিন্তু সে বোতাম সে এখন কিছুতেই পরিয়ে উঠতে পারছিল না পাঞ্জাবীর ভেতর। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠেছে তার এই ঠাণ্ডা ঘরেও। এমন সময় টোকা পড়ল দরজায়। 'কাম ইন' বলে একটা বিকৃত মুখের শেষ চেষ্টা করল সে। তারপর বোধ হয় দর্জিটাকেই বেটা ভূত বলে গাল দিয়ে তাকালো
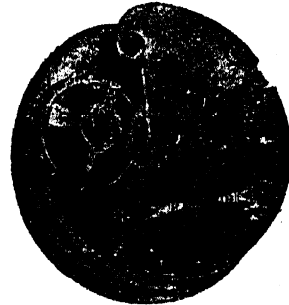
দরজার দিকে। মঞ্জুকে দেখে বিস্ময়ে তার হাত খসে পড়ল পাঞ্জাবী থেকে। একি!

—এলাম।

—এলে!

—হাঁ। গম্ভীরভাবে ভেতরে ঢুকল মঞ্জু। বললো, ভেবে দেখলাম বিয়ের চাইতে আপনার প্রস্তাবটাই আমার পক্ষে কাজের হবে বেশী।

এগিয়ে এলো রজত—আমার প্রস্তাব? কি প্রস্তাব করেছিলাম আমি?

—বাঃ সেদিন বললেন না, একেবারে বিয়ে ঠিক করে বসে আছো, নইলে গাড়ী চালানোটা শিখতে বলতাম?

বিয়েটা ওর ছিল না—ছিল ওর দিদির, এই গোড়ার কথাটাই যে জানে উল্টো, তাকে বিয়ে না হবার খবরটা সোজা পথে দিয়ে ফেলতে পারবে কেন মঞ্জু! কৌচে বসে বললো—দেখবেন এখন যেন আবার পিছপা হবেন না।

—না। এ ক্ষেত্রে তো প্রশ্নই ওঠে না। উচিতের ক্ষেত্রেও পিছপা আর পিছটানের ব্যাপারে আমার মতো নির্বিকার নির্বিকল্প ব্যক্তি তুমি আর দ্বিতীয় পাবে কিনা সন্দেহ। বাহান্ন ইঞ্চির কাঁচি ধুতির লোটানো কোঁচা জুতো দিয়ে মাড়িয়ে এসে বসল রজত। এটা সে বুঝল—যাই হোক, যাই ঘটুক, অতর্কিতে কিছু ঘটেনি। আর তেমন ঘটলেও সব প্রথম মঞ্জু তার কাছে ছুটে আসতে যাবে কেন? কোঁচাটা তুলে পকেটে ঢুকাতে ঢুকাতে বললো—অন্তত এটুকু বোঝা যাচ্ছে, বিয়ে তোমার আজ হচ্ছে না, তা যে কারণেই হোক। এ ক'দিন হয় মনে ছিল না, নয়তো সম্ভব করে উঠতে পারনি খবরটা জানিয়ে ওঠার। একটু ঝুঁকে বসে মঞ্জুর দিকে তাকালো সে। বললো—ধরো, লগ্ন বয়ে চলেছে, বর এলো না। কিন্তু কন্যাকে সে-রাতে পাত্রস্থ করতে হবেই। কেন—জিজ্ঞাসা করো না। সেকালের সমাজের ভয়ের মতো একালের জন্যও একটা কিছু এসে যাওয়া উচিত ছিল। নইলে বেনারসীর ওড়নায় মুখ ঢেকে খিড়কির দরজা দিয়ে বেরিয়ে এসে নায়কের কাছে দাঁড়ানোর মতো থ্রিলিং উপাদানটাই যে যাচ্ছে বর্তমানের গল্প-ভাণ্ডার থেকে নষ্ট হয়ে—এ খেয়ালটা কেউ করছে না। আমরা গল্পের খাতিরে ধরে নিচ্ছি, আজকের দিনেও কন্যাকে এই রাতেই সপ্তপদী গমন করতেই হবে। নইলে—নইলে যা হোক একটা কিছু ভীষণ ব্যাপার ঘটবে। সবার অলক্ষ্যে সভা ছেড়ে বেরিয়ে এলো কন্যা ওড়নায় মুখ ঢেকে। নক্ষত্রখচিত আকাশের দিকে তাকিয়ে একটা ছোট্ট চাপা নিঃশ্বাস মিলিয়ে দিল সে বাতাসে।

তার পর তড়িৎ পায় পথ অতিক্রম করে, তার চন্দনে কুমকুমে সাজানো মুখ আর কাজলটানা ডাগর দুটি চোখ তুলে দাঁড়ালো এসে নিতান্ত অপদার্থ একটা মুখের দিকে তাকিয়ে। কম্পিত ঠোঁটের কথা তার কম্পিত হাত থেকে জিনিস খসে পড়ার মতোই পড়তে লাগল খসে খসে। দিশেহারা হয়ে উঠল লোকটা। কম্পিত ঠোঁটের কাঁপুনি কন্যার দুটি আঙুলের মৃদু স্পর্শে থামিয়ে দেবে—সাহস নেই। যদি সব মিথ্যে হয়ে যায়। যদি সব মিলিয়ে যায়। তার পর সেই লগ্নের হাত ধরে কত শুভ লগ্নের আর কত অজানা ঐশ্বর্যের সন্ধানই যে সেই অপদার্থ লোকটা পেলো—একেবারে মানুষ হয়ে গেল সে।

'রোজ কত কি ঘটে যাহা তাহা, এমন কেন সত্যি হয় না আহা?' বলে মঞ্জুর দিকে হাসি মুখে তাকিয়ে উঠে দাঁড়ালো রজত।

বসে থাকতে সে পারে না। আজ যে সে বসে কথা বলছিল, সেটা বোধ হয় কিছুটা অনভ্যস্ত পোষাকের জন্য—কিছুটা বোধ হয় গল্পটা বলতে বলতে সে একটু আবিষ্টই হয়ে পড়েছিল সেই জন্য।

যদিও মঞ্জু কৌতূহলের সঙ্গেই গল্প বলা শুনছিল রজতের। কিন্তু ভেতরে ভেতরে একটা অস্বস্তি বোধও তার ছিল। প্রথমতঃ গল্পটা। দ্বিতীয়তঃ দেরী হয়ে যাচ্ছে। তাকে উঠতে হবে। যাবার আগে রজতের ভুলটা আজ ভেঙ্গে দিতে হবে। নইলে আর তার সঙ্গে দেখা হবার কারণ ঘটবে না হয়তো। রজত উঠতেই মঞ্জু বললো—এবার আমি উঠবো—সেদিন?

রজত ঘরের কোণের দিকে গিয়ে ফোনটা তুলে নিয়েছিল হাতে, মঞ্জুকে হাতের ইঙ্গিতে থামিয়ে দিয়ে ফোনে যেন কার সঙ্গে কথা বলে নিল সে। তার পর এসে বসে বললো—বোস। কেন এক্ষুণি উঠতে হবে? রাত হয়ে যাচ্ছে, না কাজ আছে?

—বৌদি আর দিদি আমার জন্য অপেক্ষা করছেন।

—বৌদি আর দিদি অপেক্ষা করছেন? কোথায়? নিয়ে এলে না কেন?

—ওরা ছবি দেখছে। আমি উঠে এসেছি।

—তাই বলো। কোন্ হলে?

—নিউ এম্পায়ারে।

—একেবারে বাজে ছবি। ওটা বসে দেখার চাইতে উঠে আসাই উচিত। অযথা ফের গিয়ে বসে দণ্ডভোগ করবে কেন? শেষ হয়ে আসুক, তার পর যেও। আমি নিশ্চয়ই তোমাকে ছবিটার চাইতে অনেক বেশী এণ্টারটেন করবো।

হাসলো মঞ্জু—তা হলেও ওরা রয়েছে। আমাকে এক্ষুণি যেতে হবে। আমি আপনার একটা ভুল ধারণা ভেঙ্গে দেবার জন্য বসে আছি। আপনি সেদিন একেবারে অকারণে হঠাৎ কেন জানি ভেবে নিলেন মৌরী নামটা আমার—

—মৌরী তোমার নাম নয়?

—না। আমার দিদির নাম। তারই আজ বিয়ে হবার কথা ছিল। আমার নয়। আপনি ধরে নিলেন আমার বিয়ে—আমিও আমোদ পেয়ে গেলাম।

মঞ্জুর আজ বিয়ে না হবার খবরটা রজতের মনে এতক্ষণ কোন নতুন ভাবের সঞ্চালন তোলেনি। হয়তো তারিখ পিছিয়ে গেছে। আজ হয়নি আর এক দিন হবে। কিন্তু আদপেই বিয়েটা মঞ্জুর ছিল না—এবার একেবারে প্রকাণ্ড খুসীতেই হাত বাড়িয়ে দিল রজত মঞ্জুর দিকে। কিন্তু মঞ্জুর কোলের উপর ন্যস্ত হাতে কোন ভাববৈলক্ষণ্য না দেখে পরিহাসতরল কণ্ঠে অভিমান ফুটিয়ে তুলে বললো—তোমার হাত দুটো নিশ্চয়ই কাঠের তৈরী। প্রাণ নেই একটুও।

বয় এসে টোকা দিয়ে ঘরে ঢুকল। তার হাতে ট্রের উপর এক ডিস ভর্তি ধোঁয়া-ওঠা খাবার। ট্রেটা টেবিলে নামিয়ে রেখে কতক্ষণ পরে চা আনতে হবে জেনে নিয়ে সে চলে গেল।

—এসব আমার জন্য নাকি? চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠল মঞ্জুর।

—হাঁ। তোমায় ছবি শেষ হতে আরো দেড় ঘণ্টার উপর দেরী আছে। এক ঘণ্টা বসলেও আধ ঘণ্টা ওদের সঙ্গে ছবি দেখতে পারবে।

তোমার মুখ দেখে বেশ বোঝা যাচ্ছে তোমার এখন কিছু খাওয়া দরকার।

—সে কি!

—হাঁ তোমার ক্ষিদে পেয়েছে। দেখোই প্লেটটা টেনে নিয়ে আমার কথা সত্য কি না। আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি আজ তোমার ভালো করে খাওয়া হয়নি—বা একেবারেই হয়নি। বিশ্রাম করোনি। কেবল ঘুরছ।

মঞ্জু সত্যি বিস্মিত ভাবে রজতের দিকে তাকিয়ে রইল।

—সেদিনও কিছুতেই খেলে না—আজও না খেলে আমি দুঃখিত হবো। প্লেটটা নিজ হাতে সে এগিয়ে দিল মঞ্জুর দিকে।

মঞ্জুর মনে পড়ে গেল ফিরপোতে রজতের সেই প্রথম দিনের খাওয়ানোর কথা। বিশুদের সঙ্গে ওর হাত থেকে পর্যন্ত ছুরি-কাঁটা নিয়ে নিয়ে বড় বড় রোস্টের টুকরো ছোট করে কাঁটায় গেঁথে হাতে তুলে দেওয়া। কাউকে যদি ভালো লাগতে থাকে তবে একথা ভেবে, ও কথা ভেবে, সে ভালো লাগা ও ঠেলে রাখতে চায়ও না। যেন দিদির কথার জবাবটা আগে মনে মনে তৈরী করে নিয়ে তার পর সে কাঁটা চামচ তুলে নিল হাতে। এক টুকরো তাজা মাংস মুখে দিয়েই শুধু আশ্চর্য নয়—কেমন যেন সম্মোহিত—বিস্ময় বোধ করল মঞ্জু। সত্যি ওর ক্ষিদে পেয়েছে—ভাল্লো রকম ক্ষিদে। যে ক্ষিদেয় যে কোন খাবার অমৃত মনে হয়। নীলের দেওয়া ডাল-ভাত দু'-গ্রাসের বেশী সে মুখে তুলতে পারেনি। চালের পচা গন্ধ, তরকারী শুধু কচুর—ওকে তৃতীয় গ্রাস মুখে তুলতে দেয়নি। নীলের অলক্ষ্যে জল ঢেলে থালাটা ঠেলে রেখে দিয়েছিল ও চৌকির নীচে।

বাড়ী ফিরে সময় ছিল না। মনেও হয়নি, হৈ-হৈ করে দিদিকে টেনে—বৌদিকে খুশী করে তৈরী হয়ে বেরিয়ে পড়েছে। হঠাৎ ওর নীলের সেই বড় বড় গ্রাসের ক্ষুধার্ত খাওয়ার দৃশ্যটা মনে পড়ে গেল। মুখের চিবানো বন্ধ হয়ে গেল ওর। সেই ভাঙ্গা স্কুল দালানটার ঘরে এখনও নিশ্চয়ই নীল ঝুঁকে পড়ে নিবিষ্ট মনে তার কাজ করে চলেছে। মোটা দাগ ধরা কাপে কালো রং-এর এক বাটি চা হয়তো কেউ রেখে গেছে—হয়তো বা যায়নি। তারও যে ক্ষিদে পেয়েছে সে খেয়াল তার নেই। কিন্তু একথা মনে করে কি খাওয়া বন্ধ করা চলে। পাগল! আর একটা মাংসের টুকরো তুলে নিয়ে মুখে দিল মঞ্জু।

রজত কৌচের পিঠে ঠেস দিয়ে বসে একটা নয়া সিগারেটের টিন ঢাকনাটা ঘুরিয়ে কাটতে কাটতে বললো—তোমার নামটাই জানা হয়নি। এবার তোমার নামটা শুনি?

—মঞ্জু হাতের ছোট্ট রুমালটা দিয়ে মুখের দুটো পাশ মুছতে মুছতে বললো—মঞ্জু।

—মঞ্জু? তোমাকে কেউ এ পর্য্যন্ত বলেনি যে, এ নাম তোমায় মানায় না? টিনটা টেবিলে নামিয়ে রেখে একটা সিগারেট তুলে নিল রজত।

—না।

—ভারি আশ্চর্য্য! সিগারেটটা ধরিয়ে কাঠিটা ছাইদানে ফেলে বললো—তোমার মঞ্জু নামের কোন অর্থ হয়! তোমাকে যে নামটা আশ্চর্য রকম মানাতো সে নামটা কবি তাঁর কাব্য প্রতিভার জোরে অস্থানে এমন অথর্ব ভাবে ব্যবহার করে গেছেন যে, সেটা আর ব্যবহার করবার উপায় নেই। লাবণ্যর নাম বন্যা—মানায়? কারুর জীবনে ভালোবাসার ঢল আনলেই যদি বন্যা নাম দেওয়া যায় তবে তো সব মেয়েই বন্যা। ও দিয়ে নাম হয় না। বাবা মা প্রকৃতির সঙ্গে মিলিয়ে সন্তানের নামকরণ করবার সুবিধে পান না। কিন্তু তারপর যদি কারুর নাম দেবার জন্য কারুর আগ্রহ হয় তবে শুধু আপন খুসীতে দিলেই চলবে না—ব্যক্তির সঙ্গে মিলের কথাটাও তাকে অবশ্যই ভাবতে হবে।

সিগারেটের ছাইটা ছাইদানে ঝেড়ে নিয়ে ওঠে দাঁড়ালো রজত। চুলের একটা গোছ একবার আঙ্গুলে জড়াতে আর একবার খুলতে খুলতে কার্পেটের উপর খালি পায় পায়চারি করতে লাগলো। একটু সময় কাটল চুপচাপ। তারপর বললো—অত বড় গাড়ীটা তোমায় পাঠিয়ে লাভ নেই। সামলাতে পারবে না। তার চাইতে পাতলা ছোট্ট একটা গাড়ী হলে শিখে নিয়ে কলকাতা সহর চষে বেড়াতে পারবে।

মুখের মাংসের টুকরো যেন গলায় ঠেকে গেল মঞ্জুর—কি?

হাসল রজত। সে বুঝল মঞ্জু শুনেছে ঠিকই কথাটা। তবু বললো আবার। তোমার জন্য একটা ছোট গাড়ীর কথা বলছিলাম।

ভয় পেয়ে গেল যেন মঞ্জু। হাতের কাঁটা-চামচ নামিয়ে ডিসটা ঠেলে দিল সে। বললো—এবার আমি উঠবো।

—ডিসটা ঠেলে দিলে কেন? আমি ত আর এক্ষুণি রুমালে বেঁধে তোমার ব্যাগে ভরে দিচ্ছিনে গাড়ীটা? তারপর যে কথাগুলো বললো সে—সে কথাগুলো শোনাতে লাগল কিছুটা আত্মগত করার

মতো। কথাগুলো তুমি কি ভাবে নেবে বুঝে উঠতে পারছিনে। ঐ দেখো, বলে হাত দিয়ে ঘরের কোণে রাখা দুটো সোডাওয়াটারের বোতল রাখবার খোপকাটা কাঠের বাক্সের মতো বাক্স দেখালো সে মঞ্জুকে। ঐ বাক্স দুটো ভর্তি আছে হুইস্কি শ্যাম্পেনে। তেমন বন্ধু সমাগম ঘটলে ক'সন্ধ্যা উতরোবে বলতে পারিনে। ভালো লাগে কি না জানিনে। জানতাম না হলে চলবে না—একদিন এক সন্ধ্যাও কাটবে না। কিন্তু আজ দেখলাম এ পর্যন্ত কাটল। তারপর হঠাৎ যেন সচেতন হয়ে উঠে সে ঝাঁকি দিয়ে ঝেড়ে ফেলল তার তদ্গত ভাবটা। বললো—সত্যি তোমার মতো মেয়ের পক্ষে গাড়ী চালানো শেখাটা খুব কাজের হবে। কিছুতেই আমি মনে মনে মানিয়ে উঠতে পারছিলাম না তোমার সঙ্গে বিয়ে কথাটা।

—মানিয়ে উঠতে পারছিলেন না! একেবারে তো অরক্ষণীয়া কন্যা বানিয়ে তুলতে চাচ্ছিলেন।

হেসে উঠল রজত—ওটা অনুপায় হয়ে। হঠাৎ টেবিলের উপর রাখা মঞ্জুর বেল কুঁড়ির মালাটার দিকে দৃষ্টি গেল তার। ওটা মঞ্জুর হাতের ব্যাগটার পেছনে পড়ে ছিল, তাই এতক্ষণ দেখেনি। ওটা দেখে মনে পড়ে গেল রজতের তার কেনা মালাটার কথা। ড্রয়ার থেকে কালো রং-এর সোনালী কাজকরা বাক্সটা এনে মঞ্জুর হাতে দিয়ে বললো—একেবারে মনে ছিল না। এটা তোমার জন্য কিনে ছিলাম আজ দেবো বলে।

—কি ওটা?

—দেখো খুলে।

কথায় কথায় খেতে খেতে ডিসটা শেষ করে এনেছিল মঞ্জু। সেটা একটু সরিয়ে রুমাল দিয়ে মুখ মুছে বাক্সটা খুলল। পাথর না চিহ্নক বাক্সের গায় হ্যামিলটন নামটা পড়তে পারে সে। আর ওটা যে কি পর্যন্ত মহার্ঘ বস্তুর বিপণি তাও সে জানে। মূল্যটা কত? চোখ দুটো ছোট করে জিজ্ঞাসা করল মঞ্জু।

—তুমি যেমন দেও। দিলে অমূল্য। না দিলে কাচ।

—কিন্তু আমি গয়না পরিনে। উঠে দাঁড়ালো মঞ্জু বাক্সটা টেবিলে ঠেলে দিয়ে।

রজত বুঝল এ নিয়ে কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। বললো—এবার উঠবেই?

—হাঁ।

—আর কিছুতেই বসবে না? হাসিমুখে মাথা নাড়ল মঞ্জু না করার ভঙ্গিতে।

—আর আসবেও তো না?

—তা কেন আসবো না?

—কবে? দিদির বিয়ের দিন ফের স্থির হলে?

হেসে উঠল মঞ্জু। না তার আগেই আমি চেষ্টা করবো আসবার কারণ বের করবার। যতদিন সেটা না হয়।

—অকারণ আসা যায় না?

—যায়। কিন্তু অনর্থক আসার অর্থটা এমন সাংঘাতিক রকমের অর্থপূর্ণ করে তোলে মানুষ যে, তার ভেতর মাথা গলায় নাকি কেউ! আচ্ছা, বলে হাত তুলে নমস্কার জানিয়ে ঘরের ভারি কাঠের দরজাটা টেনে বেরিয়ে গেল মঞ্জু হাসিমুখে।

রজতের যখন খেয়াল হলো মঞ্জুকে সে অনায়াসে নিউ এম্পায়ার পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসতে পারতো, তার বহু পূর্বে সে এই দু'মিনিটের পথ পৌঁছে গেছে। তার হাতের বেল কুঁড়ির মালাটা পড়ে আছে টেবিলের উপর।

[ক্রমশঃ।

বৃষ্টি এল

দীপ্তি সেনগুপ্তা

বৃষ্টি এল, বৃষ্টি এল
রিম্ ঝিম্ ঝিম্ বৃষ্টি এল।
গুমোট রাত, তপ্ত দুপুর
খুসী হয়ে বাজায় নূপুর
আঃ! কি আরাম, বৃষ্টি এল বৃষ্টি এল!

বৃষ্টি এল মেঘের রথে,
ধূলি ধূসর ধরার পথে;
ইন্দ্রধনুর সাতটি রঙে
সাজলো ধরা নতুন ঢঙে
বৃষ্টি এল সুর-রাঙানো পথ-বিপথে।

বৃষ্টি এল, বৃষ্টি এল,
আকাশ মাটির মিলন হল;
বৃষ্টি এল সবুজ ঘাসে,
কদম, কেয়া, বকুল হাসে,
আঃ! কি মজা, বৃষ্টি-ভেজা দিনটি এল!

দণ্ডকারণ্য

শ্রীমঞ্জুষ দাশগুপ্ত

অনৈতিহাসিক যুগ হতে তুমি অসীম তৃষ্ণা নিয়ে
লক্ষ দিবস ব্যাকুল হৃদয়ে শুধু চাতকের মত
কাটিয়ে দিয়েছো—এক ফোঁটা জল কারো কাছে পাও নাই
ক্ষোভে ও ব্যথায় বিলাপের গীতি গেয়েছো তো অবিরত।

কোটি কোটি নর বন্ধ হয়েছে চতুরিকাদের জালে
দিয়েছে কেবল—পারেনি তো হায় এমন কিছুই নিতে;
তবুও তারা তো দেখেনি তোমার সরল মধুর রূপ
তিল তিল করে দগ্ধ হয়েছে কামনার অগ্নিতে।

আর ঘৃণা নেই—ঐ বলে চলে প্রভাতের শুকতারা,
'তব প্রতীক্ষা জাগর রাত্রি হবে ঠিক অবসান,
তোমার মনের আকাশে উড়বে পুলক পাখীর ঝাঁক
আজকে শুনেছে মানুষ তোমার হৃদয়ের আহ্বান।'

হে তরুণী, জানি অংগে তোমার জাগাবেই শিহরণ
সাত পুরুষের বঞ্চিত প্রেম—অতৃপ্ত চুম্বন।

পঙ্কধর মিশ্র

আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের জন্মশতবার্ষিকী পূর্ত্তি উপলক্ষে সমস্ত দেশ জুড়ে বিরাট অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ভারতের এই বিজ্ঞান-ঋষিকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হবে। মৌলিক বিজ্ঞান চিন্তার ক্ষেত্রে পৃথিবীর ইতিহাসে প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞানীরা এক মহাগৌরবময় আসন অধিকার করে আছেন। কণাদ, পতঞ্জলি, চরক, নাগার্জ্জুন প্রভৃতি মনীষীদের অবদানের কথা আজও কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করা হয়। মধ্যযুগে ভারতের ইতিহাস অন্ধকারাচ্ছন্ন, বিজ্ঞান গবেষণার ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের স্বাতন্ত্র্য তখন একেবারে লোপ পেয়েছিলো। শিল্পবিপ্লবের ফলে ইউরোপে এলো নবজাগরণ, সেখানে জ্ঞানে বিজ্ঞানে অসাধারণ প্রতিভাশালী অনেক মহামানবের আবির্ভাব হলো। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ভারতের অতীত প্রাধান্যের কাহিনী তখন রূপকথায় পর্য্যবসিত হয়েছে। মৌলিক চিন্তার কথা দূরে থাক, বিজ্ঞান-জগতের অগ্রগতির সঙ্গে উপলব্ধির সম্পর্ক রাখার ক্ষমতাও ভারতবর্ষের ছিল না। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে দীর্ঘকাল সুপ্ত থাকার পর ভারতীয় বিজ্ঞান মনীষার পুনর্জাগরণ হলো, বিশ্বের বিজ্ঞানীমহল সসম্মানে তার স্বকীয় বিশিষ্ট সত্ত্বা স্বীকার করে নিলেন। এই পুনরভ্যুদয়ের নেতৃত্ব করেছিলেন বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্র বোস। বিশ্ববাসী তাঁর বিদ্যুৎতরঙ্গ, জড় ও জীবের সাড়ায় ঐক্য এবং নির্ভীক উদ্ভিদ জীবন বিষয়ক গবেষণার প্রাধান্য স্বীকার করে নিয়েছিলো। বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী ম্যাক্সওয়েলের মতবাদকে পর্য্যবেক্ষণমূলক পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য জার্ম্মাণ বিজ্ঞানী হার্ৎস যে গবেষণা সুরু করেন, অকাল মৃত্যুর জন্য তিনি তা সম্পূর্ণ করে যেতে পারেন নি। ভারতীয় বৈজ্ঞানিক আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বোসের বিদ্যুৎ-তরঙ্গ বিষয়ক গবেষণাসমূহের মধ্যে তা সম্পূর্ণ রূপ পরিগ্রহণ করে। জগদীশচন্দ্রের এই মহামূল্যবান আবিষ্কার সমূহের বিবরণ পাঠ করে তৎকালীন ফরাসী বিজ্ঞান পরিষদের সভাপতি কর্ণু লিখেছিলেন—

"আপনার আবিষ্ক্রিয়া দ্বারা আপনি বিজ্ঞানকে বহুদূর অগ্রসর করিয়া দিয়াছেন। দুই হাজার বৎসর পূর্বে আপনার পূর্বপুরুষগণ মানব সভ্যতার অগ্রণী ছিলেন এবং বিজ্ঞানে ও কলাবিদ্যায় জ্ঞানের উজ্জ্বল আলোক জগৎ সমক্ষে প্রজ্বালিত করিয়াছিলেন। আপনি আপনার পূর্বপুরুষদের গৌরবকীর্ত্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করুন।"

আগামী ৩০শে নভেম্বর এই মহাবিজ্ঞানীর জন্মশতবার্ষিকী পূর্ণ হবে। ঐ দিনটিকে কেন্দ্র করে অন্যান্য অনুষ্ঠানের সঙ্গে একযোগে ভারতবর্ষের সমস্ত শিক্ষাকেন্দ্রে ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানসমূহে পক্ষকালব্যাপী জগদীশ-পাঠচক্রের আয়োজন করা উচিত। এই পাঠচক্রে আলোচনার মাধ্যমে জগদীশচন্দ্রের জীবনী ও গবেষণাধারার সঙ্গে সকলে পরিচিত হবেন। বর্ত্তমানকালে সকলেরই বিশেষ করে বিজ্ঞানকর্ম্মী ও ছাত্রদের জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞান সাধনার স্বরূপের সঙ্গে একান্ত পরিচয় থাকা উচিত। জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞান সাধনার স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারলে আজকের অথবা ভবিষ্যতের প্রত্যেক বিজ্ঞানকর্ম্মীই দেশপ্রেমের সঙ্গে বিজ্ঞান সাধনার সম্পর্কের গুরুত্বের কথা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করতে পারবেন।

দেশের বিজ্ঞানকর্ম্মীদের কর্মধারার উপরই বিশ্বের দরবারে ভারতের মর্য্যাদা ও প্রতিষ্ঠার এক বৃহৎ অংশ নির্ভর করছে। বর্ত্তমান বিজ্ঞান সভ্যতার যুগে বিজ্ঞান গবেষণার ক্ষেত্রে যে দেশ যতো বেশী অগ্রগামী, তার প্রতিষ্ঠা ও সমৃদ্ধি ততো বেশী। জগদীশচন্দ্রের জীবনী ও সাধনার কথা আলোচনা করলে বিজ্ঞানের ছাত্ররা, যাঁদের উপর আগামী যুগে ভারতের সম্মান রক্ষার ভার অর্পিত হবে তাঁরা তাদের গুরুদায়িত্বের বিষয়ে সচেতন হয়ে উঠবেন। তাঁরা উপলব্ধি করতে পারবেন আচার্য্য দেবের উদাহরণ অনুসরণ করে তাঁদের বিজ্ঞানচর্চ্চাকে দেশপ্রেমের দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখতে হবে। তাই দেশবাসীর, আচার্য্যদেবের চিন্তাধারা ও জীবনের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার গুরুত্ব খুবই বেশী।

* * * *

গত ১৪ই আগষ্ট বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক ফ্রেডারিক জোলিও কুরী পরলোক গমন করেছেন। বিজ্ঞান গবেষণার ক্ষেত্রে কুরী পরিবারের অবদানের কথা সকলেরই জানা আছে। একই পরিবারের বহুজনের বিজ্ঞান গবেষণার ক্ষেত্রে অসাধারণ অবদানের অন্য কোন দৃষ্টান্ত ইতিহাসে আর নেই। সত্যি কথা বলতে কি, কুরী পরিবারের কর্মধারাই বিজ্ঞানচর্চ্চার ক্ষেত্রে এক নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। এই পরিবারের প্রথম পুরুষ অধ্যাপক পিয়ের কুরী এবং তাঁর স্ত্রী মাদাম মারি কুরী রেডিয়াম আবিষ্কার করে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। কুরী-দম্পতির কন্যা বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আইরিন কুরী এবং তাঁর স্বামী অধ্যাপক ফ্রেডারিক জোলিও কুরীর কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়তা আবিষ্কার এক নতুন জগতের সূচনা করেছে। পিয়ের কুরী ও মারি কুরী বহুদিন আগেই মারা গিয়েছেন, আইরিন পরলোকগমন করেছেন কিছুদিন আগে ১৯৫৬ সালে। গত ১৪ই আগষ্ট ফ্রেডারিক জোলিও কুরীর মৃত্যুর সঙ্গেই এই পরিবারের বিজ্ঞান সাধনার ইতিহাস শেষ হয়ে যায়নি।

জোলিও ও আইরিনের কন্যা হেলেনও একজন বিজ্ঞানী এবং তিনি তাঁর স্বামী উদীয়মান বৈজ্ঞানিক পিয়ের লাঙ্গেভাঁর সঙ্গে বিজ্ঞান গবেষণায় ব্যাপৃত আছেন। অধ্যাপক হ্যালডেন জানিয়েছেন হেলেন তাঁর মার চেয়েও বেশী প্রতিভাশালিনী। সুতরাং আশা করা যায়, কুরী পরিবারের মর্য্যাদা এবং ঐতিহ্য তিনি একই ভাবে রক্ষা করতে সমর্থ হবেন। অধ্যাপক হ্যালডেন বিজ্ঞানী হেলেনকে ভারতবর্ষে নিয়ে এসে গবেষণার পূর্ণ সুযোগ দেবার প্রস্তাব করেছেন। বিদেশের খ্যাতনামা এবং উদীয়মান বিজ্ঞানীরা ভারতবর্ষে এসে, ভারতের বিজ্ঞানকর্ম্মীদের সহযোগিতা করলে এই দেশেরই উন্নতিবিধান ঘটবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাই এই প্রস্তাবের মূল্য ও মর্য্যাদা যথেষ্ট বেশী। তবে প্রথম কথা, হেলেন দেশত্যাগ করতে রাজী হবেন বলে মনে হয় না। কুরী-পরিবারের দেশপ্রেম

বন্দিত, তাই মনে হয়, এই বিজ্ঞানীও তাঁর সাধনার সাফল্যের গৌরব তৃভূমিকে শ্রদ্ধার সঙ্গে অর্পণ করবেন।

* * * *

বিজ্ঞানী ফ্রেডারিক জোলিও ১৯০০ সালের ১৯শে মার্চ্চ জন্মগ্রহণ রেন। রসায়ন ও পদার্থ-বিজ্ঞানের প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করে নি ১৯২৫ সালে মাদাম কুরী—কুরী ইনসটিটিউটে সামান্য কাজে াগদান করলেন। এইখানে তাঁর অসাধারণ বিজ্ঞান-প্রতিভা াকশিত হলো এবং ১৯২৬ সালে মাদাম কুরীর কন্যা আইরিন কুরীর ঙ্গ তিনি পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হলেন। ফ্রেডারিকের পদবী জোলিও, ন্তু বিবাহের পর কুরী পরিবারের গৌরব নামের সঙ্গে বহন করবার ন্য শেষে কুরী কথাটাও যুক্ত করে নেন। কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়তা াবিষ্কার করার জন্য এই কুরীদম্পতি যুক্তভাবে ১৯৩৫ সালে নোবেল রস্কার লাভ করেন। আইরিন এবং ফ্রেডারিকের এই সম্মানলাভের র কুরী-পরিবার মোট তিন বার জগতের এই মহাসম্মান অর্জ্জন রলেন। আজ পর্য্যন্ত এই অসামান্য ঐতিহ্যের অধিকারী একমাত্র রাই।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে দেশপ্রেমিক বিজ্ঞানী ফ্রেডারিক মুক্তিসংগ্রামে যাগ দেন। জার্ম্মাণরা ফরাসী দেশ দখল করলে তিনি গবেষণাগারে নিজের খরচে বোমা তৈরী করে ফ্যাসিষ্টদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাবার ন্য দেশপ্রেমিকদের সরবরাহ করতেন। ১৯৪২ সালে তিনি ফরাসী দেশের কম্যুনিষ্ট পার্টির সভাপদ গ্রহণ করেন। যুদ্ধের পরে জগতের শান্তি কামনায় সস্ত্রীক শান্তি আন্দোলনে যোগ দেন। আইরিন ও ফ্রেডারিক উভয়েই মৃত্যুর শেষ দিন পর্য্যন্ত বিশ্বশান্তির জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে গিয়েছেন। ১৯৫৩ সালে ফ্রেডারিক ষ্টালিন শান্তি পুরস্কার লাভ করেন। কেবল বিজ্ঞানী হিসেবে নয়, শান্তিকামী মানবপ্রেমিক হিসাবেও বিজ্ঞানী ফ্রেডারিক জোলিও কুরীর নাম চিরকাল ইতিহাসের বুকে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

* * * *

স্ত্রী আইরিন কুরীর মতন লিউকেমিয়া রোগই জোলিও কুরীর মৃত্যুর প্রধান কারণ। তেজস্ক্রিয় পদার্থ নিয়ে সারাজীবন গবেষণা করবার সময় নির্গত রশ্মি সমূহের প্রভাবে তাঁদের দেহে এই মারাত্মক রোগের সৃষ্টি হয়েছিল। কুরী-দম্পতির লোকান্তর সাধারণ মৃত্যু নয়, সমগ্র মানব সমাজের স্বার্থে তাঁরা আত্মত্যাগ করেছেন। এই রোগের প্রভাবে বহুদিন ধরেই ধীরে ধীরে তাঁরা মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন, বিজ্ঞানের বৃহত্তর স্বার্থের চিন্তায় তাঁদের মন সবসময়েই পুর্ণ থাকার ফলে নিজেদের নিরাপত্তার দিকে বিশেষ মনোযোগ কোন সময়েই তাঁরা নিতে পারে নি। কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়তার আবিষ্কার ঘটিয়ে তার মঙ্গলদায়ক প্রভাব বিশ্বের মানবসমাজের জন্য রেখে দিয়ে, এই বিজ্ঞানিদ্বয় নীলকণ্ঠের মতো গরলটুকু নিজেরা গ্রহণ করে আত্মাহুতি দিলেন। কুরী-দম্পতির স্বপ্ন সফল হোক, হিংসা ও হানাহানি পরিত্যাগ করে মানুষ তেজস্ক্রিয় রশ্মি কেবল সমাজের মঙ্গলের জন্য ব্যবহার করুক। পরমাণু শক্তির কল্যাণকৃৎ ব্যবহারের বিরাট সম্ভাবনা আমাদের সামনে উম্মুক্ত হয়ে রয়েছে; এই পরিবেশ সৃষ্টির জন্য কুরী-পরিবারের অবদান অতুলনীয়। তাই তাঁদের স্বপ্ন বা কল্পনাকে রূপ দিয়ে এই শক্তির ব্যবহার অমৃতসম্ভবা পথে পরিচালিত করার গুরুদায়িত্ব বর্ত্তমানকালের বিজ্ঞানীদের উপরই ন্যস্ত হয়েছে। কেবলমাত্র কুরী-পরিবারই নয়, আইনষ্টাইন, ফের্মি প্রভৃতি মহান বিজ্ঞানিবৃন্দের স্বপ্ন বা কল্পনা একই ছিল। তাঁদের সকলের স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দেবার জন্য, বিজ্ঞানীরা নানাভাবে পরমাণু শক্তির মানব কল্যাণে ব্যবহার সুরু করেছেন। এ দায়িত্ব তাঁদের পালন করতেই হবে।

একটি ছড়া

দীপ্তি সেনগুপ্তা

ইষ্টি কুটুম, ইষ্টি কুটুম,
মিতা কি তোর বুদ্ধ ভুতুম!
সোনালী রোদ গাছের পরে
কী যেন এক মিষ্টি সুরে,—
ডাকছে তোরে, ডাকছে মোরে
হরিণগুলো ছুটছে জোরে।

হলুদ-চাঁপা গায়ের বরণ,
কাশ-শিউলি পাতার কাঁপন
গুন-গুন-গুন মিষ্টি মধুর,—
পুজোর ছুটি আর কতো দূর?

ঢাকের বাদ্যি টাক ডুমাডুম,
ইষ্টি কুটুম, ইষ্টি কুটুম, ॥

চিঠি আসে না কেন?

সন্ধ্যা ঘোষ

চিঠি আসে না কেন?

দুপুর গড়ায় ভর সন্ধ্যায় একটি কথাই শুধু
মনের চাতালে মাথা খুঁড়ে মরে
পাখীরা সকলে উড়ে গেছে ঘরে
চোরকাঁটা শুধু আঁচল টানে—গাগরী ভরণে বধূ।

শিরশিরে হাওয়া ছুঁয়ে যায় দেহে
মনের হরিণ নিষেধ জানে না
তিয়াসী আঁখির সেঁজুতি জেলে নিশীথ নীরব গেহে
আহা লো শরম, যুবতী ধরম মানে না।

দুটি কথা বই আর কিছু নাই
ভালবাসি তার ভাল আছি তাই
তবুও চিঠি আসে না কেন?
দিন গেছে ঢলে সন্ধ্যার কোলে—বুঝি বা তাহার মনেই নাই।

ভারত থেকে তিব্বত

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

রায় বাহাদুর শরৎচন্দ্র দাস

তৃতীয় অধ্যায়

তিব্বতের উচ্চ মালভূমিতে

আমার অনুমান ফিরোজা রঙের মণিগুলি নদীর তলদেশেই আছে। যে মণিগুলির জন্যই তিব্বতীয়রা গর্ব অনুভব করে, তা আমি একটিও খুঁজে পেলুম না। মধ্য রাত্রে অনেকগুলি ছোট ছোট পাহাড়ে নদী পেরিয়ে বড় রাস্তার ধারে দি-কং (দি-বং)* গ্রামে পৌঁছুলুম। এখানেও আমরা মুক্ত আকাশের তলে কম্বল গায়ে দিয়ে আরামে রাত কাটালুম। জ্যোৎস্নালোকে দেখলুম দক্ষিণ হিমালয়ের অগুন্তি শুভ্র চূড়া মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে, যার পশ্চাতে আছে এক স্বপ্নময় তৃণভূমি। বাম দিকে দি-কং ছাড়িয়ে পাহাড়। আমাদের সামনে মধ্য তিব্বতীয় হিমালয়ের নিম্ন গিরিশ্রেণী।

১লা জুলাই—তখন সবেমাত্র পূবাকাশে আলোর ছটা প্রকাশ পেয়েছে। আমরা উঠেই সার ও টিংকি জং-এর উত্তর-পশ্চিমে আট মাইল দূরবর্তী আশে পাশের গ্রামগুলি দিঙনির্ণয় করতে করতে চলতি পথে চোরটেন ন্যিমো নদীকে দ্বিতীয়বার পার হলুম। এক মাইল অগ্রসর হবার পরই আমরা একটা ঘণ্টার আওয়াজ শুনতে পেলুম। আমাদের অনুমান হল কোন পথিক এদিকে আসছে। ঠিক তাই—তারা সংখ্যায়ে চার জন। সারের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। আমাদের দেখেই পরিচয় জানতে চাইলে—

—আমরা কে ?

—কোত্থেকে এসেছি ?

—কোথায় যাব ?

সেই মামুলি প্রশ্ন। ফুরচুঙ্গ আমাদের হয়ে সব উত্তর দিলে। তারা আমাদের নেপালী বা শেরপা লামা মনে করেছিল। যেহেতু আমরা তখন নেপাল সড়কের মধ্যে। চোরটেন ন্যিমো নদীর দক্ষিণ তীরে দি-কং গ্রাম। এই নদীটি পূবদিকে বিস্তৃত বৃক্ষহীন গিরিশ্রেণীর নিম্ন ঢালু পথের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত। গ্রামটি পাথরের প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। প্রাচীরটি আট ফুট উঁচু আর পাথরগুলো অমসৃণ। বাড়ীগুলির ছাদও পাথরের। ছাদের প্রত্যেক কোণে একটি করে নিশান। নিশানের দণ্ডগুলি কম্বলের দড়ি দিয়ে বাঁধা। তাতে একটা করে কাগজ টাঙ্গানো—সেগুলোতে মন্ত্র লেখা।

বাড়ীর আশে-পাশে ছোট ছোট তৃণ আর ফুলগাছের ঝোপ। কিছু দূরেই দেখা যাচ্ছে বার্লির ক্ষেত। নদী থেকে স... সরু খাল কেটে আনা হয়েছে চাষের কাজের সুবিধের জন্য। আমাদে... পেছনে পশ্চিম দিকে অনেকগুলি গ্রাম। গ্রামগুলি সারও টিং... জং-এর উত্তর-পশ্চিমে সিকিম রাজ্যের তিব্বতীয় জমিদারী ডোবত... গ্রাম।

ৎসো-মোট-থুং নামে একটা বিশাল হ্রদ গবাদি, খচ্চর প্রভৃতি... পানীয়ের জন্য নির্দিষ্ট। এই হ্রদটির চার ধারে যে গ্রাম আছে তা... নাম ডোবতা। কয়েক মাইল দূরে সার দেশের নিম্ন অংশে অরুণ আ... টিংকি জং-এর সংযোগ স্থলের পথে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে একটা ছোট... নদী নেমে এসে পড়েছে এই হ্রদে। হ্রদটির জল অতি পরিষ্কার। উত্তর... তাসি-ৎসে-পা নামে একটা গ্রাম। এই গ্রামে উঁচু একটা বেল্লা... চারতলা ও ৬০টি জানালা আছে। একজন ধনী তিব্বতীয়ের সম্পত্তি... এটা। একদিন হ্রদের ধারে পশুচারণ করতে করতে এই তিব্বতীয়... এক বিপুল গুপ্ত সম্পদ আবিষ্কার করে। ঐ হ্রদটা সম্বন্ধে এ... কৌতুকময় কাহিনী প্রচলিত আছে। কাহিনীটি এই—

পাথরে ঘেরা ছোট্ট একটা ঝর্ণা। তাতে বাস করত পাতালে... এক নাগকন্যা। মানুষ স্বামী নিয়ে মনের সুখেই থাকত। ঝর্ণার... মুখ একটা ছোট্ট পাথর দিয়ে ঢাকা থাকত। বিস্তীর্ণ অনুর্বর আ... বন্ধুর পথ ভ্রমণে তৃষ্ণায় কাতর পথিক এসে এর সুমিষ্ট জল পান কর... স্বর্গীয় সুখ উপভোগ করত। এটাই ছিল পথিকদের বিশ্রামস্থল। এক সময়ে কোন এক ধনী বণিক শত শত খচ্চর সমেত এখানে আশ্র... নেয়। ঝর্ণার সুমিষ্ট জলে তারা তৃষ্ণা নিবারণ করে। ঝর্ণা থেকে জল তোলার পর সেই ধনী ঝর্ণার মুখে শ্লেট পাথর চাপা দিতে ভুলে যায়। খচ্চরগুলোও তৃষ্ণার্ত। ইত্যবসরে তারা তার জল পান করতে সু... করে। একসঙ্গে পান করাতে সমুদয় জল শুকনো হয়ে যায়। বাকী যা জল থাকে তা তারা পা দিয়ে মাড়িয়ে অপবিত্র করে দেয়। নাগকন্যা এতে ক্রুদ্ধ হয় আর অপমানিত বোধ করে। সে অভিসম্পাত দেয় যে এই ঝর্ণা এখনি সাগরে পরিণত হবে। তার মানুষ স্বামী ভারতীয় আচার্য ফা-দম-পাই সঙ্গে তাকে এই অভিসম্পাত কার্যকরী করা থেকে বিরত করতে চেষ্টা করে। কেন না এ হলে অনেক প্রাণী ধ্বংসের মুখে পড়বে। কিন্তু নাগকন্যা অটল থাকে। অতি অ... সময়ের মধ্যে সে এই ঝর্ণাটিকে এক সাগরের সঙ্গে যোগ করে দেয়। মুহূর্ত্তের মধ্যে ঝর্ণাটি এক বড় হ্রদে পরিণত হল। এটা সমস্ত তিব্বতকেই ডুবিয়ে দিত; যদি না তার স্বামী তৎক্ষণাৎ সেই ঝর্ণার চারদিকে নর্দমা কেটে জলকে বার করে দিত। উত্তর দিকের নর্দমার মুখ গিয়ে পড়েছে অরুণ নদীর মুখে।

নাগকন্যার স্বামী মহান আচার্য এই টেংরি-জং-এর প্রতিষ্ঠাতা। ডোবতা গ্রামে তার নামে একটা মন্দির আছে—সেখানে তার এবং তার নাগিনী পত্নীর প্রতিমূর্তি আছে। এই মূর্তি দেখবার জন্য যাত্রীদের কাছ থেকে এক টঙ্কা অর্থাৎ ছয় আনা পয়সা দর্শনী নেওয়া হয়। হ্রদটির উত্তর-পূর্বস্থিত গ্রামগুলির মধ্যে তাজিং, ওয়েৎস, কোলোমাই প্রধান। আমাদের গন্তব্যপথ ও হ্রদটির মাঝখান দিয়ে অরুণ নদী নেপালের দিকে প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছে। সোংনগা শাখানদী ছেড়ে ব্যতীত এখানকার নদীগুলি অরুণেতে মিশেছে। একজন ভাল পথিকের এই হ্রদটি পরিক্রমা করতে তিন দিন সময় লাগতে পারে।

দি-কং-এ টাট্টু ঘোড়া পাওয়া যায় নি। তাং জুং নামে নিকটবর্তী...

---

* দি-কং নামটি যখন তিব্বতীয় ভাষায় লিখিত হয় তখন ইহা থাল-কং হয়। থাল শব্দ ধুলাকে বুঝায় আর কং বা পাং বোঝায় মাথার উপর অর্থাৎ চূড়া। এই গ্রামাঞ্চলে যখন বাতাস প্রবল ভাবে বইতে থাকে তখন ধুলোর স্তূপ উড়তে থাকে। ১৮৭৯ ও ১৮৮১ সালে যখন আমরা এই গ্রামেতে প্রবেশ করি তখন ধুলোর ঝড়ের মধ্যে আমাদের পড়তে হয়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমরা আমাদের চোখ মুখ কাপড় দিয়ে ঢেকে রেখে দিলুম যতক্ষণ না তার বেগ প্রশমিত হয়েছিল।

গ্রামে আমাদের যেতে হয়েছে। বৃহৎ গ্রাম তাং-স্থং—এটি শীত-উপত্যকা।

ছোট একটা নদীর দু'ধারে গ্রামটি অবস্থিত। এই নদীটি চোরটেন ডিমা গিরিশ্রেণীর পূর্বাংশে প্রবাহিত। এই গ্রামে তিনশ' বাড়ী আছে। নদীর দু'ধারেই বিস্তৃত বার্লিক্ষেত। গ্রামবাসীদের প্রধান সম্পদ হল সুন্দর চমরু গাই। সম্প্রতি নেপাল থেকে এক সংক্রামক রোগ এসে অধিক সংখ্যক চমরু গাইকে নষ্ট করে দিয়েছে। অনেক ভেড়া ও ছাগল মাঠে চরতে দেখা গেল। পাথর দিয়ে ঘেরা প্রবেশ-পথ। সামনে দুটো বড় চৈত্য। গ্রামেতে একটা ছোট বৌদ্ধমন্দিরও আছে। ফুরচুঙ্গ তার পরিচিত লোকের এক বাড়ীতে আমাদের নিয়ে গেল। গৃহকর্ত্রী বৃদ্ধা, অতিথিপরায়ণা। বার্লি মদ ও চা দিয়ে অভ্যর্থনা করলে। আপ্যায়নের ত্রুটি নেই, তার সঙ্গে এক কাঠের পাত্রে বার্লির সুস্বাদু খাবার। ২০ ফুট লম্বা ও ৮ ফুট চওড়া একটা ছোট ঘরে আমাদের থাকার ব্যবস্থা হল। ঘরটি পাথরের পর পাথর বসিয়ে তৈরী, মাটি দিয়ে লেপা। শ্লেট পাথরের ছাদ, তাতে একটা ছোট ঘুলঘুলি। আমাদের মনে হল, এটা একটা পরিত্যক্ত দোকান। মেঝেটায় পুরু ধুলো আর ঘরের কোণে উনুন। ছাগলের চামড়ার তৈরী একটা হাপর। এই ঘরের আসবাব। হাপরটা চালাতেই ধুলোগুলো উড়তে লাগল আর আমাদের দম বন্ধ হবার উপক্রম।

আমরা সকলে ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম। ঘর পরিষ্কার হলে সবে সাজিয়ে গুছিয়ে বসেছি—একদল ভিক্ষুকের আবির্ভাব। আমরা তাদের বার্লির খাবার আর তামাকপাতা দিয়ে বিদায় দিলুম। এগুলো আমরা সঙ্গেই এনেছিলুম। তিব্বতের স্ত্রীলোকদের কাছে তামাক বেশ আদরণীয়। অনেক দর্শক এসে দরজার ফাঁক দিয়ে আমাদের দিকে উঁকি-ঝুঁকি মারছিল। যদিও ধোঁয়া আর ধুলোয় আমরা অতিষ্ঠ তবুও মনে আমাদের খুব স্ফূর্তি। একজন ফেরিওলা আর তার স্ত্রী আমাদের দরজার সামনে এসে নাচ-গান সুরু করলে। পুরুষটি সারেঙ্গ বাজাচ্ছিল—আর মেয়েটি তালে তালে নাচছিল। তারা উভয়েই গান গাইছিল। যাত্রা আমাদের শুভ হ'ক। এই কামনায়ই তিনটি গান গেয়ে ফেললে। গানগুলি আমার খুব ভাল লাগছিল; কারণ সেগুলি বেশ ভাল বুঝতে পারছিলুম। আমি তাদের চার আনা পয়সা ও কিছু তামাকপাতা দিই। তারা খুসী হয়ে বিদায় নেয়। এর পরে। চাংকু আসে। চাংকু তিব্বতীয় বন্য কুকুর, তিব্বতীয় ভালকুত্তার মত বড় নয়। তাদের গায়ের রং ফিকে চেষ্টনাট বাদামের মত। এই নেকড়ে জাতীয় কুকুরটি খুব পোষা। আমাদের কাছে এসে খুব সেলাম করতে লাগল। কুকুরের মালিকটি দেখাতে চাইলে যে সে কত আজ্ঞাকারী। আদেশ করার সঙ্গে সঙ্গে সে আমাদের ঘরে ঢুকে পড়ল। কুকুরের প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই গৃহকর্ত্রী দারুণ রেগে গিয়ে সেই ভিক্ষুককে বাড়ীর বার করে দিলে। কারণ ওই বন্য অপবিত্র চাংকু কুকুর বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করে বাড়ীর পবিত্রতা নষ্ট করেছে।

২রা জুলাই—সকাল বেলায় আমি কতকগুলি ডিম কিনলুম—আর লামা একটা ভেড়ার ধড় অর্থাৎ মাথা, পা ও অন্যান্য অব্যবহার্য অংশ বাদ দিয়ে অবশিষ্টাংশ কিনলে মাত্র আট আনায়। বাবুয়ানির মত

এ কাজটা সে করে ফেললে। এ থেকে টুকরো টুকরো মাংস কেটে গাইড আর কুলিদের বিলোলে। নিজের জন্যও বেশ খানিকটা রাখলে। গৃহকর্তাকে এক টাকা বকৃশিস করে আমরা তিনটে টাট্টু ঘোড়া নিয়োগ করে যাত্রা করলুম। আমাদের যাত্রাটা বেশ আরামদায়ক হল। কারণ আমরা থা-লা। ডন-কি-চু আর নেপালের স্বচ্ছ নদী ডুডু-কোলী ধার দিয়ে চলতে লাগলুম। দূরে আমাদের ডাইনে আর বাঁয়ে দু'সারি পাহাড় রয়েছে। তার বিস্তার উত্তর-পশ্চিমে। কম্বা-জং-এর গিরিশ্রেণীর একটা অংশ এই পাহাড়ের ডান দিকে টং-ছং-এ পৌঁছেচে। মাঝে মাঝে বার্লিক্ষেত। আশে-পাশে গরু, ভেড়া, ছাগল চরছে। মাঠে অসংখ্য গর্তের মধ্যে থেকে শত শত গিরি-মূষিক ছুটে বেড়াচ্ছে। পথের ধারে দুটো গ্রামের ধ্বংসাবশেষ দেখা গেল—তার মাঝে মাঝে মাটি আর পাথরের ঢিবি। ১১টার সময় সুশোভিত গ্রাম মেগ্রেয় পৌঁছলুম। তার দুধারে উর্বর জমি। গ্রামের সামনে ফুলের বাগান। সেখানে আছে ছোট ছোট উইলো, বার্চ (ভূর্জ), ছোট ছোট জুনিপার, তাদের পাতার কি বাহার! ওগুলো গন্ধদ্রব্যের জন্যই ব্যবহৃত হয়। আরও কত অজানা ছোট ছোট চারা গাছ। যাদের নাম আমি জানি না। গ্রামের মধ্যে পৌঁছুতেই প্রায় ২০জন গ্রামবাসী আমাদের ঘিরে ফেললে। তাদের প্রশ্ন—আমরা তাদের জন্য কি বিক্রী করতে এসেছি। তারা আমার রিভলবার আর লামার পিস্তল দেখে খুশী হল, কেনবার জন্য ঝুলোঝুলি। গ্রামের মোড়ল এগিয়ে এল। চমরু গাই-এর চামড়ার কম্বল পেতে দিলে বসবার জন্য। সে নিজে মাটিতেই বসল, তার স্ত্রী আমাদের খাতির করলে বার্লি মদ, মাখন, চা আর আটা দিয়ে। এই সব খেয়ে আমরা বেশ তাজা হলুম। আবার চলার পালা। পথের কি আর শেষ নেই? ছোট ছোট নদীগুলো পার হয়ে একটা সুন্দর গ্রামে পৌঁছলুম—নাম (দার-গে) টার-গে কম্বাপনের নিকট ইয়াক্ক-ৎসং-পো'র একটা গ্রাম। এই গ্রামের বিপরীত দিকে আছে শের-ডিং গোম্পা নামে একটা মঠ, বেশ সূক্ষ্ম কারুকার্য-খচিত। আমরা পথচারীদের আস্তানায় রাতটা কাটালুম। টাং-লুম কুটীরের চেয়ে এটাতে জায়গা বেশী ছিল। টা-লুমের গবাদির চেয়েও এখানে গবাদি বেশী। আমাদের দক্ষিণে—দক্ষিণ-পূর্ব পাহাড়ের শৃঙ্গের উপর কম্বা-জং দুর্গের দৃশ্য বেশ দেখা যেতে লাগল।

৩রা জুলাই—সকালে আমরা ইষাক্ক-লা-পাহাড় পেরলুম এই পাহাড়টি কম্বা-জং গিরির উত্তর পশ্চিমের বিস্তার। বণিকের দলেরা গাধার দল নিয়ে যাচ্ছে। আমরা তখন তিব্বতের ফে-চু অরুণ নদীর তীরে। রান্না ও খাওয়ায় ব্যস্ত। দুপুরে যাত্রা করে ২-৩০টা নাগাদ আমরা গুয়মে বা কুর্ম, একটি ছকপাল শহরে এলুম। এখানে ছ'শ পরিবারের বসতি। তারা সকলেই পশু পালন করে জীবিকা অর্জন করে। তাদের ভেতর বেশীর ভাগ লোকেরাই নিকটস্থ পাহাড়ে নেমদার (পশমের) তাবু খাটিয়ে বাস করে। কারণ ঐ সব জায়গায় তাদের পশুরা প্রচুর পরিমাণে চারণ ভূমি পায়। তাদের বাড়ীগুলি মালিকদের অভিরুচি অনুযায়ী কোনটি কোনটি পাথরের আর কোন কোনটি রোদে শুকান মাটির ইট দিয়ে তৈরী। বাড়ীগুলির চারপাশের দেওয়াল মাটির বা পাথরের। এই গ্রামের আশে পাশে চাষ বাসের কোন ব্যবস্থা নেই। এখানকার লোকেরা আশপাশের গ্রামের চালানি-মালের ওপর জীবিকা নির্বাহ করে। ভেড়া বা ছাগল এখানে খুব সস্তা। একটা সবচেয়ে মোটা চর্বিযুক্ত ওজনে অন্ততঃ দেড় মণ দাম তার এক টাকার বেশী নয়। এক এক জন লোকের এখানে অনেক ভেড়ার পাল আছে, তারা কাছেই খোঁয়াড়ে থাকে। উহা প্রায় এক একর ভূমি বিস্তৃত। তার চার পাশেও পাথরের দেওয়াল। প্রত্যেক খোঁয়াড়ে ন্যূনাধিক পাঁচ'শ ভেড়া বা ছাগল থাকে। এদের শুকনো মল জ্বালানির জন্য দরকার হয়। সেই জ্বালানি মন পিছু এক টঙ্কা বা ছ' আনায় বিক্রি হয়। কুর্মতে আমরা একটা মেণ্ডং-এর ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করি আর আমাদের টাট্টুগুলিকে নিকটস্থ চারণভূমিতে চরতে পাঠাই। ফুরচুঙ্গ তার টাট্টু থেকে নেমে লামার লম্বা লাঠিটা নিয়ে গ্রামের মধ্যে মদ আর মাংস সংগ্রহের জন্য ঢুকল। বিপদ হল। দু'-তিনটে ভীষণাকৃতি ডালকুত্তা তার দিকে তেড়ে এল। ভীষণ ভাবে চীৎকার সুরু করলে। ফুরচুঙ্গ লাঠি দিয়ে তাদের তাড়াবার চেষ্টা করলে যাতে তারা কাছে না ঘেঁষতে পারে। তার দৃঢ়তাব্যঞ্জক চেহারা, উগ্র দৃষ্টি, কোমরে তরবারি, গ্রামবাসীদের শঙ্কিত করে তুললে তারা ঠিক করে নিলে যে ডাকাত না হয়ে যেতে পারে না। গ্রামবাসীরা তার কোন কথা শুনলে না কোন বাড়ীতেই ঢুকতে পেল না। বিষাদ খিন্ন মনে সে আমাদের কাছে ফিরে এল। এর মধ্যে অনেক গ্রামবাসী আর ভিখারীরা আমাদের ঘিরে ফেললে। আমাদের তারা অনেক প্রশ্ন করলে উত্তর পেয়ে সন্তুষ্ট হয়ে তখন আমাদের এক জগ মদ উপহার দিলে পরিমাণ প্রায় এক গ্যালন সঙ্গে বার্লির আটা। যে আমাদের মদ ও বার্লি দিলে তাকে আমি চার আনা পয়সা দিলুম, খুশী হল খুব। নামা আর ফুরচুঙ্গ আকণ্ঠ মদ খেলে সঙ্গীরা সকলেই মদ পেয়ে সন্তুষ্ট। কিন্তু আমার সেই মদ সইল না, আমি ছোট্ট এক কাপ মাত্র পান করি। বাকী যা রইল ভিখারীদের ভাগ করে দেওয়া হল। এর মধ্যে একদল ভারাক্রান্ত চমরু আর গাধা এসে হাজির। পেছনে ঘোড়ায় চড়ে দু'জন লোক আমাদের দিকে এগিয়ে এল। তাদের মুখে শোনা গেল একদল ডাকাত কিয়াও-লাতে এসেছে, তারা তাদের হাত থেকে অস্বাভাবিক ভাবে উদ্ধার পেয়েছে। এখানকার বাসিন্দারা বললে ডাকাতেরা এই কুর্ম গ্রামেরই লোক দু'মাস আগে খাবার সংস্থান করতে না পেরে তারা এই স্থান ত্যাগ করেছে। এই গ্রামের মোড়লেরা আর তাদের আত্মীয়রা তাদের খুঁজে বেড়াচ্ছে।

বিশ্রামের পর আমরা যাত্রার আয়োজন করলুম। আমি আমার রিভলবার ভর্তি করলুম আর লামা তার তরবারি, ভুটানি ছুরি আর পিস্তল নিয়ে যুদ্ধের সাজে তৈরী হল। তিনটার সময় আমরা বালি, নুড়ি পাথর আর ঝোপ-ঝাড়ের ভেতর দিয়ে নামতে লাগলুম। সমতল ভূমিতে নামবার প্রবেশ-পথে মেণ্ডাং রয়েছে সারি দিয়ে। এগুলো পথনির্দেশ করছে শারি মঠের দিকে। শারি মঠ এক বিপদাচ্ছন্ন পাহাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। সমতল ভূমিটা কয়েক মাইল লম্বা আর তিন মাইল চওড়া। তুষার পাহাড়ের সারি তার মধ্যে সাং-রা-লা পর্বতটি মাথা উঁচু করে আমাদের দক্ষিণে উত্তর-পূর্ব কোণে বিস্তৃত রয়েছে। আমরা অধিক রাস্তাও যাইনি এমন সময় ঝড়। প্রবল বৃষ্টি, বিদ্যুৎ আর বজ্রপাত সুরু হল। আমার পোষাক সব ভিজে গেল। কিন্তু আমরা দ্রুত চলে কিয়াগো-লার পাদদেশে পৌঁছলুম। এখানে লুক-রে একটা জায়গায় এক মেষপালকের ঘরে আশ্রয় নিলুম। মেষপালক তখন ভেড়া নিয়ে চরাতে গেছে, তার ফিরে আসবার সময় হয়ে

এসেছে ; বাইরের দিকের জমি বরফে একেবারে সাদা। আমরা সেই চাই চাই গোবরভর্তি ঘরে কম্বল পেতে বসলুম। আমরা ওখানে ভাত রাঁধলুম, মাংস রাঁধলুম। বেশ আরামে খাওয়ার পাট সারলুম। পাঁচটার সময় মেষপালক ফিরে এল। একপাল ভেড়া আর গরু নিয়ে। পাঁচশ'র কম হবে না। আমাদের কুলীরা তাকে বোঝালে যে আমরা বড় বড় লামা আর বণিক—সুতরাং আমাদের এখানে থাকতে দেওয়া হোক। মেষপালক বললে—কাল রাত্রে এখানে একদল ডাকাত এসেছিল—খোঁয়াড়ে ঢুকে বাছাই করে মোটাসোঁটা কতকগুলো ভেড়া নিয়ে চলে যায়। আমরা ডাকাত নই জেনে সে খুব খুসী হল। আমাদের পৌঁছনোর কিছুক্ষণ পরে কয়েক জন তিব্বতীয় ছ'টা গাধা নিয়ে এল। আমাদের ঘরের প্রায় ৪০গজ দূরে কাল নেমদার (চমরুর পশম) তাঁবু খাটালে। তাদের আসাতে আমরা খুসী হলুম—কারণ ডাকাত যদিই আসে তাদের কাছ থেকে তো সাহায্য পাওয়া যাবে।

৪ঠা জুলাই—আজ প্রাতর্ভোজন সেরে ৮টার সময় কুলীদের মাথায় বোঝা চাপালুম। লামা পার্শ্ববর্তী পাহাড়গুলি ও মেণ্ডের অবস্থিতির দিকনির্ণয় করতে লাগল। কয়েকটি ছোট ছোট নদী পেরিয়ে লা'তে উঠলুম। সেখান থেকে ২টার সময় রী (শ্রী) নদীর তীরে। রী নদী স্থির অথচ দ্রুতগামী। আমাদের পথ এখন ফিরলো—লার দিকে। এই সমতল ভূমির পথটা চলতে চলতে আমার মনে হল আমি যেন সিকিমের উপর দিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু এর তেমন সৌন্দর্য ও তৃণরাজির প্রাচুর্য নেই ; যে চূড়াটির তলদেশ দিয়ে আমরা যাচ্ছি তা হিমশীতল ও অনুর্বর। নামতে নামতে আমরা রী নদীর তীরে এলুম। এখানে কতকগুলো মেষের দল ঘোরাফেরা করছে। আমরা এগিয়ে আসতেই দুটো ডালকুত্তা আমাদের দিকে ভীষণভাবে চীৎকার করতে করতে তেড়ে এল। মেষপালক বোধ হয় কাছাকাছি ছিল না। ফুরচুঙ অনবরত পাথর ছুঁড়তে লাগল। তাতে তারা আরও ক্ষেপে তেড়ে আসছিল। লামা তখন পিস্তল নিয়ে একটাকে গুলী করলে—অপরটি তখন তড়িৎ বেগে অদূরে মেষপালকের কুটিরের মধ্যে ছুটে পালাল। সন্ধ্যার আঁধার পার্বতীয় পথে নেমে এল।

ইউ আর ৎসাং প্রদেশের সীমারেখা মধ্যস্থল। ইয়াঙ্গে শহরের এক তৃণাচ্ছন্ন নদীতট। শান্ত পরিবেশের মধ্যে রাত্রিযাপন এখানেই স্থির করা হল। ইয়াগো শহরটি লাসার অন্তর্গত। শতাধিক বাড়ী নিয়ে শহরটি। উত্তর দিকের প্রবেশপথে আটার কল। কলটি চালিত হয় নদী স্রোতে। সমতলভূমিতে তখনও পশুর পাল। বৃষ্টি থেমে গেছে, মেঘ অদৃশ্য হয়েছে—আমাদের মনও প্রফুল্ল—তবুও দূরে ডাকাত লুকিয়ে থাকতে পারে এই আশঙ্কায় আমার অস্বস্তিবোধ হচ্ছিল। ডিম, বার্লির রুটি, মাখন-চা খেয়ে শরীরটাকে বেশ জুতসই করে নেওয়া হল। সবুজ ঘাসের ওপর কম্বল বিছিয়ে শরীরের ক্লান্তি অপনোদন করতে লাগলুম। কিছু দূরে একদল তিব্বতীয় তাঁবু খাটিয়ে বসেছে। তাদের তাঁবু আছে, আমাদের আছে মুক্ত আকাশের চন্দ্রাতপ। সন্ধ্যাটি সুখদায়ক স্নিগ্ধ। আমাদের এক সঙ্গী সংগলিং পা বেশ স্ফূর্তিবাজ ছোকরা নানা রকম হাসি কৌতুক পরিবেশন করে মধুর সন্ধ্যাকে আরও মধুরতর করে তুলল।

৫ই জুলাই—টাট্টু ঘোড়া চড়ে আমরা সকাল সকাল পড়ং উপত্যকার ওপর দিয়ে চললুম। ছোট্ট গ্রাম। মাত্র কয়েকখানি বাড়ী, গ্রামের শেষে ছোট্ট নদী, রী নদীর পোষক। তার ওপর সেতু। সেতুটা পাইন গাছের শাখার। সেতুতে ওঠবার আগেই দু'ধারে ১০ ফুট লম্বা পাথর শোয়ান আছে সেতুতে ওঠবার জন্যে। সেতুর কাছেই দুটো আধুনিক ধরণের মেণ্ডং রয়েছে, যার মাথায় চমরু গাইএর লেজের দুটো দড়িতে ঝোলান নানা রঙের পতাকা। সেগুলো পাহাড়ের চূড়ো পর্যন্ত টানা হয়েছে। দুপুরে প্রবল বাতাস ও বৃষ্টি। আমরা খুব তাড়াতাড়ি রে-সে'র এক গ্রামে ঘোড়া ছুটিয়ে গেলুম! গ্রামটির অবস্থা ক্ষয়িষ্ণু। বর্তমানে তার গুরুত্ব কিছু নেই। গ্রামবাসীর দৈন্য অবস্থা, নদীর বামদিকে নিকটস্থ মন্দির থামার টাগ-মার বা লাল খাড়া পাহাড় ধ্বংসের পথে। রী নদী এখানে দুটি শাখায় বিভক্ত। দুটি শাখার মধ্যে বিস্তৃত তৃণ-শ্যামল ভূমি। অগুন্তি মেষ, ছাগ আর চমরু চরে বেড়াচ্ছে। এই তৃণশ্যামল ভূমির মাঝে আমরা টাট্টু থেকে নেমে কাছাকাছি থাকবার স্থান নির্ণয় করলুম। এখান থেকে নজরে পড়ল এক অদ্ভুত দৃশ্য রী মঠ (শ্রীগিয়াদ পাই গোম্পা)। এ দৃশ্য আমার কাছে নতুন। তিব্বতীয় বিহারের মনোহারিত্ব কি এই আমি প্রথম দেখলুম! আধ ঘণ্টা বিশ্রামের পর আমরা নদী পেরলুম। নদীর প্রস্থ প্রায় ৫০ গজ, গভীরতা ৩।৪ ফুট হবে। রী গোম্পা বা মঠটি উত্তর-পূর্ব দিকে আধ মাইল বিস্তৃত যে পাহাড়টা আছে তারই নিচের ঢালু পথে অবস্থিত। ছবির মতন। প্রাচীন হলেও এখনও এর সৌন্দর্য্য অটুট আছে। সন্ন্যাসী প্রায় তিনশ' জন এখানে বাস করেন—। সকলেই তন্ত্রোপাসক। মহান লামার প্রসিদ্ধি আছে এখানে খুব। অধিবাসীদের বিশ্বাস লামার ক্ষমতা আছে তুষার আর শিলার্ষ্টি পতন রোধ করার। এরই পাশে বৃহৎ শহর টামার। এই শহরে দু'শ ঘর ও কয়েকটি চৈত্য আছে। শহরের উত্তর দিকস্থ রাজপথ দীর্ঘ ও স্বল্পরিসর। দূর থেকে দেখলে এর রূপের সমাবেশ দেখা যায়। ৪টার সময় আমরা নগু-জংলাতে উঠতে লাগলুম। নীচের সমভূমিতে শত শত ভোজনরত গবাদি। কোথাও কিছু নেই হঠাৎ প্রবলধারে তুষারপাত হতে লাগল। আমরা ছুটে চললুম মেষপালকের বাড়ীতে। তার বাড়ীতে দুজন পুরুষ ও তিনজন স্ত্রীলোক রয়েছে। দু'-চার কথা বিনিময়ের পর তারা আমাদের দুধ, মদ আর দই দিলে।

ঘরের মধ্যে একটা চরকার পাশে আমি আশ্রয় নিলুম। মেষপালকের বৌ মুক্তো, গোমেদ আর ফিরোজা মণি কারুকার্য্যমণ্ডিত মস্তকাবরণ পরে রয়েছে।

তুষারপাত থামে না। তখনও দিনের আলো না থাকায় আমরা যাত্রা করলুম। আমাদের পোষাক আর টুপি তুষারে ভর্ত্তি হয়ে গেল। কিন্তু মোটেই ভিজল না। ৬টার সময় গিরিপথের উঁচু স্থানে উঠলুম। কয়েকটি বৃষ্টিধারার ঝর্ণা অতিক্রম করে আমরা একটা বিশ্রাম-স্থান অনুসন্ধান করতে লাগলুম। একটা ভেড়ার খোঁয়াড় দেখা গেল, তাতে কাদা ও জলে ভর্তি। সামনে আর কোন আশ্রয় উপযোগী জায়গা মিললো না। তখন আমরা নদীর মাঝে মাঝে উঁচু চওড়া পাথরের ওপর কম্বল পাতলুম। বৃষ্টি থেমে গেল। আমরাও সেখানে চায়ের যোগাড় করতে লাগলুম। জল ফুটল ১৮৭°তে। এখানের উচ্চতা ১৩,৫০০ ফুট। সারা রাত্রি ধরে অসম্ভব ঠাণ্ডা, কনকনে হাওয়া আর সুতীক্ষ্ণ তুষার। আমি শীতে প্রায় জমাট বেঁধে গেছি। হাত-পাগুলো অসাড় হয়ে গেছে।

৬ই জুলাই—আজকের দিনে না খেয়েই খুব ভোরে চলতে সুরু করলুম। লা থেকে খাড়াই ভাবে নামা—কষ্টকর ব্যাপার, ঘোড়ায় চড়ার প্রয়োজন হল না। বিশাল প্রান্তর পার হতে লাগলুম। নদী থেকে জল উপ্‌চে পড়ছে। নদীর দু'ধারেই ছোট ছোট বার্লিক্ষেত। এত দিন ধরে অনুর্ব্বর জমির ওপর দিয়ে এসে এই আমরা প্রথম তৃণশ্যামল প্রান্তরের মধ্য দিয়ে যেতে লাগলুম। এখানে প্রত্যেক গ্রামই তৃণলতা-বৃক্ষরাজি শোভিত। যে দেশ দিয়ে যাচ্ছি, সেখানকার জমিগুলি সবই উর্বর, জলসিঞ্চিত আর জলবাওয়া বেশ সুখাবহ। উজ্জ্বল, নির্মল নদীগুলি, তৃণাচ্ছন্ন ফলফুলে সমাচ্ছন্ন তার তীরগুলি, জং-রিং-খাঙ্ক পরিবেশের কথা মনে করিয়ে দিলে। লু গুরি জং ও বাযডেন-লিং-এর গ্রামগুলি আমরা অতিক্রম করলুম। লুগুরি জং-এর একজন অতিথিপরায়ণা মহিলা নবম্রে পুটি আমাদের সুস্বাদু চা, মদ ও বার্লির রুটি দিয়ে অভ্যর্থনা করলে। আমরা অনেক চমরু গাই ও খচ্চরের দল দেখতে পেলুম। টার-গে-চু বা কুথা-চুর নদীর ধারে লা-জং গ্রাম। এই নদীর স্রোতে এখানকার আটার কল চলতে দেখলুম। এখানে আমরা অপর যাত্রীদের সঙ্গে রাত্রিবাস করলুম।

৭ই জুলাই—নির্মল আকাশ, উষাকাল। অশ্বারোহণে আমরা ক'জনে বার্লির ক্ষেতের পর ক্ষেত অতিক্রম করছি। কয়েক জন লামা আর জিলঙের (সাধু) সঙ্গে দেখা। তারা ছুটিতে বাড়ী যাচ্ছে দামী পোষাক পরে। তাদের মধ্যে অনেকেই ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছিল। আমাদের সম্বন্ধে পাছে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করে, সেই ভয়ে আমরা তাদের এড়িয়ে চলেছি। ৭টার সময় গিয়া-লা শৈলের প্রান্তে উপস্থিত হলুম, সেখান থেকে দূরে প্রান্তরের শেষ সীমায় তাসি-লাম্পো'র দৃশ্য দেখা গেল। মধ্য তিব্বতের মনোহর দৃশ্য এখান থেকে ভাল ভাবে দেখা যায়। পশ্চিম নার থং বিহারের শ্বেত প্রাচীর ঘন নীলকায় শৈলের মাঝে কি অপূর্ব দেখায় তা বর্ণনা করা যায় না! নীচে রূপালি প্রবহমানা পেনাং-নিয়াংচু নদী। সম্মুখে দূরে উত্তর হিমালয়ের হিমাবৃত শৈলশিখর। শৈলপথের বক্রাংশ অতিক্রম করে আমরা সমতল ভূমিতে নামলুম। ঐ—ঐ সামনে তাসি-লাম্পোর প্রধান বিহার। ৎসাং মহাগুরু ৎসাং পাঞ্চেন রিংপো-চে আবাস স্থল। তাসি-লাম্পোর (মঙ্গলকূট বা গৌরববাহী শৈল) মনোহর দৃশ্যের কি সুপরিবেশ! দূর থেকে চৈত্যগুলির কনকোজ্জ্বল ছাদগুলি হিমাদ্রির বুকে আলো ঝলমল করছে। আমরা চলেছি—এগিয়ে চলেছি—তাসি লাম্পোর নিকটতম গ্রাম ডেলেতে। তিন শতাধিক আবাসে অধ্যুষিত গ্রাম—ডেলে। অধিবাসীরা বিত্তশালী। ইয়াং চান পুতি নামে এক মহিলার বাড়ীতে অভ্যর্থিত হলুম। সুস্বাদু মদ ও বার্লি পরিবেশিত হল। মহিলাটির স্বামী বেশ আমুদে লোক। যাত্রার সময় এক কাপ করে চা খেয়ে সনম্র প্রত্যাভিবাদন করলুম। পথের মাঝে বহু লামা আর বণিকদের যাতায়াতের দৃশ্য। সুন্দর সুন্দর টাটুতে চড়ে যাচ্ছে। অনেক চমরু ও সুদৃশ্য খচ্চর। দ্রুত অশ্বচালনা করে আমরা স্বর্ণ মঠের দ্বারে পৌঁছলুম। দ্বারের নিকট শহরে সরবরাহের প্রয়োজনে শত শত চমরু দণ্ডায়মান। চৈত্য আর বিহারকে ঘিরে রয়েছে অসংখ্য লামা। জেলাং, নানা শ্রেণীর নরনারীর সীমাহীন শোভাযাত্রা। এত দিনে বহু সর্পিল বিপদসঙ্কুল পথের বুঝি শেষ হল। বহু আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য ভূমির প্রথম স্পর্শ ঘটল আমার জীবনে, জীবন-প্রবাহের যাত্রাপথে কত গিরিমালা, কত তুষারনদী, কত ঝর্ণা, কত তৃণহীন প্রান্তর, কত দুর্গম হিম-শৈলপথ। কত ঝড়, ঝঞ্ঝা, কত তুষারপাতের সমারোহ। আবার কোথাও নদীর উভয় তীরে হরিৎ শ্যামল তরুবীথি সমন্বিত কুটীরঘন পল্লী। গোচারণ প্রান্তর, নিবিড় শস্যক্ষেতের স্নিগ্ধ দৃষ্টির সামনে দাঁড়িয়ে আছে মন্ত্রমুখর দীপারাত্রিক সজ্জিত বৌদ্ধবিহার, চৈত্য।

অনুবাদক—শ্রীশৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ

সমাপ্ত

স্মৃতি-ফুল

রমা বন্দ্যোপাধ্যায়

আজ স্মৃতি-ফুলে যবে মালা গাঁথি
আপনার মনে মনে,
ভাবি একটি ফুল কি কভু আর
পাঠাতে পারিব গো দুয়ারে তার
মধুর গন্ধ সনে?

সে যে কভু আপনার হৃদয়েতে
দেখে নাই মোর ছায়া,
ভাবি তবু কি গো মুহূর্তের লাগি
হৃদয়-আকাশে উঠিবে না জাগি
সজল মেঘের মায়া?

গতবারে কলকাতা মাঠের ফুটবল লীগের খেলা সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছিলাম। সেই আলোচনার জের টেনে এবারের সেরা খেলোয়াড় চুনী গোস্বামী সম্পর্কে দু' একটা কথা না বললে লীগের আলোচনা অসমাপ্ত রয়ে যাবে।

চুনী গোস্বামী কলকাতার খ্যাতনামা মোহনবাগান ক্লাবের নির্ভরযোগ্য লেফ্‌ট্‌ ইন। অতীত দিনের দিকপাল খেলোয়াড়দের বিচারে চুনী গোস্বামী এ বছরের সেরা খেলোয়াড়ের সম্মান অর্জন করেছেন। চুনী গোস্বামীর এ সম্মানে সকলেই আনন্দিত।

চুনী গোস্বামীর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন রেল দলের খ্যাতনামা রাইট আউট প্রদীপ ব্যানার্জি। প্রদীপ ব্যানার্জি সুদক্ষ খেলোয়াড় সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই; কিন্তু মাঠের মাঝে তাঁর সময় সময় অখেলোয়াড়চিত মনোভাব এ সম্মানলাভের প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

খেলোয়াড় নির্বাচন কেবলমাত্র খেলার নিপুণতা ও দক্ষতার মাধ্যমে বিচার করা হয় না। এর সংগে আচার-ব্যবহার, নম্রতা, শিষ্টাচার, ভদ্রতা প্রভৃতিকে অপরিহার্য্য গুণাবলী বলে ধরা হয়।

* * * *

প্রথম ডিভিশন লীগ চ্যাম্পিয়ান রেলওয়ে স্পোর্টস ক্লাব এবার আন্তঃ রেল ফুটবল প্রতিযোগিতায় বিজয়ীর জয়মাল্য লাভ করেছে।

এবারকার প্রতিযোগিতায় ২-০ গোলে সাউথ ইষ্টার্ণ রেল দলকে পরাজিত করেছে।

গত ১০ বৎসর ধরে এ প্রতিযোগিতা হচ্ছে। রেলওয়ে স্পোর্টস ক্লাবের এ সম্মান নতুন নয়। আন্তঃ রেল ফুটবল প্রতিযোগিতাকে কেন্দ্র করে খড়গপুরে প্রতি বছরই বেশ উৎসাহ উদ্দীপনা জেগে ওঠে। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। খেলা দেখার জন্য হাজার হাজার দর্শক এসেছে। সবচেয়ে বড় কথা এখানকার দর্শকদের খেলা দেখার জন্য কোনরূপ কষ্ট পেতে হয়নি। এখানে আঠার হাজার দর্শকের খেলা দেখার জন্য সুন্দর একটি ষ্টেডিয়াম আছে। এই ষ্টেডিয়ামটির সংক্ষিপ্ত নাম ইংরাজীর পাঁচটি অক্ষর সম্বলিত। এস, ই, আর, এ, এ, ষ্টেডিয়াম। অর্থাৎ কিনা সাউথ ইষ্টার্ণ রেলওয়ে এ্যাথলেটিক এসোসিয়েশন ষ্টেডিয়াম। তবে ফাইনালের দিন স্থান সঙ্কুলান সম্ভব হয়নি। আকাশ বাণী ক'লকাতা কেন্দ্রের কর্তৃপক্ষরা এই খেলার ধারা বিবরণীর আয়োজন করে ক্রীড়ামোদিদের কৃতজ্ঞ করেছেন।

* * * *

ক'লকাতা মাঠে আই, এফ, এ শীল্ডের খেলা সুরু হয়ে গেছে বেশ কয়েকদিন। বহিরাগত ও ক'লকাতার দলগুলির মধ্যে এবার কোন দল শীল্ড বিজয় করে দেখা যাক। খেলার এই অবস্থায় আলোচনা করা যুক্তি সঙ্গত হবে না। তাই এই প্রসঙ্গে আই, এফ, এ শীল্ডের ইতিহাস অপ্রাসঙ্গিক হবে না। আগামীবারে আই, এফ, এ শীল্ডের খেলার পর্য্যালোচনা ক'রব।

ভারতের ফুটবল প্রতিযোগিতার মধ্যে আই, এফ, এ শীল্ড অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফুটবল প্রতিযোগিতা। ভারতের ফুটবল ইতিহাসে আই, এফ, এ শীল্ড অনেকখানি স্থান দখল করে আছে। ১৮৯৩ সালে আই, এফ, এ শীল্ডের খেলা সুরু হয়। ভারতের সকল প্রান্তে ও ভারতের বাহিরে বিভিন্ন শক্তিশালী দল প্রতি বছর এতে যোগদান করে।

১৮৯২ খৃষ্টাব্দের শেষের দিকে ডালহৌসী ক্লাবের সম্পাদক এ, আর, ব্রডিন ও ডালহৌসী ক্লাবের দক্ষ খেলোয়াড় বি, আর, সি, লিণ্ডসে, ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাবের ওয়াটসন এবং শোভাবাজার ক্লাবের এন, সর্ব্বাধিকারী এক সভায় ঠিক করেন 'ট্রেডস কাপ' অপেক্ষা বড় একটা ফুটবল প্রতিযোগিতার সুরু করবেন। যাতে স্থানীয় দলগুলি ছাড়াও ভারতের যে কোন শক্তিশালী দল এ প্রতিযোগিতায় যোগদান করতে পারে। তাঁরা মনে করলেন এতে খেলাধুলার উন্নতি হবে। এর জন্য আর্থিক সাহায্য করলেন কুচবিহার ও পাতিয়ালার মহারাজা, স্যার এ, এ, আপকার এবং ডালহৌসী ক্লাবের জনৈক সভ্য।

জে, সুদারল্যাণ্ড নামে একজন উৎসাহী ভদ্রলোক মেসার্স এলকিংটন এণ্ড কোম্পানীর কাছ থেকে তাদের কলকাতার প্রতিনিধি মেসার্স ওয়ালটার লক্‌ এ্যাণ্ড কোম্পানীর সংগে যোগাযোগ করে আই, এফ, এ শীল্ড তৈরী করেন।

আই, এফ, এ শীল্ড খেলার প্রথম বছরে এ খেলাকে দুই ভাগে ভাগ করে পরিচালনা করা হয়। একটি কলকাতায় এবং অপরটি লক্ষ্ণৌতে খেলা হয়? মোট ১৩টি দল এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে। কলকাতায় ফিফথ ওয়েষ্টার্ণ ডিভিসনের আর, এ, এবং লক্ষ্ণৌতে রয়েল আইরিশ রেজিমেণ্ট জয়লাভ করে কলকাতায় ডালহৌসী মাঠে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। রয়েল আইরিশ রেজিমেণ্ট দল ১৮৯৩ সালে সর্ব্বপ্রথম আই, এফ, এ শীল্ড লাভ করে। প্রথম বছরের প্রতিযোগিতায় একমাত্র ভারতীয় দল হিসাবে শোভাবাজার ক্লাব যোগদান করে।

* * * *

বিপদ সঙ্কুল ভয়াবহ ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রমের প্রতিযোগিতায় এবারও ডেনমার্কের সাঁতারপটীয়সী শ্রীমতী গ্রেটা এণ্ডারসন উপর্য্যুপরি দুইবার ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রমের প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করলেন। গতবার গ্রেটা এণ্ডারসনের ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করতে সময় লেগেছিল ১৩ ঘণ্টা ৫ মিনিট আর এবারে ১১ ঘণ্টায় তিনি এ পথ অতিক্রম করেন। মাত্র ১০ মিনিটের জন্য গ্রেটা এণ্ডারসন বিশ্ব রেকর্ডকে ম্লান করতে পারেন নি। ১৯৫০ সালে মিশরের হাসান আব্দুল রহিম ১০ ঘণ্টা ৫০ মিনিটে অতিক্রম করে বিশ্ব রেকর্ড করেন।

এবার দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছেন পূর্ব্ব বাংলার তরুণ সাঁতারু শ্রীব্রজেন দাস। ব্রজেন দাস প্রথম প্রচেষ্টাতেই ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করলেন। তাঁর এ পথ অতিক্রম করতে সময় লেগেছে ১৪ ঘণ্টা ৫৭ মিনিট। তাঁর এ সম্মানের জন্য পাকিস্থান খেলাধুলার আসরে আরও খানিকটা উচ্চে স্থান পেল। পূর্ব্ব এশিয়ার মধ্যে ব্রজেন দাসই একমাত্রই সাঁতারু যিনি ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করলেন।

পূজার প্রাকালে

শারদীয়া সংখ্যার আসন্ন প্রকাশের এই প্রাক-অবস্থায় লেখক-লেখিকা, শিল্পী মাত্রেই যে অত্যন্ত ব্যস্ত শুধু নয় ব্যতিব্যস্ত হয়ে আছেন—আমরা সকলেই তা অনুমান করছি। কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল, অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গ ও অন্যান্য বঙ্গভাষাভাষী স্থানে বাঙলা ভাষায় প্রকাশিত শারদীয়া বিশেষ সংখ্যা যত আত্মপ্রকাশ করবে—তাদের পাশাপাশি রাখলে কলকাতার মধ্যবিন্দু থেকে অনেক দূরের দিল্লীর দরবার পর্য্যন্ত একটি লাইন হয়তো রচনা করা যায়। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রাদেশিক সাময়িক পত্রসমূহ এক করলেও দেখা যাবে, বাঙলা দেশ পরিসংখ্যায় অনেক এগিয়ে আছে—বাঙলা পত্র-পত্রিকার সংখ্যা প্রায় সংখ্যাতীত। সম্প্রতি আনন্দবাজার পত্রিকা ভবনে ও দেশ সম্পাদক অশোককুমার সরকারের আমন্ত্রণে সাময়িক-পত্র-সম্পাদক সম্মেলনে জানতে পারা যায়—বাঙ্গলা ভাষায় আনুমানিক চার শত পত্র-পত্রিকা আছে। এই চারশো কাগজের জন্য যত লেখক-লেখিকার প্রয়োজন হয় বাঙ্গলা ভাষায় সেই অনুপাতে সাহিত্যসেবীদের সংখ্যা অনেক কম। অবশ্য মনে রাখতে হবে, অধিকাংশ সাময়িক পত্রের (বাঙলা দেশে) লেখকদের আমরা সাংবাদিক আখ্যা দিতে পারি। কিন্তু শারদীয়া সংখ্যার খোরাক সংবাদ নয়—সাহিত্য। এবং কেবল মাত্র নামে সাহিত্য নয়, অরিজিনাল সাহিত্য। গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, উপন্যাস ইত্যাদি—।

পূর্ব্বেই বলা হয়েছে, কাগজের অনুপাতে বাঙালী সাহিত্যিকের সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য। পৃথিবীতে এমন বহু দেশ আছে যেখানে মেয়ে অপেক্ষা পুরুষের সংখ্যা কম। মেয়ের অভাব নেই। রাশিয়াতেও শোনা যায় এই পুরুষের অভাবে রুশ মেয়েরা না কি অনেক অসুবিধায় কালাতিপাত করে। নাচের আসরে নর্ত্তকী সঙ্গী খুঁজে পায় না। বাঙালী লেখকদের অবস্থা রুশ মেয়েদের মত—কা'কে যে কখন সামলাবেন তার ঠিক নেই কিছু। ভয় নেই, মা আসছেন। জগজ্জননীর শুভাগমনে খোকা-খুকুদের নতুন পোষাকের মত পত্রপত্রিকা এক এক বিশেষ সাজসজ্জায় 'স্পেশাল ইস্যু' হয়ে বাজারে বেরোবেন। এক হাতে রঙিন ফানুস, অন্য হাতে কেষ্টনগরের পুতুল।

হলফ করে বলতে পারি, একখানি শারদীয়া সংখ্যা দেখলে পাঁজি ব'লে ভুল হবে। তারপর হাতে তুলে প্রচ্ছদ বা 'কভার' দেখলে চোখে শিব আর দুর্গাকে একত্রে দেখতে পাওয়ার মত একটা বেশ পাওয়ারফুল শকে চোখে ধাঁধা লাগবে। শিব-দুর্গা নয়, টলিউডের নায়ক-নায়িকা। আবার মজা এমন যে, মাত্র ক'খানি পত্রিকা ব্যতীত আর কেউ ছাপাতে পারবে না এমন ছবি। কারও রুচিতে বাধবে। কেউ জোগাড় করতে পারবে না—শিব-দুর্গার কাছে যেতে সাহসী হবে না। সেখানে দেখিয়ে বিশ হাজার, লুকিয়ে সত্তর হাজার।

যাই হোক, বাঙলা কালচার আর ট্রাডিসন বজায় না রাখলে বাঙালীর সামাজিক মর্য্যাদার হানি হবে। আর এই জন্য এত অজস্র স্পেশাল ইস্যুর জন্য লেখক-লেখিকাদেরও ছুটতে হচ্ছে এক্সপ্রেস নয়, তুফান 'মেইলে'র মত। সম্পাদক তো দূরের কথা, লেখক-লেখিকাও স্থির করতে পারছেন না কা'কে বলে গল্প? কা'কে বলে বড় গল্প? কা'কে বলে উপন্যাস? কারেই বা গত্ত আর কারেই বা পত্ত বলে?

পাইকা টাইপে ফাঁপিয়ে ফুঁপিয়ে মার্জিন রক্ষা ক'রে বড় গল্পকে উপন্যাসের নামে চালানোর বাজার এসেছে বাঙলা সাহিত্যে। পূজার বাজারে, সাধু পাঠক-পাঠিকা সাবধান হবেন, আমরা জানি।

উল্লেখযোগ্য সাম্প্রতিক বই

পৌরাণিক অভিধান

সাহিত্যসেবীদের নামের তালিকায় শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকারের নাম বিশেষ ভাবে রক্ষিত হয়ে থাকবে। এই দরদী পুরুষ নিজের জীবনের একটি বিরাট অংশ অতিবাহিত করেছেন সাহিত্যসেবায়। প্রকাশকদের মধ্যেও ইনি একজন অগ্রগণ্য, এঁর প্রতিষ্ঠান থেকে বহু সুপাঠ্য এবং জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়ে বাঙলা সাহিত্যকে পুষ্ট করেছে। পত্রিকা-সম্পাদকরূপেও এঁর অবদান কম নয়, এঁর সম্পাদিত 'মৌচাক' আজ সুদীর্ঘকাল ধরে বিজয়পতাকা বহন করে চলেছে। তাঁরই প্রতিষ্ঠান থেকে বহু বিখ্যাত অভিধান প্রকাশলাভ করেছে। বর্ত্তমানে উপরোক্ত অভিধানটি প্রকাশ করে সুধীর বাবু জনানির্ব্বিশেষে কৃতজ্ঞতা লাভ করবেন। আমাদের জীবনধারা পুরাণের প্রভাবে ভরপুর, ভারতবর্ষের সেই সব অতীত অবলুপ্ত স্বর্ণযুগের আদর্শই আমাদের দেশে মানুষ গঠনের প্রধান অবলম্বন। আমাদের চিন্তাধারার পুষ্টিতে পুরাণের দান অনস্বীকার্য। শুধু তাই নয়, আমাদের দেশের অন্দরমহলেও এর অবাধ গতিবিধি অর্থাৎ শুধু শিক্ষিত সম্প্রদায় কেন, সাধারণ গ্রাম্য সম্প্রদায়ের অবগুণ্ঠনবতী মহিলাদের কাছেও পুরাণের প্রভাব চিরকাল ধরেই অনতিক্রম্য। সুতরাং এই একটি প্রামাণিক অভিধান যে ঘরে ঘরে আদৃত হবে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহই থাকতে পারে না। বহু পরিশ্রম, নিষ্ঠা ব্যয় করে যে অভিধানটি সুধীর বাবু সুসম্পাদিত করলেন এতে আমাদের বহুদিনের একটি অভাব তিনি মোচন করলেন। এ জন্যে তিনি বারবার ধন্যবাদার্হ। প্রকাশক—এম, সি সরকার য়্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ, ১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জী ষ্ট্রীট। দাম—সাত টাকা মাত্র।

বীরেশ্বর বিবেকানন্দ

আলোর দেশ ভারতবর্ষ। ভারতের প্রতিটি ধূলিকণা যুগ যুগ ধরে ধন্য হয়েছে যুগত্রাতাদের পূতপবিত্র প্রজ্ঞার আলোয়। সেই আলো ভারতবর্ষের মনকে করেছে পুষ্ট, জীবনকে দেখিয়েছে পথ, আত্মাকে করেছে সত্যের আলোয় উদ্ভাসিত। যে কালজয়ী পুরুষদের কল্যাণে এগুলি সম্ভবপর হয়েছে, বীরশ্রেষ্ঠ বিবেকানন্দ তাঁদের অন্যতম। স্বামিজীর একটি বহুল তথ্যপূর্ণ জীবনকাহিনী রচনা করেছেন প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। এ জাতীয় জীবনী-সাহিত্য রচনায় অচিন্ত্যকুমার সিদ্ধহস্ত। বীরেশ্বর বিবেকানন্দের মধ্যে অচিন্ত্যকুমারের সুনিপুণ বর্ণনাভঙ্গী এক মধুর পরিবেশের সৃষ্টি করেছে। এই সারগর্ভ গ্রন্থটির বহুল প্রচারই আমাদের কাম্য। প্রকাশক—এম, সি, সরকার য্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ, ১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জী ষ্ট্রীট। দাম—পাঁচ টাকা মাত্র।

হে যুদ্ধ—বিদায়

বিশ্ব-সাহিত্যের দরবারে আর্নেষ্ট হেমিংওয়ে আজ একটি অটল আসনের অধিকারী। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের সাহিত্য-জগৎ থেকে তিনি আজ লাভ করেছেন সবিশেষ শ্রদ্ধা। তাঁরই লেখনী থেকে জন্ম নিয়েছে "ফেয়ারওয়েল টু আর্মস"—তারই বঙ্গানুবাদ বহন করছে উপরি উল্লিখিত গ্রন্থটি। যুদ্ধের পটভূমিকায় বাঙালী সাহিত্যিকেরা যে পরিমাণ সাহিত্য-সৃষ্টি করেছেন, বলতে বাধা নেই বিদেশের সাহিত্যিকেরা তাঁদের থেকে অনেক বেশী এমন সব গ্রন্থ রচনা করেছেন যার পটভূমিকা যুদ্ধ। যুদ্ধের প্রভাব মানুষের মনে, তার সমাজে, তার জীবনে কতখানি ছায়াপাত করতে পারে ও তার পরিণতিই বা কি হয়, এই প্রশ্নগুলিই এই সকল গ্রন্থে আলোচিত হচ্ছে বিভিন্ন চরিত্রগুলির সাহায্যে। যুদ্ধের পর মানুষ ফিরে আসে আবার তার পূর্বজীবনে, তখন সে চায় শান্তির নীড়, সে নীড় গড়ে ওঠে প্রেমে, কিন্তু তাসের ঘরের মতই তা হয় ক্ষণস্থায়ী। উপরোক্ত গ্রন্থে এই বক্তব্যই প্রধান উপজীব্য। অনুবাদ করেছেন শ্রীমতী দীপালি মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক—পার্ল পাবলিকেশান্স প্রাইভেট লিঃ। এই প্রকাশকগোষ্ঠীর দ্বারা প্রকাশিত আরও বহু সুপাঠ্য গ্রন্থ আমাদের দপ্তরে এসেছে, যথাসময়ে সেগুলির সমালোচনা প্রকাশ করা হবে। ১৯, ওয়াটার্লু ম্যানসন (ত্রিতল), গান্ধী রোড, বোম্বাই-১। দাম—এক টাকা মাত্র।

চন্দ্রমল্লিকা

প্রধানতঃ অনুবাদের ক্ষেত্রে দেখা গেলেও মৌলিক রচনার দরবারে, ভবানী মুখোপাধ্যায় অনুপস্থিত নন। অনুবাদ রচনার ক্ষেত্রেই তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভা কেবলমাত্র সীমাবদ্ধ নয়, মৌলিক রচনার ক্ষেত্রেও তাঁর লেখনী উর্বর, উপরোক্ত গ্রন্থটি কয়েকটি ছোট গল্পের সমষ্টি। প্রত্যেকটি গল্প স্বকীয়তায় ভরপুর। গল্পগুলি স্ব স্ব তাৎপর্যের জন্য বৈশিষ্ট্যের দাবী রাখে। ভবানী মুখোপাধ্যায়ের যুগোপযোগী দৃষ্টিভঙ্গী প্রশংসনীয়। চরিত্রগুলির যথাযথ চিত্রণের মধ্যে তাঁর দরদ ও অনুভূতির প্রকৃষ্ট পরিচয় ধরা পড়ে। গ্রন্থের প্রচ্ছদপট এঁকেছেন প্রখ্যাত শিল্পী মাখন দত্তগুপ্ত। প্রকাশক এম, সি, সরকার য্যাণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, ১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট। দাম—আড়াই টাকা মাত্র।

কারামাজভ কাহিনী

রাশিয়ার গৌরব বিশ্বের দরবারে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যাঁরা বাড়িয়ে গেছেন, স্মরণীয় সাহিত্যিক থিওডোর ডষ্টয়েভস্কির নাম তাঁদের মধ্যে বিশেষ ভাবে প্রণিধানযোগ্য। ডষ্টয়েভস্কির সাহিত্য সৃষ্টি বিশ্বের এক গর্বের বস্তু। রাশিয়ার এক বর্ধিষ্ণু পরিবারের কাহিনী এই গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। একটি মেয়েকে ঘিরে পিতা ও পুত্রের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতাই এ গ্রন্থের প্রধান উপজীব্য। পিতার তিনটি পুত্র তিন বিভিন্ন ধরণের চরিত্রের অধিকারী। আজকের দিনে সোভিয়েট রাশিয়ার যে চিত্র বিশ্ববাসীর সামনে ধরা পড়ে, একশ' বছর আগের জারেদের আমলের তার যে চিত্র পাওয়া যায়, সেই চিত্রই সাহিত্যের আকারে রূপ নিয়েছে এই গ্রন্থে। সুবোদ্ধা পাঠক সহজেই অনুমান করতে পারবেন যে, সেদিনের রাশিয়া ও এদিনের রাশিয়ায় কতখানি আকাশ-পাতাল ব্যবধান! অনুবাদ করেছেন নির্ম্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। প্রকাশক, নতুন প্রকাশক ১৩।১ বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট। দাম—ছ' টাকা আট আনা মাত্র।

ত্রিপুরা সম্পর্কীয় দু'খানি গ্রন্থ

বাঙলার মানচিত্রে কিছুটা অঞ্চল জুড়ে আছে ত্রিপুরা। আজ নয়, বহু কাল থেকে। বহু যুগের সাহিত্যিকদের লেখনীও স্বীকৃতি দিয়েছে এই স্থানটিকে। রবীন্দ্রনাথ-প্রমুখ বহুজনের কাহিনীর পটভূমিকায় সম্মান পেয়েছে ত্রিপুরা। ত্রিপুরার সঙ্গে আমাদের সাংস্কৃতিক যোগাযোগ অবিচ্ছেদ্য। জাতীয়তাবোধের যে পরিচয় ত্রিপুরার রাজপরিবারে পাওয়া গেছে তাও অবিস্মরণীয়। বর্তমানে ত্রিপুরা সম্বন্ধে দু'টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। প্রথমটি মোহিত পুরকায়স্থের লেখা ত্রিপুরার বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য ও দ্বিতীয়টি কৃষ্ণপদ দত্তের ত্রিপুরার ইতিকথা। গ্রন্থদ্বয়ে ত্রিপুরার সম্বন্ধে বহু তথ্যপূর্ণ কাহিনী পরিবেশন করা হয়েছে। সাহিত্যের ক্ষেত্রে এবং ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে ত্রিপুরার অবদান আলোচনার ক্ষেত্রে লেখকদ্বয় প্রভূত পরিশ্রমের স্বাক্ষর রেখে গেছেন এবং প্রশংসনীয় রচনানৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন। গ্রন্থ দুটির আমরা বহুল প্রচার কামনা করি। প্রথমটির প্রকাশক ফার্মা কে, এল, মুখোপাধ্যায় ৬।১এ বাঞ্ছারাম অক্রুর লেন। দাম পাঁচ টাকা মাত্র এবং দ্বিতীয়টির প্রকাশক ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানী, ৯ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট। দাম—দু টাকা মাত্র।

মধুরে মধুর

বাঙলা দেশের সাহিত্যক্ষেত্রে যে ক'জন শক্তিময়ী লেখিকার আসন অটল তাঁদেরই সংখ্যা বৃদ্ধি করলেন সুলেখিকা মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য্য। উপন্যাস ও ছোট গল্প রচনায় ইনি প্রভূত দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। এঁর রচনা সু-সাহিত্য সৃষ্টির জন্যে প্রশংসার দাবী রাখতে পারে। এঁর উপরোক্ত গ্রন্থটির প্রধান উপজীব্য প্রেম। নৃত্যশিল্পীদের কেন্দ্র করে তার বিকাশ, গতি ও প্রসার। মহাশ্বেতার লেখনী চিত্রধর্মী। লেখার মধ্যে দিয়ে ছবি আঁকতে তিনি সুনিপুণা। প্রেম-ধর্মের একটা পরম মধুর চিত্র এই উপন্যাসের মধ্যে তিনি এঁকে রেখেছেন। এই বিরাট ধর্মের প্রতিটি খুঁটিনাটি প্রাঞ্জল বর্ণনায় পরম রমণীয় করে তুলেছেন। উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীরাও পাঠক-চিত্তে রীতিমত প্রভাব বিস্তার করে। প্রতিটি চরিত্র সৃষ্টিতে মহাশ্বেতার কুশলতার ছাপ পাওয়া যায়। —প্রকাশক এ, মুখার্জী য্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ, ২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট। দাম পাঁচ টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা মাত্র।

দামের তুলনায় সেরা

কাজেও অতুলনীয়
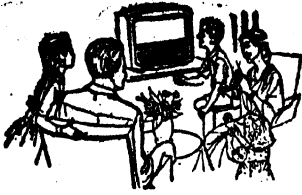
ন্যাশনাল-একোর দুটি চমৎকার মডেল।

রেডিও শোনার আনন্দ উপভোগ করার জন্যে দুটি চমৎকার ন্যাশনাল-একো মডেল—দামের তুলনায় সেরা, কাজের দিক থেকেও অপূর্ব! এগুলো 'মনসুনাইজ্‌ড', আর প্রত্যেকটিতে এক বছরের গ্যারান্টি আছে। আপনার সবচেয়ে কাছাকাছি ন্যাশনাল-একো ডীলারের কাছে গেলেই বাজিয়ে শোনাবে।

মডেল ৭১৭ : বর্ডার দেওয়া মেরুন রঙের প্ল্যাস্টিক কেবিনেট। মডেল ইউ ৭১৭—৫ ভাল্‌ব, ৩ ব্যাণ্ড ২৩০ ভল্টের জন্য, এসি/ডিসি। মডেল বি-৭১৭ : ৫ ভাল্‌ব, ৩ ব্যাণ্ড ড্রাই ব্যাটারীতে চলে।

দাম ২৫০৲ টাকা

নেট দাম দেওয়া হ'ল। এর ওপর স্থানীয় কর

মডেল ১৮৭ : ৬ ভাল্‌ব, ৮ ব্যাণ্ড, সুন্দর কাঠের কেবিনেট। মডেল এ-১৮৭ এসিতে চলে। মডেল ইউ-১৮৭ এসি বা ডিসির জন্যে। দাম ৪১৫৲ টাকা

ন্যাশনাল-একো রেডিওই সেরা—এগুলো

জেনারেল রেডিও এণ্ড অ্যাপ্লায়েন্সেস প্রাইভেট লিমিটেড

৩ ম্যাডান স্ট্রীট, কলিকাতা ১৩ • অপেরা হাউস, বোম্বাই ৪ • ১/১৮ মাউণ্ট রোড, মাদ্রাজ • ৩৬/৭৯ সিলভার জুবিলী পার্ক রোড, বাঙ্গালোর • যোগধিয়ান কলোনী, চাঁদনী চক, দিল্লী • ফ্রেজার রোড, পাটনা।

GRA. 6398.

দেশীয় শিল্প,—রঞ্জিত ও চিত্রিত বস্ত্র

অতীতের বিস্মৃতি গহ্বরে লুক্কায়িত মণি মাণিক্য হারাইয়া গিয়াছে। বিদেশীর হাতে সর্ব্বস্ব ধন সমর্পিত হইয়াছে। এখন প্রত্যাহার না করিলে উপায়ান্তর নাই।

সেই এক দিন, যখন বিলাতবাসী ভারতের চিত্রিত বস্ত্রের জন্য লালায়িত হইত, একখানি চিত্রিত বস্ত্র পাইলে তাহা কত সমাদরের সহিত পরিধান করিয়া আপনাকে ধন্য মনে করিত। আর এই একদিন যখন বিলাতি রঞ্জিত ও চিত্রিত বস্ত্রে ভারতবাসী আপনাকে সুশোভিত করিতেছে। তখন বিলাতে ছিট দেখা যাইত না, এখন বিলাতের বাজার ছাপাইয়া বিলাতি ছিট ভারতের হাট-বাজার ভাসাইয়া দিতেছে।

বহুকালাবধি ভারতে যে রঞ্জিত বস্ত্রের ব্যবহার প্রচলিত থাকিবে, তাহা বড় বিচিত্র নহে। কেন না, প্রায় প্রত্যেক জাতিকেই কোন না কোন বর্ণে তাহাদের পরিধেয় ও গাত্র রঞ্জিত করিতে দেখা যায়। উদ্ভিদ্-জগতে অনেক গাছ আছে, যাহাদের পত্র মূল কিম্বা পুষ্প দ্বারা সহজেই বস্ত্রাদি রঞ্জিত করিতে পারা যায়।১ ভারতে অসংখ্য প্রকার গাছ আছে, যাহা হইতে রঙ্গ পাওয়া যায়। এ অবস্থায় প্রাচীন ভারতবাসিগণ যে কাপড় রঙ্গ করিতে শিখিবেন, তাহা কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

আর যে ভারত, পৃথিবীর সকল জাতিকে বস্ত্র বয়ন করিবার প্রাণালী শিখাইয়াছে, সেই তন্তুবায় গুরুর কাপড় রঙ করা আদৌ বিচিত্র নহে। "টানা পোড়েন" দিয়া বস্ত্র বয়ন প্রণালী ঋগ্বেদে উল্লেখ আছে। ইহার অর্থ এই যে, যখন পৃথিবীর কোন জাতিই সভ্যতাব্যঞ্জক বস্ত্র পরিধান করিতে জানিত না, যখন সকল জাতিই উলঙ্গ অবস্থায় থাকিত কিম্বা শীত নিবারণার্থে সহজলভ্য পশুচর্ম্মে বা বল্কলে গাত্র আবৃত রাখিত, সে সময়েরও অনেক পূর্ব্বে ভারতবাসী আর্য্যগণ সুন্দর সুন্দর বস্ত্র বয়ন করিতেন। যজুর্বেদে নাকি সোনালী জরির কাজকরা বিছানার চাদরের উল্লেখ আছে। কথাটা ঠিক কি না, জানি না। সত্য হইলে, তথাকার আর্য্যগণ শিল্পের কত উচ্চ সোপানে উঠিয়াছিলেন, তাহা অনায়াসেই বুঝা যায়। রামায়ণে, সতোয় মেঘাভনীল বস্ত্র, পীত কৌষেয়, রক্ত কৌষেয় প্রভৃতি রঞ্জিত বস্ত্রের উল্লেখ আছে। মহাভারতে, পশমী, রেশমী, তসর, ক্ষৌমবস্ত্র প্রভৃতি আধুনিক সময়ের প্রায় সকল রকম বস্ত্রের বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। মানব ধর্ম্মশাস্ত্রে, কৌষেয়, আবিক (মেষলোম জাত কম্বল), কুতপ (নেপালি কম্বল), অংশুপট্ট, ক্ষৌমবস্ত্র, কুসুম্ভাদি দ্বারা রক্তবর্ণ সূত্রনির্ম্মিত সর্ব্ববিধ বস্ত্র ; যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায় চিত্রিত বস্ত্রাদি, হারীত ও শাতাতপ সংহিতায় অতিশয় রক্ত ও নীল বস্ত্র এবং পীতবর্ণ বস্ত্র ব্যবহার সম্বন্ধে ব্যবস্থা আছে। প্রাচীনকাল হইতে সন্ন্যাসিগণের লোহিত ও পীত গৈরিক বর্ণ বস্ত্র পরিধেয় প্রচলিত আছে। ইতিহাস-লেখক প্লিনি এক প্রকার স্পষ্টই লিখিয়া গিয়াছেন যে, ভারত হইতে গ্রীকগণ কৃষ্ণ, হরিদ্রা ও আর দুই একটা রঙ প্রস্তুত করিবার প্রণালী শিখিয়া গিয়াছিলেন। প্লিনির সময় মিশরবাসিগণও নানাবর্ণে বস্ত্র রঞ্জিত করিত।

সে পুরাতন কাহিনী থাক। কার্পাস তুলা হইতে বস্ত্র প্রস্তুত করা যাইতে পারে, এ কথা য়ুরোপীয়গণ আজ সাত শত বৎসর মাত্র শিখিয়াছে। এ বিদ্যা ভারত হইতে মিশর, মিশর হইতে য়ুরোপে যায়। যে মাঞ্চেষ্টার আজ ভারতের এক সীমা হইতে অপর সীমা পর্য্যন্ত সমস্ত দেশ তাহার কার্পাস কাপড়ে ছাইয়া ফেলিয়াছে, সে মাঞ্চেষ্টারে যোড়শ শতাব্দীতেও কার্পাস বস্ত্রের কথা অজ্ঞাত ছিল। ছিট প্রস্তুত করিবার জন্য মাঞ্চেষ্টার অনেক চেষ্টা করিয়াছিল ; কিছুতেই পারিল না দেখিয়া সভ্য জগতের স্বাধীন ব্যবসায়-ধ্বজাধারী ইংলণ্ড ১৭২১ খৃষ্টাব্দে ছিটের কাপড় ব্যবহার আইন প্রণয়ন দ্বারা নিষেধ করেন। কারণ এই যে, তখন ভারত হইতে ছিট ইংলণ্ডে রপ্তানী হইত। স্বদেশানুরাগী ইংলণ্ডের তাহা সহ্য হইল না। ১৭০০ খৃষ্টাব্দে আর এক আইন জারি হয়, তদ্দ্বারা পারস্য, চীন, কিনা ভারতজাত রেশমী-কাপড় কিম্বা ছিট গ্রেট ব্রিটেনের কোন ব্যক্তি ব্যবহার করিতে পারিত না।২

১। রঞ্জিত বস্ত্র অর্থে যে বস্ত্রখানির সমুদায় ভাগ এক কিম্বা দুই প্রকার রঙ্গে রঞ্জিত হইয়াছে এবং চিত্রিত বস্ত্র অর্থে যে বস্ত্রখানি এক কিম্বা অধিক রঙ্গে লতা ফুল ইত্যাদি চিত্রে চিত্রিত হইয়াছে। অর্থাৎ "রঙ্গকরা" কাপড় এবং "ছিট"। কাঁচা ও পাকা, এই দুই রকম রঙ্গ কাপড়ে দেওয়া যায়। কাঁচা রঙ্গের জন্য বিশেষ আয়োজন আবশ্যক হয় না। কেবল রঙ্গ, জল কিম্বা অপর তরল পদার্থে মিশ্রিত করিতে পারিলেই হইল। কাপড়ে পাকা রঙ দুই প্রকারে দেওয়া যায়। ১ম, এমন অনেক রঙ পদার্থ আছে, যাহা কাপড়ে লাগিলেই পাকা হইয়া যায়, অর্থাৎ ধুইলে কাপড় হইতে ছাড়ে না, যেমন কুসুম ফুল, হরিদ্রা, নীল, হিরাকস ইত্যাদি। ২য়, যে সকল রঙ অপর পদার্থের সাহায্যে কাপড়ে পাকা হয়, যেমন ফটকিরি সাহায্যে মঞ্জিষ্ঠা। পাকা রঙ আবার দুই প্রকার। এক; সূর্য্যের আলোক প্রভাবে যে রঙ ক্রমশঃ অদৃশ্য হয়, যেমন কুসুম ফুলের রঙ, হরিদ্রা রং। আর এক, যে রং সূর্য্যের আলোকে তাদৃশ ভাবাপন্ন হয় না, যেমন নীল রং। বলা বাহুল্য, উভয় প্রকার রঙই এই অর্থে পাকা, যে ধোবা ধুইয়া ছাড়াইতে পারে না। অতএব অস্থায়ী, অচিরস্থায়ী ও চিরস্থায়ী এই তিন ভাগে যাবতীয় রঞ্জিত ও চিত্রিত বস্ত্রকে শ্রেণীবদ্ধ করিতে পারা যায়। কাপড় রঙ করিবার প্রণালী বর্ণনা করা আমার এখন উদ্দেশ্য নহে, সুতরাং এ সম্বন্ধে সবিশেষ বলিবার প্রয়োজন নাই।

২। একথা ইংলণ্ডের ঘোর কলঙ্কস্বরূপ বিদ্যমান রহিয়াছে। এখন 'ফ্রি ট্রেডের' বা স্বাধীন ব্যবসায়ের প্রচলন পক্ষে ইংলণ্ড অত্যন্ত-মনোযোগী। ভাল হউক, মন্দ হউক, আমেরিকার যুক্তরাজ্যের ন্যায় উন্নত রাজ্য সময় বিশেষে দ্রব্য বিশেষের উপর 'ফ্রি ট্রেড' বন্ধ করিয়া দেয়। এদেশে অনেক ব্যক্তি আছেন, যাঁহারা দেশ কাল পাত্র বিবেচনা না করিয়া সর্ব্বত্র "ফ্রি ট্রেড" চালাইতে চাহেন।

১৬৭৬ খৃষ্টাব্দে স্কটলণ্ডে প্রথমে কার্পাস বস্ত্র প্রস্তুত হইতে রম্ভ হয়, আর ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে মাঞ্চেষ্টারে ছিট রীতিমত প্রস্তুত । খৃঃ ১৭৮৬ সালে সার উইলিয়ম জোনস বলিয়াছিলেন "বস্ত্র ন সম্বন্ধে হিন্দুরা এখনও পৃথিবীর সকল জাতিকে হারাইয়া তেছেন।" উহার পর এক শত বৎসর হইল, এখনও, বিলাতে রতীয় বস্ত্রের বিশেষ আদর আছে। পৃথিবীর প্রায় যাবতীয় তিই উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে, ভারত এখনও অচল অটল। রতীয় বস্ত্রের এমন একটা স্বাভাবজ গুণ আছে, যদ্দারা এখনও হা সভ্য সমাজের নিকট স্পর্দ্ধা করিতে পারে। ভারতীয় রঙ্গ দার্থের ব্যবহার ইংলণ্ডে আরম্ভ হইয়াছে। আর ভারত আজ ই সমস্ত উৎকৃষ্ট রঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া মাজেণ্টাদি রঙ্গসমূহের কচিকো বিমোহিত হইতেছে। রসায়ন বিদ্যার সম্যক লোচনায় ভিন্ন ভিন্ন দেশের শিল্প বিলাতের করতলস্থ হইতেছে। ই ভবিষ্যদ্বাণীই সার উইলিয়াম জোনস খৃঃ ১৭৮৫ সালে বলিয়া য়াছেন। জাতির উদ্যোগ ও চেষ্টাই প্রাণ, কিন্তু ভারত, দবমুখাপেক্ষা করিয়া নিশ্চেষ্ট! চেষ্টা ও উদ্যোগে বিলাতে ্যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে।

এখনও ভারতে যেরূপ ছিট প্রস্তুত হয়, তদ্রূপ অন্যত্র কোথাও হয় না। বিকানীর, বরোদা, গুজরাটের অন্তর্গত পত্তন, বিওয়ার প্রভৃতি পশ্চিমদেশে এখনও যে প্রকার ছিট প্রস্তুত হয়, তাহার ন্যায় বিলাতে এত রসায়ন বিদ্যার চর্চ্চাতেও প্রস্তুত হইতেছে না। প্রসিদ্ধ সার জর্জ বার্ডউড সাহেব লিখিয়াছেন, "ছিটের উন্নতি করিতে যদ্যপি বিলাতি তাঁতিদিগের ইচ্ছা থাকে, তাহারা যেন ভারতজাত রঙ্গপদার্থ ব্যবহার করে। এরূপ করিলে আজকালকার মাজেণ্টাদি রঙ্গের উৎকট বর্ণের পরিবর্ত্তে গাঢ় ও সুরম্য ভারতীয় বর্ণের সৌন্দর্য্য আনিতে পারিবে। কিন্তু হায়, ভারতের এত হীনাবস্থা ঘটিয়াছে, বিলাতী জিনিসের জাঁকজমকে রুচি এত বিকৃত হইয়াছে যে, দেশীয় ছিট পরিত্যাগ করিয়া অপকৃষ্ট বিলাতি ছিট আগ্রহের সহিত ভারতবাসী ব্যবহার করিতেছেন। ৫ বৎসর হইল, টমাস ওয়ার্ডল সাহেব এ দেশের রেশম চাষ দেখিতে বিলাত হইতে প্রেরিত হন। তিনি ভারতের আধুনিক অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া শোকান্বিত হন। তিনি লিখিয়াছেন, "ভারতে ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিলাম যে, আধুনিক মাজেণ্টাদি রঙ্গে ভারতজাত বস্ত্রের অত্যন্ত ক্ষতি করিয়াছে।" তিনি অলওয়ার প্রদেশে এক রঞ্জিত ওড়না দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়াছেন। ওড়নাটি বিলাতি সূক্ষ্ম 'নেট' কাপড়ের। কাপড়ের এক পৃষ্ঠে পীতবর্ণ অন্য পৃষ্ঠে লালবর্ণ। স্থানে স্থানে সোনালী জরির কাজ। তিনি লিখিয়াছেন "ইহা বস্ত্র রঞ্জনের অদ্বিতীয় দৃষ্টান্ত। য়ুরোপে এরূপ একখানি কাপড় প্রস্তুত হইতে পারে কি না, বিশেষ সন্দেহের বিষয়। যদি হয়, তাহা হইলেও বিলাতি রঙ্গে কিছুতেই হইবে না। কারণ আমার সন্দেহ হয়, বিলাতি রঞ্জকের নৈপুণ্য এখনও এতদূর বৃদ্ধি হয় নাই, যদ্দারা অতি সূক্ষ্ম নেট কাপড়ের এক পিঠে এক রঙ্গ অন্য পিঠে আর এক রঙ্গ দিতে পারে।" [illegible] লিখিয়াছেন যে, "যে প্রণালীতে এই অপ্রতিরূপ শাড়ী রঞ্জিত হইয়াছে, সেই প্রণালীটি সাবধানে গোপন করিয়া রাখিয়াছে।৩ এইরূপ রঙ্গ করিবার প্রণালীটি প্রকাশ করিলে আর কি রক্ষা ছিল? কোন জাতি কোন বিদ্যা তাহার সমকক্ষ জাতির নিকট প্রকাশ করিলে ক্ষতি হয় না। কিন্তু ভারতের একে উন্নতি কিম্বা নূতন আবিষ্কার কিম্বা পরবিদ্যা আয়ত্ত করিবার ক্ষমতা নাই। যাহা ছিল তাহার প্রায় সমুদায় অপর জাতি করতলস্থ করিয়াছে, যৎকিঞ্চিৎ যাহা আছে, তাহা গেলেই কেবল মৃতদেহের ভস্মমাত্র অবশিষ্ট থাকিবে। সভ্য সমাজেই যখন নবাবিষ্কৃত শিল্পকৌশল এক জাতি অপরকে বলিতে চায় না, তখন ভারতের কোন শিল্পবিদ্যা য়ুরোপীয় উন্নত জাতির নিকট প্রকাশ করা, আর স্বপদে কুঠারাঘাত করা, তুল্য কথা। অনেকে এ প্রণালীকে দোষাবহ মনে করেন। এক বিষয়ে দোষ আছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহাদের দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করা কর্ত্তব্য, বিলাতের "**Trade secret**" এর কথা স্মরণ করা উচিত। মূল তত্ত্বের উপর নির্ভর করিলে সকল সময় চলে না।

গুপ্ত বিদ্যা শিখাইবার প্রয়োজন নাই। কোন ভারতীয় জিনিষের বেশী বিক্রয় দেখিলে বিলাতি ব্যবসায়িগণ লোভ সম্বরণ করিতে পারে না। পঙ্গপালের ন্যায় মাঠ ঘাট ছাইয়া ফেলে।৪ মান্দ্রাজের শিল্প-বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ হ্যাভেল সাহেব লিখিয়াছেন৫। "কুম্ভকোনম্ এবং নাগোরের ছিট অতিশয় সুন্দর। এখানকার প্রায় সমুদায় ছিট সিঙ্গাপুর ও পিনাঙ্গে রপ্তানি হইত। কিন্তু গত বিশ বৎসরের মধ্যে ঐ ছিটের ব্যবসায় শতকরা প্রায় ৮০ভাগ কম পড়িয়াছে। কেন কম পড়িয়াছে, বলিতে হইবে কি?

তিনি মান্দ্রাজের যাবতীয় শিল্পের ক্রমিক হ্রাস দেখিয়া সত্যই বলিয়াছেন যে কাপড়ের ব্যবসায় বিলাতি সংঘর্ষে কম পড়িয়াছে। কাষ্ঠ খোদাই, গালিচা ও চারু তৈজসকার্য্য প্রভৃতি বিলাসসামগ্রী সকল প্রাচীন জমিদারও রাজাগণের বিলোপে বিলুপ্ত হইতেছে। কিন্তু বিলাতি সংঘর্ষে ও পুরাতন ধনী বংশের লোপে, ভারতীয় শিল্পের অবনতি ও বিলোপের বিশিষ্ট কারণ এই যে, পাশ্চাত্য শিক্ষা ও তদনুযায়ী রুচি বিকৃতি। এই রুচি পরিবর্ত্তনে শিক্ষিত ভারতবাসী স্বদেশীয় বেশভূষা পরিত্যাগ করিতেছেন, আপন আপন গৃহ ব্রাসেলস কার্পেটে ও কুৎসিত আধা দেশী আধা বিলাতি সাজসজ্জায় ভূষিত করিতেছেন। এই রুচি পরিবর্ত্তনের গুণে তাঁহারা স্বদেশী কারুকার্য্যের মধ্যে কিছুই ভাল দেখিতে পান না। বিলাতি সচিত্র মূল্যতালিকা দেখিয়া আপন আপন ব্যবহার্য্য সামগ্রী গড়াইয়া লইতেছেন। ভারতীয় দ্রব্যের গৌরব হ্রাস ও বিলাতি প্রতিদ্বন্দ্বিতাই ভারতীয় শিল্পের অবনতির প্রধান কারণ।"

ভারতীয় দ্রব্যের গৌরব হ্রাস, ভারতবাসীর নিকট ঘটিয়াছে।

ঈশ্বর গুপ্ত অতি দুঃখের সহিত লিখিয়াছেন, "রপ্তানিটি বন্ধ করে দেশের লোকের দাও মা খানা। (এরা) বলে 'ফ্রিট্রেড' বন্দ কর্ত্তে কোন কালে কেউ পারে না।"

৩। Journal of Indian Art.

৪। সেদিন কাগজে দেখিতেছিলাম, বিলাতে ভারতীয় তৈজস সামগ্রীর এক প্রদর্শনী হইবে। এই সমুদয় প্রদর্শনীর কি অর্থ, এমন স্থূল বুদ্ধি নাই, যিনি এখনও তাহা বুঝিতে না পারিয়াছেন। হায়, আমাদের কাঁসারির অন্নও দুই-চারি বৎসরে মারা যাইতে বসিল।

৫। Journal of Indian Art.

অর্থাৎ পাশ্চাত্য সভ্যতায় ভারতজাত দ্রব্যের শ্রেষ্ঠতা ও গুণবত্তা দেখিতে দেয় না। কথাটা বড় মূল্যবান। পাশ্চাত্য সভ্যতা ভারতে প্রবেশ করিয়া বিষময় ফল উৎপাদন করিতেছে। এই সভ্যতার গুণেই শিক্ষিত বাবু "হোয়াইট-ওয়ে-লেডল"কে জামা সেলাই করিতে দেন। এই জন্যই রামমিস্ত্রি ছাড়িয়া 'ডসনের' জুতা ব্যবহার করেন, এই জন্যই টুপিতে "হার্টমানের" নামাঙ্কিত না দেখিলে টুপী পছন্দ হয় না। এই রুচিভেদেই দেশের সর্বনাশ করিতেছে। যাহা মন্দ, তাহা ত্যাগ করিতে কেহ নিষেধ করে না; যাহা ভাল, এমনই চক্ষে ধাঁধা লাগিয়াছে, তাহাকে মন্দ ভাবিয়া পরিত্যাগ করিতেছে। ভারতীয় জিনিস যতক্ষণ না কোন সাহেব ভাল বলেন, ততক্ষণ তাহা গ্রহণীয় নহে।

বিলাতি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দেশীয় ছিট ও রঙ্গিন কাপড়ের ব্যবসায় প্রায় লুপ্ত হইতে চলিল। দেশীয় তাঁতিগণ কাপড়ের 'পাড়' ও শতরঞ্চ প্রভৃতি বুনিবার নিমিত্ত পূর্ব্বে আপনারা দেশীয় ও বিলাতি নির্ম্মিত সূত্রকে নীল, লাল, জরদ প্রভৃতি নানাবিধ রঙ্গে প্রস্তুত করিয়া লইত। কিম্বা দেশীয় রঙ্গরেজগণ উক্ত কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিত। কিন্তু সম্প্রতি এমনই দশা উপস্থিত যে, তাঁতিরা শাদা সূতা আর রঙ্গিন করে না, আবশ্যক হইলে বাজার হইতে বিলাতি রঙ্গিন সূতা ক্রয় করিয়া লইতেছে। যে অল্প পরিমাণে দেশীয় কাপড় প্রস্তুত হইতেছে, তাহার জন্য শাদা ও রঙ্গিন সূতা সমস্তই বিলাতি তাঁতিরা যোগাইতেছে। এই ভাবে কিছু দিন গেলে রঙ্গ করিবার অনেকগুলি উৎকৃষ্ট প্রণালী দেশ হইতে বিলুপ্ত হইবে। ভারত হইতে কার্পাস যাইবে, বিলাতি তাঁতিরা সূতা প্রস্তুত করিয়া দিবে। ভারত হইতে নীল যাইবে, সেই নীল লইয়া বিলাতি তাঁতিরা ভারতের তাঁতির জন্য সূতা নীলবর্ণ করিয়া দিবে।

বিলাতি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ভারতের কি কারুকার্য্য, কি দৈনিক ব্যবহার্য্য সামগ্রী, প্রায় যাবতীয় শিল্পের ব্যবসায় লুপ্ত হইতে চলিয়াছে। হেনড্‌লী সাহেব ৬ একটি সুন্দর বিবরণ দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, "কয়েক বৎসর হইল, বিলাতের কোন ব্যবসায়ীর কর্ম্মচারী রাজপুতানার কয়েকটি বাজার বিলাতি ছিটে পরিপূর্ণ করিয়া ফেলে। সেই সমস্ত ছিটের সুলভ মূল্য ছিল এবং যতদূর সম্ভব, অতিশয় সুন্দর চিত্রে ছিট প্রস্তুত করা হইয়াছিল। কিন্তু দেখা গেল, বাজারে সে ছিটের বেশী কাটতি হইল না। অনুসন্ধানে সেই ব্যবসায়ী জানিতে পারিল যে, তাহার ছিটের উৎকৃষ্টতাই কম বিক্রয়ের প্রধান কারণ। পরিকল্পনা কেমন একঘেয়ে হইয়াছে। কাপড়টি ভাল হইলে কি হয়, কাপড়ের 'জমিনে' একপ্রকার রঙ্গ থাকা চাই। তথাকার লোকেরা সেই রঙ্গ পছন্দ করে। অমনই বিচক্ষণ ছিট বিষয়ে দক্ষ ব্যক্তিগণ ৭ তথায় প্রেরিত হইলেন। তাঁহারা দেখিলেন যে, তথাকার এক নদীর জলে 'জমিনে' তদ্রূপ রঙ্গ উৎপন্ন হয়। নদী বিলাতে আনা যায় না। সুতরাং রসায়নবিদ কর্ম্মচারিগণকে এমন একটা দ্রব্যের আবিষ্কারে নিযুক্ত করা হইল, যাহাতে ছিটের তদ্রূপ বর্ণ ঘটিতে পারে। বলা বাহুল্য, সে বিষয়ে তাঁহারা অনতিবিলম্বে সফল হইলেন। ছিটের পরিকল্পনার উৎকর্ষ কিঞ্চিৎ হ্রাস করিবার জন্য ছাপিবার 'রোলর' ও 'ব্লক' গুলি ইচ্ছা পূর্ব্বক কিছু কিছু বিকৃত ও অসম্পূর্ণ করিয়া ফেলিল। তখন তথাকার ক্রেতাগণ আসল ও নকল সহজে বুঝিতে পারিল না; দেশীয় ছিটের ধ্বংস হইতে আরম্ভ হইল।"

এমন ব্যবসার সংগ্রামের মধ্যে ভারতে যে এখনও অল্পাধিক ছিট প্রস্তুত হইতেছে, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়! বাঙ্গালা দেশে ছিট অতি অল্পই প্রস্তুত হয়। বাঙ্গালা দেশ দেখিয়া ভারতীয় ছিটের অবস্থা অনুমান করা যুক্তিসঙ্গত নহে। পূর্ব্বে ভারতের কতকগুলি স্থানের নামোল্লেখ করিয়াছি। তদ্ব্যতীত, ভারতের পশ্চিমাংশে সিন্ধুপ্রদেশে এখনও বহুল পরিমাণে ছিট প্রস্তুত হইতেছে। তথাকার গুজরাটী স্ত্রীলোকেরা ছিট সর্ব্বদা ব্যবহার করেন। পালঙ্কপোষ, শাড়ী, ধুতি, রুমাল, জাজম, উড়ানী, ঘাগরা, রেজাই প্রভৃতি বস্ত্র সকল চিত্রিত হয়। মসলিপত্তনের ছিটের এখনও প্রচুর আদর আছে। পারস্য দেশে তথাকার ছিট এখনও বিশেষ আদৃত হইতেছে। মান্দ্রাজ প্রদেশের স্থানে স্থানে উৎকৃষ্ট 'বন্ধন' ছিট প্রস্তুত হয়। লক্ষ্ণৌতেও কয়েক প্রকার ছিট হয়। বৃন্দাবন ও মথুরার ছিটও সুরম্য। 'বন্ধন' ছিট প্রস্তুত করিবার সহজ প্রণালী বিলাতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। বাজারে সেই ছিট যথেষ্ট পরিমাণে আমদানী হইতেছে। 'বন্ধন' ছিট প্রস্তুত করিতে শিল্পীর কতদূর নৈপুণ্য প্রকাশ পায়, যাঁহারা উক্তবিধ ছিট দেখিয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন।

ভারতীয় শিল্পের অবনতির দুইটি কারণ উল্লেখ করা গিয়াছে। (১) বিলাতি প্রতিদ্বন্দ্বিতা, (২) ভারতজাত শিল্প-সামগ্রীর গৌরব হ্রাস। এই দুই কারণ ব্যতীত আর একটি বিশিষ্ট কারণ উপস্থিত হইয়াছে। পূর্ব্বকালের মত, ছিট কিম্বা রঙ্গিন কাপড় এদেশীয় লোকেরা ব্যবহার করেন না। এখন শাদা কাপড়ের 'দিন'। বেশ ভূষাতে এখন 'শাদা' বা অনলঙ্কার ভাব। রঙ্গিন কাপড় বা কারুকার্য্যময় বিলাস সামগ্রী অত্যল্প লোকেই পছন্দ করে। ঘটী চাই, তাহার গাত্রে কোনরূপ 'কাজ' থাকিবে না, গুড়গুড়িটি সমুদায় 'শাদা' হইবে, ছবির ফ্রেমে বেশী জাঁক জমকের আবশ্যক নাই, চেয়ারখানিতে চারিখানি মোটা মোটা 'পা' থাকিলেই হইবে, ইত্যাদি। ঘর বাড়ী সম্বন্ধে সরকারী পূর্ত্ত কর্ম্মচারিগণ যে 'শাদা' ভূষণাভাবের নমুনা দেখাইতেছেন, তাহাই নকল করিবার জন্য লোকেরা ব্যস্ত। কম খরচের কিম্বা কার্য্যের সুবিধার জন্য এখন অলঙ্কৃত অট্টালিকাদি নির্ম্মাণ করিতে গভর্ণমেণ্ট বাধ্য হয়েন। গভর্ণমেণ্ট আদালত গৃহ কিম্বা কোন ব্যবসায়ীর দোকান ঘর দেখিয়া দেশীয় ধনিগণ স্ব স্ব আবাসগৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া চরিতার্থ বোধ করেন। দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিতে কষ্ট স্বীকার করেন না। সরকারী 'মার্কা' মারা বলিয়া যে সরকারী গৃহ অনুকরণীয় হইবে, শাস্ত্রে এমন কিছু ব্যবস্থা নাই। আর একটি কথা আছে। সরকারী ঘাট, বাড়ী প্রভৃতি সাহেব মিস্ত্রী দ্বারা

৬। **Surgeon Major F. H. Hendley, Hon. Sec. Jeypore Museum. No. 26, Journal of Indian Art.**

৭। এস্থানে বলা আবশ্যক যে, বিলাতি প্রত্যেক 'রঙ্গরেজ' তাঁতির এক একটা পরীক্ষাগার আছে। তথায় দুই চারিজন সুশিক্ষিত দক্ষ রসায়নবিদ কর্ম্মচারী রঙ্গ বিষয়ের পরীক্ষায় নিযুক্ত থাকে। নূতন নূতন সহজ ও সুলভ-সিদ্ধ প্রণালী আবিষ্কার দ্বারা তাঁতির লাভ বৃদ্ধি করা, ঐ সকল রসায়নবিদ কর্ম্মচারীর দৈনিক কার্য্য। ভারতীয় 'রঙ্গরেজ' ইহাদের সমকক্ষ হইতে পারে কি?

রচিত হয়। অর্থাৎ বিলাতী পদ্ধতিক্রমে সরকারী বাড়ী নির্ম্মিত হইয়া থাকে। একটা যে ভারতীয় পদ্ধতি আছে, তাহা পরিত্যাগ করিবার কারণ কি? কারণ এই যে, রুচি পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। এই রুচি পরিবর্ত্তনের গুণে না জানি কবে শিক্ষিত ভারতবাসী ভুবনেশ্বরের ন্যায় অপূর্ব্ব মন্দির কিম্বা তাজমহলের ন্যায় অদ্বিতীয় কীর্ত্তিকে অসভ্যতার নষ্টাবশেষ বলিয়া ঘৃণা করেন। কেবল একটু আশা এই যে, বিলাতি ইঞ্জিনিয়ারগণ উক্ত মন্দিরদ্বয়ের প্রশংসা করিয়াছেন।

প্রবন্ধটি ইচ্ছাতিরিক্ত দীর্ঘ হইয়া পড়িল। কি উপায়ে দেশীয় শিল্প রক্ষা হয়, তাহার উদ্ভাবন করা স্বদেশানুরাগী ব্যক্তিমাত্রেরই কর্ত্তব্য। দুই একটা উপায় বলা যাইতে পারে। কার্য্যে পরিণত করাও তত দুঃসাধ্য নহে। ভারতের কোন স্থানে কি দ্রব্য উৎপন্ন হয়, তাহা অধিকাংশ লোকেই জানেন না। যদি কোন উদ্যোগী ব্যক্তি ভারতজাত সামগ্রীর একটা তালিকা প্রস্তুত করিয়া বিশেষরূপে প্রচার করেন, তাহা হইলে বিশেষ ফললাভের সম্ভাবনা। দ্বিতীয়ত, স্থানে স্থানে ভারতজাত দ্রব্যের বিক্রয়-স্থান স্থাপন করা। এ সকল স্থানে যাহাতে দ্রব্যাদি খুচরা পাওয়া যাইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। তৃতীয়তঃ, শিল্পসমিতি সংগঠন। যাহাতে উৎকৃষ্ট দেশীয় শিল্পের মধ্যে বিদেশীয় পদ্ধতি প্রবেশ না করে, তাহাই শিল্প সমিতির লক্ষ্য হইবে। এই কার্য্য সাধন জন্য বিশেষ বিশেষ উৎকৃষ্ট শিল্পকৌশল, কিম্বা বিশেষ উৎকৃষ্ট পরিকল্পনা প্রদর্শনের জন্য স্থান বিশেষে শিল্পীবিশেষকে সমিতি অর্থ সাহায্য করিবেন।

এই সকল উপায় দ্বারা ভারতের সমগ্র শিল্পের উন্নতি না হউক, মরণোন্মুখ অবস্থা হইতে কথঞ্চিৎ রক্ষা করা যাইতে পারে। প্রত্যেক ভারতবাসীর যখন ভারতজাত দ্রব্যের প্রতি অনুরাগ জন্মিবে, তখনই সমধিক উপকার হইবার সম্ভাবনা। —যোগেশচন্দ্র রায়

'পেপারওয়েট' বা কাগজ-চাপা

যেদিন থেকে মানুষ 'পেপার' বা কাগজ নিয়ে নাড়া-চাড়া সুরু করেছে, 'পেপারওয়েট' বা কাগজ-চাপার প্রয়োজন হয়েছে তার পাশাপাশি সেই থেকেই। কোন যুগে কে সর্ব্বপ্রথম এই প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করলো এবং কোন জিনিস কি ভাবে সং হ করে প্রয়োজন মেটালো এর, সঠিক বলা দুঃসাধ্য। তবে ধরে নেওয়া যেতে পারে—প্রথম অবস্থায় মাটির ঢেলা, পাথর খণ্ড, টুকরো কাঠ—এসকলই ব্যবহার হতো 'পেপারওয়েট' বা কাগজ-চাপা হিসাবে। সহজ কথায় বলতে পারা যায় যে, আজকের দিনে এই অত্যাবশ্যক শিল্প সামগ্রীটি যতটা উৎকর্ষ লাভ করেছে এবং সহজলভ্য হয়েছে যে পরিমাণে, যাত্রার প্রথম পর্য্যায়ে এমনটি আদৌ ছিল না। সভ্যতা বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে একদিকে যেমন জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চ্চা বৃদ্ধি পায়, অপর দিকে কাজের তাগিদ থেকে অফিস আদালতও গড়ে উঠতে থাকে বিশ্বজোড়া। অর্থাৎ সকল দিক থেকেই মানুষের কাগজপত্র নিয়ে নাড়া চাড়ার প্রয়োজন বর্দ্ধিত হয়ে যায় অতি মাত্র। আর প্রথমেই যা বলা হ'ল, কাগজ নিয়ে নাড়াচাড়ার অর্থই উহার পাশাপাশি চাই কাগজ-চাপা বা 'পেপারওয়েট' একরূপ অপরিহার্য্য-ভাবে। তাই সেই প্রথম যুগের কাগজ-চাপা যা হয়ত সামান্য মাটির ঢেলা বা পাথর খণ্ড ছিল, তা আজ রূপ নিয়েছে, কাঁচ, পিতল, হাতীর দাঁত, প্লাষ্টিক প্রভৃতি নির্ম্মিত বিচিত্র কাগজ-চাপার।

আজকাল দেশ বিদেশের অফিস আদালত সমূহে সবচেয়ে বেশীরকম ব্যবহার হয় সম্ভবতঃ কাঁচের কাগজ-চাপা বা 'পেপারওয়েট।' পিতলের কাগজ-চাপা বা 'পেপারওয়েটের' ব্যবহারও তুলনায় একেবারে কম নয়। অনেক ক্ষেত্রে এখনও পাথর খণ্ডই কাগজ-চাপা হিসাবে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। বাড়ী-ঘরে কাগজ-চাপার যেখানে প্রয়োজন, সেখানে নানা ধরণের বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে। ক্ষেত্র বিশেষে বিলাসী ধনিকরা রৌপ্য নির্ম্মিত কাগজ-চাপা বা 'পেপারওয়েট'ও ব্যবহার করে থাকেন। কিন্তু এ সকলেরই লক্ষ্য হল—অত্যাবশ্যক কাগজ পত্রগুলো যাতে খোয়া না যায় কিংবা ওলট-পালট হয়ে যেয়ে অযথা হয়রানি সৃষ্টি না করে।

কাঁচনির্ম্মিত 'পেপারওয়েট' বা কাগজ-চাপার ব্যবহারও সমাজে প্রচলিত বহুকাল থেকেই। ইতিহাস পর্য্যালোচনায় দেখা যায়—ইউরোপের দেশগুলোতে বিশেষভাবে ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ডে এই শ্রেণীর কারুশিল্পখচিত কাগজ-চাপা উঁচুমহলে বরাবর বিশেষ সমাদর পেয়ে আসছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসী দেশে যে কাগজ-চাপার ব্যবহার ছিল কিংবা ভিক্টোরিয়ার যুগে ইংল্যাণ্ডে, ওদের ওজন এক একটি বহু আউন্স হতো। অধুনা সেই পুরাতন কাগজ-চাপার নিদর্শনী ব্যাপারে এসে পড়লে প্রচুর মূল্যে বিক্রয় হবে, এ আদৌ বিচিত্র নয়।

এ প্রসঙ্গে একটি কথা বলা যেতে পারে—কাঁচনির্ম্মিত কাগজ-চাপার ব্যবহারিক মূল্য একদিক থেকে খুব বেশী। বৎসরের পর বৎসর অতিবাহিত হলেও এর গায়ে পুরাতনের দাগ বা ছাপ পড়ে না। পরীক্ষায় দেখা গেছে—মনোরম কারুকার্য্যখচিত একটি কাঁচের কাগজ-চাপা শতাব্দীর পর শতাব্দী অতিক্রম করে গেলো—কিন্তু আশ্চর্য্য, এর বহিঃসৌন্দর্য্য এতটুকু ম্লান হলো না—প্রথম দিনে যেমনটি ছিল, তেমনটি থেকে গেলো শেষ অবধি।

আজকের দিনে 'পেপারওয়েট' বা কাগজ-চাপায় যুগোপযোগী 'ডিজাইন' বা কলাকুশলতার ছাপ লক্ষ্য করা যায়। কাঁচের স্বচ্ছ কাগজ-চাপাগুলোর অভ্যন্তরে কত রঙ-বেরঙের কারু-কার্য্য থাকছে—যা দেখে নির্ম্মাণ-কৌশলের সত্যি তারিফ না করে পারা যায় না। ইংল্যাণ্ডের রাণীর অভিষেককালে শিল্পীরা কাঁচ দিয়েই চমৎকার 'পেপারওয়েট' বা কাগজ-চাপা নির্ম্মাণ করেন। এর ভেতরটি রাণীর মাথায় 'টায়রা'র মডেলে এমনি কারুশিল্পখচিত করা হয়—দেখা মাত্র চোখে ভুল ঠেকবে, বুঝি এ খাঁটি জহরে তৈরী।

শুধু দেখতে মনোরম বলেই নয়, ব্যাপক তৈরী ও সরবরাহের দিক থেকেও কাঁচের কাগজ-চাপার গুরুত্ব স্বীকার্য্য। গ্রেটবৃটেনের টে নদীর উপকূলে আধুনিক ধরণের একটি বিখ্যাত 'পেপারওয়েট' বা কাঁচের কাগজ-চাপা কারখানা রয়েছে। এই কারখানাটিতে (ভাসার্ট গ্লাস ওয়ার্কস) বহু সুদক্ষ শিল্পী বা কারিগর কর্ম্মনিযুক্ত রয়েছেন। এই শ্রেণীর কারখানা অন্যত্রও দেখতে পাওয়া যায়—যেখানে শিল্পীরা এই শিল্পের মাঝে রেখে চলেছেন তাঁদের অপূর্ব্ব কলা-কুশলতার স্বাক্ষর।
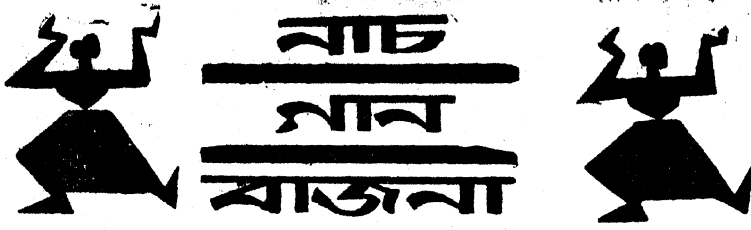
নাচের রাজ্যে অরাজকতা

আজকাল নৃত্যকলা বিষয়ে শিক্ষিত সমাজের আগ্রহ অনেক বেড়েছে। বিভিন্ন অনুষ্ঠান, সভা-সমিতি প্রভৃতিতে নৃত্যের বহুল ব্যবহার হচ্ছে। কিছুকাল আগেও এই কলাবিদ্যার খুব আদর উঁচু সমাজে ছিল না। অবশ্য তার কারণও ছিল। সব থেকে যেটা প্রবল কারণ, তা হোল মুসলমান আমল এবং তারও আগে থেকে ইংরেজ আমলের প্রায় মাঝামাঝি পর্য্যন্ত নৃত্যকলা সীমাবদ্ধ ছিল নীচু সম্প্রদায়ে। বিশেষ করে রূপোপজীবিনীদের একটা প্রধান আকর্ষণ ছিল এই নাচ। তাই অভিজাত ও শিক্ষিত সমাজে নাচের খুব আদর ছিল না। চলও ছিল না। আজকাল বাতাসের গতি ফিরেছে। নাচের চর্চা আজকাল নীচু সম্প্রদায়ের থেকে উঁচু সম্প্রদায়েই বেশী। রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশাতেও নাচের যে কি দুরবস্থা ছিল তা তাঁর লেখার মধ্যেই আমরা জানতে পারি। শান্তিনিকেতনে নাচের ক্লাস খুলে দশজনের কাছ থেকে পেয়েছিলেন ব্যঙ্গ বিদ্রূপ। সব কিছু সহ্য করেও নিজের ঐকান্তিক চেষ্টায় আমাদের দেশে নাচকে জাতে তোলবার জন্যে তিনি যে অমানুষিক পরিশ্রম ও ত্যাগ স্বীকার করে গেছেন তার জন্যে কলারসিক মাত্রেরই সেই মহান পুরুষের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানানো উচিত। 'আপনি আচরি ধর্ম অপরে শিখায়' রবীন্দ্রনাথ নিজের অবিস্মরণীয় জীবনে তা বর্ণে বর্ণে দেখিয়ে গেছেন। সুতরাং শিক্ষিত ও অভিজাত সমাজের দৃষ্টি এমনি ফেরেনি। দৃষ্টিদান রবীন্দ্রনাথই করে গেছেন।

আজ নাচ শেখার সমাদর হচ্ছে। ঘরে, সমাজে, দেশে, বিদেশে আজ নাচের কত আদর এ সবই তাঁর দান। নাচের এই যে জনপ্রিয়তা, জীবনের দৈনন্দিন অতি প্রয়োজনের তালিকায় এই যে ঠাঁই করে নেওয়া এর আরো একটা কারণ হোল নাচের অর্থকরী দিক। নাচে যাঁরা কৃতী হয়েছেন আর্থিক সমাদর তাঁরা কম পাচ্ছেন না। সিনেমা, থিয়েটার, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আজ নাচকে বাদ দিয়ে করা সম্ভব হয় না। নাচ আজ সভ্যতা প্রদর্শনের দেশী বিদেশীর মাঝে মিত্রতা স্থাপনের বিশেষ যোগসূত্র অথবা মাধ্যম হয়ে উঠেছে। আরো স্পষ্ট সাক্ষ্য হোল উঁচু সমাজে মেয়েদের গুণ বিচার আজকাল নাচকে বাদ দিয়ে করা হয় না। বিয়ের পাত্রী নির্বাচনে অনেকেই আজকাল মেয়ের নাচতে না জানার দরুণ ক্ষুণ্ণ হচ্ছেন। তাই শহরে ও শহরতলীতে নাচ শেখার স্কুল বেড়ে উঠছে দিনের পর দিন। ছোট বয়স থেকে ছেলেমেয়েদের ভর্তি করাচ্ছেন অভিভাবকেরা। নাচ শিখিয়েও নাচ দেখিয়ে জীবিকা নির্বাহ করছেন ভালোভাবেই গুরুজীরা।

দেশ স্বাধীন হবার পর দেশের যাঁরা কর্ণধার তাঁরাও উপেক্ষা করতে পারলেন না নাচকে। বরং নাচ গান অভিনয়কে আরো জনপ্রিয় করে তোলবার জন্যে একটা আলাদা বিভাগ খুলতে বাধ্য হলেন। সঙ্গীত নৃত্য-নাটক আকাদমী হোল সেই বিভাগ। প্রতি বছর প্রচুর অর্থব্যয় করা হয় এই ললিত কলার শিক্ষা বিস্তারের জন্য। তরুণ শিল্পীদের বৃত্তি দিয়ে নাচ-গান-অভিনয় শেখানোর এই সরকারী প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। এ ছাড়াও বহু বেসরকারী স্কুলকে সরকার নিয়মিত অর্থ সাহায্য করে থাকেন। মধ্যপ্রদেশে সম্প্রতি এই নাচ গানের জন্যেই একটি স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হোল। এ সম্পর্কে আরো একটা আশাপ্রদ খবর আমরা সংবাদপত্রের মারফত জানতে পেরেছি—তা হোল সম্প্রতি ভারত সরকার ৩১ জন তরুণ শিল্পীকে বিশেষ বৃত্তি দান করেছেন। এঁদের মধ্যে দুজন তরুণ নৃত্যশিল্পীও আছেন। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি কত অল্পকালের মধ্যে নাচের ও নাচিয়েদের জন্য কত বিরাট ক্ষেত্র তৈরী হয়ে গেল। নাচের সম্বন্ধে দেশের পত্র পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশ হচ্ছে অনেক। কয়েকখানি পুস্তকও প্রকাশিত হয়েছে নাচকে বিষয়বস্তু করে।

সুতরাং নাচের এই ব্যাপক বিস্তার দেখে আমরা ধরে নিতে পারি যে একটা জাতিকে সভ্য সমাজে সুসম্পূর্ণ হতে হলে অন্য বিষয়ের সঙ্গে নাচ-গান-অভিনয়েও দক্ষ হয়ে ওঠা প্রয়োজন। সেই কারণে নাচ-গান-অভিনয় আজ শিক্ষিত-অশিক্ষিত উঁচু-নীচু সব সমাজেরই দরকারী জিনিষ। এই ললিতকলার সুন্দর ভবিষ্যত তাই আজ ধীরে ধীরে গড়ে উঠছে। ধীরে ধীরে সব রকমের মানুষ এই বিদ্যার প্রতি অনুরাগী ও অনুসন্ধিৎসু হয়ে উঠেছেন। নিজেদের ঘরে একে বরণ করে নিচ্ছেন একান্ত সমাদরে। সফল করে তুলছেন একটি সুপ্রাচীন জাতির, ঐতিহ্যাশ্রয়ী জাতির দাঁড়িয়ে ওঠার পদক্ষেপকে। **'A good education consists in knowing how to sing and dance well.'** প্লেটোর এই বাণীকে সার্থক করে তুলছেন প্রশংসনীয় এই সব।

কিন্তু এই সঙ্গে এসে পড়েছে এক মহা সমস্যার কথা। যার সমাধান এখন থেকে না হলে নাচ কখনো ঠিক পথ ধরে চলবে না। চালকবিহীন গাড়ীর মত দুর্ঘটনার পর দুর্ঘটনা সৃষ্টি করে চলবে। অনেক নৃত্যকলাবিদের সঙ্গে আলোচনা করে বুঝতে পেরেছি কি কঠিন সেই সমস্যা। সর্বসাধারণের সামনে সেই সমস্যাকে তুলে ধরা আমাদের জাতীয় কর্তব্য। তার পর যাঁরা এ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন তাঁরাই ঠিক করবেন কিভাবে সেই কঠিন সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে। এই শিল্পকে বাঁচিয়ে রেখে এই শিল্পের অগ্রগতিকে বন্ধ না করে সমস্যা সমাধানের সমান দায়িত্ব মনে করতে হবে সকলকেই—যাঁরা নাচেন আর যাঁরা নাচকে ভালোবাসেন। সমস্যাটি তুলে ধরবার আগে নাচের সম্বন্ধে দু চারটে অতি প্রয়োজনীয় কথা বলা দরকার।

(ক) যাঁরা ইতিহাস পর্য্যালোচনা করেছেন তাঁদের কাছে আমরা জেনেছি নাচের ইতিহাস। বহু প্রামাণ্য সূত্রের মাঝখান দিয়ে তাঁরা দেখিয়েছেন মানুষের সংস্কৃতিবোধের ইতিহাসকে। নাচের ইতিহাস তাঁদের মতে সব চাইতে সুপ্রাচীন! এর উৎস সন্ধান করতে হলে সৃষ্টির আদিকাল পর্য্যন্ত পৌঁছিয়ে গেলেও বুঝি শেষ হবে না। মূর্ত্তি পুঁথি প্রভৃতির সাক্ষ্যে যা পাওয়া যায় তাতে করেও তার বয়স সংস্কৃতির ইতিহাসে সব থেকে বেশী। নাচের সম্বন্ধে সব থেকে যে প্রামাণ্য গ্রন্থ ভরত মুনি কৃত নাট্য শাস্ত্র (ভরতনাট্যম্) তার প্রাচীনত্ব আজ কে অস্বীকার করবেন। আরো একটি প্রামাণ্য নাচের বই 'নর্তক নির্ণয়' তার বয়সও কম করে ৮৬০ বছর হবে। পুণ্ডরীক বিঠ্ঠল এটি রচনা করে গেছেন। দু হাজার বছর আগেকার লেখা কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে পেশাদার নাচিয়ের কথা উক্ত আছে। বৌদ্ধযুগে বাংলা দেশে 'বাজিল নাচ' বেশ জনপ্রিয় ছিল। নাচের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে আরো অনেক প্রমাণ দেওয়া যেতে পারে। সব বলতে গেলে শুধু তার জন্যই একটা গ্রন্থ লেখা হয়ে যায়। এখানে সে দীর্ঘ আলোচনার সুযোগ নেই। আগের দেওয়া সংক্ষিপ্ত প্রমাণ থেকেই আমরা স্থির নিশ্চয় হতে পারি যে, নাচের ইতিহাস মানব সভ্যতার ইতিহাসের চেয়েও প্রাচীন এবং ধর্মবোধের পূর্বেও নাচের অস্তিত্ব ছিল।

(খ) নাচ শাস্ত্রীয় বিদ্যা। নাচের পেছনে রয়েছে ব্যাকরণ অথবা শাস্ত্রীয় শিক্ষা পদ্ধতি। ভরতমুনি কৃত 'নাট্যশাস্ত্র', নন্দিকেশ্বর কৃত 'অভিনয় দর্পণ', পুণ্ডরীক কৃত 'নর্তক নির্ণয়' প্রভৃতি বহু সুপ্রাচীন পুঁথিপত্রের ভেতর আমরা দেখতে পাই নাচকে আয়ত্ত করতে হলে কি ভাবে তার চর্চা করতে হবে। সুতরাং এটা খাঁটি কথা যে, নাচ শিখতে হলে তার বাচিক ও ব্যবহারিক দুটো বিষয়ই জানতে হবে। তবেই জানা সম্পূর্ণ হবে এবং তিনি নর্তক পদবাচ্য হবেন। এই প্রসঙ্গে বক্তব্য হোল এই যে, নিজের খুসীমত হাত পা ঘোরালেই তাকে নর্তক বলা হবে না। যিনি ব্যাকরণ ও অলঙ্কারকে মেনে অঙ্গ, ভঙ্গী, মুদ্রা ও অভিনয়ের দ্বারা প্রকৃত রস সৃষ্টি করিবেন তিনিই নর্তক। 'সঙ্গীত দামোদর'কার এই কথাই বলেছেন।

"দেবকচ্যা প্রতীতো যত্তালমানরসাশ্রয়ঃ সবিলাসোঽঙ্গঃ
বিক্ষেপো নৃত্যমিত্যুচ্যতে বুধৈঃ, ল্যায়াত্থিস্তিষ্ঠতে বাক্ত
বাক্তাত্থিস্তিষ্ঠতে লয়ঃ, লয়ঃ, তালসমারব্ধং ততো নৃত্যং প্রবর্ততে।"

ধ্রুবপদী নৃত্যের ক্ষেত্রে মৌলিক অধিকারের প্রশ্নই আসে না। তার ক্ষেত্র আলাদা।

(গ) নাচকে যদি আমরা দুটো ভাগে ভাগ করি তাহলে আলোচনা করবার আরো কিছুটা সুবিধা হবে। এক—ধ্রুবপদী (ক্লাসিক বা মার্গনৃত্য) যার পেছনে রয়েছে শাস্ত্রীয় শিক্ষাপদ্ধতি ব্যাকরণ অলঙ্কার রস। এক কথায় বাঁধা-ধরা নিয়মকানুন। দুই—লঘু (লোক্ বা লোকনৃত্য) যার পেছনে কোন শাস্ত্রীয় পদ্ধতি নেই। যা সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক চেতনায় আপনা-আপনি কোন কোন অঞ্চলে গ্রামীণ জীবনে গড়ে উঠেছে।

(ঘ) আজকাল মার্গ ও লঘু নাচ-গানের যত না শিল্পী দেখা যাচ্ছে, তার থেকে বেশী দেখা যাচ্ছে এক রকমের বোহেমিয়ান শিল্পী। এঁদের কোন জাত নেই, ধর্ম নেই, প্রকৃতি নেই। এরা কোন ব্যাকরণের ধার ধারেন না। শাস্ত্রীয় নাচের নাম করে সর্বত্র নিজেদের মৌলিক অধিকার প্রয়োগ করেন এবং যা-তা একটা সস্তা দরের আবেদন ফুটিয়ে তুলে লোকরঞ্জনের চেষ্টা করেন। যাকে জগাখিচুড়ী ছাড়া আর কি আখ্যা দেওয়া যেতে পারে! এঁদের নাচ গানের আসরে লোকের ভীড়ও বড় কম হয় না। অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় যে, নাচ-গানের শিক্ষকতার ক্ষেত্রে এঁদের গুরুগিরি আজকাল সংক্রামক ব্যাধির মত ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করছে।

(ঙ) নাচ-গান শেখানোর ক্ষেত্রে আর এক রকমের গুরুজীরা আছেন যাঁরা নিজেদের স্বয়ংসম্পূর্ণ ভাবেন। এঁদের মধ্যে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত দুই-ই আছেন। এঁদের বংশানুক্রমিক পেশাই হোল নাচ-গান শিক্ষা দেওয়া। শাস্ত্রের নির্দিষ্ট পথকে ষোল আনা অধিগত না করেই গুরু পরম্পরায় যে শিক্ষা পেয়ে এসেছেন তার ওপর নির্ভর করে নিজেদের ছাত্রদের এঁরা শিক্ষা দিয়ে থাকেন। কতকগুলি কিংবদন্তী, সংস্কার আর গোঁড়ামীর ওপর একটা মোটামুটি বাচিক পদ্ধতি খাড়া করে তার সাথে নিজস্ব পদ্ধতি মিশিয়ে খাঁটি জিনিস শেখাচ্ছেন বলে দাবী করেন। এঁদের মধ্যে অনেকেই আবার কোন গুরুর কাছে দীর্ঘকাল ধরে শিক্ষালাভ করেন নি। বিভিন্ন গুরুর কাছে অল্প অল্প সময় থেকে পাঁচমেশালী অঙ্গভঙ্গী আর গোঁড়ামী সঞ্চয় করেছেন। এই ধরণের গুরুজীরা এক একটা সম্প্রদায় গড়ে তুলেছেন। নিজস্ব বিদ্যালয়ও গড়ে তুলেছেন। বড় বড় আসরে এঁরা সম্প্রদায় নিয়ে খাঁটি মার্গনৃত্য প্রয়োগ করেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এই ধরণের গুরুজীদের মধ্যে কারো সাথে কারো শিক্ষাদান পদ্ধতির মিল তো নেই-ই এমন কি খাঁটি মার্গনৃত্যেরও কোন মিল নেই। উপরন্তু একে অন্যের ত্রুটি ধরে থাকেন।

নাচের ক্ষেত্রে বর্তমান অবস্থাটা ঠিক মত বোঝানোর জন্ম কথাগুলি না বললে সমস্যাটি সাধারণের কাছে জটিল হয়েই থাকবে। এখন আসল সমস্যা হোল অরাজকতা। নাচ-গানের ক্ষেত্রে বিশেষ করে নাচের ক্ষেত্রেই অরাজকতা চলছে পুরোদমে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে—মনে করুন কোন একটি দৃশ্যের পরিকল্পনা ক্লাসিক পদ্ধতিতে কোন এক গুরুজী করলেন। যদি অন্য এক গুরুজীকে দিয়ে সেই দৃশ্যটি তৈরী করান হয় তাহলে দেখা যাবে আগেরটির সাথে পরেরটির কিছুমাত্র সাদৃশ্য নেই। আগেরটি যদি গিয়া থাকে শ্যামবাজারের দিকে, পরেরটি গিয়াছে বেলেঘাটায়। কিন্তু মার্গসঙ্গীতের ক্ষেত্রে তো এমনটি হয় না। বিভিন্ন ওস্তাদ মালকোষ বা বেহাগ যদি গেয়ে যান তাহলে শাস্ত্রীয় যে বাদী-সম্বাদী, রাগ-রূপ, স্বরগ্রাম, আরোহ-অবরোহ এবং সব জড়িয়ে রাগটির যে কাঠামো বা রূপ তার বিশেষ কোন পরিবর্তন হবে না। এর অর্থ সোজা মার্গসঙ্গীতের ক্ষেত্রে এখনো অরাজকতা ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করেনি। আরো সোজা ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয় মার্গসঙ্গীত চর্চার ক্ষেত্রে একটা মান (**Standard**) আছে। যার জন্য মালকোষ বা অন্য যে কোন শাস্ত্রীয় রাগের পরিবেশনে যে কোন ওস্তাদের কণ্ঠেই সেই রাগের মূল সুরটি শুনতে পাওয়া যাবে।

এটি হওয়াই স্বাভাবিক। অন্ততঃ যার পেছনে কোন শাস্ত্র আছে, কোন বিজ্ঞান আছে তার মূল রূপের কোন বিভিন্নতা হবে না। অথচ নাচের ক্ষেত্রে এ সবের কোন বালাই নেই। এ বিষয়ে গুরুজীদের প্রদত্ত উত্তর মোটেই যুক্তিসঙ্গত নয়। কারণ তাঁরা যুক্তি মানেন না, গুরু পরম্পরায় পাওয়া সংস্কার আর গোঁড়ামীকেই দাম দেন বেশী। একের ধারণা তাঁর পরিকল্পনাই শাস্ত্রসম্মত, অপরের পরিকল্পনা অশাস্ত্রীয়। ঠিক এই অরাজক অবস্থার ভেতর দিয়ে কোন শাস্ত্রীয় পদ্ধতি সম্পন্ন কলাবিদ্যার উন্নতি সাধন সম্ভব কি? শহরে ও শহরাঞ্চলে যাঁরা নাচ শিখিয়ে থাকেন তারা এই অরাজকতা দমনে সক্রিয় হলে তবেই হবে সম্ভব। নচেৎ সুনির্দিষ্ট ও সুনিয়মিত পদ্ধতি থাকা সত্ত্বেও শাস্ত্রীয় কলাবিদ্যার অপমৃত্যু ডেকে আনা হবে। সম্প্রতি যুগান্তর পত্রিকায় কোন একটি বাংলাভাষায় রচিত নাচের বই এর সমালোচনা প্রসঙ্গে তাঁরা যে ইঙ্গিত দিয়েছেন অপ্রাসঙ্গিক হবে না ভেবে তার উল্লেখ করি…"নৃত্য সম্প্রতি বাংলা দেশে বহু বিস্তৃতি লাভ করিতেছি। অথচ ইহার গুরুত্ব সম্বন্ধে অনেকেই সচেতন নহেন।…আমরা আশা করি, ভবিষ্যতে অধিকতর ব্যাপক ভাবে নৃত্য শিক্ষা পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করিবেন এবং বাংলায় এই শিক্ষার ক্ষেত্রে যে অরাজকতা চলিয়াছে, তাহার উপশমে সাহায্য করিবেন।"

নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিচার করলে এই অরাজক অবস্থার জন্য কাউকেই দায়ী করা চলে না। কলাকারদের স্বইচ্ছায় নাচ শেখানোর ক্ষেত্রে এই অরাজকতা আসেনি। স্বভাবতঃ এসে গেছে এ দেশের রাজনৈতিক ওলট-পালটের মধ্যে, এসে গেছে পরাধীনতার দুর্বল মুহূর্তে। আজ যখন আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি তখন আমাদের লুপ্তপ্রায় একটি ঐতিহ্যের খাঁটি চেহারাকে খুঁজে বার করতেই হবে। নাচের রাজ্যে অরাজকতা সমস্যাটি এখনো এমন জট পাকায়নি যা আমাদের আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে। চেষ্টার দ্বারা অনুশীলনের দ্বারা, সকলের সমবেত সহযোগিতার দ্বারা নাচ শেখানোর বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিকে আমরা আবার ফিরে পেতে পারি। কয়েকজন নিষ্ঠাবান কলাবিদের অভিমত অনুযায়ী নাচের রাজ্যে অরাজকতা দমনে কি কি উপায় অবলম্বন করা দরকার তার উল্লেখ করছি।

(১) নির্দিষ্ট পাঠ্যক্রম প্রণয়ন।

(২) সুনির্দিষ্ট ও সুনিয়মিত ব্যবহারিক পদ্ধতি নির্দ্ধারণ।

(৩) যে সিলেবাস তৈরী হবে তাকে মেনে চলবার জন্যে নৃত্য শিক্ষকদের উৎসাহিত করা দরকার।

(৪) নাচের পাঠ্যক্রম অনুযায়ী খণ্ড খণ্ড পুস্তক প্রকাশ।

(৫) সরকারী পরিচালনাধীনে পরীক্ষা গ্রহণ।

এ সব যে নৃত্য শাস্ত্রসম্মত হবে এ কথা বলাই বাহুল্য। এ বিষয়ে সহযোগিতা করার জন্য তরুণীদের এগিয়ে আসতে হবে। এগিয়ে আসতে হবে কলা রসিক জনসাধারণকে। আর বেশী করে সক্রিয় হতে হবে নৃত্য-নাটক-আকাদমীকে। তিন মাথা একত্র হলে নাচের রাজ্যে অরাজকতা দমনের সুনির্দিষ্ট পন্থা নিশ্চয়ই নির্দ্ধারিত হবে। —শ্রীগোপী ভট্টাচার্য

রেকর্ড-পরিচয়

এবার পুজোর জন্যে যে নতুন রেকর্ডগুলি প্রকাশিত হয়েছে, তার সংক্ষিপ্ত পরিচয়:—

হিজ মাষ্টার্স ভয়েস

P 11933—"না না ফুটনারে ফুল" ও "কথা দিয়ে এলে না"—বৈশিষ্ট্য অভিনবত্বে পূর্ণ দু'খানি আধুনিক গান গেয়েছেন কুমার শচীন দেববর্মণ।

N 82795—শ্রীমতী সুচিত্রা মিত্রের কণ্ঠে "মেঘের পরে মেঘ জমেছে" ও "সকালবেলার কুঁড়ি আমার" দু'খানি রবীন্দ্র-সংগীত।

N 82796—বোম্বাই-প্রবাসী সুনিপুণ গায়ক মান্না দে'র কণ্ঠে দু'খানি আধুনিক গান—"এ জীবনে যত ব্যথা" ও "আমি সাগরের বেলা।"

N 82797—পরিবেশন দক্ষতায় অপূর্ব শিল্পী মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে "এই নিরালা সাগর বেলায়" ও "জীবনের এই যে মধুর"—দু'খানি আধুনিক গান।

N 82798—তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুরাগভরা কণ্ঠের দু'খানি আধুনিক গান—"চম্পাকলি গো" এবং "ও রাজকন্যে, আমার জন্যে।"

N 82799—অনবদ্য দু'খানি আধুনিক গান—"জল টল্ টল্ তালপুকুরে" ও "অরুণ-বরুণ-কিরণমালা" গেয়েছেন কুমারী বাণী ঘোষাল।

N 82800—শ্রীমতী কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠমাধুর্যে মধুর দু'খানি অতুলপ্রসাদী গান—"যখন তুমি গাওয়াও গান" ও "মোরা নাচি ফুলে ফুলে।"

N 82801—জনচিত্ত আলোড়নকারী শিল্পী কুমারী আল্পনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠ-ঝংকারে লোভনীয় দু'খানি আধুনিক গান—"বকুল গন্ধে যদি" ও "ছোট্ট পাখী চন্দনা।"

N 82802—সনৎ সিংহের দু'খানি আধুনিক গান "দুর্গোৎসব" "দেওয়ালী"—সময়োপযোগী।

N 82803—গভীর ভাবাবেগে গাওয়া শিল্পী সতীনাথ মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে দু'খানি আধুনিক গান—"ঐ দূর আলেয়ার" ও তুমি যে আমার বিকল রাতের।"

N 82804—পল্লীগীতির সুর-ঝঙ্কার মেশানো "চোখের নজর কম হলে" ও "কার মঞ্জীর বাজে"—গেয়েছেন শ্যামল মিত্র।

N 82806—তালাত মামুদের মায়াঝরা কণ্ঠে গাওয়া দু'খানি আধুনিক গান—"এলো কি নতুন কোনো" ও "সুন্দরতর তুমি।"

N 82805—"লেডী টাইপিষ্ট" (কৌতুক-নক্সা)—এতে অভিনয় করেছেন ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীমতী তপতী ঘোষ।

কলম্বিয়া

GE 24905—আধুনিক ও রাগপ্রধান গান দিয়ে শিল্পী ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য এবারের অর্ঘ্য সাজিয়েছেন—"তোমার ভাল লাগাতে" ও "চামেলী মেলনা আঁখি।"

GE 24906—গীতশ্রী কুমারী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের সুমধুর কণ্ঠে গাওয়া দু'খানি আধুনিক গান—"এই নদীতীরে খুঁজিয়া বেড়াই" ও "মরমী গো আজি।"

GE 24907—শিল্পী পান্নালাল ভট্টাচার্যের কণ্ঠে শ্যামা-সংগীত—"জেনেছি জেনেছি তারা" ও "জগত তোমাতে তোমারি মায়াতে।"

GE 24908—কুমারী গায়ত্রী বসুর আবেগময় কণ্ঠে গাওয়া দু'খানি আধুনিক গান—"যেন গোলাপ হ'য়ে উঠলো হিয়া" ও "আমার সন্ধ্যাপ্রদীপ।"

GE 24909—গীতশ্রী কুমারী ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়ের দু'খানি ধর্মমূলক গান—"দেহি দেবী দরশন" ও "দিলে না দিলে না দিন।"

GE 24910—কণ্ঠ-লালিত্যে মধুর দু'খানি আধুনিক গান—"এতো কাছে পেয়েছি তোমায়" ও "ওই কোকিল শোনায়"—গেয়েছেন কুমারী ইলা চক্রবর্তী।

GE 24911—"দুরন্ত ঘূর্ণির এই" ও "পথ হারাবো বলেই এবার"—গেয়েছেন সর্বজনপ্রিয় শিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

GE 24912—শ্রীমতী লতা মুঙ্গেশকরের মধুকণ্ঠে গাওয়া দু'খানি আধুনিক গান—"প্রেম একবারই এসেছিল" ও "ও পলাশ ও শিমুল।"

GE 24913—শ্রীমতী আশা ভোঁসলের সুধা-ঝরা কণ্ঠের দু'খানি আধুনিক গান—"তোমার মনের সুবা" ও "আমার জীবনে তুমি।"

GE 24914—স্বনামধন্যা শিল্পী শ্রীমতী প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আধুনিক গান—"চাঁদ ভাবে জ্যোৎস্না ঢেলেছে" ও "মেঘলা ভাঙা রোদ উঠেছে।"

GE 24915—সুরপ্রধান দু'খানি আধুনিক গান—"ফুলের বনে লাগলো" ও "একটু চাওয়া আর একটু পাওয়া"—গেয়েছেন দক্ষা শিল্পী শ্রীমতী গীতা দত্ত।

GE 24916—দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়ের উদাত্ত কণ্ঠের দু'খানি আধুনিক গান—"সাতনরী হার" ও "চম্পা বনে লোন লোন।"

আমার কথা (৪৪)

শ্রীতিমিরবরণ ভট্টাচার্য্য

১৯০৪ সনের ১০ই জুলাই কলিকাতার এক বিশিষ্ট সাধক-বংশে শ্রীভট্টাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন। পিতামহ ছিলেন তন্ত্রগুরু ৺জগমোহন তর্কালঙ্কার, পিতা ৺জ্ঞানেন্দ্রনাথ তন্ত্ররত্ন ও মাতা ভট্টপল্লীর তনয়া ৺শৈল দেবী। প্রসিদ্ধ সঙ্গীত-সাধক যদুভট্ট ছিলেন মায়ের মাতুল। তিন ভ্রাতা ও চার ভগিনী। তিন-চার বৎসর হইতে তিনি গান গাহিতেন—গলার স্বরে মিষ্টতা থাকায় বাবার শিষ্য-শিষ্যা সমাগমে ভক্তিমূলক গান শোনাইতেন। তদুপরি গানে আগ্রহ আসে বাবার শিষ্য মহারাজ স্যার প্রদ্যোৎ ঠাকুরের আমন্ত্রিত বিশিষ্ট গায়কদের স্বগৃহে সমাবেশে। পাঁচ বৎসর বয়সে সংস্কৃত কলেজিয়েট বিদ্যালয়ে ভর্তি হন, কিন্তু প্রথমবারে ফেল করায় গৃহে বাবার কাছে পড়াশুনা চলিত। তবে উক্ত স্কুলের সারস্বত সম্মেলনে নিয়মিত গান গাহিতে হইত। পাঁচ বৎসরে মাকে হারান, আর দশ বৎসর বয়সে পিতা পরলোকগমন করেন। অপুত্রক জ্যাঠামহাশয় তাঁহাদের মানুষ করিয়া তোলার দায়িত্ব নেন। তখন তিনি সিটি ট্রেনিং স্কুল ও ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীতে পড়াশুনা করিতেন। চোদ্দ বৎসরে জ্যেঠামশায়কে চিরকালের মতন হারালেন। দ্বাদশ বৎসরে ৺মহিম চ্যাটার্জ্জির পুত্র ৺রাজেন্দ্রনাথের নিকট উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীতে ক্লারিওনেট বাজান শিখিতে থাকেন। সেই সময় কলিকাতায় অনুষ্ঠিত শঙ্কর-উৎসব, লালচাঁদ-উৎসব ও মুরারি-উৎসবে সঙ্গীত-শ্রোতা হিসাবে উপস্থিত থাকিতেন। আর ৺রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামীর নিকট রাগ-রাগিণী শিখিতেন। প্রথম হইতে তিনি প্রত্যহ আঠার ঘণ্টা সাধনা
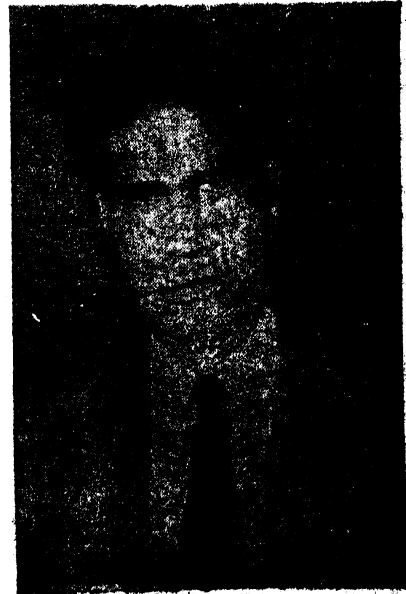
শ্রীতিমিরবরণ ভট্টাচার্য্য

করিতেন এবং একাদিক্রমে ছয় বৎসর Solo বাজাইয়া ছিলেন। রাজেনবাবুর নিকট ব্যাঞ্জোও শিখিতেন কিন্তু তৎকালীন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সরোদ-নির্ম্মাতা গোবর্দ্ধন মিস্ত্রীর পরামর্শে ওস্তাদ কেরামতুল্লার সহিত শিক্ষণের জন্ত সাক্ষাৎ করেন। মনোমত না হওয়ায় তিমিরবরণ ১৯২০ সালে আমীর খাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। উক্ত গোবর্দ্ধন মিস্ত্রী নির্ম্মিত ৩৩ বৎসর পূর্ব্বেকার সরোদ যন্ত্রটি আজও তিনি সযত্নে রক্ষা করিতেছেন এবং বাজাইতেছেন।

হাফেজ আলী খাঁ সাহেবের নিকট-আত্মীয় আমীর খাঁ সাহেবের পাঁচ বৎসর প্রাণঢালা দরদ দিয়া শিক্ষণের পর ১৯২৫ সালে তিনি ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ সাহেবের সহিত মাইহারে গমন করেন।

আলাউদ্দীন খাঁ সাহেব কিছুকাল ক্লারিওনেট শেখেন স্বামী বিবেকানন্দের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ৺হাবু দত্তের নিকট। ১৯২৫ সালে তিনি মাইহার হইতে কলিকাতায় আসিলে তিমিরবরণ তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করার কথা জ্ঞাপন করিলে একদিন ওস্তাদজীকে সরোদ বাজনা শোনাইতে হয়। এক ঘণ্টা শুনিবার পর তিনি মন্তব্য করেন, "এত দরদ, এত স্নেহ, এত ভালবাসা দিয়া আমীর খাঁ যাহাকে নিজস্ব ঘরোয়ানার শিক্ষা দিয়াছেন—তাঁহাকে আমি 'পুত্রহারা' করিয়া মাইহারে তোমায় নিয়ে যাব না।" তিমিরবরণ শেষে পূর্ব্বগুরুর সম্মতি গ্রহণ করিয়া আলাউদ্দীন সাহেবের সঙ্গী হলেন এবং পাঁচ বৎসর সমস্ত সম্পদ উজাড় করিয়া ওস্তাদজী তাঁহাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন।

কলিকাতায় ফেরার পর ১৯৩০ সালে মিলন হল নৃত্যবিশারদ উদয়শঙ্করের সহিত দরদী যন্ত্র-শিল্পী তিমিরবরণের। নৃত্য সম্প্রদায়ের সঙ্গীত-পরিচালক হিসাবে তিনি রওনা দিলেন পরাধীন ভারতের প্রথম Cultural Missionএর সহিত বিদেশে ভারতীয় নৃত্যকলা প্রদর্শনীর জন্য। প্যারিসে ছয় মাস চলল মহড়া। তত্রস্থ 'শাঁজে-লিজে' মঞ্চে অভূতপূর্ব্ব জনসমাগম—নৃত্য ও বাজনার অপূর্ব্ব প্রশংসা পেল। তার পর চারি বৎসর তিমিরবরণ দলের সঙ্গে পরিভ্রমণ করলেন ইউরোপ, বর্ম্মা, ভারত, আমেরিকা ও দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া। বালী, জাভা, সুমাত্রা ও মালয়ের নাচ ও বাজনা শিল্পীর মনে রেখাপাত করল খুবই। তজ্জন্ত ১৯৩৪ সালে ভারতে ফিরে নিউ থিয়েটার্সে সঙ্গীত-পরিচালক হিসাবে যোগদান করেই গেলেন দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার দেশসমূহে কবিগুরুর ও ডাঃ সুনীতি চট্টোপাধ্যায়ের পরিচয়-পত্র নিয়ে। সঙ্গে ছিলেন শ্রীশ্যাম লাহা (ছয়া)। সেখানকার সুলতান সমস্ত দেখালেন আর প্রচুর অভ্যর্থনা জানালেন গুরুদেবের পরিচিত ভারতীয় শিল্পীকে। শুনে এলেন—দেখে এলেন—শিখে এলেন—হিন্দু-সংস্কৃতিতে পূর্ণ জাভা, বালী, সুমাত্রা ও মালয়ের সঙ্গীত ও নৃত্য। সেই স্থানে জার্ম্মাণ সঙ্গীত-বিশেষজ্ঞ Dr. Spieceএর সহিত পরিচিত হন।

নিউ থিয়েটার্সে থাকার সময় বিজয়া (দত্তা), হিন্দী দেবদাস, পূজারিণ (দেমাপাওনা) ও অধিকার (হিন্দী ও বাংলা) ছায়াছবির সঙ্গীত পরিচালনা করেন। ১৯৩৬ সালে CAPএর সঙ্গীত-পরিচালক হিসাবে সাবিত্রী, ওমরখৈয়াম, বিদ্যুৎপর্ণা ও সাধনা বসুর Dance-Dramaর অংশ গ্রহণ করেন। ইহার পর বোম্বেতে 'কুমকুম' (হিন্দী ও বাংলা), মধু বসু পরিচালিত Court-Dancer ও রাজনর্ত্তকীতে (হিন্দী ও বাংলা) সুরকার ছিলেন। ১৯৪২ সালে সাধনা বসুর নৃত্য-সম্প্রদায়ে সঙ্গীত-পরিচালক এবং ১৯৪৩ সালে ৺প্রমথেশ বড়ুয়া পরিচালিত 'উত্তরায়ণ'এ সুরদাতা হন। সেই সময় কলেরায় আক্রান্ত হইয়া তাঁহার প্রাণ-সংশয় উপস্থিত হয়। ১৯৪৫ সালে লাহোরে জোহরা বেগমের সম্প্রদায়ে সঙ্গীত-শিক্ষক ছিলেন। ১৯৫২ সালে বোম্বাইতে সাধনা বসুর 'অজন্তা' মঞ্চাভিনয়ে সঙ্গীত পরিচালনা করেন আর 'বাদবান' ও 'ফুটপাত' ছবিতে সুরারোপ করেন। ১৯৫৪ সালে করাচীতে গমন করিয়া 'ফাণ্ডকার', 'আনোখী' ও কয়েকটি ফিল্মের সুরকার হন। তিমিরবরণ ১৯৫৬ সালে আফরোজা ও বুলবুল চৌধুরীর নৃত্য-সম্প্রদায়ের সঙ্গীত-পরিচালক হিসাবে হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, সুইজারল্যাণ্ড ও ইটালী পরিভ্রমণ করেন। করাচীতে 'Dances of Pakistan' নামে একটি সরকারী ডকুমেণ্টারী ফিল্ম পরিচালনা করেন। রেডিও-পাকিস্তানে তাঁহাকে সুযোগ না দেওয়ায় তত্রস্থ সংবাদপত্রসমূহে প্রতিবাদ করা হয়। বর্ত্তমান বৎসরের জানুয়ারী মাসে ব্রিটিশ-পাক মিলিত উদ্যোগে মানিক ব্যানার্জ্জির 'পদ্মা নদীর মাঝি' ছায়াছবিতে তিনি সঙ্গীত-পরিচালক নিযুক্ত হন। এত দিনে তিনি একটি মনের মতন ছবিতে কাজ করবার সুযোগ পান। উহা সমাপ্তপ্রায়—লণ্ডনে সম্পাদনা হইতেছে—কেবল সরোদ বাজনার উপর নেপথ্য-সঙ্গীত হইবে বলিয়া তাঁহাকে শীঘ্রই তথায় যাইতে হইবে।

১৯৩৩ সালে অসুস্থ মহাত্মাজীর সাক্ষাৎপ্রার্থী হিসাবে তিনি তাঁহার একটি ছবি তোলেন এবং বোম্বেতে তাঁহার প্রার্থনা-সভায় 'পুরিয়া ধানেশ্রী' রাগে সরোদ বাজাইয়াছিলেন। মাইহার যাওয়ার পূর্ব্বে তিনি কবিগুরু, ইন্দিরা দেবী ও সরলা দেবী চৌধুরাণীকে যন্ত্র-সঙ্গীতে মুগ্ধ করিতে সক্ষম হন।

১৯৩০ সালে শ্রীমতী মণিকা দেবীকে বিবাহ করেন এবং একমাত্র পুত্র ২১ বৎসরের শ্রীমান ইন্দ্রনীল বর্ত্তমানে মাইহারে ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ সাহেবের নিকট সেতারে শিক্ষানবিশ করিতেছেন।

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সুপণ্ডিত, সাহিত্যরসিক ও গ্রন্থকার শ্রীমিহিরকিরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় বাল্যকাল হইতে বরাবর তিমিরবরণকে কণ্ঠ ও যন্ত্র-সঙ্গীতে প্রচুর উৎসাহ ও উদ্দীপনা দিতেন—সে কথা তিনি শ্রদ্ধার সহিত আমায় বার বার জানাইলেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতা শিশিরশোভন তাঁহার সঙ্গে বহুবার তবলা-সঙ্গীত করিয়াছেন। তিন ভ্রাতার কাব্যিক নামকরণ শুনিয়া বিশ্বকবি খুবই আনন্দিত হন। ইঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র মিহিরকিরণ বাবুর পুত্র শ্রীঅমিয়কান্তি ভট্টাচার্য্য একজন বিশিষ্ট সেতার-বাদক।

কলিকাতা বেতারকেন্দ্রে তাঁহার সৃষ্ট সিম্ফনী (Symphony) নিয়মিত বাজান হয়। ১৯৩৬ সাল হইতে ১৯৪৭ সাল পর্য্যন্ত যতগুলি গ্রামোফোন রেকর্ডে তিমিরবরণের যন্ত্র-সঙ্গীত গৃহীত হইয়াছে—অদ্যাবধি সেগুলির Negative সযত্নে রক্ষিত আছে।

শেষে শ্রীভট্টাচার্য্য আমায় জানাইলেন, "সঙ্গীতকে ধর্ম্মকেন্দ্রিক বিষয় হিসাবে গ্রহণ করেছি—আর যন্ত্র-সঙ্গীতে প্রয়োজন সুদৃঢ় স্বাস্থ্য।"

"Marriage has many pains, but celibacy has no pleasures."
—Samuel Johnson.

আগামী মহাপূজা ও ছায়ালোক

আর মাসখানেকের মধ্যেই এসে যাচ্ছে পূজো। বাঙলা দেশে বারো মাসে তেরো পার্বণ। পূজা অর্চনার বিরাম নেই এই দেশে। সকল পূজার চেয়ে শারদীয়া মহাপূজাই প্রতিটি বাঙালীর প্রাণমন এক নতুন আবেগে ভরিয়ে তোলে। এই পূজাকেই কেন্দ্র করে বাঙলা দেশে আসে এক অভূতপূর্ব প্রাণোন্মাদনা, অবর্ণনীয় উত্তেজনা, অভাবনীয় উদ্দীপনা। একে কেন্দ্র করে ঐ সময়েই বাঙলার ছায়া জগত ও বেশ জমে উঠবে আশা করা যায়। সব সময়ই দেখা যায় যে বাঙলা দেশের নির্মিত ছবিগুলির মধ্যে অনেকগুলিই মুক্তি প্রতীক্ষিত হয়ে পড়ে থাকে। স্বভাবতঃই পূজার অবকাশ বা পূজার আনন্দ ছায়ামোদী দর্শকদের দ্বিগুণ করে তোলার জন্য প্রদর্শকরাও যত্নবান হয়ে ওঠেন। অর্থাৎ বেশ ভালো ভালো কতকগুলি ছবি এই সময় মুক্তিলাভ করে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে শুধু এই জন্যেই বহু নির্মিত ছবি পড়ে থাকে, এই সময় ছাড়পত্র লাভ করবার জন্যে।

এ বছরই দেখা যাচ্ছে পূজোয়, কিংবা তার অব্যবহিত আগে বা পরে বেশ কয়েকটি জমাট ছবি মুক্তির তালিকায় রয়েছে। কাহিনীর দিক থেকে, অভিনবত্বের দিক থেকে, শিল্পকুশলতার দিক থেকে, প্রয়োগনৈপুণ্যের দিক থেকে, তারকা সমারোহের দিক থেকে এদের কোন না কোনটি বিশেষত্ব বহন করছে।

সত্যজিৎ রায়ের "জলসাঘর" এর নাম এই প্রসঙ্গে বিশেষ ভাবে মনে পড়ছে। এতে ছবি বিশ্বাসের অভিনয় দেখার জন্যে কত জন যে ব্যাকুল আগ্রহে দিনাতিপাত করছেন তার ইয়ত্তা নেই। তা ছাড়া সত্যজিৎ রায়ের ছবি দেখার আগ্রহ তো স্বাভাবিকই। তার উপর তারাশঙ্করের লেখনীর যে অপূর্বত্ব এর মধ্যে মেশানো আছে তার প্রতি আগ্রহও তো সাহিত্য তথা চিত্ররসিকদের কম নয়। "মরুতীর্থ হিংলাজ"ও এইরকম একখানি ছবি। অপরিচয়ের অন্ধকার থেকে খ্যাতির স্বর্গলোকে অবধূতকে আনে এই গ্রন্থটিই। প্রথম প্রকাশের লগ্ন থেকেই যে পরিমাণ সাড়া বাঙলা দেশে জাগাতে সক্ষম হয়েছে এই গ্রন্থটি, সমসাময়িক ইতিহাসে তার তুলনা পাওয়া বিরল। এক এক সময় অবধূত মরুতীর্থ হিংলাজের স্রষ্টা না মরুতীর্থ হিংলাজই অবধূতের স্রষ্টা—এই প্রশ্ন বেশ গভীর ভাবে মনকে আকৃষ্ট করে—এহেন কাহিনীর চিত্ররূপ যে চিত্তাকর্ষক হবে এ কথা বলাই বাহুল্য। যতদূর মনে হয় মরুতীর্থ হিংলাজ বোধহয় ঐ সময় নাগাদই মুক্তিলাভ করবে। একে কাহিনীর জোরালো আবেদন তার উপর বিকাশ-উত্তম-চন্দ্রা-সাবিত্রী। এই চতুঃশক্তির সম্মেলন—বাজার মাত যে করবে এবিষয়ে সন্দেহ আছে? সুশীল মজুমদারের পরিচালিত "পুষ্পধনু" প্রবোধ সান্যালের লেখা কাহিনীরই চিত্রায়ণ। ১৩৬২ সালের বসুমতীর শারদীয়া সংখ্যায় এই উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়েছিল, সেই থেকে বহুজনের মনে আলোড়ন এনেছে শক্তিশালী বক্তব্য। উত্তমকুমার ও অরুন্ধতী এর প্রধান চরিত্রগুলি কিরকম রূপ দেন দেখা যাক। "সাহেব-বিবি-গোলাম" এর পর সুমিত্রা-উত্তম একসঙ্গে আবার নামছেন "যৌতুক"এ। প্রবীণ সাহিত্যিক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের লেখা যৌতুক। সুমিত্রা-উত্তমএর একত্রে সমন্বয়ের প্রতি অনুরাগ অল্প জনের হবে না। সুচিত্রা-উত্তম সম্মেলন ধরুণ "ইন্দ্রাণীতে"ই। অচিন্ত্য সেনগুপ্তের কাহিনীর সার্থক চিত্রায়ণ হবে বলেই আশা করা যেতে পারে যদিও এর পরিচালক নীরেন লাহিড়ী,
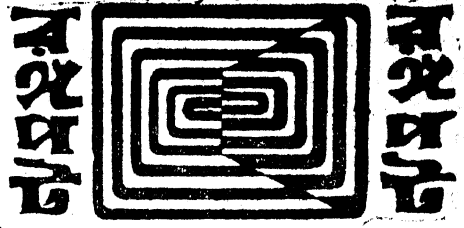
তাঁর পরিচালনায় ছবি কতখানি উতরোবে এ বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। তবু কাহিনীর জোরে এবং সুচিত্রা-উত্তম ও তৎসহ অন্যান্য শক্তিমান ও শক্তিময়ী শিল্পীদের অভিনয়কল্যাণে ইন্দ্রাণী জনপ্রিয় ছবির তালিকায় পড়বে বলে আশা করা যায়। "সূর্যতোরণের" কথা মনে করুন। গীতিকার গৌরীপ্রসন্নের লেখনীজাত এক সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে সৃষ্ট এর কাহিনী, বাস্তব সমস্যা গভীরভাবে এর অন্তর্ভুক্ত। এই চিন্তাপূর্ণ রচনাটি ছবিতে আসছে তারও প্রধানাংশে দেখা দেবেন সুচিত্রা-উত্তম। এঁরা ছাড়াও এর ভূমিকালিপিও অত্যন্ত সমৃদ্ধ। ছবির মধ্যে এমন বক্তব্য উপস্থাপন করা হচ্ছে যা দর্শককে রীতিমত ভাবিয়ে তোলে এবং নিছক আনন্দের পরিবর্তে সুস্থ আনন্দ পরিবেশন করে। মানুষের চিন্তাধারাকে গতির স্পর্শে সজীব করে তোলে।

শারদীয়ার আঙ্গিনায় ছায়ালোকের মাধ্যমে এঁরা আসছেন সুধী দর্শকদের যথাযোগ্য অভিবাদন জানাতে—এখন দেখা যাক এদের সম্বন্ধে আমাদের চিন্তাধারা কতদূর মিলে যায়।

বামাক্ষ্যাপা

অধ্যাত্মবাদের লীলাভূমি এই ভারতবর্ষ। এই ভারতবর্ষের মহামানবের সাগরতীরে যুগে যুগে ধন্য হয়েছে অসংখ্য মহাপুরুষের পদস্পর্শে। একশ' বছর আগে বাঙলা দেশ যখন আলো করে আছেন পরম ভট্টারক যুগত্রাতা রামকৃষ্ণ—সেই সময়েই বাঙলার আর এক প্রান্ত আলো করেছিলেন সাধক বামাক্ষ্যাপা। এই মহাসাধকের জীবনী চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়ে দর্শক সাধারণকে তৃপ্তি দান করছে। ছবিতে সাধকের বাল্যকাল থেকে সন্ন্যাসগ্রহণ সিদ্ধিলাভ তারপর সহস্র প্রতিবন্ধক অতিক্রম করে সর্বসাধারণের শ্রদ্ধা অর্জন করা এবং সর্বশেষে মহাসমাধিস্থ হওয়া দেখানো হয়েছে। আজকের দিনে বিশেষ করে এই স্বার্থপরতার, পরশ্রীকাতরতার, হিংসা-দ্বেষ-বিদ্বেষের কৃষ্ণ কুটিল দিনগুলিতে এই সব মহাপুরুষের পুণ্যজীবনের আলোক-সামান্য প্রভাব বিশেষ ভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। সুতরাং সাধারণ্যে এঁদের জীবন কাহিনীর প্রচার যতই হয় ততই মঙ্গল। তবে এই ছবিটি নিখুঁত নয়। নারায়ণ ঘোষ পরীক্ষার সীমারেখা অবধি পৌঁচেছেন মাত্র তবে তা তিনি অতিক্রম করতে পারেন নি। সমস্ত ছবিটিতে পরিচালন নৈপুণ্যের এতটুকু পরিচয়ও পাওয়া গেল না। সাধকের জীবনের অলৌকিক ঘটনাগুলির সম্পাদনার ক্ষেত্রেও তিনি ব্যর্থতাই দেখিয়েছেন, সাধকের মহাপুরুষত্ব দেখাতে গিয়ে ছবিটিকে তিনি রীতিমত ম্যাজিক-ধর্মী করে ফেলেছেন। এ জিনিষ এই জাতীয় ছবির গাম্ভীর্যের পরিমাণ বহুলাংশে লাঘব করে তোলে আর এ ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয় নি। অসংগতি তো আরও নানা জায়গায়—শ্মশানের বেদীর উপর বামা মাথা খুঁড়ছেন—মাথা খোঁড়া

যে ভাবে পরিচালক দেখিয়েছেন তাতে দর্শকদেরই শিরঃপীড়া ঘটে যায় কিন্তু যাঁর মাথা খোঁড়া দেখে তা হয় তাঁর কিন্তু রক্তারক্তি তো দূরের কথা কোথাও এতটুকু ফোলা পর্যন্ত দেখা গেল না।

একবার মাত্র বামাক্ষ্যাপাকে দেখা গেল দেশীয় গ্রাম্য ভাষায় কথা বলতে—তা ছাড়া আগাগোড়া সব জায়গাতেই দেখতে পাচ্ছি তিনি পরিষ্কার শহুরে ভাষায় কথা বলছেন, আশ্চর্যের কথা এই যে "খাবুনি, করবুনি" জাতীয় সংলাপ বীরভূমের নয়, বীরভূমের ভাষা আমাদের যতদূর জানা আছে "খাবেকনি, করব্যাকনি" এই জাতীয় বোধহয় হবে। পল্লীগ্রামের শ্মশানে নরমুণ্ড ছড়ানো থাকে এ কথা বহুজন সমর্থিত সত্য, কিন্তু সেই বহুজনের সমর্থনের সুযোগ নিয়ে এঁরা একেবারে সেই বহু হাজার বছর আগেকার কোন রাজার গুপ্ত ধনভাণ্ডার বানিয়ে তুলেছেন শ্মশানটিকে। বামাক্ষ্যাপাকে দিয়ে যে ভাবে কারণ-পাত্র ধরানো হয়েছে তা যেমনই ত্রুটিপূর্ণ আর তেমনই ক্ষমার অযোগ্য। কারণ-পাত্র ধরার রীতি পরিচালকের যদি নাই জানা থাকে তবে কেন তিনি এ বিষয়ে অভিজ্ঞ কোন উপযুক্ত ব্যক্তির কাছ থেকে জেনে নিলেন না—**There are more things in heaven and earth, than that of your philosophy, Horratio.** বামাক্ষ্যাপার বাল্যাবস্থায় ছোট পুরোহিতকে আমরা দেখছি, তারপর তিনি বড় হলেন, সন্ন্যাসী হলেন, সিদ্ধপুরুষ হলেন, এমন কি দেহরক্ষাও করলেন—ছোট পুরোহিত যেমনকার তেমনটিই রয়ে গেল, তার আকৃতির বা স্বাস্থ্যের কোন পরিবর্তনই দেখা গেল না। এঁকে কি পরিচালক জনি ওয়াকারের সঙ্গে তুলনা করছেন, না এই ছবির মাধ্যমে পরিচালক নিজেই কোন যৌবন-সংরক্ষণী সভার প্রচার সচিবের কাজ করছেন তা বোঝা দুষ্কর। সমগ্র ছবিতে আর একটি জিনিষ দেখা গেল যে ছবির মধ্যে এমন একটা ভাব প্রচার করা হয়েছে যাতে করে মনে হয় যে এক বামাক্ষ্যাপা নিজে ছাড়া আর কোন খ্যাতিমান বা সাধক পুরুষ সে সময় এ দেশে বিদ্যমান ছিলেন না। ছবির পটভূমিকাকে রীতিমত কোণঠাসা করে রাখা হয়েছে। মর্ত্যজীবনে ঠাকুর প্রমুখ যে সব মহামানবদের বা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রমুখ যে সব খ্যাতিধর পুরুষদের সংস্পর্শে বামাক্ষ্যাপা এসেছিলেন সে সম্বন্ধে উল্লেখ পর্যন্ত নেই বরং ছবির এই অভাবটা যতদূর সম্ভব প্রচারের দিক থেকে ভরিয়ে তুলেছেন দীপ্তেন্দ্রকুমার সান্যাল সুতরাং এর জন্যে অভিনন্দন দীপ্তেন্দ্রকুমারের প্রাপ্য, এঁদের নয়। কলা কৌশলের ক্ষেত্রে সকলকে অতিক্রম করে গেছেন অনিল বাগচী। তাঁর সঙ্গীত পরিচালনা সুবিশেষ উপভোগ্য। অভিনয়ে দক্ষতার ছাপ রেখেছেন গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মলিনা দেবী এবং শ্রীমতী জয়শ্রী, এই তিনজনের অভিনয়ের মধ্যে দিয়েই চরিত্রগুলি জীবন্ত হয়ে উঠেছে। ছবি বিশ্বাস, কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, নীতীশ মুখোপাধ্যায়, মিহির ভট্টাচার্য, তুলসী চক্রবর্তী, হরিধন মুখোপাধ্যায়, মণি [illegible] এবং পদ্মা দেবীর অভিনয়ও যথোচিত প্রশংসার দাবী রাখে। এঁরা ছাড়াও ভূমিকালিপিতে আছেন জহরলাল মুখোপাধ্যায়, [illegible] চট্টোপাধ্যায়, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, ধীরাজ দাস, ননী মজুমদার, বেচু সিংহ, ধীরেশ মজুমদার, খগেন পাঠক, মেনকা দেবী, ইরা চক্রবর্তী, কমলা অধিকারী প্রভৃতি।

"প্রাচী"র দশম বর্ষে পদার্পণ

দীর্ঘ দশ বছর জনসাধারণের মনোরঞ্জন করে প্রাচী সিনেমা দর্শকের কাছে প্রিয় চিত্রগৃহ হয়ে উঠেছে। বাংলা ছায়াছবির প্রসারে এঁদের দৃষ্টি সজাগ, কেন না এই দশ বছরে মাত্র দুটি হিন্দী ছবি এখানে প্রদর্শিত হয়েছে। জন্ম বার্ষিকীতে অন্যান্য চিত্রগৃহের মত আনন্দ উৎসবে অর্থ ব্যয় না করে সেই অর্থ এঁরা চিত্রগৃহের কর্মীদের মধ্যে বণ্টন করে দিয়েছেন। সিনেমা কর্মীদের জন্য প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড প্রচলন করে এবং যাদবপুর টি বি হাসপাতালে একটি বেড ও অন্যান্য বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে বহু অর্থ দান করে কর্তৃপক্ষ মহত্ত্বের ও উদারতার পরিচয় দিয়েছেন। আমরা এই প্রতিষ্ঠানের এবং তার কর্তৃপক্ষেরও উত্তরোত্তর উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

রঙ্গপট প্রসঙ্গে

বাঙলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে আশুতোষ মুখোপাধ্যায় আজ একজন খ্যাতিমান পুরুষ। তাঁর সাহিত্যসৃষ্টি শুধু সাহিত্যই নয়, চলচ্চিত্র জগতকেও পুষ্ট করেছে রীতিমত। অসিত সেনের পরিচালনায় তাঁর "দ্বীপ জ্বেলে যাই" কাহিনীর চিত্ররূপ গৃহীত হচ্ছে। এতে অভিনয়াংশে দেখা যাবে পাহাড়ী সান্যাল, বসন্ত চৌধুরী, অনিল চট্টোপাধ্যায়, তুলসী চক্রবর্তী, অজিত চট্টোপাধ্যায়, শ্যাম লাহা, চন্দ্রা দেবী, সুচিত্রা সেন, নমিতা সিংহ, কাজরী গুহ, অপর্ণা দেবী প্রভৃতিকে। * * * বৌদ্ধযুগের পটভূমিকাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠছে "আম্রপালী"র চিত্ররূপ। সঙ্গীতের ভার নিয়েছেন পঙ্কজ মল্লিক এবং শ্রীতারাশঙ্করের পরিচালনায় অভিনয়ের জন্যে নির্বাচিত হয়েছেন ছবি বিশ্বাস, কমল মিত্র, নীতীশ মুখোপাধ্যায়, অসীমকুমার, দীপক মুখোপাধ্যায়, মণি শ্রীমাণী, শ্রীমান্ বিল্টু, শ্রীমান্ বাবুয়া, শ্রীমান্ দেবাশীষ, শোভা সেন, সুপ্রিয়া চৌধুরী, সুদীপ্তা রায়, লীলা পাল ইত্যাদি। * * * সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালনা করছেন "অদৃশ্য ইঙ্গিত" এর মাধ্যমে যে সব শিল্পীদের দেখা যাবে তাঁদের নাম ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ী সান্যাল, নীতীশ মুখোপাধ্যায়, অসীমকুমার, দীপক মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রা দেবী, সুপ্রিয়া চৌধুরী, কল্পনা দে। * * * সুশীল মজুমদার পরিচালনা করছেন "অগ্নিসম্ভবা" যাঁদের অভিনয়ে চরিত্রগুলি রূপ লাভ করবে তাঁদের মধ্যে ছবি বিশ্বাস, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মলকুমার, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, নৃপতি চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। * * * "সংযোগ" ছবিটি তোলা হচ্ছে চিত্রতন্ত্রর পরিচালনায়, সঙ্গীতাংশ গৃহীত হচ্ছে অনিল বাগচীর নির্দেশনায়। রূপায়ণে থাকছেন বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুপকুমার, সন্তোষ সিংহ, মলয়া সরকার, নীলিমা দাস, লীলা পাল, রাজলক্ষ্মী প্রমুখ শিল্পিবর্গ।

স্মৃতির টুকরো

সাধনা বসু

পিছনে ফেলে এলুম সমগ্র অতীত। যে অতীত পিছিয়ে গেল, হারিয়ে গেল অবলুপ্তির অন্ধকারে, তবু সে মরল না—কালকে সে জয় করল এবং তারই চিহ্নস্বরূপ অনন্তকাল ধরে সে বেঁচে রইল তারই বুকের উপর দিয়ে ঘটে-যাওয়া ঘটনাগুলোর মাধ্যমে। সেই নানা রঙে

রঙানো, মধু-বিচিত্র অতীতকে স্মৃতির সূত্র ধরে টেনে আনতে চেষ্টা করছি বর্তমানের আঙিনায়। তার প্রারম্ভে যে কথাটি আমার অকপটে স্বীকার করতে কোনই বাধা নেই—সেই কথাটি হচ্ছে যে এই প্রচেষ্টা আমার পক্ষে এক দুঃসাধ্য প্রচেষ্টারই নামান্তর মাত্র।

পৃথিবীর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় কলকাতার সমবায় ম্যানসন (পুরোনো হিন্দুস্থান ভবন) এরই একটি ঘর থেকে। বংশমর্যাদার দিক থেকে নিজেকে সৌভাগ্যশালিনী মনে করার পিছনে যুক্তিও আমার অল্প আছে বলে মনে হয় না—যদিও ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের নাতনী হওয়ার কতখানি যোগ্যতা আমার আছে সে বিষয়ে আমার নিজেরই সন্দেহ আছে যথেষ্ট পরিমাণে। আমার বাবা স্বর্গীয় ব্যারিষ্টার সরলচন্দ্র সেন ছিলেন ব্রহ্মানন্দের চতুর্থ পুত্র। রেঙ্গুনের প্রথম ভারতীয় প্রধান শাসক (Administrator General) চট্টগ্রামের পরলোকগত পি, সি, সেন ছিলেন আমার মাতামহ। তাঁরই চতুর্থী কন্যা স্বর্গীয়া নির্মলা সেন ছিলেন আমার মা।

কিছুকালের জন্যে ঠাকুরদাদা পুণ্যশ্লোক মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের একজন বিশেষ অনুগামী ছিলেন। ঠাকুরদাদার চিন্তাধারা ছিল এক পরিপূর্ণ স্বাতন্ত্র্যে ভরপুর। সেই জন্যেই তাঁর ভাবধারার সঙ্গে হাত মেলাতে পারলেন না তাঁর আত্মজনেরা। ফলে বিরোধ হয়ে উঠল অলঙ্ঘ্য। যার জন্যে ঠাকুরদাদাকে বাড়ী ছেড়ে জোড়াসাঁকোয় (মহর্ষির আশ্রয়ে) আশ্রয় নিতে বাধ্য হতে হয়। মহর্ষিকে ঠাকুরদাদা দিয়েছিলেন প্রগাঢ় ভক্তি, বিনিময়ে তাঁর কাছ থেকে পেয়েছিলেন অগাধ স্নেহ, সেইজন্যেই পুত্রের মর্যাদা দিয়ে নিজের আশ্রয়ে তাঁকে সাদরে টেনে নিতে মহর্ষি দ্বিধাবোধ করেন নি। তা ছাড়া ঠাকুরদাদার ভিতরকার প্রগতিবাদের উপরেও মহর্ষির ছিল সুগভীর আস্থা। কিছুকাল পরে ঠাকুরদাদা তাঁর পৈতৃক ভদ্রাসনের নিজস্ব অংশটুকু বিক্রি করে দেন এবং আপার সার্কুলার রোডের লিলি কটেজ (কমল-কুটীর) কিনে নেন। এই লিলি কটেজেই আমার ছেলেবেলার চপল-বিভোর দিনগুলো কেটেছে আর আমাদের চার হাত এক হওয়ার ব্যাপারটাও ওখান থেকেই ঘটেছে।

এবারে আবার নিজের গণ্ডীর মধ্যে ফিরে আসা যাক, বোধ করি তাই সমীচীন। আপনাদের দরবারে আমার যৎসামান্য পরিচিতির মূলে যে নাট্যপ্রতিভা বিদ্যমান, পরিমাণে তা যতই কম হোক না আমার নিজের মতে তার সবটুকুর উপরেই পড়েছে ঠাকুরদাদার প্রভাবের ছায়া। কেবলমাত্র ধর্মীয় এবং সামাজিক আন্দোলনেই তাঁর প্রতিভা সীমাবদ্ধ ছিল না, নাটকরচনাতেও পাওয়া গেছে তাঁর কুশলতার পরিচয়। অভিনয়ের ক্ষেত্রেও দেখিয়ে গেছেন এক অনন্যসাধারণ দক্ষতা। তাঁর নাটকগুলির মধ্যে "নববৃন্দাবন"এর নাম সবিশেষ উল্লেখনীয়। এতে পাহাড়ীবাবার ভূমিকায় নিজে অবতীর্ণ হয়ে বহুজনের মনে আনন্দের খোরাক তিনি জুগিয়েছিলেন। বহু বছর বাদে, আমাদের বাল্যকালে ঐ ভূমিকাতেই বাবাও অবতীর্ণ হয়েছিলেন, সে ঘটনা আজও স্পষ্ট মনে পড়ছে। সেই স্মৃতিতে এখনও লাগে নি মালিন্যের এতটুকু ছোঁয়াচ পর্যন্ত।

ভাই-বোনে মিলিয়ে আমরা পাঁচজন এবং অশেষ সৌভাগ্যের নিদর্শনস্বরূপ এমন বাবা-মা পেয়েছিলুম যাঁরা উভয়েই ছিলেন গীতি-প্রেমী। লিলি কটেজে আমরা প্রায়ই নানাবিধ সঙ্গীতানুষ্ঠান ক'রে থাকতুম, প্রতিবেশীর ছেলেমেয়েদের নিয়েও আমরা বহু শিশু-উৎসব অনুষ্ঠান করেছি। আমাদের দলটির নাম দেওয়া হয়েছিল "বিসানী" এই নামকরণের পিছনে লুকিয়ে আছে এক তাৎপর্য। আমার দিদির নাম বিনীতা, অনুষ্ঠানের নাট্যাংশ রচনার ভার তাঁর উপরেই ন্যস্ত ছিল, আমার বোনের নাম নীলিনা। এমনি ভাবে আমাদের তিন বোনের নামের আদ্যক্ষর একত্রে করে "বিসানী"র সৃষ্টি।' এই হ'ল "বিসানী"র নামায়ণের ইতিহাস। আমার দাদা সুনীথচন্দ্র সেন ছিলেন (ছিলেনই বা বলি কেন এখনও আছেন) একেবারে খাঁটি গ্রন্থকীট, মার্গসঙ্গীতের প্রতি তো তাঁর অবর্ণনীয় আগ্রহ, তবলার উপরেও তাঁর ছিল সুনিপুণ দক্ষতা। এক কথায় গোটা ছেলেবেলাটা আমাদের কেটেছে এক অদম্য উত্তেজনার মধ্যে দিয়ে, এক নিরবচ্ছিন্ন আনন্দে আর বাঁধনহারা বাল-চপলতায়। এই ছেলেবেলা আমাদের কেটে গেছে যাত্রানুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে, মহিলা-মেলা (আনন্দবাজার) ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে। এই সব অনুষ্ঠানাদির খরচের ভারটা প্রধানতঃ বহন করতেন আমার বড়পিসীমা (কুচবিহারের মহারাণী স্বর্গীয়া সুনীতি দেবী) এবং আমার সেজপিসীমা (ময়ূরভঞ্জের মহারাণী সুচারু দেবী) অবশ্য পরিবারের অন্যান্য সদস্যেরাও প্রত্যেকে নিজেদের সাধ্যানুযায়ী এই ভার বহন করতে কার্পণ্য প্রকাশ করেন নি।

স্কুলের বয়েস এসে গেল। আমাকে পাঠানো হ'ল ঠাকুরদাদারই প্রতিষ্ঠিত ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিটিউশানএ। পরে আমাকে আর নীলিনাকে গেলুম লোরেটো কনভেন্টে আর ভিক্টোরিয়া থেকে প্রবেশিকার গণ্ডী পার হয়ে দিদি নাম লেখালেন বেথুন কলেজে

সাধনা বসু

এদিকে শুধু ইতিহাস-ভূগোল-ব্যাকরণের নীরস জগৎ আমাদের মন ভরাতে পারল না, তাই আমাদের তিন বোনকেই বাসা বাঁধতে হ'ল সুরের সরসলোকে। সঙ্গীতসঙ্ঘের খাতায় আরও তিনটি নাম যুক্ত হ'ল —দিদির আমার ও নীলিনার। এর প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছেন ডক্টর অশ্বিনী চৌধুরী (মহর্ষির সেজ ছেলে হেমেন্দ্রনাথের দৌহিত্র এবং বিচারপতি স্বর্গীয় স্যার আশুতোষ চৌধুরীর সেজ ছেলে)। সঙ্গীতসঙ্ঘের সঙ্গেই সঙ্গীত-সম্মিলনীতেও যোগ দিলুম, এর প্রাণ-পত্তন করেছেন স্বর্গীয় ডক্টর বনওয়ারীলাল চৌধুরীর সহধর্মিণী স্বর্গীয়া প্রমদা দেবী চৌধুরাণী। এ ছাড়া বাড়ীতেও আমরা বহু গুণীর লাভ করেছি শিষ্যত্ব। সঙ্গীতসঙ্ঘে গানের পাঠ দিয়েছেন গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, বাড়ীতে স্বর্গীয় গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী, কথকনাচের কলাকৌশলের সঙ্গে আলাপ জমিয়েছি তারকনাথ বাগচীর নির্দেশনায়। বাড়ীর বিভিন্ন সঙ্গীতানুষ্ঠানেও বহু গুণীকে দেখেছি অংশগ্রহণ করতে। এনায়েৎ খান, জামীর খান, আবদুল আজিজ খান, আবেদ হোসেন খান, গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী, কৃষ্ণচন্দ্র দে, কুন্দনলাল সায়গল, শচীন দেববর্মণ, রাইচাঁদ বড়াল, জ্ঞান দত্ত, তিমিরবরণ প্রভৃতি বহু-বন্দিত শিল্পীদের নাম এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে।

পিয়্যানোর সঙ্গেও আমার নেহাৎ অপরিচয় ছিল না। এর রীডগুলোর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেন মিঃ টি, ক্র্যাঙ্গোপোলো এবং আমার এক ভাইঝি মনীষা চৌধুরী (বড় জ্যাঠামশাই স্বর্গীয় করুণাচন্দ্র সেনের নাতনী)। গানের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল নীলিনা, ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে সে রেওয়াজ করতে পারত, কিন্তু সময়ের দীর্ঘসূত্রিতার সঙ্গে আপোষ করা আমার স্বভাববিরুদ্ধ। তাই সেই ম[illegible]টিকে সযত্নে পরিহার করে নিজের কানকে শোনাতুম গ্রামাফোন এঁ[illegible]দের গান এবং সেই অবসরকে ভরিয়ে তুলতুম নিজে ছোট ছোট প্রচুর পরিকল্পনা করে তার রূপ দিয়ে—আজ এতকাল বাদে যা একটি [illegible]লেখামুখী ছাড়া আর কিছু বলে মনেই হয় না।

হয়েছে [illegible]৬ সাল। দিদির বিয়ে হয়ে গেল একদিন। এক বৌদ্ধ কোন [illegible]র প্রধানের ছেলে (পরবর্তীকালে তিনিও প্রধানের আসনকে [illegible]ন অলঙ্কৃত) স্বর্গীয় রাজা নলিনাক্ষ রায়ের সঙ্গে। এ বিয়ে সকলকেই করেছিল বিস্মিত। কিন্তু আমরা ব্রাহ্মধর্মের উপাসক, তাই জাত-গোত্র-মেল এ সবকে আমরা বিশ্বাসের মর্যাদা দিতে পারি না, তা ছাড়া আমাদের পরিবারে এ জাতীয় বিবাহ সংখ্যায় কিছু কম যায় না। দিদির বিয়ের পর আমার ছোট ভাই প্রদীপচন্দ্র সেন জন্মাল। নীলিনার বয়েস তখন নয়। ছোট্ট প্রদীপ হয়ে উঠল আমাদের নয়নের মণি। নীলিনাতে আর আমাতে নিজেদের অধিকারের আওতায় সারাক্ষণ রাখতুম সেই ছোট্ট নাদুস-নুদুস শিশুটিকে।

বলতে গেলে সেই সময় থেকেই একটা পরিবর্তনের ঢেউ এল আমাদের মধ্যে নানা দিককে কেন্দ্র করে, যার তরঙ্গ আমাদের জীবনধারাকে নানাভাবে বদলে দিয়ে গেল। আমাদের সেই সব ছেলেবেলাকার অনুষ্ঠানগুলির পুরোপুরি যবনিকাপাত ঘটল। একটু একটু করে আমাদের চোখে আনন্দের অঞ্জন পরাতে পরাতে প্রদীপ বড় হতে লাগল, তার মন গড়ে উঠতে লাগল এক কাব্যময় অনুভূতির ভিতর দিয়ে। কাব্যের আমেজ ক্রমশঃ তার মনপ্রাণ আচ্ছন্ন করে ফেলল ঠিক যেমনটি দিদির মধ্যেও দেখা গিয়েছিল। এখনও প্রদীপ কাব্যের পূজারী, বহু কবিতা আজ পর্যন্ত জন্ম নিয়েছে তার কলম থেকে। গানের মধ্যেই মিশে রইল নীলিনা, প্রভূত খ্যাতি অর্জন করে কৃতিত্বের সঙ্গে মার্গসঙ্গীত পরিবেশন করে—এখনও এক অপূর্ব মাধুর্যমণ্ডিত কণ্ঠসম্পদের অধিকারিণী সে।

ছেলেবেলা থেকেই আমার মন ভীতিরসে বিহ্বল কিন্তু নীলিনার মন তেমনটিতো নয়ই বরং একেবারে বিপরীতধর্মী। সেই সময়ে আমার ও নীলিনার মধ্যে এক কৌতুককর ঘটনার অভিনয় ঘটত প্রতিটি নিশীথরাত্রে। পুতুল, চকোলেট ইত্যাদি কেনবার জন্যে ছেলেবেলায় আমাদের প্রত্যেকেরই কিছু হাতখরচের ব্যবস্থা ছিল। রাত্রে মাঝে মাঝে যখন চানঘরের তাগিদ আসত ঠিক সেই সময়ে কি জানি কোন ছিদ্র দিয়ে অপদেবতার দল আমার ছোটমনটিকে একেবারে কায়েম করে ফেলতেন, বোধ করি রাতের নিচ্ছিদ্র অন্ধকারের রন্ধ্রপথ দিয়েই চলত তাঁদের অবাধ আনাগোনা। তখন একমাত্র সহায় নীলিনা, ঘুমের রাজ্য থেকে একরকম তাকে ছিনিয়েই আনতে হোত জাগার রাজ্যে, রীতিমত মিনতি করতে হোত তাকে একটু সঙ্গ দেবার জন্যে, দিত—তবে নিঃস্বার্থ ভাবে নয় দস্তুরমত একটি চুক্তিতে। চুক্তিটি এই যে, সে আমার কথা রাখবে, বিনিময়ে পাঁচ মিনিট ধরে তার পিঠটি চুলকে দিতে হবে আর আমার নিজস্ব পুঁজি থেকে চারটি পয়সা তাকে দিতে হবে।

নীলিনা গান নিয়েই রইল আর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সনাতন নৃত্যশিল্পের সঙ্গে কিছুটা নিজস্বতার পরশ বুলিয়ে তাকে এক নবরূপ দিয়ে তার মধ্য থেকে নতুন নতুন সম্ভাবনা সৃষ্টি করার উন্মাদনায়, আমার মন প্রাণ একসঙ্গে নেচে উঠল। এক পরিপূর্ণ বৈচিত্র্যের আস্বাদে ছেলেবেলা থেকে পুষ্ট আমার মন। আমার মনে হয় যে আমার অপরিণত বয়েসে বিয়ের হয়তো সেটাও একটা কারণ।

লিপিবদ্ধ করে রাখার মতন যে স্মরণীয় ঘটনা আমার বাল্যজীবনে ঘটে গেছে তা হচ্ছে গান্ধীজীর সাক্ষাৎ ও সান্নিধ্যলাভ। এর পিছনে একটি কাহিনী জড়িয়ে আছে তার সূত্র উদ্ধার করা এ ক্ষেত্রে বিশেষ প্রয়োজন। আমার মা ছিলেন দাদামশায়ের অত্যন্ত আদুরে মেয়ে। দাদামশাই মারা যাওয়ায় মা ভয়ানক ভেঙে পড়েন। আমার বড় মাসীমা সরলা সেন ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের জাঠতুতো ভাই ধুরন্ধর আইনজ্ঞ স্বর্গীয় সতীশরঞ্জন দাশ (বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্র ও দিকপাল দার্শনিক ডক্টর প্রসন্নকুমার রায়ের শ্যালক) এর সহধর্মিণী। ঠিক এই সময় গান্ধীজী কলকাতায় আসেন ও দেশবন্ধুর বাড়ীতে ওঠেন, পিতৃশোকে মুহ্যমানা আমার মা এবং আমার বাবাও সান্ত্বনার সন্ধানে গান্ধীজীর প্রার্থনাসভায় যোগ দিতে থাকেন এবং বলা বাহুল্য, এর ফলেই পিতৃশোক অনেকাংশে মা করলেন অতিক্রম এবং ধীরে ধীরে মা গান্ধীজীর একজন ভক্ত হয়ে উঠলেন এবং লিলি কটেজে ঠাকুরদাদার এবং ঠাকুরমা স্বর্গীয়া জগন্মোহিনী দেবীর (যিনি জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ঠাকুরদাদার আদর্শের পদাঙ্ক অনুসরণ করে গেছেন) পবিত্র সমাধিবেদিকা দেখাবার জন্যে গান্ধীজীকে মা লিলি কটেজে নিয়ে আসেন। যদিও আমার বয়েস তখন বেশী নয় তবুও সেইদিনের প্রতিটি খুঁটিনাটি এখনও আমার চোখের সামনে পরিষ্কার ভেসে উঠছে।

[ক্রমশঃ।

অনুবাদ : কল্যাণাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়

ক্ষমতাসম্ভোগ

"সাম্প্রদায়িকতা-কর্মনাশার জলে জাতীয়তা বিসর্জন দিয়া—দেশ বিভাগের ফলে—ইংরেজদের কৌশলে খণ্ডিত ভারতের প্রধানমন্ত্রী হইয়া পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু দীর্ঘ একাদশ বর্ষকাল প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা পরিচালিত করিবার সুযোগ পাইয়াছেন। তাঁহার সেই ক্ষমতা-পরিচালন ভারতের নাগরিকদিগের পক্ষে কল্যাণকর হইয়াছে কি না, সে আলোচনা করিবার সময় সমুপস্থিত। কিন্তু তাঁহার দল গঠনের দক্ষতায় সে আলোচনা হইতে পারে নাই। মাউন্টব্যাটেন মার্কা গণতন্ত্র এদেশে নূতন। বিশেষ সরকার এই একাদশ বৎসরেও দেশে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক না করায় দেশের জনসাধারণ ভোট পাইয়াছে, কিন্তু ভোট ব্যবহার করিবার যোগ্যতা অর্জন করিতে পারে নাই। কাজেই পণ্ডিত জওহরলালের ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ থাকায় বিস্ময়ের বিশেষ কারণ থাকিতে পারে না। ক্ষমতাসম্ভোগ হেতু তাঁহার বিশ্বাস জন্মিয়াছে, তিনিই ভারত রাষ্ট্র; তিনি যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন। সেই বিশ্বাসবশে তিনি দেশের জনমতের অপেক্ষা না রাখিয়া পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীকে ভারত রাষ্ট্রের কতকগুলি স্থান উপহার দিতে চাহিয়াছেন। তাঁহার সে প্রস্তাব সংবিধান সম্মত কিনা, তাহাও তিনি বিবেচনা করেন নাই। তাঁহার প্রতিশ্রুতি আমরা প্রস্তাব ব্যতীত আর কিছু বলিতে পারি না। কারণ, সে প্রস্তাব গ্রাহ্য করা বা না করা দেশের জনমতসাপেক্ষ। তিনি ঐ প্রস্তাব করিবার পরে—পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী যেরূপ উৎফুল্লভাবে—আপনার জয় ঘোষণা করিয়াছেন, ভারতের প্রধানমন্ত্রী সেরূপ করিতে পারেন নাই। কারণ—লাভ হইবে পাকিস্তানের আর ক্ষতি ভারত রাষ্ট্রের। ভারতের সেই ক্ষতি করিতে চাহিয়াছেন—পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু। তিনি যে কুণ্ঠিত ভাবে ভারতের ক্ষতি স্বীকার করিয়াছেন, তাহার কারণ—'Conscience does make cowards of us all.' বিবেকবৃত্তি বিসর্জন করিবার চেষ্টা করিলেও তাহা সহজসাধ্য হয় না। হয়ত শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যু তিনি ভুলিতে পারেন নাই। কাশ্মীর-সমস্যার সৃষ্টি করিয়া যিনি প্রধান মন্ত্রীর কাজ আরম্ভ করিয়াছিলেন—অত্যাচারের জন্য বা ভয়ে পাকিস্তানত্যাগী প্রায় দশ হাজার হিন্দুকে পাকিস্তানের চরণে সমর্পণ করিয়া এবং—**adding insult to injury** তাহাদিগকে পাকিস্তানের প্রজা হইতে বলিয়া কি সেই প্রধানমন্ত্রীর মন্ত্রিত্বের অবসান হইবে?" —দৈনিক বসুমতী।

নেহরু-নুন সাক্ষাতের পরে

"নেহরু-নুন যুক্ত বিবৃতি প্রকাশের পরে পশ্চিমবঙ্গের কোন কোন সীমান্ত অঞ্চলে আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে। বিবৃতিতে প্রকাশিত ইছামতী নদী ও যথাসম্ভব উহার গতিপথ ধরিয়া সীমান্ত-বিরোধ সমস্যার মীমাংসার হইবে, এই সংবাদই আতঙ্ক সৃষ্টির হেতু। এইরূপ ঢালাও সর্ত স্থির হইয়াছে কি না, শুধু প্রকাশিত যুক্ত বিবৃতি হইতে তাহা সঠিক বুঝা যায় না। কিন্তু আতঙ্ক সৃষ্টির পক্ষে উহাই যথেষ্ট। সংবাদে দেখিতেছি পশ্চিমবঙ্গের হাসনাবাদের সীমান্ত এলাকায় অধিবাসী ভারতীয় মুসলমানগণ পাকিস্তানী পতাকা উড়াইয়াছে এবং এই বলিয়া উল্লসিত হইয়াছে যে, তাহারা এবারে খাঁটি পাকিস্তানী হইল। তাহারা ধরিয়া লইয়াছে যে, সর্ত অনুযায়ী তাহাদের এলাকা পাকিস্তানভুক্ত হইয়া গেল। স্পষ্টতঃই দেখা যায়, ভারতে থাকিলেও ইহাদের যে পাকিস্তানী মতি-গতি গোপন ছিল, চুক্তির পর তাহাই বর্তমানে সদম্ভে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তে কি ধরণের 'ভারতের নাগরিকগণ' বসবাস করে—তাহা এই সকল ঘটনায় ও উল্লাসের মধ্যে প্রকাশ পাইতেছে। এদিকে সীমান্তের ভারতের হিন্দু নাগরিকগণ এই সব ব্যাপারে সঙ্গত ভাবেই শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছে। সংবাদে দেখিতেছি, কংগ্রেস নেতা ডাঃ জীবনরতন ধর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট ফোন করিয়া জানিয়াছেন যে, আতঙ্কের হেতু নাই। যে অঞ্চল লইয়া কোন বিরোধই নাই, তাহা চুক্তির আমলে আসিবে না। কিন্তু কি বস্তু আমলে আসিবে, তাহাই বা নিশ্চিত ভাবে কে বলিবে? পাকিস্তানের দাবী বা বিরোধের সীমা যে কোথায় শেষ, তাহাই বা কে বলিবে! এ সম্পর্কে অধিকতর সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা একান্ত আবশ্যক।" —আনন্দবাজার পত্রিকা।

এক্স্‌রে ফিল্ম নাই

"কিছুদিন হইতে এক্স-রে ফিল্মের অভাবে পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ চিকিৎসক ও রোগিগণ এবং হাসপাতালের ডাক্তারেরা বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতেছেন। বর্তমান বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার যুগে বহুরকম অবস্থায় রোগীর চিকিৎসার জন্য এক্স-রে ফটো দরকার হয়। এক্স-রে ফিল্মের অভাবে এই সকল রোগীর চিকিৎসাই প্রায় অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। আজকাল যক্ষ্মারোগের প্রাদুর্ভাব কম নয়। সময়মত এই রোগের চিকিৎসা আরম্ভ না হইলে রোগীর জীবনের আশাই অনেক সময় দূরীভূত হয়। অথচ এই রোগের চিকিৎসায় এক্স-রে ফটো অপরিহার্য। পশ্চিমবঙ্গের হাজার হাজার রোগীর এই সকল গুরুতর অসুবিধা দূর করিবার উদ্দেশ্যে রাজ্য গভর্ণমেণ্ট কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের সাহায্য চাহিয়াছিলেন। শুনা যাইতেছে যে, আজ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেণ্টের অনুরোধে কর্ণপাত করেন নাই। ফলে, এ রাজ্যের হাজার হাজার রোগী যে আরও বেশী অসুবিধাগ্রস্ত হইতেছেন, ইহা বলাই বাহুল্য। এক্স-রে ফিল্মের অভাবে অনেক

কঠিন রোগীর জীবনও যে বিপন্ন হইতে পারে ইহাও মনে রাখা দরকার। এই সমস্ত কথা বিবেচনা করিয়া কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট যদি পশ্চিমবঙ্গের জন্য উপযুক্ত পরিমাণ এক্স-রে ফিল্মের বরাদ্দ মঞ্জুর করেন, তবে এ রাজ্যের জনসাধারণ বিশেষ উপকৃত হইবে। বিষয়টি অত্যন্ত জরুরী। সে জন্য আশা করা যায় কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট জনস্বাস্থ্যের খাতিরে এই অত্যাবশ্যক কার্যে অবিলম্বে অগ্রসর হইবেন।"

—যুগান্তর।

উভয় সঙ্কট

"সর্ব্ববামের খাদ্যমূল্য প্রতিরোধ সম্মেলনে সভাপতি ছিলেন ডাঃ সুরেশ ব্যানার্জ্জি। (তিনি মূল্যবৃদ্ধি ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটিরও চেয়ারম্যান) ঐ সম্মেলনে খাদ্য আন্দোলন ও প্রত্যক্ষ সংগ্রাম করা হইবে বলিয়া স্থির হয়। যে কেহ প্রত্যক্ষ সংগ্রাম সম্বন্ধে আপত্তি তুলিয়াছেন, সভাপতি সুরেশ ব্যানার্জ্জি তাহাকেই ধমক দিয়া বসাইয়াছেন এবং গর্জ্জন করিয়াছেন—প্রত্যক্ষ সংগ্রাম চাই-ই চাই। এর পর বর্দ্ধমানে পি-এস-পি সম্মেলনে স্থির হইল, কম্যুনিষ্টের সঙ্গে কোন আন্দোলনে যোগ দেওয়া হইবে না। খাদ্য আন্দোলন সুরু হইয়াছে। অন্যান্য পার্টির নেতারা কারাবরণে অগ্রসর হইয়াছেন। কিন্তু ডাঃ সুরেশ ব্যানার্জ্জিকে কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। বেচারা সুরেশ ব্যানার্জ্জি! চাকদা রাখিতে হইলে পার্টি ছাড়াও চলে না, আবার কম্যুনিষ্ট চটানোও চলে না। এমন উভয় সঙ্কটেও মানুষ পড়ে!"

—যুগবাণী (কলিকাতা)।

ফরাক্কা বাঁধ

"পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যসরকার, প্রদেশ কংগ্রেস দল এবং বিভিন্ন বামপন্থী দল আজ ফরাক্কা বাঁধ নির্ম্মাণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াছেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার ফরাক্কা বাঁধ নির্ম্মাণে বিশেষ উৎসাহ দেখাইতেছেন না। আমরা শুনিয়াছি, প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সময় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তৎকালীন সেচমন্ত্রী, শ্রদ্ধেয় ভূপতি মজুমদার মহাশয় ফরাক্কা বাঁধ নির্ম্মাণের জন্য সচেষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁহার সেই প্রচেষ্টা ফলবতী হয় নাই। ফরাক্কা বাঁধের ফলে পশ্চিমবঙ্গের সমৃদ্ধি অনেকাংশে নির্ভরশীল। নদীমাতৃক পশ্চিমবঙ্গে প্রতিটি নদীর অবস্থা আজ শোচনীয়। ভাগীরথীর তো কথাই নাই। কাটোয়া বহরমপুর প্রভৃতি স্থানে গত ১৫ বৎসর পূর্ব্বে গ্রীষ্মকালে হাঁটিয়া পারাপার করা যাইত না। আজ ঐ সব স্থানে বর্ষাকাল ব্যতীত জল থাকে না। ফরাক্কা বাঁধ নির্ম্মিত না হইলে আগামী বৎসরে ভাগীরথী নদীর যথেষ্ট অবনতি দেখা যাইবে। কলিকাতা বন্দর ফরাক্কা বাঁধের উপর নির্ভরশীল। ফরাক্কা বাঁধ না করিলে কলিকাতা বন্দর বাঁচিবে না। কলিকাতা না বাঁচিলে কলিকাতা-কেন্দ্রিক বিভিন্ন সমস্যাসঙ্কুল পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যকে বাঁচান যাইবে না। কেন্দ্রীয় সরকারের কর্ত্তব্য ফরাক্কা বাঁধের গুরুত্বটি উপলব্ধি করিয়া আগামী তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাতে অন্তর্ভুক্ত করা। নেতৃবিহীন পশ্চিমবঙ্গের এই সমস্যাটির সুষ্ঠু রূপায়ণে একমাত্র যোগ্য নেতা ডাঃ রায়। তিনি নিজে অগ্রণী হইয়া ঐ কার্য্য সাধিত করুন।"

—ভাগীরথী (কালনা)।

দায়িত্ব কংগ্রেসের

"কংগ্রেসে গান্ধীজির অভ্যুদয়ের পর স্বর্গীয় বিপিনচন্দ্র পাল কংগ্রেস হইতে পদত্যাগ কালীন লিখিয়াছিলেন, "এইবার কংগ্রেস ব্যবসায়ীর প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইতে চলিল।" সেদিন লোকে স্বর্গীয় নেতার সতর্কবাণীর মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। আজ অনেকেই বুঝিতেছেন সে বাণী বর্ণে বর্ণে সত্য। নির্বাচনে কোটি কোটি টাকা দিয়া যাহারা কংগ্রেসের ছাপ দেওয়া প্রতিনিধি পাঠায় তাহাদের বিরুদ্ধে আইন করার অনেক অসুবিধা আছে। শুধু শূন্যগর্ভ বাকচাতুর্যে কোন রাষ্ট্রের কোন সমস্যার সমাধান হয় না। সর্ব্বদলীয় কমিটি গঠন করিলেই খাদ্য ঘাটতি পূরণ হইবে না। খাদ্যসমস্যাকে সর্ব্বদলীয় রূপদানের কোন অর্থ নাই। কংগ্রেস গবর্ণমেণ্টের সৃষ্ট এই সমস্যার সমস্ত দায়িত্ব কংগ্রেসের, ইহা সর্ব্বদলীয় প্রশ্ন নয়।"

—বীরভূম বাণী।

সরকারী সতর্কতার মূল্য কি?

"একচেটিয়া কারবারগুলির কার্য্যকলাপ সম্পর্কে তদন্তের উদ্দেশ্যে পার্লামেণ্ট কর্তৃক একটি কমিটি গঠনের জন্য লোকসভায় বেসরকারী প্রস্তাবটি অগ্রাহ্য হইয়া গিয়াছে। প্রস্তাবটির তীব্র বিরোধিতা করিয়া শিল্প-দপ্তরের মন্ত্রী শ্রীমনুভাই শাহ জোর গলায় বলেন যে, আজ ভারতে ঐ ধরণের কোন কারবার নাই এবং ভবিষ্যতেও সরকার কোন কারবারকে ক্রেতাসাধারণের স্বার্থ গ্রাস করিয়া স্ফীত হইতে দিবেন না। মন্ত্রিবরের এই উক্তি দুইটি বাস্তব অবস্থার দ্বারা সমর্থিত হইলে আনন্দের কোন সীমা থাকিত না। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে উল্লেখ করিতে বাধ্য হইতেছি যে, বাস্তব অবস্থা সম্পূর্ণই বিপরীত। অন্যান্য ব্যবসা-কেন্দ্রের অবস্থা আমাদের জানা নাই। তবে কলিকাতা সহরে দেখিতেছি যে, মাত্র ৮।১০ জন ফাট্‌কাবাজ মশলার ব্যবসায়ি, ১৪।১৫ জন ভাগ্যান্বেষী সমগ্র পশ্চিম বাংলায় ও আসামে কাপড়ের কারবার, ৬।৭ জন আড়তদার চিনির কারবার নিয়ন্ত্রণ করিতেছে। যে কোন ছল-ছুতা পাইলেই নিজেদের মধ্যে ঘরোয়া রফা করিয়া ইহারা দর চড়ায়; আর ঐরূপ চড়া দর না দিয়া খুচরা দোকানদাররা সওদা করিতে পারে না। তার পর খুচরা দোকানের পক্ষে সে টাকাটা উশুল করা ভিন্ন উপায় কি? শিল্পমন্ত্রীর উক্তির দ্বারা ইহাই প্রমাণ হইতেছে যে, চোরাকারবারের আল-গলি সম্পর্কে তাঁহার কোন ধারণাই নাই। বাছিয়া বাছিয়া এ রকম আনাড়ি লোকের উপর দায়িত্ব অর্পণ করিলে শেষ পর্য্যন্ত জাতীয় অর্থনীতিতে বিপর্যয় না ঘটাই আশ্চর্য্য! শাহ্‌জী আরও আশ্বাস দিয়াছেন যে, মুনাফাবাজরা যাহাতে মূল্যবৃদ্ধির 'খেল' দেখাইতে না পারে তৎপ্রতি সরকার সতর্ক দৃষ্টি রাখিবেন। বাস্তব ক্ষেত্রে সরকারের ভাবগতি কিন্তু ইহার বিপরীত। সরকারী মালিকানায় ও পরিচালনায় ষ্টেট ট্রেডিং কোম্পানী কর্তৃক প্রতি পাউণ্ড ৬৩ নয়া পয়সা দরে বিক্রীত ননীতোলা গুঁড়া দুধই আজ দুই টাকা পাউণ্ড দরে বিক্রয় হইতেছে; সওয়া চারি টাকা দরের হরলিক্‌স সওয়া আট টাকা দরে এবং এক শিশি ক্লোরোমাইসেটিন এক শত টাকা পর্য্যন্ত দরে বিক্রয় হইয়াছে; সরকারী সতর্কতা সত্ত্বেও যদি এরূপ অবস্থা ঘটিয়া থাকে, তাঁহারা নিদ্রিত থাকিলে কি ঘটিত, সে কথা কল্পনা করিতেও ভয় হয়।"

—প্রদীপ (মেদিনীপুর)

উপর্য্যুপরি তিন রাত্রে চুরি

"রঘুনাথগঞ্জ সহরের সদর রাস্তার উপরে অবস্থিত শ্রীঅমূল্যকুমার ভদ্রের দোকান হইতে ১২ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার রাত্রে প্রায় দুই মণ চাউল চুরি হইয়া গিয়াছে। গত ১৩ই সেপ্টেম্বর শনিবার রাত্রে সদর রাস্তার উপরে শ্রীকমলাকান্ত সেনের দোকান হইতে প্রায় পৌণে সাত মণ চাউল চুরি গিয়াছে। গত ১৪ই সেপ্টেম্বর রবিবার রাত্রে শ্রীশম্ভুনাথ পণ্ডিত (কুম্ভকার) এর দ্বিতলের ঘর হইতে চাউল, কলাই ও ময়দা চুরি গিয়াছে। আমরা এই বিষয়ে স্থানীয় মহকুমা পুলিশ অফিসারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।" —জঙ্গীপুর সংবাদ।

কৃষকদের প্রতি

"বর্দ্ধমান জেলার কয়েকটি অঞ্চলে বোরো ধান্য চাষের বিশেষ সুযোগ রহিয়াছে। মন্তেশ্বর ও কাটোয়া থানার খড়ি নদীর সুবিস্তৃত বিল অঞ্চলে বোরো ধান্য চাষের বিশেষ সুযোগ রহিয়াছে। সরকারী প্রচেষ্টায় মাঝে মাঝে খড়ি নদীর উপর বাঁধ বাঁধিয়া বোরো চাষের ব্যবস্থা হইলেও তাহা যথাসময়ে হইয়া উঠে না। অসময়ে বাঁধ নির্মাণের ব্যবস্থা হওয়ায় বহু জমি অনাবাদী হইয়া পড়িয়া থাকে। কেবল বোরো চাষই নহে, রবিশস্য ও সব্জি চাষের জন্য এই বিল অঞ্চলগুলিতে এখন হইতে বাঁধ নির্মাণের জন্য ব্যবস্থা না লইলে এই চাষ পিছাইয়া যাইবে। সরকারী বিভাগের কাজকর্ম্ম এমনিই মন্থর গতিতে চলে কিন্তু খাদ্য উৎপাদনের ব্যাপারে কিঞ্চিৎ ক্ষিপ্রতার পরিচয় দিতে না পারিলে সুফল আশা করা কঠিন। বাঁধ নির্মাণে এবং বোরো ও অন্যান্য চাষে উৎসাহদানে জেলা কৃষি বিভাগকে এখন হইতেই তৎপর হইতে দেখিলে আমরা সুখী হইব।" —বর্দ্ধমান।

ধ্বনিত হউক

"খাদ্য সংকট রোধে বিক্ষোভকারীদের পক্ষ হইতে প্রতিনিধি দল যে সমস্ত দাবী জেলা সমাহর্ত্তার নিকট পেশ করেন, রাজ্যের খাদ্য দপ্তরের জয়েণ্ট সেক্রেটারীর সহিত ট্রাঙ্ককলযোগে যোগাযোগ স্থাপন করিয়া এবং জেলার গুরুত্ব উপলব্ধি করাইয়া জেলা সমাহর্ত্তা জেলাবাসীর সম্মুখে যে প্রতিশ্রুতি রাখিয়াছেন, তাহার যথাযথ মর্য্যাদা রক্ষিত হইলে আমরা আনন্দিত হইব। প্রতিনিধিদল এবং বিক্ষোভকারীদের সহিত জেলা সমাহর্ত্তা যেরূপ গুরুত্বসহকারে দীর্ঘকাল যাবৎ আলোচনা করিয়াছেন, তাহাতে জেলার খাদ্যসংকট রোধে তাঁহার আন্তরিকতা সম্পর্কে বিন্দু মাত্র সন্দেহ প্রকাশ করিবার কারণ নাই। কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতার কষ্টিপাথরে যাচাই করিয়া যে অভিজ্ঞতা জনসাধারণ লাভ করিয়াছেন তাহাতে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিবার ব্যাপারে সরকারী নীতি সম্পর্কে সন্দেহমুক্ত হইতে পারা যায় না। জেলার এই গুরুত্বপূর্ণ সংকটকালে অনাহারে, অর্দ্ধাহারে, অভাব বা বেকারীর জ্বালায় একটি প্রাণও যাহাতে মৃত্যুর কবলিত না হইতে হয়, তজ্জন্য যাহাতে অধিক পরিমাণে খাদ্যশস্য কৃষি ও গো-ঋণ বরাদ্দ হয় এই দাবী আজ মহকুমা হইতে জেলা, জেলা হইতে রাইটার্স বিল্ডিংএর দপ্তরে, দলমত নির্বিশেষে, পৌঁছাইয়া দিতে হইবে।" —জনমত (মুর্শিদাবাদ)।

শোক-সংবাদ

কুমার প্রমথনাথ রায়

ভাগ্যকুলের বিখ্যাত রায়-পরিবারের স্বর্গীয় রাজা শ্রীনাথ রায়ের একমাত্র পুত্র দানবীর কুমার প্রমথনাথ রায় গত ৫ই ভাদ্র ৭১ বছর বয়সে পরলোক গমন করেছেন। শহরের ইনি একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ছিলেন, কিন্তু তা ছাড়াও দান-কল্পে ইনি ছিলেন মুক্তহস্ত। সারা জীবনে ইনি প্রায় এক কোটি টাকার উপর দান করে গেছেন। বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠান এবং অসংখ্য দুঃস্থ নরনারী এঁর পৃষ্ঠপোষণায় পুষ্ট ও সমৃদ্ধ হয়েছেন। এঁর মৃত্যু দেশ থেকে একজন মানবদরদী পুরুষের অভাব ঘটাল।

জ্ঞান বসু

বর্ষীয়ান শিক্ষাব্রতী জ্ঞান বসু (জ্ঞা বসু নামে সমধিক পরিচিত) গত ১৩ই ভাদ্র ৮৯ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। ইনি দ্বারভঙ্গ রাজ্যের অর্থ নৈতিক উপদেষ্টা ছিলেন ও থ্যাকার স্পিঙ্কের চেয়ারম্যানের আসনে ছিলেন অধিষ্ঠিত। ওয়ালফোর্ড ট্রান্সপোর্ট, ইণ্ডিয়ান আয়রণ য়্যাণ্ড ষ্টীল কোং লিঃ প্রভৃতির ইনি অন্যতম পরিচালক ছিলেন। শিক্ষাক্ষেত্রেও এঁর অবদান অবিস্মরণীয়। অগ্রজ স্বর্গীয় উপেন্দ্রনাথ বসু (নেতাজী সুভাষচন্দ্রের মেশোমশাই) শ্রদ্ধেয়া স্বর্গীয়া ডঃ য়্যানী বেসান্ত এবং সম্প্রতি পরলোকগত মনস্বী ডঃ ভগবান দাসের সঙ্গে মিলিত হয়ে বারাণসীতে এঁরা যে সেনট্রাল হিন্দুকলেজের পত্তন করেন, কালক্রমে আজ তাই বারাণসীর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ নিয়েছে। এঁর চরিত্রের সব চেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য যে, আমরা নিজেদের নামের ইংরাজী বানানের আদ্যক্ষরেই সাধারণতঃ বাঙ্গালী-সমাজে পরিচিত হই কিন্তু ইনি পাশ্চত্য-সমাজেও নামের বাঙলা বানানের আদ্যক্ষরে নিজেকে পরিচিত করেন এবং সেই অক্ষরটি (জ্ঞা) তিনি ইংরাজী অক্ষরে বানান করে থাকতেন। শেষ দিন পর্যন্ত সাধারণ্যে তিনি সেই নামেই পরিচিত ছিলেন।

শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঙলার বিখ্যাত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ব্যাঙো য়্যাণ্ড কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৫ই ভাদ্র ৭০ বছর বয়েসে ইহলোক ত্যাগ করেছেন। ভারতে বৈদ্যুতিক পাখা, ঘড়ি থেকে সুরু করে বহু সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি এবং বিরাট যন্ত্র নির্মাণের প্রথম যুগের অগ্রগামী শিল্পপতিদের মধ্যে ইনি অন্যতম। বাঙলার বৈপ্লবিক আন্দোলনের সঙ্গেও এঁর যোগাযোগ ছিল। ব্রিটিশ সরকার এঁকে "নাইট হুড"দিতে ইচ্ছুক হলে ইনি তা গ্রহণ না করে নিজের জাতীয়তাবোধের পরিচয় দেন। এঁর মৃত্যুতে বাঙলা দেশ একজন বিশিষ্ট শিল্পপতিকে হারাল।

সুলেখা সরকার

বিখ্যাত প্রকাশক প্রতিষ্ঠান এম, সি, সরকার য়্যাণ্ড সন্সের স্বত্বাধিকারী সাহিত্যসেবী শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকারের সহধর্মিণী সুলেখা সরকার গত ১৬ই ভাদ্র মাত্র ৫৬ বছর বয়েসে লোকান্তরিতা হলেন। ইনি সুধীর বাবুর সুযোগ্যা সহধর্মিণী ছিলেন এবং নিজেও একটি গ্রন্থের রচয়িত্রী ছিলেন। বিদ্যানুশীলন, দয়াধর্ম, পরদুঃখকাতরতা প্রভৃতি গুণগুলির সমন্বয় এঁর মধ্যে দেখা গিয়েছিল।

সম্পাদক—শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

কলিকাতা ১৬৬ নং বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, "বসুমতী রোটারী মেসিনে" শ্রীতারকনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

বিদেশী কুকুরপ্রীতি কেন ?
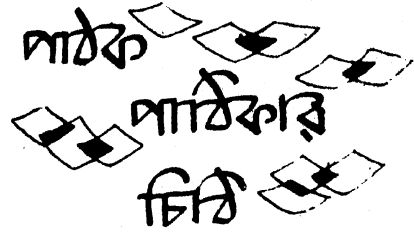
গত আষাঢ় সংখ্যার মাসিক বসুমতীতে শ্রীমতী শুক্লা সেনগুপ্তা আমার দুটি উত্তরের শেষেরটি নিয়ে অর্থাৎ ভারত কমনওয়েলথে থাকতে পারে কি না, কয়েকটি উদাহরণের সংগে প্রতি-প্রশ্ন করেছেন। তাঁর জবাব আমি দিচ্ছি আমার বুদ্ধিমত যেমন পেরেছি সেই অনুসারে। তবু একথা এখানে বলে রাখছি, প্রত্যেক জিনিষই যেমন পারফেক্ট নয়—তার দোষ এবং গুণ দুই-ই থাকে এবং গুণের দিকটা ভারি হলে সাধ্য পক্ষে সেইটাকে গ্রহণ করি, কমনওয়েলথ প্রসংগেও সেই কথা। অনেক তর্কাতর্কির পরও কমনওয়েলথ টিঁকে আছে এবং ভারত তার সভ্য হয়ে রয়েছে। কেন রয়েছে, তাই হল প্রশ্ন।

British Empire and Commonwealth of Nations এর ক্রমবিকাশের বিশ্লেষণের ভার ঐতিহাসিকের। বর্তমানে এর যে বৈশিষ্ট্যগুলি চোখে পড়ে তা হল আন্তর্জাতিক সংস্থা হিসেবে এর গঠন এবং কর্মপ্রণালী। ডমিনিয়ন ষ্টেটাস ছিল এশিয়ার যে তিনটি রাষ্ট্র—ভারত, পাকিস্তান এবং সিংহল, যারা এককালে বিজিত এবং অত্যাচারিত হয়েছিল কলোনী হিসেবে, যারা য়ুরোপীয় ধর্ম, কৃষ্টি এবং জাতি থেকে ভিন্ন তারাই আজ কমনওয়েলথে যোগ দিয়েছে। ১৯৪৯ এর এপ্রিলে ভারত, পাকিস্তান এবং সিংহল স্বাধীনভাবে যখন এই সম্মেলনে যোগ দেয় এবং সভ্যপদ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে তখন ফরমূলা ছিল যে এই ডমিনিয়নত্রয় শুধু সাংবিধানিক যোগসূত্রে (**constitutional link**) **crown**-এর প্রতি আনুগত্য দেখাবে। কিন্তু **allegiance to the crown** সভ্যরাষ্ট্রের পক্ষে আবশ্যিক নয়। সভ্য হিসেবে তারা শুধু মনে করছে যে এটা শুধু **special associatian**—যার কোন **concrete obligation** নেই। সেই সাংবিধানিক সূত্রেই ব্রিটেন কমনওয়েলথ প্রধান এবং **crown**-এর **subject** থাকাটা ফরম্যাল। সভ্যরাষ্ট্ররা প্রত্যেকেই স্বাধীন, তাদের নীতি আলাদা, মত পৃথক—যা বৃটিশের ধারে কাছেও যায় না। অনেক রাষ্ট্রের মত ভারতও আজ স্বাধীন প্রজাতন্ত্রী। **Automatic military obligation** কোনও প্রশ্ন এখানে অবান্তর। প্রত্যেকে নিজেদের স্বাধীন এবং সমান ক্ষমতাসম্পন্ন জেনেই ইংল্যাণ্ডকে প্রধান রাখা হয়েছে এবং যে কেউ ইচ্ছা হলেই এ বন্ধন ছিন্ন করতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ, কমনওয়েলথ আজ যে নতুন শক্তি পেয়েছে সে শুধু প্রিন্সিপ্যাল এবং আইডিয়োলজিক্যাল বিবর্তনবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। সংক্ষেপে তাদের তিন ভাগ : সহনশীলতা, স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধা এবং প্রগতিশীল গণতন্ত্র। কমনওয়েলথ যে হেতু শক্তির (**force**) উপর প্রতিষ্ঠিত নয় সেই হেতু কাশ্মীর সমস্যায় প্রত্যক্ষ হাত দেওয়ার কাজে উপায় নেই। এবং সেই কারণেই এই সম্মেলনে দুই দেশের ভিতরের ব্যাপারের আলোচনা নিষিদ্ধ। তবু কমনওয়েলথ প্রধান পাক-ভারত মন্ত্রিপর্যায়ের আলোচনার চেষ্টায় ইংল্যাণ্ড **tension** দূর করার কিছুটা চেষ্টা করে বৈ কি ! আর কাশ্মীর ব্যাপারে ইংল্যাণ্ড যেহেতু ভারতকে সাহায্য করছে না, সেজন্য ভারত কমনওয়েলথ ত্যাগ করুক—এ হল অভিমানের কথা। ভারত সফরকালে মিঃ ম্যাকমিলান কাশ্মীর ব্যাপারে ইংল্যাণ্ডকে দূরে রাখার আভাস দিয়েছেন।

তৃতীয়তঃ, শ্রীমতী শুক্লা সেনগুপ্তা বাণিজ্যিক আলোচনা করে আলোচনার ধারার সুবিধা করে দিয়েছেন, যেটা সব থেকে প্রয়োজনীয়। এবং আমার মতে ভারতের কমনওয়েলথে থাকার প্রয়োজনীয়তা সেইখানে সবচেয়ে বেশি। সার্বভৌম, রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সাংবিধানিক যোগ এবং **legal looseness**-এর মধ্যে যেটুকু শক্তি রাষ্ট্রগুলিকে এক করে রেখেছে তা হল অর্থনৈতিক সম্বন্ধ—যার অর্থনৈতিক সংকটে ষ্টার্লিং এলাকা একটা নতুন রাজনৈতিক গুরুত্ব এনে দেবে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে।

উনবিংশ শতকে ইংল্যাণ্ডের অবস্থা যা ছিল আজও সেই অবস্থা রয়েছে। অর্থাৎ ডমিনিয়ন এবং কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলি থেকে আজও সে কাঁচা মাল এবং খাদ্যসম্ভার কিনছে আর দিচ্ছে যন্ত্রপাতি এবং ম্যানুফ্যাকচারিং দ্রব্যাদি। ডমিনিয়ন এবং কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলি ক্রমশঃ শিল্পোন্নত হয়ে উঠছে সন্দেহ নেই, তবুও ইংল্যাণ্ডেই আজ তাদের সবচেয়ে বড় ক্রেতা।

কোন একটা কিছু কেনায় যেখানে সুবিধা অথবা একই **quality** -র জিনিষ যেখানে কম দামে পাওয়া যায়, স্বাধীন হলেও শুধু ভারত কেন, কোন অনুন্নত দেশের পক্ষেই সেখান থেকে কিছু কেনা সম্ভব নয়। কেনাটা দেশের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে সন্দেহ নেই, তবু ভেবে দেখতে হয় যে-দেশের সংগে তার বেশি লেন দেন তার সংগে অপ্রীতিকর কিছু না ঘটে। তা না হলে পূর্বে যে জিনিষ তার কাছে সস্তায় পাওয়া যাচ্ছিল আর সস্তায় সে দেবে না, বিশেষ করে ইংরেজের মত বণিক জাতির, যে নিজের স্বার্থ ছাড়া বোঝে না।

১৯৫০ সালে ইংল্যাণ্ড তার সমগ্র আমদানীর ৪৩% ভাগ আমদানী করেছে কমনওয়েলথ দেশগুলি থেকে এবং রপ্তানী করেছে সমগ্র রপ্তানীর ৪৯% ভাগ। ডলার আর স্টার্লিং এলাকার মধ্যে যে প্রাচীর খাড়া হচ্ছে তার ফলে ক্যানাডার সংগে ইংল্যাণ্ডের বাণিজ্যিক অবনতি ঘটছে। তবু একথা বলা যায় যে, ক্যানাডাসহ অন্যান্য কমনওয়েলথ রাষ্ট্রগুলির কাছে সেটা কঠিন আঘাত হবে যদি বৃটিশের বাজারে **economic disaster** নেমে আসে। ভারতের ক্ষেত্রে চায়ের বাজার ভীষণভাবে মার খাবে। তখন অন্য বাজার পাওয়া শুধু সুকঠিন হবে তাই নয়, অতিপ্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি এবং কতকগুলি ভোগ্য সামগ্রীর অভাব মিটবে না। এ কথা সমগ্র স্টার্লিং এলাকায় প্রযোজ্য। এর ফলে স্টার্লিং-য়ের ডিভ্যালুয়েশন হবে। সংগে সংগে জীবনযাত্রার মান যাবে নেমে এবং ভারত ও অষ্ট্রেলিয়ার মত দেশ—যারা শিল্পোন্নত হওয়ার উচ্চস্পৃহায় মগ্ন রয়েছে, তাদের পক্ষে সে হবে অভিশাপ, অনির্দিষ্টকালের জন্যে সব কাজ বন্ধ রাখতে হবে।

সাধারণ ভাবে স্টার্লিং এলাকার প্রত্যেক কমনওয়েলথভুক্ত রাষ্ট্র স্টার্লিং এলাকা ত্যাগ করতে পারে ! কিন্তু গুরুতর অর্থনৈতিক উৎক্ষেপণ (**upheaval**) ব্যতীত তাদের পক্ষে তা সম্ভব হবে না। ডলারের সংগে স্টার্লিংয়ের ডিভ্যালুয়েশনের ফলে পরস্পরের কাছে অর্থনীতিগত নির্ভরতা এসে গেছে।

পরিশেষে একটা কথা বলছি। শ্রীমতী সেনগুপ্তা শালীনতা প্রসংগে যুক্তি দেখিয়েছেন যে যেহেতু ইংরেজরা ভারতীয়দের কুকুরের

সংগে তুলনা করত হোটেলের প্রবেশ-পথে সেইহেতু বিদেশীদের কুকুর সম্বোধনে আমাদের শালীনতায় বাধা উচিত নয়। এ সম্বন্ধে বেশি কথা নিষ্প্রয়োজন মনে করি। শুধু একটা কথা তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিই। যে কথাটা উচ্ছৃঙ্খল ইংরেজ এখানে এসে ইংরেজ সমাজকে কলঙ্কযুক্ত করেছিল, গোটা ইংরেজ সমাজ তার জন্য লজ্জা পেয়েছিল এবং তাদের অনেকেরই বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিল। দেশটা ইংল্যাণ্ড বলেই হেষ্টিংসের **Impeachment** হয়েছিল। একটা দেশ প্রচণ্ড শক্তি নিয়েও যে বিচার, স্বাধীনতা এবং সাম্যের কথা ভোলে না তার দৃষ্টান্ত ইংল্যাণ্ড। এটা তাদের গুণের দিক। মন্দের দিক হল তাদের সাম্রাজ্য-নেশা—যার বিরুদ্ধে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে।—শ্রীঅনীতা হাজরা, বোঁড়শো, পোঃ সড্যা বর্ধমান।

বাঙালী ও ব্যবসা

বাংলার বেকার সমস্যা সকলকে বিচলিত করিয়াছে, অন্নসমস্যা সমাধানের উপায় নির্দ্ধারণ দুরূহ হইয়াছে। মাসিক বসুমতীর কেনাকাটা বিভাগে 'কম পয়সায় ব্যবসা' সম্বন্ধে আলোচনা সময়োপযোগী ও দেশের কল্যাণকর হইয়াছে। ব্যবসা জাতির মেরুদণ্ড। নিজেদের দূরদর্শিতার কারণ বিপথগামী হইয়া আজ আমরা পথভ্রান্ত, নিজের দেশে নিজেরা ভিখারী। ভাবপ্রবণ মূর্খ আমরা, স্বদেশী যুগের স্রষ্টা সুরেন্দ্রনাথ, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র, রসরাজ অমৃতলাল, স্যার নীলরতন প্রমুখ মনীষীদের ভবিষ্যদ্‌বাণী অগ্রাহ্য করিয়া আজ আমাদের এই দুর্দ্দশা। বঙ্কিমচন্দ্রের "বাবু", হেমচন্দ্রের "গোলামের জাতি শিখেছে গোলামি" লজ্জা দিতে পারে নাই। অল্প পয়সায় ব্যবসা হয় না ইহা সম্পূর্ণ ভুল। শিক্ষা, উদ্যম, পরিশ্রম, সততা ও ধৈর্য্য ব্যবসার মূলধন। পৃথিবীর সমস্ত দেশের কৃতী ব্যবসায়ী অতি সামান্য অবস্থা হইতে উন্নতি করিয়াছেন। বাংলার বটকৃষ্ণ পাল, মহেশ ভট্টাচার্য্য স্যার রাজেন, নলিনী সরকার, বসুমতী প্রতিষ্ঠাতা উপেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, পৌরাণিক চিত্র প্রকাশক রামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, কয়লাখনির মালিক **(Coal prince)** নিবারণ সরকার, অভ্র ব্যবসায়ী **(Mica prince)** কুমার মিত্র প্রভৃতি অগণিত কৃতী ব্যবসায়ী সামান্য অবস্থা হইতে ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। বাংলা দেশের অবাঙ্গালী কোটিপতি ব্যবসায়ী কেহ স্বদেশ হইতে প্রভূত মূলধন লইয়া আসেন নাই, তাঁহাদের উন্নতির মূল অব্যবসায়ী বাঙ্গালী বাবুর অর্থ ও সহায়তা। বর্ত্তমান আমাদের অবস্থা বঙ্কিম বাবুর কথা "বাঙ্গালী কাঁদে আর চুল ছিঁড়ে"। গোবিন্দ দাসের আক্ষেপ বাঙ্গালীর স্মরণ করিবার সময় আসিয়াছে, "অধম পিশাচগুলি গর্দ্দভের পদধূলি মাথায় মাখিয়া ছি ছি বড়লোক হয়, বাঙ্গালী মানুষ যদি প্রেত কারে কয়?" বাঙ্গালীর যদি কিছু মাত্র ব্যবসা-বুদ্ধি থাকিত তাহা হইলে কয়লা, অভ্র, লৌহ, গালা, পাট, বস্ত্র কোন ব্যবসা বাঙ্গালীর হাতছাড়া হইত না একসময়ে সমস্ত বাঙ্গালীর একচেটিয়া ছিল। **National Insurance Co. Ltd., Tata Iron Steel Co. Ltd.** সুপ্রতিষ্ঠিত লাভজনক সাবানের কারখানা, ঢালাই কারখানা, বৈদ্যুতিক পাখার কারখানা, পাটকল, ধানকল, তেলকল তৈয়ারী করিয়া অবাঙ্গালীর হাতে তুলিয়া দিত না। এক সঙ্গে শত ব্যাঙ্ক ফেল করিয়া বাঙ্গালার ব্যবসায়ের মূলে কুঠারাঘাত করিত না। এখনও কৃতী বাঙ্গালীর রক্তে গড়া বহু প্রতিষ্ঠান তাঁহাদের বংশধরগণের বিরোধের ফলে ও পরিচালনায় অক্ষমতার কারণ লোপ পাইয়াছে এবং যাহা আছে তাহাও অন্তঃসার শূন্য হইয়া লোপ পাইবে অথবা অবাঙ্গালীর অধিকারে যাইবে। পুরাতন সুপ্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানগুলি রক্ষা করিতে হইবে ও নূতন প্রতিষ্ঠান গড়িবার চেষ্টা করিতে হইবে, নতুবা এ জাতির মঙ্গল নাই।

আমি কৃতী প্রতিষ্ঠাবান ব্যবসায়ী না হইলেও চল্লিশ বৎসরের বেশি গালা-অভ্র কয়লা ও অন্যান্য ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকায় এশিয়ার বহু দেশ ব্রহ্ম, মালয়, চীন, জাপান ভ্রমণ করিয়া যে অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান লাভ করিয়াছি তাহাতে আমার বিশ্বাস, পশ্চিমবঙ্গের ছেলেরা কষ্টসহিষ্ণু নহে। পরিশ্রম করিতে কাতর, তাহাদের মান অভিমান (**false vanity**) বেশী। স্বল্পায়াসে বাবু হইয়া প্রভূত উপার্জ্জনের আশা করে। তাহাদের ধারণা বেশি মূলধন না হইলে কারবার হয় না। বিনা শিক্ষায় কোটি টাকা মূলধন লইয়াও কোন ব্যবসায় লাভ করা যা না। বহু শিক্ষিত, ব্যবসায় অনভিজ্ঞ যুবক অভিভাবকের কষ্ট উপার্জি অর্থ অথবা পৈত্রিক ধন সম্পত্তি কারবারে নষ্ট করিয়া নিজে পরিজনবর্গকে পথের ভিখারী করিয়াছে। সুতরাং কম পয়সায় যে কো কারবার আরম্ভ করিয়া অভিজ্ঞতা হইতে বাড়াইবার চেষ্টা করা যুক্তি সঙ্গত। ব্যবসায়ীর সততা থাকিলে তাহার উন্নতি নিশ্চিত, তাহ মূলধনের অভাব হয় না। ব্যবসা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, প্রবঞ্চ ব্যবসার শত্রু। আমি প্রথমে স্বল্প মূলধনে চালানী কাজের আলোচ করিব। ইহাতে মূলধন আবদ্ধ হইবে না, লাভ লোকসান চাক্ষুষ দে যাইবে, ক্ষতির ভয় কম। অন্য ব্যবসায়ের তুলনায় লাভ বেশি আ করা যায়। বিহার হইতে মহুয়া ফলও মহুয়া তেল, মেস্তা পাট, কার্ত্তি মাসের ধান, পাকা পেঁপে, খাঁটি ঘৃত ও উৎকৃষ্ট পেঁড়া কলিকাত চালান লাভজনক। এই সকল চালানি কাজ দুই শত টাকা হই দশ হাজার টাকার মূলধন লইয়া যাহার যেরূপ ক্ষমতা সেই রকম ক করিতে পারে। আরও নানা প্রকার কাজ আছে যদি কেহ বিস্তারি বিবরণ জানিয়া কাজ করিতে ইচ্ছুক হয়, আমি সানন্দে যথাসাধ্য (করিব।—শ্রীরজনীচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, আরামবাগ, টালিশম্যা বিলাসী, দেওঘর।

পত্রিকা সমালোচনা

ছোট্ট বেলায় প্রবাসেতেই কেটেছে আমাদের দিনগুলো। ব লাহোরের বাড়ীতে মাসিক বসুমতী নিয়ে যখন আসতেন, তখন থে মাসিক বসুমতীর সঙ্গে পরিচয়। পরে আপনার হাতে যেন 'মা বসুমতী' দিনের পর দিন সোনার কাঠির স্পর্শের মত নূতন উঠছে। লেখাগুলোর জন্য দিন গুণতে হয়। সমস্ত মা বসুমতীটাকে হাতে নিয়ে স্পষ্ট বোঝা যায় সুন্দর সম্পাদনায় কত ? লেখা নির্ব্বাচন করা যায়! নূতন লেখকের আবিষ্কার ও আ দান স্মরণীয় হয়ে থাকবে ভবিষ্যতের পাতায়, বাংলার ইতিহা "বন্ধনহীন গ্রন্থির" পরে এবার জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার প্রয়াসী লিখিত স্রোতে ভাসা" লেখাটি ভাল লাগলো। প্রথমে যাকে নির্মম ি মায়ের ভূমিকায় দেখে ঘৃণা করি, তাকে মৃত্যুর পরের চিঠি যেন ম নাড়া দেয় বার বার। মনের সকল প্রশ্নের জবাব যেন ক আঁচড়ে মায়ের বুকের ব্যথা ব্যক্ত করা হয়েছে। ক্রমশঃ লেখা ভাজই। সিনেমা সমালোচনা ঠিক মনোমত হচ্ছে না। যেন দু বাঁচিয়ে লেখা হচ্ছে। আরও কঠোর সমালোচনা চাই। নম শ্রীতরুণকুমার দত্ত C/o সনৎ ঘোষ, বড়বিল (উড়িষ্যা)।
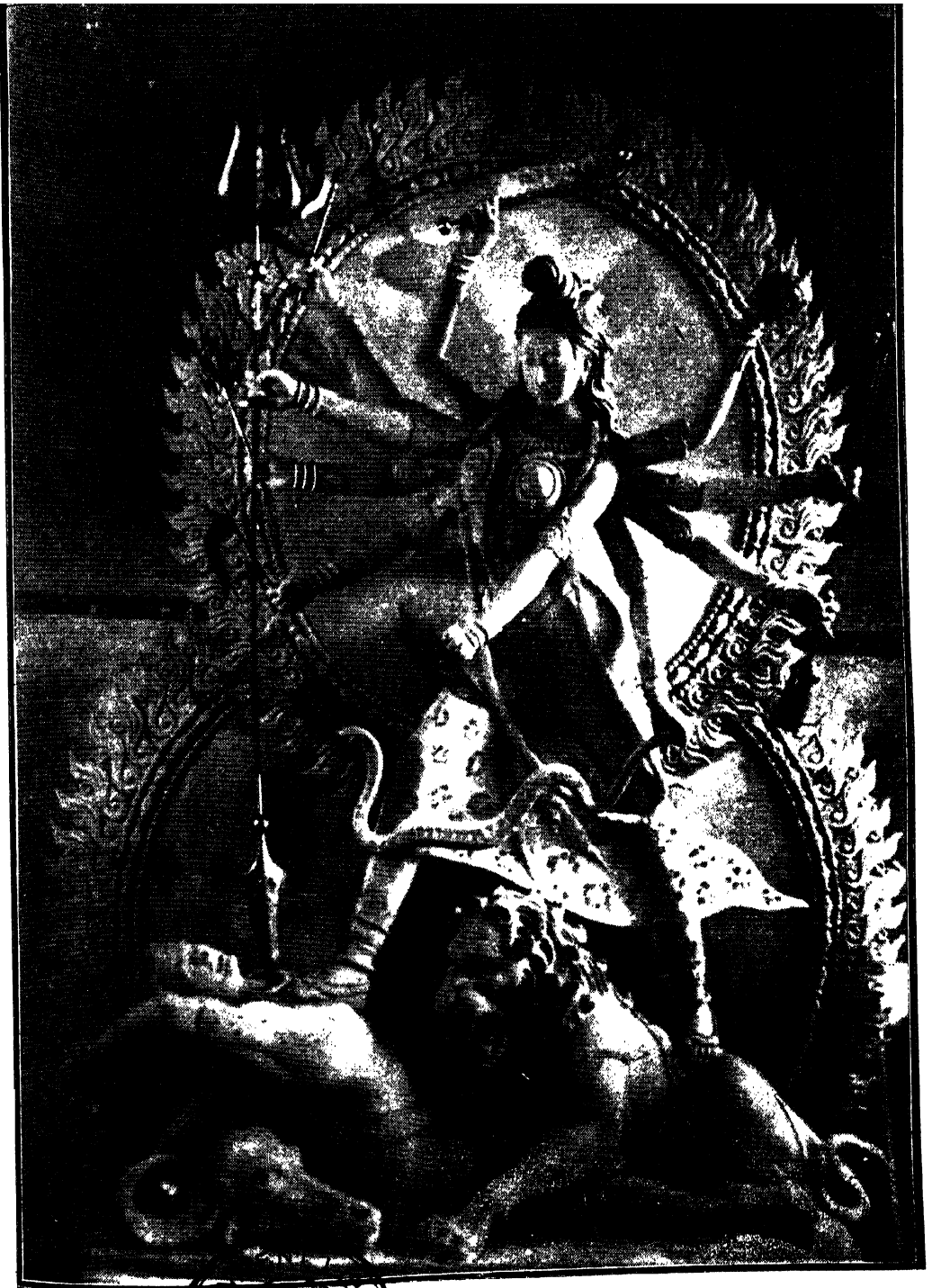
(মৃণ্ময়মূর্ত্তি)

মহিষমর্দ্দিনী

—ভাস্কর শ্রীরমেশ পাল নির্ম্মিত
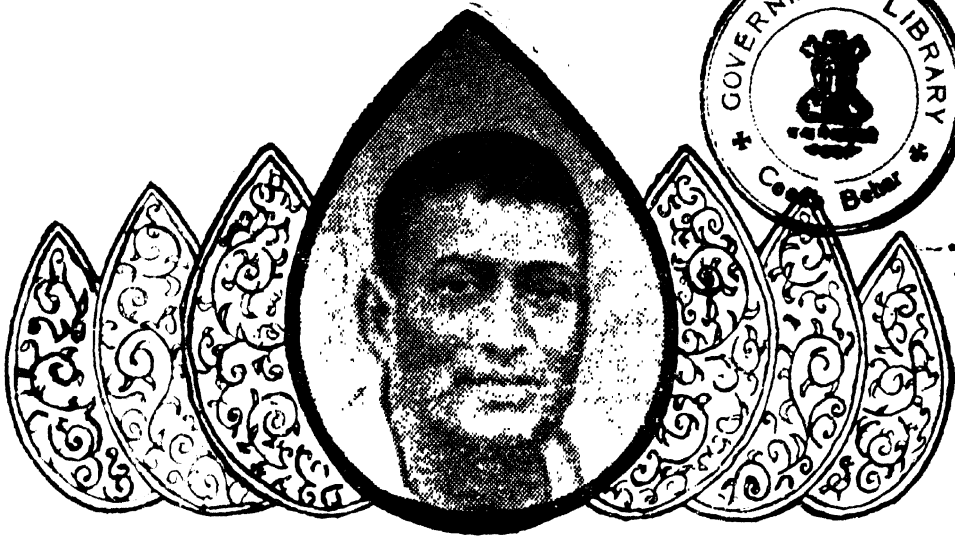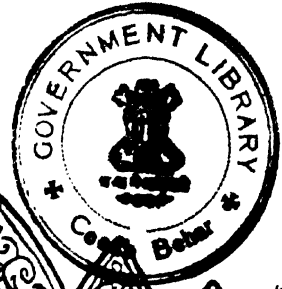
সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

মাসিক বসুমতী

৩৭শ বর্ষ—আশ্বিন, ১৩৬৫ ॥ স্থাপিত ১৩২৯ ॥ [প্রথম খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব। "দিনের পর দিন যত যেতে লাগলো, রামলালারও তত আমার উপর পিরীত বাড়তে লাগলো। (আমি) যতক্ষণ বাবাজির (সাধুর) কাছে থাকি, ততক্ষণ সেখানে সে বেশ থাকে—খেলাধুলো করে; আর (আমি) যেই সেখান থেকে নিজের ঘরে চলে আসি, তখন সেও (আমার) সঙ্গে সঙ্গে চলে আসে। আমি বারণ করলেও সাধুর কাছে থাকে না! প্রথম প্রথম ভাবতুম, বুঝি মাথার খেয়ালে ঐ রকমটা দেখি। নইলে তার (সাধুর) চিরকেলে পূজো করা ঠাকুর, ঠাকুরটিকে সে কত ভালবাসে—ভক্তি ক'রে সন্তর্পণে সেবা করে, সে ঠাকুর তার (সাধুর) চেয়ে আমায় ভালবাসবে—এটা কি হ'তে পারে? কিন্তু ও-রকম ভাবলে কি হবে?—দেখতুম, সত্য সত্য দেখতুম—এই যেমন তোদের সব দেখছি এই রকম দেখতুম—রামলালা সঙ্গে সঙ্গে কখন আগে, কখন পেছনে নাচতে নাচতে আসচে। কখন বা কোলে উঠবার জন্য আবদার কচ্চে। আবার হয়ত কখন বা কোলে কোরে রয়েছি—কিছুতেই কোলে থাকবে না, কোল থেকে নেমে রোদে দৌড়াদৌড়ি করতে যাবে, কাঁটাবনে গিয়ে ফুল তুলবে বা গঙ্গার জলে নেমে ঝাপাই ঝুড়বে! যত বারণ করি, 'ওরে অমন করিসনি, গরমে পায়ে ফোস্কা পড়বে! ওরে অত জল ঘাটিসনি, ঠাণ্ডা লেগে সর্দ্দি হবে, জ্বর হবে,'—সে কি তা শুনে? যেন কে কা'কে বলচে! হয়ত সেই পদ্মপলাশের মত সুন্দর চোখ দুটি দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে ফিক্ ফিক্ করে হাসতে লাগলো আর আরো দুরন্তপণা করতে লাগলো বা ঠোঁট দু'খানি ফুলিয়ে মুখভঙ্গী ক'রে ভ্যাঙচাতে লাগলো। তখন সত্য সত্যই রেগে বলতুম, 'তবে রে পাজি, রোস্—আজ তোকে মেরে হাড় গুঁড়ো করে দেবো!'—ব'লে রোদ থেকে বা জল থেকে জোর ক'রে টেনে নিয়ে আসি; আর এ-জিনিসটা ও-জিনিসটা দিয়ে ভুলিয়ে ঘরের ভিতর খেলতে বলি। আবার কখন বা কিছুতেই দুষ্টামি থামছে না দেখে চড়টা-চাপড়টা বসিয়েই দিতাম। মার খেয়ে সুন্দর ঠোঁট দু'খানি ফুলিয়ে সজল নয়নে আমার দিকে দেখতো! তখন আবার মনে কষ্ট হত; কোলে নিয়ে কত আদর কোরে তাকে ভুলাতাম! এই রকম সব ঠিক ঠিক দেখতুম, করতুম!"

রঙ-বেরঙ

(অপ্রকাশিত)

স্বর্গত পঞ্চানন নিয়োগী

বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, মৌলিক রং সাত প্রকারের। সূর্য্যালোককে যদি একটি ত্রিশিরা কাচের (prism) মধ্য দিয়া প্রেরণ করা যায়, তাহা হইলে উহা বিচ্ছুরিত হইয়া নিম্নলিখিত সাতটি রং-এ বিভক্ত হয়। বেগুনে (Violet) নীলবড়িই (Indigo) নীলা (Blue) সবুজ (Green) হরিদ্রা (Yellow) কমলা (Orange) এবং লাল (Red) রামধনুর মধ্যেও এই সাতটি রং আছে।

একটু পর্য্যবেক্ষণ করিলে শীঘ্রই বুঝা যাইবে, এই সাতটি রং ছাড়া বহু, এমন কি শত শত মিশ্রিত রং প্রস্তুত হইতে পারে। হইয়াছেও তাই। ইহাদের এই সাত শ্রেণীর মধ্যে ফেলা দুষ্কর। দুই বা ততোধিক মৌলিক রং কম-বেশী পরিমাণে মিলাইয়া বহু মিশ্রিত রং উৎপন্ন হয়। অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। যথা, লাল ও সবুজ মিশাইলে চকোলেট, তিনটি মৌলিক রং সমপরিমাণে মিশাইলে 'গ্রে' বা ধূসর রং হয়। উহাতে নীলের ভাগ কিছু বেশী দিলে শ্লেট রং এবং উহাতে লালের ভাগ কিছু বেশী দিলে রসেট রং উৎপন্ন হয়। এমন কি, মৌলিক রং যেগুলিকে বলা হয় সেগুলি যে বাস্তবিকই মৌলিক রং, তা ত মনে হয় না! নীল ও হরিদ্রা রং মিশাইলে সবুজ রং, নীল ও লাল রং মিশাইয়া বেগুনে বা পারপল রং এবং হরিদ্রা ও লাল রং মিশাইয়া কমলা রং প্রস্তুত হয়। অপর দিকে বেগুনে ও সবুজ রং মিশাইয়া নীল, কমলা ও সবুজ মিলাইলে হরিদ্রা এবং বেগুনে ও কমলা রং মিলাইলে লাল রং প্রস্তুত হইতে পারে। তবে মৌলিক রং বলিব কা'কে?

তারপর এক একটি মৌলিক রং-এ গাঢ়তা অনুযায়ী তাহার নানা বর্ণ হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরুন নীল রং, নীলবড়ি, অপরাজিতা ফুল, আকাশের রং—সবই নীল, কিন্তু উহারা কি একই প্রকারের নীল? নীলবড়ির রং গাঢ় নীল, অপরাজিতা ফুলের রং তার চেয়ে একটু ফিকা, অপেক্ষাকৃত কম নীল। আকাশের রং ইংরাজীতে যাহাকে বলে 'স্কাই ব্লু,' ফিকে নীল। গাঢ়তা অনুপাতে লাল রং নানা প্রকার রূপ ধারণ করে। সিমুলফুলের, জবাফুলের বা সিন্দুরের রং ঘোর লাল। দুধে-আলতা রং অনেক কম লাল। গোলাপ ফুলের রং গোলাপী লাল। এখন মুস্কিল হইতেছে, কোন্‌টাকে মৌলিক লাল বলিব? সিন্দুরের রং, দুধে-আলতা রং না গোলাপী রংকে?

সে যাহা হউক, মৌলিক রং লইয়া এখানে মাথা ঘামাইতে বসি নাই। বসিয়াছি পৃথিবীতে রং-এর বৈচিত্র, পোষাক-পরিচ্ছদ, পুতুল, ফল, ফুল, গাছ, পালা, পশু, পক্ষী মৎস্য, কীট-পতঙ্গ, প্রজাপতি, জন্তু-জানোয়ার জাতীয় পতাকা, ষ্ট্যাম্প, টাকার নোট, ধাতু, অধাতু ও তাহাদের যৌগিক প্রস্তর প্রভৃতি তাহাদের রং-এর বৈচিত্র অনুধাবন করিতে। একটু পর্য্যবেক্ষণ করিলে সচরাচর যাহা নজরে পড়ে না, তাহাও নজরে পড়ে এবং সেই সমস্ত একত্র করিলে বিশ্বসৃষ্টির বা মানবের হাতে গড়া সহস্র সহস্র বস্তুর মধ্যে যে রং-এর অনন্ত সৌন্দর্য্যের সমাবেশ আছে, তাহা উপভোগ করিয়া যুগপৎ আনন্দিত ও বিস্মিত হইতে হয়।

কোন জিনিষ লইয়া প্রথম আরম্ভ করিব? আচ্ছা, আরম্ভ করি পোষাক-পরিচ্ছদের কথা। এখানে রং-এর বৈচিত্র খুব বেশীই, বিশেষতঃ মহিলাদের পোষাকে। বাঙ্গালী পুরুষদের পোষাকে রং-এর বৈচিত্র বেশী নয়। ধুতির পাড়ে পাঁচ-ছয় রকমের রং দেখা যায়। লাল, কালো, চকোলেট, ফিকা হলদে, ফিকা নীল বা ফিকা সবুজ। লাল-কালোই বেশী। জরী ও মুগার পাড় চকচকে হলদে। ধুতি ও উড়ানীর পাড়ের চাকচিক্য বাড়াইবার জন্য জরী মুগার ব্যবহার যথেষ্ট আছে। পুরুষের গাত্রবস্ত্র বা উড়ানীর ব্যবহার প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। তবে শীতকালে গাত্রবস্ত্র বা শাল, আলোয়ান না হইলে চলে না। এই সকল শাল, আলোয়ানে অনেক রং-এর সমাবেশ আছে। সাদা রং-এর শাল, আলোয়ান চলে বটে, তবে ধূসর এবং ফিকা সব রংও চলে। তার উপর শালের পাড় বহু প্রকার রঙ্গীন পশমী সূতায় প্রস্তুত হয়। পুরুষদের জামা সম্বন্ধে রং-এর প্রচলন এইরূপ—পুরুষরা সাদা সার্ট বা পাঞ্জাবী পরিধান করিয়া থাকেন। কোটের রং প্রায়ই কালো, ধূসর, গাঢ়-নীল বা ঐ-সব রং-এর হইয়া থাকে। যাঁহারা সাহেবী ফ্যাশনে প্যাণ্ট পরেন তাঁহাদের প্যাণ্টের রং সাদা, কালো, ধূসর বা গাঢ় নীল বা ষ্ট্রাইপড কাপড়ের হয়। ছেলেদের পোষাকে কিন্তু রং-এর প্রাচুর্য্য। তাহারা সাদা সার্ট, পাঞ্জাবী পরে বটে, কিন্তু বিভিন্ন প্রকারের রং-এর সার্ট, পাঞ্জাবীও পরিয়া থাকে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মহিলাদের পোষাকে রং-এর ছড়াছড়ি। বিধবারা সাদা শাড়ী পরেন বটে কিন্তু কুমারী ও সধবাদের শাড়ী বহু প্রকার রঙ্গীন খোলের উপর রঙ্গীন পাড়ওয়ালা। শাস্ত্রের কথা, 'ভিন্নরুচির্হি লোকঃ'—একথা শাড়ী বা পোষাকের বেলা একেবারে খাঁটি সত্য। দোকানদার হরেক রকম রং-এর শাড়ী তাহার দোকানে সাজাইয়া রাখিয়াছে। কোনও মহিলা বা তাঁহার অভিভাবকের পছন্দ লাল শাড়ী, আবার কাহারও পছন্দ গোলাপী, কাহারও নীল, সবুজ, রসেট, চকোলেট কমলা, হলদে, বেগুনে বা তাহাদের সংমিশ্রণে প্রস্তুত অন্যান্য বহু প্রকার রং-এর শাড়ী।

কাহারও আবার দুরঙ্গা, তিনরঙ্গা শাড়ী পছন্দ। কাহারও পছন্দ ডুরে। সিল্কের শাড়ীতে রং-এর বাহার আরও বেশী। তাহার উপর সাদা বা হলদে জরীর কাজের আদর খুবই অধিক। শাড়ীর বোনা বা ছাপার পাড়ে যে কত প্রকার রং লাগে তাহা গণনা করা শক্ত। শাড়ী ছাড়া জামা, ব্লাউজ, পেটিকোট প্রভৃতি মহিলা-দিগের পোষাকের অত্যাবশ্যকীয় জিনিষগুলি প্রায়শঃই রঙ্গীন হয়। এখানেও রং-এর ছড়াছড়ি। আবার শাড়ী ও ব্লাউজের রং বেশ ম্যাচ করা চাই, না হইলে চলিবে না। এইজন্য অনেক শাড়ীর সঙ্গে ঠিক সেই রং-এর বা পাড়ের ব্লাউজ-পীস্ থাকে।

আচ্ছা, পরিচ্ছদের দোকান ছাড়িয়া ছবির কথা বলি। ছবি আঁকা একটা মস্ত বড় আর্ট। অনেকে ছবি আঁকিয়া বিশ্বব্যাপী খ্যাতি অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। পুরাতন মাষ্টারদের ছবি মিলে না, উহাদের নকলই বিক্রয় হয় হাজার হাজার টাকায়। এই সকল ছবিতে রং-এর বিচিত্র সমাবেশ। রং ফুটাইতে না পারিলে ভাব ফুটাইতে পারা যায় না। ওয়াটার ও অয়েল কলার দুই-ই ব্যবহৃত হয়। প্রথমটি জলে ও দ্বিতীয়টি তৈলে দ্রবনীয়। সকল প্রকার রংই ব্যবহৃত হয়। লাল, গোলাপী, হলদে, বেগুনে, কমলা, সবুজ প্রভৃতি। ইহাদের সকল প্রকার 'সেড'ও লাগে। এই সকল রং-এর সাহায্যে যে সব ছবি অঙ্কিত হয়, অভিজ্ঞ পেণ্টারের তুলিকাঘাতে

সেগুলি অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়া পৃথিবীর সর্ব্বজাতির ও সর্ব্বকালের নর-নারীকে অপূর্ব্ব আনন্দ দান করে।

পুতুল তৈয়ারী ছোট আর্টের মধ্যে গণনীয়। কারণ, সেগুলি তৈয়ারী হয় হাজারে হাজারে। মাটি, সিমেণ্ট, পেপার-পাল্প, শোলা, কাপড়, কাঠ প্রভৃতি দ্রব্য হইতে কারিগর নানাবিধ ও নানারং-এর পুতুল তৈয়ারী করে। মাটি, সিমেণ্ট, পেপার-পাল্পের পুতুল তৈয়ারী হয় কারিগরের নিজের মনোনীত ছাঁদ হইতে। কাঠের পুতুল হয় ছোট করাত দিয়া কাঠ কাটিয়া। কাপড়ের পুতুল হয় সূতি, রেশম ও পশমের কাপড় কাটিয়া। এগুলি প্রস্তুত করিতে সব রকম রং-ই লাগে এবং কোনও পুতুলের দোকানে যাইলে রং-এর ঔজ্জ্বল্যে ও বৈচিত্র্যে মন মুগ্ধ হয়। পূজার জন্য দেব-দেবীর মূর্ত্তি গঠনের কার্য্যেও বহু প্রকারের রং-এর সমাবেশ দেখা যায় এবং তাহাদের সাজসজ্জা ও বস্ত্রাদির রং-এর বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়।

পৃথিবীর জাতিবর্গের জাতীয় পতাকা সব বিভিন্ন রং-এর। কোনও জাতির পতাকার রং ও অঙ্কন পদ্ধতি অন্য জাতির পতাকার সহিত মিলে না। স্বাধীন ভারতের পতাকা ত্রিবর্ণরঞ্জিত, পাকিস্তানের পতাকা প্রধানতঃ সবুজ। কোনও পতাকা লাল, কোনটা নীল, কোনটা গৈরিক ইত্যাদি। আবার এই সকল রঙ্গীন জমির উপর বিবিধ রং-এর নক্সা, লাইন ইত্যাদি অঙ্কিত থাকে।

ডাকঘরে ব্যবহৃত পোষ্টেজ ষ্ট্যাম্পের কথা কোনও দিন ভাবিয়াছেন কি? নিশ্চয়ই নয়। কিন্তু কোন ডাকঘরে গিয়া তাহাদের বিবিধ প্রকারের ষ্ট্যাম্পের খাতা যদি দেখেন, তবে দেখিতে পাইবেন, প্রত্যেক প্রকারের ষ্ট্যাম্পের রং আলাদা। এক পয়সা, দুই পয়সা, তিন পয়সা, এক আনা, ছয় পয়সা, দুই আনা, চারি আনা, আট আনা প্রভৃতি ষ্ট্যাম্পের রং সম্পূর্ণ বিভিন্ন। কোনটা লাল, কোনটা বেগুনে, কোনটা গোলাপী, ফিরোজা, ব্রাউন প্রভৃতি। তার উপর প্রত্যেক দেশে ব্যবহৃত পোষ্টেজ ষ্ট্যাম্পের রং আলাদা। অনেক ব্যক্তি আছেন, যাঁহারা বিভিন্ন দেশে এবং বিভিন্ন সময়ে ব্যবহৃত ষ্ট্যাম্প সংগ্রহ করেন। ইঁহাদের খাতা বা 'এলবাম্' দেখিলে ষ্ট্যাম্পে ব্যবহৃত রং-এর প্রাচুর্য্য ও সংখ্যা দেখিয়া তাক্ লাগিয়া যায়।

বায়োস্কোপ ও থিয়েটারের টিকিটও বিভিন্ন রং-এর হইয়া থাকে। চারি আনার টিকিট হয়ত হলদে রং, আট আনার টিকিট লাল, এক টাকার সবুজ, দুই টাকা বা ততোধিক হয়ত অন্য প্রকারের রং-এর। রেলগাড়ী বা ষ্টীমারের যাত্রীটিকিটও বিভিন্ন রং-এর লক্ষ্য করিয়াছেন ত? তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট হয়ত হলদে, মধ্যম শ্রেণীর লাল, প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্য প্রকার রং-এর।

বাড়ীঘর ও দরজা-জানালার রং-ও বিভিন্ন প্রকারের। বাড়ীর বাহিরের দিকের রং সাধারণত সাদা, গোলাপী, লাল ও হলদে। ভিতরের অধিকাংশ ঘরই সাদা চূণকাম করা। তবে অনেকে ঘরের ভিতরের দেয়াল রঙ্গীনও করেন। বিভিন্ন প্রকার রং-এর ডিসটেম্পার লাগাইয়া ঘরের দেওয়াল রং হয়। প্রায় এক শত প্রকার রং-এর ডিসটেম্পার কিনিতে পাওয়া যায়। এই সকল ঘরে আবার বিভিন্ন প্রকারের ও রং-এর ফুল-ফলওয়ালা 'বর্ডার' লাগাইয়া পটুয়ারা ঘরকে অতি সুন্দর করিয়া অঙ্কিত করেন।

বাড়ীর দরজা, জানালার রং সাধারণত সাদা, গ্রীণ, ব্রাউন ও হলদে হয়। খড়খড়ির রং প্রায়ই সবুজ হয়। সার্সির রং সাধারণত হলদে বা 'বাফ্' রং হয়। কেহ কেহ দরজা বার্ণিসও করেন, উহার রং হয় ব্রাউন বা ঐ প্রকারের। ঘরের মেঝের রং সাধারণত সিমেণ্টের রংই হয়। কেহ কেহ লাল রং বা বিচিত্র রং-এর মোজেক মেঝেও করেন।

এইবার অন্যান্য দিকে রং-এর অনুসন্ধানে যাওয়া যাক্। রাসায়নিকেরা স্থির করিয়াছেন যে, পৃথিবীর তাবৎ দ্রব্য প্রায় নব্বইটি মৌলিক পদার্থের দ্বারা সৃষ্টি হইয়াছে। এই সকল পদার্থকে প্রধানত দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়—ধাতু ও অধাতু। ধাতুই বেশী। অধাতুদের মধ্যে হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন গ্যাস, ইহাদের বর্ণ নাই। ক্লোরিণও গ্যাস, তাহার রং হলদে। ব্রোমিন তরল পদার্থ, রং লাল। আইওডিন গভীর নীল রং-এর কঠিন পদার্থ। উত্তাপ দিলে অতি সুন্দর বেগুনে রং-এর বাষ্পে পরিণত হয়। গন্ধক হলদে। ফস্‌ফরাস্ দুই রং-এর হয়, লাল ও সাদা। কার্ব্বন কালো কিন্তু ইহার এক প্রকার ভেদ হইয়াছে হীরক,—অতি সমুজ্জ্বল বর্ণহীন। স্বচ্ছ পদার্থ।

ধাতুদের মধ্যে স্বর্ণ হলদে, তাম্র লাল, বাকী সব ধাতুই বিশুদ্ধ অবস্থায় সাদা। পিতল, কাঁসা প্রভৃতি অনেক মিশ্রিত ধাতু রঙ্গীন। বায়ুর সংস্পর্শে উহাদের অনেকেরই রং ম্লান হইয়া যায়।

ধাতু ও অধাতুর যৌগিক অসংখ্য প্রকারের। উহাদের রংও অসংখ্য প্রকারের। এক কার্ব্বন ঘটিত রং-এর সংখ্যাই সহস্র সহস্র প্রকারের। এগুলি প্রধানতঃ কাল্সো আল্‌কাতরা চোয়াইয়া যে সকল ক্রুর পদার্থ পাওয়া যায়, সেগুলি হইতে অদ্ভুত রাসায়নিক প্রক্রিয়া প্রস্তুত হয়।

মণি-মাণিক্যের রংও বিভিন্ন প্রকারের। হীরক স্বচ্ছ ও বর্ণহীন। মুক্তা সাদা। চুণি লাল। টোপাজ হলদে। পান্না সবুজ বা নীল। ওপেল নানা রং-এর আভাযুক্ত। বহু বর্ণের মণি-মাণিক্য পাওয়া যায়। একই মণি নানা রং-এরও হয়।

এইবার আমরা উদ্ভিদরাজ্যে রং-এর সমাবেশ নিরীক্ষণ করি। উদ্ভিদরাজ্যে সবই প্রায় রঙ্গীন। প্রকৃতির যেদিকে চাই গাছ পালা ধান্যক্ষেত্র, শাকসব্জী কাঁচা সবই সবুজ। আম, কাঁঠাল, জাম, লিচু, লেবু, পেয়ারা, বট, অশ্বত্থ প্রভৃতি সব গাছের পাতাই সবুজ। কিন্তু ইহার ব্যতিক্রমও আছে। ব্যাঙ-এর ছাতা সাদা। গাছের পাতা শুকাইয়া গেলে প্রায়ই হলদে বা ধূসর হয়। পাতা-বাহার গাছের পাতা লাল, হলদে সবুজ ব্রাউন ও অন্যান্য অনেক প্রকার রং-এর হইয়া থাকে। একই পাতায় আবার নানা রং দৃষ্ট হয়। সাধারণ কচুপাতার রং সবুজ। কিন্তু নানা রং-এর বাহারী কচুপাতাও বাগানের শোভা বৃদ্ধি করে।

লাউ, কুমড়া প্রভৃতি অনেক শাকই সবুজ, কিন্তু ডেঙ্গো শাকের পাতা ও ডাঁটা সবুজও হয় এবং লালও হয়। নটে শাক সবুজ কিন্তু লাল নটেও আছে। পুঁইশাকের পাতা ও ডাঁটা সবুজ ও লাল দুই-ই হয়। বেগুন সাদা, মাকড়াটে ও বেগুনে রং-এর হইয়া থাকে। ফুলকপি সাদা হইয়া থাকে, কিন্তু বাঁধাকপি সাদা ও সবুজ হয়। গাজর হলদে, বীট পালং ঘোর লাল, মূলা সাদা, গোলাপী ও লাল রং-এর হয়। কালো রং-এর মূলাও জন্মে। পেঁয়াজ সাদা বেগুনে রং-এর হয়। কিন্তু রসুন কেবল সাদাই হয়। ঢেঁড়স সাদা ও সবুজ দুই রং-এর

এবং টম্যাটো কাঁচা অবস্থায় সাদা বা সবুজ থাকে কিন্তু পাকিলে হলদে বা ঘোর লাল রং ধারণ করে।

গাছের পাতা ও শাক-সব্জীর কথা ছাড়িয়া ফলের রং-এর কথা আলোচনা করা যাউক। আম, লিচু, আনারস, পেয়ারা, কাঁঠাল, পেঁপে, লেবু, কলা, নারিকেল প্রভৃতি তাবৎ ফল কাঁচা অবস্থায় সবুজ থাকে। পাকিলে উহারা হরিদ্রাভ বা হরিদ্রা রং প্রাপ্ত হয়। আম পাকিলে হলদে হয়, লালও হয়। পেঁপে পাকিলে বাহিরে হলদে হয়, ভিতরে হরিদ্রাভ এমন কি লালচেও হয়। লিচু পাকিলে প্রথমে হলদে পরে গোলাপী, লাল বা লালমিশ্রিত ব্রাউন রং হয়। পাতি বা কাগ্জি লেবু পাকিলে ঘোর হলদে হয়। বাতাবি লেবু পাকিলে বাহিরে ঈষৎ হলদে হয় বটে, কিন্তু ভিতরে উহার কোষগুলি জবাফুলের মত লাল হয়। কলা পাকিলে বাহিরে হলদে হয় কিন্তু লাল রং-এর কলাও আছে। ভিতরে কিন্তু সব কলাই সাদা। জামরুল কাঁচা বা পাকা অবস্থায় সাদা, গোলাপজাম হলদে হয়। তাল পাকিলে কালো হয়, হলদেও হয়, জাম পাকিলে ঘোর বেগুনে রং ধারণ করে! আনারস পাকিলে ভিতরে ও বাহিরে হলদে হয়। তরমুজ অদ্ভুত ফল! বাহির দেখিয়া কেহ বলিতে পারিবেন না যে, উহার ভিতরটা কিরূপ। কাঁচা অবস্থায় উহার ভিতরটা সাদা, কিন্তু পাকিলে উহা গোলাপী এমন কি টকটকে লাল জবাফুলের রং প্রাপ্ত হয়। ফুটী ও খরমুজের পাকা অবস্থায় ভিতর ও বাহির দুই-ই সাদা হয়। কুমড়া কাঁচা অবস্থায় সবুজ থাকে, পাকিলে বাহিরটা লালচে ব্রাউন আর ভিতরটা ঘোর হলদে বা লাল হয়।

লাউয়ের ভিতরটা কাঁচা বা পাকা দুই অবস্থাতেই সাদা থাকে। আপেলের রং কাঁচা অবস্থাতে সাদাটে থাকে, পাকিলে উহা পরিবর্ত্তিত হইয়া সুন্দর গোলাপী বর্ণ ধারণ করে। সাধারণ ডালিমের বাহির পাকিলে ঈষৎ হলদে হয় এবং ভিতরের দানাগুলি গোলাপী হয় কিন্তু লাল ডালিমের ভিতর ও বাহির কি ঘোর লাল!

ফলের রাজ্য ছাড়িয়া এবার ফুলের রাজ্যে যাই। এখানে রংএর সবচেয়ে বেশী বাহার। কোনও ফ্লরিষ্টের দোকানে গিয়াছেন কি? সেখানে ফুলের রং-এ রং-এ চক্ষু ধাঁধা লাগিয়া যায়। সাদা রং-এর ফুলও ঢের আছে, যথা, বেল, যুঁই, চামেলী, গন্ধরাজ রজনীগন্ধা, টগর, কামিনী প্রভৃতি। সাদা গোলাপও আছে। এক টগর, কাঞ্চন প্রভৃতি ছাড়া এই সকল সাদা ফুল প্রায়ই সুগন্ধযুক্ত কিন্তু রঙ্গীন ফুলও বহু আছে। চাঁপা ফুল হলদে ও সাদা, দুই-ই সুগন্ধযুক্ত। কলকে ফুল সাদা, গোলাপী ও হলদে রং-এর পাওয়া যায়। স্থলপদ্ম সাদাও হয়, গোলাপীও হয়। পদ্মফুল ফুলের রাজা। ইহার রং অতি সুন্দর, শ্বেতমিশ্রিত ঈষৎ গোলাপী বা বেগুনে। সুগন্ধও যথেষ্ট। কাহারও কাহারও মতে গোলাপ ফুল ফুলের রাজা। কথাটা বোধ হয় ঠিক, গন্ধ ও রং-এর বাহারে গোলাপ ফুলের মধ্যে অতুলনীয়। বৈজ্ঞানিক উপায়ে নানা প্রকারের গোলাপ উৎপন্ন হইতেছে। বস্তুতঃ, এক শত প্রকারের গোলাপ গাছের নাম কোন ফ্লরিষ্টের লিষ্টিতে পাইবেন এবং নিত্য নূতন জাতীয় গোলাপ গাছ আবিষ্কৃত হইতেছে। সাদা, লাল, গোলাপী, ভেলভেট প্রভৃতি নানা প্রকারের গোলাপ, গোলাপবাগান আলোকিত করে। প্রত্যেক রং-এর বিভিন্ন সেডের তারতম্য অনুযায়ী বহু প্রকারের গোলাপ অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করে।

গোলাপ ছাড়া বিভিন্ন রং-এর কত ফুলেরই বা নাম করিব? জাপানের জাতীয় ফুল ক্রিমান্থিমাম আমাদের দেশে রোপিত হইয়া ছোট, বড়, সাদা, হলদে, বেগুনে, লাল ফুল দিতেছে। যেমনই রং-এর বাহার, তেমনই এগুলি সাইজে খুব বড়। ডালিয়াও এদেশে খুব ফোটে। রং-এর প্রাচুর্য্যে ও আকারের বৃহত্বে এ ফুল খুব সমাদর লাভ করিয়াছে। গাঁদা ফুলের রং সাধারণতঃ হলদে। ফিকে হলদে, হলদে, কমলা রং-এর গাঁদা পাওয়া যায়। বেগুনে মিশ্রিত হলদে এক জাতীয় গাঁদা ফুলও জন্মে।

ফুলের মধ্যে সবচেয়ে রং-এর বাহার দেখা যায়, বিলাতী মরসুমী (Season flowers) ফুলেতে। কী রং-এর ছটা! একই ফুল নানা রং-এর হয়। কসমস সাদা, লাল, গোলাপী ও বেগুনে রংএর হইয়া থাকে। পপি ফুল রং যেমন লাল, তেমনি সাদা, বেগুনে, হলদে প্রভৃতি রং-এর পপি ফুলও ফুটিতে দেখা যায়। দোপাটিও নানা রং-এর হইয়াছে। ডায়ান্থাস বা পিঙ্ক জাতীয় যে ফুল আছে তাহার রং অনন্ত প্রকারের। একই ফুলে কত বিচিত্র রং-এর সমাবেশ! পিটুনিয়া, ফ্লক্স, এণ্টিরিনাম, হলিহক প্রভৃতি ফুলের রং নানাবিধ ও নয়নাভিরাম। দেশী ফুল অপরাজিতা সাদাও আছে, কিন্তু ইহার নীল রং বাস্তবিকই রং-এর মধ্যে অপরাজেয়। কৃষ্ণচূড়ার সুবৃহৎ বৃক্ষ যখন অসংখ্য লাল ফুলের স্তবকে মণ্ডিত হয়, দূর হইতে সে দৃশ্য বাস্তবিকই অপূর্ব!

উদ্ভিদরাজ্যে রং-এর প্রভাব বর্ণনার পর প্রাণিরাজ্যে উহার প্রভাব বর্ণনা করিতেছি। মাছের কথাই আগে বলি। ইলিশ, ভেটকী, রুই, কাতলা, মৃগেল, পুঁটী, চাঁদা প্রভৃতি মৎস্য সবই সাদা। কালিবাউস মাছ অনেকটা কালো। অপর দিকে মাগুর, সিঙ্গি, কই, ল্যাঠা, শোল প্রভৃতি জিওল মাছ কালো। সাধারণ মাছের মধ্যে বোয়াল, পাকাল মাছ ঈষৎ হলদে। তোপসে মাছ বেশ হলদে রং-এর। গলদা চিংড়ীর রং সুন্দর নীল। অন্যান্য রঙ্গীন মাছ নাই কী? আছে বৈ কী। অতি সুন্দর সুন্দর লাল, নীল, হলদে, কালোয় সাদায় মিশান মাছ তাহারা বিক্রয় করে। ইহাদের বর্ণচ্ছটা অতি মনোহর! চৌবাচ্ছায় রাখিলে এরা ডিম পাড়ে এবং ঐ সকল ডিম ফুটিয়া রঙ্গীন মাছের ছানা জন্মে। সেগুলিকে উপযুক্ত আহার দিয়া চৌবাচ্ছাতেই রঙ্গীন মাছের ব্যবসায়ীরা বড় করে ও পরে বাজারে বিক্রয় করে। একোরিয়াম (aquarium) দেখিয়াছেন? সেখানে সমুদ্রের বিভিন্ন প্রকারের মৎস্য জীবিত অবস্থায় রক্ষিত হয়। ঐ সকল মৎস্য প্রায় সমস্তই রঙ্গীন। ইহাদের রং এত বিভিন্ন প্রকারের ও এত সুন্দর যে ফুলের রংকেও হার মানাইয়াছে।

মৎস্যের পর পক্ষীদিগের রং-এর কথা বলিতেছি। কোনও জুলজিক্যাল উদ্যানে গেলেই নানা রং-এর পক্ষীর সন্ধান পাওয়া যাইবে। সাদা, কালো, লাল, হলদে প্রভৃতি বহু রং-এর পাখী আছে। দোয়েল পাখীর রং কি সুন্দর হরিদ্রা রং-এর! টিয়া পাখীর রং সুন্দর সবুজ। পক্ষিশ্রেষ্ঠ ময়ূরের পাখার রং-এ নীল, সবুজ প্রভৃতি রং-এর কি অদ্ভুত সমন্বয়! আর ময়ূর যখন পক্ষ বিস্তার করিয়া নৃত্য করে তখন উহার পক্ষের বর্ণসৌন্দর্য্য দেখিয়া মানব-মন মুগ্ধ হয়।

আর সব জন্তু-জানোয়ারদের গায়ের রং পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাই, ইহাদের রং অনেক স্থলে বিভিন্ন। গরু অনেক

রং-এর হয়—সাদা, কালো, লাল পাঁশুটে। খানিকটা অংশ সাদা, খানিকটা কালো বা লাল এরূপ রং-এর গাভী বা বলদও দেখা যায়। তবে নীল বা সবুজ রং-এর গাভী বা বলদ দেখা যায় না। ছাগলের গায়ের রং গরুরই মত। নীল সবুজ ছাগল দেখি নাই। কুকুর ও বিড়ালের গায়ের রংও ঐরূপ। এখানেও নীল বা সবুজের স্থান নাই। ভেড়ার গায়ের সাধারণতঃ রং সাদা বা ধূসর। মহিষ সব কালো। গণ্ডারও তাই। হাতীও কালো, তবে ব্রহ্মদেশে শ্বেত-হস্তী দেখা যায়। ভল্লুক সাদা বর্ণের হইয়া থাকে। সিংহের গায়ের রং ধূসর বা রক্তাভ। চিতার গায়ের রং অনেক প্রকার ও ডোরা কাটা। হরিণের রঙ সাধারণত হরিদ্রাভ। তাই স্বর্ণমৃগের রূপ ধারণ করিয়া সীতা দেবীকে প্রলুব্ধ করিয়াছিল। অন্যান্য রং-এর হরিণও আছে।

শ্রেষ্ঠ জীব মানুষের গায়ের রং সাধারণতঃ চারি প্রকারের। সাদা, হলদে, ব্রাউন ও কালো। ইউরোপীয় ও খাঁটি আর্য্য জাতীয় মানুষের গায়ের রং সাদা। চীন, জাপানের লোকেরা পীত জাতীয়। ভারতবর্ষের লোকেদের গাত্রচর্ম্ম সাধারণতঃ ব্রাউন। নিগ্রোরা কালো জাতির সংমিশ্রণের ফলে অনেকের গাত্রচর্ম্ম এই সব রং-এর মাঝামাঝি বহু দৃষ্ট হয়।

ফাল্গুনের দোল-পূর্ণিমায় স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভক্ত গোপিনীদের সঙ্গে রং-এর খেলা খেলিয়াছিলেন। সেই অবধি ভারতের সর্বত্র ঐ দিন হিন্দুরা রং-এর খেলা বা হোলি উৎসব পালন করেন। তখন সকলকার পরিধেয় বস্ত্রাদি বিবিধ রংএ এবং মস্তকের কেশ ও কপোল প্রদেশ লাল আবীরে রঞ্জিত হইয়া থাকে।

রং-বৈচিত্রের আলোচনা এইখানেই শেষ করিতেছি। সকলেই চায় রং। সবচেয়ে বেশী চায় শিশু, তাই শিশুপাঠ্য গ্রন্থে রঙ্গীন ছবির প্রাচুর্য্য। প্রকৃতির যে রং-এর ভাণ্ডারের অধিকারী মানুষ-মন তাহা সর্ব্বদা উপভোগ করিয়া থাকে। নিশাবসানে 'জবাকুসুমসঙ্কাশ' সূর্য্যদেব পূর্ব্বগগনে উদিত হন। তখন আকাশে অল্প অল্প মেঘ থাকিলে সূর্য্যরশ্মি বিচ্ছুরিত হইয়া মেঘে মেঘে রক্তের ঢেউ-এর সৃজন করে। সমুদ্রগর্ভ হইতে প্রাতঃসূর্য্যের উদয় রং-এর এক বিস্ময়কর দৃশ্য! তার পর সূর্য্যরশ্মি প্রখর হইতে প্রখরতর হইতে থাকিলে সমগ্র পৃথিবীর রংভাণ্ডার উন্মুক্ত হয়। পল্লীগ্রামের দিগ্‌দিগন্তব্যাপী বৃক্ষশ্রেণীর সারি সবুজ রং-এ ভরা। শাবদাগমে মাঠে মাঠে ধান্যগুচ্ছেও সেই সবুজ রং-এর দিগন্তবিস্তৃত খেলা। উপরে নীল আকাশ, নিম্নে পৃথিবীর সবুজ মেখলা—চমৎকার রং সামঞ্জস্য! পৃথিবীর তিন ভাগই জল। তাই সমুদ্রতীরে দাঁড়াইয়া দেখি, নীল রং-এর অপূর্ব্ব সমাবেশ। উপরে নীল আকাশ, নিম্নে সমুদ্রের সুনীল অনন্ত বারিরাশি। কি সুন্দর এই দৃশ্য! যিনি স্বচক্ষে না দেখিয়াছেন, তিনি উপলব্ধি করিতে পারিবেন না। দিবাবসানে সূর্য্য পশ্চিম গগনে অস্ত গেলেন। আবার মেঘে মেঘে লাল, কমলা, পীত, বেগুনে রং-এর ঢেউ উঠিল এবং উহা সাগরের নীল ও বৃক্ষরাজির সবুজ মিলিত হইয়া সমস্ত বর্ণেরই একত্র সমাবেশ সম্ভবপর হইল।

জয়দেবকৃত দশাবতার

[স্তোত্র অবলম্বনে]

শ্রীমৎ কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী

যবে প্রলয়ের কালে ভাসিল সাগর-জলে বেদমাতা সহ এই ধরণী,
মীনরূপে ভগবান মায়াতীত মহীয়ান রক্ষা কর সমগ্র মেদিনী।
জয় হোক হে কেশব, জয় হোক জগদীশ, জয় হোক হরি গুণমণি।
কূর্ম্মরূপে যবে তুমি ধরণীরে ধর স্বামী বিপুল তোমার পৃষ্ঠে ক্ষত-চিহ্ন হয়।
কূর্ম্মমূর্ত্তিধারী হরি রক্ষা কর ত্রিপুরারি বিশ্বজনে গাহে তব জয়।
জয় হোক হে কেশব, জয় হোক জগদীশ, জয় হরি জয় জ্যোতির্ম্ময়।
এ মেদিনী ভীতা হলে প্রবেশিলে রসাতলে উদ্ধারিলে দেব নিরঞ্জন,
বরাহ মূরতি ধরি দশন শিখরে হরি সে কলঙ্ক করিলে ধারণ।
জয় হোক হে কেশব, জয় হোক জগদীশ, জয় হরি পতিতপাবন।
তব কর-নখ-শৃঙ্গে বধ কর দেহ-ভৃঙ্গে হিরণ্যকশিপু নামে অরি,
নরহরি রূপ ধরি প্রহ্লাদে বাঁচালে হরি তব জয় গাহে নর-নারী,
জয় হোক হে কেশব, জয় হোক জগদীশ, জয় হরি ভক্তের কাণ্ডারী।
বামনরূপেতে হরি বলিরে ছলনা করি পবিত্র করিলে গঙ্গাবারি,
তব নখস্পর্শ পেয়ে মর্ত্তে নামিল ধেয়ে দগ্ধ ধরা গেল স্নিগ্ধ করি,
জয় হোক হে কেশব, জয় হোক জগদীশ, জয় হরি মুকুন্দমুরারি।
অত্যাচারী ক্ষাত্র রক্ত ধরণী করিলে সিক্ত ক্ষাত্র-বীজ সমূলে নাশিলে।
ক্ষাত্রদম্ভ চূর্ণ করি ভৃগুপতিরূপ ধরি মর্ত্তধামে তুমি প্রকাশিলে,
জয় হোক হে কেশব, জয় হোক জগদীশ, জয় জয় গাহি সবে মিলে।
দশদিকপতি আশে দশানন কাঁপে ত্রাসে দশমাথা করিলে হরণ।
রঘুপতিরূপ ধরি দশাননে বধ করি দশ দিকে করিলে অর্পণ,
জয় হোক হে কেশব, জয় হোক জগদীশ, জয় হরি কৌশল্যানন্দন।
নীল-বসনপরি বলবান হলধারী জন্মিলেন শুভ্র তনু লয়ে।
যমুনার নীল আভা তাহে শুভ্র তনুশোভা জগজনে হেরিল বিস্ময়ে,
জয় হোক হে কেশব, জয় হোক জগদীশ, ভুবন ভরিল তব জয়ে।
পশুবধে ব্যথাহত দেব যজ্ঞে অবিরত নিন্দিলে সে যজ্ঞের বিধান!
বুদ্ধমূরতি ধরি প্রকট হইলে হরি করুণায় বিগলিত প্রাণ,
জয় হোক হে কেশব, জয় হোক জগদীশ, জয় হরি করুণানিদান।
ম্লেচ্ছ নিধনের তরে শাণিত করাল করে ধূমকেতু সম প্রকটিত,
কল্কিরূপ ধরি হরি বিনাশিবে যত অরি তব যশে ধরণী প্লাবিত,
জয় হোক হে কেশব, জয় হোক জগদীশ, শ্রীচরণে প্রণতি সতত।
দশরূপে মর্ত্ত্যধামে প্রকাশিলে ভিন্ননামে জয়দেব বন্দে ও চরণ,
যে নামেতে সদাশুভ পার করে ভবার্ণব সেই নাম লইনু শরণ,
জয় হোক হে কেশব, জয় হোক জগদীশ, জয় হরি বিশ্ববিমোহন।
এবে সেই মূর্ত্তি ধরি দাঁড়াও সম্মুখে হরি যাহে ভোলে ব্রজের ললনা,
কৃষ্ণানন্দ যায় ডুবে তোমার মোহনরূপে যে রূপের নাহিক তুলনা,
জয় হোক হে কেশব, জয় হোক জগদীশ, দাস তব গাহে সে বন্দনা।

রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়কে লেখা কয়েকটি অপ্রকাশিত পত্র

[বাঙলার জাতীয় জাগরণের অন্যতম পথপ্রদর্শক উত্তরপাড়ার স্বনামধন্য স্বর্গত রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়ের নাম তদানীন্তন ভারতীয় রাজনীতির ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে। সমসাময়িক মনীষিবৃন্দ অশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে রাজাকে নানা বিষয়ের সমস্যায় আহ্বান জানিয়েছেন—নিম্ন পত্রসমূহ যার জ্বলন্ত নিদর্শন। রাজাকে লেখা এই চিঠিগুলি শ্রীরমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত।—স]

দাদাভাই নাওরোজীর পত্র

হাউস অফ কমন্স
৩১এ মে ১৮৯৫

প্রিয়বর মহাশয়,

আপনার গত ৮ই তারিখের পত্রে সমকালীন পরীক্ষাগুলির বিষয় সমূহকে কেন্দ্র করিয়া এক বৃহৎ সভা আহ্বানকল্পে আপনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন জানিয়া পরমানন্দ লাভ করিলাম। উপরোক্ত বিষয়গুলি লইয়া ঐ জাতীয় যে কোন বৃহৎ সভার সংবাদেই আমি পরিতৃপ্ত হইব। এমন কি, যদি ঐ জাতীয় কোনও সভা শেষ পর্যন্ত আহুত না-ও হয় তাহা হইলে সেক্ষেত্রে সারা ভারতবর্ষ হইতে প্রচুর সংখ্যক স্বাক্ষর সম্বলিত যতগুলি সম্ভব আবেদন সংগ্রহেরই প্রয়োজনীয়তা সর্বাপেক্ষা অধিক। উপরোক্ত বিষয়ে ভারতবর্ষের অধিবাসিবৃন্দ কতখানি আগ্রহান্বিত কিন্তু সমকালীন পরীক্ষা সম্পর্কীয় ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের সংবিধানগুলির কার্যকরণের দিকে ভারতীয় কর্তৃপক্ষগণের বিরাট উপেক্ষা যে কি পরিমাণে তাহাদিগকে নিরাশ করিতেছে, ঐ আবেদনগুলির সাহায্যে তাহাই আমরা হাউসকে দেখাইতে চাহি। আবেদনগুলিকে আয়তনে দীর্ঘ করিবার প্রয়োজন নাই। উহার সহিত সম্বলিত স্বাক্ষর সমূহের সংখ্যাপুষ্টিই অধিক পরিমাণে জরুরী এবং প্রয়োজনীয়।

আপনার একান্ত বিশ্বস্ত
দাদাভাই নাওরোজী

দিকপাল আইনজ্ঞ
স্বর্গীয় ডাঃ স্যার রাসবিহারী ঘোষের পত্র

[স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের বিধবা কন্যা স্বর্গীয়া কমলা দেবীর পুনর্বিবাহকেই কেন্দ্র করে নিম্নলিখিত পত্রটি লিখিত। এই পুনর্বিবাহের ব্যাপারে সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের সহধর্মিণীর যোগাযোগ থাকায় আমরা অনুমান করতে পারি (বিশেষ করে এতে তাঁর আপত্তি লক্ষ্য করে) যে কমলার প্রথম পক্ষের শ্বশুরকুলের সঙ্গে বঙ্কিমগৃহিণীর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা বিদ্যমান ছিল। এই পত্র-পাঠান্তে প্যারীমোহন স্যার রাসবিহারীর অনুরোধ রক্ষা কল্পে তাঁর সুযোগ্য জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রসিদ্ধ বিপ্লবী নেতা স্বর্গীয় রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (মিশ্রীবাবু)কে উপরোক্ত পত্রেরই পশ্চাৎপৃষ্ঠায় নিম্নোক্ত নির্দেশ-চিরকুটটি লিখে দেন—"এই পত্র পড়িয়া তুমি ৫-৯ মিনিটের গাড়ীতে বালি হইতে কলিকাতায় যাইয়া সিধুর মাকে এ বিষয়ে যদি মত করিতে পার চেষ্টা করিবে।"]

[illegible] থিয়েটার রোড
কলিকাতা
ফেব্রুয়ারী ২৬, ১৯০৮

প্রিয় রাজা,

আপনার জ্ঞাত আছে যে, বিচারপতি মুখোপাধ্যায়ের অল্পবয়স্কা বিধবা কন্যার পুনর্বিবাহ ঘটিতেছে আগামী কল্য। এই পুনর্বিবাহে বঙ্কিমবাবুর বিধবা প্রবল প্রতিবাদ উত্থাপিত করিয়াছেন এবং আমার ভয় হয় যে হয়তো আগামী কল্য তিনি এক বিশ্রী অবাঞ্ছিত পরিবেশের সৃষ্টি করিতে পারেন। আপনি জানেন যে, এইরূপ ক্ষেত্রে কন্যার পিতাই তাহার অভিভাবক এবং এ সকল বিষয় কন্যার প্রথম পক্ষীয় শ্বশুরকুলের কোনরূপ দাবী কিংবা তাহার প্রতি কোনরূপ অভিভাবকত্ব আইনের চক্ষে কোনক্রমেই গ্রাহ্য নহে। বঙ্কিম বাবুর পরিবারের সহিত আপনার নিবিড় বন্ধুত্বের কথা স্মরণ করিয়া এই আসন্ন তিক্ততার নিবারণকল্পে স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিতে সনির্বন্ধ অনুরোধ জ্ঞাপন করি। অপব্যয় করিবার মত সময় একেবারেই নাই। যদি বিশেষ পক্ষপাতের ছায়া না পতিত হয় তাহা হইলে একবার অনুগ্রহ করিয়া অদ্য কিংবা তাহা যদি একান্ত অসম্ভব হয় তো আগামী কল্য প্রাতে বঙ্কিম বাবুর বিধবার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আপনাকে অনুরোধ করিতাম। বেচারী আশু অত্যন্ত বিপদ ও অসুবিধায় পড়িয়াছে, তাহার অনুরোধেই আপনাকে আমি এই পত্র লিখিতেছি।

আপনারই
রাসবিহারী ঘোষ

কাশিমবাজারের স্বর্গীয় মহারাজা স্যার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর পত্র

কাশিমবাজার রাজবাটী
২৩শে ফেব্রুয়ারী ১৯০৬

প্রিয়বর রাজা,

আপনার স্নেহপূর্ণ পত্র এবং তৎসহ প্রেরিত কার্পাস উৎপাদন সম্বন্ধীয় পুস্তিকাখানির জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ গ্রহণ করিবেন। যথার্থই

ইহা একটি অতি সুন্দর পুস্তিকা। সংক্ষিপ্ত অথচ প্রয়োজনীয় তথ্যসমূহে ভরপুর। যাহারাই নিজ নিজ দেশে কার্পাসের মার্জ্জন বা উৎপাদনের বিষয় আগ্রহশীল এই পুস্তিকা তাহাদিগকে বহুল পরিমাণে সাহায্য করিবে। আমাদের বঙ্গদেশে কার্পাস যদি অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয় এবং আমাদের বঙ্গদেশীয়গণের দ্বারাই যদি সূত্রকর্ত্তন কার্য্য সম্পন্ন হয় তাহা হইলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস বা ধারণা যাহাই বলুন যে, বিদেশ হইতে আনীত বস্ত্রগুলির তুলনায় অতীব অল্পমূল্যে যে কোন শ্রেণীর বস্ত্র বিক্রয় করা যাইতে পারে। এই মহৎ প্রচেষ্টায় আপনার হস্তক্ষেপ এবং ইহার উন্নতি সাধনকল্পে আপনার পরিশ্রম সত্য সত্যই ধন্যবাদার্হ।

আমার কলেজের অধ্যক্ষ পদের জন্য আমাদের নির্ব্বাচন পরম শ্রদ্ধাভাজন স্বর্গীয় রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়ের দৌহিত্র রেভারেণ্ড ই. এম হুইলারের পক্ষে গিয়াছে। ঘটনাচক্রে এবং পারিপার্শ্বিক প্রভাবের চাপে উক্ত পদের জন্য ক্যামেরণ মহোদয়ের আবেদন আমাদের সমর্থন লাভ করিতে পারিল না। এজন্য আমি দুঃখিত। আশা করি সপরিবারে কুশলে আছেন।

আপনারই

মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী

ভারতের তৎকালীন বড়লাট ডাফরিন ও এভার মার্কুইসের পত্র

ব্রিটিশ এমব্যাসী, রোম
এপ্রিল ২৭, ১৮৮১

প্রিয়বর রাজা,

প্রতিমূর্তি ও প্রতিকৃতির নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ করা হইয়াছে জানিয়া আপনি যে আনন্দিত হইবেন, এ বিষয়ে আমি স্থির নিশ্চিত। অন্যতম শ্রেষ্ঠ (যদি একান্তই তাঁহাকেই ইয়োরোপ খণ্ডের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলা না যায়) ভাস্কর মিঃ বোকুম্ (Bochm) একটির এবং মিঃ শ্যামন্স (Shammons) অপরটির নির্ম্মাণ করার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। যেহেতু, লণ্ডনের শ্রেষ্ঠতম ঋতুর বিরাজ কালে লেডী ডাফরিনকে প্রতিকৃতি ও প্রতিমূর্তি উভয়ের জন্যই শিল্পীদের সম্মুখে নিয়মিত ভাবে বসিতে বলা ঠিক সম্ভব হইবে না, তজ্জন্যই আমি প্রস্তাব করিয়াছি যে ভবিষ্যতে শরৎকালে তিনি যখন রোমে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন সেই সময় তাঁহার প্রতিমূর্তি নির্ম্মাণ কার্য্য সুরু হইবে। আশা করি সর্বতোভাবে আপনি কুশলে আছেন। ইংল্যাণ্ডে লেডী ডাফরিন এবং আমার সন্তান-সন্ততিগণ বর্তমানে অবস্থান করায় আমি একাকী এই চারি মাস এখানে বেশ নিরুপদ্রবে অতিবাহিত করিতেছি। দীর্ঘদিনের অবকাশ লইয়া যে মাসের শেষের দিকে তাহাদিগের সহিত মিলিত হইব বলিয়া আশা রাখি।

প্রিয়বর রাজা, আপনার বিশ্বাসার্থী

একান্ত ভবদীয়
ডাফরিন য়্যাণ্ড এভা

আচার্য্যা ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর পত্র

শ্রীমতী প্রতিমা দাশগুপ্তকে লেখা

লাল বাঙ্গলা, ১নং পাম প্লেস
বালিগঞ্জ

কল্যাণীয়াসু—

তোমার ১৩ইর চিঠি ঘুরে ফিরে আমাকে কলকাতায় এসে ধরেছে। কারণ আমরা ১৩ই বোলপুর থেকে জয়যাত্রা করেছি। প্রতি বৎসর যেমন এবারও তেমনি গরমের ক' মাস এখানে কাটিয়ে সেই বর্ষার মুখে বোলপুর ফিরবো। এ বাড়ী ত তোমার চেনা হয়ে গেছে। বাড়ীর লোকও কতক তোমার জানা। শাশুড়ী, তিন জোড়া ছেলে বউ ও তস্য ছেলে পিলে এবং আপাততঃ আমরা উপরি। এবার আর একটি নতুন লোকও সপরিবারে রয়েছেন—আমার ছোট ভাইঝি জয়শ্রী সেন। মঞ্জুশ্রী (বড়) কে বোধ হয় সেবার দেখেছিলে। জয়শ্রীর স্বামী মটরু সেনকে চেনো কি? ৺গুরুপ্রসাদ সেনের নাতি, সিমলায় ডাকঘরে বড় কাজ করে। তোমার স্বামী বোধ হয় চিনবেন। জয়শ্রীর স্বামী ওকে ২২শে এপ্রিল এসে নিয়ে যাবে, সুতরাং তার আগে কলকাতায় এলে তবে তার সঙ্গে তোমার দেখা হবে।

এখানে গরম পড়ে আসছে, তবে এখনো কষ্টকর হয়নি। আমার সময় মোটের উপর পুর্ব্ববৎ কাটছে। উপরন্তু মাঝে মাঝে ঠিকেতে ঠকস ঠকস করে আত্মীয়, বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে যাই। আশীর্ব্বাদ জেনো। ইতি

শ্রীইন্দিরা দেবী

পুনশ্চ, শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু—

অনেকদিন পর তোমার প্রণামী পত্র পেয়ে খুসি হলুম। তুমি আমাদের বিজয়ার স্নেহাশীর্ব্বাদ জেনো। এবার এত চিঠি পেয়েছি যে সকলকে সময়মত লেখা অসম্ভব ছিল। তুমি দেরিতে এসেছ তাই দেরিতে জবাব পেয়েছ। আমার আবার সম্প্রতি কলকাতায় যাবার মিথ্যা গুজব কে রটালে জানিনে। আমি তো শুধু মাস তিনেকের জন্য গরমের সময় কলকাতা যাই মাত্র।

তোমার ওখানে যাবার সাদর নিমন্ত্রণ পেয়ে খুব খুসি। কিন্তু কোন কালে রক্ষা করবার আশা দুরাশা মাত্র। যে মানুষ পাশের বাড়ী হেঁটে যেতে দশ মিনিট লাগান, তাঁকে নিয়ে তোমাদের পাণ্ডব-বর্জ্জিত দেশে যাওয়া অসম্ভব। যদিও ডাক্তার বর্জ্জিত নয়, সে এক মস্ত সুবিধে।

তোমার ঘর সংসারের কাজের বর্ণনা পড়ে বেশ মজার লাগল। তবে অপর পক্ষের জবানী না শুনলে ঠিক বোঝা যায় না। তুমি আমার তিন কেলে গলার গান কি শুনবে; আমিই বরং এবার দেখা হলে তোমাকে গান না গাইয়ে ছাড়ব না। আমার তো অধিকাংশ সময় এখন গান নিয়েই কাটে। পুজার ছুটির পর আজ স্কুল খুললো। গরম কমে ঈষৎ ঠাণ্ডা পড়েছে। আশীর্ব্বাদ জেনো। ইতি

শ্রীইন্দিরা দেবী

পুনশ্চ, শান্তিনিকেতন—

কল্যাণীয়াসু—

আমার চিঠিখানা খুলেই বুঝতে পারবে গোড়ায় কি গলদ করেছ, তোমার 'বাসন্তী' নামক কোন প্রিয় বান্ধবীর চিঠি আমার নামাঙ্কিত লেফাফায় পুরে ডাকে দিয়েছ এবং খুব সম্ভব আমার চিঠিখানা তাঁকে পাঠিয়েছ। তাই নয় কি? আমার ভুল চিঠিখানা তোমাকে ফেরৎ পাঠালুম, যথাস্থানে পাঠিও, আর তিনিও সম্ভবতঃ তাই করবেন। লাভের মধ্যে তোমার ডবল ডাক খরচা লাগবে।

এমন অন্যমনস্ক হলে কেন বল দেখি? বরাবরই এই রকম, না সম্প্রতি শরীর খারাপ হয়ে অমন হয়েছে? এখন কেমন আছ? আশা করি ক্রমে বল পাচ্ছ। তোমার তো ঘরেই ডাক্তার, ভাবনা নেই, কিন্তু রোগীরও নিজের যত্ন চেষ্টা দরকার। বিশেষতঃ তোমার মেয়েটিকে দেখতে হবে।

ভালো কথা। আমি তোমার কি বিশেষণ দিয়েছিলুম যা শুনে তোমার শ্বেতাঙ্গ বন্ধুটি হেসে বাড়ী ফাটাবার উপক্রম করলেন। এখন তো এই বর্ণনাটিই উপযুক্ত মনে হচ্ছে :—

"A daughter of the Gods, divinely tall
and most divinely fair"

কিন্তু তখন কি লিখেছিলুম মনে নেই, লিখে পাঠাও।

এখানকার সঙ্গীত-ভবনের সঙ্গে আমি বরাবর সংশ্লিষ্ট কিন্তু তিনকাল গত; কাজেই মেয়েরা পুরনো গান শিখতে আমার কাছে আসে, তা ছাড়া একটা শ্রেণীকে নিয়মিত শেখাতেও হয়। সামনে মাঘোৎসব আসছে, এবার তার গান নিয়ে পড়ব। এখানে বারো মাসে তেরো পার্ব্বণ, আর সব সময়েই গান। তা ছাড়া লেখাপড়া সংক্রান্ত কাজও মন্দ নেই। প্রুফ দেখা, তর্জ্জমা করা ইত্যাদি। প্রধানতঃ ওঁর চিঠিপত্র বা শ্রুতিলিখন লেখা, কারণ নিজে ভাল লিখতে পারেন না। ওঁকে একলা রেখে বেশিদূর বেড়াতেও যাইনে, বড় জোর পাশের বাড়ী 'উত্তরায়ণ' পর্য্যন্ত। আমাদের 'রোলস রয়েস' হচ্ছে রিকশ। আমি ৭ই পৌষের মেলার সঙ্গে এক মহিলা শিল্প মেলা ফেঁদে বিপদে পড়েছি, এখন তার হিসেব মিলিয়ে উঠতে পারছিনে। এবার গরমের ছুটিতে দেখা হলে তোমার গান শোনবার সময় নখী, দন্তী, শৃঙ্গীদের যথাসাধ্য দূরে রাখতে চেষ্টা করব। এবার শীত তেমন বেশী পড়েনি। আশীর্ব্বাদ জেনো।

ইতি

শ্রীইন্দিরা দেবী।

পুনশ্চ শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,—

তোমাকে কবে শেষ লিখেছিলুম তা' ঠিক মনে নেই। তবে তোমার চিঠি পাবার পর থেকে আমাদের এখানকার প্রধান প্রধান ঘটনা হচ্ছে—প্রথমে জানুয়ারির শেষ হপ্তায় মাঘোৎসব। তার গান ও পাঠ নিয়ে আমাকে বেশ কিছুদিন ব্যস্ত থাকতে হয়। আর তার আগে ডিসেম্বরের শেষ হপ্তায় পৌষ মেলার সঙ্গে মহিলা শিল্পমেলা যোড়বার কথা বোধ হয় পূর্ব্বেই বলেছি। পরে ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে শ্রীনিকেতনের মেলা হল। কলকাতা থেকে আমাদের ২।৩টি বান্ধবী সে সময়ে এসেছিলেন। তার মধ্যে ব্রহ্মকুমারী বা সাধন রায়ের স্ত্রীকে হয়ত জান। তাঁদের সঙ্গে গল্প ও মেলা যাতায়াতে ক'দিন বেশ কাটল।

এখানে ১২ মাসে ২৪ পার্ব্বণ। কাজেই এখনো আমাদের উৎসব চলছে। আসছে সোমবার দোল, সে উপলক্ষে জলসাদির তালিম চলছে। ইতিমধ্যে সাহেব অতিথিদের মনোরঞ্জনার্থে তাড়াতাড়ি দু'টি সঙ্গীতসন্ধ্যার আয়োজন করতে হল। তার মধ্যে মধ্যে তোমার মিতিন (এক নাম বলে) এবং আমার ভাজ প্রতিমা দেবী রবিবার "ডাকঘর"টা অভ্যাস করাচ্ছিলেন; আজ হবে। আমরা শারীরিক ভালো আছি। তবে সেদিন হঠাৎ একটি ৩৫।৩৬ বৎসরের পুরনো চাকরের মারা যাবার খবর পেয়ে মনটা বড় ভাল নেই। অন্য লোক পেলেও সেরকম আর হবে না।

গরম ক্রমে পড়ে আসছে। এবারে কলকাতা যাওয়ার পালা। তুমি কি এবার যাবে? তোমার শরীর এখন ভাল আছে আশা করি। একলা একলা বসে কিছু লেখবার চেষ্টা কর না কেন? নিশ্চয় চেষ্টা করলে পার, ভালও লাগে। আশীর্ব্বাদ জেনো। ইতি—

শ্রীইন্দিরা দেবী

লাল বাঙ্গলা, ১ পাম প্লেস, বালিগঞ্জ

কল্যাণীয়াসু,—

তোমার চিঠি পেয়ে খুশি হলুম, উত্তরে কার্ডখণ্ড মার্জ্জনীয়, কিন্তু দেখবে এতেও ধরাতে পারলে কম ধরে না। আমরা বোলপুরে ফিরে যাবার দিন এখনো ঠিক করিনি। তবে জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহ মধ্যেই সম্ভব যাব। বৃষ্টি পড়ার উপরেই কতকটা নির্ভর করে। এখন শুনতে পাই সেখানে ভীষণ গরম। এই লোকপ্রিয় বিশেষণটি অতি ব্যবহৃত হলেও এ স্থলে অতিরঞ্জিত হয়না। এখানে গরম কিছু কম না হলেও অমন লু বয়না, আর ২৪ ঘণ্টা পাখা পাওয়াটাও মস্ত সুবিধে। তোমরা কি পাও? তোমাদের ওখানের বর্ষা তো বিখ্যাত, থামতে জানেনা।

তোমার দাসীটি কি রকম সান্ধ্য অতিথির ভয় পায় ও দেখায় ঠিক বুঝলুম না। তাঁদের বলতে কি বুঝায়—ভূত, বাঘ না সাপ? যা হোক কোনটাই আদরণীয় নয়। তা হলেও তুমি সাড়ে ছটা থেকে কি করে এই গরমে দরজা দিয়ে ঘরে একলা (?) বসে থাক বুঝতে পারিনে। সন্ধ্যায় কি একটু বেড়াতেও যাও না? কি করে সময় কাটাও জানতে ইচ্ছে করে। ছোট্ট পরিবারের ঘরকন্নার কাজে ত খুব বেশি সময় লাগবার কথা নয়। তারপরে কি কর? পড়া, সেলাই, লেখা, গান-বাজনা, পড়ানো, কোনটা ভালবাস? এখানে তিনদিন 'মায়ার খেলা' অভিনয় সম্প্রতি শেষ হয়েছে। আমি দ্বিতীয় দিন বউদের নিয়ে গিয়েছিলুম। মাঝারি রকম মনে হল। কারোই খুব গলার জোর নেই। পুরুষদের চেয়ে মেয়েদের গান, অভিনয় ও সাজ ভাল হয়েছিল। তুমি থাকলে যেতে পারতে। বউমার কাছে পরে শুনলুম তুমি নাকি গীতশ্রী? পুজোর সময় কোথাও তো যাইনে, বোলপুরেই থাকি। এক যেতে হলে রাঁচিতে বাড়ী আছে সেখানে যেতে পারি। আশীর্ব্বাদ জেনো। ইতি—

শ্রীইন্দিরা দেবী

কবি কর্ণপূর বিরচিত

আনন্দ-বৃন্দাবন

অনুবাদক—শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ

আমি বন্দনা করি

কৃষ্ণের পদারবিন্দযুগল :—

যেখানে আপনা হ'তেই লগ্ন হয়ে থাকে কুরঙ্গীনয়নাদের স্নিগ্ধ অঙ্গরাগ···স্তনালিঙ্গন-প্রণয়ের লীলাবিলাসে।

তাঁর চরণতলের রক্তিমাটিকে নির্ব্বাধে সংবর্ধন করে,··· কুরঙ্গীনয়নাদের স্তনাগ্রমণ্ডলের কুঙ্কুম ;

তাঁর পায়ের পাতার নীলিমাটিকে প্রগাঢ় করে,···স্তনের অধোমণ্ডলের কস্তুরিকা ;

তাঁর নখ-চন্দ্রমার কান্তি-তরঙ্গটিকে,···ছলনা না করেই উচ্ছলিত করে···স্তনের মধ্যমণ্ডলবর্তী শ্রীখণ্ড। ১ ॥

"পূতনা"-রাক্ষসীর যিনি শত্রু, তাঁর চরণপদ্ম আমাদের পালন করুক ; রক্ষা করুক।

সেই পদ্মটির পাপড়ি—

কৃষ্ণের শোণ-স্নিগ্ধ চরণের ঐ অঙ্গুলি দল। নিজের পরাগে নয়, শ্রীরাধার স্তনযুকুল ঢুটির কুঙ্কুম-পরাগে আরক্তিম সেই পাপড়ি! নখরের তেজঃপুঞ্জ···সেই পদ্মের কিঞ্জল্ক-জাল ; জঙ্ঘাদেশ তার মৃণাল ; এবং ভক্তবৃন্দের শ্রদ্ধা···সেই কমলের মধু। ২ ॥

ভক্তচিত্তহারী চৈতন্য-নামা কৃষ্ণদেবের জয় হোক্। তিনি আমাদের কুলদৈবত।

নববিধ-ভজন-স্বরূপ স্বর্ণ-কমলের তিনি কানন ;

কারুণ্যের অমৃত নির্ঝর-পুষ্ট সৎপ্রেমের তিনি কনকাচল ;

ভক্ত-মেঘমালা-বিজয়িনী তিনি যেন এক নিষ্কম্প-বিদ্যুৎ। ৩ ॥

তাঁর যাঁরা প্রিয়পরিজন, তাঁদের হৃদয় বাৎসল্য-রসে ভরা ; তাঁদের আমরা নমস্কার করি।

আমাদের প্রভু,···জগতের দুঃখ-পাপ-ব্যসন-রাশির তিনি ক্ষয়কৃৎ ; তাঁর অদ্বৈত-প্রমুখ প্রিয়জনদেরও আমরা নমস্কার করি।

যাঁরা তুল্যপ্রেমী তুল্যগুণী ও তুল্য-করুণাময়···স্বরূপাদি সেই সরসমধুরদেরও আমরা নমস্কার করি। ৪ ॥

আমাদের গুরুদেব, তাঁর নাম "শ্রীনাথ", বিপ্রবংশের তিনি বিধু। প্রভুর তিনি দয়িত। তাঁর মুখনিঃসৃত শ্রীবৃন্দাবনের নির্মল রহঃ-কথা শ্রবণ করেন ও আস্বাদ ক'রে, জগতে কে এমন রয়েছেন যিনি পুলকাঞ্চিত হয়ে ওঠেননি? পৃথিবীর তিনি ভূষণ-রত্ন ; তাঁকেও আমরা নমস্কার করি। ৫ ॥

হায়, চৈতন্য ভগবৎ-পরীবার, এবং তৎপরে তিনিও, যখন স্ব-স্ব ধামে প্রয়াণ করেন, তখন বিগলিত হ'য়ে বিলুপ্ত হয়ে যায় বৈদগ্ধী প্রণয়-রসরীতি, এবং নিরালম্বের মত বাতাসে ঘুরে বেড়াতে থাকে সুকবিদের কাব্য-কুসুমমঞ্জরীর পরিমল। ৬ ॥

হে বাণি, আমি আজ কী গাইব তোমার স্তবগান? এমন কোন্ প্রাণী আছে, যে তোমার উদ্যমকে তোমার বাসনাকে ভাষায় প্রকট করতে পারে?

যে তোমাকে ভালো ক'রে বাঁধতে পারে তারই তুমি মান বাড়াও ; আর যে বাঁধে না, মান পেলেও তার সে মান তুমি ঘুচিয়ে দাও। ৭ ॥

হে বাণি, তুমি আমাদের মা। তোমার করুণা নিশি-দিন আমাদের আনন্দ-প্রসন্ন করে রেখেছে। তোমাকে দিয়েই আমরা স্তব করি···তোমারি : জল দিয়ে জলধির পূজা।

আমি কেবল আজ তোমার এই প্রত্যুপকারটুকু করেছি,···

আমি তোমাকে ডুবিয়েছি,

ভগবান কৃষ্ণের লীলামৃত-স্রোতে ;

সেই স্রোতঃ থেকে যেন তোমার

পুনরুত্থান না হয়। ৮ ॥

দেহীদের কাছে নিজের আত্মাটি বড় প্রিয় ; তাই চোখ খুলে নিজের কীর্ত্তির দোষগুলি তাঁরা দেখতে পান না। অন্য সমস্ত তিমির দূরে নিক্ষেপ করে দেয় দীপ, কিন্তু বিনাশ আছে কি তার আত্মমূল তিমিরের? ৯ ॥

নিজের চরিত্র সুনির্ম্মল হলেও, যাঁরা সুজন তাঁরা সর্ব্বপ্রথমেই পর্য্যালোচনা করেন স্ব-দোষ। স্বতেজে 'উজ্জ্বলন্ত হলেও অগ্নিদেব সর্ব্বসমক্ষেই উদ্গীরণ করে দেন ধূম। এর অর্থ তো স্পষ্ট। ১০ ॥

অর্থ-প্রভৃতির পর্যাকলন না হলেও, সুকবির পদাবলীই হ্লাদিত ক'রে তোলে হৃদয়। অবগাহন না করলেও পুণ্যনদীগুলি যেমন বারেক দর্শন দানেই পবিত্র করে দেন মন। ১১ ॥

পৃথক পৃথক পদাবলী মাত্র-ততঃক্ষণই নির্দ্দোষ হ'য়ে প্রতিভাত হয়, নিজের রসনা-সূচী দিয়ে যতক্ষণে না তাদের মাল্য করে গেঁথে ফেলছেন আমাদের কবি। ১২ ॥

হে বাণি, তুমি সম্মার্জনী ; তুমি নির্মল কর ভুবন ; পরের ফেলা এতটুকুও মালিন্য তুমিই ঝেঁটিয়ে পরিষ্কার করে দাও! তবু হে বাণি, তোমার জিহ্বার খল-স্পর্শ···হৃদয়ে জাগায় ভীতি। ১৩ ॥

নখ এবং লোম ছেঁটে ফেললেও ব্যথার ছিটে-ফোঁটাটি থাকে না ; বেড়ে উঠলেই কষ্ট দেয়। নখ-লোমের মতই···এই খল। বন্ধনহীন কে এমন রয়েছেন সংসারে যিনি সেই খল-পদার্থটিকে থর-ত্যাগ না করেন? ১৪ ॥

"আনন্দ-বৃন্দাবন"—নামধেয় কৃষ্ণচরিত্র-চিত্র এই চম্পুটির বিরচন করেছেন কর্ণপূর ;

রসগ্রাহীদের মনোবিনোদনের জন্য,

এবং স্বকীয় আনন্দিতির জন্য। ১৫ ॥

হেথায় হোথায় শাখায় শাখায় ছড়িয়ে ফুটে থাকে ফুলদল; গুম্ফন-কৌশলে তাদের চিত্রায়ণ হয় মাল্যে; তার উপরে, শুভ সৌরভগুলি যদি লগ্ন হয় তাদের অঙ্গে, তাহ'লে তার চেয়ে আর কী হতে পারে রমণীয়তর? ১৬॥

প্রথম স্তবক

বনের নাম বৃন্দাবন। কারণ, নিখিল গুণ-বৃন্দের এখানে "অবন" হয়, অর্থাৎ পালন হয়, শুভাগমন হয়, প্রাপ্তি হয়, দান হয়।

এই শ্রীবৃন্দাবন,—

নিখিল বৈকুণ্ঠের সার হ'লেও, কুণ্ঠা তাঁর সার মাধুর্য বল নয়। মৃত্তিকার স্তূপ হলেও নিত্য নবনবোদ্ভাসমান প্রচুরতম চিন্ময় তেজঃপুঞ্জ থেকেই তাঁর প্রাদুর্ভাব। নিজে অকৃত্রিম হলেও, কৃত্রিম সুখের তিনি গঠনকারী। প্রকৃতি-সিদ্ধ হলেও, অপ্রকৃতি মায়া-দ্বারা তিনি সিদ্ধ নন।

অতএব, নিত্য ভূত হলেও, তাঁরি মধ্যে বিরাজ করে অ-কারাত্মক বিষ্ণুর নিত্যরূপ প্রাণী-পৃথিবী-আদি প্রপঞ্চ। সু-রসের ও সু-ফলের বাহুল্য থাকলেও দেব-দুর্লভ।

বৃক্ষে বৃক্ষে সমাকীর্ণ এই বৃন্দাবন। বৃক্ষের প্রতিটি পল্লব বিশিষ্ট হলেও এখানে নেই এক কণা 'বিপদের আশঙ্কা। নিজেরা অ-জন্মা হলেও, ফুলের জন্ম দিয়ে তাঁরা ধন্য। তাঁরা "লীলা"-র আয়তন, ভ্রমরদের গুঞ্জন-যন্ত্রে প্রসন্ন।

লোভিত হয়ে রয়েছেন বৃন্দাবন মন্দার-দ্রুমের বাহুল্যে; অমন্দেরাই সেখানে স্থান পান।

বকুল-দ্রুমের সে কী সমারোহ! সবাই যেন নব কুলের।

নতমালা তমালের কী অপূর্ব বাহার!

প্রথম দর্শনেই মনে হয়, এই বৃন্দাবন যেন শ্রীভগবানের অতি-করুণ ভ্রমর-দেহ। ভ্রমরটি যেন বসে রয়েছেন প্রেয়সীর স্তনবলয়ের শিখরে এবং স্তনটিতে যেন ফুটে উঠেছে মন্মথের করজলেখার রক্তচন্দন।

তারপরেই মনে হয়, ইনি যেন মুনিদের একটি মণ্ডল। যেথের মধ্য দিয়ে প্রকাশ হয়ে যায় বৃক্ষ-মাহাত্ম্য। কারণ, সেখানে রয়েছেন "শাণ্ডিল্য" (পক্ষে বিল্ববৃক্ষ) "লোমশা"দি (পক্ষে জটামাংসীবৃক্ষ) মুনিবৃন্দ; রয়েছেন বানপ্রস্থিগণ (পক্ষে মহুয়া বৃক্ষ); এবং সেখানে তাঁদের চলেছে "গায়ত্রী"র (পক্ষে খদির বৃক্ষ) নিত্য "জপা" (পক্ষে জবা-বৃক্ষ)।

তারপরেই মনে হয়, ইনি যেন একটি সমরক্ষেত্র। যেহেতু সেখানে দেখতে পাওয়া যায় "অম্লান-বাণ" (পক্ষে নীলঝিণ্টি) "বীরের" (পক্ষে করবীর বৃক্ষ) বীরত্ব, "চর্মীর" (পক্ষে ভূর্জবৃক্ষ) ক্রীড়া, "পীলু"র (হস্তী, পক্ষে বৃক্ষভেদ) পরিবৃত্তি।

সত্যই যেন কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ হয়ে গেছে এখানে। তা না হ'লে এখানে এত ঘটা করেই বা থাকবেন কেন "গাঙ্গেয়" (ভীষ্ম, পক্ষে কাঞ্চন গাছ), ব্রণকর "অর্জুনশর" (পক্ষে নাগকেশর) এবং "শিখণ্ডী" (পক্ষে ময়ূর)?

আর এখানে রয়েছে··"অশোক" "অতিমুক্ত" (পক্ষে মাধবীলতা) "পুরুষের"র (পক্ষে পুন্নাগবৃক্ষ) নিবিড়তা। যেমন তিনি নিজে।

রন্ধ্রহীন একটি জ্যোতিশ্চক্র নিত্য বিরাজ করেন এই শ্রীবৃন্দাবনে। তাই—

একবার মনে হয়, এখানে সূর্য নেই, চন্দ্র নেই, ভূমি নেই, জীব নেই, শুক্র শনি কেতু রাহু বুধ বা নক্ষত্র—কিছুই নেই; আবার পরক্ষণেই মনে হয়, স্বতেজের আনন্দ-গরিমায় শ্রীবৃন্দাবন যেন জ্বলছেন ···তাই তিনি স-সূর্য; অমৃতের কিরণ ঝরাচ্ছেন···তাই তিনি স-চন্দ্র; বিধান করছেন নিখিল মঙ্গল,···তাই তিনি সু-মঙ্গল; বিবোধনের তিনি আধার,···তাই তিনি স-বুধ, স-জীবও সু-কবিগম্য। আলোকে আলোকে তিনি আলোকময়, ভানুপুত্র শনি থাকলেও সে আলোক তাঁর কমে না।

কেতনে কেতনে তিনি সমাকুল। অভিসার-সহায় তমসায় তিনি আবৃত। মোক্ষবিধায়িনী তারক-শক্তির তিনি আশ্রয়,···তাই বুঝি তিনি তারায় তারায় ভরা।

ভূ-তিলক হলেও এই বৃন্দাবন কিন্তু প্রাকৃত ভূমিবিশেষ নন। বিকার-কারণ "কাল" এখানে রহিত, অথচ উৎসব এখানে সদা-প্রচলিত। নিজে তিনি ব্যাপক, অথচ নব্য স্তবনীয় প্রেমের বা কৃষ্ণের তিনি প্রাপক।

১। এই বৃন্দাবনে—

কোথাও ভূ-প্রদেশ মরকতের,
গুল্মলতাদ্রুম কনকের;
কোথাও লতিকাগুলি পান্নার
বীথিকাগুলি স্বর্ণের;
কোথাও ভূ-প্রদেশ পদ্মরাগের,
গুল্মলতাদ্রুম স্ফটিকের;
কোথাও বাটিকাগুলি স্ফটিকের;
লতিকাগুলি পদ্মরাগের।

কোথাও পান্নার গাছে লতিয়ে উঠেছে সোনার লতা; সোনার গাছকে মাতিয়ে রেখেছে পান্নার লতা; কোথাও স্ফটিকের পাদপে জড়িয়ে উঠেছে পদ্মরাগ-লতিকা; পদ্মরাগপাদপকে আবার ফুটিয়ে তুলেছে স্ফটিকের লতা।

আর এখানে···এমন মণিদ্রুম নেই যার প্রত্যেক শাখাটি নয় বিবিধ রত্নময়;

এমন শাখা-প্রশাখা নেই যেটি সুচিত্রিত নয় মণিপল্লবে; এমন মণিপল্লব নেই, যার বন্ধনাতে নেই রত্নফুল, এমন রত্নফুলও নেই, যার বন্ধু নয় সুগন্ধ—আহা, আলবালগুলিও কী সুন্দর এই মণিদ্রুমের! কিন্তু ভিন্ন মণি দিয়ে তারা গড়া;

সুপূর্ণ তারা,···মণির ঝর্ণার মত নিত্য-ঝরে-পড়া বিহারমণি পর্বতের জলধারায়: উল্লসিত তারা,···অনিন্দ্যসুন্দর মণি-পক্ষীদের বিলাসে।

২। এবং এই শ্রীবৃন্দাবনের তরুগুলি—

পরমেষ্ঠীদের মত স্বয়ংজন্মা, ধূর্জটিদের মত জটাবিশাল, সূর্যদের মত সুচ্ছায়া।

তরুগুলির এত আলবাল,—যে ভ্রম হয় সনকাদি ঋষিগণ বুঝি শ্মশ্রু তুলিয়ে বসে রয়েছেন;

তরুগুলির এত আভা—যে মনে হয় চন্দ্রদেবেরা বুঝি আহ্লাদে চরণ মেলে দিয়েছেন কিরণের;

কাণ্ডগুলির এত সুগঠন,—যে মনে হয় তাঁরা যেন সকলেই ধনুর্দ্ধর যোদ্ধা ; অথচ এত শোভন তাঁদের বল্কল, যে দেখায় যেন বিলাসী।

এঁদের অজস্র শাখার নিত্যনির্মল কান্তি ভ্রান্তি জন্মায় ;

—কার্ত্তিকেয়-সনাথ সুরসৈনিক-সঙ্ঘের।

বাণের মত পাতাগুলির সে কী অপূর্ব বিন্যাস! প্রতিশাখায় মালতী ফুলের মঞ্জরী!···স্বপ্ন বহন করে আনে বর্ষার, স্বর্গের।

এই সমস্ত তরুই—

অবীজ-সমুৎপন্ন,

অব্যভিচারি-ফুল,

অনভিষিক্ত স্নিগ্ধ;···

যেন এঁরা মূর্ত্তিমান কর্মযোগ, যেন এঁরা মূর্ত্তিমান শর ;

যেন এঁরা—চিত্রশ্রেণীর মত, সুকবির কাব্যাভরণের মত অন্যূন, অনতিরিক্ত ;

যেন এঁদের সবগুলিই একই সময়ে অঙ্কুরিত-পল্লবিত-মুকুলিত-স্মেরিত-ফলস্থ-পাকস্থ হয়ে পক্বফল-দশায় অতিপ্রকাশ হয়ে উঠেছেন।

৩। ঊর্দ্ধ-পল্লব দলের প্রতিবিম্ব পড়ে আলবালে ; সৃষ্টি হয়ে যায় অধোপল্লবের দল। তখন মনে হয়, বৃন্দাবনের তরুবৃন্দই বিস্তারিত হয়ে প্রকাশ পেয়েছেন ঊর্দ্ধে ও অধে। অথচ আশ্চর্য! প্রস্তার স্ফটিকের সেই আলবালগুলি নিঃসলিল! অথচ সেখানে উদ্ভিন্ন হয়ে উঠেছে কিরণের অঙ্কুর, সেখানে পূর্ণসলিল-ভ্রমে রক্তপক্ষীরা এসে স্নানে নামছেন, চঞ্চু দিয়ে ডানা মেলে পালক ঝাড়ছেন, গা মাজছেন!

কোথাও আলবালটি আবার ইন্দ্রনীলমণি-ঘটিত। মণি যেন দুলছে, ঢেউ ছুটেছে নীল আভার। কালিন্দীর বাতাসচঞ্চল নীল জলে যেন ঐ ভরে উঠল আলবাল। আর সেই নীলজলে কাঁপল—কয়েকটি রোমাঞ্চিত-কোরক তরুশ্রেষ্ঠের প্রতিবিম্ব। যেন তারা বুকে জড়িয়ে ধরে রয়েছেন ধ্যানাবস্থিত কৃষ্ণ-কান্তির অজস্র মহিমা।

কোথাও আবার আলবালটি কুরুবিন্দ-রত্নের। রত্নের আভা লাগে অঙ্গ তরুর গায়ে ; আর মনে হয়, ওঁরা যেন চিরদিন অভিষিক্ত হয়ে চলেছেন লাক্ষারসেই। সত্যিই কি ওটি লাক্ষারস? না না, তা তো নয়! তরুবৃন্দই যেন সমুদ্‌গীর্ণ করে দিয়েছেন কৃষ্ণ-অনুরাগরস ; আত্মদেহের মধ্যে অবকাশ না পেয়ে, নিরন্তর চায়মান হয়ে যেন ছুটে বেরিয়ে আসছে সেই রস।

এই বৃন্দাবনে সমস্তই চিদাত্মক, সমস্তই বিবিধ শক্তিমান, সমস্ত কিছুই যেন ভগবানের অবতার। তাই অলৌকিক হলেও, সব কিছুই যেন লোকনেত্রে লৌকিকের মত দেখায়।

৪। এবং—

এই বৃন্দাবনের সমস্ত লতিকাই সর্বকাম-প্রদা।

এঁরা কি ললিতপত্রাঙ্কুরা বিলাসিনী? এঁরা কি স্বাধীনভর্তৃকার দল? নয়ন-প্রলোভন প্রিয় তরুগুলির আলিঙ্গনে পীড়িতা হয়েই তবে কি জড়িয়ে ধরেছেন তাঁদের তরুণ-সুন্দর প্রিয়তমদের? অনুরাগিনীদের উৎকণ্ঠিকার মত এঁদের বৃন্তে ফুটে উঠেছে ফুলের কলি। বাঁকা হলেও কে বলবে এঁরা বাঁকা? পুষ্পবতী হলেও এঁরা নীরজস্কা। আহা, এঁরা যেন সুচির-জ্যোতিঃ বিদ্যুতের দল। নিত্যকালের ভ্রমর উড়লেও ভ্রম জন্মান না এঁরা। মরুৎ দেবতা আন্দোলিত করলেও এঁদের গায়ে লাগে না ঝড়ের বাতাস।

৫। এবং, এই বৃন্দাবনে রয়েছে বহু উপবন। প্রত্যেকটি দর্শনীয়।

একটি উপবন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নারিকেল-বৃক্ষের অজস্র রমণীয়তা! ফলভারে নুয়ে পড়েছে ডাল আর মূলদেশগুলিকে শ্রীমণ্ডিত ক'রে বিছিয়ে রয়েছে নারিকেলের ফল ; মণিময় আলবালগুলিকে মাথার বালিশ ক'রে নেন তারা ঘুমিয়ে পড়েছে সুখে।

আর একটি উপবনে গুবাক-বৃক্ষের অপূর্ব্ব কমনীয়তা! গুচ্ছ গুচ্ছ ফলভরে তারা আনত। তনুমধ্যাদের কটিদেশের মত তাদের ফলগুলি করগ্রাহ্য ; মাল্যের মত তারা দুলছে গুবাকতরুর কণ্ঠে।

আর একটি উপবনে কী ফলই না ধরেছে নারঙ্গ-লতায়! পেকে উঠেছে অথচ গলেনি। যেন গগনে ফুটিয়ে রেখেছে আরক্ত মঙ্গল-গ্রহের মত অপরিমিত রক্তশোভা।

উপবনে উপবনে লবলী-লতার সে কী নয়নবিমোহন কম্পন! অথচ তাদের শোভন পল্লবগুলির লীলতা কী স্থির!

ডালিমলতার উপবনে সে এক চমক্ দেওয়া আনন্দ! কী অপূর্ব্ব ফুল! দিগ্বধূদের সীমন্তে যেন সিন্দুরের কলাবিলাস। আর তাদের ফল! পেকে ফেটে দানা ঝরছে। দানা নয়, যেন সিংহ-নখ-দীর্ণ রুধিরারুণ গজমোতি। শুকপাখীর পায়ের আঘাত লেগে নত হয়ে তারা ঝরছে।

খর্জ্জুরের উপবন রয়েছে সেখানে। কিন্তু সেখানে নেই খর্জ্জু-ব্যাধি ; অর্থাৎ নেই শোক, নেই মোহ, নেই জরা, নেই মৃত্যু, নেই ক্ষুৎ, নেই পিপাসা।

আর এই উপবনগুলির মাঝে মাঝে রয়েছে বহু অবান্তর কানন। তারা নিতান্তই মনোহর। দ্রাক্ষাফলে রমণীয় ও মধুর। আর সেখানকার বিরামগৃহগুলি বড় নির্মল, কেমন যেন কোমল। সেখানে যা চান তাই পেয়ে যান মৃদুলারা।

আর একটি উপবনে দ্রষ্টব্য বটে প্রিয়ঙ্গুলতিকার পরমরমণীয় সকলত্ব। ফল ধরেছে 'কর্মরঙ্গ', ফুল ধরেছে 'রঙ্গন', স্বর্গের যেন প্রাঙ্গণ। লক্তিতা' 'রম্ভার' প্রাচুর্য দেখে মনে হয়, স্বর্গের অপ্সরা দু'টি যেন উপবনে গান গাইতে নেমেছেন, আর গানের তালে তাল রেখে তালগাছগুলি দুলছে। আর ঐ 'কণ্টকি' ফলের (কাঁঠাল) কানন! তারা যেন কর্মকাণ্ডের শ্রেণী, পরিণামে যার মাৎসর্য-অঙ্কুরা —পাতশঙ্কাদি কণ্টকনিচিত স্বর্গাদি ফল। 'শৈলূষ-বৃক্ষের' (বিল্ব) বাহুল্য রয়েছে এখানে ; তারা যেন রূপকউপরূপাকে সফল শৈলূষদেরই দল।

আর ঐ জম্বুকাননগুলির শ্যামিমা। মনে পড়িয়ে দেয় মেরুমন্দর-শৃঙ্গের বিশিষ্ট তেজঃপুঞ্জ।

আর···নারায়ণের তপোরাশির মত সেখানকার 'বদরিকা' বন।

৬। এই বৃন্দাবন কালাতীত হলেও লাভ করেছিলেন ষড়্-বিভাগ। এখানে বিরাজ করতেন ছয় 'ঋতু'। অপ্রাকৃত হলেও প্রাকৃতের মতই তাঁরা ভাসমান। ভগবৎ-লীলার উপযোগিরূপে তাঁরাই পরিকল্পনা করেছিলেন এই ষড়্‌বিভাগ। যথা—

বর্ষাহর্ষ, শরদামোদ ; হেমন্ত-সন্তোষ, শিশিরসুখাকর, বসন্ত-কান্ত এবং নিদাঘ-সুভগা।

৭। বর্ষার 'হর্ষ' যখন নামেন তখন সর্বদাই···
কৃষ্ণ-মেঘ থেকে ঝরতে থাকে ঘনরস,—
যেন ভগবানের ভক্তিযোগ ;
চঠকাতে থাকে বিদ্যুৎ—
ক্ষণদ্যুতি সদানন্দদায়ী
ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারের মত ;
উৎকণ্ঠায় কেকাধ্বনি করে ময়ূর,—
পার্ব্বতীর বিগ্রহ দেখে
সমুৎকণ্ঠিত যেন নীলকণ্ঠ ;
অবিশ্রান্ত ডাকতে থাকে ডাহুক,—
বিতর্কমূলে ন্যায়গ্রন্থের যেন বচায়ন ;
ডাকতে থাকে চাতক,—
গরুড়ের যেন সবল ডানার গান।

বর্ষার 'হর্ষ' যখন প্রকাশ করে দেন অর্জুন গাছগুলিকে তখন মনে হয়···আলো ফুটল।

অতি সুন্দর দেখতে হয় এঁকে, যখন ভগবৎ-লীলার উপযোগী ব'লে—

ঝিরি-ঝিরি ঝরতে থাকে জল,
নিরন্তর জন্মাতে থাকে নবমৃদুল তৃণাঙ্কুর,
পান্নার মণিভূমিতে এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ায়
চমূরুমৃগের দল,
নবীন তৃণাঙ্কুরগুলিকে ভুল করে ভাবে
···মরকত মণিশিলার কিরণাঙ্কুর
আর পান্নার মণিভূমির কিরণ-বাষ্পগুলিকে ভাবে
বাষ্পাচ্ছেন্ন শস্য,
এবং চেবাতে থাকে তাই।

এবং ইনি যখন পৃথিবীর বুকের উপর টেনে দিতে থাকেন ঐ ওড়না··· নবতৃণাঙ্কুরময় পান্নার রঙের ঐ ওড়না···সজীব অতিমৃদুসঞ্চার ইন্দ্র-গোপকীটের মত পদ্মরাগমণিবসানো ঐ ওড়না,···তখন এঁকে সুশীতল করে রাখে কদম্বের গন্ধভরা অতিলঘু জলকণবাহী স্নিগ্ধ সমীর।

৮। এই বর্ষাহর্ষ বিভাগে—
মালতী-লতায় ফুল ফুটিয়ে
তাঁর মধুর হাসিখানি হেসে ফেলেন মেদিনী ;
কদম্বের কোরকে কোরকে
রোমাঞ্চিতা হয়ে ওঠেন বনশ্রেণী ;
আর—মেঘের অজস্র জলকণায়
অশ্রুমতী হয়ে ওঠেন দ্যু-রমণী।
এঁরা সকলেই সমানভাবে ছড়াতে থাকেন অনুরাগ।

৯। আর তখন কী অপূর্ব্বই না দেখতে হয় মনোমোহিনী ঐ নবোন্নত-পয়োধরা দিগ্বধূটিকে!
ভালে তার ইন্দ্রধনুলতিকার তিলক আঁকা,
আঁধার কুন্তলে নেচে বেড়াচ্ছে কনক-কেতকীর বিদ্যুৎ,
গলায় দুলছে—
বিমল বলাকার বিলোল মাল্য।

আর তখন শুনতে পাওয়া যায়···একটি সুস্নিগ্ধ গুরু-গুরু ধ্বনি। চাতকীরা ব্যাকুল হয়ে ডাকতে থাকে "এস এস দেরী কোরো না, আমাদের প্রাণ বাঁচাও" : আর মেঘের দল আশ্বাস দিয়ে বলেন— "মানিনি, উৎকণ্ঠিত হোয়ো না, এসেছি, বর্ষাচ্ছি" ; তারপরেই ওঠে তাঁদের গুরু-গুরু ধ্বনি, যেন ঘুরতে থাকে মানিনীদের মানভাঙ্গানোর এক যন্ত্র।

আর তখন শুনতে পাওয়া যায়···নৃত্যোন্মত্ত ময়ূরদের মৌরজ রব। শুনতে পাওয়া যায়···মেঘের গর্জন। সে নিনাদ যেন প্রিয়হারার প্রাণ-নিষ্কাশন মন্ত্র-পাঠ।

১০। কখনও বা এই বিভাগে—
চতুর্দিকে ডাকতে থাকে ডাহুক,
দলে দলে ডাকতে থাকে টিটিহবী,
দাত্যূহী, ময়ূর ময়ূরী,
ধারাকারে আকাশ ভেঙ্গে ঝরতে থাকে জল,
ঝপৎ ঝপৎ—শব্দ ওঠে,
স্নিগ্ধাতিমন্দ্র-ধ্বনি,
রতান্তসময়ে চক্ষে ঘনায় নিদ্রোৎসব
মুগ্ধনয়নাদের।

কখনও আবার এই বিভাগে—
বহুবরণ চিত্রের মত প্রস্ফুরিতা হয়ে ওঠেন উদ্যান শ্রী।
মাঝখানটি হয় গৌরবরণ,
পক্কফল নম্রশাখা আমের বনের মায়া নামে ;
অন্ত হয় শ্যামলবরণ,
পক্কফল জামের বনের ছায়া ঢলে ;
প্রান্ত হয় পাণ্ডুবরণ,
সূচীর মত কেতকীফুল গন্ধ হানে।

১১। দ্বিতীয় বিভাগটির নাম "শরদামোদ"।
পদ্মের দীঘিতে দীঘিতে ইনি সুন্দরিত ; যেন ইনি কমলা-করলালিত ভগবানের একখানি শ্রীচরণ।

শরতের এই "আমোদ"-টি যখন নামেন,—
তখন,—
হরিভক্তের পরম-নির্মল জীবনের মত,
ভক্তিবিবর্দ্ধিনী আশার মত,
নির্দ্দোষ হয়ে যায়
অমলিন হয়ে যায়—
দিক্‌দিগন্ত ;

তখন,—
জলাশয়ে জলাশয়ে,—
উড়তে থাকে চক্রবাক
ফুটতে থাকে পদ্ম।
দেখে মনে হয় যেন সানন্দে চক্র ঘোরাচ্ছেন চক্রী
আর তাঁর পাশে বসে রয়েছেন
প্রফুল্লিত কমলা।

তখন,—
জলাশয়ে জলাশয়ে,—
বুক চিতিয়ে ঘুরে বেড়ায় "ধার্ত্তরাষ্ট্র"—হংসের গর্ব্ব।
যেন তারা ধৃতরাষ্ট্রের নন্দন!
অবজ্ঞা করেছেন শ্রীভগবানের পাণ্ডব-দৌত্য।

।র তখন,—

জলাশয়ে জলাশয়ে,—
মিশে যায় মিশে যায় রাজহংসের বলয় ;
চুরি হয়ে যায় মন ;
মনে হয়, ওরা যেন সবাই
একটি একটি পরমহংস—
বিচরণ করছেন অধ্যাত্মযোগের মার্গে।

।এ এই শরদামোদ-বিভাগে,
এত ডাকতে থাকে অভিরাম "লক্ষণ"-সারসের সংহতি,
যে ভ্রম হয়, আমোদটিই যেন—
একখানি রামায়ণ,
রামলক্ষ্মণের আলাপলীলায় সুমধুর।
এত উঠ্‌তে থাকে নীলপদ্মের সৌরভ,
যে ভ্রম হয়, এই আমোদ-টিই যেন—
ভুবনামোদী ভগবৎ-যশঃ।
এত ফুটতে থাকে পুণ্ডরীক (শ্বেতকমল)
যে ভ্রম হয়,
ঐ বুঝি অগ্নিকোণে উদয় হয়েছেন
"পুণ্ডরীক" নামা শুভ্র দিগ্‌বারণ।
কুমুদফুলের মদ খেয়ে এত আমোদিত হয়ে ওঠে মধুকর,
যে ভ্রম হয়,
ঐ বুঝি নৈঋত-কোণে মদধারা ঝরাচ্ছেন
"কুমুদ"-নামা লোহিত দিগ্‌বারণ।
আর এত বিকশিত হয়ে ওঠে "রক্তসন্ধ্যক" পুষ্প
যে ভ্রম হয়,
ঐ বুঝি সায়ংকালে ধরণীতে নামছেন
রক্তিম-বরণী সন্ধ্যা।
তখন দলে দলে খেলে বেড়ায় মদোৎফুল্ল বৃষ,
সত্যযুগের ধর্মরাশির যেন পূর্ণ উল্লাস !
এবং আকাশে হেসে ওঠেন চাঁদ,—
সংগ্রামের সূচনায়
যেন তলোয়ারের বিলাস !

১২। এই শরদামোদ বিভাগে—
মহাহ্রদগুলির অবস্থা হয়ে ওঠে
বহিরুষ্ণ কিন্তু অন্তঃশীতল ;
দুর্জনের বাক্যোত্তপ্ত সজ্জনের মত।
এবং নীল গগনে ভেসে বেড়ায় শুভ্র মেঘের খণ্ড।
দিগঙ্গনার শ্বেতচন্দনের অঙ্গরাগের চেয়েও
সেই মেঘখণ্ডগুলি শুভ্রতর,
নভোলক্ষ্মীর বাতাসে-কাঁপা বসনাঞ্চল খণ্ডের চেয়েও
তারা শুভ্রতর,।
পবন-কন্যার রৌদ্রে-মেলে-দেওয়া কর্তনীয় কার্পাস তুলোর চেয়েও
তারা শুভ্রতর,

১৩। তপনতনয়ার কালো জলে,
যখন বিলাসসম্ভারের মত
বিম্ব পড়ে ঐ শুভ্র শুভ্র খণ্ড মেঘের,
তখন অনুমান বলে ওঠেন—
"যমুনার কালো জলে চর জেগেছে" ;
কখনো বা আবার বলে ওঠেন—
"ভগবানের অবগাহন-সৌভাগ্য উপভোগ করবার অভিলাষে,
সুরসরিৎ মন্দাকিনী বাস করতে এসেছেন যমুনা-দেবীর গর্ভে।"

১৪। এবং তখন বায়ু-কোণের ঐ "পুষ্পদন্ত"—দিগ্‌বারণ,—
বিকচ-কমল-কহ্লার আর হল্লকের আমোদে যিনি···মেদুর,
সপ্তচ্ছদের সৌরভে যিনি···মদগন্ধি,
মধুজীবী ভ্রমরদের অভিযানে যিনি···অঙ্কিত,
তিনি
অন্ধকার করে দাঁড়ান দিগ্বলয়,
চতুর্দিকে ছড়াতে থাকেন
পরমানন্দ-সৌরভ।

এবং তখন···তথায়···
আভাসিতা হতে থাকেন
পরাগ-রক্তি-বসনা মূর্তিমতী দেবী শরৎ।
কূজন-মুখর সারসেরা···তাঁর কাঞ্চিকা,
কলনাদী কলহংস···পায়ের পাঁয়জোর,
চক্রবাক-চক্রবাকী···তাঁর উচ্চ স্তনযুগ, এবং
ঈষৎ-বিকসিত কমল-কোষ···তাঁর বরানন।
কী অনিন্দ্য···তাঁর ঐ নীলপদ্মের নয়ন-জোড় !
কী চঞ্চল···তাঁর ঐ ভোমরা-লতার ভুরু !

এবং যখন পঙ্ক শুকিয়ে যায় আশ্বিনে—
তখন কপিলা গাভীদের মুখদর্শনের
শুভক্ষণ উপস্থিত হয় শরৎ-রাণীর।
একদা···তাই হয়েছিল "দেবহূতির"
যখন তিনি স্বামী "কর্দমের" প্রব্রজ্যা শেষে
দেখতে পেয়েছিলেন তাঁর পুত্র 'কপিলে'র মুখ।

আর তারপর—
যখন স্থলকমলের কাননে বিছিয়ে থাকে ফুলের বিছানা,
মুক্তাবিতানের মত চমকাতে থাকে নক্ষত্র-খচিত ব্যোম,
চামরের মত দুলতে থাকে কাশকুসুমের সমারোহ !
তখন মনে হয়,
অতুলিতকান্তি শরৎ-ঋতুই বুঝি
রাজার মত আমোদলীন হয়ে সমাসীন রয়েছেন এখানে। এবং
বর্ষাহর্ষ-বিভাগ থেকে ক্ষণিকের তরেও এই শরদামোদ-বিভাগে উপস্থিত
হলে তর্ক ওঠে—ব্যোমবৃক্ষের সেই শাখাগুলি,
যেগুলিকে টান মেরে নামিয়ে এনেছিলেন দিগ্‌বারণের দল,
যেগুলি আরো নুয়ে পড়েছিল সজল মেঘের প্রত্যভিযানে,—
তাদের কি সম্প্রতি মেঘমুক্ত দেখে,
দূরে চলে গেছেন দিগ্‌বারণের দল ?

১৬। তৃতীয় বিভাগটির নাম "হেমন্ত-সন্তোষ"।
"মহাসহা" ফুলের অম্লান মধুগন্ধে ইনি স্নিগ্ধ ;
···মহাবল-স্নিগ্ধ ভীমসেনের যেন অবতার।
মধুসূদন ভ্রমরদের সখা পীতাভ 'ঝিণ্টী' ফুলে ইনি রমণীয় ;
···মধুসূদনের প্রিয়সহচর অর্জুনের যেন অবতার।

'বাণ'-ফুলের এত নীলাভ আনুগত্য ইনি লাভ করেন, যে ভ্রম হয়,···মহেশের আনুগত্য স্বীকার করে ফেললেন নাকি বলি-পুত্র বাণ ?

লোধ্‌-ফুলের প্রফুল্লতায় এতই ইনি উল্লসিত, যে প্রশ্ন জাগে—ইনিই কি তবে কৈলাস,···যেখানে তাঁর শৃঙ্গারবতী অবলাটিকে অঙ্কে নিয়ে বিহার করেন শম্ভু ?

আহা, হেমন্তের এই সন্তোষটি যেন শ্রীভাগবত-গ্রন্থ,

···"শুকে"র মধু-ভাষায় বাচাল।

"হারীত"-পাখীর উড্ডীয়মানতায় ইনি এত সঞ্জীবিত, যে এঁকে দেখলেই মনে হয়, ইনি যেন প্রবীণ 'হারীত'-মুনি প্রবর্তিত আয়ুর্বেদ।

মদমত্ত "লাব"-পাখীর নিত্যানন্দে ইনি এত পুলকিত, যে এঁকে দেখলেই মনে হয়, ইনি যেন অহঙ্কারচ্ছেদী সাধুসঙ্গ।

এঁর অধীনতায় "দোষা" নাম্নী রজনী দেবী অহরহঃ উপচীয়মানা হলেও এঁকে দেখায় নির্দোষ। এঁর আবির্ভাবে ক্রমে ক্রমে এত শীতল হয়ে যায় সলিল, যে এঁকে দেখলেই মনে হয় ইনি যেন জনৈক জীবন-সলিল শীতলিত ভাগবৎ-উপাসক।

এবং পদ্মিনাদের গ্লানিকর হলেও, রাত্রিটিকে দীর্ঘ করে দিয়ে, ইনি পদ্মিনী সহেলিয়াদের কাছে হয়ে ওঠেন মহোৎসব।

১৭। এই হেমন্ত-সন্তোষ বিভাগে,—

প্রভাত হলেই, নব-রবির কিরণটুকু উপভোগ করবার লালসায় উতরোল হয়ে ওঠে মানুষের মন ;

অভিনব রৌদ্রের ধারা নেমেছে ভেবে, পদ্মরাগের মণি-ক্ষেত্রে শীত কাটাতে বসে যায় হরিণবধূর সভা ; জ্যোৎস্নায় ফুটফুট করছে ভেবে স্ফটিকের বিলাস-বীথিতেও জ্যোৎস্না-ভ্রমণ বর্জন করেন তাঁরা ;

ভগবান সূর্যদেবও যেন শীতের শঙ্কায় অগ্নিকোণের উপকণ্ঠটিকে সোৎকণ্ঠে গ্রহণ করে বসেন,···পরদার-কণ্ঠের মত।

১৮। এবং, তখন মরকত মণির বীথির পরিসরগুলি উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে কিরণাবলীর স্পর্শে। ওগুলি কি কিরণ ? না নতুন জাগা অঙ্কুর ? আমি সেগুলিকে যবাঙ্কুর ভেবে, এদিকে ওদিকে চাইতে চাইতে চরে বেড়ান চমুরু-মৃগের রমণীরা। ব্রজের হরিণনয়নাদের আঁখিতে তাঁরাই কি সঞ্চারিত করে দেন চমৎকারিতা ?

১৯। এবং এই হেমন্তের "সন্তোষ"-টি যখন নামেন,—

তখন, বিপুল হিম-স্পর্শে এক দিকে যেমন ধীরে ধীরে মন্দী হয়ে আসতে থাকে সূর্যের উষ্মা, তেমনি অন্য দিকে তেজী হতে থাকে··· রমণীদের কুচমণ্ডলের উষ্মাবৈভব। এক দিকে যেমন ধীরে ধীরে চিরায়মানা হতে থাকেন রাত্রি, অন্য দিকে তেমনি শীতার্ত প্রিয়তমদের আলিঙ্গন-সমরে স্বল্পায়মান হতে থাকে বধূদের বাম্য-সুরত।

তখন আর শীতের ভয়ে, মণি দিয়ে নিজেদের সজ্জিতা করেন না ব্রজসুন্দরীরা। তাঁরা কেশপাশে পরেন কুরুবক, অলকে দেন লোধ্‌ ফুলের রেণু, বুকে দোলান হলুদ-বরণ ঝিঁটি ফুলের মাল্য। ধূপের ধোঁয়ায় ভরিয়ে ফেলেন লীলাগৃহ, অঙ্গরাগে ব্যবহার করেন কালীয়কের প্রলেপ, তাম্বূলে দেন এলাচ।

শীতের গুণটিকে আর গুণ বলে তখন মনে হয় না, মনে হয় যেন···দোষ।

২০। চতুর্থ বিভাগটির নাম "শিশির সুধাকর।"

এই সময়ে সুহৃৎদের সমাগমের মত, উল্লসিত হয়ে ওঠে "বন্ধুজীব"-ফুল ;

কুন্দকলির দেহের উপর এমন ঢলে পড়ে সূর্যের আলো, যে মনে হয়, দুহিতা "সংজ্ঞা"-র কল্যাণের জন্য বিশ্বকর্মা বুঝি কুঁদের উপর চড়িয়ে দিয়েছেন সূর্যকে।

"দমনক"-ফুলের কী অপূর্ব উগ্র শোভা ! মনে পড়িয়ে দেয় সর্বদানব-দমনক ভগবান বৈকুণ্ঠনাথকে।

"মরুবক"-ফুলের পাতায় সে কী অপূর্ব গন্ধ, শুভ্রতায় সে কী আনন্দ ! সেই আমোদখানি ভেসে বেড়ায় সর্বত্র, আর মনে জাগায় অতীতের সেই মহা-বর্ষণের কাহিনী, যখন মরুর বুকের উপর দিয়ে উড়ে পালিয়েছিল উল্লাস-অধীর শঙ্খ-বকের পাঁতি।

এই সময়ে আনন্দে চঞ্চল হয়ে ওঠে ভরদ্বাজ পাখীর দল,···যেন ভরদ্বাজ-মুনিসমাজ। প্রেয়সী পদ্মিনীর বিয়োগ-ব্যথায় যেন কাতর হয়েই উত্তরায়ণ করেন সূর্যদেব ; এবং পৃথিবীর মানুষ সেবা করতে থাকে তাঁর কিরণ-শ্রীপাদ।

২১। এঁর প্রভাতগুলি বড় বিচিত্র !

জলের তলায়,···বিছিয়ে থাকে মণির নুড়ি। অজস্র তাদের কিরণের পদ্মরাগ-আভা···ধূমায়মান বাষ্পের মত উঠতে থাকে উপরে। সেই রক্তিম ধোঁয়ায় অদৃশ্য হয়ে যায় নদী, সরোবর, পল্বল, বন, জল। জল খেতে এসে থমকে দাঁড়ায় হরিণ-তরুণীরা, ভাবে দাবানল জ্বলছে বুঝি জলে। খাওয়া ভুলে যায়, চমকিয়ে চমকিয়ে চায় প্রভাতের মুখে।

তখন জমে গিয়ে দানা বেঁধে যায় নিশির চোখের শিশির। ঘরের শিখরে শিখরে শিশির-জমা তুহিনের বিন্দুগুলি সৃষ্টি করে তোলে মুক্তা-জালিকার মায়া-গুণ্ঠন। কোমল করাগ্র দিয়ে, অসীম আদরে, স্বয়ং যেই সেটিকে চোরের মতন অপসারণ করেন ভগবান বিভাবসু, সেই এক নিমেষে বিরল হয়ে যায়···নিশীথিনীর নয়নলোর !

২২। এবং এই শিশির-ঋতুর সুখটি যখন নামেন,—তখন নিতান্ত রমণীয় হয়ে ওঠে শ্রীবৃন্দাবনের দিনান্ত। ঘন পাতার বিথার ঘেরাটোপ দেওয়া বড় বড় গাছের তলায়, মধুর আরামে বিশ্রাম করে কৃষ্ণসার মৃগের দল ; রোমন্থন অভ্যাস করে আনন্দে। পাতার ঘেরাটোপের উপরে ফোঁটা ফোঁটা পড়তে থাকে হিম, তাই শীতের ভয় আর তাদের থাকে না।

আর তারপর বৃন্দাবনের সন্ধ্যা ! গগণে অয়স্কান্ত মণির পিণ্ডের মত প্রকাণ্ড একখানি সূর্যমণ্ডল সাগরজলে খসে পড়ে যেই। উঠতে থাকে পুঞ্জ পুঞ্জ বাষ্প। আর সেই বাষ্পগুলিই যেন তুহিনের কণা হয়ে ম্লান করে দেয় দিগ্‌বধূদের মুখ। নিজের নিজের নীড়ের দিকে আকাশ ছেয়ে উড়ে চলে যায় উন্মুখমুখর রক্তপাখীর দল।

আর তারপর বৃন্দাবনের রাত্রি ! বধূদের বুকে নিয়ে পক্ষীরা তখন সুখে শুয়ে পড়েন যে যাঁর পত্র-বাটিকায়। তাঁদের এই পাতার বাসা বড় আরামের। নুয়ে-পড়া অতি ঘন পত্রের নিবিড় আশ্লেষে গরম হয়ে থাকে সেই কুঞ্জগৃহ। ক্ষান্ত হয়ে যায় কূজন। আনন্দ রসে নিশ্চল হয়ে যায় তরুগ্রাম। শীতের ভয়ে সেই গরম কুঞ্জ ছেড়ে জ্যোৎস্না পান করতেও ছুটে বেরিয়ে যান না চকোরের দল।

এবং তখন গাঢ় আলিঙ্গন-রঙ্গে আনন্দিত হয়ে ওঠে

বৃন্দাবনের মনুষ্যমিথুনের সুখশয়ন,

স্যার ধীরেন্দ্রনাথ মিত্র

[প্রখ্যাত এটর্ণী ও কলকাতার ভূতপূর্ব শেরিফ]

কি পরাধীন ভারতে—কি স্বাধীন ভারতে—শাসক ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের নিকট সমভাবে বিশ্বাসভাজন হওয়া—কর্ম্ম-জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য বলেই প্রতিভাত হয়। সুনিপুণ সংগঠক স্যার ধীরেন্দ্রনাথ মিত্রের কর্ম্মধারাই এর জাজ্বল্যমান প্রমাণ। ১৮৯১ সালের ১৮ই এপ্রিল তারিখে ধীরেন্দ্রনাথ কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। বাবা আলীপুরের বিশিষ্ট ব্যবহারজীবী ৺উপেন্দ্রনাথ মিত্র এবং মা বড়জাগুলিয়া গ্রামের ৺সর্ব্বেশ্বর ঘোষ-চৌধুরীর মেয়ে স্বর্গগতা শরৎকুমারী দেবী। ১৯০৭ সালে বঙ্গবাসী কলেজিয়েট বিদ্যালয় থেকে দ্বিতীয় বিভাগে তিনি এনট্রান্স, ১৯০৯ সালে সেণ্টজেভিয়ার্স কলেজ থেকে দ্বিতীয় বিভাগে আই, এ ও ১৯১১ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে ইংরাজী সাহিত্যে অনার্স নিয়ে গ্রাজুয়েট হন। 'দ্বারভাঙ্গা বৃত্তি'সহ ১৯১৫ সালে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ থেকে আইন পরীক্ষা এবং প্রথম স্থানাধিকারী হিসাবে ১৯১৬ সালে এটর্ণীসীপ পরীক্ষোত্তীর্ণ হন। তাঁহার সহপাঠীদের মধ্যে ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ জে পি নিয়োগী, অধ্যাপক হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী ও বিচারপতি প্রমথ মিত্রের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৯১৬ সাল হইতে তিনি বরেণ্য ব্যবহারিক পরলোকগত য়্যাটর্ণী হীরেন্দ্রনাথ দত্তর কার্ম্মের অন্যতম অংশীদার রূপে ১৯৩৭ সাল পর্য্যন্ত যুক্ত থাকেন। ঐ বছর হইতে সরকারী সলিসিটার হিসাবে দিল্লীতে ১৯৪৭ সাল পর্য্যন্ত তথায় অবস্থান করেন। ঐ বছরের (১৯৪৭) ১৮ই আগষ্ট তিনি ইংল্যাণ্ডে তদানীন্তন ভারতীয় হাই কমিশনার শ্রী ভি. কে. কৃষ্ণমেননের সহকারী (মিনিষ্টার) হিসাবে লণ্ডনে গমন করেন। এই সময় তিনি কতকগুলি আন্তর্জাতিক অধিবেশনে ভারতীয় প্রতিনিধি হিসাবে আমেরিকা ও য়ুরোপের বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করেন। ১৯৪৯ সালে বিশেষ কাজের জন্য আঙ্কারায় ভারতীয় দূতাবাসে কিছুদিন যুক্ত থাকেন। ঐ বছরেই ভারতীয় রেলপথের উন্নয়নমূলক কাজের জন্য বিশ্বব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নেওয়ার জন্য যে প্রথম ভারতীয় প্রতিনিধিদল প্রেরিত হয়, স্যার ধীরেন্দ্রনাথ তাঁদের আইন বিষয়ক পরামর্শদাতা রূপে আমেরিকা গমন করেন।

১৯৩৯ সালে তিনি C. B. E. ও ১৯৪৪ সালে Knight উপাধিদ্বয় প্রাপ্ত হন।

১৯৫১ সালে ভারতে ফিরে এসে তিনি রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের সচিব নিযুক্ত হন এবং ঐ বছরের ডিসেম্বর মাসে সরকারী কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

১৯৫২ সালে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক গঠিত 'ব্যাঙ্ক লিকুইডেশন কমিশন'এর চেয়ারম্যান হিসাবে স্যার ধীরেন্দ্র সারা ভারত পরিভ্রমণ করেন। ১৯৫৩ থেকে ১৯৫৫ সাল পর্য্যন্ত তিনি হিন্দুস্থান ইন্‌স্যুরেন্সের প্রধান পরামর্শদাতা ছিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ-শক্তি বোর্ডের চেয়ারম্যান, রাজ্য উন্নয়ন বোর্ডের সহঃ সভাপতি, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কেন্দ্রীয় সমিতির ও ষ্টেট ব্যাঙ্কের স্থানীয় সমিতির এবং কেন্দ্রীয় জীবন-বীমা সংস্থায় (পূর্ব্বাঞ্চলের প্রতিনিধি হিসাবে) কার্য্য পরিচালনা সমিতির অন্যতম সদস্য। ১৯৫৬ সালের জানুয়ারী মাসে তিনি হিন্দুস্থান ইন্‌স্যুরেন্সের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হয়ে স্থানীয় অন্যান্য সংস্থাগুলির উপদেষ্টা হিসাবে কর্ম্ম সম্পাদনা করিতেন। বর্ত্তমানে তিনি ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনঃ-এর সঙ্গে যুক্ত আছেন। কলকাতার শেরিফের আসনও একদা তিনি করেছেন অলঙ্কৃত।

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের কথায় স্যার ধীরেন্দ্র বলেন, 'সুভাষকে ছোট ভাইয়ের মতই দেখতুম। Politics ছেড়ে দেশের জন্য অন্য কাজে লিপ্ত হওয়ার কথায় সুভাষ আমায় বলেছিল যে, সংলোকেরা

স্যার ধীরেন্দ্রনাথ মিত্র

রাজনীতি ছেড়ে যদি স্বকার্য্যে ব্যস্ত থাকেন তবে Dr. Johnsonএর ভাষায় তা 'Refuge of Scroundel's হয়ে দাঁড়াবে'।

ডক্টর শ্যামাপ্রসাদের প্রসঙ্গে তিনি জানান, 'শ্যামাপ্রসাদের রাজনীতি ও বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করার প্রশ্ন ওঠায় উত্তর পাই যে ব্যারিষ্টারী করে পয়সা জমিয়ে গোটা কয়েক গাড়ী রেখে সাহেবীয়ানা করার ইচ্ছে আমার নেই। পেছিয়ে পড়া বাঙ্গালা দেশকে পূর্ব্বাবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। 'ভারতীয়' শ্যামাপ্রসাদ কিন্তু 'বাঙ্গালী' হিসাবে নিজেকে কোন দিন ভুলে যাযনি।

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় সম্বন্ধে স্যার ধীরেন্দ্রনাথ মন্তব্য করেন, ১৯২০ সালে পরলোকগত শরৎচন্দ্র বসুর মাধ্যমে ডাঃ রায়ের সঙ্গে পরিচিত হই। দ্বিতীয় মহাসমরের সময় জেনারেল জলী চিকিৎসক-সংগ্রহের জন্য ডাঃ রায়ের সাহায্য গ্রহণের কথা আমায় বলেন। বিধানচন্দ্র জানান যে তিনি সরকারকে সাহায্য না করে চিকিৎসকদের সুবিধা করে দেবেন। গান্ধীজীর সম্মতি পেয়ে তিনি সিমলায় তদানীন্তন বড়লাটের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য আসেন কিন্তু সরকারী ভোজে ভারতীয় পোষাকেই যোগদান করিতে সম্মত হন। সেই সময় ডাঃ রায়কে 'নাইট' উপাধি দেওয়ার কথা উঠিলে তিনি জানান যে দেশশুদ্ধ লোক তাঁকে 'Sir' বলে সম্বোধন করে থাকে।'

গণহিতব্রতী লৌহমানব শ্রদ্ধেয় সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে তিনি 'বাস্তববাদী' বলে আখ্যাত করেন। স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রী হিসাবে পূর্ব্বতন সরকারী কর্ম্মচারীদের কংগ্রেস পরিচালিত সরকারী কর্ম্মধারায় অনুরক্ত করিয়া তোলা—সর্দ্দারজীর এক মহান্ অবদান বলিয়া স্যার ধীরেন্দ্রনাথ মনে করেন।

স্বর্গীয়া সরোজিনী নাইডু দিল্লীতে তাঁর গৃহে প্রায়ই আসতেন। যদিও বাংলা ভাষায় তিনি কথা বলতে পারতেন না, তবুও তিনি যে বাঙ্গলার মেয়ে—সে কথা কোনদিন ভোলেননি—এ জিনিস স্যার ধীরেন্দ্র বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করেছিলেন।

শ্রীমতী সুচন্দ্রা দেবীর সঙ্গে শুভ পরিণয়ের সূত্রে ধীরেন্দ্রনাথ আবদ্ধ হলেন ১৯১৬ সালে। সুচন্দ্রা দেবী বাঙলার অগ্নিযুগের অন্যতম ঋত্বিক দানবীর স্বর্গীয় রাজা সুবোধ মল্লিকের মেয়ে।

বিচারপতি প্রশান্তবিহারী মুখোপাধ্যায়

[বলিষ্ঠ, নির্ভীক আইনজ্ঞ ও সংস্কৃতজ্ঞ সুধী]

মহারাজা আদিশূর আনীত কনৌজ পঞ্চব্রাহ্মণদের অন্যতম ভরদ্বাজ গোত্রীয় শ্রীহর্ষ পণ্ডিত হইতে বিংশতিতম অধস্তন পুরুষ কামদেব পণ্ডিতের প্রপৌত্র প্রবলপুরুষ গোষ্ঠীপতি চাঁদশর্ম্মা মহারাজ প্রতাপাদিত্যের শ্রীশ্রী৺রাধাকান্ত বিগ্রহ যশোহর হইতে স্বগ্রাম খড়দহে আনিয়া কুলবিগ্রহরূপে স্থাপনা করেন। ইনিই বিচারপতি শ্রীপ্রশান্তবিহারী মুখোপাধ্যায়ের কুলদেবতা। চাঁদশর্ম্মার অধস্তন পঞ্চমপুরুষ কন্দর্পের দ্বিতীয় পুত্র পণ্ডিত নরহরি শিরোমণি মহাশয় ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সংস্কৃত ও হিন্দু-ন্যায়ের শিক্ষক ছিলেন। নিজ দক্ষতায় তিনি প্রাদেশিক আপীল-আদালতের জর্জ্জ-পণ্ডিত ও পরে বিচারবিভাগের সদর-ওয়ালা নিযুক্ত হন। শিরোমণি মহাশয়ের এক ভ্রাতা রাজীবলোচন ওয়ারেন হেষ্টিংসের শাসন-পরিষদের অন্যতম সদস্য ছিলেন এবং পরে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া সংসার ত্যাগ করেন। শিরোমণি মহাশয়ের পৌত্র ৺বিপিনবিহারী মুখোপাধ্যায় বিচার বিভাগে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন ও অবসর গ্রহণের পূর্ব্বে কলিকাতা প্রেসিডেন্সী স্মল-কজ-কোর্টের বিচারপতি হন। শেষোক্তের পৌত্র হইলেন সুপণ্ডিত ন্যায়নিষ্ঠ বিচারপতি স্বনামধন্য শ্রীপ্রশান্তবিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয়। ইতিহাস ও বংশ পরিচয় হইতে জানা যায় যে, বিচার ও আইন শাসনের দিক দিয়া ও আধুনিক কলিকাতা হাইকোর্টের পূর্ব্বতর প্রতিষ্ঠান কলিকাতা সুপ্রীম কোর্টের সহিত তাঁহার বংশের সংযোগ এক শতাব্দীর অধিক।

বিচারপতি প্রশান্তবিহারী মুখোপাধ্যায়

তাঁহার পৈতৃক ও পূর্ব্বপুরুষগণের নিবাসস্থান ২৪ পরগণার বিখ্যাত গ্রাম "খড়দহ"। ইংরাজি ১৯১০ সালের ৩০শে জুলাই প্রশান্তবিহারী কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ৺রায়-বাহাদুর বিজয়বিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয় অবিভক্ত বাংলার ডিরেক্টর অফ ল্যাণ্ড রেকর্ডস ছিলেন এবং অবসর গ্রহণ করিয়া হাইকোর্টের এডভোকেট হইয়াছিলেন। তাঁহার মাতৃদেবী ছিলেন বিখ্যাত রামায়ণ আখ্যায়ক কৃত্তিবাস সম্পর্কিত ফুলিয়া গ্রামনিবাসী ৺ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়ের একমাত্র কন্যা স্বর্গীয়া কমলপদ্ম দেবী। প্রশান্তবিহারী তাঁহার পিতামাতার জ্যেষ্ঠ সন্তান। তাঁহার দুই ভ্রাতা ও দুই ভগিনী। তিনি ১৯২৫ সালে হিন্দু স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় নবম স্থান ও ১৯২৭ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে আই এস-সি পরীক্ষায় পঞ্চম স্থান অধিকার করিয়া সরকারী বৃত্তি লাভ করেন। আই এস-সি পরীক্ষায় স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেন বলিয়া তাঁহার শিক্ষকেরা তাঁহাকে চিকিৎসা-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে পরামর্শ দেন। কিন্তু উহা নিজ মনোমত না হওয়ায় ১৯২৯ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে অর্থনীতিতে অনার্স সহ গ্রাজুয়েট

হন। তাঁহার শিক্ষকদের মধ্যে হিন্দু স্কুলের ভূতপূর্ব্ব প্রধান শিক্ষক ব্রজকিশোর মুখোপাধ্যায়, প্রেসিডেন্সী কলেজের বহু-বন্দিত অধ্যাপক ব্রজানন্দ-জামাতা সুবোধচন্দ্র মহলানবিশ, তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র প্রসিদ্ধ পরিসংখ্যানবিদ প্রশান্ত মহলানবিশ, চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, জে. সি. কয়াজী, অধ্যক্ষ ষ্টেপলটন, প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, জয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও উপেন্দ্র ঘোষালের নাম উল্লেখযোগ্য।

১৯২৯ সালের অগাষ্ট মাসে প্রশান্তবিহারী বিলাত যাইয়া অক্টোবর মাসে লণ্ডনে মিডল টেম্পলএ ব্যারিষ্টারী পড়িবার জন্ম ভর্ত্তি হন। স্যার উইলিয়ম হোল্ডসওয়ার্থের তিনি অতি প্রিয় ছাত্র ছিলেন এবং তাঁহার সাহায্যে তিনি লণ্ডনের বিখ্যাত ব্যারিষ্টার এডওয়ার্ড মিলনার হল্যাণ্ড, কিউ, সির চেম্বারে যোগদান করেন। প্রশান্তবিহারী ব্যারিষ্টার হইবার পরও প্রায় ছয় মাস কাল হল্যাণ্ডের সহকারিরূপে লণ্ডন সুপ্রীম কোর্ট ও মিডল সেক্স সারকিট মামলা পরিচালনা করেন। ছাত্রাবস্থায় লণ্ডনে প্রশান্তবিহারীর সহিত জর্জ বার্ণার্ড শ'র ফেবিয়ান সোসাইটিতে সাক্ষাৎ পরিচয় হয় এবং যুবক প্রশান্তবিহারী তাঁহার (শ'এর) চায়ের বদলে দুগ্ধপান ও আমিষের বদলে নিরামিষ ভোজন দেখিবেন বলিয়া আশা করেন নাই। পরে কয়েক বার নিমন্ত্রিত হইয়া এই বিশ্ববন্দিত সাহিত্যিকের গৃহে তিনি গিয়াছিলেন। মিঃ রামজে ম্যুর, ও রবীন্দ্রনাথের পরিচয় পত্রে আয়ার্ল্যাণ্ডের কবি ষ্টার্জ ম্যুরের সহিত তিনি পরিচিত হন। এইরূপ সাহিত্য-জগতের সহিত পরিচয়ের ফলে তিনি ইংরাজী সাহিত্য ও ইংরাজী বক্তৃতার প্রতি আকৃষ্ট হন। তাঁহার আইনের সহপাঠী ছিলেন বর্ত্তমান লর্ড হেলব্যাম, যাঁহার সহিত তিনি লণ্ডনের হার্ডউইক সোসাইটি ও অন্যান্য সভায় একত্রে বক্তৃতায় যোগদান করিতেন।

১৯৩০ সালে লণ্ডনে গোল-টেবিল বৈঠক যখন অনুষ্ঠিত হয় শ্রদ্ধাস্পদ স্বর্গগত স্যার বিনোদচন্দ্র মিত্র তখন লণ্ডনে প্রিভি কাউন্সিলার ছিলেন এবং তিনিই প্রশান্তবিহারীকে Barএ যোগদানের জন্য বহু উৎসাহ ও পরামর্শ দিতেন এবং প্রায়শঃ তাঁহার Ashley Gardens ভবনে প্রশান্তবিহারীকে আমন্ত্রণ করিতেন। লণ্ডনে ছাত্রাবস্থায় প্রশান্তবিহারী "আন্তর্জাতিক ছাত্র আন্দোলন ভবনের" সহিত সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন এবং কেকার সোসাইটি (Quakers Society)র সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ঐ সময়ে তিনি জার্মানী, ইটালী, ফ্রান্স, অষ্ট্রেলিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, আয়ার্ল্যাণ্ড স্ক্যাণ্ডিনেভীয় দেশসমূহ ইত্যাদি য়ুরোপের বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেন।

১৯৩৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি ব্যারিষ্টার হইয়া কলিকাতা হাইকোর্টে যোগদান করেন। দুই বৎসরের মধ্যে তাঁহার পসার ও খ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। আইন ব্যবসায়ে অমিয়নাথ চৌধুরী, স্যার অশোক রায়, বি সি ঘোষ, স্যার সুধাংশু বসু, অতুল গুপ্ত প্রভৃতি প্রখ্যাত আইন বিশারদের সহিত তিনি কার্য্য করিয়াছেন। স্বর্গগত শরৎচন্দ্র বসু মহাশয় তাঁহাকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। ১৯৪৭ সালে তিনি রাজ্যসরকারের জুনিয়ার ষ্ট্যাণ্ডিং কাউন্সেল নিযুক্ত হন। উক্ত বৎসরে শ্রীঅতুল গুপ্ত ও তিনি জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষ হইতে কাউন্সেল হইয়া উপস্থিত হন ভারতীয় বিভাগ সম্পর্কীয় বিখ্যাত র‍্যাডক্লিফ কমিশনের সম্মুখে। কঠোর পরিশ্রম, গভীর চিন্তা, ও বহু জটিল মামলায় সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচারে লব্ধ জ্ঞান তাঁহার প্রতিভাকে জনসমক্ষে উদ্ভাসিত করে এবং ইহার ফলস্বরূপ মাত্র ৩৮ বৎসর বয়ঃক্রমে কলিকাতা হাইকোর্টের অন্যতম বিচারপতি নিযুক্ত হন। বর্ত্তমান শতাব্দীতে এত অল্প বয়সে এইরূপ সম্মানের অধিকারী একমাত্র ইনিই প্রথম।

১৯৩৬ সালে কৃষ্ণনগরের (রাজ-পরিবারের দৌহিত্রবংশীয়) ৺রায়বাহাদুর মন্মথনাথ রায়ের প্রথমা কন্যা বেথুন কলেজের গ্র্যাজুয়েট শ্রীমতী গীতা দেবীর সহিত শ্রীমুখোপাধ্যায়ের বিবাহ সম্পন্ন হয়। শ্রীমতী গীতা দেবীও বহু জনকল্যাণকর অনুষ্ঠানের সহিত জড়িত যথা আন্তর্জাতিক মহিলা সমাজের ও ভারতীয় "রেডক্রশ" শিশু ও মাতৃকল্যাণের সভানেত্রী, লাইট-হাউস ফর দি ব্লাইণ্ড, বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল বুইমেনস কাউন্সিল, সরোজনলিনী দত্ত এসোসিয়াসেন, ডিভিশানাল প্ল্যানিং কমিশনার গার্ল-গাইডস্‌, সারদাশ্রম, রোটারি ক্লাব, পঙ্গু-শিশু-সেবায়তন এবং শম্ভুনাথ হাসপাতালের অন্যতম গবর্ণর ইত্যাদি। ইহাদের একমাত্র পুত্র শ্রীমান পার্থ "লা মার্টিনিয়ার"এর ছাত্র।

ভ্রমণপ্রিয় প্রশান্তবিহারী নিজ দেশের নির্জন জনপদ, নিভৃত-প্রান্তর জনবিরল পার্ব্বত্য প্রদেশ ও বিশিষ্ট তীর্থক্ষেত্রসমূহ সুদূর কাশ্মীর হইতে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত পরিভ্রমণ করিয়া আধ্যাত্মিক ভারতের সুমহান রূপ উপলব্ধি করিয়াছেন। তিনি পণ্ডিচেরীতে শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে ও অরুণাচলে মহর্ষি রমণের আশ্রমে কিছুদিন অবস্থান করিয়াছিলেন। যুবক অবস্থা হইতে আসন, প্রাণায়াম ইত্যাদি যোগসাধনার মাধ্যমে তাঁহার নানাবিধ অতীন্দ্রিয় ও অলৌকিক অভিজ্ঞতা লাভ হয় বলিয়া জানা যায়। তাঁহাকে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করায় তিনি আলোচনা করিতে অসম্মতি জানান ও বলেন, ইহা সাধনার নিষেধ। তবে এইটুকু বলেন যে, "নিজের চোখে যা দেখেছি, তা আপনার আধুনিক বিজ্ঞানকে হার মানিয়ে দেয় এবং তা আপনার এটম্‌ বম্ব, বা Intercontinental Ballistic Missilesএর চেয়েও অদ্ভুত।" ১৯৫১ সালে তিনি বর্মা, মালয় ইত্যাদি ভ্রমণে যান এবং ১৯৫৭ সালে জাপান, হাওয়াই, য়ুরোপ ভ্রমণ করেন ও আমন্ত্রিত বক্তারূপে আমেরিকায় তাঁহার ভারতীয় ও মার্কিন আইন বিষয়ে ছয়টি বক্তৃতা বিশেষ প্রশংসিত হয়।

সঙ্গীতচর্চ্চা, অঙ্কন, ফটোগ্রাফী ও পশুপক্ষী পালন বিচারপতি মুখোপাধ্যায়ের অবসর বিনোদনের পন্থা।

বহু জাতীয় প্রতিষ্ঠানের সহিত শ্রীমুখোপাধ্যায় খুব নিবিড়ভাবে সংশ্লিষ্ট। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট ও সিন্ডিকেটের, এসিয়াটিক সোসাইটির, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন-কলেজের এবং শ্রীরামকৃষ্ণ সারদাপীঠের কার্য্যকরী সমিতির সভ্য। শ্রীরামকৃষ্ণ ইনষ্টিটিউট অফ কালচারের সহ-সভাপতি, বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদের লেডী ব্রেবর্ণ কলেজের, ক্যালকাটা ক্লাবের সভাপতি প্রমুখ সম্মান-আসন সমূহ তাঁহার দ্বারা অলঙ্কৃত। তিনি কলিকাতার পশুশালারও সহ-সভাপতি। বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য প্রশান্তবিহারীর সংস্কৃতশিক্ষার প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ।

শ্রীমুখোপাধ্যায় যাহাতে সংস্কৃত ভাষা অবশ্য পঠিতব্য বিষয় হয় এবং যাহাতে একটি সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় এইখানে প্রতিষ্ঠিত হয় তাহারই চেষ্টা করিতেছেন। ১৯৫৫ সালে হাওড়া সংস্কৃত সমাজ তাঁহাকে "ন্যায়ভারতী" উপাধি দান করেন।

প্রায় দশ হাজার পুস্তক সমন্বিত তাঁহার নিজস্ব গ্রন্থাগারটি ভারতের বহু গবেষণাকারীর ঈপ্সিত সম্পদ। আইনের বহু পুস্তক ব্যতীত সাহিত্য বেদ ও উপনিষদের অনেক দুষ্প্রাপ্য আহরণ উহার অন্যতম আকর্ষণ। আর চোখে পড়ল তাঁহার অপূর্ব সাধনার ঘর, যাহা ভারতের বহু সাধকের চরণ-ধূলায় পবিত্র।

প্রশান্তবিহারী আজ প্রায় দশ বৎসর যাবৎ কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারাসনে অধিষ্ঠিত এবং এই সময়ে তাঁহার বহু আইনসংক্রান্ত বিচার সিদ্ধান্তগুলি ভারতবর্ষে সুবিদিত। রাষ্ট্রীয় ও গণতান্ত্রিক যে সকল সিদ্ধান্ত তিনি দিয়াছেন তাহার ফলে অনেক ক্ষেত্রে নূতন আইন সংস্কার হইয়াছে। সম্প্রতি তাঁহার যে সকল বিচার সিদ্ধান্ত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে তাহার মধ্যে শিল্প প্রতিষ্ঠানের রাজনৈতিক দলে অর্থ সাহায্য না করা, শিক্ষকদের রাজ্যসার্ভিস কমিশনের সামনে উপস্থিত না হওয়ার সমর্থন ও কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠানের কমিশনারের অপসারণ উল্লেখযোগ্য। ম্যাজিষ্ট্রেটদের পুলিশের সাক্ষিস্বরূপ ডাকার বিরুদ্ধে তাঁহার বিচার ভারতীয় সুপ্রীম কোর্ট হইতে ভূয়সী প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছে। আমেরিকার সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি ডগ্‌ল্যাস প্রশান্তবিহারীর রাষ্ট্রতান্ত্রিক আইনের বিচারকে প্রশংসা করিয়াছেন। বহু রাজকীয় সমস্যার সমাধানের জন্য প্রশান্তবিহারীর ডাক পড়িয়াছে। নেহেরু-লিয়াকত আলি চুক্তিতে যে ওয়েষ্ট বেঙ্গল ডিষ্টারবেন্সেস এনকোয়ারী কমিশন ও আসাম ডিষ্টারবেন্সেস এনকোয়ারী কমিশন স্থাপিত হয় এবং পশ্চিমবঙ্গের প্রেস-পুলিশ এঙ্কোয়ারী কমিশন ও ট্রাম ফেয়ার 'ইনক্রিজ কমিশন হয় সেই সব কমিশন তিনিই পরিচালনা করেন। তিনি ইণ্টার ন্যাশানাল ল' এসোসিয়েশনের ট্রেড মার্কস বিষয় এনকোয়ারী কমিটির সভাপতি ছিলেন।

দেশের বর্তমান আইন সংক্রান্ত ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে তাঁর পঞ্চমুখী কল্পনা, খাদ্য, শিক্ষা, বস্ত্র, গৃহ ও কর্ম্মসংস্থান, যাহা তাঁহার মতে স্থায়ী জাতি গঠনের অপরিহার্য্য ভিত্তি। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন—বালক, যুবক ও প্রাপ্তবয়স্কের মধ্যে যে বিশৃঙ্খলা আজ এক সমস্যারূপে দেখা দিয়েছে আমার মতে তার মূল কারণ হচ্ছে যে, গৃহে নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধার অভাব। এই গৃহ সংস্কার তাই প্রথম প্রয়োজন এবং তার জন্য পিতামাতার দায়িত্বই প্রাথমিক।

বসুমতী-সাহিত্য-মন্দিরের অন্যতম একজিকিউটর স্বর্গীয় ভবতোষ ঘটক মহাশয় তাঁহার জীবদ্দশায় প্রায়ই শ্রীপ্রশান্তবিহারীর গ্রন্থাগারের গ্রন্থ সমাবেশের সমাদর করিতেন ও তাঁহার সহিত লুপ্ত গ্রন্থের পুনরুদ্ধার ও পুনর্মুদ্রণের পরামর্শ করিতেন। মাসিক বসুমতী ও তার সম্পাদকের প্রতি এই বিচার-অভিজ্ঞ সুপণ্ডিত খুব বেশী আস্থা পোষণ করেন।

যখন প্রশান্তবিহারীর গৃহ হইতে বিদায় গ্রহণ করিলাম তখন মনে হইল যেন সনাতন ও আধুনিকের এক অদ্ভুত সমন্বয় দেখিয়া আসিলাম।

শ্রীঅতুল্য ঘোষ

[পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসপ্রধান ও সুদক্ষ সংগঠক]

বাস্তব রাজনৈতিক আবর্ত্তে জনগণ ও দলের নিকট পরিচালক-নেতা হন সমালোচনার পাত্র। সেজন্যে তাঁর মনে আসে না কোন ক্ষোভ, কোন দুঃখ, কোন অভিমান বা কোন দ্বেষ।

শ্রীঅতুল্য ঘোষ

বরং দলীয় গঠনমূলক উক্তিগুলিকে গ্রহণ করে তিনি আত্মানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন আর জনমতের প্রতি বিনত হয়ে ওঠেন। 'কংগ্রেস ভবন'এ রাজ্য-কংগ্রেস সভাপতি, সেবাব্রতী ও সুষ্ঠু সংগঠক শ্রীঅতুল্য ঘোষের নিজস্ব বাহুল্যবর্জ্জিত কক্ষে তাঁর সঙ্গে পরিচয়ের সময় মনে মনে এই রকম ধারণাই হয়েছিল।

শ্রীঘোষ ১৯০৪ সালের ২৭শে আগষ্ট কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। বাবা ৺কার্ত্তিকচন্দ্র ঘোষ আর মা বিগতকালের স্বনামধন্য বাঙ্গালী ৺অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী হেমহরিণী দেবী। স্বগ্রাম হুগলী জেলার হরিপাল থানান্তর্গত জেজুর। সেখানকার ঘোষ পরিবারের স্বাদেশিকতা, দরিদ্র-সেবা, অতিথি-আপ্যায়ন, বাৎসরিক দুর্গোৎসব ও নানা জনহিতকর প্রচেষ্টা আজও জেলায় সুবিদিত।

উত্তর কলিকাতার এক বিদ্যালয়ে পাঠকালে মাত্র পনের বছর বয়সে তিনি রাজনীতির প্রতি আসক্ত হন। গৃহের বিপরীত দিকে জেলা-কংগ্রেস সমিতির অফিসে হ'ত বিশিষ্ট জননায়কদের শুভাগমন। বালক অতুল্য গৃহকোণ থেকে সমস্ত লক্ষ্য ক'রতেন কিন্তু এগিয়ে যেতে সাহস পেতেন না। অবশেষে এক দিন সেখানে সোজা হাজির হলেন—পরিচয় হল ডাঃ ইন্দ্রনারায়ণ সেনগুপ্ত, শ্রীহেমন্ত বসু, ডাঃ আশুতোষ দাস ইত্যাদি কংগ্রেসসেবীদের সঙ্গে। ১৯২১ সালে প্রথম শ্রেণীর ছাত্র অতুল্য অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন—চলে এলেন হরিপালে—কর্ম্মক্ষেত্র হল জেলার সদর শ্রীরামপুরে—আর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শ পেলেন স্থানীয় নেতা ডাঃ আশুতোষ দাস ও শ্রীবিজয় ভট্টাচার্য্যের। ১৯২৪ সালে তিনি প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সদস্য এবং ১৯২৫ সালে হুগলী জেলা কংগ্রেসের সহঃ-সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন। তখন তার সভাপতি ও সম্পাদক ছিলেন যথাক্রমে ৺তুলসীচন্দ্র গোস্বামী ও শ্রীনগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। ১৯২৭ সালে তিনি জেলা

কংগ্রেস সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন এবং পুনরায় ১৯৩৪-৪১ সাল পর্য্যন্ত উক্ত পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। ১৯৪৮ সালে তিনি রাজ্য কংগ্রেস সম্পাদক পদে বৃত হন ও হুগলী জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান হন। ১৯৫০ সালে তিনি পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের সভাপতি হিসাবে কার্য্যভার গ্রহণ করেন; আজ পর্যন্ত তিনি উক্ত পদে সমাসীন। ১৯৫৫ সালে হুগলী জেলা স্কুল বোর্ডের সভাপতি থাকাকালীন তিনি নিখিল বঙ্গ স্কুল বোর্ড এসোসিয়েশনের প্রেসিডেণ্ট পদে নির্ব্বাচিত হন। এতদ্ব্যতীত তিনি পশ্চিমবঙ্গ মিউনিসিপ্যাল ও কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল এসোসিয়েশনের সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করে আছেন। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্ব্বাচন—তাঁর কর্ম্ম-জীবনের বৈশিষ্ট্য। উনিশ বছর বয়সে তিনি শ্রীমতী বিভাবতী দেবীর সঙ্গে আবদ্ধ হন পরিণয়-সূত্রে।

রাজনৈতিক কর্ম্মীর জীবন যে কণ্টকাকীর্ণ আর পথ যে বন্ধুর—তা অতুল্য বাবুর ক্ষেত্রেও অপ্রযোজ্য নয়। ১৯৩০ সালে দাসপুর দারোগা হত্যার জন্য তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয় কিন্তু প্রমাণাভাবে ১৯৩১ সালে অব্যাহতি পান। গঠনমূলক কর্ম্মে লিপ্ত থাকার সময় ১৯৩৩ সালে তিনি কারাবরণ করেন এবং ১৯৩৫ সালে Bone T.B. হওয়ার জন্য ১৯৩৬ সালে মুক্ত হন। ঐ বছর দামোদর বন্যাত্রাণে ভারপ্রাপ্ত হয়ে তিনি সমগ্র হুগলী ও বর্দ্ধমান জেলাদ্বয় পরিভ্রমণ করেন। বন্যাক্লিষ্টদের হাহাকার, আর্ত্তনাদ, দুঃখদুর্দ্দশাও বিদেশী শাসকদের আর্ত্তত্রাণে অসহযোগে শ্রীঘোষকে খুবই বিচলিত করে।

১৯৪২ সালে ভারত রক্ষা আইনে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং ভগ্নস্বাস্থ্যের দরুণ ১৯৪৬ সালে মুক্তি পান। জীবনের প্রায় ষোলটি বছর লৌহকারার অন্তরালে আবদ্ধ থাকার দরুণ তাঁর স্বাস্থ্য ভগ্ন হয় ও পুলিশী অত্যাচারের ফলস্বরূপ চিরকালের মতন হারালেন দক্ষিণচক্ষুর দৃষ্টিশক্তি আর পঙ্গু হল একটি হাত ও একটি পা। একদা বৃটিশ-সরকার তাঁকে গ্রেপ্তারের জন্য দুই হাজার টাকার পুরস্কারও ঘোষণা করেছিলেন।

১৯৪৬ সালে (ভারত বিভাগের প্রাক্কালে) শ্রীঘোষ শ্রীরামপুরে অনুষ্ঠিত এক মহতী জনসভায় মুসলীম লীগের সমগ্র বঙ্গদেশ দাবীর বিপক্ষে বঙ্গ-বিভাগের প্রস্তাব করেন। তাকে শক্তিশালী করে তোলার জন্য তিনি কলকাতার ভারত সভা ভবনে 'জাতীয় বঙ্গ সংগঠন সমিতি' গড়ে তোলেন। শ্রীযাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা ও শ্রীহরেন্দ্র-নাথ মজুমদারকে যথাক্রমে সভাপতি ও যুগ্ম-সম্পাদক হিসাবে বরণ করে সম্পাদক অতুল্য বাবু কলকাতা ও জলপাইগুড়িতে দুইটি বিরাট অধিবেশনের আয়োজন করেন।

১৯৫২ সাল থেকে শ্রীঘোষ ভারতীয় লোকসভার সদস্য। এ ছাড়াও তিনি কেন্দ্রীয় ভাষা কমিশন, আদিবাসী উন্নয়ন কমিটীর সদস্য, বিশ্বভারতী সংসদ, আকাশবাণী ও দূরভাষ উপদেষ্টা বোর্ডের সভা ও রাজ্য খাদ্য কেন্দ্রের ট্রাষ্টী বোর্ডের চেয়ারম্যান। ১৯৪৯ সালে তাঁর সম্পাদনায় সাপ্তাহিক 'জনসেবক' ও পরের বছর থেকে সেটি দৈনিকপত্র হিসাবে প্রকাশিত হচ্ছে।

এগারো বছর বয়সে পিতৃহীন হওয়ায় বালক অতুল্য মাতামহ বাঙ্গালার অন্যতম মনীষী ৺অক্ষয়চন্দ্র সরকারের কাছে চুঁচুড়ায় চলে আসেন। সেখানে চার বছর অবস্থানের সময় তিনি দেখেছেন অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র, প্রতিভাবান সাহিত্যিক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রমুখ দিকপালদের আর শুনেছেন তাঁদের মধ্যে নানাবিষয়ে আলাপ আলোচনা। তন্মধ্যে নিজমনের মণিকোঠায় রক্ষিত অনেক কথা তিনি আমায় জানালেন। মাতামহের কাছেই জানতে পারেন যে সেই গৃহে বহুবার পদার্পণ করেছেন সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র, কবি নাট্যকার দীনবন্ধু, ঋষি রাজনারায়ণ, কবি হেমচন্দ্র প্রভৃতি বরেণ্য ও প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিরা। কিন্তু এই স্নেহময় দাদামহাশয়কেও তিনি হারালেন মাত্র পনেরো বছর বয়সে। কিন্তু আশীর্ব্বাদস্বরূপ পেলেন সুগ্রন্থপাঠের আগ্রহ। কলিকাতায় ও চুঁচুড়ায় পঠদ্দশায় তাঁর গৃহশিক্ষক ছিলেন যথাক্রমে প্রখ্যাত অভিনেতা ও সুখ্যাত নাট্যকার যোগেশচন্দ্র চৌধুরী ও অধ্যাপক জ্যোতিষ ঘোষ তাঁর লেখা অহিংসা ও গান্ধী, নৈরাজ্যবাদীর দৃষ্টিতে গান্ধীবাদ, নোয়াখালীতে গান্ধীজি, পাকিস্থান ও সাম্প্রদায়িক সমস্যা প্রমুখ পুস্তকগুলির নাম উল্লেখযোগ্য।

পশ্চিমবঙ্গের বর্ত্তমান অবস্থার কথায় শ্রীঘোষ জানালেন, বাঙ্গালীর বেকারদশা উদ্বাস্তু সমাগমে কিছুটা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে। কারণ, আমরা দেখি যে অন্যান্য প্রদেশবাসীরা বাংলার কলকারখানা, গৃহের কাজ প্রভৃতি দখল করেছে বর্ত্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে। কেন যে বাঙ্গালী কায়িক পরিশ্রমবিমুখ হল বলা শক্ত। তবে মনে হয় যে, বিদেশী শাসক প্রবর্ত্তিত শিক্ষার ছোঁয়াচ লাগার সঙ্গে এর একটা সম্পর্ক আছে। ১৯০৫-০৬ সালে স্বদেশী আন্দোলন বাঙ্গালী নেতারা পরিচালনা করেন অথচ বেশ কয়েকটি বস্ত্রকল গড়ে উঠল গুজরাট প্রদেশে—আর সেই সঙ্গে বাংলার তাঁতীরা পড়ে গেল। বঙ্গ-ভঙ্গ রদ করতে গিয়ে আমরা হারালুম সিংভূম, মানভূম ও ধলভূম যাদের খনিজদ্রব্য অতুলনীয় অথচ কোন প্রতিবাদ ধ্বনিত হল না বাংলা দেশ থেকে সেই সময়। তাই ১৯৫৬সালের রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের কাছে উক্ত জেলাত্রয় হারানর জন্য (বঙ্গব্যবচ্ছেদের সময়) বাংলা হইতে কোনও আন্দোলন হয়েছিল কি না—তার বিশেষ কোনও প্রমাণ দিতে পারা যায় নি। উদ্বাস্তু সমস্যা সমাধানে আমাদের নিতে হবে comprehensive war Footing পন্থা। ১৯৫৬ সাল পর্য্যন্ত উহাদের আগমন-সংখ্যা নিরূপণ করে বর্ত্তমানে রাজ্যসরকার সমূহের সহযোগিতায় কেন্দ্রীয় সরকার সুদৃঢ় ব্যবস্থাবলম্বন করেছেন। দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনায় আছে বিশেষ ব্যবস্থা। আর সেখানকার জমি, জল ও আবহাওয়া বাঙ্গালীর বসবাসের উপযোগীই। পাট বুনন ও চাষের জমির উপর গৃহাদি নির্ম্মাণের জন্য পশ্চিমবঙ্গে ফসল উৎপাদন কম হচ্ছে। সে জন্যে অন্যপ্রদেশ ও বিদেশী আমদানীর উপর আমাদের নির্ভর করতে হয়। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ে যদিও পশ্চিমবঙ্গ অন্যান্য রাজ্যগুলির তুলনায় অধিক অগ্রসরমান, তবুও এখনও তাদের পূর্ণভাবে প্রকট হয়নি। তবে আনন্দের কথা এই যে, বর্ত্তমানে বাঙ্গালী যুবকেরা কায়িক পরিশ্রমে পরাঙ্মুখ নয়। অনেক কথার পর সবার শেষে তিনি বললেন যে, কতদিনে যে পশ্চিমবঙ্গের কেন্দ্রীভূত সমস্যাগুলির সুরাহা হবে বা বাঙ্গালীর উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতের উদয় হবে সে সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করা শক্ত। শ্রীঘোষ মাসিক বসুমতীর অন্যতম শুভানুধ্যায়ী।

শ্রীআশুতোষ গুহ

[বস্ত্রশিল্পে ভিক্টোরিয়া ইউনিভার্সিটি অব ম্যাঞ্চেষ্টারের বি. এস. সি. (টেক) ডিগ্রিধারী প্রথম ছাত্র]

নিজের জীবনেতিহাস ব্যক্ত করার জন্তে শ্রীগুহকে যখন প্রথম অনুরোধ জানালাম, তখন তিনি সত্যি লজ্জিত হয়ে পড়লেন এবং কিছুতেই রাজি হলেন না কিছু প্রকাশ করতে। এ যুগে এ সত্যি কিছুটা বিস্ময়কর। একদিন নয় বহুদিন সাধ্য সাধনার পর অবশেষে তিনি কিছুটা রাজি হলেন। এ সংগ্রহে বিশেষ সাহায্য করেছেন শ্রীগুহের স্ত্রী শ্রীমতী রেণুকা গুহ। ঢাকা জেলার বজ্রযোগিনী গ্রামের প্রসিদ্ধ গুহ-পরিবারে আশু বাবু জন্মগ্রহণ করেন। ময়মনসিংহ জিলা স্কুল থেকে তিনি এনট্রান্স পাশ করেন এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। স্কুল-জীবনেও তিনি বরাবর প্রথম হয়ে এসেছেন। ঢাকা কলেজ থেকে এফ, এ, পাশ করে প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হন। স্বদেশী আন্দোলনে কলেজ ছাড়তে বাধ্য হন; তারপর সিটি কলেজ থেকে বি, এ পাশ করেন বি কোর্সে। এর পর কেমেষ্ট্রি নিয়ে এম, এ,তে ভর্তি হন আবার প্রেসিডেন্সি কলেজে। তখন স্বদেশী আন্দোলনের যুগ, বিলেতী কাপড় পোড়ানো হচ্ছে, 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই'-এর গানে দেশ মাতোয়ারা, দেশের জন্তে সত্যিকারের কাজ কিছু করব সেই ছিল তাঁদের তখনকার ধ্যান জ্ঞান জীবনের ব্রত। বস্ত্রশিল্প সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করে দেশকে উক্ত শিল্পে আত্মপ্রতিষ্ঠিত করানোর মধ্য দিয়ে দেশ সেবায় তৎপর হয়ে উঠলেন।

সুযোগও এল। ১৯০৫ সালে এম, এ পরীক্ষা দেবার প্রাক্কালে টাটার বৃত্তি নিয়ে নাগপুরে এমপ্রেস মিলে শিক্ষানবিশী হয়ে প্রবেশ করার সুযোগ পান। তাঁরা দু'জন মাত্র বাঙ্গালী সেখানে প্রবেশ করতে পারেন। এ বিষয়ে শ্রীগুহ

শ্রীআশুতোষ গুহ

তখনকার স্বনামধন্য ব্যারিষ্টার ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশানএর স্বর্গীয় যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর কাছ থেকে অদম্য উৎসাহ এবং সাহায্য পান এবং নাগপুরে স্যার বিপিনকৃষ্ণ বসু তাঁকে নিজের বাড়িতে রেখে সর্বপ্রকার সুযোগ সুবিধা ও উৎসাহ দান করেন। এঁদের উৎসাহ না পেলে ঐ বন্ধুর পথে অগ্রসর হওয়া শ্রীগুহের পক্ষে সম্ভব হত না। তিনি সেখানে চার বৎসর উইভিং সম্বন্ধে কৃতিত্বের সঙ্গে শিক্ষালাভ করে আসেন। এখানে উল্লেখযোগ্য তখন কোনো ফ্যাক্টরী আইন ছিল না। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত ১৪ ঘণ্টা কাজ করতে হত যা আজকালকার কর্মীরা কল্পনাও করতে পারেন না। শিক্ষা-নবিশীর কাজ শিক্ষা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আরেকটি কাজ শেখার সুযোগের আশায় একটি অনিশ্চয়তার মধ্যে ঝাঁপ দিলেন শ্রীগুহ।

ম্যাঞ্চেষ্টারে কারিগরী বিদ্যা শিক্ষার জন্তে মধ্যপ্রদেশ সরকারের বৃত্তিলাভের আশায় তিনি আবেদন করে বসলেন। সে সময়ে ঐ সমস্ত দেশ থেকে বাঙ্গালী নির্বাচিত হওয়াটা কল্পনাতীত। তবু বহু প্রার্থীর মধ্যে তিনি নির্বাচিত হন। তিনি ইণ্টারভিউর সকল পরীক্ষায় আশাতীত নম্বর পেয়ে প্রথম হন। প্রতিভা বিশ্বজয়ী। বাঙ্গালীর গৌরব শ্রীগুহ বিলেত পাড়ি দিলেন ১৯১০ সালে। সেখানে ৩ বৎসর পাঠান্তে স্কুল অব টেকনোলজিতে তাঁর অধ্যয়ন শেষ হয়। তিনি এ, এম, এস, টি (Associate of the municipal School of Technology) পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং ৫ পাউণ্ড পুরস্কার লাভ করেন। এর পরের ইতিহাস আরও উল্লেখনীয়।

সে সময়ে ম্যাঞ্চেস্টারে টেকস্টাইলে কোন ডিগ্রি কোর্স ছিল না। ভিক্টোরিয়া ইউনিভার্সিটি স্থির করে যে, ১৯১৩ সাল থেকে টেকস্টাইলে বি, এস, সি (টেক্) ডিগ্রি খোলা হবে। অসীম মেধাসম্পন্ন এবং ছাত্রজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে যিনি ছিলেন একনিষ্ঠ, তাঁর প্রতি শিক্ষক সমাজের পূর্ণদৃষ্টি ছিল। একদিন উক্ত ফ্যাকাল্টির ডীন শ্রীগুহকে ডাকলেন, খোলাখুলি সব আলোচনা করে মন্তব্য করলেন,—এই নাও কাগজ কলম। তুমি ডিগ্রি কোর্সে পরীক্ষা দেবার জন্তে এক্ষুণি দরখাস্ত কর। শ্রীগুহ তো বিস্ময়ে হতবাক! ডীন বললেন, পরীক্ষা দেবার জন্যে যে সমস্ত গুণাবলী বা বা শিক্ষাগত যোগ্যতার দরকার সবই তো তোমার আছে। সুতরাং মা ভৈঃ। তাই হল। শ্রীগুহ দরখাস্ত করলেন। একজন লোকের জন্য একটিমাত্র প্রশ্নপত্র ছাপা হল। শ্রীগুহ পরীক্ষা দিলেন এবং ম্যাঞ্চেস্টারের টেকস্টাইল ডিগ্রি কোর্সে প্রথম ছাত্র এবং এবং প্রথম ভারতীয় হিসেবে সারা ভারতকে গৌরবান্বিত করলেন। এ থেকে বোঝা যায়, শিক্ষিত মহলে তিনি কতখানি প্রিয়পাত্র ছিলেন।

এর পর বিলেতের বিশিষ্ট যন্ত্রতৈরীর কারখানা ডবসন বার্লোতে তিনি হাতে-কলমে কাজ শেখেন এবং সেখানে একটি কটন মিলে কিছুদিন ম্যানেজার-এর কাজ করেন। ১৯১৫ সালে তিনি দেশে রওনা হন। তখন একই ষ্টীমারের যাত্রী তিনি এবং গান্ধীজী। এসময় তিনি বহুভাবে গান্ধীজীর সাহচর্যে আসেন। গান্ধীজী তখন কবিগুরুর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে বাংলা চর্চা করছিলেন। শ্রীগুহের সঙ্গে প্রত্যহ ষ্টীমারের ডেকে গান্ধীজীর বাংলা ভাষা নিয়ে বহু আলোচনা হত। দেশে এসে শ্রীগুহ শ্রীরামপুর গবর্ণমেণ্ট উইভিং

কলেজে ভাইস প্রিন্সিপ্যাল-এর পদে নিযুক্ত হন। এর পর তিনি উক্ত কলেজের প্রিন্সিপ্যাল পদে পাঁচ বৎসর অফিসিয়েট করেন।

অতঃপর তিনি ব্র্যাডফোর্ড ডায়ার্স এসোসিয়েশন-এ যোগদান করেন এবং সেখানে চার বৎসর সসম্মানে চাকরি করেন। জীবনে আরো সুযোগ এল। তদানীন্তন ভারতের বিশিষ্ট বস্ত্র কারখানা ঢাকেশ্বরী কটন মিলের ম্যানেজারের পদে নিযুক্ত হয়ে তিনি নারায়ণগঞ্জে বসতি স্থাপন করেন ১৯৩০ সনে। এর পর তিনি জেনারেল ম্যানেজার পদেও অধিষ্ঠিত হলেন এক নম্বর, দু' নম্বর এবং (আসানসোলে) তিন নম্বর ঢাকেশ্বরী কটন মিলের। কারখানার স্বল্প লাভ থেকে দু' নম্বর ঢাকেশ্বরী মিল গড়ে তোলার ইতিহাসে শ্রীগুহের দান স্মরণীয়। নিজের কৃতিত্বে আজ তিনি ঢাকেশ্বরী এক নম্বর ও দু' নম্বর কটন মিলের সুপারিন্টেন্ডেন্ট পদ সগৌরবে অধিকার করে আছেন। প্রতিটি কর্মে ভারতের এই প্রতিকৃতি সন্তানের নির্দেশ আজ সেখানে অমূল্য সম্পদরূপে গণ্য করা হয়। কর্মক্ষেত্রে তাঁর সময়, নিষ্ঠা এবং শ্রমিক মালিক সম্পর্ক প্রীতিপূর্ণ রাখার ক্ষেত্রে কর্মনীতি আদর্শ হয়ে আছে। ব্যক্তিগত জীবনে আশুতোষ সার্থকনামা পুরুষ। বার্ণার্ড শ,' ডুমা, ডিকেন্স, স্কট প্রভৃতি লেখকদের সম্পূর্ণ রচনাবলী তিনি পাঠ করেছেন এবং তাঁর সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত আছে! ফাঁক পেলে এখনও তিনি বার্ণার্ড শ' পড়েন। বাংলা বইও তিনি অধ্যয়ন করেন। বঙ্কিমচন্দ্র থেকে বনফুল পর্যন্ত সবই তিনি পড়েছেন। স্বাস্থ্যবিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান একজন চিকিৎসকের চেয়ে কম নয়। তাঁর উদার মতবাদ এবং দরদী মন হৃদয় স্পর্শ না করে পারে না। এই নিরহংকার জ্ঞানতপস্বী অত্যন্ত কুণ্ঠার সঙ্গে সেদিন নিজের কথাগুলি বলে গেলেন। বহুদিন পর মনে একটা পরম তৃপ্তি নিয়ে এলাম এবং প্রত্যক্ষ করলাম, বিদ্যা মানুষকে সত্যিই কতখানি বিনয়দান করতে পারে!

সে বিশাল ছবি

জয়ন্তী সেন

আমার ঘরের পাশে ছোট মাঠ ঘাসের সবুজে
অনেক পান্নার দ্যুতি সারা দিন জেলেছে জ্বলেছে
রোদ-ঝরা দাবানল—তারপর ঘন নীল রাত
মধুর আবেশে তার ছড়িয়েছে আদরের হাত।
মেঘ থেকে একক একে শূন্যতায় পাখির ডানায়
মাটির প্রস্তুত বুকে অন্তরঙ্গ ঘন কামনায়।
আমার মাঠের ঘাসে ছোঁয়া তার পড়েছে কখন
ঘাসফুল ঝরে গেছে—সব রঙ ভুলে গেছে মন
আলোছায়া হাসি-খেলা ছায়া-দোলা পাখির হৃদয়
স্মৃতির নীরন্ধ্র দেশে মুছে নিল নিবিড় সময়।
আমার ঘরের পাশে ছোট মাঠ এখন অসীম
যে দূর দিগন্তে ঝরে অবিচল তারাদের হিম
সে অনন্ত শূন্যতায় একাকার আকাশ পৃথিবী
সীমার কল্পনা ভুলে চেয়ে দেখি সে বিশাল ছবি।

... এ মাসের প্রচ্ছদপট ...

এই সংখ্যার প্রচ্ছদে শিবদুর্গার যুগলমূর্তির আলোকচিত্র প্রকাশিত হয়েছে। আলোকচিত্রশিল্পী রামকিঙ্কর সিংহ।

বিবেকানন্দ স্তোত্রে

সুমণি মিত্র

৭৩

গোপী-প্রেমের মর্ম
বোঝবার আগে
পার্থের প্রতি কৃষ্ণের
এই মহাবাক্যটা বোঝো,—

"সর্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য
মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো
মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥" ১

*   *   *

যাগ-যজ্ঞ, ক্রিয়া-কাণ্ড,
তপশ্চরণ,—
সবকিছু বিসর্জন দিয়ে
নিজেকে একান্তভাবে
আমাকেই করো সমর্পণ,
সমস্ত পাপ থেকে
বিমুক্ত কোরে আমি
খুলে দেবো মায়ার বাঁধন।

মৃত্যুবিবর্জিত
আমার শরণাগতি,
—সেইটেই শ্রেষ্ঠ সাধন।

*   *   *

জ্ঞানযোগ, ধ্যানযোগ,
সব যোগ শেষ কোরে কিনা
গীতার সমাপ্তিতে
শ্রীকৃষ্ণ বোল্‌ছেন এই—
ভগবৎশরণতা
সাধনার শেষ কথা,
তার বাড়া তপস্যা নেই।

এবং এ-গোপীপ্রেমেই
ছিলো এই নিষ্কাম
আত্মসমর্পণ-যোগ;
সেই জন্যেই
গোপাঙ্গনার প্রতি
কৃষ্ণের এ-কথা প্রয়োগ,—

"ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং,
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মাভজন্ দুর্জরগেহশৃঙ্খলাঃ,
সংবৃশ্চ্য তদ্‌বঃ প্রতিযাতু সাধুনা ॥" ২

*   *   *

পার্থকে বোল্লেন—শোনো,

"সহায়া গুরবঃ শিষ্যা
ভুজিষ্যা বান্ধবাঃ স্ত্রিয়ঃ।
সত্যং বদামি তে পার্থ
গোপ্যঃ কিং মে ভবন্তি ন ॥" ৩

*   *   *

"মন্মাহাত্ম্যং মৎসপর্য্যাং
মৎশ্রদ্ধাং মন্মনোগতম্।

১। "সকল ধর্মাধর্মের অনুষ্ঠান পরিত্যাগ কোরে একমাত্র আমার শরণাগত হও। আমি ছাড়া অতিরিক্ত কোনো বস্তুই নেই, —এই রকম দৃঢ়নিশ্চয় কোরে আমাকে সর্বদা স্মরণ করো। তুমি এই রকম নিশ্চিত বুদ্ধিযুক্ত এবং স্মরণশীল হোলে তোমার কাছে আমি আত্মভাব প্রকটিত কোরে সমস্ত ধর্মাধর্ম-বন্ধনরূপ পাপ থেকে তোমায় আমি মুক্ত কোরবো। অতএব, শোক কোরো না।"

—শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা (মোক্ষযোগ, শ্লোক-৬৬)।

২। "শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের বোলেছিলেন, হে সুন্দরীগণ! তোমাদের সঙ্গে আমার প্রেমসংযোগ নির্মল, আমি দেবতাদের পরমায়ু পেলেও তোমাদের প্রত্যুপকার কোরতে পারবোনা; কারণ দুশ্ছেদ্য গৃহশৃঙ্খল ছেদন কোরে তোমরা আমাকে ভজনা কোরছো। আমি তোমাদের ঋণ পরিশোধ কোরতে সমর্থ নই; অতএব তোমাদের নিজেদের সাধুব্যবহার দ্বারাই তোমাদের সাধুব্যবহারের বিনিময় হোলো, অর্থাৎ আমি প্রত্যুপকার কোরে অ-ঋণী হোতে পারলাম না, তোমাদের শীলতার দ্বারাই তোমরা সন্তুষ্ট হও।"

—শ্রীমদ্ভাগবত (১০ম স্কন্ধ, ৩২ অধ্যায়, শ্লোক-২২)।

৩। "শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বোলেছিলেন, হে পৃথানন্দন! গোপিকারা আমার যে কি নন তা' বোলতে পারিনা। তাঁরা আমার সহায়, গুরু, শিষ্যা, দাসী, বন্ধু, প্রেয়সী,—যা' বলো তাই।"

—গোপীপ্রেমামৃত।

জানন্তি গোপিকাঃ পার্থ
নাঙ্গে জানন্তি তত্ত্বতঃ ॥" ৪

*   *   *

মথুরার শ্রীকৃষ্ণ
গোপীদের প্রসঙ্গে
তাই এত বিহ্বল হন,—

"তা মন্মনস্কা মৎপ্রাণা
মদর্থে ত্যক্তদৈহিকাঃ।
যে ত্যক্তলোকধর্মাশ্চ
মদর্থে তান্ বিভর্ম্যহম্ ॥
ময়ি তাঃ প্রেয়সাং প্রেষ্ঠে
দূরস্থে গোকুলস্ত্রিয়ঃ!
স্মরন্ত্যোঽঙ্গ বিমুহ্যন্তি
বিরহোৎকণ্ঠ্যবিহ্বলাঃ ॥
ধারয়ন্ত্যতিকৃচ্ছ্রেণ
প্রায়ঃ প্রাণান্ কথঞ্চন্।
প্রত্যাগমনসন্দেশৈ-
র্বল্লব্যো মে মদাত্মিকাঃ ॥" ৫

৭৪

কামদগ্ধ মানুষ যখোন
গোপী-প্রেমের স্বাদ
একেবারে ভুলে গিয়েছিলো,
দেহাত্মবোধ নিয়ে
দেহাতীত বিষয়ের
বিকৃত ব্যাখ্যা চলছিলো,
অমনি তখোন
গোপীদের প্রেমার্তি
অনন্ত ব্যাকুলতা নিয়ে
মহাপ্রভুর আগমন :

গোপিকার মহাভাবে
সর্বদা রোমাঞ্চ,
পুলক, অশ্রু, কম্পন!

*   *   *

"যদি গৌর না হ'ত কি মেনে হইত
কেমনে ধরিতাম দে।
রাধার মহিমা প্রেমরসসীমা
জগতে জানাত কে।
মধুর-বৃন্দা-বিপিন-মাধুরী
প্রবেশ-চাতুরী-সার।
বরজ-যুবতী-ভাবের ভকতি
শকতি হইত কার।" ৬

*   *   *

দেহাতিরিক্ত ঐ
শ্রীমতীর বিশুদ্ধ প্রেম,
অনন্ত প্রেম-মত্ততার
জ্বলন্ত আদর্শ
স্বয়ং মহাপ্রভু,
জীবন্ত বিগ্রহ তার।

আর,
শ্রীরাধা হোলেন
শ্যামের স্বরূপশক্তি,
অসীম হ্লাদিনীশক্তি তাঁর। ৭

*   *   *

"কৃষ্ণকে আহ্লাদে তাতে নাম হ্লাদিনী।
সেই শক্তিদ্বারে সুখ আস্বাদে আপনি ॥
সুখরূপ কৃষ্ণ করে সুখ-আস্বাদন।
ভক্তগণে সুখ দিতে হ্লাদিনী কারণ ॥
হ্লাদিনীর সার অংশ তার প্রেম নাম।
আনন্দ চিন্ময়-রস প্রেমের আখ্যান ॥
প্রেমের পরমসার মহাভাব জানি।
সেই মহাভাবরূপা রাধাঠাকুরাণী ॥

*   *   *

সেই মহাভাব হয় চিন্তামণিসার।
কৃষ্ণবাঞ্ছা পূর্ণ করে এই কার্য্য যার ॥

*   *   *

সেই রাধার ভাব লঞা চৈতন্যাবতার।
যুগধর্ম্ম নাম প্রেম কৈল পরচার ? ৮"

৪। "আমার মাহাত্ম্য, পূজা, আমার প্রতি শ্রদ্ধা এবং আমার মনোভীষ্ট কেবলমাত্র গোপিকারাই জানেন। হে পার্থ, স্বরূপতঃ ঐসকল অন্য কেউই জানেনা।"—আদিপুরাণ।

৫। "যারা আমার জন্যে ইহকাল,পরকালের সুখ বিসর্জন করে, আমি তাদের সুখী কোরে থাকি।

হে উদ্ধব! গোপীরা সমস্ত প্রিয়বস্তুর চেয়ে আমাকে আরও বেশি ভালোবাসে। আমি তাদের কাছ থেকে দূরে র'য়েছি, আমাকে তারা নিরন্তর স্মরণ কোরছে, আর আমার বিরহজনিত উৎকণ্ঠায় কাতর হোচ্ছে। গোকুল থেকে আমি যখন মথুরায় আসি, তখন 'আবার আসবো' বোলে গোপীদের আমি যে-আশ্বাস দিয়েছিলাম, সেই আশ্বাসেই তারা আজ পর্যন্ত কষ্টে-সৃষ্টে কোনরকমে প্রাণধারণ কোরে আছে।

তাদের দেহে আত্মা নেই (অর্থাৎ—আমার কাছেই তাদের আত্মা), থাকলে আমার বিরহানলে এতদিনে তা' দগ্ধ হোয়ে যেতো।"

—শ্রীমদ্ভাগবত (দশম স্কন্ধ, ষটচত্বারিংশ অধ্যায়, ৩—৫)।

৬। কবি শ্রীবাসুদেব ঘোষ।

৭। "হ্লাদিনী সন্ধিনী সংবিৎ ত্বয্যেকাসর্ব্বসংশ্রয়ে।"
—বিষ্ণুপুরাণ (প্রথমাংশ, দ্বাদশ অধ্যায়)।

৮। —শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (মধ্যলীলা ও আদিলীলা)।

৭৫

"Chaitanya
Represented
The mad love of the Gopis,
..The Radhaprema,
With which
He used to remain intoxicated
Day and night
Losing his individuality
In Radha." ১

* * *

নীলাচলে গম্ভীরায়
মূর্ত হোলো গোপিকার প্রেম,
যে প্রেমের প্রসঙ্গে
বাঙালী সাধক-কবি
নরহরি দাস গেয়েছেন,—

"গম্ভীরা ভিতরে গোরা রায়
জাগিয়া রজনী পোহায়।
ক্ষণে করয়ে বিলাপ
ক্ষণে রোয়ত ক্ষণে কাঁপ।
ক্ষণে ভিতে মুখ শির ঘসে
কই নহি রহু পহু পাশে।
ক্ষণে কান্দে তুলি দুই হাত
কোথায় আমার প্রাণনাথ!"

* * *

"অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিতধূলিসদৃশং বিচিন্তয় ॥
নয়নং গলদশ্রুধারয়া বদনং গদ্গদরুদ্ধয়া গিরা।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি ॥

যুগায়িতং নিমিষেণ
চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতং।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্বং
গোবিন্দবিরহেণ মে ॥

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মাম্
অদর্শনাৎ মর্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ ॥" ১০

৭৬

সবশেষে শোনো এইবার
ভাগবত-বর্ণিত
গোপী-প্রেমের প্রতি
মহাপ্রভুর মনোভাব।

শ্রীবাসের মুখ থেকে
গোপীদের প্রেম-লীলা শুনে
সাক্ষাৎ মহাপ্রভুর
দিব্য দেহ ও মনে
রোমাঞ্চ হোতো কতোদূর,
একটু আভাস তার
তাঁরই জীবনীকার
দিয়েছেন কবি কর্ণপূর।

* * *

"বৃন্দাবনক্রীড়িতানি স্মৃত্বা স্মৃত্বা কৃপানিধিঃ।
সান্দ্রানন্দৈকসন্দোহমগ্নস্তূষ্ণীমভূৎ ক্ষণং ॥
ততশ্চাতিশয়াবিষ্টোহুদ্ধরোমা মহাপ্রভুঃ।
ব্রূহি ব্রূহীতি সততমুচ্চৈস্তং নিজগাদ সঃ ॥

* * *

ইত্থমুদ্ভটসুখাম্বুধিমগ্নং
গৌরচন্দ্রমবধা সোঽভিজগাদ।
শ্রূয়তাং প্রভুবর স্ববিহারং
প্রাকৃকৃতং স্বয়মহং কথয়ামি ॥" ১১

[প্রথম পর্ব্ব সমাপ্ত]

১। "চৈতন্যদেব ছিলেন গোপীদের প্রেমোন্মত্ততার আদর্শস্বরূপ; শ্রীরাধার সত্তায় নিজেকে বিলীন কোরে দিয়ে যে-রাধাপ্রেমে তিনি দিনরাত উন্মত্ত হোয়ে থাকতেন—তার জীবন্ত বিগ্রহ।"

—*Sages of India and Conversations and dialogues* (*vol-V, Page-260.*)

১০। "হে শ্রীকৃষ্ণ, দুস্পার ভবসিন্ধুতে পতিত দাস আমাকে কৃপাপূর্বক তোমার চরণকমলের ধূলির সমান মনে করো। তোমার নাম গ্রহণে কখোন আমার নয়ন গলদশ্রুধারায়, বদন বাষ্পরুদ্ধ বাক্যে। এবং শরীর রোমাঞ্চে পূর্ণ হবে? হে গোবিন্দ, তোমার বিরহে একটা নিমেষ আমার কাছে যুগযুগান্ত বোলে মনে হয়, নয়নে ছেয়ে আসে বর্ষার জলধারা আর নিখিল বিশ্ব শূন্যে বিলীন হোয়ে যায়।

সেই রসরাজপদানুরক্ত আমাকে আলিঙ্গনে পেষিতই করুন, কিংবা দর্শন না দিয়ে মর্মে বিদ্ধই করুন, অথবা আমার প্রতি যথেচ্ছ ব্যবহারই করুন, তবুও তিনিই আমার প্রাণনাথ, অন্য কেউ নন্।"

—শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু।

১১। "কৃপানিধি গৌরচন্দ্র বৃন্দাবনের ক্রীড়ার কথা বার বার স্মরণ কোরে নিবিড় আনন্দে তুষ্ণীম্ভূত হোয়ে রইলেন। তারপর মহাপ্রভু অত্যধিক আবেগে পুলকিত হোয়ে উচ্চৈঃস্বরে নিরন্তর শ্রীবাসকে অনুরোধ কোরতে লাগলেন,—'বলো, বলো শ্রীবাস, বলো।'

এইরূপ অগাধ সুখসাগরে নিমগ্ন গৌরচন্দ্রকে নিরীক্ষণ কোরে শ্রীবাস বোল্লেন,—'হে প্রভুবর! আপনার পূর্বকৃত লীলা আমি স্বয়ং বর্ণনা কোরছি,—আপনি শুনুন।"

—কবি কর্ণপুর প্রণীত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতমহাকাব্য (অষ্টম সর্গ, শ্লোক—৫৮ ও নবম সর্গ, শ্লোক—১)।

সিংহ মহারাজ

—বিনয়কুমার ঘোষ

(লক্ষ্ণৌ পশুশালা)

কৌতূহল

—রথীন রায়

দেওয়ানী খাস (আগ্রা দুর্গ) —এস, এম, হায়দার

অলস দুপুরে —আশুতোষ সিন্হা
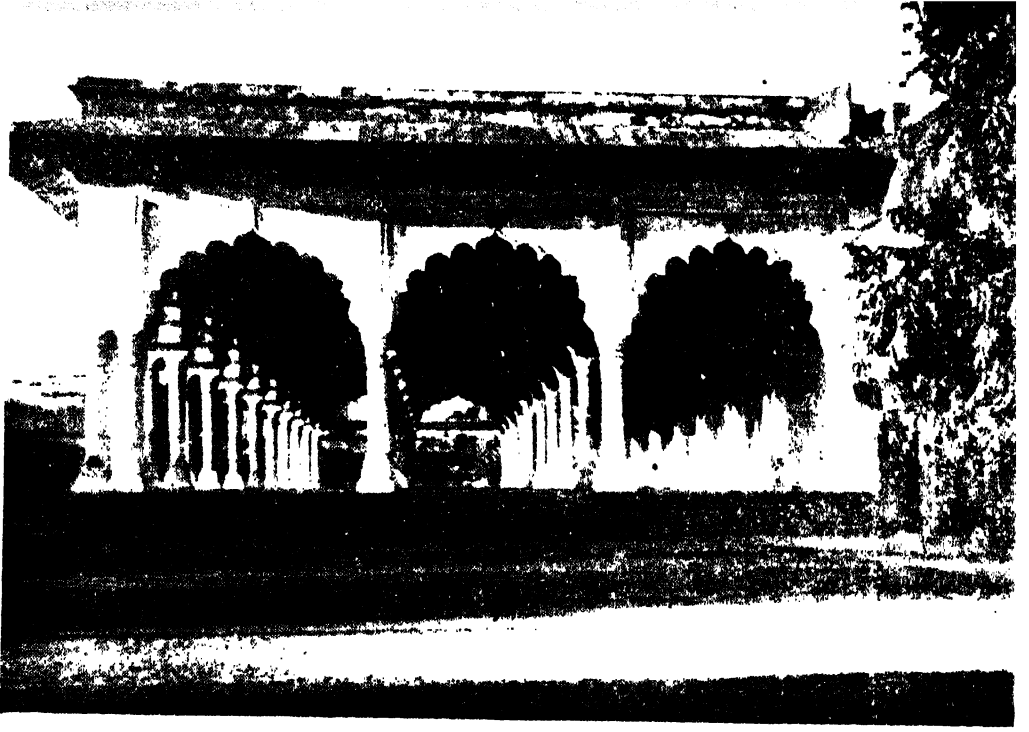
পাল্কী চলে —দীপক বসাক
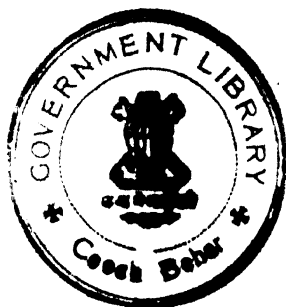
নিরালা মধ্যাহ্নে —জ্যোতির্ময় ঘোষ

(আলিপুর পশুশালা)

—গোপাল দাস-মজুমদার

শৈব-তীর্থে জাগ্রত তারকনাথ

শ্রীসমীরেন্দ্রনাথ সিংহ-রায়

ভেলোর হাসপাতাল।

দক্ষিণ-ভারতের ছোট্ট সহর, মাদ্রাজ হতে প্রায় নব্বই মাইল ...র নর্থ আরকট জেলার সদর সহর—ভেলোর। চারিধারে পাহাড় ...য়ে ঘেরা সহরটি। বিরাট হাসপাতাল, আর এই হাসপাতালকেই ...ন্দ্র করে গড়ে উঠেছে এই সহরটি। ক'দিন আগে আমার ভাইয়ের ...রাট এক অস্ত্রোপচার হয়েছে এই হাসপাতালে। অস্ত্রোপচারের ...-তিন দিন পরে হঠাৎ তার অবস্থা খারাপের দিকে যেতে লাগল। ...কদিন গভীর রাত্রে বাইরে একটানা বৃষ্টি পড়ছে ঝম-ঝম করে। ...বিধার নিস্তব্ধ। মধ্যে মধ্যে এখান ওখান হতে রোগীদের চীৎকারের ...ব্দ, কাতরানি শোনা যাচ্ছে।

একটি ঘরে আমি ভাইয়ের কাছে বসে নিঃশব্দে কাঁদছি আর ...কুর-দেবতা স্মরণ করছি। ভাইয়ের পায়ের দিকে আমাদের ...রাতন ভৃত্য মাথা হেঁট করে চুপচাপ বসে। আত্মীয়-স্বজন, ...ন্ধু-বান্ধব হতে বহুদূরে ভারতের এক প্রান্তে, বর্ষার এক নিস্তব্ধ ...ভীর রাত্রি।

ক্ষীণ মৃদুস্বরে ভাই বললে, আর পারলাম না দাদা, চললাম। ...আমি আর থাকতে পারলাম না—মুখে তাকে সাহস দিলেও কাঁদতে ...লাগলাম নিঃশব্দে আর ঠাকুর-দেবতা স্মরণ করতে লাগলাম। তার ...গায়ে হাত দিয়ে দেখি হাত-পা, গা সব ঠাণ্ডা, কেমন করছে সে। ...ছুটে গিয়ে নার্সকে খবর দিলাম—সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার এলেন, ...ব্লাডপ্রেসার নেই, পাল্‌স নেই, তবুও ডাক্তার বললেন শেষ চেষ্টা ...করছি, ভগবানকে ডাকুন। নিজেকে আর সামলাতে পারলাম না, ...কান্না আর আটকাতে পারলাম না, ছুটে বাইরে গিয়ে খানিকটা ...কাঁদলাম।

পর পর কয়েকটা ইনজেকসন দেওয়ার পর ভাইয়ের ঘুমের মত ...ল। ডাক্তাররা চলে গেল, আমি নীরবে বসে বসে নানান ...কথা চিন্তা করছি। হঠাৎ ভাই চীৎকার করে উঠল—বাবা, বাবা, ...বাবা—

আমি কান্নার বেগ আর থামাতে পারলাম না। তার গায়ে ...মাথায় হাত বোলাতে লাগলাম আর ঠাকুর-দেবতা স্মরণ করতে ...লাগলাম। জোরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাই বললে—দাদা, ...র ভয় নেই। বাবা তারকনাথ আমায় বললেন—তোর আর ভয় ...নেই, তুই ভাল হয়ে গেছিস। আরও অনেক কথা বলল সে— ...নীরবে সব শুনলাম আর ভাবতে লাগলাম বাবার দয়ার কথা। সত্যই ...র পরদিনই ভাই উঠে নিজেই বসল, দাড়ি কামাল, খেল, যার ...বিছানায় পাশ ফিরে শোবার অবস্থা ছিল না। অল্প কয়দিনের ...মধ্যেই ভাই সুস্থ হয়ে উঠল এবং ছুটি পেল চলে আসবার।

বাবার দয়ায় মৃতপ্রায় ভাইকে ফিরে পেলাম, তাই ঠিক করলাম ...দেশে ফিরেই বাবার পূজা দিয়ে আসব। আমাদের দেশের কাছে ...জাগ্রত দেবতা—আর আমরা বিশ্বাস করতে পারি না! কোথায় ...সুদূর বিদেশ হতে মৃতপ্রায় ভাইকে যাঁর দয়াতে ফিরে পেলাম তাঁকে ...সেই পূজা দেব, এই মানত করলাম মনে মনে। আর ডাকতে ...লাগলাম বাবা তারকনাথকে সর্বদা।

—তুমি রক্ষা কর বাবা—সুস্থ হয়ে ভাইকে নিয়ে যেন যেতে পারি। বাবার কানে সে ডাক পৌঁছাল—তাই ফিরে এলাম দেশে। আসার কয় দিন পরেই রওনা হলাম তারকেশ্বর। হাওড়া হতে ট্রেণ ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যাত্রীরা একসঙ্গে বলে উঠল— "জয় বাবা তারকনাথ"।

মনে মনে বাবা তারকনাথের নাম স্মরণ করে প্রণাম জানালাম। আমিও আজ যাত্রী—বাবার পূজা দিতে চলেছি। ট্রেণের কামরাটি আমাদের লোকজনেই প্রায় ভর্ত্তি। তবুও কয়েকজন উঠবার চেষ্টা করলেন—মৃদু আপত্তি জানাতে একজন বলে উঠলেন, রিজার্ভ করেছেন নাকি? বিনয়ের সঙ্গে উত্তর দিলাম, আজ্ঞে না, তবে জায়গা আর নাই তবে•••ভদ্রলোক আবার কি বলতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় ট্রেণ ছেড়ে দেওয়ায় তিনি অন্য কামরায় উঠলেন।

যথাসময়ে তারকেশ্বরে ট্রেণ থামল। আমরাও সদলবলে প্ল্যাটফর্ম্মের বাইরে আসায় পাণ্ডা, পুরোহিত ও সরাইওয়ালারা আমাদের ঘিরে ধরল। নানান সুবিধা অসুবিধার কথা বলে আমাদের মন আকর্ষণ করবার চেষ্টা করতে লাগল। শেষে যখন জানতে পারল যে, পূর্ব্ব হতেই আমাদের ঘর পুরোহিত প্রভৃতি ঠিক করা হয়েছে তখন একে একে সকলেই নিরাশ হয়ে গেল। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে আমরাও ধীরে-সুস্থে আমাদের স্থিরীকৃত ডেরায় আশ্রয় নিলাম।

তার পর যথাসময়ে স্নান, পূজাদি সমাপন করে খাওয়া দাওয়ার পর তীর্থস্থানটি দেখতে বার হলাম। বাবার মাহাত্ম্য কে না জানে? তবুও যা জানতে পারছি তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে দিলাম। মুকুন্দ নামে এক ঘোষের একটি কপিলা গাই ছিল। কিছুদিন হতে দুধ কম দেওয়ায় ঘোষ মহাশয়ের সন্দেহ হয় এবং গাইটির প্রতি গোপনে নজর রেখে দেখেন যে, গাইটি জঙ্গলে ঢুকে একটি উঁচু স্থানে দাঁড়িয়ে আছে এবং দুধ আপনা আপনি পড়ছে। সেই স্থান খনন করে একটি পাথর দেখতে পান। পরে সেই পাথরের উপর অনেকে ধান ভানতেও থাকে। এই ভাবে বার বৎসর অতিবাহিত হওয়ার পর পাথরে এক বিরাট গর্ত্ত হয়ে যায়। তখন মুকুন্দ ঘোষকে স্বপ্নে আদেশ হয় যে—আমি তারকেশ্বর, সন্ন্যাস গ্রহণ করে আমার পূজা কর।

"চারি শত দশ সালে হলেন প্রচার।
জরাযুক্ত কলির জীবে করিতে উদ্ধার॥

বাবার মাথায়—

"কৃষাণে কাটিয়ে ধান্য রাখালে কুড়ায়।
আনন্দে বাবার মাথায় ধান্য ভানি খায়॥"

এই ভাবে বাবা বিশ্বনাথ—তারকনাথ নামে যখন আবির্ভূত হলেন, তখন চারি ধারে সেই সংবাদ প্রচারিত হয়ে গেল। রামনগরের মহারাজা সেই সংবাদ পেয়ে দেখতে এলেন এবং রামনগরে নিয়ে স্থাপন করবার মনস্থ করে মাটি খনন করে সেই লিঙ্গমূর্ত্তি তুলবার ব্যবস্থা করলেন, কিন্তু যতই খনন করতে

লাগলেন ততই লিঙ্গ নীচের দিকে যেতে লাগল। অবশেষে একদিন এক সন্ন্যাসী এসে রাজাকে নিষেধ করায় রাজা খননকার্য্য বন্ধ করে জঙ্গল কেটে মন্দির নির্ম্মাণ করে—বাবার পূজাদির ব্যবস্থা করলেন। সেই অবধি আজও পূজা হয়ে আসছে এবং তারকনাথের মহিমা চারিধারে প্রচারিত হল—

"ধরিয়া সন্ন্যাসী মূর্ত্তি দিলেন স্বপন।
শুন রাজা ভারামল্ল আমার বচন।।"

মুকুন্দ ঘোষ হতেই বাবা তারকনাথের প্রথম প্রকাশ বলিয়া আজও ঘোষেদের প্রাধান্য দেখা যায়। গাজনের সময় পাঁচ জন মূল সন্ন্যাসীর মধ্যে চার জন থাকে গোপ। তারকনাথের উৎসবগুলির মধ্যে গাজন-উৎসবই সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। এই সময় লক্ষাধিক যাত্রী-সমাগম হয়। এখানে আর বিভিন্ন স্থান হতে পুরুষ-নারী নির্ব্বিশেষে সন্ন্যাসী হয়ে গাজন উৎসবে যোগ দেয়। প্রথমে তারকেশ্বর কর্ত্তৃক অনুগৃহীত হয়ে মুকুন্দ ঘোষ তাঁর পূজা অর্চনা করতেন। পরে ব্রাহ্মণ-পূজারী নিযুক্ত হন। কালক্রমে বাংলা দেশে বিখ্যাত শৈবতীর্থ রূপে প্রসিদ্ধি লাভ করে এই তারকেশ্বর ধাম। মুকুন্দ ঘোষের সমাধি আজও তারকেশ্বরে মন্দিরের পার্শ্বে বিরাজিত এবং যাত্রিগণ এই স্থানেও দুধ, জল, পূজা দিয়া থাকেন। নিকটেই অপর একটি মন্দিরে দশভুজা দেবী বিরাজিতা থাকেন—রাজা ভারামল্ল মুকুন্দ ঘোষের আবিষ্কৃত তারকনাথ প্রথমে নিজের গড়ের মধ্যে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেন, পরে অকৃতকার্য্য হয়ে ও স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে, এই স্থানেই মন্দির নির্ম্মাণ করে দেন।

—"জঙ্গল কাটিয়া দিল অপূর্ব মন্দির।"

পূর্ব্বে এই স্থান জঙ্গলাকীর্ণ ছিল ও চারি ধারে নীচু জমি নলখাগড়ায় পরিপূর্ণ ছিল। রাজা ভারামল্লের পর বর্দ্ধমান মহারাজাও বহু সম্পত্তি দেবসেবার জন্য দান করেন। এই রকম নানা দানের ফলে তারকনাথদেবের অনেক সম্পত্তি হয়। তখন অর্থই অনর্থের মূল হয়ে দাঁড়ায়। মুকুন্দ ঘোষের পর দশনামী সম্প্রদায় 'গিরি' উপাধিধারী সন্ন্যাসিগণ তারকেশ্বরের মোহান্ত পদ লাভ করেন। সম্পত্তি, অর্থবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই সব মোহান্তদের মধ্যে নানারূপ অনাচার, অত্যাচার দেখা দেয়। পরে এই সম্প্রদায়কে অপসারিত করে বাঙালী সন্ন্যাসীদের মোহান্ত পদে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। বাবার কাছে যাঁরা মানত পূজা দিতে আসেন, তাঁরা মন্দিরের নিকটে দুধপুকুরে স্নান করে দণ্ডি খাটিয়া বাবার দর্শনলাভ করেন ও পূজা দিয়া থাকেন। মন্দিরের সম্মুখের নাটমন্দিরের মনস্কামনা পূর্ণ ও রোগমুক্তির আশায় বহু নরনারী ধর্ণা দিয়া থাকে। ভক্তিভরে বাবার কাছে যে যা মানত করে তারা সকলেই সুফল পায়। অনেক অন্ধের চোখ হওয়ার সংবাদ, অনেক দুরারোগ্য ব্যাধিমুক্তির সংবাদ, অনেকের অনেক মনোবাঞ্ছা পূরণের কথা শোনা যায় এবং এই সবকে কেন্দ্র করে এতদঞ্চলে অনেক প্রবাদবাক্য, অনেক ছড়া, অনেক সঙ্গীত গান আজও প্রচলিত আছে। কলিতে অত বড় জাগ্রত দেবতা আর নাই, একথা অধিকাংশ লোকেই বিশ্বাস করেন। সম্প্রতি আমিও বাবার কাছে মানত করে ফল পেয়ে পূজা দিতে গিয়েছিলাম, সেকথা পূর্ব্বেই বলেছি।

দিনকালের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই তীর্থস্থানকে কেন্দ্র করে বহু ব্যবসাদার নানাভাবে এখানে ব্যবসা শুরু করেছেন। কেউ ঘর ভাড়া দিয়া, কেহ দোকান করিয়া কেহ পুরোহিতগিরি করিয়া নানাভাবে যাত্রীদের কাছ হতে অর্থাদি রোজগার করছে। তীর্থস্থানগুলিতে এই ভাবে ধর্ম্মের নামে উৎপীড়ন অত্যাচার আজও স্বাধীন ভারতে কী ভাবে সম্ভব হচ্ছে তা চিন্তার বিষয়। অবশ্য পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বিষয় অত্যাচার হ্রাস হয়েছে বটে কিন্তু এখনও অত্যাচার, উৎপীড়ন, অনাচার এইসব তীর্থস্থান-গুলিকে কেন্দ্র করে চলছে। পশ্চিমবাংলায় তারকেশ্বর ধাম এক মহাতীর্থস্থান। "রাঢ়ে চ তারকেশ্বরঃ।" এখানকার প্রধান উৎসব—শিবরাত্রি, চৈত্রমাসে গাজন, এবং শ্রাবণমাসে শ্রাবণী। এছাড়া নানা ছোট-খাট উৎসব ত লেগেই আছে। সোমবার শিবের বার, তাই প্রতি সোমবারে, ছুটীর দিনে এবং বিশেষ বিশেষ উৎসবে লক্ষ লক্ষ নর-নারী সমাগম হয় এই তারকেশ্বর ধামে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই প্রসিদ্ধ জাগ্রত দেবতার তীর্থক্ষেত্রে যাত্রিগণের সুখ, সুবিধা, স্বাচ্ছন্দ্য এবং পূজাদির সুব্যবস্থার দিকে মোহান্ত, পাণ্ডা, সরাইওয়ালারা প্রভৃতি কাহাদেরও লক্ষ্য নাই। অথচ সকলেই এই তীর্থকে কেন্দ্র করে যাত্রিগণকে অবলম্বন করে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করছেন। তারকেশ্বর ষ্টেটের আয়ও প্রচুর। এই সব অর্থ না তীর্থযাত্রীদের সুখ-সুবিধায়, না স্থানীয় অধিবাসীদের সেবায় ব্যয়িত হয়। এত বড় তীর্থস্থানের রাস্তা-ঘাট, ড্রেন প্রভৃতি দেখে সেই কথাই মনে হয়।

অনুসন্ধানে জানা গেল যে, একটি পরিচালনা-কমিটি আছে মাত্র কিন্তু কোন কাজই সেই কমিটি শৃঙ্খলার সঙ্গে করিতে পারছে না। বর্ত্তমান মোহান্তও একজন নবীন সন্ন্যাসী। পূজা ও ক্রিয়াকলাপেই তাঁর সময় অতিবাহিত হয়—পরিচালনা ব্যাপারে তাঁর জ্ঞান কতটুকু থাকা সম্ভব, জানি না। যে বেড়াজালের চক্রান্তে এই সম্পত্তি প্রচুর অর্থাদিকে বেষ্টন করিয়া সব কিছু বাধার সৃষ্টি করিতেছে, তাহার অনুসন্ধান লইয়া সুষ্ঠুভাবে কাজ পরিচালনার জন্য কমিটি পুনর্গঠন করা বিশেষ ভাবে প্রয়োজন। এদিকে জাতীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া আমি এই কথাই আজ বলিব যে, যেখানে লক্ষ লক্ষ যাত্রীর সমাবেশ, সেখানে সর্ব্বপ্রথম সেই যাত্রীদের সুখ-সুবিধার উপর নজর রাখা দরকার। তার পর আসে স্থানীয় অধিবাসীদের কথা। অবশ্য অনুসন্ধানে আরও জানা গেল, স্থানীয় জনহিতকর কাজের জন্য মন্দির-কর্ত্তৃপক্ষ সম্প্রতি বাহান্ন হাজার টাকার মত ব্যয় করিয়াছেন। জনসাধারণের সহযোগিতায় সরকারী চেষ্টায় এই তীর্থস্থানের আগত যাত্রীদের সর্ব্বপ্রকার সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা অবিলম্বে হওয়া প্রয়োজন, আর প্রয়োজন তারকেশ্বরের রাস্তা-ঘাট, ড্রেন প্রভৃতির আমূল সংস্কার ও জল—বিশেষ করিয়া পানীয় জলের সুব্যবস্থা। যেখানে বছরে লক্ষ লক্ষ নরনারীর সমাবেশ, সেখানে সর্ব্বপ্রথম সেই সব নরনারায়ণের সুখ-সুবিধা, স্বাচ্ছন্দ্যের সুব্যবস্থা সর্ব্বপ্রথম হওয়া প্রয়োজন বলেই মনে করি।

ট্রেণ ছাড়িল। আস্তে আস্তে মন্দিরের চূড়া চোখের বাইরে চলিয়া গেল। মনে মনে প্রণাম করিয়া এই প্রার্থনা জানাইলাম—এই সব অসহায় যাত্রীদের তুমিই দেখ বাবা! তুমিই রক্ষা কর তাদের।

[দ্বিতীয় পর্ব্বে "ত্রিধারা" নাম পরিবর্ত্তন ক'রে নতুন নাম দেওয়া হ'ল "অভিযাত্রী"। —লেখক]

দ্বিতীয় পর্ব্ব

এক

প্রদীপের দেশ ত্যাগের খবর বন্দনা পেল হপ্তা দুই পরে।

জাহাজে ব'সে কলম্বো থেকে প্রদীপ তার কাছে চিঠি লিখেছিল। সংক্ষিপ্ত চিঠি :

"বন্দনা,

চিঠির ওপরের ছাপ দেখেই বুঝতে পারবে দেশ ছেড়ে আমি চলে গেছি অনেক দূরে। আমার গন্তব্য স্থান বৃটেন, যাকে সচরাচর বলা হয় বিলেত। পাথেয় এবং মাস দুই থাকবার মত টাকা জোগাড় হয়েছে, ভবিষ্যতের ভাবনা পরে ভাবব।

দেশ ছেড়ে চলে আসার আমি আনন্দ পেয়েছি এবং দুঃখও পেয়েছি। হেঁয়ালি না করে খুলে বলছি।

কিছুদিন থেকেই আমি অনুভব করছিলাম যে দেশের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারছিলাম না। যাঁদের এতদিন আপন ব'লে জানতাম তাঁরা সবাই হয়েছেন আমার উপর বিরূপ। তার জন্য সম্পূর্ণ ভাবে দায়ী আমি, আর কেউ নয়। কিন্তু বাঁচতে হবে ত? তাই কাপুরুষের মত এই পলায়ন, এবং সেই পলায়নে সাময়িক আনন্দ।

যত দূর মনে হচ্ছে দেশ বোধ হয় এবার সত্যি স্বাধীন হবে। দুঃখের কারণ এই যে এই বিরাট পরিবর্ত্তনের মুহূর্ত্তে আমার থাকা হ'ল না, যে বিপুল উল্লাস তোমরা অনুভব করবে তার অতি সামান্য একটি ঢেউ হয়ত গিয়ে পৌঁছবে বিলেতে। তবু দুঃখ করবার অধিকার আমার নেই, কারণ স্বাধীনতার যুদ্ধে আমার অবদান কত সামান্য!

শেষ দিনে যে বিষয় নিয়ে তোমার সঙ্গে আলোচনা হয়েছিল সে সম্বন্ধে চিঠিতে কোন উল্লেখ করতে চাইনে, শুধু এটুকু বলতে চাই যে তুমি নবকিশোর বা অন্য কারো কাছ থেকে যা' শুনেছ তা' অত্যন্ত অসম্পূর্ণ এবং পনেরো আনা মিথ্যে। আমি তোমার বা কারো প্রতি কোন অন্যায় করিনি।

ইতি

প্রদীপ।"

বন্দনা চিঠিখানা বার বার পড়ল, বিশেষ ক'রে শেষের লাইন কয়টি। কি বলতে চায় প্রদীপ? পনেরো আনা মিথ্যে? এক আনা তাহ'লে সত্যি, তার নিজেরই স্বীকৃতি অনুসারে। অভিযুক্ত হবার পক্ষে এই কি যথেষ্ট নয়?

তা ছাড়া, সত্যি যদি অন্যায় ক'রে না থাকে, তাহলে সে তার কথা খুলে বলছে না কেন? সেদিন না হয় বন্দনা তার সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার করেছিল (করবার যথেষ্ট কারণ ছিল), কিন্তু এখন—দুস্তর সমুদ্র যেখানে তাদের মাঝখানে—চিঠিতে লিখবার মত সাহস কেন হ'ল না তার? এও আরেক ধরণের প্রবঞ্চনা, আলোছায়ার অন্তরালে বসে সহানুভূতি আকর্ষণের প্রয়াস।

বন্দনা নিজের মনকে আবও শক্ত, সুদৃঢ় করে রাখল।

সুমিত্রা খবরটা পেল নবকিশোরের মারফৎ। এটা একটা খবরের মত খবর বই কি! অবশেষে প্রদীপ, মেদিনীপুরের কংগ্রেসকর্ম্মী, বিয়াল্লিশ সালের একজন যোদ্ধা, চলল কিনা বিলেতে, তা'ও দেশ স্বাধীন হবার প্রাক্কালে!

জ্যোতির্ম্ময় বাবুও শুনলেন। বললেন, আমার প্রথম থেকেই সন্দেহ হয়েছিল, ছেলেটার মতিস্থির নেই। এ তারই আর একটা নিদর্শন। আর আমি বুঝতেই পারছি না, এখন বিলেতে গিয়ে ও কি করবে? যুদ্ধ মাত্র শেষ হয়েছে, সারা ইংলণ্ড বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে আছে, চার দিকে অরাজকতা চলেছে শুনেছি, এই কি ওখানে যাবার সময়?

একটু পরেই অটলবিহারী বাবু এলেন সেখানে। তাঁর মুখেও সেই এক কথা, বিলেতে যাবার এ কি অদ্ভুত সময় নির্ব্বাচন করল প্রদীপ? সখ যদি হয়েছিল তা' বছর দুই পরে গেলেই হ'ত। বিলেত আর পালিয়ে যাচ্ছে না।

—আচ্ছা, ওকে টাকা দিল কে? জ্যোতির্ম্ময় বাবু প্রশ্ন করলেন।

—সেটাই একটা রহস্য রয়ে গেল। আজকালকার দিনে সহজে কেউ কাউকে একটা পয়সা দিতে চায় না, আর তার বিলেত যাবার খরচ জোগাচ্ছে। ছেলেটা ধুরন্ধর বটে!

—নবকিশোর দেয়নি ত? এক কালে প্রদীপের সঙ্গে ওর খুব ভাব ছিব।

—আরে নাঃ। আমারও একবার এই সন্দেহ হয়েছিল। নবকিশোরকে সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, সে বলল, তুমি পাগল হয়েছ বাবা? প্রদীপদা'র বিলেতে যাবার খরচ দেব আমি?

—থাকগে ওসব প্রসঙ্গ। তার পর যে জন্যে আপনাকে ডেকেছি শুনুন। দেখছেন ত দেশের হাওয়ার গতি। বৃটিশসিংহকে অবশেষে লেজ গুটিয়ে প্রস্থান করতেই হবে। যত দূর মনে হচ্ছে দেশকে দু' ভাগ করা হবে, এক ভাগে থাকবে মুসলমান, আরেক ভাগে থাকবে হিন্দু। অবশ্য গান্ধীজি এখনও রাজী হচ্ছেন না, কিন্তু তিনিও শেষ রক্ষা করতে পারবেন না। সে যাই হোক, কংগ্রেসকে অগ্রাহ্য করলে চলবে না—এই মুসলমান-প্রধান বাংলা দেশেও। গঠনমূলক কাজের জন্য টাকার দরকার।

—আমি ত বরাবর আপনাদের ফাণ্ডে টাকা দিয়ে এসেছি, জ্যোতির্ম্ময় বাবু!

—অস্বীকার করছিনে, কিন্তু বিয়াল্লিশ সাল থেকে একেবারে বন্ধ

রয়েছে। অবশ্য এজন্ত আপনাকে দোষ দিচ্ছিনে, কংগ্রেস যেখানে আসামীর কাঠগড়ায় সেখানে তাকে সাহায্য করা একটু কঠিন। কিন্তু এই কয় বছরে ফাণ্ডের প্রাপ্যও কম হয়নি। তা ছাড়া ঐ সামান্ত ছুটকো দানে চলবে । এখন থেকে অঙ্কটায় আরেকটা শূন্ত বসিয়ে দিন।

—তার মানে বছরে বিশ হাজার টাকা ? অসম্ভব!

—অসম্ভব বললে কি করে চলবে অটল বাবু আমরা যদিও জেলে ছিলাম তবু বাইরে কি হচ্ছে না হচ্ছে তার কছু কিছু খবর রাখতাম। যুদ্ধের বাজারে আপনার কত মুনাফা হয়েছে তা' আমাদের অজানা নেই। তার সামান্ত একটা অংশ সংকাজে ব্যয় করতে বলছি। আরও বলছি বিদেশী আমলে আপনারা যা' করেছেন তা' আমরা ভুলে যাব যদি এখন আমাদের সাথে সহযোগিতা করেন।

—এ যে রীতিমত ব্ল্যাকমেল—

—ব্ল্যাকমেলই বলুন, আর স্পষ্ট ভাষণই বলুন, আপনাকে এখন থেকে বছরে বিশ হাজার টাকা দিতে হবেই।—বকেয়াটা না হয় পুরানো হারেই দেবেন, আমরা চশমখোর নই

তারপর জ্যোতির্ময় বাবু অন্ত কথা পাড়লেন।

—আপনার ছেলের গতিবিধির দিকে নজর রাখছেন ত?

—কেন বলুন ত

—আজকাল আমার বাড়ীতে বেশ ঘন ঘন যাতায়াত করছে। আমার অবশ্যি কোন আপত্তি নেই, যদি তার উদ্দেশ্য সাধু হয়ে থাকে। আমি আবার একটু সেকেলে লোক কি না! জেলে বসে গীতা আর মনুসংহিতা পড়ে কুসংস্কারগুলো বোধ হয় একটু বেড়েছে!

কি বলবেন অটলবিহারী ভেবে পেলেন না।

জ্যোতির্ময় বাবু আশ্বাস দিয়ে বললেন, ঘাবড়াবার কোন কারণ নেই, আমার মেয়ে নিজের তত্ত্বাবধান করতে জানে। তবু, বলা ত যায় না!—আপনি কোন সময় কথাপ্রসঙ্গে আপনার ছেলেকে আমার মতামত জানিয়ে দেবেন, কেমন?

বাড়ীতে ফিরে এসে অটলবিহারী ছেলেকে ডাকলেন। প্রথমে তাকে জানালেন কংগ্রেস ফাণ্ডের জন্ত টাকা দাবী করার কথা।

নবকিশোর বেশ তাচ্ছিল্যের স্বরে বলল, এ আমি আগে থেকেই জানতাম।

অসহিষ্ণু ভাবে অটলবিহারী বললেন, আগে থেকেই যদি জানতে তাহ'লে প্রস্তুত হওনি' কেন'?—এখন প্রায় ত্রিশ হাজার টাকা একসঙ্গে বার করে দিতে হবে তা' বুঝতে পারছ?

—তাতে অসুবিধে কি? ব্যাঙ্কে ত অনেক টাকা আছে।

—টাকা যে আছে জানি, কিন্তু অদানে অব্রাহ্মণে নষ্ট করবার জন্তে এই টাকা আমি রোজগার করিনি'। কি কষ্ট করে তিলে তিলে এই ব্যবসা আমাকে গড়ে তুলতে হয়েছে তা তুমি কি বুঝবে?

নবকিশোর একটু হাসল। বলল, বাবা, কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত তুমি খুবই কষ্ট করে টাকা রোজগার করছিলে এ আমি মানতে রাজী আছি, কিন্তু গত সাত আট বছর তোমার যা' আয় হয়েছে তা' প্রায় ঘরে বসে।—হ্যাঁ, বুদ্ধি খাটাতে হয়েছে, অনেক রকম বিপদের ভেতর দিয়ে যেতে হয়েছে, কিন্তু পরিশ্রম বলতে সচরাচর যা' বোঝায় তা' বিশেষ করতে হয়েছে কি?—শান্ত ভাবে তুমি নিজেই ভেবে দেখ না!

অটলবিহারী চুপ করে রইলেন।

নবকিশোর বলতে লাগল, আসল কথা হচ্ছে এই, যে কারণে তুমি এর আগে কংগ্রেস ফাণ্ডে টাকা দিতে, সেই কারণেই এখন ও আবার দেবে! এতে বিচলিত হবার কি আছে?—অবশ্য টাকার পরিমাণটা একটু বেশী হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু তোমার লাভও ত কম হয়নি'!—এবং এঁরা যদি প্রসন্ন থাকেন তাহ'লে ভবিষ্যতে লাভের পথও খোলা থাকবে।—জলে বাস ক'রে কুমীরের সঙ্গে ঝগড়া করা চলে না, বাবা!

এবার অটলবিহারী একটু শান্ত হলেন। তারপর দ্বিতীয় কথাটা পাড়লেন।

—জ্যোতির্ময় বাবুর ওখানে তুমি আজকাল একটু বেশী যাতায়াত সুরু করেছ, সেটা তাঁর চোখ এড়ায়নি', নবু!

—আমি ত লুকিয়ে যাইনে!

—সে কথা বলছি না। উনি প্রকারান্তরে আমাকে জিজ্ঞাসা ক'রেই বসলেন, তোমার অভিপ্রায় কি। অর্থাৎ সুমিত্রাকে তুমি বিয়ে করতে চাও কি?

—এসব আলোচনা এক্ষুনি না করলে হয় না?

—শোন, নবু, আমি তোমার কাছ থেকে চূড়ান্ত কোন জবাব এক্ষুনি চাইছি না। তবে তোমাকে ব'লে রাখা উচিত যে, সুমিত্রাকে বিয়ে করবার এতটুকু ইচ্ছে যদি তোমার না থেকে থাকে তাহ'লে এখন থেকে কেটে পড়াই ভাল।—জ্যোতির্ময় বাবু প্রতাপশালী লোক একবার ওঁর বিরাগভাজন হ'লে চোখে-মুখে পথ দেখতে পাবে না।

—আমি সেটা জানি, বাবা। তুমি ভেবো না, আমি এমন কোন কাজ করব না যাতে জ্যোতির্ময় বাবু অসন্তুষ্ট হন।

নবকিশোরের এই আশ্বাসেই তখনকার মত অটলবিহারীকে চুপ করে থাকতে হ'ল।

সুমিত্রা নবকিশোরের কাছে শুনেছিল প্রদীপ জাহাজ থেকে বন্দনার কাছে চিঠি লিখেছে।—বন্দনা সেটা সযত্নে কোথায় লুকিয়ে রেখেছে, কিছুতেই নবকিশোরকে দেখতে দেয়নি'। শুধু বলেছে যে প্রদীপ বিলেত রওনা হয়ে গেছে।

প্রদীপ কি লিখেছে তা জানতে সুমিত্রার খুবই কৌতূহল হচ্ছিল। প্রদীপ যখন তাকে প্রত্যাখ্যান করে চলে যায়, তখন বন্দনার প্রতি তার ঈর্ষা হয়েছিল, কিন্তু এখন বন্দনাকেও বঞ্চনা করে চলে যাওয়ায় তার আর কোন ঈর্ষা ছিল না, বরং সে খানিকটা সহানুভূতিই অনুভব করছিল। তবে তার কাছে দুর্ব্বোধ্য লাগছিল এই যে, প্রদীপ শুধু বন্দনার কাছেই চিঠি লিখেছে।—বন্দনা যে তাদের কাছ থেকে কোন একটা বিষয় লুকিয়ে রেখেছে সে সম্বন্ধে তার কোনই সন্দেহ ছিল না।

নবকিশোর অবশ্য অনুমান করেছিল প্রদীপের সঙ্গে বন্দনা বিচ্ছেদের কারণ—একদা সেই বন্দনার কাছে প্রকাশ করেছিল ছবি কাহিনী। কিন্তু সুমিত্রাকে এসম্বন্ধে কিছু বলতে তার সাহস হয়নি', সুমিত্রার তীক্ষ্ণ জেরায় ছবির সঙ্গে তার সম্পর্কের দিকটা হয়ত বেরিয়ে পড়বে এই ভয় তার ছিল।

সুমিত্রা একদিন হঠাৎ এসে হাজির হ'ল বন্দনার কাছে।

খানিকক্ষণ অবান্তর কথাবার্ত্তার পর সুমিত্রা জিজ্ঞাসা কর

আচ্ছা, বন্দনা, তোকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, কিছু গোপন না ক'রে জবাব দিস। প্রদীপের এই হঠাৎ বিলেত যাওয়ার কারণটা কি রে?

—আমি কি করে জানব? বন্দনা এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করল সুমিত্রার প্রশ্ন।

—তুই ছাড়া কে জানবে? তোর সঙ্গেই ত ভাব ছিল তার।

—তোর সঙ্গেও ত ছিল।- বন্দনা জবাব দিল।

—আমার সঙ্গে যে ভাব ছিল সে হচ্ছে প্রাচীন কালের কথা। মেদিনীপুর থেকে ফিরে আসার পর ওকে কয়েকটা স্পষ্ট কথা বলেছিলাম ব'লে তার কি রাগ! তার পর থেকে আমার কাছে আর আসেনি বললেই চলে। কিন্তু তোর সঙ্গে ত শেষ পর্য্যন্ত দেখা শুনো হয়েছে। আমি ত ভেবেছিলাম তোকে বিয়েই করবে।

বন্দনা ক্লান্ত ও পীড়িত বোধ করল। বলল, এসব কথা তুলছিস কেন?

—সাধারণ কৌতূহল, বন্দনা। এই হঠাৎ বিলেত চলে যাওয়ার পেছনে কি রহস্য আছে তা উদ্‌ঘাটন করবার চেষ্টা।

—রহস্য কিছু আছে ব'লে ত জানি না। কিছুদিন থেকেই সে মনমরা হয়েছিল দেশের পরিস্থিতি দেখে। তার পর কি হয়েছিল জানি না, জাহাজ থেকে তার চিঠি পেলাম যে সে বিলেত চলেছে।

—কি লিখেছে সেই চিঠিতে? আমি অবশ্য চিঠিটা দেখতে চাচ্ছি না, মোটামুটি কি লিখেছে জানতে চাচ্ছি।

—যা বললাম তা'ই লিখেছে, সে অত্যন্ত ক্লান্ত এবং অবসন্ন, স্থান এবং হাওয়া পরিবর্ত্তন দরকার, তাই সে চলল বিলেতে।

সুমিত্রা বুঝল বন্দনা বেশ খানিকটা গোপন করে গেল।

বলল, এ যে লাটসাহেবিরও বাড়া, বন্দনা। স্থান এবং হাওয়া পরিবর্ত্তনের জন্য একেবারে বিলেত যাত্রা!

দুই

আরও তিন মাস কেটে গেছে। বৃটিশ ক্যাবিনেটের মহারথী তিন জন বৃটেনে ফিরে গেছেন। তাঁদের মিশন যদিও সফল হয়নি তবু কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগ-এর সঙ্গে একটা মিটমাট করবার আশা তাঁরা ছাড়েননি। তাঁদেরই নির্দ্দেশে লর্ড ওয়াভেল চেষ্টা করছেন সব পার্টিকে নিয়ে একটা জাতীয় গভর্ণমেণ্ট গঠন করতে। কিন্তু কংগ্রেস আসতে রাজী হচ্ছে না।

এ'দিকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সুরু হয়েছে ভারতবর্ষের নানা জায়গায়। অনেকেই সন্দেহ করছে এর পেছনে আছে ক্ষমতা বিভাগে অনিচ্ছুক বৃটিশ কর্ম্মচারীদের নির্দ্দেশ। অবশেষে কংগ্রেস দেখল যে ব্যাপক অরাজকতা চলেছে তাতে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা চলে না। ছেচল্লিশের আগষ্টে, অর্থাৎ বিয়াল্লিশের আগষ্টের ঠিক চার বছর পরে, পণ্ডিত নেহরু হলেন অন্তর্বর্ত্তী গভর্ণমেণ্টের প্রধান মন্ত্রী।

সুদূর লণ্ডনে বসে প্রদীপ শুনল এই খবর। মালবাহী জাহাজ নানা বন্দরে আসতে আসতে সে বিলেতে এসে পৌঁছেছিল মে মাসে। অনেক দিন ঘোরাঘুরির পর সে কাজ পেয়েছিল একটা **Repairs and Demolition Unit** এ। বোমা বা আগুন লেগে যে সব জায়গা এবং দালান বিধ্বস্ত বা আধাবিধ্বস্ত হয়ে গেছে, সে সব আবর্জ্জনার স্তূপ পরিষ্কার করা, আংশিক ভাবে ভাঙ্গা দালানকে সম্পূর্ণ ভেঙে দেওয়া, এই জাতীয় কাজ প্রদীপ সানন্দে সুরু করে দিল। আর সে অবাক হয়ে দেখল কি সহিষ্ণু, কি শৃঙ্খলাবদ্ধ এই জাতটা। সহরতলীর পর সহরতলী ধূলিসাৎ হয়ে গেছে, প্রায় প্রত্যেকে হারিয়েছে তার কোন না কোন আত্মীয় বা বন্ধু, কিন্তু যারা বেঁচে আছে তারা নীরবে করে যাচ্ছে পুনর্গঠনের কাজ। ক্লান্তির ছাপ তাদের মুখে, কিন্তু বাইরে কোন প্রকার বিরক্তি প্রকাশ নেই।

প্রদীপের কাজ ছিল সাধারণ মজুরদের সামান্য একটু উর্দ্ধে, যাকে বলা চলে **semi-skilled**, বাংলা দেশের খর রৌদ্র এবং বৃষ্টিতে সমান ভাবে কাজ করার অভ্যাস ছিল বলেই বোধ হয় বৃটেনের প্রতিকূল আবহাওয়ায় ও নিজেকে মানিয়ে নিতে পেরেছিল। অন্যান্য মজুরদের সঙ্গে সেও থাকত ব্যারাকে, তাদের হাসি ঠাট্টা, আমোদ আহ্লাদে অংশ গ্রহণ করত। যে একাকিত্ব বোধটা তাকে দেশে সঙ্কুচিত এবং সন্ত্রস্ত করে তুলেছিল তা' ধীরে ধীরে কেটে যাচ্ছিল।

পণ্ডিত নেহরুর প্রধান মন্ত্রিত্ব গ্রহণের খবর তার ব্যারাকে বেশ একটা সোরগোলের সৃষ্টি করল। প্রশ্নের পর প্রশ্ন ক'রে তার সহকর্মীরা তাঁকে উদ্বাস্ত করে তুলল। নেহরু গান্ধীজির ছেলে না কি? গান্ধীজি কেন প্রধান মন্ত্রী হলেন না? এবার আশা করি, নেহরু বৃটেনের রাজার কাছে আনুগত্য স্বীকার করতে রাজী হবেন?

কলম্বো থেকে প্রদীপ বন্দনাকে যে চিঠি দিয়েছিল তার পর আর কোন চিঠি লেখেনি। কাজেই বন্দনার দিক থেকে চিঠি পাবার কোনই সম্ভাবনা ছিল না। নিয়মিত ভাবে অর্থাৎ মাসে একখানা করে চিঠি লিখে যাচ্ছিল একমাত্র গায়ত্রীর কাছে। গায়ত্রীই হয়ে দাঁড়িয়েছিল দেশের সঙ্গে তার শিথিল-হওয়া বন্ধনের একমাত্র প্রতীক। গায়ত্রীর কাছ থেকে আর আর্থিক সাহায্য নেবার প্রয়োজন হয়নি। সে যা রোজগার করছিল তা' তার একার পক্ষে ছিল যথেষ্ট। প্রতি সপ্তাহে সে কিছু কিছু সঞ্চয়ও করতে সুরু করেছিল।

তার ব্যারাকের বন্ধুরা তাকে টেনে নিয়ে যেতে চেষ্টা করল তাদের আমোদ আহ্লাদের জায়গায়, পাব্ এ অথবা নৃত্যশালায়। সে দু'-একবার গিয়েছিল, কিন্তু দেখল সেখানে সে নিজেকে উন্মুক্ত করে দিতে পাচ্ছে না ওদেশের নরনারীর মত। তাই সে অবসর মুহূর্ত্ত কাটাতে সুরু করল অন্য উপায়ে। লণ্ডনের পথঘাট, নদীতট এবং উপকণ্ঠ পুনরাবিষ্কারের মধ্যে সে অনুভব করল নতুন এক আনন্দ, তৃপ্তি।

এই ভাবে ঘুরতে ঘুরতে একদিন তার পরিচয় হ'ল এমিলির সঙ্গে। সে গিয়েছিল ভিক্টোরিয়া এম্‌ব্যাঙ্কমেণ্টএ—টেমস্‌এর পাশে বাঁধানো ফুটপাতে দাঁড়িয়ে পর্য্যবেক্ষণ করছিল একদিকে জার্ম্মাণ বোমারুর আক্রমণে বিধ্বস্ত ইট এবং পাথরের স্তূপ, আর অপরদিকে দেখছিল নির্ব্বাক অবজ্ঞায় বয়ে চলেছে নদীর আদিহীন স্রোত।

এমিলিই এসে প্রথমে কথা বলেছিল, তোমাদের দেশের ওপর দিয়ে নিশ্চয়ই এরকম ঝড় বয়ে যায়নি?

প্রশ্নটা খুবই সাধারণ, কিন্তু প্রদীপ কখনও এদিকটা ভাবেনি। সে স্বীকার করতে বাধ্য হ'ল যে ছোটখাট ঝাপ্‌টার সম্মুখীন যদিও তার দেশবাসীকে হতে হয়েছে, লণ্ডনের প্রলয়ের তুলনায় তা' কিছুই নয়।

—অথচ যুদ্ধের মধ্যে তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলে, আমাদের এই জীবন-মরণ সঙ্কটকে আরও সঙ্গীন করে তুলেছিলে!

লণ্ডনে যদি প্রদীপ না আসত, যুদ্ধের ছয় বছর বৃটেন কি আগুনের মধ্য দিয়ে কাটিয়েছে স্বচক্ষে যদি তার চিহ্ন না দেখত, তাহ'লে এমিলির এই প্রশ্নের জবাব সে দিত গতানুগতিক ছন্দে। কিন্তু সহজ এবং সুষ্ঠু কোন উত্তর আজ তার মুখ দিয়ে বেরুল না।

শুধু বলল, আমরা তোমাদের বিপন্ন করতে চাইনি। তবে বিপন্ন যে তোমরা বোধ করেছিলে তা' অস্বীকার করছি না।

এমিলি বলল, তুমি জানো বৃটেনের কত তরুণ প্রাণ দিয়েছে এই যুদ্ধে, তোমাদেরই দেশের সীমান্তে? তারা যদি সেখানে এগিয়ে না যেত তাহ'লে তোমাদের অবস্থা হ'ত ইউরোপে বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, ফ্রান্স, নরওয়ের মত, এশিয়ায় বর্ম্মা, ইন্দোনেশিয়া, ইন্দোচীন, ফিলিপাইন-এর মত। অথচ তোমরা বাধা দিচ্ছিলে তাদেরই যারা আপ্রাণ চেষ্টা করছিল জাপানীদের হাত থেকে তোমাদের রক্ষা করতে। তোমাদের সাইকলজি সত্যি আমরা বুঝতে পারি না!

প্রদীপ বলল যে এমবাঙ্কমেন্ট-এ দাঁড়িয়ে দু'-এক কথায় এসব প্রশ্নের জবাব দেওয়া সম্ভব নয়। আগন্তুকার যদি আপত্তি না থাকে তারা নিকটবর্ত্তী একটা কফির দোকানে বসে একটু শান্ত ভাবে আলোচনা করতে পারে।

প্রদীপ জানতে পারল যে এমিলির দুই ভাই প্রাণ দিয়েছে বিগত মহাযুদ্ধে, তার মধ্যে একজন বর্ম্মা-সীমান্তে। তার বাবা এবং এক বোন্ মারা গেছে লণ্ডনে জার্ম্মাণ বোমার আঘাতে। পরিবারের মধ্যে বেঁচে আছে একমাত্র সে, তার মা এবং আট-নয় বছরের একটি ভাই। যুদ্ধের সময় সে কাজ করেছে এক একসপ্লোসিভ ফ্যাক্টরীতে, এখনও সেখানে কাজ করছে, আর সন্ধ্যার সময় যাচ্ছে পলিটেক্নিক্এ, ফলিত রসায়নে ট্রেনিং নিচ্ছে।

কফির পেয়ালা সামনে রেখে প্রায় এক ঘণ্টা আলোচনার পর এমিলি বোধ হয় খানিকটা বুঝতে পারল কেন সারা ভারতবর্ষ গান্ধীজির নেতৃত্বে মেতে উঠেছিল 'কুইট ইণ্ডিয়া' এই দাবী জানিয়ে। বলল, একটা বিষয় যে কতভাবে বিচার করা যায় তা' তোমার সঙ্গে কথা বলে আজ উপলব্ধি করলাম।—আচ্ছা, তুমি হঠাৎ এদেশে চলে এলে কেন? অত্যন্ত ব্যক্তিগত প্রশ্ন করছি, যদি তোমার আপত্তি থাকে, জবাব দিয়ো না।

—বলতে আমার বিশেষ আপত্তি নেই, মিস বার্ক, কিন্তু কারণগুলো এত ঠুন্‌কো যে তোমার বিশ্বাস হবে না। বিশ্বাস হ'লেও তুমি হাসবে।

—আমার প্রশ্ন প্রত্যাহার করে নিচ্ছি, মিঃ গুহ! এবার যে প্রশ্ন করব সেটা খুবই সহজ এবং সরল। তুমি যেখানে কাজ করছ সেখানে কি সুখী বোধ করছ?

একটু চিন্তা করে প্রদীপ জবাব দিল, সুখী বোধ করছি বললে হয় অতিশয়োক্তি হবে, তবে অসুখী বোধ করছি না। আমি স্বচ্ছন্দে সন্তুষ্ট, মিস বার্ক!

—সে ত দেখতেই পাচ্ছি। নইলে এমব্যাঙ্কমেন্টএর উপর ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব হ'ত না!

—তাহ'লে তুমিও ত ঐ পর্য্যায়ে এসে পড়ছ, মিস বার্ক! তুমি এমব্যাঙ্কমেন্ট এ কেন এসেছিলে?

—তোমার সঙ্গে পরিচিত হ'তে।—পরিহাসের সুরে এমিলি জবাব দিল।

অল্প পরিচয়ে এই প্রকার প্রগল্‌ভতা প্রদীপের কাছে খুবই অভিনব। সে লজ্জায় লাল হয়ে উঠল।

—আমি অত্যন্ত দুঃখিত, অজান্তে যদি কোন বেফাঁস কথা বলে ফেলে থাকি। আমি ঠাট্টা করছিলাম মাত্র।—এমিলি বলল।

মিস এমিলি বার্ক-এর এই ক্ষমা ভিক্ষায় প্রদীপ যেন আরও বিব্রত বোধ করল। সে কোন প্রকারে জানাল যে সে অসন্তুষ্ট হয়নি মোটেই, বরং খুসীই হয়েছে যে এমন অপ্রত্যাশিত ভাবে তার সঙ্গে আলাপ হ'ল।

—তাহ'লে আমরা পরস্পরকে বন্ধু ব'লে গ্রহণ করতে পারি? এমিলি প্রশ্ন করল।

—নিশ্চয়।—গাঢ় স্বরে প্রদীপ জবাব দিল।

সপ্তাহান্তের মধ্যেই প্রদীপ এবং এমিলি একে অন্যের নাম ধরে ডাকতে সুরু করল। প্রদীপের নামটা একটু দুরুচ্চার্য্য বলে এমিলি তার সংক্ষিপ্ত সংস্করণ করল "দীপ"।

এমিলি বলল যে প্রদীপের উচিত সন্ধ্যাবেলায় পলিটেক্নিক্এ কোন একটা বিষয়ে ট্রেনিং নেওয়া, যেমন সে নিচ্ছে। নইলে কুলিমজুর শ্রেণীর উর্দ্ধে উঠতে তাকে বেশ বেগ পেতে হবে। সন্ধ্যাগুলো প্রদীপেরও দুর্ব্বহ হয়ে উঠছিল, সে সানন্দে এমিলির এই উপদেশ গ্রহণ করল। তার ফলে তাদের দেখাসাক্ষাতের সুযোগও একটু বাড়ল।

এমিলি প্রদীপকে তার বাড়ীতে নিয়ে যেতে রাজী হ'ল না। বেশ খোলাখুলি ভাবেই প্রদীপকে জানাল যে তার দ্বিতীয় ভাই বর্ম্মা-সীমান্তে মারা যাবার পর অবধি তার মা ভারতীয়দের দু'চক্ষে দেখতে পারেন না, তাঁর দৃঢ়বিশ্বাস সৈন্যবাহিনীর পেছনে ভারতীয়রা যদি নানাপ্রকার sabotage না করত তাহ'লে তাঁর পুত্র হয়ত অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হ'ত না। প্রদীপ বুঝল, কোন আপত্তি করল না।

প্রদীপ থাকত তার সহকর্ম্মীদের ব্যারাকে, এমিলির পক্ষে সেখানে যাওয়া একপ্রকার অসম্ভব ছিল। কাজেই পলিটেক্নিক্ এর করিডর, ক্যানটিন এবং ক্লাশটাই হ'ল তাদের মিলিত হবার একমাত্র এবং সবচেয়ে প্রশস্ত স্থান।

প্রদীপ আর এমিলির মধ্যে যে সম্পর্কটা গড়ে উঠল তাকে ঠিক বন্ধুত্বের পর্য্যায়ে বোধ হয় ফেলা যায় না। অথচ, ভালবাসা বলতে যা বোঝায়, অন্ততঃ বন্দনার প্রতি প্রদীপ যা' অনুভব করেছিল (এবং এখনও করছিল) এমিলির প্রতি সেই জাতীয় অনুরাগ ও তার মনে জাগল না। আর এমিলিও জ্ঞাতসারে চেষ্টা করল না তাকে তার স্বরচিত ব্যূহের মাঝখান থেকে বের করে নিয়ে আসতে। অথচ একটা অনাবিল আনন্দ, একটা তৃপ্তি তারা দু'জনেই পেতে আরম্ভ করেছিল পরস্পরের সাহচর্য্যে। প্রদীপ এর নাম দিল সাথীত্ব।

একদিন হাসতে হাসতে বলল, জানো, এমিলি, আমাদের দেশের লোক ভাবতেই পারি না দু'টি অবিবাহিত ছেলে এবং মেয়ে কি ক'রে এই ভাবে মিশছে, গল্প করছে, আনন্দ পাচ্ছে—প্রেমিক-প্রেমিকার পরিচ্ছদ না পরেও।

—তাই নাকি? তাই বুঝি তুমি প্রথম দু'তিন দিন আমাকে এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করেছিলে, দীপ? আমি তখন বুঝতে পারিনি', ভেবেছিলাম, বোধ হয় আমি বিদেশিনী ব'লে, অথবা আমার বাড়ীতে তোমাকে নিয়ে যাওয়ায় বাধা আছে ব'লে, তুমি আমার সঙ্গে মিশতে চাও না!

—এই দেখ, ভুলবোঝার সৃষ্টি কি ভাবে হয়! ভাগ্যি কথাটা আজ উঠেছিল, নইলে ত তুমি এই ধারণা নিয়েই বসে থাকতে।

—বসে যে থাকিনি' তা'ত দেখতেই পাচ্ছ। আমি তোমাদের চেয়ে অনেক বেশী লিবারেল দীপ!—এমিলি জোর দিল 'তোমাদের' এই কথাটার উপর, বলতে চাইল ভারতীয়েরা বৃটিশদের মত লিবারেল নয়।

মাসখানেক আগে হ'লে প্রদীপ এই জাতীয় মন্তব্যে হয়ত দপ ক'রে জ্বলে উঠত, কিন্তু ইংলণ্ডে থেকে এবং এমিলির সংস্পর্শে এসে সে সব জিনিষেরই 'ওপিঠ'টা অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট ভাবে দেখতে সুরু করেছিল। তাই আজ এমিলির কথায় সে একটুও রাগ বা বিরক্তি-প্রকাশ করল না, শুধু একটু হাসল।

তিন

লণ্ডনে প্রদীপের প্রায় সাত মাস কেটে গেল। ইতিমধ্যে সে ব্যারাক্ ছেড়ে চলে এসেছে এক বোর্ডিং-হাউসে। দেখতে দেখতে এল খৃষ্টমাস এবং নববর্ষের সূচনা।

বিলেতে তার এই প্রথম খৃষ্টমাস। যদিও যুদ্ধের আঘাতের চিহ্ন প্রকট রয়েছে পথে-ঘাটে, অট্টালিকায়, পার্কে, তবু উৎসবের নানা সজ্জায় এসব আচ্ছাদন করে ফেলতে লোকের কি প্রয়াস! চার দিকে আনন্দের কোলাহল, স্ফূর্তির প্রবাহ। প্রদীপের মত introspective মনও খানিকটা অভিভূত না হয়ে পারল না।

কিন্তু সে অত্যন্ত বিষাদগ্রস্ত বোধ করছিল অন্য কারণে। গত তিন-চার মাস ধরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার যে দাবানল জ্বলে উঠেছে, ভারতবর্ষের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত, তার যেন বিরাম নেই, বিস্মৃতি নেই। গান্ধীজি যাবেন নোয়াখালিতে, কিন্তু হিংসায় উন্মত্ত দেশকে শান্ত করতে পারবেন কি তিনি?

গায়ত্রীর চিঠিও এসেছিল। তার চিঠিতেও সেই একই সুর—চারদিকে যে অরাজকতা সুরু হয়েছে তার সমাপ্তি যদি শীঘ্র না হয়, তাহ'লে দেশের ভবিষ্যৎ অত্যন্ত অনুজ্জ্বল। মিঃ কর দিন-দিন আরও রুক্ষ, আরও কঠিন হয়ে উঠছেন, যেন মনে হচ্ছে এই নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে তিনি তাল রাখতে পারছেন না। সবশেষে গায়ত্রী লিখেছে যে প্রদীপের অভাব সে অনুভব করছে পদে পদে, প্রদীপ দেশে থাকলে অনেক বিষয়ে তার সঙ্গে পরামর্শ করত, তার উপদেশ গ্রহণ করত।

প্রদীপ গায়ত্রীর চিঠির জবাব লিখল নববর্ষের আগের দিন সন্ধ্যায়। অন্যান্য কথার পর লিখল যে, তার চারদিকে বাজছে উচ্ছল আনন্দের সঙ্গীত, বিলেতের নরনারী বন্ধনমুক্ত হয়ে ছুটে চলেছে প্রমত্ত দেবতার আহ্বানে। যদিও এই কয় মাস এদেশে থাকার ফলে তার ভূতপূর্ব্ব পিউরিট্যানিজম্ অনেকখানি কেটে গেছে তবু সে নিজেকে সম্পূর্ণ ভাবে ভাসিয়ে দিতে পারছে না জীবনের বাধাহীন স্রোতে। একি সঙ্কোচ, না ভীরুতা?

চিঠিটা খামে বন্ধ করে প্রদীপ উঠে দাঁড়াল। জানালার সামনে এসে দেখল, চারদিকে আলোর মেলা, রাস্তার দু'ধার দিয়ে কাতারে কাতারে যাচ্ছে নরনারী—যুবক-যুবতী, কিশোর-কিশোরী, প্রৌঢ়-প্রৌঢ়ার দল। হাতে হাত বেঁধে তারা যাচ্ছে, গান গাইছে, অকারণে হাসছে। পথের পাথরগুলোও যেন সজীব, মুখর হয়ে উঠেছে।

দরজায় টোকা মারল এমিলি। প্রদীপ তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিল।

—দীপ, আজকের রাতে তুমি ঘরের এই বদ্ধ হাওয়ায় বসে রয়েছ? চলে এসো, বাইরে এসো।

এমিলির মুখ চোখ উজ্জ্বল, উৎসবের সজ্জায় সজ্জিত সে। তার আধাসোনালি চুলের উপর রিবন্ বাঁধা, দেখাচ্ছে যেন ষোল-সতেরো বছরের কিশোরীর মত। প্রসাধন এবং মনের উৎফুল্লতা তার বয়সকে নামিয়ে নিয়ে এসেছে অন্ততঃ পাঁচ বছর।

—চিঠি লিখছিলাম। খানিকটা যেন লজ্জিত ভাবে প্রদীপ বলল।

—চিঠি লিখবার সময় পরে যথেষ্ট পাবে, কিন্তু নতুন বছর আবাহনের সুযোগ পাবে না অনেক দিন পর্য্যন্ত। আজ তুমি লণ্ডনের চেহারা দেখলে চিনতেই পারবে না। চলে এসো, বাইরে বেজায় ঠাণ্ডা। তোমার ওভারকোটটা সঙ্গে নিয়ে এসো।

—কোথায় যাব আমরা? প্রদীপ তবু প্রশ্ন করল।

—কোথায়? সারা লণ্ডন আমাদের সাম্রাজ্য, যাবার জায়গার ভাবনা? আর দেরী ক'রো না, বেরিয়ে এসো।

ব'লে প্রদীপকে একরকম টানতে টানতেই এমিলি নিয়ে এল ঘরের বাইরে—রাস্তায়।

এমিলির এ এক নতুন রূপ। সেই শান্ত বুদ্ধিমতী এমিলিকে পেছনে রেখে এগিয়ে এসেছে উচ্ছল, উপচে-পরা, প্রাণবন্ত এক এমিলি!

প্রদীপ বলল, হাওয়ার ছোঁয়াচ তোমার গায়েও লেগেছে, এমিলি!

—আজও যদি হাওয়ার ছোঁয়াচ তোমার আমার গায়ে না লাগে তাহ'লে বুঝব আমরা নিতান্ত জড়, প্রাণহীন। ছোঁয়াচটা যাতে ভাল করে লাগে সেইজন্যেই ত তোমাকে ঘরের বাইরে মুক্ত আকাশের নীচে নিয়ে এলাম! দেখত, আজ আকাশ কেমন পরিষ্কার, তারা জ্বলছে, অনেকটা তোমার দেশের মত, নয় কি?

ব'লে এমিলি প্রদীপের হাতটা নিজের হাতের মুঠোর মধ্যে নিয়ে আরও জোরে চেপে ধরল। বলল, আজকের রাতে ভিড় কিন্তু প্রচণ্ড হবে, একবার যদি হারিয়ে যাও তাহলে খুঁজে পাওয়া হবে মহা এক সমস্যা। কাজেই যতটা সম্ভব আমার কাছে কাছে থেকো।

তারপর একটু চটুল হাসি হেসে বলল, আর তোমার হাতে আমার গায়ের স্পর্শ যদি একটু-আধটু লেগে যায়, আজকের রাতটা অন্ততঃ তা' proper spirit-এ নিয়ো!

হাতে হাত ধরে দু'জনে চলল লণ্ডনের জনস্রোতের মধ্যে নিজেদের এলিয়ে দিয়ে। প্রদীপ প্রথমে সত্য সত্যই সঙ্কুচিত বোধ করছিল, কিন্তু যখন চারপাশে তাকিয়ে দেখল যে এই হচ্ছে রীতি, তখন কোন আপত্তি করল না। লোকের ভিড় এবং কোলাহল ক্রমশঃই বাড়ছিল এবং অন্যান্য দম্পতি বা যুগলের সঙ্গে সংঘর্ষ এড়াবার জন্য প্রদীপ এবং এমিলি বাধ্য হচ্ছিল পরস্পরকে জড়িয়ে ধরতে। পুরু আবরণীর মধ্য দিয়েও সে অনুভব করছিল এমিলির যৌবনের উত্তাপ, এমিলির উচ্ছল প্রগলভতা ধীরে ধীরে সংক্রামিত হচ্ছিল প্রদীপের রক্তে।

এমিলি প্রশ্ন করল, তোমাদের দেশে এরকম কোন উৎসব নেই, যখন বছরে অন্ততঃ একটি দিন ছেলেমেয়েরা বেপরোয়া হয়ে আনন্দ করে, কোনরকম বন্ধনের নির্দ্দেশ মানে না?

—ঠিক এমন ধারা কোন উৎসব নেই, অন্ততঃ সভ্য শালীন সমাজে নয়। তবে তথাকথিত সভ্যতার বাইরে কতকগুলো জাত আছে যাদের ছেলেমেয়েরা বছরে এক বা দু'বার উৎসবের মত্ততায় নিজেদের আত্মসমর্পণ করে নিঃশেষে।

—মনে কর আমরা আজ তথাকথিত সভ্যতার বাইরে সেই একটা জাতের দুটি তরুণ-তরুণী। তোমার আপত্তি আছে ?

কি বলতে চায় এমিলি ? দারুণ শীতের মধ্যেও প্রদীপ ঘেমে উঠল।

—কথাটা ভাল লাগল না বুঝি ? বেশ, আমরা তাহ'লে সভ্য লণ্ডনের বাসিন্দাই না হয় থেকে যাই, কেমন ?

প্রদীপ তবু কোন জবাব দিল না, নীরবে হাঁটতে লাগল।

—আচ্ছা, দীপ, আজ তোমাকে বলতেই হবে তোমার হঠাৎ এদেশে চলে আসার কারণ ? বন্ধুত্বের দাবীতে এই প্রশ্ন করছি।

প্রশ্নটা এড়িয়ে যাবার প্রয়াসে প্রদীপ বলল, ওই দেখ, ওরা রাস্তার মাঝখানেই নাচতে সুরু করে দিয়েছে! এটা বড্ড বাড়াবাড়ি নয় কি ?

—মোটেই নয়, দীপ। আজকের রাতে আইনকানুন যদি একটু না ভাঙ্গে তাহ'লে কবে আর ভাঙ্গবে ? এই রাত ত বছরে একবারের বেশী আসবে না! কিন্তু আমার প্রশ্নের উত্তর ত তুমি দিলে না ?

—খাঁটি কথা শুনতে চাও, এমিলি ? গম্ভীরভাবে প্রদীপ প্রশ্ন করল।

—নিশ্চয়।

—আমি একটি মেয়েকে ভালবাসতাম। আমার ধারণা ছিল সেও আমাকে ভালবাসে। কিন্তু দেখলাম আমার ধারণা ভুল, সবই আমার কল্পনার মোহজাল। তাই—

—তাই তুমি পালিয়ে এলে ? আমাকে অবাক করলে, দীপ!

—কি লাভ হ'ত উঞ্ছবৃত্তি ক'রে, যেখানে আমি স্পষ্ট অনুভব করলাম যে সে আমাকে ভালবাসে না, ভালবাসতে পারে না।

—সে কি আর কাউকে ভালবেসেছিল ?

—যতদূর জানি, না।

—তবে ? তবে তুমি পালিয়ে এলে কেন ?

—ঐ ত তোমাকে বললাম, এমিলি, আমি অত্যন্ত sensitive, যখন বুঝতে পারি যে আমি অপ্রয়োজনীয় তখন কাঙালের মত দাঁড়িয়ে থাকাটা পছন্দ করিনে।

—তুমি চিরকাল বড্ড বোকা, দীপ!

প্রদীপ এমিলির চোখের দিকে স্থিরনেত্রে তাকাল। তারপর বলল, অর্থাৎ তুমি বলতে চাও যে তখনও আমি বোকামি করেছিলাম আমার ভালবাসার পাত্রীর কাছ থেকে পালিয়ে এসে, আর এখনও বোকামি করছি তোমার আহ্বানে সাড়া না দিয়ে ?

এমিলি খিল-খিল করে হেসে উঠল। বলল, সাড়া যারা দিতে চায় তারা কথার জালে নিজেদের এমন করে জড়িয়ে ফেলেনা। এসো না, নাচবে ?

—আমি নাচতে জানিনে!

—আজ যে নাচ হচ্ছে তাতে পূর্ব অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হবে না। বাজনার তালে তালে পা ফেলে চলতে পারবে ত ? আমি তোমাকে শিখিয়ে দিচ্ছি, এসো।

ব'লে সে প্রদীপকে একরকম টেনে রাস্তায় নিয়ে এল। বলল, ওরা যেভাবে তাদের পার্টনারদের জড়িয়ে আছে ঠিক সেই ভাবে আমাকে জড়িয়ে ধরো, বাকীটা আপনি এসে যাবে।

যুগলনৃত্যের এই প্রথম প্রয়াস প্রদীপের। সে অবাক্ হয়ে লক্ষ্য করল, সত্যসত্যই দূর থেকে যতটা কঠিন মনে হয়েছিল, কার্য্যক্ষেত্রে নেমে মোটেই তেমন দুঃসাধ্য ঠেকছে না।

—শুধু দেখো, আমার পাটা মাড়িয়ে দিয়োনা যেন! পরশু আবার কাজে বেরুতে হবে, তখন যদি খোঁড়াতে থাকি তাহলে লোকে বলবে কোন্ boorish পার্টনারের পাল্লায় পড়েছিলাম।

তারা দু'জনে নাচতে সুরু করল। প্রথমে খুব ধীরে, মন্দাক্রান্তা গতিতে। তারপর সঙ্গীত হতে লাগল আরও জোরালো, আরও দ্রুত, আর সঙ্গে সঙ্গে নৃত্যরত যুগলদের গতিও উঠতে লাগল পঞ্চম, সপ্তম, নবম খাদে। প্রদীপ দেখল এর সঙ্গে তাল রাখা তার পক্ষে অসম্ভব—সে হঠাৎ এমিলিকে মুক্ত করে দিল তার বাহুবন্ধন থেকে।

—ওকি, থামলে যে ? এমিলি বলল।

—তাল রাখতে পারছিনা, অভ্যেস ত নেই!

একটু পরের সঙ্গীত ও বন্ধ হয়ে গেল। হাতঘড়ির দিকে এমিলি তাকাল। বারটা বাজতে মিনিট কুড়ি বাকী।

—তাহলে চল, পিকাডিলি সার্কাসে যাওয়া যাক্। এমিলি বলল।

—সেখানে আবার কি হবে ?

—চলোই না, দেখতে পাবে।

নীরবে প্রদীপ এমিলির হাত ধরে চলতে আরম্ভ করল।

—দীপ! এমিলি বলল।

—কি ?

—তোমার দেশের প্রেয়সীকে মনে পড়ছে কি একটু ?

—না, ত। সরলভাবে প্রদীপ জবাব দিল।

—আমি যদি তুমি হ'তাম তাহলে নিশ্চয় মনে করতাম।

—তুমি ত আর আমি নও, কাজেই ও প্রশ্ন উঠছেনা।

আবার দু'জনে নীরবে হাঁটতে লাগল।

পিকাডিলি সার্কাসে উভয়ে যখন পৌছল তখন সমস্ত সার্কাসটা লোকে লোকারণ্য হয়ে গেছে, নড়বার চড়বার মত তিলার্দ্ধ জায়গা নেই। Eros-এর মূর্তি এবং ফোয়ারার চারদিকে উৎকণ্ঠ জনতা দাঁড়িয়ে আছে, ঘড়িতে কখন বারটা বাজবে তার প্রতীক্ষায়।

অবশেষে ঢং ঢং করে ঘড়িতে বারটা বাজল। জনতার সে কি উত্তেজনা, উল্লাস! যুবক-যুবতী, কিশোর-কিশোরী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা সবাই সুরু করল পরস্পরকে সম্ভাষণ, আলিঙ্গন, চুম্বন। সকলের মুখে এক কথা: নতুন বছর সুখময় হোক্, শান্তি আসুক।

প্রদীপ এমিলির দিকে তাকাল। দেখল এমিলি নিষ্পলকনেত্রে তাকে লক্ষ্য করছে।—বাঁহাত দিয়ে এমিলিকে নিজের বুকের কাছে টেনে নিয়ে প্রদীপ তার ঠোঁটের উপর বসিয়ে দিল ছোট্ট একটি চুম্বন। এমিলির ঠোঁটটা যেন একটু নড়ে উঠ্‌ল, সে যেন কিছু বলতে চেষ্টা করল, কিন্তু কোলাহলের মধ্যে কিছুই শোনা গেলনা। প্রদীপ শুধু অনুভব করল, অদৃশ্য এক আলোর স্পর্শে এমিলির সমস্ত অবয়ব কেঁপে উঠল, আর সঙ্গে সঙ্গে সেও যেন বেরিয়ে এল বহুকালের সুপ্তির অন্ধকার থেকে।

[ক্রমশঃ।

শতাব্দীর ঐতিহ্য বরণীয়
লক্ষ্মীবিলাস
তৈল
আপনার
আনন্দের
মুহূর্তকে
মধুর
করুন
বিশুদ্ধতায়
সৌগন্ধে
রুচিতে

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

ডক্টর এক্স

সকালের রান্নার তরকারী কুটে সাজিয়ে রেখে বরুণা রান্নাঘরে এসে মিসেস সেনকে বলল—মা, আমার বড় শরীর খারাপ হয়েছে, পেট ব্যথা করছে। আমি সকালে দু'বার বমি করেছি। ভেবেছিলাম, বমি হলে ব্যথা কমে যাবে, তাই আপনাকে কিছু বলিনি। এখন ব্যথাটা আরও বেড়েছে, আর আমি বসতে পারছি না মা।

বরুণা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপছিল, তাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে মিসেস সেন্ বল্লেন,—সে কি বৌমা, এতক্ষণ তুমি এভাবে আছ, আর আমায় বলনি ? ছি—ছি, এস শোবে চল।

মিসেস সেন্ বরুণাকে ধরে এনে বিছানায় শুইয়ে তার গায়ে একটা কাঁথা চাপা দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—আরও কিছু কি তোমার গায়ে দেব বৌমা ! এখনও কি তোমার শীত করছে ?

বরুণা উত্তর দিল—না মা আর শীত করছে না।

বাইরে বারান্দায় একটা ক্যাম্বিসের ডেকচেয়ারে শুয়ে কমল ব্রিটিশ মেডিকেল জার্ণাল পড়ছিল, মিসেস সেন্ ঘর হতে বার হয়ে এসে তাকে বল্লেন,—কমল, বরুণার খুব শরীর খারাপ হয়েছে, কি হল দেখতো !

মিসেস সেন্-এর সঙ্গে ভিতরে এসে বরুণাকে ভাল করে পরীক্ষা করে কমল মিসেস সেনকে বাইরে ডেকে বললে—মা, ওর খুব শক্ত ধরণের এ্যাপেণ্ডিসাইটিস হয়েছে, এখনই অপারেশন করতে হবে, না হলে ফল খারাপ হতে পারে।

তুমি ওর টেম্পারেচার নাও, আমি পাশের বাড়ী হতে টেলিফোনে এ্যাম্বুলেন্স আর নার্স পাঠাতে বলে আসি। ওকে সিভিল হসপিটালে পাঠাতে হবে।

—এ কি হল কমল ?

—ভয় পেও না মা, তুমি ভয় পেলে আমরা কার মুখ চাইব ? তুমি ওর কাছে যাও মা, আমি যাই।

একটু পরে কমল ফিরে আসতে মিসেস সেন কমলকে জিগ্যেস করলেন—এত দেরী করলি কেন কমল ? এ্যাম্বুলেন্স কখন আসবে ?

—দেরী তো হয়নি মা, তুমি অত অস্থির হোয়ো না। এ্যাম্বুলেন্স আসছে। তুমি একটু ওর হাত ধরবে চল, আমি ওকে একটা ইনজেকশন দেব।

—আমি আর ওর কষ্ট দেখতে পারছি না কমল, ও কি বাঁচবে না ?

—একটু শক্ত হও মা, ওর কাছে চল। নিজের মেয়েকে চোখের উপর মরতে দেখেও তো তুমি এত অধীর হওনি ?

—ওরে কমল, ওর যে মা নেই। ও যে আমায় মা বলে ডেকেছে। ওকে যে আমি নিজের পেটের মেয়ের চেয়েও বেশী করে দেখেছি।

—অমন কোরো না মা, একটু ধৈর্য্য ধর। চল ভেতরে যাই।

ইনজেকশন দেওয়া শেষ হয়ে গেলে বরুণাকে মিসেস সেন বললেন—ভয় কি মা, এইতো আমি রয়েছি, কমলকে কিছু বলবে ? কি বলবে বল, আমি একটু ঠাকুরের ফুল নিয়ে আসি।

মিসেস সেন-এর কোলে মুখ লুকিয়ে অবরুদ্ধ কণ্ঠে বরুণা বললে—মা আমার অপারেশানের সময় ও আমার কাছে—

তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে মিসেস সেন বললেন—হাঁ মা, অপারেশনের সময় কমল তোমার কাছে থাকবে বই কি, নিশ্চয় থাকবে ! তারপর কমলের দিকে ফিরে তিনি বললেন—কমল এইখানে বস, ওর মাথা কোলে তুলে নাও। আমি ঠাকুরঘরে যাই।

মিসেস সেন যতক্ষণ বরুণার সঙ্গে কথা বলছিলেন ততক্ষণ কমল একটাও কথা বলেনি, বরুণার দিকে একবারও তাকায়নি।

মিসেস সেন চলে যেতে, সন্তর্পণে বরুণার মাথা আপনার কোলে নিয়ে সে অতি কুণ্ঠিত স্বরে বরুণাকে জিজ্ঞাসা করল—বরুণা আমি তোমার কাছে একটা জিনিস চাইব, আমায় দেবে ?

বেদনার্তস্বরে বরুণা উত্তর দিল—ও রকম করে কেন বলছ, আমার যা কিছু আছে সবই ত তোমার। তোমার নিজের জিনিষও কি তুমি চেয়ে নেবে ?

নিজের অন্তরের দাবাগ্নিকে প্রাণপণে সংযত করে কমল বলল—আমাকে তোমার দুটো চুড়ি দেবে বরুণা, আমি তোমার কাছে ভিক্ষা চাইছি। এই চুড়ি বিক্রী করে সেই অর্থে আমাকে একজনের উপকার করতে হবে। এর চেয়ে বড় প্রয়োজন আর আমার জীবনে কখনও আসেনি। আর সময় নেই বরুণা, সব কথা হয়ত আমি ঠিক করে তোমায় বোঝাতে পারছি না। আমার জীবনের গোপন অধ্যায় তোমার কাছে খুলে ধরব, কিসের জন্য আমি সব ত্যাগ করেছি, তোমায় কষ্ট দিয়েছি, সমস্তই তোমাকে জানাব ; একদিন এই আমি ভেবেছিলাম। ভেবেছিলাম, আমার এ পরিচয়কে তোমার সামনে তুলে ধরার সুযোগ ঈশ্বর আমায় দেবেন কিন্তু আজ মনে হচ্ছে, সে সামান্য সুযোগও হয়তো আর আমার জীবনে আসবে না। আমার আজকের এই শেষ নিষ্ঠুরতাই হয়ত তোমার কাছে সত্য হয়ে থাকবে। বরুণা, আমি আর যাই করে থাকি, জ্ঞানে অজ্ঞানে কোন দিন তোমার কাছে অবিশ্বাসী হইনি, তোমায় প্রতারণা করিনি আজও করব না। তাই আজ তোমার চেতনা থাকতে একটা কথা তোমায় আমি জানিয়ে দেব।

শোন বরুণা, ভাল করে তোমার এই নিষ্ঠুর স্বামীর কথা শোন—আজ কোন কারণে তোমার অপারেশনের সময় আমি তোমার কাছে থাকতে পারব না তাই তোমার হাত হতে এই চুড়ি আমি এখনই নিচ্ছি। যদি তুমি—যদি তোমার কিছু হয় তাহলে হয়ত তোমার হাত হতে চুড়ি খুলে নিতে আমারও বাধবে।

শুনছ বরুণা, আমারও বাধবে ! আমারও বাধবে !

—ওগো!

—না না, বরুণা আজ আর অমন করে আমায় ডেকো না। আমি আর সহ্য করতে পারব না। আমি কি করে তোমায় এখন এ-সব কথা বলছি? আমি বুঝতে পারছি আমি কি করছি? আমি কি হৃদয়হীন, আমি কি পিশাচ? দেখ তো বরুণা, আমার মুখে কিসের ছায়া?

কমলের আনত মুখ নিজের কম্পিত দুই হাতে ধরে বরুণা আর্তস্বরে বলল, ওগো, তুমি অমন কোরো না। তোমার কষ্ট আর আমি দেখতে পারছি না। ওঠ, মুখ তোল, এই নাও চুড়ি।

তুমি দেখ আমি ভাল হব—আবার তোমার কাছে ফিরে আসব।

চিত্রাকে নিয়ে এ্যাম্বুলেন্স চলে যেতে মিসেস সেন কমলকে জিজ্ঞাসা করলেন—বরুণাকে নার্সের সঙ্গে পাঠালি, তুই সঙ্গে গেলি না কেন? কখন যাবি তুই?

কমলকে চুপ করে থাকতে দেখে তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন—চুপ করে রইলি কেন? কি হয়েছে?

শান্ত, ধীর কণ্ঠে কমল উত্তর দিল—আমি ওর অপারেশনের সময় ওর কাছে থাকতে পারব না মা!

—কি বলছিস তুই কমল, আমি যে বরুণাকে, তুই ওর কাছে থাকবি বলে কথা দিয়েছি!

—তুমিই কথা দিয়েছ মা, আমি দিইনি। কেন দিইনি তার কারণটাও তোমায় জানতে হবে। একটা ক্যানসার রোগী দেখবার জন্য আজ আমায় সহর হতে কিছু দূরে একটা গ্রামে যেতে হবে। আজ যদি এই রোগী আমি না দেখি, তাহলে হয়ত আমার রিসার্চের ভূপ্রণীয় ক্ষতি হতে পারে। হয়ত এই রকম ক্যানসার রোগী আর আমি না-ও পেতে পারি। আমার জীবনের প্রত্যেকটি মুহূর্ত এখন আমায় হিসাব করে খরচ করতে হবে মা তাই রিসার্চ ছাড়া অন্য কারও দিকে তাকাবার সময় আর আমার নে।

—অন্য কারও দিকে? তোর নিজের স্ত্রীও আজ তোর কাছে অন্য কেউ হয়েছে?

—হয়নি, আমিই করে দিয়েছি। এখনও উত্তেজিত হোয়ো না, আরও শোনো। এই দেখ, আজ যখন ও আমার হাত ধরে, আমার মধ্যে আশ্রয় নিয়ে নির্ভয় হতে চাইছিল সেই সময় আমি ওর হাত হতে এই চুড়ি খুলে নিয়েছি। এই চুড়ি বিক্রীর টাকায় আমি সমরের রিসার্চ ছাপাব।

এ কাজের পরও কি তুমি আমাকে ওর কাছে যেতে বলবে?

—কি সর্বনাশ করেছিস কমল, ওরে তুই কি মানুষ?

—মানুষ বই কি মা, নইলে বরুণার মধ্যে আমার যে শেষ আশ্রয় ছিল তাকে কি আমি এভাবে নষ্ট করতে পারতাম?

মা, আজ এত-বড় পৃথিবীতে আমি একা। আমার অতীত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ সব এই একাকীত্বের মধ্যে মিলিয়ে গেছে। এরই মধ্যে আজ হতে আমায় প্রতিক্ষণ, ক্ষমাহীন সাংসারিক আঘাতের অপেক্ষায় থাকতে হবে।

সংসার, সমাজ, দেশ, ঈশ্বর সকলেই আজ আমার কাছে তাদের প্রাপ্য নিষ্ঠুরভাবে বুঝে নেবে। আমার দেহ, আমার হৃদয় এই বিশ্বগ্রাসী চাওয়ার অগ্নিতে নিঃশেষে দগ্ধ হয়ে যাবে তবু—তবু আমি কারও কাছে কিছু আর প্রত্যাশা করতে পারব না; কারও স্নেহাঞ্চলছায়ায় আশ্রয় নিতে পারব না! এর চেয়ে বড় শাস্তি তুমি কল্পনা করতে পার?

যে রিসার্চের জন্য আজ আমি এত-বড় অপরাধ করেছি সেই রিসার্চের জন্য হয়ত উত্তরকালে আমার আর সমরের যশের অবধি থাকবে না। কিন্তু আজ যদি বরুণার মৃত্যু হয় তাহলে সেদিনের সমস্ত গৌরব, খ্যাতি, অনন্ত ঐশ্বর্য্য কি ক্ষণকালের জন্যও আমার বরুণাকে ফিরিয়ে দিতে পারবে?

আজ যে ভালবাসার স্পর্শের জন্য তার সমস্ত দেহ-মন উন্মুখ হয়েছিল, সেই স্পর্শ তাকে দেবার অবকাশ কি সেই ভবিষ্যৎ আমায় এনে দেবে?

আমার মৃত্যুপথযাত্রিনী স্ত্রীর একটা সামান্য অনুরোধ আমি রাখিনি। সামান্য ভালবাসা, একটু স্নেহ আমি মিথ্যা করেও তাকে দেখাতে পারিনি; এই কথাই আজ হতে সকলে জানবে। আজ হতে এ কাজের জন্য আমি চিরলাঞ্ছিত, ধিক্কৃত হব। তুমিও এর পর আমায় পুত্র বলে স্বীকার করতে ঘৃণা বোধ করবে। কিন্তু তাতে আর আমার ক্ষতি-বৃদ্ধি নেই।

জীবনের সবচেয়ে বড় ক্ষতি সহ্য করে আজ আমি লাভ-ক্ষতির বাইরে এসে দাঁড়িয়েছি।

মুখ ফিরিও না মা! দেখ—বরুণা আজ তার হৃদয়হীন স্বামীকে সজ্ঞানে এই চুড়ি খুলে দিয়েছে।

তার হাত হতে, তার অনিচ্ছায়, চুড়ি খুলে নিতে হলে আজ হয়ত আমিও পাগল হয়ে যেতাম। কিন্তু বরুণা আমায় রক্ষা করেছে।

সে শুধু আমায় প্রাণ দেয়নি মা, বৈজ্ঞানিক গবেষণার ইতিহাসে, যুগ-যুগান্তরের নর-নারীর নিঃস্বার্থ দানের যে ঐতিহ্য আছে, তাকেও প্রাণ দিয়েছে। বরুণা আমায় বিশ্বাস করেছে। মৃত্যুবিভীষিকাও তার বিশ্বাসকে নষ্ট করতে পারেনি। তার এ বিশ্বাসের, এত বড় দানের মূল্য আমি কি করে দেব বলতে পার?

দেখ মা, একবার চেয়ে দেখ—জীবনব্যাপী ব্যথা, বেদনার ছায়ায় ঢাকা আমার মুখে এই চুড়ির সোনার আভা কি দেখতে পাও?

এই আভাতেও কি আমার পথের অন্ধকার দূর হয়ে যাবে না?

হাসপাতাল হতে যেদিন বরুণার ফিরবার কথা, তার আগের দিন বিকালে কমল মিসেস সেনকে বলল—মা, আমি আজ রাত্রে লক্ষ্ণৌ যাব। কিছুদিন আমাকে সেখানে থাকতে হবে।

মিসেস সেন আশ্চর্য্য হয়ে বললেন—সে কি? বরুণা কাল ফিরবে—তার দাদা তাকে নিয়ে যাবার জন্যে আসছে—আর তুই থাকবি না?

এ ক'দিন তুই একবারও হাসপাতাল যাস্‌নি। এখনও কি বরুণার সঙ্গে তুই দেখা করবি না?

—তুমি ঠিকই ধরেছ মা, ওর সঙ্গে দেখা না করবার জন্যই আমি সরে যাচ্ছি।

—তুই যা ভেবে এ কাজ করতে যাচ্ছিস, তার কোন প্রয়োজন ছিল না। বৌমা তোর সব অপরাধ ক্ষমা করেছে, এ-ও কি তুই বুঝতে পারিসনি?

—বুঝতে পেরেছি বলেই তো ওর কাছ হতে আমি দূরে সরে যাচ্ছি।

ক্ষমা পেলেও যে অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হয় না—যে অপরাধ জন্ম-জন্মান্তরে মানুষকে দগ্ধ করে, সে অপরাধ কি তুমি কোন দিন দেখেছ?

বরুণার কথা আর তুমি আমার কাছে বোলো না।

বলতে বলতে কমল তার ঘরের দেয়ালের কাছে রাখা বড় ড্রয়ারটার পিছন হতে একটা ইঁদুরের খাঁচা বের করল।

মিসেস সেন তাই দেখে চকিতস্বরে বললেন—ও আবার কি করছিস?—ও দিয়ে কি হবে?

কমল উত্তর দিল—এই ইঁদুরের উপর ক্যানসার সম্বন্ধে একটা পরীক্ষা করবার জন্য এটা নিয়ে আমি লক্ষ্ণৌ যাব।

—দূর করে ও-সব ফেলে দে। এততেও কি তোর শিক্ষা হয়নি? এখনও কি তুই রিসার্চ করবি?

—হ্যাঁ মা, এখনও আমি রিসার্চ করব।

—আমার কথা শোন কমল, এমন করে আর নিজেকে নষ্ট করিস না। রিসার্চ করা ছেড়ে দে, নাহলে তোর সর্ব্বনাশ হবে।

—অনেক দূর আমি এগিয়েছি মা, এখন আর আমি রিসার্চ ছাড়তে পারব না। আর যে সর্ব্বনাশের ভয় তুমি করছ, আমার সে সর্ব্বনাশ বহুদিন আগে, যেদিন তুমি সমরকে ইনকামট্যাক্সে চাকরী নিতে বাধ্য করেছিলে, সেদিন আরম্ভ হয়েছে। সেই সর্ব্বনাশের বোঝা আপনার উপর নিয়ে এখন আমি শুধু তার সমাপ্তির দিকেই তাকিয়ে আছি।' সর্ব্বনাশের চিন্তা আর আমি করি না।

—বরুণার কথাও কি তুই একবার ভাববি না?

—ওর কথা তুমি আমায় মনে করিয়ে দিও না মা! বহ্নি-নারায়ণ সাক্ষী করে যাকে আমি গ্রহণ করেছি, তার কোন কষ্টই আমি মোচন করতে পারিনি, এর চেয়ে বড় দুঃখ আর আমার কিছু নেই! ওর কথা আর কোন দিন—কোন ছলে আমার সামনে বোলো না।

—তোর এত বড় সর্ব্বনাশ, আমি বেঁচে থেকে দেখতে পারব না কমল! আমি মা হয়ে তোর কাছে ভিক্ষা চাইছি, এ কাজ তুই আর করিস না—রিসার্চ করা ছেড়ে দে।

—তুমি যদি ওরকম কর মা, তাহলে আমার শেষের দিন আরও এগিয়ে আসবে, তাতে কারও ভাল হবে না।

আর ছ'মাস পরে রোমে ইনটারন্যাশনাল মেডিকেল কংগ্রেস হবে—আমি খবর পেয়েছি। সেই কংগ্রেসে আমার রিসার্চের ফলাফল আমাকে জানাতেই হবে। লক্ষ-কোটি লোকের শুভাশুভ এর উপর নির্ভর করছে। তুমি আর আমার এই শেষ সুযোগে কোন ক্রমেই আমাকে বাধা দিও না, বিচলিত কোরো না।

ভয় পেও না, মৃত্যু আমার কাছে আসবে না। তার চেয়ে বড় সর্ব্বনাশ ভবিষ্যৎ আমার জন্য সঞ্চয় করে রেখেছে। আমার সৃষ্ট সেই নরক হতে কেউ আমায় উদ্ধার করতে পারবে না। সে বৃথা চেষ্টা আর তুমিও কোরো না।

রাত্রি গভীর হতে গভীরতর হচ্ছে, তবু কমলের ঘুম আসছে না। আজ-কাল, রাত্রে কমলের প্রায়ই ঘুম হয় না। ক্ষণকালের জন্যও চোখ বন্ধ করলে, ট্রিরোল গ্রুপের ট্রাকচারাল ফরমূলার ছবি লক্ষ লক্ষ ছোটবিন্দুর মত তার সামনে ভেসে উঠতে থাকে। আর মনে হয়, এদের সঙ্গে ক্যানসারের সম্বন্ধের একটি অতি সাধারণ সমাধান যেন কেবলই তাকে এড়িয়ে যাচ্ছে।

কমলের রিসার্চ এখনও শেষ হয়নি, তবু যতটা হয়েছে, তারই রিপোর্ট কমল রোমের কংগ্রেসে পাঠিয়েছিল। সেখানকার কর্ত্তৃপক্ষ কমলকে রোমে গিয়ে তার রিসার্চ সম্বন্ধে লেকচার দিতে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

এর অপেক্ষা বড় সম্মান কমল কোন দিন আশা করেনি। কিন্তু কিছু দিন হতে তার কেবলই মনে হচ্ছে, এই সম্মানই বোধ হয় তার শেষ সম্মান।

যার অপেক্ষায় বিগত দশ বছরের প্রতি মুহূর্ত্ত কমলের কেটেছে, তার সেই চরম পরীক্ষার, তার শেষের দিন যেন খুব কাছে এগিয়ে এসেছে। এই আসন্ন সর্ব্বনাশের হাত হতে কমল যেন কোন ক্রমেই আর নিস্তার পাবে না!

এই সর্ব্বনাশের হাত হতে তার রিসার্চকে রক্ষা করবার জন্য—রোমের কংগ্রেসে বৈজ্ঞানিকমণ্ডলীকে তার রিসার্চের বিবরণ জানিয়ে সেই রিসার্চ অব্যাহত রাখবার অনুরোধ করবার জন্য—কমল রোমে যাবার প্রাণপণ চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তার সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছে।

রোমে যাবার জাহাজ-ভাড়াও সে জোগাড় করতে পারেনি।

মিনিষ্ট্রি অফ হেলথও তার দরখাস্তের উত্তরে তাকে জানিয়েছেন, অর্থাভাবে এ বিষয়ে কমলকে কোন সাহায্য করতে তাঁরা অক্ষম।

কেন এদের চিঠি লিখেছিল কমল? কেন এত-বড় ভুল সে করেছিল?

তার মত নগণ্য লোকের যে কোথাও স্থান নেই, কোন অধিকার নেই, এ কথা কেন সে বিস্মৃত হয়েছিল?

কেন সে নিস্পৃহ হতে পারেনি? নিজের আকাঙ্ক্ষাকে আপনার হাতে কেন সে শ্বাসরুদ্ধ করতে পারেনি? তার অবাধ্য মন, তার প্রতি অন্যায়, বঞ্চনার বিরুদ্ধে কেন একবারের জন্যও বিদ্রোহ করেছিল? কেন? কেন? কেন?

বিছানায় শুয়ে কমল ছটফট করতে লাগল।

আজও তার ঘুম আসবে না। ঘরের হাওয়া যেন আগ্নেয়গিরির মত উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। বিছানা ছেড়ে নিঃশব্দ পদে ঘর হতে বেরিয়ে কমল, বাগানের এক কোণের নিমগাছ-তলায় এসে দাঁড়াল।

পিছনে ফেলে-আসা বাড়ীটা অন্ধকারে বিশাল ছায়ার মত দেখাচ্ছে। মাথার উপর একটা পাখীর ডানা ঝাপ্‌টানির শব্দে কমল চমকে উঠল! সুপ্তিময় চরাচরের অখণ্ড নিস্তব্ধতায় এই সামান্য শব্দও যেন অস্বাভাবিক ভাবে কমলকে পীড়ন করতে লাগল।

নিদ্রাহীনতাই বোধ হয় মানুষের সবচেয়ে বড় শাস্তি। যে চিন্তাগ্নি কমলকে পলে পলে দহন করছে, তার হাত হতে কমল যদি একবার নিষ্কৃতি পেত!

ব্যথা, আনন্দ, সুখ, দুঃখ, সব বিস্মৃত হয়ে—বরুণার কোলে মাথা রেখে কমল যদি এইখানে, এই বৃক্ষতলে ক্ষণকালের জন্যও ঘুমাতে পারত!

বরুণা!

বহুদিন পরে আজ যেন নূতন করে বরুণার কথা কমলের মনে পড়ল। কত দিন, কত যুগ সে বরুণাকে দেখেনি!

একবার বরুণার কাছে যাবার জন্য সকলের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ

সে প্রত্যাখ্যান করেছে। তাকে ভুলতে চেয়েছে কমল। তাকে নিজের জীবন হতে নিশ্চিহ্ন করতে চেয়েছে। কিন্তু সে কি বরুণাকে হৃদয় থেকে মুছে ফেলতে পেরেছে?

হৃদয়ের কোন্ গহন হতে আজ বরুণা তার সামনে হাসিমুখে এসে দাঁড়াল?

যে মেয়েটিকে তার আদর্শের রথচক্রতলে কমল নিষ্ঠুরের মত নিষ্পিষ্ট করেছে, আজ তার সামান্যতম স্মৃতিও কমলের উত্তেজিত মনকে ক্ষত-বিক্ষত করতে লাগল।

আর বোধ হয় বরুণার সঙ্গে তার দেখা হবে না! কমলের শরীর, মন, জীর্ণতার শেষ সীমায় এসে পৌঁছেচে। তার অদম্য ইচ্ছাশক্তিও যেন তাকে একটু-একটু করে ত্যাগ করে যাচ্ছে।—তবুও যে অমৃত সমুদ্র এখনও তাকে সঞ্জীবিত করতে পারে, তাকে কমল গ্রহণ করতে পারবে না।

দানের দিন শেষ হয়ে গ্রহণের ক্ষণ আজও তার জীবনে আসেনি!

এক অতীন্দ্রিয় অনুভূতিবশে সে যেন আদর্শের জন্য তার শেষ দানের—মহাদানের জন্য প্রস্তুতির আহ্বান চারি দিকে শুনতে পাচ্ছে!

এত দিনে কি সত্যই সে তার পথের শেষে পৌঁছেচে? আজ যদি সে একবার বরুণাকে দেখতে পেত!

যদি একবার কমল তাকে বলতে পারত—'আমার আত্মা, আমার হৃদয়, তোমাতে পরিণতি লাভ করবার জন্য যাত্রা করেছে—তাকে তুমি গ্রহণ কর বরুণা, তাকে আশ্রয় দাও।'

পায়ের কাছে খানিকটা ময়লা জল জমেছে, সেদিকে তাকিয়ে কমল একই ভাবে দাঁড়িয়ে রইল। দূরে একটা ঘড়িতে প্রহরের পর প্রহর ঘোষণা করে গেল কিন্তু ক্ষীয়মাণ রাত্রির সে ইঙ্গিত সেই নিশ্চল মূর্ত্তিকে আর বিচলিত করতে পারল না।

পরদিন সকালে অনেক বেলা পর্য্যন্ত কমলের কোন সাড়া না পেয়ে মিসেস সেন তার ঘরে এসে দেখলেন, সে তখনও ঘুমাচ্ছে।

যেখানে কমল শুয়ে আছে ঐখানেই ডাঃ সেনও শুতেন। ঐখানেই তাঁর শেষ নিঃশ্বাস পড়েছিল।

কমলের শীর্ণ মুখে নিবিড় ক্লান্তির ছায়া দেখে আজ অকস্মাৎ তাঁর ডাঃ সেন-এর মৃত্যুশয্যার কথা মনে পড়ল। কমলের মুখের দিকে আর তিনি তাকাতে পারলেন না। এক অজানা আশঙ্কায় তাঁর মন কি রকম করতে লাগল।

তাঁর কেবলই মনে হতে লাগল, ডাঃ সেন-এর মত, কমলও এবার বোধ হয় তাঁদের ত্যাগ করে যাবে!

প্রাণপণে নিজেকে সংযত করে তিনি কমলের গায়ে হাত দিয়ে তাকে বললেন,—ও কমল ওঠ, আজ কাজে যাবি না?

মিসেস সেন-এর ডাকে, বিছানায় উঠে বসে চোখ মুছতে মুছতে কমল বলল।—আমাকে একটু আগে কেন ডেকে দাওনি মা, আমার যে অনেক কাজ আছে!

খবরের কাগজ কি দিয়ে গেছে? ওটা পড়বারও বোধ হয় আমার সময় হবে না।

মিসেস সেন বললেন—কাগজ তো যে সময় রোজ দিয়ে যায় সেই সময়ই দিয়ে গেছে। কাল রাত্রে কি তোর ভাল ঘুম হয়নি?

কমল উত্তর দিল—না মা, কাল অনেক রাত্রে ঘুম এসেছিল।

মিসেস সেন বললেন—আজ তাহলে একটু তাড়াতাড়ি ফিরিস। দুপুরে ঘুমিয়ে নিলে শরীরটা ভাল হবে।

—তাই আসব। এখন আমি স্নান করতে যাচ্ছি, মাথাটা ভার হয়ে আছে, স্নান করলে বোধ হয় হাল্কা হবে।

স্নান করে এসে খবরের কাগজটা পড়তে গিয়ে তার প্রথম পাতায় প্রফেসর ব্রুণোর, 'ইউনিফায়েড ফিল্ড থিয়োরীর' উপর একটি নূতন আবিষ্কারের কথা দেখে কমল চমকে উঠল।

বরুণার চুড়ি বিক্রী করে, সেই টাকায় সমরের যে রিসার্চ্চ কমল ছাপিয়েছিল, তারই প্রসঙ্গে একদিন সমর কমলকে বলেছিল, 'ইউনিফায়েড ফিল্ড থিয়োরী' সম্বন্ধে সে যে গবেষণা করছে তা যদি সফল হয় তাহলে বিজ্ঞান-জগতে এক যুগান্তর হবে। যে রিসার্চ্চ ছাপান হয়েছে, সেটা এ রিসার্চ্চের মুখবন্ধ মাত্র।

খবরের কাগজে এই আবিষ্কারের সংবাদ পড়ে তাই কমল আজ উত্তেজিত হয়ে উঠল।

সমরের রিসার্চ্চের সঙ্গে এ আবিষ্কারের কি সম্বন্ধ আছে? এই রিসার্চ্চ যদি সমরের রিসার্চ্চের সমধর্ম্মী হয়, তাহলে কি সমর তার রিসার্চ্চের মূল্য পাবে না? তার সাধনা কি অবজ্ঞাতই থাকবে? সমরও কি এ সংবাদ দেখেছে? খবরের কাগজে এই সংবাদ পড়ে তারই যদি মনের অবস্থা এরকম হয়ে থাকে, তাহলে সমর কি করছে?

কাগজের আর একটা পাতাও উলটে না দেখে কমল মিসেস সেন-এর কাছে গিয়ে বলল—মা, আমি এখনই বেনারস যাচ্ছি।

মিসেস সেন পূজার ঘরে কিছু করছিলেন। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে কমলকে ঐ কথা বলতে শুনে তিনি হাতের কাজ ফেলে জিজ্ঞাসা করলেন—বেনারস কেন যাবি রে কমল?

কমল উত্তর দিল—দাদার সঙ্গে দেখা করতে যাব, বড় দরকার। তোমার যদি কিছু রান্না হয়ে থাকে তো দাও। ট্রেণের আর বেশী দেরী নেই। তুমি একটু সাবধানে থেক, আজ রাত্রেই আমি ফিরে আসব।

লক্ষ্ণৌ হ'তে মাত্র কিছুদিন আগে সমর বেনারস বদলী হয়ে এসেছে। অফিস সে তখনও জয়েন করে নি।

কমলকে অসময়ে তার কাছে আসতে দেখে সে বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল,—কোন খবর না দিয়ে কেন এলি রে কমল? মার কি কোন অসুখ করেছে?

কমল উত্তর দিল—মার শরীর ভাল আছে। তোমার সঙ্গে দরকার বলেই আমি তোমার কাছে এসেছি। আমার একটা কথার জবাব দাও।

আজকের খবরের কাগজে 'ইউনিফায়েড ফিল্ড থিয়োরীর' উপর প্রফেসর ব্রুণোর যে আবিষ্কারের কথা পড়লাম, তার সঙ্গে তোমার রিসার্চ্চের কি কোন সম্বন্ধ আছে?

—মনে তো হয় আমার রিসার্চ্চ অনেকটা এই রকমই।

—কি করে একথা তুমি স্বচ্ছন্দে উচ্চারণ করছ দাদা? কেন তুমি এ সর্ব্বনাশ করলে? কেন তুমি পৃথিবীকে আপনার যথার্থ মূল্য জানালে না? কেন তুমি এ রিসার্চ্চ আগে শেষ করনি?

কমল এ রিসার্চ্চ কেন আমি শেষ করতে পারিনি তা তো তুই ভাল করেই জানিস। তাছাড়া আর এসব ভাল

লাগে না। আমার যে রিসার্চ তুই ছাপিয়েছিলি, সে সম্বন্ধে ইউরোপ থেকে দু'-একটি চিঠি পাওয়া ছাড়া আর কি মূল্য আমি পেয়েছি? যদিও আমার আসল রিসার্চের বিষয়ে এতে আমি শুধু ইঙ্গিতই দিয়েছিলাম, তবু আরও উৎসাহ কি আমার প্রাপ্য ছিল না?

—ভাল লাগে না? তোমার প্রাপ্য? এ সব আজ আমি তোমার মুখে কি শুনছি দাদা? এ তোমার কি অধঃপতন হয়েছে? তুমিই না একদিন নিষ্কাম হয়ে বিশুদ্ধ জ্ঞানের চর্চ্চা করতে চেয়েছিলে?

—কি হবে আর ওসবে? এবার—

—এবার কি দাদা? চাকরীর উন্নতি, বিলাসের মোহে আপনাকে ডুবিয়ে দিয়ে এবার জীবন উপভোগ করতে চাও এই তো?

এ তুমি কি বলছ দাদা? একবার পিছন ফিরে তাকাও—গত বার বছরের কথা একবার স্মরণ কর! একবার আমার দিকে চেয়ে দেখ? আমি যে তোমার মুখ চেয়েই আপনাকে নষ্ট করেছি!

মুখ ফেরাচ্ছ কেন? আমার দিকে তাকিয়ে—আমার মুখের দর্পণে নিজের আত্মবঞ্চনার মিথ্যাকে দেখতে কি তোমার ভয় করছে?

কিন্তু তুমি মুখ ফেরালেও আমি তো ফেরাব'না। তুমি ছাড়তে চাইলেও আমি তো ছাড়ব না! রিসার্চ করতে আমি তোমায় বাধ্য করব।

শক্ত হও দাদা ওঠ—জড়তা ত্যাগ কর। বিলাস, সম্মান প্রাচুর্য্যের মোহ তো তোমার সাজে না? আমরা অনেক নষ্ট করেছি, অনেক নষ্ট করেছি কিন্তু আর নয়—এবার তোমাকে বাঁচতে হবে।

রিসার্চের মধ্য দিয়ে সেই যথার্থ বাঁচার পথ ছাড়া অন্য কোন পথে আর আমি তোমায় চলতে দেব না।

এবার হয়ত তোমার চিতাগ্নিতে তোমার পথ আলো হবে কিন্তু তাতে কি ক্ষতি? এ আলো শুধু তোমার পথ দেখাবে না তোমার পরে যারা আসবে তাদের পথের অন্ধকার দূর করে দেবে।

—কমল।

—না দাদা না আর আমি তোমার কোন কথাই শুনব না।

—বেশ তাই হবে—তোর কথা আমি রাখব। কিন্তু এ যে কত বড় ভার তা কি তুই বুঝতে পারছিস?

—পারছি বই কি দাদা—তাই তো এ ভার তোমাকে দিয়ে যাচ্ছি। আজ হতে ঈশ্বরের কাছে কামনা করব তুমি ধরিত্রীর মত সহিষ্ণু হও।

সেই রাত্রেই কমল লক্ষ্ণৌ হতে ফিরে এল। সমরের সঙ্গে কথা বলতে বলতে নিজের কর্ত্তব্য সে ঠিক করেছে!

এতদিনে—এতদিনে নিজের সঙ্কল্প পালন করে সে মুক্তি পাবে।

কমল ফিরে যাবার কয়েক দিন পরে বিকালে অফিস হতে ফিরে সমর তার একটা চিঠি পেল। কমল তাকে লিখেছে—

দাদা,

তোমাদের কাছ হতে বহু দূরে এসে আজ আমি তোমায় এই চিঠি লিখছি। এই চিঠি লেখবার সময়, বার বছর আগের একটি দিন হতে যেসব চিঠি আমি তোমায় লিখেছি, তাদের কথা আমার মনে পড়ছে। সেসব চিঠির কথা তোমার মনে আছে কিনা জানি না, কিন্তু আমার আছে। অস্তগামী সূর্য্যের আলোয় রঙ্গীন, দিক্‌চক্রবালের মেঘের মত, তারা জীবনান্তকাল পর্য্যন্ত আমার স্মৃতি-বিস্মৃতির দেশের সীমারেখায় দাঁড়িয়ে থাকবে। সেসব চিঠিতে আমাদের জীবন-যুদ্ধের, আমাদের দুঃখ-বেদনা, আশা-নিরাশা, উত্থান-পতনের যে ইতিহাস রচনার আরম্ভ হয়েছিল, আজকের এই চিঠিতে তাতে আমার অধ্যায়ের পূর্ণচ্ছেদ হতে যাচ্ছে। কিন্তু এ ছেদ শুধু আমারই, তোমার নয়। আমার সমাপ্তিতে তোমার আরম্ভ, এ কথা জানাবার জন্যই আমি এ চিঠি তোমায় লিখছি। আজ হতে এ কথা যেন তোমার মনে চিরজাগ্রত থাকে যে এ ইতিহাসের কেবলমাত্র একটিই শেষ আছে—সে শেষ, 'তোমার সাফল্য—তোমার রিসার্চের সাফল্য!'

আমি যেদিন তোমার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম, সেদিন তোমায় তিরস্কার করতে আমার বুক ফেটে যাচ্ছিল, তবু তোমার শেষ কথায়—তোমার ব্যথাকাতর মুখের উপরে ভেসে-ওঠা ক্ষণেক দীপ্তিতে আমি বুঝেছিলাম, আমার কষ্ট সার্থক হয়েছে।

আমি বুঝেছিলাম, আমার ভুল হয়নি—তোমার বৈজ্ঞানিক মন মুমূর্ষু হয়েছে মাত্র, তাকে বাঁচান যেতে পারে—তবে তার জন্য তোমার মনকে এমন এক আঘাত দিতে হবে—যার বেদনা, মৃত্যু অথবা উম্মত্ততা ছাড়া আর কিছুতেই যেন মুছে দিতে না পারে।

সেই আঘাত তোমায় দেবার জন্য আমি গৃহত্যাগ করে এসেছি। তুমি যখন এই চিঠি পাবে, তখন মাকে আর আমার স্ত্রীকে তোমার কাছে এনে রাখবে। মাকে আমি জানিয়েছি, আমি কিছু দিনের জন্য বাইরে যাচ্ছি। কিন্তু এ মিথ্যা! এই প্রথম আমি তাঁকে মিথ্যা কথা বলেছি আর এই শেষ।

দাদা, যে সংসার সুখ-দুঃখের মায়ায় আমায় এত দিন লালন করেছিল তাতে আর আমি ফিরবনা। অনন্ত দুঃখের মাঝেও আমার যা একমাত্র আশ্রয় ছিল—আমার দুঃখিনী মার আমার চিরবঞ্চিতা স্ত্রীর সেই স্নেহচ্ছায়ায় ফিরে যাবার দুঃসহ প্রলোভন হতে আপনাকে মুক্ত রাখতে আজ হতে আমি কঠিন সংগ্রাম করব। আমি কি ছিলাম তাও ভুলে যেতে চেষ্টা করব। আজ হতে আমি তোমাদের কাছে শুধু মৃত হবনা—হব বিলুপ্ত!

আমার এই কঠোর সংগ্রামের স্মৃতি নিষ্ঠুরের মত আমি যাদের পিছনে ফেলে এসেছি, তাদের ম্লান মুখে উৎকণ্ঠ প্রতীক্ষায়, মর্ম্মান্তিক ব্যথার ছায়া আজ হতে তোমায় তিলে তিলে দগ্ধ করবে। জীবনের এক এক দিন আজ হতে তোমার কাছে লক্ষ বৎসরের মত দীর্ঘ মনে হবে—অনন্ত জীবনের এই ভারে আজ হতে তুমি প্রতিক্ষণে আপনার মৃত্যুকামনা করবে কিন্তু সেই অতিবাঞ্ছিত মৃত্যুও আজ হতে তোমাকে দেখে ভয়ে দূরে সরে যাবে। অন্ধকার সমুদ্রে আলোকস্তম্ভের মত এ অভিশাপ আজ হতে তোমায় শুধু একই দিকে পথ দেখাবে সে পথ রিসার্চের পথ। আজ হতে হয় রিসার্চের নিশ্চিত সফলতা নয় উম্মত্ততা ছাড়া তৃতীয় সম্ভাবনা তোমার জীবনে থাকবে না! দাদা, একদিন তোমায় বলেছিলাম, আমি এই প্রার্থনা করব যে তুমি ধরিত্রীর মত সহিষ্ণু হও, কিন্তু সেদিন আমি ভুল বলেছিলাম। আজ হতে আমি এই প্রার্থনা করব, 'কোটি বিশ্বজগতের সহিষ্ণুতা যেন এইক্ষণ হতে তোমাতে আশ্রয় নেয়!'

অনেক কথা তোমায় লিখলাম এবার আর মাত্র একজনের উল্লেখ করে আমি তোমার কাছ হতে বিদায় নেব।

দাদা, তোমার প্রতি কর্ত্তব্যের জন্য একটি নারীহৃদয়কে আমি নিষ্ঠুরভাবে পদদলিত করেছি আমার নিরপরাধা, অসহায়া স্ত্রীর মনের পর আমি যে অত্যাচার করেছি তার অপেক্ষা হীন, নীচ কাজ বুত আর কিছুই হয়না। বিশ্ববিধানে একজনের অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত আর একজনকে বোধ হয় এমনি করেই করতে হয়!

দাদা, তোমাকে আশ্রয় করে মা হয়ত একদিন আমার দুঃখও ভুলতে পারবেন কিন্তু আমার স্ত্রী কি অবলম্বন করে আমায় বিস্মৃত হবে?

তোমার সংসার? সমাজ? ঈশ্বর? এ সবের কিছুই কি আমাকে তার মন হতে মুছে দিতে পারবে?

এর চেয়ে বড় কষ্ট কি তুমি কল্পনা করতে পার?

দাদা, তোমার জন্য আমি সতিত্যুক্তা কামনা করব কিন্তু আমার স্ত্রীর জন্য কামনা করব মৃত্যু।

আমার এ অপরাধের বিভীষিকা আজ হতে কুকুরের মত আমাকে দেশ দেশান্তরে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াবে।

আমার সৃষ্ট এই রৌরব হতে, অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যতের সামান্যতম পুণ্যও আমাকে পরিত্রাণ করতে পারবে না। কিন্তু এও আমার সহ্য হবে—সহ্য হবে এইজন্য যে আমি জানি যতবড় অপরাধই আমি করে থাকি, আমার স্ত্রীকে একটা কথা জানাবার অধিকার আজও আমি নষ্ট করিনি।

আমার হয়ে সেই কথাটা তাকে জানাবার অনুরোধ করে আজ আমি তোমার কাছ হতে বিদায় নিচ্ছি।

বরুণার চোখের সামনে পৃথিবী যখন সঙ্কীর্ণ হয়ে আসবে—দ্বারপ্রান্তের প্রতি পদশব্দে উৎকর্ণ হয়ে, একবার—শেষবার আমাকে দেখবার আশায়, ছায়াচ্ছন্ন দৃষ্টির ক্ষেত্রে সে যখন আপনার প্রাণকে সমস্ত শক্তি দিয়ে ধরে রাখতে চেষ্টা করবে, বরুণার সেই অন্তিম সময়ে তাকে জানিও—'কমল তোমার মৃত্যুকামনা করেছিল, কিন্তু বঞ্চনা করেনি—সে তোমায় ভালবেসেছিল।'

হিমালয়!

যা কিছু বৃহৎ; যা কিছু মহান, যা কিছু সুন্দর, সবেরই মূর্ত প্রতীক! যুগযুগান্তর হতে মানুষ যখনই এর আশ্রয়ে এসেছে তখন অন্তত ক্ষণকালের জন্যেও যে এই সৌন্দর্য্যের পটভূমিকায় আপনাকে বিশ্লেষণ করে দেখতে চেয়েছে; এই মহলোকের দিকে তাকিয়ে তাকে অন্তত: একবারের জন্যও ভাবতে হয়েছে, আদর্শ কি? সত্য কি? মানব জীবনের পরিণতি কি?

যোগী, ভোগী, দীন, দরিদ্র, সকলের জন্য সর্ব্বকালে এই সৌন্দর্য্যস্বর্গ আপনাকে অবারিত করে রেখেছে।

এই স্বর্গের এক কোণে আজ কমলও তার শেষ আশ্রয় পেয়েছে। ধরিত্রীর আনন্দস্রোতে নিজেকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে বৈরাগী মন মানুষকে প্রতিক্ষণে আহ্বান করে, সেই মনই আজ কমলের যাত্রাশেষে তাকে এখানে পথ দেখিয়ে এনেছে!

হিমালয়ের এক নির্জ্জন প্রদেশে—পাইন বনের ছায়ায়, কমলের শেষ বিশ্রামশয্যা রচিত হয়েছে।

গৃহত্যাগ করে আসবার পর কতদিন কেটে গেছে আজ কমল তা যেন কিছুতেই স্মরণ করতে পারছে না।

অতীত দিনের স্মৃতির দংশন হতে পরিত্রাণ পাবার জন্য দিন হতে দিনান্তরে কমল এক নির্জ্জনতা হতে অন্য নির্জ্জনতায় পলায়ন করেছে।

নদীতটের বেণুবনের মর্ম্মরে, অরণ্যের গভীরতায়, নীল সমুদ্রের মায়ায়, বসুন্ধরার অসংখ্য সৌন্দর্য্যালোকে সে আপনার আত্মাকে, সত্যকে অন্বেষণ করে ফিরেছে। এতদিনে তার এ অন্বেষণ শেষ হয়েছে।

চারিদিকে মৃত্যুর নিস্তব্ধতা—মাথার উপরের মর্ম্মর; পায়ের কাছের ঝর্ণার কলধ্বনিকে আলিঙ্গন করছে।

বহু উর্দ্ধের নীল আকাশের উপরে কৃষ্ণবর্ণ বিন্দুর মত শকুনের ঝাঁক দেখা যাচ্ছে।

চক্রাকারে ঘুরতে ঘুরতে তারা নীচে নেমে আসছে।

কমলের মুখের মৃত্যুর ছায়া কি অত উর্দ্ধেও প্রতিফলিত হয়েছে?

আজ কমলের বড় ইচ্ছা করছে, মসৃণ ঝরাপাতার উপর নিজেকে গড়িয়ে দিয়ে খেলা করতে, শেওলা ধরা যে পাথরগুলি ঝর্ণার উপর সেতুর মত হয়ে রয়েছে, তাদের উপর দিয়ে পারাপার করতে!

কমলের ছায়াচ্ছন্ন দৃষ্টির ক্ষেত্রে কারা যেন ভীড় করে আসতে লাগল।

—মা একটা গল্প বল না।

—রোজ রোজ এত গল্প কোথায় পাব রে কমল?

—ঐ জালের আলমারীটা কোথা থেকে এল মা, ওর মধ্যে আমার গল্পের বই থাকত না?

—বাবা কোথায় মা?

—এইবার আসবেন।

—ঐ দেখ খাঁ সাহেবও এসেছে। তোমার পিছনে দাঁড়িয়ে আছে। কি সুন্দর ললিতা গৌরী ও একদিন যে পেয়েছিল!

মা তোমরা এত সুন্দর কি করে হলে? তোমাদের সকলকে একসঙ্গে আমি কি করে দেখছি মা; আমি কি আবার ছোট থেকে বড় হচ্ছি?

এতদিন কেন তোমরা আমার কাছে আসনি মা? কেন আমাকে জানতে দাওনি তোমরা আমার এত কাছে আছ?

তোমায় না বলে চলে এসেছিলাম বলেই কি এত দুঃখ তুমি আমায় দিলে?

মা হয়েও কি আমার কষ্ট তোমরা বুঝতে পারনি?

বরুণা কোথায় মা? তাকে যে আমার অনেক কথা বলবার আছে!

কতদিন—কতযুগ তাকে দেখিনি আমি!

কি বলছ? এইবার তার সঙ্গে আমার দেখা হবে? আমার অপেক্ষা করে আছে সে?

আনন্দে কমলের মৃত্যুছায়াচ্ছন্ন মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। লোভ, মোহ, পাপ, পুণ্য, সুখদুঃখের অতীত যে সত্যলোক কমল এতদিন অন্বেষণ করে বেড়িয়েছে সেই সত্যলোক আজ যেন অকস্মাৎ কমলকে ধরা দিল। আজ যদি কমলের লিখবার শক্তি থাকত তাহলে সে লিখে যেত—

"হে ঈশ্বর, হিমালয়ের নিষ্কলঙ্ক হিমশিখর আমার দৃষ্টিপথে একটু একটু করে অন্ধকার হয়ে আসছে কিন্তু জীবনের বহুদিনের হারিয়ে যাওয়া ব্যথা, বেদনা আনন্দময় তুচ্ছতম, দীনতম ঘটনাগুলি সেই অন্ধকারে প্রদীপের মত আমার সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে।

জীবনমৃত্যুর মাঝের দ্বার তারা আমায় যেন পথ দেখিয়ে অতিক্রম করে নিয়ে যাবে। জন্ম হতে মৃত্যু পর্য্যন্ত দিনগুলিতে যারা আমার কাছে অতি সাধারণ নগণ্য হয়েছিল আজ আমি তাদের যেন নূতন করে আবিষ্কার করছি।

কোন সংশয়—কোন ভয় আর আমার মনে নেই!

জন্মমৃত্যুচক্রের আবর্ত্তে, যতবার আমি এই পৃথিবীতে আসব ততবার আমার জীবনব্যাপী নিষ্ফলতা, দুঃখের, শোকের এই কয়টি ক্ষণ হতে তুমি কখনও—কখনও আমায় বঞ্চিত কোরো না!

শকুনের পাল নীচে—আরো নীচে নেমে এল।

সমাপ্ত

নাগিনী

বন্দে আলী মিয়া

দিনের প্রান্তদেশে দাঁড়ায়েছি এসে—প্রদোষের মলিন আকাশ
বেদনা পাণ্ডুর আঁখি বন্ধ্যা বসুমতী—শুনি তার করুণ নিশ্বাস।
একটি সোহাগ সাধ মূর্চ্ছাহত হায় বাষ্পাতুর নীল হলাহল
কাঁপিছে বিদগ্ধ নভ চির উপবাসী—ফুটিল না নিশীথ কমল।

আমার জীবন-তৃষ্ণা আজো হায় কাঁদে—সিন্ধুসম ফুঁসে বার বার
ধূসর বিষণ্ণ মেঘ ফেলিয়াছে ছায়া—শেষ হয় ক্ষুব্ধ কামনার।
তোমার দীপের দাহে পুড়িল আমার পুষ্পিত সোনালি কমল
লৌহ নিগড় তব রুদ্ধ করে হায় নয়নের মাধবী স্বপন।

একটি নাগিনী আজ লক্ষ ফণা তুলি অবিরাম রোষে গরজায়
অশনি চমকে তার ভ্রূকুটি কুটিল অগ্নি-শিখা আঁখির তারায়।
আমার সৌরলোক কুহেলী আঁধার—জনহীন মরু-প্রান্তর
শ্মশানের বিষ-ধূমে মোর রাত্রি-দিন অশ্রুলিপ্ত ধূলায় কাতর।

মিথ্যার বেসাতি দিয়ে মঞ্জুষা ভরি পদে পদে মোর পরাজয়
একটি হৃদয়ে তব ছিলো যেই ঠাঁই আজি তার হয়েছে বিলয়।
এবারে বিদায়-বাঁশী বাজিতেছে হায় সাড়া হীন রৌদ্রদগ্ধ মন
আমার আঁখির জলে ছিন্ন হলো আজ জীবনের গ্রন্থি-বাঁধন।

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

সুলেখা দাশগুপ্তা

চোখের দু'টো কোণ দু আঙুলে টিপে, মুখটা উৰ্দ্ধমুখী করে মাথাটা চেয়ারে রেখে বসে রইল মৌরী। মঞ্জুর ঐ হাসির পর এ বিষয়ে আর কথা না বলাই ভালো।

অমিতা বললে—মনে করে একজনকে আসতে বলে এলেই হতো।

—কি হতো?

—ওরা একজন কেউ আমাদের নিয়ে যেতে আসতেন।

ফের একই কথা জিজ্ঞাসা করল মঞ্জু—কি হতো তবে?

হেসে ফেললো অমিতা। চকলেটের একটা টুকরো ভেঙ্গে মুখে দিতে দিতে বললো—তবে আর একা মনে হতো না।

গম্ভীর কণ্ঠে মঞ্জু বললো—দেখো বৌদি, মনটাকে আপদ-বিপদে কেবল করুণ আর্তনাদ তোলার জন্য তৈরী না করে তাকে দিয়ে কিছু কিছু ডন-বৈঠক করিয়ে অন্তত পথঘাটটুকু চলার মতো পোক্ত করে তোল তো।

—শরীরের ডন-বৈঠকটা তাই বুঝি। মনেরটা কি রকম তা জানিনে তো!

—একই রকম। অলস না রেখে ওঠ-বস দৌড়-ঝাঁপ, ডামির সঙ্গে লড়াইএর রেওয়াজ করানোটা যেমন শরীরের ব্যায়াম; মনের ব্যায়ামও তেমনি। অলস স্বপ্নে ফেলে না রেখে শক্তকাজ করানো। বিপদ-বিপত্তির ডামির সঙ্গে লড়াই-এর রেওয়াজ রাখা।

অমিতা অবশিষ্ট চকলেটটা মুখে ফেলে হাতের রাংতাটা দিয়ে কাপ বানাতে বানাতে বললো—তা বটে। শরীর তৈরী করলে সে যেমন শক্তির পরিচয় দিতে পারে না। মনও তৈরী না করলে আর্তনাদই কেবল করতে পারে, আত্মরক্ষা করতে পারে না। তাই স্বীকার করার ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল অমিতা।

দুটি ইউরোপীয়ান তরুণীকে নিয়ে এসে চেকার ওদের লাইনের শেষ চেয়ার দুটো টর্চের আলো ফেলে দেখিয়ে দিয়ে গেল। মৌরী চোখ থেকে হাত নামিয়ে সোজা হয়ে বসল। তিন জনই পা হাঁটু মুড়ে পথ করে দিল। ভারী নিতম্ব আর গাউনের মস্ত ঘের প্রায় ওদের শরীরের উপর দিয়ে টেনে নিয়ে গিয়ে চেয়ারে বসে তারা হাত দিয়ে পেছনের বব-চুল কাঁপিয়ে দিতে লাগল। সেন্টের মৃদু গন্ধে ভরে উঠল জায়গাটা। অমিতা একবার দেখে নিল তাদের। তারপর ফের মঞ্জুর দিকে তাকালো। মনটাকে বলিষ্ঠ করা গেল ডামির সঙ্গে লড়াই করে। কিন্তু শরীরটা?

আলো নিভে গেল। পর্দায় পড়ল ভারতীয় সংবাদ-ছবির

ছবি শেষ হয়ে গেল। ভিড়—পায়-পায় এগিয়ে চললো; সঙ্গে সঙ্গে হলের নানা দিক থেকে চেয়ার সোজা করে দেবার শব্দ উঠতে লাগল খট্‌খট্‌। অগত্যা উঠে দাঁড়ালো ওরা তুজনেও। বাইরে এসে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়ালো ওরা মঞ্জুর অপেক্ষায়। সবার মাথার উপর দিয়ে চোখ খুঁজে বেড়াতে লাগল মঞ্জুকে। সন্ধ্যার শো'র ভিড় খালি হয়ে গেল। ভিড় বাড়তে লাগল রাতের শো'র। কিন্তু কোথায় মঞ্জু! একে তো ছবিটা একেবারে বাজে। চোখ বন্ধ করেই থাকতো মৌরী, যদি না চোখ বুজলেই আজকের সন্ধ্যার বার্থলগ্ন আর সুদর্শন এসে ওর মুখোমুখী না দাঁড়াতো, ওর মনের উপর দৌরাত্ম্য আরম্ভ করে না দিত। তার উপর মঞ্জুর এই যথেচ্ছ চলতি মন মেজাজ রীতিমতো ত্যক্ত করে তুলছিল ওর। একটুক্ষণ বাদে হন্তদন্ত অবস্থায় মঞ্জুকে ডান দিকের ফুটপাত থেকে হলের দিকে মোড় ঘুরতে দেখে নেমে এলো অমিতা-মৌরী। মঞ্জুর দিকে না তাকিয়ে, একটা কথাও না বলে হাঁটা দিল মৌরী ট্রাম স্টপেজের দিকে।

মঞ্জু বলে উঠল—কোন দিকে চললি দিদি? ডান দিকে ঘোর।

ভুরু তুটোকে বিরক্তিতে কোঁচকালো মৌরী।

—ভুল চলছিনে।

—বাঃ, চলছিনে কি রকম? 'লাইট হাউসে' যাবো তো। তুটো ছবি দেখবো আজ—এই কথা ছিল না আমাদের বৌদি?

অমিতা খুশীর সঙ্গে মাথা নাড়ল—হাঁ, তা অবশ্যি ছিল।

—সেই জন্য টিকিট কাটতে গিয়েই তো আমার এতো দেরী হয়ে গেল। বড্ড লোকের পেছনে পড়ে গিয়েছিলাম। আর একটু পর হলে আর টিকিটই মিলত না। ছবিটা নাকি ভালো।

মৌরীর ইচ্ছে হলো বলে—তোরা যা। আমি বাড়ী চললাম। কিন্তু বললো না। অযথা পথের উপর কথা বাড়বে। যেতে ওকে হবেই। মন মেজাজ মৌরীর আশ্চর্য রকম দখলে। নীরবে সে অনুসরণ করলো ওদের।

চলতে চলতে জিজ্ঞাসা করলো মঞ্জু—ছবিটা ঠিকই একেবারে বাজে নাকিরে দিদি?

মৌরীর একবার ইচ্ছা হলো বলে, এই 'ঠিক'টা তোকে বললো কে। কিন্তু বললো না। শুধু 'হু' দিয়ে জবাব দিল সে।

অমিতা বললো—যাচ্ছেতাই। না দেখে শাস্তি ভোগ থেকে বেঁচেছ।

চেকারের হাতে টিকিট দিয়ে ভেতরে ঢুকল। চেকার আসন দেখিয়ে দিয়ে চলে গেল। ওরা বসল। কাজু বাদাম, সলটেড বাদাম, চকলেট, দেশী ভুটার খৈ-এর বিলিতি চেহারার প্লাষ্টিক প্যাকেট ইত্যাদির ট্রে গলায় ঝুলিয়ে যারা ঘোরাঘুরি করছিল তাদের একজন কাছে এসে নিচু গলায় 'চকলেট,' সলটেড বাদাম? বলে তুটো প্যাকেট বাড়িয়ে ধরলো! একটা চকলেট কিনে তু ভাগ করে মৌরী আর অমিতার হাতে দিল মঞ্জু। অমিতা জিজ্ঞাসা করলো—তুমি নিলে না?

—আমি ভীষণ খেয়েছি।

হঠাৎ চকলেট খাওয়া বন্ধ করে অমিতা বলে উঠলো—আচ্ছা, রাত বারোটার সময় আমরা তিনজন একা ট্যাক্সি করে যাবো কি করে?

—তিন জনে একা! হেসে উঠল মঞ্জু। তোমরা আর মানুষ হবে না বৌদি।

অশোক চিহ্ন। চুপ করতে বলার বিরক্তি-ব্যঞ্জক দৃষ্টি নিয়ে মৌরী আগেও একবার ওদের দিকে তাকিয়েছিল। আবারও তাকালো। মঞ্জু সংক্ষেপে জবাব সারলো—দুর্বল মনের মানুষ বলিষ্ঠ শরীর নিয়ে যা না করে উঠতে পারে, দুর্বল শরীর নিয়ে বলিষ্ঠ মনের মানুষ তার চাইতে অনেক বেশী করতে পারে—লড়তেও পারে।

কোথাকার কোন মন্ত্রী যেন কোথাকার কোন ইমারতের ভিত স্থাপন করছেন। চকচকে মুখ। দুরস্ত পোষাক। নিজস্ব ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে রক্ষিত দেহে বার্দ্ধক্য রোখা তারুণ্য। শশব্যস্তে একজন এক কণিক সিমেন্ট তুলে দিল তাঁর হাতে। একজন সবিনয় মুখে এগিয়ে ধরে রইল একখানা ইট! দু'তিন জোড়া হাত এগিয়ে রইল তাঁকে সাহায্য করবার জন্য। কর্ণিকের সিমেন্টটুকু বিছিয়ে তার উপর রাখলেন তিনি ইটখানা। দলবল সহ এগিয়ে চললেন তিনি। নিউজ রিলের ক্যামেরা ঘুরে চললো তার সঙ্গে সঙ্গে।

সংবাদ-ছবি। সংবাদপত্রের মতোই পরিবেশন করে চললো টুকরো খবর: ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ার আওয়াজ তুলতে তুলতে চার ইঞ্জিনের বিশেষ ব্যবস্থায় তৈরী বিমান তার বিশাল পাখা ছড়িয়ে নেমে এসে শরীর রাখল মাটিতে। স্মিত মুখে বেরিয়ে এলেন সফর শেষ করে ফিরে আসা কোন এক প্রথম স্তরের ক্যাবিনেট মন্ত্রী। প্রতিক্ষারত শহরের সরকারী বেসরকারী বাছাই করা ভিড়ের হাতের মালা স্তূপীকৃত হয়ে উঠতে লাগল তাঁর গলায়। ক্যামেরা কাঁধে খবরের কাগজের প্রতিনিধিরা লম্বালম্বা পা ফেলে ছুটোছুটি করতে লাগল এদিক ওদিক। পুলিশ ব্যবস্থার ভেতর দিয়ে নতুন মডেলের গাড়ীগুলো আলোর দ্যুতি ঠিকরাতে ঠিকরাতে গিয়ে প্রবেশ করল লাটভবনে। আমাদের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা দেশের এবং মানুষের জীবন যাত্রার মান আজ উন্নত করেছে—আমাদের ক্যাবিনেট মন্ত্রীর ডিনার পার্টির ভাষণের আবেগ কম্পিত ধ্বনি প্রতিধ্বনি তুলতে লাগল সিনেমা হলের দেয়ালে দেয়ালে—'আমরা দ্রুত সমৃদ্ধি ও উন্নতির পথে অগ্রসর হয়ে যাচ্ছি। আমাদের পাঁচ হাজার ক্রোড় টাকার দ্বিতীয়—।'

: জল—জল জল। বদলে গেল পর্দার পটভূমি। প্যানোরেমিক স্ক্রিণের বিশাল বুক জুড়ে থই থই করে উঠল দিগন্ত লীন সমুদ্রপ্রায় জলরাশি। তার এখানে ওখানে দেখা যেতে লাগল কোথাও উঁচু গাছের কেবলমাত্র জেগে থাকা মাথা। কোথাও হাল্কে ছাওয়া চালাটুকু! ডিঙ্গি—নৌকোয় হাঁড়িকুড়ি মাদুরে জড়ানো কাঁথা বালিশ গরু ছাগল তুলে, গরু ছাগলের সঙ্গে একমাথা হয়ে মিশে বসে আছে বন্যা-তাড়িত মানুষ। মাথার ওপর অঝোরে ঝরে চলেছে বৃষ্টি। ভিজছে মানুষগুলোর অনাবৃত মাথা, অনাবৃত শরীর। ভিজছে কাঁথা-বালিশ গরু-ছাগল। দু'একজন ডালা কুলো মাথায় দিয়ে চেষ্টা করছে মাথাটুকু বাঁচাতে। ডাঙায় চলছে রিলিফের কাজ। বিতরণ করা হচ্ছে চাল, ডাল, গুঁড়োদুধ। কুব্জদেহী মানুষ জল কাদার উপর আঁচল বিছিয়ে বসে আছে উবু হয়ে। দেখে বুঝবার উপায় নেই কে নারী কে পুরুষ, কেইবা বালক কেইবা বৃদ্ধ। সম্বলের ভেতর আছে শুধু তাদের কতগুলো বয়সের অঙ্ক—যে অঙ্কগুলো কেবল দুঃসহজীবনকে দীর্ঘ করতেই পারে আর কিছু করতে পারে না। যৌবনটা যদি বিক্রীর সামগ্রী হতো তবে সেটা বিক্রি করেই হয়তো এরা অন্ন ভিক্ষা করতো। ভারতীয় নেতাদের সৌভাগ্য-আকাশের এক মাত্র অন্তরায় যেতো মুহূর্তে দূর হয়ে।

হঠাৎ কেন যে মঞ্জু চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো তা সে নিজেও জানে না। ও উঠে দাঁড়ানো মাত্র অমিতা মৌরীর দৃষ্টি একসঙ্গে গিয়ে ওর উপর পড়তে যেন সম্বিত ফিরে পেয়ে আবার বসে পড়লো মঞ্জু।

—তোর মাথাটা কি একেবারেই খারাপ হয়ে গেল!

রাত বারোটায় ট্যাক্সিতে বাড়ী ফেরবার যে ভয়ে সারা হয়ে যাচ্ছিল ওরা, এই মাত্র বাড়ী ফিরে, বাড়ীর সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে উঠতে ওদের এতক্ষণে মনে পড়লো, পথের ভয়ের কথা প্রায় ওরা ভুলেছিল। মঞ্জুকে অমিতা বলেছিল বাঙ্গালী ড্রাইভার দেখে গাড়ী ধরবার কথা। কিন্তু শুনে মঞ্জু এমন দৃষ্টিতে ওদের দিকে তাকিয়েছিল যেন, অর্বাচীন আর কাকে বলে। ট্যাক্সি পেলে যেখানে বর্তে যাবে সেখানে ড্রাইভার শিখ না বাঙ্গালী, চোখ দুটো তার লাল না সাদা, চেহারটা লোক ভালো বলে বলছে না বলছে মন্দ বলে! সত্য। মঞ্জুর চেষ্টায় যে হলোই না পাক্কা আধ ঘণ্টা ছুটোছুটি করে ফুটপাতের ট্যাক্সি ধরে দেওয়া ছেলেগুলোর একজন যখন ওদের জন্য একটা গাড়ী ধরে নিয়ে এলো তখন ট্যাক্সি পাওয়াটাই সব। ড্রাইভারের কথা ভাববার প্রশ্নই ওঠে না। তবু শিখ ড্রাইভারের গোঁফ দাড়ি ঢাকা মুখ, তার বিশাল বলিষ্ঠ দেহ, তার মোটা লোহার বালা পরা ষ্টিয়ারিং-এ রাখা মজবুত হাতের দিকে চোখ পড়ে, গাড়ীতে মাথা গলাতে বুক ঢিপ ঢিপ করছিল ওদের। কিন্তু মিটার তুলে দিতে ড্রাইভারের স্পষ্ট বাংলায় জিজ্ঞাসা, 'অপনারা কোথায় যাবেন।' আর সঙ্গে সঙ্গে মঞ্জুর আপ বাংলা জানতার মতো মতো অপূর্ব হিন্দী শুনে তার সহাস্য মুখের, 'হাঁ আমি বাংলা জানে।' জবাব ওদের ভয়ের মিটারের পারা একটানে অনেকটা নামিয়ে এনেছিল। তারপর ডাইনে আর বাঁয়ে, আর ডাইনে পথ বাতলে দেবার মাঝে মাঝে মঞ্জুর দু একটা উৎসুক প্রশ্নের জবাবে যখন সে ওদের মুহুর্মুহু চমকিত করে দিয়ে বলতে লাগল, তার মেয়ে কমল বেথন কলেজে পড়ে। ছেলে প্রীতম সিং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। প্রীতম তার মাকে জানিয়ে দিয়েছে সে বাঙ্গালী মেয়ে বিয়ে করবে এবং সেও রবীন্দ্রনাথের কবিতা জানে, 'পেয় আজি এ প্রাতে নিজহাতে কি তোমারে দেব দাম।'

পরভাতের গান? বলে সে যখন আবৃত্তি করে উঠল তখন ভয় ডরের কথা ওদের মনেও নেই। মেয়ের অভ্যাস করা শুনতে শুনতে বাবার মুখস্ত হয়ে যাওয়া অদ্ভুত উচ্চারণের আবৃত্তি শুনে অনাবিল আনন্দে তিনজনেই হেসে উঠেছিল ওরা।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে মৌরী বললো—মঞ্জুর ভাগ্যে এমন ড্রাইভার মিলেছিল।

—আমার না তোদের? সময়টা ভালো কাটলো—বিদেশীর মুখে বাংলা শুনে আনন্দ হলো সে ভিন্ন কথা। কিন্তু বাড়ীতে নির্বিঘ্নে পৌঁছোনোর জন্য কলেজে পড়া ছেলেমেয়ে এবং রবীন্দ্রনাথের নামে জানা ট্যাক্সি ড্রাইভার প্রয়োজন হয় না, এ কথায় তোরাতো গভীর সন্দেহ প্রকাশ করেই চলবি।

সিঁড়িতে বাতি জ্বলছে। খালি গায়, খালি পায় জয়দেব পাটাহাটি করছে। অমিতার কানের কাছে মুখ নিয়ে মঞ্জু বললো—দাদার মুখের চেহারাখানা দেখো।

—তুমি আমাকে হলের ভেতর যে কথাগুলো বলেছিলে বুক ফুলিয়ে সেগুলো শুনিয়ে দেবো। সত্যি তো এতো কি কেবল ভয় আর ভয়। 'বনের বাঘে খায় না মনের বাঘে খায়' মনের এই বাঘের ভয় আমাদের দূর করতেই হবে। এক রাতেই যেন বীর রমনী হয়ে উঠল অমিতা। ঘরে ঢুকে গেল সে। জয়দেব পেছন পেছন ঢুকতে ঢুকতে বললো—তোমরা তিন জনে রাত বারোটার সময় ছবি দেখে একা ট্যাক্সিতে বাড়ী ফিরলে?

আবার সেই তিনজনে একা। মঞ্জু হেসে নিজেদের ঘরের দিকে যেতে যেতে বাসুদেবের বন্ধ দরজায় বেশ জোরহাতে কয়টা থাবড়া দিয়ে বলে গেল, তোমার বৌ নেই বলে বোনদের জন্য বারান্দায় পাটাহাটি করবে না একি রকম কথা।

শোবার আগে চুল বাঁধতে বসে মঞ্জুকে জিজ্ঞাসা করল মৌরী—এবার শুনি, তুই হঠাৎ উঠে ওভাবে কোথায় গিয়েছিলি?

মঞ্জু চুলটুল না বেঁধেই টান হয়ে শুয়ে পড়েছিল বিছানায়। আজ সমস্ত দিনটা গেছে একরকম শুধু দুটো পায়ের উপর। ঘুমে ক্লান্তিতে শরীর ওর আসছিল অবশ হয়ে। ঘুম চোখে জবাব দিল—কালকে বললে হয় না? শুধু তখন কোথায় গিয়েছিলাম এই তো সব নয়। আজকের সমস্ত দিনের কথাই তো জমে আছে। রাত ভোর হয়ে যাবে বলতে বসলে।

—সে সব কথা থাক, কালকেই শোনা যাবে। সন্ধ্যেরটা কেবল শুনি। ঐ লোকটির হোটেলে গিয়েছিলি সে তো বুঝতেই পারছি। কিন্তু কেন।

অগত্যা পাশ ফিরল মঞ্জু। বললো বিয়ের নেমন্তন্ন করে এসেছিলাম কিন্তু না হবার কথাটা কি জানানোর খেয়াল ছিল আমার? তখন মনে পড়ে গিয়েছিল বলেই না তবু রক্ষে।

—হল থেকে একটা ফোন করে দিলেই পারতিস।

—এ সব কথা ফোনে বলা যায়? বিশেষ করে এই শেষ মুহূর্তে যখন তৈরী হচ্ছেন। শোভন হতো সেটা?

—অন্তত এই রাত করে তার হোটেলে যাওয়ার অশোভনতার চাইতে নিশ্চয়ই বেশী শোভন হতো। জট ভেঙ্গে চিরুণী রেখে বিনুনী পাকাতে পাকাতে বললো মৌরী।

—রাত কোরে বলে কি! তখন তো সবে সন্ধ্যে। এখন গিয়ে যদি বলতাম, ট্যাক্সি মিলছে না। আপনার গাড়ীটা দিয়ে একটু পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করুন—হাঁ, তবে নিশ্চয়ই তুই রাত বলতে পারতিস। বলে ঘুমঘুম ভাবের দুটো লালচে চোখের আড়দৃষ্টি ফেললো সে মৌরীর দিকে।

—গেলিনে কেন?

—তোর ভয়।

—তোর দিক থেকে এই রাতে ওখানে যেতেও কোন আপত্তি ছিল না?

—একেবারেই না। এই মাত্র যেমন প্রমাণ পেলি ট্যাক্সি ভীতিটা

তোদের একেবারেই অহেতুক। যদি তুই রাজী থাকিস তো চল, তোকে এক্ষুণি নিয়ে গিয়ে আমি প্রমাণ করে দিচ্ছি, তোর এই ভদ্রলোক ভীতিটাও একেবারে অহেতুক। যথার্থ ভদ্র ব্যক্তির কাছে যে ব্যবহার আশা করা যায়, যখনই যাই না কেন, সেই ব্যবহারই পাবো তাঁর কাছে। আবার তির্যক দৃষ্টি ফেলল মঞ্জু মৌরীর মুখের উপর—আর লোকটি উদারও আশ্চর্য্য রকম। আমাকে একটা গাড়ী তো আজই দিয়ে দিতে চাচ্ছিলেন। হ্যামিলটনের বাড়ীর দামী মালাটা—তা হবে নাকি হাজার দুই তিন টাকা মূল্যের—আমিই ঠেলে রেখেছি।

হাতের বেণী রচনা বন্ধ হয়ে গেল শুধু নয় যেন নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসতে চাইল মৌরীর। মঞ্জুর বোজা চোখের নির্বিকার মুখের দিকে কতটুকু সময় তাকিয়ে রইল সে স্থির চোখে। তারপর বললো—আমি বলে রাখছি, আর তুই ওখানে যেতে পারবিনে।

—না যাবো কেন আর।

খুসী হলো মৌরী। বললো—তুই আবার তবু বলছিস ভদ্র। এসব লোক এমনি লোভ দেখিয়েই এগোয়। হাতের মুঠোয় আনে। আর দুদিন বাদেই দেখতে পেতিস সে তোকে ভালোবাসার কথা জানাচ্ছে। উঠে বাতি নিবিয়ে দিয়ে গায়ের ব্লাউজ বডিস খুলতে খুলতে বললো—এদের এগুনোর পদ্ধতিই এই।

—দুদিন বাদে কেন, সে কথা তো আজই জানিয়েছেন।

—এঁ্যা। এর এগোনোর গতিটা দেখছি কিছু বেশী দ্রুত! তা তুই কি বললি?

—আমি আর কি বলবো। চুপচাপ শুনে গেলাম।

—চুপচাপ বসে লোকটার মুখে ঐ সব কথা শুনলি তুই!

—শুনবো না কেন। 'ভালোবাসি' কথাটার মতো ভালো কথা বিশ্বে আর ক'টা আছে? ওটা শুনতে 'সাট-আপ' বলে চেঁচিয়ে উঠবো বা দুহাতে কান চাপে ছুটে পালবো—আমি কি উন্মাদ।

অন্ধকারে মৌরীর মুখ দেখা না গেলেও তার নড়াচড়াটা দেখা যাচ্ছিল। সেটা যে বন্ধ হয়ে গেছে স্পষ্ট বোঝা গেল। মঞ্জুর চোখের ঘুমও তখন উধাও হয়ে গেছে। উঠে কুঁজো থেকে এক গ্লাস জল গড়িয়ে নিয়ে জলটা চায়ের মতো অল্পে অল্পে খেতে খেতে বললো—জীবনে আমি একজনকে মাত্র ভালোবাসবো, আমাকেও কেবলমাত্র একজনই ভালোবাসবে, ভালোবাসার এ তত্ত্বে বিশ্বাসী নই আমি—শ্রদ্ধাশীল নই আমি। দু'জনে মুখোমুখী গভীর দুঃখে দুঃখী বা গভীর সুখে সুখী যাই হই, চারি দিকে নেই যেন কেউ আর—এটা কল্পনায় ভাবতে গেলেও আমার শরীর শিউরে ওঠে। ভাই-এর মতো—বোনের মতো, মার মতো—বাবার মতো, ছেলের মতো—মেয়ের মতো—স্নেহ ভালোবাসার সব ক্ষেত্রেই একটা 'মতো' বলে কথা আছে—আছে না?

মৌরী চুপ।

মঞ্জু এক চুমুক জল খেয়ে নিয়ে বললো—এই 'মতো'টা দিয়ে মানুষ তার প্রীতির সৌহার্দের গণ্ডি বাড়িয়ে তোলে এবং জীবনের বিস্তৃত ক্ষেত্রে সেই বিস্তৃত বেড়টা নিয়েই সে সুখে দুঃখে আনন্দ বেদনায় এগোয়। কিন্তু ভাই-বোন, মা-বাবা, ছেলে-মেয়ে যে যার জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে একা। 'মতো'র ফাঁকটা ভরাট করবার মাটি মনের ভাণ্ডারে মেলে না। অন্ধকারের ভেতর দৃষ্টিটাকে তীক্ষ্ণ করে মৌরীর মুখটা দেখবার চেষ্টা করতে করতে বললো—ভালোবাসার ক্ষেত্রে—একান্ত জনের ক্ষেত্রেও ঐ 'মতোতে' বিশ্বাসী আমি। সেতারের একটা তারই বাজে কিন্তু ঝঙ্কারের তারগুলো ফেলে দিলে গুণী হাত দিয়ে তা স্পর্শ করবে না! সফটকর্ণার অর্থাৎ মনের সুরেলো কোণগুলোও হলো গিয়ে মনের ঝঙ্কারের তার—নিশ্চল মৌরীর ছায়াটার দিকে তাকিয়ে হাতের গ্লাসটা টেবিলে রেখে উঠে গিয়ে দুহাতে জড়িয়ে ধরল মঞ্জু মৌরীকে। বললো—যাক্ আছিস। আমি ভেবেছিলাম ঘেমে গলে জল হয়ে বুঝি তুই গড়িয়ে গেছিস। যাবরাস নে দিদি ভাই। আমার—

'যেমন বেণী তেমনি রবে
চুল ভেজাবো না গো আমি
বেণী ভেজাবো না—
এধার ওধার সাঁতার পাথার
করি আনাগোনা।
জলে নামবো, জল ছড়াবো,
জলে ডুব দেবো
কারুর কথা শুনবো না।
যেমন বেণী তেমনি রবে
চুল ভেজাবো না—'

মৌরীকে শক্ত হাতে তেমনি জড়িয়ে ধরে তার বুকে এলোমেলো চুল শুদ্ধ মাথাটা ঘষতে ঘষতে মঞ্জু গান ধরল ছোট্ট গলায়।

চায়ের টেবিলের আসরটা এতদিন ধরে ভাঙ্গাই চলছে। যতীন [illegible] আর বাসুদেবের চেয়ার দুটো খালি থাকে। পিসীমা এসে দাঁড়ায় না। জয়দেব আসে। কিন্তু কালকের রাত করে ফেরা নিয়েই হোক বা অন্য কোন কারণেই হোক, একটা মন কষাকষি হয়ে গিয়ে থাকবে অমিতার সঙ্গে তার। আজ সেও অনুপস্থিত। অমিতাও ডেকে পাঠায়নি। রামুর হাতে তিনপ্রস্থ চা খাবার শুদ্ধ ট্রে তুলে দিয়ে ফুলোফুলো মুখে বলেছে, যা দিয়ে আয় বাবুদের সব ঘরে ঘরে।

মৌরীর চেহারাও আজ ভিন্ন রকম। তার মুখের জমা পাথরের মতো চিবুকে আর চোখের অসহ্বলে দৃষ্টিতে এতদিন যা ছিল তা হলো সংগ্রামের ভাব। আজ যেন চিবুকটা তার কিছু নরম। দৃষ্টিটা যেন বাইরের দিকে তীর ছোঁড়া নয়। ভেতরের দিকে ফেরানো এবং ভাবিত। রজতকে নিয়ে মন ওর উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে। মঞ্জুকে ভয় দেখানো বৃথা। যদি বলা যায় ঐ বনে যাসনে মঞ্জু, বাঘ আছে। বাঘ থাকলেও সে তক্ষুণি উঠে দাঁড়াবে—বাঘ? কই দেখি। যদি এমন সে বলে, লোকটি ভালো নয়। এঁর পাতা ফাঁদে পা দিসনে। অমনি সে হয়তো বলে বসবে, ফাঁদ? সেটা কি বস্তু দেখিতো। কাল যদিও মঞ্জু বলেছে, না আর ওখানে যাবো কেন। কিন্তু কো[illegible] নিশ্চয়তা নেই যে মঞ্জুর এ কথায়—এ সত্য মৌরীর চাইতে কে বে[illegible] জানে।

অমিতা ওদের তিন জনের চা ঢালতে ঢালতে বললো—এ[illegible] তোমার কালকের গল্প শুনি। মমতার সঙ্গে তো বললে [illegible] হয়েছিল?

মঞ্জু বেছে কড়া টোস্টের জন্যে একফালি রুটি তুলে নিয়ে মা[illegible] মাখাতে মখোতে বললো—হাঁ দেখা হয়েছিল। জান, আমার মনে

বৌদি, এ বিয়ে না হয়ে ভালোই হয়েছে। সামনের দাঁত তিনটে দিয়ে ঠোঁটটায় কামড় দিল মঞ্জু।

—কেন গো? ঔৎসুক্যে অমিতার চা উছলে পড়ে গেল। চা ঢালা বন্ধ হয়ে গেল। মঞ্জুর দিকে তাকালো সে।

চেয়ারের সামনের পা দুটো শূন্যে তুলে, পেছনের পা দুটোতে দোল খেতে খেতে মঞ্জু যেন ভাবতে লাগল।

ফের চা ঢালতে ঢালতে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে রইল অমিতা। তারপর চা ধরে দিতে দিতে বললো—কেন এ কথা বলছ?

—বলছিলাম এই জন্য—বলে মঞ্জু আবার চুপ করতেই ভয়ঙ্কর বিরক্তিতে ধমকে উঠল মৌরী—কি ন্যাকামোই করছিস।

—বাঃ, ভেবে চিন্তে বলতে হবে না।

—তোকে ঘটনা বলতে বলা হচ্ছে। তোর চিন্তা নয়।

—বিয়ে না হয়ে ভালো হয়েছে এটা কি আমি ঘটনা বললাম? এটা তো আমার চিন্তাই।

—সে চিন্তাটাই তোর মাথায় কোন ঘটনার বীজ পড়ে গজালো সেটাই শুনতে চাচ্ছেন বৌদি।

—তুই?

—আমার কণামাত্র আগ্রহ নেই। বসে হাতের পত্রিকা টেবিলে রেখে চেয়ার ঠেলে উত্মার সঙ্গে উঠে দাঁড়ালো মৌরী।

ঠক্ করে চেয়ারটার সামনের পাদুটো ফেলে সোজা হয়ে বসে হাত চেপে ধরলো মঞ্জু মৌরীর। তার এই উষ্ণভাবের পেছনের কারণটা মঞ্জু বুঝল। কিন্তু কি অযথা। বস্তুত 'ভালো কি মন্দ তা নিয়ে মাথা ঘামানোর প্রয়োজনটা কি ওদের।

বস্তুতঃ মঞ্জু সময়টা নিচ্ছিল কথাটা মনের ভেতর গুছিয়ে নেবার জন্য। কিছুটা ছাঁটকাট চালাতেই হবে। নইলে অবিচার করা হবে অনুপস্থিত সুদর্শনের উপর। অপরের খাতা বিচারে নির্বিচারে তার খাতায়ও শূন্য বসিয়ে রাখবে মৌরী। কে ডাঃ চাটার্জি বিয়ে করতে যাচ্ছে এবং নমিতা নাম্নী মেয়ের সঙ্গে তা নিয়ে কোন সংঘাত আছে কি না; কে ডাঃ বোস। তাকে খুসী করলে কি হতো দরকার কি। ডাঃ সেনকেও মঞ্জু ততটুকুই হাজির করল তার কথায় যতটুকু মমতার প্রয়োজনে না এনে উপায় নেই। ডাঃ চ্যাটার্জিকে নয়, ডাঃ বোসকেও নয় সেনকেও নয়—মঞ্জু বন্ধুর মতো আড়াল দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল যেন সুদর্শনকে।

অমিতা বললো—ওকে তুমি ভাই ও কথা বললে কেন, বিয়ে না হয়ে ভালো হয়েছে? মেয়েটির তো বেশ উঁচু দরের চরিত্র।

—উঁচু মাথার মতোই উঁচু চরিত্রের জন্য প্রবেশ পথের গেট উঁচু হতে হয়। নইলে কেবল মাথা ঠোকাঠুকিই সার হয়।

অমিতা এ বাড়ীর বধূ। আহত হলো সে। আত্ম অভিমানে আঘাত লাগল তার। চা খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। চায়ের পাট ট্রেতে তুলে নিয়ে চলে গেল সে ভাঁড়ারের কাজে।

মৌরী বলল—মমতা তো তক্ষুণি চলে গেল। তারপর তবে এই পাঁচটা পর্যন্ত ছিলি কোথায় তুই?

—সেখানেই।

—সেখানেই।

—হাঁ। যখন শুনলাম মমতা বলে গেল তার দাদা এক্ষুণি আসছেন তখন তার দাদার অপেক্ষায়ই বসলাম। মানে বসাই তো ছিলাম। আর উঠলাম না।

পাশের বাড়ীর রেডিওটায় বহুক্ষণ থেকেই গান বেজে চলছিল। সেটায় এবার বেজে উঠল সানাই। সানাই-এর সুরে একই সঙ্গে মৌরী মঞ্জু এমনই অন্যমনস্ক হয়ে গেল যে, মুহূর্তের জন্য একজন আর একজনের কথা গেল বিস্মৃত হয়ে।—আজ একুশে আষাঢ়ের ভোর। আজকের এই ভোর ছিল মৌরীর জীবনে পুরুষস্পর্শে জেগে উঠবার প্রথম ভোর। তার মনের আনন্দ-বেদনার সুরে সুরভরে নিয়ে সানাই-এর এ বাড়ীতে আজ কেবল কেঁপে কেঁপে বেজে চলবার কথা ছিল।

কিন্তু একুশে আষাঢ়ের ভোর এরও বহুপূর্বে চোখ মেলেছিল লক্ষ্ণৌ শহরে, সুদর্শনের ঘরে। সুদর্শনকে একটিবার দেখে আসবার যে দিব্য দৃষ্টিটুকুর জন্য মঞ্জু কাতর হচ্ছিল, যদি সে তা এখন লাভ করতো, তবে দেখতে পেতো ঠিক এই মুহূর্তে সুদর্শন তার হাতের বিংশতিতম সিগারেট শেষ করে একবিংশতিতম সিগারেট হাতে তুলে নিচ্ছে।

[ক্রমশঃ।

ভুল-ভাঙ্গা

জয়শ্রী বসু

ইনিয়ে বিনিয়ে প্রেমের কবিতা
বলেছ অনেক, আর না আর না
শোন শোন ঐ রাতের কান্না।

ললাটে তোমার এক গোছা চুল
লুটায় আলসে সন্ধ্যা-সকাল
মন মরুভূমে পড়েছে অকাল।

জলভরা দুটি ছল-ছল চোখে
কিসের আভাস বুঝি না, বুঝি না
পুরানো স্মৃতিরে আর তো খুঁজি না।

তোমার আমার দুই সুখী মন
এ লজ্জা আজ কোথায় যে রাখি
ভুল ভেঙ্গে যেতে নেই আর বাকী।

আজকে বন্ধু বিদায়, বিদায়
এ পথ তো জানি আমার একার
শেষ হয়ে গেছে স্বপ্ন দেখার।
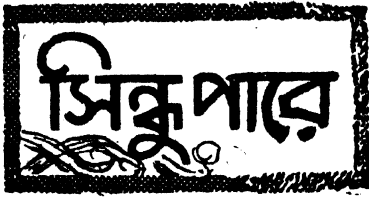
শ্রীনীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত

আঠারো

বুলা! এইবার আমার জীবনের প্রথম পর্ব্ব শেষ করি। বাকি বছরখানেকের মধ্যে এ দেশের জীবনে বৈচিত্র্য আমার কিছুই ঘটেনি—তাই সে বিষয় বিস্তারিত লিখলে তোমার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটতে পারে—কি প্রয়োজন তার? এক কথায় জীবনটা আমার ক্রমেই মসগুল হয়ে উঠছিল—মার্লিনকে নিয়ে। ক্রমে এমন হল—সরল ভাবেই স্বীকার করি—একদিনও যেন কেউ কাউকে না দেখে থাকতে পারি না। যদি বল একটা নিদারুণ নেশায় আমাকে পেয়ে বসেছিল, বলব হয়ত তাই। কিন্তু তোমাকে এইটুকু শুধু ভেবে দেখতে বলি—জীবনে বেঁচে থাকাটাই ত একটা নেশা; নইলে মানুষ হাজার দুঃখ-কষ্ট সত্বেও জীবনটাকে এমন করে আঁকড়ে ধরে কেন?

যাই হোক, শেষপর্য্যন্ত মাস ছয়েক পরে আমাকে ডব্লিন ছাড়তে হল। আমার কাজের মেয়াদও গেল ফুরিয়ে, এবং পরীক্ষা দেওয়ার জন্ম লণ্ডনে কিছুদিন থাকারও হল প্রয়োজন। লণ্ডনে ডাক্তারী বইয়ের ভাল ভাল লাইব্রেরী আছে ডব্লিনে ত সে সব কিছুই নাই। এবং তাছাড়া পরীক্ষার জন্ম ভাল ভাবে তৈরী হতে হলে কিছুদিন লণ্ডনের আবহাওয়ায় থাকাও প্রয়োজন। তাই পরীক্ষার আগে মাস তিনেক লণ্ডনে এসে বাস করেছিলাম।

ডব্লিন ছেড়ে আসার সময় মনের অবস্থা যে নিদারুণ হয়ে উঠেছিল—সে কথা আর বিস্তারিত করে তোমাকে লিখব না। বারে বারে বলেছিলাম, লীনা, রোজ কিন্তু তোমার একখানা চিঠি চাই। মার্লিন মুখে কিছুই বলেনি। এমনকি আমাকে অনুরোধ ও জানায়নি—রোজ একখানা করে চিঠি দিতে। আমিই বলেছিলাম আমিও লিখব রোজই। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত, আমার চিঠি লিখতে দু'এক দিন বাদ গেলেও মার্লিনের চিঠি রোজ আসত লণ্ডনে। এ ছাড়া এই তিন মাসের মধ্যে দু'তিন দিনের জন্ম বার তিনেক আমি ডব্লিন ঘুরেও এসেছি। ছিলাম অবশ্য জর্জ হোটেলে।

* * * *

লণ্ডনে, এই মাসতিনেক থাকার বিষয় সংক্ষেপে বলি।

লণ্ডনে এসে বাসা নিয়েছিলাম, টেভিষ্টক স্কোয়ারের কাছে কার্টরাইট গার্ডেনস্ বলে একটি রাস্তার একটি ছোট হোটেলে—হোটেলটির নাম ক্রেসেণ্ট হোটেল। যদিও নামে হোটেল, আসলে এটি এদেশে যাকে বোর্ডিং হাউস বলে—তারই অন্যতম। ছোট দোতলা একটি বাড়ী, রাস্তা দিয়ে কয়েক ধাপ সিঁড়ি উঠে গিয়ে সদর দরজা এবং যেমন লণ্ডনের সাধারণ বাড়ীগুলি হয়—সদর দরজা দিয়ে ঢুকে একটি বারান্দা মতন স্থান এবং তার মধ্য দিয়ে একটি সিঁড়ি উঠে গিয়েছে দোতলায় এবং তিনতলায়। এই বাড়ীর তিনতলার উপরে রাস্তার দিকে একটি ছোট ঘর আমি পেয়েছিলাম—একটি মাত্র বড় জানালা দিয়ে বাইরে রাস্তার ওপারে কার্টরাইট গার্ডেনস বলে ছোট্ট পার্কটি দেখা যায়। এ ঘরটি আমার জন্ম ঠিক করে দিয়েছিল রায় (নৃপতি রায়) বলে একটি ব্যারিষ্টারী-পড়া লণ্ডন প্রবাসী ছাত্র।

তোমাকে আগে বলিনি—পাউইস গার্ডেনস-এর ফ্ল্যাটে থাকার সময় দু'চারটি ভারতীয় ছাত্র মাঝে মাঝে আসত সেখানে এবং নৃপতি রায় তাদের মধ্যে একজন। নৃপতি বিশেষ করে সুনীলেরই বন্ধু ছিল, কিন্তু সকলের সঙ্গেই সুমিষ্ট ব্যবহারে সে আমাদের সকলেরই ছিল প্রিয়। নৃপতি রায়কে দেখেই আমার ভাল লেগেছিল এবং তার সঙ্গে ভাবটি বজায় রাখার তাগিদ পেয়েছিলাম মনে—মাঝে মাঝে চিঠিপত্রের আদান-প্রদানে সেই ভাবটুকু আমি বরাবরই রক্ষা করে এসেছিলাম। সৌখিন ছোটখাট মানুষটি, ব্যবহারে কথায়-বার্ত্তায় সব সময়ই তার কাছ থেকে একটি সুরুচির পরিচয় পাওয়া যেত—এবং সেইটিই আমাকে বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করেছিল তার প্রতি। পরে শুনেছিলাম—ব্যারিষ্টারী পাশ করে দেশে ফিরে গিয়ে অল্প কিছুদিনের মধ্যেই মারা যায়—পেটের কি একটা নিদারুণ অসুখে! এবং তার মৃত্যুর খবর পেয়ে আমি বিশেষ মনোকষ্ট পেয়েছিলাম, আজও মনে আছে। শুনেছিলাম—একটি সুন্দরী তরুণী বিধবাকে এ সংসারে রেখে সে জীবন থেকে নিয়েছিল বিদায়।

এই সময়, অর্থাৎ কার্টরাইট গার্ডেনস-এ থাকার সময় এই নৃপতি রায়ের সঙ্গে আমার ভাবটা বেশ জমে উঠেছিল এবং তার সঙ্গে মিশে মনে আনন্দই পেতাম। সেও থাকত কার্টরাইট গার্ডেনস-এর কাছাকাছি র‍্যাসেল স্কোয়ারে মিউজিয়াম ষ্ট্রীটে এবং প্রায়ই রোজই বিকেলবেলা সে আসত আমার ঘরে আমাকে নিয়ে বেড়াতে যাওয়ার জন্ম। সমস্তদিন পড়াশুনার পর তার সঙ্গে বেড়াতে যাওয়াটা বেশ মধুরই লাগত মনে। বেড়িয়ে দুজনে রাত্রে এক সঙ্গে বাইরে ডিনার খেয়ে যে যার বাড়ী ফিরে যেতাম। বলতে ভুলে গিয়েছি—ক্রেসেণ্ট হোটেলে শুধু বেড ও ব্রেকফাষ্টের বন্দোবস্ত ছিল আমার, তাই মধ্যাহ্ন ভোজন বা সান্ধ্য ভোজন বাইরেই সেরে নিতে হত। ক্রেসেণ্ট হোটেলের কাছাকাছি 'গ্রীন কাফে' বলে বেশ সস্তার একটি ভোজনাগার ছিল—বেশীর ভাগ দিনই আমি খেয়ে নিতাম সেইখানে। আগেই বলেছি—নৃপতি রায় একটু সৌখিন রুচির লোক ছিল। তাই তার পাল্লায় পড়ে মাঝে মাঝে ভাল ভাল রেস্তোরাঁতে দুজনে ডিনার খেতাম এবং সেটুকু সে জীবনে বেশ উপভোগই করেছি। কোথায় কোন ভাল রেস্তোরাঁতে কোন খাবারটি পাওয়া যায়—এসব নৃপতির বেশ ভালই জানা ছিল।

বুলা! তার সঙ্গে একদিনের কথাবার্ত্তার বিষয় একটু বলি। তা হলেই তার চরিত্রগত মনোভাবের কতকটা বুঝতে পারবে। সেদিন আমরা দু'জনে সান্ধ্যভোজনে গিয়েছিলাম—পিকেডেলি সার্কাসের সংলগ্ন ছোট একটি গলিতে, ছোট্ট একটি রেস্তোরাঁয়। এ রেস্তোরাঁর খবরটি নৃপতির জানা ছিল—এখানে খাবার নাকি অতি উপাদেয়। রেস্তোরাঁটি সাধারণ রকমের মোটেই নয়—রাস্তা দিয়ে ঢুকে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যেতে হয় বেসমেণ্টে এবং সেখানে একটি ঘর নানারকম আলোর সামঞ্জস্যে সুন্দর সাজান। আলোগুলি যে খুব উজ্জ্বল তাও নয়—একটু চাপা রকমের আলোর বাহারে যেন একটি স্বপ্নরাজ্য তৈরী হয়েছে—সমস্ত বাইরের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন।

ঘরের কোণে কোণে খাবার টেবিলগুলো এমন ভাবে সাজান যে টেবিলের উপর সবই বেশ পরিষ্কার দেখা যায় অথচ যারা এইসব টেবিলে বসে খাচ্ছে—ঘরে ঢুকে তাদের মুখ চেনা যায় না।

আমরা যখন ঢুকলাম—কোণের টেবিলগুলি সবই দখল করা হয়ে গেছে—তাই আমাদের নিতে হল ঘরের মাঝামাঝি একটি টেবিল।

বললাম, বাঃ জায়গাটি ত বেশ—একটু নতুন রকমের।

বলল, খাবারও এখানে খুব ভাল—খেয়ে দেখ—একটা বিশেষত্ব আছে। এবং মোটের উপর বেশ সস্তা। ক্রমে খাবার এল—সত্যিই নৃপতির কথা ঠিক। খাবারগুলিতে একটা বিশেষ সুস্বাদ টের পেলাম।

শুধালাম, তা এতদিন এখানে আমাকে আননি কেন?

মৃদু হেসে নৃপতি বলল, একটু অপেক্ষা কর, এখুনিই টের পাবে।

কি ব্যাপার বুঝতে না পেরে একটু চুপ করে আছি, এমন সময় দুটি তরুণী হেলে দুলে এসে ঢুকল ঘরে, একবার এদিক ওদিক চেয়ে বসল আমাদেরই টেবিলের পাশের টেবিলে। আমি একবার তাদের দিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখলাম—সাজগোজেরও যত বাহার, মুখে রং মাথারও তত। মনে হল—সত্যিকারের আসল রূপটি বাইরের রং চংয়ের বাহারে চাপা পড়ে গেছে। ভাল করে সত্যিকারের রূপটি দেখে নেওয়ার জন্য আমি চেয়েই রইলাম—এরা আমার মার্লিনের পাশে কি দাঁড়াতে পারে?

হঠাৎ নৃপতি বলল, ওরকম করে চেয়ো না—এখুনিই ধরা পড়ে যাবে।

শুধালাম, কি রকম?

বলল, আর একটু চাইলেই, মৃদু হেসে এগিয়ে আসবে আমাদের টেবিলে। বলবে—আমাকে একটা Drink খাওয়াও না।

হেসে শুধালাম, তারপর?

বলল, তারপর আর কি। ক্রমে তোমাকে গ্রাস করবে—মরবে হাবুডুবু খেয়ে।

কথাটা আমি যে একেবারেই জানি না, তা নয় আগে এ ধরণের কথা বন্ধুবান্ধবের কাছে শুনেছি।

বললাম, আচ্ছা, ওদের কি একটুও লজ্জাসরম নেই।

বলল, ঐ ত ওদের ব্যবসা। তাই ত' এদেশের মেয়েদের কাছ থেকে শত হস্তেন বাজিনা—

মার্লিনের কথা নৃপতিকে এতদিন কিছুই বলিনি।

বললাম, এদেশের সব মেয়েই ওরকম নয়। ভাল মেয়েও ঢের আছে।

নৃপতি বলল, হয়ত আছে। কিন্তু কোথায় তারা? তাদের সঙ্গে আমাদের কোনও যোগাযোগই হয়না। তারা আমাদের কাছে আসবেই বা কেন। আমাদের সঙ্গে যাদের যোগাযোগ হয়—সবই এই শ্রেণীর। কাজেই জীবনে ওদের এড়িয়ে চলাই ভাল। যে ক'টা দিন এদেশে আছি দরকার কি ওদের খপ্পরে পড়ায়।

শুধালাম, এ ধরণের মেয়েদের কথা ছেড়ে দাও, কিন্তু সত্যি ভাল মেয়ের সঙ্গে যদি বন্ধুত্ব হয়—সেটাও কি তুমি মানবে না?

নৃপতি বলল, দেখ, মেয়ে-পুরুষের ও ধরণের বন্ধুত্বটা আমি ঠিক বিশ্বাস করি না। তার পিছনে Sex (যৌনবৃত্তি) থাকবেই। তাই আমার মনে হয়, যখনই কোনও মেয়ে আমাদের মতন কালো-লোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব করবার জন্য এগিয়ে আসে—সে মেয়ে, ভাল মেয়ের দলে ঠিক নয়।

কথাটায় আমার মন যে একেবারেই সায় দেয়নি—বলাই বাহুল্য।

বললাম, প্রেম জিনিষটাও তুমি কি অস্বীকার কর? একটি যথার্থ ভাল মেয়ের সঙ্গে আমাদের মতন ভারতবাসীর প্রেম হওয়াও কি অসম্ভব?

নৃপতি হেসে উঠল। বলল, তোমার কথা যদি মেনেওনি—প্রেম। প্রেম জিনিষটা ত দুদিনের নেশা—সময় কেটে যাবেই। তখন? যদি বিবাহে তার পরিণতি হয়—তখন ত খালি বিরোধ। এদেশের মনোবৃত্তির সঙ্গে আমাদের মনোবৃত্তি কিছুতেই খাপ খায় না, কেন না দুই দেশের মনের গড়নই আলাদা। তাই ও পথে না যাওয়াই ভাল।

বহুদিন আগে চন্দ্রনাথের কথাটা মনে পড়ল—তেলে জলে মিশ খায় না। কথাটা আমি যে এখন আদৌ মানি না—একথা লেখাই বাহুল্য।

শুধালাম, আচ্ছা রায়! তুমি ত' প্রায় দু' বছরের উপর এদেশে আছ—তোমার কোনও মেয়ে বান্ধবী হয়নি?

বলল, না—আমি এড়িয়ে চলেছি। মনে যে সখ একেবারেই হয়নি—এমন কথা বললে মিথ্যে কথা বলা হবে। এবং সুযোগও ঘটেনি—তাও নয়। কিন্তু মনকে দৃঢ় করে সব সময়ই নিজেকে নিয়েছি গুটিয়ে।

বললাম, তোমার মনের জোর অসাধারণ।

বলল, ঠিক তা নয়। কথাটা কি জান—এদেশের মেয়েদের প্রতি আমার তেমন আস্থা নাই—মেশামিশিতে কখন কি বিপদের সৃষ্টি হয়, সেই ভয়েই এগুতে পারিনি। তাছাড়া দেশে আমার স্ত্রী আছে, তার মুখখানা মনে পড়লে—

যদিও মার্লিনের ব্যাপারে নিজেকে কোনও দিনই আমি দোষী মনে করিনি, তবুও নৃপতির কথা শুনে মনে মনে তার প্রতি শ্রদ্ধাই হল। ইতিমধ্যে অনেকবার ভেবেছি—মার্লিনের ব্যাপারটা নৃপতিকে সব বলি। কাউকে সব কথা বলে মার্লিনকে নিয়ে আলোচনা করার মধ্যেও যে একটা আনন্দ ছিল আমার মনে। কিন্তু আজ নৃপতির কথাগুলি শুনে সহজেই মনে হল—নৃপতিকে মার্লিনের কথা একেবারেই বলা চলে না। বলতে গেলে লজ্জাই পাব। কিন্তু কেন?

খাওয়া দাওয়া শেষ করে দুজনে উঠলাম। উঠে মেয়ে দুটির দিকে চেয়ে দেখলাম। তারা তখন দুজনে দু'গ্লাস সুরা নিয়ে বসে খাচ্ছে এবং গল্প করছে। আমার সঙ্গে চোখাচোখী হওয়াতে একটি মেয়ে মৃদু হেসে চোখের ইসারায় আমাকে জানাল আমন্ত্রণ।

নৃপতি বলল, চল চল।

* * * * *

নৃপতির মনের আর একটু পরিচয় অল্প কিছুদিনের মধ্যেই পেলাম তার প্রতি শ্রদ্ধা বাড়ল। ইতিমধ্যে সুনীলের কথা একটু বলে নি।

সুনীল রায়কে মনে আছে ত? সেই সুনীলের সঙ্গে ইতিমধ্যে লণ্ডনে আসার পর দু'-তিন দিন দেখা হয়েছিল। সুনীল তখন

থাকত—এলটাম পার্কে সেই মিসেস ব্লেকের বাড়ী। লণ্ডনে আমার দু'-চার দিনের মধ্যেই একদিন বিকেলে তার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম—এলটাম পার্কে। দেখা হল এবং সুনীল ত আমাকে দেখে আনন্দেই অস্থির। মিসেস ব্লেকের সঙ্গেও দেখা হল এবং একথা জোর করে বলতে পারি তিনিও এতদিন পরে আমাকে দেখে যথার্থ উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিলেন। অনেকক্ষণ বসে অনেক কথাবার্তা হল এবং শেষ পর্য্যন্ত সুনীল বিশেষ ধরে বসল—রাত্রে খেয়ে যাবার জন্য। মিসেস ব্লেক যে সে কথার খুব সমর্থন করেছিলেন—এমন কথা বলতে পারি না। তবে তাঁর ভাব ভঙ্গি দেখে মনে হয়েছিল—তাঁর তেমন তেমন আপত্তি নাই।

মুখে বললেন—মিঃ চৌধুরী আমাদের সঙ্গে খেয়ে গেলে যে আমি বিশেষ সুখী হব—সে কথা বলাই বাহুল্য। তবে বিশেষ ত কিছু রাঁধিনি—উঁকে খেতে কি দেব?

সুনীল বলল—যা আছে তাই ভাগাভাগি করে খাব।

শেষ পর্য্যন্ত খেয়ে দেয়ে রাত্রে গ্রীনহোম রোড থেকে ফিরে এলাম এবং সুনীল ও মিসেস ব্লেক দুজনেই ষ্টেশন পর্য্যন্ত আমাকে পৌঁছে দিয়ে গেলেন।

খেতে বসে বলেছিলাম এলটাম পার্কে ত বেড়াতে যাওয়া হল না—সেই প্রথম ইংলণ্ডে এসে কত বেড়িয়েছি।

তৎক্ষণাৎ সুনীল আর একদিন খাওয়ার নিমন্ত্রণ করে বসল এবং মিসেস ব্লেকও সে কথায় সায় দিলেন। ঠিক হল দিন চারেক পরে আমি গিয়ে খেয়ে দেয়ে লণ্ডন থেকে এলটাম পার্কে বেড়িয়ে যাব।

একটা জিনিষ বিশেষ করে লক্ষ্য করেছিলাম—সেটুকু এইখানেই বলে রাখি। সুনীল এলটাম পার্কে তার বাসাটি ঠিক নিজের বাড়ীর মতনই করে নিয়েছিল। বাড়ীর সমস্ত কাজে, এমন কি রান্না-বান্নায়ও মিসেস ব্লেককে সাহায্য করত—সেটা অবশ্য সুনীলের নিজস্ব স্বভাব। শুধু তাই নয়, সমস্ত বাড়ীর উপর তার যেন একটা কর্তৃত্ব আছে—ধরণে ধারণে সেটা পরিষ্কার হয়ে ফুটে। এবং মিসেস ব্লেকও হাসি মুখে তার সমস্ত আবদার সহজেই মেনে নিতেন—সেটুকুও আমার লক্ষ্য এড়ায়নি। সুনীল অবশ্য বয়সে আমাদের সকলের চেয়ে একটু ছোট এবং সহজেই সকলের স্নেহ কেড়ে নেওয়ার শক্তি তার ছিল—সে ইঙ্গিত আগেই দিয়েছি। কিন্তু মিসেস ব্লেকের স্নেহ শেষ পর্য্যন্ত সুনীল যে এমন করে কেড়ে নেবে—সেটা আগে ধারণা করিনি।

দ্বিতীয় দিন কথায় কথায় এক ফাঁকে সুনীলকে বললাম, বেশ জমিয়ে আছেন দেখছি।

একটু হেসে বলল, হ্যাঁ খাসা আছি। ভদ্রমহিলা যে আমাকে কি যত্ন করেন—

শুধালাম, এখানে আছেন কতদিন?

বলল, তা অনেকদিন—ছ' মাসের উপর হয়ে গেল।'

যে ক'টাদিন এদেশে 'থাকব—এইখানেই থাকব। আর কোথাও যাচ্ছিনা।

একটু হেসে শুধালাম, মলির কি খবর?

হেসে বলল, তার সঙ্গে আর কোনও যোগাযোগ নেই—অনেক দিন ছিন্ন হয়ে গেছে।

একবার ইচ্ছা হল শুধাই—এখন কোনও মেয়ে বন্ধু নাই? কিন্তু জিজ্ঞাসা করতে লজ্জা হল—সুনীলও আর কিছু বলল না। দ্বিতীয় দিন খেতে খেতে সুনীল বলেছিল, চৌধুরী আপনি এসে পড়েছেন খুব ভালই হয়েছে। আমরা সেক্সপীয়ার হাটে নীরেনের মৃত্যু-বার্ষিকী করছি—এই সামনের ২৭শে তারিখ। আর দিন দশ-বারো বাকী। বিকেল চারটায়। আপনাকে কিন্তু আসতেই হবে।

শুধালাম, আমরা মানে—কে কে?

বলল, আমিই প্রথম জিনিসটার উদ্যোগ করি—তবে সকলের কাছ থেকেই বেশ সাড়া পেয়েছি। লণ্ডন প্রবাসী বাঙ্গালী ছাত্ররা ত প্রায় সবাই আসবে এবং তাছাড়া কিছু কিছু ইংরেজ ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলাও আসবেন আশা করছি। মিসেস ব্লেকও যাবেন।

মিসেস ব্লেক বললেন, নিশ্চয়ই যাব। দু'এক দিন ত মাত্র তাকে দেখেছিলাম, কিন্তু আমার খুব ভাল লেগেছিল। কেমন হাসিমাখা মুখখানা—

বললাম, যাব ত নিশ্চয়ই। নৃপতি জানে না? সে ত আমাকে কিছু বলেনি।

সুনীল বলল, জানে বৈকি। সেই ত আমার সঙ্গে ঘুরে ঘুরে অনেক সাহায্য করছে।

দ্বিতীয় দিন খাওয়া দাওয়া সেরে এলটাম পার্কে বেড়াতে গেলাম—সেই এলটাম পার্ক।

* * * *

যথা সময়ে নৃপতির সঙ্গে গেলাম—নীরেনের স্মৃতি সভায়। ভেবেছিলাম—দু চার জন বাঙালী ছাত্র মিলে এই ব্যাপারটির আয়োজন করেছে, অতএব বেশী লোকের ভিড় হবে না। কিন্তু সত্যিই দেখে অবাক হয়েছিলাম—যথেষ্ট ভারতীয় ছাত্র সমবেত হয়েছে—সেক্সপীয়ার হাটে। সামনের হলটি প্রায় গিয়েছে ভরে। এ ছাড়া ইংরেজ ভদ্রলোক এবং ভদ্রমহিলাও দু' চার জন ছিল—তার মধ্যে মিসেস ব্লেকও ছিলেন উপস্থিত।

নৃপতিকে বললাম, লোক ত কম হয়নি।

নৃপতি বলল, হবেই ত নীরেনের জানা শোনাও ছিল অনেক এবং সে সকলেরই প্রিয় ছিল যে।

বললাম, তা বটে। তার চরিত্রগত মাধুর্য্যের কথা ত অস্বীকার করা চলে না।

উচ্ছ্বসিত হয়ে নৃপতি বলল, শুধু কি তাই, তার মনটা কত বড় দরাজ ছিল জানেন? ভারতীয় ছাত্রদের মধ্যে অনেকেই তার কাছে ঋণী। বিপদে পড়ে, টাকার সাহায্য চাইলে সে কাউকে বিমুখ করেনি। বেশ মোটা হাতে টাকা দিত। আমি নিজেই ত দু'তিন জনার বিষয় জানি। তারা ওর জানাশুনাও বিশেষ ছিল না। আমার কাছে এসেছিল—কিন্তু আমার হাতে তখন টাকা না থাকাতে ওর কাছে পাঠিয়েছিলাম। আমার কথায় অনায়াসে তাদের দিল টাকা।

নীরেনের মতন নৃপতিও ছিল খুব বড় লোকের ছেলে এ খবর অবশ্য আমার আগেই জানা ছিল। সে যাই হোক, নৃপতির কথা শুনে চুপ করেই রইলাম। তার কথায় নীরেনের প্রতি যে একটা অকৃত্রিম সহজ শ্রদ্ধা প্রকাশ হল—এমি জনসনের ব্যাপারটা কি সে জানে না? নৃপতির এদেশের মেয়েদের প্রতি মনোভাবও আমি

জানি এবং নীরেন-এমির ব্যাপারটা ত লণ্ডনে বাঙালী ছাত্র সমাজে কারোই বোধ হয় অজানা নাই—তবে ?

নৃপতিই আবার বলল, নীরেনের জীবনের সবই ত আমি জানি। দিনকতক রাহুগ্রস্ত হলেও সে ছিল আসলে চাঁদ।

হলের একপাশে নীরেনের একটি বড় ছবি সুন্দর করে ফুল দিয়ে সাজান ছিল এবং দেখলাম সবাই একে একে সেই ছবিতে গিয়ে ফুল দিয়ে আসছে। আমরাও সঙ্গে কিছু ফুল কিনে এনেছিলাম—দু'জনে গিয়ে ফুল দিলাম নীরেনের ছবিতে।

ছবিটার দিকে চেয়ে দেখি—একদৃষ্টে আমার দিকে আছে চেয়ে, মুখে লাগান রয়েছে সেই মৃদু হাসিটি।

নীরেনের গুণাবলীর বিষয় দু' একটা বক্তৃতার পর ক্রমে সভার কাজ শেষ হল ; সুনীল মহা ব্যস্ত, এদিক ওদিক ছুটে বেড়াচ্ছে—তাই তারসঙ্গে বিশেষ কথাবার্তা হলনা। সভার শেষে মিসেস ব্রেকের সঙ্গে দুচারটে কথা বলে, আমিও নৃপতি একসঙ্গে সভা ত্যাগ করলাম।

বাইরে এসে দেখলাম—নীরেনের হাসিমাখা মুখখানা মনটাকে একেবারে পেয়ে বসেছে—তার প্রতি একটা অভূতপূর্ব দরদে মনটা ভারি হল। বারে বারে মনে হতে লাগল নৃপতির কথাটা—দিনকতক রাহুগ্রস্ত হলেও সে ছিল আসলে চাঁদ।

* * * *

আগেই বলেছি—মালিনের কাছ থেকে রোজই চিঠি পেতাম এবং রোজই অনেকক্ষণ বসে বারে বারে চিঠিখানা পড়তাম—আজও মনে আছে। চিঠির মধ্যে কোথায় কোন কথাটায় আমার প্রতি সত্যিকারের প্রাণের দরদটা সব চেয়ে বেশী উঠেছে ফুটে—সেটা আবিষ্কার করা যেন আমার একটা বিশেষ কাজ হয়ে উঠেছিল। এবং শেষ পর্য্যন্ত প্রত্যেক চিঠির মধ্যে সেই কথাটি আবিষ্কার করে সেই কথাটাকে তুলে নিতাম প্রাণে। এবং পরের দিনের চিঠি না পাওয়া পর্য্যন্ত উঠতে বসতে শুতে সেই কথাটি একটি মধুর সুরে বাজত সারাক্ষণ আমার অন্তরতম অন্তরে—আনন্দে ভরিয়ে দিত মন এবং উৎসাহ দিত কাজে।

বুলা ! কথাটা আরও একটু পরিষ্কার করে বলা দরকার ! নৈলে হয়ত তুমি একটু ভুল বুঝতে পার। সাধারণত প্রেমপত্র বলতে তোমরা যা বোঝ, মালিনের সে যুগের চিঠি মোটেই সে রকমের নয়। সহজ সাধারণ চিঠি—প্রেমের বিশেষ কোনও অভিব্যক্তি তার মধ্যে ছিলনা—কোনও উচ্ছ্বাস ত ছিলই না তবুও এটা বরাবরই লক্ষ্য করেছিলাম—চিঠিখানা ভাল করে পড়লে দেখা যেত তার মনের নিবিড় অনুভূতিটির সূক্ষ্ম ইঙ্গিত কোথাও না কোথাও আছে লুকিয়ে—শুধু একটু খুঁজে নেওয়া সাপেক্ষ।

সে যুগের তার চিঠিগুলি এখনও আছে আমার কাছে। তার মধ্য থেকে তিনখানা চিঠি আমি তোমার জন্য তুলে দিচ্ছি আমার এই চিঠিতে। ভাল করে পড়লে আমার কথাটা কতকটা হয়ত বুঝতে পারবে।

* * * *

প্রিয়তম বিকো ! একটা ভারি মন নিয়ে রোজই সকালে ঘুম ভাঙে, তারপর সেই ভার বয়ে সংসারের দৈনন্দিন সমস্ত কাজই করে যাই—কিন্তু কিছুতেই কোনও উৎসাহ পাই না। তুমি চলে যাওয়ার পর থেকে এক ভাবেই একটির পর একটি করে আমার দিনগুলি কেটে যাচ্ছে। কত বড় আনন্দের খোরাক আমার জীবনে রয়েছে সেটা ত আমার অজানা নয়। তবুও কেন এমন হয়—এই কথাটি বারে বারে ভেবেছি। কিন্তু মনের কাছ থেকে এতদিন কোনও সদুত্তর পাইনি। গতকাল মনে হল যেন উত্তরটি পেলাম। সেই কথাটিই আজ তোমাকে বলব।

আমাদের বাড়ীর পিছনে যে ছোট প্রাঙ্গণটা আছে সেখানে একটি বড় অ্যাস (Ash) গাছ আছে—তুমি দেখেছ নিশ্চয়ই। এখন গ্রীষ্মকাল, গাছটি পাতায় ভরা। আমি ফাঁক পেলেই তার তলায় গিয়ে বসি, সেইটুকুই যেন আমার জীবনের একমাত্র আনন্দ হয়ে উঠেছে। আমাদের বাড়ীর পিছনে প্রাঙ্গণের ওধারে আর বাড়ী নেই—জানই ত। সেই অ্যাস গাছতলায় বসে অনেকদূর পর্য্যন্ত সবুজ মাঠ দেখতে পাওয়া যায়, একটি রেলের লাইন তার মধ্য দিয়ে চলে গিয়েছে—আমি একদৃষ্টে থাকি চেয়ে। কত কথাই না ভাবি। বারে বারে মনে পড়ে—লুটেতে আমাদের সেই কয়েকটা দিন।

কাল বিকেলে মাকে 'চা' খাইয়ে আমি এসে অ্যাস গাছটির তলায় বসেছিলাম অনেকক্ষণ—প্রায় সন্ধ্যা পর্য্যন্ত। নানান কথায় মনটা যেন তোলপাড় হয়ে উঠল। হঠাৎ যেন বুঝতে পারলাম কেন আমার মনটা ভারী হয়ে থাকে।

মানুষ অতীত নিয়ে বাঁচেনা, বাঁচে ভবিষ্যত নিয়ে। কল্পনায় ভবিষ্যতের রঙ্গিন ছবি মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যায় জীবনের পথে। নইলে মানুষ অবশ হয়ে অসাড় হয়ে বসে পড়তে চায় এগুতে চায়না।

ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে দেখি আমার যে সবই অন্ধকার। পরীক্ষার জন্য তৈরী হতে তুমি আমাকে ছেড়ে লণ্ডনে গিয়ে আছ, আমার যে দারুণ পরীক্ষা আসছে সামনে আমি কি করে তৈরী হব সে পথও যে খুঁজে পাচ্ছি না।

জানি—পরীক্ষা পাশ করে তুমি দেশে ফিরে যাবে একটি বেদনা নিয়ে যাবে মনে। কিন্তু তোমার দেশের সেই চিরপরিচিত আবহাওয়ায় সে বেদনা হয়ত ক্রমে যাবে সেরে। কিন্তু আমার—

তুমি বারে বারে বলেছ, তুমি আবার আসবে ফিরে। আমি তোমাকে অবিশ্বাস করিনা, হয়ত আসবে। কিন্তু এমনই আমার মনের দৈন্য, কল্পনার সে ছবিটিকে ত রঙ্গিন করে তুলতে পারছি না। সে যেন ভবিষ্যতে অনেক দূরে, আমার মনের নাগালের বাইরে।

যাক্। আমার মনের বিস্তারিত খবরে তোমাকে আর বিব্রত করতে চাইনা, বিশেষত সামনে তোমার পরীক্ষা। আমার মনের খবর এতদিন তোমাকে কিছু বলিনি আর বলবও না কিছু। বিকো ! তুমি ভেবনা। সময়ে সব ঠিক হয়ে যাবে।

এদিককার খবরে নতুনত্ব কিছুই নেই। মার শরীর একরকমই আছে, তবে আজকাল লাঠি ভর দিয়ে একটু যেন বেশী হাঁটতে পারেন। বারবারার সঙ্গে ফিলিপের বিয়ের খবর ত আগেই লিখেছি।

হাঁা ভাল কথা। কাল সকালবেলা রোলাণ্ড, সেই আমার রোলাণ্ড, অনেকদিন পরে হঠাৎ এসে হাজির। এতদিন তিনি এ অঞ্চলে ছিলেন না, স্কটল্যাণ্ডে ছিলেন। মার ভাব দেখে বড় মজা লাগলো। রোলাণ্ডকে পেয়ে যেন হাতে স্বর্গ পেলেন।

তোমার লীনা।

[ক্রমশঃ।

Cooch Behar
...ওঁকে অবজ্ঞা
করবেন না
সাধারণ একজন গৃহকর্ত্রী... কিন্তু ওঁর ইচ্ছে অনিচ্ছের মূল্য আমাদের কাছে অনেক। ওঁর কি প্রয়োজন শুধু এইটুকু জানার জন্যেই আমরা সারা দেশে মার্কেট রিসার্চের কাজ পরিচালনা করি। সেইজন্যেই হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী জিনিষ-পত্রের মান নির্ণয় করছেন গৃহকর্ত্রীরাই। এই জিনিষগুলির গুণাগুণের যাতে কোন তারতম্য না ঘটে সেইজন্যে উৎপাদনের বিভিন্ন স্তরে নানাধরনের পরীক্ষা চালানো হয়। তাই আমরা আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী ভাল জিনিষপত্র সরবরাহ করতে সক্ষম।

ভাবি এক, হয় আর

শ্রীদিলীপকুমার রায়

সতের

[গত জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত লেখার অপ্রকাশিত অংশ]

পল্লবের চিঠির উত্তরে দুদিন পরে একসঙ্গে এল দুটি চিঠি :

মিসেস নর্টনের—কেমব্রিজ থেকে, আর মোহনলালের—লণ্ডন থেকে। পল্লব সাগ্রহে মিসেস নর্টনের চিঠিটিই আগে খুলল। তিনি লিখেছিলেন :

প্রিয় মিষ্টার বাগচি,

আপনার চিঠি পেয়ে আনন্দ হ'ল—আরো আপনার আনন্দ দেখে। প্রথম যৌবনের এই উৎসাহ, উচ্ছ্বাস, বহু আশা—বিশেষ ক'রে সরলতা—আসে বিধাতার বরদান হয়ে। আর একবারই আসে। কিন্তু একথা বলার মানে নয় যে সব যুবকই আপনার মত সরল আদর্শবাদী—অন্তত আমাদের দেশের যুবকরা তো নয়ই। আমরা ক্রমশই হয়ে পড়ছি সফিস্টিকেটেড : জটিল, প্যাঁচালো হ'তে পারাটাকে আমরা প্রায় বাহাদুরির সগোত্র মনে করি—আমাদের আধুনিক সাহিত্যেও পাবেন এর পরিচয়—যাকে বলে wheels within wheels, চিন্তাকে সর্পিল করতেই আমরা যেন উল্লিয়ে উঠি, সরলতা আমাদের কাছে ঠিক বোকামির সামিল না হলেও আমরা যেন মুখ চেপে হাসি কারুর সরল আশাশীলতা দেখলে : ভাবটা—'কি naive !' মরুক গে। একথা এতটা ফেনিয়ে বললাম শুধু আমার এই আন্তরিক কামনা জানাতে—যেন এই সহজ সরলতা আপনি খুইয়ে না বসেন আমাদের তরুণ প্রাজ্ঞদের সিনিক আবহাওয়ায়।

আর্চিকে আপনার ভালো লেগেছে জেনেও আমার মন কম খুশি হয় নি। ও-ও আমাকে লিখেছে—আপনার মিষ্ট স্বভাব, সুকুমার শালীনতা, সহজ সরলতা—বিশেষ করে আপনার আশ্চর্য কণ্ঠ ওকে গভীর ভাবে স্পর্শ করেছে। লিখেছে—ওর দুটি সঙ্গীতজ্ঞ বন্ধু একদিন খাবার ঘর থেকে শোনে যখন আপনি পিয়ানো বাজিয়ে একটি ইতালিয়ান না ফরাসী গান সাধছিলেন। তারা সত্যিই চমকে উঠেছিল। আপনাকেও খানিকটা ভালোবেসে ফেলেছেই বলব, নৈলে নিজের জীবনের অপূর্ণতার কথা ও কখনই আপনার কাছে ব'লে ফেলত না। কারণ ও স্বভাবে সহৃদয় ও দরদী হ'লেও জাতে ইংরাজ তো। সহজে আমাদের মুখ ফোটে না। বাইরের লোক তো বহিরঙ্গ, আমরা স্বজন বন্ধু অন্তরঙ্গের কাছেও সহজে বলতে পারি না আমাদের স্নেহ কি ব্যথার কথা।

এবার আপনার প্রশ্ন আমি। আপনি জানতে চেয়েছেন আপনার প্রস্তাবে আমার মন কি ভাবে সাড়া দিল। আমার সব আগে মনে এলো নিশ্চিন্তি, কেন না আর্চি শুধু যে বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ তাই নয়—অন্তর্দৃষ্টি তথা দূরদৃষ্টি ওর সহজাত তাই ভুল উপদেশ ও কিছুতেই দেবে না। প্রার্থনা করি : সঙ্গীতকে বরণ ক'রে আপনার জীবন যেন সমৃদ্ধ ও সার্থক হ'য়ে ওঠে। আর্চি লিখেছে যে আপনাদের দেশের সঙ্গীতের ও বোদ্ধা না হ'লেও এটুকু বুঝতে ওর দেরি হয় নি যে আপনার মন তেমনি গ্রহিষ্ণু, যেমন দরাজ আপনার কণ্ঠ। লিখেছে : প্রতিভার কোনো অভিজ্ঞান খুঁজে পাওয়া যায় না তার কাচা কি ভাঁপা অবস্থায়। তবু ওর মনে হয়েছে যে, সঙ্গীতই আপনার স্বধর্ম এবং প্রতিভা আপনার স্বয়ংসিদ্ধ। ওর মনে আপনার প্রতিভা সম্বন্ধে 'কিন্তু' নেই—কেবল ওর দুঃখ এই যে, আপনাকে আপনার বন্ধুরা উস্কে না দিয়ে নিরুৎসাহ করছে। আমাদের দেশের যত দোষই থাকুক এখানে আমরা গুণী—লিখেছে ও পুনশ্চ দিয়ে—কারণ আপনার মতন কণ্ঠ যদি কোনো ইংরাজ যুবকের থাকত তার আত্মীয় বন্ধুদের কেউই এতটুকু ইতস্তত করত না তাকে সঙ্গীতের দিকে ঠেলে দিতে।

কিন্তু আজ আপনাকে শুধু অভিনন্দন জানিয়েই ক্ষান্ত হচ্ছি না। আমার বেশ কিছু লিখবার আছে। অবহিত হোন।

আর্চি হয়ত রিতার কথা আপনাকে ব'লে থাকবে, কারণ রিতা মাত্র আট দিন আগে ওকে প্যারিস থেকে এক মস্ত চিঠি লিখেছিল ও তিন চারদিন আগে হঠাৎ আমার এখানে এসে হাজির—সাউথেণ্ড যাবে যাবে করছে। আর্চির স্ত্রী ওর আপন মাসি। ওর দুঃখের কথা আমি আপনাকে একটু খুলেই লিখছি শুধু আপনার সরলতায় প্রতিদানে সরল হ'তে চেয়ে নয়—এখানে আমার একটু স্বার্থও আছে। যদিও খানিকটা নিঃস্বার্থ স্বার্থই বলব। ভিতরকার কথাটা এই যে আপনার মতন একটি বন্ধু ওর বড় দরকার। তবে এও বলব যে এতে লাভ যে শুধু একতরফা তা নয় ওর সাহচর্যে আপনারও লাভ হবে—ওর কাছে ফরাসি গান শিখে। অবশ্য সঙ্গীতে ও অসামান্যা নয় তবে ফরাসি গানে ও ফরাসি স্বরভঙ্গীর মিষ্টতা বেশ ফুটিয়ে তুলতে পারে। নাচতেও ও পারে—ভালোই বলব। কিন্তু ওর বিশ্বাস—ওর স্বধর্ম অভিনয়। ওর জীবনের আদর্শ এলিওনোরা দুজে ও সারা বার্ণার্ড। এককথায়—ও চায় থিয়েটারে ঢুকতে।

ছাব্বিশ

সাউথেণ্ড ষ্টেশনে কুঙ্কুমকে লণ্ডনের ট্রেনে তুলে দিয়ে পল্লব যখন ফিরল তখন মন ওর আনন্দে ভ'রে গেছে। ফের ওর মনে জেগে উঠল ভগবানের ভুলে-যাওয়া করুণা। রিতা কুঙ্কুমকে দেখে মুগ্ধ হয়েছে যতই ভাবে ততই ওর মনে জেগে ওঠে ভগবানের প্রতি কৃতজ্ঞতা—যাঁর কৃপায় ঘটল এ-হেন অঘটন।

ও গুন্-গুন্ ক'রে পথে যেন উড়ে চলে ওর একটি অতিপ্রিয় গান গাইতে গাইতে :

> এবার তোরে চিনেছি মা, আর কি শ্যামা তোরে ছাড়ি ?
> ভবের দুঃখ ভবের জ্বালা পাঠিয়ে দিছি যমের বাড়ি।

* * * *

মিষ্টার টমাসের বাগানের গেট খুলে যখন ও ঢুকল তখন বিকেল চারটে। বাগানে গিয়েও সেই ঝর্ণার কাছে বসতে যাবে এমন সময়ে শুনল রিতার কণ্ঠ—ড্রয়িং রুমে পিয়ানো বাজিয়ে গাইছে পল্লবের একটি প্রিয় গান—যেটি রিতার কাছে ও শিখেছিল : বিখ্যাত—আভে মারিয়া—ল্যাটিন স্তোত্রটির ফরাসি অনুবাদ। এ গানটি ওর আরও ভালো লাগত এই জন্যে যে য়ুরোপে ভগবানকে মাতৃভাবে পূজা করার রেওয়াজ প্রায় লুপ্ত হ'য়ে যাওয়ার দরুণ ওর মন মাঝে মাঝে ক্ষুণ্ণ হ'য়ে উঠত। এ জগতে মার চেয়ে আপনার কে ? ভগবানকে সেই মার পদবী দেওয়া—এর চেয়ে সহজ সুন্দর স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আর কি হ'তে পারে ? এ গানটি ফরাসি থেকে ও মোটামুটি বাংলায় অনুবাদ করেছিল—যেটি ও গাইত অবিকল মূল সুরেরই অনুভাবে। ও গুন্

গুন করে ধরল বাইরে থেকে (এ ভাবে ওরা মাঝে মাঝে ডুয়েট গাইত—রিতা গাইত ফরাসিতে, পল্লব ঠিক সেই সুরে গাইত বাংলায়):

মেরি! কৃপাময়ি! এসো—
অবনীতলে অয়ি, এসো!
জননীরূপিণি! এসো!
বেদনহারিণি! এসো!
বন্ধনতারিণি! এসো!

নমি মা, শিশু সম চরণে
উচ্ছ্বসি'—করুণা-বরণে।
মুক্তি বিধায়িনি মাগো!
প্রতি হৃদয়ে অয়ি, জাগো!
অশ্রু মুছাতে এসো
তিমিরে আলো হেসো।
যিশু তব দেবকুমারে
ডাকো মধু ঝংকারে
তরিতে ভুবনে আজি
তারক-মন্ত্র বাজি'।

পল্লব সন্তর্পণে ড্রয়িং রুমের দোর খুলতেই দেখে রিতা গাইছে একা ব'সে—চোখে জল, মুখে অপরূপ আলো:

A. . .ve. . .Ma. . .ri. . .a. . .

পল্লবকে দেখেই ও ডাকল ঘাড় নেড়ে। পল্লব পিয়ানোর কাছে আসতেই বলল: ধরো।

দুজনেই ধরল একযোগে:

Ave Maria !
Toi—Qui fus Mère
Sur cette terre !
Tu partageas nos chaines.
Allège nos peines.
Vois :
Nous Sommes tous—nous Sommes tous
A tes genoux !
Sainte Maria ! Sainte Maria !
Viens—Sécher nos Larmes
Dans nos alarmes !
Implore ! Implore ton fils pour nous !

গাইতে গাইতে আনন্দে, ভক্তিতে, আবেশে পল্লবের মন ছেয়ে যায়। মনে হয়—যতই বিদ্রোহ করিনা কেন, মানুষ যখন পড়ে অথৈ জলে তখন ডাকবে আর কাকে—সেই এক কাণ্ডারীকে ছাড়া! তখন বাইরের অবান্তর নাস্তিক ডুব দেয় কোন্ লজ্জার অতলে—সামনে এসে দাঁড়ায় সেই চিরন্তন আস্তিক যার দিন কাটেনা তাঁকে অঙ্গীকার না করলে যিনি মণির মণি, সুধার সুধা, আলোর আলো। গান থেমে যায়। দুজনেরি চোখে জল।

ঠিক এমনি সময়ে দোরে টোকা!

পল্লব এসো বলতেই—অতিথির আবির্ভাব।

পল্লব চেঁচিয়ে ওঠে: মোহনলাল!

মোহনলাল হেসে বলে: একটা নতুন টু-সিটার কিনেছি, তাই সোজা চ'লে এলাম।

রিতা উঠে দাঁড়ায়। মোহনলাল বিলিতি কেতায় মাথা নীচু ক'রে অভিবাদন করে। রিতাও প্রত্যাভিবাদন করার সঙ্গে সঙ্গে পল্লব বলে: রিতা! ইনিই আমার বন্ধু মোহনলাল ঘোষ—যাঁর সম্বন্ধে আজই সকালে কথা হচ্ছিল।

মোহনলাল সপ্রতিভ ভাবে বলল: আর আপনিই নিশ্চয় মাদ্‌মোয়াসেল্ পিনো—পল্লব এমন ভুলো আমার নাম বলল, কিন্তু আপনার নাম বলার কথা মনে নেই।

রিতা হেসে বলল: আর্টিষ্টদের এমনিই হয় মিষ্টার ঘোষ! আপনার বন্ধুকে তো জানেন।

ঠিক এই সময়ে মিষ্টার টমাসের প্রবেশ! পল্লব এবার হরিৎকর্মা হ'য়ে বলল: আমার বন্ধু—মোহনলাল ঘোষ—মিষ্টার আর্চিবল্ড টমাস।

করপীড়ন পর্ব যথাবিধি সমাপ্ত হ'লে মিষ্টার টমাস বললেন: আজকের দিনটাকে শুভ বলতেই হবে, পর পর দু'জন খ্যাতনামা অতিথি। এই মাত্র মিষ্টার সেন চ'লে গেলেন।

মোহনলাল পল্লবের দিকে চেয়ে আশ্চর্য হ'য়ে বলে: কে? কুঙ্কুম?

মিষ্টার টমাস বললেন, তিনিই। সত্যি তাঁকে কি ভালো যে লাগল।

মোহনলাল হেসে বলল: কুঙ্কুমকে দেখার পরেও ভালো লাগেনি বলতে কাউকে শুনি নি।

মিষ্টার টমাস বললেন: দুই বন্ধুর অন্তরঙ্গতার কথা শোনা যায়। কিন্তু তিন বন্ধুর অন্তরঙ্গতার কথা পড়েছি এর আগে শুধু ডুমার থ্রি মাস্কেটিয়ার্সে।

মোহনলাল খোলা হেসে বলল: বেশ বলেছেন। কেবল একটু টুকব তবু। আমি ত্রয়ীর মধ্যে বয়সে জ্যেষ্ঠ হ'লেও বীরত্বে কনিষ্ঠ—দেহে বলিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও।

রিতা হেসে বলল: কিন্তু কথার বাঁধুনিতে শ্রেষ্ঠ বলেই মনে হচ্ছে।

চারজনেই হেসে উঠল। মিষ্টার টমাস বললেন: বড় বুদ্ধি করেছেন রবিবারে এসে।

মোহনলাল বলে, পল্লব আপনার নিমন্ত্রণের কথা জানিয়েছিল তাই বুদ্ধির প্রেরণা আসতে দেরি হয় নি—ভাবলাম যেতে যদি হয় তো এক্ষণি—রবিবারে—now or never আর কি।

মিষ্টার টমাস হেসে বললেন: এ কথা কিন্তু প্রবীরের মুখেই সাজে। কাজেই অনুমান করছি আপনি বিনয় বশেই নিজেকে অ-বীর ব'লে পরিচয় দিয়েছেন।

পল্লবের মন খুশিতে যেন উপচে পড়ে, বলে: আপনি ঠিকই ধরেছেন মিষ্টার টমাস, কেবল আমার এ-বন্ধুটির একটি দোষ আছে: ও নিজেকে ছোট বলে শুধু প্রতিবাদ শুনতেই।

সম্মিলিত হাসির রেশ থামলে মিষ্টার টমাস বললেন: চলুন বাগানেই গিয়ে বসা যাক—সেখানেই চা আনতে বলছি—আপনারা এগোন—রিতা বসাবে আপনাদের—বলে রিতাকে: সেই ফোয়ারাটার পাশে বুঝলে তো? বলেই বেরিয়ে গেলেন।

পল্লব ও মোহনলাল রিতার পিছন পিছন গিয়ে বসল ফোয়ারার

পাশে দুটো বেঞ্চিতে মাঝে একটি গোল কাঠের টেবিল। শনি রবিবারে ওরা বৃষ্টি না হ'লে এখানেই চা-পান করত।

মোহনলাল পল্লবকে বলল: তোমার ভাগ্যকে হিংসে হয়। আসতে না আসতে পেয়ে গেলে বন্ধু—আর এমন উদার আতিথেয় বন্ধু!

রিতা খুশী হ'য়ে বলে: আপনার মানুষ চিনবার ক্ষমতা আছে বৈ কি, মিষ্টার ঘোষ।

মোহনলাল হেসে বলে: চিনতে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি। পল্লব শুধু গানেই অদ্বিতীয় নয়, চিঠি লিখতেও ওর জুড়ি নেই। আর যেখানে যা দেখবে—লিখবে হয় আমাকে না হয় কুঙ্কুমকে—ফিস্তে দিস্তে। তাই সাবধান মাদমোয়াসেল! ভাববেন না যে আপনার নাড়ীনক্ষত্রের কিছু আমার অজানা আছে।

রিতা হেসে বলে: এবার কিন্তু একটু কাঁচা কথা হ'য়ে গেল মিষ্টার ঘোষ। পল্ল আপনাকে লিখেছে শোনা কথা, কিন্তু শোনা কথার এলাকা পেরুলে তবেই না চাক্ষুষের চৌহদ্দি! ব'লেই থেমে: কিন্তু পল্লব-এর এই চিঠি লেখার ব্যসনের কথা তো জানতাম না—এবার থেকে একটু সাবধান হ'তেই হবে দেখছি।

পল্লব হাসি মুখে বলে: তা বৈ কি। ফাঁশ করব নাকি তা হ'লে? চিঠি বুঝি শুধু একা আমিই লিখতে জানি?

রিতা শাসিয়ে বলল: যদি বলো—তবে তোমার সঙ্গে আর কথা কইব না।

মোহনলাল বলল: কি এমন চিঠি, মাদমোয়াসেল? বলতে গিয়ে কি এমন বলেই থেমে গেল—কেন না ঠিক এই সময়ে পিছনে বাটলারকে নিয়ে মিষ্টার টমাসের আবির্ভাব। রিতা উঠে পেয়াল' রেকাবি ইত্যাদি টেবিলে রাখল পর পর।

বাটলার যথাবিধি অভিবাদন ক'রে প্রস্থান করবার পরে মোহনলাল রকমারি গল্প ব'লে দেখতে দেখতে আসর জমিয়ে তুলল। মিষ্টার টমাস যে মিষ্টার টমাস তিনিও উৎসুক হ'য়ে শুনতে লাগলেন।

হঠাৎ মোহনলাল থেমে গেল, বলল: আমি একাই ব'লে চলেছি। এবার থামি, নৈলে হয়ত দুর্নাম রটবে আমি এক দুঃসহ বোর—।

মিষ্টার টমাস হেসে বললেন: বিনয় ভালো জিনিস মিষ্টার ঘোষ, কেবল যথাস্থানে।

মোহনলাল বলল: মানে?

মিষ্টার টমাস বললেন: মানে প্রতিভাধর কথকের স্বধর্ম বলা—শোনা নয়। অতএব ব'লে যান আপনি প্রাণের বা মানের মায়া ছেড়ে।

মোহনলাল বলল: আপনাদের শ্রেষ্ঠ কবির উপদেশ কিন্তু একটু অন্যরকম ছিল: give every man thine ear but few thy voice.

মিষ্টার টমাস বললেন: ও সে পুরাকালের রাজারাণীদের যুগে যখন বেফাঁশ কথা বললে ডুয়েল লড়তে হ'ত। তাই অকুতোভয়েই চালান আপনি—কথকতা।

এই সময়ে বাটলার এসে বলল রিতাকে: আপনার টেলিফোন।

রিতা উঠে গেল। মিষ্টার টমাস পল্লবের দিকে তাকিয়ে বললেন: রিতাকে তো কেউ টেলিফোন করে না? ব্যাপার কি?

পল্লব বলল: লাঞ্চের আগে ও বোধহয় কাউকে তার করতেই গিয়েছিল পোষ্টাফিসে। হয়ত তারই উত্তর।

মিষ্টার টমাসের মুখ মেঘলা হ'য়ে এল। সঙ্গে সঙ্গে কথাবার্তার ছন্দ এল ঢিমিয়ে। একটু পরে মিষ্টার টমাস উঠে মোহনলালকে বললেন: চলুন, আপনাকে আমার সাধের hot houseটি দেখাই।

ওরা তিনজনে উঠল। ঠিক এমনি সময়ে রিতার পুনঃপ্রবেশ। মিষ্টার টমাস জিজ্ঞাসা করলেন: কে?

রিতা মৃদুস্বরে বলল: মিষ্টার ককরান।

থিয়েটারের?

রিতা হ্যাঁ বলেই জুড়ে দিল: ভয় নেই আংকল, আমি না করে দিয়েছি।

মানে—?

মানে, থিয়েটারে আমি ঢুকব না ঠিক করেছি।

মিষ্টার টমাসের চোখমুখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল, বললেন: সে কি? কখন ঠিক করলে?

রিতা অম্লান বদনে বলল: মিষ্টার সেন চ'লে যাবার পরেই। ব'লেই বলল: অমন মুখ করবেন না আংকল। আমি বুঝতে পেরেছি আমার ভুল। থিয়েটারে আমি যেতে চেয়েছিলাম নাম কিনতে। কিন্তু বুঝতে পেরেছি এর নাম ঠিক আদর্শবাদ নয়।

মিষ্টার টমাস ওর কণ্ঠবেষ্টন ক'রে বললেন: ঠিকই বুঝেছ রিতা।—আর বড় সময়ে। ব'লে মোহনলালকে: আমাদের এই মেয়েটির অন্ত পাওয়া ভার মিষ্টার ঘোষ। তবে তাই ব'লে বলব না ও অবুঝ। ব'লে ফের রিতাকে: এত খুশি আমি অনেকদিন হইনি রিতা! একটু থেমে: কিন্তু কি করবে ঠিক করেছ কি?

রিতা মুখ নিচু ক'রে বলল: ভাবছি বছরখানেক কেমব্রিজে পড়ব কেবল গার্টনে সীট পেলে হয়।

মিষ্টার টমাস সোল্লাসে বললেন: সে ভার আমার।

পল্লব হেসে বলল: কুঙ্কুম শুনলে খুশি হবে, রিতা!

রিতা আশ্চর্য হ'য়ে বলে: আমার মতন প্রগলভার সম্বন্ধে তাঁর মতন মানুষের তো বিশেষ ঔৎসুক্য থাকার কথা নয়।

মোহনলাল বলল: কার মনে কখন কোন্ পথ দিয়ে যে কি ভাব প্রবেশ করে কেউ কি জানে, মাদমোয়াসেল?

রিতা বলে: তা বটে, কিন্তু তবু মির‍্যাকল তো আর ঘটে না এ-যুগে।

মিষ্টার টমাস হেসে বললেন: কে বললে? একটিবার ভাবো দেখি—তুমি কাল কি চাইছিলে আর আজ কি চাইছ?

পল্লব রিতাকে বলে: তবে আমিও বলব নাকি আর একটি মির‍্যাকলের কথা?

রিতা বলে: কি?

পল্লব বলে: কুঙ্কুম খানিক আগে আমাকে ব'লে গেছে বিশেষ ক'রে তোমাকে বোঝাতে যাতে থিয়েটারে তুমি না যাও।

রিতার মুখ রাঙা হয়ে উঠল, আসছি বলেই ও নিজের ঘরের দিকে চ'লে গেল। মিষ্টার টমাস মোহনলালকে একটু বসুন, রিতার সঙ্গে আমার একটু কথা আছে—বলেই রিতার পিছন পিছন চ'লে গেলেন।

মোহনলাল পল্লবকে বলে : ব্যাপার কি হে ?

পল্লব বলে : সে বলব পরে—অনেক কথা। কিন্তু তুমি হঠাৎ ?

মোহনলাল হেসে বলল : যে-চিঠি ঝাড়লে 'এক্সপ্রেস ডেলিভারি'-তে—না এসে করি কি বলো ?

পল্লব হাসে : বলতে ইচ্ছা হয়—তুমিও ক্রটাস ? ধিক্ কৌতূহলী !

মোহনলাল হেসে বলে : এ বিদেশ জীবনের মরু পার হ'তে কার না সাধ যায় ভাই মাঝে মাঝে ঝর্ণার দেখা পেতে ? ব'লেই থেমে : কিন্তু শুধুই কৌতূহলই নয়—সুলতার জ্বালায় লণ্ডনে আর টিকতে পারলাম না ভাই !

ওদের ওখানেই ফের উঠলে কেন তবে ?

মোহনলাল কেমন একরকম হেসে বলে : জ্ঞানীরও চোখ খুলতে দেরি হয় ব'লে—আর কি ?

সাতাশ

মোহনলাল লণ্ডনে সুলতাদের ওখানে সত্যিই টিঁকতে পারেনি ব'লেই টুসিটার মোটরে বেরিয়ে পড়েছিল—খানিকটা 'যেদিকে দুই চক্ষু যায় উধাও হবে ব'লে। কাজেই মিষ্টার টমাস ওকে দু' চার দিন সাউথেণ্ডে তাঁর আতিথ্য স্বীকার করতে বলামাত্র সে রাজি হ'য়ে গেল। পল্লবকে বলল হেসে : না থেকে পারি ?—একেবারে ত্রিবেণী-সঙ্গম : তুমি, মিষ্টার টমাস, রিতা !

*　　*　　*　　*

দু'চার দিনের মধ্যেই মোহনলাল যেন টমাস পরিবারেরই একজন হ'য়ে দাঁড়ালো। ছেলে মেয়েদের সঙ্গে দৌড়ঝাঁপ করতে, রিতার সঙ্গে টেনিস খেলতে, কাছের সুইমিং পুলে সাঁতার দিতে, তাকে নিজের টুসিটারে নিয়ে হৈ হৈ ক'রে বেড়াতে, সবাই মিলে নৌকা-বিহার করবার সময়ে নিখুঁত দাঁড় টানতে, এখানে ওখানে বন ভোজনে গিয়ে চমৎকার কত কি আশ্চর্য ব্যঞ্জন রাঁধতে—কিছুতেই তার জুড়ি ছিল না। তার উপর কত গল্পই যে বলত ! এই ভাবে সে দুদিনেই টমাস পরিবারের প্রায় একজন হ'য়ে উঠল।

দেখতে দেখতে ব্যাপারটা আরো ঘনিয়ে উঠল, আর এমন ভাবে সে সকলেরি চোখে পড়ল। না প'ড়ে পারে ? রিতা ও মোহনলাল উভয়েই বেপরোয়া, মিষ্টার টমাস সকালবেলা বেরিয়ে যান কাজে, ফেরেন সন্ধ্যায়। মিসেস টমাস রিতাকে পছন্দ করতেন না—পারতপক্ষে ওর ছায়াও মাড়াবেন না। কাজেই মোহনলাল হ'য়ে দাঁড়াল নিরঙ্কুশ : যখন তখন রিতাকে তার টুসিটার মোটরে নিয়ে বেরিয়ে যেত সকালে, ফিরত সন্ধ্যায়—আপত্তি করবে কি ?

কিন্তু এর ফলে পল্লব ওদের উভয়ের কাছ থেকেই যেন দূরে

সরে গেল। রিতা ওর সঙ্গে সমানই হাসিমুখে কথা কইত বটে, কিন্তু ওকে গান শেখাতে আর তেমন আগ্রহ বোধ করত না দেখে পল্লবও আর শিখতে চাইত না। মোহনলালেরও হ'ল ভাবান্তর: সে পল্লবকে সামনা-সামনি আগেকার মতনই স্নেহ সম্ভাষণ করলেও আর তেমন কাছে টানত না—দিত না কথায় কথায় উপদেশ। পল্লবের স্বভাবে ঈর্ষা ন' থাকলেও সময়ে সময়ে একটু ফাঁকা-ফাঁকা লাগত বৈ কি: রিতার সঙ্গেও আর তেমন মেলামেশার সুযোগ পায় না, মোহনলালও অনেকটা দূরে স'রে গেছে। কিন্তু আশ্চর্য: এই শূন্যতায় উল্টো পিটে একটা স্বস্তিও ছিল বৈ কি—যে, ভগবানের করুণায় ও মুক্তি পেয়েছে এমন একটা মোহ থেকে যা ওকে মাসখানেক আগে দিনে দিনে এমনি পেয়ে বসছিল—যাক, এ চিন্তাকেও ও দূরে ঠেলে দেয়। কাজ কি বাজে চিন্তায়?

মিষ্টার টমাস একদিন নির্জনে নিজেই কথাটা তুললেন।

রিতার কাছে আর ক'টা ফরাসী গান শিখলে বাকচি?

পল্লব সকুণ্ঠে বলল: সম্প্রতি আর বড় গান শেখা হয়নি।

মিষ্টার টমাস মৃদু হাসলেন: হুঁ! বলেই আচম্বিতে: তোমার কি মনে হয় ওদের সম্বন্ধে?

পল্লব আশ্চর্য হ'য়ে তাকালো মিষ্টার টমাসের চোখের দিকে তিনি বললেন: আমার কোনোই আপত্তি নেই—রিতাকে সেদিন বলেছি। কেবল একটা কথা: ঘোষের বাড়ির আবহাওয়া কেমন?

পল্লব একটু বিব্রত বোধ করে বৈ কি! কারণ সে জানত—মোহনলালের মা দারুণ হিন্দু—খানিকটা সেকেলে জাতের মানুষ—ব্রত-পার্বণ ঠাকুরপুজো নিয়েই থাকেন—তার উপর দারুণ শুচিবাই। কিন্তু মিষ্টার টমাসকে একথা বলে কি করে? বলল: আমি ঠিক জানি না। আপনি কুঙ্কুমকে জিজ্ঞাসা করবেন।

কিন্তু ঈর্ষা ওর মনে ঠাঁই না পেলেও একটা অভাব বোধ ওর ক্রমশই বেড়ে উঠতে থাকে: রিতা শুধু যে ওকে গান শেখাতেও তেমন আর আগ্রহ বোধ করে না তাই নয়—কি যেন একটা রহস্য লুকোবার চেষ্টা করছে বলে ওর মনে হয়। এক সময়ে থাকে না চাইতেই কাছে পেয়েছিল, আজ তার সহজ অন্তরঙ্গতা কত দূরে! কিন্তু এ জন্যে ক্ষোভ এলেই কুঙ্কুমের একটা কথা ও বারবার জপ করত: যা পাইনি তার উপর জোর দেওয়ার চেয়ে যা পেয়েছি তাকে বড় ক'রে দেখাই ভালো। রিতার কাছে শুধু ফরাসী ভাষা ও গান শিখেই নয়, নানা দিক দিয়েই ও অনেক কিছু লাভ করেছিল। এক সময়ে মোহ ওকে আবিষ্ট করে তুলবার উপক্রম করেছিল বটে, কিন্তু কুঙ্কুমের প্রভাবে সে মোহকে ও প্রায় কাটিয়ে উঠেছিল। কাটাতে বেশি বেগ পেতেও হয় নি, কেন না এক তরফা মোহ খোরাক পায় না বলেই পুষ্ট হ'তে পারে না। ও মনকে সান্ত্বনা দিল—ভালোই হয়েছে, এক আধবার পা না টললেও হোঁচট খেতে যে হয় নি এও ঐ ভগবানেরি করুণা ছাড়া আর কি? তবু মনের কোথায় একটা জায়গায় কেমন যেন একটা ফাঁক থেকে যায়—খচ খচ করে। ও কুঙ্কুমকে তার ডাবলিনের ঠিকানায় সব কথাই খুলে লিখল—নিজেকে একটুও না বাঁচিয়ে।

দুদিন বাদে ডাবলিন থেকে এল উত্তর:

ভাই পল্লব,

তোমার চিঠি পেয়ে বড়ই ভাবনা হ'ল। মোহনলাল কেন—আমাদের দেশের কোন যুবকই এদেশের মেয়েকে বিবাহ করলে আমার মনে হয় দেশের ক্ষতি ছাড়া লাভ হ'তে পারে না। এ ধরণের বিবাহের পরিণামও খতিয়ে ভালো হয় না। সব চেয়ে ভোগে সন্তানেরা—কোনো কালচারেই পাকা হয় না। তাছাড়া মোহনলালের বিধবা মা সেকেলে জমিদার-গৃহিণী, কখনই মেম-বউকে বরণ করে ঘরে তুলবেন না—আলাদা হবেনই হবেন। তিনি ভক্তিমতী, স্নেহময়ী, মোহনলাল তাঁর একমাত্র সন্তান! বড় ঘা খাবেন। তাই চেষ্টা কোরো মোহনলালকে বোঝাতে—যদিও আমার মনে হয় না এখন ব'লে-ক'য়ে কিছু হবে—মানে, যদি মোহ ওকে পেয়ে ব'সে থাকে! মোহ বলছি এই জন্যে যে, রিতার সঙ্গে ওর স্বভাবের মিল নেই, থাকতেই পারেনা—তাই আমি একে কিছুতেই প্রেমপদবী দিতে পারিনা। তুমি হয়ত তর্ক তুলবে—প্রেম বা মোহ সম্বন্ধে আমার কোনো ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নেই। মানি। তবু বাইরের চেহারা থেকে কিছু তো ধরা যায়। যাক এ সব অবান্তর কথা। মনটা আমার বেজায় খারাপ হয়ে গেছে। ইচ্ছে করছে এখনি ছুটে যেতে। কিন্তু এখানে হঠাৎ অনেক কিছু শিখবার সুযোগ পেয়েছি যা দেশে ফিরে খুবই কাজে আসবে? তাই শুধু তোমাকে অনুরোধ করা ছাড়া উপায় কি? চেষ্টা কোরো অন্তত, কেবল আমার চিঠির কথা বোলো না। কেন একথা বলছি বুঝতেই পারছ! ও আরো বেঁকে বসবে—যদি শোনে যে ওকে নিয়ে আমরা আলোচনা করছি। ও কি রকম স্পর্শকাতর—জানোই তো।

শেষ কথা, যদি পারো—চেষ্টা কোরো রিতা যাতে কেম্ব্রিজে পড়তে না আসে। মোহনলালকে একা কেম্ব্রিজে যদি বা কিছু বলতে পারি, রিতা সেখানে থাকলে সবই পণ্ড হবে। তবে হয়ত এখন আর বিশেষ কিছুই করা যাবেনা, কেননা আমার মন নিচ্ছে—মোহনলাল খানিকটা জড়িয়েই পড়েছে।

যাই হোক তোমাকে শুধু বলা: তুমি সোজা কেম্ব্রিজে চ'লে এসো। আমিও সোজা সেখানে ফিরব। এ-যাত্রা বোধহয় আর সাউথেণ্ডে ঢুঁ মেরে যাওয়ায় সময় পাবনা। ফের বলি—তুমি একবছর কেম্ব্রিজে মিউজিক স্পেশাল নাও। কিছুদিন এদেশের সঙ্গীতের থিওরি প'ড়ে বার্লিনে যেও। সেখানে আমার জর্মন বন্ধু তোমাকে সাহায্য করবেন—সে কথা তোমাকে আগেই বলেছি।

হ্যাঁ এই অবসরে জর্মন ভাষাটা আর একটু শিখে রাখো। একটু শিখেছ জানি—কিন্তু সে পুঁথিপড়া বিদ্যায় সানাবে না, কথাবার্তা বলা চাই। আমিও শিখেছি জর্মনে কথা বলতে। ভাষা শেখায় তোমার তো সহজ প্রতিভা—তাছাড়া জর্মন ভাষা অতি বলিষ্ঠ ও উৎকৃষ্ট ভাষা। ভবিষ্যতে ফরাসি ভাষার চেয়ে তোমার বেশি কাজে আসবে - বিশেষ করে গানের ক্ষেত্রে।

শেষে ভগবানকে ধন্যবাদ দিই যে তুমি অন্তত নিষ্কৃতি পেয়েছ মোহনলালের ভাবনা ভেবে কি আর হবে বলো? তবু ওর জন্যে পারো তো একটু চেষ্টা কোরো। আমিও ওর জন্যে প্রার্থনা করব বৈ কি। ইতি

তোমার নিত্যশুভার্থী কুঙ্কুম।

আটাশ

পল্লব স্থির করল কুঙ্কুমের কথা মতই কাজ করবে। মিসেস মর্টনকে লিখে দিল—তাঁর পাশের বাড়িতে ওর ঘর ছুটো আ

থাকতেই রিজার্ভ করে রাখতে। বায়না হিসাবে চার পাউণ্ড অগ্রিম পাঠিয়ে দিল। কুঙ্কুমের একটা কথা কেবল সে রাখতে পারল না : মোহনলালকে কিছুই বলল না।

কেবল একটা প্ল্যান ওর বদলাতে হ'ল : ও ভেবেছিল—কলেজ খুললে তবে কেম্‌ব্রিজে ফিরবে। এখন ভেবে চিন্তে ঠিক করল—আর দেরি করা নয়, 'কাল পরশুই রওনা হবে। কুঙ্কুমকে সেই মর্মেই লিখে দিল। শেষে পুনশ্চ দিয়ে লিখল একটু জোর করেই ; তোমার একটা কথায় কেবল আমার একটু আপত্তি বা জিজ্ঞাসা আছে, যাই বলো। প্রেম ও মোহ এ-দুইয়ের বাইরের চেহারা দেখলে সময়ে সময়ে মনে হয়ই হয়, এরা Siamese twin বলা শক্ত কোন্‌টা কে ? আমার নিজের ক্ষেত্রে যে বুঝতে পেরেছি রিতার প্রতি আমাকে মোহই পেয়ে বসছিল সেটা হয়ত এই জন্যে (অন্তত আমার তাই মনে হয়) যে রিতা আমার মোহে পড়ে নি। যদি পড়ত তাহ'লে কি হ'ত কে বলতে পারে ? হয়ত ইন্ধনের তাপে মোহ গ'লে প্রেমেই রূপান্তরিত হ'ত। আমার ভাগ্যবশেই রিতা আমার দিকে ঝোঁকে নি যেমন সে ঝুঁকেছিল তোমার দিকে। তবে তুমি তুমি ব'লেই রিতা তার দুরাশাকে প্রশ্রয় দেয়নি। কারণ মোহনলাল যতই বাঞ্ছনীয় বল্লভ হোক না কেন, যদি রিতা তোমার নাগাল পেত তাহ'লে কখনই মোহনলালের প্রতি আকৃষ্ট হ'ত না।

এক্ষেত্রে তুমি অলভ্য ব'লেই সে ওকে আঁকড়ে ধরেছে এ বিষয়ে আমার এতটুকুও সন্দেহ নেই। কেন নেই ? বলি। তুমি চ'লে যাবার পরে ও স্থির করে কেম্‌ব্রিজ গার্টন কলেজে পড়বে, অথচ মিসেস নর্টন ওকে যখন ধরেন গার্টনে ভর্তি হ'তে তখন ও সোজা ব'লে দিয়েছিল—না। এর পরে বলা চলে না কি যে, ও কেম্‌ব্রিজে যেতে চেয়েছিল তোমার দুরাশায়ই—উদ্বাহুরিব বামন :—hoping against hope ? তবে মোহনলাল একটা কথা ঠিকই বলে : যে, বিশেষ করে মেয়েদের মন বহুরূপী—ক্ষণে ক্ষণে রঙ বদলায়। তাই না দুদিন আগে রিতার মন তোমার রঙে রঙিয়ে ওঠা সত্ত্বেও দুদিন পরে মোহনলালের রঙে রঙিয়ে উঠতে পারল ! কিন্তু ঠিক সেই জন্যেই আমার মনে হয় যে এ-রঙ ওর শেষ রঙ—বা অন্য উপমা দিয়ে বলি—অনেক ওঠা পড়ার পরে ওর মন এসে দাঁড়িয়েছে স্থায়ী টেম্পারেচারে। প্রেম ও মোহের মধ্যে যদি কোনো মূলগত তফাৎ থাকে তবে তার নিকষ এই স্থায়িত্ব ছাড়া আর কি বলবে ?

আমার থীসিসটা হয়ত একটু ঘোরালো হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে—সাদা বাংলায় বললে সিদ্ধান্তটি দাঁড়ায় এই যে, তোমার প্রতি টান কাটিয়েও যদি কোনো মেয়ে মোহনলালের দিকে ঝুঁকতে পারে তবে তাকে অন্তত মোহ বলা চলে না। অন্য ভাষায়, মোহনলালের প্রতি শেষটায় ঝুঁকেছে মনেপ্রাণেই—যাকে বলে—the water has found its own level—অন্তত আমার তাই মনে হয়। এরূপ ক্ষেত্রে কি ওদের মিলনে বাধা দিতে যাওয়া বিড়ম্বনা নয় ? না কুঙ্কুম, আমার একটা কথা আজ মনে হয় যে, তুমি বা আমি আমাদের আজকের অভিজ্ঞতার জোরে যদি বলি এইটে প্রেম আর এইটে মোহ তবে ভুল করব কেননা এটা হবে গা জোয়ারি কথা ডগম্যাটিক। তাই আমার মনে হয় আমার পক্ষে মোহনলালকে এ বিষয়ে লেকচার

দিতে যাওয়া অসঙ্গত হবে তো বটেই, এমন কি তোমার পক্ষে সেটা সমীচীন হবে না। বরং এসো আমরা উভয়েই কামনা করি ওরা সুখী হোক। ইতি। তোমার স্নেহকৃতজ্ঞ পল্লব।

উনত্রিশ

পরদিন এল কুঙ্কুমের তার: আমি কালই উড়ে লণ্ডনে যাচ্ছি—২১ নং রাসেল স্কোয়ারে। সেখানে তুমি এক্ষুনি এসো—পারো তো মোহনলালকে নিয়ে। জরুরী কথা আছে। বেলা তখন পৌণে আটটা। পল্লব তারটি হাতে ক'রে মোহনলালের ঘরে গিয়ে দেখে মোহনলাল নেই। রিতার ঘরেও রিতা নাই। ঠিক এই সময়ে প্রাতরাশের ঘণ্টা বাজল। ও ডাইনিংরুমে ঢুকতেই মিষ্টার টমাস মেঘলামুখে বললেন: গুড মর্ণিং বাকচি। বোসো। বড় খারাপ খবর।

পল্লব উদ্বিগ্নমুখে জিজ্ঞাসা করে: কি?

মিষ্টার টমাস জবাব দেবার আগেই মিসেস টমাস বললেন ঝংকার দিয়ে: কি আবার? পই পই ক'রে ওঁকে বলেছি, পরের মেয়ের বোঝা সেধে না বইতে—তা উনি তো শুনবেন না। বেশ হয়েছে। ভুগুন এখন!

মিষ্টার টমাস উত্যক্ত কণ্ঠে বললেন: চুপ করো এডিথ! কাউণ্ট যে এদেশে এসেও সত্যি গুণ্ডামি করবেন, একি তুমিই ভেবেছিলে? বলেই পল্লবকে: কাল তুমি শুতে যাবার একটু পরেই ট্রাঙ্ক কল এল কেমব্রিজ থেকে। ইভেলিন বলল টেলিফোনে, খুবই দুর্বলকণ্ঠে, যে রিতার গহনার বাক্স পরশু রাত দুপুরে বার্গলারে চুরি করে নিয়ে গেছে। কাউণ্ট ধরে নিয়েছিলেন নিশ্চয়ই যে, রিতা ওর গহনা কেমব্রিজে ইভেলিনের কাছেই গচ্ছিত রেখে এসেছে। আমি রিতাকে বলেছিলাম ব্যাঙ্কে রাখতে, কিন্তু সে গ্রাহ্য করেনি, ইভেলিনও এমনটা হবে স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি তো। তাই হয়ত ওদের কাউকে দোষ দেওয়াও যায় না—কারণ এ রকম কাণ্ড বেশি ঘটে আমেরিকায়ই—ইংলণ্ডে নয়। কিন্তু সে যাই হোক, রাতদুপুরে দু'ছুটো বার্গলার জানলা ভেঙে ইভেলিনের ঘরে ঢুকে ওকে ক্লোরোফর্ম ক'রে ওর সিন্দুক ভেঙে রিতার গহনার বাক্স নিয়ে চম্পট দেয়। কাল সারাদিন ইভেলিন অজ্ঞান মতনই ছিল। সন্ধ্যায় জ্ঞান হ'তেই আমাকে টেলিফোন করল—রিতাকে পাঠাতে।

পল্লবের বুকের মধ্যে গুড়-গুড় ক'রে ওঠে, বলল: তার পর?

মিসেস টমাস বিরসকণ্ঠে বললেন: তার পর আর কি? মিষ্টার ঘোষ রিতাকে নিয়ে আজ ভোরেই গেছেন কেমব্রিজে। এখন সামলাও ঠেলা—পুলিশের পাল্লায় পড়ো। অশান্তি কি ছাই আমার একটা?

মিষ্টার টমাস তপ্তকণ্ঠে বললেন: কেবল নিজের কথাই ভাবছ এডিথ! বেচারি মেয়ের কথা ভাবো তো একবার। আজও একেবারে নিঃস্ব।

মিসেস টমাস রুখে উঠে বললেন: নিঃস্ব না ছাই। ও বেশ জানে, কার স্কন্ধে ভর করবে ফের।

মিষ্টার টমাস উগ্র সুরে বললেন: চুপ করো। আমার যদি আর একটি মেয়ে থাকত—তাহ'লে? ফেলতে পারতে তাকে? ওকি আমার নিজের মেয়ের চেয়ে কম নাকি? বলে পল্লবকে: আহা! আমি কেবল ভাবছি, ওর মনের কথা। অভিমানিনী মেয়ে—জানি তো, আমার পরগ্রহ হ'তে না চেয়েই থিয়েটারে যেতে চেয়েছিল। এখন হয়ত ব'লে বসবে: না, ও চাকরি করবে কি থিয়েটারেই যাবে, কে বলতে পারে? জেদী মেয়েকে সামলানো এক দায়।

পল্লব একটু ভেবে বলল: কিছু যদি মনে না করেন তো বলি—মোহনলাল ও আমি দুজনে মিলে ওর কেমব্রিজের পড়ার খরচ সহজেই দিতে পারি।

মিষ্টার টমাস বললেন: ধন্যবাদ বাকচি। এ তোমারই যোগ্য কথা। কিন্তু একটু ভেবে দেখলেই বুঝবে, কেন এ-প্রস্তাবে ও রাজি হ'তে পারে না।

পল্লব বলে: কেন, মিষ্টার টমাস? টাকাটা কি এতই বড়? বাপ-মা যদি সন্তানের ব্যয়ভার বহন করতে পারেন, তবে বন্ধু পারে না?

মিষ্টার টমাস বললেন: পারে। কিন্তু বাকচি, তোমাদের সঙ্গে ওর যে-ধরণের বন্ধুত্ব—তাতে এ ধরণের প্রস্তাবকে আমল দেওয়াই যায় না। এ-সমস্যার সমাধান হ'তে পারে এক মোহনলালকে দিয়ে। কেবল—

পল্লব বলল: কেবল?

মিষ্টার টমাসের মুখে করুণ হাসি ফুটে ওঠে, বলেন: কেবল মুস্কিল এই যে এ-ধরণের হাঙ্গামায় কোনো মেয়ে পড়লে—বুঝতেই পারছ তো?—মানুষের মন বড় বিচিত্র বস্তু, বাকচি! কখন যে সে কোন্ দিকে মোড় নেয়—বীরও যে কোন্ অছিলায় কেমন করে রাতারাতি কাপুরুষ ব'নে যায়—কেউ কি জানে? বলে একটু থেমে: আমি কেবল ভাবি—কাউণ্ট কি সর্বনেশে লোক।

পল্লব বলে; এর কর্মকর্তা কি তিনিই সত্যি?

মিসেস টমাস ফের ঝংকার দিয়ে ব'লে বসলেন: সে বিষয়ে কি সন্দেহ আছে? ও সব পারে—সিলভিয়াকে খুন করে যে—

মিষ্টার টমাস বললেন: অতটা নয় অবশ্য।

মিসেস টমাস বললেন: অতটা নয়—মানে? সিলভিয়া আমাকে চিঠি লিখেছিল বিষ খাওয়ার দু'দিন আগে। তাতে লিখেছিল ওর গহনার জন্যে কাউণ্ট ওকে খুন করতেও পারে। অমনি তুমি ছুটলে পারিস—ঐ ছাই পরের মেয়ের গহনার তদারক করতে।

মিষ্টার টমাস রুক্ষ সুরে বললেন: এ সব মিথ্যে তর্ক তুলে এখন আর লাভ কি? এখন বরং ভাবো—কি ক'রে রিতার ভাঙা মন জোড়া দেওয়া যায়।

মিসেস টমাস তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললেন: পারব না আমি ছাই পাঁশ ভাবতে। আমি চাই শুধু এখন ওকে বিদায় করতে—তা তুমি রাগই করো আর যাই করো। তোমার দুর্নামের ভয় নৈ। থাকলেও আমার আছে। ব'লেই চোখে রুমাল দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

ত্রিশ

মিষ্টার টমাস রোজকার মতন তাঁর কাজে লণ্ডন রওনা হ'লেন প্রাতরাশ সেরেই। পল্লব একা একা সমুদ্রের ধারে খানিকক্ষণ ঘুরে বেড়িয়ে নিজের ঘরে ফিরে এসে জানলার ধারে আরাম কেদারায় হেলান দিয়ে ভাবে আর ভাবে। এ কি কাণ্ড! সব ছাপিয়ে ওর মনে কেবল একটা চিন্তাই বড় হ'য়ে ওঠে: মোহনলাল এখন কি করবে? ভাবতে ইচ্ছে হয়: নিশ্চয় রিতার পাশে দাঁড়াবে। কিন্তু মিষ্টার

টমাসের সংশয় ওকেও পেয়ে বসে। যদি না দাঁড়ায়—কে বলতে পারে মানুষের মন তো? পুলিশ-কেসে পড়া মেয়ে, তার উপর এ-ধরণের দুর্দান্ত হবু শ্বশুর! যদি ভয় পেয়ে শেষ পর্য্যন্ত পেছোয়ই—তবে ওকে খুব দোষ দেওয়া যায় কি? মোহনলালেরই একটা প্রায়োক্তি ওর মনে ফিরে ফিরে বাজে: আমি তো তোমাদের দুজনের মতন আইডিয়ালিষ্ট নই ভাই, আমি হলাম স্বভাবে রিয়ালিষ্ট, এক পা এগোই তো দু'পা পেছোই। ঝোঁকের মাথায় কিছু করে বসতে নেই!—এই ধরণের আরো কত বিজ্ঞ, সাবধানী কথা! তার উপর রয়েছে সাক্ষাৎ কুঙ্কুম। সে কখনই এর পরেও মোহনলালকে বলবে না রিতার পাশে দাঁড়াতে—বিশেষ করে এই জন্যে যে এক্ষেত্রে পাশে দাঁড়ানোর একমাত্র পন্থা—বিবাহ। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে যায় মোহনলালের নিজেরি কথা: বিবাহ বড়ই গুরুগম্ভীর ব্যাপার ভাই! উচ্ছ্বাস আবেগ খারাপ বলি না—কিন্তু বিবাহের সময় সব আগে চাই—মনের মিলের কথা ভাবা। রোমান্সের রঙ দেখতে চমৎকার—কিন্তু ধোপে টেঁকে না যে!

সারাদিন ভারি অশান্তিতে কাটল। সন্ধ্যায় একলা ব'সে রইল অনেকক্ষণ সমুদ্রের ধারে। ফিরবার পথে একটা ঘন বীথিকার পাশ দিয়ে আসছে এমন সময় চোখে পড়ল—চির-পরিচিত যুগলমূর্তি। একটি গাছের ও-পাশের বেঞ্চিতে ওরা ব'সে। প্রণয়িনীর কটি বেষ্টন করে যুবকটি ওকে চুম্বন করল। পল্লব লজ্জিত হ'য়ে স'রে আসে। কিন্তু একটি কথা ওর কানে যায়, যুবকটি বলছে: তাতে কি হয়েছে? তোমাকে আমি চাই কি তোমার টাকার জন্যে না বাপের জন্যে? শুধু তোমার জন্যে—আর কোনো মেয়ে নয়—শুধু তুমি, চিরদিন তুমি—বাকি কথাগুলো ওর কানে পৌঁছয় না।

কি চমৎকার কথা! যুগ যুগ ধরে কত শত প্রণয়ীই না তার দয়িতাকে বলেছে এই অদ্বিতীয় কথা: তোমাকে চাই আমি শুধু তোমার জন্যে—তুমি আমার চিরকালের ধন। অথচ—মনে হয় ওর ক'জন প্রণয়ীর অঙ্গীকার জীবনে কৃতকৃত্য হয়েছে আচরণের স্বাক্ষরে? মানুষ আবেগের মুহূর্তে যে শপথ করে, আবেগ উচ্ছ্বাস উবে যেতে না যেতে কি সে শপথ পাণ্ডুর হ'য়ে না গিয়ে পারে? কতশত দম্পতিই না যুগে যুগে স্বপ্নভঙ্গের পর তাদের স্বপ্নপ্রেমকে চিনেছে মোহ বলে!

অবশ্য মোহনলালের এ প্রেমই হোক বা মোহই হোক, ওদের রোমান্স এখনো তাজা—তাই উবে যাওয়ার প্রশ্নই হয়ত ওঠে না। তবু মিষ্টার টমাসের দুর্ভাবনার কথা ওর মনে ফিরে ফিরে উঁকি মারে: ধরো মোহনলাল এরপরে যদি ধরো রিতার পাশে না দাঁড়ায়? মানুষের মন তো—ঘটনার, বিশেষ ক'রে দুর্ঘটনার ঘায় অনেক সময়েই হয়ে পড়ে বিকল—বলেছিলেন তিনি একদিন লোকমতের প্রসঙ্গে। তাছাড়া এখানে শুধু রিতার পারিবারিক কেলেঙ্কারিই তো নয়—ওদিকে কুঙ্কুম রয়েছে যে! মোহনলাল যতই বলুক হিরো-ওয়র্শিপ বা গুরু বাদে ওর আস্থা নেই, পল্লব তো জানে—কুঙ্কুমের অনুমোদনের দাম ওর কাছে কতখানি! এক্ষেত্রে কুঙ্কুম কখনই মত দেবে না। তখন? কি করবে মোহনলাল? পিছিয়ে যাবে না এগিয়ে আসবে বেপরোয়া হবে?

মানুষ যখন দোটানায় পড়ে তখন বেশি জোরালো শক্তিটাই তো জেতে, টাগ অব ওয়ারের উপমা মনে আসে। যখন দু পক্ষ টানাটানিতে বিপর্যস্ত—এদিক ওদিকে ভার প্রায় সমান, সে সময়ে একটা ছোট ছেলের রশি ধরায়ই হারজিৎ নির্নীত হয় নাকি এক মুহূর্তে? এক্ষেত্রেও যে ঠিক তাই হবে না কে বলতে পারে? মোহনলাল রিতার পাশে দাঁড়াবার মুখে যখন যুক্তি ও বিবেকের টানাটানিতে—টলমল করতে থাকবে ঠিক সেই সংকট লগ্নে ওকি কুঙ্কুমের নিষেধের কথা না ভেবে পারবে? ভেবে চিন্তে পল্লব স্থির করল—এ-টাগ-অফ-ওয়ারে নিজে দাঁড়াবে মোহনলালেরই দিকে, কুঙ্কুমের দিকে নয়। কিন্তু কুঙ্কুমের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো—ভাবতেও মন খারাপ হয়ে যায় যে!

রাত্রে মিষ্টার টমাস লণ্ডন থেকে টেলিফোন করলেন তিনি সোজা কেম্ব্রিজ যাচ্ছেন। মিসেস টমাস পল্লবের সামনেই কেঁদে সারা। পল্লব ভারি বিব্রত বোধ করে, বলে: কি হয়েছে?

মিসেস টমাস বললেন তীক্ষ্ণ কণ্ঠে: হবার আর বাকি কি বলুন! আমাদের ভদ্র পরিবারে এ-পঁচিশ বৎসরের মধ্যে কখনো এমন কিছু ঘটেনি যা নিয়ে পাঁচ জনে হাসাহাসি কানাকানি করতে পারে। কে জানে ওঁকে পুলিশ কোর্টে ডকে দাঁড়াতে হবে কিনা সাক্ষী দিতে? শুধু ঐটুকুই বাকি আছে। ব'লে হঠাৎ মিনতির সুরে: আমার একটা অনুরোধ রাখবেন মিষ্টার বাকচি! ওঁকে বলবেন না কিন্তু লক্ষ্মীটি! আপনার বন্ধুকে একটু খোলাখুলি বলবেন সব কথা? উনি যে-মানুষ, জানেন তো—প্রাণ গেলেও কাউকে কোনো পীড়াপীড়ি করবেন না। কিন্তু সংসার তো উনি বোঝেন না। আর কেলেঙ্কারি হ'লে তার চাপ পড়ে বাড়ির গিন্নিরই উপরে, কর্তা পুরুষ মানুষ—পার পেয়ে যান সহজেই—It's we women who have to bell the cat and bear the brunt, বুঝলেন না?

পল্লব আমতা আমতা করে। এমন সময়ে ঘরে ফের টেলিফোন ওঠে বেজে। মিসেস টমাস উঠে ধরলেন।

হ্যাঁ আমি—কি?—কাউণ্টই করেছেন?—এতো জানাই ছিল—তোমাকে বলি নি আমি বারবার? - কি রিতা অজ্ঞান হ'য়ে পড়েছে? —কি?—কিন্তু ইভেলিন তো রয়েছে—তুমি গিয়ে কি করবে শুনি? —কি? যেতেই হবে?—অগত্যা—কিন্তু কালই ফিরবে তো?—আচ্ছা—কি? ভয় নেই?—হয়েছে হয়েছে—ঐ মেয়েই হয়েছে আমাদের কাল—কি? ওকে নিয়ে আসবে এখানে?—না আমি পারব না এত ঝক্কি বইতে—ওকে কেম্ব্রিজেই রেখে এসো, লক্ষ্মীটি আর্চি, আমার কথা শোনো—ও আর্চি—

দূর, চ'লে গেছে—বলেই দুম্‌ ক'রে রিসিভার রেখে দিয়ে কাঁদো-কাঁদো সুরে,—বলুন তো মিষ্টার বাকচি, কেন এ সাধ ক'রে নাহক পরের মেয়ের বোঝা বওয়া? রিতার সঙ্গে ওর সম্পর্ক তো আমাকে দিয়েই—তবে? আমি যখন ওকে নিয়ে ঘর করতে চাইছি না, তখন ওঁর এত মাথা ব্যথা কিসের? সিলভিয়া ওঁর নিজের বোন হ'লেও বা কথা ছিল। স্ত্রীর বোনকে নিয়ে এমন আদিখ্যেতা করে কোন্‌ সুবুদ্ধি মানুষ, শুনি?—তার উপর যে-মেয়ে কলঙ্কের ডালি মাথায় ক'রে ঘর ছাড়ে কিন্তু থাক এ সব, আপনাকে কেন মিথ্যে উদ্‌ভ্রান্ত করা?

পল্লব বিপন্ন কণ্ঠে না না করে। কি বলবে?

আমাদের রানীমা

আমাদের বাড়ীর কাছেই ছোট একটা বাড়ী আছে। সে বাড়ীতে থাকেন রানীমা। আমরা যখনই ছাদে উঠি দেখি রানীমা বাড়ীর উঠোনে বসে হয় চরকা কাটছেন নয় সোয়েটার বুনছেন। একদিন ছাদে রোদ্দুরে চুল শুকোতে উঠে আমি দেখি রানীমা চরকার সামনে চুপ করে বসে আছেন। আমি ভাবলাম ওঁর সঙ্গে গিয়ে একটু গল্পসল্প করা যাক। আমি যেতে আমাকে বসার একটা আসন দিয়ে রানীমা বললেন "দ্যাখ্, আমি না হয় মুখ্যসুখ্য মানুষ তাই বলে আমি কি এতই বোকা যে আজে বাজে কিছু বুঝিয়ে দিলেই বুঝব? রাশিয়া নাকি আকাশে একটা নতুন নক্ষত্র ছেড়েছে আর তার মধ্যে নাকি একটা কুকুর পোরা! হ্যাঁ: যত সব—"।

আমি যখন রানীমাকে স্পুটনিক আর লাইকা সম্বন্ধে সব কিছু বুঝিয়ে বললাম রানীমা একেবারে হতবাক বললেন-"আমায় আর একটু খুলে বলতো, আমার মাথায় অত চট্ করে কিছু ঢোকে না।"

রানীমা কিন্তু সেটা বললেন নেহাৎই বিনয় করে। বুদ্ধিসুদ্ধি ওঁর বেশ ভালই আছে। ছেলে মেয়েরা যখন চেঁচিয়ে ওদের পড়া মুখস্ত করে উনি তখন ওদের নানারকম প্রশ্ন করে নানা বিষয়ে জেনেছেন। অন্যান্য মহিলাদের মত বাঁধাধরা গতে চলতে উনি মোটেই রাজী নন। সেদিন আমি যাচ্ছিলাম কেনাকাটা করতে। রানীমা আমায় বললেন "আমায় একটু কাপড় কাচা সাবান এনে দিবি ভাই?"

আমি অভ্যাস বশে ফিরে এলাম সানলাইট সাবান কিনে। রানীমা সানলাইট সাবান দেখে অনেকক্ষণ প্রাণ খুলে হাসলেন তারপর বললেন—"এত দাম দিয়ে সাবান কিনে আনলি; কিন্তু আমাদের বাড়ীতে সিল্কের জামাকাপড় তো কেউ পরেনা!"

"কিন্তু রানীমা, আমার বাড়ীতে সব জামা-কাপড়ই কাচা হয় সানলাইট সাবান দিয়ে।" রানীমা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন—"বোনটি তুই বোধ হয় আমাদের বাড়ীর অবস্থা জানিসনা। আমরা এত দামী সাবান দিয়ে জামাকাপড় কাচব কি করে?"

আমাকে তাড়াতাড়ি ফিরতে হোল বলে ওঁকে সব কথা বুঝিয়ে বলতে পারলাম না। আমি রানীমাকে প্রতিশ্রুতি দিলাম যে আবার ফিরে আসব কিন্তু কাজে এমন আটকে গেলাম যে আমার আর রানীমার কাছে যাওয়াই হোলনা।

বিকেলে আমার বাড়ীর দরজায় কড়া নড়ে উঠল। দরজা খুলে দেখি রানীমা। বললেন—"ভগবান তোকে আশীর্বাদ করুন। সানলাইট সত্যিই আশ্চর্য্য সাবান। একবার দেখে যা!"

রানীমার উঠোনে গিয়ে দেখি সারি সারি পরিষ্কার, সাদা, উজ্জ্বল কাপড় টাঙানো—যেন একটা বিয়ের মিছিল চলেছে। রানীমা আমার কানে কানে বললেন—"আমি এত কাপড়জামা ধুয়েছি কিন্তু এখনও কিছুটা সাবান বাকী আছে···এ সাবানটা দামী নয়, মোটেই নয়—বরং সস্তাই।"

রানীমা বসে পড়লেন, তারপর বললেন "আমাকে একটা কথা বল তো। আমি শুনেছিলাম সানলাইট দিয়ে কাচার সময় জামাকাপড় আছড়াতে হয়না। সেই জন্যে আমি শুধু সানলাইটের ফেণায় ঘষেই জামাকাপড় কেচেছি···তাতেই জামাকাপড় এত পরিষ্কার আর উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে···হ্যাঁ কি যেন বলছিলাম, আচ্ছা বলতো সানলাইট সাবান এত
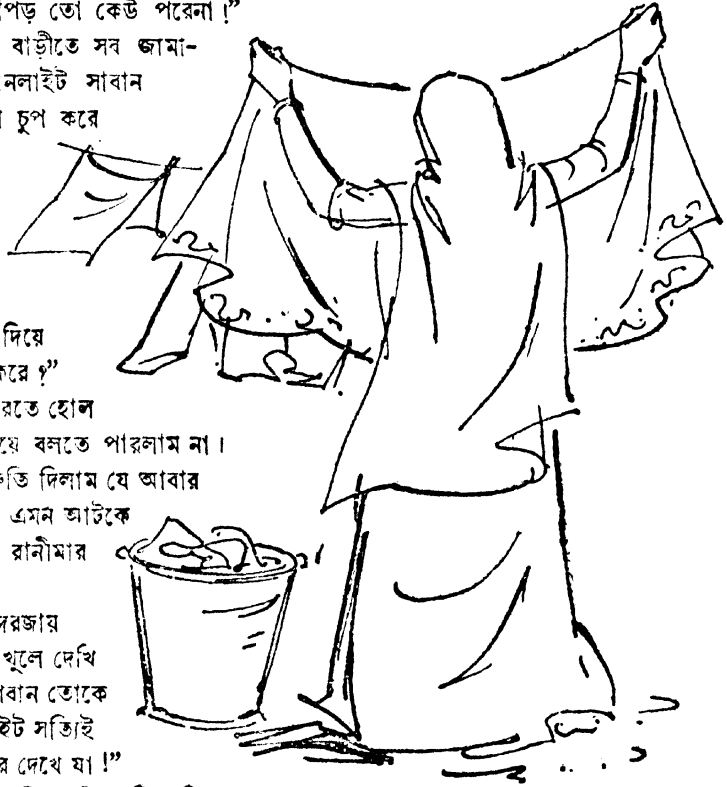
ভাল হোল কি করে?" আমি রানীমাকে বোঝালাম—"রানীমা, সানলাইট সাবানটি একেবারে খাঁটি; তাই এতে ফেণা হয় প্রচুর। আর এ ফেণা কাপড়ের সুতোর ভেতর থেকে লুকোনো ময়লাও টেনে বের করে।"

"ও! এখন বুঝেছি সানলাইট দিয়ে কাচলে জামা-কাপড় কি করে এত তাড়াতাড়ি এত পরিষ্কার আর উজ্জ্বল হয় ওঠে। আর সানলাইটে কাচা জামা-কাপড়ের গন্ধটাও আমার পরিষ্কার পরিষ্কার লাগে।"

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে রানীমা বললেন—"এবার কি বলবি বল। আমার হাতে অনেক সময় আছে।"

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড, কর্তৃক প্রস্তুত।

S. 261B-X52 BG
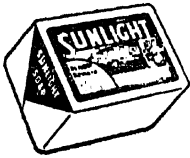
রাত্রে শুয়ে কেবলই ফের সেই একই চিন্তা—মোহনলাল এখন কি করবে? ঘণ্টা-দুই হিজি-বিজি ভাবনার পর ক্লান্ত হ'য়ে ঘুমিয়ে পড়ল। স্বপ্ন দেখল: রিতা কাঁদছে, মোহনলাল তাকে বোঝাবার চেষ্টা করছে—এমন সময়ে সামনে কুঙ্কুম! মোহনলাল রিতাকে ছেড়ে দিয়ে হেঁটমুখে দাঁড়ায়। কুঙ্কুম ভর্ৎসনার সুরে বলে: মোহনলাল! শেষে তুমিও? মোহনলাল দু'হাতে মুখ ঢাকে। পল্লবের ঘুম ভেঙে যায়। ভোরের আলো ঘরে বিছিয়ে গেছে। গাছে ডাকছে একটা পাখি! মাথা ওর দব-দব করে। একটু এ-পাশ ও-পাশ ক'রে ফের ঘুমিয়ে পড়ে।

একত্রিশ

পল্লব প্রাতরাশের ঘণ্টা শুনে নিচে নেমে দেখে—টেবিল খালি। বাটলারকে জিজ্ঞাসা করতে সে বলল: মিসেস টমাস ভোরবেলা টেলিফোনের ডাকে লণ্ডনে গেছেন মোটরে ছেলে মেয়েদের নিয়ে।

পল্লব চমকে ওঠে। কি ব্যাপার? একবার ভাবল সেও সোজা লণ্ডনে যায়। দুর্ভাবনা নিয়ে একলা একলা কাঁহাতক ঘর করা যায়? কিন্তু লণ্ডনে যাবে ছাই কোন চুলোয়। সাত পাঁচ ভেবে চিন্তে শেষে স্থির করে: অপেক্ষা করাই ভালো।

লাঞ্চ খেয়ে বেরিয়ে পড়ল। পথে একটা থিয়েটারে ম্যাটিনি অভিনয়। শ'র পিগম্যালিয়ন। টিকিট কিনে ঢুকল। খানিক হেসে মনটা একটু ঠাণ্ডা হয়।

যখন বাইরে বেরুল তখন গোধূলি। আবছা আলোয় ফের দুর্ভাবনা ওর মনকে ছেয়ে ধরে। বিমনা হ'য়ে বাড়ির গেটের কাছে এসেই থমকে যায়। কি কাণ্ড! সামনে মোহনলালের বাহুলগ্না সুহাসিনী রিতা—আর পিছু নিয়েছেন স্বয়ং কাউণ্ট! ও সরে গিয়ে একটা গাছের আড়ালে দাঁড়ায়। কাউণ্ট গেটের কাছে ওদের ধ'রে ফেলতেই মোহনলাল ও রিতা ফিরে দাঁড়ায়। রিতার মুখের হাসি উবে যায় মুহূর্ত্তে।

কাউণ্ট মোহনলালকে বললেন: আমার ওর সঙ্গে একটু একলা কথা আছে। ব'লেই রিতাকে: আয় এদিকে।

রিতা মোহনলালের বাহুতে চাপ দিয়ে বলে: আমি ওর মুখ দেখতেও চাই না,—ব'লে দাও ওকে। ব'লেই কাউণ্টকে: vat'en (চ'লে যাও এখান থেকে)।

কাউণ্ট চেঁচিয়ে ব'লে উঠলেন: বটে? যত বড় মুখ নয় তত বড়—

মোহনলাল বাধা দিয়ে দৃঢ়কণ্ঠে বলল: কেন মিথ্যে রাস্তায় দাঁড়িয়ে চেঁচাচ্ছেন কাউণ্ট? আপনার মেয়ের উপর আপনার এখন আর কোনো অধিকারই নেই যখন জানেন—

কাউণ্টের সুন্দর মুখ রাগে বীভৎস হয়ে ওঠে মুহূর্ত্তে, চেঁচিয়ে বললেন: জানবার যা আমি সবই জানি—জানেন না আপনিই যে ফ্রান্সে এখনো বড় ঘরে মেয়ের বর বাপেই ঠিক করে—আমি ওর বিয়ের ঠিক করেছি কাউণ্ট ফুশের সঙ্গে—

রিতা সপদদাপে বলে: তোমার লজ্জা করে না—কাউণ্ট ফুশের নাম উচ্চারণ করতে—যে একদিন আমাকে তোমার বাগানে পেয়ে কি রকম পশুর মতন চেপে ধরেছিল—আর তুমি—তুমি—তার কবলে আমাকে ছেড়ে দিয়েছিলে তার সঙ্গে পরামর্শ করে—শুধু টাকার লোভে—chien de l'enter! (নরকের কুকুর)।

কাউণ্ট চীৎকার করে উঠলেন: Envoita assez, coquine! (থাম বেহায়া মেয়ে!) শাস্তি পেয়েও শায়েস্তা হওনি, আরো মার খাবার জন্যে পিঠ শুড়শুড় করছে না? তাই হবে। কিন্তু বলে রাখছি এর পরের শাস্তি হবে এমন দারুণ—যদি না—

মোহনলাল বলল: কেন মিথ্যে রাস্তায় দাঁড়িয়ে 'সীন' করছেন, কাউণ্ট? যা পারেন আপনি করুন গে—আমরা ভয় করি না।

কাউণ্ট ব্যঙ্গকণ্ঠে বললেন: এর আগে ও ছিল ওর চেলার রক্ষিতা, এখন দেখছি আপনার হয়েছে। কেবল জানেন কি, সে কোনো দেশের আইনেই রসের নাগরের অধিকারকে মানে না?

মোহনলাল শ্লেষের সুরে বলে: আমাদের কিছুই অজানা নেই কাউণ্ট। কেবল আপনিই দেখছি জানেন না আজো যে সব দেশের আইনেই মানে—সব চেয়ে বড় অধিকার হল স্বামীর।

কাউণ্ট মুখ খিস্তি করে বললেন: স্বামীর? diable! হা: হা: হা:—

মোহনলাল বলল: হাসবার কথা আজ আমার কাউণ্ট, আপনার নয়। আজ সকালে লণ্ডনে ওর মেসোমহাশয় ও মাসিমার সামনে রেজিষ্ট্রি করে আমাদের বিয়ে হয়েছে। বিশ্বাস না হয় খোঁজ নিয়ে দেখতে পারেন। এসো রিতা।

[ক্রমশঃ।

একটি প্রাচীনতম খেলা

মানব-ইতিহাসে সবচেয়ে প্রাচীন খেলা হিসাবে যেটি স্বীকৃত, সে হচ্ছে 'archery' বা তীর-ধনুক নিয়ে খেলা। তার পরই নি:সংশয়ে নাম করতে হয় 'বোল' (bowls) খেলার। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এই খেলাটির পরিচয় বিশেষ ভাবে পাওয়া যায়। এই 'বোল' থেকেই আধুনিক যুগের বল কথাটি এসেছে কিনা, সে অবশ্য গবেষণার বিষয়।

অতীত যুগে এক সময় 'বোল' (কন্দুক ক্রীড়া বিশেষ) খেলা খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। এমন কি, রাজপরিবার থেকে শুরু করে সকল সম্ভ্রান্ত ও উঁচু মহলের নারীরা এই ক্রীড়ায় অংশ গ্রহণ করতেন এবং এইটি ছিল তাঁদের পরম নিশ্চিন্ত ও সুখী-জীবনের এক মস্ত বিলাস। 'বোল' (bowls) কথাটি সর্ব্বপ্রথম আইন-বিধিতে স্থান পায় ১৫১১ সালে—ইংল্যাণ্ডের রাজা অষ্টম হেনরীর সময়ে। ১৫৪১ সালে একটি আইনে কারিগর, শ্রমিক, শিক্ষানবীশ, পরিচারক প্রভৃতি পর্য্যায়ের কর্ম্মীদের পক্ষে খেলাটি নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়। একমাত্র বড়দিনের সময় এই ক্রীড়ায় কারো পক্ষে বাধা থাকতো না, এমনি ছিল তখনকার আইন-ব্যবস্থা। অবশ্য ১৮৪৫ সালে এই নিষেধাত্মক আইনটি বাতিল হয়ে যায় এবং 'বোল' খেলায় সমাজের সকলেরই অবাধ অধিকার আসে সেই থেকে।

প্রশান্ত চৌধুরী

৭

"ঐ যে সকল জ্যোতির মালা,
গ্রহতারা রবির ডালা,
জুড়ে আছে নিত্যকালের পসরা ;
ওদের হিসেব পাকা খাতায়
আলোর লেখা কালো পাতায়
মোদের তরে আছে মাত্র খসড়া।
মোদের কিছু ঠিক-ঠিকানা নাই।
আমরা আসি আমরা চলে যাই।"

রবীন্দ্রনাথের খেয়া কাব্যগ্রন্থের মেঘেদের এই উক্তিকে বোধহয় বেমালুম বসিয়ে দেওয়া চলে তাঁদের মুখে, ১৮৭২ সালের ৭ই ডিসেম্বর জোড়াসাঁকোর মধুসূদন সাণ্ডেলের বসতবাটির প্রশস্ত প্রাঙ্গণে বাঙলার প্রথম সাধারণ নাট্যশালার উদ্বোধন দিন থেকে আজ পর্যন্ত এই সুদীর্ঘকাল ধরে যাঁরা ষ্টেজের আড়ালে দাঁড়িয়ে টেনেছেন ড্রপের দড়ি, ফেলেছেন আলো, চটের উপর এঁকেছেন স্ফটিকের স্তম্ভ, প্যাকিং বাক্সর কাঠে লোহার পেরেক ঠুকে গড়েছেন দুর্ভেদ্য দুর্গতোরণ।

গিরিশচন্দ্র বড় দুঃখেই লিখে গেছেন,—'দেহপট সনে নট সকলি হারায়।'

আর এঁরা? ঐ যাঁরা পরচুলে নারকেল তেল মাখিয়েছেন, দুটো তারের মুখ এক কোরে বিদ্যুতের চমক দেখিয়েছেন ষ্টেজে, কিংবা চক্ষের পলকে এ-দৃশ্যের রাজসভার সিংহাসন তুলে নিয়ে ও-দৃশ্যে সাজিয়েছেন কারাগারের তৃণশয্যা ;—তাঁরা? দেহপট হারাবার অনেক আগেই তাঁরা হারিয়েছেন সবকিছু। দৃশ্যপটের আড়ালে থেকে দর্শকের মানসপটেরও আড়ালে থেকে গেছেন তাঁরা চিরদিন।

বাঙলার নাট্যজগতের আকাশে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের যদি গ্রহতারা রবি-শশীর সঙ্গে তুলনা করা যায়, তাহলে এঁদের বলা যেতে পারে সে-আকাশের মেঘ। সে মেঘ আসে আর ভেসে যায়।—'ওদের তরে আছে মাত্র খসড়া।'

আজ থেকে পাঁচশো বছর আগে ঐ যেদিন মধুসূদন সাণ্ডেলের বাড়ীর পূজার দালানে বাংলার প্রথম সাধারণ নাট্যশালা গড়ে তোলার কাজে কোমর বেঁধে লেগেছিলেন একদল যুবক,—যেদিন ভুবন নিয়োগীর গঙ্গার ঘাটের বৈঠকখানা বাড়ীতে রাতের পর রাত চলেছে প্রথম সাধারণ নাট্যশালার প্রথম নাটকের মহলা,—যেদিন লালদিঘির ধারে মইসিঁড়ি ঘাড়ে করে থিয়েটারের প্ল্যাকার্ড মেরেছেন রসরাজ অমৃতলাল বসু,—যেদিন রাধাগোবিন্দ কর আর বেলকাপ্তেন, মতি সুর আর নগেন বাঁড়ুজ্যে, রাধামাধব কর আর যোগী মিত্তির, দেবেন বাঁড়ুজ্যে, আর মহেন্দ্র বসু,

নিজ পরিবার মাঝে বিরক্তি কারণ।
কুটুম্ব সমাজে লজ্জা নিন্দার ভাজন॥

হয়েও গড়ে তুলেছেন পাব্লিক ষ্টেজ,—সেদিন বাঙলার সেই ক্ষুদ্র প্রথম রঙ্গমঞ্চটির নির্মাণ ব্যাপারে বাঙলা রঙ্গমঞ্চের বিশ্বকর্মা ধর্মদাস সুরকে করাত আর বাটালি নিয়ে কি সাহায্য করেনি কোন মিস্ত্রি? কে সে? সেদিন অবিনাশ করকে কে সাজিয়েছিল যোগ সাহেব? শরৎ ভট্টাচার্যের ঠোঁটের ওপর কে লাগিয়ে দিয়েছিল গোপীনাথ দেওয়ানের গোঁফ?

তারা কি সেই সাধারণ নাট্যশালার প্রথম দিনের অভিনয় শেষে নিজেদের ঘরে গিয়ে প্রতিদিনের মতই কলহ করেছে রুগ্না স্ত্রীর সঙ্গে? চড় মেরেছে অস্থিসার হাংলা ছেলেটার গালে? লঙ্কা আর পেঁয়াজের উগ্র তরকারী দিয়ে এক সানকি ভাত খেয়ে ঘুম দিয়েছে তেলচিটচিটে বিছানায় শুয়ে?

না কি, বাঙলার প্রথম সাধারণ নাট্যশালার প্রথম দিনের অভিনয় শেষে বাড়ী ফিরে তারা বহুদিন বাদে অনাদৃতা স্ত্রীর গলায় পরিয়ে দিয়েছে এক পয়সায় কেনা একছড়া টাটকা বেলের মালা,—রোগা ছেলেটাকে পাশে নিয়ে তার মুখে তুলে দিয়েছে দুধমাখা কাজলা চালের ভাতের গরাস,—তারপর অনেক রাতে ছেলে-বৌ ঘুমিয়ে পড়বার পরেও ঘরের দাওয়ায় ছেঁড়া মাদুরে শুয়ে আকাশের লক্ষ তারার দিকে তাকিয়ে বিচিত্র এক অনুভূতি নিয়ে কাটিয়ে দিয়েছে মধুর এক বিনিদ্র রজনী?

কে জানে? কে হিসেব রেখেছে তার? কে খোঁজ নিয়েছে তাদের মনের, তাদের আঁকা দৃশ্যপটের ওঠা-নামার সঙ্গে তাদের মনের সুর আর বুকের রক্তও ওঠা-নামা করেছিল কি না কোনদিন, কে জানতে চেয়েছে তা? কে জানতে পেরেছে?

জানতে পেরেছি আমরা শুধু একজনের কথা।—

ক্লান্ত কণ্ঠে বললেন : পরিশ্রমটা তার চেয়ে অনেক বেশি হয়েছে। একবার আড়াইশো লোকের একটা ব্যাচকে মাংস পরিবেশন করেছিলুম একা হাতে,—তাতেও এত ঘাম ঝরেনি মশাই পায়ে, এত দম নিতে হয়নি।

তারপর অমূল্যবাবুর দিকে ফিরে বললেন : পাখাটা জোর করে দিনতো অমূল্যবাবু!

: ব্যাপারটা কি ?—জিজ্ঞেস করলুম মেক-আপের পেন্সিলটাকে ছুলতে ছুলতে।

: হস্তলিপি উদ্ধার করছিলুম। একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন হৃদয়রাম।

হস্তলিপি ? অবাক লাগল শুনে। শ্রদ্ধা জাগল মনে কোঙারের প্রতি। লোকটিকে এ ক'দিনের আলাপে যা ভেবেছিলুম তা তো নয়। প্রাচীন হস্তলিপি উদ্ধারের সারস্বত আনন্দের দিকেও ঝোঁক আছে দেখছি ভদ্রলোকের। ভদ্রলোক শুধু ব্যবসাদারই নয়, বিদ্যোৎসাহী এবং বিদ্বানও বটে।

বললুম : কোন শতাব্দীর লিপি ? দশম না একাদশ ?

: বিশ :—খিঁচিয়ে উঠলেন হৃদয়রাম। এই লিপির বয়স এখনও চব্বিশঘণ্টাও হয়নি। এই নিন ধরুন। দেখুন কিছু উদ্ধার করতে পারেন কি না।

পকেট থেকে একখানা ভাঁজ-করা কাগজ বের করে আমার দিকে এগিয়ে দিলেন শ্রীকোঙার। তারপর অন্য পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট এবং দেশলাই বের করতে করতে বললেন : গত দুঘণ্টা এই চিঠির সঙ্গেই কুস্তি লড়ছিলুম। হেরে গেছি। আপনার লেখার হাত আছে,—দেখি হাতের লেখাকে কায়দা করতে পারেন কি না।

পারলুম না।

বললুম : এ চিঠি সম্ভবতঃ মালয়লম কিংবা কানারিজ গোছের কোন দক্ষিণী ভাষায় লেখা।

: তাহলে তো আর ভাবনা ছিল না মশাই। আমার তেল কলের মাদ্রাজী অ্যাকাউন্টেন্টকে দিয়েই তো তাহলে পড়িয়ে ফেলতে পারতুম চিঠিটা। এ-চিঠি তেলেগু, তামিল, মহারাষ্ট্রী, পুস্ত, উড়িয়া, বাংলা কোন ভাষাতেই লেখা নয়।

: তবে ?

: নির্ভেজাল ইংরিজি অক্ষরে লেখা।

: অসম্ভব !—চিঠিটাকে আরো একবার চোখের কাছে মেলে ধরে বললুম : ইংরিজি হলে আর পড়তে পারতুম না ?

হাসলেন মৃদু হৃদয়রাম : ঐ যে আপনাদের বিদেশী সাহিত্যে কি একটা বেশ কথা আছে, দেয়ার আর মোর থিংস্ ইন হেভেন্ অ্যাণ্ড আর্থ······

: কিন্তু আপনিই বা জানলেন কি করে যে, অক্ষরগুলো ইংরিজি ?

: চিঠিটা যে খামে এসেছে, তার ঠিকানাটা হাতে-লেখা নয়, ইংরিজি অক্ষরে টাইপ-করা। সেখানে লেখা আছে,—To the humble Proprietor of Jupiter Theatre. From most humbly Manager.

অমূল্য বাবু ওধারে বসে একমনে ধুতি কোঁচাচ্ছিলেন, ম্যানেজারের নাম শুনেই লাফিয়ে উঠলেন : ওরেব্ বাবা ! ম্যানেজার বাবুর নিজের হাতের লেখা চিঠি ! ও-চিঠি নষ্ট করবেন না স্যার। ও-চিঠি স্যার সাক্ষাত ধন্বন্তরি একেবারে !

: অমূল্য বাবু কি নেশা করেছেন ?—ধমক দিয়ে উঠলেন হৃদয়রাম কোঙার : কি বকছেন আবোল-তাবোল।

: আবোল-তাবোল নয় স্যার।—হাতজোড় করে উঠে দাঁড়ান অমূল্যবাবু। ম্যানেজার বাবুর হাতের লেখা চিঠি তো স্যার ? ইংরিজিতে লেখা তো ? এক বর্ণও পড়া যাচ্ছে না তো ? সত্যি বলছি স্যার, বিশ্বাস করুন আমাকে, ও-চিঠি একেবারে সাক্ষাত ধন্বন্তরি।

হৃদয়রাম কোঙার চোখ পাকিয়ে কি একটা বলতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই অমূল্য বাবু বলে উঠলেন : গরীবের কথাগুলোই শুনুন স্যার আগে দয়া করে। সবখানি শুনে যদি মনে হয় নেশার ঝোঁকে কথা বলেছি, সাত জুতো মেরে বের করে দেবেন।

সুরু করলেন অমূল্য বাবু।—

বছরখানেক আগেকার কথা। তখন নতুন এসেছি এ-থিয়েটারে। তখন ষ্টেজে আমাদের ঐ 'কৃষ্ণসখা' নাটকটা হচ্ছিল। বৌ বললে, ওগো, তোমাদের থিয়েটারে তো এবার ঠাকুর-দেবতার পালা এসেছে, পাশ এনো, দেখতে যাব। বললুম, দূর মুখপুড়ি, ও আবার ঠাকুর-দেবতার পালা কোথায় ? ও তো সোস্যাল। বৌ বিশ্বাসই করে না। বলে, তবে ঐ যে 'কৃষ্ণ' লিখেছে ? বললুম,—হেই দ্যাখো পাগলির কথা। কৃষ্ণসখা মানে ভগবান কৃষ্ণের সখা শ্রীদাম-সুদাম কিংবা অর্জ্জুনের গল্প নয়। কৃষ্ণ মানে হচ্ছে গিয়ে ব্ল্যাকমার্কেট, কালো-বাজার। সেই কালোবাজারের ব্যবসায়ীকে নিয়ে নাটকটা লেখা কি না, তাই নাটকের নাম 'কৃষ্ণসখা'। কিন্তু এত বলেও কি ছাই বিশ্বাস করাতে পারি ? বৌ গোঁ ধরল, কোন কথা শুনতে চাই না, ওই নাটক আমি দেখবই দেখব। চারখানা পাশ চাই। আমি একা যাব না, আমার সঙ্গে আমার গঙ্গাজল আর তার দুই জাও যাবে।

ম্যানেজারবাবুর কাছে বলতেই ম্যানেজারবাবু খরখর করে একটা কাগজে ইংরিজিতে কি সব লিখে দিয়ে বললেন ; এইটে বুকিং-এ দেখালেই হবে। কাল দুপুরের শো-এর পাশ লিখে দিয়েছি চারখানা।

কিন্তু থিয়েটারের শেষে বাড়ী ফিরে, দেখি সব ভণ্ডুল হয়ে গেছে। পাশ লিখিয়ে আনাই সার। ছেলেটার তেড়ে জ্বর এসেছে,—সুতরাং কাল থিয়েটার দেখতে যাবার দফা গয়া।

সারারাত ছেলেটার মাথায় জলপটি, পায়ে গরম জলের বোতল ধরলুম,—জ্বর কিন্তু ছাড়ল না। সকালে ছুটলুম ডাক্তার বাড়ী। গরীব মানুষ আমি। হাফ্ ফী দিই ডাক্তারকে। তাই পুরো ফী-এর রুগীদের সব দেখে শুনে ডাক্তারবাবু যখন আমার বাসায় পা দিলেন, তখন বেলা দেড়টা। ছেলেটার বুক-পিঠ সব দেখে শুনে ভুরু কুঁচকে বললেন,—বুঝতে পারছি না ঠিক মশাই। তবে খুব সাদা মাটা জ্বর বলে মনে হচ্ছে না। সাবধানে রাখবেন। ঠাণ্ডা হাওয়াটি একেবারেই লাগাবেন না। আর, একটা কাগজ দিন, ওষুধ ক'টা লিখে দিই।

ছেলেটার হাতের লেখার খাতাটাই এগিয়ে দিলুম। ডাক্তারবাবু খস্খস্ করে প্রেসক্রিপশন লিখে দিয়ে চলে গেলেন।

ওদিকে তখন থিয়েটারের ম্যাটিনি শো আরম্ভ হবার সময় এসে গেছে। কাজেই আমার পক্ষে আর ওষুধ আনা সম্ভব হল না। বৌকে বললুম,—দোতলার ভাড়াটের ছোট ছেলে বলাইকে দিয়ে বড়রাস্তার

ধারের বড় দোকান থেকে ওষুধটা নিয়ে আসতে। তার পর প্রেসক্রিপশনের কাগজটা আর পাঁচটা টাকা বৌয়ের হাতে গুঁজে দিয়ে তাড়াতাড়ি ছুটলুম থিয়েটারের দিকে।

ম্যাটিনির শো হয়ে গেল। আধ ঘণ্টার ছুটি। ভাবলুম, ম্যানেজারকে তাঁর পাশ-লেখা কাগজখানা ফেরৎ দিয়ে আসি। কাজেই যখন লাগল না, তখন ওটাকে আর রাখা কেন?

কাগজখানা ফেরৎ দিয়ে চলে আসছি, ম্যানেজার ডাক দিলেন: আঃ। এটা কি দিয়ে গেলেন অমূল্যবাবু? এটা যে ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন দেখছি।

শিউরে উঠলুম। গিন্নীকে তাহলে প্রেসক্রিপশনের বদলে ম্যানেজারের লেখা কাগজটাকেই দিয়ে এসেছি তাড়াতাড়িতে। সর্বনাশ! রোগা ছেলেটার মুখে ওষুধ পড়েনি তাহলে এখনও এক ফোঁটা। কোন রকমে সাড়ে ছটার শোয়ের ফার্স্ট অ্যাক্টের ড্রেসগুলো গুছিয়ে দিয়ে ছুটলুম উর্দ্ধশ্বাসে বাড়ীর দিকে। মাঝপথে একটা মাঝারি গোছের দোকানে ঢুকে প্রেসক্রিপশন দেখিয়ে মিক্সচারটা নিয়ে নিলুম তাড়াতাড়ি।

বাড়ী পৌঁছে দেখি গিন্নী ভেটকি মাছের কাঁটা দিয়ে তরকারী রাঁধছে রান্নাঘরে বসে;—মুখে একমুখ পান-দোক্তা। আমাকে দেখে হেসে বললে, কি ব্যাপার? আজ যে এত সকাল সকাল?

বাড়ীতে ছেলেটার অসুখ; সারাদিনে ওষুধ পড়েনি, এক ফোঁটা—আর ছেলের মা কি না খোস মেজাজে ভেটকি মাছের কাঁটা দিয়ে ঝাল চচ্চড়ি বানাচ্ছে! বলব কি, আপাদমস্তক তখন জ্বলে যাচ্ছিল রাগে। দাঁতে দাঁত চেপে বললুম: ছেলেটা কেমন আছে?

বৌ পিঁড়িটা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললে: ভাল আছে গো। ঘুমোচ্ছে। দু-দাগ ওষুধ পেটে পড়তে না পড়তে ছেড়ে গেছে জ্বরটা। ডাক্তারের ওষুধের পয় আছে বাপু।

: ওষুধ—ওষুধ কোথায় পেলে তুমি!—চীৎকার করে উঠি আমি।

বৌ বলে: বা রে,—যাবার সময় তুমি ডাক্তারের ওষুধ-লেখা কাগজ আর পাঁচটা টাকা দিয়ে গেলে মনে নেই। আমি সেই কাগজ দিয়ে দোতলার ভাড়াটেদের গোপালকে পাঠালাম বড়রাস্তার ডিসপেনসারিতে।

শিউরে লাফিয়ে উঠলুম আমি: ডিসপেনসারিতে ঐ কাগজ দিয়ে ওষুধ আনাতে পাঠালে তুমি!

: হ্যাঁ।

: ঐ কাগজ দেখে ওষুধ দিলে তারা?

: হ্যাঁ গো।

বৌ মাছের কড়ায় খুন্তি নাড়তে নাড়তে বললে: লাল টকটকে রঙের ওষুধ এনেছে গোপাল। আড়াই টাকা দাম। চার ঘণ্টায় দু'দাগ খাইয়ে দিয়েছি। জ্বর ছেড়ে গেছে।

জ্বর না খোকা, কে কাকে ছেড়ে গেছে দেখবার জন্যে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটলুম ওপরে। গিয়ে দেখি, ঘুম থেকে উঠে খোকা চুপচাপ শুয়ে আছে। আমাকে দেখতে পেয়েই হাসিমুখে বললে,—বাবু, গপ্পো বল। গায়ে হাত দিয়ে দেখি জ্বরের চিহ্নমাত্রও নেই!

অমূল্যবাবুর এ-গল্পের উপসংহার একটা কিছু ছিল নিশ্চয়ই। কিন্তু আমার আর হৃদয়রামবাবুর মিলিত অট্টহাস্যে সেসব কোথায় চাপা পড়ে গেল।

হাসি থামতে অমূল্যবাবু ব্যাকুল কণ্ঠে বললেন: দোহাই আপনাদের, ও-কাগজ ফেলবেন না স্যার। সাক্ষাৎ ধন্বন্তরি। আপনারা না রাখেন, আমাকে দিন স্যার। ছেলেপুলে নিয়ে ঘর করি। জ্বরজাড়ি লেগেই আছে। বড় উপকারে লাগবে।

হৃদয়রামের উদ্দেশ্যে লিখিত ম্যানেজার সাহেবের চিঠির মর্ম পরে উদ্ধার করা গেছল। অবশ্য সাতদিন পরে। ম্যানেজারসাহেব নিজে এসে চিঠির মর্মোদ্ধার করে দিলেন। ব্যাপারটা কিছুই নয়, ভদ্রলোক হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় দিন সাতেকের ছুটির দরখাস্ত করেছিলেন ইংরেজিতে!

আবুহোসেন
জয়দেব
শিবচতুর্দশী
চাঁদে চাঁদে
ও
শ্রীদুর্গা

জুপিটার থিয়েটারের মস্ত মস্ত প্ল্যাকার্ড পড়ে গেল কলকাতার রাস্তার চৌমাথার দেওয়ালে দেওয়ালে।

"আগামী শিবচতুর্দশীর রাত্রে ধর্মপ্রাণ বাঙালীর জন্য জুপিটারের সারা রাত্রিব্যাপী বিরাট আয়োজন। দীর্ঘকাল পরে বঙ্গরঙ্গমঞ্চে জয়দেব, চাঁদে চাঁদে ও শ্রীদুর্গার পুনরাভিনয়। মাত্র একরাত্রের জন্য সেই পুরাতন আসল দৃশ্যপট, সেই পুরাতন খাঁটি সুর, সেই পুরাতন ভঙ্গির সখীনৃত্য। কোথাও এতটুকু অদলবদল নাই। এ সুযোগ জীবনে একবারই আসিবে। আসুন। দেখুন। একসঙ্গে পুণ্য এবং আনন্দ সঞ্চয় করুন।

দেখতে দেখতে সমস্ত থিয়েটারের আবহাওয়াটাই যেন বদলে গেল ক'দিনে। কোথা থেকে সব আসতে লাগলেন অদ্ভুত অদ্ভুত মানুষ। কোথা থেকে আসতে লাগল এমন সব বাদ্যযন্ত্র, সাবেক কালের ভিস্তির মশক, কিংবা রেড়ির তেলের পিদিমের মতই আজকাল যা যাদুঘরের সামগ্রীতে পরিণত হয়েছে।

সেই বাদ্যযন্ত্রে উঠল ১৯১৪ সালের সুর। বেজে উঠল পেতলের ঘুঙুর ১৯১৬ সালের অদ্ভুত ছন্দে। মাটির ভাঁড়ে আসতে লাগল কড়া লিকারের চা আর বাণ্ডিল বাণ্ডিল লাল সুতোর বিড়ি। সন্ধ্যেবেলা উঠতে-নামতে স্টেজের পিছন দিক থেকে পাওয়া যেতে লাগল মিষ্টি মিষ্টি কি একটা পানীয়ের গন্ধ। আমার সাজঘরের বন্ধ জানালার কপাট ভেদ করে ভেসে আসতে লাগল ওদিকের সমস্বর সঙ্গীত। কখনো পুরুষ কণ্ঠে—

"ঠুন্ ঠুন্ পেয়ালা ক্যায়া রং বেদম।
নেশা চল্তা হ্যায় ঝম্ ঝম্ ঝম্।"

কখনো বা নারী কণ্ঠে—

"হেল্‌কে দোল্‌কে ধীরি ধীরি।
মার নয়না ছুরি॥
রৌশ্‌নকা দিন আড় ছোড় দে সরম।
পায়েলা বাজেহে ঝম্ ঝম্ ঝম্।"

কখনো পিলুখাম্বাজ—খেমটায় শোনা যায় মোটা ধসা-গলার গান—

"চাও চাও বদন তোল
কথা কও মুচকি হেসে।"

কখনো বা সাহানা-একতালায় ককিয়ে ওঠে একটি চাঁচাছোলা কনকনে নারীকণ্ঠ—

"তুমি শিখেছ কত ছলনা।
ভাল ভুলাতে জান ললনা।"

শুনতে শুনতে চোখের সামনে যেন ভেসে উঠতে থাকে সেই সাবেকী থিয়েটার; সেই বড় পিসিমাদের দলের সঙ্গে থিয়েটার দেখতে যাওয়া; সেই লুচির বাক্স, পানের ডিবে, দোক্তার কৌটো, পিচ ফেলার ডাবর নিয়ে রহমৎ গাড়োয়ানের রবারের টায়ার-দেওয়া সেকেণ্ড ক্লাস ঘোড়ারগাড়ীর মধ্যে ঘাড়াঘাড়ি ঘেঁষাঘেঁষি হয়ে চেপ্টে বসা সেই ঘোড়ার গাড়ীর ঝিলিমিলির ফাঁক দিয়ে রাস্তার একটু একটু দেখতে পাওয়া; সেই থিয়েটারের দোতলার বিছানাপাতা বক্সে বসা; মাঝরাত্তিরে মা-পিসিদের গরম চায়ে এক চুমুক ভাগ পাওয়া; সেই হাণ্ডবিলের রঙীন কাগজের লম্বা মোড়কের ভাঁজ খুলে নকুলদানা খাওয়া; সেই ছারপোকার কামড়ে উস্‌খুস্‌, মশার কামড়ে উঃ-আঃ করা; সেই সব সব স-ব কিছু।

একবারের একটা ঘটনার কথা মনে আছে এখনো। যেন ভাসছে চোখের সামনে।

নাটকটা ছিল বোধ হয় 'জনা'। পিসি-খুড়ীদের দলের সঙ্গে গিয়ে যথারীতি বসেছি দোতলার বিছানা-পাতা নিচু পাঁচিলের বক্সে। নিচে কনসার্ট বাজছে। মেজ খুড়ীমা বলতেন, কণ্ঠশ্বাস। পালা সুরু হতে তখনো অনেক বাকি। ছারপোকারা কিন্তু তখনই কুটুস-কাটুস করতে সুরু করে দিয়েছে। মুখ ঘুরিয়ে ড্রপ-সিনের ওপরে আঁকা বিজ্ঞাপনগুলো পড়ে ফেলেছি সব। খাঁটি সরিষার তৈল, সিলেটের চুণ, রমণীরঞ্জন শাঁখা, মগরার বালি, ফসলের বীজ, হারিকেনের চিমনি, আড়ংদরে মশলাপাতি, টি-শেপ্‌ড ফুটবল পাগাজ্বরের পাঁচন, চোঙ-দেওয়া ফোনোগ্রাফ-এর বিজ্ঞাপন। বিবিত্র তার ভাষা। বিচিত্র তার অক্ষরের লতাপাতা। বিচিত্র তার ছবি। কোথাও ফোনোগ্রাফের ঢেউ-খেলানো চোঙের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছেন কৃষ্ণ-রাধা এবং খড়্গধারিণী কালী। তলায় লেখা,—ফোনোগ্রাফের রেকর্ডে শ্যাম ও শ্যামা বিষয়ক গান শুনিয়া জীবন ও কর্ণ ধন্য করুন। কোথাও অস্থিচর্মসার এক রোগী তার সাপের মতো লম্বা নাকে জড়িয়ে ধরে আছে পালাজ্বরের অমোঘ পাঁচনের মস্ত বোতল। কোথাও কাফ্রী বাপ তার কাফ্রী পুত্রের গায়ে সিলেট চুনের পোঁচড়া টেনে হাস্যবিগলিত।

আসল থিয়েটারের চেয়েও অধিকতর আকর্ষণীয় সেই সব অদ্ভুত ছবির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে নকুলদানা খচ্ছিলুম, হঠাৎ নজরে পড়ল, আমাদের পাড়ার ছবির ফ্রেমের দোকানের নিবারণবাবু থিয়েটারের হলে ঢুকছেন দরজায় টিকিট দেখিয়ে। সঙ্গে একটি পাগড়ী-বাঁধা পাঞ্জাবী কিশোর। ময়লা তার রঙ, কিন্তু টানা-টানা চোখ, আর মিষ্টি তার মুখ।

থিয়েটারে গিয়ে দোতলা-তিনতলার বারান্দা থেকে নিচের হল-এ কোন চেনা লোককে আবিষ্কার করা, সে এক ভারী আনন্দের ব্যাপার ছিল। আমাদের চেয়ে মেয়েদের আরো বেশি।

বড়পিসিমা তখন পাশের বক্সের মেয়েদের কার ক'টি ভাসুর-দেওর, কার ক'টি আইবুড়ো ননদ তার হিসেব নিচ্ছিলেন পরমোৎসাহে। তাঁকে ঠেলা দিয়ে বললুম, বড়পিসিমা, ঐ দ্যাখো নিবারণবাবু।

পাশের বক্সের গিন্নী তখন আপিসের বড়সাহেবের সঙ্গে তাঁর কর্তার ঘনিষ্ঠতার গল্প সবেমাত্র জমিয়ে তুলেছেন;—সে-গল্পকে মাঝপথে ফেলে রেখে তাঁর গর্বোজ্জ্বল মুখটিকে অকস্মাৎ নিষ্প্রভ করে দিয়ে বড়পিসিমা ঝুঁকে পড়লেন বক্সের বারান্দায়।—

: কই রে?

নিবারণবাবু ততক্ষণে বসে পড়েছেন তাঁর চেয়ারে। পাশে সেই পাঞ্জাবী কিশোরটিকে নিয়ে। তাঁকে লক্ষ্য করতে গিয়ে বড়পিসিমা আবিষ্কার করে ফেললেন চালতাবাগানের সুরেনদাদুদের বুড়ো সরকারকে, মেজখুড়ীমা আবিষ্কার করে ফেললেন পাঁচু ঠাকরুদের তিন ভাইকে, আর জ্যাঠাইমা ওপর থেকে চক্‌চকে টাক দেখে যাঁকে তাঁর বাপের বাড়ীর নিচেকার হাঁদু ময়রা বলে মনে করলেন, মুখ তুলতে দেখা গেল, তিনি সম্পূর্ণ অন্য ব্যক্তি।

লোকদের কলরব, পান-বিড়ি-সিগ্রেটের হাঁক-ডাক, গরম-চায়ের আনাগোনা সব কমে আসতে লাগল ধীরে ধীরে। দরজাগুলো বন্ধ হতে লাগল। দর্শকের মধ্যে কেউ কেউ বসবার চেয়ারের শেষবারের মত ঠুকে নিয়ে ছারপোকা তাড়াতে লাগলেন। কনসার্ট-এর আওয়াজ ক্রমে ক্রমে মিইয়ে আসতে লাগল। করতাল বাদক তাঁর হাতের মুঠি আলগা করে দিলেন, হারমোনিয়ম বাদক এঁটে দিলেন তাঁর হারমোনিয়মের বেলোর ছিটকিনি, বেহালা নেমে গেল বাদকের কাঁধ থেকে,—তারপরেই অন্ধকার হয়ে গেল সব।

তারপর লাল কাপড়পরা একজন দেবতা গোছের লোকের সঙ্গে এক রাজার কি যেন সব কথাবার্তা হতে লাগল। হাজার ঝলমলে পোশাকে লাল-নীল আলো পড়তে লাগল। একদল সখী এসে নাচলে। মদনমঞ্জরী নামে এক রাণী এসে কেমন কাঁদো কাঁদো গলায় টেনে টেনে কথা বললে। তাঁর সখী কিন্তু কেমন যেন রঙ্গ করে করে গান গাইলে একটা। তারপর কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি, কে জানে।

প্রচণ্ড একটা কোলাহলে ভেঙ্গে গেল ঘুমটা। ধড়মড় করে উঠে বসে দেখি, থিয়েটারের হলে আলো জ্বলে উঠেছে, ষ্টেজের ওপর মহাদেবকে ঘিরে কাঠের মত দাঁড়িয়ে রয়েছে গেরুয়া ধুতি ও শাড়ী পরা একদল স্ত্রী-পুরুষ। তাঁদের সামনে হুড়মুড় করে পর্দা পড়ে গেল। কিন্তু গোলমালটা তখনো চলছে: এবং ওপর থেকে সবাই ঝুঁকে কি যেন দেখছে নিচের দিকে।

আমিও তাকালুম ভয়ে ভয়ে। দেখি, সেই আমাদের নিবারণ বাবুকে ঘিরে চীৎকার করছে একদল লোক,—জিভে আঙুল পুরে সিটী বাজাচ্ছে অনেকে। আর,—কি আশ্চর্য! সেই যে সেই পাঞ্জাবী কিশোর? তার পাগড়ীটা চলে গেছে কোথায় যেন। বেরিয়ে পড়েছে তার মাথার মস্ত খোঁপা! আর, সেই মস্ত খোঁপাশুদ্ধু মাথাটাকে হেঁট করে দাঁড়িয়ে আছে সে চুপচাপ।

বড়পিসিমার হঠাৎ চোখ গেল আমার দিকে। জানি না, হঠাৎ ধমক্ দিয়ে উঠলেন,—শুয়ে পড়্, হতভাগা।

ভয়ে ভয়ে শুয়ে পড়লুম। বুঝতে পারলুম না ধমক্‌টা খেলুম কোন্ অপরাধে।

একবার রাস্তায় এক ভেল্কীওলা একটা কাঠের বলকে আম করে দিয়ে 'থ' করে দিয়েছিল আমাদের। কিন্তু সেই রাত্রে সেই পাঞ্জাবী কিশোরের আচমকা খোঁপাওলা মেয়ে হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা আরো হাজার-হাজার গুণ থ' করে দিল আমাকে। তাকে আর একটিবার দেখবার জন্তে মনের মধ্যে আকুলি-বিকুলি করতে লাগল সারাক্ষণ। কিন্তু পিসিমার ভয়ে চুপচাপ শুয়ে থাকতে হল। দেখা আর হল না।

দেখা হয়েছিল। আরো আঠারো উনিশ বছর পরে। বিপত্নীক নিঃসন্তান নিবারণবাবু তখন বাতে পঙ্গু। দোকান দেখাশুনো করবার জন্তে এলেন এক রোগা খটখটে আধাবয়সী স্ত্রীলোক। নিবারণবাবুর পায়ে বাতের তেল মালিশ করতেন যখন তিনি, তখন হাতের চেয়ে তাঁর মুখই চলত বেশি। ভাতের থালা নিবারণবাবুর সামনে ধরে দিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে বলতেন,—গেলো।

কে বিশ্বাস করবে যে, যে-যুগে থিয়েটারের একতলার হল-এ পুরুষদের সঙ্গে মেয়েদের বসবার নিয়ম ছিল না, সেই যুগে এক রাত্রে এঁকেই দেখেছিলুম পাঞ্জাবী কিশোরের ছদ্মবেশে নিবারণবাবুর পাশে? কে বিশ্বাস করবে যে, একদিন এই মাণিকবালার অধিকার নিয়ে বচসায় নিবারণবাবু মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিলেন নেবুতলার মশলাওলা ক্ষেত্রচন্দ্র নাগের?

অবশেষে এসে গেল শিবরাত্রি।

সমস্ত জুপিটার থিয়েটারটা নিমেষে এমন একটা রূপ ধারণ করল যে, আমার কেবলই মনে হতে লাগল, আমি যেন রহমৎ গাড়োয়ানের ঘোড়ার গাড়ীতে ঘেঁযাঘেঁষা হয়ে বড় পিসিমাদের সঙ্গে সে যুগের মিনার্ভায় এসে পৌঁছেছি।

থিয়েটার সুরু হতে তখনো একঘণ্টা দেরী। তারই মধ্যে একদল নানা বয়সের মহিলা নিচের চাতালে পোঁটলা-পুঁটলি নিয়ে জমায়েৎ হয়ে সেটাকে প্রায় রেল ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম করে তুলেছেন। এক পাশে ছোট একটি শিশু প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিয়ে ফেলেছে! জননী লম্বা ঘোমটায় মুখ ঢেকে হাণ্ডবিলের লাল কাগজে তা নিশ্চিহ্ন করবার ব্যর্থ প্রয়াস করছেন। টেপো খোঁপা-বাঁধা ফ্রক পরা দুটি মেয়ে পুঁটলি মাথায় দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে এক ধারে। হরিবাবুর চায়ের দোকান থেকে মুহুর্মুহু চায়ের ভাঁড় আসছে আর খালি হয়ে যাচ্ছে। বহুকাল আগে একদিন পাঞ্জাবী কিশোরের ছদ্মবেশ থেকে বেরিয়ে পড়েছিল যেমন মাণিকবালা,—মনে হল ঠিক তেমনি, জুপিটার থিয়েটারের ছদ্মবেশ খুলে গিয়ে বেরিয়ে পড়েছে যেন সেযুগের মিনার্ভা থিয়েটার। এই যেন তার আসল চেহারা,—এই তার নিজস্ব রূপ।

ধীরে ধীরে ঢুকলুম ষ্টেজের ভিতরে। গতকাল সন্ধ্যাতেও যে ষ্টেজে অভিনয় করে গেছি,—এ যেন সে ষ্টেজই নয়।

ষ্টেজের পিছনে যারা ছিল এতকাল আবর্জনার মতো,—তারা এগিয়ে এসেছে সামনে। উইং-রুমের কাটা-সিনকে আজ একরাত্রের জন্তে সড়িয়ে দিয়ে এগিয়ে এসেছে আবার কপিকলে ঝোলানো রাজসভার সিন্,—এগিয়ে এসেছে রাজোদ্যানের ফোয়ারা,—দুর্গের প্রাকার, গুলবাগিচার নীল গাছে লাল ফুলের থোকা। সিঁড়ির তলার গুদামঘরের ঝুল ঝেড়ে বেরিয়ে এসেছে ভীমের গদা, শিবের ত্রিশূল।

যথাসময়ে সুরু হয়ে গেল নাটক। রঙচটা মানস সরোবরের দৃশ্যপটের সামনে ধ্যানরত রৌদ্রাশ্বের ধ্যানভঙ্গের জন্য যেসব মায়া নায়িকারা 'এ ভরা যৌবন-জোয়ার মানে কি মানা বঁধু হে?' বলে গান গেয়ে গেয়ে নেচে উঠলেন, তাঁদের যৌবন বিদায় নিয়েছে অন্তত বছর কুড়ি আগে। মনে হল, চল্লিশ বছর আগেকার কোন্ কীটদষ্ট মাসিকপত্রের পাতা ফুঁড়ে যেন বেরিয়ে এসেছেন; এই মায়ানায়িকার দল! বহুকাল আগে বড় পিসিমাদের সঙ্গে 'জনা' দেখতে গিয়ে যাদের নাচতে দেখেছিলুম মদনমঞ্জরীর উদ্যানে, সেই সব কুইনকুমারী, মিস গোপালী, মিস বেদানা, মিস ভুলিদেরই দেখছি যেন আজ চোখের সামনে! দেখছি সেই ভঙ্গির নাচ, যে নাচ ডো-ডো পাখীদের মতোই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে পৃথিবী থেকে। শুনছি সেই কণ্ঠস্বর, যে কণ্ঠস্বর লোপ পেয়ে গেছে সেই যুগের সঙ্গে, যে যুগে বাবুরা খেত উইলসনের দোকানের মাংস, কেরাণীরা চাকরিতে যেত কাবা আর পাগড়ী এঁটে, ঢুলীরা ঠাকুরদালানের উঠানে নেচে নেচে বোল্ তুলত,—'ট্যাংরা মাছের তিনখানি কাঁটা'!

জীবন্ত মিউজিয়মের মতো এই যারা ধরে রেখেছে চলে যাওয়া যুগটাকে,—আজ এই একরাতের কয়েক ঘণ্টার চাঞ্চল্যের পর আবার

তারা পাদপ্রদীপের আলো থেকে ফিরে যাবে জীর্ণ ঘরের ধূমাঙ্কিত কালির মধ্যে। তারপর একটানা সেই আশাহীন, সম্মানহীন, সাচ্ছন্দ্যহীন বুকচাপা কান্নার জীবন। সেই ছারপোকার দাগলাগা নোনাধরা চারটে দেওয়ালের খুপরীর মধ্যে অকেজো অসাড় দেহটাকে কোনক্রমে জিইয়ে রাখার প্রয়াস। দেহপসারিণী পাতানো বোন্‌ঝিদের দেওয়া ভাতের সঙ্গে ক্রমাগত মুখনাড়া খাওয়া। গঙ্গাস্নানের পরে ভিজে গামছা মাথায় চাপিয়ে শ্মশানের চিতায় কোন সধবা পক্বকেশাকে দেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলা ?

'এ ভরা যৌবন-জোয়ার মানে কি মানা বঁধু হে !'

নেচে নেচে গাইছেন তখনো ছাপ্পান্ন বছরের মায়ানায়িকার দল।

মনে হল, এ গান নয়, কান্না। বুক ফাটা কান্না। ভাগ্যবিধাতা ওদের জীবনে না দিয়েছেন শৈশব, না দিয়েছেন কৈশোর, না দিয়েছেন বার্দ্ধক্য। জীবনের সব বৈচিত্র্য কেড়ে নিয়ে হাবুডুবু খাইয়েছেন শুধু যৌবন-জোয়ারের ঘোলা জলে। শৈশবের পুতুল খেলার দিন থেকে ওদের শিখতে হয়েছে যৌবন-জোয়ারের গা-ভাসাবার গোপন বিদ্যা,—আজ বার্দ্ধক্যের মালা জপার দিনেও তার শেষ নেই। আজও বেতো শরীরটাকে বেঁধে ঘোলাটে চোখের কোলে কাজলের রেখা টেনে, ছেঁড়াচুলে বকুলফুলের মালা গেঁথে নেচে ওদের গাইতে হয়,—'এ ভরা যৌবন-জোয়ার মানে কি মানা বঁধু হে।' যতদিন জীবন থাকবে ততদিন ওদের আর্তনাদ করে এই কথাই বলে যেতে হবে,—'এ ভরা যৌবন-জোয়ার মানে কি মানা বঁধু হে।' এ-ছাড়া উপায় নেই। এ ছাড়া পথ নেই আর।

সারা জীবন এই আদি অন্তহীন ভয়ঙ্কর যৌবনের কারাগারে মাথা কুটতে কুটতে ওরা শুধু প্রতীক্ষা করবে সেইদিনের ; যখন—

সে আসি প্রদীপ নিবাইয়া দিবে একদিন
তুলি লবে তারে রথে
নিয়ে যাবে তারে গৃহ হতে কোন্ গৃহহীন
গ্রহতারকার পথে।

সকলের অলক্ষ্যে বেরিয়ে পড়লুম হল্ ছেড়ে। মায়ানায়িকারা হেলে দুলে তখনো গাইছেন,—

—'কর দান, কর দান অধরে অধরে মধু হে !'

[ক্রমশঃ।

রাজধানীর পথে পথে

উমা দেবী

একটি প্রভাতে

এই শুভ্র নীলাকাশের শান্ত নীলিমায়
দেহ ডুবিয়ে ভেসে উঠল মন।
পীতাভ রৌদ্রে পচামান মদিরার মত
ঈষদ্ আতপ্ত হাওয়ায় ছড়িয়ে গেল সৌরভ—
ঐখানে কুলী দের মাল টানার একটানা আওয়াজ
সঙ্গত দিচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে কাকের কর্কশতা—
তবু তা ছাপিয়ে ফাল্গুনের খুশি ও খেয়াল
কোকিলের ডাকে মুহুর্মুহু ধ্বনিত হ'য়ে উঠল—
ঝিলমিলিয়ে উঠল রোদ্দুরে রোদ্দুরে নিম-গাছের
কাঁচা-সবুজ পাতার ঝালরে।

এই আতপ্ত রৌদ্রে পুরানো দিনের
স্মৃতির আবেশ-বিহ্বলতা
ঘিরে নিল মনকে।
এই উধাও হাওয়ায় উড়ে গেল
বর্তমানের রঙিন যবনিকা।
কোন গুপ্ত উৎস থেকে উৎসারিত হোলো—
ভাবীকালের এক বেদনা মধুর আনন্দ—
ছড়িয়ে গেল শান্ত নীলিমায়—
উদাস হাওয়ায়—
আর হৃদয়ের গভীর গুহায়—
একটি অজানা আশায়।

সুপার হোয়াইট কলিনস

দিয়ে দৈনিক মাত্র একবার দাঁত মাজলে দাঁতের ক্ষয় ও মুখের দুর্গন্ধকারী জীবাণু ধ্বংস হবে।

• পরিবারের সকলেই সুপারহোয়াইট 'কলিনসের' শীতল তৃপ্তিদায়ক মিণ্ট স্বাদ পছন্দ করবে।

যাদের পক্ষে প্রত্যেকবার খাবার পর দাঁত মাজা সম্ভব নয়, মনে রাখবেন, দৈনিক মাত্র একবার সুপার হোয়াইট 'কলিনস' দিয়ে দাঁত মাজলে, আপনার দাঁত ক্ষয়প্রাপ্ত হবেনা উপরন্তু অধিকতর সাদা ঝকঝকে পরিষ্কার হবে।

দাঁতের ক্ষয় নিবারণ করে।

পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, দৈনিক একবার মাত্র সুপার হোয়াইট 'কলিনস' দিয়ে দাঁত মাজলে দাঁতের ক্ষয় ও গহবর উৎপাদনকারী জীবাণুর বেশীভাগ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

মুখের দুর্গন্ধ দূর করে

সুপার হোয়াইট 'কলিনস্' সঙ্গে সঙ্গে মুখের বিস্বাদ, দুর্গন্ধ দূর করে এবং সকাল থেকে রাত পর্যন্ত আপনার নিশ্বাস প্রশ্বাস মধুরতর রাখে।

দাঁত আরও পরিষ্কার করে ! মুখে সুস্বাদ বজায় রাখে।

সুপার হোয়াইট 'কলিনস্' কত তাড়াতাড়ি আপনার দাঁতকে উজ্জ্বলতর ও আরও শুভ্র করে তোলে এবং মুখ পরিষ্কার করে প্রফুল্লতা আনে, তা পরীক্ষা করুন।

সুপার হোয়াইট 'কলিনস্ চেয়ে নিন।

Registered User
Geoffrey Manners & Company Private Limited

চরম প্রমাণ
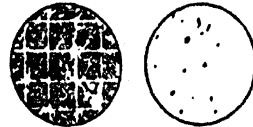
পরীক্ষাগারে প্রমাণিত হয়েছে যে, মাত্র একবার সুপার হোয়াইট কলিনস্‌দ্বারা দাঁত মাজার পর মুখের দুর্গন্ধকারী ও দাঁত ক্ষয়কারী জীবাণু সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়।

ভবানী মুখোপাধ্যায়

এগারো

৩১শে আগষ্ট ১৯৪৬ তারিখে পারীতে গ্রানভিল বার্কারের মৃত্যুর পর বার্ণার্ড শ' লণ্ডনের Times পত্রিকায় যে চিঠিটি লিখেছিলেন, তার কথা বলেছি। শ' আর একটি মূল্যবান প্রবন্ধ বার্কার সম্পর্কে লিখেছিলেন, এই প্রবন্ধটি আমেরিকার Harpen's Magazine-এ জানুয়ারী ১৯৪৭ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়, বার্ণার্ড শ'র এই রচনাটি তাঁর কোনো গ্রন্থে সংকলিত হয়নি, বা কোনো জীবনী-গ্রন্থে আজ পর্যন্ত উল্লিখিত হয়নি। রচনাটির মূল্য কিন্তু বার্ণার্ড শ'র জীবনীকারদের পক্ষে অসীম, কারণ এই প্রবন্ধে শ' স্বয়ং তাঁর রঙ্গমঞ্চের জীবন সম্পর্কে কিছু বলেছেন, যা তাঁর Sixteen Self Sketches-এর মধ্যেও নেই। আত্মকথামূলক এই প্রবন্ধটির কিছু অংশ তাই এইখানে উধৃত করলাম—

১৯০৪ খৃষ্টাব্দে আমার বয়স প্রায় আটচল্লিশ, কিন্তু লণ্ডনে এখনও আমার কোনো নাটক অভিনীত হয় নি, তবে বিদেশে কিছু কিছু সাফল্য হয়েছে, জার্মানীতে এগনেস সোরমা অভিনীত Candida আর ন্যু ইয়র্কে রিচার্ড ম্যানসফীল্ড অভিনীত The Devil's Disciple প্রমাণ করেছে যে, আমার নাটকাবলী গ্রহণীয় এবং সম্ভবতঃ লাভজনক। কিন্তু লণ্ডনের পেশাদারী রঙ্গমঞ্চ (তা ছাড়া আর কিছু ছিল না) এ সব গ্রাহ্য করলেন না, তাঁদের মতে আমার নাটকে নাটকীয়ত্বের অভাব এবং অর্থনৈতিক সাফল্যের দিক দিয়ে তার প্রযোজনা অসম্ভব।

আমার নাটকে হত্যা, ব্যভিচার, যৌনলীলা কিছুই নেই। যাঁরা নায়িকা তাঁরা সাধারণ স্ত্রীলোকমাত্র, মোটেই নায়িকোচিত ন'ন। মঞ্চের নিয়ম অনুসারে কুড়িটি কথার চাইতে বেশী সংলাপকে অত্যন্ত দীর্ঘ বলে মনে করা হত। রাজনীতি এবং ধর্ম সংক্রান্ত কথার উল্লেখ থাকবে না, তার পরিবর্তে রোমান্স, কল্পিত পুলিস কাহিনী বা ডিভোর্স কাহিনী থাকতে পারে—আমার নাটকের চরিত্রদের উক্তি দীর্ঘ এবং তাদের বক্তব্য রাজনীতি এবং ধর্মের বিরোধী।

তা ছাড়া পেশা হিসাবে আমি ছিলাম নাট্য সমালোচক, তাই কোনও থিয়েটার-ম্যানেজারকে আমার নাটক দেওয়ার উপায় ছিল না, দিলে তা উৎকোচ গ্রহণের সমতুল্য বলে বিবেচিত হত।

তাই আমার নাটক প্রকাশ করা ছাড়া তাকে পাঠযোগ্য করে তুলতে হয়েছে। আমার পরিচিত এক প্রখ্যাত পুস্তক-প্রকাশক একজন জনপ্রিয় নাট্যকারের নাটক প্রকাশ করতেন। তাঁরা লেজার খুলে দেখালেন নাটক বিক্রয়ের হিসাব। এক রকম বিক্রী হয় না বলাই চলে, শুধু সৌখীন সম্প্রদায় রিহার্সেলের খাতিরে মাঝে মাঝে দু' চারখানি কিনে থাকেন।

আমি মঞ্চ নির্দেশকে যথাসম্ভব সহজবোধ্য এবং পাঠযোগ্য বিবরণে পূর্ণ করলাম, একখানি নাট্যগ্রন্থকে কিভাবে উপন্যাসের মতো আকর্ষণীয় করা যায়, তার ব্যবস্থা করলাম। গ্রান্ট রিচার্ডস নামক জনৈক তরুণ প্রকাশক এগিয়ে এলেন—তিনি পথিকৃতের ভূমিকা গ্রহণ করলেন। তাঁর সেই প্রচেষ্টা সার্থক হল—নাটকগুলি প্রকাশক-মহলে সাহিত্য-গ্রন্থ হিসাবে গৃহীত হ'ল আর আমার কোন নাটক অভিনীত না হলেও নাট্যকার হিসাবে আমি খ্যাতিলাভ করলাম। আমার নাটকগুলি রিজার্ভ ষ্টক হিসাবে রইল, কোনও দুঃসাহসিক থিয়েটার কর্তৃপক্ষ পরীক্ষামূলক ভাবে তা গ্রহণ করতে পারতেন।

এর পর বার্ণাড শ' কি ভাবে হারলে গ্রাণভিল বার্কারকে আবিষ্কার করলেন তা লিখেছেন। ক্যানডিডার কবির ভূমিকা গ্রহণের উপযোগী একজনের সন্ধান করছিলেন, এমন সময় তেইশ বছরের যুবক গ্রাণভিল বার্কারের সাক্ষাৎ পাওয়া গেল। চোদ্দ বছর বয়স থেকেই তিনি রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। বার্ণাড শ' বলেছেন—"He was self-willed, restlessly industrious, sober and quite sane. He had Shakespeare and Dickens at his finger ends." বার্ণাড শ' মনে করেছিলেন যে এই পরম সংস্কৃতিবান মানুষটি নেহাৎ ঘটনাচক্রে রঙ্গমঞ্চের সংস্পর্শে এসে পড়েছেন। বার্ণাড শ জার্মাণ নাট্যকার হপ্তম্যানের 'Fried ensfest' নাটকে বার্কারকে অভিনয় করতে দেখে অভিভূত হয়ে সেইখানেই তাঁকে নির্বাচিত করলেন ক্যানডিডার 'কবি'র ভূমিকার জন্ত।

কি ভাবে পরে ভেড্রেনে এবং বার্কার নাট্য প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল তা আগে বলা হয়েছে।

এই সময়েই বার্ণাড শ আবিষ্কার করেন লীলা ম্যাক্কারথিকে। বার্ণার্ড শ'র সমস্যা মেটেনি বার্কারকে পেয়ে। শুধু নায়কেই ত' নাটক হয় না, নায়িকা চাই—শ' বলেছেন—"She dropped from heaven on us in the person of Lillah McCarthy—"

ষোল বছর বয়সে এই মেয়ে লেডী ম্যাকবেথের ভূমিকায় অভিনয় করে 'The Sign of The Cross'-র মারসিয়ার ভূমিকা নিয়ে সারা পৃথিবী ঘুরে এসেছিল। বার্ণার্ড শ' তাঁর দিকে নজর পড়তেই বুঝলেন—এরই অপেক্ষায় ছিলাম এতদিন।

তিনি বলেছেন—ওর দিকে একবার তাকিয়েই আমি ওর হাতে 'Man and Superman' দিয়ে বললাম, তুমি এ্যান হোয়াইটফিল্ডের চরিত্র সার্থক করে দাও।

এই ভাবে বার্ণার্ড শ'কে নাটক লেখা নয়, নাটক প্রকাশ করা, তার প্রযোজনা করা, এমন কি মঞ্চের খুঁটিনাটি ব্যবস্থা এবং বৈষয়িক দিকও দেখতে হয়েছে। বার্কার এবং লীলা ম্যাক্কার্টিকে পেয়ে শ' ভাবলেন তাঁর এতদিনের স্বপ্ন সার্থক হয়েছে। তিনি লিখেছেন—

"We are now complete. The Court experiment went through with flying colours."

কিন্তু আর সব দিক দিয়ে সার্থক হলেও আর্থিক সাফল্য সুলভ হল না। বার্কারকে অনেক কাজ করতে হ'ত, শ'র নাটক ছাড়া আর সব নাটকের প্রযোজনার ভার তাঁর, অন্য সব শিল্পীদের তালিম দেওয়ার কাজও তাঁর—পরে অভিনয় করা ছেড়ে প্রযোজনার কাজেই বার্কার অধিক ভাবে মন দিলেন, নাটকও লিখলেন। কোর্ট থিয়েটার ছাড়তে হল, বার্ণার্ড শ' বলেছেন—"The pace grew hotter and hotter ; the prestige was inmense." কিন্তু বক্স-অফিসের পাওনা দিয়ে কোনো রকমে চলে গেলেও মজুত টাকা কিছু থাকতো না, আর থিয়েটারে সঞ্চিত ভাণ্ডার না থাকলে নতুন নাটক বা নতুন নাট্যকারকে সুযোগ দেওয়া সম্ভব নয়। ফলে ঋণ হতে লাগল এবং এক দিন থিয়েটারের দরজা বন্ধ করতে হল। ভেডরেনের সর্বনাশ করে তাকে ঋণশোধ করতে বলা অনুচিত, তাই বার্কার তাঁর যা ছিল সব দিলেন এবং বাকী টাকা দিলেন বার্ণার্ড শ' স্বয়ং। বার্ণার্ড শ' বলেছেন—"So the firm went down with its colour flying."

বার্ণার্ড শ' বলেছেন, এর জন্য লণ্ডনের অতিরিক্ত ভাড়া এবং ট্যাক্সই দায়ী। কিন্তু এই সূত্রে লীলা-বার্কার-বার্ণার্ড শ' সহযোগে যে সম্মিলিত গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল, তা অটুট রইল। তার সঙ্গে সেক্সপীয়র যুক্ত হল, কেন না বার্কার-এর পর লণ্ডনে সেক্সপীয়রীয় নাটক প্রযোজনা করে বিশেষ খ্যাতিলাভ করেছিলেন। বার্কার হিসাবী মানুষ ছিলেন না, এই সব প্রচেষ্টায় ভেডরেনে না থাকায় তিনি আরো বে-পরোয়া হয়ে টাকা নিয়ে প্রায় ছিনিমিনি খেলেছেন কিন্তু নাটকের আর্থিক লাভ না হলেও তার পরিপূর্ণ শিল্প-মর্যাদা দিয়েছেন বার্কার। সেই হিসাবে তিনি মহৎ।

বার্ণার্ড শ' এই প্রবন্ধে লিখেছেন যে, "এই ইতিহাসের সূচনাতেই লীলা এবং বার্বারের বিয়ে হয়ে গেল, আমি জানতাম কাজটা ভুল হবে, জানতাম এই বিবাহ মণিকাঞ্চন সংযোগ, আর জানতাম এ বিবাহ দীর্ঘস্থায়ী হবে না। কিন্তু যার উপায় নেই তা মেনে নিতে হয়। সাময়িক ভাবে অবশ্য এই বিবাহ আদর্শ বিবাহ হিসাবে স্বীকৃত হয়েছিল—এ যে সফল বিবাহ সে বিষয়ে সকলেই নিঃসন্দেহ ছিলেন। —পেশা হিসাবে নটজীবন ভ্যাগাবণ্ডের জীবন হলেও বার্কার চরিত্রে বোহিমিয় উদ্দামতা ছিল না—তাই বিবাহ সুরু থেকেই যথোচিত মর্যাদা মণ্ডিত মনে হল, বার্কারের পক্ষে ভালোও হল।—আমি বিস্মিত হলাম, ভাবলাম যে এই ব্যবস্থা উভয়পক্ষের পক্ষেই সুবিধাজনক হয়েছে—কিন্তু আমার আশংকা একটা পারিবারিক বিপর্যয়ে অবশেষে সত্যে পরিণত হল!

উচ্চ মানের সাংস্কৃতিক নাট্যানুষ্ঠানের যে পরীক্ষা লীলা-শ' এবং বার্কার-গোষ্ঠী সুরু করেছিলেন তা এক দিন গণেশ ওলটালো—দেউলিয়া হয়ে কোম্পানি লাল বাতি জ্বালানো, বার্কার এক রকম রিক্ত হয়ে পড়লেন। ন্যু ইয়র্কে নবগঠিত মিলওনেয়ার থিয়েটারে ডিরেক্টর হিসাবে যোগ দেওয়ার জন্য বার্কার সেখানে গেলেন কিন্তু সেই রঙ্গমঞ্চ তাঁর কাছে অযোগ্য মনে হল, তাই তিনি সেই কর্ম প্রত্যাখ্যান করে যুদ্ধে যোগ দিলেন, তত দিনে ১৯১৪-১৮'র যুদ্ধ সুরু হয়ে গেছে। এইখানেই সেই ধনী মার্কিন রমণীর প্রেমে পড়ে বার্ণার্ড শ'কে চিঠি দিলেন এক সপ্তাহের মধ্যে লীলার সঙ্গে ডিভোর্স ব্যবস্থা করে দিতে।

বার্ণার্ড শ' বলেছেন—"আমি বুঝিনি যে আমি পাগলকে নিয়ে পড়েছি (I was dealing with a lunatic), স্বভাবতঃই ভেবেছিলাম লীলা ও এর জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে, হয় ত আমেরিকা যাত্রার আগেই সব ঠিক-ঠাক হয়েছে। ওদের বিবাহের স্থায়িত্ব সম্ভব এ কথা আমি কোনো দিনই বিশ্বাস করিনি, তাই ভেবেছিলাম ডিভোর্সটাই ওদের পক্ষে স্বাভাবিক এবং মঙ্গলকর।" লীলাকে ডিভোর্সের কথা বলতে গিয়ে অপ্রস্তুত হলেন বার্ণার্ড শ'। সে এই প্রস্তাবে অতিশয় অপমানিত বোধ করল। এ তার কাছে কুৎসিত অপমান। এ সব সাধারণ স্ত্রীলোকের জীবনেই ঘটে তার মতো রমণীর জীবনে এ যেন অভিশাপ।

বার্ণার্ড শ' মুস্কিলে পড়লেন। দু' পক্ষই তাঁকে অবিশ্বাস করতে লাগল, 'লীলা ম্যাক্‌কারথি মনে করলেন বার্ণার্ড শ' এই প্রস্তাবের প্রতিবাদ করলেন না কেন আর বার্কার ভাবলেন এই সহজ সাধ্য কর্মটাও বার্ণার্ড শ' কেন করছেন না, তিনি বোধহয় লীলার পক্ষ নিয়ে টালবাহানা করছেন। যে-বিবাহ এতদিন পর্যন্ত বেশ আদর্শ বলে মনে হচ্ছিল এক কথায় তার অবসান ঘটলো। যুক্তিতে তাদের বোঝানো যায় না। বার্ণার্ড শ' বলেছেন—"They red literally nothing to say each other ; but they had a good deal to say to me, mostly to the effect that I was betraying them both."

বার্ণার্ড শ'র এত মাথা ব্যথা কিসের ওদের ব্যাপারে—এই প্রশ্ন হতে পারে, তার উত্তরে তিনি বলেছেন—"Well, I had thrown them literally to one another's arms as John Tanner and Ann Whitefield, and I suppose it followed that I must extricate them." অবশেষে বার্ণার্ড শ' সফল হলেন, তিনি বলেছেন আরো আগেই হত ওরা যদি একটু যুক্তির প্রতি ভক্তি রাখতো।

এই প্রবন্ধেই বার্ণার্ড শ' লিখেছেন—

"এই বিবাহের অবাস্তবতার জন্য বিচ্ছেদ উপলক্ষে যে-নির্মম ঝড় উঠেছিল তা যখন থামলো তখন আকাশ সম্পূর্ণ মেঘমুক্ত হল। সব ভালো যার শেষ ভালো। এই দ্বন্দ্বের সময় এক মহেন্দ্রক্ষণে ভবিষ্যৎবাণী করে বলেছিলাম, লীলা, তোমাকে আমি চিরদিন বার্কারের জীবন রঙ্গমঞ্চের নায়িকা হিসাবে দেখতে চাই না, তুমি কোন পদবীধারী ভদ্র এবং সৎ ভদ্রলোকের সুগৃহিণী হয়ে সুখে ঘর সংসার করবে তাই মনে করি। আমার এই উক্তি সেদিন লীলা কুরুচির পরিচায়ক মনে করেছিল। সে ভেবেছিল তার জীবনের নিদারুণ সমাপ্তি ঘটবে কিন্তু তা হয়নি, আমি যা বলেছিলাম তাই হয়েছিল। ওরা দুজনেই যৌবনে আমার সঙ্গে একত্রে কাজ করেছে, পরিণত বয়সে শান্তিময় জীবনে অবসর গ্রহণ করাতে ওদের সুখে আমি সুখী হয়েছিলাম।"—

আগেই বলা হয়েছে বার্কার যাকে বিয়ে করেছিলেন সেই

মার্কিণী রমণীকে বার্ণার্ড শ' স্বচক্ষে দেখেন নি, তিনি তাঁর উল্লেখ করেছেন, "the lady who enchanted Barker'—এই হিসাবে। বার্কার ও এই মহিলা প্রথমে ডেভন ও পরে প্যারীতেই বসবাস করতে লাগলেন। বার্কার এই সময় Prefaces to Shakespeare ছাড়া আরো দুটি নাটক লিখেছিলেন, স্ত্রীর সহযোগে কয়েকটি স্প্যানিস গ্রন্থ অনুবাদ করেছেন। বার্ণার্ড শ' বার্কারকে বলেছেন—a highly respectable Professor—বার্ণাড শ'র বার্কারের প্রতি যে কি গভীর মমতা ছিল তা এই প্রবন্ধে আভাস পাওয়া যায়। মনে মনে বার্কারের সঙ্গে যোগাযোগ করার ইচ্ছা থাকলেও বোধহয় বার্কারের মার্কিণী স্ত্রীর জন্যই তা সম্ভব হয়নি।

বোধকরি এই কারণেই বার্কারের মৃত্যুর পর বার্ণার্ড শ'র মনে সুইনবার্ণের কবিতার এই ক'টি লাইন মনে হয়েছিল—

"Time turns the old days to derision,
Our loves into Corpses of wives ;
And marriage and death and division
Make barren our lives—"

বারো

১৯০৫ এর ২৮শে নভেম্বর Major Barbara প্রথম মঞ্চস্থ হয়। এই দিন দর্শকদের মধ্যে ছিলেন আর্থার বালফুর এবং লণ্ডনের সমগ্র বিদগ্ধ সমাজ, আর ছিলেন বক্স ভর্তি স্যালভেশন আর্মির কমিশনারবৃন্দ। তাঁরা জীবনে কোনোদিন থিয়েটারে পদার্পণ করেননি। প্রথম দুটি অংক প্রচুর হাততালি পেল। ২য় অংকের শেষে লবিতে দেখা হল নাট্যকার এলফ্রেড সুট্রো বার্ণার্ড শকে অভিনন্দিত করে বললেন—"এ তোমার মাষ্টারপীস্, ! শেষ অংকটি যদি প্রথম দুটির মতো হয়"—

তাঁর কথায় বাধা দিয়ে শ' বললেন—"শেষ অংকটি অভিনয় হতে এক ঘন্টা লাগবে, কেবল কথা আর কথা।"

এই কথায় সুটরোর মুখটা গম্ভীর হয়ে উঠল।

সেদিকে বার্ণার্ড শ'র লক্ষ্য পড়তেই বললেন—ভয় নেই, কথা ওরা গিলে নেবে।

কিন্তু অভিনয় শেষে দর্শকরা ভাবতে লাগল দ্বিতীয় অংকের মেলোড্রামা কি সুদীর্ঘ তৃতীয় অংকে পুষিয়ে নেওয়া হল।

শ' বলেছেন—শেষ অংকটি দর্শককে ক্ষেপিয়ে তুলেছিল, তার কারণ অনডারসাফটের পার্ট যিনি করছিলেন তিনি ভালো বোঝেন নি, তার ফলে তাঁর অভিনয় জমেনি।

এই নাটকের অভিনয় দেখে ম্যাকস বীরবোহম সুদীর্ঘ সমালোচনায় লিখেছিলেন—

বলা হয় মিঃ শ' জীবনকে রূপায়িত করতে অক্ষম, তিনি তার বিকৃতরূপ দেখাতেই শুধু পারেন। মানব প্রকৃতির কোনও অভিজ্ঞতা তাঁর নেই, উনি নিছক থিওরিষ্ট। ওঁর সৃষ্টচরিত্রাবলী আসলে ওঁর স্বীয় প্রকৃতির বিভিন্ন অবস্থা মাত্র। সবচেয়ে বড়ো কথা উনি নাটক লিখতেই পারেন না। ওঁর নাটকীয় চেতনা নেই, নাটকীয় আঙ্গিকের জ্ঞান নেই। প্রখ্যাত সমালোচকরা বার বার এই কথাই বলে থাকেন জোর গলায়, কিন্তু বার্ণার্ড শ' Major Barbara নাটকে বারবারা এবং তাঁর বাবা এই দুটি চরিত্র সৃষ্টি করেছেন, এরা প্রাণরসে উজ্জ্বল, এই সত্যটুকু তাঁদের ব্যঙ্গ করে। এছাড়া ছোট খাটো চরিত্রের ভীড়ও জীবন থেকেই গৃহীত (কিছু অবশ্য অতিরঞ্জন আছে) এত শত সত্ত্বেও সমালোচকরা বলেন—বার্ণার্ড শ' নাট্যকার নন।

ম্যাকস আরো লিখেছেন—আমারও ধারণা ছিল বার্ণার্ড শ'র নাটক রঙ্গমঞ্চে অচল। এতদ্বারা প্রমাণিত হয় যে আমার নাটকীয় জ্ঞান সীমাবদ্ধ, রঙ্গমঞ্চে নাটকের যে সম্ভাবনা তা নাটক পাঠ করেও বুঝিনি।

চার্লস ফ্রোমান বলেছিলেন—"Shaw's very clever ; he always let the fellow get the girl in the end—"

কোর্ট থিয়েটারে Major Barbara ছয় সপ্তাহ ধরে চলল।

মেজর বারবারা এক তেজস্বী রমণীর কাহিনী, সে ধর্মের আশ্রয়ে বাস করত, পরে আশ্রয়চ্যুত হয়। নিজের এবং জগতের আশা এবং বিশ্বাস চুরমার হয়ে গেল তার চোখে, অবশেষে সে আশ্রয় পেল এক নতুন ধ্যান-ধারণার নিরাপদ নীড়ে। এই হল নাটকের কেন্দ্রীয় বাণী, অন্তর্নিহিত বাণী।

ডেসমণ্ড ম্যাক্‌কার্থী বলেছেন—"It is the first English play which has for its theme the struggle between two religious in one mind."

মেজর বারবারা নাটকের পরিকল্পনা, লিপি কুশলতা বার্ণার্ড শ'র প্রতিভার উপযুক্ত অভিব্যক্তি। মেজর বারবারার বার্ণার্ড শ'র নিজস্ব রচনা রীতির বিশিষ্ট রূপ চোখে পড়ে। মেজর বারবারার দ্বিতীয় অংকের পটভূমি স্যালভেসন আর্মি সেল্টার, ওয়েষ্টহাম, এই অংকটিই একটি পূর্ণাঙ্গ নাটকের সমতুল। প্রথম অংকের পটভূমি ওয়েষ্ট এণ্ডের ভাবটি ড্রয়িংরুম এবং অংশতঃ গোলাবারুদের কারখানা পল্লী। এই নাটক তিনি তেমন মনোযোগ দিয়ে লেখেন নি, বারবারা সম্পর্কে তিনি মনস্থির করতে পারেন নি। নাটকের নাম দেখে মনে হবে বারবারাই বুঝি প্রধান ভূমিকা,—কিন্তু নাটকে তার বাবা এণ্ড্রু অনডার অণ্ডার সাফটই প্রধান চরিত্র। এই নাটক অসংলগ্ন, ষ্টিফেন, সারা এবং চার্লস লোবাকস্ এই তিনটি চরিত্র অপ্রয়োজনীয়। বার্ণার্ড শ' বলেছেন এই নাটকে তিনি বাস্তব জীবন এবং রোমাণ্টিক কল্পনার সমাবেশ ঘটিয়েছেন। বার্ণার্ড শ' বলেছেন—'tragic comic—irony'—আসলে আদর্শ বিলাসীর স্বপ্ন ভঙ্গ। বারবারা যেদিন জানলো যে স্যালভেশন আর্মি মদ্য ব্যবসায়ী, গোলাবারুদ ব্যবসায়ী প্রভৃতির কাছ থেকে অর্থ সাহায্য গ্রহণ করে তখন সে নিদারুণ হতাশায় স্যালভেসন্ আর্মির সম্পর্ক ত্যাগ করল।

বারবারার বাবা জ্ঞানী মানুষ তিনি মেয়েকে শেষ অংকে বলেছেন—"Does my daughter despair so easily ? Can you strike a man to the heart and leave no mark on him ?"

সে উত্তর দেয়—"You may be a devil, but God speaks through you sometimes !

নাট্য-সমালোচকদের মতে বার্ণাড শ'র Caesar and

Cleopatra ও Major Barbara এই দুটি নাটকের নায়িকা-চরিত্রের ক্রম-পরিণতি আছে, এই ক্রম-পরিণতি রীতিগত ভঙ্গীতেই হয়েছে, তাঁর সৃষ্ট আর সব চরিত্র স্থিতিশীল।

Major Barbara—নাট্যকারের উদ্ভট খেয়াল নয়, এই নাটকের উপজীব্য একটি মহৎ কাহিনী—এবং সেই কাহিনী জীবনের মতো বাস্তব। Three Plays for Puritans—সম্পর্কে বিচারকালে সমালোচকরা বলেন শ'র সব নাটকেই প্রধান চরিত্র কিঞ্চিৎ কৃত্রিম ব্যবস্থার পরিবেশে বিজড়িত থাকেন। দেখা গেছে এই পদ্ধতি বা প্রকরণ Man and Superman এবং Pygmallion নাটকে কিঞ্চিৎ অন্তর্মুখী। এই নাটকগুলিতে নায়িকাই প্রধান—নায়ক তার ছায়া মাত্র। এমন কি John Bull's other Island-এর কেন্দ্রীয় চরিত্র ব্রডবেন্টও অন্তর্মুখী আদর্শবাদী। Major Barbara নাটকের ত্রয়ী কেন্দ্রীয়-চরিত্র—অনডারসাফট, বারবারা, কসিনস্, ব্রডবেন্ট, কী গান, ডয়েল-চরিত্র থেকেও যেমন বিপরীত, তেমনই প্রভেদ রয়েছে রামসডেন, এ্যান এবং ট্যানার প্রভৃতি চরিত্রের সঙ্গে। এই নাটকের যে মানুষটি জীবনে সাফল্য লাভ করেছে সে একজন আধুনিক সীজার। সেডিয়ান ভঙ্গীতে কল্পনাকুশল এবং প্রাণরসে পূর্ণ নায়ক। আদর্শবাদী নায়িকা প্রথমদিকটায় স্বপ্নবিলাসে মত্ত হলেও নাটকের পরিণতি দৃশ্যে বাস্তব-জগতে ফিরে আসে। অনডারসাফটের উত্তরাধিকারী গ্রীকভাষার তরুণ অধ্যাপক কল্পনাও বাস্তবের সমন্বয় ঘটাবে এমন আভাস নাটকে আছে, ব্যবহারিক বুদ্ধি এবং প্রচার সমাবেশ—একেবারে অতিমানবীয় সংযোগ।

নাটকের এই অভিব্যক্তি কিন্তু তেমন অনুমান করা যায় না, বারবারার প্রাথমিক স্বপ্নভঙ্গের চেয়ে তার পরিণতির রূপায়ন তেমন বলিষ্ঠ নয়। কসিনসের চেয়ে অনডারসাফট চরিত্র অধিকতর পরিস্ফুট। বার্ণার্ড শ' দারিদ্র যে অপরাধ এবং পাপ তা বোঝাতে চেয়েছিলেন তাই অনডারসাফটের বিবেচনা শক্তি প্রাইসের চেয়ে অনেক বেশী। এই নাটকের নাম হওয়া উচিত ছিল Andrew Undershafts profession.

Major Barbara উদ্ভট সৃষ্টি নয়। বার্ণার্ড শ'র সৃষ্ট নারী-চরিত্র এক নতুন আকৃতি লাভ করল এই নাটকে। প্রথম যুগে বার্ণার্ড শ' দুই জাতীয় নারী-চরিত্র এঁকেছেন, রোমান্সহীন ভিভি, ক্যানডিডা, লেডী সিসিলি এবং মিসেস ওয়ারেন বা ব্ল্যানচি সারটরিয়সের মত লোভী এবং সঞ্চয়ী মনোবৃত্তির নারী। এই পরবর্তী চরিত্রই উত্তরকালে এ্যান হোয়াইট ফিলড হয়েছে। Caesar and Cleopatra এবং Major Barbara উভয় নাটকেই সমস্থার

এই নাটকটি রচনার পিছনে একটা ইতিহাস আছে। Major Barbara নাটকের মূল কাহিনী স্যালভেশন আর্মি ও দারিদ্র্যের ভিত্তিতে গঠিত। এই নাটকের দুটি প্রধান চরিত্রে গিলবার্ট মারে এবং তাঁর জননী লেডী কার্লাইলের জীবনের ছায়া আছে।

ইষ্ট এণ্ডের পথে—প্রান্তরে বক্তৃতাকালে অনেক সময় স্যালভেশন আর্মির বক্তৃতামঞ্চের কাছাকাছি তিনিও জায়গা পেতেন। এই সময় স্যালভেশন আর্মির মহিলা কর্মীদের মধ্যে নাটকীয় প্রতিভা তাঁর চোখে পড়ে। একদিন একজন সাংবাদিক একটা হট্টগোল সম্পর্কে বিরক্তি প্রকাশ করলেন—Worse than a Salvation Army Band। সেই পত্রিকায় প্রতিবাদ করে চিঠি দিলেন বার্ণার্ড শ', সঙ্গীত সমালোচক হিসাবে তিনি স্যালভেশন আর্মি ব্যাণ্ডের প্রশংসা করলেন। স্যালভেশন আর্মির কর্তা জেনারেল বুথ খুসী হলেন এবং এই অপ্রত্যাশিত প্রশংসা পত্রের পরিপূর্ণ সুযোগ নিলেন। বার্ণার্ড শ'কে ক্ল্যাপটন হলে একটা বিরাট ঐকতান সভায় আমন্ত্রিত হলেন। স্যালভেশন আর্মি সম্পর্কে প্রবন্ধ লিখলেন বার্ণার্ড শ'।

এরপর এঁদের সঙ্গে ঘনিষ্টতা হওয়ার পর বার্ণার্ড শ' একদিন মনের কথা পাড়লেন, স্যালভেশন আর্মি মেয়েদের অভিনয় প্রতিভার সদ্ব্যবহার করা হোক্। তাদের সঙ্গীত পারদর্শিতার পরিপূর্ণ পরিচয় পাওয়া যাবে ছোট্ট নাটিকাভিনয়ে। তিনি নিজেই নাটক লিখে দিতে রাজী হলেন।

কর্তৃপক্ষরা রাজী হলেও বললেন—মুক্তিফৌজের অনেক সেনা থিয়েটারের পথেই নরকের দ্বারে পৌঁছেছেন, তাঁরা অভিনয় ব্যবস্থা করতে পারেন, যদি নাট্যকার প্রতিশ্রুতি দেন যে প্রতিটি কথা সত্যের ভিত্তিতে রচিত।

বার্ণার্ড শ' বললেন—তোমাদের কি বিশ্বাস বাইবেলে কথিত Prodigal Son এক আসল চরিত্র ?

স্যালভেশন আর্মির কর্তা বললেন—নিশ্চয়ই। আমরা তাই বিশ্বাস করি। বার্ণার্ড শ' মিসেস ব্রামওয়েল বুথকে প্রশ্ন করলেন—একটা ছোট্ট নাটিকা লিখে দেব, অভিনয় করবেন ?

মিসেস বুথ বললেন—তার চেয়ে একটা যদি চেক লিখে দেন সকৃতজ্ঞ চিত্তে গ্রহণ করবো। বার্ণার্ড শ' হতাশ হওয়ার পাত্র ন'ন সেই ছোট্ট নাটিকার পরিকল্পনাই বিরাট নাটকের আকারে প্রকাশিত হল— Major Barbara।

সেন্সর বোর্ডে সাক্ষ্যদান কালে গ্রানভিল বার্কারকে প্রশ্ন করা হয় —এই নাটক স্যালভেসন আর্মি প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষদের মনে আঘাত করতে পারে কি না!

বার্কার বললেন—তাঁরা খুসী হয়ে কোর্ট থিয়েটারে অভিনয়ের জন্য স্যালভেশন আর্মির ইউনিফর্ম দিয়েছেন। এ তাঁদের এক চমৎকার বিজ্ঞাপন।

বার্কার সেই দিন একথা না জানালে হয়ত অভিনয়ের জন্য প্রয়োজনীয় লাইসেন্স পাওয়া যেত না।

গ্যাব্রিয়েল প্যাসকাল এই নাটকটি পরে ছায়াছবিতে রূপায়িত করেন। সেই সময় বার্ণার্ড শ' দম্পতি দুজনেই অসুস্থ। গ্যাব্রিয়েল প্যাসকাল অনেকখানি সময় ফিল্মের আলোচনায় কাটাতেন। বৃদ্ধ বার্ণার্ড শ'র কাছে যান্ত্রিক ব্যাপারের একটা বিশেষ আবেদন ছিল, ফটোগ্রাফির খেলায় তিনি ডুবে গেলেন। এই নতুন মাধ্যমের নাটকীয় সম্ভাবনা উৎসাহিত হয়ে বার্ণার্ড শ' ভাবলেন এ তাঁর জীবনের এক নতুন দিনের সূচনা—সমাপ্তি নয়। কারণ মঞ্চের জন্য যখন লিখেছিলেন তখন থিয়েটার কর্তৃপক্ষের আর্থিক অবস্থার কথা ভেবে যথাসম্ভব ব্যয়সঙ্কোচ করতে হয়েছে। এখন বিস্তারিত ভাবে অনেক দৃশ্য সাজিয়ে Major Barbara প্রদর্শিত হবে। কিন্তু মন খারাপ হয়ে গেল—নাটকটিকে নতুন দৃষ্টিতে 'ব্যাক-ডেটেড' (পুরাতন) মনে হল।

গ্যাব্রিয়েল প্যাসকাল বলল—একেবারে আধুনিক আসবাবে মুড়ে দেব। বিংশ শতাব্দীর স্থাপত্য হবে পটভূমি। তা ছাড়া থাকবে আসল অর্কেষ্ট্রা।

বার্ণার্ড শ'র উৎসাহ এত বেড়ে গেল গেল যে Pygmalion নাটকের রয়্যালটির টাকা এই ফিল্মের প্রতিষ্ঠানে লগ্নী করলেন। প্যাসক্যাল অতি সহজেই ষোলটি নতুন দৃশ্য লিখিয়ে নিলেন ছবির জন্য। বার্ণার্ড শ'র জীবনে বারবার নানা মানুষের প্রখর প্রভাব পড়েছে, ভ্যানভেলর লী থেকে রিচার্ড ডেক-জয়েনস থেকে ডাঃ আভেলিং, এ্যানি বেসান্ট থেকে এলিনর মার্কস, ফ্রাঙ্ক প্যারিস থেকে কানিংহাম গ্রেহাম, গ্রানভিল বার্কার থেকে টি, ই, লরেন্স। কিন্তু তোষামোদে গ্যাব্রিয়েল প্যাসকাল সকলকে অতিক্রম করে যায়, তার কথাই অন্যরকম। প্যাসকালের মতে তার স্বীয় জন্মভূমি হাঙ্গেরীর দুটি নদীতে প্রতিফলিত নীল আকাশের ছায়ার ন্যায় ঘন নীল দৃষ্টি বার্ণার্ড শ'র চোখে, তাঁর শুভ্র কোমল শ্মশ্রু তাঁর স্বদেশের পর্বতমালার ওপরকার তুষার কিরিটীর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়—ইত্যাদি ইত্যাদি।

শ' যা বলেন, করেন সবই আশ্চর্য—অদ্ভুত, বিস্ময়কর।

যুদ্ধের সময় প্যাসকাল বার্ণার্ড শ'কে একদিন বলল—

You Master, are the only man who could put Hitler on your lap and give him the smeeking on his bottom he deserves. You are the only man who could exert authority…

বার্ণাড শ! চোখে দুষ্টামি ভরা হাসি ফুটে ওঠে। সেই সময় আর্ধেকের ওপর য়ুরোপ হিটলারের পদানত, প্যাসক্যাল ভাবে বার্ণাড শ'র এক ধমকে হিটলার ঠাণ্ডা হবে।

Major Barbara ছবিতে রূপায়িত করার সময় তাই প্যাসক্যাল বলে—The great ones of the world have already acclaimed you as the Master mind. Churchill has called Major Barbara a master piece. Now every servant girl and every peasant will vibrate to you.

অনেক অল্প ব্যয়ে এই নাটকের চিত্ররূপ গ্রহণ করা হয়েছিল। ছবি দেখে বার্ণাড শ'র বন্ধু ও একমাত্র কড়া সমালোচক এইচ, জি, ওয়েলস ১৬ই এপ্রিল ১৯৪১ তারিখে নিম্নলিখিত চিঠি লেখেন—

প্রিয় জি, বি, এস,

আজ তোমাকে চিঠি লিখব স্থির করেছিলাম, আমাদের মন সমবেদনায় ভরা। সোমবার Major Barbara দেখলাম, আমার বেশ লাগল। তুমি একটা নতুন সংজ্ঞা দিয়েছ। এমড্ অনডার সাফটের মুখখানা একটু ভাবগম্ভীর হলে ভালো হত। মনে হল যেন আগাগোড়াই সে নিজেকে নিয়েই বিস্মিত। হাউসে জায়গা ছিল না, সব ভর্তি। Moura এবং আমি একেবারে শেষ সিট পেয়েছিলাম এর চেয়ে সংবেদনশীল দর্শক আশা করা যায় না। ঠিক জায়গায় সবাই হেসেছে, অধিকাংশই প্রায় সামরিক ইউনিফর্মধারী তরুণ।…বুড়ো হওয়াটা ক্লান্তিকর, বুদ্ধির দিক দিয়ে বৃদ্ধ হইনি, তবে হার্ট-টা মাঝে মাঝে থমকে দাঁড়ায়, ব্রেণ-এনিমিয়ার ফলে নাম ভুলে যাই, ছোট অক্ষর দেখতে পাই না। New world order সম্পর্কে একটি প্রদর্শিকা লিখেছি আর একটা উপন্যাস লিখছি। নাটক লিখে যাও।

এখন যা হয় হোক, আমাদের কালটা একরকম ভালোই কাটলো। ইতি এইচ, জি। স্বভাবতঃই এই চিঠিটা পড়ে খুসী হলেন জর্জ বার্ণাড শ'। [ক্রমশঃ।

কোল্ড ষ্টোরেজ

হিম কক্ষ (কোল্ড ষ্টোরেজ) বা ঠাণ্ডা আধারে খাদ্য-সামগ্রী সংরক্ষণ আধুনিক যুগে বহুল প্রচলিত। কিন্তু একটি জেনে রাখবার বিষয় যে, এই ব্যবস্থার প্রথম প্রবর্ত্তক হ'লেন স্বনামধন্য দার্শনিক ফ্রান্সিস ব্যাকন। লণ্ডনের হাইগেটের নিকটবর্ত্তী তাঁর বাস-ভবনের সন্নিহিত অঞ্চলে অতিমাত্রায় তুষারপাত হচ্ছিল সেদিন। ব্যাকনের মাথায় হঠাৎ কি মতলব এসে জুটল—লবণের সহায়তায় যেমন টাটকা মাংস সংরক্ষণ সম্ভবপর, বরফেও সেইটি হওয়া হয়ত বিচিত্র নয়। সঙ্গে সঙ্গে একটি মুরগীর ছানা কিনে নিয়ে আসেন তিনি এবং এর দেহটা বেশ করে চাপা দিয়ে দেন বরফে। এদিকে তুষার-ঝঞ্ঝায় তাঁর নিজের শরীরও হিম-শীতল হয়ে যায় এবং খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েন এই খ্যাতিমান মানুষটি। তবে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ পেলেন তিনি—যখন দেখা গেল, তাঁর পরীক্ষা সফল হয়েছে। আজকের বিশ্বে খাদ্য সংরক্ষণের যে ব্যবস্থা (কোল্ড ষ্টোরেজ) একটি বিরাট শিল্প হিসাবে পরিগণিত, এইখানে এমনি ভাবেই এর প্রথম সূত্রপাত।
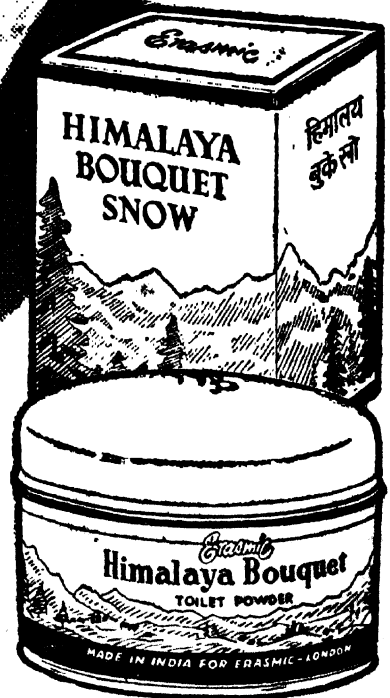
যেদিন ফুটলো বিয়ের ফুল

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

বিবি

গুরুগুরু

সবাইকে আমি জিজ্ঞেস করি, দুটো কান পেতে সবাই শোনো,
এতো অদ্ভুত মানুষ কোথাও, তোমরা দেখেছো অন্য কোনো ?
ও যে কি চাইছে বোঝা মুস্কিল, ও কি ভেবেছে যে আমিই গিয়ে,
দশ জোড়া শাঁখ বাজাতে বাজাতে ওকে পায়ে ধরে আসবো নিয়ে !
গলায় কাপড় দিয়ে বুঝি তাকে আমিই বোলবো, বন্ধু ওগো,
আমার দোষের জন্যে কেন যে তুমি মিছিমিছি দুঃখ ভোগো !
দাঁড়াও তো এসে সবার সামনে, মহাপাতকীর বুকটা চিরে,
আলতা পরাবো তোমার দু'পায়ে, আগে ধুয়ে নিয়ে নয়ননীরে।

নিজেই তো এলো হঠাৎ সেদিন, তারপরে করে কেলেঙ্কারি,
এখন সেজেছে সাধু মহাত্মা, দরশন মেলা শক্ত ভারি।
আমাদের বাড়ী ভুলেও আসে না, একটি বারো তো ওঠে না ছাতে,
পরদানসীন নিখিলেশ রায়, স্বেভকরা মুখ, ঘোমটা তাতে।
একটা রত্তি পৌরুষ নেই, পুরুষ কেবল নামেই শুধু,
জুজুর ভয়েতে আঁৎকে রয়েছে, ফিডিং বোতলে খায় কি দুদু ?
কালকে সকালে ভাবছি একটা ঝুমঝুমি কিনে পাঠিয়ে দেবো,
দু' চোখে কাজল, গলায় মাদুলি, চুপি চুপি গিয়ে ফটোটা নেবো।

সবাইকে আমি জিজ্ঞেস করি, এমন লোক কি কোথাও আছে—
লুকিয়ে বেড়ায় চোরের মতন, দেখা হয়ে যায় দু'জনে পাছে ?
ললিতার বুকে ঘুমন্ত নারী, জাগিয়ে দিয়েছে গা ঠেলে তাকে,
নিজে সাধ করে বুকেতে জড়িয়ে, সেই থেকে দূরে পালিয়ে থাকে।
অতোটা এগোতে কে তাকে বললে, পায়ে ধরে আমি সেধেছিলুম ?
ও রকমটা করা তার অনুমতি, কখন বলো না আমি দিলুম ?
অথচ কেউ তো জানে না সে কথা, সেই দিন থেকে দারুণ জ্বালা,
সারা বুকটাতে দাপাদাপি করে, তীব্র বেদনা লজ্জা-ঢালা !

মনে মনে খুব ইচ্ছে করছে, ওদের বাড়ীতে নিজেই যাই,
বেশ করে ওকে দু'কথা শোনাই, যদি একবার সামনে পাই।
বলে আসি, তুমি নীচ, বর্বর, একেবারে পশু চতুষ্পদ,
দুশ্চরিত্র এতো বড়ো যে সে নিশ্চয়ই খায় লুকিয়ে মদ।
সবাইকে আমি সব বলে দেবো, খুলে দেবো নিজে সবার চোখ,
সবাই বুঝবে, ভালো সেজে থাকো, আসলে যে তুমি কেমন লোক।
সবাই জানবে, নিখিল তো শুধু মদই খায় না, চরিত্রহীন,
মদের বোতল রোজ চাই তার, নতুন স্ত্রীলোক প্রতিটা দিন।

বুঝলুম আমি, না হয় নিখিল লজ্জা পেয়েছে সেদিন থেকে,
বুঝলুম, তার বুকের মধ্যে উঠেছিল খুব বন্যা ডেকে।
সাময়িক মোহে সব সংযম হারিয়ে যে গেল, বুঝলুম তাও,
দেখছো ললিতা ঠাণ্ডা মাথায় বিচার করছে, আর কি চাও ?

ওর পোজিসনে নিজেকেই রেখে চেষ্টা করছি বুঝতে ওকে,
ললিতার মতো মেয়ের সুমুখে কার না পা টলে নেশার ঝোঁকে ?
নিখিলেশ রায় যা কিছু করেছে সব ন্যাচার্যাল, সবটা ঠিক,
ললিতা চট্টো যেখানে থাকবে, যাদু ছড়াবেই দিকবিদিক।

তবু তো পারতো মার্জনা চেয়ে একখানা চিঠি লিখতে আমায়,
বলতে পারতো, রাগ কোরো না কো, রক্ত-মাংস সব করায়।
লিখতে পারতো, ভুলে যেও সব, মনে ভেবে নিও সব স্বপন,
মনে করো তুমি, নিখিলেশ রায় আসেনি সেদিন, অন্য জন
কেউ এসেছিলো, হ্যালুসিনেশন সাবকনসাস্ তোমার মনের,
কাউকে তুমিই সৃষ্টি করলে, কোন প্যারিসকে ট্রোজান রণের।
কোন অপমান করিনি কো ললি, আদর করেছি উচ্ছ্বসিত,
ভালোবাসা, তার দাম নেই বুঝি ? কোন মেয়ে সেটা ফিরিয়ে দিত?

পড়তুম যদি একখানা চিঠি, কিম্বা একটু করতো দেখা,
বুঝতুম, ওর মনে আঁকা আছে, সেদিনের কিছু সোনার লেখা।
তারপর, বুকে জ্বালিয়ে আগুন, কেন যে হঠাৎ পিছিয়ে গেলো,
কি যে লাভ হ'ল ওরকম করে, মিছে মনে মনে ব্যথাই পেলো।
ললিতার মন খাঁ-খাঁ করে শুধু, মনে হয় যদি আসে নিখিল,
আর একবার বুকেতে জড়ায়, আর একবার ঠোঁটের মিল।
শুধু একবার, আর একবার, বুকের ওপরে জড়িয়ে ধরে,
ফিস-ফিস কথা একটু-আধটু, ঠোঁট দুটো চাপা ঠোঁটের পরে।

এদিকে একটা মজার ব্যাপার, বাড়ীতে কেবল আসে ঘটক,
তার হাতে নাকি রকমারি বর, যতো বিচ্ছিরি, ততো চটক।
বেনারসে থাকে বিমল বন্দ্যো, অমন পাত্র ক'জন হয় ?
পাকা প্রফেসারি, নিজেদের বাড়ী, ব্যাঙ্কে টাকা মন্দ নয়।
শ্রীশ্রীযোগমায়া কাশী গিয়ে এই বিমল বন্দ্যো পেলেন খুঁজে,
ললিতা তাকে তো বিয়ে করবেই, সব কিছু ভুলে মুখটা বুজে।
বিমল বন্দ্যো দেখতে কেমন, সেই কথা শুধু জানতে বাকি,
আবলুস-কালো, ছোট ছোট চোখ, বাছুরের মত হাঁ-মুখ নাকি ?

শ্রীশ্রীযোগমায়া ঠিক করেছেন, অতএব মা তো নিজেই সেধে,
বিমলের সাথে ললিতার ঠিক গাঁটছড়াটাকে দেবেন বেঁধে।
ললিতা চট্টো বড়ো হয়ে গেছে, আইবুড়ো মেয়ে ধুমসী করে,
ঘরে রাখলেই, আবোল তাবোল দশ দিকে যাবে মনটা সরে।
তাইতো দু'জায়ে ঠিক করেছেন, চার চোখে কোন দিক না চেয়ে,
ললিতাকে সঁপে বিমলের হাতে হাফ ছাড়বেন গঙ্গা নেয়ে।
রসিক সুজন বিমল বন্দ্যো, সাহিত্য লেখে, অধ্যাপক,
শুনছি পারে না কথাই বলতে, মুখেতে লাগানো ডবল লক।

এই ঠিক হ'ল নিখিল রায় তো মুখের মতন জবাব পা'বে,
নাকের সামনে ড্যাং-ড্যাং করে বউ সেজে ললি চলেই যা'বে।
যাবার সময় ডাকিয়ে পাঠাবো, অপমান করে তাড়িয়ে দেবো,
যতো অপমান করেছে আমায়, ঠিক তার বেশী পুষিয়ে নেবো।
বলবো, এ'বার সাবধান হও, ডিসেন্ট হবার চেষ্টা করো,
তুমি ডাক্তার, ওর চেয়ে ভালো, যদি কিছু বিষ খেয়েই মরো।
লুকিয়ে গেলাম সব ব্যাপারটা, পুড়িয়ে ফেলেছি তোমার চিঠি,
তবু নিখিলেশ শুধরো নিজেকে, ছেড়ে দিও সব ভালগারিটি।

বেনারস থেকে খবর এসেছে, ললিতার ফটো পাঠালে হবে।
মেয়ে দেখবার দরকার নেই, ঠিক করা হোক দিনটা কবে।
দেরী করে মিছে কি ফল ফলবে, সাত তারিখে দিন একটাই ?
শ্রাবণ মাসের, তার পর সেই অঘ্রাণ মাসে তাই কি চাই।
মা তো বলেছেন ঐ দিন হবে যে কোন প্রকারে সারতে বিয়ে
শুভকাজে নাকি বিলম্ব করা, খেলা করা কালনাগিনী নিয়ে।
ললিতারা কেন সবুর করবে, তিন মাস কারো সয় কি তর,
হাতের কাছেই যখন আছেই বিমল বাবুর মতন বর ?

শ্রাবণ মাসের সাত তারিখেই ফিফথ ইয়ারের একজামিন,
বিয়েই হোক বা মৃত্যুই হোক, পরীক্ষাটা দেবোই সেদিন।
ইচ্ছে আছে বেনারসেই সিক্সথ, ইয়ারে ভর্তি হবার
বার্ষিক এ পরীক্ষাটার সার্টিফিকেট তাই দরকার।
পণ করলুম দিন-রাত্তির ব'য়ের ভেতর থাকবো ডুবে,
সকাল থেকেই খিলটা বন্ধ, সমস্ত দিন কে বেরুবে ?
সন্ধ্যে হবার আগেই আবার 'সাট ললিতা ইওর ডোর,'
'নো এ্যাড্‌মিশন্' সবার বেলায় যতক্ষণ না হচ্ছে ভোর।

পারছিনা'কো পড়তে মোটেই এই অবস্থায় মন কি বসে ?
আমায় নিয়ে ডাইনে বাঁয়ে বিমল নিখিল অঙ্ক কষে।
পড়ছি সেদিন বন্ধুর লেখা এক্সপ্রেস ডাকে হঠাৎ পেয়ে,
আপনি অনেক সাহস পেলাম, মন যেন গান উঠলো গেয়ে।
প্রতিমা লিখেছে, এইখানে আয়, এইখানে কর প্রিপারেশন,
পরীক্ষা দিবি সাত তারিখেই, সেটাই করলি পণ যখন।
ফার্ষ্ট পেপারটা দিয়ে রাত্তিরে ছাঁদনাতলায় উঠবি গিয়ে,
নারভাসনেস সামলাতে তোর প্রতিমাকে যাস সঙ্গে নিয়ে।

মাকে বললুম, সিমলায় গিয়ে প্রতিমার বাড়ী পড়াই ভালো,
অরুণ বাবু তো টুরেতে গেছেন, প্রতিমা নিজেই লিখে জনোলো।
তোমাদের যতো বিধি-ব্যবস্থা, টেনো না আমাকে সে সবে মিছে,
কাকীমা আছেন কোমর বেঁধেই ছায়ার মতন তোমার পিছে।
কালকেই যাবো প্লেনে করে আমি, প্রথমে দিল্লী, সিমলা পরে,
এখুনি বেরুবো টিকিট করতে, টাকা দাও, নেবো পার্সে ভরে।
প্রতিমার বাড়ী পড়লে দেখবে, ভালো নম্বর পাবোই আমি
নির্জন ঘরে একলা পড়াটা, এইটাই হল সবার দামী।

প্রতিমার নামে তার পাঠালুম, ছটার প্লেনেই বেরুবো কাল,
সিমলায় শীত, বাড়ীতে তো আছে কেবল ক'খানা বনেদি শাল।
তখুনি বেরিয়ে কিনে আনলুম, জামা ও কাপড়, আর যা' কিছু
দরকার হবে প্রবাসী-জীবনে, প্রতিমা রায়কে না করে নিচু।
বেশ হল এই, চললুম দূরে, দু'মাস এখন নিখিল রায়,
রোজ দশ হাত বার করে যেন দশ মণ চাল একলা খায়।
আরও দু'-দশটা ভদ্র ঘরের মেয়ের ঘটিয়ে সর্বনাশ,
রোজ যেন খায় চুমুকে চুমুকে একটা ডজন মদের গ্লাস।

আচ্ছা, বলো তো, এর চেয়ে কিছু মোর সিরিয়াস আর কি আছে,
কুমারীকে বুকে টেনে নিয়ে তাকে তপ্ত করাটা তুচ্ছ আঁচে ?
বুকেই যে টানা, তাই শুধু নয়, মুখে মুখ দিয়ে চুমু অনেক,
তারপর সেই পুরোনো কথাটা : 'কিস দ্যাট মিস দেন ফরসেক'।
ও কি ভেবেছে যে মড়ার শরীর, রক্ত নেইকো দেহে আমার ?
নিজের ইচ্ছে পূর্ণ করেছি, নিজেরটা তুমি বোঝো তোমার।
ললিতার কাছে সংযম রাখা খুব যে শক্ত জানাই আছে,
কিন্তু তা' বলে উচিত কি হ'ল আর না আসাটা আমার কাছে ?

এরোড্রোমে আমি একলাই গেছি, সঙ্গেতে কেউ নেই যাবার,
সাত তারিখের আগে যেন আসি, মা তো বললেন অনেক বার।
পঁচিশ মিনিট তখনো তো বাকী ছাড়তে দিল্লী যাবার প্লেন,
পাইচারি করি একা একা আর মনে পড়ে মা তো কাঁদছিলেন।
একি ভূত নাকি ? ঘন নিঃশ্বাস বুকের ভেতরে উঠলো জেগে,
মনে হল যেন সারা আকাশটা সারা পৃথিবীটা ঢেকেছে মেঘে।
ভুল বুঝো না, এই চিঠি নাও, ফেলে দিওনা কো, পোড়ো রাস্তায়—
অনেক দিনের পরে দেখলুম, কথা বলে এসে নিখিল রায়। [ক্রমশঃ।
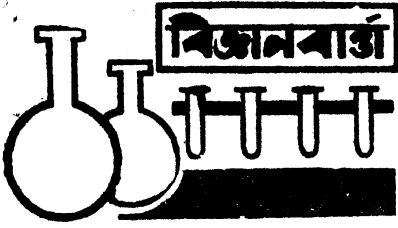
পক্ষধর মিশ্র

পরমাণু শক্তির যুগে তেজস্ক্রিয় রশ্মির আক্রমণ থেকে মানবদেহকে কি ভাবে নিরাপদে রাখা যায়, সে বিষয়ে বিজ্ঞানীদের চিন্তার অন্ত নেই। যুদ্ধের সময়ে কেবলমাত্র পরমাণু বোমার বিস্ফোরণ থেকেই মানুষ এই রশ্মির দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে তা নয়, শান্তির সময়েও পরমাণু শক্তির কল্যাণকর পথে ব্যবহারের আয়োজনও দুর্ঘটনার মধ্যে দিয়ে মানুষকে যে কোন সময়েই বিপন্ন করে তুলতে পারে। নিরাপত্তার জন্য বিজ্ঞানীরা তাই বহুদিনই মানুষের তেজস্ক্রিয় রশ্মি সমূহ সহন করার ক্ষমতাকে বাড়িয়ে তুলবার চেষ্টা করছেন। সম্প্রতি জানা গিয়েছে, আমেরিকার জনৈক বিজ্ঞানী এমন একটি রাসায়নিক পদার্থ আবিষ্কার করেছেন, যার প্রভাবে মানুষের তেজস্ক্রিয় রশ্মিসমূহ সহন করার ক্ষমতা দ্বিগুণ বেড়ে যাবে। আবিষ্কর্তা বিজ্ঞানীর নাম ডাঃ কে. সি. এটউড তিনি ওকরিজের সরকারী গবেষণাগারের একজন গবেষক। ডাঃ এটউড, উইসকনসিন বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে আহূত এক বৈজ্ঞানিক আলোচনাচক্রে তাঁর এই গবেষণামূলক প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রবন্ধ পাঠের পর সংবাদপত্র সমূহের প্রতিনিধিরা তাঁর কাছ থেকে এই বিষয়ে বিস্তারিত এবং সাধারণবোধ্য সংবাদ সংগ্রহ করবার জন্য আর একটি সভার আয়োজন করেন।

ডাঃ এটউডের ভাষণে জানা গিয়েছে, জীবদেহে তেজস্ক্রিয় রশ্মিসমূহের প্রতিরোধ শক্তি বাড়িয়ে দেবার জন্য যে বস্তুটি তিনি আবিষ্কার করেছেন তা এমিনোইথাইলথায়োইউরোনিয়াম এবং এরই সমগোত্রীয় রাসায়নিক পদার্থ। আবিষ্কর্তা এর সংক্ষিপ্ত নাম দিয়েছেন AET। এই বস্তুটির উপর গবেষণার ধারা অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে এবং সেই গবেষণার ফলাফল যে পর্য্যায়ে আছে তাতে যে কোন সময়েই প্রয়োজন হলে বস্তুটিকে প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত করা যাবে। তেজস্ক্রিয় রশ্মিদ্বারা আক্রান্ত হবার আগে বস্তুটিকে গ্রহণ করা দরকার। ডাঃ এটউড এই সম্মেলনে আরও ঘোষণা করেন যে, তেজস্ক্রিয় রশ্মির ক্ষতিকারক প্রভাবকে একেবারে জয় করা মানুষের পক্ষে কোন দিনই সম্ভব হবে না। মানুষ সাধারণ ভাবে যে পরিমাণ তেজস্ক্রিয়তা সহন করতে পারে, আগামী যুগে বিজ্ঞানের সহায়তায় হয়তো খুব জোর সে তার পাঁচগুণ বেশী সহন করতে পারবে। তেজস্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে মানুষের বিজ্ঞান গবেষণার জয়যাত্রার শেষ সীমা এইখানেই শেষ। মানুষ যদি তার দেহের তেজস্ক্রিয় রশ্মি সহন করার ক্ষমতা আরও বৃদ্ধি করতে চায়, তাহলে তাকে মানবদেহের আণবিক সন্নিবেশ পরিবর্তিত করতে হবে। এই পরিবর্তন করার চিন্তা বা কল্পনা অবাস্তব, তাই মনে হয়, মানুষের তেজস্ক্রিয় রশ্মি সহন করার ক্ষমতা একটা নির্দ্দিষ্ট সীমার চেয়ে আর বাড়তে পারবে না।

* * *

হারওয়েলের ব্রিটিশ বিজ্ঞানীরা লক্ষ লক্ষ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড উত্তাপ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন। সাম্প্রতিক খবরে প্রকাশ, সোভিয়েট রাশিয়ার বিজ্ঞানীরা কোটি ডিগ্রী উত্তাপ সৃষ্টি করতে সক্ষম। এখন পাঠকদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, এই উত্তাপ কি ভাবে পরিমাপ করা হয়? আমরা উত্তাপ পরিমাপ করার জন্য যে সাধারণ থার্মোমিটার ব্যবহার করি তা এখানে কোন কাজেই লাগবে না, ঐ সব থার্মোমিটারে পদার্থের পরিবর্ত্তন পর্য্যবেক্ষণ করে তুলনামূলক বিচারের মধ্যে দিয়ে উত্তাপের পরিমাণ নির্ণয় করা হয় কিন্তু এই প্রচণ্ড উত্তাপের ধারে-কাছে আসবার অনেক আগেই যে কোন পদার্থ স্বল্লাকারে উড়ে যাবে বলে এই সব ক্ষেত্রে উত্তাপ মাপবার জন্য থার্মোমিটার ব্যবহার করার কল্পনাও করা যায় না।

হারওয়েলে এই উত্তাপ স্পেকট্রোস্কোপের সহায়তায় পরিমাপ করা হয়। ঐ প্রচণ্ড উত্তাপে, উত্তপ্ত গ্যাসের মধ্যে যে সব পরমাণু-কেন্দ্র ঘুরে বেড়ায় তাদের গতি পরিমাপ করাই এই পদ্ধতির এক প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ অংশ। অত্যন্ত বেশী উত্তাপে পরমাণু-কেন্দ্র নির্দ্দিষ্ট কম্পনজাত একপ্রকার আলো বিকিরণ করে। এই আলোর তীব্র নীল ঔজ্জ্বল্য অতি সহজেই স্পেকট্রোস্কোপের সহায়তায় বিশ্লেষণ করা যায়। এখন একটি চলন্ত ট্রেনের বাঁশীর শব্দের কম্পনসংখ্যা, ঐ ট্রেনের গতির উপর নির্ভর করে। এই ক্ষেত্রেও ঠিক একই রকম ভাবে বেগবান পরমাণু-কেন্দ্র থেকে বিচ্ছুরিত আলোর কম্পনসংখ্যার পরিমাণ নির্ভর করবে ঐ পরমাণু-কেন্দ্রের গতির উপর। স্পেকট্রোস্কোপের সাহায্যে আলো বিশ্লেষণ করে উৎসের গতির পরিমাণ জানা যাবে এবং ঐ গতির পরিমাণ থেকেই সোজা নির্ণয় করা হবে উত্তাপের পরিমাণ। উত্তাপ পরিমাপ করার এই আয়োজনটি এমন নিখুঁত ভাবে করা হয়েছে যে, আলোর নির্দ্দিষ্ট কম্পন-সংখ্যার পরিমাপ থেকেই সোজাসুজি উত্তাপের পরিমাণ পরিমাপ করা সম্ভব।

* * *

ক্যান্সারের কোন প্রতিষেধক অথবা তার চিকিৎসার কোন নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা আজও মানুষ করতে পারে নি। বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান-গবেষণার সমস্ত অগ্রসরকে তুচ্ছ করে আজও এই রোগ নিরাময়ের অসাধ্য বলে পরিগণিত হয়। রোগ আক্রমণের প্রাথমিক পর্য্যায়ে কোন কোন ক্ষেত্রে হয়তো নিরাময় করা সম্ভব হলেও, অসুখের আক্রমণের পরিধি সামান্য বিস্তারলাভ করলে, এর নিবৃত্তির চেষ্টা চিকিৎসকদের কাছে এক বিরাট সমস্যা হয়ে আছে। রশ্মি প্রয়োগ করে চিকিৎসকেরা অস্বাভাবিক ক্যান্সার জাতীয় টিসুগুলিকে নষ্ট করে দেবার চেষ্টা করেন। তবু মনে হয়, এই ধরণের চিকিৎসার ধারা আজও গবেষণার প্রারম্ভিক পর্য্যায় অতিক্রম করতে পারে নি।

সম্প্রতি জানা গিয়েছে, আমেরিকার পিটসবার্গের জনৈক বিজ্ঞানী ডাঃ জে. ই. সল্ক, ক্যান্সার রোগের চিকিৎসার ক্ষেত্রে এক মূল্যবান আবিষ্কার ঘটিয়েছেন। বিজ্ঞানী সল্কের এই আবিষ্কার থেকে অনেকেই আশা করছেন, এমন এক ঔষধ তৈরী হবে যা সোজাসুজি ক্যান্সার রোগস্পৃষ্ট দেহকোষগুলিকে আক্রমণ করতে পারবে। ডাঃ সল্ক তাঁর গবেষণা কি ভাবে পরিচালিত করেন

তার সামান্য পরিচয় এখানে দিচ্ছি। পরীক্ষামূলকভাবে তিনি ক্যান্সার সদৃশ দেহকোষ বাঁদরের দেহের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেন। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা গেল যে, এর দ্বারা ঐ বাঁদরের কোন ক্ষতি হয় না। কোন কোন ক্ষেত্রে ঐ বাঁদরের দেহের মধ্যে টিউমারের সৃষ্টি হলো বটে কিন্তু ঐ টিউমার কিছুদিন পরে আবার মিলিয়ে গেল। এর থেকে বিজ্ঞানী সক স্থির করলেন, আক্রমণকারী দেহকোষগুলির বিনাশের জন্য নিশ্চয়ই এই ক্ষেত্রে বাঁদরগুলির দেহের মধ্যে প্রতিরোধক কোন শক্তির উদ্ভব হয়েছে। তিনি ঐ বাঁদরগুলির রক্তের জলীয় অংশ নিয়ে পরীক্ষা করে দেখলেন, বৃদ্ধিকামী ক্যান্সার কোষগুলির উপর এই পদার্থের প্রভাব খুবই বেশী। এই পদার্থ ক্যান্সার কোষগুলিকে সঙ্গে সঙ্গেই নষ্ট করে ফেলে কিন্তু সুস্থ ও সবল দেহকোষের কোন ক্ষতি করে না।

এই পথে আরও অগ্রসর হতে গিয়ে সক কিন্তু এক প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়েছেন। দেখা যাচ্ছে, কোনও জীবের দেহ থেকে প্রস্তুত ঔষধ কেবল সেই জীবের উপকারে লাগে। বাঁদরের দেহ থেকে প্রস্তুত করা হলে, এই সিরাম কেবল বাঁদরের ক্যান্সারের চিকিৎসায় ফলপ্রদ হবে। একে যদি অন্য কোন জীবের দেহে প্রয়োগ করা হয় তাহলে রুগ্ন দেহকোষগুলির সঙ্গে এই পদার্থ সুস্থ ও সবল দেহকোষগুলিকে বিনষ্ট করবে। ঐ সিরাম মানুষের দেহের মধ্যেই উৎপন্ন করতে হবে। যাই হোক, বিজ্ঞানী সক জানিয়েছেন, এর সমাধান প্রতিকারের উপায়ও তিনি উদ্ভাবন করেছেন। সিরাম মানুষের দেহের মধ্যে প্রস্তুত না করেও, আশা করা যায়, সক উদ্ভাবিত পদ্ধতি দ্বারা মানুষের ক্যান্সার নিরাময়ের উপযোগী ঔষধ পাওয়া যাবে।

* * *

তিমির মৃতদেহগুলিকে সংরক্ষণ করা তিমি-শিকারীদের এক বিরাট সমস্যা। তিমি শিকারের পর ঐ প্রাণীর মৃতদেহ টেনে ডাঙ্গায় অথবা জাহাজে নিয়ে আসবার জন্য যে সময় লাগে, তাতে তাদের দেহে পচন শুরু হয়ে যায়। অনেক সময়ই তিমিদেহের এক বিরাট অংশ নষ্ট হয়ে যাবার জন্য শিকারী এর জন্য উচিত মূল্যের মাত্র অর্দ্ধেক পান। সম্প্রতি অ্যাণ্টিবায়োটিক জাতীয় রসায়ন দ্রব্য ব্যবহার করে তিমিদেহ কিছুদিন পর্যন্ত অটুট অবস্থায় রাখার সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। অ্যাণ্টিবায়োটিক জাতীয় এই ঔষধ ব্যবহার করার ফলে তিমি-শিকারীরা পচন রোধ করে তাদের শিকারের এক বৃহৎ অংশ রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছেন। কিছুদিন আগেই নরওয়ের উত্তরাংশে, কি ভাবে এই পচন রোধ করে তিমিকে যথাশীঘ্র সম্ভব কেটে নিয়ে কাজে লাগিয়ে লোকসানের এক বৃহৎ অংশকে বাঁচান যায় তার এক প্রদর্শনী হয়েছিল। তিমি শিকার করার পর দড়ি দিয়ে বেঁধে, জলে ভাসমান অবস্থায় জাহাজ বা ডাঙ্গার দিকে নিয়ে যাবার আগেই তার দেহে এক প্রকার বিশেষ ধরণের অ্যাণ্টিবায়োটিক জাতীয় রসায়ন দ্রব্য ইনজেকসন করে দেওয়া হয়। এই অ্যাণ্টিবায়োটিকটির নাম অক্সিটেট্রাসাইক্লিন। তিমিশিল্পের জন্য উপযুক্ত করে এক বিশেষ প্রণালীতে প্রস্তুত এই ঔষধ মৃত তিমির দেহের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলে ধীরে ধীরে সে তার সর্ব অঙ্গলে ছড়িয়ে পড়ে। এর ফলে জাহাজে বা তীরে পৌঁছাবার পর দেখা গিয়েছে, সাধরণক্ষেত্রে পচনের ফলে এই তিমিদেহের যে পরিমাণ অংশ নষ্ট হয়ে যেতো, অ্যাণ্টিবায়োটিকের প্রভাবে তার অধিকাংশই রক্ষা পাচ্ছে। প্রসঙ্গক্রমে বলা যেতে পারে কেবল তিমিশিল্প কেন, নানাপ্রকার আরও বহু শিল্পে পচন রোধ করার জন্য আজ-কাল অ্যাণ্টিবায়োটিক জাতীয় ঔষধ ব্যবহার হয়, বিশেষ করে খাদ্য সংরক্ষণ শিল্পে অ্যাণ্টিবায়োটিকের ব্যবহার যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটিয়েছে। অতি সামান্য অ্যাণ্টিবায়োটিকের উপস্থিতিতে খাদ্যের কেবল পচনই রোধ হয় না, তার স্বাদ ও গন্ধ অবিকৃত থাকে।

* * *

আশা করা যাচ্ছে, ভারতবর্ষের তৃতীয় পরমাণু-চুল্লী ১৯৫৯ সাল থেকে কাজ সুরু করবে। এর নাম হবে 'জারলিনা'। নতুন ধরণের পরমাণু-চুল্লীর নক্সা প্রস্তুত করার জন্য বিজ্ঞানী এবং যন্ত্রবিজ্ঞানীদের গবেষণার কাজে জারলিনা সহায়তা করবে। পাঠকেরা নিশ্চয়ই জানেন, ভারতবর্ষের প্রথম পরমাণু-চুল্লীর নাম 'অপ্সরা'। ১৯৫৬ সালে অপ্সরা প্রস্তুত শেষ হয় এবং তার পর থেকেই সে ভারতের বিজ্ঞানীদের নিউট্রন ফিসিক্স বিষয়ে গবেষণা এবং তেজস্ক্রিয় আইসোটোন উৎপাদনে সহায়তা করছে। ভারতবর্ষে যে দ্বিতীয় পরমাণু-চুল্লীটি তৈরী হচ্ছে, এই বছরের শেষেই তার কাজ সুরু হবে। দ্বিতীয় পরমাণু-চুল্লী নির্ম্মাণে কলম্বো পরিকল্পনা অনুসারে কানাডা সরকার ভারতবর্ষকে সহায়তা করছেন। কি ভাবে ভারতবর্ষের থোরিয়াম সম্পদ থেকে পরমাণবিক জ্বালানী প্রস্তুত করা যায়, বিজ্ঞানীরা সেই বিষয়ে দ্বিতীয় চুল্লী দ্বারা গবেষণা চালাবেন।

* * * *

কিছুদিন আগেই সংবাদপত্রে দেখছিলাম, কোন কোন নেতৃস্থানীয় লোক ভারতীয় বিজ্ঞানকর্ম্মীদের বিদেশে চাকরী গ্রহণ করার বিপক্ষে মত প্রকাশ করেছিলেন। তাঁদের আলোচনার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায় যে, ভারতবর্ষের বেশ কয়েক হাজার সেরা বিজ্ঞানকর্ম্মী ও বিজ্ঞানী কেবলমাত্র আমেরিকাতেই চাকরি বা গবেষণা করছেন। ইউরোপে অবস্থানকারী ভারতীয় বিজ্ঞানকর্ম্মীর বিরাট সংখ্যা এর সঙ্গে যোগ দিলে বোঝা যায়, ভারতবর্ষ এঁদের অভাবে কি পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ভারতবর্ষকে যদি বর্ত্তমান বিজ্ঞান সভ্যতার সঙ্গে পা মিলিয়ে এগিয়ে চলতে হয় তাহলে এই সব বিজ্ঞানকর্ম্মীদের সহায়তা তার একান্ত দরকার। একেই দেশে উপযুক্ত গবেষক, যন্ত্রবিজ্ঞানী ও বিজ্ঞানকর্ম্মীর সংখ্যা খুবই কম, তার উপর যদি আবার সেই সামান্য সংখ্যার এক বিরাট অংশকে রুটীর চিন্তার জন্য বিদেশ যাত্রা করতে হয়, তাহলে দেশের অগ্রগতির পথ রুদ্ধ হয়ে যাবে।

নেতারা বোধ হয় জানেন না, দেশের এই ক্ষতির জন্য সরকারের বিজ্ঞান গবেষণা পরিচালনার ত্রুটিই মূলতঃ দায়ী। দেশে যাঁরা ফিরছেন তাঁরা উপযুক্ত মর্য্যাদার চাকরী পাচ্ছেন না; তাই তাঁদের অনেককেই আবার বিদেশে ফিরে যেতে হচ্ছে। পাঠকেরা বলতে পারেন, গরীব দেশ বিদেশের মতো টাকা দেবে কি করে। খুব সত্যি কথা, কিন্তু বাঁচবার জন্য নিতান্ত প্রয়োজনীয় টাকা তো তাঁদের রোজগার করতেই হবে। মূল্যবৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক চাপ আমাদের দেশে এতোই দুর্বিষহ যে, বাঁচবার জন্য প্রয়োজনীয় টাকাও সকল বিজ্ঞানকর্ম্মী ঠিকমতো পাচ্ছেন না।
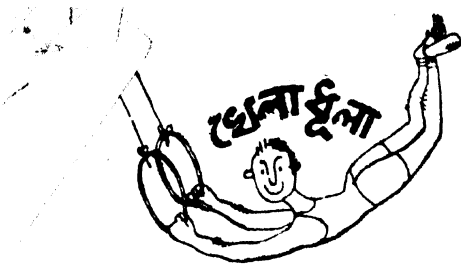
জয়তু মিহির সেন

এবারকার খেলাধূলার সংবাদে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য সংবাদ মিহির সেনের ইংলিশ চ্যানেল পার হওয়ার সংবাদ। এশিয়ার মধ্যে মিহির সেন হচ্ছেন প্রথম সাঁতারু—যিনি ইংলণ্ডের ডোভার থেকে ফ্রান্সে ক্যালে পর্য্যন্ত অতিক্রম করেছেন। মিহির সেনের ইংলিশ চ্যানেল পার হতে সময় লেগেছে ১৪ ঘণ্টা ৪৫ মিনিট।

ঐকান্তিক প্রচেষ্টা যে মানুষকে সফলতার পথে নিয়ে যায়, তার প্রমাণ করে দিলেন মিহির সেন। পর পর তিন বছর ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করার জন্য চেষ্টা করছিলেন মিহির সেন। এ বৎসরও তিনি দু'বার ব্যর্থ হয়ে হতাশ হয়ে পড়েন। ছয় বারের প্রচেষ্টায় মিহির সেন এবার ইংলিশ চ্যানেলের কাছে অপরাজেয়।

ইংলিশ চ্যানেলের প্রকৃতি লোণা জলের দুরন্ত স্রোত আর উত্তাল-তরঙ্গ। সেই সঙ্গে বরফগলা জল। এছাড়া অজানা অসংখ্য সামুদ্রিক ভয়াবহ জীব আর মাছ। তার মধ্যে জেলী ফিস-এর অত্যাচার সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করার জন্য সাঁতারুরা শরীরের উপর গ্রীজ ব্যবহার করেন। জেলী ফিসরা গ্রীজের লোভে সাঁতারুদের সংগে লেগে থাকে। এর সংগে আছে প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়। স্রোতের টান দ্বিমুখী। একটি ল্যাব্রাডার কারেন্ট অপরটি গলফ্ ষ্ট্রিম। ল্যাব্রাডার কারেন্টের জল কনকনে ঠাণ্ডা আর গলফ্ ষ্ট্রিমের জল অপেক্ষাকৃত উষ্ণ হলেও অসহনীয়। এত রকমের বাধা-বিপত্তি কাটিয়ে ৪০ মাইল পথ অতিক্রম করা অসাধ্য সাধন ছাড়া আর কিছু নয়।

মিহির সেন-এর কথা প্রসঙ্গে ব্রজেন দাশ-এর কথা এসে পড়ে। কিছু দিন পূর্ব্বে পাকিস্থানের ব্রজেন দাশ প্রথম প্রচেষ্টায় ইংলিশ চ্যানেল পার হলেন। মিহির সেন একক প্রচেষ্টায় ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করেছেন আর ব্রজেন দাশ মিঃ বিলি ব্যাটলিন প্রযোজিত ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রমের আন্তর্জাতিক সাঁতার প্রতিযোগিতায় সমষ্টিগত ভাবে। মিহির সেনের সাঁতারের শেষ দিকে খেয়ালী চ্যানেল হঠাৎ রুদ্র মূর্তি ধারণ করেছিল। কিন্তু মিহির সেন শেষ পর্য্যন্ত ইংলিশ চ্যানেল-এর কাছে অপরাজেয় হয়ে ফিরে এসেছেন।

১৯৫৪ সালে ব্যারিষ্টারী পরীক্ষার জন্য ইংলণ্ডে অবস্থান করছিলেন আজকের তরুণ ব্যারিষ্টার মিহির সেন। ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করার জন্য কোন ভারতীয় প্রচেষ্টা করছেন না দেখে তাঁর মনে ইচ্ছা জাগলো ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করা।

সাঁতারু হিসাবে মিহির সেনের নাম ইতিপূর্ব্বে শোনা যায়নি। ভারতীয়ের এই দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা সেদিন ভারতবাসী শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেছিল। ব্রজেন দাশ পাকিস্থানের ছেলে। খাল, বিল, নদী-নালায় চিরদিন সাঁতার কেটেছেন। ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করার পূর্ব্বে পদ্মা ও মেঘনার বুকে দীর্ঘ ৪৫ মাইল সাঁতার কাটার অনুশীলন করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ৪২ মাইল পথ অতিক্রম করতে পেরেছিলেন। পাকিস্থানে দূর পাল্লা আর কাছাকাছি সাঁতার কাটার জন্য তিনি বিখ্যাত। সাঁতারু হিসাবে তিনি একজন দক্ষ সাঁতারু। ব্রজেন দাশের ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম মিহির সেনের মনে এক অপরাজেয় জিদ এনে দেয়। এবারকার ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম মিহির সেনের চ্যালেঞ্জ বলে ধরে নিতে পারা যায়। তাঁর এ প্রচেষ্টার সফলতার জন্য প্রতিটি ভারতবাসী গর্ব্ব বোধ করে।

মিহির সেন ইংলিশ চ্যানেল পার হওয়ার পর বলেছেন, তাঁর আশা পূর্ণ হয়েছে। নানান স্থান থেকে তিনি অভিনন্দন পেয়েছেন কিন্তু দুঃখের বিষয়, ভারতের কোন সাঁতার-সংস্থা থেকে কোন রকম অভিনন্দন পাননি। সত্যি এ সংবাদ দুঃখের! দূরপাল্লার বিপদ-সঙ্কুল সাঁতারের ভারতীয়ের পথিকৃৎ হিসাবে মিহির সেনকে প্রাপ্য সম্মান না দেওয়ার জন্য সাঁতার-সংস্থাগুলির লজ্জা পাওয়া উচিত।

যবনিকা পতন

অমীমাংসিত ভাবে আই. এফ. এ শীল্ড খেলা শেষ হওয়ার সংগে ক'লকাতা মাঠে ফুটবলের উপর যবনিকা পতন হয়েছে। এবারে শীল্ডের ফাইন্যাল খেলার কোনরূপ মীমাংসা হয়নি। তার প্রধান কারণ পারস্পরিক সহযোগিতার অভাব। এ অসম্পূর্ণ খেলার সম্পূর্ণ হওয়ার কোনরূপ সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না।

আই এফ শীল্ডের খেলার সুষ্ঠ পরিচালনার জন্য এবারে কোন রকম গোলমাল না হয়ে ফাইন্যাল খেলা অমীমাংসিত রয়ে গেল। সুষ্ঠ পরিচালনার জন্য কলকাতার রেফারীদের সর্ব্বাগ্রে ধন্যবাদ জানাই।

শীল্ড খেলার প্রত্যেকটি খেলার আলোচনা সম্ভব নয়। তবে মোটামুটি ভাল খেলাগুলির আলোচনা করব।

এবারকার শীল্ডে কয়েকটি উন্নত ধরণের খেলা দেখা গিয়াছে। প্রথম দিকের খেলাগুলি অত্যন্ত সাধারণ স্তরের। বহিরাগত দলগুলির মধ্যে গুর্খা বিগ্রেড, অন্ধ্র পুলিশ (পূর্ব্বনাম হায়দ্রাবাদ পুলিশ) ও ঢাকা মহামেডান স্পোর্টিং-এর খেলায় উন্নত ধরণের ক্রীড়ামান দেখা গিয়াছে।

এবারকার লীগবিজয়ী তরুণ বাঙালী খেলোয়াড়পুষ্ট রেলদলের নিকট শীল্ডে আশানুরূপ খেলা দেখতে পাওয়া যায়নি। শীল্ডের খেলায় রেলদলের খেলা কেমন যেন নিষ্প্রভ ঠেকছিলো। রেলদল তৃতীয় রাউণ্ডে অন্ধ্র পুলিশ-এর নিকট ৩-১ গোলে পরাজয় বরণ করে।

গতবারের রোভার্স ও ডুরাণ্ড কাপবিজয়ী হায়দ্রাবাদ পুলিশ নব কলেবরে অন্ধ্র পুলিশ নাম ধারণ করে আই, এফ, এ শীল্ডের খেলায় যোগদান করে। দুই-একজন খেলোয়াড় রদবদল ছাড়া অন্ধ্র পুলিশদলের সকল খেলোয়াড়ই আছে। এবারকার শীল্ডে ক'লকাতার অন্যতম শক্তিশালী দল রাজস্থানকে ৩-০ গোলে, লীগ চ্যাম্পিয়ান রেলদলকে ৩-১ গোলে পরাজিত করে বেশ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিল। শেষ পর্য্যন্ত সেমি-ফাইন্যালে ইষ্টবেঙ্গল দলের কাছে ১-০ গোলে পরাজয় বরণ করল। ইষ্টবেঙ্গল দলের বিরুদ্ধে শক্তিশালী অন্ধ্র-পুলিশ দল সুবিধামত খেলতে পারেনি।

ইষ্টবেঙ্গল দল তৃতীয় রাউণ্ডে বোম্বাই-এর অপরাজেয় ওয়েষ্টার্ণ রেলকে ৫-১ গোলে, কোয়ার্টার ফ্যাইনালে উয়াড়ীকে ৩-১ গোলে

এবং সেমি ফাইন্যালে অন্ধ্র-পুলিশকে ১-০ গোলে পরাজিত করে ফাইন্যালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে। অপর দিকে মোহনবাগান ক্লাব তৃতীয় রাউণ্ডে গুর্খা বিগ্রেডকে অতিরিক্ত সময়ে ৩-১ গোলে কোয়ার্টার ফাইন্যালে জামসেদপুর স্পোর্টিংকে এবং সেমি-ফাইন্যালে মহামেডান স্পোর্টিংকে ১-০ গোলে পরাজিত করে ফাইন্যালে উঠল।

এবারকার শীল্ডে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য খেলার কথা আলোচনা করা যাক্।

প্রথম, মোহনবাগান বনাম গুর্খা ব্রিগেড-এর তৃতীয় রাউণ্ডের খেলাটি বেশ প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক হয়েছিল। দুই দলের খেলায় চমৎকার ক্রীড়ানৈপুণ্য লক্ষ্য করা গেছে। আক্রমণধারা রচনা, প্রতিআক্রমণ খেলাটিকে আকর্ষণীয় করে তুলেছিল। মাঠ ভিজে থাকায় গুর্খাদলকে খেলতে বেশ বেগ পেতে হয়। গুর্খাদলের খেলা এবারে বেশ কিছুটা ছাপ রেখে গিয়েছে। এ খেলায় গুর্খা বিগ্রেডই প্রথম গোল করে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত মোহনবাগান দল গোল শোধ করায় অতিরিক্ত সময় খেলা হয়। অতিরিক্ত সময়ে মোহনবাগান দল আরও দুটি গোল করে জয়লাভ করে।

দ্বিতীয়, এবারকার শীল্ডে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ও তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক খেলা হয়েছিল, ক'লকাতার দুই প্রথিতযশা দলের মধ্যে। মোহনবাগান বনাম মহামেডান স্পোর্টিং-এর খেলাটি। তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক এ খেলায় মোহনবাগান দল ১-০ গোলে পরাজিত করে। দুই পক্ষের এই খেলায় মহামেডান দলের গোলরক্ষকের ভুলের জন্ম শেষ পর্য্যন্ত মোহনবাগান দল ১-০ গোলে জয়লাভ করে।

তৃতীয়, বহিরাগত দুইটি দল। ঢাকা মহামেডান স্পোর্টিং ও কোলার গোল্ড ফিল্ডের খেলায়। ঢাকা মহামেডান স্পোর্টিং দলে পাকিস্থানের জাতীয় ফুটবল দলের ৫ জন খেলোয়াড় আছেন। এদিনের খেলায় কোলার গোল্ড ফিল্ডের খেলোয়াড়রা কিছুটা বিপর্য্যস্ত হয়ে পড়ায় ঢাকা মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব উপর্য্যুপরি হানা দিয়ে ৬-০ গোলে পরাজিত করে।

দীর্ঘ দিন পরে কলকাতার দুই প্রতিদ্বন্দ্বী মোহনবাগান ও ইষ্টবেঙ্গল দলের ফাইন্যাল খেলায় অভূতপূর্ব্ব দর্শক-সমাগম হয়। ষ্টেডিয়ামবিহীন এই মহানগরীতে ফুটবল-পাগল দর্শকরা বার বার হয়রাণ হওয়া সত্ত্বেও জীবনে বিপদের ঝুঁকি নিয়ে খেলা দেখে। নানান দুর্ঘটনাও ঘটেছে ফাইন্যাল খেলার দিন। ষ্টেডিয়াম নিয়ে অনেক বার বসুমতীর পাতায় আলোচনা করেছি। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ষ্টেডিয়ামের অভাবই অমীমাংসিত খেলার মীমাংসা এখনও পর্য্যন্ত সম্ভব করতে পারেনি।

মোহনবাগান দল ফাইন্যালে অগ্রগামী থেকেও নিতান্ত দুর্ভাগ্য-বশতঃ পরমুহূর্তে 'আত্মঘাতী' গোলে গোল পরিশোধ হওয়ার পর আর কোন গোল না হওয়ায় খেলাটি শেষ পর্য্যন্ত অমীমাংসিত ভাবে শেষ হয়।

আই. এফ. এ কর্ত্তৃপক্ষ যুগ্মভাবে দুই দলকে বিজয়ী করার প্রচেষ্টা করে কিন্তু মোহনবাগান দলের আপত্তিতে তা আর সম্ভব হয়নি। ৩০শে সেপ্টেম্বর চ্যারিটি ম্যাচের যে বন্দোবস্তের আয়োজন চলে, তাতে মোহনবাগান দল চ্যারিটি খেলতে সম্মত হয় না। অপরপক্ষে ইষ্টবেঙ্গল দল ফাইন্যাল খেলা সাধারণ খেলা হিসাবে খেলতে নারাজ হওয়ায় শেষ পর্য্যন্ত খেলা অমীমাংসিত ভাবেই রয়ে গেছে।

প্রান্তরের স্বপ্ন

প্রতিমা চট্টোপাধ্যায়

রক্তিম গোধূলি ক্ষণে
রঙে রঙে স্বপ্নময় আকাশের নীচে
যেখানে সুবিস্তীর্ণ শ্যাম শস্যক্ষেত্র
দিগন্তের কোণে বিলীয়মান ;
সেইখানে সেই শব্দহীন পরিবেশে
তোমার মুখের পানে চেয়ে
মুগ্ধ নির্ব্বাক হয়েছি আমি।

সব উচ্ছ্বাস গেছে নিমিষে স্তব্ধ হয়ে।
মৌনতাকে ছিন্ন-ভিন্ন কোরে
শুধু পাখীর উড্ডীন কাকলি
ভেসে গেছে দূর-দুরান্তরে।
সেদিন প্রান্তরের শস্যক্ষেত্র উঠেছিল দুলে
বাতাসের স্পর্শনে ; তারই কাঁপনের ঢেউ
লেগেছিল এসে তোমার আমার মনে।

সোনালী ফসলে ছিল কি
আগামী দিনের স্বপ্ন জড়ানো ;
দূরের আকাশে উড়ে যাওয়া
পাখীর পালকের মত নরম মনে,
ভবিষ্যতের স্বর্ণোজ্জ্বল ছবি
দেখেছিলাম কি তুমি আমি।

জানি'না সে কথা
হয়ে গেছে শেষ ক্ষয়িষ্ণু দিন,
গেছে মুছে
প্রেমের রক্তিম শপথ।
দিগন্তলীন অন্ধকার প্রান্তরে
শুধু ফসল শেষের শূন্যতা আছে ছড়ানো।
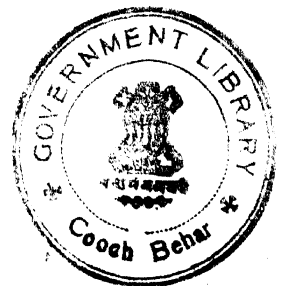
ব্লেনিম ক্রেসেন্ট—(নভেম্বর ১৯৫১—মে ১৯৫২)

হিমানীশ গোস্বামী

No, Sir, when a man is tired of London, he is tired of life. —Dr. Johnson

The famous old city, pensive giant London, in the end leaves a depressing film of sorrow on the heart. —Maxim Gorky

তিন চার দিন লণ্ডনে থেকে পুলক বসু চ'লে গেল স্কটল্যাণ্ডে। বন্ধুহীন হয়ে আমি চলে এলাম ব্লেনিম ক্রেসেন্টে। পাড়াটা নটিং হিল গেট থেকে কয়েক মিনিট। নটিং হিল গেট পাড়াটা একটু মিশ্রিত পাড়া, নানা ধরনের মিশ্রণ এখানে দেখতে পাওয়া যায়। প্রথমত গরীব পাড়া এবং বড়লোক পাড়া এই একই অঞ্চলে গড়ে উঠেছে। তা ছাড়া আছে সমস্যা জর্জরিত কালো এবং বাদামী লোকেদের বাস। প্রতি মাসে এদের সংখ্যা বাড়ছে এই অঞ্চলে এবং আরো কয়েকটি অঞ্চলে। এরা আসে তাদের দেশ থেকে সাধারণত কাজ করতে।

আমি যে ধরনের বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নিলাম সেগুলোকে ইংরিজিতে বলে digs। কেন বলে জানি না। বোধ হয় যুদ্ধের সময় ট্রেঞ্চ খুঁড়ে আশ্রয় নেওয়া থেকে কথাটা এসেছে। আর ব্যাপারটা প্রায় তাই, যদিও এমন আশ্রয়স্থল পাবার জন্য মাটি খুঁড়তে হয় না, তবে বেশ খানিক মাথা খুঁড়তে হয় বটে। পাড়ায় পাড়ায় টুঁ মেরে বেড়াতে হয়, যতক্ষণ না সন্ধান মেলে। অনেকটা 'গেছো বাবা'র
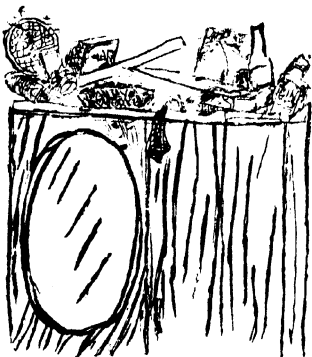
ওয়ার্ডোবের মাথার উপর নানারকম পরিত্যক্ত জিনিস ছড়ানো

সন্ধানে ঘোরার মতো। এর জন্য অশেষ সাধ্যসাধনার প্রয়োজন। মনের মতো ঘর পেতে অনেক সময় তিন চার মাসের কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। এই কথাটার মধ্যে কিছু ভুল বুঝবার অবশ্য সম্ভাবনা আছে—ঘর পাওয়া সমস্যা বটে, কিন্তু সে হল কম ভাড়ার ঘর, বেশি ভাড়া দিতে পারলে ঘর প্রচুর মেলে অবশ্য। আমাদের মতো বাদামী লোকেদের এবং আফ্রিকার কালো লোকেদের পক্ষে ঘর পাওয়া একটু বেশি শক্ত।

লণ্ডনের সঙ্গে কোলকাতার কোনো তুলনাই হয় না। লণ্ডনে যাকে ওরা বলে ভয়ানক ঘিঞ্জি অঞ্চল, সে অঞ্চল কোলকাতার প্রায় যে কোনো অঞ্চলের তুলনায় দশ গুণ ভালো। লণ্ডনের পাড়ায় পাড়ায় পার্কের ছড়াছড়ি। একটি ম্যাপ নিলেই দেখা যায় সবুজ ভর্তি লণ্ডন। গোল্ডার্স গ্রীন থেকে আরম্ভ করে হার্ন হিল পর্যন্ত অজস্র পার্ক লণ্ডনের শহরে জীবনকে এনে দেয় অপূর্ব প্রশান্তি। কেবল হাইড পার্ক আর কেনসিংটন গার্ডেনস নয়, শহরের মধ্যে আছে আরো—গ্রীন পার্ক, এই পার্কে কোনো ফুলের গাছ নেই। শুধু সবুজ পার্ক এটি। সেন্ট জেমস পার্ক, অপূর্ব সুন্দর এই পার্কটিতে আছে নানা জাতের হাঁস। বার্কলি স্কোয়ার, এর পাশে রয়েছে আমাদের দেশের সঙ্গে বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট রবার্ট ক্লাইভের বাড়ি। নাইটিংগেল পাখির গান শোনা যায় এই পার্কে। আর পাখি ভর্তি রীজেন্টস পার্ক, প্রিমরোজ হিল ইত্যাদি। পার্কে বসে, শুয়ে নানা লোককে দেখা যায়। ইংরেজরা পার্ক খুব পছন্দ করে। বিশাল পার্কের মধ্যে আরো অনেক আছে—যেমন রিচমণ্ড পার্ক, উইম্বলডন পার্ক এবং কিউ গার্ডেন্স। পার্ক মানুষকে স্বস্তি যদিও দেয় কিন্তু চার্লি চ্যাপলিন তাঁর নিজের ছেলেবেলার কথা বলতে গিয়ে বলেছেন পার্ক তাঁকে সবচেয়ে বিষণ্ণ করে তুলতো। পার্কের হাসি খেলার মধ্যে তিনি নিজেকে মনে করতেন আরো বেশি নিঃসঙ্গ। চার্লি চ্যাপলিনের জন্ম হয় লণ্ডনের দরিদ্রতম পাড়ার মধ্যে অন্যতম কেনিংটনে। এ পাড়াটি অবশ্য এখন অনেকটা চলনসই হয়েছে, যদিও যুদ্ধের সময়কার বাইশ হাজার টন বোমার কতকগুলির দাগ এখনো মেলায়নি।

নানুদার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল লণ্ডনে নেমেই। তিনি আমাদের লণ্ডন সম্পর্কে খানিক বক্তৃতা দিয়ে নিয়েছিলেন। কি ভাবে খরচ কমাতে হয় তার একটা সংক্ষিপ্ত ফিরিস্তি। তিনিই বলেছিলেন মিসেস ম্যাথার্সের বাড়িতে গিয়ে একবার টোকা মেরে দেখতে। আর যদি সেখানে না হয় তাহ'লে 'কোলভিল টেরাসে' গিয়ে মিসেস উডের কাছে যেতে। ঘর খুঁজতে বেরিয়েছিলাম আমি আর পুলক। ঘর অবশ্য কেবল আমার জন্য, পুলক কেবল সঙ্গে এসেছিল—যদিও দুজনেই ঘর খোঁজার ব্যাপারে নেহাতই গেঁয়ো—বিশেষতঃ লণ্ডনে। তবে ভরসা ছিল যে বাড়িটা সম্পর্কে নানুদার বাক্য, যাও দেখবে মোটামুটি খুব খারাপ নয়—খেতে দেয় অনেক। আর পাড়াটা? নানুদা বলেছিলেন, পাড়াটা মন্দ নয়, তারপর একটু থেমে যোগ করেছিলেন, না খুব খারাপ নয়! নানুদার মুখ দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম যদি আরো জিজ্ঞেস করি তিনি বলেই দেবেন, জঘন্য পাড়া! কিন্তু ভরসা হ'ল না অন্য কোনো কথা জিজ্ঞেস করার। আমি আর পুলক একদিন সন্ধ্যায় ব্লেনিম ক্রেসেন্টে এসে উপস্থিত হ'লাম।

প্রথমে বাড়িটাকে আমরা পর্যবেক্ষণ করলাম বাইরে থেকে।

কিন্তু বাইরে থেকে লণ্ডনের কোনো বাড়ি বোঝা যায় না যে সেটা ভেতরে কেমন। অতএব গিয়ে কড়া নাড়লাম। দরজা তৎক্ষণাৎ খুলে গেল। একজন মোটা ভদ্রমহিলা দরজা খুলে দিয়ে বললেন, —কি চাই? আমরা ঘর আছে কিনা জানতে চাইলাম। কি আশ্চর্য! ঘর আছে।—কেন কষ্ট করে এলে, টেলিফোন করলেই তো পারতে, মিসেস ম্যাথার্স তাঁর ছোটছোট চোখ দিয়ে আমাদের দেখতে দেখতে এবং হাসতে হাসতে বললেন। লক্ষ্য করলাম এক টুকরো কাটা শশা লেগে আছে তাঁর জামার উপর কাঁধের কাছে। শশা কাটতে কাটতে এক ফাঁকে কখন লেগে গেছে। পুলক বললো, টেলিফোন করলে তো ঘরটা দেখা যেত না, আমরা ঘরটাকে দেখতে চাই। এ কথায় মিসেস ম্যাথার্স বললেন, জর্জ! জর্জ! এরপরেই আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপের মতো কাণ্ড! পাশ থেকে বিশাল চেহারার লাল টুকটুকে এক বুড়ো নোংরা একটা পাইপ মুখে করে আবির্ভূত হ'লেন।—ওদের নিয়ে ঘরটা দেখাও—হ্যাঁ ওপরের ঘরটি। বুড়োটি অস্ফুট স্বরে কি যেন বললেন, সে ভাষাটা সবাই বিরক্ত হ'লে ব্যবহার করে। কোনো কথা নয় কেবল এক জাতের আওয়াজ।

ভদ্রলোক আমাদের নিয়ে ওপরে চললেন। সিঁড়ি ক্যাঁচ ক্যাঁচ আওয়াজ করে উঠলো। সিঁড়ির আলোগুলি এত ক্ষীণ যে ওর চাইতে সামান্য কম আলো হ'লেও দেখতে পাওয়া অসম্ভব হ'ত। কাঠের সিঁড়ির উপর পাটের কার্পেট তাও শতচ্ছিদ্র আর বিবর্ণ। দেয়ালের কাগজ কতদিন আগে বদলানো হ'য়েছিল তা সপ্তম এডোয়ার্ড বেঁচে থাকলে হয়তো বলতে পারতেন। এখন আর তা দেয়ালের কাগজ বলে চেনা যায় না।

এই পর্যন্ত এই বাড়িটির বর্ণনায় মনে হ'তে পারে এবারে আমি অলৌকিক কোনো কাহিনী শোনাতে বসেছি। কিন্তু তা নয়। কোনো অলৌকিক ঘটনা সে বাড়িতে আমি ঘটতে দেখিনি যদিও পরে জেনেছি আমি যে ঘরে ছিলাম সেই ঘরেই মিসেস বোস নামক এক ভদ্রমহিলা কয়েক বছর আগে থাকতেন—পরে তিনি বাড়ির কাছেই বাস চাপা পড়ে মারা যান। আমি সেই মিসেস বোস সম্পর্কে অনেক কথা মিসেস ম্যাথার্সকে জিজ্ঞেস করেছি, কিন্তু তিনি মানুষের বর্ণনায় একেবারেই অপটু ছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ঐ ভারতীয়দের দেখতে যেমন হয় তেমনি আর কি। কালো চুল, কালো চোখ, আর সুন্দরী দেখতে। কিন্তু ঐরকম বর্ণনা তিনি সমস্ত ভারতীয়দের সম্পর্কেই করতেন। তিনি বাড়িতে ছিলেন সর্বে-সর্বা—সমস্ত বাড়িতেই ল্যাণ্ডলেডিদের এই প্রধানত্ব জানা যাবে রবীন্দ্রনাথের য়ুরোপ প্রবাসীর পত্রে: "বিলেতে ছোট খাট বাড়িতে বাড়িওলা বলে একটা জীবের অস্তিত্ব আছে হয়তো, কিন্তু যাঁরা বাড়িতে থাকেন, বাড়িওয়ালীর সঙ্গেই তাঁদের সমস্ত সম্পর্ক।" কথাটা এখনো সত্য। মিসেস ম্যাথার্স যেন পুলিসের 'আলিবাই'এর থিয়োরী অমান্য ক'রে সমস্ত ঘর এক সঙ্গে দেখাশোনা করেতেন। প্রতিটি ছোট বড় কাজে তাঁর নজর ছিল।

মিঃ ম্যাথার্স ঘরটি দেখালেন, যেন নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও। ঘরে ঢুকে বললেন, নতুন ওয়ালপেপার দেয়া হ'য়েছে, নতুন বৈদ্যুতিক হীটার আনা হ'য়েছে, নতুন টেবলক্লথ দেওয়া হ'য়েছে। কিন্তু দেখলাম ওয়াড্রোবের মাথার উপর নানা রকম পরিত্যক্ত জিনিস ছড়ানো রয়েছে। বিছানাটা ছোট। পুলক সেটাতে বসে দেখলো তা কতখানি নরম। দেখে বললো, বিছানা ঠিক আছে, আর কি চাই? অতএব সপ্তাহে তিন পাউণ্ড ভাড়ায় রাজি হ'য়ে এক পাউণ্ড জমা দিয়ে আমরা বাড়ি থেকে বেরুলাম। পুলক বললো, ঘরটা তেতলায়, বেশ ভালই হবে। তা ছাড়া জানালা দিয়ে দেখে নিয়েছি বাড়ির পেছনে বাগান আছে—অতএব ভালই মনে হ'চ্ছে। তখন জানতাম না যে লণ্ডনে যত উঁচুতে ঘর হয় তত তার সম্মান এবং ভাড়া কমে যায়। সব চেয়ে ভাল ঘর হ'ল এক তলার, যার নাম হ'ল গ্রাউণ্ড ফ্লর। এর তলায়ও ঘর থাকে, অর্ধেকটা যার মাটির নীচে, তা হ'ল বেসমেণ্ট। আরো জানতাম না, লণ্ডনের এবং ইংল্যাণ্ডের সর্বত্র, প্রায় প্রতিটি বাড়িতেই একটু করে বাগান আছে—আর তা না করলে বাড়ি তৈরির অনুমতিই পাওয়া যায় না।

পরদিন পুলককে বিদায় দিলাম। ও চলে যাবার পর আমি জিনিসপত্র নিয়ে বেরুলাম রয়্যাল হোটেল থেকে। ব্লেনিম ক্রেসেণ্টে পৌঁছুলাম মিনিট পোনের কুড়ি পর। দিনের বেলা এই প্রথম পাড়াটা দেখলাম। দেখলাম প্রতিটি বাড়িই প্রায় একরকম দেখতে। প্রতিটি বাড়িরই একটি বিশেষ জায়গায় নম্বর লেখা আছে। নম্বরগুলি ভাগাভাগি নয়—জোড় এবং বিজোড় এই দুরকম নম্বর রাস্তার দু-পাশে। অর্থাৎ এক তিন পাঁচ সাত নয় ইত্যাদি, অন্য পাশে দুই চার ছয় আট ইত্যাদি।

বাড়িটা বহুদিন যে সারানো হয়নি তাতো প্রায় অন্ধকারেও স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলাম, দিনের বেলা কিছু ফাটল চোখে পড়ল। তবে ওতে ভাবনার কিছু নেই, বাড়ির পাশে বহুদিন আগে, সেই যুদ্ধের সময় একটা উড়ন্ত বোমা পড়েছিল ফাটলটা সেই থেকেই আছে। খুব বিপজ্জনক হয়নি এখনো। রাস্তার উপরে প্রায় ভাঙা, এবং ভাল এই দুজাতের মোটরগাড়ি থেমে আছে। কোনোটা আবার ত্রিপল দিয়ে ঢাকা। প্রতিটি বাড়ির পেছনে যেমন, তেমনি সামনেও বাগান আছে, তবে আয়তনে ছোট, কিন্তু ফুল নেই। মাসটা নভেম্বর বলেই হয়তো। ব্লেনিম ক্রেসেণ্টের সমস্ত রাস্তায় একটি লোকের দেখা পেলাম না, যদিও সকাল তখন এগারোটা। রাস্তার মোড়ে অতি উজ্জ্বল লাল রঙের চিঠির বাক্স। লণ্ডনের বাস দমকল আর লেটার বক্স এ তিনটিই এখানে লাল রঙ করা দূর থেকে দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য —আর ভালোও লাগে, ছাইরঙের সমুদ্রে এই লাল দ্বীপগুলি।

হাওয়াতে কিসের গন্ধ। কিছুটা কুয়াসার যেন আভাস, আর কেমন যেন কয়লার ধোঁয়ার গন্ধ। কিছুক্ষণ সে হাওয়ায় থাকবার

মিষ্টার এবং মিসেস ম্যাথার্স বাজার করছেন

পর প্রায়ই সর্দি হয়। সমস্ত লণ্ডনের লোকেরা সানতে ভোগে। এখানে প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ অ্যাসপিরিন বড়ি বিক্রি হয়। অবশ্য অ্যাসপিরিন অনেক কারণেই ব্যবহৃত হয়—পরিশ্রান্ত লণ্ডনবাসীদের মানসিক দুশ্চিন্তা দূর করতে এর সাহায্য নেওয়া হয়। একজন অ্যামেরিকান প্রকাশক বর্তমানকালকে অ্যাসপিরিন যুগ বলে অভিহিত করেছেন। লণ্ডনের হাওয়ার একটি বিশেষ গন্ধ আছে, সে গন্ধ থেকেই বোঝা যায় কি মাস তখন। অন্তত কী ঋতু সেটা তা বোঝা সহজেই যায়। অক্টোবর থেকে এপ্রিল পর্যন্ত এই ছমাস ধরে ঘর গরম করবার জন্য কয়লার ব্যবহার খুবই বেশি হয়। এই কয়লার ধোঁয়ার সঙ্গে যুক্ত হয় লণ্ডনের সহরতলীর কারখানার ধোঁয়া। এ ধোঁয়া কুয়াসা হলে উড়ে যায় না, কুয়াসার সঙ্গে মিশে থাকে। যাঁদের নস্যি নেওয়া অভ্যেস, তাঁদের ছাড়া প্রত্যেকেরই বেশ অসুবিধা হয়। সাধারণ নাকের পক্ষে এ ধোঁয়া অসহ্য, তবে কোলকাতায় যাঁরা থাকেন তাঁদের তুলনায় লণ্ডনের লোকেরা অনেক কম ধোঁয়া নাকে নিয়ে থাকেন।

বাড়ির মধ্যে ঢুকলে ধোঁয়ার তীব্রতা কমে আসে। ইংরেজদের বাড়ি মানে একটি দুর্গ, কথাটা ইংরেজরাই বলে থাকেন। অবাঞ্ছিতদের প্রবেশাধিকার নেই সেখানে। ধোঁয়া এবং কুয়াশা অবাঞ্ছিত, অতএব বাড়ির মধ্যে ঢুকতে পারে না, কারণ কাচের জানালা দিয়ে তাদের পথ বন্ধ করা থাকে। একেবারে ঢোকেনা তা নয়, হাওয়ার সঙ্গে ধোঁয়াও কিছুটা ঢোকে। এই ধোঁয়া এড়াবার একমাত্র উপায় বিদ্যুতের সাহায্যে ঘর গরম করার ব্যবস্থা করা। কিন্তু ইংরেজদের পক্ষে তা করা সম্ভব নয়, তাহলে ইংরেজ চরিত্রের আর বাকী থাকে কি? এরা জাত রক্ষণশীল। পুরোনো জিনিস, ব্যবস্থা ইত্যাদিই এদের পছন্দ।

আমার ঘরটি দিনের আলোয় মন্দ লাগলো না। আমার জানালা দিয়ে বাড়ির পেছনে অনেকটা দূর দেখা যায়। বাড়ির পেছনে অযত্নে রাখা একটা বাগান। আকাশে মেঘ, যেন মৌসুমি লণ্ডনেও ধাওয়া করেছে; ঘন কালো মেঘ, বৃষ্টিহীন।

প্রথম আলাপ হ'য়েছিল ব্লেনিম ক্রেসেণ্টের বাড়িতে যার সঙ্গে তার নাম জীবন লোকুড়। জাতে মারাঠি, সুগঠিত দেহ, কোঁকড়া চুল, সব সময় একটু বাঁকা হাসি লেগে রয়েছে, কিন্তু হাসিটাই বাঁকা। চোখ দুটি শিশুর মতো সরল এবং কৌতুকময়। উজ্জ্বল তামাটে রঙ তার, ব্যবহারে অত্যন্ত ভদ্র। আমার জিনিসপত্র নিয়ে উপরে তুলে দিল, তিন তলায়—অনুরোধ করতে হ'ল না। সে আমাকে জিজ্ঞেসই করলো না আমার সাহায্যের প্রয়োজন আছে কিনা। সে ধরেই নিল আমার প্রয়োজন আছে, এবং অযথা তা নিয়ে সে কথা বললো না। আমার জিনিসপত্র সে তুলে দিয়ে বললো এ বাড়িতে এলে, বাড়িটা খুব ভাল নয়। আমি বললাম, পরে খুঁজে বার করবো কোনো একটা আস্তানা। জীবন বললো, মুশকিল কি জানো, এখানে কিছুদিন থাকলে খুব অলস হ'য়ে পড়ে লোকেরা, আর বাড়ি খুঁজতে মন বসে না। আমি নিজেই তো গত ন'মাস ধরে অন্য কোথাও চলে যাবো ভাবছি! প্রত্যেক সপ্তাহেই কোনো না কোনো বাধা এসে উপস্থিত হয়।
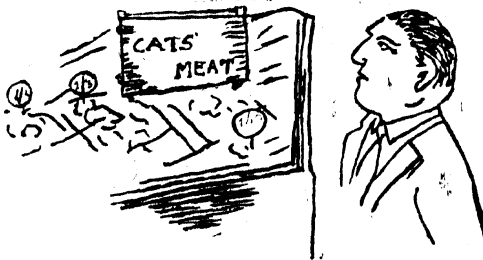
আমি বললাম, যাই হ'ক, বাড়িটা সস্তা যখন, তখন এখানে একটু কষ্ট করে হ'লেও থাকতে হবে বৈ কি!

জীবন বললো, মুশকিল হচ্ছে এই যে এখানে কষ্টটারই অভাব। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত তোমাকে ভাবতে হ'চ্ছে না কিছু। মিসেস ম্যাথার্স ঘর পরিষ্কার করছেন, ব্রেকফাষ্ট তৈরি করছেন, প্লেট ধুচ্ছেন, খাওয়ার ঘরে কয়লা জ্বালছেন, বাজার করছেন। ফলে আমাদের প্রকৃতি অলস হ'য়ে পড়ছে। এমন একটা জায়গায় যাবো যেখানে অন্তত নিজের রান্না নিজে করতে বাধ্য হই, আর ঘরটাও পরিষ্কার করতে চাই।

ভারতীয়রা পরিশ্রম করতে চায় না একথাটা আর সত্যি বলে মনে হ'ল না। অন্তত একজন যে পরিশ্রম করতে চায় তার প্রমাণ পেয়ে বড় ভাল লাগলো। আধুনিক যুগে ভারতীয়দের সম্পর্কে নানরকম বদনাম শোনা যায়—কর্মবিমুখতা তাদের অন্যতম। আমি বিস্মিত ভাবে জীবন লোকুড়কে দেখলাম। এই একটি মাত্র লোককে আমার জীবনে দেখলাম যার সুখ সহ্য হ'চ্ছেনা। কিন্তু একটু পরেই আমার ভুল ভাঙলো, এবং সে ভাঙা আর জোড়া লাগে নি।

আমি জীবনকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কি করো? জীবন বললো, আমি আইন পড়ি আর দিনের বেলায় ভারতভবনে কেরানীগিরি করি।

আমি বললাম, তা তুমি অফিসে যাওনি যে?

জীবন বললো, কি হবে গিয়ে? ডাক্তারের সার্টিফিকেট দিয়েছি আমি অসুস্থ। পোনের দিন যাবো না, অবশ্য গেলেও কোনো অসুবিধে হবে না। আমাদের সেকশনে কেউ কাজ করে না—কাজ করবার কিছু নেই সেখানে। যেটুকু আছে তা আমার অফিসে না গেলেও আটকে থাকবে না।

মিসেস ম্যাথার্স ছিলেন জাতে আইরিশ এবং যথেষ্ট মোটা। তিনি সমস্ত সময়েই খারাপ, নোংরা পোশাক পরে থাকতেন। রবিবারটা ছিল স্বতন্ত্র। সেদিন চার্চে যাবার দিন। বয়স ষাট বছরের কাছাকাছি, কিন্তু পঞ্চাশ বছর বললে খুশি হ'তেন। মিষ্টার ছিলেন ইংরেজ, রাজনীতিতে না রক্ষণশীল না শ্রমিক, একেবারে প্রায় জাতহীন লিবারাল। দুজনের ধর্ম ছিল আলাদা। মিষ্টার ছিলেন প্রোটেস্টাণ্ট আর মিসেস ছিলেন রোমান ক্যাথলিক। খাবার ঘরে একটা বাঁধানো এবং ছাপানো বাণী টাঙানো ছিল, তার বাংলা হ'চ্ছে, যে পরিবার একত্রে প্রার্থনা করে, সে পরিবার ভেঙে যায় না তাদের মধ্যে অন্য কোনোরকম ঝগড়াঝাঁটি দেখিনি—অন্তত ধর্ম বিষয়ে। খাওয়ার ঘরে একটা পুরোনো বিলিতি পিয়ানো ছিল, মাঝে মাঝে তার উপর আমরা আমাদের সঙ্গীতের অজ্ঞতার প্রমাণ দিতে বসতাম।

তাঁরা দুজনে অন্ধকারময় একটি ঘরে থাকতেন, সূর্য্যালোক

তাতে প্রবেশ কোনোদিনই করত না। সূর্যালোক অবশ্য লণ্ডনের কম করেই প্রবেশ করে। মিষ্টার ম্যাথার্স, মিসেস ম্যাথার্সের মতোই নোংরা ছিলেন, তবে গুণের মধ্যে তিনি বিশেষ কথা বলতেন না। প্রায়ই গলা দিয়ে অস্ফুট আওয়াজ করতেন। সে আওয়াজের মানে বোঝা আমাদের সাধ্য ছিলনা। আমরা তা বুঝবার চেষ্টাও করতাম না! পাইপ টানতেন বোকা বোকা মুখ করে, আর বিষাদময় মুখ তাঁর কোনোদিনই আনন্দে উদ্ভাসিত দেখিনি। তাঁদের কোনো ছেলে-মেয়ে ছিলনা। সমস্ত বাড়ির কাজ নিজেরাই করতেন। এই কাজের মধ্যে সকাল থেকে বাড়ির সবার জন্ত ব্রেকফাস্ট তৈরি করা, নানা লোককে নানা সময়ে সকালে ডেকে তোলা। ডেকে তোলার ভার ছিল মিষ্টার ম্যাথার্সের উপর। তার পর ব্রেকফাস্ট টেবিল সাজানো, টোস্ট করা, বেকন এবং ডিম ভাজা। এত হালকা ক'রে কাটা বেকন আর কোথাও দেখিনি। এরকম ভাবে বেকন কাটা প্রায় আর্টের পর্যায়ে পড়ে, তুলনা করা চলে অনেকটা ঢাকাই মসলিনের সঙ্গে। তার সঙ্গে চর্বির ভেজাল—সমস্ত বেকনের সঙ্গেই কিছু কিছু চর্বি অবশ্য লেগে থাকে। ব্রেনিম ক্রেসেণ্ট কখনো আমাদের মোটা বেকন জোটেনি। ব্রেকফাষ্টের সময় আমরা প্রচুর চা খেতাম। এ ব্যাপারে মণি পালিত বোধ হয় রেকর্ড ভঙ্গ করতেন। তিনি রোজই ব্রেকফাস্টের সময় চার পাঁচ কাপ চা ধীরে সুস্থে খেতেন। তবে সে চা কে চা বলাটা বোধ হয় ভুল। আমাদের দেশ থেকে সে চা যেত, কিন্তু আমার মনে হয় তার সঙ্গে কাঠের গুঁড়োও কিছুটা মেশানো থাকতো! কিন্তু আমার ভুল হ'তেও পারে। ইংরেজদের চা তৈরির কায়দাটা একটু অন্তরকম। কনকনে ঠাণ্ডা দুধ দিয়ে চা হয়, আর প্রায়ই ছাঁকনির ব্যবহার হয়'না।

জ্যাম, জেলি, মারমালেড টেবিলের উপ সাজানো থাকতো যতখুসি তা থেকে খাওয়া চলতো, কিন্তু খুব বেশি খুশি হতাম না তা খেয়ে। বাজারের সবচেয়ে সস্তা জিনিসের স্বাদ কদাচিৎ ভাল হ'য়ে থাকে। অবশ্য এ ব্যাপারে মিসেস ম্যাথার্সই একমাত্র খারাপ জিনিস খাওয়াতেন তা নয়। যত ল্যাণ্ড-লেডির কথা শুনেছি, দু' একজন ছাড়া সবাই খারাপ খাবারের প্রতিযোগিতা করতেন।

চায়ের সময় চিনিরও বেশ টানাটানি ছিল। প্রত্যেক মাসে পেতাম এক সেরের কিছু কম চিনি। তা দিয়ে চা খেতে হ'ত আর পরিজ খেতে হ'ত। মাসের পোনেরো-কুড়ি তারিখের মধ্যেই আমাদের চিনি কমে আসতো। আমরা চিনি ছাড়াই চা খেতে অভ্যেস করেছিলাম, কারণ পয়সা দিলেও আর চিনি মিলত না—তখনও বৃটেনে চলছিল র‍্যাশনিং। মনের মতো চা আমাদের ভাগ্যে মিসেস ম্যাথার্সের বাড়িতে কখনো জোটনি।

মিসেস ম্যাথার্স নোংরা জলে আমাদের খাবার প্লেট ধুয়ে নোংরা কাপড় দিয়ে সেটাকে মুছে দিতেন। ছুরি-কাঁটা আমাদের পাড়ার পোর্টোবেলো রোডের হাট থেকে কেনা সস্তায়। সেগুলো কোনো ক্লাবের বা হাসপাতালের ছিল কোনো এককালে, তা ছুরি-কাঁটা চামচের উপরকার আদ্যাক্ষরগুলি দেখলেই বোঝা যেত। ছুরি পরিষ্কার দেখাতো, যদিও তাতে ধার থাকতো না। মাংস কাটতে অনেকখানি সময় লেগে যেত। মাংস মাঝে মাঝে ভাল সেদ্ধ হ'ত, প্রায় সময়েই পেতাম প্রায় অসিদ্ধ। মাংস হয়তো ছ' সাত মাসের

পুরোনো। বৃটেনের সমস্ত মাংস বৃটেনে তৈরি হয় না, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, আর্জেন্টিনা ইত্যাদি জায়গা থেকে তার চালান আসে। আসতে সময় লাগে। ঠাণ্ডা-করা ঘরে সে মাংস থাকতে থাকতে জমে কঠিন হ'য়ে যায়—স্বাদেরও কিছু পরিবর্তন হয়।

ছুরি পরিষ্কার পাওয়া গেলেও কাঁটা কখনোই পরিষ্কার দেখিনি। কাঁটার মধ্যে পুরোনো খাবার লেগে থাকতো, সেগুলো আর মিসেস ম্যাথার্সের ক্ষীণ দৃষ্টিতে পড়ত না। সেগুলো ভাল করে না ধুয়েই মুছে ফেলা হ'ত। আমরা যে কোনরকম মাংসই খেতাম বা খেতে প্রস্তুত ছিলাম। আমরা জিজ্ঞেস করতাম না কিসের মাংস খাচ্ছি। তবে যখন মাংস অপেক্ষাকৃত টাটকা পাওয়া যেত তখন বুঝতাম তা হ'ল ঘোড়ার মাংস। আমাদের পাড়ায় ঘোড়ার মাংস বিক্রির একটা দোকান ছিল। লণ্ডনে ঘোড়ার মাংস খুব অপ্রচলিত নয়। অনেক রেস্তোরাঁই ঘোড়ার মাংস সরবরাহ করে।

একদিন প্রভাস চৌধুরী নামে আমাদের এক বন্ধু হঠাৎ উত্তেজিত হ'য়ে এসে আমাদের বললো, সর্বনাশ হয়েছে, আর সহ্য করা যাচ্ছে না লণ্ডনের এই নারকীয় খাদ্য। ঘোড়ার মাংস পর্যন্ত রাজী ছিলাম, কিন্তু বেরালের মাংস! এই লণ্ডনের লোকেরা কি ছাগল, এরা কি না খায়। উত্তেজনায় তার প্রায় দম বন্ধ হ'য়ে যায়।

জীবন জিজ্ঞেস করলো, বলি, ব্যাপারটা কি?

প্রভাস বললো, আর বলো কেন ভাই, এক্ষুনি দেখে এলাম দোকানে বেরালের মাংস বিক্রি করছে।

মণি পালিত স্তম্ভিত ভাবে প্রভাসের দিকে তাকালেন। মণি পালিতের বয়স আমাদের চাইতে কয়েক বছর বেশি, লণ্ডনে অনেকদিন আছেন এবং লণ্ডন সম্পর্কে ওয়াকেবহাল। অতএব আমরা জিজ্ঞেস করলাম কি ব্যাপার মণিদা?

মণিদা বললেন, ঠিক বুঝতে পারছি না। বোধহয় খরগোসের মাংস হবে। খরগোসকে চামড়া ছাড়ালে অনেকটা বেরালের মতো দেখতে হয় বটে।

প্রভাস আরো উত্তেজিত হ'য়ে বললো, না—না—আমি দেখে এলাম একটা মাংসের দোকানের বোর্ডে স্পষ্ট লেখা আছে বেরালের মাংস পাওয়া যায়।

আমি বললাম, ঠিক কি লেখা আছে বলো ত!

তখন প্রভাস বললো, লেখা আছে Cats Meat।

মণিদা তখন হেসে উঠে বললেন, এই ব্যাপার—না বেরালের মাংস নয়—ওটা হবে বেরালের জন্য মাংস বুঝলে?

ঘোড়ার মাংস খেতে খুব খারাপ লাগত না। তবে মাংসে ছিবড়ের পরিমাণ একটু বেশি। মাংসটা টাটকাও পাওয়া যেত। এ ঘোড়াগুলি বেশির ভাগ আসতো আয়ার্ল্যাণ্ড থেকে। ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়েনে এ সম্পর্কে অনেকগুলি প্রবন্ধ বেরিয়েছিল; তাতে অবশ্য ঘোড়াদের দুঃখ কমেনি।

আমাদের টেবিলে জলের গেলাস থাকত না। প্রত্যেক খাবারের সঙ্গেই থাকতো চায়ের বন্দোবস্ত। আমরা বিশেষ করে জলের বন্দোবস্ত করেছিলাম নিজেদের জন্য। আমাদের চায়ের কাপ একটিও অক্ষত ছিল না—মনে হয় সেগুলি ঐ অবস্থাতেই পোর্টোবেলো রোডের হাট থেকে কেনা। আমাদের পাড়ায় পোর্টোবেলো রোডে প্রতি শনিবারে হাট বসতো। অর্থাৎ ফুটপাথ রাস্তা ভ'রে যেত দোকানদার আর তাদের পসরায়। এখানে দেখতাম মিষ্টার আর মিসেস ম্যাথার্স বাজার করছেন, আর কিনছেন বাজারের সবচেয়ে সস্তা জিনিসগুলি।

আমাদের বাড়িভাড়া ছিল অপেক্ষাকৃত কম। সাধারণত ছাত্রদের দেখেছি অন্যত্র থাকতে চার বা সাড়ে চার পাউণ্ড খরচ করতো তারা। আমাদের বাড়িতে ছিল আড়াই পাউণ্ড। পৃথক ঘর নিলে দশ শিলিং বেশি। আমার একা থাকা অতএব আর পছন্দ হ'ল না। সপ্তাহে দশ শিলিং কম খরচ হবে এজন্য নিচের একটি লোক চলে যেতেই নেমে এলাম একদিন। আমার নিজের ঘরটি আয়তনে ছোট ছিল এবং খুব ঠাণ্ডা ছিল বটে, কিন্তু ঘরটা আমার নিজস্ব ছিল। পাশেই ছিল চানের ঘর—যদিও সপ্তাহে একবারের বেশি চান আমরা কেউই করতাম না পারত পক্ষে। লণ্ডনের অনেক বাড়িতে আবার চানের ঘরই নেই। বহুলোক বছরের পর বছর প্রায় চান না করে থাকেন। তবে যুদ্ধের পর থেকে জনসাধারণের মধ্যে চানের অভ্যেসটা ক্রমশ বাড়ছে। অনেকগুলি সাধারণ স্নানাগার আছে, সেখানেও অনেকে চান করে থাকেন। তবে লণ্ডনের স্নানাগার খুব বেশি পরিষ্কার নয়—যদিও খরচ হয় প্রায় ন আনার কাছাকাছি প্রতিবার চান করবার সময়। চানের জন্য টবেরই প্রচলন বেশি—শাওয়ার বাথ প্রায় নেই। তবে টার্কিশ বাথের কিছু প্রচলন আছে। যাদের টাকা খরচ করবার মতো ক্ষমতা, এবং প্রচুর সময় আছে তারা টার্কিশবাথে গিয়ে ভালভাবে ধোলাই হ'য়ে আসতে পারে।

এইবার তখনকার আমলের রাজনৈতিক ঘটনার কিছু উল্লেখ করছি। কিছুদিন আগেই বিখ্যাত চার্চিল এসেছেন রক্ষণশীল দলের নেতা এবং প্রধানমন্ত্রী হ'য়ে। রক্ষণশীল দল পেয়েছেন ৩২১টি আসন। আর অ্যাটলির শ্রমিকদল পেয়েছে ২৯৫টি আসন। যদিও বেশি লোক শ্রমিকদের ভোট দিয়েছে। শ্রমিকদল দুলক্ষ ভোট বেশি পেয়ে সরকার গঠন করতে পারলো না এ নিয়ে তখন কাগজে অনেকরকম লেখালিখি চলছিল। এবারে অন্য পার্টিগুলির কথা বলা যাক—লিবারাল দল পেয়েছিল ছটি আসন, ভোট পেয়েছিল শতকরা আড়াই। আর সবচেয়ে করুণ অবস্থা কমিউনিষ্টদের—তারা সর্বসাকুল্যে পেয়েছিল বাইশ হাজার ভোট, যেখানে অন্যান্য দল সবাই মিলে পেয়েছিল প্রায় তিন কোটির কাছাকাছি। বৃটেনে কমিউনিষ্টরা ভোটে না জিতলেও শ্রমিকসংঘে তাদের বেশ প্রতিপত্তি দেখা যায়। নিউজ ক্রনিক্‌ল পত্রিকা রাজনৈতিক পরিস্থিতি দুটিন লাইনে প্রকাশ করেছিল, The people have cast out a party they no longer want, in favour of one they do not trust. No one has any right to be pleased.

তবে ভোট দিয়েছিল লোকে প্রচুর। শতকরা বিরাশিজন লোক বাড়ি থেকে বেরিয়ে কিউ করে দাঁড়িয়েছিল ভোট দিতে। কোনো রকম উত্তেজনা, মারামারি, অগ্নিকাণ্ড, মাথা ফাটাফাটি হয়নি। বৃটেন এ ব্যাপারে আশ্চর্য শান্ত। প্রধান দল দুটির মধ্যে অমিলের চেয়ে মিলই বেশি দেখা যায়। চেহারায়, কথাবার্তায়, ব্যবহারে, এক কাপ চায়ের জন্যে কিউ ভে করে, আলস্যে এই দুটি দলের এত বেশি মিল যে আসলে ভোট দেওয়া নেওয়া অনেকটা

ফুটবল খেলার মতো। যে দলই জিতুক না কেন, সামগ্রিকভাবে দেশের বিশেষ পরিবর্তন হয়না। অ্যাটলি এবং চার্চিল ছোটবেলা থেকেই বন্ধু এবং যতদূর মনে পড়ছে কোথাও পড়েছি, তাঁরা দুজনে একই ইস্কুলে, একই ক্লাসে পড়াশুনাও করেছিলেন।

আমাদের বাড়িতে আমরা কিছু ভারতীয় ছিলাম, আর ছিল কিছু আইরিশ। এরা নাকি নিজেদের দেশে খুব মারপিট করতে অভ্যস্ত। একটি গল্প আছে, রাস্তায় বেশ মারামারি চলছে, একটি ছোট ছেলে এসে জিজ্ঞেস করলো একজন দর্শককে, বলতে পারেন মারামারিটা কতক্ষণ চলবে?

—কেন?

—বাবা চান করতে গেছেন, তিনি এসে এই মারামারিতে যোগ দিতে চান কিনা তাই জানতে চাইছেন।

দি কোয়ায়েট ম্যান নামের একটি বিখ্যাত ফিল্মে আইরিশদের এই হাঙ্গামা-প্রিয়তার অনেক ঘটনা আছে। একটি ঘটনায় দেখা যায়, এক বুড়ো ভদ্রলোক মৃত্যুশয্যায়—পাদরী এসে প্রার্থনা করলেন, বুড়োর চোখ বুজে এলো যেন চিরকালের জন্য। কিন্তু না, হঠাৎ দূর থেকে আওয়াজ এলো যেন দাঙ্গা হচ্ছে। লোকটি যেন দৈবশক্তিতে উঠে বসলো, তার পর মৃত্যু স্থগিত রেখে একটা হ'সেরি লাঠি নিয়ে ছুটলো সেই হাঙ্গামার উৎস সন্ধানে।

অথচ দেখলাম ব্লেনিম ক্রেসেন্টের আইরিশেরা নেহাতই শান্ত, এমন কি গোবেচারাও বলা চলে। একটু লাজুক প্রকৃতিরও তারা। ধীরে ধীরে কথা বলে। আমাদের সঙ্গে কোনো বাক্‌বিতণ্ডায় যেতে রাজী হয় না, মারামারি করা দূরের কথা। তারা আমাদের টেবিলেও বসে না, একটু দূরে দূরে বসতে পারলে বাঁচে। আমাদের অবশ্য সাধারণ কোনো কথা আলোচনা করবার থাকত না। ভারতীয়দের সবাই আলোচনা করতো কৃষ্ণমেনন, ডাঙ্গে, রজনীপাম দত্ত, মোরারজী দেশাই, রবীন্দ্রনাথ এবং মস্কো ওয়াশিংটন সম্পর্কে। আইরিশরা আলোচনা করতো কারখানা, শ্রমিক-সমস্যা, থাকার জায়গা সমস্যা—কেবল এইখানেই আমাদের সঙ্গে তাদের কিছু মিল ছিল।

এ ছাড়া তারা যে আর কি ভাবতো বা বলতো, তা আমাদের জানবার উপায় ছিল না। তবে হাইড পার্কে যে সমস্ত আইরিশ মুষ্টিবদ্ধ হাতে গলা ফাটিয়ে উত্তর এবং দক্ষিণ আয়ারল্যাণ্ডকে এক করবার স্বপক্ষে যুক্তি এবং বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে বোমা মেরে উড়িয়ে দেবার হুমকি দেখাতো, তাদের সঙ্গে আমাদের বাড়ির আইরিশদের ছিল বিশেষ পার্থক্য। আমাদের বাড়ির একজন আইরিশ এক দিন তো বলেই ফেললেন যে তিনি ডি ভ্যালেরার সম্পর্কে কিছুই জানেন না এবং তিনি আরো জানালেন, জানবার উৎসাহ পর্যন্ত নেই। আইরিশরা দেশ থেকে আসে লণ্ডনে কাজ করতে, দেশে টাকা পাঠাতে, কারণ তাদের দেশ নেহাতই গরীব। বহু যুগ থেকেই আইরিশরা বিদেশে ছুটেছে বসতি করতে। আমেরিকায় প্রথম যুগে যে সময় লোক সে দেশে গিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন আইরিশ।

লণ্ডনে তিন জন আইরিশ ভদ্রলোক খুব নাম করেন। তিন জনই ইংরিজী জীবনযাত্রার ধরন-ধারণ, রীতি-নীতি ইত্যাদিকে আক্রমণ করেন কঠোর ভাষায়। এঁদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হ'লেন বার্ণার্ড শ'। ভারতবর্ষ বার্ণার্ড শ'কে ভোলেনি, যদিও ইংল্যাণ্ড তাঁকে ইতিমধ্যেই ভুলতে বসেছে। বার্ণার্ড শ'এর আয়োত সেণ্ট লরেন্সের বাড়িটি ভাড়া দেওয়া হয়েছে একজন আমেরিকানকে। বার্ণার্ড শ'কে ভুলবার একটি কারণ হ'ল, বার্ণার্ড শ' ইংরেজদের সমাজ-ব্যবস্থা পছন্দ করেননি। সমালোচনা ইংরেজদের হৃদয় স্পর্শ করে না, বিশেষতঃ সমালোচক যদি বিদেশী হয়, তাহ'লে তো কোনো আশাই নেই সে সমালোচকের। অস্কার ওয়াইল্ডও ইংরেজদের জীবনযাত্রা নিয়ে যথেষ্ট বিদ্রূপ করেছেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি নিজেই দুর্নীতির জন্ত জেলে যান। ঐ একটি অপরাধে অস্কার ওয়াইল্ডের সমস্ত খ্যাতি ধূলিসাৎ হ'ল। ইংরেজদের সমালোচনা করার প্রতিশোধ ইংরেজরা শেষ পর্যন্ত নিতে পেরেছিল। আর ফ্র্যাঙ্ক হারিস, এঁর কথা ইংরেজরা শুনলো না, কারণ এঁর অতীত কিছুই জানা যায় না। বার্ণার্ড শ'এর জীবনীকার এবং আত্মজীবনী লেখক ফ্র্যাঙ্ক হারিস মিথ্যাবাদী বলেও যথেষ্ট বিদ্রূপ সহ্য করেছেন। [ক্রমশঃ।

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

চক্রপাণি

বরাকরের দিকে আর একটা তার নিয়ে আসে কয়লা বরাকর থেকে। রাস্তার মাথায় দেওয়া আছে তারের জাল, গুঁড়ো কয়লা থেকে পথচারীর মাথা বাঁচানোর জন্যে।

এখান থেকে একটু এগিয়েই চৌমাথা—লম্বভাবে জি, টি রোড চলেছে বাংলা থেকে বিহারে, আর আমাদের রাস্তা একটু এগিয়ে গিয়েই মিশেছে পুরুলিয়া রোডে,—ডিসেরগড়, সাংগেরিয়া পার হয়ে দামোদরের ওপর দিয়ে ওপারের পুরুলিয়ার দিকে। সুনির্দিষ্ট 'দিগ্‌দর্শন' মিলবে এই চৌমাথায়।

অপরিষ্কার ফলমূল আর মনোহারীর দোকানে চৌমাথার চার দিক ভর্ত্তি। ফলের খোসা, চায়ের খুরি আর রাজ্যের সমস্ত আবর্জ্জনায় ভর্ত্তি রাস্তা,—কোন পৌর প্রতিষ্ঠান নেই। সবই নাকি আসানসোল মাইনস্ বোর্ডের এলাকা। শুধু কয়লার জন্যেই পত্তন হয়েছে এ সমস্ত শহরের, আর সেই সঙ্গে মাইনস্ বোর্ডের। তাই তারা শুধু কয়লার ভাবনাই ভাবে—জল আলো, রাস্তাঘাট, নর্দমা আবর্জ্জনা—এ সমস্ত নিয়ে মাথা ঘামাবার তাদের অবসর কোথায়? বরাকর আর দামোদরের বালির মধ্যে থেকে 'পাম্প' করে জল বের করে নেয় আশে-পাশের সমস্ত কোম্পানী তাদের খনি, শিল্প আর কর্ম্মচারীর ব্যবহারের জন্য। সেখানে কল বন্ধ করতে ভুলে গিয়ে কর্মচারীর স্ত্রী সারা রাত ধরে জল নষ্ট করে আর এখানে এই বে-ওয়ারিশ মানুষগুলো জলের অভাবে গ্রীষ্মকালে নদীর বালি খুঁড়ে বসে থাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা—যতক্ষণ না এক কলসী জল এসে ভর্ত্তি হয় সেই গর্ত্তের মধ্যে।

এ-হেন চৌরঙ্গীতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট রেষ্টুরেন্ট হাত ধোবার বেসিনের ওপর এক জলের ড্রাম বসিয়ে অভিনব প্রথায় 'ওয়াশ-বেসিন' তৈরী করেছে! তার ভেতর বসে চা পান করতে করতে চোখের সামনে ভেসে উঠল—চৌমাথার ওপর দিগ্‌নির্দ্দেশ—পুরুলিয়া, চিত্তরঞ্জন, কলকাতা, দিল্লী।

সূর্য্য একেবারে মাথার ওপর উঠে এসেছে। কোন দিকে যাব? 'রেলওয়ে প্রজেক্ট' করছিল যে আমাদের পার্টি 'রিভার সার্ভে' করছিল যে পাঁচ থেকে দশ নম্বর তাদের কারুরই ত পাত্তা নেই এখানে! আসানসোলের দিকে যাবো? না, কাম্পে ফিরে গেলে ত চলবে না! যে রাস্তা দিয়ে এসেছি সেই রাস্তা দিয়েই ফিরে যাবো ঠিক করলাম! রেলওয়ে ব্রিজ পার হয়ে ওপারে যাবো চিত্তরঞ্জনের দিকে। পাশে বন-জঙ্গল, টিলাখাদ, নদী পাহাড়, পুরোনো খনির পরিত্যক্ত সুড়ঙ্গ আর পোড়ো বাড়ী। এদের মধ্যে একান্ত আপনার জনের মত যদি কেউ ঘুরে বেড়ায়ও সে এই আমাদের দল!

দিগ্‌ভ্রম হয়েছিল একটু আগেই। এখন আমার সত্যি দিগদর্শন হ'লো। ইতিহাস নেই, ধর্ম্ম নেই, তেমন কোনো নয়নমুগ্ধকর দৃশ্যও নেই এ অঞ্চলে। কিন্তু দর্শন আছে! বুদ্ধিমান মানুষ বিজ্ঞানের সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার নিয়ে হাজির হয়েছে এখানে প্রকৃতির সঙ্গে সম্মুখ সমরে! বসুন্ধরা প্রকৃতি সর্ব্বংসহা জগদম্বার মত শুধু ভালবেসে হেসেছেন আর নিজেকে উজাড় করে ঢেলে দিয়েছেন সন্তানের কল্যাণে! কিন্তু অকৃতজ্ঞ নরাধম, বিজ্ঞানের দর্পে মাতৃত্বের সম্মান পর্য্যন্ত দেয়নি! অকুণ্ঠিত চিত্তে প্রকৃতির সর্ব্বস্ব গ্রহণ করেছে সে, কিন্তু তার বিনিময়ে এতটুকু শ্রদ্ধাও জানায় নি সে জননীর পদতলে।

শতাব্দীর পর শতাব্দীতে সেই পাপ কি শুধু বেড়েই উঠছে? না। আজ স্বাধীন চিন্তাধারার সঙ্গে সঙ্গে বিবেক-বুদ্ধি জেগেছে ভারতবাসীর। অন্ধকার ঘুচেছে। বহুজনের কল্যাণের বাণী বহন করে কল্যাণ-বর্ত্তিকা জ্বলেছে! বহুজনের প্রচেষ্টায় কল্যাণকামী রাষ্ট্রের কল্যাণ-অনুষ্ঠান মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে গণ্ডোয়ানার স্তরে স্তরে! দীপকের কোলে অন্ধকার থাকে, থাকুক! কিন্তু তার কল্যাণের আলোয় যেন উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে সারা জগৎ। কল্যাণের সঙ্গে সঙ্গে আসুক সত্য ও শিব, শিবের সঙ্গে সুন্দর। তখন সেই সত্যশিব-সুন্দরের সমাগমে মানুষ শুধু নিজের জন্যেই নয়, সারা বিশ্বজনের জন্যে প্রার্থনা করুক—

'বিদ্যাবন্তং যশস্বন্তং লক্ষ্মীবন্তং জনং কুরু।'

দীপক থেকে দীপক জ্বলবে। আর সেই শুভ দিনের প্রতীক্ষায় এখন থেকেই বলি, হে অমৃতের পুত্র, তোমরা একত্রে চল, একত্রে বল, আর সকলকে একত্রে জানো—'সংগচ্ছধ্বং, সংবদধ্বং, সং বো মনাংসি জানতাম্।' আর সকলে একত্র হয়ে জগদ্ধাত্রী প্রকৃতিকে প্রণাম করে বল—যা চেয়েছি, যা পেয়েছি—তুলনা তার নেই!

সেই একত্রে চলবার জন্যে এগিয়ে চলেছি, প্রায় আধ ঘণ্টা। হঠাৎ নাম ধরে ডাকল কে রাস্তার পাশ থেকে! চারিদিকে জঙ্গলে ভর্ত্তি উঁচু-নীচু পাহাড়ের ঢালে খানিকটা খিলেন-কারা ইটের গাঁথুনি, অতীতের ঢালু সুড়ঙ্গপথে কয়লার খনিতে নামার জন্যে। পরিত্যক্ত কলিয়ারীর 'ইন্‌ক্লাইন'-এ বসে আশে-পাশের জঙ্গল থেকে শুকনো কাঠ এনে আগুন জ্বালিয়েছে তেরো নম্বর পার্টি। চোদ্দ নম্বরও যোগ দিয়েছে তার সঙ্গে। তিনটে ইট যোগান দিয়ে তৈরী হয়েছে উনুন—তার ওপর মাটির হাঁড়িতে টগবগ করে ফুটছে মাংসের ঝোল। পেন্সিল-কাটা ছুরি নিয়ে আলু কাটছে রণজিৎ আর

তার সামনে তাস নিয়ে ব্রিজ খেলে চলেছে বাকী চার জন। সেখান থেকে প্রায় দু'শো গজ দূরে 'ডাম্পি লেভেলে'র উপর ছাতা ধরে আছে এক কুলি আর তার নীচে দু'পা ছড়িয়ে দিয়ে বসে বসে বেমালুম আঁক লিখে গেছে কাপুর লেভেল বুকে—'ব্যাক্' 'ফোর,' 'ইণ্টার'। ষ্টাফ পড়ে রয়েছে মাটিতে, অথচ 'ষ্টাফে'র রিডিং লেখা হয়ে যাচ্ছে লেভেল বুকে। আমার ত চক্ষু চড়কগাছ!

কাপুর কি তিন মাইল 'লেভেল-সেকশন' মুখস্থ করে ফেলেছে নাকি?

হ্যালো কাপুর, এই তিন মাইল সেকশন কি তুমি ব্রেণে এঁকে রেখেছো?

ফুল—সিধে হয়ে দাঁড়ালো মনোহর, টেলিস্কোপ দেখিয়ে বলল—দেখ ভেতরে। ঐ যে চিমনিটা দেখছিস ঐটেই আমাদের রেফারেন্স পয়েণ্ট। সালানপুর থেকে 'স্টার্ট' করে যাচ্ছি কল্যাণেশ্বরীর দিকে! লেভেল বুকে দিক পালটানোর জায়গাগুলো দেখিয়ে বলল—দশটা অ্যাঙ্গলে'র দশটা 'বিয়ারিং' দেখছিস ত, দশ বার 'ডিরেকশান' পালটিয়েছি।

খুব হয়েছে। তোমাকে আর লেভেলিং-এর লেকচার দিতে হবে না।

তবে বিশ্বাস করছিস ত আমরা তিন মাইল মঠের ওপর দিয়ে সত্যি লেভেলিং করে আসছি।

করেছি!

এইবার কাপুর একটু হাসল আর কুলিকে ষ্টাফ নিয়ে দাঁড় করিয়ে দিল সামনেই এক খাড়াই টিলার ওপর। বলল—এইবার ষ্টাফটা দেখ।

কত রীডিং?

দুই পয়েণ্ট পাঁচ।

বেশ এইবার আবার দেখ। কুলিটা বাঁ-পাশে ষ্টাফ নিয়ে একটু সরে প্রায় খাদের ওপর এসে দাঁড়িয়েছে।

কত রীডিং?

ষ্টাফের সবচেয়ে উঁচু রীডিং চোদ্দতে গিয়ে টেলিস্কোপের 'ক্রস-হেয়ার' ছুঁই-ছুঁই করছে।

তবে বুঝলি ত এখানে তিন-চার ফুট এদিক-ওদিকে লেভেলের পঞ্চাশ ফুট তফাৎ হওয়াটাও বিচিত্র নয়! বলেই কাপুর বিজ্ঞের হাসি হাসল, তারপর আবার যথেচ্ছাচার সুরু করল লেভেল-বুকে।

আমি হাঁ করে তাকিয়ে রইলাম রীডিংগুলোর দিকে। একের পর এক মন্তব্য লিখছে কাপুর—কাটসা কালভার্ট, ক্রসেস ডিচ, পাসেস ভিলেজ ট্র্যাক, মিটস সালানপুর রোড—সালানপুর রোড! চমকে গেলাম। সেই সালানপুর যার কথা বলেছিল গ্যাসোলিন ডলিকে।

আচ্ছা কাপুর, ডলির খবর কী?

গম্ভীর হয়ে বলল সে—কী খবর চাও বলো?

যেটুকু জানিয়ে তোমার খুসী সেইটুকুই বলো।

কিছু জানি না আমি। ও আমার কে যে ওর খবর আমায় রাখতে হবে?

সত্যিই ত! সম্বন্ধের হিসেবে শকুন্তলাদি' হতবুদ্ধি করেছে আমাকে, আজ তার ভাইও হতবাক করল আমায়।

পিকনিক শেষ হল। পোড়া ভাত, আধসেদ্ধ মাংস আর কাঁচা পেঁয়াজ খেয়ে বড় বড় পোল হাতে নিয়ে শিকার থেকে ফিরে এলাম যখন তাঁবুতে, তখন সূর্য্য ডুবেছে। 'লেকচার-টেণ্ট' থেকে প্রফেসর শুধু একবার মুখ বাড়িয়ে দেখলেন, বেশী কথা বা উপদেশের লোক নন তিনি। পার্টি-লীডার যখন গুড-ইভনিং জানাল, তিনি শুধু জিজ্ঞেস করলেন—তিন নম্বর প্রজেক্টের নক্সা কত দূর? নক্সা তখনও সুরু হয়নি। বললাম—প্রায় অর্দ্ধেক হয়েছে। বেশ কালকেই সাবমিট করো আমার কাছে। আর একদিনও দেরী হলে অর্দ্ধেক নম্বর কাটা যাবে।

ড্রইং টেণ্টে তেরো আর চোদ্দ নম্বরের জয়েণ্ট প্রজেক্ট—তিন নম্বরের সঙ্গে পেন্সিল স্কেচ সুরু হল। দুশ্চিন্তায় মুখ শুকিয়ে গেছে আমাদের। লেভেল-বুকে যোগ-বিয়োগ করে 'রিডিউসড লেভেল' বার করছিল কাপুর। খানিকটা করেই বলল—আর ভালো লাগছে না ভাই!

নিতান্ত পরিহাসচ্ছলেই জিজ্ঞেস করলাম—কেন? ডলি কিছু বলেছে নাকি?

ধ্যেৎ, ওর সঙ্গে দেখাই হয়নি দু'দিন। কাল গিয়ে দেখলাম, ড্রইংরুমে বসে আছেন এক পার্শী ভদ্রলোক, আমার দিকে খানিকক্ষণ কটমট করে তাকিয়ে বললেন, ডলিকে চাও? ডলি বাড়ী নেই।

মনে হল দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাবটিও পর্য্যন্ত দেবেন না তিনি।

ভদ্রলোকটি কে ?

মনে হয় ডলির কাকা। ডলি তার 'প্রিষ্ট আঙ্কলে'র যে বর্ণনা দিয়েছিল, তার সঙ্গে অবিকল মিলে যায়। আমি বেরিয়ে আসছিলাম, তিনি আবার ডাকলেন, শোনো, ফিরে দাঁড়ালাম, এ দুটো তোমার ? তার হাতে আমার দেওয়া ডলির কানের দুল দুটো ঝুলছে ! প্রশ্নের জবাব দিতে পারলাম না। ভদ্রলোক হঠাৎ খুব নরম হয়ে বললেন, এ দুটো বোধ হয় তুমি এখানে সেদিন ভুল করে ফেলে রেখে গিছলে, বাট্ মাই বয়, এ বয়সে এত কেয়ারলেস হলে ত চলবে না ? বলেই দুলটা আমার দিকে ছুড়ে দিলেন। এর পর থেকে আর আমি ডলির বাড়ী যাইনি।

আচ্ছা রায়, আমার কি সত্যি খুব অন্যায় হয়েছে ?

দশ বার 'অ্যাঙ্গল' বদলে আপার কুলটি ছাড়িয়ে, বরাকর ছাড়িয়ে, রামনগর ছাড়িয়ে আমার ভূমিরূপের 'সেকশন' তখন মাইথনের রাস্তার ওপর পর্য্যন্ত চলে এসেছে। শেষ কোণের 'বীয়ারিং' লিখতে লিখতে ভাবলুম, দুলটা কবেই বা কাপুর দিল ডলিকে !

কাপুর বলল, তুই যেদিন বোখারোয় গেলি, সেদিন ক্যাম্পে ফিরে এসে সিনেমা যাব ঠিক করলাম। কিন্তু সুটকেশ খুলে প্যান্ট বার করার সময় প্যান্টের সঙ্গে সঙ্গে উঠে এল লাল বাক্সটা। দুল দুটো যেন বাক্সের ভেতর থেকে চকচক করে উঠল। সিনেমার প্রোগ্রাম বাতিল করে, বেরিয়ে পড়লাম সোরাবজী সাহেবের বাড়ীর দিকে। বাড়ীর সামনে এসেই চার দিক অন্ধকার দেখে হতাশ হয়ে গেলাম। তবু পুরোনো অভ্যেসের বশে আংটাটা তুলে গেটটা খুললাম, ড্রইংরুমের সামনে ফুল-কাটা সবুজ পর্দ্দার ফাঁক দিয়ে একটা সবুজ আলো বাইরে এসে পড়েছে। কিছুটা আশা এল বুকে। ঘরের মধ্যে থেকে ভেসে আসছে দ্রুত তালে ব্যাণ্ড-মিউজিক ! পর্দ্দা তুলে ঘরে ঢুকতেই চোখে পড়ল একেবারে 'ক্যালিপ্সো !' রেডিওগ্রামে অর্কেষ্ট্রা বাজছে 'রাম্বা'র তালে আর কাল্পনিক সঙ্গীর দিকে হাত দুটো বাড়িয়ে সামনে পাশে দুলে দুলে উদ্দাম হয়ে নাচছে ডলি, তার শাড়ীর একটা খুঁট কাঁধের ওপর থেকে মাটিতে এসে পড়েছে। দ্বিতীয় ব্যক্তির পদশব্দ শুনে বিক্ষিপ্ত চুলগুলো এক ঝাঁকা দিয়ে মাথার ওপর এনে গাছকোমর করে শাড়ীর খুঁটটা বাঁধল ডলি আর মৃদু হেসে বলল —ওয়েলকাম মিষ্টার ! কি সৌভাগ্য আজ আমার ! তার পরেই ধপ্ করে বসে পড়ল সোফায় আমার পাশে।

পাশে এক সুন্দরীর উপস্থিতিতে কিছুতেই আমি স্বাভাবিক ভাব আনতে পারছিলাম না। একবার চোখ বুলিয়ে দেখলাম, আশে-পাশে কেউ নেই। তার পরেই চট ক'রে পকেট থেকে একটা দুল বের করে তার হাতে গুঁজে দিলাম, বললাম—এই নাও তোমার দুল। আর ইয়ারিং ইয়ারিং করে আমায় মোটে জ্বালিও না। দিদির কথাগুলো ভাবলাম। কিন্তু মুখ দিয়ে আমার কিছুই বেরোল না। ডলি উঠে গেল আয়নার কাছে, গেঞ্জির মত ছোট হাতার ব্লাউজ পরেছে ডলি, তার পিঠের ওপর তাসের ডায়ামণ্ডের মত চওড়া ফাঁক। কানের পাশ থেকে কোঁকড়ানো কালো চুলগুলো সরিয়ে শুভ্র কাঁধের ওপর ফেলে দিল ডলি আর বাঁ হাতে কানের চামড়াটুকু টেনে ধরে দুলটা পরিয়ে ফেলল কানে। তারপর দু' হাত দিয়ে টেনে তুলল আমার এক হাত—বলল, নিজের হাতেই পরিয়ে দাও তুমি আরেকটা।

কি ?

কি আবার ? দোকানে ত একটা দুল কিনতে পাওয়া যায়না ডীয়ার ! এক কানে দুল পরে থাকি কি করে ? দাও লক্ষ্মীটি, আরেকটা তোমার নিজের হাতেই পরিয়ে দাও।

নিজের গাম্ভীর্য্য আর বজায় রাখতে পারলাম না। পকেট থেকে আরেকটা ইয়ারিং বার করে দিয়ে বললুম—এই নাও। শকুন্তলাদি' তোমায় উপহার পাঠিয়েছে আমার হাত দিয়ে। এইটেই সত্যি, আর বাকী যা বলেছি, তা একেবারে মিথ্যে !

শকুন্তলাদি' ? তার সঙ্গে তোমার আলাপ হ'ল কি করে ? ডলি যে মুচকিয়ে হাসছিল অত লক্ষ্য করিনি ! রেগে জবাব দিলাম—ও ! আমি ত ভাবছি, তার সঙ্গে তোমার আলাপ হল কি করে ? শকুন্তলাদি'র মুখের দিকে চেয়ে দেখেছ ? আর আমার দিকে চেয়ে দেখ ; এতেও যদি কিছু না বোঝ, তবে ভাবব, তোমার মাথা গোবরে ভর্ত্তি। বলেই দুলটা ছুঁড়ে দিয়ে আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লুম ! দরজার সামনে এসে পথ রোধ করে দাঁড়াল ডলি।

আমায় মাপ করো কাপুর ! মিথ্যে কথা বলেছি তোমাকে, দুল-টুল কিছু হারায় নি আমার, আমায় মাপ করো তুমি ! গম্ভীর হতে গিয়ে ডলি হেসে ফেলল। আমি স্থির হয়ে দাঁড়ালাম।

তবে এইবার আমায় পরিয়ে দাও।

বাঁদিকের কানটা ডান হাতে [illegible] ধরলাম, পাতলা চামড়াটুকু লাল হয়ে উঠল। কিন্তু দুলের আংটা যে কোথাও লাগে না ! কোথায় কান ফুটিয়েছে ডলি, জিজ্ঞেস করলাম, সে হো-হো করে হেসে উঠল।

মচ-মচ করে জুতোর শব্দ হ'ল পিছন থেকে। চেয়ে দেখি সোরাবজী সাহেব দাঁড়িয়ে, সঙ্গে তার আলখাল্লাপরা এক প্রৌঢ়, সোরাবজী সাহেব হাসলেন আর সেই ভদ্রলোক দুর্ব্বাসা মুনির দৃষ্টি নিয়ে তাকালেন আমার দিকে।

কুশল-প্রশ্ন করলেন সোরাবজী সাহেব, আমি কোন রকমে মুখ নীচু করে বেরিয়ে এলাম। গেটের কাছ থেকে শুনতে পেলাম, কাকা বলছেন—ডলি, তোমার এখন বোঝবার বয়স হয়েছে। ভুলে যেও না, 'ফায়ার টেম্পলে' প্রবেশের অধিকার পার্শী ছাড়া আর কারো নেই।

নক্সার ওপর আমার লাইনিংপেন আটকে গেল ! যাদের আমরা দেশের সব চেয়ে আধুনিক সমাজের লোক বলে মনে করি, তাদের ধর্ম্মমন্দিরে আর কারো প্রবেশের অধিকার নেই !

সোরাবজী সাহেব বললেন—হ্যাঁ তাই। পরের দিন মাঠ থেকে ফিরে এসেই সিধে গিয়ে হাজির হলুম সোরাবজী সাহেবের বাংলোয়, সবে সন্ধ্যে তখন। ড্রইংরুমে ঢুকতে গিয়েই বেরিয়ে এলুম, সাদা ফতুয়া আর পাজামা পরে দরজার দিকে পিছন ফিরে করজোড়ে দাঁড়িয়ে আছেন সাহেব। মাথায় তার গান্ধী ক্যাপের মত একটা টুপি, হাতে তার, কোমরে জড়ানো পৈতের একাংশ। একেবারে যেন গায়ত্রী জপ করছেন সোরাবজী সাহেব। বেরিয়ে এলুম পোর্টিকোতে। মিনিট দশেক পরেই চাকর এসে খবর দিল—সাহেবের আহ্নিক শেষ ! চাকরকে জিজ্ঞেস করলাম —সাহেব এ-সব আবার কবে থেকে ধরেছেন ?

হিন্দুস্থানী চাকর উত্তর দিল—সাহেব বরাবরই আহ্নিক করতেন, তবে সে দিনে দুবার, শোবার আগে আর ঘুম থেকে উঠে! এখন এর মাত্রা বেড়ে গেছে। ভেতরে ঢুকতেই স্লিপিং-গাউন আঁটতে আঁটতে সোরাবজী সাহেব জিজ্ঞেস করলেন—কি ডলির খবর নিতে এসেছ ?

ঘাবড়ে গেলাম! এঁদের হল কি? কাপুরকে এর ভাই এই প্রশ্ন করেছিলেন, আমাকেও তাই! একটু ক্ষুব্ধ হয়েই বললাম—না।

তবে ?

আমি একটা খবর নিতে এসেছি আপনার কাছে। আপনাদের ফায়ার টেম্পলে কি পার্শী ছাড়া আর কাউকে ঢুকতে দেওয়া হয় না ?

হ্যাঁ তাই, চমকে গিয়ে বললেন সোরাবজী সাহেব—তবে তোমার হঠাৎ এ খবরে প্রয়োজন হল!

না এমনি। কালকেই এ ব্যাপারটা জানলাম কি না! প্রথমে আমার বিশ্বাসই হয়নি, তবে এখন বিশ্বাস হচ্ছে।

বিশ্বাস হয়নি কেন ?

কারণ, দেশের সবচেয়ে গোঁড়া বলে যাদের বদনাম, সেই হিন্দুদের দেবমন্দিরও আজ আস্তে আস্তে সব জাতের জন্যে উন্মুক্ত হয়ে যাচ্ছে, আর সবচেয়ে উদার বলে যাঁদের সুনাম, তাঁদের মন্দির একেবারে অগম্য।

আশ্চর্য্য হচ্ছ? কিন্তু তুমি জান না, পারস্যে আমাদের সমস্ত গ্রাস করেছে ইসলাম। শুধু আমরা মুষ্টিমেয় কয়েক জন জরথুষ্ট্রের বাণী বুকে নিয়ে পালিয়ে এসেছি হিন্দুস্থানে। সারা পৃথিবাতে পার্শীর সংখ্যা এক লক্ষ হবে কি না সন্দেহ! সেই উদ্বাস্তু জাতির শেষ চিহ্নটুকুতেও ভাঙ্গন দেখা দিয়েছে। তাই আজ সমস্ত বন্ধনগ্রন্থি আমরা জোর করে বাঁধছি, যাতে এই ভগ্নাবশেষটুকুও লুপ্ত না হয়।

কিন্তু তার জন্যে মন্দিরে প্রবেশ নিষিদ্ধ করে কি লাভ? বরঞ্চ মন্দিরের দ্বার অবারিত রাখলে আপনাদেরই ত ধর্ম্ম প্রচারের সুবিধে।

না, ধর্ম্মপ্রচার আমরা করি না। হিন্দু মুসলমান হয়, কিন্তু মুসলমানকে কখনও হিন্দু হতে দেখেছ? পার্শী খৃশ্চান হয়, কিন্তু খৃশ্চান কখনও পার্শী হয়েছে, এ কথা শুনেছ? মাঝখানে থেকে শুধু দরজা খুলে দিলে বাইরের দমকা হাওয়াই ভেতরে আসবে, ভেতরের পবিত্র বাতাস বাইরে যাবে না।

কিন্তু এ বিশ্বাসও ধর্ম্মান্ধতার। আপনি কি করে এ কথা বলেন ?

সোরাবজী সাহেব মৃদু হেসে বললেন—দেখ একদিন আমিও এসব বিশ্বাস করতাম না, কিন্তু আজ করি। ধর্ম্ম এক আর কর্ম্ম এক। ধর্ম্ম বাঁচাতে গিয়ে কর্ম্মের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা হয়, তখন অতি-নবীনও হয়ে পড়ে। আজ থেকে হাজার হাজার বছর আগে জরথুষ্ট্র যা বলে গেছেন পৃথিবীর মানুষ আজও তা পালন করতে অক্ষম, সর্বধর্ম্মের সার সেই উপদেশ শুধুমাত্র কয়েকটি অক্ষরে আবদ্ধ করেছেন ঈশ্বর—"হুকাতা, হুমাতা, হুবাবার্তা—সংচিন্তা, সংবচন, সংকর্ম্ম। শুধু পার্শীদের জন্যে নয়, সারা বিশ্ববাসীর পক্ষে এই উপদেশই যথেষ্ট। কিন্তু পৃথিবীর কথা দূরে থাক, পার্শীদের মধ্যেই বা কটা লোক আজ জরথুষ্ট্র উপদেশ স্মরণ করে? তাই প্রচারের কথা আমরা একেবারেই ভুলেছি।" শুধু আত্মরক্ষার জন্যেই প্রাণপণ যুদ্ধ করছি আমরা শতাব্দীর পর শতাব্দী।

কথা থামিয়েই সোরাবজী সাহেব বইয়ের সেলফের দিকে তাকালেন। সেখান থেকে একটা বই নিয়ে এসে বললেন—পড়। তা হ'লেই বুঝবে, তোমাদের বেদ আর আমাদের আবেস্তা একেবারে এক।

টীচিংস অবজোরায়াষ্টার—জরথুষ্ট্রের শিক্ষা। পৃথিবীর সমস্ত জীবনের আধার আহুর মজদা—স্বর্গীয় আলোকে তার বিকাশ। অনন্ত সঙ্গীতে পূর্ণ তাঁর জগৎ। তাঁরই লীলা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে! সেই আহুর মজদাকে কল্পনা করেছেন ঋষি জরথুষ্ট্র—ষড়ৈশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ ভগবান। 'আশাবহিস্তা,' 'বহুমনা,' 'ক্ষাত্রৈর্ধ্যে,' 'স্পেস্তা অর্মাতি,' 'হৌরবাগত' ও 'আমেরাতাত'—এই ছ'টি ঐশ্বর্য্যে পূর্ণ আহুরমজদা। তিনি সত্য, তিনি 'আশানবহু:' তিনি 'বহুমনা'—তাই তিনি শুভমন; সংচিন্তা, সংবাক্য আর সংকর্ম্মের উৎস তিনি। স্বর্গীয় অনন্তশক্তি তিনি—তাই তিনি 'ক্ষাত্রৈর্ধ্য্যে,' প্রেম আর ভক্তির প্রতীক তিনি—তাই তিনি 'স্পেস্তা অর্মাতি'। যা কিছু পূর্ণ, যা কিছু সুন্দর, যা কিছু আনন্দময়, তা সমস্তই তাঁর প্রকাশ; তাই তিনি হৌরবাতাত, তিনি অনন্ত অক্ষয়, তিনি অনাদি অমর, তিনিই চিরন্তন সত্য—তাই তিনি আমের তাত—অমৃত। সেই চিন্ময় আদিত্যবর্ণ মহাশক্তি, তাঁর প্রতীক অগ্নি! অজ্ঞানের অন্ধকারে আলো দেখাও অগ্নি! মানের মালিন্য পুড়িয়ে দূর করে এগিয়ে নিয়ে যাও সেই মহাশক্তির দিকে। হে অগ্নি, জ্ঞান দাও, আনন্দ দাও, সুখ দাও আমায়, সুখ দাও আমার প্রতিবেশীকে, সুখ দাও বিশ্বের সমস্ত প্রাণীকে। তোমায় আমার অনন্ত কোটি প্রণাম! আহুর মজদার চরণে আমার ভক্তি অটুট করো আর আমায় শক্তি দাও, আমি যেন শয়তান আহির মনকে জয় করতে পারি।

বইয়ের পাতা উলটিয়ে চললুম। হঠাৎ সোরাবজী সাহেব বললেন—দেখ আমি একটা কথা বুঝি না, তোমাদের ধর্ম্মের চরম লক্ষ্য হল সেলফ—অ্যানিহিলেশন বা আত্মবিনাশ। যে যত ভাল কাজই করুক না কেন, তাকে ধর্ম্মজীবনে উঠতে গেলে হতে হবে সন্ন্যাসী—সর্ব্বস্ব ত্যাগ করে সমাজ-সভ্যতা ছেড়ে তাকে কঠোর তপস্যায় মগ্ন

হতে হবে গভীর বনে। মানুষের সততা, সেবা, সৎকর্ম্ম—এ সবকেও তোমরা পূর্ণ মর্য্যাদা দাও না, যতক্ষণ না সে মানুষ সর্ব্বস্ব ত্যাগ করে। পৃথিবীটা তোমাদের কাছে অলীক, অনিত্য; মানুষ-জন্মটাই তোমাদের কাছে অভিশাপ আর দয়ামায়া ভালবাসা সবই মায়া।

সোরাবজী সাহেব বেদান্ত সম্বন্ধে আলোচনা করবেন, স্বপ্নেও ভাবি নি!

তবুও বললাম—দেখুন অজস্র মত আছে হিন্দুদের ধর্ম্মে। যার যে মতে খুসী সে সেই মতে ভগবানের আরাধনা করে। যারা প্রকৃত হিন্দু তারা পৃথিবীর সমস্ত ধর্ম্মকেই নিজেদের ধর্ম্ম বলে মনে করে। কারণ, সব ধর্ম্মের উপদেশই কোনো না কোনা হিন্দুমতে বিধিবদ্ধ আছে। এই আপনাদেরও ভগবান সম্বন্ধে যে ধারণা, তা' অবিকল হিন্দুদের মত! সেই অনাদি অনন্ত, অক্ষয় অমৃত, আদিত্যবর্ণ পুরুষ, যিনি অন্ধকার থেকে আলোকে, মৃত্যু থেকে অমৃতে, অসত্য থেকে সত্যে, অজ্ঞান থেকে জ্ঞানে নিয়ে যান মানুষকে তিনিই ভগবান!

আর আত্মবিনাশের কথা যে বলেছেন, সেটা হচ্ছে আত্মবিলুপ্তি। হিন্দুরা বলে, তুমি যখন পরমাত্মার অংশ তখন সেই উৎসে বিলীন হওয়াই তোমার জীবনের চরম সার্থকতা। সুতরাং পৃথিবীর সুখে, পৃথিবীর ভোগে তোমার প্রয়োজন কি? 'যেনাহমমৃতং ন স্যাম তেনাহং কিংকুর্য্যাম্'—যা দিয়ে আমি অমৃত পাব না, তাতে আমার প্রয়োজন কি?

তবে সৎকর্ম্মের প্রয়োজন আছে বৈ কি। ধর্ম্ম বলে, কর্ম্মে তোমার অধিকার আছে, কিন্তু কর্ম্মফলে নয়। পরমপুরুষ রামকৃষ্ণ বলেছেন—কচ্ছপ জলে চরে বেড়ায়; কিন্তু মন তার আড্ডায় পড়ে থাকে, যেখানে তার ডিমগুলো আছে—তেমনি সংসারে সব কর্ম্ম করবে, কিন্তু ঈশ্বরে মন ফেলে রাখবে।

সোরাবজী সাহেব কি বুঝলেন, কে জানে! তবে তিনি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে অন্দরে চলে গেলেন। সেখানে এসে বসলেন, তাঁর স্ত্রী, কতকগুলো ডালমুট, কাঠিভাজা আর এক কাপ চা রাখলেন তিনি টেবিলের ওপর। আমি দাঁড়িয়ে উঠে 'রাম-রাম' করলাম।

মৃদু হেসে হিন্দু-গুজরাটীর মত 'রাম-রাম' জানালেন তিনিও। তার পর জিজ্ঞেস করলেন—আচ্ছা, কাপুর এখন কোথায়? কই, তাকে ত আর এদিকে দেখতে পাই না।

আর দেখতেও পাবেন না। সে আর আপনাদের বাড়ী আসবে না।

কেন?

আপনারা তার আসা পছন্দ করেন না বলে। শুনলাম, সেদিন ডলির কাকা নাকি তাকে সোজা সদর দরজা দেখিয়ে দিয়েছিলেন!

করুণ মুখচ্ছবি স্নেহশীলা মাতার। সেদিকে তাকিয়ে আমিও একটু অভিভূত হয়ে পড়লাম। ডলির মা বললেন, কি জানি বাপু, আমিও ওদের কথাবার্ত্তা কিছুই বুঝি না। মেয়েটাকেও নিয়ে চলে গেল এখান থেকে। কিছুতেই যেতে চায়নি ডলি, বাপ-কাকা মিলে এক রকম জোর করেই পাঠাল তাকে বোম্বে।

বোম্বে! সেখানে কি করবে ডলি?

নার্সিং শিখবে সে। ফিরোজ ভায়ের ধারণা এখানে আমাদের সমাজই নেই। 'পার্শী কালচার' শেখার জন্যে মেয়ের বোম্বে যাওয়া দরকার। সেখানে ফিরোজভায়ের কাছে থাকবে আর পার্শী এ্যাম্বুলেন্সে নার্সিং শিখবে। সোরাবজীও প্রথমে আপত্তি করেছিল, বলেছিল, ইণ্টারমিডিয়েট শেষ হলেই নিয়ে যেও। কিন্তু কাকা ফিরোজভাই শুনল না। বলল—আমি আবার কবে আসব ঠিক নেই আর মেয়ের যে রকম হাবভাব, তাতে আর একদিনও এ হাওয়ায় থাকা উচিত নয় তার। একে 'ফায়ার-টেম্পলের' প্রিষ্ট, তার ওপর ছোটবেলা থেকেই সোরাবজীকে মানুষ করেছে সে। সোরাবজী শেষ পর্য্যন্ত আর অমত করতে পারল না।

অতবড় মাতৃহৃদয় একেবারে শূন্য! যাবার সময় রাম-রাম করলাম, তিনি বললেন, এসো, আর কাপুরকে একবার আসতে বলো।

জরুর! ফির মর্ড়িং।

মনোহরকে আমি আর কিছু বলিনি। ড্রইংবোর্ডে টি-স্কোয়ার ফিট করে তার ওপর সেট-স্কোয়ার লাগিয়ে লাইন টানতে টানতে মুখ তুলে তাকাল কাপুর। দূরে ছাইগাদার ওপারে চিমনির ওপারে উঁচু হয়ে উঠে গেছে জমি দিগন্তের কোল ঘেঁষে একেবারে আকাশের বুকে। শুধু এইটুকু দুঃখ, উদাসনয়নে চেয়ে রইল কাপুর আর ধীরে ধীরে বলল, কোনো দিন একটা ভালো কথাও বললুম না। শেষ দিন ক্ষমা পর্য্যন্ত আমার কাছে চাইল সে, আমি তাও প্রাণ ভরে দিইনি।

চিরথুণ্ডার সেই পুরোনো সেতুর উপর দাঁড়িয়ে অপলকনেত্রে চেয়ে রইল কাপুর বরাকরের জলের দিকে। নদীর জল এসে যেন লেগেছে মানুষের চোখে। স্তব্ধ বরাকর। ওদিকে কুলুকুলু স্বরে উচ্ছল আনন্দে বয়ে চলেছে নর্ম্মদা, বৃদ্ধার ভঙ্গিমায় যেন বসন্তের জোয়ার। কন্যাকে ফিরে পেয়েছে সে বরাকরের কোল থেকে। দক্ষিণাপথে চলে গেছেন অগস্ত্যমুনি! উঁচুমাথা নীচু করে প্রণাম করেছিল বিন্ধ্যাচল। গিরিরাজ হিমালয়ের অনুরোধে সে মাথা আর উঁচু করার অনুমতি দেননি মুনিবর। সুরলোকের প্রিয় হিমালয়, বিন্ধ্যের শ্রেষ্ঠত্ব এতটুকুও সহ্য হলো না দেবলোকের। টপটপ করে অশ্রু ঝরে পড়ল বিন্ধ্যের শত-সহস্র চক্ষু দিয়ে—অশ্রুর প্রবাহ বয়ে চলল গণ্ডোয়ানার বুক চিরে, নর্ম্মদা, তাপ্তী, কৃষ্ণা গোদাবরী, দামোদর, বরাকর।—দূরে অনেক দূরে ভূধর-প্রান্তর জনপদ পেরিয়ে নর্ম্মদার কোলে দাঁড়িয়ে আছে ব্রোচ। তার পার্শী জনপদের অগ্নিমন্দিরে সন্ধ্যাহ্নিক সুরু হয়েছে। তারই কোন অলিন্দে করজোড়ে যেন প্রার্থনা করছে ডলি—'হুকাতা, হুমাতা, হুবারাস্তা।' প্রার্থনার অন্তে মন্দিরের সিঁড়ি দিয়ে নর্ম্মদায় নেমে গেল ডলি। চমকে উঠল সে জলের ভেতর নিজের প্রতিচ্ছবি দেখে। এ কি! এ নর্ম্মদা না বরাকর—স্বচ্ছ নর্ম্মদা! নদীর জল এসে লেগেছে মানুষের চোখে।

* * *

বিদায় নেবার দিন ঘনিয়ে এল। কালকেই দেওয়ালী, তারপর আর দিন দুয়েক! অতঃপর পাততাড়ি গুটিয়ে ফিরে চল মহানগরীর বুকে—ঢং-ঢং করে ঘণ্টা সাইরেণের সঙ্গে সঙ্গে।...

সস্তা ফুলঝুরি, ফটকা আর ছুঁচোবাজিতে ভরে উঠল ইস্পাত-নগরীর দোকানপাট! রাতে প্রদীপ-মোমবাতিও জ্বলল চোদ্দপুরুষের পরকালের পথ আলোকিত করার জন্যে! কিন্তু মাথার ওপর ব্লাষ্ট-ফার্ণেসের লাল হলকা দেখে ভয়ে লজ্জায় সঙ্কুচিত হয়ে গেল

দীপশিখা—বড় লোকের ভোজসভায় ছেঁড়া জামা-পরা গরীব ছেলেটি যেন! আর তার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশের দল ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠল—অলিতে গলিতে, বস্তীতে গুমতীতে উচ্ছৃঙ্খলতা আর অশ্লীলতা—মদ, জুয়ো আর মেয়েমানুষ! বছরে দুটি দিনের প্রতীক্ষা করে কয়লা আর লোহার শ্রমিককুল—এক বিশ্বকর্ম্মা পুজোর দিন, আর এক এই দেওয়ালীর দিন। জীবনের সমস্ত অবরুদ্ধ কামনা-বাসনা উজাড় করে ভরিয়ে নিতে চায় তারা তামসিক রসে!

রাস্তা দিয়ে চলাও বিপজ্জনক। শেরী-শ্যাম্পেন খাওয়া মুখের দুর্গন্ধে আর টলায়মান দেহের অযাচিত স্পর্শে নিরীহ পথচারী সঙ্কুচিত হয়ে চলেছে! কুলি-লাইনের সামনেই ওভারব্রিজ—কোম্পানীর লাইনের ওপর দিয়ে যাবার রাস্তা। ব্রিজের রেলিং ধরে দুটি পরিচিত পুরুষ অশ্রাব্য ভাষায় চীৎকার করে ঝগড়া করছিল। ঝগড়া থেকে মারামারি দাঁড়ালো। সিগারেট কিনছিল রাও নীচের সিগারেটের দোকান থেকে, আমি হতভম্ব হয়ে চেয়ে আছি যুধ্যমান লোক দুটোর দিকে। হঠাৎ চীৎকার উঠল চরমে। বাঁচাও বাঁচাও রব উঠল মাঝখান থেকে আর 'মর গিয়া মর গিয়া' আওয়াজ উঠল নীচে থেকে। যুধ্যমান এক বীর একেবারে ওপর ওপর থেকে নীচে পড়েছেন। দৌড়ে গিয়ে হাজির হলাম ঘটনাস্থলে। লাইনের ধারেই নামানো ছিল বালির স্তূপ—তার ওপর মুখ গুঁজড়ে গোঙাচ্ছে একটা লোক; তার হাঁটু দুটো মুড়ে গেছে লাইনের ওপর, হাঁটুর একটা খিল থেঁতো হয়ে দুমড়ে গেছে—রক্তের স্রোত বয়ে যাচ্ছে বালি স্লিপার আর লাইনের ওপর দিয়ে! হতভাগার সঙ্গীটি পালিয়েছে। চারপাশে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে দর্শকবৃন্দ। তারা হা-হুতাশ করছে; চীৎকার করে লোক জড় করছে; কিন্তু হতভাগাকে হাসপাতালে পাঠাবার একটুকুও উদ্যোগ নেই।

হঠাৎ ভিড়ের মধ্যে থেকে 'হট যাও হট যাও' করতে করতে বেরিয়ে এলো একটা লোক—চেয়ে দেখি আমাদের ক্যান্টিনের সুনীল বাবু! লোকটাকে চিৎ করাতেই মুখ বেরিয়ে পড়ল—দরদর করে রক্ত বেরুচ্ছে নাক দিয়ে আর তার সঙ্গে সঙ্গে অবিরাম গোঙানি! বালির ওপর পড়ে আছে ইয়াসিন!

এগিয়ে গেলাম সুনীল বাবুর সাহায্যের জন্যে। তারপরই ধরাধরি করে ইয়াসিনের দেহ তুললাম রিকশায়। কোম্পানীর ডাক্তার ঘোষণা করলেন—পরমায়ু আর কয়েক ঘণ্টা। ডাক্তারের নিষেধ সত্ত্বেও এক রকম জোর করেই বের করে নিয়ে এল সুনীল বাবু ইয়াসিনের দেহটাকে। বলল—সবশেষ হবার আগে ফুলজানকে একবার দেখাতেই হবে।

সে কে?

লোক জানে সে কলিয়ারী অঞ্চলের বড় বাইজি। কিন্তু আসলে সে ইয়াসিনের জান। বিয়ে হয়নি বটে, তবু এত ভালবাসা আমি কখনও দেখিনি! সুনীল বাবুকে সাহায্য করার জন্যে একজনের দরকার। রাওকে পাঠিয়ে দিলাম ক্যাম্পে; বললাম—আমার ফিরতে রাত হবে, ম্যানেজ করে দিস। ইয়াসিনের দেহ নিয়ে আমরা চললুম।

কয়লার গুঁড়ো-ভর্তি রাস্তা দিয়ে পচা নর্দ্দমা পার হয়ে বস্তীর শেষ প্রান্তে পৌঁছুলাম। দেওয়ালীর একটাও মোমবাতি নেই সেখানে। কৃষ্ণা অমাবস্যার জমাট অন্ধকারে একটা পোড়ো ইটের বাড়ীতে এনে হাজির করল সুনীল বাবু। পাশাপাশি দুটো ঘর—উৎকট গন্ধ আসছে ঘরের ভেতর থেকে। তার ডানদিকের ঘর থেকে ধ্বস্তাধ্বস্তির শব্দ আর নারীকণ্ঠের চীৎকার। কী যেন খাওয়াতে চেষ্টা করছে একজন, আরেক জন বলছে—নেহী পিউঙ্গী, তার উত্তরে অশ্লীল গাল দিচ্ছে প্রথম জন—তেরী মা বাঈজী, তেরী নানী বাঈজী ঔর তু সতী বনেগী। দুম দুম করে কপাটে ধাক্কা দিল সুনীল বাবু। ভেতর থেকে চীৎকার করে উঠল প্রথম জন নিকাল যা, নিকাল যা শয়তান, যো রুপিয়া লিয়া উসকা পাশ যা। সুনীল বাবু সমস্বরে চীৎকার করে উঠল—জলদি খোল ফুলজান, মৈ সুনীল বাবু হুঁ। হঠাৎ শান্ত হয়ে গেল সব! দরজার খিল খুলে গেল।

এক খণ্ড কাঁচুলির ওপর বিস্রস্ত বাস সামলাতে সামলাতে পাশে দাঁড়াল ফুলজান। বলল—এ কোন হ্যায়? সুনীল বাবু সে কথার উত্তর দিল না। ফুলজানকে ঠেলা দিয়ে বলল—হট্ যা। ফুলজান গাল দিয়ে উঠল। তারপর মোড়াটা টেনে পিছন ফিরে বসে বোতল উল্টিয়ে ঢক্ ঢক্ করে কি খেতে লাগল। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ছবি-ওলা একটা বই থেকে স্লেটে কি সব লিখছিল দ্বিতীয়া নারী লখিয়া! আমাদের দিকে বিস্ফারিত নেত্রে চাইল সে; তারপর চট করে এসেই খাট থেকে ঝুমুর, বোতল, চুড়ি, বালা, সায়া, ব্লাউজ সব নাবিয়ে ফেলে ধরাধরি করে শুইয়ে দিল ইয়াসিনকে খাটিয়ার ওপর! ফুলজান পিছন থেকে বিড়বিড় করে বকে যাচ্ছে—আজ দেওয়ালী, আজ নাকি খুশীর জমানা, আজ নাকি অনেক পয়সা উপায় হবে তার। জিজ্ঞেস করলাম সুনীল বাবুকে—অত মদ খাচ্ছে কেন ফুলজান?

প্রাণের জ্বালা মেটাবার জন্তে। স্বামী পুত্র ঘর ত কখনই পেল না, তাই মদ খেয়ে ভুলছে সমস্ত! তা' অত খেলে যে মরে যাবে।

হঠাৎ দরজার ওপর দড়াম্ দড়াম্ করে শব্দ হ'ল আর চীৎকার শোনা গেল বাইরে থেকে—হারামী কা বাচ্চা, হারামী কী বাচ্চী, দরওয়াজা খোল। বলা বাহুল্য, অশ্লীল গাল দিচ্ছে তারা ইয়াসিনকে আর এদের! আমার বুক কাঁপতে লাগল। সুনীল বাবুকে জিজ্ঞেস করলাম—এ সব কি?

আর জিজ্ঞেস করো না বাবু, চুপ করে বসে থাকো। বাইরের গোলমাল মিটে গেলেই তোমাকে ক্যাম্পে পৌঁছে দোব।

কিন্তু কী চায় এরা ?

কী চায় ? এরা চায় ফুলজান, আর ও সপ্তার একশো টাকা নিয়েছিল ইয়াসিন যে মিঞার কাছ থেকে, সেও এসেছে, তার চাই লখিয়া !

বাইরের শব্দ আরো জোর হতে লাগল। মনে হ'লো, দরজাই বুঝি ভেঙ্গে যাবে। ফুলজান মোড়া থেকে পড়ে যেয়ে চীৎপাত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।

শব্দের আওয়াজে তার আমেজ কেটে গেল। হুড়মুড় করে উঠে বসেই সে আমাদের দিকে তাকিয়ে দেখল ভাল করে। দেখতে দেখতে উঠে দাঁড়াল সে, শাড়ীর আঁচল কুড়িয়ে তুলল মাটি থেকে, ভালো করে গুছিয়ে নিল বেশবাস। খাটিয়ার কাছে এসেই থমকে দাঁড়াল ফুলজান। এতনা 'খুন ! কেয়া হুয়া মালিক ! হাঁ করে চাইল আমার মুখের দিকে, সুনীল বাবুর মুখের দিকে—নির্ব্বাক আমরা ! ইয়াসিনের শরীর থেকে রক্তমাখা চাদর খুলে ফেলল ফুলজান। মুগুরের মত বলিষ্ঠ হাত কোথায় ? ঘোড়ার পায়ের মত শক্ত পা এ রকম পিষ্ট হল কেন ? জানু ফেটে রক্ত বেরুচ্ছে—চারদিকে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা মাথা রক্তে ভিজে গেছে ! ফুলজান ডুকরে কেঁদে উঠল আর ইয়াসিনের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে গোঙাতে লাগল—সর্দ্দার, আঁখে খোলো। সর্দ্দার চোখ মেলেছিল কিনা জানি না। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল !

ফুলজান বুকের ওপর শুয়ে শিশুর মত আছড়ে আছড়ে চীৎকার করে কাঁদছে। বাইরে দুর্বৃত্তদের চীৎকার ক্রমশ: বাড়ছে—বছরের সেরা বাত দেওয়ালী—ইয়াসিন শালা বেতায়া বেসরম বেতমিজ, উল্লু কা বাচ্চা, বাত ভি দিয়া, পয়সা ভি লিয়া, লেকিন সওদা কাঁহা। পয়সার পুরো দাম উসুল করে নেবে হিংস্র পশুগুলো ! সুনীল বাবু এগিয়ে গেল খিল খুলতে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল লখিয়া। দৌড়ে এসে ধরল সে সুনীল বাবুর হাত—বললো, বাহার মাত যাইয়ে, ওলোগোঁকা শ্রেফ আওরৎ চাহিয়ে, ও তুম্‌হেঁ মার ডালেগা। বলেই বই শ্লেট সরিয়ে বার করলো এক ভাঁড় পানীয়, যা খাওয়াবার জন্যে ফুলজান চেষ্টা করেছিল এতক্ষণ ! সেইটা এক হাতে নিয়ে গেল ফুলজানের কাছে। তার পর ফুলজানকে ঠেলে বলল—দেখলোও দিদি, মেরী মা বাঈজী, মেরী নানী বাঈজী, মৈ ভী বাঈজী বনেঙ্গী। বলেই চুমুক দিল ভাঁড়টায়।

বিস্ফারিত নেত্রে চেয়ে দেখল ফুলজান কয়েক মুহূর্ত্ত ! দেখেই পাগলীর মত তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠে—এক ঠেলা মেরে ভাঁড়টা ফেলে দিল মাটিতে। বলল—ফির মদ্ ছুয়েগী ত খতম্ কর দুংগী। তারপর মেঝেতে উপুড় হয়ে চেটে খেল বিষরস। তারপর খিল খুলে দৌড়ে বেরিয়ে গেল ফুলজান ঘরের বাইরে—অবিন্যস্ত বেশবাস ঘরেই পড়ে রইল ! যাবার সময় বলে গেল—লখিয়ার শরীর যেন কেউ না স্পর্শ করে !

ফুলজানের বিকট হাসি আর পশুদের উন্মত্ত চল্লোড় আস্তে আস্তে কমে এল ! বড় বড় চোখ বের করে দরজার দিকে তাকিয়ে আছে ইয়াসিনের মৃতদেহ ! সুনীল বাবু বলল—সকাল হয়ে গেল আর নিয়ে যাওয়া যাবে না লখিয়াকে ! তুমি একটা উপকার করতে পারো রায়বাবু ?

বলুন।

এখনও অন্ধকার আছে। আমি বোরখা পরিয়ে দিচ্ছি লখিয়াকে জানানা ওয়েটিং রুমে পৌঁছিয়ে দেবে ? আমি সৎকার করেই বেরিয়ে পড়বো !

এ আর এমন কী !

বোরখা পরে ছোট সুন্দরী পিছু পিছু এলো। ওয়েটিংরুমে পৌঁছিয়ে দিয়ে বললাম—তুম রহো। মুঝে জলদি হ্যায় ! বোরখা খুলে ফেলল ছোট সুন্দরী। মৃদুস্বরে বলল—একটু দাঁড়ান।

আমি দাঁড়ালাম। আমার জোড়াপায়ের ওপর হাঁটু গেড়ে বসে কপাল ঠেকিয়ে প্রণাম করল সে ! আমি হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। আরও ধীরে সে বলল—আমি কে, কোথায় যাব, আমার পরিণাম কি,—এসব ত কিছুই জিজ্ঞেস করলেন না ?

তুমিও ত আমায় জিজ্ঞেস করো নি। আর এ সবে দরকারই বা কি ?

কিন্তু আমরা কি এতটুকু দয়া পাবারও যোগ্য নই ?

আমি মুখ তুলে চাইলাম, ছোট সুন্দরী বলে চলল—বাবু, একটা কথা আমি অনেক বার তোমায় বলবার চেষ্টা করেছি, কিন্তু সুবিধে পাইনি। আমার মা বাঈজী ছিল বটে, কিন্তু আমার বাবা মস্ত বড় ভদ্রলোক ! আর তিনি ছিলেন তোমারই মত বাঙালী ! শুনেছি তিনি এখনও বেঁচে আছেন। বলেই সে এমন এক ভদ্রলোকের নাম করল, যিনি ঐশ্বর্য্যে ও প্রতিপত্তিতে এ অঞ্চলের এক স্বনামধন্য পুরুষ !

লখিয়া এবার আমায় যেতে বলল—বাবু তুমি যাও। আমার কাছে আর থেকো না, বিপদ হতে পারে।

বলেই ঝপ করে আরেক বার প্রণাম করল আমায় ! বলল—তুমি আমার বাবার দেশের লোক, আমায় শুধু একটু আশীর্ব্বাদ কর, শুধু বল, আমার যেন আসছে দেওয়ালীর আগেই মরণ হয় !

আমার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল। বরাকরের দিকে মুখ রেখে গণ্ডোয়ানার বনমহোৎসব ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে আকাশের পানে চেয়ে বললাম—ভগবান, যন্ত্রের পুজো আমার মাথায় থাক ! মানুষের পুজো করে মানুষ হবার শক্তি দাও আমাকে !

পকেট থেকে রুমাল বের করে চোখ মুছলাম। বরাকরের জল এসে যেন লেগেছে রুমালে। আমার হাত থেকেই তুলে নিল ছোট সুন্দরী রুমালটা। বলল—এটা আমি নোব ?

পঞ্চকূটকে সাক্ষী রেখে সিক্ত উত্তপ্ত বস্ত্রখণ্ডের দিকে চেয়ে বললাম—নাও।

দূরে অনেক দূরে মাথা নীচু করে বিন্ধ্যাচল অশ্রুপাত করছেন। নর্ম্মদা তাপ্তী উৎস নিয়েছে আমার চোখে ! দামোদর বরাকরের ধারা বয়ে চলেছে গণ্ডদেশে ! যন্ত্রের চাকাগুলো সমস্ত স্তব্ধ !

সমাপ্ত
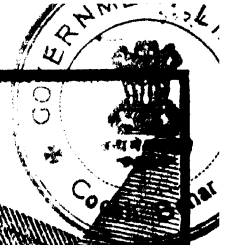
যাঁরা ভাল স্বাস্থ্য
ভালবাসেন তাঁরা সবসময়
লাইফবয় দিয়ে
স্নান করেন
খেলাধুলোই বলুন বা কাজকর্ম্মই বলুন আমরা কখনই ধুলোময়লার থেকে নিরাপদ নয়। আর ময়লা বহন করে রোগের বীজানু যা সবসময় আপনার স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। লাইফবয় সাবান এই বীজাণুগুলি ধুয়ে সাফ করে দেয় এবং আপনার স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখে।
LIFEBUOY
SOAP
প্রত্যেকদিন লাইফবয় সাবান দিয়ে স্নান করে আপনার স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখুন-এটি আপনাকে এত ঝরঝরে করে তোলে।

শান্তনু নিবিষ্টমনে একটা ফর্দ তৈরী করছিল। ফর্দটা আর কিছুর নয়, তাদের আসন্ন অভিযান সম্পর্কে।

হিমালয় পর্বতে কত বার অভিযাত্রীর দল এসেছে। সুদুর্গম পথে কত বার মানুষের পদচিহ্ন পড়েছে আবার তা পরক্ষণেই মুছে গেছে। এই ত সেদিন এক বিদেশীর দল হিমালয়ের সুদুর্গম পথে যাত্রা করেছিল। কুড়ি হাজার ফুট উর্দ্ধে উঠেই তারা নামতে বাধ্য হয়। তাদের সঙ্গে আনুষঙ্গিকের অন্ত ছিল না। তবুও তাদের ক্ষতি কম হয়নি, তুষার-ঝড়ের কবলে পড়ে কয়েক জন আর ফিরে আসতে পারেনি।

অবশ্য অভিযাত্রীদের উদ্দেশ্য ছিল হিমালয় জয় করা, তার উর্দ্ধতম শিখরে চড়া। যে মানুষ শূন্যমার্গে নিরালম্ব হয়ে হাজার হাজার ফুট উর্দ্ধে উড়ে বেড়াচ্ছে সেই মানুষ মাটির পৃথিবীর উচ্চতম শিখরে তার পদচিহ্ন আঁকবে, এ আকাঙ্খা নিশ্চয়ই অন্যায় আকাঙ্খা নয়। সত্যিই সে এক দিন এভারেষ্টের শিখরেও তার জয়-পতাকা ওড়ালো। এসব কাহিনী শান্তনুর ভালো করে জানা আছে। তাই সে অনেক সাবধানে নিজেদের প্রস্তুতির কথা ভাবছিল।

কিশোর একটা পাহাড়ে চড়ার বই পড়ছিল। সে হঠাৎ সেটা বন্ধ করে বললে—অসম্ভব! শান্তনু, তোমার এটা পাগলামি ছাড়া আর কিছু নয়।

কিসে তুমি এই সিদ্ধান্ত করলে? জিগ্যেস করে শান্তনু।

কিসে? তুমি কি পড়নি mountaineering একটা সহজ ব্যাপার নয়। একে ত আমরা একেবারে আনাড়ি, কোনও অভিজ্ঞতাই নেই। আগে ভাবতুম পাহাড়ে চড়াটা বেশ মজার। কিন্তু সেদিনে ঐ কাছের পাহাড়ে খানিকটা উঠেই বুঝেছি, এটা তা নয়। এর জন্যে শিক্ষা দরকার, অভ্যাস দরকার। একমাত্র শেরপারাই শুধু পারে।

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

শ্রীশৈল চক্রবর্তী

আর যারা বিদেশীরা আল্পস পাহাড়ে নিয়মিত চড়া এবং কষ্ট সহ্য করা অভ্যাস করেছে, তারাই পারে।

তুমি ঠিক কথাই বলেছ, কিশোর! শান্তনু ধীর কণ্ঠে বলে। সেটা আমি অনেক আগেই ভেবেছি কিন্তু—

তার পরে সাজ-সরঞ্জাম ও রসদের কথা চিন্তা করেছ কি? অধৈর্য কিশোর বলে যায়। একটা অভিযানে হাজার হাজার টাকা খরচ, কত তার উপকরণ, কত তার সরঞ্জাম, কত তার রসদ। কত লোকজন; কত মালপত্তর! বিশেষ ধরণের জামা জুতা, চশমা, থার্মোমিটার ব্যারোমিটার, ওষুধপত্তর, অক্সিজেন, তাঁবুর সরঞ্জাম—কী বিরাট ব্যাপার!

হাসতে হাসতে শান্তনু বলে, তুমি বেশ ভয় পেয়ে গেছ দেখছি। বেশ তো, তুমি না গেলেই পারো। তোফা আরামে আমার বাঙলোয় থেকে যাও। জানলা থেকে দিব্যি শুয়ে শুয়ে আকাশ দেখো আর রবি ঠাকুরের কবিতা আওড়াও।

খুব হয়েছে! কিশোর বলে ওঠে, বেশ আমি তাই করবো, আর দেখবো তোমাদের বীরত্বখানা—অ্যাজ এ ফ্রেণ্ড, আমার উচিত তোমাকে সাবধান করা, তাই করছিলাম।

এমন সময় লালী ঢুকলো ঘরের মধ্যে। ওঃ, তোমার ঝমরীটাকে জেলখানায় পাঠাও শানুদা', এই দেখ কি করেছে। আমার শাড়ীর আঁচলাখানা মনের আনন্দে চিবুচ্ছিল।

তোর শাড়ী চুলোয় যাক লালী, বললে কিশোর, আমি তোদের সঙ্গে যাচ্ছি না, আর সাবধান করে দিচ্ছি, তোরও যাওয়া উচিত নয়।

কোথায়, কোথায়?

পাহাড়ে পাহাড়ে—ঐ যে দুস্তর দুর্গম পথের যাত্রী হচ্ছিস তোরা —হিমালয় অভিযান—হার্ট হিলারী, তেনজিং-এর পাশে তোদের নাম ছাপা হবে আর ঐ দেশ-বিদেশ থেকে অভিনন্দন আসবে। হৈ হৈ ব্যাপার—কিন্তু ঠেলাটা কি রকম তা তো জানো না, গোঁয়ারের মত ঝুঁকেছ। বুঝবে পরে। একটা তুষার-ঝড়ের মুখে পড়লেই ব্যস। তারপর চলমান বরফের পাহাড়, যাকে বলে গ্লেসিয়ার, তার সামনে পড়লেই হলো। এক নিমেষে তোমাদের চিহ্নটুকুও থাকবে না। এই বইটা পড়ে দেখিস, এর মধ্যে ছবিও আছে।

সে ত জেনে-শুনেই যাওয়া। তবে দলে দলে এত অভিযাত্রী যায় কি ক'রে? লালী তর্ক করে।

যায় যেমন বিপদেও পড়ে তেমনি। আর যারা যায় তাদের সঙ্গে তোমাদের তুলনা? একটা নেপালী কি ভুটিয়ার চেহারা দেখিসনি? জন্ম থেকেই তারা পাহাড়ে ওঠে নামে, তাদের দেহের সর্বাঙ্গের পেশীগুলো সেই ভাবে তৈরী।

যুক্তিগুলো মানবার মতো হলেও লালীর পছন্দ হয় না। তর্কে সে-ও কম যায় না। সে বলে, যাই বল, ও সব হিতবচন চিরকাল ধরেই আমরা শুনে আসছি। সবাই লক্ষ্মী ছেলে-মেয়ে হয়ে বেঁচে-বর্তে থাকবে আর ঘর-পোষা হয়ে বার্দ্ধক্যের জন্যে অপেক্ষা করে বসে থাকবে সারাজীবন, এই চাইতেন আমাদের বাপ-মা, ঠাকুমা দিদিমারা। তার ফলেই আমরা শান্তশিষ্ট বাঙালী হয়েছি। আমাদের দিয়ে পৃথিবীর কোন কঠিন কাজটা হয়েছে, শুনি?

কঠিন কাজ বাঙালী যদি না ক'রে থাকে, তবে কেউ করেনি। আর এটাও ঠিক, তোদের দ্বারা কোনও কাজই হবে না। দেখ শান্তনু, ওর সঙ্গে আমি তর্ক করতে চাই না। আমি বাবাকে

আজই একটা তার ক'রে দেব। তারপর তোমরা যা ভাল বোঝ করবে। কিশোর উত্তেজিত হয়ে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে।

লালী শান্তনুর কাছে এগিয়ে বসলো, বললে, দাদাকে চটানো খুব সহজ, তাই নয়? তুমি কিন্তু কিছুতেই মত বদলাবে না।

বই পড়ে কিশোর nervous হয়ে গেছে। বললে শান্তনু! ও যা বলছে সবটাই সত্যি কিন্তু—

আমাকেও ভয় দেখাচ্ছ নাকি?

ভয়কে আগে চিনে নিতে হবে ত, তারপরেই তাকে জয় করা যায়।

আঁ, তুমি যে ঠিক গুরুদেবের'মত বাণী শোনাচ্ছ মনে হচ্ছে, বলে ফেললো লালী হাসতে হাসতে। হো হো হো হো করে হেসে উঠলো শান্তনু। দুজনেই খুব খানিকটা হাসলো।

না, ফাজলামি করছি না, লালী, শান্তনু বলে। সত্যিই ভয়ানক বিপদসঙ্কুল পথ। তুষাররাজ্যে যাবার আগেই যে কত বিপদ ঘটতে পারে তা বলে শেষ করা যায় না। হিংস্র জীবজন্তু যে কত আছে অরণ্য অঞ্চলে, তার হিসাব করা শক্ত। হিংস্র ভাল্লুক, হায়েনা, সাপ-খোপ, বিচ্ছু এ সব ত আছেই, তার পর আরও হিংস্র ও রহস্যময় ইয়েতিরা আছে শিকিমের অরণ্যে আর লাটাং পর্বতমালার নীচে। নিশ্চয়ই শুনেছ ইয়েতিদের কথা?

শুনেছি কিন্তু পুরো বিশ্বাস করি না।

বিশ্বাস করার মত প্রমাণ আছে। মোট কথা, সারা হিমালয় যেন নানা ভয়াল হিংস্র পরিবেশ দিয়ে মোড়া। কোথায় যে কোন বিপদের কুটিল গহ্বর হাঁ করে আছে সমতলের দ্বিপদ জীবকে গ্রাস করার জন্যে, কে জানে? কিন্তু তবু আমাদের বেরুতে হবে।

দেখ শানুদা', গম্ভীর গলায় বলে লালী, আমার মরতে ভয় করে না, তবে বোকার মত মরতে চাই না। তাতে লাভটাই বা কি? তোমাকে শুধু ভয়—

আমাকে ভয়?

হ্যাঁ, তোমাকে ভয় করে তখন, যখন ভাবি, তোমার ছোটবেলার পাথরকাকুর ভূত তোমার কাঁধে চেপে আছে। সে লোকটিকে পাগল ছাড়া আর কিছু মনে হয় না আমার।

তাহলে, তোমাকে বলি শোন। শান্তনু বলে, আমাকে পাগল বল আর যাই বল, আমি সেই পাথরকাকুর অসমাপ্ত কাজটিকে সম্পূর্ণ করতে চাই। সেই সোনালি ঝরণার কথা আমি ভুলতে পারিনি। আমার মনে সেই রহস্যের হাতছানি ডাক সব সময়ই শুনতে পাই। আমি যতদূর তথ্য সংগ্রহ করেছি তাতে মনে হয়, আমরা নেপাল থেকে পশ্চিমে কিছুদূর গেলেই সেই ঝরণার সন্ধান পাব। প্রয়োজন হলে তোমাদের ফেলে আমি একাই যাত্রা করবো। কিন্তু এখন আর থাক, চলো, আপাততঃ কিশোরের মাথা ঠাণ্ডা করতে হবে, তারপর পাকস্থলীর যা তাগিদ অনুভব করছি, তাকে ঠাণ্ডা করতে দরকার হয়ে পড়ছে।

কিশোর সাধারণ ছেলে, তার মনে কোনও বিরাট কল্পনা নেই, বিশেষ আকাঙ্ক্ষাও নেই। দুঃখ-কষ্টকে পাশ কাটিয়ে যেটুকু আনন্দ পাওয়া যায় তাইতেই সে খুশি। তার বেশি সে চায় না। সে যখন শুনলো যে এটা সেই ধরণের অভিযান হচ্ছে না, যাতে প্রতি মুহূর্তে বিপদের আশঙ্কা আছে, তখন সে রাজি হলো ওদের সঙ্গে যেতে।

ইতিমধ্যে শান্তনু কলিকাতার সরকারী সার্ভে বিভাগে চিঠি-পত্র লিখলো যে, কয়েকটি জরুরী কারণে তাকে নেপালে যাওয়া দরকার। নেপাল সরকারকেও জানানো হলো। কিছুদিনের মধ্যেই অনুমতিপত্র পেয়ে গেল এবং নেপাল সরকার তাকে সর্বতোপ্রকারে সাহায্য করবে এ রকম সদিচ্ছা জানিয়ে চিঠি লিখলো। শান্তনু খুবই খুশি। সরকারী কাজের যে নজীরটা সে দেখিয়েছিল সেই সম্বন্ধে শুধু সরকারী একটা নির্দেশ ছিল। সে যেন নেপালে অবস্থিত একজন অভিজ্ঞ লোকের সাহায্য নেয়। খুব ভাল কথা, এ ত তাদের দরকার হতোই।

এবার সত্যিকার তোড়জোড়, রওনা হতে হবে। দিন পর্যন্ত স্থির হয়ে গেছে। বাক্স-বিছানা, জামা-জুতো। ছোট আকারের তাঁবু, দড়িদড়া, টর্চলাইট, ক্যামেরা ইত্যাদি। দেখতে দেখতে সরঞ্জামের একটা স্তূপ হয়ে দাঁড়ালো। খুঁটিনাটি সমস্ত বিষয়ে শান্তনুর তীব্র দৃষ্টি, তার সঙ্গে অ্যাসিষ্ট্যান্ট লালী। কিশোরও সাহায্য করছে।

নেপালে কিন্তু সব জিনিষ পাওয়া যায় না যে দরকার হলে ওখানে কিনে নেবে, সে বিষয়ে খেয়াল থাকে যেন, কিশোর মাঝে মাঝে সতর্ক ক'রে দেয়।

সে আমাদের হুঁস আছে, লালী বলে। একটা কিছুর নাম করো ত দেখি?

—আচ্ছা, কম্বল ক'টা নেওয়া হয়েছে?

—ছ'টা।

—আরও ছ'টা নেওয়া উচিত। তারপর ফ্লাস্ক?

—হাঁ, মশাই, সে সব ঠিক আছে।

—খাবার জিনিষ? মাখন রুটি জ্যাম জেলী—

—সে সব ভাবনা এখন কেন? আমরা ত যাচ্ছি কাটমুণ্ডুতে। ওখানের লোক কি না খেয়ে থাকে?

—ওরা যা খায় কিন্তু আমরা তা খেতে পারবো না।

—তা হ'লে কিশোর, শান্তনু বলে ওঠে, তোমার জন্যে ওয়াগন ভর্তি চাল, সোনামুগের ডাল, নৈনিতাল আলু, গাওয়া ঘি—এই সব নিতে হয়।

খেলার সরঞ্জাম কি নেওয়া হয়েছে? কিশোর জিগ্যেস করে। তাস দাবা আর ব্যাটমিণ্টন সেট আমার মতে একান্ত দরকার।

তাস দাবা নিতে পারো কিন্তু টেনিস ফুটবল ব্যাটমিণ্টন চলবে না।

হারমনিয়ম সম্বন্ধে তোমাদের মতামত কি?

আমি দুঃখিত, তোমার ওটাও বাদ দিতে হলো কিশোর, শান্তনু বললে, তবে পিঠে হ্যাভারস্যাকের মধ্যে বাঁশী একটা চলতে পারে।

দি আইডিয়া! কিন্তু বাঁশী কোথা? কিশোর ভাল বাঁশী বাজায়। বাঁশের বাঁশী—কিন্তু কলকাতায় পড়ে আছে সেটি!

তার বদলে আমার গীটারটা কি রকম হয়? শান্তনুর একটু গীটারের শখ ছিল। বাংলোয় ছিলও একটি। লালী তাড়াতাড়ি পাড়লো সেটা—

লগেজ ক্রমশই ফুলতে লাগলো। বাক্সের ডালা বন্ধ করা হলো সমস্যা। কিটব্যাগগুলো ঠাসা, হোল্ড-অল ভর্তি—

তিন জন মাথায় হাত দিয়ে বসে।

আবার কাট-ছাঁট হলো। লগেজগুলিকে এরোপ্লেনে তোলার উপযোগী করতে যে কী পরিশ্রম করতে হলো তা তারাই জানে।

নির্দিষ্ট দিনে প্লেন ছাড়লো। আকাশে উঠে হিমালয়কে তারা দেখলো ভাল ক'রে। কী অপূর্ব দৃশ্য নীচে চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে! সকালের আলো যেন স্বর্গের মায়া বিছিয়ে দিয়েছে নানা রঙের আলপনায়। পৃথিবী একটা ধূসর কুয়াশায় ঢাকা পড়েছে। নীলাভ মেঘের স্তর। যেন ধোঁওয়ার দিগন্ত-জোড়া সমুদ্র। আর সেই সমুদ্রতল ভেদ ক'রে অসংখ্য স্বর্ণচূড়া উঠেছে উঁকি। মুগ্ধ হয়ে দেখছে লালী, অপলক চোখে চেয়ে আছে কিশোর, তন্ময় হয়ে গেছে শান্তনু।

তাদের স্বপ্ন ভেঙ্গে যায় একটা ঝাঁকুনিতে। একটা শব্দ। প্লেনটি মাটি ছুঁয়েছে। কাটমুণ্ডু এরোড্রোমের মাটি। [ক্রমশঃ।

তিব্বতী তান্ত্রিকের কাটা আঙ্গুল

যাদুকর এ, সি, সরকার

এই মজাদার খেলাটি দেখিয়ে সেবার আমি পোর্ট সৈয়দের রাস্তায় কতকগুলি মিশরীয় আর ফরাসী ছেলে-মেয়েকে বেশ ভড়কে দিয়েছিলাম। ভয়ে তো তারা দৌড়ে পালিয়েছিল। একজন সাহসী ছেলে আবার ডেকে এনেছিল পাহারাদার পুলিশ অফিসারকে। অফিসার কাছে এগিয়ে এলে যখন তার সামনেও তুলে ধরলাম এই খেলা, তখন অফিসারের দেহও কণ্টকিত হল— এ দৃশ্য সহ্য করতে না পেরে তিনি তাড়াতাড়ি আমাকে বন্ধ করতে বললেন আমার ম্যাজিক কৌটো। শুধু পোর্ট সৈয়দের রাস্তাতেই নয়, পৃথিবীর অন্যান্য অনেক দেশেই এই লোমহর্ষক খেলাটি দেখিয়েছি আমি এবং ফলও পেয়েছি একই রকম।

এই খেলাটা দেখানোর আগে একটু বেশী রকম বাক-আড়ম্বর করতে হয়। করতে হয় একটা গল্পের অবতারণা:

প্রায় দুই হাজার বছর পূর্বে তিব্বতের এক গুম্ফায় ছিলেন এক মহা ধার্মিক সন্ন্যাসী। তিনি মিথ্যা কথা বলা, জীব হত্যা করা প্রভৃতি কাজ থেকে সর্বদা বিরত থাকতেন। পরোপকারই ছিল তাঁর জীবনের ব্রত। তিনি ছিলেন সিদ্ধপুরুষ। আশ্রিতকে আশ্রয় দান, ক্ষুধাতুরকে আহার্য্যদান প্রভৃতি ছিল তাঁর নিত্যকর্মের অন্তর্ভুক্ত। একদিন এক খুনী আসামী কোতোয়ালের চোখে ধূলি দিয়ে এসে আশ্রয় নিল এই সন্ন্যাসীর আশ্রমে।

সন্ন্যাসী যথারীতি তাকে আদর করে আশ্রয় দিলেন ঘরে। কিছুক্ষণের মধ্যেই খুনীকে অনুসন্ধান করতে করতে স্বয়ং নগর কোতোয়াল এসে হাজির হলেন ঐ গুম্ফায়। সন্ন্যাসীকে প্রণাম করে কোতোয়াল খুনীর চেহারার বর্ণনা দিয়ে জানতে চাইলেন যে, ঐ রকম কোনও লোককে তিনি দেখেছেন কি না। সন্ন্যাসী পড়লেন মহা বিপদে—একদিকে আশ্রিতকে রক্ষা করা, অন্য দিকে সত্য ও ন্যায়। সন্ন্যাসী এই উভয়-সঙ্কটের মধ্যে ব্যবহার করলেন তাঁর তর্জ্জনী। মুখে কিছু না বলে তিনি তর্জ্জনী সঙ্কেতে একটি কুটীর দেখিয়ে দিলেন। এই কুটীরেই আসামী আত্মগোপন ক'রে ছিল। বন্দী অবস্থায় গুম্ফা ত্যাগ করার সময়ে খুনী সন্ন্যাসীকে দিয়ে গেল অভিশাপ। "আশ্রয়দাতা হয়েও যে তর্জ্জনী সঙ্কেতে তুমি আমাকে ধরিয়ে দিলে, সেই তর্জ্জনী তোমার মৃত্যুর পরেও জীবন্ত হয়ে থেকে বিশ্ববাসীর ত্রাস সৃষ্টি করবে। মৃত্যুর পরে তোমার সর্বাঙ্গ বিনষ্ট হলেও এই তর্জ্জনী অবিকৃত থাকবে।" তার পরে কেটে গেছে বহু শতাব্দী কিন্তু তবুও এই তর্জ্জনীর কোনও পরিবর্তন হয়নি। এই যে দেখুন, আমার হাতের এই বাক্সটির মধ্যে রয়েছে ঐ আঙ্গুর আঙুলটি।

এই কথা বলে আমি খুলে ধরি বাক্সের ডালা। ছোট্ট একটি পেষ্টবোর্ডের বাক্স, আকারে দেশলাইয়ের বাক্সের চেয়ে একটু বড়, তার মধ্যে তুলোর মধ্যে রয়েছে একটি কাটা আঙ্গুল রক্তহীন পাণ্ডু বিবর্ণ। তার উপরে একটু ফুঁ দিতেই ঐ আঙ্গুল বেশ খানিকটা উঁচু হয়ে উঠলো আর শিষের তালে তালে নাচতে থাকলো। মৃতদেহের কাটা আঙ্গুলের এই অদ্ভুত কাণ্ড কারখানা দেখে গায়ে কাঁটা না দিয়ে পারে?

এইবার শোন খেলাটার মূল কৌশলের কথা। গল্পে বলা সন্ন্যাসীর সঙ্গে কিন্তু বাক্সের আঙ্গুলের কোনই সম্পর্ক নাই। আসলে এ হচ্ছে আমারই ডান হাতের তর্জ্জনী। বাক্সটির তলায় একটি এমন ফুটো আছে (ছবি দেখ) যার ভেতর দিয়ে আমি অনায়াসে ঢুকিয়ে দিই আমার তর্জ্জনী। চারিদিকে তুলো থাকাতে এই ফুটো দেখা যায় না। একটুখানি সাদা পাউডার নিয়ে এই আঙ্গুলের উপরে ছড়িয়ে দিলে তা বিবর্ণ হয়ে যায় ঠিক মৃতদেহের আঙ্গুলের মতন। বাকী অংশ খুবই সহজ, মুখে শিষ দেওয়া আর তালে তালে আঙ্গুল ওঠানো-নাবানো। আগে থেকে পকেটে একই রকমের আর একটি বাক্স রাখতে হয় তুলো ভ'রে। এতে কোনও ফুটো থাকবে না। কেউ দেখতে চাইলে এই দুই নম্বর বাক্সটাই বের করে দিতে হয়।

পিরামিড

শ্রীদেবব্রত ঘোষ

সাহারা মরুভূমি ঘেরা উত্তর-আফ্রিকার পূর্বপ্রান্তে যে দেশটি অবস্থিত তার নাম মিশর বা ইজিপ্ট। বর্ত্তমান বিশ্বের রাজনৈতিক দাবাখেলায় এই দেশটি এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেছে। মিশরকে 'পিরামিড-এর দেশ' বলা হয়। অতি প্রাচীন কালে মিশরের সম্রাটদের উপাধি ছিল 'ফারাও'। এই ফারাওদের মৃত্যু হলে যেখানে তাঁদের কবর দেওয়া হত, তার উপরে গড়ে উঠত এক একটা

বিশালকায় পিরামিড। তাই আসলে এগুলি ফারাও সম্রাটদের সমাধি-মন্দির।

মিশরীয় ভাষায় 'পির-এম্-আস্' (PIR-EM-US) শব্দের অর্থ হল উঁচু ঢিবি। কিন্তু পুরাকালে গ্রীকরা পির-এম-আস্ শব্দটি উচ্চারণ করতে পারত না। তাই তারা বলত পিরামিড।

প্রাচীন মিশরীরা পরলোকতত্ত্বে বিশ্বাসী ছিল। তারা বিশ্বাস করত যে মৃত ব্যক্তির দেহ যদি অবিকৃত রাখা যায় তা'হলে সে পরলোকে অর্থাৎ জীবন-মৃত্যুর দেবতা 'ওসিরিশ'-এর রাজ্যে গিয়ে শাশ্বত জীবনের অধিকারী হয়। ফলে মৃতদেহকে পচনের হাত থেকে রক্ষা করার নানা উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা চলতে লাগল। ক্রমে তারা গাছ-গাছড়া ও খনিজ পদার্থ থেকে এমন কতকগুলি আরক আবিষ্কার করল যা মানুষের মৃতদেহে মাখিয়ে সেই দেহ সূক্ষ্ম রেশমী কাপড়ের ফালি দিয়ে জড়িয়ে রাখলে তা' হাজার হাজার বছর পর্য্যন্ত অবিকৃত থাকত। ফারাওদের মৃতদেহে প্রাচীন মিশরীরা এই আরক মাখিয়ে তাকে কবর দিত। পারস্যভাষায় এই আরক 'মুমিয়াই' (MUMIAI) নামে পরিচিত ছিল। তাই আরকমাখানো মৃতদেহকে 'মমী' বলা হত।

মিশরের সুদীর্ঘ ছ' হাজার বছরের প্রাচীন ইতিহাসে ত্রিশটি রাজবংশের উল্লেখ পাওয়া যায়। তার মধ্যে তৃতীয় রাজবংশের প্রথম ফারাও যোসর-এর আমলে প্রথম পিরামিড তৈরি করা হয়। সবচেয়ে বড় পিরামিড তৈরি করা হয় চতুর্থ রাজবংশের প্রথম ফারাও যুফুর আমলে। এ ছাড়া আরো ছ'টি বিখ্যাত পিরামিড এই রাজবংশের আমলে তৈরি হয়েছিল। যথা—ফারাওদের নির্মাণকাল, ভূমিতে দৈর্ঘ্য উচ্চতা মিশরীয় নাম, গ্রীক নাম: -

খুফু	কিওপস	৪৭০০ খৃ:-পূ:	৭৭৫-৯ $\frac{১}{২}$	৪৮১-৭
খাফ্রা	সেফ্রেন	৪৬০০ খৃ:-পূ:	৭০৬-'৪'	৪৭২-১
মেনকাউরা	মাইসেরিনাম	৪৫৫০ খৃ:-পূ:	৩৪৬-	১$\frac{১}{২}$ ২১৬-'০'

প্রাচীন কায়রো থেকে সাত মাইল দূরে, নীলনদের দক্ষিণ তীরে জনহীন মরু-অঞ্চলে পিরামিড-ময়দান অবস্থিত। উত্তরে আবুরোয়েস ও দক্ষিণে মেডাম জুড়ে চৌষট্টি মাইলব্যাপী বিশাল প্রান্তরে ছোট-বড় প্রায় আশীটি পিরামিড দেখতে পাওয়া যায়। যুগ যুগ ধরে ঐশ্বর্য্যলোভী মানুষের হামলার ফলে বহু পিরামিড বিকৃত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। পিরামিডের নীচে প্রচুর ধনরত্ন লুকানো আছে বলে যে কিম্বদন্তী প্রচলিত ছিল, এ তারই শোচনীয় পরিণতি! এমন কি, ম্যামডিনের মত একজন বিখ্যাত খলিফাও এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হয়ে ধনরত্নের লোভে ৮১৮ খৃষ্টাব্দে পিরামিডের নীচে খোঁড়াখুঁড়ি করেছিলেন। অবশ্য তিনি এ ব্যাপারে কত দূর সফল হয়েছিলেন তার কোন বিবরণ পাওয়া যায়নি। এ ছাড়া প্রাচীন কায়রোর অধিকাংশ সৌধ ও মসজিদগুলি পিরামিডের চূণা পাথর দিয়ে তৈরি। কয়েক জন বিখ্যাত ইজিপ্টোলজিষ্ট বা মিশরতত্ত্ববিদের মতে মরুভূমিতে ইমারত গড়বার পাথরের অভাব হেতু পরবর্ত্তীকালে মিশরীরা এখান থেকে পাথর সংগ্রহ করেছিল। যাই হোক, এই ধরণের দস্যুবৃত্তির ফলে যে সমস্ত পাথর দিয়ে পিরামিডের চূড়ো তৈরি হয়েছিল তা' সমস্তই অপসারিত হয়েছে। তাই বর্ত্তমানে পিরামিডের শিখরদেশ ভাঙ্গাচোরা ও চ্যাপ্টা। একমাত্র খাফ্রা-র পিরামিড-এর চূড়োটা আজ পর্য্যন্ত অটুট আছে।

মিশরের পিরামিডগুলির মধ্যে খুফু-র পিরামিডটাই স্থাপত্য-শিল্পের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শনরূপে স্বীকৃত হয়। এটিতে ৫৮" | ২৬" ইঞ্চি সাইজের ২৩ লক্ষ চূণা পাথরের চাঁই আছে। প্রতিটি পাথরের ওজন আড়াই টন। প্রায় সাড়ে তেরো একর জমির উপর দু'শো ছয় সারিতে পাথরগুলি পর পর সাজানো। কাছে থেকে দেখলে মনে হয় যেন ধাপে ধাপে সিঁড়ি উঠে গেছে, পিরামিডের গা বেয়ে। যে যুগে বাষ্পীয় যান ও ভারী বস্তু তোলার জন্যে ক্রেণের প্রচলন ছিল না সে যুগে কেমন করে এতবড় একটা পিরামিড তৈরি হল তার এক অতি মনোরম ও চিত্তাকর্ষক বর্ণনা পাওয়া যায় প্রাচীন গ্রীসের বিশ্ববন্দিত ঐতিহাসিক হিরোডিটাসের বিবরণ থেকে। তাঁর মতে এক লক্ষ দাস-শ্রমিক ও দক্ষ-কারিগর কুড়ি বৎসর দিবারাত্র পরিশ্রম করে গড়ে তুলেছিল এই আকাশছোঁয়া খুফুর পিরামিড। বিজিত দেশের রাজাদের কাছ থেকে এই সব দাস-শ্রমিকদের বাধ্যতামূলক ভাবে সংগ্রহ করা হয়েছিল। হিরোডিটাসের বিবরণ থেকে আরও জানা যায় যে, নীলনদের তীর থেকে পিরামিড পর্য্যন্ত পাথরগুলি গড়িয়ে নিয়ে যাবার জন্যে একটি সুন্দর রাস্তা তৈরি করা হয়েছিল। ৩০৮৭ ফুট লম্বা ও ৬২ ফুট চওড়া এই রাস্তাটা তৈরি করতে আশী হাজার শ্রমিকের ষোল বছর আট মাস সময় লেগেছিল। তিনি আরো একটি জটিল ও দ্বন্দ্বমূলক সমস্যার সমাধান করে দিয়েছেন, তা'হল—অনেকের ধারণা, একটা আস্ত পাহাড় কেটে পিরামিড তৈর করা হয়েছিল কিন্তু তাঁর মতে এটি একটি সম্পূর্ণ অলীক ও অবাস্তব কাহিনী ছাড়া আর কিছুই নয়।

পিরামিডের গায়ে উৎকীর্ণ চিত্রলিপি থেকে জানা যায় যে, দাস-শ্রমিকদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করা হত। পেঁয়াজ, রসুন, মূলো, খেজুর, দুম্বা ও উটের মাংস তাদের প্রধান খাদ্য ছিল। শ্রমিকদের খাদ্যদ্রব্যের জন্য দশ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছিল।

পিরামিড তৈরির কাজে সত্যিই দাস-শ্রমিক নিয়োগ করা হয়েছিল কি না, এ নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে যথেষ্ট মতবিরোধ আছে। অনেকের মতে এই সব শ্রমিকরা সকলেই ছিল বেতনভুক্। প্রতি বৎসর নীলনদের বন্যায় দু'পাশের সমস্ত আবাদী জমি প্লাবিত হলে যখন প্রজাদের হাতে কোন কাজ থাকত না, তখন ফারাওরা তাদের পিরামিড তৈরির কাজে নিয়োগ করতেন। রাজকোষ থেকে তাদের প্রতিদিন বেতন দেওয়া হত। এই ভাবে বেকার প্রজারা দুঃখ-দুর্দশা ও দুর্ভিক্ষের হাত হতে রক্ষা পেত।

খুফুর পিরামিডে নীলনদের দক্ষিণ তীরে অবস্থিত মুসাবার প্রস্তরখনির চূণা পাথর ও আসোয়ানের লাল গ্রানাইট পাথর ব্যবহার করা হয়েছে। আর গাঁথুনির মসলারূপে ব্যবহার করা হয়েছে সমুদ্রের এক প্রকার প্রাচীন শিলাভূত প্রাণীর দেহাবশেষ। সে যুগে আজকালকার মত যান-বাহনের সুবিধা না থাকায় পাথরগুলি খনিতেই প্রয়োজন মত মাপে কেটে কাঠের গুঁড়ির উপর দিয়ে গড়াতে গড়াতে নীলনদের তীরে টুরা-তে নিয়ে যাওয়া হত। তারপর সেখান থেকে ভেলার সাহায্যে নদী পার করা হত। হিরোডিটাস বলেছেন—ব্রোঞ্জের উপর হীরকের ধার-যুক্ত করাত দিয়ে পাথরগুলি নির্দিষ্ট আকারে কাট-ছাঁট করে কপিকল-এর

সাহায্যে ধীরে ধীরে উপরে তুলে থাকে থাকে সাজানো হত। যারা রাজমিস্ত্রীর কাজ করেছিল তাদের জ্যামিতিক জ্ঞান যে অসাধারণ ছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

ফারাওদের পিরামিড সম্বন্ধে মিশরের জনসাধারণের মাঝে নানারূপ কুসংস্কার প্রচলিত আছে। এমন কি, পাশ্চাত্য ভাবধারায় শিক্ষিত অনেক আধুনিক মিশরীও এই কুসংস্কারে পুরোমাত্রায় বিশ্বাসী। তাদের বিশ্বাস—যারা পিরামিড বিকৃত অথবা অপবিত্র করবে, ফারাওদের অভিশাপে তাদের মৃত্যু নিশ্চিত। পৃথিবীর কোন দৈবশক্তিই তাদের রক্ষা করতে পারবে না। অবশ্য এই বিশ্বাসকে নিছক কুসংস্কার বলেও উড়িয়ে দেবার উপায় নেই। তাহলে সত্যের অপলাপ করা হবে। কারণ, ১৯২২ খৃষ্টাব্দে লর্ড কার্ণাভন লাক্সারে টুটেনখামেন-এর সমাধি আবিষ্কার করার কয়েক দিনের মধ্যেই বিষাক্ত মাছির কামড়ে মারা যান। এই ঘটনার কয়েক দিন পরে তাঁর সহকারী-বন্ধু মিঃ হাওয়ার্ড কার্টার টুটেনখামেন-এর সোনার কফিন খুলতে গিয়ে ভীষণ ভাবে আহত হন। এ ছাড়া অনুসন্ধানকারী দলের রঞ্জনরশ্মি বিশারদ ডাঃ রীড লণ্ডনে ফায়ারপ্লেসের আগুনে পুড়ে মারা যান। ইনি টুটেনখামেন-এর মমী রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় পরীক্ষা করে দেখেছিলেন। মিশর-তত্ত্ববিদ ডাঃ ইভনীল হোয়াইট অজ্ঞাত কারণে রিভলবারের গুলীতে আত্মহত্যা করেন। পুরাতত্ত্ববিদ ডাঃ মেস ও লর্ড কার্ণাভন-এর একান্ত সচিব মিঃ ওয়েষ্টবেরীও কয়েক দিনের মধ্যে সামান্য অসুখে ভুগে মারা যান। তারপর, লর্ড কার্ণাভনএর ছোট ভাই ওরবী হার্বাট কার্ণাভন ও আর্থার উইগল হঠাৎ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা যান। আবার লর্ড ওয়েষ্টবেরী (মিঃ ওয়েষ্টবেরীর পিতা) লণ্ডনের এক অভিজাত হোটেলের জানলা থেকে নীচে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেন। সর্বশেষ, লেডী কার্ণাভনও ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে তাঁর স্বামীর মত বিষাক্ত মাছির কামড়ে মারা যান। এই ঘটনার প্রায় চব্বিশ বছর পরে সাককারার পিরামিডে ফারাও শেন খেত-এর সমাধি খোঁজার সময়ও হঠাৎ পিরামিডের চূণা পাথরের দেওয়াল ধ্বসে পড়ে বহু লোকের মৃত্যু হওয়ায় এই অনুসন্ধান কার্য্য মাঝপথেই পরিত্যক্ত হয়। তাই এই কুসংস্কারে অল্প-বিস্তর সকলেই বিশ্বাসী।

স্মরণীয় যাঁরা: উৎকলবীর গোপবন্ধু

সুধাংশুকুমার ভট্টাচার্য

ছেলের কঠিন অসুখ। ডাক্তার জবাব দিয়ে গিয়েছে। যে কোন মুহূর্তেই তার জীবনদীপ নিবে যেতে পারে। এমন সময় খবর এল পুরী জেলায় জলপ্লাবন। বন্যায় শত শত লোক গৃহহীন হয়েছে। কে আজ মোছাবে তাদের চোখের জল, তাদের পাশে দাঁড়িয়ে কে আজ আশা-আকাংখা আর উদ্দীপনার বাণী শোনাবে? প্রাণ কেঁদে উঠল এক মহামানবের। তিনি আর স্থির থাকতে পারলেন না। এখনি এই মুহূর্তেই তাঁকে যেতে হবে বন্যাপ্লাবিত অঞ্চলে। স্বেচ্ছাসেবকের দল যোগাড় করতে হবে। তার পর দিতে হবে নিরন্নকে অন্ন, নিরাশ্রয়কে আশ্রয়।

প্রস্তুত হয়ে যান তিনি। ওদিকে তাঁর একমাত্র ছেলে মৃত্যু-যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। জলভরা চোখে গৃহিণী এসে দাঁড়ালেন, ছেলের এই শেষ সময়ে তার সেবা-শুশ্রূষা ছেড়ে তুমি কোথায় যাচ্ছ? এ যাওয়া তোমায় যে কোরেই হোক বন্ধ করতে হবে।

কিন্তু বন্ধ করা যায় না ছেলের এ অবস্থা দেখেও। গৃহিণীর কাতর অনুনয়কে উপেক্ষা করেন তিনি। বলেন, আজ আমার হাজার হাজার ছেলে মরতে বসেছে। নিজের ছেলেকে বাঁচাতে গিয়ে হাজার হাজার ছেলেকে তো আমি মরণের মুখে ঠেলে দিতে পারি না?

ঘরের টান আর তাঁর পথরোধ করতে পারে না। আর্তের সেবার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েন তিনি। তাঁর আপ্রাণ চেষ্টায় হাজার হাজার লোক প্রাণ ফিরে পেল। বন্যা থেমে গেলে ঘরে ফিরে এলেন তিনি। কিন্তু ঘর শূন্য। মহামানব শুনলেন সব কিন্তু এক ফোঁটাও জল বার হল না তাঁর চোখ দিয়ে। পরের দুঃখে যিনি কত অশ্রুপাত করেছেন, নিজের দুঃখে তাঁর চোখ হতে পড়ল না এক বিন্দু জল! এই মহাপুরুষ হচ্ছেন উড়িষ্যার বিখ্যাত সমাজসেবী, শিক্ষাব্রতী গোপবন্ধু দাস।

পুরী জেলার সাক্ষীগোপাল মন্দিরের কাছে ১৮৭৭ সালে তাঁর জন্ম হয়। অল্প বয়সে মাতৃবিয়োগ তাঁর জীবনের একটি স্মরণীয় ঘটনা এবং এর ফলেই তিনি ভগবানের প্রতি অনুরক্ত হয়ে ওঠেন। ছেলেবয়েস থেকেই পরের দুঃখে তিনি অভিভূত হয়ে পড়তেন। বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর মনে দেশপ্রীতি বাড়তে থাকে। এ সময় হতেই তিনি দেশের শিক্ষানীতির আমূল পরিবর্তন যাতে হয়, তার জন্য চেষ্টা করতে থাকেন।

বি, এল পরীক্ষা পাশের পর তিনি প্রথমে পুরী আদালতে ও পরে ময়ূরভঞ্জ রাজার আইন-পরামর্শদাতা হিসাবে কাজ করেন। এই সময়ে তিনি তাঁর শিক্ষা পরিকল্পনাকে রূপ দেবার জন্য সাক্ষীগোপালের কাছে সত্যবাদী উচ্চ বিদ্যালয় নামে এক আদর্শ বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ছাত্রদের একত্র পান, ভোজন, উপাসনা প্রভৃতির মাধ্যমে প্রকৃত মানুষ করে গড়ে তোলবার জন্য এই বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা প্রাণপাত করে পরিশ্রম করতে থাকেন। তাঁদের পরিশ্রমের ফলেই সত্যবাদী উড়িষ্যার শান্তিনিকেতনে রূপান্তরিত হয়।

এই সমস্ত সামাজিক কাজে গোপবন্ধু অত্যন্ত নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছিলেন। তারপর তাঁকে নামতে হয় রাজনীতিতে। উড়িষ্যার তদানীন্তন কালের বিখ্যাত নেতা ছিলেন মধুসূদন দাস। তাঁরই আহ্বানে তিনি কংগ্রেসের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন।

কংগ্রেসের নেতা হিসাবেও তাঁর নাম দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং তিনি বিহার ও উড়িষ্যার বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত হ'ন।

গোপবন্ধু যে কি রকম অক্লান্ত পরিশ্রমী ছিলেন, তার নিদর্শন দেখা যায় উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষের সময়ে। এ সময়ে তিনি দুর্ভিক্ষপীড়িত অঞ্চলগুলি পরিদর্শন করে এক জ্বালাময়ী ভাষায় সরকারের কাছে রিপোর্ট পেশ করলেন। সরকার অবশ্য প্রথমে নীরব ছিলেন কিন্তু গোপবন্ধুর তাগাদায় অস্থির হয়ে ত্রাণকার্য্য আরম্ভ করেন।

দেশের শিক্ষা-প্রচারের একমাত্র উপায় হচ্ছে, মাতৃভাষায় সংবাদপত্র প্রকাশ ও প্রচার করা। আগে উড়িয়া ভাষায় কোন খবরের কাগজ ছিল না। গোপবন্ধুই প্রথম 'সমাজ' সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। সমাজ আজ উড়িষ্যার শ্রেষ্ঠ দৈনিক পত্রিকাগুলির মধ্যে অন্যতম। তা ছাড়া 'সত্যবাদী' নামে একটি

মাসিক পত্রিকাও তিনি প্রকাশ করেন। এগুলির সাহায্যে উড়িষ্যার শিক্ষা বিস্তার ও উড়িয়া ভাষার উন্নতি দুই-ই সংসাধিত হয়েছিল।

পাঞ্জাব-কেশরী লালা লাজপৎ রায় সে-সময়ে ভারতের একচ্ছত্র নেতা। তাঁর গঠিত জনসেবার আদর্শে অনুপ্রাণিত লোকসেবক সমাজের উপ-সভাপতিরূপে তিনিই এক সময়ে গোপবন্ধুকে বরণ করেন।

গোপবন্ধু ছিলেন সুকবি। অনেকগুলি কবিতা তিনি রচনা করেন। ১৯২৮ সালে ১৭ই জুন তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর জন্মভূমি সত্যবাদী গ্রামে তাঁর স্মৃতিস্তম্ভ আজও দেখা যায়। আর দেখা যায়, পুরীধামে জগন্নাথদেবের মন্দিরের সামনে তাঁর মর্মরমূর্তি। গোপবন্ধু যে দেশবাসীর হৃদয়ে কতখানি আসন করে নিয়েছিলেন, তারই সাক্ষ্য দেয় সকল তীর্থের সেরা তীর্থ জগন্নাথদেবের মন্দিরের সামনেকার এই মর্মর মূর্তিটি। এই মূর্তির মধ্যেই তিনি বেঁচে থাকবেন যুগ-যুগান্ত ধরে। শুধু উড়িষ্যায় নয়, সারা ভারতের অগণিত তীর্থযাত্রীর মনের মন্দিরে।

ধোয়ীর কবিত্ব লাভ

শ্রীবাসুদেব পাল

মহারাজাধিরাজ লক্ষ্মণসেনের রাজসভা যাঁরা অলঙ্কৃত করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে সভাকবি ধোয়ীর কথা সর্বাগ্রে মনে পড়ে। এঁর শ্রেষ্ঠ কাব্য 'পবনদূত'। লক্ষ্মণসেন স্বয়ং এঁকে "কবি-ক্ষ্মাপতি" উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। এই ধোয়ী সম্পর্কে একটি গল্প প্রচলিত আছে। জাতিতে ইনি ছিলেন তন্তুবায়—অর্থাৎ তাঁতি। কি প্রকারে যে তিনি অসাধারণ পাণ্ডিত্য, অনন্যসাধারণ কবিত্ব শক্তি লাভ করেছিলেন—সেই সম্পর্কেই আলোচ্য গল্পটি।

একদিন মহারাজ বল্লালসেন চার জন ব্রাহ্মণকে গঙ্গাতীরে মন্ত্র পুরশ্চরণ করতে পাঠিয়েছিলেন। তাঁদের চাকর হিসাবে ধোয়ীও সেখানে গিয়েছিলেন। অতঃপর একদিন ব্রাহ্মণগণ যুক্তি করে ধোয়ীকে বললেন, 'ধোয়ী, তোর সাথে আজই আমরা বাড়ী যাব।' ধোয়ী অতিবিস্মিত কণ্ঠে উত্তর করে, 'ঠাকুর, তোমাদের কথা শুনলে হয়তো রাজামশায় ক্ষমা করবেন। কিন্তু আমার কথা শুনতে পেলে তিনি কি আমায় আস্ত রাখবেন?'

সামান্য ভৃত্যের এ-হেন প্রত্যুত্তরে ব্রাহ্মণগণ ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে ধোয়ীর হাত-পা মোটা রশি দিয়ে উত্তমরূপে বেঁধে স্ব-স্ব গৃহের উদ্দেশ্যে রওনা হ'লেন। তারপর সেই রাত্রেই—তথায় অকস্মাৎ দেবী সরস্বতীর আবির্ভাব ঘটলো! বাগ্‌দেবী স্নিগ্ধ কণ্ঠে ধোয়ীকে শুধোন,—'বৎস! সে চার জন ব্রাহ্মণ কোথায় গেল?' একে একে ধোয়ী সমস্ত কথা দেবী সমীপে বিবৃত করলো।

অতঃপর দেবী তার বন্ধন মোচন করতেই ধোয়ী ভক্তিভরে বাগ্‌দেবীকে প্রণাম জানালো।

দেবী বললেন,—'তারা (ঐ ব্রাহ্মণগণ) আজ এক বছর ধরে আমার উপাসনা করছে, তাই আজ আমি তাদের উপাসনার ফলদান করতে এসেছি। যজ্ঞমণ্ডপে জলভরা কলসী আছে, সেই কলসীর জল তারা যেন পান করে।' এই পর্যন্ত ব'লেই দেবী অন্তহিত হলেন। কিয়ৎপরে ধোয়ী বিশেষ চিন্তা করে স্থির করলো যে, সে ঐ জল কিছুতেই ব্রাহ্মণগণকে পান করতে দেবে না। কারণ, তাঁরা তাকে যে ভাবে পীড়ন করেছে তাতে—

এই ভেবেই ধোয়ী নিজেই সেই কলসীর জল আকণ্ঠ পান করলো, যেটুকু বাকি রইলো তা মা গঙ্গার বুকে ঢেলে দিল। সেই থেকেই ধোয়ী হলেন পরম পণ্ডিত, শ্রুতিধর ও শ্রেষ্ঠ কবি।

ক্ষেতখানি তার ভর্তি ফুলে

শ্রীশিবপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

তার বাগিচায় গোলাপ ফোটে আমার ঘরের দুয়ার ধারে,
মন্দ বায়ু গন্ধ ছড়ায় গাছ নুয়ে যায় ফুলের ভারে।
ক্ষেতখানি তার ঝলসে উঠে পড়লে তাতে ঊষার আলো,
নিজের হাতের তৈরী তাহার, বাগানটি ঐ সত্যি ভালো।
সকল পাইট তাহার জানা মালীর মাঝে সেই তো দড়,
এপার ওপার যায় না দেখা বাগান যে তার মস্ত বড়।
জল ঢালে সে আঁজলা ভরে, পাট করে যায় স্বভাব জেনে,
দেশ-বিদেশের নূতন জাতি খেয়াল মত বসায় এনে।

পচিয়ে লয়ে ময়লা যত আপন হাতে যত্নে গুলে,
ছাঁটার পরেই সার ঢালে সে প্রতি গোলাপ-তরুর মূলে।
নিয়ম মতে নিজের হাতে ক্ষেতের পাইট তাহার চলে,
কুপিয়ে লয়ে শুকিয়ে তারে আবার সে ক্ষেত ভাসায় জলে।
আনমনে সে গাছ ছেঁটে যায় অস্ত্র শাণিত হস্তে ধরে,
পাষাণ গড়া হৃদয় কী তার হঠাৎ উঠে ব্যথায় ভরে'।
আধ মরা আর শুষ্ক তরু কঠোর হাতে নিড়ান ধরে,
যখন সে দেয় উপড়ে ফেলে, শিউরে উঠি আমরা ডরে।

খেয়াল মাফিক কাজ করে সে সারা সকাল-বিকাল বেলা।
সারা বছর সেথায় চলে রং-বেরঙের ফুলের মেলা।
গন্ধ ঝলক হঠাৎ আনে আমার বুকে উত্তর হাওয়া,
প্রাণ যাহা চায় তাই মিলে যায় মুখ ফুটে যা হয়নি চাওয়া।
সকাল-সাঁঝে কাজের মাঝে যেই বসি মোর দুয়ার খুলে,
সকল কালেই কেবল দেখি ক্ষেতখানি তার ভর্তি ফুলে।

অঙ্গন ও প্রাঙ্গণ

সেই ভোর পাঁচটায় ইন্‌জেকসনের পর থেকে অচেতন ঘুমে আবিষ্ট হয়েছিলো সুমিতা। বেলা পাঁচটা বেজে গেলো, এখনও ভাঙেনি ঘুম। ডাক্তার মাঝে একবার এসেছিলেন, ওর গভীর নিদ্রা দেখে সন্তুষ্ট হয়ে বলেছিলেন—'ঘুমই'এ রোগের মহৌষধ,—এ ঘুম যেন ভাঙানো না হয়।

অধৈর্য্য ভাবে ঘরে আনাগোণা করছে অসীম।—আঃ! এ কি ভুতুড়ে ঘুম রে বাবা! ওর সবটাই দেখছি উদ্ভট রকমের।

শেষবারের মত ঘুমিয়ে নিচ্ছে আর কি? বিদ্রূপের শাণিত হাসি ঠোঁটে মাখিয়ে বললো শুকতারা,—এবার থেকে শুরু হবে তো রাতের অত্যাচার? তাই বেচারী ঘুমের পালা সাঙ্গ করে রাখছে!

—তবেই হয়েছে, ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছো যান ননীর পুতুল, আবার রাত জাগবেন। ঐ আশায় তুমি থাকো, আমি ইস্তফা দিয়েছি। বাব্বাঃ, বিয়ে আবার কার না হয়? কিন্তু এমন তাজ্জব ব্যাপার দেখেছো কখনও? এক-রাশ বিরক্তির সঙ্গে জবাব দিলো অসীম।

—তাজ্জব কি শুধু বিয়ের ব্যাপারটাই? বিয়ের ইতিহাসটাও তো ঠিক স্বাভাবিক বলা যায় না, টিপ্পনি কাটলো শুকতারা, যাই বলো তুমি অসীম, বাহাদুরী দিই তোমাকে, ছল-চাতুরী আর ভণ্ডামীতে আমাকেও হার মানিয়েছো তুমি! ওস্তাদ বোলে তাই বার বার কুর্নিশ ঠুকছি তোমার পায়ে।

—ঠিক আছে! হাতে তাগা বেঁধে আমার সাকরেদি সুরু করে

দাও, শুকমারা বিক্তে তোমায় মারে কে? এই বুদ্ধির মারপ্যাঁচের চাকায় চলছে তামাম দুনিয়াটা, বুঝছো ডিয়ার? ঐ ধর্ম্মশাস্ত্রগুলো এই দামী বুদ্ধিকেই পুরুষকার খেতাব দিয়েছে। আর সৎ, উদার, মহৎ, এসব টাইটেল দিয়েছে ঐ সব বোকা মানুষগুলোকে; যে গুলোর কপালে এই শুধু আঙুল চোষাই সার হয়। নিজের হাতের বুড়ো আঙুলটি ঠোঁটে 'ঠেকিয়ে হাঃ হাঃ, শব্দে হেসে উঠলো অসীম। সে হাসিতে মিশলো শুকতারার উচ্চকণ্ঠের হাস্যতরঙ্গ!

সুমিতার শয্যাপাশে বসেছিলো অনিরুদ্ধ আর করবী। অসীম আর শুকতারার বাক্যবিনিময় শোনবার সৌভাগ্যে ওরা বঞ্চিত হয়নি! অনিরুদ্ধ চাইলো করবীর দিকে—করবী তখন হঠাৎ যেন আকাশে আশ্চর্য্য কিছু দেখতে পেয়েছে, তাই ভাবি মনোযোগ দিয়ে দেখছিলো সেই দিকে, স্কাউণ্ড্রেল—চাপা গর্জ্জনের সঙ্গে উচ্চারণ করলো অনিরুদ্ধ।

বারান্দা থেকে ভেসে-আসা ওদের হাসির ঢেউ লেগে মুছে গেলো সুমিতার চোখের স্বপ্নাঞ্জন। শান্তিভরা চোখ দুটি মেলে চাইলো সে।

'এ কি হোল? কোথায় দ্বীপ? এ যে তার ঘরের বিছানা! সুদাম? না না, এ তো অনিরুদ্ধদা'!

—কি দেখছো মিতা অমন করে? কি ভীষণ ঘুম যে ঘুমুলে তুমি সারাদিনটা ধরে! যাক্, এখন সুস্থ বোধ করছো তো? হাসিমুখে বললো অনিরুদ্ধ।

—কি, ঘুম ভাঙলো? বাব্বাঃ, কুম্ভকর্ণের দ্বিতীয় সংস্করণ তোমাকে বলা যায় মিতা, কি বলো অনিরুদ্ধ? বলতে বলতে ঘরে প্রবেশ করলো অসীম।

উঠে বসলো সুমিতা। স্বপ্নের ঘোর এখনও মুছে যায়নি চোখ থেকে, মধুর স্বপ্নাবেশে ঢুলু ঢুলু চোখ দুটো! সেই অপূর্ব্ব অনুভূতিতে এখনও মন-প্রাণ বিভোর হয়ে আছে। দুহাতে চোখ ঢাকলো সুমিতা।

—এই যে মিতা উঠেছো দেখছি, বলতে বলতে ঘরে এলেন অলকাপুরীর মাসীমা। বেশ সুস্থ হয়ে উঠেছো তো? নাও এবারে উঠে পড়ো তো লক্ষ্মীমেয়ে, চট করে গা-টা ধুয়ে নাও, তোমাকে সাজিয়ে গুজিয়ে বরের বাড়ী পাঠাবার জন্যে দেখো এখনও বসে আছি আমরা,—সন্ধ্যে হয়ে এলো, আর দেরী করে না, ওঠো—ওঠো!

অলস পায়ে খাট ছেড়ে নেমে এলো সুমিতা।

সুদামের বাড়ীতেই প্রবেশ করলো সুমিতা—কিন্তু যে বেশে আসার কথা ছিলো, হলো না সে রূপে আসা! রূপ বদল করে আসতে হল। চির-চেনা-জানা বাড়ীতে এসেছে সুমিতা। এ বাড়ীর প্রতিটি ইট-কাঠকে যে সে চেনে, ওদের প্রতি আছে ওর অন্তরে বড় মায়া!

মনে পড়ে সেই প্রথম দিনের কথা। যেদিন প্রথম বাবার সঙ্গে এসেছিলো এ বাড়ীতে। বড় ভীতু ছিলো সে,—সুদাম এসে ওর হাত ধরে জোর করে টেনে নিয়ে গেলো ওর মায়ের কাছে!

—মা গো—মা, কোথায় তুমি? এই দেখো কা'কে নিয়ে এসেছি!

কি যেন কাজ করছিলেন ওর মা,—কাপড়ে হাত মুছতে মুছতে ছুটে এসে ওকে কোলে তুলে নিলেন।

সে দিনের সে ছবিটা ওর মনে যেন স্পষ্ট আঁকা রয়েছে! কি চমৎকার দেখতে ছিলো ওর মাকে!

লাল ফুলপাড় ঢাকাই শাড়ী পরনে, ধপধপে হাতে একগোছা সোনার চুড়ি, বালা, শাঁখা! গলায় সোনার বড় বড় মটরমালা, নাকে ঝকঝক করছে হীরের নাকছাবি,—কপালে দপদপে সিঁদুরের ফোঁটা,—পিঠে একরাশ ভিজে এলোচুল! ঠিক যেন মা-দুর্গার মত লাগছিলো ওঁকে।

তখন সবে ওর মা মারা গেছেন, তাই সুদামের মাকে দেখে ওর চোখে জল এলো।

আঁচলে ওর চোখ মুছিয়ে দিয়ে উনি বললেন—ভয় কি মা! আমি যে তোমার কাকীমা হই! সত্যিই আর ভয় করে নি,—বড় ভালো লাগলো কাকীমাকে।

তার পর নিজে হাতে তিনি ভাত মেখে ওদের দু'জনকে এক সঙ্গে খাইয়ে দিয়েছিলেন। বাড়ী যাবার সময় দিয়েছিলেন একটা মস্ত বড় জাপানী পুতুল। দারুণ লজ্জায় লাল হয়ে বোলেছিলো সুমিতা, আমি তো এখন আর পুতুল খেলি না কাকীমা!

—তা নাই বা খেললে মা, আলমারীতে সাজিয়ে রেখো, তোমার যখন খোকা-খুকু হবে তারা খেলবে।

হো-হো করে হেসে উঠেছিলো সুদাম মায়ের কথায়, আর সুমিতা ছুটে পালিয়েছিলো বাবার কাছে। সে পুতুলটা আজও আছে কাচের আলমারীতে, তোমার বড় জা হন, প্রণাম করো এঁকে, বললো একজন মহিলা!

পা ছুঁয়ে প্রণাম করে মুখ তুলে চাইলো সুমিতা। বড় চেনা মুখ যে, কিন্তু তবুও চিনতে পারে না সুমিতা, করুণ দৃষ্টি মেলে ওঁর দিকে চেয়ে থাকে। একছড়া হীরের নেকলেশ ওর গলায় পরিয়ে দিতে দিতে ম্লান হেসে বললেন তিনি—আমায় চিনতে পারছিস না মিতু? তোর দাদাঁদা'র মা যে আমি।

—কাকীমা? পরম বিস্ময়ে অস্ফুট উচ্চারণ করলো সুমিতা। কোথায় গেলো সেই মা-দুর্গার মতো রূপ? শাদা থান পরনে, নিরাভরণা চোখ-মুখ সব যেন কি হয়ে গেছে, কোথায় গেছে সেই হাসিটুকু?

নির্বাক-বিস্ময়ে ওঁর মুখ পানে চেয়ে থেকে হঠাৎ ঝাঁপিয়ে ওঁর বুকের ওপর পড়ে দু'হাতে ওঁর গলা জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো সুমিতা।

চারিদিক থেকে হৈ-হৈ, করে উঠলো সকলে। ছিঃ, ছিঃ, আজকের দিনে কি চোখের জল ফেলতে আছে? চুপ চুপ!

ওর মাথায় পিঠে সস্নেহ হাতের কোমল পরশ মাখিয়ে দিতে দিতে বললেন কাকীমা,—পাগলী মেয়ে কোথাকার, চিরদিন কি

মানুষ এক রকম থাকে রে? বোস বোস, যাই তোর খাবার নিয়ে আসি। ওকে বসিয়ে দিয়ে চঞ্চল পায়ে চলে গেলেন তিনি। চার পাশে অজানা লোকের ভিড়। অসংখ্য কুটুম্ব, আত্মীয়, বন্ধু-বান্ধবীতে জমজমাট বাড়ীখানা। সমারোহের বিরাট আয়োজন চলছে।

হাঁফিয়ে ওঠে সুমিতা। দেহে, মনে কি নিদারুণ ক্লান্তি!

ফুলশয্যার মধুনিশি ভোর! এখনও ফোটেনি ভোরের আলো। ঝাপসা ঝাপসা আলো আর চাপ-চাপ অন্ধকার খেলছে লুকোচুরি। ফুলের রাশ বিছানো মখমল কিংখাপের বিছানায় শুয়ে কি যন্ত্রণা!

অসীমের সোহাগ ঢালা কণ্ঠস্বর এখনও বাজছে কানে, যে কথায় বুকটা ওর অব্যক্ত যাতনায় গুমরে উঠেছিলো।

এ-বাড়ীর কর্ত্রী তুমিই, বুঝেছো? কারণ বাড়ী আমার; দাদার অংশ দেনার দায়ে বিক্রি হয়ে গেছে আমার কাছে। সুদাম এলেই বৌদিকে এখান থেকে সরিয়ে দেব, তুমি সব বুঝে-শুনে নাও। আর খুব হুঁসিয়ারী চালে চলবে, বৌদিটি আমার সুবিধের লোক নন।

নীরবে শুনেছিলো সুমিতা ওর সব উপদেশ-বাক্যগুলো।

উঃ! ঘরে যেন বাতাস নেই, আলো নেই। বিরাট লৌহ-কারাগারে যেন বন্দিনী সে। এক সময়ে ঘুমিয়ে পড়লো অসীম।

ঘড়িতে ঢং-ঢং করে রাত্রি চারটে বাজলো অতি সন্তর্পণে ঘর ছেড়ে সামনের খোলা বারান্দায় পালিয়ে এলো সুমিতা। সেখানে একখানি আরাম কেদারা ছিলো, শুয়ে পড়লো তার ওপর।

মন-প্রাণ জুড়ানো দখিণ হাওয়ায় ভেসে আসছে যেন কিসের গন্ধ! বুক ভরে নিঃশ্বাস টেনে নিলো সুমিতা।

কিসের গন্ধ? আকুল হয়ে মনটা খুঁজে মরে। বড় ভালোলাগা গন্ধটা যে অনেক—অনেক কাল পরে ভেসে আসছে।

ল্যাভেণ্ডার চাপা। বিদ্যুৎ-আখরে নামটি ফুটে উঠলো ওর মানসপটে। এই বৈশাখ মাসে, পকেট ভরে ওর জন্যে এই ফুল নিয়ে যেতো দামীদা'। দিতো ওর খোঁপায় পরিয়ে।

ওর দু'চোখ ফেটে এবারে নামলো অশ্রুবন্যা। আঁচলে দুচোখ চেপে ধরে উদ্গত অশ্রুধারাকে রোধ করবার চেষ্টা করলো সুমিতা—কিন্তু বৃথা চেষ্টা, অবরুদ্ধ বেদনার চাপে বুকটা যেন ভেঙে গুঁড়িয়ে যেতে লাগলো।

এখনও জাগেনি কেউ, ঘুমে অচেতন এ বাড়ীর প্রতিটি প্রাণী। এ বড় সুযোগ মনটাকে সুস্থ করবার। প্রাণ ভরে কাঁদলো সুমিতা। অঝোর ধারায় ঝরে পড়তে লাগলো ওর বিগলিত বেদনাশ্রুধারা।

বৃক্ষশাখায় জেগেছে পাখীদের কলকাকলী। আঁচলে চোখ মুছে উঠে বসলো সুমিতা। পুব আকাশে সুরু হয়েছে উষা—অরুণের হোলিখেলা। শান্তহৃদয়ে ধীর পায়ে ফিরে চললো ঘরের দিকে সে।

সহসা একটা দমকা হাওয়ায় খুলে গেলো সামনের ঘরের জানালাটা। চমকে উঠে চাইলো সুমিতা খোলা জানালাটার দিকে।

আহা, কি অপরূপ দৃশ্য! চোখ যে আর ফেরে না।

দু'হাতে জানালার গরাদ ধরে বিহ্বল দৃষ্টি মেলে ঘরের দেয়ালে টাঙানো বৃহৎ তেলরঙা ছবিটার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলো সুমিতা।

সুদামের ছবি। মমতা-ঝরানো চোখ দুটি মেলে যেন ওর দিকে চেয়ে হাসছে দামীদা'। সূর্য্যোদয়ের রাঙা আলো ঠিক্‌রে পড়ছে ওর চোখে-মুখে। দমকা হাওয়া লেগে অল্প অল্প দুলছে ছবিখানা।

ও যেন মৌনভাষায় বলছে মাথাটি দুলিয়ে—কেঁদো না। আর চোখের জল ফেলো না মিতু!

অরুণ রাগের রক্তিম জ্যোতির্লেখায় ঝলমল করছে ওর দরদভরা মুখখানা।

জল-টলো-টলো চোখ দুটি মেলে চেয়ে রইলো সুমিতা, হঠাৎ চোখে পড়া প্রাণকাঁদানো মন ভরানো ছবিটার দিকে।

তৃতীয় ভাগ সমাপ্ত

সেদিন দুপুরে

শ্রীমতী শিপ্রাতটিনী ঘোষ

এমনি এক নিঝুম দুপুরে
মনে পড়ে তুমি ছিলে বসে
সামনের ঐ লনে
নরম দেহখানি মেলে,
তোমার রক্তাভ হাতখানি ছিল পড়ে
লনের সবুজ ঘাসে,
এমনি এক স্তব্ধ দুপুরে।
সেদিন মৌমাছির গুন-গুন তানে
ফুলের মিষ্টি গন্ধে
আর হাওয়ার শন-শন শব্দে
মন আমাদের চলছিল ভেসে,
কোন এক স্বপনপুরীর পারে
অজানার সন্ধানে।
এমনিতর রঙীন কল্পনায়
ভরে নিয়ে মনের পেয়ালা
দু' জনে সারা বেলা
খেলেছিলেম কত খেলা
সেই সে নিরালায়।

সমাজ ও রূপকথা

শ্রীমতী শরণ্যা ঘোষ

মাটির সহিত যোগ না থাকিলে,' মাটিতে শিকড় না গাড়িলেই আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনের সহিত প্রত্যক্ষ সম্পর্ক না আসিলেই কাহাকেও এই সুন্দর পৃথিবী ও মানবমন হইতে নির্ব্বাসিত করা যায় না।

বর্ত্তমান যুগ বিজ্ঞানের যুগ, এই অতি-আধুনিকতার যুগে অবাস্তবের বা কল্পনার কোন স্থান নেই। তাই রূপকথার রাজপুত্র ও রাজকন্যা আজ সম্পূর্ণ অবাস্তব। রূপকথার অপরিমেয় সৌন্দর্য্যসুধা পান করিবার মত মন আজ কাহারও নাই। কারণ, পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির নিকট জগৎ বিষাদে পরিপূর্ণ, জটিলতা-কুটিলতা, নৈরাশ্যবাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু শিশুমনে জগত বিরাট বিচিত্ররূপে প্রকাশিত হয়, সীমাহীন ভাবে জগতকে সে অনুভব করে কল্পনার রঙীন নেশায়,

তার চোখে স্বপ্নমায়া, তাই সে বাতায়নপথে দেখে সাদা মেঘের নৌকা পাল তুলে চলেছে সুদূর নীলাকাশে। আর তার মন ধাবিত হয় সুদূরের আকাঙ্ক্ষায়। রূপকথার গল্প তার মনে নানা ভাবের সৃষ্টি করে কিন্তু প্রাপ্তবয়স্কদের নিকট রূপকথা অবাস্তব। কারণ, যাহা স্থূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আকারবিশিষ্ট তাহাই বাস্তব।

ধরার মস্তকে ঐ যে নীলচন্দ্রাতপ, তা আমাদের প্রকৃত জীবন-সমস্যার কোন সমাধান করে না সত্য, কিন্তু নানাবিক্ষুব্ধ প্রশ্নসঙ্কুল জীবনে ইহা স্নিগ্ধশান্তির প্রলেপ বুলাইয়া দেয়। বাস্তবজগতে অপ্রয়োজনীয় বস্তুর কোন মূল্য নেই, কিন্তু বাস্তবের রূঢ়কাঠিন্য রূপকথার নিকটও পরাজিত হয়। তাই মনে হয়, রূপকথার বিরুদ্ধে এই যে অলীকতা ও অবাস্তবতা, ইহা সম্পূর্ণ ভ্রমজনক। কারণ, রূপকথা কতকগুলি অসম্ভব বাহ্য ঘটনার ছদ্মবেশ পরিয়া আমাদের মনের সহিত ইহার প্রকৃত ঐক্যের কথা গোপন রাখিতে চেষ্টা করে। এই আবরণ উন্মোচন করিলেই রূপকথার প্রকৃত স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয়। তাই বলি, আমাদের সামাজিক জীবনের প্রয়োজনীয় বস্তুই কেবলমাত্র বাস্তব নহে। অর্থনীতি ও বিজ্ঞান বাস্তববাদী জীবনের স্বার্থ মিটাইতে পারে সন্দেহ নাই কিন্তু তদপেক্ষা সূক্ষ্ম বাস্তব আছে যাহা মানসলোকের প্রেরণাদায়ক। ব্যক্তিত্ব ও সত্তাহীন যাহা তাহাই অবাস্তব, কিন্তু অসম্ভবেরও অর্থ আছে। অতিরঞ্জিত, বাহ্যকাহিনী, উদ্ভট কল্পনাপ্রসূত, শিশুর মনোরঞ্জনের বস্তুও বাস্তব জীবনে প্রয়োজন হয়। রূপকথার অন্তরবস্তুর সহিত আমাদের বস্তুজগতেরও সাদৃশ্য আছে। ইহার নীতি, আদর্শ প্রভৃতি বাস্তব জগতেরই রূপান্তর মাত্র। অসম্ভব কাহিনীটুকু পরিত্যক্ত করিয়া অন্তর্গত বস্তু সম্বন্ধে গোচরীভূত হইলে দেখা যাইবে যে, রূপকথা ও বাস্তবে প্রভেদ নাই। ইহার যে অন্তরলোকের শক্তি ও আদর্শ তাহা আমাদের অনুপ্রাণিত করে। মানসিক ও আত্মিকশক্তির প্রয়োজনই জীবনে অপরিহার্য্য। মনুষ্যত্ব, পরোপকার, সমাজসেবা, ধৈর্য্য আমাদের জীবনের সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত, কিন্তু রূপকথার ভিতরও ঐ গুণগুলি বিদ্যমান।

আদর্শের সন্ধান মানসে আমরা জীবনের পথে অগ্রসর হই। সুখ, শান্তি, সৌন্দর্য্য, সম্পদ লাভের আকাঙ্ক্ষায় আমাদের মন ধাবিত হয় কোন্ অচেনা, অজানা রহস্যলোকে, নানাবিভিন্ন ক্ষমতানুযায়ী জীবনে সুখলাভ করা সম্ভবপর হয়। ধর্মের পথে, কৃষ্টির দ্বারা বস্তুগত জীবনে সুখলাভ করা যায়। কিন্তু পরিপূর্ণ সুখী জগতে কে হয়? সুখের মরীচিকা চিরকাল মানুষকে উদ্বোধিত করে। আপাত রমণীয় সুখের ভিতর জীবন উপভোগ করিলেও দুঃখের শাশ্বত রূপ হইতে অব্যাহতি লাভ করা অসম্ভব। তাই দুঃখ হইতে পরিত্রাণের আশায় মানবের আর্ত্তকণ্ঠে ধ্বনিত হইয়াছে—'রাত্রির তপস্যা কি আনিবে না দিন'। সৌন্দর্য্য চিরপিয়াসী মানবমনের ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষা তাহাকে পরিচালিত করে কল্পলোকের অভিসারে। ভ্রমর ফুলের গন্ধে আকৃষ্ট হয়, চাঁদের নীলাঞ্জন কবির আঁখিপাতে মোহ ঘনায়, নারীর জন্য পুরুষের চিরন্তন অত্যুগ্র কামনাই এই সৌন্দর্য্যের রূপায়ণ। রূপকথার রাজকন্যা আমাদেরই হৃদয়ের সুপ্তকন্দরের চিরপ্রেয়সী মানসসুন্দরী। পার্থিব জগতের ন্যায় রূপকথার জগতেও পাপপুণ্যের পরাজয়বোধ রহিয়াছে।

"যা ঘটে তাই যদি লেখা হয়, তবে ত' 'ফটোগ্রাফী' মাত্র, তা সাহিত্য নহে।" কিন্তু অতিরঞ্জিত হইয়াই সাহিত্য সৃষ্টি হয় এবং Art এর মর্য্যাদা লাভ করে। একটি বস্তুর সাহচর্য্যে আর একটি বস্তুর ভাব প্রকাশকে রূপক আখ্যা দেওয়া হয়। রূপকথার 'রাক্ষসখোক্কস' পার্থিব বাধাবিঘ্নের প্রতীকস্বরূপ। ব্যঙ্গমাব্যঙ্গমী অনুকূল দৈবের রূপক। দৃশ্যমান বস্তুও বর্ণিতব্য জগত যখনই লেখনীর সাহচর্য্যে ভাবিত হয়, তখনই তাহা রূপকে পরিণত হয়। বাস্তবে যাহা অঘটিত হয় তাহা রূপকথায় কল্পিত সমাধান লাভ করে। বাস্তবজীবনে প্রেমের পথ কুসুমাস্তীর্ণ নহে। রূপকথার রাজ্যে রাজপুত্র সকল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া তাহার বহু আকাঙ্ক্ষিত প্রবালপালঙ্কে শায়িনী রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করে। কিন্তু বর্ত্তমান যান্ত্রিকজীবনে আধুনিক রাজকুমারগণ সর্ব্বদা তাহাদের মনোবাঞ্ছা পূরণ করিতে পারে না, ফলে তাহাদের অভিমানক্ষুব্ধ দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া আসে। বর্ত্তমানে বণিকধর্মী বিবাহ অর্থাৎ কাঞ্চন ও কৌলীন্য প্রথাই রাজকন্যা ও রাজকুমারের যুগলমিলনের পথে প্রতিবন্ধক। তাই রূপকথাকে 'কল্পনা'রূপে অভিহিত করা হয়। কিন্তু ইহা প্রকৃত বাস্তবতার উপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত।

রূপকথার সহিত বাংলার সামাজিকযোগ অভেদ্য। সমগ্র দেশের প্রাণ হইতে একটি শতদলের ন্যায় রূপকথার আবির্ভাব হইয়াছে। মানসিক সৌন্দর্য্য ও কল্পনার যে অনুভূতি তাহা বিশেষ রূপদান করে রূপকথায়। ইহা মানবের অজ্ঞাতসারে সমগ্র জাতির চেতনা হইতে উদ্বোধিত হইয়াছে। তাই ইহাকে Epic of Growth আখ্যা দেওয়া হয়। নবযৌবনা অনিন্দ্যসুন্দরী উর্ব্বশীর ন্যায় স্বতঃস্ফূর্ত্ত ভাবে ইহার জন্মগ্রহণ হইয়াছে।

বাংলার সামাজিক ব্যবস্থা ও সামাজিক বিচারবোধ তাহারই নবস্পন্দিত রূপায়ণ হইয়াছে রূপকথায়। বাংলাদেশের সমাজ স্থায়ী ও নিয়মশৃঙ্খলিত আদর্শময়। পাপ-পুণ্য, রীতনীতি সম্বন্ধীয় ধারণাই সামাজিক অনুশাসন। ইহাও রূপকথার মধ্যে পরিস্ফুট হইয়াছে। সামাজিক ব্যবস্থা ও বিচারবোধ পরিবর্ত্তিত হয় যুগ হতে যুগান্তরে।

পূর্ব্বে বিধবার বিবাহ, বিধবার ভালোবাসা ছিল গুরুতর অপরাধ কিন্তু বর্ত্তমানে ইহার স্থায়িত্ব ক্রমশঃ লুপ্তপ্রায়। মানবমনের পরিবর্ত্তনের সাথে সাথে সমাজেরও পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী।

বাংলার সমাজের মূলভিত্তি একান্নবর্ত্তী পরিবার। প্রাচীন কালে একটি পরিবারের একই ভূমিলব্ধ আয়ের উপর নির্ভর করিতে হইত। কিন্তু বর্ত্তমানে প্রতিটি মানুষ চাকুরীজীবী হইয়া পড়িতেছে, ফলে আধুনিক শিক্ষিত ও শিক্ষিতাগণের মনে স্বাতন্ত্র্যবোধের প্রশ্ন জাগিতেছে। এইরূপ বাস্তবের সমাজমূলক বিবিধ সমস্যা রূপকথায়ও দেখা যায় কিন্তু প্রভেদ এই যে, রূপকথায় সকল সমস্যা কল্পনার রাগে রঞ্জিত হইয়া সুন্দর সমাধান লাভ করে কিন্তু বাস্তবে তাহা অপরিণতই থাকে। তথাপি ইহা বলিতে হইবে যে, রূপকথার মৌলিকতা ও বাস্তবতা যথার্থ পরিমাণে বিরাজিত। তাই ইহার বিরুদ্ধে অবাস্তবতার যে অভিযোগ, তাহা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও ভিত্তিহীন। রূপকথা বাস্তব ও কল্পনার মিলনধর্মী সামাজিক কাহিনীর রূপান্তর মাত্র।

মুসাফির

(William Wordsworth-এর I wondered lonely as a cloud কবিতার অনুবাদ)

আমি চঞ্চল মেঘের মতই একেলা
ঘুরেছি পাহাড় ঘুরেছি অনেক দেশ ;
আমি চন্দ্রমুখীর দেখেছি বিরাট মেলা
সোনার বরণ হলুদ তাদের বেশ।
নদী-উপকূলে সবুজ গাছের নীচে
মৃদু বাতাসেই উল্লাসে তারা নাচে।
তারকার মত সামার সংখ্যা নাই
আলো-ছায়া পথে মিটিমিটি তারা চায় ;
অগণতি তারা তাদের হিসাব নাই
পথের দু'ধারে নদীর দু'কিনারায়।
লক্ষ লক্ষ অযুতে তারা যে দাঁড়ায়ে
মৃদু হিল্লোলে পুলকে দু'হাত বাড়ায়ে।
আমি তো দেখেছি উপল-মুখর ঢেউ
তবু যেন এরা শিলালাঞ্ছিত ঝর্ণা ;
সাথিরূপে পেলে কখনও এদের কেউ
খুসীর তুফানে অন্তরে জাগে বন্যা।
(আমি) অবাক পুলকে কেবল শুধুই দেখি
রূপ-বর্ণের মধুর মিছিল এ কি !
কর্মমুখর ক্লান্ত দিবস শেষে
বসেছি হয়তো কুশানে কিম্বা শোফা ;
অন্তরে তারা উঠেছে পলকে ভেসে
নির্জনতার দেখেছি নতুন শোভা।
অধরাধরার পুলকপূর্ণ মনে
আবার নেচেছি চন্দ্রমুখীর সনে।

—অনুবাদক : শ্রীজ্যোতির্ময় দাশ

উপহার

শ্রীমতী উর্ম্মিলা দাস মহাপাত্র

ঝিপ্-ঝিপ্ করে বৃষ্টি পড়ছিল, রাস্তা হয়ে এসেছে খালি। রাত ন'টা বেজে গেছে। একটা গাড়ী এসে দাঁড়াল দমদমের এক বাড়ীর সামনে। গাড়ী থেকে নেমে এল দুটি যুবক। বাইরে বাড়ীর কড়া নাড়ার শব্দ হল।

—কা'কে চান ? ভেতর থেকে একটি দশ-বার বছরের ছেলের গলার প্রশ্ন শোনা গেল।

—এটা কি অনিল বাবুর বাড়ী ?

—হাঁ, কেন ?

—একটু বিশেষ দরকার আছে। দেখা করতেই হবে।

—আচ্ছা, আসুন ভেতরে, বসুন। ভেতরে চলে গেল ছেলেটি।

—দাদু, ও দাদু। বাইরে তোমাকে ক'জন লোক ডাকছে। নাতির ডাকে চমকে উঠলেন অনিল বাবু। একটু তন্দ্রা এসেছিল তাঁর। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলেন রাত ন'টা গেছে বেজে। তাই জিজ্ঞাসা করলেন, কি দাদু, খাবার দেওয়া হয়েছে বুঝি ?

—না, বাইরে তোমাকে কারা ডাকছে। অধীর হয়ে বলল বাবলু। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালেন অনিল বাবু।

এই রকম বর্ষার রাতে আবার কে আসলো ? চটিজোড়া পায়ে গলিয়ে দিয়ে বাইরের ঘরে এসে পৌছলেন তিনি। জিজ্ঞাসা করলেন—কি চাই আপনাদের ?

নমস্কার জানিয়ে একটি যুবক এগিয়ে এসে বলল—বিশেষ জরুরী কাজে এসেছি আপনার কাছে। আমরা বালীগঞ্জ থেকে আসছি। আমার নাম হল অনিন্দ্য চ্যাটার্জ্জি।

—ও, তারপর বলুন কি দরকার আপনাদের ?

—আপনি যদি কিছু মনে না করেন তাহলে বলি। আপনার কুকুরটি আমরা দেখতে চাই।

—কেন, কি হয়েছে ?

—শুনেছি, আপনারা কুকুরটিকে নতুন এনেছেন, আর আমাদের কুকুরটি কিছু দিন হল খোয়া গিয়েছে। তাই ভাবছিলাম যদি—

ক্রুদ্ধ স্বরে অনিল বাবু বললেন—তার মানে আপনাদের কুকুর আমরা নিয়েছি ?

—আপনি নিজে না নিলেও, যে আপনাকে কুকুরটি দিয়েছে সে অসদুপায়ে এই কুকুরটি সংগ্রহ করেছে। আপনি কুকুরটিকে একবার আমাদের দেখান, আমাদের কুকুর না হলে আমরা চলে যাবো।

আরও ক্রুদ্ধ স্বরে অনিল বাবু বললেন, না দেখাবো না। তাঁর কথা শেষ হবার আগেই বাবলু টেনে টানতে টানতে নিয়ে হাজির করল এক এ্যালসেসিয়ান কুকুরকে। এই যে আমি কুকুর নিয়ে এসেছি—সে বললে।

অনিন্দ্যকে দেখে আনন্দে লাফিয়ে উঠল কুকুরটা, পুরান মনিবকে আদর করে অনিন্দ্যর হাত-পা গাল চাটতে লাগল আর তার গলা দিয়ে স্নেহভরা কুঁ কুঁ শব্দ বেরিয়ে এল। অনিন্দ্যর চোখে পাওয়ার আনন্দে জল এসে গেল। সে ডাকতে লাগল প্রিন্স, প্রিন্স, আর সেই এ্যালসেসিয়ান কুকুরটা লুটিয়ে পড়ল অনিন্দ্যর পায়ের পরে—এ যে তার কত দিনের চেনা মনিবের ডাক !

অনিল বাবু অপ্রস্তুত হয়ে বললেন—কিন্তু এর নাম ত পপি, প্রিন্স নয়। অনিন্দ্য জানাল—কিন্তু এর আসল নামই হল প্রিন্স। ছোটবেলা থেকে আমরা মানুষ করেছি একে। আজ কি আমরা চিনতে পারব না ? কে দিয়েছে আপনাকে এ কুকুর ?

—আমাদেরই পরিচিত একটি ছেলে।

—নাম অরূপ সেন, তাই নয় ? প্রশ্ন করে অনিন্দ্য।

—হ্যাঁ, কিন্তু আপনি কি করে জানলেন ?

—খবর পেয়েছি, তা না হলে বালীগঞ্জ থেকে ছুটে আসি এই দমদমে কুকুরের খোঁজে ? এ কুকুরকে খুব পছন্দ হয়েছিল আপনার মেয়ের, তাই অরূপ এনে দিয়েছে এই কুকুর।

বিস্মিত মুখে বললেন অনিল বাবু—কুকুরের সখ আমার মেয়ের চিরকালই, তবে এই কুকুরটাই যে তার পছন্দ হয়েছিল, কই তা ত জানি না ? পর মুহূর্ত্তে ডাক দিলেন—অনু ! অনু !

দরজার আড়াল থেকে বেরিয়ে এল একটি মেয়ে, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, দোহারা গড়ন, নাক-মুখ-চোখ ভালই, এক কথায় সুন্দরী বলা চলে

তাকে। দরজার আড়াল থেকে বাইরের আলোচনা সব শুনেছে সে, তার মুখ দেখেই বোঝা যায়।

—তুই নাকি এই কুকুরটাকে পছন্দ করেছিলি, তাই অরূপ এনে দিয়েছে একে, একথা সত্যি ?

—হাঁ, কিন্তু আমি জানতাম না যে কুকুরটাকে চুরি করে আনা হয়েছে।

—কোথায় দেখলে তুমি এ কুকুর ? প্রশ্ন করলেন অনিল বাবু।

—দিদি, জামাইবাবু আর অরূপদা'র সঙ্গে লেকে বেড়াতে গেছিলাম, সেখানে ওটাকে বেড়াতে নিয়ে এসেছিল। আমি শুধু বলেছিলাম—বাঃ কি সুন্দর কুকুরটা, তাতে অরূপদা' আমাকে বললো—চাও তুমি ঐ কুকুর ? আমি ব্যবস্থা করে দেব। তার কয়েক দিন পরেই তো কুকুরটা এনে দিয়ে বললেন—কুকুরটা আমার এক বন্ধুর, কিনে আনলাম তিনশো টাকা দিয়ে তার কাছ থেকে। ভিজে গলায় শেষ করে কথা কয়টি অনুশ্রী ঠোঁট দুটো কেঁপে ওঠে তার, চোখ দিয়ে যেন অপমানে জল বেরিয়ে আসতে চায়।

অপ্রস্তুত হয় অনিন্দ্য, বলে—না না, আপনার কি দোষ ? আমি সব সত্যি ঘটনা জেনেছি।

ভেতরে চলে যায় অনুশ্রী।

অনিল বাবুই একটু টাল সামলে নিয়ে মুখ খুললেন—আপনার কাছ থেকে অরূপ এই কুকুর কেনে নি যখন, সে কুকুর পেল কি করে ?

—আমার সঙ্গে আলাপই নেই অরূপ সেনের, চিনিও না আমি তাকে, কিন্তু তার পরিচয় আমার জানা আছে। সে কুকুর কি ভাবে নিয়েছে তা বলছি। শুরু করে অনিন্দ্য—

আমাদের বাড়ীর দুটো কুকুর—প্রিন্স ও টাইগার। প্রতিদিন বিকেলে বেড়াতে নিয়ে যায় তাদের আমাদের বাড়ীর একটি চাকর। সেদিনও বিকেলে সে নিয়ে গেছিল তাদের। এ হল প্রায় মাস খানেক আগেকার কথা। রাত হয়ে গেল, অথচ চাকরও ফিরে এল না, ফিরে এল না আমাদের প্রিন্স ও টাইগার। সবাই আমরা চিন্তিত হয়ে পড়লাম, কি করব ভাবছি, এমনি সময় টাইগারের চিৎকারে আমরা বেরিয়ে এলাম। চাকরটার হাতে চেনে বাঁধা রয়েছে একাই টাইগার, প্রিন্স নেই। বহু জেরার পর চাকরের কাছে জানা গেল, লেকের এক জায়গায় যখন চেন খোলা পেয়ে প্রিন্স ও টাইগার খেলা করছিল, একটি ভদ্রলোক এক ট্যাক্সিতে বসে তাদের খেলা দেখছিল। তারপর যখন সে ট্যাক্সির দরজা খুলে দিয়ে ডাক দিল, প্রিন্স ছুটে গিয়ে ট্যাক্সিতে উঠে বসল আর ট্যাক্সি প্রিন্সকে নিয়ে উধাও হয়ে গেল মুহূর্তের মধ্যে। বিশ্বাস হল না আমাদের চাকরের জবাবে। বাড়ীর গাড়ী ছাড়া প্রিন্স অন্য কোন গাড়ীতে কোন দিনই ওঠে না, সে যে একা ট্যাক্সিতে কোন কারও ডাকে উঠে পড়তে পারে, বিশ্বাস করা আমাদের সম্ভব নয়। এ যে আশ্চর্য্য ব্যাপার ! কিন্তু এর বেশী চাকরের কাছে কিছুই জানা গেল না। তাই পুলিশের শরণাপন্ন হতে হল। হাজত বাসের পর পুলিশের জেরাতে সে স্বীকার করলো, দশ টাকার বিনিময়ে প্রিন্সকে সে বিক্রী করেছে এক ভদ্রলোকের কাছে। ভদ্রলোক কয়েক দিন ধরে আসা-যাওয়া করে প্রিন্সের সঙ্গে পরিচয় করছিলেন, তার পর নির্দ্দিষ্ট দিনে আরও টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রিন্সকে জোর করে ট্যাক্সিতে তুলে নিয়ে উধাও হয়ে যান। পুলিশের বহু চেষ্টাতেও প্রিন্সের কোন খোঁজ পাওয়া যায় নাই। এইটুকু থেকে প্রিন্স আমাদের বাড়ীতে বেড়ে উঠেছিল। তাই সবারই মায়া পড়েছিল তার উপর। প্রিন্সকে হারিয়ে বাড়ীতে অনেকে কান্নাকাটি করে আর অন্য সবাই মুহ্যমান হয়ে পড়ে। আমরা প্রিন্সের আশা ত্যাগ করেছিলাম। কিন্তু আজ সন্ধ্যায় আমার এক বন্ধুর কাছ থেকে ফোনে খবর পেয়ে দমদমে আপনার বাড়ীতে এই বর্ষার রাত্রে ছুটে আসি।

একটানা এতগুলো কথা বলার পর থামলে অনিন্দ্য। স্থির হয়ে শুনছিলেন অনিল বাবু এই সব কথা। তার পর এক দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বললেন—কিন্তু আপনার বন্ধুই বা সব কথা জানল কি করে ?

—সে আপনাদেরও পরিচিত এবং অরূপ সেনেরও পরিচিত। অরূপ সেনের যে বন্ধু এই কুকুর চুরি ব্যাপারে তাকে সাহায্য করেছে, নিজেদের মধ্যে মতবিরোধ হওয়ায় আক্রোশে সব কথা বলেছে আমার কাছে এত দিন পরে। তাই আমার বন্ধু আমায় ফোন করে সব জানায়, কিন্তু পুলিশের সাহায্য নিতে মানা করে। কারণ, সে বলে, যাঁদের বাড়ীতে প্রিন্স রয়েছে তাঁরা সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ এই ব্যাপারে, আর যে প্রকৃত দোষী তাকে ধরা-ছোঁয়া যাবে না। কারণ, অরূপ সেন একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর পুত্র, পুলিশ মহলে তার বাবার যথেষ্ট প্রতিপত্তি রয়েছে, তাই পুলিশও কিছু করবে না।

অনিন্দ্যর কথায় কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়ে অনিল বাবু বললেন—যাক,

বাঁচা গেল পুলিশের হাত থেকে। নিয়ে যান মশাই আপনার কুকুর। উঃ, কি সাংঘাতিক ছেলে এই অরূপ, অন্যের কুকুর চুরি করে এনে বলে কি না, কিনে এনেছি! আর এই ছেলের সঙ্গে ভাবছিলাম আমার মেয়ের বিয়ে দোবো। যাক্, সময় মতন জানতে পারা গেছে। তা আপনারা একটু মিষ্টিমুখ করে যান। বলেই উত্তরের অপেক্ষা না করেই ডাক্ দেন—অনু, ও অনু! দরজার আড়াল থেকে বেরিয়ে আসে অনুশ্রী, পেছনে চাকরের হাতে ট্রে। খাবারের প্লেটগুলি টিপয়ে নামিয়ে রেখে বলে অনুশ্রী—খুব দুঃখিত, আপনাদের কুকুর নিয়ে এত গণ্ডগোলের কারণ আমি। তার জন্য মাপ চাইছি আপনাদের কাছে।

ব্যস্ত হয়ে অনিন্দ্য বলে—না না আপনার কি দোষ? আপনি তো জানতেন না যে অরূপ বাবু এমনি করে কুকুর নিয়ে আসবে।

কিছুক্ষণ পরে মৃদু গলায় প্রশ্ন করে অনুশ্রী—দেবাশীষ বাবু বুঝি আপনার বন্ধু হন?

চমকে উঠে অনিন্দ্য। হ্যাঁ, কেন?

—না, এমনি। আরও মৃদু গলায় জবাব দেয় অনুশ্রী। তারপর যথারীতি নমস্কারের পালা সেরে কুকুর নিয়ে গাড়ীর দিকে পা বাড়ায় অনিন্দ্য। বহুদিনের পরিচিত মনিবের গাড়ী দেখে আনন্দে ঘেউ ঘেউ করে ওঠে প্রিন্স। তারপর দরজা খোলা পেয়েই এক লাফে গাড়ীতে উঠে বসে সে। গাড়ী চলে যায়।

* * * *

অনুশ্রীর দাদার বন্ধু হল দেবাশীষ। লম্বা, দোহারা গড়ন, শ্যামবর্ণ, ছেলেমানুষী ভাব রয়েছে যেন তার মুখে। চোখে তার পুরু লেনসের চশমা, তাই চোখের ভাষাটা হারিয়ে যায় পুরু কাচের আড়ালে। দমদমে এক বেসরকারী কলেজের অধ্যাপক সে। পড়ার ব্যাপারে দেবাশীষ মাঝে মাঝে সাহায্য করে অনুশ্রীকে। এই ঘটনার পরের দিনের নিরিবিলি সন্ধ্যায় ভাল লাগছিল না কিছুই অনুশ্রীর। সবাই বাড়ীর বাইরে। যে কুকুরটিকে স্নেহ-মায়ায় জড়াতে চেষ্টা করছিল অনুশ্রী, সে-ও আজ চলে গেছে তার পুরোন মনিবের ঘরে। আজ সে বড়ই একা। আজ পড়াতে আসার কথা দেবাশীষের। অন্যমনস্ক ভাবে বইএর পাতার পর পাতা উলটিয়ে চলেছে অনুশ্রী। কখনো সে তাকিয়ে থাকে জানলার ফাঁক দিয়ে আকাশের তারাগুলির দিকে। এমনি এক মুহূর্ত্তে নিঃশব্দে ঘরে ঢুকলো দেবাশীষ। অনুশ্রীকে একাকী অন্যমনস্ক দেখে অপ্রস্তুত বোধ করে সে। কি করবে ঠিক বুঝতে পারে না। ডাকতে সে সাহস পায় না। সন্ধ্যাকাশের গায়ে যে তারা জ্বল-জ্বল করছে, সেই দিকে তাকিয়ে থাকে অনুশ্রী। আর দেবাশীষ নীরবে তাকিয়ে থাকে অনুর গালের উপর যে ছোট্ট তিলটা রয়েছে তার দিকে।

দেবাশীষের চোখে বিশেষ করে ভাল লাগে অনুর এই বসার ভঙ্গীটি, এলো খোঁপা করে বাঁধা চুলগুলি লুটিয়ে আছে তার কাঁধের প'রে। ভারী সুন্দর মনে হয় তার অনুকে। রোজই মনে হয় সুন্দর, আজ যেন আরও সুন্দর লাগে তার।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়িয়ে ফিরে দেখে দেবাশীষকে অনু।

—কখন এলেন?

—মিনিট কয়েক আগে। আজ তোঁমায় পড়ানর দিন। তুমি ত আজ বেশ অন্যমনস্ক আছ, তা আজ নয় পড়া থাক, আমি আসি।

—না, যাবেন না আপনি। বসুন একটু কথা আছে আপনার সঙ্গে। দাঁড়িয়ে রইলেন কেন?

সঙ্কুচিত ভাবে জড়সড়ো হয়ে বসে পড়ে দেবাশীষ।

—কুকুর নিয়ে কাল কি কাণ্ড হয়েছিল শুনেছেন?

হ্যাঁ, শুনেছি, মাথা নীচু করে উত্তর দেয় দেবাশীষ। জানালায় ঠেসান দিয়ে দাঁড়িয়েছিল অনু, এবার একটু এগিয়ে এসে প্রশ্ন করে—কুকুরের কথা সব জেনেও, আমাদের আগে না জানিয়ে, অনিন্দ্য বাবুকে জানাতে গেলেন কেন? এ ভাবে অপমান করানোর কি দরকার ছিল আপনার?

চকিতে সোজা হয়ে বসলো দেবাশীষ, অনুর দিকে তাকিয়ে দেখলো তার শান্ত চোখ দুটি যেন জ্বলছে। ধীর গলায় জবাব দিল সে—তোমাদের অপমান করিয়েছি আমি? কে বললো তোমাকে?

—আমি জানি, অনিন্দ্য বাবুকে আপনিই বলেছেন কুকুরের কথা।

—অনিন্দ্য বলেছে সে কথা?

—না, তিনি আপনার নামও করেন নি, কিন্তু আপনি আমায় ফাঁকি দিতে পারবেন না। কেন বলেন নি, অরূপ বাবু কেমন করে কুকুর পেয়েছেন?

—তোমরা বিশ্বাস করতে না সে কথা। ভাবতে, মিথ্যা কথা বলছি অরূপের নামে—স্থির গলায় জবাব দেয় দেবাশীষ।

ঠোঁট দুটি টিপে ধরে কি যেন বলতে যাচ্ছিল অনু, কিন্তু দরজা দিয়ে অরূপকে ঢুকতে দেখে থেমে গেল সে। মুখে সিগারেট, প্যান্ট ও হাওয়াইয়ান শার্টপরা মাঝারি গড়নের চক্‌চকে যুবকই অরূপ।

হ্যালো, অনু! কাউকে দেখছি না যে? কি ব্যাপার?

চাপা গলায় উত্তর দেয় অনু। লজ্জা করে না আপনার এ বাড়ীতে আবার আসতে?

—কেন কি হয়েছে? বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করে অরূপ।

—কি হয়েছে জিজ্ঞাসা করছেন? চুরি করে কুকুর এনে উপহার দিয়ে, আমাদের অপমান করে আবার জানতে চাইলেন কি হয়েছে? থর থর করে কাঁপছে অনু, শক্ত করে চেপে ধরে সে চেয়ারের হাতলটা।

মুহূর্ত্তে কঠিন হয়ে উঠে অরূপের মুখ। সে বলে—কে বলেছে? দেবাশীষ বাবু নিশ্চয়ই? এ রকম মিথ্যা কথা তা ছাড়া আর কে বলবে?

প্রতিবাদ করতে যায় দেবাশীষ, কিন্তু তাকে থামিয়ে তীব্র কণ্ঠে বলে উঠে অনু—হ্যাঁ, বলেছেন দেবাশীষ বাবু এবং ঠিক কথাই তিনি বলেছেন। কাল রাত্রে যাদের কুকুর তারা নিয়ে গেছে তাদের প্রিন্সকে। আর বলেছে—আপনার এই কুকর্মের সহকারী, যে কুকুর চুরি করে নিয়ে এসেছিল, সব নিজ মুখে স্বীকার করেছে সে।

মুহূর্তে ম্লান হয়ে গেল অরূপের মুখ। সিগারেটটা পায়ের তলায়

পিযে ফেলে দ্রুতপদে বেরিয়ে গেল সে। দেবাশীষও বেরিয়ে যাবার জন্য উঠে দাঁড়াল, কিন্তু অনুর ডাকে থমকে দাঁড়াল।

—যাবেন না আপনি, দেবাশীষ বাবু! বসুন। আপনি জানতেন অরূপ এই ধরণের লোক, তবে কেন আমাদের বলেন নি আপনি? ভিজে গলায় প্রশ্ন করে অনু।

—বলবার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু তোমরা শুনতে চাওনি। বড়লোক ভাবী জামাই পেয়ে তোমার বাবা মা যেমন খুসীতে অন্ধ হয়েছিলেন, তুমিও ঠিক ততখানি খুসী হয়েছিলে মনে মনে। যদিও বাইরে কিছুই প্রকাশ করনি। তাই বরাবর বলতে এসেও তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে আমি পারিনি। কিন্তু এবার না বলে পারলুম না। তোমাকেও আমি বলিনি, বলে আঘাত দিতে চাইনি। শুধু অনিন্দ্যকে বলেছিলুম, যাতে সে তার কুকুর ফিরে পায়।

একটা নিঃশ্বাস ফেলে চুপ করে দেবাশীষ। তারপর বলে —এরকম কিছু হবে এটা আমি চাইনি, কিন্তু হয়ে গেল। এর জন্য আমি মাপ চাইছি। বলেই দরজার দিকে এগিয়ে যায় দেবাশীষ। এগিয়ে এসে দরজা আগলিয়ে দাঁড়ায় অনুশ্রী। তার শান্ত দীর্ঘ চোখ দুটো তুলে ধরে বলে, এমনি ভাবে নিজেকে তুমি লুকিয়ে রাখতে কেন চাইছিলে, আর কেউ বুঝতে না পারলেও, তুমি কিন্তু আমার কাছে ধরা পড়ে গেছ।

থমকে দাঁড়ায় দেবাশীষ। মুখ তুলে তাকিয়ে দেখে সজল চোখে তাকিয়ে আছে অনু, কিন্তু তার ঠোঁটের কোণে মিষ্টি হাসির রেখা আর গালের উপর ছোট্ট তিলটা যেন আরও কাল লাগছে। মুখ নামিয়ে বলে—ধরা পড়তেই তো আমি চেয়েছিলাম, কিন্তু তোমার দৃষ্টিতে ছিল অন্য ভাষা, বুকে ছিল অন্য কথা। তাই আমার কথা তুমি বুঝতে না। আজ ধরা পড়ে বেঁচে গিয়েছি।

কয়েক দিন পরের কথা। পড়ার ঘরে ঢুকলো এসে দেবাশীষ। পায়ের শব্দে ফিরে তাকিয়ে বলে অনু—এত দেরী করলে যে?

—একটা জিনিষ আনতে গেছিলাম তোমার জন্য। তাই এত দেরী। লজ্জিত মুখে বলে দেবাশীষ।

—কি জিনিষ? উজ্জ্বল চোখে তাকায় অনু।

পিছন থেকে সামনে হাত দুটো আনে দেবাশীষ। হাতের মধ্যে একটি বাচ্চা কুকুর। লোমে ভর্ত্তি, শরীরের মাঝে মাথায় জ্বল-জ্বল করছে চোখ দুটো। ঝুলে-পড়া কান দুটো তার দুলতে থাকে, আর সে অসহায় ভঙ্গীতে তাকিয়ে থাকে অনুর দিকে।

—তোমার জন্য কিনে আনলাম, যোগাড় করে দিয়েছে অনিন্দ্য। এই উপহারের ভেতরে কোন মিথ্যা নেই, বিশ্বাস কর তুমি। দ্বিধাভরা গলায় বলে দেবাশীষ।

মনের আনন্দে দু'হাত বাড়িয়ে কুকুর বাচ্চাটাকে কোলে তুলে নিয়ে চুমা খায় অনু। তারপর স্থির চোখে দেবাশীষের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে অনু, বলে—বিশ্বাস করি তোমায়। তাই এত সহজে গ্রহণ করলাম তোমার দেওয়া উপহার। আর, আর তুমিই যে আমার একান্ত আপনার!

প্রেমের গোপন কথা

(From William Blake's Love's Secret)

শোহিনীকে তুমি ভালোবাসো বোলো না কে—
না বলা প্রেমেই প্রেমিকের পরিচয়,
কারণ জানো না? অগোচরে ধীরে ধীরে
শীতল মদির মধুর বাতাস বয়।

মোর প্রেমিকার কানে কানে একদিন
করেছি ব্যক্ত যেই মোর ভালোবাসা ;—
বিবর্ণ ভয়ে সে আমারে ছেড়ে গেলো—
ভেঙে দিয়ে গেলো সকল সুনীল আশা।

মোর কাছ হতে চলে সে যাবার পরে
একটা পথিক লঘু পায়ে কাছে আসে,—
এবং তাকে সে নিয়ে গেলো ধীরে ধীরে
মোর অগোচরে একটি দীর্ঘশ্বাসে।

অনুবাদক—শ্রীমঞ্জুষ দাশগুপ্ত

প্রতীক্ষায়

অসীম বসু

বিশ্বের শ্রান্তহীন পথ-চলা পথিকের স্রোতে
তোমাকে দেখেছি আমি বিজলীর চকিত ঝিলিকে,
দিগন্ত আকাশে যেন ডানা-মেলা উড়ন্ত উধাও বলাকার মতো।
কর্মের সমুদ্র-স্রোতে সংঘাতে বা বহু পথ হেঁটে হেঁটে এসেও
ক্ষণ দেখা সেই শুভ মুহূর্ত্তের বেদনাকে আজও ভুলিনি।

জানি, ক্লান্তির নৈরাশ্যে যেদিন রৌদ্রদগ্ধ কুকুরের মতো ধুঁকবো
সেদিন জানাবে তুমি সম্মুখের সাগরের বিশাল বিক্ষুব্ধ মত্ত
অক্লান্ত ঢেউয়ের স্রোতে
অফুরান উচ্ছল আমেজের ফেনিল সন্ধান।
তখন, আবার পাড়ি দিবো নির্ভীক চেতনা ডানায় সাগর-কপোত হয়ে
ভর দিয়ে, নতুন দিগন্তছোঁয়া কোন এক সূর্য্য-দ্বীপে।

ঝরাপাতা নিঃসীম গাছের বেদনাকে বুকে নিয়ে
আজও আমি ফাগুনের প্রতীক্ষায় আছি।

পরকীয়া

মানবেন্দ্র পাল

যদিও অসমবয়সী, তবু রসালাপ ও রসিকতায় বাধা ছিল না কিছু।

সদা হাসিখুশি মানুষ। কাঁচায়-পাকায় মেশা চুল সেকালের বিলাসী বাবুর মতো সিঁথির দু'পাশ দিয়ে ঝুলে পড়েছে কান পর্যন্ত। রোজ দাড়ি না কামালে চলে না। না হলে এক দিনেই দাড়ি উঠে যায়। কাঁচা পাকা গোড়ায় গাল ভর্তি হয়ে যায়। ভিতরের গেঞ্জিটা হয়তো শতছিন্ন, ময়লা কিন্তু গায়ের পাঞ্জাবীটি সেকালের মতো মলিদার—ইস্ত্রি নষ্ট হয়ে গেছে, তবু গিলের চিহ্ন আছে। চোখে সে-আমলের চশমা।

এই হল একজন। আর একজন হল ত্রিশের কাছাকাছি যুবক। মুখে-চোখে প্রজ্ঞার দীপ্তি। কখনো ফুলপ্যান্টের ওপর বুসকোর্ট, কখনো বা সুপারফাইন ধুতির ওপর আদ্দির পাঞ্জাবী—মাঝে মাঝে আবার শ্রীনিকেতনের তৈরি গেরুয়া পাঞ্জাবী চিলে পায়জামার ওপর।

বয়েসের হিসেব করলে এঁদের সম্পর্কটা দাঁড়ায় বাপ আর ছেলের মতো। কিন্তু অফিসে কি মেসে ও সম্বন্ধ মনে আসে না—সেখানে সবাই সহজ—সকলের সঙ্গেই সম্পর্ক এক—বন্ধু। কাজেই হরিহর বাবু যখন নিজে ডেকে শ্রীমান অতীন্দ্রকে নিয়ে রসালাপ শুরু করেন, তখন অতীন্দ্রও যেমন ক্ষুণ্ণ হয় না, তেমনি পাশের টেবিলের সহকর্মীরাও কিছু আশ্চর্য হয় না।

রসালাপটা শুরু হয় বিশেষ করে অতীন্দ্রর স্ত্রীকে নিয়ে। বিয়ে করেছে—তা দেখতে দেখতে বছর সাতেক হয়ে গেল বৈ কি। কিন্তু হরিহর বাবুর অত হিসেব নেই। বিয়ের দিন থেকে এক সপ্তাহের ছুটি নিয়ে অতীন্দ্র সেই যে বাড়ি গিয়েছিল সেই থেকেই শুরু হয়েছে তাঁর ঠাট্টা। ছুটির পর প্রথম দিন আপিসে আসতে এমনিতেই কেমন যেন অপরাধীর মতো একটা লজ্জা। তার ওপর সিঁড়ি দিয়ে উঠতেই পাশের ঘর থেকে আনন্দ-উচ্ছ্বাসে মেশা হরিহর বাবর গলা পাওয়া গেল। আরে, ও মশাই! শুনুন—শুনুন!

অতীন্দ্র লজ্জিত মুখে ফিরে তাকিয়েছিল।

—আরে আসুন না মশাই! মুখখানি আগে ভালো করে দেখি।

অতীন্দ্র অবশ্য তখনই যায়নি। আগে চাকরী রক্ষা, তার পর অন্য কথা।

ওপরে গিয়ে খাতায় নাম সইটি করে কর্তাদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করে বন্ধুবান্ধবের কাছে সহাস্য অভিনন্দন গ্রহণ করে ফিরে এসেছিল নীচের তলায় হরিহর বাবুর কাছে।

হরিহর বাবু তাকে সামনে দাঁড় করিয়ে দু'হাত দিয়ে অতীন্দ্রর দু'বাহু ধরে অনেকক্ষণ সর্বাঙ্গ পর্যবেক্ষণের ভাণ করতে লাগলেন।

অতীন্দ্র হেসে বললে—কী হল, অমন করে আমায় দেখছেন কী? এর আগে দেখেননি নাকি কখনো?

হরিহর বাবু তেমনি ভাবে বললেন—উঁহু। আমি দেখছি, তাঁর কোনো চিহ্ন কোথাও আছে কি না।

—কার চিহ্ন?

—কার? এই বলে সহাস্য ভ্রূকুটি করে হরিহর বাবু একটু থামলেন। তারপর সুর করে গেয়ে উঠলেন, যার—

'জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু
নয়ন না তিরপিত ভেল'—

অতীন্দ্র হেসে বলে—জনম অবধি আর কই, সবে তো এক সপ্তাহ।

হরিহর বাবুও ঠাট্টা করতে ছাড়েন না। বলেন—সেটা তো সামাজিক ভাবে। কিন্তু তোমাদের সম্পর্কটা? বলি পরিচয়টা কত দিনের? সে কি আজকের? এই বলে হরিহর বাবু আবার গুন-গুন করে ওঠেন।

—'দিবস রজনী হয়নি যখন তখন গণেছি মাস।'

অতীন্দ্র বলে—যথেষ্ট হয়েছে থামুন। এখন যাই। সাত দিন পর এলাম, একটু কাজ-কর্ম্ম করিগে। নইলে শেষ পর্যন্ত—

কথা শেষ না করেই হরিহর বাবুর স্নেহ-বন্ধন উপেক্ষা করে তরুণ প্রেমিক দ্রুত পায়ে চলে যায়।

এই হল সূত্রপাত।

তারপর থেকে প্রতি সপ্তাহে বাড়ি থেকে ঘুরে এলেই হরিহর বাবুর রসিকতা শুরু হয়। শুধু ঘুরে এলে নয়, যে দিন বাড়ি যাবে সেদিন থেকেই।

প্রতি শনিবার বাড়ি যায় অতীন্দ্র। দু'টো তিরিশে গাড়ি। এর পরেও গাড়ি আছে। কিন্তু প্রথম গাড়িটি যেন না ধরলেই নয়। দুটো বাজবার আগেই কোনোক্রমে ফাইল-পত্তর চাপা দিয়ে ড্রয়ার

চাবি লাগিয়ে একটা ব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে হন হন করে বেরিয়ে যায়। সুপারফাইন ধুতি—কোঁচাটি ফুলের গুচ্ছের মতো কোমর থেকে ঝুলে পড়েছে আধখানা, চুড়িদার পাঞ্জাবী—মাথায় ফুর ফুরে তেলের গন্ধ। কিন্তু প্রথমেই বাধা। ঠিক সিঁড়ির মুখেই এসে দাঁড়িয়েছেন হরিহর বাবু। নিখুঁত ভাবে দাড়িটি কামানো। কোঁচাটি পকেটে গোঁজা। কে বলবে এই রসিক পুরুষটি এই মাত্র লেজারের মোটা খাতা টেবিলে খুলে রেখে এসেছেন।

—এ কী, পথ ছাড়ুন।

হরিহর বাবু ছেলেমানুষের মতো দু'হাত ছড়িয়ে পথ আগলে ধরেন। হেসে আবৃত্তি করেন,—'যেতে নাহি দিব।'

অতীন্দ্র উদ্বিগ্ন হয়ে বলে—ট্রেণ ফেল করব যে!

হরিহর বাবু ঠোঁট টিপে হেসে বলেন—এর পরেও তো ট্রেণ আছে। না হয় একটু দেরিই হবে। জীবনে শুধু প্রেমই করেছ, প্রেমের আর্ট শেখনি। মাঝে মাঝে প্রেয়সীকে একটু ভাববার অবকাশ দিও। বলে তৎক্ষণাৎ পথ ছেড়ে দেন।

অতীন্দ্র হাত নেড়ে হাসতে হাসতে অভিবাদন করে চলে যায়।

শনিবার অতীন্দ্র বাড়ি যায় আসে সোমবার। ভোরে উঠে ট্রেণ ধরতে হয়। কোনো রকমে কলকাতায় পৌঁছেই দু মুঠো খেয়ে আপিসে চলে আসে। দাড়ি কামানোও হয় না, স্নানও হয় না।

সেই বিপর্যস্ত রূপ দেখেও হরিহর বাবুর রসিকতা উথলে ওঠে। অতীন্দ্রর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে এক সময়ে বলে ওঠেন—বড়ো হিসেবী গিন্নী পেয়েছো ভায়া, এক দিনেই সাত দিনের পাওনা উশুল করে নিয়েছেন। বলেই হা-হা করে হেসে ওঠেন। অতীন্দ্রর মুখ লজ্জায় লাল হয়ে যায়।

এ সব ঘটনা ছিল বিয়ের গোড়ার দিকে, তা প্রায় বছর ছয় আগে। কিন্তু হরিহর বাবুর অত হিসেব নেই। এই ছ'-সাত বছর পরেও তেমনি ঠাট্টা করে চলেন। কিন্তু তেমন করে অতীন্দ্রর মুখ লাল হয় না।

ছ'-সাত বছরের ব্যবধানে অতীন্দ্রর জীবনে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। গুটি তিনেক সন্তান হয়েছে! মাইনে কিছু বেড়েছে। কিন্তু খরচ বেড়েছে চতুর্গুণ। তেমন করে আর সুপারফাইন ধুতি পরতে দেখা যায় না—চুলের বাহারও তেমন নেই—সে গন্ধতেলও নেই, এমন অনেক শনিবার গেছে, হয়তো দাড়ি পর্যন্ত কামানো হয়ে ওঠেনি। তবু প্রতি শনিবার বাড়ি যাওয়া চাই এবং ঐ দুপুরের গাড়িতেই।

হরিহর বাবুর কিন্তু কোনো পরিবর্তন নেই। সেই চুল—আর একটু পাক ধরেছে এই যা! সেই পাঞ্জাবী—কোঁচাটি তেমনি পকেটে গোঁজা। এখনো রোজ দাড়ি কামানো—সেই মধুর হাসি।

—যাচ্ছ? 'শিবাস্তে সন্তু পন্থানঃ।' তোমার যাত্রাপথ মঙ্গলময় হোক। হ্যাঁ, দেবীকে বোলো, সেই আপাতদৃশ্য বৃদ্ধ এখনো মরেনি। সে তোমার কুশল জিজ্ঞাসা করে এবং কুশল কামনা করে।

অতীন্দ্র তেমনি হেসে হাত নাড়ে। কিন্তু বেশিক্ষণ দাঁড়াতে পারে না, ইচ্ছেও করে না। এখুনি ষ্টেশনে পৌঁছতে হবে। তার আগে ছোটো মেয়েটার জন্যে একটা ফ্রাক্সো কিনতে হবে। যা অবস্থা হয়েছে—দেশে এ-সব মেলেই না।

দুপুরের ট্রেণটাই ধরে অতীন্দ্র। পৌঁছয় সন্ধ্যে হব-হব সময়ে। এক সময়ে প্রথম প্রথম এই গোধূলি লগ্নটি ছিল বড়ো মধুর। তখন বাড়ি আসত মনে একটা ছবি নিয়ে, আশা নিয়ে। সে স্বপ্ন বা আশা কোনো বারই ব্যর্থ হয়নি। নববধূর তখনো ভালো করে লজ্জা যায়নি। হঠাৎ সপ্তাহ পরে স্বামীর সামনে বেরোতে পারত না। শাশুড়ী অমায়িক প্রকৃতির। তিনিই ঠেলে-ঠুলে নানা কাজের অজুহাতে পাঠিয়ে দিতেন বৌকে ছেলের কাছে।

আবার কোনো কোনো দিন এসে পড়েছে এমন সময়, যখন ছোট্ট হাত-আয়নাটি সামনে নিয়ে শ্রীমতী চুল বাঁধছে কিম্বা ভিজে কাপড়ে উঠে আসছে ঘাট থেকে।

সে-সব শনিবারের প্রতিটি মুহূর্ত গেছে রোমাঞ্চে ভরা। তখন হরিহর বাবুর ঠাট্টা মনে খুশির আমেজ এনে দিত।

তার পর বৎসর কেটে গেছে একটির পর একটি। সেই সঙ্গে একটি দুটি করে সন্তান হয়েছে অতীন্দ্রর। এক-একটি সন্তান হয় আর যেন মৃত্যুর পর থেকে ফিরে আসে তার স্ত্রী। মাথার চুল উঠে গেছে—চোখের কোণে কালি—ক্ষীণ খনখনে গলা।

প্রতিবারই প্রতিজ্ঞা করে তারা 'আর নয়'। কিন্তু—অসহ্য শীতের রাতে কিম্বা ঘন বর্ষার অজস্র বারিবাতের মধ্যে মাঝে মাঝে সে গোপন প্রতিজ্ঞার কথা চাপা পড়ে যায় বৈ কি! স্ত্রীর উপর অবাধ অধিকার আছে বলেই স্বাস্থ্য লাবণ্যর স্তুতি গাইবার প্রয়োজন হয় না।

তবু শনিবার আসে—অতীন্দ্রও যায়—স্ত্রী আর বধূ নয়—গৃহিণী—জননী। এখন গোপনে তেমন দেখা হয় না—দেখা হলেও কথা হয় না—কথা হলেও তা নিতান্ত বৈষয়িক। তার মধ্যে হরিহর বাবুর কথা মনে আসে না।

কিন্তু হরিহর বাবুর অত জানবার কথা নয়। তিনি অতীন্দ্রর স্ত্রীকে কোনো দিনই দেখেন নি। তাঁর কাছে সাত বছর আগের সেই বিরহিণী নববধূ আর গৃহগমনেচ্ছু যুবক একই অবস্থায় আজও আছে। যেখানে প্রেম টোল খায় নি। সেই আনন্দে আত্মহারা হয়ে প্রতি সোমবার প্রৌঢ় এগিয়ে এসে অতীন্দ্রকে জড়িয়ে ধরলেন।

—সখা! বৃন্দাবন অন্ধকার করে মথুরায় চলে এলে! আহা! আজ থেকে তাঁর শুরু হল দুঃখের দিন।

"তোমারি বিরহে দীন ক্ষণে ক্ষণে
তনু ক্ষীণ চৌদশী—চাঁদ সমান—।"

শ্রান্ত-ক্লান্ত অতীন্দ্র। ভালো লাগে না এখন আর এসব ব্যর্থ রসিকতা। তবু হাসতে হয়—সেই পুরনো হাসিটা।

আবার আসে এক শনিবার। তেমনি তাড়াতাড়িই বেরিয়ে পড়ে অতীন্দ্র। চুপি চুপি পালাচ্ছিল, কিন্তু নিষ্কৃতি পেল না। হরিহর বাবু ঠিক সিঁড়ির মুখে এসে দাঁড়িয়েছেন। হাতে একটি রক্ত গোলাপ!

আজ আর গান বা আবৃত্তি হল না। হরিহর বাবু ফুলটি অতীন্দ্রর হাতে দিয়ে বললে—এরই রঙের মতো বোধ হয় তার গায়ের রঙ। এটি তাঁকে দিয়ে বোলো ; সেই বৃদ্ধের বাগানের ফুল! উপহার পাঠিয়েছেন। নিলে কৃতজ্ঞ হব। এই বলে নাটকের ভঙ্গিতে মাথা দুলিয়ে পথ ছেড়ে দিলেন।

এদিন আর দুপুরের ট্রেণ ধরা গেল না। বড়ো ছেলেটির কয়েকটি বই কিনে নিয়ে যাবার দরকার ছিল। বড়ো ছেলের বই—মেজো ছেলের লজেন্স কিনে, পোস্তা থেকে শস্তায় কিছু বাজার করে বিকেলের ট্রেণে উঠল অতীন্দ্র। গয়া প্যাসেঞ্জার। অনেক দূরের যাত্রী সব রয়েছে। তারই মধ্যে একটু জায়গা করে নিয়ে বসল।

কম্পার্টমেন্টটা ছোটো। ওদিকের বেঞ্চিতে বসেছে খোট্টার দল। আর এদিকের বেঞ্চিতে ঝাড়ন পেতে চলেছে তাস খেলা। মাঝের বেঞ্চিতে এক পাশে জায়গা পেয়েছে অতীন্দ্র। আর সামনের বেঞ্চিতে কয়েকটি মেয়েছেলে। অধিকাংশই বর্ষীয়সী, কেবল কোণের দু'জন তরুণী। তাদের একজনের বিয়ে হয়েছে বোধ হয় হালে—সীঁথেয় টকটকে সিঁদুর—গাভর্তি গয়না আর মুখের হাসি দেখে তাই মনে হয়। অন্য সঙ্গিনীটিরও বয়েস অল্প, তবে বোধ হয় সন্তানের জননী। দুই সখীতে চলেছে হাস্য পরিহাস।

নববধূর চোখের ভ্রূভঙ্গি বড়ো সুন্দর—মুখের ওপর খর যৌবনের দ্যুতি। গায়ের রঙ দেখে মনে পড়ে গেল হরিহর বাবুর দেওয়া গোলাপ ফুলটির কথা।

তাড়াতাড়ি খুঁজে জামার পকেট থেকে বের করলে অতীন্দ্র। একবার দেখল ফুলটিকে ভালো করে, তারপর মেলাতে গেল তরুণীর অঙ্গের সঙ্গে। চোখাচোখী হল। মুহূর্তমাত্র। মনে হল কত দিনের অচেনা যেন এইমাত্র অতিচেনা হয়ে গেল।

নববধূ চোখ নামিয়ে নিল বটে কিন্তু মুখে হাসিটি লেগে রইল। দ্বিগুণ উৎসাহে গল্প শুরু করল সমবয়সীর সঙ্গে। কথার ভাবে ভ্রূ দুটি কখনো বেঁকে যাচ্ছিল, কখনো বা ভেঙ্গে যাচ্ছিল। তারই ফাঁকে ফাঁকে চুরি করে তাকাচ্ছিল ফুলটির পানে। বড়ো সুন্দর ফুল!

বাড়ি পৌঁছল অতীন্দ্র সন্ধ্যে উত্তরে গেলে। ঘরে ঢুকতেই স্ত্রীর কণ্ঠ পাওয়া গেল। চীৎকার করে বড়ো ছেলেটাকে পিটোচ্ছে—আর ছেলেটা কাঁদছে মর্মান্তিক সুরে।

—আসুক তোর বাবা, তারপর হচ্ছে।

অতীন্দ্র ঢুকল এই সময়। কী ব্যাপার?

—এই তো এসে পড়েছে। এই নাও তোমার গুণধর ছেলেকে। যা হয় করো।

অতীন্দ্রর মা বাতে পঙ্গু হয়ে বিছানায় পড়েছিলেন। বললেন মুমূর্ষু স্বরে—সেই থেকে বৌমা ছেলেটাকে মেরে মেরে শেষ করে দিলে।

—কী হয়েছে কী? অতীন্দ্র একটু ঝাঁঝের সুরে বললে।

—কী হয়েছে, তোমার গুণধর ছেলেকেই জিগ্যেস করো।

ছ' বছরের ছেলেটি তখন দেওয়ালে ঠেসান দিয়ে দু'চোখ রগড়ে কাঁদছিল। অতীন্দ্র জিগ্যেস করলে। কিন্তু উত্তর পাওয়া গেল না।

—কী হয়েছে, তুমিই বলো না।

স্ত্রী তেমনি ঝাঁঝের সুরেই বললে—হয়েছে আমার মাথা আর মুণ্ডু। গত সপ্তাহে যে বইখানা কিনে দিয়েছিলে সেটাও ইস্কুলে হারিয়ে এসেছেন। বইপত্তর ফেলে রেখে কোথায় যে যায়—এত বড়ো ছেলে হল একটু হুঁস দিশে নেই!

অতীন্দ্র বললে—এরই জন্যে এত মার! তা না হয় আর একটা বই কিনেই দেব। এত খরচ হচ্ছে আর—

এ কথায় অতীন্দ্রর স্ত্রী ফুঁসে উঠল। তার দু'চোখ লাল—আবাঁধা রুক্ষ চুল মুখের ওপর এসে পড়ছিল—আঁচলের একটা প্রান্ত লুটোচ্ছিল মেঝেতে। হাতের লাঠিটা সশব্দে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললে—ও ভাবে কক্ষণো ছেলেকে প্রশ্রয় দেবে না বলে দিচ্ছি! সপ্তাহে একদিন এসে দরদ দেখানো হচ্ছে! বলতে বলতে তার শীর্ণ গাল বেয়ে নামল অশ্রুধারা।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে অতীন্দ্রর মা ধমকে উঠলেন,—চুপ করো বৌমা, কথায় কথায় ভর-সন্ধ্যেবেলায়—কান্না আমার ভালো লাগে না।

অতীন্দ্রর স্ত্রী দ্বিগুণ জোরে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

সে সোমবারে যথাসময়ে যথানিয়মে অতীন্দ্র ফিরল কলকাতায়। এল আপিসে। টিফিনের সময় দেখা হল হরিহর বাবুর সঙ্গে। তেমনি হেসে বললেন—কেমন কাটল দু'টি রাত? রবিবারের রাত বড়ো তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যায়, না হে? বলেই সুর ধরলেন—

"তাই করি প্রার্থনা, করি জোড় হাত,
যেন এ যামিনী আর না হয় প্রভাত,
আর যেন উদয় হয় না দিননাথ
এই ভিক্ষে চরণে।"

তবু নিষ্ঠুর সোমবার এল। আবার শুরু হল বিরহ! অতীন্দ্র শুনছিল। অন্য দিন এতক্ষণে অধৈর্য হয়ে উঠত। কিন্তু আজ আর তা হল না। কেমন যেন নতুন লাগছিল—ভালো লাগছিল এই রসিকতাটুকু—যেমন লাগত দীর্ঘ সাত বছর আগে।

সত্যিই একটি নবীন যুবা আর একটি নববধূ। ঠিক যেমনটি দেখেছিল শনিবার দিন ট্রেণে। অমনি খরযৌবনা লাস্যময়ী যুবতী। সে কার স্ত্রী জানা নেই। সে স্বামীটিও কি আজ তারই মতো পালিয়ে এসেছে কর্মস্থলে? ঘরে তার বিরহিণী প্রিয়া আজ থেকেই শুরু করেছে দিন গুণতে।

এক প্রৌঢ় পুরুষের সামনে বসে অতীন্দ্র অফিসের কাজের অবসরে এক মনে এক অলীক দিবাস্বপ্ন দেখতে লাগল। হরিহর বাবুর দেওয়া রক্তগোলাপটা তার জামার বুকপকেটে শুকিয়ে ঝরে গেছে,—কিন্তু গন্ধটা একেবারে মিলিয়ে যায়নি।

[একটি ইংরেজী গল্প অবলম্বনে]

মাধবী ভট্টাচার্য্য

ক'দিন থেকেই মনে মনে আওড়াচ্ছি—নাঃ, এমন করে আর চলে না! এই ছোট্ট খুপরী ঘর—তার ভেতর না ঢোকে রোদ, না চলে বাতাস. তার ওপর ভাড়া গুণতে হয় মাসে পঁচিশ টাকা। এতে কি আর আমার মতো ভদ্রলোকের পোষায়? ওদিকে আর এক বিপদ! মানগোবিন্দ বাবু—আমার বইগুলো যিনি প্রকাশ করেন—তিনি প্রায় রোজই এসে একবার করে তাগাদা দিয়ে যাচ্ছেন। তিনি তো তাগাদা দিয়েই খালাস, কিন্তু এদিকে আমার অবস্থা যে কাহিল!

এই স্যাঁৎসেঁতে খুপরী ঘরে চারপাই-এর খুঁটের ওপর মোমবাতি জ্বালিয়ে বুকে বালিস চেপে, যত রাজ্যের মশা আর ছারপোকার অত্যাচার সহ্য করতে করতে মা সরস্বতীকে যে ধ্যেয়ানে ধারণ করি কত কসরত্তে—সে কথা তো আর তিনি বোঝেন না, বুঝবার তাঁর গরজও নেই। প্রতি ছয় মাসে কয়েক দিস্তার ভারী পাণ্ডুলিপি হস্তগত করতে পারলেই তিনি খুসী। এইটুকুই তাঁর প্রয়োজন—এইখানেই তাঁর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ।

কিন্তু সে যা হোক। মানগোবিন্দ বাবু তো খুসী হবেনই—তাঁর জন্যে অনেক সময় হাতে আছে। কিন্তু উপস্থিত আমি নিজে খুসী হোতে না পারলে যে দিন আর চলে না।

ঘর একটা চাই-ই এবং ভাল ঘর। একটা নতুন উপন্যাস ধরেছি—"চন্দনপঙ্ক"—কিন্তু মড়িখেগো এই ঘরের পঙ্কে এমনিই আড়ষ্ট হোয়ে পড়ছি দিনকে দিন যে, লেখাটা আর কোন ক্রমেই এগোতে চাইছে না, অথচ ওটাকে আগামী পূজোর আগেই

শেষ করে মানগোবিন্দের চরণাম্বুজে সমর্পণ করতেই হবে। কারণ আগাম টাকা খেয়ে বসে আছি।

অকস্মাৎ বিধাতা সদয় হোলেন। বোস পাড়া লেনের কোণের দিকে সর্বশেষের বাড়ীটি নাকি খালি হোয়েছে—একদিন ঘুরতে ঘুরতে খবর পেয়ে গেলাম। আর কথা নয়। তৎক্ষণাৎ গিয়ে বাড়ীওয়ালা ভদ্রলোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ফেললাম।

বড়লোক মানুষ। সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ওপাশ থেকে বক্র কটাক্ষে আমার দিকে চেয়ে চেয়ারে বসবার ইংগিত করে বললেন—বাড়ী চান? বোস পাড়া লেনের বাড়ীটা? কিন্তু কেন?

অদ্ভুত প্রশ্ন! বাড়ী চাই—কিন্তু কেন!

আজ্ঞে, বাস করবো বলে। খুব বিনীত হোয়েই উত্তরটা দিলাম. কারণ গরজ বড় বালাই!

—আর কোথাও বাড়ী পেলেন না?

—সুবিধে মতো আর পাচ্ছি কই বলুন? হয় দর, না হয় ঘর, দুটোর সঙ্গে আপোষ-রফা এত চেষ্টা সত্ত্বেও হোয়ে উঠছে না!

—আচ্ছা থাকগে। ভদ্রলোক সংক্ষিপ্ত কোরতে চাইলেন আলোচনাটাকে।

—আপনি সত্যিই বাড়ীটা ভাড়া নেবেন?

—আজ্ঞে সেই জন্যেই তো আপনার কাছে—

—থাকতে পারবেন তো?

—না পারার কোন হেতু আছে নাকি?

দেখুন, কথাটার খোলাখুলি আলোচনা হওয়াই ভাল। আপনার কথাবার্তা শুনে বোধ হোচ্ছে, ও বাড়ীটা সম্বন্ধে জনরব এখনো আপনার কানে পৌছোয়নি। পৌছোলে ও বাড়ীটা নেবার জন্যে এতোটা আগ্রহ আপনার থাকতো কি না সন্দেহ!

কৌতূহলী হোয়ে উঠলাম। ভদ্রলোক বললেন,—ব্যাপারটা যে ঠিক কি এবং ঘটনার স্বরূপটাই বা কোন ধরণের, আমি নিজে এত দিন ধরে অনুসন্ধান করেও বুঝে উঠতে পারলাম না। অথচ কিছু যে একটা ঘটছে আর সেই কিছুটাও যে একটা মারাত্মক কিছু—একথা অস্বীকার করে লাভ নেই।

—গুরুতর কোনো—

—গুরুতর তো বটেই এবং জটিলও। তবে ভৌতিক কোনো কিছু বলে আমি বিশ্বাস করি না।

—তা' হোলে?

—বলছি শুনুন। প্রথম যে ভদ্রলোক ও বাড়ীটা ভাড়া নিয়েছিলেন, তিনি ছিলেন এক মার্চেন্ট অফিসের বড় বাবু। বয়স্থ ভদ্রলোক। সংসারে এক গাদা ছেলে-পিলে, পোষ্য-পুষ্যি। বছর দশেক ওই বাড়ীতে বাস করে চাকরী থেকে বিদায় নিয়ে ভদ্রলোক দেশে চলে গেলেন। বাড়ী দখল করে বসলেন এক পার্শীদম্পতি। দু'জনেরই বয়স অল্প। একই ফার্মে চাকরী করে। দেখে মনে হোত, ওরা সত্যিকারের সুখী দম্পতি। কিন্তু কোথায় যেন একটা গোলমাল ছিল। একদিন সন্ধ্যাবেলা পাড়ার লোকেরা আর স্বামীটিকে রোজকার মতো স্ত্রীর হাত ধরে বাসায় ফিরতে দেখলো না! তার পরদিনও না—তার পরের পরের দিনও না—অর্থাৎ আর কোনো দিনই না। মাস তিনেক কেটে গেল। কানাঘুঁসোয় খবরটা আমার কাছেও এসে পৌঁছোলো। ব্যক্তিগত ভাবে আমার দিক থেকে বলবার কিছু

ছিল না, কারণ স্বামীর অবর্তমানেও মেয়েটি বাড়ী ভাড়ার টাকাটা যথারীতি আমার কাছে পৌঁছে দিচ্ছিল, কিন্তু তবুও ভদ্রলোক একটু থেমে বললেন—বোঝেন তো সব ?

একদিন সকালে গাড়ীটা নিয়ে বের হলাম অপ্রিয় কর্তব্যটুকু সমাধা করবার জন্যে।

মেয়েটি যেমন সুন্দরী, তেমনি ভদ্র। আমাকে হাত ধরে নিয়ে গিয়ে একটা সোফায় বসিয়ে বললে—বাবুজী, তুমি কেন এসেছ আমি জানি। আমাকে নোটিশ দিবার জন্যে, এই তো ? তোমার সঙ্কোচ করার প্রয়োজন নেই বাবুজী! আমি এই মাসের মধ্যেই বাড়ী ছেড়ে দেবো।

—বড় লজ্জিত হোয়েছিলাম মশাই সেদিন। ভদ্রলোক বললেন।

—কিন্তু সে যাক। মেয়েটি তার কথা রেখেছিল। সেই মাসের মধ্যেই সে বাড়ী ছেড়ে দিয়েছিল। শুধু সে বাড়ী নয়— এ পৃথিবী থেকেই সে ইস্তফা দিয়ে গিয়েছিল।

—মানে ?

—একদিন সকালবেলা নিজের বুকে গুলী করে ও আত্মহত্যা করলে।

—আশ্চর্য্য !

—আশ্চর্যই বটে! ওর আত্মহত্যার কিনারা করা দূরে থাক, পুলিশ ওই দম্পতির কোনো রহস্যেরই সমাধান করতে পারেনি।

গল্পের এই পরিণতিতে হতবুদ্ধি হোয়ে পড়েছিলাম। কিছুক্ষণ কোনো কথাই বলতে পারলাম না। ভদ্রলোকও নীরবে বাইরের দিকে চেয়ে বসে রইলেন। অনেকক্ষণ পরে আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করলাম—সেই থেকেই বুঝি ও বাড়ার ভাড়াটে পাওয়া যাচ্ছে না ?

—ভাড়াটে পাওয়া যাবে না কেন মশাই, ভাড়াটে বেশ পাওয়া যাচ্ছে কিন্তু মাস খানেকের বেশী কাউকেই ধরে রাখতে পারছি না।

—কারণ কি ?

—আরে মশাই, সেইটেই তো প্রশ্ন। ভাড়াটে চলে যাবার সময় ডেকে শুধাই, ও মশাই যাচ্ছেন কেন ? ভুতুড়ে কিছু কি দেখেছেন—কোন উপদ্রব টুপদ্রব ?

ভাড়াটে জবাব করে, না মশাই, অত দূর পর্যন্ত গড়াতে পারিনি। যতদূর হোয়েছে তাই যথেষ্ট। ধন-প্রাণ নিয়ে যে ফিরে এসেছি এই বাপের পুণ্যি।

স্পষ্ট উত্তর কারো কাছেই পাইনি।

—বেশ মজা তো !

—মজাই বটে! দু'-তিন জন ভাড়াটের কাছে একই কথা শুনে শুনে বিরক্ত হোয়ে আমি নিজে গেলাম ও বাড়ীতে কয়েকটা রাত কাটিয়ে আসবার জন্যে। কিছুই নেই। গোলমালের নাম-গন্ধ নেই—একটা স্বপ্ন পর্যন্ত দেখলাম না।

—তবে আর কি—সমস্ত ব্যাপারটার নিষ্পত্তি করে দিয়ে আমি বললাম—আপনারও একজন স্থায়ী ভাড়াটে দরকার আর আমারও মাথা গুঁজবার জন্যে একটা স্থায়ী আস্তানা প্রয়োজন। আপনি আমার সঙ্গেই সব পাকাপাকি ব্যবস্থা করে ফেলুন।

ভদ্রলোক কিছুক্ষণ নীরবে আমার পানে চেয়ে রইলেন। তারপর বললেন, Young man! কেমন যেন ভরসা পাচ্ছি না ভাই! তবুও নিতে চাইছেন, নিক—দু'দিন বাস করেই দেখুক। সুবিধে বোধ করেন—থাকবেন, না হোলে বিনা দ্বিধায় আমাকে চাবি ফেরৎ দিয়ে যাবেন।

ড্রয়ার থেকে একটা চাবি বের করে আমার হাতে দিতে দিতে আবার বললেন, এর জন্যে ভাড়া বাবদ আর কিছু আপনাকে দিতে হবে না।

হেসেই চাবিটা গ্রহণ করলাম এবং ভদ্রলোককে নমস্কার জানিয়ে বিদায় নিলাম।

সেই দিনই সন্ধ্যাবেলা সামান্য যা কিছু তল্পিতল্পা ছিল, গুটিয়ে নতুন বাড়ীতে এসে হাজির হলাম।

সুন্দর দোতলা বাড়ী। নীচে তিনখানা ও ওপরে দু'খানা বেশ বড় বড় ঘর। প্রচুর আলো আর বাতাস। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে সামনের ঘরখানায় পা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই মনটা একটা অনাস্বাদিতপূর্ব রসে ভরে উঠলো। ঘুরে ঘুরে সমস্ত বাড়ীটা দেখে নিলাম। সত্যি, মনের মতো বাড়ী একখানা পেয়েছি বটে!

তাড়াতাড়ি খাটের ওপর বিছানাটা পেতে যথস্থানে লিখবার টেবিলটা সাজিয়ে ফেললাম। ইচ্ছে আর করছে না নীচে নেমে হোটেল থেকে চারটি খেয়ে আসতে। থাকগে না, একটা রাত উপোস দিলেই বা ক্ষতি কি ? কিন্তু না, নীচে একবার নামতেই হবে— কয়েকটা দরকারী জিনিস কেনবার আছে।

ফিরতে আমার আধ ঘণ্টাও দেরী হয়নি। ঘরটার চার পাশে একবার চোখ বুলিয়ে নিলাম। সুন্দর পরিচ্ছন্ন, ঝরঝরে, আর তকতকে। মালিন্যের চিহ্নও কোথাও নেই। খাতার পাতায় কলমের আঁচড় টানলাম।

দশ মিনিট এক নাগাড়ে কলম চালাবার পর এক অদ্ভুত বিরক্তিতে আমার মন ভরে উঠলো। উপন্যাসটা এতদিন ধরে প্রায় অর্দ্ধেকের বেশী শেষ করে এনেছি। আমার ধারণা ছিল এই উপন্যাসটির মারফৎ এক যুগান্তকারী সৃষ্টি সাহিত্যের বাজারে ছাড়বো। এক একটি পাতা যে মুহূর্তে শেষ করেছি, সেই মুহূর্তে মনে মনে এত কাল অপূর্ব আত্মতৃপ্তি লাভ করেছি। কিন্তু আজ এক সম্পূর্ণ বিপরীত ধরণের চিন্তা এসে আমার মনকে আচ্ছন্ন করে দিল। মনে হোল—এত দিন ধরে রাত জেগে শরীরকে কষ্ট দিয়ে অজস্র কাগজ নষ্ট করে যা করেছি—সেটা আর কিছু নয়, ছেলেখেলা!

উঠে দাঁড়ালাম। পকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে ধরালাম। তারপর ঘরে পায়চারী করে বেড়াতে লাগলাম। অনেকটা সময় কেটে গেল। এক সময় টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। ইচ্ছে হোল বসি, আর একবার চেষ্টা করে দেখি। কিন্তু না, আর ভাল লাগছে না। কাল সকালে উঠে আরম্ভ করা যাবে। আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়লাম।

পরদিন সকালে চা খেয়ে কাগজটা নিয়ে বসেছি, অপ্রত্যাশিত ভাবে রাণুর আবির্ভাব!

ওর হাতটা ধরে ওকে নিয়ে এসে চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে বললাম— আগে বলো কি করে আমার খবর সংগ্রহ করলে? রাণু বললে, না, আগে তুমি বলো হঠাৎ আমাকে না বলে ক'য়ে তুমি কেন বাসা বদল করলে?

সময় কোথায় পেলাম বলো? হঠাৎ সকালবেলা ঘুরতে ঘুরতে খবর পেলাম, বাড়ীটা খালি পড়ে রয়েছে। দুপুরে বাড়ীর মালিকের সঙ্গে কথা বলে সন্ধ্যেতেই এসে অধিকার নিয়েছি। খবর দেবার সময়ই পেলাম না যে! আজই অবশ্য যেতাম তোমার কাছে। রাণুর দিকে তাকিয়ে হেসে কথাটা শেষ করে বললাম, কিন্তু বলতো বাড়ীটা কেমন? এত কম ভাড়ায় এ রকম একখানা বাড়ী খুঁজে বের করতে পারবে?

—থাকবে তো একলা। এত বড় বাড়ী নিয়ে করবে কি?

—সত্যি সেইটেই তো ভেবে দেখা হয়নি। কি করা যায় বল তো? রাণুর মুখের দিকে চেয়ে হেসে উঠলাম। রাণুও হেসে চোখ নামিয়ে নিলে।

হঠাৎ একটা আশ্চর্য ব্যাপার সংঘটিত হোল। রাণু আমার টেবিলের ওপর আলগা ভাবে হাত দুটোকে রেখে কথা বলছিল। ওর হাতের আঙুলগুলোর ওপর ঘরের ছাদ থেকে চুণ-বালির বেশ বড় একটা চাঙড়া ভেঙ্গে পড়লো।

উঃ মা গো! রাণু যন্ত্রণায় মুখটা বিকৃত করে হাতটা তাড়াতাড়ি কোলের ওপর নামিয়ে নিলো।

তাড়াতাড়ি জলপটী দিয়ে ওর হাতটাকে বেঁধে দিলাম। সজল চোখ তুলে মলিন হেসে রাণু বললে: ভাল বাড়ীই পেয়েছ যা হোক!

লজ্জা আর আঘাত—দু'টোই আমাকে পীড়া দিচ্ছিল। বললাম, —রাণু, বড্ড যন্ত্রণা হোচ্ছে, না? জলভরা চোখ তুলে রাণু বললে, যন্ত্রণা হোচ্ছে না, এমন মিথ্যে কথা আমি বলবো না। কিন্তু আমি এই ভেবে আশ্চর্য হচ্ছি, চুণ-বালি খসে পড়ার মতো অবস্থা আসতে যে বাড়ীর এখনো পঞ্চাশ বছরের ধাক্কা, সে বাড়ীর ছাদ থেকে চাঙড়া খসে পড়ে কি করে—আর ঠিক বিশেষ এক জনকেই লক্ষ্য করে!

—যাঃ, কি যে বলো তুমি রাণু! হতচকিত হোয়ে আমি বলে উঠি; এটা একটা দৈব-দুর্ঘটনা—এটাও বুঝতে পারছো না!

বললাম বটে। কিন্তু কথাটার বিসদৃশটা নিজের কানেই খট করে বাধলো।

দৈব দুর্ঘটনা! নিজের মনেই আওড়াতে লাগলো রাণু—হবেও বা! তারপর ঘরের চার পাশে ও চোখ বুলিয়ে বুলিয়ে দেখতে লাগলো। এক সময় আমার লেখার খাতাটা টেনে নিয়ে বললে, দেখি, কতদূর এগোলো লেখাটা?

রাণু লেখাটা পড়ে চলেছে। আমি ওর মুখের দিকে চেয়ে রয়েছি। পড়তে পড়তে ওর মুখের রেখাগুলো ক্রমাগত কুঞ্চিত হোয়ে উঠছে। তারপর এক সময় ও উঠে দাঁড়ালো। বললে— আমি চললাম।

আমি শুধু বিস্মিতই নয়, হতবাকও হয়ে পড়েছিলাম। তাড়াতাড়ি ওর যাবার পথ আগলে বললাম—ব্যাপার কি রাণু? ও নির্নিমেষে আমার পানে চেয়ে রইল। তারপর শান্ত স্বরে বললে, লেখাটার এ দুর্দশা করেছ কেন?

স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে আমি বললাম, ও তাই বলো, আমি ভাবলাম, বুঝি না জানি বা আর কিছু। কিন্তু। কিন্তু আসল ব্যাপারটা কি জানো রাণু! আমি কৈফিয়তের সুরে ওকে বোঝাবার চেষ্টা করি—ব্যাপার হোচ্ছে, এতদিন ধরে যা লিখে এসেছি, মনে হোচ্ছে, ওগুলো সব ছেলেখেলা। আগাগোড়া ওগুলোকে ঢেলে না সাজালে চলবে না।

—এই মনে হওয়াটা কি তোমার গত কাল রাত থেকে সুরু হোয়েছে? রাণু যেন ব্যঙ্গ করে বলে উঠলো।

—না, না, তা কেন। সত্যি কথাটা চেপে আমি বলবার চেষ্টা করি—ক'দিন থেকেই তো মনে মনে ভাবছি—

—দেখ, একটা কথা বলবো। রাণু বাধা দিয়ে বলে।

—আমার একটা কথা রাখবে?

—বলো।

—কি জানি কেন, আমার যেন মনে হোচ্ছে, এ বাড়ীতে থাকলে তোমার ও লেখা আর শেষ হবে না। তুমি এ বাড়ীটা ছেড়ে দাও।

আমার দু'হাত চেপে ধরলে রাণু। বললে—আমার এ কথাটা রাখবে না লক্ষ্মীটি! মিনতিতে ওর চোখ দুটো ছলছল করছে।

—পাগল, তুমি পাগল। সান্ত্বনা দেবার জন্যে ওকে বলি। চলো তোমাকে গলির মোড় পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসি।

বাস আসছে। রাণু বললে, দেখ তোমার সঙ্গে পরিচয় হবার দিন থেকে আজ পর্যন্ত কখনো তোমায় কোন অনুরোধ করিনি। আমার আজকের এই প্রথম অনুরোধ তুমি রাখবে না?

বাস এসে পড়েছে। বললাম—রাণু উঠে পড়ো।

—রাখবে তো?

—পাগল কোথাকার! বাস ছেড়ে দিল। রাণু চলে গেল।

আজ ক'দিন ধরে একটা নতুন অনুভূতি আমার সমস্ত মনকে আচ্ছন্ন করে রয়েছে। এ বাড়ীতে রাণুর আগমন আর আমার অভিপ্রেত নয়। মনের এই বিচিত্র গতির দিকে চেয়ে আমি নিজেই অভিভূত হোয়ে পড়ছি—অথচ আমার দিক থেকে করবার যেন কিছু নেই। আমার এই অদ্ভুত মানসিক পরিবর্তন যে রাণুর চোখ এড়ায় না—তা বুঝতে পারি। কিন্তু মেয়েটি তবু আসে—না ডাকলেও আসে—আসাটা যেন ওর প্রয়োজন!

একদিন ওর যাবার পরে সিঁড়িতে ওর পায়ের শব্দ তখনো মিলায় নি, হঠাৎ একটা আর্তনাদ শুনে ছুটে বেরিয়ে এলাম। সিঁড়ির মুখেই জুতো শুদ্ধ পা মুচকে রাণু পড়ে গেছে। দুর্ঘটনা!

ওকে হাত ধরে তুলছি, হিষ্টিরিয়া রোগীর মতো হেসে উঠলো। বড্ড মোটা হোয়ে পড়েছি গো, বড্ড মোটা হোয়ে পড়েছি।

দেখো না, সিঁড়িতে পা'টা পিছলে গেল। আঃ, ছাড়ো, ছাড়ো না আমায়—দেখছো না কিছু হয়নি।

—দাঁড়াও দেখি, কোথায় লাগলো। নীচু হোয়ে হাত বাড়াচ্ছি, ও পা সরিয়ে নিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতেই দরজার দিকে সরে গেল। না গো না, আমাকে যেতে দাও। আমাকে পালাতে দাও।

—কিন্তু তোমার পায়ে যে ব্যথা—যাবে কেমন করে?

—না, না লক্ষ্মীটি, আমাকে ধরে রেখো না। দেখছো না আমি এখানে অনাহূত। আমাকে এখানে কেউ চায় না।

—রাণু! ভাঙ্গা গলায় আমি আর্তনাদ করে উঠলাম। সঙ্গে সঙ্গে রাণু ঘুরে দাঁড়ালো।—ওগো, না, না, তোমাকে আমি ও কথা বলিনি। তোমাকে ও কথা বলিনি—কিন্তু না, হ্যাঁ, তোমাকেই তো বলেছি—আমাকে এখানে কেউ চায় না। আমি আসতাম না। সেদিনকার সেই ঘটনার পর আর আমি আসতাম না। কিন্তু থাকতে পারলাম না—ওগো, তোমাকে সত্যি করে বলছি, আমি চেষ্টা করেও থাকতে পারিনি।

আমার চোখের সামনে মেয়েটার বুকখানা টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙ্গে যাচ্ছে। আমি নিশ্চল পাথরের মতো দাঁড়িয়ে দেখছি। কী করতে পারি আমি—কী-ই বা বলতে পারি! হৃদয়ের গভীর কোণগুলো হাতড়ে বেড়ালাম—রাণু, রাণু, রাণু! নাঃ, রাণুর চিহ্ন মাত্রও সেখানে অবশিষ্ট নেই। রাণু এখনো কেঁদে যাচ্ছে। ওগো, আমি চলে যাই! আমাকে যেতে দাও। আমাকে পালাতে দাও।

—একটু দাঁড়াও রাণু! তোমাকে নিয়ে ডাক্তারখানায় যাবো। রাণুর চোখে জল। মুখে ম্লান হাসি। বললে—তোমাকে সহস্র ধন্যবাদ।

পেছন ফিরে খোঁড়াতে খোঁড়াতে আমার চোখের সামনে দিয়ে রাণু গলিটা পার হোয়ে গেল।

আজ রাত্রে আর কিছু খাবো না। ভাল লাগছে না কিছুই। রাণুর কান্না বিজড়িত স্বর এখনো আমার কানে বাজছে। বেচারী রাণু! কিন্তু কী করতে পারি আমি? কী করা আমার উচিত ছিল! আজ রাণু ওর সমস্ত মনটাকে উন্মুক্ত করে আমার সামনে মেলে ধরেছিল, কিন্তু আমি ওকে সান্ত্বনা দিয়েও বলতে পারিনি, না রাণু, ভয় নেই। আমি তো আছি। কি বলে তুমি আমার বাড়ীতে অনাহূতা। কার সাধ্য তোমাকে এখান থেকে তাড়িয়ে দেয়! কিন্তু হোল না—সাহস হোল না। পারলাম না বলতে। বেচারা বেচারী রাণু!

আচ্ছা, রাণুকে বিয়ে করলে কেমন হয়? রাণুর চেহারাটা আমার চোখের সামনে ফুটে উঠলো। পা মুচড়ে সিঁড়ির সামনে পড়ে রয়েছে। যন্ত্রণায় মুখখানা বিকৃত হোয়ে গেছে। দু'চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে।

এঃ, রাণুটা কি বিশ্রীই না দেখতে! পুরুষের মন জয় করতে চোখের জল যদি নারীর অস্ত্র হয়—তা' হ'লে যে কান্নার নমুনা আজ রাণু দেখালো—সেটা ওদের বিরুদ্ধ কথাই বলবে।

ঘর অন্ধকার। আলো জ্বালবার ইচ্ছা নেই।

আচ্ছা, মেয়েরা তো শুনেছি, মনে যখন প্রচণ্ড আঘাত পায়—ভয়ংকর ভয়ংকর সব কাজ করে বসে। রাণু যদি সেই রকম কোন একটা—

আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলো—গলায় কাপড়ের ফাঁস দেওয়া রাণুর মৃতদেহটা কড়িকাঠের সঙ্গে ঝুলছে! উঃ, কী ভীষণ চেহারা হোয়ে উঠেছে ওর মুখের! চোখ দু'টো ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। জিভ আধখানা ঝুলে পড়েছে। দুই কস বেয়ে শীর্ণ দু'টি রক্তধারা গড়িয়ে পড়ছে—উঃ, কী বীভৎস!

দূর ছাই! কি যে সব আজে-বাজে চিন্তা করছি! নাঃ, আলোটা জ্বালাই! কিন্তু উঠতেও যে ইচ্ছা হোচ্ছে না!

নিস্তব্ধ নয়—অন্ধকার বাড়ী। ইঁদুরগুলো এ-ঘরে ও-ঘরে দাপাদাপি করে বেড়াচ্ছে। চারিদিকেই খুট্‌খাট্, ধুপ্‌ধাপ্ আওয়াজ। হঠাৎ আমার মনে হোল, এই এতগুলো পরিচিত শব্দের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে একটা যেন অতি সূক্ষ্ম, মৃদু অপরিচিত অথচ পরিচিত শব্দ ক্রমাগত এগিয়ে আসছে। নতুন জর্জেটের সাড়ী পরে ঘুরে বেড়ালে যে ধরণের শব্দ ওঠে, এটাও যেন সেই ধরণের।

ধ্যেৎ তেরি! গরম মাথায় দেখছি যা-তা কতকগুলো ভাবতে আর শুনতে আরম্ভ করেছি। আচ্ছা, রাণুকে কি আমি সত্যিই ভালবাসি না? যদি না-ই বাসবো, তবে ওর ভাবনা নিয়ে সেই সন্ধ্যে থেকে বসে মাথা গরম করছি কেন? আসলে বোধ হয় নিজের মনটাকেই আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না।

আবার, আবার সেই শব্দ। শব্দটা স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হোয়ে উঠছে। মনে হোচ্ছে—কেউ যেন সাড়ী ঝলমলিয়ে অনবরত যাওয়া-আসা করছে। এত ব্যস্ত কেন ও? শব্দটা কাছে এগিয়ে আসছে—বলছে, আরও কাছে। আমার সমস্ত চেতনা ভয়ে শিউরে উঠলো। মাথার চুলগুলো পর্যন্ত যেন খাড়া হোয়ে উঠলো। দু'টো হাঁটু ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে। তবু উঠে দাঁড়ালাম।

—কে? কে তুমি? কে তুমি ওখানে দাঁড়িয়ে?

কত বার, কত বার যে এই একই প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করে গেছি, জানি না। হঠাৎ নিজের কণ্ঠস্বরে নিজেই একবার চমকে থেমে গেলাম।

চীৎকার করতে সাহস নেই। আমার কম্পমান হাত দু'টো শূন্যে অন্ধকার হাতড়ে কখন এক সময় দেওয়ালের গায়ে গিয়ে দেহটাকে নিয়ে আছড়ে পড়লো, কি উপায়ে, কোন অলঙ্ঘ্য বিধানে সুইচ টিপে আলো জ্বালালো—তা' একমাত্র সেই বিধানকারই হয়তো বলতে পারবে।

আলো ঝলমল ঘর খট্‌খট্ করছে। চারিদিক তন্ন তন্ন করে দেখলাম। অস্বাভাবিকতার চিহ্ন মাত্রও কোথাও কিছু নেই।

মাস দুই পরে। এখন আর আমি ভয় পাই না। পরিবর্তে একটা তীব্র কৌতূহল আমার সারা মনকে আচ্ছন্ন করে রয়েছে। কে তুমি? তোমাকে আমি জানতে চাই—বুঝতে চাই। তোমার স্বরূপ দেখতে চাই।

সেদিন সকালে যথারীতি আমার অর্ধ-সমাপ্ত উপন্যাসখানা নিয়ে বসেছি—শুনতে পেলাম ও আসছে। হ্যাঁ, ও আসছে। অতি ধীর মৃদু চরণ ফেলে আমার দিকে এগিয়ে আসছে। বাতাসে ওর হাতের চুড়ির ঝিন্-ঝিন্ শব্দ, সেই অতি অস্পষ্ট নতুন সাড়ীর খসখসানি—

সব সেই। ও আসছে—নির্ভুল ভাবে এগিয়ে আসছে।—অপূর্ব মাদকতায় আমার দেহ-মন শিহরিত হোতে লাগলো। চীৎকার করে বলতে ইচ্ছা হোল—ওগো তুমি প্রকট হও, প্রকট হও। মূর্তিতে দেবে নাকি ধরা?

ওকে কাছে পাবার, ওকে নিকটতর করে সামনে ধরবার একটা উগ্র প্রবৃত্তি আমাকে ব্যাকুল করে তুললো। তারপর থেকে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত আমি ওর প্রতীক্ষায় বসে থাকি। আমার প্রাত্যহিক কাজ-কর্ম মাথায় উঠলো। খাওয়া আর শোওয়া —জীবন ধারণের পক্ষে যে দু'টো নেহাৎই অপরিহার্য—সে দু'টোকেও আমি ধীরে ধীরে ভুলে যেতে লাগলাম। আমার জাগ্রত চিন্তায়, নিশীথের তন্দ্রা বিহীন নয়নের একমাত্র কাম্য-বস্তু—ওই অশরীরী দেহের আবরণ উন্মোচন, ওর শারীরী প্রকাশ।

কিন্তু বৃথা—বৃথাই আমার প্রতীক্ষা! একদিন গেল, দু'দিন গেল—গেল ক্রমান্বয়ে পাঁচটা দিন ও রাত্রি। নিষ্ফল হতাশায় ছ' দিনের দিন সকালে মাথায় একটা নতুন বুদ্ধির উদয় হোল। ব্যস, আর কথা নয়। বিন্দুমাত্র সময়ক্ষেপ না করে হাওড়ায় এসে একখানা টিকিট কেটে সোজা বর্ধমানে এসে উপস্থিত হলাম। এইখানেই দুটো দিন কাটাতে হবে।

—এই বার, এই বার কি হয়! আমার যেন আর রাগ হোতে নেই! বেশ, দেখা দেবে না—দিও না। আমিও ফিরে যাচ্ছি না।

দু'দিন নয়। চার দিন কাটিয়ে দিলাম বর্ধমানে। তারপর পাঁচ দিনের দিন একটু রাত করেই ঘরের চাবি খুলে ভেতরে ঢুকলাম। মনে মনে ঠিক করেছি—নিজেকে আর অতো খেলো করবো না। কারো জন্যে অকারণ প্রতীক্ষা করে সময় আর আমি নষ্ট করবো না।

পা টিপে টিপে গেলাম রান্নাঘরের দিকে। পূর্ণিমার রাত বোধ হয়। প্রচুর চাঁদের আলো জানালা গলিয়ে মেঝেয় লুটিয়ে পড়েছে। চারি দিক ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলাম। আমার আবছায়া ছায়ামূর্তিটা দেয়ালের গায়ে গায়ে আমাকে সঙ্গ দিয়ে এগিয়ে যেতে লাগলো।

বাথরুমে ঢুকলাম। সেখানেও চাঁদ চুরি করে জমি দখল করেছে। অল্প অল্প নীল রঙের আলো জড়িয়ে ধরেছে জানালার গরাদে আর জলের পাইপগুলোকে। তারপর ফিরে এলাম পড়বার ঘরে। বহুক্ষণ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলাম, জানালা দিয়ে গলির ওপারের রূপোলী ছাদগুলোর দিকে। তারপর নিঃশব্দে অতি চুপে চুপে প্রবেশ করলাম এসে আমার শোবার ঘরে।

জ্বেলে দিলাম নীল আলোটা। খোলা জানালাটা দিলাম বন্ধ করে। তারপর গা থেকে কোটটা খুলে ফেলে শ্লিপার-জোড়া বের করবার জন্যে ঝুঁকে পড়লাম খাটের তলায়। আশ্চর্য্য! শ্লিপার-জোড়া ওখানে নেই।

অকস্মাৎ আমার সমস্ত সাবধানতা ও নিরাসক্তিকে ছাপিয়ে একটা দুরন্ত ভয় আমার নাভিমূল থেকে উঠে একেবারে মাথার কাছে এসে থমকে দাঁড়ালো।

শ্লিপার-জোড়া পেয়েছি। হ্যাঁ, এই তো—দু'হাত দিয়ে ওদের দৌঁকে চেপে ধরেছি কিন্তু ওরা আসছে না কেন? ওদের ছাড়াতে পারছি না কেন? কিসের সঙ্গে ওরা অমন করে লেপটে রয়েছে এ্যাঁ, কিসের সঙ্গে?

হাঁটু মুড়ে সেই যে মাটিতে পড়ে রয়েছি এখনো উঠছি না কেন? না। ভালই করেছি। হয়তো উঠতে গেলেই মুখ থুবড়ে পড়ে যেতাম। উঃ, এখনো পা দু'টো কাঁপছে। শ্লিপারজোড়া টেনে আনতে এত জোরে ওপরের দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁট কামড়ে ধরেছিলাম যে, দু'ফোঁটা রক্ত এইমাত্র মাটিতে ঝরে পড়লো।

চোখের দৃষ্টি ঘোলাটে হয়ে গেছে। তবু এক সময় উঠে দাঁড়ালাম আর সঙ্গে সঙ্গেই আমার দৃষ্টি গিয়ে পড়লো সামনের বড় দেয়াল-আয়নায়। সেই নীল আবছা অন্ধকার ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে আমি স্পষ্ট দেখলাম—আমার হাতীর দাঁতের তৈরী বড় চিরুণীটা এক অদ্ভুত উপায়ে শূন্যের মধ্যে একবার উঠছে আবার নামছে। তারপর—আমার চোখের সামনে স্পষ্ট হোতে স্পষ্টতর হোয়ে উঠতে লাগলো এক পূর্ণ মানুষী মূর্তি।

মূর্তি দাঁড়িয়ে রয়েছে আমার আয়নার সামনে। অপূর্ব সুন্দরী এক নারী! সেই নারীর মুখ আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি না। পিঠ বেয়ে ওর রুক্ষ কেশগুচ্ছ ছড়িয়ে পড়েছে। বাঁ হাত দিয়ে তারই এক গুচ্ছ টেনে নিয়ে ডান হাতে চিরুণী চালিয়ে যাচ্ছে। নিবিষ্টমনা।

আমি দেখছি। প্রস্তরাভিভূত অবস্থা আমার। তবু সর্বাঙ্গব্যাপী অনুভব করছি এক অননুভূতপূর্ব বিদ্যুৎ শিহরণ। সেই শিহরণ আমার অঙ্গে অঙ্গে গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে জাগিয়েছে পুলক চাঞ্চল্য।

বিদেহিনী ফিরে দাঁড়ালো। আমার পাশে চেয়ে দেখলো কি দেখলো না—জানি না,—কিন্তু মনে হ'ল, এক ঝলক হাসির ছটায় ওর সারা মুখখানা ভরে গেছে।

কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিলাম জানি না। সম্বিৎ যখন ফিরলো, চোখ কচলে দেখি, শূন্য ঘর শূন্যই পড়ে আছে। আমি নিজে ছাড়া কোন শরীরী, অশরীরী পদার্থের চিহ্নমাত্রও নেই।

তার পর কত দিন আর কত রাত্রি একে একে এল আর গেল! প্রতিটি দিন আর প্রতিটি রাত্রে আমি স্তব্ধ হোয়ে বসে থেকেছি, কখন আমার সমস্ত অন্তরাত্মাকে মথিত করে বেজে উঠবে ওর স্তিমিত মৃদু পদধ্বনি! আমি উন্মুখ উন্মাদনায় কান পেতে শুনেছি ওর হাতের চুড়ির রিণি-রিণি ঝঙ্কার। ও এসেছে, হেসেছে, আবার ফিরে গেছে মায়ারাজ্যে। ওর রহস্যে-ঘেরা মায়া-সংকেত আমার প্রত্যেক দিন আর প্রত্যেক মুহূর্তকে এক জগৎ থেকে ঠেলে ক্রমাগত অন্য জগতের দিকে নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। আঃ কি পুলক! কি উন্মাদনা!

আর কি বিশ্রী এই বাইরের জগৎটা! দু'দণ্ড শান্তিতে বাস করবার উপায় নেই। শুধু হট্টগোল আর চীৎকার! দিলাম দরজা-জানালাগুলো বন্ধ করে। এত চীৎকার, এত গোলমাল আমার অসহ্য! উঃ, মানুষের গলায় এত জোরও থাকে!

কি যেন নাম ধরে ডাকলো না? হ্যাঁ, তাই তো। আমারই নাম ধরে বারে বারে ডাকছে রাস্তা থেকে?

যাবো নাকি? দূত্তোরি! কি হবে গিয়ে! সাড়া না পেলেই তো ও চলে যাবে—তবে আর ভয় কি?

বরবধূ —শচীন ঝাপড়

কানে কানে —অদিতি দাস
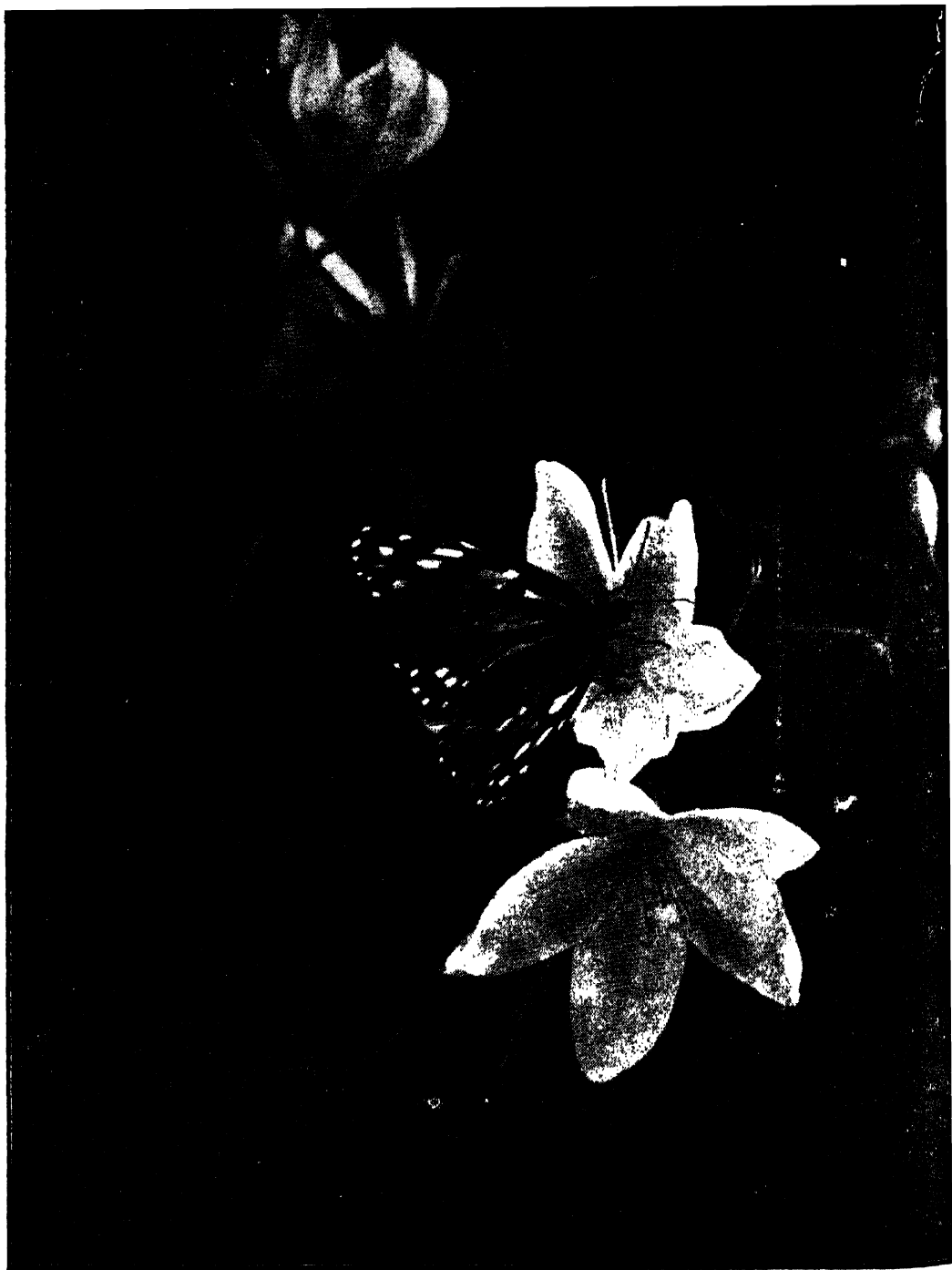
মধুলোভী —রামকিঙ্কর সিংহ
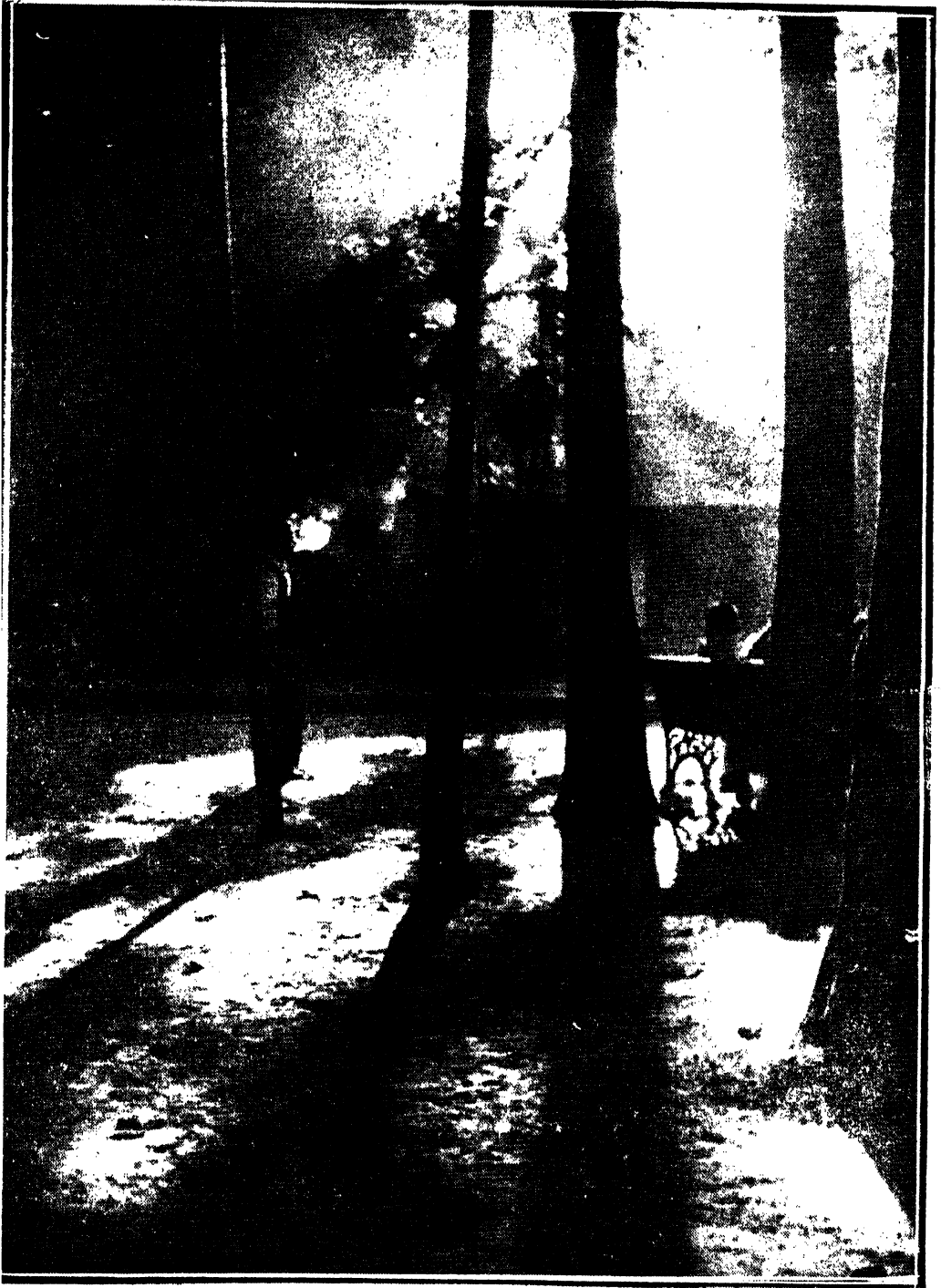
প্রথম আলো —মধুসূদন মুখোপাধ্যায়

শিলং

—রথীন রায়

বাইরে কি এখন দুপুর গড়িয়ে বিকেল হোয়ে এল ? জানালাটা খুলে একবার মুখ বাড়িয়ে দেখবো নাকি ? দাঃ পাগল কোথাকার, তাও কি হয় !

একটু একটু যেন খিদে পাচ্ছে—মনে হোচ্ছে যেন অনেক দিন খাইনি। কিন্তু তাই বলে তো আর দরজা খুলে, এতগুলো সিঁড়ি ভেঙ্গে রাস্তায় নামতে পারি না ?

কে যেন ডেকে উঠলো দরজায় নাম ধরে। দরজায় বারে বারে ধাক্কা দিয়ে ডাকছে। ওই আবার—আবার ডাকে নাম ধরে। মনে হোচ্ছে যেন রাণুর গলা। হাঁ, ওই বটে। আবার জ্বালাতে এসেছে মেয়েটা।

—এই শুনছো, দরজাটা খোল। আমি জানি তুমি ভেতরেই আছো—সাড়া দিচ্ছ না। শোনো, তোমার সঙ্গে বড্ড দরকার। লক্ষ্মীটি, একবার দোর খোল।

কথা বললেই আর ওকে থাম মানানো যাবে না। সুতরাং চুপ করেই আছি।

—ওগো, শুনছো, আমার যে বড় ভয় করছে। নিশ্চয়ই তোমার কোন বিপদ হয়েছে। আমার মন বলছে। আমি জানি। একবার দরজার কাছেও অন্তত এস।

আমি মুখে হাত চাপা দিয়ে দমকে দমকে হেসে উঠছি। যে বাড়ীতে রাণুর নিজেরই বিপদ সব থেকে বেশী, সেইখানেই ও এসেছে আমাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করতে !

—ওগো, শুনবে না ? মেয়েটার আর্ত হাহাকার আমার কানে এসে বাজছে। ইচ্ছে হোচ্ছে, চীৎকার করে বলি, ওরে হতভাগী, তুই যা—যা চলে এখান থেকে। তোর ডাকে সাড়া দিয়ে নষ্ট করবার মতো সময় আমার হাতে নেই। কিন্তু কথা আমি বলবো না। ঠোঁট কামড়ে পড়ে আছি।

কতক্ষণ যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মেয়েটা কেঁদেছিল, আমি জানি না। এক সময় সিঁড়ি দিয়ে ওর পায়ের শব্দ মিলিয়ে যেতেই, উদ্দাম আগ্রহে দুই চোখ বিস্ফারিত করে আমি সামনের দিকে চেয়ে বসে রইলাম। এই তো রাণুকে বিদায় করে দিয়েছি। কই, দাও এবার আমার পুরস্কার।

সঙ্গে সঙ্গে পাশের ঘরে যাবার দরজাটার একটা পাট খুলে গেল আর আমি থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়ালাম। টলতে টলতে গিয়ে আর একটা পাট—যেটা বন্ধ অবস্থায় ছিল—দিলাম খুলে, তারপর চেয়ারটা টেনে নিয়ে এসে বসলাম খোলা দরজার মুখটিতে। তারপর দুরু দুরু বুকের সে কি উন্মাদ প্রতীক্ষা !

* * * *

গলির মুখের দিকের দরজার ফাঁক দিয়ে আগে ডাকপিওন চিঠি ফেলে যেতো। প্রথম প্রথম গিয়ে দেখতাম, আজ-কাল আর দেখি না। খবরের কাগজওয়ালাটা মাঝে মাঝে বাইরে থেকে জানালার খড়খড়ি উঠিয়ে ভেতর দিকে অন্ধকারে উঁকি দেবার চেষ্টা করে—কিছু বলে না। বলে না বোধ হয় এই জন্যে যে, ও আমাকে পাগল ঠাউরেছে। ভাবে, হয়তো পাগলকে ঘাঁটিয়ে লাভ নেই।

একদিন সকালে—হ্যাঁ, সকালই হবে বোধ হয় সময়টা—চুপি চুপি যখন পাশের ঘরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলাম, পায়ের চাপে দু'খানা কাগজ খস-খস করে উঠলো। তুলে নিলাম। দু'খানা চিঠি। খুলে পড়লাম। স্বপ্ন। স্বপ্ন। কোন সুদূর মায়ারাজ্য থেকে এসে পড়েছে দু'খানি স্বপন-লিপিকা। এ কি কখনো সত্যি হোতে পারে—সত্যি হওয়া সম্ভব ? অন্ধকার ঘরে হাঃ হাঃ করে হেসে উঠলাম। চিঠি দু'টোকে ছিঁড়ে ঘরময় ছড়িয়ে দিলাম।

আর একদিন। তখন বোধ হয় দুপুর। টেলিগ্রাফ ছোকরাটা দরজার কাছে ডাকাডাকি করে সাড়া না পেয়ে জানালার খড়খড়ির ওপর দুম দুম করে কিল মারতে লাগলো। কিন্তু আমার তাতে কি। মারুক না ও কত মারবে। ওরই হাতে ব্যথা হবে। আমি জানি ওর ঝুলিতে ভরে ও কি এনেছে আর কি আমাকে গছাতে চায়—এক রাশ মৃত, ঝরা ফুল। যাও যাও, ফিরে যাও। আমার ওতে লোভ নেই। ফিরেই গেলো ও অবশেষে।

কেমন যেন দুর্বল বোধ করছি নিজেকে। শরীরটা যেন একটা বোঝা। জীবনটা যেন অন্ধকার একটা খানায় পড়ে গেছে মুখ থুবড়ে। কদাকার মলিন বিছানা। পড়ে আছি ওপর দিকে চোখ চেয়ে। কড়ি-বরগাগুলো গুণে শেষ করে ফেলেছি। আর যেন কোন কাজ নেই—কোন কাজ ছিলও না যেন কোন দিন। মনে হোচ্ছে, একটা অদ্ভুত বিস্মৃতি আমার সমস্ত চেতনাকে ধীরে ধীরে গ্রাস করে ফেলেছে। সব ধোঁয়া আর সব অন্ধকার। সময় সময় চকিতে ভেসে ওঠে আমার নিজের লেখা কোন কোন সমাপ্ত ও অর্ধসমাপ্ত উপন্যাসের পৃষ্ঠা। কখনো গোটা উপন্যাসখানাই তার

সমস্ত পাত্র-পাত্রী সমেত ভীড় করে দাঁড়ায়। ওরা সকলেই মলিন আর শীর্ণ।

এক একটা মুহূর্ত আসে যখন আমি বিভোর হোয়ে থাকি রাণুর চিন্তায়। ওকে আমার চিন্তারাজ্য থেকে যতই দূরে সরিয়ে রাখবার চেষ্টা করি—ও ঠিক এসে সময় বুঝে জুড়ে বসবে। আশ্চর্য না-ছোড় মেয়েটা!

আচ্ছা, এত দুর্বল কেন বোধ হচ্ছে নিজেকে? বন্ধ ঘরের চার দিক থেকে কেমন একটা ভ্যাপ্‌সা দুর্গন্ধ বের হোচ্ছে। ইচ্ছে করছে উঠে গিয়ে জানালাটা খুলে দিই—কিন্তু উঠবার শক্তি কই? এত দুর্বলতা কেন? অন্ধকারে এক সময় নিজের মুখে হাত দিয়ে ঠেকতেই মনে মনে চমকে উঠলাম। দাড়ী-গোঁফে জংগল হোয়ে গিয়েছে সারা মুখটা। কত কাল কামাই নি কে জানে!

সমস্ত ব্যাপারটাই কেমন যেন অদ্ভুত আর অবাস্তব। আমার কি কোন কঠিন অসুখ করেছে? খুব কঠিন অসুখ, খুব শক্ত একটা কিছু? কিন্তু তাই বা কি করে হবে? এই বিরাট নগরী—বাইরে এত লোকজন, পাড়া-প্রতিবেশী—কেউ কি আমার খোঁজ নেবে না? সকলেই কি আমায় পরিত্যাগ করে গেছে? না-না-না। তাই কি সম্ভব? আর যদি তাই সম্ভব হয়ও, পৃথিবীশুদ্ধ সবাই যদি আমাকে পরিত্যাগ করেই থাকে—তবু তো জানি, একজন এখনো আমার আছে, যে আমাকে কোনো অবস্থাতেই কখনো ত্যাগ করতে পারে না।

রাণু, রাণু, রাণু—আঃ দু' অক্ষরের মিষ্টি নামটি উচ্চারণ করতেও বুক ভরে ওঠে। আঃ—রাণু, রাণু। কি তৃপ্তি! কি শান্তি!

কে যেন চীৎকার করে আমার নাম ধরে ডেকে উঠলো না? কান পেতে রইলাম। না, বাইরে থেকে নয়। ডাকটা যেন আমার রান্নাঘরের দিক থেকেই এল মনে হোচ্ছে।

—কে? কে ওদিকে? বিছানা থেকেই চেঁচিয়ে উঠলাম। কেউ সাড়া দিল না।

—কে? কে তুমি ওখানে?

স্পষ্ট মনে হোচ্ছে, কেউ যেন ঘোরা-ফেরা করছে রান্নাঘরের মধ্যে। সাড়া দিচ্ছে না কেন? আমি যে পরিষ্কার শুনেছি, কে আমার নাম ধরে ডাকলে। কে? কে? হঠাৎ চকিতে আমার মনে হোল রাণু নয় তো?

—রাণু, রাণু! প্রাণপণে আমি চেঁচিয়ে উঠলাম। রাণু, আমি এঘরে রয়েছি। তুমি এখানে এস।

দরজা বন্ধ করার শব্দ এবার আমি স্পষ্ট শুনতে পেলাম। তার পরেই যেমনকার নিস্তব্ধতা—তেমনি। কেউ আমার ঘরের দিকে এগিয়ে এল না।

হঠাৎ একটা নতুন ধরণের ভয়ের প্রভাবে আমি বিভ্রান্ত হোয়ে পড়লাম। কে, কে হোতে পারে? কণ্ঠস্বর যে রাণুর, এখন আর আমার সন্দেহ নেই। কিন্তু মেয়েটা গেল কোথায়? করছে কি? নাঃ ব্যাপারটা কি, না দেখলে চলবে না।

বহু কষ্টে টেনে-টেনে একখানা পা খাটের ওপর থেকে মেঝেতে রাখলাম। আর একখানা পাকেও সেই ভাবে টেনে এনে ধরে রেখে, যেই শরীরটাকে নিয়ে যেমনি সোজা হোয়ে দাঁড়াতে যাবো—মাথা-মুড় গুঁজে থুবড়ে পড়ে গেলাম। যন্ত্রণায় শিরদাঁড়াগুলো ককিয়ে উঠলো। কিন্তু থামবার সময় নেই। থামলে চলবে না।

ছিঁচড়ে ছিঁচড়ে শরীরটাকে টেনে নিয়ে গেলাম দেওয়াল পর্যন্ত তার পর উঠে দাঁড়ালাম দেওয়াল ধরে। কিন্তু রান্নাঘর—সে যে বিস্তর পথ এখান থেকে। পারবো তো অতিক্রম করতে এতখানি পথ?

দেওয়াল ধরে দাঁড়িয়ে আছি। চতুর্দিকে চাপ চাপ জমাট অন্ধকার। এই অন্ধকারের মধ্যে যে সব বিভীষিকারা এত দিন নিঃশব্দে রাজত্ব করে এসেছে, তাদের কেউ কেউ যদি আনাচ কানাচ থেকে এই মুহূর্তে আমার ওপর লাফিয়ে পড়ে?

নাঃ, আর সাহস দেখিয়ে কাজ নেই। ফিরেই যাই আমার নিরালা বিছানায়—আমার একমাত্র নির্ভরযোগ্য আশ্রয়।

আর তা' ছাড়া যাবোই বা কেন? কার জন্তেই বা কষ্ট স্বীকার করবো? যদি সত্যিই রাণু এসে থাকে—ও নিজের দায়িত্বেই এসেছে। কর্মফল যা ভুগবার ওই ভুগুক। আমি কেন মিছে নিজেকে বিপন্ন করি! সব থেকে বড় কথা—আমার সময়াভাব। আমার নিরবচ্ছিন্ন চিন্তারাজ্য থেকে একচুল এদিক ওদিক হোলেই আমার সমস্ত পরিকল্পনাই যে নষ্ট হোয়ে যাবে! একটা নতুন উপন্যাস সুরু করবো। আমার উপন্যাসের নায়িকাকে আমি কল্পনায় পূর্ণাঙ্গ মূর্তি দান করেছি। সুন্দরী, ভীষণা, নিষ্ঠুর হিংস্র জ্বালাময়ী—সব মিলিয়ে নিখুঁত শয়তানের এক বিচিত্র নারী-সংস্করণ। সেই বিচিত্র নারীচরিত্র—সেই বিচিত্র নারী—আমি জানি, ওর আসবার সময় হয়েছে। ঘরের আবহাওয়াতে ঘনিয়ে আসছে পরিবর্তন! ও আসছে—আসছে। ওর বায়বীয় সত্তা যেন ডানা মিলে উড়ে আসছে! আমি ওর পক্ষধ্বনি শুনতে পাচ্ছি। ও আসছে।

অকস্মাৎ অন্ধকার ঘরের সমস্ত বায়ু চলাচল যেন স্তব্ধ হোয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো। পুঞ্জীভূত অন্ধকার আরও ঘন, আরও নিবিড় হোয়ে এল। আমার সমস্ত সত্তা এক অসহ্য স্নায়ু-কম্পনে মূর্ছাতুর হোয়ে পড়লো—দেওয়াল ছেড়ে টলতে টলতে আমি বিছানার ওপর এসে লুটিয়ে পড়লাম।

ও এসেছে!

আমার দু' চোখের পাতা ভারী হোয়ে আসছে—নিঃশ্বাস রুদ্ধ হোয়ে আসছে—বুকের ওপর, দেহের ওপর দুঃসহ এক ভার। কিন্তু কী তীব্র অনুভূতি! কী অসহ্য আনন্দ!

* * * *

এইখানেই সাহিত্যিক অবনীশ মুখুজ্জের ডায়েরী শেষ হোয়েছে। এই ঘটনার বছর খানেক পরে পাগলা-গারদের কর্তৃপক্ষ অবনীশের মৃত্যুর পর, ডায়েরীখানা তাঁর আত্মীয়স্বজনের হাতে তুলে দেন।

ডায়েরীর অমুক্ত পরিচ্ছেদটি সামান্য। পুলিশের রেকর্ড ও পাড়ার লোকের কাছ থেকে এর একটা বিবরণ আমি সংগ্রহ করেছিলাম। সেইটেই এখানে তুলে দিচ্ছি।

রাণু যে প্রায়ই রোজই এসে একবার করে অবনীশের খবর নিয়ে যায়—এ কথা অবনীশ জানতে না পারলেও, পাড়ার ছেলে-ছোকরাদের দৃষ্টি এদিকে খুব প্রখরই ছিল। একটা আধ-পাগলা লোক একটা ভুতুড়ে বাড়ীতে নিঃসঙ্গ বাস করছে আর একটি তরুণী প্রতিদিন তার কাছে যাওয়া-আসা করছে—লোকের দৃষ্টি এতে আকৃষ্ট হবার তো কথাই।

একদিন সন্ধ্যায় অন্ধকার ঘনিয়ে আসবার সঙ্গে সঙ্গেই মেয়েটি ওই বাড়ীতে ঢুকলো। তারপর ঘণ্টা কাটলো, প্রহর কাটলো, পাড়ার চায়ের দোকানে যে ছোকরারা নৈমিত্তিক সান্ধ্য-আসর জমাতো এবং মেয়েটির আসা-যাওয়ার পথের দিকে ব্যগ্র চোখে চেয়ে থাকতো—তাদের সেই চোখে নামলো ঢুলুনী এবং এক সময় দোকানের ঝাঁপও বন্ধ হোল। মেয়েটি কিন্তু আর বাইরে বেরিয়ে এল না!

অবনীশের বাড়ীর ঠিক পাশের বাড়ীর লোকেরা বলে, তারা রাত্রে একটা অস্ফুট আর্তনাদের মতো শব্দ শুনতে পেয়েছিল। কিন্তু শব্দটা হোয়েছিল একবারই এবং কিছুক্ষণ কান পেতে থেকেও আর কোন কিছু শুনতে না পেয়ে ওরা আর সে রাত্রে এ নিয়ে মাথা ঘামায় নি।

মাথা কিন্তু ঘামাতে হোল পরদিন বিকেলে, যখন, রাণু যে আত্মীয়টির বাড়ীতে থেকে এখানে পড়াশুনো করতো—সেই আত্মীয়টি খুঁজতে খুঁজতে এ পাড়ায় এসে হাজির হোলেন। এক সময় পুলিশকেও ডাকতে হোল। কারণ ভেতর থেকে অর্গল দেওয়া দরজায় অজস্র করাঘাত করেও কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

দু'জন দারোগা, একজন কনষ্টেবল, রাণুর আত্মীয়টি পাড়ার দু'জন ভদ্রলোককে নিয়ে দরজা ভেঙ্গে ভেতরে প্রবেশ করলেন। সামনেই ওপরে যাবার সিঁড়ি। সিঁড়িতে পুরু করে ধূলো জমে রয়েছে। ওপরে উঠেই সামনের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করা। বড় দারোগা বাবু খড়খড়ির ভেতর দিয়ে হাত গলিয়ে ছিটকিনিটা খুলে ফেললেন। ঘরের মধ্যে রাত্রির অন্ধকার ও স্তব্ধতা! কনষ্টেবলটি গিয়ে তাড়াতাড়ি রাস্তার দিকের বড় জানালাটা খুলে দিলে। এক ঝলক আলো আর বাতাস প্রবেশ করলো। এবারে সমস্ত ঘরটাই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে—ঘরের একেবারে কোণের দিকে একটি ছোট খাট, তার ওপর ময়লা বিছানা আর সেই বিছানায় শুয়ে আছে একটি শীর্ণকায় ব্যক্তি। এত শীর্ণ চেহারা যে, দেখলে ভয় করে। হাড় আর চামড়া। মাংসের পদার্থ নেই। অসম্ভবে দু'টো চোখে শুধু অস্বাভাবিক দীপ্তি।

দারোগা বাবু প্রশ্ন করেন—ও মশাই, শুনছেন? রাণু দেবী কোথায়? রাণু দেবীকে কোথায় রেখেছেন?

লোকটা ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

দারোগা বাবু প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করলেন। কোন সাড়াই পাওয়া গেল না।

রাণুর আত্মীয়টি অধৈর্য হোয়ে এগিয়ে আসছিলেন। দারোগা বাবু বাধা দিয়ে বললেন, দেখতেই তো পাচ্ছেন মশায়! একে ঘাঁটিয়ে কী লাভ। তার চেয়ে চলুন অন্য ঘরগুলো খুঁজে দেখা যাক।

বাড়ীর সমস্ত ঘর শেষ করে অবশেষে রান্নাঘরে গিয়ে খোঁজার পরিসমাপ্তি হোল। পাওয়া গেছে—রাণুকে পাওয়া গেছে। ওর সুন্দর দেহটা রান্নাঘরের কোণে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। প্রাণহীন মৃতদেহ!

লোকটা তেমনিই পড়ে আছে বিছানায়। ওর কাছে সব ব্যাপারটাই যেন স্বপ্ন! কেনই বা পুলিশ তার বাড়ীতে হানা দিল, কেনই বা ধরাধরি করে সকলে ওকে নামিয়ে বাইরের পুলিশের গাড়ীতে শুইয়ে দিল—এ সবের কিছুই ও বুঝতে পারছে না। শুধু জ্বল-জ্বলে দুই চোখ মেলে শূন্য আকাশের দিকে চেয়ে রইল।

এক সময় গাড়ী ষ্টার্ট নিয়ে এগিয়ে চললো। পেছনে আর একখানা গাড়ী। ওটাও এগিয়ে আসছে। অনেকক্ষণ আসার পরে একটা মোড়ের মাথায় বাঁক নিয়ে ওটা অদৃশ্য হোয়ে গেল। ওই দিকে মর্গ। সামনের গাড়ীটা এগিয়েই চলেছে। ওটা যাবে থানায়।

কি যে বৃষ্টি হয়ে গেল

নচিকেতা ভরদ্বাজ

কি যে বৃষ্টি হয়ে গেল—এখন আকাশ কত নীল!
তোমার মনের মত উজ্জ্বল দিনের প্রবাহ
রাত্রির রহস্য থেকে স্নিগ্ধ ভোরে যেমন নির্মাল
তোমার আশ্চর্য সত্তা; ঘুম-নীল দু'চোখে উৎসাহ
ভোরের নানান কাজে তোমাকে চেনাই যায় না, তুমি
নিপুণ নৃত্যের শিল্পে জীবনকে বার বার সাজিয়ে দিয়েছ,
দুপুরে হাওয়ার হাতে তোমার সে সত্তাকেই চুমি'।
এমনি নীলাভ নীল অন্ধকারে আকাশ-পাতাল
তুমিও তো ঢেকে দাও—মেঘে মেঘে মুক্তো ছড়িয়েছ:
বাসনার ঝিঁঝি আর ছোট ছোট পোকারা বাঁচাল
আকাঙ্ক্ষার পোকা তারা! বৃষ্টি হয়ে গেছে তবু ধ্বনির প্রবাহ
পৃথিবীকে ছেয়ে আছে: আমার ও বিমুগ্ধ বাসনারা
তোমাকে তবুও যেন ঢেকে থাকে—রাত্রি ভোর হয়ে গেলে পরও।
তোমার দু'চোখে তবু বৃষ্টির ফোঁটা ফোঁটা—অবাক কান্নারা
কয়েকটি হাওয়ার মত এমনিই বয়ে যায়—
দূরের উজ্জ্বল বনে কাঁপে থরো-থরো।
আকাশে ডাকছে মেঘ—এ হৃদয় তো তোমাকেই ডাকে
হাজার পাওয়ার পরও কেন এ অদম্য তৃষ্ণা তবু জেগে থাকে!

এমনি নীলাভ স্নিগ্ধ অন্ধকার পথ ধরে ধরে
আমারও হারিয়ে যেতে ভালো লাগে: মাঠে-ঘাটে জল—
ঘাসে-ঘাসে স্নিগ্ধ শান্তি—চারিদিকে স্মৃতির মলমল
শিশিরে ছড়িয়ে গেছে: উষ্ণ জল ঝিলের ঝালরে
ঢেউ ঢেউ দিন কাঁপে—তীরময় একটা বক, কয়েকটা হাঁস
চুপচাপ ভেসে আছে তীক্ষ্ণ জলে।
জল-ঝরা বকুলের ডালে
ক'টা কাক ডানা ঝাড়ে—উড়ে গেল খয়েরী শালিখ।
হলুদ নির্জন সাপ এঁকে-বেঁকে থিরথির জলের মর্মরে!
এ সব চিত্রের অর্থ আরো বেশী অনুভূত—এ সব উল্লাস
আমাকে জড়িয়ে থাকে: মেঘ-ভীরু দিনের প্রবালে
তোমাকে নতুন করে দেখে নেব, মেঘ-বৃষ্টি সব ঢেকে দিক
পৃথিবীর মানচিত্রে বার বার তোমার উপমা:
আকাশে আবার ত্যাখো ঘন মেঘ নেমে এল
চারিদিকে নীল অন্ধকার।
পায়ে পায়ে চলো তবে—ঘরে ফিরি সব কাজ পড়ে থাক জমা,
তাহলে ছড়িয়ে দাও নরম নির্জন বৃষ্টি—
খুব বেশি দেরী নেই মায়াবী সন্ধ্যার।
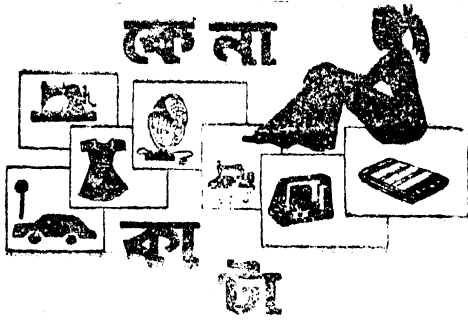
ভারতে পাট উৎপাদন

অন্য সব দিকে যেমনই হোক্, পাট উৎপাদনে ভারতবর্ষ সমগ্র বিশ্বে শীর্ষস্থান অধিকার করে এসেছে বরাবর। পক্ষান্তরে এ-ও সত্যি, ভারতীয় পাটের শতকরা ৯৫ ভাগই সেদিন অবধি উৎপন্ন হত বাংলার মাটিতে। দেশবিভাগের পর পাটশিল্পের ক্ষেত্রে ভারত পিছিয়ে পড়ে মারাত্মক ভাবে—একে নিজের চাহিদা মেটাবার জন্য নির্ভর করতে হয় পাকিস্থানের উপর। এর স্পষ্ট কারণ—বাংলার যে অংশটি ছিল পাটের সর্ব্বপ্রধান উৎপাদন কেন্দ্র, ভাগাভাগির দায়ে সেইটি অর্থাৎ গোটা পূর্ব্ব বাংলাটা ভারতের বাইরে চলে যায় এবং আজও রয়েছে সে তেমনি ভাবে।

রাজনৈতিক বিপর্য্যয়ের পরিণতিতে পাট উৎপাদনের নিজস্ব ঐতিহ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে ভারত কিন্তু চুপ করে থাকলো না, আলোচ্য প্রসঙ্গে 'এইটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার। পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে ও বিহার, আসাম প্রভৃতি অঞ্চলে পরিকল্পনা অনুযায়ী পাট চাষ সুরু করা হয় এবং উৎপাদনও বেড়ে চলেছে ধাপে ধাপে। এমনি দৃঢ়তা বজায় রাখার নিশ্চিত ফলস্বরূপ পাটের ব্যাপারে আজকের ভারত নিজের লুপ্ত সুনাম ও গৌরব ফিরিয়ে আনবার পথ পেয়েছে অনেকটা।

ভারতের পাটশিল্প সম্পর্কে সম্প্রতি একটি হিসাব প্রকাশিত হয়েছে—যা থেকে এই শিল্পের অগ্রগতির একটা পরিচয় পাওয়া যায় ভালরকম। ১৯৫৭ সালে অর্থাৎ বিগত বর্ষে এই রাষ্ট্রে পাটজাত দ্রব্য উৎপন্ন হয়েছে ১০,৯৬,২৪৮ টন। এই উৎপাদনের বেশীর ভাগই পশ্চিমবঙ্গের দান, এইটি সহজেই অনুমান করা চলে। বিগত বর্ষের উক্ত পাটজাত পণ্যের মধ্যে বিদেশের রাষ্ট্র সমূহে রপ্তানী হয়েছে প্রায় ৮,৪৮,০০০ টন। প্রদত্ত হিসাব থেকেই জানতে পারা গেছে—রপ্তানী মারফত পাটশিল্প খাতে ভারতের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জ্জিত হয়েছে ১১৪ কোটি টাকার ও কিছু বেশী।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলা যায় এবং কথাটি সুবিদিত যে, দেশ বিভাগের পর প্রথমটায় পাটের ক্ষেত্রে ভারত পিছিয়ে পড়লেও ভারতবর্ষের পাটকলগুলির বেশীর ভাগই থেকে যায় খণ্ডিত পশ্চিমবঙ্গে। এই দিক থেকে পাট উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র পাকিস্তান এ দেশের উপর নির্ভরশীল হয়। ভারতে মোট পাটকল আছে এক্ষণে ১১২টি। তন্মধ্যে ১০১টি পাটকলই দাঁড়িয়ে আছে পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে এবং সে-ও বিশেষ করে কলকাতার সন্নিহিত গঙ্গা নদীর উভয় তীরে। অবশিষ্ট ১১টি পাটকলের মধ্যে ৪টি অন্ধ্র প্রদেশে, তিনটি উত্তর প্রদেশে, তিনটি বিহার রাজ্যে এবং বাকি ১টি মধ্য প্রদেশে অবস্থিত।

পাট উৎপাদনে ভারত আজ যে বহুদূর এগিয়ে গেছে, পরিষ্কার জানতে পারা যায় ভারতীয় চটকল সমিতির সভাপতি মিঃ জেমিসনের সাম্প্রতিক এক ঘোষণা থেকে। ভারতীয় পাটজাত পণ্যের বাজার সম্প্রসারণের জন্য বিদেশ সফরে যাত্রার প্রাক্কালে তিনি সোৎসাহে বলেছেন—আলোচ্য বর্ষে (১৯৫৮) কাঁচা পাট উৎপাদনে ভারত স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে সমর্থ হবে। বিগত বর্ষে অর্থাৎ ১৯৫৭ সালে এই দেশে পাট উৎপন্ন হয়েছিল ৫০ লক্ষ গাঁট। এ বছর উৎপাদন আরও বৃদ্ধি পেয়েছে এবং উৎপাদনের মোট পরিমাণ হবে ৬৩ লক্ষ গাঁটের উপর। এখানেও একটি জিনিস লক্ষ্য করবার—১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার বছরে এবং তার পরও ক্রমাগত কয়েক বছর কাঁচা পাটের চাহিদা মেটাবার জন্যে ভারতকে পাকিস্তান থেকে প্রচুর পাট আমদানী করতে হয়। দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় এক্ষণে সেই প্রশ্ন বা সমস্যার মোটামুটি মীমাংসা হয়েছে, নিশ্চয়ই দাবী করা যায় এইটি।

কিন্তু আশার এই আলো দেখা যাওয়ার পরও একটি প্রশ্ন উঠছে—পাটের মূল্য যা পাট উৎপাদনকারী কৃষক পেয়ে থাকে, সেই নিয়ে। পাট তদন্ত কমিটির হিসাবেই দেখা যায়—এক মণ উৎপাদনের জন্য খরচ ১১ টাকার কম হয় না। সুতরাং কাঁচা পাটের দাম এর চেয়ে নীচে দাঁড়ালে কৃষকের উপরই পড়বে এর প্রথম আঘাত। জাতীয় সরকার পাট উৎপাদনে যেমন কৃষকদের উৎসাহ যুগিয়ে এসেছেন এবং আসবেন, তেমনি উৎপন্ন পাটের উপযুক্ত মূল্য যাতে কৃষিজীবীরা পায়, সেই দিকেও তাঁদের লক্ষ্য না রাখলে নয়।

একটি আশার কথা—ভারতের পাটকলগুলির কাঁচা পাটের বিপুল চাহিদা মেটাবার আরও একটি পদ্ধতিতে চেষ্টা চলেছে এবং সে বেশ কিছুকাল ধরেই। উহা আর কিছু নয় এই দেশের মাটিতে পাটের বিকল্প সামগ্রী মেস্তার চাষ বা উৎপাদন বাড়িয়ে যাওয়া। তাই দেখা যায় প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা শেষে কাঁচা পাটের উৎপাদন যে ক্ষেত্রে ৪২ লক্ষ গাঁটের মতো হয় এখানে, সে ক্ষেত্রে মেস্তার উৎপাদনও দাঁড়ায় প্রায় সাড়ে ১১ লক্ষ গাঁট। কিন্তু লক্ষ্য করবার যে, তখনও বাইরে থেকে ভারতকে নিজস্ব চাহিদা মেটাতে প্রায় ১৪ লক্ষ গাঁট পাট আমদানী করতে হয়েছে। পাটের সঙ্গে সঙ্গে মেস্তার উৎপাদনও অবশ্যি বেড়ে চলেছে বহুল মাত্রায় এবং আমদানীর প্রশ্নও এখন পূর্ব্বের ন্যায় ততখানি জরুরী নয়।

ভারতে কাঁচা পাটের অভাব যাতে কখনই হতে না পারে এবং বিজ্ঞান সম্মত পন্থায় যথেষ্ট উন্নত ধরণের পাট উৎপাদন সম্ভবপর হয়, সেই দিকে গভীর মনোযোগ নিবদ্ধ করতে হবে সংশ্লিষ্ট সকলকেই এবং বিশেষ ভাবে সরকারকে। প্রকৃত প্রস্তাবে পাট শিল্প এমনি গুরুত্বপূর্ণ যে, এর রপ্তানী মারফত ভারতের পক্ষে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জ্জন সম্ভবপর। সুতরাং কোন অবস্থাতেই একে উপেক্ষা বা অবহেলা করা চলতে পারে না।

কুলুপ ও সিন্দুক নির্ম্মাণে ভারত

মূল্যবান্ সম্পদের নিরাপত্তার নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা হিসাবেই কুলুপ ও সিন্দুক আবিষ্কৃত হয়েছিল এককালে। আবিষ্কারের পর এদের ব্যবহার ক্রমেই ব্যাপকতা লাভ করে, এ সহজেই অনুমেয়। কিন্তু প্রথম ধাপে যেমনটি ছিল, কলা-কুশলতা ও কার্য্যকারিতার দিক থেকে এ দুই-এরই উন্নতি হয়েছে এখন প্রচুর। এই অভিমত বহির্দেশের পক্ষে যতখানি খাটে, ভারতের পক্ষে খাটে

উচাপ চেয়ে বেশী ছাড়া কম নয় এবং ইহা নিঃসংশয়ে আশার কথা।

ইতিহাস পর্যালোচনা করতে যেয়ে দেখা যায়—রোমানরাই প্রথম অপেক্ষাকৃত উন্নত ধরণের লৌহতালা বা কুলুপ আবিষ্কার করে এবং সেই সঙ্গে যতদূর সম্ভব মজবুত চাবিকাঠি। নিনেভের নিকটবর্ত্তী খোরসাবাদ প্রাসাদে যে কুলুপের সন্ধান পাওয়া গেছে, ইহাই বোধ হয় সর্বাধিক পুরাতন। এই তালা বা চাবিকলটি মিশরীয় মডেলে গড়া, এইটি জানতে পারা গেছে আজ ভালরকম।

রোমানদের তৈরী এই প্রয়োজনীয় তালা বা কুলুপ বহুকাল ধরে চালু ছিল বিস্তৃত অঞ্চলে। কিন্তু পরে প্রমাণিত হয়—দেখতে উহারা বেশ সুন্দর হলেও নিরাপত্তার ও ব্যবহার দিক থেকে পুরাদস্তুর নির্ভরযোগ্য নয়। বৃটিশ কারিগরশ্রেণী এই সময় কুলুপ শিল্পের ক্ষেত্রে সক্রিয়ভাবে আত্মনিয়োগ করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়াকার বছর গুলোতেই বিলেতে এই শিল্পটি প্রতিষ্ঠা অর্জন করে অনেকখানি। সেখানকার শক্ত তালা ও চাবিগুলো তখন থেকেই দেশ-বিদেশে ভাল বাজার পায়।

ভারতেও কুলুপ নির্মাণ সুরু হয়েছে মোটামুটি কয়েক শতাব্দী আগে থেকেই। এই উপমহাদেশের পশ্চিম উপকূলেই প্রথম ব্যাপক হারে এ নির্মাণ উপযোগী কারখানা বসে কিন্তু এর শিল্পগত উৎকর্ষ ও অগ্রগতির জন্য প্রধানতঃ নিশ্চয়ই দায়ী ওলন্দাজ কিংবা পর্তুগীজরা। ইতিহাসেরই একটি তথ্য বা বিবরণ—আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে কুলুপশিল্প খুব সম্ভব বোম্বাই নগরীতেই গড়ে ওঠে সর্বপ্রথম। গুজরাট ও মালাবারের সুদক্ষ কুলুপ শিল্পী বা কুলুপ-নির্মাতারা ভাবতে থাকেন কেমন করে এই ক্ষুদ্রাকৃতন অথচ অতি প্রয়োজনীয় বস্তু-১জাতি সস্তায় তুলে দিবেন নাগরিকদের হাতে। শুধু সস্তায় দেওয়া নয়, সস্তায় নিতান্ত কার্য্যকরী মজবুত তালা বা চাবিকল সরবরাহই ছিল তাদের ভাবনার মূল লক্ষ্য। তারপর ক্রমে দেশের আরও কত জায়গায় এই শিল্পটি ছড়িয়ে পড়ে এবং নির্মিত হয় ইস্পাত, পিতল প্রভৃতি মারফৎ নির্ভরযোগ্য রকমারী কুলুপ।

পরিসংখ্যান্ থেকেই জানতে পারা যায়—বহুদিন হ'তে এদেশে হাজার হাজার নরনারী কুলুপশিল্পে নিযুক্ত রয়েছেন। আলিগড় জেলায় এই শিল্পটি প্রসার লাভ করেছে খুব দ্রুত এবং সেখানে এর একটির চমৎকার বাজারও রয়েছে চলতি। বৈজ্ঞানিক সূত্র ধরে আজকাল কুলুপ শিল্পীরা কুলুপ নির্মাণে পর্য্যাপ্ত কর্ম্ম-চাতুর্য্য ও প্রতিভা দেখাচ্ছেন। মানুষের ধন-সম্পদ ও বহুমূল্য দলিল পত্রাদি সংরক্ষণের ব্যবস্থা যাতে আরও নিশ্চিত ও নিরাপদ হয়, প্রাপ্যের বিনিময়ে এইমাত্র তাদের চাওয়া।

সম্প্রতি একজন সুনিপুণ ভারতীয় শিল্পী সুটকেস আটকাবার একটি অপূর্ব্ব তালা বা চাবিকল আবিষ্কার করেছেন। চক্ষুর অন্তরালে উক্ত যন্ত্র সমন্বিত সুটকেস নিয়ে চম্পট দিতে চাইলে অমনি সেই থেকে এলার্ম (বিপদ সূচক আওয়াজ) বেজে উঠবে। 'সেফ্ ভল্ট' সমূহের জন্য আবিষ্কৃত মজবুত ভারতীয় তালা বা চাবিকলও এদের অনুপম কলা কুশলতার দরুণ বিশ্ববাজারে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে অসাধারণ। ভারতীয় শিল্পপ্রতিভার আর একটি অভিনব আবিষ্কার—'টাইমলক' বা টাইম (সময়) কুলুপ। এই তালা বা চাবিকল সজ্জিত কোন কেস বা সিন্দুকের ঢাকনা নির্দ্ধারিত সময় ব্যতীত খোলা সম্ভব নহে কোনক্রমেই—এমনকি উহার মালিকের পক্ষেও নয়।

কুলুপ শিল্পের ন্যায় লৌহ সিন্দুক নির্মাণের ক্ষেত্রেও ভারত অনেকখানি অগ্রসর হয়ে গেছে এর ভিতর। আগুন প্রভৃতিতে যাতে অভ্যন্তরে সংরক্ষিত কোন ধন-সম্পদ ও দলিলপত্র বিনষ্ট না হতে পারে, দুষ্কৃতকারীর গোপন হাত প্রবিষ্ট হবার পথ থাকে সর্বক্ষণ রুদ্ধ, সেইদিকে লক্ষ্য রেখে আজকাল লোহার সিন্দুকগুলো (আয়রণ সেফস্) তৈরী করা হচ্ছে সযত্নে।

অবশ্য একথা ঠিক, প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী আগেও ভারতে নিরাপত্তা ব্যবস্থার দিক থেকে উল্লেখযোগ্য মজবুত কোন সিন্দুক ছিল না। ও ক্ষেত্রটিতেও বোম্বাই-এর শিল্পীরাই প্রথমে আসেন এগিয়ে এবং নির্মাণ সুরু করেন নানা ধরণের সেফ বা সিন্দুক। সস্তায় উৎকৃষ্ট জিনিষ সরবরাহের দরুণ স্থায়ী বাজার মিলে যায় তাদের অল্পদিন মধ্যেই। বোম্বাইএর অনুকরণে অন্যান্য কয়েকটি কেন্দ্রেও এই শিল্পের অগ্রগতি হয়ে চলেছে এবং এমনি দাঁড়িয়েছে যে, বিশ্বে আজ উহা একটি সত্যিকারের গর্বের সামগ্রী।

কি ভারতীয় কুলুপ কি ভারতীয় সিন্দুক—বহির্ভারতে এদের বাঁধা বাজার রয়েছে—পূর্বেই বলা হলো। বিদেশে রপ্তানী মারফত ভারত এই খাতে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জ্জন করতে পারে নিশ্চয়ই কম নয়। সুতরাং জাতীয় সরকারকে এই শিল্প দু'টির সমৃদ্ধি ও সম্প্রসারণের দিকে নজর রাখতে হবে বহুল পরিমাণে। পর্য্যাপ্ত ইস্পাত বা কাঁচা মাল সরবরাহ যাতে নিয়মিতভাবে হয়, আলোচ্য ব্যাপারে এর নিশ্চয়তা একটি বড় কথা এবং এইখানেই সরকারের দায়িত্ব সর্বাধিক। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী ইস্পাত কারখানা স্থাপন কর্মসূচী সম্পূর্ণ কার্য্যকরী হলে ভারতের পক্ষে হয়ত কুলুপ ও সিন্দুক নির্মাণ সম্ভব হ'বে প্রচুর সংখ্যায় এবং রপ্তানী ও বৃদ্ধি করা যাবে আনুপাতিক হারে। মোটের উপর শিল্পীদের উদ্যোগীপণার অভাব না হলে এবং সরকারী সহযোগিতা অব্যাহত থাকলে দু'টি শিল্পের ভবিষ্যৎই আরও উজ্জ্বল, এটুকু অনায়াসে বলা যায়।

বিজ্ঞাপনে বিশেষণের বহর

বিজ্ঞাপনে উপযুক্ত বিশেষণের প্রয়োগের দ্বারাই ক্রেতার ইতস্ততঃ দূর করা সম্ভব, এবং উৎপাদক বা বিক্রেতা এই বিশেষণ প্রয়োগের বিদ্যায় যত দক্ষতা আয়ত্ত করতে পারেন, ততই সফল ব্যবসায়ী হয়ে দাঁড়াবেন; সে বিশেষণ বাক্য, বাক্যাংশ বা শব্দই হোক্।

উপযুক্ত বিশেষণের উদাহরণ দেই। বিক্রেতা শক্ত তালা বাজারে ছাড়েন কিন্তু পাউডারের পাফ ছাড়েন কুসুম-কোমল। মানুষ যখন গ্রীষ্মকালে গরমে হা হুতাশ করে, তৃষ্ণার্ত্ত ও ক্লান্ত বোধ করে তখন বিজ্ঞাপনদাতা দিতে চান বহুদিন টিঁকে থাকবে এমন পাখা যা হবে দেখতে যেমন সুন্দর তেমনি বিদ্যুত খরচ করবে কম, আবার হাওয়া ছড়াবে সব দিকেই। বৈদ্যুতিক পাখার আর কোন গুণ আবিষ্কৃত হয়েছে কি? নিদাঘে ক্লান্তিনাশক ঠাণ্ডা পানীয়, ঘন ঘোর বরিষায় না ভিজে ঘোরাফেরার সরঞ্জাম, শীতে আরামদায়ক

মোলায়েম টেঁকসই চিত্তাকর্ষক ডিজাইনের অথচ কমদামের শীতবস্ত্র ক্রয়ের উপদেশ বিজ্ঞাপনই দেয়।

শুধু সাময়িক ব্যবহার্য্য পণ্যদ্রব্যের বিজ্ঞাপনই নয়, সর্ব্ব ঋতুতে ব্যবহার্য্য দ্রব্যের বিজ্ঞাপনের বিশেষণও চমকপ্রদ। বিজ্ঞাপনদাতা উপদেশ দিচ্ছেন তাঁরই 'টুথপেষ্ট' ব্যবহার করতে, কারণ এর ব্যবহারে মাড়ির স্বাস্থ্য বজায় থাকে, দাঁত অটুট, শ্বাস-প্রশ্বাস নির্ম্মল ও হাসি ঝক্‌ঝকে হয়। ক্ষৌর কর্ম্মে আরাম পেতে চান? বিজ্ঞাপন পড়ুন জানতে পারবেন কোন্ ব্লেডে কামালে আপনার কোমল গণ্ডের কোমলতা বজায় থাকবে। স্বামীর মন হরণের জন্য এসেন্স সাবান ক্যাজ্ঞি স্নো একমাত্র উপকরণ না হলেও, রূপ রক্ষা নারীর একটি প্রধান কর্ত্তব্য। তাই উৎপাদকের বিজ্ঞাপন বলে "আমাদের সাবান ব্যবহার করে টাটকা ফুলের মত সুন্দর হোন; আমাদের সাবান আপনার ত্বকের পুষ্টি বাড়াবে, এর মন মাতানো সুবাস আপনাকেও দিন ভর প্রফুল্ল রাখবে।" চিত্তাকর্ষক, অপূর্ব্ব সুগন্ধযুক্ত মখমলের মতন মোলায়েম পাউডার এবং মুখশ্রী মসৃণ, কোমল ও লাবণ্যময় রাখবার জন্যে হাল্কা তুষার শুভ্র ক্রীমের সন্ধানও বিজ্ঞাপনেই পাবেন। বাহ্যিক চাকচিক্যই কি চূড়ান্ত? আভ্যন্তরীণ সুস্থতাও চাই। আর বিজ্ঞাপনেই তার হদিশ মিলবে। সন্ধান মিলবে স্বাস্থ্যপ্রদ, সুগন্ধে ভুর ভুর খাদ্যের যা জোগান দেবে কর্ম্মশক্তির, রক্ষা করবে সজীবতা। নবতম, চাকচিক্যময় রং-বেরং-এর সময়ের সঙ্গে মানানসই নানাবিধ বাহারী ও বৈচিত্র্যময় পরিচ্ছদ চান, বিজ্ঞাপন পড়ুন। বস্ত্র ব্যবসায়ী দিতে চাইছেন কাপড়, যার রং বদলাবে না, চিক্কণতা ঘুচবে না, যা কাচলে কুঁচকোবে না; আর সাবান উৎপাদক বলছেন, এতে কাচা কাপড় চিরকাল উজ্জ্বল থাকে নূতনের মত দেখায়।

জ্ঞানী-গুণীরা পছন্দসই কলম চান? কালি, যা আপনার লেখার সময় আপনার কলম পরিষ্কার রাখবে, নিব খোলা পড়ে থাকলেও কালি শুকিয়ে যাবে না? ধুলেই উঠে যায় এমন কালিও পাবেন, পাকা লেখা-লেখির জন্যেও কালি চান তো বিজ্ঞাপন পড়ুন।

আপনার ঘরের আসবাবপত্র আপনার রুচিরই পরিচয় দেয়। বিক্রেতার প্রস্তাবিত সামগ্রী ক্রয় করুন। ইনি দিতে চাচ্ছেন এমন আসবার, যা চিরস্থায়ী তো হবেই, রং-এর বৈচিত্র্যে ও গঠনের নৈপুণ্যে আপনার আভিজাত্যই প্রকাশ করবে। বিজ্ঞাপনই বলছে মিষ্টান্নযোগ আজকাল আপ্যায়নের শেষ পদ নয়। অতিথি আপ্যায়নে বেতার ভোজেরও প্রয়োজন। সহজ কিস্তিতিও বিজ্ঞাপনের নবতম আবিষ্কৃত রেডিও গ্রাহক যন্ত্র চান, পাবেন। সর্ব্বনিম্ন খরচায় ঘরের আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রের সন্ধানও পাবেন বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে।

আপনার মাথা ব্যথা করে না তো? না করলে আপনাকে ভাগ্যবান বলব। সর্দ্দি-জ্বর ঠিক না হলেও, মাথাধরা মাংসপেশীর ব্যথা আজকাল প্রায় নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। নিত্য নৈমিত্তিক অসুখের ওষুধ সস্তা অথচ কার্যকরী হলেই ভাল হয় না কি? বিজ্ঞাপন পড়লেই জানতে পারবেন কোথায় পাওয়া যায়, উপযুক্ত পরিমাণে কয়েকটি অত্যন্ত ফলপ্রদ বেদনা নিবারক ওষুধের সমন্বয়ে তৈরী নিরাপদ ও নিশ্চিত ভাবে আরামদায়ক ভেষজ। বিশেষ পানীয় যা পান করে শয়ন করলে আরামে ঘুম যাবেন, প্রত্যূষে তাজা হয়ে উঠবেন, তার সন্ধানও বিজ্ঞাপনে রয়েছে।

সিনেমাশিল্পই বোধ হয় সর্বাপেক্ষা অধিক বিজ্ঞাপন ছাপায়। চলচ্চিত্রের বিজ্ঞাপন বিভাগ দিচ্ছে এমন ছবি যাতে রয়েছে মানবিক আবেদন, সাধারণ ছবির মান দিয়ে যার বিচার করা যায় না, যা অমুক সহরে মাসের পর মাস চলছেই। এরপর প্রযোজক বলছেন, "রাশিয়া ছাড়ছে মহাকাশে ক্ষুদে চাঁদ, সিনেমা গগনে আমাদের ক্ষুদে নক্ষত্র দেখুন"—শিশু অভিনেতার ওপর বিজ্ঞাপন।

আপনার পেশা যাই হোক্, সময়ের জ্ঞান থাকা অনিবার্য; আর ঘড়ি আপনাকে সময় সম্বন্ধে সচেতন রাখে, তাই ঘড়িওয়ালা বিজ্ঞাপনে বলছেন "জলে পড়ুক, আঘাত লাগুক, বা চুম্বকের সংস্পর্শে আসুক আমাদের ঘড়ি ঠিক সময়ই দেবে; পৃথিবীতে এর চাহিদাই সবচেয়ে বেশী।"

আপনি কি মনে করেন বিজ্ঞাপনে ব্যবহৃত বিশেষণের বহর আপনার বিচারশক্তি ধাঁধিয়ে দেয়, কি কিনবেন কি কিনবেন না ঠিক করে উঠতে পারেন না? যাই হোক্ বিজ্ঞাপনদাতাকে সন্দেহ কোরবেন না, কারণ বার বার খোলাখুলি না বলে দিলেও উৎপাদক ও দোকানদারের শাশ্বত প্রস্তাব রয়েছে "পরীক্ষা প্রার্থনীয়"।

—সুধাংশু ঘোষ

সঙ্গীতশিল্পী শরৎচন্দ্র

স্বনামধন্য সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রকে লোকে অন্যতম কথাশিল্পী বলেই জানে। সাহিত্যিক হিসেবে পৃথিবীময় তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে আছে। কিন্তু সঙ্গীতজ্ঞ শরৎচন্দ্রের পরিচয় কেউই জানেন না। তাঁর সাহিত্যের প্রতিভা তাঁর অন্য যে কোন গুণকে ম্লান করে রেখেছে। অনেক খ্যাতিমান প্রতিভাবান ব্যক্তির ক্ষেত্রেও এ কথা সত্যি। এক বিষয়ের শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্ব তাঁদের অন্য গুণাবলীকে লোক-চক্ষুর আড়াল করে রাখে।

শরৎচন্দ্র গান জানতেন। তাঁর জীবনী থেকেই আমরা এ তথ্যের সন্ধান পাই। যদি তিনি সাহিত্যচর্চ্চা না করে জীবনব্যাপী সঙ্গীত সাধনাই করতেন—তা' হলেও মনে হয় তাঁর অতুলনীয় প্রতিভা বলে তিনি একজন শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞ হিসেবে অমরত্ব লাভ করতে পারতেন। কিন্তু ভগবান তাঁকে পাঠিয়েছিলেন ভিন্ন ক্ষেত্রে ফসল বুনতে। ভিন্ন মালঞ্চের মালাকর হ'তে। তাই আমরা পেয়েছি অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রকে, সঙ্গীতশিল্পী শরৎচন্দ্রকে নয় এবং সেদিক থেকে আমরা কম লাভবান হইনি।

শরৎচন্দ্রের গান-বাজনার প্রতি ঝোঁক হয় প্রবেশিকা পরীক্ষার পর। সেই সময় তিনি রাজুকে (তাঁর উপন্যাসের ইন্দ্রনাথ) সঙ্গিরূপে লাভ করেন। রাজুর সংগে মেশবার ফলে তাঁর এ্যাডভেঞ্চারের আকর্ষণ প্রবল হয়ে ওঠে। রাজুর সংগে মেশবার আর একটা প্রবল আকর্ষণ ছিল গান-বাজনা শেখা। তিনি বাঁশী সাধতে সুরু করলেন। কিন্তু বাড়ীতে এ সবের ভীষণ অসুবিধা। তাই ঠিক করলেন একটা ভুতুড়ে বাড়ী। বাড়ীটাতে ভূতের ভয় ছিল বলে কেউ ঢুকতে সাহস করতো না। কাজেই সাধনার খুব সুবিধা হোল। রাজু ও শরৎচন্দ্রের ও সব ভূতের ভয়টয় ছিল না। সেই ভূতের বাড়ীর একধারে ছিল গঙ্গা আর তার তীরে ছিল গুলঞ্চমদনের কাঁটাবন। সূর্য্যের আলো সেখানে ঢুকতো না। লোকেও মাড়াত না সেই জঙ্গল। ঐ জায়গাটি ছিল শরৎচন্দ্রের ভারী প্রিয়। ঐ বনের তিনি নাম দিয়েছিলেন তপোবন। কাউকে না বলে ঐ বনে ঢুকে তিনি আপন মনে বাঁশী বাজাতেন।

শরৎচন্দ্রের এই রকম সঙ্গীতপিপাসায় ও তাঁর নানা খামখেয়ালীতে বিরক্ত হয়ে তাঁর পিতা তাঁকে একবার ভৎসনা করেন। যার ফলে অভিমান করে শরৎচন্দ্র সন্ন্যাসীর বেশে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়েন। নানা জায়গা ঘুরতে ঘুরতে তিনি মজঃফরপুরে হাজির হন। সেখানকার লোকের প্রথমে তাঁকে বাঙালী বলে চিনতে পারেন নি। তাঁর হাবভাব বেশভূষায় তাঁকে বাঙালী বলে ভুল হয়েছিল। সেখানে তিনি এক ধর্ম্মশালায় উঠেছিলেন। তিনি রাত্রে সেই ধর্ম্মশালার ছাদে বসে গান করতেন। সেখানেই শ্রদ্ধেয়া অনুরূপা দেবী ও তাঁর স্বামী শ্রীশিখরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংগে তাঁর পরিচয় হয়। তাঁরা গান শোনবার জন্য শরৎচন্দ্রকে তাঁদের বাড়ীতে নিয়ে আসেন। শরৎচন্দ্র সেখানে অতিথিরূপে কিছুদিন ছিলেন। কিছুদিনের মধ্যেই স্বভাবগুণে তিনি মজঃফরপুরে বেশ পরিচিত হয়ে ওঠেন ও শীঘ্রই সেখানে একটি স্থান গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন একজন আসর-জমাটি লোক, সেরা বৈঠকী গল্প বলিয়ে। গানে, গল্পে ও রসালাপে তিনি সকলকে আনন্দে ভরপুর করে রাখতে পারতেন। কাজেই তাঁর এই মধুর স্বভাব যে কোন সময়ে লোকের চিত্ত জয় করতে ও প্রিয় হয়ে উঠতে তাঁর দেরী হত না। মজঃফরপুরে থাকাকালীন তিনি লিখতেনও। 'শ্রীকান্তে'র কুমার সাহেবের চরিত্র ঐখানকার জমিদার মহাদেব সাহুকে দেখেই তিনি এঁকেছিলেন। লেখার কথা বাদ দিলেও গান তিনি এতই অপূর্ব্ব গাইতেন যে কেউ তাঁকে ভুলতে পারেনি মজঃফরপুরে, বিশেষ করে শ্রীঅনুরূপা দেবীর স্ব... শিখরনাথ বাবু। এ সব কথা জানা যায় শ্রীঅনুরূপা দে... লেখা থেকে।

শরৎচন্দ্র যখন রেঙ্গুনে থাকতেন সে সময় রেঙ্গুনে 'বেঙ্গলী সোশ্যাল ক্লাব' নামে বাঙালীদের একটি প্রতিষ্ঠান ছিল। সেখানে প্রতি সন্ধ্যায় সঙ্গীত, সাহিত্য, নাট্যকলা, আবৃত্তি, অধ্যয়ন, খেলাধূলা ইত্যাদির চর্চ্চা হত। শরৎচন্দ্র ছিলেন এই ক্লাবের একজন বিশিষ্ট সভ্য। আগে ওস্তাদ ভাইয়েরা সেখানে আসর জমিয়ে রাখতেন। শরৎচন্দ্র আসবার পর তাঁরা বর্জিত হলেন। সেখানকার প্রধান গায়ক হলেন—শরৎচন্দ্র। ঐ সময় রেঙ্গুনে ঐ ক্লাবের পক্ষ থেকে কবিবর নবীন সেনকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। সেই সভায় উদ্বোধনী সংগীত করেন শরৎচন্দ্র। নবীনচন্দ্র সে গায়ককে ভুলতে পারেন নি। তিনি শরৎচন্দ্রকে 'রেঙ্গুন-রত্ন' উপাধি দিয়েছিলেন এবং আলাপ করতে চেয়েছিলেন তাঁর সংগে। কিন্তু লাজুক শরৎচন্দ্র সভা ছেড়ে পালিয়েছিলেন—লজ্জায় দেখা করেন নি।

আজকাল রবীন্দ্রনাথের গানের প্রচলন বেড়েছে। রবীন্দ্র-সঙ্গীতের স্বরলিপিও সহজলভ্য হয়েছে! কিন্তু ঐ সময়েই শরৎচন্দ্র রবীন্দ্র-সঙ্গীত ভাল রকম জানতেন, এবং রবীন্দ্রনাথের দেওয়া নিঁখুত সুরে গাইতেন। এছাড়া বৈষ্ণব পদাবলী, কীর্ত্তন, ভজন, মহাজন রচিত দোঁহা প্রভৃতিও অত্যন্ত দরদী গলায় গাইতেন শরৎচন্দ্র।

কোন ধরণের গান কি রকম চর্চ্চা করতেন শরৎচন্দ্র, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের চর্চ্চা করতেন কি না—এ সব খুঁটিনাটি কথা ও তাঁর সঙ্গীত সাধনার আরও বিস্তৃত ইতিহাস বিশেষ কিছুই প্রকাশলাভ করে নি সাধারণের কাছে। কারণ তাঁর এ গুণাবলীর আলোচনা কেউই তেমন করেন নি, যেমন তাঁর সাহিত্যে আলোচনা করে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপণ করেছেন। তবু আমাদের জানতে ইচ্ছে করে নাকি সঙ্গীত শিল্পী শরৎচন্দ্রের কথা। ভাবতে ভাল লাগে নাকি কল্পনায়—খ্যাতিমান হয়ে ওঠবার প্রায় পূর্ব্বে স্বামী বিবেকানন্দের মত কোন ঘরোয়া আসরে